নিশাচরের

কয়েকখানি যুগান্তকারী রহস্য-উপন্যাস

কুন্তীবাঈ

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

রামবাড়ি

॥ চার টাকা ॥

সুলতার বিয়ে

॥ চার টাকা ॥

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪॥০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

কল্যাণী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ১২

জরাসন্ধ

একাধারে দরদী স্রষ্টা ও কুশলী শিল্পী। তারই পরিচয় বহন করছে তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস

আবরণ

দাম—৩৷৷০

কথাকলি কলিকাতা-৯ | ত্রিবেণী প্রকাশন কলিকাতা-১২

বিলিতি ছড়া ও শারদীয়া ছড়ার অসামান্য সাফল্যের পর শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শ্রীসুকমল দাশগুপ্তের নূতন বই

—ঘুম ভাঙানো ছড়া—

প্রাণ মাতানো ছন্দে দেশের শিল্প বিপ্লব নিয়ে এ ধরনের বই শুধু বাঙলার শিশুসাহিত্যে নয়—পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যেই বিরল।

খোঁজ করুন :

১। ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং
৬৫।২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

২। জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী এভেনিউ
কলিকাতা—২৯

(সি ১৬৮৯)

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত উক্ত বিষয়ের গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা ও শক্তি-সাধনার আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দুই শতাধিক পদকর্তা হইতে প্রায় চার হাজার পদের টীকা, ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। একটি গ্রন্থে পদাবলী সাহিত্যের সার সংরক্ষিত। [২৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত বহু সুন্দর চিত্রাবলী সহ অনিন্দ্য প্রকাশন। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস মোট ছয়খানি একত্রে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯৲]

সা হি ত্য স ং স দ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা—৯

আমাদের বই সর্বত্র পাইবেন / পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

OMEGA

Seamaster

Steel Automatic—Rs. 520/-

ROY COUSIN & CO.

4, Dalhousie Sq. Calcutta-1

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

গোরা কালার হাট

গোরা কালার হাট: অশোক গুহ। **গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,** ১১এ, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য ৮·৫০ নঃ পঃ।

একালের বাংলা উপন্যাস বিষয়বস্তু ও রূপকর্মের বিচিত্র পথে পদসঞ্চার করেছে। ভৌগোলিক পরিধির বিস্ময়কর আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক পটভূমির সংকীর্ণ গলিপথের কৌতূহলী অনুসন্ধান যেমন এর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে, তেমনি এর ফর্ম ও টেকনিক নিয়েও নূতন নূতন পরীক্ষা চলেছে। অশোক গুহের সাম্প্রতিক উপন্যাস "গোরা কালার হাট" পড়তে পড়তে এই কথাই মনে হলো। উপন্যাসখানির পটভূমি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ। যুগসন্ধির জটিলাবর্ত ও বিচিত্র প্রবাহে এর নায়ক-নায়িকারা স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে এসে একই উপকূলে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। সুতার নেশা আর ধুম্রজালের মধ্যে ধলা বেনিয়া জব চার্ণক দুপুরের রোদে যে আজব শহরের কল্পনা করেছিলেন, তারই রূপ রচিত হয়েছে গোরা আর কালার বিচিত্র জীবনচর্যায়, কান্নাহাসির বিচিত্র কাহিনীতে। পার্ব-বাংলা থেকে হার্মাদদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাঙাম নৌকায় চড়ে এসেছে মকরন্দ গুহ, রেভারেণ্ড জন স্মিথের অবৈধ সন্তান মেরী লণ্ডন থেকে ভাগ্যচক্রে আবার এই নালা-নর্দমার সহরেই ফিরে এলো, ফারসীনবীশ লাডলীমোহন পিতার দুষ্টাচরণে বিরক্ত হয়ে চার্ণকের সহরেই আশ্রয় খুঁজে পেলো, উত্তরখণ্ড থেকে এই জনস্রোতের সঙ্গে মিশলো রাণী ভবানীর এই আশ্রিত প্রজা হরানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপাট খড়দহ থেকে রাজানবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত বাগেশ্বর শর্মার গৃহিণী হয়েছে ভাগ্যতাড়িতা চাঁপালতা, সুজামুঠা পরগণার পিতু নায়েক যে রাজ প্রধানের নুনের কারবারের প্রধান সহায় ছিল, সেও এখানে এসেছে মহারাজ নন্দকুমারের খানসামা হয়ে, আর এসেছে ত্রিবেণী থেকে রক্তমুখী নীকা নিয়ে নীলাম্বর পালি।

সে যুগের রীতিনীতি, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নানা উপকরণ দিয়ে উপন্যাসটিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। সেই যুগের মর্মবাণীকে লেখক সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপাদান ও উপকরণের জন্য তাঁকে শ্রমনিষ্ঠ গবেষণারও আশ্রয় নিতে হয়েছে। অথচ কাহিনীরস ও গল্পপ্রবাহ কোথায়ও খণ্ডিত হয়নি। সাতটি কাহিনীর স্রোত মিশেছে এক গর্জমান মহাসমুদ্রে। প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে সাতটি কাহিনী স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে এই সপ্তকাহিনী কিভাবে একই ধারায় মিলিত হয়েছে। নন্দকুমারের ফাঁসির ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্রকে অবলম্বন করে এই চরিত্রগুলি তাদের অজ্ঞাতসারেই ইতিহাসের অঙ্গীভূত হল। নবম, দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে সেই ঐতিহাসিক বিপর্যয়েরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনী। মন্থরগতি উপন্যাসের দীর্ঘকাহিনীসূত্র বয়নে, বর্ণময় বর্ণনায় ও কথারস বিস্তারের কৌশলে লেখকের নৈপুণ্য সুপরিস্ফুট। চরিত্রগুলির গভীর রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। হরানন্দের মেজবৌঠান, কৃষ্ণরঙ্গিনী, রাজ প্রধানের ভাতিজা 'ময়না', আর্মানী মেয়ে মারিয়ন প্রভৃতি কয়েকটি স্বল্পরেখ চরিত্র অবিস্মরণীয়। নন্দকুমারের ব্যক্তিত্ব ও সৌম্য-সুন্দর আভিজাত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির একটি কেন্দ্রসংহতি আছে, কিন্তু তা তেমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। সাতটি কাহিনী সাতটি দ্বীপের মতো জেগে আছে। খণ্ড কাহিনীগুলির রসই উপন্যাসটির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। খণ্ড খণ্ড 'এপিসোড'গুলি তেমনভাবে কেন্দ্রবদ্ধ হতে পারেনি—মাঝে মাঝে যে ফাঁক আছে তা তেমনভাবে ভরাট হয়নি। লেখক অবশ্য এই উপন্যাসের মর্ম সম্পর্কে অসবার্ট সিটওয়েল-নামধারী বৈলাতিক মুনির" মতবাদের পক্ষপাতী। 'উপন্যাস ফর্মহীন'—এই মত স্বীকার করে নিয়েছেন লেখক। কিন্তু ফর্মহীনতার মধ্যেও একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য ও সমগ্রতা থাকে। আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঐক্য তেমন ঘনবদ্ধ নয়। খণ্ড কাহিনীগুলিই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, স্টাইলের পরিমার্জিত লাবণ্য, কথারসের মনোহারিত্ব ও চরিত্রসৃষ্টির মৌলিকতা উপন্যাসটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাল্পনিক হলেও ইতিহাস-বিরোধী নয়, দেশকালের বিচিত্র উপকরণ দিয়ে তাদের ইতিহাস-সম্ভাব্য করে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের জটিল যুগাবর্তের পটভূমিকায় লেখক যে কিস্‌সা - কাহিনী - ইতিহাস শুনিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। প্রকাশকও গ্রন্থপ্রকাশ ব্যাপারে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। (২৮৬)

২৬শে নভেম্বর ১৯৬১ তারিখের "যুগান্তর" পত্রিকায় শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়।

সূচিপত্র

সূচীপত্র

কেশবিন্যাসে
বসন্ত মালতী
কেশ তৈল
আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত
সি, কে, সেন এণ্ড
কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা-১২

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 23rd December 1961

২৯ বর্ষ ॥ ৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৭ই পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

সাহিত্য-সম্মেলন

কলকাতার সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানে এ-সময়টায় প্রতিবারই দেখা দেয় পৌষের পাকা ফসলের সমারোহ। তার উপর এবার কলকাতায় তিন তিনটি সর্ব-ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশন ২৩ থেকে ২৫শে ডিসেম্বর; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারতীয় হিন্দী পরিষদের অধিবেশন ২৯ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, আর গুজরাটী সাহিত্য সম্মেলন [illegible] ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী। [illegible]দ্র জন্মশত-বর্ষের সমাপ্তি পর্বে কল[illegible]তায় গুণীজন সম্মেলনের এই ত্রিবিধ [illegible]দ্যোগ খুবই সময়োচিত এবং অভিনন্দনীয়।

মনীষীরা বলেন, সাহিত্যের কোন দেশকালগত আঁটসাঁট সীমানা নেই, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কখনই সীমান্ত-সচেতন নয়। যার মানে কাব্য উপন্যাস নাটক ইত্যাদি যে ভাষাতেই রচিত হোক না কেন তার রসবস্তুর আবেদন সর্বজনীন। আদর্শ হিসেবে সাহিত্যের এই সর্বজনীন মানবিক তাৎপর্য সাধারণত আমরা সকলেই স্বীকার করি। যে-কারণে য়ুরোপের নানা দেশের নানা ভাষায় রচিত সাহিত্যের বিচিত্র রসাস্বাদনে আমাদের আগ্রহ অপরিসীম, যত্নের অভাব নেই। য়ুরোপের কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী, এখনও য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবনা, চেতনা এবং কলাকৌশল আমাদের সাহিত্যিক প্রয়াসের অংগীভূত হচ্ছে। এর ভাল-মন্দ বিচার অন্য কথা। আপাতদৃষ্টিতে যে জিনিসটা বিস্ময়কর, এমন কী পীড়াদায়ক সেটা হল য়ুরোপীয় সাহিত্য-শিল্পের প্রতি আমাদের অনুরাগ যে-পরিমাণ গভীর প্রায় ঠিক সেই পরিমাণেই প্রকট আমাদের নিজেদের বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির পরস্পর বিরাগ অথবা উপেক্ষা কিম্বা উদাসীনতা।

সাহিত্যিক সীমান্ত-সচেতনতা যে সুস্থ নয়—না দেশের পক্ষে, না সাহিত্যের পক্ষে—একথা যুক্তি হিসেবে সাহিত্যসেবীরা প্রায় সকলেই মানবেন। বিভিন্ন ভাষার পার্থক্য, প্রকৃতিগত তারতম্য এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনায় আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু ভাষাগত পার্থক্য স্বতই ভাষা বিরোধের জন্ম দেয় না, কোন ভাষার শ্রেষ্ঠত্বও তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। য়ুরোপের নানা দেশের নানা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও সহ-অস্তিত্ব যদি সম্ভব হতে পারল, আমাদের দেশের চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেই বা সেটা সম্ভব হচ্ছে না কেন? জানি এ প্রশ্নের পূর্ণ সদুত্তর বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী কিম্বা অন্য আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যসেবীরা দিতে পারেন না। কারণ ভাষা বিরোধে সাহিত্যিকরা পাকেচক্রে অস্পবিস্তর জড়িত হয়ে পড়লেও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর পরস্পর-বিরোধিতার উৎস সাহিত্য নয়, রাজনীতি। "মাই কান্ট্রি, রাইট অর রং" যেমন উগ্র জাত্যাভিমানের জনক তেমনি "আমার ভাষাই এক এবং অদ্বিতীয়" এই অহমিকা থেকে ভাষা-বিরোধের উৎপত্তি।

হিন্দীর সংগে বাংলার, বাংলার সংগে গুজরাতীর অন্তরঙ্গতা স্থাপনে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্তত কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ঘটবার যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। এককালে এই কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র থেকেই হিন্দী-চর্চার আয়োজন বিস্তৃত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার উদ্যোগকে সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি এবং ভাষাগত অহমিকা আর যেখানেই হোক, বাংলাদেশে প্রশ্রয় পায়নি। ভারতের নবজাগৃতির প্রথম পর্ব থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির সুযোগ পেয়েছে; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাধরদের কৃতিত্বগুণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব সমৃদ্ধি এবং বাংলাসাহিত্যের সে-সমৃদ্ধি হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বকে তা বলে অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যের মর্যাদাহানিকর মনে করার কারণ নেই। হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠি, বাংলা প্রভৃতি সবগুলি আঞ্চলিক ভাষাই নিজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহৎ ও বৃহৎ সংকল্প সাধনে নিযুক্ত থাকুক, বহুভাষী ভারতকে এক সূত্রে গ্রথিত করুক পরস্পর সহযোগিতায়, সহিষ্ণুতায় — আমাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সর্বজনীন আদর্শ এই রকমই হওয়া উচিত। জনসংখ্যার অনুপাত হিসাব করে অথবা ভোটের জোরে রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা চেষ্টার মত মূঢ়তা আর কিছুই হতে পারে না।

ভাষা ও সাহিত্যের সীমানা নিয়ে বিরোধের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের জনজীবনের বৈচিত্র্য আমাদের সাহিত্যসেবীদের কাছে, সাহিত্যরসপিপাসুদের কাছে প্রায় অনাবিষ্কৃত রয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সাহিত্যের সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যকৃতির সংগে আমাদের পরিচয়ে বাধা ঘটছে না, য়ুরোপীয় সাহিত্যের সর্বাধুনিক প্রয়াস সম্পর্কেও আমাদের সাহিত্যসেবীরা নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন। অথচ প্রতিবেশীর ভাবনাচিন্তা শিল্পসৌষ্ঠবের পরিচয় অজ্ঞাতপ্রায়। উপেক্ষা, উদাসীনতা, অথবা বিরূপতা, একে যাই বলি না কেন, আমাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির মধ্যে এই যে ব্যবধান রচিত হয়েছে, তার ফলে জাতীয় চেতনা অনেকাংশে খণ্ডিত এবং ভাষাবিরোধ অমীমাংসিত। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্যসেবীদের মধ্যে পরস্পর ভাববিনিময়ের দ্বারা এ অবস্থার প্রতিকার কতখানি সম্ভব বলা কঠিন। বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে মিলিত হওয়ার কিছু পরিমাণ সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। তবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যরসপিপাসুগণ যাতে নিজ নিজ ভাষা ছাড়াও, অন্যান্য ভাষার সাহিত্য-সম্ভারের সংগে পরিচিত হতে পারে, সেজন্য সুপরিকল্পিত উদ্যোগ বাঞ্ছনীয়। ভাষার গণ্ডী অতিক্রম করে পরস্পর অন্তরঙ্গতা ও শ্রদ্ধার অনুশীলনেই সাহিত্যের সর্বজনীনতা আমাদের দেশে বিস্তৃত হতে পারে।

গ্রীষ্টমাস সমাসন্ন
হে সান্তাক্লস, গ্রীষ্টমাসের উপহার স্বরূপ গোয়া আমাকে দাও
পাকিস্তান পর্তুগালকে ভাড়াটে সৈন্য সরবরাহ করবে।
ঘোলা জলে মাছ ধরা।
ভারতের সমস্যাবলী
ন্যাটো পরিষদ বার্লিন সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেছে।
পুলিস রাস্তা ছেড়েছে
ন্যাটো
কাতাঙ্গায় বৃটেনের সেই পুরাতন খেলা।
ঝোলা থেকে বেরোলো বিড়াল
কঙ্গোনীতি
কায়েমী স্বার্থ

বৈদেশিকী
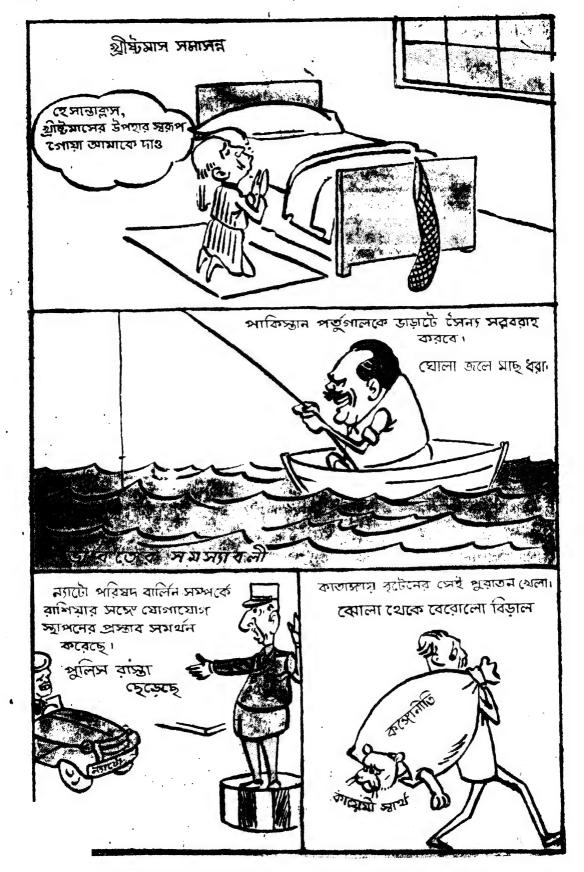
সতেরোই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে ভারতীয় ফৌজ গোয়া, দামান এবং দিউতে প্রবেশ করেছে। দামান এবং দিউতে পর্তুগীজদের দিক থেকে বস্তুত কোনো বাধা দেবার চেষ্টা হয়নি। গোয়াতে কিছু সংঘর্ষ হয়েছে। অবশ্য দুপক্ষের শক্তির পরিমাণে এতো পার্থক্য যে ভারত সরকার যে এটাকে "পুলিস অ্যাকশন" বলছেন কথাটা সেদিক দিয়েও খাটে। এই প্রবন্ধ ছাপা হবার পূর্বেই গোয়া সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ফৌজের দখলে চলে আসবে বলে ধরে নেওয়া যায়। ইতি-মধ্যে অবশ্য পর্তুগাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে নালিশ জানিয়েছে এবং সিকিউ-রিটি কাউন্সিলে বিষয়টি আলোচনার যোগ্য বলে গৃহীত হয়েছে। সিকিউরিটি কাউন্সিলকে দিয়ে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেওয়াবার চেষ্টা অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে সেরকম নির্দেশ আসার আগেই বোধহয় ভারতীয় ফৌজ তাদের যা করার শেষ করে ফেলবে অর্থাৎ গোয়ার কোথাও পর্তুগীজ কর্তৃত্বের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে একটা যুদ্ধবিরতির নির্দেশ বার না হওয়া পর্যন্ত পর্তুগীজ শক্তি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করে কোনো-রকমে একটু অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে কিন্তু সে চেষ্টা সফল হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য মামলা চালাবার জন্য পর্তুগীজরা আত্মসমর্পণ করেও হয়ত বলতে থাকবে যে তারা আত্মসমর্পণ করে নি। ভারতীয় ফৌজের বিরুদ্ধে তারা লড়ে যাচ্ছে। অন্যপক্ষে পর্তুগীজ বাধা সম্পূর্ণ-ভাবে নিঃশেষ হবার আগে যদি সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ আসেও তাহলেও ভারতীয় ফৌজ যে তাদের আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ না করে ক্ষান্ত হবে তা মনে হয় না। গোয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত করার সময়ে এসব কথা ভারত সর-কার নিশ্চয়ই চিন্তা করেছেন এবং দরকার হলে সিকিউরিটি কাউন্সিলের নির্দেশ একটু আধটু অমান্য করার জন্য প্রস্তুত হয়েই ভারত সরকার এ পথে অগ্রসর হয়েছেন। সুতরাং সিকিউরিটি কাউন-সিলের কোন নির্দেশ গোয়ায় ভারত সর-কারের "পুলিস অ্যাকশন" বাধাপ্রাপ্ত হবে এরূপ সম্ভাবনা নেই।

ভারতভূমি থেকে বিদেশী শাসনের কলঙ্ক নিঃশেষে দূর হওয়ায় সকল ভারত-বাসীই আনন্দিত হবে কিন্তু গোয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতি অর্থহীন ছিল না এবং আজও বিশেষরূপে সতর্ক না

হলে সেই নীতি ভ্রান্তপথে যাবার সম্ভাবনা আছে একথা মনে রাখা দরকার। সেইজন্য গোয়ামুক্তির আনন্দের দিনেও ভারত সরকারের কার্যধারার প্রতি দেশবাসীর সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বলপ্রয়োগের দ্বারা পর্তুগীজদের বিতাড়নকে যাঁরা অন্যায় বলে মনে করেন না তাঁদের মধ্যেও অনেকের মনে এই ব্যাপারে সরকারের নীতি পরিচালনার নানা দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। যে-বলপ্রয়োগ সরকার শেষ পর্যন্ত করলেন তার জন্য এতদিন অপেক্ষা করার কী আবশ্যকতা ছিল এবং এখন না করে কয়েক বছর আগে করলে সেটা দেশের পক্ষে ভালো হত কিনা—এসব কথা গত সপ্তাহে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। ভারত সরকার অনেক সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হলেন—একথা আজ বলা যেমন শোভন কয়েক বছর আগে বলাও তেমনি শোভন হত।

গোয়ায় পর্তুগীজদের নৃশংসতা ১৯৫৫ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে কি কিছু কম ছিল? পর্তুগীজরা যখন নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের গুলী করে মারছিল তখন ভারত সরকার সেটা কেমন করে সহ্য করলেন? সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ভারত সরকার একদিকে বলতে লাগলেন যে গোয়া ভারতভূমির অন্তর্গত, সেখান থেকে পর্তুগীজ শাসন অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ থাকবে এবং অন্যদিকে বলতে লাগলেন, গোয়ার মুক্তিলাভ গোয়াবাসীদের নিজেদের চেষ্টার দ্বারাই করতে হবে। অথচ একথা সকলেরই জানা যে গোয়ার অধিবাসীরা যতই মুক্তিকামী হোক এবং তার জন্য তারা যতই চেষ্টিত হোন ভারত এবং ভারত সরকারের সাহায্য ছাড়া পর্তুগীজকে তাড়ানো অসম্ভব। এবার যখন ভারত সরকার বলপ্রয়োগের সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন তখনও আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করছেন যে, গোয়ার মুক্তি গোয়াবাসীদের সাধনার বস্তু, তবে গোয়ার মুক্তিকামীদের উপর পর্তুগীজরা যদি নৃশংস ব্যবহার করে তবে ভারত সরকার তা সহ্য করবেন না। এরকম তৃতীয় শ্রেণীর উকিলী ফাঁকিবাজির কথা বলা ভারতের সম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর। গোয়ার অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পর্তুগীজ শাসন ক্রমশ বিপর্যস্ত হয়ে আসছে, এই ধরনের সংবাদ কয়েক সপ্তাহ ধরে পাওয়া যাচ্ছিল। ভারত সরকারের ফৌজ গোয়ায় প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এটা যখন সুস্থির তখন গোয়ার অভ্যন্তরে মুক্তিকামী কর্মীদের দ্বারা পর্তুগীজ শাসনে বিশৃঙ্খলা ঘটানো কঠিন নয়। এ কাজে তাঁদের ভারত থেকে সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি কয়েক বছর আগেও হতে পারত।

১৯৫৫ সালের সত্যাগ্রহের সময়ে গোয়ার ন্যাশনালিস্ট আন্দোলন বর্তমানের চেয়ে কম শক্তিশালী ছিল একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। যে-পার্থক্য হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভারত সরকারের পরিবর্তিত

মনোভাব এবং কার্যধারার দরুণ হয়েছে। তখন ভারত সরকার কিছু করতে চান নি, বরঞ্চ প্রথম উৎসাহ দিয়ে পরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরই পথরোধ করেছিলেন। কিন্তু এখন ভারত সরকার বলপ্রয়োগের দ্বারা পর্তুগীজদের বিতাড়নের সিদ্ধান্ত করেছেন—এই হচ্ছে পার্থক্যের মূলে। তখন যদি ভারত সরকার সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হতেন তাহলে তখনও গোয়ার অভ্যন্তরে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে বিলম্ব হোত না। আসল কথা হচ্ছে যে ভারত সরকার বলপ্রয়োগের দ্বারা ভারতভূমি থেকে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসন দূর করে দিতে অগ্রসর হয়েছেন। এই কথাটা স্পষ্ট থাকা উচিত, আজেবাজে কথা এবং যুক্তির দ্বারা এর স্পষ্টতা ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়। বিদেশীদের একথা বলা যায় যে আমরা বহুদিন ধৈর্য ধরে থাকার পরে বলপ্রয়োগের পথ নিতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু দেশের লোক সরকারের কাছ থেকে আরো প্রশ্নের জবাব চাইতে পারেন। যথা, যদি বলপ্রয়োগই করতে হল তখন আরো আগে করা হল না কেন? যখন হয়ত প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ভারতের দুশ্চিন্তার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর ছিল। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করলে পর্তুগালের বন্ধুদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের ভয় পূর্বে ছিল এখন নেই—এ যুক্তিও চলবে না। বৃটিশ পার্লামেণ্টের আলোচনা থেকে জানা যায় যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ১৯৫৪ সালেই পর্তুগালকে বলে দিয়েছিলেন যে, পর্তুগালের পক্ষ হয়ে কমনওয়েলথ সদস্য ভারতের সঙ্গে লড়াই করা বৃটেনের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। বৃটেন তথা আমেরিকা ভারত সরকারের বর্তমান কার্যকে সমর্থন করছে না। আগে হলেও করত না কিন্তু পর্তুগালের হয়ে ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে এখন যেমন তারা আসছে না পূর্বেও আসত না। একথা ভারত সরকারের নিশ্চয়ই অজানা ছিল না।

ভারত কর্তৃক গোয়াতে সামরিক হস্তক্ষেপে বৃটেন, আমেরিকা এবং অন্য কয়েকটি পশ্চিমা শক্তি ক্ষুব্ধ হয়েছে। অন্য পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রের মুখপাত্রগণ ভারত সরকারের কার্যে সমর্থন জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে "কোল্ড ওয়ারের" স্পর্শ লাগার ভয় আছে, ভারত সরকারের সেদিক দিয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের কাজে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছে তাঁদের সকলকে পাইকারীভাবে ভারতের শত্রু, এবং যারা সমর্থন জানিয়েছেন তাঁদের একমাত্র মিত্র—এইভাবে বিতর্ক চালালে আমাদের ক্ষতি হবে। যাঁরা আজ শান্তির বাণী শোনাতে এতো উৎসুক তাঁরা এতদিন কী করেছিলেন, তাঁরা পর্তুগালকে পথে আনার জন্য কী চেষ্টা করেছেন, এ প্রশ্ন অবশ্যই করা যেতে পারে এবং করা উচিত, কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে পলিটিশিয়ানরা যাই করুন পৃথিবীর অনেক দেশেই সাধারণ লোকের মধ্যে ভারত সরকার সম্বন্ধে এরূপ একটা ধারণা জন্মেছিল যে সকলপ্রকার আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানই বিনা বলপ্রয়োগে করাই ভারতের অলংঘ্য নীতি। বছরের পর বছর পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতাদির দ্বারা এই ধারণা প্রকট হয়েছে। ভারতের কার্যে যাঁরা দুঃখিত হয়েছেন, বলছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের দুঃখ আন্তরিক তাঁরা গোয়ার সমস্যার প্রকৃতি ঠিক না বুঝলেও তাঁদের ক্ষোভের মূলে রয়েছে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব। সুতরাং যাঁরাই ভারতের কাজের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন তাঁদের সকলকেই শত্রু মনে না করে ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের ভারতের বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা থাকা আবশ্যক। পর্তুগাল সম্বন্ধে এতো বছর ধরে ধৈর্য ধরার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজ ভারতের কার্যে যাঁরা দুঃখিত তাঁদের সম্পর্কে কিছুটা ধৈর্য রেখে চলার প্রয়োজন আছে। ১৮।১২।৬১

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

রাজহংসের মরণগীতি

(৫)

গত প্রবন্ধে মস্কো যুদ্ধের বর্ণনা লেখার কালি শুকোতে না শুকোতে খাস মস্কো থেকে একটি চমকপ্রদ খবর এসেছে। মস্কো যুদ্ধের বিংশ বাৎসরিক স্মরণ দিবসে গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯৬১ খৃ) মস্কো শহরে মার্শাল রকসফস্কি তাস্ এজেন্সিকে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জর্মানরা স্থির করেছিল, মস্কোকে জলের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে সেটাকে সমুদ্রের মত করে ফেলবে। পরে যখন দেখা গেল টেকনিকাল কারণে সেটা সম্ভবপর নয় তখন তারা বোমা ফেলে সেটা ধ্বংস করার চেষ্টা দিল।

আমার মনে হয়, টেকনিকাল কারণে সম্ভবপর হলেও কৃত্রিম বন্যায় মস্কো ভাসিয়ে দেবার প্রস্তাবে হিটলার স্বয়ং রাজী হতেন না। তাঁর প্ল্যান ছিল, জর্মান সৈন্য মস্কো লুট করে গরম জামা-কাপড় এবং কিছু কিছু খোরাক পাবে—কিন্তু প্রধানত গরম জামা-কাপড় ও শীতের আশ্রয়ই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য, কারণ যুদ্ধ শীতের পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে মনে করে হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য সে-ব্যবস্থা করেননি। (এ স্থলে স্মরণ রাখা উচিত, জর্মানিতে কোনো কালেই উলের প্রাচুর্য ছিল না—জর্মানিতে চিরকালই তার জন্য নির্ভর করেছে প্রধানত স্কটল্যাণ্ডের উপর এবং মস্কোর দোরে যখন জর্মানরা আটকা পড়ে গেল তখন হিটলারকে বাধ্য হয়ে জর্মানির জনসাধারণের কাছে শীতবস্ত্রের জন্য ঢালাও আবেদন জানাতে হল)। কাজেই মস্কো শহরকে সমুদ্রে পরিণত করলে তাঁর কোনো লাভই হত না। এবং মনে পড়ছে, নেপোলিয়নের বেলাতে রুশরা নিজেই কাঠের তৈরী মস্কো শহর পুড়িয়ে খাক করে দেওয়ার ফলে তিনি মস্কোর শ্মশানভূমিতে তাঁর সৈন্যের জন্য এক কণা ক্ষুদ, ঘোড়ার জন্য এক রত্তি দানা পাননি। এবারে রুশরা সেটা চাইলেও করতে পারতো না, কারণ ইতিমধ্যে তাবৎ মস্কো শহর কনক্রিট আর লোহাতে তার বাড়িঘর বানিয়ে বসে আছে। সেটাকে পোড়ানো অসম্ভব।

কাজেই মস্কো জয় করে নেপোলিয়ন লাভবান হননি, কিন্তু হিটলার হতেন।

মার্শাল রকসফস্কি আরো বলেছেন, মস্কোবাসী এবং সেখানকার রুশ সৈন্যদল জর্মানদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব

করা সত্ত্বেও তারা সেটা গ্রহণ করেনি। এটা সত্যই অত্যন্ত চমকপ্রদ খবর। এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, কোনো নগর আত্মসমর্পণ করলে সেটাকে বে-এক্তেয়ার লুট-তরাজ করা যায় না।১

অবশ্য যে সব ভুলের ফলে হিটলার মস্কো দখল করতে পারলেন না, সেগুলো না করে মস্কো দখল করতে পারলে তিনি যে তারপর অন্য ভুল করে যুদ্ধ হারতেন না, সে কথা বুক ঠুকে বলবে কে?

• • •

সমস্ত জার্মানি যখন রুশ, ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয়ে গিয়েছে, রুশবাহিনী প্রায় তাবৎ বার্লিন দখল করে হিটলারের বুংকারের থেকে দু' পাঁচ শ' গজ দূরে, বুংকার সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, বার্লিনের বাইরে তাঁর সৈন্যদল ও সেনাপতিরা আত্মসমর্পণে ব্যস্ত তখনো হিটলার কিসের আশায় পরাজয় স্বীকার করছিলেন না? আত্মহত্যার ঠিক তিন মাস পূর্বে হিটলার তাঁর আদর্শ মানব ফ্রেডরিককে স্মরণ করে বলছেন,

'না। আর কোনো আশা নেই, এরকম পরিস্থিতি কখনো আসে না। জর্মানির ইতিহাসে আকস্মিক কতবার তার সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে সেইটে শুধু একবার স্মরণ করো। সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধে ফ্রেডরিক তাঁর নৈরাশ্য এবং দুরবস্থার এমনই চরমে পৌঁছেছিলেন যে, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি মনঃস্থির করেন যে, বিশেষ একটি দিনের ভিতর তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত না হলে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। ঐ স্থির করা বিশেষ দিনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে জারিনা হঠাৎ মারা গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন দৈবযোগে সমস্ত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। মহান পুরুষ ফ্রেডরিকের মত আমরাও কয়েকটি সমবেত শক্তির (কোয়ালিশনের) বিরুদ্ধে লড়ছি, এবং মনে রেখো, কোনো কোয়ালিশনই চিরন্তনী সত্তা ধরে না। এর অস্তিত্ব শুধু গুটি কয়েক লোকের ইচ্ছার উপর। আজ যদি হঠাৎ চার্চিল অবলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে তড়িৎশিখার ন্যায় এক মুহূর্তেই সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। ব্রিটেনের খানদানী মুরুব্বিরা সেই মুহূর্তেই দেখতে পাবে তারা কোনো অতল গহ্বরের সামনে এসে পড়েছে—এবং চৈতন্যোদয় হবে তখন।'

হিটলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন, মার্কিন এবং ইংরেজ একদিন না একদিন অতি অবশ্য বুঝতে পারবে, ওদের শত্রু জর্মানি নয়, ওদের আসল শত্রু রুশ। এবং সেইটে হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই তারা জার্মানির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করে, সবাই এক জোট হয়ে লড়াই দেবে রুশের বিরুদ্ধে। হিটলার আশা করেছিলেন, যেদিন মার্কিনিংরেজ জর্মানির কিয়দংশ দখল করার পর রুশের মুখোমুখি হবে সেইদিনই লেগে যাবে ঝগড়া, মার্কিনিংরেজ স্পষ্ট বুঝতে পারবে, রুশ কী চীজ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাবে। কিন্তু ঠিক সেইটেই হল না। বার্লিনকে বাইপাস করে রুশ এবং মার্কিনিংরেজ যখন মুখোমুখি হল তখন তারা সুবোধ বালকের ন্যায় আপন আপন গোঠে জমিয়ে বসে গেল।

এবং অদৃষ্ট হিটলারের দিকে শেষ মুহূর্তে কী নিদারুণ মুখ-ভেংচিই না কেটে গেলেন।

হিটলারের দুর্দশা যখন চরমে, তিনি যখন দিবারাত্রি আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্তনের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন, গোবেলস্ প্রভুর হৃদয়ে সাহস সঞ্চারের জন্য কার্লাইলের লিখিত 'ফ্রেডরিক দি গ্রেটের ইতিহাস' মাঝে মাঝে পড়ে শুনিয়ে যান, এমন সময় উত্তেজনায় বিবশ গ্যোবেলস্ প্রভুকে ফোন করলেন, "মাইন ফ্যুরার, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। নিয়তি আপনার পরম শত্রুকে বিনাশ করেছেন। জারিনা মারা গেছেন।'

এ স্থলে জারিনা অবশ্য রোজোভেল্ট ঃ তিনি মারা যান ১২ই এপ্রিল ১৯৪৫।

কিন্তু হায়, চার্চিল নয়, অদৃশ্য হলেন রোজোভেল্ট! তবু মন্দের ভালো। কিন্তু তার চেয়েও নিদারুণ হায়, হায়—রোজোভেল্টের মৃত্যু সত্ত্বেও মার্কিন তার সমরনীতি বদলালো না। হিটলার প্রতিটি মুহূর্ত গুনলেন অধীর প্রত্যাশায়—ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। আত্মহত্যা করলেন তার আঠারো দিন পরে। ফ্রেডরিককে করতে হয়নি।

• • •

এইবারে তাঁর শেষ ভবিষ্যদ্বাণী:

'জর্মানি হেরে গেলে, যতদিন না এশিয়া, আফ্রিকা এবং সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার ন্যাশনালিজমগুলো জাগ্রত হয়, ততদিন পৃথিবীতে থাকবে মাত্র দুটি শক্তি যারা একে অন্যকে মোকাবেলা করতে পারে—মার্কিন এবং রুশ। ভূগোল এবং ইতিহাসের আইন এদের বাধ্য করবে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা অর্থনীতি এবং আদর্শবাদের (ইডিয়লজিকাল) সংগ্রাম। এবং সেই ইতিহাস ভূগোলের আইনেই উভয় পক্ষই হবে ইয়োরোপের শত্রু। এবং এ বিষয়েও কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, শীঘ্রই হোক আর দেরিতেই হোক, উভয় পক্ষকেই ইয়োরোপের একমাত্র বিদ্যমান শক্তিশালী জর্মান জাতির বন্ধুত্বের জন্য হাত পাততে হবে।'

এর টীকা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় যে জর্মানিতেই হচ্ছে সে-কথা কে না জানে? আর আডেনাওয়ারের কণ্ঠস্বর যে ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠছে সেও তো শুনতে পাচ্ছি! এবং রুশ যে পূর্বজর্মানির মারফতে পশ্চিম জর্মানির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করতে উদ্‌গ্রীব, সেও তো জানা কথা!

(সমাপ্ত)

১। এর সঙ্গে তুলনীয় মার্কিন কর্তৃক হিরোশিমায় অ্যাটম বম প্রয়োগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্মানির পরাজয়ের পর জাপান নিরপেক্ষ সুইডেনের মারফতে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। মার্কিন সেটা গ্রহণ করলে হিরোশিমায় অ্যাটম বম ফাটিয়ে তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। তাই করেনি। করলো এক্সপেরিমেণ্টটা দেখে নিয়ে।

আকাশবাণী ও সাহিত্যিকেরা

সবিনয় নিবেদন,

গত ন' দশ বছরে আকাশবাণী আমাকে বহুবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং ছ' সাত-বার আমি তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। ফলে এই ছ' সাতটি গল্প—যা উৎকৃষ্ট গল্প হলেও হতে পারতো—নষ্ট করেছি দশ-পনেরো মিনিটের আওতায় আনার চেষ্টায়।

যে-হেতু গল্পের কপি রাখা শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ সেই হেতু 'বেতার জগৎ'-এর ওপর ভরসা রাখতে হয়েছে গল্পের কপি পাওয়ার জন্যে। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপি বেতার-কেন্দ্র থেকে হারিয়ে যাওয়ায় 'বেতার জগতে'ও ছাপা হয় নি, লোক পাঠিয়ে কপি করিয়েও আনাতে পারিনি এমন দুটি গল্প চিরতরেই বিলুপ্ত হয়েছে। অন্তত মৌখিক অনুসন্ধানে এ-কথাই জানানো হয়েছিল।

অথচ দক্ষিণা পেয়েছি অন্যান্য পত্রিকা যা দেন তার অর্ধেক। অবশ্য তার জন্যে আপীল পিটিশন করিনি, অভিযোগ আনিনি। তার চেয়ে অনেক সহজ সমাধান: চুক্তিপত্রটি পত্রপাঠ ফেরত পাঠানো।

রমাপদ চৌধুরী
কলকাতা

॥ ২ ॥

'দেশ' সম্পাদক সমীপেষু,

অবশেষে আকাশবাণীর স্বেচ্ছাচারী নিয়ন্ত্রণের শিকার হলেন বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা। এই সঙ্গে বোধ করি এই শিশুপালপ্রতিষ্ঠানটির শত অপরাধ সম্পূর্ণ হল। অতঃ কিম?

শ্রদ্ধেয় সংগীতশিল্পীদের প্রতি অবিচার, উত্তর-স্বাধীনতা যুগে আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্রগুলির অনুষ্ঠানসূচিতে পরি-কল্পিতভাবে ভারতের সরকারী ভাষার উগ্র-অনুপ্রবেশ, গীতিকারদের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার, বাংলা খেয়াল গানের ওপর নিষেধাজ্ঞার নির্দেশনা এবং সবশেষে সাহিত্যিকদের সহযোগিতামূলক ব্যবহারের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তাঁদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করানো—আকাশ-বাণীর এই কটি কীর্তিই বোধ করি প্রধান।

এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আমাদের সাহিত্যিকদের সর্বতোভাবে অকৃপণ দাক্ষিণ্য বোধ করি কর্তৃপক্ষের মনে এমন ধারণা এনে দিয়েছে যে সাহিত্যিকেরা বুঝি পরিপূর্ণভাবে বেতার-নির্ভরশীল; অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে আকাশবাণীই বুঝি বঙ্গদেশের সংস্কৃতি-নিয়ন্ত্রণকারী। নিয়ন্ত্রণ-কারী বললুম এই জন্য যে, যে কোন লেখা পঠিত হবার পূর্বে একজন Controller লেখাটিকে বীজাণুশূন্য করে নেন, অর্থাৎ অসনাতনীয় (শ্রীযুক্ত সন্তোষ-কুমার ঘোষ যা বলেছেন) বক্তব্য ও আঙ্গিক বর্জন করা হয়।
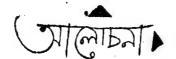
প্রথমে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও অধুনা বুদ্ধদেববাবুর ক্ষুব্ধ অভিযোগের পর এখন সমস্ত সাহিত্যসেবীরা তাঁদের অভিযোগ ব্যক্ত করতে উৎসাহিত বোধ করছেন। সুখের কথা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রতিবাদ হচ্ছে না। সাহিত্যিকদের এই অসম্মিলিত ও দ্বিধাগ্রস্ত রূপ আকাশ-বাণীর অজানা নেই। সাহিত্যিকদের অনুরোধ করি অন্তত তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত যেন 'ব্যক্তিগত মত'-এর অভিমান নিয়ে দূরে সরে না থাকেন।

কোন ব্যক্তির একক প্রতিবাদ বা একক-ভাবে আকাশবাণী বর্জনে আকাশচারী দেবতাদের যে কোন ক্ষতি হয় না শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর এককভাবে বেতার বর্জন তার অন্যতম উদাহরণ। ইতি

শ্রীবিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়
বর্ধমান

ভারতীয় সংহতি

শান্তিনিকেতন
১৫।১২।৬১

স্নেহাস্পদেষু,

সাগর, গৌহাটী থেকে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভূঞা জানিয়েছেন যে, "আসাম আমার দেশ" বলে আসামে কোনো জাতীয় সংগীত নেই তাঁদের একটা আনুষ্ঠানিক গীত আছে, তার প্রথম চরণটি তিনি তুলে দিয়েছেন।

অ' মোর আপোনার দেশ
অ' মোর চিকুনী দেশ
এনেখন সুজলা এনেখন সুফলা
এনেখন মরমর দেশ।

রাজেনবাবুকে ধন্যবাদ। তিনি প্রমাণ দিলেন যে, আসাম তাঁর আপনার "দেশ" তা হলে ভারত কী? ভারত কার দেশ?

স্নেহ জেনো। ইতি। শুভাকাঙ্ক্ষী

অন্নদাশঙ্কর রায়

রবীন্দ্র-কথা

সবিনয় নিবেদন,

দেশ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যাতে মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে লেখা সৈয়দ মুজতবা আলীর "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক রচনাটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ দৈনন্দিন জীবনেও যে কবিজনোচিত ব্যবহার করতেন তার উদাহরণস্বরূপ আলী সাহেব একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ভৃত্য বনমালী কবির জন্য এক গ্লাস সরবৎ এনে দেখে বাইরের কে বসে আছেন। বনমালী থেমে যাওয়াতে কবি বললেন, 'ওগো বনমালী দ্বিধা কেন?' পরে এই কবিতার মতো উক্তিটি তাঁর মনে এমনই চাঞ্চল্য তুললো যে তিনি সেদিনই গান রচনা করলেন,

"হে মাধবী দ্বিধা কেন,
আসিবে কি ফিরিবে কি,
আঙিনাতে বাহিরিতে
মন কেন গেল ঠেকি॥

এই গান রচনা এবং ভৃত্য বনমালীর আগমন, এই ঘটনাটির উল্লেখ আমরা নির্মল-কুমারী মহলানবিশ লিখিত "কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে" নামক বইয়েও পাই। কিন্তু সেখানে ঘটনাটির বর্ণনা একটু অন্যরকম। সেখানে নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখেছেন, "গানের কথা বলতে গিয়ে একটা মজার কথা মনে পড়ল। যেদিন সন্ধ্যেবেলা 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' শেখাচ্ছিলেন সেদিন হঠাৎ গানের মাঝখানে দেখি কবির পুরাতন ভৃত্য বনমালী কবির জন্যে এক প্লেট আইসক্রীম নিয়ে ঘরে ঢুকবে কিনা ইতস্তত করছে। একবার চৌকাঠের ভিতরে পা দিয়ে উঁকি মেরেই পরক্ষণে পাটা টেনে নিয়ে বারান্দায় ফিরে যাচ্ছে। বারকতক এইরকম করবার পর হঠাৎ কবির নজরে পড়বামাত্র তিনি বনমালীর দিকে ফিরে হাত নেড়ে গেয়ে উঠলেন, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন? ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন? আসিবে কি ফিরিবে কি দ্বিধা কেন?' বনমালী তো ততক্ষণে দে ছুট।" (পৃঃ ৯।১০)

এখানে স্বভাবতই মনে হয়, গানটি রবীন্দ্রনাথ আগেই রচনা করেছিলেন। কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর বর্ণনা পড়ে মনে হয়, গানটি রচনার মূলে ছিল কবির নিজেরই উক্তি 'হে বনমালী দ্বিধা কেন?'

আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কোন বর্ণনাটি ঠিক?

আরতি গোস্বামী
কলিকাতা

লেখকের বক্তব্য

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আমি যাঁর থেকে 'গল্পটি' শুনি তিনি এখন পরলোকে। কাজেই তাঁর দোহাই দিয়ে আর কোনো লাভ নেই।

ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত 'তথ্যটি'ও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "এখনও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনতে পাই, আমার রচনা সম্বন্ধে এই যেমন সেদিন—বললে, আপনি নাকি বনমালীকে দেখে লিখেছেন—হে মাধবী দ্বিধা কেন?' শুনে এমন মনের অবস্থা হল, না হয় সুদিন গেছেই, তাই বলে কি এমনই দুর্দশা হয়েছে যে, বনমালীকে দেখে গাইব—ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন?" (পৃঃ ১৮৬, ১৩৬৪ সংস্করণ)।

অতএব সমস্ত ব্যাপারটা 'রবিপুরাণের' অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

বাংলার গ্রাম

সবিনয় নিবেদন,

বাংলা দেশের গ্রাম সম্পর্কে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনা পড়লাম। নানা জরুরী কারণে এই আলোচনা দীর্ঘ, সুষ্ঠু ও ফলপ্রদ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

কিছুকাল আগে ব্যক্তিগত কারণে আমাকে নদীয়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার দূরবর্তী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। বাসে জীপে চড়ে গেছি, মাইলের পর মাইল হেঁটেছি, কখনো রাত্রিযাপন করেছি পূর্ব-পরিচয়হীন পল্লীমোড়লের বাড়িতে। গ্রাম আর গঞ্জ এবং অজপাড়াগাঁ দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তাছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কলকাতার বিত্তশালী সৌখীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। ড্রইংরুমে, নিশিপ্রমোদবাসরে, এমনকি শয্যাপার্শ্বেও। স্বয়ং মধ্যবিত্ত জাত হওয়ায় এই শ্রেণীর আশা, স্বপ্নভঙ্গ, যন্ত্রণা ও আত্মসর্বস্ব চেতনা আপন শোণিত-প্রবাহে অনুভব করি। সেজন্য আমার কিছু অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য আছে।

চার কোটি মানুষের দেশ পশ্চিম বাংলার একটিমাত্র শহর, কলকাতা। বর্ধমান বা কৃষ্ণনগরের সমৃদ্ধি পল্লীনির্ভর নয়, কলকাতা সম্পর্কিত কারণে। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, বহরমপুর, মেদিনী-পুর, সিউড়ি নিতান্তই মফস্বল শহর। না আছে জাঁক, না শিল্পগুরুত্ব। দার্জিলিং তো আলিপুর-বালিগঞ্জেরই আরেকটি বিকল্প পাড়া। হাজার হাজার মৃত গ্রামের মধ্যে শহর কলকাতার স্ফীতি পেটমোটা অথচ রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা চলে। হাড় বার-করা কোটরগত চোখের পেটমোটা মুমূর্ষু মানুষ প্রতি পল্লীতে অজস্র চোখে পড়বে। যোজনব্যাপী ফসলের মাঠের মধ্যে মাটির কয়েকটি দরিদ্র বাড়ি নিয়ে সেই সমস্ত গ্রাম। আট-দশটা গ্রামের মধ্যে একজন হাতুড়ে ডাক্তার, একটা ইস্কুল, দুটো কি তিনটে 'টিউকল'। হাসপাতাল ও থানার সুবিধা পেতে গেলে আরো অনেক বেশী গ্রাম নিয়ে এক একটা বৃত্ত আঁকতে হবে।

মাঠের ফসল, পালিত জীবজন্তু, ঈশ্বরের রোষ আর বহু জন্মের সঞ্চিত দুর্ভাগ্য নিয়ে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের কম্বলে জীবন মুড়ি দিয়ে এই সমস্ত মানুষ আয়ুর পথ হাঁটে। এক একটি জোয়ান মানুষকে পরখ করুন, দেখবেন কেউ আত্মনির্ভর নয়। সরল গোবেচারী অশিক্ষিত মানুষগুলি সবকিছুর জন্য পরের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে এরা সমস্ত দুর্ভাগ্য অনায়াসে সহ্য করার বিস্ময়কর ক্ষমতা রাখে। মুষ্টিমেয় কিছু লোক সামান্য শিক্ষা, কলকাতার খবরের কাগজ আর শহর-গঞ্জে ঘোরাফেরা করে গ্রামের কেউকেটা হয়ে শত শত মানুষের বোকামিকে আপন স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করে। রাইটার্স বিল্ডিংসের সমস্ত সং-চেষ্টাকেই এরা আপন সুখবৃদ্ধির উপাদান বলে মনে করে। তাই সরকারী পরিসংখ্যান রূঢ় বাস্তবে হাস্যকর। বড় বড় গ্রামগুলিতে প্রথমেই আপনার চোখে পড়বে দোতলা এমন কি তিনতলা ইটের বাড়িগুলি ভাঙা-চোরা, জঙ্গলে আকীর্ণ, লোকজনহীন। শুনবেন গ্রামের কৃতী ও সমৃদ্ধ পরিবার-গুলি এখানে বাস করতেন, আজকাল কলকাতা দিল্লি লক্ষ্ণৌ বা ইন্দোরের স্থায়ী বাসিন্দা, গ্রামের সঙ্গে তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন। কালেভদ্রেও দয়া করে এঁরা এখানে পা বাড়ান না। তাঁদের ভয় গ্রামের সাপ, দলাদলি, অশিক্ষা ও কুসংস্কার। আর এগুলি নিয়ে বিষণ্ণ, ভয়াবহ দারিদ্র্যপীড়িত আশাহীন গ্রামগুলিতে যারা বাস করে তাদের ভীতি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি, বৃহৎ বিশ্বের প্রতি, আধুনিক কালের প্রতি।

অথচ ইংরেজী শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকতায় আকণ্ঠ নিমগ্ন উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী সমাজের মানুষগুলিকে দেখুন। এদের ঝকঝকে পোশাক, চকচকে হাসিখুশি মুখ, চোখের তারায় ঠোঁটের চমকে প্রসন্ন দীপ্ত হাস্যরেখা। কিন্তু কাছাকাছি যান, আরো নিবিড় সম্পর্কে দেখবেন এরা সততায় বিশ্বাস করে না, মানবতায় শ্রদ্ধা নেই, দেশপ্রেম জানে না, এমন কি ফুলের মত সুন্দরী আপন সঙ্গিনীর সতীত্বেও আস্থাহীন। এরা এক-একটি আশ্চর্য স্বতন্ত্র জীব, নিছক ব্যক্তি-সুখ ও স্বার্থের বাইরে এদের দৃষ্টি কিছুতেই উত্তীর্ণ হয় না। মানবপ্রেম বা দেশপ্রেমের কথায় স্নব ও ন্যাকা এই মানুষ-গুলি তির্যকভাবে ব্যাঙের হাসি হাসবে। নয়ত ভুল যুক্তির ভ্রান্তিময় ফোয়ারায় আপনাকে কপট যুদ্ধে আহ্বান করবে।

এই দুই সীমান্তের মাঝখানে শিক্ষিত দরিদ্র আবেগবান একদল মানুষ। যাদের চোখ আকাশের দিকে অথচ ভাঙা পা দুটো মাটিতে। নৈরাশ্য আর যন্ত্রণার বিচিত্র ট্রাজেডি এদের জীবন। এদের কেউ কেউ তুবড়ির মত উপরের দিকে উঠে যায়, অধিকাংশেরই ঘটে অধঃপাতের দিকে উল্কাপতন!

চোদ্দ বছরের স্বাধীনতা ও দু' দুটো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় আমাদের জাতীয় জীবন যথার্থই কতটুকু এগোতে পেরেছে? (হায় বিদেশ!) পরিসংখ্যানের খাতা ফেলে দিয়ে খোলা চোখ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ক'দিন ঘুরে এলে হৃদয়বান মানুষের বেদনা অনুভব না করে উপায় নেই। আমার ধারণা, স্বরাজ সাধনায় আমরা কেবল রোমাণ্টিকতা আশ্রয় করে কিছু কিছু লোক প্রাণ দিয়েছিলাম অথচ সারা দেশময় কোনও বৈজ্ঞানিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারি নি বলেই এই বিপত্তি। তাই সর্বত্যাগী দেশ-প্রেমিকদেরও এখন আদর্শ হয়েছে ভোট, মন্ত্রিত্ব, ক্ষমতা—সংক্ষেপে আত্মস্ফীতি।

কিরণকুমার রায়

জংশন-স্টেশনে গাড়ি থামতে না থামতে রে-রে করে মানুষ ছুটে আসে। ফুল-দোলের মেলা বসেছে, মেলার লোক ফিরবার শেষ ট্রেন। পলকের মধ্যে কামরা ভরতি। তাই বলে ছেড়ে দেবে! দরজার পথে উপায় নেই তো জানলা দিয়ে দুমদাম মাল ফেলছে ভিতরে। মালের পিছন পিছন মানুষ এয়ারবন্ধুরা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে পিঠে ঠেকনো দিয়ে মালের মতো মানুষও জানলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ঢুকে তো পড়—জানলার সংকীর্ণ পথে ছিটকে বেরিয়ে আসার ভয় নেই। তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাক ভিতরে।

ঠাসাঠাসি মানুষ, তার উপরে গরমটাও বিষম আজকে। রক্ষা এই যে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেঁধেছে, তার রকমারি খবর লোকের মুখে মুখে। নোয়াখালিতে এই করেছে, বিহার তার পাল্টা শোধ দিল এই রকমে। দেহকষ্ট ভুলে কামরার সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। যে লোকের যত গরম খবর, তাকে ঘিরে তত জমাটি। বুদ্ধদার কথা শান্ত হয়ে বলতে গেলে তাড়া খেয়ে তাকে চুপ করতে হয়।

এমন গরমের মধ্যে গায়ে মাথায় মোটা চাদর জড়িয়ে বেঞ্চির উপর জুবুথুবু হয়ে আছে—মানুষটার নাম লালমোহন। পাশের ভূষণচন্দ্র এই নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। ম্যালেরিয়া-রুগী লালমোহন—জ্বর আসবে এক্ষুনি, শীত-শীত করছে। কামরার ভিতর যে-ই কেউ ঢোকে, লালমোহন সচকিত হয়ে দেখে নেয়। এ নিয়েও ভূষণচন্দ্রের প্রশ্ন : কেউ আসবে বুঝি?

লালমোহন সায় দিয়ে বলে, মেলা দেখে আমার এক শালা-কুটুম্বর ফিরবার কথা। এসে পড়লে রক্ষা পাই। চার মাইল পথ ভেঙে বাড়ি যেতে হবে। একা না বোকা—জ্বরের তাড়শে হয়তো বা মাথা ঘুরে মাঠের উপরে পড়লাম।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে সেই সময়, শালা-কুটুম্ব নন তিনি—একসাধু এসে উঠলেন বাঁ-হাতে কিডব্যাগ ঝুলিয়ে। গেরুয়া বসন গেরুয়া আলখাল্লা, মোটা গোঁফ ও লম্বা দাড়ি। সেই দাড়ির অর্ধেকটা ঢেলে বেলফুল যূঁইফুল ও রজনীগন্ধার একগাদা মালা। গন্ধ ভুরভুর করে ওঠে। সাধু মানুষ দেখে ধাক্কাধাক্কিটা হল না, কষ্টেসৃষ্টে বরঞ্চ একটুখানি দাঁড়াবার মতন ঠাঁই করে দিল তাঁর।

বাঙ্কের শিকল ধরে কাত হয়ে সাধু-মহারাজ চতুর্দিকে দৃষ্টিবিস্তার করলেন। দাঙ্গার তর্কাতর্কিতে কামরার ভিতরেই এক দাঙ্গার ব্যাপার ঘাড় তুলে সাধু-দর্শনের ফুরসত কার! দেখেছে কেবল লালমোহন—পলক পড়ে না এমনি ভাবে দেখছে। জ্বরের যন্ত্রণা ভুলে ভক্তিভরে সে আহ্বান করে : আসতে আজ্ঞা হয় স্বামিজী। এই যে এদিকে—

প্রশান্ত হাস্য বিকিরণ করে স্বামিজী বলেন, জায়গা আছে?

লালমোহন বলে, আপনার জন্যে জায়গার অভাব! যেখানে দয়া করবেন,

'ঠক ঠক করে কাঁপছে'

সেইখানে জায়গা। আপনার জায়গা তো মাথার উপর সকলের।

পাশের ভূষণচন্দ্র খিঁচিয়ে উঠে : সকলকে নিয়ে টানাটানি কেন মশায়? ভক্ত
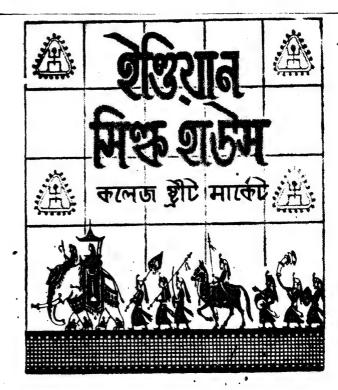
মানুষে আপনি ডেকে আনছেন; বসতে দেবেন আপনার মাথার উপরে। অন্যের মাথা সস্তা নয়, কেউ মাথা পেতে দিচ্ছে না।

উপর মুখো দেখে নিয়ে আবার বলে, তারও মুশকিল আছে। লম্বা মানুষ স্বামিজী। মাথার উপরে জায়গা দিয়ে বসাবেন, ওঁর যে মাথা ঠুকে যাবে বাংকে।

এক কামরা গাদাগাদি মানুষের ভিতর দিয়ে অবলীলা ক্রমে পথ করে স্বামিজী লালমোহনের কোণের দিকটায় আসছেন। কাছে এসে বললেন, কই, কোথায় জায়গা?

লালমোহন তড়াক করে উঠে দাঁড়ল: আসুন না। এইখানে আমার জায়গায় বসে পড়ুন।

ভূষণচন্দ্র অবাক হয়ে বলে, জ্বর গায়ে আপনি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

স্বামিজী বলেন, জ্বর হয়েছে তোমার?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, বসতে পারছিনে। আপনাকে বসিয়ে দিয়ে তারপর আমি শুয়ে পড়ব।

ভূষণচন্দ্র বলে, বেশ মশায়! লোকে বসার জায়গা পাচ্ছে না, শোবেন আপনি!

লালমোহন নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, বসার জায়গা নেই কিন্তু শোওয়ার জায়গা অঢেল।

স্বামিজী বললেন, তবে এতক্ষণ শোওনি কেন বাবা?

শুলে জায়গা রাখা যেত না, আজবাজে লোক বসে পড়ত। কষ্ট করে আগলে ছিলাম ভাল দেখে কাউকে বসাব বলে। তা জোর কপাল আমার—দুনিয়ার সকলের সেরা মানুষটিকে পেয়ে গেলাম।

পুলকিত কণ্ঠে স্বামিজী বলেন, আমায় চেন বুঝি তুমি? ফুলদোলের মেলায় আমার ভাগবত-পাঠ শুনে এসেছ?

লালমোহন বলে, এই দেখুন, আপনাকে চিনতে মেলায় যেতে হবে! তাবৎ দুনিয়ার মধ্যে না চেনে আপনাকে কে?

ইতিমধ্যে বসে পড়েছেন স্বামিজী। কৌতূহলী ভূষণচন্দ্র লালমোহনের গায়ে ঠেলা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, কে ইনি, কী নাম?

স্বামী—

স্বামী তো ওঁরা সবাই। তার পরে?

নাছোড়বান্দা মানুষটিকে জবাব কিছু দিতে হবে। যা মুখে আসে, লালমোহন বলে দেয়, স্বামী অঘোরানন্দ—

চুপিচুপি হলেও কথা স্বামিজীর কানে গিয়েছে। একগাল হেসে বললেন, গোলমাল করে ফেললে যে বাবা। অঘোরানন্দ নয়, পরমানন্দ।

লালমোহন সঙ্গে সঙ্গে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে। আগাপাশতলা ঠিক আছে, মাঝে একটুকু গোলমাল হয়েছে।

হাতের ব্যাগটা কোথায় রাখা যায়—বাংকের উপর তো একটি সূঁচ ঢোকানো চলে না। স্বামিজী এদিক-ওদিক দেখে ব্যাগ বেঞ্চির নিচে ঠেলে দিয়ে নড়েচড়ে অতঃপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন বেঞ্চির উপরে।

আমার তো দিব্যি হল। তুমি কোথায় শোবে, শুয়ে পড় এইবার।

যে আজ্ঞে—। বলে লালমোহন দু-বেঞ্চির ফাঁকে মেজের উপর গড়িয়ে পড়ে। হু-হু হু-হু—জ্বরের কাঁপুনি বেড়েছে, কাহিল হয়ে পড়েছে বেশ। মোটা চাদরটা সে গায়ের উপর টেনে দেয়।

এ কি মশায়? ভূষণচন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে: পায়ের কাছে কী রকম শোওয়া!
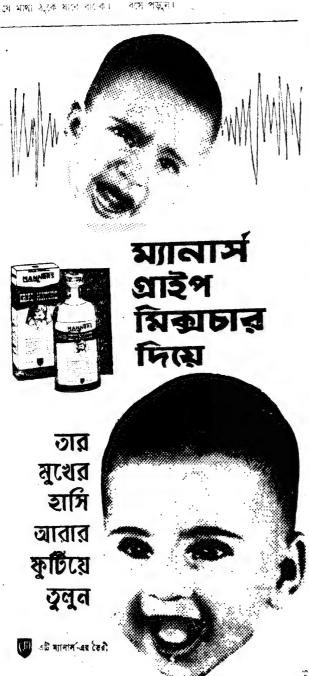
লালমোহন বলে, সাধুমহাত্মার পদতলে পড়েছি, ভাগ্যটুকু আপনি আর খুঁড়বেন

না। উঁহু-হু, কী শীত রে বাবা, হাড়ের ভিতর অবধি কনকন করছে।

আপাদমস্তক সে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ল।

চুপচাপ কাটল খানিকক্ষণ। গাড়িসুদ্ধ চলেছে। স্বামিজীও চোখ বুজেছেন। লালমোহন সহসা লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কামরার আধঘুমন্ত মানুষগুলোকে সচকিত করে গর্জন করে ওঠে : সাধু না কচু তুমি। জালিয়াত। জাল-নোটের গোছা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ।

চাদরের ভিতর থেকে হাত বের করে সর্বসমক্ষে মুঠো খুলে ধরে। পাঁচ টাকার নোট কতকগুলো। বলে, দেখুন আপনারা, ঠাহর করে দেখুন। সদ্য ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। আসল কি জাল কাগজে হাত ঠেকিয়েই আমরা ধরতে পারি। চোখ মেলে পরখ করতে হয় না।

স্বামিজী হকচকিয়ে গেছেন : আমার জিনিস কে বলল?

পরের জিনিস তুমি ব্যাগে পুরে নিয়ে বেড়াচ্ছ? লালমোহন খলখল করে হেসে উঠল : দেখ, আমার কাছে ধাপ্পা দিও না। কে আমি জান—ডিটেকটিভ ললিত-কুমার। ছ-মাস তোমার পিছন পিছন ঘুরেছি, কায়দায় ফেলতে পারিনে—

অন্তত বিশখানা রোমহর্ষক নভেল আছে ললিতকুমারকে নিয়ে। বইয়ের মানুষ সত্যি সত্যি চোখের উপরে—চক্ষু সকলের ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম।

ভূষণচন্দ্র বলে, কী আশ্চর্য! অরূপ-গড়ের নেকলেস-চুরির কেসটা আপনিই তবে—

লালমোহন—উঁহু, ললিতকুমার বুকে থাবা মেরে বলে, আমিই তার আস্কারা করলাম। কিন্তু আজকের কেস তার চেয়েও তাজ্জব।

স্বামিজীর দিকে কটমট চেয়ে বলে, বড্ড ভুগিয়েছ আমায়। বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—এখন?

বিপন্ন স্বামিজী অতঃপর অন্যপথ ধরলেন : মেনে নিলাম জাল-নোট আমার কাছে ছিল। কিন্তু আমি জাল করেছি, সেটা কি করে বলেন? দশজনা রয়েছেন বিচার করে দেখুন আপনারা। আসরে রেকাবি পেতে দিয়েছে, বড় বড় ভক্তেরা তার উপর প্রণামী ফেলে যাচ্ছেন। আমি তো ভাগবত-রসে মজে আছি, প্রণামী-নোট জাল কি সাচ্চা দেখে নেব কেমন করে?

বটে রে! রাগে গরগর করতে করতে ললিতকুমার বেঞ্চির তলা থেকে কিডব্যাগ উঁচু করে ধরল। ব্যাগের চামড়া এমড়ো-ওমড়ো কাটা। সেই কাটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ডিটেকটিভ তাড়া তাড়া পাঁচ টাকার নোট বের করছে। হরির লুটের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে। বলে, প্রণামী দিয়ে গেছে—তাড়া ধরে ধরে নোটের প্রণামী? এক টাকা দু-টাকার নেই, সমস্ত পাঁচ টাকার?

উঃ কত কাণ্ড করতে হয় দেখ, একটা অপরাধী ধরবার জন্য! জালিয়াতের পায়ের তলায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ডিটেকটিভ নিঃসাড়ে কাজ করে গেছেন,

বাইরে থেকে তিলেক টের পাওয়া গেল না।

বিস্ময়ের ঝোক কাটিয়ে মার মার করে উঠল মানুষ : মুঠো মুঠো করে ঠাকুর তোমার ঐ দাড়ি উপড়াব।

রেলের কামরার ভিতর হাতে অন্য কাজ না থাকায় করতেও সাঁতা সাঁতা তাই। ললিত-কুমার এই সময় হাত ধরে হেঁচকা টান দিল: নেমে এস।

কোথায়?

থানায়। সেখান থেকে কৈবল্যধামে।

পরমানন্দ স্বামী ডিটেকটিভের আগে আগে প্লাটফরমে নেমে পড়েন। নেমে যেন বেঁচে যান। ললিতকুমারও নেমেছে। কামরার দিকে চেয়ে সে বলে উঠল, আপনারাও কেউ কেউ আসুন। সাক্ষি দেবেন।

নামছে না কেউ, সকলে চোখ তাকাতাকি করে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। পুলিসের ছোঁয়াছুঁয়িতে ঘায়ের সংখ্যা বোধহয় গোণা-

দাড়ি উপড়ে নেব

গুণতিতে আসে না, সেইজন্য ওটা প্রবচনের মধ্যে নেই।

ললিতকুমার হাঁক দিয়ে ওঠে: কি হল, নামছেন না যে কেউ? গাড়ি ছেড়ে দেবে এইবার।

ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে কামরার মধ্যে। এ বলে তুমি নাম, ও বলে আপনি নামুন। গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে এই বড় ভরসা, ততক্ষণ এইরকম চালিয়ে গেলে হল।

বিরক্ত হয়ে ললিতকুমার বলে, না আসেন তো বয়ে গেল। সাক্ষি আমি নিজেই গড়ে-পিটে নেব। সে ক্ষমতা রাখি।

আবার স্বামিজীর হাত এঁটে ধরেছে। স্বামিজী বলেন, সত্যি সত্যি থানায় নেবেন? কিন্তু বন্দোবস্ত এখানেই তো হতে পারে। থানায় হাঙ্গামা বিস্তর। বড়-দারোগা মেজ-দারোগা জমাদার কনেস্টবলে জন পনের হবেই। তার উপর দেশলের টিকটিকিটা

তুমিও ক্ষণজন্মা পুরুষ হে

পর্যন্ত সেখানে হাঁ করে আছে। এতগুলো হাঁ বাঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের ভাগে কি থাকবে, দেখুন ভেবে।

থমকে দাঁড়ায় ললিতকুমার, কথাটা প্রণিধান করল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামিজীর মুখে তাকিয়ে বলে, যা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি জবাব দেবে?

মিথ্যে কথায় কাজকারবার হয় না। মিথ্যে কেন বলতে যাব?

বহুদর্শী ললিতকুমারের জানা আছে সেটা। চোর-ডাকাত জালিয়াত-জুয়াচোর নিজেদের ভিতরে বড় সাচ্চা।

ভুয়া নোট ভাঙাতে মেলায় ঢুকেছিলে। ক'খানা ভাঙিয়েছ বল।

মোটে তিনখানা। বেজার মুখে স্বামিজী বলতে লাগলেন, মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে, দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। আমি হাতে করে দিচ্ছি, সে জিনিসে তিনবার টোকা দিয়ে বার পাঁচেক আঙুলে ঘষে ফেরত দেয়: বদলে দিন ঠাকুরমশায়।

নিশ্বাস ফেলল ললিতকুমার। হিসাব করছে: তিনখানা—তিন পাঁচে পনের। বখরা আধাআধি। আমার ভাগে সাড়ে সাত টাকা—

হাত বাড়িয়ে বলে, দিয়ে দাও।

স্বামিজী আলখাল্লার পকেট থেকে গুণে গুণে সাতখানা এক টাকার নোট দিলেন। বলেন, খুচরো নেই আমার কাছে। পঞ্চাশ নয়া পয়সা দিয়ে আপনি আর এক টাকা নিয়ে নিন।

ললিতকুমার বলে, খুচরো আমারও তো নেই।

তবে?

চায়ের দোকান সামনে। স্বামিজী সোৎসাহে বলেন, গলা শুকিয়ে গেছে। খুচরো যখন কেউ দিতে পারছি নে, এজমালি টাকাটায় চা খাইগে চলুন।

ললিতকুমারও বলে, চল তাই। চা আর কাটলেট। খিদে পেয়ে গেছে।

ছোট একটা টেবিল নিয়ে দুজনে সামনা-সামনি বসল। এক কাপ করে চা দিয়ে গেছে। কাটলেট ভাজা হচ্ছে, হয়ে গেলে সেই সঙ্গে আবার চা আসবে।

চা খেতে খেতে স্বামিজী একবার ললিত-কুমারের দিকে একবার নিজের কিডব্যাগের দিকে তাকান। সহসা বলে উঠলেন, পরি-পাটি হাত আপনার মশায়। চামড়ার ব্যাগের উপর নয়, যেন মাখনের দলায় ছুরি চালিয়ে গেছেন। তাই বলছিলাম—ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি?

ললিতকুমার মুখ তুলে সহাস্যে বলে, বলই না—

ডিটেকটিভের কাজে কত আর পয়সা মশায়? এই বিদ্যে নিয়ে লাইনে থাকলে দু-হাতে পয়সা কুড়িয়ে কুলে পেতেন না।

ললিতকুমার বলে তবে শোন। লাইনেরই মানুষ আমি। ললিতকুমার নই, লাল-মোহনও নই, লালমামুদ।

বিস্ময়ে স্বামিজীর দুই চক্ষু কপালে উঠে গেছে। লালমামুদ বলে, তোমার পরিচয়টা শুনি এবার স্বামিজী। কে তুমি?

স্বামিজী নাম বললেন: পরমানন্দ-টন্দ নয়, পরশুরাম চক্কোত্তি। পরশুঠাকুর বলে—

লুফে নিয়ে লালমামুদ বলে, গাড়ির মধ্যে সেই যা বলেছিলাম ঠিক ঠিক তাই মিলে গেল। ও নাম দুনিয়াসুদ্ধ জানে। অত বড় ওস্তাদের পায়ের নিচে শুয়েও ছিলাম আমি ঠিক জায়গায়।

বিনয়ের পাল্লাপাল্লি চলে অতঃপর দুজনে।

পরশুঠাকুর বলে, তোমার লাইনে তুমিও শাহানশা হে। লালমামুদ মানুষটা এদ্দিন দেখা ছিল না, কাজকর্ম সমস্ত জানি। পকেট কাটতে গিয়ে চামড়ার এক পর্দা তুলে নিলেও মক্কেলের হুঁশ হবে না, এমনি নিখুঁত হাত তোমার।

লালমামুদ বলে, যতই হোক লোকে তবু বলে গাঁটকাটা। তুমি হলে কত বড়! গরমেন্টো টাকশাল বানিয়েছে, তেমনি এক আলাদা টাকশাল তোমার। টক্কর দিয়ে সমান তালে তুমি টাকশাল চালাচ্ছ।

কাটলেট এসে পড়ল। মুখ বন্ধ হবে এবার অন্যদের কলরব কানে আসে: বিহার-শরিফে কি কাণ্ড করল, ঢাকায় তার কিরকম শোধ নিচ্ছে।

লালমামুদ বলে, আহাম্মকগুলো দাঙ্গা করে মরে কেন?

ঘৃণা ভরে পরশুঠাকুর বলে, বখরা মেরে দেয় বলে। আবার কি!

লালমামুদ ঘাড় নড়ে সায় দেয়: হক কথা। ন্যায্য গণ্ডা হিসেব করে নিয়ে কাটলেট খেয়ে গলাগলি হয়ে আমরা এই ডেরায় ফিরছি। রাত পোহালে যে যার কাজে নামব। আমাদের মতো ক'জন?

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৩৪৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার জ্যাঠাইমার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার খবর ভালো লাগল না। বুঝতে পারচি আরোগ্যের আশা অল্পই।

কাল মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় যাত্রা করব। আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা কোরো না। দলের সঙ্গেই থাকতে হবে।

যদি অবকাশ পাও খবর দিয়ো ও খবর নিয়ো। আমার শরীর ভালোই আছে। ইতি ৯ মার্চ ১৯৩৬

কবি

॥ ৩৪৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মনে লাগচে যেন বহু দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটিয়েছি। এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে আর এক গৃহস্থের বাড়িতে। মন বসাবার সময় পাইনি। চিঠি লিখে চিঠির জবাব পাব এমন ঠিকানা ও সময়ের স্থিরতা ছিল না। ক্লান্ত জীর্ণ শরীরকে নিয়ত ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছিলেম। ব্যবস্থা করেছিলেম কলকাতা হয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসব। এমন সময়ে বর্ধমানে ধীরেন প্রভৃতি একদল আমাকে শান্তিনিকেতনের অভিমুখে টেনে নিয়ে এলো। শুনলুম রথী কলকাতায় যায়নি। তার সঙ্গে কাজের কথা বিস্তর জমে উঠেছে। দেরী করা কর্তব্য বোধ করলুম না।

তোমাদের খবর কিছুই জানিনে। আশা করি দুচার লাইন লিখে জানাবে। তোমাদের ছুটি কবে এবং গরমের সময় কোথায় যাবে তার আভাস একটুখানি জানিয়ো।

বুড়ির বিয়ের কথা আলোচনা করা যাচ্চে। মীরা কলকাতায়, সে এলে তার মত নিয়ে দিন স্থির করব। আমাদের এ অঞ্চলের মত হচ্ছে পয়লা বৈশাখ নাগাদ। এই নাট্যের প্রধান নায়ক নায়িকা যারা তারাও শুভকার্য সমাপনের জন্যে সমুৎসুক হয়ে আছে।

যে শরীরটাকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলুম, তাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। যে বিশ্বকর্মা এ দেহটাকে গড়েছিলেন তাঁকে বাহবা দিই। ঘাটে ঘাটে খেয়া দিয়ে দিয়ে জীর্ণ হয়ে গেল—ভাঙে না ডোবেও না, ডাইনে বাঁয়ে টলমল করে—ডাঙা থেকে যারা দেখে তারা ক্ষণে ক্ষণে মনে করে তলিয়ে গেল বুঝি। একটু জল সেঁচে ফেললেই তখনি এমনই সোঁ সোঁ করে চলে যে কোনকালেই নোঙর ফেলবার প্রয়োজন তখনকার মতো ভুলে যেতে হয়।

আমাদের চিত্রাঙ্গদার পালা সম্বন্ধে যতই কমিয়ে বলি না কেন মনে হবে অহংকারের অত্যুক্তি। এমনও মনে হতে পারে ওদেশের লোক বাঙালীর মতো প্রখর বুদ্ধিমান নয়, ওরা অল্পেতেই ভোলে। এসকল আলোচনা সাক্ষাতে হবে। আপাতত আরামকেদারাটার দিকে দেহমন উন্মুখ। বাতাসটা আছে ঠাণ্ডা, আকাশটা মেঘাবৃত, মনটা ক্লান্ত, দেহটা জড়ত্বিষ্ট। ইতি ৩ এপ্রিল ১৯৩৬

কবি

॥ ৩৫০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এ কী অন্যায়। ভেঙে দিচ্চে তোমাদের বাসা! এ সংবাদের আভাসমাত্র যদি জানতুম তা হলে যেমন করে হোক আমি হাওড়ায় গিয়ে নামতুম। আমাদের দলবল শান্তিনিকেতনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে ছিল, আমাকেও টানবার চেষ্টায় ছিল, তবু আমি কলকাতায় যাওয়া নিশ্চিত স্থির করেছিলুম। এমন সময় ধীরেনরা বর্ধমানে এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আমার বিশ্বাস ছিল রথী কলকাতায় আসবে সেখানেই তার সঙ্গে কথাবার্তা সব হতে পারবে—গোলমাল হয়ে গেল। ভালো লাগবে না।

বুড়ির বিয়ের আলোচনা চলচে। সকলের ইচ্ছে পয়লা গায়ে হলুদ, তরা বিয়ে। মীরাকে রথী লিখে দিয়েছে, আশা করি সে আজকালের মধ্যেই আসবে। শীঘ্রই চুকে যাওয়াই শ্রেয়। আমিও তা হলে ছুটি পাই।

তোমার চিঠি থেকে বোঝা গেল না কবে তোমাদের নড়তেই হবে। এপ্রেলের শেষাশেষি যদি বুড়ির বিয়ে হয়, ১৫।১৬ই নাগাদ, তা হলে নেত্রকোনা বিলুপ্ত হবার আগে কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে আসব, অন্য সমস্ত আসবাবপত্র তোলবার আগে নেত্রকোনা ঘরটার দুটো একটা অত্যাবশ্যক আসবাব রেখে দিয়ো, যাতে ঠেসান দিয়ে বসে কটাক্ষে তোমাদের পুকুরের কোণের ঝিলিমিলি দেখতে পাই। তোমার স্বরোপিত গাছপালা যখন তুলবে তখন তার দুচারটে আমার এখানকার জন্যে আনবার দাবি রাখলুম। তোমার বাতাবী লেবুর গাছগুলিকে মাছের জল খাইয়ে খাইয়ে পরিপুষ্ট রেখেছি। আমাদের এখান থেকে সোনাঝুরি নিয়ে গিয়েছিলে, দেখে এসেছি সেটা বেড়ে উঠেছে, ভাবী স্বত্বাধিকারীরা তার গৌরব স্বীকার করবে কিনা জানি নে।

বাসা গড়া ও বাসা ভাঙায় সংসারের অনিবার্য আবর্তন। একই জীবনের পরিধির মধ্যে জন্মমৃত্যুর লীলা বারে বারে দেখিয়ে দেয়। নূতন বাসা নূতন দেহান্তরেরই সামিল। বিচ্ছেদের স্মৃতি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসবে, নূতন শিকড় নূতন মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে। নব স্থিতির উৎসাহে আনন্দে নূতন বাসা প্রাণবান হয়ে উঠতে থাকবে। ক্ষতির মুহূর্তে কিছুতে মনে করতে পারিনে, একদা ক্ষতিপূরণ হবেই। বস্তুত ক্ষতিপূরণ প্রয়াসের সচেষ্ট আনন্দেই ক্ষতবেদনা নিরন্তর দূর হতে থাকে। পূর্বতন যা ছেড়ে আসতে হবেই প্রতিদিন হাতে হাতে তার মূল্য তো পেয়েছ অনেক, তোমার নিজের রচনা তোমার নিজেকে পুরস্কৃত করেছে—সেই রচনার উদ্যম তো তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে—এবং নবরচিত সৃষ্টির সঙ্গে তোমার জীবনের সমস্ত সম্বন্ধ জড়িত হয়ে আবার পল্লবিত হয়ে উঠবে। তার নতুন রূপ নতুন পূর্ণতা তোমার কল্পনার সামনে নেই বলেই তুমি বেদনা বোধ করচ, কিন্তু শূন্য আবার

ভরে উঠবেই তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক তোমার ভাঙা বাসার অধিদেবতাকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে আসব, তার পরে আবার নূতন বেদীতে নূতন মূর্তিতে যখন তার প্রতিষ্ঠা হবে তখন তার আবাহনে যোগ দেওয়া যাবে।

শরীর আমার এবার অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে গেছে বলে আত্মীয়েরা আক্ষেপ প্রকাশ করচে। আমার তরফ থেকে সেটা ভালোই। সকরুণ সেবার দাবি করতে পারব। ইতি ৫।৩।৩৬

কবি

॥ ৩৫১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ঘটর ঘটর চলল গাড়ি—প্রত্যেক মুহূর্ত গ্রীষ্মকাতরতায় সুদীর্ঘ হয়ে উঠল। মর্তলোক যে মর্ত্য, কিছুই যে চিরকাল থাকে না তা নিয়ে আমরা হাহুতাশ করে থাকি, কিন্তু কালকেকার রেলযাত্রা যদি অমর্ত্য হত তা হলে কী হত সেই কথা ভাবতে ভাবতে ব্যাণ্ডেল পার হলুম, মগরা ছাড়িয়ে গেল, পেরোলো পাণ্ডুয়া, তারপর এল নিদ্রাবেশ, সজাগ হয়ে উঠলুম বর্ধমানে এসে, এক গেলাস লেমনেড পান করে অন্তরতাপ কিছু পরিমাণে নিবারণ হল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের অভিমুখে পৌঁছলুম বোলপুরে। Warm reception যাকে বলে। বিছানা পড়ল দক্ষিণের বারান্দায়। যখন জেগে উঠলুম তখন সাড়ে পাঁচটা।

আজ সকালে উঠে প্রথম কথা মনে উঠল সেই জর্মান মেয়ের আবেদনপত্রের জবাব দিতে হবে। পত্রখানি রেখেছিলুম দক্ষিণ দিকের তাকের উপর। মনে নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতার সঙ্গে তুলে দেবে আমার বাক্সে। দেখচি হয়তো কোনো এক জায়গায় রেখে থাকবে কোনো একসময়ে সন্ধান মিলবে। কিন্তু কর্তব্যরীতি অনুসারে তার অনেক পূর্বেই জবাব দেওয়া উচিত। তাই জবাব লিখলুম। যদি চিঠি পাও তবে সেই ঠিকানায় অত্রসহ প্রেরিত পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়ো। যদি না পাও তবে নগেনের ঠিকানা তোমাদের জানা আছে।

খুব বেশী গরম নয়; রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল, সকালেও ঠাণ্ডা, এখন দুপুরে এখনো বায়ুর প্রকোপে রুক্ষ হয়ে ওঠেনি, আকাশের মেজাজ তোমার সঙ্গে না হোক তোমার বরানগরের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। বায়ুবেগে জানলা দরজা দুদ্দাড় করে পড়চে, গরীবের মাটির ঘরের দরজায় ছিটকিনির শৈথিল্য।

একটা বাজল ঘড়িতে। মধ্যাহ্নসূর্য আকাশের মধ্যকেন্দ্রে উঠেচে, গাছের ছায়া গাছের আপনার মধ্যেই সংবৃত। যদি তোমার শাসনপরিধির মধ্যে থাকতুম তা হলে তোমার বিশ্রামের অনুরোধ উপলক্ষে তোমার কলকণ্ঠ সমস্ত পাড়ার বিশ্রাম ভঙ্গ করে দিত। ঘুম পেয়ে এল, বিদায় নিই। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৪২

কবি

॥ ৩৫২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সেদিন যখন জেগে উঠলুম চমকে উঠে দেখি পাণ্ডুরবর্ণ অন্ধকারে চারিদিক নিস্তব্ধ। মোটরের শব্দ শুনিনে, গাড়ুলির কণ্ঠ নীরব, বিদায়যাত্রার কোনো চাঞ্চল্য কোথাও নেই বুঝলুম সে চলে যাবার সে চলে গেছে। তবু একবার সেই উত্তরের ঘরের দিকে গেলুম। দরজার কাছে একটা লণ্ঠন ম্লান হয়ে জ্বলচে, বিছানা পরিত্যক্ত—ঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখলুম চারটে বেজেছে, ডাকতে শুরু করেছে ভোর বেলার কোকিল। কেদারায় বসলুম, সেটা শিশিরে ভেজা। তারপরে দিনের কর্তব্য ধীরে ধীরে শুরু হোলো—রোদ্র উঠল—লতামণ্ডপের ধারে চৌদিকে পড়েছে। সুজন নিয়ে এল চায়ের সরঞ্জাম, তারপরে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনি চলচে এখন—তারপরে সেদিনকার মতোই একদা ভোর রাত্রির অন্ধকারে বিছানা ফেলে যাত্রা করব, পৌঁছব স্থানান্তরে—কবে এখনো অনিশ্চিত। খবর দেব হয়তো। আসাযাওয়ার আবর্তন চলবে এমনি, অবশেষে শেষ শুকতারার আলোকে শেষ রাত্রি ভোর হবে কোথায় কোন্ শয্যাতলে তাই ভাবি—দ্বারের বাইরে ম্লান আলোর লণ্ঠন জ্বলবে বৃথা, কোকিল ডাকতে থাকবে বৃথা, কোকিল ডাকতে থাকবে নিত্য নিয়মে, শেষ পঁচিশে বৈশাখের কোন্ তারিখটাতে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৪৩

কবি

॥ ৩৫৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আগামী মঙ্গলবার ২২শে বৈশাখ প্রত্যুষে চার ঘটিকার সময় এখান থেকে যাত্রা করে বের হব।

একটা উপলক্ষ্য আছে। পেন্ ক্লাব থেকে আমার জয়ন্তী উৎসব করবে কালিদাস এবং রাধারানী মিলে এমন প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এখন নিস্তব্ধ আছেন তাঁরা, যে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। বউভাতে অনিমন্ত্রিত যাওয়া চলে কিন্তু নিজের জয়ন্তী সভায় আনাহূত উপস্থিত হওয়া অসম্মানজনক, বিশেষত যখন সেই সভাটাই অবর্তমান।

কবির মান রক্ষা করতে চাও যদি বরানগরে দশজন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ কোরো তার বেশী নয়, তার খরচ বাবদ দশ টাকা আমিই দেব। সেই "জলযোগ" ওয়ালার পরে যদি জয়ন্তী জমাবার ভার দাও তাহলে হয়তো দেশবরেণ্য সাহিত্য-সম্রাটের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে তারা নিজের ব্যবসাকে সার্থক করতেও পারে। প্রতাপকে বলে দেব একটা গোড়ে মালা কিনে নিয়ে আসবে। আবৃত্তি প্রভৃতি কবিসম্রাটের দ্বারাই হবে। গান গাবে তুমি। কথাটাকে যদি অপরিহসনীয় ভাবে নাও তাহলে আমার অনুরোধটা পালন কোরো। দশ কিংবা পনেরো জনের বেশী যেন ভিড় না হয়। যদি দেখি হয়েছে তাহলে তৎক্ষণাৎ মোটরযোগে বালিগঞ্জে আত্মঘাত সরোবরে গিয়ে ঝাঁপ দেব। সরোবর বরানগরেও আছে কিন্তু তার জল কলুষিত করতে চাই নে। দূর হোক্ গে ভালোবুঝতে পারিচনে কী করা কর্তব্য। এখানকার স্থানীয় ভক্তেরা বলচে ঐ দিনটাতে তারা দখল করতে চায়। প্রত্যুত্তরে আমি বলচি এইরকম [illegible] সমারোহে নিকট আত্মীয়ের চেয়ে দূরের লোকের দাবী বেশী। কিন্তু দূরের লোক যদি দূরতম হয় তাহলে কী জবাব দেওয়া কর্তব্য ভেবে পাচ্চিনে। এরা যখন শুনবে জয়ন্তী-উৎসবটা ষোলো আনাই ফাঁকি তখন আমার মুখ লাল হয়ে উঠবে। ব্যাপারটা জাগতিক ঘটনা সমাবেশের মধ্যে কোন প্রধান স্থান নিতে পারে না এর চেয়ে আবিসিনীয় যুদ্ধটা অনেক বেশী গুরুতর—তথাপি—!

যাহোক দূরবীন যন্ত্রযোগে পাকা খবর আনিয়ে এদিকে চালান করে দিয়ো—তার পরে কপালে যা থাকে। আমার সংশয়ের কথাটা সাহস করে এ অঞ্চলে কারো কাছে বলতে পারচিনে—ওরা মনে করচে পাকা দেখা অনেক পূর্বে হয়ে গেছে—বাকি কেবল সপ্তপদী গমনে, এখান থেকে হাওড়া

পর্যন্ত। ক্যাপেস্ক্যাপের টোপর পরাটা আমার এ বয়সে শুভ্র কেশের উপর শোভন হবে না।

ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করে তোমার কলকণ্ঠে যদি উচ্চহাস্য জাগে তাহলে সংগত মনে করে আমি তাতে আপত্তি করব না, কিন্তু সানুনয় অনুরোধ এই যে কৌতুকের অন্তরালে একটু-খানি যেন বেদনার স্থান থাকে।

শেষ কথা এই যে, পেন্ ক্লাবের আমন্ত্রণটা যদি নেহাৎ বিড়ম্বনা না হয় তাহলে সেই অলক্ষ্মুনে সরোবরের ধারে উৎসব না করে বরানগরের অচ্ছোদ সরোবর তটে করলে দোষ কী হয়। ভেবে দেখো। ইতি ৩ মে ১৯৩৬

কবি

॥ ৩৫৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

উদ্বিগ্ন চিত্তে চিঠিখানা লিখতে হচ্ছে। এখানে আসবামাত্র গাঙ্গুলি আমার বাক্স প্রভৃতি খানাতল্লাসি করে আমাকে বললে আমার একটা নখকাটুনি পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকে, আর কোন উপায়ে নখ কাটতে পারিনে। তোমার ওখানে থাকতেও একদিন ব্যবহার করেচি। আমিও নিজে বাক্স ঘেঁটে তার সন্ধান পেলুম না।

নতুন দুটো কবিতা এখানে এনে কপি করিয়ে যথাস্থানে পাঠাব স্থির করেছিলুম। তাদেরও উদ্দেশ না পেয়ে বুঝতে পারচি তোমরাই পাঠাবার ভার নিয়েছ। আমার খাতায় যে লেখা আছে সে অসংশোধিত। অন্তত তোমার খাতায় যে কপি করে দিয়েছি সেটার একটা নকল পাঠালে কাজে লাগবে কারণ বিচিত্রা বের হতে এখনো দেড় মাস দেরী।

একটা পাখির ছবি হারিয়ে গেছে। খুঁজে পাও তো পাঠাবার চেষ্টা কোরো—আরও কয়েকটা ছবি গরঠিকানা।

বরাবর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। গরম পাইনি, বাংলা বইগুলো পড়েছি এইটেতেই দুঃখ পেতে হোলো।

সরভাজা প্রায় নিঃশেষ করেছি, এখনো দুখণ্ড বাকি। ডিম ভাজাটা উপাদেয় ছিল না। পত্র লিখচি কিন্তু পাত্র কোথায় জানিনে। যদি কালই দৌড় মারো তবে এ চিঠি তোমাদের নাগাল পাবে না।

কিন্তু নখকাটুনির বিয়োগ দুঃখ দূর করবার চেষ্টা কোরো। জিনিসটা শুনতে যৎসামান্য, ওটা সম্বন্ধে এমন কি গদ্য কাব্য লেখাও চলে না, কিন্তু ওর অভাববেদনা উপেক্ষনীয় নয়। ব্যবহারের পর সেটা রেখেছিলুম দক্ষিণ দেওয়ালসংলগ্ন তাকের উপর। চটি জুতোজোড়ার এক পাটিও হারায়নি—হারালেও অধিক উৎকণ্ঠিত হতুম না।

পাঁচটা বেজেছে। তোমার দিবানিদ্রা ভাঙবার সময় প্রায় নিকটবর্ত্তী। এখানে চারিদিকে সবাই জাগরূক—অনেকদিন পরে এটা অনভ্যস্ত ঠেকচে—বনমালী ভালোই আছে তার জন্যে উদ্বেগের কারণ নেই। ইতি ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

কবি

॥ ৩৫৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে এইবার চীনের মান্দারিন কিম্বা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর মতো লম্বা নখ রাখব এমন সময় নখকাটুনি এসে পৌঁছল। কবিতা দুটোর কপি পাঠিয়েছিলে স্বীকার করি কিন্তু তৎপূর্বেই খাতাপত্র ঘেঁটে আবার নতুন করে সংশোধন করে যথাস্থানে রওনা করে দিয়েছি। তোমার হস্তলিপি সুধীরচন্দ্র করের হস্তগত হোলো, সে সযত্নে রেখে দিয়েছে।

এখানে ঝড়বৃষ্টি পুরো উৎসাহেই নেবেছে। শিলঙে যাবার প্রস্তাব করেছিলেম, মত বদলাবার অভ্যাস থাকাতে এবার বেঁচে গেছি। সেখানে বন্যায় রাস্তাঘাট ভেসে গেছে। অহংকার করেই বলব এখন আমাদের শান্তিনিকেতন তোমাদের শৈলনিবাসের চেয়ে অনেক ভালো। বাইরের থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

কবে তোমরা বরানগরে ফিরবে এবং কতকাল থাকবে যদি তার আভাস পাই তবে তদনুসারে বিচিত্রায় একটা সভা আহ্বান করতে পারি। এইরকম উপলক্ষ্য নিয়ে মাঝে মাঝে কলকাতার সঙ্গে সম্মিলনের পরামর্শ চলচে। পারুলের স্বহস্তপক্ক মাছের ঝোলেরও আশা পাওয়া গেছে।

এইমাত্র আহার সেরে এসে বসেছি—বেলা এখন ঠিক দুপুর—মেঘ নেই—গাছের পাতা ঝলমল করচে—পাখিরা অত্যন্ত উৎসাহিত, পাশের বাড়িতে ছাত পিটানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোন কর্তব্যে মন নেই ছবি আঁকতে ইচ্ছে করচে। ইতি ৬ জুন ১৯৩৬

কবি

॥ ৩৫৬ ॥

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

কলকাতা শহরে রাষ্ট্র হয়েছিল যে তোমরা সোমবারে অর্থাৎ অদ্য স্বস্থানে ফিরে আসবে। টানাটানি করে সোমবার পর্যন্ত ছিলুম। এমন সময় শোনা গেল মঙ্গলবারে তোমাদের আগমনের আশা আছে। অতএব এ যাত্রার মত গড়ে বাই।

দায়ে পড়ে ছিলেম এখানে সপ্তাহখানেক। একদা প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল। আজও তার ধাক্কাটা বহন করে রেখেছি বক্ষে। চলেছি শান্তিনিকেতন অভিমুখে।

হয়তো কোনো একটা উপলক্ষ্যে কোনো একসময় আবার আসব। কোন একটা সোমবার হোক, মঙ্গলবার হোক। তখন আলাপ আলোচনা হতে পারবে। ইতি সোমবার, ২১ জুলাই ১৯৩৬।

কবি

সময় সাহিত্য সমালোচনা

এক বর্ষকালের সাহিত্য-প্রবন্ধ

অশ্রুকুমার শিকদার

[এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারাটি সর্বাপেক্ষা নির্জীব, শীর্ণস্রোতা। সেই স্রোত কখনো প্রশংসায় হঠাৎ উচ্ছ্বসিত, কখনো বিদ্রূপে মারাত্মক। অথচ, সমালোচকের সতর্ক এবং সংবেদনশীল দৃষ্টি ছাড়া সাহিত্যের মূল্যায়ন অথবা অগ্রগতি সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, রাতারাতি এই দুঃসময়ের প্রতিকার অসম্ভব। তবু, আমরা এক্ষেত্রে একটি দায়িত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছি। বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত অথবা গ্রন্থে সংকলিত রচনার মধ্যে যা-কিছু উল্লেখযোগ্য তার পর্যালোচনা আমরা মাঝে-মাঝে পত্রিকায় প্রকাশ করব। 'সময় সাহিত্য আলোচনা'—এই পর্যায়ে এক বছরের প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ করা হবে।

রবীন্দ্রশতবর্ষ এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নিবিড়তম প্রসঙ্গ বলে তৎ-সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা দিয়ে আমরা এই বিভাগটির উদ্‌ঘাটন করছি। গত শরৎ থেকে এবারকার শরৎকাল পর্যন্ত যে-সব সাহিত্য-প্রবন্ধ বেরিয়েছে, সেগুলির গতিপ্রকৃতি নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন বর্তমান সমালোচক; এবং রবীন্দ্রপ্রসঙ্গও, স্বভাবতই, তিনি বিশেষভাবে স্পর্শ করেছেন। এইরকম আলোচনা তথ্যগত ও দার্শনিক দু দিক থেকে একই সঙ্গে সম্পূর্ণাঙ্গ হওয়া দুরূহ। কিন্তু বাদানুবাদের ভিতর দিয়ে যে-সত্যটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে, তা বহুমূল্য। এ-সম্পর্কে পাঠকদের সুষ্ঠু, সুচিন্তিত অথচ সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা সাগ্রহে প্রকাশ করব। সম্পাদক, দেশ]

গত বৎসরের শরৎকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান বর্ষের শরৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত সাহিত্য-প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশ স্বাভাবিক কারণেই রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত। দেশব্যাপী রবীন্দ্র-উৎসবের মধ্যে যদি কোন স্থায়ী কর্ম হয়ে থাকে, তা হয়েছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায়। সেই আলোচনার অধিকাংশ ফসল এই বৎসরে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে বর্তমান। সেই প্রবন্ধগুলি আলোচনা করতে গেলে যে ব্যাপার আলোচকের সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তা হলো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্মী সাহিত্যিকদের রচনার অনুপস্থিতি। যাঁরা সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, গল্প বা উপন্যাস লেখক, তাঁরা এই মহৎ উত্তরসূরী সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনা লিপিবদ্ধ করেননি। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁদের ঋণ, রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁদের দূরত্ব বা নৈকট্য, এই সব সাহিত্যিকদের যে বিশেষ চিন্তিত করেছে এমন কোন প্রমাণ তাঁরা এই জন্ম-জয়ন্তী বর্ষে রেখে গেলেন না। অথচ তাঁরাই যেহেতু সেই পুষ্টিদায়ী ফসলের উত্তরাধিকারী সেইজন্য তাঁদেরই সবিশেষ দায়িত্ব ছিল। তাঁরা কিছুই ভাবেন না এ সম্পর্কে একথা সত্য হতে পারে না কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই ভাবনা তাঁরা লিপিবদ্ধ করেননি। বরং বহু-নিন্দিত অধ্যাপকবর্গ, যথাসাধ্য আলোকে, সেই প্রতিভার আলোচনার দায়িত্ব পালন করেছেন। কখনো কখনো যখন কোন কোন ঔপন্যাসিক বা কবিকে রবীন্দ্র বিষয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হতে দেখি তখন লক্ষ্য করি তাঁদের অধিকাংশেরই বৃত্তি অধ্যাপনা।

এই বর্ষকালে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে—যেমন, শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত দুই খণ্ড 'রবীন্দ্রায়ণ', শ্রীগোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ', কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ', স্বর্গত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' ও 'রবিপ্রদক্ষিণ' এবং শ্রীসুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প।'

এই সমস্ত সংকলনে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেষ্টন ও চিন্তা সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে। 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ভারত-ইতিহাস-ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথের দুটি মতের প্রতিবাদ করেছেন—রাষ্ট্রগৌরবের প্রতিপত্তি প্রাচীন ভারতে ছিল না এবং ঐক্য-প্রতিষ্ঠাই হিন্দুর মূলনীতি, একথা তিনি স্বীকার করেননি। পক্ষান্তরে তিনি দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের নবীন জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কী পরিমাণে অভ্রান্ত ছিল। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনৈতিক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার নয়, রাষ্ট্রনৈতিক কর্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত লেখক গান্ধিজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শের পার্থক্য অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। যখন লেখক স্বীকার করেন যে, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি কবির রাজনীতি তখন তার আলোচনা শুধু কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে পূর্ণতা পায় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। বিদেশীর পদাশ্রয়ে অর্ধ-কলোনিত্বের পঙ্কপটে বিকশিত হওয়ায় বাংলার নবজাগরণে যে ইতালির রেনেসাঁসের সার্বভৌমত্ব নেই, বরং নানা বিরোধী শক্তির মধ্যে বিরোধ আছে—যেমন যুক্তি ও ভক্তিবাদে, সনাতনপন্থায় - প্রগতিপন্থায়, ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বের সমীকরণে—তা তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই দ্বন্দ্ব বহুল পরিমাণে বর্তমান ছিল। আমাদের দেশের এই দ্বন্দ্ব-সংকুল অবস্থার সঙ্গে লেখক উনিশ শতকে রুশ দেশে পশ্চিমপন্থী ও স্লাভপন্থীর দ্বন্দ্বের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু লেখক যখন বলেন রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমদৃষ্টিই প্রগতিদৃষ্টি তখন সেই সিদ্ধান্ত বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। শ্রীচিন্মোহন সেহানবিশের 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ এবং সেই কারণে মূল্যবান, কিন্তু তথ্যনির্বাচন অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক। রুশ ক্রিয়াকাণ্ডের সমর্থন

ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিমূলক ধারণাকে এক করে দেওয়া হয়েছে এবং যেখানেই এই সমীকরণ অসুবিধাজনক হয়েছে সেখানেই অপরাধী করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিভ্রান্তিকে, শত্রুপক্ষের প্রচারকে।

আলোচ্য সংকলনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ' ও 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দুটি রবীন্দ্রনাথের মানসিক পশ্চাৎপট উপলব্ধিতে বিশেষ সাহায্য করে। প্রথম প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে, এই মানবতাবাদকে বিবর্তনবাদের সত্য পুষ্টিদান করেছে এবং রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ ইউরোপীয় মানবতাবাদের মত ধর্মনিরপেক্ষ নয়। বিবর্তনবাদের পিছনে চৈতন্যময় ও মঙ্গলময় সত্তার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী। প্রকৃত প্রস্তাবে মানবতাবাদের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি উপনিষদীয় অদ্বয়বাদের দ্বারা প্রভাবিত। এই উপনিষদগুলির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও চিন্তায় কী সর্বব্যাপী ও গভীর ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ শশিভূষণ দ্বিতীয় প্রবন্ধে দিয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর অন্তরালে উপনিষদের ঋষির মত এক সত্তার অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা শুধু উপনিষদের প্রতিধ্বনি নয়, কবির ব্যক্তিগত জীবনব্যাপী উপলব্ধির ফলও বটে—লেখকের এই সাবধানবাণী বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাবের মৌলিক কারণ, ব্রাহ্মধর্ম প্রভৃতি পারিবেশগত নয়, কবিচরিত্রের ধাতুগত সাদৃশ্য। তার প্রমাণ—কৈশোর বা নবযৌবনের রচনায় উপনিষদের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুপস্থিত অথচ পরাপর রচনার মধ্যে কোন অনৈক্য নেই—সর্বত্রই একই ভাবনার অনুকম্পন অনুভব করা যায়। উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রচেতনার একটি পার্থক্য উল্লেখ করা যায়—উপনিষদে সত্তার সর্বব্যাপী প্রশাসনে উদ্যত বজ্রের মত মহৎ ভয়ের দিক আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাধান্য স্বীকার করেছেন আনন্দের দিককেই। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার কথা উপনিষদে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের কোন কোন রচনায় প্রবন্ধকার nature mysticism-এর আভাস পেয়েছেন—কেননা সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিতে অদ্বয়বাদের কোন প্রভাব নেই, যা উপনিষদীয় অদ্বয়বাদের মৌলিক লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষির মত বিশ্বাস করেন সত্য যেহেতু স্বপ্রকাশ সেই কারণে ইন্দ্রিয়সমূহ জাগ্রত থাকলে সত্যান্বেষী চিত্তে সত্য ধরা পড়বেই।

স্বর্গীয় প্রবাসজীবন চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথ ও রোম্যান্টিক সাহিত্যদর্শন' একটি প্রণিধানযোগ্য রচনা। এই প্রবন্ধে রোম্যান্টিক সাহিত্যাদর্শের কয়েকটি মৌলিক সমস্যার—সাহিত্য মঙ্গলামঙ্গলনিরপেক্ষ কিনা, সাহিত্যের ভাব পাঠকের মধ্যে সঞ্চারের উপায় কী, দুঃখের ভাব অবলম্বনে রচিত ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় কেন, সাহিত্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক কী—সমাধান রবীন্দ্রনাথ কীভাবে করেছিলেন তার আলোচনা করা হয়েছে। প্লেটো অভিযোগ করেছিলেন হৃদয়ধর্মী সাহিত্য মানুষকে দুর্বল ও কোমল করে, লেখকের মতে, "প্লেটোর অভিযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।" আদি রোম্যান্টিকেরা মনে করতেন সাহিত্য পরোক্ষে নীতিশিক্ষা দেয়, পরবর্তী রোম্যান্টিকেরা বললেন সাহিত্য নীতিনিরপেক্ষ। কিন্তু রবীন্দ্রচেতনায় সুন্দর ও মঙ্গল অবিচ্ছিন্ন। সাহিত্যের লক্ষ্য যে আনন্দ তার সঙ্গে ট্র্যাজেডির সামঞ্জস্য দুই দিক থেকে—প্রকাশের দিক এবং ঐক্যের দিক। দুঃখের নিবিড় অনুভূতির মধ্যেই মানবাত্মার সর্বোত্তম প্রকাশ, ট্র্যাজেডির আনন্দ তাই আত্মপ্রকাশের আনন্দ। ঐক্যতত্ত্ব অনুযায়ী সুখ-দুঃখ দুই-ই এক সর্বব্যাপী আনন্দের অংশ এবং "সুখের বিপরীত দুঃখ কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়"। এই প্রবন্ধের একটিমাত্র উক্তি আপত্তিকর মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ধারণার সঙ্গে লেখকের এই বক্তব্য মেলে না, "রবীন্দ্রনাথ ভাবের প্রকাশ বলতে কোন অর্ধচেতন বা অন্ধচালিত ব্যাপার মনে করতেন না।"

শ্রীসুকুমার সেন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষাব্যবহার' ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের শব্দ' দুটিই বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধ। প্রথম লেখক রবীন্দ্রনাথের মৌলিক শব্দভাণ্ডারে জয়দেব, মেঘদূত, বৈষ্ণব পদাবলী বিশেষত ব্রজবুলির উল্লেখযোগ্য অবদানের উদাহরণ দিয়েছেন, দ্বিতীয় লেখক সেই তালিকায় যোগ করেছেন উপনিষদ, কাদম্বরী ও বিহারীলালের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দকে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার আধারে এবং প্রকৃতি অনুযায়ী গড়া বলে তাদের নতুন-তৈরি বলে সহসা চেনা যায় না। দুইজন আলোচকই লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথে নামধাতুর প্রাচুর্য এবং মধুসূদনের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর সাদৃশ্য। মধুসূদনের নামধাতু ব্যবহারের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল, তার কারণ, সুকুমার সেনের মতে, তৎকালীন সমালোচকদের অজ্ঞতা, বীরেন্দ্রনাথের মতে, বাংলা ভাষার স্বভাবের সঙ্গে মধুসূদনের নামধাতুর বৈষম্য, যে বৈষম্য রবীন্দ্রনাথে নেই। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দ আলোচনার ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ইতিহাস, অর্থ ও গঠনের দিক থেকে ঔৎসুক্যজনক এবং রবীন্দ্রমানসতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এমন পৌনঃপুনিক ব্যবহৃত শব্দাবলীকে তিনি রবীন্দ্রশব্দ আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দাবলীকে তিনি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এবং নিবিষ্ট গবেষণায় কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যে সাহিত্যবোধ না থাকলে সত্যকার শব্দবোধও থাকে না সেই সাহিত্যবোধ বহুল পরিমাণে এই লেখকের মধ্যে বর্তমান।

শ্রীভবতোষ দত্তের 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিও মূল্যবান। বঙ্কিমের গদ্যের আদর্শ ছিল—আভিধানিক স্পষ্টতা, নিরলংকার ঋজুতা, অনুচ্ছেদ রচনায় যুক্তির পরম্পরা অনুসরণ। ইংরেজী বাক্যরীতি তিনি ব্যবহার করেছেন, শব্দের অর্থাভাসের উপর নির্ভর করেননি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বৈশিষ্ট্য—বিষয়ীপ্রাধান্য: তাঁর পাঠাভ্যাস বিদ্যালয়শাসিত নয় বলে তাঁর রচনা বিশ্লেষণাত্মক বা গবেষণাধর্মী নয়; তিনি শব্দের অর্থাভাসকে পুরোপুরি ব্যবহার করেন; তাঁর আলোচনা তত্ত্বাশ্রয়ী নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-নির্ভর; তাঁর অনুচ্ছেদ যুক্তির পরম্পরা অনুসরণ করে না, ভাবনাকে জোরালো করার জন্য তাঁর গদ্যে অনুচ্ছেদ রচিত হয়; যুক্তির চেয়ে তুলনা উপমার প্রাধান্য অধিক। শ্রীযুক্ত দত্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন পরবর্তীকালের গদ্যে চলিত ক্রিয়ার তিনটি সমস্যার সমাধান রবীন্দ্রনাথকে করতে হয়েছিল—হসন্তপ্রবণতায় মুক্তধ্বনির রুদ্ধধ্বনিতে পরিণত হওয়া, ফলে সুরের অভাব এবং ক্রিয়াপদের স্থাননির্দিষ্টতায় ও নামধাতুর অভাবে একঘেয়েমি এবং এই সমাধানচেষ্টার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী গদ্যের রূপান্তররহস্য নিহিত। লেখকের একটি দাবি বিতর্কমূলক। বাংলা গদ্যধ্বনির ঐশ্বর্যের পিছনে সংস্কৃতের দানের সঙ্গে তিনি অনুমান করেছেন উনিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যের স্পন্দিত গদ্যের ঋণ। কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' প্রবন্ধে চোখের বালি এবং যোগাযোগের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণের পরিচয় পাই। লেখক দেখিয়েছেন রেনেসাঁসের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রের দিকেই রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি, উঠতি-সমাজের প্রতিনিধি মধুসূদনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নেই। কিন্তু লেখকের এই উক্তি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যদিও খাটে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খাটে না। মধুসূদন বিপ্রদাসের চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে উজ্জ্বলতর চরিত্র

হয়েছে। যে সমালোচক জানেন 'উগ্র মতপ্রাধান্যে উপন্যাসশিল্পের মৃত্যু' তিনিও সহসা এমন ছ'কে-বাঁধা উক্তি করে বসেন 'সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের মিলন অচল' তাই কুমু মধুসূদনকে গ্রহণ করতে পারলো না। চতুরঙ্গের আলোচনা নেই, তার কারণ বোধহয় উনিশ শতক কাহিনীপ্রধান উপন্যাসের দিকে মার্কসবাদী আলোচকদের ঝোঁক। উপন্যাস সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ'। বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি'র উপর বঙ্কিম-প্রভাব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন দুটি কারণে। প্রথমত, এই দুটি উপন্যাসে বঙ্কিমী রোম্যান্সের রক্তিমা নেই; দ্বিতীয়ত, এখানে প্রকৃতির যে সজীব উপস্থিতি বর্তমান, বঙ্কিমের উপন্যাসে তা দুর্লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অতিপ্রাকৃত জগতের বিশ্লেষণাত্মক শ্রেণীবিভাগ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের অতি-প্রাকৃত বা ভৌতিক গল্প' প্রবন্ধের মধ্যে পাই। তিনি চমৎকারভাবে ক্ষুধিত পাষাণ ও মণিহারা গল্পের আবহাওয়া ও প্রতিক্রিয়ার স্তর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মণিহারার শেষে যে সংশয়াত্মক মন্তব্য তাকে লেখক এড়িয়ে গেছেন। ঐ অন্তিম মন্তব্য সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' প্রবন্ধে শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "এই সংশয়িত পরিবেশ সত্ত্বেও গল্পের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনা কোথায়ও নিবিড়তা হারায় নাই। বক্তার অবিশ্বাসী মন গল্পরসে নিমগ্ন হইয়া উহার সমস্ত সংশয়কে অতিক্রম করিয়াছে। যখন অনুকূল আবেষ্টনে ও বর্ণনাকৌশলে ভৌতিক রস জমিয়া উঠে তখন অবিশ্বাসীরও দেহে কাঁটা দিয়া উঠে। এখানেও তাহাই ঘটিয়াছে।" এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—রবীন্দ্রনাথের কবিতার বর্ষা ক্লাসিকাল অনুষঙ্গে অনেকটা সৌখীন জিনিস, কিন্তু ছোটগল্পের বর্ষা সজীব ও সাধারণ জীবনের অনুগামী; প্রেম এখানে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত পরিবেশকে অবলম্বন করে; জমিদারী জীবনযাত্রা যখন আত্ম-অবিশ্বাস ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কীটে পীড়িত হয়নি, তার জীবনদর্শন ও মর্যাদাবোধ এই গল্পগুলিতে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইমেজ বা চিত্রকল্প বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এই সংকলন গ্রন্থসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক প্রবন্ধে নিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিলেও তিনি চিত্র এবং চিত্রকল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখান নি। এই পার্থক্য নির্ণয়ের অভাব শ্রীঅমলেন্দু বসুর 'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা' প্রবন্ধেও লক্ষ করি। সম্ভবত এই কারণেই দুইজন নিবন্ধকারই সিদ্ধান্ত করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম রচনাবলীতে চিত্রকল্প বিরল। এ-কথা স্বীকার করা কঠিন; বরং মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কবিতায় উপমা, চিত্র ও রূপকের আধিক্য এবং শেষ যুগের রচনায় ইমেজ ও প্রতীকের আধিক্য। এই মতের সমর্থন শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্রকল্প' প্রবন্ধে পাই—"শেষ দশকের কাছে চিত্রকল্প শায়কসুতীক্ষ্ণ বাক্‌সংযম পেয়েছে এবং সর্বান্বয়ী জ্যোতির্বিন্দে পৌঁছে দেয়।" শ্রীযুক্ত বসু তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধে নিষ্প্রাণ প্রতিমা ও পুঞ্জীভূত প্রতিমার উদাহরণ দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রকাব্যে ঘ্রাণ, স্পর্শ, শব্দ ও সর্বাধিক পরিমাণে দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইমেজের আবির্ভাব হয় (অবশ্য অপর একটি নিবন্ধে এই শেষ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ তিনি নিজেই করেছেন, সেখানে বলেছেন, "কবির প্রতিমাপ্রয়োগে যদিও ধ্বনি-স্পর্শ-গন্ধ-দৃষ্টি সব কয়টি ইন্দ্রিয়বেদিতার পুনরাবৃত্ত প্রকাশ, তবুও ধ্বনিই প্রবল।") লেখক আরো দেখিয়েছেন কবি কীভাবে বিমূর্তকে ইমেজের সাহায্যে অবয়ব ও রূপ দেন এবং সাবধান করেছেন এই বলে যে কাব্যসৃষ্টির কারবার শারীর ইন্দ্রিয় নিয়ে নয়, শরীরোত্তর কল্পনাগম্য ইন্দ্রিয়বোধ নিয়ে।

শ্রীশঙ্খ ঘোষের 'নাটকে গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক' বিশ্লেষণদক্ষতায় অচিরেই পাঠককে মুগ্ধ করে। প্রবন্ধটিতে তিনি প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিবার্য ছিলো না। এমন কি যে নাটকে গান নেই সেই ডাকঘরেই গীত পরিবেশ সবচেয়ে সুরক্ষিত। লেখকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাট্যকার ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথের এই অস্বস্তিকর আপোসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন নাট্যকার। এই আলোচনার সপক্ষে তিনি উপস্থিত করেছেন বিচিত্র ও কৌতূহলপ্রদ বহির্দৈনিক তথ্য ও নাটকের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ। প্রসংগত গানের সময় সহ-অভিনেতা ও গায়কের কায়িক অভিনয়ের সমস্যার সুন্দর আলোচনা করেছেন, প্রমাণ করেছেন 'গান যখন সংলাপ তখন নৃত্যই তার অভিনয়', এবং সেই কারণে রবীন্দ্রনাটকের চরম পরিণতি নৃত্যনাট্যে। তিনি দেখিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে গানগুলি অব্যবহিত পূর্বের গদ্য সংলাপের রূপান্তর মাত্র। তাতে কোন লাভ হয় না, বরং মাধ্যমের অকস্মাৎ স্তরপরিবর্তনে শিল্প লক্ষভ্রষ্ট হয়। মুক্তধারার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণ নির্ণয়ে লেখকের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। শ্রীযুক্ত ঘোষের অপর একটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা' শুধু এই কারণেই উল্লেখযোগ্য নয় যে, এটি এই বিষয়ে সম্ভবত প্রথম আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের জীবনও যেহেতু শিল্প, তাই তাঁর পত্রাবলীও রচিত শিল্প। সাহিত্যে যতটুকু পত্রাবলীতেও ঠিক ততটুকু তাঁর আত্মপ্রকাশ
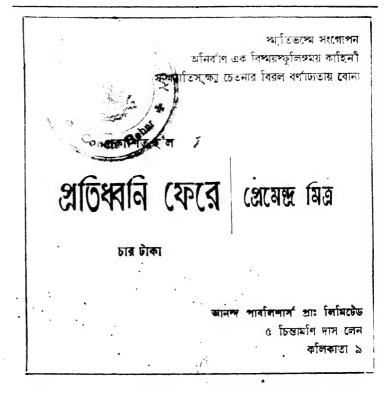
কোন নেপথ্য ইতিহাস চিঠিতে নেই বলে ছিন্ন পত্রাবলীকেও ডায়েরিধর্মী বলা যায় না। লেখকের একটি সিদ্ধান্ত মূল্যবান— 'তাঁর পত্রাবলী মনীষা-নির্ভর নয়, অনুভব-নির্ভর'। ছিন্নপত্রের পত্রাবলী বারংবার আবর্তনে ক্লান্ত করে এ কথা স্বীকার করা যায় না অবশ্য। যে কারণে ধরণীর তৃপ্তি-হীন একই লিপি বসন্তে বর্ষায় ক্লান্ত করে না, সেই কারণে এই পত্রগুলির পুনরাবৃত্তিও ক্লান্ত করে না। কারণ রচিত হলেও আশ্চর্য ভাবে সেগুলিকে প্রাকৃতিক মনে হয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভোরের পাখী' প্রবন্ধটি মূল্যবান। প্রথমে মুদ্রিত কবিতা অভিলাষে রবীন্দ্রনাথ উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার দিয়েছেন, ঐ কবিতায় কবি কর্তৃক তৎকালে অনূদিত কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথের প্রভাব বর্তমান এবং অভিলাষ রচনার প্রেরণা সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালীর বাহুবল প্রবন্ধের প্রতিবাদের বাসনা—এই বিষয়গুলি লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ প্রমাণের সাহায্যে লেখক অনুমান করেন কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশবর্ষীয় বালক রবীন্দ্রনাথের রচিত নয়, ওটির রচনাকাল ১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যবর্তী কোন এক সময়।

এই সংকলন কয়টি ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের একত্র ব্যবহার এবং একই তথ্যের বারবার পুনরাবৃত্তির বিরক্তিজনক উপস্থিতি সত্ত্বেও শ্রীকানাই সামন্তের 'রবীন্দ্র প্রতিভা' একটি নিষ্ঠাপূর্ণ সংযোজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন প্রকৃত সমালোচক পূজারী পুরোহিত, শ্রীযুক্ত সামন্ত রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত সেই সমালোচনা পদ্ধতি এই গ্রন্থে অনুসরণ করেছেন। বর্তমান সময় সে পদ্ধতিকে যে মেনে নেবে এমন ভরসা কম কিন্তু লেখকের 'কমলা' 'উত্তরীয়' 'দামিনী' প্রবন্ধগুলি অনিবার্যভাবে প্রাচীন সাহিত্যের কাব্যের উপেক্ষিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাকে সর্বাধিক আকর্ষণ করেছে 'রবীন্দ্র কাব্যের নেপথ্যচারিণী' এবং 'রবীন্দ্র প্রতিভার নেপথ্যভূমি' প্রবন্ধ দুটি। কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে কবির সম্পর্ককে ঘনীভূত সৌন্দর্য ও প্রীতির আকার বা হ্লাদিনী শক্তি বলে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা লেখক করেছেন বটে কিন্তু রক্তে যে সম্পর্ক দোলা দিয়েছে, সেই তেইশ বছরের শোকের মধ্যের মানবিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। এই ধীময়ী মহিলার ছবি দেখে ছবি কবিতার ও সেই সঙ্গে বলাকা ছন্দের জন্ম এবং তাঁর মৃত্যুর পর লিখিত পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে লিপিকার অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য নির্দেশ এইগুলি এই প্রবন্ধের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সত্য যে জীবনের নিকষে পরীক্ষিত তার একটি প্রমাণ শাজাহান কবিতার প্রেমতত্ত্ব ও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সাদৃশ্য। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর পিছনে যে কারখানাঘর তার কিছু পরিচয় আমরা পাই, এবং সেই পরিচয় পাঠকের আগ্রহ আরো উদ্দীপিত করে।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান' গ্রন্থে বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনা পাই। ভানুসিংহের পদাবলী থেকে আলোচনার সূত্রপাত। ভানুসিংহের পদাবলীর ভাষা কৃত্রিম এ-কথা অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না, কেননা ভাব যেখানে কৃত্রিম ভাষা সেখানে কৃত্রিম হবেই। লেখক সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে এই পদাবলীর ভাবের পার্থক্য দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর সমালোচক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির শিল্পদক্ষতার প্রতি অবিচার করেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে বিষয়-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। পদাবলীর শব্দ, ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ লেখক দিয়েছেন। প্রাক-গীতাঞ্জলি যুগে পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল, পরবর্তীকালে তার বিশেষ অভাব দেখে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন পদাবলীর কাব্যাংশ কবিকে মুগ্ধ করেছিল, বৈষ্ণব সাধনপ্রণালী করে নি। লেখক সর্বশেষে দাবি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সাধনা বৈষ্ণবদের মত রসের ও আনন্দের সাধনা। কিন্তু এই আনন্দের সাধনা তো উপনিষদেও বর্তমান এবং এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্তমর্ণ উপনিষদ্‌, পদাবলী নয়। তা ছাড়া অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের উৎস খোঁজেন নি, তাঁর আনন্দের ঝরনা বিশ্বেই বর্তমান। কবির সম্পাদিত পদরত্নাবলী পরিশিষ্টে যোগ করায় গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।

শ্রীআদিত্য ওহদেদারের 'সমালোচক রবীন্দ্রনাথ' এই প্রসঙ্গে পৃথক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে বিশেষ মূল্যবান। গ্রন্থটি প্রকৃত-পক্ষে সাহিত্যসমালোচনার নানা দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের সংকলন, সুতরাং গ্রন্থটি একটি হ্যান্ডবুকের প্রয়োজন চরিতার্থ করবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ধারণা কত পূর্বে স্পষ্ট রূপে নিয়েছিল, রবীন্দ্রকৃত প্রথম সমালোচনার বিশ্লেষণ করে লেখক তা খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। লেখক কখনো-কখনো রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে অন্যদের মতের সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, যেমন সাহিত্যে অপ্রয়োজন তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসের একটি উক্তির, রবীন্দ্রনাথের প্রকাশতত্ত্বের সঙ্গে এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতার, এবং ট্র্যাজেডীতে আনন্দ বিষয়ে রিচার্ডস্-এর মতের—কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে সাদৃশ্য নিরূপণে লেখকের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। মার্কসের একটি বিচ্ছিন্ন উক্তির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু সাহিত্যে অপ্রয়োজনবাদ কোনদিন মার্কসীয় মতবাদ কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতার দিকে লেখক কোন ইঙ্গিত করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের তত্ত্ব ভাব উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করেন নি— "অলংকারের দুটি প্রধান উপাদান—চিত্র আর সংগীত" নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন নি।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য' গ্রন্থে প্রান্তিক থেকে শেষ লেখার বিস্তারিত আলোচনা পাই। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ে মূলত চার শ্রেণীর লেখা পাই, ডায়েরিধর্মী শিথিল বহিঃদৃশ্য বিবরণ, অতীতের বিশেষত শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন, কাহিনীমূলক রচনা এবং যুগযন্ত্রণা ও রোগযন্ত্রণাজাত নূতন অভিজ্ঞতা প্রকাশকারী কবিতা। চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কবিতায় সার্থকতার শিখরে রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ে আরোহণ করেছেন। এই গ্রন্থে এমন কোন শ্রেণীভাগ পাই না বটে কিন্তু শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের পুনঃপুনঃ সার্থতার বিবৃতি যে নঞর্থক নয়, সত্যের বীর্যবান স্বীকৃতি এ-কথা লেখক চমৎকারভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একদিকে যেমন দেখিয়েছেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে লেখা রচনাগুলিতে উত্তেজনা যতটা আছে কবিত্ব ততটা নেই, তেমনি অপরদিকে দেখিয়েছেন মৃত্যুর ছায়ায় পীড়িত দিনগুলিতে রচিত অনেক কবিতায় ট্র্যাজিক মহিমা বর্তমান। কিন্তু সব সত্ত্বেও গ্রন্থটি মোটের উপর পাঠককে হতাশ করে। লেখক নিজেই গ্রন্থের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েও কেন সেই দুর্বলতার দূরীকরণে চেষ্টা করলেন না, এটি পাঠকের একটি সংগত প্রশ্ন। 'সত্তার গভীর গুহা' থেকে যে নূতন ইমেজারি জন্ম নিল তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন নি, গদ্যছন্দের আবিষ্কারের পর শেষ পর্যায়ে আবার কেন কবি অমিল পদ্যছন্দে ফিরে এলেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেন নি, উত্তর পর্যায়ের রচনাবলীর কাব্যমূল্য সম্বন্ধে লেখক নিজস্ব মতামত দিতে সাহসী হননি।

॥ ২ ॥

আলোচ্য বর্ষকালে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেইগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'। যিনি অধ্যাপক দাশগুপ্তের রচিত ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত আছেন তিনিই জানেন এই বিষয়ে আলোচনার তিনি যোগ্যতম অধিকারী। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে তিনি শাক্ত সাহিত্য ও সাধনার আলোচনা করেছেন। যদিও বাংলা সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই মূলত তাঁর আলোচনা তবুও ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া ও হিন্দী শাক্ত সাহিত্যের আলোচনা যোগ করায় গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। কোন কোন ধারার মিশ্রণে বর্তমানের শক্তিতত্ত্ব ও শাক্তদেবীর ধারণা রূপ পরিগ্রহ করেছে তার বিবৃতি লেখক দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, হিমাচল-সংশ্লিষ্ট প্রদেশের চীনাচার, শস্যপ্রসবিনী পৃথিবী দেবীর কল্পনা, দক্ষতনয়া সতীর পৌরাণিক ধারা, শস্ত্রধারিণী অরিনাশিনী দুর্গা, সমরপ্রিয়া চণ্ডী এবং অনার্য দেবী কালী ও শোণিতলোলুপা চামুণ্ডার সংমিশ্রণে বর্তমান শাক্ত দেবীর ধারণা পুষ্টি লাভ করেছে। লেখকের মতে শৈলবাসিনী সিংহবাহিনী উমাই শক্তির প্রাচীনতম রূপ। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উৎসবপ্রধান দুর্গাপূজার চেয়ে সাধনার ক্ষেত্রে কালীর প্রাধান্যের সম্ভাব্য কারণ আলোচনা করেছেন। মঙ্গলকাব্যে বন্দিত লৌকিক দেবীরা ক্রমে কী ভাবে সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে উচ্চ কোটির পূজিত দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, গোসাধনাও গৌরীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল, একটি কৌতূহল উদ্রেককারী অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে তা বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিতা ও শাক্ত কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচারে এবং আগমনী বিজয়ার সাহিত্যগুণ বিশ্লেষণে কোন নূতন দৃষ্টির পরিচয় নেই, হয়তো তার অবকাশও নেই। সর্বজনীনতা, তন্ত্রের পশ্বাচার থেকে মুক্তি, শ্যামাকে ব্রহ্ম দান, প্রতিমাপূজার বিরোধী না হয়েও প্রতিমাকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা—এইগুলিই শাক্তসাধনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। রামকৃষ্ণের সাকারসাধনা ও তৎশিষ্য বিবেকানন্দের বেদান্তমতে যে কোন বিরোধ নেই তা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনায় প্রদর্শিত হয়েছে। অপর একটি অধ্যায়ে লেখক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন যেখানে তিনি বাংলা স্বদেশী সংগীতে দেশমাতৃকা ও শ্যামা মায়ের অভেদ কল্পনার আলোচনা করেছেন। বন্দেমাতরমে দ্বিজেন্দ্রলালে, এমনকি রবীন্দ্রনাথে দেশ ও শ্যামা মা অভিন্ন হয়ে গেছে—ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।

এই প্রসঙ্গে অপর একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়—শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্যের 'বাংলা কাব্যে শিব'। অধ্যাপক দাশগুপ্তের মতামতের দ্বারা এই গ্রন্থ প্রভাবিত এবং অনেক দিক থেকে পূর্বোক্ত গ্রন্থটির পরিপূরক এই গবেষণাটি। গ্রন্থের প্রথমার্ধে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে শিবধারণার বিবর্তন দেখানো হয়েছে। বৈদিক রুদ্র অনার্য কৃষকগণ পূজিত উর্বরতার দেবতা, বুদ্ধপ্রভাবের মিশ্রণের ফল এই শিব। লেখক শিব-পরিবার ও শিব-প্রতীকসমূহেরও পরিচয় দিয়েছেন। অতঃপর মূল বিষয়ের অবতারণা করে বাংলা কাব্যে শিববন্দনা, শিবের জন্মবিবরণ, কৃষকরূপ ও বিবাহের বিবরণের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা কাব্য শিবের দেবত্ব ক্ষুণ্ণ করেনি এ মন্তব্য স্বীকার করা যায় না। যে কৃষক ভবঘুরে ভিক্ষুক কামুক মাদকসেবী ঐন্দ্রিক ও বিদূষকের চিত্র তিনি বাংলা কাব্য থেকে আহরণ করে উপস্থিত করেছেন তার ভিত্তিতে আর্য শিবের দেবত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি এমন দাবি করা চলে না। এ ছাড়া আরো কয়েকটি আপত্তির কথা উল্লেখ করা উচিত। কৃষি ও শস্যোৎসবের কৌম ধারণার প্রভাব যে এখনো বর্তমান, লেখক রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে তার উদাহরণ দিয়েছেন, কিন্তু শিব মূলত কৃষি ও প্রজননের দেবতা হলেও কৃষি-প্রজননের অনুষঙ্গ মানেই কি শিব? লেখকের আলোচনার ধারা দেখলে মনে হয়, লেখক দুইকে অভিন্ন করে দিয়েছেন। এ ছাড়া, শিবের কোন অনুষঙ্গ থাকা মাত্র, কখনো অনুষঙ্গ ব্যতিরেকেও, কবিতাকে শিবধারণার কাব্য বলে ব্যাখ্যা দেবার অনুচিত প্রবণতা লক্ষ্য করি। "মানবপুত্র এবং শিশুতীর্থ কবিতা দুটির পশ্চাৎপট খৃষ্টজীবনী হলেও মূলত কুমারসম্ভব অথবা শৈবভাবের দ্যোতক" এ এক অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত। কুমারসম্ভবে কি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্মের কথা আছে? 'আমার কাজের মাঝে মাঝে কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে' এখানেও হতবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি লেখক শিবধারণা আবিষ্কার করেন। যখন 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' উদ্ধার করে বলেন এখানে 'শিব নেই তবুও তিনি আছেন' যেহেতু জীবনের জয়গানের অধিনেতা শিব, তখন বিস্মিত হয়ে ভাবি অহিন্দু বিশ্বের কত কবির কবিতাই না শিবভাবনায় ভাবিত! সে ক্ষেত্রে শেলির ওয়েস্ট উইন্ডও শিব; বরং কে নয়?

শ্রীঅজিত দত্তের 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' ও শ্রীঅজিতকুমার ঘোষের 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' এই দুটি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে একটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাই। দুজনেই স্বীকার করেছেন মধ্যযুগের হাস্যরসে শুচিতার অভাব কিন্তু সে কথা স্বীকার করে নিয়েও শ্রীযুক্ত ঘোষ মধ্যযুগের হাস্যরসের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত অপর পক্ষে আধুনিক-পর্বে হাস্যরসের বিশেষ মর্যাদা দেননি বলে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র ছাড়া ঐ অধ্যায়ের অপর কোন কবির আলোচনা করেন নি। শ্রীযুক্ত দত্তের গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি বহু অবান্তর বিষয়ের অবতারণা। "হাস্যরসটুকু আলাদা করে নিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়" এ কথা তত্ত্বগত দিক থেকে সত্য হলেও, সেই তত্ত্বকে বাস্তবে রক্ষা করতে যেয়ে তিনি এমন বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা বিষয়ের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। এই লক্ষ্যভ্রষ্টতা বা কেন্দ্রচ্যুতি শ্রীযুক্ত ঘোষের লেখায় নেই। শ্রীযুক্ত ঘোষ রূপকথা, ছড়া ও প্রবাদের হাস্যরস আলোচনা করায় তাঁর গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। দুজন সমালোচকই দেখিয়েছেন, সংস্কৃতে হাস্যরস ও তৎসম্পর্কিত আলোচনার অভাব, মধ্যযুগে স্থূল বিষয় ও বীভৎস বিষয় অবলম্বনে হাস্যরসের বিকাশ ও আধুনিক

যুগে হাস্যরস বিকাশের তিনটি প্রধান বিষয় —সনাতন ও প্রগতিপন্থীদের পারস্পরিক আক্রমণ, ইংরেজীয়ানা ও স্বাদেশিকতার দুর্বলতাকে আক্রমণ এবং ব্রাহ্ম ও হিন্দু-সমাজের পারস্পরিক ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ। শ্রীযুক্ত দত্তের প্রধান কৃতিত্ব ব্যক্তিগত লেখকদের রচনার আলোচনায়—বিশেষত সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও রাজশেখর বসুর রচনার বিচারে। প্রথাগতভাবে যা হাস্যকর নামে পরিচিত অথচ যেখানে হাস্যরসের লেশমাত্র নেই সেখানে স্পষ্টভাবে সেই অভাবের কথা শ্রীযুক্ত দত্ত বলেছেন, এই সাহস অভ্যর্থিত হওয়ার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষের আলোচনা যদিও বিস্তৃততর, তবু শ্রীযুক্ত দত্তের আলোচনা গভীরতর বলে মনে হয়। শ্রীযুক্ত ঘোষ যখন শরৎচন্দ্রকে হাস্যরসিক বলেন অথবা বলেন দীনবন্ধু আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক তখন সংশয় জাগে—বিশেষত যখন জানি দীনবন্ধুর হাস্যরস বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যগত স্থূলতার উত্তরাধিকারী। হতবাক হই যখন দেখি শ্রীযুক্ত ঘোষ বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থে সুকুমার রায়ের নাম-মাত্র উল্লেখ করেন এবং অবনীন্দ্রনাথের রচনার কোন আলোচনাই করেন না।

বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে এতদিন পর্যন্ত শ্রীকুমারবাবুর গ্রন্থটিই অদ্বিতীয় ছিল। সম্প্রতি ঐ বিষয়ে শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। অবশ্য গ্রন্থটিকে বাংলা উপন্যাসের শতবর্ষের ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া চলে না, কারণ সেই ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য অনেক অপ্রধান ঔপন্যাসিক এই গ্রন্থে অনালোচিত। লেখক উপন্যাস সম্বন্ধে তত্ত্বগত আলোচনায় প্যাটার্নের উপর জোর দিয়েছেন, যদিও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নি এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন উপন্যাসের বক্তব্য থাকে উপন্যাসের সর্বাঙ্গে, উপন্যাসের সারাংশ উপন্যাসের বক্তব্য নয়। লেখক বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা করেছেন কিন্তু বঙ্কিমের পরবর্তী উপন্যাসগুলির আলোচনা করেন নি—পরবর্তীকালে সচেতন-শিল্পী বঙ্কিমের শিল্পাদর্শের পরিবর্তনের ফলে তাঁর উপন্যাসের কর্মে কী পরিবর্তন হয়েছে তার আলোচনাও করেন নি। রবীন্দ্রনাথের যে চারটি উপন্যাস এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে চোখের বালি ও গোরার আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও অত্যন্ত মূল্যবান। "বঙ্কিম মেনেছেন ঘটনা ও চরিত্র সংঘাতের লজিক ও রবীন্দ্রনাথ পুরো ব্যক্তিত্বের লজিক" সমালোচকের এই উক্তি তাঁর তীক্ষ্ণদর্শিতার উদাহরণ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের দুর্বলতা তাঁর শিল্পীস্বভাবের নানা মুদ্রাদোষ সমালোচকের চোখ এড়ায় নি। তারাশঙ্কর ও অন্নদাশঙ্করের সত্যাসত্যের আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর আলোচনা করেন নি, "মানিকবাবুর শিল্পীজীবনের প্রকৃষ্ট অধ্যায়ে মার্কসবাদের সাঙ্গীকরণ হয়নি"—এই মূল্যবান উক্তির সমর্থনে লেখক কোন ব্যাখ্যা দেননি।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন শ্রীভবতোষ দত্ত তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে। তিনি দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমের ধর্মগত ধারণা যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম ইতিহাসচেতনা ও পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের মিশ্রণে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর ধর্মতত্ত্বের মধ্যে ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বীজ। শিক্ষার ক্ষেত্রে রামমোহনের মত তিনিও জোর দিয়েছিলেন বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার উপর। বঙ্কিম ব্যতীত ঐ যুগের মনন-সাধনার অন্য ধারাগুলির—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ—অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ-বিস্তারিত আলোচনায় পশ্চাৎপটটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় রচনার ও ইতিহাসচেতনার যে পরিচয় শ্রীযুক্ত দত্ত দিয়েছেন তাতে বঙ্কিমের ইতিহাসদৃষ্টির গভীরতার পরিচয় মেলে। বঙ্কিমের ইতিহাস রাজমালা নয়, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। সাহিত্যচিন্তার বিচারে দেখি, বঙ্কিমের মতে সাহিত্য মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য রূপবিকাশ, তাঁর সমালোচনাপদ্ধতি রোমান্টিকপর্বে প্রত্যক্ষতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত, এবং তাঁর মতে কাব্যের উদ্দেশ্য শিল্পসৌন্দর্য বজায় রেখে চিত্তশুদ্ধি দান। বঙ্কিমের মনীষার বৈশিষ্ট্য কীভাবে বঙ্কিমের শিল্পকর্মকে প্রভাবিত করেছিল সে সম্বন্ধে একটি অধ্যায় বোধ হয় গ্রন্থটিতে যুক্ত হতে পারতো।

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রের 'তারাশঙ্কর' গ্রন্থটি পেয়ে যে পরিমাণে উৎসাহ বোধ করেছিলাম একজন জীবিত প্রধান ঔপন্যাসিকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভেবে, পাঠান্তে সেই পরিমাণে হতাশ হয়েছি। এই হতাশার জন্য প্রধানত দায়ী প্রভূত অবান্তর বিষয়ের অবতারণা যা লেখকের রচনাকে প্রায়শই লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। প্রথম শতপৃষ্ঠা পর্যন্ত এলোমেলো লেখার বহুলাংশের সঙ্গে তারাশঙ্করের রচনার যোগ কোথায় তা ভেবে বিমূঢ় হতে হয়। এ বই সাহিত্যসমালোচনা, না স্মৃতিকথা, না জীবনী তা স্থির করাই দুরূহ ব্যাপার। অশ্রুতনামা ননীবালা গুপ্তার বা সুহৃৎচন্দ্র চৌধুরীর প্রবন্ধের অংশবিশেষ কেন তাঁর কাছে উদ্ধৃতিযোগ্য বলে মনে হয় সে কথা বোঝার কোন উপায় নেই। যে-অধ্যায়ের নাম 'তারাশঙ্করের কলাকৌশল' তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে 'কল্লোল ও কালিকলমপর্বে আবহাওয়া' নামে একটি ঐতিহাসিক অংশ ঢুকে পড়ে। মূল বিষয়ের আলোচনায় ছোট গল্পের বিবর্তন স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয় নি; উপন্যাসের ফর্ম, স্থান ও মৌলিক বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের কথা বলা হয় নি; মোটিফের প্রতি ঝোঁক এবং কতকগুলি থীমের পুনরাবৃত্তি-প্রবণতার কোন আলোচনা নেই। তারাশঙ্করের রচনার বিষয়বস্তুতে আমার মনে হয় তিনটি পদক্ষেপ আছে—সামাজিক সমস্যা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্য দিয়ে নৈতিক সমস্যায় উত্তরণ; গ্রাম ভারতবর্ষ থেকে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের স্পর্শ মধ্যান্তরে লাভ করে পরিণামে ভারতবর্ষের নৈতিক ট্রাডিশনে প্রত্যাবর্তন। শ্রীযুক্ত মিত্র গ্রন্থটিতে তারাশঙ্করের গদ্যরীতি নিয়েও কোন আলোচনা করেন নি।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'গীতি-কবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ যেখানে তিনি ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা প্রভৃতির উপর ভারতচন্দ্রের প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। বৈষ্ণবকাব্যের কতকগুলি বহিরঙ্গ অনুষঙ্গের উপস্থিতির ফলে মধুসূদনের মধ্যে লেখক বৈষ্ণবপ্রাণতা অনুমান করেছেন অথচ লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন ব্রজাঙ্গনার রাধা বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি বৈষ্ণবপ্রবণ তাঁর রাধার কি এই দুরবস্থা হতে পারে? নজরুল সম্বন্ধীয় আলোচনায় যে দিকগুলি সচরাচর অবজ্ঞাত হয়, তাঁর উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক ও সাংবাদিকতা, তার কৌতূহলপ্রদ আলোচনা শ্রীসুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল-চরিত-মানস' গ্রন্থে পাই। শ্রীঅর্পণাপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে চণ্ডীচরণ সেন ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা পাই।

॥ ৩ ॥

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সাহিত্য প্রবন্ধাবলী ব্যতীত নানা পত্র-পত্রিকাতে যে সমস্ত অনুধাবনযোগ্য প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষকালে প্রকাশিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্বশেষে আমি অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। আগেই জানিয়ে রাখি, বহুলসংখ্যক পত্রিকার ভিড়ে কোন কোন মূল্যবান প্রবন্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, যদিও লেখকের তরফে নিষ্ঠা ও সন্ধিৎসার অভাব

ছিল না। রবীন্দ্রবর্ষে যেমন প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাই বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা নানা আলোচনায় সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন, তেমনি এই বর্ষের পত্রিকাসমূহের সাধারণ সংখ্যাগুলিতেও অনেক রবীন্দ্র সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'শারদীয় আনন্দবাজারে' শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় 'মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ইউরোপীয় মানবিকবাদ অতিপ্রাকৃতকে অস্বীকার করতে যেয়ে শিল্পে যে রিয়্যালিজম্ বা ন্যাচারালিজম্ প্রবর্তন করেছে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মানবিকবাদ তাকে স্বীকৃতি দিতে পারে নি। শতবার্ষিকী 'সাহিত্য পত্রে' শ্রীশান্তি বসু 'আনন্দ, শান্তি, অমৃত' প্রবন্ধে দাবি করেছেন, স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অনুসারক রবীন্দ্রনাথের বিচার রেনেসাঁ-প্রাপ্ত সূত্রের দ্বারা করা চলে না। যে ঐতিহ্যকে ঈশ্বরের সন্তানের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না, যে ঐতিহ্যের মতে সর্বজীবপ্রকৃতিতেই আনন্দময় ঈশ্বর, সেই ঐতিহ্যের আনন্দ-সম্পৃক্ততা রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতাকে অমন মহৎ উচ্চারণের সামর্থ্য দিয়েছে। তার মানে এই নয় যে তিনি ঐতিহ্যের অন্ধ স্তাবক, তিনি জড় ঐতিহ্যের মধ্যে স্বীয় অভিজ্ঞতার দীপ্তিতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। শতবার্ষিকী 'পূর্বপত্রে' শ্রীত্রিদিব ঘোষ 'রবীন্দ্রচেতনায় বিশ্বপ্রকৃতি' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মনে কীভাবে দার্শনিক, মরমী, কবি ও বৈজ্ঞানিকের জগৎবোধের সংমিশ্রণ হয়েছিল এক লীলাময় সামঞ্জস্যের উপলব্ধি সৃষ্টির কাজে। 'উত্তরসূরীর শতবার্ষিকী সংখ্যা সুপরিকল্পিত ও নানা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। চিত্রাবলী ও সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধগুচ্ছ দুটি সংখ্যাটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এই সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ শ্রীকানাই সামন্তের 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' লেখকের 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'কবিতা' ও 'উত্তরসূরী'র স্মারক সংখ্যা দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুটি সংখ্যাই বিগত কবির পত্রাবলীতে সমৃদ্ধ। প্রবন্ধাবলীর মধ্যে শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনদর্শন' সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায় উল্লেখযোগ্য, অনেক ভ্রান্ত ধারণার হন্তারক। অকম্প্র নাস্তিকতাই সুধীন্দ্রনাথের নৈঃসঙ্গ্যের জন্য দায়ী অথচ নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি শ্রেয়োবোধ বিসর্জন দিতে পারেন নি, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দায়িত্বশীল মানুষের চেতনাই মূল্যবোধের উৎস। প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন, এই কবি সোহহংবাদ ও ক্ষণবাদের দ্বন্দ্ব এড়াতে পারেন নি, এবং এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব যে তিনি এই দ্বন্দ্বের কোন সহজ সমাধান খোঁজেন নি। 'চতুরঙ্গে' শ্রীঅমলেন্দু বসুর* 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' এমন একটি রচনা যা পাঠককে ভাবায়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বর্তমান বিরোধে দ্বিধাগ্রস্ত কবিকল্পনায় প্রাক্তন সুডৌল ও সর্বাঙ্গসুষম মানস ফিরে আসুক, এই প্রবন্ধকারের প্রার্থনা। বর্তমানে কবিদের মানসে সেই সমগ্রতার অভাবের জন্য যেমন কবিরা দায়ী, তেমনি যে বিজ্ঞানের সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর বিশেষীভাব দায়ী এ-কথা শ্রীযুক্ত বসু বলেননি। বিজ্ঞানীরা যখন কাব্যের সত্যকে অলীক বলে উড়িয়ে দেন, আর কবিরা যখন স্বজ্ঞাপ্রাপ্ত কবিতার সত্যকে মহত্তর সত্য বলে দাবি করেন, তখন লেখক বিজ্ঞানপন্থীদের দাবিই মেনে নেন বলে মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা মানবসভ্যতার অনিবার্য অগ্রগতিতে বিশ্বাসী উদারপন্থীদের বিপত্তির কথা যদি মনে রাখি, যার জন্য দায়ী মানুষের অভ্যন্তরের অযৌক্তিক শক্তিকে অস্বীকার, তা হলে বিজ্ঞানপন্থীদের দাবি কিঞ্চিৎ লবণ-সহযোগে গ্রহণ করতে হয়। কবিদের বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য লেখক দায়ী করেন কবিকুলকে। কিন্তু মনে হয়, এই সর্বাঙ্গীণ বিচ্ছিন্নতাবোধের রোগ শুধু কবিদের চেষ্টায় উপশম হতে পারে না, তা সভ্যতারও দায়িত্ব। এই বর্ষে 'বিশ্বভারতী পত্রিকার অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা একটি মহামূল্যবান প্রকাশন। এই সংখ্যায় অন্তত তিনটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা আছে সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। শ্রীঅমলেন্দু বসু 'কথক অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের রচনায় কথারীতির তথা কথকতার প্রভাব আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ যেখানে লেখক অবনীন্দ্রনাথের উপর মুসলমানী পুঁথি বা দোভাষী সাহিত্য ও কিস্সা সাহিত্যের প্রভাব দেখিয়েছেন। অজিত দত্ত 'ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' নামক মূল্যবান প্রবন্ধে দেখিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা তাঁর গদ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। অবনীন্দ্রনাথের সাধু ও সংস্কৃতবহুল গদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কাদম্বরীর কথা স্মরণ করেছেন। শ্রীঅমলেন্দু বসু আক্ষেপ করেছেন বাংলা-গদ্যের ছন্দোবিশ্লেষণ হয়নি বলে, শ্রীঅশোকবিজয় রাহা 'বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের ছন্দোবিচার করে সেই আক্ষেপের কারণ আংশিকভাবে দূর করেছেন। যাঁরা বর্তমানে বাংলা কবিতায় মুক্তছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়েছেন তাঁরা শ্রীযুক্ত রাহার কৃত 'অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ বিশ্লেষণে বিশেষ উপকৃত হবেন বলে মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথের লেখা গদ্য ও কবিতার আশ্চর্য সমন্বয়, এই উক্তি অশোকবাবুর বিস্ময়কর বিশ্লেষণ থেকে সত্য মনে হয়। এই ছবির জাদুকর রূপকথা সৃষ্টির কাজে 'যেমন করে মুখে গল্প কর' সেই ছড়ার ছন্দের পর্বে-পর্বে গেঁথে তাঁর গদ্য রচনা করেছেন —সেই গদ্যের উপকরণ ছড়ার ছন্দের পর্ববিন্যাসের কত বৈচিত্র্য, কত ভঙ্গিমা, চালের স্বাতন্ত্র্য!—সমস্ত নিপুণভাবে শ্রীযুক্ত রাহা দেখিয়ে অবনীন্দ্র-ভক্তদের কৃতজ্ঞ করে রাখলেন।

'নতুন সাহিত্যে' বর্তমান বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ঔপন্যাসিক শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার 'উপন্যাসের ভূমিকায়' প্রবন্ধে উপন্যাসকে বিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে এগিয়ে যেতে দেবার অধিকারে দাবি করেছেন। অন্য প্রসঙ্গে এই দাবির প্রতিবাদ করেছেন ঐ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় শ্রীনিখিলকুমার নন্দী 'অদ্যতন ছোট গল্পের ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে। বিতর্ক-ব্যগ্র এই প্রবন্ধে লেখক বাংলা গল্পের বর্তমান স্বাস্থ্যহীন রীতিবিলাস ও ভঙ্গিসর্বস্বতার প্রতিবাদ করেছেন। যদিও এই প্রবন্ধের অনেক উক্তিই গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও আমার মনে হয় কারও মুখ থেকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন ছিল। এতদ্ব্যতীত 'দেশে' এই বর্ষে প্রকাশিত শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'গ্যোয়েতের ফাউস্ট' ও শারদীয় 'পরিচয়ে' প্রকাশিত শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীর্ঘ কবিতা ও চিত্রকল্পের সংলগ্নতা' উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ। শারদীয় 'দেশ'-এ প্রকাশিত শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'বীটবংশ ও গ্রীনিচ গ্রাম' অত্যন্ত সুলিখিত ও সুখপাঠ্য একটি প্রবন্ধ, যার মধ্য দিয়ে মার্কিন দেশের এক নবীন সাহিত্য আন্দোলনের তিনি কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল আলোচ্য বর্ষ 'সমকালীন' পত্রিকায় ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ ধারাবাহিকভাবে দিয়েছেন। এই বিবরণের মধ্যে রঙ্গদেবতাপূজা প্রথা, পূর্বরঙ্গ বিবরণ উপসমিতি বা উপনিষদে বিভক্ত সংসদ যে সূত্রধার নির্বাচিত করত—এই সমস্ত সংবাদ কৌতূহলোদ্দীপক।

সূত্রহীন

শিশিরকুমার দাশ

দুর্লভ রোদের রেখা আবার হারায় মেঘে
পাখীহীন ক্লান্তিভরা আকাশে আকাশে
রোগার্ত সবুজ মাঠে মেয়েটির দৃষ্টি আছে জেগে
উজ্জ্বল হলুদ স্কার্টে বসে আছে ঘাসে।

লোমশ কুকুর দুটি ছুটে যায়, সহাস্য দম্পতী
দাঁড়ালো রাস্তার ধারে, চলে গেল বাস
মদের গন্ধের রেশ কারো মুখে, ক্লান্ত কারো গতি
বৃষ্টি নামল ভারী কোটে· নিস্পৃহ বাতাস

এই যে বিচ্ছিন্ন ছবি, দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া
পুলিশের নীল টুপি, তরুণীর লাল ঠোঁট দুটি
সোনারঙা ড্যাফোডিলে পুকুরের দুইতীর ছাওয়া
একমনে বুড়ো বসে খেয়ে চলে জীর্ণ পাঁউরুটি—

সমস্ত স্রোতের মত ভেসে চলে, স্বদেশে দুপুরে
কে এসে বাজায় গান বুকের নিকটে—
নিমগাছ ছায়া ফেলে, নীচে সুপ্ত নিরীহ কুকুর;
গলিতে ক্রিকেট খেলে, কাগজেতে রটে

আসামে রক্তের স্রোত, অত্যাচার কঙ্গোর উপর,—
হে চাঁদ আছ তো ভালো, সবুজে সোনালি
কবিরা কবিতা লেখে; ক্রমশই সভ্যতা বর্বর—
অবশ্য জগৎভরা রবীন্দ্রমেলার করতালি॥

॥ সহজ সনেট ॥

কেতকী কুশারী

বৃষ্টি থেমে গেলে পর ঝিকিমিকি রেশমী আকাশে
কম্পিত আলাপ চলে ঝাউপাতা সজল হাওয়ায়,
সান্ধ্য ট্র্যাফিকের স্বর ভিজে রাজপথ থেকে আসে,
আলোকিত জানালারা কদাচিৎ সংগীত ঝরায়।

রেস্তোরাঁয় খেয়ে এলে ঘরে যেতে গীর্জার মাথায়
শঙ্খশাদা ভরা চাঁদ দেখা যায় উঠেছে কখন,
একরাত্তি জ্যোৎস্না এসে লেগে থাকে শূন্য বিছানায়,
সমস্ত দেওয়াল জুড়ে বেজে যায় ঘড়ির স্পন্দন।

রাত দশটা পনেরোর বাতি-জ্বলা দুঃখের স্টেশন
তখন একমাত্র হয়ে' জেগে থাকে স্মৃতির অন্তরে,
ফ্রেমে আঁটা একটি মুখ, শুরু-হওয়া গতির গর্জন
পূর্ণ জোয়ারের মত সব কিছু আকাঙ্ক্ষায় ভরে।

কিনারায় ঢেউ তার আবর্তিত স্মৃতিচিহ্ন রাখে,
আজ দশদিন হোলো চিঠি নেই, দেখি না তোমাকে।

হেমন্তে এ কোন বসন্ত

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

এ সোনার বাংলা দেশে এখন সোনা আর খুব বেশী জায়গায় ছড়ানো নেই. দিন দিন ঘর ঘর থেকে সোনা কর্পূর হয়ে উবে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও এক জায়গায় সোনার হরির লুট হয়ে থাকে, যা কুড়িয়ে নিতে এক পয়সাও লাগে না। তা হল শীতকালের সোনা ঝরানো রোদ্দুরের অকৃপণ বিতরণ—গা পাতলেই সোনায় অংগ ভরে ওঠে। কিন্তু তাই বা ক'দিনের জন্য! শীতের চপেটাঘাত এখানে বড্ড মৃদু—জাগতে জাগতেই শীত কলকাতার বুড়ী ছুঁয়ে দেয় চম্পট—হিমালয়ের কোলে গিয়ে মাথা রাখে। বরং গ্রীষ্মের কশাঘাত এখানে আরও নির্দয়। যার ফলে সবাই অতি সহজে হয়ে উঠি ঘর্মাক্ত এবং জর্জরিত—অনেক বেশীদিন ধরে চলে ভাজা-ভাজা হওয়ার পালা। শীত আসার পর কার্তিক-গণেশের মত হাঁচি-কাশি যতক্ষণ না এসে হাজির হয় ততক্ষণ শীত এসেছে বলে ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। তারা আসতে শুরু করলে শীতকে কাটবার জন্য আলোয়ান নামক উলের তলোয়ারটির দিকে হাত বাড়াই লড়াইএ অবতীর্ণ হবার জন্যে। এদিকে ধুনুরী ধনুকে সাজ সাজ রণের টংকার তোলে। গলির মধ্যে এসে পড়ে হাঁড়ি ভর্তি ভর্তি জয়নগরের মোয়া না আরও কিছু—এসব খুদে খুদে মিষ্টি মিষ্টি অ্যাটম বম। ধাওগালী মাত্রেই এই সময়ে কল্পনায় উতরোল—এলো কী এলো না, জানা গেল কী গেল না—শ্রীনলেন গুড় মশাই-এর খবর। বসন্তের দূত যদি বা হয় কোকিলরা—কলকাতায় শীতের দূত হল ইডেন গার্ডেনসের কাগতাড়ুয়া ক্রিকেটাররা। শীত আসার সংগে সংগে কাগজে নজর রাখা শুরু হয়ে যায় এবার অস্ট্রেলিয়া না ইংল্যাণ্ড না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ? অন্দরমহল থেকে খবর কানে আসবে : বাজার দরের ব্যারো-মিটারে ফুলকপির অধোগতি, পটলের উর্ধ্বগতি আর মাছ মাংস non-alignment Nation-এর মত এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। দামের ব্যাপারে সব সময়ে এককাট্টা। চিংড়ি আর কড়াইশুটিদের উদ্দেশ্য করে বলতে ইচ্ছা হয়—তোমাকে বধিবে যে (যে) কলকাতার-গোকুলে কাঁদিছে সে (সে)। প্রথম হেমন্তের পাতলা কুয়াসা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে শীতের নাম করে কলকাতাকে ঘোলাটে আলিংগন শুরু করে দেয়। এক মাঘে শীত পালায় না, এক শরতেও সব পুজো সংখ্যা শেষ করা যায় না। শীত এসে গেলেও পুজো সংখ্যারা পুজোর রেশটুকু ছাপার হরফে অন্তত ঘরের মধ্যে জাগিয়ে রাখে।

বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকায় গ্রীষ্মের অবসানে আর শীতের আগমনের মাঝখানে আর একটি স্বর্ণ সময় আসে যখন দ্বিতীয়-বার বসন্ত আচমকা আর একবার ফিরে আসে। এই সময়টিকে আমেরিকানরা বলে ফল্—বসন্তের দোসর এ হেমন্ত। বসন্ত আসার পর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ আর দেখা যায় না—নানারকম গাছ তাদের মাথায় নানারকম পাতার পাগড়ি পরে কনের.

ধনুর্ধরী ধনুকে রণের টঙ্কার তোলে

দ্বারের পাইক বরকন্দাজের মত ভাঁকিয়ে মাথা উঁচু করে থাকে। আর আকাশ নববধূর মত সলজ্জ হয়ে কিছু হেসে কিছু ইঙ্গিতে কিছু আভাসে তার অনুচ্চারিত ইচ্ছাটির কথা বার বার প্রকাশ করতে চায়। সঙ্গিনী বাতাস বড় মুখরা—প্রিয়সখীর বাসনাকে রসিকতা করে হাওয়ায় দোল খাওয়ায়। গাছে গাছে পাখীর সুরে সুরে বসে তিমিরবরনের মত নিপুণ কোন সুরস্রষ্টার তৈরী অর্কেস্ট্রার সুর। আসলে বসন্ত ক্ষণস্থায়ী। তাই হেমন্তের নাম করে সে পলাতক ধরায় আর একবার ফিরে আসার ছাড়পত্র এই সময় পায়। সমস্ত প্রকৃতি শীতে রিক্ত হয়ে যাওয়ার আগে, তার সমস্ত পাতার সাজসজ্জা নির্মূল হয়ে ঝরে যাওয়ার পূর্বে হঠাৎ দিকে দিকে পাতায় পাতায় এই সময় আসে রঙিন আলোর চমক। হেমন্ত আসে ঢংবাগিয়ে শীতের রাজদূত হয়ে। হিম-শীতল তুষারস্পর্শে বিশ্বপ্রকৃতিকে নিঝুম করে দেওয়ার পূর্বক্ষণে সবুজ পাতারা মুখরা হয়ে কথা কয়—বিচিত্র বহুল বর্ণ-বিন্যাসে তাদের মধ্যে আসে নব উল্লাস। পাতার সবুজের মধ্যে রঙের এত কারচুপি তাও কী কেও জানত! বসন্ত ঠিক যেন কোন কুমারী তন্বীর মত—তার সাধ অশেষ, অচরিতার্থ বাসনা শুধু সম্ভাব্য পুলকের আভাসটুকু নিয়েই সে পৃথিবীর দরবারে পা বাড়ায়। কিন্তু হেমন্তের মধ্যে এই রঙের কারচুপি দেখে মনে হয় সে যেন বয়সগুণে আরও নিপুণা, তার ঠাটঠমকে সে আরও সুচতরা, যৌবনে স্থিরমধ্যা, প্রণয়ে অকুণ্ঠিতা। রস রূপ হয়ে পাতায় পাতায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মে যে পাতারা ছিল গাঢ় সবুজ তারাই হেমন্ত এলে হয়ে ওঠে রক্তিম। ফল-এর আগমনের সঙ্গে প্রথমে সবুজ পাতারা বদলে হয় গোলাপী। গোলাপীর পর তারা আস্তে আস্তে আরও রঙ বদলে হয় লাল। লাল থেকে কাঁচা সোনার রঙ পায়। নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে বেয়ার মাউন্টেনের পার্কের চত্বরে যদি কখনও অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় তৃতীয় সপ্তাহে যান তা হলে দেখতে পাবেন গাছের মাথায় সে কী রঙের ঝলক। ওক, বার্ক, মেপেল, ডগ উড, ভার্জিনিয়া ক্রিপার প্রভৃতি গাছরা কেমন রঙে বালতি ভর্তি করে একে অন্যের ওড়না ছুপিয়ে দেয়। সবুজ পাতা হলদে রঙ পাবার পরেই দেখা যায় শিরশিরে হাওয়ায় শীতের ভ্রূকুটি আরম্ভ হয়েছে। পাতারা সেই শাসনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বর্ণ-বিন্যাসের পারিপাট্য সাত দিনের মধ্যে কোথায় ঘুচে যায়—শুরু হয় পাতা ঝরার দিন। দেখতে দেখতে পাতার জাফরী ভেঙে চুর হয়ে যায়—আসর ভেঙে যাওয়ার পর মনে হয় এ কী পরিহাস। পাতা ঝরে যাওয়ার পর আকাশের মুখ আর পাতায় ঢাকা পড়ে না। শীতের আমেজ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। পৃথিবী থেকে তাপ উধাও হয়ে যায়— চারিদিকে একটা বিষাদের সুর বাজে। রাত্রির দাপট বাড়ে—দিন সঙ্কুচিত হয়। বরফ আসবে তার ভাবনা সবার মনে। যেবার যত শীত পড়ে তার পরের বছর ফল্-এ নাকি গাছের পাতা তত রঙবাহার হয়—এই ধারণা সবার মধ্যে খুব প্রচলিত।

কিন্তু শহর নিউইয়র্ক ফল্-এর সময় হয়ে ওঠে আরও লোভনীয়। ঘরে ঘরে সেণ্ট্রাল হিটিং চালু হয়—স্কুল-কলেজের নতুন টার্ম শুরু হয়। হালকা জামাকাপড়ের ছুটি মঞ্জুর হয়—পশমীরা ওয়ারড্রোব থেকে মুক্তি পায়। ম্যানহাটনের স্বপ্নালু নিয়ন আলোর তলায় তাঁদের আনাগোনা বাড়ে। গরমের ছুটিতে দূরে দূরে সব জায়গায় যারা নিউইয়র্ক ছেড়ে ভেকেশন করতে গিয়েছিল তাদের এখন অফুরন্ত সময়। শীত ঠিক আসেনি—কানে আসছে তার পদধ্বনি, গায়ে লাগছে তার শিহরন। Glamour রানীদের অঙ্গ ব্রোকেডে মুড়ে উগ্র প্যারিসীয় কোন ন্যাতোয়্যারার গন্ধ হাওয়ায় বিলিয়ে সোহাগ করছেন এবং পাচ্ছেনও। ব্রডওয়েতে তাঁরা জুড়ীকতে জুড়ীকতে জমায়েত হচ্ছেন কোন প্রথম রজনী দেখতে। ধনুকের মত রঙকরা মিশকালো ভুরু দুটি এক জোড়া
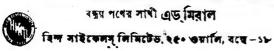
নিজের হার্তটিকে হালের মত চালিত হতে দিচ্ছেন অপরের হাতের মধ্যে রেখে

লাল ঠোঁটের উপর এদিক ওদিক দৃষ্টির তীর হয়ে ছুটে চলেছে। নিজের হার্তটিকে হালের মত চালিত হতে দিচ্ছেন অপরের হাতের মধ্যে রেখে! শহরে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রাস্তা ভর্তি করে প্যাকার্ড, বুইক, পনটিয়াক হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে—মার্কিন বাবু মশাইরা তেনাদের সঙ্গিনীদের নিয়ে কত রাতে ফিরবেন, সেই আশায়।

ছুটি ফুরিয়েছে—এখন ফুরসত অফুরন্ত। চাকরে মেয়ের মনে হয়েছে এবার বরাত খুলে যাবে—ভাগ্যে এক নতুন বয়-ফ্রেন্ডের উদয় হয়েছে; তার কী তুলনা হয়। তাই তার উদ্দেশ্যে বিকেলে ছুটি হওয়া মাত্র মেয়ের পা যেন ছুটেছে সেতারে রবিশংকরের গমকের মত।

আগন্তুক হয়ে ফল্-এর সময় নিউইয়র্কে কত লোক আসে—কনসার্ট, শো, অভিনয়, মেট্রোপলিটন অপেরা, রাশিয়ান ব্যালে, ভরত-নাট্যম, ফুটবল খেলা। কিন্তু ভাববার যা কথা তা হল কোথাও কী এখুনি গিয়ে টিকিট পাবেন? সব কিছুতেই তিন মাস আগে অগ্রিম বুকিং হয়ে বসে আছে। সময় আপনার পিছু নেবে—সময়ের পিছু আপনি নিলে আপনার বরাতে দুঃখ আছে এই নিউইয়র্কে। ক্যালরির কথা ভুলে শৌখীন তনুধারিণীরা এখন ডিনারে বসে বেপরোয়া। এখন টার্কি, চাইনিজ, ইটালিয়ান, গ্রীক, ভারতীয় সব রকম ডেলিকেসীতে মন রাজি। মনে মনে তাঁরা সবাই সংকল্প করেছেন গায়ে যেটুকু জমবে তা আসচে সামারে দৌড়ঝাঁপ সাঁতার করে তখন সেটুকু সরিয়ে ফেলা যাবে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয় এবং স্ত্রীলোকের মেদের বোঝা? স্বামীর ডলার? আর স্বামীর মেদ? ডিনারের সময় যদি নিউইয়র্কে বসে বসেই ভাবতে চান প্যারীতে রয়েছেন, তা হলে. আপনাকে যেতে বলি Le Pavillion এ। আবহাওয়ার গুণে নয়—ফরাসী-পানির সৌজন্যে।

শীতের প্রারম্ভে নিউইয়র্ক এই সময় খুশির একটি প্যান্ডেল বনে যায়। আপনার প্রাণের খেলাঘরের দেওয়ালের সঙ্গে বিশ্ব-প্রাণের বিরাট খেলাঘরের দেওয়ালে একই রঙে কলি ফেরানো হয়। এতেও মন রঙিন হবে না তো কখন হবে? এর পর চার মাস তো বাড়ির গর্ত থেকে বার হয়ে কোন রকমে কাজের বাড়ির গর্তে ঢোকা আবার ফিরে আসা—সব কিছু বরফে আর ঠান্ডায় চাপা পড়ে থাকবে। সঙ্গ, উত্তাপ, জটলা তাই ফল্-এর সব অভিপ্রেত জিনিস। ফল্-এর সময় পাতা ঝরে যাওয়ার দৃশ্য দেখে কার মনে কী হয়?

একজন ডাক্তারের চোখে মনে হয়—এ যেন শীতের অপারেশন করার আগে ফল্ এসে সব কিছুকে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে নিঝুম করে দিয়ে যাচ্ছে।

নাইট ক্লাব সম্বন্ধে পাকাপোক্ত একজন ছোকরার মতে—গাছেরা মানুষের দেখাদেখি ফল্-এর নাম করে ট্রিপটিস করছে।

কোন গদ্য-কবিতা লিখিয়ে এমন কোন মার্কিন যশোপ্রার্থী কবির মতে—ফল্-এর সময় প্রকৃতির চেহারাটা হয় যেন গাছেরা কোন সেলুনে গিয়ে ইয়াঙ্কি ছাঁট দিয়েছে।

আর যিনি সত্যি পদ্য-কবিতা লিখিয়ে সেই অদ্বিতীয় কবি তো আগেই বলে গেছেন—ঝরা পাতা গো, আমি তোমারই দলে।

॥ ২০ ॥

চাপা প্রত্যাশার গুঞ্জন হঠাৎ যেন কোনো অদৃশ্যপ্রভাবে স্তব্ধতায় বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য। কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই হারিয়ে-যাওয়া শব্দ যেন অকস্মাৎ আলোতে রূপান্তরিত হলো। অন্ধকারের বুক ভেদ করে ছুঁচের মতো সরু আলোর রেখা স্টেজের সামনে এসে পড়লো। সেই আলোর রেখা যেন মত্ত অবস্থায় কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কে যেন স্টেজের উপর এসেও দাঁড়িয়েছে; কিন্তু মাতাল আলোর রেখা কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। স্টেজের উপর যে দেহটা অন্ধকারের ঘোমটা পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই কি কনি?

পৃষ্ঠপোষকদের ঔৎসুক্যে আর সুড়সুড়ি না দিয়ে আলোর রেখাটা এবার বেশ মোটা হয়ে উঠলো। **কিন্তু কোথায় কনি? কনি নেই। সেখানে ইভনিং স্যুটপরা দুফুট লম্বা এক বামন ঘোরাঘুরি করছে। তার মাথায় একটা তিনফুট উঁচু টুপি। বামন সায়েবের হাতে ছড়ি।**

আশাহত দর্শকদের বিস্ময় প্রকাশের কোনো সুযোগ না দিয়ে বামনটা টুপিটা খুলে বাঁ হাতে নিয়ে, হাতের ছড়িটা ঘুরিয়ে, একটা চেয়ারের উপর উঠে পড়ে বললে—"গুড্ ইভনিং, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান। আমিই কনি দি......বলে, যেন ভুলে গিয়েছে এমনভাবে বিড় বিড় করে গুনতে লাগল—ছেলে না মেয়ে, মেয়ে না ছেলে...না, আমিই সেই মেয়েমানুষ কনি, কনি দি উয়োম্যান।"

দর্শকরা এবার একসঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠলেন। সমৃদ্ধ কলকাতার দু'একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক আর স্থির থাকতে পারলেন না। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, চিৎকার করে বললেন, "আমরা কনিকে চাই। এই বিটলে বামনটা কোথা থেকে এল?"

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকেও অভিনয় করতে হলো। যেন কনির বদলে এই বামনকে স্টেজের উপর দেখে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছি, এমন ভাব করে মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই পাঁচ মিনিট আগেও আমি কনির ঘরে গিয়েছিলাম। ওর জামাকাপড় পরা হয়ে গিয়েছিল। একটা ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে যাচ্ছিল। আমাকে বললে, 'তুমি অ্যানাউন্স করগে যাও, আমি রেডি', তারপর এই দু' ফুট ভদ্দরলোক যে কোথা থেকে এলেন!"

বামন কিন্তু দমল না। আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই তেড়ে মাইকের কাছে এসে, মাইকটা নামিয়ে মুখের কাছে এনে, মেয়েদের মতো সরু গলায় বললে, "বিশ্বাস করুন, আমিই কনি। আমি একটা ভুল ওষুধ খেয়ে ফেলেছি। সে যাই হোক, আপনারা যে আমার জন্যে এই রাত এগারোটা পর্যন্ত জেগে রয়েছেন, এর জন্যে আমি গর্ব বোধ করছি।" বলা শেষ করেই, বামন ক্যাবারে মেয়েদের কায়দায় নাচতে আরম্ভ করলে। সমস্ত হল এবার হৈ হৈ করে উঠলো।

আমি এবার মাইকের কাছে গিয়ে বললাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আপনারা অধৈর্য হবেন না। আমি এখনই ডাক্তার ডাকবার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। ভুল ট্যাবলেট খাবার ফলেই, এই অঘটন ঘটেছে।"

বামন এবার বললে, "পাঁচ মিনিট আগে আমার নারীত্ব, আমার যৌবন সব ছিল। কিন্তু এখন তারা যে কোথায় গেল", বামন এবার নিজের দেহটা নিজেই হাত দিয়ে খোঁজ করতে লাগল। পকেট থেকে আর একটা ট্যাবলেট বার করে সে খেল। তারপর কি যেন মন্ত্র পড়তে লাগল।

হঠাৎ আবার আলো নিবে গেল এবং প্রথম সারির এক মারওয়াড়ী ভদ্রলোক পরমুহূর্তেই সভয়ে কাতর চিৎকার করে উঠলেন। "ও! আমার কোলে কে যেন এসে বসেছে!"

আমি এদিক থেকে অন্ধকারের মধ্যে বললাম, "ভয় পাবেন না। কেমন বুঝছেন?"

মারওয়াড়ীর ততক্ষণে ভয় কেটে গিয়েছে। তাঁর কোলে কী জিনিস হঠাৎ ধপাস করে বসে পড়েছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি এবার অবলীলাক্রমে উত্তর দিলেন, "বহুত্ সফ্‌ট—খুব নরম!"

এবার একটা আলো জ্বলে উঠলো, এবং সেই আলোতে দেখা গেল মারওয়াড়ী ভদ্রলোকের গলা জড়িয়ে বসে রয়েছে কনি। তার মাথায় টায়রা, গলায় হার, পায়ের গোড়ালি থেকে হাতের মনিবন্ধ পর্যন্ত রঙীন নরম কাপড়ে ঢাকা। এবার আরও কয়েকটা আলো জ্বলে উঠলো এবং সেই মারওয়াড়ী ভদ্রলোককে টানতে টানতে স্টেজের উপর নিয়ে এসে দর্শকদের দিকে মাথা নত করলে, কনি দি উয়োম্যান।

মারওয়াড়ী ভদ্রলোক ভুঁড়ি নিয়ে কোনো রকমে ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, কনি আপনাদের সামনে উপস্থিত। ইনি টেলিভিশনে বহুবার অভিনয় করেছেন। একবার মহামান্য ষষ্ঠ জর্জের সামনেও ইনি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আজ আপনারা সকলেই এই বালিকার মহারাজা। কিং এমপারার অফ কনি দি উয়োম্যান!"

কনি এবার নাচতে শুরু করলো। সেই পুরো কাপড়ে আলখাল্লা সমেত নাচের মধ্যে তেমন গতি ছিল না। দর্শকরা যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন।

কনি বললে, "মাই ডার্লিং ক্যালকাটা-ওয়ালাজ, আমি শুনেলাম তোমাদের কয়েকজন আমার স্ট্যাটিসটিক্স চেয়েছ। আমি দুঃখিত, আমার সংখ্যা কিছুতেই মনে থাকে না। তোমরা কেউ যদি আমার ফিগারগুলো হিসেব করে নিয়ে যাও। অঙ্কের কোনো প্রফেসর এখানে আছেন নাকি?"

দর্শকদের মধ্য থেকে, কেউ উত্তর দিলেন না।

"চাটার্ড একাউন্টেন্ট?" কনি মুখ বেঁকিয়ে এবার প্রশ্ন করলে।

এবারও কোনো উত্তর নেই।

"এনি দর্জি?"

এবারও সভাগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

"মাই ডিয়ার ডিয়ার" কনি কপট দুঃখে চোখ মুছতে লাগল। "এই গ্রেট সিটিতে কি দর্জি নেই? তোমরা, তোমাদের গার্লরা কি সেলাই করা কিছুই পরে না?"

এবার সকলে একসঙ্গে যেন হেসে উঠলো। শুধু আমার যেন গাটা কেমন ঘুলিয়ে উঠলো। মনে হলো মাথাটা ঘুরছে। এখনই হয়তো পড়ে যাবো। গোমেজ আমার কোটটা টেনে ধরে বললেন, "চিয়ার আপ বয়! খুব ভাল হচ্ছে।"

"এনিবডি, যে ভাল অঙ্ক করে?"—কনি এবার আবেদন জানালো।

ফোকলা চ্যাটার্জি যেন এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে স্টেজের দিকে আসতে আরম্ভ করলেন। আমি একটা দর্জির ফিতে কনির দিকে ছুড়ে দিলাম।

এদিকে বেঁটে সায়েব আবার হলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সুবেশা সুন্দরী কনিকে দেখে যেন সে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। জিভ বার করে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে। মাথা চুলকোচ্ছে। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না। স্টেজের অপর অংশে কনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফোকলার হাতে ফিতেটা দিয়ে বলছে, "মাপো। গতকালও ছিল ৩৬-২৮-৩৪।"

বামনটা এতক্ষণে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে যেন দর্শকদের কানে কানে বলছে, "আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল আমি কনি নই। আমার নাম ল্যামরেটো। ল্যামরেটো দি ম্যান।"

তারপর মেমসায়েবের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে সে বললে, "মাদমাজেল, আমি স্ট্যাটিকটিক্সে সুপন্ডিত। আমি পাশকরা একাউন্টেন্ট। আমি নামকরা দর্জি। আমি মুখে মুখে ঢাউস-ঢাউস অঙ্ক কষে ফেলতে পারি।" খুব লজ্জিতভাবে কথাগুলো বলে মিস্টার ল্যামরেটো কোটের পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগলো।

এদিকে ফোকলা চ্যাটার্জি দীর্ঘাঙ্গিনী কনিকে মাপজোক করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে দেখে ল্যামরেটো আর ধৈর্য ধরতে পারল না। বিচিত্র ভঙ্গিতে সেদিকে ছুটে গেল। তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো ল্যামরেটোর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। ফোকলাকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে সে বললে, "সরো। আমি মাপবো।"

ফোকলা প্রথমে তাকে পাত্তা দেননি। কিন্তু ল্যামরেটো তখন সত্যিই সর্বশক্তি দিয়ে

তাঁকে ঠেলতে আরম্ভ করেছে। হলসুদ্ধ লোক হাসিতে হল ফাটিয়ে দেবার উপক্রম করছে। বাধ্য হয়ে তখন বামনের হাতে ফিতেটা দিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জি ফিরে এলেন। কনি তখন গুন গুন করে গান ধরেছে। তার হাঁটুর কাছ থেকে ল্যামব্রেটা চিৎকার করে কী যে বলছে, সে যেন শুনতেই পাচ্ছে না। কনি পাদুটো একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল। তার পায়ের তলা দিয়ে বামন ল্যামব্রেটা দু'বার চলে গেল। অশ্লীল ইংগিতে হলের কয়েকজন দর্শক সিটি বাজিয়ে দিলেন। ল্যামব্রেটার সেদিকে কিন্তু খেয়াল নেই। বিনয়ে বিগলিত হয়ে সে মেমসায়েবের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। কিন্তু গরবিনী, দীর্ঘাঙ্গিনী কনি যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছে না।

বহু চেষ্টাতে ব্যর্থ হয়ে, ল্যামব্রেটা হঠাৎ কোথা থেকে একটা মই জোগোড় করে নিয়ে এল। সেই মইটা কনির পিঠে লাগিয়ে সে যেমন উঠতে আরম্ভ করেছে, অমনি কনি আবার হাঁটতে শুরু করলে। ল্যামব্রেটাও ছাড়বার পাত্র নয়। কনির ফ্রকটা টেনে ধরে রইল। মই এর তলায় যে দুটো চাকা লাগান ছিল, এবার তা বোঝা গেল। কারণ ল্যামব্রেটাকে নিয়ে মইটাও চলতে আরম্ভ করল। যতই মই-এর গতি বেড়ে যাচ্ছে, ততই ল্যামব্রেটার ভয় বাড়ছে। সে যেন নিরুপায় হয়ে কনির কোমরটা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে কনি একবার ঘুরে দাঁড়াল। বামন সায়েবও সংগে সংগে বোঁ করে ঘুরে গেল। এবার যেন তার সাহস বেড়ে গিয়েছে, মই বেয়ে সে আরও খানিকটা উঠে গিয়ে বললে, "মিস্ কনি তোমার জন্যে আমি একটা গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছি।"

কনি সৌজন্যে বিগলিত হয়ে বললে, "তোমার মতো লোক হয় না, সত্যি সুন্দর গোলাপ ফুল।"

এই কথা শোনামাত্রই ল্যামব্রেটা উত্তেজনায় ধপাস করে মই থেকে মেঝের উপর পড়ে গেল। কনি সেদিকে কোনো নজরই করলে না। বরং আর-একটু হলে তাকে মাড়িয়েই দিত। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়িয়ে, ধুলো ঝেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ল্যামব্রেটা আবার মইটা জোগাড় করে মেমসায়েবের পিঠে লাগিয়ে কনিকে চুমু খাবার চেষ্টা করল। কিন্তু দৈহিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ল্যামব্রেটা এবার মুখের ভাষায় কনিকে প্রেম নিবেদনের চেষ্টা করলে। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। মই বেয়ে উঠে কানে কানে কী বলতেই, কোপবতী কনি ল্যামব্রেটার কানটা ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলে। পা দুটো শূন্যে দোলাতে দোলাতে কাতর কণ্ঠে ল্যামব্রেটা বললে, "প্লিজ, প্লিজ। আমি ক্ষমা চাইছি, মিস্। আমি কখনও আর এত লম্বা মেয়েকে প্রপোজ করবো না। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে।"

ল্যামব্রেটাকে কনি যখন ছুঁড়ে মেঝের উপর ফেলে দিলে, তখন হাসতে হাসতে কয়েকজন চেয়ার থেকে কার্পেটের উপর গড়িয়ে পড়ল। একমুহূর্তের জন্যে আলো জ্বলে উঠলো, এবং সেই আলোতে ল্যামব্রেটাকে ছুটে পালাতে দেখা গেল।

এবার আমি মাইকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "ঐ বামনটাকে বহুকষ্টে দূর করা গেছে, এবার নাচ আরম্ভ হচ্ছে।"

আমার দিকে মিষ্টি হেসে, কনি তার বাইরের আলখাল্লাটা খুলে ফেললে। গোমেজের দল তখন তাদের বাজনার চটুল-ছন্দে মানুষের মনের গভীরে ঘুমিয়ে-থাকা আদিম প্রবৃত্তিগুলোর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

কনি নাচতে নাচতে স্টেজ থেকে নেমে গিয়ে একজনের কোলে গিয়ে বসলো। আর একজনের রুমাল নিয়ে হাসতে হাসতে নিজের দেহের ঘামটা মুছে ফেললে। আর একজন ভদ্রলোক ডাক দিলেন, "আমরা পিছনে পড়ে রয়েছি।"

কনি ছুটে সেদিকে গিয়ে, কাউকে খুঁজে না পেয়ে মিস্টার রঙ্গনাথনকে টেনে আনলে। রঙ্গনাথনকে আদর করে বললে, "হ্যালো মাই বয়, আমার পাশে বোসো।"

রঙ্গনাথন আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কনি শুনলে না, জোর করে তাকে নিজের পাশে বসিয়ে দিলে। রঙ্গনাথনের মনটা এতক্ষণ বোধ হয় নরম হলো। নেশার ঘোরে কনির ফ্রকটা হাত দিয়ে দেখে, বললেন, "বাঃ, চমৎকার তো।"

কনি তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি একটা খনির মতো। যতই আবিষ্কার করবে ততই ভাল জিনিস পাবে।"

কনির কথা থেকে রঙ্গনাথন কী বুঝলেন কে জানে। কিন্তু কনির নিজের আর সময় নেই। রঙ্গনাথনকে এবার স্টেজ থেকে সরিয়ে দিয়ে সে তার আদিম নৃত্য শুরু করে দিল। এক-এক করে তার দেহের বাস খসে পড়ছে। মাথার মুকুট বিদায় নিয়েছে। হাতের দস্তানা উধাও হয়েছে। এবার স্কার্টটাও খুলে পড়লো। আদিম কলকাতা এবার যেন প্রত্যাশার উত্তেজনায় হৈ-হৈ করে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই আশাভঙ্গের বেদনা। তাঁরা যা চেয়েছিলেন, তা যেন হয়নি। কনি ভিতরে যে পরের পর অনেক-গুলো জামা পরেছে, তা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

তারপর? তারপর আমার কিছুই মনে নেই। দেখলাম, গোমেজের মুখটা যেন ঘৃণায় এবং ক্লান্তিতে বেঁকে গিয়েছে। তার সহকারীরা যন্ত্রের মতো দ্রুতবেগে বাজিয়ে চলেছে। হঠাৎ মনে হলো, কনির দেহে যেন কিছুই নেই। সেই

মুহূর্তেই সমস্ত হলটা অন্ধকার হয়ে গেল। একটা পাতলা ওড়না মেঝে থেকে তুলে নিয়ে কোনরকমে লজ্জানিবারণ করতে করতে কনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার আলো জ্বলে উঠলো। প্রচণ্ড হৈ-হৈ-এর মধ্যে অবিশ্রান্ত হাততালি পড়তে লাগল। স্টেজে দাঁড়িয়ে দেখলাম, অসংখ্য জামা-কাপড়ের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। বোটে ল্যামরেটা স্কার্ট, প্যান্টি, ফ্রক, ব্রেসিয়ারের টুকরোগুলো আস্তে আস্তে কুড়িয়ে নিচ্ছে।

আমি মাইকে ঘোষণা করলাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, এবার আমাদের কয়েক মিনিট বিরতি।"

গোমেজ রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে, "ডেথ-নেল অফ সিভিলাইজেশন—সভ্যতার মৃত্যু-ঘণ্টা তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?"

আবার বাজনা বেজে উঠলো। কয়েক মিনিটের বাসরে অতিথিদের অনেকেই আরও কয়েক পেগ টেনে নিলেন। আর রঙ্গনাথনও দেখলাম, হুইস্কির স্বাদ গ্রহণ করছেন।

আবার আলো নিবে গেল। ঝুমুরের ঝুমঝুম শব্দে এবার যেন সমস্ত হলঘরটা ভরে গেল। গোমেজের সংগীতযন্ত্র থেকে এবার এক অদ্ভুত শব্দধারা বেরিয়ে আসতে লাগল। মনে হলো, যেন কোনো গভীর অরণ্যে আমি বসে রয়েছি। সেখানে 'ঘাইমৃগী' সারারাত ডাকে।

"পুরুষ হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার, তাহারা পেতেছে টের, আসিতেছে তার দিকে। আজ এই বিস্ময়ের রাতে তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে।

মানুষে যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে, তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে হরিণেরা আসিতেছে।"

আস্তে আস্তে আলো জ্বলে উঠলো। স্টেজের উপর কনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একি! কনির দেহে এবার কোনো বস্ত্র নেই। শুধু বেলুন। অসংখ্য রবারের রঙীন বেলুনে ওর লজ্জা নিবারণ করছে।

রঙিন বেলুনের উপর রঙিন আলো পড়ে নানা বিচিত্র রঙের সৃষ্টি হতে লাগল। আর তার মধ্যেই কনি নাচ শুরু করল। কনি নাচছে। নাচছে তো নাচছেই।

নাচতে নাচতেই সে তার বেলুন-শরীর নিয়ে অতিথিদের মধ্যে নেমে এল। হাতে একটা ছোট লোহার যন্ত্র রয়েছে। সেইটা একজনের হাতে দিয়ে বললে, "একটা বেলুন ফাটাও।"

ভদ্রলোক লোহার খোঁচাটা কনির বুকের কাছের একটা বেলুনে সজোরে ঢুকিয়ে দিলেন। একটা বিশ্রী আওয়াজ করে বেলুনটা ফেটে চুপসিয়ে গেল।

একটু নাচানাচি করে কনি আর-একজনের কাছে গেল। তিনিও একটা বেলুন ফাটিয়ে দিলেন।

বেলুনের সংখ্যা যতই কমছে, কনির নিরাভরণ দেহের তত বেশী অংশ দেখা যাচ্ছে। ততই যেন হলের উন্মাদনা বাড়ছে। পুরুষ হরিণদের বুকে আজে যেন কোনো স্পষ্ট ভয় নেই। সন্দেহের আবছায়া নেই কিছু। কেবল পিপাসা আছে। আর আছে রোমহর্ষ। আজ এই বসন্তের রাতে লালসা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ, স্বপ্ন যেন সব দিক স্ফুট হয়ে উঠেছে।

কনির দেহে এখন মাত্র তিনটে বেলুন রয়েছে। সেই বেলুনগুলো ফুটো করবার জন্যে কয়েকজন বুড়ো একসঙ্গে ছুটে এলেন। দুম দুম করে কয়েকটা আওয়াজ হলো—আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলো নিবে গেল। সেই অন্ধকারে পালাতে গিয়ে বেচারা কনি কার্পেটে পা আটকিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অন্ধকারের মধ্যেই তাড়াতাড়ি তাকে টেনে তুললাম। হাঁপাতে হাঁপাতে সে কোনো রকমে বললে, "প্লিজ, আমার আলখাল্লাটা দাও।"

আলখাল্লাটা তার হাতে দিয়ে দিলুম। এবং সে ছুটে হল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলো জ্বলে উঠলো। সেই আলোতে এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। আমারই ঠিক পাশে কনির একজোড়া জুতো পড়ে রয়েছে। গোমেজ মাথা নিচু করে তাঁর ছেলেদের নিয়ে যন্ত্রগুলো গুছোতে লাগলেন। মাইকের কাছে গিয়ে কোনো-রকমে বললাম, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমান, এই আনন্দ সভায় উপস্থিত থাকবার জন্যে কনি এবং শাজাহান হোটেলের তরফ থেকে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুভরাত্রি, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমান।"

এখনও মুক্তি নেই। ফোকলা চ্যাটার্জি কাছে এসে বললেন, "মিস্টার রঙ্গনাথন কনির সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।"

আরও দু-একজন একই অনুরোধ করলেন। বললাম, "স্যরি, তার কোনো উপায় নেই।"

ফোকলা দেহটা দুলিয়ে বললেন, "এই-জন্যেই আমি প্রথম শোতে আসতে চাই। পরের শোতে মেয়েটা এতোটা ফ্রি থাকবে না! কলকাতার ল' অ্যান্ড অর্ডারের মালিকরা এতোটা কিছুতেই অ্যালাউ করবে না। অন্তত লাস্ট তিনটে বেলুন কিছুতেই ফাটাতে দেবে না।"

যাবার আগে ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, "আর-একটা কথা, আপনি বেঙ্গলী বলেই জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, ওরা বোধ হয় একেবারে নেকেড হয় না। তাই না? সেটা তো ক্যালকাটায় চলে না। বোধ হয় একটা পাতলা সিল্কের বা নাইলনের কিছু পরে থাকে, তাই না?"

কানের পাতা দুটো কেন জানি না বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। মুখ দিয়ে কথাও বেরুচ্ছিল না। ওঁর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললাম, "জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।"

আমার সামনে গোমেজ তখন এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, "চলুন, এবার ঘরে ফেরা যাক।"

ফোকলা চ্যাটার্জি আর রঙ্গনাথনের মধ্যে কী কথা হলো। ফোকলা আমার হাতটা ধরে বললেন, "একটু চলুন না?"

বললাম, "কেন?"

ফোকলা হেসে বললেন, "একটু প্রাইভেট কথা ছিল। স্ট্রিক্টলি প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল।"

ফোকলার সঙ্গে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

তিনি বললেন, "আপনাদের এখানে এলে বড় আনন্দ হয়। এমন রেসপেক্টেবল হোটেল ইণ্ডিয়াতে আর একটাও নেই। অন্য জায়গাতেও তো শো হয়, কিন্তু সেখানে ডিগনিটি থাকে না। যা বলছিলাম, আপনি বেঙ্গলী। আপনাকে আমার দেখা কর্তব্য। যাতে আপনিও মাইনে ছাড়া দুটো পয়সা হাতে পান, তার জন্যে চেষ্টা করা আমার ডিউটি। বিশেষ করে, সে-পয়সা যদি নন-বেঙ্গলীদের কাছ থেকে আদোয় করে দিতে পারি তাহলে আরও সুখের কথা।

আমি তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। ফোকলা চ্যাটার্জি এবার রঙ্গনাথনের দিকে ঝুকে, ওঁর কাছ থেকে গোটা কয়েক দশ টাকার নোট নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন, "আসলে, মুশকিল হয়েছে কি জানেন? মিস্টার রঙ্গনাথন খুবই লোনলি ফিল করছেন। কলকাতায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছেন। আমি এখনই বাড়ি ফিরে যাবো। আমার ওয়াইফ এখনও ওয়েট করছেন। কনিকে একটু রাজী করিয়ে দেন যদি। রাত্রি তো এখনও বেশী হয়নি। তাছাড়া ওদের তো রাত্রি-জাগা অভ্যাস আছে। সারাদিন ওরা ঘুমোতে পারে।"

কোনো উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। শুধু হাতটা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো সরিয়ে নিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

রাত্রের অন্ধকারে হা-হা করে হেসে উঠলেন ফোকলা চ্যাটার্জি। হাসতে হাসতেই বললেন, "টু ইয়ং! একেবারে কাঁচা! একেবারে কাঁচ!"

নোটগুলো নিজের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে তিনি বললেন, "বেশ মুশকিলে ফেললেন আপনি। এ-জানলে, অন্য কোথাও আগে থেকে অ্যারেঞ্জ করে রেখে দিতাম। ভেরি ইম্পর্টেণ্ট পারচেজ অফিসার। ওঁকে তো আর যে-কোনো জায়গায় রাত কাটাতে বলতে পারি না।"

মিস্টার রঙ্গনাথনকে নিয়ে ফোকলা চ্যাটার্জির গাড়ি চলে গেল। আমারই চোখের সামনে দিয়ে একে একে সমস্ত গাড়িগুলো তাদের মালিকদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আজ আমার কিছুই ভাল লাগছে না। আজ সন্ধ্যাতে কিছুই খাইনি। তবু এখনও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই যেন হঠাৎ হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কলকাতা এবার যেন সত্যিই ঝিমিয়ে পড়েছে। কে যেন পেথিড্রিন ইঞ্জেকশন দিয়ে অসুস্থ কলকাতাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

রাত্রের কলকাতার এমন শান্ত অথচ ভয়াবহ রূপ আমি কোনোদিন দেখিনি। হোটেল থেকে বেরিয়েই চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে যার সামনে এসে দাঁড়ালাম, তাঁর নাম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। চৌরাস্তার মোড়ে বিচারকের বেশে বিশালবপু স্যার আশুতোষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্যার সুরেন ব্যানার্জি, স্যার আশুতোষ, স্যার হরিরাম চৌরঙ্গীর তিন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সারারাত বোধ হয় চোখের জল ফেলেন। স্যার আশুতোষের মাথার অনেক উপরে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সদর দপ্তরের চূড়ায় গোলাকার আলোর পৃথিবীটা তখনও নিজের মনে ঘুরছে।

আবার আপনাদের মার্জনা ভিক্ষা করি। বোসদা বলে দিয়েছিলেন, "শুধু দেখে

যাবে। প্রশ্ন করবে না।" তবুও দুপুরে রাতে নিজেকে প্রশ্ন করতেই হলো, এই কি কলকাতা? এই কি আমাদের সব স্বপ্নের ধন শহর কলকাতা? না, লিবিয়ার গহন অরণ্যে সহায়-সম্বলহীন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি?

সেই রাত্রেই এই কলকাতার এক নাগরিক কবিকে মনে পড়ে গিয়েছিল। তিনি সত্য-সুন্দরদার প্রিয় কবি। সত্যসুন্দরদাই আমাকে অনেকবার পড়ে শুনিয়েছেন—

"হাইড্রাণ্ট খুলে দিয়ে
কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে-হাইড্রণ্টে হয়তো বা
গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত
নগরীতে দল বেঁধে নামে।
* * *
নিতান্ত নিজের সুরে
তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে
ইহুদী রমণী;
* *
ফিরিঙ্গি যুবক কটি
চলে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে
এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।
নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—
অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।"

"বাবু? আপনি এখানে?"

আমি চমকে উঠে দেখলাম আমাদেরই হোটেলের দুজন ওয়েটার দাঁড়িয়ে রয়েছে?

"তোমরা এখানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"এবার আমরা ঘুমোবো হুজুর। আমরা এখানেই ঘুমোই হুজুর। রান্নাঘরে একটুও জায়গা নেই। কুকের মেটরা সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয় না।"

হোটেলের লাউঞ্জে অনেক জায়গা পড়ে, কার্পেটের উপর ইচ্ছে করলেই কয়েকটা লোক ঘুমিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাতে হোটেলের সৌন্দর্য নষ্ট হবে! সেখানে কাউকে শুতে দেওয়া যায় না। বাইরের গাড়ি-বারান্দাও নিষিদ্ধ। সেখানে হোটেলের কর্মচারী পড়ে থাকলে, হোটেলের সম্মানের ক্ষতি হয়। তাই স্যার আশুতোষ এবং ভিক্টোরিয়া হাউসের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

"তোমরা খেয়েছ?" প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ হুজুর, ছোটো শাজাহানের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা করা আছে। প্রত্যেক মিল চোদ্দ পয়সা। শুধু মায়াধর খায়নি।"

"কেন মায়াধর, তুমি খাওনি কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

মায়াধর তখন ঘাসের উপর বসে পড়েছে; যন্ত্রণায় পায়ের ডিমটা চেপে ধরে সে বসে আছে।

বেয়ারাদের একজন বললে, "হুজুর, ওর পায়ের ব্যথা বেড়েছে। পায়ের শিরগুলো আজকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।"

হাঁটু গেড়ে বসে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের বিনা পয়সার আলোয় দেখলাম, ওর পায়ের নীল শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠেছে। যেন অনেকগুলো নীল সাপ একসঙ্গে ওর পা জড়িয়ে ধরেছে। সত্যদার কাছে শুনেছি, এর নাম ভেরিকোজ ভেন।

বেয়ারাদের একজন বললে, "হুজুর, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় পা দুটোকে কেটে ফেলে দিই।"

বেয়ারাদের একজন বলে, "হুজুর, আমাদের শেষ ওটেই। হোটেলের অনেকেরই ওই রোগ হয়। বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শিরাগুলো ফুলতে আরম্ভ করে। সায়েবদের কাছে লুকিয়ে রাখতে হয় হুজুর। স্টুয়ার্ড সায়েব জানতে পারলে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে।"

"ডাক্তার দেখাও না তোমরা?" আমি জিগ্যেস করেছি।

"সুই লাগাতে হয় হুজুর, অনেক টাকা লাগে। আর ডাক্তরেরা বলে, পা দুটোকে বিশ্রাম দাও। তা হুজুর, হোটেলের কাজ করবো, আবার পাকে বিশ্রাম দেবো তাতো হয় না।"

মায়াধরকে বললাম, "তুমি এখনও ডাক্তার দেখাওনি?"

মায়াধর বললে, "বোসবাবু এক জানা-শোনা ডাক্তারের কাছে চিঠি লিখে দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু যাওয়া হয়নি। টাকা জমাচ্ছি — অনেক সুই দিতে হবে যে। এবার যেতেই হবে, হুজুর। নইলে ভরতের মতো হবে হুজুর। এর পরেই সমস্ত পায়ে ঘা হয়ে যাবে। সে ঘা ফেটে ফেটে রক্ত পড়বে। আর দাঁড়িয়ে থাকবার মতো অবস্থাও থাকবে না। চাকরিও যাবে। ছেলেপুলে নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যেতে হবে হুজুর।"

"রাত অনেক হয়েছে, তোমরা শুয়ে পড়ো।" এই বলে আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

কোথায় যাবো আমি? আমি নিজেই তা জানি না। রাতের অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কে এসে ঢুকলাম। সেখানেও অনেকে ঘুমিয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যেও শাজাহান হোটেলে আমার সহকর্মীরা আছে কিনা, কে জানে। স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার পদতলে পাথরবাঁধানো লোভনীয় জায়গাটা কয়েকজন ভাগ্যবান অনেক আগেই দখল করে বসে আছে। রেলিঙের পশ্চিম দিক থেকে রাস্তার আলো এসে স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার পা ধুইয়ে দিচ্ছে। সেই আলোর অত্যাচার থেকে রক্ষে পাবার জন্যে 'হরিরাম ধর্ম-শালার' অতিথিরা বেশ সুন্দর বুদ্ধি খাটিয়েছেন। চোখের উপর বড় বড় শাল-পাতা চাপিয়ে তারা একটা আবরণ সৃষ্টি করেছে। কর্পোরেশনের বিনা পয়সার বিতরিত আলো শালপাতার উপর এসে আটকে গিয়েছে। তার তলায় অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারেই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষ। (ক্রমশ)

পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ বারবার প্রমাণ করেছে এক ঝলক বারুদের আগুনের সামনেও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্যের মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। এমনি একটা দৃঢ় চেতনা নিয়ে পৃথিবীর সব চাইতে বিক্ষুব্ধ নগরী বার্লিনে ভারতীয়রা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও তাঁদের "ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহ" উদ্‌যাপন করলেন। ১৩ই আগস্টের বার্লিন সীমান্ত সমস্যার পর থেকেই সবার মনে নানা আতঙ্কের মধ্যে এই আতঙ্কটাও দেখা দিয়েছিল—এবার ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হবে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বার্লিনে যেমন "জার্মান অক্টোবর ফেস্ট" আড়াই কোটি মার্ক ব্যয়ে "জার্মান অপেরার" নতুন ভবনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হল, তেমনি অক্টোবরের ২০ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত ভারতীয়রাও তাঁদের সংস্কৃতি সপ্তাহ পালন করলেন।

এই "ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহ" পরিচালনা করে এখানকার "ভারত মজলিস"। সঙ্গে সহযোগিতা করেন আমাদের মাননীয় কনসাল জেনারেল মহাশয়। এ কথা এখানকার সংস্কৃতি মহল দ্বিধাহীন চিত্তেই স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর সমস্ত বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র ভারতীয়রাই বার্লিনে এত বড় একটা উৎসব পরিচালনার যোগ্যতা রাখে।

প্রথম দিন উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বার্লিনের সেনেটর ডাঃ কিলিংগার ও কনসাল জেনারেল মেহবুব আমেদ "ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহ"-এর উদ্দেশ্য ও ভারতের মর্মবাণী বিশ্লেষণ করেন। সেই সাথে আকাডেমী ডেয়ার কুউনস্টস্ হল-এ একটি মনোরম প্রদর্শনী "গতকাল ও আজকের ভারতবর্ষ"-এর উদ্বোধন করা হয় এবং ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত অজস্র জার্মান দর্শকদের আনন্দ দান করে।

সেদিন বার্লিনের প্রখ্যাত ভবন "কংগ্রেস হলে" ভারতের স্বনামধন্য সেতার শিল্পী বিলায়েৎ খাঁ ও তবলা শিল্পী প্রোফেসর শান্তা প্রসাদ যে ঝংকার ও শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন তার দ্বারা ভারতের রাগরাগিণীর মহৎ সুরের স্রোত প্রতিটি জার্মান শ্রোতার অন্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে—প্রাচ্যের এই যন্ত্রটির প্রতি দিনে দিনেই এখানে একটা অবাক কৌতূহল জেগে উঠেছে। কেননা, গত বছর এই "কংগ্রেস হলে"ই পণ্ডিত রবিশংকর সেতার বাজিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। এইদিন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমারৎ খাঁও সেতারে অংশ গ্রহণ করেন। আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল দক্ষিণ ভারতের শিল্পী কুমারী সৌদামিনীর ভারত নাট্যম নৃত্য। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন বার্লিনের প্রখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী

বাংলা সংগীতের উদাস করা সুর শুনিয়ে গেলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে শ্রীশ্যামল চৌধুরী। শ্রীবলাই সেনের রাগপ্রধান গানও বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল।

বিভিন্ন দিনের গান বাজনা ও নাচে আর যাঁরা অংশ নেন, তাঁরা হলেন সর্বশ্রী বলাই সেন, অশোক ঘোষ, গোয়েল, শ্রীমতী ইংগেবোর্গ মানৎকে, মিসেস শেখ, মিসেস শর্মা প্রভৃতি।

বার্লিন থিয়েটারের জন্য বিখ্যাত। এই বিশ্ববিখ্যাত থিয়েটার-প্রধান অঞ্চলে ভারতীয় ও জার্মান ছেলেদের যৌথ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" (Das Opfer) নাটকটি অভিনীত হয়। অজস্র দর্শককে মুগ্ধ করে কাগজে কাগজে তার প্রশস্তি বেরোয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ফ্রয়লাইন বারবারা কাউটস্ ও বারবারা ভেন্ডেট, সর্বশ্রী রঞ্জন মুখার্জি, মহেন্দ্র

বার্লিনের প্রখ্যাত "আকাডেমী ডেয়ার কুউনস্টস্" হলে ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহের প্রথম দিনের সংগীতে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় ও জার্মান ছেলেমেয়েরা।

হের কার্ল রাডাটৎস্ ও ফ্রাউ মারিয়ানা হপে।

"Cultural Centres of India"—এই অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি, প্রাচীন মূর্তি ও ছবির ফিল্ম প্রদর্শনী, সেই সাথে ডাঃ হেরেটেলের বক্তৃতা ভারতের গভীর আত্মাকে তুলে ধরেছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে আর যাঁরা এসে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লন্ডন থেকে শ্রীমতী মাধুরী মুখার্জি ও সুরজিৎ বেদীর নাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের "মধু গন্ধে ভরা" গানটির সাথে শ্রীমতী মুখার্জির ব্যালে জাতীয় নাচ খুবই মনোমুগ্ধকর হয়েছিল। তা ছাড়া, বাংলা দেশের একটা ছোট্ট বাঁশের বাঁশী কত মধুর সুর ঢালতে পারে, সেই মাটি মাখা

প্রসাদ, উলরিখ লোমেল ও আরো অনেকে। পরিচালনা করেন হের হারটমুট বেকার।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১০০)

লক্ষ্মীদি আসার দিন থেকেই সব বদলে গিয়েছিল এ-বাড়ির। সে রাত্রে সনাতনবাবুকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার পর দীপঙ্করও একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সতী এসেই লক্ষ্মীদিকে নিয়ে পড়েছিল।

সতীও ঝুঁকে পড়ে বলেছিল—কী হলো লক্ষ্মীদি! তোমার কী হলো?

লক্ষ্মীদি তখনও তেমনি করেই কাঁদছিল শুধু। নিজের বোনকে দেখে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিল। সতীকে জড়িয়ে ধরেই যেন সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছিল লক্ষ্মীদি। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি, শুধু বলছিল—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই, আমার সব গেছে—

—সব গেছে মানে কী? কী গেছে তোমার? কেন একলা চলে এলে? দাতারবাবু কোথায়? তোমার ছেলে কোথায়?

লক্ষ্মীদি সে-সব কথার কোনও উত্তর দিত না। শুধু কাঁদতো। শেষকালে অনেক রাত্রে বোধহয় একটু ক্লান্তি এল লক্ষ্মীদির। লক্ষ্মীদিকে রেখে সতী বাইরে এল। দীপঙ্কর চুপ করে তখনও বসে ছিল। সতীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কী হলো? কেমন আছে লক্ষ্মীদি?

সতী বললে—বুঝতে পারছি না, এখন যেন একটু চোখ ঢুলে আসছে—

দীপঙ্কর বললে—কী সর্বনাশ হয়েছে, বলেছে কিছু?

সতী বললে—না, কিছু বলছে না, শুধু কাঁদছে—

—সেদিন যে তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিল, তাতে কী লেখা ছিল?

সতী বললে—কিছুই না, শুধু লিখেছিল, সর্বনাশ হয়ে গেছে, জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, স্টার্টিং—আর কিছু নয়। কবে আসছে কখন আসছে, তাও জানতাম না—ক'দিন ধরে বড় মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল—

তারপর দীপঙ্করও কী করবে বুঝতে পারেনি।

সতী বললে—তুমি আর বসে কী করবে। তুমি এখন যাও—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এই অবস্থায় লক্ষ্মীদিকে নিয়ে তুমি একলা সামলাতে পারবে?

সতী বললে—আমি সামলাতে পারি আর না-পারি, তুমি তো সারারাত্রি তা বলে এই রকম করে রাত জাগতে পারবে না? তুমিও তো সারাদিন অফিসে খেটেছ, তার ওপর আবার কালকেও তো তোমার অফিস—

দীপঙ্কর বললে—আমি না-হয় অফিসে কাল না-ই যাবো—

—না, না, তাহলে অফিস কামাই করতে যাবে কেন মিছিমিছি? অনেক রাত হয়ে গেল তুমি এখন যাও। কাল সকালে যদি পারো তো একবার এসো।

পরের দিন অফিসে যাবার আগেও একবার এসেছিল দীপঙ্কর। সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরেই এসে হাজির হয়েছিল। লক্ষ্মীদি তখন যেন একটু শান্ত হয়েছে। দীপঙ্কর কাছে গিয়ে খাটের ওপর বসলো। বললে—এখন কেমন আছো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার দীপঙ্করের কথায় যেন আবার উথলে উঠলো। বললে—দীপু, আমি কী করবো বলতে পারিস, আমি কার কাছে যাবো, কোথায় গেলে বাঁচবো?

দীপঙ্কর বলেছিল—দাতারবাবু জানে যে তুমি এখানে চলে এসেছ?

লক্ষ্মীদি বললে আমি—কাউকে কিছু বলিনি, সোজা এখানে চলে এসেছি—

—খবর দেব দাতারবাবুকে? টেলিগ্রাম করে দেব আজকে?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—না দীপু, তোর পায়ে পড়ি, কাউকে খবর দিস্‌নি আমি কারোর মুখ দেখতে চাই না, আমার কেউ নেই, আমার কিছু নেই—

সতী এসে বললে—তুমি অফিসে চলে যাও, তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে—

তারপর বললে—আজকেই তুমি টেলিগ্রাফ করে দিও দীপু, আমার যেন কেমন ভালো মনে হচ্ছে না—

—সারা রাত কেমন ছিল লক্ষ্মীদি?

সতী বললে—কেবল ছট্‌ফট্‌ করেছে, নিজেও ঘুমোয়নি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি—

অফিসে গিয়েই দীপঙ্কর সেদিন টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল। যে-ঠিকানা থেকে লক্ষ্মীদি চিঠি লিখতো, সেই ঠিকানাতেই। আর্জেণ্ট।

অক্ষয়ঙ্কর বললে—কী ব্যাপার সেন?

কীসের টেলিগ্রাম? হোয়াই ডু ইউ লুক আপসেট্?

সমস্ত দিনই বড় রুক্ষ ছিল দীপংকরের মেজাজ। ফাইল নিয়েও যেন পুরোপুরি মন বসাতে পারলে না। কারোর সঙ্গেই ভালো করে কথা বলতে পারলে না। সবাই সেন-সাহেবের মেজাজ দেখে হতবাক হয়ে গেল। এমন ব্যবহার তো করে না কখনও সেন-সাহেব। কে-জি দাশবাবু, রামলিঙ্গম-বাবু ফাইল নিয়ে এসেছিল। পুলিনবাবু, হরিশবাবু, সুধীরবাবু সবাই এসে এসে ফিরে গেল।

হরিশবাবু জিজ্ঞেস করলে—কী রে মধু, সেন-সাহেবের কী হয়েছে? এমন গোমড়া মুখ কেন?

মধু বললে—সাহেবের আজকে শরীর ভাল নয় হুজুর—

কয়েকদিন ধরেই অফিসে কানাঘুষো চলছিল। কয়েকদিন ধরেই সেকশানে-সেকশানে গুজ্-গুজ্ ফিস্-ফিস হচ্ছিল। ঘোষাল সাহেবের আট মাস জেল হবার পর থেকেই সমস্ত অফিসময় যেন একটা থম্‌থমে ভাব। বাইরের লোক, কোনও বাইরের মার্চেণ্ট্ এলেই সবাই যেন বাঁকা চোখে দেখাতো চেয়ে চেয়ে। সবাই যেন সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। অফিসের ফাইল নিয়ে কাজ করতে করতে এদিক-ওদিক চেয়ে নিত। কে কোন্ ঘরে ঢুকছে, কে কার সঙ্গে চুপি-চুপি কথা বলছে, তা লক্ষ্য রাখতো। ঘোষাল-সাহেব যেন সকলের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। তবে তো পাপীর সাজা হয় মশাই। তবে যে বলে এটা কলিযুগ। কলিযুগে নাকি পাপের পরাজয় হয় না?

কে-জি দাশবাবু বললেন—ঘোষাল সাহেব তো তুচ্ছ মশাই, ব্রিটিশ গর্ভমেণ্টই এখন টলোমলো দেখছেন না?

একজন বললে—পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না জানবেন, একদিন ফুটে বেরোবেই—

হঠাৎ সকলেরই যেন কেমন বাক্‌রোধ হয়ে গেছে ব্যাপার দেখেই তবে এত যে ব্ল্যাক-মার্কেটিং চলছে, এত যে চুরি, বাট-পাড়ি চলছে, সকলেরই তাহলে শাস্তি হবে একদিন? সবাই তাহলে একদিন ঘোষাল-সাহেবের মত জেল খাটবে? এতদিন যারা ধর্ম নেই বিচার নেই বলে গলাবাজি করছিল, তারাও মুখ বুজিয়ে ফেলেছে। তাদের আর কিছু বলবার মুখ নেই। কই, ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট তো তেমন খারাপ লোক নয় মশাই। সেই তো জেল হলো! সেই তো শাস্তি হলো আসামীর! যে মানুষের এত তম্বি ছিল, যে-মানুষটা এতদিন সকলকে গেট-আউট্ বলে গালাগালি দিয়ে এসেছে, তার তো উচিত শাস্তিই হলো! আট মাস জেল! সোজা কথা! কোথায় পাবে চুরোট, কোথায় পাবে ড্রিংকস্, কোথায় পাবে মেয়েমানুষ? সবাই যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল খবরের কাগজ পড়ে। সেদিন টানাটানি পড়ে গিয়েছিল খবরের কাগজখানা নিয়ে। সেদিন অ্যাংলো-আমেরিকার অতবড় ডেসার্ট-ভিক্টরিও যেন ফিকে হয়ে গিয়েছিল ঘোষাল-সাহেবের জেলে-যাওয়ার খবরের কাছে। ওয়েণ্ডেল্ উইল্কি সেই সময় রাশিয়ায় গিয়েছিলেন সেখানকার অবস্থা দেখতে। সেদিন সে-খবরও বেরিয়েছিল—

"clothing nearly gone. Children work in many of the shops the full 66-hour week worked by adults. The only food that can be bought in the markets was black bread and potatoes at exhorbitant prices"

জার্মান সিক্‌স্থ আর্মি স্ট্যালিনগ্রাড থেকে হটে এসেছে। স্ট্যালিন শেষ হুকুম দিয়েছে Die, but do not retreat. ফজলুল হক্ মিনিস্ট্রি চলে গিয়ে নাজি-মুদ্দিনের মিনিস্ট্রি হয়েছে। কত খবর কত দিকে। খবরের কাগজ পড়ে শেষ করা যায় না। ছ'পয়সার আনন্দবাজার পত্রিকা কিনলে খবর পড়ে পেট টইটুম্বুর হয়ে ভরে যায়। কিন্তু সেদিন অফিসের লোকের কাছে অন্য সমস্ত খবর যেন জোলো হয়ে গেল। সবাই খবরের কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে অফিসে নিয়ে এসেছে। চুপি চুপি পড়ো। কেউ যেন হেসো না। কেউ যেন টিট্‌কিরি দিও না। ঠাট্টা কোর না। হোক ঘোষাল সাহেবের জেল, তবু সে তোমাদের ডি-টি-এস। এক্স-ডি-টি-এস। তার বিরুদ্ধে

কোনও রিমার্ক করা চলবে না। বি কেয়ারফুল!

এক-একজন খবরটা পড়তে পড়তে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লো। এক-একজন তেত্রিশ টাকার ক্লার্ক একলাই এক প্যাকেট্ সিগ্রেট টেনে শেষ করে ফেললে। সেদিন ক্যান্টিনে দু'মণ রসগোল্লা এক ঘণ্টার মধ্যে কাবার হয়ে গেল। শুধু রসগোল্লা নয়, সিঙ্গাড়া, পান্তুয়া চপ্, কাটলেট, ডিম, এমনকি দরবেশ পর্যন্ত লোপাট্। ক্যান্টিন্ একেবারে ধোয়া-মোছা। কিছু নেই, একেবারে সাফ্-সুট। দলে-দলে খদ্দের-বাবুরা এসে খালি পেটে ফিরে গেল। মিষ্টির থালা তখন নিঃশেষ। শুধু মাছি। মাছিরাই তখন রাজত্ব চালাচ্ছে ক্যান্টিনে। এমন ঘটনা রেল-অফিসের ক্যান্টিনে কখনও ঘটেনি। এমন ঘটনা রেলের অফিসের ক্যান্টিনে কেউ দেখেও নি!

যারা জানতো না, যারা খবরের কাগজ পড়তো না, তারাও জেনে গেল। সাউথ্ কেবিন জানিয়ে দিলে নর্থ কেবিনকে। কণ্ট্রোল-অফিস জানিয়ে দিলে ডিস্ট্রিক্টকে। ডিস্ট্রিক্ট জানিয়ে দিলে গার্ড, ফায়ারম্যান ড্রাইভারদের। তারপর সেখান থেকে জেনে গেল কুলী, গ্যাঙ্ম্যান, খালাসী সকলে। কারোর আর জানতে বাকি রইল না। অ্যাংলোইণ্ডিয়ানরা হাতে-পাকানো সিগ্রেট দাঁতে কামড়ে বললে—ব্লাডি বাস্টার্ড—

ক্লার্করা কলম পিষতে পিষতে চুপি চুপি বললে—বেশ জব্দ হয়েছে শালা—

কুলী-জমাদাররা বললে—ঠিক হুয়া বেইমান—

স্টেশন মাস্টাররা টরে-টক্কা করতে করতে বললে—ভগবান বলে একজন আছেন তাহলে—

ট্র্যাফিক-অফিসের কর্মচারীরা সেদিন চাঁদা তুলে সবাই মিলে ট্রাম-ভাড়া খরচ করে কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এল। মা'র সামনে হাতজোড় করে প্রণাম করে বললে—মা, তুমি আমাদের মুখ রেখেছ মা—

কিন্তু সংসারী মানুষ যেমন অল্পতে ভয় পায়, তেমনি বোধহয় বড় অল্পতে খুশীও হয়। মানুষের ঈশ্বর তার খুশী-অখুশীর ধার ধারুক আর না-ই ধারুক, তাতে তার ভয় পাওয়াও যেমন আটকায় না, তেমনি তার খুশী হওয়াও আটকায় না। ফরাসী বিপ্লবের পর লুই-দি সিক্সটিন্থকেও এমনি করে গালাগালি দিয়েছিল ফরাসীরা, রাশিয়ার বিপ্লবের পর নিকোলাস দি সেকেণ্ডকেও এমনি করেই গালাগালি দিয়েছিল রাশিয়ানরা। এমনি করেই চার্চে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিল তারা। কিন্তু ইতিহাস জানে মানুষের ঈশ্বর তাদের সে-পুজো গ্রহণ করেছে কি করেনি। ইতিহাসই কেবল সাক্ষী আছে সে বিবর্তনের। ইতিহাসই বলতে পারে কখন কার পুজো ঈশ্বর গ্রহণ করবে আর কার করবে না।

মিস্টার ঘোষালকে জেলে পাঠিয়ে সেদিনকার কলকাতার মানুষ যদি খুশীই হয়ে থাকে তো সে-সুখ বড় ক্ষণিক। বড় সাময়িক। মাত্র আটমাসের সুখ। আট তিরিশং দু'শো চল্লিশ দিনের সুখ। পাঁচ হাজার সাত শো ষাট ঘণ্টার সুখ। কিন্তু দীপঙ্করের একত্রিশ-বছর জীবনের পট-ভূমিকায় সে-সুখ আর কতটুকু?

কিন্তু সে-ঘটনা আরো পরের।

সেদিনও দীপঙ্কর একমনে ফাইল দেখছিল। হঠাৎ মধু এসে একটা স্লিপ্ নিয়ে এল। দীপঙ্কর বললে—ভেতরে পাঠিয়ে দে—

আর একজন মার্চেণ্ট্। দীপঙ্কর ভেবেছিল যেমন আর পাঁচজন মার্চেণ্ট্ আসে তেমনি। ভালো করে নামটা পড়েও দেখিনি। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই দীপঙ্কর দেখলে হোসেনভাই কাশেমভাই-এর পার্টনার—মিস্টার হোসেনভাই।

—আবার কী মিস্টার হোসেনভাই? এ-মাসের অ্যালটমেণ্ট্ তো নিয়ে গেলেন সেদিন?

—না, ওয়াগন নয় সাহাব। এসেছি অন্য কাজে।

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। বললে—কী কাজ?

হোসেনভাই পকেট থেকে একটা চেক-বই বার করলে।—আপনি সেদিন কিছু টাকা চেয়েছিলেন?

টাকা! দীপংকর ভালো করে চেয়ে দেখলে সোজাসুজি!

হোসেনভাই বললে—আপনি বলছিলেন আপনার টাকার দরকার, আমি সেই টাকা এনেছি—

দীপংকরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় যেন হঠাৎ কেমন রক্ত চলাচল বেড়ে গেল। নিজের শরীরটা যেন নিজেরই বশে রইল না আর। একেবারে একদৃষ্টি চেয়ে রইল হোসেনভাই-এর দিকে। মুখ দিয়ে কথা বেরোতে গিয়েও যেন আটকে গেল।

হোসেনভাই ততক্ষণে চেক্-বই বার করে ফেলেছে। ফেলে একেবার লিখতে সুরু করেছে। তারপর লিখতে গিয়ে বললে—কত টাকা দরকার আপনার? এক লাখ?

দীপংকর যেন বোবা হয়ে গেছে। তার সমস্ত শরীরে জামার ভেতরে সে ঘামতে আরম্ভ করেছে। দর-দর করে ঘাম ঝরছে।

মুখ দিয়ে একটাও উত্তর বেরোল না তার। হাজার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলে না। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সতীর মুখখানা। সতী আবার সুখী হবে। সনাতনবাবু আবার স্ত্রী পাবে। নয়নরঞ্জিনী দাসী আবার তার বাড়ি খালাস করতে পারবে।

—আমি তিনটে বেয়ারার চেক্ লিখে দিচ্ছি—তিনটে ব্যাঙ্কের।

—আর ইণ্টারেস্ট?

হোসেনভাই হাসতে লাগলো। বললে—ইণ্টাররেস্ট কিছু লাগবে না সেন-সাহেব, ইণ্টারেস্ট্ আপনার কাছ থেকে নেব না আমি, আপনি অনেক ওয়াগন দিয়েছেন আমাদের—

দীপঙ্কর আপত্তি করলে—সে কি? ইণ্টারেস্ট ছাড়া আপনার কাছ থেকে টাকা নেব কেন আমি, আমি মিছিমিছি আপনার কাছ থেকে এত টাকা...

কিন্তু হোসেনভাই অনেক সাহেব দেখেছে জীবনে। শুধু এই রেল নয়। অনেক রেলের হেড্-অফিসে তাকে যেতে হয়। অনেক সাহেবদের চরিয়ে আসছে আজ অনেক দিন ধরে। অমায়িক হাসতে হাসতে সেলাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিস্টার হোসেনভাই। তখনও যেন দীপঙ্কর নিজেকে নিয়ে সামলে উঠতে পারেনি। তখনও যেন সে স্থানুর মত চুপ করে বসে আছে।

অনেকক্ষণ পরে যেন খেয়াল হলো। তাড়াতাড়ি ডাকলে—মধু!

ঘড়িতে তখন একটা বেজেছে। আর সময় নেই। মধুকে বললে—আমি আজ এখনি বেরোচ্ছি—কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি চলে গেছি—

থাক্ রেলওয়ের কাজ। থাক সব কিছু ফাইল। পৃথিবী রসাতলে যাক। কারোর কিছু দরকার নেই। দীপঙ্কর যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। কে-জি-দাশ-বাবু ফাইল নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছিল। এসে সুইং-ডোরটা ঠেলে ভেতরে ঢুকবে। মধু বললে—সাহেব নেই হুজুর—

—সে কী রে? সাহেব কোথায় গেল?

মধু বললে—সাহেব এখুনি তো বাইরে বেরিয়ে গেল।

—কখন আসবে?

মধু বললে—তা বলে যায়নি আমাকে—

দীপঙ্কর তখন আর দাঁড়ায়নি কোথাও। সোজা ব্যাঙ্ক থেকে চেক্ ভাঙিয়ে নিয়ে একেবারে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে গিয়ে হাজির। দুপুর বেলা। এমন সময় কখনও আসেনি দীপঙ্কর এ-বাড়িতে। দু'একটা পায়রা কার্নিশের ধারে বক্‌বকম্ করছে। যেন ভূতের বাড়ি মনে হলো দীপঙ্করের কাছে। যেন ঝিমিয়ে পড়েছে সমস্ত বাড়িখানা। ভেতরে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কোন দিকে যাবে ঠিক করতে না পেরে ওপরে উঠতে লাগলো। একেবারে তেতলায়। জুতোর আওয়াজেই বোধহয় নয়নরঞ্জিনী কান খাড়া করেছিলেন। বললেন—কে?

দীপঙ্কর কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। বললে—আমি, আমি আপনার সেই টাকাটা পেয়েছি—

টাকা! নয়ন রঞ্জিনী সোজা হয়ে বসলেন। দীপঙ্কর তখন এ-পকেট ও-পকেট থেকে টাকাগুলো বার করছে। হাজার টাকার নোট সব। ব্যাঙ্ক থেকে পিন-আপ্ করা তাড়া তাড়া নোট। নোটের বাণ্ডিল। বাণ্ডিল-বাণ্ডিল নোটের গাদা বিছানার ওপর রাখলে দীপঙ্কর। এত নোট দীপঙ্করও একসঙ্গে কখনও দেখেনি। হয়ত নয়নরঞ্জিনী দাসী এককালে দেখেছেন। কিন্তু তখন সে-সব কথা ভুলে গেছেন। সে-সব শ্বশুরের আমলের কথা। তখন এমনি নোটের বাণ্ডিল এসে এ-বাড়ির সিন্দুকে জমা হতো। সে-সিন্দুকের চাবি থাকতো তাঁরই কাছে।

দীপঙ্কর বললে—আপনাকে আর গুণতে হবে না, আমি ব্যাঙ্ক থেকে গুণেই এনেছি—

নয়নরঞ্জিনী দাসীর তখন মনের কী অবস্থা তা তিনিই বলতে পারেন। বললেন—তা হ্যাঁ বাবা, বৌমা শেষ পর্যন্ত রাজি হলো দিতে?

দীপঙ্কর সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—এতেই হবে তো আপনার? এতেই আপনার বাড়ি খালাস হয়ে যাবে তো?

নয়নরঞ্জিনী নোটের তাড়াগুলোর গায়ে তখনও হাত বুলোচ্ছেন। বললেন—খুব হবে বাবা, খুব হবে। উকিলবাবু তো বলেছিল এক লাখ টাকা জমা দিলেই হবে আপাততঃ, তারপরে মামলায় যা হয় হবে। এখন রাস্তায় দাঁড়ানোটা তো বন্ধ হলো।

তারপরেই হঠাৎ বললেন—ওমা, তুমি উঠছো নাকি?

দীপঙ্কর বললে—আমি উঠি এবার, আমার কাজ আছে—

ব্যাঙ্ক থেকে অনেক ভিড় ঠেলে বেরোতেই আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। তারপর এই ভবানীপুরে এসেছে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। তারপরে এখান থেকে আর অফিসে গিয়ে কোন লাভ নেই। তারপর যেতে হবে লক্ষ্মীদির বাড়িতে। লক্ষ্মীদি ক'দিন ধরে কিছু খাচ্ছে না। কিছু কথা বলছে না। শুধু কাঁদে, আর অনেক সময় আবার চুপ করেও থাকে। এখন গিয়ে লক্ষ্মীদিকেও দেখে আসতে হবে।

—তা একটু মিষ্টিমুখ করে গেলে না? এই দুপুর রদ্দুরে তেতে-পুড়ে এলে?

নয়ন রঞ্জিনী দাসীর মুখে এ-কথা শুনে দীপঙ্করের অবাক হওয়ারই কথা। কিন্তু তখন আর সে-দিকে মন দেবার সময় ছিল না দীপঙ্করের। দীপঙ্কর তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এসে রাস্তায় পড়লো।

সে উনিশ-শো তেতাল্লিশের কলকাতা। কোথায় কত দূরে যুদ্ধ হচ্ছে ঠিক নেই, কিন্তু এখানে এই ইণ্ডিয়ায় তখন তার ছোঁয়াচ লেগেছে বড় স্পষ্ট হয়ে। চাল-চিনির জন্যে সকাল থেকে লাইন দিতে হয়। কেরাসিনের জন্যে ধর্না দিতে হয় দোকানে-দোকানে। পাঁচ সের কয়লা পেতে গেলে খোসামোদ করতে হয় দোকানদারকে। কাশী কত দিন ফিরে এসেছে খালি হাতে। হাতে পয়সা নিয়ে গিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

এ-সব খবর দীপঙ্কর রাখতো দৈনিক। সবই জানতো সে। কিন্তু কোথায় এর প্রতিকার বুঝতে পারতো না। জীবনের কত সমস্যার প্রতীকার করবে সে? নয়নরঞ্জিনী দাসী সব টাকা জমা দিয়ে এসেছেন কোর্টে গিয়ে। এবার মামলা চলছে বাদীর সঙ্গে। দিনের পর দিন মামলা চলছে। যত দিন পড়ছে তত টাকা নিচ্ছে উকীল। কত দিনে কত বছরে যে সে মামলার ফয়শালা হবে কে জানে? তারপর আছে কিরণ। কিরণের কোনও খবরই পায় নি কতদিন। কতদিন কত জায়গায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছে। কেউ বলতে পারে না। প্রাণমথবাবুও কোথায় কোন্ জেলে আছে তাও জানার উপায় নেই। প্রত্যেকদিন গড়িয়া-হাটের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসে। লক্ষ্মীদি যেন দিনের পর দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। কিছু আর খায় না তখন।

কিন্তু সেদিন বড় অবস্থা খারাপ হয়ে গেল লক্ষ্মীদির। সন্ধ্যে থেকে কারো আর ফুরসৎ নেই। লক্ষ্মীদি যেন আর স্থির থাকতে পারছে না। সতী বললে—দাতারবাবুর কোনও খবর এল?

দীপঙ্কর বললে—বোধহয় ঠিকানা বদলেছেন তারা—

—কিন্তু লক্ষ্মীদি এখানে আছে কিনা সে খবরটাও তো তারা একবার নেবে? কী রকম মানুষ তারা?

দীপঙ্কর বললে—এখানে চলে এসেছে তাই বা তারা কী করে জানবে?

—জানুক আর না-জানুক, তোমাকেও তো একবার একটা চিঠি লিখতে পারতো!

কে জানে! এত লোক থাকতে দীপঙ্করকে লিখবে কী করতে! দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির কে? কিন্তু সতী তো রয়েছে! এ-বাড়িতে সতী রয়েছে, এটা তো জানে দাতারবাবু! সতীর কাছেও তো একটা চিঠি লিখতে পারতো যে লক্ষ্মীদি কলকাতায় এসেছে কি না!

দীপঙ্কর আরো কয়েকটা টেলিগ্রাম করেছিল। তারও কোনও উত্তর আসেনি। প্রতিদিন অনেক রাত পর্যন্ত ও-বাড়িতে কাটিয়ে শেষকালে চলে আসতো দীপঙ্কর। পা যেন আর চলতে চাইতো না। মনে হতো ওখানে থাকলেই যেন ভালো হতো। ডাক্তার এসে লক্ষ্মীদিকে দেখে যেত। কিন্তু কিছুই ধরতে পারতো না তারা।

সেদিন ডাক্তারবাবুকে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কি করবো বলতে পারেন?

ডাক্তারবাবু নতুন দেখতে এসেছিলেন। বললেন—এরকম পেসেণ্ট আগে আমি কখনও দেখিনি, তবে খুব নার্ভাস শক্ পেয়েছেন মনে হচ্ছে—খুব সাবধানে থাকা দরকার, পাগল হয়ে যেতে পারে—

—কিন্তু একটা কিছু ওষুধ দিন, যাতে অন্ততঃ ঘুমোতে পারে পেসেণ্ট—

ডাক্তারবাবুর ঘুমের ওষুধেই যেন শেষকালে একটু ঝিমিয়ে পড়লো লক্ষ্মীদি। দীপঙ্কর বাইরের চেয়ারে তখনও চুপ করে বসেছিল। সতী বাইরে আসতেই হঠাৎ দেখে ফেললে। বললে—একী, এখনও যাওনি তুমি?

দীপঙ্কর বললে—এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে যাই কী করে?

সতী বললে—কিন্তু কাল তো অফিস আছে তোমার। রাত্রে ঘুমোবে না?

দীপংকর বললে—একটা রাত না ঘুমোলে আর কী হয়?

—কিন্তু এখানেই এমনি করে বসে থাকবে তাবলে!

—বসে থাকবো না তো কী করবো?

সতী বললে—না-না, পাগলামি করো না, বাড়ি যাও—যাও যাও আমাদের জন্যে কি তুমিও বাড়িঘর ত্যাগ করবে নাকি?

দীপংকর বললে—কিন্তু হঠাৎ যদি কোনও দরকার হয়, তখন?

—তুমি যদি না-থাকতে, তোমার সংগে যদি পরিচয়ই না হতো, তাহলেই বা কী করতুম? যাদের দীপংকর নেই, তাদের কি চলছে না? তারা কি বেঁচে নেই? সব মরে গেছে?

দীপংকর সতীর মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে দেখলে। এতদিন সতীর জন্যে এত করেছে। এতদিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিজের সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে সতীর সুখের কথা ভাবার পর সতীর মুখ থেকেই এই কথা শুনতে হচ্ছে! সতীর হয়ে যে-টাকা নয়নরঞ্জিনী দাসীকে দীপংকর দিয়েছে, সে-টাকা সারা জীবন ধরেই হয়ত শোধ করতে হবে তাকে। মাইনেটা হাতে পেয়ে আগে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে মিস্টার ঘোসেনভাইকে। তারপর তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে তিনটি প্রাণী। তাদের কথাও এতদিন দীপংকর একমুহূর্তের জন্যেও ভাবেনি। আর তারই প্রতিদান হিসেবে সতী এই কথা বললে তাকে। দীপংকর যেন বিশ্বাস করতে পারলে না নিজের কানকেও।

দীপংকর সতীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুমি আমাকে চলেই যেতে বলছো সত্যি-সত্যি?

—হ্যাঁ যাও, লক্ষ্মীদির যা হবার হবে, আমারও একদিন যা হবার হবে, তাবলে তুমি তাই ভেবে-ভেবে নিজের শরীর খারাপ করবে নাকি! আমার কপালে যদি শ্বশুর-বাড়ির সুখ না-থাকে, লক্ষ্মীদির কপালে যদি কণ্ট থাকে তাহলে তুমি কী করবে? তুমি তো সব রকম চেণ্টা করে দেখলে?

দীপংকর তখনও চুপ করে রইল। সতী বলতে লাগলো—একদিন ছোটবেলায় দুই বোনে এসেছিলাম কলকাতায়। তখন অনেক সাধ ছিল অনেক স্বপন ছিল। তারপর কত কী ঘটলো, কত জিনিস ওলোটপালোট হয়ে গেল। আমার বিয়ে হলো, আমি আবার ছিটকে কোথায় চলে এলুম, লক্ষ্মীদি কত কাণ্ড করে কোথায় চলে গিয়েছিল, সে-ও ফিরে এল—সব দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে দেখেছি—কিন্তু এখন থেকে ঠিক করেছি আর ভাববো না, মানুষ ভেবে-চিন্তে সব কিছু ঠিক করলেও, একজন বুঝি আড়াল থেকে সব কিছু উল্টে দেয়—

দীপংকর সতীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। সতী এত কথাও ভাবে তাহলে?

—ভেবেছিলাম স্বামী শাশুড়ির ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে পৃথিবীতে যত কিছু অন্যায় আছে সব করে দেখবো, যা প্রাণে চায় সব করবো, কারোর কথা মানবো না। সবই তো করলুম। তুমি কত বারণ করেছিলে, তবু আমি তা শুনিনি। কিন্তু লক্ষ্মীদিকে দেখে আজ আমার আর কোনও ক্ষোভ নেই। আমার কোনও দুঃখ নেই। দু'জনে দু'পথে গিয়েছিলুম, দু'জনেরই এক পরিণতি হয়েছে—! এর পরও তুমি আমাদের ভালো চাইছো? আমাদের ভালো করবার ক্ষমতা তোমার আছে?

দীপংকর বললে—কিন্তু সনাতনবাবু কেন হতাশ হতে বারণ করেন তাহলে?

সতী বললে—ওঁর কথা ছেড়ে দাও, মানুষের জীবনটা তো পুঁথি নয়, মানুষের জীবন ওঁর পুঁথির নিয়ম-কানুন মেনে তো চলে না! তুমি এখন যাও, তুমি এখানে এলেও যা হবে, এখানে না এলেও তাই হবে। তুমি না এলেও আমাদের দুই বোনের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না—

দীপংকর তবু যেন কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। বললে—সত্যিই কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না তোমাদের?

—কীসের ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে? আসলে যারা আপনার লোক তারা চলে যাবার পরও যখন কোনও ক্ষতি হলো না, তখন তুমি মনে করছো তুমি চলে গেলে আমাদের মস্ত ক্ষতি হবে? তুমি তো পর ছাড়া কিছু নও!

তারপর সতী দীপংকরের দুটো হাত ধরলে। বললে—বললে তুমি কণ্ট পাবে। কিন্তু তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, আমাদের সংগে তুমি আর কোনও সম্পর্ক রেখো না। আমাদের সংগে সম্পর্ক রাখলে তোমার কপালেও আমাদের মতন দুর্দশা আছে। যাও—

বলতে গেলে দীপংকরকে একরকম জোর করেই সতী রাস্তায় বার করে দিলে। কিন্তু সম্পর্ক রাখবো না বললেই কি সম্পর্ক মুছে ফেলা যায়? সম্পর্কটা কি শুধু বাইরের জিনিস? জামা-কাপড়ের মত একেবারে তুচ্ছ সামগ্রী? ফেলে দিতে চাইলেই কি ফেলা যায়?

রাস্তায় বেরিয়েই সেদিন দীপঙ্কর ঠিক করেছিল আর সে আসবে না। অন্ততঃ এত ঘন-ঘন, এত সকাল-বিকেল আর আসবে না। কেন সে আসতে যাবে এখানে? কীসের দায়ে? লক্ষ্মীদির নিজের টাকা আছে, সতীরও নিজের অনেক টাকা আছে। টাকার যখন ভাবনা নেই, তখন যেমন করে হোক দুজনের চলে যাবেই। নয়ন রঞ্জিনী দাসী টাকা পেয়ে গেছেন। এর পর তাঁকে আর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। মাঝখান থেকে দীপঙ্কর কেন জঞ্জাল হয়ে সকলের মাঝে বাধার সৃষ্টি করবে?

সেদিন ক্রফোর্ড সাহেব ডেকে পাঠালেন। বললেন—বোস সেন, টেক্ ইওর সীট—

দীপঙ্কর বসলো। সাহেব বললে—সেন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, তুমি ভুল বুঝো না—

দীপঙ্কর বললে—বলুন—

সাহেব বললে—রেলওয়েতে আমার চাকরি হয়ে গেল আজ তিরিশ বছর, আমি অনেক রকম লোক দেখলাম, অনেক ইন্ডিয়ান দেখলাম, আই য়্যাম্ এ ম্যান্ অব্ ফিউ ওয়ার্ডস্—কিন্তু আমি তোমাকেও দেখলাম!

সাহেব কী কথা বলতে চায় বুঝতে পারলে না দীপঙ্কর।

—নাউ, আমি জানি না কার এ কাজ, কোত্থেকে দিল্লীর বোর্ড এ খবর পেলে, কিন্তু আমাকে তুমি সত্যিই বলো তো, তোমার কি টাকার দরকার খুব?

দীপঙ্কর হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। টাকার দরকার ছিল বটে একদিন। কিন্তু সে দরকার তো তার মিটে গেছে!

জিজ্ঞেস করলে—এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন স্যার?

সাহেব বললে—না, দিল্লী থেকে একটা কনফিডেনশিয়াল চিঠি এসেছে জেনারেল ম্যানেজারের নামে,তোমাকে ট্র্যানস্ফার করে দিতে বলেছে এখান থেকে। ডিস্ট্রিক্টে—

—ট্র্যানস্ফার?

সাহেব বললে—ইয়েস, ট্র্যানস্ফার!

—কিন্তু কেন স্যার? আমি কী দোষ করেছি?

সাহেব বললে—জানি না। সে লেটার আমি দেখিনি। কিন্তু ঘোষালের কেস-এর পরে আর ও-পোস্টে কোনও জুনিয়ার লোককে রাখা যায় না। বোর্ড থেকে মিস্টার ভার্মা ওখানে আসবে। ইউ আর ভেরি জুনিয়ার—

দীপঙ্কর হতবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলে না। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আমার এগেনস্টে কোনও কমপ্লেইন্ আছে?

—আমি যতদূর জানি নেই। তবে সন্দেহ আছে। য়্যাস্পারসান্ আছে। তোমারও নাকি অনেক অভাব। তোমারও নাকি অনেক টাকার দরকার হয় মাঝে-মাঝে। তা কোথায় তুমি যেতে চাও? শিলিগুড়ি যাবে? শিলিগুড়িতে একটা ভেকেন্সি আছে—

দীপঙ্কর পাথরের মত চুপ করে রইল। সমস্ত অন্তরাত্মা তার যেন বিদ্রোহ করতে চাইলো। কিন্তু তখনি নিজেকে শান্ত করে নিলে সে। আশ্চর্য্য! একদিন তো চাকরি ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল সে। একদিন তো চাকরি থেকে ঘৃণায় দূরে চলে যেতেই চেয়েছিল সে। তাহলে কেন সে উত্তেজিত হয়ে উঠল সহসা। হঠাৎ মনের সামনে প্রাণমথবাবুর মুখটা ভেসে উঠলো তার।

● হাবুলি, "সপ্তপদী" ছবিটা দেখেছিস?
● না! মা বলেছিল ওটা নাকি মিলনান্ত করেছে। মিলনান্ত মানে কি গ্যাপেদা?
● মানে,—তোর সঙ্গে আমার যে ব্যাপারটা বাবা এখন কিছুতেই হতে দেবেন না,—তাকেই বলে মিলনান্ত।

● মানসী, তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হ'লে আমি আজই "গোয়া বর্ডারে" চলে যাবো বলে দিচ্ছি!
● প্লীজ্ হাবুদা,—'গোয়ার' প্রোগ্রামটা বদলে—"কাতাঙ্গা" কর।

চোখের সামনে অমলবাবুর মুখটা ভেসে উঠলো। কিরণের মুখটাও ভেসে উঠলো। মা'র মুখটা ভেসে উঠলো। কত কষ্টে নৃপেনবাবুকে ধরে মা তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছিল তাকে। তারপর ধাপে-ধাপে কত বড় হয়েছে। কত মাইনে বেড়েছে তার। দশ-জনের চোখে কত সম্মান সে পায় এই চাকরিটার জন্যে। আর তা ছাড়া কার জন্যেই বা এই চাকরি করবে সে? সতী, লক্ষ্মীদি, নয়নরঞ্জিনী, গাঙ্গুলীবাবু, সবাই চলে গেছে। কিরণও হয়ত দু'দিন পরে পৃথিবী থেকে চলে যাবে। একটি মাত্র বন্ধন তার ধার। মিস্টার হোসেনভাইএর কাছে ধার। কোনও সই নেই, কোনও রসিদ নেই, কোনও ভাউচারও নেই। তবু ধার তো ধারই। সে ধার শোধ করতে হলে চাকরি তাকে করতে হবেই। আর চাকরি যদি করতে হয় তো এই কলকাতা থেকে দূরে চলে যাওয়াই ভালো। এমন এক জায়গায় যেখানে প্রতিদিনের এই গ্লানি প্রতি মুহূর্তের এই অপমৃত্যু তাকে নিজের চোখে দেখতে হবে না। সেখান থেকেই প্রতি মাসে সে টাকা পাঠিয়ে দেবে মিস্টার হোসেনভাইকে। প্রতি মাসের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ হয়ে থাকবে সতীর কাছে। এই-ই তার বন্ধন। এই-ই তার মুক্তি! এমনি করে সতীর কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েই বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পাবে।

দীপঙ্কর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। দাঁড়িয়ে উঠে বললে—অল্ রাইট্, স্যার, থ্যাংকিউ—

বলে আর দাঁড়াল না সেখানে। একেবারে সোজা নিজের ঘরে চলে এল। তারপর কিছুক্ষণ কোনও কাজ করতে পারলে না। সমস্ত মন সমস্ত মানসিকতা যেন তার বিকল হয়ে গেছে। কখন ঘন্টায় ঘন্টায় ঘড়ি বেজে গেছে, কখন বিকেল হয়েছে, কখন সন্ধ্যে হয়েছে কিছুই খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ মধু এসে ঘরে ঢুকলো। একটা চিঠি এনে সামনে রাখলে। অফিসের নয়। দীপঙ্করের নামে।

কেমন অবাক হয়ে গেল। তাকে তার নামে অফিসে কে চিঠি দেবে? ওপরে দিল্লীর পোস্ট্-অফিসের ছাপ। চিঠিখানা হাতে তুলে নিয়ে বার-কয়েক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে। তারপর ছিঁড়ে ফেললে খামের মুখটা।

আশ্চর্য?! দাতারবাবুর চিঠি! দাতার-বাবু লিখেছে দিল্লী থেকে। দাতারবাবুর নতুন ঠিকানা কেরলবাগ। সমস্ত চিঠি-খানা ইংরিজীতে লেখা। দীপঙ্কর দম বন্ধ করে পড়তে লাগলো—

'ডিয়ার দীপুবাবু,

আমি আজ ভীষণ বিপদাপন্ন। অনন্যোপায় হয়ে অন্য ঠিকানা জানি-না বলে তোমার অফিসের ঠিকানায় এই চিঠি লিখছি। জানি না এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছোবে কি না। তোমার লক্ষ্মীদি তোমাদের কলকাতায় গেছে কি না বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমাদের বাড়ি ছেড়ে কাউকে না বলে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। আজ একমাস ধরে অনেক জায়গায় চিঠি দিয়েছি, অনেক জায়গায় খোঁজও করেছি। শেষের দিকে তোমার লক্ষ্মীদির মাথাটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু আমরা সাবধানে রাখতাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তুমি বোধহয় এখানকার খবর জানো না। আমি যে এখনও বেঁচে আছি এ বোধহয় আর এক পরম আশ্চর্য ঘটনা। তোমার লক্ষ্মীদি পালিয়ে গিয়ে হয়ত বেঁচেই গেছে। আমি কিন্তু পালাতে পারিনি। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আমার পালাবার উপায়ই নেই। আমার ছেলে আজ মানুষ খুন করার অপরাধে জেলে বন্দী হয়ে আছে। বাপ হয়ে তার মামলার তদ্বির করতে হচ্ছে আমাকেই......

দীপঙ্করের চোখের সামনে চিঠির ছোট-ছোট অক্ষরগুলো যেন ঝাপ্সা হয়ে গেল এক নিমেষে। আরো আলোর তলায় নিয়ে এল চিঠিখানা।

সমস্ত শরীরে তখন অবধারিত রোমাঞ্চ সুরু হয়ে গেছে দীপঙ্করের। চোখের সামনে দীপঙ্কর যেন সমস্ত ঘটনাটা স্পষ্ট দেখতে পেলে। যেন দিল্লীর একটা বাড়িতে তখন নাটকের শেষ অঙ্ক শুরু হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ রাত। কনট্-প্লেসের একটা বাড়িতে

টিপি-টিপি পায়ে এ ঘর থেকে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল একজন বিংশ-শতাব্দীর মানুষ। সমস্ত দিল্লী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে। টাকার দিল্লী, ব্যাভিচারের দিল্লী, মোগল-সম্রাটদের দিল্লী, ভাইসরয়দের দিল্লী যেন অসাড় হয়ে পড়ে আছে চোখ বুজে। যা খুশী পাপ করো তোমরা, আমরা চোখ বুজে থাকবো। আমাদের অন্য অনেক ভাবনা আছে। আমরা কেউ কিছু দেখতে যাবো না। ঘরের দরজা বন্ধ করে তোমরা এডাল্ট্রি করো, রেপ্ করো, যা-কিছু করো, তবু আমরা চোখ বুজে থাকবো। আমরা শুধু যুদ্ধে জিততে চাই। আমরা শুধু চাই ভিক্ট্রি। আর কিছু চাই না।

বারান্দা পেরিয়ে মানুষটা টিপি টিপি এগিয়ে এল আর একটা ঘরের সামনে। দরজাটা ভেজানো। মানুষটা ভেজানো দরজার সামনে গিয়ে কী যেন দ্বিধা করলে একবার।

তারপর ঘরের ভেতর ঢুকেই হঠাৎ আচমকা দুম্-দুম্ আওয়াজ করলে দু'বার। একটা মেয়েলি গলার চিৎকার। আলো জ্বলে উঠলো। সেই চিৎকারে সমস্ত দিল্লী আতঙ্কে উঠলো আর্তস্বরে। ভাইসরয়ের দিল্লী কেঁপে উঠলো থর থর করে।

কিন্তু লক্ষ্মীদি তখন আর চুপ করে থাকতে পারে নি। সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়ে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে গলা ছেড়ে। সে শব্দে ওঘর থেকে ঘুম ভেঙে উঠেছে দাতারবাবু। চাকর-বাকর-ঝি-খানশামা-বাবুর্চি-আর্দালী-সবাই জেগে উঠেছে। হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার সবাই! আসামী পালিয়ে যাবে।

কিন্তু যে আসামী সে পালাবার এতটুকু চেষ্টা করেনি। রিভলবারটা হাতে নিয়ে চুপ করে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে তখনও। লোকজন সবাই এসে ঘরে ভিড় করেছে। দাতারবাবুও এসে হতবাক হয়ে গেছে। লক্ষ্মীদিও তখন যেন আসামীর মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে ভুলে গেছে।

শুধু একজনই উঠলো না আর। উঠতে পারলো না। লক্ষ্মীদি আর সুধাংশু একই ঘরে একই বিছানায় শুয়ে ছিল। গুলী দুটো গিয়ে সুধাংশুর বুকেই লেগেছিল টিপ করে। সুধাংশু বিছানাটার ওপর রক্তের সমুদ্রে যেন ভাসছে তখন। ভাসছে আর অসাড় হয়ে পড়ে আছে। মিলিটারি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর তখন সমস্ত সাপ্লাই-এর উর্ধে চলে গেছে।

দাতারবাবুর মুখ দিয়ে শুধু একটা কথা বেরিয়েছিল—মানস, তুমি

তারপরের ইতিহাস বড় সংক্ষিপ্ত। তারপরের ইতিহাস বড় মর্মান্তিক। পুলিস, দারোগা, কোর্ট, কাছারি, এনকোয়ারী সে তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু তুচ্ছ জিনিস হলেও বাপ হয়ে তার তদ্বির তকে করতেই হচ্ছে—। চিঠি শেষে দাতারবাবু লিখেছে—যদি তোমার লক্ষ্মীদি তোমার কাছেই গিয়ে থাকে তো তাকে একটু দেখবে। তার আঘাতটাই বড় মর্মান্তিক। এই ছেলের জন্যেই তোমার লক্ষ্মীদি তার সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছিল একদিন, এই ছেলের জন্যেই আমি একদিন সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম—। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধহয় তা নয়। তবু লক্ষ্মীদি যদি তোমাদের কাছে আছে জানতে পারি তো কিছুটা নিশ্চিন্ত হবো। আমাকেও একটা খবর দিও—

ইতি তোমার দাতারবাবু

(ক্রমশ)

ফরাসী শিল্পীদের মন-মেজাজ

সলিল ঘোষ
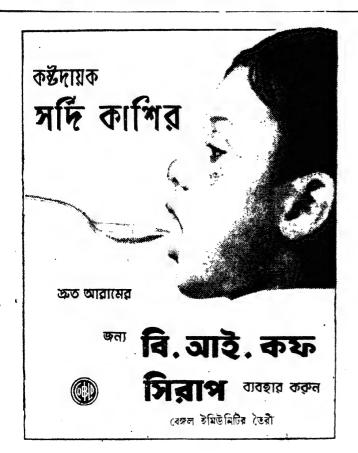
প্যারিসে আমার বিশেষভাবে দেখাশোনার বা বেড়ানোর কোনো নির্দিষ্ট কার্যসূচী বা পরিকল্পনা ছিল না। আর্ট নিয়ে একটু আধটু অনধিকার চর্চা করার খেয়ালের জন্যই ভেবেছিলাম, প্যারিসের শিল্পজগৎ কি ভাবে চলছে, তা দেখে আসব। কী এমন আজব দুনিয়া সেখানে, যা নিয়ে প্যারিস শহর সারা দুনিয়ার শিল্পীদের মক্কা হয়ে বসে আছে। সব দেশের শিল্পীদের কেন এভাবে প্যারিস আকর্ষণ করে। কী এর গোপন রহস্য, তার যদি কিছু হদিস করতে পারি। প্যারিসের আবহাওয়ায়, পরিবেশে অনেক কিছুই আছে যা অন্যত্র কোথাও নেই এবং শিল্পীদের পক্ষে খুবই অনুকূল। তবুও এটা বলা চলে যে, বিদেশীরাই প্যারিসকে এত মহিমামণ্ডিত করেছে, নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার দ্বারা। সূক্ষ্ম মোহময় চুলচেরা কত কিছু সব আবিষ্কার করে। আমিও এই সব খুঁজতে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় লাভ করাই ছিল আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্যারিসের সব দর্শনীয় স্থান, মিউজিয়াম, ঐতিহাসিক কেন্দ্র ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করে আর্টের পণ্ডিত হতে আমি চাইনি, "ইকোল্ দ্য-প্যারী"র আর্টের ধারা কোন্ দিকে বইছে, তা নিয়েও গবেষণা করা আমার ইচ্ছে ছিল না। ফ্রেদেরিকের মধ্যস্থতায় সেখানকার শিল্প-জগতের পরিচয় পাবার সুযোগও আমার ঘটেছিল। লেখক-ফটোগ্রাফার ফ্রেদেরিক ওই জগতেরই একজন। ১৯৫৫ সালে ফ্রেদেরিক ও তার স্ত্রী মিসেং ভারতে এসেছিল। কয়েকজন বিখ্যাত ফরাসী প্রকাশকদের উদ্যোগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিত্রসংবলিত কয়েকটি বই লেখা ছিল তার উদ্দেশ্য। সঙ্গে ছিল ওদের বন্ধু দেনী ব্রিহা। ফ্রেদেরিক লেখক ও ফটোগ্রাফাররূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। আপাতত সে বিখ্যাত ফরাসী প্রকাশক "হ্যাশেত"-এর বিদেশ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশনা বিভাগের একজন ডিরেক্টর। ভারত সম্বন্ধে ফ্রেদেরিকের কয়েকটি সচিত্র বই সমাদৃত হয়েছে ফ্রান্সে—যেমন "ভারত ভ্রমণ কাহিনী", "ভারতীয় নৃত্য", "সূক্ষ্ম যোগাসন" এবং তার সুবৃহৎ মূল্যবান গ্রন্থ "ভারতীয় মন্দির ও স্থাপত্য", যা এর মধ্যেই ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ব্রিহা একজন জাতশিল্পী ফটোগ্রাফার। বিদেশে এখনও খ্যাতিলাভ না করলেও তার প্রতিভা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। এক বছর এরা ভারতে ছিল, নানা স্থানে ঘুরেওছিলাম ওদের সঙ্গে। এই পরিচয় পরে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। ফ্রেদেরিক ও ব্রিহা দুজনেই খাঁটি ফরাসী, কিন্তু চরিত্রে, মেজাজে একেবারে বিপরীত। প্যারিসের দ্রুত বা মন্থর জীবনের উত্তেজনা ও মৌতাত না থাকলে ফ্রেদেরিকের চলে না, কিন্তু প্যারিসের জীবনচর্যা সম্পর্কে ব্রিহার অনীহা অপরিসীম। তাই সে দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভেন্স-এর এক জনমানবহীন অঞ্চলে প্রকৃতির মধ্যে একলা বাস করছে। ফ্রেদেরিক আড্ডাবাজ ও কুঁড়ে। বড় বড় কথা বলে, সবজান্তা সমঝদার ভাব। অথচ বৈষয়িক বুদ্ধিও তার অত্যন্ত প্রখর। তবে অল্পেতেই অধৈর্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। তখন ফ্রেদেরিক সঙ্গীরূপে অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু যখন ও খোশমেজাজে আছে, তখন একাই একশো, সকলকে আনন্দদান করবে নিজের উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে। ব্রিহা কোন-প্রকার অদরকারী কাজ টাকার জন্য করতেই চায় না। প্রয়োজন হলে ফ্রেদেরিক চটপট্

এক নাগাড়ে খেটে সে ধরনের অর্ডারী কাজও করতে পারে। নানান অসুবিধার মধ্য দিয়ে গেলেও এই কারণেই ফ্রেদেরিক বৈষয়িক জীবনে কিছুটা প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অর্জন করেছে। ফ্রেদেরিক কি পারিবারিক জীবনে কি বন্ধুত্বের বন্ধনে কি নিজের কাজেকর্মে কিছুটা ভাসা-ভাসা, আন্তরিকতার অভাব তার মধ্যে সর্বত্র। এসবের মধ্যেই বেশ একটা চিন্তা-ভাবনাহীন দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেপরোয়া জীবন ওর, যা অনেক ফরাসী শিল্পীর মধ্যেই পাওয়া যাবে। রিহা খুবই কঠিন জীবনযাপন করলেও অতটা বেপরোয়া নয়। মধ্যে আছে শিশুসুলভ কোমল হৃদয়, অনুভূতির আন্তরিকতা। যে-কারণে প্যারিসের জৌলুসের চাইতে, কৃত্রিমতার চাইতে আদিম প্রকৃতির মধ্যে নিরিবিলি সরল জীবনই ওর কাম্য। রিহা অর্ডারী কাজ করতেই চায় না, তা না হলে ফটো-গ্রাফাররূপে ওর যা কিছু প্রতিষ্ঠা হয়েছে ফ্রান্সে, তাতে ও রীতিমত সচ্ছল জীবন-যাপন করতে পারত। ফ্রান্সের বাইরে ফটো-গ্রাফাররূপে ওর কোন খ্যাতি না হলেও এই মেজাজী শিল্পীর অনেক কাজ আর্টের পর্যায়ে পড়ে। আপন মনে কোনপ্রকার অর্থ প্রত্যাশা না করে কষ্টের মধ্য দিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছে। নিজেকে "ভিলেজ ফটোগ্রাফার" বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ, তরুণ রিহা একদিন বিখ্যাত হবে নিজের কাজে। রিহার আন্তরিকতা, ও'র অনুভূতির গভীরতা ফ্রেদেরিকের তুলনায় আমাকে মুগ্ধ করেছিল আরও বেশী।

ফ্রেদেরিকের চরিত্রের আরও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে অনেক ফরাসী শিল্পীর "রিকম্যানশিপ" জীবনযাত্রার উদাহরণ দিচ্ছি। ফ্রান্সে যাবার আগে আমি ও ফ্রেদেরিক কিছুদিন পূর্ব জার্মানীতে কাটিয়েছিলাম। প্যারিস থেকে নিজের গাড়ি করে সে এসেছিল। দারুণ স্ফূর্তি মনে, হই-হই করছে, জার্মান মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে ওদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছে। দু হাতে টাকা খরচ করছে, কেনা-কাটা, উপহার দেওয়া চলছে সমান তালে। ভারতে নানান কষ্টের মধ্যে ওকে কাজ করতে হয়েছে। ফিরে গিয়েও, বই ইত্যাদি প্রকাশ করেও খুব সচ্ছল হতে পারেনি, সে-খবর পেয়েছিলাম। জার্মানীতে ওকে ওভাবে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এতদিনে ও তাহলে সচ্ছল হয়েছে। কিন্তু এসবই যে ওর বেপরোয়া খামখেয়ালী জীবনের অভিব্যক্তি, প্যারিসের পথেই আমি তা টের পেলাম। ধার-দেনা ফটোগ্রাফীর সরঞ্জাম বিক্রি করেই ও জার্মানীতে এসেছে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে মার্ক-এর বেআইনী লেন-দেনে অতিরিক্ত পূর্ব জার্মান মার্ক যা পেয়েছে, তা দু হাতে খরচ করেছে। ফেরার পথে পেট্রোল কেনারও পয়সা নেই। এমনকি, রাস্তায় হোটেলে রাত্রিবাসের খরচাও। প্রকাশকদের কাছে প্রচুর দেনা, অতিরিক্তভাবে অগ্রিম অর্থ নেবার জন্য। প্যারিসে এসে লাঞ্চ খাবারও পয়সা নেই। স্টীর বন্ধুর কাছে আমার সামনেই ধার করল আরও। আমি থাকতে থাকতেই নির্লিপ্ত মনে বেমালুম গাড়িও বেচে দিল। পায়ে-চলাদের দলে ভিড়ে গেল অনায়াসে। একটু বিরক্তি প্রকাশ করল না। কোনপ্রকার চিন্তা-ভাবনা কিছু লক্ষ করলাম না। যখন কাজকর্ম করে উপায় করার সবচাইতে বেশী প্রয়োজন, তখনই সে কুঁড়েমির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে দিনরাত কাফেতে বসে সময় কাটিয়ে দিল। ফটো-গ্রাফীর সরঞ্জাম সবই বিক্রি করে দিয়েছে। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, একেবারে নিধিরাম। যদিও অনেক অর্ডারী কাজ তখন ওর হাতে। আমার কাছে অনুযোগ করত— "উঃ, কত কাজ! আমি দারুণ ক্লান্ত, কিছু ভাল লাগছে না।" ব্যাস, ওই পর্যন্তই। "ফইয়েল দেজ্ আর্তিস্ত্ আঁতালেকচুয়াল"-এ লাঞ্চ ও ডিনার ধারে খাচ্ছে, আর কাফেতে বসে সময় কাটাচ্ছে। কাফেতে নানারকম বন্ধুবান্ধবী, সকলেরই সে প্রিয়। সারাদিন এবং রাত দুটো পর্যন্ত ওখানেই কাটায়। ওর স্ত্রী মিনেৎ সর্বদা আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করতো। "ফ্রেদেরিক আমার সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে আসে না, অথচ সারা-দিন সিলেকত-এর ওই বাউণ্ডুলে মেয়ে-গুলোর সঙ্গে সময় কাটায়।" ফরাসী মেয়ে বলতে বিদেশে অনেকে যা ভাবে, মিনেৎ কিন্তু ঠিক তার উল্টো। একেবারে সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী। সে চাইত, স্বামী তাদের ছোট সংসারে ফিরে আসুক, তার পরিচর্যা করে সে একটু আনন্দ পাবে। কিন্তু ফ্রেদেরিক ওসব পছন্দ করে না। আবার হঠাৎ একদিন
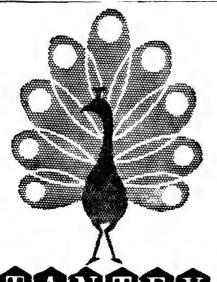
ফ্রেদেরিক কোথা থেকে এক দামী 'শন হফ' ক্যামেরা কিনে নিয়ে এল. কাজ শুরু করবে বলে। প্যারিসে এই সব ধরনের শিল্পী, লেখক, ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যে বেশ একটা আঁতাত আছে। "আজ তোমার পয়সা নেই? ঠিক আছে, আমার হাতে বেমক্কা কিছু পয়সা এসেছে, এক বন্ধু আমেরিকান একটা ছবি কিনেছে। তুমি নাও, যা তোমার দরকার।" এসব ক্ষেত্রে ধার নেওয়া, শোধ দেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আজকের গ্রহীতার হয়ত কিছুদিন বাদে হাতে পয়সা আসবে, তখন আবার দাতার পকেটে ছুঁচোর কেত্তন। তখন সে আবার ওকে সাহায্য করবে। এই ধরনের একটা সমঝাওতা বেরাদরী প্যারিসের শিল্পজগতে আছে বলেই আর্থিক ক্ষেত্রে শিল্পীদের নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব। পূর্বোক্ত ঘুষিমারা মোটরচালকের মত বম্বেতে ফ্রেদেরিকের অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্যের আর এক কাহিনী বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। বম্বে থেকে ফেরার পথে ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের জন্য তাকে ভারতীয় আয়কর অফিসের বিদেশী বিভাগে যাতায়াত করতে হয় কয়েকবার। ওর যাত্রার দিন আগত, অথচ সার্টিফিকেট পাচ্ছে না। এ নিয়ে অফিসারের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়, টেবিলের একগাদা ফাইল তুলে ওকে ছুঁড়ে মারে এবং অফিসার প্রতিবাদ করে ওকে বাধা দিতে গেলে দুই-এক চড়চাপড় লাগিয়ে দেয়। অফিসার তখন ওকে পুলিস হেফাজতে দিয়ে দেয়। বিচারাধীন আসামী জাহাজ ধরতে পারে না। আদালতে জজসাহেব ওকে সতর্ক করে দিয়ে খালাস করে দেন। এ নিয়ে আমাকেও ওর হয়ে কিছু ঝামেলা পোহাতে হয়। এই ঘটনার বিবরণ ওর ভারত-ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে ফরাসী-সুলভ রসিকতার সঙ্গে চমৎকার বর্ণনা করেছে।

অনেকে হয়ত ভাবছেন, প্যারিসের আর্টের জগতের কথা লিখতে গিয়ে, নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ব্যক্তিগত জীবনের বিশদ বিবরণ কেন আমি দিচ্ছি। প্রথমত, আমার প্যারিসের আর্ট-জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এরা বিশেষভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত এই প্রসঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এঁদের কথা আরও আসবে। এরা সকলেই এক-একটা ফরাসী টাইপ, যারা প্যারিসের শিল্প-জগৎকে এতটা কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলেছে। এই রকম আরও সব বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়েই প্যারিসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই সব শিল্পী, লেখক, ইনটেলেকচুয়ালরাই সে-জগতের এক-একটি প্রতিনিধি, বিচিত্র সব চরিত্র। বন্ধুরা অবশ্য আগেই অনুমতি দিয়েছে যে, প্যারিস প্রসঙ্গে ওদেরকে নিয়ে আমার যা মনে হয়েছে, যেরকম ইচ্ছা লিখতে পারি, বিরূপ হলেও ক্ষতি নেই। ফ্রেদেরিক ত বলেই দিয়েছে—"আমার বিষয় যদি কোন উল্লেখ করো, তোমার যা ধারণা, তাই লিখো, তবে সততার সঙ্গে। সে-ধারণা ভুল হলেও আমি ক্ষুব্ধ হব না।" এটাও ফ্রেদেরিকের দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্যের আর এক দিক। কে কি বলল না-বলল, সে নিয়ে ওরা থোড়াই পরোয়া করে। আমাদের মত স্পর্শকাতর নয় ওরা।

সিলেকত্ কাফেতে প্রথম প্রবেশের ধাক্কা মনে একটা জমজমাট ভাব এনেছিল। তখন শীতকাল। ফুটপাথ পর্যন্ত কাফের বিস্তৃত অঞ্চল কাঁচ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা। ভিতরটা তাপনিয়ন্ত্রিত। শীতের পর এই কাঁচ খুলে নেওয়া হয়, তখন কাফে একেবারে ফাঁকা ফুটপাথের উপর বলে মনে হয়। ভিতরের তাপ-সংরক্ষণের জন্য দুটো দরজা একটু তফাতে, একটা দরজা খুললে যাতে ঠাণ্ডা ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের মতই। ভিতরে ফুটপাথের অংশে ঠাসাঠাসি ছোট্ট ছোট্ট নীচু বেতের চেয়ার, ক্ষুদে ক্ষুদে টেবিল। কাফে-রসিকরা সাধারণত একই কাফেতে নিয়মিত যায়, প্রায় সকলের মধ্যেই আলাপ-পরিচয় থাকে। নতুন কেউ দু-চারবার যাওয়া-আসা করলেই মুখ চেনাচেনি হয়ে যায়। প্রথমে হাসি বিনিময়, পরে আলাপ-আলোচনা চলে। পরিচয় না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই, সব কিছুই ইনফরম্যাল। পাশের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেই হল। গায়ে গায়ে লাগালাগি করেই ত বসতে হয় ওখানে। সিলেকত-এ যারা নিয়মিত যায়, সকলের মধ্যেই জানাশোনা লক্ষ করলাম। ফ্রেদেরিক দেখাল নিকটেই বসে আছে বিখ্যাত শিল্পী জাদকিন। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী, চেলাবৃন্দ, বন্ধু, অনুরাগী তাকে ঘিরে বসেছে। ইস্রায়েলের প্রধান ও প্রবীণ

শিল্পী এক পক্ককেশ বৃদ্ধও বসেছিলেন ওখানে, ফ্রেদেরিক কি সব কথাবার্তাও বলে এল। আর একজনকে সেই প্রথম দিনই দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ওখানে থাকাকালীন এক মাস ধরে একইভাবে দৈনন্দিন তাকে কাফেতে দেখেছি। শুনলাম, সে-ও নাকি শিল্পী, কিন্তু কখনও ছবি আঁকার কোন কিছুরই আঁচ পাইনি ওর মধ্যে। ভারতীয়-দের মত চেহারা, এমনকি গায়ের রঙও। বাবরি চুল, রোগা শীর্ণ মুখে দাড়ি। গরীব ভারতীয় দরবেশ বলেই মনে হয়। জাতিতে ইহুদী। দিনরাত নোটবুকে কি লিখতেন, নিরিবিলি কোন একটা কোণা বেছে নিয়ে। কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতে দেখিনি। ফুটপাথ এলাকার চেয়ারেই বসে থাকতে ভালবাসে, ভিড়ের সময় স্থান না পেলে ভেতরে বারের গদি-আঁটা সোফায় কখনও বসত। তা না হলে একেবারে কাউণ্টারে। কোনদিনও কথা বলিনি, তবুও এই লোকটি আমার খুব বেশী কৌতূহল জাগিয়েছিল। খুব নির্বিকার প্রকৃতির লোক। আর একটি মেয়েকেও দেখেছিলাম প্রথম দিনই, অদ্ভুত পোশাক পরে। সে-ও সিলেকতকেই ঘরবাড়ি করে তুলেছিল। সুইডিশ মেয়ে। বহু ভাষা জানে, ইংরিজীও। ফ্রেদেরিক আলাপও করিয়ে দিয়েছিল। কাফেতে লাঞ্চ আর ডিনার পাওয়া যায় না। পাশের 'ফইয়ের'-এ ওই সময়টাতে গিয়ে খাবার খেয়ে সিলেকত্-এস এসে সময় কাটাত। ওখানে বসেই নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্ম চিঠিপত্র লেখা পড়াশোনা গল্প-গুজব প্রেম সব কিছুই করত। এ এক জীবন বটে। দু পায়ে বেগুনী রঙের মোজা। হাঁটু পর্যন্ত কালো ফ্রকের সঙ্গে একটা শীতকালের কোট, মাথায় চওড়া কালো ফিতে বাঁধা। সঙ্গে থাকত পাতা দিয়ে তৈরী বড় একটা ঝুড়ি, যাতে ফরাসী মেয়েরা লম্বা গোল লাঠির মত রুটি বাজারের সওদা ইত্যাদি বহন করা থেকে আরও অনেক কিছুই করে। চেহারায় ও পোশাকে মেয়েসুলভ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কিছু নেই, অগোছালো আলুথালু মেয়েটির সব কিছু। বিদেশী, যারা কিছুকাল প্যারিসে থেকেছে, তারা সবাই একটা প্যারিসী রঙচঙ গায়ে মেখে নেয়, অল্প-দিনের মধ্যেই। কিন্তু আমি যে সমাজের কথা বলছি, এরা সবাই কিছুটা বাউণ্ডুলে জগতের; তা না হলে, আমাদের মতই ঘর-সংসারী গৃহস্থ, যাদের জীবনযাত্রা সাবেকী চালে চলে, এমন লোকও ফ্রান্সে আছে। সিলেকত্-এর মত কাফের জগতের লোকেরা এক আলাদা সমাজ, ফ্রান্সের এক অংশ শুধু। এ-জগৎ দিয়ে ফ্রান্সকে যাচাই করলে চলবে না। ফ্রেদেরিক "আমার ইন্দিয়েন বন্ধু" বলে নানারকমের পুরুষ-মহিলাদের সঙ্গে প্রথম দিনই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। একটা জিনিস হাড়ে হাড়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম সেদিনই। ফরাসী দেশে ওদের ভাষা শিখে না গেলে ও দেশে যাওয়া না যাওয়ারই সামিল। অর্ধেক আনন্দই নষ্ট হয়ে যায় ওদের ভাষা না জানার জন্য। ফরাসীরা ইংরাজীকে ভাষা বলেই জ্ঞান করে না, এমনই গর্ব ওদের নিজের ভাষা সম্বন্ধে। ইংরেজী ভাষায় কথা বলাই ওদের অপছন্দ, এমনকি ভাষা জানলেও। ওদের ভাষার গরবের নির্বুদ্ধিতার চরম নিদর্শন পেলাম প্যারিসের রাস্তাতেই। লণ্ডন, নিউ ইয়র্কের ইংরেজী দৈনিক পত্রিকাগুলির বিক্রয়

প্যারিসে প্রচুর। ফরাসী বড় বড় কাগজগুলির ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করে এই সব ইংরাজী দৈনিকের বাজার দখল করার কোন প্রচেষ্টা নেই। জাপানী দৈনিক কাগজগুলি কিন্তু ইংরাজী সংস্করণ বিদেশীদের জন্য প্রকাশ করে। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাতে বলেছিল—"আমাদের কি দরকার ইংরাজীতে কাগজ বার করার?" চাহিদা যখন আছে ব্যবসায় ক্ষেত্রে, ওরাই লাভবান হত ইংরাজী দৈনিক প্রকাশ করলে। কিন্তু তা কেন করবে? ওতে ফরাসী ভাষার গৌরব যে নষ্ট হবে, এমনই ওদের মনোভাব। বাকবাগীশ ফরাসীদের সঙ্গে সমান তালে যদি কথাই না বলতে পারলাম, তবে আর মজা কোথায়। কাফেতে সর্বদাই এটা উপলব্ধি করতাম। প্রথম দিন চুপচাপ বসে বসে এই পাগলখানার হালচাল লক্ষ করতে করতে নিজেকে মজিয়ে দিলাম। বলা বাহুল্য, খুবই উপভোগ করছিলাম এই পরিবেশ। মেয়েদের দেখলাম, নিজেদের সুন্দর মুখের চেয়ে সুগঠিত পদযুগলকে জাহির করতেই অধিক সচেষ্ট। ফরাসী মেয়েদের পায়ের গঠন ও আকৃতি খুবই সুন্দর এবং এ বিষয়ে মেয়েরাও খুব সচেতন। জার্মান বা রুশী মেয়েদের মত গোব্দাগোব্দা পা নয়। ওদেরকে "What a sweet face" বলে প্রশংসা না করে "What shapely legs you have" বললে বোধ হয় আরও খুশী হয়। এককালে সুন্দর মুখের নরম গালে হাত বুলিয়ে, এমনকি চিমটি কেটে হয়ত অধিকারিণীকে অভিনন্দন জানানো চলত, এখন সেখানে ফরাসী কাফেতে পায়ে হাত বুলিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বললে ওরা খুশিতে গলে যায়। এই কাফে সমাজের পুরুষদের দেখে কেমন যেন মনে হল, ওই একটিমাত্রই পোশাকের তারা অধিকারী, যা তারা পরে আছে। সবই কেমন যেন নোংরা-নোংরা। এই কাফে-সমাজের পুরুষদের নিকট ছিমছাম, ফিটফাট, পরিচ্ছন্ন হওয়া ভদ্রলোকের লক্ষণ যা তারা চায় না। ওদের কাছে ওসব পয়সাওয়ালাদের অধঃপতনের চিহ্ন। জীবনধারণ ও জীবিকার্জনের জন্য কোন কাজ করা, চাকরি করা এসবে ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদাহানি হয়, নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া হয় গোলামীতে। নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার মত শিল্পী হয়েও আমরা উপার্জনের ধান্দা করব এ কেমন কথা। আমরা শিল্পী, তোমরা আমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াও। আমরা ইচ্ছামত সৃষ্টির কাজে মেতে থাকি, ওই সব তুচ্ছ জীবনধারণ ও জীবিকার্জনের কথা চিন্তা না করে: এটাই যেন ওরা বলতে চায়।

ফ্রেদেরিক বেচারী আমাকে নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়েছে, তাও বুঝতে পারছিলাম। কাঁহাতক আর বারবার "আমার ইন্দিয়েন বন্ধু" বলে আলাপ করানো যায় আর প্রাথমিক কথাবার্তায় দো-ভাষীর কাজ করা যায়। ধৈর্য হারাবারই কথা। আমি ওকে বললাম, "আমার জন্য তুমি ভেবো না, আলাপ-পরিচয় করানোরও কোন প্রয়োজন নেই। আমি সব হালচাল দেখি, তুমি তোমার আড্ডা চালাও।" নিজের মনে ভাবছিলাম অনেক কিছু, কাফের সব কিছুই লক্ষ করছিলাম। ভাবছিলাম বম্বে শহরের কয়েকটি বিশেষ কাফের দোকানে আজকালকার এক ধরনের বড়লোকের ছেলেমেয়েদের প্যারিস পরিবেশ আনার প্রচেষ্টা। প্যারিসের কাফে-সমাজের এই মেজাজ, ভারতীয়রা যে কোনদিনও আনতে পারবে না, সেটা ওরা বোঝে না। তাই হাস্যকর লাগে ওদের সেই অর্বাচীনতা দেখে।

ফরাসী মেয়েদের দেখে, বিশেষ করে ওই কাফে-সমাজের, মনে খুবই অনুকম্পা জাগত। ফরাসী পুরুষদের মত আনুসিভালরাস্ জাত আমি দেখিনি। মেয়েদের ওরা যেন মানুষ বলেই গণ্য করে না নেহাত উপভোগের সামগ্রী ছাড়া। ফরাসী মেয়েরাও এত মগজহীন আর ফ্যাশন-ব্যবসায়ীরা এমনভাবেই ওদের খেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যে, অত ফ্যাশন করেও পুরুষদের মন পাচ্ছে না। পুরুষদের হাতে নিজেদের শুধু ক্রীড়নকই বানিয়েছে। না পাচ্ছে তারা পুরুষদের শ্রদ্ধা, না পাচ্ছে সত্যিকার ভালবাসা।

guard against
athlete's foot
FORBINA dusted on the feet regularly offers effective protection against Athlete's foot and similar skin infections.
CIBA
Forbina
ANTISEPTIC POWDER

গত সপ্তাহে তরুণ শিল্পী গোষ্ঠকুমার তাঁর উনিশটি চিত্রকলা এবং বারোটি ভাস্কর্যের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। গোষ্ঠকুমার গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট-এর প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে ইনি ভারত সরকার পরিচালিত ডিজাইন সেণ্টারের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। এ প্রদর্শনী শ্রী কুমারের সর্বপ্রথম একক প্রদর্শনী।
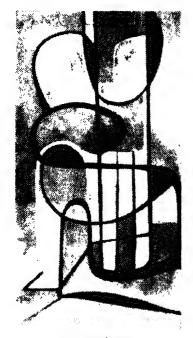
রচনা—গোষ্ঠ কুমার

রচনা—গোষ্ঠ কুমার

শ্রী কুমার 'আধুনিক' ধরনের কাজ করেন। এঁর শিল্পকর্মগুলির জাত যে কি তা সঠিক বলা যায় না। চিত্রকলাগুলি দেখে কতকটা কিউবিস্টিক মনে হয় বটে কিন্তু আমার মনে হয় কিউবিস্ট শিল্পীদের আদর্শ শ্রী কুমারের নয়। রেখা, ফর্ম, বর্ণ এ সবের রচনাই (compostion) এঁর চিত্রের মূল দ্রষ্টব্য বিষয়, অন্তর্নিহিত উপাখ্যান নজরে না পড়লেও খুব ক্ষতি হয় না। মন দিয়ে লক্ষ করলে কিছু না কিছু পরিচিত বিষয়বস্তু গোচরে আসে। রেখায় সুমধুর ছন্দ অনুভূত হয়। বর্ণ অত্যন্ত উগ্র তবে অপ্রীতিকর নয়। রেখার বেষ্টনীর মধ্যে কিছু আকৃতির সৃষ্টি হয়েছে যা রচনাটিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে রেখেছে। শিল্পী ছবি আঁকিয়ে হিসেবে যতটা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এঁর ভাস্কর্যগুলি থেকে সুতরাং মূলত এঁকে ভাস্কর হিসাবেই ধরা সমীচীন। একটি পাথরের কাজ এবং একটি পিতলের চাদর কেটে মুচড়ে দুমড়ে আকৃতির সৃষ্টি ছাড়া বাদ বাকি সবই পোড়া মাটির ভাস্কর্য। তবে টেরাকোটা বলতে যা বোঝায় শ্রী কুমারের শিল্পকর্মগুলি ঠিক সে রকম নয়। ইনি ভাস্কর্যগুলির ওপর রঙ দিয়েছেন। রঙ দেওয়া হয়েছে ১০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে ফেলে গলিত কাচ মিশ্রিত করে, যার ফলে নিদর্শনগুলি বেশ ঝকঝকে হয়ে বসেছে। সুতরাং এগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এই পরীক্ষণ নিরীক্ষণে শিল্পী বাস্তবিকই কৃতকার্য হয়েছেন। ভবিষ্যতে মনে হয় অনেকেই এঁর পথ অনুসরণ করবেন। কতকগুলি ভাস্কর্য একেবারেই অ্যাব্স্ট্রাক্ট কম্পোজিশন আবার কতকগুলির মধ্যে কিছুটা আদিম শিল্পের স্পর্শ লেগেছে—রদাঁর কাজের মত এর ভাস্কর্যেও মাঝে মাঝে অ্যাসিরিয়ার প্রভাব পড়েছে। রদাঁর সঙ্গে অবশ্যই আমি শ্রী কুমারের তুলনা করতে যাচ্ছি না। সেটা হবে বাতুলতা। তবে অনুপ্রেরণার উৎস এঁরও মাঝে মাঝে অ্যাসিরিয়ার আর্ট সেইটেই বলতে চাই। আফ্রিকার আদিম শিল্পেরও প্রভাব আছে মনে হয় অনেক কাজে। প্রভাব পড়াটা আমি দোষের মনে করি না; রদাঁর নাম এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য—এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ছিলেন রদাঁ, তাঁরও কাজে প্রভাব পড়েছিল। হেনরী মুর, পিকাশো প্রভৃতি আধুনিক পাথকৃৎ প্রায় সকলের কাজেই লক্ষ্য করা যায় বিশেষ প্রভাব। শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবমুক্ত হয়ে কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে পরের কাজ নকল করে নিজের বলে চালানোটাই হল দোষের। শ্রীকুমারের কাজে নকল বা কোনও পুরনো কাজের পুনরাবৃত্তি কিছু নজরে পড়েনি। সুতরাং তিনি প্রশংসার পাত্র। ভাস্কর্যগুলির মধ্যে সাদা পাথর কুঁদে যে কাজটি করেছেন আমার মনে হয় সেইটেই শ্রেষ্ঠ কাজ। লক্ষ্য করলাম শ্রী কুমারে বেশ কিছু শিল্পকর্ম বিক্রি হয়েছে। বাস্তবিকই এটা সু-খবর। আমরা শিল্পীকে অভিনন্দন জানাই।
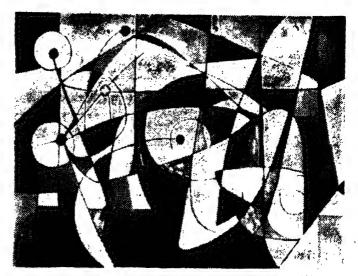
পরিশেষে উল্লেখ না করে পারছি না যে, যে ঘর দুটি শ্রী কুমারকে দেওয়া হয়েছে প্রদর্শনীর জন্য সেগুলি একক প্রদর্শনীর জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত তবে আর্টিস্ট্রী হাউস-এর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি যেন তাঁরা আলোর ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করেন। বর্তমানে যেভাবে আলো দেওয়া হয়েছে তা কোনও প্রদর্শনীর জন্য উপযুক্ত আদৌ নয়।

—চিত্ৰগ্ৰীব

আপনি কি বহুরকমের ক্রীম ও লোশন ব্যবহার করে নিজিকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন ? সর্বথা উপযোগী নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করে আপনার ত্বকের উন্নতি সাধন করুন।
ত্বকের জন্যে চাই—নিভিয়া
NIVEA
Creme

(৯)

অপেরা পার্টির যাত্রা নিয়ে আসার সুযোগ হয় কচিৎকদাচিৎ। গ্রামের সচ্ছল অবস্থার লোকগুলো বেশীর ভাগই দূরে দূরে শহরে চলে গেছে, কিংবা প্রবাসে গিয়েই হয়তো অবস্থা ফিরিয়েছে। তারা কেউই প্রতি বছর পুজোয় বাড়ি আসে না। আসে দু'পাঁচ বছর পর পর। মজুমদাররাও তাই। আর ইদানীং অবনীমোহন আসেন পাঁচ-সাত বছর বাদে বাদে। ব্যবসা তাঁর ফেঁপে উঠেছে, বাড়ি করেছেন কোলকাতায়, আর বেশীর ভাগ সময়েই থাকেন রেঙ্গুনে। তাই আগেকার মত আর জমির ধানটার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে আসেন না, যেবার আসেন দু'পাঁচ বস্তা ধান চাঁদা দিয়ে দেন বারোয়ারী তলায়।

তাই যে বছর প্রবাস থেকে ফিরে আসে অনেকে, কিংবা আউশ ধানটা ভাল হয়, সেই বারেই দরাজ হাতে দু'চার বস্তা করে ধান দেয় সকলেই আর সেই ধান বেচা টাকায় কোলকাতা থেকে অপেরা পার্টির যাত্রা আনা হয়।

কিন্তু চাঁদা না উঠলেও যাত্রা হয় প্রতিবারই। গাঁয়ের লোকরাই করে, কাটোয়া নয় তো আমোদপুর থেকে ড্রেস ভাড়া নিয়ে এসে। পুজোর অনেক আগে থেকেই তাই পালা ঠিক হয়ে যায়, রিহার্সাল শুরু হয়ে যায় মজুমদারদের বাংলো বাড়িতে।

গানের গলা নেই আর, সে-শরীরও নেই, তবু বংশীর উৎসাহ কমে নি। সেও এসে এক পাশে পা গুটিয়ে বসে তামাক টানতে টানতে রিহার্সাল দেখে, হঠাৎ এক এক সময়ে বলে ওঠে, হলো না, হলো না, সুদামা হলেন গিয়ে তোমার কৃষ্ণের সখা, কোলকেত্তার বাবু নন গো তিনি।

কেউ উপদেশ নেয় তার, কেউ নেয় না।

কিন্তু দামু পালের কথায় তারা ওঠে বসে। বংশীর ছেলে উদাস। হংস চাটুজ্যে। ধীরেন সাঁই অবশ্য আসে অনেক পরে, পুজোর মাত্র দিন কয়েক বাকী থাকতে। রানীগঞ্জে স্বজাতি এক বাবুর বাড়িতে থেকে খায়, রান্নাবান্না করে সে। তার পার্ট লিখে ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রান্না করতে করতে উনোনের ধারে বসে বসে পার্ট মুখস্থ করে সে। অথচ পুজোর সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেই যখন আসরে নামে, মনে হয় যেন কতদিন ধরে রিহার্সাল দিয়েছে।

তবে উৎসাহ সবচেয়ে বেশী দেখা যায় উদাসের। দামু বাড়ি এসেছে খবর পেলেই ছুটে আসে, কি পালা হবে, কোন পার্ট পাবে সে, ধীরেন সাঁইকে তার পার্ট লিখে পাঠানো হয়েছে কিনা; সব খবর নেয়। সাইকেল নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে সবাইকে এনে জড়ো করে মজুমদারদের বাংলো বাড়িতে।

অথচ সেই উদাসের এবার আর কোন আগ্রহ নেই যেন।

দামু পাল তাই ফিরুকে কাঁধে নিয়ে একেবারে সটান চলে এলো বংশীর বাড়িতে, কোটাল পাড়ায়।

উদাসকে ডাকতে যাচ্ছিল দামু, তার আগেই চোখ পড়লো উদাসের বউ এক টুকরো ময়লা 'কানি' পরে ঝাঁটা হাতে চালার গায়ের ঝুল ঝাড়ছে।

ডাকতে গিয়েও থেমে গেল দামু। কে জানে, কেমন মেজাজে আছে উদাসের বউ। রোগা প্যাঁকাটির মত চেহারা, চোখের কোল দুটো বসে গিয়ে চোখ দুটোকে বীভৎস করে তুলেছে আরো। কিন্তু তার চেয়েও ভয় ওর ঝগড়াটে ব্যবহার আর চিৎকারকে। বউটার দিকে তাকালেই মায়া হয় উদাসের ওপর। এই বউ নিয়ে কি করে ঘর করে!

ঘর অবশ্য করে না উদাস, সমস্তক্ষণ বাইরে বাইরেই কাটায়। সকালে চলে যায় সাইকেল নিয়ে, কাটোয়ায় ড্রাইভারী শিখতে, সন্ধ্যের আগে ফিরে আসে।

তবু খবরটা তো দেয়া দরকার উদাসকে।

তাই শেষ পর্যন্ত ডাক ছাড়লে দামু।—উদাস আছে বাড়িতে? উদাস!

উদাসের বউ লক্ষ্মীমণি ফিরে তাকালো ঝাঁটা হাতে। তারপর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। —উদাস, উদাস ঘরে থাকে নিকিন এক দন্ড?

দামু শান্ত করার চেষ্টা করে বললে, আহা, রাগছো কেন, তাই জিগ্যেস করছি কখন আসবে?

লক্ষ্মীমণি কাছে এগিয়ে এলো এবার। হাত পা নেড়ে বলে উঠলো, সে কোথায় কোন ভাগাড়ে পড়ে আছে তার খপর আমায় রাখতে হবে?

চিৎকার শুনে ঘরের ভেতর থেকে বংশী বেরিয়ে এলো। কপালে তিলক, গলায় তুলসী কাঠের মালা, হাতে হুঁকো নিয়ে বাইরে বেরিয়েই দামুকে দেখে বললে, ও তাই বলি পাগলী চেঁচায় কেন এত।

লক্ষ্মীমণির রাগ যায় নি তখনো। শ্বশুরকে দেখে ঘোমটাও টানলো না। দামুকে বললে, ঐ যে গুণধর বেটার বোষ্টম বাপকেই শুধোও ক্যানে।

লক্ষ্মীমণির ব্যবহার আর ঝাঁঝালো গলার স্বর শুনে শুনে অভ্যস্থ হয়ে গেছে বংশী, তবু দামুর সামনে অস্বস্তি বোধ করলে সে। ধমক দিয়ে উঠলো। থাম তুই।

ক্যানে থামবো ক্যানে? গুণের বেটা তেনার ডাইভারী শিখছে। ডাইভারীর মুখে ছাই, কচি খুকী আমি? কিছু বুঝি না?

বংশীও বিস্মিত হয় তার কথায়। বলে, কি বলছিস কি তুই? থামবি না?

ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা নিয়ে বিশ্রী অংগভংগী করে খেঁকিয়ে ওঠে লক্ষ্মীমণি। বলে, আমিও কাটোয়ার মিস্ত্রীর বিটি গো, কত ধানে কত চাল সব জানি। বলি, বেটা তোমার দুপুরের দিন ডাইভারী করে, না ঐ পদ্মারে খুজে বেড়ায়। মুখের ওপর নুড়ো পায়ে দিয়ে চলে গেল, তবু লাজলজ্জা নেই মানুষটার।

আরে, কি বলে বসলে টিকটিকিনা নেই, ভয়ে ভয়ে দামুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো বংশী। বললে, তুমি বরং গিরিদাদা-দের বাড়িটা দেখে যাও দামু, নিতাইক বাহন নিয়ে বাবু গেলেন বোধ হয় ঐ দিকে।

তারপর থেমে বললে, না পাও তো বৈকালে ফিরে এলে বলবো, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

সন্ধ্যে হবার আগেই অবশ্য ফিরে আসে উদাস। তারপর সাইকেলটা তুলে রেখে ঘটির জলে মুখ হাত ধুতে গিয়ে দেখে জল নেই ঘটিতে। খিরকির ডোবায় গিয়ে হাত-পা ধুয়ে আসে।

পনেরো মাইল পথ নিত্যদিন সাইকেল চালিয়ে যাওয়া আর আসা। সারা শরীরে ঘাম ঝরে, ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যায়।

তবু ভয় হয় লক্ষ্মীমণিকে ডাকতে। এখনই হয়তো ঝগড়া বাধিয়ে বসবে, নয়তো চিৎকার জুড়ে দেবে। চুপচাপ তাই কিছু-ক্ষণ বসে থাকে উদাস। লক্ষ্মীমণি নিজেই মুড়ি-মুড়কি কিছু দিতে আসবে ভেবে। কোন কোনদিন সত্যিই ভিজে ভাত আর পোস্ত নয়তো মুড়ি চিঁড়ে কিছু এনে দেয় লক্ষ্মীমণি, যেদিন মন ভালো থাকে।

কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থেকেও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিলো উদাস।

ডাকলে, বউ! অ বউ!

কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েছিল লক্ষ্মীমণি, ডাক শুনে নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুলো।
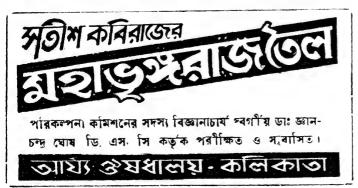
উদাস আবার ডাকলে,

অসীম বিরক্তিতে মুখের ওপর থেকে কাঁথাটা সরালো লক্ষ্মীমণি। মুখ বিকৃত করে বললে, গায়েগতরে দরদ নিয়ে শুয়ে আছি, জ্বরে পুড়ে মরছি, এট্টুকুন মায়াদয়া নাই গো মানুষটার।

উদাস তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললে, জ্বর হয়েছে তোর? বলে লক্ষ্মীমণির কপালে হাত দিতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিলে লক্ষ্মীমণি।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে উদাস বললে, হ্যাঁ রে বউ, বড্ড ক্ষিদে লেগেছে, কি আছে বল, আমি নিয়ে নিচ্ছি।

এবারও ঝাঁঝিয়ে উঠলো সে।—কি আমার দু'মহল ভাঁড়ার আছে। দেখে খুঁজেপেতে নেবে যাও না। আমায় জ্বলানো ক্যানে।

আর কোন কথা বললে না উদাস। রাগে অভিমানে এসে শুয়ে পড়লো দাওয়ার ওপর। শুধু একটা অসহ্য ব্যথা পাক দিয়ে দিয়ে বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলো। আর শুয়ে থাকতে থাকতে ক্ষণিকের জন্যে পদ্মর মুখখানা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। সেই হাসি মুখখানা, সেই ঠাণ্ডা নরম চোখ দুটি!

কোন্ কুক্ষণে যে দশরথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার, মোটর ড্রাইভার হওয়ার সাধ জেগেছিল!

সে-সব দিনের কথা ভাবলে নিজের ওপরই রাগ হয়। নিজের ওপরই প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় তার।

কোটালের ঘরের ছেলে, কোথায় শশাংক হাজরাদের বাড়িতে বাগাল হয়ে দুবেলা পেটের ভাত রোজগার করবে, তারপর লাঙল ধরতে শিখলে পাঁচ-দশ বিঘে জমি ভাগে চষবে, তা নয় ড্রাইভার হবার শখ হয়েছিল।

সেদিনটার কথা চিরকাল মনে থাকবে তার।

এক বাণ্ডিল কাগজপত্র দিয়ে হাজরাদের মেজোবাবু বলেছিল, কাটোয়ায় উকিল-বাবুর বাড়িতে পেণছে দিয়ে আসতে।

যাতায়াতের পয়সা নিয়ে সরানের ধারে অপেক্ষা করছিল উদাস।

একটু পরেই দেখলে ধুলো উড়িয়ে মোটর-বাস আসছে। যাত্রী দেখে মোটর বাসটা এসে দাঁড়ালো, কিন্তু বাসে তখন তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

পিছন দিকে ওঠবার চেষ্টা করে পারলো না উদাস। অথচ কাটোয়ায় না পেণছলে চলবে না। বাবুরা রেগে যাবে, গালাগালি দেবে, হয়তো......

পাংশু মুখে কি করবে ভাবছে উদাস, সেই সময়েই ড্রাভারের পাশে-বসা লোকটা ডাকলো তাকে। পাশে বসার জায়গা করে দিলো।

লোকটার সর্বাঙ্গে কালিঝুলি, প্যাণ্টের গায়ে, গেঞ্জীতে। সারা মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তবু লোকটাকে খুব বন্ধু মানুষ মনে হলো। একটা বিড়ি নিজে ধরিয়ে আরেকটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলে সে।

লোকটা খুটিয়ে খুঁটিয়ে ওর পরিচয় নিলে, কোন গাঁয়ে বাড়ি, কি নাম, কি জাত। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে বললে, তবে তো হামারা জাতভাই রে বেটা।

তারপর নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বলেছে, এই দশরথ মিস্ত্রীকে সবাই চেনে কাটোয়ায়, কিন্তু কোটাল বলুক দিকিনি কেউ। বলেই ড্রাইভারের পিঠ চাপড়ে দিয়েছে।—চালাও ড্রাইভার সাহেব, টায়ার ফাটে তো দশরথ মিস্ত্রী হাজির হায়।

লোকটার মেজাজ, কথাবার্তা, অন্ত-রংগতা সব কিছুই যেন আকর্ষণ করেছে উদাসকে। মনে হয়েছে, লোকটা গ্রামের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে।

কাটোয়া যাওয়া-আসা করতে করতে আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে দশরথের সঙ্গে। তারপর একদিন তার বাসাতে উদাসকে নিয়ে গেছে সে।

সেইদিনই প্রথম লক্ষ্মীমণিকে দেখেছে উদাস। রোগা প্যাঁকাটির মত চেহারা, চোখের ওপর কর্কশ ঘন ভুরু। দেখেই মনে হয়েছে ভীষণ বদমেজাজী আর খিটখিটে।

দশরথের সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে মেয়েটা কাচের গ্লাসে করে চা এনে দিয়েছে।

উদাস বলেছে, চা তো আমি খাই না।

—চা খায় না! মেয়েটা হেসে উঠেছে। যেন চা না খাওয়াটা চরম অসভ্যতা।

তারপর একদিন উদাসের খাটো করে চুল ছাঁটা মাথাটা দেখিয়ে ঠাট্টা করে। বলেছে, কাকের বাসা।

মেয়েটাকে মোটেই ভালো লাগে নি উদাসের। তবু, হাটে চিরুনী কিনে এনে টেরী কাটতে শিখেছে ও, হাজরাদের বাড়িতে চা খেতে চেয়েছে কোন কোনদিন। আসলে ধীরে ধীরে ও দশরথের মেয়েকে খুশী করতে চেয়েছে, দশরথকে। কারণ, উদাসের মনে তখন একটা নতুন স্বপ্ন জেগেছে।

দশরথও বলেছে, ড্রাইভারীর কাজে ইজ্জত আছে।

সত্যিই তো, মটোর-বাসের ড্রাইভারকে ঐ হাজরাদের মেজবাবুও কত খাতির করে কথা বলে। অথচ, বাগাল বলে উদাসকে কি গালাগালিই না দেয় উঠতে বসতে।

দশরথ বলেছে, রোজ দুপুরে আসতে পারো তো ড্রাইভারী শিখিয়ে দেবো। **ড্রাইভাররা সব আমার হাতের লোক।**
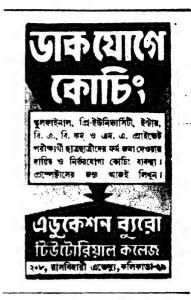
কিন্তু নিত্যদিন কাটোয়ায় আসবে কি করে সে। তাই দাম্ পালের কাছে সাইকেল চড়া শিখেছে, তারপর বাপের কাছে আব্দার ধরেছে, একটা সাইকেল কিনে দাও।

মা-মরা একমাত্র ছেলে, শেষ অবধি দশ-কাঠা বাকুড়ি জমি বেচে সাইকেল কিনে দিয়েছে বংশী। ভাবে নি, এমন একটা কথা শুনতে হবে।

সাইকেল পেয়েই কাটোয়ায় যাতায়াত শুরু করেছে উদাস, বাপকে বলেছে, ও সব মুনিষ-বাগালের কাজ করতে পারবো না আমি। ও তোমার ছোটলোকের কাজ। আমি ড্রাইভারী শিখছি।

—ড্রাইভারী? আকাশ থেকে পড়েছে বংশী। মনে মনে ভয় পেয়েছে। ও-সব কাজে কখনো স্বভাবচরিত্র ভালো থাকে? কত ঠগ বদমাশের সঙ্গে মেলামেশা, বেপাড়ায় যাতায়াত!

ভেতরে ভেতরে খোঁজ নিয়েছে উদাসের জন্যে একটা সুন্দর মত মেয়েকে ঘরের বউ করে আনার। তা হলেই হয়তো ঘরে মন বসবে ছেলের জমি বেচে কন্যাপণের টাকা রেখেছে হাতে।

তারপর ভিতরে ভিতরে মেয়েও দেখেছে। এমন রূপ বুঝি কোটালবাড়িতে দেখা যায় না।

শেষে একদিন উদাসকে বলেছে, মেয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

—মেয়ে, কার নেগে?

বংশী হেসে বলেছে, কার আবার, বুড়ো বয়সে আমি বিয়ে করবো?

উদাস বলেছে, উঁহু।

—উঁ হু কি, মেয়ে সে খুব সোন্দর। মাত্তর পাঁচ কুড়ি টাকা নেবে।

উদাস হেসে উড়িয়ে দিয়েছে বাপের কথা। বলেছে, টাকা নাগবে না আমার জন্যে; সে তুমি ভেবো না। দশরথ মিস্ত্রী বলেছে, ওর মেয়েকে বিয়ে করলে ড্রাইভারী শিখিয়ে দেবে, লাইসেন করিয়ে দেবে।

শুনে রেগে গিয়েছে বংশী। ভেবেছে, নিজের চোখে মেয়ে দেখলে আর অমত করবে না উদাস। মিস্ত্রীর মেয়ে কি আর এত সোন্দর হবে!

ভুলিয়ে ভালিয়ে একদিন পাশের গাঁয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাকে নিয়ে গেছে বংশী। খবর দিয়েছে, মেয়েকে কোন এক অছিলায় নিয়ে এসে দেখাতে।

পাঁচু কোটাল মেয়েকে নিয়ে এসেছে সেখানে, কিন্তু তার আগেই কি করে যেন টের পেয়েছে উদাস, রেগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছে সেখান থেকে।

আর দিন কয়েক পরেই লক্ষ্মীমণিকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছে। বাপকে বলেছে, বউ, বউ করে ক্ষেপে গিয়েছিল, এই নাও বউ।

তখনো ড্রাইভার হওয়ার নেশা লেগে আছে উদাসের চোখে। ড্রাইভার হবে, লাইসেন্স পাবে, তারপর বর্ধমান থেকে কাটোয়া অবধি মটর-বাস চালিয়ে নিয়ে যাবে ভোঁ ভোঁ করে, আর বনপলাশির বাবুরা, ঐ হাজরা বাড়ির লোক সরানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে, উদাসের খোশামোদ করবে তার পাশে একটু বসবার জায়গা পাওয়ার জন্যে।

লোকে বলবে, হ্যাঁ, কোটালদের একটা ছেলে মানুষ হয়েছে।

মান-ইজ্জত আছে। রোজগার আছে ড্রাইভারীর। তার কাছে কিনা বারো বছরের নোলক-পরা একটা খুকীকে বিয়ে করবে উদাস!

কিন্তু লক্ষ্মীমণিকে ঘরে আনার পরই স্বপ্ন ভেঙে গেছে তার। প্রথম দিনেই নাক বেঁকিয়েছে সে, মাগো, কাদা আর কাদা, এ-ঘরে মানুষে থাকে!

কখনো বলেছে, কাটোয়ায় চলো, ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবে।

চটাতে সাহস পায় নি উদাস। বলেছে, দুটো দিন সবুর কর বউ, লাইসেনটা পেলেই চলে যাবো।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠেছে লক্ষ্মীমণি। ধীরে ধীরে তার খিটখিটে স্বভাবটা অসহ্য ঠেকেছে উদাসের। বলেছে তোর জন্যে তিনবেলা চায়ের জোগান দিতে নারবো আমি। আজ স্নো চাই, কাল তেল চাই......

চড়া গলায় লক্ষ্মীমণিও জবাব দিয়েছে, মটরমিস্ত্রীর মেয়ে বটি গো আমি, মুনিষ-বাগালের মেয়ে নই।

দিনরাত ছেলে আর ছেলের বউয়ের ঝগড়া শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বংশী। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। কোন কোনদিন বা নিজে গিয়ে হাতাহাতি থামিয়েছে দুজনের।

ক্রমে ক্রমে তাই লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে দূরে সরে গেল উদাস। সকাল হলেই কিছু মুখে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর সন্ধ্যের একটু আগে ফিরে আসে। পনেরো মাইল পথ, ঘামে ভিজে সারা শরীর জবজবে হয়ে যায়। খিদেয় পেট জ্বলে যায়। তবু যেন অনেক শান্তিতে থাকতে পায় উদাস।

লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে দূরে থাকলেই যেন শান্তি। আর যখন যাত্রার মরশুম পড়ে তখন আরো খুশী হয় ও। দুপ্রহর রাত অবধি মজুমদারদের বাংলোবাড়িতে রিহার্সাল দিয়ে এসে নিজেই হাঁড়ি থেকে ভাত নিয়ে খেতে বসে। লক্ষ্মীমণিকে ঘুম থেকে তোলে না।

এমনি ভাবেই কাটছিল দিনগুলো। এমন সময় হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

পাশের গাঁ থেকে পাঁচু কোটাল উঠে এসে ঘর বাঁধলো এগাঁয়ে। বললে, ভাগের জমি সব কেড়ে নিয়েছে বাবুরা, তাই এলাম এখানে, চাটুজ্যেদের জমি চষবো ভাগে। পুকুরের পাড়ও নিয়েছেন ওনারা ঘর তোলার নেগে।

তারপর আবার একদিন এলো সে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

উদাস তখন তার সাইকেলের চাকাগুলো মাজছিল ছাই দিয়ে। ছেঁড়া কানি দিয়ে ঘষে করে বাইকটা পরিষ্কার ঝকঝকে করে তুলছিল।

চোখ তুলে তাকালো সে মেয়েটার দিকে। তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। যৌবনে পরিপূর্ণ একটা সুপুষ্ট শরীর। এমন রূপ কোটাল-দের ঘরে?

মেয়েটাও চোখ তুলে তাকিয়ে উদাসের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই লজ্জায় মাথা হেঁট করলে।

আর বংশী সেই মুহূর্তে বলে উঠলো, আয় মা পদ্ম, আয়। ঘরের বউ করে আনবো তোকে ভেবেছিলাম মা, তা আমার ড্রাইভার ছেলে কোত্থেকে যে একটা ডাইনীকে নিয়ে এলো......

কথা শুনে স্তম্ভিত বিস্ময়ে উদাস যেন নিজের মনেই অস্ফুটে বলে উঠলো, পদ্ম!

সমস্ত মুখ তার মুহূর্তের জন্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

বিশ্ববা[illegible]

ন্যাটা হলেও ক্ষতি নেই

মানুষের দুটি হাতই দেখতে এবং আকারে অবিকল এক হলেও প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই দক্ষিণ হস্তেরই জোর বেশী। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সর্বত্রই মানুষ দক্ষিণ হস্তের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে আসছে এবং বাম হস্তকে অবজ্ঞা বা বিদ্রূপ করে। চিকিৎসা শাস্ত্রে বাম হস্তের প্রতি তাচ্ছিল্যকে সহজ প্রবৃত্তিজাত বিরাগ বলে প্রমাণ করে দিলেও আদিকাল থেকে প্রচলিত বিরূপতা মানুষের বহু সামাজিক আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

সাহারা মরুভূমির টুয়ারেগ সম্প্রদায় এখনও এই কুসংস্কারগত প্রথা মেনে চলে। এরা কখনই বাম হাতে কোন খাদ্যবস্তু স্পর্শ করে না। ওরা বাম হাতকে অপরিচ্ছন্ন মনে করে, বলে তার দ্বারা খাদ্য বিষাক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। এই উপজাতীয় প্রথার কথা শুনে হয়তো হাসি পাবে, কিন্তু সব দেশেরই লোকে দক্ষিণ হস্তে ভোজন করার রীতিই মেনে চলে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সামাজিক ভদ্রতার দোহাই দিয়ে নিমন্ত্রণকর্তা বিশেষ অতিথির ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বটিতেই উপবেশন করেন। মেয়েরা বিয়ের আংটি কেন বাম হস্তের আঙুলে পরে, তারও একটা অর্থ আছে। এমনি ধরনের একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, অপদেবতার প্রভাব বাম দিক থেকে আসে বলে সেটা ঠেকিয়ে রাখতেই বাম হস্তে আংটি পরা হয়।

মেক্সিকোর সান ব্লেস দ্বীপের আদিবাসীরা আজো কোন ন্যাটা স্ত্রীলোককে খাদ্য পরিবেশন করতে দেয় না। ওদেশে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, ঐসব স্ত্রীলোকদের হাতে খাদ্যবস্তু নষ্ট হয়ে যায়। পশ্চিম আফ্রিকার টিসাডের অন্তর্গত ঔবাঙ্গী সম্প্রদায়ের হংসচঞ্চু নারী সন্তানকে কোনমতেই বাম স্তন পান করতে দেয় না।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসী সংখ্যার শতকরা মাত্র আটজন ন্যাটা। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিতদের অভিমত হচ্ছে বিপুলসংখ্যক লোক যে দক্ষিণহস্তের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায় সেটা সামাজিক চাপে—দৈহিক কোন স্বাভাবিক কারণে নয়। দক্ষিণহস্তকে বেছে নেওয়াটা জীবন শুরু হওয়ার ক্ষণ থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়। আর তাই যা কিছু যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তৈরী হয়, সবই দক্ষিণহস্তের পক্ষে সুবিধের দিক বিবেচনা করে। ন্যাটা লোকদের জন্যে বিশেষভাবেই তৈরী করিয়ে নিতে হয়।

স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার আগের আমলে দক্ষিণহস্ত ব্যবহারকারীদের উপযোগী করে তৈরী রাইফেলে গুলী ভর্তি করতে ন্যাটা সৈন্যদের বিপদে পড়তে হতো।

ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাই লেখা হয় বাম থেকে দক্ষিণে। পুরাকাল থেকেই আমরা দক্ষিণহস্তের প্রশস্তি করে আসছি। লাতিন ভাষায় বাম অর্থে অমঙ্গল, আর দক্ষিণহস্ত বিশিষ্টদের বর্ণনা করা হয়েছে সুদক্ষ অর্থাৎ নিপুণ, কুশলী বলে। অবশ্য রাজনীতিতে বাম ও দক্ষিণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সৎ বা অসৎ বোঝায়।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে দক্ষিণহস্তের প্রতি একটানা পক্ষপাতিত্ব চলে আসতে থাকায় সাম্প্রতিককালে যেসব শিশুকে ন্যাটা দেখা যায় তাদের জোর করে ডানপেশে করার কেউ বড় একটা চেষ্টা করে না। আগে, বাড়িতে তো বটেই, স্কুলেও ন্যাটা ছেলেমেয়েদের দক্ষিণহস্ত ব্যবহার করার জন্য চাপ দেওয়া হতো। শেষে মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেন যে, ন্যাটাদের জোর করে দক্ষিণহস্ত ব্যবহারে বাধা করলে তাদের ব্যাপক আবেগসংক্রান্ত ক্ষতির সম্ভাবনা যা প্রকৃত মানসিক ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

কারণ, বামহস্ত দক্ষিণহস্তের চেয়ে বলশালী হলে সাধারণত দেহের সমস্ত বাম দিকটাই, এমন কি মস্তিষ্কও স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ দিকের চেয়ে বেশী পুষ্ট হয়। এটা স্পষ্টভাবে ধরা যায় দুবছর বয়সের পর।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি ছোটদের দুহাতই সমানভাবে ব্যবহার করতে শেখানো হয়। দুহাত ব্যবহারে সমান পারদর্শী হলে, বিশেষ করে খেলাধুলোয় দক্ষতা বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। বস্তুত ন্যাটারা যে ক্রীড়াজগতে একটা বিশেষ স্থানলাভ করে তার দৃষ্টান্ত বক্সিং ও ক্রিকেটে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আর ফুটবলের ক্ষেত্রে লেফ্‌ট-ব্যাক, লেফ্‌ট-ইন বা লেফ্‌ট-আউট তো সহজে জোটেই না।

গত ক'বছর ধরে সংকলিত তথ্য থেকে মনে হয় যে, সামাজিকভাবে-স্বীকৃত দক্ষিণহস্ত সাম্প্রদায়িক আচরণবিধি ছাড়া কিছু নয়। তবুও, এই প্রথাটির মূল অর্থ বহুপূর্বে বিস্মৃত হলেও আজ মানুষের কাজের বহুক্ষেত্রে এর প্রভাব রয়েছে। যেমন,
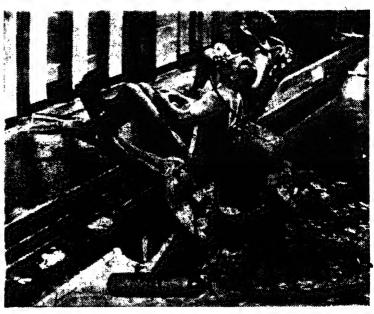
সম্প্রতি হামবুর্গে জীবন-রক্ষী সাঁতারুদের জলের নীচে ডুবে থাকার নিরাপত্তাম সরঞ্জাম পরীক্ষা করে দেখা হয়। পিঠে আট মিটার ওজনের একটি আধার নিয়ে ৪০ মিনিট জলের নীচে থাকা সম্ভব। এই সরঞ্জামটিকে চারটি আধারযুক্ত করা চলে এবং সেক্ষেত্রে জলের নীচে ১৬০ মিনিট অবস্থান সম্ভব। এছাড়া আছে ২০ মিনিটের উপযোগী মজুত বাতাস। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডুব দেবার সময় ডুবুরিরা জলের দিকে পিছন ফিরে কিভাবে ঝাঁপ দেয়

সৌহার্দ্য প্রকাশ করতে আমরা দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে দিই এবং সেটা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই।

বেশী দিনের কথা নয়, এর ঠিক বিপরীতটাই এক অসাধারণ ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক সফলকীর্তি বাড়ি তৈরীর ঠিকাদার খৃস্টিয়ান সরেনসেন মেরীল্যান্ড রাজ্যে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এক কন্ট্রাক্ট লাভ করেন। এটি ছিল ছ'শ বিলাসব্যবস্থা-সমন্বিত ফ্ল্যাটযুক্ত একটি বারোতলা বাড়ি তৈরি করা। অন্যান্য ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে যেমন একটি ধারা থাকে এ ব্যাপারেও ছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে না পারলে প্রতিদিন দেরীর জন্য খেসারত দিতে হবে।

সে সময়ে ইট বসাবার লোকের প্রচণ্ড অভাব ছিল। সরেনসেন কাগজে বিজ্ঞাপন দেন, এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সীর কাছে আবেদন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতো দরকার তার অর্ধেকসংখ্যক রাজমিস্ত্রী জোটানোও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজ নেবার পর এক সপ্তাহ পার হয়ে যেতে অবস্থা যা দাঁড়াল তাতে সরেনসেন বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে চুক্তি রাখতে নির্ঘাত প্রচুর টাকা লোকসান দিতে হবে। দুদিন ধরে সরেনসেন সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করলেন। শেষে তাঁর মুখের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পরদিন সকালে সরেনসেন বাল্টিমোরে স্থানীয় এক সংবাদপত্রের অফিসে গিয়ে এই বিজ্ঞাপনটি দিলেন:

"অনতিবিলম্বে প্রয়োজন: ন্যাটা রাজমিস্ত্রী। কাজের জন্য তৈরি হয়ে আসুন। মেরীল্যান্ড এপার্টমেন্টস, সেন্ট পল ও ইউনিভার্সিটি পার্কওয়ের কোণে, বাল্টিমোর।"

পরদিন সকাল ছটার মধ্যে বাড়ি তৈরির জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি কর্মপ্রার্থী লোকের ভিড়ে গিজগিজ করতে দেখা গেল। বেলা নটার মধ্যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বাড়ি তৈরির শেষ করতে যতো লোকের দরকার তার চেয়ে বেশী লোককে সরেনসেন নিয়োগ করে নিলেন।

মজা হচ্ছে যে, ইট বসাবার কাজে যে অগণিত লোককে নিযুক্ত করা হয় তার মধ্যে সত্যি ন্যাটা ছিল মাত্র দুজন। ওদের মধ্যে একটা মিল ছিল—ইট বসাবার কাজে কেন কেবলমাত্র ন্যাটা লোককে আবেদন করতে বলা হয়েছে সেটা জানার কৌতূহল।

বাড়ি তৈরির অন্যান্য ঠিকাদার কর্মীদের উৎসাহিত করার যে ব্যবস্থা করে সরেনসেন তা বাদ রাখেননি। আর পাঁচজনে ইট বসানোর জন্য যে বেতন দেয় সরেনসেনও সেই হারই ধার্য করে দেন।

অন্যান্য ঠিকাদাররা যে ক্ষেত্রে ইট বসাবার লোক জোগাড়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ঠিক সেই সময়েই কেবলমাত্র একটা রহস্য সমাধানে মানুষের একটা সহজাত ইচ্ছাকে উস্কানি দিয়ে তিনি দরকারের চেয়ে বেশী লোক জোগাড় করতে সক্ষম হন।

নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে বাড়ি তৈরি যেদিন শেষ হয়, সরেনসেন সেদিন মুখে হাসি নিয়ে বলেন, "আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, কেন আমি ন্যাটা লোক চাইছি, সেটা জানতেই দলে দলে লোক উপস্থিত হবে। তারা এলোও এবং আমিও ওদের নিযুক্ত করে নিই।"

"আমার মনে হয় যে, বুদ্ধি খাটালে যে কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব।"

বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ প্রদানকারি যন্ত্র

ধরুন, একজন ভারতীয় বিদেশে গিয়ে বিমানবন্দর থেকে কোন একটা বিশেষ জায়গায় যেতে চান অথবা একটা হোটেল খুঁজে নিতে চান, কিন্তু তিনি সেই দেশের একটি শব্দও বোঝেন না অথবা বলতে পারেন না। এটা স্বাভাবিক যে এমন পরিস্থিতিতে তিনি নিজেকে সেখানে অসহায় বোধ করবেন। কিন্তু তিনি যদি পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গে বিমান থেকে অবতরণ করেন তাহলে তিনি কোন রকম অসুবিধা বোধ করবেন না। কারণ সেখানে এমন একটি যন্ত্র আছে যা তাঁকে যোলটি ভাষায় প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে পারে।

হামবুর্গের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটিকে জার্মানীর আধুনিকতম বিমানবন্দরে পরিণত করার জন্য একদল কর্মী গত দুই বছর যাবৎ কাজ করছেন। কংক্রিট এবং কাচ দিয়ে তৈরী বিমানবন্দরের বিপুল গাঁটি যে শুধু বিমান চালনার নিরাপত্তার দিকেই লক্ষ্য রাখে তাই নয়, যাত্রীদের সুবিধে অসুবিধের দিকেও লক্ষ্য রাখে। এখানকার সাজ সরঞ্জামের মধ্যে অতি আধুনিক জিনিসটি হ'ল সংবাদ যন্ত্র। এটির নাম দেওয়া হয়েছে "জিওম্যাট"।

এই যন্ত্রটির সাহায্যে যে কোন যাত্রী শহরের যে কোন অংশের অবস্থান, হোটেল বা নির্দিষ্ট ঠিকানার মানচিত্র বের করে নিতে পারেন।

এই "জিওম্যাটটি" দেখতে যেকোন বড় টেলিভিশন সেটের মতো, এবং এতে তিনটি পর্দা আছে। এতে তিন সারি সাদা পুস বাটন্ সুইচ রয়েছে। এক সারিতে রয়েছে, এ থেকে এইচ পর্যন্ত অক্ষরগুলি, দ্বিতীয় সারিতে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা এবং তৃতীয় সারিতে আছে ১৬টি দেশের পতাকা। মনে করুন জার্মান ভাষার একটি অক্ষরও বোঝেন না এমন একজন যাত্রী হামবুর্গ শহরের মানচিত্রে কোন একটি বিশেষ রাস্তার অবস্থান জানতে চান। তাহলে তাঁকে প্রথমে তাঁর দেশের পতাকা অঙ্কিত সুইচটি টিপতে হবে। তখন, মধ্যভাগের বড় পর্দায় তাঁর ভাষায় লিখিত নির্দেশে তাঁকে, অক্ষর ক্রমিক তালিকায় তাঁর প্রয়োজনীয় রাস্তাটির নাম খুঁজে বার করতে বলা হবে এবং তালিকায় সেই রাস্তার পার্শ্বে যে অক্ষর সংখ্যা দেওয়া আছে, সেই অক্ষর ও সংখ্যার সুইচগুলি টিপতে বলা হবে। সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যভাগের বড় পর্দায় হামবুর্গ শহরের একটা বড় অংশের মানচিত্রে, ১:৩০০০ স্কেলে তাঁর প্রার্থিত রাস্তাটি দেখতে পাবেন। বাঁ দিকের পর্দায় তখন হামবুর্গ শহরের কোন জায়গায় সেই অংশটি অবস্থিত তা দেখতে পাওয়া যাবে। ডান দিকের পর্দায় দেখা যাবে অন্যান্য খবর।

"জিওম্যাট" যন্ত্রটি, পর্যটকদের সংবাদ সরবরাহ করার জন্য শহর পরিকল্পনা, যানবাহনের চলাচল পরীক্ষা, শান্তিরক্ষা ইত্যাদি

নানা উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিভিন্ন বিমানের আসা-যাওয়ার সময়, থিয়েটার ও সিনেমার অনুষ্ঠান সূচী, রেলওয়ের টাইমটেবল, বাস চলাচল ইত্যাদির সংবাদও এই যন্ত্রটি থেকে পাওয়া যায়।

এই রকম একটি "জিওম্যাট" যন্ত্রের দাম প্রায় ৩৫,৭০০, টাকা। হামবুর্গের একজন স্কুল শিক্ষক দশ বছরের পরিশ্রমে এই যন্ত্রটি তৈরী করেছেন। ৪৮ বছর বয়স্ক এই শিক্ষকটির নাম হ'ল মিঃ টম কটবার্গ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াট্ল-এ যে বিশ্ব প্রদর্শনী হবে তাতে এই যন্ত্রটি প্রদর্শিত হবে। এই যন্ত্রটি হামবুর্গ বিমানবন্দরে বসানোর সঙ্গে সঙ্গে নানা জায়গা থেকে এখনই যে রকম অনুসন্ধানমূলক চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটি যে সমগ্র বিশ্বে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে তা এখনই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

মননশীল উত্তাপগৃহ ও বৃক্ষহীন উদ্যান

শিশুদের জন্য উপযুক্ত সাজ সরঞ্জামসহ নার্সারি তৈরী করাটা বর্তমান যুগে শিশুকল্যাণ কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলে মনে করা হয়। আগামীকালের নাগরিক আমাদের শিশুদের উন্নতি ও সুখের জন্য আমরা এই সব নার্সারিগুলি সব আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে সুসজ্জিত করি। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গে, ভবিষ্যতের বৃক্ষ ও উদ্যানের জন্য, ঠিক একই রকম বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জামসহ চারাগাছের নার্সারি তৈরী করা হয়েছে। চতুর্দিকে বিপুল বিস্তৃত ফলবান বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র দিয়ে ঘেরা চারাগাছের নার্সারি ও অরণ্যবেষ্টিত বহির্বিশ্বে যাওয়ার জন্য জার্মানীর নিষ্ক্রমণ দ্বার ২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত হামবুর্গ শহরকে সহজেই ইয়োরোপের অন্যতম সুন্দর শহর বলা যেতে পারে। এখানে যতখানি অঞ্চল জুড়ে অরণ্য, ফলের বাগান ও বৃক্ষের উদ্যান রয়েছে সমগ্র ইয়োরোপে আর কোথাও সে রকম নেই। সুসজ্জিত পার্ক, শত শত বৎসরের প্রাচীন বৃক্ষাদি, চতুর্দিকের নয়নমনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঝকচকে জলবিশিষ্ট শহরের মধ্যবর্তী দুটি হ্রদ, এ ছাড়া আরও কয়েকটি কৃত্রিম হ্রদ বিশিষ্ট ব্যবসাপ্রধান হামবুর্গ শহরে ১৯৬৩ সালে বিশ্ব উদ্যান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। ইয়োরোপের উত্তরাঞ্চলের ভেনিস বলে বর্ণিত এই শহরটিতে এসে এখানকার সৌন্দর্য পর্যটকগণ মুগ্ধ হয়ে যান।

বার্লিনের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জার্মানীর অন্যতম প্রধান স্থপতিবিদ বার্নহার্ড হার্মাকিস, গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের বৃক্ষাদি উৎপাদন করার একটি খুব বড় নার্সারি তৈরী করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। এটির নাম হল পাম হাউস।

এই সুবৃহৎ নার্সারিতে অধ্যাপক হার্মাকিসের পরিকল্পিত আর একটি বাড়ি তৈরী হচ্ছে, সেটি হ'ল সম্পূর্ণ স্বয়ংচালিত উত্তাপ গৃহ। উদ্যান ও বৃক্ষচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ইয়োরোপে হামবুর্গের যথেষ্ট সুনাম আছে। ১৯৬৩ সালে উদ্যান ও বৃক্ষ প্রদর্শনীর সময় এখানে যে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ পর্যটক ও বিশেষজ্ঞের সমাবেশ হবে, তাঁদের কাছে এই স্বয়ংচালিত উদ্যানগৃহটি অত্যন্ত আকর্ষনীয় জিনিস বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। এই রকম একটি স্বাধীন স্বয়ংক্রিয় ও "মননশীল" উত্তাপ গৃহ এই প্রথম তৈরী করা হচ্ছে। এটি সাধারণ মানুষ ও বিশেষজ্ঞ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ফটোইলেকট্রিক পদ্ধতিতে উত্তাপগৃহটি স্বয়ংক্রিয় উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হবে। উত্তাপ গৃহে যে পরিমাণ আলো আসা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী ছাদের ঢাকনি খুলবে বা বন্ধ হয়ে যাবে। আবহাওয়া যে রকমই হোক না কেন স্বয়ংক্রিয় শীততাপ নিয়ন্ত্রণকারী এই গৃহে একটা নির্দিষ্ট উত্তাপ বজায় রাখবে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থাসহ হাইগ্রোমীটার, চারাগাছ ও ফলগাছগুলিতে জল ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় জল ছিটোবার যন্ত্র চালিয়ে দেবে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে এই "মননশীল উত্তাপ গৃহটি" কেবলমাত্র জার্মানীতেই নয়, সমগ্র বিশ্বের উদ্যান চর্চায় যুগান্তর নিয়ে আসবে।

এই স্বয়ংক্রিয় উত্তাপ গৃহের কাছেই, ১৯টি "জাতীয় উদ্যানের" প্রথম উদ্যানটি তৈরী করা হচ্ছে। প্রথম জাতীয় উদ্যানটির জন্য সম্প্রতি ৫০০০ ফিট এলাকায় মাটি খোঁড়ার কাজ সুরু করা হয়েছে। জুরিখের স্থপতিবিদ ক্লা মা রে র পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্যানটির নক্সা তৈরী করা হচ্ছে। এটি হবে আধুনিক ও প্রগতিশীল জনগণের উদ্যান। ১৯৬৩ সালের প্রদর্শনীতে যাঁরা আসবেন এটি হবে তাঁদের জন্য একটি আকর্ষনীয় দ্রষ্টব্য, কারণ এই সুউচ্চ উদ্যানটিতে বৃক্ষ একরকম থাকবে না বললেই হয়। গৃহের সারি ও রাস্তার মধ্যবর্তী জায়গায় এই উদ্যানটি নির্মিত হবে, এটি হবে এক ধরনের উন্মুক্ত স্থান, রাস্তার পার্শ্বস্থিত গৃহগুলির সম্প্রসারিত অঙ্গন। এই আকর্ষণীয় অত্যাধুনিক উদ্যানটিতে থাকবে একটি ত্রিকোণাকৃতি সাঁতার কাটার পুকুর, সূর্যস্নানের জন্য অনেকখানি জায়গা, খেলার মাঠ, বিশ্রাম করার গৃহ এবং রঙীন টালি দিয়ে ঢাকা খানিকটা জায়গা।

আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ সম্ভাবনা

এক ভূ-কম্পবিদ সম্প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পৃথিবীর অতি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অন্যতম কিলাউইয়া এই বছরের শেষের দিকে প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হবে। চার হাজার চারশো ফিট উঁচু প্রশান্ত মহাসাগরস্থ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের এই আগ্নেয়গিরিকে ঘিরে রয়েছে ফুটন্ত লাভার এক হ্রদ।

আগ্নেয়গিরিটার মুখগহ্বর থেকে ধোঁয়া বা আগুন অবিরাম বের হয়ে আসছে। কখনও উপচে পড়েনো পথ ধরে গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন বিপজ্জনক কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি।

১৮৪০ সালে আগ্নেয়গিরিটির সমগ্র ইতিহাসে অন্যতম প্রচণ্ড যে বিস্ফোরণ ঘটে, তার ফলে পর্বত গাত্র বেয়ে পাঁচ মাইল প্রশস্থ ও দুশো ফিট গভীর ফুটন্ত লাভাস্রোত নেমে আসে।

দু বছর আগে উত্তপ্ত সাদা লাভা ফিনকি দিয়ে বের হয়ে কাপোহো শহরটির প্রভূত ক্ষতি করে। প্রায় পনের কোটি ঘনফুট লাভা এক হাজার একর মূল্যবান ক্ষেত নষ্ট করে ফেলে।

১৯৩৩ সালে হাওয়াইতে আগ্নেয়গিরি পূজার অনুষ্ঠান হঠাৎ ফিরে আসে। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হচ্ছে আগ্নেয়গিরিকে তুষ্ট করার জন্য তার গহ্বরে জীবন্ত কুমারী মেয়েদের নিক্ষেপ করা।

আগ্নেয়গিরির রোষ শান্ত করবার জন্য অন্ততঃ তিনটি মেয়ে নিজেদের অর্পণ করবে বলে খবর বের হয়। কিছুকাল পর, আমেরিকান প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখে, দুটি মেয়ে ওদেশের আগ্নেয়গিরির দেবী পেলের নামে জীবনোৎসর্গ করে।

তরুণী কুমারী মেয়ে দুটি তালের রস থেকে তৈরি সুরা পান করে মত্ত অবস্থায় আগ্নেয়গিরির গহ্বরমুখে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর ওদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় ফুলের মালা। অনুষ্ঠান অন্তে ওরা হাজার ফিট নীচে গলিত লাভায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।
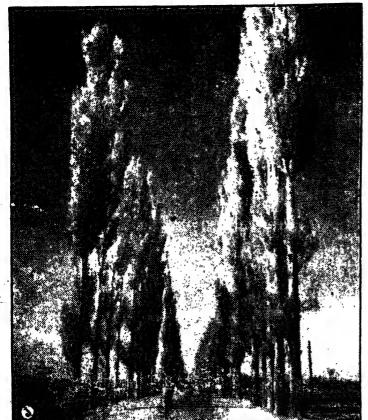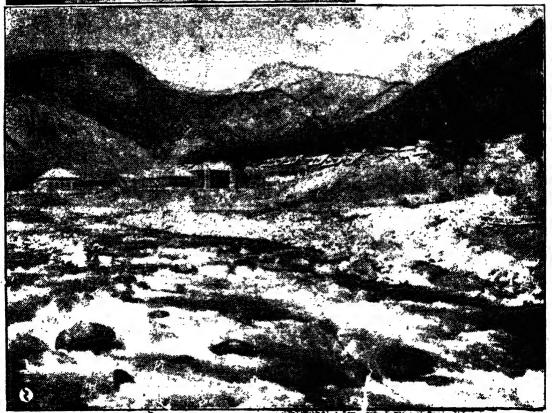
ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, পর্তুগীজ সরকার নাকি গোয়া, দমন, দিউকে স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজী হইয়াছেন। সংবাদ পরিবেশক ইহাকে 'স্বায়ত্তশাসনের টোপ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের

খুড়ো বলিলেন—"শুধু টোপে তো চলে না, সঙ্গে চার চাই। সেটা কোন্ দিক থেকে আসবে তা অবশ্য সংবাদদাতা বলেন নি।"

পর্তুগাল অভিযোগ করিয়াছেন—ভারত গোয়ার চতুর্দিকে ৩০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে, ভারতের বিমান দমন দিউ ও পর্তুগীজ গ্রাম ফাকিরপোতার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া পর্তুগাল এলাকাগুলির বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ও আক্রমণাত্মক কার্য-কলাপ চালাইতেছে......শ্যামলাল পাদপূরণ করিয়া দিল, "ইহার পরও অপমান করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে !!"

কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনপ্রকার অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সরকারী কর্ম-চারীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।—"এই

সতর্কীকরণের আওতায় এক ডি আই পি ছাড়া অন্য কেউ পড়বেন বলে তো মনে হয় না। বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদদাতা বলিতেছেন—"দা ই টা স" [illegible]-এর প্রেস কর্মীদের কাছের [illegible] মুখ্যমন্ত্রীর [illegible] [illegible] মধ্যেই

মেরামত হইয়া গেল।—"তাই হয় ভাই, তাই হয়। কিন্তু আমাদের কপালে যে শুধু শনির দৃষ্টিপাত। তাই তো মেরামতের বদলে সব ভেঙে খানখান হয়ে যায়।" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় "দেশ গড়ার যজ্ঞে" সহযোগিতার জন্য আবেদন

জানাইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"ঘৃত-ধারক হয়ত পাবেন। কিন্তু ভেজালের বাজারে যজ্ঞের বিশুদ্ধ ঘৃত সংগ্রহ যে দুষ্কর!"

কলিকাতার ট্রাফিক পুলিস কর্তৃপক্ষ জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শহরের পথ-নিরাপত্তার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি পাঠচক্রের আয়োজন করিয়াছেন।—"ফলাফল এই পাঠচক্রের শত-বার্ষিকী উৎসবে ঘোষণা করা হবে, অপেক্ষা করে থাকুন।" মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

তামাক সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গুজরাট সরকার একটি গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।—"খুব ভালো কথা। তবে কথা হল, তামাকের গুণাগুণ নির্ধারণ করতে গিয়ে হুঁকো বন্ধের ব্যবস্থা না হলেই হয়।" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

মেগাটন নয়, নিউট্রন নয়। এবারে যা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইল আসল মরণরশ্মি। এই রশ্মিপাত জড় বা জীবন্ত যে-কোন বস্তুর উপর ঘটিবে তাহাই বাষ্পীভূত হইয়া ক্রমশ বায়ুতে মিলিয়া যাইবে।—"বুঝেছি, আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় কথাটা মরণরশ্মি আবিষ্কারের আগেই শুনেছি। সোজা কথায় সবই হাওয়া।" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় সরেজমিনে তদন্তের জন্য কোচবিহার গিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সঙ্গে লাঠি মিত্রকে নিয়ে গেছেন কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি!"

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, চীন বৃটেন হইতে ২০ লক্ষ পাউন্ড দিয়া ছয়টি ভাইকাউণ্ট বিমান ক্রয় করিয়াছেন। যাত্রি-বাহী বিমান চীন পূর্বে রাশিয়া হইতেই ক্রয় করিত। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"বিমানের দর আমাদের জানা নেই, সুতরাং সস্তার জন্য বৃটেনে বাজার করা হল কিনা বলা শক্ত। এবং রাশিয়া চীনকে সস্তার পস্তাতে হয় কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কিনা তা বলা আরো শক্ত !!"

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে পুরাতত্ত্ব আমাদিগকে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অতীতের দিকে তাকাইতে শিক্ষা দেয়। "কোন কবি বলে গেছেন—রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী, টোডরমলের কটা ছিল নাতি, আর আকবর শাহ কাছা দিত কিনা, নুরজাহান ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা।"—ছড়া কাটিয়াই সহযাত্রী তাঁর মন্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া দিলেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট শ্রীব্রেজনেভ কলিকাতা আসিতেছেন। শুনিলাম, তাঁহার নাগরিক সংবর্ধনার স্থান লইয়া পৌরপ্রতিষ্ঠান বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সমাসন্ন টেস্ট ম্যাচের জন্য ইডেন উদ্যানে স্থান করা গেল না।—"বাজে কথা। এসব টেস্ট ম্যাচের টিকিট না দেওয়ার তাল !!"

সংবাদে শুনিলাম, পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ সাহেব যৌথ প্রতিরক্ষায় রাজী, তবে শর্ত, কাশ্মীরের ফয়সালা। খুড়ো গল্প বলিলেন—"একটি ছেলেকে নদী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়েছিল। ছেলেটি গরু ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতে পারত না। তাই সে লিখে গেল—'নদী পাহাড় হইতে বাহির হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। নদীর দুই তীর তৃণে আচ্ছাদিত। সেখানে গরু চরে। গরুর চারিটি ঠ্যাং। দুইটি শিং। গলায় গলকম্বল আছে...ইত্যাদি। এর পর গরু দিয়েই সে নদীর প্রবন্ধ শেষ করল। কাশ্মীর ফয়সালাটাও সেইরকম ঝালে ঝোলে অম্বলে !!"

সমস্ত শব্দ থেমে গেলে ঘরের অন্যান্য জিনিসের ওপর কেমন সন্দেহ ও সন্দিগ্ধ হয়ে তাকাতে হয়। খাট আলমারি আয়না দেরাজ এমন কি ঘরের পাশে ছোট বাথ-রুমের দরজার ঘষা কাচের ওপর হঠাৎ কোন মানুষ দেখার মত, একটি হঠাৎ কোন ভয়ের মত, মানুষের ছবি দেখতে পাওয়ার আগে কোন ইশারা যেন থামিয়ে দেয়। শব্দ শব্দ শব্দ : মানুষের গলা বা মানুষের তৈরী কোন শব্দ; শব্দের তফাৎ থাকলেও মানুষের তৈরী শব্দ জমাট হয়ে যাওয়া যাবতীয় নৈঃশব্দের কাছে। আর এই নৈঃশব্দের মধ্যে থেকে যদি বা মানুষ কোন শব্দ তৈরী করে থাকে সেটাই যেন এই কাচে, জানলার জোড়-মুখে শুরু হবে, যেখান থেকে এই শব্দের কথা ধারণা করতে পারে নি। দিদিরা বা বড়বৌদি বা বৌদির ছোট বোন—এরা সকলে যে শব্দটাকে তৈরী করছিল কিছুক্ষণ আগেও সেই শব্দের প্রমাণ স্বরূপ একজন শাড়ি পরিহিতা ছুটে চলে গিয়ে পরে আস্তে আস্তে হালকা পালকের মত তার শব্দটাকে নামিয়ে দিয়েছে এই জানলা বা ঘষা কাচের কাছে; সুতরাং এক-মাত্র সেদিকেই নীরব ও নিস্তব্ধতা।

নৈঃশব্দের অন্ধকার হঠাৎ একটা শব্দের আকার নেবার জন্যে তাকিয়ে রইল।

শিশির অবাক ও নিস্তব্ধ হয়ে ঘরের দরজার কাছে চাইল। দরজার রঙ খিলানের দিকে নয়, দরজার ছিটকিনির লাগা-স্ক্রুর দিকে। যেন শব্দটা একমাত্র সরু সুতোয় কালো ও আলগা হয়ে দালানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে এসেছে।

কিছুক্ষণ আগেও এরা দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিতান্ত ভালমানুষের মত বলছিল, "যা শুয়ে পড়, খিল দে"। "যা শুয়ে পড়, খিল দে, অনেক রাত হয়ে গেল" কথাটা খুব ভদ্রভাবে অভিভাবকের সুরে বলার ভঙ্গিতে বলেই পরে আবার খিল খিল করে হেসে উঠতেই শিশির তৈরী ছিল। যেন সে অনেক লাজুক ও দিশেহারার মতন শব্দটার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শব্দটা জমাট হয়ে হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

তখনও ওরা দাঁড়িয়েই ছিল।

অনেকগুলো মানুষের শরীর এই ঘরে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের শব্দ যেন থেমে নিভে গিয়ে এখন সমস্তটাই পরিহাসের মত নিঃশব্দে নিঝুমে আর একাকী করে সরিয়ে দিয়েছে একজন উত্তীর্ণ কৌমার্য মেয়ের কাছে, একজন প্রায় বধূ হয়ে যাওয়া মেয়ের কাছে। এমন কি এই শব্দ-গুলো যেন সব গুঁড়ি মেরে ঘষা কাচের দিকে জানলার নিবিড় খাঁজে ছড়িয়ে গুমোট বেঁধে আছে। শিশির অপেক্ষা করছিল শব্দটা যেন তার পায়ের চেটোয়—মেঝে থেকে আবার নতুন করে হাজির হয়ে যাবে। আর ঠিক এ সময়ও শিশির কল্পনা নামের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার পা মেঝেয়, খাটের বাজুর দিকে, সে ঘাড় হেঁট করে প্রায় অধোবদন।

মেয়েটি পর্যন্ত নিস্তব্ধ বলেই শিশির আরো কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করে দরজায় খিল না-দিয়ে ভাবছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে প্রায় নিঃশব্দের মত, কোন নিষিদ্ধ ঘরের কাছে দাঁড়াবার মত ভাবছিল। একমাত্র তার পাঞ্জাবীর শব্দটা থেকে সে বুঝছিল, এই নতুন জীবন ও এই একটি জায়গা থেকে তার নতুন শব্দ উঠতে পারে। একমাত্র এই জায়গা থেকেই এই শব্দটা উঠবে, যে শব্দকে সে এতক্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে যে এখুনি এই পাঞ্জাবীর নতুন ভাঁজ ও মুগোর পাট থেকে শব্দ উঠবে ভাবতে ভাবতে নিঃশব্দ ঘরের দিকে দাঁড়াল। হঠাৎ ফিরে আস্তে করে খিল দিতে গিয়ে তার পাঞ্জাবীর থেকে শব্দ ছড়িয়ে সে এখন ড্রেসিং টেবিলের কাছে। আয়নার কাচে আড়াআড়িভাবে কল্পনা নামের মেয়েটি একলা। সে তখনও সেই

একই রকম। সে নড়েনি। সুতরাং এখনও তার কাছ থেকে কোন শব্দ তৈরী হয় নি। বাকিটুকু সে না জানলেও বুঝেছিল, অনেকেই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমে অচেতন।

বাথরুম ও ঘরের অন্যান্য জায়গায় সে আঁতিপাঁতি দেখল. পাশের বারান্দা ও চেয়ারের নীচ পর্যন্ত বাদ দিল না শিশির। যদি ওখানেও কেউ লুকিয়ে আড়ি পাতে। সেই দেখার সময় বাইরে থেকে "ভয়ানক চালু ছেলে দেকছি ত", "শয়তানি বুদ্ধি আছে" ইত্যাদি কথা শুনতে পাচ্ছিল। তারপর জোর পাওয়ারের আলো নিবিয়ে দিতেই "আজ আলো নেবাতে নেই—জেলে রাখ" কথাটা শুনলো শিশির। ঘরে দেখল কোন ডিম-লাইট নেই। সুতরাং ভয় পেয়ে সে আবার জ্বালল। তারপর—মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল. "শুয়ে পড়ো না, অনেক রাত হল।" বলতেও সে অনড় ও সুন্দর রইল। দ্বিতীয়বারের মত বলল, তারপর কাছে এসে—

"দ্যাখো, তুমি যদি না শোও তবে আমাকেই শুইয়ে দিতে হবে, দেওয়া উচিত। কারণ তোমার লজ্জা ত! এ অবস্থায় আমারই উচিত তোমাকে শুইয়ে দেওয়া!" বলতেও সে প্রায় অনড় ও সুন্দর হয়ে রইল। লম্বা সুন্দর হাত, বেনারসীতে সামান্য শব্দ তুলেই নিশ্চুপ। আর শিশির কেবল ঘামছিল।

ঘামতে ঘামতেই তার ফুলের মাথার দিকে তাকিয়ে বালিসের কাছে এসেই ভাবল কী বলবে। ঘরের আলোতে, ঘরের মধ্যে ফুলের মাথার আলোতে কাছে সরে এসে সে খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল।

"আচ্ছা একটা কথা বলবে? আজকের দিনে ওরা বলছে ঘরের আলো নেবাতে নেই। আমার মনে হয় নিয়ম কিছু নেই; ওরা দেখার জন্যে একথা বলছে। তুমি এর জান কি কিছু?"

বলতেই ও ঘাড় নাড়ল—"জানে না"। অথচ সুন্দর অস্পষ্ট ও তার হাতের কাছ থেকে যেন "জানে না" এই অজানা ব্যাপারটা শিশিরের কাছে উচ্চারণের মত শোনায়।

তারপরই শিশির আলো নেবাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো আর বলল, "তুমি উঠে শোও, না হলে আলো নেবাতে পাচ্ছি না।" সুইচে হাত লাগিয়ে কাচের গ্লাসের জলের দিকে তাকিয়ে ওকে শোবার জন্যে অনুরোধ করা হলে ও নিঃশব্দ রইল। "আচ্ছা যদি আলোটা নিবিয়ে দি' তাহলে আমাকে অসভ্যের মত মনে হবে না ত?" শিশির কথাটা উচ্চারণ করল প্রায় ওর ঘাড়ের কাছ থেকে। এ কথাটি তার কোন নিজের দেখে শেখা নয়, কোন এক [illegible] লেখকের কাছ থেকে পড়া জিনিস। সে [illegible] করে বলছিল অত্যন্ত করুণার সঙ্গে।

তখনও ঘরের জিনিসপত্র দৃশ্যমান। কাচের ওপর প্রতিফলিত সাদা আলোর রশ্মি তুষারের মত।

শিশির কথাগুলো বলছিল নিজের মত করে কি তাও জানে না। তবে তার মধ্যকার যে একটি সভ্যতা আছে, সেই সভ্যতার কাছ থেকে সভ্য মানুষের মত সে কথা বলছে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার মুহূর্তে সে তখনও দেখল ঘরে অন্ধকার কেমন করে ছড়িয়ে গেছে; চেয়ারের তলায় খাটের তলায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার. আর তখনই তার ঘড়ির নীলচে রেডিয়াম ডায়াল দেখাচ্ছিল।

অন্ধকারে সব অদৃশ্য জিনিসের মধ্য থেকে ছোট টেবলের ওপর ঢাকা-দেওয়া কাচের গ্লাসে জল, রেডিয়ামের বোকা নীলচে মোটা আলো। তারপর বালিশের গন্ধ থেকে ফুলের রমণীয় আস্বাদন।

বেনারসী কাপড়ের শব্দ করে সেই মেয়েটি শুয়ে পড়েছে। মেঝের ওপর আর কোন শব্দ লেগে নেই। কোন শব্দ নেই। শিশিরকে একলা রেখে অন্যদিকে ফিরে গিয়ে মেয়েটির মুখ, লম্বা হাত। সরু কোমর সংক্ষিপ্ত করে জড়োসড়ো বেনারসীতে ছোট্ট হয়ে হয়ে—তার পায়ের অংশ থেকে খুব ছোট ও সংক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল। এবং সে প্রায় দিশেহারা হয়ে কী বলা উচিত তা ভেবে পাচ্ছিল না; এ জন্যে কেউ কি আগে থেকে তৈরী হয় তা জানা নেই শিশিরের। শিশির কেমন করে প্রশ্নগুলো করে যাবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। সেই একই গলায় এই রাত্রির মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে শব্দগুলো জানাচ্ছিল, শোনাচ্ছিল।

শিশির ওর হাতের দিকে তাকাল। হাত চোখ নাক ভ্রু। এবং এটা যে খুব একটা মোটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না এ বিষয়েও সে কেমন বিষণ্ণ হয়ে রইল। বাস্তবিক ঘরে খিল দেওয়া, আজকের রাতের জন্যে পাওয়া তার একটি সঙ্গিনীকে হঠাৎ এই আলো নেবানোর প্রস্তাব জানানো তার বিবেকের কাছে এসে ঘা দিল। যেন ঠিক হতবুদ্ধির মত করে সে কাজটা করিয়ে নিচ্ছে। খুব অসভ্যের মত মনে হবে না ত? হয়ত নয়। কিংবা হবেও বা। সেই আদিম দিকটা আদিমতার কথা ভাবতে ভাবতেই তার সময় নষ্ট হয়ে যায়।

এই রাতে তাকে প্রথম কাছে পাওয়া, এভাবে রাত্রি দিয়েই সুরু। এই রাত্রির প্রতিটি সময়ই যেন অন্ধকার, আদিম।

ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকিয়ে থাকি; কেন না আমার রাত চলে যাবে; আমার রাত শেষ হয়ে যাবে। এই ত অন্ধকার। আমার অনেক কথা আছে। আমার রাত শেষ না-হয়। অন্ধকারে সে মেয়েটি অজানা, অচেনা সে বারে বারে।

দিনের আলোয় ঘড়ির ডায়াল দেখার মত নয়; রাতের অন্ধকারে রেডিয়ামের মোটা নীলচে আলোয় যেমন ধোঁয়াটে এই সময়ের চিহ্ন, তেমনি করে মেয়েটি ব্রীড়াময়ী। ওর হাত দেখি লম্বা! চোখে 'সুন্দর' দেখি। কপালের সামান্য সুন্দর অংশ, নির্মল ভ্রু-পাখা। তার চুল 'রেশম' ভাবি। ভাবি আর ভাবি। মেরুদণ্ড স্থির। তার চাউনি মেলে ধরে, তার বারেক চাউনি মেলে ধরে। তার বালিশের গন্ধে 'ফুল' ভাবি। অন্ধকার মায়ায় ভুলে যাচ্ছি। কেমন করে ধরে আছি এই অন্ধকারকে। সুন্দর সুন্দর ভ্রু-পাখা। আমি যে জেগেছি তার এই কাজল চোখের সুষমায়। যদিও জানি এই অন্ধকারে হারিয়ে যাব, যাব এই অন্ধকারে। অন্ধকারে শব্দ খুঁজতে খুঁজতে হারিয়ে যাব। আমরা দুজনেই একা একা ভীষণ একা। এই অন্ধকারে দুজনেই অনুভূতিতে চিনতে চাইছি। সময়কে আগামী কালের হাতে তুলে দেব না। তোমার আমার বর্তমানের ঘড়িটা থেমে যাক। এই পৃথিবী একটি অন্ধকার স্থিরচিত্র হয়ে পিছনে ঝুলতে থাকুক। অন্ধকার পিছনে ঝুলতে থাকুক। কেবল আমি এই অন্ধকারে সক্রিয় হয়ে তোমার খুঁজতে থাকি। তুমি কেয়া ফুল ও তার মাধাখানের মত গোপন থাক। তোমার দুটি বাহু বহুদিন ধরে কেয়া ফুলের পাপড়ির মত হয়ে, কুসুমকে গোপন করার চেষ্টায় কেয়া ফুলের পাপড়ি হয়ে ঘিরে থাকুক। লম্বা অথচ দীঘল শক্ত কেয়া ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে সরিয়ে সরিয়ে আমি অবগুণ্ঠনবতীকে অনেক দূর থেকে কষ্ট করে দেখতে থাকি। তুমি নীরব থাক।

অনেকক্ষণ ধরে সে ওই ডায়ালটিকে নীলচেই দেখুক, ওটাই চায় সে। ঘড়ির ডায়াল নীলচে থাকুক। মেয়েটি আস্তে আস্তে তার কথার উত্তর দিল।

সে হয়ত অনেক সময় কাটিয়েছে কিন্তু তখন এতখানি গভীরতা সে উপলব্ধি করেনি। আজ এই নিষিদ্ধ ঘরে দাঁড়িয়ে তার এক মিনিট সময়ও ঘড়ির ওপর থেকে অযথা সরিয়ে দিতে চাইল না, অথচ সে কি কথা কইবে এ সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তার সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

এতদিন যেমন বিয়েকরা লোকগুলোকে সে কেমন একচোখে দেখে আসছিল আজ আর তেমনি করে না দেখে সে একেবারে অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছিল। এটা ত মানুষের জীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ। এটা না হলে যেন জীবনের এক একটি দিক অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সত্যি, এটা কি ঠিক কথা নয়। জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। এভাবেই সে তার ওই নিষিদ্ধ ঘরের কাছে সমস্ত সত্তাকে টেনে হাজির করছিল, আর সমস্ত

নিঃশব্দতা থেকে সে জানছিল বাইরে আর কেউ নেই। অথচ মেয়েটি নিঃশব্দ অনড়।

এতদিন ভেবেছিলুম যারা বিয়ে করে তারা কত বোকা। বরগুলো বর্বরের মত চলে যায়। আজ আর তা মনে হচ্ছে না। আমার বিয়ে হয়ে গেল। হাঃ। এর পরের যে কোন বিয়ের তারিখ এলে কী মনে হবে। কী মনে হতে পারে। আমি এই বিয়ে সম্পর্কে কী অনুভূতিতে হাজির হচ্ছি। আমার বিয়ের পর অন্যান্য বিয়ের তারিখগুলোকে আমি নিজের অস্তিত্ব দিয়ে কি ভাবব? মনে হবে যেন আমারই কোন বিশেষ বন্ধু ঐ সব দিনে বিয়ে করতে যাচ্ছে।

"আচ্ছা আমার বাবা মাকে তুমি ত দেখলে, যতটুকু দেখেছো তাতে তোমার কেমন লাগল?"

"ভাল।"

"আর ঠাকুমা পিসিমা?"

"ভালই।"

"এরা সত্যি খুব ভাল, আমাকে খুব ভালবাসেন, স্নেহ করেন। আর ছোট বোন দুটিকে কেমন লাগল? যদিও ওরা তোমার সঙ্গী হতে পারে না বয়সের দিক থেকে, তবুও মনে হয় এ জন্যেই তুমি খুব সাধারণভাবে মিশতে পারবে।"

ও হয়ত কিছু বুঝল না, তাই উত্তর দিতে পারল না। আর তাতেই যেন আরো পাগল হয়ে যায়। শিশির আরো কথা দিয়ে ওর বোঝা না বোঝার ব্যাপারটা জানতে চায়।

"বলছি যে ওরা তোমার সমান বয়সী নয় বলেই তোমাকে ওরা অন্য চোখে দেখতে পারবে। আর তাতেই তুমি আনন্দ পাবে। শৈশবের প্রবৃত্তি তোমার মধ্যে খেলা করবে। বাবা মা ঠাকুমা পিসিমার কাছে তোমার খানিকটা স্নেহের দাবি থাকবে আর বাকিটুকু তোমার বয়সের সঙ্গী হিসাবে তোমার মনের গোপন কথার সঙ্গী হিসাবে তুমি..." বাকি কথাটা গলার কাছ থেকে সরে গিয়ে 'তোমার গোপন কথার সঙ্গী'র কাছ থেকে সরে গিয়ে একটু থেমে আবার বলল, "আমাকে তোমার কেমন লাগল?"

একথা বলার পরই শিশির থেমে গেল। আর কিছুই সে বলল না। পরে আবার বলল, "তুমি কি ঘুমোবে! আমার মনে হয় এ রাত্রি ত আর জীবনে কোনদিন আসবে না, কোনদিন নয়। তাই একে ঘুমিয়ে নষ্ট না করে আমি যা খুশী তাই করব, আমি আনন্দ করবো, গান করবো, গল্প করবো। অথচ তুমি যদি ঘুমোও।" কথাটা শিশির তার পড়া বিশিষ্ট সব লোকের ফুলশয্যা রাত্রির বর্ণনার অভিজ্ঞতা থেকে বলল।

তারপরই শিশির ওর মাথার কাছ থেকে জানলার পর্দার পাশ দিয়ে আলো দেখল। পরে, কল্পনা বলল, "আমি উঠে বসব, শুয়ে থাকলে হয়ত আবার ঘুমিয়ে পড়ব—তাই।"

এবং ও উঠে পড়ার মুহূর্তে শব্দ ফুল বেনারসী গন্ধ সব একত্রিত হয়ে লম্বা হাতের কাছে ছড়িয়ে আবার সুন্দর আবছা আলোর বিকিরণ হয়ে উঠল।

গরমে ঘামছিল শিশির। ঘামের সূচনাতেই সে আরো থমকে পড়ে। এই ঋতুর কথাটা ভেবে মন থেকে খারাপ এ-কথা বিবেচনা করতে পারছিল না। কারণ সে বৈশাখে বিয়ে করেছে, গরম হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণেই তার কেন যেন মনে হয়েছে ঋতু-শ্রেষ্ঠ একেই বলা উচিত। বৈশাখ, খর নিদাঘ, ঘনঘন রোদ্দুর, খর ধুলোর আবরণ, মেঘ ঝড় ও জলের মধ্য দিয়ে সে অনুভব পাচ্ছিল রুক্ষ দিনের অবস্থা থেকে গরম বাষ্পীয় অনুভূতিতে সে জানছিল, এটাই যেন উপযুক্ত সময়। শীত নয়, বর্ষা নয়, বসন্ত নয়—এই গ্রীষ্মকাল, গ্রীষ্মঋতু, গ্রীষ্মসময়টি যেন পুরুষের মত, শক্ত কঠোর ঋতু।

যদিও তার বিয়ের ব্যাপারে কেউ তাকে কোনরকম সাহায্য করেনি। বিশেষ করে বাবা মা কেউ তাকে মেয়ে দেখার ব্যাপারে কোন কথা বলেনি। এমন কি বন্ধুরাও তার মেয়ে দেখার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে নি। আর শিশির তার অনেক জায়গায় কোষ্ঠি ঠিকুজি অমিল হওয়ায়, বিশেষ আগ্রহী ছিল না। তবুও এ বিষয়ে কথা-বার্তা যখন প্রায় ঠিক হয়েই গিয়েছিল তখন কেন যে কেউ তাকে একবার দেখে আসতে বলেনি! কেন কেন কেন। যেন পীড়ন করছিল। আগেকার এই ভুল যেন ক্ষতির মত তাকে পীড়ন করছিল।

ও বলল, "আমার বাবা মা তোমার বাবাকে অনেকবার বলেছিলেন তোমায় দেখার কথা।"

"কিন্তু আমায় ত কেউ এ কথা বলে নি। যেতাম। তবুও হয়ত আজ মনে হচ্ছে যেন অবহেলার মত হয়ে গেছে। দেখে শুনে যারা বিয়ে করে তারা সত্যিই মহৎ। কিন্তু, কেমন এক আঘাত লাগছে মনে। দেখলে হয়ত তোমার সম্বন্ধে ধারণাটা ভালই হত। আমার অপছন্দের কিছুই থাকত না। যদি তোমরা একখানা ফটোও পাঠাতে তাহলে

হয়ত এতটা উদাস ও ভাবিত হয়ে পড়তুম না। সত্যি, বিশ্বাস করো, কেউই জোর গলায় স্পষ্টভাবে বলে নি তোমাকে দেখতে ভাল—তোমাকে দেখতে এমনিধারা। কেউ হয়ত বলেছে তোমার গায়ের রঙ ভয়ানক ফর্সা, চোখ ভাল। অথচ দেখ গায়ের রঙ চোখ মুখ আলাদা আলাদা ভাবে আমি মনের মধ্যে কত ভেঙে ভেঙে গড়তে পারি বলতো! কেবল তোমার যা একখানা জামার মাপ এসেছিল—লাল ব্লাউজ আর চুড়ির মাপ। আমি তাকেই কেবল দেখেছি। দেখেছি আর ভেবেছি। অথচ বলতো, ভাবনা হয় কিনা! যাকে বিয়ে করছি তার সম্বন্ধে এই এতখানি অপরিচিত হয়ে যাওয়া কেমন লাগে!" বলেই গলার শব্দ করল।

"হ্যাঁ, তোমার নিজের চোখে দেখে আসাই উচিত ছিল, নিজের দেখাই ভাল ছিল।"

তারপর শিশির নিস্তব্ধ থাকে কিছুক্ষণ। যেন আগে থেকে এতখানি অপরিচিত হয়ে থাকাটা হঠাৎ দুজনের দিক থেকে অপরাধের মত। এটাই এখন সে উপলব্ধি করল। এইমাত্র সে যেন আঘাত পেয়ে সেই অতীতে ফিরে যেতে চাইল। যেন বর্তমানে যতটুকু হয়ে গেছে তাকে থামিয়ে সে আবার অতীত থেকে সুরু করতে চাইল।

কিংবা হয়ত এও ঠিক, না-দেখে সে ভালই করেছে। হয়ত সে জন্যেই তার এতকরে ভাল লাগছে। দেখেশুনে বিচার করে ভালবাসা করে বিয়ে করে যারা—তারা ফুলশয্যার রাত্রে মেয়েটিকে অত্যন্ত নির্লজ্জ খুব নির্লজ্জ ভাবে নাকি? তার থেকে বরং ভালই করেছে। এটা এত নতুন। তার অপছন্দ আর কিছুই নয়, এই যে অতীতের ওপর তার এত দুঃখ। যেন এত তাড়াতাড়িতে সেটা বয়ে গেছে সে চোখ মেলে তাকায়নি। অতীতকে সে দেখেনি। সেই দুঃখ তার ছড়িয়ে থাকল। এবং সে ভাবল না, নিজে দেখলেই হয়ত ভাল হত। এ তো পুরনো হবার নয়। একে পুরনো মনে হয় না। হবার নয়। তারপর আবার ভাঙল, আবার সেই অন্ধকার দেখতে দেখতে দেওয়ালের ওপর পুরনো বহুরাতের অন্ধকার একই রকম দেখতে দেখতে ভাবল—পুরোনো পুরাতনই। হ্যাঁ, মেয়েটি ক্রমশ পুরনো হয়ে যাবে, যাবেই। সুতরাং বিয়ের আগে দেখলেই বা পুরনো মনে হবে কেন। তারপর সে ঝরঝর করে উঠল, অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থেকে পরে বলল, "দ্যাখো, ভাবনা হয় কিনা কতখানি যেন ক্ষতি করে ফেলেছি, আমি অতীতকে অবহেলা করেছি। তোমারও নিশ্চয় এ ভাবনা হয়েছিল—আমাকে কেমন দেখতে হবে। আমি কেমন মানুষ হবো এ বিষয়ে!"

"না। এ বিষয়ে আমার মোটেই সন্দেহ ছিল না। কেন না বাবা মার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি জানতাম তাঁরা আমাকে যা দেখে দেবেন কোনদিন তা খারাপ হবে না।"

বলতেই শিশির দমে গিয়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে তারপর থিতিয়ে উত্তরটা খুঁজে পেল। "হ্যাঁ, সেটা তুমি ঠিকই বলেছ। সেটা ত আদর্শের কথা। তোমার আদর্শের কাছ থেকে একথা বলছো। কিন্তু আসলে ওটা ত তোমার নিজস্ব কথা নয়। তোমার নিজস্ব কথা তোমার প্রাণের কথাটা কি! তোমার বুকের কাছে কি এই কথারই শব্দ ছিল। না তা নয়।" বলতেই নিঃশব্দ সুন্দর ও।

ওর চোখ সাদা, এই চাঁদের ঝকঝকে আলোয় সভ্যতার মত—সভ্যতার মত ওর ছোট কপাল ও দীর্ঘ ভ্রূ-পাখা নিস্তব্ধ। চোখের কাছে হাত ঢাকা। যেন কলঙ্ক চাঁদ ওর চোখের জন্যে সৃষ্টি করছে বা কাঁদিয়ে দিচ্ছে।

"একি কাঁদছো কল্পনা, কল্প! এবার থেকে তোমায় আর কল্পনা বলব না। তাহলে আমাকে তোমার সম্বন্ধে সর্বদা কাল্পনিক হয়ে থাকতে হবে। ওটা বড় দূরের জিনিস। এতদিন তুমি আমার কাছে কল্পনা ছিল, এবার কল্পনার আগের 'ক' আর শেষের 'না' রাখলাম। মাঝখানের 'ল্প'টা বাদই দিলাম। তোমায় কনা বলেই ডাকবো।"

"না আমায় তোমার পছন্দ হয়নি।"

"না না ওকথা বলচিনে। সে কি পছন্দ হয়নি কে বলল। এই দ্যাখো রাগ কোরো না। তোমার চুলের বর্ণনা দেব? তোমার গায়ের রঙ গোলাপের মত। তোমার বাবা আর মায়ের ফর্সা রঙ থেকে নিয়ে তুমি আরো ঘন ও গোলাপ হয়ে উঠেছো। উজ্জ্বলতায় এতখানি রঙ তোমার যার জন্যে রোদ্দুরে তোমার গায়ে বেশ লাগে, যেন গলে গলে যাবে মনে হয়। এতখানি রঙ তোমার। আর একটা কথা বলব। সাধারণত যে সব মুখ দেখলে আমরা তাড়াতাড়ি বলতে পারি সেই ঘুমের একটা দিক আছে, একটা দিকের মানে আছে, একটা রীতি আছে! যেমন চোখ স্বচ্ছ, নাক ভাল, একটুখানি মুখ। সব বুদ্ধিদীপ্ত, গালে টোলপড়া অবস্থা—এসব দেখলে আমার মুখ ছিমছাম মনে হয়। এক লহমায় দেখে এসব মুখকে লোকে ভাল বলতে পারে। কিন্তু যেমন তোমার পশমের মত পাতলা চুল, কপাল ছোট, চোখ বড়, সুন্দর, বড় ও কালো ভ্রূ দুটি বিশেষ করে বাঁকা ও অনেকদূর বিস্তৃত। ঠোঁটে তোমার তিল, ঠোঁটে তিল, অথচ সামান্য পুরু ঠোঁট তোমার—আমার খুব ভাল লাগে। আর এই তোমার মুখে ব্রন, তাও কেমন বয়েসের গন্ধ মাখান। এই যে নাক তেমন ভাল নয়, মুখে মানানসই, অথচ চোখ নত, সুন্দর ভুরু ও ঠোঁট, ঝিকমিকে দাঁত, চিবুক কানের লতি চুল এগুলি এত সুন্দর এমন ভাল মনে হয়! কোন সৃষ্টিকর্তা বা ক্রিয়েটারের মুখ এমনি হয়। কোন প্রতিভাবান লোকের মুখ এমনি হয়। হয়ত তার কেবল চোখ কিংবা নাক কিংবা ঠোঁট অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল হয়ে থাকে। মুখের সবটুকু জড়িয়ে হয়ত কোন মানে হয় না, কিন্তু এই এক একটি জায়গা হয়ত খুব ভাল হয়ে থাকে। কোন জননীর মত তোমার মুখের গড়ন। এত রঙ তোমার আহা রে! আমার তোমাকে ঠিক সেই রকম মনে হয়েছে। সেই সৃষ্টিকর্তার মত।"

ও হয়ত কিছুই বুঝল না। মোটেই বুঝল না। কিংবা হয়ত কিছু ভাবল। শিশির মেয়েটির লম্বা হাত, দীঘল চোখ, করুণ লজ্জা দেখল।

শিশির বলল, "তোমার শরীর খারাপ লাগছে কি!"

নিঃশব্দ।

শিশির আবার ওর কাছে সরে এসে বলল, "কী মনে হচ্ছে, খুব শরীর খারাপ লাগছে কি?"

"হুঁঃ। বুকটা কাঁপছে।"

"জল খাবে?"

বলতেই ও বসল।

শিশির কোনদিন কারো উচ্ছিষ্ট জিনিস খায়নি। এবার তার মনে হল, সে একজন মেয়ের ঘাম নোংরা থুথু রক্ত সব—সবই নিতে পারে। সে ত আলাদা নয়। সে মোটেই তার কাছে আলাদা হতে পারে না। কিছুতেই না একেবারে। এজন্যেই তার এই এঁটো জল দিতে সে লজ্জা পেল না।

"তোমার অনেক লজ্জা, এত লজ্জা পাওয়া কি ঠিক।" বলেই শিশির বলল, "মেয়েদের লজ্জা থাকাটাই ত ভাল, তাতে খুব বিশিষ্ট সুন্দর ও গভীর বলে মনে হয়। যে মেয়ের যতখানি লজ্জা, তার মানে তার ততখানি লজ্জার দরজা খুলে তার কাছে যাওয়া যায়।" তারপরেই বলল, "অবিশ্যি আমি জানি, এতখানি লজ্জা তুমি আমার কাছে আর রাখবে না, হয়ত কিছুটা আলগা করে দেবে।"

ও বলল, "পুরুষরা খানিকটা আন্দাজে আর খানিকটা না বুঝেই আমাদের সম্পর্কে কিছু জেনে ফেলে।"

এ কথা শুনেই শিশির থমকালো। ভাবল, তার এতখানি ধারণার ব্যাপারে হঠাৎ যেন মেয়েটি তাকে দমিয়ে দিল।

তারপরই শিশির মেয়েটির বসার কাছে নিজের বালিশ থেকে মাথাটা বিছানার ওপর নামিয়ে মেয়েটি যেখানে ঝোলা পায়ে খাটের কাছে বসেছিল, সেখানে মাথা রেখে শোয়া অবস্থায় ওর ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, একটা কথা শুনবে।" বলতেই কল্পনা চাইল।

আলোর দিকে তাকিয়ে শিশির বলল, "এই দ্যাখো, এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলাপন করেছি আসলে তা লোকে কেমনভাবে নিয়েছে, তা নিশ্চয় জানো। এতগুলো লোক কাছে ছিল, এতগুলো লোক কাছে থেকে মজা দেখবার মত পেয়েছে আলাপনটা, শুভ-দৃষ্টি। অথচ এটা আমাদের দুজনের মধ্যে দুজনের একান্ত নিজস্ব ও গোপনীয়। এটা এতখানি আনন্দের যে, লোকে দেখলে এর আলাদা মানে হয়। এটা খুব গোপনে হওয়া উচিত।" একথা বলার সঙ্গে শিশির জরি ও ফুলজড়িত রজনীগন্ধার মালা নিল, নিজে শোয়া অবস্থায় থেকে অলসভাবে একটি হাত দীর্ঘ করে ওর গলার কাছে আনতেই মেয়েটি তার নরম শাঁখের গলা কাত করে ধরে।

"এবার নিশ্চয় তোমার কী করা উচিত, একথা বলতে হবে না।" বলতেই ও ওর লম্বা হাত দিয়ে একটা শ্বেত মালা শিশিরের কাছে দুলিয়ে নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। ঘরের অন্ধকার যেন ভাবতে থাকে। শিশির তার হাত দিয়ে ওর হাতখানা গলা ও গালের কাছে নিয়ে কানের লতির কাছে রাখতে রাখতে আস্তে আস্তে নিজের শব্দটাকে অনুভব করছিল। পরে হাতখানা মেয়েটির বুকের কাছে আনতেই ওর হাতে বাধা পেল। তার লম্বা সুন্দর আঙুলের মত হাত শব্দ তুলে শিশিরের হাতটাকে নীচে সরিয়ে রাখল। তাতে দুঃখ পেল শিশির ও নিজের সম্বন্ধে তার খারাপ ধারণা এল।

শিশির ওর সুন্দর হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই হাতটা, এই হাত আমায় বাধা দেয়, এই হাত আমায় বাধা দেবে। আমি এর আগে ত তোমায় দেখিনি, একদম নয়। যখন বিয়ের রাতে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, তখন তোমার মুখে পান-ঢাকা। সুতরাং তখন মুখে পান-ঢাকা দেওয়া দুটি লম্বা সুন্দর হাত প্রথমেই দেখি। দুটি লম্বা হাত প্রথমেই দেখে চমকে উঠেছিলাম। চমকে বুকের কাছে ব্যথা অনুভব করেছিলাম। আহা। আমি রঙ ও গড়ন দেখার আগে, এমন কি, মুখ পর্যন্ত দেখার আগে (অবশ্য মুখ তখন হাত দিয়ে চাপা ছিল) এই দীঘল হাত দেখে চমকে যাই। এই হাতটাই যেন আমাকে সরিয়ে দিচ্ছে, চিরকাল ধরে আমাকে সরিয়ে দেবে, এটা আমায় সরিয়ে দেবে। আহারে, তোমার সুন্দর হাত"—বলেই শিশির ম্রিয়মান হয়ে গেল।

সামান্য হাওয়া ছিল, তাতে জানলায় শব্দ করল, পর্দা কেঁপে উঠল। তখনও ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ, প্রায় বিছানার সংলগ্ন চাঁদ খানিক অদৃশ্য, খানিক কলঙ্কের অংশ দেখা যাচ্ছে। জানলায় হাত দিল শিশির। "কল্পবালা—তোমার ঘুম ধরেছে কি?"

"না।"

"তবে শোনো না।"

শব্দ করল।

"কল্প, তোমায় নিয়ে আমি সুখী হতে চাই। অথচ দ্যাখো এই যে—তোমার আমার মধ্যে এত সুখের কথা, এর মধ্যে একমাত্র বাধা হয়ে আছে দেহটা। তুমি কোনদিন পুরনো হবে না। মাঝে মাঝে তুমি সন্দেহ করো, আমি সন্দেহ করি—তুমি কি আমায় সন্দেহ করো?"

"না।"

"তুমি?"

"আমিও না।"

"তবুও দ্যাখো এই যে দেহ, এত জানা-শোনার পরও তুমি আমি মন থেকে কি সন্দেহ করি, কত সন্দেহ থাকে। হাজার ভাবের পর আবার সন্দেহজড়িত বাধা। মনের ছবি ত আর দেখা যায় না। বড়জোর তাকে ভেবে নেওয়া চলে। কিন্তু তা পাল্টায়: ক্রমেই পাল্টায়। সে কারণেই তোমার আমার মধ্যে এই নতুন, চিরকালের এই নতুন ব্যবধান আছে। আমি একে স্বীকার করছি। মনের এই ব্যবধান থাকবেই। নিত্য অচেনা সন্দেহ। সন্দিগ্ধ মন। তাই তুমি আমি কেবল নতুন। এখানে বাধা সৃষ্টি করার বস্তু একমাত্র দেহ। দেহটাই বাধা হতে যাচ্ছে মনের। অথচ দেহ থাকলে মনটাও কি উঠবে ছাই। কল্প শুনবে একবার!" বলেই সুন্দর কানের কাছে ডাকল—"কল্প!"

ও শব্দ করল। সেই শব্দে যা কেবল ওর চোখের সাদাটে অংশ একবার আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের রঙ, আকাশ দেখল।

"কল্প!"

"উঁ!"

"কল্প, তুমি! তোমার বয়স কত?"
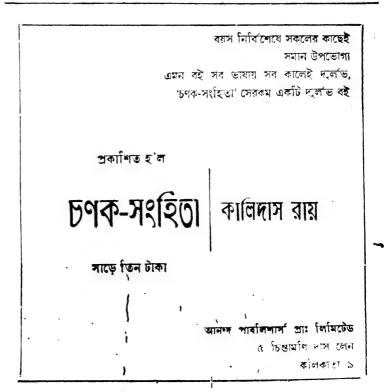
কুহু করে এ সময় হঠাৎ কোকিলের শব্দ বাইরে আকাশের কাছে ছুটে গোল হয়ে যায়।

"তোমার হাতের গড়ন কেমন জানো।"

ও নিশ্চুপ থাকে। কেবল এই শব্দটি গোল হয়ে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মিশে যায় হাওয়ায়। কোকিলের ডাক চূর্ণ হয়ে হয়ে চূর্ণ হয়ে হয়ে ভেঙে যেতে থাকে।

"এই শোনো।"

নিস্তব্ধ।

"এই শোনো, আমি বড় প্রেমে কাতর, কোনদিন প্রেম করি নি, প্রেম কাকে বলে তা জানি না।"

বলতেই মেয়েটি নিস্তব্ধ থাকে, আর কোকিল ডেকে ডেকে সারাটি অন্ধকারে কম্পন তুলে সারাটি অন্ধকার রাত্রির ওপর কয়েকটি কালো কালো দাগ কেটে যাচ্ছিল। কয়েকটি কালো কালো স্রোত, সুরের জাল বুনে যাচ্ছিল। আর সেই মুহূর্তকে চিন্তা করে চিন্তা করে শিশির ভয়ানক আশ্চর্য বোধ করছিল।

"এই শোনো।"

নিস্তব্ধ, কেবল হাওয়া ঘুরতে থাকে।

কোকিল ডেকে ডেকে যেন রাত্রিতে ছড়িয়ে পড়ে। শিশির তার প্রশ্নগুলোকে এই শব্দের মধ্য দিয়ে পেঁৗছাতে চাইছিল। আর বার বার শব্দগুলো তরল আছাড় খেয়ে পড়ছিল। তরঙ্গায়িত হয়ে দুলে দুলে উঠছিল। হাওয়া আসছিল, প্রচুর হাওয়া তার জানলা দিয়ে ঢুকে পর্দা কাঁপিয়ে কাচ আলমারি ফুলদানি সব কিছুকে শব্দ করে করে নাড়াচ্ছিল। আর শিশির বাতাস ঘাটছিল। বাতাসের মধ্য দিয়েই তার কাঁপা কাঁপা শব্দ করছিল। "কম্প জানো, তোমার যতটুকু দেখেছি তাতে খুব গম্ভীর ও করুণ মনে হয়েছে, জানি না হাসলে তোমায় কেমন দেখাবে!"

জানলার পর্দা উড়ছিল, শব্দ আসছিল। শিশিরের প্রশ্নের পর মেয়েটির নিস্তব্ধতার পর কোকিল ডাকে ডাকে।

"আমি তোমায় সন্দেহ করি না, তুমি কি আমায় সন্দেহ করো।" কথাটি ভাঙছিল বার বার। শিশির মেয়েটির কথা শুনল না, শুনতে পেল না।

শিশির ভাবলো সে কথা বলবে না। মেয়েটি ভাবল সে কথা বলবে না। সুতরাং শব্দটা উঠতে থাকবেই। দুজনের মাঝখান থেকে এই শব্দটা ঘুরবেই।

শিশির আবার কথা কইতে থাকবে। মেয়েটি যেমন করেই হোক নিস্তব্ধ থাকবে কিন্তু সে কতক্ষণ কতক্ষণ! ভাবতে ভাবতে শিশির মেয়েটির ঘাড় মাথা পিঠ লক্ষ্য করতে লাগল।

মেয়েটি কথা বলে না। মেয়েটি ভাবল সে কথা বলবে না, সে কেবল ঘামবে সিক্ত হবে, সে ঘামবে, সিক্ত হবে। ছেলেটি ভাবল সে একাই কথা বলবে না চুপ হয়ে যাবে। কিন্তু ছেলেটিকে ভাবতে হল, সে আবার কথা কইবে। কথা কইতেই হবে। কিন্তু কী কথা কইবে কী প্রসঙ্গ, সেই প্রসঙ্গের জন্যেই অপেক্ষা করল।

মেয়েটি ভাবল সে কথা বলবে না। ছেলেটি আরো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক, সে কথা কইবে না। ছেলেটি ভাবল সে কী কথা কইবে। সে কী কথা বলবে সেই ইচ্ছাটা তার মাথায় ঘুরতে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে গোল হয়ে গেল বায়ুমণ্ডলে। সেই ইচ্ছাটা তার বায়বীয় হয়ে ঘুরতে লাগল।

এমন বহুদিনের অন্ধকারে বসে বসে সে যখন ভাবল তার দেহে পরিবর্তন এনে দিচ্ছে, অনেক পরিবর্তন, পৃথিবীর বিভিন্ন শব্দয় সে কান খাড়া রাখল। রাত্রি তার পিছনে অন্ধকার প্রচ্ছদ হয়ে ঝোলে। অন্ধকারে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভাবে—মেয়েটি অনেক কথাই হয়ত বলে না, আর সেই না-বলা কথাই দীর্ঘ হয়ে লম্বা হয়ে অনেকখানি বড় হয়ে যায়। মেয়েটিকে দীর্ঘ মনে হয়। অন্ধকার বায়ুমণ্ডলে পিছনদিক ফেরা মেয়েটিকে ফর্সা পৃথিবীর মত মনে হয়। এই সন্দেহ থেকেই তাকে নতুন লাগে। নিত্য নতুন রকমের দিক নির্ণয়। একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে শিশির দুঃখের মত মুখ নিয়ে দীর্ঘ হয়ে যাওয়া মেয়ের কাছে তার বোধকে লম্বা করে ধরে। তার বিস্মৃতপ্রায় অতীত থেকে প্রেম কি, জীবনের প্রেম সম্বন্ধীয় নানা জটিল প্রশ্ন ছড়িয়ে আসে। আর সে বাবা মা ভাই বোন এদের প্রীতি ভালবাসা স্নেহ সম্পর্কীয় ভূখণ্ড থেকে অন্য এক নিষিদ্ধ পারে এসে ভাবতে পারে আমি আমার বাবা মা ভাই বোন এদের প্রীতি মমতা ভালবাসা ভুলেছি, ভুলতে পারছি। ভুলিয়ে নিয়ে অন্য এক রমণীর কাছে আমার পরিপূর্ণ বয়স পায়ে পায়ে গোপনে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি একজন পরিপূর্ণ যুবক। আমি প্রেম সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি—সেখানে অবতীর্ণ।

সেই আবর্তিত প্রেমের কাছে, প্রেম সম্বন্ধে আমি—আমরা আবিষ্কারক হয়ে দাঁড়ালাম।
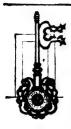
প্রবন্ধ-সাহিত্য

যুগপরিক্রমা — শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রকাশক: সেনগুপ্ত ট্রাস্ট, '২২।২৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯। আট টাকা।

নরেশচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর রচনার রসমূল্য বিষয়ে সমালোচক-সম্প্রদায় আজ যে-ধারণাই পোষণ করুন, একটি কথা নিশ্চিত যে, আধুনিক মনন ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব একটি অনিবার্য পরিমণ্ডল রচনা করে আছে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের দ্বারোদ্ঘাটন রবীন্দ্রনাথ করে গিয়েছেন। সেই বিশ্লেষণী পদ্ধতিটিকে বিজ্ঞানসম্মত একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে নরেশচন্দ্র এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে আমরা তাঁর নিকট বিশেষরকম অধমর্ণ বলে বোধ করি।

তাঁর রচিত 'যুগপরিক্রমা' নামক প্রবন্ধমালা পড়তে গিয়ে আনন্দিত হয়ে লক্ষ করলাম যে সৃজনস্বভাবী এই সাহিত্যিকের সৃষ্টির অন্তরালশায়ী মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তির অসামান্যতা ছিল। বিশ্বসাহিত্যের উপন্যাস ও কথা-কাহিনী সম্পর্কে তাঁর ক্ষুরধার পর্যালোচনা পাঠ করে মনে হলো আজও তাঁর অধিকাংশ ভাবীকথন এবং অন্তর্দৃষ্টি-প্রসূত সত্যোক্তি অব্যর্থ। এ-বইয়ের সর্বাধিক উল্লেখ্য প্রবন্ধ 'সাহিত্য-ধর্মের সীমানা' আজও প্রাসঙ্গিক এবং উদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এই প্রবন্ধের অবতারণা—এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর কনিষ্ঠ সমকালীনদের সচেতন অস্বস্তি ও সতর্ক মনীষার ছাপ এখানে লক্ষ করবার মতো। রচনাটি আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের একটি উদ্ভাসিত অভিজ্ঞান।

বইটির ব্যাপক সমাদর একান্ত কাম্য। সাহিত্য শিক্ষকগণের কাছে বইটি অবশ্যপাঠ্যের কোঠায় পড়ে।

তবে, সংকলনটির দাম কি একটু বেশী নয়? (৫৪০।৬১)

উপন্যাস

সায়লা পোখরী—সৌরীন সেন। অমর লাইব্রেরী: ৫৪।৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

শ্রীসৌরীন সেনের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ঘটনার ঘটনায় ততখানি নয়, যতখানি তা চরিত্রগুলির নাটকীয়ত্বে। তা ছাড়া তথাকথিত নায়কও তিনি সৃষ্টি করেন না। অসং সোনা যেমন তাঁর উপন্যাসে নায়কত্বের দাবি করতে পারে, ভালো মানুষ কুশলও প্রমাণ করতে পারে যে সেও অবহেলার যোগ্য নয়। যা হোক, উপন্যাসটির কাহিনী চট্টগ্রাম থেকে এসে 'সায়লা পোখরী'তে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সোনা জীবনে দুটি জিনিসই জানে—নারী আর কন্ট্রাক্টরি। ছিল চা-ওয়ালা, যুদ্ধের কৃপায় হল কন্ট্রাক্টার। মনটাও তার পরিবেশানুরূপ। চট্টগ্রামকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কলকাতায় এসে ফাটকা খেলল, বিয়েও করল শীলাকে। সোনার জীবনে কখনো উত্থান, কখনো পতন। প্রয়োজন হলে শীলাকেও বন্ধক রাখতে পারে। কিন্তু দার্জিলিং-এর 'সায়লা পোখরী'তে তার কোনো কায়দাই খাটলো না। শীলার প্রতিও অত্যাচার চালায়।

নতুন চিন্ময়ীকেও পেয়েছে। আবার সায়লা পোখরীর ফরেস্ট অফিসার কুশলকেও যেন অগ্রাহ্য করে। কুশল চায় শীলাকে রক্ষা করতে। সোনা তা জানতে পেরে চিন্ময়ী আর শীলাকে নিয়ে গেল এক নিভৃত স্থানে। সেখান থেকে সে চিন্ময়ীকে গভীর খাদে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর ছুটন্ত শীলাকে হত্যা করে আর কি। কুশলের হাতের বন্দুকে গুলীবিদ্ধ একটা বাঘ হত্যা করলো সোনাকেই। এই অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল যে শীলা, সে কুশলের স্পর্শে জেগে উঠল।

কাহিনীর মোটামুটি বিচার করে বলা যায় যে পাঠকমনে সেন্সেসন জাগানোই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। চরিত্রাংকনে দক্ষতা নেই। চরিত্র 'টাইপ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোনা এবং কুশলই তার প্রমাণ। লেখক অনেক সময় কার্যকারণ থেকেও বিচ্যুত হয়েছেন। সোনা চিন্ময়ীকে ফেলে দিল খাদে—তার কি কোনো কারণ থাকতে পারে না? যাহোক না থাক, সোনার কি অন্তর্জিজ্ঞাসাও ছিল না, এসব প্রশ্ন মনে জাগে। অন্যান্য চরিত্রগুলি যথাযথ হয়েছে।

৪৫৮।৬১

ডাকো নতুন নামে—প্রশান্ত চৌধুরী। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: চার টাকা।

উপন্যাসটির আঙ্গিকে অভিনবত্ব থাকলেও এর কাহিনী নাটকীয়—যা চলতি সিনেমা-শিল্পের জনাকর্ষক অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য উপন্যাসটির প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এর ঘটনাবিপর্যয় শুধু বাংলাদেশের সীমার মধ্যে গণ্ডীভূত নয়। যে সব চরিত্র লেখক এই উপন্যাসে অংকিত করেছেন, তারা বাঙালী এবং অবাঙালী। অবাঙালী মাধোলাল কুম্ভমেলায় পেয়েছিল একটি ছেলেকে। মাধোলাল সেই ছেলের নাম রাখলো সুন্দরলাল। মাধোলালের প্রকৃতি ভাল নয়। তবু আশ্চর্যরকম ভালবাসে সুন্দরলালকে। মারা যাওয়ার আগে দুই ছেলেকে অর্থকড়ি না দিয়ে, তা দিয়ে গেল সুন্দরলালকে। এই কারণে সুন্দরলালের সংগে মাধোলালের দুই ছেলের ঝগড়া বাধলে সে পালিয়ে গেল। দু-ভাইয়ের একজন নিহতও হল। অন্য ভাই সুন্দরলাল ভেবে যাকে হত্যা করলে সে সুন্দরলাল নয়, নিতাই। হঠাৎ একদিন নিতাই-এর ছেলে গোপাল আত্মগোপনকারী সুন্দরলালকে 'বাবা' ভেবে বাড়ি নিয়ে গেল। সে নিতাই ভেবে সেখানেই থাকলো। পরে জানা গেল, সে নিতাইয়েরই যমজ ভাই গৌরচরণ। গৌরচরণই হারিয়ে গিয়েছিল কুম্ভমেলায়।

কাহিনীতে নতুনত্ব ত নেই-ই; বরং পচা ইংরেজী গল্পের নকলপনা রয়েছে। তবে লেখকের শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। চরিত্রাংকনে যেমন তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি গল্পের সূত্রকে কোথাও ছিন্ন হতে দেননি। মাধোলালের চরিত্রের বৈপরীত্যভাব যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি ললিতা চরিত্রটিও সুন্দরভাবে অংকিত হয়েছে। ৪৫৯।৬১

কবিতা

তোমার প্রতিমা—তারাপদ রায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ২২।১, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬ থেকে প্রকাশিত। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় বাংলা কবিতার আসরে নিজস্ব একটি আসন অধিকার করে রয়েছেন। বাক্‌পদ্ধতি ও বক্তব্যের অন্বিত-সাফল্যে তাঁর কবিতাবলী উজ্জ্বল। এবং জগৎ ও জীবনকে নিরীক্ষণ করার একটি স্বকীয় দৃগ্‌ভঙ্গি তিনি অর্জন করেছেন বলে পাঠকের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেন।

'তোমার প্রতিমা' গ্রন্থে তিনি সাম্প্রতিক পাঠকের কাছে একটি নূতন ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সম্প্রতি তিনি বিভিন্ন সাময়িকীতে যেসকল কবিতা রচনা করেছিলেন, সেগুলি প্রধানত স্যাটায়ারশাণিত। সেই সব স্যাটায়ারের অন্তরালে যে বেদনা লুকিয়ে ছিলো না, এমন কথা বলি না। কিন্তু কৌতুকসমৃদ্ধ প্রকাশরীতিটি প্রায়শই আমাদের কাছে অনন্য একটি আকর্ষণ বিস্তার করে মুখ্য হয়ে উঠতো। 'তোমার প্রতিমা' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে, লক্ষ করেছি, বেদনাই কবির বক্তব্য ও ভূষণ। সেই বেদনা, মননে ও রূপায়ণে, অবিস্মর্তব্য হয়ে উঠেছে।

উৎসর্গপত্রের সংগে সন্নিবিষ্ট অপূর্ব কবিতাটি উদ্ধৃত করি:

> সমুদ্র শংখের চুড়ি,
> রাগরক্ত সিঁথির মহিমা
> আদিগন্ত স্মৃতিভার
> সঞ্চারিতা নীলাঞ্জনা শ্যামা
> অক্ষম পটুয়া আমি,
> আমি ব্যর্থ সাজাতে পারি না
> স্মরণ শোভন রূপে,
> হে মৃন্ময়ী, তোমার প্রতিমা।

স্বদেশ-বন্দনার এই গাঢ়স্বর স্তোত্রটি যেমন, তেমনি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতাই আমাদের অভিভূত করে। যখন স্বদেশ-এষণা সাহিত্যে অনাদৃত, যখন অস্পষ্ট থিয়োরির ব্যর্থ সম্মোহনে অনেকেই নিমগ্ন, সেই মুহূর্তে বধির অরণ্যে দাঁড়িয়ে জননীর নামে রোদন করার এই সংসাহস তাঁর আছে বলে তারাপদ রায় দেশবাসীর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করবেন, এইটেই একান্ত স্বাভাবিক।

প্রেমের স্মৃতিঘন কবিতাও আলোচ্য সংগ্রহে উপস্থিত। কিন্তু সেই প্রেমও একটি স্বদেশজ সৌরভে অভিনব গরিমা পেয়েছে।

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় অংকিত প্রচ্ছদ স্নিগ্ধ ও গ্রন্থানুগ। (৩৯৭।৬১)

ভ্রমণ-সাহিত্য

পশ্চিম দিগন্ত—ধীরেন্দ্রলাল ধর। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

ধীরেন্দ্রলাল ধর কিশোর পাঠকদের কাছে একটি রোমাঞ্চকর নাম। তাঁর রচনারীতি সরস এবং সহজ। পশ্চিম দিগন্ত তাঁর ভ্রমণপঞ্জীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই বই শুধু কিশোর পাঠককে নয়, বয়স্কজনকেও খুশী করবে।

এই ভ্রমণবিবরণী যথাক্রমে আমেদাবাদ, প্রভাস, সোমনাথ, জুনাগড়, গিরনার, দ্বারকা, ভেটদ্বারকা, আবু পাহাড়, অচলগড়, বোম্বাই, কানাহরি, যজ্ঞেশ্বরী, এলিফ্যান্টা, ইলোরা, দৌলতাবাদ, ঔরংগাবাদ, অজন্তা,

জব্বলপুর, ভূপাল, সাঁচী, বিদিশা, ঝাঁসী, খাজুরাহো, পান্না ও সারনাথকে স্পর্শ করেছে। এ শুধু প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা নয়, অন্তরঙ্গ প্রেমিকের বিবরণী। এক-একটি জায়গার স্থানিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য যেমন বর্ণনা করতে লেখক সিদ্ধহস্ত, তেমনি সেই সব জায়গায় নিহিত রহস্য জ্ঞাপন করতেও তিনি সপ্রতিভ। যাঁরা ভারত-ভ্রমণে উৎসুক, এ বই তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করবে। ভারত-তীর্থের অন্তরাত্মা এই গ্রন্থে অপূর্বরূপে অভিব্যাপ্তিত হয়ে আছে।

সংযোজিত বৈশিষ্ট্য কয়েকটি আলোক-চিত্র। অনেক অনতি-খ্যাত অথচ দর্শনীয় বিষয়বস্তু সেই আলোকচিত্রাবলীতে উপস্থিত।

আমরা বইটির বহুল স্বীকৃতি কামনা করি। কেননা বইটির ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিরাট একটি পরিসরের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আন্তরিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। (৩৩০।৬১)

ধর্ম ও দর্শন

কালী-কীর্তন (৫ম খণ্ড)—স্বামী সত্যানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা—৩৬। দাম—৭৫ নঃ পঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম খণ্ড (আলোচনা)—ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই। গ্রাম—পলাশী, পোঃ মাঝিপাড়া, জেলা—২৪ পরগনা। দাম—৭৫ নঃ পঃ।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু মহাবাণী—শ্রীনরেন্দ্রলাল বসু প্রকাশিত। মহাউদ্ধারণ মিশন: ১ডি, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা—১৪। মূল্য—৭৫ নঃ পঃ।

প্রথম পুস্তিকাটিতে পদাবলীর আকারে কীর্তন-গানে কালীর রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো পদে কাব্য-সৌন্দর্য থাকলেও কবিহৃদয়ের ভক্তি-আকূতি কীর্তনগুলির প্রধান গুণ। ভক্তরসিকদের কাছে কালী-কীর্তন আদরণীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় পুস্তিকাটিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর উদ্ধৃতি ও তার আলোচনা করেছেন লেখক। বেদের যেমন ভাষ্য প্রয়োজনীয় হয়, তেমনি রামকৃষ্ণ কথামৃতের তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য আলোচনাগুলি মূল্যবান মনে হবে। আলোচনায় পাণ্ডিত্যের দম্ভ নেই, সহজ উপলব্ধি প্রকাশ রয়েছে। এ ধরনের আলোচনা আরো অধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় পুস্তিকাটিতে প্রলয়বার্তা প্রচারের সঙ্গে প্রলয় হতে রক্ষার উপায় বর্ণিত হয়েছে। শ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ভক্তমণ্ডলীর কাছে পুস্তিকাটির মূল্য থাকলেও সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়।

৪৯৫।৬০, ১৮৯।৬০, ৩৩৩।৬০

বিবিধ

চিকিৎসা-বিদ্যার ইতিহাস—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম বি বি এস, আয়ুর্বেদাচার্য। সাধনা প্রকাশনী, ৩৬ সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর কলিকাতা-৪৮। মূল্য ১·৩৭ নয়া পয়সা।

বইখানিতে গ্রন্থকার সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রাগৈতিহাসিক হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা দেশের ও নানা পদ্ধতির চিকিৎসা বিদ্যার বর্ণনা লিখিয়াছেন তবে ভারতে প্রচলিত আয়ুর্বেদের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। লেখক প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এইজন্য উভয়বিধ শাস্ত্র আলোচনা করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছে।

"শীতপ্রধান দেশের উপযোগী ঔষধপথ্য চিকিৎসার বিধি-ব্যবস্থা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তেমন কার্যকরী হতে পারে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে অপকারী হতে পারে। এজন্য আয়ুর্বেদের বিধিবিধান ঔষধ পথ্য চিকিৎসার প্রণালী—যা এদেশেই বহুকাল অতিশয় কার্যকরী রূপে অনুসৃত হয়েছে এবং এখনও যার ওপর এদেশের বহু লোকের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তা নিয়ে প্রাচীনতম আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে কালোপযোগী করে তোলবার জন্যে গভীর গবেষণা করা নিতান্ত প্রয়োজন।" লেখকের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ৬৭৭।৬১

নিকোলাস নিকল্‌বি। অনুবাদ—সুধীন্দ্রনাথ রাহা। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড। ২১, ঝামাপুকুর লেন; কলিকাতা ৯। দাম—দু' টাকা।

চার্লস্ ডিকেন্সের বিখ্যাত গ্রন্থ "নিকোলাস নিকল্‌বি"র ছোটদের উপযোগী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এটি। অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ রাহা এর আগেও একাধিক খ্যাতনামা বিদেশী লেখকের নাম-করা গ্রন্থ ছোটদের জন্যে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এই গ্রন্থটির অনুবাদও তাঁর সেই পূর্ব-অনূদিত বইগুলির মতই সুখপাঠ্য ও সাবলীল। (৪৮৭।৬১)

তিন পকেট হাসি—প্রবুদ্ধ। পূরবী প্রকাশনী। ১৩, পটুয়াটোলা লেন; কলিকাতা ৯। দাম—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়াপয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের আগের দুটি বই "এক পকেট হাসি" ও "দুই পকেট হাসি"র মতই প্রচুর হাসির চুটকি ও কার্টুনে ভরা। সময় কাটাবার জন্যে যাঁরা হালকা কিছু পড়তে ভালবাসেন এবং "এক পকেট হাসি" ও "দুই পকেট হাসি" যাঁদের ভাল লেগেছে, "তিন পকেট হাসি" তাঁদের খুশী করবে। (৪৯২।৬১)

পত্রিকা

ব্রিটেনের চিত্র—সেণ্ট্রাল অফিস অফ ইনফরমেশন, লণ্ডন। ভারতে অবস্থিত বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস প্রকাশিত।

শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, জনসেবার ব্যাপারে এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ও বৃটেনের লোকের ব্যক্তিগত নব নব প্রচেষ্টার সচিত্র বিবরণ এতদিন যা ইংরাজী ভাষায় এ দেশে পরিবেশিত হচ্ছিল বর্তমানে তা ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। আলোচ্য সাময়িক সুমুদ্রিত প্রকাশনটির মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠক বৃটেন সম্পর্কে জানবার সুযোগ লাভ করবেন।

স্পন্দন—সম্পাদক: শ্রীজীবন ভৌমিক। ১, রাজকৃষ্ণ কুমার স্ট্রীট, বেলুড় মঠ, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। মূল্য ৫০ নঃ পঃ।

"জীবিকার উনুনে জীবনটাকে গুঁজে দিয়ে কেবলমাত্র নির্জীব নির্লিপ্ত একটা মাংসপিণ্ডের মত স্থবির না থেকে...নিজের সেবায়, নিজের সংস্কারে স্বীয় শক্তিকে যথাসাধ্য প্রয়োগ" করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত বালি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ প্রকাশিত আলোচ্য স্মারক গ্রন্থ। প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের রচয়িতাদের মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় ব্যক্তি এবং কতকগুলি রচনা পরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের। অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, শ্রীস্বদেশ বসু, অধ্যক্ষ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প এবং সর্বশ্রী দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, আনন্দ বাগচী, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রভৃতির কবিতা।

স্মরণে—হুগলি ট্রাস্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৪২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬।

বাঙালীকে ব্যবসাবাণিজ্যে উদ্যোগী করার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রেরণা ও প্রচেষ্টার স্মরণে আলোচ্য পুস্তিকাখানি প্রকাশিত। আচার্য রায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর বক্তব্য ও বাণীর নির্বাচিত অংশের সংকলনটি ব্যবসাবিমুখ বাঙালীকে নতুন করে প্রেরণা দেবে।

স্বাক্ষর—সম্পাদক শ্রীজিতু গুপ্ত। ভারতী লেখক সংঘ। ১২এ, অভয় বিদ্যালংকার রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। মূল্য সাধারণ ১·৫০ নঃ পঃ, বোর্ড বাঁধাই: ২ টাকা মাত্র।

ভারতী লেখক সংঘের আলোচ্য সংখ্যাখানি কতকগুলি কবিতা ও ছোট গল্পের সংকলন। অধিকাংশ লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা কয়টি সংখ্যাখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

ইন্দ্রপুরী—সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সাহা ও শ্রীলক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শারদীয়া দীপালি-সংখ্যা (১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)। ৪৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫০ নঃ পঃ।।

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী ও নাটিকায় সমৃদ্ধ হইয়া এই সংখ্যাখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রখ্যাত লেখকগণের মধ্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, আরতি নন্দী ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত আরও অনেক নবাগত লেখকের অবদানও রহিয়াছে।

প্রাপ্তিস্বীকার

সাহিত্যচিন্তা—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

তুমি মাতা তুমি কন্যা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মিলক গ্রহে মানুষ—অদ্রীশ বর্ধন।

পত্রলেখা—কামাখ্যাশংকর গুহ।

গাঁয়ের নাম কেয়াপুর—দীপককান্তি দে।

তুষার থেকে সাগর—শ্যামলবিহারী সরকার।

একটি মুখ তিনটি মন—বাসুদেব সাহা।

ঝরনাতলার নির্জনে—চিত্ত ভট্টাচার্য।

মণিমেলা—নীলমণি ঘোষ।

চৌধুরী বাড়ি—বিশ্বনাথ রায়।

তুলাদণ্ড—মণি গঙ্গোপাধ্যায়।

সমাজ-সমীক্ষা অপরাধ ও অনাচার—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

গীতবিতান পত্রিকা। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত।

চন্দ্রশেখর

বহুরূপীর "বিসর্জন"

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বহুরূপীর নবতম উপহার "বিসর্জন" কলকাতায় গত ১০ই ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যনাটক সংঘাত ও বেদনার এক অশান্ত ঘূর্ণিবাত্যায় যেন আন্দোলিত, অঙ্কে অঙ্কে বিকশিত। শক্তিসাধক রঘুপতির প্রচণ্ড ক্রোধ ও ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা এই ঘূর্ণিবায়ুর একটি প্রবল ঝাপটা। এর আঘাতে শিষ্য জয়সিংহের হৃদয় উত্তাল সংশয়ে আলোড়িত। অপর্ণার বেদনা বিদ্যুতের ক্ষণিক ঝলকের মত দেখা দিয়েই মুহূর্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। প্রেম ও অহমিকা, অভিমান ও অন্ধবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে অসহ্য হয়ে ওঠে গুণবতীর অন্তরের অস্থিরতা। সংস্কার ও সত্যের বিরোধ এক সর্বনাশা ঝটিকার রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ঝড়ের সামনে শান্ত, অচঞ্চল, আপন বিশ্বাসে অটল শুধু গোবিন্দমাণিক্য। কিন্তু প্রলয়ের বেগ শেষ পর্যন্ত এসে থামে সংশয়ক্লিষ্ট, যন্ত্রণাদগ্ধ জয়সিংহের বুকে। আপন বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে আত্মবলি দেয় সে দেবীর চরণে। অর্ঘ্যরূপে ঢেলে দেয় রাজরক্ত। দুঃসহ আঘাতে রঘুপতির আজন্ম বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিটি নড়ে ওঠে। এক মর্মান্তিক "ট্র্যাজেডি"র অবয়ব হয়ে বেঁচে থাকেন রঘুপতি। তাঁর নয়নের ক্রোধাগ্নি অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। তার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিহিংসা মিশে যায় নিদারুণ চিত্তদাহে। গুণবতী মুক্তি চায় প্রেমে, গোবিন্দমাণিক্য নিজকে খুঁজে পান সত্য ও মানবতার উদার প্রশান্তিতে, অপর্ণা রঘুপতিকে হাত ধরে নিয়ে চলে মহত্তর বিশ্বাসের পথে।

গতির পর পরিণতি, বিক্ষোভের পর শান্তি। এক সংঘাতময় ও বেদনাময় গতিবেগে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" কাব্যনাটকটি অনুরণিত, বহুরূপী পরিবেশিত "বিসর্জন"-এর মঞ্চরূপে তা বিসর্জিত নয়। সম্মিলিত সুচারু অভিনয় ও সুষ্ঠু প্রয়োগ-নৈপুণ্যের গুণে তা আশ্চর্য সুন্দররূপে মঞ্চ-নাটকটিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এবং নাটকের যবনিকায় সকল সংঘাতের অনিবার্য পরিণতির ছন্দটি প্রশংসনীয়ভাবে অনুসৃত।

বাইরের সংগ্রাম ও অন্তরের দ্বন্দ্বে উদ্বেলিত "বিসর্জন" কাব্যনাটকটিতে প্রতি মুহূর্তের ঘটনাপ্রবাহে যে মর্মসঞ্চারী আবেগকণা এবং অস্থির কৌতূহলের রস দানা বেঁধে উঠেছে, মঞ্চ-নাটকটি সে রসের ধারায় উজ্জীবিত। নাট্যরূপকার কাব্যনাটকটির প্রধানতম একাধিক চরিত্রের মর্মমূলে অতি স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেছেন এবং ভাবে ও বক্তব্যে অবিকৃত রেখে চরিত্ররাজিকে মঞ্চে উপস্থিত করেছেন।

কাব্যনাটকটির গুণবতী চরিত্রটি এই নাট্যপ্রয়াসে কিছুটা অবহেলিত। এবং নাটকের কোন কোন দৃশ্যে চড়া সুরের "মেলোড্রামা"র অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু এ-সত্ত্বেও মূল রবীন্দ্র-রচনার অন্তঃপ্রবাহী রস ও স্বাদ নাটকটিতে সুরক্ষিত। বহুরূপীর এই সর্বাধুনিক নাট্যপ্রয়াস তাই নিঃসন্দেহে রসিকজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবে।

এই নাটকের প্রধান সম্পদ অভিনয়। প্রথমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করতে হয় জয়সিংহের রূপসজ্জায় শম্ভু মিত্রকে। চরিত্রটির সংশয়জ্বালা ও অন্তরদাহ শ্রীমিত্র তাঁর অনবদ্য অভিনয়-কুশলতায় অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করে রাখে, নাটকটির মর্মরসের সঙ্গে দর্শকদের অনায়াসে পরিচয় করিয়ে দেয়। এমন মঞ্চাভিনয় বিরল।

তাঁর পর অভিনয়-দক্ষতার জন্য আর যে দুই শিল্পী দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা পাবেন তাঁরা হলেন রঘুপতিরূপী অমর

বহুরূপী প্রযোজিত "বিসর্জন"-এর একটি দৃশ্যে জয়সিংহবেশী শম্ভু মিত্র ও রঘুপতির ভূমিকায় অমর গাঙ্গুলী

সিটিজেন্স ফিল্মসের বহুবর্ণরঞ্জিত মহার্ঘ্য অবদান "গঙ্গা-যমুনা"-র নায়িকার ভূমিকায় বৈ জয়ন্তীমালা

গঙ্গোপাধ্যায় ও গোবিন্দমাণিক্যবেশী কুমার রায়। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় রঘুপতির চরিত্রটিকে দম্ভ ও অন্ধ আত্মবিশ্বাসে, ক্ষুরধার কুটিলতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং নাট্য-পরিণতিতে বেদনার মুহূর্তে স্মরণীয় করে তুলেছেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত অভিনয়-গুণে।

কুমার রায় গোবিন্দমাণিক্যের শান্ত, অচঞ্চল চরিত্রটিকে মহৎ দুঃখের অনুভূতিতে ও অন্তর-বিশ্বাসের প্রসন্নতায় জীবন্ত করে তুলেছেন।

গুণবতীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র চরিত্রটির অহমিকাবোধ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু অন্তর-বেদনা ও হতাশ্বাসে চরিত্রটিকে আরও মর্মগ্রাহী করে তোলার সুযোগ তাঁর ছিল। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় যাঁরা সুঅভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন রমলা রায় (অপর্ণা), দেবতোষ ঘোষ (চাঁদপাল) ও শোভেন মজুমদার (নক্ষত্ররায়)।

দেবীমন্দির ও তার প্রাঙ্গণের একটি সুপরিকল্পিত দৃশ্যপটে নাটকটি অভিনীত হয়। মঞ্চপরিকল্পনার জন্য প্রশংসা পাবেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপ্রসাদ ঘোষের আলোকসম্পাত সুষ্ঠু। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবহ-সংগীত পরিবেশানুগ।

চিত্রালোচনা

বড়দিনের মরশুমে একটিও বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে না—এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা। অথচ মুক্তি-প্রতীক্ষিত বাংলা ছবির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ছবি তৈরি হয়ে পড়ে থাকা মানেই চিত্র-ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের একটা মোটা অংশ অকেজো হয়ে থাকা। বাংলা ছবির ব্যবসায়ে একেই মূলধনের অপ্রতুলতা, তার ওপর যদি ছবি শেষ হবার পরও তার মুক্তির ব্যবস্থা না হয় তাহলে এ-ব্যবসায়ে যাঁরা টাকা খাটান তাঁদের উৎসাহে ভাঁটা পড়লে দুঃখের কারণ হয়তো আছে কিন্তু বিস্মিত হবার কিছু নেই।

ঘটছেও তাই। ছবি আরম্ভ হবার পর টাকার অভাবে মাঝপথে তার কাজে ছেদ পড়ার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার আঁতুড়ঘরেই নবজাতকের মৃত্যু ঘটে, অর্থাৎ শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানের পর তার আর কোন সাড়াশব্দ শোনা যায় না। এমনিভাবে বাংলা ছবির ব্যবসায়ে blocked capital-এর পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলা ছবির যাঁরা অনুরাগী এবং চিত্র-ব্যবসায়ের যাঁরা হিতকামী তাঁদের এ বিষয়ে অবহিত হবার সময় এসেছে।

• • •

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির জনপ্রিয়তার ফলে অনেক সময়ে মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবির প্রদর্শনীতে বিলম্ব ঘটে। ব্যবসায়ের দিক থেকে তা' হয়তো অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু দুঃখের কারণ ঘটে তখন যখন দেখি বাংলাদেশে বাংলা ছবি প্রদর্শিত হবার সুযোগ আশ্চর্যরকম সীমিত। এক হাতে গোনা যায় এমনি গুটিকয়েক মাত্র সিনেমায় বাংলা ছবির প্রবেশাধিকার, বাকিগুলিতে হিন্দী ছবির একাধিপত্য। হিন্দী ছবি প্রদর্শনের আমরা বিরোধী নই, কিন্তু বাংলা ছবির প্রদর্শনীর পথ রুদ্ধ করে তার দাপটের আমরা অবসান চাই। এই দাপটের স্বরূপ নীচের বিবরণী থেকে স্পষ্ট হবে।

১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী সিনেমার সংখ্যা ছিল ২৭০। তার মধ্যে মাত্র ১৭টিতে কেবলমাত্র বাংলা ছবি দেখান হত এবং ৮০টি সিনেমায় মোটেই বাংলা ছবি দেখান হত না। অন্য ৬০টি সিনেমায় মাঝে মাঝে বাংলা ছবি মুক্তি পেত বটে, প্রদর্শনী সময়ের অনুপাতে বাংলা ছবির ভাগ্যে জুটত শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র সময়। বাকিগুলিতে অবশ্য প্রদর্শনী সময়ের এতখানি বৈসাদৃশ্য ঘটে নি, তবে সংখ্যায় বাংলা ছবির তুলনায় অনেক বেশী হিন্দী ছবি দেখান হত সেই সব সিনেমায়।

এ অবস্থায় একটি বা দুটি বাংলা ছবি দীর্ঘদিন ধরে চললেই মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবির ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এবারেও তাই হয়েছে।

• • •

এ সপ্তাহে যে-দুটি নতুন হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য দিলীপকুমার লিখিত ও প্রযোজিত টেকনিকলার ছবি "গঙ্গা-যমুনা"। ভারতের দুটি

সপ্তকের প্রথম নিবেদন "বন্ধন"-এর খল-নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ নদীর নামে ছবির নাম নয়, গংগা ও যমুনা দুই অসম প্রকৃতির সহোদরের নাম এবং তাদের নিয়েই এর গল্প। এই দুই ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলীপ-কুমার ও নাসির খাঁ, ব্যক্তিগত জীবনেও যাঁরা সহোদর। বৈজয়ন্তীমালা ছবির নায়িকা। ভূমিকালিপিতে আরো যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আজ্‌রা, কানাইয়ালাল, নজির হুসেন, এ নাজির, লীলা চিটনীশ ও হেলেন। পরিচালনার কৃতিত্ব নীতীন বসুর। টেকনিকলারে ছবি তুলেছেন বাবা সাহেব এবং তাঁর ক্যামেরার কাজ সত্যিই অভাবনীয়ভাবে উৎরেছে। নৌসাদের সুরেও ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

অপর হিন্দী ছবিটির নাম "বাগদাদ"।

মধ্যপ্রাচ্যের একটি বিস্মৃত উপকাহিনী এর আখ্যান অবলম্বন।

নাট্যাভিনয়

ইয়ুথ কয়ার-এর "বাল্মীকি প্রতিভা"

রবীন্দ্র-শতাব্দী উপলক্ষে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের শিল্পীদল গত ১৭ ও ১৮ই ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" গীতিনাট্যটি পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত ও বহু-অভিনীত গীতিনাট্যটির আবেদন অক্ষয়। বার-বার অভিনয়েও এর রসের হ্রাস ঘটে না, এর স্বাদ পুরনো হয় না। এবং সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশনের গুণে এর আকর্ষণ বুঝি আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। গত সপ্তাহে ইয়ুথ কয়ার নিবেদিত "বাল্মীকি প্রতিভা" যাঁরা দেখেছেন তাঁরা শেষের কথাটি নিঃসংশয়ে মেনে নেবেন।

সত্যজিৎ রায়ের তত্ত্বাবধানে অরূপ গুহ-ঠাকুরতা পরিচালিত এই গীতিনাট্যাভিনয় রসজ্ঞ দর্শকদের যে প্রভূত আনন্দ দিতে পেরেছিল তার মূলে প্রধানত ছিল কয়ার-এর শিল্পীদের সমবেত অভিনয়-সৌকর্য ও সুকণ্ঠের গান। গীতিনাট্যের মঞ্চরূপটি ছিল সুগ্রথিত। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে গীতিনাট্যের গতি ও পরিণতির ধারাটি স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল প্রয়োগ-কর্মের গুণে।

এই গীতিনাট্যাভিনয়ের অপূর্ব শিল্প-শোভন মঞ্চরূপটি দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অরণ্যের পটভূমিটি সুন্দর শিল্পসৌষ্ঠবের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। এবং উঁচু বেদীর ওপরে আলোর সংযোগে কালীমূর্তিটি সর্বক্ষণ দর্শকদের দৃষ্টিগোচর করে রাখার কৌশলটিও চমৎকার পরিবেশ রচনা করে তোলে।

বাল্মীকির রূপসজ্জায় অবতরণ করেন পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতা। গানে ও বিশেষত অভিনয়ে চরিত্রটির মর্মরূপটি তিনি মনোজ্ঞভাবে ফুটিয়ে তোলেন। অন্যান্য চরিত্রে আশিস দাস, প্রদীপ ঘোষ, অনিল দে, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত সেন, অমল ভট্টাচার্য, অজিত মুখোপাধ্যায় ও অসিত চট্টোপাধ্যায় যথাযোগ্য অভিনয় করেন।

ছোট ভূমিকায় স্ত্রী-চরিত্রে রমা গুহ-ঠাকুরতা (লক্ষ্মী), বিজয়া রায় (সরস্বতী) ও মধুশ্রী বর্ধন (বালিকা) অল্প অবকাশে দর্শকমনে রেখাপাত করেন। নৃত্যাংশে বন-দেবীদের বেশে নমিতা চট্টোপাধ্যায়, মীরা দত্ত, ইলা ঘোষ, রিনা মুখোপাধ্যায় ও নমিতা ঘোষাল নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

নেপথ্য থেকে মঞ্চাভিনয়টিকে যাঁরা চিত্তাকর্ষক করে তোলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাপস সেন (আলোকসম্পাত), মদন পাঠক (রূপ-সজ্জা) এবং বিমল চক্রবর্তী (মঞ্চরূপ)। সংগীত পরিচালনা ও নৃত্যপরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদনে ছিলেন যথাক্রমে প্রভাতকমল এবং অসিত চট্টোপাধ্যায় ও রমা গুহঠাকুরতা।

সুন্দরম-এর নবপ্রয়াস

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা সুন্দরম সম্প্রতি নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে সংস্থার মুখপাত্র নাট্যকার-নাট্যপরিচালক-অভিনেতা শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী বলেন, আজকের দিনের নবনাট্য সচেতনাকে সার্থক করে তোলার কাজে সুন্দরম আত্মনিয়োগ করতে চান বলেই তাঁরা এই নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, "পথের পাঁচালী", "মৃত্যুর চোখে জল", "ডাকঘর" ও "ফিঙ্গার প্রিণ্ট" প্রভৃতি পরিবেশন করে তাঁরা রসিকজনকে আনন্দ দিতে পেরেছেন। এবং এই প্রসঙ্গে জানান যে প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাঁরা "ফিঙ্গার প্রিণ্ট" নাটকটি নাট্যামোদীদের সামনে উপস্থিত করবেন।

"ফিঙ্গার প্রিণ্ট" পরিচালনা করবেন এই নাটকের রচয়িতা পার্থপ্রতিম চৌধুরী। এই রহস্য নাটকের আলোকসম্পাত ও সুরসংযোজনায় থাকবেন যথাক্রমে তাপস সেন ও ভি বালসারা।

বিদেশে ভারতীয় সংগীতের সমাদর

সংগীতের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলনের সেতু রচনায় সম্প্রতিকালে যাঁদের অবদান সর্বাধিক, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সম্প্রতি কানাডা আর্টস কাউন্সিল এবং মণ্ট্রিয়েল ও ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি কানাডায় গিয়েছিলেন। সেখানকার বিভিন্ন শহরে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীখাঁ ভারতের রাগসংগীত সম্বন্ধে বক্তৃতা সহযোগে তাঁর অনবদ্য যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। প্রেস ক্লাবের তাঁবুতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্পী তাঁর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

মণ্ট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অব মিউজিক-এর অন্তর্গত "সামার স্কুলে" তিন সপ্তাহ ধরে ডাঃ রোসেটি রেনশ-এর সঙ্গে একত্রে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সুর-পরিবেশনের সঙ্গে ভারতীয় রাগসংগীতের ওপর বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-

মণ্ট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ "সামার কোর্সে" ভারতীয় সংগীতের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ (দক্ষিণ প্রান্তে)। অন্যান্যদের পরিচয় (বাঁদিক থেকে) ফ্যাকালটি অব মি উজিকের ডীন রেভারেন্ড ক্লেমেণ্ট মরিন, তবলাবাদক মহাপুরুষ মিশ্র ও ডক্টর রসেটি রেনশা
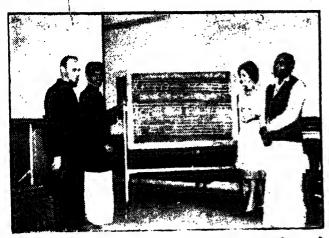
াত্রী এবং বহু সংগীতরসিক শিল্পীর াঞ্জল আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠানের ভতর দিয়ে ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীত ম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন াবং এর মাধুর্য ও ঐশ্বর্য অনুভব করবার ুযোগ পান।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ পরিবেশিত ংগীত-পর্যালোচনা সম্পর্কে মণ্ট্রিয়েল বশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব দি ফ্যাকালটি অব মউজিক রেভারেন্ড ক্লিমেণ্ট মোরিন বলেন য, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি দীর্ঘ-ালের একটি প্রতিবন্ধক দূর করে দিয়েছেন —পাশ্চাত্ত্য দেশের পক্ষে ভারতীয় সংগীত অনুধাবনের পথের প্রতিবন্ধক। মণ্ট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইস্ট-ওয়েস্ট এ্যাসথেটিকস কোর্স"-এর বিশিষ্ট পাঠ-ক্রম হিসাবে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর বক্তৃতা ও সংগীত পরিবেশনের আয়োজন করা হয়। শেষদিনের বৈঠকে শ্রীখাঁর দীর্ঘসময়ব্যাপী সংগীতানুষ্ঠান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে।

কানাডার লিনস্ক, শেরব্রুকে ও ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণেও ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ বক্তৃতা সহকারে সংগীত পরিবেশন করেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের বহু শ্রোতা সর্বপ্রথম এই বিখ্যাত সরোদ-শিল্পীর কাছ থেকে সরোদের বাজনা শোনার সুযোগ পেলেন।

এ-বাদে শিল্পী টোরণ্টো-তে টেলি-ভিশনে ভারতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। এবং তিনি নিউইয়র্কে কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং টেলিভিশন সিস্টেম-এর কর্মসূচীতেও অংশগ্রহণ করেন।

নিউ ইয়র্ক-এর ভারতীয় ছাত্রসমাজ ("ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টস সোসাইটি") তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র-সফর শেষে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন নিউ ইয়র্ক-এর এসিয়া সোসাইটি।

টোকিও হয়ে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। টোকিওতে ভারতীয় সংগীত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে বলে শিল্পী সাংবাদিকদের জানান। বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে শিল্পী সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন, সংগীতের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাবমিলন সম্ভব—যদি এক দেশের সংগীত-শিল্পকে অপর দেশের কাছে যথাযথভাবে উপস্থিত করা হয়।

রেলকর্মী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পরিষদ

পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে গঠিত রেলকর্মী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পরিষদ গত জুন মাস থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে এসেছে। প্রতি মাসেই পরিষদ সাহিত্যবৈঠক, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে-ছিল এবং তাতে বহু রেলকর্মী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। পরিষদ তাদের পূর্ব-ঘোষণানুযায়ী আগামী ২৬শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক উৎসবের আয়োজন করেছে এবং এটাই হচ্ছে পরিষদের শেষ কর্মসূচী। ছয় দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সদর দপ্তরের বিভাগীয় আনন্দ সংস্থা-গুলি নাটক, নৃত্যনাট্য, একক ও সমবেত
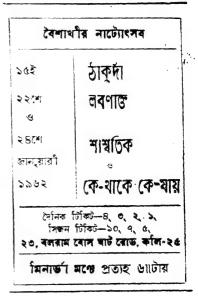
সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করবেন এবং প্রতিদিনই বিভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমালোচক রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। তা ছাড়া নিমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ সেন, নীলিমা সেন, কমলা বসু, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অমল নাগ, কাজী সব্যসাচী, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত প্রভৃতি। কলকাতার বিভিন্ন পেশাদার নাট্য-গোষ্ঠীরা কয়েকদিন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করবেন। একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়েছে এবং বিভিন্ন দিন রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি-নিকেতন সম্বন্ধে একাধিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হবে।

তুলসী চক্রবর্তী

তুলসী চক্রবর্তী স্মরণে

বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ বা প্রতিপত্তির দিক থেকে অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী হয়তো সকলকে ছাপিয়ে চোখে পড়বার মত মানুষ ছিলেন না। কিন্তু যাঁরা বাংলা ছবি ও নাটকের নিয়মিত দর্শক তাঁরা তুলসী চক্রবর্তীকে সহজে ভুলতে পারবেন না। কারণ ভূমিকা যেমনি হোক, তুলসীবাবু থাকলেই তা উপভোগ্য হয়ে উঠত। অভিনেতা হিসাবে এইটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে খ্যাতিমান শিল্পীর অসদ্ভাব নেই, কিন্তু এই কৃতিত্ব তাঁদের মধ্যে কতজন দাবি করতে পারেন, বা কেউই পারেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

যাঁরা তুলসীবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁদের কাছে তুলসীবাবুর আর একটি বড় পরিচয় ছিল। এই মেকির যুগে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ—সদালাপী, নিরহংকার, হৃদয়বান পুরুষ। কর্মক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে কাউকে কোনদিন বিপাকে পড়তে হয় নি। ছোট বড় সকল পরিচালকের নির্দেশ তিনি সমান তৎপরতার সঙ্গে মেনে চলেছেন। চিত্রগ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে গানে-গল্পে-কথায় স্টুডিও কর্মীদের মাতিয়ে রাখতে তুলসীবাবুর জুড়ি ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই তুলসীবাবুর মৃত্যুতে মঞ্চ ও চিত্রজগতের সকলেই আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতায় তুলসীবাবুর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন রেল কোম্পানীর চাকুরে। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত তাঁকে। তাই জ্যেষ্ঠতাত প্রসাদচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে তুলসীবাবুর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এবং তাঁর কাছ থেকেই তিনি পান রঙ্গজগতের সন্ধান। প্রসাদবাবু স্টার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেন এবং বালক তুলসী অনেক সময়ে তাঁর খাবার পৌঁছে দিতেন থিয়েটারে। পরবর্তী জীবনে নাট্যজগতের সঙ্গে তুলসী-বাবুর সম্পর্কের সূত্রপাত হয় সেই বাল্যকালে।

সাধারণ নাট্যশালায় অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশের আগে তুলসীবাবু পাড়ার সৌখিন নাট্যসংস্থায় প্রথমে হাত মক্স করেন। ব্যায়াম ও শরীরচর্চায় বাল্যকাল থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল। তার ফলে সে-যুগের প্রসিদ্ধ বোসেজ্ সার্কাস-এ তিনি কিছুদিন দৈহিক কসরত দেখান। কিন্তু এতে তাঁর মন ভরছিল না। শেষ পর্যন্ত জ্যাঠামশায়কে তুলসীবাবু তাঁর মনের অভিলাষ জানালেন। প্রসাদবাবু অভিনয়-পাগল ভাইপোকে নিয়ে গেলেন স্টার থিয়েটারের তদানীন্তন ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁরই আনুকূল্যে এবং শিক্ষকতায় তুলসীবাবুর নাট্যজীবন শুরু হল। বিংশ দশকের গোড়ার দিকের এই ঘটনা। তারপর থেকে গত পুজোর অব্যবহিত আগে রোগে শয্যাগত হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তুলসীবাবু নিরবচ্ছিন্নভাবে নাট্য-কলার সাধনা করেছেন এবং সাধকের গৌরব নিয়েই তিনি পরলোকে প্রয়াণ করেছেন। মঞ্চে ও চিত্রপটে তাঁর অভিনীত চরিত্রের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। কারুর কারুর মতে তা তিন চার শোর বেশী হবে। আমরা এই সাধক পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে কবির সেই অমর বাণী স্মরণ করছি—"তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ"।

বিখ্যাত ইতালীয় পরিচালক ভিত্তোরিও ডি সিকা তাঁর বাঙালী সহকারী রবীউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলাপ করছেন। সম্প্রতি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটির উদ্যোগে ডি সিকা-র চারখানি বিশ্ববিখ্যাত চিত্র—"মির‍্যাক্‌ল্ ইন মিলান", "হ্যালো এলি-ফ্যান্ট", "দি গোল্ড অব নেপ্‌ল্‌স্" ও "বাইসাইক্‌ল্ থীভস্" — কলকাতায় পুনঃপ্রদর্শিত হয়েছে

চিঠিপত্র

গিরিশ নাট্যোৎসবে "ক্ষত্রবীর"

মহাশয়,

গত ২৫শে নভেম্বর বিশ্বরূপায় গিরিশ নাট্যোৎসবে শিল্পশ্রী সম্প্রদায় স্বর্গত নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ক্ষত্রবীর" অভিনয় করলেন। আমি দর্শক হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। "ক্ষত্রবীর" নাটকের মধ্যে নিতান্ত অপ্রয়োজনে অন্যান্য নাট্যকারদের লেখা বিভিন্ন দৃশ্যাংশ অঙ্গীভূত করার অপপ্রয়াস অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম। মূল নাটকের এই বিকৃত রূপ উপস্থিত নাট্য-

অজয় কর পরিচালিত "অতল জলের আহ্বান"-এর একটি বহির্দৃশ্যে ছবির নায়ক অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মোদীদের ক্ষুণ্ণ করেছে। "ক্ষত্রবীর" 'ভূপেন্দ্রনাথের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক। সেই নাটকের উপর এই ধরনের যথেচ্ছাচার কল্পনার অতীত ছিল।

শুনেছি বাংলা দেশে নাট্য উন্নয়নের প্রয়াসেই বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ এই গিরিশ নাট্যোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। লোকান্তরিত নাট্যকারের বিখ্যাত নাটকের বিকৃতি ঘটিয়ে কিভাবে নাট্য-উন্নয়ন সম্ভব আমার তাই জিজ্ঞাস্য। স্বর্গত নাট্যকারের পুত্র হিসাবে এবং একজন সামান্য নাট্যকার হিসাবে আমি এই অপপ্রয়াসের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইতি—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-৭।

রঙমহল প্রসঙ্গে

মহাশয়,

সংবাদপত্র মারফত এই দুঃসংবাদটি জানা গেল যে, রঙমহল থিয়েটার আগামী ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে যে শুধু সংশ্লিষ্ট কমবেশী পঞ্চাশজন কর্মীর প্রতি পরিবারে গড়ে ছজন করে পোষ্য হিসাবে তিন শো জন লোকের অন্ন মারা গেল তাই নয়, শুধু যে মঞ্চশিল্পীদের চাকরি গেল তাও নয়, এতে যেখানে রঙ্গমঞ্চের জন্মস্থান—সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ, যেখানে অভিনয় শিল্পের সত্যিকারের অনুশীলন করা হয়, তা বাংলা দেশের কলকাতা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নেই। তাই নাট্যরসিকদের কাছে এটা নিঃসন্দেহে একটি মর্মান্তিক সংবাদ যে পাঁচটি রঙ্গমঞ্চের মধ্যে একটির দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার পাদ-প্রদীপ জ্বলে উঠছে, তা আর জ্বলবে না।

বাংলা দেশের একে একে সবই যেতে বসেছে, সাংস্কৃতিক উঁচু মানটা এখনও বজায় আছে। তাও চক্রান্তের জালে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে।

দেশীয় সরকারের কাছে নিবেদন, নাটক যে জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটা তো সরকার কর্তৃকও স্বীকৃত। তবে তাঁরা কি পারেন না এই থিয়েটারটাকে বাঁচাতে? মঞ্চকে বাঁচাবার জন্যেই তো মঞ্চকে প্রমোদ-কর থেকে তাঁরা রেহাই দিয়েছেন। ইতি— সুনীল চক্রবর্তী (নাট্যকার)।

রঙমহল সম্বন্ধে

মহাশয়,

৮ই ডিসেম্বরের সংবাদপত্র মারফত আমরা জানিতে পারিলাম যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বর হইতে রঙমহলের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এই সংবাদে নাট্যকার সংঘ অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবসা অপ্রতিহত রাখিয়া বাংলা থিয়েটার জগতের অগ্রগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। পেশাদার অথবা অপেশাদার যে কোন সংস্থার যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহারা ইহা করিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

কলিকাতা শহরের নাট্যপিপাসু অগণিত জনগণ বারবার ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বর্তমানে যে কয়টি পেশাদার থিয়েটার নিয়মিতভাবে চলিতেছে তাহাতে তাঁহাদের নাট্যরসপিপাসা সম্পূর্ণরূপে মেটে না। সুতরাং ইহার যে কোন একটি মঞ্চের অভিনয় বন্ধ হইয়া যাইলে তাঁহাদের অত্যন্ত দুঃখের কারণ ঘটিবে।

এ বিষয়ে নাট্যকার সংঘ সংবাদপত্র, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। ইতি
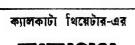
মন্মথ রায়,
সভাপতি, নাট্যকার সংঘ

চিত্রপ্রযোজকের "বিপাশা"র প্রধান দুই শিল্পী—সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

একলব্য

প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টের মত দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারত ও ইংলণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলার ফলাফলও অমীমাংসিত থেকে গেছে। ফলে ভারতের মাটিতে পর পর নয়টি টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে শেষ টেস্ট খেলা, ১৯৬০-৬১ সালে প্যাকিস্তানের সঙ্গে পাঁচটি টেস্ট এবং এই বছর ভারত ও ইংলণ্ডের তিনটি টেস্ট নিয়ে এই হিসাব।

দিল্লির তৃতীয় টেস্ট অবশ্য পুরো পাঁচদিন খেলা হয়নি। তিন দিন খেলার পর বাকি দু'দিনের খেলা পর্জন্যদেবের দয়ায় ধুয়ে মুছে গেছে। দয়া বলছি এজন্য যে বৃষ্টি না হলেও খেলায় জয়পরাজয়ের আশা ছিল সুদূরপরাহত। মহা-অনিশ্চয়তা ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য। তাই জোর করে কিছু বলা যায় না। তবু খেলার হালচাল ও গতি এবং পিচের অবস্থা দেখে সবাই ধরে নিয়েছিল এ খেলাও ড্র-র দিকে।

আবারও সেই মাটির দোষ দিচ্ছি। অর্থের দিকে চেয়ে টেস্ট খেলাকে পুরো পাঁচদিন জিইয়ে রাখার সেই উৎকট বাসনা নিয়েই দিল্লির উইকেট তৈরী। তবু বিধি বাম! বৃষ্টির ফলে শেষ দু'দিন খেলা না হওয়ায় দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে নাকি লাখ খানেক টাকার লোকসানের ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

ক্রিকেট একদিকে যেমন খেলা, অপরদিকে তেমন তত্ত্ব ও তথ্যের সংমিশ্রণ। তিন দিনের খেলাতেও তথ্যের অভাব নেই। তিনদিনে তিনজন ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরী করেছেন।

বোম্বের প্রথম টেস্টে হয়েছিল একটি সেঞ্চুরী; করেছিলেন ইংলণ্ডের কেন ব্যারিংটন। কানপুরে সেঞ্চুরী করেছেন ৪ জন ব্যাটসম্যান—ভারতের পক্ষে পলি উমরিগর, ইংলণ্ডের পক্ষে ই আর ডেক্সটার, ব্যারিংটন ও পুলার। দিল্লিতে ভারতের হয়ে সেঞ্চুরী করেছেন এম এল জয়সীমা ও বিজয় মঞ্জরেকার, ইংলণ্ডের পক্ষে কেন ব্যারিংটন।

বলা বাহুল্য, ভারতের মাটিতে পর পর তিনটি টেস্টে এবং তার আগে প্যাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলায় লাহোরে সেঞ্চুরী করার ফলে ইংলণ্ডের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান কেন ব্যারিংটন উপর্যুপরি ৪টি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী লাভের অধিকারী হয়েছেন। তিনি একটি নতুন বিশ্ব রেকর্ডের দ্বারে এসে প্রায় উপস্থিত। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এভার্টন উইকস পর পর পাঁচটি টেস্টে সেঞ্চুরী করে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। ব্যারিংটন এই রেকর্ড স্পর্শ করবেন কি ভেঙে দেবেন তা দেখবার জন্য আজ বিশ্বের সকল ক্রিকেটরসিকই আগ্রহী।

ভারতের পক্ষে জয়সীমার ১২৭ রান তার প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরী। গত বছর কানপুরে প্যাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ৯৯ রানের মাথায় আউট হওয়ায় জয়সীমা সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। এবার তিনি ব্যাটিং নৈপুণ্যের নিপুণ ছলাকলায় সেঞ্চুরীর অধিকারী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ১৯৬ মিনিটে জয়সীমার শতরান উজ্জ্বল এবং চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার সত্যিকার চিত্র।

ভারতের আস্থাভাজন ব্যাটসম্যান বিজয় মঞ্জরেকারের নট আউট থেকে ১৮৯ রানও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। মঞ্জরেকারের ১৮৯ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানের সবচেয়ে বড় রান। ১৯৫২ সালে লর্ডস মাঠে বিনু মানকড়ের ১৮৪ রানই ছিল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সর্বাধিক রান। এবার মঞ্জরেকার মানকড়ের কৃতিত্ব ম্লান করে দিয়েছেন। মঞ্জরেকারের দুর্ভাগ্য তিনি ডবল সেঞ্চুরীর অধিকারী হতে পারেন নি। এর জন্য দায়ী কিছুটা মঞ্জরেকার নিজে, কিছুটা ভারতের বাকি খেলোয়াড়রা। ডবল সেঞ্চুরীর জন্য আরও একটু পিটিয়ে খেলা মঞ্জরেকারের উচিত ছিল। আর ভারতের শেষ দিকের পাঁচজন খেলোয়াড়ের মাত্র ৩৩ রানের মধ্যে আউট হয়ে যাওয়া উচিত হয়নি, একজন আবার হয়েছেন রান আউট। মঞ্জরেকারের ডাবল সেঞ্চুরীর জন্য এরা আর একটু সতর্ক হতে পারতেন। কিম্বা মঞ্জরেকারও পারতেন আর একটু পিটিয়ে খেলতে। উইকেটে বিশেষ কিছুই ছিল না। উইকেট যখন ব্যাটসম্যানের সহায়ক, ব্যাটসম্যান যখন পূর্ণ আস্থাবান, তার দৃষ্টি স্থির, তখন মন্থর ক্রিকেট অর্থহীন। টেস্ট খেলায় ডাবল সেঞ্চুরীর অধিকারী ভারতের মাত্র দু'জন খেলোয়াড়—বিনু মানকড় ও পলি উমরিগর। মানকড় আবার দু'বার ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন, উমরিগর একবার। তিনটি ডাবল সেঞ্চুরীই শক্তিহীন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। শক্তিশালী দল এবং ক্রিকেট স্রষ্টা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরীর অধিকারী হলে সেটা হত মঞ্জরেকারের নতুন কৃতিত্ব।

তৃতীয় টেস্টের আর একটি ঘটনা ও তথ্যের খোরাক এর কৃতিত্ব ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের—ব্যারিংটন ও পুলারের। ব্যারিংটন ও পুলারের জুটিতে দ্বিতীয় উইকেটের ১৬৮ রান ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। ১৯৫২ সালে লর্ডস টেস্টে দুই কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড় লেন হাটন ও পিটার মে-র দ্বিতীয় উইকেটের ১৫৮ রানই ছিল এতদিন ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় উইকেটের বেশী রান। ব্যারিংটন ও পুলার সে রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

এই আলোচনার পর খেলাটির ধারাবাহিক আলোচনার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবু সংক্ষেপে বলিঃ—

প্রথমদিন টসে জিতে ব্যাটসম্যানের সহায়ক উইকেটে ব্যাটিং করবার সুযোগ পেয়ে ভারত করে ৩ উইকেটে ২৫৩ রান। অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর ৩৯ রান করে আউট হন, পতৌদির নবাব জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় আউট হন 'অশুভ' ১৩ রানের মাথায়। জয়সীমা আউট হন জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী পূর্ণ করে। মঞ্জরেকার ৬১ ও উমরিগর ৫ রান করে নট আউট থাকেন।

অধিনায়ক কন্ট্রাক্টরের ২০০ মিনিটে ৩৯ রানের ইনিংসে সেই আস্থাহীনতার আভাস ফুটে ওঠে। অপরদিকে জয়সীমা দু'বার ক্যাচ তুললেও মারের জৌলুসে দর্শকদের ঘন ঘন হাততালি আদায় করেন। ২৪৯ মিনিটে ১৪টি বাউণ্ডারী ও ২টি ওভার বাউণ্ডারীর সমন্বয়ে তাঁর ১২৭ রান সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

পতৌদির তরুণ নবাব মনসুর আলী খাঁ তার ঘরোয়ানার মর্যাদা রেখেই ব্যাটিং আরম্ভ করেছিলেন। ত্রিশ হাজার দর্শকের বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে ব্যাট করতে এসে তিনি প্রথমেই চোখজুড়ানো স্কোয়ার কাট ও অন ড্রাইভ করে পর পর দুবার বাউণ্ডারী করেন।

দিল্লিতে তৃতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভের আগে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সংগে ভারত ও ইংলন্ডের খেলোয়াড়গণ

কিন্তু 'অশুভ' ১৩-র মাথায় পৌঁছে নতুন বলের আক্রমণে নবাবের ব্যাটের নৃত্য থেমে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা ঐ অবস্থায় থাকবার পর স্মিথের একটি বল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মেরে মিড উইকেটে রিচার্ডসনের হাতে ক্যাচ দিয়ে তিনি আউট হন।

আগের দিনের ২৫৩ রানের সংগে ২১৩ রান যোগ করে ভারত ৪৬৬ রানে ইনিংস করবার পর দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংলন্ড ইংলন্ড ২১ রান করতেই রিচার্ডসনের উইকেট হারায়।

ভারতের এইদিনের খেলোয়াড়দের মধ্যে মঞ্জরেকারের নট আউট থেকে ১৮৯ রান লাভের কথা আগেই বলা হয়েছে। মঞ্জরেকার এইদিন পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরীর অধিকারী হন। এর আগে তিনি ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ১৩৩, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১১৮ এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৭৭ ও ১১৮ রান করে চারটি সেঞ্চুরীর অধিকারী ছিলেন। মঞ্জরেকার সর্বসুদ্ধ ৩৮৭ মিনিট ব্যাটিং করেন এবং তাঁর ১৮৯ রানের মধ্যে ২৯ বার বল মাঠ পেরিয়ে যায়। সেঞ্চুরী পূর্ণ হবার পর শুধু একবার মঞ্জরেকার ভুল করে নিজেকে আউট হবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

মঞ্জরেকার ছাড়া ভারতের এইদিনের খেলোয়াড়দের মধ্যে ইংলন্ডের ডিফেন্সিভ ফিল্ড সত্ত্বেও চাঁদু বোরদের ৪৫ এবং সেলিম ডুরানীর ১৮ রান প্রশংসাযোগ্য। ডুরানী বেশী রান করতে পারেননি সত্য। কিন্তু তিনি মারমুখী মন নিয়ে মাঠে নামেন এবং প্রথম ১৬ রান করেন দর্শকদের আনন্দরোলের মধ্যে পর পর চারটি বাউন্ডারী মেরে।

একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের খেলায় ইংলন্ড সংগ্রহ করে ৩ উইকেটে ২৫৬ রান। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৪৬৬ রানের বড় ইনিংসের বিরুদ্ধে তাদের মন্থর ব্যাটিং ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। বিশেষ করে দ্বিতীয় দিনের শেষে ২ রানের মাথায় রিচার্ডসন আউট হওয়ায় তারা মন্থর খেলার নীতি গ্রহণ করে। তবু 'নির্জীব' উইকেটে এ ধরনের ব্যাটিং ইংলন্ডের অধিনায়ক ডেক্সটারের 'ব্রাইট' ক্রিকেটের প্রতিশ্রুতির পূর্ণ পরিপোষক নয়। ব্যারিংটনের সেঞ্চুরীর কথা এবং দ্বিতীয় উইকেটে ব্যারিংটন ও পুলারের নতুন উইকেট জুটির কথা আগেই বলেছি।

পরের দিন বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ থাকায় তৃতীয় দিনের শেষেই প্রকারান্তরে খেলার পরে যবনিকা পড়ে। শেষদিন ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা ক্রিকেটের বদলে মাঠে নেমে আধঘণ্টা খানেক ফুটবল নিয়ে পেটাপেটি করেন।

ভারত ও ইংলন্ডের টেস্ট খেলার ইতিহাসে ১৯৫২ সালে ওভাল মাঠের টেস্ট বৃষ্টির জন্য ঠিক এই অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। দিল্লিতে তবু তিনদিন খেলা হয়েছে। একটি বলও না হয়ে এর আগে দুটি টেস্ট খেলা বন্ধ হবারও নজীর আছে। ১৮৯০ ও ১৯৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দুটি টেস্টে কেউ একটি বল করারও সুযোগ পাননি। বৃষ্টির ফলে মাঠ জলে একেবারেই ভেসে গিয়েছিল।

তৃতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডঃ—

ভারত—প্রথম ইনিংস—৪৬৬ (বিজয় মঞ্জরেকার নট আউট ১৮৯, এম এল জয়সীমা ১২৭, চাঁদু বোরদে ৪৫, নরী কণ্ট্রাক্টর ৩৯, পলি উমরিগর ২২; ডেভিড এলেন ৮৭ রানে ৪ উইকেট, ব্যারী নাইট ৭২ রানে ২ উইকেট)।

ইংলন্ড—প্রথম ইনিংস (৩ উইকেটে) ২৫৬ (কেন ব্যারিংটন নট আউট ১১৩; জিওফ পুলার ৮৯, টেড ডেক্সটার নট আউট ৪৫)।

খেলা অমীমাংসিত : বৃষ্টির জন্য শেষ দুদিন খেলা বন্ধ।

দুই দলে খেলেছেনঃ—

ভারতের পক্ষে—এম এল জয়সীমা, নরী কণ্ট্রাক্টর (অধিনায়ক), বিজয় মঞ্জরেকার, পাতৌদির নবাব, পলি উমরিগর, চাঁদু বোরদে, সেলিম ডুরানী, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (উইকেটকিপার) এ জি কৃপাল সিং, লক্ষ্মীকান্ত দেশাই ও সুভাষ গুপ্তে।

ইংলন্ডের পক্ষেঃ—পি রিচার্ডসন, জিওফ পুলার, কেন ব্যারিংটন, মাইক স্মিথ, টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক), জন মারে (উইকেট কিপার), বব বারবার, ব্যারী নাইট, ডেভ এলেন, টনি লক ও ডেভিড স্মিথ।

খেলার তারিখঃ—১৩ই, ১৪ই ও ১৬ই ডিসেম্বর।

মুকুল

নমিতা ঘোষ

ব্যক্তি বড়, না প্রতিষ্ঠান বড়? এর জবাবে হয়তো সবারই এক উত্তর—প্রতিষ্ঠান বড়।

আবার নানা ব্যক্তির সৎ এবং মহৎ কাজের উপরই সে প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং তার স্থায়িত্ব একথাও অস্বীকার করা যায় না।

সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানের কথাই ধরা যাক। আচার্য কৃপালনী, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি নেতা বহুর সঙ্গে যারা ত্যাগে সেবায়, সাধনায়, কর্মক্ষমতায় কংগ্রেসকে পরম শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তবু কংগ্রেস—কংগ্রেস, দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র-যন্ত্রের পরিচালক।

আবার এই সব দেশনায়ক কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও এখনো নেতা, সবার সম্মানের পাত্র। তাঁদের কর্মধারা এবং বক্তব্য দেশের সুনাগরিকের চিন্তার খোরাক। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচ্ছেদে দুইয়েরই ক্ষতি। উভয়ের সম্পর্ক পারস্পরিক।

খেলাধুলার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। সাধারণ খেলোয়াড় বড় ক্লাব—মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলে খেললে সে বড় খেলোয়াড়। আবার বড় খেলোয়াড়ও বড় ক্লাব থেকে সরে এলে তার আদর কম। তাই বলে এ কথাও স্বীকার্য বড় বড় খেলোয়াড়ের ক্রীড়া-কীর্তিতেই মোহন-বাগান—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল—ইস্ট-বেঙ্গল। অবশ্যই পরিচালকদের ক্লাব পরি-চালনার কৃতিত্বের কথা বাদ না দিয়ে।

আজ যে মেয়েটির জীবনী নিয়ে আলো-চনা করছি সেই মেয়েটি এবং আর দু'একটি মেয়ের জন্যই অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে পানি-হাটি স্পোর্টিংয়ের পরিচিতি। আবার পানিহাটি স্পোর্টিংই যে নমিতা ঘোষকে স্পোর্টস-পটিয়সী করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এখানেও সম্পর্ক পারস্পরিক। তবে আমার লেখার পাত্রী এবং পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের অন্তরালে আছেন আর এক ব্যক্তি। তিনি

নমিতা ঘোষ

হচ্ছেন পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের অন্যতম পরিচালক গৌরীপ্রসাদ রায়। এই তিনের সংযোগে অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে বাঙলা পেয়েছে এক কৃতী কন্যাকে।

আজ নমিতা ঘোষের ঘরে শ'দুই পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র থরে থরে সাজানো। 'সোনার মেডেলের' সংখ্যাই ২৫টি। আর এসব পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র নমিতা পেয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীদের হাত থেকে। কলকাতা, কটক, দিল্লি, বোম্বাই, জব্বলপুর, জলন্ধর, ত্রিবেন্দ্রাম প্রভৃতি যে সব জায়গায় জাতীয় অ্যাথলেটিকসের আসর বসেছে সেখানকার মাঠেই রয়েছে নমিতার পায়ের চিহ্ন। সর্বভারতীয় স্পোর্টসে বাঙলার দশবারের প্রতিনিধি। সর্বভারতীয় স্কুল স্পোর্টসেও সমপ্রতিনিধিত্ব। সাতবারের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন। দশ বছরের দলগত চ্যাম্পিয়ন-শিপের বড় অংশীদার।

আরও আছে। ১৯৫৮ সাল থেকে ৮০ মিটার হার্ডলস রেসে নমিতা বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই একটিমাত্র ইভেন্টে আজও বাঙালী মেয়ের প্রাধান্য অক্ষুন্ন।

লং জাম্পেও নমিতার কৃতিত্ব বাঙালী মেয়ের গর্বের বিষয়। গত বছর কালীঘাট স্পোর্টসে নমিতা লাফিয়েছে ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী মেয়েই এতখানি লাফাতে পারেনি। লং জাম্পে বাঙলার রেকর্ডের অধিকারিণী রেঞ্জার্স ক্লাবের গ্লোরিয়া প্রাউলিংয়ের লাফের দূরত্ব ১৫ ফুট ১১½ ইঞ্চি, নমিতার চেয়ে মাত্র ১½ ইঞ্চি বেশী।

এ ছাড়া পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়ে হিসাবে কত স্কুল স্পোর্টসে নমিতা কৃতিত্বের স্বাক্ষর এঁকেছেন তাঁর হিসাব নিকাশ নেই।

স্পোর্টসের পরিবেশের মধ্যে নমিতার স্পোর্টসে হাতে খড়ি। পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের ছোটদের বিভাগের নাম ছিল 'পানিহাটি বয়েজ স্পোর্টিং'। নমিতাদের বাড়িতেই ছিল তার প্রধান কর্মকেন্দ্র। কাকা গৌরহরি দাস ঘোষ কর্ণধার। খেলা-পাগল মানুষ। খেলার মধ্য দিয়ে মানুষ গড়াই তার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কিছুটা সফল না হয়েছে, এমন নয়। তাঁর কাছ থেকেই প্রথম খেলা শিখে মোহনবাগানের ফুটবল গোলকিপার সনৎ শেঠ, ইস্টার্ন রেলের রাইট আউট স্বরাজ ঘোষ ফুটবলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তাঁর ছাত্র আরও অনেকে খেলেছে কলকাতার প্রথম ডিভিশন ক্লাবে। নমিতার মা জ্যোতির্ময়ী ঘোষেরও খেলাধুলার উপর একটা বিশেষ টান। বাড়িতে ক্লাব। ছেলেরা এসে হৈ-হুল্লোড় করে, লাফালাফি দাপাদাপি করে। জ্যোতির্ময়ী দেবী শুধু সহ্য করেন, তাই নয় হাসিমুখে উৎসাহ দেন, পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে এনে রেঁধে খাওয়ান। সে অবশ্য আগের কথা। পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের শিশু বিভাগ এখন বড় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এবং সেবার স্বীকৃতি হিসাবে নমিতার কাকা এবং মা ক্লাবের আজীবন সদস্য।

নমিতাদের বাড়ির সামনেই ছিল খেলার মাঠ। দিদিদের সঙ্গে ওখানেই প্রথম ও দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। ১৯৫০ সালে গৌরীপ্রসাদ রায় যখন ক্লাবের সম্পাদক হয়ে আসেন দিদিরা তখন অন্দরমহলে বন্দী।

সেবার কালীঘাট স্পোর্টসে একটি বাঙালী মেয়ে ছিল না। কি একটা কারণে বাঙলার তখনকার শ্রেষ্ঠ অ্যাথলেট নীলিমা ঘোষ যোগ দেয়নি। গৌরীপ্রসাদ রায়ের এ দৃশ্য বড় চোখে লাগে। বাঙলার মাঠে স্পোর্টস অথচ

একটিও বাঙালী মেয়ে নেই'! তিনি ঠিক করলেন পানিহাটি স্পোর্টিং থেকেই মেয়ে বের করবেন। জোর কদমে শিক্ষা আরম্ভ হল।

কলকাতায় দৌড়নোর কথা শুনেই নমিতার চক্ষু চড়কগাছ। তাও আবার মেম সাহেবদের সঙ্গে। তবু মা, দিদি ও কাকার উৎসাহ পেয়ে আর শিক্ষাগুরু গৌরীপ্রসাদের আশীর্বাদ নিয়ে ১৯৫২ সালে কালীঘাট স্পোর্টসে প্রথম নামল নমিতা খালি-পায়ে ফ্রক পরে। সঙ্গে ক্লাবের আরও একটি মেয়ে। নাম কমলা শ্রীমানী। এই ঘটনায় 'উইমেনস স্পোর্টস ওয়ার্লড' কাগজে লেখা হল:—

"....The Kalighat meet also saw the debut of two other mofusil girls, Nomita Ghosh and Kamala Sreemany from Panihati. Both of them failed to achieve anything in their Broad Jump event; yet with their zeal and enthusiasm they are sure to come up just with a bit of training and practice as also with better equipments."

এই আগ্রহ এবং উৎসাহের ফলেই নমিতা আজ স্পোর্টসে সুপ্রতিষ্ঠিত। আগ্রহ এবং উৎসাহের চেয়েও বেশী ছিল নমিতার আন্তরিকতা। না হলে পানিহাটি স্পোর্টসে জীবনের প্রথম ব্যর্থতায় কেউ কেঁদে আকুল হয়!

আন্তরিকতা আবার একতরফা নয়। একদিকে ছাত্রীর অপরদিকে শিক্ষকের। নমিতা চেয়েছে স্পোর্টসে পটু হতে, সবার আগে এগিয়ে যেতে। গৌরীপ্রসাদ চেয়েছেন তাকে এগিয়ে দিতে। অবশ্য শুধু নমিতাই নয় এক সঙ্গে পাঁচটি স্পোর্টস-পটু মেয়ে বেরিয়েছিল পানিহাটি স্পোর্টিং থেকে।

স্পোর্টসের উন্নত শিক্ষার জন্য যখন যার কাছ থেকে যেটুকু সাহায্য পেয়েছে সেটুকুই আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে নমিতা। বিশ্বখ্যাত দৌড়বীর এমিল জ্যাটোপেক এসেছেন তাঁর সহধর্মিণী অলিম্পিকের জ্যাভেলিন-চ্যাম্পিয়ন ডানা জ্যাটোপেকভার সঙ্গে। নমিতা যেটুকু পারে তাদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। পোলভল্ট
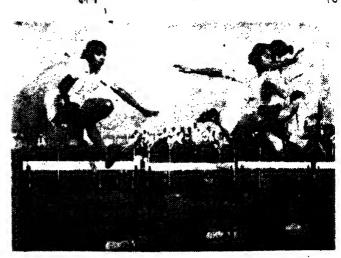
নমিতা ঘোষের (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়) হার্ডলস রেসের দৃশ্য।

চ্যাম্পিয়ন বব রিচার্ডের ক্লিনিকে নমিতা সদা হাজির, ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন বব ম্যাথিয়াসের সঙ্গে ছায়ার মত নমিতার কায়া। মাদ্রাজের ওয়াই এম সি এ কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের 'কোচ' টি ডবলিউ আর্নল্ডের কোচিং ক্যাম্পে নমিতা যেন কাঁচ মেয়ে। ক, খ থেকে সবই শেখার বাসনা।

আর্নল্ড যাবার সময় নমিতার হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে গেলেন। তাতে লেখা আছে:—

"She (Nomita) shewed keen interest, was present for every session and shows promise of becoming a great ahtlete. I have not found an athlete who is willing to train more faithfully in all of India."

শিক্ষাগুরু গৌরীপ্রসাদ রায় সম্বন্ধে নমিতার নিজের কথা: 'জীবনে আজ যেটুকু সাফল্য লাভ করেছি তার সবটুকু কৃতিত্ব আমার শিক্ষাগুরু, গৌরদার। আদর্শ অ্যাথলেট তৈরী করতে শিক্ষকের যেসব চারিত্রিক দৃঢ়তা, সংযম ও ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন তার এক অদ্ভুত সমন্বয় গৌরদা। সিনেমা না দেখা, বা কম দেখা, ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করা, খেলার মাঠে কম কথা বলা, সৎসঙ্গ, ধর্মে ভক্তি এসব সুশিক্ষা তাঁর থেকেই আমি পেয়েছি। এবং একে আমি জীবনের পাথেয় বলেই মনে করি।"

নমিতার বড় ভাই রমাপ্রসাদ ঘোষ ফুটবলে ২৪ পরগণা জেলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ছোড়দা শিবপ্রসাদ ক্রিকেট-রসিক। বাবা জয়গোপাল ঘোষের নেশা তাসে ও ছিপ ফেলে মাছ শিকারে। রোজ সন্ধ্যার পর এক মাইল দূরে যান তাস খেলতে। কিন্তু যেদিন নমিতার স্পোর্টস থাকে সেদিন তার খবর না জেনে এক পাও এগোন না।

আগেই বলেছি ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়। নমিতার কাছেও তাই। কলকাতার কয়েকটি ক্লাব নিজেদের দলে টানবার জন্য প্রলোভনের টোপ ফেলেছে বহুবার। কিন্তু নমিতা পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি।

গঙ্গার কূলে বাড়ি। সুতরাং সাঁতারে সাবলীলা। ওটা সহজাত বিদ্যা। এক সময়ে অক্লেশে গঙ্গা পার হয়েছে। তবে সাঁতারে প্রতিযোগিতা করেনি। খেলাধুলার অবসরে ঘরের কাজকর্ম আর ফুল গাছের পরিচর্যা করে নমিতার সময় কাটে।

দেশী সংবাদ
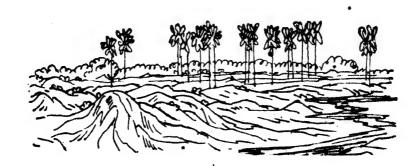
১১ই ডিসেম্বর—গতকাল গভীর রাত্রির অন্ধকারে বাটানগরের নিকট দ্রুতগতি- সমুদ্রগামী এক জাহাজের সহিত সংঘর্ষে গম-বোঝাই তিনটি বজরা সহ একটি লঞ্চ গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। ফলে প্রায় ১৭ জন লোক নিখোঁজ হয় বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

সীমান্ত বরাবর ভারতের যে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন আছে, তাহাদের চীনা আক্রমণ শুধু প্রতিরোধ নয়, ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘনকারী চীনা বিমানকে গুলী করিতেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আজ রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী এই কথা ঘোষণা করেন।

১২ই ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে যাইবার সময় আগামী বৎসরের (১৯৬২) ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে।

জম্মু হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গতকাল অপরাহ্নে একখানি পাকিস্তানী বিমানকে ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করিয়া রণবীরসিংপুরা এলাকা এবং জম্মু ক্যান্টনমেন্টের উপর উড়িতে দেখা যায়। বিমানখানি পরে দ্রুতগতিতে পাকিস্তানের দিকে চলিয়া যায়।

১৩ই ডিসেম্বর—বিশেষ নির্ভরযোগ্য মহলের খবরে প্রকাশ, গোয়ার ব্যাপার লইয়া ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য পর্তুগালের তরফ হইতে যে অনুরোধ করা হয়, ভারত সরকার নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় তাহা কার্যত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ভারত সরকারের নিকট এই মর্মে খবর আসিয়াছে যে, গোয়ায় পর্তুগীজ সরকার সেখানকার সমস্ত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকে সপরিবারে পাততাড়ি গুটাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

১৪ই ডিসেম্বর—গোয়া-সমস্যার সমাধান সশস্ত্র উপায়ে না করার জন্য বিশ্বের দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্র—বৃটেন ও আমেরিকা ভারতের উপর কূটনৈতিক চাপ দিতে শুরু করিয়াছে। নয়াদিল্লিতে বৃহৎ রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রতিনিধিদের তৎপরতা দেখা দিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রী পি সি মজুমদার পৌরসভার স্ট্যান্ডিং ফাইনান্স কমিটির নিকট নূতন বৎসরের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে আগামী বৎসরের (১৯৬২-৬৩) পৌরসভার রাজস্ব খাতে মোট ৩৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

১৫ই ডিসেম্বর—সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ শ্রীলিওনিড ব্রেজনেভ অদ্য নয়াদিল্লিতে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে সাদর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

তৃতীয় অর্থ-কমিশনের সুপারিশের ফলে রাজ্যসমূহ আয়কর ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কের আরও বেশী অংশ পাইবে এবং আন্তঃরাজ্য বৈষম্য কিয়দংশ লোপ পাইবে।

১৬ই ডিসেম্বর—কানোড়িয়া হত্যা মামলায় চারজনকে মৃত্যুদণ্ডে এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। আর একজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শেষ রাত্রে ১৫ নং বর্ধমান রোডে ভগবতীপ্রসাদ কানোরিয়াকে হত্যা করার অভিযোগে ছয়জন দারোয়ানকে অভিযুক্ত করা হয়।

১৪০ মাইলব্যাপী সমগ্র গোয়া সীমান্তে আতঙ্কজনকভাবে পর্তুগীজ সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে বলিয়া বেলগাঁও হইতে সরকারীভাবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর—অদ্য মধ্যরাত্রে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গোয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। ভারতভূমিতে উপনিবেশবাদের শেষ চিহ্ন মুছিয়া ফেলিবার এবং গোয়াবাসীদিগকে পর্তুগীজ অত্যাচার হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর ইহাই প্রথম পদক্ষেপ।

পি টি আই-এর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গোয়ার গবর্নর জেনারেল এবং তাঁহার পরিবারের লোকেরা গোয়া হইতে পলায়ন করিয়াছে। কয়েকজন পদস্থ রাজকর্মচারীও এই প্রকার পলাইয়া গিয়াছে। মনে হয় তাহারা পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে বিমানে লিসবন অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১১ই ডিসেম্বর—গত রাত্রে গোয়া বেতারের এক সংবাদে বলা হয় যে, লিসবন ভারতের সমস্ত দাবি—মায় গোয়া হইতে সৈন্যাপসরণ পর্যন্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত। কিন্তু গোয়ার উপর পর্তুগালের সার্বভৌম অধিকার সম্পর্কে কোন কথা বলা চলিবে না।

আজ জেরুজালেমে আদালত ভূতপূর্ব 'এস এস কর্নেল' অ্যাডলফ আইখম্যানকে ইহুদী জাতি ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। শীঘ্রই দণ্ডাদেশ ঘোষণা করা হইবে।

১২ই ডিসেম্বর—গতকাল একটি বিশেষ গেজেটে প্রকাশিত নূতন অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছে যে, নেপালে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক ধরনের সর্বপ্রকার বিক্ষোভ, জমায়েত ও ধ্বনি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

টোকিওর পুলিস মহলের খবরে প্রকাশ, অতর্কিতে ক্ষমতা দখল এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীহায়াতো ইকেদাকে হত্যার চক্রান্ত করার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়ার পর জাপানের সৈন্য ও নৌবিভাগের তেরজন প্রাক্তন অফিসারকে আজ সকালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর—বুসেলসের কাতাঙ্গা প্রতিনিধি দলের সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপুঞ্জ বিমানবহর আজও প্রেসিডেণ্ট টিশোম্বের বাসভবনের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

কঙ্গোতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দানের জন্য বৃটেনের প্রস্তাব সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৪ই ডিসেম্বর—রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদ্য রাত্রে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করার জন্য ১৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কমিটি গঠনে সম্মত হন এবং সাধারণ পরিষদকে উহা অনুমোদন করিতে বলেন।

ওয়াশিংটন মহল হইতে জানা গেল—পর্তুগীজ সরকার এখন গোয়া, দমন ও দিউকে স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজী।

১৫ই ডিসেম্বর — অদ্য ইস্রায়েলে নাৎসী জার্মানীর ইহুদী নিধন যজ্ঞের হোতা ৫৫ বৎসর বয়স্ক অ্যাডলফ আইখম্যানের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়।

আজ সকালে এলিজাবেথভিল শহরের কেন্দ্রস্থল অভিমুখে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভারতীয় সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায় এবং মর্টার ও মেশিনগান হইতে প্রচণ্ড গুলীবর্ষণের শব্দ শোনা যায়।

১৬ই ডিসেম্বর—অদ্য যুদ্ধরত রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনাবাহিনী মর্টার হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সঙ্গে কাতাঙ্গা সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিয়া এলিজাবেথভিলের কেন্দ্রস্থল অভিমুখে অগ্রসর হইলে প্রেসিডেণ্ট টিশোম্বে সদলবলে রাজধানী হইতে পলায়ন করেন বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর—অদ্য রাত্রে লিসবনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতীয় বাহিনী গোয়ার কোন কোন অঞ্চল দখল করিয়াছে। মুখপাত্র আরও জানান যে, উত্তর গোয়ার সীমান্ত-ঘাটি সিনকুইরভান, পাড়ারদেম এবং মৌলিসগড়ম ভারতীয় বাহিনী দখল করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

আধুনিক কালের মহত্তম উপন্যাস !

প্রকাশিত হ'ল

অসিত গুপ্ত | এই সব আলো প্রেম

সাড়ে চার টাকা

সম্প্রতি প্রকাশিত ! এই দশকের আশ্চর্য সাহিত্য সৃষ্টি !

অজিত দাশ | ক্রৌঞ্চ-নিষাদ

ছ' টাকা

"....উপন্যাসের আঙ্গিকে একটি নির্ভীক ব্যতিক্রম।" —যুগান্তর

"....লেখকের বাস্তবকে দেখবার নৈপুণ্য গভীর।....একটি উল্লেখযোগ্য নভেল বিশেষ।" —দেশ

"....আমাদের অভিভূত করেছে। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, কল্পনার বলিষ্ঠতায়, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় ক্রৌঞ্চ-নিষাদ একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। লেখক ... মানুষের দিনযাপনের ইতিহাস রচনা করেছেন....সাহিত্যিক সততার এক নিদর্শন।" —অমৃত

"....এমন একটি গভীর নাড়া দেওয়া সমস্যাকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে লেখক ... চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।....এ প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ।" —স্বাধীনতা

প্রকাশক : তিন সঙ্গী প্রকাশনী
পি-৮৬, রায়পুর-২ কলিঃ-৩২

পরিবেশক : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ডিটেকটিভ উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা

পৌষালী সংখ্যায় ২টি সম্পূর্ণ রহস্যোপন্যাস ছাড়াও

অনেকগুলি বড় ও ছোট রোমাঞ্চ গল্প

রোমাঞ্চ : ... কলিকাতা ৬

প্রতি সংখ্যা ১, বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬॥৹

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদপটে—তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ-এ ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় সুভাষ গুপ্তের বল-এ মাইক স্মিথের আউট হবার দৃশ্য।

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক
নাট্যসাহিত্য অনগ্রসরিত যাঁরা বলেন
তাঁদের প্রতি নিবেদিত—

সাতটা থেকে দশটা ১,
ন'টা থেকে বারোটা ১,

প্রাপ্তিস্থান—**চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স**
১।১।১এ, বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

(সি ১০৩৫)

কবিতার মাসিক পত্র

পৌষ সংখ্যা বেরিয়েছে

প্রতি সংখ্যা ৫০ নঃ পঃ বার্ষিক সডাক ছয় টাকা
১৩।বি কাকুলিয়া রোড । কলিকাতা ১৯

আগামী ২৮শে জানুয়ারী

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি
"তোমারে স্মরণ করি, স্মরে যথা
তীর্থশেষে ফিরি'
আপনার গৃহকোণে দীন গৃহী
দূর গিরিচূড়া—"

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রথিতযশা লেখক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ প্রমোদরঞ্জন রায়ের নূতন টেকনিকে লেখা স্বামীজির জীবন কাহিনী ॥ ১·৫০ ॥

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজির আমেরিকা অবস্থানকালের বহু অপ্রকাশিত ঘটনা 'Swami Vivekananda in America : New Discoveries' এই আকর-গ্রন্থ হইতে ছোটদের উপযোগী ভাষায় জীবনী-সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত মণি বাগচী সংকলিত
॥ ২·০০ ॥

বিবেকানন্দ বাণী

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের পরম নিষ্ঠাবান জহুরী কুমারকৃষ্ণ নন্দী মহাশয় **সংকলিত** ॥ ১·২৫ ॥
॥ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত এবং পরিবেশিত ॥
বিবেকানন্দের বাণীই আজিকার মন্বন্তরের কোলাহলে ভারতের নিজস্ব সাধনাকে সঞ্জীবিত রাখিবে

জেনারেল বুকস্,
এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

॥ আনন্দ - পাবলিশার্স - প্রকাশন ॥

দু'টি অমূল্য গ্রন্থ

সরলাবালা সরকারের **গল্প-সংগ্রহ** ৫·০০
সরলাবালা সরকারের **পিন্‌কুর ডাইরি** ২·০০

উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **প্রচ্ছদপট** ৩·৫০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **যে যাই বলুক** ৬·০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **রূপসী রাত্রি** ৫·০০
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **তিন দিন তিন রাত্রি** ৫·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের **পঞ্চশর** ৩·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের **প্রতিধ্বনি ফেরে** ৪·০০
মনোজ বসুর **রূপবতী** ৩·০০
রবি গুহ মজুমদারের **মানুষ দেবতা হবে না** ৩·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **বহু যুগের ওপার হতে** ২·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **মনের মানুষ** ৩·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **সারা রাত** ৪·০০
সুবোধ ঘোষের **শতকিয়া** ৮·০০

গল্প-সংগ্রহ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **প্রেমের গল্প** ৪·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **তিন শূন্য** ৩·৫০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **প্রেমের গল্প** ৪·০০
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **ময়ূরী** ৩·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **কহেন কবি কালিদাস** ৩·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **প্রেমের গল্প** ৪·০০
সুবোধ ঘোষের **ভারত প্রেমকথা** ৬·০০

অন্যান্য

কালিদাস রায়ের **চণক-সংহিতা** ৩·৫০
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের **চিন্ময় বঙ্গ** ৪·০০
বীরেন্দ্রনাথ সরকারের **রহস্যময় রূপকুণ্ড** ৩·৫০
শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর **রবীন্দ্র মানসের উৎস-সন্ধানে** ৩·৫০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের **বিবেকানন্দ চরিত** ৫·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের **ছেলেদের বিবেকানন্দ** ১·২৫

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 30TH December 1961

শনিবার, ১৪ই পৌষ, ১৩৬৮ বংগাব্দ
২৯ বর্ষ ॥ ৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা

সম্মেলনের পরে

রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত মহর্ষি ভবনে নিঃ ভাঃ বংগ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। আরও দুটি সম্মেলনের অধিবেশনও সমাসন্ন। সন্দেহ নেই যে, কলকাতা এ-বছরে এ-বিষয়ে বিশেষ এবং তার যোগ্য মর্যাদা পেয়েছে।

সাহিত্যের অ-ভৌগোলিকতা সম্পর্কে গত সপ্তাহে এই পৃষ্ঠাতে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করেছি। সৎ-সাহিত্য সীমান্ত-নিরপেক্ষ—একের বেদনায় তার রচনা হতে পারে, কিন্তু তার আবেদন বহুর কাছে। আরও কম কথায়, দেশ কালে সাহিত্যের মূল প্রোথিত বটে, তবু তার পল্লবের বিস্তার সর্বদেশে, তার ফল সর্বকালের জন্য। বলা বাহুল্য, এ-শর্ত সব-রকম শিল্প-প্রকরণের বেলাতেই খাটে, তবে দেশকালনিরপেক্ষ রচনার ব্যাপারে সাহিত্যের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন। তার কারণ, সাহিত্যের আধার হল ভাষা। এই শতং-বদ দুনিয়ায় সেটা কম অসুবিধার কথা নয়। কোথাও ফুল ফুটেছে টের পেলে অলিকুল ছুটে আসতে পারে, এবং সাহিত্য ফুলের সমতুল হলেও তার গন্ধে আমোদিত হয়ে দিগ্বিদিকের রসিকেরা কিন্তু ছুটে আসেন না। অনুবাদকের নিপুণ হাত দিয়ে তার পাপড়ি খোলাতে হয়। প্রধান য়ুরোপীয় ভাষাগুলি এই অসুবিধা থেকে বহুলাংশে মুক্ত বলে তথায় পারস্পরিক ভাব-বিনিময়, পরিচয় চিন্তার ক্ষেত্রে লেন-দেন অপেক্ষাকৃত সহজ, রসাস্বাদনেও বাধা কম। ভারতীয় ভাষাগুলি—বস্তুত যাবতীয় এশীয় ভাষাই—এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সেই সংগে একথাও বোধ হয় ঠিক, বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও একটু নিবিড় হতে পারত। এই উপমহাদেশে নানা ধর্ম, নানা পরিধানের মত ভাষাও অনেক; কোন্‌টিতে কী রচিত হল, কার প্রগতি কতখানি, সে-বিষয়ে অন্য অঞ্চলে আগ্রহের অভাব কেবল বিস্ময়কর নয়, জাতীয়তাবোধের উন্মেষের পরিপন্থী। বাংলা সাহিত্যের যথোচিত স্বীকৃতি সর্ব-অঞ্চলে মেলেনি, এই যথোচিত অভিমান স্বাভাবিক; আবার এ-কথাও বোধ হয় স্বীকারযোগ্য যে, অপরের কীর্তি এবং কৃতি-বিষয়ে ঔদাসীন্যের দায়ভাগী শিক্ষিত বাঙালীও।

এ-সব প্রসংগ গতবারেই আলোচিত হয়েছে। সম্মেলন বংগ সাহিত্য আকাদেমি-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই সংগে নানা সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে আনাগোনার পথ সুগম করার জন্য যদি বাস্তব ও সম্ভব কোনো কর্মসূচী গৃহীত হয়, তাহলে আরো ভালো।

সম্মেলনের কয়েকটি অভিভাষণে এবং আলোচনা চক্রে সাহিত্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। সর্বদেশে এবং এ-দেশেও, সাহিত্যের দিক-পরিবর্তন সম্পর্কে বক্তাদের সচেতনতা লক্ষ্য করেছি। মূল সভাপতি প্রবীণ সাহিত্যসেবী, তিনিও নূতন ধারাকে স্বীকার করেছেন। উভয় ধারার সহ-অবস্থিতির সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর মতামত তাঁরই উদারতা ও রসজ্ঞতাসূচক।

বলা বাহুল্য, সাহিত্য বিচারে এই রসজ্ঞতা ও উদারতার অভাবেই কখনো কখনো ভ্রান্তি, এমন কি মনোমালিন্য দলাদলির সৃষ্টি করে। নূতনের আবির্ভাব ঘটে স্বাভাবিক নিয়মে, তাকে স্বাগত জানিয়ে তবে তার আতিশয্য, সীমান্তলঙ্ঘন অথবা বিকৃতির সহৃদয় সমালোচনা সমীচীন। যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসারী হয়েও অনুকারী ছিলেন না, ঠিক সেই কারণেই রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের লেখকেরাও রবীন্দ্রনাথ থেকে স'রে আসতে চেয়েছেন। শিল্পীর ধর্মই এই, সে নিজেও কিছু, নিজের মতো ক'রে বলতে চায়। রবীন্দ্রনাথের ধারায় যাঁরা সাহিত্য রচনা করলেন না, তাঁদের মনে সম্ভবত দুটি কথা সক্রিয় ছিল। এক, রবীন্দ্রনাথের মতো ক'রে লেখা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। দুই, যদি সম্ভবও হ'তো, লেখকেরা হুবহু দাগা বুলোতে ভিতরের তাগিদ পেতেন না। অর্থাৎ, আপত্তি গ্রাহকদের ততোটা নয়, জোগানদারদের যতোটা।

এ-কালে চিত্তস্পর্শী রচনা ক্রমশ বিরল হ'য়ে আসছে; এই প্রায় সার্বজনীন অভিযোগের জবাব এ-কালের লেখকেরাই দেবেন। নিপুণ রচনার সাক্ষাৎ এ-কালেও মেলে, কিন্তু বৃহৎ, মহৎ সৃষ্টির সংগে প্রথম পরিচয়ের অভিভব কোথায়, যা বহুকাল স্মরণে রাখার যোগ্য—বহু পাঠক সখেদে এই প্রশ্ন করেন। এমনকি, এককালে যিনি অজস্র অকৃপণ ধারায় দিয়েছেন, তাঁর দানের মহিমাও মলিন হ'য়ে এলে, পরিমাণ শীর্ণ হ'লে, পাঠকের অভিযোগের অন্ত থাকে না। উত্তরে লেখকেরা বলবেন, সাহিত্যস্রষ্টাও মানুষ, যাবতীয় জৈব নিয়মের অধীন, তাঁরও জরা মৃত্যু ঘটে। শক্তি ক'মে আসে; এক-দিন হয়তো ফুরিয়েও যায়। এই সবই সত্য। নিষ্ঠুর কালের নিয়মেই শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতার হয়তো অভাব ঘটে। কিন্তু প্রশ্নঃ উপভোগ ক্ষমতার কি ক্লান্তি নেই, জৈব নিয়মের অধীন তো পাঠকও। বাল্যে যিনি বঙ্কিম-মধু প'ড়ে অভিভূত হয়েছেন, এ-কালের লেখা তাঁর মনে সাড়া যদি না-জাগায়, সে-দোষ কেবল লেখারই নাও হ'তে পারে। লেখা হয়তো তুলনায় নীরেস, তবে এও কি সম্ভব নয় যে, ইতিমধ্যে এই পাঠকেরও হয়তো শিল্প রসাস্বাদনের শক্তিও হ্রাস পেয়েছে! মৃত্যু কি শুধু লেখকেরই ঘটে, পাঠকের মৃত্যু নেই?

সাহিত্যবিচারের এই তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি বহু সমালোচকের চোখ এড়িয়ে গেছে। সম্মেলনে এদিকে কেউ আলোকপাত করেছিলেন কি না, আমাদের জানা নেই। সৃষ্টির শক্তি এবং উপভোগের অবক্ষয় সম্পর্কে একটি সম্ভব-সত্যকে সংক্ষেপে এখানে পেশ করা হ'লো মাত্র। এ-প্রসংগ অধিকারীদের দ্বারা আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনাযোগ্য।

'গোয়ার মুক্তি কৃষ্ণ মেননের নির্বাচন জয়ের পথ সুগম করে দিয়েছে।
আচার্যজী লুপ্ত সুযোগ পুনরুদ্ধারের জন্যে হিমালয় যাত্রা করতে পারেন।
চীন সীমান্ত
কলকাতায় টেস্ট খেলা চলছে।
ইনিংস শেষ হবার আগে আপনার অবসর গ্রহণের কোন মতলব আছে কি?
'গোয়া'য় 'অহিংসা' বিসর্জন দেওয়ায় আদেলাই স্টিভেনসন ভারতকে আক্রমণ করেছেন।
আরেক গান্ধীজী!
বারমুডায় ম্যাকমিলান ও কেনেডির মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্য সম্ভব হয়েছে।
মোর একটি রাবার স্ট্যাম্প।
KUTTY
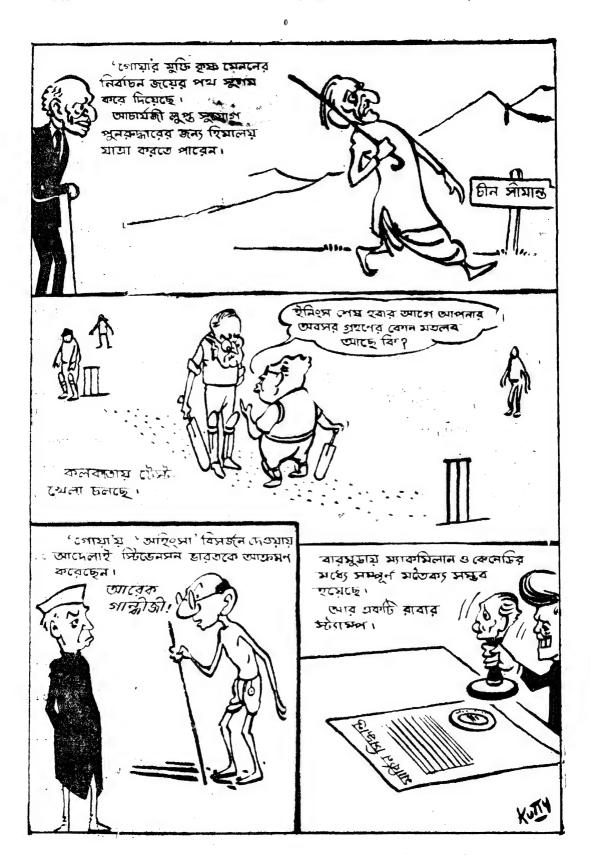
ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসানের পরেও ভারতভূমিতে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের যে ছিটেফোঁটাগুলি ছিল গোয়া, দামান এবং দিউ থেকে পর্তুগীজ কর্তৃত্ব নির্মূলে হওয়াতে সেগুলির নিঃশেষ সমাপ্তি ঘটল। সেজন্য ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দিত। এই ব্যাপারে ভারত সরকার যে নীতি ও উপায় অবলম্বন করেছেন সেগুলি আগাগোড়া অনিন্দনীয় এবং সকল সমালোচনার অতীত বলে ধরে নেওয়া প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কর্তব্য, এরূপ মনে করা কিন্তু উচিত নয়। বরঞ্চ বর্তমান পরিস্থিতি ভারতবর্ষকে আত্মবিশ্লেষণের একটা সুযোগ দিয়েছে, এরূপ মনে করতে পারলে আমাদের উপকার হবে।

বলপ্রয়োগের দ্বারা ভারত সরকার গোয়া অধিকার করেছেন বলে কোনো কোনো বিদেশী মহলে ভারত সরকারের কার্যের সমালোচনা হয়েছে। আবার অনেক বিদেশী মহল থেকে ভারত সরকারের কার্য সমর্থিত হয়েছে। সমালোচক এবং সমর্থক এই দুই দলের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ করতে হবে। যাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণীর সমালোচনার মূলে রয়েছে ভারতের প্রতি অসূয়া এবং বিদ্বেষ, যাঁরা ভারত যাই করুক তাতে তাঁরা দোষ ধরবেন। এক শ্রেণী আছে যাঁদের পর্তুগালের "মিত্র" হিসাবে ভারত সরকারের কার্যের সমালোচনা না করে উপায় নেই, কিন্তু তাঁরা মূলত ভারত সরকারের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন, এরূপ বলা যায় না।

সমালোচকদের মধ্যে আর কিছু লোক আছেন যাঁরা সত্যই দুঃখিত এবং সে দুঃখ আশাভঙ্গের দুঃখ। এঁদের ভারতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে। পর্তুগীজ নীতি এবং ব্যবহারকে এঁরা অতিশয় দূষ্য বলে মনে করেন, কিন্তু এঁরা আশা করেছিলেন যে, বলপ্রয়োগ না করে, অহিংস উপায়ে গোয়া প্রভৃতি স্থান থেকে পর্তুগীজ কর্তৃত্ব অবসান করতে ভারতবর্ষ সক্ষম হবে। আন্তর্জাতিক বিপদের নিষ্পত্তি যুদ্ধের দ্বারা করার চেষ্টা অনুচিত। যুদ্ধের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হয় না ইত্যাদি কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ক্রমাগত বলে আসছেন এবং কার্যত চোদ্দ বছর ভারত সরকার পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের চেষ্টা করেননি। সুতরাং যাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা মনে করেছেন যে, ভারত সরকার গোয়ার ব্যাপারে বলপ্রয়োগের নীতি কখনই নেবেন না, গোয়া বিনা বলপ্রয়োগেই ভারতের

অহিংস শক্তির দ্বারাই কোনো সময়ে মুক্ত হবে। তাহলে একটি পরম উপাদেয় আদর্শ পৃথিবীতে স্থাপিত হোত। সেই সম্ভাবনা নষ্ট হলো বলে বিদেশে কিছুসংখ্যক লোকের সত্যই আশাভঙ্গের দুঃখ হয়েছে। ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলেই এঁদের দুঃখ।

বিদেশে ভারতের কার্যকে যাঁরা সমর্থন করেছেন তাঁদের সকলকেও এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। ঔপনিবেশিক শাসন এবং অত্যাচার থেকে যাঁরা ভুগছেন অথবা তা থেকে সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছেন তাঁদের সমর্থনের আন্তরিকতা সুস্পষ্ট। অনেকে মনে করেন যে, হিংস বা অহিংস যে-কোনো উপায়ে হোক বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানো যেতে পারে। একথা যাঁরা বলেন এবং ভারত সরকারের গোয়া সম্পর্কিত কার্যের সমর্থন করছেন তাঁদের মধ্যে সকলের সমর্থনই যে সম্পূর্ণভাবে নীতিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। ভারত সরকারের কার্যের যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁদের বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি কাজ করছে। অন্য ক্ষেত্রে যাঁরা নিজেরা অপরের স্বাধীনতাকে আঘাত করতে দ্বিধা করেন না তাঁদের সমর্থনের নৈতিক মূল্য ষোল আনা ধরে নেওয়া যায় না। যেমন, যাঁরা নিজেরা বলপ্রয়োগে ওস্তাদ তাঁদের সমালোচনাকেও শ্রদ্ধা করা যায় না।

বর্তমান অবস্থায় যাঁরা ভারত সরকারকে সমর্থন করছেন তাঁরাই ভারতের খাঁটি বন্ধু এবং যাঁরা কোনোরকম সমালোচনা করছেন তাঁরা সব শত্রু, এরকম একটা ভাব সহজেই উদ্রেক করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর হবে না। প্রকৃতপক্ষে বিদেশীর স্তুতি এবং নিন্দার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ না দিয়ে আমাদের নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত অবস্থা বিচার করা উচিত এবং দেখা দরকার যে ভারত সরকারের নীতি ঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে কিনা এবং তার ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ আছে কিনা।

গোয়ায় পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ভারত সরকার কর্তৃক বল-প্রয়োগের ঔচিত্য সম্পর্কে যাঁদের মনে সন্দেহ নেই বা কোনোদিন ছিল না তাঁদের মধ্যেও অনেকের মনে গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের অনেক কথা এবং কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে। বলপ্রয়োগ যদি অনুচিত না হয় তবে কয়েক বছর আগেই সেই পথ কেন নেওয়া হয়নি এবং কেনই বা ঠিক এই সময়ে সে পথ নেওয়া হলো—এই প্রশ্নের উত্তর দেশবাসী চাইতে পারে। বিনা বলপ্রয়োগে পর্তুগীজরা গোয়া ছেড়ে যাবে না, এই সিদ্ধান্ত সাত বছর আগেই করা যেতে পারত। এই সিদ্ধান্ত সাত বছর আগে না করার কি যুক্তি আছে বুঝা যায় না। অথবা সাত বছর আগেই ভারত সরকার বুঝে-ছিলেন যে, পর্তুগীজরা বলপ্রয়োগ ছাড়া যাবে না, কিন্তু বলপ্রয়োগের উপযুক্ত সময়ের জন্যই এতো বছর অপেক্ষা করা হয়েছে?

"উপযুক্ত সময়" নির্ণয় করার পক্ষে দুই যুক্তি হতে পারে। এক যুক্তি এই হতে পারে যে, সাত বছরের জায়গায় চোদ্দ বছর অপেক্ষা করলে পৃথিবীর লোক মনে করবে যে ভারত সরকার যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়েছেন, সুতরাং বলপ্রয়োগের সমালোচনা কম হবে।

দ্বিতীয় যুক্তি এই হতে পারে যে, এর পূর্বে বলপ্রয়োগ করায় বিপদ ছিল। হয়ত পর্তুগালের "মিত্রেরা" পর্তুগালের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হোত। এই যুক্তির কোনোটাই ঘাতসহ নয়। সাত বছরের জায়গায় চোদ্দ বছর অপেক্ষা করা হয়েছে বলে সমালোচনার ইতরবিশেষ হয়েছে এরূপ মনে করার কোনো কারণ দেখি না। যাঁরা আজ সমালোচনা করছেন তাঁরা সাত বছর আগে হলেও যেমন সমালোচনা করতেন, তেমনি আজ যাঁরা সমর্থন করছেন তাঁরা সাত বছর আগে হলেও সমর্থন করতেন। সাত বছর আগে না করে সাত বছর পরে গোয়ায় সৈন্য পাঠানোতে ভারত সরকারের কাজের সমালোচকের সংখ্যা কমেছে এবং সমর্থকের সংখ্যা বেড়েছে, এরূপ কোনো প্রমাণ নেই।

বরঞ্চ এই সাত বছর ধরে কিছু না করে ভারত সরকারের মুখপাত্রগণ এমন সব কথা বলেছেন যার ফলে অনেকের মনে এই ধারণাই প্রশ্রয় পেয়েছে যে, গোয়া সমস্যার সমাধান বিনা বলপ্রয়োগেই হবে, ভারত সরকার বলপ্রয়োগের পথে যাবেন না। তাতে ভারতের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল তাঁদের আশা-ভঙ্গের দুঃখ বেশি হয়েছে। হয়ত আশা-ভঙ্গের দরুণ আজ যাঁরা দুঃখিত হয়ে ভারত সরকারের সমালোচনা করছেন তাঁদের কেউ কেউ আজ সমালোচকের শ্রেণীতে থাকতেন না, যদি ভারত সরকার এই ধৈর্যের পালা না দেখাতেন। আরো গোলমাল করা হয়েছে ভারত সরকারের মুখপাত্রগণের কতকগুলো উল্টোপাল্টা কথার দ্বারা। একই মুখে বলা হয়েছে যে, ভারতভূমিতে পর্তুগীজ শাসন দূর না হওয়া পর্যন্ত, গোয়ায় ভারতের ভূমিতে পর্তুগীজদের অবৈধ দখলের উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না এবং আবার বলা হয়েছে যে, গোয়ার মুক্তি গোয়াবাসীর প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে, যদিও সকলেই জানতেন যে, পর্তুগীজ শাসনের উচ্ছেদকামী হয়েও গোয়াবাসীরা মাত্র নিজেদের চেষ্টা দ্বারা স্বৈরাচারী পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটাতে সক্ষম নয়, তার জন্য ভারতবাসী এবং ভারত সরকারের সহায়তা আবশ্যক। এই দুরকম পরস্পরবিরোধী কথা বলার ফলে বল প্রয়োগের সমর্থনে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এমন কিছু কিছু ঘটনা এবং যুক্তির সমাবেশ করতে হয়েছে যাতে ভারত সরকারের সম্মান বৃদ্ধি হয়নি। সোজা পথে চললে অহিংসা রক্ষা না হলেও "সত্যমেব জয়তে" বাক্যের সম্মান অটুট থাকতে পারত।

ন্যায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, অনন্যোপায় হয়ে ভারতবর্ষকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে একথা জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেখাতে হবে যে, ভারতবর্ষ কেবল নিজে অন্যায় বলপ্রয়োগ করে না। অপরের অন্যায় বলপ্রয়োগের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সমর্থনও করে না। তিব্বতী-দের মানবিক অধিকার লোপের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড নেশনস্-এর জেনারেল অ্যাসেম্বলীর প্রস্তাব যে-সরকারের প্রতি-নিধিরা সমর্থন না করে চুপচাপ বসে থাকতে পারেন তাঁদের পক্ষে বলপ্রয়োগের ব্যাপারে কোনো নৈতিক আদর্শবাদের বড়াই করাতো সাজেই না, বরঞ্চ লজ্জা রাখাই দায়। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই এইরকম করে থাকে। আমাদের সমালোচনা করার অধিকার কারো নেই, এইসব কথা অবশ্য বলা হচ্ছে। কিন্তু ভারতবাসীরা তাতে সন্তুষ্ট হবে কেন, ভারতবাসীরা কেন চাইবে না যে তাদের সরকার সর্বদা ন্যায় ও সত্যের পথে দৃঢ় থাকবেন। অন্যের কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করবেন না?

ন্যায় অন্যায়ের কথা ছেড়ে এখন "বাস্তব" সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নে আসা যাক। একথা মোটেই ঠিক নয় যে, সাত বছর আগে বল-প্রয়োগের দ্বারা গোয়ার মুক্তিসাধনের চেষ্টা করা এখনকার চেয়ে বিপজ্জনক হোত। মুখে তাঁরা যাই বলুন, গোয়ার জন্য পর্তুগালের "মিত্ররা" যে পর্তুগালের হয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না, একথা অন্তত সাত বছর আগেই ঠিক ছিল এবং সেকথা ভারত সরকারের অগোচর থাকার কোনো কারণ নেই। সুতরাং এই সাত বছর অপেক্ষা করার হেতু কী? কী কারণে এই ঘটনা এখন ঘটল? এই সব প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক, কারণ তার সঙ্গে ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যত সম্পর্কিত।

ভারতবর্ষ বিনা বলপ্রয়োগে গোয়া সমস্যার সমাধান করতে পারল না, এজন্য ভারতবর্ষেও অনেক লোক দুঃখিত, যদিও পর্তুগীজ শাসনের অবসান প্রত্যেকেই চেয়েছেন। কিন্তু ভারত সরকার একটা অহিংস সমাধান আবিষ্কার করবেন এরূপ আশা যদি কেউ করে থাকেন তবে সেটা ভুল হয়েছে। অহিংস সমাধান যাঁরা চেয়েছেন দেশের অহিংস শক্তি সংগ্রহের দায়িত্বও তাঁদের ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপর অত্যধিক ভরসা করে থেকে তাঁরা সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আশা করি এইবার টনক নড়েছে।

২৫-১২-৬১

সৈয়দ মুজতবা আলী

হাস্যরস

একদা বেতারে শুনতে পাই, জনৈক সাহিত্যিক কোনো প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, 'হাস্যরস? হাস্যরস ভালো জিনিস। তবে কি না, হাস্যরস তৈরী করতে হলে কাউকে না কাউকে একটু পীড়া দিতে হয়।' ইংরিজিতে বললেন, 'ইট ইজ এট দি কস্ট্ অব্ সাম্ ওয়ান।'

পরে তাঁর সঙ্গে ক্লাবে দেখা হলে আমি বললুম, 'সে তো ব্যঙ্গ রসের বেলা। ইংরিজিতে যাকে বলে স্যাটায়ার। সে অতি প্রাচীন জিনিস। শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মোক্ষম অস্ত্র। গ্রীক সংস্কৃত থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনে হাসির গানে ভাষাতেও আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ যাকে হাস্যরস বলে প্রাচীনকালে পাওয়া যায়, সেটা তো কারো 'কস্ট' হয় না।'

তারপর বললুম, 'এবং অনেক হাস্যরস এট দি কস্ট অব্ সামওয়ান বটে কিন্তু সেটা এতই সামান্য যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।' সঙ্গে সঙ্গে চট করে প্রাচীন দিনের একটি গল্প মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় 'সন্দেশে' পড়েছিলুম। সেই 'সন্দেশ' বহুকাল পর আবার বেরচ্ছে এবং আগেরই মত মনোরম।

লণ্ডনের খাস কক্নী কয়েকজন গোরা সেপাই পাঠানো হয়েছে চীন দেশে। রাত্রে মশার কামড়ে তারা অতিষ্ঠ। এ প্রাণীর সঙ্গে তাদের আদপেই পরিচয় নেই। একজন বললে, 'মানুষ কী ভুল খবরই না দিতে পারে। প্রাচ্যে আসবার সময় সবাই বললে, বাঘ হাতি সিংহের দেশে আসছি—সাবধানে থাকতে। কই, সেই বিরাট বিরাট জন্তুগুলোর সঙ্গে তো এ যাবৎ দেখা হল না। প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললে এই ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীগুলো।' আরেকজন উপদেশ দিলে, 'এক কাজ কর। আলো নিভিয়ে দে। মশাগুলো তা হলে আমাদের খুঁজে পাবে না।' তাই করা হল। হঠাৎ একজন কানের কাছে পিন্-ন্-ন্-ন্ শব্দ শুনে কম্বলের নিচের থেকে মাথা খুলে সেই অন্ধকারে দেখে—। কি দেখে? হবি তো হ ঠিক সেই সময়ে একটা জোনাকি পোকা ঢুকেছে ঘরে। সেটাকে দেখতে পেয়ে আর্তরব ছাড়লে, 'আর রক্ষা নেই রে—মশাগুলো লণ্ঠন নিয়ে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে।'

এ গল্পটাতে কক্নি গোরার কূপমণ্ডূকতার প্রতি যে সামান্য কটাক্ষ করা আছে সেটা কিছু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এটাকে

তাই ব্যঙ্গরস না বলে রঙ্গরসই বলা উচিত।

চীনা গল্পটির তুলনায় ভারতীয় গল্পটি কিন্তু আরো সরেস।

সেই কক্‌নি গোরাদের একজন এসেছে ভারতবর্ষে। ছুটিতে গিয়েছে তাজমহল দেখতে। রেস্তর অভাব বলে উঠেছে এক সস্তা হোটেলে। ম্যানেজার বাড়িয়ে দিয়েছে একটা ছারপোকা খাতার এক প্রান্ত থেকে থেকে কি কারণে আগমণ সব-কিছু লিখে দিতে হয়। ককনি কলম নিয়ে যখন সে-সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে যাচ্ছে এমন সময় দেখে, একটা ছারপোকা খাতার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি চলে গেল। ককনি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বললে, 'এ কী মারাত্মক দেশে এসেছি রে বাবা, যেখানে ছারপোকা খাতাতে পড়ে যায় কোন্ ঘরে কে উঠেছে— সেখানে গিয়ে পছন্দ মত রক্ত খাবে বলে।' অতএব দেখুন, চীনা মশার তুলনায় ভারতীয় ছারপোকা কতখানি তালেবর।

এখানে ভারতীয় নোংরা হোটেলের প্রতি কটাক্ষ আছে বটে কিন্তু সেটা গায়ে মাখবার মত নয়। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই নোংরা হোটেল আছে—প্যারিসে দেদার, লন্ডনেও কিছু কমতি নয়। আমার রেস্ত আকছারই কম, তাই এইসব হোটেলের সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশী। অবশ্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সব সময়ই ডরচেস্টার ভালডর্ফ-আস্টোরিয়ার নামে দোহাই কাড়ি। তা সে যাক্।

আমার মনে হয়, রঙ্গরস ব্যঙ্গরস যার কল্টেই হোক না কেন, সর্বোত্তম রসসৃষ্টি হয় যদি সে রস 'এট ওয়ান্স ঔন কস্ট' হয়—অর্থাৎ নিজেকে নিয়ে নিজে ঠাট্টা। এ ধরনের রসিকতা রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই করতেন, এবং তার আরম্ভ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। পাছে মনিব্যাগটা ভুলে জাহাজে ফেলে যান তাই লিখছেন, 'এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনই সাবধান করে দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বললে, ক্ষেপেছ? আজ সকালে তাকে বৃথা ভৎসনা করেছি। নন্টোম্ধার করে হোটেলে ফিরে এসে স্নানের পর আরাম বোধ হচ্ছে। (এবং) রাত্রে যখন কলকাতামুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসছিলুম। (এবারে বুঝি কবি মনকে সাবধান করেন নি কিংবা সেও 'ক্ষেপেছ'?—বলোনি) তবু সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয়নি।'

এ ছাড়া নিচেরটি তো সকলেরই জানা:—

তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার
বদ-অভ্যাস,
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস,
কিছু না হক 'লঙফেলো'দের
হব আমি সমান তো,
এখন মাথা ঠান্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।

* * *

আমার বড় ভালো লাগে মধ্যযুগের এক আরব গুণীর নামে প্রচলিত একটি গল্প। এ গল্পটি আপনি কাইরো, দমস্কস্ বাগদাদ সব কফির দোকানেই শুনতে পাবেন। আরবদের বিশ্বাস এই গুণী জাহিজ-ই[১] পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যিনি নিজেকে নিয়ে নিজে—এট ওয়ান্‌স ঔন কস্ট—প্রথম এবং বিস্তর মস্করা করেছেন।

তিনি ছিলেন গভীর পণ্ডিত এবং অসাধারণ সুপুরুষ। সমকালীন সর্বলেখকই এ দুটি কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। অথচ কিংবদন্তী বলে, তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

'আমার মৃত্যুর পর আমার সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের দুশমনরা অনেক কুৎসা রটাবে। তার অন্যতম, আমি নাকি সুপুরুষ ছিলুম!

এর বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করতে চাইনে। কারণ সেটা বে-ফায়দা। তবে একটি ঘটনার বিবরণ আমি দেব যার থেকে পাঠক স্বয়ং বিচার করতে পারবেন, আমি সুপুরুষ কি না।

আমি যাচ্ছিলুম বাগদাদের রাস্তা দিয়ে। আমার পরনে মোল্লার বেশ। এমন সময় বোরকায় সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি মহিলা আমার ঝোলা আস্তিনে টান দিয়ে বললেন, 'আমি বিপদে পড়েছি—আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?' (এস্থলে বলে রাখা ভালো আরব দেশে মোল্লা-মাত্রকেই এ-ভাবে অনুরোধ করা যায়, এবং তিনিও উপকার করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন।) আমি বললুম, 'বলুন, ভদ্রে।' তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তুর এ-গলি সে-গলি হয়ে তিনি দাঁড়ালেন এক ভাস্করের দোকানের সামনে—সে প্রতিমা বেচে—দোকানে একেরর ভিনাস, এফ্রডাইটি, জিয়ুস ইত্যাদি দেবতার মূর্তি। মহিলাটি আমার দিকে অঙ্গুলি করে দোকানীকে নির্দেশ দিয়ে আমাকে সবিনয়ে বললেন, 'আমার কাজ হয়ে গিয়েছে; অনেক শুক্রিয়া, আপনি যেতে পারেন।'

জাহিজ বলছেন, 'যদিও কাজ হয়ে যাওয়ার পর মোল্লা হিসেবে পরের ব্যাপারে আমার আর কোনো কৌতূহল থাকা অনুচিত, তবু আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করলো, রহস্যটা কি। তাই প্রহরখানেক পর ফের গেলুম সেই দোকানে। ভাস্করকে শুধালুম, 'ভাই, সব কথা খুলে কও। আমাকে দেখিয়ে দিতেই সব-কুছ হয়ে গেল, ব্যাপারটা কি?' ভাস্কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে এই মহিলাটি মাসখানেক পূর্বে আমাকে এসে বললেন, 'আমি আজীবন ভগবানের পুজো-আরাধনা করেছি, কখনো কোনো অন্যায় করিনি, কিন্তু এই তিন মাসের ভিতর পটপট করে আমার স্বামী-পুত্র পিতা ভ্রাতা মারা গেলেন। তাই আমার বিশ্বাস হয়েছে, শয়তানই সর্বশক্তিমান। আমি এখন থেকে তার পুজো করবো। আপনি আমাকে শয়তানের একটি মূর্তি গড়ে দিন।" আমি বললুম, "ম্যাডাম, আমি কখনো শয়তানের কোনো মূর্তি এ পৃথিবীতে দেখিনি। অতএব মডেল না পেলে গড়বো কি করে?" তিনি তখন আপন কাঁধে সে-ভার নিলেন ও আজ সকালে আপনাকে মডেলরূপে দেখিয়ে গেলেন।।'

সর্বশেষে জাহিজ বলছেন, 'আশা করি এর পর আর কেউ দয়া করে বলবেন না, আমি সুপুরুষ।'

(১) এঁর প্রধান প্রধান এবং নানা বিষয়ে লেখা গ্রন্থের পরিচয় পাঠক পাবেন Encyclopaedea Britannicaয়।

আকাশবাণী ও সাহিত্যিক

(১)

দেশ সম্পাদক সমীপেষু,—

কবিদের হয়ে বন্ধুবর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যখন এগিয়ে এলেন, তখন আমারটুকুও বলতে হয়। নীরেন্দ্রনাথ দশ, আমি তাঁর আরও বছর চার আগে থেকে কবিতা পড়ছি আকাশবাণীর কলকাতা-কেন্দ্রে। আমারও বাড়েনি দক্ষিণা। অবশ্য তার মধ্যেও কথা আছে। আইনগত কারণে আমার নাকি দিনে পঁচিশ, মাসে পঞ্চাশের ওপর নেওয়ার উপায় নেই। আগে অন্তত তাই-ই ছিল। এখন যদি কিছু এর হের-ফের হয়ে থাকে, বলতে পারিনে। যেমন আগে একজন সরকারী কর্মচারীকে আকাশবাণীর কোনো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হলে, তাঁর বিভাগীয় ওপরওয়ালার সম্মতি গ্রহণ করতে হ'ত, এখন আর তার দরকার হয় না। সরকার [illegible] কিন্তু যা দক্ষিণা টাকাপয়সার ব্যাপারে আকাশবাণী থেকে সরকারী কর্মচারীর আয় এর থেকে বেশী হলে, সরকারকে একটা পরিমাণ নাকি আবার ছেড়েও দিতে হয়।

তা ছাড়া এই-ই বা কেমনতর রীতি, নীতির দিক থেকেও নিশ্চয়, যেহেতু একজন গুণী ব্যক্তি সরকারী কর্মী সরকারী কর্মচারী হিসেবে যদিও তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকু সম্যক পালন করে চলেছেন তিনি সাহিত্য করেন। শুধু সেইটুকু কারণেই তিনি তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন? আর তাঁর সমমর্যাদার একজন সমসাময়িক সাহিত্যিক যদি আকাশবাণী থেকে পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ পান, তিনিই বা চিরদিন পঁচিশে আটকে থাকবেন কেন? অনেক নামী সাহিত্যিক আছেন, বৃত্তিতে যাঁরা সাংবাদিক। যে সব সংবাদপত্রে তাঁরা জীবিকানির্বাহের জন্য কর্ম করেন, সেই সব সংবাদপত্রের বিশেষ সাহিত্যসংখ্যাগুলিতে কবি, গল্পলেখক বা প্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁদের স্বতন্ত্রভাবে ডাক পড়ে। এবং তার জন্য তাঁরা, যাঁর যা মর্যাদা, যথাযোগ্য দক্ষিণাও পান। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মী-সাহিত্যিক বলে তাঁদের বিশেষ কোনো দর বাঁধা থাকে না পাওনার অংশবিশেষ প্রতিষ্ঠানকে আবার প্রত্যর্পণ করতে হয়, এমন উদ্ভট কথা কিন্তু ত শুনিনি কখনো।

নীরেন্দ্রনাথ আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। দরখাস্ত দাখিলের। ও আমিও শুনেছি। তবে তা কবিতা পড়া নিয়ে নয়,

গান রচনা নিয়ে। তা সে একই কথা। তিনি পার্টিশানের ওধারে পরামর্শ চেয়েছেন, আমি নয় এধারে। উকিল আলাদা হলে কি হবে, আইনে তারতম্য কোথায়? উকিলেরা কি করবেন? তবু রক্ষা—নীরেনবাবু গান লেখেন না। লিখলে—মানে 'আকাশবাণী'র রম্যগীতি-অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে লিখতে হলে, মজাটা আরো ভালো করে বুঝতেন। আমার থলিতে অমন আরো দু' চারটি চোখা-চোখা রূপকথা জমা আছে।

গোবিন্দ চক্রবর্তী
রানাঘাট, নদীয়া

(২)

দেশ সম্পাদক সমীপেষু—

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আকাশবাণীর বিরুদ্ধে লেখা চিঠিগুলো পাঠ করেছি এবং সাহিত্যিকদের প্রতি আকাশবাণীর অপমানকর আচরণে বিস্মিত এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি। এ কথা ভাবতে আমি আজ সত্যই লজ্জিত যে, আকাশবাণী জনকল্যাণের মুখোশ পরে ব্যবসায় অবতীর্ণ হয়েছেন; এবং যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ও সুসমৃদ্ধ করছেন তাঁদেরই মূল্যবান রচনা নিয়ে খেলছেন কাটুকাবাজি।

আকাশবাণীর ব্যবহারের বিরুদ্ধে সাহিত্যিকদের কণ্ঠে সম্প্রতি যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে তাতে যদি আকাশবাণী কর্ণপাত না করেন তা হলে ভবিষ্যতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন সুসাহিত্যিকই তাঁর রচনা আর আকাশবাণীকে দেবেন না। ফলে অল্প অর্থের বিনিময়ে ভেজাল-সাহিত্যের আমদানি এবং প্রচার শুরু হবে; এবং যাঁরা সাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁরা প্রবঞ্চিত হবেন।

আমি একজন সাধারণ পাঠক। বাংলার সাহিত্যিকদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। শ্রদ্ধা আছে। পাঠক হিসেবে আমি আকাশবাণীর দুর্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করছি এবং দাবি করছি, আকাশবাণীর যে নিয়ম সাহিত্যিকদের মর্যাদাকে বারবার আঘাত করে আসছে তার দ্রুত এবং আমূল পরিবর্তন। ইতি—

দীপককুমার চট্টোপাধ্যায়
রায়গঞ্জ

চৌরঙ্গী

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ২৯ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যার 'আলোচনায়' শ্রীশান্ত রায় তৈলচুম্বক সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। 'চৌরঙ্গীর' লেখকের মতে ব্যঙ্গার্থে শব্দের এরূপ ব্যবহার নিপাতনে সিদ্ধ। দুঃখের বিষয় স্বয়ং সুলেখক 'শংকর' বললেও শব্দের এরূপ বর্ণসংকর ব্যবহারকে আমরা অপব্যবহার বলেই মনে করব। Sheep অর্থে জাহাজ কিংবা Ship অর্থে ভেড়া 'শংকর' কেন স্বয়ং শংকরাচার্য বললেও লোকে মেনে নেবে না। আমাদের মতে শব্দের অপব্যবহারে ব্যঙ্গ বা কৌতুক কোনটাই প্রকাশ পায় না। বরং স্থানে অস্থানে ব্যঙ্গের প্রয়োগে বিঘ্ন ঘটতে পারে। যেমন এই ক্ষেত্রে ঘটেছে। magnet এবং magnate-এ তফাৎ আছে।

হীরকজ্যোতি দত্ত
শান্তিনিকেতন

বাংলা দেশের গ্রাম

মহাশয়,

আপনার বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিকে প্রকাশিত গ্রাম সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচনাটি পড়িলাম। তিনি বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টিতে বাংলা দেশের গ্রামকে দেখিয়াছেন, সেই হেতু গ্রামের অবনতি বিষয়ে প্রকারান্তরে গ্রামবাসীকেই দোষী করিয়াছেন। ইহা ঠিক নয়। তিনি যদি তাঁহার দৃষ্টিকে আরো গভীরে অনুপ্রবিষ্ট করাইতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, সরকারের সকল শুভ প্রচেষ্টা সরকারী আমলারাই বানচাল করিতেছেন। গ্রাম-জীবনের উন্নতি বিধানের নিমিত্ত আজ পর্যন্ত (স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মাধ্যমে) যে-সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার একচতুর্থাংশ মাত্র গ্রামবাসীর প্রকৃত মঙ্গল সাধনে সক্ষম হইয়াছে। পরিকল্পনা এবং অর্থব্যয় অনেক হইতেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেগুলি যথাযথ এবং যথাস্থানে পৌঁছানোর পক্ষে সরকার আখ্যাধারী ব্যক্তিরা বিশেষ অন্তরায়। গ্রামবাসীকে বাদ দিয়া গ্রামের উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা বা অর্থব্যয় অনেকটা ফুটো পাত্রে জল সংগ্রহের মত। যাঁহাদের হাতে গ্রামের উন্নতি সাধনের ভার দিয়া সরকার নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহারা হয় আবাল্য শহরবাসী, না হয় কোন রাজনীতিক দলের প্রচ্ছন্ন সমর্থক। গ্রামের মাটি, জল, নিঃশ্বাসের সহিত তাঁহাদের কোনই যোগ নাই। গ্রামবাসীরা আজও তাঁহাদের আত্মীয়-সম্পর্কে দেখিতে পারেন নাই, দূর হইতে অকিঞ্চনের মত কার্যব্যপদেশে তাঁহাদের দুয়ারে উপস্থিত হন, কখনও বা ভিক্ষা কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে কাহারও মঙ্গল হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বি-ডি-ওর (Block Development Officer) কর্মতৎপরতায় বরাদ্দ, মঞ্জুরীকৃত অর্থও সম্পূর্ণ ব্যয় না হইয়া ফেরত যায়। গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং প্রাপ্তবয়স্কের কর্মসংস্থান ব্যাপারে সরকারী অর্থব্যয়ের কার্পণ্য না থাকিলেও এ যাবৎ তাহা কোন স্থায়ী এবং প্রকৃতমঙ্গল (Real Value) সাধনের আদর্শে ব্যয়িত হয় নাই। অনেকটা বিবাহ উৎসবাদি ক্রিয়াকাণ্ডে অবিমিশ্র ব্যয়ের অনুরূপ—ক্ষণস্থায়ী ও অদূরদর্শী।

গ্রামের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দলাদলির কথা সুনীলবাবু উল্লেখ করিয়াছেন এবং সরকারী অর্থ আত্মসাতের নিমিত্ত ধিক্কার তুলিয়াছেন তাহার মূলে গ্রাম-উন্নয়ন ও সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারী নীতির বিকৃত বিশ্লেষণ এবং শিথিল ও প্রাণহীন আমলাতান্ত্রিক হস্তাবলেপ দায়ী। আমি ইহা মনে করি। সরিষার মধ্যে যদি ভূত থাকে তাহা হইলে সেই সরিষায় ভূত ছাড়ান সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে আমি গ্রামের উন্নতিকামী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দিবাকর দেব সরকার
মালা, মহিরামপুর, ২৪ পরগণা

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৩৫৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর সম্বন্ধে খবর এক এক সময়ে প্রধান খবর হয়ে ওঠে—নইলে সাধারণত ও কথাটা আলোচ্য মনে করি নে। খবরের কাগজে বোধ করি কিছু আভাস পেয়েছিলে, এবার টাউনহলে আমাকে গুরুতর জখম করেছিল। নীলরতনবাবু যদি আগে থাকতে অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত না থাকতেন তাহলে আমি বোধ হয় মূর্ছিত হয়ে পড়তুম। বৃহস্পতিবার এই অত্যাচারের স্মৃতিটা ছিল না। কিন্তু শুক্রবারে বুকের মধ্যে খুব একটা দুর্বলতার আক্রমণ অনুভব করলুম, বিশেষত রাত্রে। মনে করলুম তার পরদিনেই শান্তিনিকেতনে দৌড় দেব। কিন্তু বিরজার সঙ্গে জরুরি কাজের কথা ছিল তাই যেতে পারিনি। বুকের কষ্ট ও দুর্বলতা চলল। আমার কেমন মনে হোলো হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে, কিন্তু কলকাতায় আমার দিন শেষ হবে একথা মনে করতে ভালো লাগে না। রবিবারে যাওয়া ঠিক ছিল। কিন্তু সোমবারে তোমরা আসবে জেনে একটা দিন রয়ে গেলুম। তুলসী গোসাঁইয়ের মোটরে যাওয়ার ব্যবস্থা হোলো। সকাল বেলায় ভালো লাগছিল না। নীলরতনবাবুকে খবর দেবার চেষ্টা করেছিলুম, তিনি বাড়ি ছিলেন না। চলে এলুম। সেই অবধি চুপচাপ আছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার জের আছে তবু বোধ হচ্চে ছিয়াত্তরটা পার হয়ে যেতেও পারি। নাইব পারলুম।

তোমরা কোথায় আছ কেমন আছ, কোথায় থাকবে কোনো খবর জানিনে। জানবার জন্যে উৎসুক রইলুম।

যেদিন আমাকে চারজনে মিলে কলকাতায় টেনে নিয়ে গেল—তার পরের দিনই প্রবল বৃষ্টিপাতে আমার শ্যামলী বাড়ির কয়েকটা অংশ ভেঙে পড়ল, আমি যে জায়গায় বসতুম সেইখানেই। আমার মাথায় পড়া অসম্ভব ছিল না। সংক্ষেপে সমাপ্তি ঘটত। মনের মধ্যে এই কথাটা ঘুরে বেড়ায়, এগুলি বুঝি উপসংহারের শেষ ভাঙনের লক্ষণ—তোমরাও তার সঙ্গে যোগ দিয়ো না। নতুন বাড়িটা তৈরি চলচে। মনে মনে হাসি। পাখি কি বাসা বাঁধে সন্ধ্যাবেলায়।

মেঘে আকাশ চাপা। বৃষ্টি পড়চে টিপ্ টিপ্ করে। মাতাল যে রকম মদের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে, সূর্যের আলোর জন্যে আমার সেইরকম অবস্থা।

এখন স্থান পরিবর্তন করেছি। উদয়নের একতলায় বড় ঘরটাতে আমার আবাস। বারান্দায় বৌমার বাগানের সামনে দিন কাটে। প্রচুর আলো আকাশের বরাদ্দ এখানে।

মাঝে মাঝে খবর দিতে কৃপণতা কোরো না—চিঠি পাও বা না পাও। পূর্বেই যত চিঠি অনাহূত পেয়েছ তার ঋণ শোধ করতে সময় লাগবে। ইতি ২১ জুলাই ১৯৩৬

কবি

॥ ৩৫৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার শেষ চিঠিটা ক্যান্‌সেল করলুম। কারণ বোধ হয় দরকার নেই। কেননা তোমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে যে চিঠি লিখি সে তোমার হাতে পৌঁছয় না। যদিও অশ্বিনী নেই তবু তার পিঁজরাপোলটা আছে বোধ হয়। আজকাল চিঠি লিখতে সহজে কলম সরে না সেই জন্যে লুপ্তির গর্তে চিঠি উৎসর্গ করতে উৎসাহ হয় না।

সেই চিঠিতে আমার দেহ নিয়ে আলোচনা করেছিলুম। ওটা আলোচ্য বিষয় নয়। রুগ্ন হলে ওর খবরটা প্রাধান্য লাভ করে। শাস্ত্রে দেহাত্মবোধের নিন্দা করেচে—আমিও করি—কিন্তু রোগের দুর্বলতাকে বাহন করে দেহটার খবর আর সব খবরের চেয়ে এগিয়ে চলে। আর বার বার চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখা দিয়েছিল সে জন্যে অনুতপ্ত আছি। সেই জন্যে বলচি—সে চিঠিটা ক্যান্‌সেল করে দিলুম।

ডাকঘর কলকাতায় অভিনয়ের সংকল্প আছে। পুজোর বন্ধের আগে। অতএব তাড়াতাড়ি নেই, বর্ষামঙ্গল হবে তার পূর্বে। আজ থেকে রিহার্সাল শুরু হবে। প্রস্তুত হলে তার পরে দিন ঠিক করা যাবে। প্রস্তুত হতে সময় লাগবে—আশা করচি তার আগেই বর্ষা দৌড় মারবে না। তোমার চিঠিতে জানিয়েছিলে মঙ্গলবারে ফিরবে—আজ বৃহস্পতিবার। শুক্রবারে চিঠি পাবে। অনিশ্চিতের জন্যে যথেষ্ট মার্জিন রাখা গেল—কিন্তু অনিশ্চিতের আয়তনের সীমা নির্দেশ করতে কে পারে? ইতি ৩০ জুলাই ১৯৩৬

কবি

[কবির কিরকম যেন বদ্ধমূল ধারণা দাঁড়িয়েছিল যে আমার কাছে ওঁর চিঠি পৌঁছয় না, ক্রমাগতই চিঠি হারায়। যদিও সে ধারণা সত্য নয়। ওঁর লেখা ২।১ খানা চিঠি ছাড়া কোনো চিঠিই আমার হারায়নি। অশ্বিনী বলে আমাদের একটি পুরাতন অনুচর ছিল। তার বুদ্ধি সম্বন্ধে কবির বিশেষ আস্থা ছিল না। তাই কেবলই অশ্বিনীর নাম উল্লেখ করে বলতেন তার হাতে পড়ে চিঠি কোথায় তলিয়ে গেছে। আসলে কবির অত্যন্ত ভুলো মন ছিল বলে কবির মনে হতো সে অন্যমনস্ক হয়ে চিঠি কোথায় হারিয়ে ফেলেছে।]

॥ ৩৫৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

হয়ত আগামী শনি কিংবা রবিবারে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করব। শুনেচি চারটের সময় যে গাড়ি ছাড়ে সেইটে এক নম্বর রথমঞ্চে থামে অতএব সেই গাড়িই আশ্রয় করব—একেবারে তোমার আশ্রয় যদি নিই তাহলে অত্যাচার হবে না তো। আশ্রয় দেওয়াই যদি স্থির করো তাহলে তোমাদের রথে বলার সারথ্যে গম্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে কি? তোমার শরীর ভাল নয় হঠাৎ এ রকম খবরে হয়তো তাপ বৃদ্ধি হয়ে সাড়ে আটানব্বইয়ে পৌঁছতে পারে। যদি সে রকম লক্ষণ ঘটে আমাকে ক্ষমা কোরো। এইরকম বাক্যগুলো চলতি ঠাট্টার অঙ্গ, অনুরূপ ভাষায় তুমি এর প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা কোরো না কারণ—থাক্ সে সব তর্ক। অশ্রদ্ধাসূচক কথা যদি আমার মুখ থেকে দৈবাৎ বেরিয়ে পড়ে তুমি সেটা ঠাট্টা বলেই কল্পনা করে নাও এই আমার একটা মস্ত সুবিধে। ইতি ২ আশ্বিন ১৩৪৩

কবি

॥ ৩৬০ ॥

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার চেনা পরিচিত জগৎটা যেন নিঃঝুমে হয়ে রয়েছে—কারো সাড়া পাইনে। মরে ভূত হলে মানুষের ভাবখানা কী রকম হয় তা কতকটা বুঝতে পেরেছি। হাওয়ায় ভাসচে মনটা—বুঝতে পারবে না কতটা আছে কতটা গেছে।

একসঙ্গে নানান্ কাজ ঘাড়ে পড়েছে—কাজ না থাক্‌লে ভূতটার শূন্যত্ব আরো বেশি বেড়ে উঠত।

শনি আমার বাসাটার উপর মেরেছে এক লাথি, তোমার বাসার উপরেও দৃষ্টি দিয়েছে। আমার আর এক বাসা মাথা ঝেড়ে উঠচে, তোমাদের বাসান্তরটা কোথায় সে অনিশ্চিত। তুমি তো তাকাচ্চ গিরিডির দিকে—আমার নেত্রকোণায় পর্দা পড়ল। একবার ইচ্ছা করচে সমুদ্রপারে চলে যাই—আণ্ডামানে নয়।

ভাদ্রমাসের ১০ই নাগাদের মধ্যে বর্ষামঙ্গল তৈরি হয়ে ওঠবার কথা। তদুপলক্ষে এখানে তোমার আসা হয়ে উঠবে কিনা সে কথাটা মনের মধ্যে হাতড়ে পাচ্চি নে। ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩৪৩

কবি

॥ ৩৬১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এসে অবধি প্রুফ দেখা, পুরোনো লেখা সংশোধন করা, রিহর্সাল চালানো, নতুন নাটটার জন্যে নতুন গান রচনা, ভিজিটরের সঙ্গে আলাপ ইত্যাদিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত্রি পর্যন্ত নিরতিশয় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এক হিসেবে ভালোই। কিন্তু একটুও অবকাশ না পেলে কি রকম হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আমাদের দিন স্থির হয়েছে অক্টোবর ৪ঠা ৫ই। আমি হয়তো অক্টোবরের প্রথমেই যেতে পারব ততদিনে রিহর্সাল সমাধা হবে আশা করচি। কিন্তু তার পূর্বেই নেত্র-কোণা থেকে তুমি অন্তর্ধান করবে। সেই গেটের ভিতর দিয়ে পুষ্পবনে প্রবেশের কোনো উপলক্ষ থাকবে না।

তুমি খুব কসে বিশ্রাম কোরো। সেইটেই প্রধান চিকিৎসা। আমার আতিথ্য ব্যাপারেও তোমার দেহকে পীড়িত করতে হয়েছিল—এখন কিছুদিন ধরে তার ক্ষতিপূরণ করে নাও। যখন যাব তখন যেন দেখতে পাই তুমি বিশ্রামসাগর থেকে উঠেছ লক্ষ্মীর মতো নিরাময় লাবণ্যজ্যোতি নিয়ে।

বৃষ্টি মনে হচ্চে এইবার শ্রান্ত হয়ে আসচে—সন্ধেবেলা হঠাৎ দেখা দেয়, বেশীক্ষণ আসর জমাতে পারে না।

আমার সেই ওষুধের প্যাকেটের আশা আমি তো ছেড়েই দিয়েছিলুম—কিন্তু গাঙ্গুলি ছাড়তে চায় না। সে বলে দিয়েছিল আমি উদ্ধার করে আনবই, যদি সহজে তা হাতে সমর্পণ না করো তা হলে সে তোমার জিনিসপত্রের মধ্যে রীতিমত Raid করবে। এই সামান্য জিনিসের জন্যে বিরোধ কোরো না—এতে তোমার নাম খারাপ করবে—তাতে আমিও লজ্জিত হব। ৪ আশ্বিন ১৩৪৩

কবি

॥ ৩৬২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কেমন আছ? এখনো কি দেহ শয্যালগ্ন। সংক্ষেপে খবর দিয়ো।

বর্ষা এখনো লড়াই চালাচ্চে, স্পেন গভর্নমেণ্টের মতো—কিন্তু হারের লক্ষণ দেখা যাচ্চে। অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে আসচে বলে মনে হয়—সকালের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে শরতের রৌদ্র, গাছ-পালা ঝলমল করে ওঠে, একটু সংশয়াপন্ন উত্তরে হাওয়াও ক্ষণে ক্ষণে বইতে থাকে। আবার দেখি সন্ধ্যার দিকে কোথা থেকে মেঘগুলো গোঁফ ফুলিয়ে দাড়ি দুলিয়ে এসে হাঁক ডাক শুরু করে দেয়, বর্ষা ঘোরতর বাঙালের মতো কিছুতে আপন জেদ ছাড়তে চাচ্চে না।

রিহর্সাল চলচে। বোমা নেই, অত্যন্ত নিঃসহায় বোধ করচি। এবারে মেয়েরা নিজের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে, আশা করচি নৈরাশ্যজনক হবে না—বুড়ির উপরই প্রধান নির্ভর।

বাজল আড়াইটা। বনমালীর কল্যাণে একটা আতা খাওয়া গেল। আজ বুড়ির বাড়িতে সায়াহ্নে আমার নিমন্ত্রণ। মীরা তার জামাতৃগৃহে অধিষ্ঠান করেছে। শুনচি কাল সে কলকাতায় চলে যাবে। মিস্টর গাঙ্গুলি দশোৎপাটন উপলক্ষে কলকাতায় চলে গেছে, সেই কারণে এ-পাড়ায় কোথাও সাড়াশব্দ নেই। —কিন্তু ভাগ্যিস ভদ্রলোক কলকাতায় গিয়েছিল তাই তোমার কাছ থেকে ঐ সামগ্রী উদ্ধার করতে পেরেছে, আমি ভালো মানুষ আমার সাধ্য ছিল না।

এখানেও পিঁপড়ে আছে কিন্তু কামড়ায় না। ইতি ৬ আশ্বিন ১৩৪৩

কবি

বিচিত্রার চিঠিগুলোতে ছাপার ভুল আছে, এবং মনে হচ্চে পাঁচটাকা মূল্যের পরিমাণে মাল কম।

॥ ৩৬৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শশিভূষণ ভিলা থেকে তোমার যে শেষ পত্র পেয়েছিলুম তার মধ্যে এই আশ্বাসবাণী ছিল যে পত্রটির প্রান্তদেশে তোমার ভাবী ঠিকানা লেখা থাকবে। প্রান্তদেশ মনোযোগের সঙ্গেই সন্ধান করলুম। একটা শব্দ পাওয়া গেল রাণী। অনেক চিন্তা করলুম, রাণীগঞ্জ, রাণীক্ষেত, রাণীমুদ্দা, কোনোটাই সম্ভবপর বোধ হোলো না—রাজমহলের বাস সীমানায় রাণী-মহল আছে কিনা পোস্ট আপিসে খবর নিতে পাঠালুম, তারা বললে, হতভাগা বাজেমহল বিপরীত। হতাশ হয়ে আমার যা লেখবার কিছু আছে পাঠাতে রাজী হলুম লইশোদশ নম্বর কর্নওয়ালিসে। ঐ পথ দিয়ে হয়তো একেবারে খবর কর্নওয়ালীর গোচরে পৌঁছতে পারে। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের অভিনয় হবে ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজ হল স্টেজে ১০—১১ তারিখ শনি রবি বারে। চিত্রাঙ্গদাকে দেখবার এবং শোনবার যোগ্য করে তোলা গেছে। খবরটা অত্যন্ত ইম্পর্টেণ্ট্ নয়—তবু যদি লক্ষ্যস্থানে ঈষৎ চমক লাগাতে পারে।

আমি যাব বৃহস্পতিবার সকালের গাড়িতে। ছেলেমেয়েরা আসবে তার পরদিনে। ঝড়ের কাণ্ড লেগেছে চারদিকে, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি নামচে অশ্রুধারায়, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। জামসেদপুরে তোমার শরীরের দশা কী হোলো সেই খবরটার আশা রাখি। ইতি তারিখ জানিনে—

কবি

৫-১০-৩৬

॥ ৩৬৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

[illegible] কলকাতায় নীরস কলরবে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে সকাল বেলায় বিছানা থেকেই সুধাকান্তকে

বললুম, আনো ট্যাক্সি, চলো হাওড়ায়। দূরধ্বনিবাহ যন্ত্রে তোমাকে সংবাদ দেবার চেষ্টা করেছিলুম—কিন্তু তোমাদের যন্ত্রটার কখনোই অবকাশ থাকে না। —উদয়নেই আশ্রয় নিতে হোতো, আমার নতুন বাড়িটা মিস্ত্রিদের আক্রমণে মুখরিত, বাতাস ধূলিপুঞ্জে নিবিড়। উদয়নের বিশাল রাজপুরী শূন্য —সন্ধ্যেবেলায় কিছুকাল নূপুর নিক্কনে গুঞ্জরিত ছিল, এখন সব নিস্তব্ধ। এখানকার জীবনস্রোত ছুটিমুখো—শরতের আকাশে ছুটির হাওয়া বইচে। সোনালী রোদ্দুরটা মধুরে বাতাসটাতে আগামী শীতের প্রথম বার্তা পৌঁচেছে। ইতি ২৭শে আশ্বিন ১৩৪৩

॥ ৩৬৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিজ্ঞাপন

এখানে সকলে ধ'রে পড়েছে পরিশোধ অভিনয়ের জন্যে। ছুটির আগেই দেখাতে হবে। যদি আসতে চাও অন্তত তিন টাকা দামের টিকিট কিনতে হবে। সোণার হার বিক্রির জরুর নেই। বাসাভাড়া ও খাইখরচের জন্যে অতিরিক্ত খরচ লাগবে না—আত্মীয়স্বজন সঙ্গে আনলেও দ্বারী নিষেধ করবে না। ইতি—

১৪-১০-৩৬

॥ ৩৬৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সুধাকান্তর কৈফিয়ৎটা তোমাকে শোনাই। সে বলচে, তিনবার তোমাকে ফোন্ করতে চেষ্টা করে খবর পেলে টেলিফোন বাগ্দত্ত। তারপর একজন কে ধরল, বললে, তুমি নেই, বুলাও নেই; তুমি এলে তোমাকে খবর দেবে এমন আশ্বাসও দিল। এখন বোঝা গেল লোকটা কাজ বাঁচিয়েচে। —আমি এখানে এসেই স্থির করেছি ছুটি আরম্ভের পূর্বে পরিশোধটা এখানকার মঞ্চে চড়িয়ে দেব। তুমি দেখতে পাওনি কলকাতায়, দেখতে পেলে খুসি হতে। প্রধানত এই কথাটা মনে রেখেই প্রস্তাবটা করেছি। ছেলেমেয়েরা অনেকেই বাড়ি চলে গেছে—তাতেও নিরুৎসাহ হইনি। এ-আশঙ্কাটাও মনে আছে, তোমারও আশা হবে না, ভাঙা হাটে অভিনয়টাও হবে। আমাদের সংকল্পগুলো অন্ধকারে ঢেলা মারা, অনিশ্চয়তার মধ্যে দৈবাৎ লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়, না পৌঁছনোরই সংখ্যা বেশি। যাই হোক, আগামী কাল অর্থাৎ ৩১শে আশ্বিন শনিবার সায়াহ্নে ভাঙা আসরেই অভিনয় হবার কথা রইল—আশা করি তারিখ বার যেটা লিখলুম সেটা ভুল নয়। কাল কোন্ তারিখ এবং কোন্ বার তা পঞ্জিকা দেখলেই জানতে পারবে। মোটের উপর এখানে সময়টা ভালোই। শরৎলক্ষ্মী অনবগুণ্ঠিতা, চারিদিকে রৌদ্রের মধ্যে যেন একটা চিরবিরহবেদনার আভাস পাওয়া যায়।

এ চিঠিখানা টেলিফোনের বার্থ বার্তার মতো কোনো একটা শূন্য ঠিকানায় পৌঁছবে কিনা জানিনে—অসময়ে হোক যথাসময়ে হোক ডাক বিভাগ একেবারে বঞ্চিত করবে না। ইতি ৩০শে আশ্বিন(?) ১৩৪৩

কবি

॥ ৩৬৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আন্দাজ করচি তুমি আছ গিরিডিতে। আমার ঠিকানা পাবে এই চিঠির সব শেষে।

বুড়ির হাত দিয়ে আমাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলে। সেই চিঠি পেয়েছি—তার অক্ষরবর্জিত খামটা খোলা। সেই খামটাই আমার লাভ। বুড়ি বোধ করি সন্দেহ করেছিল ওর মধ্যে তারই শরীর সম্বন্ধীয় আলোচনা আছে—অতএব ঐ চিঠিতে আমার চেয়ে তারই অধিকার বেশি। নারীজাতি সুলভ কৌতূহলবৃত্তি ভদ্ররীতিকে লঙ্ঘন করতে কুণ্ঠিত হয় না। ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্চে—মাঝে মাঝে মেঘ করচে, আবার রোদ্দুরও দিচ্ছে দেখা। বর্ষার দাক্ষিণ্যে এবার গাছপালা পরিপুষ্ট।

তোমার পদযুগলের স্থূলবৃদ্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে খবর জানিয়ো। ইতি সপ্তমী ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ

বুড়িকে Calc. Sulf. দিচ্চি—জ্বর নেই)

॥ ৩৬৮ ॥

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

অনতিকাল পূর্বে চিঠি লিখেছি, উত্তরের অপেক্ষা বা প্রত্যাশা না করেই আবার লিখতে বসেছি এর থেকে মনে করতে পার আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সন্ধান নিলে জানবে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, প্রকৃতিস্থ আছি। কৌতূহলবশত একটা প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্যেই এই অধ্যবসায়।

ছন্দা নামক একটি মাসিক পত্রিকা আছে, তার সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়। তার পূজার সংখ্যা এইমাত্র আমার হস্তগত হোলো,—তাতে একটি পত্র বেরিয়েছে, সে পত্র একদা তোমাকে লিখেছিলেম। বাল্যকালে জো-দার ভৃত্য চিন্তা শীতের প্রভাতে রুটি টোস্ট করছিল এই সুগন্ধি লোভনীয় ঘটনার উল্লেখ করে আমি কিছু বর্ণনা প্রকাশ করেছিলুম। সেই চিঠিখানি এই পত্রিকায় বেরিয়েছে—স্বীকার করেছে বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। তুমি বিশ্বভারতী দেবী নও একথা সর্বজনবিদিত। এবার বরনগর থেকে বিদায় নেবার পূর্বে এ চিঠিখানি তোমার খাতায় দেখেছি। এটা বিচিত্রায় দেওয়া হবে বলে জল্পনাও করেছিলে। বিচিত্রার কপিকারক দুই অংশ দুই পথে চালান করেছে বলেই সন্দেহ করি। তোমার সম্মতি নেয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। বিশ্বভারতীর প্রতিনিধি হচ্চেন কিশোরীমোহন—তাঁর আপিসের খাতার সঙ্গে তোমার খাতার জড়িত হবার সম্ভাবনা নেই—তাছাড়া হঠাৎ অকারণে আপন অধিকার লঙ্ঘন করে তিনি সৌজন্য প্রকাশ করতে যাবেন এমন স্বভাব তাঁর নয়। —ঘটনাটা নিছক দুর্ঘটনা নয় কারণ হেমেন্দ্র আমার একজন অকৃত্রিম ভক্ত, সে আমার কাছে দান প্রার্থনা করলে খুসী হয়েই দিতুম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জেগে উঠেছে—তুমি রহস্য ভেদ করতে পার যদি আমাকে জানিয়ো, সেই সঙ্গে জানিয়ো তোমার পায়ের মেজাজ কী রকম—তার দর্প কমেছে কী? —অধ্যাপকের আমাশাঘটিত একটা বৃত্তান্ত একদা ছন্দে বর্ণিত হয়েছিল। অধ্যাপকের শ্যালক সেটি তাঁর বিষাণ পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের সৌজন্যে। তিনি যদি অধ্যাপকের সম্মতি না নিয়ে থাকেন, তবে জেনো সেটা তাঁর বিশেষ সম্বন্ধের স্পর্ধার লক্ষণ। আমাকে দায়ী কোরো না। বেলা এখন দুটো। বসে আছি হিমঝুরির বীথিকার ছায়ায়। আমার ঠিকানা :—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ছন্দাতে আমার চিঠি বেরোনোর প্রসঙ্গ]

রমাপদ চৌধুরী

(১০)

সেই পদ্মই নেই, যাত্রার আসর ঘেঁষে বসবে না সে, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকবে না উদাসের চূড়ার দিকে, রঙ ঝলমল জোড়া-বুক-ছতরীর দিকে, বেশকারীর নিপুণ তুলিতে আঁকা তার টানা টানা চোখের দিকে। আর তার অভিনয় দেখে বিভোর হয়ে থাকবে না পদ্মর শান্ত কোমল চোখ-জোড়া। মুগ্ধ গলায় গালে হাত দিয়ে হেসে হেসে বলবে না, তোমার কণ্ঠের কথাগুলোন চিনির মত নাগে না গো বোনাই।

লক্ষ্মীমণির সঙ্গে গ্রাম্য আত্মীয়তার সূত্রে বোনাই বলে ডাকতো পদ্ম। বলতো, তোমার দুঃখে কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা করেচে সবাই, তুমি লট বটো গো বোনাই, পাকিতো লট।

উদাস হেসে বলেছে, আমার নেগে দুঃখু নয় পদ্ম, বলো হরিশ্চন্দের নেগে দুঃখ। কেমন সে মানুষটা ছিল, ভাবো তুমি।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পার্ট খুব ভালো করতো উদাস, সবাই প্রশংসা করতো। মজুমদারদের গিন্নী-মা একবার পাঁচ-সেরী একখানা বগী থালা পুরস্কার দিয়েছিল উদাসকে। পদ্মও প্রশংসা করতো। তবু ও-সব পুরাণ-কথায় মন উঠতো না উদাসের।

বলতো, ব্রজেনবাবুর পালা আনাও গো দামুদাদা। অপেরা পার্টি এয়েছিল গতবারে কাটোয়ায়, পর পর চারদিন চারখানা পালা হলো....

কখনো বা বলতো, এবার থেয়টার করলে হয় না দামুদাদা?

সেই উদাসের কিন্তু কোন উৎসাহই নেই যেন এবার। বাপের কাছে খবর শুনে, এলো বটে দামু পালের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু মনের আগ্রহ তার মরে গেছে। কার জন্যে সে রঙ মাখবে মুখে, অভিনয় করবে?

তবু দামুদাদার সঙ্গে দেখা না করে পারলো না। সাইকেলটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেই খিড়কির ডোবায় হাত-পা ধুয়ে বেরিয়ে পড়লো।

একবার মনে হলো লক্ষ্মীমণিকে শুধোয় খাবার কিছু আছে কিনা। পরক্ষণেই ভাবলে, দামুদাদার বাড়ি থাকতে আবার খাবার ভাবনা।

পালেদের বাড়িতে পেঁছে দেখলে ইতি-মধ্যেই আসর জম-জমাট। একটা কম্বল বিছিয়ে বসেছে সবাই। দামুদাদার কোলে ফিরু, আর সামনে কানা-উঁচু থালায় এক রাশ মুড়ি আর ফুলুরি নিয়ে ঘিরে বসেছে গ্রামের ছেলে-বুড়ো অনেকেই।

উদাসকে দেখতে পেয়েই খুশী হয়ে উঠলো দামু পাল। ডাকলে, আয় উদাস, আয়।

দাওয়ার এক প্রান্তে গিয়ে বসলো উদাস। তারপর ফিরুকে ডাকলে। ফিরু বাপের কোল ছেড়ে নড়বড়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে উদাসের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আর রেণু এক সময় এসে বললে, দাদা বাড়ি না এলে আর খোঁজ খবর নিতে নাই, না উদাস?

উদাস হাসলো। —সময় পাই না গো দিদি, সারা দিনমান তো কাজের চাকায় ঘুরি।

গোপেন মোড়ল রসিকতা করে বললে, তা বটে, ও কি চাষাভুষো মানুষ এখন, মটোর ড্রাইভার!

বিনয়ে লজ্জায় মুখ নীচু করলো উদাস। বললো, এখনো হই নি গো খুড়ো, লাইসেন পাই আগে।

গোপেন হেসে বললে, হ্যাঁ, লাইসেন্স পেলে বুঝবি কত ধানে কত চাল হয়। জমিজমার মূল্য তো বুঝলি না, দেখবি পরে।

উদাসের ইচ্ছে হলো বলে, গোপেন তার ছেলেকে তা হলে শহরে রেখে কলেজে পড়াচ্ছে কেন। জমিজমা তো তার অনেক, উদাসের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

তবু কিছু বললে না উদাস, শুধু হাসলো। এতদিন পরে দামুদাদার সঙ্গে দেখা, দু'একটা সুখদুঃখের কথা হবে, যাত্রার পালা ঠিক হবে, এখন আর ও-সব কথা গায়ে মেখে কাজ নেই।

ফিরুকে আদর করতে করতে উদাস লক্ষ্য করলে ঘোমটা টেনে রাঙা বৌঠান ওদিকের ঘরের কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে হাসি হাসি মুখে।

উদাস উঠে গিয়ে চৌকাঠের বাইরে, থেকেই মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে। —পেন্নাম গো বৌঠান। বলে ফিরুকে আদর করে

কোলে নিয়ে বললে, বেটা তোমার খুব বুদ্ধিবান হবে গো। কতদিন আসি নি ঠিক চিনতে পেরেছে আমায়।

দু' একটা সাধারণ কথাবার্তার প আবার ফিরে এসে বসলো উদাস।

আর রেণু বললে, বসো উদাস, চলে যেও না যেন।

ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে তখন। কাটোয়া থেকে শুধু দুখানা হোটেলের রুটি খেয়ে বেরিয়েছিল, তারপর এই পনেরো মাইল পথ আসতে আসতে কখন তা হজম হয়ে গেছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ গিয়ে পড়ছিল। কানা-উঁচু বড় থালাটার ওপর। এক রাশ তেল মাখা মুড়িতে ফুলুরি আর লাল লঙ্কা ছড়ানো, থালাটা থেকে সবাই মুঠো মুঠো মুড়ি তুলে মুখে পুরছে।

উদাস দেখলে, রেণু ইশারায় বাগাল ছেলেটাকে ডাকালে। আর সে মরাই তলা থেকে কাঁসার থালাটা এনে দাঁড়ালো, রেণু মুড়ি ঢেলে দিলে তাতে, লঙ্কা আর ফুলুরি, আর একটু গুড়।

তারপর বললে উদাসকে দিয়ে আসতে।

বাগালটা উদাসের সামনে মুড়ির থালাটা রেখে যেতেই কিন্তু সেটা ঠেলে সরিয়ে দিলো ও।

রেণু বলে উঠলো, কি হলো উদাস?

উদাস হাসলো। —ক্ষিদে নাই গো দিদি।

এর আগেও উদাস এ-বাড়িতে বহু-বার খেয়ে গেছে, এই থালাতেই, কোনদিন আপত্তিকর মনে হয় নি। কিন্তু আজ পার্থক্যটা যেন বড় বেশী চোখে পড়লো। অন্য কেউই কিছু বুঝতে পারলো না ভাবলে, সত্যিই হয়তো ক্ষিদে নেই তার।

উদাস নিজেই খানিকটা পার্থক্য রেখে চলে। ঘরের লোকের মত ভাব ভালোবাসা সবার সঙ্গে, তবু কম্বল ছেড়ে বসেছে সে, সম্মান করে কথা বলেছে। অথচ তার জন্যে কিনা বাগালের থালা। অথচ কাটোয়ার হোটেলে সবাই সমান। ড্রাইভার না হলে, শহরে না গেলে বুঝি মানুষের মর্যাদা মিলবে না।

গোপেন মোড়ল অতশত মনের খবর রাখবে কেন। তাই ঠাট্টা করতে ছাড়লে না। বললে, ও এখন শহুরে ভদ্দরলোক হয়েছে দাদু, মুড়ি খায় কখনো!

কথাটা শুনে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো উদাস। বললে, পেটের খাওয়াটাই সব নয় গো।

গোপেন আবার ঠাট্টা করলে, তাই তো বলছি, ড্রাইভারদের কীর্তিকাহিনী আমরা আর কি জানি বল? কত রকম সব ক্ষিদে ওদের!

উদাস রেগে গেল।

বললে, আপনাদের ভদ্দরলোকদের কথাও আর বলবেন না গো। যা কীর্তি দেখে এলাম আজ।

—কি কি? কি দেখে এলি? কোন সালো কাহিনী শোনবার জন্যে সবাই যেন উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো।

উদাস কথাটা চাপা দিয়ে বললে, সে কিছু না, ঐ গিরিজাখুড়োর মেয়েদের কথা......

কথাটা বলে যেন উপস্থিত সব কটা লোকের বিরুদ্ধে একটা প্রতিশোধ নিতে চাইলে।

*

গিরিজাপ্রসাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন অনেক দিন থেকেই শুরু

হয়েছিল। তার একটা প্রধান কারণ হয়তো এই যে সাজপোশাক, কথাবার্তা এবং চাল-চলনে ওদের সঙ্গে গ্রামের লোক যে শুধু খাপ খাইয়ে চলতে পারে নি তাই নয়, বিমলা-কমলারাও যেন মিশে যেতে চেষ্টা করে নি। একদিকে কিছুটা ঈর্ষা, আরেক দিকে অসীম তাচ্ছিল্য—আর সেই অস্পষ্ট অস্ফুট বিরোধটাই চাপা গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছিল।

অবশ্য তার জন্যে কোন মাথাব্যথা ছিল না বিমলার। মোহনপুরের বউয়ের সেদিনের কটূক্তি কানে এসেছিল নিভাননীর, শুনে মনে মনে গজরেছিলেন। তবু সাবধানও করতে চেয়েছিলেন মেয়েদের। —তোরা হৈ হৈ করে বেড়িয়ে বেড়াস, ঐ বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিস...

বিমলা হেসে ফেলেছে সে-কথা শুনে। —তুমিও কাকীমার মত হয়ে গেলে মা!

নিভাননী তারপর আর আপত্তি তোলেন নি। সাথীই তো, বন্ধুবান্ধব নেই, মেলা-মেশার লোক নেই, এই আধো অন্ধকার ঘরে সারাক্ষণ কাটাবে কি করে ওরা। নিভাননী নিজেই তো অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এক এক সময়। আর অমরেশও যেন এই গ্রাম্য আবহাওয়া থেকে, এই কর্মহীন নিস্তব্ধতা থেকে পরিত্রাণ পেলে বাঁচে। পুজোর পরই অবশ্য কলেজ খুলবে ওর, সেই দিন কটির অপেক্ষায় আছে।

কিন্তু বিমলা-কমলা? গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে, টিয়ার সঙ্গে, কোন মিল নেই যেন। প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন একটা চাপা কৌতুকে তাদের সঙ্গ ভাল লেগেছিল। এখন অটামার কথাগুলোও যেন একঘেয়ে লাগে। আর এই বনপলাশির জীবন যেন একটা দম বন্ধ হয়ে যাওয়া নিস্পন্দ ঘড়ি। থেমে আছে, থেমেই থাকবে। এখানে জন্ম ছাড়া আনন্দ নেই, মৃত্যু ছাড়া শোক নেই, বিবাহ একমাত্র স্বপন। বিমলাও বুঝি এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

মাঝে মাঝে গিরিজাপ্রসাদ স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। মেয়েদের শহরের বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াবেন কিনা, কিংবা বড় ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তারই সমাধান খুঁজে বেড়ান।

বিমলা আর কমলা ততক্ষণে বই-খাতা গুটিয়ে উঠে পড়ে। অমরেশকে বলে, চল্ দাদা, আজ সেই আখের ক্ষেতটায় যাবো।

নতুন-গোড়ের ঝুড়ি নামা বটগাছটার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা আল ধরে এগিয়ে চলে ওরা তিন ভাইবোন। নতুন-গোড়ের ঘাটে বাসন ধুতে ধুতে গ্রামের বউ-ঝিরা দু'একজন হয়তো দু' একটা কথা বলে, বেশির ভাগই তাদের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, তারপর নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসে, টিপ্পনি কাটে।

আল ধরে ধরে মাঠে মাঠে অনেকেই তারা যাতায়াত করে বটে, কিন্তু এমন নির্লজ্জ ভাবে হাসাহাসি চিৎকার করতে করতে নয়। ঘোমটা টেনে পতপত করে শাড়ির শব্দ করে দ্রুত পায়ে যাওয়া আসা করে, থমকে থামে, পথের মাঝখানে অন্য বাড়ির বউ-ঝি দেখলে চাপা-গলায় দুটো কথা বলেই ঘরে ফেরে। বারো বছরের মেয়েটাও এমন ভাবে দৌড়ে বেড়ানোর কথা ভাবতে পারে না।

সেইজন্যেই বুঝি বিমলার মনে তাদের সম্পর্কে এমন একটা তাচ্ছিল্য। তাচ্ছিল্যটা হাবে-ভাবে প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু মনের মধ্যে সেটা সব সময়েই চাপা থাকে।

আগের দিন দূর থেকে আখের ক্ষেতটা দেখে এসেছে, যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দুপুরের চড়চড়ে রোদে যেতে পারেনি। আজ তিনজনে হাসাহাসি গল্পে মেতে সেদিকেই এগিয়ে গেল।

কখনো দৌড়ে, কখনো লাফ দিয়ে কাটা-আলের জলো খাল ডিঙিয়ে আখের ক্ষেতে নেমে পড়লো। আখের ক্ষেত থেকে গোটা কয়েক আখ ভেঙে নিয়ে আবার আলপথ ধরলো।

আর কিছুটা গেলেই জেলাবোর্ডের বড় রাস্তা। ধুলো উড়িয়ে বিকালের বাস আসছে, অনেক দূর থেকে বিমলা দেখতে পেল।

বললে, চল্ দাদা, আজ রাস্তা অবধি যাই।

অমরেশও ফুর্তিতে নেচে উঠলো। —যাবি?

তিন জনেই দাঁতে চেপে আখের ছিলে ছাড়াতে ছাড়াতে এগিয়ে চললো বড় রাস্তাটার দিকে। আশপাশের মাঠে যারা নিড়েন দিচ্ছিল তারা মুখ ফিরিয়ে একবার দেখেই আবার কাজ করতে শুরু করলে। ভাবলে, বাস ধরতে যাচ্ছে হয়তো। তা না হলে এত বড় মেয়ে কি আর মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়।

কাশঝোপ পার হয়েই একটা বড় খাল,

সামান্য জল আর কাদা থাকে এ-সময়টায়। বর্ষাকালে কাঁদরের জল বের করে দেয়া হয় এখান দিয়ে।

ঝিরঝিরে হাওয়ায় কাশফুলের ঢেউ দুলছে, কাঁপছে। থমকে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলো ওরা।

তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে খালটা পার হল। ছোট একটা সাঁওতাল পল্লী একটা ডোবাকে ঘিরে। কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, মুর্গী চরছে। আর সেই বাজে পোড়া অশথ গাছটা দাঁড়িয়ে আছে কালো রুক্ষ চেহারা নিয়ে।'

গাছটা পার হয়েই বাসের রাস্তা। দু' পাশে খোয়া জমা হয়ে আছে থাকে থাকে।

হঠাৎ একটা নীল রঙের সুন্দর একটা পাখি উড়ে গেল ডোবার জলে ছোঁ মেরে।

কমলা জিগ্যেস করলে, ওটা কি পাখি রে দিদি?

—কি জানি।

—মাছরাঙা না কি বলে, তাই বোধ হয়। অমরেশ বললে।

বিমলা হাসলে, দূর! মাছরাঙা নয়।

নানা রঙের পাখি, মাঠে নানা রঙের ফুল —সরষে, কলাই কি আল,—যা দেখে ওই পরস্পর পরস্পরকে জিগ্যেস করে। কেউ বলতে পারে না। কেউই নিঃসন্দেহ নয়।

মাঠের মুনিষদের কখনো কখনো জিগ্যেস করেছে। তারপর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে। ওমা, এই নাকি সরষে ফুল! একটার পর একটা বিস্ময়। এত বিস্ময়ও গ্রামের জীবনে লুকিয়েছিল!

একটা সাঁওতালদের ছেলে ঘাটে নামছিল পায়ের কাদা ধুতে, তাকে ডাকতে যাচ্ছিল বিমলা। হঠাৎ হর্ণের শব্দ শুনে ফিরে তাকালো।

দুরন্ত স্পীডে ধুলো উড়িয়ে একখানা জীপ আসছে। আধ চিবোতে চিবোতে সেদিকে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে রইলো বিমলা।

ওদের পার হয়ে সামান্য ক'গজ এগিয়ে গিয়েছিল জীপটা, তারপর থেমে পড়লো।

প্রভাকর ডাকলো ওদের।

আর চিনতে পেরে ওরা তিনজনেই ছুটে গেল।

বিমলার দিকে তখনো মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে প্রভাকর। গাছ-কোমর করে পরা রঙিন শাড়িতে বিমলার প্রভাতী যৌবন যেন অজ্ঞাত এক রোমাঞ্চের সন্ধান দিয়েছে। প্রভাকরের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ করে তুললো বিমলাকে। পরক্ষণেই হাসতে হাসতে সে বলে উঠলো, কি মশাই, খুব ইস্কুল বানিয়ে দিয়ে গেলেন তো!

প্রভাকরও হাসলো। —সে ইস্কুলে তুমিও পড়বে নাকি?

বিমলা হেসে উঠলো। —তবেই হয়েছে। আপনাদের ইস্কুল হবে, আমি পড়বো সে ইস্কুলে, ততদিনে......

কমলা বাধা দিল। —ছোটদি না পড়ে, আমি তো পড়বো!

জীপে বসে বসেই কথা বলছিল প্রভাকর, পিছন থেকে পর পর কয়েকটা মাল বোঝাই ট্রাক আসছে দেখে জীপটাকে একেবারে রাস্তার পাশ ঘেঁসে বুনোকুলের ঝোপের ধারে এনে থামালে।

অমরেশ জিগ্যেস করলে, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

—বলগা স্টেশনে। হাসলো প্রভাকর,

বিমলার দিকে ফিরে বললে, যাবে? খুব বড় হাট বসে আজ।

—সত্যি? যেন কত অবিশ্বাস্য একটা কথা বলেছে প্রভাকর, এমন ভাবে প্রশ্ন করলে কমলা।

আর বিমলা হেসে বললে, ছাই, গেঁয়ো হাট তো আপনাদের. মুলো আর বেগুন পাওয়া যাবে শুধু। খিলখিল করে হেসে উঠলো বিমলা।

—আমাদের হাট? হাসলো প্রভাকর। আসলে বিমলারাই যে এ অঞ্চলের লোক, প্রভাকরই ভিনদেশী তা মনে ছিল না বিমলার।

প্রভাকর বললে, চলো তা হ'লে তোমাদের পেঁৗছে দিয়ে আসি বাড়িতে। অবিনাশ-বাবুর সঙ্গেও দেখা করে আসতাম।

অমরেশ বিমলার দিকে তাকালে। চল্ না, স্টেশনের দিকেই যাই।

বিমলার মুখ দেখে বোঝা গেল ওরও তাই ইচ্ছে। তবু কোথায় যেন একটু সঙ্কোচ ঠেকছে। ও প্রভাকরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কতক্ষণ লাগবে ফিরতে?

—কতক্ষণ আর, আধ ঘণ্টাও না।

বিমলা হেসে বললে, তবে তাই চলুন।

হাটটাই দেখে আসি। "বলে গাছ-কোমর করে পরা শাড়ির আঁচলটা কোমর থেকে খুলে ভালো করে পরে নিলো।

অমরেশ আর কমলা পিছনের আসনে বসতে যাচ্ছিল, প্রভাকর হেসে কমলাকে বললে, তুমি আমার পাশে ব'সো।

কমলার বয়স কম, তাই লজ্জা আর অস্বস্তিও তার বেশী। কমলা অপ্রতিভ হয়ে বললে, না বাবা, আমি পিছনে বসবো। আর বিমলা কমলার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে কিংবা প্রভাকরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পিছনের দিক থেকে লাফিয়ে উঠে বসলো ভিতরে।

জীপ ছুটলো পাকা রাস্তা ধরে। মুহূর্তের মধ্যে মনটা খুশী হয়ে উঠলো বিমলার। নিঃসঙ্গ নিস্পন্দ গ্রামজীবনের মধ্যে এসে নিজেকে এতদিন মনে হয়েছে যেন কারাগারের বন্দী। ক্ষণিকের জন্যে হলেও, এ যেন মুক্তির আনন্দে ছুটে চলা। হাওয়ায় চুল উড়ছে, শাড়ির প্রান্ত উড়ছে, চোখেমুখে ঠাণ্ডা বাতাসের দাপট।

তারপর সেই ছোট লাইনের ছোট্ট রেল স্টেশন, বিকেলের ভাঙা হাটে সাঁওতাল মেয়েপুরুষের ভিড়। চুড়ি, মোটাসুতোর খাটো শাড়ি, মাটির পুতুল আর শাকসব্জী। ভিড় ফিকে হয়ে গেছে তখন।

ওদের একটা টিনের চালা দেওয়া চায়ের দোকানে বসিয়ে রেখে নিজের কাজ সারতে গেল প্রভাকর। ইতিমধ্যে হুইসল দিয়ে ট্রেনটা এসে থামলো। যাত্রী উঠলো নামলো। আবার চলে গেল ট্রেনটা।

চা খেয়ে মুখটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। উঠে এসে হাটটা ঘুরে ঘুরে দেখলো বিমলা। সাঁওতাল মেয়ে পুরুষগুলোকে। তারা বিস্ফারিত চোখে দেখলো ওদের, আর দূর দূর গ্রামের লোক ওদের সাজ-পোশাক দেখে কানাকানি করে হাসলো।

অস্বস্তিতে হাট থেকে বেরিয়ে এসে জীপের ওপর উঠে বসে রইলো ওরা।

তারপর এক সময় প্রভাকর ফিরেও এলো। জীপ ছুটলো আবার বনপলাশির দিকে। কিন্তু, জীপটা বাজে পোড়া গাছটার কাছে পেঁৗছে বনপলাশির দিকে বাঁক নিতেই হৈ হৈ করে উঠলো বিমলা। বললে, এখানেই নামিয়ে দিন।

প্রভাকর পেঁৗছে দিতে চাইলো, কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়েছে বিমলা। বললে, এটুকু হেঁটে হেঁটে চলে যাবো আমরা।

কেন? প্রভাকর বুঝতে পারলো না।

আর বিমলা হেসে উঠে বললে, আমার খুশী। আপনি যান তো মশাই, কাজে ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ালে রিপোর্ট করে দেবো।

বিমলার কথায় অমরেশ আর কমলাও হেসে উঠলো। আর প্রভাকর হাত তুলে বিদায় জানিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

সাঁওতাল পাড়ার পাশ দিয়ে মাঠের আল ধরে হেঁটে আসতে আসতে বিমলা হঠাৎ বললে, এই দাদা, হাট দেখতে গিয়েছিলাম, মাকে বলিস না যেন!

বিমলার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসলে ছোট বোন কমলা।

অমরেশ শুধু বললে, এত ভয় যদি তো না গেলেই পারতিস!

ভয়? নিজের মনেই হাসলো বিমলা। আর এপাশ-ওপাশ চোরা চোখে তাকিয়ে দেখতেই চোখোচোখি হ'য়ে গেল উদাসের সঙ্গে। অনেকটা দূরে, ওদিকের কাঁচা রাস্তার মোড়ে সাইকেলে ঠেস দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উদাস। বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছে বিমলাদের দিকে।

(ক্রমশ)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
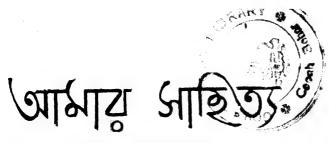
আমি অসুস্থ। হাসপাতালের কেবিনে লোহার খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে আমি এই অভিভাষণ লিখছি। আমার অস্ত্রোপচার হবে। কাজেই অবস্থা ঠিক ফাঁসির আসামীর মত। জানি না আপনাদের সঙ্গে বসে আমি নিজের মুখে এই লেখাটি আপনাদের পড়ে শোনাতে পারব কিনা।

একবার ভেবেছিলাম, আপনাদের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করব না। আমার চেয়ে কোনও যোগ্যতর সাহিত্যসেবী আপনাদের কাছে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার কথা শোনাবেন। কিন্তু আমার এই পরিণত বয়সে সাহিত্যতীর্থ থেকে অযাচিতভাবে যে-আহ্বান আমার কাছে এলো, তাকে আমি আমার আরাধ্যা দেবী বীণাপাণির প্রসাদী নির্মাল্যের মত কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করে মাথায় তুলে নিলাম।

আজকাল আমাদের সারস্বতমন্দিরে পাণ্ডাপূজারীর সংখ্যা অগণিত। মন্দিরের দরজায় ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি বড় বেশি। আমি স্বভাবদুর্বল মানুষ। দূরে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। নেপথ্য পথযাত্রী বলে উপেক্ষা না করে আমার সতীর্থ বান্ধবেরা কাছে টেনে নিলেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আপনারা শুনেওছেন অনেক কিছু। কাজেই তার চেয়ে ভিন্নতর কিছু আমি বলতে পারবো—সে ভরসাও আমার নেই। সে আশাও আপনারা করবেন না।

আমি সাহিত্যিক। সাহিত্য কি বস্তু তা আপনারা জানেন। সুতরাং যা আপনারা জানেন না সেই কথাই বলি।

জানেন না—আমার অন্তরের কথা।

কেন আমি সাহিত্যিক হলাম সেকথা অবশ্য আমি নিজেই জানি না। কেমন করে হলাম সেই কথাই বলি। সেটাও আমি অবশ্য অনেক বড় হয়ে আবিষ্কার করেছি।

আমি যখন খুব ছোট, তখনও আমার জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি, তখন আমার মা [illegible]লেন মরে। বাবা আবার বিয়ে করে নতুন সংসার পাতলেন। আমি রয়ে গেলাম আমার মামার বাড়িতে। মস্ত বড় লোক মায়ের বাবা। মস্ত বড় বাড়ি। মস্ত বড় সংসার। তখনকার দিনের বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। আত্মীয় অনাত্মীয় দাসদাসী লোকজনের সীমা-পরিসীমা নেই। লোকে লোকে লোকারণ্য। আর সেই অরণ্যের মাঝখানে মনে হতো আমি যেন একা। সঙ্গী সাথী অনেক, তবু মনে হতো—নিঃসঙ্গ একাকী। ওদের মা আছে, বাবা আছে, আমার কেউ নেই।

সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্ব আমার আজও ঘুচলো না। অগণিত হিতৈষী বান্ধবের মাঝখানে আমার চিন্তা নিয়ে আমি একাই রয়ে গেলাম।

আজ মনে হচ্ছে, লেখকরা বোধ করি সকলেই তাই। আপন আপন চিন্তা নিয়ে জীবনের জিজ্ঞাসা নিয়ে সবাই নিঃসঙ্গ, সবাই একাকী।

আমার বয়স যখন বারো কি তেরো, ইস্কুলে পড়ি, রীতিমত লিখতে পড়তে শিখেছি, সেই সময় উপরি উপরি দুটো ঘটনা ঘটলো আমার জীবনে। ভারি মজার ঘটনা।

জনি আর টনি দুটো কুকুরের নাম। দুজনেরই বাচ্চা হয়েছিল। জনি ছিল মামার-বাড়িতে। আর টনি ছিল এই বড় বাড়িতে। মামার-বাড়িতে কেমন করে না-জানি একদিন আগুন লেগে জনি পুড়ে মরে গেল। বাচ্চা ছিল চারটে। একটা তার মায়ের সঙ্গে পুড়ে মরলো। বাকি তিনটে রইলো বেঁচে। তারা তখনও দুধ ছাড়েনি। ভাল করে চোখ ফোটেনি। কেঁদে কেঁদে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বিকেল একটুখানি দুধ আর একটা ন্যাকড়ার পলতে নিয়ে গেলাম তাদের দুধ খাওয়াতে। গিয়ে যা দেখলাম, তেমনটি দেখবো, সে-আশা করিনি। এ বাড়ি থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে মামার-বাড়ি। কি তারও চেয়ে কিছু বেশি। দেখলাম, এ বাড়ি থেকে টনি গিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে খড়ের গাদার ওপর শুয়ে আছে, আর জনির তিনটে বাচ্চা তার পেটের তলায় মুখ গুঁজড়ে পরমানন্দে মাই টানছে।

হাতের বাটি আমার হাতেই ধরা রইলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম টনির মুখের দিকে। দু পাটি দাঁত বের করা তার সেই কুৎসিত মুখটা তুলে টনি একবার দেখলে আমাকে। মুখটা তার আর কুৎসিত মনে হলো না। মনে হলো যেন অনেক মানুষের মুখের চেয়ে সুন্দর।

কুকুরের মায়ের কাণ্ড দেখে চোখে আমার জল এসে গেল।

তার কিছুদিন পরেই আবার আর-একটা ঘটনা ঘটলো। সেদিনও চোখে আমার জল এসেছিল। সেই একই জল। সেই একই রকম লবণাক্ত অশ্রুধারা। কিন্তু তবু তার জাত আলাদা।

আমাদের ইস্কুলের একজন পণ্ডিতের ছিল দুটো বউ। দুটো বউ একসঙ্গেই থাকতো। মিলেমিশে ঘরকন্নার কাজকর্ম করতো। ঝগড়াঝাঁটি হতে কোনোদিন দেখিনি। আমার মামার বাড়ির পাশেই ছিল তাদের বাড়ি। আমি প্রায়ই যেতাম তাদের বাড়িতে। যাবার একটা কারণ ছিল পণ্ডিতের ছোট বৌ-এর ছিল একটি ফুটফুটে ছেলে। সবে তখন তার দাঁত উঠছে মুখে আধো-আধো কথা ফুটছে। ছেলেটি আমাকে দেখলেই খিল্ খিল্ করে হাসতো আর আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। ছোট-বৌ বলতো, "যা তো বাবা, বাবুকে বাইরে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।—[illegible] কাজগুলো আমি সেরে ফেলি।"

আমি নিয়ে আসতাম বাবুকে।

ভারি দুরন্ত ছেলে বাবু। সবে তখন সে হামা দিতে শিখেছে। কোলে কিছুতেই থাকবে না। মাটিতে নামিয়ে দিতে হবে। খর খর করে হামা দেবে। ফিরে ফিরে তাকাবে। খিল খিল করে হাসবে। আবার খানিকটা এগিয়ে যাবে। এই তার খেলা।

বাবু হয়ে উঠলো যেন আমার খেলার সাথী।

বাবুকে সেদিন নিয়ে আসছি, সদর দোরের কাছে দেখি, পণ্ডিতের বড়-বৌ তার সাত-আট বছরের মেয়ে টেঁপিকে নিয়ে বাড়ি ঢুকছে। আমার দিকে একবার চোখ পাকিয়ে তাকিয়েই জোর করে ছেলেটাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিলে—"এটা পুতুল নয় বাবা, চব্বিশ ঘণ্টা একে নিয়ে খেলা করে না। যাও তুমি পড়াশোনা করোগে যাও।"

টেঁপি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটাকে তার কোলে তুলে দিয়ে বললে, "যা নিয়ে যা। কপালে গোবরের একটা ফোঁটা দিয়ে দে।

রাস্তায় ডান-ডাকিনী আছে, নজর দিয়ে দেবে।"

বাবু সেদিন কেঁদেছিল খুব। আমার কোল থেকে যেতে চায়নি।

সেই কান্না শুনতে শুনতে আমি চলে এসেছিলাম। পিছন ফিরে তাকাইনি—বাবুর সংগে চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয়ে।

সন্ধ্যার কিছু আগেই হুলুস্থুলু কাণ্ড!

বাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার কাছে খোঁজ নিতে এলো বাবুর মা। বললাম, "তোমার বড় সতীন বাবুকে কেড়ে নিয়েছে আমার কোল থেকে। কেড়ে নিয়ে টেবির কোলে দিয়েছে।"

টেবি বলছে, "ছেলেকে আমি তার মা'র কাছে নামিয়ে দিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলাম।"

খানিক পরেই শোনা গেল, পাওয়া গেছে বাবুকে। ছুটে দেখতে গেলাম।

'বাবু' বলে ডাকতে গিয়ে মুখের ডাক আমার মুখেই আটকে রইলো। পল্লীগ্রামের সেই আসন্ন সন্ধ্যায় পণ্ডিতমশাই-এর ঘরের দরজায় যে-দৃশ্য দেখলাম, সে-দৃশ্য যেন না দেখাই ছিল ভাল।

কোথায় বাবু, কোথায় কে—কিছুই দেখতে পেলাম না। লোক জড়ো হয়েছে বিস্তর। সেই ভিড়ের এক পাশে দেখলাম, বাবুর মা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছে আর তার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে বড়-বৌ। শুনলাম নাকি সে জ্ঞান হারিয়েছে।

জ্ঞান হারানো কাকে বলে জানতাম না তখন। চোখে দেখলাম।

দেখলাম না শুধু বাবুকে। শুনলাম, পণ্ডিতমশাই নিজে তাকে খুঁজে বের করেছেন। বাড়ির খিড়কি-পুকুরের জলের তলায় ছিল সে চুপটি করে শুয়ে। দু' হাত দিয়ে যখন তাকে তুলে ধরেছেন, তখন তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। সেই মরা ছেলে তুলে এনেছেন তিনি ঘাট থেকে।

কিন্তু দুরন্ত ছেলে হামা দিতে গিয়ে কখন গড়িয়ে পড়েছে ঘাটের জলে, চেঁচিয়েছে, কেঁদেছে, ছটফট করেছে—টেবি কিছুই জানতে পারেনি। ছেলেটাকে পাড়ের ওপর বসিয়ে দিয়ে দূরের একটা কুলগাছে ছিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে কুল পাড়তে গিয়েছিল। ফিরে এসে এই অবস্থা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠে ছুটে পালিয়েছিল সেখান থেকে।

কথাটা সে বলতে চায়নি। কিন্তু বলতে হয়েছিল তাকে শেষ পর্যন্ত।

জ্ঞান ফিরে পেল বাবুর মা।

বাবুই শুধু ফিরে পেলে না তার প্রাণ।

না পেলে তো কার কি এসে গেল? ছোট্ট এতটুকু একটা শিশু, জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে যে ঘুরে বেড়াতো, মানুষের মত তখনও যে হাঁটতে পর্যন্ত শেখেনি, সে যদি এমনি করে অকস্মাৎ একদিন চলেই যায় তো এ পৃথিবীর কী ক্ষতি?

ক্ষতি কারও হলো না, সবাই ভুলে গেল বাবুর কথা।

ভুলতে পারলাম না শুধু আমি। আর ভুলতে পারলে না বাবুর মা।

সে-কথা বড় বেশি করে বুঝতে পারলাম সেইদিন—যেদিন ওদের ছোট-বৌ কেঁদে ফেললে আমার সংগে চোখাচোখি হতেই। তক্ষুনি সে তার মুখটাকে ফিরিয়ে নিলে। আমার দিকে সে তাকাতে পর্যন্ত পারলে না।

কেনই-বা পারবে? ছোট-বৌ তার সতীনকে জানে না, টেবিকেও জানে না, জল-জ্যান্ত হাসিখুশী ছেলেটাকে সে তুলে দিয়েছিল আমারই হাতে।

তারপর তাকে আর সে জ্যান্ত ফিরে পায়নি।

কী অশান্তি যে ভোগ করতে লাগলাম, তা জানলাম একমাত্র আমি। তার সাক্ষী কেউ রইলো না।

পড়ায় মন বসে না, অস্থির হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াই। বাবুকে যেখানে পুঁতে ফেলা হয়েছে, সেই 'ছেলে-পোঁতা'র গাবার ধারে গিয়ে চুপটি করে বসে বসে একদৃষ্টে সেই দিক তাকিয়ে থাকি। গাছের তলায় বসে বসে কাঁদি।

সেদিন অমনি একা-একা গাছের তলায় বসে আছি, পেছনে পশ্চিম-পাড়ার পুরোহিত দেবু ভটচাজ কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ শুনলাম, সে বলছে, "এখন আর অমন করে কাঁদলে কি হবে? ছেলেটাকে পুকুরের ঘাটে বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলি তো সেখান থেকে? একবার ফিরেও দেখলি না! ছি!"

আমার জবাবের অপেক্ষা করেনি দেবু ভটচাজ। কথাটা বলেই সে চলে গিয়েছিল।

মনে হলো, সবাই যেন এই কথাই বলতে চায়। সবাই বলতে চায়—আমিই অপরাধী।

এই কথা যেন বাবুর মা'ও বলতে চেয়েছিল সেদিন। আমিই তার ছেলেটাকে মেরে ফেলেছি।

ছেলের মা বলতে চায়। গ্রামের প্রতিটি মানুষ বলতে চায়। বলতে পারে না শুধু আমি বড়লোকের নাতি বলে।

কিন্তু আমি তো অপরাধী নই!

আমার মনের কথা আমি বলবো কাকে? কেমন করে জুড়াবো এই মনের জ্বালা!

পরের দিন ইস্কুলের রুটিনে দেখলাম, বাড়িতে কয়েকটা অংক কষে নিয়ে যেতে হবে। অংকের খাতার সাদা একটা পাতার ওপর অংকের অক্ষর লিখতে গিয়ে লিখে বসলাম:

'মা!'

তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে ফেললাম সুদীর্ঘ এক চিঠি।

চিঠি লিখলাম আমার সেই মাকে। যে-মা আমার অনেকদিন আগেই মরে গেছে। জানি সে চিঠি আমার মা'র কাছে গিয়ে পৌঁছোবে না। তবু লিখলাম।

লিখলাম অনেক কথা। লিখলাম বাবুর কথা, লিখলাম বাবুর মায়ের কথা। আর লিখলাম, জনি টনি দুটো কুকুরের কথা। লিখলাম, জনি-কুকুরটা মরে গেছে, কিন্তু টনি তার বাচ্চাগুলোকে মাই খাওয়াচ্ছে।

লিখে অনেকখানি শান্তি পেলাম। ইস্কুলের অংকের খাতায় লিখলাম জীবনের অংক। অংকের প্রশ্নের সংগে উত্তর মিললে মনে যেমন শান্তি হয়, তেমনি শান্তি পেলাম। মনের বোঝা কিছুটা যেন হালকা হয়ে গেল।

কেমন যেন নেশার মত পেয়ে বসলো মাকে এই চিঠি লেখার কাজটা। রোজই চিঠি লিখতে লাগলাম। নির্জনে ছাতে গিয়ে চুপটি করে বসে বসে পাতার পর পাতা লিখে লিখে খাতাটা প্রায় শেষ করে ফেললাম।

অনেকগুলো চিঠি আমি লিখেছিলাম।

আজকে আমার এই পরিণত বয়সে পেছনের জীবনটাকে জরিপ করতে বসে বুঝতে পারছি—এইখানেই হয়েছিল আমার সাহিত্যের হাতে-খড়ি।

সাহিত্যের চেহারাটাও ঠিক এমনিই। সাহিত্যও এমনি মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা ও কাহিনীতে ভরা।

কিন্তু এই যে আমার মাকে চিঠি লেখা, একেও আমি ঠিক সাহিত্য বলতে পারছি না। দুটোর চেহারা দেখতে প্রায় একই রকম। কার্যপ্রণালীও প্রায় এক। তবু বলবো—দুটোর জাত আলাদা।

চিঠিটা আমার। চিঠি আমার। মা আমার। দুঃখ বেদনা আনন্দ অনুভূতি—সবই আমার। আমারই মনকে মুক্তি দিয়েছি—আর-একটি মনের কাছে আমার মনের বেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু এটা আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এমনি দুঃখ-কষ্ট মনের যাতনা হয়ত আপনারও আছে। হয়ত কেন! নিশ্চয়ই আছে। শুধু আপনার নয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আপামর সাধারণ সকলেরই আছে। আর সবাই তা প্রকাশ করতে চায়। প্রকাশ না করে যে উপায় নেই! মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে সবাই চাইছে তার মনের মানুষ। কেউ প্রকাশ করছে মুখের ভাষায়, কেউ প্রকাশ করছে লেখার হরফে, কেউ-বা আভাসে, কেউ-বা ইঙ্গিতে।

মনের ভাবকে চেপে রাখবে কে? হাসিতে হোক, কান্নায় হোক ফেটে সে একদিন পড়বেই। এই দুনিয়ার নিয়ম। এই জন্যই

এ-পৃথিবীতে এত টানাটানি, এত কানাকানি, এত হট্টগোল।

এ হলো গিয়ে একটি মানুষের মনের প্রকাশ আর-একটি মানুষের কাছে। তাই বলে কি এ-সবই সাহিত্য?

না। ভাবের প্রকাশমাত্রই সাহিত্য হয় না।

এ-প্রকাশ ব্যক্তিগত। এ-প্রকাশ সাহিত্যের নয়। সাহিত্য ব্যক্তি-নিরপেক্ষ।

আপনি আমি মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে যে হট্টগোল বাধাই, সে শুধু নিজের মনস্তুষ্টির জন্য। নিজের জন্য যেমন-হোক একটা-কিছু হলেই হয়।

কিন্তু সাহিত্য যা গড়ে তোলে, তা সকলের জন্য। সেখানে যেমন-হোক একটা কিছু হলেই হয় না। আমি যা দেখলাম, আর-সকলের কাছে তার সত্যাসত্য প্রমাণ করতে হয়।

এইখানেই প্রয়োজন হয় শিল্পীর। প্রয়োজন হয় ছন্দের, প্রয়োজন হয় রমণীয় রচনার।

এইখানেই গ্রহণ-বর্জনের লীলা চলতে থাকে। অনাবশ্যক আবর্জনাকে বাদ দিতে হয়, সেই ফাঁক ভরাট করতে হয় কল্পনার সাহায্যে।

ফাঁক ভরাট করতে হয়, কিন্তু ফাঁকি চলে না।

এ-সব কথা বুঝেছিলাম অবশ্য অনেক দিন পরে।

বুঝেছিলাম অন্যের হৃদয়কে যদি স্পর্শ করতে হয়, তাহলে আমার বলবার কথাটিকে সৃষ্টি করতে হবে হৃদয় দিয়ে।

এ যেন হৃদি দিয়ে হৃদি অনুভব!

কাজেই হৃদয়ের মূলধনে যে যত বড় ধনী, সাহিত্য-জগতে তারই কারবার তত ফলাও।

আমার হৃদয়ের সৃষ্টিকে যদি অপরের হৃদয়ের সামগ্রী করে তুলতে হয়, তাহলে শুধু তাকে সুন্দর ভাষায় সাজিয়ে সুরুচিত নৈপুণ্যে প্রকাশ করলেই চলবে না। হৃদয়ের সঙ্গে তার রসের সম্পর্ক পাতিয়ে দিতে হবে। কারণ সত্যের সঙ্গে হৃদয়ের কোনও সম্পর্ক যদি পাকা হয় তো সে রসের সম্পর্ক।

আজ আর আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, এই সৃষ্টি-প্রতিভার মাপ আমার মধ্যে যত বড়, সাহিত্যের বিচারে আমার রচিত সাহিত্যের স্থানও ঠিক সেইখানে। তার চেয়ে উঁচুতেও নয়, নীচুতেও নয়।

সাহিত্য মানব-হৃদয়ের আনন্দের সৃষ্টি। বিধাতার আনন্দের সৃষ্টি যেমন এই বিশ্ব সংসার, মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত এই সাহিত্য-সৃষ্টির আবেগ যেন ঠিক তার প্রতিধ্বনি।

এমনি একটা প্রাণ-পোড়ানী আবেগের জ্বালা নিয়ে সঙ্গীহীন অশান্ত মন আমার ক্রমাগত ছুটে বেড়িয়েছে সারা কৈশোরকাল এবং প্রথম যৌবনের অনেকখানি সময়। ছুটে বেড়িয়েছে এমন একটি সংকীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে—যেখানকার সমাজজীবনে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে না-ছিল কোনও প্রবহমান সংযোগ, না ছিল কোনও তৃষ্ণা। সাহিত্য ছিল অজ্ঞাত, অপরিচিত। ইস্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকই ছিল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র।

চারিদিকে ছোটখাটো মাপের মানুষ বাধাসংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ জীবনের পরিধি কিছুটা উত্তরাধিকারসূত্রে মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া, আর বাকিটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তৈরি। যেন আলাদা আলাদা ছাঁচে গড়া সবাই।

মনের মাপ—কারও-বা নিতান্ত ছোট কারও-বা একটু বড়। সেই মাপেই পৃথিবীর দেনা-পাওনা তারা চুকিয়ে নেয়। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও হয় তাদের সেই মনের মাপে।

নিতান্ত স্বার্থ-সর্বস্ব সাধারণ মানুষ নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ক্ষণিক সুখকেই জীবনের চরম আনন্দ ভেবে সুখে-দুঃখে জীবন যাপন করে। সুখগুলোকে ভাবে নিজে উপার্জন করলে, আর দুঃখগুলোকে অদৃষ্ট ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার পর্যন্ত করে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে কোনও-কিছুই অনুভব করতে চায় না সহজে। নিজের ক্ষতি হলে অনুভূতির কেন্দ্রে একটুখানি স্পন্দন জাগে। নিজের ছেলে মরে গেলে কেঁদে সারা হয়, কিন্তু পরের ছেলে মরলে চোখে একটু জলও আসে না। ছোটখাটো অন্যায় অপরাধ করতে কুণ্ঠিত নয়, অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলতে পারে, ধরা পড়বার ভয় না থাকলে চুরি করতেও আটকায় না—এমনি একজন পাষণ্ডের কথা আজ আপনাদের বলবো।

একদিন দেখলাম, সেই রকম একটা লোক যাত্রার আসরে বসে যাত্রা শুনছে, আর অপলক নয়নে কাঁদছে।

যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল ভরত উপাখ্যান। শ্রীরামচন্দ্র বনে চলে গেছেন। রাজা দশরথের মৃত্যু হয়েছে। ভরতকে বসতে হবে অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে। ভরতের মা ভরতকে অনুরোধ করছেন। ভরত কিছুতেই বসছেন না। বলছেন, "এ অন্যায় অনুরোধ তুমি আমাকে কোরো না মা। আমি জানি পুত্রস্নেহে অন্ধ তুমি কি প্রকারে কাকে বঞ্চিত করে আমাকে অযোধ্যার রাজা করেছ। কিন্তু রাজ্যভার যদি আমাকে গ্রহণ করতেই হয় তো সে ভার আমি গ্রহণ করলাম শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিভূরূপে।' এই বলে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদুটি সিংহাসনের ওপর রেখে ভরত ভক্তিভরে একটি প্রণাম করলেন।

যেই প্রণাম করা, লোকটির কান্না যেন আরও বেড়ে গেল।

সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বিষ্টু হালদারের কাণ্ড দেখে। মানুষের নিষ্ঠুরতার কোনও মূল্য যে সে দিতে পারে সে-বিশ্বাস আমার ছিল না। কোনও মহৎ চরিত্রের দীপ্তি যে বিষ্টু হালদারের মত পাষণ্ডের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করতে পারে সে-কথাও কোনোদিন ভাবতে পারিনি।

আবার আর-একদিনের আর-একটা ঘটনার কথা শুনুন।

গারাং মাঝির নাম ওখানে সবাই জানতো। লোকটা জাতে সাঁওতাল। ও-তল্লাটে শুনেছি নাকি বড় বড় চুরি ডাকাতি রাহাজানি—যেখানে যা-কিছু হয়েছে, সবই ওই গারাং-এর কীর্তি। একবার কখন না জানি সে জেল খেটেছিল মাসখানেকের জন্যে, তারপর পুলিস নাকি প্রমাণ অভাবে তাকে এর পরের জন্যও জেলে ঢোকাতে পারেনি।

একদিন শুনলাম সেই গারাং নাকি ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে নির্মল ডাক্তারের বাংলোয়।

কয়লা-কুঠির ডাক্তার নির্মলবাবু। ছোট্ট একটি শুকনো নদীর ওপরে তার নির্জন বাংলো। ছুটে দেখতে গেলাম গারাং মাঝিকে।

গিয়ে দেখি, সব চুপচাপ। আমার মত অনেকে গিয়েছিল গারাংকে দেখতে। ডাক্তার-বাবুর চাকর আর তার মেয়ে মিলিদি দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ—কোত্থেকে কি-সব গুজব শুনে এসেছ তোমরা। গারাং নেই এখানে। তোমরা চলে যাও এখান থেকে।

সবাই চলে যাবার পর, মিলিদির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কথাটা সত্যি?"

"কী কথা?"

"তুমি যা বললে! গারাং ধরা পড়েনি!"

মিলিদি বললে, 'না। গারাং এখানে আসেনি। সব মিছে কথা!"

মিছে কথা বলে মিলিদি সেদিন যে-কথাটা চাপা দিয়েছিল, দেখতে দেখতে সেটা অত্যন্ত বিশ্রী রকমের সংবাদ হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। মিলিদির বাবা নির্মল-ডাক্তার পূর্ববঙ্গের মানুষ। অনেকদিন ধরে কলিয়ারীতে ডাক্তারী করছেন। মিলিদি নাকি কলকাতার কোন্ এক কলেজে পড়ে। ছুটিছাটা পেলেই বাপ-মার কাছে চলে আসে। অপূর্ব সুন্দরী এই মিলিদি। একে সুন্দরী, তার ওপর কলেজে পড়ে। তখন-কার দিনে আমার মামার বাড়ির অঞ্চলে সারা গাঁ খুঁজলে একটা গ্র্যাজুয়েট ছেলে পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ, আর মিলিদি তো মেয়ে-ছেলে। যে-বয়েসে মেয়েদের বিয়ে হয় সে-বয়েসটা পেরিয়ে গেছে মিলিদি'র। স্নো-পাউডার মেখে, ঠোঁট দুটো রাঙা করে, জুতো পায়ে দিয়ে, রোজ রোজ নতুন নতুন শাড়ী-গয়না পরে মিলিদি' ঘুরে বেড়ায়। তাই নিয়ে কত লোক কত কথা বলাবলি করে। কথাগুলো অবশ্য ভাল নয়।

গুজবটা ছড়ালো ওই দিক দিয়ে। গারাং-এর নামটাও জড়িয়ে দিল এই সঙ্গে। এবং কথাটা অত্যন্ত জঘন্য বলে গারাংকে তারা নাকি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই চাপা দিয়ে দিয়েছে এই জঘন্য কেলেঙ্কারীকে।

এ-সব কথা লোকে বিশ্বাস করবার জন্য বসে থাকে। কাজেই বিশ্বাস করে বসলো সবাই। বিশ্বাস করবার আর-একটা কারণ অবশ্য ছিল।

মাস-খানেক পরেই দেখা গেল, নির্মল-ডাক্তার তাঁর এতদিনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাটিবাটি তুলে হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেলেন কেউ জানতেও পারলে না।

কথাটা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। এর প্রায় বছর-দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন দেখি কিনা আমার মাতামহ সেই গারাং মাঝিকেই বাড়ির দারোয়ানের চাকরি দিয়ে বসলেন।

সবাই হৈ হৈ করে উঠলো প্রথমে। বাড়ির মেয়েরা চেঁচামেচি করতে লাগলো। কিন্তু বড়বাবুর কাছে কারও টুঁ শব্দটি করবার জো নেই।

কানাঘুষো শুনতে লাগলাম, গ্রামের কেউ কেউ বলাবলি করছে—"রতনেই রতন চেনে! বড়বাবুই-বা আমাদের কম কিসে? গারাং মাঝি ডাকাতি করে গায়ের জোরে, আর বড়-বাবু ডাকাতি করে বুদ্ধির জোরে। ডাকাতি না করলে এত-এত টাকার মালিক হতে পারে কখনও!"

সে যাই হোক্, আমার মাতামহের নিন্দা আমার মুখ থেকে নাই-বা শুনলেন!

গারাং মাঝি রয়ে গেল বাড়িতে।

এয়া বুকের ছাতি, হাতের কব্জি দুটো লোহার মত শক্ত, টাঙ্গির মত গোঁফ, বড় বড় চোখ, মাথায় বাব্‌রি চুল আর কালো-কুচ্-কুচে গায়ের রং।

ভাব করে ফেললাম লোকটার সঙ্গে। যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ নয়।

—"তুমি ডাকাতি করেছ গারাং?"

—"হাঁ বাবু করেছি।"

—"মানুষ খুন করেছ?"

—"হ্যাঁ তা করতে হয়েছে বই-কি!"

—"কতগুলো?"

—"বহুৎ।"

বলেই সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হেসেছিল।

—"হাসছো যে? বল না—কতগুলো মানুষকে মেরেছ তুমি!"

তিনটি আঙুল তুলে দেখিয়েছিল গারাং। বলেছিল, "তিনটি। তিনটি মানুষকে একে-বারে মেরে ফেলেছি বাবু।"

তিনটি মাত্র মানুষ মেরেছে গারাং বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। বললাম, "ধেৎ! মিছে কথা বলছো তুমি।"

গারাং বলেছিল, "মিছে কথা আমাদের বলতে নেই। আমরা সাঁওতাল।"

—"সাঁওতালদের বুঝি চুরি-ডাকাতি করতে আছে?"

কথাটার জবাব দিতে পারেনি গারাং। জবাব আমি চাইওনি। যে-কথাটা জানবার আগ্রহ আমার সবচেয়ে বেশি, এই সুযোগে সেই কথাটা জেনে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "বেশ তবে একটা সত্যি কথাই বল গারাং। নির্মল-ডাক্তারের বাড়িতে শুনেছিলাম তুমি ধরা পড়েছিলে। তাই না শুনে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম তোমাকে দেখতে। দেখতে পাইনি।' তোমাকে দেখতে পাইনি, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে খুব একটা খারাপ গুজব শুনেছিলাম।"

বলতে প্রথমে সে চায়নি। চুপ করে মুখ গুঁজে বসেছিল।

তার পর বলেছিল। বলেছিল—

মধু পোখ্‌রার জমিদারের মেজ ভাইটা ছিল যেমন মাতাল, তেমনি দুশ্চরিত্র। প্রায়ই সে গারাংকে বলতো, নির্মল-ডাক্তারের মেয়েটাকে যদি কোনোরকমে জ্যান্ত তুলে আনতে পারিস তো তোকে দু'হাজার টাকা দেবো।

সেই দু'হাজার টাকার মধ্যে নগদ দু'শ টাকা হাতে পেয়ে গারাং গিয়েছিল মিলিকে তুলে আনতে। তার আগেই গারাং সব-কিছু ঠিক করে রেখেছিল। নির্মল-ডাক্তারের বাড়ির চাকরটাকে দিয়েছিল পঞ্চাশটা টাকা। খিড়কির দরজাটা সে খুলে রেখেছিল। মিলি কোন্ ঘরে শোয়, কেমন করে কোনদিক দিয়ে বাইরে থেকে তার ঘরের খিল খোলা যায়—সবই সে বলে দিয়েছিল গারাংকে। সবই ঠিক। আর এক মিনিট দেরি হলে কী যে হতো বলা যায় না। মিলিকে চেপে ধরে মুখে তার কাপড় গুঁজতে যাবে, এমন সময় মিলিই দিলে সব মাটি করে। সোজা গারাং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "বাবা! আমাকে নিয়ে কী করবে তুমি বাবা? তার চেয়ে আমার গয়নাগুলো নাও—আমি সব দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।"

শুধু 'বাবা' বলে ডেকেছিল মেয়েটা! এমন ঘটনা বড়-একটা ঘটে না। সবাই যেন তাকে তেড়ে মারতেই আসে। আর নয়তো কে'দে কে'দে পায়ে ধরে।

আর দিন-ক্ষণটাও বোধকরি খারাপ ছিল। তাই গারাং-এর মনটাও কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। অত বড় অসুরের মত জোয়ানটা হয়ে গেল যেন একটা শিশু।

মিলি তার গয়নাগুলো দিতে এসেছিল তাকে একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে বেঁধে। মিলি ভেবেছিল বুঝি সে সেইজন্যই বসে আছে।

কিন্তু না। মিলির হাতটাকে সরিয়ে দিয়েছিল গারাং। সরিয়ে দিয়েও ছুটে পালায়নি। খাটের বাজুটা একহাত দিয়ে চেপে ধরে চুপটি করে বসে ছিল।

কী যে হলো নিমকহারাম চাকরটাও বুঝতে পারেনি। গারাং-এর কান্ড দেখে চুপিচুপি ডেকে দিয়েছিল নির্মল-ডাক্তারকে। মনিবের কাছে সাধু সেজেছিল।

নির্মল-ডাক্তার ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল মিলির ঘরে। মিলির মা এসেছিল তার পিছু-পিছু। বলেছিল, "লোকজন ডেকে ওকে পুলিসে ধরিয়ে দাও।" মিলিকে বলেছিল, "তুই পালিয়ে আয় ওখান থেকে।"

মিলি পালায়নি।

নির্মল-ডাক্তার রাগে কাঁপতে কাঁপতে পায়ের জুতো খুলে মেরেছিল গারাং-এর মাথায়। আরও হয়তো মারতো, কিন্তু মিলি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গিয়ে দুজনের মাঝখানে। দু হাত বাড়িয়ে গারাংকে আড়াল করে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "ওকে মেরো না বাবা।"

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছিল মিলির কথা শুনে। তার চেয়েও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল অত বড় দুর্ধর্ষ ডাকাত গারাং-এর কান্ড দেখে। যার ভয়ে পুলিস পর্যন্ত ভয় পায়, সেই গারাং কিনা মুখোশ খুলে চুপ করে রইলো। কী এমন মহামন্ত্র আছে [illegible] যার জোরে মিলি তাকে একেবারে কেঁচোটি করে দিয়েছে?

মুখ তুলে তখন তাকাতে পারছে না গারাং।

মিলি এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছিল ঘর থেকে। বলেছিল, "পুলিসে খবর দিতে হয় আমি দেবো।"

তারপর গারাং-এর মাথায় হাত রেখে বলেছিল, "এবার তুমি যাও গারাং।"

গারাং গিয়েছিল সেখান থেকে।

রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকে একেবারে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর অনেকদিন পরে, দেশে যখন আবার ফিরে এলো, গারাং মাঝি দাঁড়িয়েছিল গিয়ে নদীর সেই শুকনো বালির ওপর। নির্মল-ডাক্তারের বাংলোর পাশে জেগে সেই তালগাছের পাতার ফাঁকে একফালি চাঁদ উঠেছিল আকাশের গায়ে। এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলোর দিকে। কাউকে দেখতে পায়নি গারাং। তখন অন্য ডাক্তার এসেছে সে বাংলোয়।

তার পরেও সে এখানে-ওখানে সেখানে যতটুকু পেরেছে সন্ধান করেছে নির্মল-ডাক্তারের। কোথাও তার সন্ধান পায়নি। আবার হয়ত সে চলে গেছে [illegible]। মিলির হয়ত বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে। হয়ত সে অন্য ছেলের মা হয়েছে।

গারাং-এর মুখ দিয়েই গারাং-এর কাহিনী শুনেছিলাম।

যেরকম করে সে বলেছিল সেরকম করে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। মাথা নীচু করে বলেছিল তার এই কলঙ্কের কাহিনী। চোখে আমি তার জল দেখেছিলাম স্পষ্ট মনে আছে।

সেও তো আজ অনেকদিনের কথা।

আমার কৈশোরকাল তখন আমি অতিক্রম করতে চলেছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তখনও আমি মা-সারদামণির ডাকাত-বাবার গল্প পড়িনি। ভিক্টর হিউগোর 'জিন্ ভলজিন' ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত।

চোখের দৃষ্টি সবে তখন আমার একটু একটু খুলেছে।

এই গারাং মাঝি, যাত্রার আসরের সেই বিল্টু হালদার,—একটি একটি করে খুঁজে খুঁজে বের করলে এমন অনেক আছে: এরাই যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দিলে। দেখিয়ে দিলে, নিতান্ত ছোট-মাপের সংকীর্ণ একটি জীবনের মধ্যে ভাল এবং মন্দ দুইই কেমন মিলেমিশে একসঙ্গে বাস করে। মানুষের নীচতাকে দীনতাকে, মানুষের মধ্যে যা-কিছু মন্দ— সব-কিছুকে এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এই যে সর্বজয়ী মঙ্গলশক্তির মহাআবির্ভাব, মনে হতে লাগলো মানুষের গৌরব করবার যদি কিছু থাকে তো এই। দীনতমকে শ্রেষ্ঠতমের সঙ্গে একই মর্যাদায় একই বন্ধনে বেঁধে দেবার জন্যই বিধাতা বোধকরি মনুষ্যত্বের ভান্ডারে ভাল ও মন্দ—এই দুটি বিরুদ্ধধর্মী বস্তুকে একই মানুষের হৃদয়ে পাশাপাশি রেখে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

সাধারণ মানুষের ভেতর এমন একটি মানুষ এখনও পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি—যে শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাল কাজই করে চলেছে। এমন কি মন্দ কাজ যখন সে করে, নিজের মনের কাছ থেকে একটা সম্মতি আদায় করে নেয়। প্রত্যেকটি মানুষের কাজের ওপর নিজের মনের মাপ অনুযায়ী নিজের চরিত্রটি যদিও ঠিকরে ঠিকরে পড়ে, তবু সে মুখে কোনোদিন ছোট হতে চায় না। ছোট হতে চায় না শুধু এই জন্য যে, বড়র প্রতি, ভালর প্রতি, একটা অজানা আকর্ষণ—একটা গোপন ভালবাসা তার থাকেই থাকে।

ভালয়-মন্দয় মেশানো এই অসহায় মানুষগুলিকে ভালবেসেছিলাম।

ভালবেসেছিলাম ছোট মানুষকে। তাই আমার যৌবনকালের লেখায় মানুষের মধ্যে যা বৃহৎ, যা মহৎ, যা কল্যাণকর, তার ওপর নিজের মনের আলো যেমন ফেলেছিলাম, তেমনি যে-সব হতভাগ্য মানুষের মনের মাপ নিতান্ত ছোট, বৃহত্তর জীবন বা মহত্তর আনন্দের পরিধি যাদের নাগালের বাইরে, তাদের একমাত্র মূলধন স্বার্থসিদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ক্ষণিক আনন্দের ওপর বিভীষিকার কালো পর্দা টেনে দিতে পারিনি।

এখন স্বীকার করতে দোষ নেই—হয়ত-বা অন্যায় করেছিলাম। কারণ আমিও ছিলাম তখন কাঁচা। সাহিত্যের রাজপথের ঠিকানা তখন আমারও কাছে ছিল অজানা।

সে সন্ধান এখন পেয়েছি বললে বড় বেশি অহংকার করা হবে।

জীবনের সত্যানুসন্ধানের অভিসারযাত্রা আমার এখনও চলছে। এখনও দেখছি, এক-দিকে যেমন দেশের অধিকাংশ মানুষ দয়া-মায়াহীন ধর্মাধর্মবিবর্জিত হয়ে তার দুরাশার চরমতম স্বপ্নকে সফল করবার জন্য অসত্যকে অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে নিচ্ছে, নিজে যা নয় তাই হবার জন্য কোনও অন্যায় করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না, অবলীলাক্রমে অপরের ক্ষতি করে নিজে বড় হবার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তেমনি তার সাহিত্যে চলেছে জীবনের জয়গান, চলেছে—মানুষের নিত্যরূপে এবং শ্রেষ্ঠরূপের প্রকাশ। মানুষের আনন্দবোধ এবং সুখ-বোধের সীমা কেমন করে দুরাশার চরমতম স্বপ্নকে পেছনে ফেলে রেখে, ইন্দ্রিয়-

সম্ভোগের তৃপ্তিকে অতিক্রম করে, মানুষের সমস্ত মন, ধর্মবুদ্ধি এবং হৃদয়কে অধিকার করে—সাহিত্যে রচিত হচ্ছে তারই বিচিত্র কাহিনী। মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতায় চলেছে সাহিত্যের বিজয়োৎসব।

সাহিত্যের কল্যাণে মানুষের হৃদয়রাজ্যের পরিধি ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে।

সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ মানুষের নিজের সংসারের ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর বাইরে আর-কোনও সংসারের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে যার হৃদয়ের এতটুকু যোগসূত্র কোনো দিন ছিল না, সাহিত্যরচিত আর একটি সংসারকে মনে হচ্ছে যেন তার দ্বিতীয় সংসার। শিল্পীর কল্পনার সৃষ্টি আর বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কোনও প্রভেদ-পার্থক্যই তার নজরে পড়ছে না। অপরের দুঃখে মন যার কোনোদিন বিচলিত হয়নি, সাহিত্যের একটি কাল্পনিক চরিত্রের দুঃখে সে অভিভূত হয়ে পড়ছে। আনন্দে উল্লসিত হচ্ছে। প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তি থেকে এমনি করেই হচ্ছে মানুষের মনের মুক্তি।

মানুষের জীবন আর জীবনের রহস্য বড় অদ্ভুত।

জীবনের বিচিত্র রসধারার সন্ধান করতে গিয়ে জীবন-সন্ধানী শিল্পী যখন তার গভীরতম রহস্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায় তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। জীবন-দর্শনের সীমা ছাড়িয়ে তখনই বোধ-করি সে জীবন-সত্যের অতলস্পর্শী গভীরতার মাঝখানে চিরজ্যোতিষ্মান এমন একটি আশ্চর্য বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করে—ভাষা দিয়ে যার কোনও সীমা টানা যায় না।

কী সে অনির্বচনীয় বস্তু? কে তার সন্ধান দিতে পারে?

সন্ধান দিতে পারে আমাদের এই দেশ। এই ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর অন্য কোথাও কোনও জাতির কোনও মানুষ যে-কথা কোনোদিন বলেনি, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই ভারতবর্ষের কোন্ জীবন-ধেয়ানী শিল্পী—ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে কৌপীনধারী কোন্ মহাতপস্বী নিজের সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করে দুর্বলতম মানুষের মহত্তম গৌরবের কথা দৈববাণীর মত উচ্চারণ করে গেছে—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" —'আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি যিনি জ্যোতির্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী।'

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে অনেককিছু জানতে হয়। জানতে হয়—কেমন করে কোত্থেকে সে তার খাদ্য আহরণ করবে, জানতে হয়—কেমন করে অন্ন, বস্ত্র, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান আয়ত্ত করে জগতের এই জীবলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব বলে নিজের পরিচয় দেবে। কিন্তু এই সমস্ত জানাকে পশ্চাতে ফেলে, চিররহস্যাবৃত অন্ধকারের সে কোন্ পরপারে তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানবার ব্যাকুল আগ্রহে এই ভারতবর্ষের মানুষই একদিন রাজশক্তির সুতীব্র মাদকতাকে বিসর্জন দিয়েছে, রাজসিংহাসন অবহেলায় পরিত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তৃপ্তিহীন ভোগকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। আবরণ, আচ্ছাদন, দম্ভ, অহংকার, বাসনা, কামনা—সব-কিছু অসার হয়ে গেছে তার কাছে।

এ আমাদের মনের বিলাস নয়। দারিদ্র্য গোপন করবার কৌশল নয়। জীবনকে একটা প্রগতিবিমুখ জপমালাধারী জড়পিণ্ডে পরিণত করবার ইঙ্গিত নয়। এই আমাদের মনের ধর্ম।

ভারতবর্ষের মাটিতে যে-মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, এই তার জীবনের আদর্শ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী ইওরোপের মদগর্বী প্রতাপ, অপরিমিত ঐশ্বর্য, ইওরোপের সমাজব্যবস্থা এবং শিল্প-সাহিত্যের অসংগত অক্ষম অনুকরণ আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু অন্তঃকরণকে স্পর্শ করেনি। কারণ, ভিন্ন ধাতুতে গড়া এ-দেশ, ভিন্ন সুরে বাঁধা আমাদের মন।

প্রতাপ এবং ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতে আমরা যদি কোনোদিন ইওরোপের সমকক্ষ হয়েও উঠি, সমাজব্যবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণের সার্থক অনুকরণে ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন আমাদের আর ভারতীয় বলে চিনতে নাও পারি, তেমন কোনও অশুভ দিনের শুভ মুহূর্তে যদি হঠাৎ দেখি, ত্যাগধর্মের দীক্ষিত কোনও সাধক তার সকল চাওয়া সকল পাওয়ার ঊর্ধ্বে কোনও উঁচু সুরে জীবনের যন্ত্রটি বেঁধে ফেলেছেন, তখন সেই পরধর্ম গ্রহণকারী ভারতীয়ের হৃদয়েও তৎক্ষণাৎ সেই চিরপরিচিত সুরটি প্রতিঝংকৃত হয়ে উঠবে। মাথা তার আপনা থেকেই হেঁট হয়ে যাবে সেইখানে।

এমনি একটি বিচিত্র উপাদানে গড়া আমাদের ভারতীয় মানুষের মন।

এই মানুষের মাঝেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সেই পরমাশ্চর্য মহাশক্তি—যা তাকে ক্রমাগত টানছে তার আবশ্যক সীমার বাইরে, যেখানে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দেনা-পাওনার কোনও অভাবই তার মিটবে না। সেই সমস্ত অভাববোধকে, পাওয়া না-পাওয়ার হিসাব-নিকাশকে অনায়াসে অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের সেই পরিপূর্ণতার, আত্মসমর্পণের সেই অত্যাশ্চর্য আনন্দের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যে ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা চিরকাল ব্যাকুল, আমি সেই 'মিস্টিক' ভারতবর্ষের, চির রহস্যময় ভারতবর্ষের মানুষের জীবন-সন্ধানী শিল্পী। যে পরমাশ্চর্য জ্ঞানের গৌরবে ভারতবর্ষ চিরকাল গর্বিত, যে-জ্ঞান মানুষকে তার সমস্ত ভেদবুদ্ধি, তার সমস্ত সংকীর্ণতা, তার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির দুর্ভাবনার পরপারে নিয়ে যায় তার মনের মুক্তির সে এক সীমাহীন আনন্দের মধ্যে, মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের সেই তেজস্বী জ্ঞানকে—সেই জ্ঞানের অমিত শক্তিকে স্পর্শ করাই হোক আমাদের এই ভারতীয় সাহিত্যের মূলমন্ত্র!

জীবনের শেষ পর্বে আমি এসে পৌঁছেছি। লেখনীধারী এক অক্লান্ত সাহিত্যসেবী। আমার অক্ষমতা, আমার ব্যর্থতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, আমার আনন্দেরও কোনো অন্ত নেই। এ আনন্দ শুধু এই জন্য যে সাহিত্য-সেবার মত পুণ্য-কর্মের অধিকারী হয়ে এ জীবন আমি অতিবাহিত করতে পারলাম। ধন্য হলাম আমি আমার সমধর্মী সহকর্মীদের স্নেহ, ভালবাসা পেয়ে। আমার সময়ে যারা এসেছে আমার পরম স্নেহভাজন সাহিত্যব্রতী এবং আমার পরে যারা আসবে এই পুণ্যতীর্থে—সবার জন্য রইলো আমার হৃদয়ের যথাসর্বস্ব ধন আমার স্নেহ-প্রীতি-প্রেম।

আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন—যে আরব্ধ তপস্যা আমার অসমাপ্ত রইলো জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় তা যেন আমি সমাপ্ত করতে পারি! *

---
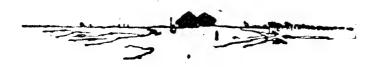
* নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

॥ ২১ ॥

ঘুরতে ঘুরতে যখন আবার হোটেলে ফিরে এলাম, তখন রাত অনেক। আমার জন্যে অপেক্ষা করে করে ইংরিজী ক্যালেণ্ডারের পুরনো তারিখটাও তার কর্তব্য শেষ করে বিদায় নিয়েছে। কেন জানি না, জনহীন কলকাতার রাজপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হলো, এতোদিনে আমি সাবালক হয়ে উঠেছি। এতোদিন অনভিজ্ঞ বালকের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছি আমি; কিন্তু পরিপূর্ণ হইনি আমি। আজ রাত্রে আমি পরম পূর্ণতা লাভ করেছি। জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করে এতোদিনে যেন এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করছি আমি।

হোটেলে ঢোকার পথেই দেখলাম সত্যসুন্দরদা তখনও রিসেপশন কাউণ্টার আলো করে বসে আছেন। শাজাহানের কাউণ্টারে এখন কোনো লোক নেই। পৃথিবীর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে, সত্যসুন্দরদা একা যেন জেগে রয়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যসুন্দরদা যেন কিসের ইঙ্গিত পেলেন। চোখ দুটো বোধ হয় একটু লাল হয়েছিল। হাত দুটো চেপে ধরে সত্যসুন্দরদা বললেন, "কী? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?"

"কোথায় গিয়েছিলে? রাতে কিছুই খাওনি। বুড়ো জুনো সায়েবকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বললে তোমাকে খেতে দেখেনি। শেষে বুড়োর কাছ থেকে গোটা কয়েক স্যাণ্ডউইচ আদায় করে, এই ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এখন শাজাহানে কেউ আসবে না। সুতরাং নিয়ম মানবার দরকার নেই। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের ছেলেদের মতো খেয়ে নাও।"

সত্যসুন্দরদা যেন বুঝতে পারছেন না, আমার মধ্যে এক আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আমি আর ছেলে নেই। আমার মনের সুবোধ সুশীল ইস্কুলবয়টাকে তাড়িয়ে দিয়ে, একটা অপরিচিত ভয়াবহ পুরুষ যেন সেখানে আসর জাঁকিয়ে বসবার চেষ্টা করছে।

কোনোরকমে বললাম, "সত্যসুন্দরদা, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"সেইজন্যেই তো স্যাণ্ডউইচ আনিয়ে রেখেছি। খিদে থাকলে, দুটো স্যাণ্ডউইচে তো কিছুই হতো না। তাছাড়া, তোমাকে আজ খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। চমৎকার অ্যানাউন্স করেছো। কনিও খুব খুশী। কনি তো বিশ্বাসই করলে না, জীবনে কোনোদিন তুমি ক্যাবারে আর্টিস্টদের প্রেজেণ্ট করোনি। তোমার মধ্যে সুন্দর একটা নাটক-বোধ আছে।"

আমার চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আমার আপত্তি অমান্য করে চোখের জল কেন যে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছে বুঝতে পারলাম না।

মানুষের মনের কথা বোসদা যেন অতি সহজেই বুঝে ফেলেন। আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, "বেশ বুঝতে পারছি, একদিন এই হোটেলে তোমার জুড়ি থাকবে না। পরে, ক্যাবারেতে তোমাকে না হলে এক মুহূর্তও চলবে না।"

বোসদা যেন হঠাৎ দেখতে পেলেন, আমি কাঁদছি। "কী হলো? ছিঃ কাঁদছো কেন?"

পরমুহূর্তেই বোসদা হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। আমাকে পরমস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন। আমার মুখটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন। শাজাহানের আগুনে এগারো বছর পুড়ে পুড়েও বোসদা যে ছাই হয়ে যাননি, তা যেন আবিষ্কার

করলাম। জড়িত কণ্ঠে বোসদা বললেন, "আমি খুব খুশী হয়েছি। তুই যে কাঁদছিস, এতে আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু দেখে যা। দেখার এমন সুযোগ জীবনে আর কখনও হয়তো পাবি না। কিন্তু চিরকাল এমন থাকিস। চিরকাল যেন এমন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে পারিস।"

বোসদা এবার নিজেকে সামলে নিলেন, 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে নেমে গিয়েছিলেন, এবার আবার 'তুমি'-তে ফিরে এলেন। বললেন, "সাপারে বসে কনি তোমাকে খুঁজছিল। ভারি মিশুকে মেয়েটা। চমৎকার কথাবার্তা বলে। অনেক মজার মজার গল্প বলছিল। সারা জীবনটাই তো যাযাবরের মত কাটিয়ে দিল। পৃথিবীর এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে নাচতে নাচতেই ওর বসন্ত শেষ হয়ে যাবে। কনিই বলছিল, খেলোয়াড়, অভিনেত্রী এবং নর্তকীর জীবনে মাত্র একটি ঋতুই আছে। তার নাম বসন্ত ঋতু। এরা সকলেই কেবলমাত্র যৌবনে ধন্য। ভদ্রমহিলা আরও গল্প করতেন। কিন্তু শ্যামব্রেটাকে নিয়েই বিপদ হলো। বামনটা বারে যেতেই কয়েকজন মহিলা ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন। তাতে অপমানিত হয়ে শ্যামব্রেটা একজনের টেবিলের উপর বসে পড়ে। ভদ্রমহিলা মেটারনিটি জ্যাকেট পরে স্বামীর সঙ্গে বার-এ বসেছিলেন। শ্যামব্রেটা তাকে বলে, 'আমার দিকে ওইভাবে তাকিও না। আমি বলে দিলাম, তোমার যে ছেলে হবে সে আমার থেকে সাইজে ছোটো হবে!'

ভদ্রমহিলা সেই শুনে ফেণ্ট হয়ে যাবার সামিল। খবর পেয়ে আমরা আবার বার-এ গিয়ে ওদের সামলাই। কনিও জোর করে শ্যামব্রেটাকে ঘরে নিয়ে গেল। আড্ডাটা জমলো না।"

বোসদা বললেন, "যাও, শুয়ে পড়গে

যাও। আমিও চেয়ারে বসে একটু ঢুলে নিই। রাত চারটের সময় কয়েকজন গেস্ট চলে যাবেন, তাঁদের জাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।"

ছাদের উপরে উঠে আস্তে আস্তে দরজাটা টেনে খুললাম। এই সময় কাউকেই জেগে থাকতে দেখার আশা করি না। গুড়বোঁড়িয়াও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু পা দিয়েই দেখলাম আশ্চর্য ব্যাপার। একটা চ্যাপ্টা মদের বোতল নিয়ে ল্যামব্রেটা ছাদের ধুলোর উপর বসে আছে। কোট-প্যাণ্ট-টাই সে কিছুই ছাড়েনি। মাঝে মাঝে বোতলের মুখটা খুলে সে দু' এক ঢোক গিলে নিচ্ছে।

আমাকে দেখেই ল্যামব্রেটা উঠে দাঁড়াল। বললে, "কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখছো?"

আমার তখন চাঁদ দেখবার মতো মানসিক অবস্থা নেই। বললাম, "ঘুমোবেন না?"

মদের বোতলটা হাতে করে ল্যামব্রেটা এবার সোজা আমার সঙ্গে চলে এল। আমার অনুমতি না নিয়েই ঘর খোলামাত্রই সে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ল্যামব্রেটার চোখ দুটো দেখে আমার যেন একটু ভয় ভয় করতে লাগল। যে আমুদে ক্লাউন কিছুক্ষণ আগেও কলকাতার সাড়ে তিনশো লোককে হাসিয়ে এসেছে, সে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

ল্যামব্রেটা বললে, "আমি শুনলাম, তুমি এখানেই ঘুমোও। তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কাল থেকে ক্যাবারেতে অন্য কাউকে তুমি কনির কোলে বসতে ডাকবে না। তাহলে বিপদ হবে।"

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকটা কি মদে চুর হয়ে আছে?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে, ল্যামব্রেটা বললে, "কলকাতার লোকেরা তোমরা জানোয়ারের মত। তোমাদের বাবা, মা, ঠাকুমা, দিদিমা কেউ মানুষ ছিলেন না। সব জানোয়ার।"

বলেই ল্যামব্রেটা তার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে নাচতে শুরু করল। সঙ্গে গান। সে গানের অর্থ—'আমাদের এই দুনিয়ায় সবাই জানোয়ার। যদি বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গে রাত্রে খারাপ পাড়ায় চলো, না হয় অন্তত হোটেলে এসো।'

আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছে। এই সময় কী পাগলের হাতে পড়লাম! বললাম, "মিস্টার ল্যামব্রেটা, রাত অনেক হয়েছে।"

ল্যামব্রেটা এবার কুৎসিত গালাগালি শুরু করল। "রাত হয়েছে তো কী হয়েছে? কী তোমার সতী-সাবিত্রী হোটেল! এখানে রাত ন'টা বাজলেই সব ব্যাটাছেলে যেন ঘুমিয়ে পড়েন!"

বললাম, "মিস্টার ল্যামব্রেটা, সারাদিন কাজ করে ক্লান্তি অনুভব করছি।"

বিছানার উপর উঠে নাচতে নাচতে ল্যামব্রেটা বললে, "কনির কোলে বসে পড়বার সময় তো সে-কথা মনে থাকে না?"

বললাম, "আমাকে এসব বলে লাভ কী? আমি তো কনির কোলে বসিনি।"

"না তোমরা বসবে কেন? তোমরা রোমের পোপ, তোমরা ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ, তোমরা লর্ড বুদ্ধের ডাইরেক্ট ডিসেনডেণ্ট! কনির যে একটা কোল আছে তাই তোমরা ক্যালকাটা সিটিজানরা জানো না।"

ল্যামব্রেটার হাবভাব দেখে মনে হলো, মদের ঘোরে সে এবার আমার ঘরের জিনিস-পত্তর ভাঙতে আরম্ভ করবে। নিজের ঘর ছেড়ে সে যে আমার ঘরে দুপুর রাত্রে হামলা করছে, তা যেন তার খেয়ালই নেই।

নিরুপায় হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে গুড়বেড়িয়ার খবর করলাম। গুড়বেড়িয়া ঘুমোচ্ছিল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললে, "কী হয়েছে? দেবতা কিছু গণ্ডগোল করছে নাকি?"

"দেবতা? সে আবার কে?" আমি তো ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলাম না। তারপর গুড়বোঁড়িয়ার কথাবার্তায় জানলাম, দেবতাটি ল্যামব্রেটা ছাড়া আর কেউ নন। বামন সায়েবকে দেখে গুড়বোঁড়িয়ার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, ইনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অবতার ছাড়া আর কেউ নন।

গুড়বোঁড়িয়াকে বললাম, "তোমার ভগবান-টগবান রাখো। এখন এই মাতাল সায়েবকে কী করে ঘর থেকে বার করা যায় বলো?"

গুড়বোঁড়িয়া আমার তোয়াক্কা রাখে না। আমার খুশী-অখুশীতে তার চাকরি নির্ভর করে না। তাছাড়া, ক্ষতি যা হবার তা প্রায় হয়েই গিয়েছে। পরবাসীয়াও মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে।

ভেবে দেখলাম কোনো উপায় নেই। কনিকে ডেকে পাঠানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

গুড়বোঁড়িয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কনি মেমসায়েব কোথায়?"

গুড়বেড়িয়া বললে, "নিচের তলায়।"

বাধ্য হয়েই ফোন করলাম। কনির ঘরে কয়েকবার টেলিফোনটা বেজে উঠতেই কনি ফোনটা ধরলে। এতো রাত্রে কেউ যে তাকে ফোনে ডাকতে পারে, সে বোধ হয় ভাবতেও পারেনি। প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর বললে, "কে? কী ব্যাপার?"

যথাসম্ভব কম কথা খরচ করে আমার সমস্যার কথা কনির কাছে নিবেদন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করলাম—এতো রাত্রে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করা আমার উচিত নয়; কিন্তু ল্যামব্রেটার মাতলামো আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।"

আমার কথা শুনেই কনি যেন বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে যে চমকে গিয়েছে, তা তার গলার স্বর থেকেই বুঝলাম। কনি বললে, "আমি এখনই ছাদে যাচ্ছি।"

কনি ছাদে আসছে শুনে গুড়বোঁড়িয়া তড়াং করে উঠে দাঁড়ালো। "এতোরাত্রে। ল্যাংটা মেমসায়েবদের আবার ছাদে আসবার দরকার কী?

ছাদের দরজাটা এবার মুহূর্তের জন্যে খুলে গেল। সেখানে স্লিপিংগাউনে দেহ আবৃত করে, মাথায় সিল্কের বনেট জড়িয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকঘণ্টা আগে সে কলকাতার গণ্যমান্যদের মনোরঞ্জন করেছে। তার ভঙ্গীতে তখন লাস্য ছিল, আগুন-জ্বালা যৌবনের দাহ ছিল। কিন্তু রাত্রের এই অন্ধকারে, আমার চোখের সামনে এই মুহূর্তে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে যেন অন্য কেউ। সে আর যাই হোক—কনি দি উয়োম্যান নয়। এ কনিতে একটুও আগুন নেই। নিতান্ত একঘেয়ে হলেও, সেই পুরনো উপমাই মনে পড়ছে—তার মুখে আকাশের চাঁদের স্নিগ্ধতা। যে চাঁদ শাজাহান হোটেলের মাথার উপরে, লক্ষ লক্ষ তারার আসরে আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তার উদ্বিগ্ন মুখেও আমি সহজেই চন্দ্রের স্নিগ্ধতা খুঁজে পেলাম; আর তার চোখে লজ্জার সুর্মা।

কনি বললে, "কোথায় সে? আপনাকে অ্যাটাক করেছিল নাকি?"

বললাম, "আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে আক্রমণ করে নি, কিন্তু আমার ঘর অধিকার করে বসে আছে। ওখানে বসে বসে মদ খেতে খেতে, অনেকটা হুইস্কি আমার বিছানার তোষকের উপর ফেলে দিয়েছে।"

আমার কথা শুনে কনির যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল। আস্তে আস্তে বললে, "আই অ্যাম সো স্যরি, বাবু।"

কনি এবার সোজা আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। ঢুকেই অস্ফুট স্বরে শুধু একটি কথা বললে, "হ্যারি।"

ল্যামব্রেটার যে আর কোনো নাম থাকতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। হ্যারি বলে ডাকতেই ল্যামব্রেটা চমকে উঠে দরজার দিকে মুখ ফিরে তাকালো। কনিকে দেখেই, প্রথমে সে হুইস্কির বোতলটা প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে। যেন ওইটা কেড়ে নেবার জন্যেই, কনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ল্যামব্রেটা যেন সব বুঝতে পারলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রতিবাদের সাহস যোগাড় করে বললে, "আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না। জানোয়ারের বাচ্চাদের আমি ছারপোকার মতো টিপে মেরে ফেলবো। তাতে তোমারই বা কী? আর এই গালফুলো বেলুনমুখো ছোকরারই কী?"

কনি দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "হ্যারি রাত্রি অনেক হয়েছে। তুমি এই নিরীহ ভদ্রলোকের বিছানা নষ্ট করে দিয়েছো।"

"তার জন্যে আমি স্যরি। আমি ইচ্ছে করে করিনি। ছারপোকা মারতে গিয়ে বোতলটা পড়ে গিয়েছিল। তাতে ওঁর কী ক্ষতি হয়েছে? আমারই তো লোকসান হলো।"

"হ্যারি!" কনি এবার আরও চাপা, অথচ আরও তীব্র স্বরে বললে।

ল্যামব্রেটাও এবারে দপ করে জ্বলে উঠলো। "বেশ করবো। আমার যা খুশী তাই করবো। তাতে দুনিয়ার কী? তাতে তোমার কী? এক মগ বীয়ার নিয়ে এসে আমি এই ছোঁড়ার মাথার বালিশ ভিজিয়ে দেবো; দু বোতল রাম দিয়ে আমি নিজের কোট কাচবো; হোয়াটস্ দ্যাট টু ইউ?"

এমন অবস্থার জন্যে কনি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। ল্যামব্রেটা যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। লজ্জায়, অপমানে কনির মুখ যে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, তা আমি বুঝতে পারলাম। কনি নিজের দেহের সব রাগ চেপে রেখে, আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে কিছু করতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন তার মনে পড়ে গেল ঘরের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে রয়েছি।

মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে কনি আমাকে বলল, "প্লিজ, তুমি যদি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।"

কোনো কথা না বলে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিদ্রাবিহীন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, নিদ্রাবিহীন আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু সে বোধ হয় এক মিনিটেরও কম সময়ের জন্যে। তারই মধ্যে যেন মন্ত্রের মতো কাজ হয়ে গেল। কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে ল্যামব্রেটা যেন তার সম্বিত ফিরে পেয়েছে।

কনি আমাকে ঘরের মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, "কাম ইন।"

ভিতরে ঢুকে দেখলাম ল্যামব্রেটা একেবারে জল হয়ে গিয়েছে।

বলছে "প্লিজ। আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি রিয়েলি স্যরি।"

কনি বললে, "আর নয়। আমি অনেক সহ্য করেছি।"

ল্যামব্রেটা এবার কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "আমি এখনই যাচ্ছি। আমি এখনই নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছি।"

"যাও। এখনি নিজের ঘরে চলে যাও।" কনি বললে।

নিজের ঘরে যাবার জন্যে উঠে পড়ে ল্যামব্রেটা। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেল। অভিমানে ছোট ছেলের মতো মুখ ফুলিয়ে বললে, "তুমি শুধু আমারই দোষ দেখো। আর ওরা যে আমাকে শিম্পাঞ্জী বললে। তখন? তখন তো কিছু বললে না?" তারপর ছোটোছেলের মতো ভেউ ভেউ করে

কাঁদতে কাঁদতে ল্যামব্রেটা নিজের ঘরে চলে গেল।

কনি ওকে কি বলবার জন্যে ওর দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কোনো কথা না শুনে ল্যামব্রেটা তার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি দেখলাম, দরজার সামনে কনি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বার জন্যে আমিও তৈরি ছিলাম না। কনি এবার আস্তে আস্তে ছাদের এক কোণে এসে দাঁড়ালো। আমি দেখলাম, কনি কাঁদছে।

কনি দি উয়োম্যান স্লিপিং গাউনের হাতা দিয়ে চোখের জল মুছছে। আস্তে আস্তে সে এবার আমাকে বললে, "ব্রুটস। পৃথিবীর এই লোকরা ব্রুটস্। হ্যারির সামনে শাজাহানের বার থেকে উঠে এসে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার এই ক্লাউনটা শিক্ষিত শিম্পাঞ্জি না মানুষ?"

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বললে, "শিম্পাঞ্জি নয়। দেখছিস না সাদা।"

আমি ওকে কিছু বলতাম না। ও যদি নিজের ঘরে বসে মাতলামো করতো, আমি দেখতেও যেতাম না। ওই তো আমাকে বাধ্য করলে। আমার কী দোষ?"—কনি যে সত্যিই কাঁদছে তা আমার বুঝতে বাকি রইলো না।"

কনিকে যেন সেই মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করলাম। সে আস্তে আস্তে বললে, "তুমি কিছু মনে করো না। সারাদিন খেটে খুটে তুমি যখন ঘুমোতে এলে, তখন হ্যারি তোমার মুডটা নষ্ট করে দিয়ে গেল।"

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, "তাতে কী হয়েছে। উনি তো আর জেনে শুনে কিছু করেন নি। নেশার ঘোরে কেউ কিছু করলে, তার জন্য তাকে পুরোপুরি দোষী করা চলে না।"

কনি বললে, "যাই ওকে আর একবার দেখে আসিগে যাই।"

কনি এবার ল্যামব্রেটার ঘরে পা টিপে টিপে ঢুকে গেল। আমি তখনও ঘুমোতে যেতে পারলাম না। যেন কিছুতেই আজ আমার ঘুম আসবে না। গুড়বেড়িয়াকে এক গ্লাস জল আনতে বলে, আমি আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু কনির কী হলো? ল্যামব্রেটার ঘরে সেই যে সে ঢুকেছে, আর বেরোবার নাম নেই। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না। ঘরের দরজাটা কনি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা দু'জনে কি কোনো কথা বলছে? না তো। ফিসফিস করে কথা বললেও, কাঠের পার্টিশান ভেদ করে কিছু গুঞ্জন এই স্তব্ধ রাত্রে আমার কানে এসে হাজির হতো।

গুড়বেড়িয়া আমার হাতে জলের গেলাসটা দিয়ে দিল। খেয়ালের ঘোরেই জলটা এক নিশ্বাসে পান করে ফেললাম। বুকের ভিতরটা যেন একেবারে শুকনো মরুভূমি হয়েছিল। গুড়বেড়িয়া এতোক্ষণে যেন কোনো গন্ডগোলের আভাস পাচ্ছে। এই রাত্রে ছাদের ঘরগুলোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার। সেখানে কোনো অঘটন ঘটলে, তার চাকরিটাই আগে মা কালীর পায়ে বলি যাবে।

গুড়বেড়িয়া ফিসফিস করে প্রশ্ন করলে, "ল্যাংটা মেমসায়েব নিচেয় চলে গিয়েছেন তো?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলাম, মেম-সায়েব এখনও যান নি।

"এ্যাঁ! যান নি? তাহলে কোথায় তিনি?"

ইশারায় গুড়বেড়িয়াকে দেখিয়ে দিলাম। গুড়বেড়িয়া বললে, "হুজুর, যতোদূর মনে হচ্ছে ঘরের আলো নেভানো। তাই না?"

বললাম, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে।"

সন্দেহ নিরসনের জন্যে গুড়বেড়িয়া এবার সোজা ল্যামব্রেটার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের কাছাকাছি গিয়ে, কাঠের ফাঁক দিয়ে সে যেন নিঃসন্দেহ হতে চাইলো, ঘরের আলো নিভে গিয়েছে কিনা।

আমি তখনও বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। গুড়বেড়িয়া ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। বললে, "সর্বনাশ হয়েছে, হুজুর।"

"কী সর্বনাশ।"

গুড়বেড়িয়া সভয়ে বললে, "বুলু আলো জ্বলছে।"

"তাতে তোর কী?" আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম।

"কী বলছেন, সায়েব! ঘর একেবারে অন্ধকার থাকলে আমি এতোটা ভয় পেতাম না। পুরবাসীরা, হুজুর, আমাদের প্রথম দিনে বলে দিয়েছিল, 'আলো থাকলে ভয় নেই, আলো না থাকলেও তেমন ভয় নেই, কিন্তু দুশমন হচ্ছে ঐ বুলু আলো।"

গুড়বেড়িয়ার এবার কেঁদে ফেলবার অবস্থা। চোখ মুছতে মুছতে বললে, "আমাকে শনিতে ধরেছে, হুজুর। আমার আর চাকরি থাকবে না।"

কাঁদতে কাঁদতে সে নিবেদন করলে, "ল্যাংটো মেমসায়েবদের উপর কড়া নজর রাখবার হুকুম আছে। তাদের বার-এ ঢুকতে দেওয়া বারণ; তাদের ঘরে কোনো পুরুষ-মানুষের ঢুকতে দেওয়া বারণ; কোনো পুরুষমানুষের ঘরেও তাদের ঢুকতে দেওয়া বারণ। যদি কারুর ঘরে সে ঢুকেও পড়ে দরজা হাট করে খুলে রাখতে হবে। আমার চাকরিটা আজ গেল হুজুর।"

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "অতো ভয় পাচ্ছো কেন? এই রাত্রে কে তোমার খোঁজে আসছে।"

"আপনি জানেন না। মার্কো সায়েব রবারের জুতো পরে কখন যে এসে পড়বেন, কিছুই ঠিক নেই। সায়েব কোনো কথা শুনবে না। সঙ্গে সঙ্গে হোটেল থেকে দূর করে দেবে। করিমকে সেবার যেমন সায়েব ঘাড় ধরে বার করে দিল। তখনকার ল্যাংটো মেমসায়েব বলেছিল, একজন সায়েবকে রাত্রে ছেড়ে দিতে। ছেড়েও দিয়েছিল করিম। পাঁচটা টাকার জন্যে করিমটার সব গেল।"

গুড়বেড়িয়া এবার দরজায় ধাক্কা দেবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। চাকরি যাবার ভয়ে বামনাবতার তার মাথায় উঠেছে। আমি বাধা দিলাম। বললাম, "গুড়বেড়িয়া, সারাদিন কাজ করে বহু পরিশ্রান্ত লোক এখন ঘুমোচ্ছে। এখন তাদের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করো না।"

গুড়বেড়িয়া আমার কথার মধ্যে কিসের ইঙ্গিত খুঁজে পেল কে জানে। মনে হলো, ওর সন্দেহ মেমসায়েবের ওই ঘরে ঢুকে পড়ে নীল আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার পিছনে আমারও কোনো হাত আছে।

গুড়বেড়িয়া এবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব আর ভাষায় প্রকাশ করতে সাহস করলে না।

আজ রাত্রের আকাশকে আমার বড় বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। যেন সৃষ্টির ভাণ্ডারে যত আনন্দ ছিল, পৃথিবীর বেহিসেবী মানুষরা তার সব উড়িয়ে দিয়েছে। কারুর জন্য, কোথাও যেন এক ফোঁটা প্রশান্তি অবশিষ্ট নেই। অদূরদর্শী লোকদের কল্যাণে সে-সব কবে আদালতের নীলামে বিকিয়ে গিয়েছে।

ল্যামব্রেটোর ঘরের দরজা যেন এবার খুলে গেল মনে হলো। ঘরের নীল আলোটা এখন আর জ্বলছে না। সেখানে নির্ভেজাল অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্য থেকেই শ্বেতদ্বীপবাসিনী কনি লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে। আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির দিকে আসতে আসতে সে আমাকে দেখতে পেল। আমাকে সে যে দেখতে পারে তা বোধ হয় তার হিসেবের মধ্যেই ছিল না। আমাকে অবজ্ঞা করেই সে যেন নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে সে একবার থমকে দাঁড়াল। আমাকে কিছু বলবার জন্যেই কনি যেন আবার ফিরে আসছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে যেন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করলে। তবুও আমার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। আর সেই মুহূর্তেই তার মুখে এক বিচিত্র বিষণ্ণতা যেন হাসি হয়ে জ্বলে উঠলো। কনির সে হাসিকে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করবার মতো শক্তি আমার নেই। কিন্তু সেই হাসির মধ্য দিয়ে সে যে আমাকে অনেক কিছু বলতে চাইল, তা বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হলো না।

(ক্রমশ)

ফরাসী কবি সাঁ জন প্যার্স ১৯৬০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেও তিনি কিন্তু ফরাসী জনসাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নন। ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে আমি এমন অনেককে দেখেছি যে, তারা শিক্ষিত, সাঁ জন প্যার্সের নাম শুনেছে কিন্তু তাঁর কবিতা পড়েনি। এদের সংখ্যাই বেশী।

সাঁ জন প্যার্স জনপ্রিয় নন তার প্রধান কারণ, তিনি সহজ-সরল ভাষায়, চিরাচরিত প্রথায় পয়ার বা ছন্দ মিলিয়ে কবিতা গাঁথেননি। ভাষার দিক দিয়ে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ছন্দের দিক দিয়ে সুধীন দত্ত বা বিষ্ণু দে। তার ওপর আরও আছে। তাঁর কবিতা যেন দার্শনিক প্রবন্ধের কাব্যিক আকার। এ হেন দার্শনিক কবি যখন ফরাসী সাহিত্যে জাঁকিয়ে বসতে পারেন নি, সেই সময়ে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যের সাথে ফরাসী সাহিত্যিক মহলে পরিচয় করিয়ে দেন সাঁজন প্যার্স।

ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম, যিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে শুধু প্রথম আলাপ নয়, তাঁর গীতাঞ্জলি যাতে ফরাসীতে অনূদিত হয় তার ব্যবস্থা করেন। সাঁ জন প্যার্স গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদটি সংগ্রহ করে প্রথমে পড়তে দেন আরেক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্‌কে। পরে আঁদ্রে জিদ্ গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদের পর থেকে ফরাসী সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি কৌতূহল বাড়তে থাকে। যার ফলে বছরের পর বছর ধরে রবীন্দ্রসাহিত্য ফরাসী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে এদিক দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী মাত্রেই সাঁ জন প্যার্স-এর কাছে ঋণী।

ফরাসী সাহিত্যপত্রিকা 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাসে'জ'-এর নভেম্বর ১৯৬১ সংখ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে কবি সাঁ জন প্যার্স যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, সেটি অমূল্য। এত ছোট প্রবন্ধে রবীন্দ্রদর্শন এমন পরিষ্কারভাবে কেউ ব্যক্ত করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার মনে হয় তা সাঁ জন প্যার্সের মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর পরিচয় পর্ব সম্বন্ধে প্রথমে বলি। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় লণ্ডনে। তখন

রবীন্দ্রনাথ

সাঁ জন পার্স

কিন্তু তিনি সাঁ জন প্যার্স বলে পরিচিত নন। সাঁ জন প্যার্স তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম হল আলেক্সি সাঁ লেজে। আলেক্সি সাঁ লেজে তখন ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। লণ্ডনের ফরাসী দূতাবাসে কর্মনিরত। তখন তিনি ছদ্মনামে লিখতেন। তখনকার ছদ্মনাম ছিল সাঁ লেজে। সরকারী চাকরির ফাঁকে সাহিত্যচর্চা চলছে তখন তাঁর। শিল্পী ও দার্শনিক মন কখনো সরকারী ফাইলের স্তূপে ঢাকা থাকতে পারে না, সে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠবেই। তার প্রমাণ সাঁ জন প্যার্স।

লণ্ডনে তখন রবীন্দ্রনাথের বিজয়-পতাকা উড়ছে। ইংরেজ সাহিত্যিকরা জটলা করছে রবীন্দ্রপ্রতিভা নিয়ে। সেই জটলায় যোগ দেন সাঁ জন প্যার্স। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রপ্রতিভায় সাঁ জন প্যার্স ডুবে যেতে বাধ্য হন। তাঁর নিজের কথায়ঃ "তখনও মহাযুদ্ধ বাধেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তাঁর সাথে লণ্ডনে হল পরিচয়। আমি ফরাসী যুবক, তিনি আমার চেয়ে তখন বছর তিরিশেক বড়। আলোচনা চলছিল পশ্চিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

"লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন-এর এক বাড়িতে বসে আমাদের আলোচনা চলছিল সমকালীন ইতিহাস নিয়ে। তখন পশ্চিমী শক্তির রবি মধ্যগগনে, তার আধিপত্য জগৎ জুড়ে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর কারখানার চিমনি দিয়ে নির্গত হচ্ছিল শক্তি ও শিল্পপ্রসারের ধোঁয়া। বিজ্ঞানের সাথে সাহিত্য ও শিল্পের জয়যাত্রা বয়ে চলেছে তখন ইউরোপ জুড়ে। পশ্চিমের মানুষ তখন কামারশালায় লোহা পিটছে। নির্মাণ করছে হাতিয়ার......। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করে আমার সব বললেন।

"তাঁর সবচেয়ে দুঃখ তখন যান্ত্রিকতার অতি বাড়বাড়ি। অতিমাত্রায় শিল্প সমৃদ্ধি ও কলকারখানার বিষম পরিণতির কথা তাঁকে নাড়া দিয়েছে। সভ্যতার সংকট থেকে সভ্যতার ধ্বংস যে আসছে তা তিনি তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমষ্টিগত মানুষ থেকে একলা মানুষের ধ্বংস কিভাবে এগিয়ে আসছে।

"তা হলে সমস্যার সমাধান? কোন পথে তার সমাধান, কোন পথে সে এগুবে? তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক পথই ছিল শ্রেষ্ঠ; তাতেই মানবের রক্ষা ও উন্নতি। তাঁর কিন্তু তখন পাশ্চমী অতিমাত্রায় 'প্রাগমাটিজম্'--এর প্রতি আস্থা নেই। কারণ তাঁর মতে

পশ্চিমী 'প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম' সংকট থেকে সভ্যতাকে বাঁচাতে সক্ষম নয়। তাঁর আস্থা ছিল ফরাসী মানবতাবাদীদের প্রতি। তাঁর শ্রদ্ধা ছিল ফরাসী উদারনীতি ও স্বাধীনতার বাণীর প্রতি।

"আমার কাছে তিনি জানতে চাইলেন ফরাসী সাহিত্যিকদের সাথে আলাপ-পরিচয়ের পথগুলো। আমার আরেক বন্ধু আঁদ্রে জিদের সাথে তাঁর আলাপের ব্যবস্থা করেছিলাম। আরও অনেকের সাথে।...... যুদ্ধের পর অনেক কাল তাঁর সাথে দেখা হয়নি। আমি তখন চীনে। তিনি তখন জাপানে। বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পেলাম তিনি তখন চলেছেন আমেরিকার দিকে। পশ্চিম থেকে পূবে। কিন্তু সে পূবেও পশ্চিমী সভ্যতার কেন্দ্র। তিনি প্রাচ্যের পরিব্রাজক, চলেছেন মৈত্রীর বাণী প্রচার করতে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি চলেছেন মানুষে মানুষে আত্মা ও প্রেমের বিনিময় করতে। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য তাঁর একই গান—মৈত্রী। মানুষের মহত্ত্ব প্রচার করতেই তিনি তখন পদব্রজে বেরিয়েছিলেন। মনুষ্য আত্মার প্রতি-রক্ষাতেই।

"তাঁর পেছনে ছিল শাশ্বত ভারত। কত ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। ইতিহাসের ঝড়-বৃষ্টি তাকে ধুইয়ে দিয়ে তাকে রেখেছে পরিষ্কৃত করে। ভারতের ভাগ্য যেন মানুষেরই ভাগ্য।

"রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন মানে ফরাসীদের সর্বোচ্চ আদর্শ মানবতাবাদের প্রতিই শ্রদ্ধানিবেদন।

"আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ওপরে, এমনকি তাঁরই অধ্যাত্মবাদেরও ওপরে। তাঁর উজ্জ্বল ললাটে দেখা যেত দুই রশ্মির বিবরণ : কবি হিসেবে তিনি কবিদের স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছেন। আর তাঁর কাব্য দেশ-কাল-পাত্রের অতীত। সে চিরন্তন। খুঁজে বেড়িয়েছে সে মানুষের উৎস, অন্তহীন মানুষের সত্তা। যার ছিল না আদি ও অন্ত, অশেষ তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

"তিনি ছিলেন যেমন চিরযুবক তেমনি তাঁর কবিতা। তাঁর যশোগৌরব লুকিয়ে রয়েছে তাঁর কাব্যে, তিনি পূর্ণভাবে জীবন্ত তাঁর কবিতায়, সে জানে প্রতিটি প্রাণীর জীবনস্পন্দন।

"তিনি আমাদের পশ্চিমের সমাজে এখনও জীবন্ত। তাঁর গীতাঞ্জলির মধ্য দিয়ে তিনি করছেন বিচরণ। একমাত্র গীতাঞ্জলি। গীতাঞ্জলিই যেন এশিয়ার কোন এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মতন। প্রকাশ করেছেন তিনি বিশুদ্ধ আত্মার আর্ট যার সাথে রয়েছে রহস্যময়ীর আঘ্রাণ। আরও রয়েছে আত্মার দিগ্‌বিজয়।

তাঁর দূরের বাণী আমাদের করেছে নিকট; তাঁর প্রাচ্যসংগীত আমাদের দিয়েও গাইয়েছেন সর্বত্র। তাঁর স্বদেশী মৌসুমী বাতাস বইয়েছেন আমাদের দেশে, শিখিয়েছেন তাঁর দেশের আচার। ফরাসী-দের কানে সে সুর নতুন হলেও, তাতে ছিল আন্তর্জাতিক আত্মার ডাক। সেখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব।

"তিনি আমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন, যেন রূপকথারাজ্যের অতিথি। শুভ্র তাঁর বেশভূষা, এনেছেন তিনি নতুন বার্তা। অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে তিনি সুন্দর, দার্শনিকের চেয়ে সুমধুর কণ্ঠে গেয়েছেন মানুষের জয়গান। সুমধুর তাঁর চাহনি। যেন সবটাই রূপকথার রাজ্য। সেই রূপকথার রাজ্যে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তাঁর যৌবনের কবিতা, সে যেন অতি সাধারণ মানুষের অব্যক্ত বাণী।

"এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন আমাদের মাঝে। দুই জগতের মাঝে তো বটেই, দুই কালের মাঝে। বিরাট পুরুষ তিনি শতাব্দীর বাইরে, আবার তিনি ভেতরেও, একাধারে তিনি অতীতকালের কবি আবার অন্য দিকে তিনি আজকের। কারণ তিনি কালজয়ী।

"ক্ষণজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় যতখানি তিনি ব্যথিত হয়েছেন, ঠিক ততখানি ব্যথা পেয়েছেন তাঁর সমকালীন মানুষের ও সমাজের বেদনায়। ইউরোপে তিনি এসেছিলেন তাঁর বাণী শোনাতে, সমাধিস্থ হতে নয়। আরও দেখেছি তাঁর স্বদেশপ্রেম, তাঁর স্বচ্ছ বিচার-বিশ্লেষণ।

"তাঁর মৃত্যুর অনেক কাল পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ দেখে তাঁর ঐশ্বরিক বাণীর কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে বার-বার। যে সম্বন্ধে আমি তাঁর সাথে আলোচনা করেছি অনেক কাল আগে। প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের মানুষকে যা বলেছিলেন বহু আগে, তার ফল আমরা দেখলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ তাই এখনও জীবিত। ফ্রান্স তাঁর প্রতি আস্থা রাখে, করে শ্রদ্ধা। ভারতের সেই মহান পরি-ব্রাজক এখনও আমাদের পথ দেখিয়ে চলেছেন।

"তাঁর মর্মবাণী এখনও আমাদের মধ্যে জাগ্রত। তাঁর বাণী প্রতিটি আত্মার মধ্যে জেগে উঠুক। এই আমার কামনা।

দিলীপ মালাকার

ক্রিকেটের চারটি হৃদয়, একটি চোখ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

তিন দানবের এক চোখের কথা অনেকেই পড়েছেন গ্রীক পুরাণে। গ্রীক বা ভারতীয় সব পুরাণই নানা অসম্ভবে আক্রান্ত। কিন্তু আমাদের খুব কাছাকাছি আরো একটি সৃষ্টি আছে, গঠনবৈগুণ্যে যা নিতান্ত বিস্ময়কর, তা সকলে হয়ত খেয়াল করে দেখেন নি। উক্ত বস্তুটির হৃদয় সংখ্যায় চার, এবং চোখ মাত্র এক। বস্তুটির নাম ক্রিকেট। তবে এখানে আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি, আমার মত ক্ষীণদৃষ্টির এই ক্রিকেট-দর্শন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না: আমার বিশ্বাস অতঃপর কোনো উচ্চ শ্রেণীর দ্রষ্টা আরো বেশী সংখ্যায় ক্রিকেট-দেবতার হৃদয় এবং নয়ন দর্শন করে 'ক্রিকেটীয়'দের ভক্তিপিপাসাকে চরিতার্থ করবেন।

ক্রিকেটের চোখটি কিন্তু পাথরের চোখ। সে চোখ স্কোরারের, খেলোয়াড়ের কীর্তি এবং আম্পায়ারের নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ থেকে পাঁচশো পর্যন্ত অঙ্কপাত যিনি নির্বিকারে করে থাকেন। হৃদয় তাঁর নিশ্চয়ই আছে, তিনিও চঞ্চল হন, উত্তেজনা কিংবা আতঙ্কে তাঁর হাত কাঁপতেও পারে কিন্তু গণিতে ভুল হয় না। প্রীতি বা বিদ্বেষ রানসংখ্যা বা বোলিং, ফিল্ডিং-এর হিসেবকে ওলটপালট করতে পারে না।

যাঁরা হস্তলিপি দেখে মানুষের চরিত্র অনুমান করতে পারেন, তাঁদের ক্ষমতার প্রতি আমার ঈর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রম আছে। যদি সেই ক্ষমতা থাকত তা হলে একবার স্কোরারের খাতাখানা টেনে নিয়ে তাঁর অঙ্করেখার বিন্যাস থেকে অনুমান করবার চেষ্টা করতুম মনোভাবের প্রকৃতি। অনুরাগের বা অনিচ্ছার ভাষা স্পষ্ট করে পড়ে নিতুম আপাতনিস্পৃহ সংখ্যাতত্ত্বের ভিতর থেকে। কেননা আমি জানি, পাথরের চোখ বসানো থাকে নরম সজল অনুভূতিশীল একটি রক্তমাংসের আধারে—শুধু তাই নয়, সত্যকার চোখকে হারিয়ে যে আধারের স্পর্শকাতরতা হয়ত বেড়ে গিয়েছে।

পাথরের চোখের কারুণ্যের কথা আপনারা শুনে থাকতে পারেন—সেই উচ্চাঙ্গের রসিকতাটি! ধনী বন্ধুর কাছে এসেছে দরিদ্র বন্ধু, সব দরজায় ধাক্কা খাওয়ার পরে। সে জানে, দরিদ্রের দরজা যদি বন্ধ হয়, ধনীর দরজা সেখানে খোলে না—সোনারুপোর বল্টু আঁটা বড় ভারী সে দরজা। তবু ক্ষুধা আর প্রয়োজন মাথা কোটে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়। শেষ চেষ্টা ধনী বন্ধুর কাছে যদি দেউড়ি খোলে।

স্কোরারের হলো পাথরের চোখ

দরিদ্র বন্ধুর প্রার্থনা শুনে ধনী বন্ধু কিন্তু উচ্ছল হয়ে উঠল। টাকা চাও? নিশ্চয় পাবে—দশ হাজার টাকা দেব—যদি ঠিক করে বলতে পারো। কিছুদিন আগে আমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—ধনী বন্ধু বলতে লাগলো,—অনেক টাকা খরচ ক'রে আমি একটা পাথরের চোখ তৈরী করেছি; তুমি যদি বলতে পারো কোনটি আসল কোনটি নকল চোখ, তা হলে দশ হাজার টাকা তোমাকে দেব—দেবই। এ পর্যন্ত কেউ সঠিক বলতে পারেনি। হাঃ হাঃ। প্রস্তর-চক্ষুর গর্ব অট্টহাস্য করে উঠল।

দরিদ্রটি খানিকক্ষণ তাকাল ধনীর কৌতুকপ্রফুল্ল মুখের দিকে, তারপর আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল,—ওইটা পাথরের চোখ।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে চেকবই বার ক'রে দশ হাজার টাকা লিখে দিয়ে বিস্মিত-ভাবে ধনী শুধোল—কিন্তু কি করে বললে বলতো?

—দু' চোখের মধ্যে যেটাতে একটু করুণার আভাস দেখলুম, বুঝলুম সেটাই পাথরের। দরিদ্র জানাল।

এই কাহিনী শোনার পর থেকে পাথরের চোখ সম্বন্ধে ধারণা আমার বদলেছে। আমার সর্বপ্রকার সহানুভূতি তাঁদের বিষয়ে, যাঁরা দিনেব পর দিন স্কোর লিখে গিয়েও স্কোরের উপর নিজের হৃদয়ের মুদ্রণ এঁকে দিতে পারেন না।

একবার মাত্র একজন স্কোরার পেরে-ছিলেন, বিখ্যাত ডবলিউ জি গ্রেসের সময়ে, ডবলিউ জি যেবার চার শো রান করে-ছিলেন। ঘটনাটি বলা দরকার, কারণ আমার জানা এই একটি ক্ষেত্রেই মানবিক

স্বাধীনতাকে উপভোগ করেছেন স্কোরার।

সেটা হ'ল ডব্লিউ জি'র সুবিখ্যাত ১৮৭৬ সাল। ক্রিকেটের পামীর মাল-ভূমিতে তখন তাঁর রাজত্ব। ঐ বছর জুলাই মাসে গ্রিমস্‌বিতে স্থানীয় বাইশের সঙ্গে ইউনাইটেড সাউথের খেলা। খেলার আগে গ্রিমস্‌বি-র অধিনায়ক অভিযোগ করে বললেন, ডাঃ গ্রেস যে দল এনেছেন, তা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। কথাটা না বললেই ভাল করতেন। প্রথম দিনের শেষে আগন্তুক দল করল দু উইকেটে ২১৭—তার মধ্যে ডাঃ গ্রেস ১৩৬ নট আউট এবং তাঁর ভাই ফ্রেড গ্রেস নট আউট ৩৯। বাইশ জন ফিল্ডস-ম্যান ও মাঠভর্তি বড়ো বড়ো ঘাসের মধ্যে বল গলিয়ে গলিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে ডাঃ গ্রেস করলেন নট আউট ৩১৪ —যার মধ্যে খুচরো রান ১৫৮। দ্বিতীয় দিনের শেষে ডাঃ গ্রেস সুখবর পেলেন টেলিগ্রামে —ভালয় ভালয় তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। গ্রেস পরিবারের নতুন শিশুর কল্যাণে শ্যাম্পেন পানোৎসব হ'ল। তৃতীয়

দিনেও ডাঃ গ্রেস অসমাপ্ত ইনিংস শেষ করতে পারলেন না, কারণ ৬৮১ রানে যখন তাঁর দলের শেষ উইকেট পড়ে গেল, তখনো তিনি অপরাজিত। গ্রিমস্‌বির লোকেরা এখনো দিব্যি গেলে একটা কথা বলে থাকে। ডাঃ গ্রেস প্যাভিলিয়ানে ফিরে গিয়ে নিজের স্কোর জানতে চাইলেন—খেলার সময় প্রতি খেলোয়াড়ের স্কোর জানানোর ব্যবস্থা সেই মাঠে ছিল না। স্কোরার জানালেন, ডাঃ গ্রেসের রান ৩৯৯। হেসে উঠে ডাঃ গ্রেস বললেন, ঠিক আছে ওটাকে ৪০০ করে দাও। সহাস্যে অনুমোদন করে স্কোরারও বললেন, তাই হবে। অমন একটা ইনিংস আপনি খেলেছেন, এবং একটা সুন্দর শিশুর জন্ম হয়েছে, আপনি একটা রান বেশী পেতে পারেন।

এইভাবেই নাকি সমস্ত রেকর্ডে ডাঃ গ্রেসের নামের পাশে ৪০০ নট আউট লেখা আছে।

চিত্রগুপ্তের বংশধরের স্বাধীন বিবেচনা-শক্তি এবং হৃদয়বত্তার এই একতম পরিচয়ে আমি মুগ্ধ। চিত্রগুপ্ত আমারও আদি পুরুষ।

ক্রিকেটের চারটি হৃদয়ের যেটি সবচেয়ে অগভীর অথচ উত্তাল, নিরন্তর বিক্ষুব্ধ কিংবা নিঃশ্বাসরুদ্ধ,—সে অংশে থাকি আমি—সেটি হ'ল দর্শকদের গ্যালারি। তার কথা অজস্রভাবে বলেছি, নানা স্থানে, বলবও যখনই সময় পাব। কাব্য ক'রে বলতে পারা যায়, শেষের কবিতার ভাষায়—আমরা হলুম স্বচ্ছধারা ঝরনা, আমাদের উপরই সূর্যতারার ছায়াপাত। কিন্তু যেখানে ডুবুরি নামালেও তল পাওয়া যাবে না, সে হচ্ছে ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুতর হৃদয়—নির্বাচকদের পরামর্শকেন্দ্র। হৃদয়ের চেয়ে বোধ হয় মস্তিষ্কের সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ বেশী। দেশব্যাপী অসংখ্য রত্নরাজির মধ্যে রাজকণ্ঠের মাল্য রচনার উপযোগী কয়েকটি মাত্র রত্ন এ'দের নির্বাচন করতে হয়। কিংবা যেখানে রাজার বাস বনগ্রামে (যেমন আরণ্যক ভারতবর্ষে), সেখানে যৎসামান্য যা আছে, তাকেই পালিশ করে কিভাবে উপস্থিত করা যায়, অস্থির হতে হয় তারই চিন্তায়। নির্বাচকদের অবস্থা শোচনীয়,—অগ্র বা পশ্চাৎ যে কোনো ক্ষেত্রেই নির্বংশের বংশধর হওয়া অবধারিত। নির্বাচকেরা তাই জনসাধারণের অনভিজ্ঞতায় বিরক্ত, সমালোচকদের দায়িত্বহীন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ এবং অনির্বাচিত খেলোয়াড়দের বিবেচনাবুদ্ধির অভাবে অসন্তুষ্ট। তাঁরা বলেন, দলে যে এগারো জনের বেশী লোকের ঠাঁই হতে পারে না, এ জ্ঞান তোমাদের কবে হবে? স্বাধীনতাপূর্বে ভারতের ক্রিকেট-নির্বাচকদের ছিল প্রাণান্ত দায়িত্ব—এক দিকে রাজন্যবর্গ ও তাঁদের পার্ষদ-পরিজনদের রিজার্ভ সিট, অন্য দিকে বাকি আসনের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজে সাদা-কালোর বাঁটোয়ারার সঙ্গে আবার দ্বীপে দ্বীপে লড়াই—কোন্ দ্বীপের ক'জন দলে যাবে? সেখানে নির্বাচকদের বিশেষ কর্তব্য—মারামারি করে দলের মধ্যে মাতৃদ্বীপের খেলোয়াড় বেশী ঢুকিয়ে দেওয়া। এই সমস্ত ব্যূহের মধ্যে পথ ক'রে যাঁদের এগোতে হয়, সেই নির্বাচকরা যদি বুদ্ধির দ্বারা নিজেদের আবেগহীন ক'রে তুলতে না পারেন, তা হলে

গুড মর্নিং স্যার

তাঁদের জন্য আছে দুশ্চিন্ত দিবস এবং বিনিদ্র রজনী।

নির্বাচকদের কি না বিবেচনা করতে হয়! মাঠের অবস্থা—মাঠ পাথরে বাঁধানো কি 'মাদুরে' ঢাকা; ভিজে কি শুকনো; ভাঙা কি ভাঙবে ভবিষ্যতে? খেলোয়াড়ের কথা—ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, না, ব্যাট ছুঁড়ে দেবে খুশিমত; বুক পেতে নেবে বোলারের মার, না, মেরে বোলারের বুক ভেঙে দেবে; নেটে যে ছোকরা অদ্ভুত, টেস্টে সে ছোকরা ভূত হয়ে যাবে কি না? বোলারের কথা—স্পিন বেশী ঘুরবে, না, সুইংগ বেশী ছুটবে; বল পড়ে লাফাবে, না, গোঁত্তা খেয়ে ঢু মারবে? দর্শকের কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না—অমুক ছোকরাকে ঠাঁই না দিলে মাঠে কতগুলো পটকা ফাটবে এবং কাঁসর ঘণ্টা সহযোগে পাঁঠাবলির কি ধরনের উদ্যোগ চলবে—চিন্তার শেষ কোথায়?

সবচেয়ে বড় চিন্তা—হৃদয়ের চিন্তা,—রোজ সকালে যার হাসিমুখ দেখি, দুপুরেও যে গুড মর্নিং করে, সন্ধ্যাকালে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দেয় বিনীত মস্তকে—তাকে দলে কোনোক্রমে প্রবেশ করানো যায় কি করে?—অন্য নির্বাচকদেরও তো পুষ্পসরবরাহকারী আছে, আর আছে তিল দোষকে তাল করতে পটু খবরের কাগজ।

প্যাভিলিয়ানের সবচেয়ে সম্মানের আসনের তলায় ডি ডি টি দিয়ে ছারপোকা মেরে ফেলা হয়েছে—চিন্তার ছারপোকাগুলো যে অব্যাহতি দেয় না।

তৃতীয় হৃদয়টিকে বাইরে থেকে মনে হতে পারে গুরুতম, কিন্তু তা যে নয়, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। থিয়েটারের গ্রীনরুম থেকে অভিনেতা বেরিয়ে আসে, কিন্তু আসলে সে বেরিয়ে আসে কোথা থেকে? তেমনি ড্রেসিংরুমকে যেন ক্রিকেটে বেশী মর্যাদা দিয়ে না ফেলি। কোনো আদিমকালে—যখন সর্বাত্মক বার্টার ব্যবস্থা চালু ছিল সমাজে, যখন যে শিকার করত সেই আগুন জ্বালাত, মাংস ঝলসে নিত এবং নিজেকে নিজেই পরিবেশন করে পরিবেশিত খাদ্য নিজেই গ্রহণ করত—তখন হয়ত ক্রিকেটারের শিবিরের মর্যাদা ছিল। কিন্তু এখন?—আপনারা জানেন যে, ডিনার-লাঞ্চ তৈরী হয় যা 'শাজাহান' হোটেলের পাকশালায়,—মালিক-ম্যানেজার তাকে টাঁকশালে পূর্বাহ্নে প্রস্তুত করে রাখেন।

সুতরাং ড্রেসিংরুম আধুনিক ক্রিকেটে আপেক্ষিকভাবে রিক্ত হৃদয়। তবু তো হৃদয়! আমাদের সকলের মনের মধ্যেই একটা কৌতূহলী বালক আছে, যে পাড়ার থিয়েটারের গ্রীনরুমে উঁকি দেবেই বারংবার ধমক সত্ত্বেও। উঁকি দিয়ে দেখে কি? কাজের সুবিধার জন্য আমি 'দৃশ্য'গুলিকে ভাগ করে ফেলেছি।

যথা হাসপাতাল:—যেমন সিড বার্নসের বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে ইংলন্ডে

সাসেক্স কাউণ্টি গ্রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ড্রেসিংরুম। রে লিণ্ডওয়াল ইনফ্রা রে ল্যাম্পের তলায় শায়িত; বিল জনস্টন লম্বমান মর্দন-চৌকিতে, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় এক পাশ ফিরে আছেন রিচি বেনোড এবং কাত হয়ে কাতরাচ্ছেন এক পায়ের উপর নির্ভরশীল কিথ মিলার।

যথা নাট্যশালা:—১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে ক্যালিপসো মুখরিত ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ড্রেসিংরুম: কিংবা তারও পূর্বে ১৯৪৮ সালে দল থেকে নিয়মিত বাদ-পড়া অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে ব্যঙ্গকরুণ নৃত্যগীত।

যথা পাঠশালা:—অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম অবতরণে সেঞ্চুরী করে উৎফুল্ল চিত্তে কম্পটন ফিরলেন, ড্রেসিংরুমে অধিনায়ক হ্যামণ্ড কড়া মাস্টারী গলায় জানালেন, ডেনিস, একটা নয়, সম্ভব হলে একদানে ডবল সেঞ্চুরী করতে বলেছিলুম তোমাকে।

যথা প্রতীক্ষালয়:—কখনো প্যাড পরে শবরীর প্রতীক্ষা, যখন ব্রাডম্যান ব্যাট করতে গেছেন পনস্‌ফোর্ডের সঙ্গে। কখনো ছুটন্ত বিমানে প্যারাসুট সৈনিকের প্রতীক্ষা, যখন ভারতীয় খেলোয়াড়েরা ব্যাট করতে গেছেন ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে।

যথা পুত্রের মৃত্যুশয্যা:—ধরা যাক ১৮৮২ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত টেস্ট ম্যাচের সময় ইংলণ্ডের ড্রেসিংরুম, যে খেলায় ইংলণ্ড মাত্র ৮৫ রান করলেই জিততে পারবে এমন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান স্পফোর্থ ৭৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে সাবাড় করে দিয়েছিলেন ইংলণ্ডকে এবং দর্শকদের মধ্যে সত্যি সত্যি একজনের 'পতন মূর্ছা ও মৃত্যু' ঘটেছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে ইডেন গার্ডেনে হোলকারের সঙ্গে বাংলার রণজি ট্রফির ফাইন্যাল খেলাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। এই রকমের ব্যাধিসৃষ্টিকরা খেলা ক্রিকেটে প্রায়ই হয়। ক্রিকেটের মহিমা এইখানে। এইসব 'ক্রিটিক্যাল মোমেণ্টে' কেউ কাঁদে, কেউ হাসে (পাগলের), কেউ লাফায়, কেউ নাচে, বিড়বিড় করে কেউ বকে, কেউ বিড়বিড়

শবরীর প্রতীক্ষা

করে জপ করে—পুত্রের মৃত্যুশয্যার পাশে পিতা যে রকম করতে পারেন।

যথা নিজের মৃত্যুশয্যা:—যেমন, গ্রেস ফিরলেন ১৯০৬ সালে ড্রেসিংরুমে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে। ১৯৩০ সালে হবস এবং ১৯৪৮ সালে ব্রাডম্যানও বিদায় নিয়েছিলেন ক্রিকেট থেকে। ওভাল মাঠের ড্রেসিংরুমে ক্রিকেটের দুই নাইটের শেষ বর্ম পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই কালে, কেউ প্রশান্ত, কেউ বিষণ্ণ, কেউ করুণ—গম্ভীর। একজনের বড় বেদনাময় অবসান। আহত হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত গ্রেগরী। উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেললেন,—আমার শেষ! আমার শেষ!

ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অতি উজ্জ্বল কিরণ নিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন ডাঃ গ্রেস। জেণ্টলম্যান বনাম প্লেয়ার্সদের সেই খেলার মধ্যেই পড়ল ডাঃ গ্রেসের ৫৮তম জন্মদিন। নিজের যৌবনদিনের স্মৃতি জাগিয়ে যখন ডাঃ গ্রেস আউট হলেন, তখন রান করেছেন ৭৪। প্রবল করতালির মধ্যে ফিরে আসার পথে ডাঃ গ্রেস বললেন, এই শেষ, আর খেলছি না। তূর্যধ্বনির মধ্যে মহাবীরের নিষ্ক্রমণ।

১৯০৬ সালে ডাঃ গ্রেসের সেই শেষ খেলাও হয়েছিল ওভাল মাঠে। ওভাল বিদায় দিয়েছে ক্রিকেটের তিন শীর্ষপ্রধানকে—গ্রেস, হবস, ব্রাডম্যান।

১৯৩০ সালে হবস শেষ খেলায় করেছিলেন ৯ রান, ব্রাডম্যান করুণ আত্মপরিহাস করে বলেছেন, আমি করেছিলুম তার থেকে ৯ রান কম।

সংবাদপত্রে হবসের বিদায়-বর্ণনা সাহিত্যের স্তরে উঠেছে। বীরের প্রস্থান-পথের শেষ চক্রধূলিমাখা সেই ধূসর বর্ণনা:—

সমস্ত গতকালটি ছিল টেস্ট ক্রিকেটের নাটক।

যখন হবস উইকেটে পৌঁছলেন, তখন বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা তাঁকে অভূতপূর্ব সংবর্ধনায় ভূষিত করলেন, কারণ টেস্ট ক্রিকেটে এইটেই তাঁর শেষ ইনিংস।

তাঁরা সকলে তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন, অধিনায়কের নির্দেশে মাথার টুপি খুলে সমস্বরে 'জয়' দিলেন। জনতাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জয়রবে। অভিনন্দনের ঝড়ো বাতাসে দুলে উঠল চারিদিক। ক্বচিৎ কোনো ক্রিকেটার এমন অভ্যর্থনা পেয়েছেন, যদি সত্যই কখনো কেউ পেয়ে থাকেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট-জীবনের শেষ খেলা কিন্তু এইভাবে শেষ হবে তা অপ্রত্যাশিত ছিল। জনতা কিন্তু তাঁর প্যাভিলিয়ানে পৌঁছানো পর্যন্ত সর্বসময় মুখর হয়ে রইল জয়-ঘোষণায়।

প্যাভিলিয়ানে ফিরে গেলেন একজন বিষাদাচ্ছন্ন মানুষ।

ভাবাবেগ,—মনে হল ভাবাবেগই, তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

যেতে যেতে হাত থেকে গ্লাভস্ পড়ে গেল—স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মত সেটিকে কুড়িয়ে নেবার জন্য নীচু হলেন—সেই একই আবেশে।

ওভালের দর্শকেরা—যদিও তারা কিছু আশাহত হয়েছে—প্রীতিভরে তাদের পুরাতন বন্ধুকে বিদায় দিল।

ছোট উইকেট-গেটটি খুলে গেল, তার মধ্যে প্রবেশ করলেন হবস—প্রস্থান করলেন চিরতরে টেস্ট ম্যাচের দৃশ্যপট থেকে।"

যথা নীতি ও ধর্মসভা: চার্চ বা মন্দির:—ড্রেসিংরুম ধর্মসভার রূপ নেয় যখন কর্মকর্তারা ড্রেসিংরুমে ঢুকে উপদেশ বর্ষণ করতে থাকেন। বলটা এইভাবে খেলা উচিত ছিল এবং এইভাবে খেলা উচিত ছিল না। তোমার এই টেম্পারামেণ্ট থাকায় গেছ। এবং তুমি এই টেম্পারামেণ্ট না থাকায় গেছ। খেলোয়াড়রা দুঃখ করে বলেন, এই সব ধর্মোপদেশ প্রায়ই ধর্মনিরপেক্ষদের কাছে থেকে আসে—কর্মকর্তারা অনেকেই ব্যাটের ওজন বা বলের আকার জানেন না। এ ছাড়া উইকেটে ভ্রান্তবুদ্ধি খেলোয়াড় ড্রেসিংরুমে এসে স্বীকারোক্তি করে। কনফেশনস্‌-এ পূর্ণ ড্রেসিংরুম তখন চার্চের চরিত্র নেয়।

সত্যকার ড্রেসিংরুম:—ওখানে কিন্তু প্রবেশ নিষেধ। ওটা নিষিদ্ধ জগৎ। খেলোয়াড়েরা প্রায়ই যে অবস্থায় থাকেন, যদি নগ্নগাত্র মানুষ দেখতে আপনার সঙ্কোচ থাকে, উঁকি দেবেন না।

চতুর্থ বা শেষ হৃদয়টি সত্যই অসাধারণ। এইটেই কাব্যিক হৃদয়,—অনুমানে কল্পনায় পূর্ণ পত্রগর্ভ সৃষ্টিশালা। এর নাম প্রেস বক্স ও কমেন্‌টেটরস্‌ বক্স। এই জিনিসটা না

থাকলে 'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর' এ কথা ক্রিকেট কোনদিন বুঝতো না।

আমার বহুদিনের ইচ্ছা যদি দর্শকদের গ্যালারি থেকে এক লাফে উঠে পড়তে পারি প্রেস বক্সে। যদি সত্যই অত বড় একটা লাফ দিতে পারতুম, তা হলে অনেক অজ্ঞাত রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেত। ঐ বিরাট লাফ দেওয়ার মধ্যে যতখানি শারীরিক সামর্থ্য, তারও চেয়ে বেশী প্রয়োজন কল্পনাশক্তির। আমি যদি সেই শক্তিতে সমৃদ্ধ হতুম!

প্রেস বক্সকে আমার নমস্কার! কত সময় দর্শকদের গ্যালারিতে বসে ভুল করে ভেবেছি এটা খেলা। তদনুযায়ী কখনো রেগেছি, কখনো হেসেছি। কিন্তু ওটা যে বিবাহের চেয়ে বড়োর মত খেলার চেয়ে বড়ো কিছু ছিল, তা প্রেস বক্স ছাড়া কে জানাত? অত কাণ্ড চলেছে মাঠে—ঐ সাদা জামা প্যান্ট পরা ব্যক্তিগুলির পেটে পেটে এত! সবুজ মাঠের মধ্যে সাদাটে ফালি জমি—যার নাম পিচ—তার এমন জটিল চরিত্র, বিভক্ত ব্যক্তিত্ব, তাকে কি কোনোদিন ভেবেছি, ভাবতে পেরেছি? প্রেস বক্স আমাদের কিভাবে না ভাবিয়েছে!

একই বস্তুকে ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নভাবে দেখা তো ছোট কথা, এক ব্যক্তিই তাকে সময়ান্তরে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখতে পারেন। তার চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান। আপনাদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি:—

১। "ইয়ার্ডলে যেভাবে রানের দ্রুতগতি কমিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন, তাতে উভয়পক্ষের খেলা চাতুর্যের সংগ্রামে পরিণত হল। [illegible] এবং লেকারের লেগের দিকে নীচু বল বোলিং-এর সময় আত্মরক্ষামূলক ফিল্ডিং সাজিয়ে ইয়ার্ডলে ব্রাডম্যান ও হ্যাসেটকে শম্বুকগতি গ্রহণে বাধ্য করলেন।

খেলাটিকে যদি এইভাবে ইয়ার্ডলে গুটিয়ে না আনতেন, তা হলে তা মন্দ অধিনায়কত্বের অমার্জনীয় দৃষ্টান্তস্বরূপে বর্তমান থাকত।"

২। আত্মরক্ষামূলক ফিল্ডিং সাজানো আধুনিক টেস্ট ক্রিকেটের দুঃখজনক ব্যাধিবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার দর্শনীয়তাকে তা ধ্বংস করে এবং অন্যথা-আক্রমণী বোলারকে ক্রীড়ারাজনীতির ব্যক্তিত্বহীন যন্ত্রবিশেষে পরিণত করে তোলে।"

প্রথম মন্তব্য করা হয়েছে ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টে ইয়ার্ডলে কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি বিষয়ে, দ্বিতীয় মন্তব্য ঐ সিরিজেরই চতুর্থ টেস্টে ব্রাডম্যানের নীতি সম্বন্ধে।

একই লেখকের লেখা।

শীতলভাবে ব্রাডম্যান বলেছেন, লেখক

উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বেতার বক্তা

বোধ হয় মনে করেছিলেন, তাঁর বর্ণান্তর কারো চোখে পড়বে না।

মতের প্রগতিশীলতাকে বর্ণপরিবর্তন আখ্যা দিয়ে স্যার ডন অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রেস বক্সের চেহারা কেমন—নাকি অসহ্য! ধরা যাক ১৯৫৩ সালে ইংগ-অস্ট্রেলীয় টেস্ট ম্যাচের সময় ইংলণ্ডের প্রেস বক্স। একেবারে শ্বাসরোধী আবহাওয়া। দেড়শোর উপর সাংবাদিক কনুইয়ে কনুই ঠেকিয়ে গাদাগাদি করে বসে। সংবাদ স্কুপ, সংবাদ সাজানো, শিরোনামা, ঘটনার ব্যাখ্যা—ইত্যাদি চিন্তায় তাঁরা অস্থির। ডজন ডজন টাইপরাইটারের ঘটাঘট একঘেয়ে শব্দ। বহু বিখ্যাত খেলোয়াড়ের একত্র সমাবেশ—অনেকেই আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়।

১৯৫৩ সালে টেস্ট ব্রিজ টেস্টে প্রেস বক্সে ঐতিহাসিক' সমাবেশ—প্রেস বক্সে ক্রিকেটের দুজন নাইট আসন গ্রহণ করলেন, একজনের নাম স্যার জ্যাক হবস্, অপরজনের নাম স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান।

ক্রিকেটের চতুর্থ হৃদয় মূলত প্রেস বক্স—একটি অংশে জায়গা করে নিয়েছে রেডিও-কমেনটেটরস্ বক্স। প্রেস বক্সের সংবাদ-সারথিদের সম্বন্ধে বলেছি, বেতারবাণী-কুমারদের সম্বন্ধে আর কি বলব—তাঁরা এতই সরব যে, আমাদের নীরব ক'রে রাখেন খেলার পাঁচ ঘণ্টা। এ'দের সব কিছু 'হাতে গরম'। চোখে দূরবীন এবং কণ্ঠে উন্মাদনা লাগিয়ে রেখে এ'রা জাগিয়ে রাখেন পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের উৎসাহীদের। কার্টুনে দেখেছি—প্রৌঢ় ক্রিকেট-উৎসাহী টিকেট না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন, অগত্যা রেডিওর সামনে বসে। কপালের উপর তখনো কাগজের রৌদ্র-নিবারণ হুড, চোখে দূরবীন, পাশে ফ্লাস্ক, টিফিন ক্যারিয়ার এবং হাতে স্কোর কার্ড। উত্তেজিত হয়ে শুনছেন এবং শুনে উত্তেজিত হচ্ছেন। কখনো বা ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আছেন ঘরের মধ্যেই—গৃহিণীর বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন দুঃখিতভাবে—প্রিয়ে, বৃষ্টি! খেলা বন্ধ! রেডিওর ক্রিকেট বক্তারা কিভাবে অতিবড় নীরস খেলাকেও জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে রাখেন, তার চিত্রমূলক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সুবিখ্যাত পাঞ্চের ব্যঙ্গচিত্রকর। আমি চিত্র বাদ দিয়ে ক্যাপশনটুকু শুধু অনুবাদ করে দিচ্ছি:—

এখন অমুকচন্দ্র অমুক ফিরছেন—/বল করতে।/তিনি ঘুরছেন।/তিনি ছুটতে সুরু করেছেন—/ছুটছেন!/এই যে—/ছুটে—/উইকেটের দিকে—/আসছেন!/এখন ঠিক—/বল ছুঁড়তে—/যাচ্ছেন!!/তিনি—/বোলিং

"প্রিয়ে বৃষ্টি! খেলা বন্ধ!"

করতে — /উদ্যত!!!/তিনি বল — /দিলেন বলে'!/বল দি - য়ে—/দি—লে—ন!!!!!/ এবং—

কি যেন তাঁর নাম ভদ্রলোক শান্তভাবে আত্মরক্ষা ক'রে বলটি সামনে যথারীতি ঠেলে দিলেন। স্কোর এখনো দু' উইকেটে ২৫৬।
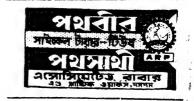
বেতার-বক্তারা কতখানি জনচিত্ত হরণ ক'রে আছেন, তা শেখবারের মত জানাতে পারি সাময়িক পত্রের একটি রসচিত্রের উল্লেখ ক'রে। রেডিও খুলে এক ব্যক্তি—ভারতীয়—বসে, রেডিওতে শোনা গেল, বাংলা দেশে বন্যায় দশ হাজার লোকের প্রাণহানি। শ্রোতা নির্বিকার। শোনা গেল দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষে দুই লক্ষ লোক পীড়িত। শ্রোতা ব্যাজার। শোনা গেল, জাপানে ভূমিকম্পে নিদারুণ ক্ষতি। শ্রোতা বিরক্ত। শোনা গেল আণবিক বোমায় সভ্যতার বিলয় আশঙ্কার শতাধিক বিশ্ব-মনীষীর সতর্কবাণী। শ্রোতা এইবার রীতি-মত ক্রুদ্ধ।

হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে শ্রোতৃবর মাথা চাপড়ে চেয়ার উল্টে মেঝেয় পড়ে গেলেন। একেবারে মূর্ছিত।

রেডিওতে এইমাত্র শোনা গিয়েছে, পর পর তিনবার গোল্লা করেছেন হাটন!

ক্রিকেটের এই চতুর্থ হৃদয়—হৃদয় গড়ে এবং ভাঙে নিরন্তর।

ক্রিকেট মাঠে দুই সিংহের লড়াই

মুকুলকুমার দত্ত

ক্রিকেট খেলার রাজা। আবার রাজারও খেলা। প্রজার খেলাও বটে! রাজা প্রজা এক সঙ্গে ক্রিকেট খেলে, শাসক ও শাসিত খেলে এক সঙ্গে। ক্রিকেট মাঠে জাতির ও আভিজাত্যের ভেদাভেদ নেই।

শীতের দিনে সবুজ ঘাসে সোনা ছড়ানো সোনালী মাঠে ক্রিকেট সবাইকে কাছে টানে। রাজা, প্রজা, বনেদী মধ্যবিত্ত, কাজের জোয়াল কাঁধে করা মানুষ—সবাইকে।

ক্রিকেট খেলার এক যাদু আছে। আছে অনুপম অপরূপ মাধুর্য। ক্রিকেট হচ্ছে সুন্দরের সাধনা। ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দেহভঙ্গিমার মধ্যে ফুটে ওঠে অন্তরের শিল্প-সৃষ্টি। এদের [illegible] মাঠের মধ্যে দেখা যায় বিজ্ঞানের নানা সূত্রের নিয়মের মূর্ত প্রকাশ। ক্রিকেট সুখী মানুষের নন্দন-ক্রীড়া। গভীর মনোসংযোগ। আবার খেলার ফাঁকে ফাঁকে ছন্দোময় আনন্দ-বিলাস। ক্রিকেটের প্রতিটি বল নতুন। প্রতি মুহূর্তে মহা-অনিশ্চয়তা। আবার ক্ষণে ক্ষণে খুশীর আমেজ।

ক্রিকেট ইংরেজের সৃষ্টি। ইংরেজ বিশ্বকে অনেক কিছু দিয়েছে। সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নাটক, গণতান্ত্রিক শাসন রীতি—অনেক—অনেক কিছু। বিশ্বকে ক্রিকেটও উপহার দিয়েছে ইংরেজ। ইংরেজ যেখানে গিয়েছে সেখানেই সাম্রাজ্যের খুঁটির সঙ্গে পুঁতেছে ক্রিকেটের স্ট্যাম্প। তাই আজ পাঁচ মহাদেশ জুড়ে ক্রিকেটের মহাপ্রতিষ্ঠান।

ইংরেজের কাছে ক্রিকেট শুধু ব্যাট বলের খেলা নয়। ইংরেজের কাছে ন্যায়, নীতি ও নিষ্ঠার নাম ক্রিকেট। কোন কিছু অন্যায়কে ইংরেজ ধিক্কার দেয় "ইট ইজ নট ক্রিকেট" বলে। ক্রিকেট ইংরেজ চরিত্রের অন্যতম জীবন-বেদ।

আমাদের খেলা শেখাও ইংরেজের কাছ থেকে। আমাদের মাটি থেকে ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদের জন্য যখন আমরা ত্রিশ কোটি কণ্ঠে দাবি তুলেছি, বিলেতী দ্রব্য বর্জন করেছি, ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করেছি তখনও কিন্তু ইংরেজী ক্রিকেটের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিনি।

আমরা বহুবার গিয়েছি ওদেশে ক্রিকেট খেলতে। সাগর পার থেকে, ওরাও এসেছে আমাদের আতিথ্য নিয়ে।

বিশ্ব ক্রিকেটের উচ্চ আদালতের ব্যবস্থাপনায় দেশের বাছা বাছা ক্রিকেট বীরদের নিয়ে যে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম তারই নাম ক্রিকেট টেস্ট। এ খেলার একদিকে যেমন শান্ত মহিমা, অপরদিকে তেমন বলিষ্ঠ জৈব সত্তার বলদৃপ্ত বিকাশ। যেন সিংহ লড়াই। শক্তির শান্ত ও উদ্ধত প্রকাশ লাবণ্য। সিংহ

ক্রিকেট মাঠের ফিল্ড প্লেসিং
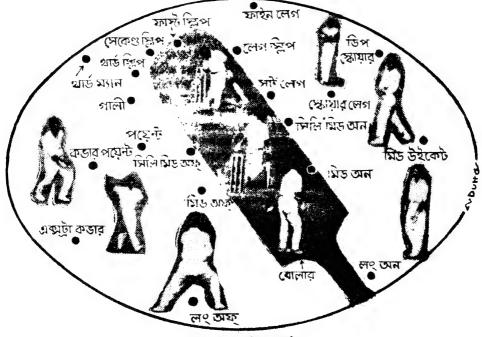
ভারত ও ইংলণ্ডের দুই অধিনায়ক নরীম্যান কণ্ট্রাক্টর ও এডওয়ার্ড র‍্যালফ ডেক্সটার

লড়াই-ই বটে। কারণ দুই দেশের ক্রিকেট প্রতীকেই তিনটি করে সিংহ মূর্তি। আজ ভারতীয় ক্রিকেটের পীঠভূমি, বিশ্বের দ্বিতীয় ক্রিকেট মাঠ 'ইডেন উদ্যানে' ভারত ও ইংলণ্ডের এই পর্যায়ের চতুর্থ টেস্ট খেলার পরিপ্রেক্ষিতে আগের ২৭টি লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অবান্তর নয়।

ভারতের মাটিতে ক্রিকেটের বীজ উপ্ত হবার পর ভারতের দুটি পার্শী দল প্রথম ইংলণ্ড সফর করে। ১৮৮৬ সালের ইংলণ্ড সফরকারী প্রথম পার্শী দলের অধিনায়ক ছিলেন ডাঃ ডি এইচ প্যাটেল। মোট ২৭টি খেলার মধ্যে পার্শী দল একটি খেলায় জয়-লাভ করে, ১৮টি খেলায় পরাজিত হয়, ৮টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

১৮৮৮ সালে পি ডি কাঙ্গার অধিনায়কত্বে যে দ্বিতীয় পার্শী টীম ইংলণ্ড সফর করতে যায় ৮টি খেলায় জয়ের গৌরব নিয়ে তারা দেশে ফিরে আসে। বাকি ২৩টি খেলার ১১টি খেলায় দ্বিতীয় পার্শী টীম পরাজিত হয় আর জয়পরাজয়ের প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকে ১২টি খেলার।

এবার ইংলণ্ডের পালা। ১৮৮৯-৯০ সালে জি এফ ভার্ননের দলের ভারত সফরই এদেশের মাটিতে সর্বপ্রথম বিদেশী টীমের আগমন। ভার্ননের টীম অপরাজয়ের গৌরব নিয়ে দেশে ফিরতে পারেনি। ১২টি খেলার মধ্যে ১০টি খেলায় বিজয়ী হলেও বোম্বেতে পার্শী দলের সঙ্গে দুটি খেলায় তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। ভারতের মাটিতে সেইটাই বিদেশী দলের প্রথম পরাজয়।

১৮৯২-৯৩ সালে লর্ড হকের অধিনায়কত্বে ইংলণ্ডের আর একটি দল আসে ভারত সফর করতে। বাঙলার পরবর্তী গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন ছিলেন লর্ড হকের টীমের অন্যতম খেলোয়াড়। ১৫টি খেলায় জয় এবং একটি খেলা ড্র করলেও লর্ড হকের দলকে বোম্বের পার্শী দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়।

১৯০২-০৩ সালে কে জে কী-র অধিনায়কত্বে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অথেনটিক্স দলও পার্শী দলের কাছে দুটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করে।

ভারতের সব প্রান্তের খেলোয়াড় নিয়ে গড়া সর্বভারতীয় দল প্রথম ইংলণ্ড সফর করে ১৯১১ সালে। অধিনায়ক পাতিয়ালার মহারাজা। বর্তমান মহারাজার পিতা। ২৩টি খেলার মধ্যে ১৫টি খেলায় পরাজিত হয়ে, ৫টি খেলা ড্র করে এবং ৬টি খেলায় জয়ের গৌরব নিয়ে দলটি ভারতে ফিরে আসে।

ভারতে এখন ক্রিকেটের পূর্ণ জোয়ার। ক্রিকেটের রাজপুত্র রণজির খেলার অপূর্ব ছলাকলায় মুগ্ধ ইংলণ্ডের মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে ভারতের ক্রিকেট-প্রতিভা। ভারতে তখনও ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হয়নি। তবু ১৯২৬ সালের ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের আসরে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আসনে বসেছেন দুই ইংরেজ, মারে রবার্টসন ও স্যার উইলিয়াম কার্রি। তারই ফলে ক্রিকেটে ভারত পেল কৌলীন্যের মর্যাদা। আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে সরকারীভাবে এম সি সি টীম ভারত সফরে এল ১৯২৪-২৫ সালে। পরম শক্তিশালী টীম। গিলিগান, ব্রাউন, স্যান্ডহাম, ওয়াটের মত ব্যাটস্‌ম্যান, এস্টিলের মত বোলার, টেট গিয়ারীর মত চৌকস খেলোয়াড়। ভারতেও তখন ক্রিকেটের জীবন প্রভাত। সি কে নাইডু, এল পি জয়, প্রফেসর দেওধর, রামজি, ওয়াজির আলী, নাজির আলী, এমনি আরও কত কীর্তিখ্যাত ক্রিকেটারের নাম। করাচী, কলকাতা, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, বোম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরে খেলা —অপরাজয়ের কৃতিত্ব নিয়ে গিলিগানের টীম দেশে ফিরে গেল।

১৯২৭ সালের নভেম্বরের ২২ তারিখ ভারতীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় দিন। এই দিন দিল্লির রোসেনারা ক্রিকেট ক্লাবে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সূচনা এবং তার ফলেই ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে টেস্ট খেলায় ভারতের অধিকার।

ইংলণ্ড সফর ১৯৩২

১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরে ভারত পায় মাত্র একটি টেস্ট খেলার অধিকার। ক্রিকেটের পীঠভূমি 'লর্ডস' মাঠের সে খেলায় ভারত পরাজয় স্বীকার করে। পোর বন্দরের মহারাজা দলের অধিনায়ক হলেও টেস্টে ভারতের নেতৃত্ব করেন সি কে নাইডু। প্রথম সরকারী সফরে যাঁরা ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তাঁদের নামঃ—

পোর বন্দরের মহারাজা (অধিনায়ক), সি কে নাইডু, কে এস ঘনশ্যামজী, ওয়াজির আলী, নাজির আলী, জে নাউমল, এন ডি মার্শাল, এস এইচ এম কোলা, অমর সিং, পি ই পালিয়া, লাল সিং, ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ, জে জি ন্যাভলে, যোগেন্দ্র সিং, বি ই কাপাদিয়া, গোলাম মহম্মদ, এস আর গোদাম্বে ও মহম্মদ নিসার।

মোট ৩৬টি খেলার মধ্যে ভারত জয়ী হয় ১৩টি খেলায়, ৯টিতে পরাজয় স্বীকার করে, অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় ১৪টি খেলা। টেস্টের ফলাফলঃ—

১৯৩২ সাল—লর্ডস মাঠ
(তারিখ ঃ ২৫, ২৭, ২৮ জুন)
অধিনায়ক ঃ জার্ডিন ও সি কে নাইডু

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—২৫৯ (ডি আর জার্ডিন ৭৯, এল এমস ৬৫, ওয়ালী হ্যামণ্ড ৩৫; মহম্মদ নিসার ৯৩ রানে ৫ উইঃ, সি কে নাইডু ৪০ রানে ২ উইঃ, অমর সিং ৭৫ রানে ২ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—(৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ২৭৫ (ডি আর জার্ডিন নট আউট ৮৫, ই পেণ্টার ৫৪, আর রবিনস ৩০, এফ ব্রাউন ২৯; ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ ৬০ রানে ৪ উইঃ)।

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—১৮৯ (সি, কে নাইডু ৪০, জে নাউমল ৩৩, ওয়াজির আলী ৩১; ভোস ২৩ রানে ৩ উইঃ, বাউয়েস ৪৯ রানে ৪ উইঃ, রবিনস ৩৯ রানে ৪ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—১৮৭ (অমর সিং ৫১, ওয়াজির আলী ৩৯, লাল সিং ২৯, জে নাউমল ২৫; হ্যামণ্ড ৯ রানে ৩ উইঃ, ভোস ২৮ রানে ২ উইঃ, বাউয়েস ৩০ রানে ২ উইকেট)।

[ইংলণ্ড ১৫৮ রানে বিজয়ী]

এম সি সি-র ভারত সফর

ইংলণ্ডে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার অধিনায়ক ছিলেন ডগলাস জার্ডিন। সেই জার্ডিনই ১৯৩৩-৩৪ সালে ইংলণ্ডের টীম নিয়ে সরকারীভাবে ভারত সফরে আসেন। দলে ছিলেন ঃ—

ডগলাস জার্ডিন (অধিনায়ক), বি এইচ ভ্যালেণ্টাইন (সহ-অধিনায়ক), সি এফ ওয়াল্টার্স, সি জে বার্নেট, এল এফ টাউনসেণ্ড, জে ল্যাংরিজ, এ এইচ বেকওয়েল, এ মিচেল, এইচ ভেরিটি, আর গ্রেগরী, এইচ ইলিয়ট, এম নিকলস, জে এইচ হিউম্যান, ডব্লিউ ভি এইচ লেভেট, ই ডব্লিউ ক্লার্ক ও সি এস ম্যারিয়ট।

ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম টেস্ট খেলায় ভারত ৪ দিনব্যাপী তিনটি খেলার অধিকার পায়। ইংলণ্ড দুটি টেস্টে জয়ী হয়, একটি খেলার ফলাফল থাকে অমীমাংসিত। বোম্বের প্রথম টেস্টে লালা অমরনাথের সেঞ্চুরী ও তার ব্যাটিংয়ের অপরূপ রূপ-লাবণ্য সে সফরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টেস্টের ফলাফল ঃ—

বোম্বাই মাঠ (প্রথম টেস্ট)
(তারিখ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ডিসেম্বর)
অধিনায়ক ঃ জার্ডিন ও সি কে নাইডু

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—২১৯ (অমরনাথ ৩৮, উজির আলী ৩৬, এস এইচ কোলা ৩১, সি কে নাইডু ২৮; ভেরিটি ৪৪ রানে ৩ উইঃ, ল্যাংরিজ ৪২ রানে ৩ উইঃ নিকলস ৫৩ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—২৫৮ (অমরনাথ ১১৮, সি কে নাইডু ৬৭, বিজয় মার্চেণ্ট ৩০; নিকলস ৫৫ রানে ৫ উইঃ, ক্লার্ক ৬৯ রানে ৩ উইঃ)।

জার্ডিন ও নাইডু—১৯৩২ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফর ও ১৯৩৩-৩৪ সালে ইংলণ্ডের ভারত সফরে দুই দেশের দুই টেস্ট অধিনায়ক

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—৪৩৮ (বি এইচ ভ্যালেণ্টাইন ১৩৬, সি এফ ওয়াল্টার্স ৭৮, ডি আর জার্ডিন ৬০, এইচ ইলিয়ট নট আউট ৩৭, সি জে বার্নেট ৩৩, জে ল্যাংরিজ ৩১; মহম্মদ নিসার ৯০ রানে ৫ উইঃ, জামসেদজি ১৩৭ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—১ উইকেটে ৪০।

[ইংলণ্ড ৯ উইকেটে বিজয়ী]

ইডেন গার্ডেন (দ্বিতীয় টেস্ট)
(তারিখ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮ জানুয়ারী)
অধিনায়ক ঃ জার্ডিন ও সি কে নাইডু

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—৪০৩ (জে ল্যাংরিজ ৭০, ডি আর জার্ডিন ৬১, ভেরিটি নট আউট ৫৫, এ মিচেল ৪৭, এল টাউনসেণ্ড ৪০, বি ভ্যালেণ্টাইন ৪০, সি ওয়াল্টার্স ২৯; সি কে নাইডু ৪০ রানে ৩ উইঃ অমর সিং ১০৬ রানে ৪ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—২ উইকেটে ৭ রান।

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—২৪৭ (দিলওয়ার হোসেন ৫৯, বিজয় মার্চেণ্ট ৫৪, ওয়াজির আলী ৩৯, সি এস নাইডু ৩৬; ভেরিটি ৬৪ রানে ৪ উইঃ, ক্লার্ক ৩১ রানে ৪ উইঃ নিকলস ৭৮ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—২৩৭ (দিলওয়ার হোসেন ৫৭, জে নাউমল ৪৩, সি কে নাইডু ৩৮; ভেরিটি ৭৬ রানে ৪ উইঃ, ক্লার্ক ৫০ রানে ৩ উইঃ, টাউনসেণ্ড ২২ রানে ২ উইঃ)।

[ভারত ফলো-অন করে, কিন্তু খেলার ফলাফল থাকে অমীমাংসিত]

মাদ্রাজ (তৃতীয় টেস্ট)
(তারিখ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩ ফেব্রুয়ারী)
অধিনায়ক ঃ জার্ডিন ও সি কে নাইডু

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩৩৫ (এ বেক-

এলেন ও ভিজি—১৯৩৬ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফরে দুই দেশের অধিনায়ক

ওয়েল ৮৫, সি ওয়াল্টার্স ৫৯, ডি আর জার্ডিন ৬৫, ভেরিটি ৪২, এ মিচেল ২৫, অমর সিং ৮৬ রানে ৭ উইঃ, অমরনাথ ৬৯ রানে ২ উইঃ)

দ্বিতীয় ইনিংস—৭ উইঃ ডিক্লেঃ ২৬১ (সি ওয়াল্টার্স ১০২, জে ল্যাংরিজ ৪৬, জার্ডিন নট আউট ৩৫, এ মিচেল ২৮, সি জে বার্নেট ২৬; নাজির আলী ৮৩ রানে ৪ উইঃ, অমরনাথ ৩২ রানে ২ উইঃ)

ভারত—প্রথম ইনিংস—১৪৫ (বিজয় মার্চেণ্ট ২৬, পাতিয়ালার যুবরাজ ২৪; ভেরিটি ৪৯ রানে ৭ উইঃ) **দ্বিতীয় ইনিংস**—২৪৯ (পাতিয়ালার যুবরাজ ৬০, অমর সিং ৪৮, দিলওয়ার হোসেন ৩৬.

হ্যামণ্ড ও পাতৌদি—১৯৪৬ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফরে দুই দেশের অধিনায়ক ওয়ালী হ্যামণ্ড ও পাতৌদির নবাব

বিজয় মার্চেণ্ট ২৮, অমরনাথ নট আউট ২৬; ল্যাংরিজ ৬৩ রানে ৫ উইঃ, ভেরিটি ১০৪ রানে ৪ উইঃ)

[ইংলণ্ড ২০২ রানে বিজয়ী]

১৯৩৬ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফর

ভারত সরকারীভাবে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড সফর করে ১৯৩৬ সালে। এবার অধিনায়ক বিজয়নগরের মহারাজকুমার, ক্রিকেট জগতে যিনি 'ভিজি' নামে পরিচিত। তিনদিন-ব্যাপী তিনটি টেস্ট খেলায় এবারও ভারতকে দুটি টেস্টে হার স্বীকার করতে হয়। ম্যাঞ্চেস্টারে দ্বিতীয় টেস্টের ফলাফল থাকে অমীমাংসিত। এই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান মার্চেণ্ট ও মুস্তাক আলীর প্রথম উইকেটের ২০৩ রান, দুজনের সেঞ্চুরী এবং তাদের খেলার সুললিত ছন্দ ইংরেজ ক্রিকেট লেখকদের সাহিত্যের খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। আবার দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে মন কষাকষি এবং অমরনাথের প্রত্যাবর্তন ভারতেও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৩৬ সালের ইংলণ্ড সফরকারী দলে ছিলেনঃ—

বিজয়নগরের মহারাজকুমার ('ভিজি'—অধিনায়ক), সি কে নাইডু, ওয়াজির আলী, মহম্মদ নিসার, পি ই পালিয়া, লালা অমরনাথ, সুটে ব্যানার্জি, আমীর ইলাহি, এম জে গোপালন, ডি ডি হিন্দেলকার, বাকা জিলানী, এল পি পাই, মামুদ হোসেন, কে পি মেহরমজী, বিজয় মার্চেণ্ট, এস মুস্তাক আলী, সি রামস্বামী, সি এস নাইডু, অমর সিং, ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ, দিলওয়ার হোসেন ও এস এম মোদি।

তিনটি টেস্টের ফলাফলঃ—

লর্ডস (প্রথম টেস্ট)

(তারিখ ঃ ২৭, ২৯ ও ৩০ জুন)

অধিনায়ক ঃ জি এলেন ও ভিজি

ভারত—প্রথম ইনিংস—১৪৭ (বিজয় মার্চেণ্ট ৩৫, হিন্দেলকার ২৬; এলেন ৩৫ রানে ৫ উইঃ, রবিনসন ৫০ রানে ৩ উইঃ, ভেরিটি ৪২ রানে ২ উইঃ)

দ্বিতীয় ইনিংস—৯৩ (হিন্দেলকার ১৭; ভেরিটি ১৭ রানে ৪ উইঃ, এলেন ৪৩ রানে ৫ উইঃ)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—১৩৪ (এম লেল্যাণ্ড ৬০; অমর সিং ৩৬ রানে ৬ উইঃ, নিশার ৩৬ রানে ৩ উইঃ) **দ্বিতীয় ইনিংস**—১ উইকেটে ১০৮ (এইচ গিম্বলেট নট আউট ৬৭, এম টার্নবুল নট আউট ৩৭)

[ইংলণ্ড ৯ উইকেটে বিজয়ী]

ম্যাঞ্চেস্টার (দ্বিতীয় টেস্ট)

(তারিখ ঃ ২৫, ২৭, ২৮ জুলাই)

অধিনায়ক ঃ জি এলেন ও ভিজি

ভারতঃ—প্রথম ইনিংস—২০৩ (ওয়াজির আলী ৪২, সি রামস্বামী ৪০, বিজয় মার্চেণ্ট ৩৩, অমর সিং ২৭; ভেরিটি ৪১ রানে ৪ উইঃ, রবিনস্ ৩৪ রানে ২ উইঃ, এলেন ৩৯ রানে ২ উইঃ)

দ্বিতীয় ইনিংস—৫ উইকেটে ৩৯০ (বিজয় মার্চেণ্ট ১১৪, মুস্তাক আলী ১১২, সি রামস্বামী ৬০, অমর সিং নট আউট ৪৮, সি কে নাইডু ৩৪; রবিনস্ ১০৩ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ডঃ—প্রথম ইনিংস—৮ উইকেট ডিক্লেঃ ৫৭১ (ওয়ালী হ্যামণ্ড ১৬৭, জো হার্ডস্টাফ ৯৪, টি এস ওয়ার্দিংটন ৮৭, রবিনস্ ৭৬, ভেরিটি ৬৬, এ ফ্যাগ ৩৯; সি কে নাইডু ৮৪ রানে ২ উইঃ)

(খেলা অমীমাংসিত)

ওভাল (তৃতীয় টেস্ট)

(তারিখ ঃ ১৫, ১৭, ১৮ আগস্ট)

অধিনায়ক ঃ জি এলেন ও ভিজি

ইংলণ্ডঃ—প্রথম ইনিংস—৮ উইকেট ডিক্লেঃ ৪৭১ (ওয়ালী হ্যামণ্ড ২১৭, টি ওয়ার্দিংটন ১২৮, সি জে বার্নেট ৪৩, এম লেল্যাণ্ড ২৬; নিসার ১২০ রানে ৫ উইঃ)

দ্বিতীয় ইনিংস—১ উইকেটে ৬৪ (বার্নেট নট আউট ৩২)

ভারতঃ—প্রথম ইনিংস—২২২ (বিজয় মার্চেণ্ট ৫২, মুস্তাক আলী ৫২, দিলওয়ার হোসেন ৩৫, সি রামস্বামী ২৯; সিমস ৭৩ রানে ৫ উইঃ, ভেরিটি ৩০ রানে ৩ উইঃ) **দ্বিতীয় ইনিংস**—৩১২ (সি কে নাইডু ৮১, দিলওয়ার হোসেন ৫৪, বিজয় মার্চেণ্ট ৪৮, অমর সিং ৪৪, সি রামস্বামী ৪১; এলেন ৮০ রানে ৭ উইঃ)

(ইংলণ্ড ৯ উইকেটে বিজয়ী)

১৯৪৬ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফর

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে রাজপুনা দল নামে একটি ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরের পর ১৯৪৬ সালে ভারত আবার ইংলণ্ড সফরে যায়। এবার অধিনায়ক হন পতৌদির নবাব। বর্তমান টেস্ট খেলোয়াড় তরুণ নবাব মনসুর আলী খাঁর বাবা, যিনি ইংলণ্ডের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছেন। ১৯৪৬ সালের দলে ছিলেনঃ—

পতৌদির নবাব (অধিনায়ক), বিজয় মার্চেণ্ট, বিজয় হাজারে, লালা অমরনাথ, বিনু মানকড়, রুসি মোদি, মুস্তাক আলী, সুটে ব্যানার্জি, সি এস নাইডু, গুল মহম্মদ, এস ডব্লিউ সোহনী, ডি ডি হিন্দেলকার, সি টি সারভাতে, আব্দুল হাফিজ কারদার, আর বি নিম্বলকার ও এস জি সিন্দে।

এবার তিনটি খেলার মধ্যে ভারতের একটিতে পরাজয়, দুটি ড্র, একটি বৃষ্টির ফলে।

হাওয়ার্ড-হাজারে-হাটন—১৯৫১-৫২ সালে ইংলণ্ডের ভারত সফরে এবং ১৯৫২ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফরে তিন অধিনায়ক নাইজেল হাওয়ার্ড, বিজয় হাজারে ও লেন হাটন

টেস্টের ফলাফল ঃ

লর্ডস (প্রথম টেস্ট)

(তারিখ ঃ ২২, ২৪, ২৫ জন)

অধিনায়ক ঃ হ্যামণ্ড ও পতৌদি

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—২০০ (রুসি মোদি নট আউট ৫৭, আব্দুল হাফিজ ৪৩, বিজয় হাজারে ৩১; বেডসার ৪১ রানে ৭ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—২৭৫ (ভি মানকড় ৬৩ অমরনাথ ৫০ হাজারে ৩৪, বিজয় মার্চেণ্ট ২৭; বেডসার ৯৬ রানে ৪ উইঃ, স্মেলস ৪৪ রানে ৩ উইঃ)।

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—৪২৮ (জো হার্ডস্টাফ ২০৫, পি এ গিব ৬০, হ্যামণ্ড ৩৩, বেডসার ৩০, ওয়াশব্রুক ২৭, স্মেলস ২৫; অমরনাথ ১১৮ রানে ৫ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—উইকেট না হারিয়ে ৪৮ (ওয়াশব্রুক নট আউট ২৪)।

(ইংলণ্ড ১০ উইকেটে বিজয়ী)

ম্যাঞ্চেস্টার (দ্বিতীয় টেস্ট)

(তারিখ ঃ ২০, ২২, ২৩ জুলাই)

অধিনায়ক ঃ হ্যামণ্ড ও পতৌদি

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—২৯৪ (হ্যামণ্ড ৬৯, হাটন ৬৭, ওয়াশব্রুক ৫২, কম্পটন ৫১; অমরনাথ ৯৬ রানে ৫ উইঃ, মানকড় ১০১ রানে ৫ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৫ উইকেটে ডিক্লেঃ ১৫৩ (কম্পটন ৭১, জে টি আইকিন নট আউট ২৯, ওয়াশব্রুক ২৬; অমরনাথ ৭১ রানে ৩ উইঃ, মানকড় ৪৫ রানে ২ উইঃ)।

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—১৭০ (বিজয় মার্চেণ্ট ৭৮, মুস্তাক আলী ৪৬; পোলার্ড ২৪ রানে ৫ উইঃ, বেডসার ৪১ রানে ৪ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৯ উইকেটে ১৫২ (হাজারে ৪৪, আব্দুল হাফিজ ৩৫, মোদি ৩০; বেডসার ৫২ রানে ৭ উইঃ)।

(খেলা অমীমাংসিত)

ওভাল (তৃতীয় টেস্ট)

(তারিখ ঃ ১৭, ১৯, ২০ আগস্ট)

অধিনায়ক ঃ হ্যামণ্ড ও পতৌদি

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস ৩৩১ (বিজয় মার্চেণ্ট ১২৮, মুস্তাক আলী ৫৯, মানকড় ৪২, সোহনী নট আউট ২৯, মোদি ২৭; এডরিচ ৬৮ রানে ৪ উইঃ)।

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—৩ উইকেটে ৯৫ (হাটন ২৫, কম্পটন নট আউট ২৪; মানকড় ২৮ রানে ২ উইঃ)।

(বৃষ্টির ফলে খেলা অমীমাংসিত)

১৯৫১-৫২ সালে এম সি সি-র ভারত সফর

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের টীম যায় অস্ট্রেলিয়া সফরে। পরের বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আসে ভারতে। দুটিই সরকারী সফর। কিন্তু টেস্টে ভারত তখনও জয়লাভে বঞ্চিত। ১৯৫১-৫২ সালে নাইজেল হাওয়ার্ডের ইংলণ্ড দলকে মাদ্রাজের মাঠে পরাজিত করে ভারত টেস্ট খেলায় প্রথম জয়লাভ করে। নাইজেল হাওয়ার্ডের টীমে এসেছিলেন ঃ—

নাইজেল হাওয়ার্ড (অধিনায়ক), ডোনাল্ড কার (সহ-অধিনায়ক), জে ডি রবার্টসন, টি ডব্লিউ গ্রেভনি, এফ এ লোসন, ডি জে কেনিয়ন, জে বি স্ট্যাথাম, আর টি স্পুনার, ডি ভি ব্রেনান, এম জে হিল্টন, রয় ট্যাটারসল, এইচ জি রোডস, এরিক লীডবিটার, এলান ওয়ার্টকিন্স, সি জে পুল, ডি স্যাকেলটন ও এফ রিজওয়ে।

ভারতের মাটিতে এবার পাঁচদিনব্যাপী পাঁচটি টেস্টের আয়োজন। প্রথম তিনটি টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থাকবার পর কানপুরের চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড বিজয়ী হয়। ভারত বিজয়ী হয় মাদ্রাজের শেষ টেস্ট খেলায়। নাইজেল হাওয়ার্ডের ইংলণ্ড দল তেমন শক্তিশালী ছিল না। ইংলণ্ডের ক্রিকেটে তখন যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের অনেকেই ভারত সফর করেন নি। টেস্ট খেলাগুলির ফলাফল ঃ—

দিল্লি প্রথম টেস্ট

(তারিখ ঃ ২, ৩, ৪, ৬, ৭ নভেম্বর)

অধিনায়ক ঃ হাওয়ার্ড ও হাজারে

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—২০৩ (রবার্টসন ৫০, ওয়ার্টকিন্স ৪০, কেনিয়ন ৩৫; সিন্ধে ৯১ রানে ৬ উইঃ, মানকড় ৫৩ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৬ উইকেটে ৩৬৮ (ওয়ার্টকিন্স নট আউট ১৩৮, ডি বি কার ৭৬, লোসন ৬৮; মানকড় ৫৮ রানে ৪ উইঃ)।

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ডিক্লেঃ ৪১৮ (বিজয় মার্চেণ্ট ১৫৪, হাজারে নট আউট ১৬৪, অধিকারী নট আউট ৩৮)।

(খেলা অমীমাংসিত)

বোম্বাই (দ্বিতীয় টেস্ট)

(তারিখ ঃ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯ ডিসেম্বর)

অধিনায়ক ঃ হাওয়ার্ড ও হাজারে

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—৯ উইঃ ডিক্লেঃ ৪৮৫ (হাজারে ১৫৫, পঙ্কজ রায় ১৪০, গোপীনাথ নট আউট ৫০, মন্ত্রী ৩৯, অমরনাথ ৩২, অধিকারী ২৫; স্ট্যাথাম ৯৬ রানে ৪ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—২০৮ (গোপীনাথ ৪২, মানকড় ৪১, উমরিগর ৩৮, সোহনী ২৮; ওয়ার্টকিন্স ২০ রানে ৩ উইঃ, রিজওয়ে ৩৩ রানে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—৪৫৬ (টম গ্রেভনি ১৭৫, ওয়ার্টকিন্স ৮০, স্পুনার ৪৩, রবার্টসন ৪৪, স্ট্যাথাম ২৭; অমরনাথ ৬১ রানে ৩ উইঃ, মানকড় ৯১ রানে ৪ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—২ উইকেটে ৫৫ (গ্রেভনি নট আউট ২৫)।

(খেলা অমীমাংসিত)

কলিকাতা (তৃতীয় টেস্ট)

(তারিখ : ৩০, ৩১ ডিসেম্বর, ১, ২ ৪ জানুয়ারী)

অধিনায়ক : হাওয়ার্ড ও হাজারে

ইংলণ্ড :—প্রথম ইনিংস—৩৪২ (স্পুনার ৭১, ওয়াটকিন্স ৬৮, সি জে পুলে ৫৫, লীডবিটার নট আউট ৩৮; মানকড় ৮৯ রানে ৪ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৫ উইঃ ডিক্লেঃ ২৫২ (স্পুনার ৯২, সি জে পুলে ৬৯)।

ভারত :—প্রথম ইনিংস—৩৪৪ (ডি জি ফাদকার ১১৫, মানকড় ৫৯, মঞ্জরেকার ৪৮, পংকজ রায় ৪২ : রিজওয়ে ৮৩ রানে ৪ উইঃ, টাটারসল ১০৪ রানে ৪ উইঃ)।

গাইকোয়াড় ও মে—১৯৫৯ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফরে দুই দেশের অধিনায়ক দত্তাজিরাও গাইকোয়াড় ও পিটার মে

দ্বিতীয় ইনিংস—উইকেট না হারিয়ে ১০৩ (মানকড় নট আউট ৭১, পংকজ রায় নট আউট ৩১)।

(খেলা অমীমাংসিত)

কানপুর (চতুর্থ টেস্ট)

(তারিখ : ১২, ১৩, ১৪ জানুয়ারী)

অধিনায়ক : হাওয়ার্ড ও হাজারে

ভারত :—প্রথম ইনিংস—১২১ (পংকজ রায় ৩৭ : টাটারসল ৪৮ রানে ৬ উইঃ, হিল্টন ৩২ রানে ৪ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস** ১৫৭ (অধিকারী ৬০, উমরিগর ৩৬; হিল্টন ৬১ রানে ৫ উইঃ, রবার্টসন ১৭ রানে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড :—প্রথম ইনিংস—২০৩ (ওয়াটকিন্স ৬৬, লোসন ২৬; গোলাম আমেদ ৭০ রানে ৫ উইঃ, মানকড় ৫৪ রানে ৪ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—২ উইকেটে ৭৬ (গ্রেভনি নট আউট ৪৮)।

(ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী)

মাদ্রাজ (পঞ্চম টেস্ট)

(তারিখ : ৬, ৭, ৮, ১০ ফেব্রুয়ারী)

অধিনায়ক : ডি বি কার ও হাজারে

ইংলণ্ড :—প্রথম ইনিংস—২৬৬ (রবার্টসন ৭৭, স্পুনার ৬৬, ডি বি কার ৪০, গ্রেভনি ৩৯; মানকড় ৫৫ রানে ৮ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—১৮৩ (রবার্টসন ৫৬, ওয়াটকিন্স ৪৮, গ্রেভনি ২৫; মানকড় ৫৩ রানে ৪ উইঃ, গোলাম আমেদ ৭৭ রানে ৪ উইঃ)।

ভারত :—প্রথম ইনিংস—৯ উইঃ ডিক্লেঃ ৪৫৭ (উমরিগর নট আউট ১৩০, পংকজ রায় ১১১, ফাদকার ৬১, অমরনাথ ৩১, গোপীনাথ ৩৫ :)

(ভারত এক ইনিংস ও ৮ রানে বিজয়ী)

১৯৫২ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফর

শীতের মরসুমে নিজেদের মাটিতে খেলে প্রায় ইংলণ্ড টীমের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে ইংলণ্ড সফরে যেতে হয়। ১৯৫২ সালের দলে স্থান পান :—

বিজয় হাজারে (অধিনায়ক), হেমু অধিকারী, এন চৌধুরী, আর ডিভেচা, ডি কে গাইকোয়াড়, গোলাম আমেদ, সি ডি গোপীনাথ, বিজয় মঞ্জরেকার, এম কে মন্ত্রী, ডি জি ফাদকার, জি এস রামচাঁদ, পংকজ রায়, সি টি সারভাতে, পি সেন, এস জি সিন্ধে ও পলি উমরিগর।

ইংলণ্ড থেকে যোগ দেন বিনু মানকড়।

১৯৫২ সালে ৪ দিন ব্যাপী খেলার চারটি টেস্টে ইংলণ্ড বিজয়ী হয় তিনটিতে। বৃষ্টির ফলে ওভাল মাঠের শেষ টেস্টের ফলাফল থাকে অমীমাংসিত।

এ সফরে লীডস মাঠের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে কোন রান হবার আগে ভারতের চারটি উইকেট পড়ে যাওয়া—যেমন উল্লেখ করবার মত ঘটনা তেমন লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিনু মানকড়ের প্রথম ইনিংসের ৭২ ও দ্বিতীয় ইনিংসের ১৮৪ রান চটকপূর্ণ ব্যাটিংয়ের উজ্জ্বল কাহিনী। টেস্ট খেলাগুলির ফলাফল :—

লীডস মাঠ (প্রথম টেস্ট)

(তারিখ ৫, ৬, ৭, ৯ জুন)

অধিনায়ক : হাটন ও হাজারে

ভারত—প্রথম ইনিংস—২৯৩ (মঞ্জরেকার—১৩৩, হাজারে—৮৯; লেকার—৩৯ রানে ৪ উইঃ, ট্রুম্যান ৮৯ রানে—৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—১৬৫ (ফাদকার—৬৪, হাজারে—৫৬; ট্রুম্যান ২৭ রানে ৪ উইঃ, জেংকিনস ৫০ রানে ৪ উইঃ)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩৩৪ (গ্রেভনি—৭১, ইভান্স—৬৬, ওয়াটকিন্স—৪৮, জেংকিনস—৩৮, সিম্পসন—২৩; গোলাম আমেদ ১০০ রানে ৫ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৩ উইকেটে ১২৮ (সিম্পসন—৫১, ডেনিস কম্পটন নট আউট ৩৫; গোলাম আমেদ ৩৭ রানে ২ উইঃ)।

[ইংলণ্ড ৭ উইকেটে বিজয়ী]

লর্ডস মাঠ (দ্বিতীয় টেস্ট)

(তারিখঃ ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪ জুন)

অধিনায়কঃ হাটন ও হাজারে

ভারত—প্রথম ইনিংস—২৩৫ (মানকড় ৭২, হাজারে ৬৯, পংকজ রায় ৩৫; ট্রুম্যান ৭২ রানে ৪ উইঃ, ওয়াটকিন্স ৩৭ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৩৭৮ (মানকড় ১৮৪, হাজারে নট আউট ৪৯, রামচাঁদ ৪২; ট্রুম্যান ১১০ রানে ৪ উইঃ, লেকার ১০২ রানে ৪ উইঃ)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৫৩৭ (হাটন ১৫০, ইভান্স ১০৪, পিটার মে ৭৪, গ্রেভনি ৭৩, সিম্পসন ৫৩; মানকড় ১৯৬ রানে ৫ উইঃ; **দ্বিতীয় ইনিংস**—২ উইকেটে ৭৯ (হাটন নট আউট ৩৯, পিটার মে ২৬)।

[ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী]

ম্যাঞ্চেস্টার (তৃতীয় টেস্ট)

(খেলার তারিখঃ ১৭, ১৮, ১৯ জুলাই)

অধিনায়ক : হাটন ও হাজারে

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৯ উইকেটে ডিক্লেঃ ৩৪৭ (হাটন ১০৪, ইভান্স ৭১, পিটার মে ৬৯, শেপার্ড ৩৪, আইকিন ২৯; গোলাম আমেদ ৪৩ রানে ৩ উইঃ, ডিভেচা ১০২ রানে ৩ উইঃ)।

ভারত—প্রথম ইনিংস—৫৮ (মঞ্জরেকার ২২; ট্রুম্যান ৩১ রানে ৮ উইকেট)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৮২ (অধিকারী—২৭; বেডসার ২৭ রানে ৫ উইঃ, লক ৩৬ রানে ৪ উইঃ)।

[ইংলণ্ড এক ইনিংস ২০৭ রানে বিজয়ী]

ওভাল (চতুর্থ টেস্ট)

(তারিখঃ ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ আগস্ট)

অধিনায়ক : হাটন ও হাজারে

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ডিক্লেঃ ৩২৬ (শেপার্ড ১১৯, হাটন ৮৬, আইকিন ৫৩)।

ভারত—প্রথম ইনিংস—১৮ (হাজারে ৩৮; ট্রুম্যান ৪৮ রানে ৫ উইঃ, বেডসার ৪১ রানে ৫ উইঃ)।

[বৃষ্টির জন্য খেলা অমীমাংসিত]

১৯৫৯ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফর

ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে ঐ বছরই ভারতীয় দল নিজেদের মাটিতে টেস্ট যুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সর্ব-প্রথম 'রাবার' লাভ করে। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এবং ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান থেকে ঘুরে এসে আবার 'রাবার' পায় নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশের টেস্ট খেলায় ১৯৫৫-৫৬ সালে। তারপর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ১৯৫৬ সালে তিনটি টেস্ট এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে পাঁচটি টেস্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯৫৯ সালে আবার যায় ইংলণ্ড সফরে। এবারকার দল গঠন করা হয় নিচের খেলোয়াড়দের নিয়েঃ—

ডি কে গাইকোয়াড় (অধিনায়ক), পলি উমরিগর, বিজয় মঞ্জরেকার, কৃপাল সিং, নরী কণ্ট্রাক্টর, পংকজ রায়, এ এল আপ্তে, চাঁদু বোরদে, জে এম ঘোরপাড়ে, আর জি নাদ-কার্নী, এম এল জয়সীমা, এন এস তামানে, পি জি যোশী, সুরেন্দ্রনাথ, ভি এম মুদিয়া আর বি দেশাই ও সুভাষ গুপ্তে।

ইংলণ্ড থেকে যোগ দেন আব্বাস আলী বেগ।

১৯৫৯ সালে ইংলণ্ডে ভারতের সর্বপ্রথম পাঁচটি টেস্ট খেলার মর্যাদা। কিন্তু ভারত পাঁচটি টেস্টেই হেরে তার ক্রিকেট সুনাম অনেকখানি ধুলোয় লুটিয়ে দেয়। খেলা-গুলির ফলাফলঃ—

নটিংহাম (প্রথম টেস্ট)

(তারিখঃ ৪, ৫, ৬, ৮ জুন)

অধিনায়কঃ মে ও গাইকোয়াড়

ইংলণ্ডঃ—প্রথম ইনিংস—৪২২ (পিটার মে ১০৬, ইভান্স ৭৩, হার্টন ৫৮, ব্যারিংটন ৫৬, স্ট্যাথাম নট আউট ২৯, ট্রুম্যান ২৮; সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৪ উইঃ নাদকার্নী ৪৮ রানে ২ উইঃ।

রানে ২ উইঃ।

ভারতঃ—প্রথম ইনিংস—২০৬ (পংকজ রায় ৫৪, গাইকোয়াড় ৩৩; ট্রুম্যান ৪৫ রানে ৪ উইঃ, মস ৩৩ রানে ২ উইঃ।। **দ্বিতীয় ইনিংস**—১৫৭ (পংকজ রায় ৪৯, মঞ্জরেকার ৪৪, গাইকোয়াড় ৩১; স্ট্যাথাম ৩১ রানে ৫ উইঃ) (ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫৯ রানে বিজয়ী)

লর্ডস (দ্বিতীয় টেস্ট)

(তারিখঃ ১৮, ১৯, ২০ জুন)

অধিনায়কঃ মে ও পংকজ রায়

ভারতঃ—প্রথম ইনিংস—১৬৮ (কণ্ট্রাক্টর ৮১, ঘোরপাড়ে ৪১; গ্রীনহাউ ৩৫ রানে ৫ উইঃ, হর্টন ২৪ রানে ২ উইঃ, স্ট্যাথাম ২৭ রানে ২ উইঃ)

দ্বিতীয় ইনিংস—১৬৫ (মঞ্জরেকর ৬১, কৃপাল সিং ৪১; স্ট্যাথাম ৪৫ রানে ৩ উইঃ, মস ৩০ রানে ২ উইঃ, গ্রীনহাউ ৩১ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ডঃ—প্রথম ইনিংস—২২৬ (ব্যারিংটন ৮০, স্ট্যাথাম ৩৮, কাউড্রে ৩৪, মস ২৬; দেশাই ৮৯ রানে ৫ উইঃ, সুরেন্দ্রনাথ ৪৬ রানে ৩ উইঃ)

দ্বিতীয় ইনিংস—২ উইকেটে ১০৮ (কাউড্রে নট আউট ৬৩, পিটার মে নট আউট ৩৩)

(ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী)

লীডস (তৃতীয় টেস্ট)

(তারিখ ঃ ২, ৩, ৪ জুলাই)

অধিনায়ক ঃ মে ও গাইকোয়াড়

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—১৬১ (উমরিগর ২৯, নাদকার্নী ২৭, গাইকোয়াড় ২৫; রোডস ৫০ রানে ৪ উইঃ, ট্রুম্যান ৩০ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—১৪৯ (বোরদে ৪১, উমরিগর ৩৯; ক্লোজ ৩৫ রানে ৪ উইঃ, মর্টিমোর ৩৬ রানে ৩ উইঃ, ট্রুম্যান ২৯ রানে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—(৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ৪৮৩ (কাউড্রে ১৬০, পার্কহাউস ৭৮, ব্যারিংটন ৮০, পুলার ৭৫, ক্লোজ ২৭; গুপ্তে ১১১ রানে ৪ উইঃ)

(ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ১৭৩ রানে বিজয়ী)

ম্যাঞ্চেস্টার (চতুর্থ টেস্ট)

(তারিখ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ জুলাই)

অধিনায়ক ঃ কাউড্রে ও গাইকোয়াড়

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—৪৯০ (পুলার ১৩১, মাইক স্মিথ ১০০, ব্যারিংটন ৮৭, কাউড্রে ৬৭, মর্টিমোর ২৯; সুরেন্দ্রনাথ ১১৫ রানে ৫ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—(৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ২৬৫ (পার্কহাউস ৪৯, ইলিংওয়ার্থ নট আউট ৪৭, ডেক্সটার ৪৫, ব্যারিংটন ৪৬; গুপ্তে ৭৬ রানে ৪ উইঃ)।

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—২০৮ (বোরদে ৭৫, নাদকার্নী ৩১, এ বেগ ২৬; ব্যারিংটন ৩৬ রানে ৩ উইঃ, ইলিংওয়ার্থ ১৬ রানে ২ উইঃ, রোডস ৭২ রানে ৩ উইঃ)

দ্বিতীয় ইনিংস—৩৭৬ (এ এ বেগ ১১২, উমরিগর ১১৮, কণ্ট্রাক্টর ৫৬, নাদকার্নী ২৮; ব্যারিংটন ৭৫ রানে ২ উইঃ)

(ইংলণ্ড ১৭১ রানে বিজয়ী)

ওভাল (পঞ্চম টেস্ট)

(তারিখ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৪ আগস্ট)

অধিনায়ক ঃ কাউড্রে ও গাইকোয়াড়

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—১৪০ (তামানে ৩২, সুরেন্দ্রনাথ ২৭; ট্রুম্যান ২৪ রানে ৪ উইঃ, স্ট্যাথাম ২৪ রানে ২ উইঃ, ডেক্সটার ২৪ রানে ২ উইঃ)

দ্বিতীয় ইনিংস—১৯৪ (নাদকার্নী ৭৬, কণ্ট্রাক্টর ২৫; ট্রুম্যান ৩০ রানে ৩ উইঃ, স্ট্যাথাম ৫০ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—৩৬১ (মাইক স্মিথ ৯৮, সুব্বারাও ৯৪, সোয়েটম্যান ৬৫, ইলিংওয়ার্থ ৫০; সুরেন্দ্রনাথ ৭৫ রানে ৫ উইঃ)

(ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২৭ রানে বিজয়ী)

এম সি সি-র এবারের ভারত সফর

ইতিমধ্যে ভারত নিজেদের দেশে আরও দুটি সিরিজ টেস্ট খেলেছে। ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে, ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে। এখন খেলছে ইংলণ্ডের সঙ্গে। ইংলণ্ড থেকে এবার খেলতে এসেছেন ঃ—

টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক), মাইক স্মিথ (সহ-অধিনায়ক), ডেভিড এলেন, বব্ বারবার, কেন ব্যারিংটন, এলান ব্রাউন, ব্যারী নাইট, টনি লক, জি মিলম্যান, জন মারে, পিটার পারফিট, জিওফ পুলার, পিটার রিচার্ডসন, এরিক রাসেল, ডেভিড স্মিথ ও ডেভিড হোয়াইট।

বোম্বে, কানপুর এবং দিল্লির তিনটি টেস্টই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ফলে ভারত ও ইংলণ্ডের এ পর্যন্ত ২৭টি টেস্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড জিতেছে ১৫টি খেলায়, ভারত মাত্র একটিতে, ১১টি খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ভারতের মাটিতে ছয় সিংহের দুটি লড়াই এখনো বাকি।

এবারকার তিনটি টেস্টের ফলাফল ঃ—

বোম্বাই (প্রথম টেস্ট)

(তারিখ ঃ ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ নভেম্বর)

অধিনায়ক ঃ কণ্ট্রাক্টর ও ডেক্সটার

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—(৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ৫০০ (ব্যারিংটন নট আউট ১৫১, ডেক্সটার ৮৫, পুলার ৮৩, রিচার্ডসন ৭১, মাইক স্মিথ ৩৬; রঞ্জনে ৭৬ রানে ৪ উইঃ, বোরদে ৯০ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—(৫ উইঃ ডিক্লেঃ) ১৮৪ (ব্যারিংটন নট আউট ৫২, রিচার্ডসন ৪৩, বারবার ৩১, ডেক্সটার ২৭; ডুরানী ২৮ রানে ২ উইঃ)।

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—৩৯০ (সেলিম ডুরানী ৭১, বোরদে ৬৯, মঞ্জরেকার ৬৮, জয়সীমা ৫৬, কৃপাল সিং ৩৮; লক ৭৪ রানে ৪ উইঃ, এলেন ৫৪ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৫ উইকেটে ১৮০ (মঞ্জরেকার ৮৪, জয়সীমা ৫১; রিচার্ডসন ১০ রানে ২ উইঃ)।

(খেলা অমীমাংসিত)

কানপুর (দ্বিতীয় টেস্ট)

(তারিখ ঃ ১, ২, ৩, ৫, ৬ ডিসেম্বর)

অধিনায়ক ঃ কণ্ট্রাক্টর ও ডেক্সটার

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—(৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ৪৬৭ (উমরিগর নট আউট ১৪৭, মঞ্জরেকার ৯৬, জয়সীমা ৭০, ডুরানী ৩৭, ইঞ্জিনীয়ার ৩৩, সারদেশাই ২৮; লক ৯৩ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—২৪৪ (বব্ বারবার নট আউট ৬৯, লক ৪৯, পুলার ৪৬; গুপ্তে ৯০ রানে ৫ উইঃ, বোরদে ৫৯ রানে ৩ উইঃ)। **দ্বিতীয় ইনিংস**—৫ উইকেটে ৪৯৭ (ব্যারিংটন ১৭২, ডেক্সটার নট আউট ১২৬, পুলার ১১৯, রিচার্ডসন ৪৮)

(খেলা অমীমাংসিত)

দিল্লি (তৃতীয় টেস্ট)

(তারিখ ঃ ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮ ডিসেম্বর)

অধিনায়ক ঃ কণ্ট্রাক্টর ও ডেক্সটার

ভারত ঃ—প্রথম ইনিংস—৪৬৬ (মঞ্জরেকার নট আউট ১৮৯, জয়সীমা ১২৭, বোরদে ৪৫, কণ্ট্রাক্টর ৩৯; এলেন ৮৭ রানে ৪ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ—প্রথম ইনিংস—(৩ উইকেট) ২৫৬ (কেন ব্যারিংটন নট আউট ১১৩, পুলার ৮৯, ডেক্সটার নট আউট ৪৫)

(খেলা অমীমাংসিত—শেষ দুই দিন বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ)

ভারত ও ইংলণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড় পরিচিতি

প্রদ্যোত দত্ত

ডিসেম্বরের তিরিশ তারিখ থেকে ঐতিহাসিক 'ইডেন উদ্যানে' ভারত ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলা আরম্ভ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দুই দেশের খেলোয়াড়দের পরিচিতি।

ইংলণ্ডের খেলোয়াড়

টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক)

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী এম সি সি দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার সাসেক্স কাউন্টির খেলোয়াড়। ইংলণ্ডের পক্ষে ইনি ভারতের তিনটি টেস্ট নিয়ে ২৬টি টেস্ট খেলেছেন এবং অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করেছেন।

ইংলণ্ডের চৌকস খেলোয়াড় ডেক্সটারের ব্যাটিংয়েও যেমন দক্ষতা বোলিংয়েও তেমন ভাল হাত। এর হাতের মার দর্শক চোখের আনন্দের খোরাক। বোলার হিসাবে ফাস্ট-মিডিয়াম। এ বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ডেক্সটারের ১৮০ রান ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত রানের সবচেয়ে বেশী রান। বোলিংয়েও কম খ্যাতি অর্জন করেননি। পাঁচটি টেস্টের ৯ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রহ করেছেন ৩৭৮ রান। বোলিং অ্যাভারেজে রয়েছেন শীর্ষস্থানে।

গল্‌ফ খেলায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু ডেক্সটার এক সময়ে গল্‌ফকেই জীবনের প্রধান স্পোর্টস হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন ক্রিকেটেই এঁর বেশী আগ্রহ। ১৯৬০ সালে ডেক্সটার সাসেক্স দলের অধিনায়ক হন এবং সেই মরসুমে সংগ্রহ করেন ২২৭১ রান। বয়স ২৬ বছর। টেড ডেক্সটার ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের বিখ্যাত খেলোয়াড় এবং বাঙলার প্রাক্তন অধিনায়ক টম লংফিল্ডের জামাতা।

ইংলণ্ডে ডেক্সটার 'লর্ড ডেক্সটার' নামে পরিচিত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি ও ভারতের বিরুদ্ধে এই পর্যন্তকার তিনটি টেস্টের মোট ৭ ইনিংসে ডেক্সটার রান করেছেন ২০ ও ৬৬ নট আউট, ৮৫ ও ২৭, ২ ও ১২৬ নট আউট (দ্বিতীয় টেস্ট কানপুরে) এবং ৪৫ নট আউট।

মাইক স্মিথ (সহ-অধিনায়ক)

ওয়ারউইকশায়ারের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান মাইক স্মিথ সফরকারী এম সি সি দলের সহ-অধিনায়ক। ইংলণ্ডের একজন জনপ্রিয় খেলোয়াড়। ইংলণ্ডের পক্ষে এ পর্যন্ত পাকিস্তানে একটি ও ভারতের তিনটি টেস্ট নিয়ে ১৫টি টেস্ট খেলেছেন।

১৯৫৪, ৫৫ ও ৫৬ পর পর তিন বছর মাইক স্মিথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু পান এবং প্রতিটি খেলায় সেঞ্চুরী করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ১৯৫৭ সালে স্মিথের উপর ওয়ারউইকশায়ার দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পড়ে। অন্তত ৮ বার ইনি মরসুমের হাজার রান পূর্ণ করেছেন। ফিল্ডিংয়েও যথেষ্ট সুনাম আর সুনাম আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাগবী খেলোয়াড় হিসাবে। মাইক স্মিথের বয়স ২৮ বছর।

টেড ডেক্সটার মাইক স্মিথ

ভারত ও পাকিস্তানের এই সফরে মাইক স্মিথের ব্যাটিংয়ে অবশ্য ব্যর্থতার পরিচয়। লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯৯ রানের মাথায় দুর্ভাগ্যক্রমে রান আউট হয়ে যান। সেই দুর্ভাগ্যই চলছে স্মিথের সাথে সাথে। ভারতে এসে বোম্বাইতে প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৬ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য রানে ফিরে যান। কানপুরে দুই ইনিংসেই শূন্য করায় পর পর তিন ইনিংসে তাঁর রানের কোঠা শূন্য। দিল্লিতে করেছেন মাত্র ২ রান।

কেন ব্যারিংটন

ইংলণ্ডের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানের মধ্যে ৩০ বছর বয়স্ক সেরা ব্যাটসম্যান কেন ব্যারিংটনের খুবই নামডাক। মহা-অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু খুব কম খেলাতেই ব্যারিংটন দর্শক-সমর্থকদের হতাশ করেন। খেলোয়াড় হিসাবে নাকি একটু 'ক্রুড' অর্থাৎ হাতের মারে চোখের তৃপ্তি কম। কিন্তু হাতে রান বাঁধা।

ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যারিংটন এ পর্যন্ত ২৫টি টেস্ট খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ বছর পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই ইনি দলভুক্ত হন এবং পাঁচটি টেস্টের ৯ ইনিংসে সংগ্রহ করেন ৩৬৯ রান। দুই দলের খেলোয়াড়দের ব্যাটিং অ্যাভারেজে ব্যারিং-টনের স্থান ছিল চতুর্থ। ইংলণ্ড খেলোয়াড়-দের মধ্যে দ্বিতীয়, সুব্বারাওয়ের পরে।

এই উপমহাদেশ ব্যারিংটনের কাছে অপরিচিত নয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে এম সি সি দলের সঙ্গে পাকিস্তান সফর করে গেছেন।

এবার ব্যারিংটন এক নতুন রেকর্ডের দ্বারে প্রায় উপস্থিত। কারণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লাহোরে ১০৯ নট আউট, ভারতের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে ১৫১ নট আউট, কানপুরে ১৭২, দিল্লিতে ১১৩ নট আউট রান করার ফলে উপর্যুপরি চারটি টেস্টে সেঞ্চুরীর অধিকারী হয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভার্টন উইকসের পর পর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরীর রেকর্ড আছে। ব্যারিংটনের কল্পনা পর পর ছয়টি টেস্টে সেঞ্চুরী করা। বাকি দুটি টেস্টে তিনি কি করেন দেখবার বিষয়।

আরও উল্লেখযোগ্য ব্যারিংটন শুধু ব্যাটিং অ্যাভারেজেই শীর্ষস্থানের অধি-কারী নন—পাকিস্তান ও ভারতে এই পর্যন্ত টেস্টের ৭ ইনিংসে ব্যারিংটন তিন-

বার নট আউট থাকেন আর রান আউট হন দু'বার, দুবারই সেঞ্চুরী করে। এ ছাড়া পুনায় ভারত সফরের উদ্বোধনী খেলাতেও সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে নট আউট থেকে ব্যারিংটনের ১৪৯ রান উল্লেখযোগ্য।

বড় রসিক লোক। মাঠের মধ্যে ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে দর্শকদের দিকে ব্যাট উঁচু করে বন্দুকের মত ধরে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেন।

জিওফ পুলার

মারের মনোহারিত্বে দর্শকমনোমুগ্ধকর ন্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান ল্যাঙ্কাশায়ারের জিওফ পুলার। বয়স এখন ২৬ বছর।

১৯৫৯ সালে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেই পুলারের প্রথম সুনাম। ভারতের বিরুদ্ধে ইনি তিনটি টেস্ট খেলেন এবং সে মরসুমে সর্বসুদ্ধ করেন ২৬৪৭ রান। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টের ১০

কেন ব্যারিংটন জিওফ পুলার

ইনিংসে এবার ২৮৭ রান সংগ্রহ করেছেন, এর মধ্যে সর্বোচ্চ রান ৬৩ অ্যাভারেজ ৩১·৮৮।

লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে পুলারের দুই ইনিংসে শূন্যে রান দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। কিন্তু দোষ বোধ হয় ওখান থেকেই খণ্ডে গেছে। ভারতে এসে টেস্টের ৪টি ইনিংসে করেছেন ৮৩, ৪৬, ১১৯ এবং ৮৯ রান। আমেদাবাদের পশ্চিমাঞ্চল দলের বিরুদ্ধেও পুলারের ১০৪ রান উল্লেখের দাবি রাখে।

পিটার রিচার্ডসন

কেন্টের ন্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান পিটার রিচার্ডসনের বর্তমান বয়স ৩০ বছর। ১৯৫৫-৫৬ সালে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফর করেছেন। ইংলন্ড টীমে এ'র ডাক পড়েছে মোট ২৫ বার। পাকিস্তান ও ভারতের এই পর্যন্তকার ৪টি টেস্ট নিয়ে মোট টেস্ট খেলেছেন ২৯টি। এ সফরে ৫টি টেস্টের ৮ ইনিংসে রিচার্ডসনের রানের সংখ্যা ৪ ও ৪৮, ৭১ ও ৪৩, ২২, ১৪ এবং ২।

জন মারে পিটার রিচার্ডসন

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত রিচার্ডসন ছিলেন উরস্টারশায়ারের খেলোয়াড়। অধিনায়কও। তারপর ক্রিকেটের পেশাদারবৃত্তি অবলম্বন করে কেন্ট কাউন্টিতে আছেন।

জন মারে

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট যুদ্ধে দুই দলের দুই নব আবিষ্কার হচ্ছে জন মারে ও বিল লরী।

মিডলসেক্সের ২৬ বছর বয়স্ক উইকেট কিপার মারে এখন ইংলন্ডের এক নম্বর উইকেট কিপার গডফ্রে ইভান্সের যোগ্য উত্তরাধিকারী। অবশ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে এখনো পূর্ণতা লাভ করেননি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টের ৮ ইনিংসে সংগ্রহ করেছেন ১৬০ রান। ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সাল জন মারের গৌরবের দুই বছর। দুই মরসুমেই ইনি হাজার রান করেছেন এবং ক্যাচ ধরে ও স্টাম্পিং করে আউট করেছেন এক শো জন খেলোয়াড়কে, ক্রিকেটের ভাষায় এটা উইকেট কিপিংয়ের ডাবলস।

কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান সফরে মারের ব্যাটিং খুবই নৈরাশ্যজনক। লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে তিনি করেছেন মাত্র ৪ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে হয়নি। বোম্বাইতে ভারতের বিরুদ্ধে ৮ ও ২, কানপুরে ২ ও ৯ নট আউট। দিল্লীতে ব্যাটিং করেননি। এ ছাড়া বোম্বাইতে ভারতের প্রথম ইনিংসে অতিরিক্ত ৪৫ রান মারের উইকেট কিপিংয়ের অপটুতার পরিচয়।

ডেভিড এলেন টনি লক

তাই ইংলন্ডের কাগজে কথা উঠেছে কলকাতার টেস্টে মারেকে বদলে মিলম্যানকে উইকেট কিপার কর।

ডেভিড এলেন

ইংলন্ডের উঠতি স্পিন বোলারদের মধ্যে ডেভিড এলেনের নাম সবচেয়ে বেশী। এ বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চারটি টেস্টেই এ'কে দলভুক্ত করা হয়। সবসুদ্ধ ইংলন্ডের পক্ষে খেলেছেন ১৫টি টেস্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্য এ'র প্রথম ডাক পড়ে। ১৯৫৯ সালে ওভাল মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্যও এলেন ইংলন্ড দলে মনোনীত হন। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় খেলতে পারেন না। এ বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার ব্যাটিং এবং বোলিং অ্যাভারেজে এলেনের স্থান তৃতীয়।

অফ্ স্পিনার হিসাবে খ্যাতি অর্জন ছাড়াও ডেভিড এলেন ব্যাটিংয়ে বেশ একটু নাম করেছেন। বিশেষ করে ওভাল মাঠে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়ার শেষ টেস্ট খেলায় এ'র ব্যাটিং বহুদিন ইংলন্ডবাসীর মনে থাকবে। এ খেলায় এলেন ৪২ রান করেও নট আউট থাকেন। শেষ টেস্টে ইংলন্ডের পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার মূলে ডেভিড এলেনের দান কম নয়।

লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে এলেনের ৪০ রান তাঁর ব্যাটিংয়ে ভাল হাতের পরিচয়। এ খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১ রানে ৩ উইকেট, বোম্বাইতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৫৪ রানে ৩ উইকেট এবং দিল্লীতে প্রথম ইনিংসে ৮৭ রানে ৩ উইকেট লাভ তাঁর উল্লেখযোগ্য বোলিং। ডেভিড এলেনের বর্তমান বয়স ২৫ বছর।

টনি লক

ক্রিকেটস্রষ্টা ইংলন্ডের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম পূজনীয় সারের ন্যাটা স্পিন বোলার টনি লক। সফরকারী দলের সবচেয়ে এবং সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান খেলোয়াড়। অভিজ্ঞতার পেছনে রয়েছে ৩৪টি টেস্ট।

১৯৫৯ ও ৬০ সালে লকের বোলিং-এ থ্রোইংয়ের 'অপবাদ' আসায় নতুন পদ্ধতিতে তিনি বোলিং আরম্ভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এবার তিনটি টেস্ট খেলেছেন।

কিন্তু এক সময় টনি ছিলেন ইংলন্ড টীমে অপরিহার্য এবং খেলা জেতার কার্যকারণ। লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় লককে দলভুক্ত করা হয়নি। ভারতে অবশ্য তিনটি টেস্টই খেলেছেন। এর মধ্যে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৭৪ রানে ৪ উইকেট এবং দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯৩ রানে ৩ উইকেট লাভ উল্লেখযোগ্য। এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য

দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের বিপর্যয়ের মুখে লকের বে-পরোয়া ব্যাটিংয়ের কথা। দশম খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে এসে তিনি ৪৯ রান করে 'ফলো-অনের' হাত থেকে ইংলণ্ডকে বাঁচাবার উপক্রম করেছিলেন; কিন্তু পারেননি। এই ৪৯ রানই লকের টেস্ট খেলার দীর্ঘ জীবনের বড় রান। ভারতে আসবার পর প্রথম টেস্ট খেলায় পাঁচটি উইকেট লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর খেলায় লকের তিন হাজার উইকেট পূরে গেছে।

ডেভিড স্মিথ

গ্লস্টারশায়ারের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ডেভিড স্মিথ ভারতে আসার আগে টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। তবে এম সি সি 'এ' টীমের সঙ্গে গতবার নিউজিল্যাণ্ড সফর করে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। চারবার মরসুমের শত উইকেট লাভ করেছেন ডেভিড স্মিথ। টেল-এণ্ডের ব্যাটসম্যান। শেষ দিকে নেমে পিটিয়ে রান তুলতে অভ্যস্ত। লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টে ডেভিড স্মিথ দ্বাদশ খেলোয়াড় ছিলেন।

ভারতে এসে তিনটি টেস্ট খেললেও ডেভিড স্মিথ কিন্তু একটিও রান করতে পারেননি। তার বোলিংয়েও চরম ব্যর্থতা। তিনটি টেস্টে মাত্র তিনটি উইকেট অথচ বোলিং করেছেন ১১২ ওভার।

জিওফ মিলম্যান

এম সি সি দলের দ্বিতীয় উইকেট কিপার জিওফ মিলম্যান নটিংহামশায়ারের খেলোয়াড়। ব্যাটসম্যান এবং নটিংহামের ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবেও সুনাম আছে। ১৯৫৯ সালে মিলম্যান সংগ্রহ করেছিলেন ১১১৮ রান। কিন্তু এবার বেশ কিছু দিন আগে সে সংখ্যা পার হয়ে গেছে।

এখনো টেস্ট খেলেননি। ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকরা জন মারের বদলে কলকাতার টেস্টে মিলম্যানকে দলভুক্ত করতে সুপারিশ করেছেন।

এরিক রাসেল

মিডলসেক্সের ওপেনিং ব্যাটসম্যান এরিক রাসেল ইংলণ্ডের উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় এবং সাবলীল ক্রিকেট খেলতে অভ্যস্ত। এ মরসুমে সবচেয়ে আগে সহস্র রান পূর্ণ করেছেন। গত মরসুমে করেছেন ২০৫১ রান। গত বছর এম সি সি 'এ' টীমের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ড সফর করেছেন। বয়স ২৫।

লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছেন। সে টেস্টে ইংলণ্ড জিতেছে ৫ উইকেটে। ভারতে তিনটি টেস্টের কোন

ডেভিড স্মিথ জিওফ মিলম্যান

টেস্টেই তাঁকে দলভুক্ত করা হয়নি। 'ভাগ্যবান' খেলোয়াড় হিসাবে তিনি কি দলে আসবেন? নাগপুরে সেণ্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে রাসেল একটি সেঞ্চুরীও করেছেন।

ব্যারী নাইট

চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে ব্যারী নাইটের খ্যাতি ১৯৫৯ সাল থেকে। অনেকের আশা ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্য এসেক্সের এই খেলোয়াড়ের ডাক পড়বে। পড়েছিলও বটে। প্রথম টেস্টে ছিলেন দ্বাদশ খেলোয়াড়। তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এঁর কথা আর বিবেচনা করা হয়নি। ১৯৫৯ সালে মাত্র ৫ রানের জন্য ব্যারী নাইট হাজার রান ও শত উইকেট লাভের (ডাবলস) কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দলের কনিষ্ঠতম খেলোয়াড়।

এই সফরে কানপুর ও দিল্লিতে দুটি টেস্ট খেলেছেন। মিডিয়াম ফাস্ট নাইটের বয়স ২৩ বছর।

ডেভিড হোয়াইট

সফরকারী দলের ২৫ বছর বয়স্ক ফাস্ট বোলার ডেভিড হোয়াইট হ্যাম্পশায়ার দলের খেলোয়াড়। ১৯৫৭ সালে হ্যাম্পশায়ার দলে যোগ দেন এবং গত বছর নিয়মিত খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পান। ইংলণ্ড সমর্থকদের ধারণা স্ট্যাথাম ট্রুম্যানের অভাবে ডেভিড হোয়াইট হবেন ইংলণ্ড দলের আক্রমণের প্রধান স্তম্ভ।

লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেছেন। প্রথম ইনিংসে ৬৫ রানের বিনিময়ে উইকেটও পেয়েছেন ৩টি। ভারতে এখনো টেস্ট খেলেননি। ডেভিড স্মিথের

এরিক রাসেল ব্যারী নাইট

বদলে কলকাতার টেস্টে তাঁর দলভুক্তির সম্ভাবনা আছে।

এলান ব্রাউন

স্বাস্থ্যের অধিকারী এলান ব্রাউন মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। কেণ্টের খেলোয়াড়। বয়স ২৬। এখনও প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় হিসাবে পরিগণিত হননি। লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫ রানে ৩টি উইকেট পেলেও ভারতে প্রথম টেস্টে কোন উইকেট পাননি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টেও দলভুক্ত হননি।

বব বারবার

ল্যাংকাশায়ার কাউণ্টির অধিনায়ক বব বারবার বাঁ হাতে ব্যাট করেন, ডান হাতে করেন লেগ ব্রেক বল। ইনি ১৯৬০ সালে

ডেভিড হোয়াইট এলান ব্রাউন

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলেছেন। গতবার নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণকারী এম সি সি 'এ' টীমের সদস্য ছিলেন।

চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে বারবারের সুনাম আছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে ৬টি উইকেট পেয়েছেন। কানপুরে ভারতের বিরুদ্ধে ফলো-অনের মুখে বারবারের নট আউট থেকে ৬৯ রান লাভ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

পিটার পারফিট

মিডলসেক্সের ন্যাটা ব্যাটসম্যান পিটার পারফিটের ইংলণ্ডে এখন উঠতি সুনাম। গত বছরই প্রথম কাউণ্টি দলে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এখনো বড় কিছু করেননি। ফুটবলেও পারফিটের সুনাম আছে। ফুটবল খেলেন নরউইচ সিটি ক্লাবে। বয়স ২৬।

ভারত ও পাকিস্তান সফরে পারফিট এখনো টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। নাগপুরে সেণ্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে নট আউট থেকে ১৬৬ রান লাভ তাঁর ব্যাটিং শক্তির পরিচয়। মাইক স্মিথের বদলে পারফিটকে চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড দলভুক্ত করার জন্য ইংলণ্ডের সাংবাদিকরা সুপারিশ করেছেন। কে জানে ঐতিহাসিক ইডেন

বব বারবার পিটার পারফিট

উত্থান পিটার পারফিটের জীবনের প্রথম ক্রীড়াঙ্গন হবে কি না!

ভারতের খেলোয়াড়

নরী কণ্ট্রাক্টর

১৯৫২ সালে রনজি ট্রফির খেলায় বরোদার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে ১৫২ ও ১০২ রানের দুটি সেঞ্চুরী করে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রথম সুনাম অর্জন করেন। তারপর সুনামের সোপান বেয়ে উচ্চে আরোহণ।

ভারতের তরুণ অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর। গত বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫টি টেস্টেই তিনি ভারতের অধিনায়কের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেও নরী কণ্ট্রাক্টর সব কটি টেস্টেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরিচালিত করবার জন্য অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

ন্যাটা কুশলী ব্যাটসম্যান কণ্ট্রাক্টর। ১৯৫৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর টেস্ট খেলায় প্রথম অংশ গ্রহণ। এর পর ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময়ে পূর্ণ প্রতিভায় ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ। ১৯৫৯ সালে ইংলণ্ড সফরে কণ্ট্রাক্টর করেছিলেন ১,১৮৩ রান, যার গড় হিসাব ছিল ৩১·১৩। ১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে তাঁর ১০৮ রান স্মরণীয় হয়ে আছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গত বছর চতুর্থ টেস্টে ৮১ এবং পঞ্চম টেস্টে ৯২ রান করে কণ্ট্রাক্টর নিজের ব্যাটিং সুনামকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

কিন্তু আজ কণ্ট্রাক্টরের সুনাম অনেকখানি ধুলোয় মলিন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারছেন না। হয়তো অধিনায়কের দায়িত্বে তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত। প্রথম টেস্টে করেছেন ১৯ ও ১ রান দ্বিতীয় টেস্টে ১৭, তৃতীয় টেস্টে ৩৯।

পলি উমরিগর

চেহারার মধ্যে এমন এক দৃঢ়তা আছে, আছে এমন এক শক্তি ও কুশলতার ছাপ, প্রথম দর্শনেই যা দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দেয় একজন জাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কথা। উমরিগরের দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, গৌর বর্ণ, সবাই প্রিয়দর্শন চেহারা।

ব্যাট, বল, ফিল্ডিং—ক্রিকেটের প্রধান তিনটি গুণাবলীর ধারক উমরিগর। ভারতীয় দলের অন্যতম পুরোধা হিসাবে উমরিগর বিবেচিত হয়ে আসছেন দীর্ঘ দিন ধরে। আজ পর্যন্ত ৫২টি সরকারী এবং ১৫টি বেসরকারী টেস্ট খেলেছেন তিনি। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৩টি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ২টি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫টি এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি দ্বিশতাধিক রানের হিসাব ধরলে উমরিগরের ক্রিকেট জীবন ১১টি সেঞ্চুরীতে সমৃদ্ধ। বর্তমানে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে উমরিগরই বয়োজ্যেষ্ঠ, ৩৫ বছর এখন তাঁর বয়স। কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে উমরিগরের তিন হাজার রান পূরে গেছে।

নরী কণ্ট্রাক্টর

বিজয় মঞ্জরেকার

ভারতীয় ক্রিকেটের তিন 'বিজয়'। বিজয় মার্চেণ্ট জ্যেষ্ঠ, বিজয় হাজারে মধ্যম, বিজয়
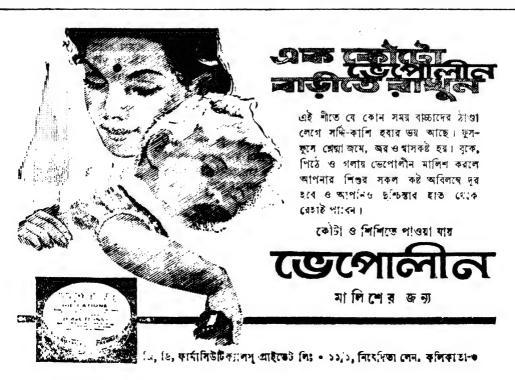
মঞ্জরেকার কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠই আজ ভারতের ব্যাটিং শক্তির শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। ক্রিকেট খেলায় যত রকমের মার আছে তার সবগুলিতেই হাত পাকিয়েছেন মঞ্জরেকার। যে কোন বোলিং এবং যে কোন অবস্থাতেই তিনি মাঠে নেমে মারের জোলুসে দর্শকমন জয় করে নিতে পারেন। মঞ্জরেকারকে আউট না করতে পারলে তাই বিপক্ষ দল শান্তি বা স্বস্তি পায় না।

১৯৫১-৫২ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে প্রথম ভারতীয় দলে স্থান হয় মঞ্জরেকারের। ১৯৫২ সালে ইংলণ্ড সফরে মঞ্জরেকার হাজার রানের সীমানা অতিক্রম করে আরও ৫৯ এগিয়ে যান। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে মঞ্জরেকারের ৬৮১ রানের গড় হিসাব ছিল ৫৬·৭৫ রান। ১৯৫৪-৫৫ সালে পাকিস্তান সফরের পর নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৫টি টেস্টের মধ্যে দুটি টেস্টে সেঞ্চুরী। ১৯৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৪টি টেস্ট খেলে আবার ঐ একই বছরে ইংলণ্ড সফরে মোট ৯টি খেলায় ৭৫৫ রান।

গত বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মঞ্জরেকারের টেস্ট খেলায় সর্বাপেক্ষা বেশী ৭৩ রান থাকলেও এবারে তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিটি টেস্টেই অপরিসীম দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছেন। প্রথম টেস্টে ৬৮ ও ৮৪, দ্বিতীয় টেস্টে ৯৬ এবং তৃতীয় টেস্টে মঞ্জরেকারের নট আউট ১৮৯ ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় রান। উপরের শত রান ছাড়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আগেও তাঁর একটি সেঞ্চুরী আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১টি এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২টি ধরলে টেস্ট খেলায় মঞ্জরেকার মোট ৫টি সেঞ্চুরীর অধিকারী। বর্তমানে ৩০এর কোঠায় পা দিয়েছেন মঞ্জরেকার। টেস্টে দু হাজার রান কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টেই পুরে গেছে।

এম এল জয়সীমা

বোম্বাইতে প্রথম টেস্টে ৫৬, কানপুরে আরও এক ধাপ এগিয়ে ৭০। তারপর দিল্লিতে তৃতীয় টেস্টে বহু আকাঙ্ক্ষিত শত রানের সীমা অতিক্রম করেছেন জয়সীমা। গৌরবজনক ১২৭ রান জয়সীমার টেস্ট খেলায় প্রথম শত রানের গৌরব এনে দিয়েছে জয়সীমাকে, যে গৌরব গতবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কানপুরে মাত্র ১ রানের জন্য হাতছাড়া হয়েছিল।

১৯৫৯ সালে ইংলণ্ড সফরে জয়সীমা ভারতীয় দলে স্থান পান। এই সফরে মোট ৮২৪ রান করেন তিনি—যার গড় হিসাব করলে দাঁড়ায় ২৩·৫৪। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলকাতায় পঞ্চম টেস্টে মোট ৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে ৭৪ রান করে ধৈর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন রাখেন। এই খেলায় ৫ দিনই কিছু না কিছু সময় তাঁর ব্যাট করার সুযোগ হয়। পরম ধৈর্যশীল ওপেনিং ব্যাটসম্যান।

পলি উমরিগর বিজয় মঞ্জরেকার

চাঁদু বোরদে

১৯৩৪ সালের ২১শে জুলাই জন্ম। দক্ষ অলরাউণ্ডার। ১৯৫৮-৫৯ সালে দিল্লিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্ট খেলায় ১০৯ ও ৯৬ রান করে প্রথম আলোড়ন তোলেন। ১৯৫৯ সালে ইংলণ্ড সফরে তাঁর রান ছিল ১,০৬০। এ ছাড়া বোলিংয়েও গড়ে ২৬·৫৮ রানে ৭২টি উইকেট দখল করে সকলের উপরে স্থান পান। গত বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে ১৭৭ নট আউট বোরদের টেস্ট খেলায় সর্বাধিক রান। সাধারণত লেগ স্পিন বল করেন। মাঝে মাঝে গুগ্‌লিও ছাড়েন। কভার ফিল্ডিংয়ে বোরদের যথেষ্ট সুনাম আছে।

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উইকেট-রক্ষক হিসাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৫৮-৫৯ সালে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার কৃতিত্বের প্রথম স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত উইকেটরক্ষক হিসাবে ইঞ্জিনীয়ারকে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬০ সালে ইণ্ডিয়ান স্টারলেট দলের নিয়মিত উইকেটরক্ষক হিসাবে তিনি পাকিস্তান সফর করেন।

এ বছর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্টে ইঞ্জিনীয়ার উইকেট রক্ষার গুরু দায়িত্ব প্রশংসনীয়ভাবে পালন করেছেন। উইকেট রক্ষা ছাড়া ব্যাটিংয়েও বেশ হাত আছে। মাত্র ২৩ বছর বয়স বোম্বাইয়ের উদীয়মান খেলোয়াড় ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের।

এম এল জয়সীমা চাঁদু বোরদে

সেলিম ডুরানী

ভারতীয় ক্রিকেটে বর্তমানে উঠতি অলরাউণ্ডার যে ক'জন আছেন তাঁদের পুরোভাগে ডুরানীর স্থান। ১৯৩৪ সালে ১১ই ডিসেম্বর ডুরানীর জন্ম। বল ব্যাট দুটোই করেন বাঁ হাতে। ১৯৫৯ সালে বোম্বাইতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ হয় তাঁর। বল, ব্যাট ছাড়া ফিল্ডিংএ যথেষ্ট সুনাম আছে ডুরানীর। প্রয়োজন হলে উইকেটরক্ষকের দায়িত্বও সেলিম ডুরানী গ্রহণ করতে পারেন।

এম সি সির বিরুদ্ধে ডুরানী এবারে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বপ্রথম

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার সেলিম ডুরানী

সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন রাজস্থানের হয়ে ১২৪ রান করে। তা ছাড়া প্রথম টেস্টে ডুরানীর ৭১ রান সংগ্রামী ও সাহসী ক্রিকেটের নিদর্শন হয়ে আছে। দ্বিতীয় টেস্টে করেছেন ৩৭ আর তৃতীয় টেস্টে ১৮, প্রথম ১৬ রান উপর্যুপরি ৪টি বাউণ্ডারী মেরে।

ডুরানীর বাবা আব্দুল আজিজ, যিনি এখন পাকিস্তানে আছেন, তিনিও উইকেট কিপার ছিলেন এবং জ্যাক রাইডারের অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে কলকাতার আন-অফিসিয়াল টেস্টে ভারতীয় দলের উইকেট রক্ষা করেছেন। ডুরানীর আসল নাম কিন্তু সেলিম। ছোটবেলায় বন্ধুবান্ধব তাঁকে 'ডুরানী' বলে ডাকত, তাই এখন সেলিম ডুরানী।

এ জি কৃপাল সিং

মাদ্রাজ ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক এ জি কৃপাল সিং-এর জন্ম ১৯৩৩ সালের পয়লা আগস্ট। অলরাউণ্ডার হিসাবে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৩-৫৪ সালে রনজি ট্রফিতে সেঞ্চুরী করে তিনি ক্রিকেট কর্মকর্তাদের নজরে আসেন। ঐ বছরেই এস

জি ও সি দলের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টে কৃপালকে দলে নেওয়া যায়। ১৯৫৪-৫৫ সালে মাদ্রাজের রনজি ট্রফি ঘরে তোলার জন্য কৃপালের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৯৫৫-৫৬ সালে হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১০০ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি টেস্টে খেলেছেন। মাদ্রাজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে আবার কৃপালকে দলভুক্ত করা হয়।

১৯৫৯ সালে ইংলণ্ড সফরে কৃপালের মোট রান ছিল ৮৭৯। এবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৩টি টেস্টেই খেলেছেন। তার মধ্যে প্রথম টেস্টেই ৩৮ নট আউট রানই সবচেয়ে বেশী। টেস্ট খেলোয়াড় মিলখা সিং-এর সহোদর কৃপাল।

আর বি দেশাই

দেখতে ক্ষুদে, কিন্তু কাজে অত ছোট নয়। ছোটোখাটো মানুষটির হাতে যে অত

কৃপালসিংহ   আর দেশাই

জোরে বল কোথা থেকে আসে আর কোন শক্তির প্রেরণায় ওভারের পর ওভার একইভাবে বল করে যান এ কথা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। শুধু কি তাই, দেশাই-এর অব্যর্থ আক্রমণে ঘায়েল হয়েছেন পৃথিবীর অনেক সেরা ব্যাটসম্যান। ১৯৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে দেশাই প্রথম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ঐ একই সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৫টি টেস্টেই তাঁর স্থান হয়। এর পর ১৯৫৯ সালে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে শেষ দুটি টেস্টে ৮ জন করে ব্যাটসম্যানকে আউট করেন তিনি। গতবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫টি টেস্টে ২১টি উইকেট পেয়েছেন দেশাই।

মিডিয়াম ফাস্ট বোলিং ছাড়া ব্যাটিংয়েও দেশাই [illegible] গত বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ব্যাটিংয়ে ৮৯ রান এবং নবম উইকেটে পি জি যোশীর সহযোগে ১৪৯ রান করে নবম উইকেট জুটির এক নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। ২২ বছর বয়স, সুতরাং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এখনো সামনে পড়ে আছে।

সুভাষ গুপ্তে

১৯৫৩ সালটি গুপ্তের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয়। দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত খেলতে গিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। তিন 'ডারিউ'-এর তখন দুর্দান্ত প্রতাপ। বিশ্ব ক্রিকেটের তিন ডারিউ উইকস, ওয়ালকট, ওরেল তখন নন্দিত ও বন্দিত। যে কোন দেশের যে কোন বোলিংকে ঐ তিনজন মেরে খানখান করে দেন। রানের থলি বোঝাই করে ফিরে আসেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে সুভাষ গুপ্তের বল 'ভেল্কি' দেখাতে লাগল। ওরেল, উইকস, ওয়ালকট সে আক্রমণে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। অনেক বোলার তাঁরা দেখেছেন, কিন্তু সুভাষ গুপ্তের মত এত সমীহ ওরেল, উইকস, ওয়ালকট আর কোন বোলারকে কখনো করেননি। এই সফরের পর বিশ্বের সেরা এগারজন খেলোয়াড় নিয়ে যে বিশ্ব একাদশ দল গঠনের কথা উঠল তাতেও গুপ্তের নাম বাদ পড়লো না। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 'লেগস্পিনার' হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পেলেন।

১৯৫৯ সালে ইংলণ্ড সফরে গুপ্তে প্রথম শ্রেণীর খেলায় পেয়েছিলেন ৯৫টি উইকেট, আর টেস্ট খেলায় ১৭ জন খেলোয়াড় আউট হয়েছিল তাঁর নিখুঁত লেংথের বলে। ঐ বছরই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত সফরের সময়ে কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে গুপ্তে ১০২ রানে ৯টি উইকেট দখল করে তাঁর বোলিং শক্তির পরিচয় দেন।

মোট ৩৬টি টেস্ট খেলেছেন গুপ্তে। এবারে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে গুপ্তে তাঁর সুন্দর ফ্লাইটের বলে প্রিয় কানপুরের মাঠে ইংলণ্ডের প্রথম ৫ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দেন মাত্র ৪৩ রানের বিনিময়ে। এখন পেশাদার খেলোয়াড় তিনি। অনেক রাজ্য ঘুরে আবার নিজের রাজ্য বোম্বাইতে ফিরে গিয়েছেন। বয়স ৩৩।

পতৌদির নবাব

১৯৪১ সাল। ইডেন গার্ডেনে ভাইসরয়ের যুদ্ধ ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে এক আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলার আয়োজন। দুই দলেই বহু খ্যাতকীর্তি ক্রিকেট খেলোয়াড়। এক দলের অধিনায়ক রূপেনির্বাচিত হয়েছেন পতৌদির নবাব, যিনি ইংলণ্ডের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছেন। কিন্তু খেলার প্রথম দিনে পতৌদির নবাবকে মাঠে দেখা গেল না। পাতিয়ালার মহারাজা তাঁর বদলে অধিনায়ক হিসাবে মাঠে নামলেন। উপস্থিত ক্রিকেট উৎসাহীদের মনে এক বিষাদের ছায়া নেমে এলো। দ্বিতীয় দিনে নবাব খেলায় যোগদান না করলেও এসে হাজির হলেন মাঠে। স্মিতহাস্যে সহখেলোয়াড়দের জানালেন তাঁর অনুপস্থিতির কারণ। দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হয়েছে তাঁর। এক ফুলের মত সুন্দর নবকুমার, পতৌদি বংশের ভাবী উত্তরাধিকারী ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেই নবকুমারই আজকের নবাব কুমার 'টাইগার' পতৌদি। তাঁর পুরো নাম মনসুর আলী খাঁ।

যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। বাবা শুধু ইংলণ্ডের হয়ে টেস্ট খেলেননি, ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন।

বাবার গুরু ফ্রাঙ্ক উলীর কাছে তাঁর ক্রিকেটের হাতেখড়ি। হ্যাম্পশায়ারে উইনচেস্টার স্কুলের ছাত্র অবস্থায় মাত্র ১৬ বছরে টাইগারের নাম ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ বছরেই সাসেক্স কাউন্টি দলে খেলেন পতৌদি।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট অধিনায়ক হিসাবে পর পর তিনটি সেঞ্চুরী ভাগ্যে জুটেছে। টাইগারের পিতা এ সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

সুভাষ গুপ্তে   পাতৌদির নবাব

আজ পিতার যোগ্য পুত্র হিসাবে নিজে তিনি সে সম্মান অর্জন করেছেন। ইংলণ্ডের এ বছরে ক্রিকেট মরসুমে অক্সফোর্ডের অধিনায়ক হিসাবে পরপর তিনটি সেঞ্চুরী করার পর সারা ইংলণ্ড 'টাইগারের' আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাঁর পিতার উপর্যুপরি ৪টি শত রানের রেকর্ড পুত্র ভাঙতে পারবে কি-না এই প্রশ্নই সকলের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে।

ক্রিকেটে টাইগারের প্রিয় মার হল ড্রাইভ, পুল ও সুইপ। ব্যাট ছাড়া কভারে তাঁর ফিল্ডিং অপূর্ব। কিছুদিন আগে এক দারুণ মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চোখে আঘাত পান। আবার তিনি ক্রিকেট মাঠে নেমেছেন।

এবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে সর্বপ্রথম পতৌদির তরুণ নবাবকে টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু কানপুরে খেলতে পারেননি অসুস্থতার জন্য। দিল্লীতে তৃতীয় টেস্টে করেছেন মাত্র ১৩ রান। পতৌদি ঘরোয়ানার উত্তরাধিকারী টাইগার চতুর্থ টেস্টে কি করেন তার জন্য সবাই আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে।

(সি ১৮৮০)

সাধনা চ্যবনপ্রাশ

বহু দূর দূরান্তর হইতে সংগৃহীত সর্বোৎকৃষ্ট ভেষজসমূহের সংমিশ্রণে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আয়ুর্বেদজ্ঞের প্রত্যাক্ষ তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রানুমোদিত প্রণালীতে অতি সতর্কতা ও যত্ন সহকারে প্রস্তুত হয়। এই সব কারণে সাধনা চাবনপ্রাশের তুলনা নাই।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন)
এম, সি, এস (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ঃ
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস
(কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১০১)

শুধু দিল্লির কনট্ প্লেসেই নয়, শুধু কলকাতার প্যালেস্ কোর্টেই নয়, সমস্ত ইণ্ডিয়াতেই তখন আর এক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। একদিন বাঙলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে কটন্ মিলের পত্তন হয়েছিল, বিলিতী কাপড় পোড়ানোর আন্দোলন শুরু হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুজরাটীরা তারই সুযোগ নিয়ে এখন কাপড়ের দুর্ভিক্ষ শুরু করে দিলে। প্রথমে ছিল চাল। তারপর হলো কাপড়, বাপ-মাকে পেটের ছেলেরা অবিশ্বাস করতে, শ্রদ্ধা করতে ভুলে গিয়েছিল, স্বামীরা স্ত্রী-দের ভালবাসতে কার্পণ্য করেছিল, শ্বশুরেরা বউদের অত্যাচার করতে আরম্ভ করেছিল, বউরা শাশুড়ীদের নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাইছিল। সমাজে-সংসারে যেমন ভাঙন ধরেছিল তেমনি বাইরের জগতেও। বাড়ির ছেলেরা বাড়ি ছেড়ে আলাদা-আলাদা হয়ে গেল। মা-বাবা স্বামী-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সব ছড়িয়ে ছত্রখান হয়ে গেল চারদিকে, আসল কারণ টাকা। আগে যে-টাকায় সংসার চলতো সে-টাকায় আর সংসার চলতো না। আগে যে-ত্যাগ করতে তৈরি ছিল সবাই, সে-ত্যাগ আর করতে চাইল না কেউ। আমি সংসারে মাসে দু'শো টাকা দিই, সুতরাং আমার ছেলে লুচি খাবে। তুমি দাও পঞ্চাশ টাকা, তোমার ছেলে খাক মাড়। এই চণ্ডীদাস, এই চৈতন্যদেব, এই রামমোহন, এই পরমহংস-দেবের দেশের লোকই হঠাৎ ১৯৪৩ সালে এসে হঠাৎ বলতে শুরু করলো—টাকাই ধর্ম, টাকাই মোক্ষ, টাকাই স্বর্গ। সেদিনকার কলকাতার মানুষ সব জিনিসের দাম বুঝতো, কিন্তু কোনও জিনিসেরই মূল্য দিতে চাইল না আর। একলা দীপঙ্কর শুধু দেখতো। আর মনে মনে কষ্ট পেত। আর একজন বুঝেছিলেন। আগা খাঁর প্যালেসের জেলখানার এক কোণে তখন আর একজন একুশ দিনের উপবাস করছেন। সমস্ত দেশের পাপের জন্যে, সমস্ত দেশের অন্যায়ের জন্যে আমি দায়ী। আমি উপবাস করে পরিশুদ্ধ হবো। সমস্ত ইণ্ডিয়া আমার পরিশুদ্ধিতে পরিত্রাণ পাবে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালেই তখন দেখা যেত মানুষের জটলা। মহাত্মা গান্ধী উপবাস করছেন। উপবাস করছেন নিজের জন্যে, ইণ্ডিয়ার জন্যে, ওয়ার্ল্ডের জন্যে। মানুষ পরিশুদ্ধ হোক। মানুষ শুদ্ধাত্মা হোক। মানুষ মানুষ হোক।

দীপঙ্করও অফিস ফেরার পথে অনেক-দিন দাঁড়িয়ে শুনতো। কী খবর? শেষ খবর কী? তিনি বেঁচে আছেন? এক দিন, দু' দিন, তিন দিন। ইণ্ডিয়ার মানুষ দিনের পর দিন আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে খবরের জন্যে। কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাক্তার বিধান রায় গিয়েছেন গান্ধীজীর পাশে। আরো ছ'জন ডাক্তার পরীক্ষা করছেন তাঁকে। না, কোনও ভয় নেই। একুশ দিনের দিন বড় অশান্তিতে কাটলো দীপঙ্করের। মানুষ কি পরিশুদ্ধ হবে সত্যি সত্যি? মহাত্মা গান্ধীর আশা পূর্ণ হবে? দীপঙ্কর যা চায় তা-ই কি হবে শেষ পর্যন্ত?

ডাক্তার বিধান রায় ফিরে এলেন। এসে এক সভায় বক্তৃতা দিলেন। কোনও ভয় নেই। সমস্ত নির্বিঘ্ন। যেদিন উপবাস ভাঙলেন মহাত্মাজী, শেষ মুহূর্তে যখন সমস্ত বিপদ কেটে গেল, মহাত্মাজী চাইলেন তাঁর টাকঘড়ির দিকে। ডাক্তার রায় শুনলেন—মহাত্মাজীর প্রথম কথা—

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। জিজ্ঞেস করলে—কী প্রথম কথা?

মহাত্মাজী বললেন—আমি বুঝতে পারছি না ঈশ্বর কেন এ-যাত্রা আমাকে রক্ষা করলেন। হয়ত আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তিনি আমাকে দিয়ে তাঁরই কোনও ইচ্ছে পূর্ণ করতে চান্—আরো কোনও কাজ করাতে চান আমাকে দিয়ে—

যারা শুনছিল ডাক্তার রায়ের বক্তৃতা, তাদের চোখ এইবার সজল হয়ে উঠলো।

বিকেল থেকেই সেদিন লক্ষ্মীদি একটু যেন শান্ত হয়ে এসেছিল। সতী নিয়ম করে ওষুধ খাইয়েছে। শুধু আজ নয়, যেদিন প্রথম লক্ষ্মীদি এসেছিল, সেইদিন থেকেই সতী লক্ষ্মীদিকে নিয়ে পড়েছিল। কখন লক্ষ্মীদি ওষুধ খাবে, কখন স্নান করবে তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হতো সতীকে। দুই বোন যেন অনেক ঘাটের ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে আবার একই বন্দরে এসে জুটেছে। সতী বোঝাতো—তুমি কেন অত কাঁদছো লক্ষ্মীদি? কার জন্যে কাঁদো এত? সংসারে কে কার? আমার কথাই ভেবে দেখ না! আমার কথা ভেবেও তো তুমি একটু সান্ত্বনা পেতে পারো! স্বামী কেউ নয়, ছেলেও কেউ নয়, সবাই নিজের-নিজের স্বার্থ চায়, কেউ কারো মুখের দিকে চায় না, এ সংসারের এইটেই নিয়ম বলে মনে করে নাও না তুমি!

লক্ষ্মীদি বলতো—ওরে, তা আমি কেমন করে মনে করবো? তুই তো জানিস না আমার সে-সব কী দিন গেছে! একখানা কাপড়ে সাবান দিয়ে কেচে বাইরে বেরিয়েছি, এক-হাতে বাঁ চোখের জল মুছে, ডান চোখ দিয়ে হেসেছি। সে কার জন্যে করেছি, বল্?

সতী বলতো—সে-সব করেছ, ভুল করেছ তুমি! সংসারে কেউ কারো নয়, স্বামী-পুত্র-শ্বশুর-শাশুড়ী-বাবা-মা সবাই স্বার্থপর, স্বার্থ ছাড়া আজকাল কিছুই চলে না, স্বার্থ ছাড়া জগৎ-সংসার সব কিছু অচল হয়ে যায় লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বলতো—কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না ভাই! আমার ছেলে যে সে-রকম ছেলে নয়। আমার ছেলে যে মা বলতে অজ্ঞান ছিল—

—সে তোমার মনের ভুল লক্ষ্মীদি! সে-সব মনের ভুল মনে ক'রো। সেই সব ভেবে ভেবে কি তুমি মরে যাবে বলতে চাও?

লক্ষ্মীদি বলতো—হ্যাঁ ভাই, আমি মরবো। মরাই আমার ভালো—আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী? এ-জীবন নিয়ে আমার কী লাভটা হবে?

তারপর সতী অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লক্ষ্মীদিকে শান্ত করতো। ওষুধ খাওয়াতো। ডাক্তার বলেছিল ঘুমোতে-ঘুমোতেই আস্তে আস্তে উনি সব ভুলে যাবেন। যত ঘুমোতে দেবেন ততই ভালো। এ-রোগীর ঘুমই একমাত্র ওষুধ! ওষুধ খেলেই একটু পরে ঘুমিয়ে পড়তো লক্ষ্মীদি। তখন সতীর একটু বিশ্রাম। তখন কিছুক্ষণের জন্যে সতী তার নিজের কথা ভাববার সময় পেত। তখন দীপংকর অফিস থেকে আসতো। দীপংকর বদলি হয়ে যাবে শিলিগুড়িতে, তার কথা বলতো। তার শাশুড়ী টাকা পেয়ে গেছেন, সেই সব কথা বলতো। আর কোনও ভাবনা নেই তাদের। টাকার জন্যেই তো সতীকে এত খোশামোদ। টাকার জন্যেই একদিন শাশুড়ীর এত আদর। সেই টাকাই যখন যোগাড় হয়ে গেছে তখন আর সতীকে তাঁদের দরকার নেই। সতী কেমন আছে তা দেখবারও প্রয়োজন নেই।

দীপংকর বলতো—তোমাকে শ্বশুর-বাড়িতে তুলে দিয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম তা আর হলো না—

সতী বলতো—তাঁরা টাকা পেয়ে গেছেন যখন, তখন আর কেন আমাকে নেবেন? কিসের দায় পড়েছে তাঁদের?

দীপংকর বলতো—দায় তাঁদের নয়, দায় আমার—

—তোমার দায়? কেন?

দীপংকর অন্য দিকে চোখ রেখে বলতো—কী জানি, কেন? কিন্তু মনে হয়, তোমার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে হয়ত আমিই দায়ী, আমার জন্যেই তোমার এই দুর্ভোগ হলো—

—কেন? তুমি কেন দায়ী হতে যাবে? আমারই কপালের দোষ!

দীপংকর বলতো—না, সেই বহুদিন আগে, একদিন আমার জন্মদিন যে কেন মরতে করতে গিয়েছিলে তুমি! সেদিন তুমি তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন না-করলে আজ এই দুর্দশা হতো না তোমার—

—দুর্দশা! সতী হেসে উঠতো। বলতো—একে তুমি দুর্দশা বলো? আমার মত সুখী কে? আমার মত স্বাধীন কে? আমার মত ক'জন মেয়ে এত টাকার মালিক? আমি কার পরোয়া করি আজ? জানো, এখন থেকে কারোর কাছে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। আমি যখন ইচ্ছে ঘুমোতে যাবো, যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠবো, কেউ বলবার নেই! আমি এখন যা খুশি ভাববো, যা খুশি করবো, কারোর মুখ চেয়ে আমাকে চলতে হবে না। কারোর মন যুগিয়ে আমায় শাড়ি-গয়না পরতে হবে না। একে যদি সুখ না বলি তো সুখ বলবো কাকে?

ইদানীং সতী এই ধরনের কথাই বলতো কেবল। বলতো—তুমি শিলিগুড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, আমার কোনও বিপদ হবে না এখানে। আমি এখানে খুব আরামে থাকবো। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না—

যেদিন থেকে সতী খবর পেয়েছে দীপঙ্কর বদলি হয়ে যাচ্ছে সেইদিন থেকেই সতী এই ধরনের কথা বলছে। বলছে—ভালোই তো হলো দীপু, ভাবছো কেন অত? দূরে গেলে তবু তোমার চাকরিতে মন দিতে পারবে। দূরে গেলে তবু আমার কথা ভুলতে পারবে! আমার কথা ভুলে যাওয়াই তো তোমার পক্ষে ভালো। আমি তোমার কে বলো না? আমি তো আসলে তোমার কেউই নই। মাঝখান থেকে আমার কথা ভেবে-ভেবে তুমি কেন নিজের জীবনটা নষ্ট করবে? এ তো ভালোই হলো এক-রকম। তোমার পক্ষেও ভালো হলো, আমার পক্ষেও ভালো হলো—না কি বলো?

দীপঙ্কর এর কিছু উত্তর দিতে পারতো না।

সতী বলতো—তুমি বিয়ে করবে, সংসার করবে, তোমার সংসারকেই না-হয় আমি আমার নিজের সংসার বলে মনে করবো, তাতে দোষ কী বলো? তোমার ছেলেকেই না-হয় আদর করবো, তোমার ছেলেকেই না-হয় আদর করে আমার নিজের ছেলে ভাববো! তাতে তোমার আপত্তি কিসের? আর তোমার ছেলে আর আমার ছেলে কি আলাদা? না-হয় ভাববো আমারই মরা ছেলে আবার তোমার ছেলে হয়ে জন্মেছে—! ভাবতে কিছু দোষ আছে, তুমিই বলো না? দোষ আছে?

এ-সব পাগলামির কোনও উত্তর দিত না দীপঙ্কর।

সতী বলে যেত—কিন্তু তুমি যদি বিয়ে করো দীপু তো আমি নিজে তোমার মেয়ে দেখে দেবো। সত্যি! আমাকে মেয়ে দেখিয়ে তবে বিয়ে করো তুমি। শেষকালে হয়ত আমার মত এক অপয়া মেয়েকে বিয়ে করে বসবে, আর ও'র মতন সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে তোমাকে। তুমি জানো না দীপু সে কী জ্বালা! আমার জন্যে যে উনি কত যন্ত্রণা পেয়েছেন তা তুমি বুঝতে পারবে না—

—জেনে-শুনে তুমি সনাতনবাবুকে যন্ত্রণা দিয়েছ?

—আমি কি দিয়েছি দীপু, দিয়েছে আমার কপাল। আমার মত বউ হয়েছিল বলেই ও'র এত কষ্ট। আমি ওদের সংসারে ঢোকবার পরদিন থেকেই ওদের আকাল হলো। ওদের টাকা গেল, প্রতিপত্তি গেল, গাড়ি বিক্রি হয়ে গেল, ওদের সংসারে শনি ঢুকলো। আমি শনি হয়েই ঢুকেছিলুম ওদের বাড়িতে—! সাধে কি আমি বলছি তোমাকে ভালো করে মেয়ে দেখে বিয়ে করতে। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অনেক বিচার করে তবে বিয়ে করবে ভাই। হুট্ করে যা-তা করে যাকে-তাকে বিয়ে করে ফেল না দীপু, তার চেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই। ও'কে দেখেও তোমার শেখা উচিত—

দীপঙ্কর বলতো—কিন্তু সনাতনবাবু তো তোমার অযোগ্য নন, কিংবা তুমিও তো তাঁর অযোগ্য নও, তবে কেন এমন হলো?

সতী বলতো—সে তো আমিও ভাবি কেন এমন হলো। শুধু কি আমার শাশুড়ীর জন্যে? তাও তো নয়। কত বউয়ের কত খারাপ শাশুড়ী তো থাকে, কই, তারা তো আমার মত এমন করে স্বামী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় না, এমন করে পরের বাড়িতে বাস করে না। আমারই বা কেন এমন হলো! তাই বলি, এ আমার কপাল।

দীপঙ্কর বলতো—না, হয়ত আমিই এর কারণ, আমি দূরে চলে গেলেই হয়ত আবার সব ঠিক হয়ে যাবে—।

সতী বলতো—না দীপু, না, আর ঠিক হবে না কিছু, আর জোড়া লাগবে না। আর সে জোড়া না-ই বা লাগলো। ক্ষতি কী? এই তো ভালো। বেশ স্বাধীন। তারপর তুমি একদিন বিয়ে করবে, সংসার করবে। আমি বছরে এক-একবার করে তোমাদের দেখে আসবো, তোমার বউ-য়ের জন্যে শাড়ি কিনে নিয়ে যাবো, তোমার ছেলের জন্যে খেলনা কিনে নিয়ে যাবো। আবার ফিরে আসবো এখানে। লক্ষ্মীদিও তখন ভালো হয়ে উঠবে, আবার দিল্লী চলে যাবে। তখন একেবারে স্বাধীন। সমস্ত বাড়িটিতে একলা! একলা কাটাতে আমার আর খারাপ লাগে না আজকাল, জানো দীপু, একলা-একলা আমি বেশ সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। কোনও কষ্ট হবে না আমার—

শেষের দিকে দীপঙ্কর এলেই এমনি সব আজেবাজে কথা সতী এক-নাগাড়ে বলে যেত। সে-কথা যেন আর ফুরোত না। তারপর যখন অনেক রাত হয়ে যেত, তখন দীপঙ্কর উঠতো। আস্তে আস্তে অন্ধকার রাস্তায় পা বাড়াতো। আর সেই অন্ধকারে দীপঙ্করের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে যেত। কলকাতা, ইন্ডিয়া, এসিয়া, সক্রেটিস, গান্ধী, প্রাণমথবাবু সব মন থেকে মুছে যেত। অফিস, টাকা ধর্ম, ট্রান্সফার সব কিছু সে-ভাবনার তলায় তলিয়ে যেত।

হোসেনভাই কাশেমভাই-এর পার্টনার মিস্টার হোসেনভাই অবাক হয়ে গেছে সেন-সাহেবকে দেখে। কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে, কেমন করে অভ্যর্থনা করবে ভেবে পেল না। সেন-সাহেব একেবারে সশরীরে এসে গেছে তার অফিসে। এ যে অভাবনীয় সৌভাগ্য।

দীপঙ্কর বললে—আমি বসতে আসিনি মিস্টার হোসেনভাই, আমি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি শুনেছেন তো?

—হ্যাঁ, সে তো জানি।

দীপঙ্কর বললে—আমি মাসে-মাসে আপনাকে শোধ করবো বলেছিলুম। এই নিন এ-মাসের টাকা। আমি মাইনে পেয়েই আপনাকে দিতে এসেছি। আট শো দিয়ে গেলাম, শুনে নিন—

হোসেনভাই বললে—এর জন্যে আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি তো কিছু বলিনি তার জন্যে?

—না বলুন, কিন্তু আমার তো দায়িত্ব আছে। এর পর আমি শিলিগুড়ি থেকে টাকা পাঠাবো।

—সে আপনার যেমন খুশি দেবেন। আমি কত ওবলাইজ পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। আমি তো দশ-বিশ লাখ কামিয়েছি সেই ওয়াগন নিয়ে!

দীপঙ্কর বললে—তা হোক, আমি তো

ধার নিয়েছি আপনার কাছ থেকে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি শোধ করে দিতে চাই, আমি দেনা রাখতে চাই না।

হোসেনভাই বললে—কিন্তু, আপনি পরে দিলেও তো হ'ত, আমি তো মারা যাচ্ছি না, আমার তো ফার্ম রইল।

—আপনি না মারা যেতে পারেন, কিন্তু আমি মারা যেতে পারি, তখন কে আপনার ধার শোধ করবে?

এর পর দাঁড়ায়নি দীপঙ্কর। অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিল। যাবার আগে সব কিছু গুছিয়ে রেখে যেতে হবে। কলকাতা থেকে চলে যাওয়া মানে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তার নাড়ির সংগে জড়িয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। এত সহজে কি ছাড়া যায়? এই কলকাতা, এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, এই ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, এই স্টেশন রোড, এই গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং। এর প্রত্যেকটি ধূলিকণার সংগে সে যে মিলে-মিশে ছিল এতদিন। এখানকার খুঁটিনাটি, এই কলকাতার পাপ-

পুণ্যের সঙ্গে একাত্মা হয়ে গিয়েছিল সে। একে ছেড়ে যেতে হবে। যত দিন এগিয়ে আসতে লাগলো ততই যেন টান পড়তে লাগলো তার মনে। দাতারবাবুকেও টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল তাঁর কেরলবাগের নতুন ঠিকানায়। দাতারবাবু উত্তর দিয়েছিল—আমি দু' দিনের জন্যে কলকাতায় যাবো। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে থাকতে পারবো না। আমার মামলার তদবির করতে হবে। তোমরা তোমাদের লক্ষ্মীদিকে দেখো।

ফেরার পথে শেষবারের মত প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ির সামনে নামলো। শেষবারের মতই বটে। আর কি কখনও এ-বাড়িতে আসা হবে! শেষবারের মতন সতীর শাশুড়ীকে একবার অনুরোধ করে আসবে। সনাতনবাবুকেও একবার বলে আসবে।

শম্ভুর সঙ্গে দেখা হলো বাইরেই। বললে—আসুন, দাদাবাবু—

শম্ভুরও যেন মুখের ভাব বদলে গিয়েছে। ওরাও যেন টের পেয়ে গিয়েছে এ-বাড়ি ছেড়ে আর রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না তাদের। ওরাও যেন টের পেয়ে গিয়েছে টাকা জমা দেওয়ার কথা। ওরাও জানে ওদের বউদিমণি এক লাখ টাকা দিয়ে এ-মামলা ওদের [illegible] করেছে।

শম্ভু জিজ্ঞেস করলে—এবার বউদিমণি আসবে, জানেন বোধ হয়?

—কেন? কে বললে?

—জানেন না? বউদিমণি যে মা-মণিকে মকদ্দমার টাকা দিয়েছে, দাদাবাবু যে আনতে গেছে বউদিমণিকে—

—সে কী? কে বললে তোমায়?

শম্ভু বললে—আমরা সব শুনেছি, কাতেসীর মা, ভূতির মা সবাই জানে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোমার মা-মণি বাড়িতে আছেন?

—আছেন, যান না, ওপরে আছেন। বলেই নিজেও সামনে সামনে চলতে লাগলো।

নয়নরঞ্জিনী সবে ঘুম থেকে উঠেছেন তখন। একটু যেন ভালো হয়েছে চেহারাটা আবার। আবার যেন সেই আগেকার মত খুশী-খুশী মেজাজ।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সতীকে আপনি আনতে পাঠিয়েছেন? শুনলাম সনাতনবাবু নাকি গেছেন সতীকে আনতে? সত্যি?

নয়নরঞ্জিনী মুখ বেঁকালেন। বললেন—আরে তুমিও যেমন ভালোমানুষ বাবা! কে বললে তোমায়?

—শম্ভু বলছিল!

নয়নরঞ্জিনী শম্ভুর উদ্দেশে এ-দিক ও-দিক চাইলেন। সামনে থাকলে হয়ত বকুনি খেয়ে মরতো। কিন্তু সে তখন কোথায় সরে গেছে চট্ করে।

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলুন না, আপনি রাজী হয়েছেন?

নয়নরঞ্জিনী আবার মুখ বেঁকালেন। বললেন—কী যে বলো তুমি বাবা, আমি রাজী-অরাজী হবার কে? আমার কথার ধার ধেরেছে? বউমা টাকা দিয়েছে আমাকে, এখন বউমার খুশি! আমি রাজিও হইনি, অরাজীও হইনি! তুমি তো এতদিন দেখছো বাবা আমাকে! আমি কোনওদিন বউমার কোনও কথায় হাঁ-না-রাম-গঙ্গা কিছু বলেছি? আমি কি সেই কথা বলার মানুষ! আমি তো কোনওদিন ছেলে-বউয়ের কোনও কথাতেই থাকিনি বাবা! তাদের কথায় আমার থাকা কিসের দায়? এই দেখ না, এই যে মামলা চালাচ্ছি, এ কার জন্যে? এ বাড়ি যদি বাঁচে তো কে ভোগ করবে এ-সব? আমি?

এ-সব পুরোনো কথা শোনবার জন্যে দীপঙ্কর আসেনি। বললে—সে তো আমি জানি, কিন্তু আপনি বউমাকে নেবেন কি না বলুন?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আচ্ছা, তুমি যে কী বলো! আমি কি বউমাকে তাড়িয়েছি বাড়ি থেকে যে, আমি ডেকে আনতে যাবো? বউমার খুশি হয় আসবে, না-হয় না-আসবে! আমি কী করতে পারি বলো? আমি এই বুড়ো বয়েসে কি বউয়ের পায়ে হাত দিয়ে সাধবো বলতে চাও?

দীপঙ্কর বললে—আমি সে-সব কিছুই শুনতে চাই না আপনার কাছে, আমি যাবার আগে শুধু জেনে যেতে চাই যে, আপনি তাকে গ্রহণ করেছেন।

—তুমি যাবে? কোথায় যাবে তুমি?

দীপঙ্কর বললে—আমি বদলি হয়ে বিদেশে চলে যাবো! হয়ত আর আসা হবে না কখনও। কিন্তু আপনার বউকে আপনি ঘরে নিয়েছেন এইটে জানতে পারলেই আমি নরকে গিয়েও শান্তি পেতে পারি—আপনি বলুন, আপনি তাকে নেবেন! আপনি আপনার টাকা পেলেন, এখনও আপনার কিসের আপত্তি? আপনি জানেন সতীর মত মেয়ে হয় না—সতী আপনার সত্যিই সতী-লক্ষ্মী বউ, আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, অনেক তপস্যা করলে তবে সতীর মত বউ পাওয়া যায়—

—তা আমি কি বলছি বাবা যে, পাওয়া যায় না? এ তো দেখছি মহা জ্বালা হলো তোমাকে নিয়ে...

দীপঙ্করের আর তখন এ-সব বাজে কথা শোনবার সময় ছিল না। বললে—আপনি জানেন সনাতনবাবু সতীর কাছেই গেছেন?

—হ্যাঁ বাবা, তা গেছে। জোয়ান ছেলে যখন বায়না ধরেছে তখন আর আমি

তাকে না বলতে পারিনি! কেন? তুমি এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

কিন্তু দীপঙ্কর তখন আর দাঁড়ায়নি সেখানে। আর বেশী কথা শোনাবার সময়ও ছিল না তার। কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে দীপঙ্কর দেখে যাবে। দেখে যাবে সতী এখানে এসেছে। সতীকে সনাতনবাবু আবার সম্মান দিয়েছেন, আবার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছেন। আর তারপর শিলিগুড়ি কেন, পৃথিবীর যে কোনও কোণে গিয়ে থাকতেও তার কোনও আপত্তি নেই।

সতী তখন লক্ষ্মীদিকে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও গা ধুয়ে নিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়েছে। কতদিন কোথা দিয়ে তার সময় কেটে গেছে, কোথা দিয়ে তার দিন কেটেছে, রাত কেটেছে কিছুই সে টের পায়নি। সেই কবে কোন্ ১৯৩৯ সালের কোন্ মাসে পৃথিবীর বুকে এক যুদ্ধ বেধে উঠেছিল, তার হিসেব সে রাখতে পারেনি। কিন্তু তার নিজের বুকের ওপর যে-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার হিসেব সে জানতো। যে যুদ্ধে কত রাত বিনিদ্র কেটেছে, কত চোখের জল, কত মনের স্বপ্ন মাটিতে ঝরে পড়েছে তারও হিসেব তার জানা ছিল। লক্ষ্মীদি আসার পর থেকেই যেন সতী অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। এতদিনে নিজেকে নিয়েই সে বিব্রত ছিল, এবার লক্ষ্মীদিকে দেখে যেন সে শান্ত হয়েছিল। এই তো জীবন। কান্না আর হাসি, সুখ আর দুঃখের মধ্যে তফাত তো এইটুকু! এরই জন্যে এত হাহাকার, এত মারামারি, কাড়াকাড়ি আর এত হানাহানি!

সিঁদুরের টিপ লাগানোটাও যেন অভ্যেস। ওটা লাগাতে হয় তাই লাগানো, নইলে ওর যেন কোনও উপকারিতা নেই জীবনে। ওটা যেন শুধু মুখের একটু শোভা মাত্র। মনের দুঃখটা ঢাকবার একটা ছদ্মবেশ। আর কিছু নয়—

বাইরে হঠাৎ কড়া নড়ে উঠলো। ওই দীপু এসেছে। সতী ডাকলে—রঘু। ——

রঘু বুঝি বাইরে কোথাও গিয়েছিল। প্রত্যেকদিন অফিস থেকেই তো সোজা চলে আসে দীপঙ্কর। যতদিন সতী এ-বাড়িতে এসেছে, ততদিন এসেছে। ঝড়-বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্ম, কোনও দিন কোনও ব্যতিক্রম হয়নি তার। কতদিন এয়ার রেড হয়েছে। কতদিন সাইরেন বেজেছে। কতদিন কত কী বিপর্যয় ঘটে গেছে পৃথিবীতে, কিন্তু দীপঙ্কর ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে এসে হাজির হয়েছে এখানে। ওই ঘরটিতে বসে দুজনে মুখোমুখি কাটিয়েছে। তারপর আবার যখন রাত ঘন হয়েছে, তখন উঠে দাঁড়িয়েছে দীপু। আস্তে আস্তে বাইরে অন্ধকারে পা বাড়িয়েছে একলা। একলা এতখানি রাস্তা মাড়িয়ে অনেক রাতে বাড়িতে পৌঁছেছে গিয়ে। অনেক রাতে ভাত খেয়েছে। অনেক রাতে শুতে গিয়েছে নিজের সেই একক বিছানায়। তারপর পরের দিন আবার সকালে উঠে যথারীতি অফিসে গিয়েছে। নিজের কাজ করেছে।

এমনি বছরের পর বছর।

কিন্তু এবার থেকে আর আসবে না সে। সতীর প্রতিদিনের অপরাহ্ণের পাঁচটি মুহূর্ত আর এমন করে কাটবে না। দীপঙ্কর চলে যাবার পরও পৃথিবীতে সূর্য উঠবে সকালবেলা, সূর্য ডুববে সন্ধেবেলা, কিন্তু এ-বাড়িতে দীপঙ্কর আর আসবে না। তার আসা এবার থেকে ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, সতীর জীবন থেকে দীপঙ্কর হারিয়ে যাবে চিরকালের মত।

সতী ঘড়ির দিকে একবার তাকালে। ঘড়ি যেন আর চলতে চাইছে না। ঘড়ি যেন দীপঙ্করের আসা পেছিয়ে দিচ্ছে মিনিটে মিনিটে।

হঠাৎ বাইরে যেন কার কড়া নড়ে উঠলো! সতী তাড়াতাড়ি সজাগ হয়ে উঠলো।

—রঘু!

রঘু বুঝি কাছাকাছি কোথাও ছিল না। সতী নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দিলে। কিন্তু দীপু আজ এত তাড়াতাড়ি এসে গেল যে! এত শিগ্‌গির তার অফিস ছুটি হয়ে গেল! দীপু কি তার কাছে আসার জন্যে অফিস কামাই করলে!

কিন্তু না। আশ্চর্য! কেউই না। বাইরের রাস্তার এদিক-ওদিক অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেও কোথাও দীপঙ্করের মূর্তি দেখা গেল না। সতী আবার দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে এল। হঠাৎ

সমস্ত বাড়িটা যেন একটা জেলখানা মনে হলো তার কাছে। তাকে এখানেই থাকতে হবে চিরকাল—চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে। দীপংকর তাকে এই চারটে দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে নিজে পালিয়ে যাবে অনেক দূরে! তারপর বালিশটা আঁকড়ে ধরে হঠাৎ চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হলো সতীর। একটা নিঃশব্দ হাহাকারে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। বাইরের কেউ জানতে পারলো না, বাইরের কেউ শুনতেও পেলে না। ঈশ্বরের আদালতে সতী তার শেষ আপীল পেশ করে যেন শেষবারের মত মুহ্যমান হয়ে রইল।

—কে?

আবার উঠলো সতী। তাড়াতাড়ি গিয়ে সদর দরজাটা খুলে দিলে। এবার নিশ্চয়ই দীপু এসেছে।

কিন্তু দরজাটা খুলেই একেবারে দশ হাত পেছিয়ে এসেছে সতী! সনাতনবাবু সামনে দাঁড়িয়ে। আজ সঙ্গে দীপংকর নেই, শম্ভু নেই। আজ সনাতনবাবু একলাই এসে তার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

এক মুহূর্তের মধ্যেই সতী নিজেকে সামলে নিয়েছে। বললে—তুমি? তুমি যে হঠাৎ?

সনাতনবাবু ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে বললেন—বসবো?

সতী বললে—হ্যাঁ, বোসো। কিন্তু তুমি হঠাৎ এলে যে?

সনাতনবাবু বসলেন। বললেন—হঠাৎ তো নয়। আমি সব দিক ভেবেই তোমাকে নিতে এসেছি। মা জানেন আমি তোমার কাছে এসেছি।

—কিন্তু কেন আবার এলে? তোমরা তো টাকা পেয়ে গিয়েছ। পাওনি?

সনাতনবাবু বললেন—তা পেয়েছি—

—টাকা যখন পেয়ে গিয়েছ, তখন কেন আবার এসেছ শুনি? আমার টাকাটাই তো তোমাদের দরকার ছিল। টাকা যখন পেয়েই গিয়েছ তখন আমার কাছে তোমাদের আবার কিসের দরকার শুনি? আমি তোমাদের আর কী দিতে পারি?

সনাতনবাবু বললেন—তুমি সবই দিতে পারো।

সতী বললে—সব কি তুমি একদিন নিতে পেরেছিলে? আমি তো আমার সবই তোমাকে দিতে চেয়েছিলুম একদিন, সব কিছু দিতেই তো তৈরী ছিলুম, সেদিন তো আমার দিকে ফিরেও তাকাও নি তুমি? আজ আবার কেন ও-কথা বলছো?

সনাতনবাবু বললেন—অভিযোগ করলে অভিযোগই শুধু বেড়ে যায়, সুতরাং ও-কথা থাক! অনেক কষ্ট পেয়েছ, এবার তুমি ফিরে চলো।—

সতী বললে—এ-কথাও তো তোমার নতুন নয়, এ-কথা তো তোমার মুখ থেকে আমি অনেক বার শুনেছি, শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, আর শুনতে চাই না। তা ছাড়া আমার বুকে অত অপমান সহ্য করবার ক্ষমতাও আর নেই, তা জানো?

সনাতনবাবু বললেন—তা আমি ভালো করে জানি।

সতী বললে—ছাই জানো তুমি! কতটুকু জানবার ক্ষমতা আছে তোমার? কতটুকু তোমার মন? সেই মন দিয়ে আমার অপমান তুমি কী করে বুঝলে? কী করে বুঝবে মেয়েমানুষের সম্পত্তি, শ্বশুরবাড়ি, টাকা, গাড়ি সব পেলেও তার কিছুই পাওয়া হয় না? কী করে বুঝবে মেয়েমানুষের মন বলে আলাদা একটা জিনিস আছে, যা তোমাদের মনের সঙ্গে অনেক তফাত?

সনাতনবাবু বললেন—তাও আমি জানি।

—তাই যদি জানবে, তা হলে আমি কি সাধ করে প্যালেস কোর্টে চলে গিয়েছিলুম? সাধ করে আমি চাকরি করতে গিয়েছিলুম রেলের অফিসে? আর সাধ করে আমি এখানে এই পরের বাড়িতে পড়ে আছি বলতে চাও? সবই আমার মন-গড়া? কিছুই সত্যি নেই এর পেছনে?

সনাতনবাবু বললেন—বেশ, তা হলে আজ খুলে বলো কী তুমি চাও? আমার কাছে কী পেলে তুমি সব পাবে? তোমার সব সাধ মিটবে?

সতী বললে—ছিঃ, তুমি আমার মুখ থেকে সেই কথা শুনতে চাও? আমি মেয়েমানুষ হয়ে মুখ ফুটে তাই বলবো তোমার কাছে আর তুমি আমাকে তাই দেবে? তুমি কি আমাকে সেই রকম মেয়ে পেয়েছ? এর চেয়ে যে আমার মরা ভাল!

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু তুমি যদি না বলো তো আমি বুঝবো কী করে?

সতী বললে—যদি বুঝতেই না পারো তো কেন বিয়ে করেছিলে? যখন তোমার মা তোমার বিয়ে দিতে চাইলে তখন কেন তুমি আপত্তি করলে না? কেন আমার গলায় এমন করে দড়ি ঝুলিয়ে দিলে? আর জন্মে আমি কী পাপ করেছিলুম তোমার কাছে বলতে পারো?

সনাতনবাবু যেন কী বলবেন কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সতী তাঁর

সামনে উন্মাদের মত ব্যবহার করছে। তিনি সান্ত্বনা দেবার আশায় বললেন—সত্যিই আমি স্বীকার করছি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

—কিন্তু কেন তুমি বুঝতে পারো না?

সনাতনবাবু তখনও বললেন—বিশ্বাস করো আমাকে, তুমি নিজের মুখে না বললে আমি বুঝতে পারবো না—

—তুমি বুঝতে পারো না, কিন্তু অন্য সব স্বামীরা তো বুঝতে পারে! দীপু তো বুঝতে পারে!

—দীপঙ্করবাবু?

—হ্যাঁ, দীপঙ্করকে তো আমার কোনও কথা খুলে বলতে হয় না। সে তো আমার দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-আনন্দ সব বুঝতে পারে। তাকে তো মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় না? দীপঙ্কর না থাকলে আমি তো কবে আত্মহত্যা করতুম। দিনের পর দিন সে তো ঠিক এসেছে! আমার ভালো-মন্দ নিয়ে তার কত ভাবনা, তা তুমি জানো! আমি তাকে কত বকেছি, কত গালাগালি দিয়েছি, কতবার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তবু তো সে আমাকে ভুল বোঝেনি তোমার মত! তুমি দীপুর মত হতে পারো না? আর সব স্বামী যেমন করে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করে তেমনি ব্যবহার করতে পারো না? তুমি সাধারণ হতে পারো না?

সনাতনবাবু বললেন—সত্যিই দীপঙ্করবাবু খুব ভালো লোক!

—কিন্তু দীপু ভালো হয়ে আমার কী লাভ? তুমি কেন অমন হলে? এত অহঙ্কার তোমার কিসের? কিসে আমি তোমার অযোগ্য বলতে পারো? কেন এত অপমান তুমি আমাকে করো?

সনাতনবাবু বললেন—অপমান করতে চাইলে কি বার-বার এমন করে তোমার কাছে আসি?

সতী বললে—আমি তো তোমাকে তাই আসতেই বারণ করি। কেন তুমি এমন করে বার-বার আসো? কেন তুমি বার-বার অপমান করে যাও! একবার তুমি আসো, একবার তোমার মা আসে—কেন তোমরা এমন করো? তোমাদের যা দরকার ছিল তা তো পেয়েছ—

সনাতনবাবু বললেন—মার দরকার মিটেছে, কিন্তু আমার?

—তোমার দরকার আর তোমার মার দরকার কি আলাদা?

সনাতনবাবু বললেন—না—

—তা হলে?

সনাতনবাবু বললেন—তুমি সেই একই প্রসঙ্গ তুলছো। আমার মা তো তোমারও মা। তুমি আমিই কি আলাদা? তুমি, আমি, আমার মা—সকলকে জড়িয়েই সংসার। তোমাকেও যেমন ছাড়তে পারি না, আমার মাকেও আমি তেমনি ছাড়তে পারি না। মাকে ছাড়লে তোমাকেও ছাড়তে হয় যে। আর তোমাকে ছাড়লে আমার নিজেরই তো কোনও অস্তিত্ব থাকে না—

এতখানি কথা সনাতনবাবুর মুখ থেকে সতী আগে কখনও শোনে নি। সনাতনবাবুর মুখের দিকে সতী চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, বললে—সত্যি বলছো? সত্যি বলছো তুমি এমন করে চাও আমাকে!

সনাতনবাবু বললেন—তুমি এখানে এমনি করে পড়ে থাকো, এ কে চায়? তুমি আমাদের বাড়ি গেলে বুঝতে পারবে, সেখানে সমস্ত বাড়িটা খাঁখাঁ করছে তোমার অভাবে।

—এত টাকা পেয়েও খাঁখাঁ করছে? এত টাকা পেয়েও সমস্যা মেটেনি?

—টাকায় কি সব সমস্যা মেটে!

সতীর যেন তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। বললে—ওগো, তুমি সত্যি বলছো?

সতী আর দাঁড়াতে পারলে না। সনাতনবাবুর পাশের চেয়ারটাতেই বসে পড়লো। বললে—কোর্টে তো টাকা জমা দেওয়া হয়ে গেছে তোমাদের?

সনাতনবাবু বললেন—শুনেছি হয়েছে—

—শুনলাম, চাকর-বাকরদের বাকি মাইনেও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে?

—হয়ত হয়েছে। ও-সব মা জানে, আমি কিছুই খবর রাখি না।

সতী সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—শুনলাম তোমাদের সরকারবাবুও নাকি আবার এসে কাজে লেগেছে?

সনাতনবাবু বললেন—দেখেছি, এসেছে। কিন্তু সে-সব তো বাইরের জগতের খবর—

—হোক বাইরের জগতের খবর, কিন্তু টাকা পেয়েছ বলেই তো সব মিটিয়ে দিতে পারল! টাকা পেলে বলেই তো সব দিক বাঁচলো!

সনাতনবাবু বললেন—সেই জন্যেই তো মা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ!

সতী অবাক হয়ে গেল। বললে—আমার কাছে? কেন?

—বা, তুমিই তো টাকা দিয়েছ! তুমি যদি টাকা না দিতে তো এসব কি হতো?

সতী এবার দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—

—আমি? আমি টাকা দিয়েছি?

—হ্যাঁ, তুমিই তো দীপঙ্করবাবুর হাত দিয়ে এত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ। নইলে মাকে বড় মুশকিলে পড়তে হতো যে!

সতী আর থাকতে পারলে না। বললে —কী বলছো তুমি? আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি? দীপুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি? আমি?

সনাতনবাবু বললেন—তুমিই পাঠিয়েছ। তুমি তোমার বাবার অনেক টাকা পেয়েছ, সেই টাকা পাঠিয়েছ তুমি! মা তো সেই কথাই বললেন—

সতীর মাথায় যেন তখন ঘূর্ণি-ঝড় বয়ে গেল। বললে—বলছো কি তুমি? আমি দীপুর হাত দিয়ে আমার বাবার টাকা তোমাদের পাঠিয়েছি?

সনাতনবাবু নিজেও তখন অবাক হয়ে গেছেন—কেন? তুমি পাঠাওনি?

সতী তখন আরো সরে এসেছে। বললে —তাই বুঝি তুমি এসেছ? তাই বুঝি তোমার মা তোমাকে পাঠিয়েছে? তাই বুঝি আজ এত মিষ্টি কথা তোমার মুখে? তাই বুঝি বাকি টাকাটার লোভে আমার এত খাতির? তোমার লজ্জা করে না এত মিথ্যে কথা বলতে? আমার চেয়ে আমার টাকাটাই তোমাদের কাছে এত বড় হলো? তোমরা এত নীচ? এত ছোট তোমাদের মন?

সনাতনবাবু হঠাৎ সতীর এই ব্যবহারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—কী বলছো তুমি, আমি বুঝতে পারছি না—

—তা কেন বুঝতে পারবে? তা বুঝতে পারলে যে অনেক টাকা হাতছাড়া হয়ে যায় তোমাদের। টাকা দিয়েই তোমরা সব জিনিসের দাম যাচাই করে নাও! টাকাটাই তোমরা ধর্ম বলে মনে করো? আমার বাবা আমার বিয়েতে যৌতুক বেশী দিতে পারেনি বলেই এতদিন এত অত্যাচার করেছিলে আমার ওপর, আর আজ আমি তোমাদের বিপদের সময়ে টাকা দিতে পেরেছি বলেই এত খাতির? তাই যদি হয় তার দরকার নেই এত খাতিরের। এ খাতিরের মুখে আমি লাথি মারি। তুমি চলে যাও এখান থেকে। তোমার মুখও আমি দেখতে চাই না আর—চলে যাও—

সনাতনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

সতী বললে—যাও, চলে যাও—

সনাতনবাবু চলেই যাচ্ছিলেন হয়ত। সতী বললে—তবে যাবার আগে শুনে যাও। টাকা আমি দিই নি, আর দেবও না কখনও। আমার এত অধঃপতন হয়নি যে আমি ঘুষ দিয়ে সুখ কিনবো। এ-জন্মের মত আমি সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো তবু টাকা দিয়ে শ্বশুর বাড়ির সুখ কেনবার দুর্বুদ্ধি যেন আমার কখনও না হয়—। টাকা আমি রাস্তায় ফেলে দেব, জলে ভাসিয়ে দেব, তবু তোমাদের দিয়ে আমি আমার কালো মুখ আর কালো করবো না—যাও—

সনাতনবাবু এ-কথার উত্তরে যেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়লো। রঘু হঠাৎ বিব্রত হয়ে ঘরে ঢুকতেই সতী পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলে —কী রে? কিছু বলবি?

রঘু ভয়ে-ভয়ে বললে—বড়দিদিমণিকে পাচ্ছি না—

—বড়দিদিমনি! কেন? কোথায় গেল? এই তো ঘুমোচ্ছিল, কোথায় আবার যাবে?

—না, সব জায়গায় খুঁজেছি কোথাও

নেই। বাথরুমে নেই, দোতলায় নেই—

—নেই কীরে? যাবে কোথায়?

কথাটা বলেই সতী তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। যে-ঘরে লক্ষ্মীদি শুতো সে-ঘর ফাঁকা। সতী অবাক হয়ে গেল। এ ঘর ও-ঘর সব ঘর খুঁজতে লাগলো। শেষকালে ভয় হতে লাগলো। কোথাও বেরিয়ে গেল নাকি? কথাটা ভাবতেই যেন সতীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠলো।

ভূষণ মালী প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। প্রতিদিন সে এই লেভেল-ক্রসিং গেটে পাহারা দিয়ে আসছে। মাসে আঠারো টাকা মাইনে টিপ্ সই দিয়ে নিয়ে সে এই লেভেল-ক্রসিং-এই তার পৃথিবী বানিয়ে ফেলেছে। যখন সাউথ-কেবিন থেকে করালীবাবু বলেছে, কে? ভূষণ?

ভূষণ বলেছে—হাঁ বড়বাবু আমি—

করালীবাবু বলেছে—থার্টি থ্রি আপ্ লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেছে, গেট বন্ধ করিস—

—আচ্ছা, ঠিক আছে হুজুর,—

বলে ভূষণ গেট বন্ধ করে দিয়েছে। গেটে কদিন থেকেই ভীষণ ভিড় হতে সুরু করেছে। ময়লা ছেঁড়া কাপড় সব। হাড়-সার চেহারা। কোলে-কাঁখে ছেলে। পায়ে হাঁটা পথে দূর-দূর থেকে সব আসছে। ওদিকে সাহেব মেমদের গাড়িরও তখন খুব ভিড়। তারা চলেছে ফুর্তি করতে। যোধপুর ক্লাবের সাহেব-আড্ডা তখন জমতে সুরু হবার কথা। ভূষণ কদিন থেকেই নিচেয় নেমে এসে ভিড় হটিয়েছে। ভাগো-ভাগো সব, দেখতা নেই, সাহেব লোকোকা গাড়ি আতা হ্যায়? ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো, ভাগ যাও—

গ্রামের গরীব-গুরবো লোক সব। জীবনে হয়ত তারা কখনও মোটর-গাড়িও দেখেনি। সাহেব-মেমও দেখেনি। তারা শুধু দেখেছে ক্ষিদে। ক্ষিদে ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই তারা জানে না। শুধু দুবেলা পেট-ভরা আউষ-চালের মোটা লাল ভাত, আর কচু-ঘেঁচু কাঁচালংকা যা-হোক একটা কিছু। কিন্তু তা-ও কমাস ধরে জোটেনি তাদের। ভূষণ এসব কথা জানে না। সে রেলের গেট্‌ম্যান্। এত কথা জানবে কেন সে? লাইনের ওপর ভিড় করলেই ভূষণ লাঠি নিয়ে তাড়া দিত। বলতো—এ কোম্পানীকা জায়গা, ভাগো হিঁয়াসে—

কবে এই রেলওয়ে ছিল কোম্পানীর হাতে, কবে সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে; সে-খেয়াল ছিল না ভূষণের। ভূষণ সেই আদ্যি-কালের লোক। আদ্যিকালের আইন-কানুনের প্রতিনিধি। তার ধারণা আজো সেই পুরোন আইনেই পৃথিবী চলছে। সেই যে-আইনে পুব-দিকে সূর্য ওঠে; সে-আইনে পশ্চিম দিকে সূর্য ডোবে, সেই আইন। সে জানে না পাঠান-মোগল-ব্রিটিশ যুগ পেরিয়ে এখন টাকার যুগ চলছে। টাকা-ওয়ালারা সব টাকা মজুত করেছে নিজেদের সিন্দুকে। মানুষের খাবার আজ মুষ্টিমেয়র হাতে চলে গিয়েছে। সে জানেনা সে নিজেও আর এক টাকাওয়ালার হাতের যন্ত্র হয়ে গিয়েছে। সে জানে না যে রেলের বড় সাহেবের চোখে তার দাম আজ আঠারো টাকা বার আনা। জানে না বলেই হম্বি-তম্বি করে, মন দিয়ে কাজ করে, প্রাণ দিয়ে গেট বন্ধ করে।

চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। হঠাৎ কী যেন একটা নজরে পড়লো। ভূষণ ভালো করে ঠাহর করে তাকিয়ে দেখলে সেদিকে। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে না? ঠিক গুমটি-ঘরের নিচেয়, অন্ধকার একটা কোণ বেছে নিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে একলা। জেনানা আদমী! আবার ভাল করে দেখলে। হয়ত নজরের ভুল। কিম্বা হয়ত অন্ধকার রাতের ছায়া। ডিউটি করতে করতে আগে এমন অনেক ছায়া দেখেছে ভূষণ।

এবার ভূষণ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে—কৌন্ হো ইধার?

ছায়াটা যেন একটু আবছা সরে গেল এবার। আরো পাশে সরে গেল। একেবারে গুমটি ঘরের নিচে কাটা ঝোপটার পাশে।

ভূষণ আবার বললে—কৌন্ হো? কৌন হো তুম?

ওদিকে তখনই হঠাৎ করালীবাবুর টেলি-ফোন বেজে উঠেছে। লাইন্ ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আপ্ সিগ্‌ন্যাল দিয়ে দিয়েছে করালীবাবু। গেট বন্ধ করো। ভূষণ গেট বন্ধ করেছে। রাস্তার গাড়িগুলো ব্রেক কষে থেমে গেল বাইরে। ভূষণ জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলে—আপ্ সিগ্‌ন্যাল ঠিক পড়েছে। ওদিকে হোম্-সিগন্যালটাও ঠিক পড়েছে। লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেছে। আর দেরি নেই থার্টি-থ্রি আপ্ আসতে—

তারপরেই কয়েকটা মেয়েলি গলার আওয়াজ এল কানে। গুমটি ঘরের নিচেয় যেন কান্না-কাটি চেঁচামেচি হল্লা সুরু হয়ে গেছে। ওদিকে থার্টি-থ্রি আপের হেড্-লাইটও দেখা যাচ্ছে। ভূষণ কী করবে বুঝতে পারলে না। কাঠের স্লিপারের ওপর তখন চাকার ঘটাঘট্ ঘটাঘট্ প্রতিধ্বনি সুরু হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হ্যান্ড-সিগ্‌ন্যাল্-ল্যাম্পটার রং বদ্‌লি করে নিচেয় নেমে এল। নিচেয় নেমে এসে দেখে অবাক কাণ্ড!

আর সঙ্গে সঙ্গে থার্টি-থ্রি আপ্ একেবারে হুড়-মুড় করে ভূষণকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে থার্টি-থ্রি আপের হুইশল্ বেজে উঠলো—হু-উ-উ-উ উ—

দীপংকর ঠিক সেই সময়েই এসে পড়েছে। দূর থেকেই দীপংকর দেখতে পেয়েছিল—গেট্‌টা খোলা। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু মনে হলো যেন অনেক লোক কাকে ঘিরে জটলা করছে। কেউ চাপা পড়েছে? দীপংকরের কী যেন একটা সন্দেহ হলো। দম বন্ধ করে দীপংকর এগিয়ে চললো সেই দিকে। কেউ চাপা পড়েছে?

—কী হয়েছে এখানে? এত ভিড় কেন?

হঠাৎ কোত্থেকে ভূষণ শুনতে পেয়েছে। সেন-সাহেবের গলা। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে লাফিয়ে সামনে এসেই সেলাম করলে। সেলাম হুজুর—

—কী হয়েছে ভূষণ? এত ভিড় কেন এখানে?

—হুজুর এক জেনানা আদমী...

আর শোনবার ধৈর্য হলো না। একেবারে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো দীপংকর। ভেতরে সতী দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মীদিও দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মীদি থর থর করে কাঁপছে। সতীও যেন দীপংকরকে দেখে অকূলে কূল পেলে। বললে—দীপু, এখুনি সর্বনাশ হয়ে যেত, এই দেখ—

সনাতনবাবু সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সেদিকে না-দেখে দীপংকর লক্ষ্মীদির দিকে এগিয়ে যেতেই লক্ষ্মীদি তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—আমি মরতে চাইনি দীপু, আমি মরতে চাইনি, এরা আমাকে মিথ্যিমিথ্যি ধরে এনেছে—

দীপু কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আর একটা ট্যাক্সি সেখানে এসে ঠিক সেখানেই থেমে গেল। ভেতর থেকে কে যেন নেমে দাঁড়ালো সেইখানেই। তারপর আস্তে এগিয়ে এসেই দীপংকরের কাঁধে হাত রাখলে। প্রথমটা চিনতে পারেনি দীপংকর। সেই চেহারা এ-রকম হবে কী করে। কিন্তু গলা যেন খুব চেনা চেনা মনে হলো। —দীপংকরবাবু, আপনি? কখন এলেন? এ কী চেহারা হয়েছে আপনার!

(ক্রমশ)

শাসনকর্ম ও যন্ত্রবিদ্যার দুই দিক্‌পাল স্যার মির্জা ইসমাইল ও স্যার এম, এম, বিশ্বেশ্বরায়ার যৌথ-প্রযত্নে মহীশূর শহরের অদূরে কাবেরী নদীর উপর যখন কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধটি নির্মিত হয়, তখন নিছক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রয়োজনের পিছনে একটি শিল্পী-মনও কাজ করেছিল। বাঁধের অপর দিকে শুষ্ক নদীগর্ভে যে-মনোরম উদ্যানটি রচিত হয় তার তুলনা ভূ-ভারতে বিরল। অজস্র ফোয়ারা-শোভিত এই "বৃন্দাবন উদ্যান" রাত্রিকালে নানা রঙের বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হয়ে অতি অপরূপে মায়াময় হয়ে ওঠে। প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রে উদ্যানের প্রবেশদ্বার ও সাধারণ দৃশ্য। শেষের চিত্রগুলিতে মনোরম ফোয়ারার সার।

আলোকশিল্পী

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
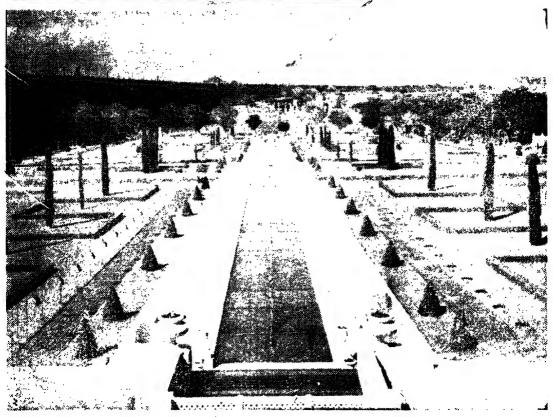
অবস্থায় এনে ফেলছেন তার বিরুদ্ধে কি কোনো প্রতিবাদ হয়েছে? প্রতিবাদ করবে কারা? যাঁরা করতে পারেন তাঁরা বুড়ো হয়ে গেছেন তাঁদের আর এ নিয়ে কচকচি কস্তে ইচ্ছে হয় না। আর, তরুণ সম্প্রদায় তো ক্লাসিকাল বাংলা রাগসঙ্গীত বাংলার স্বকীয় রীতিতে গাইতেই শেখেনি। অতএব যে সুযোগ পাচ্ছে সেই ঢোল সাজছে—ভয়টা কিসের?

হাল আমলের বাংলা রাগপ্রধান গানে তানের তুবড়ি, সগম, বিস্তারের নানা কসরত দেখি কিন্তু আড়ঠেকায় বাংলা রাগসঙ্গীত কাউকে তো গাইতে শুনি না। বাংলার খাম্বাজ, বাংলার বেহাগ, বাংলার সিন্ধুড়া, বাংলার বাগেশ্রী, ভৈরবী, ভীমপলশ্রী, ইমন, কেদারা—সে সব গেল কোথায়। দ্রুত খেয়ালের এ কায়দা বাংলার ঐতিহ্য নয়। তার গতিপ্রকৃতিতে নানা বৈচিত্র্য বর্তমান যা হিন্দী খেয়ালের অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা যাবে না। একদা এইসব গান ওস্তাদ গাইয়েরা গাইতেন আর হিন্দী গানে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে গাইতেন আগে নয়। রাগকল্পদ্রুম, বাঙালীর গান, প্রীতি-গীতি, সঙ্গীতসার সংগ্রহ প্রভৃতি বিরাট বিরাট গ্রন্থের পাতা ওলটালে সে সব গানের ভাষাটুকু পাওয়া যাবে, সুর এবং তানের উল্লেখ দেখা গেলেও রূপের পরিচয় পাওয়া যাবে না। এসব রূপের পরিচয় হারিয়েছে কাদের অবহেলায়? ইতিহাস উপেক্ষিত হয়েছে কাদের অবহেলায়? এর উত্তরে আমরা কেবলমাত্র আমাদেরই দায়ী করতে পারি আর কাউকে নয়।

বেতার কর্তৃপক্ষ সঙ্গীতের উন্নতি-বিধানের প্রচেষ্টা করে আসছেন বলে দাবি করেন, কিন্তু সেটা যথার্থ নয়; কারণ উন্নতি-বিধানের জন্য যে পরিকল্পনা দরকার তা তাঁদের নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীত রয়েছে, অতুলপ্রসাদের গান রয়েছে অথচ সমসাময়িক অপর সুরকারদের খোঁজখবর নেই। ধারাবাহিকভাবে বাংলা গানকে শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করবার কোন প্রচেষ্টাই করা হয়নি। কেবলমাত্র শাস্ত্রীয়, উপশাস্ত্রীয় গোছের অর্থহীন বড় বড় নাম দিলেই কাজ হয় না বরঞ্চ যা হয় তা চেষ্টার নামে নিশ্চেষ্টতা। এর মধ্যে আর একটা সঙ্গীতের বিকৃতিকে আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে সেটা হিন্দী গীত। এই গানের কোন ট্রাডিশন নেই অথচ তাকে চাপিয়ে দেওয়া হল কলকাতার শিল্পীদের কণ্ঠে। এর ইতিবৃত্ত যতটুকু আমরা জানি তা পাঠকদেরও জানিয়ে রাখি। একদা এক শুভলগ্নে বেতারের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ দেশের রুচির উন্নতি সাধনার্থে ফিল্মী গানকে lewd, vulgar ইত্যাদি উপাধি দিলেন। ফিল্মওয়ালারা চটে গিয়ে বললেন—"আচ্ছা, তা হলে আর কোনো ফিল্মী রেকর্ডই বেতারে বাজাতে দেব না।" কর্তৃপক্ষের অবস্থা কাহিল—এমন কি কোনো কোনো কেন্দ্রে (যা হিন্দীর মক্কামদিনা) কণ্ঠশ্বাস, নাভিশ্বাস। Fill up the blank করা যায় কি করে। সর্বক্ষণ তো আর ক্লাসিকাল, ভজন আর কাজরী চলে না। বাংলায় অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম, শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, পদাবলী কীর্তন অনেক কিছু আছে। তখন হুকুম হল হিন্দী কবিদের বলো গান রচনা করতে। এল ঝুড়ি ঝুড়ি গান অর্থাৎ কবিতা। গান এদের জানা নেই—অতএব যে মাল এল সে অনেকটা—

রাত্রি হৈ অঁধেরী অন্ধকার ভাদ্র কী হৈ অমা
চারো ঔর সে ছা রহী হৈ কজ্জলো
কী কালিমা।

অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত গান তৈরি হল—সেই ফিল্মী সুরেরই ঢঙে। ওই সুর নিয়ে এদিক ওদিক করে নাকানো বাড়িয়ে ফচকামো কমিয়ে, কাদুনি কমিয়ে গদ্গদানি বাড়িয়ে বানানো হল গান। অর্থাৎ সেই ফিল্মী গানই শুনছেন বেতার শ্রোতারা—শুধু শব্দগুলো বিকটতর, কর্ণপটহবিদারক। অতঃপর আমাদের জিজ্ঞাস্য—কী প্রয়োজনে এই গীত নামক ভেজাল পদার্থটি কলকাতা বেতারের অনেকখানি সময় অধিকার করছে এবং যোগ্যতার বাংলা গান দিয়ে কেনই বা এর স্থান পূর্ণ করা হবে না।

আকাশবাণী এবং শিল্পী সম্প্রদায় উভয় পক্ষই যদি চেষ্টা করেন তা হলে বাংলা গানের ট্রাডিশনকে বজায় রাখা যায় এবং নতুন সৃষ্টিও সম্ভব হয়। কিন্তু আদর্শ থাকা দরকার এবং পরিশ্রমও স্বীকার করতে হবে পিতৃপুরুষের পরিচয় জানতে। নিজেরা আত্মবিশ্লেষণে অক্ষম, নতুন কিছু প্রতিষ্ঠা করতেও অপারগ—এমন অবস্থা কৌলীন্যের দাবি করতে গেলে বিশ্বামিত্রের অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। তুলনাটা বোধ হয় ভুল হল—বিশ্বামিত্রের প্রতিভার অভাব ছিল না ফাঁকা অহংকার নিয়েই তিনি ব্রাহ্মণ হতে চাননি।

বৈদ্যুতিক অ্যানেস্থেসিয়া

চিকিৎসার প্রথম যুগে অস্ত্রচিকিৎসক যখন রোগীর ওপর অস্ত্রোপচার করতেন, তখন রোগীর কষ্ট লাঘব করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পরে, রোগী যাতে কোন-রকম কষ্ট না পায়, সেজন্য একটা বেদনা-হীনতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ওষুধ দিয়ে রোগীকে অজ্ঞান করার উপায় উদ্ভাবন করা হয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়েছে যে, এইরকমভাবে অজ্ঞান করার ফলে কতকগুলি খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়। কাজেই কার্যকরী হয় অথচ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না, এমন কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কি? পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে, বিদ্যুৎশক্তির মাধ্যমে তা সম্ভবপর হতে পারে।

বিদ্যুৎশক্তির মাধ্যমে মোহনিদ্রার সৃষ্টি করে সাফল্যজনক প্রথম অস্ত্রোপচারের সংবাদ সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই সংবাদ চিকিৎসা-জগতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে। কিন্তু এর বহু পূর্বেই, ১৯২৮ সালে ৬১ বৎসর বয়স্ক জর্মান ইঞ্জিনীয়ার ওয়ালটার আনভারফের্ট নিজের গবেষণায় মোহনিদ্রা সৃষ্টি করার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করার একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই উদ্ভাবক সম্প্রতি তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই আবিষ্কার সম্পর্কে তিনি ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং ১৯৬০ সালের মে মাসে দুটি পেটেন্টও রেজেস্ট্রী করেছেন। বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে অজ্ঞান করা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিটিতে অলটারনেটিং কারেণ্ট (এসি) ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জর্মান আবিষ্কারক আনভারফের্টের পদ্ধতিতে ডাইরেক্ট কারেণ্ট (ডি সি) ব্যবহৃত হয় এবং তা অনেক বেশী ভালো।

মিঃ আনভারফের্ট, পশ্চিম জার্মানীর আসচেন শহরে তাঁর এই নতুন বৈদ্যুতিক অ্যানাস্থেসিয়া পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারক বলেছেন যে, তাঁর পদ্ধতি অজ্ঞান করার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা নয়, এটা হ'ল অস্ত্রোপচারের জন্য অজ্ঞান করার সম্পূর্ণ একটা নতুন বৈদ্যুতিক পদ্ধতি। দুটি প্রতিফলিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ মস্তিষ্কের মধ্যভাগে সঞ্চারিত ক'রে এই অবস্থার সৃষ্টি করা হয়।

বিভিন্ন জন্তুর ওপর এই পরীক্ষা চালিয়ে তারপর ১৯৫৯ সালে, পশ্চিম জর্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরতত্ব প্রতিষ্ঠানে, আসচেনের পৌর চিকিৎসালয়ে এবং আনভারফের্ট নিজের ওপর চারবার পরীক্ষা চালিয়ে উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন। অজ্ঞান ও অবশ করার এই অদ্ভুত উপায়টি সম্পর্কে অন্যান্যের মধ্যে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হানস শেফার অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করে আনভারফের্টের পদ্ধতিটি নিয়ে আরও পরীক্ষা চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন। বৃটেন, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি সহ বিদেশের বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানী এই নতুন জর্মান পদ্ধতিটির সফল উন্নয়ন সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

আবিষ্কারক বলেছেন যে, অজ্ঞান করার প্রাচীন পদ্ধতির তুলনায় তাঁর উদ্ভাবিত উপায়টি অনেক বেশী উন্নত, কারণ অজ্ঞান করার প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য এতে কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না। কোন রকম প্রতিক্রিয়ারই আশংকা থাকে না। তিনি মনে করেন, অজ্ঞান ও অবশ করার এই বৈদ্যুতিক পদ্ধতি ভবিষ্যতের অ্যানাস্থেসিয়ায় পরিণত হবে।

কৃত্রিম স্বরযন্ত্র

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অন্ততঃপক্ষে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক অগ্রগতি করেছে। তা হল, মানুষের শরীরে কৃত্রিম অংগপ্রত্যংগের সংস্থাপন। কাঠের পা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রে কৃত্রিম ভাল্‌ভ বসানো পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। এখন স্বাভাবিক স্বরযন্ত্রের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক স্বরযন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

স্বরযন্ত্রের ক্যানসার রোগের বিরুদ্ধে মানুষ যে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলো, সম্প্রতিককালে তাতে অনেক-খানি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কতকগুলি আধুনিক চিকিৎসাগারে, এই নতুন পদ্ধতিটি প্রয়োগ ক'রে এই রকম রোগীর শতকরা ৬৫ জনকে ভালো করা সম্ভবপর হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে এই সাফল্য বিশেষ উৎসাহজনক। কিন্তু এখনও, চিকিৎসকগণ কতকগুলি ক্ষেত্রে নিরুপায় বোধ করেন এবং চিকিৎসার নতুন কোন উপায় সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করছেন।

স্বরযন্ত্রে (ল্যারিংস) ক্যানসার রোগের আক্রমণ যদি প্রথমাবস্থায় ধরা পড়ে, তাহলে নিরাময়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণত বয়সে এই রোগটি ধরা পড়ে। ল্যারিঙ্গোলজী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক লেইচার সম্প্রতি একটি বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে এই সমস্যাটি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেছেন যে, সাধারণ গলা-খুসখুসি যদি কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়,

তাহলে তা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা উচিত। অধ্যাপক লেইচার, চিকিৎসকগণের সুবিধের জন্য একটি নতুন ধরনের ল্যারিঙ্গিয়েল কাচ বা ল্যারিঙ্গোস্কোপ উদ্ভাবন করেছেন, যা দিয়ে, শরীরের এই অংশে কোন টিউমার হয়েছে কিনা, তা সহজেই পরীক্ষা করা যায়।

আজকাল যদিও সম্পূর্ণ ল্যারিংসটি অপসারিত করার প্রয়োজন হয় না, তবুও অনেক বয়স্ক ব্যক্তি এই অস্ত্রোপচার করাতে ভয় পান। স্বাভাবিক স্বরযন্ত্রের পরিবর্তে জটিল একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হয়তো কথা বলতে কষ্ট হবে, অথবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর পাওয়া যাবে না, এই ভয়ে তাঁরা অস্ত্রোপচারে সহজে রাজী হতে চান না। অস্ত্রোপচার ক'রে যাদের স্বরযন্ত্র অপসারিত করা হয়েছে, অধ্যাপক লেইচার তাঁদের জন্যও একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনি এমন একটা বৈদ্যুতিক স্বরযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যা দিয়ে কিছুদিন পর এই রকম ব্যক্তিও স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে পারবেন। এই জর্মান গবেষক যে বিবরণী দিয়েছেন সেই অনুযায়ী, ১৯৬২ সালে এই নতুন বৈদ্যুতিক ল্যারিংস পাওয়া যাবে এবং কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে যাঁরা মনোকষ্টে কাল অতিবাহিত করছেন, তাঁরা আবার স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবেন।

প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার

দক্ষিণ বুলগেরিয়ার প্লোভিড জেলায় গোর্ণেস্লিভ গ্রামের কাছে এক ক্ষেতে লাঙল চালাবার সময় সেখানকার সমবায় খামারের কৃষকরা বেশ একটি বড়ো রকমের মুদ্রা-ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে। কৃষকরা মাটি খুঁড়ে চোঙার আকারের যে তামার পাত্রটি পায়, তার মধ্যে বাইজানটাইন আমলের ৭৮৬টি স্বর্ণমুদ্রা (মোট ওজন ৩,৩৬০ কিলোগ্রাম) আবিষ্কৃত হয়েছে।

সবগুলি মুদ্রাই একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন বাইজানটাইন সম্রাটদের রাজত্বকালে মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রাগুলি অসমানভাবে গোলাকার; সেগুলির ব্যাস ছিল তিন থেকে চার সেন্টিমিটার এবং প্রত্যেকটি মুদ্রার ওজন চার থেকে পাঁচ 'গ্রাম'। মুদ্রাগুলির একপিঠে ২য় সম্রাটের একক মূর্তি অথবা পবিত্র মেরীমাতার মূর্তি সহ সম্রাটের মূর্তি অঙ্কিত আছে। সম্রাটের এক হাতে একটি গ্লোব এবং অন্য হাতে একটি 'ক্রশ'। মুদ্রাগুলির অপর পিঠে "রাজাধিরাজ" বেশে সিংহাসনে আসীন যীশুর মূর্তি। মুদ্রাগুলির উপর অঙ্কিত অক্ষরগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, মুদ্রাগুলি ১৮ থেকে ২০ ক্যারেট সোনার এবং সেগুলিতে সামান্য রূপার খাদ মেশানো আছে।

পশ্চিম জর্মানীর ওয়াইসব্যাডেন শহরের উষ্ণ জলপ্রপাত বাত, গেঁটেবাত ও সায়াটিকা বেদনার আরোগ্য ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত। কেবলমাত্র জর্মানীর লোকেই নয়, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ঐসব রোগে আক্রান্তরা এখানে আসে। ১৫২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের উত্তাপযুক্ত এই খনিজ জলকে আধুনিক যন্ত্রের সহায়তায় প্রয়োজনমতো কম তাপে নামিয়ে আনা যায়। ওখানকার অনেক হোটেলের স্নানাগারে এই জল পাইপের সাহায্যে পৌঁছে দেবারও ব্যবস্থা আছে। ছবিতে সম্রাট ফ্রেডেরিক স্নানাগারে রোমীয়-আইরিশ অংশে স্নানের একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে

সন্দেহ নেই যে এই মুদ্রাগুলি বুলগেরিয়ায় বাইজানটাইন শাসনের আমলে কোন ধনী সামন্তের সম্পত্তি ছিল। হয়তো দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দ্বিতীয় বুলগেরীয় রাজ্যের মুক্তিসেনাদের ভয়ে মাটির নীচে ভাণ্ডার গোপন করে সেই সামন্ত প্রভুটি অতি দ্রুত ঐ এলাকা ছেড়ে সরে পড়েন।

সামন্ত যুগের অর্থনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থা অধ্যয়নের পক্ষে নবাবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রা ভাণ্ডার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪৪ টন ওজনের জাহাজের প্রপেলার

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারত নৌ-চালনায় দক্ষ। বর্তমান যুগেও আমরা, আমাদের জাহাজ নির্মাণের শিল্পকে দ্রুত সম্প্রসারিত করছি। বিশাখাপত্তনমে তৈরী জাহাজ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে জলে ভাসানো হয় এবং সেই ছবি যখন [illegible] পৃষ্ঠায় দেখি, তখন এই [illegible] জন্য আমরা গর্ব [illegible] ছবিতে আমরা [illegible] দিকটাই দেখতে পাই। [illegible]

প্রধান অংশ-প্রপেলারটি জলের নীচেই থাকে। এই প্রপেলারের ওপরেই জাহাজের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

সম্প্রতি হামবুর্গে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রপেলারটি ঢালাই করা হয়। এটির ওজন হল ৪৪ টন এবং ব্যাস হল প্রায় ২৬ ফিট। তামা, এ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানীজের একটি বিশেষ মিশ্রণে তৈরী করার ক্ষেত্রে এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কারখানা। প্রায় একশো বছর পূর্বে এই কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারখানায় মোটর বোটের ক্ষুদ্রতম প্রপেলার থেকে বিরাট মালবাহী ও তৈলবাহী জাহাজেরও প্রপেলার তৈরী করা হয়। বিপুল পরিশ্রমে অত্যন্ত নির্ভুলতার সঙ্গে প্রপেলার তৈরী করতে হয়। পৃথিবীর যে কোন জাহাজ নির্মাণ কারখানায় যে জাহাজই তৈরী করা হোক, তার প্রত্যেকটির জন্য পৃথক প্রপেলার প্রয়োজন। প্রত্যেকটি নক্সা তৈরী করার সময় জলস্রোতের গতি এবং জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভুলভাবে স্থির করতে হয়। হামবুর্গের কারখানাটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করে।

নতুন কোন প্রপেলারের নক্সা আঁকা সম্পূর্ণ হলে, অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীরা ঢালাই-য়ের জন্য ধাতু মিশ্রণ তৈরী করে। অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই মিশ্রণ সর্বক্ষণ পরীক্ষা করা হয়। এগুলি এমন সতর্কতার সঙ্গে ঢালাই করা হয় যাতে মাপের এক মিলিমিটারের ভগ্নাংশেরও কম বেশী না হয়।

ঢালাই হয়ে যাওয়ার পর এগুলি, বিশেষ যন্ত্র দিয়ে আবার পালিশ করা হয়। ৪৪ টনের মতো বিপুল আকারের প্রপেলার তৈরী করতে, নক্সা আঁকার পর, ডেলিভারী দেওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজে দু মাস সময় লাগে।

হামবুর্গের এই কারখানাটি বিশ্বের সমস্ত জাহাজ নির্মাণ কারখানার জন্য সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে। এই কারখানার মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়। বর্তমানে সমুদ্রগামী প্রায় প্রতি চতুর্থ জাহাজটির প্রপেলার জার্মানীতে তৈরী হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে বিদেশী জাহাজ মালিক, বিদেশের কোন জাহাজ নির্মাণ কারখানায় জাহাজ তৈরী করার অর্ডার দিয়েও বিশেষ করে জার্মানীতেই প্রপেলার তৈরী করতে দেন। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের গতি তথা জাহাজের ভাগ্য ভালো প্রপেলারের ওপর নির্ভর করে।

জাহাজের প্রপেলার বা পাখা একই মাপে পর্যায়ক্রমে তৈরী করা যায় না, কারণ দুটি জাহাজ কখনও একই রকম হয় না। একই জাহাজ নির্মাণ কারখানায় পর পর দুটি জাহাজ তৈরী করলেও সেগুলি এক মাপের হয় না। প্রত্যেকটি হালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে কাজেই অতি সতর্কতার সঙ্গে অংক কষে উপযুক্ত আকারের পাখা লাগাতে হয়। এক মিলিমিটারের ভগ্নাংশের বিচ্যুতিতেও জাহাজ চালানোর খরচ বেড়ে যেতে পারে, ফলে জাহাজ মালিকের হিসাবেও গরমিল হয়ে যাবে। উপকূলভাগে চলাচলকারী ছোট জাহাজ এবং মহাসমুদ্রে চলাচলকারী বিরাট জাহাজ, উভয় ক্ষেত্রেই এই সমস্যাগুলির নির্ভুল সমাধান হওয়া প্রয়োজন। গত একশো বছর ধরে বিশ্বের সমস্ত সমুদ্রে অসংখ্য জাহাজ, হামবুর্গে তৈরী প্রপেলারের সাহায্যে নির্ভয়ে চলাচল করছে।

শ্রুতলিপি নেওয়ার বেতার সেট

পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত টেলি-ফাংকেন কোম্পানী, অফিসের সেক্রেটারী-গণের জন্য এক ধরণের বেতারগ্রাহক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এখন আর ডিক্টেটিং মেসিনে ইয়ারফোন লাগানোর প্রয়োজন হবে না। একটি ব্যাটারিসহ ছোট একটি ট্রানজিস্-টার রিসিভার সেই কাজ করবে। সেক্রেটারী তাঁর পোষাকের ওপর এই বেতার গ্রাহক যন্ত্রটি পরিধান করবেন। নীচে নামিয়ে রাখলে এটি নিজের থেকেই সুইচ অফ্ করে নেবে। ডিক্টেটিং মেসিনের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি এরিয়েল টাইপরাইটারের কাছেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখান থেকে শ্রুতলিপি প্রচারিত হয়ে গ্রাহক সেটে যাবে। সেক্রেটারী তাঁর ইয়ারফোন কানে রেখে যে কোন সময়ে উঠে অন্যত্র যেতে পারবেন।

'লেবেডেফ চর্চার নূতন পর্ব'

ভবতোষ দত্ত

গত ১৮ই নভেম্বর ১৯৬১-র 'দেশ' পত্রিকায় অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় 'লেবেডেফ চর্চার নূতন পর্ব' নামে একটি বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক লেবেডেফ চর্চার একটি ধারাবাহিক ইতিহাসও দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ষোলোটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত গেরাসিম (অথবা হেরাসিম) লেবেডেফ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল খুবই সামান্য। অধ্যাপক দাশগুপ্ত মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এঁর সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করে আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর এই প্রবন্ধটি এ বিষয়ে তাঁর সর্বশেষ অনুসন্ধানের ফল।

গেরাসিম লেবেডেফ একজন রুশ পর্যটক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি লন্ডন থেকে মাদ্রাজে আসেন। সেখান থেকে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন। সেখানে তিনি নিজের পয়সায় রঙ্গালয় স্থাপন করে দুটি ইংরেজী নাটকের বাংলায় অভিনয় করেন। আমাদের দেশে এই প্রথম রঙ্গমঞ্চ প্রবর্তিত হয় এবং সেই হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর একটা স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। বারো বৎসর নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ভারতবর্ষে কাটিয়ে লেবেডেফ লন্ডনে ফিরে যান। লন্ডন থেকে একটি হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। পরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লেনিনগ্রাদ (তখনকার সেন্টপিটার্সবার্গ) থেকে "পূর্ব ভারতের সমাজব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এই বইটির কিছু নমুনা 'লেবেডেফ চর্চার নূতন পর্বে' দিয়েছেন।

এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রবাবু জানিয়েছেন, রাশিয়ায় লেবেডেফের অনেক কাগজপত্র অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই কাগজপত্রের মধ্যে আছে লেবেডেফকৃত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রুশ ভাষায় অনুবাদ, তাঁর বাংলা অভিধান, একটি বাংলা কথোপকথনের গ্রন্থ, বীজগণিত সম্বন্ধে গ্রন্থ, বাংলা পাঞ্জিকা এবং সংস্কৃত বাংলা ও হিন্দুস্থানীর এক শব্দসংগ্রহ। এসব কাগজপত্র রাশিয়ার কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রবাবু আরও বলেছেন Soviet Academy of science-এর ১৯৫৬ সালের Istoricheskiy Arkhiv পত্রিকায় K A Antonova এই কাগজপত্রগুলির এক বিবরণ প্রকাশ করেছেন। লেবেডেফের এই পাণ্ডুলিপি থেকে বুঝতে পারা যায় কোনো কোন বিষয়ে তিনি উইলিয়ম কেরীরও পূর্বসূরী ছিলেন।

এতদিন পর্যন্ত লেবেডেফ সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানতাম সবই মূলত ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে প্রকাশিত লেবেডেফের The Grammer of the Pure and Mixed East Indian Dialects. এর ভূমিকা থেকেই প্রাপ্ত। কিন্তু এবার রবীন্দ্রবাবু লেবেডেফের নবাবিষ্কৃত কাগজপত্রের মধ্যে ১৭৯৭ সালে ইংরেজীতে লেখা প্রায় ৩০ হাজার শব্দের এক memorandum-এর সংবাদ দিয়েছেন। সেটা অত্যন্ত মূল্যবান। এতে লেবেডেফ তাঁর ইংলন্ড থেকে ভারতবর্ষে আসার কাহিনী এবং ভারতবর্ষে অবস্থানকালীন নানা অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। এতে অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৫৬তে K A Antonova-র প্রবন্ধ প্রকাশের আগেই রাশিয়ায় আবিষ্কৃত লেবেডেফের এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বের সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি অধ্যাপক দাশগুপ্তের চোখে পড়েছিল কিনা জানি না। চোখে পড়বার কথা নয়, কারণ গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী করে সংবাদটি পরিবেশিত হয়নি। ভারতস্থ তাস প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ডি এ্যাকিমফ কর্তৃক ২৫নং বারখাম্বা রোড নিউ দিল্লী হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'সোবিয়েৎ দেশ' নং ২০, ২৫এ অক্টোবর ১৯৫৫-এর সংখ্যায় 'একটি ভারতীয় গ্রন্থের ইতিকথা' নামে একটা বিবরণমূলক রচনা বেরিয়েছিল। লেবেডেফের অসম্পূর্ণ বিদ্যাসুন্দরের বর্ণনা দেওয়া এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনার বিবরণও অতি সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে। এই বিবরণ সম্ভবত রবীন্দ্রবাবু উল্লিখিত memorandum থেকেই দেওয়া হয়েছে। লেবেডেফের বিদ্যাসুন্দর মুদ্রিত হয়নি: অনুবাদটি বিরাট এবং অসম্পূর্ণ। উল্লেখযোগ্য এই যে, লেবেডেফ যে বিদ্যাসুন্দর পড়েছেন তার প্রমাণ ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছে। তাঁর The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialect গ্রন্থের নামপত্রে ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে উদ্ধৃতি আছে। এই নামপত্রের ছবিটি রবীন্দ্রবাবু ১৯৪৮-এ Hindusthan Standard পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 'সোবিয়েৎ দেশ' পত্রিকায় বিদ্যাসুন্দর ও লেবেডেফ সম্পর্কিত অন্যান্য যে বিবরণ বেরিয়েছিল, তার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধৃত করছি। পাঠক দেখবেন আমাদের দেশে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সঙ্গে লেবেডেফের কাহিনীর কিছু কিছু অনৈক্য আছে।

"...যে বর্ণমালায় সেই পাণ্ডুলিপিটি লিখিত তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। প্রতিটি শব্দের নিচে শব্দটির উচ্চারণ ও অর্থ যে ধরনের রুশ ভাষায় লিখিত তাহা প্রচলিত ছিল ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। কিন্তু রহস্যের চাবিকাঠি পাওয়া গেল রুশ ভাষায় লিখিত একটি বাক্যের মধ্যে:—"এই বইটির নাম 'বিদ্যাসুন্দর' (সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্যা' ও 'সুন্দর' শব্দ দুইটির অর্থ দেওয়া হইয়াছে)। বর্ধমানরাজ বীরসিংহের অনুরোধে ভারতচন্দ্র রায় নামে এক ব্রাহ্মণ রাজকন্যা বিদ্যার সুন্দর নামে এক যুবকের সহিত বিবাহ উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেন। রুশ নাগরিক গেরাসিম লেবেদেফ কর্তৃক কলিকাতায় লিখিত ও অনূদিত।"...

এর প্রথমে ভারতবর্ষে লেবেডেফের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। তারপর—

"কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি "বিদ্যাসুন্দরের" কাব্যটি লিখিয়া লন এবং নাটকের সময়ে সঙ্গীত ব্যবহার করিবার জন্য বিদ্যাসুন্দরের কোন কোন অংশ কাজে লাগান। পাণ্ডুলিপিটি এক বিরাট গ্রন্থের আকার লইয়াছে। সেই বৈজ্ঞানিক ও সঙ্গীত-শিল্পী যখন যেখানে গিয়াছেন বইখানি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার কাছছাড়া হয় নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি সেটিকে স্বদেশে লইয়া আসেন। সম্ভবত ১৮শ শতাব্দীর এই ভারতীয় কাব্যটির রুশ তর্জমা সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় কারণ

শেষের দিকের পৃষ্ঠাগুলিতে শব্দসমূহের নিচে অর্থ ও উচ্চারণ লিখিত হয় নাই।...

এক প্রণয়ীযুগলকে লইয়া কাব্যের কাহিনী। প্রেমের জন্য তাহারা চিরাচরিত আচারবিচার অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত। মনে হয় বর্ধমান শহরের কোন একটি আসল ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনা করেন। স্থানীয় রাজা বীরসিংহের সুন্দরী কন্যা বিদ্যা পিতাকে কহিল যে এমন লোককে সে বিবাহ করিবে যে তাহাকে তর্কে পরাজিত করিতে পারিবে। এই কথা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। তখন কাঞ্চীপুরের রাজপুত্র গোপনে বর্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে সুন্দর কবিতা রচনায় নিপুণ। হীরা মালিনী মুখরা রমণী বলিয়া তাহার নাম হীরা রাখা হয়। যুবককে দেখিয়া স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল। তারপর হীরা যখন বিদ্যাকে তাহার সুপুরুষ অতিথির কথা বলিল তখন বিদ্যা তাহাকে দেখিতে চাহিল। এক সুড়ঙ্গ পথে রাজকুমার হীরার বাসা হইতে প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বিদ্যা এবং তাহার দাসীদের সহিত কবিতার ছন্দে কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিল। বাগ্‌-যুদ্ধে হার মানিয়া বিদ্যা সুন্দরের কণ্ঠে মালা দিয়া তাহার সহধর্মিণী হইবার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বিদ্যার পিতামাতা যখন সেই প্রণয়ের কথা জানিতে পারিলেন তখনই প্রহরীদের রাজপুত্র কালুসিংহকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন কারণ সে তাঁহার বংশের অপমান করিয়াছে। নারীর ছদ্মবেশে কালু-সিংহ যখন সুড়ঙ্গ হইতে বিদ্যার ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন প্রহরীরা তখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। কিন্তু বীরসিংহ এবং বর্ধমানের নাগরিকরা যুবকের সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বিদ্যা তাহার চেয়ে সুন্দর স্বামী কোথায় পাইবে? তথাপি আইনানুসারে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল। শেষ মুহূর্তে কাঞ্চীপুর হইতে এক দূত আসিয়া হাজির। সে রাজকুমারের আসল পরিচয় প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিল যে বীরসিংহের কন্যাকে পুত্রবধূ হিসাবে পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া কাঞ্চীপুরের রাজা বীরসিংহের কাছে লোক পাঠাইতেছেন। বীরসিংহ রাজকুমারকে অব্যাহতি দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কাব্যের শেষাংশে নবদম্পতির প্রণয়সুখের বর্ণনা করা হইয়াছে।

কবি ভারতচন্দ্র রায় (নায়ক নায়িকার কথোপকথন এবং তাহাদের সহিত কবির নিজের কথাবার্তা) কবিতা রচনায় সংলাপের সাহায্য লইয়াছেন। ফলে কাহিনীটি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং জনসাধারণের প্রতি নিজের সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন এবং সেখানেই কবির কৃতিত্ব।..."

প্রবন্ধ-সাহিত্য

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র—ভবতোষ দত্ত। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ঃ ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম ৬·০০ টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁসকে চিনতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাজগতের সন্ধান নেওয়াই যে একটি প্রধান কর্তব্য আজকের সংস্কৃতিপরায়ণ বাংলাদেশের এ কথাটি একান্তভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত এ-দিক থেকে পথিকৃৎ নন, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে নানা দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্বীতার যে পরিচয় উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন তিনি, তা অনুসন্ধিৎসু এবং গবেষণাপ্রবণ পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে অবশ্যই স্বীকৃত হবে।

বলাই বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র গত শতাব্দীর একজন বিস্ময়কর সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল সমাজ সংস্কারক। কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় কিছুর মতো তাঁরও অভ্যুদয়ের ও অস্তিত্বের কারণ আছে—যা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন, ইতিহাসসম্মত প্রাঞ্জল বিশ্লেষণধারায় ভবতোষ দত্ত বঙ্কিমমানসের সেই উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তার ফলে, কখনও কখনও এমনও মনে হতে পারে, এই উৎসসন্ধানের জন্য যে ব্যাপক আলোচনার অবতারণা করেছেন লেখক তাতে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দূরে সরে গেছেন। তার জন্য লেখককে দায়ী করা অবশ্যই নিরর্থক হবে। কেননা, মনে রাখতে হবে, এ-গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্বিতা বা মননশীলতা হলেও শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহুশতাব্দীবাহী ঐতিহ্যের ধারাশ্রয়ী নন। অন্যপক্ষে সাধারণের বিশ্বাসমতো তিনি কায়মনোপ্রাণে ইংরেজী সভ্যতারও বাঙালী প্রতীক ছিলেন না। এ-কথা যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও তেমনি সত্য। কিন্তু এ দুই-এর মধ্যেও অমিল ছিল প্রত্যক্ষ। সুতরাং কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার নিকষে তাঁর মননের বিচার করতে গেলে তাতে লেখককে অবশ্যই প্রচলিত সংস্কারের ফাঁদে পড়তে হতো। কিন্তু লেখকের ইতিহাসচেতনা তাঁকে সেই অপঘাত থেকে রক্ষা করেছে। কী অসীম স্থৈর্য ও নিরলস অধ্যবসায়ে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় সব উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তা বিস্ময়ের বিষয় হলেও পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না যে লেখক কোথাও তাঁর বিষয়ের সীমাকে লঙ্ঘন করেন নি। গবেষকসুলভ পাণ্ডিত্য সমগ্র গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তা অতিরিক্ত সাজসজ্জার মতো প্রত্যক্ষ প্রকট হয়ে ফুটে ওঠেনি। যে উপাদানকে আশ্রয় করে প্রথম দুটি প্রবন্ধ 'বঙ্কিম মনীষার উন্মেষ' এবং 'বঙ্কিম যুগের মননসাধনা' রচিত হয়েছে, সে উপাদানেরই পুনরুক্তিতে সহজে গড়ে উঠতে পারতো পরবর্তী আরো অন্তত দুটি প্রবন্ধ। কিন্তু লেখক পাঠককে যেমন ফাঁকি দিতে চান নি, তেমনি নিজেকেও ফাঁকি দেন নি। আসল কথা, তাঁর আসল উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন চেহারায় দেখাতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি তাঁকে নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি লেখক অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু অন্তহীন শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁকে তিনি দেবতা করে তোলেন নি। যুক্তি এবং বুদ্ধির আঘাতে বঙ্কিমের আদর্শ ও বিশ্বাসকে বারবার পরীক্ষা করতেও তাই লেখকের বাধেনি। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্ত্য মনীষা' থেকে পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধেই তার প্রমাণ মেলে। পরিমিতি বোধ একজন লেখককে বিশেষত একজন সমালোচককে কেমন করে চরম পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েও তাঁকে অবিচলিত রাখতে পারে তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি। ইতিহাসের সত্যকে অবিকৃত রেখে সমান শ্রদ্ধায় দুটি অনন্যসাধারণ মনস্বীর তুলনামূলক বিচার কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভবতোষ দত্তের কৃতিত্ব এইখানে যে সে-আলোচনায় তিনি এতখানি

সার্থক হয়েছেন যে, তাঁর আলোচনার আলোতে শুধুই বঙ্কিমচন্দ্রই নন, সে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও আধুনিক কালের বাঙালী সমাজের কাছে নতুন রূপে উদ্ভাসিত হবেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে এ প্রবন্ধটি বাঙালীমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য বলে মনে করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা সম্পর্কে ভিন্ন কোনো আলোচনার অবতারণা করেননি লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত চিন্তাশীল সাহিত্যিক হলেও সে সাহিত্যের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর সমাজসংস্কারকের রূপ। বিভিন্ন প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা থাকলেও মূল উদ্দেশ্য নয় বলে তা কোথাও দানা বাঁধেনি। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে লেখককে এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে অনুরোধ জানাই। ৩৬৪।৬১

কবিতা-সংকলন

শতাব্দী শতক। সম্পাদনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিরণশংকর সেনগুপ্ত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম ৪৲।

রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী উৎসবের পটভূমিকায় যত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আলোচ্য সংকলনটি বিশেষ করে কাব্যরসিকজনের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করবে। কারণ গত এক শ' বছরের এক শ'জন কবির এক শ'টি কবিতার সংকলন এটি। এবং এ ধরনের বইতে যে ধরনের ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী, কোনো বিশেষ কবি বা কবিতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সম্বন্ধে পাঠকদের মনে যে অসন্তোষ জাগা স্বাভাবিক, সে সমস্ত স্বীকার করে নিয়েও বলা যেতে পারে যে, সম্পাদকরা তাঁদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছেন। বাংলা কাব্যধারার বিচিত্র গতি, ভাবরূপের বহুমুখী বিকাশ, ভাষা ও ছন্দের বিন্যাসে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার চিহ্ন এই সংকলনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলা কাব্যের প্রাচুর্যৈশ্বর্যের সম্বন্ধে পাঠকদের অবহিত করে দেওয়া একটা মহৎ কাজ এবং কবিগুরুর পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা সে বিষয়ে সন্দেহ কী। ৩১৪।৬১

উপন্যাস

বসন্তরজনী। শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী। সেকাল ও একাল। ৭ টেমার লেন, কলিকাতা—৯। দাম ২৲।

বসন্তরজনীর আহ্বান প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একদিন আসে। একটি বিশেষ ক্ষণে মনে জোয়ার ওঠে। আবেগ-তরঙ্গের পরিধি দেহকে আপ্লুত করে আরো ছাড়িয়ে যায়। সাধারণত প্রজাপতির আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েই এই ডাকে সাড়া দেয় সাধারণ মানুষে। কিন্তু প্রচলিত ছকের বাইরে যারা, তারা?

এমনিধারা কয়েকটি চরিত্রকে আশ্রয় করে লেখক তাঁর গল্পের সিঁড়ি বানিয়েছেন। মৃত্যুপথযাত্রী অজয়, বৈষ্ণবী রাধা, স্বামী-ত্যক্তা টুলু, আর কাহিনীর সূত্রধার মৃণাল। অজয়ের মৃত্যুর পর টুলু এবং রাধা দুজনেই আশ্রয় নিল মৃণালের কাছে। তাকে গভীরভাবে ভালোবেসেও একজন শেষ পর্যন্ত চলে গেল। দূরে। সম্ভবত ভালো না বেসেও অন্যজন তার বাহুবন্ধনে দিল ধরা। এটুকুই গল্প। কোনো বড় সামাজিক সমস্যার বর্ণনা নয়। একটি বিশেষ পরিবেশে প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়া কয়েকটি মানুষের কামনা বাসনা সুখ-দুঃখের বর্ণনা মাত্র। এদের সঙ্গে একাত্মবোধ অসম্ভব। আবার তাদের উপেক্ষা করাও চলে না। সম্ভবত লেখকের অভিপ্রায়ও তাই, এবং সেইখানেই তাঁর লেখনীর সফলতা। ৩৮৩।৬১

চা মাটি মানুষ—বীরেশ্বর বসু। কথা-মালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম ৫·০০।

বাংলা সাহিত্যের সীমার ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাস নগরজীবন অতিক্রম করিয়া সুদূর পল্লীগ্রামে এবং সেখান হইতে অনেক অজানা অচেনা পরিবেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসখানিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। চা আমাদের প্রিয় পানীয়, অথচ এর উৎপত্তিস্থলে প্রকৃতপক্ষে যাহাদের শ্রমে এই শিল্পের ভিত্তি তাহাদের কথা আমাদের অজানা। বীরেশ্বর বসু সুদীর্ঘ তিন খণ্ডে চা-শ্রমিক-জীবনের আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এ উপন্যাসের আলোচ্য খণ্ডটি শেষ অংশ। পূর্ব খণ্ডগুলিতে যে সব চরিত্র কোন পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, এই খণ্ডে লেখক প্রত্যেকটি চরিত্রকে নিয়তি নির্ধারিত পরিণতিতে সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভাও-নাথের চরিত্রটি একটি বিশিষ্ট আদর্শ চরিত্র হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনীর নানা স্থানে লেখক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য লইতে চাহিয়াছেন সত্য কিন্তু তাহা আরও সুপ্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কাহিনীটি

আগাগোড়া নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় হইয়াছে।

৪২৯।৬১

রম্যরচনা

ঈশান কোণের মেঘ—উর্বশী। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড পরিবেশিত। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা সাহিত্যের আসরে স্বাভাবিক কারণেই নতুন আগন্তুকের অসদ্ভাব নেই, তবে লক্ষণীয় এই যে, এর ভেতরে প্রথম পদক্ষেপে সার্থক রচনার স্বাক্ষর রাখতে পারছেন অজস্রের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক; বলা যেতে পারে সামান্য কেউ কেউ। 'ঈশান কোণের মেঘ'-এর লেখিকা 'উর্বশী'-ও সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে নবাগতা; সুখের কথা তাঁর প্রথম রচনায় আন্তরিকতার উত্তাপ এবং বক্তব্যপ্রকাশে হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিক লেখিকার বলিষ্ঠ ভাবনার পক্ষ সমর্থন করে।

কোনো এক সময়ে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে কোনো একজন রূপিণী হাসপাতালে যান। সেখানে রোগমুক্তির সাথে সেই রূপিণীর জীবন-দর্শন হয়েছিল। তারই প্রতিফলন আলোচ্য গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। বিচিত্র আখ্যান এবং চরিত্রসমষ্টিতে কাহিনী বিস্তার লাভ করলেও আলোচ্য গ্রন্থটি কিন্তু উপন্যাস বা নিছক গল্প-পর্যায়ভুক্ত নয়। হাসপাতালের অনাত্মীয় পরিবেশে লেখিকা মনের দর্পণে অনেক মুখের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, রমণীয় পরি-বেশনের ভঙ্গিতে সেই সব নানা মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন করে তাদের দুঃখ সুখ বিচিত্র-জটিল জীবনবোধ খুঁজিয়েছেন; প্রসঙ্গত তিনি সমাজ সংস্কৃতি নীতিবোধের নানা সমস্যারই অবতারণা করেছেন কিন্তু বিচিত্র চরিত্রমুখের গতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারায় তা কখনো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। চরিত্রগুলির মধ্যে [illegible], [illegible], মিসেস [illegible] পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থসজ্জা শোভন।

৮৫০।৬১

বিবিধ

ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস—অরুণ ঘোষ। এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, ২৬এ, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯। দাম পাঁচ টাকা।

ইংরেজী শিক্ষা ও শিক্ষণ রীতিপদ্ধতির প্রভাব আমাদের দেশে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সরাসরি ইংলণ্ড থেকেই আমদানী। ১৯৪৪ সালের পর থেকে ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘকাল পরেও আমাদের দেশের অচলায়তনের সর্বাঙ্গীণ ভাঙাগড়া তো হয়ই নি, পরন্তু আমরা অনেক পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছি। এর প্রতিকার যেমন একদিকে দেশের কর্ণধারদের হাতে, তেমনি অন্যদিকে দেশের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ওপরেও নির্ভর করছে।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক পনেরটি অধ্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন, মাধ্যম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ত্রিধারা, অধিকতর শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা, শিক্ষা আইন, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পরিশাসন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এবং তারপরে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের শিক্ষাধারা একটি সমগ্র ছবি ধরে দিতে চেষ্টা করেছেন লেখক। এটা অবশ্য ঠিকই যে আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির স্বরূপ জানতে হলে পূর্ব-রূপ ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাস আমাদের জানা প্রয়োজন। এই গ্রন্থের সেখানেই সার্থকতা। মুদ্রণপ্রমাদ অনেক।

৫২৩।৬১

সরল গীতা—শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। পি কে ঘোষ অ্যাণ্ড কোং, ৫এ অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা-৪। মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তিকাখানি মূল গ্রন্থের সহজ এবং সরল বাংলা অনুবাদ। গীতার প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে সকলকে পরিচিত হইবার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারের এই উদ্যম প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থকার এই কার্যে সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

৪৫৪।৬১

কবিগুরু স্মরণে—সম্পাদক শ্রীপ্রদ্যোৎ-কুমার ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, কলিকাতার কতিপয় ছাত্র কর্তৃক পরি-বেশিত। শিল্পায়ন, ১৯০, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

কবিশেখর কালিদাস রায়, অধ্যাপক [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক [illegible] বসু, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণের কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতা আলোচ্য সংখ্যাখানির উপজীব্য। রচনাগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও ভাবগাম্ভীর্যে অতুলনীয়।

প্রাপ্তিস্বীকার

বঞ্চনার রাজত্ব, কংগ্রেস শাসনের পনের বছর।

প্রতিধ্বনি ফেরে—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

চণক-সংহিতা—কালিদাস রায়।

ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীপ্রভাত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিরামিডের মাথায় মানুষ—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়।

জাগর দীপ—অঞ্জলি বসু।

গান গেয়ে যাই—ভবেশ দত্ত।

শেষ অভিসার—সুদীন চট্টোপাধ্যায়।

আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয়—প্যাট্রিস লুমুম্বা। অনুবাদক আজাদ সুলতান।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা—বি. জে. পি. উডস।

আন্তর্জাতিক যুব উৎসব—পিটার হালাস্। অনুবাদক বাণী দাশ ও দীপক গুহরায়।

আধুনিক কালের বিপ্লব—হিউ সেটন ওয়াটসন। অনুবাদক কৃষ্ণগোপাল চট্টো-পাধ্যায়।

আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ — আলফ্রেড জুবোরম্যান।

আর কমরেড নই—আণ্ডর হেলার। অনুবাদক অমলেন্দু দাশগুপ্ত।

রাশিয়ার ভবিষ্যৎ—লিওনার্ড সেপিরো। অনুবাদক জগদানন্দ বাজপাই।

দেশোন্নয়নে গণতন্ত্র—অমলেন্দু দাশ-গুপ্ত।

চরিত্র-চিত্র—বিপিনচন্দ্র পাল।

চন্দ্রশেখর

বাংলা ছবির খতিয়ান

১৯৬০ সালের মত এ বছরেও নতুন বাংলা ছবির সংখ্যা নিম্নাভিমুখী। ১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির সংখ্যা চৌত্রিশ। অর্থাৎ আগের বছরের চেয়ে দু'খানি কম। ১৯৫৯ সালে এই সংখ্যা ছিল একচল্লিশ, তার আগের বছরেও তাই। আরো আগে গড়ে পঞ্চাশখানি করে নতুন বাংলা ছবি মুক্তি পেত প্রতি বছরে। প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা কিছু কিছু বাড়ছে বটে, কিন্তু বাংলা ছবির মুক্তির পথ তাতে সুগম হয়নি। ওপরের তালিকাই তার প্রমাণ।

গত বছরে কয়েকটি ছবি দীর্ঘদিন ধরে চলবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ("ক্ষুধিত পাষাণ" ৫৭ সপ্তাহ, "মায়ামৃগ" ৫০ সপ্তাহ)। এ বছরে কোন ছবিই তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে নি। ১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির তালিকা নীচে দেওয়া হল তাদের সম্মিলিত প্রদর্শনীর দৈর্ঘ্যানুক্রমেঃ—

স্বরলিপি (৩৮ সপ্তাহ), মানিক (৩৭ সপ্তাহ), ঝিন্দের বন্দী (৩৩ সপ্তাহ), দুই ভাই (৩১ সপ্তাহ এবং এখনও চলছে), সপ্তপদী (অনুরূপ), তিন কন্যা (২৯ সপ্তাহ), অগ্নিসংস্কার (২৭ সপ্তাহ), বিষকন্যা (অনুরূপ), কেরী সাহেবের মুন্সী (২৬ সপ্তাহ), কাঞ্চনমূল্য (২৪ সপ্তাহ), আশায় বাঁধিনু ঘর (২১ সপ্তাহ), কঠিন মায়া (অনুরূপ), মধ্যরাতের তারা (অনুরূপ), পুনশ্চ (২০ সপ্তাহ), পঙ্ক-তিলক (১৯ সপ্তাহ), সাধক কমলাকান্ত (অনুরূপ), মা (অনুরূপ এবং এখনও চলছে), মিস্টার অ্যান্ড মিসেস চৌধুরী (১৮ সপ্তাহ), রায়বাহাদুর (অনুরূপ), সাথীহারা (অনুরূপ), স্বয়ম্বরা (১৬ সপ্তাহ), ডাইনী (১৫ সপ্তাহ), নেকলেস (অনুরূপ), সন্ধ্যা-রাগ (১৩ সপ্তাহ এবং এখনও চলছে), আহ্বান (১১ সপ্তাহ), কানামাছি (১০ সপ্তাহ এবং এখনও চলছে), দিল্লি থেকে কলকাতা (১০ সপ্তাহ), মেঘ (অনুরূপ), আজ কাল পরশু (৯ সপ্তাহ), কোমল গান্ধার (৮ সপ্তাহ), মিথুনলগ্ন (৭ সপ্তাহ), ইঙ্গিত (৬ সপ্তাহ), মধুরেণ (৪ সপ্তাহ) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ (৪ সপ্তাহ)।

প্রতি ছবির সঙ্গে যে সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে তা কলকাতার মুক্তিগৃহগুলিতে সম্মিলিত প্রদর্শনের যোগফল। এ থেকে ছবিগুলির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

লেখকদের মধ্যে শৈলেশ দে এ বছরে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। কারণ তাঁর তিনটি গল্পের চিত্ররূপ মুক্তি পেয়েছে গত বারো মাসে। রবীন্দ্রনাথ ও ঋত্বিক ঘটক দুটি করে ছবির কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। "তিন কন্যা"র অন্তর্গত তিনটি কাহিনী আলাদাভাবে গুনলে অবশ্য রবীন্দ্রকাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় চার। আরো যে-সব প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা ছায়াছবির বিষয়বস্তু হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, অনুরূপা দেবী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্র-কুমার মিত্র, প্রতিভা বসু, শরদিন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায়, জরাসন্ধ, সন্তোষকুমার ঘোষ ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পরিচালকদের মধ্যে একমাত্র অসিত সেনই এ বছরে দু'খানি ছবি উপহার দিয়েছেন। আর সবাই একখানি করে। বাংলা দেশে এখন যাঁরা নাম করা, তাঁদের প্রত্যেকেরই ছবি এ বছরে মুক্তি পেয়েছে—যেমন সত্যজিৎ রায়, অগ্রদূত, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেন, অজয় কর, বিকাশ রায়, সুধীর মুখোপাধ্যায়, অসিত সেন প্রভৃতি। পুরাতন-দের মধ্যে সুশীল মজুমদার, সুকুমার দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব মিত্র, চিত্ত বসু প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

এ বছরে ছ'জন নতুন পরিচালকের সঙ্গে চিত্রামোদীদের পরিচয় ঘটেছে। তাঁদের ও তাঁদের ছবির নাম এখানে দেওয়া হলঃ উৎপল দত্ত ("মেঘ"), শ্রীজয়দ্রথ ("বিষকন্যা"), বিজলীবরন সেন ("মানিক"), ভবেন দাস ("কানামাছি"), শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ("মধুরেণ") ও শিব ভট্টাচার্য ("মিথুন-লগ্ন")।

১৯৬১ সালে অনেক নতুন শিল্পী আত্ম-প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মনে রাখবার মত অভিনয় করেছেন তন্দ্রা বর্মণ, কণিকা মজুমদার, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা দাশগুপ্ত, সুনীতা, এন বিশ্বনাথন, দীপিকা দাশ ও বঙ্কিম ঘোষ। চিত্রজগতে এঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বললে ভুল হবে না।

একাধিক শিশু শিল্পীও বিভিন্ন ছবিতে নজরে পড়বার মত কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গৌতম বন্দ্যো-পাধ্যায়, চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণাঞ্জন মিত্র ও কুনাল বসুর নাম।

এ বছরে উত্তমকুমার ছ'টি ছবিতে নায়কের

"কাঞ্চনজঙ্ঘা"র কাজ শেষ করেই সত্যজিৎ রায় অভিযাত্রিকের "অভিযান" ছবির পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন। বর্ধমান অঞ্চলে বর্তমানে এর বহির্দৃশ্য তোলা হচ্ছে।

অগ্রগামীর আগামী ছবি "কান্না"-র নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও নবাগতা নন্দিতা বসু

ভূমিকায় নেমেছেন। নায়ক ও উপনায়ক রূপে অনিল চট্টোপাধ্যায়কে সাতটি ছবিতে দেখা গেছে। সমগোত্রীয় অন্যান্য শিল্পী-দের ছবির সংখ্যা এইরকমঃ বিকাশ রায় (৮), অনুপকুমার (৮), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (৫), অসিতবরন (৪), বিশ্বজিৎ (৩), নির্মলকুমার (১)।

অভিনেত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছবিতে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও ছায়া দেবী। তাঁদের প্রত্যেকের ছবির সংখ্যা ছয়। সুচিত্রা সেন ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে মাত্র একখানি করে ছবিতে দেখা গেছে। অন্যান্যদের সংখ্যা এইরকম ঃ সন্ধ্যা রায় (৪), সন্ধ্যারাণী (৩), অনুভা গুপ্তা (৩), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (২)।

পার্শ্বচরিত্রাভিনেতা হিসাবে এ বছরেও ছবি বিশ্বাস আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা ১৩। জহর রায়ের ১১, পাহাড়ী সান্যালের ১০, তরুণ-কুমারের ৮ এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭।

সুরকারদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছ'টি ছবির সংগীত পরিচালনা করে। রবিশংকর ও আলি আকবর খাঁ প্রত্যেকে তিনটি করে, এবং কালীপদ সেন ও ভি বালসারা প্রত্যেকে দু'টি করে ছবিতে সুর যোজনা করেছেন। সত্যজিৎ রায়, বাঁশরী লাহিড়ী ও সমরেশ রায় সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বছরেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্র

(রাধামোহন ভট্টাচার্য)

আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্র উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতেছে অথবা অবনতির অধঃপাতে যাইতেছে এ প্রশ্নের নির্দ্বন্দ্ব উত্তর নাই। কোনও দেশের চলচ্চিত্র সম্বন্ধেই নাই। যেমন কোনও দেশের, সুতরাং বাংলা দেশের, সাহিত্য সম্বন্ধেও নাই। তবে নির্দ্বন্দ্ব উত্তরের অভি-মানমাত্র না রাখিয়া অধম নিবেদন করে যে, বিশ বৎসর পূর্বে গুটিকয়েক এবং আধুনিক গুটিকয়েক বাংলা চলচ্চিত্র এক আসরে উপর্যুপরি দেখিলে অধিকাংশ দর্শকই অগ্রসরণের চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। এবং তাহা শুধু চলচ্চিত্র নির্মাণের এক বা দুই দিকেই নয়, প্রায় সর্বদিকে। বিশ বা ততোধিক বৎসর পূর্বের দেখা প্রিয় কোনও একটি চলচ্চিত্রের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ফতোয়া জারি করিলে শুদ্ধ বিচার হইবে না।

বিদেশী চলচ্চিত্রের সহিত তুলনা টানিয়া অনেকে আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহাদের নাসিকা লইয়া আলোচনার ধৃষ্টতা অধমের নাই। তবে ক্ষীণ নিবেদন এই যে, এই কলিকাতা শহরে বৎসরে দেড়শত হইতে দুই শত বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যদি কোন উৎসাহী দর্শক তাহার প্রত্যেকটি দেখেন এবং বৎসরে প্রদর্শিত গড়ে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতিটি দেখেন, তাহা হইলে উভয় শ্রেণীর শতকরা কয়টি দেখিবার যোগ্য সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন। নিশ্চয় সেই শতকরা হিসাবটি বাংলা চলচ্চিত্রের বিশেষ বিপক্ষে যাইবে না। কিন্তু সেখানে সান্ত্বনা খুঁজিতে যাওয়া কূপমণ্ডূকতা। বিচার হওয়া উচিত বিদেশের এবং বাংলার সেরা চিত্রের। চল-চ্চিত্র নির্মাণের অনেকখানি অংশ যন্ত্র-নির্ভর। যন্ত্র নির্মাণে আমরা এখনও সম্পূর্ণ বিদেশনির্ভর। সুতরাং যান্ত্রিক কুশলতায় পশ্চাতে থাকা বিচিত্র নহে। সেখানে প্রতিযোগিতা সম-প্রতিযোগিতা নহে, বিষম প্রতিযোগিতা। আমরা স্পুটনিক

নির্মাণ করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকগণ অধোবদন হইয়া আছেন বলিয়া শুনি নাই। চলচ্চিত্র-নির্মাণের যান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের পশ্চাতে থাকার জন্য বিদেশী চলচ্চিত্রের নাম লইয়া গঞ্জনা দেওয়া অকরুণ। তবু তো এত অসুবিধা সত্ত্বেও একটি দুইটি বাংলা চলচ্চিত্র বহু বিদেশী শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সহিত প্রতিযোগিতার মুক্ত অঙ্গনে জয়মাল্য আনিয়াছে। শিকাছেঁড়ার গুঞ্জন যদি তুলিতে চান তাহা হইলে বলিব শিকাও অকারণে ছেঁড়ে না।

আরো অধিক সংখ্যায় উচ্চশ্রেণীর বাংলা চলচ্চিত্র হইতেছে না কেন এ প্রশ্ন অনেকে করেন। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। উত্তরে যাহা বলিবার চেষ্টা করিব তাহা অনুযোগ নহে, অভিযোগ নহে। 'দেশ' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃতি মার্জনা করিবেন—"১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী সিনেমার সংখ্যা ছিল ২৭০। তার মধ্যে মাত্র ১৭টিতে কেবলমাত্র বাংলা ছবি দেখান হত এবং ৮০টি সিনেমায় মোটেই বাংলা ছবি দেখান হত না। অন্য ৬০টি সিনেমায় মাঝে মাঝে বাংলা ছবি মুক্তি পেত বটে প্রদর্শনী সময়ের অনুপাতে বাংলা ছবির ভাগ্যে জুটত শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র সময়। বাকিগুলিতে অবশ্য প্রদর্শনী সময়ের এতখানি বৈসাদৃশ্য ঘটেনি, তবে সংখ্যায় বাংলা ছবির তুলনায় অনেক বেশী হিন্দী ছবি দেখান হত সেই সব সিনেমায়।" কলিকাতায় কমবেশী আশিটি চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র চারটিতে কেবলমাত্র বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, পনের কুড়িটিতে অন্যের সঙ্গে কিছু বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, বাকিগুলিতে আদৌ হয় না।

অন্যপক্ষে যেখানে বর্তমান বৎসরে এই পশ্চিমবঙ্গে পঁয়ত্রিশটি মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্রের মধ্যে একাধিক চিত্রগৃহে সাকুল্যে তিশ সপ্তাহের অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র পাঁচটি, কুড়ি সপ্তাহের অধিক মাত্র আরো নয়টি, বাকিগুলির কথা নাই তুলিলাম—সেখানে এই বৎসরে এই পশ্চিমবঙ্গে মোট তিরাশীটি মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবির মধ্যে একখানি প্রদর্শিত হইয়াছে নব্বই সপ্তাহ, কোনটি সত্তরের অধিক, কোনটি ষাটের অধিক, কোনটি পঞ্চাশের অধিক। পূর্বে বলিয়াছি ইহা অনুযোগ নহে, অভিযোগ নহে। কারণ এই প্রেক্ষাগৃহগুলিতে দর্শক সর্বাধিক সংখ্যায় বঙ্গভাষাভাষী। অবশ্য উৎকৃষ্ট বাংলা চলচ্চিত্র দেখিতে কিছু অবাঙ্গালীও অধুনা আসিতেছেন ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু তুলনায় তাহা মুষ্টিমেয়। আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্র ও আধুনিক হিন্দী চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। পূর্বোক্ত পঁয়ত্রিশটি বাংলা চলচ্চিত্রের মাত্র কয়েকটি হইতে লভ্য হইয়াছে, আর অল্প কয়েকটি হইতে মূলধন বা তাহার কাছাকাছি

আর ডি বি-র নির্মীয়মান ছবি "অতল জলের আহ্বান"-এর একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

উঠিয়াছে, অধিকাংশ হইতে লগ্নী অর্থের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে বা শেষ পর্যন্ত হইবে। তবু বাংলা চলচ্চিত্রে কেহ কেহ যে অর্থ লগ্নী করেন সে কীরূপ? ভেষজশাস্ত্রে বর্ণনা না থাকিলেও সাধারণ্যে প্রচলিত অশ্বরোগ নামক রোগের নাম আমরা কে না শুনিয়াছি। নানা ব্যাপারে অর্থ নষ্ট করা অশ্বরোগের লক্ষণ। চলচ্চিত্র ব্যাপারে অর্থ-নাশের সম্ভাবনা, অন্য অনেক ব্যাপার অপেক্ষা গুরুতর। সুতরাং ইহাকে অশ্বতররোগ বলিতে পারেন। এতদুপরি সরকারী কৃপাদৃষ্টিতে চলচ্চিত্র ব্যাপারে সাহায্যের দেখা নাই, দোহনের আয়োজন সুপ্রচুর। এই সকল সত্ত্বেও বাংলা চলচ্চিত্র যে এখনও জীবিত আছে ইহাই সংবাদ এবং কচিৎ যে কোনও বাংলা চলচ্চিত্র দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হইতেছে ইহা সুসংবাদ।

আরো অধিক সংখ্যায় সেরা বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হইতেছে না কেন—এই প্রশ্নের সূত্রে আরো নিবেদন করি। যেমন সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্প-কৃতিতে কালজয়ী, অথবা বরণীয়, এমন কি লক্ষণীয় কৃতি প্রকৃতিগত কারণেই সাকুল্য-সৃষ্টির মধ্যে অল্পই হইয়া থাকে, তেমন চল-চ্চিত্রের ক্ষেত্রেও হইবে। ইহাতে কেবলমাত্র চলচ্চিত্র কর্মীদের অখেদন হইবার কিছু নাই। মুষ্টিমেয় স্রষ্টার মধ্যেও সকলে যে এইরূপ সংকটপূর্ণ পরিবেশে নিজ ক্ষমতার সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিবেন এমন ভরসা করা যায় না। তথাপি সততা, নিষ্ঠা, অধ্য-বসায় ত্রুটি হইলে তাহাই হইবে ক্ষোভের বিষয়। বর্তমান মরণাবর্ত হইতে বাংলা চলচ্চিত্রপ্রয়াসকে টানিয়া তুলিতে একটি বিশেষ কর্মধারার প্রয়োজন। চক্ষু মুদিয়া স্থানুর মত বসিয়া কেবল পদঘর্ষণ করিতে থাকিলে আর কিছুকাল পরে তখনকার আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্র বলিয়া কিছু থাকিবে বলিয়া মনে হয় না, থাকিবে মাত্র কয়েকটি প্রাচীন বাংলা চলচ্চিত্র।

এই বিশেষ কর্মের একটি হইতেছে আরো অনেক অধিক সংখ্যায় চিত্রগৃহ। তদুদ্দেশ্যে বর্তমানে যে সকল বাধা আছে তাহা অপ-সারণের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা। দ্বিতীয়, বিদেশ হইতে সেরা বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের দ্বারা অধিক অর্থ আনয়ন। ভালো অর্থ আমদানি করিতে হইলে বিদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শনক্ষেত্রের অন্ধিসন্ধি জানা যেমন প্রয়ো-জন তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া স্থায়ী ব্যবসার পত্তন। এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার কয়েকটি বাধার অন্য-তম হইতেছে ব্যবসায়িকতার উদ্দেশ্যেও বিদেশে যাওয়া ও বাস করার অসম্ভাব্যতা। আপাততঃ এই দুই কর্মে যদি কিছু অগ্রসর হওয়া যায় সেই চেষ্টা সকলের করিতে করিতে হইবে।

কোনও কোনও লেখক স্ব স্ব দুর্বলতার পোষকস্বরূপ কিছু বিদেশী লেখকের নাম কচলাইলেও তাঁহাদের যে বিশেষ সুবিধা হয় না কালের কষ্টিপাথর তাহার সাক্ষ্য দিবে। বিদেশী লেখকের নামের ঢক্কানিনাদে কোনদেশেই কালজয়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, হইবে না। যেহেতু চলচ্চিত্রনির্মাতারা দ্বিহস্ত দ্বিপদবিশিষ্ট মনুষ্যপ্রাণী সুতরাং তাঁহাদের কেহ কেহ এইরূপ দুর্বলের পন্থা লইয়া থাকিলে বিচিত্র নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সেইরূপ স্বল্প কর্মীরই সেই দৃষ্টি, রসপিপাসা ও পরি-বেশের সুবিধা গ্রহণের ক্ষমতা আছে ও থাকিবে যাহাতে কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি সম্ভব হইবে। যেমন সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকর্মে উৎকৃষ্ট সৃষ্টির মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, জড়িবুটি জানা
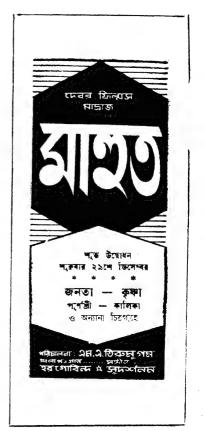
বি আর সি সিনে প্রোডাকসন্সের "সরি ম্যাডাম"-এর নায়কের রূপসজ্জায় বিশ্বজিৎ। ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে

নাই, তেমন চলচ্চিত্রকর্মেও নাই। সকল শিল্পকর্মের মতই এক্ষেত্রেও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হইবে অল্প। গঞ্জনা দেওয়া বৃথা। অন্বয় প্রধান অথবা অঙ্গসজ্জা প্রধান—এ বিতণ্ডাও আমাদিগকে অধিক দূরে লইয়া যাইবে না। উৎকৃষ্ট শিল্পকৃতি যখন চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইবে তখন কাহাকেও তাহা চিনাইয়া দিতে হইবে না। অবশ্য সমালোচনাও থাকিবে। এমন ত হইবেই :—

শির নাড়ি কেহ কহে, "সব শুদ্ধ মন্দ নহে
ভালো হত আরো ভালো হলে।"
কেহ বলে "আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন
চিরদিন রবেনা তা বলে।"
কেহ বলে "এ ছবিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হত যদি অন্য কোনোরূপে।"

তখন চিত্রনির্মাতা বলিতে পারিবেন :

যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়
আমি শুধু বসে আছি চুপ।

এবং শেষ কথা থাকিবে :—

কে বোঝে কে নাই বোঝে
ভাবুক তা নাহি খোঁজে
ভালো যার লাগে তার লাগে।

[নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।]

চিত্রালোচনা

বর্ষ বিদায়ের লগ্ন আসন্ন, কিন্তু শেষ গানের আসরে বাংলা ছবি এবারেও অনুপস্থিত। শেষ গানের পালায় যোগ দিতে এসেছে মাত্র দুটি হিন্দী ছবি। তাদের নাম "ঝুমরু" ও "মাহুত"।

কে এস ফিল্মসের "ঝুমরু" রঙ্গকৌতুকে ভরা হাল্কা রসের ছবি। নায়ক অভিনেতা কিশোরকুমারকে এতে আরো দুটি নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। এক নম্বর, তিনিই এর গল্প লেখক। দু'নম্বর, সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন। ছবিটির ভূমিকালিপি লোভনীয়। কিশোরকুমারের বিপরীতে অভিনয় করেছেন মধুবালা, চঞ্চল, অনুপকুমার, ললিতা পাওয়ার, জয়ন্ত, কুমার ও সজ্জন। ছবিটির পরিচালনা করেছেন শঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

মাদ্রাজের দেবর ফিল্মস্ "মাহুত"-এর নির্মাতা। দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ বন্য জীবনের একটি কাহিনী এর মধ্যে চিত্রিত। দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন বি সরোজা দেবী, উদয়কুমার, বীরপ্পা প্রভৃতি। এম এ থিরুমুগম্ ও আর সুদর্শনম্ যথাক্রমে ছবিটির পরিচালক ও সুরকার।

একটি অসাধারণ ছবি

চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ শর্ত : জনমনোরঞ্জন। এবং কোন ছবিতে তা যদি রুচি ও রসের ভেতর দিয়ে পালিত হয় তবে সর্বশ্রেণীর দর্শকের মনোবাসনাও ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সিটিজেন্স্ ফিল্মস-এর টেকনিকলারে তোলা হিন্দী ছবি "গঙ্গা-যমুনা" এমনি ধরনেরই একটি সুখভোগ্য ছবি।

শুধু সুখভোগ্য বললে হয়তো কম বলা হয়। ছবিটি অভিনয় প্রয়োগ-কর্ম ও আঙ্গিক গঠনের উৎকর্ষে সম্প্রতিকালের একটি স্মরণীয় ছবি। বহিরঙ্গ শিল্পকলায় ভারতীয় চলচ্চিত্র যে আজ উঁচু মানের অধিকারী, এই হিন্দীচিত্র তারই একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে গঙ্গা ও যমুনা নামে দুই ভাই এবং অগ্রজের প্রণয়িনীকে কেন্দ্র করে। অভিন্নহৃদয় দুই সহোদরের জীবনের গতি দুই বিপরীত ধারায় বইতে শুরু করে। ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করে তোলার জন্যে নিজের সকল সুখ ও সাধ বিসর্জন দিতেও বড় ভাই কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু তার মহৎ সংকল্পে বাধা হয়ে দেখা দেয় খলচরিত্রের শত্রুতা, পদে পদে তাকে সইতে হয় নানা অন্যায় অত্যাচার। এরই প্রতিক্রিয়ায় গঙ্গা শান্তিপূর্ণ জীবনের পথটি হারিয়ে ফেলে। বাহুবল দিয়েই সে সব নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে চায়। তাই আইনের হাত এড়ানো তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। হৃদয়ের স্বাভাবিক ঔদার্য নিয়ে এক ডাকাত-দলের নেতারূপে হিংসার পথেই সে মানবকল্যাণের ভ্রান্ত ও ব্যর্থ স্বপ্ন দেখে চলে। প্রেয়সীকেও সে নিজের কাছে নিয়ে আসে এবং তাকে নিয়ে করে জীবনের শূন্যতা অনেকখানি ভরিয়ে তোলে।

ইতিমধ্যে যমুনা অনেক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে পুলিসে চাকরী পেয়েছে এবং অনেক আশা-কল্পনা নিয়ে নিজের জন্মভূমিতেই ভারপ্রাপ্ত পুলিস-অফিসার হয়ে এসেছে।

চিত্রকাহিনীর শেষ অঙ্কে দানা বেঁধে ওঠে এক দুর্বার নাট্য-সংঘর্ষ। গঙ্গা ফেরারী ডাকাত, তাকে দমন করার ভার পড়ে যমুনার ওপর। দুই সহোদরের হৃদয় পরস্পরের জন্যে আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে। কিন্তু উভয়ের মিলনের পথে অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় আইন—যার কাছে স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার বন্ধন তুচ্ছ। নিদারুণ দ্বন্দ্বের অবসান শেষ পর্যন্ত ঘটে দুটি মৃত্যুর ভেতর দিয়ে। গঙ্গা ও তার স্ত্রীর। কেমন করে তাদের জীবনাবসান ঘটল তারই অশ্রুসজল ঘটনারাজিকে ঘিরে কাহিনীর যবনিকা।

এই চিত্রকাহিনীর প্রধান উপাদান : প্রণয়, হৃদয়াবেগ ও রুদ্ধশ্বাস ঘটনাপ্রবাহের রোমাঞ্চ। ইতিপূর্বে আর কোন হিন্দী ছবিতে এই তিন উপাদানের এমন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত রসায়ন দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না। এবং ছবির এই বিশেষ সম্পদের জন্যে রসিকজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদের অধিকারী হয়েছেন চিত্রপরিচালক নীতীন বসু। চিত্রকাহিনীর বিন্যাস ও বিস্তারের

প্রতি অঙ্কে আবেগ ও রোমাঞ্চ এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দানা বেঁধে উঠেছে যা দর্শকদের অভিভূত করে রাখে।

উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের পট-ভূমিতে তোলা এই ছবির বহিদৃশ্যাবলী নয়নাভিরাম। এবং দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখার মত এই ছবির কলাকৌশলের কাজ। তার ওপর ছবিটি আগাগোড়া নাট্যাবেগে সমৃদ্ধ। সব মিলে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এই ছবি যার তুলনা হিন্দী চিত্র-জগতে বিরল।

ছবির প্রয়োগ-ধারায় মামুলী ও গতানু-গতিক পন্থা অনুসরণ যে করা হয়নি তা-নয়। গানের বাহুল্য ছবির একাধিক নাট্যমুহূর্তের রসাস্বাদনে বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। অযৌক্তিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে ছবিটিতে। কিন্তু ছবির সর্বাঙ্গীণ গুণের বিচারে এই সব দোষ-ত্রুটি উপেক্ষণীয়। ছবির আমোদ-উপকরণের মধ্যে নাচ-গান অনেকখানি স্থান জুড়ে নিয়েছে। সেদিক থেকেও ছবিটির একটি বিশেষ আবেদন রয়েছে।

ছবির প্রধান সম্পদ অভিনয়। গঙ্গার চরিত্রে দিলীপকুমারের অপূর্ব অভিনয় দর্শকদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, এবং তার সঙ্গে তাঁরই প্রণয়িনীর ভূমিকার সমান কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন বৈজয়ন্তী-মালা। প্রণয়াবেগ ও দুঃখ-দহনের মুহূর্তে এঁদের অভিনয় ভোলবার নয়।

ছোট ভাই যমুনার চরিত্রে দিলীপকুমারের অনুজ নাসির খাঁ প্রশংসনীয় সংযম ও যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে যথাযোগ্য অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন আনোয়ার, আজরা, কানাইয়ালাল ও লীলা চাটনিস।

সংগীত-পরিচালক নৌশাদ আবহ-সংগীত রচনায় রাগাশ্রয়ী ও লোকসংগীতের সুরে ছবির অনেক সুন্দর মুহূর্তের ভাবরসটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সুরারোপিত গানগুলিও সুখশ্রাব্য।

টেকনিকলারে তোলা ছবির রঙীন দৃশ্যগুলি নয়নবিমোহন। আলোকচিত্রগ্রহণে অনিন্দ্য কৃতিত্বের অধিকারী বাবাসাহেব। সম্পাদনায় অতুলনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। কলাকৌশল ও আঙ্গিক গঠনের অন্যান্য বিভাগের কাজ নিখুঁত বললে অত্যুক্তি হবে না।

দর্শকের দরবারে "সপ্তপদী"র বিচার

"সপ্তপদী" ছায়াছবির সমালোচনা করে আমাদের জনৈক পাঠিকা কয়েক সপ্তাহ আগে একটি পত্রযোগে ছবিটির কাহিনীকার এবং বাংলাদেশের চিত্রসমালোচকদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ পেশ করেছিলেন। তাঁর চিঠিটি গত ২রা ডিসেম্বর 'দেশ'-এ ছাপা হয়েছিল। চিঠিটি প্রকাশিত হবার পর পত্রলেখিকার বক্তব্যের বিরুদ্ধে ও সপক্ষে দুই শতাধিক পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও সব কয়টি পত্র স্থানাভাববশত ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 'সপ্তপদী' সম্পর্কিত পত্রগুচ্ছ আদ্যোপান্ত পড়ে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ছবিটি দর্শকমহলে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে এই যে ছবিটি দেখে তৃপ্তিলাভ করেছেন অগণিত দর্শক—যাঁরা এই ছবির বিরুদ্ধে কোন অভিমতই পোষণ করতে রাজী নন। এই অসংখ্য দর্শকশ্রেণীরই এক গোষ্ঠী আমাদের পাঠিকার অভিযোগের উত্তরে আপন বক্তব্য জানিয়ে আমাদের দপ্তরে পত্রাঘাত করেছেন। আবার ছবিটিতে ভুল-

ছুটি যাঁরা খুঁজে পেয়েছেন তাঁরাও পাঠিকাকে সমর্থন জানিয়ে পত্র লিখেছেন। বলতে সঙ্কোচ নেই, যে পত্রগুচ্ছ আমাদের হস্তগত হয়েছে তাতে এই ছবির বিরুদ্ধে সমালোচকের সংখ্যা অনুরাগীদের তুলনায় খুবই কম।

এ-কথা অনস্বীকার্য, "সপ্তপদী" সম্প্রতিকালে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা তুলনারহিত। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি দশ সপ্তাহে শহর ও মফঃস্বলে "সপ্তপদী" ছবির খাতে প্রমোদকর সমেত মোট আয়ের অঙ্ক ১৩ লক্ষ টাকার ওপর। ইতিপূর্বে আর কোন বাংলা ছবি মাত্র দশ সপ্তাহের মধ্যে এতখানি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। ছবিটির এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে কী কী কারণ বিদ্যমান তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। তবে একটি কথা সকলেই স্বীকার করবেন, যে-কোন পথ দিয়েই হোক ছবিটি দর্শকমনের অন্তরে প্রবেশ করেছে। এবং আজ যে ছবিটি সম্বন্ধে অনুকূল ও

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি "বধূ"-র দুটি মুখ্য ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ছবি বিশ্বাস

গতিকতা"। পত্রলেখিকা বাংলার চিত্র-সমালোচকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কালে "দেশ"-এর এই মন্তব্যটির কথাই যে বিস্মৃত হয়েছিলেন তা নয়, বাংলার অন্যান্য বহুল প্রচারিত দৈনিক কাগজ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রসমালোচকদের সমালোচনা হয়তো ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখেননি। বাংলাদেশের প্রায় সব সমালোচকই (একজন কী দুজন বাদ থাকতে পারে) "সপ্তপদী"র মিলনান্ত পরিণতি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তবে কোন পাঠক বা পত্রিকার পক্ষে তাঁর পত্রে যে উষ্মা ও কটূক্তি প্রকাশ করা সম্ভব, কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিস্বরূপ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাংবাদিকের পক্ষে তা প্রকাশ করা অসমীচীন, অশোভন। তাই হয়তো চিত্রসমালোচকদের মার্জিত ও যুক্তিসম্পন্ন অভিমত অনেকেরই নজর এড়িয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জনৈক পত্রদাতা শ্রীমতী দাসের অভিযোগের উত্তরে লিখেছেনঃ "সবশেষে চিত্রসমালোচকদের কথা। চিত্রসমালোচনাও একটা শিল্প, সেখানেও বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও কোন রসিক পাঠক ছায়াছবি সম্বন্ধে আসল খবরটা পেতে পারেন। শ্রীমতী দাসের কাছে আমার প্রশ্ন নামকরা বিভিন্ন কাগজে "সপ্তপদী"র যতগুলো সমালোচনা বেরিয়েছিল তিনি কি সবগুলো পড়েছেন? যদি পড়ে থাকেন, তবে চিত্রসমালোচকদের প্রতি তাঁর রূঢ় অভিযোগের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না"।

সুচিত্রা-উত্তমের অভিনয় সম্বন্ধে শ্রীমতী কনক দাস যে মন্তব্য করেছেন তার বিরুদ্ধে বহু পাঠক-পাঠিকার পত্র আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। এই বিষয়ে তাঁর সপক্ষে মত দিয়েছেন এমন পত্রলেখক বা লেখিকার সংখ্যা অঙ্গুলিগ্রাহ্য। কোন এক পত্রদাতা লিখেছেন, "নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমার অনবদ্য। কৃষ্ণেন্দুর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য বা বিকাশ রায়ের চিন্তা করা (যা লেখিকা করেছেন) নেহাৎই হাস্যকর ও ছেলেমানুষী। বাংলা চিত্রজগতে উত্তমকুমার ছাড়া অন্য কোন শিল্পীর কথা কৃষ্ণেন্দুর ভূমিকায় ভাবা যায় না। "ওথেলো"র দৃশ্যে উত্তমের ঠোঁট মিলানো মোটেই লজ্জাকর নয়। উৎপল দত্তের উচ্চারণে আর উত্তমের অভিনয়ে "ওথেলো"র দৃশ্য চরম সাফল্য লাভ করেছে—যা উত্তমকুমার নিজে উচ্চারণ করলেও হত না। উত্তম সে চেষ্টা না করে শেক্সপীয়ারকে সম্মান দিয়েছেন এবং সর্বোপরি শিল্পী হিসাবে সৃষ্টিকে মর্যাদা দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীমতী সেনের অপূর্ব অভিনয় অবিস্মরণীয়। বাংলা চিত্রজগতের অন্য কোন তারকার সাধ্যের বহির্ভূত এমন চরিত্রের রূপ দেওয়া। শ্রীমতী সেনের সমালোচনায় লেখিকা একটু বেশী উত্তেজিত হয়েছেন বোঝা যায়। একদল আছেন, যাঁরা উত্তম-সুচিত্রা বলতে অজ্ঞান। আবার আরেক দল আছেন, যাঁরা কারণে-অকারণে এই জুটিকে অভিযুক্ত করেই সুখী। দু'দলই সমান দোষে দুষ্ট।"

অপর এক পাঠক লিখেছেন, "স্মরণ করতে বাধা নেই যে, উক্ত দুই শিল্পীর যুগ ছোঁবার লগ্নে পৌঁচেছে এবং সহজেই স্বীকার করা চলে যে, শিল্পীজীবনের শুরুতেই এ'রা জনপ্রিয়তার স্বর্ণসিংহাসনে বসেননি। তীক্ষ্ম সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে এ'দের অভিনয়-ক্ষমতা। তারপর এসেছে জনপ্রিয়তা এবং এই জনপ্রিয়তাকে সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়েও রাখতে হচ্ছে। শুধুমাত্র বক্স-অফিস-জনপ্রিয়তা ছাড়াও এমন ছবি বিরল নয় যা এ'দের বলিষ্ঠ অভিনয়ে সমৃদ্ধ এবং সত্যিকারের শিল্পমানে উন্নীত।"

শ্রীমতী দাসের চিঠির আর সব মন্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হয়েছেন। কিন্তু পারেননি শুধু সুচিত্রা-উত্তম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে। তবু যে ও-বিষয়ে শ্রীমতী দাস কোন সমর্থক পাননি তা নয়। যাঁরা তাঁর সপক্ষে বলেছেন তাঁদের মন্তব্য থেকে কয়েকটি উক্তিঃ "কৃষ্ণেন্দুর চরিত্র অভিনয়ে যে উত্তমকুমার সাফল্য অর্জন করতে পারেননি তা যে-কোন দক্ষ অভিনেতাই বলতে পারেন।" "কয়েকটি রোমান্টিক মুহূর্ত ছাড়া অধিকাংশ দৃশ্যেই এই শিল্পীজুটির অভিনয় হাস্যকর। অনেকক্ষেত্রে তাঁদের স্বরক্ষেপণ—বিরক্তিকরভাবে ত্রুটিপূর্ণ। উত্তমকুমার সাধারণ পর্যায়ের অভিনেতা। এ-ধরনের চরিত্রের রূপ দেওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য"। "উত্তমকুমারের ইংরেজী উচ্চারণের অক্ষমতা ক্ষমা করা যায়, কিন্তু শ্রীমতী সেন যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাতেও কী এ ত্রুটি ক্ষমার্হ? তাঁর চলা-বলার ভঙ্গীতে কোথাও ইংরেজ-ললনার স্বচ্ছন্দ সপ্রতিভতা নেই।" "উত্তমকুমার সম্বন্ধে আপনাদের পত্রিকার সমালোচকের বেশ একটু দুর্বলতা আছে।" "সুচিত্রা-উত্তমের অভিনয়ের গতানুগতিক ন্যাকামিতে ছবিটি সর্বাঙ্গদুষ্ট"।

মূল কাহিনী থেকে চিত্রনাটকের বিচ্যুতি নিয়ে শ্রীমতী দাস তাঁর পত্রে যে মন্তব্য করেছেন তার সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেকেই অভিমত জানিয়ে পত্র লিখেছেন। জনৈক পাঠক লিখেছেন, "দেখে এলাম একটি কল্পনার, একটি অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টির ভয়াবহ এক বিকৃত পরিণতি।......কোন দরদী পাঠক কখনও কী ভাবতে পারেন দেবদাসের শুভবিবাহ কিংবা শ্রীকান্তের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা! কিন্তু আমরা পেরেছি। কৃষ্ণেন্দু ও রিনার মিলন স্বচক্ষে দেখে এলাম"। এই অভিমত আরও যে-কয়টি পত্রে পাওয়া গেছে তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ "ছায়াছবিতে সবশেষে যে-ভাবে চিত্রনাট্যকার ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দুতে

এনে দুটি অতৃপ্ত আত্মাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাতে দৃশ্যটি আকর্ষণীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, তবুও সাহিত্য-লিপ্সু মন এতে একটু খুঁত খুঁত করে ওঠে”। “যদি “সপ্তপদী” তারাশংকরের রচনা না হয়ে অন্য কোনও সাধারণ লেখকের রচনা হত তবে এত আলোচনা হত না। তাঁর মত লেখকের একটা রসোত্তীর্ণ রচনা চিত্ররূপের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে জনসাধারণের কাছে প্রচার লাভ করবে, আর আমরা নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নেব এটাই বা কী কথা। জানি না, মূল কাহিনী বিকৃত করে চিত্ররূপ দেওয়ার সময় তারাশংকরবাবুর মতামত নেওয়া হয়েছিল কিনা। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কেন তিনি নিজের রচনার অপমৃত্যু ঘটতে দিলেন বুঝলাম না।”

“তিনি (কনক দাস) কাহিনীর অপমৃত্যু সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা নিঃসন্দেহে সমর্থন-যোগ্য। তাছাড়া সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনা সত্যই প্রশংসার্হ। তিনি যে কৈফিয়ত দাবি করেছেন তাও যুক্তিসংগত এবং সময়োচিত”। “মূল রচনায় ইহা (“সপ্তপদী”) মহান ও স্মরণীয় ট্র্যাজেডি, ছবিতে নিতান্তই সাধারণ গতানুগতিক প্রেমোপাখ্যান এবং অবাস্তব মামুলী ছবি। ...মূল রচনা থেকে এর বিচ্যুতি ছবির মূল বক্তব্য ও আবেদনকেই নষ্ট করে দিয়েছে—ঘটনার গতি ও ধারাও কেটে গেছে।” “বাংলা চিত্র সাহিত্যের এইরূপ অনাচার এই নতুন নয়। জনপ্রিয় শিল্পীযুগলের মিলন ঘটাতে কাহিনীর উপর অত্যাচার করা হয়েছে। অনেকে বলেন জনপ্রিয় দুটি শিল্পীর বিয়োগান্ত পরিণতি দেখালে দর্শকেরা “ক্ষেপে” যাবেন। কোন সভ্যজগতের দর্শকদের সম্বন্ধে এমন অপমানজনক মন্তব্য আর শোনা যায়নি”।

কাহিনীর বিচ্যুতি সম্পর্কে শ্রীমতী কনক দাসের বক্তব্য খণ্ডন করার চেষ্টাও করেছেন অনেকে। জনৈক পত্রদাতা লিখেছেন, “শ্রীমতী দাসের মতে “সপ্তপদী” ছায়া-ছবিতে সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটেছে। বিচার করে দেখতে গেলে মূল উপন্যাসে যেখানে ধর্মগত আদর্শ মহিমান্বিত হয়েছে, “সপ্তপদী” ছবিতে সেখানে প্রেমের প্রত্যয়কে বড় করে দেখানো হয়েছে।” অপর পাঠক লিখেছেন, “সবচেয়ে ব্যথিত হয়েছি তারাশংকরবাবুর প্রতি তাঁর কটূক্তিতে। “সপ্তপদী”র লেখক “চাঁদি”র কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন কিনা জানি না; তবে “সপ্তপদী”র চিত্ররূপের কাহিনীকে সমর্থন করে খবরের কাগজে তিনি যে সরল স্বীকারোক্তি জানিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ করিনি। একমাত্র বিচ্ছেদের মধ্য দিয়েই কৃষ্ণেন্দু ও রিনার চরিত্র দুটো সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, মিলনে তা হয় না—একথা মানি না। এর মধ্যে অনেকখানি দুঃখবিলাস আছে। অনেক যুগের ক্ষয়ধরা সমাজ, সংস্কার, শিক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতির প্রভাবে একথা হয়তো ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু এই ভাববিলাস বাদ দিলে, কৃষ্ণেন্দু ও রিনার মিলনান্তক পরিণতিকেও অসুন্দর মনে হবে না।”

জনৈক অধ্যাপক লিখেছেন, “প্রথমেই যদি শ্রীমতী দাসকে প্রশ্ন করি যে খ্যাতনামা লেখক বইখানার নাম “সপ্তপদী” দিলেন কেন? এটা আমরা নির্ভয়ে মেনে নিতে পারি যে বই-এর সর্বাপেক্ষা মূলকথার অনুযায়ী নামকরণ হয়। অন্তত লেখকের কাছে সেটাই মুখ্যভাব। খ্যাতনামা লেখক নাম দিয়েছেন “সপ্তপদী” এবং তিন পা চলার পর সাত পা চলার কথা যখন কৃষ্ণেন্দু সম্পর্কেই বলা হয়েছে তখনই ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন কৃষ্ণেন্দুর সংগে মিলনের। লেখক বিবাহ দিলেন খ্রীষ্টের সংগে। চিত্র-পরিচালক দিলেন আমাদের নায়কের সংগে। আমার প্রশ্ন এই, বইতে কি ঘটনার সমাবেশ এমন যে খ্রীষ্টের সংগে বিবাহ যুক্তিসংগত? ঘটনার চাপ কি নিঃসন্দেহে সেই দিকে?” আরেকজনের অভিমত: “একটা ভুললে চলবে না যে, একটি পুরুষ ও একটি নারীর সম্ভাবনাময় আর প্রাণস্ফূর্তিপূর্ণ ভালবাসার মিলন-না-হওয়া পরিণতি ট্র্যাজেডির সুর পেয়েছে উপন্যাসে, যে পরিণতি স্পষ্ট নয় “সপ্তপদী”-ও ছবিতে হয়েছে, উপন্যাসের চিত্ররূপে নায়ক-নায়িকার অশ্রুসিক্ত ভালবাসার মিলনান্তক পরিসমাপ্তি তার চেয়ে জীবন-রসিকের কাছে কম আকর্ষণীয় নয়”।

বিচ্যুতির সপক্ষে ও বিপক্ষে এই বাদানুবাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তারাশংকরবাবুর অভিমত জানবার কৌতূহল প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, “তারাশংকরবাবুর অনুরাগী পাঠক হিসাবে আমাদের কৌতূহলটিকে যদি তিনি নিজে এ বিষয়ে নীরব না থাকেন। আশা করি শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিরাশ করবেন না।” অপর একজন পাঠক লিখেছেন, “বেশ কয়েক বছর আগে বাংলা দেশের কৃতী পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসু বঙ্কিমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর” উপন্যাসটির বিকৃত চিত্ররূপ প্রদান করে রসিকজনের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন (যদিও ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিল) এবং যতদূর মনে পড়ে তিনি শেষ পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। শ্রীঅজয় কর কি শুধু পত্রিকাগুলির এবং স্বয়ং তারাশংকরবাবুর প্রশংসাপত্রের জোরেই রুচিবান অথচ যাত্রিকার সংগে অসম্পর্কিত সাহিত্যরসগ্রাহী বাঙালীর কাছে অনুরূপ দুঃখ প্রকাশ করবার গ্লানি থেকে অব্যাহতি পাবেন?”

যাঁরা “সপ্তপদী” ছবির কঠোর সমালোচক তাঁরাই শুধু কাহিনীকার ও চিত্র-পরিচালকের নীরবতাকে বাদানুবাদ থেকে পশ্চাদপসরণ বা ত্রুটি স্বীকারের মনোভাব বলে আখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের মৌনতা আত্মপ্রত্যয়ের নামান্তরও তো হতে পারে—বিশেষত যখন দর্শকশ্রেণীর এক বিরাট গোষ্ঠীর কাছে তাঁদের চিত্রসৃষ্টি সমাদর লাভ করে চলেছে। সুতরাং পাঠক-পাঠিকাদের এই বাদানুবাদে তাঁদের ভূমিকা আত্মশ্লাঘা বোধ করা নয়, কৌতূহলের সংগে এর গতি ও ধারাটি লক্ষ্য করে যাওয়া —এই অভিমতও অনেকে পোষণ করতে পারেন। তবে “অধিকন্তু ন দোষায়” এই আপ্তবাক্যটি সবক্ষেত্রে খাটে না। “অধিক” অনেকক্ষেত্রে বিকর্ষণের সৃষ্টি করে। অতএব “সপ্তপদী” সম্পর্কে পাঠকদের আর কোন চিঠি এই বিভাগে ভবিষ্যতে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না—যদি না “সপ্তপদী”র কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার অথবা নির্মাতাদের কেউ তাঁর বক্তব্য পেশ করতে চান।

যাঁর চিঠিকে উপলক্ষ করে “সপ্তপদী” নিয়ে এত বাদানুবাদ, তিনি (শ্রীমতী কনক দাস) তাঁর সমালোচকদের উত্তরে আরও একটি চিঠি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন। “সপ্তপদী” সম্পর্কে পাঠকবর্গের শেষ চিঠি হিসাবে আমরা এটি এই সংগে প্রকাশ করলাম। শ্রীমতী কনক দাস লিখেছেন, “গত ২রা ডিসেম্বর তারিখের “দেশ”-এ আমার চিঠিটা ছাপিয়েছেন দেখে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই চিঠির উত্তরে দেখলাম শ্রীউত্তমকুমার এবং শ্রীমতী সেনের কয়েকজন Fan তাঁদের পক্ষে কিছু বলবার চেষ্টা করেছেন। যাঁদের আমরা খুব পছন্দ করি তাঁদের সব কিছুই আমাদের ভাল লাগে, এটাই স্বাভাবিক সত্য। ওঁদের বিরুদ্ধে আমার নালিশ কিছু নেই, তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে যাঁকে পছন্দ করি তাঁর দোষগুলো ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে আরো ভালো করার চেষ্টা করাটাই বোধ হয় প্রকৃত admirer-এর কাজ। কিন্তু আমার অভিযোগ যাঁদের বিরুদ্ধে ছিল, যাঁদের কাছে আমি কৈফিয়ৎ আর জবাবদিহি চেয়েছিলাম তাঁদের উত্তর আমি পাইনি। মনে হয় পাবও না। তাঁদের নীরবতাই তাঁদের সবচেয়ে বড় উত্তর। সুতরাং আমার আর কিছু বলবার নেই। তবে দুঃখ হয় যখন দেখি বাংলা সাহিত্য আজ সিনেমা সাহিত্য হতে চলেছে আর তার জন্য দায়ী বাংলা সাহিত্যের কর্ণধারেরাই। সত্যি বাংলার এই চরম দুর্দশার জন্য আমরা বাঙালীরাই সবচেয়ে দায়ী। তাই নয় কি? ধন্যবাদ ও নমস্কারান্তে, ইতি কনক দাস, কলিকাতা।”

দেশী সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর—রাজধানী পাঞ্জিম বাদে প্রায় সমগ্র গোয়া এখন ভারতীয় বাহিনীর করায়ত্ত। পাঞ্জিমেও ভারতীয় সেনাদল প্রবেশ করিতে শুরু করিয়াছে এবং যে কোন মুহূর্তে এই নগরের পতনের সম্ভাবনা।

ভারত সরকার আজ ভারতস্থ বৈদেশিক দূতাবাসসমূহে গোয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে একই মর্মে নোট প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, গোয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা নিঃশেষিত হওয়ায় ভারতকে বাধ্য হইয়া সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর—আজ প্রাতঃ যে গোয়া, দমন দিউ আত্মসমর্পণ করিয়া ভারতের বুকে প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটিল। এই সময়েই পাঞ্জিমের পর্তুগীজ সেনাদল আত্মসমর্পণ করে।

দেরাদুনের দায়রা জজ শ্রীশঙ্করীনাথ পরলোকগত এম এন রায়ের পত্নী এলেন রায়কে হত্যার জন্য বসন্তকুমার ও সুরেশচন্দ্র ছেত্রীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জজ তাঁহার রায়ে বলেন যে, এই মৃত্যুদণ্ড এলাহাবাদ হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ।

২০শে ডিসেম্বর—শুভেচ্ছা ও মৈত্রীর বাণী লইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর প্রধান শ্রী এল আই ব্রেজনেভ অদ্য অপরাহ্ণে কলিকাতায় পৌঁছাইলে সাদর সম্বর্ধনা লাভ করেন। শ্রীমতী ব্রেজনেভ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন।

আজ নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, মার্মাগোয়ার এক দুর্গে গোয়া, দমন ও দিউ-এর গভর্নর জেনারেল ভাসিলভার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহার প্রতি যথাবিধি সৌজন্য প্রদর্শিত হইতেছে।

২১শে ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গোয়া, দমন ও দিউকে বিদেশী শাসনের বন্ধনমুক্ত ও মাতৃভূমির সহিত উহাদের মিলন সাধনের জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ ভারতের জনগণের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পে কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতন মাত্র ৬০ টাকা সুপারিশ করিয়া রাজ্যের ৬৪ হাজার কর্মচারীর উপর "মৃত্যু পরোয়ানা" জারী করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

২২শে ডিসেম্বর—উত্তর ভারতে যে প্রচণ্ড হিমপ্রবাহ চলিতেছে, তাহাতে কানপুরে অনুমান ৩৬ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আজ কানপুরে স্মরণকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের যে সরকারী ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ মকুব করার প্রস্তাবটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৩শে ডিসেম্বর—আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বোলপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেন যে, তেমন অবস্থা দেখা দিলে চীনকে হটিতে বাধ্য করার জন্যও ভারত বলপ্রয়োগ করিতে পারে।

ইউ এন আই-এর এক সংবাদে প্রকাশ, কয়লা পর্যৎ ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে তিনটি করিয়া মোট ছয়টি কেন্দ্রীয় রোপওয়ে নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঝরিয়া অঞ্চলের পি ডি এলাকায় ১৬ মাইল দীর্ঘ প্রথম রোপওয়েটি নির্মাণের জন্য একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত কয়লা পর্ষদের একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর—উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত এক সপ্তাহ ধরিয়া সমগ্র উত্তর প্রদেশে যে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ চলিতেছে, তাহা আজ অব্যাহত রহিয়াছে। ফলে এ যাবৎ মোট মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় একশতজনে দাঁড়াইয়াছে। পাটনা অফিসের সংবাদে জানা যায় যে, প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে সমগ্র বিহারে এ যাবৎ ৫২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর—অদ্য বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড হিউম লর্ডসভায় বলেন যে, বৃটেন পর্তুগালকে জানাইয়াছে যে, কমনওয়েলথের অপর সদস্য ভারতের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না।

পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকায় ত্রিশ হাজার ভারতীয়কে অন্তরীণ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। গোয়ায় ভারতীয় সৈন্যদলের অভিযানের জন্য এই ভারতীয়দিগকে বিশেষ শিবিরে আটক করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীসিরিল আডুলার সহিত কাটাঙ্গার সংহতি সাধন সম্পর্কে আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীএডমণ্ড গুলিয়ন কাটাঙ্গার প্রেসিডেন্ট শিশোম্বেকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আজ লিওপোল্ডভিল হইতে বিমানযোগে যাত্রা করিয়াছেন।

১৯শে ডিসেম্বর—ভারতকে পররাজ্য আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করার দাবি দ্বারা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের দরবারে পর্তুগাল গোয়াকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিয়া ভারতকে জব্দ করার জন্য যে অর্জি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সোভিয়েটের ভেটো প্রয়োগে তাহা বানচাল হইয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোকর্ণ আজ যোগজাকার্তায় এক বিরাট জনসমাবেশে ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম ইরিয়ানকে নেদারল্যাণ্ডে অধিকৃত নিউগিনি মুক্ত করার জন্য তিনি দেশের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও সম্পদ লইয়া প্রস্তুত থাকার জন্য আদেশ জারি করিয়াছেন।

২০শে ডিসেম্বর—পর্তুগাল রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদ অনুযায়ী তাহার অধীন অঞ্চলগুলি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিতে অস্বীকার করায় 'অছি কমিটি' পর্তুগালের নিন্দা করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ তাহা অনুমোদন করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের লবী মহলের মতে নিরাপত্তা পরিষদে গোয়া বিতর্কের নীট ফল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার ন্যাটো জোটের "নৈতিক পরাজয়" এবং আফ্রো-এশীয় জাতীয়তাবাদের বিপুল জয়।

২১শে ডিসেম্বর—কাটাঙ্গা প্রেসিডেন্ট ও কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী আডুলার মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনার পর কাটাঙ্গার ১৬ মাসের বিচ্ছেদের অবসান হইয়াছে।

পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, গোয়া-দমন-দিউয়ের "পতনের জন্য" এইবার পর্তুগালে বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে আমোদ আহ্লাদ ও আলোকসজ্জা করা হইবে না।

২২শে ডিসেম্বর—কাটাঙ্গা মন্ত্রিসভা আজ এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন, কিটোনায় (আলোচনাকালে) যে সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট শিশোম্বের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অনুমোদন করিতে তাঁহারা অসমর্থ। কার্যত কাটাঙ্গা-মন্ত্রিসভা কিটোনা চুক্তি অগ্রাহ্য করিলেন।

২৩শে ডিসেম্বর—রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, বর্তমান সপ্তাহে কঙ্গোতে যে আপসমূলক আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, শিশোম্বেকে রক্ষা করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ সেক্রেটারিয়েটের আমেরিকান সদস্য ডঃ রাল্ফ বাঞ্চকে নির্দেশ দিয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর—সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের গতকাল এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করে যে, মিশরস্থ বিদেশীদের সমস্ত জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

বৃটিশ নৌ-দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ জানান যে, কঙ্গোস্থ রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর জন্য "কয়েক হাজার রাউণ্ড" বিশ মিলি-মিটার গোলা সরবরাহ করা হইয়াছে। জঙ্গী-বিমানে সন্নিবিষ্ট ছিসপানো কামানে এ সকল গোলা ব্যবহার করা হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র
স্মরণীয় ৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

তা'হলে এই সাধারণ পরীক্ষাটি করুন—

পেটব্যথা, গা বমিবমি অথবা পেটফাঁপা—অম্লাধিক্যের এই অস্বস্তিকর লক্ষণগুলি দেখা দেবার সাথে সাথেই ম্যাকলীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডারের একটি মাত্রা খেয়ে নেবেন৷ "ম্যাকলীন কার্ব্বোনেটস্" এবং "এ্যালুমিনিয়াম্ হাইড্রক্সাইড" এর সমন্বয়ে প্রস্তুত এই অপূর্ব্ব ঔষধটি আপনাকে অবিলম্বে দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে ম্যাকলীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডার শুধু পাকস্থলী থেকে অতিরিক্ত অম্লরস দূরই করে না, সাথে সাথে এর পুনর্গঠন প্রতিরোধ করে।

ম্যাকলীন ব্রাণ্ড
ইন্‌ডিজেশন্ পাউডার

আসল জিনিষের জন্য এই—
Alex. C. Maclean সইটি দেখে [illegible]

বিশ্বাস না হয় পরখ করুন

এম্‌ব্যাসী

খেয়ে দেখুন

কত কম দামে
কত ভালো সিগারেট

উইল্‌স-এর **এম্‌ব্যাসী**-
দামের হিসেবে পরিতৃপ্তি অনেক বেশি

১০টি ২২ ন প
২০টি ১.১২ ন প

Embassy

JWTE 129

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 6th January, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ১০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২২ পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

ঐক্যের ভিত্তি

নেতারা উদ্বিগ্ন, জাতীয় ঐক্যের 'পরশপাথর' আবিষ্কার না করা পর্যন্ত তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। স্বাধীন দেশ, প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক সংবিধান, আধুনিক রাষ্ট্রনীতির বিচারে ভারতের ঐক্যবিধানের কোন কিছুরই অভাব থাকবার কথা নয়। তবুও কথা উঠেছে এবং কথাটা একেবারে মিথ্যা নয় যে, আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিতটা এখনও কাঁচা। যতদিন ব্রিটিশ-রাজ ছিল ততদিন আমরা অনেকেই এই ভেবে আশ্বস্ত বোধ করেছি যে, ঐক্যের অভাবটা বিদেশী শাসনের কুফল মাত্র এবং বিদেশী শাসন অপসারিত হলেই 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতার' সূর্যোদয় অবধারিত। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর সাড়ে চোদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিস্থিতি আশানুরূপ পরিমাণে একাত্মবোধের পরিপোষক হয় নি। নেতারা সে-কারণে উদ্বিগ্ন; জনসাধারণ সচরাচর যেমন হয় জীবনধারণের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত এবং সে-কারণে জাতীয় ঐক্য বিধানের সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন নয়। তবু সমস্যাটা এমন যে, জনসাধারণও পাকেচক্রে জাতীয় জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িত এবং কখনও কখনও বিড়ম্বিত। আমাদের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেখিয়েছে ভারতীয় ঐক্যের প্রতিবাদী শক্তি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কী পরিমাণ সক্রিয়।

বিরোধ অকল্যাণকর, সদ্ভাব এবং ঐক্য সর্বাংশে শ্রেয়ঃ, এই তত্ত্ববাক্যের পুনরাবৃত্তি দ্বারা জাতীয় সংহতির ক্ষেত্র রচনা আগেও সম্ভব হয় নি, এখনও হতে পারে না। 'হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের সন্তান', নানা সুরে ও ছন্দে দেশজোড়া ঐকতান সঙ্গীতের জোরে দেশ-বিভাগ রোধ করা যায় নি। আজও কেবল 'এক হও' 'এক হও' মন্ত্র জপ করে জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা জনজীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত করার চেষ্টা সম্পূর্ণ অবাস্তব। অথচ নেতারা সেই মামুলি মন্ত্রজপের বিবিধ পদ্ধতি ও প্রকরণের উপরই সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করায় উদ্যোগী দেখা যাচ্ছে। প্রথমে একদফা মুখ্যমন্ত্রি-সম্মেলন, তারপর জাতীয় সংহতি সম্মেলন এবং অবশেষে ডঃ সম্পূর্ণানন্দের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির ভাবনৈতিক ঐক্যবিধান সংক্রান্ত সুপারিশ তথা সুবচনসংগ্রহ। জাতীয় সংহতি বস্তুটা আর যাই হোক, এতখানি সুলভ ও সুগম নয় যে, স্কুল-কলেজে কতকগুলি সুবচন পাঠ নিত্যনৈমিত্তিক এবং আবশ্যিক করলেই একাত্মবোধ স্বচ্ছন্দ ও শক্তিশালী হতে পারে। জাতীয় সংহতির প্রবক্তাগণ যে দৃষ্টিভঙ্গী ও যে বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করছেন তা না বৈজ্ঞানিক, না ঐতিহাসিক; এই মহাদেশের বাস্তব রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মূলাধারও তাঁরা কার্যত উপেক্ষা করেছেন। ভাবের ঘরে ফাঁকি দ্বারা জাতীয় সংহতির অভাব পূরণ করা যায় না, আধুনিক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসেই রয়েছে তার অজস্র প্রমাণ।

ভারতবর্ষকে হুবহু য়ুরোপীয় 'নেশন-স্টেটের' ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টা কোনকালেই সফল হতে পারে না। ভারতীয় ঐক্যের আদিপর্বে যেটুকু একাত্মবোধ জনজীবনে ওতপ্রোত ছিল তার মূলাধার হল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা। ব্রিটিশ আমলে এই ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক একাত্মবোধের উপর আরোপিত হল প্রশাসনিক ঐক্য, রাজনৈতিক একীকরণ এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনে নবীন জাতীয়তাবাদী চেতনা। জাতীয় সংহতির প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে ব্রিটিশ আমলের প্রশাসনিক ঐক্য এবং ইংরেজী ভাষাচর্চা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল, এ-কথা আজ সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করায় বাধা নেই। ইংরেজীকে হটিয়ে এখন হিন্দিকে সর্বভারতীয় ঐক্যের যোগসূত্র করার অদূরদর্শী চেষ্টার পরিণাম জাতীয় সংহতির বনিয়াদ দৃঢ়তর করা দূরের কথা, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধই তীব্রতর করছে। কৃত্রিম উপায়ে ভাষাগত একীকরণ য়ুরোপের নেশন-স্টেটগুলিতেও নি, আমাদের এই বিরাট বহুভাষী দেশে সে-রকম একীকরণের বিপর্যয়কর হতে বাধ্য।

আমাদের নেতারা ভাষাগত, বর্ণগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্যকে ভারতীয় জনজীবনের সুস্থ ও স্বাভাবিক অঙ্গহিসাবে মেনে নিতে অনিচ্ছুক, তাই সর্বভারতীয় ঐক্য তথা জাতীয় সংহতির নামে তাঁরা তুঘলকী কায়দায় কেন্দ্রীয় ফর্মান জারি করায় উৎসাহী। জাতিগত, বর্ণগত, ভাষাগত, শ্রেণী ও ধর্মগত ভেদাভেদ য়ুরোপের 'নেশন স্টেটে'ও অল্পবিস্তর আছে, মামুলি সুবচন প্রচার করে কিম্বা কেন্দ্রীয় ফর্মান জারি করে এই ধরনের ভেদাভেদ বিলোপের চেষ্টা য়ুরোপের কোথায়ও ঘটতে দেখা যায় না। আসলে ভাষা বা বর্ণ নয়, জাতীয় সংহতির প্রথম ও প্রধান বাধা জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতা। দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি সর্বত্র জনজীবনের সকল স্তরে বিস্তৃত হলে ভাষাগত, বর্ণগত প্রভেদ নিয়ে তিক্ততা নিঃসন্দেহে প্রশমিত হবে। ভাষাগত ও বর্ণগত বৈচিত্র্যের বিলোপসাধন নয়, দেশগঠনের একাত্মবোধ ও সংকল্পই স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংহতিকে সমৃদ্ধ জনজীবনের অন্তঃস্থলে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

স্ট্যালিন দীর্ঘজীবী হউন
স্ট্যালিন দীর্ঘজীবী হউন
সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি মিঃ ব্রেজনেভ কলকাতার স্মৃতি কখনও ভুলতে পারবেন না।
জীবনের সব চাইতে বড় ভয় তিনি এখানে পেয়েছেন।
পাটনায় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে।
কংগ্রেস
নেহরুজী নির্বাচন-জয়ী তাবিজ এনেছেন।
কেরালায় কমিউনিস্টরা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছে।
বাঁচাও! কেন্দ্রীয় সরকার বাঁচাও!!
কম্যুনিস্ট পার্টি
যুক্তরাষ্ট্র
আয়ুব খাঁ চীনের বন্ধুত্ব চায়।
চাইলেই কি পাওয়া যায়?

ভারত সরকার কর্তৃক গোয়া, দামান এবং দিউ থেকে পর্তুগীজ শাসনের উচ্ছেদ-সাধনের ব্যাপার নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আরো বেশ কিছুকাল চলবে। ভারতভূমি থেকে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের কলঙ্কের দাগ নিঃশেষে মুছে যাওয়ার আনন্দের মধ্যেও এ সম্পর্কে যে-সব কথা চিন্তা করে ভারত-বাসীর সতর্ক থাকা উচিত, তার কিছু কিছু আলোচনা গত সপ্তাহে এবং তার পূর্ব সপ্তাহে "বৈদেশিকী"তে করা হয়েছে। বিদেশী সমালোচনায় অত্যধিক বিচলিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া অথবা বিদেশী প্রশংসার দ্বারা সম্মোহিত হওয়া উভয়ই বিপজ্জনক হবে। কোনো শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করার কথা যে আমরা বলে থাকি, তার সত্যতা বজায় রাখার দিকে এখন বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গত বৃহস্পতিবার পণ্ডিত নেহরু দিল্লীতে তাঁর প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে, ভারত সরকার এই নীতি থেকে বিচ্যুত হবেন না। কিন্তু অতীতে ভারত সরকার সর্বক্ষেত্রেই এই নীতিতে দৃঢ় থেকেছেন, কখনও এদিক-ওদিক হেলেন নি, এমন কথা মোটেই বলা যায় না। পণ্ডিত নেহরু মুখে যাই বলুন, তাঁর নীতি পরিচালনায় যাঁরা নিযুক্ত, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেটাকে এদিক-ওদিক টানার চেষ্টা করেন না, এরূপে বিশ্বাস দেশবাসীর নেই। সুতরাং বর্তমানে যখন ভারত সরকারেরই কোনো কাজ আন্তর্জাতিক তর্ক-বিতর্কের বিষয় হয়েছে, তখন কোল্ড ওয়ারের দুই পক্ষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকে ভারত সরকারের ঘোষিত নিরপেক্ষ নীতিকে পুরোপুরি বাঁচিয়ে রাখতে হলে যথেষ্ট স্থিরবুদ্ধি এবং সতর্কতা আবশ্যক।

গোয়াতে পর্তুগীজ শাসন কেবলমাত্র অবৈধ ছিল না তা নয়, গোয়াবাসীদের পক্ষে সেটা অত্যাচারপূর্ণ এবং পীড়াদায়ক ছিল—এই যুক্তির ভিত্তিতেই ভারত সরকার গোয়ার মুক্তিকল্পে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করেছেন। এই যুক্তির সততা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই এবং ভারত সরকারের কার্য দ্বারা যে একটা অবৈধ বিদেশী কর্তৃত্ব অপসারিত হয়েছে, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। তবে গোয়ার ভারতভুক্তির ফলে গোয়াবাসীদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়েছে, এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব কিন্তু ভারত সরকারের। পর্তুগীজ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কতকগুলি খারাপ জিনিস গেছে, কিন্তু ভারতীয় শাসনের প্রবর্তন হয়েছে বলেই যে সেখানে সাধারণের সব দুঃখ ঘুচেছে তা নয়, সাধারণের দুঃখ ঘোচাতে হলে তার জন্য সুষ্ঠু চেষ্টা আবশ্যক। গোয়ার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভের আশায় সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত সামরিক এবং বে-সামরিক ব্যুরোক্রাটিক কর্মকর্তারা জাঁকিয়ে বসছেন। ফলে, সাধারণ লোক, যারা আশা করেছিল যে, পর্তুগীজ শাসন অপসারিত হলে তারা একটা স্বাধীন নূতন জীবনের স্বাদ পাবে, তারা হয়ত কিছুটা বিমূঢ় বোধ করছে। তা যদি হয়, তবে সেটা খুবই দুঃখের কথা হবে। তাতে জগতের কাছেও ভারত লজ্জিত হবে।

সুতরাং নবপ্রবর্তিত ভারতীয় শাসন যাতে গোয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতা বোধের সহায়ক হয় এবং তাদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে, সে বিষয়ে সজাগ হতে হবে। গোয়ার মুক্তির পর সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে যে-সব খবর আসছে, তার সবগুলোই সমান প্রীতিকর, এরূপ বলা যায় না। ভারতের নিন্দা করতে যারা সর্বদাই আগ্রহান্বিত, ভারত সরকার তাদের হাতে কোনো নূতন হাতিয়ার যেন না জোগান। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সাংবাদিকদের গোয়ায় ঢুকতে দেননি; পরে ঢুকতে দিয়েছেন। সেই অদ্ভুত আদেশ কেন দেওয়া হয়, তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখানো হয়নি। ফলে, একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়, যার হয়ত সত্যই কোনো মূল নেই, আদেশদানকারীর 'মর্জি' বা 'দেমাক' ছাড়া। যাই হোক, মুক্তির পরে গোয়ায় কী হচ্ছে, ভারতীয় কর্তারা কীরূপ ব্যবহার করছেন, গোয়ার সাধারণ লোকেরা মুক্তির আস্বাদ পাচ্ছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে ভারতে সচেতন জনমত থাকা চাই।

*   *   *

কঙ্গোর পরিস্থিতির জটিলতা যদি আজ মনে হয় একটু কমের দিকে তো কাল দেখা যায় আবার বেড়েছে। কটংগায় ইউ-এন এবং প্রেসিডেন্ট চোম্বের ফৌজের মধ্যে লড়াই বন্ধের চুক্তি অকেজো হয়ে গিয়ে আবার লড়াই শুরু হয়েছিল। তারপর নানা চেষ্টা-চরিত্রের পরে বিশেষ করে আমেরিকান চেষ্টার ফলে কিটোনায় কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী শ্রী অ্যাডোলার সঙ্গে কটংগার প্রেসিডেন্ট চোম্বের কথাবার্তা হয় এবং একটি চুক্তিও হয়, যাতে শ্রী চোম্বের কটংগাকে কঙ্গো থেকে বিচ্যুত করার নীতি পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত হন। কটংগা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং নূতন কনস্টিটিউশন গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করবেন, এটাও স্বীকৃত হয়। কিন্তু শ্রী চোম্বে এলিজাবেথভিলে ফিরে এসেই অন্য মূর্তি ধরেন এবং নানা ফ্যাকড়া তুলে কিটোনার চুক্তি নস্যাৎ করে দিতে চান, অর্থাৎ শ্রী চোম্বের নিজের কোনো সত্তা নেই, পিছন থেকে যারা, বিশেষ করে তাঁর বিদেশী মন্ত্রণাদাতা এবং সমর্থকরা তাঁকে দিয়ে যা করান এবং বলান, তিনি তাই করেন এবং বলেন—এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করেন। কটংগা থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছেন, কিন্তু তাঁদের বক্তৃতা এবং কিটোনার চুক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আবার জোর করে লড়াই আরম্ভ হবার উপক্রম হয়েছে। রোডেশিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র আসা বন্ধ হলে শ্রী চোম্বের ফৌজের যুদ্ধ করার শক্তি অচিরে শেষ হবে। তবে যুদ্ধ বন্ধ হলেই যে কঙ্গোর সমস্যা সমাধানের তীরে পৌঁছবে তা নয়।

*   *   *

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট দ্য গল একটি টেলিভিশন বক্তৃতায় বলেছেন যে, তিনি আশা করেন যে, আলজেরিয়া এবং ফ্রান্সের মধ্যে শীঘ্রই আপোসে একটা চুক্তি হবে এবং আগামী এক বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ ফরাসী সৈন্য আলজেরিয়া থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রেসিডেন্ট দ্য গলের এই বক্তৃতার পরেই আলজেরিয়ায় গোঁড়া ইউরোপীয়ান ঔপনিবেশিকরা নূতন করে খুন-খারাপি শুরু করেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট দ্য গলের চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় এবং দ্য গল যদি অপসারিতও হন, তাহলেই যে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আটকানো যাবে তা নয়। বরঞ্চ দ্য গলের চেষ্টায় যদি এখনো একটা আপোস-মীমাংসা হয়, তবে আলজেরিয়ায় ফরাসী স্বার্থ কিছু পরিমাণে রক্ষা পেতে পারে, তা না হলে সবই যাবে।

*   *   *

লাওসে তিন প্রিন্সের মধ্যে যে মিটমাট হয়েছিল, তা নাকি আবার ভেঙে গিয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রেসিডেন্ট ডিয়েমের গভর্নমেন্টের সৈন্য এবং কম্যুনিস্ট গেরিলাদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চলেছে। ডাচদের হাত থেকে পশ্চিম ইরিয়ান (নিউ-গিনি) 'মুক্ত' করার জন্য ইন্দোনেশিয়ান গভর্নমেন্ট কর্তৃক সামরিক অভিযানের প্রস্তুতির সংবাদের বহর ক্রমশই বাড়ছে। গোয়া নিয়ে যে-সমস্যা ছিল, এগুলির কোনোটাই তার সঙ্গে তুলনীয় নয়, তাহলেও গোয়ার ব্যাপারের ঠিক পরেই ভারত সরকারের পক্ষে 'বলপ্রয়োগেন নৈব নৈব চ' বলে এগিয়ে এসে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য স্বীয় নৈতিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করতে কিঞ্চিৎ দ্বিধাবোধ হবে।

৩১।১২।৬১

আমাদের মতো অসহায় জীব অর্থাৎ ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর এদের চোখ পড়েছে। ব্যাপারটা খুলে বলা যাক্। গত ১৮ই ডিসেম্বর কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে (যার মধ্যে আমিও একজন) বি বি সি টেলিভিশনে এক আলোচনা সভায় ডাকা হয়। বক্তব্য ছিল গোয়া-ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদের মতামত কি। আমরা সকলেই নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনায় নেহরু-সরকারের প্রশংসা করেছিলাম। Mr. Dom Moraes এই সভাতে যোগদান করেছিলেন। Mr Moraesকে 'ভারতের' অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সমালোচক বলে পরিচয় দেবার পর ওঁনার মতামত জানতে চাওয়া হলো। উনি সরবে ঘোষণা করলেন ভারতের আজ বড়ো দুর্দিন এবং ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর পথ বন্ধ। আমরা এই বক্তব্যকে যতদূর সম্ভব ভদ্র ভাষায় সমালোচনা করতে চেষ্টা করেছিলাম। ফল কিছু যে হয়েছিল তার প্রমাণ পরে পাওয়া গেল। সাধারণের সুবিধার্থে Mr. Moraes-এর কথঞ্চিৎ পরিচয় দেবার ইচ্ছে করি। উনি অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলেন এবং ১৯৫৮ সালে Hawthorn-don Prize পেয়েছিলেন। ভারতের উপর একটি বই লিখেছেন যার বিচার বিদগ্ধ-সমাজ করবেন। রানী এলিজাবেথ যখন ভারতে যাবার সংকল্প করেন, তখন উনি Introduction to India বলে B.B.C. TVতে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ সম্বন্ধে ভারতীয় ছাত্রদের মতামত নিতান্ত অজানা একথা বলা চলে না। যাই হোক সেদিন অন্যান্য বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এটাও গোচর হলো যে উনি একজন ভারতীয়। ভালো কথা। লণ্ডনে gutter press বলে এক ধরনের গোষ্ঠী আছে যার মধ্যে Evening Standard হোমরাচোমরা বিশেষ। ২১শে তারিখের সংখ্যায় Dom Moraes একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন যা আমাদের সকলকেই যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে। প্রবন্ধটির শিরোনামায় "I am an Indian, and on this day, I can not but feel ashamed." কথাটি বড়ো বড়ো হরফে জ্বলজ্বল করছে। প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতি করলে বক্তব্য সরল হবে। Dom Moraes-এর মতে "Goa is a foolish, beautiful, palm-spiked country....it is a country that looks rather like Spain....I write now as an Indian—something I rarely do—because I believe in a kind of free-masonary of peoples—for the single and simple reason that I believe that the action taken in Goa has not only reduced the stature of India as a neutralist element but has punched a hole in the tenuous gut of world peace."

এইটুকু বলার পর আমাদের কি তীব্র আক্রমণ!

"I met, the other day, a number of Indian students who (obviously) had views of Goa. It was amazing to listen to them......One of the students I spoke to said, if I properly understood his rather involved argument that those who abhorred the use of force could not be wrong if they used force, particularly, against colonialism. This also and surprisingly since it is ridiculous, is the official line of the Indian Govt."

এ স্থলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন তবু তর্কের খাতিরে বলা অন্যায় নয় যে আমরা একথাও বলেছিলাম পর্তুগাল অন্যান্য শান্তিমূলক পন্থা উপেক্ষা করার পর ভারত ১৪ বছর পরে তথাকথিত রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে। উনি অবশ্য সেই সমালোচক যিনি উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পাতা পড়েই তার মূল্য নির্ধারণ করতে সক্ষম। সবশেষে সাবধান-বাণী। "Therefore, I suppose one should not be surprised by what India has done in Goa. But if one is horrified, there is no reason for one to be alive." ......

আমরা সমবেতভাবে Mr Dom Moraes মহাশয়ের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করলাম।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়
৪ গর্ডন স্ট্রীট, লণ্ডন

বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : 'মানসী'

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

বিগত ৬ষ্ঠ এবং ৭ম সংখ্যা (২৯ বর্ষ) 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু লিখিত "বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ:

'মানসী'" প্রবন্ধটি পাঠ করে কয়েকটি প্রশ্ন মনে এসেছে। সেদিকে প্রবন্ধলেখকের এবং অন্যান্য পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।—

(১) লেখক মন্তব্য করেছেন (পৃ ৪৯৮): "ব্লেকের সময়ে ইংরেজী বা র‍্যাঁবোর সময়ে ফরাসীর তুলনায় বাংলা কবিতা প্রায় মধ্যযুগে পড়ে আছে তখনও. মধুসূদনের বীরোচিত কীর্তি তার আকৃতিগত পার্থক্য ঘটালেও, তাতে আধুনিক ভাবনা বেদনা সঞ্চারিত হয়নি।"
—এই মন্তব্য কি সমর্থনীয়? বাংলা কাব্যে আধুনিক ভাবনা বেদনার বলিষ্ঠ প্রকাশ কি মধুসূদনের কাব্যেই প্রথম সূচিত হয়নি? —সে প্রকাশভঙ্গি ব্লেক বা র‍্যাঁবোর মতো নিশ্চয়ই নয়। —তেমনটি হওয়া সম্ভবও ছিল না, অভিপ্রেতও ছিল না। তাছাড়া এই মন্তব্যে লেখক যে রোমাণ্টিক বেদনার রসানুভূতি বোঝাতে চেয়েছেন, বিহারী-লালের কাব্যেও কি তার সূচনা দেখতে পাননি? লেখক বলতে চান সন্ধ্যা সংগীতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ভাবনা বেদনা প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই রোমাণ্টিক লিরিক-ভাবনার ক্ষেত্রে বিহারী-লালকেই গুরুরূপে স্বীকার করেছেন।

(২) ছন্দের পরিভাষার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বসু সম্ভবত অক্ষরবৃত্ত (বিশিষ্ট কলমাত্রিক) রীতিকে পয়ার নামে পরিচিত করতে চাইছেন। এখানে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি আর আকৃতির মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি এনেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একদা পয়ারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, "আটছয় আট ছয়। পয়ারের ছাঁদ কয়॥" আসলে পয়ার ছন্দের একটি আকৃতিবিশেষ। যেমন ত্রিপদী, চৌপদী বন্ধ—তেমনি দ্বিপদী পয়ারবন্ধ। বাংলা ছন্দের প্রধান তিন প্রকৃতিতেই এই দ্বিপদী পয়ার বহু লেখা যায়। যেমন—

(ক) মাত্রাবৃত্ত (সরল কলামাত্রিক) পয়ার (৮+৬)

> নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
> ঊর্ধ্বে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল॥

(খ) স্বরবৃত্ত (দলমাত্রিক) পয়ার (৮+৬)

> আমি যদি জন্ম নিতেম
> কালিদাসের কালে
> বন্দী হতেম না জানি কোন্
> মালবিকার জালে।

(গ) অক্ষরবৃত্ত (বিশিষ্ট কলামাত্রিক) পয়ার (৮+৬)

> দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর:
> হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।

শ্রীযুক্ত বসু ছন্দের আকৃতিবিশেষকে ছন্দের একটি প্রকৃতি হিসেবে গণ্য করায় পাঠকদের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

(৩) মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর (প্রবহমান) ছন্দ রবীন্দ্রনাথই প্রথম সমিল-ভাবে ব্যবহার করেছেন—একথা সম্পূর্ণ ঠিক

নয়। ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে ১৮ মাত্রার ছত্রে প্রবহমান মহাপয়ার সমিলভাবে ব্যবহার করেছেন (দ্রঃ 'রসাতল প্রয়াণ' অংশ)। তাছাড়া প্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ার বন্ধে ছত্র শেষে মিল অনেকটা কৃত্রিম। সব সময়ে কানে আসে না। সে সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

মুক্তক (যাকে প্রবন্ধ লেখক 'অসমপংক্তিক পয়ার' বলেছেন) প্রবর্তনের কৃতিত্বও রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁর পূর্বেই কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচার নক্সায়) এবং রাজকৃষ্ণ রায় ('নিভৃতনিবাস' কাব্যে) এ ছন্দের পরীক্ষা করেছেন। সূচনা হয়েছে আরও পূর্বে স্বয়ং মধুসূদনের হাতে। 'বিবিধ কাব্যে'র অন্তর্গত 'পদ্ম ও সদা' কবিতায় সমিল মুক্তকের আভাস পাওয়া যায়।

(৪) লেখক ৫০০ পৃষ্ঠায় পাদটিকাতে মন্তব্য করেছেন,—"এখানে বলা দরকার যে 'মানসী'তে এবং 'মানসী' থেকে 'কথা ও কাহিনী' পর্যন্ত পুস্তকে স্বরবৃত্ত নেই।" —এ উক্তি পুরোপুরি ঠিক নয়। 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত 'হোরিখেলা', 'বিবাহ' এবং 'নকলগড়' কবিতা তিনটি স্বরবৃত্ত (দলমাত্রিক) রীতিতে রচিত।

(৫) লেখক ৫৯৭ পৃষ্ঠাতে প্রশ্ন তুলেছেন, "কেন এমন হলো যে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে এক বছরে জন্মগ্রহণ করেও, কখনো মধুসূদনের অনুকরণ করলেন না" —নিজেই এ প্রশ্নের জবাবে আবার লিখেছেন, "তরুণ রবীন্দ্রনাথের বেদনাবিদ্ধ হৃদয় 'মেঘনাদে'র উচ্চনাদে সাড়া দিতে পারেনি, এবং তাঁর স্বজ্ঞার (?) প্ররোচনায় তিনি জেনেছিলেন যে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ব্যবহার্য হলেও আমাদের ভাষার ও ছন্দের নাড়ির টান সেদিকে নয়।"

—এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল, ভাবাদর্শে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের অনুরাগী না হলেও পদ্য আঙ্গিক এবং ভাবাদর্শে—বিশেষ করে ছন্দে তিনি মধুসূদনকে অনুসরণ করেছেন। বাংলা কাব্যে পদ্যের ছন্দশৃঙ্খল থেকে ভাবমুক্তির প্রথম বিপ্লবী পদক্ষেপ সূচিত হয়েছে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে (প্রবহমান)।

(৬) লেখকের অভিমত হল, বাংলায় অমিত্রাক্ষর (প্রবহমান) ছন্দের বিকাশ সম্ভব নয়, কারণ এ ভাষায় শুদ্ধ স্বরবর্ণ ও অসংখ্য স্বরান্ত শব্দ আছে। আর ইংরেজীতে অমিত্রাক্ষরের এত প্রভাব কারণ সেখানে 'হলন্ত' শব্দের প্রাদুর্ভাব এবং স্বরাঘাত-শাসিত উচ্চারণ পদ্ধতি' রয়েছে।

—এই যুক্তি ছন্দজিজ্ঞাসুগণ মেনে নিতে পারবেন না বোধ হয়। বাংলায় প্রবহমান ছন্দ কতটা স্বভাবধর্মী হয়ে উঠতে পারে একা মধুসূদন নন রবীন্দ্রনাথও তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন মুক্তক (—এটিও প্রবহমান ছন্দ) রীতির অসংখ্য কবিতা লিখে। প্রবহমান পয়ার আর মুক্তকে উচ্চারণের দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই,—আছে চোখে দেখা লাইনবিন্যাসের প্রভেদ। প্রবহমান মুক্তক আধুনিক (রবীন্দ্রোত্তর) কবিরাও যথেষ্ট ব্যবহার করেন। প্রবন্ধকার নিজেও তার মধ্যে একজন।

(৭) বাংলা কবিতার মিল কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র পড়ে পাওয়া যায় না, রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যে তার প্রথম সার্থক নিদর্শন মেলে,—লেখক এই মত প্রকাশের সময় বৈষ্ণব পদাবলী কাব্যের কথা সম্ভবত বিস্মৃত হয়েছেন। আমাদের অনুমান, জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের মিলবিন্যাস এবং যতিভাগ রবীন্দ্র মাত্রাবৃত্ত রীতির মিল ও যতিভাগের পথ নির্দেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ লঘু-গুরু (পদাবলীর মাত্রাবৃত্ত) উচ্চারণে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর পদগুলিও লিখেছিলেন। —এবং সেখান থেকে সূত্র পেয়ে বাংলা উচ্চারণের স্বভাববিরোধী মুক্তদলের (ওপেন সিলেব্‌ল্‌) দ্বিমাত্রিক টান তুলে দিয়ে এবং রুদ্ধদলের (ক্লোজড্‌ সিলেব্‌ল্‌) দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ রেখে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত (সরল কলামাত্রিক) রীতির ব্যবহার করেছেন।

বিজোড় মাত্রাভাগের (পাঁচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পর্বভাগ) পর্ববন্ধে এ ছন্দের ব্যবহার বাংলা পদ্যে সর্বপ্রথম বৈষ্ণব কবিরাই করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবি-প্রদক্ষিণ এবং রবীন্দ্রচর্চা (শতবার্ষিকী স্মারক) গ্রন্থটিতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের দুটি প্রবন্ধ পঠিতব্য।

(৮) বাংলা কবিতার স্তবক বন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। তবু এপথে মধুসূদনই তাঁর পথিকৃৎ—এই সত্যটি শ্রীযুক্ত বসুর প্রবন্ধে অনুল্লেখিত রয়েছে। মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা কাব্যে পদ-পংক্তির মিল বিন্যাসে এবং স্তবক রচনায় যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। 'আত্মবিলাপ' কবিতাটিতেও স্তবক বৈচিত্র্য ও মিল বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মিলবিন্যস্ত পংক্তির মাঝে এক একটি মিলবিহীন পংক্তি ব্যবহারের নমুনাও যদি খুঁজতে চান লেখক, মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় তা পাবেন। একটি দ্বিপদী (৮+৬) এবং আটটি চৌপদী (৮+৮+৮+৬) পংক্তিতে কবিতাটি লিখিত। তার মধ্যে তৃতীয় এবং পঞ্চম পংক্তিটি মিলবিহীন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। 'মানসী' কাব্যের 'দুরন্ত আশা' কবিতাটির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করতে গিয়ে লেখক পদ ভাগকেই পংক্তি বলেছেন।

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্প সম ফোঁসে

এটি দুই পংক্তি না এক পংক্তি? —আমাদের বিবেচনায় এটি দ্বিপদী পয়ারবন্ধে (৮+৬) দুটি ছত্রে (লাইন) সাজানো একটি পংক্তি (মেট্রিক্যাল লাইন)। যদি এক ছত্রে লেখা হত,—

মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে

লেখক কি বলতেন তাকে?

(৯) লেখক একটি মন্তব্যে বলেছেন, "আমরা সাধারণত যাকে 'বলাকা'র ছন্দ বলে থাকি সেই অসম পংক্তিক সমিল পয়ারের উৎসস্থল এক হিসেবে 'মেঘদূত' এবং অন্য হিসেবে 'নিস্ফল কামনা';

—কোন দুই হিসাবে এই কবিতা দুটিকে বলাকার ছন্দের (অর্থাৎ প্রবহমান মুক্তকের) উৎস বলেছেন জানি না। আমাদের ধারণা, আরও পূর্বে লেখা 'সন্ধ্যা সংগীতে'র 'সন্ধ্যা' কবিতায় মুক্তকের সূচনা এবং ঐ কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় কবিতা 'তারকার আত্মহত্যা'য় মুক্তকের রূপাদর্শ প্রথম সুস্পষ্ট হয়েছে। 'নিস্ফল কামনা' কবিতাটির রচনাকাল এর প্রায় বারো বছর পরে। ইতি—

নীলরতন সরকার
বিদ্যাসাগর কলেজ, বীরভূম।

বাংলাদেশের গ্রাম

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা নগরীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বাংলার সংবাদপত্রগুলিকে অনেক লেখালেখি করতে দেখেছি। কিন্তু বাংলার পল্লী অঞ্চলের সমস্যাগুলির প্রতি এদের নিস্ক্রিয়তা এবং সর্বনাশী নীরবতা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে বামপন্থী দলগুলি পর্যন্ত) তৎপরতা সাধারণত কলকাতা-হাওড়া এবং আসানসোল এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের এই জীর্ণ এবং দারিদ্র্যপীড়িত পল্লীগ্রামগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, স্বাধীনতা লাভের এই চৌদ্দ বছরে বাংলা কতটা উন্নতি করেছে!

আমি বাঁকুড়া জেলাবাসী। বাঁকুড়ার পল্লী এলাকা সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এখানকার প্রকৃতি যেমন রুক্ষ, শুষ্ক, বন্ধুর এবং নিষ্করুণ, তেমনি এখানের অধিকাংশ গ্রামও নির্জন এবং শ্রীহীন। গ্রামে যাতায়াতের অবস্থা শোচনীয়: গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড জলকষ্ট। অধিকাংশ গ্রামেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা সরকারী ডাক্তারখানা নাই। গ্রামবাসীরা দরিদ্র, রুগ্ন এবং শীর্ণ। যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরা শহরে থাকেন। পূজা-পার্বণে কখনও কখনও তাঁরা গ্রামে আসেন। কিন্তু গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে ভাববার বা কিছু করবার তাদের সময় নেই। সরকার 'স্পেশ্যাল কেডার' শিক্ষকদের বহাল করেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই পড়ান হচ্ছে কিনা, তা দেখবার কেউ নেই। সরকারী কর্মচারীরা কদাচিৎ গ্রামে পদার্পণ করেন।

প্রশান্তকুমার সরকার
হাজারীবাগ, বিহার।

যুগচরিত্র ও সরলাবালা সরকার

প্রমথনাথ বিশী

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে দেখা গেল যে আমাদের জাতিমনে দুটি প্রধান প্রবণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একটি দেশপ্রেম, অপরটি ভগবৎভক্তি। পরবর্তী কালের বাংলাদেশ তথা বাংলাসাহিত্য জাতিমনের এই দুটি প্রধান প্রবণতায় তৈরী হয়ে উঠেছে বললে অন্যায় হয় না। এই হিসাবের মধ্যে ডিরোজিওর ছাত্রদল আসছে না। তৎসত্ত্বেও—তারা অনেকেই এই প্রবণতার ঊর্ধ্বে নয়। ডিরোজিও নিজেই ভারতভূমিকে মাতৃভূমি বলে সম্বোধন করেছেন। বোধকরি ভারতবর্ষ এই প্রথম নিজ সন্তানের কণ্ঠে 'মাতৃভূমি' সম্বোধন শুনলো। ডিরোজিওর অন্যতম ছাত্র রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন বটে। কিন্তু শেষজীবনে তিনি প্রগাঢ় খৃষ্টভক্ত হয়েছিলেন। কাজেই দেশপ্রেম ও ভগবৎভক্তির দৃষ্টান্ত ডিরোজিও-ছাত্রদের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু এ দুটি তাদের জীবনের প্রধান প্রবণতা নয়। রামমোহন রায়কেও আমরা এই হিসাবের মধ্যে ধরবো না, যেহেতু বহুল পরিমাণে তিনিই এ দুটি প্রবণতার প্রধান প্রেরণাদাতা। এখন এই বিরল দৃষ্টান্ত কটি বাদ দিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বোধকরি একটিও বিশিষ্ট বাঙালী পাওয়া যাবে না, যিনি ঐ যুগলক্ষণাক্রান্ত নন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে কারও মনে একটি লক্ষণ প্রবল কারও মনে মনে বা অপরটি। আবার অনেকের মনে এক সঙ্গে দুটিই সমান প্রবল।

ঈশ্বরগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বাঙালী সন্তানগণ এই প্রবণতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু শুধু বাংলা দেশ বা বাংলা সাহিত্যই বা কেন, বাঙালী মনীষিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন জাতীয়তাবোধ—তাও এই দুই প্রবণতার মিশ্রণে গঠিত। প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তক্ষেপের ফলেই ধর্মে ও দেশাত্মবোধে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত, 'আনন্দমঠ', 'ধর্মতত্ত্ব', ('অনুশীলন') আমাদের উক্তির সাক্ষ্য বহন করে। এই দুইএ যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেই জটিলতা চলছে, তার সুফল কুফল দুইই আমরা ভোগ করছি। এইসব মহামনীষীদের পর্যায় থেকে নীচে নেমে এলে দেখা যাবে যে সেকালে বাঙালীর মন—এই মিশ্র উপলব্ধিতে গঠিত হয়ে উঠেছিল। দেশপ্রেম ও ভগবৎভক্তিতে তাদের ব্যক্তিত্বের তন্তু উপতন্তু রচিত, এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে মনীষীদের প্রভাব তাঁদের মধ্যেই সংহত হয়ে থাকেনি, সমস্ত দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল—এমন না হলে এই দুই প্রবণতায় দেশগঠিত হয়েছিল, একথা বলা নিরর্থক হত। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য সরলাবালা সরকারের জীবন ও সাহিত্য—এই বিচিত্র প্রবণতার একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

"সরলাবালা সরকারের জন্ম ১২৮২ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ (১৮৭৫ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর)। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের কাঠালপোতা পল্লীতে। এই বাড়ি সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের। তাঁর জ্যাঠামশাই দ্বারকানাথ সরকারের। সরলাবালার পিতার নাম কিশোরীলাল সরকার। তিনি ছিলেন কলকাতার হাইকোর্টের নামকরা অ্যাডভোকেট। আইনবিশেষজ্ঞ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল অসাধারণ। কিশোরীলালের লেখা আইন সংক্রান্ত কয়েকখানা ইংরাজী বই সে যুগে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। তিনি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক'ও ছিলেন।

বাংলাদেশে তখন মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ছিল অপরাধ। সরলাবালা সেই ঊনিশ শতকের পর্দানশীন বাংলার মেয়ে।

তাঁর পিতামহী রাসসুন্দরী দাসী—'আমার জীবন' নামক অত্যাশ্চর্য আত্মজীবনীর লেখিকা। রাসসুন্দরী আজ থেকে প্রায় একশো পঞ্চাশ ষাট বছর আগে এই বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনে লেখাপড়া শেখার কোন সুযোগ ঘটেনি। তিনি নিজের চেষ্টায় নিজেকে গঠন করে নিয়েছিলেন।

পিতামহীর সংগে সরলাবালার জীবনের মিল বিস্তর। কোনদিন তিনি স্কুলে পড়েননি। ঘরে বসেই বিদ্যাচর্চা করেছেন।

সরলাবালার ডাকনাম ছিল 'গৌরী'। অল্পবয়সে তিনি এবং তাঁর দাদা ডাঃ সরসীলাল সরকার মাতৃহীন হন। তাঁর মা লীলাবতী ছিলেন স্বদেশপ্রাণা এবং ভগবৎ অনুরাগী। পূজা করতে বসে তিনি প্রায়ই সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। গৃহকর্মেও নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী সকলের দুঃখেই তিনি ছিলেন সমদুঃখী।

সরলাবালা তাঁর সেজোমামা স্বর্গত শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' ও

'শ্রীশ্রীকালাচাঁদ গীতা' প্রভৃতি বই রচনার সময় লেখার ভার বেশীর ভাগ নিজের হাতেই নিয়েছিলেন। কারণ তিনি খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন। শিশিরকুমার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন আর অনর্গল বলে যেতেন। সরলাবালা পেন্সিল দিয়ে অতি দ্রুত সেগুলি লিখে যেতেন। তখন তাঁকে অনেক তাল-পাতার পুঁথিও ঘাটতে হয়েছিল।

'শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত' নাম দিয়ে গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা করে তাঁর সেজো-মামা সরলাবালার মনের মধ্যে অনুরাগের যে দাগ রেখে গেছেন ঠিক এই দাগের কথাই কীর্তনগানের ভেতর দিয়ে ব্যক্ত করতে গিয়ে সরলাবালার মা একদিন মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন।

সরলাবালার সংবেদনশীল মনে স্বদেশী আন্দোলন গভীর ছাপ রেখেছিল। বাংলার স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের প্রতি তাঁর অন্তরের আহ্বান প্রথম দিককার কবিতায় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। বিপ্লবীদের অনেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাঘা যতীন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা দুজনেই সরলাবালাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করতেন।

বাঘা যতীনের শিষ্য সুরেশচন্দ্র মজুমদারও সরলাবালার সান্নিধ্যে আসেন। প্রথম পরিচয় থেকে সুরেশচন্দ্র তাঁকে নিজের মায়ের মত ভক্তি করতেন।

সাতাশিতম জন্মদিনের মাত্র আটদিন আগে ছিয়াশি বছরের গৌরবময় জীবনের অবসানে জন্মমাস অগ্রহায়ণেরই এক বিষণ্ণ অপরাহ্নে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার সরলাবালা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ধর্ম এবং সাহিত্যের আলোচনায় মগ্ন ছিলেন।"

॥ ২ ॥

সরলাবালা সরকারের জীবনকথা সুবিদিত, এখানে বিস্তারিত বিবরণ দান অনাবশ্যক। শুধু যে কয়টি কথা বর্তমান প্রসঙ্গে অর্থাৎ সরলাবালা সরকারের জীবনের অর্থ বিশ্লেষণে লাগবার সম্ভাবনা অপরের একটি রচনা থেকে সেই অংশটুকুই উদ্ধার করে দিলাম। আগেই বলেছি যে যুগের প্রধান দুটি লক্ষণ তাঁর জীবনে বর্তেছিল। কিন্তু এ তো সাধারণ পরিচয়। সেকালের ছোট বড় প্রায় সকলেই যুগলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। তবে তার মধ্যে তাঁর বিশেষ পরিচয় কোথায়? তাঁর বিশেষ পরিচয় এই যে তিনি শুধু যুগলক্ষণাক্রান্তা মহীয়সী নারী ছিলেন না, তিনি মনস্বিনী নারীও ছিলেন। এই গুণটি তাঁর পিতৃকুলের সম্পত্তি। পিতামহী রাসসুন্দরী দাসী, পিতা কিশোরীলাল সরকার—দুজনেই

মেধায় ও মনীষায় অনন্যসাধারণ। সেই বংশের সন্তানদ্বয় সরসীলাল ও সরলাবালা দুজনেই বহুল পরিমাণে পিতৃকুলের এই গুণটি পেয়েছিলেন।

ধর্মানুরাগ ও দেশপ্রেম এ দুটি গুণ তিনি পেয়েছিলেন মাতৃকুল থেকে। তাঁর জননীর পরিচয় এইমাত্র দেওয়া হয়েছে আর তাঁর স্বমাহাত্ম্যখ্যাত মাতুল শিশিরকুমার ঘোষের পরিচয় সুপরিজ্ঞাত। তাঁর মধ্যেও জোট বেঁধেছিল সে যুগের প্রধান লক্ষণদ্বয়—দেশপ্রেম ও ভগবদ্‌ভক্তি। আর রক্তের ধারা বেয়ে ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে এই গুণ দুটি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল সরলাবালার জীবনতন্তুতে। এর উপরে অল্প বয়সেই এসে পড়লো ভগিনী নির্বেদিতার প্রভাব। এই মহীয়সী নারীর মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তি ও প্রবল মনস্বিতা একত্র সমাবিষ্ট হয়েছিল। সেকালের অধিকাংশ বিখ্যাত বাঙালী নির্বেদিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সরলাবালাও হলেন। তাঁর মধ্যে আগেই যে তিন গুণ সঞ্চারিত হ'য়েছিল এবারে নির্বেদিতার সাহচর্যে ও প্রভাবে তা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। এইবারে বলা চলে যে সরলাবালার জীবনতন্ত্র গঠন সম্পূর্ণ হ'ল। তখনকার দিনে তাঁর মতো গৃহাবরোধপালিনী নারীর পক্ষে হাতেকলমে দেশের কাজ করা সম্ভব ছিল না—তাই তিনি নিজেকে প্রক্ষেপ করলেন বাঘাযতীন, মানবেন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে—"এরাই ছিল আমার উপাস্য বালগোপাল।"—এঁরাই ছিল গৃহাবরোধে বন্দিনী এই বিপ্লববাদিনী নারীর হাত পায়ের মতো। এই গেল তাঁর একদিকের পরিচয়—আংশিক। আবার তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে আছে তাঁর অন্যদিকের পরিচয়—অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ—কারণ তাতে মনস্বিতা, দেশপ্রেম ও ভগবদ্‌ভক্তি তিনটি গুণেরই পরিচয় লিপিবদ্ধ।

॥ ৩ ॥

প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক নব্য বাঙালী সাহিত্যিকগণ সকলেরই প্রতিভা অল্পাধিকতর বহুমুখী। রবীন্দ্রপ্রতিভায় যে বহুমুখিতা পূর্ণ বিকশিত, তারই অল্পাধিক বিকাশ নবযুগের বাঙালী লেখকদের মধ্যে। বহুমুখিতা নব্যসাহিত্যের একটি সাধারণ লক্ষণ। সরলাবালা সরকারেও বহুমুখিতা গুণটি বর্তমান। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু লক্ষ্য করবার মতো তাদের বৈচিত্র্য। তিনি গদ্য ও পদ্য দুই-ই লিখেছেন, স্বভাবতই গদ্যের পরিমাণ অধিক। গল্প, জীবনী, কাব্য ও কবিতা, স্মৃতিকথা, ধর্মকথা, সাহিত্য সমালোচনা ও শিশুগল্প প্রভৃতি নানা জাতের রচনা তিনি লিখে গিয়েছেন আর জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত সচল ছিল তাঁর মস্তিষ্ক ও মেধা। ধর্মজীবনযাপনের এটি একটি শুভফল। সন তারিখের দ্বারা সচেতন না হ'য়ে উঠলে বুঝতেই পারা যাবে না যে গল্প সংগ্রহ গ্রন্থের শেষের দিকের অনেক রচনা ১৩৬৩ সালে লিখিত। তারপরেও তিনি লিখেছেন। কী ঝরঝরে গদ্য। সুবাসিত মল্লিকা কুসুমসন্নিভ অন্নের মতো। প্রত্যেকটি দানা গুণে নেওয়া যায়। এ গদ্যরীতি পেয়েছেন কেতাবী শিক্ষায় বঞ্চিত, তাঁর পিতামহী রাসসুন্দরী দাসীর কাছে—যাঁর "আমার

জীবন" বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত। কেতাবী শিক্ষা বিশেষ বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যসংক্রান্ত কেতাবী শিক্ষা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে সাহায্য করছে কিনা সংশয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্বচ্ছ, সতেজ অথচ স্নিগ্ধ গদ্য আবার লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ, পিতামহী ও পৌত্রী দুজনেরই। এ যেন কলমে লিখিত নয় ব্যক্তিত্বকে গলিয়ে ঢেলে দেওয়া। খুব সহজ বলেই খুব কঠিন। তাঁর বহুমুখিতার মধ্যে কোন একটি গুণকে যদি নির্বাচন করে নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে হয় তবে অনেকেই তাঁর গদ্যরীতিকে বেছে নেবেন। আমি তো অবশ্যই নেবো। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর ভঙ্গী ও রামকৃষ্ণদেবের বাচনভঙ্গী লেখিকার ব্যক্তিত্বের উত্তাপে গলে গিয়ে এই বিস্ময়কর রীতির সৃষ্টি করেছে।

(১) "দুপুরবেলা চারু ঘরের জানালাটিতে একা বসিয়া আছে, আর বাড়ির কথা মনে পড়িয়া আপনা-আপনি চোখে জল আসিতেছে, কিছুতে সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। গাল দিয়া জল গড়াইয়া আসিতেছে, আর ভয়ে ভয়ে অমনি মুছিয়া ফেলিতেছে। পাছে কেহ আসিয়া দেখে।"

। সাহিত্য, কার্তিক, ১২৯৯।

(২) "মা আমার, তোমার জন্য আপনার বড় ভাবনা হইয়াছিল, আমি তোমাকে লইয়া অকূলপাথারে ভাসিতেছিলাম। তুমি আমার বড় আদরিণী, কার হাতে সঁপিয়া দিব সে তোর আদর করিবে কিনা, এই ভাবনায় মন বড় ব্যাকুল হইত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। যাহার ধন তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছি। হায় প্রভু, বন্ধন ভালো, না, বন্ধনের মুক্তি ভালো, এখনও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই।"

। ভারতী ও বালক, পৌষ, ১৩০৪।

এ বাক্‌ স্পন্দ, গদ্যরীতির এই ছন্দ স্পষ্টত ঊনবিংশ শতকের—আর এর মূলে বাঙালীর তৎকালীন জাতিচরিত্র। এই ছন্দটাই মূলে, তবে লেখকভেদে, অর্থাৎ আধারভেদে এক এক রূপ গ্রহণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ও সরলাবালা সরকারের গদ্যরীতিতে পার্থক্য প্রতিভার—কিন্তু মূলে ছাঁচটা দুজনেই এক; আর সে ছাঁচ দুজনেই গ্রহণ করেছেন নিজ নিজ ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে যেখানে জাতিচরিত্র প্রতিফলিত। ব্যক্তিচরিত্রে পৃথক হয়েও জাতিচরিত্রে এক বলেই ছোট বড় সকলের মধ্যেই গদ্যরীতির ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়।

আর শুধু গদ্যই বা কেন, পদ্য ভিন্ন ধরনের শিল্পকলা হওয়া সত্ত্বেও অনেকস্থলে পদ্যেও একই জাতিচরিত্রের প্রকাশ।

(১) "তুমি মোর পূর্বজন্মে বিষাদের স্মৃতি
এত মোরে বাস ভালো,
তবু মোরে দগ্ধ করো নিতি।"

। জাহ্নবী, ভাদ্র, ১৩১৩।

(২) ঊর্মিসম স্মৃতি আজি এই ঢেউ আসে
আবার মিলায়ে যায়, খুঁজি চারিপাশে,
নাই নাই, কিছু নাই চিহ্নটুকু তার,
বিস্মৃতিতে গেছে ডুবে স্মরণ আমার।

এ দুটি অংশ সুগভীর অর্থে পদ্য নিঃসন্দেহ কিন্তু গদ্যের সঙ্গে এদের যেখানে ছন্দঃস্পন্দে ও বাক্‌ স্পন্দে মিল সেখানে এদের মধ্যে একই যুগচরিত্রের প্রকাশ।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, সরলাবালা সরকার যুগ চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত বলেই যুগের প্রতিনিধি। আর যুগের প্রতিনিধি বলেই সে যুগে তাঁর আসন চিরদিনের জন্য চিহ্নিত হয়ে রইলো। সবশেষে উপসংহারে এসে অনেককাল আগে তাঁর 'হারানো অতীত' গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষ্যে যে কয়টি কথা লিখেছিলাম তারই অন্ত্যভাগ উদ্ধার ক'রে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করতে ইচ্ছা করি।

"সবশেষে আলোচনা করিবার ইচ্ছায় চারিটি অধ্যায় রাখিয়া দিয়াছি, ব্যাস সরোবর, পুরীর সমুদ্রতীর, মালপাড়ার কীর্তন আর ধুলোট কীর্তন। এই অধ্যায়গুলিতে লেখিকা সংক্ষেপে ও প্রচ্ছন্নভাবে নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলিয়াছেন। এসব কথা আভাসে ইঙ্গিতে ছাড়া বলা চলে না, লেখিকাও অন্যরূপ চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুঝিতে পারা যায় যে, আধ্যাত্মিক জীবন ও শ্রী গৌরাঙ্গভক্তিই তাঁহার জীবনের কেন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসেবা, দেশসেবা, সমাজসেবা সকলেরই মূলে সর্বরসের আধার ঐ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা। এ বিষয়ে অধিক বলিতে আমি অনধিকারী। আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস বলিয়া অধ্যায়গুলি নীরস মনে করিবার কারণ নাই, ব্যাস সরোবর দর্শন ও মালপাড়ার কীর্তন শ্রবণের কাহিনী তো রীতিমত অ্যাড্‌ভেঞ্চার। তাঁহার জীবনের মতো তাঁহার বইখানিও "ধুলোট কীর্তনে" আসিয়া স্পৃহনীয় উপসংহার লাভ করিয়াছে।

"শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরনী॥"

ভক্তিপ্রীতির সেই অবিনশ্বর পুষ্পবনে লেখিকার চিত্ত আসিয়া শেষ পর্যন্ত অনন্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এই বইখানি মাত্র নয়, তাঁহার অনেক রচনা পড়িতে পড়িতে তাহাদের অন্তঃনিসৃত সরল ভক্তির ধারা দেখিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গ লেখিকাকে দয়া করিয়াছেন। কিন্তু এসব কথা বুঝাইবার নয়, আর এই অবিশ্বাসের যুগে বুঝাইতে গেলেও কেহ বড় বুঝিবে না—তাই সে চেষ্টা করিব না। শুধু এই বলিয়া আজ ক্ষান্ত হইব যে বাংলা সাহিত্যের যে প্রবাহিনীটি শ্রীগৌরাঙ্গপদ-নিঃসৃত সেই কল্লোলিনীতে লেখিকা আর একটি শান্ত স্নিগ্ধ ভক্তিপ্রবাহ যোগ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই ভক্তি প্রবাহের সঙ্গে তাঁহার নামটিও বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়ভাবে থাকিয়া যাইবে।"

হাতের মালা বিদ্যুৎগতিতে ঘোরাতে ঘোরাতে নিভাপিসি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠেন, 'সব সইতে পারি, বুঝলি শশী, সইতে পারিনে শুধু ওই ছোড়া-ছুঁড়িগুলোর দোহাত্তা 'লভে' পড়া! ছি ছি! সমাজ সংসার কী সব রসাতলে গেল গা! গার্জেনরা একটা প্রতিবাদ করে না! বলি শশী, তুই তো শুনতে পাই এই ফেলাটগুলোর কেয়ার অব্—'

'কেয়ার অব নয় পিসি', শশীপদ বিনীতভাবে বলে, 'কেয়ারটেকার।'

'থাম শশী, তুই আর আমাকে নতুন কথা শেখাতে আসিসনে। বলে জন্মকাল জেনে এলাম কেয়ার অব্, এখন শেখাতে এল টেকার চেকার। বেশ, নয় তাই হলি, বলি সেটা একটা দায়িত্বর কাজ তো? ফেলাটের ভালমন্দ দেখবি তো? এই লভে পড়াপাড়ির একটা প্রতিকার করবি না?'

শশীপদ মৃদু হেসে বলে, 'আমার প্রতিকারের দায়িত্ব ছাত থেকে জল পড়লে, কি কল থেকে জল না পড়লে। ওসব লভে পড়াপাড়ির আমি কি প্রতিকার করবো?'

'করবি না!' নিভাপিসি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, জলদগম্ভীর স্বরে বলেন, 'সমাজ রসাতলে যাক?'

'গেলে আর আমি কি করতে পারি?' শশীপদ বলে উদাসমুখে।

'দেখ শশী, সব সইতে পারি, তোদের ওই গা এলানো কথা সইতে পারিনে। তুই কড়া নোটিস দে যে, "এ হচ্ছে সরকারী কোয়ার্টারস; এখানে ওসব ছ্যাবলামি ফাজলামি চলবে না।" দেখি গার্জেনগুলো কেমন না গা করে।'

শশীপদ বলে, 'অমন কোন নোটিস দেবার আইন নেই।'

'থাম শশী, তুই আমায় আইন বোঝাতে আসিসনে। বলে কত আইন অমান্যি দেখলাম। ওই আইন অমান্যি করে করেই লোকে স্বরাজ পেল, আর এখন আসছে আমায় আইন দেখাতে! তুই না পারিস, ও তোর গিয়ে আইন আমাকেই হাতে নিতে হবে।'

'সর্বনাশ করেছে' শশীপদ সভয়ে বলে, 'তুমি আবার আইন হাতে নেবে কি? তোমার হাতে বাপু শুধু এই হরিনামের মালাই শোভা পায়।'

'দেখ শশী, সব সইতে পারি, তোর এই আদিখ্যেতা সইতে পারিনে। হরিনামের মালাই শোভা পায়। বলে তো বললি। বলি নিশ্চিন্দি হয়ে হরিনাম করতে দিচ্ছে ওরা? চব্বিশ ঘণ্টা সিঁড়ির জানলায় চোখ পেতে বসে থাকতে হয় না আমায়? দেখতে হয় না, কাদের মেয়ে কাদের ছেলের সঙ্গে লোকে যাচ্ছে, পার্কে যাচ্ছে, সিনেমায় যাচ্ছে!'

'বল কি পিসি, তোমায় দেখতে হয়?'

'হবে না?' নিভাপিসি মালার গতি আরও দ্রুত করে বলেন, 'সবাই চক্ষু মুদে অন্ধ হয়ে থাকছে বলে, আমাকেও তাই থাকতে হবে? প্রতিকার চিন্তা করতে হবে না?'

শশীপদ সকাতরে বলে, 'ওর আর প্রতিকার হবে না পিসি, ছেড়ে দাও। বরং জানলা থেকে সরে এসে পুজোর ঘরে বসে মালা জপো।'

'পুজোর ঘরে বসে মালা জপবো? বাঃ, বেশ! ভালো আমার বিধেনদাতা এলেন রে! বলি হরিনাম হবে? প্রাণের মধ্যে হাঁকপাঁক করবে না? আশেপাশে ধারেকাছে মেয়ে-ছেলেগুলো দোহাত্তা লভ্ করবে, আর আমি পুজোর ঘরে বসে মালা ঘোরাবো? বলি শশী, রক্তমাংসের মানুষ বই তো পাথরের

…তুল নই? আমি বলছি তুই নোটিস দে। …ড়া চাবুক মেরে নোটিস দে। দেখি …গিণীরা জব্দ হয় কিনা।'

শশীপদ হতাশ কণ্ঠে বলে, 'কিন্তু পিসি, …ই, আমাদের চোখে তো কখনো ওই সব …ভুটভু পড়ে না?'

'পড়ে না! তা জানি। পড়বে কোথা থেকে? চক্ষু থাকতেও অন্ধ যে! চোখকান খোলা রাখলেই টের পাবি ওই চার নম্বরের ফ্ল্যাটের সঙ্গে সাত নম্বর, পাঁচ নম্বরের সঙ্গে আট নম্বর, তিন নম্বরের সঙ্গে—'

'থাক থাক পিসি', শশীপদ ব্যস্ত হয়ে বলে, 'ধরে নিচ্ছি সব নম্বরের সঙ্গে সব নম্বর, কিন্তু করা যাবে কি? চোখকান বুজে সয়ে যেতেই হবে। যে কালের যা।'

'থাম শশী, তুই আর আমায় কালের ধর্ম শেখাতে আসিসনে—' নিভাপিসি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'বলে ওই তোদের কালের মুখ চেয়ে কত সওয়াই সইছি! এই যে এখনকার বউ-ঝিগুলোর হায়া নেই, লজ্জা নেই, মাথায় কাপড়ের বালাই নেই, গোবর গঙ্গাজলে ছেদ্দা নেই, গুরুগোবিন্দয় মন নেই, কাজের মধ্যে শুধু ধিঙ্গীনাচ নেচে বেড়ানো, দেখছি না এসব চেয়ে চেয়ে? সইছি না মুখ বুজে? এই তো আমারই ঘরের বউ, পাঁচ ছেলের মা, গিন্নী, বড় মেয়েটার সময়ে বিয়ে হলে এতদিনে দুটো নাতি নাতনী 'দিদিমা দিদিমা' করে বেড়াতো, তিনিও চুলের গোড়ায় লাল রিবনের ফুল উড়িয়ে যাচ্ছেন কেলাবে, যাচ্ছেন সাঁতারে, যাচ্ছেন নাচের ইস্কুলে! প্যাঁট প্যাঁট করে তাকিয়ে দেখছি আর হরিকে ডাকছি, হরি হে পার করো। তবু বলে আরও সও। সব সইতে পারি শশী, কিন্তু পারিনে ওই 'লভে' পড়াপড়ি সইতে! সকল নম্বরের কাণ্ডকারখানা দেখি আর ভয়ে মরি, বলি, হে হরি, আমার নাতনীটার যেন মতিবুদ্ধি ভাল থাকে।'

নিভাপিসির নাতনীর 'মতিবুদ্ধি' সম্পর্কে শশীপদ ওয়াকিবহাল, তাই সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা গোপন করে ফেলতে হয় তাকে।

নিভাপিসি আবার নামের মালায় মনঃসংযোগ করে বলেন, 'ভালমতন একটা পাত্তরের সন্ধান দে দিকি শশী, আমি থাকতে থাকতে মেয়েটাকে পার করি। নইলে যে গা হালকা ওর মা বাপ, বিয়ের কথা তুলবেই না! পাস করে বেরোলেই বলবে, "যা চাকরি কর গে যা?" সব সইতে পারি শশী, এই মেয়েগুলোর ধেইধেই করে চাকরি করতে যাওয়া সইতে পারিনে। তেমনি হয়েছে মা-বাপগুলো, মেয়ে ছেলে বড় হলে যে বিয়ে দিতে হয়, এ কথা যেন বিস্মরণ হয়ে গেছে।'

শশীপদ হেসে বলে, 'তা বড়ই যখন হচ্ছে, তখন নিজেদের বিয়ের কথা নিজেরাই ভাবুক না পিসি! ধরে ধরে যা হোক একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়াই কি ভাল? মনের মিল হবে কি না হবে—'

'তুই থাম শশী', নিভাপিসি হাতের মালা সবেগে আছড়ে থলির মধ্যে পুরে ফেলে বলেন, 'আর হাড়-জ্বালানে কথা বলিসনে। মনের মিল! মনের মিল না হয়ে বিদ্যেসাগরের চলল, ভূদেব মুখুয্যের চলল, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের চলল চলবে না শুধু তোদের এই রাজ্যপদ পাওয়া ছেলেমেয়েগুলোর? বলি মনের মিলের বিয়ে করে করে দেশের দশের কী উপ্‌গারটা করছে শুনি?'

শশীপদ অবাক হয়ে বলে, 'দেশের দশের আবার কি উপকার করবে? নিজেরাই সুখে শান্তিতে থাকবে—'

'তুই থাম শশী, সব সইতে পারি, তোর ওই পাকামি সইতে পারিনে। সুখে শান্তিতে! বলে শান্তি কথাটাই পৃথিবী থেকে উপে গেল, এখন আমায় এসেছে শান্তি দেখাতে! যে সুখ-শান্তির বড়াই করছিস শশী, সে বস্তু পশু-পক্ষী কীটপতঙ্গরও আছে। ঝ্যাঁটা মারো! মনের মিল! বলি মনের কোনও ঠিকঠাক আছে? সে আজ বলবে একে চাই—কাল বলবে ওকে চাই। সুবিধে পেলে পরশু বলবে তাকে চাই! তখন কিসের বড়াই করবি শুনি? সব সইতে পারি শশী, তোদের এই বড়াই সইতে পারিনে। তুই আমার নাতনীটার জন্যে একটা পাত্তর দেখে দে দেখি!'

শশী কষ্টে হাসি চেপে বলে, 'কেন, তোমাদের ওই বারো নম্বর ফ্ল্যাটের জজসাহেবের ছেলেই তো রয়েছে সামনে। বাজারের সেরা পাত্তর। যেমন রূপ, তেমনি বিদ্যে, তেমনি টাকা, তেমনি—'

'তুই থাম শশী,' নিভাপিসি ব্যাজারমুখে বলেন, 'সব সইতে পারি, পারিনে শুধু তোর ওই খোকামি! আমার ছেলে করবে জজের ছেলেকে জামাই? তাও যদি মেয়ের রূপ থাকতো!'

শশী হেসে বলে, 'রূপেতে কী করে বাপু গুণ যদি থাকে?'

'গুণ!' নিভাপিসি দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, 'থাক শশী ও আলোচনা। কোন ফাঁকে আবার বউমার কানে যাবে। বউমা আবার নেয্য কথা একেবারে সইতে পারে না। ওই যে আসছেন।'

নিভাপিসির বউমা এসে দাঁড়ান।

দু' কাঁধে দুটি বেণী, কোমরে খুঁট গোঁজা—আঁটসাঁট করে শাড়ি পরা, পায়ে হাওয়াই চটি, গায়ে নাইলন ব্লাউস।

আদুরে ভাঙা-ভাঙা গলায় নিভাপিসির বউমা বলেন, 'মা, বোবর তো কাল জন্মদিন, পায়েসের দুধ কি পাঁচ সের বলে দেব, না আরও বেশী?'

নিভাপিসি ব্যাজারমুখে বলেন, 'যা ভাল বোঝ কর বাছা। পাঁচ সের দুধের পায়েস যে কে খাবে তাও তো জানিনে।'

'ওমা সে কী, জানেন না? ইস্—' বউমা অপ্রতিভের ভান করে বলেন, 'বলতে একদম ভুলে গেছি, এই সব ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়েদের, মানে ওদের সমবয়সীমিতনদের নেমন্তন্ন করেছি যে!'

'হরি বল মন, মদনমোহন!' নিভাপিসি গালে হাত দিয়ে বলেন, 'এত বড় একটা যজ্ঞি ফাঁদছ, তার কিছু জানি না আমি। কালে কালে কতই হবে! বলি বউমা, ওই জজের ছেলেটাকে নেমন্তন্ন করেছ?'

'ওমা, করব না আবার! ও তো আগে!' বউমা বিগলিত হাস্যে বলেন, 'বড় খাসা ছেলে! আপনার সঙ্গে চেনা করিয়ে দেব।'

নিভাপিসি বলেন, 'থাক বাছা, আমার আর চেনা করায় দরকার নেই। কত যে গুণের ছেলে, তা আর ধরে করে বোঝাতে হবে না আমাকে। সব সইতে পারি বউমা, শুধু তোমাদের ওই বড়লোক ঘেঁষাপনা সইতে পারিনে। বলি আমার নাতনীর

'তুই হচ্ছিস কেয়ার অব'

জন্মদিনে জজের ছেলে কেন? দামী একটা প্রেজেণ্টো দিয়ে মাথা কিনবে বলে? মরুক গে, শশী, তুই তা হলে কাল আসিস। ভাল-মন্দ দুটো রান্নাবান্না হবে!'

শশী ত্রস্তেব্যস্তে বলে, 'আমাকে আবার কেন? আমি ওই সব ছেলে-ছোকরার মধ্যে—'

নিভাপিসি দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, 'সেই জন্যেই তো আরও আসা দরকার! তুই হচ্ছিস কেয়ার অব্—'

'কেয়ার অব্ নয় পিসি, কেয়ার টে—'

'থাম তুই শশী— যা বলছি শোন। কাল আসবার সময় বেশ কড়া করে একটা নোটিস লিখে আনবি। পষ্ট পষ্ট করে লিখে দিবি, এই সরকারী কোয়ার্টারে ওসব লভ্ ফভ্ চলবে না। সেই নোটিস ঝুলিয়ে দিবি ওদের নাকের সামনে। বউমারও শখ কম নয়, যত রাজ্যের লভে-পড়া ছেলেমেয়েকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে জড় করছেন! আমার নাতনীটার মতিবুদ্ধি একটু ভাল আছে, সেটাকেও উচ্ছন্ন দেবে আর কি! শশী, তুই ওই নোটিসে ও-কথাটাও ঢুকিয়ে দিস!'

'কোন্ কথা পিসি?'

'ওই যে এ নম্বরে সে নম্বরে অত ঘটঘটি চললে বাড়ি ছাড়বার নোটিস দেওয়া হবে।'

'কী মুশকিল, ও-কথা লেখবার যে আইন নেই পিসি—'

'থাম শশী, ফের আমায় আইন দেখাতে আসছিস? সব সইতে পারি, ওই আইন দেখানো সইতে পারিনে! নোটিস তুই আনবি। কেয়ার অব্ হয়ে, কেয়ার করবি না ছেলেপেলেগুলো উচ্ছন্ন যাচ্ছে কি না?'

মালাগাছটা আবার থলি থেকে টেনে বার করে জোরে জোরে ঘোরাতে থাকেন নিভা-পিসি।

শশী ও-ঘরে গিয়ে বলে, 'নিন বউদি, এখন বুঝুন ঠেলা? উচ্ছেদের নোটিস লিখে আনবার হুকুম হয়েছে।'

নিভাপিসির বউমা মুখ টিপে হেসে বলেন, 'এনো।'

'তা'পর? তাতে পিসির নিজের ঘরেই তো আগে লালবাতি জ্বলবে।'

'জ্বলুক না!'

'কাল যা ঘটা লাগাচ্ছেন শুনেছি, ব্যাপারটা প্রকাশ না পেয়ে কি আর ছাড়বে?'

বউদি মৃদুহাস্যে বলেন, 'প্রকাশের জন্যেই তো করা! কাল তো ওদের এনগেজমেণ্টের মতই হবে একটা কিছু—'

'যা দেখছি, নিভাপিসি কাল কাশী চলে যাবেন।'

বউদি শুধু একট মৃদু হাসি হাসেন।

'আমার কিন্তু আসতে একটু দেরি হবে।'

'তা হোক, কিন্তু এসো অবিশ্যি করে।'

তা শশীপদ আসে অবিশ্যি করে।

তবে ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে।

বাজে কাগজে বাজে স্ট্যাম্প মেরে একটা নোটিস লিখে এনেছে, নইলে কে জানে নিভাপিসি তাকে আস্ত রাখেন কি না রাখেন।

'পিসি!' মৃদু স্বর শশীপদর।

কিন্তু এ কী! নিভাপিসির নয়নে এমন বরাভয় কেন? মুখে এমন কাঁচ কলাপাতা

"পায়েসের দুধ কি পাঁচ সের বলে দেব না আরও বেশী?"

রঙের হাসি কেন? নিভাপিসির হাতে মালা নেই কেন?

কী এ? রাগের আর এক অভিনব প্রকাশ?

রাগ ভাঙাতে শশী তাড়াতাড়ি বলে, 'পিসি, নোটিস এনেছি।'

নিভাপিসি তাচ্ছিল্যভরে বলেন, 'নোটিস কিসের র্যা শশী?'

'সেই যে "চলবে না! সইব না"'

নিভাপিসি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'থাম শশী, সব সইতে পারি, তোর ওই মুখ্যুমি সইতে পারিনে। "চলবে না" "সইবে না"—এসব বললেই হল? বলি যে কালের যে ধর্ম! তোর কথায় কালের ধর্ম উলটে যাবে নাকি?'

'বল কি?'

'বলবার আবার আছে কি। না বুঝে-সুঝে অমনি নোটিস লিখে আনা হল!'

'তা হলে ছিঁড়ে ফেলি?'

'এক শো টুকরো করে।'

'কিন্তু পিসি—'

'তা তুই যা-ই বলিস শশী—' নিভাপিসি সেই কাঁচ কলাপাতা রঙের হাসিটুকু আর একটু হেসে বলেন, 'এ-কালের মেয়েগুলো চালাক আছে। আমার ওই নাতনীটা? দেখলে মনে হয় বোকা-হাবা, কেমন একখানা বর গে'থে তুলেছে দেখেছিস!'

শশী আকাশ থেকে পড়ে বলে, 'আঁ!'

'তার আবার অত চমকাবার কী আছে!' নিভাপিসি সতেজে বলেন, 'সব সইতে পারি শশী, তোর ওই আকাশ-থেকে-পড়া সইতে পারিনে। সকল নম্বর ফেলাটের দোহাত্তা 'লভে' পড়াপাড়ি চলছে, আর যত দোষ আমার নাতনীটির বেলায়? কেন? কেন শুনি?'

'কিন্তু পিসি—'

'অত "কিন্তু কিন্তু" করিস নে শশী, একটু মন খুলে আনন্দ কর। কতবড় সুখবরটা দিলাম তা বল? তা যাই বলিস শশী, এ-কালের ওই লভে পড়াপাড়িটা নেহাত মন্দও নয়, ওর গুণেই মেয়েগুলোর কপালে বিনি পয়সায় ভাল ভাল বর জুটছে। নইলে ওই তো আমার নাতনী, রূপের ধুচুনি! আর আমার ছেলের মুরোদ কত তা জানতেও তোর বাকী নেই! পারতো সে জজের বেটাকে জামাই করতে?'

'তা হলে পিসি, 'লভ' চলবে?'

নিভাপিসি ধমক দিয়ে বলে ওঠেন, 'থাম শশী! সব সইতে পারি, তোর ওই পিত্তি-জ্বালানে কথাগুলো সইতে পারিনে। চলবে মানে কি? না বুঝে-সুঝে যেখানে সেখানে চলবে নাকি? আমার বেবির মতন জাত-কুল বজায় রেখে আকাশের চাঁদটি পেড়ে মুঠোয় ধরতে পারে তো, অবিশ্যি চলবে। কথাতেই আছে, 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা!'
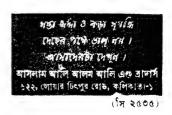
নিসর্গ-শোভায় পূব-বাংলার সঙ্গে কেরলের সাদৃশ্য খুবই নিকট। নদী-বহুল কেরলের দিগন্তপ্রসারী ধানখেত ও অজস্র নারিকেল-বীথি বাঙলা দেশের অনুরূপ। আর আছে অপরূপ নীল "লেগুন"গুলি (প্রথম চিত্র) যাদের প্রশংসায় বিদেশী লেখকেরা পঞ্চমুখ। আরব সমুদ্রসৈকতে নতশির নারিকেল-শ্রেণী যেন প্রসারিত-কর বন্ধুদের আহ্বান (দ্বিতীয় চিত্র)। স্বাভাবিক কারণেই আরব সমুদ্রের উপর নির্ভর করে বহুসংখ্যক কেরলবাসী। এদেরই একটি নৌকা তীরে প্রত্যাগত (তৃতীয় চিত্র)। চতুর্থ চিত্রে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত বেড়াজাল আকর্ষণ-নিরত একদল কেরলীয় মৎস্যজীবী।

আলোকশিল্পী

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৩৬৯ ॥

ওঁ
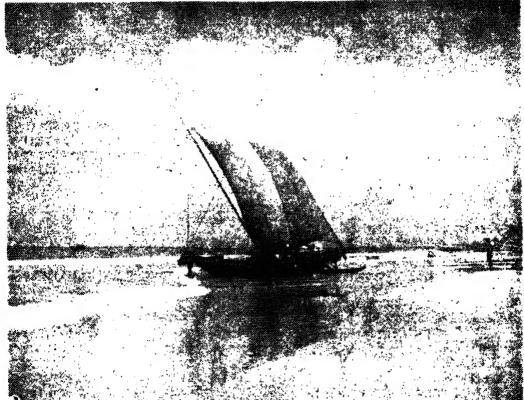
শান্তিনিকেতন

শ্রীমতী রাণী মহলানবিশ

কল্যাণীয়াসু—

পশ্চিম দিকের প্রান্তে ম্লায়মান রবি
হেরিতেছে ধরণীর গোধূলির ছবি।
সেথা তব বাতায়নতলে
আরতির দীপখানি জ্বলে,
রবি সেই স্থির শিখা পর
বিদায়ের আশীর্বাদে মিলাইল কর।

শান্তিনিকেতন — **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
২৪ অক্টোবর
১৯৩৬

[আমাকে জন্মদিনের আশীর্বাদ]

॥ ৩৭০ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে চিঠি লেখার পরেই আমার কাছে খোঁটা খেয়ে বুড়ি অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে উঠল। সে বললে সে চিঠি খোলে নি পড়ে নি, কৃপালানি বললে সে চিঠিখানি যে আধারে তাড়াতাড়ি রেখেছিল সেইখান থেকেই বের করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। চিঠিখানা একেবারে খোলা ছিল না, লেফাফাটা খানিকটা সংলগ্ন ছিল—তুমি বোধ হয় লেফাফায় আমার নামকরণটা বাদ দিয়েছিলে। যাই হোক ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ অশান্তির সৃষ্টি করেছে। এটা আমার গ্রহদোষ। ভুল করার কারণ ঘটে, ভুল করি, তার পরে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই।

ছন্দায় তোমার চিঠি গেছে এ নিয়ে তুমি যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছ, এর প্রধান কারণ স্বভাবতই তোমার মস্তিষ্কে উষ্মার পরিমাণ সদয়হৃদয়া রমণীদের চেয়ে অনেক বেশী—তারপর তোমার রক্তের মধ্যেই malignity-র মিশোল হয়েছে আকস্মিক কারণে। একে তো রোগ তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছে তারপর তাপ যদি তোমার মাথায় চড়ে বসে তা হলে তোমার চেয়েও সেটা উদ্বেগের বিষয় আশপাশের লোকের। অতএব আমার পরামর্শ, তোমার পক্ষে যতদূর সম্ভব শান্ত হও—জগজ্জনের প্রতি ক্ষমার অনুশীলন করো যদি তোমার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য না হয়। সম্প্রতি হাতে সময় আছে, বিছানায় পড়ে পড়ে বৌদ্ধদর্শন পড়তে থাক—অপরিমেয় মৈত্রী পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না—অতি স্বল্প পরিমাণ মৈত্রীও যদি হাতে আসে তবে নির্বাণ-মুক্তির স্টেশনের পথে কোনো একটা অজায়গায় কোনো একটা সাইডিঙে হঠাৎ থেমে যেতে পারো—সেখান থেকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পাবে এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে পরিত্রাণের মেলগাড়ি মালগাড়ি প্যাসেঞ্জার গাড়ি বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছুটে চলেছে। তাদের কয়লার গুঁড়ো এবং ধুলোটাতেও তুমি ধন্য হতে পারবে।

তোমার কনিষ্ঠ তোমাকে বিষাণ পাঠায় নি তার কারণ সেই সংখ্যায় অধ্যাপকের জঠর-বিকৃতি সম্বন্ধে একটা ছড়া বেরিয়েছে—সেটাও তোমার পক্ষে তাপজনক হতে পারে এই আশংকা ছিল। বুড়ো তার সহোদরাকে জানে।

আজ আমি চলেছি শ্রীনিকেতনে। দার্জিলিং দুর্গম—সুরুলের কুঠির তেতলাটাও কম নয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য—দিন সাতেকের মতো ঠাঁই নাড়ার ইচ্ছা আছে। চারদিকে এখন ধানের ক্ষেতে সবুজের বন্যা লেগেছে—চোখ দুটো দিগন্ত পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে বেড়াবে এই আমার সাধ। ইতি ২৬-১০-৩৬

কবি

॥ ৩৭১ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আছ কেমন? আমি আছি নিঃখবর শূন্যতায়, নিরাত্মীয় দূরত্বে। নীচের দিকে তরুশ্রেণী এবং তা পেরিয়ে সবুজ ধানের ক্ষেত দিগন্তরেখায় অবচ্ছিন্ন।

দিনের বেলায় আকাশের এখানে সেখানে ছেঁড়া ছেঁড়া বেকার রোগা মেঘের দল, আর কম্পমান আমলকীশাখা থেকে বিচ্ছুরিত হেমন্তের রৌদ্র। সন্ধেবেলায় নির্বাণদীপ ছাদের অন্ধকারে আকাশভরা তারার নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত।

পারুল এসে খুব ধুমধাম করে ভাইফোঁটা দিলে, তার খরচ কম লাগেনি। আমার মনটাকে করুণায় ব্যথিত করে কাল সে চলে যাবে। আমার নির্জন দিনের স্রোতে এরা ভেসে আসা ফুলফলের মতো।

ভাইদ্বিতীয়া — **কবি**
১৩৪৩

॥ ৩৭২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

একখানি কাগজে ছোট একটি ছবি এঁকে তারই এক প্রান্তে তোমার খবর জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মনে মনে ভেবেছিলুম খুব কৌশল করেচি। ব্যর্থ হয়েচে।

এবার ছবি আঁকলুম না—সাদা কাগজে প্রশ্নপত্র পাঠাই।

ইহলোকবাসীদের সম্বন্ধে তিনটি সর্বপ্রধান জিজ্ঞাসা আছে। কে, কোথায় এবং কেমন। তোমার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের গবেষণায় প্রথম প্রশ্নের উত্তর কিছু পরিমাণে পাওয়া গেছে—তাতে কাজ চলে যায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি ক্ষণে ক্ষণে অনিশ্চিত হতে থাকে। সেই কারণে মাঝে মাঝে মাসুল খরচ করা আবশ্যক হয়ে ওঠে। মানুষ জীবটা খাবার প্রয়াসী ও খবর প্রয়াসী। দুটো প্রয়োজনই মেটবার সময় এল। ইতি ২৫।১১।৩৬

কবি

॥ ৩৭৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার কাপড় দুটো জোড়াসাঁকোয় কালুর কাছে পাঠানো হয়েছে—সে যদি না দিয়ে থাকে আদায় করে নিয়ো। এণ্ড্রুজ

আছে—আরো নানাবিধ অতিথি দর্শনার্থী প্রত্যহই প্রত্যেক প্রহরেই আসচে। মাথা ঘুলিয়ে গেছে। আজকাল সে ও খাপ-ছাড়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত আছি। ইতিমধ্যে তাগিদে পড়ে পুপের জন্যেও কবিতা লিখতে হোলো—ঘরে বাইরে কেউ আমাকে ছাড়ে না। বউমা এখনো কষ্ট পান, তাতে আমার মন খারাপ হয়ে আছে। বোটযাত্রার আলোচনা চলচে। নদীপথ খোলা পাওয়ার উপরে সব নির্ভর করে। ইতি ১।১২।৩৬

কবি

॥ ৩৭৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

অত্যন্ত কুণ্ঠিত কণ্ঠে জানাচ্চি পুরোনো চশমা জোড়া ফিরে চাইতে হোলো। নতুন চশমা করতে খরচ হোলো বিস্তর তাই বলে যদি জেদ করে ব্যবহার করি তা হলে চোখটাও খরচ হয়ে যাবে। ওটার দাম চশমার দামের চেয়ে বেশী। তোমাকে আর একটা আমার অদূরদর্শিতার চশমা এর বদলে দেব আরো গোটা কতক আছে। সাহেবকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। বিদেশ থেকে আগন্তুকের আনাগোনা চলচে। এই পৌষের পরে বোটে চড়বার ইচ্ছে। মাথাভাঙা মোহানা যদি খোলা পাই চলে যাব পদ্মা বেয়ে। সুন্দরবনের রাস্তা সহজ নয়—পথ না জেনে চালালে গম্যস্থানে পৌঁছনো সম্বন্ধে সংশয় থেকে যায়। ইতি ৩।১২।৩৬

কবি

॥ ৩৭৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে তোমার দুষ্টগ্রহ ছাড়তে চাচ্চে না তার রুচির দোষ দিতে পারা যায় না। প্রশান্তর সংকটের অবস্থা পেরিয়ে গেছে আশা করি। আমাদের এখানকার আকাশে ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, হেমন্তের রৌদ্রে চারদিক ঝলমল করচে। উৎপাতের মধ্যে আছে আগন্তুকের ভিড়। ক্রমশই বেড়ে উঠচে। ৭ই পৌষটা কেটে গেলেই পালাব মনে করচি। ইতি ১০।১২।৩৬

কবি

॥ ৩৭৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার অবস্থা কী এবং অবস্থান কোথায় জানতে কৌতূহল ছিল। বস্তুত এটা অন্তহীন কৌতূহলের বিষয়। প্রশ্ন করতে কলম বাগিয়ে বসেছিলুম, হেনকালে ডাকযোগে এইমাত্র জানা গেল যে হিজলা বটাশ্রমে তোমার আকস্মিক অভ্যুৎপাতে তোমার ডাক্তার দাদা চকিত হয়ে আনন্দ প্রকাশের অভিনয় করেছিলেন। একে ইংরাজী ভাষায় বলে How interesting!

আমার সংসারে আমি আছি অনাথাশ্রমে রথী নেই বউমা নেই পুপে লক্ষ্ণৌএ—সুধাময়ী নাম্নী অভিভাবিকার তত্ত্বাবধানে দু' বেলা শাকভাত জুটে যাচ্ছে। আর আছেন বনমালী, গাঙ্গুলী গেছেন দন্তসংস্কারে, রথীর মাতুল মহারাজ রাজধানীতে। অতএব বর্তমানে আমার নিঃসহায় অবস্থায় তোমার যদি উদ্বেগ উপস্থিত হয় তবে সে খবর পেলে খুশী হব।

৭ই পৌষ আসন্ন। পূর্ব হতেই তার আতিথ্যের ভূমিকা নিবিড় হয়ে উঠেছে। মনের শান্তি আবিল হয়ে উঠচে—বিপদ এই যে, সকলেরই পালাবার পথ আছে, কেবল যমের অনুগ্রহ ছাড়া আমার পথ নেই। —আমার ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম জটিল সংশয়ে জড়িত। ১৮।১২।৩৬

কবি

॥ ৩৭৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের উপর এ কীরকম দুঃখের দিন এলো? কেবলই ঘনিয়ে উঠচে বাধাবিপত্তি। তোমরা যেন একটা ঘোর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছ, রাস্তা নেই কোনখানে। আর যাই করো আবার একটা রীতিমতো রোগের সৃষ্টি কোরো না এ সম্বন্ধে তোমার যেন একটা পারদর্শিতা আছে—কথাটা ঠিক হোলো না, নানাবিধ রোগেই তো ঝাঁপ দিয়েছ কিন্তু পার হওনি কোনোটাই। চারদিকে চেয়ে যখন দেখি তখন দেখতে পাই পৃথিবীতে একমাত্র অরোগী আছি আমি—খবরের কাগজে প্রাত্যহিক বুলেটিন প্রকাশ করবার গৌরব আমার কপালে জুটল না। আজকাল হাজার রকমের ইনজেকশনের সৃষ্টি হয়েছে—তার একটাও আমাকে সম্মানিত করেনি। তোমার সঙ্গে বোধ করি মাঝ ফেব্রুয়ারির আগে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। সেই সময়ে আমাকে কনভোকেশনের বক্তৃতা দিতে যেতে হবে। ঠিক করেছি সেই সময়টা বোট আশ্রয় করে থাকব। যে রকম গ্রহের দৃষ্টি দেখচি তাতে আশা হয় না শীঘ্র গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারবে। মাঝে মাঝে সংক্ষেপে খবর দিয়ো। রাসেলের আতিথ্য কি সম্পন্ন হতে পেরেচে?

কবি

॥ ৩৭৮ ॥

ওঁ
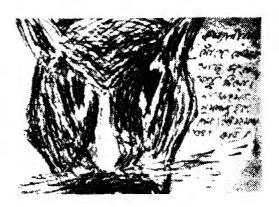
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

দোঁহে কেমন আছ সংক্ষেপে খবর দিয়ো। মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হয়ে গেল। ইতি ১২ মাঘ ১৩৪৩

কবি

॥ ৩৭৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু*

যে কাজটা আমাকে আঁকড়িয়ে ছিল সেটাকে ঝেড়ে ফেলে ছুটি নিতে অনেক চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু আমাদের দেশে কাজের মন্থরগতিকে ত্বরান্বিত করা কারো সাধ্য নয়, এগারই মের আগে বেরোনো অসম্ভব হোলো। ইতিমধ্যে শুনলুম তুমি পালিয়েছ অতএব তাড়া করবার প্রয়োজন নেই। ভেবেছিলুম তোমাকে চন্দননগরের বাগানে আমন্ত্রণ করব—তুমি লিখলে কলকাতাতেই তোমার নড়াচড়া বন্ধ। তার পরে স্থির করেছিলুম বোটে শিলাইদহ অভিমুখে যাব। হেনকালে ডাক পড়ল পার্লামেন্ট অফ রিলিজন্সে -মার্চ মাসের প্রারম্ভে। রথীরা পর্যন্ত বললে এটা কাটানো চলবে না—ভালো মানুষের মতো মেনে নিলুম। মাঝখানে পড়ল চন্দননগরে সাহিত্য সম্মেলন। ওরা বিশ্বভারতীতে দিলে পাঁচ শো টাকা, আরো পাবার প্রত্যাশা আছে। ওদের তারিখ বিশে। প্রজারা ধরে পড়েছে আমাকে নিয়ে যাবে পতিসরে। ২০শে এবং ১ মার্চের মাঝে ছাড়া সময় নেই, তারপরে কলকাতায় ফিরে এসে পার্লামেন্ট। ইতিমধ্যে চলনবিলের জল যাবে শুকিয়ে, পথ হবে বন্ধ। তার পরে যেমন পূর্বে তেমনি পরে। ছুটি যদি পাই বসে বসে চেষ্টা করব ছবি আঁকতে। পি আর দাসের নিমন্ত্রণ মসুরিতে। হয়তো গ্রীষ্মের তাড়ায় মানতে হবে। ইদিকে লিভারটা শাসাচ্ছে, হৃৎপিণ্ডটাও ভালোবাসাটি করচে না।

কবি (৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭)

* ভুল করে লেখা

॥ ৩৮০ ॥

ওঁ

রাণী

কাল কখন জোয়ারের মুখে বোটে ওঠা সম্ভব হবে আজ রাত্রির আট নটার সময় রথী জানাবে। খবর নিতে রথী বোটে গেছে। হয়তো সকালে ৭।৮টার সময় ডাক পড়বে। তুমি কি সন্ধ্যার দিকে আর একবার আসতে পারবে, জোড়াসাঁকো তো আজ ত্যাগ করে যাচ্ছি। অত্যন্ত ক্লান্ত।

কবি ১৯।২।৩৭

॥ ৩৮১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিস্তর কাজ। অল্প একটুখানি ছুটি পেয়ে লিখচি কেমন আছ এবং চিকিৎসা চলচে কী প্রণালীতে।

পরিশোধের পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিযোজনার কাজে বউমা আমাকে লাগিয়ে দিয়েছেন তাই হাঁফ ছাড়বার সময় নেই, কথা বাঁধচি, সুর জুড়চি, শেখাচ্ছি শান্তিকে। খুব চেষ্টা যাতে দোলপূর্ণিমায় ওটা মঞ্চে চড়ানো হয়—কঠিন কাজ। ইতিমধ্যে অপর্ণা লিখেছে দোলের পরদিন কীর্তনের দল ও রাণী মহারাণীদের নিয়ে এখানে আসবে। চাপেই মারা পড়ব। আমার কুষ্ঠিতে আছে অপঘাত মৃত্যু ভিড়ের ঠেলাতেই।

কবি ১৬।৩।৩৭

॥ ৩৮২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কাল তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পত্র দিয়েছি, আজ তোমার চিঠি পেলুম, আশ্বাসজনক নয়। তোমার কাঁধে জ্বর চাপার প্রতিকার যদি দু ডোজ ওষুধেও না হয়ে থাকে তা হলে বদল করা দরকার। হোমিয়োপ্যাথির আশ্রয় নিয়ো। মীরুর খবর পেয়ে মন খারাপ হয়ে আছে। আমি তো অচলপ্রায়, নইলে যেতুম। সুধাকান্তকে আজই পাঠাবার চেষ্টায় আছি। —তোমরা ২৩শে তারিখে নিশ্চয়ই এসো এবং যতদিন খুশি থেকো—এখানকার কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরে তোমাদের আসন শূন্য পড়ে আছে।

আমি চাই মীরু হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করে। রেমিটেন্ট জ্বরে এলোপ্যাথিকে বিশ্বাস করিনে, তার উপরে সুহৃদকে। আপাতত ওকে লিখে দিচ্ছি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালা করে বায়োকেমিক ফেরমফস ও কেলিসাল্ফ খেতে। কাশির জন্যে কেলিমুরও দরকার হতে পারে। জীবনকে একবার পাঠানো চলে কি?

এখানে রিহর্সল চলচে। খুব শক্ত। এদিকে নিবেদিতা অসুস্থ। আমাদের চারিদিকে যেন ছায়া পড়েছে।

যাই হোক তুমি এখানে এলে আর একবার কোমর বেঁধে তোমার চিকিৎসায় লাগবো। হাতে কাজ পাওয়া যাবে।

ইতি ১৭।৩।৩৭

কবি

বই পড়ার স্বাধীনতা
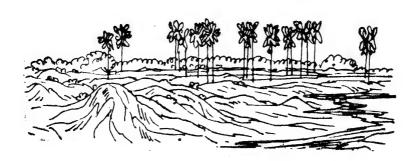
হেনরি মিলার

[আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে হেনরি মিলারই সবচেয়ে বেশী আইনের বিষ-নজরে পড়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বার বার তাঁর বইগুলির প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছে, প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি, বহু কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—অর্থাৎ পাঠকদের কাছে তাঁর রচনা পৌঁছুতে দেওয়া হয়নি। তাঁর রচনা মহৎ কি অসৎ তার বিচারের সুযোগও সব সময় পাঠকরা পাননি। তাঁর নিজের দেশ আমেরিকাতেও এই সেদিন তার 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' বইটি প্রকাশের অনুমতি লাভ করেছে। অবশ্য মিলার এ জন্য বিচলিত নন, তাঁর মতে, 'যদি একজন পাঠকও আমার বই পড়ে এবং লেখকের সঙ্গে একমত হয়, তাহলেই যুদ্ধে জয়।' কিন্তু এ সত্ত্বেও শুধু একজন পাঠকের কাছেই নয়, হেনরি মিলার পৃথিবী বিখ্যাত লেখক।

১৯৫৭ সালের মে মাসে নরওয়েতে মিলারের Sexus (The Rosy Crucifixion) বইটি নিষিদ্ধ হয়। এই বই-এর প্রথম খণ্ডের কিছু ডেনিশ সংস্করণ তখনও পাওয়া যাচ্ছিল, সেগুলি বাজেয়াপ্ত হল এবং দুজন দোকানদারকে কুৎসিৎ পূর্ণ অশ্লীল গ্রন্থ বিক্রয়ের অভিযোগে দণ্ডিত করা হল। সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল হয়। এই উপলক্ষে মিলার তাঁর উকিলকে একটি চিঠি লেখেন, তাঁর যুক্তিগুলি যেমন আন্তরিক তেমনি মননীয়। সেই চিঠির মূল অংশ এখানে অনূদিত হল। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দোকানদার দুটি যদিও মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থটির উপর নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়নি। এই চিঠি লেখা হয়েছে উনিশ শো উনষাট সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারী। —অনুবাদক]

প্রিয় মিঃ হাস্‌,

মার্চ এপ্রিল মাসে সুপ্রীম কোর্টে আমার গ্রন্থখানি সম্পর্কে যে বিচার হবে তাতে ব্যবহার করবার জন্য আপনি আমার বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। ১৯৫৭ সালে আমার বই Sexus-এর বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে যখন বিচার চলছিল, তখন আমি যে চিঠি লিখেছিলাম, তার চেয়ে স্পষ্ট করে আর কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত। যা হোক, আমার আরও কিছু নতুন চিন্তা আপনাকে জানালাম, এগুলি হয়তো আপনার কাছে উপযুক্ত মনে হবে।

অসলে টাউন কোর্টের সিদ্ধান্ত [illegible] করে আমার বিচিত্র অনুভূতি হয়েছিল। খানিকটা অক্ষম অনুবাদের জন্য, খানিকটা আমার সুনীতি লঙ্ঘনের যে অদ্ভুত তালিকা দেওয়া ছিল তার জন্য যদি সেটা পড়ে মাঝে মাঝে আমার হাসি পায়, তবে তার জন্য আশা করি কেউ কিছু মনে করবেন না। পৃথিবী যেমন আছে তাকে সেইরকমই ধরে নিয়ে এবং যে-সমস্ত মানুষ আইন বানায় এবং প্রয়োগ করে—তাদের সে-রকমই ভেবে নিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি তাদের সিদ্ধান্ত ইউক্লিডের যে-কোন উপপাদ্যের মতই সৎ এবং স্বাভাবিক। এ বিষয়েও আমি অনবহিত কিংবা উদাসীন ছিলাম না যে, আইনের সূক্ষ্ম ভাষাকে অতিক্রম করেও রচনার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। (অসম্ভব সেই কাজ, কারণ আইন যদি মানুষের জন্য তৈরী হয় মানুষ আইনের জন্য নয়, তাহলেও একথা সত্য যে কিছু কিছু মানুষ আইনের জন্যই তৈরী এবং আইনের চোখ দিয়ে ছাড়া অন্য কিছু তারা দেখতে পায় না।)

বিদ্বান, সাহিত্যের পণ্ডিত, মনোবিজ্ঞানী, ডাক্তার ইত্যাদি এদের ভারী ভারী, জমকালো, স্পষ্ট মতবাদে আমি কখনো মুগ্ধ হতে পারিনি, আমাকে স্বীকার করতেই হবে। কি করে হবো, এরা শুধুই একদেশদর্শী, রসজ্ঞান বর্জিত এবং অধিকাংশ সময় এদের প্রতিই আমার অস্ত্র উদ্যত থাকে।

ঐ দীর্ঘ নথিপত্রগুলি আজ আর একবার পড়ে আমি সম্পূর্ণ ব্যাপারটার অর্থহীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। (কী সৌভাগ্যবান আমি, যে বিকৃত কিংবা অধঃপতিত হিসেবে অভিযুক্ত হইনি, শুধু আমি যৌনতাকে বড় বেশী মনোরঞ্জক এবং নির্দোষ হিসেবে দেখাই!) অনেক সময় আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়, ঐ ভদ্রলোকের অন্য অনেক

কিছু দেবার ক্ষমতা আছে, তখন তিনি কেন শুধু শুধু এইসব আপত্তিজনক, আলোড়ন-উন্মুখ যৌন দৃশ্য নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন? একথার ঠিক উত্তর দিতে হলে আমাকে মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেকেরই, পুরোহিত কিংবা বিচারক বা গবেষক বা আইনজীবী, একটা তৈরী করা উত্তর আছে, কিন্তু কেউ-ই বেশী দূরে যায় না, যথেষ্ট গভীরে যায় না। ধর্মীয় উত্তর অবশ্য এই, অপরকে বিচার করার আগে প্রথমে তোমার চোখের ধুলোবালি পরিষ্কার কর।

আমি যদি বিচারকের আসনে থাকতুম, তবে আমিও হয়তো বলতুম, দোষী, সবরকমে দোষী, ওকে ফাঁসি দাও। কারণ আমি যখন সামান্য, সীমাবদ্ধ চোখে দেখি, তখন বুঝতে পারি আমি সত্যিই দোষী, এই বইটি লেখার আগে থেকেই দোষী। দোষী, তার কারণ, আমি যে-রকম ঠিক সেই রকম ভাবেই চলতে চাই। সবচেয়ে চমৎকার হচ্ছে এই যে, আমি একজন স্বাধীন মানুষের মত হেঁটে যাচ্ছি। মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর মুহূর্তেই এজন্য আমাকে দণ্ডিত করা উচিত ছিল।.........

......সম্প্রতি হোমারের কাব্য পড়ে আমার কি অনুভূতি হয়েছে সে কথা বললে আমার মনে হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বরং কৌতূহলজনকই মনে হবে। আমার প্রকাশক 'অডিসি'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করছেন এবং তাঁর অনুরোধে আমি একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিয়েছি। আমি 'অডিসি' এর আগে কখনও পড়িনি, শুধু 'ইলিয়াড' পড়েছি— তাও মাত্র কয়েক বছর আগে। আমার বলার বিষয় হল এই যে, দীর্ঘ সাতষট্টি বছর অপেক্ষার পর এই বিশ্ববন্দিত মহাকাব্য পাঠ করে আমি এতে অনেক ঘৃণ্য অংশ দেখতে পেলাম। 'অডিসি'র চেয়েও বেশী আছে ইলিয়াড-এ, (অথবা কশাই-এর বিবরণী—আমি এই নাম দিয়েছি।) কিন্তু আমার এ-কথা কখনও মনে হয়নি যে এ-বই বাজেয়াপ্ত করা কিংবা পুড়িয়ে ফেলা উচিত। অথবা শেষ করার পর আমার এমন ভয়ও হয়নি যে আমি একটি কুড়ুল হাতে ঘরের দরজা থেকে লাফিয়ে পড়বো এবং হত্যার জন্য ছুটোছুটি করবো! আমার ছেলে ন বছর বয়েসে ইলিয়াড (শিশু সংস্করণ) পড়েছে, সে আমার কাছে স্বীকার করে যে 'মাঝে মাঝে দু-একটা খুন' তার ভাল লাগে, কিন্তু সেও বলেছে হোমার তার একেবারেই ভাল লাগেনি, ভাল লাগেনি অত খুন জখম আর দেবতাদের বুজরুকি। কিন্তু আমি কখনও এমন ভয় করিনি যে আমার এই এগারো বছরের ছেলে, যে বাজে কমিকগুলো পড়তে ভালবাসে, ওয়াল্ট ডিজনির ভক্ত, (আমি ডিজনিকে একেবারে দেখতে পারি না), সিনেমা দেখার ভীষণ ঝোঁক—বিশেষত গোলাগুলির ছবি, কিন্তু আমার এমন ভয় নেই যে, সে বড় হয়ে একটা খুনে গুণ্ডা হবে। (এমন কি সৈন্য-বাহিনী থেকে তাকে তলব করলেও না!) আমি দেখবো—তার মন অন্য কোনদিকে আকৃষ্ট হয় কিনা—সম্ভব হলে সেগুলি সংগ্রহ করে দেবো—কিন্তু একথাও ঠিক—আমাদের সকলের মতই সেও এই যুগেরই ফসল। আমি মনে করি, এই যুগে আমরা সকলে, বিশেষত যুবাবৃন্দ, কোন বিপদের সম্মুখীন তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। প্রত্যেক যুগেই আশঙ্কার রূপও বদলায়। সেটা পিশাচবিদ্যা, মূর্তিপূজা, কুষ্ঠ, ক্যান্সার, সিজোফ্রেনিয়া, কম্যুনিজম্, ফ্যাসিজম অথবা যাই হোক, আমাদের যুদ্ধ করে যেতেই হয়। কদাচিৎ আমরা প্রতি-পক্ষকে পর্যুদস্ত করতে পারি—তা সে যে-বেশেই আসুক না কেন। বড়জোর আমরা উদাসীন হয়ে যেতে পারি। কিন্তু যে বিপদ আড়ালে প্রতীক্ষমান, তার কথা আমরা আগে থেকে জানতে কিংবা আগে থেকে প্রতিরোধ করতে পারি না। যতই পণ্ডিত অথবা জ্ঞানী অথবা বিবেচক বা সাবধানী হই, আমাদের সকলেরই অ্যাকিলিসের গোড়ালি আছে। নিরাপত্তা মানুষের নিয়তি নয়।

মাননীয় বিচারকদের কাছে নিম্নোক্ত কথা-গুলি নিবেদন করতে আমার সামান্য আনন্দ হচ্ছে, যেন আমি ষাঁড়ের সিং ধরতে যাচ্ছি। আদালত কি এ-কথা জেনে খুশী হবেন যে, জনসাধারণের চোখে আমি একজন সুস্থির মস্তিষ্ক, স্বাস্থ্যবান, স্বাভাবিক মানুষ? কেউ-ই মনে করে না আমি একজন যৌন বিকারগ্রস্ত বা অধঃপতিত বা স্নায়বিক রোগী বা এমন লেখক যে অর্থের জন্য নিজের আত্মা বিক্রয় করতে পারে। বরং স্বামী বা পিতা বা প্রতিবেশী হিসেবে

আমি কোন অঞ্চলের 'একটি সম্পদ'। হয়তো একথা একটু হাস্যকর শোনাচ্ছে, তাই নয়কি? এই কি সেই 'শিশু দানব' যে ট্রপিংস, দি রোজি ক্রুসিফিকসন, দি ওয়ার্ল্ড অভ সেক্স, কোয়ায়েট ডেজ ইন ক্লিসি—এই-সব ভদ্রলোকের পক্ষে অনুচ্চার্য গ্রন্থ লিখেছে? কেউ কেউ হয়তো একথা জিজ্ঞেস করতে পারেন। সে কি পরিশুদ্ধ হয়েছে? অথবা তার লেখক জীবনের কি শেষ হয়ে গেছে?

সংক্ষেপে প্রশ্নটি এই, এ সমস্ত সন্দেহ-জনক বই-এর লেখক এবং যে-মানুষটির নাম হেনরি মিলার—তারা কি দুজনে এক? আমার উত্তর, হ্যাঁ। এবং সেই সঙ্গে এইসব আত্মজীবনীমূলক রোমান্সের নায়কও আমি। হয়তো এতটা হজম করা একটু কঠিন। কিন্তু কেন? কারণ কি এই যে আমি 'অত্যন্ত নির্লজ্জ' ভাবে আমার জীবনের সমস্ত দিক উদ্ঘাটিত করেছি? আমিই প্রথম লেখক নই, যাঁরা রচনায় স্বীকারোক্তির পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, অথবা জীবনকে নগ্ন-ভাবে প্রকাশ করেছেন অথবা এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা স্কুলের মেয়েদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশের উপযুক্ত নয়। যদি আমি একজন সাধুসন্ত হতাম এবং অতীত পাপ-জীবনের স্বীকারোক্তি দিতাম তা হলে হয়তো আমার কোন অভ্যাসের নগ্ন বিবরণও পুরোহিত বা ডাক্তারদের কাছে মহান মনে হতো। হয়তো তার থেকে অনেক উপদেশও পাওয়া যেত!

কিন্তু আমি সন্ত নই এবং সম্ভবত কোন-দিনই হবো না। যদিও একথা বলার সময় আমার মনে পড়লো, কোন কারণে কেউ কেউ আমাকে দু'একবার এ নামে অভিহিত করে-ছেন এবং তারা এমন লোক যাদের চরিত্র কোর্টের কাছে সন্দেহের অতীত। না, আমি সন্তপুরুষ নই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি কোন নতুন রীতির প্রবর্তকও নই। আমি সাধারণ একজন মানুষ যে লেখার জন্য জন্মেছে এবং যে নিজের জীবনের কাহিনীকে তার লেখার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমি লেখার মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছি যে, এই জীবন সৎ এবং সম্পদ ও আনন্দে পূর্ণ, যদিও সাময়িক উঁচু নিচু আছে, সাময়িক বাধা বিঘ্ন আছে (যার কিছু কিছু আমার নিজেরই সৃষ্টি) এবং যদিও কিছু কিছু নির্বোধ নীতি এবং সংস্কার জোর করে প্রতিবন্ধকতা করে। সত্যিই আমি বিশ্বাস করি, একথা আমি স্পষ্টভাবেই বোঝাতে পেরেছি, কারণ আমার জীবন সম্পর্কে যা কিছু বলেছি তা শুধু মাত্র একটি জীবন, এবং আমার রচনা জীবনকে প্রকাশ করবারই একটি উপায়, এবং আমি চেষ্টা করেছি—অনেক সময় স্পষ্ট করবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি যে আমি জীবনকে দেখেছি ভাল অর্থে, 'ভাল' কথাটার যেমনভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক্ না কেন এবং আমি বিশ্বাস করি আমরাই জীবনকে যাপনের অযোগ্য করে তুলছি, আমরাই, দেবতা বা নিয়তি বা পরিবেশ নয়।

এই পর্যন্ত বলে আমার আদালতের রায়ের সেই অংশটুকু মনে পড়লো যেখানে স্বীকার করা হয়েছে যে আমার সহজভাবে দেখার ক্ষমতা আছে কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই দুর্বোধ্য হই এবং আমার দার্শনিক এবং সুরেরিয়ালিস্টিক লড়াই নিতান্ত ভান। আমি খুবই সচেতন যে আমার পাঠকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এ অভিযোগের আমি কি উত্তর দেব—কারণ এ অভিযোগ আমার সাহিত্যিক সত্তার রক্তমজ্জাকে স্পর্শ

করে। আমি কি বলবো, "আপনারা কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না?" অথবা বিচারের সমতা আনবার জন্য আমি কি স্বপক্ষে বড় বড় সমালোচকদের নাম করবো? বরং এ-কথা বলাই কি আমার পক্ষে সহজ হবে না, 'দোষী দোষী, ধর্মাবতার সর্বদিক দিয়েই এ লোকটা দোষী!'

'দোষী' কথাটা আমি বিদ্রূপ বা অশিষ্ট-ভাবে উচ্চারণ করছি না। আমি যা বলি তা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। এমন কি ভুল ভাবনা হলেও। আমার বিরুদ্ধে অভি-যোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে জানলেও—যাঁরা পিচ্ছিল ভাবে আমার প্রতি 'দোষী' কথাটা উচ্চারণ করেন—তাঁদের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করার বদলে মেনে নেওয়াই ভাল। আচ্ছা, আরও শান্ত ভাবে আলোচনা করা যাক। যাঁরা আমার বিচার করছেন এবং শাস্তি দিচ্ছেন, শুধু অসলোতেই নয়, সারা-পৃথিবীতে, তাঁরা কি ব্যক্তিগতভাবে সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, আমি অপরাধী বা 'সমাজের শত্রু'। কিসে তাদের আপত্তি? আমার রচনায় যে সমস্ত অনৈতিক, নীতির অতীত অথবা অসামাজিক ব্যবহারের বর্ণনা থাকে—অথবা ছাপার অক্ষরে এগুলির প্রকাশ। এই শতাব্দীর মানুষ কি সত্যিই এমন 'কুৎসিত' ব্যবহার করে, না এগুলি কোন অসুস্থ মনের চিন্তা। (পেট্রোনিয়াস, রাবেলে, রুশো, সাদ—এদেরও কি কেউ অসুস্থ মানব বলে?) নিশ্চয়ই আপনাদেরও অনেক বন্ধু বা প্রতিবেশী এমন ব্যবহার করে। এই পৃথিবীর একজন মানুষ হিসেবে এ-কথা আমি ভালভাবেই জানি যে, সন্ন্যাসীর গেরুয়া বা আইনজীবীর উর্দি বা শিক্ষকের পরিচ্ছদও রক্ত মাংসের প্রতি আকর্ষণ রোধ করতে পারে না। আমরা সকলেই এক পাত্রে অবস্থান করছি—আমরা সকলেই দোষী বা নির্দোষ—এটা নির্ভর করে আমরা কুনো ব্যাঙের দৃষ্টি নিয়েছি না বিশ্বদৃষ্টি গ্রহণ করেছি।...আমাদের মধ্যে পাপ নেই, যুদ্ধ নেই, বিদ্রোহ নেই, ক্রুসেড নেই, অনুসন্ধান নেই, নির্যাতন বা ধৈর্যহীনতা নেই কারণ আমাদের মধ্যেই অনেকে দুষ্ট, নীচ এবং অন্তরে হত্যাকারী।

যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং সরলভাবে বলতে গেলে জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টি-ভঙ্গি বা প্রার্থনা এইঃ "আসুন আমরা পরস্পরের প্রতিবন্ধকতা থেকে বিরত হই, পরস্পরের বিচার এবং শাস্তিদান বন্ধ করি, পরস্পরের হত্যা থামিয়ে দিই।" তার মানে যদিও এই নয় যে, আমার প্রতি বা আমার রচনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা বা দণ্ড তুলে নেবার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। আমি বা আমার রচনা এখানে প্রয়োজনীয় নয় (একজন আসে একজন যায়) যে ক্ষতি আপনারা নিজের প্রতি করছেন তাই আমার আলোচ্য। অনর্গল এই দোষ এবং শাস্তির কথা, নিষেধ বা বাজেয়াপ্ত করা, নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেওয়া বা অস্বীকার করা, সুবিধেমত আপনাদের চক্ষু বুজে থাকা, অন্য কোন উপায় না থাকলে কাউকে বলির পশু বানানো—আমি এর কথা বলছি। আমি মুখোমুখি প্রশ্ন করছি আপনাদের—এই যে সীমাবদ্ধ গণ্ডির নির্ভরতা এতে কি আপনারা জীবনের সবটুকু সার ভোগ করতে পারবেন? আমার বই যে নিশ্চিহ্ন করার কথা আপনারা বলেছেন—তাতে কি আপনা-দের খাদ্য এবং মদ আরও সুস্বাদু হবে, আপনার ঘুম আরও শান্তিময় হবে, আপনি কি আরও উন্নত মানুষ হবেন—স্বামী বা পিতা হিসেবে পূর্বের চেয়ে আরও যোগ্য হবেন? এইগুলিই বিবেচনার যোগ্য যা আপনারা নিজের প্রতি করছেন—আমার প্রতি যা করছেন তা নয়।

আমি জানি আসামীর কাঠগড়ায় যে দাঁড়ায় তার কোন প্রশ্ন করার অধিকার নেই, সে শুধু উত্তর দেবে। কিন্তু আমি নিজেকে অপরাধী বলতে অপারগ। আমি হয়তো একটু আলাদা। কিন্তু আমি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। আমার অগ্রদূতদের নাম করলে একটি উল্লেখযোগ্য তালিকা হবে। এই বিচার প্রমিথিয়ুসের কাল থেকে সুরু হয়েছে। তারও বহু আগে থেকে। আর্চ এঞ্জেল মাইকেলের সময় থেকে হয়তো। খুব বেশী প্রাচীনকালের কথা নয়, যখন "যুবাবৃন্দের অপকারক" এই নাম দিয়ে একজনকে একপাত্র হেমলক পান করতে দেওয়া হয়েছিল। আজ তিনি একজন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হিসেবে বন্দিত।

একটি আদালতকে বা যে-কোন আদালতে অনেকগুলি প্রশ্ন করা যায়। কেউ কি কোন উত্তর পাবে? না। বিচারকমণ্ডলী একটি নিরেট দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত। যখন কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হয়—তখন আমার মতে, চরম বিচারক হওয়া উচিত জনচিত্ত। আইন যখন সংশয়যুক্ত তখন মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের হাতে বিচারের ভার দিলে অবিচারই প্রসবিত হবে। ধর্মাধিকরণ কখনও পূর্ব নজির বা ধর্মের বিধিনিষেধ বা কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে না।...

শেষ কথা এই, যদি এই আদালত বা পৃথিবীর যে-কোন আদালত এই বই সম্পর্কে অনভিপ্রেত রায় দেয়—তবেই কি এই বই-এর প্রচার বন্ধ হবে? এ-জাতীয় বিচারের পূর্ব ইতিহাস তা সমর্থন করে না। নিষেধাজ্ঞা শুধু আগুনে ইন্ধন জোগাবে। যে-আইনী করার নির্দেশ একটা গড়ে তোলে, গোপনে গোপনে চলে প্রতিবাদ, শেষ পর্যন্ত তা প্রবল হয়ে ওঠে। যদি নরওয়ের একজন মাত্র লোকই বইটি পড়ে এবং লেখকের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হয় যে প্রত্যেকেরই নিজেকে প্রকাশ করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাহলেই যুদ্ধের জয়। কোন চিন্তাধারাকে কখনও জোর করে চেপে রাখা যায় না, এবং এ কথাও এই চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজের পাঠ্য বিষয় নিজে নির্বাচন করার স্বাধীনতা আছে। একজনের পক্ষে কোনটা ভাল বা মন্দ বা নিরপেক্ষ তা বিচারের স্বাধীনতা তার নিজের। অসৎ-এর বিরুদ্ধে একজন কি করে নিজেকে সংযত করবে যদি সে অসৎ কি তা না জানে।

যদিও আমার এই 'সেক্সাস' নামধেয় গ্রন্থটি, যা নরওয়ের পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে—সেটা অসৎ বা দূষিত নয়। এটা একটা সঞ্জীবনী যা প্রথমে আমি নিজে গ্রহণ করেছি এবং গ্রহণ করে শুধু যে বেঁচে আছি তা নয়, সমৃদ্ধিশালী হয়েছি। নিশ্চয়ই আমি এই গ্রন্থ শিশুদের জন্য সুপারিশ করবো না, তেমনি আমি এক বোতল জীবনরসও শিশুদের হাতে তুলে দেব না। তবে একটি কথা আমি লজ্জিত না হয়েই বলতে পারি যে, আণবিক বোমার তুলনায় আমার এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ জীবন-দায়ক গুণে পূর্ণ।

অনুবাদক—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

চুকচুক করে মাংসের ঝোলটুকু শুধু খাওয়া হয়। তাও সবটা না। ঝোল আর চাকা চাকা মাংস আর চর্বি মেশা। সমেত চমৎকার হাড়ের টুকরোগুলি ডিশে পড়ে থাকে। কাতর ক্ষুণ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে চৌধুরী সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বঙ্কু ঢোক গিলল।

'আর খেলেন না?'

'না, পারছি না।' সমবেদনার সুর কানে লাগতে সাহেবের ক্লান্ত বিশীর্ণ ঠোঁটের প্রান্তসীমায় হাসি ফুটল। এটা দেখবার মতন। কেননা কদাচিৎ তিনি হাসেন। কেননা কচিৎ কখনও এই স্বার্থান্ধ পৃথিবীর পূতিগন্ধময় তমিস্রা দু হাতে সরিয়ে দিয়ে মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে অন্তরের সমবেদনা জানাতে কেউ যদি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তো তিনি হোঁচট খান। মাটিতে পড়ে যান না বটে, টাল সামলাতে চিরকাল ওস্তাদ; হোঁচট খাবার পর তাঁর লোমশূন্য চোখের পাতা দুটো দ্রুত পিটপিট করতে থাকে, খয়েরের পুঁটুলীর মতন ঈষৎ পিঙ্গল ধূসর মণি দুটো ঝিকমিক করতে থাকে। আগন্তুকের মুখ দেখতে দেখতে ও তার কথাগুলি শুনতে শুনতে তিনি মিটিমিটি হাসেন।

অর্থাৎ চৌধুরী সাহেব বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে দুলছেন। টের পেয়ে চতুর বঙ্কু প্রায় হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যাওয়ার মতন কষ্ট ও কাতরতা চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলল।

'দাঁতগুলো গেছে বুঝি!'

চৌধুরী সাহেব মাথা নাড়েন।

'তা বাঁধানো দাঁত দিয়েও চিবোনো চলে।'

'তবে? হজম না হবার ভয়!!' বঙ্কু টেবিলের কাছে সরে গেল। চৌধুরী সাহেব মাথা নাড়লেন।

'না, তাও না। আগে গরহজমের ভয় ছিল। এখন এত সব ওষুধপত্তর এসে গেছে—দেখছ না, আলমারীর ওই তাকটা ওষুধের শিশিতেই ঠাসা।'

'তাও বটে।' বঙ্কু বিড়বিড় করে ও ঘাড় ঘুরিয়ে আলমারীর তাকটা দেখে। 'তবে আর খাচ্ছেন না কেন। সব পড়ে আছে!' যেন পুত্র শোকের বেদনা নিয়ে সে সাহেবের মুখ দেখে ও আঙুল দিয়ে ডিশটা দেখায়। কথা না কয়ে চৌধুরী সাহেব আর একটা পাত্র থেকে একটা আপেলের টুকরো তুলে তাতে কামড় লাগান। বঙ্কু পরিষ্কার দেখতে পেল বাঁধানো দাঁতের পাটি থিকথিক করে কাঁপছে। কিন্তু তা হলেও সাহেব ফলের টুকরোটা চমৎকার চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে শেষ করেন। তারপর ঐ পাত্র থেকে এক সঙ্গে তিন চারটা আঙুর তুলে মুখে গুঁজে দেন। এখন আর দাঁতের কাজ তেমন করতে হয় না। যেন আঙুর কটা তালুর সঙ্গে ঠেকিয়ে জিভের ডগা দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে রস বার করেন। আঙুরের রস জিভ বেয়ে সরাসরি গলনালীর দিকে ছুটে যাচ্ছিল বুঝি, থুতনিটা উঁচু করে ধরে ছোট একটা ঢোঁকুর তুলে গলার কাছ থেকে ফলের রসটুকু মুখগহ্বরে ফিরিয়ে এনে চোয়াল দুটো চেপে ধরে মধুর স্বাদটা একটু সময় অনুভব করেন সাহেব, পরে বড় করে একটা ঢোক গিলেন। তারপর ভিজা তুলোর পুঁটুলীর মতন আঙুরের ছিবড়েটুকু জিভের ডগা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঠোঁটের কাছে সরিয়ে আনেন ও বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁট থেকে আলগোছে সেটা তুলে আনেন।

'দাঁতের ভাবনা বা হজম না হবার ভয় অনেকদিন কাটিয়ে উঠেছি বঙ্কু।' চৌধুরী সাহেব একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন। 'আসল কথা কিছুই ভাল লাগে না। খাওয়া পরার উৎসাহ বিলকুল নিভে গেছে।'

'কেন, এমন হল কেন!' বঙ্কু বলতে পারত, কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে রইল।

'অনেক তো খেলাম, অনেক পরলাম, কিন্তু—' সাহেব আবার একটুখানি হাসলেন: 'তবু মনে হয়, এখন আরো বেশী মনে হয় কথাটা, রোজ— যেন কী আমার নেই, কী আমি পেলাম না।'

'আমি বুঝি, আমি বুঝতে পারছি।' বঙ্কু বলতে পারত, 'ষাটের ঘর অনেকদিন পেরিয়ে গেছেন। এ জীবনে অনেক খাওয়া হয়েছে অনেক পরা হয়েছে। এখন আপনি ক্লান্ত। পঞ্চাশ পার হলে আগে মানুষ বনে চলে গেছে। তারা বুদ্ধিমান ছিল। আপনি এখনো বিষয় আসয় কুকুরের মতো কামড়ে ধরে আছেন। পাই পয়সার হিসেবের গোলমাল হলে এখনো ঘুম হয় না। কাজেই এই মানুষের শান্তি কোনদিন আসে না, আসতে পারে না।' চতুর বঙ্কু সেসব কথা না তুলে চুপ করে মনিবের চোখের ফ্যাকাশে শাদা অংশটুকু দেখতে লাগল।

'মনে হয় কী আমার নেই, কী যেন পেলাম না!' বিড়বিড় করে, যেন অনেকটা নিজের মনে সাহেব কথা বলেন ও ভাঁজ করা পরিষ্কার তোয়ালেটা তুলে ঠোঁট মোছেন থুতনি মোছেন। আঙুরের রস ঠোঁট বেয়ে থুতনির ওপর নেমে এসেছিল কি। বঙ্কু চিন্তা করছিল। সাহেব গলা পরিষ্কার করে এবার অন্য সুরে কথা বলেন।

'বুঝলে বঙ্কু, এই তো চারদেয়ালের একটা খাঁচার ভিতর বেশীর ভাগ সময় কাটে আজকাল। এখান থেকে কী আর চোখে পড়ে! এক টুকরো আকাশ, ওদিকের ওই গির্জার চূড়াটা আর তার পিছনে দুটো পাম গাছের মাথা। অবশ্য গাছের মাথা পর্যন্ত চোখ যায় না, দৃষ্টির সেই তেজ কোথায়! কিন্তু—কিন্তু—আমার এক এক সময় মনে হয়, এখানে আমার এই ঘরে আমি নেই। এটা যে কলকাতা শহর, এটা যে প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, আর আমি আমার এই আলিসান বাড়ির তেতলার কামরায় আরাম কেদারায় শুয়ে আছি কথাটা বেমালুম ভুলে যাই। মনে হয় আমি একটা বনের মধ্যে আছি—গাছের গন্ধ পাচ্ছি, পশুর গায়ের গন্ধ, পাখির গন্ধ, পাতার নীচের ঘন অন্ধকারের গন্ধ পাচ্ছি।'

'তা বটে তা বটে।' বঙ্কু এক গালে হাসল। 'শহরে থেকে থেকে অরুচি ধরে গেছে আর কি, এখন আপনার মন চাইছে বনবাদাড় পাখি বানর হরিণ ভল্লুক।'

'হুঁ, বাষট্টি বছর কাটল একটা জায়গায়। ছেলেবেলায় মানুষ চুষিকাঠি লাট্টু ঘুড়ি

কাঠের ঘোড়ার স্বপ্ন দেখে। আমি দেখতাম পয়সার বাড়ির গাড়ির।'

'হ্বুঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি!' বঙ্কু এবার অন্য গালে হাসল। 'তিনটে বাড়ি হয়েছে আপনার, দুটো গাড়ি হয়েছে, ব্যাঙ্কেও—'

'চুপ চুপ!' কথাটা মুখে বললেন না চৌধুরী সাহেব, পাটকাঠির মতন শীর্ণ হাল্কা আঙুল দিয়ে টেবিলটা ঠুকে ও চোখের ইসারা করে বঙ্কুকে চুপ করতে বললেন, যেন ব্যাঙ্কে এখনো তার কী পরিমাণ আছে একথা জানতে নেই জানাতে নেই। আর সেই সঙ্গে চৌধুরী সাহেব চেহারাটাও বিকৃত করে ফেললেন।

'কিন্তু তাতে হল কি শেষ পর্যন্ত! এত সব পেয়ে এত সব থেকেও বুকটা কেমন খালি খালি ঠেকে। ঐ যে বললাম! যেন অরণ্যে আছি—আমার কেউ নেই, মাঝে মাঝে কেমন একটা ভয়ের ছমছমানি অনুভব করি। অসহায়বোধ করি।'

'কী যে বলেন! আপনার ছেলে বিলেত গেছে। কত ভাল বিয়ে দিয়েছেন মেয়ের।' বঙ্কু নতুন করে সমবেদনা জানাতে অস্থির হয়ে পড়ল। 'ঐ গিন্নিমা স্বর্গীয় হয়েছেন বলেই সময় সময় মনটা খারাপ লাগে বোধ করি।'

কপাল ও নাকের চামড়া কুঞ্চিত করে চেহারাটা আরও বিকৃতদর্শন করে তুললেন তিনি। 'আরে না না না, ও কি আর একটা খুব অসময়ে গেছে। দু' বছর আগে, তার মানে পঞ্চান্ন বছর বয়স হয়েছিল খোকার মার মরণকালে, হ্বুঁ আমার ঠিক পাঁচ বছরের ছোট ছিল, সেই হিসেব করে বলছি—না না না, তার জন্যে নয়—ওই গিন্নী বেঁচে থাকতেই মনের এই অসুখটা—কী নেই, কী যেন হল না ভাবটা দেখা দিয়েছিল। তার মানে একটা অশান্তি একটা ভয়ঙ্কর ছট-ফটানি। আমার কথাটা ধরতে পেরেছ?'

'ধরতে না পারার আছে কি!' মনে মনে বলল বঙ্কু, 'কালো বাজারি তার মানে চুরি—সুদী কারবার, মানে গরীব লোকের রক্ত চুষে তোমার এই আসয় বিষয়। দাঁত গেছে চোখ গেছে পেটের তো ওই অবস্থা, তার মানে আয়ুর বারোটা বাজতে চলল। কোথায় এখন ভগবান টগবানের নাম নেবে, তা না। এখনো লোভ লালচ তোমার মজল না—কিসের অশান্তি কেন এই জ্বালা বেশ বুঝতে পারি।' ঘৃণাক্ষরেও এসব প্রকাশ করল না বঙ্কু, একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'একটু বেড়ালে টেড়ালে ভাল হয়। সারাদিন ঘরে বসে থাকেন—তাই মনটা এমন থিতিয়ে আছে।'

'হাহা!' চৌধুরী সাহেব এবার শব্দ করে হাসলেন, 'বেড়াতে যান—তার মানে বলবে, একবার কালীঘাটে যেয়ে কালী দর্শন করে আসুন, বেলুড় দক্ষিণেশ্বর ঘুরে আসুন, নিমতলার যোগেশ বিদ্যানিধির বাড়ির রামায়ণ পাঠ শুনে আসুন—এই তো?'

'না, তা আমি বলব কেন', বঙ্ক এবং বড় একটা ঢোক গিলল, 'কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর ছাড়া কি বেড়াবার জায়গা নেই। আমি বলছি একটু খোলা হাওয়া গায়ে লাগাতে, খোলা আকাশের নিচে গিয়ে একবার দাঁড়াতে মনটা ভাল লাগবে শরীরটা হাল্কাবোধ হবে।'

'হ্বুঁ, তাই বল। আমি ভাবছি কি রাম সিং-এর মতন ভোলার মতন বা পরেশ যেমন মাঝে মাঝে এসে আমায় শহরের কালী মন্দির শিব মন্দিরগুলি বিকেলে বিকেলে বেড়িয়ে ঘুরেটুরে দেখে আসতে উপদেশ দেয়, তুমিও আবার সেরকম।'

'মোটেই না।' বঙ্কু প্রচন্ডবেগে মাথা নাড়ল। 'আসল কথা হচ্ছে আত্মার শান্তি মনের তৃপ্তি। তা পেতে হলে আপনাকে যে দেবস্থানেই ছুটে যেতে হবে তার কী মানে আছে।' একটু থেমে বঙ্কু বলল, 'বিশেষ আপনার যখন সেসব জায়গা পছন্দ না।'

'না, বাপু!' শীর্ণ কব্জিটা শূন্যে ঘুরিয়ে চৌধুরী সাহেব মলিন হাসলেন, 'ঐ তোমার কথাই আমার কথা—একটু খোলা হাওয়া মুক্ত আকাশ খুঁজলে না?' চুপ থেকে চৌধুরী সাহেব পরে বললেন। 'পরেশচন্দ্র আর এক ডিগ্রী চড়ে উপদেশ দেয়—বলছে, বৃন্দাবন মথুরা কাশী গয়া ঘুরে আসুন।'

'না না না—এই বয়সে এই শরীরে—' বঙ্কু মুখে বলল, আর মনে মনে বলল, 'এ বাড়ির দারোয়ান রাম সিং বা ভোলা চাকর বা তোমার শ্যালক পরেশচন্দ্রের চেয়ে আমি তোমায় ঢের বেশী চিনেছি, জেনেছি—ব্যাঙ্কের ব্যাপারে কি শেয়ার মার্কেটে যাবে বলে তোমাকে নিয়ে আমি যখন গাড়ি চালাই তখন লক্ষ্য করি রাস্তায় তুমি কেবল কী খুঁজে বেড়াও—বেলুড় দক্ষিণেশ্বর কাশী বৃন্দাবন তোমার জন্যে না।'

'এমনিতেও এই বয়সে এই শরীরে তীর্থ ভ্রমণ—' যেটুকু আরম্ভ করেছিল বঙ্কু সেটুকু বলে শেষ করতে যাবে, চৌধুরী মৃদু মতন ধমক লাগালেন। অবশ্য অদৃশ্য পরেশচন্দ্র রাম সিং কি ভোলা চাকরের উদ্দেশে এই ধমক ও উষ্মা প্রকাশ।

'কেবল বাজে পরামর্শ ওদের—যা আমায় দিয়ে কোনদিন হয়নি হবে না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিত্য তাই নিয়ে বক্তৃতা।' যেন তিক্ত প্রসঙ্গটা শেষ করতে চৌধুরী সাহেব আবার দুটো আঙুর তুলে মুখে গুঁজলেন। তালু ও জিভের কাজ চলল একটু সময়। চোয়াল দুটো দুবার ওপরের দিকে ঠেলে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। রসটুকু গিলে শেষ করে তুলোর পুঁটুলির মতন ছিবড়েটুকু আঙুল দিয়ে টেনে বার করে আনতে আনতে মোলায়েম স্বরে তিনি বঙ্কুকে প্রশ্ন করলেন, তাঁর গাড়ি ঠিক আছে কিনা। বঙ্কু বড় করে ঘাড় কাত করল। দুখানা গাড়িই সে রেডি রেখেছে। বড় বা ছোট—যেটা খুশি, সাহেব একবার বললেই সে গাড়ি নিয়ে বেরোতে পারে।

বেরোবেন বলেই তিনি বঙ্কুকে ডেকেছেন। এই চারদেয়ালের ভিতর আটক থেকে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন।

'খুঁজে দে বঙ্কু, মানুষের ভিড় থাকবে না গাড়ি ঘোড়ার জঞ্জাল নেই, দুটো গাছ থাকুক, একটু ঘাস থাকুক, রোদ বা মেঘ নিয়ে এক ফালি নরম আকাশ আছে—এমন জায়গায় গিয়ে আমি শান্তি পাব।'

'তাই পাইয়ে দেব—আপনার কিসে শান্তি কিসে তৃপ্তি আমি জানি।'

'তবে আর কি! বুদ্ধিমান তুমি।' আরাম কেদারায় পিঠ এলিয়ে নিয়ে চৌধুরী সাহেব যেন এখন থেকেই পরম তৃপ্তি অনুভব করছেন, চোখ দুটো আধবোজা করে ড্রাইভার বঙ্কুর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসেন: 'বখশিস পাবে, পুরস্কার দেব তোমাকে, যদি আমার মনের মতন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতে পার।'

যেন শুনে বঙ্কুও বেজায় খুশী, চোখ দুটো আধবোজা করে সে ঘাড় কাত করল, আর মনে মনে বলল, তুমি শালা হাড় কিপটে—ষাট টাকা মাইনে দিয়ে আমার মাথা কিনে রেখেছ—তার ওপর একটা আধলা তোমার হাত দিয়ে আজ পর্যন্ত গলান যায়নি—এখন বখশিস পুরস্কার অনেক কিছু শোনাচ্ছ! ভাল।

'হুঁ' বঙ্কু এখন দু গালে হাসল। 'আপনার মন ভাল হয় মেজাজ খোলে শরীর ঝরঝরে হয় এমন জায়গার সন্ধান আমি রাখি। আপনার ইটখোলায় কয়লা পৌঁছিয়ে দিতে ট্রাক চালিয়ে যখন ওদিকে যাই অনেক ভাল ভাল জায়গা চোখে পড়ে।'

'তা তো পড়বেই। ইটখোলা তো আর এখানে নয়। সেই তিলজলা। কত মাঠ ঘাট গাছ পাখি তোমার নজরে পড়ে।' চাউল চিনি ও সিমেন্টের মতন ইট পুড়িয়ে বেচাও চৌধুরী সাহেবের আর একটা কারবার। কত কাল তিনি যেন ওদিকে যাচ্ছেন না আজ তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল; অবশ্য ইটখোলা দেখাশোনা করতে ম্যানেজার আছে। কিন্তু কিন্তু—সেখানে যাবার রাস্তাটা যে ভারি সুন্দর, রাস্তার পাশে গাছের নরম ছায়ায় রংদার সব প্রজাপতি ওড়ে, ঘাসের লম্বা শিসের ওপর বসে ফড়িং দোলা খায়, ঘাসের যেখানে শেষ সেখানে জল চিকচিক করে। চৌধুরী সাহেবের বুকের ভিতর হু হু করে উঠল। যেন এখনি সেই ঘাস জল ফড়িং প্রজাপতির দেশে তিনি পা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

'বেশ, তাই হবে। আমার এই প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের বাড়িটা যেন ভূতের বাড়ি হয়ে আছে মনে হয়। এখানে এভাবে দিনের পর দিন আর কাটছে না। তুমি আমায় একদিন ওদিকে বেড়াতে নিয়ে চল।'

'তাই যাবেন—যখন খুশি আপনার—গাড়ি রেডি।' বঙ্কুর দুই ঠোঁটের ফাঁকে চুলের মতন সূক্ষ্ম হাসি উঁকি দেয়। অবশ্য সেটুকু দেখতে পাবার মতন চোখের ধার তার মনিব অনেকদিন খুইয়েছেন একথা বঙ্কুর চেয়ে আর কে বেশি জানে। তাই বঙ্কু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একটু বড় করেই হাসল।

জায়গাটা চমৎকার। হেঁচা বাঁশের বেড়ার ঘর। খোলার চাল। চালের অর্ধেকটা নিম আর তেঁতুল গাছের ঝাঁকড়া পাতায় ঢাকা। অর্থাৎ দিনের বেশির ভাগ সময় সেখানে ছায়া ছড়িয়ে থাকে। ঘরের ভিতরটা যে বেশ ঠাণ্ডা এক নজর দেখলেই তা বোঝা যায়। ঘরের পিছনে ঢালু জমিতে লম্বা ঘাস। ঘাসের জঙ্গল। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখলে ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে চিকচিকে জল চোখে পড়বে। আর একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে পুঁটি মৌরালা মাছের ঝাঁক চোখে পড়বে হয়তো—পড়বেই। আর সেই সঙ্গে চোখে পড়বে শামুক গুগলী কাঁকড়া জোঁক বেঙাচী।

বঙ্কু ইটখোলা থেকে ফিরছে। কয়লা নামিয়ে দিয়ে শূন্য ট্রাক নিয়ে পাকুড় গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় চলে আসে সে। ঘড়র শব্দ করে ইঞ্জিনটা হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। বঙ্কু গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। রাংচিতার বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মতন বিশাল দেহ একটা মানুষ। কাঠকয়লার মতন কুচকুচে কালো রং গায়ের। এত বড় শরীর আর তার তুলনায় মাথাটা এইটুকুন। বোঝা যায় মাথার কাজ করতে ঈশ্বর তাকে পৃথিবীতে পাঠায়নি, গতর খেটে খাবে— তাই শরীরটা এত বড়, আড়াই মণ ওজন হবে—তাই মাথাটা এত ছোট—এক পো তিন ছটাকের বেশি হবে না। আর ওই মাথার ভিতরে যেটুকু মগজ আছে তার ওজন রতি দেড়রতি হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু মগজ নেই বলে মুকুন্দ যে দুঃখিত, দেখে মনে হয় না। বরং যেন সুখী! তাই কি মানুষটা যখন তখন হাসে। শক্ত মজবুত দাঁত। বকের পাখার মতন ধবধবে সাদা। দাঁতের যত্ন করে সে বোঝা যায়। আবার এ-ও মনে হতে পারে ওই দাঁত দিয়ে সামান্য দুর্বাঘাস ছাড়া আর কিছু কাটবার মতন খাদ্য পায় না সে। নিত্য মাছ মাংস রুটি ভাত ফল ডিম খেয়ে খেয়ে দাঁতে যে হলুদ মতন তেলতেলে দাগ ধরে যায় মানুষের মুকুন্দ তাদের দলে পড়ে না। যেন দুধ দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন দাঁত গজিয়েছে পর থেকে সে তেমন কিছু খায়নি। তাই এত পরিষ্কার সাদা ঝকঝকে রয়ে গেছে দাঁতগুলো। এখন অবশ্য তার হেঁচা বাঁশের বেড়ার তৈরী ঘর ও রাংচিতার বেড়ার মাঝখানে কচু ও উচ্ছে জঙ্গলে ভর্তি জমির ওপর দাঁড়িয়ে মুকুন্দ কচ কচ করে একটা সাপলার নাল চিবিয়ে খাচ্ছে। দৈত্যের মতন উঁচু জোয়ান কোনো মানুষকে কড়ে আঙুলের মতন সরু সাপলার নাল চিবিয়ে খেতে দেখলে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। যেন

নিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ওই অতবড় শরীর যার তার ক্ষুধা মেটাবার মতন সাপলা ছাড়া হাতের কাছে আর কোন খাদ্য নেই। অথচ মানুষটা এখন হাতি পেলে হাতি, ঘোড়া পেলে ঘোড়া খেয়ে দিব্যি হজম করতে পারে। বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে বংকু কথাটা ভাবছিল। তার চোখের সামনে তখন আর একটা ছবি ভেসে উঠেছে। মাছের মুড়ো মাংস ফল দই মিষ্টি সামনে নিয়ে পেটরোগা ক্ষীণ-কায় মানুষটা চুপ করে বসে আছে ও থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য তার সামনে সাজিয়ে রেখে গেছে চাকর খানসামা। কিন্তু কিছুই তার মুখে উঠছে না জিভে ঠেকছে না। কেননা কিছুই পেটে সইবে না কেবল এই ভয় নিয়ে চৌধুরী সাহেব মুখ শুকনো করে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছে। আর এখানে আস্ত একটা হাতি বা মোষ গিলে খেয়ে হজম করার মতন দুরন্ত ক্ষুধার অগ্নিকুণ্ড পেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই মানুষটা—দরকার হলে পশুর গায়ের ছাল ছিঁড়ে ফেড়ে কাঁচা হাড় চিবিয়ে খেতে পারে মুকুন্দ তার ধারালো কঠিন ঝকঝকে দাঁত দিয়ে; কাঁচা হাড় চিবিয়ে মজ্জা বার করে নিতে পারে। কিন্তু কোথায় মাংস! জল থেকে সাপলা তুলে এনে তাই চিবোচ্ছে। পরনের গামছা থেকে এখনও টস টস করে জল ঝরছে—অত বড় শরীরের আর কোথাও সুতো-গাছটি চোখে পড়ে না। উদোম গা। বুকে পিঠে হাঁটুতে পেটে কাদা লেগে আছে। হাওয়ায় কিছু কিছু কাদা শুকিয়ে উঠে কালো কুচকুচে চামড়ার এখানে ওখানে সাদাটে প্রলেপ ফুটতে আরম্ভ করেছে।

'ডাইভারদা, নমস্কার।' বংকুর চোখে চোখ পড়তে মুকুন্দ হাসল।

'নমস্কার।' বংকু ঘাড় কাত করে হাসল। মুকুন্দর ব্যবহারটি বড় সুন্দর, ভদ্র। দেখতে দৈত্যের মতন হলে হবে কি, মানুষটি অত্যন্ত অমায়িক। দেখা হলেই নমস্কার জানায়।

'কাজ শেষ হল?' বংকু প্রশ্ন করল।

মুকুন্দ ঘাড় নাড়ল। এখন বেলা শেষ। কয়লার শেষ ক্ষেপ ইটখোলায় রেখে এসে মুকুন্দ যেমন ঘরে ফিরছে, বংকুও শেষ ঝুড়ি মাটি তুলে দিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে এসেছে। চৌধুরী সাহেবের ইট তৈরী করতে মাটির দরকার। মুকুন্দর কাজ ওধারের জলার কাছের নরম মাটি কোদাল দিয়ে কেটে কেটে ঝুড়িতে করে ইটখোলার মাঠে বয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তারা দুজনই চৌধুরী সাহেবের চাকর।

মুকুন্দর সাপলা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বংকু পকেট থেকে টিনের বাক্স ও দেশলাই বার করল।

'বিড়ি খাও, মুকুন্দ।'

বংকু খুশি হয়ে হাত বাড়ায়।

'এসো ওখানটায় বসা যাক ডাইভারদা।'

বংকুও চাইছে মুকুন্দর সঙ্গে বসে একটু গল্পসল্প করে। যেন করে একটা খেজুর গাছ কেটেছিল মুকুন্দ। শুকনো কাণ্ডটা রোদে জলে পুড়ে ভিজে কালো রং ধরে গেছে। খেজুর কাঠের ওপর বসল দুজন। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিল। বংকুর পায়ে রবারের চপ্পল। মুকুন্দর খালি পা। কাদা শুকিয়ে গিয়ে এমন চেহারা ধরেছে মনে হয় মুকুন্দ দু পায়ে মোজা পরে আছে।

'তারপর কেমন আছ মুকুন্দ, দুদিন ইদিকে আসা হয়নি। দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে।'

'এই আর কি—কেটে যাচ্ছে।' বিড়ি ধরিয়ে দেশলাইটা বংকুর হাতে ফিরিয়ে দেয় মুকুন্দ। 'হুঁ, যেন দিন দুই ইটখোলায় দেখিনি, গা গতর খারাপ হয়েছিল বুঝি ডাইভারদার?'

'না, অন্য লোক ট্রাক চালিয়েছে, সাহেবকে নিয়ে আমার বেরোতে হয়েছিল।'

'হুঁ, তাই বল।' মুকুন্দর গলার স্বর গাঢ় হয়, নিশ্বাস ঘন হয়ে পড়ে, যেন ঈশ্বরের নাম করছে সে, আকাশের দিকে চোখ দুটো তুলে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হুঁ, সাহেবের কত কাজ! কতবড় মানুষটা।'

বংকু মনে মনে হাসল। সাহেবের এখন আর কোন কাজ নেই, আত্মার শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। জীবনে অনেক কুকাজ করে অঢেল পয়সা জমিয়ে এখন পরম শান্তির সন্ধানে পাশে বসে গাড়ি চড়ে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'আহা! কর্তার শরীর ভেঙ্গে গেছে। আর বোধ করি বেশিদিন বাঁচবে না।' মুকুন্দ আক্ষেপের সুর বার করল।

'হুঁ।' বংকু হাতের পোড়া বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিল। তারপর মুকুন্দর দিকে তাকাল। 'মরবার আগে আর একটু ভাল করে বেশি করে বেঁচে যেতে চাইছেন যে কর্তা।' কথা শেষ করে বংকু কেমন করে জানি হাসল। মোটা মাথা নিয়ে মুকুন্দ এই হাসির অর্থ ধরতে পারে না। বরং সরল মন নিয়ে একটা সহজ সাদামাঠা অর্থই সে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে।

'তা পয়সার যখন অভাব নেই, বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে ভাল ভাল দাওয়াই খেয়ে দেহটা সারিয়ে নিলে কিছুকাল আবার হয়তো—'

'হুঁ, আবার কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারবেন। সেই দাওয়াই খুঁজছেন সেই ডাক্তারের দেখা পেতে চাইছেন তোমার আমার মনিব।' মনে মনে বলল বংকু আর বাংলোর বেড়ার ওপারে খোলার ঘরের চালের ওপর নিম ও তেঁতুল গাছের পাতাগুলো হঠাৎ কেমন চকচকে হয়ে উঠেছে দেখতে বাস্ত হয়ে পড়ল। অর্থাৎ আলোর শেষ পাপড়িটুকু গাছের মাথায় ঢেলে দিয়ে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সূর্য সদাশয় ব্যক্তি। চৌধুরী সাহেবের মতন না। কাউকে একটা আধলা দিয়ে যেতে রাজী নয়—সুখ খুঁজছে—আত্মার সুখ। যতক্ষণ শ্বাস আছে এই সুখ কিনতে কাঁড়ি খরচ করে যাবে। অপরের দিকে তাঁর তাকাবার সময় কোথায়।

'কি হল, চুপ করে গেলে কেন ডাইভারদা!'

বংকু ঘাড় ফেরাল।

'না, ভাবছি, সাহেব চালিয়ে যেতে পারবেন। কাঁড়ির জোর আছে—ভাবছি তোমার আমার চালিয়ে যাওয়াই শক্ত হবে।'

কিন্তু বংকুর কথাটা মুকুন্দর মনঃপূত হল না বলে মনে হল। ঘাসের ওপর থুথু ফেলল। দু'বার চোখ ঘুরিয়ে বেড়ার ওপারে ছাপলাটাকে দেখল।

'আমি পারব। আমার চলে যাবে ডাইভারদা।'

'চৌধুরী সাহেবের মতন যখন চোখ জ্বালা পড়তে আরম্ভ করবে? শীত পড়ে গেলে নাক মরে যাবে? কোমরে জোর থাকবে না, চলতে ফিরতে বুক ধুকপুক করবে?' চোখ দুটো ছুঁচালো করে বংকু মুকুন্দর দিকে তাকায় আর মিটিমিটি হাসে।

মুকুন্দ আকাশের দিকে আঙুল তুলে দিল।

'ছলচাতুরী জানি না, মিছা কথা জিভের আগায় আসে না, চুরি করি না, লোকের মনে দুঃখ দেই না—কাজেই তিনি আমায় চালিয়ে নেবেন।'

ঈশ্বর। বংকু আর হাসে না। চিন্তা করে। এই জীবনে কয়েক লাখবার সে দুটো কথা শুনে এসেছে। ঈশ্বর আছে ও ঈশ্বর নেই। মুকুন্দ ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে সারাদিন কোদাল চালিয়ে দু মুঠ ভাতের যোগাড় করে। ঈশ্বর বিদ্বেষী চৌধুরী সাহেব বুদ্ধির কলকাঠি নেড়ে জীবনের ভেলা চালিয়ে যাচ্ছে। উপমাটা ঠিক হল না। বংকু মনে মনে বলল, চৌধুরী সাহেবের জীবনটা একটা দামী মোটরগাড়ি। সংসারের সড়ক বেয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে চলেছে তো চলছেই।

'কেমন ডাইভারদা, কথাটা ঠিক বলছি কিনা?' বংকুর হাঁটুর ওপর মুকুন্দ হাত রাখল। বংকু মহা সমস্যায় পড়েছে। মুকুন্দর কাছে যখনই সে আসে মুকুন্দ তাকে

ঈশ্বরের কথা শোনায়। 'বুঝলে ভাইভায়রা, এই যে সারাদিন কোদাল চালিয়ে মাটি কেটে এলাম, গা বেয়ে ঘাম ঝরল, তার ফল ভগবান আমাকে পাইয়ে দেবেনই। ঘাম হল গিয়ে তোমার বৃষ্টি। বৃষ্টি না হলে জমিতে ফসল হবে না যে ভাই।'

'বুঝলে বঙ্কু, আগে ছিল বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—অর্থাৎ রথ চালিয়ে গদা ঘুরিয়ে তুমি সংসার জয় করবে ভোগ করবে। আজ শাস্ত্র পাল্টে গেছে। মগজের জোর না থাকলে, তুমি কেবল মেহেনৎ করে মরবে—মেওয়া তোমার কপালে কোনদিন জুটবে না। বুদ্ধি খাটাতে পারলে দুনিয়াটাকে হরিতকীর মতন হাতের তেলোয় নিয়ে আসা যায়।' গাড়িতে বসে চৌধুরী সাহেব বঙ্কুকে মাঝে মাঝে উপদেশ দেন। স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে বঙ্কু কান পেতে কথাগুলি শোনে। আর তখন তার মনে হয়, সত্যি সে নিজেকে যতটা চালাকচতুর মনে করে আসলে ততটা নয়। যদি তাই হত ও গাড়িতে সে সেজেগুজে চুপ করে বসে থাকত আর তার পাশের লোকটি অর্থাৎ চৌধুরী সাহেব গাড়ি চালাত। কাজেই আরো চতুর আরো সেয়ানা হতে হবে বঙ্কুকে। আর সেই জিদ নিয়ে সে চৌধুরী সাহেবকে আত্মার শান্তি পাইয়ে দিতে গাড়ি নিয়ে যখন যেখানে যাবার ছুটে যাচ্ছে।

কিন্তু এখানে এসে সব তার কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

প্রথমটায় মনে হবে মুকুন্দ পাগল। আবোলতাবোল বকছে। কিন্তু দু'মিনিট চুপ করে কথাগুলি শুনলে বুকের ভিতরটা কেমন করে। একটা ভয় আসে। অথচ জায়গাটা কত সুন্দর। নরম ঘাস। বাঁশচটার বেড়ার গায়ে একটা হলদে পাখি বসে আছে। বেড়ার ওদিক কালো কুচকুচে ছাগলটা ঘাসের বিছানায় শুয়ে আছে। এখানে বুদ্ধি করে চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে এলে চৌধুরী সাহেবের মন শরীর ঝরঝরে হয়ে যেত। কিন্তু এখানে বঙ্কু বুদ্ধি খাটাবে কেমন করে। মুকুন্দ যে অন্যরকম বলছে। যেন খুব খাঁটি কিছু বলছে।

'আমি একদিন রাজা হয়ে যেতে পারি।' মুকুন্দ নতুন বিড়ি ধরিয়ে বঙ্কুর চোখের দিকে চেয়ে মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়তে সুরু করে। 'বুঝলে ভাইভায়রা, শক্ত হাতে আমি কোদাল ধরে থাকব, আর ঈশ্বরকে ডাকব। কি, এই জন্মে যদি রাজা না হই পরের জন্মে ভগবান আমায় সিংহাসন পাইয়ে দেবেন। আমি ছলচাতুরী জানি না মিছা কথা বলি না চুরি করি না, লোকের মনে দুঃখ দেই না।'

তখন মুকুন্দর চেঁচা বাঁশের বেড়ার ঘর অন্ধকারে ঢেকে গেছে। ঘাসের ওপর ছাগলটা নেই। হলদে পাখিটা উড়ে গেছে। আকাশে তারা দেখা দিয়েছে। বঙ্কু উঠে দাঁড়াল। যেন এখন হঠাৎ সরাসরি মুকুন্দের কাছ থেকে সরে পড়া যায়। লম্বা পা ফেলে বঙ্কু মাঠটা পার হয়ে আসে।

'না, হবে না, বড় শক্ত ঠাঁই।' বঙ্কু মুখ কালো করে ফেলল।

'সে কি!' চৌধুরী সাহেব চমকে ওঠেন। 'টাকা চাইছে?'

'টাকার তার দরকার নেই—টাকা পয়সা ছড়া সে সুখে আছে।' বঙ্কু গম্ভীর গলায় বলল, 'টাকা পয়সা গ্রাহ্য করে না এমন মানুষ সংসারে এখনো একটা দুটো আছে।'

'বটে বটে!' চৌধুরী সাহেব এক সঙ্গে তিনটে আঙুল মুখে গুঁজে দেন। আঙুল দিয়ে টেবিলের বনাতের ওপর ছবি আঁকেন। না, হিসাব করছেন সাহেব। টাকার অঙ্ক কষছেন।

'টাকা পয়সা গ্রাহ্য করে না—অর্থে তার আসক্তি নেই—তবে তার নজরটা কোনদিকে—এমন কি জিনিস আছে যা পেয়ে তার মন ভরে আছে?' চৌধুরী সাহেবের পাকা ভুরু নাচতে আরম্ভ করল।

বঙ্কু লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল, সিলিং-এর দিকে দুটো আঙুল তুলে দিয়ে বলল, 'ওই একদিকেই নজরটা পড়ে আছে, তাই আর সব কিছু ভুলতে পেরেছে মানুষটা।'

'ঈশ্বর!' বিদ্রুপের বাঁকা রেখা জাগল চৌধুরীর শুকনো ঠোঁটে। 'দুষ্টু লোকেরা ওকথা বলে মানুষের মন ভোলায়। যারা ভণ্ড বজ্জাত তারা সব কিছু বলার আগে ঈশ্বরের কথাটা বলে নেয়।'

'তাই কি!' অন্তত এ ক্ষেত্রে বঙ্কু কথাটা বিশ্বাস করে না। সারাদিন মাটি কাটে, সাপলা খেয়ে ক্ষুধা মেটায়—যদি তার চারটে হাত গজায় আর সব কটা হাত লাগিয়ে সে কোদাল চালায় তবু, আড়াই টাকার বেশি মজুরী আপনি তাকে দেবেন না মুকুন্দ জানে—কাজেই......'

'বুঝলাম।' চৌধুরী সাহেব বাধা দিলেন। 'তুমি মুকুন্দর ভক্ত হয়ে পড়েছ—তুমিও ঈশ্বরের নাম জপতে শুরু করবে এখন থেকে।'

শুকনো মুখে বঙ্কু খোঁচাটা হজম করল।

'হুজুর, তেমন ভাগ্য কি আমার হবে। দুটোটা বলতেও কামড়ে ধরবার কিছু থাকবে না অথচ ভগবানের নাম করে যাব।'

'যাকগে—এখন কাজের কথায় আসা যাক। হলদে পাখি দেখলে সেখানে, কালো কুচকুচে ছাগল দেখলে, মোলায়েম ঘাস নরম রোদ, বাঁশচটার বেড়া, চেঁচা বাঁশের ঘরের পাশে উচ্ছে আর কচু জঙ্গলের ছবি আমও

এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু কেবল ওই দেখে তো আমার অন্তর শান্ত হবে না। মুকুন্দকে রাজী করাতে না পারলে কিছুই হচ্ছে না।'

'রাজী করানো শক্ত।'

'টাকা দেব।' চৌধুরী সাহেবের গলার স্বর ধারালো হয়ে উঠল। 'বলে কিনা টাকা চাইছে না, অর্থের লিপ্সা নেই—টাকা দিয়ে ঈশ্বরকে কথা বলানো যায়—আর আর মুকুন্দ তো মানুষ!'

বঙ্কু হঠাৎ কি চিন্তা করল যেন। চোখের তারা দুটো ঝিকঝিক করছে। এতক্ষণ পর—অনেকক্ষণ পর তার ঠোঁটের আগায় আবার সেই কুটিল হাসি ফিরে এসেছে। অথচ মুকুন্দর সামনে হাসিটা একেবারে মরে গিয়েছিল। চেহারাটাই কেমন শকুনো শ্মশান ফেরৎ মানুষের মতন বিরস বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখন নতুন করে সে জেগে উঠেছে। বড় করে ঢোক গিলল বঙ্কু।

'কত টাকা দেবেন—মানে কি পরিমাণ টাকার কথা মুকুন্দকে বলব?'

'এক শ? দু শ? তিন শ? পাঁচ শ—' চৌধুরী সাহেব থামলেন। বঙ্কু সিলিং-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। যেন মুকুন্দর ঈশ্বরের সঙ্গে সে পরামর্শ করতে চাইছে বিষয়টা নিয়ে। টাকার থলি বাড়িয়ে দিলে মুকুন্দ হাত বাড়াবে তো?

'হুঁ, চৌধুরীর গলার স্বর শোনা গেল। 'আর তোমার বখশিস তো আছেই—কাজ হাসিল হওয়া মাত্র আমি চেক লিখে দেব।'

মনিবের চোখে চোখ রাখল বঙ্কু। কুটিল হাসি সরে গিয়ে সলজ্জ হাসি উঁকি দিয়েছে তার ঠোঁটের আগায়।

'কি পরিমাণ আমি আশা করতে পারি হুজুরের কাছে?'

'এক শ, দু শ, তিন শ—পাঁচ শ—' চৌধুরী সাহেব থামলেন। বঙ্কু আর সিলিং-এর দিকে চোখ না তুলে মেঝের দিকে পায়ের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকে। ভাবে।

চৌধুরী সাহেব আর আঙুর খান না। প্লেট থেকে এক টুকরো আপেল তুলে নেন। তারপর বঙ্কুর দিকে তাকান।

'তুমি কি মুখখানা দেখেছ? কেমন দেখলে?'

বঙ্কু এমনভাবে ঘাড় কাত করে যে তার মাথা প্রায় কাঁধে এসে ঠেকে। আর বড় করে হাসে। সেই হাসির শব্দ নেই, কেবল দু-পাটি দাঁত দেখা যায়। চৌধুরী সাহেব খুশি হন। উঁচু আর কচু জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বঙ্কু যে মুখখানা দেখে এসেছে তার বর্ণনা তিনি আগেই শুনে নিয়েছেন। যেন আবার তা সবিস্তারে শুনতে ও জানতে চাইছেন মনিব। মুকুন্দ একটা মাংসের পাহাড়। কয়লার মতন কালো গায়ের রং। কিন্তু লতাপাতার ফাঁক দিয়ে বঙ্কু যে মুখ দেখে এসেছে তার রং চাঁদের আলোকেও হার মানায়। যেন চাঁদের আলো জমিয়ে তৈরী ঐ শরীর—হাল্কা ফিনফিনে হাতের মুঠোয় তুলে নেওয়া যায়। মুকুন্দ ঈশ্বরকে ডাকছে। এই জন্মে কেবল মাটি কেটে জীবনপাত করছে; পরজন্মে ঈশ্বর তাকে রাজা করবে এই বিশ্বাস। কিন্তু মুকুন্দ জানে না ঈশ্বর এই জন্মেই তাকে রাজা করে দিয়েছে। এমন চাঁদপানা মুখ যার ঘরে সে রাজা নয়তো কি।

'তবে আর দেরি করো না।' চৌধুরী সাহেব উসখুস করছিলেন।

'আমি এখনই বেরোচ্ছি।' বঙ্কু সতৃষ্ণ নয়নে জরাজীর্ণ বৃদ্ধের সামনে অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা উপাদেয় খাদ্যগুলি আর একবার দেখা শেষ করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

হলদে পাখি নেই। একটা নতুন পাখি তার জায়গা দখল করেছে। পিঠটা কালো বুকটা দুধের মতন ধবধবে সাদা। লাল ঠোঁট। ঠোঁটটা বাঁখারির বেড়ার গায়ে ঘষছে।

বঙ্কু হাত বাড়িয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা ঢিল তুলল। যেন ওই পাখি তার পছন্দ না। ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেবে।

মুকুন্দ তার হাত চেপে ধরল। হাসল।

'কৃষ্ণের জীব। আঘাত দিতে নেই ডাইভারদা।'

বঙ্কু হাসল। হাত থেকে ঢিলটা পড়ে গেল।

'তা বটে। কিন্তু—' ঘাসের ওপর চোখ রেখে সে ইতস্তত করে।

মুকুন্দ সেই ফাঁকে বিড়ি ধরায়।

'কিন্তু আমিও যে কৃষ্ণের জীব—' বঙ্কু চোখ তুলল, 'এই যে সারাদিন আধপেটা খেয়ে চৌধুরী সাহেবের গাড়ি চালাচ্ছি, খেটে খেটে একদিন যক্ষ্মা হবে কি হার্টের অসুখ করবে, হুট করে মরে যাব, তার কি হবে শুনি?'

'অ, তাই তোমার রাগ পাখিটার ওপর!' মুকুন্দ বিড়ির ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার করে দিল। চুপ থেকে বেশ কতক্ষণ বিড়িটা টেনে টেনে একেবারে শেষ করে ফেলল। তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বঙ্কুর দিকে ভাল করে ঘুরে বসল।

'ক্ষতিটা কি শুনি? আমরা কি পাথর—না ওই যে পাখিটাকে মারতে ঢিলটা কুড়িয়ে নিয়েছিলে সেই ঢিল। জীব হয়ে যখন জন্মেছি তখন মরতে হবে।'

'তা বলে অমন গরুর মতন খেটে খেটে? উপোস থেকে থেকে—?' বঙ্কু বুঝি রাগ করল। মুকুন্দ তার কাঁধে হাত রাখল।

'মরছে কে? তুমি না আমি? মরবে আমাদের এই শরীর—দেহটা নষ্ট হবে। তোমার আত্মাকে মারবে কে ডাইভারদা!'

'অ, তুমি তো সেই সুখেই আছ। তারপর তোমার আত্মা রাজা হবে—মোটরগাড়ি চড়ে বেড়াবে। তাই জালজোচ্চুরি মিছা কথা হিংসা বিবাদের ধারে কাছে না ঘেঁসে কেবল মাটি কোপাচ্ছ।'

'হুঁ, আমার আত্মা মোটরগাড়ি চড়ে না বেড়াক—সুখেই থাকবে— আমার আত্মা কোথায় থাকবে জান ডাইভারদা!'

বঙ্কু হাঁ করে লোকটার মুখ দেখে।

মুকুন্দ আঙুল দিয়ে তার ঘরের পাশের ঝোপঝাড় দেখায়।

'ওই ওখানে থাকবে।'

'জঙ্গলে—জঙ্গলের ভূত হয়ে বেঁচে থাকবে বুঝি আত্মাটা!' বঙ্কু অল্প হাসল।

মুকুন্দ মাথা নাড়ল।

'ওই যে তুলসীর জঙ্গলের পাশে লম্বা ডাঁটাটা মাথা উঁচিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ না, মাথায় এক থোকা হলদে ফুল?'

'হুঁ, অতসী ফুল।' বঙ্কু ঘাড় কাত করে ট্যারাচোখে ফুলগুলি দেখে নিয়ে মুকুন্দর চোখ দেখল। 'তুমি কি বলতে চাইছ?'

'আমার আত্মা ওই ফুলের মধ্যে চলে যাবে।' মুকুন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, 'এর চেয়ে বড় সুখ আর কী আছে ডাইভারদা, ফুলের মধ্যে যার বাস রাজা মহারাজার চেয়ে সে বেশি সুখী, তাই না?

বঙ্কু চুপ করে রইল। তার বুকের ভিতর

ধ্বকধ্বক করছে। পাগলের মতো বকছে এই মানুষটা। কিন্তু কথাগুলি শুনলে গায়ে কেমন কাঁটা দেয়। কথাগুলি ভাল। তবু মুখটা বিস্বাদ ঠেকছিল চৌধুরী সাহেবের ড্রাইভারের। একটা বিড়ি ধরাল। বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে সে মুকুন্দর দিকে চোখ ফেরাল।

'বুঝলাম ভাই, বুঝলাম। আধপেটা খেয়ে উদোম গায়ে থেকে দিন কাটিয়ে চৌধুরী সাহেবের ইটখোলার মাটি কেটে অনেক পুণ্যি করছ—মরে গেলে তোমার আত্মা না হয় এই অতসী পুষ্পের মধ্যে বাসা বাঁধবে, কিন্তু ঘরে যে থেকে গেল—একটা মাটির কলসী আর ফুটো লোহার থালা ছাড়া যার জন্য কিছুই রেখে গেলে না তার কী করে চলবে একবার চিন্তা করেছ কি?'

মুকুন্দ এক দলা থুথু ফেলল।

'বৌ? বৌয়ের কথা বলছ।'

'হুঁ।'

মুকুন্দ আকাশের দিকে আঙুল তুলল।

'যে চালাবার মালিক সে চালাবে। আমি চালাবার কে? আধপেটা খাক এক সন্ধ্যা খাক—এখনও যে চলে যাচ্ছে তাও কি আমি চালাচ্ছি?' কোদালের মত দাঁতগুলি ছড়িয়ে মুকুন্দ হাসল।

বংকু মুখভার করে বসে রইল। আসল কথাটা সে তুলতেই পারছে না। না কি মুকুন্দ টের পেয়ে গেছে চৌধুরী সাহেবের ড্রাইভার এখানে ঘনঘন আসছে কেন—তার এমন খাতির জমাবার চেষ্টার আসল উদ্দেশ্যটা কি। তাই কি এত পাপ পুণ্য ধর্ম অধর্মের কথা শোনাচ্ছে মুকুন্দ তাকে। বংকুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

'চুপ করে গেলে কেন ডাইভারদা।'

'মনটা ভাল নেই।' বংকু অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

'যেন মনে হয় তুমি কি একটা কথা বলবে বলবে করছ।'

বংকু চমকে উঠল। মুকুন্দর ভাঁটার মতন লাল চোখ দুটো দেখল। কটমট করে বংকুর দিকে তাকিয়ে আছে অথচ ঠোঁটের আগায় এক ফালি হাসি ঝুলছে। বংকুর বুকটা দমে গেল। কথাটা তার জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। সাহস করে এখনি সে তা মুকুন্দর কানে তুলে দিত। কিন্তু লোকটার ঐ তাকানো ও হাসি দেখে সে হতাশ হল। কথাটা আবার বংকুর বুকের অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

'চলি আজ।'

'কাল এসো ডাইভারদা। গল্পসল্প করা যাবে।'

বংকু কথা বলল না।

'না হবে না। লোহার মতন শক্ত মানুষটার মন।'

চৌধুরী সাহেব ভেংচি কাটলেন।

'দরকার হলে লোহাও গলিয়ে দেওয়া যায়। জোরালো আগুনের দরকার। আসল কথা তোমার বুদ্ধির জোর কম। বুদ্ধির আগুন দিয়ে একটা মানুষের মনকে গলানো যায় না একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'আত্মার কথা ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা নেই মুখে।'

'তোমায় পেয়েছে যেমন!' চৌধুরী সাহেব নাকে হাসলেন। 'এসব বুলি আমি একদিনে থামিয়ে দিতে পারি। ম্যানেজারকে বলে ইট পোড়ানোর কাজ কিছুদিন বন্ধ রাখব। আর মাটি কাটতে হবে না। দেখি তখন কেমন—'

'তখনো সে এসব বলবে। অসম্ভব মনের জোর লোকটার।' বংকু আস্তে আস্তে বলল, 'আমি ভেবেছি অন্য জায়গায় চেষ্টা করব। মেটিয়াবুরুজের দিকে আপনার ক'ঘর প্রজা আছে। হ্যাঁ, এদিক খোলার চাল, ছেঁচা বাঁশের বেড়ার ঘর ওদের। নিম তেঁতুল গাছ আছে, বড় জংগল উঁচু জংগল—'

চৌধুরী সাহেব মাথা নাড়লেন। রোগা শালিকের মতন চিঁচি আওয়াজ বার করলেন গলা দিয়ে। রাগ করলে চৌধুরী সাহেব এমন করে চেঁচান।

'মেটিয়াবুরুজ পরে হবে—মেটিয়াবুরুজ পরে দেখা যাবে। এখন আমার বুকের ভিতর তিলজলার ছেঁচা বাঁশের বেড়ার ঘর আর রাংচিতার বেড়াটা শক্ত খুঁটি গেড়ে বসেছে। আমি অন্য কথা শুনব না।'

'হুজুর মেটিয়াবুরুজেও হলদে পাখি আছে, নরম রোদ, রাংচিতার বেড়া আমার চোখে পড়েছে। শহর ছেড়ে অরণ্যের জন্য আপনার প্রাণ কাঁদে—সেখানে আপনি শান্তি পাবেন।'

'উঁহু তুমি ভুল করছ!' চৌধুরী সাহেব আর ভেংচি কাটেন না। হাসেন, বাঁধানো দাঁতের পাটি হাসির ধমকে খটখট করে নড়তে থাকে। 'আমার শান্তির সংগে আর একজনের অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলবে, সুখটা সেখানে বেশি, আমার তৃপ্তি তখন বেশি হবে।'

'ভয় আছে।'

'ভয় আছে বলেই তো অরণ্যে যাওয়া—ভয়ঙ্কর বলেই তো শিকারের আনন্দ।' চৌধুরীর মরা চোখের তারায় ঝিলিক উঠল। ভয়াল হিংস্র পশুর দিকে মানুষ যে-চোখে তাকায় বংকুও সেই দৃষ্টি নিয়ে মনিবের দিকে তাকাত, কিন্তু বুড়োর ক্ষয়ে যাওয়া নখ ও নড়বড়ে দাঁতের কথা চিন্তা করে ভয়ের পরিবর্তে বংকুর মনে অনুকম্পার উদয় হল। অবশ্য চেহারায় তা প্রকাশ করল না সে. আসল চেহারা গোপন করতে বংকুর জুড়ি নেই, চৌধুরী সাহেব যদি তা জানতেন। তাই বংকু ভয় পাচ্ছে ধরে নিয়ে তিনি সংগে সংগে অভয়বাণী শোনালেন।

'ভয়টয় কিচ্ছু থাকবে না—শোন বলছি, আমি হাজার টাকা দেব—মুকুন্দকে বলো।'

যেন এই পথে পা বাড়াবে বলে চতুর বংকু এতক্ষণ পায়তাড়া কষে কষে ক্লান্ত হচ্ছিল। এখন নিশ্চিন্ত হল; কিন্তু চৌধুরী সাহেবকে সে তা জানতে দিল না, বুঝতে দিল না। বরং চোখে মুখে আগের চেয়েও বেশি দুশ্চিন্তা ঝুলিয়ে দিয়ে শুকনো

গলায় বলল, 'দেখি। হাজারের কথা শুনে যদি ব্যাটা ঈশ্বরকে ভোলে।' বর্খাশ্তের কথা সাহেব আজ তুললেন না। সে তো আছেই। যেখানে মাথা আছে সেখানে কান আছে। মাথার চেয়ে কানটা বড় করা যায় কিনা বঙ্কু পরে ভেবে দেখবে বলে এখন এ সম্পর্কে এত বেশি নীরব থেকে গেল।

হাজার টাকার কথাই কি বঙ্কু বলতে পারল? পারল না। ইটখোলার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আর ইট পোড়ান হয় না। ইট তৈরী করতে মাটি কাটার দরকার নেই। মাটির কাজও বন্ধ। কাজ বন্ধ তাই তিলজালার মাঠটা কদিন ধরে কেমন চুপচাপ। যেন অন্য কোথাও কাজ পাবে বলে মানুষগুলো চলে

গেছে। অখণ্ড শূন্যতা ও প্রচণ্ড রৌদ্র নিয়ে প্রান্তরের পর প্রান্তর ধুঁকছে। যেন এখন আর ইট পুড়ছে না ধোঁয়া উড়ছে না বলে আকাশটা ইস্পাতের মত অসামান্য ধারালো ঝকঝকে নীল হয়ে প্রচুর উত্তপ্ত রৌদ্র চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়ে তুলছে। এতদিন এখানে অনেক

কালি ছিল গোলমাল ছিল। হাঁকডাক গালি-গালাজ চোখরাঙানি তোষামোদের চাপে আকাশ মাটি হাঁপিয়ে উঠেছিল। আজ আকাশ নির্মল, মাটি শূন্য স্তব্ধ। ইটের জায়গা পরিষ্কার হয়ে গেছে, মাটিতে পড়ে আছে কিছু লাল ধুলো। আবিরের মতন সেই লাল ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে একটা দমকা হাওয়া প্রান্তরের এপার থেকে ওপারে ছুটে যাচ্ছে।

গাছের ছায়ায় বসে একজন সেই গরম হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া লাল আবিরের খেলা দেখছিল। একটা কাক ডাকছিল গাছের ডালে। মাথার ওপর কাকের ডাক শুনে গাছতলার মানুষটা বিরক্ত হয়ে দুবার ঢিল ছুঁড়েছে। বেহায়া কাক দুবার উড়ে গিয়ে তৃতীয়বার ফিরে এসে ডাকতে শুরু করেছে। যেন আবার একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে মানুষটা পায়ের কাছে ঘাসের দিকে তাকাতে গেছে, হঠাৎ সে চমকে উঠল। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচমচ শব্দ করে দৈত্যের মতন একটা মানুষ হেঁটে যায়। সাপলার নাল খেতে খেতে হাঁটছে। পরনের গামছা থেকে টসটস করে জল ঝরছে। একটা জিনিস বঙ্কুকে অবাক করে দিল। তপ্ত হাওয়ার ঝলক তার চোখে মুখে লাগছিল এতক্ষণ। রোদে পোড়া মাঠের আগুন নিয়ে হাওয়াটা ছুটে ছুটে আসছিল। গাছের ছায়ায় বসেও বঙ্কু শান্তি পাচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ যেন ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তার শরীর জুড়িয়ে গেল। যেন দৈত্যের মতো ঐ মানুষটা এসে পড়াতে জায়গাটা এমন চমৎকার শীতলতায় ভরে গেল। লোকটা বুঝি যাদু জানে, বঙ্কু ভাবল, তারপর তার মনে হল, না, ঈশ্বর ভক্ত, ভক্তের ওপর সদয় হয়ে ঈশ্বর দুপুরের অসহ্য জ্বালা কমিয়ে দিয়েছেন। মুকুন্দ যে পথে হাঁটবে সেখানে দাহ থাকবে না যন্ত্রণা থাকবে না। তাই এমন সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে এই গাছতলায়। অবশ্য বঙ্কুর এই চিন্তাটা বেশিক্ষণ থাকে না। ঈশ্বরভক্ত না ছাই। লোকটা এখন জল থেকে উঠে এল। তার গায়ে জল লেগে আছে পাঁক লেগে আছে। জলের গন্ধ পাঁকের গন্ধ ছড়িয়ে মুকুন্দ হাঁটছে। তার হাতের সাপলার আঁটি থেকেও একটা ঠাণ্ডা গন্ধ উঠে আসছে। আর সেই গন্ধ বঙ্কুর নাকে লাগছে বলে সে মনে করছে দেশটা বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আসলে এখনো আগুনের হল্কা বইছে। ভুল ভাঙতে বঙ্কু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

'হেই মুকুন্দ!' বঙ্কু ডাকল।

মুকুন্দ ঘাড় ফেরাল। স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'এসো, এখানে এসো।' বঙ্কু আদুরে গলায় গলায় ডাকল।

সাপলার আঁটিটা এই কাঁধ থেকে সেই কাঁধে নিয়ে মুকুন্দ এক পা এক পা করে গাছতলার দিকে চলে এল।

'বোস বোস।' বঙ্কু তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল ও দেশলাই বার করল। মুকুন্দ পাশে বসল। সাপলার আঁটিটা ঘাসের ওপর রাখল।

'কোথায় যেন ডুব মেরেছিলে ডাইভারদা। কদিন দেখছি না।'

'না, ইটখোলায় আসা তো বন্ধ এখন। আর ইট পুড়ছে না—কয়লারও দরকার নেই; কাজেই ট্রাক নিয়ে এদিকে আর আসতে দেখছ না, হা-হা—বিড়ি খাও।'

মুকুন্দ আজ বঙ্কুর হাসিতে যোগ দিল না। কেমন যেন গম্ভীর। লক্ষ্য করে বঙ্কু ভিতরে ভিতরে খুশি হয়।

'তারপর? তোমার খবর কি।' মুকুন্দর পাশে আর একটু ঘন হয়ে বসল বঙ্কু।

'সাপলা তুলে আনলাম পুবের জলা থেকে।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি—ইস্ অনেক সাপলা তুলে এনেছ।'

মুকুন্দ কথা না বলে ঘাড় কাত করল। বিড়ি ধরাচ্ছে। মুকুন্দকে বিড়ি ধরাবার সময় দিতে বঙ্কু চুপ করে রইল। মাথার ওপর কাকটা একভাবে ডেকে চলেছে। এখন আর ইচ্ছা থাকলেও ঢিল মেরে ওটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে না বঙ্কু। কেন না মুকুন্দ তা হলে রাগ করবে। কৃষ্ণের জীবকে আঘাত করতে দেখে ঈশ্বরভক্ত মানুষটা ঈশ্বর নিয়ে জীব নিয়ে, জীবের দেহ ও আত্মা নিয়ে লম্বা বক্তৃতা সুরু করে দেবে। ফলে আসল কথাটা চাপা পড়ে যাবে। মুকুন্দর কানে কথাটা তুলতে বঙ্কু তখন সাহসই পাবে না। বরং যে সুযোগটা প্রায় হাতের কাছে এসে গেল সেটাকেই সে কাজে লাগাতে চেষ্টা করল। অল্প হেসে বঙ্কু প্রশ্ন করলঃ 'তা, কদিন ধরে কেবল সাপলাই চালাচ্ছ বুঝি? ঘরে আর চালের কণাটাও নেই মনে হয়!'

মুকুন্দ ঠাণ্ডা গলায় হাসল।

'ছিল এক মুঠো। বৌকে দিয়েছি। ফুটিয়ে দুপুরে চাট্টি ভাত খেয়েছে।'

'তারপর?' বঙ্কু হাসল না; বরং চেহারাটা বিমর্ষ করে ফেলল। 'তুমি না হয় সাপলা খেয়ে শালুক খেয়ে দিন কাটাবে—বৌ-এর দিন চলবে কেমন করে।'

মুকুন্দ এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে চুপ করে রইল।

'আহা বৌটা বড় কষ্টে পড়েছে!' বঙ্কু একটা লম্বা নিশ্বাস ত্যাগ করল। তাতে মুকুন্দর চেহারার কোন পরিবর্তন হয় কিনা বঙ্কু আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু দেখা গেল মুকুন্দ নির্বিকার চিত্তে বিড়িটা টেনে টেনে শেষ করছে। লোকটার রকমসকম দেখে বঙ্কু চটে যায়।

'কি, কথা বলছ না যে!' মুকুন্দর গায়ে কনুই দিয়ে আস্তে ধাক্কা দেয় বঙ্কু। 'ইট-খোলার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এখন তুমি বেকার। কিন্তু পাকাপাকিভাবে কি করে চলবে একটু ভেবে দেখেছ কি? আর কোথাও গিয়ে কাজকর্ম জোটাবার আশা পেলে?'

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, বোকার মতন প্রকাণ্ড দাঁতগুলি ছড়িয়ে হাসল। 'চেষ্টা করিনি—কাজ জোটাবার যিনি মালিক তিনি জুটিয়ে দেন ভাল, না দিলে আমার কি ক্ষমতা আছে কাজ জোটাই মানুষের চেষ্টায় কিছু হয় না ডাইভারদা।'

'তুমি একটা আস্ত গাধা। মোষের মতো এত বড় একটা শরীরই কেবল রেখেছ, মাথায় ছটাক পরিমাণ বুদ্ধি নেই।' বঙ্কু অন্যদিকে মুখ ফেরাল। 'আমি ভাবছি বৌটা না খেয়ে মরবে—আহা কী কষ্টে পড়ল বেচারা।'

'শুনে ডাইভারদা, বুদ্ধি থাকাটা ভাল না, বুদ্ধি মানুষের শত্রু—মালিক যেমন রাখেন তেমন থাকতে হবে। নিজের বুদ্ধি খাটাতে যায় বলে মানুষ মরে।'

'তুমি বনে যাও, বৌটাকে কারো হাতে গছিয়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যাও।' বঙ্কু মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকায়। বঙ্কু রাগ করেছে মুকুন্দ বুঝল। কিন্তু মুকুন্দ রাগ করে না। তার শরীরে তাপ বলে কিছু আছে মনে হয় না। বরং দাঁত ছড়িয়ে নিজের মনে হাসতে থাকে।

'অথচ একবার ইচ্ছা করলে, চেষ্টা করলে এই বৌকে তুমি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে
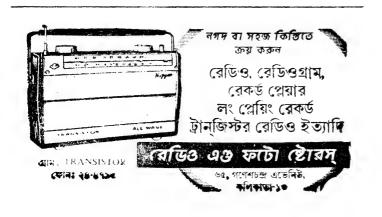
রাখতে পার, দুবেলা মাছ দুধ খাইয়ে রানীর মতো সুখে রাখতে পার--বুঝলে মুকুন্দ।'

মুকুন্দ চুপ। বঙ্কু চুপ। চুপ থেকে বঙ্কু আবার লক্ষ্য করছে মানুষটা চোখে মুখে কোন পরিবর্তন দেখা যায় কিনা। কোন পরিবর্তন নেই। একটা মাটির পিণ্ড স্থির হয়ে আছে। বঙ্কু হতাশ হয়ে একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। প্রস্তাবটা প্রায় তার গলার কাছে উঠে এসেছিল। আবার সেটা বুকের মধ্যে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করে।

'রাজার সুখ রানীর সুখ!' গলার এমন অদ্ভুত শব্দ করে মুকুন্দ হাসে যে বঙ্কু চমকে ওঠে। 'সোনাদানার টালের ওপর বসে রাজা রানীরা কত সুখে আছে তুমি একবারটি খোঁজ নিও ডাইভারদা।'

কথাটা কি মিথ্যা! বঙ্কু ভাবতে আরম্ভ করে। বাড়ি গাড়ি আর অনেক টাকাপয়সা নিয়ে চৌধুরী সাহেব রাজার হালে আছে। কিন্তু মানুষটার মনে কি সুখ আছে। তার আত্মা ছটফট করছে। বুকে শান্তি নেই। শ্মশানের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েও বুড়ো সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাজার টাকা দিয়ে মাটি কাটার মজুর মুকুন্দর কাছ থেকে সুখ কিনতে চাইছে। আর চৌধুরী সাহেবের সেই দুরন্ত ইচ্ছার কথা মুকুন্দর কানে তুলে দিতে বঙ্কু এই বাংচিতার বেড়ার কাছে এসে থেমে আছে। আর এগোতে পারছে না। যেন বঙ্কুকে কোন বুদ্ধি খাটাতে দিচ্ছে না সরল সিধা এই মানুষটা।

'সুখ খুঁজতে হয় ঐখানে।' আকাশের দিকে আঙুল তুলল মুকুন্দ। 'সব সুখ তাঁর কাছে চাইতে হবে।'

'বিড়ি খাও, বিড়ি ধরাও।' বঙ্কু হঠাৎ নরম হয়ে যায়। রাগ করলে চলবে না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে—সতর্কভাবে তাকে এগোতে হবে। তাই পরম খাতির দেখিয়ে মুকুন্দর হাতে বিড়ি ও দেশলাই তুলে দিল সে।

'আজ একটা মজার ঘটনা হয়েছে ডাইভারদা।' বিড়ি ধরানো শেষ করে মুকুন্দ চোখ তুলল।

'কি শুনি?' মুকুন্দর গলার স্বরটা হাল্কা হয়েছে টের পেয়ে বঙ্কু একটু আশ্বস্ত হয়। 'বলো শুনি ঘটনাটা।'

মুকুন্দ ঘাড় ফিরিয়ে তার ঘরের দিকে তাকাল। কচু ও উচ্ছের ঝোপটা একবার দেখল। কি যেন এক মিনিট ভাবল। হাসল নিজের মনে। তারপর বঙ্কুর দিকে চোখ ফেরাল।

'একটা কুকুর কোথা থেকে ছুটে এসে ঢুকল উঠোনে, হুঁ, আজ সক্কাল বেলা, বৌ উঠোন ঝাট দিচ্ছে তখন। দাওয়ায় বসে আমি দাঁতন করছি। কুকুরটার রকমসকম দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল—পাগলা কুকুর—চোখের রং ঘোলা, লেজটা ন্যাতার মতন ঝুলে আছে। কুকুরটাকে দেখেই আমি হৈ হৈ করে উঠলাম। দেখলাম ছুটে যাচ্ছে বৌয়ের দিকে। চেঁচিয়ে বললাম ঘরে চলে এসো। কিন্তু বৌ ঠিক দাঁড়িয়ে রইল। আর কুকুরটাও ঠিক ওর দিকেই এগোচ্ছে। বললাম, ঝাঁটা তুলে কষে ওটার মাথায় বাড়ি লাগাও। কিন্তু বৌ নড়ছে না ঝাঁটা তুলছে না, হাসছে, হেসে আমায় বলছে কিচ্ছু করবে না—'

'তারপর!' মজার ঘটনা বটে। বঙ্কু চোখ বড় করে মুকুন্দকে দেখছে।

'তারপর ঠিকই দেখলাম ওটা বৌয়ের কাছে এসে থেমে গেল, স্পর্শ করল না বৌকে—ঘাড়টা কেমন যেন নুয়ে পড়ল আপনা থেকে—বৌয়ের পায়ের কাছে মাটিতে নাকটা রাখল—যেন মনে হল ওর পায়ের গন্ধ শুঁকল, তারপর ন্যাতার মতন লটপটে লেজ নিয়ে ঘোলা চোখের কুকুরটা কেমন আবার টলতে টলতে উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল। তাজ্জব ব্যাপার!'

বঙ্কু মাথা নাড়ল।

'উঁহু, আমার মনে হয় না কুকুরটা তোমার বৌকে কামড়াতে এসেছিল। এসে-ছিল তোমার বৌয়ের সুন্দর পা-টা দেখতে—তাই পায়ের গন্ধ শুঁকে আবার উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল।'

রসিকতা মুকুন্দ উপভোগ করল এবং বঙ্কুর সঙ্গে একটু হাসলও। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

'তাই বলছিলাম ভাই তখন বৌকে—ঈশ্বরকে ধরে থাকলে কোন কষ্টই কষ্ট থাকে না, কোন বিপদই কাবু করতে পারে না। রাস্তার একটা পাগলা কুকুরও কামড়াতে এসে ফিরে যায়।'

চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল বঙ্কু। আবার সেই ঈশ্বর নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর। বৌটাকেও ঐসব ভজাচ্ছে। মুকুন্দর মতো কচি ফুটফুটে বৌটাও এখন থেকে সাপলা খেতে সুরু করে দেবে। কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করবে না।

'কি হলো ডাইভারদা?'

'উঠি চলি।' বঙ্কু উঠে পড়ল।

আশ্চর্য! বেহায়া কাকটাও গাছের ডাল ছেড়ে উড়ে গেল। যেন বঙ্কুকে জ্বালাতন করতে ওটা এতক্ষণ ওখানে চেপে বসে ছিল। কিন্তু এখন আর কাকের ওপর রাগ না—গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে আছে গামছা পরা ঐ মানুষটার ওপর রাগে বঙ্কু ফেটে পড়ছিল। অথচ রাগটা সে প্রকাশ করতে পারছিল না। রাগ করে যতবার বঙ্কু মানুষটার চোখের দিকে তাকাতে গেছে কেমন যেন তার মায়া হয়েছে। ওকে আঘাত করা আর একটা মাটির ঢিবিকে আঘাত করা এক মনে হয়েছে। তবে কি মুকুন্দকে তার ঈশ্বরই এমনভাবে আগলে রাখছে! চিন্তা করে বঙ্কুর মাথার ভিতরটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

'কি হল?'

'হল না।'

'কেন?'

'পাগল হয়ে গেছে মানুষটা। পাগলের সঙ্গে কি আর কোন কাজের কথা বলা চলে? না, বললে শোনে?' বঙ্কু মাথা চুলকায়

'কিরকম?' চৌধুরী সাহেবের মুখের রং বদলাতে আরম্ভ করে। চোখ দুটো পিটপিট করতে থাকে। রাগ করলে যা হয়। 'পাগল হয়ে গেছে লোকটা তুমি বুঝলে কি করে!' চৌধুরী বড় করে ভেংচি কাটলেন।

'আবোল তাবোল বকছে।' বঙ্কুর গলার স্বর ভারি হয়ে উঠল। কেননা সাহেবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল সে। 'হুজুর, মুকুন্দ এখন এমন সব কথা বলছে, মনে হবে বদ্ধ পাগল ছাড়া সে আর কিচ্ছু না।'

'কি সব কথা?' বঙ্কুকে চমকে দিয়ে চৌধুরী সাহেব হাত বাড়িয়ে প্লেট থেকে মাংসের চাকা তুলে নেন। যেন তাঁর জিভ চেপে গেছে। পরহজমের কথা ভুলে গিয়ে বাঁধানো দাঁতের কথা ভুলে গিয়ে আজ মাংস চিবোতে সাহেব উঠে পড়ে লেগেছেন। আঙুর আপেল গাদা হয়ে এক পাশে পড়ে আছে। চৌধুরী সাহেব ভুল করেও সেসবের দিকে তাকান না। অন্যদিন হলে বঙ্কু চুরি করে হাসত। আজ হাসল না। রাংচিতার বেড়া আর নিম তেঁতুল গাছের নিচের ছেঁচা বাঁশের ঘরের ছবি বুড়োর ঠান্ডা রক্তে নতুন করে আগুন জেলে দিয়েছে। ছবিটা বঙ্কুই বার বার সাহেবের সামনে এনে ধরেছে। কিন্তু শেষরক্ষা আর হচ্ছে কোথায়। বঙ্কু হেরে যাচ্ছে। একটা ঈশ্বর-পাগলা মানুষ মাঝখানে দাঁড়িয়ে বঙ্কুর সব ফন্দিফিকির বানচাল করে দিচ্ছে। 'কি সব বলছে লোকটা শুনি?' চৌধুরী সাহেব হাড় চুষতে লেগে গেছেন। চুষে চুষে চমৎকার হাড়ের মজ্জা বার করছেন। বঙ্ক অবাক। চোখ ঠেক দিলে বঙ্কু গলাটা ভিজিয়ে নিল।

'বলছে কি, পাগলা কুকুর ছুটে এল উঠানে তার বৌকে দেখে। কিন্তু বৌয়ের নরম তুলতুলে পা দেখে কুকুরের মায়া হল—পায়ের গন্ধ শুঁকে কুকুরটা যে-পথ দিয়ে এসেছিল সে-পথে বেরিয়ে গেল। ঈশ্বর কুকুরটার সুমতি জাগিয়ে দিয়েছিল, মুকুন্দ নাকি মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছিল।'

চৌধুরী সাহেব ভক করে হেসে ফেললেন। কিছুটা চর্বি ও মাংসের ঝোল টেবিলের বনাতের ওপর ছিটকে পড়ল।

'শয়তান! শয়তানের পাল্লায় পড়েছ তুমি। সুন্দরী বৌয়ের নরম তুলতুলে পায়ের কথা তুলে ব্যাটা টাকার অঙ্ক বাড়াতে চাইছে ঈশ্বর টিশ্বর কিছু না—সব ফাঁকা বুলি। সব বুজরুকি।'

বঙ্ক চুপ। টাকার কথাটা সে আদৌ মুকুন্দর কানে এখন পর্যন্ত তোলা হয়নি সাহেবকে তা বলতে সে সাহস পাচ্ছে না। অথচ বললে সাহেব এখনি হাজার থেকে দেড় হাজারে লাফ দেন। শেয়ালের মতো বঙ্কুর চোখের তারা চিকচিক করে উঠল।

'হুজুর, পাগলকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই। হয়তো নোটের তাড়া হাত বাড়িয়ে নেবে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেবে

কি জলে ফেলে দেবে, তারপর উল্টে আপনাকে অপমান করবে। তার চেয়ে বরং মেটিয়াবুরুজের দিকে চেষ্টা করলে—'

যেন মাংস কামড়াতে গিয়ে সাহেব নিজের জিভে কামড় বসিয়েছেন, চেহারাটা এমন বিকৃত করে ফেললেন।

'মেটিয়াবুরুজ পরে হবে—পরে দেখা যাবে। এখন রাংচিতার বেড়া আর উচ্ছে ঝোপ, নিম আর তেঁতুল গাছ।'

'মেটিয়াবুরুজের শশী মালীর ঘরের পাশে ধুধুলের জঙ্গল আছে, চমৎকার একটা কদম গাছ আছে—কানাই বাকুলীর ঘরের পাশে আছে ধুতুরা আর অপরাজিতার ঝোপ, আর এতবড় এক অশ্বত্থ বট।'

'হলদে পাখি?'

'হুজুর তাও আছে।' বঙ্কুর মুখে হাসি ফুটল। 'পাখি কি একটা? অনেক। কেবল কি হলদে? হলদে কালোয় মেশানো, লালে হলদে চিত্রি করা, হলদের ওপর সাদার ছিট লাগা হরেকরকম পাখি ওই তল্লাটে ছড়িয়ে আছে।'

চৌধুরী সাহেব চুপ। আর মাংস চিবোন না। যেন দু টুকরো তাঁকে কাহিল করে দিয়েছে। বুঝি মাড়ি টনটন করছে। যেন এখনই বদহজমের ঢেকুর উঠবে। ক্লান্ত বিমর্ষ চোখ দুটো আঙুর আপেলের দিকে সরে যাচ্ছে। অথবা এ-ও হতে পারে, সাহেব চুপ থেকে ভাবছেন। মেটিয়াবুরুজের হরেক রঙের পাখি তাঁর মগজে ঠোকরাতে আরম্ভ করেছে। তাই চাইছে বঙ্কু। বুড়ো আর দুটো দিন চিন্তা করুক, ভাবুক। বঙ্কু সময় চাইছে। ঐ মানুষটার আত্মার শান্তি কিনতে বেরিয়ে বঙ্কু নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। তার সব বুদ্ধি চাতুরী ভোঁতা করে দিয়ে আর এক পাগল মনের আনন্দে সাপলা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।

'বেশ, চেষ্টা করে দেখ।' চৌধুরী সাহেব বঙ্কুর দিকে চোখ তুলে এমনভাবে হাসলেন যে বঙ্কু ভয় পেল। যেন বঙ্কুর ওপর আর ভরসা করে থাকতে পারছেন না। কথাগুলিও সেরকম : 'হলুদ, হলুদে কালোয় মেশানো, লালে হলুদে চিত্রি করা—হলুদের ওপর সাদা ছিট অনেক কিছুই শোনাচ্ছ কিন্তু আমার মনে হয় না শেষ পর্যন্ত তুমি—'

'পারব, হুজুর, পারব।' বঙ্কু একটা আর্তনাদের সুর বার করল। 'আর একটা দিন সবুর করুন, পাখির ঝাঁক আমি ধরে এনে দেব।'

'দেখা যাক।' বঙ্কুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সাহেব সামনের সাদা দেয়ালটা দেখতে শুরু করেন। ভাগাড়ের দিকে চোখ রেখে বুড়ো শকুন যেমন অপেক্ষা করে। চৌধুরী সাহেবের তাকানোর মধ্যে সেই অপেক্ষা, সেই ছটফটানি।

'ঈশ্বর সহায় থাকলে আমি আপনাকে তুষ্ট করতে পারব।' বঙ্কু বলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাহেব গলা কাঁপিয়ে হাসলেন। গলার ঝুলে-পড়া মাংস ঢিলেঢালা চামড়া নড়তে থাকে, নাচতে থাকে। বুড়ো শকুনের গলা যেমন নড়ে, কাঁপে। বঙ্কু বুঝতে পারল, বুড়ো এমন হাসছে কেন। ঈশ্বর কথাটি এমন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে, বঙ্কু কি জানতো। শুকনো মুখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আহা, বঙ্কু এখন রাস্তায় ঘুরছে। রাস্তায় ঘুরছে আর কলের জল খাচ্ছে। চৌধুরী সাহেবের গ্যারেজের চাবি অন্য লোকের হাতে চলে গেছে।

সাহেবের কাছে বুদ্ধির দৌড় দেখাতে গিয়ে এমন হুমড়ি খেয়ে পড়বে, বেচারা বুঝতে পারেনি।

অর্থাৎ, ঈশ্বরের কাছেও বঙ্কু মার খেল, শয়তানের কাছেও গলাধাক্কা খেল। ছেঁড়া শার্ট আর ছেঁড়া চটির কপাল তার এ-জীবনে বুঝি ঘুচল না। পুরো দুটো দিন বঙ্কু রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরল। মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল।

কিন্তু একটা কথা আছে—যার বুদ্ধি আছে, এক সময় না এক সময় সে মাথার ভিতর বুদ্ধির খোঁচা অনুভব করবেই।

তৃতীয় দিন বঙ্কুর বুদ্ধি বঙ্কুকে আবার খোঁচাতে শুরু করল। বুদ্ধি থাকার এই দোষ। তাই শহর থেকে বেরিয়ে যে-রাস্তাটা তিলজলার দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বঙ্কু নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল।

সাপলা খেয়ে একটা লোক কিছু তিনদিন কাটাতে পারে না। মুকুন্দর এত বড় শরীরটা নিশ্চয় শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে। বৌটা আধমরা হয়ে এক মুঠো ভাতের জন্য চিঁচিঁ করছে। এখন এই বেলা বঙ্কু মুকুন্দর কানে কথাটা তুলতে পারে। আর মুকুন্দ যদি রাজী হয়ে গেল তো বঙ্কুকে পায় কে। এক ছুটে সে চলে আসবে চৌধুরী সাহেবের কাছে। সাহেব তখন পাকা আমের মতন বঙ্কুকে হাতের মুঠোয় তুলে নেবে।

চিন্তাটা যত পাকাতে আরম্ভ করে, বঙ্কু তত জোরে পা চালাতে থাকে। কাঠফাটা রোদ। কিন্তু তার খেয়াল নেই। কপাল বেয়ে, ধুতনি বেয়ে ঘাম ঝরছে, ভ্রুক্ষেপ নেই। বঙ্কুর চোখের সামনে কেবল একটা ছবি। রাংচিতার বেড়ার ওধারে ছেঁচা বাঁশের ঘর। ঘরের চাল তেঁতুল আর নিমের ছায়ায় ঢাকা। বেড়ার কাছে কচু উচ্ছের ঘন ঝোপ। একটা চমৎকার হলদে পাখি রাংচিতার খুঁটির মাথায় বসে আছে। নিথর দুপুর।

ছবিটা দেখতে দেখতে বঙ্কু এক সময় সেই ঘর, সেই বেড়া, আর সেই পিটুলি গাছটার কাছে এসে গেল। গাছের নীচে

শুকনো খেজুরের গুঁড়িটা পড়ে আছে। যার ওপর বসে মুকুন্দর সঙ্গে সে কদিন খুব গল্পসল্প করে গেছে।

বঙ্কু থমকে দাঁড়াল।

মুকুন্দ ঠিক বসে আছে মরা খেজুর গাছের ওপর। ঘাসের ওপর দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছে। যেন অপেক্ষা করছে, বঙ্কু এসে যাবে, তার সঙ্গে গল্প করবে।

অথচ বঙ্কুকে দেখে মুকুন্দ একটা কথা বলছে না। অন্য দিন হলে 'ভাইভারদা, ভাইভারদা' করে চেঁচিয়ে উঠত।

তবে বঙ্কু যা অনুমান করেছিল, তাই ঠিক!

কিন্তু প্রকাণ্ড দেহটা যে শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে গেছে, মুকুন্দর দিকে এক নজর তাকিয়ে বঙ্কুর তা মনে হল না। মাটির পাহাড়টা প্রায় এক রকমই আছে। কেবল মুখটা একটু বেশি শুকনো। অবাক হল সে মানুষটার চোখ দুটো দেখে। জ্বলজ্বলে নাচ করে করে মুকুন্দ সারাক্ষণ তার চোখের মধ্যে যে বাতিটা জ্বালিয়ে রাখত, আজ যেন তা নিভে গেছে। তাই মুকুন্দর তাকানোর মধ্যে কেমন শুকনো, একটা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

'কি হল, মুকুন্দ?'

'বোস ভাইভারদা।' ধসধসে গলায় মুকুন্দ কথা বলল।

বঙ্কু পাশে বসল, ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিল।

'তারপর? কি খবর?'

হঠাৎ আবার কথা নেই, মুকুন্দ আবার ভাবছে। ঘাসের দিকে চেয়ে।

'নাও, বিড়ি খাও।' বঙ্কু দেশলাই ও বিড়ির বান্ডিল এগিয়ে দিল। মুকুন্দ ধরল না। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'খবর? হ্যাঁ, খবরটা তোমায় বলব বলে আজ পুরো দেড় দিন এখানে ঠায় বসে আছি।'

'এই গাছতলায়! এই মরা কাঠের ওপর?' বঙ্কু অতিমাত্রায় অবাক হবার ভান করল ও আড়চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানুষটার চোখমুখ দেখতে লাগল। দেখা শেষ করে সে অল্প হাসল।

'কি খবর শুনি? মজার কোন ঘটনা বুঝি!'

'ওটা আবার এসেছিল।'

'কে?' বঙ্কু চমকে উঠল, তারপর হাসল। 'ও, সেই পাগলা কুকুরটার কথা বলছ? সেই যে—'

মুকুন্দ ঘাড় নাড়ল।

'বৌ? কোথায় ছিল।' বঙ্কু ঢোক গিলল। 'সেদিনের মতো উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল বুঝি!'

'না গো ভাইভারদা, তখন ভর ভর সন্ধ্যে। আমি গেছি পুকুরে সাপলা তুলতে। বৌ দাওয়ায় বসে পিরদিমের সলতে পাকাচ্ছিল।'

'তারপর?' বঙ্কু চোখ দুটো বড় করে ফেলল। 'কামড়-টামড় বসায়নি তো?'

মুকুন্দ হঠাৎ থেমে গেল।

এবার বঙ্কু সত্যি একটা বিপদটিপদ আশঙ্কা করতে লাগল। অল্প হাওয়া ছেড়েছে। মাথার ওপর থেকে গাছের একটা পাতা ঘুরে ঘুরে নিচে পড়ল।

'কি হল, তারপর কুকুরটা?' মুকুন্দর হাতে আস্তে ধাক্কা দিল বঙ্কু। মুকুন্দ হঠাৎ যেন দাঁতে দাঁত ঘষল। কপালের রগ দুটো দপ্ করে ফুলে উঠল। তার চেহারা দেখে বঙ্কুর মনে হল যেন ভিতর থেকে একটা প্রচণ্ড কিছু—রাগ বা দুঃখ ধাক্কা মেরে ওপর দিকে ঠেলে উঠছিল, আর মুকুন্দ তা চেপে রাখতে দাঁত ঘষছে, জোরে ঢোক

গিলছে। তার মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। বংকু রীতিমত ভয় পেল।

'বুঝলে ডাইভারদা, ঈশ্বরের ওপর কেরামতি করতে গেলে ও, ঈশ্বরে মন না রেখে নিজের বুদ্ধি খাটাল।'

বৌ! বৌয়ের ওপর এই রাগ বা দুঃখ। বুঝতে পেরে বংকু হঠাৎ আর কোন প্রশ্ন করে না। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কথাগুলি শোনে।

কিন্তু তখনি আবার কিছু বলছে না মুকুন্দ। চোখ তুলে দিয়েছে ওপরের দিকে, পিটুলি গাছের দিকে। যেন পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখছে। বংকু বুঝল। অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তায় কিছুক্ষণ ডুবে থাকতে চাইছে লোকটা। কিন্তু মুকুন্দ সঙ্গে সঙ্গে গাছের দিক থেকে চোখ নামিয়ে আনল।

'বুঝলে ডাইভারদা, ঈশ্বরের দায় ও নিজের কাঁধে তুলে নিতে গেল, হুঁ, বেকার আমি, ভাত-কাপড় জোটে না, সাপলা খাই, তাই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে রাতারাতি দিন ঘুরিয়ে দিতে—আমার ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিতে চাইছিল বৌ।'

কেমন হেঁয়ালী ঠেকছিল কথাগুলি। বংকু ঘাসের ওপর থুথু ফেলল। কিছু একটা আন্দাজ করতে গিয়েও আবার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তার। তাই অস্বস্তি বোধ করল।

'তা যাই বল, কুকুরটার সেই পাগলা কুকুরটার কি হল?' চোখ কুঁচকে বংকু মুকুন্দর দিকে তাকায়।

'ঐ তো বলছি ডাইভারদা, তখন ভর ভর সন্ধ্যে, আমি গেছি পুকুরে সাপলা তুলতে, দাওয়ায় বসে পিরদিমের সলতে পাকাচ্ছিল বৌ, তখন উঠোনে এসে ঢুকল ওটা।'

'তারপর?'

'আর কি, কুকুর ওর কাছে গেল, আর দিব্যি ও হাঁটুর কাপড় তুলে দিল।'

'তারপর?' বংকুর বুকের ভিতর ঢিপ করে উঠল, মেরুদাঁড়াটাও কেমন শিরশির করছিল। 'কামড়ায়নি?'

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, ঘাসের দিকে চেখে রেখে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

'কামড়াবে কেন। এমন নরম তুলতুলে পা, এমন ফরসা উরু—ইচ্ছামতন কতক্ষণ চেটে নিয়ে তারপর ওটা উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল।'

'তুমি?' কেমন ভয়ে ভয়ে বংকু প্রশ্ন করল। অথচ খুব হাসির কথা, বেশ মজার ঘটনা। আজ আর শুধু গন্ধশোঁকা নয়, বৌয়ের সুন্দর পা উরু চেটে গেছে পাগলা কুকুর। কিন্তু তথাপি তেঁতোমতন একটা ঢোক গিলতে হয় বংকুকে। 'তুমি কি সাপলা নিয়ে তখনি ফিরেছিলে?'

'হুঁ, আর সঙ্গে সঙ্গে—বুদ্ধির জাহাজ বলতে পার আমার ঘরের মানুষটাকে—আমি দাওয়ায় পা না রাখতে খুশিতে ডগমগ হয়ে এটা আমার হাতে তুলে দিল।' চমৎকার রঙিন রুমাল দিয়ে বাঁধা একটা পুঁটলি। কোমরে গুঁজে রেখেছিল বুঝি মুকুন্দ। এখন বার করল। ঘাসের ওপর রাখল রাখল সেটা, তারপর রুমালের গিঁঠ খুলল। ভাঁজকরা এত কাগজের নোট।

বংকু চট করে চোখটা অন্য দিকে সরিয়ে নেয়। আজ রোদের তেজ বেশি। ইটখোলার মাটটা যেন জ্বলছিল। তা সত্ত্বেও বংকু সেদিকেই চেয়ে থাকে, মুকুন্দর মুখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না কেমন, এই মুহূর্তে মুকুন্দর কপালের রগ আবার কী সাংঘাতিক ফুলে উঠেছে, ভাঁটার মতন চোখ দুটো কী ভয়ংকর চেহারা ধরেছে, সে অনুমান করতে পারছিল।

অবশ্য তখনি কাঁধের ওপর মুকুন্দর হাতের স্পর্শ অনুভব করল সে। যেন স্পর্শটা নরম নির্জীব। শোক পেয়ে—অতিরিক্ত দুঃখ পেয়ে মানুষের হাতে-পায়ে যে অসাড়তা আসে হয়তো মুকুন্দরও তাই এসেছে, তাই আর লোকটাকে ভয় না করে বংকু আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাল, তার মুখ দেখল।

বংকু অবাক হল। ভাঁটার মতন চোখ দুটোর ভয়ংকর চেহারা নেই তো, বরং সেদিনের মতন, বা আগে আরো কদিন যেমন দেখা গেছে, মুকুন্দর দুই চোখে সেই আশ্চর্য বাতি দুটো জ্বলে উঠেছে। ঈশ্বরের কথা আরম্ভ হতে না হতে যা জ্বলতে সুরু করে। মুকুন্দর পুরু ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছিল।

'তা, বৌয়ের কি হল জিজ্ঞেস করছ না, ডাইভারদা?'

কি হল? বংকু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মুকুন্দ উত্তর করল না। গাছের পাতা দেখল, আকাশ দেখল। কি জানি বিড়বিড় করল নিজের মনে। তারপর বংকুর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'পাপ করেছে, তার আত্মা তো আর অতসী ফুল বা তোমার ওই যাকে বলে করবীফুল চাঁপা ফুলের মধ্যে চলে যেতে পারে না—পারে কি?' বংকুর হাত চেপে ধরল মুকুন্দ।

'না পারে না।' বংকু মাথা নাড়ল। এখন বংকু টের পাচ্ছিল তার শরীরের রক্ত জমে হিম হয়ে যাচ্ছে। এই লোকটা তার হাত ধরে আছে বলে এমন হচ্ছে। অথচ সে হাত ছাড়িয়ে নিতেও সাহস পাচ্ছে না।

এদিকে মুকুন্দ বেশ ঠান্ডা গলায় হাসছিল।

'বুঝলে ডাইভারদা—ওই দাওয়া ছেড়ে আত্মাটা আর কোথাও যেতে পারেনি। নষ্ট শরীরের মধ্যে আটকা থেকে ওখানেই পচছে।'

মুকুন্দ হাতটা সরিয়ে নিল। আর বংকু আজ এই প্রথম রাংচিতার বেড়ার ওধারে উচ্ছে অপরাজিতার জঙ্গলের পাশে ছোট ঘরটার দিকে তাকাল, এতক্ষণ ওদিকে তাকাবার ফুরসৎ পায়নি। বেড়ার গায়ে হলদে পাখিটা নেই। সারি সারি শকুন বসে আছে সেখানে।

চিৎকার করে উঠতে পারত সে, কিন্তু চিৎকার করল না। লাফিয়ে উঠে এই ভয়ংকর মানুষটার কাছ থেকে ছুটে সরে যেতে পারত। কিন্তু তাও গেল না। বংকু চুপ করে বসে রইল স্থির হয়ে রইল। আর এক ঝলক হাওয়া উঠে দুটো শুকনো পাতা ঘুরে ঘুরে নিচে পড়ল।

মুকুন্দ এবার নড়েচড়ে বসে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল।

'দাও, দেশলাইটা দাও ডাইভারদা, পাপের শেষ রাখতে নেই—মালিক রাগ করেন।' বংকুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুকুন্দ দেশলাইয়ের জন্য। বংকু হঠাৎ কথাটা বুঝতে পারল না, পরে বুঝল। একটা কাঠি জেবলে মুকুন্দ রুমালশুদ্ধ কাগজের নোটগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিল। আর সেদিকে তাকিয়ে বংকুর মনে হল, নোটগুলি পুড়ছে না, যেন তার আত্মাটাই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে; অবশ্য এভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর বংকু এক নতুন মন নিষ্পাপ আত্মা নিয়ে অন্য মানুষ হয়ে যেতে পারত, কিন্তু সেরকম হবার তো তার ইচ্ছা নেই—তাই এখানে আগুন আর ওখানে চুপ করে বসে থাকা শকুনের সারি দেখতে দেখতে গভীরভাবে বংকু চিন্তা করছিল, যদি চৌধুরী সাহেবকে সে নিয়ে আসত, তবে সাহেবকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা ঠিক ওই বেড়ার ধারে পার্ক করত কি এই পিটুলী গাছের নিচে।

॥ ২২ ॥

"গন্ধ পাচ্ছি। বেশ গন্ধ পাচ্ছি। নিত্যহরি ভট্চার্যির নাককে ফাঁকি দেওয়া কঠিন কাজ।" আমার ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন। রাতের অন্ধকার তখনও কাটেনি। সেই সময়েই নিত্যহরিবাবু নিজের ঘর ছেড়ে ছাদে উঠে এসেছেন। রাতে ওঁর বোধহয় ঘুম আসে না; তাই আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবার জন্যে আমার ঘরেই চলে এসেছেন।

আমার তোশক এবং বিছানা চাদরের অবস্থা ঘরে ঢুকেই যেন তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন, "তা বেশ, বেশ। আমাদের শাস্ত্রেই রয়েছে যস্মিন দেশে যদাচার।"

গতরাত্রে আমার ঘরে যে কাণ্ড হয়েছিল তা এবার ওঁর কাছে নিবেদন করলাম। বললাম, "আপনার সাহেবরা বিছানার উপর উঠে যা কাণ্ডটা করলেন।"

নিত্যহরি আমাকে কতখানি বিশ্বাস করলেন তা ওঁর কথা থেকেই বুঝলাম। মুখ বেঁকিয়ে তিনি বললেন, "হাঁ হাঁ, মশাই, এই নিত্যহরি ভট্চার্যও তার বাবাকে একদিন বলেছিল যে, ওকে শিখ পাঞ্জাবীতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

রহস্যটা বুঝতে না পেরে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। নিত্যহরিবাবু অসন্তুষ্ট হয়েই বললেন, "কতবার আর রিপিট করবো? আপনার বাবা কি আপনাকে দুধের বদলে পিটুলি গোলা খাইয়ে মানুষ করেছেন? আপনার ব্রেনটা যে কিছুই মনে রাখতে পারে না!"

আমি চুপ করে রইলাম।

নিত্যহরিবাবু বললেন, "বাবার কাছে আমি শিখ পাঞ্জাবীর গল্প বানিয়ে ছাড়লাম। বাবা আমার আলাভোলা মানুষ, সরল বিশ্বাসে তিনি বিশ্বাস করলেন। মহাপাপ করেছিলাম। উপরে যিনি রয়েছেন তিনি তো সব দেখছেন, সব খাতায় লিখে রাখছেন। সেখানে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সব কর্মের নগদ বিদায় দেবার জন্যে থলে নিয়ে তিনি সংসারের ফটকে বসে রয়েছেন। না হলে রাঢ়ী শ্রেণী, ফুলিয়া মেল, ভরদ্বাজ গোত্র নিত্যহরি ভট্চাযকে ধোপার কাজ করতে হয়? দুনিয়ার পাপ দু'হাতে কাচতে হয়। সারারাত ধরে এই পোড়া হোটেলের ঘরে ঘরে, খোপে খোপে যত পাপ তৈরি হচ্ছে, যত অনাচার বালিশে, তোশকে, চাদরে, কাপড়ে মাখামাখি হচ্ছে তা সব আমাকে পরিষ্কার করতে হয়?" নিত্যহরিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

তারপর যেন আমাকে সাবধান করবার জন্যেই বললেন, "এমন হতো না মশায়! বাউনের ছেলে, লেখাপড়া শিখে আমিও এতোদিনে বাবার মতো বঙ্গবাসী কিংবা বিপনে একটা প্রুফরিডারি করতে পারতাম। প্রুফরিডার তো আমার বাবাও ছিলেন। প্রুফরিডারের রক্তই তো মশাই এই শর্মার শিরায় শিরায় বইছে।" নিত্যহরিবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কী যেন ভেবে গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, "সে রক্তের এক ফোঁটাও আজ আর এই শরীরে নেই। সেসব রক্ত কবে জল হয়ে গিয়েছে। শিরা কেটে দিলে নিত্যহরির দেহ থেকে এখন যা বেরোবে সে আর রক্ত নয়। সে কেবল সাবান আর সোডার ফ্যানা।"

নিত্যহরিবাবু বললেন, "ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বয়ে গিয়েছিলাম, মশাই। একদিন রাত্রে তো মদ গিললাম। পাল্লায় পড়ে বাড়িও ফিরলাম না। কিন্তু বাবা আমার মাটির মানুষ। বই ছাড়া কিছুই বুঝতেন না। মাও তথৈবচ। পরের দিন ওঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? রাত্রে ফিরলি না কেন?' আমি বললাম, 'ফিরবো কি করে? ময়দানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে সোজা ফিরছিলাম; এমন সময় শিখ-পাঞ্জাবীর পাল্লায় পড়লাম। ওরা ধরে নিয়ে গেল। সারারাত কান্নাকাটি করায় আজ সকালে ছেড়ে দিল।'"

নিত্যহরিবাবু একবার ঢোক গিললেন। "গায়ে আমার মদের গন্ধ ছাড়ছিল। তবু মা আমায় বিশ্বাস করলেন শিখ-পাঞ্জাবীদের বিছানায় শুয়ে আমার এই অবস্থা হয়েছে।

আপনিও বলছেন ওই বাঁটকুলে সায়েব আপনার বিছানা নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছে। দেখবেন মশায়। আমাকে দেখে শিখুন।"

আমি মৃদু হাসলাম। নিত্যহরিবাবু বললেন, "কলকাতার কত কাঁচ কাঁচ ছেলের বারোটা এইভাবে হোটেলে, রেস্তোরাঁয় আর খারাপ জায়গায় বেজে যাচ্ছে, তার খবর তো আর গবরমেণ্ট রাখে না। বেচারা গবরমেণ্টকেই শুধু দোষ দিই কেন, বাপেরাই রাখে না। তারা ভাবছে তাদের ছেলেদের শখ-পাঞ্জাবীতেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

নিত্যহরিবাবু ততক্ষণ আমার বিছানা থেকে চাদরটা গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করেছেন। গুটোতে গুটোতে বললেন, "তোশকটাও পাল্টিয়ে দিই। দূরে থাকুন। পাপ থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করুন।"

নিত্যহরিবাবুকে বললাম, "হাত ধোবেন?"

নিত্যহরিবাবু রেগে উঠলেন। "কতবার আর ধোবো। হাত ধুয়ে ধুয়ে তো চামড়া পচে গেল। এই সমস্ত হোটেলটা যদি বিরাট একটা ডেটলের গামলায় চুবিয়ে রেখে দেওয়া যেতো, তবে আমার শান্তি হতো।"

ও'র ভাবগতিক দেখে আমার আর কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু নিত্যহরিবাবু ছাড়লেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, "ভালো করেননি মশাই। ছিলেন শর্টহ্যান্ডবাবু ভালো কথা। কাউন্টারের আসুনবসুন-বাবু হলেন, তাও চলে যায়। কিন্তু তাঁতির আবার এ'ড়ে গরু কেনার শখ হলো কেন? ঐ রাতের নাচে যাবার কী দরকার ছিল?"

বললাম, "শখ করে কি আর গিয়েছি, নিত্যহরিদা? চাকরিটা তো রক্ষে করতে হবে?"

কে যেন নিত্যহরিদার ক্রোধাগ্নিতে জল ঢেলে দিল। চাকরির কথাতে নিত্যহরিদা যেন দপ করে নিবে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, "হ্যাঁ ঠিক ভাই। এইপোড়া পেটটার জন্যে দুনিয়াতে লোকে কি না করছে? এই পোড়া পেট না থাকলে এই ন্যাটাহরি শর্মাও দুনিয়ার লোকের পরনের কাপড় ঘেঁটে মরতো না।"

আমি বললাম, "এই পোড়া পেটটাই তো আমাদের সর্বনাশ করেছে। এই পেট না থাকলে ক্যাবারে গার্ল কনিকেও দেহ উলঙ্গ করে নেচে বেড়াতে হতো না।"

ন্যাটাহারিবাবু এবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "পেট ছাড়াও একটা জিনিস আছে। তার নাম স্বভাব, তোমাদের এই মেমসায়েবকে আমার কিন্তু ভালো লাগেনি।"

ভাবলাম গতরাত্রের ঘটনাটা বোধহয় উনি জেনে গিয়েছেন। কিন্তু ন্যাটাহারিবাবুর কথা থেকেই বুঝলাম তিনি অন্য ঘটনার কথা বলছেন।

নাকের চশমাটা সোজা করে নিয়ে ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "হ্যাঁ বাপু, যা সারা জন্ম সাপ্লাই করে আসছি, দুটো একস্ট্রা বালিশ চাও বুঝতে পারি। তা না। আর এতো লোক থাকতে কিনা আমাকে। আমি তো মশাই ট্যারা।"

"ব্যাপারটা কি?" আমি নিত্যহরিবাবুকে প্রশ্ন করলাম।

"আরে মশাই, ব্যাপার আবার কি? যা হয়ে থাকে তাই। আমি খোঁজ করতে গিয়েছি আরও বালিশ লাগবে কিনা। তার উত্তর সোজাসুজি দিয়ে দে। তা না ঠান্ডা ঘরের গরম মেমসায়েব রেগেই আগুন। বলে কিনা, আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকেও আমার লাগোয়া এয়ারকন্ডিশন ঘর দিতে হবে।

আমি বললাম, 'আমি বালিশের মালিক, ঘরের মালিক নই। তবু, মেমসায়েব, এই কথা বলতে পারি শাজাহান হোটেল আপনাকে ঠান্ডা ঘর দিলেও, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিতে পারবে না।'

মেমসায়েব বললেন, 'তাহলে সে কোথায় থাকবে?

আমি বললাম, 'যেখানে শাজাহান হোটেলের অন্য সবাই থাকে—ছাদে।'

মেমসায়েব যেন মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কিন্তু এই শাজাহান হোটেলে মাসের পর মাস কত নাচের মেয়ে আসছে, তারা কেউ তো অ্যাসিস্টেন্ট নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা এসে খোঁজ করে কোথায় তাকে ঘর দেওয়া হয়েছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থাটা ঠিক আছে কিনা। বিছানা নরম আছে কিনা। বালিশ ঠিক আছে কিনা।" ন্যাটাহারিবাবু এবার থামলেন।

আমি বললাম, "তাতে হয়েছে কি?"

"যা হবার তা হয়েছে!" ন্যাটাহারিবাবু মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, "আহা!"

ন্যাটাহারিবাবুর মাথা চাপড়ানোর কি আছে বুঝতে না পেরে ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "ভগবান কি আপনার মাথায় এক ফোঁটা ঘি দেননি? আপনি কি চোখে দেখতে পান না? অমন লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মেমসায়েব আর কোথায় ঐ বামনঅবতার। কিন্তু মশাই, কি বলবো। শাস্ত্রেই বলছে—যার সংগে যার মজে মন, কিবা হাঁড়ি, কিবা ডোম।"

আমি চুপ করে রইলাম। ন্যাটাহারিবাবুর অভিজ্ঞতা আমার থেকে অনেক বেশী। তিনি কিছু বললে, আমার পক্ষে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "কোথায় অত বড়ো নাচিয়ে, যার জন্যে আমাদের সায়েবরা হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন, আর কোথায় তার ল্যাংবোট বামন—যার শো থাকলো আর না থাকলো। অথচ বাঁটকুলের সে কি তেজ।"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"মানে আর কি। আপনি যদি বাঁটকুলের তেজ দেখতেন। বলে কিনা—কনি, তুমি এখানে থেকে যাও। আমি চললাম।"

সেই শুনেই ছুঁড়ির মুখ শুকিয়ে আমসি। বললে, 'প্লিজ, তুমি রাগ কোরো না। আমি যা হয় করছি।'

বামন তো জানে ছুঁড়ি আমার মুঠোর মধ্যে। তাই আরও রাগ দেখালে। বললে, 'না না, তুমি এখানে থেকে যাও, নাচো, লোকের হাততালি কুড়োও। আমার এসবের দরকার নেই।'

কনি তখন বলে কি জানেন? নিজের কানে না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতাম না। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ছাদে আমাকে একটা ঘর দিতে পারো না?'

নিত্যহরি ভটচায্যি তিরিশ বছর এই শাজাহান হোটেলে কাজ করে আসছে। সে সব বোঝে। মনে মনে বললাম, পাশাপাশি ঘর চাও নিশ্চয়! মুখে বললাম, 'আমি জানি না। জিমি সায়েবকে ডেকে দিচ্ছি।'

জিমি সায়েব এসে কি করলে জানি না। দেখলাম, ল্যামব্রেটো উপরে চলে গেল। মেমসায়েব ঠান্ডা ঘরেই রয়ে গেলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলো, মাঝখান থেকে পুওর উলুখাগড়ার ভেলুয়েবল লাইফটা চলে গেল। আমি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, রাত্রে একস্ট্রা বালিশ লাগবে কিনা। রেগে গিয়ে তার উত্তরই দেওয়া হলো না। বরং ন্যাকা সেজে রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো—বালিশ? ঘরে তো দুটো বালিশ রয়েছে। সিঙ্গলরুমে আর বালিশ নিয়ে কি আমি রোস্ট করে খাবো!'

কালী, কালী, ব্রহ্মময়ী মা আমার!" নিত্যহরিবাবু এবার উঠে পড়লেন। "যাই আমি! এতোক্ষণে ধোপাগুলো কাজে ফাঁকি দিয়ে গাঁজা টানতে বসে গিয়েছে নিশ্চয়।"

যাবার সময় ভদ্রলোক আমার চাদর আর বালিশ দুটো নিজেই নিয়ে নিলেন।

আমি বাধা দিতে গেলাম। বললাম, "বেয়ারা রয়েছে, সে নিয়ে যাক। না হয় আপনার ধোপাদের কাউকে পাঠিয়ে দিন। আপনি......"

ন্যাটাহারিবাবু পরমুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় যা বলে ফেললেন, তাতেই যেন তিনি আমার কাছে নবরূপে প্রকাশিত হলেন। ও'র চোখদুটো যেন মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠলো। বললেন, "ছেলেপুলে নেই বলে, আমার মধ্যে ভগবান কি মায়া দয়া দেননি? তুমি আমাকে এতো বড়ো কথা বললে? তোমার থেকেও আমার ছেলের বয়স কত বড় হতে পারতো তা তুমি জানো?" ন্যাটাহারিবাবু কথা শেষ না করেই ঘর থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন।

এই ভোরবেলাতেই আমার ঘরে যে এমন একটা ব্যাপার হয়ে যাবে, তার জন্যে গুড়বেড়িয়া প্রস্তুত ছিল না। সে ঘরে ঢুকে বললে, "আপনার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

চা-এর পাত্র শেষ করে ঘরের বাইরে এসে দেখলাম, কনি কখন ছাদের উপর উঠে এসেছে।

কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে কনি শাজাহান হোটেলের মাথায় বসে সূর্যদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। ভোরবেলার সূর্যকিরণে এমন সব গোপনপদার্থ থাকে, যার সান্নিধ্যে সুন্দরীদের সৌন্দর্য নাকি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কে জানে হয়তো তাই। কিন্তু ভোরবেলায় এই প্রকাশ্য সূর্য-সেবায় উপস্থিত অন্যান্য জীবদের যে সামান্য অসুবিধা হতে পারে, তা যেন কনির খেয়াল নেই।

সুসজ্জিতবেশবাসে রোজীও ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মার্কোপোলো সায়েব এই সময় কিছু ডিক্টেশন দিয়ে কাজের বোঝা হাল্কা করে রাখেন। আমাকে দেখেই রোজী তির্যক দৃষ্টিশর নিক্ষেপ করলো। আমি বললাম, "গুড মর্নিং।"

রোজী আমার শুভেচ্ছা ফেরত দিল না। বরং দাঁত দিয়ে হাতের নোখ কাটতে আরম্ভ করল।

রেগে গিয়ে আমি বললাম, "মিস্টার মার্কোপোলোও সেদিন তোমাকে বলেছেন—ব্লেড দিয়ে নোখ কাটতে হয়।"

হয়তো রোজীকে এমনভাবে বলা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু ওর উপর আমার কেমন একটা সহজাত রাগ ছিল। রোজী প্রথমে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। মার্জনা করবেন, ঠিক রাঙা নয়, বীরভূমের রাঙা-মাটির পথে কিছুক্ষণ হাঁটলে কালোজুতোর যেমন রঙ হয়, ওর মুখের রঙ ঠিক সেই রকম হয়ে উঠলো।

রোজী বললে, "আমি এখনই যাচ্ছি। আমি জিমিকে সঙ্গে করে মার্কোপোলোর কাছে যাচ্ছি; দরকার হলে বোসকেও ডাকবো। আমি সব বলবো।"

এবার সত্যি আমার ভয় হলো। জিমি লোকটা মোটেই ভালো নয়। শুধু শুধু এই সকাল বেলায় গায়ে পড়ে রোজীকে অপমান করাটা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু যা হবার তা হয়েই গিয়েছে। রোজী ছাড়বে না। শাজাহান হোটেল থেকে আমাকে তড়াবার সামান্য সুযোগ পেলে ওরা তা ব্যবহার করবেই।

গম্ভীরভাবে বললাম, 'মার্কোপোলোকে তুমি কী বলবে?"

"আমি বলবো, এই ছোকরাকে কিছুতেই রাখা চলতে পারে না।"

মনের রাগ চেপে বললাম, "কেন? কী তোমার ক্ষতি করেছি!"

রোজী এবার দুষ্টু হেসে আড়চোখে কনির উলঙ্গ দেহের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললে, "আমার ক্ষতি নয়, তোমার নিজের ক্ষতি করছো। তোমার বয়সের

কোনো ইয়ংম্যানকে ছাদের ঘরে রাখা কিছুতেই উচিত নয়।"

আমি এবার ভরসা পেলাম। রোজী এবার হাতের চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, "ডোণ্ট বি ওভারকনফিডেণ্ট। ঐ রাক্ষসীটা তোমার মাথা খাবার জন্যে হাঁ করে রয়েছে, আমি বলে রাখলাম।"

রোজী আমাকে উত্তর দেবার কোনোপ্রকার সুযোগ না দিয়ে, নাচের লীলায়িত ভঙ্গীতে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামতে আরম্ভ করলে।

আমি আর একবার অবাক হয়ে আমার চারিদিকের পৃথিবীকে দেখতে লাগলাম। একি আমি স্বপ্ন দেখছি? যে আমি এই মুহূর্তে শাজাহান হোটেলে চাকরি নিয়ে বসে আছি, সেই আমিই কি একদিন কাসুন্দেতে বাস করতো? সুধাংশু ভট্টাচার্যের বাড়িতে প্যাটারসনদা, চিনিদা, কানাইদা, পুলিনদা, রবেদার সংগে গল্প করতো? এই আমিই কি একদিন মেট্রো সিনেমাতে ছবি দেখতে এসে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল? একবার মনে হলো স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি আমি—দুনিয়াতে শাজাহান হোটেল বলে কিছুই নেই; কাসুন্দের টোলে বসে, বিজয়া দশমীর দিন সিদ্ধি খেয়ে আমি মাথা গোলমাল করে ফেলেছি। আবার পর মুহূর্তে কনির দিকে নজর পড়ে গেল।

ঐ তো সকটল্যাণ্ড-দুহিতা কনি ভারতীয় সূর্যের কিরণে তার দেহটাকে পুড়িয়ে সিঁকিয়ে স্নান করাচ্ছে। এইটাই সত্য, কাসুন্দেটাই স্বপ্ন। শাজাহান হোটেল থেকে চুরি করে কয়েক পেগ হুইস্কি চড়িয়ে আমি স্বপ্ন দেখছি কাসুন্দে বলে একটা জায়গা ছিল, সেখানে একদিন আমার যাতায়াত ছিল।

আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর থেকে ছাদের কেন্দ্রে চলে এলাম। ন্যাটাহারিবাবুরে আত্মা যেন হঠাৎ আমার উপর ভর করেছে। মনে হলো, কনি সূর্য-বিলাস করছে না, সর্ব-পাপঘ্ন দিবাকরের জ্যোতিতে নিজেকে শুদ্ধ করে নিচ্ছে।

আমাকে দেখেই কনি ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে, "গুড্ মর্নিং।"

আমি বললাম, "গুড্ মর্নিং"

কনি এবার বললে, "তোমরা এত বোকা কেন? এমন সুন্দর ছাতটাকে তোমরা সান-বেদিঙের জন্য ভাড়া দাও না কেন? রিভাইভ্ড্ ফর সান বেদিঙ করে তোমরা অনেক টাকা রোজগার করতে পারো।"

আমার উত্তর দেওয়ার আগেই ছাদের একটা ঘর থেকে গ্রামোফোন বেজে উঠলো। কনি সংগে সংগে চিৎকার করে করে উঠলো, "কে এমন বেরসিক? এই ভোরবেলায় কোনোরকম শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না।"

আমার মনে হলো শব্দটা যেন মিস্টার গোমেজের ঘর থেকে ভেসে আসছে। কনি অধৈর্য হয়ে বললে, "যে বাজাচ্ছে, সে নিশ্চয়ই তোমাদের কলিগ। তুমি কি তাকে গ্রামোফোন বন্ধ করতে বলবে? সারারাত তো আমাকে গানের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। আবার এখনও?"

যা ভেবেছি তাই। সোজা মিস্টার গোমেজের ঘরে গিয়ে দেখলাম, একটা বুশশার্ট এবং পায়জামা পরে, একটা চেয়ারে মিস্টার গোমেজ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সামনে একটা গ্রামোফোন রেকর্ড আপন মনে বেজে চলেছে।

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। এই ভোরবেলায়, এই সোনা-ছড়ানো সকালে কে যেন বেলা শেষের গান ধরেছে। এখনই যেন পশ্চিম দিগন্তে ক্লান্ত সূর্য অস্ত যাবেন। আমাদের বিদায় নেবার মুহূর্ত যেন সমাগত। সংগীতের কিছুই বুঝি না আমি। কিন্তু মনে হলো কেউ যেন আমাকে কোকেন ইঞ্জেকশন দিয়ে ধীরে ধীরে অবশ করে দিচ্ছে।

গোমেজ আমাকে দেখে বিষণ্ণ হাসিতে মুখটা ভরিয়ে দিলেন। ফিস ফিস করে করে বললেন, "শুনুন, মন দিয়ে শুনুন।"

আমারও শোনবার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কনি এতোক্ষণে হয়তো চিৎকার করতে শুরু করবে। কানে কানে বললাম, "কনি আপনাকে ডাকছে। ও আপনার খোঁজ করছে।"

বিরক্তভাবে একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে গোমেজ বাইরে বেরিয়ে এলেন। গোমেজকে দেখেই কনি একটা টার্কিশ তোয়ালে নিজের দেহের উপর বিছিয়ে দিলে; আস্তে আস্তে বললে, "মিস্টার গোমেজ এই ভোরবেলায় কোনো শব্দ আমার ভাল লাগে না।"

কে যেন গোমেজের দেহে বিদ্যুতের চাবুক মারলো। এই হোটেলে তাঁর অবস্থা কি গোমেজের জানতে বাকি নেই। হোটেলের প্রধান ভরসা কনি, যার জন্যে এক রাত্রে আট ন' হাজার টাকার বিক্রি বেড়ে যায়, তার ইচ্ছের উপর যে সামান্য একজন বাজনদারের মতামতের কোনো মূল্য নেই তা তিনি জানেন, তবু, যেন তাঁর দেহটা মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠলো। কনি যেন গোমেজের এই পরি-বর্তন দেখতে পেয়েছে। তোয়ালেটা সরিয়ে আরও খানিকটা রোদ্র উপভোগ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হতে সে বললে, "কী হলো?"

গোমেজ কোনোরকমে বললেন, "মিস্ কনি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার অসুবিধে ঘটাবার জন্যে আমার লজ্জার শেষ নেই। তবে আজ আমাদের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন, সেই জন্যেই।"

গোমেজ সোজা একবার নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। কনি হঠাৎ তার মাদুর থেকে

উঠে পড়ল। স্লিপিং গাউনটা পরতে পরতে বললে, "মিস্টার গোমেজ।"

কনি যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তার ছেলেমানুষী, তার স্বভাবসিদ্ধ পশ্চিমী ন্যাকামোপনা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

গোমেজ যেন কিছুই শুনতে পেলেন না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে গ্রামাফোনটা বন্ধ করে দিলেন। কনি ততক্ষণ ছুটতে ছুটতে গোমেজের ঘরে গিয়ে ঢুকছে। আমিও পিছন পিছন গিয়ে দেখলাম কনি বলছে, "আজকের তারিখে কী হয়েছিল?"

গোমেজ যেন এখন কাউকে ভয় পাচ্ছেন না। ম্যানেজমেন্টের প্রিয়, দর্শকদের প্রিয় কনি যেন তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আসতে আসতে তিনি বললেন, "তুমি নাচো, তুমি গান গাও। আর তুমি জানো না আজকের তারিখটা কী?"

কনি যেন ভয় পেয়ে গিয়েছে। মন্ত্রবলে গোমেজ যেন তাকে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে। কোনোরকমে সে বললে, "আমার অজ্ঞতা ক্ষমা করো। বলো আজকের তারিখে কী হয়েছিল?"

গোমেজ, অপমানিত সংগীতজ্ঞ গোমেজ, নিজের মনেই বললেন, "সুরের রাজা, আমাদের রাজাধিরাজ আজকের দিনে অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আজও তিনি আমার রাজা। আমি রক-অ্যাণ্ড-রোল বাজাই, আমি ক্যাবারেতে তোমার সংগে সংগীতের সুর দিই, তবু আজও তিনি আমার রাজা।"

আমি আর চুপ করে থাকতে পারিনি। বলে ফেলেছিলাম "কে? বীঠোফেন?"

মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে গোমেজ বলেছিলেন, "আমার রাজা অন্য জন। তিনি দরিদ্র। তিনি খ্যাতি পেয়েছিলেন, আবার খ্যাতি হারিয়েও ছিলেন। একজন ধর্মযাজকের বাড়িতে তিনি বাজাতেন। যাজক একদিন লাথি মেরে আমাদের রাজাকে বাড়ির বার করে দিয়েছিলেন। আমাদের দরিদ্র রাজা তারপর শুধু দুঃখই পেয়েছেন। আমাদের এই পৃথিবীকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'কথা দাও আমার মৃত্যুর সংবাদ তুমি এখন কাউকে জানতে দেবে না। আমার চাকরিটা তা হলে হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমার বন্ধু, বেচারা Albrechtsberger এর একটা চাকরির দরকার। সে বেচারা যখন অ্যাপ্লিকেশন করে দেবে, তার পর যেন অন্য লোকে জানতে পারে মোৎসার্ট আর ইহলোকে নেই।'"

এই মুহূর্তে মোৎসার্টকে কবরে শুইয়ে দিয়ে যেন গোমেজ ফিরে এসেছেন। তাঁর চোখ দুটো ছল ছল করছে। গোমেজ বললেন, "তিনি জানতেন, চাকরির কী যন্ত্রণা তিনি জানতেন। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সুরের রাজা বন্ধুকে ভুলতে পারেননি। আর পারেননি তাঁর মৃত্যুর গানকে। Mozart's Requiem—K626

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থেকে সেই সুর তিনি সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছিলেন। একজন ফরমাজ দিয়েছিলেন—তার জন্যে আগাম টাকাও দিয়েছিলেন। সুরের সৃষ্টির মধ্যে তিনি ডুবে থাকতেন। কাঁদতেন, বলতেন, 'এই রিকুয়েম আমি কারুর জন্যে সৃষ্টি করছি না। আমি জানি আমি নিজেই আমার মৃত্যুর গান রচনা করে যাচ্ছি। আমাকে এই সুর শেষ করে যেতেই হবে—I must not leave it incomplete.'"

মৃত্যুর কিছু আগে মোৎসার্ট তাঁর প্রিয় শিষ্য এবং বন্ধুদের বিছানার পাশে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কথা বলবার শক্তি তখন তাঁর প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ইঙ্গিতে বললেন —"শুরু করো। Mozart's Requiem

তারপর গানের চরমতম মুহূর্তে এসে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মোৎসার্ট সংজ্ঞাহীন। অচৈতন্য অবস্থায়ও মনে হলো তিনি সেই গানই যেন গেয়ে চলেছেন।

"তাঁর শেষ কথা কী জানো?" গোমেজ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমি দেখলাম কনিও যেন কেমন হয়ে উঠেছে। সে ফ্যাল ফ্যাল করে কলকাতার এক হোটেলের এক সামান্য বাজনাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গ্রামোফোনের উপর মোৎসার্টের রিকুয়েমটা চড়াতে চড়াতে গোমেজ বললেন, "তাঁর শেষ কথা—
Did I not tell you, that I was writing this for myself?"

মৃত্যুর গান তখন যন্ত্রের বুকের মধ্যে যেন গুমরে গুমরে মরছে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা দেহের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে যেন মহাশূন্যে মিশে যাবার জন্য ছটফট করছে। জীবনের প্রভাত বেলায় আমরা যেন মৃত্যু-সন্ধ্যার সাক্ষাৎ পেলাম। শুভদৃষ্টির লগ্নেই যেন আমার বধূকে বিধবা যোগিনীর সাজে দেখলাম। সংগীত আমি বুঝি না। বোঝবার মতো শিক্ষা বা সুযোগ কোনোটাই পাইনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর মহত্তম সংগীতের জন্য কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। সে শান্ত এবং ধীর পদক্ষেপে আমাদের বিনানুমতিতেই আমাদের হৃদয়ের দরজায় এসে কড়া নাড়ে।

গোমেজ যেন তাঁর জড় দেহটাকে শাজাহান হোটেলের ছাদে ফেলে রেখে কোন্ সমুদ্রের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন। আর কনি কোন মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিজের উলঙ্গ দেহটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে স্লিপিং গাউনের ভিতর বন্দী করে ফেলেছে। কনি কাঁদছে।

আমার বিশ্বাস হয়নি, চোখটা মুছে নিয়ে আবার দেখলাম, সত্যিই আমাদের রাতের রমণী কনির গণ্ডে অশ্রুর রেখা। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে গোমেজকে উদ্দেশ্য করে সে বললে, "আই অ্যাম স্যরি।" তারপর ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। (ক্রমশ)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১০২)

নদিদি যেন কোথেকে খোঁজ পেয়েছিল। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সেদিন এসে হাজির। সেইদিনই সন্ধেবেলা। সনাতনবাবু তখন গেছেন বউকে আনতে। নয়নরঞ্জিনী শম্ভুকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন। বলি, শুনে যে মাইনে মাইনে করেছিলি সবাই, এবার সব টাকা বুঝে পেয়েছিস তো? সব টাকা গুনে নিয়েছিস্ তো?

শম্ভু মাথা নিচু করে বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ মা-মণি!

—শুনে যে এখন পাড়ায়-পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছিলি যে ঘোষ-বাড়ি এবার নিলেম হবে, শুনে যে তোরা সবাই পাড়ায় পাড়ায় চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছিলি! দেখি কে তোদের কত কালিয়া-পোলোয়া খেতে দেয়, একবার অন্য বাড়িতে কাজ করে দেখ্, না কেমন সুখ, সেখানে—

শম্ভু প্রতিবাদ করলে—আজ্ঞে, মা-মণি, আমি তো বলিনি। আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি গালতে পারি—

মা-মণি ধমকে উঠলেন—একশোবার বলেছিলিস্। তোরা ভাবিস আমি কিছু খবর পাই না, ভাবিস বুড়ি মাগী কালা হয়ে গেছে কানে, কিন্তু আমার কাছে সব খবর আসে—

শম্ভু তবু বললে—আজ্ঞে, মা-কালীর দিব্যি বলছি, আমি অমন কথা কখনও বলিনি—

—এই তো ডাক্ বাতাসীর মাকে, ডাক্ ভৈরবমাকে, ডাক্ কৈলাসকে, কেষ্টকে কী বলেছে সব আমার কানে এসেছে। ওরে, এখনও আমি মরিনি! নেমকহারামের দল গলায় পা দিয়ে আমাকে মারতে চায়! ডাক্ তোরা, আমার খেয়ে, আমার পরে আমারই ওদের সবাইকে, আমি দেখি ওদের কত কেরামতি—

ঝি চাকর ঠাকুর মহলে ওদিকে রটে গেছে খবরটা। পাড়াতেও খবর রটে গেছে ঘোষ-বাড়ির গিন্নী আবার চাকর ঝিদের বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিয়েছে। পুরোন সরকারবাবুরও বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে, আবার সে এসে কাজ-কর্ম শুরু করে দিয়েছে। আবার বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে। চুন-কাম হচ্ছে দেয়ালে। বাইরে বাঁশের ভারা বাঁধা হয়েছে। অর্থাৎ আবার অবস্থা ফিরে গেছে ঘোষ-বাড়ির। বকেয়া মাইনে হাতে পেয়ে ঘোষ-বাড়ির চাকর-বাকররাও আবার দেশে টাকা পাঠিয়েছে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সবাই এল মা-মণির সামনে। নয়নরঞ্জিনী বললেন—কী গো বাতাসীর মা, তোমাকেই বলি, তুমিই তো দলের পাণ্ডা, যত দল তুমিই পাকিয়েছ—

বাতাসীর মাকে আর বেশি বলতে হলো না। সে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—আমাকেই তুমি দুষলে মা-মণি, আমিই হলুম দলের পাণ্ডা!

—আমো, ভর সন্ধেবেলায় মড়া কান্না কেঁদো না! বলি, মাইনে সব মিটিয়ে দিয়েছে তো সরকারবাবু?

বাতাসীর মা বললে—আমি তো মাইনের জন্যে কখনও বলিনি মা-মণি তোমাকে—

—বেশি বক্-বক্ কোর না বাতাসীর-মা, নেমখারামের দল যত, আমার বাড়িতে খেয়ে-পরে এ্যাদ্দিন আমারই শত্তেক খোয়ার করেছ, এ্যাদ্দিন কিছু বলিনি, মুখ বুঁজে সব সহ্য করিছি। শুধু দেখছিলুম হারামজাদীরা কত বাড় বাড়ে! তা হ্যাঁগা, এতদিন আমার খেলে-পরলে, মানুষের একটা হায়া বলেও তো জিনিষ থাকে! তা তোমাদের কি তাও নেই বাছা? পরের বাড়িতে কাজ করতে এয়েছ বলে কি সেটারও মাথা খেয়ে বসে আছো?

নয়নরঞ্জিনীর লম্বা বক্তৃতায় আর কারো মুখে একটা কথা বেরোবার সাহস হলো না।

—তোমাদের মত নেমখারামের হক্কের টাকা নিয়ে ভেবো না আমি বড়লোক হবো বাতাসীর মা। অমন বাপের জম্মিতু নই আমি। অমন দুশো-পাঁচশো টাকা আমি খোলামকুচির মত ছুঁড়ে দিতে পারি, তা জানো? এই যে আমার বিপদ গেল এতবড়, সবাই তো হেসেছিল, ভেবেছিল এবার ঘোষ-বাড়ি টসকে যাবে, কই, গেল? তোমাদের সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলাম তো! সরকারবাবুকে সেই আমার কাছে এসেই দু মুঠো ভাতের জন্যে চাকরি করতে হলো তো! ওগো, ভগমান বলে একজন মানুষ মাথার ওপর আছেন, তিনি সব দেখছেন। তিনি দর্পহারী মধুসূদন, তাঁর কাছে কিছু অজানা থাকে না, জানো? কে কী-রকম মানুষ তাঁর খাতায় সব লেখা থাকে, বুঝলে

বাছা? নইলে ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা নিতে পারতুম না? বলো না তোমরা, নিতে পারতুম না?

এ-প্রশ্নের কেউ উত্তর দিলে না। উত্তর বোধহয় তিনি চানও নি।

—আর এই যে আমার বৌমা, বৌমাকে কী সুখে রেখেছিলুম, আর কেউ না-দেখুক, তোমরা তো দেখেছ? তোমরা তো জানো, আমার নিজের মেয়ে ছিল না বলে বৌমাকে আমি পেটের মেয়ের মতন আদর করতুম! পাড়ার লোকে যা-ই বলুক, তোমরা তো বাপু সে-আদর দেখেছ! আমার ন'দিদিও বলতো— তুই আদর দিয়ে দিয়ে তোর বৌ-এর মাথাটা খেয়ে ফেলবি নয়ন! তা ন'দিদির কথাই তো সত্যি হলো শেষ-পর্যন্ত! ন'দিদিকে আমি দোষ দিলে কী হবে, ন'দিদি তো মিথ্যে কথা বলবার লোক নয়। তা তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি বাপু, বৌমা আজ আসছে, এতটুকু যদি আদিখ্যেতা দেখি তো আমি কারো হাড়-মাস আর এক ঠাঁই রাখবো না—এই বলে দিলুম—

ভূতির-মা বুঝি খবরটা জানতো না, বললে —বৌদিমণি কি আসবে মা-মণি?

—হ্যাঁ আসবে, কিন্তু এতটুকু আদিখ্যেতা যদি দেখি তোমাদের তো আমি বরদাস্ত করবো না, এই বলে দিলুম, যেমন বড়-মুখ করে গিয়েছিল, তেমনি থোঁতা-মুখ ভোঁতা করে আসছে। তা আসুক, ছেলের বউ যখন তখন আসবার হক্ থাকবে বৈ কি! কিন্তু খবরদার শম্ভু, তোকেও বলে দিচ্ছি, তোরই বেশি বাড়, তুই যেন বৌদিমণি বলতে আদেখ্লে-পনা করিসনি—আমি এখন থেকে সাবধান করে দিচ্ছি—

—বৌদিমণি কি আজই আসবে? কৈলাস জিজ্ঞেস করলে।

নয়ন-রঞ্জিনী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—আসবে না তো যাবে কোথায় শুনি? যাবে কোথায়? কোন্ চুলো আছে তার? বাপ তো পটোল তুলেছে, এক বাউণ্ডুলে বোন ছিল, তার কীর্তিতে তো মুখ-দেখানো ভার, এখন আমি না ঠাঁই দিলে কোথায় দাঁড়ায় সে? তা আমি ভাবলাম মরুক গে, হাজার হোক, ছেলের বউ তো, এত করে সাধছে, বাড়িতেই ঠাঁই দিই—

বাতাসীর মা বললে—বেশ করেছ মা-মণি, তুমি শার্উড়ির কাজই করেছ—তোমার জন্যে ভগমান আছে—

—না-বাছা, ভগমানের ভরসা আমি রাখিনে। ভগমানের ভরসায় থাকলে কবে আমি সংসার-ধর্ম ছেড়ে কাশীবাসী হতুম, আমার এ পোড়া সংসার নিয়ে আর এত জ্বালায় জ্বলতে হতো না। এই যে তোমাদের মাইনেকড়ি মিটিয়ে দিলুম, এ কি ভগমান দিলে আমাকে? ভগমান টাকা দিলে? ভগমানের কি দশটা হাত আছে না সিন্ধুক-ভর্তি টাকা আছে যে চাইলেই হুড়-হুড় করে ঢেলে দেবে? ভগমান মানুষকে হাত দিয়েছে, মানুষের মাথায় বুদ্ধি দিয়েছে, মানুষকে বুদ্ধি খাটিয়ে টাকা উপায় করতে হয় গো, তবে টাকা আসে! বুঝলে? টাকা অত সহজ জিনিষ নয় বাতাসীর-মা, আমি বুড়ো মানুষ, উকীল-কাছারি করে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি আজ......

কথা তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎ সিঁড়ির সামনে ন'দিদির চেহারা দেখা গেল। নয়ন-রঞ্জিনী বললে—ওমা তুমি?

মোটা মানুষ, হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন—বিপদের ওপর বিপদ চলছিল ভাই, কতদিন আসবো-আসবো করে আসতে পারিনি—তা শুনলুম, তোর দেনাটেনা নাকি মিটে গেছে? বাড়িতে ভারা বাঁধা দেখলুম, মিস্ত্রী খাটছে?

বহুদিন নয়নরঞ্জিনীর মনে একটা অভিযোগ ছিল ন'দিদির ব্যবহারে। একবারও দেখা করেনি। টেলিফোন করেও উত্তর পাননি তিনি। যখন টাকার জন্যে স্বর্গ-

মর্ত্য দৌড়োদৌড়ি করছে—, তখন নাদিদির টিকিটিরও সাক্ষাৎ পাননি। আজ এতদিন পরে কোত্থেকে শুনেছেন, কোর্টের টাকা জমা দেওয়া হয়ে গেছে, ঝি-চাকর-ঠাকুর-সরকারের মাইনে-কড়ি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ওমনি এসে ভালবাসা দেখাতে হাজির হয়েছেন। ধন্যি আত্মীয়-স্বজন, ধন্যি জ্ঞাতি-কুটুম!

নাদিদি বললে—ওরে না রে নয়ন, না, তুই কিনা আমাকে ভুল বুঝলি শেষকালে? আমি কি বেঁচে ছিলুম রে এ্যাদ্দিন? আমি যে কী জ্বালায় জ্বলছিলুম তা আমি জানতুম আর আমার ভগবান জানতো রে। আমার বৌ তো আঁতুড় থেকে উঠে মরো-মরো হয়ে গিয়েছিল—শেষকালে ডাক্তার-বদ্যি, যমে-মানুষে টানাটানি চললো এতদিন, শেষ-কালে তোর জামাইবাবুকে বললুম—আর নয়, আমি নয়নকে একবার গিয়ে দেখে আসি, তার বিপদের সময় আমি না দাঁড়ালে দাঁড়াবার আর কেউ নেই—! উঃ, তোর জামাইবাবু কি আসতে দেয় আমাকে? শেষে জোর করে চলে এলুম—

নয়নরঞ্জিনী তখনও কথা বলছেন না। নাদিদির আসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝি-চাকর সবাই চলে গিয়েছিল। নাদিদি এবার সামনে বসলো। বললে—যাক্, নিজের ছেলে যে উদ্ধার হয়েছিস এইটে বড় কথা, আমি বৌ-এর দেনা পর্যন্ত [illegible] দিয়ে ভগ-মানকে ডাকছুম। তোর দেনা [illegible] তো [illegible] কী [illegible] না [illegible] আমার [illegible] দুঃখী, সে যেন সব দুঃখ থেকে রেহাই পায় না! যাক্, এখন ভালোই হলো, বড় আনন্দ হলো তুই এলি।

তখনও নয়নরঞ্জিনী কিছু বলছিলেন না।

নাদিদি বললে—তা হ্যাঁরে, টাকাটা তাহলে কে দিলে? তোর বৌ? তোর বউকে তো ভাল বলতে হবে তবে! এত কাণ্ডর পরেও তো টাকা দিলে দেখছি!

—ছাই দিয়েছে! তুমি ভাবছো আমি বৌ-এর কাছে ভিখ্ মাঙবো? বৌ-এর টাকা নিয়ে আমি দেনা শোধ করবো! গলায় দড়ি আমার!

—তাই বল্! আমি ভাবলুম বউএর বুঝি শেষকালে সুমতি হয়েছে!

নয়নরঞ্জিনী বললেন আমাকে তুমি তেমন মেয়ে পাওনি নাদিদি! আমি তোমার কাছে হাজারবার যেতে পারি, লক্ষবার খোসা-মোদ করতে পারি তোমাকে, কিন্তু তাবলে বৌ? তুমি কী বলে ভাবতে পারলে শুনি?

—তা কোত্থেকে টাকা পেলি তুই?

নয়নরঞ্জিনী বললেন জুটে গেল নাদিদি, দীন-দুঃখীরা যার কাছে পায়, আমিও তার কাছ থেকেই পেয়েছি! ভগমান মুখ রেখেছে আমার। নইলে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়ালে তখন তুমিই কি আসতে আর নাদিদি?

—ওই দ্যাখ, তুই যে কী বলিস্ নয়ন। আমার যে কী বিপদের মধ্যে দিন কেটেছে তা ভগমানই জানেন। এ ক'মাসে কত টাকা যে জলের মত খরচ হয়ে গেল, তা তোর জামাইবাবুকে তুই জিজ্ঞেস করিস গিয়ে—

—আর জিজ্ঞেস করতে হবে না নাদিদি, আমি এবার কলকাতাতেই থাকবো না।

—ওমা, কলকাতাতে থাকবি নে কী রে? বাড়ির দেনা মিটলো, ঝি-চাকরদের মাইনে মিটিয়ে দিলি, বাড়িতে মিস্ত্রী খাটাচ্ছিস, আর তুই চলে যাবি মানে? তোর ছেলে কোথায় থাকবে? ছেলেকে কার কাছে রেখে যাবি?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—বৌ-এর কাছে—

—ওমা, সে কী কথা? এত কষ্টে বাড়ি উদ্ধার করলি, সব বৌ-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—বাড়ি তো এখনও উদ্ধার হয়নি নাদিদি, এখনও মামলা চালাচ্ছি—

—তাহলে মামলার কী হবে?

—ওরা যদি মামলা চালাতে পারে তো চলবে। ওরা যদি বাড়ি রাখতে পারে তো বাড়িও থাকবে। ওদের সংসার ওরাই বুঝবে, আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কাশী-বাসী হবো নাদিদি! আমি সংসার চিনে নিয়েছি, আমি সংসারের মানুষকেও চিনে নিয়েছি, আর আমার কিছু চিনতে বাকি নেই! যথেষ্ট হয়েছে। এই দেখ, আজ বৌ এসে বৌ-এর হাতে এই সব চাবির গোছা তুলে দিয়ে আমি কালই বিদেয় নেব—

—আজ আসবে তোর বউ? আজই?

—হ্যাঁ নাদিদি আজই, এই এখনি এসে পড়লো বলে! সোনা গেছে তাকে আনতে!

—তা জেনে শুনে তুই ছেলেকে আনতে পাঠালি? ছেলেকে বারণ করতে পারলি না?

নয়নরঞ্জিনীর চোখ দুটো হঠাৎ ছল্ ছল্ করে উঠলো। বললেন—সোনা আর সে-সোনা নেই নাদিদি, আমার ছেলে আর আমার বশে নেই! বশে থাকলে আমার আজ ভাবনা? তেমন হলে আমি আজই আবার ওই ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ-কে জব্দ করতে পারতুম, আমার সে পথও গেল! এখন সেই বৌ এসে আমার বুকে ঢেঁকির পাড় দেবে, তা-ও আমাকে সহ্য করতে হবে!

বলে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন নয়নরঞ্জিনী।

নাদিদি বললে—এই এত দেনা তোর মাথার ওপর, আর এখন কি না বৌ আনতে গেল ছেলে?

—তুমিই বলো নাদিদি, তুমিই বলো! এই এত দেনা করে সকলের মাইনে-কড়ি মিটিয়ে দিলুম, বাড়িতে মিস্ত্রি লাগালুম। এ সব বউ এসে ভোগ করবে বলে? সবই আমার বউ-এর ভোগে লাগবে নাদিদি!

নাদিদি বললে—তা তোরই দোষ! তুই যদি জানিস যে বউ এসে তোর সব ভোগ করবে

তো কেন এত দেনা করতে গেলি? এ কে শুধবে? তোর বউ?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আগে কি জানতুম নʼদিদি যে পেটের ছেলে আমার এত শত্রুতা করবে? তাহলে আমি এত উকীল-আদালত করে মরি? আমার কীসের দায় বলো না! একটা তো বিধবার পেট, এটার জন্যে কি আর ভাবনা?

নʼদিদি অনেক সান্ত্বনা দিলে। কত বোঝালে। বললে—এ সংসারে কেউ কারো নয় রে নয়ন। তুই কত কষ্ট করে টাকা রেখে গেলি, সেই টাকা তোরই ছেলে-বউতে উড়িয়ে দেবে। এই-ই আকছার হচ্ছে সংসারে। জীবন বড় অনিত্য, আগেই বোঝা উচিত ছিল নয়নরঞ্জিনীর। আগেই নিজের কাজ গোছানো উচিত ছিল! ছেলে-বউকে ছেড়ে তীর্থ ধর্মে মতি দেওয়া উচিত ছিল।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—এখন আমি কী করি বলো তো নʼদিদি? নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে, এখন কার কাছে নালিশ করি?

হঠাৎ মনে হলো যেন নিচেয় গাড়ির আওয়াজ হলো। নয়নরঞ্জিনী চমকে উঠলেন। বললেন—ওই বউ এসেছে—

নʼদিদি বললে—তুই চুপ করে থাক, রাগের মুখে হুট্ করে কিছু বলে ফেলিসনি, যা বলবার আমি বলবো—

কিন্তু না, বৌ আসেনি। সনাতনবাবু একলা এসে নামলেন ট্যাক্সি থেকে। সদাশিব মানুষ। মুখ দেখে তার কিছুই বোঝাবার উপায় নেই। শম্ভু খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছিল। বললে—বউদিমণি আসেনি দাদাবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—না—

তারপর সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন। সামনেই নʼদিদি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে—কী বাবা, বৌমাকে নিয়ে এলে না?

সনাতনবাবু থেমে বললেন—না।

—এল না বুঝি? তা সে যখন নিজে আসতে চায় না তখন অত খোসামোদ করবার দরকার কী বাবা?

—খোসামোদ? সনাতনবাবু যেন কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন—তার সংগে খোসামোদের সম্পর্ক তো নয় নʼমাসীমা।

—খোসামোদের সম্পর্ক যদি নয় তো কেন তাকে আনতে গিয়েছিলে তুমি? তোমার মা'র কথাও তো শুনতে হয় একটু। তোমার বউ এসে তোমার মাকে লাথি-ঝাঁটা মারবে, সেটাই কি ভাল কথা বাবা?

সনাতনবাবু আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—লাথি-ঝাঁটা মারবে কেন? লাথি-ঝাঁটা কি কখনও মেরেছে সে? আর তা ছাড়া মা'ই তো আমার বিয়ে দিয়েছিল।

—এই তো তোমার মা'ই বলছিল বউ এলেই কাশী-বাসী হবে। কতখানি দুঃখু হলে নিজের মা হয়ে এমন কথা বলে, ভাবতে পারো? তুমি তো সব বোঝ বাবা। এত লেখা-পড়া করে এত শিখেছ আর এই কথাটা বোঝ না?

সনাতনবাবু বললেন—মা কাশী-বাসী হবে? আপনি ঠিক শুনেছেন?

—হ্যাঁ বাবা, আমি এমন ভুল শুনবো কেন?

সনাতনবাবু বললেন—ভুল যদি না শুনে থাকেন তো মা'কে আপনি বলুন গিয়ে যে এ-বাড়িতে মা যদি থাকে তো সতীও থাকবে, আর সতী যদি না থাকতে পায় তো মা'রও থাকা দরকার নেই, আমারও থাকা মিথ্যে!

—বলছো কি বাবা? তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে?

—না নʼমাসীমা, গোলমাল আমার হয়নি। এ-বাড়ির গৃহলক্ষ্মীকে আজ হোক কাল হোক আমি এ-বাড়িতে আনবোই, তাতে এ-বাড়ির কল্যাণই হবে, মা'রও অকল্যাণ হবে না!

বলে আর নʼদিদির উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

নয়নরঞ্জিনী এতক্ষণ নিজের ঘর থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে সব শুনছিলেন। নʼদিদি আসতেই গলা নামিয়ে বললেন—কী হলো? বৌ আসেনি?

নʼদিদি বললে—কই দেখছিনে তো! তা তোর ছেলের যে-রকম মতি-গতি দেখছি, তাতে কোন্‌দিন বউকেই এনে তুলতে পারে বাপু, ও-ছেলের ওপর কিছু ভরসা নেই!

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তাহলে কী করি বলো তো নʼদিদি!

—কী আবার করবি? তুই গাঁট্ হয়ে বসে থাক! তোর টাকা, তোর বাড়ি, এখন তো আর টাকার জন্যে তোর বউকে খোসামোদ করতে হবে না—তোর ভাবনা কী শুনি? তুই এ-বাড়ি ভাড়া দে, ভাড়ার টাকায় তোর জীবনটা আয়েস করে চলে যাবে! কথায় আছে—ঝি জব্দ শিলে আর বৌ জব্দ কিলে! আর যদি তেমন কিছু হয়, আমাকে খবর দিবি, আমি আছি কী করতে? কিচ্ছু ভাবনা নেই তোর—

বলে সে-দিনের মত নʼদিদি বাড়ি চলে গেল।

গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর বাড়িতে দীপঙ্কর বাইরের ঘরে চুপ করে তখনও বসে ছিল। সনাতনবাবুকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দীপঙ্কর তুলে দিয়েছিল। সেদিন লক্ষ্মীদির সেই দুর্ঘটনা না-ঘটলে হয়ত সনাতনবাবু থেকেই যেতেন শেষপর্যন্ত। আরো কিছু কথা হতো সতীর সঙ্গে।

দীপঙ্কর বলেছিল—এদিকে আমি চলে যাচ্ছি কলকাতা ছেড়ে, আমাকে দিয়ে আপনা-

দের দু'জনের কোনও উপকারই হলো না সনাতনবাবু, আমি কিছুই করতে পারলুম না, অথচ আমি আপনাদের এই অশান্তির মধ্যে নিমিত্তের ভাগী হয়ে রইলুম কেবল—

সনাতনবাবু কথাটা শুনে হেসেছিলেন। বলেছিলেন—সংসারে অশান্তি যদি আমরা সৃষ্টি করতে চাই তো তার জন্যে নিমিত্তের কখনও অভাব হয় না দীপংকর বাবু—

দীপংকর বলেছিল—তবু আমার নিজেকেই কেবল অপরাধী মনে হয়! মনে হয় সেই প্রথম দিন আমি বোধহয় আপনাদের বাড়িতে না-গেলেই পারতুম! আমি তখন কিছুই জানতুম না। ভাবতাম সতী খুব সুখেই আছে। তারপর কখন কেমন করে আপনাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলুম আজ আর তা মনে নেই। এদের দুই বোনের সঙ্গে আমার জীবন কেমন করে একাকার হয়ে গেল। কেমন করে সমস্ত কলকাতা সঙ্গেই আমি মিশে গিয়েছিলাম। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সরু গলিটা থেকে সুরু করে প্রিয়নাথ মল্লিক রোড ধরে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, স্টেশন রোড, আর এই গড়িয়াহাটের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম—সব যেন আজ আমার কাছে উপন্যাস বলে মনে হয়—

তারপর একটু থেমে হঠাৎ দীপংকর সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে বললে—আমার একটা শেষ অনুরোধ রাখবেন আপনি?

—শেষ কেন বলছেন?

—শেষই তো! আমি চিরকালের মত এখান থেকে চলে যাবো, কলকাতায় আর আসবো কিনা তারও কোনও ঠিক নেই। আপনি আমায় কথা দিন আমার একটা উপকার করবেন!

—বলুন কী উপকার?

দীপংকর বললে—সতীকে আপনি সুখী করবেন, এর চেয়ে বড় কামনা আমার আর নেই। আমি জানি সতী আমার কেউ নয়, তবু মনে হয় অনেকের অনেক দুঃখ আমি দেখেছি, অনেকের অনেক অভাব আমি অনুভব করেছি, কিন্তু সকলের সব দুঃখ সব অভাবের মোচন আমি সতীর মধ্যে দিয়েই দেখতে চাই—

সনাতনবাবু তখনও হাসছিলেন। বললেন—সুখ আপনি কাকে বলেন? সুখের ডেফিনিশন কী আপনার আগে বলুন?

দীপংকর বলেছিল—এ-সব কথা আমি আপনার মুখ থেকে অনেক শুনেছি, এখন আর শুনবো না। ছোটবেলায় আমি সোক্রেটিসের একটা কথা পড়েছিলুম—**To a good man no evil can happen.** আমি চাই সোক্রেটিসের সেই কথাটা সত্যি হোক। আপনার কাছে আমার এইটেই শেষ অনুরোধ,—বলুন, আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন?

সনাতনবাবু শেষ পর্যন্ত কথা দিয়েছিলেন—আমি রাখবো-

—সতীকে সুখী করবেন?

—হ্যাঁ সুখী করবো!

বলে ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় এক রহস্যময় হাসি হেসেছিলেন সনাতনবাবু। সেদিন সনাতনবাবুর সে হাসির মানে বুঝতে পারেনি দীপংকর। পরে বুঝেছিল। অনেক পরে। তখন সতী সুখীই হয়েছিল। দীপংকর সে-সুখের মানে না বুঝলেও সতী হয়ত সুখীই হয়েছিল। সনাতনবাবু সুখীই হয়ত করেছিলেন সতীকে। সনাতনবাবু তার অনুরোধ রেখেছিলেন বৈ কি! সনাতনবাবু চলে যাবার পর দীপংকর আবার লক্ষ্মীদির ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। দাতারবাবু তখনও লক্ষ্মীদির পাশে রয়েছেন। লক্ষ্মীদি তখনও কাঁদছে। সেইদিকে চেয়ে চেয়ে সতী যেন পাথর হয়ে গেছে তখন। কেন এমন কাজ করতে গেল লক্ষ্মীদি! যখন সনাতনবাবু আর সতী কথা বলছে এক মনে, তখন কখন যে লক্ষ্মীদি নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে খিড়কী দরজা দিয়ে একেবারে লেভেল-ক্রসিং-এর গুমটি-ঘরের নিচেয় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউই জানতে পারেনি। অন্ধকার ঝাপসা। রাস্তার লোকরাও কেউ সন্দেহ করেনি। গেট-কীপার ভূষণও সন্দেহ করেনি।

রঘুই হঠাৎ আঁৎকে উঠেছিল প্রথম। সেই প্রথম খবর দিয়েছিল সতীকে। সতীও অবাক হয়ে গিয়েছিল। যে-মানুষ এতদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে আর ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে, সে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যাবে!

সতী বলেছিল—নিশ্চয় ওপরে আছে লক্ষ্মীদি, ওপরের ঘরে দেখেছিস?

রঘু বলেছিল—দেখেছি দিদিমণি, কোথাও নেই—

তারপর যখন বাড়ির ভেতর কোথাও পাওয়া গেল না, তখন খোঁজ পড়লো বাইরে। একেবারে রাস্তায়। রাস্তায় খুঁজতে খুঁজতে একেবারে লেভেল-ক্রসিং-এর গুমটি ঘরের আড়ালে। তখন সিগ্‌ন্যাল ডাউন হয়ে গিয়েছে। ট্রেন এসে যাবে একটু পরেই। সেই অন্ধকারেই সতী গিয়ে লক্ষ্মীদিকে ধরে ফেলেছিল। তারপর টানাটানিতে আরো অনেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। সনাতনবাবুও তখন আর কোনও সাড়া-শব্দ না-পেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন ট্যাক্সির খোঁজে। হাঁটতে হাঁটতে লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে এসে দেখলেন সবাই সেখানেই। আর তারপরেই দীপংকর এসে পড়েছিল, দাতারবাবু এসে পড়েছিল। তখন এক মহা সোরগোল বেঁধে গিয়েছিল সেইখানে।

ভূষণ শুধু জিজ্ঞেস করেছিল একবার—এ কে হুজুর?

দীপংকর শুধু বলেছিল—এ আমার জানাশোনা, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না—তুমি ডিউটি করো—

কোথা থেকে সমস্ত কী হয়ে গেল! **কিছুই যেন দীপংকরের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু মানুষের অভিপ্রায়ের ধার ধারবে, মানুষের ঈশ্বর হয়তো এত পরনির্ভরশীল** নয়। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক কোথায় কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে বার বার হার মানতে হয়েছে তাকে। তবু হার মানবার বেদনাকে সে স্বীকার করেনি। আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। প্রাণ-পণে অমোঘকে পরাজিত করার বাসনা নিয়ে বুক ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। দীপংকরের যেন তাই হলো।

দাতারবাবুকে বললে—এখন ঘুমোচ্ছে লক্ষ্মীদি, এখন একটু বাইরে আসুন—

সতীও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এল। বাইরে এসে সোজাসুজি দাতারবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বোনের স্বামীকে এই প্রথম ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলে। হঠাৎ বললে—আপনিই সেই?

এতক্ষণে যেন দাতারবাবুও সতীর দিকে চেয়ে দেখবার ফুরসুৎ পেলে। দুই হাত তুলে বললে—নমস্কার—আমি আপনাকে এতক্ষণ চিনতে পারিনি—আমায় ক্ষমা করবেন!

সতী আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—এত কাণ্ডর পরেও আপনার লজ্জা হচ্ছে না? আপনি কি মানুষ?

দাতারবাবু বোধহয় হঠাৎ এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বললে—সব দোষ আমি স্বীকার করছি আজ, আমার অন্যায় হয়েছে, আমি ক্ষমারও যোগ্য নই মিসেস ঘোষ—

সতী বললে—আপনি যদি জানতেন আপনি আমাদের সংসারের কী ক্ষতি করেছেন, তাহলে আজ একথা বলতে আপনার মুখে বাধতো! আপনি যদি সেদিন ধূমকেতুর মত আমার লক্ষ্মীদির জীবনে হাজির না হতেন তাহলে হয়ত তার জীবনও এমন নষ্ট হতো না, আমার জীবনও আজ এমন নিষ্ফল হতো না—! আপনি জানেন যে আপনি আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিয়েছেন!

—তাই তো ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।

সতী ঝাঁঝিয়ে উঠলো—আবার ক্ষমা-

করার কথা বলছেন! রেঙ্গুনের সেই সব দিনের কথা ভাবুন তো! আপনাকে আমি সেদিন সাবধান করে দিইনি? বলিনি যে আমার দিদির সঙ্গে আপনি মিশবেন না, আমার দিদিকে আপনি চিঠি দেবেন না? বলিনি? সাবধান করে দিইনি আপনাকে?

দাতারবাবু এ-কথার কোনও উত্তর দিতে পারলে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। দীপঙ্করের মনে হলো দাতারবাবু বুঝি আবার আগেকার মত পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু সতী ছাড়বার পাত্রী নয়। এতদিন পরে এত বছর পরে যখন সামনে পেয়েছে তখন সে যেন তার প্রতিশোধ নেবে বলেই প্রতিজ্ঞা করেছে। বললে—তবু আপনি বার বার দিদিকে চিঠি দিতেন, বার বার দিদির সঙ্গে দেখা করাতেন—তার উদ্দেশ্যও কি ছিল এই? এইজন্যই আপনি আমাদের কারোর ভালো চাননি? এমনি করে আমাদের দু'জনকে পথে বসিয়ে আপনি কার্ কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন? নিজেরই বা কী ভালোটা হলো আপনার?

দাতারবাবু এতক্ষণে ক্ষীণ সুরে কথা বললে—আপনি আমাকে আরো কিছু বলুন, আরো গালাগালি দিন,—

—আপনাকে গালাগালি দিলে যদি আমাদের সব কষ্টের লাঘব হতো তো গালাগালি দিতেও আমি পেছপাও হতাম না। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, কী সুখটা পেলেন আপনি আমাদের এই সর্বনাশ করে! দিদিই বা আপনার কাছে কী অপরাধ করেছিল, আর আমিই বা আপনার কাছে কী দোষ করেছিলুম, বলতে পারেন?

বলতে বলতে সতীর গলা ক্রমেই করুণ হয়ে উঠলো। অভিযোগ নয় এবার, যেন অনুযোগ। যেন নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলো সতী। বললে—আপনাকে এড়াবার জন্যে দিদি কলকাতায় এল, যাতে আপনি না জানতে পারেন তাই কালিঘাটের গলির মধ্যে বাড়ি-ভাড়া নেওয়া হলো, তবু সেখানেও আপনি কেমন করে দিদিকে খুঁজে বার করলেন, তা ভগবান জানেন! আপনি কি জানেন যে আজ যে শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাকে চলে আসতে হয়েছে তার জন্যেও আপনি দায়ী?

দাতারবাবু বললে—সে শাস্তি আমি নিজেও পাচ্ছি মিসেস ঘোষ!

—আপনি আমাদের তুলনায় কতটুকু শাস্তি পাচ্ছেন, শুনি?

দাতারবাবু তেমনি মাথা নিচু করে বললে—আমার ছেলে আজ খুনের আসামী, তার বোধহয় ফাঁসীই হবে—

সতী রুখে উঠলো—হোক, ফাঁসি হোক, আপনার সঙ্গে যারা মিশেছে, আপনার সংস্রবে যারা এসেছে তাদের সকলের ফাঁসি হোক, তাতেও আমার তৃপ্তি হবে না। আপনার ফাঁসি হলেও আমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরুবে না। আমার দিদির
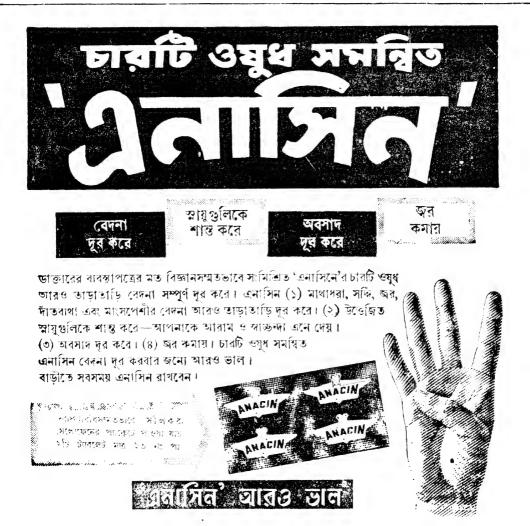
ফাঁসি হোক, আমারও ফাঁসি হোক। আমাদের সকলকে ফাঁসি দেয় না কেন বলতে পারেন? আপনার নিজের জীবন নষ্ট হয়েছে, আমাদের জীবন আপনি নষ্ট করেছেন,—আর এই দীপু, এই দীপু আমাদের দুর্ভাগ্যের সংগে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে—এরও জীবন আপনি নষ্ট করেছেন তা জানেন?

দাতারবাবু দীপংকরের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বললে—আমাকে তুমি ক্ষমা করো দীপুবাবু—

দীপংকর তাড়াতাড়ি দাতারবাবুর হাত দুটো নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরলে।

সতী বললে—আজ আপনার ছেলের ফাঁসি হবে বলে আমাদের কাছে সহানুভূতি চাইছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, আপনার ছেলের ফাঁসি হবে না তো ফাঁসি কার হবে? তার আত্মসম্মানবোধ ছিল, তার আত্মমর্যাদা ছিল, তাই তার ফাঁসি হচ্ছে, আর আপনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত ব্যভিচারের সংগে আপোষ করেছেন, তাই আপনি এখনও ভদ্রলোক সেজে বেড়াচ্ছেন! ফাঁসি তো আপনাদের হবে না, ফাঁসি হয় তাদের, যারা সত্যি কথা বলে, যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, যারা অত্যাচারের প্রতিকার করতে চায়!

দীপংকর এতক্ষণে একটু প্রতিবাদ করতে গেল। বললে—থাক সতী, তুমি ভেতরে যাও, লক্ষ্মীদির কাছে গিয়ে বোস একটু—

—কেন থামবো? কেন ভেতরে যাবো? এতদিন পরে মুখোমুখি পেয়েছি, আমি ছেড়ে দেব বলতে চাও? আমার বাবা কি কম কষ্ট পেয়েছেন এই ভদ্রলোকের জন্যে? আমার বাবার মৃত্যুর জন্যেও তো এই ভদ্রলোক দায়ী! এতগুলো মৃত্যু ঘটিয়ে আপনার কী লাভটা হলো? কী সুখটা ভোগ করতে পারলেন? এতগুলো মৃত্যু ঘটিয়ে এখন আপনি আমাদের সহানুভূতি আদায় করতে এসেছেন?

দাতারবাবু বললে—আমার ছেলের যা-হোক একটা কিছু হয়ে যাক, তারপর আমি এর জবাব দেব—

সতী বললে—কিন্তু আপনার ছেলে একটা খুন করে চুপ করে গেল কেন? আপনাকেও খুন করতে পারলে না সে? তার রিভলবারে আর একটা গুলীও বাড়তি ছিল না? তার মাকেও মেরে শেষ করতে পারলো না সে?

দাতারবাবু বললে—এর চেয়ে হয়ত তাই করলেই আরো ভালো হতো! তাতে আমিও হয়ত একটু শান্তি পেতাম!

সতী বললে—কিন্তু শান্তি তো আপনি চাননি! আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছি, আমার বাবাও আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তবু তো আপনার চৈতন্য হয়নি?

দাতারবাবু যেন ক্রমেই মুষড়ে পড়ছিল। নিজের অসংখ্য ঝঞ্ঝাটের ওপর সতীর এই কথাগুলো তাকে যেন আরো পীড়িত করে তুললো। বললে—কিন্তু এখন আমি কী করতে পারি বলুন? আমি আপনার সামনে আমার মাথা পেতে দিচ্ছি, আপনি যা ইচ্ছে করুন আমাকে নিয়ে! ওদিকে আমার ছেলের মামলা, আর এদিকে আমার স্ত্রীর এই অবস্থা। আমি একদিনের জন্যে শুধু আমার স্ত্রীকে দেখতে এসেছিলুম, আমি আবার কালই ফিরে যাবো বলে এসেছি, এখন আমাকে কী করতে হবে, বলুন?

সতী বললে—কাল নয়, আপনি আজই যান, লক্ষ্মীদিকে আমি একলাই দেখতে পারবো, এবাড়িতে আপনার আর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না।

দীপংকর এবার এগিয়ে গেল। বললে—সতী, কী বলছো তুমি?

—তুমি থামো দীপু, আমি ঠিক বলছি, আর এক মুহূর্তও এর এখানে থাকা চলবে না!

—তুমি অবুঝ হয়ো না। মাথা গরম করে তুমি কী বলছো তার মানে জানো না।

সতী বললে—আমার মাথা যদি গরম হতো দীপু, তাহলে এর আগেই আমি অনেক কান্ড করে বসতুম। এখনও আমার মাথা ঠান্ডা আছে, এখনও মাথা ঠান্ডা আছে বলেই আমি লক্ষ্মীদির মত রেলের চাকায় মাথা দিতে যাইনি। নইলে এতদিন আমাকে দেখতেই পেতে না এখানে। এই বাড়িতে দিনের পর দিন রাতের পর রাত একলা কাটিয়েছি, রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ট্রেনের চাকার শব্দ শুনেছি, আর নিজের জীবনের কথা ভেবেছি। পাগল যে হয়ে যাইনি, সেও মাথা ঠান্ডা রেখেছি বলে। মাথা গরম আর যারই হোক আমার হবে না।

দাতারবাবু বললে—কিন্তু আর একটা রাত আমাকে থাকতে দিন আমার স্ত্রীর কাছে—আমি কথা দিচ্ছি কালই চলে যাবো দিল্লীতে—

সতী হেসে উঠলো—এতদিন পরের বিছানায় নিজের স্ত্রীকে শুতে দিতে তো আপত্তি হয়নি আপনার? তখন তো কোনও দুর্ভাবনাই হয়নি আপনার মনে? তখন তো নিজে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন? আর আজ স্ত্রীর জন্যে এত দুশ্চিন্তা?

দাতারবাবু যেন চমকে উঠলো। নিজের পরাজয়ের কলঙ্ক যেন এমন করে এর আগে কখনও পরের চোখে ধরা পড়েনি। একটা কথাও মুখ দিয়ে সরলো না। শুধু ফাঁকা দৃষ্টিতে হাবার মত চেয়ে রইল।

দীপংকরের আর সহ্য হলো না। বললে—দাতারবাবু আপনি ভেতরে যান, লক্ষ্মীদি একলা রয়েছে, ভেতরে যান—

তারপর দাতারবাবুকে হাত ধরে ভেতরে পাঠিয়ে দিলে। ফিরে এসে দীপংকর আর একটাও কথা বলতে পারলে না। সন্ধ্যের ঘটনার পর থেকেই যেন এ-বাড়ির রুটিন-বাঁধা জীবনে একটা ছেদ পড়েছে। প্রতিদিন এখানে দীপংকর আসে আর প্রতিদিন পাশাপাশি বসে থাকে দুজনে। আজ আর যেন কোনও কথা বলবার নেই। আজ লক্ষ্মীদির দুর্ঘটনার পর সব যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। সনাতনবাবু এসে ফিরে গেছেন রিক্ত হাতে। আর দুদিন পরে দীপংকরকেও কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে। জীবনে কোথাও যেন সামঞ্জস্য ছিল না। সতী তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। দীপংকর সেদিকে না তাকিয়ে সোজা সদর-দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দরজা খুলে বাইরে পা দিতেই পেছন থেকে সতী বললে—কোথায় যাচ্ছো?

দীপংকর ফিরে দাঁড়াল। বললে—এবার যাই—

—না শোন!

দীপংকর আবার ভেতরে এসে দাঁড়াল।

সতী বললে—আজ উনি এসেছিলেন—

দীপংকর বললে—জানি!

—আমাকে আবার নিয়ে যেতে এসেছিলেন!

দীপংকর বললে—তাও শুনেছি।

সতী বললে—তুমি শুনেছ তা আমি জানি। আমি তোমাকে সে-জন্যে ডাকিনি! ডেকেছি অন্য কারণে! তুমি এত টাকা কোথা থেকে পেলে?

দীপংকর অবাক হয়ে গেল। সতীর মুখের দিকে সোজা মুখ তুলে চাইলে।

সতী আবার বলল—বলো, তুমি এত টাকা কোথা থেকে পেলে? তুমি কি ভেবেছ তুমি আমার জন্যে আমার শাশুড়িকে টাকা দিয়ে আমায় ঋণী করে রাখবে? বলো, উত্তর দাও?
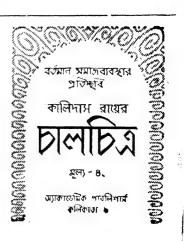
দীপঙ্কর তবু উত্তর দিতে পারলে না।

সতী বললে—তোমার সামনেই তো আমি সেদিন বলেছিলুম যে, ঘুষ দিয়ে আমি শাশুড়ির স্নেহ স্বামীর ভালবাসা পেতে চাই না, তবে জেনেশুনে কেন আমার এ-অপমানটা করলে? আমার মুখ এমন-ভাবে পোড়াতে হয়?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কে এ সব বললে তোমাকে?

সতী বললে—যে-ই বলুক, তিনি আর যাই করুন, মিথ্যে কথা বলেন না! কিন্তু এই সস্তা মহত্ত্ব দেখাতে কে তোমাকে বলে-ছিল? এ-বাহাদুরি দেখিয়ে আমার কী ভালোটা হলো?

দীপঙ্কর বললে—না দিলে সনাতন-বাবুরা রাস্তায় এসে দাঁড়াতেন।

—ওঁরা রাস্তায় দাঁড়ান বা না-দাঁড়ান তাতে তোমার কীসের মাথা-ব্যথা?

দীপঙ্কর বললে—সে তুমি বুঝবে না!

—তবু একবার বুঝিয়েই দেখ না, বুঝতে পারি কি না!

দীপঙ্কর বললে—এত বছর ধরে আমার সঙ্গে এত মেলামেশার পরেও যদি বুঝতে না পেরে থাকো তো আর বুঝে দরকার নেই। আমি যাই—

সতী সামনে পথ আটকে দাঁড়াল। বললে—আমার কথার জবাব না দিয়ে তুমি পার পাবে না। বলো, তোমাকে বুঝিয়ে বলতেই হবে। অনেক দিন ধরে অনেক অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছি, তবু তোমার এই হেঁয়ালি আমার কাছে আজো স্পষ্ট হয়নি। বলো, কেন তুমি এত টাকা ওঁদের দিতে গেলে? তোমার এতে কীসের স্বার্থ? তুমি কী চাও আমার কাছে?

দীপঙ্কর চাইলে সতীর দিকে। ঘৃণায় যেন সমস্ত মুখটা কুঁচকে উঠলো! বললে—ছিঃ, পথ ছাড়ো—

সতী পথও ছাড়লো না, মুখও নামালো না। বললে—তুমি তো কলকাতা ছেড়ে চলেই যাচ্ছো?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, সে তো পুরোন খবর!

—কিন্তু কেন চলে যাচ্ছো? কীসের ভয়? ভেবেছ আমি তোমার কোনও ক্ষতি করবো?

দীপঙ্কর বললে—ক্ষতি! ক্ষতি তো আমিই করেছি তোমার এতদিন!

—তাই বুঝি এখন ছেড়ে চলে যাচ্ছ আমাকে জব্দ করবে বলে?

দীপঙ্কর বললে—আমি এ-কথার উত্তর দেব না।

—তা উত্তর যদি না দেবে তো কেন টাকা দিতে গেলে ওঁদের? কেন ওঁদের এমন করে বাঁচালে? ওঁদের বাঁচিয়ে তোমারই বা কী লাভ হলো আর আমারই বা কী ভালো হলো? বলো, উত্তর দাও।

দীপঙ্কর চুপ করে রইল। কোনও উত্তর তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

সতী হঠাৎ দীপঙ্করের কোটের কলারটা চেপে ধরলো। বললে—বলো, চুপ করে থেকো না, উত্তর দাও—

দীপঙ্করের সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। এক মুহূর্তে তার সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করে এল সে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, সেই ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট, সেই ধর্মদাস মডেল স্কুল, সেই প্রাণমথবাবু, সেই মিস মাইকেল, সেই কিরণ, সেই লক্ষ্মীদি, দাতারবাবু, সমস্ত কিছু যেন এক মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সারা জীবন ধরে সে তো একটা জিনিসই জানতে চেয়েছে। কেন মানুষ দুঃখ পায়, কেন ভালোর এত যন্ত্রণা, কেন সত্যের এত লাঞ্ছনা! তা-হলে এই-ই কি তার উত্তর? এই সতীই কি তার মূর্তিমতী জবাব?

—বলো, জবাব দাও, কেন ওঁদের তুমি টাকা দিতে গেলে? চুপ করে থেকো না, বলো—

দীপঙ্কর চাইলে সতীর দিকে। বললে—তোমাকে সুখী দেখতে চাই বলে!

সতী হঠাৎ কোটের কলার থেকে হাতটা ছেড়ে দিলে। তার চোখ দুটো যেন হঠাৎ বড় কালো হয়ে উঠলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলে—কোত্থেকে টাকা পেলে তুমি?

দীপঙ্কর কোনও জবাব দিলে না।

সতী বললে—বলো, এত টাকা কোত্থেকে পেলে?

দীপঙ্কর বললে—ধার করেছি!

ধার! সতী যেন চমকে উঠলো। এত টাকা ধার করেছে দীপু তার জন্যে! এ যে অনেক টাকা!

—এ ধার শোধ করবে কেমন করে? কত দিনে শোধ করবে?

—সে যেমন করে হোক আমি শোধ করবো! তোমাকে ভাবতে হবে না! আমাকে যেতে দাও—

সতী বললে—না, আমাকে ঋণী রেখে তুমি আমাকে জব্দ করবে, তা হবে না। তোমার এ ধার আমি শোধ করে দেব, আমি সব টাকা দিয়ে দেব তোমাকে, তুমি আমার জন্যে মনে মনে বাহাদুরি নিতে পারবে না।

দীপঙ্কর বললে—তা হয় না। ইচ্ছে হলে তুমি তোমার শাশুড়িকে দিও, তাঁর উপকার হবে তাতে।

সতী বললে—তা দিলে আগেই দিতে পারতুম! তুমি আজই এ-টাকা নিয়ে যাও—

দীপঙ্কর বললে—তা হয় না।

সতী বললে—খুব হয়, তুমি আমাকে টাকা দিয়ে কিনে রাখবে, তাও আমি সহ্য করবো না। তোমাকে টাকা নিতেই হবে—

দীপঙ্কর তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সতী বললে—তোমার পায়ে পড়ি দীপু! এত বড় অপমান আমাকে কোরো না, টাকা নিয়ে তুমি আমাকে আমার অপমান থেকে বাঁচাও, আমি এখনি চেক-বই নিয়ে আসছি, তুমি টাকা না নিলে রাত্রে আমার ঘুম হবে না তোমার পায়ে পড়ি দীপু, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি—

বলে তাড়াতাড়ি সতী ভেতরের ঘরের দিকে চলে গেল। ঘরের আলমারি খুলে তাড়াতাড়ি দুটো ব্যাঙ্কের পাশ বই নিয়ে আবার আলমারিটা বন্ধ করলো। পাশেই লক্ষ্মীদির ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল লক্ষ্মীদি বিছানায় শুয়ে আছে আর দাতারবাবু তার পাশেই একটা চেয়ারে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সতী তাড়া-তাড়ি আবার বাইরের ঘরে এসে ঢুকলো। কিন্তু, দীপু কোথায়! সদর দরজাটা খোলা। সতী একবার এদিক ওদিক চাইলে। কোথাও নেই। তারপর সদর দরজা পেরিয়ে বাইরের সিঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার চার-দিকে। সতী ডাকলে—দীপু—দীপু—

তারপর সেই অন্ধকার রাস্তা দিয়েই লেভেল ক্রসিং-এর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। দীপু—দীপু—

দীপঙ্কর তখন সতীর নাগালের বাইরে দূরের গ্রহ নক্ষত্র অতিক্রম করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পা চালিয়ে চলেছে। অন্ধকারের আড়ালে সে তখন নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলেছে।

(ক্রমশ)

আওয়াজে যে সুরটি বাজছে সেটি 'বন্যার' মাঝখানের বাঁশির ডাকটি। প্রথম পর্বের মন্দ্রসুরটি এসেছে একাধিকবার। সমাপ্তির মুখে ফিরে আসে প্রথম পর্বের দুটি সুরধারা যার কথা সে পর্বের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আর সূচনার সুরটি।

শেষ পর্বের মধ্যাংশটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে আছে দ্রুতছন্দের চপল ওয়ল্‌জ্, তরুণ মনের সরলতায় ভরা। শস্তাকভিচ নিজে বলেছেন এই অংশটির সঙ্গে যোগ রয়েছে শিশুদের, নতুন ও ভাবী পর্যায়ের দূত যারা।

দ্বাদশ সিম্ফনিকে এক সুরভাবগত বা মোনোথেমাটিক সিম্ফনির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ বলছেন সমালোচকরা। বলছেন লিসৎ আর রুশ সুরকার তানিয়েভের ঐতিহ্যের সুন্দর বিকাশ ঘটেছে এতে।

এই সিম্ফনিটিতে শস্তাকভিচ বিপ্লব সংক্রান্ত প্রচলিত গানের সুরকে সুন্দর কাজে লাগিয়েছেন। একাদশ সিম্ফনিতেও শস্তাকভিচ তাদের সমৃদ্ধির সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই সিম্ফনিতে অবশ্য সেরকমভাবে বিশেষ কোন গানকে চেনা যাবে না। কিন্তু বিপ্লবের গানগুলির যে চরিত্র সেটিকে শস্তাকভিচ কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে যে সব গানে রয়েছে উদ্দীপনা, উত্তেজনা। পেত্রগ্রাদের বিপ্লব'-এ তারা এসেছে একের পর এক। শেষ পর্বে জীবনে দৃঢ় প্রত্যয় ও আশার যে প্রকাশ ঘটেছে তার মূলে রয়েছে বিপ্লবের গানের ভঙ্গী।

সংগীত শেষ হল। শ্রোতাদের হাততালি কিন্তু তেমন স্বতঃস্ফূর্ত মনে হল না। সুরকারকে তাঁরা মঞ্চে দেখতে চাইলেন। চবার তাঁকে এসে অভিবাদন গ্রহণ করতে হল। ঠিক পিছনের শ্রোতা জানালেন লেনিনগ্রাদে তিনি তিনবার মঞ্চে এসেছিলেন। সবশেষে শিল্পীদের ঘরে সুরকারের প্রতি অভিনন্দকদের ভিড় লেগে থাকলেও মনে হল এবং শুনতেও পেলাম বহু শ্রোতা আরো বেশী কিছু আশা করেছিলেন। কেন এমন হল বুঝলাম না। তার একটি কারণ অবশ্যই শস্তাকভিচের সংগীতের চরিত্র। তা কখনোই শুধু আবেগনির্ভর এবং সুরেলা নয়। (যদিও এই রচনায় আবেগের অভাব নেই, বিশেষত উদ্দীপনার, তীব্র উত্তেজনায় কন্ডাক্টর অন্ততঃ একবার বেদী ছেড়ে কিছুটা লাফিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আসল গুণে হল আবেগের সংহত গম্ভীর রূপে।) শস্তাকভিচের সংগীত অনেক পরিমাণেই বুদ্ধিনির্ভর। এই সিম্ফনির দ্বিতীয় পর্ব প্রধানত সুরধর্মী। কিন্তু সেখানেও এক একটি সুরধারা যেন রয়েছে পাশাপাশি। এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানসূচীর প্রথমাংশে চাইকভস্কির সংগীতে যেমন তারা একটা থেকে আর একটা স্রোতের মতো বয়ে এসেছে এখানে তা হয়নি। তার যেন যুক্তির মতো এসেছে একটার পিঠে আর একটা। আর এইভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে রচয়িতার বক্তব্য বিষয়কে। এবং তাঁর এই নতুনতম রচনাতেও শস্তাকভিচ সুর অসঙ্গতি বা ডিসোনান্স প্রয়োগ করেছেন, যার জন্য তাঁকে কম সমালোচনা শুনতে হয়নি প্রথম জীবনে। অবশ্য এই রচনায় রুশ ধরনের সুর ও রুশ ক্লাসিকাল সংগীতের ঐতিহ্যের যে ছাপ আছে এমন আর শস্তাকভিচের কোন সিম্ফনিতে দেখা যাবে না। কারো কারো মতে আবার রচনাটি তার সূচনার প্রথম কয়েক সেকেন্ডের অপূর্ব আর্কিটেক্টনিক গঠনে এবং বিষয়গৌরবে যে মহান সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছিল তাকে যেন পুরো রূপ দিতে পারেনি। চল্লিশ মিনিটের সিম্ফনি তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এটিও আমার কাছে গ্রাহ্য মনে হয়নি। একটি বিরাট মহান ভাবকে শস্তাকভিচ চল্লিশ মিনিটে অপূর্ব দৃঢ় সংহত রূপে দিয়েছেন। তাকে বিযুক্ত করেছেন সব বাহুল্য আর সস্তা ভাবালুতা থেকে। তার ফলে তা শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। যার প্রবেশদ্বার হল একেবারে গোড়ার মুখটা, অন্তঃপ্রকোষ্ঠে হল একাধিকবার ঘুরে ঘুরে আসা গম্ভীর সুরমন্দ্রটি, শেষ বা ফিনালে বেহালার একই তীব্র দীপ্ত ঋজু সুরের পুনরাবর্তনে হল চূড়া। শুধু এই শেষের অংশটিই যদি কেউ শোনেন তা হলেই তিনি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার শস্তাকভিচের সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

শুভময় ঘোষ

নৈমিষারণ্যের উপকথা

—বিকর্ণ

আমার এক বন্ধু ছিলেন একটি বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার। বেচারী ডায়াবেটিসের রুগী, ফলে ময়রায় সন্দেশ খায় না প্রবাদবাক্যটি তাঁর ক্ষেত্রে আক্ষরিক সত্যতা লাভ করেছিল। নৈমিষারণ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনার সঙ্গে আমার বর্তমান সম্পর্কটাও প্রায় ঐ রকম। তিনটি প্রদেশ জুড়ে বিরাট এলাকার এর ব্যাপ্তি; কিন্তু আমি পড়ে আছি তার একান্তে শৈলগিরীতে — হেড-কোয়ার্টার্সে। জঙ্গল সাফা করে গ্রামের পত্তন যেখানে হচ্ছে সেসব পুনর্বাসন এলাকা এখান থেকে কয়েক শত মাইল দূরে!

হঠাৎ একটা কাজের মতো কাজ পেয়ে গেলাম একদিন। কর্তৃপক্ষ নতুন এক অঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্য জমি পাচ্ছেন প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে। তাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ আসছেন জমিটা পরখ করতে—দেখতে, এই নতুন এলাকায় জঙ্গল সাফা করে যে জমি পাওয়া যাবে সেটা চাষের পক্ষে কতটা উপযোগী। আমার উপর আদেশ হল ভদ্রলোককে সেই জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া—তাঁর প্রয়োজনমত মজুর সরবরাহ ক'রে মাটির স্যাম্পেল যোগাড় করা।

আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। বছর ত্রিশেক বয়স। সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারা—দিল-দরাজ অট্টহাস্য কথায় কথায় স্বতই উৎসারিত হয়ে আসে। বললাম ঃ জঙ্গলে ক্যাম্প খাটিয়ে থাকা—খাওয়াদাওয়ার তো বটেই, নানারকম অসুবিধা হবে কিন্তু আপনার—অপরাধ নেবেন না।

বললেন ঃ সেজন্যে তৈরী হয়েই এসেছি। ওতে আমি অভ্যস্ত।

শহরের দোকান থেকেই কিনে নিলাম—পাউরুটি, টিনের জ্যাম, বিস্কুট, মাখন, সিগারেটের টিন, দেশলাই তিন দিনের সংসারের যা কিছু প্রয়োজন। মালপত্র বোঝাই দিয়ে আর্দালী নন্দু থাপা বেরিয়ে গেল জীপে অ্যাডভান্স পার্টি। কিছু পরে আমরাও রওনা হয়ে পড়লাম স্টেশন ওয়াগনে।

এলাকাটার নাম মালিকানাগিরি। কেন এমন অদ্ভুত নাম হয়েছে জানি না। গিরি তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে—ধ্যানস্তিমিত নীলাভ-সবুজ পাহাড়ের সারি মাইলের পর মাইল—কিন্তু তার মালিকানা কার? সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার জরিপও হয়নি এ অঞ্চলে, মৌজা-ম্যাপ বা সেটলমেণ্ট-ম্যাপ বলতে যা বুঝি তাও নেই। বিরাট অঞ্চল পড়ে আছে প্রায় অনাবিষ্কৃত। সভ্যজগতের মানুষ এ অরণ্যে, এ গিরিতে মালিকানার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়নি আজ পর্যন্ত। পাহাড়ের মাথায় আছে অসভ্য বোণ্ডাদের গ্রাম। সমতলে ওরা সচরাচর আসে না, সমতলের মানুষদের সঙ্গে মিশতে চায় না। তবু ওদের কেউ কেউ নেমে আসে পাহাড়তলির হাটে। নিয়ে যায় হাতে বোনা চাটাই, হরিণের শিং, মহুয়া আর নিয়ে যায় শুধু লবণ। ওরা কেরোসিন কেনে না—রাতে জ্বালায় কাঠ, দেশলাই কেনে না—চকমকি ঠোকে আজও। কলাই-করা বাসন, সস্তা জামা বা অন্য কিছুই ওরা চায় না, চায় শুধু নুন। শিকারেই ওদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা—যদিও চাষবাসও করে আদিমতম পদ্ধতিতে। ধান রুইতে জানে না—ছিটিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে, মই দেয় না, নিড়ায় না, সার দেয় না জমিতে। পুরুষ-রমণীর বেশে বিশেষ ফারাক নেই—উভয়েই বসন-সার। বিশেষ বয়সের মেয়েরা বুকের উপর জড়িয়ে নেয় কটিদেশ থেকে জানু পর্যন্ত একটা আবরণ—গাছের পাতা, বাকল অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সমতল থেকে সংগ্রহ করা এক টুকরো নেকড়া। নারী-পুরুষ উভয়েরই মাথা কামানো, উভয়েরই হাতে যা-হোক একটা হাতিয়ার।

স্টেশন ওয়াগন চলেছে রাঙামাটির বন্য সড়ক ধরে—শাল-মহুয়া-হরতুকির যোজন-বিস্তৃত বন। অর্জুন-আমলকি-বয়রা, বট-অশ্বত্থও আছে। আর আছে কদমগাছ—বিরাটাকার। পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে রাস্তা কখনও উঠছে উপরে—কখনও নামছে নীচে। সারা দিন গাড়ি চালালেও হয়তো বিপরীত-গামী কোন গাড়ির দর্শন মেলে না। দিনে দুখানি বাস যায় এ পথে, দুখানি আসে। তাও প্রথম পঞ্চাশ মাইল—তারপর বোধ করি নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ড! পথে খরস্রোতা উপল-বন্ধুর একটি নদীর উপর একটি ব্রীজ পেলাম। থ্রি-স্প্যান ল্যাটিস্-গার্ডার ব্রীজ—অর্থাৎ বাংলা পরিভাষায় যাকে বলা যায় 'ঝক্ঝকে সুন্দর সাঁকো'!

মিত্রমশাই গাড়িটা দাঁড় করালেন। ম্যাপ খোলা হল। নদীটিকে সনাক্ত করা দরকার। কোলাব। এঁকেবেঁকে শেষ পর্যন্ত গোদাবরীতে গিয়ে মিশেছে। কোলাবের একটি শাখানদী 'সপ্তসরা' আমাদের সমান্তরালে চলল অনেকটা পথ। ব্রীজ অন দি রিভার

কোয়াই বইটির শ্যুটিং এখানে অনায়াসে করা চলে। সৌন্দর্যে রিভার কোয়াইও সপ্ত-ধারাকে হারাতে পারবে না।

মিত্রমশাই বললেন ঃ এ জঙ্গলে বন্য জন্তু দেখেছেন?

বললাম ঃ বহুবার। হরিণ আর খরগোশই বেশী দেখেছি। ভালুক দুবার আর বাঘ মাত্র একবার।

তারপর বাঘের গল্পই চলল অনেকটা রাস্তা। বাঘের গল্প ওঠায় স্টেশন ওয়াগনের ড্রাইভার পাঁড়েজি দেখলাম উশখুশ করছে। দেব-দ্বিজে বড় ভক্তি পাঁড়েজির, এখনই হয়তো দক্ষিণরায়ের গল্প ফেঁদে বসবে—কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত পাঁড়েজি মুখ খুলল না আর।

সন্ধ্যাবেলায় এসে পৌঁছলাম একটি গণ্ড-গ্রামে। নন্দুরা আগেই এসে টেণ্ট খাটিয়ে ফেলেছে। তাঁবুর ভিতর পেট্রোম্যাক্স-বাতি জ্বলছে—আলোর ছোপ পড়েছে জঙ্গলের গায়ে। গাছপালার মাঝখানে বেশ ফাঁকা জায়গাটা। মহুয়া গাছতলায় পোর্টেবল চেয়ার-টেবিল পাতা। গাড়ির আওয়াজ হতেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল নন্দু থাপা ঃ গরম পানি তৈয়ার।

মুখ হাত ধুয়ে বসতেই এসে গেল দু পেয়ালা গরম চা আর খাবার। মিত্রমশাই বললেন ঃ তবে যে বলেছিলেন জঙ্গল জায়গায় কিছু পাওয়া যাবে না?

টেবিলের উপর ম্যাপটা পাতা গেল। যে জমিটা প্রাদেশিক সরকার আমাদের দিতে চাইছেন—তার আনুমানিক নকশা, প্ল্যান নয় কিন্তু। জরিপই হয়নি এখনও—যাকে বলে রাফ্-ইণ্ডেক্স ম্যাপ। একটু পরেই এসে গেলেন মিস্টার কাণ্ডারী আর মুখার্জি সাহেব। পরিকল্পনার নিজস্ব মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী। শুরু হয়ে গেল আলোচনা। উঠে এলাম সেখান থেকে।

বাইরে এক আকাশ তারা। সূর্য এখন কন্যা রাশিতে। দক্ষিণায়নের পথে সবে যাত্রা শুরু করেছেন। সূর্যাস্তের পর এক প্রহরও হয়নি। পশ্চিম দিগ্বলয়ে—ঐ নাম-না-হওয়া পাহাড়ের মাথায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বৃশ্চিক রাশির চিরন্তন জিজ্ঞাসা। পিতৃপক্ষ চলেছে—সান্ধ্য আকাশে চাঁদ নেই। আকাশ আর অরণ্য আলিঙ্গন করেছে পরস্পরকে—কোনটা জোনাকি আর কোনটা তারা তা চিনবার উপায় নেই। গাছতলায় তিন-পাথরের কাঠের উনানে রান্না চাপিয়েছে নন্দু। এ পাশের হোলদারী তাঁবুটায় পাঁড়েজি সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে ঃ গাছপালা পশুপক্ষী কাঁদছে, অযোধ্যার নরনারী চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে—আজ নবদুর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র ভাইয়ের হাত ধরে পতিব্রতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলেছেন।

চুপচাপ বসে পড়লাম একটা বড় পাথরের উপর। অযোধ্যা থেকে শ্রীরামচন্দ্র নাকি এই অরণ্যের দিকেই এসেছিলেন। চিত্রকূট পর্বতে ভরত-মিলনের পরে তিনি দক্ষিণাভি-মুখে আসেন। গোদাবরী নদীর তীরে কুটির বেঁধে বাস করেন। এখান থেকে গোদাবরী বেশী দূরে নয়। কে জানে যে পাথরটার উপর বিংশ শতাব্দীতে আমি এসে বসেছি আজ, এই বৃহদায়তন পাথরটার উপরেই একদিন পথশ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র এসে বসেছিলেন কিনা। এই অনাবিষ্কৃত দেশের কোন সন্ধানই আমরা রাখি না। এখানে মাটির নীচে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কে বলতে পারে, খুঁড়তে খুঁড়তে হয়তো একদিন মাটির নীচে থেকে বেরিয়ে আসবে জটায়ু-রাজার প্রাসাদ!

পরদিন জীপে যেতে যেতে কথাটা বলেছিলাম মিত্রমশাইকে ঃ সয়েল-স্যাম্পল নিতে গিয়ে ধরুন যদি কোদালের মুখে উঠে আসে একটা তাম্রশাসন—যাতে লেখা আছে সীতাদেবীর সংবাদ দেওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে রাজা জটায়ুর বংশধরকে একটা সনদ দিচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র?

মিত্রমশাই হেসে বলেন ঃ অতটা আশা করি না। এতটা পথ এলাম একটা রামগড়, লক্ষ্মণপুর অথবা সীতাগাঁও দেখলাম না—তার তাম্রশাসন! রামসীতা যে এ পাড়া কখনও মাড়িয়েছিলেন তার কোন সুদূর-প্রসারী কল্পনা করবারও সুযোগ পাচ্ছি না।

পাঁড়েজি কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু তার আগেই মিত্রমশাই বললেন ঃ রোখ্‌কে!

বনপথ দু দিকে ভাগ হয়ে গেছে। নামলাম জীপ থেকে। ফ্লাস্ক থেকে একটু চা-পান করা গেল। ম্যাপটা খুলে পাতলাম জীপের বনেটের উপর। কম্পাস বের করে ওরিয়েণ্ট করা গেল ম্যাপখানা। বৃথাই। এ দুটি বনপথের কোন অস্তিত্বই নেই ম্যাপে। যে গ্রামে কাল রাত্রিবাস করেছি সেটা ম্যাপে সনাক্ত করা যায়। তারপর আমরা বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এসেছি। জীপের মাইলো-মিটার বলছে আট-মাইল। স্কেল দিয়ে নকশায় চিহ্নিত করলাম জায়গাটা। বললাম ঃ ডান দিকের জংলা-পথ ধরে মাইল তিনেক গেলেই আশা করছি একটা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছাব।

ঃ কী নদী?

ম্যাপ পড়ে বললাম ঃ তামাশা!

হো হো করে হেসে উঠলেন মিত্রমশাই ঃ তামাশা করছেন না তো মশাই?

বললাম ঃ বিশ্বাস না হয় নিজে পড়ে দেখুন...TAMASA—তামাশা।

পাঁড়েজি লম্বা সেলাম করে বললে ঃ লেকিন সাব্‌--

ঃ কি হল? পেট্রল ফুরিয়েছে?

ঃ নেহি সাব—পেট্রল তো কাফি হ্যয় পুরা টাঙ্কি।

ঃ তবে আর ফালতু বাত নয়...এই ডান দিকের পথটা ধরেই ছোটাও তোমার পুষ্পক-রথ—দেখি তামাশা কত দূর গড়ায়।

পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে নগর-সংকীর্তনের ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে চলল জীপ। দু পাশে বন আর বন—একটি মানুষের সন্ধান পেলাম না পথে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল অদ্ভুত-দর্শন একটা পাখি—বিচিত্র কাঁ-কাঁ-কাঁ ডাক দিয়ে। বিকটাকার এই জীপ-জন্তুটাকে দেখে ভয় পেয়েছে আর কি। ঘড়িতে দেখলাম পনের মিনিট চলেছি আমরা। যে গতিতে চলেছি তাতে মাইল পাঁচেক এসেছি নিশ্চয়—কিন্তু কোথায় নদী?

মিত্রমশাই ঠাট্টা করে বললেন ঃ নদী আমাদের সঙ্গে সাত-সকালে এ কি লুকো-চুরির তামাশা শুরু করল বলুন তো?

আমি কোন জবাব দিলাম না। গণ্ডূষ করে ভাতে হাত দিয়েই শুধু নয়, স্টিয়ারিঙে হাত দিলেও পাঁড়েজি বাক-সংযম করে থাকে। কোন কথা নেই তার মুখে। অবশেষে এসে পৌঁছলাম নদীর কিনারে। ছোট্ট খরস্রোতা পাহাড়ে নদী। ঝরনাই বলা চলে। ভারী মনোরম পরিবেশ। অসংখ্য ছোট বড় পাথরে নদীর ঘাট যেন বাঁধানো। নদীতে স্নান করছিল দুটি আদিবাসী মেয়ে। ঊর্ধ্বাঙ্গে শুধু কড়ির মালা ঝুলছে গলা থেকে। মাটি-মার্বেল বা ক্যানভাস নয়...কেমন যেন বিশ্রী লাগলো, সরে এলাম জীপের আড়ালে। আশ্চর্য, স্নানরতা মেয়ে দুটির কোন চাঞ্চল্য নেই--কৌতূহল আছে কিন্তু সঙ্কোচ-লজ্জার কোন আভাস ফুটে উঠল না তাদের সে বন্য দৃষ্টিতে।

মিত্রমশাই বললেন ঃ সরকার থেকে এদের মধ্যে বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরণ করা উচিত। বিদেশীরা এ দৃশ্য দেখলে কি বলবে?

বিদেশীরা কি বলবে তা জানি। মিস্ মেয়ো, বিভার্লি নিকল্‌স-এর বইও যে না পড়েছি তা নয়। কিন্তু সে কথা নয়, আমি ভাবছিলাম সত্যই কি বস্ত্র বিতরণ করা মঙ্গলজনক হবে? খাদ্য-জল-বাতাস প্রাণ ধারণের আবশ্যিক প্রয়োজনীয় উপকরণ। বস্ত্র তো তা নয়। বস্ত্রসমস্যাও আজকের দুনিয়ায় বিরাট এবং ব্যাপক—কিন্তু তার

প্রয়োজনীয়তা জান্তব নয়, সামাজিক। সামাজিক মানুষের এ স্বখাত-সলিল। এ সত্য অনুধাবন করেই আজ পশ্চিম ন্যুডিস্ট কলোনী গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। এই আদিবাসী মেয়েরা ঊর্ধ্বাঙ্গ গোপন করার প্রয়োজন অনুভব করে না—সেটা আমাদের চোখে বিসদৃশ লাগে—কিন্তু ওদের তো কোন বিকার নেই। অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা আজ খাটো চোলি পরে যে বেশে ট্রামে-বাসে অফিসে-আদালতে আমাদের সাথে সমানতালে পা ফেলে চলেছেন তা পঞ্চাশ বছর আগে ছিল অচিন্তনীয়। আজ স্বর্গ থেকে আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ যদি নেমে আসেন তা হলে ডীপ-কাট খাটো চোলি পরা নাইলন-ভূষিতা আধুনিকাকে দেখে লজ্জায় মুখ লুকোবেন—ঠিক যেমন করে আমি সরে এলাম। উড়ুনী-সর্বস্ব খড়ম-পেয়ে শিখাধারী আমার বুড়ো-ঠাকুরদার বাবাকে দেখে আধুনিকাও নিশ্চয় কৌতূহলী হবে—লজ্জা পাবে না! চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল পাঁড়েজির কণ্ঠস্বরে: উ নেই চলেগা সাব কাপড়া পিহ্‌নেনেসে ই লোগ সব বিলকুল মর যায়েগা।

আমরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম। মেয়ে দুটি কি বুঝল তা ওরাই জানে। তাড়াতাড়ি উঠে গেল জঙ্গলের পথে। যাবার সময় কঠিন ভ্রূকুটি দেখলাম ওদের চোখে। বোধ করি ওদের অবগাহন-স্নানের মাঝখানে আমরা আসায় বিরক্ত হয়েছে ওরা।

বিনয় প্রকাশ করে পাঁড়েজি এর পর যা বললে—তাই এ গল্পের উপসংহার। বক্তব্যটা নিবেদন করবার আগে কিছুটা ভূমিকা করল পাঁড়েজি। আমরা যেন তার গোস্তাকি মাপ করি, সে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ, লিখাপাঢ়ি জানে না, থোড়াকুছ তুলসীদাসজীর কিতাব পড়ে, কিন্তু আংরেজি জানে না। তবু গাড়িতে আমরা যেসব কথাবার্তা বলেছি তা থোড়াবহুত ও বুঝতে পেরেছে। তাই এ প্রসঙ্গে ও দু একটি কথা নিবেদন করতে চায়।

পাঁড়েজি নৈমিষারণ্য পরিকল্পনায় ডেপুটেশনে এসেছে এই প্রাদেশিক সরকারের তরফ থেকে। পরিকল্পনা এ অঞ্চলে কাজ করতে এসেছেন আজ মাত্র তিন বছর—পাঁড়েজি এ অঞ্চলে চাকরি করছে গত পঁয়ত্রিশ বছর। আদিবাসীদের ভাষাও কিছুটা জানে। চাকরির প্রথম যুগে ও ছিল এখানকার একজন ইংরাজ জেলা-শাসকের ড্রাইভার। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করলে সেই ইংরাজ আই-সি-এস অফিসারটির নাম। নামটা জানা—আদিবাসীদের মধ্যে অনেক কাজ করেছেন তিনি। সম্ভবত ভদ্রলোক অ্যানথ্রপলজির ছাত্র ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন এদের সভ্য করে তুলতে। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, এদের গান শুনতেন, লিখে নিতেন, নাচ দেখতেন, ফটো নিতেন। অসভ্য সরল মানুষগুলো তাঁকে ভালোবাসতে শিখল। শেষে তিনি আন্দোলন করলেন ওদের কাপড় পরাতে হবে। ছেলেরা না হলেও মেয়েরা, ওদের নিজস্ব গ্রামে না হলেও অন্তত সমতলের হাটে আসার সময়। ওদের গাঁও-বুড়ো বা প্যাটেল বললে: তা হয় না। তোদের ঐ জিনিস গায়ে জড়ালেই গায়ে আমাদের ফোস্কা পড়বে—গায়ে জ্বালা ধরবে—চামড়া ফেটে যাবে। অপদেবতা ভর করবে সে দেহে—আমরা মরে যাব!

জেলা সমাহর্তা এ কুসংস্কারকে আমল দেননি। ওদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও

—সেই নদীতে অবগাহন স্নান করছে

আমদানী করলেন পাঁচ-হাতি খাটো শাড়ি, জামা, ইজের। বিতরণ করলেন বিনামূল্যে। বুড়ো সর্দার যাই বলুক তরুণ-তরুণীর দল খুশী হল কিন্তু। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ছিটের ব্লাউস, লালপাড় শাড়ি। পাঁড়েজি বলেনি, আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম পীনপয়োধরা একটি নারীর মুখে ফুটে উঠেছে সেই রহস্যময়ী হাস্যরেখা—যা একদিন ফুটে উঠেছিল জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের পর আদিমতমা নারী ঈভের ওষ্ঠাধরে। শুধু ওদের গাঁওবুড়ো কেশহীন মুণ্ড নেড়ে বলেছিল:

: এ তুই ভাল করলি না সাহেব, এ তুই ভাল করলি না।

অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির অ্যানথ্রপলজির ছাত্রটি হেসেছিলেন সে কথায়।

কিন্তু সে হাসি স্থায়ী হয়নি। মাস দুয়েকের মধ্যেই খবর এল—অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে গাঁয়ে! ওদের গায়ে কেমনজানি সব ফোস্কা পড়ছে, গায়ে জ্বালা ধরছে, চামড়া ফেটে ফেটে যাচ্ছে! দলে দলে মরে যাচ্ছে ওরা! মহামারীরূপে এসেছে বসন্তরোগ। হেলথ-ইন্সপেক্টরদের একটি য়ুনিট নিয়ে সাহেব স্বয়ং এলেন তদন্তে। আশ্চর্য! গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! পাতায় ছাওয়া কুটিরে জনমানব নেই। ইতস্তত ছড়ানো মাটির হাঁড়ি, কাঠের হাতা, হাতে বোনা চাটাই—কিন্তু মানুষ নেই। মৃতদেহ আছে, অর্ধভুক্ত বীভৎস দেহ! পাঁড়েজিও ছিল সাহেবের সঙ্গে। লক্ষ করেছিল সাহেব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। একের পর এক শূন্য কুটির পরিদর্শন করে চলেছেন।

অবশেষে মানুষের দেখা মিলল একটি কুটিরে। তখনও জ্ঞান ছিল মানুষটার গাঁয়ের সেই বৃদ্ধ প্যাটেল। পড়ে আছে একা—বিষাক্ত তার সঙ্গে। সাহেব ওয়াটার বট্‌ল খুলে জল দিলেন তার মুখে। হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠল লোকটা। সাহেব স্ট্রেচারে করে নামিয়ে এনেছিলেন পাহাড় থেকে। হাসপাতালে গিয়েও বাঁচেনি সে। তবে একটু সুস্থ হয়ে সাহেবকে শুনিয়েছিল একটি উপাখ্যান। গল্প নয়, উপকথা। বোন্ডাদের কথিত ভাষা আছে, লিখিত বর্ণালী নেই। ওরা বাপ-পিতামহের কাছ থেকে বংশ-পরম্পরায় যে কাহিনী শুনে এসেছে সেটাকে ওরা উপকথাও মনে করে না—সেটা ওদের কাছে সত্য ঘটনা।

বহু বহু যুগ আগে—সে কত আগে তা বলতে পারব না—সেই যখন গাছপালা, পশু-পাখী মানুষের ভাষায় কথা বলত—তখন এই অরণ্যে একজন মস্ত বড় রাজা ছিলেন। বোন্ডাদের রাজা। মস্ত বড় রাজার বাড়ি, হাতি-ঘোড়া, লোক-লস্কর—কিছুরই অভাব ছিল না। তুই যেমন রঙিন জামা এনেছিলি আমাদের গাঁয়ের মেয়ে-মরদের জন্যে, তার চেয়েও ভাল ভাল জামা কাপড় পরতো সেই রাজ্যের মানুষ—না, না, বোন্ডারা তখন ন্যাংটো হয়ে থাকত না। একদিন রাজামশাই লোকজন নিয়ে শিকারে বের হলেন। সাত আকাশ পেরিয়ে, সাত পাহাড় ডিঙিয়ে

রাজা অবশেষে সসৈন্য একদিন এসে পৌঁছলেন এই বিজন বনে। পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত, তৃষ্ণায় বুকে ফেটে যাচ্ছে। এক ফোঁটা জল নেই কোথাও। হঠাৎ রাজা দেখলেন একটা মহুয়া গাছের ডালে বসে আছে একটা ঝুঁটিওলা বনমোরগ। রাজা বললেন : বনমোরগ, বনমোরগ, এ বনে জল কোথায় আছে?

বনমোরগ গলা ফুলিয়ে বললে : এই ডানহাতি পথ ধরে গেলেই নদী দেখতে পাবে। জল খেয়ো, কিন্তু খবরদার চোখ খুলো না।

ডানহাতি পথে কিছুদূরে গিয়েই রাজা একটা জলের আওয়াজ শুনলেন। মোরগের কথামতো চোখ বুজে এগিয়ে চললেন তিনি। কিন্তু জলে ও কিসের আওয়াজ! যেন কোন বন্যজন্তু জল খাচ্ছে! নিশ্চয়ই সম্বর হরিণ! শিকারী রাজার লোভ হল। চোখ খুলে চাইলেন। দেখলেন পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে সেই নদীতে অবগাহন-স্নান করছে। তার অঙ্গাবরণ একমাত্র বাকলটি পড়ে আছে নদীর কিনারে। ভোরবেলাকার সূর্যের সিঁদুরে-সোনার মত মেয়েটির গায়ের রঙ! রাজা লজ্জা পেলেন, নিজের উপস্থিতি জানাবার জন্য গাছের আড়ালে গিয়ে কাশলেন। তবু মেয়েটি বিচলিত হল না। বিরক্ত হয়ে রাজা বেরিয়ে এলেন গাছের আড়াল থেকে। মেয়েটি চোখ তুলে এবার তাকালো তাঁর দিকে—কিন্তু লজ্জা পেলে না।

রাজা এবার রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলেন—মেয়েটি যেন তাঁকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করছে না। বললেন : তুমি কি রকম মেয়ে? এভাবে নির্লজ্জের মতো স্নান করছ আমাদের সামনে?

মেয়েটি বললে : বনমোরগ তোমাদের বারণ করেনি চোখ খুলতে?

রাজা সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন : তুমি এত নির্লজ্জ কেন?

মেয়েটি বললে : আমার লজ্জা পাওয়ার কি আছে? আমি তোমাদের মায়ের মতো। তোমাদের উচিত মোরগের কথামতো চোখ বুজে জলপান করে চলে যাওয়া।

রাজা হেসে বললেন : মায়ের মতো? তুমি বয়সে আমার রানীর চেয়ে বড় হবে না—তুমি আমার মায়ের মতো হলে কি হিসাবে?

মেয়েটি বললে : আমার স্বামী পৃথিবীর পিতা। তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়ে আমি জগজ্জননী হয়েছি—তোমরা সকলেই আমার সন্তান।

শুনে রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন। রাজবয়স্য এই মওকায় একটা আদিরসাত্মক রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলেন না। শুনে সকলেই দ্বিগুণ জোরে হেসে ওঠে!

জ্বলে উঠল মেয়েটির দু চোখ। বললে : আমি রাজার কন্যা, রাজার ঘরনী,—ভাগ্য-দোষে আজ আমি বল্কলধারিণী। আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই—তাই মোরগকে পাহারায় রেখে আমি স্নান করছিলাম। তোমরা সতীনারীর অপমান করেছ, তাই তোমাদের অভিশাপ দিলাম—আমাকে যে অবস্থায় দেখে তোমরা রসিকতা করলে বংশ-পরম্পরায় তোমাদের সেই অবস্থায় থাকতে হবে!

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজা দেখলেন তিনি সসৈন্য বস্ত্রহীন হয়ে পড়েছেন! পরিধেয় বস্ত্রগুলি উধাও হয়ে গেছে! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজা। বুঝলেন, ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী! তখন তাঁরা সকলে মিলে মেয়েটির স্তবস্তুতি শুরু করলেন।

শেষ পর্যন্ত মেয়েটি সন্তুষ্ট হয়ে বললে : তোমাদের অনুশোচনা দেখে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু অভিশাপ খণ্ডাবার উপায় আমার জানা নেই। তবু তোমাদের শুধু নিম্নাঙ্গ আবরিত করবার অনুমতি দিয়ে গেলাম। ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরিত করলে তোমাদের গায়ে ফোস্কা পড়বে, চামড়া ফেটে যাবে—তোমরা সবংশে মরে যাবে।

বুড়ো সর্দার সাহেবকে তাই বলেছিল : তাই তোকে বলেছিলাম সাহেব! আমাদের জামা দিস্ না, কাপড় দিস্ না! তুই শুনলি না সে কথা। তাই আমাদের গায়ে ফোস্কা পড়ল, চামড়া ফেটে ফেটে গেল—আমাদের গাঁও উজাড় হয়ে গেল।

পাঁড়েজির গল্প শুনে বললাম : ভারী মজার গল্প তো! কে জানে হয়তো এই তামাশা নদীতেই স্নান করছিল সেই মেয়েটি!

মিত্রমশাই বললেন : হিস্ট্রি রিপিট্‌স্ ইট্‌সেলফ্। আমরাও প্রায় মালিকানাগিরির রাজার মতো আজ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি এই তামাশা নদীর তীরে। আর কী আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন, আমরাও আজ সাক্ষাৎ পেয়েছি স্নানরতা বিবসনার! তাতে আমরাই লজ্জা পেয়েছি—ওরা পায়নি।

পাঁড়েজি হাত দুটি কচলে বললে : এ রাজ্যের নাম মালিকানাগিরি নয় সাহেব, মল্লিকানগরী—তুলসীদাসজির গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে! আর নদীর নামও তামাশা নয়—তমসা! অধীনের গোস্তাকি মাপ করবেন গরীবপরবর—যে মেয়েটি এদের অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং সীতামাঈ!

TAMASA তামাশা তমসা! সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল আমার। কল্‌কল্ কল্লর বয়ে চলেছে সম্মুখে খরস্রোতা বন্য-স্রোতস্বিনী। মাথার উপরে চেয়ে দেখলাম না, সেই কাঁ-কাঁ-করা ক্রৌঞ্চবকটি মিলিয়ে গেছে দূরে নীলাকাশের নিঃসীমায়। আচমকা হাওয়া উঠেছে একটা শালমহুয়ার বনে। সিরসির করে কি যেন কানাকানি স্পষ্ট বোঝা যায় না, কি জানি, যদি পাঁড়েজির মতো বিশ্বাসের জোর থাকতো তা হলে হয়তো সেই বনমর্মরে কান পেতে শুনতে পেতাম কয়েক সহস্রাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসা আদিমতম শ্লোকের প্রতিধ্বনি : মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ!

পরিভাষা ও বিজ্ঞান

অশোককুমার দত্ত

॥ এক ॥

শব্দ যেন এক ধরনের দীপ্তি ছড়ায়। দীপশিখার আলো যেমন। অন্ধকার পটভূমিতে প্রদীপের আলো বিস্তৃত থাকে। কথার মানেও তেমনি—আলোর পরিধির মত, স্পষ্ট কোন সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কখনো বিস্তৃত হচ্ছে, অন্য সময় বা ঈষৎ পরিবর্তিত। কথাগুলির মধ্যে যেন একটা স্থিতিস্থাপক গুণ রয়েছে। রচয়িতার প্রয়োজনে পড়ে শব্দের অর্থ বায়ুকম্পিত দীপশিখার মতই বারবার স্পন্দিত হয়। বিজ্ঞান প্রযুক্ত শব্দগুলি কিন্তু অপরপক্ষে স্থির অর্থবাহী। পরিভাষারে মানে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে, সুনিপুণ ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নির্দেশে তা স্পষ্ট থাকে। আমাদের সচরাচর ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার এ হলো মূল তফাত। শিথিল অর্থপ্রয়োগ বিজ্ঞানের প্রখর যুক্তিধর্মিতার রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা। বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে সার্থকভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বিশেষ অর্থপ্রযুক্ত শব্দের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

॥ দুই ॥

আমাদের সাধারণ প্রচলিত কথাগুলির মধ্যেও বিজ্ঞান তার পারিভাষিক অর্থ আরোপ করে। শব্দ তখন আলাদা একটি দৃঢ় অর্থ নিয়ে প্রকাশ পায়। সাধারণ শব্দার্থের সঙ্গে তার একটা মিল থাকে, কিন্তু এই মিলটুকু অতিক্রম করেই বিজ্ঞানের বইয়ে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে তার প্রতিষ্ঠা। আলোর কথাই ধরি না। আলো বলতে আমরা রামধনুর সাতটি রঙের বর্ণালী দেখেই খুশী হয়েছি। বিজ্ঞানের অসীম জিজ্ঞাসাবোধ আরো গভীর রহস্যের সন্ধানে ফিরেছে। আলোতে আমরা দেখি, কিন্তু রাত্রি যখন গভীর সেই অন্ধকারেও তো বিচিত্র আলোর মেশামেশি। সব আলো আমাদের চোখে দেখার অনুভূতি জাগায় না। অথচ সাধারণ আলোর সঙ্গে তাদের প্রকৃতি-সাম্য। আলু এবং টম্যাটো যেমন সমশ্রেণীর, একস্-রে অতিবেগনী বেতার-তরঙ্গ—এদের প্রত্যেকেই তেমনি বিভিন্ন রূপে আলো। বৈজ্ঞানিক অর্থে আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে তরঙ্গ বিস্তার, আমাদের দেখার কাজে আসছে কিনা তা গৌণ বিবেচনা। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে আলোর অর্থ এভাবে বিস্তৃত হয়েছে। স্পষ্টতই, তা এখানে একটি পারিভাষিক শব্দ। বেগ এমনি আর একটি পরিভাষা। বেগের মানে বলতে আমরা যা বুঝি, বৈজ্ঞানিক ধারণায় তা ঠিক নয়। বল এবং শক্তির মধ্যে যে প্রভেদ, সহসা তা আমাদের চোখে পড়ে না। বিজ্ঞানীর চিন্তায় তারা পৃথক অর্থ নিয়ে প্রদীপ্ত হচ্ছে। ক্ষমতা বলতে কি বুঝবো? সামর্থ্য নিশ্চয়ই নয়। বিজ্ঞান তার প্রয়োজনে আলাদা একটা অভিধান তৈরি করে নিয়েছে। যে ভাষাতেই চর্চা করি না, সহজ পরিচিত সীমার বাইরে তার একটা গণ্ডী টানা রয়েছে। সাধারণ ভাষার মধ্যেও আলাদা একটা ভাষা যেন—এই বিজ্ঞানের ভাষা। বিজ্ঞানের বিশেষ কলাকে বজায় রাখতে গিয়ে এভাবে ভাষার একটা আলাদা রূপ দিতে হয়েছে।

॥ তিন ॥

কিন্তু সাধারণ কথায় পারিভাষিক অর্থ-যোজনা করেই বিজ্ঞানের এই বিপুল প্রকাশ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হয় না। সমস্ত জাগতিক ঘটনাকে সম্ভাব্য যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করা বিজ্ঞানের মস্ত উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে যা কিছু আমাদের সাধারণ ধরা-ছোঁয়া আয়ত্তের বাইরে, যা অসীম রহস্যময় তার প্রতিও মানুষের জিজ্ঞাসাবোধ নিয়োজিত করা চাই। সব মিলিয়ে এ হলো বিজ্ঞানের সুবিপুল কর্মকাণ্ড। সাধারণ কথাগুলি, সাধারণ উদ্দেশ্যে যাদের প্রয়োগ বিজ্ঞানের এই অসামান্য জগতে এসে তারা যেন দিশাহারা হয়ে যায়। নিজের অর্থের সীমানাকে চিনতে না পেরে এক জটিল অরাজকতার সৃষ্টি করে। শব্দবোধ তাই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানেই সমস্যার সমাধান নয়। খুব সম্ভব সাধারণ ভাষা বিকাশের সময় থেকেই বিজ্ঞান-বোধ মানুষের মনে অঙ্কুরিত ছিল। কিন্তু সাহিত্যের কলাকৌশল সেই প্রথম অবস্থাতেও মানবীয় অনুভূতির প্রকাশে যে পরিমাণে নিপুণ ও সূক্ষ্মধর্মী, বিজ্ঞানের প্রকাশপদ্ধতি অপরপক্ষে সংখ্যা আবিষ্কার এবং সাধারণ জ্যামিতিক রেখাচিত্রের বাইরে, উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে পারে নি। ভাষার ভারসাম্য তাই বিচলিত হল। কবিতার সফলতা হেতু সাহিত্যিক ভাবনা ও মন মানুষের সমস্ত প্রকাশকর্মের মধ্যেই সুস্পষ্ট প্রভাব এঁকে দেয়। ভাষা গঠনের প্রথম পর্যায় থেকেই এভাবে আমাদের প্রকাশ-পদ্ধতি সাহিত্যিক প্রয়োজনে অধিকতর প্রস্তুত ও যোগ্য হয়ে ওঠে। বর্তমানে সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের জ্ঞানের সীমানা সহস্রগুণ প্রসারিত হয়েছে। ভাষার উপর তাই ঘা পড়েছে। বিজ্ঞানের সমস্ত তাত্ত্বিক উপলব্ধিকে মানুষের কাছে হাজির করার মত পরিসর কোথায়। সাধারণ পরিচিত কথায় বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আরোপ করেই তা যথেষ্ট হয় না। বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনে উপরন্তু নূতন নূতন অনেক কথা তৈরি করে নিতে হয়েছে। সেই সঙ্গে গণিতের অবদান অবশ্য আছে। সংখ্যা ও চিহ্ন প্রয়োগে তার বিচিত্র প্রকাশ-পদ্ধতি, চিত্রের মত গণিতের আবেদন সারা ভাষাভাষীর পক্ষেই। তবে উপযুক্ত ব্যাখ্যার জন্য পরিভাষাবহুল সাধারণ ভাষার কিছু ব্যবহার থাকে। মোট কথা, গণিতের বাঁধনের মধ্যে বিজ্ঞানের অনেক জটিল তত্ত্ব প্রকাশযোগ্যভাবে গড়ে উঠেছে, সাধারণ পারিভাষিক কথার গণ্ডীতে যা কোনদিনই ধরা পড়তো না। গণিত এভাবে বৈজ্ঞানিক প্রকাশের সমস্যাকে অনেকটা লঘু করেছে, কিন্তু বহুবিস্তৃত বিজ্ঞানের রাজ্যে সব-কিছুই গণিতের আয়ত্তে আসে না। পরিভাষার প্রয়োজন তাই রয়ে গেছে। বস্তুত, বিজ্ঞানের পরিধি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যতই প্রসারিত হচ্ছে পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনও ততই বৃদ্ধির মুখে। তত্ত্ব সন্ধানের মত বিজ্ঞানের যুক্তিধারাকেও মানব-মনের কাছে প্রকাশশীল করে তোলা এক মস্ত সমস্যা। মানুষের প্রত্যুৎপন্নমতি এ পর্যন্ত তার সমাধান যুগিয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অভিধানগুলির আয়তনও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বর্তমানে জগৎব্যাপী যে ব্যাপক বিজ্ঞান আলোচনা তা প্রধানত চার কি পাঁচটি মাত্র ভাষাতেই সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য, ইংরেজীর স্থানই সর্বপ্রধান, পঞ্চাশ ভাগ। বিজ্ঞান আলোচনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্যে সামান্য একটি অংশ মাত্র পৃথিবীর প্রধান কয়টি বিজ্ঞান-ভাষার পক্ষে সাধারণ। অধিকাংশ শব্দই ভাষাবিশেষের প্রকৃতিগত হিসাবে তৈরি হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই প্রকাশের সমস্যা প্রতিটি ভাষার পক্ষেই পৃথক এবং সংযোগহীন।

ভাষা বিকাশের পক্ষে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। লক্ষ করার বিষয়, ইতালিয়ান

প্রভৃতি ভাষা যথার্থই অগ্রসর থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তত্ত্বগুলির অনুশীলনে অনেক ক্ষেত্রেই সংযোগহীন। পঞ্চাশ বছর আগেও বিষয়টি সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ছিল। সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে ভাষার গতি নিশ্চয়ই রুদ্ধ হয়ে পড়ে নি। আসল কথা, প্রকাশের দাবি বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজন সর্বদাই বাড়তির মুখে। এমন অবস্থায় আশ্চর্য কি যদি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ফরাসীর ন্যায় গুণান্বিত ভাষাতেও অনুরূপ সীমাবদ্ধতা এসে পড়ে। শুনতে পাই, ইতিমধ্যে তার সূত্রপাতও দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে দ্রুত হারে বিস্তৃত হচ্ছে, ইংরেজী ও রুশ ছাড়া তৃতীয় ভাষা জার্মান যদি তাল দিয়ে থাকতে পারে যথেষ্ট হলো। গবেষণাপত্রের সংখ্যা বিজ্ঞানের উন্নতির পরিমাপক নয়, কিন্তু এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক জগতের সুবিপুল কর্মকাণ্ডের পরিমাণ নির্দেশ করে। সাম্প্রতিক হিসাবে জানা যায়, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সারা পৃথিবীতে শুধু গবেষণাপত্রই প্রকাশিত হয় প্রতি সপ্তাহে প্রায় বিশ হাজার। বলা বাহুল্য, একমাত্র অনুবাদের উপর নির্ভর করে ইংরেজীভাষী বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও নিজস্ব বিষয়ে সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর সমস্ত খোঁজ রাখা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞান আলোচনার উচ্চতর পর্যায়ে বহু ভাষার চর্চা অনেক দিন আগেই শুরু হয়েছে।

॥ চার ॥

এমন অবস্থায় বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সমস্যাগুলি স্পষ্ট আকার নিয়ে ধরা দেয়। কিন্তু সমস্যা যতই কঠিন হোক না, মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি অস্বীকার করা যায় না। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সারা দেশে প্রসার করার পক্ষে মাতৃভাষাই শ্রেষ্ঠ সহায়। বিজ্ঞানের সত্যগুলি সাধারণ জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকেই আশ্চর্য সুনিপুণতায় ফুটে ওঠে, তাই সে সম্বন্ধে মূল ধারণা শিক্ষার্থীর সর্বাধিক পরিচিত ভাষাতেই সহজে হয়ে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ভাষাগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ বিজ্ঞান আলোচনার পক্ষে অপ্রস্তুত ছিল। বাংলায় শুভসূচনা অবশ্য অনেক আগেই। অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল ও জগদীশচন্দ্রের হাতে বিজ্ঞানচর্চার প্রাথমিক কাজ পাকাপোক্তভাবেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বা জগদানন্দের সাধনা সত্ত্বেও বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা অব্যাহত ধারায় অনুষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে আবার এ বিষয়ে শিক্ষিতজনের নজর পড়েছে। রাম না জন্মাতে রামায়ণের স্বপ্ন যারা দেখেন তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু ভাষা বিকাশের পক্ষে যা সত্য, প্রয়োজনের টানেই তা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর্তমান পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বিজ্ঞানচর্চা মাতৃভাষাতেই সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতি পাওয়ার মূলেই উপযুক্ত গ্রন্থ রচনার কারণ নিহিত আছে। সে সঙ্গে সীমাবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতির বাইরেও বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। সাময়িক পত্রগুলিতে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের প্রকাশ একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধুমাত্র বিজ্ঞানকে উপজীব্য করে পত্রিকা গঠন আজ আর বিরল ঘটনা নয়, একাধিক পত্রিকা বাংলা ভাষায় এ উদ্দেশ্য সাধন করছে। মৌলিক গবেষণার কাজ প্রকাশ করা সম্ভব কিনা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে তা পরীক্ষা করে দেখেছেন।

অনুশীলনের ফলে ভাষার প্রকাশকৌশল আরো সাবলীল হবে। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কপালকুণ্ডলা রচনা করেন বাংলা গদ্যের লেখ্য রূপ নিয়ে বিতর্কের অবধি ছিল না। কিন্তু সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থার কী অভাবনীয় পরিবর্তনই না হলো, সাহিত্যের সাধারণ ছাত্রেরও তা অজানা নয়। প্রতিভা ও অনুশীলনের সম্মিলিত প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক প্রকাশের ধারা অবশ্য সাহিত্য রচনার সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবু প্রকাশ যখন তাকে করতেই হয়, কতক বিষয়ে মিল স্বাভাবিকভাবেই হাজির থাকে। বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে যে সমস্যা সর্বপ্রধান হয়ে দেখা দেয় তা হলো পরিভাষা। বিস্তৃতগর্ভ বিজ্ঞান, তার অভিনব বিষয়গুলি প্রকাশের জন্য চাই উপযুক্ত শব্দসম্ভার। অনেকে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এর উত্তর খোঁজেন। সংস্কৃত ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে মাতৃ-সমান, তাতে বিভিন্ন প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ করে অপর্যাপ্ত শব্দ গঠন করা সম্ভব। হিন্দী ভাষা এ দিকেই ঝুঁকেছে। ভারত সরকারও এ বিষয়ে আনুকূল্য দেখাচ্ছেন। ডঃ রঘুবীরের সম্পাদনায় ইতিপূর্বেই একটি অভিধান পরিভাষা কোষ প্রকাশ হয়েছে, প্রত্যক্ষ সরকারী উদ্যমে সম্প্রতি আরো লক্ষাধিক শব্দ তৈরি হলো। নূতন ভাবনা রূপ দেওয়ার চেষ্টায় নূতন নূতন শব্দ আবিষ্কার বা রচনা করা ভাষাবিশেষজ্ঞের পক্ষে অবশ্যই কৃতিত্বের কথা। কিন্তু বিষয়টি যেখানে দুঃখবহ তা হলো এই যে, এ সমস্ত বিচিত্র শব্দ পাণ্ডিতদের সৃজনী প্রতিভার গুণে সাধারণের কাছে বিদেশী ভাষার মতই অপরিচিত। বরং তার থেকে কিছু বেশী। 'প্রোক্ষা' কথাটার সঙ্গে একটি অপরিচয়ের বিস্ময় আমাদের ঘিরে ধরে, কিন্তু উত্তরার মত যা জোরে ছোটে তা হলো সেই রকেট। প্রোক্ষা রকেটের শাস্ত্রীয় প্রতিশব্দ। ব্লিচিং পাউডার কথাটা আমরা অনেকেই জেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু বিরঞ্জন চূর্ণ না বললে নাকি ঘোরতর ভাষাদুষ্টি। ভারতীয় অর্থনীতি বিকাশে বিদেশী যন্ত্র ও শিল্প-দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, কিন্তু ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে সহজ সত্যকে গ্রহণ করতে পারিনি। বাতাসে অক্সিজেন পুরোমাত্রায় থাকে না, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা আমাদের জীবনধারণের বিঘ্ন নয় বরং সব দিক দিয়েই অনুকূল, প্রকাশ-কৌশলের মধ্যেও তেমনি এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় প্রবেশ করে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব পাশ্চাত্য দেশে, তার চর্চায় আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির ভাঁড়ারে বহু নূতন কথার আমদানি হবে এটাই স্বাভাবিক। জাতীয় গৌরবের মোহে তা গ্রহণে আপত্তি তোলা হীনমানসিকতারই পরিচায়ক। বিজ্ঞান জ্ঞানের মার্গে মানুষের মিলন ঘটিয়েছে। এক সময় প্রশাসনিক প্রভাবে প্রচুর আরবী ও ফারসী শব্দ ভারতীয় ভাষাগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু আজ তা বিজাতীয় বৈষম্য হারিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছে। আমাদের সাধারণ আলাপ-আলোচনায় ইংরেজীর যে কতখানি প্রভাব, অনেক সময়েই সে বিষয়ে সচেতন থাকি না। আসল কথা, ছুৎমার্গকে বাদ দিতে হবে। ময়লা বাছতে গেলে কয়লার এক কণাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইংরেজী পরিভাষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। পরমাণু রি-অ্যাক্টরের নাম 'অপ্সরা' রাখলেই যেমন তার বিদেশী যন্ত্রপাতির পরিচয় গোপন থাকে না, পাণ্ডিতনির্দিষ্ট 'জাতীয়' পরি-ভাষাগুলিও তেমনি বিজ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশে সফল হয় নি। অপরিমেয় অর্থ ও মনীষা ক্ষয় করে ভাষার ক্ষেত্রে শুধু বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করেছে।

॥ পাঁচ ॥

সামঞ্জস্যবোধের মধ্য দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। গণিতের প্রয়োগ ভাষার গণ্ডীকে মুছে দিয়েছে। কিন্তু তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ, এবং উচ্চতর পর্যায়েই নির্দিষ্ট। রাসায়নিক জিনিস ও জীবজন্তুর নামে যে অসংখ্য পরিভাষা গল্পের নায়কদের নাম-করণের মত তা ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রকাশমাত্র নয়। বরং উপযুক্ত বিবেচনা ও সম্মিলিত চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে সমস্ত বিষয়টি যুক্তি-শৃঙ্খলার বাঁধনে অটুট হয়ে উঠেছে। এক ইলেকট্রন কথাটাই ধরি না। জনস্টোন স্টোনি ১৮৭৪ সালের এক বক্তৃতায় প্রথম ইলেকট্রন কথাটির উল্লেখ করেন। বিচিত্র-ধর্মী ক্যাথোড রশ্মি তখন সবে আবিষ্কার হয়েছে। বৈদ্যুতিক ধর্ম নির্বিশেষে ক্ষুদ্র কণামাত্রকেই স্টোনি ইলেকট্রন বলেছিলেন। কথাটাও এসেছে গ্রীক ইলেকট্র থেকে, যার মানে অম্বর, সূর্য। সংস্কৃত উল্কা শব্দটির সঙ্গেও নাকি তার নিকটসাম্য। যা হোক, কালক্রমে ইলেকট্রন নেগেটিভধর্মী পরমাণু-কণাকেই বোঝাতে শুরু করলো। প্রতিটি পরিভাষার এমনি বিচিত্র ইতিহাস। তাতে বিশেষজ্ঞজনের চিন্তার ছাপ এসে পড়েছে। ক্রমে তার অর্থ একটি সূক্ষ্ম রেখার বাঁধনে নির্দিষ্ট হয়েছে, বিশেষ কোন অর্থের বাহন হিসাবে বৈজ্ঞানিক অভিধান স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের যে দিকগুলি আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত সাধারণ জগৎ থেকে গড়ে ওঠে, তার আলোচনাতেও দেখি সেই অজ্ঞাতপূর্ব পরিভাষার ব্যবহার। সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যকে বজায় রাখতে গিয়ে তা প্রয়োজন হয়েছে। ইংরেজীতে জলের উপযুক্ত প্রতিশব্দ আছে, কিন্তু রসায়নের বইয়ে যে কথাটি প্রায়শই ব্যবহার হয় তা হলো হাইড্রোজেন মনো-ক্সাইড। সাধারণ জিনিসের এমন একটা অদ্ভুত নামকরণে অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানেরও যিনি অধিকারী এমন একটা দুরূহ শব্দের মধ্যেও তিনি যুক্তিধর্মী মনের সরলতা লক্ষ্য না করে পারেন না। অনর্থক শব্দ বিস্তারই পরি-ভাষার উদ্দেশ্য নয়, জলের পরিভাষা জলের

গঠন ও দ্রব্যগুণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দেখিয়েছে।

তবে কি আমরাও বাংলায় জলকে হাইড্রোজেন মনোক্সাইড বলবো। নিশ্চয়। সেই সঙ্গে বিবেচনার দিকও রয়েছে। জালকে সোজা কথায় জাল বা 'নেট' না বলে আবার Reticulated vein dicasseted at regular intervals. এর মত কোন আজব জিনিস না হয়ে পড়ে। 'হাইড্রোজেন মনোক্সাইড' একটি স্বাদহীন গন্ধহীন বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ। স্বাদহীন হলেও তা আমরা গ্রহণ না করে পারি না। বস্তুত, হাইড্রোজেন মনোক্সাইড ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না, এজন্য তার অপর নাম জীবন। পৃথিবীতে হাইড্রোজেন মনোক্সাইড অপর্যাপ্ত রয়েছে। ভৌগোলিক ভাগ-বাঁটোয়ারায় এক ভাগ স্থল ও তিন ভাগ 'হাইড্রোজেন মনোক্সাইড।' —কিন্তু এ কথা বলার পরেও এটি যে কি বস্তু তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে, তা যে সামান্য জল মাত্র এটুকু জানলে অনেক বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। আসলে বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ আমরা প্রকৃতির কাছ থেকেই অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করে থাকি। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পরিচিত জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতাই বিশেষভাবে নূতন ভাবনায় বিশিষ্ট ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। এখানে বিজ্ঞানের জগৎ শিক্ষার্থীর নূতন করে দেখার জগৎ। জলকে তাই আমরা সম্ভবক্ষেত্রে জলই বলবো, হাইড্রোজেন নয়। Tricothensis Dioira বলে ছাত্রের মনে কেন আতঙ্কের সঞ্চার করি, তার থেকে বরং পটলই বলি না। সোনাকে সোনা বললেই যথেষ্ট, বিজ্ঞানের প্রারম্ভিক স্তরে Gold বা Aurum বলার প্রয়োজন দেখি না। তাই বলে উদ্‌জান চলবে না, হাইড্রোজেনই বলবো বরং, অঙ্গারাম্ল নয়, কারবন-ডাই-অক্সাইড। এ সমস্ত কথা পরিভাষা গঠনের উৎসাহে তৈরি, আমাদের ভাষায় স্বাভাবিক বা পরিচিত নয়। অসংখ্য রাসায়নিক দ্রব্যের কয়টিতে আমরা স্বদেশী নামের চাদর জড়াতে পারি। কারবন-ডাই-অক্সাইড —অঙ্গারাম্ল, মনো-অক্সাইডকে বলি কি? রাষ্ট্রীয় মর্যাদার যে উঁচু আসনেই প্রতিষ্ঠা পাক না, হিন্দীর অন্ধ অনুকরণে আমরা প্রস্তুত নই।

প্রতিফলন, না Reflection? প্রতিফলন। আলোকে আলো বলি, না Light? Speed-এর বাংলা দ্রুতি চলতে পারে, বলি কোনটা? বেগ, না Velocity? শব্দ, না Sound? বলবো বাংলাতেই। কথাগুলি এখানে জীবজন্তু বা রাসায়নিক পরিভাষার সমশ্রেণীর নয়, সাধারণ পরিভাষার কিছু ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানের বিশেষ ধারণাকে তা প্রকাশ করছে। শিক্ষার্থীর মনে যথার্থ বিজ্ঞানবোধ জাগরিত করতে হলে এ সমস্ত বিমূর্ত বিষয়ের পরিচয় মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হবে। এই বোধসঞ্চারই প্রধান কথা। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী অনেক কথাই তৈরি হবে। ভাষা তার স্বাভাবিক বিকাশের পথেই শব্দকে আকর্ষণ করে নেবে। স্বদেশী কথার অভাবে ইংরেজী ভাষার অপর্যাপ্ত ভাণ্ডার তো রয়েছেই।

কিন্তু বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র যতই প্রসারিত হোক না, উচ্চতর পর্যায়ে ভিন্ন ভাষার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে। বর্তমানে স্কুলের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত যার অবাধ সঞ্চার, ক্রমে তা কলেজ অবধি বিস্তৃত হবে। ঐশ্বর্যময়ী মাতৃভাষার সম্ভাবনাকে কাজে লাগালে তা নিশ্চই দীর্ঘদিন অসাধ্য থাকবে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে মাতৃভাষার চর্চা নিয়েই থাকে দারুণ সংশয়। গবেষণার কথা বাদ থাক। অনেক বহুবিস্তৃত ভাষাতেও এ কাজ সব সময় সার্থক হয় না। কিন্তু ইংরেজী ভাষাভাষীর পক্ষে যেখানে ভিন্ন ভাষার চর্চা একমাত্র উচ্চতম পর্যায়ে গবেষণার জন্যই দরকারী, আমাদের ক্ষেত্রে সেখানে তা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মাতৃভাষার এত অনুশীলনের পরেও শিক্ষাদানের বিষয়ে সামান্য কয়েকটা ধাপ অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে মাত্র। কিন্তু আপাতত যা সাধারণ তার মধ্যেই সফলতার আশ্চর্য সোপান লুকিয়ে আছে। এতদিন যখন বিদেশী ভাষার চর্চা ছিল, বিজ্ঞানের নানা ভাবনার জগতে এসে শিক্ষার্থীর অপরিসীম বিস্ময় পদে পদেই হোঁচট খেয়ে মরতো। মাতৃভাষার দৌলতে সে দুরবস্থা গেছে। পরিভাষাগুলি এখানেও বোধ হয় তার পরিচিত নয়— কিছু বাংলা কিছু সংস্কৃত, কিছু বা ইংরেজী —কিন্তু সব মিলিয়ে একটি পরিচিত ভাষাপরিবেশ অকূল রহস্যের মধ্যেও জানবার আগ্রহকে উদ্বেল করে তোলে। বিজ্ঞানের অভিনব চিন্তাগুলি মনকে কখনোই বিমূঢ় করে না, প্রথম থেকে তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

বিজ্ঞানের ধারণাগুলি মনের গভীরে শিকড় বিস্তার করে। কিন্তু "পাতনো" দেওয়া ধানের চারার মত শীঘ্রই তার "রোয়া"র দিন এসে যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই আমাদের ছাত্রকে বিদেশী ভাষার জগতে প্রবেশ করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে সমস্ত পরিভাষাকেও নূতন করে আয়ত্ত করে নিতে হয়। মাতৃভাষার শিক্ষায় যে সমস্ত পরিভাষা তার পরিচিত ছিল, বিদেশী ভাষায় তার অধিকাংশই অনধিগম্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে তাই দু দুটি ভাষার শব্দকে আয়ত্ত করতে হবে। শিক্ষার গতি কিছু ব্যাহত হচ্ছে বটে, কিন্তু পরিভাষাই বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা নয়। আসল কথা, বিজ্ঞানের ধারণাগুলি আয়ত্তে আনা। মাতৃভাষার মাধ্যমেই তার ভিত্তি তৈরি থাকে। বৈজ্ঞানিক বোধ স্পষ্ট থাকার জন্যই সাধারণ গবেষণাকর্মীর পক্ষেও একাধিক ভাষায় তত্ত্বালোচনা সহজ এবং সম্ভব হচ্ছে।

পরিভাষার গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু আমরা যেন তার অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। ভারতীয় ভাষাগুলিতে পরিভাষার একান্ত অভাব, তাই এর কারণ। ভাষার প্রস্তুতি পর্বে এ অভাবই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে আমাদের আরো মনোযোগী হতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিভাষাই একমাত্র কথা নয়। সাধারণ পরিচিত কথাগুলিই রচনার প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে। পরিভাষার পশ্চাতে পটভূমি যেন। তাদের ব্যবহারে অমনোযোগী হওয়ার কথা নেই। বরং তা যেন ফুটে ওঠে পরিভাষার মতই অপরিসীম যত্নে, সাহিত্য রচনার মত অকূল রহস্যের সন্ধানে। মোট কথা, ভাষার ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা চাই। এখানেই মস্ত পরীক্ষা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন অভিধানে শব্দের ঘাটতি না থাকলেও রচনার সমস্যা অন্যভাবে দেখা দেয়, তেমনি পরিভাষা কোষ সম্পূর্ণ হলেই বিজ্ঞান আলোচনার সমস্ত দিকের পূরণ হয় না। পরিভাষা প্রথম ধাপ, রচনা পরে আসে।

(১১)

তাঁর সম্পর্কে কোথায় কি আলোচনা হয়, কে কি টিপ্পনি কাটে, কিছুই কানে পৌঁছয় না গিরিজাপ্রসাদের। তবু একটা ব্যাপার তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য করেন। গ্রামের লোকরা প্রথম প্রথম তাঁকে যতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখতো, যতখানি সম্মান করে কথা বলতো, ইদানীং আর তেমনটি করে না। কখনো কখনো অবশ্য ভাবেন, এ তাঁর মনের ভুল। আবার এক-এক সময় ব্যবহারের পার্থক্যটা চোখে পড়ে যায়।

কথায় কথায় আগে অনেকেই আসতো যুক্তি-পরামর্শ নিতে। সরকারী আপিস থেকে সারের দাম মেটাবার নোটিশ এলে, কিংবা নতুন আইনের নির্দেশ অনুযায়ী জমিজমার রিটার্ন দিতে হলে একবার গিরিজাপ্রসাদের উপদেশ নিয়ে যেত অনেকেই।

অবশ্য এখনো আসে কেউ কেউ, তবে দু-পাঁচ মিনিটের জন্যে সে শুধু মুখটা দেখিয়ে যাওয়া। আর তেমনভাবে দু' দণ্ড বসে গল্পও করতে চায় না। পরামর্শও চায় না।

তবু বাংলা বাড়ির উঁচু দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসেন গিরিজাপ্রসাদ প্রতি সন্ধ্যায়, হ্যাজাক বাতিটা এক সময় সামনে রেখে দিয়ে যায় টিয়া, আর বিমলা নয়তো কমলা চা করে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে দিয়ে যায়। গিরীনের সঙ্গে একদিন খরচপত্তর নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হওয়ার পর থেকে চায়ের পাটটা পৃথক করে নিয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ। চা-চিনির খরচ নিজেই যোগান, চা তৈরীর ভারও নিয়েছেন নিভাননী। কিন্তু তার পর থেকেই বাংলা-বাড়ির লোকদের জন্যে ঢালাও চায়ের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে।

তবু গোপেন মোড়ল কি বংশী এলে কোন কোনদিন চা দিতে বলেন গিরিজা-প্রসাদ। আর চায়ের লোভেই হয়তো গোপেনও একবার করে আসে।

কিন্তু অন্য লোভও বোধ হয় ছিল গোপেনের। সুযোগ বুঝে কথাটা একদিন পেড়েই ফেললে ও।

বংশী বলছিল, কড়ি-বরগগুলো এবার সারাও গিরিদাদা। লোকে বলবে কি, এত বড় মানুষটা, তার কি না ঘর-দুয়োরের এই অবস্থা! পিলপিল করে ডোরা বেরুচ্ছে গর্ত থেকে......

বলে মাটির দেয়ালের একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখালে বংশী। সত্যিই সেখান থেকে সারি সারি কালো কালো মাথাভারী ডেঁয়ো পিঁপড়ে বের হচ্ছে।

বংশী বললে, কত কাল যে মাটি পড়েনি দেয়ালে মেঝেতে, চাল ছাওয়া হয়নি!

গিরিজাপ্রসাদ ঈষৎ রুষ্ট গলায় বললেন, সে-কথা বললেই তো রাগ হবে ভাইয়ের আমার!

বংশী হেসে বললে, তা তুমিই এবার ব্যবস্থা করো কাকা। কপাট, কাঠের কড়ি, বরগা যা দরকার, উদাসকে বলো, আনিয়ে দেবে, ওর চেনা দোকান আছে......

—কাঠের যা দাম আজকাল। আগুন একেবারে। সুযোগ পেয়েই গোপেন বললে।

বংশী হেসে বললে, সে তোমার লোহা, কাঠ, সিমেন্ট সবই তাই। ধানের দর বেড়ে কোন লাভ হলো না গো, চাষীর ঘরে যে অভাবের, সেই অভাবেই রয়ে গেল।

গোপেন বললে, তা ঠিক, এখন টাকা শুধু ব্যবসায়, পেতাম কিছু টাকা, কাঠের গোলা খুলে দিতাম তোমার বলগনায়!

গোপেনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা বুঝলেন না গিরিজাপ্রসাদ, তাই চুপ করে রইলেন। হয়তো বা এখনো তাঁর মনের মধ্যে বংশীর কথাটাই ঘুরছে। স্বপ্ন দেখছেন দক্ষিণ-দুয়োরী ঘরখানার পাশের জমিটুকুতে আরো দু'খানা ঘর তোলার। বড় ছেলে অনিমেষ যদি ছুটি নিয়ে দু-পাঁচ দিনের জন্যেও আসে, বউমাকে, ছেলেমেয়েকে নিয়েই যদি আসে, তো শুতে দেবার ঘর নেই একখানা। তাছাড়া নিজেরাই বা ঐ পোড়ো ঘরখানায় মাথা গুঁজে থাকবেন কেন? তাই দু'খানা ঘর তোলার ইচ্ছে গিরিজা-প্রসাদেরও। কিন্তু সামান্য যা টাকা আছে, তা ভেঙে চালাবেন কি করে? সারা জীবন বাকী রয়েছে এখনো, কতদিন বাঁচবেন কে জানে! তাছাড়া অমরেশের পড়াশোনার খরচ, মেয়ে দুটির বিয়ে—স্ত্রীর জন্যেও তো কিছু ব্যবস্থা রেখে যেতে হবে।

কয়েকদিন থেকেই ইচ্ছে হচ্ছে গিরীনকে কথাটা বলার। জমির আয় থেকেই তো করা উচিত এ-সব।

এমনি সব সাত-পাঁচ কথা ভাবছিলেন, বংশী এক সময় বললে, যাই, আবার যাত্রার পালা ঠিক হবে আজ।

বলে বংশী চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোপেন বললে, তোমাকে অনেক দিন থেকে বলবো বলবো ভাবছি একটা কথা।

—কি বলো তো? উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন গিরিজাপ্রসাদ।

গোপেন চাপা গলায় বললে, হাজার তিন-চার টাকা ফেলো তো একটা ভালো ব্যবসা হয়। বলগনায় একটা কাঠের গোলা করি, রাঁচীর দিক থেকে শালবল্লী কিনে আনবো সস্তায়, ডবল দামে বিক্রি হবে এখানে। তাছাড়া ছুতোর মিস্ত্রী দিয়ে কড়ি, বরগা, দরজা, জানলা বানিয়ে বিক্রি করলে......

গিরিজাপ্রসাদ আর একটু হলেই বলে বসতেন, টাকা কোথায় আমার! কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন। এই ক' মাসেই বুঝে ফেলেছেন গিরিজাপ্রসাদ, টাকা নেই তাঁর এ-কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে গাঁয়ের লোক যেটুকু বা সম্মান দেখায়, সেটুকুও উবে যাবে রাতারাতি।

তাই কথাটা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, ব্যবসা কি আমাদের পোষায় গোপেন! না, ও ব্যবসা-টাবসা আমি করবো না, তা হলে অনেক আগেই করতাম।

গোপেন মনে মনে চটে গেল। বহুদিন থেকে কাঠের ব্যবসা করার নেশাটা চেপে বসে আছে তার মনে। গিরিজাপ্রসাদ চাকরি করে অনেক টাকা নিয়ে এসেছেন, সুতরাং সামান্য দু-চার হাজার টাকা ফেলে নিশ্চয় ব্যবসা করতে রাজী হবেন, এমনি একটা ধারণা ছিল গোপেনের। স্বপ্নটা গিরিজাপ্রসাদ যেন একটা কথায় ভেঙে দিলেন।

মনে মনে চটে উঠলো গোপেন মোড়ল। তারপর বললে, ব্যবসা আবার পোষাবে না! গিরীন যে গিরীন, ভেতরের খবর জানো কিছু!

—না। কিসের খবর? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন গিরিজাপ্রসাদ।

আর গোপেন ধীরে ধীরে চাপা গলায় বললে, ভেতরে ভেতরে বেনামীতে একটা হাস্কিং মেশিনের লাইসেন্স যোগাড় করেছে, মেশিন বসাচ্ছে নিগনে।

গিরিজাপ্রসাদ শুনলেন কথাটা। কোন সাড়া দিলেন না। স্তম্ভিত বিস্ময়ে আহত অভিমানে চুপ করে রইলেন। কিন্তু কথাটা কিছুতেই যেন মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। সত্যি? সত্যিই হয়তো গোপনে গোপনে নিজের নামে একটা হাস্কিং মেশিন

চালাবে গিরীন, হয়তো দু' দিন পরে একটা ধানকলের মালিক হবে। আর গিরিজাপ্রসাদ?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফিসফিস করে নিভাননীকে খবরটা দিলেন।

নিভাননী শুনলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, দাসীর কথা বাসি না হলে তো কেউ দাম দেয় না। তখন পইপই করে বলেছি, জমিজমার একটা ব্যবস্থা করো। তা তো করলে না। ধানকলই হোক, চালকলই হোক, জমির ধান বেচা টাকাতেই তো হচ্ছে!

গিরিজাপ্রসাদ কোন উত্তর দিলেন না।

খবরটা গোপেনের কাছ থেকে খ'ুটিয়ে জেনে নেবার ইচ্ছে ছিল গিরিজাপ্রসাদের। ভাবলেন, পরের দিন সে এলেই জেনে নেবেন।

কিন্তু পরের দিন আর এলো না গোপেন। তার পরের দিনও না।

শুধু গোপেন নয়, একে একে সকলেই সরে এলো গিরিজাপ্রসাদের কাছ থেকে। লাইব্রেরীর নামে কিছু বই কিনে দেয়ার জন্যে দিনের পর দিন আব্দার ধরেছে পশুপ্রথ চাটুজ্যে, তারপর বিরক্ত হয়ে আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে এসে জুটেছে মজুমদারদের বৈঠকখানায়, যাত্রার রিহার্সালে। হংস চাটুজ্যেও যাতায়াত বন্ধ করেছে। বলেছে, টাকায় যখ দেবে গিরিজাকাকা ম'লে, তবু দুশোটা টাকা দিলে না বাবু কালীতলার উঠোনটুকু সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধাতে।

একজন একজন করে সবাই সরে গেছে। তবু আশা ছিল বংশী আসবে। প্রতিদিনের মতই সেদিনও হ্যাজাক জেলে বাংলাবাড়ির দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করেছেন গিরিজাপ্রসাদ।

রাত ঘন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। হ্যাজাকের আলোয় একা-একা বসে অপেক্ষা করেছেন গিরিজাপ্রসাদ। ঠায় তাকিয়ে থেকেছেন সমনের অন্ধকারের দিকে। জোনাকির সারি জ্বলছে নিভছে। অন্ধকারে চাঁদের ক্ষীণ আলোয় মাখামাখি হয়ে খড়ের গালুইটা দাঁড়িয়ে আছে একটা অতিকায় জন্তুর মত। মরাই তলায় সাপ কি ই'দুরের ছোটাছুটির সরসর শব্দ। দূরে কোথায় বাউড়ি পাড়ায় কারা যেন চিৎকার করছে।

অনেকক্ষণ একা-একা বসে থেকেছেন গিরিজাপ্রসাদ। না, কেউ আসেনি। কেউ না। হঠাৎ নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়েছে তাঁর। নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে হ্যাজাক বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ। তারপর এক সময় নিভোনো হ্যাজাকটা হাতে নিয়ে ভিতর-বাড়িতে ফিরে এসেছেন।

নিভাননী প্রশ্ন করেছেন, কি হলো, এত তাড়াতাড়ি চলে এলে আজ?

গিরিজাপ্রসাদ সে-কথার কোন উত্তরই দেননি। চোখ ঠেলে জল এসেছে তাঁর। চোখের পাতা দুটো ভিজে ভিজে ঠেকেছে নিজের কাছেই।

তারপর অকারণেই হঠাৎ অটুমার কথা মনে পড়ে গেছে। আহা বেচারী, বুড়ো মানুষ, কথা বলবার একটা সঙ্গীও নেই। কি দুঃসহ জীবন। অটুমার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়েছে গিরিজাপ্রসাদের।

অটুমার অসহায় একাকীত্বের মধ্যে যেন নিজেকেই খ'ুজতে চেয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ।

একে একে সকলেই কেন যে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, বুঝতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ। বংশী তবু সকালে দুপুরে একবার খবরাখবর নিয়ে যায়, কিন্তু সন্ধ্যে হলেই যেন সব নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। বাইরের বৈঠকখানা খাঁ খাঁ করে। হ্যাজাক বাতিটা জ্বালবার প্রয়োজন হয় না আর। তবে কি সকলেই জেনে গেছে, তাঁর কাছে আশা করবার কিছু নেই? তিনিও গ্রামেরই আর পাঁচটা লোকের মতই দীনদরিদ্র?

মাঝে মাঝে গোপেন মোড়লের কথাটা মনে পড়ে। গিরীন একটা হাস্কিং মেশিনের লাইসেন্স পেয়েছে, মেশিন বসাচ্ছে নিগনে। এর পর হয়তো ব্যবসা ফেঁপে উঠবে গিরীনের, দালান-কোঠা তুলবে, টাকা করবে—আর গাঁয়ের লোক হয়তো বলবে, গিরিজা—সারাটা জীবন মাস্টারী করে কাটালে......

শিক্ষাদীক্ষা—নিজের জীবনের ওপরই অশ্রদ্ধা হচ্ছিল গিরিজাপ্রসাদের। এমন সময় হঠাৎ একদিন হংস চাটুজ্যে এসে হাজির হলো।

বললে, একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে কাকা। ইংরিজীতে দু' কলম লিখে দিতে পারে, তুমি ছাড়া তো লোক নেই গো।

শুনে খুশী হয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ। প্রশ্ন করেছেন, কিসের দরখাস্ত।

জবাব শুনে কিন্তু খুশী হতে পারেননি। একটা খবরের কাগজের 'কর্মখালি' বিজ্ঞাপন দেখিয়েছে হংস। বলেছে, অবনীজ্যাঠা বলেছেন দরখাস্ত করতে। চাকরিটা যাতে হয় চেষ্টা করবেন।

—অবনীজ্যাঠা?

—হ্যাঁ, এসেছেন তো। খবর পান নি?

উত্তরটা বোধহয় কানে যায় নি। কি আশ্চর্য, গ্রামে একটা মানুষ এসেছে এতদিন পরে, অথচ সে-খবরটা তিনি জানেন না! বংশী একদিন বলেছিল বটে, গিরিজাপ্রসাদের মনে পড়লো। বলেছিল, চাটুজ্জেদের বড় তরফের দালানকোঠা সব সাফসুফ করছে, শুনছি অবনী চাটুজ্যে নাকি এবার পুজোয় বাড়ি আসবে।

গিরিজাপ্রসাদ বলেছিলেন, আসে বুঝি প্রতিবার?

বংশী হেসেছিল। —না গো না, এদিক পানে মুখ করেন না কস্মিনকালে, কিন্তু এবারে না এসে যে চলছে না।

—চলছে না কেন?

বংশী হেসেছে। —জমিজমা সব বেনামী করতে হবে না? পঁচিশ একর তোমার নিজের নামে রেখে বাদবাকী সব এর-ওর নামে......

বলে অর্থপূর্ণ হাসি হেসেছে বংশী। বলেছে, ওনারই বা দোষ কি বলো, সবাই তো তাই করছে।

জমিজমার আইনকানুন, সম্পত্তি রক্ষার প্যাঁচ-পয়জার অত শত বোঝেন না গিরিজাপ্রসাদ। বুঝতে চেষ্টাও করেন না। কিন্তু অবনীমোহন গ্রামে এসেছেন এ-খবরটা গিরীন তো তাঁকে দিতে পারতো।

ইদানীং গিরিজাপ্রসাদ অবশ্য লক্ষ্য করেছেন গিরীন তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, নেহাৎ ডেকে প্রশ্ন না করলে সাড়া দেয় না নিজের থেকে। কেন, তা এখন বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। গোপনে ধানের ব্যবসা শুরু করছে ও নিগনে, হাস্কিং মেসিনের লাইসেন্স নিয়েছে, তাই বোধহয় এত ভয় তার।

কিন্তু অবনীমোহনের সংগে একবার দেখা করতে যাওয়া উচিত ছিল তাঁর। কত দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, দেখলে চিনতে পারবে কিনা তাই সন্দেহ।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন গিরিজাপ্রসাদ। হংসকে বলেছেন, লিখে রাখবো এখন, কাল এসে নিয়ে যেও।

হংস চলে যেতেই ভিতর বাড়িতে ফিরে এসেছেন গিরিজাপ্রসাদ চটির শব্দ করে, গলা খাঁকারি দিয়ে। মোহনপুরের বউকে জানান দেবার জন্যেই একটু শব্দ করে, গলার আওয়াজ করে ভিতরবাড়িতে আসেন গিরিজাপ্রসাদ।

মোহনপুরের বউ শব্দ শুনেই ঘোমটা টেনে মুহূর্তের মধ্যে আড়ালে সরে গেছে। আর গিরিজাপ্রসাদ বিমলাকে ডেকেছেন।

ডাক শুনেই চমকে উঠেছে সে। বইয়ের পাতা খুলে রেখে কি ভাবছিল সে সে-ই জানে। হয়তো কোন স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু মনে মনে যতই সেদিনের মধুর দৃশ্যটুকু রোমন্থন করুক, মাঝে মাঝেই ওর ভয় হচ্ছিল, বাবা-মা হয়তো শেষ অবধি সব শুনতে পাবে।

তাই গিরিজাপ্রসাদ হঠাৎ বিমলাকে ডাকতেই সে চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে তাকালো তাঁর মুখের দিকে।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, জামাটা দে তো মা, একবার ঘুরে আসি।

কথাটা শুনে নিশ্চিন্ত হলো বিমলা, অকারণ আতংকের জন্যে নিজের মনেই হাসলো। তারপর জামাটা এনে দিয়ে বললে, কাপড়টা বদলাও, এই ময়লা কাপড় পরে যাবে নাকি।

তা ঠিক্। নিজের কাপড়টার দিকে তাকিয়ে হাসলেন গিরিজাপ্রসাদ। তারপর পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে গিয়ে হাজির হলেন অবনীমোহনের বৈঠকখানায়।

ইঁটের দোতলা দালানটা দূরে থেকে দেখেছেন গিরিজাপ্রসাদ এর আগেও, কিন্তু অবনীমোহন আসার সংগে সংগে তার চেহারা যে এত বদলে গেছে ভাবতে পারেন নি। সারা বাড়িটা যেন আলোয় ঝলমল করছে। বৈঠকখানায় চৌকির ওপর সাদা ফরাস বিছানো হয়েছে, আর তার ওপর ভিড় করে আছে গ্রামের সকলে। দূরে থেকেই তাদের কথাবার্তা কানে আসছিল, কাছে গিয়ে সকলের মুখের ওপর দিয়ে চোখটা বুলিয়ে নিলেন। গোপেন, পঞ্চু, নিত্য মল্লিক—সকলেই এসে জুটেছে।

গিরিজাপ্রসাদকে দেখে সরে বসলো নিত্য মল্লিক। অর্থাৎ বসতে জায়গা ছেড়ে দিলে। তারপর বললে, অবনী জ্যাঠা এখনো বার হন নি ঘর থেকে, কাজকম্ম কিছু করছেন হয়তো।

অবনীমোহনের বৈঠকখানায় এই লোকগুলোকে দেখে মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ বোধ করলেন গিরিজাপ্রসাদ। নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন যেন। তবু অপ্রতিভ ভাবটা চাপা দিয়ে বসে পড়লেন সেখানেই।

কিন্তু অবনীমোহনের দেখা পেলেন না। অনেকক্ষণ বসে থেকেও যখন অবনীমোহন এলেন না, গিরিজাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন, খবর দিয়েছো?

গোপেন বলে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, খবর ঠিক পেয়েছেন গো, খবর পেয়েছেন। ব্যস্ত মানুষ, কাজের কি শেষ আছে! সময় পেলেই আসবেন।

কথাটা যেন একটা চাবুকের মত এসে পড়লো। অসীম ঘৃণায়, অপমানে গোপেনের দিকে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

নিত্য মল্লিক প্রশ্ন করলে, বসবেন না কাকা?

গিরিজাপ্রসাদ সে-প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন, এসে সোজা বাড়ির পথ ধরলেন।

একটা তীব্র ধিক্কার যেন তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। গ্রামের লোকগুলির বিরুদ্ধে, অবনীমোহনের বিরুদ্ধে। না, নিজের বিরুদ্ধেই একটা আত্মধিক্কার তাঁর বুক ঠেলে উঠতে চাইল।

মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বদলে গেছে। হারিয়ে গেছে সেই পুরোনো দিনের পৃথিবীটা। (ক্রমশ)

মহিলার দীর্ঘ পদযাত্রার রেকর্ড

মাস কতক আগে বৃটিশ মেয়ে বারবারা মূর আমেরিকায় একটানা তিন হাজার দুশ পঞ্চাশ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করে জগৎময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। অনেকে এই কৃতিত্বকে সারা বিশ্বের একটি রেকর্ড বলে ধরে নেন। কিন্তু বারবারা মূরের এই কৃতিত্বের চল্লিশ বছর আগে একটানা পাঁচ হাজার মাইল অতিক্রম করার এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং এক্ষেত্রেও কৃতিত্ব প্রকাশ করেন এক মহিলা। "রাশিয়ান লিলি" নামে খ্যাত এই মহিলার আসল নাম ছিল লিলিয়ান অলিং। লিলিয়ানের কৃতিত্ব আরো বেশী এই কারণে যে, বারবারা রীতিমতো প্রচারের ঢাক পিটিয়ে অগণিত রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার সমভিব্যহারে চমৎকার রাস্তায় হেঁটে শখ করে দূরত্ব অতিক্রম করেন যেক্ষেত্রে, লিলিয়ান তুষারাবৃত দুর্গম পথ একা অতিক্রম করেন আঁতের টানে।

রুশ বিপ্লবের পর তার পরিবারের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের সন্ধানে লিলিয়ান প্রথম যান নিউ ইয়র্কে। বলশেভিক গভর্নমেণ্টের অধীনে ওদেশে থাকা ওদের অসম্ভব হয়ে ওঠে। লিলিয়ানের কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্রই ওর পরিবারের লোকে আমেরিকায় পালিয়ে যাবার অপেক্ষায় ছিল। নিউইয়র্কে পৌঁছে লিলিয়ান এক রাশিয়ান রেস্তরাঁয় চাকরি যোগাড় করে নেন। কিন্তু সপ্তাহ কতক পার না হতেই তিনি দুটো দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে যান। তার এবং তার পরিবারের নতুন জায়গায় বাসা বাঁধার জন্য যে টাকা ছিল, বারবারার কর্মস্থল সেই রেস্তরাঁর এক পরিচারক সমুদয় টাকাটা চুরি করে চম্পট দেয়। নতুন অচেনা নিঃসঙ্গ জায়গা বলে লিলিয়ান পুলিসে আর খবর দেননি। কাজেই অপহৃত টাকাটা তিনি উপার্জন দ্বারা সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হন।

দ্বিতীয় আঘাত হলো একখানি পত্র। তার সারমর্ম হচ্ছে, মস্কোতে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং লিলিয়ানের বাবা, মা ও ভাইকে সাইবেরিয়ার বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়েছে। পত্রলেখক জার্মানীতে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেয়েছে।

পত্রপাঠ লিলিয়ান মতি স্থির করে নেন। অনতিবিলম্বেই তাকে সাইবেরিয়ায় যেতেই হবে। হাতে মাত্র আড়াই শ টাকা। সেইটাকা মাত্র সম্বল করে পশ্চিম-মুখো গিয়ে আমেরিকা মহাদেশ পার হওয়া তিনি সাব্যস্ত করলেন। আলাস্কার পশ্চিম উপকূল থেকে সাইবেরিয়ার দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ মাইল। পঞ্চাশ মাইল শীতল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর—বেরিং প্রণালী।

এই সংকল্পের পর আর কালবিলম্ব করলেন না তিনি। সায়ার সঙ্গে তিনি পঞ্চাশখানি এক ডলারের নোট সেলাই করে গেঁথে নিলেন। মনে মনে সংকল্প করে নিলেন যে যাত্রা সম্পূর্ণ হবার আগে সে-নোটগুলি ছোঁয়া হবে না কারণ ঐ অর্থই বন্দী শিবিরের রুশ রক্ষীদের উৎকোচ দিতে দরকার হবে। কিন্তু ঐ অর্থের কিছুটা তাকে খরচ করতেই হলো দীর্ঘপথ হাঁটার উপযোগী এক জোড়া মজবুত জুতো, পথের মানচিত্র এবং রুশ-ইংরাজী শব্দসমষ্টির একখানি তালিকাগ্রন্থ কিনতে। হাতে তখন বাকি রইল মাত্র কুড়ি ডলার (৯০ টাকা ২০ নঃ পঃ) আর সামনে কয়েক হাজার মাইল পথ।

নির্দিষ্ট দিনে লিলিয়ান পশ্চিমমুখো যাত্রা সুরু করলেন। একাকিনী এক মহিলাকে হাঁটতে দেখে অনেকেই তাকে গাড়িতে এগিয়ে দিতে চাইলেও, আমেরিকায় ওটা যে একটা সামাজিক সৌজন্য বা কর্তব্য সেটা জানা না থাকায় লিলিয়ান তাদের সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেন। রাত কাটাতেন তিনি কোন কৃষক পরিবারে এবং তার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণে অরাজী হলে তিনি রান্নার কাজ করে দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাইতেন। অর্থ সঞ্চয় বাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি দিনকতক কোথাও কাজ জুটিয়ে নিতেন। শিকাগো, মিনিয়েপোলিস, উইনি-পেগ—প্রত্যেক শহরে আজো এমন লোক পাওয়া যায় যাদের মনে পড়ে রেস্তরাঁয় দিন-কতক কাজ করার পর পদব্রজে যাত্রা করা সেই মহিলাকে।

কানাডায় যখন পৌঁছান সেসময়ে ওখানে শস্য কাটা আরম্ভ হয়েছে। লিলিয়ান ক্ষেতের কাজে লেগে গেলেন। তারপর কানাডায় দুর্ধর্ষ শীত আরম্ভ হবার মুখে এক টেলি-ফোন লাইন্সম্যান ওকে বৃটিশ কলাম্বিয়ার মধ্যস্থলে দেখতে পায়। তখন ওর পোশাক জীর্ণ এবং টেনিস-সু পায়ে হেঁটে চলেছেন। ঐ অবস্থায় দেখে লাইন্সম্যান হেজলটোন পুলিসকে ফোন করে দেয়। কারণ সে জানতো যে শীতের মুখে যথেষ্ট গরম পোশাক ছাড়া উত্তর অঞ্চলে যাওয়ার অর্থ নির্ঘাত মৃত্যুবরণ করা। পুলিস লিলি-য়ানকে হেজলটোনে নিয়ে গিয়ে শীতকালে উত্তরমুখো যাওয়ার বিপদের কথা বোঝাতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু লিলিয়ান জানালেন যে তিনি খুবই শক্ত এবং রাশিয়ায় বরফের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস তার আছে। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেন যে তাকে যেতেই হবে। কি খাবেন জিগ্যেস করতে লিলিয়ান তার সঞ্চিত অর্থ দেখিয়ে বলেন তিনি দাম দিয়েই খাবার কিনবেন। ওর কাছে তখন ছিল দশ ডলার অর্থাৎ চুয়াল্লিশ টাকা বাট নয়া পয়সা মাত্র।

থানার সার্জেণ্ট জানালেন তিনি লিলি-য়ানকে ভ্যাংকুভারে ওকালা কারাগারের মেট্রনের কাছে পাঠাবেন যেখানে ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া করে সুস্থ হয়ে শীত কাটিয়ে বসন্তকালে তিনি আবার যাত্রা করতে পারেন।

লিলিয়ানের কাছে এ ব্যবস্থা একটা নিদারুণ বিপত্তি মনে হল। ভ্যাংকুভার কয়েকশত মাইল দক্ষিণে। কিন্তু এদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও তিনি দেখলেন না। বিশ্রাম এবং নিয়মিত খাদ্য গ্রহণে লিলিয়ান হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। ওর পদযাত্রার ঝোঁক কাটিয়ে দেবার চেষ্টায় ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া হলো। লিলিয়ান অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এবং জুন পর্যন্ত থাকবেন কথা দিয়েছিলেন বলে মাস কতক কাজে লেগে রইলেন। তারপরই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পরবর্তী দু'সপ্তাহ তিনি দিনে গড়পড়তায় তিরিশ মাইল চলে হেজলটোনের কাছে স্মিদার্স শহরে পৌঁছান।

ওখানকার পুলিস সার্জেণ্ট একটা মতলব ঠিক করেন। তিনি ব্যবস্থা করলেন যে, লিলিয়ান পথে প্রত্যেক টেলিগ্রাফ কেবিনে দেখা করবেন। লাইন্সম্যানদের জন্য কেবিন-গুলি অবস্থিত ছিল বিশ মাইল অন্তর।

ডিভিসনাল পয়েণ্টে ছিল অনেকগুলি কেবিন। লিলিয়ান সেখানে পৌঁছান শীতের শুরুতে। ওখানকার লোকে ওকে একজোড়া
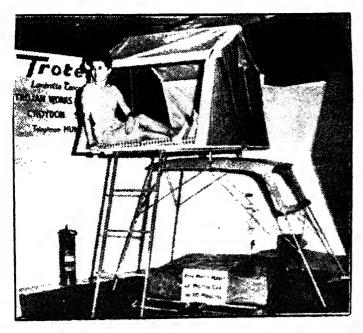
কিছুদিন পূর্বে লন্ডনের আর্লস কোর্টে এক আন্তর্জাতিক 'ক্যারাভান' প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ক্যারাভান বলতে প্রাচীনযুগের শকট নয়—এখন তার অর্থ মোটরে টেনে নিয়ে যাওয়া গৃহ। এই প্রদর্শনীতে চাকার ওপর আধুনিক সকলআরামপ্রদ ব্যবস্থাসমন্বিত দুতলা ছোট্ট বাড়ীও বোঝায়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে কোন মোটরের ছাদে খাটিয়ে নেবার ব্যবস্থা-সমন্বিত শোবার ঘর

মজবুত জুতো, প্রচুর গরম পোশাক এবং ব্রুনো নামে একটি কুকুর সঙ্গে দেয়। উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লোকে এই অদ্ভুত পদযাত্রীর খবর রেখেছিল। হঠাৎ এক ঝলক শীতল হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হয়ে টেলিগ্রাফ লাইনের তারে বরফ জমতে থাকায় এ্যকোলেবা জেলার লাইন্সম্যানেরা মেরামত কাজে বেরিয়ে পড়ে। স্কটি ওগিলভি নামে লাইন্সম্যানদের একজন দক্ষিণ দিকের লাইন ধরে যাত্রা করলে মহিলার দেখা পেয়ে তাকে, প্রয়োজন হলে, সাহায্য করতে।

স্কটিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিরতে না দেখে আর দুজন লাইন্সম্যান তার যাত্রা-পথ অনুসরণ করে নিনগানশ নদীতে পৌঁছয়। ওরা দেখে নদীর তীরে জমে থাকা বরফের একটা স্তূপ ভেঙে পড়ায় স্কটি সেইসঙ্গে ভেসে গিয়েছে। ওরা ভাটার মুখে স্কটির মৃতদেহ খুঁজে পায় এবং দেহটিকে ওরা স্কটিরই কেবিনের পাশে কবর দেয়। তারপর একো লেকের সেই লাইন্সম্যানেরা অবাক হয়ে যায় বরফ ভেঙে লিলিয়ানকে কেবিনের দিকে আসতে দেখে।

"লিলিয়ান পারলে, আর স্কটি তা পারলে না!" স্কটির এক সহকর্মী বিস্ময় প্রকাশ করে বললে। অন্যেরা ওর কথা চাপা দিতে বললে, "ওকথা বলে মেয়েটিকে ঘাবড়ে দিও না।" লিলিয়ানকে ওরা স্কটির কবর দেখাতে উনি বুঝতে পারলেন কি ব্যাপার ঘটেছে। কবরের ধারে আনত অবস্থায় ওকে রেখে ওরা চলে যায়। পরে ক্রুশের গায়ে ওরা একটা অদ্ভুতদর্শন অলঙ্কার দেখতে পায়—সম্ভবত পয়মন্ত কিছু যা লিলিয়ান সযত্নে রক্ষা করছিল।

লিলিয়ানের পথে একসময়ে টেলিগ্রাফ লাইন এবং সেইসঙ্গে লাইন্সম্যানদের আতিথেয়তা শেষ হয়ে গেল। ঝড় দেখে তিনি পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েন। মাঝে মাঝে শিকারিদের খালি কেবিনে আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং দীর্ঘকাল পরে পরে কারুর কুটিরে এবং জনবসতিতে কিছুদিন করে কাটিয়ে দিতেন। বৃটিশ কলাম্বিয়ার উত্তরে এটলিনে যখন পৌঁছান তখনও তার সঙ্গে কুকুরটি ছিল। কিন্তু ভুসিভরা অবস্থায়। পথে কোথাও সম্ভবত ওর মৃত্যু ঘটে থাকবে এবং লিলিয়ান কোন উপায়ে ওর চামড়া খুলে নিয়ে ভুসিভর্তি করে থাকবে।

য়ুকোন নদীর তীরবর্তী ডসনে লিলিয়ান মাস কতক চাকরি করে যে অর্থ উপার্জন করেন তাই দিয়ে বরফ গলে যাবার ঠিক আগে একটি ছোট্ট জীর্ণ নৌকা কেনেন। প্রত্যেক বছর বরফ গলতে আরম্ভ হবার সময় সারা শহর ভেঙে পড়ে সেই দৃশ্য দেখতে। দীর্ঘ-দিন ধরে বরফের স্তূপ সশব্দে ফেটে যেতে যেতে একদিন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে ভেঙে পড়ে। আর তখন য়ুকোনের জল তীর বেগে সমুদ্রের দিকে ছুটে যায়।

সেবার হঠাৎ ওদের চোখে পড়লো রুশ মেয়েটি। জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করা ওর নৌকাটার দাঁড়ীতে বসে আছেন, আর ওর জিনিসপত্তর রয়েছে সামনে জড়ো করা। খর-স্রোতা য়ুকোনের ওপর দিয়ে তিনি একাই ভেসে চলেছেন। কিছুক্ষণ পরই লিলিয়ান এবং তার নৌকা সবার দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়।

এরপর ভাঁটির দিকে পাঁচশ মাইল দূরে ওকে টানানাতে দেখা যায় এবং সম্ভবত তার-পরই উনি নৌকাটি ত্যাগ করেন। অতঃপর তার সন্ধান পাওয়া যায় সীওয়ার্ড উপত্যকায় নোম নামক একটি জায়গার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে। ওখানে তিনি প্রয়োজনীয় সামগ্রী

কেনেন কিন্তু তারপরই আবার নিখোঁজ হয়ে যান। পরে এক এস্কিমো খবর দেয় যে প্রিন্স অব ওয়েলস অন্তরীপের উপকূলে একটি শীর্ণকায়া মহিলাকে ওরা দেখেছে তার জিনিসপত্তর জোড়াতালি দিয়ে তৈরী একটা ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যেতে। বোঝা গেল সে লিলিয়ান অন্তত পাঁচ হাজার মাইল হেঁটে গিয়েছেন তখন! ওর অগ্রগতির খবর ঐখানেই শেষ হয়ে যায়।

হয়তো উনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রণালী পার করে দেবার জন্য এস্কিমোদের অনুরোধ করে থাকবেন। হয়তো শেষপর্যন্ত তিনি সাইবেরিয়ায় পৌঁছেও গিয়েছিলেন। লোকালয়হীন রাশিয়ার বরফ জমা সাইবেরিয়ার কোথাও হয়তো তিনি তার পরিবারের সঙ্গে মিলিতও হতে পেরেছিলেন—সঠিক খবর কেউ আর বলতে পারেনি।

হল্যাণ্ডের প্রতীক কাষ্ঠ পাদুকা

যে সব পর্যটক হল্যাণ্ডে বেড়াতে যান তাঁরা প্রায় সব সময়েই উইন্ডমিল, ফুলের বাগান এবং ওলন্দাজগণের কাঠের জুতোর ফটোগ্রাফ নিয়ে আসেন। এই সব ছবির মধ্যে কোনগুলি বেশী প্রসিদ্ধ তা অবশ্য বলা কঠিন কারণ, এগুলির সবই কোন না কোন প্রাচীরপত্রে দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক কাঠের জুতো যে একটা প্রতীকে পরিণত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই কারণ কাঠের জুতো দেখলেই হল্যাণ্ডের কথা মনে হয়। ওলন্দাজগণের কাঠের জুতো, বড় বড় শহরের কঠিন রাস্তায় ব্যবহৃত হয় না, চাষের মাঠে এবং ভিজে গোচারণ ভূমিতে এগুলি ব্যবহার করা হয়। কাজেই চাষী, জেলে ও উদ্যান রচয়িতাগণই সাধারণতঃ কাঠের জুতো ব্যবহার করেন। অর্থাৎ যাদের স্যাঁতসেঁতে ও ঠাণ্ডা মাটিতে দাঁড়িয়ে অথবা কর্দমাক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাঁরাই কাঠের জুতো ব্যবহার করেন। যাঁরা কখনও হল্যাণ্ডের কোন গরুর হাটে গেছেন তাঁরাই দেখেছেন যে এইসব হাটে হাজার হাজার গরু, বিক্রীর জন্য আনা হয়। এইসব জায়গায় স্বাভাবিক কারণেই কেউ চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে কাজ করে নিজের জুতো নষ্ট করতে চাইবেন না, কিন্তু ওলন্দাজ চাষিগণ কাঠের জুতো পায়ে দিয়ে নির্বিবাদে এখানে কাজ করে। কাঠের কারণ জুতো তাদের পায়ের পাতাকে গরম ও শুকনো রাখে।

প্রয়োজন হলেই অত্যন্ত সহজে কাঠের জুতো পরিষ্কার করা যায় কারণ কাঠে কোন ময়লা আটকে থাকতে পারে না। তবে এই জুতো পরিষ্কার করার খুব প্রয়োজন হয় না। কারণ চাষী যখন মাঠের কাজ সেরে বাড়ি আসে তখন সে সাধারণতঃ তার জুতো বাইরে খুলে রেখে মোজা পায়ে অথবা চটি পায়ে দিয়ে ঘরে ঢোকে। তবে চাষী বউ তাতে সন্তুষ্ট হয় না। পরিবারের সমস্ত কাঠের জুতো নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা হয়। সাধারণতঃ প্রতি শনিবার বিকেলে সমস্ত কাঠের জুতো ঘসে মেজে পরিষ্কার করে তুলে রাখা হয়। হল্যাণ্ডের গ্রামগুলিতে অনেকেই বিশ্বাস করে যে ছুটির দিনে চামড়ার জুতো ব্যবহার করলে সমৃদ্ধি বাড়ে সুতরাং এই বিশ্বাস অনুযায়ী বেশীর ভাগ কাঠের জুতো সোমবার সকাল পর্যন্ত শেল্‌ফে তোলা থাকে।

কাঠের জুতোর দামও খুব বেশী নয়। এক জোড়া জুতোর দাম সাধারণতঃ সাড়ে চার শিলিং অর্থাৎ এক জোড়া চামড়ার তৈরি বুটের দামের প্রায় এক দশমাংশ। এগুলি মেরামত করার বিশেষ কোন প্রয়োজনই হয় না। স্কুলের কোন ছেলে যদি খেলতে গিয়ে তার জুতোর ডগাটা ভেঙে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পেরেক দিয়ে একটি লোহার পাত জুড়ে দেওয়া হয় এবং তখনই আবার সেটি ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে যায়। জুতোর তলা ক্ষয়ে যাওয়ার পর যখন আবার নতুন এক জোড়া জুতো কেনার প্রয়োজন তখন বুঝতে হবে যে পাদুকা দুটি সত্যিই বহুদিন সেবা করেছে এবং উপযুক্ত সময়েই তারা অবসর গ্রহণ করতে চাইছে। কাঠের জুতো তৈরি করাটা প্রথমে হস্তশিল্প হিসেবে সুরু হয়েছিল এবং চাষীরা তাদের আয় বাড়ানোর জন্য অবসর সময়ে এগুলো তৈরি করতো। পপলার বা উইলো কাঠের ভাল একটি টুকরো নিয়ে ছুরি দিয়ে সেটিতে জুতোর আকার দেওয়া হয়। তারপর জুতোর ভেতরের খোলটা তৈরি করার জন্য নানা রকম ড্রিল ও ছুরি ব্যবহার করা হয়। তারপর জুতোগুলি পালিশ করা হয়, শুষ্ক করা হয় এবং প্রয়োজন হলে রং করা হয়। বর্তমানে অবশ্য এইসব কাজের বেশী ভাগই মেশিনে করা হয়। কিন্তু মেসিনে এই সব কাজ করা হলেও জুতোর ভেতরের খোলটা সব সময়েই হাতে করা হয় এবং এই কাজে যথেষ্ট কুশলতার প্রয়োজন।

কাঠের পাদুকাশিল্পের শতকরা ৯০ ভাগ যন্ত্রচালিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে এগুলির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য নেই। প্রথম কথা হল পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু জুতোর মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া পায়ের পাতা সম্পূর্ণ ঢেকে থাকে এইরকম জুতো এবং ওপরের দিক খোলা চামড়ার স্ট্র্যাপ দেওয়া এই দুই রকম জুতোর মধ্যেও নানা-রকম বিভিন্নতা রয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে, সামনের দিক চ্যাপটা, গোল অথবা ছুঁচলো ধরনের বিভিন্ন রকমের জুতো। পুরুষরা সাধারণতঃ যে সব জুতো পরে সেগুলির রঙ হয় সাধারণতঃ হলদে এবং তাতে লাল রঙের নক্সা, মেয়েদের জুতোয় থাকে নানা-রকম রঙের ফুলের নক্সা। কোন কোন কাঠের জুতোতে কালো রঙ করা হয় আবার কতক-গুলোতে সোজাসুজি সাদা রং করে রাখা হয়। তবে ব্যক্তিগত পছন্দও জুতো তৈরিতে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। এমন কতকগুলি জেলা আছে যেখানে এক বিশেষ স্টাইলের জুতোর প্রচলন বেশী।

হল্যাণ্ডে সাধারণতঃ যে সব কাঠের জুতো ব্যবহৃত হয় ঠিক সেই রকম একটু ছোট আকারের অত্যন্ত বেশী চিত্রিত যে কাঠের জুতো তৈরি করা হয় সেগুলি, দেশ ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পর্যটকগণ কিনে নিয়ে যান।

হল্যাণ্ডে প্রধানতঃ পপলার ও উইলো কাঠ দিয়ে জুতো তৈরি করা হয় এবং এই গাছগুলি এখানকার আবহাওয়া খুব ভালো-ভাবে সহ্য করতে পারে বলে এই দু রকম গাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে লাগানো হয়। ওলন্দাজ শহরগুলির রাস্তার ধারে, বাঁধে এবং খামারের চতুর্দিকে এই গাছগুলির অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পাদুকা শিল্পের জন্য গাছগুলির মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। তবে কাষ্ঠ-পাদুকা নির্মাণ শিল্পে কর্ম সংস্থানের সুযোগ তেমন নেই। হল্যাণ্ডে যে ৭৫০টি প্রতিষ্ঠান কাষ্ঠ পাদুকা তৈরি করে সে-গুলিতে শিল্পের মালিক ও আত্মীয়স্বজন ছাড়া প্রায় ৯০০ জন মাইনে করা কর্মী আছে। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত এই কাষ্ঠ পাদুকার গুরুত্ব একদিক দিয়ে অত্যন্ত বেশী, কারণ এই কাষ্ঠপাদুকা ওলন্দাজ "ট্রেড মার্কে" পরিণত হয়েছে।

চিত্রগ্রীব

গত সপ্তাহে প্রিণ্টস আর্ট গ্যালারী শিল্পী জে ব্যানার্জির চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। জে ব্যানার্জি কলকাতায় খুব পরিচিত না হলেও বাইরে নাম করেছেন। বিদেশেও কিছু ছবি এঁর বিক্রি হয়েছে।

শিল্পী বলেন, 'আমি বিশেষ কোনও গোষ্ঠীভুক্ত নই—আমি ছবি আঁকি কারণ আমি ছবি আঁকতে ভালবাসি।' বাস্তবিকই শিল্পীর ছবি আঁকার ধারা এত রকম যে, বোঝা মুশকিল এঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে কোন ধরনের রচনায়। কখনও অ্যাবস্ট্রাক্ট,

সংগীত —চিন্ময় চৌধুরী

কখনও রিয়ালিস্টিক, কখনও ডেকোরেটিভ, আবার কখনও বা কমার্শিয়াল আর্ট এরও ধারে ধারণ লক্ষ্য করা যায়। এমনধারা প্রদর্শনী সত্যিই আমরা খুব বেশী দেখিনি। প্রদর্শনীকক্ষে প্রবেশ করে মনে হয় যেন কোনও শিল্পীগোষ্ঠীর প্রদর্শনী দেখছি এবং কম করেও এই গোষ্ঠীর সভ্য সংখ্যা দশ হবে। এসব থেকে এইটেই প্রমাণিত হয় শিল্পী এখনও কোনও স্বকীয় ধারা লাভ করতে পারেননি; পরীক্ষণ নিরীক্ষণ এখনও এঁর সমাপ্ত হয় নি। প্রিণ্টস আর্ট গ্যালারী এই শীতে কয়েকটি একক চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। জে ব্যানার্জির চিত্রকলা প্রদর্শনী এই সিরিজের প্রথম। এর পর স্বর্গীয় আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, সনৎ কর, প্রকাশ কর্মকার, বিজন চৌধুরী, সত্যেন ঘোষাল, পরিতোষ সেন এবং কমলা রায় চৌধুরীর একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হবে পর পর। কলকাতায় আরও দুটি যে গ্যালারী আছে তারাও এই রকম একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন কিন্তু প্রিণ্টস আর্ট গ্যালারীর সঙ্গে তাদের তফাত হল, তাঁরা বাংলার শিল্পীদের বিশেষ আমল দিতে চান না—কিন্তু প্রিণ্টস আর্ট গ্যালারীর কোনও প্রাদেশিক সংকীর্ণতা নেই। প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনীতে এঁরা অবশ্য যে ক'জন শিল্পী বাছাই করেছেন তাঁরা সকলেই বাংলা দেশের। বাংলা দেশে বসে যখন ছবির ব্যবসা করতে নেমেছেন তখন বাংলার শিল্পীদের কিছুটা প্রাধান্য তাঁদের দিতেই হবে, তবে এঁদের ভবিষ্যৎ একক প্রদর্শনী সিরিজে বাংলার বাইরেরও বহু শিল্পীর চিত্রকলা প্রদর্শিত হবে বলে এরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ সপ্তাহে স্বর্গীয় আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলা প্রদর্শনী চলছে প্রিণ্টস আর্ট গ্যালারীতে। আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বাংলা দেশের শিল্পী এবং শিল্পরসিক মহলে অবিদিত নয়। শিল্পীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে আমরা বাস্তবিকই মর্মাহত হয়েছিলাম। মারা যাবার পর তাঁর একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এর বহু পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের বড় বড় শিল্পসংস্থাগুলি বরাবরের মত এ সম্বন্ধেও উদাসীন থেকেছেন। প্রিণ্টস আর্ট গ্যালারী এ দায়িত্ব গ্রহণ করে বাস্তবিকই রসিকসমাজের এবং শিল্পীর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়বর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্র-কলার বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হবে পরের সংখ্যা দেশ পত্রিকায়।

•   •   •

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ এক নবাগত শিল্পী চিন্ময় চৌধুরীর চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। চিন্ময় চৌধুরী শুধু নবাগতই নন, চিত্রবিদ্যা শিক্ষাও এঁর কোনও স্কুল বা কলেজে কখনও হয় নি। বছর দশেক আগে ইনি প্রথম ছবি আঁকা আরম্ভ করেন গভীরভাবে এঁর অগ্রজের পরামর্শে। তখন ইনি আঁকতেন প্রতিকৃতি, ল্যাণ্ডস্কেপ প্রভৃতি। ক্রমে ইনি আরম্ভ করেন আধুনিক চিত্রকলা। বর্তমানে শিল্পী উগ্র আধুনিকপন্থী। ছবিগুলি রচনায় একটু যেন এলোমেলো ভাব লক্ষ করা যায়, কিন্তু আধুনিক চিত্র-কলার ব্যাকরণ শিল্পী বেশ ভালভাবেই আয়ত্তে এনেছেন—এঁর রচনায় মাঝে মাঝে সুররিয়ালিজম আবার মাঝে মাঝে এক্সপ্রেসানিজম-এর প্রভাব পড়েছে। এক-একটি রচনা চমৎকার ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে

এক মহিলা ও জলের কল —জে ব্যানার্জি

যেমন ল্যাণ্ডস্কেপ, সিকনেস, উলস হাউস প্রভৃতি আবার কিছু ছবির মধ্যে বেশ দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। এ থেকেই বোঝা যায় শিল্পীর প্রতিভা এখনও ঠিক যেন সে পথ ইনি খুঁজেছেন সে পথের সন্ধান পাননি। ভবিষ্যতে ইনি যে এঁর পথ আবিষ্কার করবেনই সে বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। আমরা এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ কাজ দেখার অপেক্ষায় রইছি। এঁর প্রদর্শনী দেখে বাস্তবিকই আমরা আনন্দ লাভ করেছি।

গোয়ার পরাভবে শোক প্রকাশের জন্য শুনিলাম, লিসবনে এইবার বড়দিন ও নববর্ষের আনন্দোৎসব বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আশা করি, অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েহ্নি—বৃষোৎসর্গ না হলেও অন্তত তিলবৈতরণী হবে!!"

গোয়ার পরাজয়ের পরে শ্রীকৃষ্ণ মেনন লণ্ডন হইতে নিউ ইয়র্কে পৌঁছিলে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা তাঁর প্রতি কেন অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করিয়াছে, এই প্রশ্ন অনেকেই করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"অনুমান করছি, প্রশ্নকর্তারা নীলবর্ণ শৃগালের কাহিনী পড়েননি।"

সংবাদে শুনিলাম, পূর্বপরিকল্পনা মত কলিকাতা শহরে মনোরেল হইবে না। —"আমরা ট্রামে-বাসে অনেকদিন আগেই বলেছিলাম—কলকাতা মনোরেল নয়, মনোরথের পক্ষেই উপযোগী"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

শ্রীনেহরু তাঁর সাম্প্রতিক শান্তিনিকেতনের ভাষণে বলিয়াছেন—বিশ্বকে দেওয়ার মত বাণী ভারতের আছে।

—"কিন্তু বিশ্ব হয়ত গাইছে, শুধু তোমার বাণী নয় গো বন্ধু হে প্রিয়" সহযাত্রী তাঁর মন্তব্যটাকে সুরসংবলিত করিয়া দিলেন।

কংগ্রেস পক্ষের জনৈক প্রবীণ কাউন্সিলার নাকি ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন জানাইয়াছেন—কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজকর্মের ভার ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করা হউক। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু ঠিকাদারের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। যথারীতি টেণ্ডার ইসু না করলে এই নিয়ে স্বর্গ এবং কর্পোরেশনের সভায় যে খণ্ড-প্রলয় শুরু হয়ে যাবে!!"

বড়দিনের উৎসবে আমেরিকায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি পথ-দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বড়দিনটাকে আরও একটু বড় করতে পারলে

বোধ হয় আর আণবিক বোমার প্রয়োজন হবে না!"

লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চফ নাকি বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও

চোর, জুয়াচোর, প্রতারক, এমনকি হত্যাকারী—সবই আছে। —"তা হলে দেখছি কাশীতেও ভূমিকম্প হয়!" সংক্ষেপে বলে শ্যামলাল।

আমেরিকার অন্য এক সংবাদে শুনিলাম—সেখানে হাসপাতালের নার্সদিগকে জুজুৎসু শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। —"কলকাতায় এই ব্যবস্থার প্রচলন হলে, লেডীস সীট ছোড় দিজিয়ে বলার পরও যাঁরা সীট ছাড়তে টালবাহানা করেন, তাঁদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, এমনিতেই তো ৪৪০ ভল্ট।"

একটি সংবাদ-শিরোনামা—'ঝরিয়া ও রানীগঞ্জে বিশ্বের বৃহত্তম রোপওয়ে নির্মাণের ব্যবস্থা।' —"আশা করি, এতে কোন মুদ্রাকর প্রমাদ নেই, ওটা ঠিক রোপওয়ে, ভারতের রোপট্রিক নয়।" বলেন খুড়ো।

এম সি সি'র চারজন খেলোয়াড় নাকি এলেনবরো কোর্সে পোলো খেলা দেখিতে গিয়াছিলেন—"তাঁরা হয়ত এলেনবরো মাঠে ভবিষ্যতের উইকেটটা কী রকম হবে, তা-ই দেখতে গিয়েছিলেন। সবারই হয়ত মনে আছে এলেনবরো মাঠে আমাদের স্টেডিয়াম তো এই হয়-হয়। মন্তব্য করে শ্যামলাল।

টেস্ট টিকিট লইয়া ক্লাবে ক্লাবে উত্তেজনা'—অন্য এক সংবাদ। "গাছে গাছে উত্তেজনার সংবাদ হয়ত ৩০শে ডিসেম্বরের পরে পাওয়া যাবে। কিন্তু শুনলাম, এবারে নাকি ইডেন উদ্যানের গাছগুলিও বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগে শুধু চীনকে অভিযুক্ত করে লাভ কী, চেনারাও তো কম যান না।" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বিশু খুড়ো টেস্ট খেলা দেখার টিকিট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।"

সার্ভিসেসের সঙ্গে খেলায় এম সি সি নাকি পাঁচজন ন্যাটা ব্যাটসম্যানকে মাঠে নামাইয়াছিলেন। শ্যামলাল বলিল—"কলকাতায় বামপন্থীদের দাপাদাপির কথা ডেক্সটার নিশ্চয়ই শুনেছেন!!"

কৃষ্ণনগরের এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে জনৈক যুবক দারুন শীতে সারা রাত্রি একটি গির্জার সম্মুখে দাঁড়াইয়া টেস্ট ম্যাচ খেলা দেখার টিকিটের জন্য প্রার্থনাতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছে। —"কিন্তু যুবক হয়ত জানে না যে, 'প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ড' আর যেখানে হোক, ইডেন গার্ডেনে নয়।" বলেন বিশু খুড়ো।

কলিকাতায় শীতের প্রথম শিকার'—একটি সংবাদ-শিরোনামা। —"আশা করি, সংবাদ পরিবেশক প্রথম শিকার

বলতে সার্ভিসেসের দলকে বোঝাতে চাননি। বলেন জনৈক ক্রিকেট-রসিক সহযাত্রী।

বেহালা অঞ্চলে জনৈক ব্যক্তি একদিন সকাল সাড়ে আটটায় একটি ৮০ ফুট উচ্চ নারিকেল গাছে চড়িয়া বসিয়া বসিয়া পা দোলাইতে থাকে। তাহাকে নামাইয়া আনিবার জন্য দমকল বাহিনী ও পুলিসের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে বেলা বারটায় তার কোন আত্মীয়ের কথায় সে নামিয়া আসে। সংবাদে বলা হইয়াছে, লোকটি পাগল। —"কিন্তু বেহালা থেকে গাছে চড়ে সে খেলা দেখতে চেয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে কোন তদন্ত হয়নি।"

কলাবতী

বিনায়ক ভট্টাচার্য

কখনো কি মনে পড়বে না
পাহাড়ের ঢেউ ভেঙে লাফিয়ে পথচলা
হরিণগতি ফটিকজল ঝর্ণার মতো তোমাকে,
আমার বুকের রক্তে রাঙানো দিনগুলি
কখনো কি মনে পড়বে না,
যখন আমার বাগানে ফুটবে
একটি লাল কলাবতী?

দ্যাখো, আমার বাগানে
একটি লাল কলাবতী ফুটেছে।
জানো, আমি নিজের হাতে
এই গাছটা লাগিয়েছিলাম!
ভেবেছিলাম ফুরিয়ে গেছি কবে,
জুড়িয়ে গেছে রক্ত, তার রঙ
ফিকে আরো ফিকে হয়ে শেষে
হলুদ হয়ে গেছে, কিন্তু দ্যাখো

সেই গাছটার বুকের ভেতর থেকে
একটি কলাবতী ফুটে উঠেছে
আর তার রঙটাও একবার দ্যাখো—
তাজা রক্তের মতো লাল।

কখনো কি মনে পড়বে না
একটা গাছ লাগিয়েছিলাম এইখানে
আর সেই গাছটায় একদিন
একটি কলাবতী ফুটেছিলো
তোমার আমার আরো অনেকের স্বপ্ন নিয়ে,
মনে পড়বে না তার রঙটা—
তাজা রক্তের মতো লাল,
যখন সত্যিই একদিন আমি
ফুরিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবো আর
শুকিয়ে যাবে আমার সাজানো বাগান?

দুই চরিত্র

সিদ্ধেশ্বর সেন

সৌধচূড়ায় আমিও ছিলাম একা
নেমে এলাম, রক্ত—
স্খলিতপদ

আকাশে ওড়ে নগ্ন-নিশানগুলি

ডানকানের অন্তিম, গাঢ়ছায়া
সোপান ভাঙে, আমারই
ছায়া পড়ে

পিছনে ফিরি, হাওয়ায় সরে খিল

উচ্চাশা কি ভীষণ দিবানিশা

দুর্গ-প্রাকার তোরণে কে কড়া
নাড়ে

বাহিরে কাল-পেচক
ভগ্নস্বর
ভিতরে সেই প্রেতিনী
ঘুরে মরে

উচ্চাশা কি ভীষণ দিবানিশি

ভিতরে সেই প্রেতিনী ঘুরে মরে
বাতিদানের ছায়ায়
ছায়া-ঘর

ব্যাঙ্কোর প্রেত অভিসম্পাত করে

নিদ্রা-হতনিদ্রাহত নিদ্রা-
নিহত, চোখ যতবার চাই, রক্ত-
স্খলিতকর॥

অনুবাদ

সেকালের বুখারায়। সদরুদ্দীন আইনী অনুবাদ : বিনয় মজুমদার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (পি) লিমিটেড, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ৪৲।

অনুবাদের ধকল সহ্য করে যে বই শেষ পর্যন্ত পাঠকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখতে পারে, তা নিঃসন্দেহেই ভালো বই। সদরুদ্দীন আইনী লিখিত ও মূল রুশ থেকে অনূদিত 'সেকালের বুখারায়' সম্বন্ধেও এ কথা অনায়াসেই বলা চলে।

লেখকের শৈশবস্মৃতিবিজড়িত বুখারা শহর এবং নিকটবর্তী দুটি গ্রাম সক্তারা ও হিজ্‌দুভানের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী, তার মানুষজন, তাদের আশা আনন্দ দুঃখ হতাশা—এ সমস্তই কুশলী লেখনীমুখে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাশিয়ার বিপ্লবপূর্ব যুগে বুখারার আমীরের নির্মম শাসনযন্ত্রের পেষণে এবং হাজী-কাজী-মোল্লা-মৌলবীদের স্বার্থান্ধতার চক্রে সেখানকার সাধারণ মানুষদের যে কী অত্যাচার অবিচার নিয়ত সইতে হত তার একটি যথাযথ ছবি লেখক নিপুণভাবে মেলে ধরেছেন।

অনুবাদের উৎকর্ষ সর্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হয়নি। তা ছাড়া সদরুদ্দীন আইনীর জীবন এবং সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর মত কিছু উপকরণ পরবর্তী মুদ্রণের সময় সংযোজিত হওয়া উচিত। ৩৮৪।৬১

ধর্মগ্রন্থ

গৌর-প্রিয়া— শ্রীমৃণালকান্তি দাসগুপ্ত। প্রকাশক—বসু সাহিত্য সংসদ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

বাঙলার সম্পদ, ভারতের গৌরব, প্রেম ও ভক্তিরসের অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের এবং তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভাবঘন যুগলমূর্তি'র যেন নূতন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন লেখক তাঁহার আবেগ-স্পন্দিত ভাষার সাহায্যে। অনুভব-প্রবণ ভক্তের দৃষ্টি ভিন্ন এ কাজ সম্ভব হইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ভূমিকায় তাই লিখিয়াছেন: "গৌরাঙ্গের আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নিগ্ধ মহিমাকে আমাদের নিকট আভাসিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার মধ্যে লেখকের কোন আত্মসচেতনতা নাই, আছে গভীর প্রত্যয় ও বিনম্র প্রয়াস। বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নিগ্ধ মহিমাকে প্রকাশ করিবার জন্য ইহারই প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক।" বাৎসল্য-রসগৌরবে শচীমাতাও পুস্তকে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।

অন্যান্য সকলের মতোই বিষ্ণুপ্রিয়াও নদীয়ানাগরকে লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন ভক্তির পথে, অন্তরাত্মার সমস্ত প্রীতি নিবেদন করিয়া। তাই প্রিয়বিচ্ছেদদুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তাপসীর মতো; স্বামীর সাধনপথে বাধার সৃষ্টি করেননি। যে অসামান্য ধর্মীয় প্রতিভা একদিন আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে নিজেকে ও নিজ ধর্মভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই অন্তরালবর্তিনী এই রমণীর জীবনব্যাপী কান্না ত তাঁরই কণ্ঠে কীর্তনে রূপায়িত হইয়াছিল। লেখক এই রমণীকে আমাদের সামনে তাঁহার পূর্ণ মহিমায় উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। পুস্তকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নদীয়া-লীলা সম্পূর্ণ-ভাবে লিপিবদ্ধ। ৪৫২।৬১

মামা-ভাগ্নে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীহৃদয়রাম) —শ্রীমতী পুষ্প বসু। প্রকাশিকা—শ্রীমতী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক : বিশ্ববাণী। ১১এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য—৩॥৹ টাকা।

পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার ভাগিনের হৃদয়রামের মধুর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আজ আর কাহারও অজ্ঞাত নেই। পুস্তকটিতে হৃদয়রামের প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া ঠাকুরের সমস্ত ভার গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া উভয়ের সম্পর্ক ছোটদের জন্য গল্পের আকারে অতি চিত্তাকর্ষক-ভাবে বলা হইয়াছে। এই পুস্তকের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানবতা এবং মহামানবতা এই উভয়ের ধারণাই কিশোরচিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই দিক দিয়া পুস্তকটি সার্থক হইয়াছে। হৃদয়ের বাস্তবধর্মী বুদ্ধি এবং ঠাকুরের আপনভোলা দিব্যভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ক্রোধ ছোটদের নিকট অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ হইবে। হৃদয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় অল্পবয়স্কা বালিকার সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ঘটনাটি মনোজ্ঞ। ৪৯৩।৬১

অবিনশ্বর — ব্রহ্মচারী শান্তিপ্রকাশ। প্রকাশক—অমৃত সাহিত্য মন্দির। ১৬।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

সমগ্র পুস্তকটির মধ্যে ভূমিকাটি ভাল লাগিল। ইহাতে বিদেহী আত্মা সম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্র এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় যাহা এযাবৎ জানা গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

কিন্তু এই চিন্তাপূর্ণ ভূমিকাটি পড়িয়া পুস্তকটি সম্পর্কে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, পুস্তকটি পাঠ করিয়া তাহা সমূলে ভূমিসাৎ হইল। দেখিলাম কতকগুলি আষাঢ়ে ভূতের গল্পের সমষ্টি। কিন্তু 'ভূতের গল্প' বলিয়া প্রকাশ করাই কি উচিত ছিল না? তাহাতে হয়ত বইটির কাটতি বেশী হইত।

লেখকের ব্যক্তিত্বে এমন কিছু একটা বিশেষ গুণ ছিল যাহার জন্য তিনি বাল্য-কাল হইতেই বিদেহীদের দেখা পাইতেন। কাশীতে একবার স্বর্গের দেবর্ষিরা তাঁহাকে দেখা দিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া একপ্রকার বিশেষ বিমানযানে করিয়া অন্তর্ধান করিয়াছিলেন।

লেখক যেখানেই যাইতেন অজস্র ভূত ও প্রেতিনী তাঁহার নিকট জমায়েত হইত এবং তিনি তাঁহাদের নানা শাস্ত্রীয় উপদেশ দিয়া পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া পরলোকের পথে রওনা করিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি এই আত্মাদের যেরূপে বড় বড় পা ও বিকট আকৃতির কথা লিখিয়াছেন তাহা আধুনিক প্রেততত্ত্ব গবেষকদের নিকট শোনা যায় না, ছোটদের জন্য রচিত ভুতুড়ে গল্পতেই শোনা যায়।

লেখক নিজের মাতার আত্মার সহিত স্বর্গলোক প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আকাশপথে পর্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন।

৪৯০।৬১

উপন্যাস ও বড় গল্প

অচেনা। শুদ্ধসত্ত্ব বসু। সুরুচি প্রকাশনী। ১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

কবি হিসাবে শুদ্ধসত্ত্ব বসু খ্যাতিমান। সাম্প্রতিক কালে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন, তাই তাঁর রচনায় এক দিকে যেমন কাব্যের রসাস্বাদন সম্ভব, অন্য দিকে তেমনি কাহিনী রচনার আড়ষ্টতাও পরিদৃশ্যমান। তথাপি এই গ্রন্থে বর্তমান জটিল জীবনের সহৃদয় অবলোকন নিষ্ঠাবান পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টিগোচর হবে। কাহিনী রচনার কিছু অংশে লেখক কষ্টকল্পিত ঘটনার অবতারণা করেছেন যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ভাষা স্বচ্ছ এবং চিত্রধর্মী। পরবর্তী রচনায় লেখকের সাফল্য কামনা করি।

৩০৯।৬১

রোদ বৃষ্টি ঝড়। মনোজ দাস। হানিকম্ব পাবলিশার্স। ১০৬এ সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪। মূল্য ২৲।

নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন রচনা, ভাষা ব্যবহার আড়ষ্ট, কাহিনী অংশ বৈচিত্র্যহীন। চরিত্রচিত্রণে কখনও কখনও চমকের পরিচয় দেয় কিন্তু তা নিতান্তই মুহূর্তের জন্য। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মামুলী। ৩৯২।৬১

সানাই—অজিতকৃষ্ণ বসু। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দামঃ ২·৫০ নয়া পয়সা।

উদয়নারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে চিত্রার বিয়েতে এসেছে সানাইবাদক মকবুল হাসেন। সানাইয়ের সুরের সঙ্গে শ্রোতারা যেদের অতীত দিনগুলির স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছে। পঙ্গু পাইলট দীপক বোস এবং পাড়ার সর্দার শঙ্কর চিত্রার কাছে আশ্বাস পেয়েছিল, কিন্তু কেউই তাকে পায়নি। চিত্রাকে প্রায়-ছিনিয়ে নিয়ে গেল সুব্রত মজুমদার। দীপক আর শঙ্কর সানাইয়ের সুরে আচ্ছন্ন হয়ে সেই কথাই ভাবছে। পার্বতী চৌধুরাণী ভাবছে তার অতীত ঐশ্বর্য এবং মৃত স্বামীর কথা। নবদম্পতি স্বামী-স্ত্রীও ভাবে বিভোর হয়ে উঠেছে। 'আজ রজনীর শেষ' সানাইবাদক মকবুলও আচ্ছন্ন হয়ে ভাবে তার আব্বাজানের কথা—যিনি নবদম্পতির সুখের জন্য প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন। শেষ রজনীতে প্রাণ হারালো পার্বতী চৌধুরাণী।

'সানাই'কে উপন্যাস বলা যায় না। একে একাধিক ছোট গল্পের সমষ্টি বলা যেতে পারে। সানাই-এর ঘটনায় যেমন পারম্পর্যের অভাব রয়েছে, তেমনি কোনো চরিত্রই যথার্থভাবে গড়ে ওঠেনি। অথচ গ্রন্থটিতে প্রকাশকের মনোরম রুচি সর্বত্র বিচ্ছুরিত হয়ে রয়েছে। ৪৮৫।৬১

নওগাঁর প্রাসাদে—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। সরস্বতী প্রকাশালয়। ৯৮, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ৩·৫০ নয়া পয়সা।

উপন্যাস রচনায় সুশীলকুমার ইতিমধ্যেই কিছু খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, এই উপন্যাসটিতে সে খ্যাতি বর্ধিত হইবে কি? বঙ্গদেশে জমিদারদের মদ ও মেয়েমানুষে আসক্তির কাহিনী কিছু নূতন নয়, সুমিত্রার মতো রূপের অনলে ইতিপূর্বে অনেক মেয়েই দগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু সুশীলবাবু তাঁহার উপন্যাসে বিলাসের এই উপকরণ দুইটির উপর আকর্ষণ যে কিরূপে হৃদয়হীনভাবে নির্লজ্জ হইতে পারে তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। পুত্রের এই পাপ বাসনে মাতার প্রশ্রয় যখনই আরম্ভ হইল, তখন হইতেই শেষ দৃশ্যে প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ ও মাতা-পুত্রের মস্তকে বজ্রাঘাতের অমোঘ ভবিতব্যতার আভাস প্রতিটি চরণকে বেগবান করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র পুস্তকটিতে যে যথেচ্ছাচার, প্রচণ্ড ভোগলিপ্সা ও অবাধ অত্যাচার ও অর্থব্যয়ের প্রজ্বল চিত্র দেখানো হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকের স্পষ্ট ধারণা জন্মায় কেন এ দেশে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন হইয়াছে। ৪৮৯।৬১

কবিতা

এক নদী বহু তরঙ্গ। অ-কু-ব। বসুধারা প্রকাশনী। ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·৫০।

এমন একটি (আশ্চর্য) কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ যে কোন পাঠক এবং সমালোচককে কিঞ্চিৎ বিব্রত এবং বিরক্ত করে তুলবে। এমন অদ্ভুত হাস্যকর কাব্যপ্রয়াসের দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিরল, বুঝি শতাধিক বর্ষ পূর্বেও সম্ভব ছিল না। (৩১৬।৬১)

ছোট গল্প

বনতুলসী—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ১।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য—চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল গবেষক হিসেবে নয়, কবিতা ও ছোটগল্প-লেখক হিসেবে। একথা শুনে হয়তো অনেকেই বিস্মিত হবেন। শ্রীভট্টাচার্যকে জানবার জন্যে বনতুলসীর প্রকাশ অপরিহার্য ছিল। সুতরাং, বলা বাহুল্য, বনতুলসীর মাধ্যমে শ্রীভট্টাচার্যের গল্প গ্রন্থকার হিসেবে আবির্ভাব আকস্মিক নয়। 'বনতুলসী'র নামকরণের মধ্য দিয়ে যে ব্যঞ্জনা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনিভাবেই তিনি চৌদ্দটি অনবদ্য গল্পে সরল সহজ জীবনের মানবীয় আবেগগুলির রস-মূর্তি নির্মাণ করেছেন। বাইরে যদিও কয়লার কালি, হৃদয়ে কত সৌন্দর্য, মন কী অতুল ঐশ্বর্য! গল্পের ক্ষেত্র হয়তো মানবমনের বিভিন্ন সমস্যার দ্বারা প্রতিটি নাগরিকতার গণ্ডিতে বিন্যস্ত নয়, কিন্তু গল্পের নর-নারী বিক্ষুব্ধ। অবশ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় নয়, শান্তিই কাম্য। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ হচ্ছে বিনষ্টির মূল কারণ। তাই ঠিকাদারবাবুদের শিকার হয়েছে মালকাটায় পরিণত সাঁওতালরা। 'বনতুলসী' গল্পে মধুরের মাধ্যমে অপূর্ব বাৎসল্যরস সঞ্চারিত হয়েছে। 'ঝরাপালকে' সার্কাস জীবনের পটভূমিতে দুটি দগ্ধ মনের প্রেমের উজ্জ্বল্য বিস্ময়রসের সৃষ্টি করেছে। ব্রাত্যদের যেমন তিনি সহজেই গ্রহণ করেছেন, তেমনি সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের চরিত্রাঙ্কনে শ্রীভট্টাচার্য গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন। কলিয়ারী অঞ্চল, পদ্মা, বাংলার বাইরের পরিবেশ ঘটনানুগ। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য শুধু শুষ্ক গবেষক নন, একজন জীবনরস রসিকস্রষ্টা, একথা বলা অবশ্য কর্তব্য। ৬০৮।৬১

কিশোর সাহিত্য

বঙ্গসংস্কৃতির রূপরেখা — শ্রীবিনয় চৌধুরী। প্রকাশক ঃ সাহিত্য চয়নিকা। ৫৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সমাজ, ধর্ম, জাতীয়তা, সাহিত্য প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বঙ্গদেশের কৃতী সন্তানেরা যেভাবে অকুতোভয়ে একনিষ্ঠতার সহিত নিজ নিজ সাধনায় অগ্রণী হইয়া বঙ্গদেশের সংস্কৃতির বাহক ও ধারক হইয়াছিলেন, পুস্তকটি তাহারই সংক্ষিপ্ত কাহিনী, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভাষায় এ-কালের বঙ্গদেশের কিশোরদের শুনাইয়াছে। আজ বঙ্গদেশের দুরাশা ও দুর্দশার দিনে এ দেশের এই

গোরবময় ঐতিহ্যের কাহিনী যদি দেশের ভবিষ্যৎও এ-কালের তরুণদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করে তাহা হইলে লেখকের এই শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৪৬০।৬১

চেকোশ্লোভাকিয়ার রূপকথা—শিবপ্রসাদ বিশ্বাস। হোমশিখা প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর। মূল্য ১·২৫ নয়া পয়সা।

কিশোর-পাঠ্য এই পুস্তিকাখানি মাত্র ১১টি ছোট গল্পের সংকলন। চেক-ভাষা হইতে অনূদিত হইলেও চেক-রূপকথার মৌলিকত্ব সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। রূপকথার আকারে এই ছোট গল্পগুলি নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সহজ, সরল এবং সাবলীল। মুদ্রণ পারিপাট্য ও প্রচ্ছদপট প্রশংসার্হ। ৯৮।৬১

মুখোশের মেলা—অখিল নিয়োগী। সাহিত্য চয়নিকা, ৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। আড়াই টাকা।

আজ আমরা হাসতে ভুলে গিয়েছি—নানা সমস্যায় আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত। সাহিত্যের দিকে তকালেও ঐ একই দৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নানা সমস্যামূলক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে লেখা উপন্যাস ও গল্পের অভাব নেই—নতুন নতুন বই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু হাসির বইয়ের সংখ্যা তার ভেতর খুবই কম। আলোচ্য পুস্তকখানি এই অভাব কিছুটা পূরণ করবে। ৬১৯।৬১

ভ্রমণ

কাশ্মীর দেখে এলাম—দেবেশ সান্যাল। নবরঙ্গ পাবলিশার্স। ৩১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি লেখকের কাশ্মীর-ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় উল্লেখযোগ্য তথ্য-সমৃদ্ধ নয়। ইহাতে মাত্র দর্শনযোগ্য কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কাশ্মীরের কারুকার্য সম্পর্কে সামান্য কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কয়েকটি আলোকচিত্রও ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর সম্বন্ধে এত অল্প পরিসরে পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টি সাধন করার চেষ্টা লেখকের পক্ষে অবশ্য প্রশংসার যোগ্য। কলেবরের তুলনায় পুস্তিকাখানির মূল্য আরও কিছু কম হওয়া উচিত ছিল।

২৩৭।৬১

নাটক

পাওনা—লীলা মজুমদার। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড; ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭। ২·৫০ নঃ পঃ।

'পাওনা' শ্রীমতী লীলা মজুমদারের একটি নাটিকা-গ্রন্থ। 'মোহিনী' 'ডিটেকটিভ' 'তিন অংক'—এই তিনটি নাটিকা আলোচ্য সংকলনে স্থানলাভ করেছে। নাটিকাত্রয়ের বিষয়বস্তু অভিনব এবং সুখপাঠ্য; বিশেষ করে 'মোহিনী' এবং 'তিন অংকে' পারিবেশের অসঙ্গতি যেভাবে ফুটে উঠেছে তা উপভোগ্য।

৫৬৩।৬০

প্রাপ্তি-স্বীকার

সাহিত্য ও সাধনা (১ম খণ্ড)—বিপিনচন্দ্র পাল।

ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল—সুনীলকুমার নন্দী।

Soul Of India—Bipin Chandra Pal.

Writings and Speeches—Bipin Chandra Pal.

Homage to Rabindranath Tagore—Edited by B. M. Chaudhuri.

Speak English as you Please.

জপজী বা শ্রীশ্রীগুরু-মাহাত্ম্য তৎসহ যোগ-ব্যবস্থা—স্বামী যোগানন্দ।

নৌকাবিলাস ও মাথুর (১ম খণ্ড)—স্বামী যোগানন্দ।

একটি প্রেমের কাহিনী—বোম্মানা বিশ্বনাথম।

এই সব আলো প্রেম—অসিত গুপ্ত।

উত্তর তরঙ্গের নায়ক—দিলীপকুমার সেন।

অপমানিত ও লাঞ্ছিত—ডস্টয়েভস্কি অনুবাদক—সমরেশ খাসনবীশ—সম্পাদনা—গোপাল হালদার।

দেশ-বিদেশের বনৌষধি (১ম খণ্ড)—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

বেদান্ত পরিচয় (১ম খণ্ড)—শ্রীমন্ মাধবানন্দ।

চন্দ্রশেখর

আশা-নিরাশার দোলা

বছরের পর বছর আসে। সারা বছরে আমরা কী পেলাম আর কী পাইনি বছর-শেষে তার হিসাব মেলাতে বসি। হিসাবের অংক যদি না মেলে তবুও আমরা আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। একদিন হয়তো হিসাব মেলাতে পারব। বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে এই আশাটুকুই আজ আমাদের একমাত্র সম্বল, চলার পথের প্রেরণা। পথ চলতে গিয়ে পথ ভুল করলেও আমরা ভাবি, একদিন লক্ষ্যে পৌঁছব। এই ভাবনাটুকুও যদি আন্তরিক হয় তবে ঈপ্সিত লক্ষ্য কোনদিনই মরীচিকা হয়ে দেখা দেবে না।

বাংলা ছবির গত এক বছরের অর্থাৎ ১৯৬১ সালের খতিয়ান ঘেঁটে ক্ষতির যে অংকটি আমাদের চোখে পড়ে তাতে আমরা হাল ছাড়িনি। বাংলা ছবি এখনও যৌবন অতিক্রম করেনি। এরই মধ্যে বাংলা ছবি যে কৌলীন্য অর্জন করেছে তা আজ ঘরে-বাইরে স্বীকৃত। এই কৌলীন্যের মর্যাদা বাংলা ছবি পেল কী করে? বাংলা ছবির বহিরঙ্গ বৈভব নেই, কলাকৌশলের ঐশ্বর্য নেই। হিন্দী ছবির চেয়ে বাংলা ছবি অনেক বেশী দরিদ্র। কিন্তু এই দারিদ্র্যের মধ্যেও বাংলা ছবি প্রাণের এমন এক সম্পদ অর্জন করেছে যার কাছে বাইরের সমারোহ তুচ্ছ, আড়ম্বর অর্থহীন। বাইরের রিক্ততা সত্ত্বেও যে বাংলা ছবি প্রাণৈশ্বর্যে বিত্তবান তার কারণ এই চলচ্চিত্র শিল্প সব ব্যবহারিক উপঢৌকন ছেড়ে বুঝি একটি আত্মিক উপচারই খুঁজে নিয়েছিল। এই উপচার দিয়ে রসিকের চোখ নয়, মন ও অনুভূতিকে অধিকার করে নিতে চেয়েছিল বাংলা ছবি। এবং খুঁজে পেয়েছিল। তা হল কাহিনীর মাধুর্য, ঐশ্বর্য, বৈচিত্র্য। এই সম্পদকে আঁকড়ে ধরে বাংলা ছবি তিন দশক অতিক্রম করে বর্তমানের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে। এসেছে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার নিয়ে। সিদ্ধির প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

আখ্যান-ধনে ধনী বাংলা ছবির অঙ্গে নানা রূপ-রঙের অলঙ্কার পরিয়ে দিয়েছেন কালে কালে অনেক রূপকার। মহৎ শিল্পীরা এলেন পরের যুগে—এ-কালে। শিল্পের অভূতপূর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাংলা ছবিকে গৌরবের আসন দিলেন বিশ্বচলচ্চিত্রের দরবারে। আমরা আনন্দিত হলাম, গৌরবান্বিত হলাম।

আমাদের এই আনন্দ ও গৌরবের কালেও দেখি হঠাৎ করে দুঃসময়ের লগ্ন এসে উপস্থিত হয়। কাহিনী-গৌরবে বাংলা ছবি যে বিশিষ্ট আসনটি অধিকার করেছে, গত বছরের খতিয়ানে সেই গৌরবটি যেন অনেকটা ম্লান। ১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চৌত্রিশটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে সারা ভারতে ও বিদেশে গর্বভরে দেখিয়ে আনার মত কাহিনী-সম্পদ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে একটি বা দুটি ছবি। ভালো কাহিনীর ছবি গত বছরের খতিয়ানে আরও আছে। রসজ্ঞ ব্যক্তিদের বিচারে এর সংখ্যা দশের বেশী নয়। এটা আশার কথা নয় তা বলছি না। কিন্তু বেশীর ভাগ ছবির কাহিনীর ঝোঁক কোন দিকে? জনমনোরঞ্জনের প্রয়াস দোষের নয়! এ তো চলচ্চিত্রের অন্যতম শর্ত। বেশীর ভাগ ছবির কাহিনীতে কিন্তু দেখা গেছে, দর্শকের চিত্তবিনোদনের স্বার্থে রস-বর্জিত হাল্কা, স্থূল উপাদানের ছড়াছড়ি। টিকিট-ঘরের কথা চিত্রনির্মাতাদের ভাবতে হয় জানি এবং উৎকৃষ্ট বস্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা কদাচিৎই লাভ করে। তাই বলে চিত্র-নির্মাতাদের সজ্ঞান প্রয়াসটি সুন্দর ও সুস্থ ছবি তৈরির দিকে কেন নিয়োজিত হবে না?

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য অল্পকালের মধ্যেই বাংলা থেকে ছবি নির্বাচন করে পাঠানো হবে। প্রতিবারেই বাংলা থেকে যে-সব ছবি দিল্লিতে পাঠানো

চিত্রযুগের মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি "কাচের স্বর্গ"-র একটি দৃশ্যে জীবেন বসু, পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে গ্রথিত অগ্রদূতের নতুন ছবি "উত্তরায়ণ"-এর একটি বিশেষ মুহূর্তে উত্তমকুমার

হয়েছে তার সব কয়টিই যে পুরস্কৃত হয়েছে তা নয়। কিন্তু কাহিনী-সম্পদ ও শিল্প-মানের বিচারে এইসব ছবি বিদগ্ধজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেছে। তাঁরা বাংলা ছবির অগ্রগতি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন।

কিন্তু ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য দিল্লির সর্বভারতীয় সামনে যখন উপস্থিত হবে, তখন আমরা, বাঙালীরা অন্যান্যবারের মত এবারেও কি সমান গৌরব অনুভব করতে পারব? শিল্পের নবতর সমীক্ষায় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীর সম্পদে সমৃদ্ধ এমন কয়টি ছবি বাংলা চলচ্চিত্রের গত বছরের খতিয়ানে রয়েছে যা গর্বের সঙ্গে আমরা বাইরে দেখিয়ে আনতে পারি? জয়মাল্য হয়তো আমাদের জুটবে। কারণ আমাদের সত্যজিৎ রায় রয়েছেন এবং গত বছরের খতিয়ানে তাঁর একটি সর্বগুণান্বিত ছবি রয়েছে। শুধু একটি ছবিই বাংলা চিত্র-শিল্পের সারা বছরের ভরসা হয়ে থাকবে কেন? আরও যাঁরা কৃতী চিত্রস্রষ্টা আমাদের রয়েছেন এবং যাঁদের ওপর আমাদের আশা অপরিসীম তাঁদের কাছে কী আমাদের কোন দাবি নেই? বর্তমানের নৈরাশ্য আগামী দিনের আশা নিয়ে ভুলে থাকতে হয়। তাই আশা করব, এই নতুন বছরের শেষে আবার যে খতিয়ান নিয়ে আমরা বসব তাতে বাংলা ছবির নবতর গৌরবের স্বাক্ষরটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে।

হিন্দী ছবি "চাঁদি কি দিওয়ার"-এর বহির্দৃশ্য তোলা হয় কলকাতায়। সেই সময়ে লেকের ধারে ছবির নায়ক ভারতভূষণকে এই ভঙ্গিমায় বসে থাকতে দেখা যায়।

ফটো : অলক মিত্র

আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশবিদেশের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের বহু সুযোগ পেয়েছেন এদেশের চিত্রামোদীরা ১৯৬১ সালে।

বছরের গোড়ার দিকে পাঁচ দিনব্যাপী একটি উৎসবে পাঁচখানি বাছা-বাছা হাঙ্গেরীয় ছবি দেখানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ওদেশে যে নতুন চিত্র-শিল্প গড়ে উঠেছে এবং ছবির জগতে যে নিজস্ব ধারার প্রবর্তন করেছেন তরুণ হাঙ্গেরীয় পরিচালকরা তারই সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় এই ছবিগুলিতে।

সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে ৩৮টি বিভিন্ন দেশের ৩৫টি পূর্ণাঙ্গ ও প্রায় অর্ধশত ছোট ফিল্ম দেখানো হয় দিল্লি, কলকাতা, মাদ্রাজ ও বম্বেতে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে যে চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল এ দেশে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বহু সুযোগ ঘটেছিল এখানকার চিত্রনির্মাতাদের।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে তার-পরই অনুষ্ঠিত হয় পোলিশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। আন্দ্রে ওয়াইদা প্রমুখ পাঁচজন বিখ্যাত পোলিশ পরিচালকের ছবি এই উৎসবের গৌরব ও গুরুত্ব বাড়িয়েছিল। বছরে পোল্যাণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলা হয় কমবেশী ২৫খানি করে। সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য হলেও গুণের দিক দিয়ে পোলিশ ছবির স্থান একেবারে সামনের সারিতে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব এ বছরকার শেষ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান। পনেরো দিন ধরে এই উৎসব চলেছে এবং এই ক'দিনে ছ'টি পূর্ণাঙ্গ ও অনেকগুলি প্রামাণিক ও তথ্য চিত্র দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন রসের ছবি এগুলি এবং সোভিয়েত সিনেমার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় এগুলির মধ্যে।

এই উৎসবগুলি ছাড়াও অনেক বিখ্যাত বিদেশী ছবি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা-র নিজস্ব আসরে প্রদর্শিত হয়েছে এই বছরে। এই দুটি প্রতিষ্ঠান আইজেনস্টাইন ও ডি সিকা এই দুই বিশ্ববরেণ্য পরিচালকের কয়েকটি

কালজয়ী ছবিরও প্রদর্শনী আয়োজন করে চিত্রামোদীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

১৯৬১ সালে আরও একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব হয় শিশুদের জন্যে। শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ এই উৎসবের উদ্যোগ করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই উৎসবে নিজেদের তোলা শিশুচিত্র পাঠান।

তপন সিংহের আমেরিকা-সফর

সুখ্যাত চিত্রপরিচালক তপন সিংহ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে ষাট দিনব্যাপী আমেরিকা সফর শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে শ্রীসিংহ বলেন, সত্যজিৎ রায়ের "অপু"-চিত্রত্রয়ী "পথের পাঁচালী" "অপরাজিত" ও "অপুর সংসার" আমেরিকায় জন-সংবর্ধনা লাভ করার পর আমার ধারণা হয়েছে সেখানে উৎকৃষ্ট ভারতীয় ছবির চাহিদা বেড়েই চলবে। এই বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি ফিরেছি তা আশাপ্রদ। এই সম্পর্কে নিউ ইয়র্কের প্রোডিউসার্স গিল্ডের সভ্যদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলেছি। ও দেশের কয়েকজন চিত্র-পরিবেশক ও প্রদর্শকের সঙ্গেও এ বিষয়ে [illegible] হয়েছে। এইসব আলোচনা আমাকে উৎসাহিত করে তুলেছে।"

শ্রীসিংহ আরো বলেন, "ও দেশে আমাকে যা সবচেয়ে বেশী [illegible] দিয়েছে তা হচ্ছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীর অনেক [illegible] কৌতূহল। ও দেশে যাদের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি তাঁদের সকলের মধ্যেই এই কৌতূহল লক্ষ্য করেছি।"

হলিউডের বর্তমান চিত্রপরিচালকদের প্রসঙ্গে শ্রীসিংহ বলেন, "স্ট্যানলি ক্রেমার, উইলিয়াম ওয়াইলার, ফ্রেড জিনেমান প্রমুখ পরিচালকেরা এখনও এমন রসোত্তীর্ণ ছবি তোলেন যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পর্যায়ে স্থান পাবার যোগ্য।"

আমেরিকায় অবস্থানকালে তপন সিংহ সান ফ্রান্সিসকোয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পাঁচজন বিচারকের অন্যতম রূপে উপস্থিত ছিলেন। চৌত্রিশটি দেশ থেকে চল্লিশটির ওপর ছবি এই উৎসবে পাঠানো হয়েছিল। সান ফ্রান্সিসকোয় বিচারকের কাজ শেষ করে তিনি হলিউডে গিয়েছিলেন। হলিউডের চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার অবসরে তিনি সেখানকার বিশিষ্ট শিল্পী, চিত্র-পরিচালক ও চিত্রপ্রযোজকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সোভিয়েত সিনেমা

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ফিল্ম স্টুডিও আছে চৌত্রিশটি। এগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের ছাব্বিশটি শহরে অবস্থিত।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার তৃতীয় চিত্রার্ঘ্য 'সূর্যস্নান'এর নায়িকার রূপসজ্জায় দীপ্তি মিত্র

বছরে প্রায় আট শো ছবি তৈরি হয় এই স্টুডিওগুলিতে। তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের সংখ্যা গড়ে এক শো ত্রিশটি। বাকিগুলি বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত শিশুচিত্র, কার্টুন, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ছবি, পঠন পাঠনের জন্যে তোলা বিশেষ রকমের শিক্ষা-চিত্র, ডকুমেণ্টারী ইত্যাদি। ছবিগুলি সোভিয়েত দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় তোলা হয়।

বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়াতে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি। ১৯৬১ সালে এ পর্যন্ত চার শো কোটিরও বেশী দর্শক এই সব প্রেক্ষাগারে ছবি দেখেছেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কিঞ্চিদধিক সত্তরটি দেশে শ্রেষ্ঠ রুশীয় ছবি-গুলি দেখানো হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি সহ বাহান্নটি দেশের চলচ্চিত্র সোভিয়েত সিনেমাতে দেখানো হয়েছে। বাংলা ছবি "হেডমাস্টার" সম্প্রতি ও দেশে প্রদর্শনের জন্য ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ডাবিং পদ্ধতিতে ছবিটিকে ভাষা-

সত্যজিৎ রায়ের রঙীন ছবি "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়

ন্তরিত করা হচ্ছে। হিন্দী ছবি "মাদার ইণ্ডিয়া" শীঘ্রই ও দেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে।

বিদেশী চলচ্চিত্র-শিল্পীদের সঙ্গে যুক্তভাবে ছবি তুলতে সোভিয়েত সিনেমা-শিল্পীরা বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। এ পর্যন্ত তাঁরা ভারত, চীন, ফ্রান্স, ফিনল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, কিউবা ও অন্যান্য অনেক দেশের সিনেমা-শিল্পীদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ছবি তৈরি করেছেন। ভারতীয় ও সোভিয়েত শিল্পীদের যৌথ প্রচেষ্টায় তোলা "পরদেশী"-র পর ঐ ভাবে আর একটি ছবি বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে। বম্বে ও তাশখন্দের শিল্পী ও কলাকাররা একত্রে প্রাচীন কবি মীর্জা বেদিলের বিখ্যাত প্রেমকাব্য "দুইটি হৃদয়ের গাথা" অবলম্বনে এই ছবিটি তুলছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গত ষোল বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সোভিয়েত ফিল্ম দুশো পনেরোটি পুরস্কার বা মানপত্র পেয়েছে। সোভিয়েত চলচ্চিত্রের শিল্পমান যে কতখানি উন্নত তা এই থেকেই বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ

জ্যোতির্ময় বসু-রায়

রবীন্দ্র-শতাব্দী জয়ন্তীর এই বছরের এগারটি মাস অতিবাহিত। শেষের মাসটি এখন চলছে। ইতিমধ্যে সারা দেশ জুড়ে সহস্র সহস্র সংস্থা রবীন্দ্র উৎসব পালন করছেন। কোন কোন গোষ্ঠী এখনও করছেন।

রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে নানাভাবে—রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা, কবির আলোকচিত্র অথবা কবি-অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রদর্শনী, বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমে কবির জীবন কাহিনী প্রকাশ, রবীন্দ্রসংগীত অনুষ্ঠান, কবিকৃত নৃত্যনাট্য রূপায়ণ এবং রবীন্দ্র-নাট্য-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি প্রধানত গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজোর জন্য রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য অথবা নাটক বেছে নিয়েছিলেন। এক কথায়, এখানে রবীন্দ্র-উৎসবের প্রধান অঙ্গ হয়েছে নাট্যাভিনয়। এ বছরের বহুল অভিনীত কয়েকটি রবীন্দ্র-নাটক হল: 'চিরকুমার সভা', 'বিসর্জন', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'ডাকঘর', 'মুকুট', 'রক্তকরবী', 'নটীর পূজা', 'শেষরক্ষা', 'পরিত্রাণ', 'তপতী', 'বাঁশরী', এবং 'মুক্তির-উপায়'। রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকের তালিকা অবশ্যই ওই কয়েকটি নামে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে অনুল্লিখিত সেই বাকী নাটকগুলির কিছু কাব্য-নাট্য, কিছু ভাবধর্মী প্রতীক-নাট্য—অভিনয়ের মাধ্যমে যে সব রচনাকে রসোত্তীর্ণ করা দুরূহ। 'রাজা', 'অরূপ রতন', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটক এ-বছর অভিনীত হয়নি এমন কথা বলি না। 'রক্তকরবী' এবং 'ডাকঘর' এর মতো ভাবপ্রধান নাটক তো বহুল অভিনীত নাটকের তালিকাতেই স্থান পেয়েছে। তবু সাধারণভাবে বলা চলে, আগেকার মঞ্চ-সফল, জনপ্রিয় নাটকগুলিই (যেমন 'চিরকুমার সভা', 'শেষ রক্ষা', 'বিসর্জন') যেমন এ-ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেয়েছে। প্রতি দল তাঁদের সাধ্য মতো অভিনয়ে রবীন্দ্র-নাট্যের প্রতি সুবিচার করবার চেষ্টা করেছেন।

কোন কোন নাট্য-সম্প্রদায় নূতনত্ব বা বৈচিত্র্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করেছেন। প্রশ্ন এসেছে,—রসিকজনের মনে প্রশ্ন এসেছে এইখানে। রবীন্দ্রনাথের গল্প নাট্যাকারে (যে-আকার রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নয়) পরিবেশন করার অধিকার নিয়ে নিশ্চয় এ-প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নাট্যরূপ যখন দেওয়া হবে, তখন কোন্ দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখতে হবে নাট্যকারের। মাত্র বাহিরের ঘটনাগুলির দিকে, না গল্পের সারমর্মের দিকে যা হল রচনার অন্তরের কথা?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নাট্যরূপকাররা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পকে নাটকে বাঁধতে গিয়ে নতুন ঘটনার উদ্ভাবন করেছেন এবং স্বভাবতই অতিরিক্ত সংলাপ যোজনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ-সব ক্ষেত্রে প্রায়শ, এক সুরের সঙ্গে অন্য সুরের

চিত্রশোভনার "শাস্তি"র একটি দৃশ্যে অপর্ণা দেবী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বাদল পিকচার্সের নির্মীয়মান চিত্র "আগুন"-এর একটি দৃশ্যে নির্মল-কুমার ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য রচনায় ফর্ম নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু বক্তব্যের ব্যাপারে দৃষ্টি রেখেছেন তাঁর অন্তরের দিকে। সেখানে তিনি স্থিতধী, সত্যদ্রষ্টা। সেই সত্যটুকু বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার সারবস্তু গ্রহণ করলে রসাস্বাদন সম্পূর্ণ হয় কি? তাই রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ যাঁরা দেবেন, গল্পের সারমর্ম তথা ভিতর-কার সত্যটুকু জানা তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় কি? আর সেই সঙ্গে সমগ্র আগে থেকে বিচার করে নেওয়াও বুঝি আবশ্যক। বিষয়টি আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে।

নাট্যাভিনয়

গত ২০শে ডিসেম্বর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক একাঙ্ক নাটক ও প্রথম বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় একাঙ্ক নাটক বিভাগে বিয়াল্লিশটি এবং পূর্ণাঙ্গ বিভাগে তেরোটি নাট্যগোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

শেষোক্ত বিভাগে থিয়েটার লাইবারের "ধূলিমাটির সুর" প্রথম, ইউনিটি থিয়েটার কয়ারের "গৃহপ্রবেশ" দ্বিতীয় ও প্রতাপপুর মিলন মন্দিরের "রঙতুলি" তৃতীয় স্থান অধিকার করে। একাঙ্ক বিভাগে প্রথম হয় চক্র সম্প্রদায়ের "সলিউশন এক্স"। যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে চরৈবেতির "ব্যান্ডমাস্টার" এবং শিল্পী-মহল-এর "পাঁক"।

* * *

আগামী ১৫ই জানুয়ারী থেকে তিন দিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন বৈশাখী। কল্লোল মজুমদার কৃত রবীন্দ্রনাথের "ঠাকুর্দা" গল্পের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ দিয়ে উৎসব শুরু হবে। ২২শে জানুয়ারী অভিনীত হবে পৃথ্বীশ সরকারের "লবণাক্ত"। ২৪শে উৎসবের সমাপ্তি। সেদিন দুটি নাটকের অভিনয়ায়োজন করা হয়েছে—পরশুরামের ছোট গল্প অবলম্বনে তরুণকুমার কৃত "কে থাকে কে যায়" এবং কমল চট্টোপাধ্যায় রচিত "শাশ্বতিক"। সবগুলি নাটকের পরিচালনা করবেন কমল চট্টোপাধ্যায়। মিনার্ভা মঞ্চে এই নাট্যোৎসবের আসর বসবে।

* * *

এই মাস থেকে সাজঘরের সভ্যবৃন্দ দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গন মঞ্চে প্রতি শুক্রবার তাঁদের দুটি বহু প্রশংসিত নাটক "সন্ন্যাসী" ও "নারীঘটিত বিপদ"-এর নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়াও তাঁরা সলিল সেন কর্তৃক প্রকৃত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত "আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু"র গল্পটি "কিংবদন্তী" নামে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত করে মঞ্চস্থ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

* * *

দশরূপক প্রযোজিত জনপ্রিয় নাটক "ডানা ভাঙা পাখি" আগামী ৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় মিনার্ভা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। এই নাটকের ত্রিস্তর মঞ্চস্থাপত্য একটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ অবদান। নাটকখানি রচনা করেছেন পরেশ ধর। নির্দেশনায়, সংগীতে ও আলোকসম্পাতে আছেন যথাক্রমে মণীন্দ্র মজুমদার, জগন্নাথ ধর ও রবীন দাস।

* * *

হাওড়ার অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য সংস্থা বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠী আগামী ১৪ই জানুয়ারী, রবিবার সন্ধ্যায় রামরাজা-তলায় স্থানীয় দুই প্রতিভাধর নাট্যশিল্পী শ্রীফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীগণপতি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবেন এবং ঐ সঙ্গে সুধাময় লাহিড়ীর "মেঘলা আকাশ" ও রমেন লাহিড়ীর "তমসার তীরে" নাটক দুটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটক দুটি পরিচালনা করবেন রমেন লাহিড়ী।

* *

মাদ্রাজে তোলা হিন্দী ছবি "মাহুত"-এর একটি যুদ্ধ-দৃশ্যে উদয়কুমার ও বীরাপ্পা।

দক্ষিণ কলিকাতার বিশিষ্ট সংগীত প্রতিষ্ঠান মল্লার গত ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত করেন। এই উপলক্ষে "এক যে ছিল রাজা" ও "ভুল স্বর্গ" নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। নৃত্যনাট্য দুটি গ্রথিত করেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। নৃত্য পরিকল্পনা ও নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন যথাক্রমে রুবী দত্ত ও প্রভাস দত্ত। দেবব্রত বিশ্বাসের সংগীত পরিচালনা ও রুবী দত্তের নৃত্য সকলকার সাধুবাদ অর্জন করে।

*　　*　　*

গত ১৭ই ডিসেম্বর গীতবীথিকার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে সুসম্পন্ন হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন স্বনামধন্য শিল্পী ওস্তাদ আমীর খান। পরিশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা একটি বিচিত্রানুষ্ঠান ও রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বটুক নন্দী, বকুল সেনগুপ্তা, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, সুধীর সিং, মণি সিং, অনিল দাশগুপ্ত ও শ্যামলেশ ঘোষ।

গীতবিতান নিবেদিত "বসন্ত" নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য।

মল্লার পরিবেশিত "ভুল স্বর্গ" নৃত্যনাট্যের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রুবী দত্ত

গীতবিতান-এর রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব

কলকাতা এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন সংস্থার রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবে অংশ-গ্রহণ করে গীতবিতান বছর শেষে রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁদের নিজস্ব উৎসবের আয়োজন করেন। গত ২৫শে ডিসেম্বর থেকে হিন্দী হাই স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে গীতবিতান-এর পাঁচ দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের প্রথম দিন গীতবিতান-এর শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" গীতি-নাট্যকারে পরিবেশন করে রসিকজনকে মুগ্ধ করেন। অমিত মিত্র ও প্রশান্ত ঘোষ (বাল্মীকি), সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায় (বালিকা) ও অনীতা সেনগুপ্ত (লক্ষ্মী) তাঁদের গানে গীতি-নাট্যটিকে চিত্তাকর্ষক করে তোলেন। নৃত্যাংশে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন রীনা ভট্টাচার্য। হরেণ মিত্র, অজিত দাস ও তাপস সেন যথাক্রমে সংগীত পরিচালনা, নৃত্য-পরিচালনা ও আলোক-সম্পাতের দায়িত্ব বহন করেন।

দ্বিতীয় দিন প্রান্তিক এর আই পি টি এ শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের "[illegible]" মঞ্চস্থ করেন। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনীত এই নাটকে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, শিশির সেন, রেবা রায়চৌধুরী, কালিন্দী সেন, শর্মিলা বিশ্বাস প্রভৃতি।

তৃতীয় দিনে গীতবিতান-এর শিল্পীরা নিবেদন করেন "বসন্ত"। বসন্ত-ঋতু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান এই নাট্যাভিনয়ে পরিবেশিত হয়। নাটকের প্রধান অংশে ছিলেন কাজী সব্যসাচী, সুকুমার ঘোষ, দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা রায়, সর্বাণী গুপ্ত, রীনা ভট্টাচার্য প্রভৃতি। নৃত্যকলায় পারদর্শিতার পরিচয় দেন মন্দিরা গুপ্ত রায় ও ছন্দা চৌধুরী।

চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে গীতবিতান-এর উপহার ছিল "চিত্রাঙ্গদা" ও "মায়ার খেলা।" "চিত্রাঙ্গদা"র প্রধান ভূমিকাগুলির রূপ দেন

সিটিজেন্স ফিল্মসের যুগান্তকারী টেকনিকলার ছবি "গংগা-যমুনা"র একটি মধুর মুহূর্তে নায়কনায়িকার বেশে বৈজয়ন্তী-মালা ও দিলীপকুমার

অনিন্দা রায়চৌধুরী, শুভ্রা পাল ও উমা মেনন। কমলা বসু ও রমা দাস পুরকায়স্থের গানে নাটকটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পরিচালক ছিলেন শৈলেন্দ্রনারায়ণ বসু।

গীতবিতান-এর বহুপ্রশংসিত "মায়ার খেলা" গীতি-নাট্যের প্রধান অংশগুলিতে অবতরণ করেন রীনা ভট্টাচার্য, সন্ধ্যামালতী নাগচৌধুরী, ছন্দা চৌধুরী প্রভৃতি। কণ্ঠ-সংগীতে ছিলেন অদিতি সেনগুপ্ত, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, বেলা ভট্টাচার্য, অমিত মিত্র, প্রশান্ত ঘোষ, তরুণ মিত্র প্রভৃতি।

বেহালায় রবীন্দ্র-শতাব্দী উৎসব

গত ১৫ই থেকে ১৭ই ডিসেম্বর বেহালার নন্দরপুর পাঠাগারের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন রবীন্দ্র-নাথের দুর্লভ আলোকচিত্র এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা কবি-প্রতিকৃতির একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বেহালার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত। সেদিনকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল পঞ্চরূপা সংস্থা কর্তৃক "বৈকুণ্ঠের খাতা"র নাট্যাভিনয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর বক্তৃতার পর রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন বেলা ভট্টাচার্য, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখো-পাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, অর্ঘ্য সেন, সুব্রতা সেন, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা বসু প্রভৃতি শিল্পী। সংগীতানুষ্ঠানের পর "ভানুসিংহের পদাবলী" নৃত্যনাট্যাকারে পরিবেশন করেন আনন্দনিকেতন গোষ্ঠী।

তৃতীয় দিনে পাঠাগারের চতুর্দশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুধাংশুকুমার বসু এবং প্রধান অতিথি-রূপে যোগ দেন শ্রীপাহাড়ী সান্যাল। অংশ-গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (আবৃত্তি), ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শচীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, তরুণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, উদয় পাল, উৎপলা সেন, নীতা সেন, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায় (কণ্ঠসংগীত), জহর রায়, মিণ্টু চক্রবর্তী ও সুশীল দাস (হাস্যকৌতুক), ভি বালসারা ও সম্প্রদায়, নটুক নন্দী ও সম্প্রদায় এবং রাজেন সরকার (যন্ত্রসংগীত)।

রঙমহলে অবস্থান ধর্মঘট

যা ছিল সম্ভাবনার পর্যায়ে, নতুন বছর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ১লা জানুয়ারী থেকে রঙমহলের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ হয়ে গেছে। ৩১শে ডিসেম্বর "চক্র" নাটকের শেষ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত শহরের আর একটি সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বার বন্ধ হল। এ সংবাদে শহরের তথা সারা বাংলার নাট্যামোদী মাত্রেই বিচলিত হবেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়নি। রঙমহলের কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অভিনয়ের

আসর তুলে দিয়ে মণ্ডটি শৌখিন নাট্য-সংস্থাদের দৈনিক হারে ভাড়া দেবেন এই খবর পেয়ে রঙমহলের শিল্পীরা যুক্তিসংগত শর্তে সাপেক্ষে থিয়েটারটি নিজেরাই চালাতে চান। এই সূত্রে কিছু আলাপ-আলোচনাও চলে মালিকদের সংগে অভিনেতৃপক্ষের। শেষোক্ত দল বলছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের হাতে থিয়েটার চালাবার ভার ছেড়ে দিতে মালিক পক্ষ স্বীকৃত হন। এই মৌখিক চুক্তি যাতে কার্যকরী হয়, তার জন্যে যথারীতি দলিল সম্পাদন করে দেবার আশ্বাস দেন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ। স্থির হয়, ৩১শে ডিসেম্বর "চক্র" নাটকের শেষ অভিনয়ের পর সকলকার সামনে কর্তৃপক্ষ অভিনেতৃবৃন্দের হাতে থিয়েটারের পরিচালনা-ভার তুলে দেবেন এবং সেইমত দলিলও সই করবেন।

অগ্রদূত পরিচালিত "বিপাশা"র নায়িকার রূপসজ্জায় সুচিত্রা সেন

কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ও ক্ষণে দেখা গেল মালিকপক্ষ অনুপস্থিত। থিয়েটারের অভিনেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মীরা তখন সম্মিলিতভাবে স্থির করেন যে, যতদিন না মালিকরা তাঁদের মৌখিক অংগীকার রক্ষা করছেন, ততদিন পর্যন্ত শিল্পী ও কর্মীরাও প্রেক্ষাগৃহ থেকে নড়বেন না। সেইমত ৩১শে ডিসেম্বর থেকে আমাদের লেখবার সময় পর্যন্ত (২রা জানুয়ারী) রঙমহলের শিল্পী ও কর্মীরা থিয়েটার গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে আছেন। নাট্যশালায় এই ধরনের অবস্থান ধর্মঘট পূর্বে কখনও এবং কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এদিকে মালিকপক্ষ বলছেন, থিয়েটারটি পাকাপাকিভাবে বন্ধ করবার অভিপ্রায় তাঁদের মোটেই নেই। পর পর কয়েকটি নাটকের অভিনয়ে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার
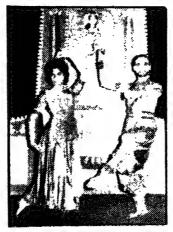
ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির অনুষ্ঠিত একটি নাচের আসরে এই আমেরিকান শিল্পীদ্বয় ভারতীয় নৃত্যে নৈপুণ্য দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেন

জন্যে তাঁরা স্থির করেন, নিয়মিত অভিনয় কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রেখে পরবর্তী নাটকের প্রস্তুতির জন্যে তাঁরা আত্মনিয়োগ করবেন। তাঁরা আরো বলেন যে, অন্তর্বর্তি-কালীন এই সময়টুকুতে অভিনয় চালু রাখার ব্যাপারে রঙমহলের কয়েকজন শিল্পীর সংগে তাঁদের আলোচনা হয়েছিল বটে, কিন্তু টাকাকড়ি সংক্রান্ত মতবিরোধের ফলে সে আলোচনা ভেঙে যায়। কর্তৃপক্ষ আরো জানান যে, ৩১শে ডিসেম্বর "চক্র" নাটকের শেষ অভিনয়ের পর রঙমহল পরিচালনার ভার সর্বসমক্ষে তাঁরা অভিনেতৃবৃন্দের হাতে সমর্পণ করবেন এমন কোন আশ্বাস তাঁরা কাউকে কখনও দেননি।

দু' পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে যত গরমিলই থাক, একটি নাট্যশালার দ্বার বন্ধ হয়ে যাক এ কামনা কেউই করবেন না। দু' পক্ষের বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে কোন পক্ষেরই সে কামনা নেই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কামনা করবো, বর্তমানে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, অবিলম্বেই তার অবসান ঘটবে মালিক-কর্মীর অবাঞ্ছিত বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসায়।

বিবিধ সংবাদ

বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের এবং বিভিন্ন লোকশিল্প, লোকনৃত্য, গীতি ও গাথার মানোন্নয়নে বংগীয় নাট্য সংগঠনীর প্রচেষ্টা আজ সর্বজন অভিনন্দিত! সমগ্র বাংলার সহস্রাধিক নাট্যগোষ্ঠীর এই কেন্দ্রীয় নাট্যসংস্থা এবার নৃত্যনাট্যের প্রচার ও প্রসারের আয়োজন করেছেন। এবং এই উদ্দেশ্যে কুড়ি দিনব্যাপী 'নিখিল বংগ নৃত্য-নাট্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে। নিঃ বঃ যাত্রা উৎসবের অসাধারণ সাফল্যের পর এটি সংগঠনীর আর একটি গঠনকার্য। উৎসবে অভিনয় পরিবেশনে ইচ্ছুক সম্প্রদায় বা বিভিন্ন সংগীতে নৃত্যশিক্ষায়তনগুলির আবেদন করার ঠিকানাঃ বংগীয় নাট্য সংগঠনী, ৩৮সি, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা—৪।

• • •

ইউ টি সি, ঋত্বিক ও নট-নাটাম সালকিয়া, শিবপুর ও মধ্য হাওড়ার এই তিনটি নাট্য প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি শ্রীনির্মলকুমার খাঁর আহ্বানে এক সভায় হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয় করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যৌথভাবে প্রথম পর্যায়ে এঁরা পরীক্ষা-মূলকভাবে সাত রজনী একাংক নাটক মঞ্চস্থ করবে। উপযুক্ত উৎসাহ ও জন-সাধারণের সাড়া পেলে স্থায়ীভাবে অভিনয় করার এদের ইচ্ছা আছে। এই মিলিত নাট্য-প্রয়াসে হাওড়ার উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ও শহর অথবা গ্রামের অন্যান্য শৌখিন নাট্যসংস্থা-গুলির সকল রকমের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য উক্ত ত্রি-সংস্থা বিনীত আবেদন জানাচ্ছে। যোগাযোগ কেন্দ্রঃ শ্রীজগমোহন মজুমদার, ৭।১, প্রিয়নাথ ঘোষ লেন, সাতরাগাছি, হাওড়া। ফোনঃ ৬৭-৩৯৮৭। সময়ঃ সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা।

* * *

সংগীত-ক্ষেত্রে বর্তমানে একটা বিশেষ খবর হলো এই যে, দক্ষিণীর শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র গীত-ভানুতে ওস্তাদ আমীর খাঁর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ইন্দোর-ঘরানার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'গীত ভানু'র শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা করেছেন ওস্তাদ আমীর খান। ইন্দোর-ঘরানার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রক্ষার্থে তিনি নিজে প্রতি বছরে তিন মাস এই শিক্ষায়তনের শিক্ষাদান কার্য তত্ত্বাবধান করবেন।

একলব্য

ডেভিস কাপ এবারও অস্ট্রেলিয়ায় থেকে গেছে। অর্থাৎ ইটালীকে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া আবার ডেভিস কাপ নিজেদের দখলে রেখেছে।

সবারই জানা আছে, ডেভিস কাপ দেশগত প্রাধান্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। যারা ডেভিস কাপ বিজয়ী হয় কাপটি থাকে তাদের অধিকারে। পরের বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হয় সেই বিজয়ী দেশকে যেতে হয় আগের বছরের বিজয়ীর দেশে কাপ জিতে আনবার জন্য। কাপ জেতার এই খেলার নাম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা।

বিশ্ব টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। এবার নিয়ে বিগত ১২ বছরের প্রতিযোগিতার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ জিতেছে ১০ বার, বাকী দু'বার আমেরিকা।

অনেকে আশা করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের প্রতিযোগী ইটালী ডেভিস কাপ ছিনিয়ে আনতে না পারলেও জোর প্রতিযোগিতা করবে। কারণ প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এবং বিখ্যাত 'কোচ' জারোশলাভ ড্রবনী ইটালীর খেলোয়াড়দের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীরাও ছিলেন নামকরা খেলোয়াড়। নিকোলা পেত্রাঞ্জলী এবং অরল্যাণ্ডো সিরোলার বিশ্বজোড়া নামডাক। অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে ইটালীর দলে ছিলেন সার্গিও টাকিনি ও সার্গিও জ্যাকোবিনি। ড্রবনী এমনও মন্তব্য করেছিলেন যে, দুই দেশের জেতার সম্ভাবনা সমান সমান। অস্ট্রেলিয়ার কোর্ট ও ঘাসের সঙ্গে রপ্ত হবার জন্য ইটালীর খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়ায় এসে জোর অনুশীলনও করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। ৪টি সিঙ্গলস ও একটি ডাবলস, এই পাঁচটি খেলার মধ্যে ইটালী একটি খেলাতেও জিততে পারেনি। এমনকি জয়-পরাজয়ের মীমাংসার মধ্যে একটি সেটও পায়নি। অর্থাৎ প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস এবং দ্বিতীয় দিনের একটি ডাবলসে অস্ট্রেলিয়ার জয় স্ট্রেট গেমে।

ডেভিস কাপ

প্রথম দিনের প্রথম খেলায় এই বছরের অস্ট্রেলিয়ার ও আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন রয় এমারসন ৯০ মিনিটের মধ্যে ইটালীর দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় নিকোলা পেত্রাঞ্জলীকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় খেলায় উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রড লেভার এক ঘণ্টারও কম সময়ে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন ইটালীর অরল্যাণ্ডো সিরোলাকে।

দ্বিতীয় দিন উইম্বলডনের ডাবলস চ্যাম্পিয়ন নীল ফ্রেজার ও রয় এমারসনের কাছে সিরোলা ও পেত্রাঞ্জলীকে মাত্র ৫৬ মিনিটের মধ্যে স্ট্রেট সেটে হার স্বীকার করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক বছরের জন্য ডেভিস কাপের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে যায়। পুরনো ঘরেই তার পুনরায় অবস্থিতি।

দ্বিতীয় দিনেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় তৃতীয় দিনের খেলার আর কোন গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকে না। তৃতীয় দিন সিঙ্গলসের পাল্টা প্রতিযোগিতায়ও অস্ট্রেলিয়ার এমারসন ও লেভার বিজয়ী হন, তবে অরল্যাণ্ডো এমারসনের কাছ থেকে একটি এবং পেত্রাঞ্জলী লেভারের কাছ থেকে দুটি সেট পান।

* * *

কয়েক বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড় টেনিসে পেশাদারবৃত্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও এখনো বিশ্ব টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার এই পর্যাপ্ত প্রাধান্যের মূলে একটি লোকের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। এই লোকটির নাম হ্যারী হপম্যান।

ডেভিস কাপের এবার ছিল সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। ৫০ বছরের খেলার ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ জিতেছে ১৬বার, আর উপর্যুপরি চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ১৪বার। এর অনেকখানি কৃতিত্ব ৫৫ বছরের জ্ঞানসমৃদ্ধ টেনিস পণ্ডিত হ্যারী হপম্যানকে কেন্দ্র করে। হপম্যান এবারও দলের কোচিং-এর ভার নিয়েছিলেন এবং শক্তিশালী ইটালীর বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার অনায়াস জয়লাভ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি এখনো অস্ট্রেলিয়ান টেনিসে অপরিহার্য।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের ক্রীড়াঙ্গন মেলবোর্নের কুয়োং স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া ও ইটালীর খেলা উপলক্ষে চিরাচরিত প্রথামত এবারও অসম্ভব উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল। ১২ হাজার দর্শক আসনের একটিও আসনও খালি ছিল না। গতবার দর্শনী থেকে এসেছিল প্রায় এক লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ড। এ বছরের আমদানিও কিছু কম নয়। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া এখন বিশ্বপ্রধান। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ক্রিকেটপ্রিয়। কিন্তু টেনিসেও অস্ট্রেলিয়ার সমান শক্তি এবং ক্রিকেট ব্যাট এবং টেনিস র‍্যাকেট এখন অস্ট্রেলিয়ার ছেলেদের হাতে হাতে।

নীচে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের ফলাফল দেওয়া হলঃ—

প্রথম দিন—রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৮—৬, ৬—৪ ও ৬—০ গেমে নিকোলা পেত্রাঞ্জলীকে (ইটালী) পরাজিত করেন।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬—১, ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে পরাজিত করেন অরল্যাণ্ডো সিরোলাকে (ইটালী)।

দ্বিতীয় দিন—নীল ফ্রেজার ও রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে নিকোলা পেত্রাঞ্জলী ও অরল্যাণ্ডো সিরোলাকে (ইটালী) পরাজিত করেন।

তৃতীয় দিন—রয় এমারসন ৬—২, ৬—৩, ৪—৬ ও ৬—২ গেমে অরল্যাণ্ডো সিরোলাকে এবং রড লেভার ৬—৩, ৩—৬,

ইডেন উদ্যানে ভারত ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলায় মাটিতে ঝাঁপিয়ে এক হাতে এক অদ্ভুত ক্যাচ ধরে পতৌদির নবাবকে আউট করছেন টনি লক

৮ ৬, ৬—৩ ও ৮—৬ গেমে নিকোলা পেট্রাঙ্গেলীকে পরাজিত করেন।

• • •

সম্প্রতি সাউথ ক্লাবে বেঙ্গল লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলায় আখতার আলীকে হারিয়ে নরেশকুমার আবার চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন। ডাবলসের ফাইনালেও দুই বর্ষীয়ান নরেশ কুমার ও সুমন্ত মিশ্র পরাজিত করেছেন আখতার আলী ও এস এ মূর্তিকে।

জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল কলকাতায় নেই। ফলে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাও ভাল জমেনি। তারপর টেস্ট ক্রিকেটের ডামাডোল ও হই হাঙ্গামার মধ্যে টেনিস চাপা পড়ে গেছে। নিয়মমাফিক খেলায় পরিণত হয়েছে এবারকার বেঙ্গল লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ।

তবে সাউথ ক্লাবের জন্য বড় টেনিস অপেক্ষা করছে। জানুয়ারীর ২৭ তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখ পর্যন্ত সেখানে বসবে এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের আগমনে সাউথ ক্লাব তখন সরগরম হয়ে উঠবে। ভারতের দুই উঠতি খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিৎলালও তার আগে দেশে এসে পৌঁছবেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।

জয়দীপ ও প্রেমজিৎ এখন রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। এরা অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ, কুইন্সল্যান্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে খেলে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। সাউথ অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে জয়দীপ সেমি-ফাইনালে পরাজিত হয়েছেন খ্যাতনামা নীল

চতুর্থ টেস্টে ভারতের দুই নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান বিজয় মেহেরা ও পতৌদির নবাব। মেহেরা ৬২ ও নবাব ৬৪ রান করেছেন

ভারত ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলার আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে আলাপরত ইংলণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার

ফ্রেজারের কাছে। কিন্তু পরাজিত হলেও অস্ট্রেলিয়ার টেনিস বিশেষজ্ঞরা জয়দীপের খেলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার নতুন মাটিতে প্রথম বছরের খেলায় এই সুনাম ভারতের বেশী খেলোয়াড়ের ভাগ্যে জোটেনি।

বিজ্ঞ কোচ হ্যারী হপম্যান নিজে জয়দীপের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলার প্রস্তুতির জন্য হপম্যান যখন লেভার, এমারসন ও ফ্রেজারকে ট্রেনিং দিয়েছেন তখন সেই সঙ্গেই ট্রেনিং দিয়েছেন জয়দীপ ও প্রেমজিৎকে। শুধু টেনিসের ট্রেনিং নয়। দেহকে সুপটু, হাতের মারকে নির্ভুল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে হপম্যান টেনিসের উন্নত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমজিৎ ও জয়দীপকে জিমন্যাস্টিকস করিয়েছেন, অ্যাথলেটিক্সের শিক্ষা দিয়েছেন। হপম্যানের এখন ধারণা বিশ্বের বড় বড় প্রতিযোগিতায় অদূর ভবিষ্যতে জয়দীপের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই বেশী। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করাও অসম্ভব নয়।

জানুয়ারী ৪ তারিখ থেকে সিডনীতে আরম্ভ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। জয়দীপ এবং প্রেমজিৎ দুজনে এখানে কেমন খেলেন তা দেখবার জন্য আমরা আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছি।

• • •

ক্রিকেট! ক্রিকেট!! ক্রিকেট!!! ক্রিকেটের আমোদে শহর মশগুল। মাঠে ক্রিকেট, বাড়িতে ক্রিকেট, অফিস রেস্তোরাঁয় ক্রিকেট, রাস্তাঘাটে ক্রিকেট, এমনকি রঙ্গালয়েও ক্রিকেট। ভারত ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং ফলাফল সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনার বিরাম নেই। চতুর্থ টেস্টের বিরতির দিন কলম নিয়ে বসেছি। খেলার বাকি দু দিন। ফলাফল এখন ভারতের অনুকূলে। কে জানে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ইডেন হবে কিনা আমাদের দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের ক্রীড়াঙ্গন। ১৯৩২ সালের লর্ডস মাঠ থেকে আরম্ভ করে ১৯৬১-র দিল্লীর ফিরোজ শাহ-কোটলা পর্যন্ত ২৭টি টেস্ট খেলার মধ্যে মাত্র একবার আমরা ইংলণ্ডকে হারিয়েছি। ১৯৫২ সালে মাদ্রাজে নাইজেল হাওয়ার্ডের (যদিও মাদ্রাজ টেস্টে অধিনায়ক ছিলেন ডোনাল্ড কার) শক্তিহীন দলের বিরুদ্ধে সেই জয়ই আমাদের একমাত্র কৃতিত্ব। ১৯৬২ সালের নববর্ষে আমরা টেড ডেক্সটারের দলকে হারিয়ে নতুন কৃতিত্বের অধিকারী হব এই আশা সমস্ত ভারতবাসীর। সেই আশা পোষণ করেই চতুর্থ টেস্টের আলোচনা আগামী সপ্তাহের জন্য মুলতবী রেখে টেস্ট খেলার আয়োজন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

• • •

প্রতি বছর টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় কি পরিমাণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, টিকিটের চাহিদা কেমন বাড়ে তা কারো অজানা নেই। টেস্টের প্রাক্কালে সবার মুখে মুখে ফেরে টিকিটের কথা। কালো-বাজারী দামে অনেকে টিকিট সংগ্রহ করেন।

প্রয়োজন যেখানে প্রচুর, খেলা যেখানে খেলা ছাড়াও অনেক কিছু, সরবরাহ যেখানে অপ্রতুল সেখানে কালো-বাজারী দামে টিকিট বিক্রি হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অনেকে এজন্য দোষারোপ করেন ক্রিকেটের কর্তৃপক্ষকে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের টিকিট বিলি-ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকতে পারে—থাকতে পারে কি—আছেও—কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে কালোবাজারের সৃষ্টি হয় না। কালো-বাজারের সৃষ্টি হয় আপনার, আমার হাতে যে টিকিট আসে তার থেকেই। এই জন্য দায়ী আমাদের প্রবৃত্তি, দায়ী আমাদের সামাজিক দুর্নীতি আর কতিপয়ের কতগুলি করে টিকিট পাওয়ার প্রলোভন। এ সম্বন্ধে বেশী লিখে ত লাভ নেই। সমাজের সামগ্রিক চেহারার সঙ্গেই কালো-বাজারী টিকিটের সম্পর্ক।

কিন্তু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই বলবার আছে। পাঁচ দিন যেখানে ছ' সাত ঘণ্টা করে দর্শকদের উপস্থিত থাকতে হয় সেখানে দর্শকদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা তাঁদের অবশ্যই কর্তব্য। বলা বাহুল্য, সেদিকে অ্যাসোসিয়েশন কোনবারই দৃষ্টি রাখেন না। তবু বলবো তুলনায় এবারকার ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত। নানা দিক দিয়ে অনেকের অসুবিধা হলেও সেটা তাঁরা অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু যে সম্বন্ধে আমরা ভুক্তভোগী সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছুই বলার আছে। আমি বলছি প্রেস বক্সের কথা। কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত সাংবাদিকদের সঙ্গে দর্শকদের অনেক পার্থক্য। তাঁদের শুধু খেলা দেখাই কাজ নয়। প্রেস বক্সে বসে সারাক্ষণই তাঁদের লিখতে হয় টাইপ-রাইটার চালাতে হয়।

প্রেস বক্সে স্থান খুবই অপ্রতুল। অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করে তাঁদের বসতে হয়। একটি মাত্র সিঁড়ি অত্যন্ত সংকীর্ণ না হয়ে উঠা-নামায় বিপদের আশংকা। তারপর প্রতি বছর প্রেস বক্সের নতুন রং তাঁদের জামা-কাপড় নষ্টের কারণ। গত বছর কাঁচা আলকাতরায় অনেকেরই জামাকাপড় নষ্ট হয়েছে। এ বছরও একই অবস্থা। তবে আলকাতরা নয়, সবুজ রং।

বাংলার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা না হয় ঘরের ছেলে, কিন্তু বাইরের যে-সব সাংবাদিক এসেছেন, তাঁরা এঁদের সম্বন্ধে কি ধারণা নিয়ে ফিরবেন? বিলেত থেকেই এম সি সি টীমের সঙ্গে এসেছেন চারজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। 'ডেইলী মেলের' এলেক্স ব্যানিস্টার, 'ডেইলী টেলিগ্রাফের' রন রবার্টস, 'রয়টারের' লেসলী স্মিথ এবং 'সানডে অবজারভারের' জুলফিকার ঘোষ। জুলফিকার ঘোষ বাঙালী হলেও ইংলণ্ডের নাগরিক, দু' তিন পুরুষ ইংলণ্ডে বাস। ইংলণ্ড টীমের সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে পিতৃপুরুষের দেশে এসে কি ধারণা নিয়ে দেশে ফিরছেন?

এ ছাড়া ভারতের সমস্ত প্রান্তের ফটোগ্রাফার এবং সাংবাদিকরাই টেস্ট খেলায়

দেশী সংবাদ

২৫শে ডিসেম্বর—বিখ্যাত বিপ্লবী ও স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অদ্য ভোর পাঁচটার সময় তাঁহার ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

অদ্য নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী কলিকাতা অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে বাঙলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটি 'বাঙলা সাহিত্য আকাদেমী' স্থাপনের অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৬শে ডিসেম্বর—বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ পদ্মভূষণ অদ্য ইণ্টালী ৪১নং দেব লেনস্থিত তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। সমগ্র মহাভারতের অনুবাদক ও টীকাকার হিসাবে তাঁহার কীর্তি স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আজ বেসরকারীসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত নয়দিন ধরিয়া প্রচণ্ড হিম-প্রবাহের ফলে সমগ্র বিহারে এ যাবৎ ১০৩ জনের প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর—পাঞ্জিমস্থিত ব্যাঙ্কে কি পরিমাণ নগদ অর্থ ও সিকিউরিটি আছে, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। পাঞ্জিমের সকল লোকের ধারণা যে, পর্তুগীজেরা এসকুইডো ও বৈদেশিক সিকিউরিটি সহ ২০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের স্বর্ণ ইত্যাদি লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে।

১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রেলপথে যত দুর্ঘটনা হইয়াছে, তাহার শতকরা ৪৩ জন রেলকর্মীদের কার্যে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এবং শতকরা ৪১ ভাগ যন্ত্রপাতির গলদের জন্য হইয়াছে। বাকীগুলি ঘটে অন্যান্য ছোটখাট কারণে।

২৮শে ডিসেম্বর—তিব্বত সম্পর্কিত চীন-ভারত চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া আসায় নূতন চুক্তির জন্য চীন ভারতকে অনুরোধ করে। সেই অনুরোধের জবাবে ভারত সরকার চীনকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতের যে এলাকা চীন দখল করিয়া আছে তাহা ছাড়িয়া না যাওয়া পর্যন্ত নূতন চুক্তি হইবে না।

রেলওয়ে বোর্ডের সাম্প্রতিক এক হুকুমনামাবলে কলিকাতাস্থ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কনস্ট্রাকশন বিভাগের প্রায় পাঁচশত বাঙালী কর্মচারীকে অকস্মাৎ বাঙলাদেশ ছাড়িয়া মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে যাইতে হইতেছে। এই নির্দেশ পাওয়ার ফলে এখানকার কর্মচারী মহলে অসন্তোষ ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

২৯শে ডিসেম্বর—নূতন বৎসরের পয়লা জানুয়ারী হইতে ভারতীয় রেলপথগুলিতে মাল বহনের ব্যাপারে এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতেছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রেলওয়েকে মাল পরিবহণে আগেকার তুলনায় অনেক বেশী দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রামাণ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা হইতে ব্যাঙ্ক অব চায়নার বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের লাইসেন্স প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

অদ্য নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী পয়লা জানুয়ারী হইতে আমানত বীমা পরিকল্পনা কার্যকর করা হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে ১৫ শত টাকা পর্যন্ত আমানতের দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে।

৩০শে ডিসেম্বর—অদ্য ভোরের দিকে কোডারমা এবং হাজারিবাগ রোড স্টেশনের মধ্যবর্তী এক স্থানে অজ্ঞাতনামা কতিপয় দুর্বৃত্তের আক্রমণে চলন্ত বোম্বাই মেলে দুইজন মহিলা সহ চারিজন যাত্রী নৃশংসভাবে নিহত হন বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া যায়।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের ফলে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার মিলিয়া এযাবৎ ৭২০ জনের প্রাণহানি ঘটিয়াছে এবং হাজার হাজার গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। শস্য ও শাকসব্জিরও ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে।

৩১শে ডিসেম্বর—নূতন বৎসরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আসামের নূনমাটিতে ভারত সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম তৈলশোধনাগারটি চালু করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তৈলশোধনের কাজে বিদেশী একচেটিয়া কারবারের অবসান ঘটিবে এবং কৃষিনির্ভর আসাম শিল্পায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবে।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে ডিসেম্বর — অ্যাঙ্গোলার আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীরা পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে নতুন দিনে অভিযান চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আক্রমণ চালানো হয়। পর্তুগীজ মহলের সংবাদে প্রকাশ, জাতীয়তাবাদীদিগকে সর্বক্ষেত্রেই হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিনিধি শ্রীঅ্যাডলাই স্টিভেনসন এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ভারত গোয়া আক্রমণ করায় অবশ্য ক্ষতি হইয়াছে। ভারতকে বলপ্রয়োগ করিতে হওয়ায় মার্কিনীদের মানসপটে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—লণ্ডনের ১৯ বৎসর বয়স্ক শ্রীস্টিফেন টাইসন শ্রীমতী কুপারকে দেখে এবং ভালবাসিতে শুরু করে। গত চার বৎসর তিন মাসে টাইসন শ্রীমতী কুপারকে দশ লক্ষাধিক শব্দের ১৫ শত প্রেমপত্র লিখিয়াছে। প্রত্যহ আট পাতার একখানা চিঠি সে ডাকে ফেলিত এবং ছুটির দিনে পত্রের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ পাতা হইত।

২৭শে ডিসেম্বর—কোন কোন কূটনৈতিক মহলের সংবাদে প্রকাশ, সীমান্ত সম্পর্কে ভারতের সহিত অনতিবিলম্বে মীমাংসা করিবার জন্য রুশিয়া পিকিং সরকারের উপর কঠোর চাপ দিয়াছে।

বৃটিশ সামরিক শক্তি এশিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যদিও উহাদের গন্তব্যস্থল উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি মনে হয়, পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য কুয়াইতের সীমান্তের দিকেই উহারা অগ্রসর হইতেছে।

আজ জাকার্তায় স্থলবাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেন যে, ডাচ-অধিকৃত পশ্চিম ইরিয়ানের (ডাচ নিউ গিনি) মুক্তির জন্য যে কোন সামরিক অভিযানে ইন্দোনেশীয় স্থলবাহিনী সুমাত্রা ও সেলিবিসে আত্মসমর্পণকারী সমস্ত বিদ্রোহীদের কাজে লাগাইবে। তিনি বলেন, প্রায় এক লক্ষ আত্মসমর্পণকারী বিদ্রোহী পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির জন্য সরকারকে সাহায্য করার শপথ গ্রহণ করিয়াছে।

২৮শে ডিসেম্বর—ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হাশেম জাওয়াদ অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেণ্টের নিকট এক তার করিয়া জানাইয়াছেন যে, মধ্য এশিয়ায় বৃটিশ সামরিক শক্তি প্রেরণের ফলে ঐ অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেখানকার শান্তি বিপন্ন হইয়াছে।

২৯শে ডিসেম্বর—নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট প্রেরিত এক বার্তায় ইরাক সরকার এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, বৃটেন আক্রমণাত্মক মনোভাব লইয়া পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক শক্তি সমাবেশ করিয়াছে। ইরাক বৃটিশ সামরিক তৎপরতার বিপর্যয়কর ফলাফল সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চায়।

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের পত্নী শ্রীমতী উইলসন গত রাত্রিতে ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

৩০শে ডিসেম্বর—অদ্য লিসবনে প্রকাশিত পুর্তুগীজ এক ইস্তাহারে এরূপ স্বীকার করা হইয়াছে যে, গোয়ার মোটা অভিযানের পর লিসবন বিমানবন্দরে কিছুসংখ্যক ভারতীয় নৌযাত্রীকে আটক করা হয়।

এলিজাবেথভিল হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে এইরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, কাটাঙ্গার সৈন্যবাহিনী ও জাতিসংঘ সৈন্যগণ সামরিক শক্তির বিপুল সমাবেশ ঘটাইতেছে। সম্ভবতঃ তাহারা রাষ্ট্রপুঞ্জের সহিত তৃতীয় দফা শক্তির লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

৩১শে ডিসেম্বর—ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের সহিত ঘনিষ্ঠ মহল বলেন যে, আলজিরিয়ার বিদ্রোহী নেতারা যদি যুদ্ধ বন্ধের অনুরোধে সম্মত না হন এবং আলজিরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য ভোট গ্রহণ ব্যবস্থায় রাজী না হন, তাহা হইলে ফরাসী সরকার সমস্যার সামরিক সমাধানের জন্য আলজিরিয়াকে বিভক্ত করিবার নীতি অবলম্বন করিবেন।

লেবানন সরকার আজ ঘোষণা করেন যে, গতকাল এক সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়াসকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

টলস্টয়ের
আনা কারেনিনা ৩॥০
ওঅর য়্যাণ্ড পীস
১ম—৫, ২য়—৪॥০, ৩য়—৫,

টমাস হার্ডির
এ পেয়ার অব ব্লু আইজ ৬,

হেলেন কেলারের
আমার জীবন ২।০

রোমানফের
অন দি ভল্‌গা ২।০

ডস্টয়ভস্কীর
ক্রাইম য়্যাণ্ড পানিশমেণ্ট ৩,

অজ্ঞাত সৈনিকের
(পৃথিবীর সব ভাষায় অনূদিত হইয়াছে)
চেনা অচেনা ২॥০

এলিজাবেথ ইয়েটস্‌-এর
দেশে দেশে রামধনু ২॥০

টুর্গেনেভের
ভার্জিন সয়েল ২৸০

প্রেমচাঁদ-এর
প্রেমচাঁদের গল্প ২,

[illegible]
মহাপতন ৪,

[illegible]
শ্রীমতী আর্ভের ৪,

জর্জ অরওয়েলের
য়্যানিম্যাল ফার্ম ১॥০

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠগল্প

১ম ৪, ২য় ৪,
৩য় ৩।০ ৪র্থ—৩॥০
৫ম—৩, ৬ষ্ঠ—৩॥০

এমিল লুডউইগের
এব্রাহাম লিঙ্কন ২॥০

ক্লার্কের
টমাস আল্‌ভা এডিসন ২,

মার্গারেট কাজিনস্‌-এর
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১॥০

ক্রাইসলারের
আত্মকাহিনী ৩,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অভিযান ৫॥০ **উত্তরায়ণ** ৫॥০ [illegible]ব ৫॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরণ্যক ৫, **দেবযান** ৫, **পথের পাঁচালী** [illegible]

প্রবোধকুমার সান্যালের
বিবাগী ভ্রমর ৭, **বেলোয়ারী** ৭, **উত্তরকাল** ৪॥০

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০ **রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহ** ১ম ৫, ২য় ৫,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপকণ্ঠে ৯, **বহ্নিবন্যা** ৮॥০ **গল্প পঞ্চাশৎ** ৯,

সুমথনাথ ঘোষের
নীলাঞ্জনা ৭, **সর্বংসহা** ৫, **জায়া ও জননী** ৫,

অবধূতের
দুর্গম পন্থা ৪, **মায়ামাধুরী** ৫॥০ **পিয়ারী** ৪,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
বেলাভূমি ৮, **চক্র** (নাটক) ৩, **উল্কা** (নাটক) ২॥০

আশাপূর্ণা দেবীর
ছাড়পত্র ৪॥০ **সমুদ্র নীল আকাশ নীল** ৫, **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
অলকাতিলকা ৪॥০ **নবনায়িকা** ৩॥০ **পঞ্চতপা** ৬॥০

চরণদাস ঘোষের
সহধর্মিণী ৪॥০ **দান** ৩॥০ **নাগরিকা** ২॥০ **নিরক্ষর** ৪॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কথাচিত্র ৩, **নয়ান বৌ** ৫॥০ **মিলনান্তক** ৪॥০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
তরঙ্গের পর ৫, **সপ্তকন্যার কাহিনী** ৩॥০

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের
লীলাভূমি ৫,

দেবেশ দাশের
সেই চিরকাল ৩॥০

শঙ্কু মহারাজের
গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-গোমুখীর অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ কাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

দ্বিতীয় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

অসংখ্য চিত্র, মানচিত্র ও পথপঞ্জীসহ
॥ ছ টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

OATINE
Oatine
Cream

সাধনা চ্যবনপ্রাশ

বহু দূর দূরান্তর হইতে সংগৃহীত সর্বোৎকৃষ্ট ভেষজসমূহের সংমিশ্রণে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আয়ুর্বেদজ্ঞের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রানুমোদিত প্রণালীতে অতি সতর্কতা ও যত্ন সহকারে প্রস্তুত হয়। এই সব কারণে সাধনা চ্যবনপ্রাশের তুলনা নাই।

চ্যবনপ্রাশ

সেবনবিধি—
পূর্ণ বয়স্কের জন্য অর্দ্ধতোলা। প্রাতে ও বৈকালে দশ ফোঁটা মধু সহ সেব্য।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্. এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস (লণ্ডন) এম. সি. এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ঃ
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সূচীপত্র

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 13th January, 1962

২৯ বর্ষ । ১১ সংখ্যা । ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৮ পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

জনগণমন ও অধিনায়ক

নেহরু-দর্শনার্থীদের ব্যগ্রতা, ব্যবস্থাপনার অক্ষমতা, উপদলীয় অপকৌশলের প্রচ্ছন্ন নৈপুণ্য, সব কিছু মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণপুরীতে কংগ্রেসের ৬৭তম বাৎসরিক অধিবেশন কুম্ভমেলার নবতম রাজনৈতিক প্রযোজনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রইল। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে জনসমারোহ গত চল্লিশ বৎসর ধরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ একাধিক। জাতীয় সংগ্রামের যুগে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কাল পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রায় প্রাকৃতিক শক্তির মতই অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য রূপ নিয়েছে। এই আকর্ষণের কতখানি বুদ্ধিগত আর কতখানি হৃদয়গত সে প্রশ্ন আগেও নানা ভাবে আলোচিত হয়েছে, এখনও হতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণপুরীতে সমাগত জনতার বেশীর ভাগই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আলোচনার ধারা অনুধাবনে উৎসুক ছিল না ধরে নেওয়া যায়। যে বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক কুম্ভমেলায় সমবেত হয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনেও জাতীয় নেতৃবৃন্দের দর্শনার্থীদের ভিড় হয়ে থাকে অনেকটা সেইরকম ভাবগত প্রেরণায়। য়ুরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে এর সমতুল কোন ভক্তিরসাশ্রিত জন-উচ্ছ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায় না। রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের দর্শনার্থীদের ভিড় অবশ্য অন্য ব্যাপার; ব্রিটেনে অ্যাস্কটের ঘোড়দৌড় যে লক্ষ লক্ষ লোককে আকর্ষণ করে সে-ও অন্য কারণে। 'টোটালিটেরিয়ান' রাষ্ট্রের নায়কদের ডাকে যে ধরণের বিপুল জনসমাবেশ ঘটে তার তাগিদও অন্যরকম। শ্রীকৃষ্ণপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে জনবাহুল্যের কারণ আর যাই হোক অন্ততপক্ষে নেতাদের অথবা গভর্নমেন্টের ভ্রূকুটি-ভয় নয়। জাতীয় নেতাদের, বিশেষ করে শ্রীনেহরুকে, দর্শনের জন্য আগ্রহ ভারতীয় জনচিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা-প্রসূত এবং কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধরে এই প্রবণতাকে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। সেই সুযোগে কোন কোন উপদলীয় স্বার্থ জন-উৎসাহকে বিপথে পরিচালিত করে শ্রীকৃষ্ণপুরীতে বিভ্রাট সৃষ্টি করতে চেষ্টিত হওয়া বিচিত্র নয়।

কংগ্রেসের গত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসে জনসমাবেশের আড়ম্বর ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। জাতীয় নেতারা তাতে অখুসী হয়েছেন মনে হয় না। শ্রীনেহরু অবশ্য মাঝে মাঝে অনুতপ্ত বালকের মত বলে থাকেন, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনাড়ম্বর, জনকোলাহলমুক্ত হওয়া উচিত। "গাঁও মে কংগ্রেস" অর্থাৎ গ্রামের শান্ত পরিবেশে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের সংকল্পও মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের উৎসাহে গ্রামাঞ্চলের কংগ্রেস-নগরীর চিত্র ও চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক যেন ভার্সেই প্রাসাদ থেকে মারি আঁতোয়ানেতের বনভ্রমণের মত। ব্রিটেনের লেবার পার্টি বা কনজারভেটিভ পার্টির বার্ষিক সমাবেশের নজীর শ্রীনেহরু এবং কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলীকে স্মরণ করানো বৃথা। হয়ত আমাদের জাতীয় চরিত্র এবং ঐতিহ্যের মধ্যেই এমন কিছু আছে যার জন্য নেতারা জনসমুদ্রে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত, উদ্দীপ্ত হতে আগ্রহী আর নেতাদের দর্শন-ভিখারী জনতা ভাবাবেগে নিরন্তর টলমল। আশ্চর্য নয় যে, শ্রীকৃষ্ণপুরীতে জন-বাহুল্যের বিভ্রাটে শ্রীনেহরু সাময়িকভাবে বিচলিত হলেও শেষপর্যন্ত জনসমুদ্রে কুম্ভস্নানের আনন্দে পুলকিত বোধ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে অভূতপূর্ব জনসমারোহের তাৎপর্য অবশ্য শুধু নেতা ও জনতার পরস্পর আকর্ষণশক্তির পরিচয়ে ও মরমী মিলনেই নিঃশেষিত নয়। মাসখানেক পরেই দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটযুদ্ধে জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ যাই হোক না কেন, ক্ষমতাধিকারী দলের ত্রুটি-বিচ্যুতি যতই থাকুক, কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও সংগঠনশক্তি এখনও অতুলনীয়, এর বাস্তব সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা এবং সংগঠনশক্তির উৎস কোথায় তার পরিচয়ও শ্রীকৃষ্ণপুরীর অধিবেশন থেকে পাওয়া যায়। এককালে জনসাধারণের চিত্তপটে কংগ্রেস ও গান্ধীজি ছিল একাকার। এখন কি তার স্থান অধিকার করেছে কংগ্রেস ও নেহরুজী? কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার মূল উৎস একান্তভাবে নেতৃকেন্দ্রিক হওয়াটা ভারতের ভক্তিবাদী ধ্যানধারণার ঐতিহ্যসম্মত মনে করা যেতে পারে, কিন্তু জাতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই পরিস্থিতিকে শুভ সম্ভাবনাযুক্ত মনে করা কঠিন।

শ্রীনেহরুর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব কংগ্রেসের পক্ষে জনউৎসাহ সৃষ্টির, জনসমর্থন সংগ্রহের সহায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু নেহরু-নেতৃত্বকে কংগ্রেসের একমাত্র রাজনৈতিক মূলধন করায় ভবিষ্যৎ বিপত্তির আশংকাও উপেক্ষা করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণপুরীতে কংগ্রেসী জয়রথের সারথিরূপে শ্রীনেহরুর জনগণ-সম্মোহন-ক্ষমতা-নৈপুণ্য তাঁর শক্তিমত্তার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হতে পারে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস-সাফল্যের প্রারম্ভিক প্রতিশ্রুতি-সূচক গণ্য হতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে গণতান্ত্রিক রাজনীতির চিন্তা ও কর্মৈষণা একান্তভাবে সর্বসমর্পিত নেতাকেন্দ্রিক হওয়া জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলকর নয়।

'জাপানি জর্নাল'

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক

বুদ্ধদেব বসুর

জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
তিনি দেখেছেন কালো কাচের চশমা চোখে এক বেঁটে ও মোটা লোকের অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাব।
গোয়া সম্পর্কে পাশ্চমী শেয়ালের সঙ্গে রাজাজীও এক রা।
তিনিই ভারতে - সাম্রাজ্যবাদের শেষ খুঁটি।
সঞ্জীবন রেড্ডী আর কংগ্রেস সভাপতি হতে চান না।
কে তাঁকে মুক্তি দেবে?
পাটনায় কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত।
অতিথিরা বিদায় নিয়েছেন —
এবার কোঁদল শুরু হোক।
সহায়-দল
ঝা-দল
Kutty

নানাপ্রশ্ন
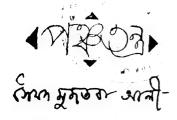
যতই বয়েস বাড়ছে, কোথায় না মনের ভিতর যে সব প্রশ্ন জাগে তার সংখ্যা কমবে, উল্টে তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই তো কয়েকদিন পূর্বে বাঙলায় লেখা কয়েকখানি মুসলমানী কেতাব বা পুঁথি হাতে পড়লো। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্য। বিষয়বস্তু ফার্সী যদিও নায়ক-নায়িকা কোনো কোনো মূল কাব্যে আরব দেশের ফার্সীর মাধ্যমে বাঙলা দেশে এসে পৌঁচেছেন। সঙ্গে এনেছেন ইরানী মেজাজ। সেটা মধুর, আরবী কাব্যের মূলে সুর দর্পী।

বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, যে-সব কবি বাঙলায় এ-সব কাব্য 'স্বাধীন অনুবাদ' করেছেন এঁদের অনেকেই উত্তম ফার্সী জানতেন। কেউ কেউ ভালো আরবী ও সংস্কৃত জানতেন এবং প্রায় সকলেই তখনকার দিনের প্রচলিত বাঙলা কাব্যের ভাষা জানতেন। ছন্দও হয় পয়ার নয় ত্রিপদী। এমন কি কবিদের একজন পয়ার লিখতে লিখতে এমনই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য যে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ভী আমদানী করতে হয় সে কথা বেবাক ভুলে গেছেন এবং কাব্য সমাপ্তির পর যখন কানে জল গেল তখন কচাকচ, ত্রিপদী-ভী বগ্‌হার দিয়ে কবি ধর্মের ইমান দুরুস্ত রাখলেন।১

তাই প্রশ্ন, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা বাঙলা কাব্যে বিদেশী সুর আনলেন তাঁরা উত্তম ফার্সী এবং আরবী শব্দ বাঙলাতে আমদানী করলেন না কেন?

দর্শনের অনুশাসন, যে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তোমার কণামাত্র ধারণা নেই, সে উত্তর কোন্ দিক দিয়ে আসতে পারে না আসতে পারে সে সম্বন্ধে তুমি কণামাত্র কল্পনা করতে পারো না সে প্রশ্ন প্রশ্নই নয়, সে প্রশ্ন বাতিল, ইনভ্যালিড। তাই আমার মনে যে কাল্পনিক 'উত্তর' এসেছে সে-দুটির ইঙ্গিত দিই।

প্রবন্ধান্তরে বলেছি, বাঙলা দেশ চিরকালই বিদ্রোহী। এ-দেশ মুসলমান আগমনের পর থেকে সুভাষ বসু পর্যন্ত একমাত্র জাহাংগীর থেকে আওরঙ্গজেবের আমলে কেন্দ্রের অর্থাৎ দিল্লি আগ্রার হুকুম তামিল করেছে। বস্তুত পাঠান মোগল প্রায় সব বাদশাকেই এ-দেশে আসতে হয়েছে 'বিদ্রোহ' দমন করতে আমরা অবশ্য বলবো, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে। বিশেষত বাঙলার স্বাধীন পাঠান রাজাদের আমলের তো কথাই নেই। তখন বাঙলা দেশ চীনের সঙ্গে রাজদূত বিনিময় করছে, প্রতিবেশী জৌনপুরী রাজাদের সঙ্গে কখনো লড়াই করছে, কখনো আশ্রয় দিচ্ছে এবং জনশ্রুতি যে বাঙলা দেশের স্বাধীন রাজা ইরানের কবি হাফিজকে নিমন্ত্রণ সওগাৎ পাঠিয়ে দাওয়াৎ করছেন এদেশে। অবশ্য নৌপথে। এখানেই হয়তো রহস্যোদ্ধারের গুপ্ত কুঞ্চিকা।

স্থলপথে ইরান যাবার কথাই ওঠে না। মাঝখানে জৌনপুর, দিল্লি, লাহোর, কান্দাহার হিরাত কত না স্বাধীন রাজত্ব! একে অন্যের সঙ্গে লড়ছে হরবকৎ। নিরীহ কবি, চিত্রকর, গায়কের তো কথাই ওঠে না, ইরান-তুরানের ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধারা পর্যন্ত মেরে কেটে হয়তো দিল্লি অবধি দু'একজন এসে পৌঁচেছে, 'দিল্লি দূর অস্ত' বরঞ্চ 'দিল্লি নজদীক্ মীশওদ' (দিল্লি কাছে এল)। কিন্তু 'বাঙ্গলা দূর অস্ত' শুধুই নয় দূরন্তর অস্ত।'

এদিকে বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতানদের মাতৃভাষা ফার্সী নয়, ফার্সী তাদের কোর্ট লেনগুইজ্ মাত্র—এমন কি স্টেট লেনগুইজও নয় যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁরা সে ভাষা ভুলে যাচ্ছেন, ওদিকে ফার্সী ভাষাও

---

(১) ইনি অবশ্য অনেক পরের কবি। সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১১০, ১১১ পশ্য।

সাহিত্যের ভান্ডার থেকে নূতন কবি নূতন লেখক সে ভান্ডারের মাল নিয়ে আসছেন না, রাজদরবারেই যখন ফার্সী দিনের পর দিন শুকিয়ে আসছে তখন জনসাধারণে সে-ভাষা প্রচলিত ও প্রসারিত হবে কি করে?

দু চারজন পণ্ডিতদের কথা সব সময়ই আলাদা। রামমোহন হীরু জানতেন, হরিনাথ দে না জানি কটা বিদেশী ভাষা সে-সব দেশে না গিয়ে এমন কি সে-সব ভাষায় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে না এসেও শিখতে পেরেছিলেন। অবশ্য স্বাধীন বাঙলায় তার চেয়ে অনেক বেশী আলিম-ফাজিল ছিলেন কিন্তু এঁদের প্রায় সকলেরই ছিল 'কাফিরদের' ভাষা বাঙলার প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা (ঐ যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও বাঙলার প্রতি বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা ছিল না)। এঁরা বাঙলায় কাব্য এমন কি ধর্মালোচনা করতেও কড়া বারণ করতেন। কিন্তু যেখানে স্টেটের খানিকটে উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে চর্চাকে কিছুটা উপেক্ষা করা যায়। তাই দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ সুলতান ইত্যাদি কবিদের আবির্ভাব। (২) পূর্বেই বলেছি এরা ফার্সী জানতেন উত্তম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটিও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তাঁদের পাঠকমণ্ডলী, কি মুসলমান কি হিন্দু, কেউই বিদেশী আরবী ফারসীর সঙ্গে সুপরিচিত নন। কাজেই আসল উদ্দেশ্য সমাধান হবে না আদপেই।

(এর সঙ্গে অজকের দিনের একটি তুলনা দিতে পারি। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখি, কোনো পশ্চিমবঙ্গবাসী ঢাকার কোনো উটকো খবরের কাগজ থেকে আরবী-ফার্সী মিশ্রিত বাঙলা উদ্ধৃত করে আর্তরব ছাড়ছেন, এত বেশী আরবী ফার্সী শব্দ যদি ঢাকার লেখকরা ব্যবহার করেন তবে এক নূতন ভাষার উদ্ভব হবে এবং বঙ্কিম-রবির বাঙলা 'দ্বিখণ্ডিত' হয়ে যাবে। এঁরা যদি অনুগ্রহ করে ঢাকার নিত্যকার খবরের কাগজ পড়েন, লেখকদের সাহিত্য রচনা পড়েন তবে দেখতে পাবেন ঢাকা সেই বাঙলাই লিখছে কলকাতা যে বাঙলা লেখে —দু'চারটি 'আব্বা', 'আম্মা', ফজরের নামাজের' কথা হচ্ছে না, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ আলাল হুতোমে আছে এবং তার কারণ দৌলত কাজী, আলাওলের বেলায় যা হয়েছিল তা-ই। ঢাকার উত্তম ফার্সী জাননেওয়ালা লেখকও বোঝেন যে তিনি ফার্সী জানলে কি, তাঁর পাঠকের অধিকাংশই যে ফার্সী জানেন না। এস্থলে অবশ্য মডার্ন কবিদের মত যাঁরা মনে করেন, যত দুর্বোধ লেখা যায় ততই 'সুবোধ পাঠক' প্রশংসা করবে বেশী, তাঁদের কথা হচ্ছে না)।

আকবরের আমলেই প্রথম অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কিন্তু তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।

ইংরিজি শব্দ যখন প্রথম বাঙলাতে ঢুকতে আরম্ভ করে তখন লেখা হয়েছিল 'লণ্ড', 'কালেজ' ইত্যাদি; আজ আমরা লিখি 'লাভ', 'কলেজ'। আজ আবার দেখতে পাই, 'স্যুটিং' 'শুটিং', 'হাসপাতাল', 'হাসপাতাল', একই শব্দ দুই বা তিন রকমে লেখা হচ্ছে। তার উপর জুটেছে এসে আরেক আপদ। ছেলে-ছোকরারা ফরাসি, জর্মন ভাষাতে ওকীবহাল হয়ে উঠেছে; 'পারি', 'পারী', 'প্যারিস' এমন কি দু-আঁসলা 'প্যারি' পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে,—'পাঁসিনে', 'পাঁশনে' আরো কত কী!

দৌলত কাজী ইত্যাদি লেখকগণ যাবতীয় আরবী-ফারসী শব্দ বে-এক্তেয়ার ভাবে গ্রহণ করেননি সত্য কিন্তু কিছু পরিমাণে তো করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁরা আমাদেরই মত এলোপাতাড়ি যাঁর যা খুশী করেছিলেন, না কতকগুলো সুস্পষ্ট আইন বেঁধে নিয়ে সেগুলো যতদূর সম্ভব মানবার চেষ্টা করেছিলেন?

যেমন মনে করুন এ যুগের মরমিয়া কবি হাসন রাজা গাইলেন,

"মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমিন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দিন।"

এখানে 'দিন'-কে যদি বাঙলা 'দিবস' অর্থে নেওয়া হয় তবে ছত্রটির কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে শব্দটি আরবী 'দীন' অর্থাৎ ধর্ম। অর্থ দাঁড়ালো 'আমার কানে এসে মুসলমানী ধর্মের খবর পৌঁছল বলে সে ধর্ম তার অস্তিত্ব পেল, যেরকম আমি যখন আঁখি মেলে চাইলুম তখনই দ্যুলোক ভূলোকের সৃষ্টি হল।' কট্টর আদর্শবাদীর (আইডিয়ালিস্ট স্কুল) মত হাসন রাজা বলছেন, 'ত্রিলোকের চিন্ময় মৃন্ময় জগৎ তাদের অস্তিত্বের জন্য আমার চিত্ত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করছে। আমি না থাকলে এসবের অস্তিত্ব নেই।'

পুনরায় বলছেন,

"আমা হইতে আসমান জমিন, আমা হইতে সব
আমি হইতে ত্রিজগৎ, আমি হইতে রব।"

এখানে 'রব' আওয়াজ, এই অর্থে নিলে সদর্থ হয় না। আরবী 'রব্' শব্দের অর্থ 'ভগবান'। হাসন রাজা বলতে চান, 'আমার চৈতন্য যদি ভগবানের অস্তিত্বের কল্পনা না করতো তবে তার স্বয়ম্ভু অস্তিত্বই হত না।'

---

(২) 'সৈয়দরা' নিজেদের মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর বলে দাবী করেন। মুসলমান ধর্মে যদিও সৈয়দদের বিশেষ কোনো সম্মান দেখাবার নির্দেশ নেই তবু কার্যতঃ এঁরা অনেকটা ব্রাহ্মণদের সম্মান পান। তার কারণ অবশ্য অংশত এই যে এঁদের ভিতরেই ইসলামী শাস্ত্রচর্চার প্রচলন ছিল বেশী। এবং ঠিক যে রকম, ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্র বানায়, এবং শাস্ত্র ভাঙে তারাই,—রামমোহন বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করুন—ঠিক সেই রকম ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য সৃষ্টিতেও সৈয়দদের ভাঙা-গড়ার সাহস বেশী। হিন্দুর বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় যে মুসলমান কবি সম্মানের সর্বোচ্চ আসন পেয়েছেন তাঁর নাম সৈয়দ মোর্তুজা।

ওলন্দাজদের হাত থেকে পশ্চিম ইরিয়ান (পশ্চিম নিউ গিনি) উদ্ধার করার জন্য ইন্দোনেশিয়ায় কিছুদিন ধরে সমরায়োজন চলেছে। কিন্তু আশা করা যায়, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হবে না, ওলন্দাজরা বিনা যুদ্ধেই পশ্চিম ইরিয়ান ছেড়ে দেবে। মার্কিন সরকার দু পক্ষকেই যুদ্ধের পথে না গিয়ে আপস-মীমাংসার দিকে যাবার জন্য চাপ দিচ্ছেন। ওলন্দাজদের পক্ষে পশ্চিম ইরিয়ানের দখল রাখার জন্য যুদ্ধ করা অর্থহীন। যুদ্ধ করে জয়লাভের কোনো আশা নেই। তাছাড়া পশ্চিম ইরিয়ান থেকে ওলন্দাজদের এমন কিছু লাভও হচ্ছে না, যার জন্য যুদ্ধে অর্থব্যয় এবং রক্তপাতের কোনো সার্থকতা থাকতে পারে। পশ্চিম ইরিয়ান হাতছাড়া হলে হল্যান্ডবাসীদের জীবনযাত্রায় কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হবে না এবং সারা ইন্দোনেশিয়া হারাবার পরে মাত্র পশ্চিম ইরিয়ান দখলে রেখে বিশেষ কিছু গৌরব বোধ করা যায় তাও নয়।

তবে ন্যায় হোক অন্যায় হোক, মূল্য থাক বা না থাক—কোনো গভর্নমেণ্টের কিছু ছাড়তে হলেই যেন মান যায়, বিশেষত স্বেচ্ছায় না ছাড়লে যেখানে অপরপক্ষ কেড়ে নেবার ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া যখন থেকে যুদ্ধের ভয় দেখাচ্ছে তার আগেই তো ইচ্ছা করলে হল্যান্ড আপস-মীমাংসার পথে যেতে পারত, তাহলে তো আর ভীতিপ্রদর্শনের কাছে হার মানার প্রশ্ন উঠত না। আপস-মীমাংসার আলোচনা এড়িয়ে যাবার জন্য একটা কৌশল ডাচ গভর্নমেণ্ট অবলম্বন করেছিলেন—হল্যান্ড পশ্চিম ইরিয়ান ছেড়ে দিতে রাজী আছে কিন্তু সেটা পশ্চিম ইরিয়ানবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ পশ্চিম ইরিয়ানবাসীদের মত নিতে হবে যে, তারা ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে চায় কিনা। ইন্দোনেশিয়ানরা একথা একেবারেই মানতে রাজী নয়। পশ্চিম ইরিয়ান ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌমত্বের অন্তর্ভুক্ত এটা স্বতঃসিদ্ধ, এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে দিতেই ইন্দোনেশিয়ার সরকার রাজী নন। আর সে প্রশ্ন যদি ইরিয়ানবাসীরা নিজেরা কোনোদিন তোলে তবে তার মীমাংসা তাদের সঙ্গে হবে, ডাচদের সে প্রশ্ন তোলার কোনো অধিকার নেই। ডাচ সরকার যদি মুখ বাঁচাবার একটা পথ চান তবে বড় জোর এই ব্যবস্থা হতে পারে যে, কর্তৃত্বের আইন মোতাবিক বা "ডি জুরে" হস্তান্তর কিছুকাল স্থগিত রাখা যেতে পারে, কিন্তু

কার্যত—"ডি ফ্যাক্টো"—কর্তৃত্বের হস্তান্তর এখনই করতে হবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত এই ধরনেরই একটা আপস-মীমাংসা হবে। ইন্দোনেশিয়ার সরকার পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ এবং যুদ্ধক্ষেত্র বলে ঘোষণা করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয়েই পশ্চিম ইরিয়ান বস্তুত ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত হবে এবং সেখানে অদূরভবিষ্যতে ডাচ শাসনের পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়ান শাসন প্রবর্তিত হবে, এরূপ সম্ভাবনা হয়েছে।

পুরাতন ঔপনিবেশিক শাসন বা কলোনিয়ালিজ্‌ম-এর দিন শেষ হয়ে এসেছে। পশ্চিম ইরিয়ান থেকে ডাচ কর্তৃত্বের অবসান সংগতই হবে। তবে ডাচের পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়ান শাসন প্রবর্তনকে পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভ বলে বোধ করবে কিনা তা বলা কঠিন। হয়ত জাতীয় স্বাধীনতার সংজ্ঞাটাই তাদের কাছে অস্পষ্ট বা অন্যরকম। আধুনিককালের উপযোগী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ধারণাই হয়ত তাদের নেই এবং ডাচ শাসকগণ তাদের আধুনিক কালের উপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা দানের ব্যবস্থাও কিছু করেন নি। ডাচদের মুখে পশ্চিম ইরিয়ানের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তোলা মোটেই শোভা পায় না, যদিও ডাচ শাসনের পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়ান শাসন প্রবর্তিত হলেই পশ্চিম ইরিয়ানবাসীদের "মুক্তি" হল বলে মনে করা ঠিক না হতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার শাসকশ্রেণী এবং পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত এবং কৃষ্টিগত পার্থক্য যে যথেষ্ট আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ডাচ এবং ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে যে-তর্ক তাতে সে-সব কথা অবান্তর। আসলে ডাচ এবং ইন্দোনেশিয়ান উভয়েরই পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে চিন্তা হচ্ছে জায়গা হিসাবে সম্পত্তি হিসাবে রাজনৈতিক এবং শাসনিক অধিকারের ক্ষেত্র হিসাবে। সেইসব হিসাবে ডাচ কর্তৃত্বাধীন থাকার পরিবর্তে পশ্চিম ইরিয়ানের ইন্দোনেশিয়ান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বহুগুণে সংগত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐ অঞ্চলে ডাচ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের এই অবশিষ্ট অংশটুকু কাঁটার মত রেখে দেবার কোনো অর্থ হয় না, পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীদের ভালমন্দের চিন্তা বাদ দিয়েই (ডাচ শাসনে তাদের কোনো উপকার হয়েছে এরূপ কোনো প্রমাণ নেই) সকল এশিয়াবাসীই পশ্চিম ইরিয়ানের ডাচ কর্তৃত্বের অবসান চাচ্ছে। সেই দৃষ্টিতে ইন্দোনেশিয়ানদের যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচারও অবান্তর।

তা নাহলে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করা যেতো যে, ইন্দোনেশিয়ানদের যা আছে তারই সুব্যবস্থা করতে না পারার আগে তারা আরো অধিকার বিস্তার এবং নূতন দায়িত্ব নেবার জন্য এতো ব্যগ্র হয়েছে কেন? ইন্দোনেশিয়ান সরকারের সমালোচকরা হয়ত বলবে যে, ঘরের অশান্তি থেকে অন্যদিকে লোকের দৃষ্টি ফেরানোও পশ্চিম ইরিয়ান "মুক্ত" করবার অভিযানের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। একথার মধ্যে সত্যতা থাকতে পারে কিন্তু তার দ্বারা বাস্তব ঘটনার কিছু ইতরবিশেষ হচ্ছে না। ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তর অবস্থায় এখনো নানারকম বিশৃঙ্খলা রয়েছে, পশ্চিম ইরিয়ান হস্তগত হলে শাসকগোষ্ঠীর সমস্যা এবং দায়িত্বভার হয়ত বৃদ্ধিই হবে, কিন্তু সেই যুক্তির বলে পশ্চিম ইরিয়ানে ডাচদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা। ইন্দোনেশিয়ান কর্তাদের কথাবার্তা এবং কাজকর্ম সব অনিন্দনীয়, এরূপ বলা যায় না। পশ্চিম ইরিয়ানে ইন্দোনেশিয়ান শাসন প্রবর্তিত হলে সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থার সংগে সংগে উন্নতি আরম্ভ হয়ে যাবে, এরূপ আশা করারও কোনো কারণ নেই। বস্তুত ইন্দোনেশিয়ার দাবি যারা সমর্থন করছে তারা পশ্চিম ইরিয়ানের লোকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন অপ্রয়োজনের দিক থেকে ব্যাপারটা দেখছে না। এখানে আবার স্মরণ করা যেতে পারে যে, সেদিক দিয়ে ডাচ শাসনের সমর্থনে কিছু বলার নেই। তারা দেখছে এটাকে একটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে এবং সেই দৃষ্টিতে পশ্চিম ইরিয়ানের ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্তি ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখা যায় না। সেইজন্য পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথাটা অবান্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ডাচদের পক্ষে তো সেটা একেবারেই অনধিকার চর্চা। আসলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সংগে মানবিক অধিকারের পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে কোনো ব্যবস্থা বা কোনো সমস্যা সমাধান করা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এখনো সম্ভব নয়। সুতরাং রাজনৈতিক সমাধান কোনো ক্ষেত্রেই পুরো সমাধান নয়, কিছু গোলমাল থেকেই যায়, পরবর্তীকালে যার জের টেনে চলতে হয় অথবা এক সমস্যা আর এক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়।

পশ্চিম ইরিয়ান ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেই যে ইরিয়ান সম্পর্কে সব আন্তর্জাতিক সমস্যা মিটে যাবে তা বলা যায় না। কারণ যদিও ইন্দোনেশিয়ান সরকার এখনো পূর্ব ইরিয়ান সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোনো দাবি উত্থাপন করেন নি, তাহলেও একথা মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ইন্দোনেশিয়ানরা যে-যুক্তি দেয়, সে-যুক্তি পূর্ব ইরিয়ান সম্পর্কেও তারা দিতে পারে এবং সুযোগ বুঝে দেবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অছি হিসাবে অস্ট্রেলিয়া এখন পূর্ব ইরিয়ানের অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব করছে। অস্ট্রেলিয়ার সংগে আপাতত ইন্দোনেশিয়া বিবাদ বাধাতে চায় না। কিন্তু পশ্চিম ইরিয়ান হস্তগত হবার পরে পূর্ব ইরিয়ান সম্পর্কে দাবি উত্থাপনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার ভিতর থেকেই ইন্দোনেশিয়ান সরকারের উপর চাপ আসতে পারে। তবে এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং হল্যাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য আছে। অস্ট্রেলিয়া পশ্চিমা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও অবস্থানের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া ঐ অঞ্চলেরই একটি শক্তি। বৃটেনের উপনিবেশ হিসাবে আরম্ভ হলেও এখন তার সত্তা অন্যরকম, এমনকি নিরাপত্তার জন্য এখন অস্ট্রেলিয়া বৃটেনের চেয়ে আমেরিকার উপরই বেশি নির্ভরশীল। ঐ অঞ্চলে ডাচ শক্তির অস্তিত্ব ইন্দোনেশিয়ার (তথা অন্য এশিয়াবাসীদের) পক্ষে অসহ্য হলেও অস্ট্রেলিয়াকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে না দেখে উপায় নেই। সুতরাং ডাচদের সংগে কোনো সম্পর্ক না রাখলেও চলতে পারে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে তা নয়। তার সংগে বনিবনা করে চলার প্রয়োজন আছে, সুতরাং পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়া যে-নীতি অবলম্বন করেছে পূর্ব ইরিয়ান সম্পর্কে সেরূপ নাও করতে পারে কারণ ইন্দোনেশিয়ান স্বার্থের পক্ষে হয়ত উপযোগী হবে না।

অবশ্য পূর্ব ইরিয়ানের উপর অস্ট্রেলিয়ার অছিগিরিও চিরস্থায়ী নয়, তারও সমাপ্তি একদিন হবে এবং তখন পূর্ব ইরিয়ানের "স্টেটাস"-এর সমস্যার কীভাবে সমাধান হবে তা এখন বলা কঠিন কারণ জাগতিক পরিস্থিতি এবং ইউনাইটেড নেশনস্-এর অবস্থা ইতিমধ্যে কী দাঁড়ায়, তার উপর সেটা নির্ভর করে। তবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডও যদি তার এশীয় প্রতিবেশীদের সংগে বনিবনা করে চলতে চায় তাহলে অন্তত দুটো ব্যাপারে এশীয় মনোভাবের সংগে তার নীতির সংগতি রাখতে হবে। "সাদা অস্ট্রেলিয়ার" নীতির পরিবর্তন আবশ্যক। যতদিন এই নীতি চলবে ততদিন কোনো এশীয় দেশের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রতি পূর্ণভাবে প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব রাখা কঠিন। দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইরিয়ানে সাক্ষাৎভাবে কোনো ব্লক-সংশ্লিষ্ট সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা বা পূর্ব ইরিয়ানকে পরোক্ষভাবে ঐরকম কোনো ঘাঁটির আওতায় আনা চলবে না। এই দুটি বিষয়ে যদি অস্ট্রেলিয়া সচেতন এবং সজাগ থাকে তবে পূর্ব ইরিয়ানের সমস্যা ধীরে ধীরে বিনা বিবাদে মিটে যেতে পারে।

৬-১-৬২

লেখক ও পাঠকের মৃত্যু

শ্রদ্ধেয় "দেশ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকীর আমি একজন মনযোগী পাঠক।

গত ৩০শে ডিসেম্বরের কাগজটি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অগ্রসর হব।

পত্রিকার সর্বপ্রথমে 'সম্মেলনের পর' শীর্ষক যে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পর্কে আমার কতকগুলি কথা বলার প্রয়োজন আছে। আপনারা লিখেছেন—'মৃত্যু কি শুধু লেখকেরই ঘটে, পাঠকের মৃত্যু নেই?'—এই প্রশ্নের উত্তর আপনাদের মতানুযায়ী নেতিবাচকই হওয়া উচিত।

পাঠকের মৃত্যু ঘটে এবং তা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'Rupee comes out of the mint first'. আর সেই টাকা ব্যবহার করে জনসাধারণ। একটি টাকা বাজারে কতদিন চালু থাকতে পারে—এ প্রশ্নটি নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর। প্রথম, জনসাধারণ সেই টাকাটিকে কিভাবে ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয় টাকাটি কেমন করে এবং কি দিয়ে তৈরী। আমার মনে হয় দুটি কারণের মধ্যে দ্বিতীয়টি যত কার্যকরী প্রথমটি তেমন নয়। সাহিত্যের রচনা এবং তার পাঠক সম্পর্কেও এই একই কথা খাটতে পারে। সাহিত্যের সততা রক্ষা পাঠকের ওপর যতটা না নির্ভর করে তার বেশী নির্ভর করে লেখকের ওপর। অন্তত পাঠকের রুচিগত বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে লেখকের ওপর নির্ভর করে। লেখক যেমন রচনা পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করবে পাঠক ব্যক্তিগতভাবে ঠিক তেমনভাবে সেই রচনাটিকে গ্রহণ করবে। তবে পাঠকের যে একেবারেই কোনো ত্রুটি নেই তা বলা চলে না। সস্তা, চটুল সাহিত্য অধিকাংশ পাঠকই হয়তো পছন্দ করে থাকে এই কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু পাঠকের এই দ্বিধাগ্রস্থ রুচিকে লেখক চেষ্টা করলেই অন্তত কতকাংশে সংশোধন করে নিতে পারেন এবং তা সম্ভব উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যমেই। মূল কথা বর্তমানে সাহিত্য পাঠকদের যতটা না অপমৃত্যু ঘটেছে তার চেয়ে অনেক বেশী অপমৃত্যু ঘটেছে সাহিত্যিকবর্গের। সাহিত্যকে 'নেশা' হিসেবে গ্রহণ করা এক কথা আর তাকে 'পেশা' হিসেবে নেওয়া আর এক কথা। নেশায় থাকে আন্তরিকতা আর পেশায় কৃত্রিমতা। যদিও সর্বত্র এই মন্তব্য করা চলে না তথাপি বর্তমানের সাহিত্যের

দুনিয়ায় উপরোক্ত মন্তব্য যথাযথ প্রযোজ্য বলেই আমার বিশ্বাস।

যেক্ষেত্রে লেখককে তাঁর রুজির জন্যে দিনে পাঁচ সাতটি করে রচনা সৃষ্টি করতে হয় সেক্ষেত্রে সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং সততা রক্ষা সহজসাধ্য বলে মনে হয় না। এই কথা আশা করি কেউই অস্বীকার করবেন না—। কাজে কাজেই লেখকের মৃত্যু হয় তাঁর লেখায়, এবং পাঠকের মৃত্যুর বহু পূর্বেই তা ঘটে থাকে। আর যে সাহিত্যের দুনিয়ায় লেখক এবং পাঠক উভয়েরই মৃত্যু ঘটে সেই সাহিত্য-জগতের ভবিষ্যৎ বিশেষ সুবিধার নয়। এক্ষেত্রে দোষত্রুটি কোনো পক্ষেরই নয়। দোষ যুগধর্মের। যেখানে মনের চাইতে ধনের মূল্য অনেক বেশী। আমার এক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সাহিত্যের দুনিয়ায় যখন দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে তখন লেখক এবং পাঠক উভয় পক্ষকে যথাযথ সতর্ক হতে হবে—তবে তুলনামূলক বিচারে লেখকের দায়িত্বই বেশী।

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিচারের ভিত্তিতে নয় সর্বজনীন বুদ্ধির বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে, সাহিত্য রচনার মানের অধিকতর উন্নতি কাম্য।

বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা ৫

বাংলা দেশের গ্রাম

মহাশয়,

বাংলা দেশের গ্রাম সম্পর্কে শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচনাটি এবং সেই সূত্রে প্রকাশিত সব কটি আলোচনাই পড়লাম।

কৃষিপ্রধান গ্রামময় এদেশের গ্রামই তার প্রাণ। দেশ স্বাধীন হবার পর দীর্ঘ ১৫ বছর পার হয়ে গেল। দু দুটো পাঁচ-শালা পরিকল্পনাও আমরা শেষ করলাম। কিন্তু গ্রামের চেহারা তেমনি কঙ্কালসার রয়ে গেছে।

গ্রামের উন্নতি বিধানের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা আমার মনে হয় সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের কিছু কিছু গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সরকারের ব্লক ডেভেলপমেন্ট স্কীমের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন কার্যকলাপের কিছু নমুনা সেসময় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এবং এ বিষয়ে আমার বক্তব্যও এদের দেশে প্রকাশিত শ্রীদিবাকর সেন সরকারের অনুরূপ। অবশ্য সুনীলবাবুর অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য এবং কিরণবাবুর "মুষ্টিমেয় কিছু লোক সামান্য শিক্ষা, কলকাতার খবরের কাগজ আর শহরগঞ্জে ঘোরাফেরা করে গ্রামের কেউকেটা হয়ে শত শত মানুষের বোকামিকে আপন স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করে"—এ কথা অনস্বীকার্য নয়।

শ্রীকিরণকুমার রায় অঙ্কিত বাংলার গ্রামের যে চিত্র অংকণ করেছেন উড়িষ্যার গ্রামগুলিরও দেখেছি ঐ একই ছবি। তবু সেখানে একটা মস্ত সুবিধা হচ্ছে প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে পাকা অথবা কাঁচা রাস্তা। অপর পক্ষে, বাংলাদেশের গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার এই দিকটা সবচেয়ে অবহেলিত। বাংলাদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে দিনে লোকেও এ গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যেতে দুস্তর বাধা অতিক্রম করতে হয়। গ্রামের সঙ্গে গ্রামের এবং গ্রামগুলির সঙ্গে শহরের যোগাযোগ-পথজাল যেন যত দ্রুত সম্পন্ন হবে, আমার মনে হয়, গ্রামজীবনের অন্যান্য দিকগুলির উন্নতি ঘটানোও তত শীঘ্র সম্ভব হবে।

সকলের দৃষ্টি এদিকে যে আকৃষ্ট হয়েছে সেটাই আনন্দের বিষয়। সকলকে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে মিলিতভাবে গ্রামগুলির সামগ্রিক উন্নতির জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কার্যপন্থা নির্ণয় করতে হবে। এই সুযোগ আপনি দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

বিনীত
হীরেন লাহিড়ী,

অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা

দরবেশ

হাইড পার্ক নয়, ভাইগল্যান্ড পার্ক। লণ্ডনের হাইড পার্কে সব সময়েই জনতার সমাগম। কেউ বা আসেন বেড়াতে, কেউ বক্তৃতা দিতে, আবার কেউ আসেন চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে অথবা দিবানিদ্রাসুখ উপভোগ করতে। অসলোর ভাইগল্যান্ড পার্কে যাঁরা আসেন তাঁরা কিন্তু নিছকই দর্শক—জীবনের দর্শক। তাঁরা এখানে কোনো নৈসর্গিক শোভা দর্শনাভিলাষে আসেন না, আসেন শুধুমাত্র জীবনের দর্শক হয়ে দেখেন অনন্যসাধারণ শত শত মর্মরমূর্তির এক অপূর্ব সমাবেশ যার জন্যই এই পার্কটি নির্মিত।

দর্শক এখানে প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্তি-গুলি দেখেন; আর ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় হয়ত কদাচিৎ অস্ফুটপূর্ব অবোধ্য একটি সংগীতের প্রতিধ্বনি শোনেন। এমন একটি পার্ক সুমেরুবৃত্তের স্বপ্নময় ছায়ায় না হয়ে অন্য কোথাও কল্পনা করা ভাবনাতীত। বর্তমানের অসুস্থ জগতে এ এক বিস্ময়কর পার্ক। অবাক হতে হয়, খানিকটা কোনার্ক, খানিকটা খাজুরাহো, কিন্তু সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে আধুনিক ভাস্কর্যের একটি অমরাবতী। সাধারণ মানুষের কাছে এই অমরাবতী কল্পনাতীত।

স্বদেশীয় ছিদ্রান্বেষীদের কটাক্ষ, 'অপ্রকৃতিস্থ' অপবাদ, ভাস্কর গুস্তাভ্ ভাইগল্যান্ডকে দিকভ্রান্ত করতে পারেনি। শিল্পীজীবনের সুদীর্ঘ আটচল্লিশ বছর এই শিল্পী তাঁর অমরাবতীর পরি-কল্পনায় ও রূপায়ণে বিনা পারিশ্রমিকে আত্মোৎসর্গ করেছেন। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের শিল্পপতিরা তাঁকে অর্থ যুগিয়েছেন তাঁর শিল্প-সাধনাকে মূর্ত করে তুলতে। ১৯৪৩ সনে পার্কটি যখন গড়ে উঠল এবং ভাস্কর তাঁর জীবনের সেরা ও সবচেয়ে অদ্ভুত সৃষ্টি 'জীবনের দর্শন' রচনা করলেন, সহসা তখনই চিরদিনের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বিকৃত পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি। হাইড পার্ক ভুবনবিখ্যাত; কার্জন পার্ক তো আমাদেরই সুপরিচিত, কিন্তু ভাইগ-ল্যান্ড পার্ক শুধু কী শিল্পরসিকদেরই ভূস্বর্গ? কিন্তু এবার আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আসা যাক।

(এক)

কদিন ধরে এই মূর্তিগুলো নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ঘুরতে বসতে বেড়াতে এরা আমায় সব সময় ভাবিয়ে তুলেছে। মূর্তি-গুলোতে পদে পদে অভিনবত্বের চমক আছে, কিন্তু আরো এমন কিছু আছে যা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। অত্যদ্ভুত শিল্প-দক্ষতা! কিন্তু তাও তো আমায় ঠিক ভাবিয়ে তুলছে না!

আজও সকাল থেকেই এভাবনমতো আমি পার্কে পরিক্রমা দিয়েছি। কোথায় এসেছি তাও যেন ধারণার বাইরে। বেঞ্চিতে একা বসে মনে হচ্ছে আমার চারিপাশে অশরীরী কারা যেন বাতাসের ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে ওরা যেন আমায় বলছে, চিনতে পারছ না আমরা কে?

এখানে এলেই আমার মনে অবর্ণনীয় সুখের এমন একটি প্রবাহ বয়ে যায় যার মানে আমি আজও জানিনে। তবু কেমন যেন অকারণেই ভয় করে, আবার এত ভালোও লাগে যেন গোপনে কোনো উর্বশীর অভিসারে এসেছি যা নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু কেন?

শিল্পী ভাইগল্যান্ডের মহোত্তম সৃষ্টি : গগনচুম্বী মর্মর স্তম্ভ শিল্পীর 'জীবন দর্শন'

ঝটকায় আমার নিবেদনটিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—আমি নিজেই জানিনে।

অন্য আর একজনের নিকট আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলুম। গলায় হাত বুলিয়ে তিনিও বললেন, ব্রাদার, আমিও কি ছাই কিছু বুঝতে পারছি!

হতাশভাবে আমি আবার নিঃশব্দে মূর্তিগুলো দেখতে লাগলুম। প্রথম ভদ্রলোকটির ডান ধারে আমি ছিলুম। বাঁ ধারে একটি মহিলা। মহিলাটি এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে বললেন—পারবেন, আমিও সবকিছু বুঝি না, তবু যতটুকু জানি আপনাকে বলতে পারলে খুশী হবো।

ভদ্রমহিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে আমি একটু সরে দাঁড়ালুম, তিনি আমার ঠিক পাশটিতে দাঁড়াবার জায়গা করে নিয়ে সপ্রতিভভাবে স্কুলমাস্টারী সুরে বললেন, ভাইগল্যান্ড দুঃখবাদী ছিলেন না, তবু বর্তমান যুগের তরুণদের সম্বন্ধে হতাশা-পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

কাঁচুমাচু মুখে আমি বললুম, সে কেমন?

ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে নির্বিকারভাবে ভদ্রমহিলা বললেন, লক্ষ করুন, যুবকটির মুখে ঐ বয়স্ক পুরুষটি ও বৃদ্ধের চোখে-মুখে [illegible] ভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

[illegible] মহিলা এবার একটু হেসে ও সহজ সুরে বললেন—আপনি নিশ্চয় জানেন, [illegible] জল থেকেই সব উৎপাদনশক্তির প্রতীক, [illegible] বিপরীত।

এবারে জল ও মূর্তিগুলির দিকে আবার আমি মনোনিবেশ করলুম। জল ও মানুষ সম্পর্কে আমার সুপ্ত ধারণাগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। পার্কের মধ্যে বেশ বড় রকমের একটি স্বচ্ছ জলাশয় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জল যে একটি [illegible] আর গাছ নরওয়েতে এককালে জীবনের প্রতীকরূপে পূজ্য ছিল, এই পৌত্তলিক শিল্পী ভাইগল্যান্ড তাঁর মনের নিভৃতে [illegible] করেছেন। তাই গাছ ও মানুষ, জল ও মানুষ, এদের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেই তিনি তাঁর শিল্পীমনের প্রতিক্রিয়া এখানে সম্ভবত রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

আমি লক্ষ করেছি, শিল্পী তাঁর গাছগুলিকে ঠিক গাছের মতন কোনো নির্দিষ্ট রূপ দেননি। গাছের পাতাগুলিকে ঠিক পাতার মতন করে তৈরী করেন নি। পাতার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট আলো আর ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে চলেছে এমন একটি ধারণা দর্শকের মনে সৃষ্টি করেছেন। গাছের ডালপালার নানান বিকৃত ভাব, মানুষের জীবন যেমন নানান ঘাতে বিকৃত। শত শত মূর্তি। সবই আবরণমুক্ত। নগ্নতাই এখানে যেন প্রকৃতির একমাত্র সহনীয় আবরণ। কেউ বৃদ্ধ, কেউ প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান তরুণ নরনারী, আবার শিশুও। প্রতিটি মূর্তি দুপুরবেলার সূর্যালোকে একভাবে প্রতিফলিত
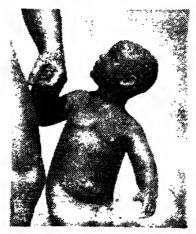
মায়ের হাত ধরে সন্তান

হয়, পড়ন্ত রোদে অন্যভাবে ও সন্ধ্যায় অন্য আরো কিছুভাবে। আলো আর ছায়ার মাধ্যমে শিল্পী অনেক কিছু বলতে চেয়েছেন, সার্থকভাবে বলেছেনও। কেননা শিল্পের ধর্মই হলো শুধু চৈতন্যকে জাগানো, তাই আমার মতন অশিল্পী মনেও এদের আলোছায়া মূর্তিগুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে মূর্ত করে তুলেছে। ভদ্রমহিলাকে বিনীতভাবে বললুম—ধন্যবাদ, আপনার সময় নষ্ট করলুম না তো?

চোখ তুলে তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমিও নিঃসংকোচে তাঁকে নিরীক্ষণ করলুম। দীর্ঘাঙ্গী নর্ডিক যুবতী। চোখের মণি দুটি চকচকে নীল। মাথার চুল চেসনাট ব্লণ্ড। চকোলেট রঙের চেককাটা ওভারকোট। ফিগারটি চোখ মেলে দু-দণ্ড দেখবার মতো। দস্তানায় ঢাকা হাতের আঙুল দেখবার উপায় ছিল না—আঙুলের সুতীক্ষ্ণ ডগা নাকি মানুষের শিল্পমনের পরিচায়ক।

হেসে তিনি সপ্রতিভভাবে বললেন, আপনি বোধ হয় এশিয়ান? মনে হয় ইণ্ডিয়ান?

আমার নাগরিকতা স্বীকার করলুম। মধুর হেসে তিনি বললেন, চলুন, পার্কটা ঘুরি।

আমি বোধ হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খুশী হয়েছিলুম, আর সেই আহ্লাদ হয়তো বোকার মতন প্রকাশ করে ফেলেছিলুম চোখেমুখে। ভদ্রমহিলা বললেন, শিল্প কিন্তু দল বেঁধে দেখার জিনিস নয়।

এত মূর্তি—মূর্তির মেলা। মূর্তিগুলি প্রচণ্ডভাবে আমাকে নাড়া দিচ্ছে। নগ্ন দুটি নারীমূর্তি মেঝের উপর কাঁধ ও মাথা রেখে সামনের দিকে সমকোণে পা দুটিকে পরস্পরের হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে আবার সমকোণেই একই সঙ্গে উপরে তুলে ধরেছে।

মায়ের অন্তরঙ্গ হাত ধরে সন্তান চলেছে। সন্তানের সে কী বলিষ্ঠ ভঙ্গী! শিশুটির চোখ দুটিতে যেন বিশ্বের জিজ্ঞাসা।
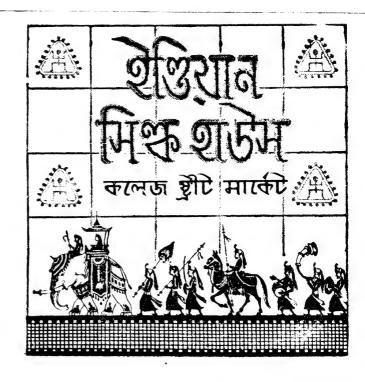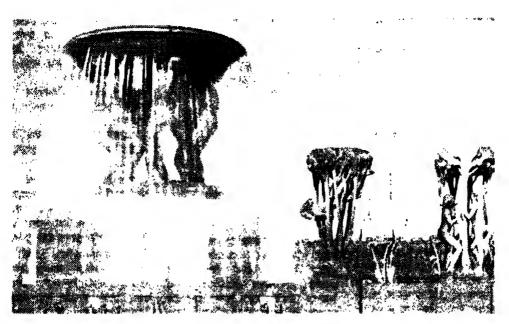
ঝরনার নীচে কতকগুলি মূর্তি একটি জলাধার ধারণ করে রয়েছে। পাশে গাছের শাখায় উবুড় হয়ে শুয়ে এক কিশোর

সিঁড়ির একপাশে স্তূপীকৃত কান্তিময় কতকগুলি নরনারীর মূর্তি, কমনীয়তা ওদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে একজনের বুকে অন্য আর একজন, তারও উপরে আরো একজন, আবার একজন। সিঁড়ির ডান ধারেই প্রশান্তমূর্তি শ্মশ্রুমুখে দুজন বৃদ্ধ, হাঁটুতে হাত রেখে বসে চিন্তিত।

অদূরেই পুরুষের পিঠে হেলান দিয়ে একটি নারীমূর্তি মুখ ঢেকে বসে রয়েছে, পুরুষের চোখে দার্শনিকের দৃষ্টি। নিকটেই বলয়াকৃতি চক্রাকারে দুটি যুগল নরনারী আকাশে ঘূর্ণায়মান, ওদের চোখেমুখে পারলৌকিক এক আনন্দ।

একটি নারীমূর্তি ছুটে চলেছে অকস্মাৎ যেন নিয়তির ডাক শুনে। দূরের বৃদ্ধটি চোখ বুজে দু' হাতের তালুতে আঁজল ভরে জলপান করছে। ভাবখানা, অমৃতের কি শেষ আছে?

একটি বেদীর উপর বহু মূর্তির সমাগম। কেউ দাঁড়িয়ে; কেউ বসে; কেউ দূরের কাকে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছে; কেউ পাশের কারুকে সামলাচ্ছে; মা ক্রন্দনরত শিশুকে বুকে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে; ছোট ভাই তারও দুটি অনুজকে দু' হাতে আগলে রয়েছে। সামনের নারীটি পুরুষটির গাল ধরে প্রশান্তমনে অধরে চুমু খাচ্ছে। পিছনের পুরুষটি আকাশের দিকে তাকিয়ে আগামী দিনকে যেন প্রার্থনা জানাচ্ছে—বুদ্ধি দাও, জ্ঞান দাও।

আমরা একটি সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চললুম। সামনেই একটি পুরুষের প্রতি-মূর্তি—তার সঙ্গিনীকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। সঙ্গিনীর দেহ-ভঙ্গীটি এত সুন্দর, এত সুন্দর সব মিলিয়ে এও যেন এক নতুন স্বর্গ।

অনেক সময়েই আমি এই রসাভিসারের মর্মগ্রহণ করতে পারি না। মূর্তিগুলিকে অবাক হয়ে দেখি, তবু মগজে চিরমঙ্গল এদের নীরব ভাষা পৌঁছয় না। আজ এরা আমার কাছে মূক, কিন্তু তিন হাজার বছর পরের মানুষ যখন মাটি খুঁড়ে এদের আবিষ্কার করবে তখন তারা কি ভাববে? আমরা মাত্র সাত শো আট শো বছর আগের কোনার্ক খজুরাহো সম্বন্ধে আজ কি ভাবছি? আমাদের অনুসন্ধিৎসা আজও এত স্তিমিত কেন?

অন্য আর একটি আলিঙ্গনবদ্ধ নগ্ন যুগলমূর্তির সম্মুখে এসে সংযত কণ্ঠে কিন্তু উজ্জ্বল চোখে ভদ্রমহিলা বললেন, আমাকে সবাই জীন বলে ডাকেন—জীন জানসেন।

আমি আমার নাম বললুম।

যথামত দূরত্ব বজায় রেখে জীন জানসেন বললেন—দেখুন, ভাইগল্যাণ্ডের এই অপূর্ব পার্ক আজও আমাদের নিকট এক অপার বিস্ময়। জীবনের চল্লিশটি বছর কারো কাছ থেকে এক কপর্দক দক্ষিণা না নিয়েও তিনি মূর্তিগুলি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আজও আমরা সঠিক জানিনে, শিল্পী তাঁর শিল্পের মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছেন। সঠিকই তো, শিল্পীর কাজ নয় তাঁর নিজ শিল্পের সত্যাসত্য নির্ণয় করা। সে তো ইতিহাস করবে। কিন্তু এও তো সুস্পষ্ট, উনি পৃথিবীর চারিধারের বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি একটা প্যাটার্ন খুঁজতে চেয়েছেন।

আমি অনুমান করি, ভাইগল্যাণ্ড এমন একটি সমাজ কল্পনা করতে চেয়েছিলেন যেখানে মানুষ নিষ্পাপ ও শৃঙ্খলাহীন পৃথিবীতে বসবাস করেও জীবনের সুর খুঁজে নেবে, সে সুরে রাজনীতির দুর্গন্ধ থাকবে না—ধনীর মর্জিমাফিক, দারিদ্র্যের দীনতা, আর মধ্যবিত্তের সংস্কারান্ধতার মূঢ়তা এ-সবও থাকবে না।

আমরা এগিয়ে চললুম। আমাদের দু-ধারে নানান প্রতিকৃতি। প্রত্যেকটিই শিল্পীর কালাতীত দৃষ্টিভঙ্গীতে দীপ্ত। একটিও প্রচলিত রীতির অন্ধ অনুকরণে রচিত নয়। সজীব, বড় বেশী সজীব।

কোথাও ক্রীড়ারত শিশুরা নেকড়ে বাঘের মুখগহ্বরে সহাস্যে হাত পুরে দিচ্ছে, কোথাও নারী ও পুরুষ বিনা উচ্ছ্বাসে পরস্পরকে ভালোবাসছে, কোথাও বা অলীক একটি স্বপ্নকে শিল্পী এমন অপূর্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, অনেকক্ষণ ধরে রহস্যময় মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকলে জীবনে কেমন একটা বিস্বাদের সৃষ্টি হয়, আবার একটা অদম্য জীবন-পিপাসাও জাগে।

জীন আমার আস্তিনে হাত রাখলেন। সুন্দর ঝকঝকে দাঁতে ভোরের আলোর মত হেসে বললেন, এবার কিন্তু আমরা ভাইগ-ল্যাণ্ডের সবচেয়ে অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য আর

সেরা শিল্পনিদর্শনের কাছে এসে পড়েছি। দেখছেন তো ঐ গগনচুম্বী বিশাল স্তম্ভটি।

(দুই)

অনাবৃতা অভিমানকুণ্ঠিতা একটি নারী-মূর্তির পাশ দিয়ে আমরা পার্কের কেন্দ্র-স্থলে স্তম্ভটির নিচে এসে দাঁড়ালুম।

আমি জানতুম, এই স্তম্ভটি ভাইগ-ল্যান্ডের সর্বোত্তম ও মহত্তম সৃষ্টি, যেটিকে অনেকেই তাঁর 'জীবন-দর্শন'-ও বলে থাকেন। সতের মিটার লম্বা এই প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ একশত একুশটি পূর্ণাবয়ব নরনারীর নগ্নমূর্তি। গোলাকৃতি প্রশস্ত একটি চত্বরের পরিধিতে প্রকৃতির আবরণে স্বপ্নায়িত কামনার নানান প্রতিকৃতি। চারধারের সিঁড়িতেও মূর্তির সারি। একদা আর্যভূমি সুইডেন-সীমান্ত থেকে সংগৃহীত স্তম্ভটি অখণ্ড একটি নিরেট গ্রানাইট পাথর। ওজনে প্রায় দুশো টন। মিশরের প্রাচীন ওবেলিস্ক ছাড়া এত বড় পাথরে তৈরী ভাস্কর্যের নমুনা কোনো দেশে কখনো আমি দেখিনি। [illegible] এমনটি আর কোথাও নেই।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সমুদ্র [illegible] অসলো [illegible] আর [illegible] উনিশশো [illegible] মার্চ মাসে স্তম্ভটির গায়ে শিল্পী তাঁর শেষ [illegible] জীবন-দর্শনের প্রতীকস্বরূপ [illegible] মহত্তর কিছুই আর [illegible] শিল্পকলা। অকস্মাৎ [illegible] হিতিকে [illegible] মহৎ শিল্পীর [illegible] কিন্তু সেদিন নরওয়েতে এমন মানুষ বড় বেশী ছিলেন না যিনি [illegible] ভাইগল্যান্ডের মৃত্যুতে [illegible] একান্ত নিভৃতে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন।

শিলাস্তম্ভটির প্রত্যেকটি আলেখ্য সরীসৃপের মতন পিছনে পালিয়ে যেতে চাইছে তলা থেকে উপরে। তলার মূর্তি-গুলি ভিড়ের চাপে অস্থির। ক্রমশ যত উঁচুতে মূর্তিগুলি উঠছে ভিড় ততই কমে আসছে। সবার উপরের মানুষগুলি মুক্ত, যেন আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

তলার মূর্তিগুলি একে অন্যকে পিষে, দলে, ঠেলে, উপরে উঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। উঠতে পারছে না। আবার কেউ কেউ পারছেও। উপরের প্রবল চাপে অনেকেই মারা গেছে। স্তম্ভের মাঝখানের মূর্তি-গুলিকে ঠিকমতন উঠবার ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে। প্রথমে অনেকেই যেন বুঝতে পারছে না [illegible] ওরা উপরে উঠছে। ওদের চোখ বোজা। দেহ আপন গতিতে চলেছে প্রাণপণে। শিলাখণ্ডের [illegible] দিয়ে গলিয়ে এ ওর মুখে পেটে কোমরে মাথায় পা রেখে ঠেলে-ঠুলে ক্রমশ সংগীতের তরঙ্গের মত উপরে উঠছে।

'জীবন-দর্শনের' মাঝপথে দেখা যাচ্ছে মূর্তিগুলি এবার যেন অনেকটা সজ্ঞানে উপরে উঠতে চাইছে। তবু কোনো কোনো মূর্তি নিচের দিকে আবার পিছলে যাচ্ছে, যেন সংগীতের একটা কোমল সুর উপর থেকে নিচে নেমে গেল। কিন্তু তলারও একটা প্রচণ্ড বিকর্ষণ আছে, সেই বিকর্ষণে একেবারে তলায় কোনো মূর্তিই গড়িয়ে পড়তে পারছে না। কয়েকটি শিশুও খাবি খাচ্ছে এই ভিড়ের মধ্যে। কোনো মূর্তিকেই শিল্পী এমনভাবে সৃষ্টি করেন নি যেটিকে দেখে দর্শকের এমন মনে হতে পারে মূর্তিটি 'জীবন-দর্শনের' বাইরে ছিটকে পড়ছে। ছন্দ ও সুরের এমন সমন্বয়, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এমন আবেদন মনে হয় বিচিত্র এক যাদু।

জীনও নিঃশব্দে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে এমন একটি বিদুষী ও সত্যিই সুন্দরী তরুণী রয়েছেন এও আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

জীন হঠাৎ ঘুমভাঙা স্বরে বললেন,—'শিলাস্তম্ভটি এবং পার্কের সব মূর্তি-গুলোতেই আপনাদের কোনার্ক ও খাজু-রাহোর কিছুটা মিল হয়তো দেখতে পাবেন।

আমার মনেও এমনই একটি প্রশ্ন নিমেষের জন্য ঝিলিক দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটির রূপ ঠিকমতন দিতে পারছিলুম না। অবান্তর, তবু বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে বললুম—আপনি বুঝি ভারতবর্ষে গেছেন?

নীল চোখ দুটি আমার দিকে তুলে ধরে লীলাপূর্ণ ভঙ্গীতে তিনি বললেন, না-তো নরওয়ে ছেড়ে কোথাও আমি যাইনি।

একটু পরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, আপনাদের দেশ সম্বন্ধে, বিশেষ করে দর্শন ও শিল্প সম্বন্ধে খানকতক বই পড়েছি।

যে প্রশ্নটি ভারতীয় কোনো বিদুষীকেও করতে আমার সাহসে কুলোতো না সুযোগ পেয়েও সেই প্রশ্নটি অনুচ্চারিত রেখে গলাটা পরিষ্কার করে বললাম, কোনার্ক আর খাজুরাহোর সঙ্গে ভাইগল্যান্ডের শিল্পের কী মিল দেখলেন?

দূরত্ব আগের মতনই বজায় রেখে একটু ভেবে নিয়ে জীন বললেন—আপনি যাকে 'মিল' বলছেন ঠিক তা বোধহয় নেই তবু মনে হয়, যেন কোথাও অনেকখানি সাদৃশ্য

বৃদ্ধ ও শিশুরা ঃ জননীর পিঠে সন্তান
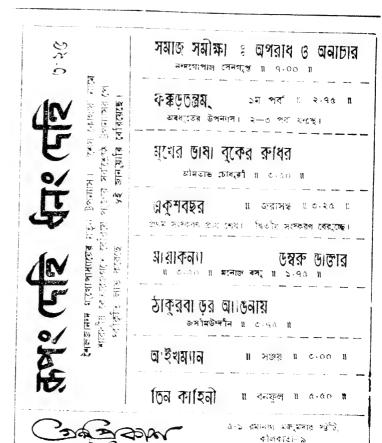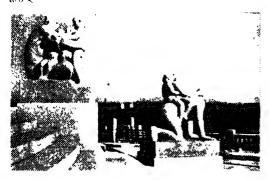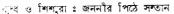
সি'ড়ির ধাপে নানা বয়সের নানা ভাবের নরনারীর মূর্তি

আছে। সুর এক কিন্তু স্বর আলাদা। মহৎ শিল্পমাত্রেই সঙ্গতি থাকতে যে হবেই। যতটুকু আমি বুঝি, আপনাদের প্রাচীন শিল্পীরা ভাইগল্যান্ড অপেক্ষাও শতগুণ মুক্ত ছিলেন, তাই জীবনকে অত গভীরভাবে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন। জীবনকে উপলব্ধি না করলে শিল্পের মাধ্যমে জীবনের প্রতিফলন করা অসম্ভব। জীবনকে যদি বিচার না করেই আমরা গ্রহণ করি তাহলে সে জীবনই যে মানুষের বিড়ম্বনা; এই বিড়ম্বনা থেকে যত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

আমি চমৎকৃত হয়ে বক্তার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাতেই সংকুচিত হয়ে তিনি একটু হেসে বললেন—আপনাদের প্রাচীন দর্শনে বলে, নিজেকে চেন।

যেন অনেকখানি বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছেন এমনি একটি ব্রীড়ানত লজ্জায় আরক্তিম বদনে আবার বললেন, কিছু মনে করবেন না; এসব কথাতো আপনারা জানেনই।

সাগ্রহে বলতে চাইলুম, না-না, আমি কিছুই জানিনে, আপনি বলুন, শুনতে ভালো লাগছে।

দর্শনের আলোচনার শেষ নেই। দর্শনের আলোচনা ছেড়ে আমরা জীবনের প্রতিচ্ছায়ারূপী গোলকধাঁধার চারিদিকে বেড়াতে লাগলুম।

দর্শকের ভিড় ক্রমশ তরল হয় এলো। উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে আবার 'জীবন-দর্শন'টিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। শিলাস্তম্ভটি যতই দেখি আর যতবারই দেখি না কেন অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারিনে। ক্লান্ত মনুষ্যমূর্তিটি স্তম্ভের উপরে আকাশে উঠে আরো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আট-দশটি শিশু। ওদের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ছেড়ে-আসা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের চোখে ওরা কি ভাবছে?

বয়স্কদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মাত্র দুজনই স্খলন ও পতনের ঊর্ধ্বে যেতে সমর্থ হয়েছে। একজন পুরুষ; অন্যটি নারী। নারীর ভঙ্গিমাটি প্রার্থনারত। পুরুষ চিন্তান্বিত, পদস্খলন থেকে কোনো রকমে নিজেকে বাঁচানোর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। মনে হয়, নীচের বয়স্করা স্তম্ভের উপরিভাগে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ক্রমশ শৈশবে ফিরে গেছে, সংখ্যায় অত তো শিশু তলার দিকে ছিল না।

আমার কোটের আস্তিনে হাত রেখে জীন অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললেন—মানুষ সম্বন্ধে এমনই একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাখ্যা শুনেছি, আপনাদের দর্শনে সম্ভবত ছিল। সংস্কারমুক্ত মানুষ শিশুতে পরিণত হয়। ভাইগল্যান্ডও হয়তো তাঁর 'জীবন-দর্শনে' শেষ পর্যন্ত সেই ধ্রুব-ই উপলব্ধি করেছিলেন, এইখানেই সহসা তাঁর মৃত্যু হলো।

স্পষ্টতই মুক্ত জীবনসৈনিক তাঁর শৈশবে ফিরে গেলেন। ভাইগল্যান্ড 'জীবন-দর্শনে' হয়তো দেখিয়েছেন—শিশুই একমাত্র মুক্ত-প্রাণী। শিশুই ভাস্বর। সংস্কারমুক্ত নির্গ্রন্থি মানুষই অনাসক্ত, তাই ভগবান।

আমরা স্তম্ভটির তলায় মেঝেতে বসলুম। তুষারপাতে দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। চোখের চশমার উপর টুপির কিনারা নামিয়ে দিয়ে জীন বললেন—শিশুই যে একমাত্র মুক্তপ্রাণী শিল্পী আরো স্পষ্ট করে তা দেখাতে চেয়েছেন স্তম্ভ-শিখরের তিনটি শিশুর মাধ্যমে; ওরা তিনজনেই স্বর্গের দিকে তাকিয়ে।

স্তম্ভ থেকে খানিকটা দূরে সরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সত্যিই তো! মনে হলো, উপরের শিশুগুলি আর তো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নেই! ওরা যে সত্যিই স্বর্গের পানে তাকিয়ে রয়েছে!

স্তম্ভের গহন অতলের বৃদ্ধ মানুষটি মৃত অথবা জ্ঞান হারিয়েছে। বৃদ্ধের মাথাটি নীচে, কাঁধের উপরে, বেঁকে-চুরে একটি তরুণী। ওদের দিকে পিছন ফিরে সর্পিলভঙ্গীতে অন্য আর একটি যুবতী দেহ এলিয়ে রয়েছে, যেন পাড়ে আছড়ে-পড়া সমুদ্রের ফেনিল একটি নিঃসঙ্গ ঢেউ। উপরে উঠবার ক্ষমতা নেই।

এদেরও উপরে আরো নরনারী। মাঝপথে একটি মেয়ে চিড়েচ্যাপটা হয়ে মুখ-কান শক্ত করে চেপে ধরে রয়েছে। এমন হতাশা, এমন লজ্জাকরুণ ভঙ্গিমা।

পার্কের গেট বন্ধ হওয়ার সময় এখনো হয়নি। তবু আমরা পার্কের বাইরে এলুম। চৌরাস্তার কাফেতে ঢুকলুম। জীন টুপি খুলে হাঁপছাড়ার মতো বললেন—এবার আমি আমার আমাতে ফিরে এলুম।

দুমগ বিয়ার আর হ্যামবুর্গার আনিয়ে এতক্ষণে সম্মোহিতভাব থেকে মুক্ত হয়ে হেসে বললুম, সে কেমন?

হাসি চেপে জীন দুষ্টুমির চোখে বললেন, দর্শনের মধ্যে থাকলে দম বন্ধ হয়ে

এখনও স্বপ্নের মত মনে হয় সেই উপত্যকাটিকে নিতি যার নাম। গাড়োয়ালের উত্তর সীমায় ধৌলি-গঙ্গার চপল স্রোত তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। আর অটল হিমালয় দিয়েছে আশ্রয়। আর অপরূপ সব নির্ঝরিণী আর অপূর্ব পাইন বন সেই উপত্যকায় সৌন্দর্যের মায়া সৃষ্টি করে রেখেছে। তেলেচা ভুটিয়ারা এই উপত্যকার সন্তান। কৃষি আর পশুপালন আর বাণিজ্য (প্রতিবেশী তিব্বতের সঙ্গে)—এই তাদের উপজীবিকা। (১) নয়ন ভুলানো নির্ঝর, (২) টিমারসেনে সমাগত ভুটিয়া সুন্দরীরা, (৩) জন্মাষ্টমীর মেলায় নৃত্যরত গ্রাম্য নর্তকীর দল এবং (৪) সুকুমার ভুটিয়া কিশোর।

ফটো ঃ গৌরকিশোর ঘোষ

৩
৪

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৩৮৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু
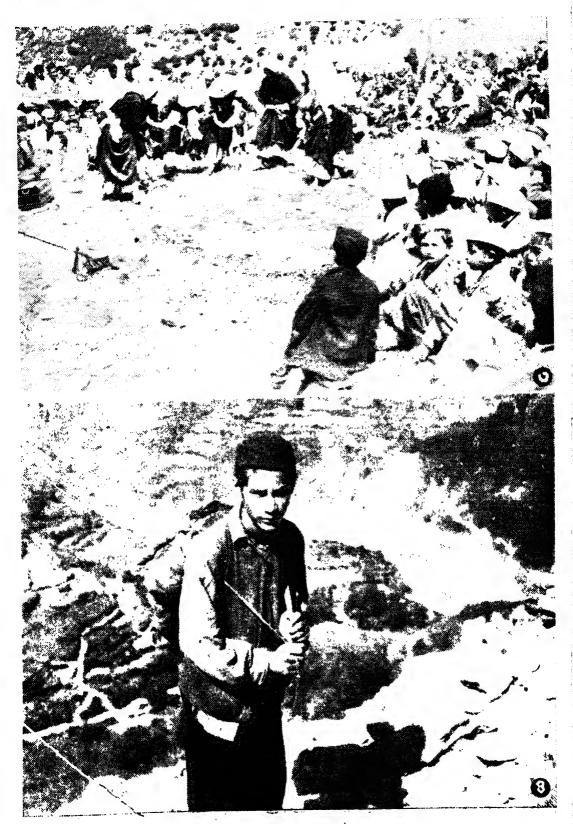
মীরার খবর পূর্বেই পেয়েছি। এখান থেকে সুধাকান্তকে পাঠিয়েছিলুম সেও বিস্তারিত বিবরণ জানিয়েছে।

তোমার খবরটা সুশ্রাব্য নয়। তোমার বহু ওষুধ খাওয়া বৈজ্ঞানিক শরীর—ব্যামো তাড়াতে বৈজ্ঞানিক মেশিনগান এবং বোমা জাতীয় প্রতিকারের দরকার হবে—কোনো নম্র পন্থায় বশ মানবার কলেবর তুমি পাওনি। অতএব তোমার ব্যামোটার যে গতিই হোক হাল আমলের সভ্য প্রথায় হবে পূর্ণ সমারোহে।

এখানে —'র কীর্তনের দল এসে আশ্রম ছেয়ে ফেলবে এমন একটা প্রস্তাব ছিল—আপাতত সেটা ঠেকিয়ে রাখা হোলো। অতএব স্থানাভাবের আশঙ্কা কোরো না। যদি আসো তা হলে দোঁহে মিলে হাত পা ছড়িয়েই থাকতে পারবে—ঘেষাঘেঁষি কিছুই হবে না।

আপন খেয়ালে নূতন নাট্য বানিয়েই চলেছি কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। আধুনিক নারী প্রগতির দল যেমন বাইসিকল চালনা করেন, আমার নাট্যকলা তেমনি সওয়ার হয়েছে আমার বহুকেলে কলমটার পরে—সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটেছে—পথ বেড়ে চলেছে তারই তাড়নায়। অবশেষে থামতে হয়েছে সে কেবল অগত্যা। কারণ আমার লেখনীকে চালানো যায় যত খুশি কিন্তু আমাদের রূপায়ণীদের হাত পা চালানোর সীমা আছে। জিনিসটা উপাদেয় হবে আন্দাজ করচি কারণ ডেকচি নামাবার পূর্বেই সুঘ্রাণ বেরিয়েছে।

ইতি ২৯।৫।৩৫

কবি

॥ ৩৮৪ ॥

কল্যাণীয়াসু

গাড়ি ছাড়ল হাবড়া। প্রাণটাকে দেহের আসক্তি থেকে আলগা করে ফেলবার ঝাঁকানি চল্‌ল সমস্ত রাত। ভোরবেলা জানলার কাছে বসে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম ধ্রুব ভূভাগের জলে স্থলে অচলা শান্তি বিরাজ করচে। কোনো একটা অজ্ঞাতনামা স্টেশনে সহচরকে স্মরণ করিয়ে দিলুম কান্তিহরের চা-রসের প্রয়োজন। ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে পাংকচুয়েশন, প্রধানত ও জিনিসটা তাই, একটানা দিনযাত্রায় ভাগ টানা।

রথ চলল, উপরে যে সূর্যের রথও চলেছে দিকপ্রান্ত থেকে মধ্যাকাশের দিকে, গরম গরম তার খবর আসতে লাগল। সহচর জিজ্ঞাসা করলে, চাই বরফ, আমি বললুম না। কেন বললুম? ওটা আমার স্বভাব, প্রয়োজনকে যথাসম্ভব অস্বীকার করা। কিন্তু প্রয়োজনের দাবী বরাবর চল্‌ল দেহে ভর করে। একটা প্রয়োজনকে আগ্রহ সহকারে মানতে পারতুম, সেটা হচ্চে স্নানের। গাড়িতে সওয়ার হবার পূর্বে ফার্স্টক্লাস যাত্রার আবশ্যকতা নিয়ে বিরুদ্ধ তর্ক করেছিলুম, তরুণ সহচর আভাস দিলেন স্নানের সুযোগের; শুনে হার মেনেছি। এক সময়ে সেই কথাটা প্রবল বেগে স্মৃতিপথে ছুটে এল, স্নানকক্ষে প্রবেশ করে দেখলুম, সাহারা মরুভূমির সেটা বিভক্ত করা কম্পার্টমেন্ট। তৎক্ষণে চিত্তাকাশে ধারাযন্ত্র স্নানের যে মরীচিকা বিরাজ করছিল দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত হাওয়ায় সেটা বিলীন হয়ে গেল। সহচরের কাছ থেকে প্রশ্ন এল আহার সম্বন্ধে কী কর্তব্য? মধ্যাহ্ন ভোজনের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেই বলে দিলুম, রুটি অমলেট। প্রতাপগড় স্টেশনে প্রথম প্রহরের শেষভাগে তকমাধারী পরিচারক আবরণীপ্রচ্ছন্ন ভোজ্যাধার রেখে দিয়ে চলে গেল, ফরমাসে কৃপণতা অনুভব করে সে অবজ্ঞা বোধ করেছিল বলে মনে করি—তার কল্পনায় বকশিশের প্রত্যাশা কৃষ্ণচতুর্দশীর চন্দ্রকলার মতো ক্ষীণ রেখার আঁচড় মাত্র কেটেছিল। সংসারে সকল কিছুরই অবসান আছে। প্রতিহত স্নানের আকাঙ্ক্ষা আপন চরিতার্থতার আসন্ন সম্ভাবনায় যেন তপ্ত ঠিক সন্ধ্যায় মৃদু দক্ষিণের হাওয়া লাগাচ্ছিল ক্লান্ত মনে। নামলুম বেরেলি স্টেশনে। বিশ্রামশালায় গোরা ফৌজের ভিড়। তাদের ধিক্কার দিয়ে প্ল্যাটফরমে চৌকি টেনে বসলুম। এসে দাঁড়ালো এসোসিয়েটেড প্রেসের দূত, বাঙালী। দেখে দেহ জুড়িয়ে গেল বললে অত্যুক্তি করা হবে। মৌনব্রতের দুর্ভেদ্যবর্মে তার প্রশ্নবাণ প্রতিহত করে উদাস হয়ে বসে রইলুম। চিত্ত তখন তীব্র পরিতাপে ব্যথিত। যাত্রারম্ভের পূর্বে সংখ্যাতাত্ত্বিক টাইম-টেবিলেরও নির্দেশাতীত যে সুপথের সংবাদ দিয়েছিল তারি লৌকিক পরামর্শের স্মৃতি ঘিরে ঘিরে মন হায় হায় করছিল। অবশেষে সংবাদ ব্যবসায়ীকে সেই পথের কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সে বললে কিছুকাল থেকে ও পথ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে; আরো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার সমর্থন করলে। এবারকার দীর্ঘযাত্রায় এই প্রথম আনন্দরসের স্বাদ পাওয়া গেল। উদ্দেশে প্রণাম করলুম দর্পহারী মধুসূদনকে। অন্য সকলের চেয়ে বেশী জানে একজন মাত্র লোক, দুর্বল মানব চরিত্রের কাছে এটা উপাদেয় নয়। তা ছাড়া, যেটা হতে পারত সেটা হয়নি এই আত্মগ্লানিজনক চিন্তাও প্রীতিকর নয়। মনে পড়তে লাগল কৃষ্ণ যখন টাইমটেবিল মন্থন করে স্পর্ধাপূর্বক প্রতিবাদ করলে, সাংখ্যিক তখন সে প্রতিবাদকে দৃঢ়স্বরে অপ্রমাণ করায় তোমার ওষ্ঠাধরের প্রান্তে একটি দৃপ্ত হাসির রেখা দেখা দিয়েছিল। তাই সর্ব প্রথমে মনে হোলো তোমাকে এ খবরটা দেওয়া চাই। একজনের গর্ব অপরের গর্বের হানিকর, তার উপরে সে গর্ব যখন অনধিকারমূলক তখন তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অকর্তব্য। বেরেলি স্টেশনে স্থির গাড়িতে চেপে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল, বায়ুবীজন-হীন কামরায় ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এল নামজাদা ব্যক্তির অভ্যর্থনায়। সারারাত তারা সঙ্গ ছাড়েনি। তার পরে বন্ধুর সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা শৈলপথ ক্লান্ত শরীরে যে প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল তাকে সবেগে আলোড়িত করতে লাগল। সেই স্বল্প-শেষ প্রাণটা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই যাত্রার অবসান হোলো।

তার পরে আলমোড়ায় একরাত্রি কাটল, আজ মনে হচ্চে পথের কথাটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র মিথ্যা মায়া। হাওয়া দিচ্চে ঠাণ্ডা, ফুল ফুটেছে চারিদিকে, অদৃষ্টকে প্রসন্নমুখ বন্ধু বলেই মনে হচ্চে।

ইতি ৩।৫।৩৭

কবি

॥ ৩৮৫ ॥

ওঁ

আলমোড়া

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসেই পথের বিবরণ সহ তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম বোধ হচ্চে পাওনি। অশ্বিনীর আস্তাবল উঠে গেছে তাই ভরসা আছে কোনো না কোনো এক সময়ে পাবে। না পেলে ক্ষতি নেই, কেননা চিঠিখানা অত্যন্ত ট্র্যাজিক, হয়তো তোমারো বুকে আঘাত দিত।

তুমি এক শিখরে আমি আর এক শিখরে। তবু উচ্চতা এবং মহিমার তুলনা করলে কেবল যে ভৌগোলিক মর্যাদায় খাটো হয়েছি তা নয় সামাজিক গৌরবেও হয়েছি অকিঞ্চিৎকর। এমন অবস্থায় মাঝখানে যে দূরত্ব আছে সেটা হয়তো ভালোই। কিছুদিনের জন্যে ভুলে থাকবো।

এখানে বাড়িটা খুব ভালো, ঘরগুলো আলোময়। সামনে খোলা, দূরে পাহাড়। বৃষ্টিস্নানের পর বাষ্পাবরণ যখন উঠে যায় তখন সুনীল আকাশের বক্ষে শ্বেত চন্দনের ছাপ পড়ে। নন্দদেবীর স্তব্ধ হাস্য দেখতে পাই। পাহাড়ের ঢালু গায়ে সরল দ্রুম যাকে বলে—অর্থাৎ পাইন গাছ রোদ পোয়াচ্চে, বারান্দায় বসে তাদের সুগন্ধী নিঃশ্বাস পাওয়া যাচ্চে। আমি যে সুদূরের পিয়াসী সেই সুদূরই যেন সুনিকট হয়ে আমাকে ঘিরেচে। সকলের চেয়ে দুর্লভ আরাম শান্ত নির্জনতা। যে সব দায়িত্বের নাগপাশ ছোটো বড়ো পাকে পাকে দিবারাত্রি জড়িয়ে ছিল গিরিরাজ তাদের বন্ধন শিথিল করে দিয়েছেন। পৃথিবীর অব্যবহিত উপরেই যে বায়ুমণ্ডল তাকে ঘিরে রয়েছে, পৃথিবীর নানা পরিমাপের তাপ লেগে সে কেবলই আলোড়িত, তাকে বলা যায় ক্ষুব্ধ মণ্ডল—তারও উপরে যে বায়ুমণ্ডল তার মধ্যে আন্দোলন নেই তার নাম দেওয়া যেতে পারে স্তব্ধ মণ্ডল। আমি সেই স্তব্ধ মণ্ডলেই আছি। না আছে আন্দোলন, না আছে কলরব। নিচের হাওয়ায় দিন-রাত্রি যে চাপ থাকে সে হালকা হয়ে গেছে। এবার জন্মদিনে তাই নূতন জন্মের স্বাদ পেয়েছি। বস্তুত দূরত্বেই আমার আপন নিকেতন। যৌবনের অনেকটা সময়ই যেন দূরে আকাশের চিলের মতো পাখা মেলে দিয়ে মনটা দূরত্বে মিলিয়ে থাকত। সেই দিনেরই কথা এখানে এসে মনে পড়চে। এই দূরত্বকে নৈষ্কর্মের নীড় মনে কোরো না—এ যেন অন্তর্গূঢ় ভাবধারার কলমুখর নিভৃত উৎস। '—' অসময়ে এসেচেন। তখন শান্তিনিকেতনে কী রকম জনতা তুমি জানো। কলকাতায় এসে শরীর মনের উপর জনতার জাঁতা ঘুরত। যখনি একটু ছুটি পেয়েছি ইচ্ছা করেছি '—'কে চিঠি লিখি। কেন যে ঠিক সুযোগ হয়নি জানিনে। এমন কি আসবার দিন এক একবার মনে যেন পীড়া বোধ হচ্ছিল।

তুমি জানো কারো সম্বন্ধে বিমুখ হয়ে থাকা আমার মনের পক্ষে একটা ভার। সকলেরই সঙ্গে সম্বন্ধ গ্রন্থি বিহীন হয়ে থাকে এই আমার শান্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক। অনেক সময়ে অনেক কারণে অনেকের উপরে বিরক্ত হই, কিন্তু সেটা আমাকে কখনো দুঃখ কখনো লজ্জা দেয় বলেই নিষ্কৃতির চেষ্টা করি। '—'কে তো আমি বিশেষভাবে স্নেহ করতুম। যতদূর মনে পড়ে এক সময়ে তার ধারণা হয়েছিল সাহিত্য বিচারে তার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা বলেচি। সেটা সম্পূর্ণই তার অমূলক কল্পনা। তার পর থেকে কেবলই নানা লেখায় নানা কথায় সে আমার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেচে। আমি কোনো উত্তর দিই নি। মুশকিল এই আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমার মত প্রকাশ করলেও বিশেষভাবে সে নিজের উপর নিয়েচে। শুধু তাই নয় শ—কেও আপন দলে টেনেচে। এইতো গেল ভূমিকা। তার পরে ছোট খাটো আরো কত কী। তার একখানা চিঠি না পড়ে ফিরিয়ে দিয়েছি বলে তার মনে লেগেছে। সে আমার কৃতকর্ম নয়—আর সে কাজটা একেবারেই ভালো হয়নি। কারণ সেটা আমার সম্পূর্ণ অযোগ্য। এবারে '—' যদি সব সংকোচ দূর করে আমার কাছে আসত খুবই খুশী হতুম। এখনো যদি সুযোগ থাকে, যদি এ অঞ্চলে আসে তাহলে যেন বিনাদ্বিধায় আমাকে দেখা দিয়ে যায়। চিঠিপত্র লেখার চেয়ে মোকাবিলায় বোঝাপড়া ও শান্তিস্থাপন অনেক সহজ। আজকাল লিখতে আমার কি বিতৃষ্ণা তুমি জানো। কলম আমার ক্লান্ত, মন আমার বোবা। বর্তমান চিঠিতে আমারই কৃত প্রতিবাদ দেখে হয়তো হাসচ হাসো। কিন্তু সাংখ্যিকের কথায় কান দিয়ো না। তথ্যের দ্বারাই সত্যের প্রমাণ হয় না এমন কি বহু তথ্যেও। যেমন, আমি ইংরেজি লিখতে পারিনে এই গূঢ় সত্য বারবার ইংরেজি লেখার দ্বারাও প্রমাণিত হয় না। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৪৪

কবি

॥ ৩৮৬ ॥

ওঁ

৩১ বৈশাখ (?) ১৩৪৪
আলমোড়া

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে সাইলিশিয়া বিভ্রাটের সংবাদ পড়ে সব অবগত হলুম। মনে ভাবলুম তোমাদের শাস্ত্রমানা জাতের শুচিবুদ্ধি, বিধি ব্যবস্থায় অল্প কিছু ব্যতিক্রম হলেই ভীত হয়ে পড়ো। হাজার শতকের ওষুধের মন্ত্র নিয়েছ ৯৯৭'র প্রয়োগটাকে মনে হয় অনাচার, শিউরে ওঠে শরীর। এ কথা মনে ভাবতে পারো না যে, যত বড় বৈজ্ঞানিক হোক না কেন ওষুধের সংহিতাকারক হাজারের দুই এক মাত্রার এদিক ওদিক নিয়ে আরোগ্য শক্তির ব্যতিক্রম নির্ণয় করতে পারে না। মনে করো হাজারটা হোলো খাস কলকাতা, আর ৯৯৭ বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ আলিপুর, চাই কি বরানগর। রাজধানীতে বাসা না যদি পেলে টালিগঞ্জেই না হয় উঠে পড়লে, তাতে শারীরিক সুযোগের খুব বেশী লাঘব হবে না। হাজার মাত্রায় যদি ফল পাবার আশা পেয়ে থাকো, ৯৯৭ এতেও মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হবে না। এমন কি যদি ৫০০-র বেশি না জুটত আমি বলতুম যথা লাভ। ওষুধ জিনিসটার মধ্যে অন্ধকারে ঢেলা মারার তত্ত্ব অনেকখানিই আছে। সাইলিশিয়া ৩০এ উপকার পেয়েছো, সেই পরিমাণে আরও পাবে হাজারে, ওটা কেবল আন্দাজের উপর ভর করে পরীক্ষা করা মাত্র। হয়তো না পেতেও পারো। টিউব ওয়েলের জন্যে মার্কিন ওস্তাদ এসে খুঁড়ে চললেন, তিন চারশো ফুট ছাড়িয়ে, কোনো ফল পেলেন না। অমূল্যবাবু শ'দেড়েক ফুট নল চালাতেই জল

উঠে পড়ল। কেউ বলতে পারে না, হাজারেই বেশি উপকার পাবে, না দুশোতেই, না সেই অতি অকিঞ্চিৎকর তিশ মাত্রাতেই। এই কথা মনে রেখে লেগে যাও ১৯৭ মাত্রাতেই। বুদ্ধির কাজ করেছ '——' বাতিল করে দিয়ে। চিন্তা করে দেখ ম্যাডাউস অনায়াসেই ৬ শতক দিয়েই বলতে পারতো হাজার। বিরুদ্ধে নালিশ করবার সাক্ষী জুটত না। দোকানদার হয়েও অক্ষমতা স্বীকার করলে, ঠকালে না। অথচ ওরা নিশ্চিত জানে, ৯০০ এবং হাজারের ফলের তফাৎ নেই বললেই হয়। তোমার চিঠি পাবার পর চৈতন্য হোলো, দশ হাজার শক্তিমাত্রার ষুধের শিশি তুলে দেখি '——' মশায়ের নাম চিহ্নিত। বলড্‌উইনের ডিপ্লম্যাসিতে অবাক হয়ে গেছি। পাঁচ টাকা দিয়েছি জলে তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু একই কালে দেখা গেল বাঙালী দোকানদার এবং বাঙালী খরিদ্দারের চাতুরী। মনে আছে প্রেমিয়র কী রকম আমার কাছে ভটচাজ ম্যাডাউসের একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছিল। আমার বিশ্বাস পাঁচ টাকা দামটা ওর বানানো, জানে সস্তা দাম বললেই দিশি গন্ধ ছাড়বে। এরকম চাতুরী যে আমার প্রতি অসম্মান একথা বোঝবার মতো শ্রদ্ধাও আমার পরে নেই। হায়রে!

বায়োকেমিক হাজার খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছ, সে সম্বন্ধেও বেদবাক্য নেই। তোমার শরীরে ফল বেশি দেবে কিসে তা অন্তর্যামী ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। সেটা হয় চোখ বুজে খেয়ে দেখ তার পরে পরীক্ষা চলুক। একেবারে এস্‌পার ওস্‌পারের ভয় নেই।

জীবনের কবিতা বাছবার কথা পূর্বেই কিশোরীকে বলে এসেছিলুম। তোমার কার্তিকগুলো পেয়ে তার থেকে তিনটে বেছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

আমাদের বাড়ি ক্যাণ্টনমেণ্টে, নাম সেণ্ট মার্কস্। —কিন্তু লেফাফায় সে ঠিকানা দিলে আমাকে অপমান করা হবে—যারা শুধু "ইণ্ডিয়া" ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিয়েছে তারা আমার যথার্থ দাম বোঝে। যদি তোমার লেখা কোন কবিতা থাকে পাঠিয়ে দিয়ো কিশোরীকে, আমাকে না। যেমন তোমার গানের রেকর্ড জমা করে রেখেচ চণ্ডীর জিম্মায়। কাল সন্ধেবেলায় ঝমাঝম্ বৃষ্টি নেমেছিল। সময়োচিত ঠাণ্ডার সীমা পেরিয়েও শৈত্যের মাত্রা বেড়েচে।

কবি

॥ ৩৮৭ ॥

ওঁ

আলমোড়া

কল্যাণীয়াসু,

মোটের উপর সিমলেটা কেবল এখান থেকে মাপে ও মানেই যে উচ্চতর তা নয় বোধ হয় স্বাস্থ্যেও এখান থেকে মার্কা বেশি পাবে। এখানে যে পাইন গাছগুলো আছে তার তলায় দিন কাটানো নিশ্চয় শরীর মনের পক্ষে আরামের বন খুব কাছেই আছে, সেখান থেকে গন্ধ আসে, কিন্তু চলৎশক্তির অভাবে বারান্দা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করে না। বারান্দা যথেষ্ট প্রশস্ত ও খোলা—সামনের বাগানটুকুতে হলদে ফুলে আগুন লেগেছে, ঢালু পাহাড় থেকে একটা দেওদার মাথা তুলে উঠেছে, সূর্যের আলোতে সে যে খুশি সে কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়চে। সামনের খোলা আকাশটা পেরিয়েই দূরের যে নীলিম পাহাড় শ্রেণী, এক একদিন অকস্মাৎ তার বরফের ঐশ্বর্য চমক দিয়ে যেন কৌতুক করে। এরকম জায়গার সঙ্গে লোকের ভিড় একেবারে বেমানান। সেটা এখানে না থাকাতে এখানকার সম্পূর্ণতা অনাবৃত ঔদাস্যে নিজেকে জানান দিচ্চে। ঘেঁষাঘেঁষিতে জীবনটা ক্রমশই পঙ্গু হতে থাকে, অভ্যাসে তার ক্ষতি ও বেদনা ভুলে যাই। এরকম জায়গায় এলেই সেটা ধরা পড়ে—বুঝতে পারি এই নির্মল নিভৃতের বাসা আমার সত্যকার বাসা, যেমন বাসা ছিল শিলাইদহে। নির্বাসনে থাকতে থাকতে যেন নিজের কাছে বিদেশী হয়ে গেচি। ইতি ১৭ মে ১৯৩৭

কবি

॥ ৩৮৮ ॥

ওঁ

আলমোড়া

কল্যাণীয়াসু,

উত্তর পাওনার তাগিদ করবার জন্যে লিখচিনে। তোমাদি দেনার পরিশোধ দাবি করা মিথ্যা। সংবাদপত্রে তোমাদের সংবাদ পাই, বুঝতে পারি শরীর সুস্থ আছে মনেও আছে স্ফূর্তি। কিন্তু যেহেতু আমাদের খবর সংবাদপত্রে উঠবে না সেই জন্যে জানিয়ে দিচ্চি যে আগামী ২৫শে জুন তারিখে গিরিশৃঙ্গ থেকে আমাদের হবে অধোগমন। যদি ওকে নেবার সংকল্প মনে আসে তবে এ ঠিকানায় নয়। রথী, কৃষ্ণ আগেই চলে গেছেন অন্তঃপুরিকাদের দায়িত্ব ভার আমারই উপরে। এই পর্যন্ত লেখার পরেই তোমার পত্র পেলুম। একথা মানব না যে, তোমার কোনো চিঠি নিরুত্তরিত আছে। আমার একটা বদ অভ্যাস আছে চিঠির উত্তর দেওয়া তোমার ঠিক আমার বিপরীত। শেষ পত্রের উত্তর না পেয়ে ভেবেছিলাম ভোজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও পরে সেটাকে পরিপাকের ব্যর্থ চেষ্টায় তোমার দিন যাচ্চে। তোমরা গরমের যে হিসাব পাঠিয়েছ এখানকার তাপমান তার কাছ দিয়েও যায়নি। আষাঢ়ও যথাবিধি সমারোহের সঙ্গে এসেছে। কালিদাসের আমলে রামগিরি পর্বত থেকে কৈলাস পর্বতে মেঘের ডাক চলত, কয়েক শতাব্দী থেকে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে নইলে টিকিটের দাম বাঁচিয়ে একবার মেঘের উপর বরাত দেওয়া যেতে পারত। ২৫শে যদি আমরা ছাড়ি ২৬শে প্রাতে লক্ষ্ণৌ পৌঁছব, সেখানে ঘণ্টা সাতেক অপেক্ষা করে পাঞ্জাব মেলযোগে পাড়ি দিতে হবে ২৭শে প্রাতে কলকাতায় পৌঁছবার কথা। ইতিমধ্যে তোমরাও যখন ডাউনে আসবে আমরাও তখন আপ-এ যদি এমন ঘটনা যদি হয় তবে সেটাকে আমি দুর্ঘটনাই বলে গণ্য করব। এড়াতে যদি পারো তাহলে ভাগ্যের জটিল গ্রন্থি সরল হবে। যাঁরা এখানে এসে বুড়ির ভার নেবে এমন একটা প্রস্তাব আছে; তার আসতে দুই-একদিন দেরি যদি হয় তবে আমাদেরও দেরি হবে। তার সম্ভাবনা অল্প। আজই তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম যোগে জানতে পারব। যদি দেরি হয় তোমাকে যথাসময়ে জানাব।—এই কার্ডের ইতিহাসটা এই:—এই রকমের বচন সহ শতাধিক কার্ড স্বহস্তে লিখেছি।

Leave out my name from my gift
if it be a burden,
but keep my song.

Rabindranath Tagore

যদি বিজ্ঞজনে অনুমোদন করেন তবে এগুলিকে অনুমুদ্রিত করে হাটে পাঠাবো। মূল্য দুই আনার বেশি হবে না। এই কার্ডটা বিজ্ঞাপনের কাজ করবে। যদি লোভ হয় তাহলে তোমার সেই বিখ্যাত শিল্পিত সর্বাধার থেকে দুটি একটি দুয়ানির ভার লাঘব হবে। বৌমা ভালোই ছিলেন ও আছেন। সাইলিশিয়ার ৯৯৯ মাত্রার সমস্যা কি রকমে সমাধান হোলো খবর পাইনি। ইতি ৬ আষাঢ়, ১৩৪৪

কবি

বিদুর সজ্জন এবং ভক্ত। বিনয়বিনম্র স্বভাব। মহাভারতের যুগে না হলে তাঁকে পরম বৈষ্ণব বলা যেত। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি মহামতি, ভবিষ্যৎদর্শী এবং উপদেষ্টা। তিনি বলতেন—বিনয় মানুষের প্রথম ও প্রধান পরিচয়, কিন্তু এক পর্যায়ে বিনয়টা দুর্বলতার সমান হয়ে পড়ে। তখন ছেদ টানতে হবে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তার প্রত্যুত্তর দিতে হবে। না হলে সে সদ্‌গুণের মহত্ত্ব থাকে না।

ভারতের বেলা কি তাই খাটে? আমরা কি বলতে পারি, ধৈর্য ধরেছি অসীম? পিতৃসত্য পালনের দায়িত্ব আমাদের ছিল না, পাশা খেলায় শকুনির চাতুরিতে আমরা বাজি হারিনি। তবু দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে গোয়ার কারাবাস আমরা সহ্য করেছি। আর নয়, এবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় তাও সই। গোয়াকে ফিরে পেতেই হবে।

কিন্তু মহাভারতে বা রামায়ণে অহিংসার স্থান নেই। ধর্মযুদ্ধে সেখানে ন্যায়ের বিধান। কুরুক্ষেত্র সেখানে ধর্মক্ষেত্র। অপর দিকে নবীন ভারত অহিংসার পূজারী। শান্তির দূত হিসেবে জগৎজোড়া তার নাম। শক্তিতে বড় নয়, তবে আদর্শে মহান। সেই ভারত কেন হিংসার পথে সমাধান খুঁজবে? পশ্চিম আজ বলছে—দুর্যোধনের ও চিরকালই খারাপ। বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী দেবে না বলেছে, সে কথাও সত্যি—তাই বলে ধর্মপুত্র নেহরু কেন ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করবে? বলং বলং বাহুবলং, এ কথা ভারতের মুখে শোভা পায় না। ধীর মাথায় ভাবলে আমাদেরও যে সে কথা মনে হচ্ছে না, তা নয়।

সাধারণ ইংরেজের ধারণা ভারত গায়ের জোরে থাবা বসিয়েছে কাশ্মীরে, এ সেই ভারত। সাম্রাজ্য বিস্তারে এ তার দ্বিতীয় পরিকল্পনা। টাইমস সম্পাদকীয় লিখেছে "কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, নাগা, গোয়া" শিরোনামে। ভাবছিলাম—জুনাগড়টা বোধ হয় মনে পড়েনি। সব কাগজের এক রা। ভারত আজ বিশ্বসভায় সর্বশেষ। কেউ বলেছে সাম্রাজ্যবাদী, কেউ দেখেছে নৃশংস বর্বরতা, কেউ ভেবেছে এ ধীরমস্তিষ্কের নগ্ন আক্রমণ। ডেলি টেলিগ্রাফের কোন নিয়মিত কলম-লেখকের কয়েকটা কথা তুলে দেই

Cool bare-faced aggression, senseless contemptible and wicked!

শেষে যোগ করেছেন, এর পর নেহরু যদি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কথামৃত বিতরণ করেন, বুঝব নেহরুই নেহরুর তুলনা। তিনি সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম হামবাগ। ডেলি এক্সপ্রেস পরদিন Arch Humbug বা

প্রতারক চূড়ামণি, এই শিরোনামায় একটা লেখা ছাপায়। পাশে নেহরুর ছবি। মাথায় গান্ধী টুপি, তার ওপর সাদা পায়রা—সম্ভবত তাঁর রাশিয়া সফরের কোন ছবি। লেখাটায় নেহরুর বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতা—শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গে কবে কি বলেছেন।

রবিবার, ১৭ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে ভারতের গোয়া অভিযান। এখানকার কাগজ পড়ে অনেকদিন আগে থেকে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, গোয়ায় পর্তুগালের আসন টলমল। দু-চার দিন আগেই অভিযান শুরু হবার কথা। তবে নেটোর গাঁটছড়ায় আমেরিকা, বৃটেন, পর্তুগাল বাঁধা। তাই দু দিন দেরি—নেহরুর ইতস্তত ভাব। এই অবসরে বিলেতের কাগজে ভারতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল পর্তুগাল ইংরেজের সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু, ১৩৫৩ সাল থেকে তাদের সন্ধি। শুধু কি একটা, অসংখ্য—১৩৭৩, ১৩৮৬, ১৬৪২, ১৬৫১, ১৬৬১, ১৭০৩, ১৮৯৯ সালে। তবে বর্ণশ্রেষ্ঠ বোধ হয় ১৬৪২ সালেরটা—ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে পর্তুগালের রাজকুমারী ইনফানটার বিবাহ উপলক্ষ্যে—একে অপরের ধন-জন-মন জান দিয়ে রুখবে। টাইমস-এর মত কাগজ সগৌরবে এর উল্লেখ করে।

১৯শে ডিসেম্বর, সোমবার। দৈনিক পত্রিকা বা রেডিয়ো টেলিভিশন খুললে মনে হয়েছে—গোয়ার মুক্তি অভিযান এবং বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কোন তফাত নেই। সেদিনকার ব্যানার লাইন নিয়ে সাংবাদিকদের মাথা-ব্যথার দরকার হয়নি। এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভরে উঠেছে ভারতের গুণগাথায়। ইংরাজী অভিধান উজাড় করে দিয়েছে ইংরাজ সাংবাদিকরা—কলমের যত কালি নিঃশেষে ভারতের গায়ে মাখিয়েছে।

সেদিনকার পাতা জোড়া হেড লাইন:

ডেলি হেরাল্ড: "Nehru Invades Goa"।

ডেলি মেল: "Indians March"!

ডেলি এক্সপ্রেস: "Nehru Invades"!

ডেলি টেলিগ্রাফ, টাইমস, গার্ডিয়ান প্রথম খবর হিসেবে ছাপায়, তবে পাতাজোড়া হেড লাইন নয়। গার্ডিয়ানের সুর একটু নরম—"India sends army into Goa"। কেবল "ডেলি ওয়ার্কার" শিরে চাপড়ে দিয়েছে: "Liberators march on Goa"। রাশিয়ার সক্রিয় সমর্থন আমরা ঠিক আশা করিনি। তবে যে কাজ দিয়েছে

খবে। স্বীকার করতে হয়, রাশিয়ার ভেটোর জোরে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদে আমরা এবার অব্যাহতি পেয়েছি। না হলে নাজেহাল হতে হত এবং U N O-র নথিপত্রে থাকত "আক্রমণকারী ভারত"। আমেরিকার সেক্রেটারী অফ স্টেট ডিন রাস্ক এই প্রসঙ্গে সখেদে বলেছেন—রাষ্ট্রসঙ্ঘের **শেষ** দশা, এখন হরিনাম শুনিয়ে খাটের যোগাড় করলেই হয়।

ভাবছিলাম, **পর্তুগালের** একনায়কত্ব নায়ক সালাজার—বয়েস ৭২ বছরেতে উকিল। তিনি ১৯৩০ সালের জগতে বাস করেন—হিটলার ও মুসোলিনির ঢঙে কথা বলেন। বিরুদ্ধপক্ষের **ন্যাকামি** তাঁর কাছে অর্থহীন, সুতরাং তারা হয় দেশত্যাগী, না হয় জেলে। সে দেশে স্ট্রাইক বে-আইনী। সাধারণ কর্মচারীকে বোঝানো হয়, অর্থই অনর্থের মূলে। গুলীর সাহায্যে সাম্রাজ্য রক্ষা তার কাছে সহজ সরল পথ। তবু বিশ্বের স্বাধীনতাকামী আমেরিকা তার পরম সহায়, গণতন্ত্রের গুরু ইংরেজ বন্ধুবর।

পত্র পত্রিকার মধ্যে একমাত্র সান্ধ্যকালীন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডে সেদিন শেষের সংস্করণে প্রথম পাতায় গোয়ার উল্লেখ নেই। আই সি আই বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায় Courtaulds কিনে নেবে সেই খবর ছাপায়। তবে পুষিয়ে নিয়েছে সম্পাদকীয় স্তম্ভে। লিখেছে সবাইকে সাধু হবার পরামর্শ দিয়ে নিজে সিঁদ কাটা। নেহরু অসহায়। বলেছেন উপায়ান্তর ছিল না। কথাটা জলজ্যান্ত ভণ্ডামি। চীনের তাড়া খেয়ে নির্জীব গোয়ার গলা টিপে ধরা। নেহরু মস্ত হিসেবের ভুল করেছেন — এ তো চীনকে সাবধান করতে গিয়ে তার সামনে আদর্শ স্থাপন করা। বোয়ালকে তিমি গ্রাস করল, তিমিংগিল কাল গুনছে তিমিকে গলাধঃকরণ করার।

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। চীন ভারতকে অভিনন্দন পাঠিয়েছে গোয়ার সাফল্যে। এ কি কূটনৈতিক চাল! চীন বোঝাতে চায় ভারতীয় সৈন্যের সাফল্যে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। এও তো হতে পারে চীন ভারত আক্রমণ করে ভারতীয় কমিউ-নিস্ট পার্টির পরম শত্রুতা করেছে। আসন্ন নির্বাচনে এ ক্ষতিপূরণের সামান্য প্রচেষ্টা।

ভারতের স্বপক্ষেও দু একজনকে পেয়েছি। প্রথম 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকা। সম্পাদকীয়তে লিখেছে ভূতের মুখে রাম নাম। সুয়েজ আক্রমণকারীদের মুখে এ হেন শান্তির বাণী। কাটাংগার শস্যে এবং পর্তু-গালকে রক্ষা করার জন্যে এই আকুলি-বিকুলি সাম্রাজ্যবাদীর উপযুক্ত কাজ। আংগোলায় অকথ্য অত্যাচারের নাম পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিরক্ষা। গোয়ায় সেই অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি হতে না দেওয়ার নাম নগ্ন আক্রমণ। সাম্রাজ্যবাদীদের এখনও কি মনে করিয়ে দিতে হবে যে, তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে?

পার্লামেন্টে বিরোধীপক্ষের নেতা মিঃ গ্যাটস্কেল সাধারণ উদারনৈতিক লোকের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে বলেছেন, আও-হয়-আও-হয়। পর্তুগাল অপরাধী তাই বলে ভারতের কাজ কোনমতে সমর্থনযোগ্য নয়। তবে লেবার দলের মিঃ উড্রু উইয়াট পার্লামেন্টে ভারতকে সমর্থন করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানের কাছে এ নিয়ে কয়েকটা উত্তর চান। স্পিকারের সংগে বাদ-বিতণ্ডার পর প্রশ্নোত্তর অসমাপ্ত থাকে।

আর একজন মনখোলা নিরপেক্ষ সমর্থক পেয়েছি। এঁর কথা দিয়ে লেখাটা শেষ করি। লর্ড অলট্রিংচাম গার্ডিয়ানে প্রবন্ধ লেখেন —"Nehru was right"। তাতে বলেন—"গান্ধী সাধুপুরুষ, নেহরু স্টেটসম্যান। এই রাজনৈতিক দলপতিদের সময়বিশেষে আদর্শ ও বাস্তবের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়—না হলে রাজ্য চলে না। গোয়া অভিযান করে নেহরু যে ঠিক কাজ করেছেন, ইতিহাস তা প্রমাণ করবে।

আমেরিকা গণতন্ত্রের ভক্ত, কিন্তু সে কেবল কমিউনিস্টদের মুঠোয় পোরা দেশ-গুলোর জন্যে। সালাজারের পর্তুগাল ও ফ্রাংকোর স্পেন বিশ্বস্ত বন্ধু। তাদের সাত-খুন মাপ। সেখানে স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। এই দুই ডিক্টেটরকে পক্ষপুটে আশ্রয় না দিলে পশ্চিম আরও শক্তিশালী হবে। ইংরেজের ভারতকে সমর্থন করা মুশকিল — হংকং আছে, জিব্রাল্টার আছে। আমেরিকার তেমন কোন দায়দড়া নেই। সুতরাং সে অনায়াসে ভুল শুধরে নিতে পারে, যেমন করেছে কিউবার ব্যাপারে। পশ্চিমে সবার গায়ে কাদার ছোপ। তাদের ভারতকে চোখ রাঙানো শোভা পায় না। যদি কারও নেহরুকে তিরস্কার করার অধিকার থাকে সে একমাত্র গান্ধী।"

হিরন্ময় ভট্টাচার্য

কবিতা

যান্ত্রিক

অরুণকুমার সরকার

যেন একটা পাখি ডাকল। চেনা গলা। চারদিকে তাকাই।
কই, না, কোথায় পাখি? আশেপাশে গাছপালা নেই যে
লুকিয়ে থাকবে। সামনে বই। খোলা বইয়ে চড়াই উৎরাই
পাথর, কাঁকর, ধুলো, শুকনো ঘাস। তবে
কোথায় ডাকল পাখি? কোথায় সে? আমিই কি নিজে
পাখি হয়ে ডেকে উঠছি? অসম্ভব। উৎসাহ কি যুক্তি নেই তার।
গুঞ্জিত মর্ত্যের স্বর্গে আশাবাদে কী হবে আমার
যখন নিয়েছি বেছে শরশয্যা মন্ত্রণা স্বেচ্ছায়?
নাকি এ সত্যিই ভুল? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা? কবে
ছেড়েছি যে-নেশা তার ছোঁয়া উঠছে? না, না, কোনো ওই
আবার ডাকছে পাখি, চেনা পাখি, কাছেই এবার।
কোথাও তো কেউ নেই এত রাতে একা আমি বই।
তাহলে কে ডাকে, কাকে ডাকে, কেন ডাকে, সে কোথায়?

হাসলাম। ও পাখি নয়। পাখির চাইতে বেশি পাখি।
সর্বদাই ডাক ছাড়ে, গান গায় দিন কি রাত কি।
আপাতত দুঃসাহসী; বস্তুত সে নকল সৈনিক
নেহাৎ অভ্যাসবশে বুলি ছাড়ছে তথাকথিত দায়িত্বের দায়,
বিশ্বাস প্রত্যয় আশা সব মিলিয়ে স্বদেশী, সঠিক।

একশো নম্বর পাবে পুরোপুরি এবং খোরাকি
আমারই পকেটে বন্দী শূন্যগর্ভ প্লাস্টিকের পাখি।

নুলিয়া, কাণ্ডারী

করুণাসিন্ধু দে

যাবোরে নুলিয়া যাবো তোর ভাঙা নৌকার ভিতরে
সাজাবো সম্পন্ন ঘর। [illegible] কল্লোলের ধ্বনি,
সাগরের ফেনিল, হাসি, দুরন্ত শিশুর কণ্ঠস্বরে
নিথর মুহূর্ত পাবে বিপ্রলব্ধা ঘনিষ্ঠ ঘরণী।

যাবোরে নুলিয়া যাবো, তোর ছিন্ন পালের মাস্তুলে
নিশান উড়াবো ছেড়ে। এবং প্রথম [illegible]
উৎসবে শঙ্খিনী এসে গান গাইবে [illegible]
শিয়রে [illegible] অঞ্জলিতে, গন্ধ ধূপ নিসর্গের শোভা।

প্রহরী নুলিয়া, শুধু শক্ত হাতে ধরে রাখ হাল।
বিশ্বাসঘাতক হাওয়া, মায়াবিনী ঢেউয়েরা যদি
গোপন মন্ত্রণা করে এক-ই সঙ্গে ডুবায় কপাল
চতুরা নারীর মতো ছিদ্রপথে গরল [illegible]
বজ্রের নির্ঘোষে; ভাঙে সাজানো সংসার ঘর, বাড়ি;
বুকের পাঁজরে তুই [illegible], নুলিয়া, কাণ্ডারী।

চতুর্থ টেস্টে ভারত ইংলণ্ডকে পরাজিত করিয়াছে শুনিয়া শ্রীনেহরু খুশী হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। অন্য অনেকের খুশি-অখুশির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। খুড়ো বলিলেন—"অন্য অনেকেই যে এখন সমাসন্ন নির্বাচনী টেস্ট নিয়ে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়ে আছেন। শুনলাম ও দেখলাম তাঁরা সবাই জোর নেট্ প্র্যাকটিস করছেন।"

চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলার শেষে জয়পরাজয় একরকম নির্ধারিত হইয়াই গিয়াছিল। শ্রী সি কে নাইডু মন্তব্য করিয়াছিলেন—'জয় আমাদের পকেটেই রয়েছে।' কিন্তু তাহাতেও সবাই আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই, বলিয়াছেন—"হ্যাঁ, পকেটে রয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু পকেটমারেরও তো অভাব নেই।" মন্তব্যটি আমাদের শ্যামলাল সংগ্রহ করিয়াছে।

শ্রী জগজীবন রাম তাঁর সাম্প্রতিক নির্বাচনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—স্বতন্ত্র পার্টি মেষচর্মে আবৃত নেকড়ে বাঘ। —"নতুন কথা কিছু বলেন নি। রাজাজী

বহু আগেই জানিয়েছিলেন যে, বুড়ো হলেও তিনি বাঘ। তবে মেষচর্মটা হয়ত সাম্প্রতিক হিম-প্রবাহের জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে।" মন্তব্য করে শ্যামলাল।

জনৈক অ্যামেচার জ্যোতিষী খেলার শেষে কোন এক অফিসে আসিয়া বলিলেন—'আমি আগেই বলেছিলাম শাস্ত্র মিথ্যা নয়; এই খেলায় যে আমরা জিতব তা গণনায় ধরা পড়েছে।' মাদ্রাজের ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষী বলিয়াছেন—'মাদ্রাজীদের সংগে খেলায় আমাদের হার হবেই।'—সংবাদটি জনৈক সহযাত্রী সংগ্রহ করিয়াছেন।

কলিকাতার পশুশালায় বিগত ৩০শে ডিসেম্বর নবনির্মিত খোলা জায়গায় একটি সিংহ ও ২টি সিংহীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—খাঁচার বদলে সেই খোলা জায়গায় তারা চরিয়া বেড়াইবে।—"ফল কী হবে জানিনা। ঐ ৩০শে ডিসেম্বর ১১টি সিংহকে 'নন্দনকাননে' ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, ফল সিংহদের পক্ষে মোটেই শুভ হয়নি।" বললেন জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, রুশ রাষ্ট্রপতি শ্রীব্রেজনেভ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন—ভারতের অতীত গৌরবময় এবং ভবিষ্যৎ সুন্দর।—"বর্তমানের কথা কিন্তু কিছুই বলেন নি, আশ্চর্য ভদ্রলোকের প্রাটোকলী সংযম"। বলে আমাদের শ্যামলাল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ মুখার্জি উন্নততর মানব সৃষ্টির সমস্যার প্রতি জীববিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আরো মানব সৃষ্টি! বিজ্ঞানীরা কি তবে পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নন?"

পাক প্রেসিডেন্ট জনাব আয়ুব খাঁ কোন এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—অন্য দেশের সাহায্যের অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য নিজেদেরই সংগ্রামের

জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।—"ঠিক বলেছেন। আমরা বহুদিন আগেই কবির মুখে বলেছিলাম আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো।"—কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্যের পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে আরো গবেষণা হওয়া দরকার বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের এক সহযাত্রী ছড়া কাটিলেন—"হবে ছেলে, ডাকবে বাপ, তবে যাবে মনের তাপ।"

ভারত হইতে একটি ইলিশের গায়ে লেবেল আঁটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—যে কেহ মাছটি ধরিবেন তিনি যেন দয়া করিয়া মাছটি ভারতের কোন সরকারী দপ্তরে জমা দেন;

দিলে দাম ছাড়াও নগদ দুই টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এই অনুরোধের মানে হয় না। তার কারণ দু টাকার লোভে ইলিশ ধরে হাতছাড়া করার মতো বোকা জনসাধারণের মধ্যে নেই। থাকলেও সরকারী দপ্তরে এমন বোকা কেউ আছেন এ ভাবতেই পারিনে। পাকিস্তানে মাছটি ধরা পড়েছে। ওঁরা আবার ব্যাপারটা দেখছেন অন্য দিক থেকে—প্রথম, গংগার ইলিশের বুড়ীগংগায় অনুপ্রবেশ কিনা। দ্বিতীয়, ভিসা সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা। গবেষণান্তে ইলিশটি জমা দিলেও দেখা যাবে, সেটি তখন সোনা-ইলিশে পরিণত হয়েছে।"

ফেব্রুয়ারী মাসে অন্তর্গতের সমাবেশের প্রসংগে নেহরুজী নাকি বলিয়াছেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর কোন উদ্বেগ নাই। বিশুখুড়ো বলিলেন—"গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশে তাঁর কোন উদ্বেগ আছে কিনা সে কথা অবশ্য তিনি বলেননি!!"

প্রেস ফটোগ্রাফাররা সেদিন নাকি নেহরুজীর ফুটো জুতার একটি ফটো লইয়াছেন।—"আগামী নির্বাচনের ব্যাপারে হাঁটাহাঁটিতে জুতো ক্ষয়ে গেছে কিনা তা বলতে পারব না।" বলে আমাদের শ্যামলাল।

খবরে শুনিয়াছিলাম, কানপুর টেস্টে দর্শকদের কেহ কেহ মাঠে আরশির প্রতিবিম্ব ফেলিয়া ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এখানে কিন্তু কেউ তা করেনি, করেছেন ইংলণ্ড দলেরই একজন, নাম তাঁর টনি লক্। তিনি নাকি তাঁর টাকে আরশি লুকিয়ে মাঠে নেমেছেন!!!"

পাদাঙ্ক

সতীনাথ ভাদুড়ী

প্ল্যাটফর্মের যেখানটায় ফার্স্ট-সেকেন্ড ক্লাসের গাড়িটা দাঁড়াবে সেইখানটুকুতেই ভিড়। প্রথম লাইনে দাঁড়িয়েছেন 'সি টাইপ কোয়ার্টার'-এর বড় বড় অফিসাররা; দ্বিতীয় লাইনে 'বি টাইপ কোয়ার্টার'-এর অফিসাররা; আর তৃতীয় লাইনে আছেন 'এ টাইপ কোয়ার্টার'-এর অফিসের বাবুর দল। বুকের পাটা ঘরের আয়তন অনুযায়ী কম বেশী। লাইন সাজানোর জন্য চেষ্টা করতে হয়নি; সরকারী কলোনির সবাই নিজের নিজের স্থান জানে। উর্দিপরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দাঁড়িয়েছে একটু দূরে। সকলেই নীরব, কেননা 'সি টাইপ কোয়ার্টার'-এর বড়সাহেবেরা পর্যন্ত এখন কথা বলছেন না নিজেদের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মের করবীতলার খেঁকি কুকুরটা পর্যন্ত যেন ধ্যানে বসেছে। রেলিং-এর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সরকারী কলোনির ছেলেমেয়ের দল, তিন দলে ভাগ হয়ে। সেখানেও এই সি টাইপ, বি টাইপ, আর এ টাইপের ভাগাভাগি।

দূরে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। হাত দিয়ে জামাকাপড় ঝেড়ে নিয়ে সকলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এসে গেল গাড়ি। সিভিল সার্ভিস-এর প্রোটোকল অনুযায়ী গুনরক্ষী সাহেব প্রথম শ্রেণীর কামরার দরজা খুলতে গেলেন। নামলেন ডক্টর সেন। প্রৌঢ়, মাথাজোড়া টাক, লম্বাচওড়া দেহ। গবাদি পশুর সংকর প্রজনন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। আমাদের এদেশী 'ব্রাহ্মণী' ষণ্ড ও বিলাতী 'এয়ারশায়ার' গাভীর বর্ণসংকরের উপর তাঁর গবেষণার খ্যাতি এখানকার গভর্নমেন্টের কানে পৌঁছেছিল তিনি ইংল্যান্ড থেকে ফেরবার আগেই। তারপর গত বাইশ বছর থেকে এখানকার এই বিরাট সরকারী গবেষণা-কেন্দ্রের সর্বময় কর্তা তিনি।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়ে গিয়েছে তাঁর এই ক'দিনের মধ্যে! একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। এত লোকজন সহকর্মীর দল কিছুই যেন নজরে পড়ছে না তাঁর। জিনিসপত্র গাড়ি থেকে নামানো হল কিনা

সেদিকে খেয়াল নাই। পেরুর বাড়ির সদ্য-বিধবা বউও বোধ হয় এরকম উদ্ভ্রান্ত ভাব দেখায় না। কেউ ঠিক এরকমটা আশা করেনি অমন একজন জাঁদরেল সাহেবের কাছ থেকে। তার উপর মেমসাহেব যে কী চিজ্ ছিলেন একখানি, সে কথা কে না জানে! তাঁরা স্টেশনে এসেছিলেন, চাকরির অঙ্গ হিসাবে, আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কর্তব্য করতে; কিন্তু গভীর শোকের মূর্তি বাপ দেখামাত্র নিজেদের অজান্তে জড়িয়ে পড়লেন তার আবেগে। বড়দের এই অন্যমনস্কতার সুযোগে ছেলেপিলের দল সি টাইপ এ টাইপের ব্যবধান ভুলে সেলুন গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। সকলেই বোস সাহেবের কাছে যেতে চায়, কিন্তু এরকম সময়ে কাছে যেতে পারেন না। সি টাইপ ... করে ঘিরে উপর বোসেদের নিয়ে চলেছেন মোটরগাড়িতে তুলে দেবার জন্য। দুটি অপেক্ষাকৃত বড় মেয়ে সংকোচে বোগিং টিপকে ভিতরে ঢুকতে পারেনি। তার মধ্যে একটি মেয়ের চোখে জল। এত অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও কি করে যেন ডক্টর বোসের নজর গেল চোখে জলভরা রেবার দিকে।

"আমার স্ত্রী ওই মেয়েটিকে খুব পছন্দ করতেন।"

সাধারণ্যের মত শোনাল, যদিও কথাটা বলা গুলেরাজানী সাহেবকে। গুলেরাজানী সাহেব তাকালেন রেবার দিকে; কাজেই বি টাইপ, এ টাইপ এবং চতুর্থ শ্রেণীর সব কর্মচারীই তাকাল সেদিকে। এ টাইপের মধ্যে রেবার বাবাও ছিলেন।

মোটা অনুসারী দল বেঁধে, বাড়ি ফেরবার সময় সকলে সেদিন শুধু মেম-সাহেবেরই গল্প করে।...... কড়া, আর বদমেজাজী হলে কি হয়, মানুষটি ছিলেন ভাল! বোস সাহেবের মত জাঁদরেল স্বামীকে শাসনে রাখতে গেলে ঐ রকম কড়া টাইপের মেমসাহেবেরই দরকার। এক একদিন স্বামীকে জুতো দিয়েও পেটাতেন; ইংরেজের মেয়ে তো! তবে হ্যাঁ, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া কোন বাড়িতে না হয়! মনটা ভাল ছিল তাঁর; এই অগ্নিমূর্তি—এখনই আবার জল! খানসামাকে একবার চায়ের কাপ ছুঁড়ে মেরে তারপর দশ টাকা বকশিশ দিয়েছিলেন। আর চেহারা ছিল কী! লম্বায় চওড়ায় বোসসাহেবেরই সমান! দুজনেরই পালোয়ানের মত চেহারা! যে ওঁকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারবে তাকেই উনি বিয়ে করবেন, বোধ হয় এই রকমই ছিল মেমসাহেবের পণ কুমারী অবস্থায়!....

সেদিনকার শোকজ্ঞাপনের পর্ব তো এই-ভাবে মিটলো। রেবার কিন্তু খুব খারাপ লাগছিল, অমন দিনে মেমসাহেবকে নিয়ে বড়দের মধ্যে ওইসব সস্তা হাসিঠাট্টা।

জীবনে মাত্র দু দিন সে মেমসাহেবের কাছে যেতে পেয়েছিল। খুব ভাল লেগে-ছিল তার ভদ্রমহিলাকে।

লোকে যে যা খুশি বলুক তাঁর সম্বন্ধে।

মেয়ে স্কুলের স্পোর্টস্-এর দিন এই লম্বা স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি প্রথম মিসিজ বোসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাইজ দেবার সময় রেবাকে একটু আদর করে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—"আমাদের বাড়িতে এক-বার যেও।"

রেবা ছাড়া আর সব মেয়েই অবাঙালী। তারা বলল, স্বামী বাঙালী কিনা, তাই মেমসাহেব রেবা মেয়েকে বাড়িতে যেতে বলেছেন। মিসিজ বোসের অতখানি বাঙালী-প্রীতি ... তিনি ... একেকার বড় অফিসারদের স্ত্রীদের সঙ্গে পাশাপাশি মেলামেশা করেছেন ... সহর ... ইউরোপীয় ... যেতেন ...।

একে সি টাইপ কোয়ার্টারের মেয়ে, তার উপর মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলবার ভয়। রেবা কখনই যেত না, কিন্তু মা-বাবার মত হল যে, যখন বলেছেন তখন যাওয়াই উচিত; না গেলে দেখায় খারাপ। কাজেই বাবার চাকরির খাতিরে রেবাকে যেতেই হল, বড়সাহেবের কুঠিতে। সেই হল দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ মিসিজ বোসের সঙ্গে। সি টাইপ কোয়ার্টারের বাথরুমের বৈশিষ্ট্যই ছোটবেলা থেকে তাদের কৌতূহলের খোরাক যোগাত; কিন্তু বসবার ঘরের জিনিসপত্রের ধরন যে এরকম হতে পারে, সে কথা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি এর আগে। তার ভয় করছে দেখে মেমসাহেব তাঁর কুকুরটাকে চেন দিয়ে বাঁধলেন। তারপর রেবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। খাঁটি বাঙালী এটো কপালে লেগে থাকায় তার গা ঘিনঘিন করে। মেমসাহেব কত কি জিজ্ঞাসা করলেন ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে, তারপর এল সেই প্রত্যাশিত
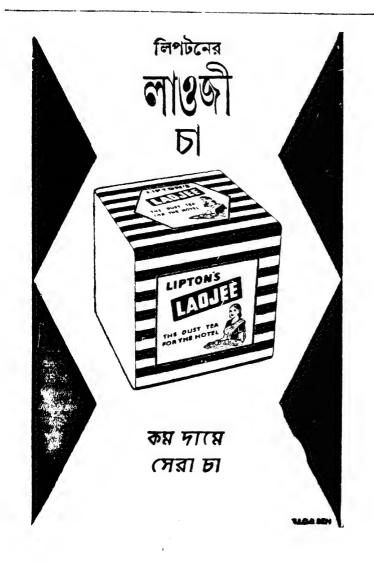
ফাড়া। তিনি কেক খেতে দিলেন। রেবা খেলো না। তিনি চটে উঠে বললেন—"হামি মেহটর না আছি।"

রেবা ভয়ে ভয়ে বলে—"খেলে মা বকবেন।"

রঙিন ছাতাটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন—"চল তোমার মার কাছে।"

ভয়ে তার বুক দুরদুর করে। কী আবার করে বসবেন মেমসাহেব কে জানে! গটগট্ করে জোরে জোরে পা ফেলে তিনি হাঁটছেন; রেবাকে ছুটতে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে। হুলস্থুল পড়ে গেল এ টাইপ কলোনিতে। রেবার মা বাড়ির দরজা খুলে দিতেই মেমসাহেব বললেন যে, ভিতরে ঢুকে তিনি তাদের ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করতে চান না; শুধু জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন যে, রেবাকে যদি তিনি কোন জিনিস উপহার দেন তা হলেও কি তার জাত যাবে? হ্যাঁ কি না তাই তিনি শুনতে চান; বেশী কথা খরচ করবার দরকার নেই।

রেবার মা বললেন—"না।"

"আর যদি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায় ও তা হলে?"

"তাও যাবে না।"

"ফেরে ফিরে এলে একটু গঙ্গাজল দিয়ে দেবেন গায়ে।"

গটগট করে মেমসাহেব চলে গেলেন নিমন্ত্রণ করে।

এ কেন দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর মিসিজ বোসের কাছে যাবার কোনদিন সুযোগ হয়নি রেবার। ডাকতে এলে যেত সে। কিন্তু গত দু বছরের মধ্যে তিনি ডেকে পাঠাননি।

দিন পনের আগে মেমসাহেব হঠাৎ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বোম্বাইয়ে, একটা কঠিন অপারেশনের জন্য। সেখান থেকেই আজ বোসসাহেব ফিরলেন—একা।

স্টেশনে রেবার চোখে জল এসেছিল মিসিজ বোসের ভালবাসার কথা মনে পড়ায়।

পরের দিন সকালে আবার এক অভাবনীয় ঘটনা। সি টাইপ কম্পাউণ্ডের বেড়ার ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে রঙবেরঙের উড়ন্ত সালোয়ার শাড়ীর উঁকিঝুঁকি দেখতে পাওয়া গেল। বি টাইপ কোয়ার্টারের বন্ধ জানলা দরজার খড়খড়ি ফাঁক হল। এ টাইপ কোয়ার্টারের ছেলেপিলের দল ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল। এ টাইপ পাড়ায় ডক্টর বোস! হেঁটে!

বোসসাহেব গিয়ে দাঁড়ালেন রেবাদের বাড়ির দোরগোড়ায়। রেবার মা ভয়ে অস্থির। বললেন—"রেবা, বলো উনি বাড়ি নেই।"

বাইরে থেকেই বোসসাহেব বললেন—"আমি তাঁর কাছে আসিনি, আমি রেবার কাছেই এসেছি।"

হাতের কাগজের মোড়কটা তিনি রেবার হাতে দিলেন।

"এটা আমার স্ত্রী নিজ হাতে বুনেছিলেন তোমাকে দেবার জন্য। বছর দেড়েক আগে এই স্কার্ফটা বোনা। প্রথমে একটা সোয়েটার বুনতে আরম্ভ করেছিলেন। পরে সেটাকে ফেলে স্কার্ফে হাত দেন। বলেছিলেন যে, এখন ওর বাড়ের সময়, সোয়েটার মাস কয়েকের মধ্যেই ছোট হয়ে যাবে। তুমি তো আমাদের বাড়ি আর গেলে না; অসুস্থ হবার পরও মিসিজ বোস সে কথা বলেছিলেন।"

গলা ধরে এল বোসসাহেবের এ কথা বলতে বলতে। বাড়ের সময়ের কথাটা শুনে একটু লজ্জা লজ্জা করে রেবার। বড়সাহেব চলে যাবার পর তার আড়ষ্টতা কাটে।

সবাই এ ঘটনাটিকে নিল ডক্টর বোসের শোকের গভীরতার একটা মাপকাঠি হিসাবে। স্ত্রীকে যে ভদ্রলোক এত ভালবাসতেন সে কথা সহকর্মীরা কেউ আগে আন্দাজ করতে পারেনি। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দেখে সকলে ভাবত তাদের বিবাহিত জীবন সুখের নয়, বিলাতে পড়বার সময় ঝোঁকের মাথায় প্রেম নিবেদন করে পরে বাইশ বছর ধরে তার ঠেলা সামলাতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, স্ত্রী মারা গিয়ে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু সকলের হিসাব গুলিয়ে দিলেন বিপত্নীক বোসসাহেব।

একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি। ছিলেন গরীব গেরস্ত বাড়ির ছেলে। পড়াশোনায় ভাল ছিলেন বলে বিলাত যাবার সুযোগ পান। মেম বিয়ে করবার জন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ঘুচে যায়। যার জন্য আত্মীয় পরিজন সব ছেড়েছিলেন, সে এমন হঠাৎ চলে গেল! এর জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বড় একলা একলা লাগে। ভাবেন কাজে ডুবে থাকবেন; কিন্তু মন বসে না। সময় কাটাবার জন্য বিকাল বেলায় ক্লাবে গেলেন দিনকয়েক। সেখানেও লোকজনের সঙ্গ ভাল লাগে না; মদ খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। চেষ্টা করে আলস্য কাটিয়ে ক্লাবে যাবার উদ্যম সঞ্চয় করাও কঠিন। মনে হতে আরম্ভ হয় যে, বাড়ীতে বসে মদ খাওয়াতেই শান্তি বেশী। ক্রমে অফিস যাওয়াও ছেড়ে দিলেন। বাড়িতে বসেই অফিসের কাগজপত্র দস্তখত করে দেন। কাজের মধ্যে সারা দিন শুধু মদ খাওয়া, আর মেমসাহেব যে রেকর্ডগুলো ভালবাসত সেইগুলোকে বাজানো। সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, বড়সাহেবের যদি একটি ছেলে কিংবা মেয়ে

থাকত, তা হলে উনি এরকম হয়ে যেতেন না কখনই। তার আজকালকার দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি তারা সংগ্রহ করে খানসামা, বাবুর্চির কাছ থেকে। এদেরই মারফত কলোনির সকলে খবর পায় যে, সাহেবের কড়া হুকুম, মেমসাহেবের জামা, জুতো, টুপি, জিনিসপত্র ঘরে ঠিক আগে যেখানে ছিল, সেখান থেকে যেন একটুও নড়চড় করা না হয়। দেখলে পরে মনে হয় যেন মেমসাহেব বেড়াতে বেরিয়েছে, এখনই ফিরবে। আর একটা খবর যে, মেমসাহেবের আদরের কুকুর ট্রিকসিকে সাহেব আজকাল নিজে হাতে দু বেলা খেতে দেয়। মেম-সাহেবের কুকুর হলে কি হয় ওটা সাহেবকেও চিরকাল খুব ভালবাসে। মেমসাহেবকে সাহেবের উপর জুলুম করতে দেখলেই ওটা দু'জনার মধ্যে পড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ডেকে হইচই বাধিয়ে দিত।

এটুকু বলবার পর বড়সাহেবের বেয়ারারা কোন গল্পটা করবে তা এ টাইপ বি টাইপ কলোনির সবার জানা। বহুবার শোনা কিনা। হোলি আর দেওয়ালির বকশিশ নিতে এসে ছেলেমেয়েদের পীড়াপীড়িতে প্রতি বছর তারা গলার স্বর নামিয়ে সেই পুরনো মজার খবরটা বলে।......বড়সাহেব যেদিনই খুব বেশী মাত্রায় খেয়ে নেশায় চুর হয়ে ঘুমুত, সেদিনই হত কাণ্ড বাড়িতে। মদ খাওয়ার জন্য কিছু নয়; সে তো মেম-সাহেব নিজেও মদ খেতো। কোন সায়েব মেম না খায়! নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমুলে বড়সাহেবের নাক মুখ দিয়ে ফর্-র্-র্ ফর্-র্-র্ করে একটা অদ্ভুত শব্দ বার হয়। মেমসাহেব বলত যে, ঘোড়ারা ঘাস খাওয়ার সময় নাকি মধ্যে মধ্যে ওইরকম শব্দ করে। অর্ধেক রাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে কানের কাছে ওই শব্দটা শুনলেই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠত। ঘোড়ার আবার বিছানায় শোবার দরকার কি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুলেই তো পারে! ধাক্কা দিয়ে সায়েবকে খাট থেকে মেঝের উপর ফেলে দিত। ট্রিকসি চিরকাল শোয় ঠিক দরজার বাইরে। মেঝেতে পড়ার শব্দটা শোনা, আর আরম্ভ হত তার চীৎকার আর দোর আঁচড়ানি। যতক্ষণ ঘরের দরজা না খুলছ, ততক্ষণ নিস্তার নাই! শেষকালে মেমসায়েব বেরুত চাবুক নিয়ে। সেসব কথা মনে করলে হাসিও পায়, আবার সায়েবের উপর মায়াও হয়! সে সময় মারলেও কি কুকুরটা থামে! শেষ পর্যন্ত সেটাকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত মেমসায়েব। তখন কুঠি ঠাণ্ডা!......

পুরনো হওয়ায় এইসব গল্পের স্বাদ যখন পানসে হয়ে এসেছে, তখন সায়েবের খানসামার কাছ থেকে পাওয়া গেল এক অতি চাঞ্চল্যকর খবর। প্রত্যহ রাতদুপুরে ট্রিকসি ডেকে ডেকে বাড়ি মাথায় করছে। ডাকে আর দোর আঁচড়ায়। সাহেব উঠে দরজা খুলে তাকে ভিতরে নিয়ে যান। পর পর ক'দিন সায়েবের ঘুমের ব্যাঘাত হতে দেখে বেয়ারা সাহসে বুক বেঁধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, কুকুরটাকে রাত্রিতে বাড়ির বাইরে বেঁধে রাখবে কিনা। সায়েব কোন কথা না বলে কটমট করে শুধু একবার তাকিয়েছিলেন তার দিকে। তারপর তিন দিন তিনি ঘর থেকে বার হননি; খানসামা বাবুর্চির সঙ্গে কোন কথাও বলেননি। চতুর্থ দিন সকাল বেলা দেখা গেল সাহেব নিজে ঘরের জিনিসপত্র গোছগাছ করলেন। বেয়ারারা তো অপ্রস্তুতের একশেষ। কোথাও যাবেন নাকি? কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে, সায়েবের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিতে গেল। তিনি বাধা দিলেন না। মেমসায়েবের জিনিসপত্র-গুলোকে দেখিয়ে সেগুলোকে আলমারির মধ্যে তুলে রাখতে বললেন। গলার স্বরে সাহেবী হুকুমের সে ঝাঁজ নেই। এতকাল ও জিনিসগুলোতে কাউকে হাত দিতে দিতেন না। ব্যাপার কী! কাল সারা রাত মদ চলেছিল; তারই জের সকালেও রয়েছে নাকি? জামা, জুতো, টুপি থেকে আরম্ভ করে ছাতা, পাউডারের কৌটো, ভ্যানিটি ব্যাগ পর্যন্ত সব জিনিস ভরা হল তিনটে আলমারিতে। তারপর সাহেব বললেন, আজ থেকে অন্য ঘরে যেন তাঁর শোবার বিছানা পাতা হয়। অবাক হয়ে গেল বেয়ারা। এ আবার কী নতুন খেয়াল

সায়েবের! বাবুর্চিখানায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেও তারা এর কোন কারণ খ‍ুঁজে পেল না। টেবিলের উপর মেম-সাহেবের যে ফোটোগ্রাফখানা ছিল সেখানাকে কাগজে মুড়ে নিয়ে সায়েব বেরুলেন বাড়ি থেকে আজ অনেকদিনের পর। সোজ গেলেন এ টাইপ কলোনিতে। রেবার হাতে ফোটোগ্রাফখানা দিয়ে বললেন—"আমার স্ত্রী তোমায় খুব ভালবাসতেন; তাই এটা তোমায় দিচ্ছি।" তিনি চলে যাওয়া মাত্র প্রতি-বেশিনীরা ছুটে এলেন মেমসাহেবের ফোটো-গ্রাফ দেখতে। মাতালকে তাঁরা ভয় করেন ঠিকই; তবু তাঁদের মন এই বিগতদার মানুষটির প্রতি সহানুভূতিতে ভরা।

"কী চেহারা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!"

"খাওয়াদাওয়া তো প্রায় নাই বললেই হয়; খালি মদে কি শরীর টেকে!"

"বউ নিয়ে ঘর করা যাদের একবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, বিয়ে না করলে তারা অবধারিত পাগল হয়ে যায়।"

"সেই রকমই লক্ষণ।"

"ছুটি নিয়ে বিলাত গিয়ে আর একটা মেম ধরে আনলেই তো পারে।"

রেবার মা সায় দিলেন—"পঞ্চাশ বছর বয়সে সায়েবদের মধ্যে কত লোক প্রথমবার বিয়ে করে।"

"উনিও করবেন; সবুর কর না কিছুদিন।"

এই হল অনিমেষ রায় এ টাইপ কলোনির মেয়েমহলের।

আর ওদিকে সাহেবের কুঠিতে, বেয়ারা বাবুর্চিরা সারা দিন মাথা ঘামিয়েও আসল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। বুঝল শেষ রাত্রিতে। ট্রিক্সির ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বেয়ারার। কিন্তু কুকুরটা আজকাল প্রত্যহ ওই রকম করে ডাকে বলে সে আর বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। হঠাৎ দরজার বাইরে জুতোর শব্দ শুনে উঠতে হল। সাহেব নিজে এসেছেন 'আউট হাউস'-এ তাকে ডাকতে। ট্রিক্সিও সঙ্গে আছে। হাঁফাচ্ছেন তিনি। সাহেব বেয়ারাকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের শোবার ঘরে; তারপর বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসলেন গদি-ওয়ালা চেয়ারটায়। অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ। ট্রিক্সি খাটের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কি যেন শুঁকছে। ভোর হবার পর সাহেব জানালেন তাঁর বিপদের কথা। মেম-সাহেব তাঁকে প্রত্যহ খাট থেকে নীচে মেঝের উপর ফেলে দিচ্ছে, তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায়।

তারপর ডাকা হল রসুলপুরের নামজাদা রুস্তম ওঝাকে। তার কথা অনুযায়ী জিনিসপত্র কেনা হল। সেগুলোকে রাখা হল সাজিয়ে, একটা প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে। শনিবারের দিন ঠিক দুপুর বেলা রুস্তম ওঝা বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে একখানা চার-কোনা রেশমী চাদর দিয়ে হাঁড়িটাকে ঢেকে দিল। ভরা দুপুরে সেটাকে মাথায় করে বোসসাহেব রেখে এলেন তেরাস্তার উপর—ঠিক যেখান থেকে এ টাইপ কলোনির রাস্তাটা বেরিয়েছে সেই মোড়ে।

এ নিয়ে চিচিক্কার পড়ে গেল সারা কলোনিতে। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি লোকটার একেবারে? কয়েকদিন এ ছাড়া আর অন্য কোন কথা নেই এখানকার লোকের মুখে। পুরুষেরা এমন সিটকল অত বড় একজন বৈজ্ঞানিককে এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর কুসংস্কারের আওতায় পড়তে দেখে। রেবার মা মেয়েকে বারণ করে দিলেন যেন পথের মোড়ের সেই জায়গাটা দিয়ে ভুলেও না হাঁটে। রাস্তার ঝাড়ুদার পর্যন্ত সেই জায়গাটুকু ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করে দিল।

আর এদিকে তেমাথার উপর হাঁড়িটা রেখে বোসসাহেব বাড়িতে এসে বসলেন বোতল আর গ্লাস নিয়ে। দুপুর থেকে আরম্ভ করে রাত বারোটা পর্যন্ত চালিয়ে গেলেন একনাগাড়ে। নেশায় বুঁদ না হয়ে পড়া পর্যন্ত ছাড়বেন না এই সংকল্প। নইলে ওঝার ওষুধের পরীক্ষা হবে না। খানসামা, বাবুর্চি, রুস্তম ওঝা, সবাই সারা রাত জেগে, কান খাড়া করে। সকাল সাড়ে আটটার সময় ঘুম ভেঙে উঠে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বোসসাহেব। ওষুধে ফল ধরেছে! যাবার আগে রুস্তম ওঝা কম্পাউন্ডের চতুঃসীমার উপর কি কি যেন ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে দিল। বলে গেল, শরাবের উপরই মেমসাহেবের রাগ, আর বোধ হয় সাহেবকে বলছেন আবার বিয়ে করতে।

সাহেব বাবুর্চিকে বলে দিলেন ভাতে জল দিয়ে রাখতে। রাত্রিতে আজ তিনি শুধু পান্তা ভাত খাবেন লেবুর রস দিয়ে। অনেক কাল পর আজ অফিস গেলেন।

সন্ধ্যাবেলাটার মদের লোভ সামলানো শক্ত। সন্ধ্যা থেকে রাত্রিতে ভাত খাওয়ার সময়টুকু কোনরকমে মদ না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে হ'ল। তারপর খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া। এ না করলে ওঝার মন্ত্রের ধক নষ্ট হয়ে যাবে। ক্লাবে গেলে পান না করে ফেরা অসম্ভব। সিনেমা প্রত্যহ দেখা চলে না। কফি, চুরুটের মাত্রা বাড়িয়ে দেখলেন; দেশ-বিদেশের মদ্যপান নিবারণী সভায় চিঠি লিখলেন উপদেশের জন্য; করে দেখলেন আরও অনেক রকমের বৈকল্পিক নেশা। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে বুঝলেন, এ টাইপ কোয়ার্টারে রেবাদের বাড়ি সন্ধ্যা-বেলায় যাওয়াটাই সব রকম নেশার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী।

গৃহস্থালির শত জিনিসে ভরা এ-টাইপ

কোয়ার্টারের ছোট ঘর। মোড়ার উপর তাঁর খাতিরে 'আসুন বসুন' লেখা আসন পাতা। দেওয়ালে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ছবি। তিনিও ছোটবেলায় এই পরিবেশেই মানুষ। সন্ধ্যা-বেলা ঘরের মধ্যের ধুনোর গন্ধটা আরও বেশী করে সেই সব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ায়। এ-ঘরে ঢুকলেই বেশ বাড়ি বাড়ি মনে হয়। প্রকান্ড কম্পাউন্ডওয়ালা সি-টাইপ বাড়িগুলো তাঁদের ছেলেবেলার ধারণা অনুযায়ী স্কুল, অফিস, কাছারির মত লাগে দেখতে। সি-টাইপ বাড়িতে তাঁদের থাকবার ধরনেও এঁদের তুলনায় একটু যেন হোটেল-হোস্টেল ভাব। খুব ভাল লাগে রেবাদের এই ঘরখানা। রেবার বাবা প্রথম থেকে বড়-সাহেবের সঙ্গে মাখামাখি করবার বিরুদ্ধে; কিন্তু অত বড় একজন লোককে নিষেধ করতে সাহস পান না। তারপর বড়সাহেব রেবার মার হাতের সুক্তানি খেতে চাইলেন; মাচার ঘন্ট খেতে চাইলেন; কেমন করে সুক্তানি রাঁধতে হয়, সেটা রেবাকে একখানা কাগজে লিখে দিতে বললেন, বাবুর্চিকে

ব্যবধানজনিত এই রকমের সংকোচকাতরতার বাধা তার পদে পদে। কিন্তু এর চেয়েও বড় আর এক রকমের বাধা তার মনের সম্মুখে খাড়া আছে অষ্টপ্রহর। মুখ্যত সেটা 'সি-টাইপ এ-টাইপ'-এর ব্যবধানজনিত। বিয়ের পর থেকে আইনের চোখে সে নিজেকে 'সি-টাইপ' বলে দাবি করতে পারে বটে; কিন্তু সে কিছুতেই নিজের হীনতার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। বাইরের লোকের কাছে সি-টাইপ কোয়ার্টারসুলভ ভাব প্রয়োজনের চেয়েও উগ্রভাবে প্রকাশ করে ফেলে; কিন্তু স্বামীর সম্মুখে গেলেই কেন যেন অন্য রকমের হয়ে যায়। সে ভাবে যে, তার স্বামী ঠিক সি-টাইপ কোয়ার্টারের অন্য অফিসারদের মত নন। তিনি যে বাইশ বছর ইংরেজ মেমসাহেবের সঙ্গে ঘর করেছেন। সেইটাই তাঁর সাক্ষাৎকারের পছন্দ। মেঝেতে বসে খাওয়া, 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যে জোর করে করা, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি তার আছে। উনি এমিলি মেমকে কী ভালবাসতেন, তা [illegible]। স্বচক্ষে দেখেছে তো মেমসাহেব মারা যাবার পর তাঁর অবস্থাটা। বিয়ে হবার পর তার বয়সী অন্য মেয়েরা [illegible] সে পেয়েছে স্বামী। স্বামীর মনের মত হওয়ার মানে সেই মেমসাহেবের মত হওয়া। সে কি মেমসাহেব হতে পারবে কোনও কালে? সে রকম রঙও কোনদিন হবে না, সে রকম ইংরেজী বলতেও পারবে না কোনদিন; সে রকম টুপি, গাউনও সে কোনদিন পরতে পারবে না [illegible] গেলেও। কিন্তু তিনি যেমন করে সংসার চালাতেন, স্বামীর দেখাশোনা করতেন, [illegible] কেন নকল করতে পারবে না? চেষ্টা করলেই পারবে। দরকার শুধু সেই সব ছোট ছোট খবরগুলো জোগাড়। বলতে পারেন একমাত্র স্বামী; কিন্তু যা চাপা মানুষ উনি, ওসব কথার ধার দিয়েও যান না। মেমের কথা জিজ্ঞাসা করতেও কেমন বাধো বাধো লাগে তাঁর কাছে। রেবা স্বামীর হাবভাব দেখে তাঁর পছন্দ-অপছন্দ বোঝবার চেষ্টা করে। পুরনো বেয়ারাকে যখন-তখন খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেও সে অনেক কথা জেনে নেয়। স্বামীর চোখ-মুখের উপর লক্ষ্য রাখতে গিয়ে অনেক সময় সে ধরা পড়ে গিয়েছে; কিন্তু তিনিও যেন ধরা পড়ে গেলেন, এমনি মুখের ভাব হয়ে যায় তাঁর তখন। কী ভাবেন, তিনিই জানেন। বেয়ারার সঙ্গে একদিন পুরনো মেমসাহেবের গল্প করছে; হঠাৎ মনে হল স্বামী তাদের কথা শোনবার জন্য দরজার পাশের চেয়ারখানায় এসে বসলেন। কেন, কে জানে!

বোসসাহেব ব্যথা পান, রেবা বেয়ারার সঙ্গে পর্যন্ত সহজভাবে কথা বলে, অথচ তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় অন্য রকম হয়ে যায়। কেন তাঁর সম্মুখে এলেই একটু

আড়ষ্ট ভাব দেখতে পান তার মধ্যে? কেন রেবাকে কিছু বলতে গেলেই তার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ে? নিজের অধিকার বুঝে নিতে কেন তার কুণ্ঠা? কেন সে তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করে না? খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও সে কোন বিষয়ে নিজের মতামত দেয় না। রেবা তাঁর কথা শোনে ঠিক; কিন্তু যার মন চাও, তার কাছ থেকে শুধু বাধ্যতা আর বশ্যতা পাওয়া, কতটুকুনি পাওয়া? কেন তার সংকোচ-ভীরুতা? আচরণে কোন ত্রুটি নেই, অথচ কি একটা জিনিসের যেন অভাব তার মধ্যে। হাতের বন্ধনের মধ্যেও তার দেহ আড়ষ্ট। দুর্বোধ্য তার মনের এই জটিলতা। যে একেবারে আপন, সে যদি সব সময় একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলে, তা হলে ব্যথা পাবারই কথা। আগের মেমসাহেব এমিলিকে তিনি বুঝতেন। সে যা বলত, পরিষ্কার খোলাখুলি বলত। কর্তব্যে ত্রুটি তার বেশী হত রেবার চেয়ে; সেবা হয়ত এমন নিখুঁত ছিল না, কিন্তু দোষ করবার পরও স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াতে এমিলির অন্তত সে রকম সংকোচ বোধ করেনি। [illegible] ... একটি ছেলে-[illegible] ... [illegible] কিন্তু এখন [illegible] দেখছে যে, কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না [illegible] পরিবেশের সঙ্গে। এ নিয়ে রেবাকে কোন প্রশ্ন করা চলে না। শুধু এ নিয়ে কেন, কিছু একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলেই তার মুখে চোখে একটা শংকাকুল ভাব ফুটে ওঠে। অসহ্য লাগে বোসসাহেবের কাছে রেবার এই চাউনিটা। এর চেয়ে এমিলির স্বভাবের ভাল দিকটার স্মৃতি রোমন্থন করে বাকি জীবনটুকু কাটানোই ছিল ভাল। ভেবেছিলেন বিয়ে করে অশান্ত মন শান্ত হবে; কিন্তু এই পেয়ে না-পাওয়ার সন্ত্রণার হাত থেকে যে মরে গেলেও নিস্তার নাই। ভোলবার জন্য আবার মদ ধরলেন বোসসাহেব।

স্বামীর মতিগতির পরিবর্তন দেখে রেবা ভয় পায়। একটা পরামর্শ করবার পর্যন্ত লোক নাই এ বাড়িতে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের প্রভেদ বেশী হবার সংকোচে সে কোন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইচ্ছা করেই করেনি। মাকে এসব কথা লিখতে বাধে। কারও কাছে বলতে পারলে বোধ হয় নিজের বুকের বোঝা হাল্কা হত। একটি ছেলেপিলে হলে হয়ত স্বামীর টান বাড়ত; কিন্তু ভগবান দিলেন কই!

রেবা জানে, কোথায় তার দুর্বলতা—কেন সে স্বামীর মন পাচ্ছে না। তাঁর পিঁড়ি পেতে বসে খাওয়ার শখ মিটতে দেখেই সে বুঝেছে। একনাগাড়ে বাইশ বছর এমিলি-মেমের সঙ্গে ঘর করে তাঁর মেজাজ হয়ে গিয়েছে সাহেবী; জোর করে নিজেকে অন্য-রকম দেখাবার চেষ্টা দিনকয়েক ছিল; এখন সে ঝোঁক ক্রমে ক্রমে কেটে যাচ্ছে। এমিলি-মেমের মত না হতে পারলে ওঁর মন পাওয়া যাবে না এই হল তার বদ্ধমূল ধারণা। সে বাবুর্চির কাছে নতুন নতুন বিলাতী খানা রান্না করা শিখতে লাগল; সুক্ত, ডাঁটা-চচ্চড়ি রাঁধবার পাট তুলে দিল; রামকৃষ্ণ-ঠাকুরের ছবি দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে নিজের স্যুটকেসে রাখল; করল আরও অনেক কিছু এমিলি-মেমের মত হবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। মদের মাত্রা দিন দিনই বাড়ছে। কলেজে থাকতে আরম্ভ করেছেন বোসসাহেব আগের চেয়ে বেশীক্ষণ; সকালে যান, সন্ধ্যার সময় ফেরেন। দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দিতে হয় সেখানে।

কলেজে বেশী সময় কাটাবার কারণ রেবা যাই ভাবুক, তাঁর সহকর্মীরা বলে যে, বোসসাহেব আবার পূর্ণ উদ্যমে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেছেন। মদের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কাজের মাত্রাও বাড়িয়েছেন। এবারকার গবেষণার বিষয় গবাদি পশুর কৃত্রিম-প্রজনন সম্পর্কিত। ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন আর মদ খান। বাড়ি ফেরবার পর তো কথাই নাই।

একটা কথা বলি-বলি করেও স্বামীকে বলতে পারছিল না দিনকয়েক থেকে। সেদিন বোসসাহেব সন্ধ্যার সময় ফিরে বোতল-গ্লাস নিয়ে বসেছেন। রেবা সাহসে বুক বেঁধে তাঁর সম্মুখে গিয়ে এক নিশ্বাসে বলে ফেলল যে, ইংরেজীতে কথাবার্তা বলা শেখাবার জন্য একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষয়িত্রীর তার দরকার।

কোন্ মেজাজে ছিলেন তখন বোসসাহেব তিনিই জানেন। চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন—"Shut up!" এরকমভাবে স্ত্রীকে তিনি কখন এর আগে তাড়া দেননি। রেবা চলে এল সেখান থেকে; চোখ ফেটে জল আসছে তার। বোসসাহেব আর এক পেগ ঢেলে নিলেন বোতল থেকে; এবার আর সোডা মেশালেন না।

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা রেবার। শুনে আসছে বটে বেয়ারার কাছে যে, দু পেগের পরই সাহেবের মেজাজ সপ্তমে চড়ে; তাই

ও-সময় পারতপক্ষে বেয়ারা তাঁর সম্মুখে যায় না। আরও শুনেছিল যে, একটু বেশী পেটে পড়লেই সব গন্ধ সাহেবের নাকে উগ্র লাগে। আগেকার মেমসাহেবের হাস্নাহেনার গাছ একবার রাত্রিতে কাটতে গিয়েছিলেন; তাই নিয়ে সাহেব-মেমে কী কাণ্ড সেদিন! গালাগালি, মারামারি। ইংরেজীতে গালাগালি। সাহেব প্রথমে আরম্ভ করেন শুয়োর-কা-বাচ্চা দিয়ে। তারপর চলে ইংরেজী। ওই ভয়েই সে সাহেবের সম্মুখে যায় না তখন, নেহাত বাধ্য না হলে।.....

এসব গল্প শুনেও ঠিক বিশ্বাস করত না রেবা আগে। ভাবত যে, বেয়ারা বাড়িয়ে বলছে আসর জমাবার জন্য। এখনও সে বিশ্বাস করে না। তবে এ কথা ঠিক যে, রাগের মাথায় স্বামী নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন, ওই 'Shut up' কথাটার মধ্যে দিয়ে। মান-অভিমান করে বসে থাকলে তার চলবে না। মনের অবস্থা স্বামীর যে এতদূর বদলে গিয়েছে এরই মধ্যে, সে কথা সে আন্দাজ করতে পারেনি। তার কোন সন্দেহ নেই যে, মেমসাহেবের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন স্বামী, আর তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। অনেক কিছু সে করতে পারত এতদিনে স্বামীর মনের মত হবার জন্য; কিন্তু বোকার মত গড়িমসি করে এর্মিলি মেমের আদব-কায়দা শিখতে দেরি করে ফেলেছে সে। মেমের গায়ের রঙ সে না পাক, টুপি গাউন সে পরতে পারত ইচ্ছা করলে; বমি এলেও অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া অভ্যাস করতে পারত হয়ত; গা ঘিনঘিন করলেও ট্রিক্সি কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারত; মার কাছে চিঠি লিখে জানতে পারত যে, স্বামীর মনের মত হবার জন্য সিঁথিতে সিঁদুর না দিলে চলে কি না। আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কী করা উচিত, কে তাকে পথ দেখাবে! স্যুটকেস খুলে সে ঠাকুরকে প্রণাম করল কাঁদতে কাঁদতে। মেমরা হাতে চুড়ি পরে না, সে হাতের চুড়ি, বালা, গলার হার খুলে ফেলে। কানের দুল হয়ত রাখা চলে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। স্নানের আগে গায়ে সরষের তেল মাখা তার অভ্যাস। কী ভুলই সে করেছে বাথরুমে স্বামীর চোখের সম্মুখে এতদিন সরষের তেলের বাটিটা রেখে! ছুটে গিয়ে সে বাথরুমের জানলা দিয়ে তেলের বাটিটা ফেলে দিল বাইরে। মেমসাহেব হতে গেলে তার সাজ সরঞ্জাম কিছু কেনবার দরকার। গুছিয়ে সেসব জিনিসের একটা 'লিস্ট' করা উচিত আগে। ফর্দ করতে বসে দেখল, বর্তমান মানসিক অবস্থায় কোন জিনিসের নাম মনে আসছে না। মেমসাহেবদের মত পোশাক পয়সা দিলেও এ-শহরে এখনই পাওয়া সম্ভব নয়। 'লিস্ট' করতে বসে বারবার নজরে পড়ছিল ফড়িংয়ের পিছনে ধাবমান ট্রিক্সির উপর। রেবা উঠল কুকুরটাকে এর্মিলি-মেমের মত জড়িয়ে ধরে আদর করতে। হাত বাড়াতেই ট্রিক্সি রুখে দাঁড়িয়ে গর্‌র্‌ করে একটা আওয়াজ বার করল গলা দিয়ে। ভয়ে পিছিয়ে এল সে।

খানসামা খাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছে। সাহেব বলেছেন, খাবেন না রাত্রিতে; মেমসাহেব এখন খেতে যাবেন নাকি? রেবা বলে দিল সে-ও খাবে না; শরীরটা ভাল নেই।

এরা তাকে মেমসাহেব বলে ডাকে। মেমসাহেব, না ছাই! কুকুরেরও অধম হয়ে গিয়েছে সে এ বাড়িতে! নটা বাজল, দশটা বাজল ঘড়িতে। ভেবে কিছু কূল-কিনারা পাওয়া যায় না! বেয়ারা, বাবুর্চি বাইরে যাচ্ছে; প্রায় এগারটা হল। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে আসবার সময় দেখল, শোবার ঘরে নীল আলোটা এখনও জ্বলেনি। তার মানে তিনি এখনও শোননি। এখনও ওই বিষ গিলছেন নাকি? স্বামীর উপর রাগ-অভিমান করে থাকলে তার চলবে না। এবার শোবার ঘরে যেতে হয়।

এই সময় হঠাৎ খেয়াল হল একটা কথা।...একবার করে দেখলে হয়; কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়! যদি পরের জিনিস ব্যবহার করতে দেখে স্বামী আরও চটে ওঠেন! ভয়ে বুক দুরদুর করে। কিন্তু যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তার চেয়ে আর বেশী খারাপ কী হতে পারে!

মনের সমস্ত বল সঞ্চয় করে সে এর্মিলি-মেমের জিনিসপত্রে ঠাসা আলমারিটা খোলে। রাতে শোবার সময়ের একটা পোশাক সে বার করল আলমারি থেকে। শাড়ি ছেড়ে সেগুলোকে পরে একবার আয়নায় দেখে নিল নিজেকে। দেখতে মেম-মেম লাগছে ঠিকই। এর্মিলি-মেমের পাউডারের গন্ধ এখনও নষ্ট হয়নি। তা-ই কৌটো থেকে নিয়ে খানিকটা লাগাল মুখে। মেমসাহেবের ব্যবহার করা একটুকরো লিপস্টিক পড়ে রয়েছে এক কোণায়। রাতে ও জিনিস মেমসাহেবরা লাগায় কিনা, ঠিক জানা নেই। সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সেটাকে একটু ঘষে নিল ঠোঁটে। মেমসাহেবের ব্যবহার করা লিপস্টিক ঘষবার সময় বড় ঘেন্না ঘেন্না করছিল তার। ইলেকট্রিক আলোতে ঠোঁট কালো দেখাচ্ছে আয়নায়। দেখাক গে! মেমদের ঠোঁট ওই রকমই দেখায়। এর্মিলি-মেম শোবার ঘরে হিল-তোলা জুতো পরত নাকি? শোবার সময় সেন্ট লাগাত নাকি? ট্রিক্সি ঘরে এসে ঢুকেছে। রেবার পরনের পোশাক শুঁকছে, আর লেজ নাড়ছে। সে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল, মেমসাহেবের মত করে। ট্রিক্সি লেজ নাড়াচ্ছে আরও বেশী করে। এতে রেবা মনে জোর পায়। এইবার সে শোবার ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত। নীল আলোটা তো জ্বলছে না ও-ঘরে! মনে মনে ঠিক করে নিল, ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে স্বামীকে কী বলবে। তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে প্রথমটায় বোধ হয় চিনতে পারবেন না; বোধ হয় চমকে উঠবেন এত রাতে একজন ফিরিঙ্গী মেমকে ঘরে ঢুকতে দেখে। চিনতে পারবার পর কি বলবেন, সেইটাই হচ্ছে কথা। ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সে শোবার ঘরে ঢুকল।

এ কী কাণ্ড! স্বামী বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। মদের নেশায় জুতো জোড়া পর্যন্ত খোলা হয়নি পা থেকে। দেখে একেবারে মুষড়ে পড়ল রেবা! ভগবান তার বিরুদ্ধে! তার এত সাজ-সজ্জা, জল্পনা-কল্পনা সব বৃথা হয়ে গেল! চোখে জল আসছে তার। নিদ্রিত স্বামীর দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে। এই অবস্থায় কি ওই বিছানায় গিয়ে শুতে ইচ্ছা করে মানুষের? কিন্তু সম্মুখে তার চলবে না। কিছু তাকে করতেই হবে। শক্ত হতে হবে। স্বামীর মন তাকে ফিরে পেতেই হবে, যেমন করে হোক।

নিদ্রিত নেশাগ্রস্ত মানুষটির নাক-মুখ দিয়ে, ঘোড়ার মত সেই ফড়্‌ফড়্‌ ফর্‌র্‌র্‌ শব্দটা বার হচ্ছে। ঘরের আলোটা নিবিয়ে নীল আলোটা জ্বেলে দিল রেবা। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। নিজের লেপটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে, দু ভাঁজ করে ঠিক খাটের পাশে মেঝেতে পাতল। বেশ পুরু গদিমত হয়েছে। সেই গদির উপর রাখল নিজের বালিশটা। মেমসাহেবের মত হতে গেলে যে এত মনের বলের দরকার আগে বুঝতে পারেনি। হে মা কালী, শেষ মুহূর্তে মনের জোরটুকু কেড়ে নিও না! স্বামীর নাক-মুখের সেই শব্দটা কানে আসছে, আর ভয়ে তার বুক কাঁপছে। খাটের উপর থেকে ঝুঁকে আর একবার মেঝেটা দেখে নিল। লেপটা ঠিক জায়গায় পাতা হয়েছে। তারপর শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে, নিদ্রিত স্বামীর গুরুভার দেহটাকে সে খাট থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দিল। ঠিক বালিশের উপর পড়েছে মাথাটা। স্বামী নেশার ঝোঁকে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। ট্রিক্সির উদ্দাম চীৎকার ও দোর আঁচড়ানিতে সব কথা শোনা গেল না। রেবার কানে এল শুধু—"এর্মিলি, তোমার গায়ে নারকোল-তেলের গন্ধ কেন?"

॥ ২৩ ॥

কনির সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। গোমেজ সায়েবকে এত-দিন যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। একটা রেস্তোরাঁর সাধারণ বাজনদার বলেই ধরে নিয়েছিলাম। অনেকদিন আগে হাইকোর্টে থাকতে থাকতে সায়েবের সঙ্গে কলকাতার এক নাম করা রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম। দূর থেকে সুরেশ ডেরেশনের বাজনা বাজাতে দেখে আমার বেশ হিংসে হয়েছিল। সায়েব হেসে বলেছিলেন, "ছাত্রজীবনে পড়েছিলাম মিউজিক ইজ অ্যান এক্সপেনসিভ নয়েজ। আমি ভাবতাম, রসিকপ্রবর জনসন সায়েব ইচ্ছে করে কথাটা বলেছেন। কলকাতার রেস্তোরাঁয় সংঘাতে খেতে এসে প্রথম বুঝলাম, জনসন মিথ্যা কথা বলেননি।"

আমি হেসে ফেলেছিলাম। সায়েব আমার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, "খাবার সময় বাজনা শোনবার এই মোগলাই রীতি কে যে প্রথম আমাদের গরীব দেশে নিয়ে গিয়েছিল জানি না। আমি যদি শুনি অভ্যাসটা আমরা তোমাদের দেশের আমীর-ওমরাহদের কাছ থেকে পেয়েছি, তা হলে আশ্চর্য হবো না। তবে বইতে পড়েছি, বোম্বেটে ড্রেক পর্যন্ত তাঁর সমুদ্রযাত্রার সময় আর কিছু নিয়ে যান আর না যান, কয়েকজন মিউজিসিয়ান নিয়ে যেতে ভুলতেন না।"

"কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"কেন আবার? খাবার সময় গান না শুনলে তাঁর পেটের ভাত হজম হতো না!" সায়েব বলেছিলেন। তারপর হেসে বলে-ছিলেন, "এই কলকাতায়, যারা আমরা রেস্তোরাঁয় খাই, তারা সবাই ড্রেক হয়ে গিয়েছি। গান চাই, বাজনা চাই, নাচ চাই—তবে তো লাঞ্চ জমবে, তবে তো ডিনারে রুচি হবে।"

সায়েব গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "দেখেছি তোমাদের অনেক মুসলমানের দোকানে লেখা আছে—নো বীফ—গোরুর মাংস বিক্রি হয় না। আমার কয়েকজন বন্ধু ঐ বিজ্ঞাপন দেখে হেসেছিলেন। তাঁরা ঐ নোটিসের অর্থ বুঝতে পারেন না। আমি তখন একবার তাঁদের মনে করিয়ে দিয়ে-ছিলাম, লন্ডনের কয়েকটা ভদ্র রেস্তোরাঁয় ঐ ধরনের নোটিস টাঙানো আছে। সেখানে লেখা—নো মিউজিক—এখানে গান-বাজনা হয় না।"

সায়েব আরও বলেছিলেন, "বিলেতের এক নাম-করা কোম্পানির অনেকগুলো রেস্তোরাঁ আছে। তাদের একটা বাৎসরিক রিপোর্ট পড়েছিলাম। তাঁরা তিন শ বাজিয়েকে মাইনে করে রেখে দিয়েছেন। বছরে তাদের জন্য দেড় লক্ষ পাউন্ড খরচা করতে হয়। ওই ধরনের কোনো রিপোর্ট নিশ্চয়ই জনসনের হাতে গিয়ে পড়েছিল; এবং তার পর যদি তিনি লিখে থাকেন—মিউজিক ইজ অ্যান এক্সপেন্সিভ নয়েজ, তা হলে তাঁকে মোটেই দোষ দেওয়া যায় না।"

আমার মুখের হাবভাব থেকেই সায়েব বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, "হোটেলে কিংবা রেস্তোরাঁয় সংগীত পরিবেশন করে বলেই এরা কিছু জানে না, এমন নয়। কলকাতায় এমন সব সঙ্গীতশিল্পীদের দেখেছি, সুযোগ এবং সুবিধে পেলে যারা হয়তো বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পারতো।"

বোসদাও বলতেন, "গোয়ানিজ এবং ক্রীশ্চান ছোকরাগুলোকে তোমরা চেনো না, সংগীতে এদের যেন জন্মগত অধিকার। সংগীত ছাড়া যেন আর কিছুই বোঝে না। এদের জীবনে যেন আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সারা দিন চেলো, ভায়োলিন, ক্ল্যারিওনেটগুলো কোলের পাশে নিয়ে শুয়ে আছে। সময় হলেই যন্ত্রের মতো জামা-কাপড় পরে নিচের নেমে যাচ্ছে। মমতাজ রেস্তোরাঁয় উপস্থিত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য একমনে বাজিয়ে তারা আবার যন্ত্রের মতোই উপরে ফিরে আসে। জামা-কাপড় খুলে ফেলে, বিছানায় শুয়ে পড়ে। এদের যেন আর কোন জীবন নেই।

"এরই মধ্যে প্রভাতচন্দ্র গোমেজ যেন ব্যতিক্রম। তিনিও যন্ত্রের মতো শাজাহান হোটেলের সংগীত পরিচালনা করে থাকেন বটে, কিন্তু অবসর সময়ে তিনি যেন অন্য এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। সে-পৃথিবীতে সুরের রাজারা সবার অলক্ষ্যে এসে ভিড় করে থাকেন।"

গোমেজের ঘর থেকে বেরিয়ে কনি আবার রোদ্রে এসে বসলো। সে যেন হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। প্রভাতচন্দ্র গোমেজ যেন তার সব গর্ব এবং দম্ভকে মুহূর্তে নষ্ট করে দিয়েছে।

কনি সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বললে, "এমন রোদ যদি আমরা ইউরোপে প্রতিদিন পেতাম, তা হলে আমাকে আর করে খেতে হতো না।"

আমি ওর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে কনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কনি হেসে বললে, "এমন রোদে পুড়তে পেলে আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মেয়ে সুন্দরী হয়ে উঠতো। এখন যারা অ্যাট্রাক্টিভ, তারা প্রকৃতির খেয়াল; তখন সুন্দর হওয়াটাই নিয়ম হয়ে যেতো। আমাদের আর কদর থাকতো না।"

রাত্রের ক্যাবারে সুন্দরীদের যে একটা সাধারণ জীবন থাকে, তার সঙ্গে যে সহজ হয়ে কথা বলা যায়, তা ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না। কনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "ভাবছি, এবার থেকে প্রত্যেক বছর একবার ভারতবর্ষে আসবার চেষ্টা করবো। তা হলে গায়ের রঙটা ভদ্রস্থ করে নেওয়া যাবে।"

কনি আরও বললে, "দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন?" একটা সূর্যমুখী চেয়ার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "বসে পড়ো।"

আমি বসলাম। কনি বললে, "হ্যারিকে দেখেছো?"

আমার ধারণা ছিল, রাতের মত্ততার পর ল্যামব্রেটা এখনও ঘুমিয়ে আছে। কনিও তাই ভেবেছিল। আমি বললাম, "মিস্ কনি, আপনি বসুন। আমি দেখছি, মিস্টার ল্যামব্রেটা এখনও ঘুমোচ্ছেন কিনা।"

কনি বললে, "যদি হ্যারি ঘুমিয়ে থাকে, তবে ওকে ডিসটার্ব করবেন না।"

মনে মনে একটু রাগ হলো। একজন ক্যাবারে গার্ল-এর সাকরেদ, কিছু এমন ভি-আই-পি নন যে, তাঁকে ব্রেকফাস্টের সময়েও ডিসটার্ব করা যাবে না! মুখে অবশ্য বললাম "আমরা হোটেলে কাজ করি; লোককে ডিসটার্ব না করার আর্ট আমাদের জানা আছে।"

আস্তে আস্তে ল্যামব্রেটার ঘরের সামনে এসে দেখলাম, দরজা বন্ধ। জানলা দিয়ে উঁকি মেরেই কিন্তু আমার ভয় হলো। বিছানায় কেউ শুয়ে আছে বলে মনে হলো না। ভালো করে দেখবার জন্যে জানলাটা সম্পূর্ণ খুলে দিলাম। কোথায় ল্যামব্রেটা? সে তো বিছানায় নেই! ল্যামব্রেটা তবে কি বাথরুমে? কিন্তু সেখান থেকেও তো কোনো শব্দ আসছে না! এবার দরজার গোড়ায় এসে নিজের ভুল বুঝলাম। দরজাটা বাইরে থেকেই চাবি বন্ধ।

কনি আমাকে ওখানে অপেক্ষা করতে দেখেই উঠে এল। নিজের দেহটা সম্বন্ধে ও যেন মোটেই সচেতন নয়। দেহটা আছে এই পর্যন্ত। সেটা ঢাকা থাকলো, না খোলা রইল, সেটা চিন্তা করবার বিষয়ই নয়। কনি

দরজার কাছে এসেই বললে, "হ্যারি ভিতরে নেই?"

"দরজা তো বন্ধ।" আমি বললাম।

কনি এবার যেন ভয়ে শিউরে উঠলো। "কোথায় গেল সে?"

আমাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন কনি অধৈর্য হয়ে উঠলো। "কিছু বলছো না কেন? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে?"

ভাল বিপদে পড়া গেল। কোথায় ল্যামব্রেটা, তা আমি কেমন করে জানবো?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কনির চোখ ছলছল করছে। কোনো রকমে সে বললে, "তুমিই এর জন্যে দায়ী। কেন তুমি রাতে আমাকে ডেকে আনলে? একটা নিরীহ ছোট্ট মানুষ যদি তোমার ঘরে গিয়ে একটু গোলমাল করেই থাকে, সেটা সহ্য করা যায় না?"

কনির কথা শুনে আমি অবাক! আমাকে আক্রমণ করা তখনও শেষ হয়নি। কনি বলে চললো, "এই যে আমি, এতো সহ্য করি। আমি ও হ্যারি যে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মানুষের হাজার রকম অত্যাচার মুখ বুজে হজম করে যাই, আমরা তো কারুর কাছে কমপ্লেন করি না। তুমি আমাকে ডেকে না আনলে গত রাত্রে আমাকে কিছুই বলতে হতো না।"

আমার তখন কথা বলবার অবস্থা নেই। কনির সজল চোখের দিকে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। কনি সত্যিই যেন আমার উপর রেগে গিয়েছে। তার সব অশান্তির জন্যে আমিই যেন দায়ী। কনি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, "জানো, গত কাল ও বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল? ঘরের মধ্যে ঢুকে কতবার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ক্ষমা চাইলাম, তবু ও আমার সঙ্গে কথা বললে না। অভিমানে ও মুখ ঘুরিয়ে থাকলো।"

আমি হয়তো কিছু বলতাম। কিন্তু তার আগেই ছাদের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। দ্রুতবেগে গিয়ে টেলিফোনটা ধরলাম। রোজী কথা বলছে।

"হ্যালো, রোজী। কী ব্যাপার?"

"না ইয়ংম্যান, তোমার সঙ্গে রোজীর ক্যাপাসিটিতে কথা বলছি না। টেলিফোন অপারেটরের ডিসেণ্ট্রি হয়েছে। বোর্ডে বসতে পারছে না। তাই আমি কাজ করছি।"

"অপরকে সাহায্য করার যে মনোবৃত্তি তুমি দেখাচ্ছো, তা সত্যি প্রশংসাযোগ্য!" আমি বললাম।

রোজী বললে, "তোমাকে ডিসটার্ব করার ইচ্ছে আমার ছিল না। ফোন এসেছে। একজন ভদ্রলোক তোমাদের কনির সঙ্গে কথা বলবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন। তাঁকে দিলাম।"

টেলিফোনে কথা বলবার মতো মনের অবস্থা তখন নেই। তবু কথা বলতে হলো।

"হ্যালো।" ওদিক থেকে কে যেন বলে উঠলো।

আমি বললাম, "ইয়েস।"

ভদ্রলোক কনি দি উয়োম্যানের মধুকণ্ঠ শোনবার জন্যে বোধ হয় প্রস্তুত হয়েছিলেন। তার জায়গায় পুরুষকণ্ঠ শুনে যেন একেবারে হতাশ হলেন। বললেন, "হামি একটু কোনির সংগে বার্তাচিত্ করতে চাই।"

"কে আপনি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হামি একজোন পাব্লিক আছি। থোড়া ডিসকাশন ওঁর সাথে কোরা দরকার।"

আমি বললাম, "সরি। ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যায় না। উনি কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলেন না।"

পাব্লিক ভদ্রলোকটি যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন। "এ আপনি কী কোথা বোলছেন। হামাদের সংগে মীট না করলে পরিচোয় কী কোরে হোবে?"

হোটেলে চাকরি করলে রাগ করবার উপায় নেই। শরীরে রাগ থাকলে তার কপালে হোটেলের বিনামূল্যে পরিবেশিত অন্ন নেই। তাই তখনও ভদ্র ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করে বললাম, ওঁর সঙ্গে দেখাও হয় না; ফোনেও কথাবার্তা চলে না।

পাব্লিকটি বললেন, "প্রাইম মিনিস্টারের সংগে ফোনে কথা চলে আর আপনাদের কনি দি উয়োম্যানের সংগে কথা চলে না?"

বললাম, "আজ্ঞে তাই। তবে আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, বলতে পারেন; আমি কনিকে জানিয়ে দেবো।"

ভদ্রলোক হতাশ হয়ে বললেন, "হামার দুনিয়ার অনেক হোটেল আমি দেখেছি, কিন্তু ক্যালকাটার মতো ব্যাড ম্যানারস কোথাও দেখিনি।" তারপর নিবেদন করলেন "হামার মোশয়, জানবার দোরকার ছিল, হামার প্রেজেণ্টেশন উনি পেয়েছেন কিনা?"

"কী প্রেজেণ্টেশন?" আমি প্রশ্ন করলাম। দূর থেকে দেখলাম, কনি আমার দেরিতে অধৈর্য হয়ে উঠছে।

পাব্লিকটি বললেন, "কুছু ফ্লাওয়ার আর কুছু ফ্রুট পাঠিয়েছি। আজ সকালে। এখনও উনি পাননি?"

"যদি পাঠিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই পাবেন।" এই বলে ফোনটা নামিয়ে দিলাম।

কনি আমার কাছে ছুটে এসে বললে, "কোনো খারাপ খবর নাকি?"

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "না। এই ফোনের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।"

কথা শেষ না করতে করতেই দেখলাম, একটা বিশাল ফুলের তোড়া এবং এক ঝুড়ি ফল নিয়ে গড়ুবেড়িয়া উপরে উঠে এল। গড়ুবেড়িয়া সেগুলো মেমসায়েবের চরণতলে

নিবেদন করলে। দেখলাম, ফুলের তোড়া থেকে একটা কার্ড ঝুলছে। তাতে সেই পাবলিক ভদ্রলোকটির নাম এবং টেলিফোন নম্বর ঝুলছে।

কনি তাকে পাঠানো উপহারের দিকে ফিরেও তাকালো না। সে তখন ছোটো মেয়ের মতো কাঁদতে আরম্ভ করেছে। ওকে সেই মুহূর্তে দেখে মনে হলো, সে যেন আমাদের আমতা বা ডোমজুরের কোনো সরল মেয়ে; আমাদের এই বিশাল শহরে তার সঙ্গের সাথী যেন হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

গুড়বেড়িয়া মেমসায়েবকে কাঁদতে দেখে ঘাবড়ে গেল। আমাকে তার নিজের ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে? মেম-সায়েবের কি ফুল পছন্দ হয়নি?"

আমি বললাম, "আমাদের বেঁটে সায়েবের কোনো খবর রাখো?"

গুড়বেড়িয়া আমাদের রক্ষে করে দিল। সে বললে, "বেঁটে সায়েব? তিনি তো বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছেন।"

যাবার আগে ল্যামরেটো গুড়বেড়িয়ার কাছে খবর নিয়েছেন, কাছাকাছি কোথায় বেড়ানো যায়। গুড়বেড়িয়া বলেছে, সেণ্ট্রাল এভিনু ধরে কিছুটা হাঁটলেই এসপ্ল্যানেড পড়বে। তারপর চৌরঙ্গী ধরে কিছুটা গেলেই গড়ের মাঠ—হাওয়া খাবার জায়গা। সায়েব তখনই গুড়বেড়িয়াকে একটা আধুলি দিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছে। যাবার আগে বলেছেন, "মেমসায়েব খোঁজ করলে বোলো আমি মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছি।"

কনি এবার যেন একটু সাহস ফিরে পেল। তার মেঘভরা মুখে হাসির সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে পাওয়া গেল। বললে, "দাঁড়াও একটু মজা করা যাক।" পায়ের গোড়া থেকে সে ফুলের তোড়াটা তুলে নিল। কার্ডটা খুলে নিয়ে সে ছিঁড়ে ফেলে দিল। আমার কাছ থেকে এক-টুকরো কাগজ নিয়ে তাতে কয়েকটা কথা লিখে গুড়বেড়িয়াকে বললে, "সায়েবের ঘরের চাবিটা কোথায়?"

গুড়বেড়িয়া বোর্ড থেকে চাবি এনে ঘরের দরজাটা খুলে দিল। কনি ভিতরে ঢুকে একটা ফুলদানির খোঁজ করতে লাগল। বললে, "এ-কেমন হোটেল যে, প্রত্যেক ঘরে ফুলদানি নেই?"

বললাম, "নিচের সব ঘরে আছে। শুধু ছাদে নেই।"

"কেন? এখানে যারা থাকে, তারা কি মানুষ নয়?" কনি একটু বিরক্ত হয়েই যেন মন্তব্য করল। তারপর একটা কাঁচের গেলাসের মধ্যেই যত্ন করে ফুলগুলোকে সাজিয়ে রাখলে।

সাজানো শেষ করে দরজা বন্ধ করতে করতে কনি বললে, "জানো, হ্যারি অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, এই অচেনা শহরে কনি কোথা থেকে তার জন্যে ফুল যোগাড় করে আনলো।"

হ্যারিকে খুশী করবার একটা সুযোগ পেয়ে কনি নিজেও যেন বেশ খুশী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সে আনন্দ কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। আমার হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কনি যেন আবার চিন্তিত হয়ে পড়লো।

আমি বললাম, "এত ভাববার কী আছে? এখনই ভদ্রলোক এসে পড়বেন।"

কনি যেন তেমন ভরসা পেল না। সে বললে, "কলকাতা শহরে ভোরবেলায় এত কী দেখবার থাকতে পারে? আমার ভয় লাগে। বামন মানুষ, কোথাও রাস্তা পেরোতে গিয়ে হয়তো বিপদ বাঁধিয়ে বসলো।"

আমি আবার ভরসা দিলাম। বললাম "দেখুন না, এখনই এসে পড়বেন। আপনারা দুজনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট বসতে পারবেন।"

আর মনে মনে বললাম, "এত আদিখ্যেতা কেন! বদমেজাজী লোকটা যতক্ষণ বাইরে থাকে, ততক্ষণই ভাল। এসেই হয়তো আবার গোলমাল শুরু করবে।"

কনি বললে, "হ্যারি এখনই এসে পড়বে, তাই না?"

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, "এই এসে পড়লো বলে।"

ভবিষ্যদ্বাণীটি আন্দাজে করেছিলাম, কিন্তু সেটা যে এমনভাবে মিলে যাবে আশা করিনি। আমার কথা শেষ হওয়া সঙ্গে সঙ্গেই ছাদের দরজা খুলে যিনি ঢুকলেন, তিনি ল্যামরেটো। ল্যামরেটোর মেজাজ এখন বেশ ভালো রয়েছে। সে গুনগুন করে গান গাইছে।

সে গানটা কি, প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। কনি নিজেও বুঝতে না পেরে ল্যামরেটোর মুখের দিকে তাকালে। তারপর আশ্চর্য হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "কী গান গাইছো, হ্যারি?"

হ্যারির ইংরেজী উচ্চারণ সাবধানে অনুসরণ করে এবার বুঝতে পারলাম, সে কি গান গাইছে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, খাঁটি ভারতীয় প্রথায় হাততালি দিয়ে ল্যামরেটো গাইছে—জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

ল্যামরেটো কি সত্যিই আবার পাগল হয়ে গেল? সে বললে, "কনি, ওয়াণ্ডারফুল গান।" তারপর নেচে নেচে ভুল উচ্চারণে

গাইতে লাগল "পতিতে পাভকে সীতা-রাম।"

ল্যামব্রেটাকে কনি প্রশ্ন করলে, "কী করছিলে এতক্ষণ? আমি ভেবে ভেবে মরি।"

ল্যামব্রেটা বললে, "হ্যাঁ, কনি ঐটাই তো তোমার স্বভাব।" তারপর ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বললে, "আমার জন্যে ভেবে ভেবে তোমার তো ঘুম হয় না। আমার জন্যে ভেবে ভেবে তোমার নেকেড্ ড্যান্সের রিদেম নষ্ট হয়ে যায়!"

কনি যেন ল্যামব্রেটার কাছ থেকে এই উত্তর শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তার চোখ দুটো আবার ছলছল করে উঠলো। সে বললে, "হ্যারি! পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তুমি আমাকে এই কথা বললে!"

প্রভাতের প্রসন্নতা সত্ত্বেও হ্যারির উপর এর প্রভাব বিস্তার করেছে। সে যেন সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পারলো।

কনির হাতটা ধরে বললে, "তোমার সঙ্গে রসিকতা করছিলাম। তুমি এখনও [illegible] আমার রসিকতা বোঝো না।"

কনিও [illegible] অপ্রস্তুত হয়ে চোখের জল মুছে নিল।

ল্যামব্রেটা বললে, "ওই দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে গঙ্গার ধারে এসে গিয়েছি বুঝতে পারিনি। সেখানেই দেখলাম, একদল লোক ফুটপাথের উপর বসে বসে গান গাইছে। ভেরি সুইট গান। ভেরি নাইস পিপল। রিয়েল জেণ্টলম্যান। তারা আমাকে দেখেই গান বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাকে তারা নমস্কার করলে। আমি বললাম, তোমরা কী গান গাইছো? তোমাদের সুইটহার্টদের জন্যে গান?"

"ওরা আমার কথা বুঝতে পারলে না। ওরা সব মার্কেণ্টাইল ফার্মের বেয়ারা, দারোয়ান। ওরা বললে, "এখন ভোরবেলা, এখন কেবল গড্। এখন কেবল সীতারাম। সীতারাম।"

"একজন দেখলাম একটু একটু ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললে, হুজুর, হামি লোগ ভোরবেলায় কেবল সীতারাম, সীতারাম। ঠিক বলেছেন হুজুর, সীতারামজীর হার্ট ভেরি সুইট।"

আমরা দুজনে ল্যামব্রেটার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনছি। সে বললে, "ওয়াণ্ডারফুল গান।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেননি তিনি। গঙ্গার ধারে, ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের সামনে তিনিও গান ধরলেন রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

কলকাতার ফুটপাথের নাগরিকরা সায়েবকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছিল না। সায়েবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের কষ্ট হচ্ছে। অথচ সায়েবকে কোথায় বসতে দেবে?

সায়েবের তখন গানের নেশা ধরে গিয়েছে। তিনি নিজেই এসে ওদের সংকীর্তন মাঝখানে বসে পড়লেন। সায়েব ওদের অনেক গান নকল করেছেন। এই গানও তিনি ধরে ফেলেছেন। হাতে তাল দিয়ে দিয়ে, গানের অর্থ না বুঝে তিনি তখন প্রচণ্ড উল্লাসে গেয়ে চলেছেন রঘুপতি রাঘব।

সায়েবকে তার গানের সঙ্গীরা যত্ন করেছে। বলেছে, "হুজুর, আমরা কয়েকটা ফুল দেবো আপনাকে?"

সায়েব বলেছেন "নিশ্চয়ই। ফ্লাওয়ার দাও।"

ওরা সায়েবকে গোটা কয়েক গাঁদাফুল দিয়েছে। বলেছে, "একলা একলা ফিরতে পারবেন তো?"

সায়েব বলেছেন, "হ্যাঁ।"

ওরা কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। বলেছে, "কলকাতা হুজুর, ভেরি খারাপ শহর।"

ওদের একজনই কেউ সায়েবের সঙ্গে শাজাহান হোটেলের গেট পর্যন্ত এসেছে।

পকেট থেকে কয়েকটা গাঁদাফুল বার করে ল্যামব্রেটা আমাদের দেখালে। বললে, "ওয়াণ্ডারফুল।"

গুনগুন করে নতুন শেখা গান গাইতে গাইতে ল্যামব্রেটা নিজের ঘরে ঢুকলেন। পরম যত্নে তাঁকে দেওয়া গাঁদাফুলগুলো টেবিলের উপর রাখলেন। কনির রূপমুগ্ধ কলকাতার পাবলিকদের পাঠানো মূল্যবান ফুলের তোড়া সত্যিই যেন ওই সামান্য কয়েকটা গাঁদাফুলের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে রইল।

আমি নিজের ঘরে চলে গিয়ে, ডিউটিতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

কিন্তু আবার বাধা পড়লো। বাথরুমে যাবার জন্যে দরজাটা খুলতে যাচ্ছি, এমন সময় গুড়বেড়িয়া এসে বললে, "মেমসায়েব আপনাকে আবার ডাকছেন।"

আবার গেলাম। আমাকে দেখেই ল্যামব্রেটা বললে, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। কনিকে সমস্ত দুপুর ধরে আমি শেখাবো, তারপর ড্যান্স করতে করতে আমরা দুজনে গাইবো রঘুপতি রাঘব রাজারাম। [illegible] সারপ্রাইজ!"

কনি বললে, "তোমার কী মনে হয়? গুড আইডিয়া?"

আমার মুখটা শুকিয়ে গেল। আমি বললাম, "আপনারা আর্টিস্ট, আপনারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।"

কনি বললে, "তা তো জানি। কিন্তু শাজাহান হোটেলের অতিথিরা কী খুশী হবেন?"

ল্যামব্রেটা বললে, "ওয়াণ্ডারফুল। প্রত্যেকটা মানুষ খুশী হতে বাধ্য।"

আমি বললাম, "গডের নাম শোনবার জন্যে কেউ আমাদের হোটেলে বড় একটা আসে না।"

কনি বললে, "ওদের রুচি তো আপনারা তৈরি করবেন।"

আমি বললাম, "আমি নতুন মানুষ, ঠিক জানি না। তবে মিস্টার সাতা বোস বলেন রুচি অনেকদিন আগে তৈরি হয়ে গিয়েছে। এক যুগের কলকাতাওয়ালারা তাঁদের রুচির ছাঁচটা আরেক যুগের হাতে দিয়ে বিদায় নেন। তাঁরা আবার অন্য যুগের হাতে সেই লোহার ছাঁচটা দিয়েই চলে যান। তাই শাজাহান হোটেলের কোনো পরিবর্তন হয় না। এখানে সেই আদি অকৃত্রিম মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাই চালু রয়েছে।"

ল্যামব্রেটা অসন্তুষ্ট হয়ে বললে, "তা হলে এই গানটা চলবে না বলছো?"

"আমার মনে হয় চলবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।" আমি উত্তর দিলাম।
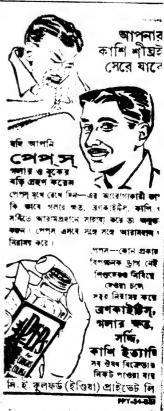
কনি বললে, "তোমার মতের উপর কথা চলে না।"

আমি বললাম, "ওই গানের মধ্যে এমন একটা লাইন আছে, যাতে আমাদের অতিথিরা অফেণ্ডেড হতে পারেন।"

"কোন্ লাইনটা?" ল্যামরেটা চিৎকার করে উঠলেন।

"সব কো সুমতি দে ভগবান।" আমি বললাম। "আমাদের অতিথিরা কী ভাববেন? তাঁদের কি সুমতি নেই?"

ল্যামরেটা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললে, "তোমরা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। এখনই ঘর থেকে চলে যাও। আমি এখন বিশ্রাম নেবো।"

কনিও এবার যেন ভয় পেয়ে গেল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। আমিও আর-এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। আমাদের পিছনে ল্যামরেটা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে।

কনি বললে, "সকালের দিকে ওর মেজাজ সাধারণত ভাল থাকে। আজ ভোর-বেলাতেই চটে উঠলো।"

আমি নীরবে হাসলাম।

কনি বললে, "স্যরি, তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম। এখন চলি। আবার দেখা হবে রাতে। মমতাজ রেস্তোরাঁয়।"

মমতাজ-এ আজ তিলধারণের জায়গা নেই। সমস্ত টেবিল অনেক আগেই বুকড্ হয়ে গিয়েছে। হাই সার্কেলের চাপে পড়ে বোসদা দু-একটা একস্ট্রা টেবিলও কোনো রকমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এমন সব স্তর থেকে মাঝে মাঝে অনুরোধ আসে যে, কোনো রকমেই না বলা যায় না।

তিনি আবার কয়েকজন লোককে সামনের দিকে বসাবার ব্যবস্থা করে গেল। বোসদা বললেন, "কিছুই বলা যায় না। সামনের কয়েকটা রোতে বসবার জন্যে লোকে ঘুষ দিতেও রাজী। টাকায় পারে না এমন কাজ নেই। অপরের ঘাড়ে বিনা পয়সায় মদ খেতে ওস্তাদ এমন লোকও এসে জুটেছেন। উনি একজন আন্তর্জাতিক এক্সপার্ট।"

মদের সেল আজ আরও বেশী। আবগারী ইন্সপেক্টর উঁকি মেরে দেখে খুশী হয়ে চলে গেলেন। গভর্নমেন্টের ইনকাম বেড়ে যাবে। 'আবগারী শুল্কে', 'ফূর্তি শুল্কে' খাতে অনেক টাকা ট্রেজারিতে জমা পড়বে।

জামা-কাপড় পরে হলের মধ্যে ঢুকে দেখলাম, আজ কয়েকজন মহিলা এসেছেন। কলকাতা কালচারের অঙ্গ এই ফ্লোর-শো। শিক্ষিতা এবং আধুনিকা ভারত-ললনারা তাই এই তীর্থভূমিতে না এসে পারেন না।

বোসদা হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, "আমরা যে রেটে সভ্য হয়ে উঠছি, তাতে অদূরভবিষ্যতে মডার্ন ভারতীয়রা স্ত্রীর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বেলি-ডান্সারদের দেখতে আসবেন। পশ্চিম যে দরজা খুলে দিয়েছে। সাধে কি আর কবিগুরু লিখে গিয়েছিলেন দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে এই শাজাহানের মহামানবের সাগরতীরে।"

যে মহিলারা পুরুষের এই জলসায় বকের মতো বসে আছেন, তাঁদের সাজ-সজ্জার বর্ণনা বোসদার এক অধ্যাপক বন্ধু কিছুদিন আগে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নামও কী এক বোস। শাজাহান হোটেলের ভিতরটা দেখবার কৌতূহলে তিনি একবার এসেছিলেন। কলকাতার মধ্যবয়সী আধুনিকাদের দু-একজনকে দেখিয়ে বোসদা প্রশ্ন করেছিলেন, "এদের সাজ-সজ্জায় কোন্ রীতির ছাপ রয়েছে?"

ভদ্রলোক বলেছিলেন, "এটি বোধ হয় সম্পূর্ণ নতুন রীতি। এমন 'আস্ত-আভাস ব্লাউজ' ও 'মিছে-আবরণ শাড়ি' আমাদের পূর্বপুরুষদের কল্পনারও অতীত ছিল।"

বোসদা হেসে বন্ধুকে বলেছিলেন, "দেখতে এসেছো দেখে যাও। কিন্তু মহাজনদের পথ অনুসরণ কোরো না। তোমাদের সাহিত্যিক নগেন পাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে প্রথম এসেছিলেন। এখনও তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। রোজ একবার বারে না এলে তাঁর চলে না।"

নগেন পালকে আজও দেখলাম। ক্যাবারে সুন্দরীর আবির্ভাব প্রতীক্ষায় বারের এক কোণে একটা হুইস্কির পেগ নিয়ে বসে আছেন। নগেন পাল সামনে ছোট্ট একটা নোটবই রেখেছেন। মদের ধাক্কায় কোনো আইডিয়া এলেই ওখানে নোট লিখে রাখেন।

"আরে মশাই! এদিকে শুনুন।" দেখি ফোকলা চ্যাটার্জি আমাকে ডাকছেন। আজকেও তিনি এসে গিয়েছেন। ফোকলা চ্যাটার্জির সামনে এক লাজুক ছোকরা চুপচাপ বসে রয়েছে। চুলগুলো ঢেউ-খেলানো। মুখের মধ্যে নবযৌবনের নিষ্পাপ সরলতা এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। ইভনিং-স্যুট পড়েছে ছেলেটি।

"দেখুন, এর কোনো মানে হয়? অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেয়ে কখনও ক্যাবারে দেখা যায়? আপনি বলুন তো?" ফোকলা আমাকে প্রশ্ন করলেন।

ছোকরা দেখলাম এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে বসে আছে।

ফোকলা বললেন, "তুই নির্ভয়ে একটু ড্রিঙ্ক কর। কেউ জানতে পারবে না। আমি মামা হয়ে তোকে অ্যাডভাইস দিচ্ছি। কেউ জানতে পারবে না। বাড়িতে তো বলে এসেছি, তুই আমার সঙ্গে থাকবি। অত যদি ভয় হয়, আজ রাত্রে আমার কাছে থেকে যাবি।"

ফোকলা আমাকে বললেন, "আপনাদের হোটেলের সবচেয়ে দামী ককটেল কী আছে? তাই দিয়েই ভাগ্নের হাতেখড়ি দিই।"

আমি বললাম, "সিলভার গ্রেড্। এক পেগ সাড়ে বারো টাকা।"

"ওতে কী আছে?" ফোকলা জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম, "ভদ্‌কা, ফ্রেশ লাইম, সিরাপ আর ক্রিম। হাতেখড়ির পক্ষে সুবিধে হবে কি? তার থেকে ম্যানহাটান ককটেল দিই না? হুইস্কি, ভারমুথ আর চেরি shaked with ice।"

ফোকলা রেগে উঠলেন। বললেন, "মশায়, এটি আমার ভাগ্নে। ভাগ্নী নয়। ভারমুথ দিয়ে ব্যাটাছেলের অন্নপ্রাশন হয়, আমি কখনও শুনিনি। আর দাম তো দেখছি সাড়ে চার টাকা। তাতে কী মাল থাকবে?"

সিলভার গ্রেড-এর অর্ডার দিয়ে দরজার কাছে এসে দেখলাম বোসদা হাসছেন। বললেন, "যার হাতেখড়ি হচ্ছে, সে কে জানো? মিসেস পাকড়াশির সন্তান। পাকড়াশি সাম্রাজ্যের প্রিন্স অফ ওয়েলস!"

এবার শো আরম্ভ হবার কথা। আমাকে স্টেজের উপরে উঠে বলতে হবে, "লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান, আই প্রেজেন্ট টু ইউ কনি দি উয়োম্যান।"

কিন্তু ল্যামরেটা এখনও হাজির হয়নি। কনিও নেই। তাড়াতাড়ি লিফটে চড়ে উপরে উঠে দেখলাম, দরজার সামনে ন্যাটাহারি-বাবু দাঁত বার করে হাসছেন।

"কনি আর ল্যামরেটাকে দেখেছেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "আমাকে এখন জ্বালাতন করবেন না। আপনার বামনাবতার কালকে আমার দুটো বালিশ ছিঁড়ে ফেলেছে। ঘরের মধ্যে তুলোতে বোঝাই। আমি কিছুতেই এই অত্যাচার সহ্য করবো না।"

কনির ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম। কিন্তু কোথায় কনি? কনি ভিতরে নেই। দরজা খোলা পড়ে রয়েছে।

(ক্রমশ)

সংবাদপত্র-পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে, কিছুকাল পূর্বে অশালীন পরিচ্ছদ পরিধান সম্বন্ধে কোন পত্রিকায় নানারূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত এই প্রসঙ্গে কেউ দ্বিতীয় কোন মতের অবতারণা না করায় বিষয়টি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি। অশালীন পোশাক পরা যে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তবে আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু দেশ ও কালভেদে পরিচ্ছেদ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তমবাপে আচ্ছাদিত ভদ্রমহিলারা ট্রামে বাসে যথেষ্ট ওঠা-নামা করছেন এরকম দৃশ্য চিন্তা করতে গেলে কল্পনাকে বিস্তর দৌড় করানো প্রয়োজন, এবং সেটা অনাবশ্যকও বটে। পরিচ্ছদে হ্রস্বতার চিহ্ন দেখে আজকে যাঁরা কষ্টি কষ্টি বলে আর্তনাদ করছেন, কে জানে ইতিহাস হয়তো তাঁদের প্রতি কৌতুকভরে দৃকপাত করছে।

শালীনতার মানদণ্ড নামক বস্তুটি নলিনীদলগত জলের মত অতিশয় চপল। মাত্র কয়েক দশক আগেও ইয়োরোপের ক্রীড়াঙ্গনে শাড়ির মত লম্বা পোশাক পরে মহিলাদের টেনিস খেলতে দেখা গেছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তের পরিধি গেছে ছোট হয়ে। গ্রীষ্মের নিষ্ঠুর দাবদাহ থেকে জেট প্রপেলিত বিংশ শতাব্দী আপনাকে অবহেলাভরে শিকাগোর মলয়-সমীরে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে কিন্তু উভয় নগরীর বিচিত্র ব্যবধানে অভ্যস্ত হতে গিয়ে আমাদের অপরিণতবুদ্ধি ছাত্রদের ঘটছে চিত্তবিকলন। ভারতীয় মহিলারা ঘোর গরমে দেহের যতটা অংশ আবৃত করেন শীতেও তাই—আবরণের সংখ্যা কিছু বাড়ে মাত্র। অন্য সভ্যদেশে মহিলারা কালোপযোগী পোশাক পরে প্রকৃতির রোষ কটাক্ষকে অগ্রাহ্য করেন। ভারতীয় শালীনতা সেই দেখে সভয়ে চক্ষু অবনত করে বলে, ছি, ছি, এ অতিশয় বর্বরতা। প্রসঙ্গক্রমে একজন অতি শালীনচিত্ত ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি অতি প্রত্যূষে প্রথম বরফপাতের দৃশ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাত্রিবাস পরেই পথে নেমে ছবি তুলেছিলেন। প্রতিবেশীরা অশালীনতার অভিযোগ করাতে তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন "এদেশের মেয়েরা গরমকালে প্রকাশ্য দিবালোকে যা ইচ্ছা তাই পরে বেড়ায়, আমার তো মশায় হাত পা সবই ঢাকা ছিল।" বলাই বাহুল্য, এক শ্রেণীর লোক যাঁদের দেশে সদাচারে বিশ্বাসী নন। এঁদেরই জন্য ক্লিভল্যাণ্ডে কার্নাভারে ও মিশিগানে মসুর ডাল সুপারমার্কেট কাউণ্টারের শ্রীবৃদ্ধি করছে।

পরিচ্ছদ-প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। স্যর ফ্রান্সিস ড্রেক প্রভৃতি এলিজাবেথীয় পুরুষেরা—যাঁদের সঙ্গে আমরা ছবিতে পরিচিত আছি—যে বিচিত্র বেশভূষা পরে জীবন কাটিয়েছেন, শালীনতার কথায় তাঁরা স্বভাবতই প্রাতঃস্মরণীয়। অত্যাধুনিক বীটনিকদের না হয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যে কোনো "সফল ব্যবসা-

প্রকৃতির রোষকটাক্ষ অগ্রাহ্য করেন

দারের" স্বচ্ছন্দ পোশাক দেখে হয়তো তাঁদের হৃৎকম্প উপস্থিত হতো। কিংবা হয়তো পরিচ্ছদে বিপ্লবের কোনো আভাস পেয়ে হাসলেট তাঁর বিখ্যাত সহচরকে "স্বপ্নেও ভাবেনি এমন বহু জিনিস ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে" জাতীয় খেদোক্তি করেছিলেন। প্রকৃতির অমোঘ লীলায় যাঁদের একদিন মানুষে রূপান্তরিত হলো; শেক্সপিয়রের সুদৃশ্য ও অসুবিধাদায়ক পোশাকও আজকের সরল লাইনের স্যুটে বিবর্তিত হয়েছে। ঐতিহ্য এবং শাড়িকে এক পর্যায়ে ফেলে অনেকে আজ বিদেশী মুদ্রা অর্জনে তৎপর হয়েছেন। শত শরৎকাল অতিক্রম করে বেঁচে থাকা সম্ভব হলে একবিংশ শতাব্দীর পুজোর বাজারে কেমন শাড়ি চলছে, বা আদৌ চলছে কিনা দেখা গেলে মন্দ হতো না।

কেননা শালীনতা-প্রসঙ্গে শাড়ির কথা উঠতে বাধ্য। শীতে গ্রীষ্মে বসন্তে এমন উত্তম আচ্ছাদন আছে কিনা সন্দেহ। শাড়ির প্রান্তদেশ আপনি মারোয়াড়ি পদ্ধতিতে

টেনিস খেলতে দেখা গেছে

গায়ে জড়াতে পারেন, অথবা কনাকর্ত্রীর কোঁচানো চাদরের ধরনে গলার দুদিকে দুলিয়ে দিতে পারেন। দরজীর শরণাপন্ন হওয়ার সংকট নেই, এমনকি আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে পছন্দসই শাড়ির বাতিল হওয়ার প্রশ্ন নেই। শাড়ির অগণিত সুবিধা সম্বন্ধে আমাদের মতদ্বৈধ থাকার কথা নয়। কিন্তু পৃথিবীর নানা জিনিসের মত চাঁদেরও অপর পিঠ অন্ধকার। এমন উদাহরণও অনেক সময় চোখের সামনে উপস্থিত হয় যখন শাড়ির দ্বারা শালীনতা বজায় রাখা তো দূরের কথা, পরিচ্ছদের নিম্নতম প্রয়োজনটুকুও সিদ্ধ হয় না। এসব অবশ্যই সংখ্যালঘুদের লঘুচিত্ততার নিদর্শন। এর দ্বারা সমাজহিতৈষীদের আতঙ্কিত হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। শক্তির অপব্যবহার পৃথিবীতে সব সময়েই হয়ে আসছে। সুতরাং শাড়িরও

"আমার ত' মশাই হাত-পা সবই ঢাকা ছিল!"

হবে এতে আর আশ্চর্য কি। আইন করে যদিও রুচিসম্মত বেশভূষা পরতে বাধ্য করা যায় কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিভেদে রুচি বিভিন্ন এবং এসব ব্যাপারে গাণিতিক কোনো সীমা নির্ধারণ সম্ভব নয় অতএব এই সমস্যার সহজ কোনো সমাধানও নেই। তবে, বর্তমান মেয়েদের সাজসজ্জার অধোগতি সম্বন্ধে

শাড়িপরা মহিলাদের দুরবস্থা দেখলে

আগে থেকে ব্যবস্থা না করলে যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে এমন কথা মনে করা ঠিক নয়। যেখানে সমস্যার চিহ্নমাত্র নেই সেখানেই অযথা কোলাহল করা আমাদের জাতীয় অভ্যাস। অথচ বিশেষভাবে অনুভূত অসুবিধার দূরীকরণ সম্পর্কে সহজ কোনো সমাধান কাজে পরিণত করতে আমাদের পর্বতপ্রমাণ আলস্য। শাড়ির কথাই ধরা যাক।

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর, আরামহীন আকার ধারণ করে যে, তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মত ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করছে তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অস্বাস্থ্য মানুষের কি করে সয় আমি ভেবে পাইনে......সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, শাসন চিরকাল ধরে যে সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পালানো উচিত—এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই এবং সুবিধেও নেই।" দুরাত্মার কৌশলের অভাব হয় না। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গদেশের মুকুটমণি কলকাতা মহানগরীতে বর্ষাকালে শাড়িপরা মহিলাদের দুরবস্থা দেখলে রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তির কথা অপ্রাসঙ্গিক হলেও মনে উদয় হয়। প্রকৃতির নানা অনুচরবর্গের শাসন ছাড়াও, শাড়ির কাছে আমরা সম্যকরূপে পরাভূত হয়ে আছি। আমাদের গতিভঙ্গী, দেহসৌষ্ঠব, চিন্তাধারা সবই শাড়ির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেবলমাত্র শাড়ির জন্য আমরা সলজ্জ, সংকুচিত, দ্বিধাগ্রস্ত। অবশ্য কাব্যের খাতিরে বলা যায় শাড়ি আকর্ষণীয়, শাড়ি অভিজাত, শাড়ি রহস্যময়। কবিত্বের দোহাই দিয়ে আরো বলা চলে, শাড়ির তরঙ্গে তরঙ্গে গ্রীক ভঙ্গিমার লালিত্য, বৈষ্ণবকাব্যের অপরূপ ভাবাবেশ। কিন্তু এই অতি বিষম অঙ্গাবরণ আবৃত করছে মেয়েদের আত্ম-প্রত্যয়, রুদ্ধ করছে তাদের স্বাভাবিক সাবলীলতা, অঙ্কুরে বিনাশ করছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বীজ। বোরখার সৌন্দর্য নিয়েও উর্দু ও ফারসীতে অনেক কবিত্বপূর্ণ বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। গালিব বলেছেন, এক কেশদামের চেয়েও কালো বোরখার মুখাবরণটি [illegible]

[illegible]

সেই সময় ছাতা অথবা রেনকোটের দরকার পড়ে। যে নীলবসনা সুন্দরী শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি যেতে গিয়ে কবির পরান সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, শাড়ি পেঁচিয়ে তাঁকে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার নীরব।

আমাদের কাব্য ও সাহিত্য থেকে শাড়িকে বাদ দিলে যা থাকে তা প্রায় হ্যামলেটবিহীন নাটকেরই সমতুল্য। শাড়ির সঙ্গে আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাড়ির অস্তিত্ব সমর্থন করতে গিয়ে একাধিক ঐতিহাসিক প্রমাণ করেছেন যে, কোনো এক যুগে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল ভারত-বাসী সেলাই না করা বস্ত্র পরিধান করতেন। কি কারণে বিদেশীদের প্রভাব শাড়িকে স্পর্শ না করে আমাদের চতুর্দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে গেল, ভাবতে গেলে বিস্ময়ে হত-বুদ্ধি হতে হয়। চীনা মেয়েদের লৌহ-পাদুকা বিসর্জন দিতে হলো আধুনিকতার মূল্য হিসাবে জাপানকে অন্ততঃ লাভ করতে কিমোনো উৎসর্গ করতে হয়েছে। 'তাহা দ্বারা আমরা যুগের উপযুক্ত না হইল তাহা লইয়া আমরা কি করিব?' অথচ প্রাচ্য আদর্শের দোহাই দিয়ে আমরা এখনো কর্মে উদাসীন, চিন্তাক্ষেত্রে স্থবির। সভ্যতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ নিতে আমাদের এখনো বহু যুগ বিলম্ব আছে।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১০৩)

সেদিন মাসীমা জেগে বসে ছিল। রোজ রোজ রাত করে আসে দীপু। এত কাজ তার কীসের সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল। প্রত্যেক দিন দীপু যখন বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে তখন ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে মাসীমার। সারা দিন সংসারের কাজে আর বিশ্রাম পায় না মাসীমা। একজন তো একটা নয়। ছোট সংসার হলে কি হবে। একদিন এই মানুষই রোগী স্বামীর সেবা করেছে, কিরণকে ইস্কুলের ভাত করে দিয়েছে, রান্না করেছে, বাসন মেজেছে, ঘর দোর উঠোন সব ঝাঁট দিয়েছে। আবার সব কাজের ফাঁকে পৈতের সুতোও কেটেছে। সুতো না কাটলে চলতো না। মাসীমা ভাবতো চাকর-ঝি থাকলে বুঝি কাজ কমে যেত অনেক। কিন্তু এখন দীপুর বাড়িতে আসার পর চাকর-ঝি থাকা সত্ত্বেও কাজও বেড়ে গেছে। অথচ ক্ষীরোদাই তো বেশি কাজ করে। রান্না করা থেকে শুরু করে পরিবেশন করা টরা সব কিছু। ঘর ঝাঁটও দিতে হয় না, বাজার করতেও হয় না, তার জন্যে লোক আছে। বাসন মাজা কাপড় কাচা এসব ভারের জন্যে ঝি ও রেখে দিয়েছে দীপু। আসলে কোনও কষ্টই রাখেনি দীপু। কিন্তু তবু মাসীমার কাজের যেন অন্ত নেই। অথচ হিসেব চাইলেও মাসীমা কাজের হিসেব দিতে পারবে না ঠিক মত। এক এক সময় মাসীমার মনে হয় ঝি-চাকর না-থাকলেই যেন ভালো হতো। তাহলেই যেন স্বস্তি পেত মাসীমা। তাই সন্ধ্যে হতে-না-হতেই মাসীমা আর থাকতে পারে না। চোখ দুটো ঢুলে আসে।

হঠাৎ যেন গায়ে ঠেলা লাগলো। ক্ষীরোদা ঠেলছে। মাসীমা জেগে উঠলো। কে এল? ডাকছিস কেন মা?

ক্ষীরোদাও কিছু কথা বলে না। মুখপুড়ী যেন দিন দিন বোবা হয়ে যাচ্ছে।

—কে ডাকছে? কী হলো কী?

তখন হঠাৎ খেয়াল হলো রাত অনেক হয়েছে। সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে।

—তা দরজাটাও খুলে দিতে পারিস না তুই মুখপুড়ী?—বলতে বলতে মাসীমা নিজেই উঠলো। তারপর সদর-দরজা খুলতেই দেখে দীপু। দীপঙ্করের চেহারা দেখে মাসীমা যেন থমকে দাঁড়াল। ইচ্ছে ছিল অনেক কথা বলবে। কিন্তু চেহারা দেখে একটু পিছিয়ে এল।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলে—তোমায় একটা কথা বলবো বাবা দীপু।

দীপঙ্কর একটু অবাক হয়ে গেল। বললে—কী মাসীমা?

—আমি তোমাকে ধরবো বলেই জেগে বসে আছি। বলি, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? আমার গলায় পা দিয়ে আমার পিণ্ডি চট্‌কাতে চাও?

দীপঙ্কর বললে ছি, ছি মাসীমা, আপনি আমার মায়ের মতন, আপনি এ-সব কী বলছেন?

—তা বলবে না? তোমার কি মায়া দয়া কিছু থাকতে নেই? দুটো খেতে পড়তে দিচ্ছ বলে কি একেবারে মাথা কিনে নিয়েছ? সংসারে খেতে-পরতে দেওয়াটাই কি সব? তুমি না খেতে দিলে কি আমরা কেউ বাচতুম না? তুমি মনে করেছ কী? তুমি মনে করেছ সারা দিন-রাত তুমি আপিস নিয়ে থাকবে আর আমরা তোমার ভাত জুগিয়ে যাবো? তোমার আপিসের জন্যেই আমরা আছি?

—কিন্তু মাসীমা......

—তুমি থামো। তোমার অনেক কৈফিয়ৎ শুনিছি, সেই সকাল বেলা আপিসে বেরিয়ে যাও, আর রাত পুইয়ে বাড়ি আসো, সংসারে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, আমরা বেঁচে আছি কি মরে গেছি, তার খোঁজ নেবারও একবার দরকার নেই? চারদিকে কত কি কাণ্ড চলেছে, বোমা পড়ছে, চালের দোকানে চাল দিচ্ছে না, এ-সব তো তোমারও দেখতে হয়! আপিস কি আর কেউ করে না? তুমি ভেবেছ কী বলো তো? তোমাকে আজ বলতেই হবে। তোমাকে ধরবো বলেই আমি আজ জেগে বসে আছি—

দীপঙ্কর যেন এতদিনে ধরা পড়ে গেছে হাতে-নাতে। যেন তার সব অপরাধ মাসীমা ধরে ফেলেছে। বললে—মাসীমা আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আমি অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছি—

মাসীমার মুখটা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। মাসীমা যেন এতক্ষণ অযথা না-জেনে তার দীপুর মনে ব্যথা দিয়ে ফেলেছে, বললে—তোমার আবার ঝঞ্ঝাট কীসের বাবা? তুমি খাও-দাও আপিস যাও, আর আপিস থেকে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ো, তোমার কীসের ঝঞ্ঝাট শুনি?

দীপঙ্কর কিছু বলতে পারলে না। বললেও হয়ত মাসীমা বুঝতে পারবে না। আর বোধহয় সবটা বলবার মতও নয়। সতী, লক্ষ্মীদি, দাতারবাবু, সনাতনবাবুর জন্যে তার এত ভাবনার মানে বুঝতে পারবে না হয়ত মাসীমা। আর শুধু কি তারাই? কিরণ? কিরণের কথাও তো মাথার মধ্যে ভারি হয়ে চেপে আছে সব-সময়। একটা বন্ধ সেলের মধ্যে বসে কিরণ প্রতি-মুহূর্তে ফাঁসির হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। সে ব্যাপারে দীপঙ্করের কিছু করবারও নেই। সে-সব কথাই বা মাসীমাকে কেমন করে বলা যায়। নিজের মা যাকে ভুলে গেছে, দীপঙ্কর কেন তাকে ভুলতে পারে না কিছুতেই? এ কেন হয়? কেন এমন হয় —দীপঙ্কর তা বুঝতে পারে না। আর পাঁচজন যেমন সংসারে খায়-দায়-ঘুমোয়-চাকরি করে, বিয়ে করে, তারপর একদিন বুড়ো হয়ে মারা যায়, দীপঙ্কর তেমনি করেই জীবন কাটাতে পারে তো! কেন তা হয় না?

মহাত্মা গান্ধী সেদিন ছাড়া পেয়েছেন। তাঁকে একলাই আগা খাঁ প্যালেস থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লী থেকে প্রেস-কমিউনিক্ বেরিয়েছিল—

In view of the medical reports of Mr. Gandhi's health, Govt. have decided to release him unconditionally. The release takes place at 8 p.m. May 6, 1944.

খবরটা বেরোবার পর থেকেই দীপংকরের মনে হয়েছিল একবার মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করে কিরণের কথা বলবে। বলবে—আপনি ভারতবর্ষের পিতা, সমস্ত লোক তাদের মুক্তির জন্যে আপনার দিকেই চেয়ে আছে। আপনার মতন আর একজন মানুষ ফাঁসির দিন গুণছে জেলখানায়। সেও ইণ্ডিয়ার ভালো চেয়েছিল। সেও আপনার মত নিজের বাবা নিজের মা, নিজের শরীর, নিজের লেখা-পড়া, নিজের স্বার্থ, কিছুর কথাই ভাবেনি। সে ইণ্ডিয়ার লোকদের জন্যেই আজ জেল-খানায় পচছে। আপনি জওহরলাল নেহরুর কথা ভাবছেন। আপনি আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেলের কথা ভাবছেন, আপনি সারা ভারতবর্ষের কথা ভাবছেন, বলতে গেলে আপনি সারা পৃথিবীর কথাই ভাবছেন। কিন্তু কিরণের কথা ভাববার যে কেউই নেই। তার আমিও নেই। আমি সতীর কথা, লক্ষ্মীদির কথা ভাবি, তার কথা ভাবিই না। তার মা-ও তার কথা ভাবে না। নিজের বিধবা মা ও তার কথা ভুলে গেছে। যাদের নাম খবরের কাগজে রোজ বেরোয়, তাদের কেউ-ই নয় সে। তার নাম ইতিহাস থেকে একদিন মুছেই যাবে। আপনার সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের চিঠি-পত্র চলছে, আপনি অনেক কথাই লিখেছেন তাতে, এবার কিরণের হয়ে কিছু লিখুন। তার মাকে আমার বাড়িতে এনে তুলেছি। তার মা জানেও না যে সে জেলের ভেতর ফাঁসির আসামী। আমি সে খবর দিইনি। দিতে পারিনি। কিরণের ফাঁসি বন্ধ হলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কোনও ক্ষতি হবে না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি না টেঁকে তো কিরণকে ফাঁসি না দিয়েও টিঁকবে না।

এমনি অনেক কথা, অনেক ভাবনা মাথার মধ্যে জোট-পাকিয়ে থাকে। কিন্তু দীপংকরের কিছুই করবার নেই। দীপংকর মাসীমার মুখের সামনে যেতেই ভয় পায়। যদি মাসীমা জানতে পারে। যদি এতটুকু আভাস পায়। মাসীমাকে দেখলেই তাই দীপংকর এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু আজ সেই জন্যেই একেবারে মাসীমার মুখোমুখি পড়ে যাওয়াতে প্রথমে চমকে উঠেছিল। কিরণের ফাঁসির খবর মাসীমা জানতে পেরেছে নাকি?

মাসীমা আবার বলতে লাগলো আর আমার কথা একবার ভাবো দিকিনি? আমি কী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে আমার সংসার করেছি? তুমি তখন ছোট, সে-সব কথা হয়ত তোমার মনেও নেই—। আর পরম শত্তুরের যেন তেমন ঝঞ্ঝাট না আসে। তার তুলনায় তুমি তো ভাল আছো বাবা! একে তুমি বলো ঝঞ্ঝাট? এইটুকু ঝঞ্ঝাটেই তুমি হয়রান হয়ে যাচ্ছো?

দীপংকর বললে—না মাসীমা, আপনি সে-সব বুঝবেন না—

—আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকলো, ও-সব বুঝেও দরকার নেই। কিন্তু যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? যে আপিস করে সে কি আর সংসার করে না?

দীপংকর বললে—এবার তো আমি চলে যাচ্ছি মাসীমা, আপনাকে তো বলেছি—

—তা বাবা, তোমার চাকরির উন্নতি হোক, তাতে তো আমি কিছু বলিনি, কিন্তু আমাদের তুমি এভাবে আর ঝুলিয়ে রেখো না, আমাকে তুমি আবার সেই নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের বস্তিতে রেখে এসো, আমি সেখানে আরামে থাকবো। এর চেয়ে আরামে থাকবো।

দীপংকর বললে—কিন্তু সন্তোষকাকার মেয়ে একলা এখানে থাকবে, তার কথাটাও তো ভাববেন একবার! তাকে কে দেখবে?

মাসীমা বললে—তার কথা আমি ভাববার কে? আমার পেটের মেয়ে সে, না আমার নিজের কেউ? আমার নিজের ছেলের কথা বলে আমি ভাবি না আর আমি ভাবতে যাবো পরের মেয়ের কথা? তার বিয়ে হলো না হলো তা নিয়ে আমার কীসের মাথা-ব্যথা? সে-ই বা আমার কে, আর আমিই বা তার কে? আমি মলে ওই মেয়ে কি আমার মুখাগ্নি করবে যে তার কথা আমি ভাববো?

দীপংকর বললে—মাসীমা, আজকে অনেক রাত হয়ে গেল, কাল এ-সব কথা ভাবা যাবে—

মাসীমা বললে—না, কাল-কাল করে অনেকদিন কাটিয়েছি, আর কাল করবো না। আজই যা হোক একটা হেস্ত-নেস্ত করতে হবে তোমাকে—

—কিন্তু আমি কী করবো আপনি বলুন? আমি তো দু'দিন বাদেই চলে যাচ্ছি। আপনি যা বলবেন তাই-ই করবো!

—কিন্তু আমি বলবো তবে তুমি করবে? তোমার নিজের একটা বুদ্ধি-বিবেচনা নেই?

দীপংকর কী যেন ভাবলে খানিক। তারপর বললে—আচ্ছা মাসীমা, আমি কালই সব ঠিক করে ফেলবো!

—কী ঠিক করবে কাল?

—সন্তোষকাকার মেয়ের বিয়ের একটা যাহোক ব্যবস্থা করে ফেলবোই?

কথাটা শুনে মাসীমা যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। এতদিনে যা হলো না, তাই হবে কাল? কালকের মধ্যেই? মাসীমা যেন কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের বারান্দায় কী যেন একটা পড়ে যাবার শব্দ হলো। চমকে উঠলো মাসীমা। কী হলো? কী পড়লো ওখানে? কে?

তাড়াতাড়ি দৌড়ে ঘরের বাইরে এসেছে মাসীমা। দীপংকরও এসেছে। ঠিক সিঁড়ির গোড়ায়। ক্ষীরোদা সেখানে পড়ে অচৈতন্য হয়ে আছে। ওমা, এ যে আমার ক্ষীরি! হাঁ মা, তুই এখানে এমন করে পড়ে গেলি কেন? কী হলো তোর? অন্ধকারে বুঝি ঠাওর করতে পারিস্ নি? দেখ্ তো কাণ্ড! আলোটা জেলে আসতে হয় তো?

তাড়াতাড়ি মাসীমা ধরে তুলতে গেল ক্ষীরোদাকে! কিন্তু ক্ষীরোদা তখন অজ্ঞান-অচৈতন্য। মাসীমা তাড়াতাড়ি ক্ষীরোদার

গায়ের কাপড়টা ঠিক-ঠাক করে দিলে। বললে—ওমা, এ যে একেবারে জ্ঞান নেই বাবা, একটু জল আনো তো, মাথায় দিই—

কাশী তখন ভেতরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, দীপংকর সেই অবস্থাতেই চৌবাচ্ছা থেকে এক মগ জল এনে দিলে। মাসীমা সেই জল মাথায় থাবড়ে থাবড়ে দিতে লাগলো। মাসীমা কী যে করবে বুঝতে পারলে না।

দীপংকর বললে—একজন ডাক্তার ডেকে আনবো মাসীমা?

মাসীমা বললে—না বাবা, তুমি এখন যাও, আমি বুঝিছি—

মাসীমা কী বুঝলে কে জানে। দীপংকর বললে—যদি কিছু খারাপ হয়, তখন?

—সে-সব তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা, তুমি এখান থেকে সরো দিকিনি। তুমি অনেক ভেবেছ আমাদের জন্যে, আর তোমাকে ভাবতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে, —এখন যাও এখান থেকে! খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো গে—

দীপংকর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওপরে চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে ক্ষীরোদার যেন একটু জ্ঞান হবার মত হলো। চোখ তুললো। চোখ তুলেই মাসীমাকে দেখে নিজের গায়ের কাপড়টা একটু টেনে আব্রু দেবার চেষ্টা করলে। মাসীমা মুখ নিচু করে বললে কী হয়েছে মা? কী হয়েছিল তোমার? পড়ে গিয়েছিল কেন? অন্ধকারে পা পিছলে গেছলো?

ক্ষীরোদার যেন এতক্ষণে হুঁশ হলো। উঠে বসতে গেল। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো।

মাসীমা বললে—কাকে খুঁজছো মা? কেউ নেই এখানে। শুধু আমি আছি আর দীপুকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার কোনও ভয় নেই। এখন কেমন বোধ করছো?

মুখ নিচু করে মাসীমা প্রশ্ন করছিল। ক্ষীরোদা মাসীমার কথার কোনও উত্তর দিলে না। যেন উত্তর দিতে গিয়ে তার দু'চোখ বেয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মাসীমা দেখতে পেয়েছিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—ছিঃ, কাঁদে না, কাঁদতে নেই—

তারপর বললে—চলো মা তোমাকে ঘরে নিয়ে যাই, আস্তে আস্তে চলো, আমি ধরছি—

ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললে—সংসার তো এখনো করোনি মা, যখন সংসার করবে তখন বুঝবে। এখনি যদি কেঁদে কেঁদে চোখের জলটুকু সব ফুরিয়ে ফেলো তাহলে পরে কী করবে মা? চলো, কাঁদার দিন তো এখনও আরম্ভ হয় নি মা তোমার, এখনও যে সামনে মস্ত সময় পড়ে রয়েছে! তখন অনেক কাঁদার সময় পাবে—চলো ঘরে চলো—

বলে মাসীমা বিছানার ওপর ক্ষীরোদাকে শুইয়ে দিলে আস্তে আস্তে।

দীপংকর ঘরের মধ্যে গিয়েও তখনও জামা-কাপড় ছাড়েনি। চুপ করে বিছানার ওপরই পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। দীপংকর যেন হিসেব মেলাতে পারছিল না। সকলের ভালো করতে গিয়ে যেন সকলের ওপর অবিচার করে ফেলছিল সে। কেন এমন হয়? এ কি তার নিজের কোনও দোষের অপরিহার্য ফল? এর কি কোনও প্রতিকার নেই?

হঠাৎ মাসীমা ঘরে ঢুকলো। দীপংকর মাসীমার দিকে চোখ তুলে চাইতেও ভয় পাচ্ছিল।

কিন্তু মাসীমা হঠাৎ যেন ফেটে পড়লো। বললে—তুমি ভেবেছ কি বল দিকিনি দীপু, এমনি করে আর কত শাস্তি দেবে তুমি?

দীপংকর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—মাসীমা, শেষকালে আপনিও এ কথা বলবেন?

—তা বলবো না? আমি তো তোমাকে গোড়া থেকেই বলে আসছি, কাজটা তুমি অন্যায় করেছ! কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে বাবা? ঘরে পাপ পুষে রেখে দিয়েছ, তার সাক্ষী রেখে দেবার জন্যে?

দীপংকর বললে—কিন্তু মাসীমা, আমি তো আপনার ভালোর জন্যেই এ করেছিলুম—

আমার ভালোর কথা ছেড়ে দাও। এই পোড়ারমুখীটার তুমি কী দশা করতে চাও আমাকে তাই বলো আগে, তবে আমি যাবো এখান থেকে। যদি ওর গলা টিপে ওকে মেরে ফেলতে চাও তো তাও খুলে বলো, আমি আজ শুনে যাই—

দীপংকর বললে—আপনার পায়ে পড়ছি মাসীমা, আমাকে আপনি একটা রাত্তিরের সময় দিন একটা রাত আমাকে ভাবতে দিন, আমি অনেক ব্যাপার নিয়ে বিব্রত, আমার মাথার ওপর অনেক বোঝা, আমি আর পারছি না—

—আপিস তো সবাই করে, আপিস করে আবার সংসারও করে! কিন্তু আপিস নিয়ে তোমার মত এমন করে ঘর-সংসার জলাঞ্জলি দিতে তো কাউকে দেখিনি।

দীপংকর বললে—না মাসীমা, অফিস নয়, সে আপনাকে বোঝাতে পারবো না, বাইরের লোক কেউ তা বুঝবেও না—সে বোঝবার জিনিসও নয়, আমি আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি, আর আমাকে শুধু একটা রাতের সময় দিন—

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। মাসীমাও ক্লান্ত, দীপংকরও ক্লান্ত। বোধহয় বেশি ক্লান্ত ছিল বলেই দীপংকর সেইভাবে বিছানার ওপর শুধু এপাশ-ওপাশ করে কাটাতে লাগলো সে-রাতটা। সে-রাতে দীপংকরের মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সবাই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। সনাতনবাবুও এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। নয়ন রঞ্জিনী দাসীও হয়ত ঘুমে অচেতন। লক্ষ্মীদিও হয়ত

ঘুমের ওষুধ খেয়ে অচৈতন্য। দাতারবাবুও তার মাথার কাছে হয়ত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সতীও হয়ত কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছে চেক-বই নিয়ে। খুঁজেছে তাকে। হয়ত সদর-দরজার বাইরের সিঁড়িতে নেমে 'দীপু' বলে ডেকেছেও হয়ত। তারপর তাকে দেখতে না-পেয়ে আবার ফিরে গেছে নিজের ঘরে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। হয়ত নিজের ঘরে মাসীমাও এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়লো। সন্তোষকাকার মেয়েও হয়ত মাসীমার বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর অন্য কথা কী, কিরণ-যে-কিরণ, সেই কিরণও বোধহয় তার সেলের মধ্যে এখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। একলা দীপঙ্করেরই শুধু ঘুম নেই।

কিন্তু দীপঙ্কর জানতো না, সেই ১৯৪৪ সালে সেদিন কেউই ঘুমোয় নি। ফিনল্যাণ্ড থেকে ইস্ট-প্রাশিয়া পর্যন্ত পোল্যাণ্ড হাঙ্গেরী রুমানিয়া জুড়ে সমস্ত ফ্রণ্টে তখন আগুন জ্বালাতে শুরু করেছে সমস্ত মিত্রশক্তি। হিটলার কি ঘুমোতে পারে সেই অবস্থায়? চার্চিল-এরও তখন অনেক ভাবনা। জাপান প্রায় সমস্ত ইস্ট-ইণ্ডিজ নিয়ে নিয়েছে। [illegible] সিঙ্গাপুর ফিলিপাইন [illegible]। কিন্তু [illegible] থেকে জার্মান আর্মিকে চলে যেতে হয়েছে, সুতরাং আর [illegible] ইটালির [illegible] থাকবে সে দেশ। পৃথিবীর কোথাও ঘুম নেই। গান্ধীজীরও ঘুম নেই তখন। তিনিও আশ্রমে বসে রাত জেগে জেগে মহম্মদ আলী জিন্নাকে চিঠি লিখছেন—

Brother Jinnah—There was a day when I could induce you to speak in the mother tongue. Today I take the courage to write to you in the same language. I had invited you to meet me while I was in jail. I have not written to you since my release. But today my heart says I should write to you. We will meet whenever you choose. Don't regard me as the enemy of Islam or of the Muslims of the country. I am the friend and servant of not only yourself but of the whole world. Do not disappoint me. Your brother M. K. Gandhi.

আর শুধু হিটলার, চার্চিল, মুসোলিনী, আইসেনহাওয়ার, গান্ধীজীই নয়, তাদের সঙ্গে মাসীমাও জেগে আছে, ক্ষীরোদাও জেগে আছে। ফাঁসি-সেলের মধ্যে সেদিন প্রত্যেক দিনের মতই আরো জেগে আছে কিরণ। ঘুম আসে না তার। ইণ্ডিয়া স্বাধীন না হলে ঘুম আসবেও না তার আর কখনও। আর, আর একজনও জেগে আছে। গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে তার অন্ধকার নিঃসঙ্গ ঘরে সতীও জেগে আছে। তার ভয়ে দীপঙ্কর ঘুষ দিয়ে দিয়েছে। দীপঙ্কর তার জীবনের ভবিষ্যৎকে ঘুষের কংক্রিট দিয়ে পাকা করতে চেয়েছে। এর চেয়ে আর কোন্ অপমান এত মর্মান্তিক হয়ে তাকে আঘাত করতে পারে? তাই সারা পৃথিবীর সঙ্গে সতীও বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে দু'চোখ খুলে।

দু'দিন অপেক্ষা করলো সতী। সে-রাতের পর থেকে বড় খিট্‌খিটে হয়ে গেল সতীর মেজাজ। দাতারবাবু দু'দিনের জন্যেই এসেছিল। তার [illegible] মামলা রয়েছে দিল্লীতে। ব্যাঙ্কের টাকা দিয়ে যদি তাকে বাঁচাতে না পারা যায় তো সম্ভব হলে বাপ তার নিজের জীবন দিয়েও বাঁচাবে। মানস পুলিসের কাছে নিজেই স্বীকার করেছে—সে সজ্ঞানে চিন্তা করে ভবিষ্যৎ ভেবে সুধাংশুকে খুন করেছে।

—কিন্তু কেন খুন করলে?

মানস উত্তর দিয়েছে—সে আমার থেকেও বেশি বড়লোক বলে!

—কিন্তু কই সে তো কই কাউকে মার্ডার করেনি! তার মার্ডারের কোনও প্রমাণ আছে তোমার কাছে?

—আছে!

—কই! প্রমাণ দাও দেখি!

প্রমাণ আমার মা। প্রমাণ আমার বাবা। প্রমাণ আমি। আমাকেও সে খুন করেছে। আমাদের ফ্যামিলির সমস্ত প্রেস্টিজকে সে খুন করেছে।

—কী ভাবে মার্ডার করেছে?

—অভাবের সময়ে আমার মা'কে টাকা দিয়ে। টাকা দিয়ে আমার মা'র সতীত্ব, বাবার পিতৃত্ব, আর আমার জীবন, সব সে নষ্ট করেছে। আমি শুধু সেই মার্ডারের প্রতিশোধ নিয়েছি তাকে মার্ডার করে। আমি গিল্টী।

লক্ষ্মীদি ছেলেকে মানুষ করেছিল ডেরাদুন স্কুল থেকে পড়িয়ে। কিন্তু আসলে সে মানুষই হয়নি। দিল্লীর রাজধানী তার স্টেটমেণ্ট পড়ে হেসেই অস্থির। নির্বোধ, ফুলিশ! বিংশ-শতাব্দীর পৃথিবীতে এই সামান্য ক্রাইমের জন্যে কেউ মাথা ঘামায়? আমরা তো চাকরিতে প্রমোশন পাবার জন্যে কত কী করেছি। ঘুষ তো তুচ্ছ কথা। ভোট দেওয়াও তো পুরোন হয়ে গেছে। ওতে আর মন ভোলে না কারো। নিজের স্ত্রীকেই আমরা মাসে মাসে বড়-সাহেবের শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি কতদিন! তাতে কী এমন ক্ষতি হয়েছে আমাদের শুনি? কেউ তো তা জানতেও পারেনি! [illegible] থেকে প্রমোশন পেয়েছি। গেজেটেড্ পোস্টের জন্যে নমিনেশান পর্যন্ত হয়ে গেছে। এবার সেক্রেটারিয়েটে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-সেক্রেটারী হবো। তখন কি সে-দাগ গায়ে লেগে থাকবে?

দিল্লীর লোক সবাই হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে গেল। তার একদিন আগে যে ছেলেকে দেরাদুন স্কুলের টাকা যুগিয়েছে, সেটা কিছুই না? তোমার বাবা যখন পাগল হয়ে গিয়েছিল তখন কে তার

চিকিৎসার খরচ দিয়েছে? তোমার মার শাড়ি, গাড়ি, বাড়ি, গয়না, রেফ্রিজারেটার, রেডিওগ্রাম, সিগ্রেট—এ সমস্ত কার জন্যে? ব্যাঙ্কে যে লক্ষ লক্ষ টাকা তোমার নামে, তোমার বাবার নামে, তোমার মার নামে, সে কার দৌলতে? তার জন্যে তোমার তো গ্রেটফুল থাকা উচিত! তা নয় প্রতিশোধ!

দাতারবাবু যাবার দিন কাছে এল। বললে —আমি চললাম—

সতী সেদিকে মুখ ফিরিয়েও দেখলে না।

—আমার ছেলের মামলার হিয়ারিং আছে সামনে, তাই আর থাকতে পারলুম না, তুমি একটু তোমার লক্ষ্মীদিকে দেখো!

তবু সতী মুখ তুললো না। বাইরে ট্যাক্সি এসে গিয়েছিল। সঙ্গে কিছুই নেবার নেই। বলতে গেলে একেবারে খালি হাতেই এসেছিল মিস্টার দাতার।

—দেখবে তো?

তবু সতী এতটুকু মুখ তুললে না। দাতারবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সতীর সামনে। কোথাও কোনও সহানুভূতির চিহ্ন দেখা গেল না। দাতারবাবু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের স্ত্রীর ঘরে গিয়েও একবার দাঁড়াল। যেন চিনতেই পারলে না তাকে। লক্ষ্মীদিও ওই রকম হয়ে গেছে। বোকা চাউনি লক্ষ্মীদির চোখে। আজকাল যেন সারাক্ষণই কী ভাবে, কী বলে কিছুই ঠিক নেই। কখনও ঘুমোয়, কখনও জেগে থাকে। কখনও আবোল তাবোল বকে। তাকে কিছু বলাও বৃথা। তবু যাবার সময় দাতারবাবু কথা বলে গেল। বললে—আমি যাচ্ছি, তুমি সাবধানে থেকো, খোকাকে যদি খালাস করতে পারি তো আমি জানাবো তোমাকে, কিছু ভেবো না—

তারপর ট্যাক্সি ছেড়ে চলে যাবার শব্দটাও কানে এল সতীর। আর তারপরও অনেকক্ষণ কেটে গেল। সমস্ত পৃথিবী জোড়া হাহাকারের মধ্যে বসে সতী যেন মুহূর্তের পদধ্বনি শুনতে লাগলো।

রঘু দুপুরবেলা একটুখানির জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর কখন বিকেল হয়েছে টের পায়নি। একলা মানুষ। সারাদিন রান্না-করা বাজার-করা, সবই করতে হয় তাকে। হঠাৎ ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেছে। ধড়ফড় করে উঠেই সামনে দেখে দিদিমণি। একেবারে বাইরে যাবার জন্যে যেন তৈরি।

সতী বললে—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি রঘু, বড়দিদিমণি একলা রইল, একটু দেখিস—

—কখন আপনি আসবেন?

সতী বললে—এই এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো, চোখে চোখে রাখবি বড়দিদিমণিকে, বুঝলি?

—দেখবো।

—দেখিস সেদিনকার মত যেন হঠাৎ আবার বড়দিদিমণি লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে না যায়। খুব সাবধান।

রঘুকে সাবধান করে দিয়ে সতী একলাই বেরোল। হাঁটা-পথ। এমনিতে বিকেল বেলা এদিকে আজকাল অনেক লোকজন থাকে। নিজের হ্যান্ড-ব্যাগের ভেতরে দুটো চেক বই পুরে নিয়েছে। সোজা লেভেল ক্রসিংটা পার হয়ে একেবারে আরো চওড়া রাস্তাটায় পড়লো। এ রাস্তায় বাস ট্রাম কিছুই চলে না। অনেক লোকের দিকে বেড়াতে চলেছে। বাঁ দিকে গেলে যাবার রাস্তা। বুদ্ধমন্দির, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। সতীর মনে হলো যেন ওই শব্দের তালে তালে তার জীবনের উত্থান-পতনের ছন্দটা একটানা মিলে যাচ্ছে। আশ্চর্য! কোথাকার কোন্ বর্মার জীবন, এতদূরে এখানে এসেও ঠিক গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। বিকেল পড়ে আসছে। বড় বড় গাছ। গাছের তলা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিয়ে সোজা রাসবিহারী এভিনিউতে গিয়ে মিশলো। আর তারপর ডাইনে। আর ডাইনে গিয়েই স্টেশন রোড। দীপুর বাড়ি!

বাড়ির সামনে গিয়ে হঠাৎই সতী অবাক হয়ে গেল। এত বড় একটা তালা ঝুলছে সদর-দরজায়।

তাহলে ভেতরে কেউ নেই নাকি? নাকি, বাড়ি ভুল করেছে? কিন্তু কই, এই তো, এই সিঁড়ি দিয়েই তো একদিন এ-বাড়িতে এসে ঢুকেছিল সতী! এই তো সেই বাইরের রোয়াকটা। সামনেই তো সেই বাইরের ঘরটা। ওপরে ওই তো রেলিং দেওয়া বারান্দা! সবই তো সেই রকম! কোথায় গেল তাহলে তারা?

রাস্তাতেও তেমন লোক চলাচল নেই। কাকে জিজ্ঞেস করা যায়। সতী বড় মুশকিলে পড়লো। পাশের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলে, তাদের সদর দরজা বন্ধ। জানালা খোলা। কিন্তু সেখানেও কেউ নেই। কোথায় কাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারা যায় তা বোঝা গেল না। তবে কি দীপংকর এই ক'দিনের মধ্যেই শিলিগুড়ি চলে গেল? যাবার আগে একবার জানিয়েও গেল না? এমন করে ভুল বুঝলো সতীকে! মাথার ঘোমটা আরো নিচু করে দিলে টেনে। কেউ হয়ত দেখলে অন্য কিছু ভাবতে পারে। ডানদিকের বাড়ির দোতলার বারান্দায় একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতক্ষণ সতী দেখতে পায়নি তাঁকে। সতীর দিকেই চেয়ে দেখছিলেন।

সেখান থেকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কাকে খুঁজছো মা?

সতী অসহায়ের মত তাঁর মুখের দিকে চোখ তুললো। বললে—এখানে এই বাড়িতে দীপংকর সেন বলে একজন থাকতেন...

বৃদ্ধ বললেন—হ্যাঁ, এ তো আমারই বাড়ি, তিনি আমার বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন, রেলে চাকরি করতেন—

—তা দরজায় তালা বন্ধ কেন? তাঁরা কোথায়?

—তিনি তো চলে গেছেন। পরশু দিন এবাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। তিনি বদলি হয়ে গেছেন শিলিগুড়িতে—

—তাঁরা এখন কলকাতাতেই নেই?

বৃদ্ধ বললেন—না মা, আমি তো অন্য লোককে এ বাড়ি ভাড়া দিয়েছি।

সতী আর দাঁড়াল না। তার পায়ের তলার মাটি যেন তখন থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে। মাথার ওপর ঘোমটাটা আরো একটু টেনে দিয়ে সতী আবার সেই রাস্তা ধরলে। যে রাস্তা দিয়ে সে এসেছিল, সেই একই রাস্তা। চলতে চলতে সতীর মনে হলো, মানুষের জীবনে ফেলে-আসা রাস্তায় ফিরে চলার মত দুর্ভোগ বুঝি আর কিছুই নেই। চারদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার আবছা হয়ে নামলো।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে এক উৎসবের অনুষ্ঠান চলেছে তখন। বহুদিন আগে এই বাড়িতেই সতী থাকতো, লক্ষ্মীদি থাকতো। সতীর কাকাবাবু কাকীমাও থাকতো। সে কি আজকের কথা। এ উপন্যাস যখন শুরু হয়েছে, সে-সব তখনকার ঘটনা। এতদিন পরে এপাড়ার চেহারাও অনেক বদলে গিয়েছে। সেই মধুসূদনদের বাড়ির রোয়াকে বসে আড্ডা দিত দুনিকাকা, পঞ্চাদা, সবাই। সে রোয়াক এখনও

আছে। এখনো সেখানে আড্ডা বসে। খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায় সকাল বেলা। কংগ্রেস, জিন্না, শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে তুমুল হট্টগোল চলে। আর সামনে ফটিক-দের সেই বস্তিটাও ঠিক সেই রকমই আছে পাথরপটির রাস্তার ধারে। কোথায় কোন কারখানায় এখন কাজ করে সে। ভোরবেলা বেরোয়, আর ফেরে রাত্রে।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—আর চন্ডীবাবুর সেই নাতি? সে কোথায় গেল রে?

ফটিক বললে—জানিস না তুই? সে তো মারা গেছে!

—মারা গেছে? কবে? কী করে?

অত বড় লোকের নাতি। একমাত্র নাতি! স্কুলে তাদের দারোয়ান রামধনি এসে এক গ্লাস দুধ আর চারটে রসগোল্লা খাইয়ে যেত রোজ। একদিন ওই চন্ডীবাবুর বাড়িতেই কিরণ আর দীপংকর ঢুকেছিল পুলিসের ভয়ে। চন্ডীবাবু সেদিন দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে সব কতদিন আগেকার কথা!

ফটিক বললে—মোটরে চড়ে যাচ্ছিল, একটা মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেখানেই মারা গেছে—

একটু আঘাত লেগেছিল দীপংকরের মনে। একমাত্র নাতি চন্ডীবাবুর। একমাত্র বংশধর। ছোটবেলায় ওদের বাড়িতে ঢুকতে পায়নি। তাতেও কিছু ক্ষতি হয়নি। এবার আরো চরম একটা এসে সব টাকা সব ঐশ্বর্য নিঃশেষ করে ছেড়ে দিলে একেবারে!

দীপংকর বললে—ঠিক সময় কিন্তু তুই যাবি! সব প্রাণমথবাবুদের বাড়িতে খুব জোগাড় করেছি, বড় বন্ধু ছিল—

—কটার সময় বিয়ে?

দীপংকর বললে—ঠিক সন্ধ্যে ছ'টায়। গোধূলি লগ্নে—

প্রাণমথবাবুদের বাড়িতে আর কেউ যাচ্ছে না। কিরণই বলতে গেলে আসল। তা সে-ই তো নেই। মধুসূদনকেও বলে এসেছিল। মধুসূদন এতদিন পরে দীপংকরকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এখন মধুসূদন ক্যালকাটা কর্পোরেশনে চাকরিতে ঢুকেছে। বললে—তুই যে আমাদের চিনতে পারবি তা ভাবিনি, তুই এখন অনেক বড় হয়ে গেছিস ভাই—

দীপংকর হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—তা বয়েস হচ্ছে, বড়ো হবো না?

—না না, সে বড়ো নয়, তুই খুব মস্ত বড় চাকরি করিস, আমরা কিছুই হতে পারলাম না।

দীপংকর মধুসূদনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—মাইনে দিয়েই তোরা মানুষের বিচার করিস? তা যদি করিস তো আমি প্রাণমথবাবুর চেয়েও যে বড় হয়েছি রে! কিন্তু যাস্ ঠিক, ছ'টার সময় বিয়ে—গোধূলি লগ্নে মনে থাকবে তো?

আসলে কিন্তু ছিটেই ছিল ভরসা। ছিটেই বলেছিল এই বাড়িতে আসতে। বাড়িটা খালি-পড়েই ছিল সৌভাগ্যক্রমে। ভাড়াও বেশি নয়। তিরিশ টাকা। আগে কুড়ি টাকা ছিল। এখন তিরিশ টাকা। ছিটে বলেছিল — জানিস তো জিনিসপত্রের দাম কী রকম বাড়ছে? তা তুই যা পারবি দিবি, এর ওপরে তো কথা নেই?

দীপংকর বলেছিল—কিন্তু আমি তো থাকবো না, আমি থাকবো শিলিগুড়িতে—

—তাহলে এবাড়িতে কারা থাকবে?

—এখানে ওরাই থাকবে। ওই কিরণের মা আর ওরা—আমি বিয়ের পরেই চলে যাবো—

সেই ১৯৪৪ এর বাঙলা দেশে তখন ছিটেদেরই অপ্রতিহত ক্ষমতা! কলকাতার লাটসাহেব রাইট অনারেবল আর জি কেসির চেয়েও ক্ষমতাশালী তারা। সমস্ত বাঙলা দেশে তখন ছিটেদের মতন মিলিটারি কন্ট্রাকটররা ইচ্ছে করলে রাতকে দিন করতে পারে। ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, শরৎ বোস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যা না করতে পারে, তা পারে ১৯৪৪ সালের একজন মিলিটারি কন্ট্রাক্টার। তাদের কথায় তখন রাজা ওঠে, রাজা পড়ে। তারা আইন গড়ে, আবার আইন ভাঙেও। কোথাও যখন চাল নেই, কয়লা নেই, পেট্রল নেই, কেরোসিন নেই, ইলেকট্রিক নেই—তখন তাদের ঘরে সব মজুত। তারা ইচ্ছে করলে এক মিনিটে সব সামনে এনে হাজির করতে পারে। তারা কংগ্রেস জানে না, তারা হিন্দু মহাসভা জানে না, মুসলিম লীগ জানে না, কম্যুনিস্ট জানে না, ট্রেড ইউনিয়ন-কংগ্রেস জানে না, এমন কি র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টিও জানে না। তারা জানে শুধু প্রফিট। তারা জানে শুধু টাকা। অঘোরদাদুর যে-টাকা ছিল সেই টাকা দিয়ে তারা অঘোর-সৌধ তৈরি করেছিল। টাকা দিয়ে তারা কংগ্রেসকেও কিনে নিয়েছিল। টাকা উপায়ের জন্যেই ছিটে খদ্দর পরতো। আর টাকা উপায় করবার জন্যেই নিজের ভাইকে জেলে পাঠিয়েছিল। টাকা উপায়ের জন্যেই ফোঁটা কালিঘাটের কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। সুতরাং সেই ছিটেই যখন অভয় দিলে তখন আর কোনও ভাবনা রইল না দীপংকরের।

সত্যিই, বিয়ের সব সরঞ্জাম যে এক-দিনের মধ্যে কেমন করে জোগাড় করলে ছিটে, সেটাই আশ্চর্য। বাড়িতে এসে শুধু টেলিফোনেই সব কাজ হাসিল হয়ে গেল। ম্যারাপওয়ালারা বাড়ির মাথায় পাল টাঙিয়ে দিয়ে গেল। নেমন্তন্নর চিঠি ছাপিয়ে নিয়ে এল এক ঘণ্টার মধ্যে। দান-সামগ্রী, বাসন, খাট, আলমারী গদী তোষক। তারপর কুশাসন, কলাপাতা, খুরী, গেলাস, মাছ, দই সন্দেশ মিহিদানা, পানের খিলি। দেখতে দেখতে একদিনের মধ্যে উনিশের একের-বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে মহা-উৎসব শুরু হয়ে গেল। দীপংকরের কাছে মনে হলো যেন আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়ে গেল রাতারাতি।

বাড়ির ভেতরে কিরণের মার সময় নেই। সকাল বেলাই গায়ে হলুদ হয়েছে। কোথায় মাছ, কোথায় দই, কোথায় ভিড়, কোথায় লোকজন, কিছুই ভাবতে দেয়নি ছিটে। নিজের ঘরে বসে ছিটে শুধু হুকুম করেছে, আর চোখের পলকে সব কাজ হয়ে গেছে।

আর কাজের লোক বটে লক্ষ্মী আর লোটন। দুজনের যেন দশটা হাত। সারা গায়ে গয়না মোড়া। দামী-দামী বেনারসী ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে, তবু কামাই নেই। মাসিমা বসে সাজাচ্ছিল। লক্ষ্মী এসে বললে—মাসিমা, আপনি সরুন, আমরা আছি কী করতে শুনি?

সে লক্ষ্মী আর সে লোটনকে দেখে আর চেনবার উপায় নেই। টাকার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমাজের বুকে পা দিয়ে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। ঝিরা দুই গিন্নীর সঙ্গে সঙ্গে আঠার মত লেগে রয়েছে। দুজনের মুখে পান জুগিয়ে যাচ্ছে অষ্টপ্রহর।

লোটনের হঠাৎ খেয়াল হলো—হ্যাঁ রে এখনও বরণডালা সাজালি না তোরা? যেদিকে দেখবো না আমরা সেদিকেই টিটি রে?

লক্ষ্মী বললে—কইরে, বিকেল হলো, এক কাপ চা দিলিনে তোরা? এদিকে এখুনি যে বর এসে যাবে!

সঙ্গে সঙ্গে দশটা ঝি ছুটলো চা আনতে। ছিটের বাড়িতে লোকের অভাব নেই। একবার হুকুম করলে দশ-বিশ জন দৌড়ে গিয়ে হুকুম তামিল করে। বাড়ির উঠোনে মস্ত শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। ছিটের বন্ধু-বান্ধব এসে হাজির হয়েছে। দীপংকরের বন্ধু-বান্ধব এসে হাজির হয়েছে। যেন ছিটেই বরকর্তা। শামিয়ানার সামনেই খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি-চাদর পরে হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসুন আসুন, আজ্ঞে আজ্ঞে হোক ঠাকুর মশাই।

কাউকে কাউকে পায়ের ধুলো নিয়েও আবার প্রণাম করছে।

—ফটিকবাবুর কোনও খবর পেয়েছ নাকি বাবাজী?

ছিটে বললে—আজ্ঞে আমি আর কী খবর দেব। সে দেশনেতা, দেশের জন্যে প্রাণ দিতে গেছে, দেশের লোকই তার খবর রাখবে, আমি কে?

—কিন্তু গান্ধীকে তো ছেড়ে দিলে?

—আজ্ঞে কী যে বলেন! মহাত্মাজীর সঙ্গে কি আর আমার ভাই-এর তুলনা! যেদিন জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, আজাদ, সরোজিনী নাইডু ছাড়া পাবেন, ফটিকও সেদিন ছাড়া পাবে। আর ছাড়া না-পেলেই বা কী করছি বলুন। দেশের জন্যে যাদের প্রাণ কাঁদে তাদের তো আর জেলের ভয় করলে চলে না।

ভেতর-বাড়িতে উঠোনের ওপর চারদিকে কলাগাছ পুঁতে ছাতনা-তলা তৈরি হয়েছে। বর আসতেই শাঁখ বেজে উঠলো। অঘোর-সৌধের ওপরে খাটানো মাচা থেকে নহবৎ পোঁ ধরলে বেহাগে। ততক্ষণ বরযাত্রীরা এসে গেছে। চাকর-বাকর ঝি-ঝিউড়িরা ছুটো-ছুটি শুরু করে দিয়েছে চারদিকে। এয়োতীরা বরণ করতে লাগলো বরকে। পিঁড়ির ওপর বসিয়ে কনেকে সাত পাক ঘোরানো হলো। হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যে নহবতের শব্দের তলায় একটা হৃদয়ের সব অনুভূতি সব অনুরাগ পিষে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেল এক মুহূর্তে।

ছাদের ওপর সার-সার লোক খেতে বসেছে। আর দুখানা গরম লুচি এ-পাতে! কী হে মন্মথ, তুমি যে কিছুই খাচ্ছো না। আরে দত্তমশাই যে, কতক্ষণ এসেছেন! আর একখানা মাছ নিন। আমি নিজে সুপারভাইজ করে রান্না করিয়েছি। রসময়, তুমি ও-লাইনে পোলাওটা নিয়ে ঘুরে যাও আর এদিকে পোনামাছের কালিয়াটা এক-বার রিপিট করে যাক কেশব। কী, আপনার শরীর কেমন বাড়ছে মশাই? ছেলে চিঠি দিয়েছে? তুমি তো ঘরের লোক হে অক্ষয়, চেয়ে খেতে পারো না?

ভেতরে স্ত্রী-আচারের আসরে খিলখিল হাসি আর হুলুধ্বনি চলেছে। সেখানে একমাত্র পুরুষ পাড়ার নাপিত বঙ্কিম। বঙ্কিম একদিন অঘোর-দাদুর দাড়ি কামিয়েছে।

সে এখন ছড়া কাটছে—

কড়ি দিয়ে কিনলাম
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম
হাতে দিলাম মাকু
ভ্যা করতো বাপু—

তারপর বরযাত্রীরা এক ব্যাচ শেষ হতেই আর এক ব্যাচ বসলো গিয়ে। বাইরে

ভিখিরী আর কুকুরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল এ'টো কলাপাতা নিয়ে। বাঁড়ুজ্জে মশাই চুপি চুপি কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলেন—কই হে ছিটে, শুনলাম পঞ্চাশ জনের বেশি খাওয়ানোর নিয়ম নেই, এ যে দেখছি দু'তিন শো লোক—

ছিটে হাসলে। বললে—ওই দেখুন, সামনে চেয়ে দেখুন—

—কী, সামনে কী? বাঁড়ুজ্জে মশাই সামনে চেয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না—

ছিটে বললে—ওই যে কোনের ঘরে টেবিলে থানার ইন্সপেক্টর খাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন না?

শুধু থানার দারোগাই নয়, কনস্টেবল, জমাদার, সবাই এসে গিয়েছে। হয়ত তাদের সকলের বাড়িতে মিষ্টিও চলে যাবে কাল সকাল বেলা। কেউ কিছু জানতে পারবে না, কেউ কিছু বলবার সাহসও করবে না। ফুড কন্ট্রোল-অর্ডার বর্ণে বর্ণে পালিত হবে বেঙ্গলে। আইন ভাঙলে তার আর রক্ষে নেই।

আর যে ঘরে একদিন সতী লক্ষ্মীদি শুয়েছিল সেই ঘরেই সম্প্রদানের অনুষ্ঠান চলেছে—

—যদিদং হৃদয়ং মম

লক্ষ্মণ সরকার টোপর মাথায় দিয়ে মাথা নিচু করে আবৃত্তি করছে—যদিদং হৃদয়ং মম

পুরুত মশায় আবার বললেন—তদিদং হৃদয়ং তব—

—তদিদং হৃদয়ং তব—

বাইরে তখন অঘোর-সৌধের মাচার ওপর থেকে নহবৎ নতুন রাগ ধরেছে দরবারী কানাড়া।

আর যখন ভিড় হট্টগোল হৈ-চৈ, কোথাও কোনও শান্তি নেই, যখন রাত অনেক বাড়লো, বাসর ঘরে ঢুকলো বর কনে। কে যেন হঠাৎ এসে বললে—মাসীমা, কনে যে কাঁদছে মাসীমা খুব—

মাসীমা বললে—তা কাঁদুক, বিয়ের দিনে কনে তো কাঁদবেই বাছা!

—কিন্তু আর যে সামলাতে পারা যাচ্ছে না মাসীমা, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে একেবারে! তুমি একটু চলো—বুঝিয়ে বলবে!

মাসীমা বললে—আমি বিধবা মানুষ, বাসর-ঘরে আর না-ই বা গেলুম—ও-রকম একটু সবাই কাঁদে। আহা বাপের কথা মনে পড়েছে হয়ত—

হঠাৎ দীপঙ্কর এসে দাঁড়াল। বললে—মাসীমা, আমি তাহলে আসি?

বলে মাসীমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল। মাসীমা দীপুর চিবুকে হাত-ছুঁইয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বললে—আজ না-গেলেই কি নয়, বাবা?

—কিন্তু কাল যে আমার শিলিগুড়িতে জয়েন করতে হবে। অফিসে। এদিকে সময়ও তো নেই!

মাসীমা বললে—আমি আর কী বলবো বাবা তোমাকে। তুমি বড় হয়েছ, তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, তুমি যা ভাল বুঝবে করবে!

দীপঙ্কর আবার মাসীমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এক-বাড়ি লোক, চারিদিকে উৎসবের কলকণ্ঠ। দীপঙ্করের চোখের সামনে হঠাৎ সব যেন নিঃঝুম নিঃশব্দ হয়ে এল। মা, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তুমি যেখানেই থাকো, আমি ন্যায় করেছি কি অন্যায় করেছি, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। তুমি তো ওপর থেকে সব দেখছো। যদি অন্যায় করে থাকি তো তুমি আমায় ক্ষমা কোর।

দীপঙ্কর আর সেখানে দাঁড়াল না। গাড়ি তৈরিই ছিল। ডাস্টবিনের সামনে যেখানে কুকুরে আর ভিখিরিতে এ'টো কলাপাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, সেইখানে শুধু গাড়িটা এক মুহূর্তের জন্যে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর আবার চলতে লাগলো সেকেণ্ড গিয়ারে। যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব। লক্ষ্মণ সরকার দীপঙ্করের সব অনুরোধ রক্ষা করেছে। একটুও আপত্তি করেনি। এককালে ছোট-বেলায় দীপঙ্করের হাত থেকে প্রিন্স অব ওয়েলসের ক্যমা কেড়ে নিয়েছিল, আজকে সে সেই ক্যমার ঋণ বোধহয় এমনি করেই শোধ করলে!

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস। রাত্রি বেলা ট্রেন ছেড়েছে। সেনসাহেবকে স্টেশনে বিদায় দিতে অফিসের কেউ কেউ এসেছিল। কারোর দিকেই ভালো করে চেয়ে দেখতে পারেনি দীপঙ্কর। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। তারাও আবার বাড়ি ফিরে যাবে!

কিন্তু মানুষের যিনি ঈশ্বর, তাঁর কাছে তো কিছুই গোপন থাকবার কথা নয়। তিনি তো অন্তরালে বসে সব হিসেবের অঙ্ক মিলিয়ে নিয়ে তবে খালাস দেবেন। সেখানে তো সংসারের চলনসই জিনিসের কারবার নেই, সেখানে এক মুহূর্তে সব ফাঁকি সব খাদ যে ধরা পড়ে যাবে। সেখানে আমি জবাবদিহি করবো কেমন করে? স্বর্গ তো মাথার ওপরেও নয়, পায়ের তলাতেও নয়। সে যে এই অন্তরের অন্তস্থলে। বাইরে তো আমাদের অনেক বন্ধন, অনেক হিসেব, অনেক অঙ্ক। কিন্তু অন্তরে তো সে বালাই নেই। সেখানে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা অখণ্ড তাৎপর্যকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। সেই যেদিন উনিশের একের বি'র বাড়িতে প্রথম ঘুঙুরের শব্দ শুনেছিল, সেই যেদিন সি আর দাশের মৃত্যুর খবর কানে এসেছিল, সেই যেদিন জেলের হাজতে গিয়ে বন্দী হয়েছিল, সেই যেদিন মার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেইদিন থেকেই তো তার জীবনের তাৎপর্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর তারপর যেদিন সতী তার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেছিল তার বাড়িতে, যেদিন তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে রেলের চাকরিতে ঢুকেছিল, আর তারপর যেদিন.........

তারপর যে কত মাস কত বছর কেটে গেল। বাইরের শক্তির সঙ্গে ভেতরের শক্তির সামঞ্জস্য করতে গিয়ে কত আঘাত কত অত্যাচার সইতে হলো তার বুঝি হিসেব নেই। দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে জানালার ধারে বসে একমনে নিজের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। একমনে কান পেতে শুনতে লাগলো—যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব। যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং.........

ট্রেন চলেছে হু হু করে। বাইরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের সঙ্গে ট্রেনের বিদ্যুৎ-গতির তাল রেখে ঊর্ধ্বে-অধঃে-অন্তরীক্ষে দীপঙ্করের একটি প্রার্থনাই শুধু নিঃশব্দে বাঙ্ময় হয়ে উঠলো—তুমি আমায় ক্ষমা কোর— (ক্রমশ)

এক বিন্দু, অনেক বৃত্ত

নৃপেন্দ্র সান্যাল

এমন কথা ভাবা সম্ভব, এবং সংগত কারণেই সম্ভব যে, আগামী একশ বছরে ইংরেজী উপন্যাসের পাল। বদল ঘটবে। তার আবহাওয়ার হয়ত সম্পূর্ণ গুণগত পরিবর্তন হবে। এ পরিবর্তনের সূচনা ১৯৫১ সাল। তৎপরবর্তী একটি দশক ভৌগোলিক সীমা অতিক্রমণের সুস্পষ্ট সাক্ষী। পৃথিবীর অপ্রত্যাশিত প্রান্তের কয়েকজন লেখক ইংরেজী সাহিত্যে নূতন সংযোজনা করেছেন। মার্কিন সাহিত্য তো ইতিমধ্যেই এক অর্থে ইংরেজী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া বৃটেনের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ডে ইংরেজী উপন্যাস রচনা করতে সাহায্য করেছিল।

সেসব উপনিবেশগুলি অনেক গ্রন্থের প্রকাশক। আর ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্যই এসকল উপন্যাসে স্বদেশ কাতরতার সুর সুস্পষ্ট। কিন্তু সাধারণ ইংরেজ এই সব রচনা ইংরেজ-সংস্কৃতির অংশ বলে মেনে নিতে ভালবেসেছে। কিন্তু কৃষ্ণ উপনিবেশের লেখক তাদের কাছে প্রধান বিস্ময়। যদিও রসিক ইংরেজ স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করবেন না, আর কে নারায়ণ সাঁচ্চা একজন গুণী ব্যক্তি; তাঁর হালকা রসের উপন্যাসগুলি সত্য কমেডি। তাঁর ভাষার স্বতোৎসার, পরিহাস উজ্জ্বল সূক্ষ্মতা সহজ প্রশংসার অধিকারী। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস The Guide (১৯৫৮) এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রায় একই সঙ্গে মনে আসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এডগার মিটেল হালজারের নাম। তাঁকে অনুসরণ করেছে অনেক রঙের ভীড়। জর্জ লেমিং, স্যামুয়েল সেলভন, জন হার্ন এবং ভি এস নইপাল এরা সকলেই। অনস্বীকার্যভাবে ইংরেজী লেখক হিসেবে তাঁদের ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন।

অবশ্যই এই ভৌগোলিক সীমা অতিক্রমণের জন্য ইংরেজী উপন্যাস তার চারিত্রিক বিশুদ্ধতায় স্থিত থাকতে পারে না।

এই পরিবর্তিত আবহাওয়ায় ইংরেজী উপন্যাসের, যার লেখক ইংরেজ, মূল্যায়ন প্রয়োজন।

অবশ্যই এর ফল আশাভঙ্গ। হিসেব করতে গিয়ে হয়ত দেখা যাবে অনেক সম্ভাবনার স্ফুরণ হইং যেন সহজ। এর কারণ হয়ত পৃথিবীর দূরপনেয় অসংগতি। হয়ত তা' একান্ত বিশ্বাসের, কোনো প্রাচীন বিশ্বাসের একান্ত অভাব।

আজকের সমাজ মানুষের মনে একক চেতনার সৃষ্টি করেছে। এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনের অবধারিত কুফল সকলের মনে সংক্রামিত। মানবিক সম্পর্কে সেই অতি দুর্গম তথ্যে সেই কারণেই সকলের প্রাণান্তকর যাত্রা। এদের মধ্যে সফল যাত্রী কে, সে-কথা এখনি বলা অসম্ভব। শুধু এইটুকুই স্পষ্ট, এদের ভাবনার বিন্দু এক। সেই একই ভাবনাকে কেন্দ্র করে তাদের পরিক্রমা। নানা বৃত্ত রচনা। আমরা যেটুকু জানি, তা' বিন্দু থেকে বৃত্তের পরিধি।

তবু এই স্বল্প যাত্রার পথে কেউ কেউ সুন্দর বিস্ময়ের সঞ্চার করেন। তাদের বক্তব্যে সম্মতি না জানাতে পারলেও এবং অনেক সময় তাদের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ সত্ত্বেও মনে হয় তাঁরা ইংরেজী সাহিত্যে, ইংরেজ লেখকের তালিকায় বিশেষ উল্লেখের অধিকারী।

লরেন্স ডুরেল, আনগাস উইলসন, নিগেল ডেনিস, উইলিয়ম গোল্ডিং এবং আইরিশ মারডকের নাম নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য।

লরেন্স ডুরেল

Bitter Lemon লিখেই ডুরেল প্রথম পাঠকের কাছে তাঁর স্থান করে নিলেন। গ্রন্থটি একটি ভ্রমণ-কথা। কিন্তু প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, শুধুই কি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন ডুরেল? এই গ্রন্থের বহু প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্য সত্ত্বেও লেখক ডুরেলকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। আমরা কবি ডুরেলকে চিনতাম। কিন্তু এমন অপূর্ব গদ্য যে একই হাত থেকে বার হওয়া সম্ভব, সে প্রত্যয় আমাদের স্থায়ী হল পরে তাঁর অন্যান্য উপন্যাস পড়ে। তাঁর 'চারতলার' উপন্যাস যা 'আলেকজাণ্ড্রিয়ান কোয়ার্টেট' নামে বিখ্যাত, সকলের মনেই বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। এর আঙ্গিক, ডুরেল নিজেই বলেছেন, আপেক্ষিক মূল্যের ওপর স্থাপিত। সমস্ত উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য লেখক একটি চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এই চরিত্রটির নাম পার্সার ওঅডেন। "We live lives based on selected fictions. Our view of reality is is conditioned by our position in space and time—not by our personalities, as we like to think. Thus every interpretation of reality is based upon a unique position. Two paces west or east and the whole picture is changed."

কোয়ার্ট্রেটের প্রথম গ্রন্থ Justine (১৯৫৭)-এর প্রায় এক বছর পর তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ Balthazar (১৯৫৮) প্রকাশিত হয়। দুটি উপন্যাসের মূল সুর অর্কেস্ট্রার একই সিম্ফনীতে বাঁধা। বালথাজার একজন মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক। ঘটনাগুলি তিনি একে একে পরিবেশন করেছেন। ছেঁড়া ছেঁড়া সুতোকাটা ঘুড়ির মত ঘটনা। আর Balthazar, প্রথম গ্রন্থের পরিপূরক নয়। Justine এর পরিণত প্রাণ। ডুরেলের বক্তব্যের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি

কারণে এক আকস্মিক গুলীতে মৃত্যু হল। আর মেগ এলিয়ট, বিধবা মিসেস এলিয়ট দারিদ্র্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কল্পনার স্বর্গ তখন ধূসর।

গ্রন্থের সর্বত্র শ্লথ গতি সত্ত্বেও উইলসনের নৈপুণ্যে আমাদের আস্থা হারায় না। শুধু মনে হয়, কেন তিনি আর কিছু, অন্য কিছু লিখলেন না।

উইলসনের সঙ্গে আর একজনের নাম করতে হয়। তাঁর নাম নিগেল ডেনিস। তাঁর Cards of Identity গত দশকের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। তাঁর চেষ্টা প্রশংসনীয় এবং এটি একটি সুন্দর প্রহসন। অথচ লেখক কোথাও তরল হননি। ডেনিস আধুনিক মানুষের মধ্যে বড় বেশী সংগতির অভাব বোধ করেছেন। তাঁরা একান্ত একক। ডেনিস মনে করেন, মানুষের মন থেকে এই ঐক্যবোধ একেবারে নির্বাসিত। মানুষের মনে এখন স্থায়ী এমন কিছুই নেই যা দুজনের মধ্যে সংগতি-চেতনার সঞ্চার করতে পারে।

উপন্যাসটির স্থান হল 'আইডেন্টিটি ক্লাবের' সম্মেলন। এখানে বিশেষজ্ঞরা অদ্ভুত কায়দায় 'ব্রেন ওয়াশ' করেন। সম্মেলনে তিনটি কেস হিস্ট্রি পড়া হল। তিনটি অপূর্ব এবং মজার।

প্রথমটি হল এক অভিজাত যুবকের উক্তি। এই উক্তিকে 'উন্নত টোরিবাদ'—এই আখ্যা দেওয়া যায়। চারিপাশের পুরনো দেয়াল ধ্বসে যাওয়ায় সে ভয় পেয়েছে। আর ভয় থেকেই সে পুরনো অতীতের অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠল।

দ্বিতীয়টি একটি রিরংসার বিবরণ। আর তৃতীয়টি একটি সন্ন্যাসীর। সে কম্যুনিজম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়েছে। সে নাকি স্বীকারোক্তি রচনায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল।

তিনজনের বক্তব্যই উপন্যাসের পটভূমি। মনে হবে আসল ঘটনার অপূর্ব তামাশা।

Card of Identity বৃহৎ উপন্যাস। এর আঙ্গিক সমালোচনার অপেক্ষা রাখে।

উইলিয়ম গোল্ডিং

সাম্প্রতিক ইংরেজী উপন্যাসে সব থেকে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারেন উইলিয়ম গোল্ডিং। সব দিক থেকে তিনি অনন্য। এবং তাঁর লেখার জাত একেবারে ভিন্ন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে The Lord of Flies, the Inheritors এবং Free Fall নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য এদের উপন্যাসের পরিবর্তে উপকথা বলাই সংগত। তাঁর গল্প বলার রীতি অপূর্ব এবং অতুলনীয়। আশ্চর্য তাঁর জীবনবোধ। তাঁর বক্তব্য অনেক সময় উপন্যাসের সীমা অতিক্রম করে।

একদল স্কুলের ছাত্র প্লেনে করে যাবার সময় হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে। প্লেন ভেঙে পড়ল একটি মরুভূমির দ্বীপে। সেখানে এখনও আদিম ধর্ম প্রবল। যার ভিত্তি হল রক্ত এবং ক্ষয়। The Lord of Flies-এর কাহিনী এই।

তাঁর Pincher Martin মনে হয় দুঃস্বপ্ন। ডিফোর মত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

গোল্ডিং সভ্যতার ভয়াবহ চিত্র দিয়েছেন। মানুষ ও পশুত্বের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম সত্তার বাধা কত সহজে ছেড়া যায়, তা তিনি জেনেছেন। তিনি তাঁর অপূর্ব বাচনভঙ্গীর সাহায্যে আমাদের তাঁর কল্পনার দিগন্তে নিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর মত ভাবতে বাধ্য হই: পৃথিবীতে এখনও নাৎসিশক্তি পরম প্রভাবশালী। আর জীবন হল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ভয়াবহ অন্ধকার।

আইরিশ মারডক

ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রীমতী আইরিশ মারডকের আসন এখন স্থায়ী। তাঁর সাহিত্যে অনুপ্রবেশ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত। আমাদের মনে তিনি চমক সৃষ্টি করেছেন। আমাদের তিনি বিস্মিত করেছেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস Under the Net জোয়ার দুঃসাহসিক পটভূমিকায় রচিত। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস The Flight from Enchanter-ও দুঃসাহসিক। কিন্তু তার মধ্যে অনেক অসংগতি ছিল। তবে এই উপন্যাসটিই সম্ভবত তাঁর দুটি পরবর্তী উপন্যাস The Sandcastle এবং The Bell-এর পূর্ব সূচনা। তার এই দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী মারডক প্রমাণ করলেন যে, সমসাময়িক কালে তিনিই অগ্রণী প্রতীকি ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে প্রতীকের স্থান কতটুকু, সে বিচারের ভার অন্যের।

আমার নিজস্ব বিশ্বাস এবং আমি তা কীটসের বিখ্যাত মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলতে পারি: "গাছে যেমন পাতার আবির্ভাব স্বাভাবিক, উপন্যাসে প্রতীকও যদি তেমন স্বাভাবিকভাবে না আসে, তবে তার ব্যবহার না করাই ভাল। প্রতীকের ব্যবহার তখনই সমাদৃত হবে, যখন তা উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা এবং সুরের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে পারে।" সম্ভবত এর পরিষ্কার করে এর বেশী আর কেউ-ই বলতে পারেনি। উপন্যাসের প্রথম কথা হল, বর্ণিত ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। সেখানে যদি লেখক ব্যর্থ হন অনেক প্রতীক, অনেক চিত্রকল্পও সেই হারানো সম্পদের স্থান পূরণ করতে পারবে না।

এই বিচারে The Bell তাঁর অপর গ্রন্থ The Sandcastle থেকে অনেক বেশী মনোযোগের বিষয়। শেষোক্ত উপন্যাসের পটভূমি ছেলেদের একটি পাবলিক স্কুল। উপন্যাসটি অনেক দিক থেকে সুন্দর। কিন্তু উপন্যাসের ঘটনা যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই মনে হবে তিনি বাস্তব থেকে দূরের পথ বেছে নিয়েছেন। জীবনের আপাতসত্য উদ্ঘাটনে তিনি প্রয়াসী। চরিত্রগুলির ব্যবহার, কথোপকথন—সবকিছুই আমার কাছে সমান অসংগত মনে হয়েছে। আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রতীকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলেও আমরা বুঝতে পারি, আসল অর্থে প্রতীক তখন অবসিত। তার স্থান গ্রহণ করেছে রূপক।

সেই দিক থেকে The Bell এখন অনেক বেশী পরিণত। উপন্যাসটি অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন প্রয়াস-প্রসূত। তা আরও কঠিন মনে হয়েছে, তার কারণ শ্রীমতী মারডকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা কেউ-ই নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু এত দুর্গম জটিলতা সত্ত্বেও উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ এই জটিলতা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মাইকেল মিডের চরিত্র থেকে উদ্ভূত।

মাইকেল মিড একটি ধর্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষের কনভেণ্ট এস্টেটের সঙ্গে তা যুক্ত। কনভেণ্টের নানেরা যদিও প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত। তবু তারা সর্বত্র অনুভূত। তারপর মিডের এই সম্প্রদায়ে ভাঙন এল। এর জন্য অংশত তাঁর নিজের চরিত্র এবং অংশত বাইরের মানুষ দায়ী।

এই উপন্যাসে একটির পর একটি দুর্গম বাধ। অবশ্যই এই গ্রন্থে ধর্মকে নিয়ে নাটক করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এর অনেকখানি অংশ রহস্যময়। আমি এখনও অনিশ্চিত, বিলের জলে ঘণ্টাটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল কেন? আর কেনই বা পরে দুজন বহিরাগত—ডোরা এবং টোবি তা উদ্ধার করল? কোন্ গূঢ় অর্থ আছে এর পিছনে। সমস্ত উপন্যাসে এমন বহু দুর্গম ঘটনা সন্নিবেশিত। ফলে কোন্‌টা প্রতীক এবং কোন্‌টি নয়—তার বিচার দুঃসাধ্য।

এতদসত্ত্বেও The Bell প্রশংসনীয়। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত উপন্যাস। এখানে ছোট ছোট প্রতীকের বহু ব্যবহার সার্থক হয়েছে। চরিত্র এবং ঘটনার সংস্থাপনা প্রত্যেকটি মানুষকে জীবন্ত করেছে।

এই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে ঘটনার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন আসে না। সমগ্র উপন্যাসে কবিতার আবহাওয়া। ভাষার এই কাব্যসম্পদ যেন শ্রীমতী মারডকের নিত্য সহচর।

(১২)

অবনীমোহন নয়, অবু।

সমুদ্রের পাড় দিয়ে আঁকাবাঁকা আলপথ ধরে অনেকখানি গিয়ে তবে রেল লাইন। ছোট লাইনের ট্রেন, ছোট্ট ইঞ্জিন, ভুসভুস করে খানিকটা কালো ধোঁয়া ছেড়ে চলে যায়। মাঠের মাঝ থেকেই দেখতে পায় গিরি। কি চমৎকার যে লাগে, আর কি রহস্যময়! বাবার কাছে গল্প শুনেছে, গোঁসাইদিদি বলেছে, এর চেয়েও নাকি অনেক বড় বড় রেলগাড়ি আছে, মস্ত বড় বড় ইঞ্জিন। এই ছোট লাইন তার কাছে খেলনার মত। এই ট্রেন নাকি ওদিকে কাটোয়া অবধি গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। অতশত বুঝতে পারে না গিরিজা, বুঝতে চায় না। বই-খাতার বাক্সটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায় ও রেল লাইনের ধারে, হাঁপাতে হাঁপাতে কপালের ঘাম মোছে। তারপর লাইনের ধারে ধারে হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মন চলে যায় অনেক অনেক দূরে। দেড় হাত তফাতে একজোড়া সরু সরু লাইন, চলে গেছে যতদূর চোখ যায়। কুয়াশা ঢাকা মেঘের দিকে। কোন এক নিরুদ্দেশের যাত্রায়।

গিরির ইচ্ছে হয় এই ট্রেনে চড়ে সেই অজানা দেশের কোথাও চলে যেতে। দেখে আসতে ইচ্ছে হয় কোথায় এর শেষ।

কোন কোনদিন চাটুজ্যেদের অবু আসে পিছনে পিছনে, আশপাশের গাঁ থেকে আরো চার পাঁচটি ছেলে।

লাইনের পাশে পাশে অসংখ্য নুড়ি পাথর জমা হয়ে আছে। দল বেঁধে ওরা সাদা আর গোল গোল নুড়িগুলো বেছে বের করে। কি মসৃণ আর গোল, কোনটা ডিমের মত। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে টিনের বাক্সে নয়তো জামার পকেটে রাখে গিরিজা, আর ভাবে, রহস্য-ঘেরা চোখ নিয়ে ভাবে কোত্থেকে আসে এমন সুন্দর সুন্দর পাথর, কি সুন্দর সেই জায়গাটা, না জানি আরো কত বিচিত্র জিনিস আছে সেখানে।

আর তো কটা মাস, তারপরই কোলকাতায়। নয়তো বহরমপুরের রাজার কলেজে পড়তে যাবে গিরি। কোনরকমে যদি এন্ট্রান্স পরীক্ষাটা পাশ করতে পারে। মা বলেছে, কলেজে পড়াবে গিরিকে। গিরি যাবে, অবু যাবে, আরো অনেকেই হয়তো যাবে।

কে জানে হয়তো কারো যাওয়া হবে না শেষ অবধি। জনপুরের কোঙারদের একটা ছেলে তো পাশ করে আর পড়তে পেলো না, নাকশাঁয়ের ইস্কুলে গিয়ে মাস্টারী নিলো। হয়তো গিরিজাও শেষ অবধি...

সেদিন কি কথা হচ্ছিল মার সঙ্গে গিরিজা শুনতে পায়নি। হঠাৎ এসে পড়ে শুধু শুনেছিল, বাবা বলছে, আর কোলকাতায় পাঠিয়ে কাজ নেই, ব্রজকে পাঠিয়ে দেখলে ত ফল, বড় ঠাকুর এখন চুল ছিঁড়ছেন।

আরো দু একটা কথা কানে গিয়েছিল গিরিজার। আর তাই ভয় হয়েছিল ওর।

পড়াশুনোর কথা উঠলেই লোকে কথায় কথায় ব্রজমোহনের কথা বলতো। বলতো, লেখাপড়া করে কি শিক্ষা পেয়েছে দেখো, অমন সুন্দরী বউ তাকে ত্যাগ করে কাকে নিয়ে আছে কে জানে!

ব্রজমোহন নামটা ছিল গ্রামের কলংক। আর কালীমোহনের সামনে কেউ ভুলেও তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করতো না।

কিন্তু জনপুরের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা খুব প্রশংসা করতেন তার। বলতেন, এই ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে ব্রজমোহন, হীরের টুকরো ছেলে। দেখো, ও ঠিক বড় হবে জীবনে, অনেক বড় হবে।

ব্রজমোহনের মতই বড় হতে ইচ্ছে হত গিরিজার। শহরের কলেজে পড়তে ইচ্ছে হতো। তবু মাঝে মাঝে ছোটমার কথা মনে পড়ে যেত, আর বুকের মধ্যে কেমন একটা অবোধ্য কষ্ট। ভেবে ভেবে তবু কোন কূল-কিনারা পেত না ও, ব্রজমোহনের মত শিক্ষিত মানুষ কেন এমনভাবে আমার ছোটমাকে—অটুমাকে—এত কষ্ট দেয়।

ছোটমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হতো যেন দুটো বড় বড় টানা চোখের আড়ালে কান্না থমথম করছে। কিন্তু কেন, তা বুঝতে পারতো না।

সেই দিনটার কথা মনে আছে গিরিজার। শুখোর বছর সেটা। বৃষ্টি নেই, বৃষ্টির জন্যে সে কি হা-হুতাশ। বাবার মুখ থমথম করে মার মুখ থমথম করে। গাঁয়ের লোক বারবার আকাশের দিকে তাকায়, অসময়ে দেখা হলে শুধু এই এক কথা। তারপর পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে ইস্কুল বন্ধ হলেও পড়ানো বন্ধ হতো না। মাস্টারমশাইরা কেউ নিজের বাড়িতে, কেউ বা ইস্কুল ঘরেই ছাত্রদের পড়াতো। পরীক্ষার জন্যে তৈরি

করাতো তাদের। তাই ছুটির সময়েও নিয়মিত ইস্কুলে যেত গিরিজা।

আর দেখতো, মাঠ ফাটছে। পাকা ফুটির মত ফালি ফালি হয়ে যাচ্ছে মাঠ চোখের সামনে। আলের মাঝে মাঝে প্রথম প্রথম ফাটল দেখা দিলো। আঁকাবাঁকা দাগ। আষাঢ় মাস এলো, শ্রাবণ এলো। তবু বৃষ্টি নেই। ছাতা মাথায় দিয়ে যে ফাটলগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে রেল লাইনের দিকে যেত গিরিজা, হঠাৎ একদিন সেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে হলো। মাঠের বড় বড় পুকুরগুলোতেও তখন আর জল নেই। গাছের পাতাও জ্বলে গেল। দেখতে দেখতে রঙ বদলে গেল পাতার। গাঁয়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া সরু খড়ি নদীতে শুধু বালি আর বালি। অমিতুর জলও যেন শুকিয়ে যাবে!

বাউড়ি বাগদী সবাই হাহাকার করে উঠলো। আর সেই সময় একদিন বংশী ছুটে এসে বললে, গিরিদাদা, শীগগির এসো।

—কেনরে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে গিরিজা।

বংশী উত্তর দিলে না, টানতে টানতে নিয়ে গেল ওকে মোড়লদের বৈঠকখানায়।

গিরিজা সেখানে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সারা গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করেছে। আর বৈঠকখানার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হৃদয় মোড়ল চিৎকার করে করে হুকুম দিচ্ছে। একটার পর একটা মরাই খুলে ধান 'বাড়ি' দিচ্ছে গ্রামের লোকদের।

আর সঙ্গে সঙ্গে খাতায় লিখে রাখছে হৃদয় মোড়ল।

বিশ পঁচিশটা মরাই সারা বছরই বাঁধা থাকতো হৃদয় মণ্ডলের বাড়িতে। দেখতে দেখতে তার তিন চারটে মরাই শেষ হয়ে গেল।

বংশী মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছিল। নিজের মনেই বললে, নামটা সার্থক বটে গো মোড়লের। হৃদয় আছে ওনার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বংশীর কথায় সায় দিলো গিরিজা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে টিপ্পনি এলো, বাড়ির ধান, কত সুদের পোষ মাসে সেটা ভাবো!

ফিরে তাকালো গিরিজা। দেখলে, অনু—চাটুজ্জেদের অনু।

মোড়লদের সঙ্গে চাটুজ্জেদের তখন কি নিয়ে যেন ফৌজদারী মামলা চলছে। গিরিজার, বংশীর—কারো তাই অনুর কথাটা মনঃপূত হলো না। টাকা ধার দিয়ে সুদ নেয় না কে? কিন্তু এমন অভাবের সময় গ্রামসুদ্ধ লোকের জন্যে মরাই খুলে দেয় কেউ?

বংশী তাই রেগে গিয়েছিল অনুর উপর। বলেছিল, মামলায় ওরা হেরে গেলেই ভালো। শুধু মামলায় হেরেই যায় নি চাটুজ্জেরা, প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। সে খবর শুনেছিল গিরিজা।

রান্নাঘরে বসে মা তখন রুটি বেলছে, আর পাশে বসে আছে গিরিজা। নিজের মনেই গজগজ করছে মা, দিদির শ্বশুর-বাড়ির বিরুদ্ধে।

কিন্তু একটা কথা বলার জন্যে চেষ্টা করছে তখন গিরিজা। খবরটা জানার পর থেকে ওর মনটাও খারাপ হয়ে গেছে। বেচারী অনু!

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে গিরিজা বলে উঠলো, মা!

—কি রে!

—মা অনু নাকি পরীক্ষা দেবে না।

দেবে না? চমকে উঠলো মা। বললে, কেন রে?

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গিরিজা বললে, অবুর বাবা যে টাকা দিতে পারবে না পরীক্ষার!

তারপর কি হয়েছিল জানে না গিরিজা। শুধু জানে বাবাও শুনেছিল কথাটা।

শুনে বলেছিল, বটে, টাকার জন্যে পরীক্ষা দিতে পারে না চাটুজ্যে বাড়ির ছেলে! কেন, গাঁয়ে লোক নেই নাকি!

পরীক্ষা দিয়েছিল অবু।

সেই প্রথম বনপলাশি ছেড়ে বাইরের জগৎ দেখতে পেয়েছিল গিরিজা। সেই প্রথম ট্রেনে চড়ে বর্ধমান গিয়েছিল বাবার সঙ্গে, পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল।

সে কি আনন্দ তার। আর কেমন বড় বড় চোখ করে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে বংশী। ঠিক যেমন ভাবে গোঁসাইদিদির কথা শুনতো সে! নবদ্বীপের রাসের গল্প, দুলোটে এটাতের গল্প।

গিরিজার কাছে শহরের গল্প শুনে, রেলগাড়ির গল্প শুনে বংশী ধীরে ধীরে বলেছিল, আমিও একদিন গোঁসাইদিদির সঙ্গে চলে যাবো। গিরিদাদা, গোঁসাইদিদি বলেছে নিয়ে যাবে আমায় ট্রেনে করে।

গোঁসাইদিদির কাছেই খবরটা শুনলে গিরিজা।

না, গিরিজাকে বলে নি গোঁসাইদিদি।

প্রতিদিনের মতই খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে এসে সদর দরজায় দাঁড়ালো গোঁসাইদিদি। তারপর গান শেষ করে জোরে জোরে বার কয়েক খঞ্জনী বাজিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর চিৎকার করে ডাকলে, কই গো, আমার গিরিগোবর্ধন কই?

ওই ডাকটার জন্যেই চুপ করে বসেছিল গিরিজা, মনে মনে হাসছিল কখন গিরি-গোবর্ধন বলে ডাক আসে।

গিরিজার উদ্দেশে ডাক দিয়েই ভেতরে চলে এলো গোঁসাইদিদি। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখোচোখি হলো গিরিজার সঙ্গে, আর মিষ্টি হেসে গোঁসাইদিদি বললে, এসো গোপাল, পরীক্ষা দিয়ে এলে তাই তোমার লেগে মহাপ্রভুর পেসাদ এনেছি। নাওসে গোপাল! বলে প্রসাদ দিয়েছিল গোঁসাইদিদি।

তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেছিল, মা কই গো ছেলে, ডাকো। বলে গিয়ে বসেছিল ঘরের পৈঠেতে।

আর এক সময় গিরিজার কানে এসেছিল অট্টামার নাম।

গোঁসাইদিদি বলছিল, চটুজ্যেদের বাড়িতে আজ আর ভিক্ষে মিললো না।

—কেন? মা বিস্মিত হলো তার কথায়। আর কালো চলোচলো রসকলি আঁকা হাসি হাসি মুখখানা হঠাৎ যেন থমথম করে উঠলো।

বললে, কি জানি দিদি! বড়ঠাকুর রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন।

—কেন? সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালো মা, আর গিরিজা নিজেও ভয় পেয়ে গেল।

অট্টামার ভাসুর, কালীমোহন ভট্টাচাযকে গাঁয়ের সকলে বলতো বড় ঠকুর। আর সে-মানুষের রাগকে সবাই ভয় পেত।

দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা ছিল কালী-মোহনের, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। টকটকে লাল পাড় গরদের একখানা শাড়ী পরে ভোর বেলা থেকে পুজোয় বসতেন কালীমোহন। তারপর পুজো শেষ করে টোলের ছেলেদের নিয়ে বসতেন। কিন্তু গ্রামের সকলেই তাঁকে ভয় পেত।

তাই গোঁসাইদিদির কথা শুনে কান খাড়া করলো গিরিজা। শুনলো, গোঁসাই-দিদি মাকে বলছে, কি হয়েছে জানি না বাপু, ছোট ঠাকুরের বউ দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

ছোটমা কাঁদছে? কেন? ভেবে ভেবে কোন কূল কিনারা পেল না। কিন্তু মনটা তার ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আহা বেচারী। হাতে শাঁখা সিঁদুর পরেও বিধবা মানুষের মত থাকে। দুবেলা দুটি খায় বৈই তো নয়। তার ওপর এত রাগ হবার কি থাকতে পারে।

ব্যাপারটা না জেনে বুঝি শান্তি নেই। কিন্তু কি করেই বা জানতে পারবে গিরিজা। জানতে না পারুক, ছোটমার মুখখানা দেখতে তো পারে।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো গিরিজা ঘর থেকে, তারপর এক ছুটে একেবারে ভটচায-বাড়ির কাছে পৌঁছতেই দেখলে অবু বেরিয়ে আসছে।

গিরিজা ডেকে বললে, ওদের বাড়িতে কি হয়েছে রে অবু?

অবু জবাব দিলে না এ-প্রশ্নের। জিগ্যেস করলে, হ্যাঁ রে গিরি, অট্টামা তোকে কোন চিঠি ফেলতে দিয়েছিল?

—চিঠি! সারা শরীর শিউরে উঠলো গিরিজার। কোন রকমে বললে, না তো।

অবু আর কোন কথা বললে না। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তার পর হঠাৎ কাঁদো কাঁদো গলায় বললে অট্টমা না রজকাকাকে চিঠি দিয়েছিল, রজকাকা তো থাকে না সেখানে, তাই চিঠি ফিরে

এসেছে। আর কালীজ্যাঠার কি রাগ তার জন্যে।

গিরিজা ভটচায-বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই অবু বললে, যাস না গিরি, কালীজ্যাঠা যা রেগে আছে, দেখবি...

গিরিজার মনেও যে ভয় না হচ্ছিল তা নয়, তবু অসীম কৌতূহলের আকর্ষণে ও পা বাড়ালো। ছোটমা কাঁদছে কেন! কাঁদবার কি আছে এতে! আর কালীমোহনই বা ওকে বকবেন কেন? স্বামীকে চিঠি লেখার মধ্যে আপত্তির কি থাকতে পারে গিরিজা খুঁজে পেল না। শুধু মনে পড়লো ওকে চিঠিটা ফেলতে দিয়েও কেমন ভয় ভয় চোখে এপাশ-ওপাশ দেখছিল ছোটমা। সেদিনও বোঝে নি, এত ভয় কেন তার।

ব্রজমোহন তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে, নিজেও আসে না—এইটুকুই গ্রামের সকলে জেনে আসছে। তার জন্যে স্বামীর বিরুদ্ধে রাগ অভিমান থাকতে পারে ছোটমার। কিন্তু সে-সব ভুলে যদি নিজে থেকেই চিঠি লেখে থাকে ছোটমা, কি এমন অন্যায় করেছে!

না কি, স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে বলেই কালীমোহন তাঁর ভাইকে ক্ষমা করতে পারেন নি!

গিরিজা ধীরে ধীরে ভটচায-বাড়ির চৌকাঠ পার হতেই দেখলে কালীমোহন খড়ম পায়ে খট খট করে উঠোনে পায়চারী করছেন। লাল পাড় গরদের শাড়িটা ধুতির মত করে পরা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, আর শ্বেতশুভ্র উপবীতে হাত দিয়ে মনে মনে কি যেন বিড় বিড় করছেন কালীমোহন।

সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই দূরে একটা কপাটের আড়ালে চোখ গেল গিরিজার। দেখলে, ছোটমা দাঁড়িয়ে আছে মুখ নীচু করে।

চোখাচোখি হতেই তাকে ইশারায় চলে যেতে বললে ছোটমা। আর ভয়ে আতঙ্কে ছুটে পালিয়ে এলো ও। কিন্তু আতঙ্কটা গেল না মন থেকে।

এদিকে দিনের পর দিন কেটে চলেছে। মনের ভেতর আর এক আতঙ্ক। পরীক্ষার ফল বের হওয়ার দিন এগিয়ে আসছে তখন।

যেদিন ফল জানতে পারলো সেদিন কি আনন্দ।

নতুন গোড়ের পাড়ে মোড়লদের গুড়ের শাল বসেছে। এক পাশে আখ স্তূপীকৃত হয়ে আছে, আখ-মাড়াই চলছে। আর বিরাট বিরাট দুটো উনোনে গনগনে আগুনে কড়াই চাপানো আছে। রস ফুটছে টগবগ করে, আর কি মিষ্টি মিষ্টি অদ্ভুত একটা গন্ধে ভরে গেছে চতুর্দিক। আর মাছি উড়ছে ভনভন করে।

গিরিজা, অবু, বংশী—সকলেই ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, দেখছিল কি করে রস ফুটছে, রস ঘন হচ্ছে।

মাঝে মাঝে শালপাতায় একটু করে গরম রস নিচ্ছিলো ওরা। ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করে চেখে চেখে দেখছিল।

এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়লো খেজুর গাছের সারির ওপারে। আলপথ ধরে একজন ভদ্রলোক এদিকেই এগিয়ে আসছেন।

গিরিজা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। একবার সন্দেহ হলো ওর, তারপরই মনে হলো, দূর, তাই কখনো হয়!

কিন্তু না, ভদ্রলোক ততক্ষণে আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছে গিরিজা।

আনন্দে, আতঙ্কে অদ্ভুত এক আবেগে বুক দুলে উঠছে ওর। ছুটে, ছুটে, ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেছে সে তাঁর দিকে।

তারপর কাছে পৌঁছেই পা ছুঁয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করেছে।

ততক্ষণে ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই যে হঠাৎ বনপলাশিতে এসে হাজির হবেন ভাবতেই পারেনি গিরিজা। বলেছে, স্যার আপনি এখানে?

হেডমাস্টারমশাইয়ের মুখখানা পাকা-পাকা দাড়ির আড়াল থেকে হেসে উঠেছে। পাশ করেছো তুমি। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছো।

আনন্দে খুশীতে নেচে উঠেছে গিরিজা।

আর হেডমাস্টারমশাই বলেছেন আজকেই ছেলেদের সব ফল দেখে ফিরছি ভাবলাম যাই গিরিজাপ্রসাদকে খবরটা দিয়ে যাই।

—আর অবনীমোহন? গিরিজা প্রশ্ন করেছে।

হেডমাস্টারমশাই বলেছেন, হ্যাঁ, পাশ করেছে, তবে...

জোর করে তাঁকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেছে গিরিজা। আর গিরিজার বাবা বলেছে, মাস্টারমশাই, এ-বেলা এখানেই খেয়ে যেতে হবে।

না, থাকতে রাজি হন নি তিনি। মা তাড়াতাড়ি দুখানা লুচি ভেজে দিয়েছে, তাই খেয়েছেন, নতুন গুড় দিয়ে। তারপর যাবার সময় বলেছেন, বাবলাডিহি যেতে হবে, তারপর বাণেশ্বর.....ছেলেরা রাতে ঘুমোতে পারছে না সব, খবরটা দিয়ে যেতে হবে তো!

গিরিজার বাবাকে বলেছেন, কোলকাতায় কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থ করুন রায়মশাই, ছেলে আপনার অনেক বড় হবে, হীরের টুকরো ছেলে।

গিরিজা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকিয়ে রইলো সেদিকে উদাস চোখে।

বংশীও চুপচাপ বসেছিল। হঠাৎ বললে, ভারী গলায় বলে উঠলো, তুমি চলে যাচ্ছো গিরিদাদা?

—হুঁ। আর কোন কথা বললে না গিরিজা।
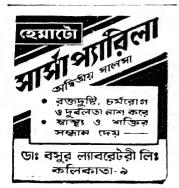
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে বংশী। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তোমায় একটা জিনিস দোব রাখবে গিরিদাদা?

—কি? বিস্মিত হয়ে গিরিজা প্রশ্ন করলে।

আর বংশী লাজুক বিষণ্ণ মুখে গিরিজার দিকে তাকিয়ে বললে, এই মাদুলীটা তুমি হাতে বেঁধে রেখো গিরিদাদা। কাল সারা দিন উপোস করে গোঁসাইদিদির মোহান্তর ঠাঁই থেকে নিয়ে এয়েছি, হাতে রেখো, তোমার কোন বিপদ হবে না। দেখো তুমি!

বলতে বলতে বংশীর চোখ থেকে টপ টপ করে দু ফোঁটা জল গাড়িয়ে পড়লো। আর তা দেখে গিরিজার বুকটাও ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। তবু মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বলেছে ও, দূর পাগল, কাঁদছিস তুই?

বংশীও হেসেছে।—না গো না, কাঁদবো ক্যানে। কোলকাতায় যাচ্ছো, বড় হবে, কত বড় হাকিম হবে তুমি, আর আমি কিনা কাঁদবো?

গিরিজাও হেসেছে। তারপর দুজনে পাশাপাশি হেঁটে গেছে খড়ি নদীর ধারে ধারে, নির্জন ঢালু রেখটার পাশে পাশে। বালির আঁকাবাঁকা একখানা চাদরের তীরে তীরে। অনেক দূর অবধি, গোঁসাইদিদির আখড়া অবধি চলে গেছে দুজনে। বন-তুলসীর ঝোপ, নয়নতারার ঝাড়গুলো শুকিয়ে গেছে, ক্ষ্যাপা সজারুর মত সারা গায়ে কাঁটা ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাতাঝরা কয়েকটা বাবলা গাছ।

না গোঁসাইদিদি, না নিকুঞ্জ দাস। কারো দেখা পায়নি, ভিন গাঁয়ে ভিক্ষে করতে চলে গেছে হয়তো।

এদিকে আবছা সন্ধ্যা নেমেছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার। গিরিজাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছে বংশী।

আর সারকুঁড়ের পাশ দিয়ে খড়ের পালুইয়ের পাশ দিয়ে আবছা অন্ধকারে আসতে আসতে হঠাৎ একটা সরসর শব্দ শুনে চমকে উঠেছে গিরিজা। সাপ নাকি?

না।

চমকে এদিকে ওদিকে তাকাতেই খড়-পালুইয়ের এক পাশ থেকে চাপা গলায় ডাক এসেছে, পেদাস, ও পেসাদ।

—ছোটমা? বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছে গিরিজা। ছোটমার আবছা ছায়াশরীরটা ও দেখতে পেয়েছে তখন।

ছোটমা দ্রুত পায়ে কাছে এগিয়ে এসেছে।

গিরিজার হাত দুখানা ধরে বলেছে, তুই যে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবি বলেছিলি পেসাদ।

গিরিজা বলেছে, যেতাম গো ছোটমা এখুনি যেতাম, ক্যানে এলে বলো তো তুমি?

ছোটমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছে, পেসাদ, তুমি কোলকেতায় যাচ্ছো বাবা, আমার একটা কথা রাখবে?

—কি কথা ছোটমা?

—ওর সঙ্গে তো দেখা হবে তোমার... গিরিজার হাত দুখানা অনুরোধের উপরোধের উষ্ণতায় চেপে ধরেছে ছোটমা। বলেছে, ওর সঙ্গে দেখা হলে বলো...

কথা শেষ করতে পারে নি ছোটমা। গিরিজা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, কান্নায় আবেগে গলার স্বর মাঝপথেই থেমে গেছে ছোটমার।

তাই বলেছে, বলো ছোটমা, দেখা হলে কি বলবো বলো।

ছোটমা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলেছে, বাবা পেসাদ বলিস যে আমি ভুল করেছিলাম, বলিস, ছোটমা ভুল বুঝতে পেরেছে, তার পথ চেয়েই আমি বসে আছি, বলিস বাবা তাকে।

কথাগুলো আবেগের গলায় বলে গেছে ছোটমা, গিরিজা শুনেছে। কিন্তু কিছুই যেন বুঝতে পারে নি সে। অবোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছে শুধু।

—ভুল করেছো? কি ভুল ছোটমা? উৎকণ্ঠার স্বরে প্রশ্ন করেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছে গিরিজা।

তারপর ছোটমা ধীরে ধীরে বলেছে। সব মিছে কথা পেসাদ, সব মিছে কথা। ওর কোন দোষ নেই রে, ও কতবার নিয়ে যেতে চেয়েছে, আমিই যাইনি। মেয়েমানুষের কাছে স্বামীর চেয়ে বড় যে আর কিছু নেই তা যে তখন বুঝি নি বাবা।

রহস্যের পর রহস্য। সারা শরীর শিউরে উঠেছে গিরিজার। এতদিনের ধারণাটা তা হলে ভুল? ছোটমা নিজেই যেতে চায় নি? কেন? কেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ছোটমা বললে, যখন ভুল ভাঙলো আমার, যখন তার কাছে যেতে চাইলাম, তখন...তখন বটঠাকুর তাকে একখানা চিঠি লিখতেও দিলেন না পেসাদ। শুধু বংশের সুনাম রাখবার জন্যে, বটঠাকুরের মান রাখবার জন্যে নিজের জীবনটা পুড়িয়ে ছারখার করেছি পেসাদ, মিছে কথা বলে লোকের ঘৃণা কুড়িয়েছি।

একটু থেমে ছোটমা আবার বলেছে, আমায় নাকি স্বামী নেয় না, হ্যাঁ পেসাদ, আমার স্বামীর মত স্বামী কার হয় বাবা। তার নামে মিথ্যে দুর্নাম দিয়েছি রে!

বলতে বলতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ছোটমা।

(ক্রমশ)

ছন্দকে কেবলমাত্র কৌশলরূপে অবলম্বন করলে ছন্দের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। বেহালায় ছড়ির টানে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা যায়। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে তার দুর্লভ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা বেহালায় সেই সার্থক সুরসৃষ্টি করতে পারি না। এমন একটা যন্ত্রকে যদি তিন তাল এক ফাঁকের চরকিবাজিতে ফেলে নাকাল করা যায়, তা হলে আমাদের রসবোধের অভাবই একমাত্র প্রমাণিত হয়ে থাকে। কেরামতুল্লাকে আমরা তাঁর সংযত এবং সম্ভ্রান্ত সঙ্গতের জন্য প্রশংসা করে এসেছি। এবারকার কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাঁকে সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুত দেখা গেল। তিনি কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের পক্ষপাতী হয়েছেন। হাততালির হাতছানি ধীর ব্যক্তিকেও আজকাল বেশিদিন স্থির থাকতে দেয় না। শ্যাম গাঙ্গুলী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গতেও তাঁর স্থৈর্যের অভাব দেখা গেল। শ্যামবাবুও আলাপে যে রূপটি গঠন করেছিলেন, সেটি গতে এসে নির্মমভাবে ভাঙতে দ্বিধা করলেন না। আমাদের কিন্তু একে সঙ্গীতের অপমৃত্যু বলেই মনে হয় এবং এই উদাহরণ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্থাপিত হলে ভারতীয় সঙ্গীতের অবনতির সূত্রপাত হবে বলেই আমাদের ধারণা।

রসসৃষ্টির দিক থেকে শ্রীমতী মালবিকা কাননের পূরিয়া কল্যাণের খেয়াল সুন্দর লাগল। তিনি একটি নিটোল সঙ্গীত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সহজ মনোজ্ঞ ভঙ্গীটি বিশেষ যোগ্যতার পরিচায়ক। ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গীতও আনন্দ প্রদান করেছে। তরুণ শিল্পী নাজাকাৎ আলী খাঁ এবং সালামৎ আলী খাঁর দেশী তোড়ী শুনলাম। এঁদের গান শুনে মনে হল কতকগুলি চিত্তাকর্ষক কাজ এঁরা আয়ত্ত করেছেন এবং মাঝে মাঝে সেগুলি প্রয়োগ করেছেন শ্রোতাদের চমৎকৃত করবার উদ্দেশ্যে; কিন্তু যে রীতিতে ধীরে ধীরে একটি রাগের পূর্ণ বিকাশ হয়, সেই রীতি এঁদের নিপুণভাবে আয়ত্ত হয়েছে বলে মনে হল না। কৃতিত্ব এঁদের আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রতিভার সৃষ্টি অন্য জিনিস। আধ ঘণ্টা ধরে এঁদের কাছ থেকে কেবলমাত্র রে গা সা রে নি সা শুনলাম; কিন্তু মনে পড়ছে মাত্র কয়েক মিনিটেই ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এই দেশী তোড়ীতে কী অপূর্ব রসসৃষ্টি করতেন। ভীষ্মদেব যে সব সময় খুব রীতি মানতেন এমন নয়—কিন্তু রসসৃষ্টির অপূর্ব প্রতিভা তাঁর ছিল। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠেও দেশী তোড়ী শুনেছি—তিনিও অপূর্ব রসসৃষ্টি করতেন এই সুরে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। এই সব স্মৃতি যাদের চিত্তে জাগরূক আছে, তাঁদের মনে হয়ত এই দেশী তোড়ী রেখাপাত করতে সমর্থ হবে না। আর একজন তরুণ শিল্পী মানোয়ার আলী খাঁ গাইলেন দরবারি কানাড়া। তাঁর সম্বন্ধেও একই অভিমত প্রকাশ করব। রাগকে পূর্ণভাবে বিকাশ করবার আগেই এঁরা কৌশল প্রদর্শন করতে অগ্রণী হন। কিন্তু যে যোগ্যতা থাকলে এই সব কৌশল অভিজ্ঞ শ্রোতাকে আকর্ষণ করে, সেই যোগ্যতা প্রচুর সাধনা দ্বারা অর্জন করতে হয়। এর জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। মানোয়ার আলীর কণ্ঠ মনোরম। নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীতবিকাশে সচেষ্ট হলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। দরবারি কানাড়ায় কিছু আলাপ করেছিলেন প্রবীণ শিল্পী হাফিজ আলী খাঁ। তিনি এই রাগটি মূলত বৃন্দাবনী সারঙ্গ, নায়কী কানাড়া এবং দেশী তোড়ীর উপাদানে প্রস্তুত বলে মনে করেন এবং এই রাগগুলি কিভাবে দরবারি কানাড়ায় রয়েছে, সেটি দেখিয়ে দেন। শ্রীমতী কেশরবাঈ-এর গান এবারে আমাদের অভিভূত করেছে। তাঁর বয়স হয়েছে, দম রাখতে কষ্ট হয়, কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও তিনি যেটুকু গেয়েছেন, তার মূল্য অসামান্য। তাঁর গান থেকে বোঝা যায়, আমাদের সঙ্গীতের গঠন বা বন্দেশ কী জিনিস—কেমনভাবে তাকে গড়ে তুলতে হয়। বিলম্বিত খেয়ালে আজকাল ছন্দের স্পন্দন অনুভূত হয় না বললেই চলে, কিন্তু কেশরবাঈ তাঁর বেহাগ-ভিত্তিক রাগের খেয়ালে প্রতিটি মাত্রা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন এবং প্রতিবারই সমে ফিরে এলেন, এখনো সঙ্গীত পূর্ণতার সম্পদে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোনো কাজে বাহুল্য নেই, চমকপ্রদ কৌশল নেই; কিন্তু যা আছে তা রূপায়ণের পক্ষে অপরিহার্য। এই হচ্ছে আর্ট এই হচ্ছে আমাদের সঙ্গীতের আকৃতি এবং প্রকৃতি। প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞকে আমরা আন্তরিক সম্মান প্রদান করছি। কণ্ঠসঙ্গীতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রী [illegible] কাননের তোড়ী আমাদের মনোরম লেগেছে। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সংযত প্রকাশভঙ্গিতে স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

শ্রী[illegible] বাদন এবং [illegible] সম্প্রদায়ের সুন্দরী বাদন উপভোগ্য হয়েছে। এঁরা সুন্দর মাত্রাবোধ দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ [illegible] এর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বলা যায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে শ্রীসুবিনয় রায় রবীন্দ্রিক রীতি রক্ষা করে দেখিয়ে দুটি রূপদান করেছিলেন। [illegible] মধ্যে গানটিতে তিনি সুন্দর কাজ করেছিলেন যোগ্যতার সঙ্গে। শ্রীদামোদরদাস খান্নার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতবোধ সম্পর্কীয় ভাষণটি সমালোচিত হয়েছে।

অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স থেকে আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সে সম্পর্কে যেটুকু বলা দরকার, তাই বলা গেল। আমাদের প্রধান অভাব রূপায়ণে দক্ষতার অভাব। এই অভাবের জন্য একদিকে দায়ী শৈথিল্য, অপর দিকে দায়ী চঞ্চলতা। আর একটি অভাব ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ সম্বন্ধে ধারণার স্বল্পতা। সঙ্গীতকে রূপায়িত করতে গেলে কৌশল দরকার, কিন্তু কৌশলের প্রদর্শনী করলে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আমাদের সব কৌশল নিয়োজিত হয়েছে সঙ্গীতের পূর্ণ বিকাশে। অতএব সঙ্গীতের বিকাশ পূর্ণ হলেই শিল্পীর প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে।

রবিবার কর্তারা গৃহকাজের খানিকটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে স্ত্রীকে দেন ছুটি। অবশ্য যদি সপরিবারে উইক-এন্ড করতে বেরিয়ে পড়েন, তবে অন্য কথা।

এক উইক-এন্ড-এ হ্যারিয়েট আমাদের নিমন্ত্রণ করল ওদের গ্রামের বাড়িতে কাটাতে। বলল, ডিক কাজে গেছে অন্যত্র, একা আছি, তোমরা যদি এসে থাকো ভাল লাগবে। তা ছাড়া তুমিও নিশ্চয় নিউ ইংলন্ডের কান্ট্রিসাইড দেখে খুশী হবে।

শুধু কান্ট্রিসাইড নয়, ওদের পারিবারিক জীবন কাছ থেকে দেখতে পেয়ে ভাল লেগেছিল।

যে কথা বলছিলাম। রবিবার সকালে হ্যারিয়েটদের কিচেন-কাম-ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখি, ছেলেমেয়েরা মহা হইচই লাগিয়েছে। কি, না, হ্যারিয়েটের রান্না তাদের পছন্দ হচ্ছে না। রবিবারের ব্রেক-ফাস্ট তৈরি করেন ডিক। ছেলেমেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরে কলরব করে অভিযোগ করল, মা যে ব্লু-বেরি পাই তৈরি করেছে একটুও বাবার মত ভাল হয়নি। হ্যারিয়েটের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম সস্নেহ হাসি।

মোটের উপর আমেরিকান দাম্পত্য জীবনে পত্নীদের আধিপত্য কিছু বেশী আর স্বামীদের আনুগত্য সরব ও প্রকাশ্য।

এদিকে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা আমেরিকাতে বেশী এ কথা সবাই জানে। কিন্তু দূর থেকে আমরা যদি ধারণা করে ফেলি, ওরা বুঝি শুধু বিয়ে করছে, ভাঙছে আর আবার করছে তবে সেটা ভুল। ও ধারণাটা শুধু হলিউডের চিত্রতারকা-জগতে সত্য। সাধারণ ভদ্র, শিক্ষিত আমেরিকান সমাজ যথেষ্ট রক্ষণশীল। বিবাহবিচ্ছেদটাকে ওরা মেনে নেয় দুর্ঘটনা হিসেবেই, ওটাই স্বাভাবিক নিয়ম নয়। বিবাহ-বিচ্ছিন্ন নরনারীকে ওরা খুব উঁচু নজরে দেখে না। তাদের ছেলেমেয়েদের দেখে সমাজের সমস্যা হিসেবে।

বন্ধুপুত্র পিটার পড়ত বেশ একটি ভাল নাম-করা রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে। আমার বন্ধুটি হঠাৎ তাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে আমাকে সব কথা খুলেই বললেন। স্কুল খুব ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশ বড়-লোক স্কুল হওয়াতে সমাজের এক বিশেষ স্তরের ছেলেরাই এখানে আসে। অনেকের বাবা-মা ডিভোর্সড। কিন্তু দু পক্ষেই হয়ত মিলিয়নেয়ার লোক। অনেক টাকা খরচ করে ছেলেকে ভাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে রেখে দিয়ে নিজেরা নিষ্কৃতি লাভ করেছে

আগে ঠিক বুঝতে পারিনি, বন্ধু কঠিন মুখে বললেন, পিটারকে আমি এ সংসর্গে রাখতে চাই না।

বিবাহবিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত যত দেখেছি টেলিভিশন স্ক্রীনে তার কিছুই দেখিনি সত্যিকারের জীবনে। আমেরিকায় যাদের ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলাম, এই তো ঠিক এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে একটাও বিচ্ছেদের ঘটনা মনে করতে পারছি না। অবশ্য একজন আমাকে বলেছিলেন, দৈবচক্রে আমার আমেরিকার প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা প্রধানত নিউ ইংলন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদিকের লোকেরা স্বভাবতই একটু বেশী ভদ্র, ধীর, কালচার্ড এবং পিউরিটানও। তাই আমেরিকান জীবনের কিছু কিছু মন্দ দিক আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। যদি গিয়ে থাকে সেজন্য ক্ষোভ নেই।

ডিভোর্স কোর্ট নিয়ে কিছু-না-কিছু প্রোগ্রাম প্রায়ই থাকত টেলিভিশনে। কোর্টে

হে ভগবান, আমার বাবা-মাকে ঝগড়া করতে দিও না

মামলা চলছে। কোর্টের বাইরে দেয়ালের গায়ে খোদাই করা আছে ছোট ছেলের মূর্তি, হাঁটু গেড়ে বসে আছে প্রার্থনার ভঙ্গীতে। ওপরে লেখা, হে ভগবান, আমার বাবা-মাকে ঝগড়া করতে দিও না। ভেতরে হয়ত কোন নিতান্ত তুচ্ছ কারণে, নয়ত কোন বড় রকমের প্রকৃত মানসিক অশান্তির জন্যই বিচ্ছেদ প্রার্থনা করছে কোন পক্ষ। কখনো দেখা যেত বিচারক চোখের জলের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিচ্ছেন। কোথাও বা রায় হল অন্যরকম। হয়ত বেরোবার মুখে কোর্টের দরজার কাছে হাতাহাতিই হয়ে গেল বাদী-প্রতিবাদীতে।

ওদের দেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রয়েছে অবাধ মেলামেশা—এটা নিশ্চয় আমাদের কাছে এখন আর কোন নূতন খবর নয়। নার্সারী স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ, কলেজ পেরিয়ে জীবনের সব কর্মক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। এই সুস্থ, সাবলীল, সহজ অন্তরঙ্গতা দেখে ভাল লাগত। আমাদের এখানে যে এখনো কলেজের ঘণ্টা পড়লে মেয়েরা বেরোয় এক গেট দিয়ে, ছেলেরা ঢোকে অন্য পথে। কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি থাকে পাছে দৈবাৎ চালে-ডালে মিশে যায়।

এই মেলামেশার ফলে কতকগুলো প্রথার চল হয়েছে ও দেশে। তার কোনটা বুঝতে পারতাম, কোন-কোনটায় খটকা লেগে যেত। এমনি একটা প্রথা হল ডেটিং। মেয়ে একটু বড় হলে তাদের সহপাঠী বা ছেলে-বন্ধু বাড়িতে আসে, অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে যায়, কখনো যায় নাচতে, কখনো খেতে। এ যেন হ'ল। এর দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে "গোয়িং স্টেডি"। একটি ছেলে যদি সব বান্ধবীদের ছেড়ে একজনের সঙ্গে ডেটিং করছে দেখা যায় বা একটি মেয়ে যদি অন্য সখাদের ত্যাগ করে একজনের সঙ্গেই ঘোরে, তবে বুঝতে হবে যে, ওরা এখন গোয়িং স্টেডি। দেখে মজা লাগত, নিতান্ত অবোধ বালক-বালিকা, তারাও বলে স্টেডি চলেছে। টিন-এজ হতে না-হতে অর্থাৎ তের-চোদ্দ বছরে পড়তে-না পড়তে এই স্টেডি চলা শুরু হল। প্রথমে স্কুলে একজনের সঙ্গে, তারপর হাই স্কুলে আর একজনের সঙ্গে তারপর চাকুরি-ক্ষেত্রে ঢুকে তৃতীয় কোন জনের সঙ্গে। অবশেষে এই আধ ডজন স্টেডিদের মধ্যে বাছাই করে একজনের সঙ্গে ঘর-বাঁধা।

আমরা বাল্যবিবাহ রদ করেছি, ওরা দিন-দিন বাল্যবিবাহের দিকে ঝুঁকছে। আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে ছেলেরা আজকাল তিরিশের ওপারে না গেলে বিয়ের কথা ভাবতেই পারে না। মেয়েরা কয়েক বছর আগেও বাইশ-তেইশে করছিল, আজকাল অনেকে দেখি সেটাকে টেনে সাতাশ-আটাশেও তুলে ফেলছে। ওখানে একজন চব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে আলাপ হলে যদি শুনি সে বিবাহিত ও অন্তত দুটি ছেলেমেয়ে আছে, তবে একটুও আশ্চর্য হই না। অনেকেই পড়া শেষ হবার আগে কলেজ-জীবনের শেষের দিকে বিয়ে করে। য়ুনিভার্সিটি অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের থাকার যেমন হোস্টেল আছে, বিবাহিত দম্পতীদের জন্যও আলাদা কোয়ার্টার আছে।

বান্ধবীরা অনেকেই যখন বলতেন যে, তাঁদের স্বামীরা এখনো "স্কুলে" পড়েন, তখন শুনতে মনে হত অদ্ভুত। এ সময়টা স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই অপেক্ষাকৃত কষ্ট করতে হয়। অনেকে বাড়ির সাহায্য পায়, যারা পায় না তারা নিজেদের ব্যবস্থা দেখে। শার্লির কথা মনে পড়ছে। তার স্বামী স্যাম হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে ছিলেন। শার্লি কেবলই স্বপ্ন দেখে স্যামের স্কুল জীবন শেষ হোক, তখন এই করব, তখন

সেই করব। আমি তাদের স্বপ্নের শহর দেখে আসতে পেরেছি। স্যাম যেবার পাস করে বেরোল, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গ্র্যাজুয়েশন উৎসবে শার্লির সংগে আমিও ছিলাম। মেডিকেল স্কুলের খোলা মাঠে নূতন গ্র্যাজুয়েটদের স্ত্রী-ছেলেমেয়ের উপস্থিতিতে গ্র্যাজুয়েশন উৎসব হল নিতান্ত খোলাখুলি অন্তরঙ্গ পরিবেশে।

এ গেল ওদের দেশের নরনারীর সম্পর্কের কথা। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক নিয়ে ও দেশে কিন্তু একটা জটিল সমস্যা আছে। এ সমস্যার সমাধান ওরা যে কি করবে, একেবারেই করতে পারবে কিনা তা তর্কের বিষয়। মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন না হলে শুধু আইন করে এর মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। আমি ওদের দেশের কালো-ধলোর সমস্যার কথা বলছি।

নিগ্রোরা ওদের দেশের হরিজন। একজন নিগ্রো যত শিক্ষিত, ধনবান বা প্রতিভাশালীই হোক না কেন, সমাজে উঠতে পারে না। টাকা-পয়সা যথেষ্ট আছে তবু ভাল পাড়ায় বাড়ি পাবে না। ফিলাডেলফিয়া বা বস্টনের কোন কোন নিগ্রো কোয়ার্টার আমাদের দেশের অনেক দুর্গন্ধ অঞ্চলকে হার মানাতে পারে। প্রতিভা আছে নিগ্রোদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা। সংগীতের কথাই ভাবা যাক। ব্রডওয়ের শো-বিজনেসে এদের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রতিভা-রাজ্যেও এদের স্বীকৃতির পথ দুর্গম।

প্রসংগত মনে পড়ল নিউইয়র্কে এই নিগ্রো সমস্যার ওপর একটি সুন্দর নাটকের অভিনয় দেখেছিলাম। Raising in the sun। পাত্র-পাত্রী, অভিনেতা-অভিনেত্রী সবই নিগ্রো। এক বৃদ্ধা নিগ্রো রমণীর ভূমিকায় এক অভিনেত্রীর আশ্চর্য প্রাণবন্ত, বলিষ্ঠ অভিনয় ভোলবার নয়। সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ভেবেছিল শেষ বয়সে বাড়ি কেনে একটু ভদ্র পাড়ায়। নিজের ছেলেমেয়েদের পারেনি কিন্তু নাতিকে মানুষ করবে মুক্ত আলো-হাওয়ায়। কিন্তু কি করে তার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল তারই সরল কিন্তু হৃদয়স্পর্শী কাহিনী।

সে সময় সেগ্রেগেশন নিয়ে আমেরিকাতে শুরু হয়েছে বাক-বিতণ্ডা, দাংগা-হাংগামা। রাষ্ট্র শাসকেরা আইন করে বলে দিয়েছেন, নিগ্রো ছেলেমেয়ে আর শ্বেতাংগ ছেলেমেয়ে এক স্কুলে একসংগে পড়বে। কিন্তু দেশের কোন কোন অঞ্চলে লোকেরা এটা মেনে নিতে পারেনি। প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে বিদ্রোহ। আর যারা মেনে নিয়েছে, তারা অন্তর থেকে কতটা সায় দিয়েছে, সেটা প্রশ্নের অতীত নয়।

একজন বুদ্ধিমতী, সহৃদয়া আমেরিকান মহিলার কথা বলি। নাম যাঁর মিসেস চিজোম। বস্টনে তখন পথের পাঁচালী চলছিল। পথের পাঁচালী দেখে তিনি কাঁদলেন। আর আমাকে বিপদে ফেলে দিয়ে কেবলই জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, তোমরা কি সত্যিই এত দরিদ্র? ওই যে লিটল গার্ল দুর্গা মারা গেল চিকিৎসার অভাবে, পথ্যের অভাবে, সত্যিই কি এরকম হয়?

এ হেন করুণাময়ী আমেরিকান নারী সেগ্রেগেশনের কথা উঠলেই হয়ে উঠতেন উত্তেজিত। না, একসংগে স্কুলে পড়া মানেই বড় হয়ে বিয়ে করা। মিশ্রণ ঘটতে

ওদের দেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রয়েছে অবাধ মেলামেশা

দিতে চাই না আমরা। হঠাৎ আমার শিশু-পুত্রের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বললেন 'তুমি বল, তুমি কি পারবে কোন নিগ্রো মেয়েকে ছেলের বউ করে আনতে?' আচমকা এই প্রশ্নে আমি একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনে হল ভারতবর্ষে আমাদের আত্মীয়-বন্ধুজন কত রকম বউ ঘরে এনেছেন—আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইয়োরোপ, মিশর, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—কিছু বাদ যায়নি। কিন্তু খাস নিগ্রো? কই, কেউ আনেনি তো!

একবার বাড়ি বদলের ফলে উঠে এলাম বস্টনের রক্সনের অঞ্চলের ধার-ঘেঁষে। আমাদের পাড়া থেকে নিগ্রো পাড়া আমেরিকান ভাষায় যাকে বলে "ওয়ান ব্লক অ্যাওয়ে" তাই। আমাদের খাস সাদা পাড়ায় কেমন করে যেন এক নিগ্রো পরিবার ছিটকে ঢুকে পড়েছে। সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা আমাদের সংগে খুব মিশতে চাইত। খেলা করতে আসতো আমার শিশুপুত্রের সংগে। এদিকে অন্য শ্বেতকায় আমেরিকান বাচ্চারাও আসে তার সংগে খেলতে। সে খুব পপুলার হয়ে পড়েছে দেখলাম। আসল কথা সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে আসা একটি ছোট্ট ছেলে এদের সকলের শিশুমনে কল্পনার রঙ ধরিয়ে দিয়েছিল।

আড়াল থেকে আমি দেখতাম সাদা ছেলেমেয়েরা যখন আসে, কালোরা তখন একটু সরে যায়। কালোরা যখন থাকে, তখন অন্যরা দূরে থেকে ইতস্তত করে। ছোট্ট মেয়ে জিন তো আমাকে একদিন বলেই ফেলল নিগ্রো প্রতিবেশীদের সম্পর্কে, ওরা তেমন নাইস পিপল নয় মিসেস বোস, ওদের সংগে ওকে মিশতে দিও না তুমি।

কিন্তু হাজার হলেও ছেলেমানুষ কতদিন এরকম চালাতে পারে? একদিন দেখলাম সকলে মিলে গেছে। খেলা করছে একসংগে আমাদের ছোট্ট কাঠের বারান্দায়। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি খেলা হচ্ছে তোমাদের? ওরা সমস্বরে বলে উঠল, "উই আর প্লেয়িং হাউজ!" সব দেশের ছোটদের মতই ওরা বাবা-মা-ছেলেমেয়ে খেলা খেলছে। নিগ্রো ছেলে রিকি হয়েছে বাবা, শ্বেতকায় হেলেন মা। আমার ছেলে হাত নেড়ে বলে দিল, আমি আর তোমার ছেলে নেই—আই অ্যাম হেলেন'জ বয়। ওদের খেলাঘর দেখতে দেখতে খুব জমে উঠল। আমি শুধু ভাবলাম, হায় মিসেস চিজোম!

এই কালা-রঙ প্রবলেমের কথাটা যদি কোনমতে ভুলে যাওয়া যায়, তবে অন্য কোনদিকে আমেরিকাতে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। জীবনে বড় হবার পথ সকলের সামনেই খোলা আছে। তুমি যদি খাটতে পারো, উন্নতি করতে পারো, তুমি কি না হতে পার? কোনরকম কাজকেই এরা নীচু কাজ মনে করে না, তাই উচুনীচু শ্রেণীভেদ একেবারেই না হলেও অনেকটাই লুপ্ত।

মিস মাসুরাম প্রথমে এ দেশে এসেই বস্টনে [illegible] গিয়েছিল। [illegible] পাঞ্জাবী খ্রিস্টান মেয়ে। নার্সের কাজ নিয়ে এসেছিল ওখানে একটি ছোট্ট হাসপাতালে। একদিন এসে বলল, এদের এখানে সবই অদ্ভুত ব্যাপার। বললাম, কেন, কি হল? বললে, কাল ছিল আমাদের হাসপাতালে বল নাচ আর সাপার। তা দেখলাম ডিরেক্টর নাচছে নার্সের সংগে, নার্স নাচছে টেকনিশিয়ানের সংগে। আবার নাচের পর সব এক টেবিলে বসে খেল, হাসাহাসিও করল একসংগে। তার কিছুটা ভাব লক্ষ করে বললাম, ক্ষতি কি। তোমার লুধিয়ানা না লায়ালপুরের হাসপাতালে এ নিয়ম চালু করলে কেমন হয়? সে বললে, সর্বনাশ, ডিসিপ্লিন রাখাই দায় হবে তা হলে।

আমেরিকাতে স্নবারি নেই মোটে—এ কথা নিশ্চয় বলতে পারব না। নিউইয়র্কের পার্ক এভেনিউর বাসিন্দা ও ওয়েস্ট ১২০ স্ট্রীটের বাসিন্দায় সামাজিকতার সম্ভাবনা কম। কিন্তু মূলত এরা ডেমোক্রেটিক জাত। এদের দেশে শ্রমের অসাধারণ মর্যাদা এর জন্য দায়ী। জীবিকার জন্য যে কোন কাজই তুমি করো না কেন, কেউ হেয় মনে করবে না। জীবনের উন্নতি নির্ভর করছে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ওপর। ওয়েস্ট ১২০ স্ট্রীটের বাসিন্দা যদি ইচ্ছা করে ও চেষ্টা করে তবে পার্ক এভেনিউ কেন, হোয়াইট হাউসের বাসিন্দাতেও পরিণত হতে পারে।

চিত্ত সিংহ, গত বছর যিনি তাঁর প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী করে অনেককেই বিস্মিত করেছিলেন, গত সপ্তাহে মহাবোধী সোসাইটি হল-এ তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। চিত্ত সিংহ ছবি আঁকার প্রথাগত ব্যাকরণ শিক্ষা করেননি। প্রথম প্রদর্শনীরও কিছু ছবি ইনি প্রদর্শন করেছিলেন এ প্রদর্শনীতে এবং কিছু নতুন ছবিও ছিল। পাঁচটি ভাস্কর্যও এবার দেখা গেল। ভাস্কর্যে শিল্পী কিছুটা প্রথাগত হবার চেষ্টা করেছেন।

চিত্ত সিংহ কবি এবং সাহিত্যিক হিসাবেই পরিচিত। গতবারের প্রদর্শনীর পর থেকে ইনি শিল্পী হিসাবেও পরিচিতি লাভ করার চেষ্টা করছেন। পেশাদার বা পাকা শিল্পীদের কাজের সংগে এঁর কাজের তুলনা করার মত দুঃসাহস আমার নেই। অনেক সংবাদপত্রেই চিত্ত সিংহ সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে ঠিক সেই সুরে সুর মেলানো আমার পক্ষে সম্ভব হল না। ছবি আঁকা না শিখে ইনি ছবি আঁকছেন, সুতরাং এঁকে উৎসাহ দেওয়া অবশ্যই উচিত। শিল্পী যে রসিক তার যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া যায় তবে অসাধারণ শিল্পী প্রতিভার বিকাশোন্মুখ সজীব স্পর্শ অনুভব করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোনও রকম আতিশয্যে করার আগে বেশ ভালভাবেই চিন্তা করা উচিত বলে আমি মনে করি। মহৎ শিল্প উদ্ভাবনার ব্যাপারে সমালোচকের দায়িত্বটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় একথা অনেকেই ভুলে যান।

চিত্ত সিংহকে আমরা নিরুৎসাহ করতে চাই না তবে তাঁকে এই কথা আমরা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি যে, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য বাস্তবিকই সাধনার বিষয় এবং তিনি যদি চিত্র বিদ্যার ব্যাকরণ আয়ত্বের মধ্যে এনে সাধনা করতে পারেন তা হলে ভবিষ্যতে তাঁর রচনাও হয়ত পাকা শিল্পী-দের চিত্রকলার পাশে বসার অধিকার পাবে।

ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট-এর বার্ষিক প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ড্রাফটসম্যানসিপের বার্ষিক চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রত্যেক বারের মতই এবারেও অসংখ্য ছবি, ব্যবহারিক শিল্প, গ্রাফিক শিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। এতগুলি শিল্প নমুনা থেকে কোনটি সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ কাজ তা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন কাজ। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রদর্শনীটির মান প্রশংসনীয়। সুকুমার

চিত্রগ্রীব

শিল্পে এখানকার ছাত্রেরা আধুনিকতার দিকে বিশেষ ঝোঁকেননি। এটা এক বিষয়ে ভাল, কারণ ছাত্রাবস্থা থেকেই ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন প্রকাশের চেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই বেশী। সুকুমার শিল্পে জল রঙ অপেক্ষা তৈল মাধ্যমের কাজগুলিই অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের বলে মনে হয়েছে। ভাস্কর্যের মধ্যেও বেশ উচ্চাঙ্গের কাজ নজরে পড়েছে। ব্যবহারিক শিল্পে রঙচঙে কাজ—পোস্টার, শো কার্ড ইত্যাদি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বেশ কয়েকটি লক্ষ্য করলাম তবে প্রেস-লে-আউট খুব উচ্চাঙ্গের কিছু নজরে পড়েনি। প্রদর্শনীটি আমরা উপভোগ করেছি।

স্বর্গীয় আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলা

পার্ক স্ট্রীট-এ প্রিন্টস আর্ট গ্যালারীতে গত সপ্তাহে স্বর্গত শিল্পী আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রিন্টস আর্ট গ্যালারী যে একক চিত্রপ্রদর্শনীর সিরিজ করছেন আদি-নাথের চিত্রকলা সেই সিরিজের দ্বিতীয় প্রদর্শনী। আদিনাথের পর সেখানে চলছে সমর রবের চিত্রকলা প্রদর্শনী। আদিনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সরকারী প্রচার বিভাগের শিল্পী। ইতালী সরকারের বৃত্তি লাভ করে ইনি ইতালী যাবার সুযোগ পান ১৯৫৮ সালে। সেখানে
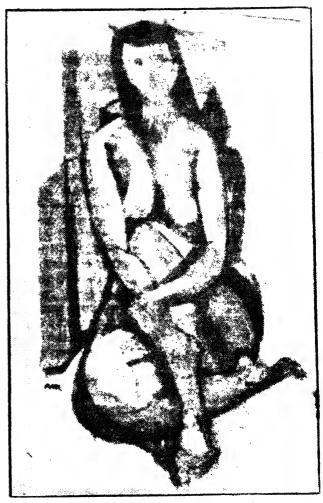
নিউড —আদিনাথ মুখোপাধ্যায়

আলো এবং বারান্দা — পাঁচুনারায়ণ গুপ্ত

প্রখ্যাত শিল্পী জিশেপ্পিনির কার্যালয়ে ইনি ভর্তি হন এবং জিশেপ্পিনির শিক্ষাধীনে থেকে আধুনিক অভিজ্ঞাকে চিত্রচর্চা শুরু করেন। বিদেশ যাবার আগে আদিনাথ ছিলেন গোঁড়া প্রথাগত শিল্পী। বিদেশ থেকে ফেরার পর আমরা লক্ষ্য করলাম তাঁকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে। কিন্তু যেহেতু প্রথাগত ধারায় তিনি চিত্রচর্চা করেছিলেন বহুদিন, তাঁর পক্ষে আধুনিক চিত্রবিদ্যার সমস্যাগুলি উপলব্ধি করা এবং সেগুলি সমাধান করার কৌশল আয়ত্ত করা কঠিন হয়নি। যে সব ছবি ইনি এঁকেছেন ইতালীতে অবস্থান কালে তা সবই মডেল দেখে, কিন্তু সাদৃশ্য সত্যের ওপর তাঁর নজর থাকেনি—নজর ছিল আধুনিক ব্যাকরণসম্মত পরিপূর্ণ ছবি সৃষ্টি করার দিকে। সব সুদ্ধ চোদ্দটি পেন্টিং প্রিন্টস আর্ট গ্যালারী প্রদর্শন করেছেন। এই চোদ্দটি রচনাই অনন্যসাধারণ। বিশেষ করে নিউড রচনায় শিল্পী অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আদিনাথের বলিষ্ঠ রেখা এবং রঙ প্রত্যেক দর্শককেই মুগ্ধ করবে। বাস্তবিকই বহুদিন পর যথার্থ রসোত্তীর্ণ কয়েকটি রচনা দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। এজন্য প্রিন্টস আর্ট গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ বাস্তবিকই রসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিছু ছবি লক্ষ্য করলাম অল্পবিস্তর জখম হয়েছে। এগুলি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার। আদিনাথ ছিলেন পশ্চিম বাংলার প্রচার বিভাগের শিল্পী সুতরাং আমরা মনে করি ছবিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁদেরই গ্রহণ করা উচিত।

চেক গ্রাফিক আর্ট

এ সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ চেকোশ্লোভাকিয়ার গ্রাফিক চিত্রকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস। ছবিগুলি চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন অজিত চক্রবর্তী। অজিত চক্রবর্তী সেখানে গিয়েছিলেন চিত্রবিদ্যা চর্চা করতে এবং যে সব শিল্পীদের সঙ্গে সেখানে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁরা তাঁকে এই সব রচনা উপহার দিয়েছেন। যে সব ছবি তিনি সেখান থেকে এনেছেন তা সব প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি কারণ আর্টিস্ট্রী হাউস-এর বাইরের দিকের লম্বা ঘরটিতে এই প্রদর্শনী হয়েছে। এ প্রদর্শনীর পক্ষে স্থানটি যথেষ্ট বড় নয়। ৮০টি ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে।

ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই আজকাল গ্রাফিক আর্ট শিল্পী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনেক সময় বড় বড় পেন্টারদেরও দেখা যায় তুলি ক্যানভাস ত্যাগ করে বসে গেছেন গ্রাফিক আর্টের নানান রকম হাতিয়ার এবং মালমশলা নিয়ে। তাঁদের অনেকেরই মতে পেন্টিং-এর থেকেও নাকি অনেক বেশী মজা থাকে এতে। ইউরোপের বড় বড় শিল্পীরাও গ্রাফিক চিত্র রচনা করার জন্য মাথা ঘামান বলে সেখানে গ্রাফিক আর্ট অত্যন্ত উচ্চ মানে গিয়ে পৌঁচেছে। তবে গ্রাফিক আর্টের চলন সেখানে নতুন নয়। বেশ কয়েক শ বছর আগে থেকেই—কাঠ খোদাই করে ছাপ

একটি প্রতিচ্ছবি —চিত্ত সিংহ

তোলার রেওয়াজ সেখানে শুরু হয়েছে। একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য চেকোশ্লোভাকিয়ার তরুণ শিল্পীদের কাজের মধ্যেও সেখানকার ক্লাসিকাল শিল্পীদের প্রভাব বিশেষ প্রবলভাবে রয়েছে। আবস্ট্রাক্ট রচনাও সেখানে হয়ে থাকে আবার সেই সঙ্গে [illegible] বেশ লক্ষ্য করা যায়। অজিত চক্রবর্তীর এই সংগ্রহটি বাস্তবিকই একটি অমূল্য সংগ্রহ। এ থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমকালীন গ্রাফিক চিত্রকলার সম্পূর্ণ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য পাশে দেখেছি পোলিশ সরকার আয়োজিত পোলিশ গ্রাফিক আর্ট, হাঙ্গেরীর [illegible] সরকারিভাবে [illegible] আর্ট ইত্যাদি। সে সব প্রদর্শনী আরও ব্যাপক হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু একজনের সংগ্রহ এই চেক চিত্রমালা দেখেও আমাদের কিছু মাত্র অসুবিধা হয়নি সে দেশের গ্রাফিকের ঝোঁক এবং মান সম্বন্ধে ধারণা করা। টেকনিক-এ নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষণ যেমন হয় তেমনি আবার একেবারে সাবেকী প্রণালীতেও রচনা করা হয়ে থাকে। আমার চোখে পুরানো ধরনের কাজগুলি বেশী রসোত্তীর্ণ মনে হয়েছে। 'আধুনিক' কাজে অভিনব সব এফেক্ট এসেছে বটে, কিন্তু রসোত্তীর্ণ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি কি এসব রচনা আরও একশ বছর পরেও পাবে? এ সম্বন্ধে আমার কিছুটা সন্দেহ আছে।

● কী দারুণ দিল "আন্ডারআর্ম বল্" দিলো.......দেখেছো হ্যাংলো!
● আঃ—চিনি, আস্তে!
আন্ডারআর্ম বল্ নয়, অফ্ ব্রেক বল্।
● যে করেই ফেরবার সময় কিন্তু বাসন্তী রঙের শাড়ীটা কিনে দিতে হবে।

● তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হবার পর আমাকে বাড়ি যাবার জন্য বাবা প্রথম যে "এক্সপ্রেস টেলিগ্রামখানা" করেছিলেন, সেটারই ডেলিভারী দিয়ে গেল!!!

ওয়াগ্‌নার ও তেরো সংখ্যা

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের কাছে অজানা না হলেও খ্রীস্টানদের কাছে অন্যতম কুসংস্কার হল তেরো সংখ্যাটি। অথচ জগতের শ্রেষ্ঠ এক সুরস্রষ্টার জীবনে উক্ত সংখ্যাটির প্রভাব যে কত গভীর সে বিষয়ে গবেষণা করেছেন এক জার্মান ভদ্রলোক। তাঁর এই অনুসন্ধান থেকে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে কিনা বলা কঠিন, তবু চমৎকৃত হতে হয় নিম্নোক্ত তালিকাটি দেখে।

Richard Wagner নামটাই তেরো অক্ষরের। আবার ঊনিশ শতকের তেরো সালে তাঁর জন্ম যে সালের যোগফলও তেরো (১+৮+১+৩); রঙ্গমঞ্চের জন্যে ওয়াগনারের সর্বসমেত রচনা-সংখ্যা কত, জানেন? বাড়িয়ে বলছি না: তেরোটি রচনা। তাঁর 'ছায়া-তরী' রচনাটি শেষ করেন তিনি এক ১৩ই সেপ্টেম্বরে, 'টান্‌হাউসার' রচনাও সম্পূর্ণ হয় এক ১৩ই এপ্রিলে। আবার ১৩ই মার্চ হচ্ছে তাঁর 'মাস্টার সিঙ্গার্স' রচনা শুরু করবার তারিখ। ড্রেসডেন থেকে পালিয়ে ভাইমার গিয়ে তিনি সুরস্রষ্টা লিস্‌ৎ-এর বাড়িতে একবার আশ্রয় নেন ১৩ই মে। আবার জুরিখ থেকে লিস্‌ৎ যখন ওয়াগনারের সঙ্গে দেখা করতে যান, সেদিনটাও ছিল ১৩ই অক্টোবর।

ওয়াগনারের বিখ্যাত রচনা 'টেনহাউজার'; সেটি প্যারী-তে প্রথম অভিনীত হয় ১৩ই মার্চ।

রিচার্ড ওয়াগনার (১৮১৩-৮৩)

এই বইটিই বাইরয়েথ-এ প্রথম অভিনীত হয় ১৩ই অগাস্ট। 'পার্সিফাল' হচ্ছে ওয়াগনারের তেরো নম্বর রচনা; এর তৃতীয় অঙ্কটি তিনি লিখতে শুরু করেন, সেদিনটা ছিল ১৩ই অক্টোবর; 'পার্সিফাল' রচনা সম্পূর্ণ হয় ১৩ই জানুয়ারী, এবং তার তেরো মাস বাদেই ১৮৮৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি ভেনিসে মারা যান। রাজনৈতিক কারণে ওয়াগনারকে নির্বাসন দেওয়া হয় জার্মানী থেকে, নির্বাসনের মেয়াদ মাত্র ১৩ বছর। স্বরচিত 'লোহেনগ্রিন' তিনি প্রথম শোনবার সুযোগ পান রচনা সম্পূর্ণ হবার তেরো বছর পরে।

ওয়াগনার মোট তেরো বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেন কোসিমা-র সঙ্গে। ওয়াগনারের মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলে সিগফ্রিডের বয়স তেরো বছর। কোসিমা-র মৃত্যু হয় ১৯৩০ সালে, যে-সালটির রাশিগুলি যোগ দিলে পাই (১+৯+৩+০) সেই তেরো। সিগফ্রিড যখন মারা গেলেন সিগফ্রিডের পুত্রের বয়সও তেরো; ওয়াগনার পুত্রের রচনা-সংখ্যাও তেরো।

গোঁড়া খৃষ্টানরা অনেকে হয়তো খবরটা জানেন না; জানতে পারলে এবার বোধ হয় ওয়াগনার শুনতে কিংবা তাঁর বইয়ের অভিনয় দেখতে কেউ সাহস করে পা বাড়াবেন না

উপন্যাস

বন কেটে বসত—শ্রীমনোজ বসু। মিত্র ও ঘোষ: ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৯, টাকা।

বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর নতুন পরিচয়দান অনাবশ্যক। তবে তাঁর নতুন সৃষ্টি অবশ্যই বিশেষ আলোচনার দাবি করতে পারে। 'বন কেটে বসত' একটি সুবৃহৎ বস্তুর জীবনধর্মী উপন্যাস। এই উপন্যাসে শ্রীযুক্ত বসু বাংলা সাহিত্যের কাহিনীর ঘটনার পটভূমিকা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে আগামীকালের ইতিহাসচেতন পাঠকের জন্যে একালের ব্রাত্য মানুষদের উপস্থাপিত করেছেন। রূপদক্ষ শ্রমিক হিসেবে শ্রদ্ধেয় লেখক 'বন কেটে বসত'-এ যাদের রূপায়িত করেছেন, একালের পাঠকের কাছে তারা এক একটি জিজ্ঞাসা এবং মনোযোগ আকর্ষণের প্রাণবন্ত পুরুষ। তাই মনে হয়, মহৎ লেখক নিছক স্রষ্টাই নয়, ভূয়োদর্শী।

২৪ পরগণা এলাকায় দক্ষিণের বাদা অঞ্চলের জেলে জীবনকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের ঘটনা বিবর্তিত হয়েছে। রুটি ও রুজির লড়াইয়ের যেন শেষ নেই। আজ যে বসত গড়ে উঠেছে কাল হয়তো তা আবার ভেঙে পড়বে, এগিয়ে যেতে হবে আরো গভীরে। জীবনে গতির যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই জীবন-সংগ্রামের। এই সংগ্রামের জন্য যারা এগিয়ে এসেছে তারা সামান্য মানুষ—চাষাভুষো, জেলে-মাঝি। প্রকৃতি যেমন কৃপা করে, তেমনি অকৃপণ এবং অকরুণও সে কম নয়। মনুষ্যবেশী পশুরা আরো ভয়ংকর। তবু এরই মধ্যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এগিয়ে যায়। তারা আবার বন কেটে বসত গড়ে। এই উপন্যাসের নায়ক গগন দাস তাই মৌল ধর্মে উজ্জীবিত। বংশানুক্রমে পেশাদারী জেলে সে নয়। সে ভাগ্যকে নানাক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছে। বিংশশতাব্দীর টানা-পোড়েন তার বক্ষকে বিক্ষুব্ধ করে। শেষ পর্যন্ত সে জেলোগিরি করে অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছে। তবু স্বাদ মিটল না। বাসা বেঁধেও সে বাঁধতে পারেনি। চীনক্ষু জীবনের প্রতিভূ হিসেবে সে যেন ভেসে চলেছে। এই কারণে শ্রীযুক্ত বসু উপন্যাসের শেষে হঠাৎ জগন্নাথকেই যেন অন্য এক নায়কের মর্যাদা দিয়েছেন। এ যেন বিংশ শতাব্দীরই ধর্ম। কেউই অবহেলিত নয়। সকলেই বিপর্যস্ত, কিন্তু কেউই বিপরীত-মুখী নয়। কিন্তু জগন্নাথও আটকে থাকতে পারেনি। পশ্চাতে পড়ে থাকে বন কেটে তৈরী বসতগুলি। ঘর যারা গড়ে, ঠাঁই যেন তারা পায় না! উপন্যাসের কাহিনীকে যেসব চরিত্র ঋদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে গগনের বিধবা বোন চারুবালা, মনোহর ডাক্তার, বলাই ও নগেনশশী বিশেষ আলোচনার দাবি অবশ্যই করতে পারে। শ্রীযুক্ত বসুর ভাষায় এবং উপকথনে যে ঘরোয়া এবং কথকতাপূর্ণ সারল্য থাকে, তা এই উপন্যাসেও বর্তমান।

৪৩৩।৬১

ধর্ম ও দর্শন

নীলকণ্ঠ—শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। (প্রথম খণ্ড)। ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ প্রণীত। সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় টাকা।

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ মহারাজ পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণের মধ্যে অন্যতম। তাঁহাকে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মানস সন্তান বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচারীজীকে গোস্বামী প্রভুরই কর্মসঙ্গী, তাঁহারই জীবন-বেদের তিনি মন্ত্র ভাষ্যস্বরূপ। বাঙলা দেশের সংস্কৃতি, দেশ এবং বাঙালী জাতিকে বুঝিতে হইলে গোস্বামী প্রভুর জীবনীর অনুধ্যান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নাহিলে বাঙালীর জীবন দর্শনের ধারাটি ধরা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগে গোসাঁইজীকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার শুদ্ধ স্বরূপটি প্রকটিত হয় এবং পূর্ণতার পথে এদেশের আত্মিক বিকাশ ঘটে। গোসাঁইজীর জীবনের রহস্য অতি নিগূঢ়। শ্রীঅরবিন্দের উক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, বিজয়কৃষ্ণের জীবনের গূঢ় রহস্য আজ পর্যন্তও তাঁহার শিষ্যদের কাছেও উন্মুক্ত হয় নাই। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের জীবনবীণায় গোসাঁইজীর সুরটি মধুরভাবে ঝংকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর জীবন এজন্য মধুর হইতেও মধুর হইয়াছে। ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনন্যসাধারণ মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সুন্দরভাবে সব কথা গোছাইয়া বলিয়াছেন। অধ্যাত্ম সাধনার পথে যাহারা অগ্রসর হইতে চাহেন, গ্রন্থখানি পদে পদে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবে। বাঙলার চিন্তাশীল সমাজ আলোচ্য গ্রন্থে পরম উপাদেয় ভোজ্যসমূহের একত্র সমাবেশে উল্লসিত হইবেন এবং তাহা আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত পাইবেন। বাঙলার জীবনী সাহিত্যে গ্রন্থখানি স্থায়ী সম্পদরূপে মর্যাদা লাভ করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৬১৯।৬১

যুগ ও জীবন

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। ৬।১, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা ১২। মূল্য সাত টাকা।

একদা বাংলা দেশের রাজনীতিতে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যে কী প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, আমরা আজ সে কথা প্রায় ভুলে যেতেই বসেছি। রাজনৈতিক পথ পরিবর্তনের সংগে সংগে দেশে নতুন আদর্শ দেখা দিয়েছে, তারই ফলে আমাদের অতীত আমাদের কাছ থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মতো দেশনেতারা আজ আমাদের কাছে নামমাত্রে পরিচিত। ইতিহাসের গতি আজ যেদিকেই হোক, ব্রহ্মবান্ধবের মতো ব্যক্তির পৌরুষ-দৃপ্ত চরিত্রবল আদর্শনিষ্ঠা চিরকালই শ্রদ্ধেয়। বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধবের নানা দ্বন্দ্ব ও প্রেরণা আমাদের কাছে সবাই এক বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারণ এ সংকট বিশেষ দেশের আত্মিক সংকট। জাতির ও যুগের বিরাট সংঘাত রূপ নিয়েছিল ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের চঞ্চলতার মধ্যে।

এই কাহিনী অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। আজকের সাধারণ জীবনের তুলনায় গল্পের মতো মনে হয়। সত্যের তপস্যা কত কঠিন হতে পারে ব্রহ্মবান্ধবের জীবনই তার দৃষ্টান্ত। লেখক-দম্পতি এই যুগ নিয়ে অনেক দিন থেকেই গবেষণায় লিপ্ত আছেন। সুতরাং তাঁদের কাছে ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের রেখাচিত্র যথার্থরূপে পাওয়ার আশা করি; সে বিষয়ে তাঁরা সফল হয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধবের কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী যতদূর জানি, প্রচলিত নেই। প্রবোধচন্দ্র সিংহের 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' সহজপ্রাপ্য নয়। তাঁর বই থেকে লেখকদ্বয় উপকরণ সংগ্রহ করেছেন সত্য, কিন্তু তা ছাড়াও সমসাময়িক 'সোফিয়া' 'টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' প্রভৃতি পত্রিকার সাক্ষ্য নিয়েছেন। এ ছাড়া অণিমানন্দের 'দি ব্লেড' এবং ইংরেজিতে লেখা ব্রহ্মবান্ধবের জীবনীও উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মবান্ধবের কয়েকটি রচনার পুনর্মুদ্রণ ছাড়াও বোলপুরে বিদ্যালয়ের সংগে ব্রহ্মবান্ধবের যোগ ও আশ্রম ত্যাগের বিবরণ বিষয়ক আলোচনা, "সোনার বাংলা" পত্রিকার রচনার সংগে ব্রহ্মবান্ধবের সম্পর্ক বিচার, বিশেষত ব্রহ্মবান্ধবের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রচনা দুটি 'বাংলার বিশ্বকবি' (অনূদিত) এবং 'নৈবেদ্য' পাঠকের কাছে পরম আগ্রহের সঞ্চার করবে।

বইটি সম্বন্ধে যে অভাব বোধ করেছি তা এই যে, ব্রহ্মবান্ধবের পরিবর্তমান মতামতগুলির আরও ব্যাপক এবং গভীরতর (ইংরেজিতে যাকে 'স্কলারলি' বলে) আলোচনা থাকলে ভালো হত। বইটা কিছু বিবরণধর্মী ঘটনা তালিকা হয়ে পড়েছে।

২৮।১।৬১

প্রাপ্তিস্বীকার

সপ্তম পাণ্ডব—সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লী-পুনর্গঠন—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনুবাদক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদা এক রাজ্যে—সৈয়দ শামসুল হক।

অগ্নিমিত্রা—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

দূরবীন—বনফুল।

পকেটমার—পঞ্চানন ঘোষাল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প।

বাংলার লোক-শিল্প — কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখর

দর্শকের দায়িত্ব

"বাংলা ছবি দেখুন, বাঙালীর ছবি দেখুন" -সম্প্রতি কোন এক বাঙালী চিত্র-পরিবেশক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র এই আবেদন-টুকু পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বাঙালী চিত্রামোদীদের কাছে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। বিজ্ঞাপনটি দেখে ভালো লেগেছিল, এই সদিচ্ছাকে মনে মনে প্রশংসা করে-ছিলাম। এই আবেদনের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই, প্রাদেশিকতার গন্ধ নেই। বরঞ্চ সংকট থেকে বাঁচার একটি উপায়ের নির্দেশ এই আবেদনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

"আরও বেশী করে বাংলা ছবি দেখুন"—এই শ্লোগানের সার্থকতা আজকের দিনে আর আছে কিনা এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগতে পারে। এমন একটা দিন ছিল—খুব বেশীদিন আগের কথা নয়—যখন আমাদের সাধারণ দর্শকদের ঝোঁক ছিল হিন্দী ছবির ওপর। হাল্কা আমোদ, হাল্কা সুরের গান ও নাচ, গ্ল্যামার এবং আরও অন্যান্য তরল প্রমোদ উপকরণের আস্বাদ নেবার জন্য তথাকথিত সাধারণ দর্শকরা—বিদগ্ধ গোষ্ঠী বাদে—হিন্দী ছবি দেখবার জন্য ভিড় করতেন। বাংলা ছবিতে তাঁদের মন ভরত না। সুখের বিষয়, দুর্লক্ষণটি দীর্ঘায়ু হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলা ছবির প্রতি দর্শকরা দিনে দিনে আবার আকৃষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন।

রুচির পালাবদল ঘটল দুটি কারণে। বাংলা ছবির আধুনিক কালে—অল্পাধিক গত এক দশকের মধ্যে—নতুন শিল্পীদল ও চিত্র পরিচালকদের আবির্ভাব ঘটল। গ্ল্যামার-প্রিয় ও হাল্কা আমোদ-অভিলাষী দর্শকরা তাঁদের প্রিয় শিল্পী-জোড়কে পেয়ে হিন্দী পর্দার গন্ধর্বকুমার ও অপ্সরী-দের যেন ধীরে ধীরে ভুলতে আরম্ভ করলেন। জনপ্রিয় নায়ক ও দর্শক-মনলোভা নায়িকা অভিনীত বাংলা ছবি দেখবার জন্য দর্শকদের ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগল। বাংলা ছবি অস্পৃশ্যতার সাময়িক অভিশাপ থেকে বাঁচল।

এরও কিছুকাল পরে রুচিবান ও বিদগ্ধ দর্শকরা নতুন করে বাংলা ছবিকে বরণ করে নিলেন। তার কারণ নতুন যুগের রূপকাররা ছায়াছবিতে অনাস্বাদিতপূর্ব রস ও অভিনব শিল্পরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। রসিকজন তাঁদের শিল্পসাধনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন।

বি আর সি সিনে প্রোডাকসন্সের 'সরি ম্যাডাম'-এর একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ

আজ বাংলা ছবি তাই অনাদরের দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত।

কিন্তু তবুও দর্শকদের আরও বেশী করে বাংলা ছবি দেখার, বাংলা ছবিকে ভালো-বাসার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প যে নিত্য নানা সমস্যায় জর্জরিত একথা বার বার বলার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলা ছবির গত এক বছরের খতিয়ান ঘাটলে দেখা যাবে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা নিম্নের দিকে।

'স্টুডিয়ো-পরিক্রমা'য় দেখা যাবে, কলকাতায় একই সঙ্গে যে কয়টি ছবি তৈরী হচ্ছে তার সংখ্যা একাঙ্গুলিগ্রাহ্য। মহরৎ-অনুষ্ঠানের পর ছবি তৈরীর কাজ বন্ধ, এমন ছবির সংখ্যা অনেক। কিছুদিন স্যুটিং চলার পর কাজ বন্ধ হয়ে আছে, চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে এমন ঘটনার সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। কলকাতার একাধিক স্টুডিয়োর দরজা বন্ধ। অল্পসংখ্যক যে কয়টি স্টুডিয়োর দরজা খোলা আছে তার সব কয়েকটি সব সময়েই যে কর্মমুখর হয়ে থাকে তাও নয়। এ থেকেই বাংলা চিত্র-শিল্পের বর্তমান দুরবস্থার স্বরূপটি উপলব্ধি করা যাবে।

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের এই সংকট দূর করার দায়িত্ব দর্শকদের ওপরই ন্যস্ত, এমন কথা অবশ্য আদৌ যুক্তিসংগত নয়। দর্শকরা আরও বেশী করে বাংলা ছবি দেখছেন না কেন এই প্রশ্নের যেসব উত্তর রয়েছে সেগুলিরও অধিকাংশই চিত্রপ্রযোজক ও চিত্রনির্মাতাদের দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত। দায়িত্ব দর্শকদের নয়। যে ছবি তাঁদের আনন্দ দেয় সে ছবি দেখবার জন্যই তাঁরা ভিড় করেন। আনন্দ অথবা আমোদ থেকে বঞ্চিত হবার জন্য কেউ ছবি দেখতে যান না। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ছবি চলেছে এবং চলছে—এই নজির তো আজও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠেনি। সুতরাং ভালো লাগলে যে দর্শকরা উৎসাহের সঙ্গেই বাংলা ছবি দেখেন তার অনেক প্রমাণই রয়েছে। দর্শকের রুচির যদি বিকার ঘটে এবং তাঁরা যদি সত্যিকারের ভালো ছবি দেখতে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন তবে তাঁদের রুচির সংস্কার সাধনের দায়িত্বও বিশেষ করে চিত্রনির্মাতাদের ওপরই নির্ভর করে। তাই বাংলা ছবির দুর্দিন অপনোদন করার দায়িত্ব সর্বাগ্রে দর্শকদের ওপরেই ন্যস্ত এমন কথা বলা ভুল।

তবুও দর্শকের দায়িত্ব বুঝি উপেক্ষণীয় নয়। প্রীতির একটি ধর্ম এই যে, তা অনেক ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সহজেই ক্ষমা করে নিতে পারে। প্রীতির শক্তি এই যে তা ভুল-ভ্রান্তিকে অনায়াসে শুধরে দিতে পারে। দর্শকরা বাংলা ছবিকে যদি তাঁদের অন্তরের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি থেকে বঞ্চিত না করেন, তবেই বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের সধনা সিদ্ধির অভ্রান্ত পথটি খুঁজে নিতে পারবে। বাংলা ছবির প্রতি এই প্রীতিবোধ জাগিয়ে রাখার মধ্যেই দর্শকের দায়িত্বটি নিহিত।

চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট

ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার দশম বার্ষিক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত গত এক বছরের এই রিপোর্টে চিত্রপ্রযোজনার বর্তমান পরিস্থিতির সুস্পষ্ট আভাস দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সারা ভারতে এর পর্যন্ত সারা ভারতে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ছিল ৩২০। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সারাভারতে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ২৩৭। বাকী দু' মাসের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা এর সঙ্গে যোগ করে নিলেও গত বছরের তুলনায় মোট সংখ্যায় শতকরা দশভাগ হ্রাস ঘটেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্রপ্রযোজনার সংখ্যা এই হ্রাসের দিকে চলেছে বলে ফেডারেশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই হ্রাসের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে রিপোর্টে। ফেডারেশন-এর মতে হ্রাসের মূলে কারণ তিনটি। আবগারী শুল্ক, আভ্যন্তরীণ সংকট এবং সেন্সর সমস্যা।

স্বল্পবিত্ত যেসব চিত্রপ্রযোজকরা অল্প লাভের আশা নিয়ে চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এতকাল আত্মনিয়োগ করেছিলেন, আবগারী শুল্কের চাপে তাঁদের অধিকাংশই বর্তমানে

এস কে প্রোডাকসন্সের 'মন দিল না বঁধু'-র নায়িকা সবিতা বসু

নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। বিশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মোট লভ্যাংশ যাঁদের কাছে তাঁরা চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্র একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ লাভের এই অংক আবগারী শুল্কের খাতেই তাঁদের ব্যয় হয়ে যায়। এই চিত্রপ্রযোজনার হ্রাসের অন্যতম কারণ আবগারী শুল্ক বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়।

চলচ্চিত্রশিল্পের আভ্যন্তরীণ সংকট সম্পর্কে তারা বলেন আর্থিক অনটনই প্রধান। আর্থিক অভাবের দরুণ চিত্র-প্রযোজনার সংখ্যা দিনে দিনে কমে আসছে বলেও রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে সেন্সর সমস্যা। ফেডারেশন মনে করেন, সম্প্রতি সেন্সর-ব্যবস্থায় কড়াকড়ি এত বেশী বেড়ে চলেছে যার ফলে চিত্রপ্রযোজকরা ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠছেন। সেন্সর-সমস্যার ফলে বোম্বাই ও মাদ্রাজের চিত্রপ্রযোজনা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ফেডারেশন মনে করেন।

চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এই হ্রাসের মাত্রা যদি বেড়েই চলে তবে চিত্রশিল্পের চরমতম দুর্দিন যে অচিরেই ঘনিয়ে আসবে, তা নিয়ে কারোর দ্বিমত নেই। এই সংকট রোধ করার উপায় যে নেই তা নয়। কী উপায়ে এবং কোন পথে চিত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায় সে ভাবনা সরকারের এবং সকল চলচ্চিত্রসেবীর।

চিত্রসংখ্যা হ্রাসের যে প্রধান তিনটি কারণ ফেডারেশন-এর বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম দুটি সম্পর্কে সকলেই একমত হবেন। আবগারী শুল্ক চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যে একটি নিদারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সংশ্লিষ্ট চিত্র-প্রযোজকরা তা মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। আবগারী শুল্কের গুরুভার যতদিন দূর না হচ্ছে, এক শ্রেণীর চিত্রপ্রযোজক ছবি তৈরীর কাজে সহজেই নিরুৎসাহ হয়ে উঠবেন। আবগারী শুল্কের এই গুরুভার থেকে চিত্রপ্রযোজকদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হয়তো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার কিছুটা ভার লাঘব করতে পারেন কিনা তা অনায়াসেই ভেবে দেখতে পারেন।

আভ্যন্তরীণ আর্থিক সংকট থেকে আশু পরিত্রাণের উপায় হয়তো চিত্রশিল্পের হাতে নেই। তবে এই সংকট কীভাবে দূর হতে পারে তা নিয়ে বিস্তর গবেষণার অবকাশ আছে। এবং সেই সঙ্গে শুভবুদ্ধি ও বিচক্ষণতারও প্রয়োজন। চলচ্চিত্রসেবীরা এই সংকট দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর হবেন এই আশাটা অন্যায় নয়। এক্ষেত্রে বাইরের সাহায্যও অপরিহার্য। ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন এই সংকট দূর করার কাজে অগ্রণী হয়ে উঠবেন এই ভরসাটা এক্ষেত্রে দোষের নয়। ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কর্মধারা নিয়ে চলচ্চিত্রশিল্প মহলে আজও

পুরোপুরি সন্তোষ দেখা যায়নি। আমরা আশা করবো, এই সংস্থা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করবেন।

ফেডারেশন-এর রিপোর্টে সেন্সর-সমস্যাকে চিত্রসংখ্যা হ্রাসের একটি বিশেষ কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। রিপোর্টের এই মন্তব্য সকলের কাছে যুক্তি-গ্রাহ্য মনে নাও হতে পারে। সেন্সর-ব্যবস্থার অযৌক্তিক বা অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ইদানীং যে ঘটেনি বা ঘটছে না তা নয়। কিন্তু সেন্সর প্রথার কড়াকড়ির জন্য যাঁরা

'মাথুর' ছবির নির্মাণকালে সুর-সুধাকর দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে অধুনা স্বর্গত পরিচালক সুধীরবন্ধু। ৫৯ বৎসর বয়সে গত ২৬শে ডিসেম্বর সুধীরবন্ধু পরলোকে প্রয়াণ করেছেন। "নৃত্যের তালে তালে" তাঁর শেষ ছবি।

চিত্রপ্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করতে অনিচ্ছুক, অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন যে সেন্সর প্রথার জন্য তাঁদের ছবি টিকিট-ঘরের আনুকূল্য পাবে না, সেই সব চিত্রপ্রযোজক-দের অভিরুচি নিয়ে বিচক্ষণ লোকদের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কারণ সম্প্রতি সেন্সর প্রথার মধ্যে যত কড়াকড়িই বর্তমান থাকুক না কেন, তা যে রসোত্তীর্ণ শিল্পের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত এটা সব যুক্তিবান ব্যক্তিই মেনে নেবেন। সুতরাং সেন্সরের অন্যায় হস্তক্ষেপের জন্য চিত্র-প্রযোজনার হ্রাস ঘটছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

আসল কথা, চিত্রপ্রযোজনার হ্রাস চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দুর্দিনের সূচনা করেছে। এই দুর্দিন যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই মঙ্গল। এবং এই দুর্গতি দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই ও বিশেষত সরকার অনতিবিলম্বেই সক্রিয় হয়ে উঠবেন আমরা এই কামনাই পোষণ করি।

চিত্রালোচনা

মাসাধিককাল বাদে এ সপ্তাহে নতুন বাংলা ছবির আবার দেখা মিলেছে এবং এক সঙ্গে দুখানির। ছবি দুটির নাম— "সরি ম্যাডাম" ও "মন দিল না বঁধু"।

বি আর সি সিনে প্রোডাকসন্সের "সরি ম্যাডাম" হাল্কা রসের ছবি। রঙ্গ কৌতুক ও নাচ গানের ছড়াছড়ি এর মধ্যে। ভূমিকা-লিপিতে আছেন সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, অপর্ণা দেবী, কেতকী দত্ত, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। দিলীপ বসু ছবিটি পরিচালনা করেছেন। গানে সুর দিয়েছেন বম্বের সুরকার ভেদ পাল।

এস কে প্রোডাকসন্সের "মন দিল না বঁধু"-একটি কৌতুক চিত্র। তুলসী চক্রবর্তীর শেষ অভিনয়ে প্রোজ্জ্বল এই ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন সবিতা বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সন্তোষ মুখোপাধ্যায় একাধারে এর পরি-চালক ও সুরকার।

• • •

এ-সপ্তাহের মুক্তি-তালিকায় দুটি হিন্দী ছবিও আছে। একটি মুভি ইণ্ডিয়ার ঐতিহাসিক চিত্র "রাজিয়া সুলতানা"। অপরটি সাগর ফিল্ম কোম্পানীর "লালচ"।

দিল্লীর তখৎ-তাউসের একমাত্র অধি-কারিণী যে সাম্রাজ্ঞী পুরুষের শৌর্য ও নারীর স্নেহ দিয়ে দেশ শাসনের নতুন উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন, তাঁরই অমর কাহিনী "রাজিয়া সুলতানা"-য় চিত্রিত হয়েছে। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নিরুপা রায়। জয়রাজ, আগা, আনসারী, কামরান, কুমার প্রভৃতি তাঁর সহ-শিল্পী। দেবেন্দ্র পরিচালিত এই ছবিতে সুর-যোজনা করেছেন লচ্ছিরাম।

"লালচ"-এর বিষয়বস্তু মানুষের লোভ ও লালসাকে ঘিরে পল্লবিত। এর ভূমিকা-লিপিতে নূতন ও পুরাতন বহু শিল্পীকে দেখা যাবে। আর ডি রাজপুত পরি-চালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। সুর সৃষ্টি করেছেন এস কিশান।

* * *

"কাঞ্চনজঙ্ঘা" শেষ করেই পরিচালক সত্যজিৎ রায় আর একটি নতুন ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। ছবিটির নাম "অভিযান" এবং অভিযাত্রিক প্রযোজক সংস্থার নাম। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস

চিত্র প্রযোজকের মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি "বিপাশা"-র একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও কেতকী দত্ত

মধ্য আনন্দের আবেদন সহজবোধ্য বলেই নয়, মঞ্চের অসাধারণত্ব ও অপূর্ব নৃত্য-নৈপুণ্যে মন কেড়ে নেয়। "ছেলেটাকে" প্রাণবন্ত করেছে রবিশঙ্করের সুর ও আবহসংগীত সংযোজনে, আর "ছেলেটা" নিজে। কিন্তু এ শুধু শিশুদর্শকের জন্য নয়। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অতিথিরা স্তব্ধ হয়ে "ছেলেটাকে" দেখেছেন, সাত ভাই চম্পা ও পারুলকে নতুন করে মনে করেছেন। একবাক্যে সাধুবাদ দিয়ে তাঁরা বলে গেছেন, বাংলা দেশ ধন্য এমন একটি সংস্থার জননী বলে।

এবারকার শিশুরঙ্গমহলের নতুন সৃষ্টি "ছন্দ"। একটি দিন ও রাতের গতিছন্দ, সুর ও রং দিয়ে এই ব্যালে। প্রথম রজনীর দোষত্রুটি বর্তমান রয়েছে। এক কথায় বলা চলে, ঠিক যা দেখান হবে বলে আশা করা গিয়েছিল তা দেখানো হয়নি বা বলতে চাওয়া হয়েছিল তা বলা হয়নি।

শিশুরঙ্গমহলের সমস্ত নাটক, নাটিকা, গীতিনাট্য কথা ও গীতিবহুল। "ছন্দ"তে তা নেই। নিরঙ্কু ব্যালে শিশুরঙ্গমহলের বোধ হয় এটিই প্রথম। মঞ্চসজ্জা ও আলো দুটিই "ছন্দ"কে ঢেকে রেখেছে। বাজনা অত্যধিক শব্দবহুল। "ছন্দ"র আঙ্গিক দেখে স্তব্ধ হতে হয়, কিন্তু মনে হয়, ব্যালে হিসেবে এটি অসম্পূর্ণ।

সবাই আশা করে থাকেন যে প্রতি বৎসর শিশুরঙ্গমহলের মঞ্চে নতুন কিছু পাওয়া যাবে। "ছন্দ" ছাড়া এ বছর অন্যান্য সব পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে শিশুরঙ্গমহল সম্পাদক বলেন যে তাঁদের ভাণ্ডারে নতুন মশলার অভাব। শিশুদের উপযুক্ত নাটক, নাটিকা, ছড়া, গানের অত্যন্ত প্রয়োজন। না পেলে এর গতি ব্যাহত হবে।

এবারকার একটি বিশেষ সংযোজন ছিল—বাংলা সুরের সাথে ছন্দশোভা (Rhythm Drill) ও রিকি হোল্ডেনের শিক্ষায় ছটি বিদেশীয় লোকনৃত্য। এই দুটিই প্রতি স্কুলে সাধারণভাবে Mass drill হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

একটি উপভোগ্য সংগীত আসর

শীতের কলকাতা সংগীত-আসরের মরশুমে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। এবারকার মরশুমের একটি স্মরণীয় আসর বসেছিল গত রবিবারের সকালে, নিউ এম্পায়ারে। অনাড়ম্বর অথচ পরম উপভোগ্য এই আসরটির আয়োজন করেছিলেন লুক পাবলিসিটি। নেপথ্যে এই সংস্থার কর্ণধার আশীষ মুখোপাধ্যায়। রসিকজনের সামনে শ্রীমুখোপাধ্যায় উপস্থিত করেন ওস্তাদ আমীর খাঁ ও রোশনকুমারীকে।

আসরের প্রথম শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ আমীর খাঁ। ইন্দোর ঘরানার এই শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক তাঁর প্রথম গানটি শুরু করলেন টোড়ি রাগে। এরপর তিনি গাইলেন ভাটিয়ার ও ভীমপলশ্রী। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য আমীর খাঁ সংগীত-রসিকদের কাছে অভিনন্দিত, তাঁর সেদিনকার সংগীতানুষ্ঠানে তা অপূর্বভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতাই তাঁর গানের প্রাণ। জনমনোরঞ্জনের দাবীতে রাগ-সংগীতের বিশুদ্ধতাকে ক্ষুণ্ণ করা অথবা সুর-তান-আলাপ-মীড়-গমক-মূর্ছনাকে কোন চটুল চমকের সঙ্গে মার্গ সংগীতকে মিশিয়ে দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাই শাস্ত্রীয় সংগীতের ভক্তদের কাছে তিনি সাধুবাদার্হ। সেদিনকার আসরে সংগীত-রসপিপাসুদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ তিনি পেয়েছিলেন এবং তাঁর দুই ঘণ্টাব্যাপী কণ্ঠসংগীতে রাগের অনবদ্য বিস্তার ও তানে সকলকে বিমোহিত করে রেখেছিলেন।

আমীর খাঁর কণ্ঠসংগীতের পর কথক-নৃত্য পরিবেশন করেন রোশনকুমারী। কথক-নৃত্যে এই জনপ্রিয় শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব সেদিন আবার নতুন করে স্বীকৃত হল। পুরাণের বিভিন্ন আখ্যান এবং শৃঙ্গার, ভয়ানক প্রভৃতি রসের ভাবরূপটি তিনি তাঁর কথক-নৃত্যের ছন্দ, মুদ্রা ও অভিনয়ে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। রোশনকুমারীর অল্পাধিক এক ঘণ্টাব্যাপী নৃত্যানুষ্ঠানের ভেতর দিয়েই আসরের সমাপ্তি ঘটে। সংগীত ও নৃত্যের এই চিত্তাকর্ষক আসরের জন্য আশীষ মুখোপাধ্যায় তথা লুক পাবলিসিটির কর্মীবৃন্দ সেদিনকার উপস্থিত রসিকমণ্ডলীর কাছে ধন্যবাদার্হ হয়ে রইলেন।

চতুর্থ টেস্ট আরম্ভের আগে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সংগে দুই দেশের খেলোয়াড় ফটো—দেশ

একলব্য

১৯৬২ সালের জানুয়ারীর ৪ তারিখটি ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ এই দিনটিতে ইডেন উদ্যানে ভারত ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারত ইংলণ্ডকে হারিয়েছে ১৮৭ রানে। টেস্ট খেলার ইতিহাসে ভারতের কাছে ইংলণ্ডের এটা দ্বিতীয় পরাজয় হলেও কলকাতার মাটিতে প্রথম। শুধু ইংলণ্ডের ক্ষেত্রেই নয়। ইডেন উদ্যানের কোন টেস্ট খেলাতেই ভারত এর আগে জিততে পারেনি। তাই পৃথিবীর দ্বিতীয় ক্রিকেট ক্রীড়াঙ্গন বলে প্রাচীন ইডেনের ইতিহাসে এটা যেমন নতুন অধ্যায়, তেমন কলকাতা তথা ভারতের ক্রিকেটপ্রিয়দের কাছে এ জয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের [illegible] পরিচয়।

শুধু ক্রিকেটপ্রিয়দের কাছেই বা বলি কেন, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের এই টেস্ট জয় সমস্ত ভারতবাসীই স্মরণীয় কীর্তি হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। বোধ করি এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণপুরীতে জাতীয় কংগ্রেসের মহা অধিবেশনের খবরও টেস্টের নীচে চাপা পড়ে গেছে। সত্যিই স্বাধীনতা লাভের পর সারা দেশে এমন আলোড়ন, এমন খুশীর আমেজ আর বেশী দেখা যায়নি।

অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন—কেন? ১৯৫৯ সালে কানপুরের ক্রিকেট মাঠে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভেও তো সারা দেশে এমন আনন্দের বান ডেকেছিল।

অস্বীকার করি না। তখনো সারা দেশে এমন আনন্দের বান ডেকেছিল সত্যি। তবু বলব অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করা আর ক্রিকেট-স্রষ্টা ইংলণ্ডকে পরাজিত করা এক কথা নয়। ইংলণ্ডের কাছ থেকে আমরা ক্রিকেট খেলা শিখেছি। সাম্রাজ্যবাদ শক্তির সঙ্গে এই কলকাতার মাঠেই তার

টেস্ট খেলা আরম্ভের আগের দিন দৈনিক টিকিটের জন্য দর্শকদের লাইনে দাঁড়িয়ে রাত্রির অবসানের প্রতীক্ষায় হতাশের দল ফটো—দেশ

দুই ইনিংসেই সবচেয়ে বেশী রান করার কৃতিত্বের অধিকারী চাঁদু বোরদে

যাই হোক, লাঞ্চ পর্যন্ত ভারতের আর কোন উইকেট না পড়ে উঠল ৭৫ রান। মেহেরা ৩২ ও পাতৌদি ১২ রান করে নট আউট রইলেন।

লাঞ্চের পর দুজনেই বেশ হাত খুলে মারার চেষ্টা করলেন। দুজনেরই ৫০ রান পূরে গেল। কিন্তু দুদিক থেকে স্পিন বোলিংয়ে আক্রমণ আরম্ভ হবার পর দুজনেরই ব্যাট মন্থর হয়ে উঠল। ভারতের ১৪৫ রানের মাথায় মেহেরা আউট হয়ে গেলেন ৬২ রান করে। এলেন পলি উমরিগর। সুদেহী প্রিয়দর্শন ক্রিকেট খেলোয়াড়, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক উমরিগরের খেলার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি লুকানো ছিল যা স্পিন বোলিংয়ের আধিপত্যকে অচিরেই অবলুপ্ত করে দিল। উমরিগরের ঝলসে-ওঠা ব্যাট থেকে প্রতি-নিয়ত বের হয়ে আসতে আরম্ভ করল চারের মার। চা-এর সময় ভারতের ৩ উইকেটে ১৬২। চায়ের পর দুটি দুরূহ ক্যাচে ধরা পড়লেন পাতৌদি ও উমরিগর। প্রথম জনের ক্যাচ ধরলেন লক, দ্বিতীয় জনের স্মিথ। ৭২ মিনিটে উমরিগরের ৩৬ রানের মধ্যে ৩২ রানই এসেছিল বাউণ্ডারীর মার থেকে। পাতৌদি ৬৪ রানের মধ্যে ১১ বার বল মাঠের বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

পাতৌদি ও উমরিগরের আউটের পর বোরদে ও জয়সীমা মিলিত হলেন ষষ্ঠ উইকেটে। প্রথম দিন ভারতের আর কোন উইকেট না পড়ে ৫ উইকেটে উঠল ২২১ রান। জয়সীমা ১২ রান ও বোরদে ১৫ রান করে রইলেন নট আউট।

দ্বিতীয় দিন—৩১শে ডিসেম্বর রবিবার। ইংরাজী বর্ষ বিদায়ের শেষ দিন। ইংরেজ খেলোয়াড়দের আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতের দুই নট আউট ব্যাটসম্যান। মাঠে একই ধরনের দর্শক সমাগম। সমান উৎসাহ উদ্দীপনা। ইডেনের শিশির ভেজা উইকেটে প্রথম ৩০ মিনিটে ভারতের ৩০ রান। উৎসাহের আতিশয্যে ভরা নন্দন ব্যাটিং জয়সীমা আর সীমার মধ্যে

দুই ইনিংসে বেশী উইকেটের অধিকারী সেলিম ডুরানী

আবদ্ধ নয়। আজ তার নতুন মূর্তি। উইকেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে মন্থর ব্যাটিংয়ে রানের মন্বন্তর সৃষ্টি করত যে জয়সীমা—সে জয়সীমা হারিয়ে গেছে। জয়সীমার মধ্যে এখন নতুন জীবন। সব বলই তার ক্ষুধার আহার। বোলারের উপর ব্যাট চালনার উদ্ধত বিকাশে ৬টি বাউণ্ডারীর সহায়তায় করা ৩৭ রান নিয়ে জয়সীমা প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলে ব্যাট করতে আসেন সেলিম ডুরানী। সাময়িক মন্থরতা এল উজ্জ্বল ক্রিকেটে। লাঞ্চ পর্বে

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ডুরানীর বলে লেগ স্লিপে ক্যাচ তুলে রিচার্ডসনের অব্যাহতি পাবার দৃশ্য। জয়সীমা ক্যাচটি ধরতে পারেন না

ফটো—দেশ

ভারতের ৬ উইকেটে ৩১০। লাঞ্চের পর আবার উজ্জ্বল ক্রিকেট। এখন ডুরানী ও বোরদের ব্যাটে রানের বান ডেকেছে। ডুরানীর একটু ভুলে বোরদে ৬৮ রানের মাথায় রান আউট হয়ে বিদায় নিলেন। ইঞ্জিনীয়ার আসবার পর ভুলের মাশুল তুললেন ডুরানী কয়েকটি চোস্ত মার মেরে। তারপর ডুরানী ও ইঞ্জিনীয়ারের আউটের পর রঞ্জনে ও দেশাই দেখালেন ব্যাটিংয়ের ফুলঝুরি। রঞ্জনের ব্যাট থেকে একটি বল মিড উইকেটের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়লো দর্শক গ্যালারীতে—খেলার প্রথম ওভার বাউণ্ডারী। ৩৮০ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হল।

বেলা ঠিক দুটোর সময় আরম্ভ হল ইংলণ্ডের ব্যাটিং। ভারতের চেয়ে ভাল সূচনা। আধ ঘণ্টায় ২৫ রান। কিন্তু ঐ রানের মাথায়ই রঞ্জনের ইনসুইংয়ে রাসেলের স্টাম্প ছিটকে গেল। খেলতে এলেন কেন ব্যারিংটন—ইংলণ্ডের ডন ব্র্যাডম্যান। চায়ের সময় ইংলণ্ডের ৩ উইকেটে ৩৮। দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১০৭। মাঝের দুটি উইকেটে বিদায় নিলেন ব্যারিংটন ও রিচার্ডসন। ইংলণ্ডের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ব্যারিংটন ১৪ রানের মাথায় আউট হবার সংগে সংগে ইডেনে কি উল্লাস! তারপর যখন ৬২ রান করে রিচার্ডসনও বিদায় নিলেন তখন আর এক ঝিলিক হাসির আলো বয়ে গেল ইডেনে। শেষ পর্যন্ত দলপতি ডেক্সটার ১১ ও পারফিট ১০ রান করে নট আউট রইলেন। তবু ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে বিষাদের ছায়া। কারণ তিনটি সোজা ক্যাচ ছেড়েছেন কণ্ট্রাক্টর, প্রসন্ন ও বোরদে।

তৃতীয় দিন—পরপর অনেকগুলো ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনের খেলার স্মৃতি ইংরেজ খেলোয়াড়দের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এক অধিনায়ক ডেক্সটার ছাড়া লাঞ্চের মধ্যে সবাই একে একে আউট হয়ে গেলেন। ডুরানী ও বোরদের স্পিন বলে। এক সময় ইংলণ্ড ফলো অনের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে কি না এ সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংলণ্ড ফলো অন বাঁচাতে পারল দুটি কারণে। এক, নতুন নিয়মে ফলো অনের জন্য ২০০ রানের ব্যবধান প্রয়োজন। দুই, অধিনায়ক ডেক্সটারের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং।

মধ্যাহ্ন ভোজের আধ ঘণ্টা পরে ২১২ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হয়ে গেল। ১৬৮ রানে এগিয়ে থেকে ভারত আরম্ভ করল দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং। মাঠে খুশীর আমেজ। শুধু শুভ সূচনা নয়—সুন্দর ব্যাটিং জয়সীমা ও নরী কণ্ট্রাক্টরের। ৩৮ মিনিটে ৩৯ রান। সত্যিই উজ্জ্বল ক্রিকেট। জয়সীমার একটি ওভার বাউণ্ডারী মিড উইকেট দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল দর্শক গ্যালারীতে। কণ্ট্রাক্টর একটি রান নিতে যেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন নিজে। আঘাত পেলেন দেহে। সেই আঘাতই হয়তো তাঁর কাল হল। ১১ রান করে স্ট্যাম্পড আউট হলেন এলেনের বলে। মঞ্জরেকার খেলতে এলেন। ৫৫ মিনিটে উঠল ৫১ রান। হঠাৎ জয়সীমার জোরালো ইনিংস শেষ হয়ে গেল। শেষ হল উজ্জ্বল ক্রিকেট। পাতৌদি আর মঞ্জরেকার খেলতে লাগলেন এমনভাবে যেন ফলো অন বাঁচাচ্ছেন। দর্শকদের টিটকিরির মধ্যেও তাদের ব্যাট নড়েচড়ে না।

য়ের সম্ভাবনার মুখে এমন মন্থর টিংয়ের নজির কম। কন্টেসৃষ্টে করা ৭ রান নিয়ে মঞ্জরেকার যখন দিনের শেষ হুর্তে আউট হলেন তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ভারতীয় দর্শক। দিনের শেষে ভারতের উঠল ৩ উইকেটে ১০৬। পাতৌদি ও ইঞ্জিনিয়ার ব্যাট হাতে ঢুকলেন প্যাভিলিয়নে একদিন বিরতির পর আবার ব্যাট করবার অভিপ্রায় নিয়ে।

চতুর্থ দিন—একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলা। মাঠে এই দিন সবচেয়ে বেশী উত্তেজনা। ব্যাটিংয়ের ফুলঝুরি দেখিয়ে লাঞ্চের সময় ভারত ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করবে সকলের এই আশা। কিন্তু আরম্ভ হল পতন। ১১৯ রানের মাথায় পর পর আউট হলেন ইঞ্জিনিয়ার, পাতৌদি ও ডুরানী। উমরিগরও আউট হয়ে যাচ্ছিলেন। রক্ষা পেলেন পারফিটের ক্যাচ ধরার ব্যর্থতায়। আবার খেলার মোড় ঘুরল। বোরদে ও উমরিগর—যোগে সপ্তম উইকেটে যোগ হল ৮২ মিনিটে ৭৩ রান। উমরিগর আউট হবার পর দেশাই আবার ব্যাটের বাড়িতে মাঠ জমজমাট করে তুললেন। মাত্র ২০ মিনিটের ব্যাটিং। তার মধ্যেই পাঁচটি বাউন্ডারী, একটি ওভার বাউন্ডারী, একটি দুইয়ের ও একটি একের মারে ২৯ রান। লাঞ্চের ৪০ মিনিট পরে ২৫২ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। বোরদে প্রথম ইনিংসে সবচেয়ে বেশী রান (৬৮ রান) করেছিলেন। এ ইনিংসেও করলেন সবচেয়ে বেশী ৬১ রান।

৪২০ রানের পেছনে থেকে ইংলণ্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরু করল তখন তাদের হাতে ৪৯০ মিনিট সময়। ২০ মিনিটে ২০ রান উঠল। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে রানের গতি। কিন্তু তারপরই বিপর্যয়। ২০ রানের মাথায় রাসেল রঞ্জনের একই ধরনের ইনসুইংয়ে পরাজিত হলেন। ব্যারিংটন পরাজিত হলেন মাত্র ৩ রান করে। বিপদ দেখে ডেক্সটার নিজে এলেন ব্যাট করতে। সাময়িক বিপর্যয় রোধ হল। কিন্তু রিচার্ডসন ও বারবার আউট হওয়ায় ইংলণ্ডের উঠল ৪ উইকেটে ১২৫ রান। ডেক্সটার অধিনায়কোচিত দৃঢ়তায় এবং ক্রিকেটের উন্নত ছলাকলায় ৬১ রান করে নট আউট রইলেন। সঙ্গে—নট আউট রইলেন পারফিট ৩ রান করে।

পঞ্চম ও শেষ দিন—ইংলণ্ডের সামনে পরাজয়ের আশঙ্কার কালো ছায়া। ভারতের সম্মুখে জয়লাভের রঙীন হাতছানি। একটি কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা থেকেই ভারতীয় দলকে পরিচালনা করছিলেন পলি উমরিগর। কারণ অধিনায়ক কন্ট্রাক্টরের হাতে চোট। মাঠে অনুপস্থিত।

সবার মুখে এক প্রশ্ন 'ডেক্সটার কি পরাজয় এড়াতে পারবেন?' সেই ডেক্সটার যখন পঞ্চম দিনের প্রথমে আর কোন রান না করে এল বি ডব্লিউ আউট হয়ে গেলেন তখন ভারতের জয় সম্বন্ধে কারোই সংশয় রইল না। কিন্তু পারফিট এবং নাইটও বেগ কম দিলেন না। ঠিক লাঞ্চের আর মিনিট আগে পারফিট আউট হওয়ায় জয় সম্পর্কে সবারই নিশ্চিত ধারনা হল। লাঞ্চের পর এক একজন করে আউট হতে আরম্ভ করলেন। একে একে নির্বিঘ্নে দেউটি। এলেন গেলেন, মিলম্যান গেলেন, লক রান আউট হয়ে ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়নে। শেষ খেলোয়াড় ডেভিড স্মিথ খেলতে এলেন। মাঠে প্রবল উত্তেজনা। শেষ উইকেট পড়বার আগেই একজন দর্শক মাঠে ঢুকে পড়ল। শঙ্খ, ঘণ্টা বিউগিলের ধ্বনিতে মাঠ পাগল। জয় আর ঠেকায় কে? ডুরানীর বলে ক্যাচ তুললেন স্মিথ, মঞ্জরেকার ক্যাচটি ধরে দৌড় দিলেন প্যাভেলিয়নে। খেলা খতম। শেষ বল তার হাতে। চা-পানের ৩৩ মিনিট আগে ২৩৩ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হল। ভারত জয়ী হল ১৮৭ রানে। মুহুর্মুহু তোপ-ধ্বনি ও তূর্য নিনাদে ইডেনের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। শহর ভেসে গেল আনন্দের বন্যায়। সে কি উন্মাদনা। কি শিহরণ। বিজয়ী খেলোয়াড়দের বুকে জড়িয়ে ধরে কি বিপুল সম্বর্ধনা।

* * *

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের এই জয় ভারতীয়দের স্বাভাবিক আনন্দের কারণ সম্পর্কে আগেই বলেছি। অন্য কারণ আছে। সেটা হচ্ছে ভারতের বিদেশ ইংরেজ সমালোচকদের সমালোচনা। ১৯৫৯ সালে ইংলণ্ড সফরে ভারত যখন পাঁচটি টেস্ট হার স্বীকার করেছিল তখন ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকরা বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে পাঁচদিন টেস্ট খেলা সময়ের অপব্যয় মাত্র; ভারত পাঁচদিন টেস্টের উপযুক্ত নয়। সেখানে ইংলণ্ডের এক

টেস্ট জয়ের পর বিজয়ী খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাবার জন্য উল্লাসে উন্মত্ত দর্শকদের পুলিস বেষ্টনী ভেদের প্রচেষ্টা

ফটো—দেশ

সংবাদপত্রেও বলা হয়েছে, যেহেতু ভারত ড্র-র জন্য খেলে সেহেতু ওদেশে সফর করা উচিত নয়। তাই ইডেন উদ্যানের এ জয় ইংরেজ সমালোচকদের বক্রোক্তির উত্তর বলে আনন্দ আরও বেশী। এর সঙ্গে আর একটি কারণও যোগ করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে উপর্যুপরি ৯টি টেস্ট ড্র-র পরে ভারতের স্বপক্ষে ফলাফলের মীমাংসা।

অতঃপর আমাদের লক্ষ্য মাদ্রাজ। মাদ্রাজের শেষ টেস্ট খেলা ড্র হলেও 'রাবার' আমাদের। কিন্তু আমরা চাই আর একটি খেলার জয়ের মাধ্যমে 'রাবারের' আনন্দ উপভোগ করতে।

সবশেষে ইংলণ্ডের স্বপক্ষে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছি। ইংলণ্ডের এ দল শক্তিশালী নয় একথা অবশ্য আমি বলতে চাই না। কারণ ইংলণ্ডের সাংবাদিকরাই বলেছেন, এটি ইংলণ্ডের তরুণ ও উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে গড়া সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ দল। ইংলণ্ডের কয়েকজন কীর্তিমান খেলোয়াড় যেমন ভারতে আসেননি তেমন ভারতেরও বহু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় রয়েছেন টেস্টের বাইরে। আমি বলছি সারদেশাই, সুর্তি, নাদকার্নী, কৃপাল সিং ও সুভাষ গুপ্তের কথা। ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্যের কারণ অনেক। ওপেনিং ব্যাটসম্যান পুলারের ব্যর্থতা ইংলণ্ডের শক্তিকে অনেকখানি দুর্বল করেছে। দুই ইনিংসে ব্যারিংটনের ব্যর্থতায় পাওয়া গেছে অদৃষ্টের পরিহাসের পরিপূর্ণ পরিচয়। কিন্তু ক্রিকেট হচ্ছে ক্রিকেট। মহা-অনিশ্চয়তাই তার মূল কথা।

স্কোর বোর্ড

ভারত—প্রথম ইনিংস

নরী কণ্ট্রাক্টর ব স্মিথ	৪
বিজয় মেহেরা ক পারফিট ব লক	৬২
মঞ্জরেকার ব এলেন	২৪
পাতৌদির নবাব ক লক ব এলেন	৬৪
পলি উম্রিগর ক স্মিথ ব এলেন	৩৬
জয়সীমা ক মিলম্যান ব স্মিথ	৩৭
চাঁদু বোরদে রান আউট	৬৮
সেলিম ডুরানী ব এলেন	৪৩
ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ক পারফিট ব লক	১২
আর দেশাই নট আউট	১৩
বসন্ত রঞ্জনে ক বারবার ব এলেন	৭
অতিরিক্ত	১০
মোট	৩৮০

উইকেট পতন—১।৬ (কণ্ট্রাক্টর); ২।৫০ (মঞ্জরেকার); ৩।১৪৫ (মেহেরা); ৪।১৮৫ (পাতৌদি); ৫।১৯৪ (উম্রিগর); ৬।২৫৯ (জয়সীমা); ৭।৩১৪ (বোরদে); ৮।৩৫৫ (ডুরানী); ৯।৩৫৭ (ইঞ্জিনীয়ার); ১০।৩৮০ (রঞ্জনে)।

বোলিং—	ওঃ	মেঃ	রান	উইঃ
স্মিথ	৩১	১০	৬০	২
নাইট	১৮	৩	৬১	০
ডেক্সটার	২৯	৭	৮৩	০
এলেন	৩৪	১৩	৬৭	৫
লক	৩৬	১৯	৬৩	২
বারবার	৩	০	১৭	০
রাসেল	৫	০	১৯	০

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

রিচার্ডসন ক কণ্ট্রাক্টর ব বোরদে	৬২
রাসেল ব রঞ্জনে	১০
ব্যারিংটন ব সেলিম ডুরানী	১৪
পারফিট ক কস্তুরীরঙ্গম (সাব) ব বোরদে	২১
ডেক্সটার ব বোরদে	৫৭
বারবার ব বোরদে	১২
নাইট স্ট্যাম্পড ইঞ্জিনীয়ার ব ডুরানী	১২
এলেন ব ডুরানী	১৫
মিলম্যান ক ফারুক ব ডুরানী	০
লক নট আউট	২
স্মিথ ব ডুরানী	০
অতিরিক্ত	৭
মোট	২১২

উইকেট পতন—১।২৫ (রাসেল); ২।৬৯ (ব্যারিংটন); ৩।৯১ (রিচার্ডসন); ৪।১৩০ (পারফিট); ৫।১৫৫ (বারবার); ৬।১৮১ (নাইট); ৭।২০৮ (ডেক্সটার); ৮।২০৯ (এলেন); ৯।২১২ (মিলম্যান); ১০।২১২ (স্মিথ)।

বোলিং—	ওঃ	মেঃ	রান	উইঃ
দেশাই	১০	১	৩৪	০
রঞ্জনে	২১	৩	৫৯	১
ডুরানী	২৩·২	৮	৪৭	৫
বোরদে	২৫	৮	৬৫	৪

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস

জয়সীমা ব লক	৩৬
কণ্ট্রাক্টর স্ট্যাম্পড মিলম্যান ব এলেন	১১
মঞ্জরেকার স্ট্যাম্পড মিলম্যান ব লক	২৭
পাতৌদির নবাব ক মিলম্যান ব লক	৩২
ইঞ্জিনিয়ার ক মিলম্যান ব এলেন	৯
উম্রিগর ব এলেন	৩৬
ডুরানী ক পারফিট ব লক	০
বোরদে ক ব্যারিংটন ব এলেন	৬১
দেশাই ক পারফিট ব নাইট	২৯
রঞ্জনে ক লক ব নাইট	০
মেহেরা নট আউট	৭
অতিরিক্ত	৪
মোট	২৫২

উইকেট পতন—১।৩৯ (কণ্ট্রাক্টর); ২।৫৫ (জয়সীমা); ৩।১০২ (মঞ্জরেকার); ৪।১১৯ (ইঞ্জিনীয়ার); ৫।১১৯ (পাতৌদি); ৬।১১৯ (ডুরানী); ৭।১৯২ (উম্রিগর); ৮।২০৩ (দেশাই); ৯।২০৩ (রঞ্জনে); ১০।২৫২ (বোরদে)।

বোলিং—	ওঃ	মেঃ	রান	উইঃ
স্মিথ	৩	০	১৫	০
নাইট	৭	২	১৮	২
লক	৪৬	১৫	১১১	৪
এলেন	৪৩·২	১৬	৯৫	৪
বারবার	২	০	৯	০

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

রিচার্ডসন ব উম্রিগর	৪২
রাসেল ব রঞ্জনে	৯
ব্যারিংটন ক ডুরানী ব দেশাই	৩
ডেক্সটার এল বি ডব্লিউ ব ডুরানী	৬২
বারবার ক জয়সীমা ব ডুরানী	৬
পারফিট এল বি ডব্লিউ ব উম্রিগর	৪৬
নাইট নট আউট	৩৯
এলেন ক মঞ্জরেকার ব দেশাই	৭
মিলম্যান ব রঞ্জনে	৪
লক রান আউট	১
স্মিথ ক মঞ্জরেকার ব ডুরানী	২
অতিরিক্ত	১২
মোট	২৩৩

উইকেট পতন—১।২০ (রাসেল); ২।২৭ (ব্যারিংটন); ৩।৯২ (রিচার্ডসন); ৪।১০১ (বারবার); ৫।১২৯ (ডেক্সটার); ৬।১৯৫ (পরাফিট); ৭।২০৮ (এলেন); ৮।২১৭ (মিলম্যান); ৯।২২৪ (লক); ১০।২৩৩ (স্মিথ)।

বোলিং—	ওঃ	মেঃ	রান	উইঃ
দেশাই	১৭	৪	৩২	২
রঞ্জনে	১৪	৩	৩১	২
বোরদে	২২	১০	৪৬	০
ডুরানী	৩৩·২	১২	৬৬	৩
উম্রিগর	৩০	১০	৪৬	২

ভ্রম সংশোধন

গত ১০ম সংখ্যা 'দেশ'-এ খেলার মাঠের শেষ পৃষ্ঠার (৯৫৮ পৃষ্ঠা) শেষে মুদ্রাকর প্রমাদবশত ২টি লাইন বাদ পড়ে গেছে। শেষ অংশ এইরূপ হবেঃ—এ ছাড়া ভারতের সমস্ত প্রান্তের ফটোগ্রাফার এবং সাংবাদিকরাই টেস্ট খেলার জন্য কলকাতায় সমাগত। কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থায় সবাই অসন্তুষ্ট।

দেশী সংবাদ

১লা জানুয়ারী—অদ্য সকাল পৌনে আট ঘটিকায় হ্যারিসন রোড ও মীর্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ের নিকট স্টেটবাসের ধাক্কায় শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দে নামে অনুমান ৫৮ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

ভারতে ইংরেজ শাসনকালে যে সব রাজনৈতিক কার্যকলাপ ঘটিয়াছে, তাহার হাজার হাজার দলিলপত্র দিল্লী এবং কলিকাতায় সরকারী দপ্তরে গোপনতার আড়ালে সংরক্ষিত আছে। ভারত সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখিবার জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ সব দলিলপত্র দেখিতে চাহিলে কোন অজ্ঞাত কারণে ঐগুলি তাঁহাদিগকে দেখিতে দেওয়া হয় নাই।

২রা জানুয়ারী—রাজ্য সরকারের পে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীরা আগামী ফেব্রুয়ারী-মার্চ নাগাদ বর্ধিত হারে বেতন পাইবেন বলিয়া জানা যায়। ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বকেয়া বেতন দিবার জন্য পৌনে দুই কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে।

অদ্য কলিকাতার পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, এইদিন সকালে আসানসোলের নিকটে গ্রামরক্ষী বাহিনী ও একদল ডাকাতের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৬ জন ডাকাত নিহত ও রক্ষী বাহিনীর একজন আহত হন।

৩রা জানুয়ারী—বিহারের দুই লক্ষাধিক মানুষের এক জনতা আজ অপরাহ্ণে পাটনা জংশন স্টেশনে কংগ্রেস সভাপতিকে বিপুল সংবর্ধনা জানায়। কিন্তু অতি উৎসাহী জনতার চাপে এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা সূচনায় ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে শোভাযাত্রায় এত উন্মাদনা দেখা যায় নাই।

নির্বাচনের কাজে রাজনৈতিক দলগুলিকে আকাশবাণী ব্যবহারের সুযোগদানের আমন্ত্রণ জানাইয়া একটি পরিকল্পনা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক [illegible] স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

৪ঠা জানুয়ারী—বড় কলেজগুলিতে ছাত্রদের ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বৎসর কলিকাতায় দশটি নূতন কলেজ স্থাপনের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়।

আজ রাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে দুইটি খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও অপরটি গোয়া সম্পর্কে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রস্তাবে কাশ্মীর ও চীনা হামলা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী আজ শ্রীকৃষ্ণপুরীতে বলেন, গোয়ায় যেমন পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটান হইয়াছে, ভারতভূমি হইতে সেইরূপ পাকিস্তানী ও চীনা আক্রমণকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য কংগ্রেসকর্মীদের সংকল্পবদ্ধ হইতে হইবে।

৫ই জানুয়ারী—চরম বিশৃঙ্খলা এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতার দুর্বার চাপে আজ ৬৭তম কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দর্শনলাভের জন্য উন্মত্ত পাঁচ লক্ষ দেহাতী লোক সকল বাধানিষেধ চুরমার করিয়া দিয়া কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাসে অভূতপূর্ব এমন এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে যে, ছলে-বলে-কৌশলে জনতাকে শান্ত করিতে ব্যর্থ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেন—সভা সমাপ্ত হইয়া গেল।

৬ই জানুয়ারী—পুরা তিন দিনের ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করিয়া আজ সন্ধ্যায় কংগ্রেসের ৬৭তম ঐতিহাসিক অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব বায়োকেমিস্ট্রির এক এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন-এ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে কলেরার টিকা দিবার এক উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

৭ই জানুয়ারী—অদ্য বিকালে কলিকাতার ময়দানে দলবদ্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল এক বিরাট জনতা দুইটি ক্লাবের তাঁবুতে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং ইহার ফলে একটি তাঁবু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং অন্যটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা ছাড়া তাঁবু দুইটি লক্ষ করিয়া বড় বড় পাথরের টুকরা ও ইটপাটকেল বর্ষিত হয়। ফলে কিছু লোক আহত হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ মহলের সংবাদে প্রকাশ "ব্যাঙ্ক অব চায়না"য় নিযুক্ত যে সকল চীনা নাগরিক ভারত-বিরোধী কার্য চালাইয়া আসিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, ভারত সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

১লা জানুয়ারী—[illegible] খবরে জানা গেল [illegible] বেজায় লিসবনের ১০৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সালাজার সরকারের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। বিদ্রোহীরা বেজায় সমস্ত সৈন্যনিবাস দখল করিয়া লয়।

উত্তর ইরাকে পুনরায় [illegible] যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কুর্দিস উপজাতীয়রা পুনরায় কাসেম সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে।

২রা জানুয়ারী—[illegible] আজ ঘোষণা করেন যে, গত কাল বেজায় বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টার ব্যাপারে [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কম্যুনিস্ট আছে। বেজা সেনানিবাস তাহারা কিছুক্ষণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল।

৩রা জানুয়ারী—গত কাল রাতে বেইরুটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সামরিক বাহিনীর ভারী ট্যাঙ্কগুলি ন্যাশনালিস্ট সোস্যাল পার্টির ঘাঁটি বলিয়া পরিচিত দুইটি গ্রামের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া কয়েকটি গৃহ বিধ্বস্ত করিয়া দেয়।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ সরকারীভাবে ডাচ্ অধিকৃত পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার নামকরণ করা হয় "ইরিয়ান বরাট"।

পর্তুগীজ প্রধানমন্ত্রী ডাঃ অ্যাণ্টোনিয়ো সালাজার আজ লিসবনে জাতীয় পরিষদে এরূপ হুমকি দেন যে, পর্তুগাল রাষ্ট্রপুঞ্জ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

৪ঠা জানুয়ারী—প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ গত কাল বাহাওয়ালপুরে বলেন যে, পাকিস্তান যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত এবং সে যে কোন আক্রমণকে প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। "ভারতের আক্রমণের আশঙ্কা" সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে আয়ুব খাঁ উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন।

কাতাঙ্গা প্রাদেশিক আইনসভায় আজ কিটোনা চুক্তির অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। গত মাসে কাতাঙ্গার প্রেসিডেণ্ট শ্রীচোম্বে ও কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীআডৌলার মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল।

৫ই জানুয়ারী—নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য পাকিস্তান তোড়জোড় শুরু করিতেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে পশ্চিমী মিত্র-রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ এবার কম বলিয়াই কূটনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

রোডেশিয়ান ফেডারেশন হইতে [illegible] সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সমরাস্ত্র ও বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈন্য কাতাঙ্গায় প্রবেশ করিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য রোডেশিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষক মোতায়েন রাখার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, রোডেশিয়ান ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গত রাত্রিতে তাহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

৬ই জানুয়ারী—[illegible]

[illegible]

৭ই জানুয়ারী—[illegible] আজ এক [illegible] প্রকাশ্যে বলেন, গোয়ার ঘটনা সত্ত্বেও ভারতের সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য দান বন্ধ করা হইবে না, বা এ সকল ব্যাপারে আমেরিকার আগ্রহও হ্রাস পাইবে না।

অদ্য ইন্দোনেশিয়ায় তিরিশ হাজার লোকের এক সভায় প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ ঘোষণা করেন, "নেদারল্যাণ্ড যদি শীঘ্র পশ্চিম নিউগিনি (পশ্চিম ইরিয়ান) ইন্দোনেশিয়াকে ছাড়িয়া না দেয় তাহা হইলে ইন্দোনেশিয়া পশ্চিম নিউগিনি আক্রমণ করিবে।"

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

একদিন আপনার মেয়ে প্রতীক্ষা ক'রে থাকবে

প্রতীক্ষা ক'রে থাকবে একদিন এক সুন্দর সুবেশ তরুণ আপনার বাড়িতে এসে উপস্থিত হবে—সে আপনার মেয়ের বর। সেই দিনটি হবে আপনার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন ; এবং হয়ত সবচেয়ে বেশী খরচের দিনও। সেই পরমক্ষণটি যখন আসবে তখন আপনার হাতে প্রয়োজনীয় টাকা থাকবে তো ? নিশ্চয়ই থাকবে, তবে যদি আপনি আপনার মেয়ের জন্য এখনই একটি ম্যারেজ এনডাউমেণ্ট পলিসি নেন। আপনাকে শুধু মাঝে মাঝে সামান্য টাকা বাঁচাতে হবে। যেমন ধরুন, মাসে মাত্র ১৫৲ টাকা করে জমালে ৩০ বছর বয়সের কোন পিতা ১৫ বছর পরে তাঁর মেয়ের ৩০০০৲ টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে রাখতে পারেন (সে সময় তিনি বেঁচে থাকুন বা নাই থাকুন)।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এখনই পলিসি নেওয়া দরকার—আপনি সুষ্ঠুভাবে যে ব্যবস্থা এখন শুরু করবেন জীবন বীমা সেটিকে সুনিশ্চিত ও রূপায়িত করে তুলবে। একটি ম্যারেজ এনডাউমেণ্ট পলিসির মাধ্যমে আপনি আপনার মেয়ের বিয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে পারবেন। আপনার আদরের মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এবং আপনার সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা করে রাখা আপনার কর্তব্য নয় কি ? এ সম্বন্ধে এখনই ব্যবস্থা করুন।

জীবন বীমার
কোন বিকল্প নেই

ASP, LIC-65 BEN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

নতুন যুগের ভোরে

উনিশ শ' চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ পর্যন্ত, বাংলার ভাগ্যাকাশে যে দুর্যোগের সূচনা হয়েছিল—অসুস্থ সমাজব্যবস্থা ও ধনতন্ত্রবাদের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে সমাজের প্রতি স্তরে যে গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে মানুষের জীবনকে করে তুলেছিল বিষাক্ত, শোষক শ্রেণীর সেই নারকীয় নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক মানুষের সংগ্রামের যে ইঙ্গিত লেখক দেখতে পেয়েছিলেন তারই পটভূমিকায় লেখা—এই উপন্যাস।

স্বচ্ছ ভাষা, শাণিত বিশ্লেষণ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা কৌশলে সার্থক সৃষ্টি।

দাম ৩·২৫

সত্যব্রত লাইব্রেরী

১৯৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি-২৯২৫)

● ● **সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস**

আশ্চর্য কাহিনী : সমাজে যাকে নিয়ে ঘরকন্না সে স্বামী : অন্তরাল থেকে যে তার ভাগ্যনিয়ন্তা সে কে?

শঙ্খসত্ত্ব বসুর **আড়াল** ... ২·৫০

ভারতের চেরাগ দুর্গেশনন্দিনী রাজ্যের মাটিতে ও তারই আলোয় ফুটে ওঠা একটি স্নিগ্ধ প্রেমের কাহিনী—যা চিরদিন বিঁধে থাকে অন্তরের গভীরে!

নরেন্দ্রনাথ দাশের

বাহাদুর শা'র সমাধি .. ৫·০০

ওছাড়া নীলকণ্ঠের চাঞ্চল্যকর

আসামী কারা ... ৩·৫০

নব বৃন্দাবন (২য় সং) ৫·০০

সুরো ঠাকুরের উপন্যাস

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা ... ৪·৫০

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

ব্রাত্য ... ৩·০০

শঙ্খসত্ত্ব বসুর উপন্যাস

পুষ্পলাবা ... ৩·৫০

জ্যোতির্ময়ী দেবীর

ব্যাণ্ডমাস্টারের মা ... ৩·৫০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

৯ রায়বাগান স্ট্রীট : কলিকাতা—৬

॥ আনন্দ - পাবলিশার্স - প্রকাশন ॥

উ প ন্যা স

প্রচ্ছদপট	৩·৫০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
যে যাই বলুক	৬·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রূপসী রাত্রি	৫·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
তিন দিন তিন রাত্রি	৫·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
পঞ্চশর	৩·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রতিধ্বনি ফেরে	৪·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপবতী	৩·০০	মনোজ বসু
মানুষ দেবতা হবে না	৩·০০	রবি গুহ মজুমদার
বহু যুগের ওপার হতে	২·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
মনের মানুষ	৩·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সারা রাত	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শতকিয়া	৮·০০	সুবোধ ঘোষ

গ ল্প - সং গ্র হ

প্রেমের গল্প	৪·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
তিন শূন্য	৩·৫০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প	৪·০০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
ময়ূরী	৩·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
কহেন কবি কালিদাস	৩·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
গল্প-সংগ্রহ	৫·০০	সরলাবালা সরকার
ভারত প্রেমকথা	৬·০০	সুবোধ ঘোষ

অ ন্যা ন্য

চণক-সংহিতা	৩·৫০	কালিদাস রায়
চিন্ময় বঙ্গ	৪·০০	আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন
রহস্যময় রূপকুণ্ড	৩·৫০	বীরেন্দ্রনাথ সরকার
রবীন্দ্র মানসের উৎস-সন্ধানে	৩·৫০	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
বিবেকানন্দ চরিত	৫·০০	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

কি শো র - সা হি ত্য

ছেলেদের বিবেকানন্দ	১·২৫	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
পিন্‌কুর ডাইরি	২·০০	সরলাবালা সরকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 20th January 1962

২৯ বর্ষ ॥ ১২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৬ মাঘ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

অভিনন্দন

গোয়া মুক্তি অভিযানের বিজয়োল্লাসের সঙ্গে প্রায় এক সুরে বাঁধা টেস্ট ম্যাচে ভারতের অভূতপূর্ব সাফল্যে দেশব্যাপী আনন্দোচ্ছ্বাস। এ-সাফল্য ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে যেমন যুগান্তকারী তেমনি জাতির যুবশক্তির উদ্দীপনাময় অগ্রগতির সার্থক পরিচয়। টেস্ট জয়ের অসামান্য কীর্তি কেবল খেলার মাঠে নয়, দিকে দিকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সকল বিভাগে সঞ্চারিত, ব্যাপ্ত করেছে নূতন বিশ্বাস ও সংকল্পের প্রেরণা। ব্রিটিশ ইতিহাসের আপ্ত বাক্য—হ্যারো-ইটনের খেলার মাঠেই ইংরেজ জাতির শৌর্যবীর্যের সাধনা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসেও এই উক্তির মহামূল্য তাৎপর্য বাস্তব স্বীকৃতি লাভ করেছে; টেস্ট ম্যাচে ভারতের 'রাবার' জয় তারই উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

খেলার রাজা ক্রিকেট; ক্রিকেটের রাজা অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যাণ্ড। সেই রাজকীয় খেলার রাজসম্মান ভারতবর্ষ যে কোনদিন আপন ক্ষমতাবলে অধিকার করতে পারবে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কুলপতিরা কখনও তা কল্পনা করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। ফুটবলের মাঠেই বা ১৯১১ সালের আগে কে ভাবতে পেরেছিল যে, গোরাদের শ্রেষ্ঠত্ব গর্ব চূর্ণবিচূর্ণ হবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যে? ফুটবলের ইতিহাসে ১৯১১ সালের মতই ক্রিকেটের ইতিহাসে এই ১৯৬২ সালটার যুগান্তকারী তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী সার্থকতার ইঙ্গিতবহ।

ক্রিকেটের মাঠে ভারতবর্ষ অবশ্য একেবারে নবাগত নয়; ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের বিদ্যুৎগতি অনায়াস সাফল্যের সহস্রধার দীপ্তিতে রঞ্জি, দলীপ সিংজী, পাতৌদির নাম ত অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ক্রিকেটের ইতিহাসে। তবুও ক্রিকেট কুলপতিরা ভারতবর্ষকে সাবালক গণ্য করতে সহজে রাজি হননি, প্রসন্ন মনেও নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিযোগিতার অধিকার ভারতবর্ষ পেয়েছে ত্রিশ বৎসর। তবুও টেস্ট খেলায় ভারতের যোগ্যতা সম্বন্ধে ক্রিকেট কুলপতিদের উন্নাসিক বর্ণগর্বী অবজ্ঞা ও অস্বস্তি একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। হোক বা না-ই হোক, এবারের টেস্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় আর ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং, সর্ববিভাগে ভারতের অসাধারণ কৃতিত্ব সংশয়হীনভাবে প্রমাণ করেছে যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যেমন তেমনি আন্তর্জাতিক ক্রীড়াতেও বর্ণগত বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এ যুগে অচল।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের শক্তিমত্তা ও নৈপুণ্য তাঁদের অতীতের পরাজয় গ্লানি নিঃসন্দেহে অপসারিত করেছে এবং দল হিসাবে ভারতীয় খেলোয়াড়রা একত্র পরস্পর সহযোগিতার যে সুচিন্তিত ও পরিণত ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা যায়, এ-বৎসর ভারতীয় ক্রিকেটের জয়যাত্রার শুভ উদ্বোধনে ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ উন্মুক্ত হল। ভবিষ্যতের প্রশ্ন বাদ দিয়েও ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে ভারতের 'রাবার' লাভই একটা চমকপ্রদ ঐতিহাসিক বিস্ময়। একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছাড়া আর কোন দলের কাছে ইংল্যাণ্ড কখনও 'রাবার' হারায়নি কিম্বা এমন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়নি। বোম্বাইএ টেস্ট ম্যাচের শুভারম্ভে জয়-পরাজয়ের পরিণাম ফল নিঃসংশয়ে সূচিত না হলেও বিজয়লক্ষ্মী ইংল্যাণ্ডের অনুকূল হওয়ার লক্ষণ অনুপস্থিত ছিল। কানপুরে ভারতবর্ষের ক্রীড়ানৈপুণ্যের প্রথম পরিচয়কে ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের পূর্বাভাস মনে করা অযৌক্তিক ছিল না। দিল্লিতে প্রকৃতির প্রতিকূলতাই ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে প্রতিবাদী হয়। চতুর্থ পর্যায়ে কলিকাতার ইডেন উদ্যানে ভারতের বিজয় সূর্যের উদয়, মাদ্রাজে পঞ্চম ও শেষ টেস্টে গৌরবশিখরে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি। বলা বাহুল্য, ভারতের এই সাফল্য আদৌ আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। তরুণ খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য আর দলগতভাবে পরস্পর সহযোগিতার অসাধারণ প্রয়োগকৌশলই দিগ্বিজয়ী ইংল্যাণ্ডকে পর পর দুইবার অবিসংবাদিতভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কুলপতিগণ আশা করি এখন প্রকৃত খেলোয়াড়-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বীকার করবেন যে, খেলার জগতে, এমন কি খেলার রাজা ক্রিকেটেও অধিকারভেদটা জাত-কুলের অপরিবর্তনীয় সীমানা চিহ্নিত নয়। ইতিহাস বদলায়, খেলার মাঠেও বদলায়, ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ক্রীড়ানৈপুণ্যের ঐতিহ্য আয়ত্ত করে ভারতবর্ষ আজ যে কীর্তি অর্জন করেছে, সেজন্য ক্ষুব্ধ বা রুষ্ট না হয়ে ইংল্যাণ্ডেরও গৌরববোধ করার সুযোগ আছে।

টেস্টে 'রাবার' জয় ভারতবর্ষের অবশ্য এইবারই প্রথম নয়। তবে পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 'রাবার' জয়ের তুলনায় ইংল্যাণ্ডের নিকট থেকে 'রাবার' লাভ অনেক অনেক বেশী গৌরবময় সাফল্য ও কৃতিত্বসূচক। এই জয় ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতীয় যুবশক্তির নূতন বলিষ্ঠ বিশ্বাসদীপ্ত পদক্ষেপ। কলকাতা ও মাদ্রাজে যে বিজয় অভিযানের শুরু, তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানাই।

ভারত ইংলিশ ক্রিকেটকে
আর ডরায় না।
অবশেষে সিংহ বশ
মেনেছে!
এম সি সি
ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ
বলেছেন যে পশ্চিম
বাংলায় বিকল্প
বামপন্থী
সরকার
স্থাপনের
আর আশা
নেই।
বাম পন্থী
সরকার নয়
গান্ধীবাদার
এত দিনে
সত্যোপলব্ধি
পাক সংবাদ পত্রে ভারত বিরোধী
প্রচার শুরু হয়েছে
'হিজ মাস্টারস ভয়েস'
পাক
সংবাদ
পত্র
পশ্চিমা সংবাদপত্র
মলোটভের রহস্যজনক
নিরুদ্দেশ!
যাদুকরের খেলা!
ভিয়েনা

নেপালে রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। পূর্ব নেপালে কয়েকটি পুলিস থানা এবং চৌকী বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়েছে বলে কয়েকদিন আগে সংবাদ আসে। কাঠমাণ্ডু থেকে রাজা মহেন্দ্র অবশ্য প্রচার করেছেন যে, বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংগে সংগে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে আর যে-সব কথা বলেছেন তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, অবস্থাটা তাঁর পক্ষে আদৌ সুবিধাজনক নয়। তিনি বলেছেন, বিদ্রোহীদের ক্রিয়াকলাপের ফলে নেপাল স্বাধীনতা হারাতে পারে, নেপালের সত্তাই বিপন্ন হতে পারে ইত্যাদি। একটি প্রতিবেশী রাজ্য থেকে অভিযান চালাবার সুযোগ বিদ্রোহীরা পাচ্ছে বলে রাজা মহেন্দ্র অভিযোগ করেছেন। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁর আর একটা অভিযোগ এই যে, তারা নাকি রানাশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের নামে দোষারোপ করার জন্য যা খুশি বলা রাজা মহেন্দ্রের অভ্যাস আছে। জনমতসমর্থিত নেপালী কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকে জবরদস্তি সরিয়ে দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বেশ্বর কৈরালাকে বন্দী করে রাজা মহেন্দ্র যখন গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটান তখন কৈরালা মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তিনি অনেক মন-গড়া অভিযোগ করেছিলেন। বন্দী শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালা বিচার দাবি করেছিলেন। যে-সব অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে রাজা প্রচার করেছিলেন সেগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার হোক—এই দাবি মেনে নেবার সাহস রাজা মহেন্দ্রের হয় নি। কারণ যদি নিরপেক্ষ বিচার হত তা হলে নিশ্চয়ই দেখা যেত যে, রাজা মহেন্দ্র যে-কর্ম করেছেন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার লোভ ছাড়া তার পক্ষে আর কোনো যুক্তি ছিল না। নেপালের সৈন্যবাহিনীর অন্য সব শ্রেণী মিলে যে-সংখ্যা হয় তার চেয়ে প্রাসাদরক্ষী সৈন্যদল যারা সাক্ষাৎভাবে রাজার আজ্ঞাধীন, তাদের সংখ্যা বেশী। ১৯৫৯ সালে এই প্রাসাদরক্ষী সৈন্যদলকে ব্যবহার করে রাজা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নেপালের প্রথম গণতান্ত্রিক মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদচ্যুত করেন এবং গণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে রাজকীয় স্বৈরাচার প্রবর্তিত হয়। নেপালী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজা যাই প্রচার করুন—নেপালী জনসাধারণের আস্থা নেপালী কংগ্রেসের উপর তখনও ছিল, এখনও আছে। বর্তমান বিদ্রোহের পিছনে প্রধানত নেপালী কংগ্রেসেরই শক্তি কাজ করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নেপালী কংগ্রেস রানাশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়—রাজা মহেন্দ্রের এই হাস্যকর অভিযোগ কেউ বিশ্বাস করবে না। যে-বিপ্লব রাজা মহেন্দ্রের পিতা রাজা ত্রিভুবনকে রানাশাহীর জালের ভেতর থেকে উদ্ধার করে এবং রানাশাহীর অবসান ঘটায় সে-বিপ্লব নেপালী কংগ্রেসের দ্বারাই সংঘটিত হয়। তখন কয়েকজন রানা ব্যক্তিগতভাবে রানাশাহীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। পরেও তাঁরা নেপালী কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন এবং এখনও আছেন। সেইজন্য কি বলতে হবে যে, বর্তমান বিদ্রোহের উদ্দেশ্য রানাশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা? রাজা মহেন্দ্রের এই কথা নেপালের জনসাধারণ একটুও বিশ্বাস

করতে পারে বলে মনে হয় না। তারা নিশ্চয়ই বুঝবে যে, তাদের ভয় দেখাবার জন্য রাজা এরূপ কথা বলছেন। যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর রাজা মহেন্দ্র কটাক্ষপাত করেছেন, বলা বাহুল্য সে-রাষ্ট্র হচ্ছে ভারতবর্ষ। রাজা মহেন্দ্রের দমননীতির হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেক নেপালী দেশপ্রেমিক ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা নেপালীদের সম্পর্কে কোনো নূতন কথা নয় এবং এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্বন্ধ নেই। বরঞ্চ এই কথাই উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবাসীদের সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে নেপালী গণতন্ত্রীদের প্রতি থাকা সত্ত্বেও এবং রাজা মহেন্দ্র এবং তাঁর পার্শ্বচরদের ভারতবিদ্বেষী ভাব সুবিদিত থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার রাজা মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো কার্যে সহায়তা করেননি। পাছে অভিযোগ করা হয় যে, ভারত-সরকার নেপালের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন সেজন্য ভারত সরকার অতিরিক্ত সাবধানী। কিন্তু ভারত সরকার যতই সাবধানী হোন না কেন, রাজা মহেন্দ্র ভারত সরকারের অপবাদ করতে কখনই বিরত হন নি। কারণ ভারত সম্বন্ধে একটা সন্দেহ এবং ভয় সৃষ্টি করে রাখা এবং নেপালী গণতন্ত্রবাদীরা ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নেপালের স্বাধীনতা খর্ব করে দেবে এই অপপ্রচার চালু রাখা রাজা মহেন্দ্র এবং নেপালী কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী কিছু রাজনৈতিক দলের একটা বাঁধা চালে দাঁড়িয়ে গেছে। কম্যুনিস্টরা যারা নিজেরা নেপালকে চীনা প্রভাবের আওতায় আনার জন্য সর্বদা সচেষ্ট এবং নেপাল পুরোপুরি চীনা কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও যারা খুশী ছাড়া অখুশী হবে না তারাও নিজেদের আসল মতলব ঢাকা রাখার জন্য এবং দেশপ্রেমিক সাজার জন্য কেবল ভারতের দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করে আছে যেন নেপালের স্বাধীনতার বিপদ ভারতের দিক থেকেই আসছে বা আসতে পারে। রাজা মহেন্দ্র ভুলে যান যে, তিনি এবং তাঁর কার্যকলাপই নেপালের স্বাধীনতার পক্ষে সবচেয়ে বিপদের কারণ। যে-দিক থেকে কোনো বিপদের কারণ নেই সেই দিক সম্বন্ধে লোককে ভয় দেখিয়ে আসলে যে-দিক থেকে বিপদ সম্ভাব্য, এমন কি আসন্ন সেদিক থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে রাখার চেষ্টা তিনি করছেন। সেই আসন্ন বিপদের অগ্রগতির পথ রাজা মহেন্দ্র নিজেই প্রস্তুত করছেন। কম্যুনিস্ট চীনা সরকারের সঙ্গে বিরোধ বাধাবার পরামর্শ কেউ নেপাল সরকারকে দিতে পারে না। কিন্তু নেপালের স্বাধীনতার বিপদ ভারতের দিক থেকে নয়, যদি বিপদ আসে তবে তা কম্যুনিস্ট চীনের দিক থেকেই আসবে—এই বাস্তব সত্যকে উল্টিয়ে দেখা এবং সেই উল্টা-দেখা অনুসারে চলাই রাজা মহেন্দ্রের অনুসৃত নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনা কম্যুনিস্ট সরকারের সঙ্গে তিনি যে-সব চুক্তি করেছেন তাতে নেপালে চীনা প্রভাবের প্রসারলাভ সহজ হবে। তিব্বতের দিক থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত যে-বড়ো রাস্তা তৈরী করার প্রস্তাব স্বীকৃত হয়েছে—বলাবাহুল্য রাস্তা চীনারাই তৈরী করবে—নেপালের দিক থেকে তার বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো রকম প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না। ভারতের প্রতি অহেতুক বিরাগই কি রাজা মহেন্দ্রকে কম্যুনিস্ট চীনের দিকে ঠেলছে যার ফল নেপালের রাজা প্রজা কারো পক্ষেই মঙ্গলকর হওয়া সম্ভব নয়? কম্যুনিস্টরা যখন যার সঙ্গে সুবিধা প্যাক্ট করতে পারে এবং নিজেদের প্রয়োজন ফুরালে তাকে খতমও করতে পারে। রাজা মহেন্দ্র নেপালে গণতন্ত্রবাদী নেপালী কংগ্রেসের শক্তির উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। কম্যুনিস্টদের তাতে আপত্তি ছিল না, বরঞ্চ তার ফলে যে-অবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে আখেরে কম্যুনিস্টদের সুবিধা হবে বলে কম্যুনিস্টরা বোধহয় খুশীই হয়েছিল। চীনা কম্যুনিস্ট সরকারও বোধহয় নেপালে গণতন্ত্রবাদী কোনো সরকারের পরিবর্তে স্বৈরাচারী রাজকীয় শাসনই পছন্দ করেন। কারণ গণতন্ত্রবাদীরা কম্যুনিস্ট প্রভাবের আক্রমণ থেকে নেপালের স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবেন এবং তাতে হয়ত কৃতকার্যও হতেন, কিন্তু স্বৈরাচারী রাজকীয় শাসনের পক্ষে দীর্ঘকাল না নিজেকে না দেশকে বাঁচানো সম্ভব। রাজকীয় স্বৈরাচারী শাসন অদূর ভবিষ্যতে দেশে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে তখন কম্যুনিস্টদের সুযোগ উপস্থিত হবে, এই চিন্তাধারা অনুসারে কম্যুনিস্টরা চলেছে। রাজকীয় শক্তির সঙ্গে গণতন্ত্রবাদীদের সাক্ষাৎ সংঘর্ষ উপস্থিত হলে—এখন যেরূপ হয়েছে এবং সেই সংঘর্ষে যদি রাজকীয় শক্তি হটতে থাকে তখন কম্যুনিস্টরা লোকচক্ষে নিজেদের মান রাখার জন্য রাজকীয় শক্তির বিরোধী রূপে দেখা দিতে বাধ্য হবে। সুতরাং নেপালী কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার কুকার্যে কম্যুনিস্টরা সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে রাজা মহেন্দ্রকে সাহায্য করে থাকলেও রাজা নিজের বিপদের সময়ে কম্যুনিস্টদের সাহায্য পাবেন এই আশা যদি তিনি করে থাকেন তবে তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত। অন্যপক্ষে তাঁর যদি "কনস্টিটিউশনাল" রাজা বা রাষ্ট্রাধিপতি হয়ে থাকার ইচ্ছে থাকত তবে গণতন্ত্রবাদী নেপালী কংগ্রেসের কাছ থেকে তাঁর কোনো ভয়ের কারণ ছিল না। রাজা মহেন্দ্র যে-পথে চলেছেন তার পরিণামফল বিনষ্টি। এখনও তিনি সে-পথ থেকে ফিরতে পারেন। নেপালের গণতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে—তার অর্থ মুখ্যত নেপালী কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করে বিদ্রোহের অবসান ঘটানো সম্ভব। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, রাজা মহেন্দ্র দমননীতি ও স্বৈরাচারী শাসন প্রত্যাহার করে জন-প্রতিনিধিদের নিকট পুনরায় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী আছেন কিনা। যদি তাঁর সে ইচ্ছা আদৌ না থাকে এবং মিটমাটের পথে না গিয়ে তিনি সৈন্যদলের দ্বারা বর্তমান বিদ্রোহের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেন, তবে তার পরিণাম রাজপদের পক্ষে কখনই ভালো হবে না। রাজা মহেন্দ্র যদি গণতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে সংস্কারের সম্ভাবের সম্পর্ক স্থাপন করতে সচেষ্ট হন তা হলে তিনি ভারতের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ এবং প্রচার করার কুফল এবং অপ্রয়োজনীয়তা দুই উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু রাজা মহেন্দ্রের যে প্রকৃতি তাতে তিনি সহজে তাঁর পূর্বানুসৃত পথ ত্যাগ করবেন এরূপ আশা করা কঠিন। তবে তিনি চতুর লোক বলে প্রসিদ্ধ। সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখলে তিনি অর্ধেক বাঁচাবার দিকে ঝুঁকবেন, এ সম্ভাবনাও আছে। ইচ্ছা করলে তিনি শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালাকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে এবং তাঁর গণতন্ত্রবাদী সহযোগীদের আলোচনার জন্য আহ্বান করে মুহূর্তের মধ্যে ঘটনার স্রোতকে নূতন এবং মঙ্গলকর পথে পরিচালিত করতে পারেন। দুরাশা হলেও নেপালের মঙ্গলকামীরা এখনো আশা করেন যে, রাজা মহেন্দ্রর সুমতির উদয় হবে।

১১-১-৬২

'কলমে' যখন একই উচ্চারণ তখন এই ধ্বনি প্রকাশের সময় বাঙলায় কোনো পরিবর্তন না করাই ভাল। অবশ্য তাঁরা 'কলম' না লিখে 'কালাম' লিখতে পারতেন (আজকে যে রকম কেউ কেউ 'হদিস' না লিখে 'হাদিস' লেখেন, 'বরকৎ' না লিখে 'বারাকৎ' লেখেন) কিন্তু তা হলে বিপদ হত যে, দীর্ঘ আ-কার-যুক্ত 'কালাম' নামক যে ভিন্ন শব্দ আছে (সেটার অর্থ 'বাণী'—আবুল কালাম আজাদ-এর অর্থ 'বাণীর পিতা, যিনি স্বাধীন') সেটাতে এবং 'লেখনী'-তে (অর্থাৎ কলম'-এ) যে পার্থক্য আছে সেটা আর লেখাতে দেখানো যাবে না।

অবশ্য তাঁরা 'ক্যলাম' (কলমের জন্য, এবং কলাম', 'বাণী'র জন্য) লিখতে পারতেন কিন্তু সেটা করতে গেলে অন্যান্য নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়—এবং সে দীর্ঘ আলোচনার জন্য এ-স্থলে স্থানাভাব।

এই আইন তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বাঙালী কিভাবে 'অ' এবং 'আ' উচ্চারণের ভিতর পার্থক্য করে স-সম্বন্ধেও বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন বলে একটি ব্যত্যয় তাঁরা করে দিয়েছিলেন। আরবী ফার্সী শব্দের আদ্যক্ষরে 'আলিফ', আইন' বা 'হে' থাকলে সেখানে 'আ' ব্যবহার করেছেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তাই 'অল্লা' 'অহমদ' না লিখে লিখেছেন 'আল্লা', 'আহমদ'; 'অব্দুলের' বদলে 'আব্দুল'; এবং 'হমিদের', 'হসনের' পরিবর্তে 'হামিদ', 'হাসন'।

দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দীর্ঘ হ্রস্ব নিয়ে। সংস্কৃত 'দিন' এবং 'দীন' উচ্চারণে, 'কুল' এবং 'কূল' উচ্চারণে আমরা কোনো পার্থক্য করি না, এমন কি সংস্কৃত পড়ার সময়ও না। তাই তাঁরা স্থির করলেন যে, বাঙলাতে আরবী-ফার্সী শব্দ লেখার সময় তাঁরা সব শব্দই হ্রস্ববর্ণ দিয়ে লিখবেন। কাজেই আরবী 'ধর্ম' অর্থে 'দীন' শব্দ যদিও দীর্ঘ উচ্চারণে আছে তবু তাঁরা বাঙলাতে 'দিন'-ই লিখলেন, এবং ঠিক সেই মত 'নূর', 'রসূলে' না লিখে 'নুর' এবং 'রসুল' লিখলেন।

তৃতীয় সমস্যা, সংস্কৃতে শ, ষ, স-এর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ। আমরা বাঙলাতে তিনটেকেই এক উচ্চারণ 'শ' অর্থাৎ 'sh'-এর মত করে থাকি। শুধু সংযুক্তের বেলা এবং অন্যান্য কোনো কোনো স্থলে ইংরিজি s-এর উচ্চারণ, অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত 'স'-এর উচ্চারণ করে থাকি। মস্তক, পুস্তক, আস্তে শ্রাবণ, প্রশ্ন ইত্যাদিতে আমরা 'শ' উচ্চারণ না করে 'স', অর্থাৎ 'sh' না করে 's' করে থাকি। আরবী-ফার্সীতে আছে চার রকমের ঐ ধরনের উচ্চারণ। মুসলমান আদি লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণপদ্ধতি মেনে নিয়ে একটি 'স' দিয়েই সব কারবার চালাবার চেষ্টা করেছেন। তবে পূর্ব বাঙলায় 'ছ' অক্ষর 'স'-এর মত উচ্চারিত হয় বলে মাঝে মাঝে (পরবর্তী যুগে এবং আধুনিক কালে আকছারই) 'ছ' এসে 'স'-এর স্থান নিয়েছে।

এ আলোচনার সর্বশেষে কিন্তু নির্ভয়ে একটি কথা বলা যেতে পারে। মুসলমান আদি লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণকে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়ে তারই রীতিনীতি মেনে নিয়েছিলেন। উদ্ভট বিদকুটে বানান লিখে নূতন নূতন ধ্বনি আমদানীর বন্ধ্যাগমন করেন নি। আরবী-ফার্সী শব্দের বাঙলা বানানে প্রথম ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯৩৬ সালে বাঙলা বানান 'নিয়ন্ত্রণ ও সরল' করতে চাইলেন। কিন্তু সে আলোচনা অতিশয় দীর্ঘ হয়ে পড়বে, আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ এবং তদুপরি আমার বিলক্ষণ জানা আছে, এ আলোচনায় অধিকাংশ পাঠকেরই কোনো উৎসাহ নেই। তবু যে আমি করেছি, তার কারণ, বাঙলা বানানের অরাজকতার মাঝখানে একথাও সত্য যে, বাঙলার একাধিক তরুণ নানা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নানা শব্দ ও ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করছেন। তাঁরা যদি এসব বিষয়ে গবেষণা করেন তবে আমার 'নানা প্রশ্নের' কিছুটা উত্তর আমি হয়তো পাব।

এটা অবশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নূতন নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বানানের অরাজকতা দূর করার জন্য সাহিত্য পরিষদ (?) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (?) অনুরোধ করেন, তিনি যেন ঐ সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। আমার যতদূর জানা আছে, তিনি সে কার্য শেষ করে উঠতে পারেন নি। আমার এ মন্তব্যে ভুল থাকতে পারে, কারণ সমস্ত জিনিসটা আমার আবছা-আবছা মনে আছে।

শেষ প্রশ্ন :—

বাঙলা বাক্যগঠন, পদবিন্যাস অর্থাৎ সিনটেকস্ এল কার অনুকরণে?

ফার্সীতে বলি, চুন (যখন) পাদশা (বাদশা) মরা (আমাকে) দীদন্দ (দেখলেন) উনহা (উনি) মরা (আমাকে) গুফতন্দ (বললেন), তু (তুই) কুজা (কোথায়) মীরওয়ী (যাচ্ছিস)? হুবহু একই সিনটেকস্?

ফার্সী থেকে?

এবং সর্বশেষ প্রশ্ন :—

আমরা যে গোটা গোটা বাঙলা লেখার সময় এবং সাইন-বোর্ডে বাঙলা অক্ষরের কোনো জায়গায় মোটা কোনো জায়গায় সরু করি সেটা এল কোথা থেকে? ফার্সী লেখার কলম (—আমাদের প্রাচীন লেখনী বা লোহার স্টিলো না—) ব্যবহার করেছিলুম বলে?

আলোচনা

বাংলার গ্রাম

মাননীয় দেশ পত্রিকা মহাশয়, সমীপেষু:

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলাদেশে গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা পড়লাম। পড়ে বেশ ভাল লাগল, এবং তারপর আরও দু'জনের আলোচনা পড়ে মনে হল গ্রাম সম্বন্ধে অন্তত কয়েকজন ভাবতে শুরু করেছেন।

নিজে একজন গ্রামবাসী হিসাবে তাই এই বিস্তৃত আলোচনার পরও কিছু বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পেশ করতে চাই।

সুনীলবাবুকে এইজন্য ধন্যবাদ যে, তিনি বাংলা দেশের গ্রামকে দেখতে চেয়েছেন, এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমাদের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন।

নানা কারণে এই আলোচনা আরো দীর্ঘ ও বহুমুখী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা না করে একটি বিশেষ দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। আমিও তাই ঐ বিষয়েই কিছু বলব।

গ্রামজীবনে অনেক অসুবিধা থাকলেও শিক্ষা ব্যবস্থাই হল প্রধান। শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকার অবশ্যই চেষ্টা করছেন। তবু বলব দু'দুটো পরিকল্পনার মাধ্যমে বিরাট আয়োজন ও বিপুল অর্থব্যয় সত্ত্বেও কেন গ্রামে শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ প্রসার লাভ হচ্ছে না। সুনীলবাবুর মতে এর জন্য দায়ী কয়েকজন স্বার্থান্ধ লোক। এ কথা আমিও অস্বীকার করি না। তবে তাদের ঘাড়েও দোষের সবটুকু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। দেখতে হবে কেন এমন হয়? কেমন করে এরা সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে।

আমি আমাদের গ্রামের স্কুল দিয়াই শুরু করব। এবং দেখাতে চেষ্টা করব, যা এখানে হয় তা গ্রাম দেশের প্রত্যেক স্কুলে হয়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এবং পরিশ্রম দিয়ে একটি স্কুল গড়ে তোলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি এখন অক্ষম। তবু স্কুল চলছে। ছাত্র সংখ্যা দু'তিন শ হবে।

গত বৎসর ঐ স্কুলটি সরকারী সাহায্য পেয়ে 'মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ'এর হাতে চলে যায় এবং এর পরই কিভাবে এই 'আদর্শ' স্কুলে গলদ প্রবেশ করল, তা বলি। ইতিপূর্বে সকালে দুপুরে ক্লাস হত এবং একজন প্রধান শিক্ষকই সেই স্কুল পরিচালনা করতেন; কিন্তু সরকারী সাহায্য পাবার সঙ্গে সঙ্গে সকালের জন্য বোর্ড থেকে অন্য একজন প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। সুতরাং প্রথম জনের বেতন গেল কমে, সেই সঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য।

বিতাড়িত এতদিন যে সকল শিক্ষক শিক্ষকতা করতেন, বোর্ডের আইনানুযায়ী তাদের কয়েকজন ছাঁটাই হলেন, কয়েকজন নীচের ক্লাসে গেলেন পড়াতে। পরিবর্তে বোর্ড কর্তৃক অবশ্যই নতুন শিক্ষক বহাল হলেন; কিন্তু তাঁরা সকলেই বাইরে থেকে আসেন। ফলে শুরু হল দলাদলি রাজনীতি। যাঁরা ছাঁটাই হলেন এবং যাঁরা এখনও আছেন তাঁরা গ্রামের ছেলে। বলা বাহুল্য গ্রামের ছেলেরা শহুরে শিক্ষকদের আচরণে নানা কারণে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত।

এর পরেরটুকু আরো সংক্ষেপ। আপনারা সকলেই জানেন স্কুল ফাণ্ডে সঞ্চয় খুব বেশী থাকে না এবং সরকারী সাহায্য আসে বৎসরের শেষ দিকে। আমাদের গ্রামের স্কুল। তহবিলের অবস্থাও তথৈবচ। এখানে মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ানো হয়। সুতরাং স্কুলের আয় কত হতে পারে! বৎসরের শেষে দেখা যায় প্রত্যেক শিক্ষকেরই কয়েক মাসের বেতন বাকী পড়ে থাকে। আইন বাঁচিয়ে অর্থাৎ লুকিয়ে টুশানি করে এরাইবা পরিবার নিয়ে থাকেন কি করে। এই অবস্থায় বহিরাগত (যারা বেতন না পেলেও ট্রেন ভাড়া দিয়ে আসেন)-দের অবস্থা হয় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত। এইভাবে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে স্বার্থান্বেষীদের আসে চরম সুযোগ। তারা শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করেন। এটা অবশ্য গ্রামের এবং বহিরাগতদের মধ্যেই হয়ে থাকে। এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শিক্ষকদের ঠকিয়ে এরাই 'সরকারী সাহায্য সবকিছু নিয়ে নিজের বাড়ি করেছেন।'

আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম। দেশপ্রেমিকেরা এর প্রতিকারের কথা চিন্তা করবেন।

শুভ্রেন্দু ধর চৌধুরী
মগ্গোলা (ভান্ডারা), হুগলী।

বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী

দেশ সম্পাদক সমীপেষু।

মহাশয়,

'দেশ'-এ ৬ষ্ঠ এবং ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধটি পড়ে ১০ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নীলরতন সেনের কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন। নীলরতনবাবুর দু' একটি প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি।

সত্যেন্দ্রনাথ ৮-৬ পয়ারের সঠিক নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু নীলরতনবাবুর বোঝার ভুল হয়ে গেছে। পয়ার বললে সত্যেনের অভ্যাস দের চোখের সামনে ৮+৬ ভেসে ওঠে ঠিকই। কিন্তু আর কিছু কি মনে আসে না? পূর্ব-কালে 'পয়ার' বলে কাব্যে এমন কোন পদের কথা নীলরতনবাবু কি মনে করতে পারেন, যেটি শ্বাসাঘাত প্রধান? এই 'পয়ার' মানেই শুধু ৮-৬ মাত্র নয়, একটি বিশিষ্ট সুরও তার সঙ্গে সংযুক্ত। তাই তিনি প্রধান পদের নামই পয়ার—যার বিজ্ঞানসম্মত নাম 'অক্ষরবৃত্ত'। আর, শুধু 'অক্ষরবৃত্তই' ৮ ও ৬ ভাগে বিভক্ত যেহেতু একটা 'আট' থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

নীলরতনবাবু যে কটি উদাহরণ দিয়েছেন, তার ফলে নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছেন। "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে" যদি বিশ্লেষণ করতে দেওয়া হয়, এবং নীলরতনবাবু যদি আমাদের শিক্ষা দেন যে, এটা ৮+৬ মাত্রিক তাহলে ছান্দসিকদের কপালে কি থাকবে জানি না, তবে ছাত্রদের কপাল ভাঙবে। এর বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ: "আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে"—৪+৪+৪+২ (স্বরবৃত্ত—শ্বাসাঘাত প্রধান)। অতএব দেখা গেল এটা ৮+৬ নয়—কারণ, ৮-এর পরে এর শ্বাস পড়ে না। এবং যেটাকে তিনি মাত্রাবৃত্ত বলেছেন ওটা আদৌ মাত্রাবৃত্তই নয়—অক্ষরবৃত্ত। তার কারণ, মাত্রাবৃত্তের যে প্রাণ-ধ্বনি, তার থেকে অক্ষরবৃত্তের 'তানের' প্রাধান্য এখানে অনেক বেশী।

নমস্কারান্তে—
সামসুল হক
ডায়মণ্ড হারবার

জাপানি জর্নাল

বুদ্ধদেব বসু

১৩ জানুয়ারি, ১৯৬১

শীত, সন্ধ্যা, ওসাকা বন্দর। ভিড় নেই; প্রায় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই মাল এসে পৌঁছলো, প্রায় আমরা দাঁড়ানোমাত্র কাস্টমস তাদের খড়ির দাগ এঁকে দিলেন, আধ মিনিটে টাকা ভাঙিয়েই ছুটি। কোনো নতুন দেশে প্রথম এসে এত সহজে এয়ার-পোর্টের বেড়া ডিঙোতে পারিনি; হয় ভাগ্য আমাদের আজকের তারিখে দয়া করেছেন, নয় এখনকার ব্যবস্থাই উত্তম। আমরা লাউঞ্জে পৌঁছবার আগেই কাচের দরজা ঠেলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর চলন দেখেই মনে হ'লো তিনি আমাদের আগমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত: সুশ্রী আধা-বয়সী ভদ্রলোক, আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থামলেন, কোমর থেকে দেহের ঊর্ধ্বাংশ নত ক'রে বললেন, 'আমার নাম কোনিচিরো হায়াশি, আপনাদের অভ্যর্থনা জানাই, আমরা কয়েকজন অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্য। আসুন।' আমরা ভিতরে যেতেই আরো কয়েকজন উঠে দাঁড়ালেন: কেউ যুবক, কারো চুল কানের কাছে রুপোলি, সকলেই অধ্যাপনা করেন ওসাকা অথবা কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে। হায়াশি তাঁদের নাম ও পদবিগুলো ব'লে গেলেন; বিনতি, করমর্দন, পুনশ্চ বিনতির বিনিময় হ'লো। তারপর তাঁরা সাতজন আধো চাঁদের আকারে ঘিরে দাঁড়ালেন আমাদের, গম্ভীর মুখে, প্রায় আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে; সকলের প্রতিনিধি হয়ে কথা বললেন একজন মাত্র। ইনি য়ুটাকা ওজিহারা, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক, দেখতে ছিপছিপে লম্বা, চোখে-মুখে উৎসাহ খেলা করছে। অনেকবার কেশে, অনেকবার থেমে, তিনি তাঁর অনভ্যস্ত ইংরেজি ভাষায় ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা করলেন। প্রথম কথা: আমাদের উদ্দেশে তাঁদের সকলের প্রীতি ও আনন্দজ্ঞাপন; দ্বিতীয়: আমাদের আগামী তিন দিনের কর্মসূচি। তাঁর উপস্থাপনায় কোনো অনুপুঙ্খ বাদ গেলো না; পাছে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়, প্রতিটি তথ্য দু-বার ক'রে বলা হ'লো। বক্তৃতার শেষে আবার বিনতি, সকলে ধীরে-ধীরে বসলেন, পেশী শিথিল হ'লো, মুখ সহাস্য, সিগারেটের ধোঁয়া উঠলো শাদা-কালো চুলের উপর দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে।

এ রকম ছবির মতো অভ্যর্থনা আর কোথাও দেখিনি। যখন আমরা মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠছি, তখনও এঁরা ছবির মতো বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে, কাল সকালের কর্মসূচি আরো একবার মনে করিয়ে দিলেন। আমি বুঝে নিলুম, জাপানি শিষ্টাচার উৎকর্ষ সাম্য ও নির্ভুলতা; সেই উচ্চতায় পৌঁছতে হ'লে—শুধু আমরা কেন, অন্য যে-কোনো মানব-সম্প্রদায় হাঁপিয়ে পড়বে।

কারখানা, আবাসিক পল্লী, প্রত্যেক ল্যাম্পপোস্টে সচিত্র বিজ্ঞাপন ঝুলছে, এবং এক-এক জায়গায় [illegible] ঝাঁকে তারার ঝিকিমিকি—এই সব পেরিয়ে কিয়োটোর [illegible] চললুম। হায়াশি আমাদের সঙ্গে আছেন, সঙ্গেই থাকলেন রাত্রির প্রায় এগারোটা পর্যন্ত। কিয়োটো হোটেলের বেসমেণ্টে, রান্নাঘরের সংলগ্ন একটি ছোটো কামরার কোণের টেবিলে ব'সে, একসঙ্গে আহার করলুম আমরা। আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছি, আর হায়াশি জবাব দিচ্ছেন ধীরে, মৃদু গলায়, শব্দগুলোকে সুচিন্তিত-ভাবে সন্ধান ক'রে-ক'রে। পারস্পরিক সম্ভাষণও আমাদের ভোজনকে দীর্ঘায়িত করলো; যতক্ষণ না দরজা বন্ধ করার সময় হ'লো, ততক্ষণ আমরা উঠলুম না। যখন শুতে গেলুম, মনে হ'লো জাপান আমাদের অনেকদিনের চেনা।

১৪ জানুয়ারি

আমি মানুষটা কিছু দীর্ঘসূত্রী, আর তা আমার অজানা নেই, তাই কোনো নিয়োগের জন্য অনেক আগে থেকে তৈরি হ'তে আরম্ভ করি। কিন্তু আজ সকালে কী বিভ্রাট হ'লো জানি না; ঘরে যখন টেলিফোন বাজলো তখনও আমাদের প্রাতরাশ হয়নি। আমাদেরই দোষ; ওজিহারার ন-টার সময় আসার কথা, ঘড়ির কাঁটায় ন-টাতেই তিনি এসেছেন। ছুটলুম নিচে: ট্যাক্সি—রেল-স্টেশন—পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ট্রেন ছাড়বে। 'এটা ছেড়ে দেয়া কি সত্যি অসম্ভব?' অনুনয় না-ক'রে পারলুম না আমি, 'কোনোরকমে এক পেয়ালা চা যদি... আপনার কি মনে হয়

ও চৌকো টেবিল (নিচু মানে আমাদের জলচৌকির মতো), তাদের ঘিরে ধবধবে শাদা কুশান পাতা, পিছনে একটি ক'রে লোহার চুল্লি তাপ বিলোচ্ছে। এক-এক টেবিলে চারজন ক'রে বসা হ'লো। টেবিলের মধ্যস্থলে গোল ক'রে খাঁজ কাটা, তাতে রক্তবর্ণ গালার পাত্র বসানো। আমরা বুঝতে পারিনি ওটার কী ব্যবহার, কিন্তু একটু পরে দেখা গেলো তারই তলায় কাঠকয়লার উনুন জ্বলছে—ঐ পাত্রেই রান্না হবে। পরিচারিকারা দিয়ে গেলো প্রতিজনকে দুটি ক'রে ফল, এক চামচে সয়াবীনের চাটনি, সামনে রাখলে একটি ক'রে বাটি ও ভোজনশলাকা (আমরা কাঁটা-চামচে নিলুম), আর ডান দিকে কুঁজো আর গেলাশ। কুঁজোতে আছে সাকে, শীতের জন্য তাতিয়ে আনা হয়েছে। ফরাশিদের যেমন 'ভাঁ', জর্মানদের যেমন বিয়ার, জাপানিদের তেমনি সাকে; এই অম্লাভ লঘু ও বর্ণহীন সুরা এদের খাদ্যের সঙ্গে নিত্যপেয়। কিন্তু সেবনের পদ্ধতিতে তফাৎ অনেক। সাকের গেলাশে আঙুল ডোবালে এক কড়ের বেশি ভেজে না, তবে পেট-মোটা সরু-গলা কুঁজোটি ছ ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু। প্রথমে একবার গলা ভিজিয়ে নিলেন সবাই, তারপর রান্না আরম্ভ হ'লো।

প্রতি টেবিলে একজন ক'রে পুরুষ রান্না করছেন। [illegible]। তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে আমার বিশ্বাস হ'লো যে অনেকখানি দীর্ঘ প্রবাসে তাঁর জাপানিত্বে চিড় ধরাতে পারেনি। হাতের কাছে কাঠের ট্রে-তে সাজানো আছে মাংস, চর্বি, নানা রকম আনাজ; [illegible] খণ্ডিত করেছেন, চর্বির সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছেন সেই গালার পাত্রটিতে, এক-এক পদ সুকিয়াকি তিন মিনিটে রান্না হ'য়ে যাচ্ছে, [illegible] তুলে তুলে দিচ্ছেন। এমনি 'উনুন-থেকে-মুখে' রন্ধনের একটি নমুনা খাওয়া হ'তে লাগলো। মাংসটা বৈদিক ঋষির ভোগে লাগলেও মধ্যযুগে [illegible] হিন্দুর ভক্ষ্য ছিলো না, কিন্তু সুকিয়াকির পক্ষে সেটি অপরিহার্য উপাদান। (শুনলুম, কোবের গোমাংস আর ওসাকার ভোজনালয় 'পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ', আমার রসনাকে মানতে হ'লো যে এই দাবির প্রথম অংশ সমর্থনযোগ্য হ'তেও পারে।) আলাদা পাত্রে অন্য এক জিনিশ পরিবেশিত হয়েছে: টুকরো করা অরুণবর্ণ কাঁচা মাছ; এই বস্তুটির খ্যাতি দেশে-বিদেশে বহুদিন ধ'রে শুনেছিলুম; এবার জানা গেলো তার স্বাদ অনেকটা কুমড়ো লাউ, অথবা কাঁচা ছানার মতো—এমন মসৃণ আর এত সহজে গলা দিয়ে নেমে যায় যে নিরামিষ ব'লে ভুল হওয়া সম্ভব! পশ্চিমী দেশে রান্না-করা মাছও এক-এক সময় গন্ধের দাপটে দুঃসহ—আর এরা কী ক'রে কাঁচা মাছকে এমন নিবাস ও স্নিগ্ধ ক'রে তোলে, এটা আমার কাছে এক সমস্যা হ'য়ে রইলো। হয়তো মাছটা কোনো বিশেষ জাতের, যা শুধু জাপানি জলেই পাওয়া যায়; অন্ততপক্ষে অভিজ্ঞদের মুখে শুনেছি যে জাপানের বাইরে অপক্ব মৎস্য সুখাদ্য নয়—জাপানি রেস্তোরাঁতেও না।

এই সুকিয়াকিতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমার মনে হচ্ছে যে ভোগের বিষয়ে জাপানিদের উৎসাহ যেমন মিতাচারও তেমনি, আর এদের বিখ্যাত 'সৌন্দর্যবোধ'-এরও মূল কথাটা বোধহয় এই। এদের আছে ইহলোকের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা (যা আমাদের নেই), আর সেই সঙ্গে এক ব্যবহারিক অণিমাসিদ্ধি (যা ভারতীয়, পাশ্চাত্য বা

এমনকি চৈনিক সভ্যতায় অভাবনীয়।) ভূষণের বিরলতার জন্যই এদের ঘর সুন্দর, এদের তানকা কবিতা ক্ষমাহীনভাবে একত্রিশ অক্ষরে সীমিত, এদের ছবিতে বস্তুর তুলনায় হিল্লোল বেশি, নো নাটের মেয়াদ আধ ঘণ্টা, আর এদের ভোজন স্বাদু, সুদৃশ্য, স্বাস্থ্যকর ও স্বল্পমাত্রিক। খৃষ্টান শাস্ত্রে (আমাদের মহাভারতেও) অতিভোজন মহাপাপের অন্যতম, কিন্তু জাপানি সমাজে তার যেন সুযোগই নেই; ভোজের পাত্রগুলির ক্ষুদ্রতাই সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই রকম ছোটো-ছোটো পাত্রে চীনেরাও পরিবেশন করে, একসঙ্গে অধিক পরিমাণ সামনে আনে না, কিন্তু এই প্রথার পরিপূরক হিশেবে তাদের ব্যঞ্জনসংখ্যা অগণনীয়। হংকঙে দু একবার পূর্ণাঙ্গ চৈনিক ভোজে আহূত হ'য়ে দেখেছি, ব্যাপারটা ক্রমশই দুঃশাসনের যোগ্য হ'য়ে উঠছে, কাহিনীর শেষ দেখা যাচ্ছে না, ঘর্ম ও দন্তের ক্ষরণ অনিবার্য ও অভিপ্রেত। জাপানি সভ্যতায় চীনের প্রভাবের কথা কারোরই অজানা নেই; অনেক বিষয়ে প্রতীচীর আক্ষরিক অনুকরণও এখানে বদ্ধমূল; কিন্তু 'জাপান' বলতে আবহমানভাবে যা-কিছু আমাদের মনে পড়ে—চানুয়ো, সোকুমার, নিভৃত নাটক—তারই একটি প্রতিরূপ আমি সুকিয়াকিতে দেখতে পেলাম।

শুধু একটা জিনিশ ভালো লাগলো না; আমরা যাকে এঁটো বলি সে বিষয়ে এরা একেবারেই অবহিত নয়; একই শলাকা দিয়ে সুপকার নিজেও খাচ্ছেন, রাঁধাও নাড়ছেন, অন্যদেরও তুলে দিচ্ছেন মাঝে-মাঝে। (এই 'এঁটো' ব্যাপারটা কি তথাকথিত আর্য-জাতিরই কুসংস্কার?)

মাসু, আমাদের সদা-আলাপিকা জাপানি তরুণী, তাঁর সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয় নিবিড় হ'য়ে উঠছে। যাকে বলে প্রথম দর্শনে প্রণয়, এ তা নয় হয়তো। মেয়েটি যেন উনিশ-শো-কুড়ির বাংলা উপন্যাসের নায়িকা, 'একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো'। ছাঁটা চুল ও পাশ্চাত্য বেশ তার সহজ লাবণ্যের ক্ষতি করতে পারেনি, তার হাত নাড়া, ঘাড় ফিরিয়ে তাকানো, আহার ও আলাপের সময় ঠোঁটের নড়াচড়া—এর প্রতিটি জিনিশ পর্যবেক্ষণের যোগ্য। ইনি কথা বলেন বাতাসের মতো গলায়; যে কোনো উক্ত মন্তব্য শুনে এঁর বুকের ভিতর থেকে যে-নিশ্বাস বেরিয়ে আসে, তা একই সঙ্গে বিনয়, বিস্ময় ও সমর্থনের পরিচয় দেয়। 'তুমি গান গাইতে পারো?' ভোজনের সমাপনে প্রশ্ন করলেন এঁকে। মাসু তখনই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন; আমাদের দেশে গায়িকা-দের যেমন অনেকবার সাধ্যসাধনা করতে হয়, তেমন আপত্তি, ছল, ছুতো, সর্দি, গলা-ব্যথা, সখীদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অপেক্ষা পরীক্ষা, নানা দিকে কপোতের চাহনি নিক্ষেপ এই সব স্নায়ুপীড়ক সিঁড়ি পেরিয়ে তবে তাঁদের হাঁ করানো সম্ভব হয়, এখানে সে-রকম কিছুই ঘটলো না, পরবর্তী কুড়ি মিনিটের মধ্যে বিনা বিরামে তিনখানা গান গাইলেন মাসু। খুব হালকা গলা, উঁচু পর্দায় ওঠে না, গানের সুরে বিলেতি মিশোল স্পষ্ট, করুণ রসের প্রাধান্য নেই। শেষের গান দুটিতে অন্যেরাও যোগ দিলেন—সিনেমার চলতি গান সে-দুটি—আবহাওয়া প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো। এমন স্বচ্ছন্দভাবে পুরুষদের গান গাইতে শুনে আমি কিছুটা অবাক হলাম। রান্না জানেন, আবার যৌথ গীতেও যোগ দিতে পারেন, এমন পুরুষ আমাদের দেশে ক-জন? এই বিষয়ে জাপানিদের সঙ্গে প্রতীচ্যদের সাদৃশ্য বেশি।

১৫ জানুয়ারি

আজ সকালে একটি পুরোনো Zen মঠ দেখতে এসেছি; আমাদের সঙ্গী হায়াশি-দম্পতি আর মাসু।

দীর্ঘ বীথিকা উঁচু হ'য়ে উঠে গেছে, তার প্রান্তে মঠের দ্বার। বীথিকার দুই দিক ঘেঁষে গাছ নিবিড়, মঠের উদ্যানেও তার প্রাচুর্য। চীড়, কিন্তু শীতে পত্রহীন ও পিঙ্গলবর্ণ; গাছগুলোর উচ্চতা এমন যে দেখা না ব'লে মনে হয় না বোধ হয়; আমেরিকায় এদের জাতি যাদের দেখেছি তারা আবার আরো ছোটো ব'লে মনে পড়ে। মঠের উদ্যানটি বিস্তীর্ণ, বন্ধুর ও উঁচুনিচুতে এলোমেলো, অর্থাৎ এর সবটা যত্ন নিয়ে দ্বারা শিল্পিত ও প্রাকৃতের মধ্যে ভেদরেখা অস্পষ্ট ক'রে দেয়া হয়েছে; য়োরোপে যাকে বলা হয় 'ভূদৃশ্য কানন' আর য়োরোপে যার উদ্ভব অষ্টাদশ শতকে, জাপানে তার চর্চা বহুকালের। কাঠের তৈরি মঠ, স্থাপত্য প্যাগোডাধর্মী, পরস্পর বিকোণ ছাদগুলির প্রান্তভাগ বাঁকানো। ঢুকেই যেখানে বিবিধ স্মারণিক বিক্রয় হচ্ছে, সেখানে আমাদের চটিপাদুকা পরিহার ক'রে ভিতরে এলাম। একটি যুবক ভিক্ষু আমাদের প্রদর্শক।

ভিতরটা ঠাণ্ডা, নিরাভরণ ও নিরানন্দ—অন্ধকারের দেশে প্রাচীন উপাসনাগৃহের মতো। এই তুলনা অন্য দিক থেকেও সার্থক, কেননা মন্দির বললে হিন্দুর মনে যে-সব অনুষঙ্গ জেগে ওঠে এখানে তার প্রায় কিছুই নেই (থাকতেও পারে না); আমাদের হিশেবে এটি একটি শিক্ষায়তন এবং শিক্ষণীয় বিষয়টিও রহস্যবিদ্যার অনুরূপ নয়। অনেকগুলো ঘর ঘুরে-ঘুরে পিছন দিকের একটি বারান্দায় এলাম, সেখানে রোদের তাপ মধুর মনে হ'লো, আর ভালো লাগলো সবুজ বনবেষ্টিত পুরোনো পুকুর, যেন বহুযুগের স্মৃতির চাপে নিথর হ'য়ে আছে। এই মঠের শিক্ষাপ্রণালী চাক্ষুষ দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিলো, কিন্তু আজ শুনলুম কোনো অধিবেশন নেই; একটি বৃহৎ ও শূন্য কক্ষে একজন আচার্য আমাদের সম্ভাষণ করলেন; সেখানে কতগুলো কাষ্ঠ-দণ্ড দাঁড় করানো আছে—তা দিয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা পরস্পরকে প্রহার ক'রে থাকেন, Zen তন্ত্রের এটি একটি অঙ্গ।

বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ঐতিহ্যের 'প্রটেস্টান্ট' শাখা বলা যেতে পারে, অন্তত এ-কথা সত্য যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদই প্রথম, মহত্তম ও সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে কেন টিকলো না তার কারণ আলোচনা করার তিলতম যোগ্যতা আমার নেই; কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে ভারতীয় হিন্দুর মনে একদিকে যেমন পৌত্তলিকতা বদ্ধমূল, তেমনি অন্যদিকে জগৎকে 'মায়া' ব'লে জেনেও দূরকল্পনার মায়া সে কাটাতে পারে না, আর বৌদ্ধ ধর্মে ঐ দুয়েরই সুযোগ স্বল্প। আমাদের মানতেই হবে যে মঙ্গোলীয় মানসতা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবনিষ্ঠ ও সংসারবিশ্বাসী; ঋজু ও কঠিন কনফুশীয় নীতি যেখানে উৎপন্ন ও ব্যাপ্ত হয়েছে সেই চীনেও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও বৈচিত্র্যলাভ স্বাভাবিক। জাপানি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রধান সম্প্রদায় ছয়টি, তাদের উপশাখা অসংখ্য, তার মধ্যে Zen প্রাচীনতম না-হ'লেও অধুনা সবচেয়ে বিখ্যাত। বোধিধর্ম, এক ভারতীয় বৌদ্ধ, ছয় শতকের প্রারম্ভে চীনে এসে ছয় বৎসর-কাল এক নিরঞ্জন দেয়ালের দিকে বদনের হ'য়ে নিঃশব্দে ও অনবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করে-ছিলেন, অন্তত তাঁর বিষয়ে এটাই কিংবদন্তী। ইনিই Zen-এর ঐতিহাসিক জনক; একে পরবর্তীকালে জাপানে নিয়ে আসেন কনফুশীয় চৈনিক পরিব্রাজকেরা; স্থানীয় শিণ্টো (দেবমার্গ) ও বুশিডো (যোদ্ধমার্গ)-র সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে এই বুদ্ধো (বুদ্ধমার্গ) এখানে এমন একটি নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকের মতে জাপানের আত্মা নিষ্কলংক-ভাবে বিধৃত।

হয়তো খুব ভুল হবে না, যদি বলি বৌদ্ধ মার্গে Zen সম্প্রদায় চরম 'প্রটেস্টান্ট'। তত্ত্ব, শাস্ত্র, আচার, উপদেশ, মন্ত্র, পূজা, অনুশাসন—যা কিছু অবলম্বন ক'রে কোনো ধর্ম তার কলেবর লাভ করে—সব বর্জন করেছেন এঁরা; শাক্যমুনিকে দৃষ্টান্ত হিশেবে মানলেও গুরু অথবা অবতারে এঁরা আস্থাহীন; অন্যেরা যাকে জ্ঞান বলে—যা বুদ্ধি ও সচেতন প্রয়াসের

* অর্থাৎ, হিন্দু বা রোমান ক্যাথলিক মন্দিরের তুলনায়। দেয়ালের কোনো-কোনো অংশ সিন্দুর-বর্ণে উজ্জ্বল, প্রাচীরচিত্রে বুদ্ধজীবনীও দেখা গেলো, কিন্তু আমরা যাকে পূজা বলি তার কোনো আয়োজন নেই। আর তা নেই বলেই Zen এখন প্রতীচীর একটি উৎসাহের বিষয়।

* Zen শব্দটি 'ধ্যান'-এর অপভ্রংশ।

দ্বারা নয়—এঁদের মতে সেটাই ভ্রান্তি। স্বজ্ঞা ছাড়া আশ্রয় নেই এঁদের; ধ্যান ভিন্ন পদ্ধতি নেই, এবং জগতের যে কোনো বস্তু এঁদের ধ্যানের বিষয় হ'তে পারে। একটি ফুল, কুমড়ো, এক বস্তা আলু, কিছুই উপেক্ষণীয় নয়, কেননা 'আসলে' সবকিছুর মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। একটি ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দ্রষ্টা যখন নিজেকেই ফুল ব'লে উপলব্ধি করেন (অর্থাৎ, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভেদ যখন লুপ্ত হ'য়ে যায়) তখনই তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ হ'লো—খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা হ'লো এই। না বললেও চলে, এই অবস্থায় পৌঁছনো সহজ নয়, তা বহু-বৎসরব্যাপী প্রযত্নসাপেক্ষ; আর আচার্যের উপদেশ না হোক উপস্থিতির প্রয়োজন আছে (সেইজন্যেই মঠ)। আচার্যের কাজ হ'লো প্রশ্নের কূট উত্তর দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে [illegible] আসন থেকে অতর্কিতে নিক্ষেপ, আকস্মিক অর্থহীন চীৎকার সবই বিধেয়। শিষ্যকে অনবরত এমনভাবে চমক দেয়া যাতে সে বুদ্ধির [illegible] থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হ'য়ে শিশুর মতো [illegible] হ'তে পারে। [illegible] সেই [illegible] (পারিভাষিক নাম 'সাতোরি') [illegible] সমস্যা থাকে না, এক [illegible] স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে, ভয়, চিন্তা, চেষ্টা সব আনন্দের [illegible] যায়।

এ-কথা কি সত্য নয় যে ভারতীয় বৌদ্ধ যুগেও ছিলো, মানস প্রচ্ছন্নভাবে কাজ ক'রে গেছে, অজন্তাবাসী শ্রমণদের ভারতীয় নাম 'ভগবান বুদ্ধ', 'অবদানশতক' দৃষ্টান্ত; 'নটীর পূজা'র শ্রীমতী ভক্তিরসে পরিপ্লুত, এবং অজন্তা-চিত্রেও হাদয় আবেদন প্রবল? কিন্তু Zen ধর্মে জ্ঞান যেমন বর্জনীয় তেমনি প্রেমেরও স্থান নেই; এবং বুদ্ধি ও হৃদয়, বিচার ও বিশ্বাস যুগপৎ পরিহার্য হ'লে যা অবশিষ্ট থাকে তা এত বেশি সূক্ষ্ম যে বাইরে থেকে সব রাস্তাই বন্ধ মনে হয়। কিন্তু সুখের বিষয় সব রুদ্ধই স্ববিরোধে আক্রান্ত; ভাষার অর্থহীনতা প্রমাণের জন্য Zen মুনিরা যেমন লক্ষ কথা লিখে গেছেন, তেমনি তাঁদের শূন্যবাদ, অসবর্ণ চৈনিক সৌন্দর্যচর্চার আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে, এমন কয়েকটি ক্রিয়াকর্মের জন্ম দিলে, যা পরতে-পরতে বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত ও আনুষ্ঠানিক। আমাদের ভাষায় যা ব্রত, জাপানের চা-অনুষ্ঠান তা-ই, আমাদের দেবমূর্তির মুদ্রার মতো নো নাটকে প্রতিটি ভঙ্গি অর্থপূর্ণ; এবং এই সবই Zen-এর অবদান, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলাতেও তার প্রভাব দূরস্পর্শী। সাধনার লক্ষ্য যেখানে নির্মমভাবে অরূপ সেখানে রূপের এই বিচিত্র আবির্ভাব এ-কথাই প্রমাণ করে যে কোনো-না-কোনো রকম প্রতিমা ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না।

মঠ দেখা শেষ হ'লে, সংলগ্ন ভোজনশালায় হায়াশি আমাদের নিয়ে এলেন। কাননে ঘেরা একতলা কাঠের বাড়ি, পরিবেশ মনোরম, বারান্দাটি রোদ্রপ্লাবিত। এতক্ষণ ধ'রে শীতে কাঁপার পরে ভালো লাগলো রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে চুল্লিতে হাত সেঁকতে। খাওয়া হ'লো জাপানি ধরনে—নিরামিষ কিন্তু সাকে দিলে। বেরিয়ে আসার সময় বারান্দায় দুটি গেইশা-মেয়েকে দেখলুম; তাদের খোঁপা জটিল ও বিরাট, গায়ে চিত্রিত কিমোনো, মুখে পাণ্ডুর প্রসাধন। ছেলেবেলায় পড়া 'জাপানি ফানুস' বইটা মনে প'ড়ে গেলো আমার; মনে হ'লো এরা সেই রূপকথা থেকে উঠে এসেছে।

(ক্রমশ)

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৩৮৯ ॥

ওঁ

আলমোড়া

কল্যাণীয়াসু

তথাস্তু। চললুম। কলকাতায় এক-আধ দিন কাজ আছে—আরো বেশি কাজ আছে শান্তিনিকেতনে। দশ হাজার টাকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত বিচলিত হইনি। এ পর্যন্ত আমার কুষ্ঠিতে ব্যয়ের স্থানেই চঞ্চলতা। আয়ের সংবাদ নিয়ে যাঁরা আনন্দ করবেন তাঁদের সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। টাকাটাও পূর্ব-প্রতিশ্রুত অতএব প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে নূতন পুলক সঞ্চারের কারণ নেই। ইতিমধ্যে কাশিমবাজার যুবরাণী মসুরি থেকে আমার দর্শনের জন্যে এসে দুদিন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর দুঃখের দিনে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলুম, সে কথা ভুলতে পারেন নি এইটেই আমার যথার্থ পুরস্কার। দৈব সুযোগে এমন কিছু দিতে পারা যায় যার প্রতিদান অক্ষয় হয়ে থাকে, শ্রদ্ধা যার ম্লান হয় না। যখন কোনো উপলক্ষ্যে আবিষ্কার করা যায় যে আমার কিছু সম্পদ আছে যা বিশুদ্ধভাবে দানেরই জন্য, তখন নিজের সেই মূল্য উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞ হই ভাগ্যবিধাতার কাছে। অন্যকে দান করতে পারাই সব চেয়ে বড়ো দান নিজের প্রতি। হয়তো এই দানের ধারা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু প্রবাহিত হয়ে থাকবে কিন্তু সেটা অত্যন্ত বেশি নৈর্ব্যক্তিক। প্রত্যক্ষ কৃতজ্ঞতার দীপ্তি তাতে অন্তরালে পড়ে, তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে খ্যাতি নিন্দার বিচার। তাতে আমার লোভ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মানুষের বুদ্ধির যাচাইয়ের চেয়ে মানুষের হৃদয়ের অর্ঘ্য অনেক বেশি মূল্যবান। সেটাকেও যেন প্রতিদানের সহজ পন্থা দিয়েই পাওয়া সম্ভব হয়—তার দাওয়াশিল বাকির খাতাটা যেন চিতাভস্মের পূর্বেই সম্পূর্ণ নস্যাৎ হতে পারে এই কামনা করচি। —কাল আসবে মীরা জ্যোৎস্না বলডুইনের সঙ্গে পর্শু যাব আমরা। বিদায়-কালের দিনগুলি মধুর হয়ে উঠেছে। বসন্তকালের মতো তপ্ত, শরৎকালের মতো নির্মল। নীল আকাশে বরফের হাড়গুলি অত্যন্ত একটি কোমল শুভ্রতার লাবণ্য বিস্তার করেছে। এর থেকে যে ভাষা প্রকাশ পায় কোনো মতেই তার কোন উত্তর দিতে পারিনে। কত অল্পেই বলা হয়েছে। সেই অকথিত বেদনা কি সঙ্গে থেকে যাবে। ২৪-৭-৩৭ রবীন্দ্রনাথ

॥ ৩৯০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি রেগে বসে আছ বরানগরে, আর আমি রেগে বসে আছি শান্তিনিকেতনে মাঝখানে ৯৯ মাইলের ব্যবধান বলে কোনো অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। তোমরা মেয়েরা আজকাল কাগজে প্রায় নিজেদের দয়ামায়াপ্রবণ চিত্তবৃত্তি এবং মাতৃধর্ম নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে ব্যস্ত আছ, তা না করে যদি অবসরমতো দুই একখানা দেড় পৃষ্ঠা আন্দাজ চিঠি লিখতে তা হলে রোগ-দুঃখসন্তপ্ত সংসারে অনেকখানি সান্ত্বনা দিতে পারতে। চার পয়সা দামের একখানা প্রশ্ন যে, শরীরটা আছে কেমন, তার সঙ্গে দুটো লাইন অত্যুক্তি জুড়ে দেওয়া যে, খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠ দিন যাপন করচি এর মূল্য চার পয়সা ছাড়িয়ে কত সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছয় তার সীমা নেই। আমার রসুলপুর যাত্রার প্রথমদিনকার খবরটা বিবৃতির যোগ্য। সেক্রেটারি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, রসুলপুর বলতে বলতে দুই চক্ষু ভাবাবেশে মুদে এল। পৌঁছলুম রসুলপুরে, অপরাহ্ণের রৌদ্রে বেনারসি সাড়ির আঁচলা জড়িয়ে দিয়েছে বনশ্রীর শ্যামল চিক্কণ দেহ ঘিরে। এ কথা সত্য উর্দ্ধসেতুর ঔদ্ধত্য নেই সেখানে। পদচালনা করে স্টেশন ঘর পর্যন্ত যেতে যেতে মনে হোলো বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে। শেষের দশ পা বাকি থাকতে পড়ে গেলুম, অসমর্থ দেহে এই প্রথম পতন শেষ পতনে গিয়ে পৌঁছবার উপক্রমণিকা। একটা চৌকিতে গিয়ে বসিয়ে দিলে, দেহ মর্যাদা নাশের দৃশ্যে হেসে উঠতে পারে, এমন রসিকা নারী তখন কেবলমাত্র উপস্থিত ছিলেন আমার ভাগ্যদেবী। এর থেকে বুঝতে পারবে শরীরের উপর অকুণ্ঠিত মনে নির্ভর করবার দিন আমার গেচে বিশ্বাসঘাতক হঠাৎ একদিন নিশ্বাস ঘাতকতা করবে বলে সন্দেহ হচ্চে। করুণ হৃদয়ে উৎকণ্ঠা উৎপাদনের আনন্দ সম্ভোগ করবার ইচ্ছায় খবরটা বিস্তারিত করে জানালুম। আশা করি যথোচিত দুঃখ বোধ করবে এই দুঃখ, রাগের তাপ নিবারণের বেলেস্তারার কাজ করতেও পারে।

বাষ্পভারমন্থর বাতাসের মধ্যে আবৃত হয়ে আছি রাত্রে যখন সুখনিদ্রার প্রত্যাশা ত্যাগ করতে হয় তখন একাধিকসহস্র রজনীর আয়োজনের কথা স্মরণ করে মন লুব্ধ হয় ঘন ঘন হাতপাখা সঞ্চালন করে দুরাশাটাকে উড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করি। এঞ্জিন যায় বিগড়িয়ে, মনটা তার সঙ্গে যোগ দেয়।

তোমাদের বরানগরের নূতন বাসায় আমার স্থান সংকুলান হবে এ কথাটা মনে রাখলুম। স্থান হয়তো অবসর হয় না—সুযোগ বিদ্রূপ করতে থাকে উপরের দিকে কল খুলে দেয়, ঘড়ার তলায় তলায় রেখে দেয় ছেঁদা। কোন এক সময়ে দেশ-কালপাত্রের সামঞ্জস্য হবেই। অলমিতিবিস্তারেণ।

ইতি ৯ জুলাই ১৯৩৭
কবি

বর্ধমানের স্টেশনের overbridge পার হওয়া এড়ানোর জন্যে কবির তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রীমান অনিল চন্দ রসুলপুরে গাড়ি বদল করার প্রস্তাব করেন। কোথা দিয়ে কেমন করে গেলে কবির দেহের পরিশ্রম বাঁচানো যায় সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনার পর এই "রসুলপুরের" প্রস্তাবটা গ্রাহ্য হয়েছিল। তার পরিণামের কথা কবির চিঠিতেই জানা গেল।

॥ ৩৯১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

দিন দুই তিন হোলো তোমার উদ্দেশে একখানি পত্র রচনা করেছিলুম। মোড়কজাত করি নি কারণ মোড়ক সংগ্রহ করার অপেক্ষা ছিল। ইতিমধ্যে স্নান সমাপন অন্তে ফিরে এসে উপলব্ধি করলুম যে পত্রখানি অন্তর্হিত। আমার সুগভীর

আলস্যজনিত এই ব্যবস্থা। আমার ঘরের কর্মসচিব যথানিয়মে পত্রখানি স্বহস্তে ও স্বমতে ঠিকানায়িত করে পাঠিয়েছেন। প্রশ্ন দ্বারা জানলুম চব্বিশপরগনা এড়িয়ে চিঠিখানি গেছে কর্নওয়ালিসে। সে জায়গাটার সঙ্গে তোমার করকমলের আদানপ্রদান আছে অতএব দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই। কিন্তু অস্বাক্ষর ও ঠিকানা বিভ্রম নিয়ে তোমার মন পাছে উদ্বেজিত হয়ে থাকে এই আমার দুশ্চিন্তা।

পরশু রথী খবর দিলেন যে তোমরা উদয়ন পথে যাত্রার সংকল্প করেছ। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে সাহস হয় নি—পাছে কঠোর প্রতিবাদ এসে পড়ে। আশা করেছিলুম পত্রে এ সম্বন্ধে এস্‌পার বা ওস্‌পারের কোনো একটা আভাস পাওয়া যাবে। নীরবে প্রতীক্ষা করাই উচিত ছিল কিন্তু বুদ্ধিমানকে সব সময়ে মনের মধ্যে হাজির দেখতে পাওয়া যায় না—সেই অবকাশে এই পত্রে উক্ত জনশ্রুতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। রথের দিন থেকে বৃষ্টি পড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে—অতএব তোমরাও যদি রথযাত্রা স্থির করো এবং উল্টোরথের রিটার্ন টিকিট কিনে না বোসো তাহলে মন না হোক্ শরীর স্নিগ্ধ হতে পারবে। ইতি ১ শ্রাবণ ১৩৪৪

কবি

॥ ৩৯২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তুমি আমার মনে অত্যন্ত ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছ—কেবলি সন্দেহ হচ্ছে যত চিঠিই লিখি না কেন সেটা শেষ চিঠি বলে গ্রাহ্য হবে না। এই জন্যে পরে পরে দুখানা চিঠি লিখেও মনে হচ্ছে প্রমাণটা পাকা হোলো না। ও একটা বাঁধা অপবাদের মতো রইল লেগে। আমার সকল তারিখের সকল চিঠিই অপর কোন এক বাকির চিঠির পূর্ববর্তী হবেই হবে। এ নিয়ে আর তর্ক করব না, কেননা বিষয়টা যুক্তির অতীত হয়ে গেছে। সূর্য যখনি ওঠে সে তার আট মিনিট আগে ওঠে পণ্ডিতদের এই মত, তুমি যখনি চিঠি লিখবে সেটা আমার চিঠির দুইদিনকার পরের চিঠি হবেই হবে, এও তদ্রূপ একটা জাগতিক নিয়মের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। আমার বর্তমান চিঠিটা উক্ত তত্ত্বের পাকা-পাকি মীমাংসার জন্যে লিখছিনে। একটা প্রয়োজনীয় সংবাদ দেবার উদ্দেশে এটার অবতারণ করচি:— আমার শেষ পত্রে লিখেছিলুম যে তোমরা এখানে আসবে এমন একটা জনশ্রুতি আশ্রমে সংক্রামিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তোমরা আগে আসবে আমি পরে যাব এটা পর্যায় বিরুদ্ধ। অতএব প্রশস্ত রীতি লঙ্ঘন করব না—স্থির করেছি আগামী সোম কিম্বা মঙ্গলবারে এখানে প্রাতের গাড়িতে চড়ে চন্দননগর স্টেশনে নেবে বালির ব্রিজ পেরিয়ে বেলঘরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করব। কিন্তু গুপ্ত-নিবাস এখনো আমাদের কাছে গুপ্ত, কী উপায়ে আবিষ্কার করা যেতে পারে জানিয়ো—আরো একটা দুঃখের কথা এই যে, বালি ব্রিজের মাশুল এতকাল এড়িয়ে এসেছি এবার বোধ হচ্ছে গাঁঠের থেকেই দিতে হবে। এ রকম স্বাভাবিক নিয়মের উলট-পালট হচ্ছে হয়তো তার একটা কারণ সম্প্রতি সূর্যমণ্ডলে কলঙ্কের আধিক্য,—তাই স্পেনে ঘটচে অন্তর্বিপ্লব, চিনে জাপানে বাধচে ঝুটোপুটি, ইটালি কেড়ে নিচ্ছে আবিসীনিয়া, আমাকে দিতে হচ্ছে বালি ব্রিজের মাশুল।

যাই হোক, যাব কি যাব না, এ সম্বন্ধে নিঃসংকোচে মত ব্যক্ত কোরো—এখনো চিঠি আসবার সময় আছে। শরীরটা এমন যে আতিথ্য করায় দায়িত্ব আছে, আনন্দ নেই, তুমি তো তোমার নতুন বাড়িতে সেবাসদন খোলো নি। একটা সুবিধে এই যে নাড়ী লাফাচ্ছে কোন্ কোন্ সংখ্যা ডিঙিয়ে তার নিশ্চিত খবর পাওয়া যাবে। নিরেনব্বইয়ের কাছ ঘেঁষে চলেছে বলে বোধ হচ্ছে। ইতি ১ শ্রাবণ ১৩৪৪

কবি

কবির যখনই শরীর খারাপ হয়েছে আমার বাড়িতে আমি টেম্পারেচার দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা নাড়ীর গতিও গুনে রেখে দিতাম। সেই নিয়ে ওঁর নিত্য পরিহাস লেগে থাকত।

॥ ৩৯৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এই তৃতীয় পত্রখানির জন্যে অসংকোচে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করচি। স্পর্ধাপূর্বক শেষ পত্র লেখবার প্রতিযোগিতার জন্যেই যে এই বিরক্তিকর অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছি তা মনে কোরো না। আমার বক্তব্য এই যে আগামী মঙ্গলবারে প্রাতের গাড়িতে রওনা হয়ে তোমার দ্বারে গিয়ে আঘাত করব—যদি দ্বার খুঁজে পাই। বউমা আমার সঙ্গে যাবেন,—তাঁর গম্যস্থান উত্তরপাড়া। যদি উত্তরপাড়া স্টেশনটা দুর্গম না হয় তাহলে সেইখানে নাবব, নতুবা চন্দননগরে। উত্তরপাড়ায় ঊর্ধ্বসেতুর উপদ্রব আছে কিনা সেই খবরটা সাংখ্যকে দিয়ে যদি আহরণ করতে পার তাহলে কাজ এগিয়ে থাকে—এবার আলমোড়া ভ্রমণের পর থেকে সাংখ্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। নঙ্গাপর্বতে গিয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছে তারা প্রশান্তকে চিনত না, প্রাণ দিয়ে এই কথার প্রমাণ দিয়ে গেছে। এবারে আমি নঙ্গাপর্বতের চুল পরিমাণ দূর থেকেই ফিরে এসেছি—বেরেলিতেই শ্বাসকৃচ্ছ্র শুরু হয়েছিল। এইখানেই তৃতীয় পক্ষের চিঠিটাকে সংযত করি। একে তো বারবার তিনবার—তার পরে নম্বরও অসহ্য। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩৪৪

কবি

॥ ৩৯৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

নিরাপদে এসে পৌঁচেছি। অক্ষত। ভাগ্যে বীরেন ছিল আমার রক্ষাকর্তা। বর্ধমানে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু চাই? আমি বললুম, কিছু চাইনে তবে দেখতে কত সুবিধা। ভেদিয়া স্টেশনে এসে বলে গেল পরের স্টেশনে বোলপুর। আমি নিঃসহায়, এলে এ খবরটা কেউ দিত না। আমি সমস্ত পথ উপলব্ধি করতে করতে এসেছি কেন তোমরা আমার সঙ্গে একজন লোক না দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো না। ধন্য তোমাদের।—আটই তারিখ রবিবারে সাঁওতালপাড়ায় হলকর্ষণ বৃক্ষরোপণ হবে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নতুন রকম হবে সাঁওতালরা নাচবে, অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। নিশ্চয় এসো।—এই রবিবারের পরের রবিবারে হবে বর্ষামঙ্গল। আমি অনুপস্থিত থাকাতে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে ওঠেনি। যদি তোমাদের রাজবাড়িটা রাজমিস্ত্রিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুই রবিবার এখানে যাপন করো তাহলে বলাবাহুল্য খুশী হবো। আশা করতে ভরসা হয় না। শরীর ভালোতর হবে তার প্রমাণ পূর্বে একবার পেয়েছ—আর একবার সেটা পাকা করে যেয়ো। এবারে আসবার সময় মনে আশঙ্কা ছিল পাছে গোলেমালে তোমাদের কোনো জিনিস নিয়ে আসি। যা ভয় করেছিলুম তাই, বাক্স খুলে দেখি Number বইটা। তার মধ্যে স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্রী স্বহস্তে আমার নামে এই অপবাদ আরোপ করে একপাটি চটি-জুতোর নিন্দা রচনার শোধ নিয়েছেন। আমি তৈরি

প্যাসেঞ্জারের হস্তে কিশোরীর কাছে চালান দেবার ব্যবস্থা করছি। আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবার কী প্রয়োজন ছিল।—গাড়িতে এসে একটি বেলঘোরিয়াবাসী জীবের আবিষ্কার করেছি—সে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে রক্ত শোষণ করে। আমার পরামর্শ এই তোমার বিছানাপত্র দুতিনদিন ধরে কৈরোসিনিক রসে অভিষিক্ত কোরো—ফল পাবে। এখন বুঝছি আমার দেহতল বন্ধুর হয়ে উঠেছিল তাদেরই প্রভাবে। ইতি মঙ্গলবার ১৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

কবি

অমিয় এসেছে।

সেবারে কবি একাই বোলপুরে ফিরে যাচ্ছিলেন। আমরা জেদ্ করে অন্য একটা ট্রেনে যাতে শ্রীযুক্ত বীরেন সেন বোলপুর যাচ্ছিলেন সেই গাড়িতে ওঁকে যেতে রাজী করি। তাই এই ঠাট্টা। ওঁর ক্রমাগত সেই এক কথা "গাড়িতে আমার অভিভাবক হয়ে কেউ থাকলো বা না থাকলো তাতে কিইবা এসে যায়।" আমাদেরও এক কথা "একলা আপনার কিছুতেই যাওয়া হবে না।" শেষকালে ওঁকেই হার মানতে হোলো।

॥ ৩৯৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

বিরক্ত হয়ো না। আর একটা চিঠি লিখতে বাধ্য হলুম। কাল লিখেছিলুম আগামী রবিবারে সাঁওতাল পাড়ায় উৎসব হবে। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল এখন সাঁওতালরা ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত তারা সময় দিতে পারবে না। এর পরের শনি রবিবারে যথাক্রমে বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল হবে। ইতিমধ্যে তোমাদের অতিথি অভ্যাগত সমাগত হয়তো সাঙ্গ হবে।

এ চিঠি কবে পাবে জানিনে। যদি সোমবারে পৌঁছয় এখানে এসে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ো না—আজ বৃহস্পতিবার। টেলিগ্রামযোগে তোমার সঙ্গে খবর চালাচালি যদি করতে হয় তাহলে আমাকে বাঁচাবার জন্যে চাঁদা তুলতে হবে। —হাওয়া দিচ্চে বেশ ঠাণ্ডা—মেঘ করে আছে, বৃষ্টি নেই বললেই হয়। অত্যন্ত কৃপণের মতো যে ধরাবর্ষণ হচ্চে তাতে ফসলের উপকার হচ্চে না। চাষীদের জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। পরে পরে দুটো চিঠি যে নিরুত্তরকে উত্তীর্ণ করে লেখা, তার একটা নোট রেখে দিয়ো। উত্তর দাবী করিনে কিন্তু অন্যায় খোঁটা সহ্য করা শক্ত। ইতি ১৯ শ্রাবণ ১৩৪৪

কবি

॥ ৩৯৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমি যেদিন এখানে পৌঁচেছি তার পর দিনেই পরে পরে তোমাকে দুখানা চিঠি লিখেছি—হয় কোনো এক সুদূরকালে পাবে কিম্বা পাবেই না। কর্নওয়ালিশের স্ট্রীটে শরণ নিলুম। দেখচি রাজবাড়ির নাবার ঘরই ভালো ডাকঘর ভালো নয়।

'——' উপদ্রবের কথা পড়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছি। তুমি দিলীপকে জানিয়ো আমি অকৃত্রিম আগ্রহের সঙ্গেই তার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলুম, আমার ভাগ্যে যে এমনতরো অভাবনীয় বাধা ঘটবে তা কল্পনাই করিনি। আমি যখন দিলীপকে আহ্বান করে পত্র লিখেছিলুম তখন '——' গায়ে পড়ে বললে, আমি নিজে নিয়ে যাচ্ছি। আমি নির্বোধের মতো মনে করলেম এতে আরো ভালো ফলই হবে। কর্তাকে জিজ্ঞাসা কোরো এতদ্দ্বারা আমার intelegent test-এর কী প্রমাণ হয়। জানিনে এখানে দিলীপের আসবার সময় বা সম্ভাবনা আছে কিনা। —ক্লান্ত মন নিয়ে কোনো কাজ করতেই ইচ্ছা করে না, অথচ কাজের অন্ত নেই। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খাড়া বসে আছি ডেস্কে—এর উপরে নিরন্তর লোকের ভিড়। কে উদ্ধার করবে এই হতভাগাকে। তোমরা গভর্নরের কাছে দরখাস্ত করো আমাকে যেন অচিরাৎ আন্ডামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—Solitary Cell-এ থাকতে রাজি আছি।

মেঘ করে আছে, বৃষ্টি নেই, সজল হাওয়া দিচ্চে বেগে—পাখিরা আনন্দে আছে—গাছপালাগুলোর চেহারাতেও ফূর্তি দেখা যাচ্চে।

আগামী সপ্তাহপ্রান্তের শনিরবিবারে আশা করি দর্শন মিলবে। ৮ আগস্ট ১৯৩৭

অমিয় এসেছে।

॥ ৩৯৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

দুঃসংবাদ আছে। যাবার কথা ছিল ২৮শে, যাওয়া ঠিক হয়েছে ২৭শে। একদিন মেয়াদ বাড়বে। একটা পাঁচিশকে বেশি। তোমার মতো চৌকো সাইজের ভরা পার্স যদি থাকত তাহলে সঙ্কোচের কারণ দূর করতে পারতুম। যা হোক পরজন্ম আছে, সেও খুব সুদূর নয়। ২৭ সকালের গাড়িতে যাত্রা করব। অপরাহ্নে জোড়াসাঁকোয় বিবির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে—তারপরে রাজবাটির দিকে। —পাচক নেব কি? হরিপদকে কি অত্যন্ত বিপদে না পড়লে পাচক নাম দেওয়া চলে। আমি ঘৃতসংযোগে হবিষ্যান্ন খাব, আর পান করব চা সংযোগে মাখন তোলা দুধ—এইটুকু মাত্র দেখতে হবে দুধটা ধরে না যায়, আর ভাতটাতে দরকারের বেশি জল ঢেলে দেওয়া না হয়। ইতি ২৪ আগস্ট ১৯৩৭

কবি

॥ ৩৯৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এখন উদ্বেগের কোনো কারণ নেই কিন্তু মৃত্যুর ধাক্কা খেয়ে দেহের কলকব্জা নড়নড়ে হয়ে রয়েছে। এতকাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে ক্ষোভ বোধ করি নি, এখন নিজের প্রতিবিম্ব দেখা বন্ধ করে অবারিত কুশ্রীতা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি—নরসমাজে এরকম রূপবিকৃতি অভদ্রতা। এই দুই কারণে আমি এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরটাকে নিয়ে কারো দুঃখ উৎপাদন করাতে ইচ্ছা করিনে। দেহটাকে ছেড়ে নিজের নিরাসক্ত মনটাকে নিয়ে আছি।

ঝড় বৃষ্টি চলচে। মীরু আজ চলে গেল। এই সামান্য চিঠিখানার জন্য কর্নওয়ালিশের শরণ নিলুম। প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশা করিনে।

কবি

সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

সমগ্র এশিয়ার মধ্যে জাপান সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করে। যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের কালে জাপানবাসীরা প্রাচীন কারুশিল্প ও কুটিরশিল্পের পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল। বলা চলে আধুনিক ও প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা আধুনিক জাপানের বিশেষ কৃতিত্ব।

বর্তমান চীন দেশে কারুশিল্পকে রক্ষা করা ও মৃতপ্রায় কারুশিল্পের পরম্পরাগুলিকে নূতন কালের উপযোগী করার চেষ্টা আধুনিক চীন সরকারের একটি বিশেষ অবদান। চীন দেশের আধুনিক কারুশিল্পের মর্যাদা বিশেষভাবে জাতীয়তা ও প্রচারকার্য সাধনের জন্যই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় কারুশিল্পের নবজাগরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংক থেকে শুরু হয়েছে, তবে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে কারুশিল্পকে দেখবার চেষ্টা শুরু হয়েছে অতি অল্পকাল মাত্র।

আধুনিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ বহু দিক দিয়ে অনুন্নত এবং তার দৈন্যের পরিচয়ও প্রায় সকল ক্ষেত্রে বর্তমান। এই অবস্থার পটভূমিতে দেখলে আরও ভালভাবে বোঝা যাবে ভারতীয় কারুশিল্প ও কারুশিল্পীদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা। সান্ত্বনার বিষয় এই যে, ভারতীয় কারুশিল্পের পরম্পরা আজও সমৃদ্ধ। কাজেই জাতির এই বিশেষ শক্তিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে লাভ বই লোকসান নেই।

চীন, জাপান বা ইউরোপের কারুশিল্পের নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক উভয় দিক যুক্ত রেখে কারুশিল্পের নবজাগরণ। নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কারুশিল্পের বিস্তার বা অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। সংস্কৃতির দিক দিয়ে কারুশিল্পের উপযোগিতা সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সচেতন থাকা উচিত। তাই কারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষেপ করা যেতে পারে।

ইতিহাস-ভূগোলের মাধ্যমে দেশের কথা, জাতির কথা আমরা জানতে পারি। অপর দিকে শিল্প, সাহিত্য, কারুকলা দেশ বা জাতিকে চেনবার অন্যতম উপায়। এত ঘনিষ্ঠভাবে চেনা তথ্যপূর্ণ পুস্তকের সাহায্যে সম্ভব হয় না। এইজন্যই আজ কালচারাল মিশন-এর বিনিময়ের চেষ্টা সকলেই করছেন। বিশেষভাবে কারুশিল্পের মাধ্যমে জাতির বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় যত সহজে আমাদের হয়, তেমন অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। জাতীয়তা বা আন্তর্জাতিকতা যে দিক দিয়েই হোক দেশে-দেশে কারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কারুশিল্প কথাটি বিশেষ সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবন্ত মানুষের সঙ্গে এই সংজ্ঞার সম্বন্ধ। তাই কারুশিল্পকে জাগিয়ে তুলতে হলে কারুশিল্পীদের সহযোগিতা দরকার—এ কথা বলাই বাহুল্য।

এ দেশে কারুশিল্প জাগিয়ে তোলার যে পরিকল্পনা, তার মধ্যে কারুশিল্পীদের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু সে স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটি বিরাট অংশ অধিকার করে আছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, মার্কেটিং অফিসার, স্ট্যাটিস্টিক্স বিশারদ ও আরও বহু ছোট বড় বিশেষজ্ঞ। অপর দিকে আছে পরম্পরাগত কারিগর যাদের কাছে থেকে কাজ নেওয়া হয় অনেকটা কারখানার শ্রমিকদের মত। এ ছাড়া আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের কিছু চাকুরির ব্যবস্থা এখানে আছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নানা স্থানে ডিজাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ (১) নূতন নূতন নকশার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন এবং (২) পুরোনো কারিগরদের নূতনভাবে শিক্ষিত করা বা নূতন উপকরণ বা করণকৌশলের সঙ্গে পরিচিত করা। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা ও উপদেশ পাবার সুযোগ-সুবিধাও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান করেছে। এইভাবে কারুশিল্পীদের সহযোগিতা পাবার সুযোগ বাড়বে, এ আশা অবশ্যই আমরা করতে পারি। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাবার পথে প্রথম বাধা বিরাট আয়তনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান।

বিরাট আয়তনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যক্তিগত রুচি ও মেজাজকে সহ্য করা সম্ভব নয়। অপর দিকে ব্যক্তিগত রুচি ও মেজাজকে যথেষ্ট মর্যাদা না দিলে কারুশিল্পীদের প্রতিভার দান আমরা পেতে পারি না। আধুনিক শিল্পী অথবা পরম্পরাগত কারিগর উভয় দিকে স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার যে ক্ষতি তা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের দাবিতে মেনে নিতে প্রস্তুত। সংস্কৃতির দিক দিয়ে কারুশিল্পকে আমরা দেখছি বলেই কারুশিল্পীদের কথাই আমরা বিশেষভাবে বিশেষজ্ঞদের

পশ্চিম বাংলার মূর্তি শিল্পের কারিগর

সামনে উপস্থিত করতে চাই। কারুশিল্পীদের মধ্যে স্বাধীন কল্পনা জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন কেন এবং তার অভাবে কি ক্ষতি তার বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপে দেশীয় খেলনার সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করতে চাই।

শিশুকালে নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্যতমরূপে খেলনার উল্লেখ অবশ্যই করা চলে। ভাত-কাপড়ের মত একান্ত প্রয়োজনীয় না হলেও খেলনা বা পুতুল খেলা ছাড়া শিশুর জীবন সম্পূর্ণ হয় না। তাই সমাজের সকল স্তরেই ছেলেদের জন্য খেলনা তৈরি করার কোন না কোন রকমের ব্যবস্থা আছে। খেলনার ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, খেলনার মাধ্যমে শিশুরা যেমন নানা রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করে তেমনি নানা বিষয় জানবার ও চেনবার সুযোগ পায় ... এই সঙ্গে শিশুদের ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা জাগাবার উপযোগী খেলনার কথাও উল্লেখ করা দরকার। যেমন ঝুমঝুমি, সক্রিয় খেলনা ইত্যাদি। ভারতীয় খেলনাতে যে বৈচিত্র্য তার তুলনা বিরল। বেলুচিস্থান বা মহেঞ্জোদারোতে এমন অনেক খেলনা পাওয়া গেছে, যার পরম্পরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলা দেশে পাওয়া যেত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত পাখির আকারে তৈরী মাটির বাঁশী। বহু শতাব্দী ধরে যে সব খেলনা সমাজে চালু ছিল তা অকস্মাৎ লোপ পাবার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে, সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, যে সব উপকরণ ছিল সহজলভ্য তা শহরবাসীর কাছে এখন আর তেমন সহজলভ্য নয়। মাটি, ঘাস, পাতা এগুলির পরিবর্তে আমরা পাই প্লাস্টিক, লোহার স্প্রিং, রবারের টুকরো ইত্যাদি। নতুন উপকরণ নিয়ে নতুন সমাজের উপযুক্ত খেলনা তৈরি করবার প্রতিভারই অভাব। আজকের দিনে পুরোনো খেলনা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা ছোটদের ব্যবহারে লাগে না। বড়দের ড্রইং-রুমে সাজানোর জন্য এগুলির প্রয়োজন আজও লক্ষ্য করা যায়। খেলনা এমন একটা জিনিস যা শিশুদের প্রয়োজনে লাগে বটে, কিন্তু তা সংগ্রহ করে অভিভাবকগণ। পুরোনো খেলনা যে শিশুদের হাতে দেওয়া হয় না তার কারণ অভিভাবকদের মতামত ও রুচির পরিবর্তন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খেলনার সাহায্যে শিশুরা সাংসারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শেখে এবং দেখা শোনা, হাতপায়ের ব্যবহার সহজে তারা আয়ত্ত করে অর্থাৎ সেন্স ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা (এক্সপিরিয়েন্স)—এই দুইয়ের শিক্ষা খেলনার সাহায্যেই হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে আধুনিক খেলনাগুলির আলোচনা করলে আমরা সহজেই লক্ষ্য করব যে, শিশুশিক্ষার আদর্শ কতটা বদলিয়েছে। অধিকাংশ খেলনাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গঠিত। রেল ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন এগুলি এখন ছেলেদের প্রধান খেলবার জিনিস। অপর দিকে আছে সক্রিয় পুতুল, যে পুতুল হাসে, কাঁদে, ঘুমোয়। বলা বাহুল্য যে, আধুনিক সমাজের উপযুক্ত শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নতুন পুতুলের সাহায্যে যেমন পাওয়া যাবে, হয়তো সেকেলে পুতুলের দ্বারা সে কাজ হবে না। আবার পুরোনো পুতুলের উপযোগিতা নতুন পুতুলে নেই। কারণ পুরোনো পুতুলে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা জাগাবার যতটা সুযোগ ছিল তার অনেকখানি বর্তমান পুতুলের পরম্পরা থেকে মুছে গেছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। অধিকাংশ শিক্ষাব্রতী এবং প্রায় সকল মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত শিশুর বিভিন্ন বিচিত্র মানসগতির বিকাশ প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করেন। এই আদর্শ সামনে রেখেই শিশুদের ছবি আঁকা, পুতুল গড়া ও অন্যান্য শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মত স্বীকৃত। অতএব শিশুদের খেলনা পুতুল বৈচিত্র্যময় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ কথা আমরা মেনে নিতে পারি যে, এই বৈচিত্র্য যন্ত্রচালিত পুতুলের কারখানার সাহায্যে হওয়া সম্ভব নয়। কারুশিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দান সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও ছেলেদের খেলনা সম্বন্ধে এই মতভেদের সম্ভাবনা আরও কম। গত ১০০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, পুতুল বা খেলনার ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্পীদের দান যৎসামান্য। কৃষ্ণনগর, কুমারটুলী, বেনারস বা সত্যসুন্দর দেব প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস' পরিচালিত পুতুল ঠিক খেলনার পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। যদিও গত ১০০ বৎসরের ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানগুলির

দানই স্মরণীয়। দেশী খেলনার মধ্যে যেটুকু বৈচিত্র্য তা কুমোর বা কাঠমিস্ত্রীদের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে। কারুশিল্পের যে সব প্রতিষ্ঠান আছে, তারা নানা দিকে হয়তো লক্ষ্য দিয়েছেন কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি পড়েনি। কারণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে হয়তো খেলনা বা পুতুলের স্থান প্রধান নয়। অনেকের হয়তো এই ধারণা যে, বিদেশী মডেলের অনুরূপে খেলনার কারখানা করলেই কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হবে। এই আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারুশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থা ও ইউরোপের অবস্থা এক নয়।

নূতন রকমের কলকব্জা ও নানা বৈজ্ঞানিক কৌশলের প্রয়োজন থাকলেও এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে যে, ভারতীয় খেলনায় আকার ও ভঙ্গির দিক দিয়ে যে বৈচিত্র্য এবং এই সব খেলনা শিশুদের যতটা উপযোগী, তেমন খেলনা কল-কারখানায় আজও তৈরী হচ্ছে না। কাজেই পুরোনো খেলনার আকারপ্রকারকে আয়ত্ত করার চেষ্টা না করে সেগুলিকে পরিত্যাগ করা মূঢ়তা। নূতন কলকব্জা ও নূতন পদ্ধতির দ্বারা পুরোনো কালের পুতুলগুলিকে রূপান্তরিত করলে লাভ বই ক্ষতি হবে না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এই চেষ্টা নিরর্থক নয়। কারণ বিদেশী খেলনার কলকব্জার নূতনত্ব আছে, কিন্তু শিশুমনের উপযোগী আকারপ্রকার গঠন সে ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষভাবে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপযোগী খেলনার সংখ্যা আরও কম।

শিশুদের উপযুক্ত পুতুল করতে হলে অনেকগুলি বিষয়ে যে লক্ষ্য রাখা দরকার তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। শিশুদের বহু ক্ষেত্রে যৎসামান্য উপকরণে সস্তা দামের পুতুল, যা সহজেই ভেঙে যাবে এমন খেলনা খুবই প্রয়োজন। এদিক দিয়ে সে ক্ষেত্রে মাটি, পাতা বা নেকড়া ইত্যাদি দ্বারা তৈরী পুতুলের উপযোগিতা প্লাস্টিকের তৈরী পুতুল থেকে অনেক বেশী। তবে এই শ্রেণীর খেলনা কল-কারখানায় হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শিশুদের পক্ষে হয়তো এই জাতীয় খেলনার বিশেষ উপযোগিতা আছে। খেলনা পোক্তভাবে তৈরি অথবা ভঙ্গুর করেই তৈরি করা হোক, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিল্পী কারিগরের সাহায্য ব্যতীত খেলনার পরম্পরাকে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। অবশ্য এই প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে যে, যে খেলনা দিয়ে বিদেশী শিশুদের মন ভোলানো যাচ্ছে, সে খেলনায় এ দেশের শিশুদেরই মন ভুলবে না কেন? অবশ্যই বিদেশী আদর্শে তৈরী খেলনার প্রয়োজনীয়তা আমাদের স্বীকার করতে আপত্তি নেই। এবং নূতন কৌশল ও কলকব্জার সাহায্য নেওয়াও দরকার। এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, আজকে বাজারে যেসব

পশ্চিম বাংলার মৃৎশিল্পী নির্মিত অশ্বারোহণে শিবাজী

প্লাস্টিকের ও রবারের তৈরী খেলনা পাওয়া যায়, সেগুলি খাঁটি খেলনা নয়। ইউরোপের কাছ থেকে নূতন যা আমরা পেয়েছি, তা হল বালকদের খেলবার যন্ত্রপাতি এবং নূতন রকমের খেলনা (গেম) যেমন, ট্রেড চাইনীজ চেকার এই সবগুলি হল আধুনিক কালের অবদান। যে দেশেই শিশুদের উপযুক্ত খেলনা তৈরী হয়েছে বা আজও যেখানে তৈরী হচ্ছে সেখানেই দেখা যাবে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান। এ দেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এখনও গড়ে ওঠেনি। যা আছে তা পুরোনো কালের। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কিভাবে হতে পারে, সে সম্বন্ধে আরও দু-চার কথা বলা প্রয়োজন।

এ কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধুনিক শিল্পীদের কাছে ভারতীয় কারুশিল্পের অনেকখানি অজানা। যে সব আধুনিক রুচিসম্মত শিল্পী ইউরোপীয়

শিল্পের নানা মতবাদ আয়ত্ত করতে উদ্যত, তাঁরা যদি ভারতীয় খেলনার সঙ্গে পরিচিত হন, তবে আকারনিষ্ঠ মৌলিক গড়নের এমন একটি পরম্পরা তাঁরা লক্ষ্য করবেন, যা আজকের শিল্পীদের সামনে নেই। যদিও এই সব খেলনার অনুকরণ নানাভাবে দেখা দিয়েছে, কিন্তু এই সব খেলনার আকার-প্রকার থেকে নূতন সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। কারুশিল্প বা কুটিরশিল্পের যে সব প্রতিষ্ঠান তাদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে হয়তো এই চেষ্টা সফল হতে পারে। কোন না কোন পথে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কারুশিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন সম্ভব নয়। এইজন্যই কারুশিল্পকে সংস্কৃতির অঙ্গরূপে স্বীকার করা আজ একান্তই প্রয়োজন।

বিরাট আয়তনের পরিকল্পনার সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ অবশ্যই আছে। কারণ সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তিত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অপরদিকে ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করলে বিরাট আয়তনের পরিকল্পনা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে অনেক রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই জাতীয় জটিল সমস্যা আজ সর্বত্রই বিদ্যমান। ভারতের কারুশিল্পকে উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কারিগরদের স্বাধীনতা এবং কারিগরী প্রয়োজনীয়তা বোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং আধুনিক ও নবীন কারিগরদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার আদানপ্রদানের সুযোগ থাকা দরকার। অর্থাৎ আধুনিক শিল্পীরা পুরনো দিনের কারিগরদের সঙ্গে ওঠা বস করতে চেষ্টা করবেন এবং পুরনো কারিগররা শহুরে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এই সুযোগ সুবিধা ছাড়া কারুশিল্পের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান অসম্ভব। এই প্রয়োজনের দিকে যাতে দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা দৃষ্টি দেন এই জন্য এই আলোচনার অবতারণা।

বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া বা দেশীয় শিল্পীদের বিদেশ থেকে শিক্ষিত করে আনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু ভারতীয় কারুশিল্পকে ভালভাবে দেখবার জন্য বিশেষ কোন বৃত্তি বা ব্যবস্থা এখনও হয়নি। পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে হয় যে, পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে দেশকে জানা এবং প্রত্যক্ষভাবে দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এক জিনিস নয়। আমরা কারুশিল্পের নবজাগরণ আশা করি, কিন্তু কারুশিল্প বা কারুশিল্পীদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

এই বিষয়ে অনেকের অভিজ্ঞতা থাকলেও উদাহরণ হিসেবে কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফট বোর্ড, গ্রামোদ্যোগ, গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এবং আরও ছোট বড় বহু প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়, যে সব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কুটির বা গ্রাম শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলা। প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে সংস্কৃতির দিক দিয়ে গ্রাম, কুটির বা কারুশিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাজেই উপরি-উক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকেই কারুশিল্পের পক্ষে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা আশা করা সঙ্গত। এই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রথম প্রয়োজন ভারতীয় কারুশিল্পের অবস্থার অনুসন্ধান। এইভাবে অনুসন্ধানের দ্বারা এমন অনেক কারুশিল্পের সন্ধান পাওয়া যাবে, যেগুলির বাজার নেই অথচ সেই সব বিষয়ে অভিজ্ঞ কারিগর আজও বর্তমান। দ্বিতীয়ত, যে সব কারুশিল্পী আজও বর্তমান তাদের কারিগরি দেখা এবং প্রতিভাসম্পন্ন কারিগরদের পরিচয় নেওয়া। তৃতীয়ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কারিগরদের আঙ্গিকের আদানপ্রদানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান। সংক্ষেপে ভারতীয় কারিগরসমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন আমাদের প্রথম কর্তব্য। এইভাবে ভারতীয় শিল্পের পরিচয় গ্রহণে সক্ষম আধুনিক শিক্ষিত শিল্পী কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। বিদেশে শিক্ষার জন্য যেমন বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, দেশের বিষয় জানবার জন্য বৃত্তির

॥ স্মৃতির পাতা ॥

নলিনীকান্ত গুপ্ত

আমার সন্ন্যাস

বার বার তিনবার। তিন তিনবার আমার সুযোগ হয়েছিল সন্ন্যাসী হয়ে যেতে। কিন্তু সন্ন্যাসের দুর্ভাগ্য কি আমার সৌভাগ্য তিনবারই আমাকে ফিরে আসতে হ'ল—তবে তিন রকমে।

প্রথম বার। জেল থেকে বের হয়েছি। কি করব এখন? আবার সংসারে প্রবেশ? পূর্ববৎ কলেজে পড়াশুনা করা, পাস করা, চাকরি করা? তা আর হয় না—প্রার্থনা করলাম ওসব শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ। সময় কাটানোর জন্য, ইতিকর্তব্য স্থির করবার পূর্বে একটা ছলা গ্রহণ করলাম বটে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের কাছে পড়াশুনাই আবার চালাব, কোথায় সুবিধা হয় ঘুরে ফিরে দেখব।

ঘুরে ফিরে কলকাতায় এসে রইলাম—আমার এক বন্ধুর সঙ্গে, এক মেসে। একদিন হঠাৎ প্রেরণা এল, আজই তবে—আজই বের হয়ে পড়া যাক—মহানিষ্ক্রমণের পথে। আর ফেরা নেই। ঠিক করলাম প্রথমে যাব বেলুড় মঠে; যদি সেখানে স্থান পেয়ে যাই ভাল—শুনেছি সেখানে একটা ভাল লাইব্রেরীও আছে। যদি স্থান না হয়, তবে... দেখা যাবে। বাসা থেকে বের হ'লাম, বেলা চারটায় হবে আগে ওখানে গিয়েছি, দক্ষিণেশ্বরেও গিয়েছি, নৌকোয়। এখন জেনেছি বেলুড় নামে একটি রেল স্টেশন আছে—তাই মনে হ'ল মঠটি স্টেশনের কাছাকাছি হবে নৌকোয় না গিয়ে ট্রেনেই যাব। পকেটে ছিল আনা দুই আড়াই পয়সা—হাওড়া গিয়ে টিকিট কিনলাম, পকেটে রইল দু'এক পয়সা। স্টেশনে পৌঁছলাম, কিন্তু শুনলাম মঠ সেখান থেকে বেশ দূরে, মাইল দুই ত' হবে। চললাম হেঁটে, অবশেষে উপস্থিত হলাম গিয়ে মঠে—বারান্দায় একটি বেঞ্চে জন দুই সন্ন্যাসী বসে ছিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আগমনের হেতু। আমি সোজা বলে ফেললাম, এখানে থাকতে এসেছি—অধ্যাত্মজীবন, সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করব বলে। তাঁরা বললেন তবে ওখানকার কর্তা-ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে ঠিক করতে হবে। কর্তাব্যক্তি হলেন শরৎ মহারাজ—একটা কামরায় নিয়ে তাঁর পাশে বসালেন। আমার প্রস্তাব শুনে অনেক কিছু বললেন ও বোঝালেন অত্যন্ত অমায়িকভাবে এবং স্নেহ-ভরে।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখানে থাকতে চাও ঠিক কি উদ্দেশ্যে?"

আমি ঃ "এ হ'ল স্বামী বিবেকানন্দের পীঠস্থান, স্বামীজির উপর আমার প্রগাঢ় আকর্ষণ, তাঁর আদর্শও অনুসরণ করতে চাই!"

তিনি ঃ "স্বামীজির উপর আকর্ষণ, খুব ভাল কথা। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়—স্বামীজিকে ভক্তি করা পূজা করা সহজ, বিশেষতঃ ভারতীয় যুবকদের পক্ষে। কঠিন স্বামীজির গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে জানা ও চেনা। আর শ্রীরামকৃষ্ণকে যে না জেনেছে ও চিনেছে, স্বামী বিবেকানন্দকে জানা ও চেনা ঠিকভাবে তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সে যা হোক, হঠাৎ ত' কাউকে এভাবে গ্রহণ করা যায় না—যাওয়া-আসা কর, আলাপ-পরিচয় হোক, তারপর সিদ্ধান্ত করা যাবে।" আমি উত্তর দিলাম, "ফিরে যাবার আমার ইচ্ছা নাই, আমি দৃঢ়সংকল্প করে এসেছি।" আমার পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশনে এসে যোগ দিয়েছেন দেবব্রত বসু এবং শচীন সেন দুজনেই আমাদের সঙ্গে আলিপুর জেলে ছিলেন বোমার আসামী হয়ে। এখানে তবে দেবব্রত বসুর কথা একটু বলে রাখি। তিনি ছিলেন উপেনদা, বারীনদা, ঋষিদার সমবয়স্ক নেতৃস্থানীয়। তিনি ছিলেন লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। যুগান্তরের বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তাঁর ও উপেনদার লেখা। তাঁর মন ছিল ধ্যানী চিন্তাশীলের মন—তাঁর চিন্তা ছিল বৈচিত্র্যময়, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ এবং অন্তর দৃষ্টি ও আন্তর অনুভূতিসম্পন্ন। অথচ তিনি ছিলেন সুরসিক যদিও তা অন্যান্যদের মত অট্টহাস্যে প্রকাশ পেত না। 'আকার-সদৃশপ্রাজ্ঞ' ছিলেন তিনি অর্থাৎ দীর্ঘাকৃত পুরুষ এবং প্রায়ই আসন করে বসে থাকতেন নিঃশব্দে অন্তর্মুখী হয়ে। মাঝে মাঝে জেগে উঠে বিতরণ করতেন আশেপাশে লোকদের কাছে তাঁর চিন্তাজগতের বা অন্তর্জগতের আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত কিছু কিছু। তাঁর ভগিনী সুধীরাও আমাদের সুপরিচিতা ছিলেন, কারণ মেয়ে হলেও তিনিও ছিলেন তাঁর ভাইয়ের সহকারী অর্থাৎ বিপ্লবী কর্মী। রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের পর দেবব্রত বসুর নাম হয় প্রজ্ঞানন্দ—তাঁর লিখিত একখানি পুস্তক আছে, গুণী-মহলে যা সুপরিচিত—"ভারতের সাধনা"। আমি দেবব্রত বসু ও শচীনের নাম উল্লেখ করলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল এবং শুনেছিলাম যে, বোমার আসামী দলে এঁদের কিছু ভুল বা গোলমাল (পুলিসের) হতে পারে। কিন্তু শরৎ মহারাজ স্পষ্ট উত্তর দিলেন দুঃখের সঙ্গে—আমাকে গ্রহণ করা তাঁদের সাধ্যাতীত। আমিও বের হয়ে পড়লাম অতঃপর সোজা এবে চলি—গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, শুনেছি এ পথ মোগলদের তৈরী, দিল্লী অবধি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। চললাম, তবে আর ফেরা নাই... বলি তবে।

হে ভবেশ হে শংকর সবারে দিয়েছ ঘর
আমারে দিয়েছ শুধু পথ

কিংবা খৃস্টের কথায়ঃ

The foxes have holes and the birds of the air have nests; but the son of man hath not where to lay his head.

চললাম ত', শহর পার হলাম, জনবসতি বিরল হয়ে এল—রাজপথের দুধারে মাঠ বিস্তৃত হয়ে চলল, কিন্তু হঠাৎ এ কি? গাঢ় গাঢ় বৃষ্টি শুরু হ'ল। ছাতা নেই, আশ্রয়ের জন্য বাড়ীঘর নেই, আছে কেবল বৃক্ষতল। ভিজতে আরম্ভ করলাম—

সুতরাং চরেবেতে। বিজয় কম্বল যোগাড় করল, লোটাও। কবে বের হব তিনও ঠিক হল—তবে ইটিনেরারী বাকী রইল। বিজয় বললে—রওনা হওয়ার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দকে জানিয়ে প্রণাম করে তবে যাত্রা করব। তাই একদিন বিকেলে নিয়মমত যখন উপস্থিত হই তাঁর কাছে, তাঁকে আমরা বললাম আমাদের প্ল্যানটা। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—অপেক্ষা কর ক'দিন। আমি কিছু আশ্চর্য হয়ে গেলাম—ধারণা ছিল আমাদের প্রস্তাবে তিনি সায় দেবেন ইতস্তত না করে। যা হোক কদিন অপেক্ষা করে রইলাম। একদিন বললেন, "তোমরা দেশভ্রমণে বের হতে চেয়েছিলে, চল দেশভ্রমণে তবে আমার সঙ্গে।" আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও উল্লসিত। তিনি যাচ্ছেন আসামে, রাজনীতিক প্রচারে—একটা প্রাদেশিক সভা ছিল 'জলমুক্তা' নামে সাঁইথিয়ার অন্তর্গত এক স্থানে—সেখানে এবং সেই সম্পর্কে আসামের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করতে।

বাংলার, নদীমাতৃক বাংলার মূর্তি নূতন করে, নূতন চোখে, আবার দেখলাম—জল, জল, এত জল আর কোথাও নাই—উপরে আকাশ যেমন বিস্তৃত নীচে তেমনি জল। গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ,—পদ্মা, শীতলাক্ষ। তারপর মেঘনা—মেঘনা যে না দেখেছে তার কল্পনা সে করতে পারে না—জাগ্রত জলেশ্বরী—নিকটেই তার প্রবাহিতা বিপুলা ধলেশ্বরী। তারপর সুর্মা নদী। স্টীমারে চলেছি বরাবর দিনের পর দিন। তারপর নৌকায় ফিরেছি। বর্ষার সময় প্রায়, দোলা জায়গা—অন্যান্য সময় শুকনো নীচু জমি, শস্যক্ষেত্র বলে—ভরে গিয়েছে জলরাশিতে। যতদূর দৃষ্টি যায় স্থির নির্মল জলপ্রসার। তার মাঝে মাঝে একটু উঁচু হয়ে জেগে রয়েছে এখানে ওখানে ক্ষুদ্র গ্রাম বা বসতি সব। একদিন অর্থাৎ এক প্রায়সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের সিঁদুরে আভায় জলস্থল গোলাপী হয়ে উঠেছে, তার মধ্য দিয়ে চলেছি মন্থরগামী নৌকায়—শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন আর দু' একজন নেতা। তখন আমি (বালক!) এমন অভিভূত হয়ে পড়ি সে আবহাওয়ায় যে দারুণ ইচ্ছা হল গলা ছেড়ে গেয়ে উঠি তখনই—

> সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা
> তরণী বেয়ে চল, তরণের নাহি বেলা
> আধ আধ দেখা যায় কনকভূমি
> সেথা কি তরী বেয়ে যাবে তুমি!

কোনরকমে নিজেকে সংযত করে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলাম।

শ্রীঅরবিন্দ সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতেন, অন্য সময়ে লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন, বাদানুবাদ দিতেন। সভাসমিতিতে লোক বেশীর ভাগ ইংরেজী-অনভিজ্ঞ। সাধারণ গ্রামবাসীর অধিবাসী কিন্তু তাঁর কথা শুনতে এবং তাঁকে দর্শন করতে দলে দলে লোক এসেছে আনন্দনন্দিত। তিনি যখন সভায় দাঁড়াতেন কথা বলতে, চতুর্দিক নিস্তব্ধ নিষ্কম্প। বাঙালীর সকলে তারা নিশ্চয় কিছু অনুভব করত। কেবলই যে রাজনীতির কথা বলেছেন তখন তা নয়। তিনি যে যোগী, সাধনার দিশারী এ কথাও অনেকে জানত—এ বিষয়ে তাঁর সাহায্য চাইত। আমি দেখেছি যখন তাঁর সঙ্গে একই ঘরে রাত্রিবাস করেছি, জলমুক্তায়—সমস্ত রাত্রিই প্রায় তিনি বসে কাটাতেন শেষ দিকে কিছুক্ষণের জন্য শয্যাগ্রহণ করতেন।

সপ্তাহের দিন ধরে আমরা দেশভ্রমণ করলাম। তারপর ফিরলাম। ফিরে শ্রীঅরবিন্দ এক প্রস্তাব করলেন, আমাদের প্রত্যেক নিজেদের শ্যামসুন্দরের স্বর্গ ও কর্মজীবন একত্র সম্পর্কে। সে কথা আর এক অধ্যায়ে বলেছি।

তিনজনের শেষজনের কথা অতি সংক্ষিপ্ত। দেশ ও কাল হল পণ্ডিচেরীতে, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত পরে। পণ্ডিচেরীর সাথে আমরা স্থায়ী হিসাবে ছিলাম পাঁচজন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একত্র। আমাদের সে ব্রহ্মচর্য বা কৌমার্যের জীবন সন্ন্যাসেরই হয়ে চলেছিল বই কি! প্রথমবারে সন্ন্যাসকে প্রত্যাখ্যান করলাম আমি নিজে—আমার আত্মপুরুষ—দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করালেন পরমপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ, আর তৃতীয়বার স্বয়ং প্রকৃতিদেবী—হয়তো প্রসাদ রূপে প্রত্যক্ষভাবে এসে সে পথ চিরতরে অবরুদ্ধ করে দিলেন—উদাহরণ হোঁচট কাঁটার উপর কাঁটা চাপিয়ে দিয়ে—এভাবে আমরা আটকা পড়েছিলাম তিনজন, দুজন তবুও ফাঁকি দিতে পেরেছিল।

শ্বেত করবী

প্রভাত দেবসরকার

মুখটা চেনা-চেনা, গতি-বিধিও জানা, কিন্তু আলাপ-পরিচয় নেই। তার অস্বস্তিটা সেইজন্যই।

সে অনেকদিন ভেবেছে, সভ্য মানুষই অসামাজিক বেশি। বিশেষ করে এই শহর-বাসীরা! গায়ে গা লাগলেও মুখ ফিরিয়ে দেখবে না, বা সমবেদনার বা সহানুভূতির উচ্চবাচ্য করবে না। যত শিক্ষিত তত সংকোচ আর অনাত্মীয়তা যেন পরস্পরের।

সে কিন্তু আলাপ করতে চায়, পরিচিত হতে চায়। কেনই বা চেনা-জানার মধ্যে মুখ ফিরিয়ে থাকবে?

কতদিন সে এক ট্রামে এসেছে, বাসে উঠে সংরক্ষিত আসন ছেড়ে দিয়ে সারা পথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তার বাড়ির দোর-গোড়া দিয়ে এক সঙ্গেও হেঁটেছে! এই তো তার বাড়ি, তারপর মোড়টা ঘুরলে ও কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে মনে হয়। তার সারারাত বড় অস্বস্তিতে কাটে। কত ভাবে ভাঙা-গড়া ক'রে, ও কোথায়, কোন বাড়িতে থাকে? ঠিক বাড়িটা জানতে যেন বড় আগ্রহ তার।

ও যখন তার দৃষ্টিপথে আসে তার দৃষ্টি অনির্বচনীয় উল্লাসে বুঝি ঝাপসাই হয়ে যায়, বুকের মাঝে অনন্ত সাগরের ঢেউ ভাঙে, দেহ-তট স্পন্দিত হয়!

হয়তো কোনদিন ঘুম ভেঙে ওর কথাই সে ভাবতে থাকে, যেন আলাপের প্রথম কথাটা সুন্দর করে ভাবে। সম্পূর্ণ মানে না বোঝা, মনে-নেশা-লাগে এমন কোন একটা গানের ভুলে-যাওয়া কলি নিয়ে কত গুন্ গুন্ করে। সারা সকাল কেমন কেটে যায়। এই আনন্দ, এই বেদনা, এই পুলক, এই হর্ষ কত অনুভূতি, কত অনুভাব বোধ। তার মনে হয়, আকাশের মত বিচিত্র রূপের আধার এই মনও, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত তারও কত ঋতু আছে আমাদের ভাবনায়।

সে যখন ওর কথা ভাবে তার মনে নানা রঙ ধরে। হৃদয়-আকাশে বিচিত্র শোভা হয় ভাবনা-মেঘের! আকাশের মেঘকে কে তুলি দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আঁকে জানি না, কিন্তু তার চিত্তের মেঘকে সে নানা রঙ-এ মাতিয়ে তুলতে পারে। তার তুলনা নেই!

কতদিন সে ভেবেছে ওকে জিজ্ঞেস করবে। রোজ ও তার দোরগোড়া দিয়ে সদর রাস্তায় যায়, কোনদিন কি সে ওর দৃষ্টিপথে পড়েছে যেমন ও পড়েছে তার চোখে?

সে জানে কোনদিন তার পক্ষে এমন একটা প্রশ্ন কোন অপরিচিতাকেই জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হবে না। তার লাজুক স্বভাব তার অজানা নেই। এই সেদিন পর্যন্ত মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে ও কথা কইতে পারতো না, অনূঢ়া সমবয়সী কত আত্মীয়া মেয়েদের সান্নিধ্য এড়িয়ে গিয়ে যেন বেঁচেছে! এখন সেসব কথা ভাবলে যদিও হাসি পায়, তবুও মনে মনে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচ হতে পারেনি সে।

সে জিজ্ঞেস করবে কি, পিছনে পিছনে নিঃশব্দ গুঞ্জনে এসে কতদিন দাঁড়িয়ে দেখেছে, ওর মুখটা কি গাম্ভীর্যে ভরা, দেহটা আত্মসচেতনতায় বিশেষ ঋজু, ভ্রূযুগল বড় কঠিন! কোনদিন ওর ভঙ্গীটা ভাল লেগেছে, কোনদিন হয়তো ভাল লাগেনি, মনে হয়েছে ওর মেজাজ হয়তো আরো কঠোর ওর ঐ ভ্রূভঙ্গির চেয়ে।

কেমন করে ওর চোখের চাওয়ায় ওর কথার উৎস-মুখ উৎসারিত হতে পারে? কেমন করে নিঃসংকোচে সে আলাপ করতে পারে? সে কতদিন ভেবেছে ঘরের-কোণে-রাখা নীরব বীণার মত সে কেবল নীরবই রয়ে গেল! কিন্তু সে জানে, সুরের ভারে তার হৃদয়-বীণা ভরা আছে।

নিজেকে নিজে সে বাজিয়ে দেখেছে, কেমন বাজেনি—একই সুর বেদনার ভারে নিবিড় হয়ে উঠেছে। কতদিন মনে হয়েছে, বৃথা হৃদয়-বীণার ঝংকারে মন মাতান! বাজাবে না, বাজাবে না! আপন-হাতে বেসুরা রবেই সে!

জানে না কবে, তবে সে একদিন ওকে দেখে কমলাসনা বীণাপাণির কথা মনে হয়েছিল। আজ যখন অকপট, তখন সে বলছে, সে অনেকটা পথ ওর অনুসরণ করেছে—ও অদৃশ্য হতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, পথে পথে ফিরেছে! কতদিন সে ওকে বৃথা খুঁজেছে!

কখনো জনতার মাঝে, কখনো নির্জনে চাক্ষুষ দর্শনে কত কি যে মনে হয়েছে, কত কি যে ভেবেছে তার ঠিক নেই। নিঃশব্দ, সশঙ্ক আকৃতিতে কেবল সে বলেছে, কথা দিয়ে এই দর্শন সার্থক হবে কবে? তার নিঃসঙ্গতা কি ঘুচবে না? ও আসবে না?...

একদিন সাহস করে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ট্রাম লাইনের ধারে সুশীল বললে,

'আপনি আমাদের পাড়া থেকেই আসেন!'

মেয়েটি আড়চোখে চেয়ে পাশ ফিরে বললে, 'শাঁখারী পাড়া!'

সুশীল উৎফুল্ল হল, অনর্গল বললে, 'অনেকদিন দেখেছি আপনাকে আসতে যেতে! মোড় পেরুলেই দোতলা বাড়ি, তারপর গ্যারাজওলা তেতলা বাড়ি, তারপর আমগাছওলা যে বাড়ি—'

মেয়েটি সাগ্রহে বললে, 'পাঁচিলের ধারে একটা গাছ আছে, না? শ্বেতকরবী?'

কথার অর্গল মুক্ত হয়েছে সুশীলের, হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি ঠিক দেখেছেন আমগাছের আড়ালে ওধারে করবী গাছ জীর্ণ, শীর্ণ!'

সোৎসুক মেয়েটি; ফুল ফুটেছে না?'

সুশীল হাসলে। হয়তো ফুটেছে, হয়তো ফোটেনি, অত নজর করে সে দেখেনি। বিষণ্ণ বিকালের মত রাস্তার ধুলো-মাখা বিশীর্ণ পাতাগুলো কালশিরা দাগের মত দগদগে!

'ঐ বাড়িটা তো?' মেয়েটি পিছন ফিরে ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে।

হ্যাঁ! বলে মুখ তুলে পাঁচিলের নিশ্চিন্ততা সংগ্রহ করতে গিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। সুশীল অবাক হয়ে দেখলে, ছোঁ মেরে ট্রামটা মেয়েটিকে নিয়ে বোঁ দৌড় দিলে। সরষে ...ড়ানর মত ভিড়টা বিগলিত!...

তারপর ভাঙা পাঁচিলের ধারে করবী গাছের যত্ন বাড়ল। কাঞ্চননগরের ছুরির ফলার মত পাতাগুলো ঝকঝকে হয়ে উঠল, কৃতজ্ঞতার আনন্দ হাসি ছড়াল। শ্বেত-করবী অনেক ফুটল।

'এ গাছে অনেকদিন ফুল ফোটেনি!' কলতলায় যেতে যেতে হঠাৎ লক্ষ্য করে মেজদা বললেন, 'এত ফুল হয় নাকি এই গাছের!'

ফুল-ফোটানর বাহাদুরিটা যেন সুশীলের, পিচকিরি দিয়ে জল ছিটিয়ে বললে, 'ফুল গাছের ফল হবে না, বাবে!'

গাড়ুতে জল ভরে মেজদা বললেন, 'কোন্ কালে বড়দি কোথা থেকে একটা ডাল এনে পুঁতেছিল, কত জল ঢেলেছিল, কারুর মনে ছিল না তারপর। সাদা সাদা ফুলগুলো তো মন্দ নয়!'

মেজদা কেবল নন, আরো অনেকে নজর করেছেন, একদা জীর্ণ-শীর্ণ অবহেলিত গাছে পুষ্পোদ্গম দেখে অবাক হয়েছেন। সুশীল চেয়ে দেখে নিঃশব্দে ফুটেছে অধিক।

কিন্তু অন্য কোনদিন শাঁখারিপাড়ার মেয়েটিকে পাঁচিল লক্ষ্য করে যেতে দেখেনি সুশীল।

'তুমি দেখবে বলে যে-ফুল ফুটলো সে-ফুল কত ঝরে গেল, বিকালের রোদ পড়ে ছায়া ঘনাল!'

আবার একদিন যখন দেখা হবে, সুশীল মনে মনে ইচ্ছে করলে, সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলে আলাপ জমবে। নাম-ধাম জানা হয়ে যাবে! তারপর—

না, সে-সম্ভব নয়। অসম্ভবও। পরিচয় কত দীর্ঘ হলে আর সাক্ষাতের অনুরাগ জন্মালে তবে সে-ফল ফলে! যার নাম—

নিজেকে বড় একলা একলা আর নিঃসঙ্গ লাগে সুশীলের। সারাদিন কত লোকের সঙ্গ কত নিরর্থক মনে হয় যখন মেজদা আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে বলেন। আলো নেভে না, আলো আরো জোরে জ্বলে ওঠে। আরো হাহাকার যেন সেই জন্যে, ঘুম না এলে আরো নিঃসঙ্গতা। মেজদা বেশ ঘুমোতে পারেন! বলেন, সারাদিন খেটে-খুটে আর অত ভাল লাগে না জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা মানে, ঐসব বাজে গল্পের বই পড়া। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়!'

নিঃসঙ্গতার মধ্যে থেকে সুবিধা নিশ্চিন্ত ... মেজদার কোন ভাবনা নেই। অন্য ... সঙ্গে এক বিছানায় শুচ্ছেন। কাল অন্য ঘরে আর একজনের সঙ্গে শোবেন। খুব বাছাবাছি খোঁজাখুঁজি চলছে। মেজদার চাকরি পাকা হয়েছে যে!

অবশ্য তাতে নিঃসঙ্গতা কিছু বাড়বে না। মেজদা পাশে থেকে কি আর আসঙ্গতা! কতক্ষণ জেগে থাকেন, কথা বলেন, আলাপ করেন, সুখ-দুঃখের মন্ত্রণা করেন? মেজদার যদি কোনদিন খেয়াল হয়, যদি ঘুম আসতে দেরি হয়, জিজ্ঞেস করেন তোর আপিসের খবর কি রে, মন দিয়ে কাজ-কর্ম করছিস তো, প্রমোশনের দেরি কত, ইত্যাদি।

মেজদার এই তিরিশ না বত্রিশ! একেবারে বুড়ো হয়ে গেছেন। তারও বয়স হয়েছে, কিন্তু—

জানালাটা খোলা থাকলে কোন কোনদিন চোখ দুটো তৃষ্ণাতুর হয়ে অন্ধকারে ছুটে যায়। গরাদের ফাঁক দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে নির্জন পথে বেড়িয়ে আসে। বেশ লাগে যেন সঙ্গীহীন পথ-পরিক্রমা। গভীর রাত বুঝি তারই মত নিঃসঙ্গ। চোখ পড়ে কোনদিন, কলতলার ওধারে করবী গাছের পাতারা সহস্র ছুরির ফলা দিয়ে যেন অন্ধকার চিরে চিরে কাটে। মণিকুন্তলা রাতের নিশিকাটা চলে কতক্ষণ।

মরা গাছে ফুল ফোটার খবর দিয়ে আর মেয়েটি দেখা দেয়নি। কতদিন যেন তার দেখাও যায়নি। অকারণ হলেও অভিমান বোধ করতে বাধে না সুশীলের—আর যেন সে ছাড়া কারো জানার অধিকার নেই মেয়েটির গতিবিধির সন্ধান নেওয়ার। যেন মেয়েটিরই উচিত ছিল বলে যাওয়ার শাঁখারিপাড়া ছেড়ে আর কোথায় যায় সে' ভারি অন্যায়।

একদিন মেজদাকে ঠেলে তোলে সুশীল। ঘুম চোখে মেজদা বলে, 'কি রে! কি জ্বালাতন আরম্ভ করেছিস রাত দুপুরে?'

উত্তেজিত সুশীল বললে, 'মেয়েটাকে তুই দেখেছিস?'

মেজদা জড়িয়ে বললে, 'উঃ! আমি দেখবো কেন, বাবা-মা দেখেছে!'

বিরক্ত হয়ে সুশীল বললে, 'দূর্ র্ কার কথা বলছি, আর কার কথা ভাবছিস! সেই মেয়ে, এখান দিয়ে যায়—'

মেজদা পাশ ফিরে বললে, 'জানি না, যা!'

হয়তো তার মত করে আর কেউ দেখেনি, আর যদি দেখেও পুনঃ দেখার জন্য তার মত উৎসুকও নয়। মেয়ে দেখার আগ্রহ সবার সমান কি? মেজদার জন্যে মেয়ে দেখা হচ্ছে! তার জন্যেও একদিন দেখা হবে, তাকে বাদ দিয়ে আর সবাই দেখে ঠিক করবে, তারপর একদিন—

সানাই বাজনা বড় বিশ্রী! বড় জানাজানি, খোলাখুলি! চোখ বুজিয়ে সুশীল ভাবলে, যদি চুপি চুপি কেউ তার ঘরে আসে একেবারে অন্ধকারের মত নিঃশব্দে মিশে, কাছে বসে আতপ্ত নিঃশ্বাসে অনুভব হয়—

'তুমি কে গো? কোথা থেকে তুমি আস? কোথায় তোমার ঠিকানা?'

অন্ধকার! অন্ধকার! বড় অন্ধকার! আলোটা কি আবার জ্বালবে? দেখবে সে যদি কোথাও এসে থাকে সে।

এ ঘরে যদি মেজদা না থাকতো, অন্ধকারটা একাধিপত্য হ'ত, তা হ'লে হয়তো কোনদিন দুপুর রাতে তার সঙ্গ পাওয়া যেত। অসম্ভব কি এমন? নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সে তাকে বুঝিয়ে আনতে পারতো। না, কেউ জানবে না!

যেন খুব সহজ ছিল, এমনিভাবে নিজের মনে আক্ষেপ করলে সুশীল। যেন বলা মাত্রই গোপন অভিসার সম্ভব হ'ত—তুমি আসবে তো যখন রাস্তার ধারে বেড়াল-ছানাটা ককিয়ে কাঁদবে গেরস্থবাড়ির আলো দেখতে না পেয়ে, নিঃসঙ্গ হয়ে জ্বলবে পথের আলোগুলো, তোমার পায়ের শব্দে তুমিই চমকে উঠবে?

যেন সে আসছে, পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে সুশীল জানালার গরাদ ধরে চোখ বাড়িয়ে স্থির হয়ে রইল। ঐ! ঐ! ঐ! আর শব্দ নেই অনেকক্ষণ, করবীগাছের ডালে কি পাতায় আটকে গেছে, প্রজাপতির গুটির মত দুলছে শব্দটা নিঃসঙ্গ রমণীয়তায়, আকাঙ্ক্ষায়, আশঙ্কায়! শ্বেত-করবী অন্ধকার ঠেলে দৃষ্টিপথে আসে না! অন্ধকারে সাদা জিনিস মিশে থাকে! করবীর ডালগুলো জানালার ধার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, হাত বাড়ালে আর স্পর্শ করা যায় না।

মেজদার বুঝি ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, অনেকবার ভেবে শুয়ে শুয়ে বললেন, 'এখনো ঘুমোসনি, কিরে?'

'ঘুম আসেনি।' যেমনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঘরে সুশীল বললে।

মেজদা অবাক হয়ে বললেন, 'ঘুম আসেনি! সারাদিন করিস কি?'

'জেগে থাকি।' সুশীল বললে।

'ঘুমের ওষুধ খা!' মেজদা বোধ হয় বিছানায় উঠে বসেছেন। ঘুম ছুটে গিয়ে অন্ধকার হাতড়াচ্ছেন। চোখের আলোয় কি যেন খুঁজছেন।

খানিক নিস্তব্ধতা। মেজদার আপ্লুত গলা শোনা গেল। 'শোন, একটা কথা বলি!'

রাতদুপুরে আবার কি কথা আছে মেজদার, ঐ তো এক কথা কেবল অফিসের নয়, সংসারের—একঘেয়ে কপচানো, খাঁচার পাখির মতন!

'কি শুনবো?' সুশীল মুখ না ফিরিয়ে বললে। করবী ডালটা হাতের কাছে এল বুঝি।

আরো ভেজা-ভেজা সুরে মেজদা ডাকলেন, 'শোন, না, লক্ষ্মীটি!'

না করবীর ডাল নয়, অন্ধকারের মায়া-স্পর্শ বুঝি। বিরক্তির সুরে সুশীল বললে, 'কি, বল?'

মেজদার গলা যেন শোনাই যায় না, ফিস্ফিস্ করে বললেন, 'ওকে কি রকম দেখতে রে?'

হঠাৎ বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে যেন একটা গর্হিত কাজ ধরা পড়েছে। মিয়োন গলায় সুশীল বললে, 'কাকে?' (মেজদাও কি শাঁখারি পাড়ার মেয়েটিকে লক্ষ্য করেন? বহুদৃষ্ট লোহিত, ছি ছি কি লজ্জা এ আলোচনায়!)

মেজদা আরো গলা ছোট করে বললেন, 'কিরে, তুই দেখিসনি তাকে?' মৃদু হলেও কৈফিয়তের মত শোনায় মেজদার বাচন ভঙ্গি। না, একেবারে দৃষ্টি-গ্রাহ্যতা অস্বীকার করবে সুশীল। দেখে থাকলেও বিচারের কোন কথা আসে না এসব ব্যাপারে। তা ছাড়া ব্যক্তিগতও—

সুশীল জানালার মরচে-ধরা গরাদ মুঠো করে ধরে অন্ধকারে চোখ রেখে তাকেই যেন দেখতে লাগল। সেই অনির্বচনীয়তা উপলব্ধি করলে। হয়তো অন্ধকারে করবী গাছের ডাল নড়ে নড়ে জানালার খড়খড়িতে টোকা দেবার চেষ্টা করছে। সে বলেছিল শ্বেতকরবী ফুটেছিল।

মেজদা অধৈর্য হয়ে গেছেন। আবার বললেন, 'সত্যি বল তুই দেখিসনি তাকে? কেমন দেখতে জানিস না?'

মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর স্বরে সুশীল বললে, 'না, না, না!'

একটা আক্ষেপ যেন অন্ধকারকে আকুলিত করলে। মেজদা সুশীলের সোচ্চার অস্বীকৃতিতে অবাক হলেন। ঘরে-বাইরে অন্ধকার প্রকট হল। হৃদয়হীন, বোবা নিষ্ঠুর।

অনেকক্ষণ পরে অন্ধকারের বক্ষস্পন্দন অনুধাবন করে মেজদা কাতরস্বরে বললেন 'বল না লক্ষ্মীটি, সে কেমন দেখতে?'

মেজদার এই আলাপ অসহ্য বোধ হয় সুশীলের। দাদার মর্যাদা এমনি করে ও কি নষ্ট করতে চায়? কোন এক মেয়ে-মানুষের দেখা-শোনা নিয়ে ইয়ার বন্ধুর মত জিজ্ঞাসাবাদ, ছি, ছি! হলেই বা তারা পিঠোপিঠি!

হঠাৎ মনে হলো অনেক দূরের করবীর ডালটা স্বচ্ছন্দে সরে এসে হাতে হাত রেখে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাঠ হয়ে আছে। পাঁচিলের ওপারে রাস্তায় অনেকদিন থেকেই আলো নেই।

অদৃশ্য স্পর্শকাতরতায় সুশীল বললে 'মন্দ নয়। কেন তুই দেখিসনি কোনদিন?'

গদগদ স্বরে মেজদা বললেন, 'না রে না। দেখবো কি, দেখতে কি দিয়েছে ছাই! যাক, তোরা দেখলেই হল!'

এতক্ষণে শঙ্কিত সংশয় ঘোচে সুশীলের, মেজদা যার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন এ সে দর্শনীয়া নয়, এ সেই বিশেষ একটি মেয়ে, যে এসে তাঁর একাকিত্ব ঘোচাবে তাকে আসঙ্গদানে দ্বিধা করবে জীবনসঙ্গিনী।

হায় করবী, তুমি মিথ্যা কেন মোহ সৃষ্টি

কখ · ওবারে তেতলা বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে এক ফালি আলো লাফিয়ে পড়ে করবী গুচ্ছের মাথাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধে রয়েছে। একাকী শ্বেতকরবী বড় ম্লান যেন।

মেজদা উঠে পড়ে আলো জেবলে জল খেয়ে বললেন, 'আমার বড় ভাবনা ছিল রে তোর বৌদি কেমন হবে দেখতে কে জানে! তা হ'লে সুন্দর কি বলিস?'

জানালা থেকে সরে গিয়ে আলো নিবিয়ে সুশীল মুড়ি দিয়ে শুয়ে বললে, 'আমি কি জানি!'

মেজদা পরম নিশ্চিন্তে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন, যেন একটা লোলুপ জিহবা লালাসিক্ত হয়ে লক্ লক্ করতে থাকে অন্ধকারে।

ঘরেতে জোনাকির মত তারাফুল ফোটে নিদ্রাহীন চোখে। সুশীলের চোখে ঘুম আসে না। এ একাকিত্ব বুঝি আর সহ্য হবে না। এ ঘরে তখন রিক্ত-শূন্যতা হা-হা দৈন্যে ভরে যাবে।
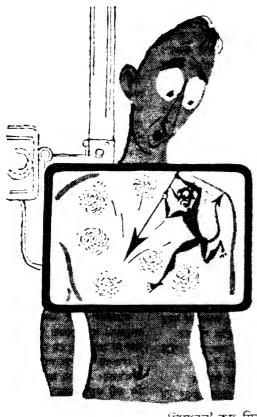
'আমি পারবো না, আমি থাকবো না একলা আর!' সুশীল মনে মনে যেন উচ্চারণ করলে! আদি-গঙ্গার ওপারে কয়েদখানার পেটা ঘড়িতে দু ঘা পড়ল!

ওর চোখের কোণে কেমন একটা ভীরুতা, মুখে সলজ্জ আভা, অবনমিত মস্তকে আর নেই সেই ঋজু কাঠিন্য যা মিথ্যা ব্যক্তিত্বের নির্মোক। এখন ওকে খুব সহজ মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যদি স্পর্শ করা যায়ও ও কিছু মনে করবে না, বিরূপ ফনিণীর মত মাথা তুলে ফণা ধরবে না।

না, বোধ হয় তেমন মেয়ে নয় শিবানী!

ছোট টেবিলে সামনাসামনি বসে সুশীল ওকে লক্ষ্য করতে লাগল। ও অনেকক্ষণ চয়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে মাথা নুইয়েছে, ঠোঁটটা বুঝি পানীয়ের উষ্ণতা পরখ করছে। ছুঁই-ছুঁই ভাব মনোরম চা-ঘরের পায়রা খোপর!

সুশীল (যেন অনেক ভাবার পর) বললেই
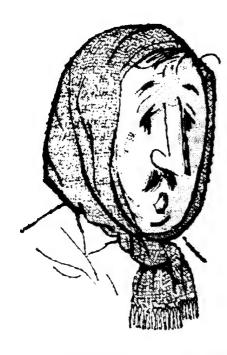
ফেললে, 'যত গরম ভাবছেন আসলে কিন্তু তা নয়, ধোঁয়াটাই বেশি!'

শিবানী চোখ তুলে তাকালে, তেমনি ভীরু ভীরু যেন সচকিত।

সুশীল বললে, 'আমি কিন্তু এক চুমুকেই শেষ করে দিয়েছি!'

একেবারে মাথা তুলে শিবানী তাকালে, মনে হল পরিচয়টা এত ঘনিষ্ঠ করা উচিত হয়নি। কেমন সন্দেহ হয়, যদি—

সুশীল বললে, 'আপনার চা কিন্তু জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

মৃদুস্বরে শিবানী বললে, 'আমি ঠান্ডা চা খাই।'

সুশীল বললে, 'আমি কিন্তু—'

হঠাৎ সুশীল থেমে গেল, চেয়ে দেখলে কাষ্ঠখণ্ডের এতটুকু ব্যবধানে যেন অনেক দূরে সরে গেছে শিবানী, ঠিক সেই রূপে আর ওকে চেনা যায় না।

সুশীল হাসবার চেষ্টা করলে, 'যার যা অভ্যেস!'

একটু বোকার মত হয়তো। শিবানী স্মিত হেসে চায়ের পেয়ালাটা মুখে তুললে।

বোলাচলচিত্তের দ্যোতক যেন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়াটা, চা-পানোপচারের স্বীকৃতি। তারপর দু মিনিটও গেল না, সুশীল উঠে পড়ে বললে, 'চলুন!'

নিঃশব্দে ওরা দুজনে বেরিয়ে এসে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। অদূরে শোভাবাজার আটকান যান-বাহনটা সচল হয়েছে এতক্ষণে।

মনে মনে এইটা না, এইটা, করতে করতে অনেকগুলো ট্রামই চলে গেল। ওদের কারো যেন আর ফেরবার তাড়া নেই। সুশীলের মুখে মৌরি-সমেত বিস্বাদ, শিবানী তখনো সুপারির কুচো দাঁতের চাপে কাটছে। আজকের অফিস ছাড়া সন্ধ্যেটা কেমন-কেমন লাগছে!

সম্মুখ হাসিও সহজ হ'ল না ওদের সান্নিধ্য। দুই ট্রাম দুজনকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিলে। সুশীল ভাবলে, মুখ ফুটে শিবানী বললে না সমভিব্যাহারের কথা! শিবানী আর অপেক্ষা করতে পারলে না?...

মেজদা যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন, বাড়ির বুড়ো লোকটার ছাপ মুখে হুবহু নকল করেছেন। হঠাৎ যেন একটা অজানা জায়গায় এসে পড়েছেন এমনি ভাব করে বললেন, 'উস্-স্, ঘরটায় কে থাকে রে!'

সুশীল অম্লান বদনে বললে, 'কেন আমি!'

'তুই!' মেজদা আরো যেন বিস্মিত হলেন। খুঁটিয়ে দেখলেন চার দেওয়ালে দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে।

'কি অবস্থা হয়েছে একবার চেয়ে দেখেছিস্!' মেজদা যেন ধিক্কার দিলেন।

'কি আবার!' সুশীল মেজদার মুখের দিকে চেয়ে বললে। কত যেন বিজ্ঞ আর ছিদ্রান্বেষী হ'য়ে গেছেন মেজদা বিয়ের পর।

সোজাসুজি মেজদা বললেন, 'এইবার তুই একটা বিয়ে কর।'

প্রস্তাব নয়, অনুজ্ঞা। শুধু মেজদা নয়, বাড়ির সবাই অনেকদিন থেকে সেই কথাই বলছে—চাকরি পাকা হ'য়েছে, আখের নিশ্চিত, সুতরাং উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে বাধা নেই। বরং এই বিধি চিরাচরিত!

করবী গাছের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুশীল বললে, 'বিয়ে করবো না ঠিক করেছি।'

'সে কি রে!' মেজদা বিস্ময়ে ফেটে পড়েন, 'তার মানে?'

'মানে আবার কি, বিয়ে করবো না।' করবী গাছের পাতাগুলো ধুলোয় মাখামাখি, ভোঁতা ছুরির ফলা যেন, সুশীল চেয়ে-চেয়ে ভাবলে।

'বাউন্ডুলে হয়ে থাকবি? তাই ঘরদোরের এই অবস্থা, কোন শ্রী নেই!'

শ্রীমন্ত অধুনা মেজদা অনেক কথা শিখেছেন। (আগে মেজদার কাছা ঝুলে থাকতো, কোঁচা হাঁটুর উপর উঠে পড়তো। অনেক উন্নতি হয়েছে বৌদি এসে!)

'ঘর সাজাবার জন্যে বিয়ে করবো না।' অনেকদিন করবী গাছে ফুল ফোটেনি সুশীল ভাবলে কথাটা বলে।

'তা হ'লে যা পারিস কর, আজকাল তোদের মতিগতি বোঝাই যায় না!' মেজদা উঠে যাবার সময় বললেন। হাল ছেড়ে দিয়েছেন বোধ হয়।

কিন্তু নতুন বৌদি ছাড়েন নি। একদিন কৌতুক করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে, প্রেম-ট্রেম কোথাও করনি তো? বল না, লজ্জা কি!'

লজ্জার কিছু নেই, আবার লজ্জারও। জাহির করবার কিছু নেই। শিবানীকে বোঝা যায় না। আলাপ হলেও পরিচয় হয় না। উভয়ের মাঝখানে দুরতিক্রম্য বাধা এক অদ্ভুত মানসিকতার।

শুধু কম কথাই বলে না, কেমন নির্লিপ্ত, উদাস যেন। হয়তো চায়ের উষ্ণতার মত ক্ষণস্থায়ী তার হৃদয়ের তাপ, মেলা-মেশার উত্তাপ। স্পর্শমাত্রেই যেন জুড়িয়ে যায়। দূর থেকে যা ভাবা যায় কাছে গিয়ে তার হাহাকার! কতক্ষণই বা কতটুকুই বা সাক্ষাৎ-দর্শন, সান্নিধ্য লাভ! অথচ দেহের সমস্ত রক্ত কণিকা দিয়ে এই আসঙ্গ লাভের কত আকাঙ্ক্ষা নিভৃতে উচ্চকিত!

সকৌতুকে সুশীল বললে, 'লজ্জা কি! ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস!'

বৌদি বিশ্বাস করেন না, নাছোড়বান্দার মত বললেন, 'দেখে তো মনে হয় না। নিশ্চয়ই কোথাও—'

চকিত হাসিতে কথাটা সম্পূর্ণ হয় না। বৌদি আর অপেক্ষা করেন না, সন্দেহটা রেখে যান।

বিপরীত অর্থে 'দেখে তো মনে হয়' কথাটা যেন পরখ করতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় সুশীল। স্পষ্ট করে কিছু পরিদৃশ্য নয়।

কিন্তু ওকি? সেই মেয়েটি যেন প্রতি-বিম্বিত মুকুরে, কলতলায় সবার দৃষ্টি-এড়ান শ্বেতকরবী হঠাৎ প্রস্ফুটিত! প্রথম আলাপের কথাটি—ভাঙা পাঁচিলের ধারে শ্বেতকরবী গাছ আছে না? আর—

প্রতিবিম্ব মুছে গেলে জানালা ধরে দাঁড়ায় সুশীল। ভাবে, জীবন ঐ সুদূর তারার মত নিঃসঙ্গ, ইচ্ছে করলেও সঙ্গ-লাভে তা মুখর হবে না। প্রেম বুঝি অনেক বিবেচনাসাপেক্ষ আজ।

শিবানীকে আর এ পাড়ায় দেখা যায় না, অফিস ফেরায় এক পথেও আর নয়। হয়তো হারিয়ে গেছে, এড়িয়ে গেছে। হয়তো—

সূঁচের মত হাতে যেন কি বিঁধলো। সুশীল হাত বাড়ালো, শীর্ণ করবীর ডালে পাতাগুলো তীক্ষ্ম ফলা! [illegible], বড়দা পরামর্শ করেছেন অফিস থেকে [illegible] ধার নিয়ে ভাঙা পাঁচিল ফেলে দিয়ে [illegible] আর কলতলার [illegible] ওপর ওপর দুখানা ঘর তুলবেন। বাবার মত আছে এইজন্যে যে, তবু পৈতৃক সম্পত্তির বৃদ্ধি হবে। সেই কবেকার বাড়ি তাঁর বাবার বাবা করে দিয়ে-ছিলেন।

[illegible] সুশীল করবীর একটা ডাল ধরে [illegible] কাছে টেনে নিলে।

জানালার ভিতর অনেকটা এগিয়ে এল করবীর ডাল। যেন তাদের মধ্যে পাওয়া গেছে একটা পরম আকাঙ্ক্ষিত [illegible] বাস্তবিকতা।

কতক্ষণ কাটে মোহগ্রস্তের মত। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আর উদার ছোঁয়ার দাম মেলে না, বড় কোমল, কান্ত, কমনীয় করবী পল্লব! ক্রুর ভাবনা জাগে।

ছেলে-খেলা!

রুমাল দিয়ে করবীর ডালটা জানালার গরাদে বেঁধে সুশীল ছুটে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে রুটি-কাটা ছুরিটা নিয়ে আসে। পোঁচিয়ে ডালটা দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলে, চকিতে বাকি ডালটা অন্ধকারে আর্তনাদ ক'রে মিলিয়ে যায়।

সুশীল নিজের মনে হাসল করবীর ছিন্ন ডাল হাতে করে। নতুন গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনায় করবীর স্থান নেই কোন। ভাড়া-আদায়ই জীবন-দর্শন!

॥ ২৪ ॥

প্রথমে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শো আরম্ভ হবার এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভদ্র-মহিলা কোথায় গেলেন? পাঁচ টাকার টিকিট কেটে, আর পঞ্চাশ টাকার মদ্যপান করে যাঁরা মমতাজ-এর সুকোমল চেয়ারে বন্দ হয়ে বসে আছেন, তাঁরা যদি এখন শোনেন ফ্লোর শো বন্ধ, তা হলে এই রাত্রে শাজাহান হোটেলের কর্মচারীদের কপালে কি আছে তা কল্পনা করে আমি শিউরে উঠলাম। টিকিটের দাম হয়তো ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মদ? সে তো আর পাকস্থলী থেকে উদ্ধার করে বোতলে আবার ঢেলে রেখে দেওয়া যাবে না। ফলে এখনই কাঁচের গেলাস ভাঙবে, টেবিল চেয়ার উল্টোবে, এবং ফোনে পুলিসের শরণ নেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো গতি থাকবে না। এমন অবস্থা অনেকদিন আগে একবার হয়েছিল শুনেছি। পুলিস এসে মাতালদের হাত থেকে হোটেল কর্মচারীদের কোনোরকমে রক্ষে করেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হয়ে ছিল তারপরই। ইনস্পেক্টরের সেবক পুলিসদলকে শাজাহান হোটেলের সেবার একবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মাতালদের তাড়িয়ে তাঁরাই আবার সেদিন মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা মমতাজের টেবিল চেয়ার দখল করে বসেছিলেন। মেনু কার্ড দেখে দামী দামী ডিনারের অর্ডার দিয়েছিলেন। ওয়াইন কার্ডের দিকে একবার দিয়ে বারম্যানদের দিকে হাঁক দিয়ে বলে-ছিলেন, "হোয়াই কিলারপোয়ার হুইস্কি সঙ্গে ব্লাক পানি লে আও।" মাটির তলায় অন্ধকার সেলারে শাজাহানের সযত্ন সঞ্চিত ব্ল্যাক লেবেল, ব্ল্যাক ডগ, ডিম্পল স্কচ, ভ্যাট এবং জনি ওয়াকার এর বোতলগুলো সেদিন যেন আসন্ন সর্বনাশের আশংকায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল। ঐশ্বর্যময় শাজা-হানের মণিমুক্তো লুট করে চেঙ্গিজ খাঁয়ের দল সেদিন যখন বিদায় নিয়েছিলেন, তখন ম্যানেজারের কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা। অথচ কিছুই বলবার উপায় ছিল না। কারণ ওঁরা ম্যানেজারের একান্ত অনুরোধে কোনো কাস্টমারকে গ্রেপ্তার করেননি। গ্রেপ্তার করলেই কোর্ট-ঘর এবং কোর্ট-ঘর মানেই পাবলিসিটি। বোসদার মুখেই শুনে-ছিলাম: এই ব্যাড পাবলিসিটিকে ভয় পায় না এমন হোটেল ম্যানেজার এখনও মাতৃ-গর্ভে।

কনির শূন্য ঘরে এসে প্রথমেই সেই ভয় হলো। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ছাদে উঠে এলাম। আমার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে এল। ল্যামরেটো বলছে, "যাও। তোমার যদি এতোই দরদ থাকে, একলা যাও।"

কনি কাতর স্বরে বললে, "প্লিজ, তুমি অবুঝ হয়ো না। চলো।"

ল্যামরেটো যেন এবার ফোঁস করে উঠলো। "আমার গায়ে হাত দিও না বলছি। ভাবছো ওতেই আমি গলে যাবো!"

ফিস ফিস করে কনিকে বলতে শুনলাম "এই আস্তে, লোকে শুনতে পাবে।"

ল্যামরেটো এবার যে তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো, তা বুঝতে পারলাম। সে বললে, "কিছুতেই নয়। কিছুতেই আমি যাবো না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে আমি এবার ল্যামব্রেটোর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজায় নক করলাম। কনি এবার বেরিয়ে এল। রাত্রের শোয়ের জামাকাপড় পরে সে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তার দেহ থেকে মূল্যবান ফরাসী সেন্টের গন্ধ ভুর ভুর করে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখেই কনি যেন সব বুঝতে পারলে। আর একবার ভিতরে ঢুকে গিয়ে বললে, "গেস্টরা রেগে উঠছেন, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও।"

ল্যামরেটো মুখে হাত দিয়ে বিছানায় চুপ-চাপ বসেছিল। গম্ভীর মুখে, বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "ইউ উয়োম্যান, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। আমাকে ডিস্টার্ব কোরো না।"

একটি কুৎসিৎ দর্শন বামনের মধ্যে যে

এমন ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে পারে, তা সেদিন নিজের চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। তার সেই বিরক্ত ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কনিও যেন ভয় পেয়ে গিয়েছে। কনি যেন বুঝতে পারছে না সে কী করবে। আমি এবার ঢুকে পড়ে বললাম, "আর দেরি হলে আমাদের হোটেলে আগুন ধরে যেতে পারে।"

কনি বললে "দোহাই তোমার, চলো।"

ল্যামব্রেটা বললে, "ঠিক হ্যায়, এই শেষবারের মতো চললাম। দেখি কাল থেকে কে আমাকে ঘর থেকে বার করতে পারে।"

আমি ও কনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ল্যামব্রেটা নিজের জামাকাপড় পরতে লাগল।

কনির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। বললে, "ওর যে কী সব অন্যায় হুকুম। বলুন তো—ক্যাবারে ইজ ক্যাবারে। অভিনয়ের সঙ্গে জীবনের কী সম্পর্ক আছে। হ্যারিকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না। একেবারে ছেলে মানুষ। বলে কিনা শোতে কোনো লোকের কোলে তুমি বসতে পারবে না। তা কখনও হয়?"

কনিকে এতোক্ষণ কিছুই বলিনি। এবার বললাম, "এমন লোক নিয়ে দল তৈরি করলে আপনার জনপ্রিয়তা কমে যাবে। অভিনয়ে আপনি কী করলেন আর না করলেন তার কৈফিয়ৎ আপনি অন্য কাউকে দেবেন কেন?"

কনি বললে, "ঠিক বলেছেন। আমার মাইনে করা একটা আর্টিস্ট রোজ আমাকে জ্বালাতন করবে, এ অসহ্য।" তারপরেই যেন ল্যামব্রেটার জুতোর শব্দে ভয় পেয়ে গিয়ে বললে, "ও যেন শুনতে না পায়।"

"লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন।" অভিজ্ঞ অভিনেতার মতোই রংগমঞ্চের সামনে মাইক ধরে দাঁড়ালাম।

"গুড ইভনিং। শাজাহান হোটেলের এই মধুর সন্ধ্যায় আপনারা আশা করি আমাদের ফরাসী সেফের রান্না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চয়ন করা মদ উপভোগ করেছেন। নাউ, আই প্রেজেন্ট টু ইউ কনি। কনি, দি উয়োম্যান। আপনাদের বৈচিত্র্যময় জীবনে আপনারা অনেক উয়োম্যান দেখেছেন, কিন্তু হিয়ার ইজ 'দি' উয়োম্যান।—যা এই শতাব্দীতে ভগবান একটিই সৃষ্টি করেছেন।"

গত রাত্রের মতো আবার আলো নিবলো। গত রাত্রের সেই মানুষগুলোই আজও যেন এখানে এসে বসে রয়েছে; কিংবা যারা এখানে আসে তাদের সবারই স্বভাব এক। কেননা আজও সেই রকম গুঞ্জন উঠলো। তারপরই সেই ছন্দপতন। প্রত্যাশী মানুষদের আশাভঙ্গ। কনি দি উয়োম্যান নেই। তার বদলে বামনাবতার ল্যামব্রেটা।

কিন্তু ল্যামব্রেটা? এই মুহূর্তে তাকে দেখে কে বলবে সে কয়েক মিনিট আগেও বিছানায় পড়েছিল। কিছুতেই আসতে চাইছিল না। সেই ক্লান্ত, বদমেজাজী, বিমর্ষ লোকটা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। এ যেন অন্য একটা ইভনিং স্যুটপরা বামন তিন ফুট উঁচু টুপি হাতে বলছে, "গুড ইভনিং লেডিজ এন্ড জেন্টলমেন। আমিই কনি...মেয়ে মানুষ কনি। আমার জন্যে এই রাত্রি পর্যন্ত আপনারা যে বসে রয়েছেন এর জন্যে আমি গর্ব বোধ করছি।"

তারপরও গতকাল যা হয়েছিল, ঠিক তাই হলো। আলো নিবে গিয়ে হঠাৎ কনি কোথা থেকে হাজির হলো। সামনের সারির একজন ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, "আমার কোলে কে যেন বসেছে।"

অন্ধকারের মধ্যে বললাম, "ভয় পাবেন না। কেমন বুঝছেন।"

আজ বোধ হয় কনি লোক চিনতে ভুল করেছিল, একেবারে বুঝনদার লোকের কোলে গিয়ে বসে পড়েছিল। সে চিৎকার করে বললে, "পেয়েছি! আলো জ্বালাবেন না।"

এই রকম অবস্থায় আলো সব সময়ই প্রস্তুত থাকবার নির্দেশ বোসদা আমাকে বার বার দিয়েছিলেন। এক মুহূর্ত দেরি না করে আলোটা জ্বালিয়ে দেবার ইঙ্গিত করলাম। মঞ্চের সব আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে সবার চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠলো। বিপদের সংকেত পেয়ে আলোর দমকল যেন নক্ষত্রবেগে কোথা থেকে ছুটে এল। কনি এবার জোর করেই যেন ভদ্রলোকের কোল থেকে উঠে এল। মনে হলো কনি যেন হাঁপাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার মতো সময় কারুর ছিল না।

কনির নাচ শুরু হয়ে গেল। নাচের প্রাগৈতিহাসিক ছন্দ যেন দামামা বাজিয়ে রাতের অতিথিদের অন্তরের আদিম মানুষটাকে জাগিয়ে তুলছে। বাধা বন্ধহীন সেই অরণ্য শক্তি যেন কোট-প্যান্ট-টাই-এর খাঁচা ভেঙে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ল্যামব্রেটাও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। সুন্দরী কনির প্রতি তার অনুরাগের বিচিত্র ভঙ্গী যেন দর্শকদের দেহে আরও সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সে বেচারা যে কনির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এবং কনির মন জয় করবার জন্যে পরিশ্রম করতে করতে ঘেমে নেয়ে উঠছে তা যেন আর কারুরই বুঝতে বাকি নেই।

উপস্থিত মহিলারাও সে দৃশ্য দেখে—"ও লর্ড," বলে অর্ধনিদ্রিতে সঙ্গীদের দেহে ঢলে পড়ছেন। কিন্তু তাঁদের মুখের প্রশস্ত-প্রান্তে চাপা হাসিতেই বোঝা যায়, তাঁরা অখুশি নন। রুচির কোনো অনুশাসন দিয়ে পুরুষদের তাঁরা বেঁধে রাখতে চান না।

ল্যামব্রেটা চেষ্টা করছে কনির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার। কিন্তু কনির [illegible] দেহ যৌবন ও সৌন্দর্যের [illegible] সমস্ত এই সন্ধ্যা [illegible] সে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে।

স্টেজ থেকে নেমে এসে দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন মহিলাকে ল্যামব্রেটা সম্বন্ধে বলতে শুনলাম, "পুওর ফেলো। আহা বেচারি।"

ভদ্রমহিলার সঙ্গী বললেন, "অযথা দুঃখ কোরো না। এরা অভিনয় করছে।"

মহিলা তাঁর সঙ্গীর হাতটা চেপে ধরে, দেহটাকে তাঁর দেহের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বাজে বোকো না, ডার্লিং। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। ওর চোখে যে আগুন দেখছি, তা কিছুতেই অভিনয় নয়। আমরা মেয়ে মানুষ, সব বুঝতে পারি।"

মহিলা বোধ হয় এবার আমাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গীকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কী যেন ফিস ফিস করে বললেন। সঙ্গী আমাকে ডেকে বললেন, "এক্সকিউজ মি, কনি আর ঐ বামনটার সম্পর্ক কী?"

বলতে হলো, "দুঃখিত, জানি না।"

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "ওরা কি একঘরে রাত্রি কাটায়?"

বললাম, "না, আমরা ওঁদের দুটো ঘর দিয়েছি।"

মহিলা এবার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেন। বললেন, "তাতে কিছুই বোঝা যায় না, ডার্লিং। এ'রা তো হোটেলের লোক, এ-সব ব্যাপারে এক্সপার্ট। জিজ্ঞাসা করো।"

মধ্যবয়সী এই মহিলার রুচিহীন জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না। হোটেলে চাকরি করে আমরা যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছি। আমাদের যেন ঘর সংসার নেই, ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। লজ্জা-শরম নেই। ভদ্রমহিলা বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝলেন। মুখ বিকৃত করে বললেন, "ম্যাগো! এই মেয়েগুলোর চোখে কোনো পর্দা নেই।"

পর্দা কোথায় আছে তা সরে আসতে আসতেই দেখলাম। আমাদের সন্ধানী চোখগুলোকে অমান্য করে টেবিলের তলায় শাড়ীর পা একটা ট্রাউজারের পাকে বেপরোয়া ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। সভ্যতার এই গহন অরণ্যে একটা মাকড়সার জালের সঙ্গে আর একটা মাকড়সার জাল যেন জট পাকিয়ে গিয়েছে।

স্টেজের এক কোণে ফিরে এসে যেন নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। দর্শকের আসন থেকে, এখানে অনেক শান্তি। আমরা এখানে অনেক ভাল আছি।

কনি নাচছে। সঙ্গে ল্যামব্রেটাও নাচছে। কনির দেহের গতি ক্রমশঃ যেন বেড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ল্যামব্রেটার বেগও যেন দ্রুততর হচ্ছে। তালে তাল দিয়ে সে যেন এই রূপসী যুবতীর মন হরনের চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ভাবে বেশীক্ষণ চলতে পারে না। কনির কাছেই শুনেছি, ল্যামব্রেটার শরীর

দুর্বল। সামান্যতেই সে হাঁপিয়ে ওঠে। তা ছাড়া লম্বা ঠ্যাঙ দিয়ে যে দূরত্ব কনি একবার অতিক্রম করছে, ল্যামরেটোকে সেখানে তিনবার পা ফেলতে হচ্ছে।

কনি বোধ হয় বুঝতে পারছে, তার সংগীর দম ফুরিয়ে আসছে। কনির রুমালটা হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেল। করুণায় গদ গদ বামনটি ওটি তুলে সুন্দরীর শ্রীকরকমলে প্রত্যাপর্ণ করে যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলো। সেই মুহূর্তেই কনি তার সংগীকে কী যেন বললে। এবার কনি হঠাৎ যেন অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। দূরের দর্শকরা ভাবলেন, কনির ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে বামনাবতার বোধ হয় কোনো কুপ্রস্তাব করেছিল। কনি হঠাৎ নাচের ভঙ্গীতেই ল্যামরেটোকে তাড়া করলে। বলতে লাগল—"পাজী শয়তান, দূর হটো। দূর হটো। তোমার এইটুকু দেহে এতো কুবুদ্ধি।"

ভয় পেয়েই যেন ল্যামরেটো আরও কুঁজো হয়ে স্টেজের বাইরে এসে দাঁড়াল। আর তাকে বিদায় করে নিশ্চিন্ত হয়ে লাস্যময়ী কনি যেন তার যৌবন-নৃত্য শুরু করলো। আমার দৃষ্টি তখন কনির নাচের দিকে নেই। আমি তখন এক মনে ল্যামরেটোর দিকে তাকিয়ে আছি। ল্যামরেটো গতকাল অনেকক্ষণ ধরে নেচেছিল। আজ অনেক আগেই ফিরে এসেছে। অন্য কেউ বুঝলো না। কিন্তু আমি বুঝলাম। ল্যামরেটোর দম ফুরিয়ে আসছিল। সে আর পারছিল না। ওর সেই অবস্থা দেখেই কনি হঠাৎ নিজের রুমালটা মেঝেতে ফেলে দিলে। ল্যামরেটোর ভাঁড়ামির সুযোগ নিয়ে বললে: "তুমি এবার বিশ্রাম নাও।"

ল্যামরেটোর যে বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, তা তার দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। বেচারা হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। ঘামে দেহের জামাকাপড় গুলো ভিজে উঠেছে।

কনির কিন্তু ক্লান্তি নেই। ল্যামরেটোকে বিদায় করে দিয়ে সে আবার দম দেওয়া লাট্টুর মতন নাচতে শুরু করেছে। মমতাজ-এর সব আলোগুলো কখন নিবে গিয়েছে। শুধু একটা রঙীন আলোর রেখা কনির অর্ধ উলংগ দেহের উপর পড়ে তাকে আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে। সেই আলোয় কনি ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মিস্টার গোমেজ এবং তাঁর ছেলেদের তৈরি-করা, শব্দ শতাব্দী-প্রাচীন এই ঘরকে প্রাণময় করে রেখেছে। কিন্তু তাদের কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকার ল্যামরেটো ও আমাকেও যেন কখন কালো রেখা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে।

ল্যামরেটো নিজেকে একটু সামলে নিয়েছে মনে হলো। আমার দিকে সে এবার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেই অন্ধকারেও মনে হলো তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। ফিস ফিস করে সে আমাকে

বললে, "যে লোকটার কোলে কনি প্রথমে গিয়ে বসেছিল, তাকে তুমি চিনতে পারবে?"

বললাম, "কেন?"

"ওর মাথায় আজ আমি সোডার বোতল ভাঙবো। আমাকে তোমরা এখনও চেনোনি। লোকটা কনিকে খামচে দিয়েছে। ওর লেগেছে।"

আমি বললাম, "রাগ করবেন না। চুপ করে থাকুন।"

ল্যামরেটা বললে, "আব্দার নাকি? এভাবিতয়ার শুধু লোকরা আমাদের উপর অত্যাচার করবে, আর আমরা সহ্য করে যাবো!"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "মিস্টার ল্যামরেটা আপনার সঙ্গে ডিবেটিং করবার মতো সময় আমার নেই। এই যে হলঘরে এতোগুলো লোক দেখছেন, তাদের মর্জির উপর আমার চাকরি নির্ভর করছে। এরা যদি কোনোরকমে অসন্তুষ্ট হয়ে খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাবো।"

ল্যামরেটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "ইফ দে ক্যান্ট, ইউ স্টার্ভ। কিন্তু খেতে আরম্ভ করে ওরা যে কনিকে খেয়ে ফেলবে। তখন?"

হা ঈশ্বর, এ কোন পাগলের হাতে পড়লাম। তোমরা এখানে নাচতে এসেছো। তার জন্যে আমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমরা অনেক টাকা নিচ্ছো। অনেক টাকা দিতে হচ্ছে বলে মালিকরা খাবার ও মদের দাম বাড়িয়ে দিয়ে আরও টাকা তুলে নিচ্ছেন। এর মধ্যে আমরা, দরিদ্র কর্মচারীরা, কোথা থেকে আসি? আমাকে আমার কাজ করতে দাও। চিৎকার করে বলতে দাও, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, শাজাহান হোটেলের তরফ থেকে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনাদের ক্লান্ত দেহ এবং মনকে দুদণ্ডের শান্তি দেবার জন্যেই আমরা এখানে সামান্য আয়োজন করেছি।'

এর মধ্যে কোথাকার তুমি হরিদাস পাল আমাদের বিরক্ত করতে আসছো কেন?

ল্যামরেটা আমার ব্যবহারে বোধ হয় আরও বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললে, "দেখাচ্ছি। তোমাদের মজা আমি দেখিয়ে ছাড়বো।"

ইতিমধ্যে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে। শাজাহান হোটেলের ইলেকট্রিসিয়ান আমার ইঙ্গিতে সুইচ টিপে প্রায় নিরাবরণ কনিকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছে। তার পরের মুহূর্তেই আবার আলো জ্বলে উঠেছে।

স্ক্রিনের পিছনে এসে একটা আলখাল্লা পরে, কনিও তখন হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলে, "হ্যারি কোথায়?"

আমি বললাম, "ওঁকে ঠিক রাখা আমাদের মতো সামান্য লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।"

কনি মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে নিজের ডান হাতের কনুইয়ের কাছে হাত বোলাতে লাগল। হাত বোলাতে বোলাতে বললে, "তোমাদের এখানে অনেকে এতো ড্রিংক করে বসে যে মাথার ঠিক রাখতে পারে না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আউট হয়ে গিয়েছিলেন।"

আমি কনির মুখের দিকে তাকালাম। কনিও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ ভাবে বললে, "একটু আয়োডিন দিতে পারো? ভদ্রলোক বোধ হয় নখ কাটেন না। এমন ভাবে খামচে দিয়েছেন যে হাতটা জ্বালা করছে।"

ল্যামরেটা এবার কোথা থেকে এসে হাজির হলো। বললে, "ভদ্রলোক? কাদের তুমি ভদ্রলোক বলছো কনি?"

দেখলাম ল্যামরেটা কোথা থেকে একটু তুলো এবং আয়োডিন জোগাড় করে এনেছে। কনির হাতটা ধরে পরম যত্নে সে আঁচড়ানো জায়গাটা স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল।

কনি চোখ বুজে বললে, "উঃ। হ্যারি, আমার লাগছে।"

ল্যামরেটা গম্ভীরভাবে বললে, "শয়তান-দের মাথায় ভগবানের অভিশাপ নেমে আসুক।"

কনি শান্ত হয়ে, নিজের জ্বালা ভুলে গিয়ে বললে, "ছিঃ হ্যারি, ভগবানের নামে কাউকে গালাগালি দিতে তুমিই না আমাকে বারণ করেছিলে?"

হ্যারি বললে, "একদম বাজে কথা। এই ডেভিলদের সর্বনাশের জন্য তুমি যা খুশি করতে পারো। গড় তোমাদের কোনো-রকমে বাধা দেবেন না। তিনি তোমাদের উপর মোটেই অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং, আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ, তিনি সুখী হবেন। তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।"

এতোদিন পরে, আজও লিখতে লিখতে, আমি যেন কনি ও সেই কুৎসিত দর্শন ল্যামরেটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মানুষের এই সংসারে ঈশ্বরের আশীর্বাদে কত বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে এলাম। কিন্তু সু এবং কু: ন্যায় এবং অন্যায়ের এই অপরূপ প্রদর্শনীতে স্রষ্টার যে কি পরি-কল্পনা রয়েছে তা আজও আমার কাছে পরিস্ফুট হলো না।

আজও আমার চোখের সামনে সেই রাত্রের দৃশ্যটা হঠাৎ পুরনো চলচ্চিত্রের নতুন প্রিন্টের মতো উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। আমি দেখি ল্যামরেটা ঈশ্বরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছে, "ও লর্ড, কার্স দেম। হে ঈশ্বর, এদের তুমি অভিশাপ দাও। তোমার ধিক্কার বজ্রসম এই ঐশ্বর্যময় অথচ কুৎসিত সভ্যতার উপর নেমে আসুক।"

কে জানে এক অর্ধ উন্মাদ বামনের সেই কাতর প্রার্থনা উদাসী সৃষ্টিকর্তার কানে পৌঁছেছিল কিনা। হাজার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে

বিচিত্র ভাষায় অপমানিত মানবাত্মা বারবারই তো সেই একই কাতর আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে কি?

ন্যাটাহারিবাবু একবার বলেছিলেন, "ভগবান? ও'র নাম করবেন না, মশাই। উনিও আর এক গবরমেণ্ট। ঠিক গবরমেণ্ট আপিসের মতো ও'র কাজ কারবার। ও'র আপিসে যদি কোনোদিন যান, দেখবেন হাজার হাজার পিটিশন রোজ এসে জমা হচ্ছে।

ভগবানের কর্মচারিরা সব 'নো অ্যাকসন। মে বি ফাইল্ড' লিখে ফাইলে ফাইলে ঢুকিয়ে রাখছে। সে-সব ফাইলের পাহাড়ে ধুলো জমছে। কস্মিন কালে কেউ কোনোদিন সে-সবে হাত দেয় না।"

ন্যাটাহারিবাবু আরও বলেছিলেন, "হাসছেন মশায়? রক্ত গরম আছে, মনটা কচি কচি আছে, ফিক করে হেসে নিন। একদিন কিন্তু কাঁদতে হবে, মশাই। বলে রাখলাম, শুধুই কাঁদতে হবে। তখন বিশ্বাস হবে আমার কথা। তখন জানতে পারবেন, ভগবানের আপিসে আর একটুও জায়গা নেই। সব ফাইলে ফাইলে বোঝাই হয়ে গিয়েছে। কত বড় বড় লোকের ফাইল সেখানে পাথরের মতো অচল হয়ে পড়ে আছে—আর আপনি ভাবছেন আপনার ফাইল, এই ন্যাটাহারি ভট্টাচার্যির ফাইল ভগবান মন দিয়ে দেখবেন। ভগবানের টাইম নেই মশাই। পেটি কেস ডিসপোজালের টাইম অতোবড়ো অফিসারের থাকতে পারে না।"

হয়তো আমার ছেলেমানুষী। হয়তো এমন মন নিয়ে শাজাহান হোটেলে চাকরি করতে যাওয়া আমার মোটেই উচিত হয়নি। কিন্তু ল্যামব্রেটা ও কনিকে স্টেজের পিছনে একলা রেখে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল গডের অফিসে আর একটা ফাইল বাড়লো। ল্যামব্রেটা সায়েবের পিটিশন সেখানে গিয়ে রেজিস্ট্রি হবে। কিন্তু কে জানে বোধ হয়, ওই পর্যন্তই। ওই-খানেই আবেদনের মৃত্যু। ল্যামব্রেটা সায়ের অপেক্ষা করবে। কনি অপেক্ষা করবে। ভাববে, এইবার বোধ হয় খবর আসবে। তারপর একদিন অপেক্ষার শেষ হবে। কনির যৌবনে ভাঁটার টান পড়বে। ল্যামব্রেটো সায়েবের ভাতে টান পড়বে। শাজাহান কেন, পৃথিবীর কোনো ক্যাবারেতেই তাদের আর দেখা যাবে না। নতুন কনি, নতুন কোনো বামনের সঙ্গে লীলায়িত ভঙ্গীতে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াবে। তারাও আবার মদে মত্ত অতিথিদের আহ্বান জানিয়ে বলবে, "গুড্ ইভনিং, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন।"

জেন্টলমেনরা উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। তাঁদেরই মধ্যে কে আবার তাঁর হিংস্র আদিম নখ দিয়ে সেদিনের কনিকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবেন। সেদিনের বামন ল্যামব্রেটোও হয়তো আজকের মতোই অধৈর্য হয়ে আবার আবেদন জানাবে। কিন্তু কিছুই হবে না। আবার ফাইল খোলা হবে। আবার বিচারের প্রত্যাশায় অধীর ল্যামব্রেটো দিন গুনতে থাকবে।

কিন্তু এ সব কি আমি ভাবছি? আমি হোটেলের রিসেপশনিস্ট। আমার এখন অনেক কাজ আছে। বামন নর্তকী যখন কিছুক্ষণের বিশ্রামের জন্য জনচক্ষুর অন্তরালে গিয়েছেন, তখন আমার বিশ্রামের সময় নয়। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করবার জন্যে সমাজ আমাকে মাইনে দিয়ে রাখেন নি। বড় বড় চিন্তা করবার জন্যে, মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল না ম্লান, আশাপ্রদ না নৈরাশ্যপূর্ণ তা নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে অনেক পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ে, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, জাতীয় গবেষণাগারে ব্যস্ত রয়েছেন। আমার কাজ অন্য। এখনই আমার মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। সেখানে বিনয়ে বিগলিত হয়ে আমাদের উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্র-মহিলাদের জানানো উচিত, 'কনি দি উয়োম্যান এখনই আসবেন। মাত্র কিছুক্ষণ আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। আমাদের বেয়ারাদের হুকুম দিয়ে মদিরা আনুন। তারপর আবার সে আসছে।'

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। শাজাহান হোটেলের ক্যাবারে অ্যানাউন্সার, আমার আরও কাজ আছে। সেই কাজ এখন আমাকে ধীর মস্তিষ্কে, সার্কাস পার্টির ক্লাউনদের মতো নিপুণভাবে করতে হবে। সেই সব কাজ কেমনভাবে আমি করতে পারি, তার উপরই আমার চাকরির ভবিষ্যৎ। তার উপরই নির্ভর করবে, শাজাহান হোটেলের বিনামূল্যে বিতরিত অন্ন আমার টেবিলে কতদিন এসে হাজির হবে।
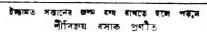
[ক্রমশ]

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১০৪)
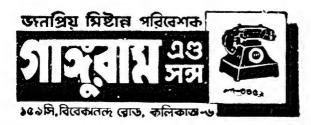
কলকাতার দিন তখন থম-থমে, রাত তখন নিথর। দীপংকর কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু কলকাতা থেমে থাকেনি। তখনও ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে মিলিটারি-কণ্ট্রাক্টারের বাড়ির সিন্দুকে লক্ষ লক্ষ টাকা এসে জমছে। টাকার স্রোত বয়ে চলেছে। অঘোরদাদুর লক্ষ টাকার সোনা-জহরত ছিল, তাতে এসে মিশলো মিলিটারি ক্যাপিট্যাল। সেই ক্যাপিট্যাল সোনা হয়ে হীরে হয়ে মুক্তো হয়ে জমতে লাগলো দিনের পর দিন রাতের পর রাত। দীপংকরের নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের ইস্পাতের চাকার শব্দের মত তাতে ঠুং-ঠাং শব্দ হতে লাগলো। কলকাতার অন্ধকার নিথর রাতে কান পেতে থাকলে শোনা যেত সেই অদ্ভুত শব্দ। কিসের শব্দ বোঝা যেত না। কিন্তু মনে হতো — কেউ যেন অতি সন্তর্পণে ধারালো ছুরিতে আরো ধারলো শান দিচ্ছে—

আর শেষ হয়ে গেল মানুষের হাতে গড়া এক ভয়াবহ যুদ্ধ। ছ'বছর একুশ ঘণ্টা তেইশ মিনিটের লড়াই। চার্চিল সাহেব সখেদে বললে—

'What is Europe now ? It is a rubble heap, a charnel house, a breeding place of pestilence and hate.'

লক্ষ লক্ষ টন ঘৃণা আর কোটি-কোটি টন প্রতিশোধ-স্পৃহার ভারে মানুষের মনের দরজায় এসে নামলো শান্তি। কবরের শান্তি। কোথাও যুদ্ধ নেই কোথাও গুলী-বারুদ-বোমার শব্দ নেই, তবু চারিদিকে ধূমায়িত হাহাকার আর আক্রোশ। রুজভেল্ট সাহেব বিবৃতি দিলে—

—The mere conquest of our enemies is not enough. We must go on to do all in our powers to conquer the doubts and fears, the ignorance and the greed, which made this horror possible.

সেই সন্দেহ আর ভয়, অজ্ঞতা আর লোভ দূর করতেই একদিন ওয়ার্ধার আশ্রমের সামনে এসে দাঁড়াল একজন অচেনা মানুষ। কোমরে তার রিভলবার কিন্তু হাতে একটা চিঠি।

—কে চিঠি লিখেছে?

লিখেছে এইচ-ই ফিল্ড মার্শাল দি রাইট অনারেবল ভাইকাউন্ট ওয়াভেল অফ সাইরেনাইকা এন্ড উইনচেস্টার পি সি, জি-সি-বি, জি-এম-এস-আই, জি-এম-আই-ই, সি-এস-জি। ইত্যাদি ইত্যাদি। নামের চেয়েও বড় তার পদবী। আর তারপর দেখা গেল একজন ন্যাংটো ফকির ভাইসরয়ের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। ইন্দ্রপ্রস্থের ময়ূর সিংহাসনের সামনে গিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন—আমার নাম—এম-কে-গান্ধী।

আর ওদিকে পুণা জেলখানা থেকে ছাড়া পেলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, আচার্য নরেন্দ্র দেব, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আবুল কালাম আজাদ, প্রাণমথ-বাবু। আর ছাড়া পেলেন ফটিক ভট্টাচার্য। ফোঁটা।

ইতিহাসের নিয়ম বড় অদ্ভুত। সে নিয়ম বাইরে থেকে দেখা যায় না। বাইরে থেকে তাকে বদলানোও যায় না। সে নিয়ম যখন বাইরে প্রকাশ হয় তখন অবাক হয়ে লোকে ভাবে, এ কেমন করে হলো। নেপোলিয়নের নিয়মে হিটলার কি চার্চিল কি রুজভেল্টের বিচার করলে তাই ভুল হয়। অথচ শাস্ত্রে বলে বিধাতার নিয়ম বড় যথাযথ, বড় অমোঘ, বড় শাশ্বত। ইতিহাস-বিধাতার সেই নিয়মের যেখানে ব্যতিক্রম করবার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই ঘটেছে বিরোধ। একজন মানুষ সমস্ত পৃথিবীর মুখের চেহারা বদলে দিতে গিয়েছে, তারপর সেই অমোঘ ইতিহাস-বিধাতার বিধানে কখন যে সে নিজেই পৃথিবী থেকে মুছে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে তার হিসেব কোথাও লেখা নেই। একদিন ইন্ডিয়ার লোক প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিয়েছে চার্চিলকে, অভিশাপ দিয়েছে হিটলারকে, অভিশাপ দিয়েছে মুসোলিনী তোজো সকলকে। তাদের সকলেরই বিচার হয়েছে নুরেমবুর্গ কোর্টে। গোয়েবলস গোয়েরিং রিবেনট্রপ — তারাই হয়ে গেল পৃথিবীর এনিমি নাম্বার ওয়ান। আর চার্চিল হলেন পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। মানুষের পৃথিবীর ইতিহাস তাই শুধু বিজেতাদের ইতিহাস, সম্রাটকন্যাদের ইতিহাস, সাকসেসফুলদের ইতিহাস। কিন্তু যারা হেরে গেল? সেই হেরে যাওয়া মানুষদের

প্রতিনিধি হারম্যান গোয়েরিং বললেন—আর কেউ দোষী নয়, পৃথিবীর যা কিছু অপকর্ম সমস্তর জন্যেই আমি একলা দায়ী।
I am responsible for German re-armament, I always wanted bombers for bombing the United States. I personally gave the orders to bomb Warsaw, Rotterdam and conventry. I do not propose in any way to hide behind the fuehrer.

কলকাতার রোয়াকে আবার জটলা। দীপঙ্কর কলকাতায় নেই বলে তো কলকাতা থেমে থাকতে পারে না! মধুসূদনের রোয়াকে দুনিকাকা, পঞ্চাদা, মধুসূদনের বড়দা আবার খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। গান্ধী-জিন্না ওয়াভেল এর ব্যাপার নিয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে আড্ডায়-আড্ডায়। ব্রিটিশ-গভর্মেণ্ট কি চলে যাবে নাকি! বলে কি? দুনিকাকা যেন কেমন ঘাবড়ে গিয়েছে ব্যাপার-স্যাপার দেখে। শেষকালে কি সত্যিই চলে যাবে সাহেবরা আমাদের অনাথ করে?

পঞ্চাদা বলে—এইবার? এইবার কী হবে দুনিকাকা? সাহেবরা যে চলে যাচ্ছে, তোমার কী হবে?

দুনিকাকা বিরস মুখে কাগজ পড়ছিল। বললে—ভালোই তো, ভালোই তো! গেলে তো ভালোই! আমি কি আর স্বরাজ চাই না বলতে চাস্? কংগ্রেস যদি দেশ চালাতে পারে তো চালাক না আমি কি খারাপ বলছি?

মধুসূদনের বড়দা বললে—আলবাৎ চালাবে! চালানোটা কী এমন হাতী-ঘোড়া কাজ শুনি? সব তো করবে আই সি এস্'রা, দেখবে সব শালাদের মুখ চুন হয়ে যাবে এবারে। এবার গান্ধী আবার চালের দাম তিন টাকা করে দেবে, ভাইস্‌রয়ের মাইনে হয়ে যাবে পাঁচ শো টাকা মাসে—

—ভাইসরয় কে হবে তাহলে?

—যে-ই হোক, নেহরুই হোক আর গান্ধীই হোক আর বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদই হোক, পাঁচশো টাকার বেশি মাইনে নিতে কংগ্রেস অ্যালাও করবে না—আর যারা অ্যাদ্দিন ব্ল্যাক্-মার্কেট করেছে তাদের কী করবে জানো তো?

—কী করবে?

কী করবে তা জহরলাল নেহরু বলেই দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৫ই অক্টোবর লখ্‌নৌতে পণ্ডিতজী বক্তৃতা দিয়েছেন—
– There is much talk about war-criminals. The time is not far off when we shall prepare one list of anti-national criminals, those who mercilessly crushed the spirit of our patriots, who opened fire on them who accepted bribes and sucked the blood of the poor. We shall never forget them.

রেলের আফিসেও সবাই লাফিয়ে উঠেছে। এবার? এবার সাহেবদের পাত্‌তাড়ি গুটোতে হবে ইণ্ডিয়া থেকে। তিন হাজার চার হাজার টাকা মাইনে নিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে বসে আর হুকুম করা চলবে না বাছাধনদের। দিনের পর দিন ওয়াগন ভর্তি করে বোমা-বারুদ পাঠিয়েছে আসাম ফ্রণ্টে। সেখানে জাপানীরা মণিপুরে এসে ঢুকে পড়েছে। দিন নেই রাত নেই কণ্ট্রোলাররা ট্রেন পাঠিয়েছে সোল্‌জার ভর্তি করে। তোজোকে আসতে দেওয়া হবে না। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লট্‌কে দিয়েছে জাপানকে রুখতে হবে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেদিন কেউ জানতে পারেনি সে তোজো নয়, সে সুভাষ বোস। সেই সুভাষ বোসই তখন নেতাজী হয়ে গেছেন।

একদিন ঈশ্বর গঙ্গুলী লেন আবার জম-জমাট হয়ে উঠলো। অঘোর সৌধের সামনের রাস্তায় গাড়ির পর গাড়ি জমে ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। ফুলের মালা হাতে করে কালিঘাট ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা ভিড়

সরাতে লাগলো। কালিঘাট কংগ্রেসের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। জওহরলাল নেহর্, আবুল কালাম আজাদ, নরেন্দ্র দেও, সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে প্রাণমথবাবুও ছাড়া পেয়েছেন। আর ছাড়া পেয়েছেন কালিঘাটের ছেলেদের ফোঁটাদা!

ফুলের মালায়-মালায় ফোঁটাদাকে ভালো করে দেখাই যায় না। স্টেশন থেকে গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আসতে আসতে চারদিকের জনতাকে মাথা নিচু করে প্রণাম করেছে। বাড়ির সামনে আসতেই ভিড়ের চাপ আর রোখা গেল না। সবাই একসঙ্গে দেখতে চায় শত্রুদিকে। প্রাণমথবাবু বুড়ো মানুষ। তিনি নিজের বাড়ির সামনেই নেমে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির সামনে অত ভিড় নেই। তবু সবাই জানতে চায়—মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছে কি না। জিন্নার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে!

সেদিন সবাই মিলে ধরে বসলো—ফোঁটাদা, আপনি দাঁড়িয়ে কিছু বলুন আমাদের—

ফোঁটা তখন দাঁড়িয়ে উঠলো। সেই [illegible] নিয়ে নিলো। বাড়ির উঠোনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে উঠে বললে—ভাই, [illegible] বলছি। [illegible] আপনাদের [illegible] কিছু আমাকে [illegible] আমি আজ পাঁচিশ বছর ধরেই জেল খেটে আসছি। জেল খাটতে [illegible]। কিন্তু আজ জেল থেকে বেরিয়ে আমি আপনাদের যে একটা সুখবর শোনাতে পারবো, এইটেই আনন্দের কথা। আমি আজ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি আমাদের এই আন্দোলনে ব্রিটিশ-সিংহ ভয় পেয়ে গেছে। স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হয়েছে। যে স্বাধীনতার জন্যে দেশবন্ধু সি আর দাশ, বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গোখলে, লালা লাজপৎ রায় জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু যে স্বাধীনতা আনতে পারেননি, সেই স্বাধীনতা আমরা আজ আনতে পেরেছি অহিংস-সংগ্রাম করে। অহিংসার প্রতিমূর্তি গান্ধীজীর কাছে আজকের ব্রিটিশ-সিংহ হার স্বীকার করেছে। এখন মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া হলেই ব্রিটিশরা এখান থেকে চলে যাবে। মহাত্মা গান্ধীকে লর্ড ওয়াভেল যে চিঠি লিখেছে, সে চিঠিও আমাকে দেখিয়েছেন গান্ধীজী। আমি নিজের চোখে সে চিঠি দেখেছি। আপনারা আর কিছুদিন ধৈর্য ধরুন। অহিংসায় বিশ্বাস রাখুন। তারপরে আমি দিল্লীতে যাবো। তখন আপনারা সমস্ত জানতে পারবেন—বন্দে মাতরম্—

সবাই ফোঁটাদার গলায় সুর মিলিয়ে এক-সুরে চিৎকার করে উঠলো: বন্দে মাতরম—

প্রাণমথবাবুর বাড়ির ঘরখানার ভেতরেও লোক-জনের আনাগোনার শেষ নেই। পাড়ার কংগ্রেসীরা সামনে এসে ভিড় করে থাকে দিনরাত। প্রাণমথবাবু কিছু বলেন। আবার কিছু বলেনও না। বলেন—কিন্তু আমার মনে হয় এর অন্য কারণ। এত লোক জেল খেটেছে বলেই যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দিচ্ছে তাও ঠিক নয়—

সবাই জিজ্ঞেস করে—তাহলে আসল কারণটা কী?

প্রাণমথবাবু বলেন—আসল কারণটা সন্দেহ করি অন্য। এতদিনের যুদ্ধের পর আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্মির পাঁচিশ লক্ষ লোক দেশে ফিরে আসছে, তারা বেকার হয়ে যাবে তখন, তাদের ভয়েই চলে যাচ্ছে ওরা। আজকাল আর্মির ভেতরেও যে স্বদেশীর বিষ ঢুকেছে। সে ওরা সার্ভে করে দেখেছে। আর তা ছাড়া.....

—তা ছাড়া কী?

—তা ছাড়া, সুভাষবাবুকেই ওদের আসল ভয়। সুভাষবাবুই গান্ধীজীর কাজটা আরও সহজ করে দিয়েছেন! জেনারেল অকিন্-লেকের কথা পড়েও তাই মনে হয়।

তাহলে যারা ওয়ার প্রিজনার তাদের কী হবে? [illegible] আলীর কী হবে? [illegible] কী হবে? তারাও তো [illegible] পথ বেছে নিয়েছিল?

প্রত্যেক কংগ্রেসী আড্ডায় এমনি আলোচনা চলেছে। তখন সমস্ত দেশের লোক গান্ধীজীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। প্রাণমথবাবু বলেন—গান্ধীজী কন্‌ডিশন দিয়েছেন লর্ড ওয়াভেলকে যে যে-সব লোককে ধরা হয়েছে, তাদের বিচার করতে হবে ওপন্ কোর্টে, তবে তিনি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কথা শুরু করবেন—

সে-সব দিন বড় থম্‌থমে, রাতগুলো বড় নিথর। যারা সুভাষবাবুর দলে যোগ দিয়েছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? শা নওয়াজ খাঁ, ক্যাপ্টেন ধীলন, লক্ষ্মীবাঈ, সর্দার জীবন সিং—সকলকে? সুভাষ বোস যদি ধরা পড়ে—তাকেও?

কলকাতা থেকে ওয়ার্ধা, মাদ্রাস থেকে ওয়ার্ধা, বোম্বাই থেকে ওয়ার্ধা, লণ্ডন থেকে ওয়ার্ধা। সমস্ত ইণ্ডিয়া তখন ওয়ার্ধায় এসে মিশেছে। সেখানে চার্চিলের ন্যাংটো ফকির চরকায় সুতো কাটতে কাটতে টেলিগ্রাফ আর চিঠিগুলো পড়ে। লণ্ডনের খবরের কাগজের লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে—চার্চিল আপনাকে কী বলেছে, আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি।

তারপর চরকায় সুতো কাটতে কাটতে চিঠির খসড়া লিখলেন, -

Dear Mr. Churchill, you are reported to have a desire to crush the simple "Naked Fakir." I have been long trying to be a Fakir and that naked a more difficult task. I approach you to trust and use me for the sake of your people and mine and through them, those of the whole world.

প্রাণমথবাবু ওয়ার্ধা যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। ওদিক থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। প্রাণমথবাবুর আর সে-শরীর নেই। সেই পান-ভর্তি মুখ, সেই গোড়ালি দোমড়ানো জুতো। হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো গোবিন্দ। বললে—

একটা টেলিগ্রাম আছে বাবু—

—টেলিগ্রাম? আবার কার টেলিগ্রাম রে?

তাড়াতাড়ি খামটা খুলে দেখলেন—নিচেয় নাম লেখাঃ দীপংকর।

দীপংকর মস্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে শিলিগুড়ি থেকে। লিখেছে—স্যার, কাগজে দেখলাম আপনি গান্ধীজীর কাছে যাচ্ছেন। আপনার সেখানে অনেক কাজ জানি। কিন্তু আমার একটা কাজের ভার দিলাম আপনাকে। আপনি কিরণকে চেনেন। সে কংগ্রেসের কেউ নয়, কিন্তু আপনার ছাত্র, আর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আজ ফাঁসির আসামী। জানি গান্ধীজী অহিংসার পূজারী। কিন্তু তিনি হিম্মতের কদর বোঝেন। তার কথাটাও একবার তুলবেন তাঁর কাছে। তুললে তিনি নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবেন। সে-ও আপনাদের মত দেশকে ভালবেসেছিল—ইতি, দীপংকর!

প্রাণমথবাবুর সব মনে পড়লো। বললেন, —চল।

গাড়ি চলতে লাগলো। হাওড়া স্টেশনের দিকে চলেছেন প্রাণমথবাবু। সঙ্গে অনেক কংগ্রেসের ফাইল। সেই ফাইলের মধ্যেই টেলিগ্রামখানা ঢুকিয়ে নিলেন। তীর্থে সবই পুণ্য। তীর্থযাত্রীর কাছে পাপ পুণ্য সব সমান। প্রাণমথবাবু আর একটা পানের খিলি মুখে পুরে দিলেন।

কিন্তু হাওড়া স্টেশনের কাছে গাড়িটা যেতেই হঠাৎ ভিড়ের সামনে গাড়িখানা থমকে থেমে গেল। কী হয়েছে? ট্রেন মিস্ করবেন নাকি? এত ভিড় কীসের হে এখানে? কিন্তু কে-কার কথা শুনেছে। হৈ-চৈ হট্টগোল, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি সমস্ত অচল হয়ে গেছে। হঠাৎ যেন বোঝা গেল। আরো কয়েকটা লোক ওদিক থেকে দৌড়ে এল হাত উঁচু করে। টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম!!

—কীসের টেলিগ্রাম?

অনেকগুলো হকার চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এল—নেতাজী মর গিয়া, নেতাজী মর গিয়া......

সেই আর্তনাদে কলকাতার থমথমে দিন যেন আরো থমথমে হয়ে গেল। কলকাতা এতদিনে সত্যিই যেন থেমে অচল হয়ে গেল। নির্বাক হতবুদ্ধি প্রাণহীন কলকাতার মানুষ ভাবতে ভুলে গেল, কাঁদতে ভুলে গেল। যে সুভাষ বোসের জন্যে এতদিন প্রতীক্ষা করেছে ইণ্ডিয়ার মানুষ, তার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত কলকাতাও নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। কান্নায় নিঃস্তব্ধ আর্তনাদ করে উঠলো সমস্ত অন্তরাত্মা!

রামমনোহর দেশাই ক্যাপিট্যালিস্ট লোক। ব্যবসাদার। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট! দেশে কংগ্রেসই আসুক আর হিন্দু মহাসভাই আসুক, তাতে কিছু এসে যায় না তার। দেশাইজী ভেতরে-ভেতরে চাঁদা দিয়েছে কংগ্রেসকে। বেয়াল্লিশ সালে কংগ্রেসীরা
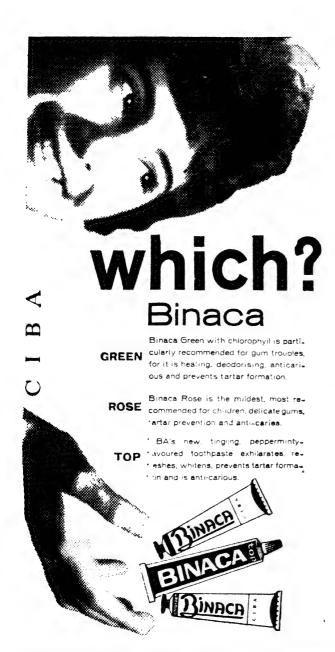
এসে তার কাছ থেকে হাজার-হাজার টাকা নিয়ে গেছে। গান্ধী-রাজই হোক আর চার্চিল-রাজই হোক, যে-রাজা হবে তাকেই চাঁদা দিতে হবে মশাই। ব্যবসার এই নিয়ম। তোমাদের বাঙলা-মুলুকে কারবার করতে এসেছি, তোমাদের কাছে নিমক্-হারামী করতে পারবো না। মুসলীম লীগ রাজা হলে তাকেও চাঁদা দেব! আমি কি তোমার পর? শুধু আমার কারখানায় ধর্মঘট হলে তোমরা দেখো, তখন যেন আমায় বিদেশী বলে হেলা-ফেলা কোর না।

সেদিন গদীবাড়িতে ক্যাশ বাক্সের সামনে বসতেই টেলিফোন বেজে উঠলো।—কে?

ওদিক থেকে উত্তর এল—ঘোষাল স্পীকিং!

—হুজুর, আপনি?

আর একটু হলেই গদী থেকে লাফিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত দেশাইজী। খুব সামলে নিয়েছে।

—কবে ফিরে এলেন হুজুর?

—শুনুন, [illegible] আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে দেশাইজী! আমার প্যালেস্-কোর্টে একবার আসুন এখনি!

—জরুর, জরুর, আমি এখনি যাচ্ছি হুজুর।

—সঙ্গে করে হাজার পাঁচেক টাকা আনবেন আমার জন্যে দেশাইজী!

প্যালেস্-কোর্টের সিঁড়িতে মকবুল, যতীন, জগন্নাথ আবার এসে দাঁড়িয়েছে। আজ প্রায় আধ-ফাঁকা হয়ে গেছে প্যালেস্-কোর্ট। যে-ক'জন ইউরোপীয়ান ছিল এখনকার টেনেন্ট, তাদের কয়েকজন ইণ্ডিয়া ছেড়ে হোমে চলে গিয়েছে। হোম, সুইট্ হোম। কেউ কেউ গেছে সাউথ্ আফ্রিকায়, কেউ গেছে কানাডায়, আবার কেউ গেছে হোয়াইট্ অস্ট্রেলিয়ায়। কারো-কারো আবার যাবার তোড়-জোড় করছে। এবার ইণ্ডিয়া যাবার [illegible]।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার এবার কোলাপ্স্ করলো বলে। পেথিক্ লরেন্সের কথা-বার্তা শুনে তাই মনে হচ্ছে। আবার নতুন কোনও কলোনীতে গিয়ে সেটল্ করতে হবে। মিস্টার গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে কি না ইণ্ডিয়ার ভাইসরয়! হোয়াট্ এ ডিস্গ্রেস্! হোয়াট্ এ শেম্! প্যালেস্-কোর্টের বয়-বাবুর্চি-খানসামাদের মুখও চুন হয়ে গিয়েছে। সাহেবরা চলে গেলে খাবে কী? কে এত বখশিশ দেবে? কারা এত টিপস্ দেবে? মকবুল, যতীন, জগন্নাথের মুখও শুকিয়ে গিয়েছে। সাহেবরা চলে গেলে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট যে কানা হয়ে যাবে। ফিটন্-গাড়িতে চড়ে আর মেম-সাহেবরা ঘুরে বেড়াবে না। সুইট্-সিল্কটীন বলে আর কাদের তারা পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে দালালি করবে? ঘোষাল-সাহেবও ছিল না। বলতে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল মকবুলের দল। কিন্তু ঘোষাল-সাহেব ছাড়া পেতেই যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। দল বেঁধে এসে হাজির হলো পীরালির কাছে। পীরালি গিয়ে খবরটা দিতেই সাহেব ক্ষেপে উঠেছে একেবারে। ভেতর থেকে সাহেবের চিৎকার শোনা গেল—গেট্ আউট্, গেট্ আউট্ ভাগাও হিঁয়াসে—ভাগাও—

পীরালি সামনে এসে বললে—তুমলোক যাও ভাইয়া, সাহেবের গোসা হয়েছে—

মকবুল বললে—গোসা হয়েছে তো কী হয়েছে? কাজ-কাম্ হবে না? আমরা না-খেয়ে মরবো?

পীরালি বললে—সাহেবেরই কাজ-কাম নেই তো তোদের কথা ভাববে কখন? তোরা এখন বাহার যা—

কিন্তু মকবুলেরা জানে। তাই অত সহজে ওরা ঘাবড়ায় না। ওরা জানে সাহেব-লোকদের এ-রকম একটু অভ্যেসই। তামাম দুনিয়াটাই সাহেবদের। একটা টেলিফোন করে দেবে সাহেবদের অফিসে আর কাজ হয়ে যাবে। সাহেবদের নোকরির একটা থাকবেই। ওদের টাকা না থাকলে ওদের পেটে ভাত জোটে না, কিন্তু সাহেবদের টাকা না থাকলেও হুইস্কি-ব্রাণ্ডি-বীয়ার-এর অভাব হয় না কোনওদিন। সাহেবরা বেঁচে থাকবেই। সাহেবরা আছে বলেই তো মকবুলেরা আছে। সাহেবরা না থাকলে তারাও থাকবে না।

ক'দিন ধরেই আসা-যাওয়া চলছিল। কয়েকদিন ধরেই সাহেব টেলিফোনে বাত-চিত করতে লাগলো। আবার গাড়ি আসতে লাগলো সাহেবের কাছে। আবার সাহেবের বাড়ি ফিরতে রাত হতে লাগলো। আবার সাহেব ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে যাতায়াত করতে লাগলো। যখন বাড়ি ফিরতে লাগলো তখন আবার বেহেড।

রাম মনোহর দেশাইজী আবার টাকা নিয়ে আসতে লাগলো। আবার বখশিশ দিতে লাগলো পীরালিকে।

মকবুল যতীন জগন্নাথ আবার এসে দাঁড়াল সিঁড়ির গোড়ায়।

—কী হলো পীরালি? সাহেবের কিছু হলো?

পীরালি বললে—চুপ, চুপ, আর কিছু দিন চুপ করে থাকো তুমলোক, সাহেবের নোকরি হয়েছে।

নোকরি হয়েছে! সাহেবের নোকরি হয়েছে শুনে মকবুল যতীন জগন্নাথের দল আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। ইয়া আল্লা! জয়-মা-কালী! বোম ভোলানাথ! তারপর দিন থেকেই বিরাট বিরাট গাড়ি

এসে দাঁড়ায় প্যালেস-কোর্টের সামনে। উর্দি-পরা নতুন ড্রাইভার। প্যালেস কোর্টের পোর্টিকোতে এসে গাড়িটা দাঁড়ায়। আর গাড়ির খবরটা দিলেই সাহেব তখন ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নেয়। কোট-প্যান্ট পরে নিচেয় গাড়িতে গিয়ে বসে। আর গাড়িটা সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যায় রাস্তায়।

সেদিন ড্রাইভারটার সঙ্গে ভাব করলে পীরালি। জিজ্ঞেস করলে—ড্রাইভার সাব সাহেবকে কোথায় নিয়ে যাও তুমি রোজ?

ড্রাইভার গাড়ির ভেতরে বসে ছিল। বললে—ঘোষাল সাব?

—হাঁ হাঁ। ঘোষাল সাহেব নোকরি করছে?

ড্রাইভার বললে—সাব তো আমাদের কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার!

—কেতনা তনখা পাতা সাহেব?

—তিন হাজার রুপেয়া।

—কোন্ কোম্পানী?

ড্রাইভার বললে—বড়বড়কা স্টেট কোম্পানী! বহুত্ বড়িয়া কোম্পানী। ওই কোম্পানীকা জেনারাল ম্যানেজার ঘোষাল সাব।

সেটা পীরালি আন্দাজ করতে পেরেছিল ক'দিন ধরেই। রেল-কোম্পানীতে সাহেব পেত হাজার টাকা। এখন তিন হাজার। তিন হাজারের কেতা-দুরস্ত সাহেবের চাল-চলনে। সাহেব আরো গম্ভীর হয়ে গেছে আজকাল। আরো দামী-দামী স্যুট পরে আরো দামী-দামী বোতল আসে সাহেবের ঘরে। সকালবেলা খবরের কাগজখানা পড়তে পড়তে আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠে! অল্ রাইট! নেহেরু, ফাকিরকে লর্ড ওয়াভেল ডেকেছে। নেহেরুকে ডেকে নিয়েছে। কংগ্রেসকে ইনভাইট করেছে [illegible]

আমেরী [illegible] হাউস অব কমন্স-এ লেকচার দিয়েছে—

"I understand from published reports that the conversation between Mr. Gandhi and Mr. Jinnah broke down over the issue of Pakistan, but that both gave expression to the hope that this was not the final end of their effort."

রাইট! ডাউন উইথ গান্ধী! ডাউন উইথ [illegible]! এদের এই ফ্যাটার করে-করেই ব্রিটিশের প্রেস্টিজ চলে যেতে বসেছে! রাগে মিস্টার ঘোষালের গলার নেকটাইটা টাইট হয়ে ওঠে! এরই নাম রুল ব্রিটানিকা! তারপর গট্ গট্ করতে করতে নেমে আসে নিচের পোর্টিকোতে। গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসে। গাড়িটা চলতে চলতে এসপ্ল্যানেডের দিকে যাচ্ছিল। [illegible] একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। [illegible]

গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। কি কেয়ারফুল! সব ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠেছে!

—হোয়াট? হোয়াট্স রং? কী হয়েছে?

ওদিক থেকেই একজন ইউরোপীয়ান গাড়ি চালিয়ে আসছিল। সেই বুঝিয়ে বললে সমস্ত। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলের ক্ষেপে গেছে। লাঠি নিয়ে চারমাথা স্ট্রীটের আশে-পাশে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। ইউরোপীয়ান দেখলেই এরা হ্যাট খুলে নিচ্ছে, নেকটাই খুলে নিচ্ছে। কোট প্যাণ্ট সব ছিঁড়ে দিচ্ছে! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য সেদিনকার কলকাতার! পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের সমস্ত ইউরোপীয়ান আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে ইউরোপীয়ানদের সবাইকে নাকি চলে যেতে হবে। নেটিভরা কাউকে এখানে নাকি থাকতে দেবে না। কাউকে হ্যাট নেকটাই পরতে দেবে না। কাউকে সুট পরতেও দেবে না। নেটিভরা ইংরেজদের হোটেল-দোকানে সব বাড়ির কাচের জানলায় ঢিল ছুঁড়ছে। রাতারাতি ইণ্ডিয়া যেন ফ্রি হয়ে গেছে। বাঃ! বাঃ! বন্দে মাতরম! জয় হিন্দ! ... জিন্দাবাদ! সবাই স্বাধীনতা [illegible] পর এখানে এসে এই ডিফিকাল্টি!

মিস্টার ঘোষাল বললে—গাড়ি ঘুরোও—

গাড়ি ঘুরলো। সাহেব আবার প্যালেস-কোর্টে ফিরে এল। প্যালেস কোর্টে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে গাড়ি থেকে নেমেই সাহেব বললে—জগন্নাথকো বোলাও।

খানিক পরেই জগন্নাথ এল হাঁফাতে হাঁফাতে। বললে—সেলাম হুজুর!

—পাড়ুয়াতে কেভেল ক্রসিং-এর খবর কী জগন্নাথ? প্রমিস করেছিস?

জগন্নাথ বললে—আজ্ঞে হুজুর। সব ঠিক আছে!

—আচ্ছা যা!

বলে মিস্টার ঘোষাল চুরোটটা ধরালো আবার। তারপর আবার ডাকলে। বললে—শোন—

জগন্নাথ ফিরে আসতেই বললে—তোকে একবার শিলিগুড়ি যেতে হবে, পারবি? খুব শক্ত কাজ!

—খুব পারবো হুজুর, জগন্নাথ কোনও-দিন 'না' বলেছে হুজুর? যে কাজ দেবেন সেই কাজই পারবো আমি হুজুর!

—আচ্ছা তুই যা। মিস্টার ঘোষাল চুরোটটাকে আবার দাঁত কামড়ে চিবিয়ে নিলে।

রেলওয়ে অফিসেও তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। সাজ সাজ রব চারদিকে। জেনারেল ম্যানেজার থেকে সুরু করে ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার, সি ও পি এস, সি সি এস, ডি টি এস সবাই ব্যস্ত। বছরে একবার জেনারেল ম্যানেজারের ইন্সপেকশান স্পেশ্যাল যায়। সমস্ত জোনে ঘুরবে স্পেশ্যাল। জেনারেল ম্যানেজার নিজে সব জমিদারী দেখবে। প্রজাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা হবে। এই দিনই প্রথম লোকে তাকে চাক্ষুষ দেখবে। রবিন্সন সাহেব ঘন ঘন তলব দিচ্ছে মিস্টার ভার্মাকে। ঘন ঘন তলব দিচ্ছে ঘোষালকে। সমস্ত ডিপার্টমেণ্টেই এক অবস্থা। রবিন্সন সাহেব অস্থির হয়ে উঠেছে। কে-জি দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু ফাইল নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে পা ব্যথা করে ফেললো। একবার রেকর্ড সেকশন আর একবার ডি টি এস-এর ঘর। জেনারেল-ম্যানেজার সকলকে হয়রান করে মারবে! তারপর যখন স্পেশ্যাল শেষ হয়ে যাবে তখন আবার কিছুদিনের জন্যে সব ঠাণ্ডা! আর তারপর তো রাম-রাজত্ব! পালিতবাবু একবার এ সেকশানে যায় আর একবার ও সেকশানে। বলে কিছু শুনেছেন নাকি কে-জি দাশবাবু?

—কীসের কী?

হরিশবাবু বলে—শুনলাম নাকি আমাদের অফিস ট্রানসফার হয়ে যাচ্ছে?

—আরে রাখুন মশাই আপনি, দেখছেন আমরা এখন জেনারেল ম্যানেজারের স্পেশ্যালে নিয়ে হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছি, এখন চাকরি রাখাই আমাদের দায় হয়ে উঠেছে—

রবিন্সন সাহেব কিছুতেই খুশী নয়। ভার্মা দিয়ে ফাইল এগিয়ে দেয় সামনে। ঘোষালকে দিয়ে ফাইল এগিয়ে দেয়। তবু কিছুতেই খুশী হয় না মিস্টার রবিন্সন। বলে নো, নো, দিস ইজ নট দি থিং—

শেষকালে কোনও উপায় না দেখে এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশানের সুধীরবাবুকে ডেকে পাঠায়। বলে সেনকে টেলিগ্রাফ করে দাও হেড ক্লার্ক, এখুনি চলে আসতে। টেলিগ্রাফ করে দাও যেন যাতে স্পেশ্যাল ট্রেনে, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ—

সুধীরবাবু সেকশানে গিয়ে বলে কী জ্বালা! সেন সাহেব না হলে কি আর রেল চলবে না মশাই? রবিন্সন সাহেবের যে কী এক ফ্যাশন হয়েছে!

সারাই অনেক সাহেব দেখেছে সুধীরবাবু। বহুদিন চাকরি হয়ে গেল তার। অফিসে সাহেব থেকে শুরু করে রবিনসন সাহেব পর্যন্ত অনেক সাহেব দেখেছে সুধীরবাবু! প্রত্যেক বছরেই এরকম স্পেশ্যাল ট্রেন ছেড়েছে। জেনারেল-ম্যানেজারের ট্যুর-প্রোগ্রাম এই প্রথম নয়। কিন্তু এবার যেন সবই উল্টো-পাল্টা। এবার যেন রবিন্সন সাহেবের মত মানুষও একটু বিচলিত হয়েছে। তা বিচলিত হবার মত দিনকালও পড়েছে। সেই সব যুগ আর নেই রেলওয়েতে। এখন ক্লার্করা আর আগেকার মত কাজ করে না মন দিয়ে। এখন ইউনিয়ন হয়েছে। এখন কমিউনিস্টরা ঢুকেছে চাকরিতে। নতুন-নতুন ছোকরা সব। সব কথাতেই কোড্ দেখায়। ম্যানুয়াল দেখায়। এখন দেয়ালে-দেয়ালে হাতে লেখা পোস্টার এঁটে দেয়। রেলওয়ে-বোর্ড থেকে এখন কড়া-কড়া চিঠি আসে। আগেকার চেয়েও কড়া। পার্লামেণ্টে কোশ্চেন ওঠে। যত স্বদেশী হবার কথা উঠছে ততই যেন চাপ পড়ছে। সব কথাতেই এখন দিল্লী থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। আরে, এতই যদি কৈফিয়ৎ চাওয়া তো এখানে হেড-অফিস রাখা কেন? হেড-অফিস দিল্লীতে উঠিয়ে নিয়ে গেলেই হয়!

সেদিন রবিন্সন সাহেব আবার ডেকে পাঠালে। সুধীরবাবু ঘরে যেতেই সাহেব বললে—লুক হিয়ার হেড ক্লার্ক, সেনকে আর একটা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পাঠাও—বলে দাও, ট্রেন থেকে নেমেই যেন ডাইরেক্ট আমার সঙ্গে দেখা করে, সমস্ত কেস আপ করে রেখে দিয়েছে এরা—

তা তাই-ই সই। সেইভাবেই সুধীর-বাবু টেলিগ্রাফ করে দিয়েছিল। সেদিন সকাল বেলাই রবিন্সন সাহেব অফিসে এসে হাজির। ব্রেকফাস্ট করা হয়নি। আর কটা দিন। তারপরেই রবিন্সন সাহেব চলে যাবে চাকরি ছেড়ে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে

কানাডায় গিয়ে সেটেল করবে। আর ইণ্ডিয়া নয়। ইণ্ডিয়ায় আর থাকা চলবে না ইউরোপীয়ানদের। ক্লাবের সব মেম্বার-দেরও সেই মত। এইবার তার সার্ভিস-লাইফের শেষ ইনস্পেকশন স্পেশ্যাল।

—গুড মর্নিং মিস্টার ক্রফোর্ড!

সাহেব মুখ তুলতেই সামনে দেখলে সেন দাঁড়িয়ে আছে। বললে—টেক ইওর সীট সেন, হাউ ডু ইউ ডু—

তারপর পাশের ফাইলগুলো টেনে নিলে সাহেব। বুঝিয়ে বললে—কেন সেনকে সোজা অফিসে আসতে বলেছে। জেনারেল-ম্যানেজার বড় রাগ করেছে। সব মেস-আপ হয়ে গেছে। স্টেটমেন্টগুলোও তৈরি হয়নি। কাল রাত দশটা পর্যন্ত টাইপিস্ট-দের খাটানো হয়েছে। এখনও কমপ্লিট হয়নি। ওদিকে দিল্লীর বোর্ড থেকে ন্যাস্টি লেটার এসেছে.—এই দেখ!

দীপঙ্কর দেখলে। ফাইলগুলো পড়লে। টুর-প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেছে. কিন্তু স্টেটমেন্ট কমপ্লিট হয়নি। দীপঙ্কর

বললে—আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি—

বাইরে বেরোতেই অভয়ংকর এগিয়ে এল। বললে—এ রকম চেহারা হলো কেন সেন? ক্লাইমেট কেমন শিলিগুড়ির?

দীপংকরের সে-সব কথার উত্তর দেবার সময় ছিল না। ক্রফোর্ড সাহেবের কাজ নিয়ে শেষ করে দিতে হবে। আর বেশী দেরী নেই। চারদিকে খবর চলে গেছে। ওদিকে লক্ষ্মীকান্তপুর, আরো ওদিকে ডায়মন্ড-হারবার। তারপর বজবজ লাইন। স্পেশ্যাল ছাড়বে। টুর প্রোগ্রামটা আবার দেখে নিলে দীপংকর। অনেক দূরে যেতে হবে তাকে। যেদিন থেকে দীপংকর এই পৃথিবীতে যাত্রা শুরু করেছে, সেইদিন থেকেই স্পেশ্যাল স্টার্ট করবে। নিজের নিরিবিলি ঘরটার মধ্যে দীপংকর ফাইলটা তৈরি করতে করতে যেন অনেক শতাব্দী অতিক্রম করে এল। শতাব্দীই বটে। সেই ছোট বেলার ঈশ্বর গাংগুলী লেন থেকে শুরু করে আজকের এই শিলিগুড়ি পর্যন্ত আসতে যেন তার অনেক শতাব্দী কেটে গেছে। কত যুগ, কত শতাব্দী অতিক্রম করতে হয়েছে তাকে! কত উত্থান-পতন। দীপংকরের মনে হতে লাগলো—তার এই পরিক্রমায় যেন কেউ তার সংগী নেই। তার নিঃসঙ্গ যাত্রার একমাত্র সান্ত্বনা যেন সে নিজেই। সে নিজেই সংগ্রাম করে এসেছে নিজের সঙ্গে। সংগ্রাম বৈ কি! নিজের সঙ্গেই সংগ্রাম। সেই কিরণের সঙ্গেই তার প্রথম সাক্ষাৎ সেই যাত্রার। সেই কিরণকেই একদিন হারাতে হলো। তারপর এল লক্ষ্মীদি। লক্ষ্মীদিও হারিয়ে গেল। লক্ষ্মীদির পরে এল সতী। সতী, সনাতনবাবু, নয়নরঞ্জিনী, নির্মল পালিত, সন্তোষকাকা, ক্ষীরোদা, গাংগুলী-বাবু সবাই একে একে হারিয়ে গেছে আজ। আর কারোর সঙ্গে কোনও সম্পর্কও নেই তার, আর সম্পর্ক থাকবেও না। শিলি-গুড়ি গিয়ে কাউকে কোনও খবর দেয়নি, কারোর খবর রাখেওনি সে।

হঠাৎ দরজাটায় একটা শব্দ হতেই দীপংকর মাথা তুললে। বললে—ইয়েস, কাম ইন—

না, ভাষা নয়, অভয়ংকরও নয়। কেউ না। লক্ষ্মণ সরকার।

দীপংকর মুখ তুলে চাইল। সেই লক্ষ্মণ সরকারের চেহারা এই এক বছরেই বদলে গিয়েছে। বললে—বোস, কেমন আছো?

লক্ষ্মণ সরকার যেন অনেক সংকোচের পর বসলো। বললে—তুমি কেমন আছো?

দীপংকর বললে—ভালো—

তারপর একটু থেমে দীপংকর আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ক্ষীরোদা কেমন আছে?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—ভালো।

—আর মাসীমা?

—মাসীমাও ভাল আছে।

আর কোনও কথা খানিকক্ষণ কারোর মুখ দিয়েই যেন বেরোচ্ছে না। একটু পরে লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমার চিঠি পেয়েছিলে তুমি?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ পেয়েছিলাম—এই যে পকেটে রয়েছে—

লক্ষ্মণ সরকার বললে—প্রথমে ভেবে-ছিলুম তোমাকে চিঠি লিখবো না। ভেবে-ছিলাম—তুমি বিরক্ত হবে। ক্ষীরোদাও বারণ করেছিল লিখতে—

—বারণ করেছিল? কেন?

—ক্ষীরোদা বলেছিল—তুমি নাকি আমা-দের ভুলে গেছ!

দীপংকর কিছু বললে না। তারপর নিজের মনেই যেন বললে—ভুলতে যদি পারতুম তাহলে তো ভালোই হতো!

—কিন্তু যখন শুনলুম তুমি আজ আসছো এখানে, ক্রফোর্ড সাহেব তোমাকে ডেকেছে, তখন লিখলুম। আজকে রাত্তিরে তুমি আসছো তো?

—কেন?

—আজ ক্ষীরোদা তোমাকে আমাদের বাড়ি খেতে বলেছিল! তোমার কি সময় হবে?

—কেন? হঠাৎ আবার খাওয়ার ব্যাপার কেন?

লক্ষ্মণ বললে—তা জানি না। তোমার কি আপত্তি আছে?

দীপংকর বললে—না আপত্তি কেন থাকবে? কিন্তু কেন মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবে আবার?

—না, আমার আর কষ্ট কীসের। তোমার জন্যে আজ সে সারাদিন বসে বসে রাঁধবে। তুমি এলে সে খুব খুশী হতো! আমিও...

—আচ্ছা, যাবো, তুমি এখন যাও!

বলে দীপংকর আবার নিজের কাজে মন দিলে। অনেকদিন পরে কলকাতায় এসে যেন সব আবার মনে পড়তে লাগলো। শুধু ক্ষীরোদাই বা কেন? অনেক জায়গাতেই তো যেতে ইচ্ছে করে। প্রাণমথ-বাবুর সঙ্গেও দেখা করা উচিত। গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর বাড়িতেও একবার গেলে ভালো হয়। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডেও একবার সনাতনবাবুর সঙ্গে দেখা করা উচিত! সতী কি সনাতনবাবুর কাছে ফিরে গেছে? কে জানে?

দুপুরে বারোটা বাজলো। দীপংকর ঘড়ির দিকে চাইলে। তারপর আবার সে নিজের ভাবনার তলায় তলিয়ে গেল। যখন মাথা তুললে তখন একটু-একটু মেঘ করছে। জানালার বাইরের আকাশটা তার নিজের মনের মতই ভারাক্রান্ত।

ঠিক দেড়টার সময়ই স্পেশ্যাল ছাড়বার কথা। বেলেঘাটা স্টেশনের নর্থ কেবিন থেকে টেলিফোন হলো সাউথ কেবিনে। কে? লাহিড়ী? স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়ছে। লাইন ক্লিয়ার দাও—

—এত দেরী কেন হে? দেড়টা তো কখন বেজে গেছে!

নর্থ কেবিন বললে—আর বলো কেন ভাই। জেনারেল ম্যানেজার নিজেই আসতে দেরি করে দিয়েছে—

যখন শেষ পর্যন্ত ট্রেন ছাড়লো, তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ট্রাফিক ম্যানেজার, ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার সি-এম-ও, ডি-টি-এস সবাই উঠে পড়লো। চার বোগীর স্পেশ্যাল। শেষে একটা অব-জার্ভেশান কার। প্রথমে বালিগঞ্জ। তারপর সোনারপুর। সকলের শেষে ডায়মন্ড-হারবার। বেলেঘাটা থেকে স্পেশ্যাল ঝড়ের গতিতে ছেড়ে দিলে। পাকা ড্রাইভার। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস চালায়। এই কিছুদিন আগে ভাইসরয়ের স্পেশ্যাল চালিয়ে এসেছে। একটা গাড়িতে নয় বাবুর্চি খানসামা চলেছে। বালিগঞ্জ স্টেশনে আফটারনুন-টি দেবে তারা। দীপংকর ফাইল কাটা নিয়ে আবার দেখতে লাগলো। ক্রফোর্ড সাহেব বললে—বালিগঞ্জে এই পেপারগুলো জেনারেল ম্যানেজার চাইতে পারে—কীপ দেম হ্যান্ডি—

স্টেশন মাস্টার মজুমদারবাবুর তখন শশব্যস্ত অবস্থা। একবার ইয়ার্ড ঘুরে আসে আবার একবার প্যাসেঞ্জার শেডে যায়। সব যেন ঠিক-ঠাক থাকে। কোথাও যেন না ময়লা পড়ে থাকে। একটা প্রমোশনের সময় এসেছে। এই সময়ে পার্সোনাল ফাইলে একটা দাগ পড়লেই ফিউচার-কেরীয়ার নষ্ট। এমন সময় টিকিট-কালেক্টর দত্তবাবু স্টেশন-মাস্টারকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসেছে।

—এই দেখুন মাস্টার মশাই, আবার এই লোকটাকে ধরেছি, রোজ-রোজ উইদাউট টিকিটে ট্রাভেল করে।

মজুমদারবাবু দেখলে। এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ। ময়লা কোট-প্যান্ট। হাতে একটা নোটবুক। বেশ স্মার্ট চোখ-মুখ। মজুমদারবাবুকে দেখেই পেন্সিল নিয়ে নোটবুকে কী যেন লিখতে লাগলো—কী নাম তোমার! কী নাম?

মজুমদারবাবু বললে—আরে একে ধরেছ কেন? এই সময়ে ঝামেলার দরকার নেই, এখুনি জেনারেল ম্যানেজারের স্পেশ্যাল এসে যাচ্ছে—

দত্তবাবু বললে—আজ্ঞে, রোজ রোজ এই রকম করে, আবার বললে রুখে আসে—

লোকটা তখন মজুমদারবাবুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। বললে—কী নাম তোমার বলো? তোমার নামও ভাইসরয়ের কাছে রিপোর্ট করে দেব, সুরেন বাঁড়ুজ্যেকে ধরিয়ে দিয়েছি, বিপিন পালকে ধরিয়ে দিয়েছি—আমি কাউকে

ছাড়বো না—ও গান্ধী বেটাকেও রেহাই দেব না আমি, কী নাম তোমার বলো?

মজুমদারবাবু বললে—আরে এই সময়ে পাগলকে নিয়ে তুমি ঝামেলা বাধাচ্ছো, দাও, ছেড়ে দাও ওকে। একে এখন কোত্থেকে ধরলে? কে ও?

—আজ্ঞে, মস্ত বড়লোকের ছেলে, নিজেও ব্যারিস্টার ছিল শুনেছি রোজ এই রকম করে আসে টিকিট না কেটে—

কিন্তু তখন আর ওসব কথা শোনার সময় নেই। ওদিকে লাইন ক্লিয়র হয়ে গেছে স্পেশ্যালের। আর খানিক পরেই দেখতে দেখতে হুড়মুড় করে এসে পড়লো জেনারেল ম্যানেজার। মজুমদারবাবু সামনের প্লাটফরমে রেড সিগন্যাল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর বুকটা দুরু-দুরু করে উঠলো। এখনি জেনারেল ম্যানেজার নামবে। চীফ ইঞ্জিনীয়ার নামবে, ট্রাফিক ম্যানেজার নামবে, ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার নামবে। সবাই নেমে স্টেশন ইনস্পেক্ট করবে।

কিন্তু কেউ নামে না। বৃষ্টি তখন বেশ জোরে পড়ছে। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। জোলো হাওয়া। মজুমদারবাবু কি রকম হতভম্ব হয়ে গেল। কেউ নামে না কেন? জেনারেল ম্যানেজারের কম্পার্টমেন্টের সামনে সবাই গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ভেতরে গিয়ে কী সব কথাবার্তা হলো। সেন সাহেবকে দেখে মজুমদারবাবু এগিয়ে গেল। বললে—কী হলো স্যার? কেন, নামছেন না কেন?

সেন সাহেব বললে—জেনারেল ম্যানেজারের জ্বর হয়েছে—বোধ হয় স্পেশ্যাল ক্যানসেল্ড্ হয়ে যাবে!

সে কি! এমন তো কখনও হয়নি আগে! সত্যিই সেই হলো শেষ পর্যন্ত! আবার ডাউন লাইন ক্লিয়ার দিতে হলো। আবার স্পেশ্যাল ফিরে গেল। সবাই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এত তোড়-জোড় এত উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা সব চুপ হয়ে গেল এক নিমেষে। ট্রেন ছাড়ার আগে সেন নেমে গেল। অভয়ঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী হলো সেন? তুমি ফিরে যাবে না?

দীপঙ্কর বললে—না, আমার একটা কাজ আছে এদিকে, আমায় একবার কালিঘাটে যেতে হবে, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনএ—

সবাই যখন চলে গেছে, মজুমদারবাবুও একবার নিজের অফিস ঘরে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ আবার প্লাটফরমে আসতেই সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা। সেন সাহেব প্লাটফরম ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে হেঁটে চলেছে। একটু অবাক হয়ে গেল মজুমদারবাবু। সেন সাহেব অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাচ্ছে ওদিকে?

সামনে গিয়ে মজুমদারবাবু বললে—স্যার, আপনি ফিরে যাননি?

দীপঙ্কর বললে—না, আমার এদিকে একটা কাজ আছে—

বলে আর সেখানে দাঁড়ায়নি দীপঙ্কর। যেন সেদিন নিজেকে সকলের চোখ থেকে আড়াল করতেই চেয়েছিল। সকলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়েই নিতে চেয়েছিল। যেন অনেকদিন পরে গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর দিকে পা চালিয়ে দিয়ে নিজের কাছেও অপরাধ করেছিল দীপঙ্কর।

চলতে চলতে যেন অনেক রাত হয়ে গেল। অনেক শতাব্দী পার হয়ে যেন আর এক নতুন শতাব্দীতে এসে পদার্পণ করলো দীপঙ্কর। এতদিনের সব সংযম যেন বাঁধ ভেঙে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। দীপঙ্কর কাঠের স্লিপারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে চলতে-চলতে যেন অনেক দূর এসে পড়লো। এই তো! আর তো বেশি দূর নয়। কাঁকুলিয়ার পর এক জোড়া লাইন চলে গেছে ঢাকুরিয়া স্টেশনের দিকে। আর এক জোড়া বজ-বজ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে স্লিপারগুলো পেছল্ হয়ে গেছে। ইস্পাতের রেল চকচক করছে। সেই চকচকে স্টীলের ওপর অন্ধকারের আলো পড়ে সব ঝাপসা করে দিয়েছে চারিদিক। হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো যেন অনেক রাত হয়ে গেছে। আশে-পাশের ডোবা থেকে ঝিঁঝিঁর শব্দ আসছে। কী যেন একটা রোমাঞ্চ এসে ঘিরে ধরলো দীপঙ্করকে। আর বাধা মানলো না মন। একেবারে উড়ে যেতে চাইল সে। এতদিন নিজেকে আড়াল করে করে যেন তার আগ্রহকে আরো উদগ্র করে ফেলেছে সে। এতদিনের সব সংস্কার যেন ভেসে যেতে বসেছে।

হঠাৎ মনে হলো যেন সামনে একটা ট্রেনের হেড লাইট দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে যেন একটা ট্রেন আসছে তারই দিকে। এত রাত্রে কোন্ ট্রেন আসবে? এখন এ সময়ে তো কোন ট্রেন নেই। তবে? তবে কি সেভেনটিন ডাউন?

দীপঙ্কর আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে।

মনে হলো যেন ওটা কোনও ট্রেন নয়। বহুদিন আগে ১৯১২ সালের ১৮ই মার্চ যে ট্রেনটা একদিন উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙুলী লেন থেকে স্টার্ট করেছিল, আজ এতদিন পরে এত ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে, ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, স্টেশন রোড সব কিছু ছুঁয়ে আবার এই এখানে গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর কাছে পৌঁছেছে। এই সামান্য দূর আসতে এত বছর লাগলো? এত পরিশ্রম? এত সময়? এত সংগ্রাম?

দীপঙ্কর পকেটে হাত দিয়ে দেখলে। পকেটে তার চিঠিটা তখনও রয়েছে। লক্ষ্মণ সরকারের চিঠি। ক্ষীরোদা তার জন্যে আজ সারাদিন রান্না করেছে। তাকে আজ খেতে হবে ক্ষীরোদার বাড়িতে গিয়ে।

ট্রেনটা তখন আরো কাছে এসে পড়েছে। হেড লাইটটা আরো স্পষ্ট, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। লাইনের ওপর ইস্পাতের চাকার প্রতিধ্বনি শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হলো ঠিক লেভেল-ক্রসিং-এর গুমটি ঘরের নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে না? হেড লাইটের আলোয় ঝাপসা দেখা যাচ্ছে সামান্য! যেন সারা গায়ে সাড়িটা জড়িয়েছে। যেন মেয়েমানুষের মতো মনে হচ্ছে।

দীপঙ্কর দৌড়তে লাগলো—কে? কে ওখানে?

চীৎকার করতে করতে দীপঙ্কর দৌড়তে লাগলো। লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদি কি আবার রেলের লাইনের কাছে এসেছে? গুমটি ঘরের ডিউটিতে কে আছে এখন? ভূষণ দেখতে পাচ্ছে না? এই সাড়িটাই তো সেদিন দীপঙ্কর সতীকে কিনে দিয়েছিল। লক্ষ্মীদি কি সতীর সাড়িটা পরেছে?

—কে ওখানে? কে? লক্ষ্মীদি? সতী? কে তুমি?

ট্রেনটা তখন আরো সরে এসেছে। আরো নির্জনভাবে এগিয়ে আসছে। দীপঙ্কর আরো জোরে দৌড়তে লাগলো।

—কে ওখানে? সরে যাও? লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদি, আবার এসেছে আত্মহত্যা করতে—ধরো ওকে, ওকে ধরো, ধরে ফেলো।

দীপঙ্কর প্রাণপণে তখন দৌড়চ্ছে, কিন্তু তার আগেই ট্রেনটা একেবারে হুড়মুড় করে দীপঙ্করের গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সাউথ কেবিনের করালীবাবু শেষ প্যাসেঞ্জারটার লাইন ক্লিয়ার দিয়ে একটু হেলান দেবার চেষ্টা করছিল। চেয়ারটার উপর বসে আর একটা চেয়ার সামনের দিকে ঠেলে তার ওপর পা-জোড়া তুলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ টেলিফোনের রিং বেজে উঠলো।

—কে রে? আবার কী হলো?

—হুজুর আমি ভূষণ!

—কীরে ভূষণ? কী হলো?

—হুজুর, অ্যাকসিডেন!

করালীবাবু চেয়ার থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠলো। অ্যাকসিডেন্ট? কীসের অ্যাকসিডেন্ট রে? কার অ্যাকসিডেন্ট?

—হুজুর, সেভেনটিন ডাউন!

উপন্যাস সমাপ্ত

(ক্রমশ)

প্যারিস, জানুয়ারী। ডিসেম্বর মাসের একটি সপ্তাহে দু-দুটি বড় উৎসব, একটা ফুরোতে না ফুরোতেই আরেকের আবির্ভাব। ২৫শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস উৎসব, তার সাত দিন পরেই নববর্ষ উৎসব। ক্রিসমাস উৎসবের যেমন আসল আনন্দ-উৎসব শুরু হয় ২৪ তারিখের রাতে, তেমনি নববর্ষ উৎসবের আসল উৎসব শুরু হয় ৩১শে ডিসেম্বরের রাতে। রাত বারটার ঘণ্টা পড়া মানেই ১লা জানুয়ারীর জন্ম। নববর্ষ শুরু। এই শুভ মুহূর্তে শুভেচ্ছা-বিনিময় হয়ে থাকে। তারপর উৎসবের পালা তো আছেই।

৩১শের রাতে বেরিয়েছি বন্ধুদের সাথে প্যারিসের নববর্ষ উৎসব দেখতে। দেখছি সাঁজে লিজে আর অপেরা পাড়ায় রেস্তোরাঁ-কাফেগুলো আলোকমালায় সজ্জিত। হই-হুল্লোড়, নাচ-গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। আমাদের গাড়ির রেডিও থেকে ভেসে আসছিল কোনো এক অজ্ঞাতনামার বাণী। গানের মাঝে রেডিও-ঘোষক বলে চলেছিল ১৯৬২ সালের ইতিবৃত্ত। রেডিও-ঘোষক কামনা করছিল রেডিও শ্রোতাদের শুভ নববর্ষ শুভময় হউক। আসুক তার ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধি। আমরা ঘোষকের সুমধুর বক্তৃতা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম না। চেয়ে দেখছিলাম রাস্তার ধারে নববর্ষ উৎসবের জৌলুস। আমাদের মধ্যে যে বন্ধুটি সাধারণত দার্শনিক তত্ত্বের ধার-কাছ দিয়ে যায় না, সেই ফিলিপ কিনা বাধা দিয়ে উঠল, "আরে শোন, শোন। কি বলছে শোন।" আমরা একটু অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ হালকা-রসিক ফিলিপের বৈরাগ্য দর্শন উদয় হল নাকি? তাও ভাববার বিষয় আমাদের। আমরা জন চারেক কান খাড়া করে শুনলাম, এক জায়গায় রেডিও-ঘোষক বলছে, "নতুন বছর আপনাদের কাছে আনবে নতুন আশা-উদ্দীপনা, শান্তি-সুখ, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। নতুন বছরের দিকে আমরা দৃঢ়পদে এগিয়ে যাবো সেটা ঠিকই। কিন্তু পেছনে পড়ে থাকা পুরোনো বছরটিকে আমরা ছেঁড়া কাঁথার মতন ছুঁড়ে ফেলে দেব না। পুরোনো বছরটা ছেঁড়া জুতো বা পুরোনো জামা নয় যে, তাকে ফেলে দেব অম্লান বদনে। পুরোনো একটি বছরের স্মৃতি কি ফেলে দেবার জিনিস? হয়ত আমরা কেঁদেছি অনেক, তার চেয়েও বোধ হয় পেয়েছি অনেক দুঃখ। এই বলে কি আমরা আনন্দে হাসিনি? জীবনের মধুময় দিনগুলোর স্মৃতি যেমন ভোলবার নয়, তেমনি দুঃখের দিনগুলো। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, লাভ-লোকসান মিলেই পুরোনো বছরের স্মৃতি আমাদের মধ্যে জেগে থাকবে। ভোলা যাবার নয়।"

হালকা-রসিক বন্ধুর ফিলিপের হঠাৎ দার্শনিক মনোভাব আমাদের সেদিন বেশ খানিকক্ষণ অভিভূত করে রেখেছিল। সে রাতে আমরা দল বেঁধে রাত বারটার পর থেকে ঘুরেছি পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি বাড়ি বেড়িয়েছি। যেখানেই পুরোনো বন্ধু, বান্ধবদের সাথে দেখা, এমনকি অপরিচিতও আমাদের দু গালে চুম্বন-আলিঙ্গনে জানিয়েছে তাদের শুভেচ্ছা। সামনের বছর, নতুন বছর শুভময় হোক, আনন্দময় হোক এই কামনা। এমনি আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছিল অনবরত। সেখান থেকে গেছি রেস্তোরাঁয়-কাফেতে বন্ধু সম্মেলনে। নববর্ষ এদের কাছে, মানে ফরাসীদের কাছে সাঁ সিলভেস্তার উৎসবদিনও বটে। রাত এগারটার পর থেকে দেখছি, রেস্তোরাঁ-কাফের খদ্দেররা কাগজের টুপি, মালা, কেউ বা সং সেজে নাচছে, বাঁশী বাজাচ্ছে। আনন্দমুখর কাবারে-রেস্তোরাঁ-কাফে। পর পর শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খোলার শব্দ বেড়েই চলেছে। আর চলেছে শ্যাম্পেন গ্লাসের ঠোকাঠুকি, ঢুং ঢাং শব্দ। সেইসঙ্গে শুভেচ্ছা-বিনিময়: তোমার ভাল হোক। আমাদের জীবন নতুন করে শুরু হোক।

* * *

আমাদের কাছে নোবেল পুরস্কার সবচেয়ে মূল্যবান, তুলনাহীন নয় ইউ-রোপীয়ানদের কাছে। কারণ ইউরোপের প্রতিটি দেশে তাদের দেশের জাতীয় পুরস্কার সবচেয়ে সম্মানীয়। তুলনাহীন বিদেশী পুরস্কার নয়। সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের উপর কত রকম পুরস্কার কয়েক ডজন করে পুরস্কার প্রতি বছরে দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো কোনো পুরস্কারের আর্থিক মূল্য পাঁচ দশ লাখ টাকা যেমন,

নববর্ষের উৎসবে আলোকমালায় সজ্জিত প্যারিসের প্রধান রাস্তা সাঁজেলিজে

তেমনি কোনোটার মূল্য পাঁচ-দশ টাকার। ফ্রান্সে সাহিত্যের ওপর বোধ হয় শ' দেড়েক পুরস্কার প্রতি বছরে দেওয়া হয়। ফরাসী সরকার, আকাদেমি ফ্রাঁসেজ, ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশক, সংবাদপত্র, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান, মহিলা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত পুরস্কার, প্যারিসের পৌরপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ফ্রান্সের ছোটখাট অনেক শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার বিতরণ করে থাকে প্রতি বছরে।

টাকার অংক দিয়ে ফ্রান্সে সাহিত্য পুরস্কারগুলোর মর্যাদা ও সম্মান বিচার করা চলে না। কারণ এমন অনেক অর্থকরী পুরস্কার আছে যাতে গ্রন্থকার হয়ত অনেক টাকা পেতে পারেন কিন্তু সম্মান নয়। জনপ্রিয় সাহিত্য পুরস্কারগুলোর আর্থিক মূল্য কয়েক শত টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সরকারী, আকাদেমি ফ্রাঁসেজ-এর পুরস্কার, পৌরপ্রতিষ্ঠানের ও কয়েকটি ব্যক্তিগত পুরস্কারের আর্থিক অংক হাজার থেকে লাখের মধ্যে।

সবচেয়ে সম্মানীয় ও জনপ্রিয় সাহিত্য পুরস্কার হল "প্রি গঁকুর"। 'প্রি গঁকুর' পুরস্কারে সম্মানিত গ্রন্থকারকে দেওয়া হয় মাত্র পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু ফরাসীদের কাছে 'প্রি গঁকুর' নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বড়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গঁকুর নামে দুই সাহিত্যিক ভ্রাতা এই পুরস্কারের সৃষ্টি করেন। দরিদ্র সাহিত্যিক ভ্রাতৃদ্বয়ের জমানো টাকার অংক ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু তাঁদের সদিচ্ছাটাই হল বড়। সেই অল্প টাকার সুদ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে প্রতি বছরে হয় নভেম্বরের শেষে, নয়তো ডিসেম্বরের গোড়ায়। গঁকুর পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীতে থাকে প্রাক্তন গঁকুর পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিকের দল। তাঁরা বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের গ্রন্থকারকে এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন। ১৯৬১ সালের 'গঁকুর' পুরস্কার পেয়েছেন ম' জ' কো, তাঁর উপন্যাস 'লা পিটিয়ে দ্য দিও' (ভগবানের কৃপা)। গঁকুর পুরস্কারে যে উপন্যাসটি দ্বিতীয় স্থান-লাভ করে সেটিকে দেওয়া হয় "রনোদো" পুরস্কার। এবারকার 'রনোদো' পুরস্কার পেয়েছেন ম' রোজে বর্দিয়ের, তাঁর উপন্যাস 'লে রে' (গম)-র জন্য।

প্যারিসে সাহিত্যের ওপর পুরস্কারগুলো শুরু হয় বছরের শেষে, চলতে থাকে নতুন বছরের বসন্তকাল পর্যন্ত।

মহিলা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত 'প্রি ফেমিনা' পুরস্কার পেয়েছেন ম' অঁরি তোমা, তাঁর উপন্যাস 'ল্য প্রমোনতোয়ার'; আর এই পুরস্কারের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ম' ফিলিপ সোলের্স, তাঁর উপন্যাস "ল্য পার্ক"-এর জন্য পেয়েছেন 'মেদিসি' পুরস্কার। আরেকটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার "প্রি অ্যাঁতেরাই" পেয়েছেন ম' জ' ফারনিও তাঁর উপন্যাস "ল্যাম্বর পোর্তে"-র জন্য।

অন্যান্য সাহিত্য পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'প্রি ভেরিতে' পুরস্কার। এই পুরস্কারটি দিয়ে থাকে 'পারিশিয়ান লিবর' সংবাদপত্র। এবার যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি পঙ্গু। নাম তাঁর ম' জ' কুরবের। তাঁর আত্মজীবনীমূলক "ফেয়ার ফাস' গ্রন্থটির জন্য। 'প্রি লিবার্তে' পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে হাঙ্গারিয়ান উদ্বাস্তু ম' পালকোজি-হোরভাত-এর 'লা দোঁলভ্রেন্স' প্রবন্ধগ্রন্থের জন্য। দার্শনিক ও মানবদরদী আলবের সোয়াইৎজার-এর নামে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মাদাম এডিটা মরিস-কে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'লে ফ্লর দিরোসিমা' (হিরোসিমার ফুল)-এর জন্য। অনুবাদকদের জন্য দেওয়া হয় হালব্রিন-কামিনস্কি পুরস্কার। এবারে অনুবাদকের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মাদমোয়াজেল ইভন্ দাভেকে। ইনি নাভকভের ললিতা উপন্যাস অনুবাদ করে পুরস্কার পেয়েছেন।

ওপরে যেসব পুরস্কারের নাম করলাম সেগুলোর টাকার অংক বড় নয় বটে, কিন্তু পুরস্কার ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার ও প্রকাশক লাখ লাখ টাকা উপার্জন করে। অর্থাৎ গঁকুর পুরস্কার পাওয়া বইটির কাটতি কয়েক লক্ষ কপি হবেই। তার ওপর হবে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ। বই বিক্রি আর অনুবাদ থেকে গ্রন্থকার ও প্রকাশক লাখ লাখ টাকা কামাবেন। গঁকুর পুরস্কার ও ফেমিনা পুরস্কারের পূর্বে লা পিটিয়ে দ্য দিও ও ল্য প্রমনতোয়ারের উপন্যাস দুটির কাটতি ছিল মাত্র যথাক্রমে পঁচিশ হাজার ও সাত হাজার। পুরস্কার পাওয়ার পর এই দুটি উপন্যাসের কাটতি সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আর তেষট্টি হাজার কপি।

এবার সাংবাদিকদের জয়জয়কার। গঁকুর পুরস্কার বিজয়ী ম' জ' কো, ফেমিনা পুরস্কারপ্রাপ্ত ম' অঁরি তোমা, রোনোদো পুরস্কারের রোজে বর্দিয়ের, অ্যাঁতেরাই পুরস্কারের ম' জ' ফ্যারনিও, এমন কি মেদিসি পুরস্কারপ্রাপ্ত ফিলিপ সোল্যার্স, এঁরা সবাই সাংবাদিক। জ' কো কাজ করেন সাপ্তাহিক 'লেক্সপ্রেস' পত্রিকায়, আর জ' ফ্যারনিও হচ্ছেন জনপ্রিয় দৈনিক 'ফ্রাঁসোয়া' পত্রিকার কূটনৈতিক বিভাগের সম্পাদক। আর বাকিরা হল সাপ্তাহিক নয়তো মাসিক পত্রিকায় কাজ করেন। তার ওপর এক ম' ফ্যারনিও ছাড়া প্রায় সবার বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের মধ্যে। প্যারিসের সংবাদপত্র মহলে উৎসব চলেছে।

প্যারিশিয়ান

(১৩)

দিনে দিনে কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল! বাংলোবাড়ির উঠোনে পায়চারি করতে করতে ভাবছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। মনে হয় এই তো সেদিন। সত্যি, একটা জীবনই তো প্রায় পার হয়ে এলেন, অথচ মনে হয় কত সংক্ষিপ্ত এই জীবন। কিন্তু এরই মধ্যে সমস্ত পৃথিবীটাই যে কেমন করে বদলে গেল! হৃদয় মণ্ডলদের টাকার অভাব ছিল না। তিনখানা গাঁ ছাড়িয়ে জমিজমা, খামারবাড়িতে মরাইয়ের পর মরাই বাঁধা থাকতো শুখোর বছরেও। মাঠের ধান ঘরে তুলতে না তুলতে বেচে দিতে হতো না তাদের আর পাঁচজনের মত। তবু কই, মোড়লদের ছেলেগুলো তো সেদিন গ্রামের লোকের কাছে তেমন সম্মান পেতো না! গিরিজাপ্রসাদকেই সকলে সম্মান দিতো। হৃদয় মোড়লও বলতো, তুমিই গাঁয়ের মুখোজ্জ্বল করেছো গিরিজা, টাকা আজ আছে কাল নেই, শিক্ষাদীক্ষা চিরকালের।

গিরিজাপ্রসাদ নিজেও সেদিন এ-কথাই ভাবতো। কিন্তু আজ যেন সব বদলে গেছে। সেই অবনীমোহনই আজ মর্যাদার আসনে বসেছে। আর গিরিজাপ্রসাদ? গ্রামের লোক বুঝে নিয়েছে হয়তো, গিরিজাপ্রসাদ ব্যর্থ হয়ে, নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছেন। তাই তাঁকে আর মানুষ বলেও কেউ গণ্য করে না, অপমান করতেও বাধে না তাদের।

অবনীমোহন কাজের মানুষ, খবর দিলেই কি আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে! একটা মানুষের টাকা আছে জেনেই গাঁ-সুদ্ধ লোক কেমন তোষামোদের ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও অপমান বোধ করে না। নাকি কথাটা বলে গোপেন গিরিজাপ্রসাদকেই শুধু অপমান করতে চেয়েছে? বোঝাতে চেয়েছে, গিরিজাপ্রসাদ বেকার। গিরিজাপ্রসাদ কাজের মানুষ নন!

পায়চারি করতে করতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গিরিজাপ্রসাদ, থমকে দাঁড়ালেন। খতে কোটাল তাঁর চোখের সামনে দিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকলো, খড়-বিচালির পর, দুটোকে খুলে নিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যান্য দিন যতকে ডেকে দু' একটা কথা বলেন, আজ আর ইচ্ছে হলো না। পাটকরুনী ঝিটা ওঁকে দেখে গোবর-জলের ছিটে দিতে দিতে ঘোমটা টেনে দিলো আরেকটু। চড়ুই পাখিগুলো লাফাতে লাফাতে আসছে, ঠোঁটে ধান তুলে নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে। তালগাছের কাঁধে বাবুইয়ের বাসাটা দুলছে। ঘুঘু ডাকছে কোথায় থেকে থেকে। ঘাট থেকে এক রাশ বাসন ধুয়ে নিয়ে পাঁচিলের ওধার দিয়ে ঘোমটা টেনে কে যেন চলে গেল। ছবির মত কত কি ভেসে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে কিন্তু কোন কিছুই যেন চোখে পড়ছে না। এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার যে এত গভীরভাবে বুকের ভেতর নাড়া দিতে পারে, কে জানতো। জীবনে এর চেয়ে অনেক বেশী অপমান কুড়িয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু অবনীমোহনের কাছে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়েছে বলে কি...না, গ্রামের লোক তাঁকে তুচ্ছ মনে করেছে বলেই হয়তো এতখানি আঘাত পেয়েছেন তিনি।

না, উপায় থাকলে এ-গ্রাম ছেড়ে, এই পঙ্কিল আবহাওয়া ছেড়ে চলে যেতেন

তিনি। চলে যাবেন? আবার নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করবেন কোথাও গিয়ে? কিন্তু কত স্বপ্ন ছিল মনে, ফিরে আসবেন, নতুন করে গড়ে তুলবেন গ্রামখানা। ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, কাঁদরের পুলে কত কি গড়বেন। পুকুরগুলোর পানা সাফ করাবেন, পোনা ফেলবেন! সবই স্বপ্ন রয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে শুধু দু' বেলা দু' মুঠো খেতে পেলেই বেঁচে যান। আর মেয়ে দুটির, অমরেশের ব্যবস্থাটা হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন, আর কিছু চাই না।

বিব্রত দুশ্চিন্তায় আবার পায়চারি করতে শুরু করলেন গিরিজাপ্রসাদ। আর হঠাৎ দেখতে পেলেন ধুতির ওপর খাকি বুশ শার্ট, দু' বগলে দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে অবিনাশ ডাক্তার।

গিরিজাপ্রসাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই এক মুখ হাসি হেসে অবিনাশ ডাক্তার দূর থেকেই চিৎকার করে উঠলো—মাস্টারমশাই, ও মাস্টারমশাই, গুড নিউজ, আপনার জন্যে একটা গুড নিউজ এনেছি!

গিরিজাপ্রসাদও মুখে হাসি টেনে এগিয়ে এলেন।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাছে আসতে আসতে অবিনাশ ডাক্তার বললে, পা নেই তবু নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছি মাস্টারমশাই, কেন জানেন? যা ধরবো তার শেষ না দেখে ছাড়বো না এই প্রতিজ্ঞা আছে বলে, বুঝলেন!

গিরিজাপ্রসাদ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। মানুষটাকে বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। একটা পা নেই, অসহায় মানুষ, তাই এদিকটাই চাপা রাখতে চান গিরিজাপ্রসাদ, এমন ভাব দেখান যেন ওটুকু চোখেই পড়ে না। অথচ অবিনাশ ডাক্তার কথায় কথায় সেটুকুই চোখে পড়িয়ে দিতে চায়। যেন ওইটুকুই ওর গর্ব।

অবিনাশ ডাক্তার ততক্ষণে হাসতে হাসতে কাছে এসে পড়েছে। হেসে উঠে এবার বললে, আপনি তো মাস্টার মশাই ছাত্রদের ইস্কুলে অনেক এসে লিখিয়েছেন। তাই না?

গিরিজাপ্রসাদ বুঝতে না পেরে শুধু হাসলেন।

অবিনাশ ডাক্তার কিন্তু থামতে চায় না। বললে, গাধা, ঘোড়া, গরু এই সবের? কেমন?

—হ্যাঁ, তা তো লিখিয়েছি। হাসলেন গিরিজাপ্রসাদ।

—কিন্তু মানুষের ওপর লিখিয়েছেন কখনো?

—হ্যাঁ, তা বিবেকানন্দ, রামমোহন...

বাধা দিয়ে অবিনাশ ডাক্তার বলে উঠলো, উঁহুহুঁ, ওসব নয়। ও'রা হলেন মহামানব—গ্রেট মেন। ও'দের কথা নয়, মানুষ—ম্যান—ম্যানকাইণ্ড সম্বন্ধে এসে লিখিয়েছেন?

গিরিজাপ্রসাদ হেসে বললেন, না তো।

অবিনাশ ডাক্তার হেসে উঠলো—জানি, লেখাননি তা জানি। এইখানেই আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের ডিফেক্ট, বুঝলেন।

গিরিজাপ্রসাদ চুপ করে গেলেন। হাসতে পারলেন না। ভাবলেন, শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কেই হয়তো কিছু বলতে চায় ডাক্তার। কিন্তু ওই একটা জায়গাতেই দুর্বলতা তাঁর। আজকালকার মাস্টারদের ওপর, শিক্ষারীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ তিনি। কথায় কথায় সমালোচনা করেন তার। কিন্তু তাঁদের যুগের সেই পুরোনো রীতির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই আহত বোধ করেন। তেমন তেমন ক্ষেত্রে মুখ ফুটে বলেই ফেলেন, পুরোনো প্রথায় পড়িয়েই তো বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র হয়েছিল...

অবিনাশ ডাক্তার কিন্তু সে দিক দিয়েই গেলো না।

বললে, আমাকে যদি মানুষের ওপর এসে লিখতে বলেন, প্রথম লাইনেই কি লিখবো জানেন?

গিরিজাপ্রসাদের আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। না, তা হলে কোন রসিকতা করতে চায় ডাক্তার।

হেসে প্রশ্ন করলেন, কি লিখবেন?

—লিখবো, [illegible] প্রত্যেক মানুষেরই একটা ল্যাজ আছে।

গিরিজাপ্রসাদ হেসে উঠলেন হো হো করে।

প্রশ্ন করলেন, মানে?

—মানে, মানুষ মাত্রেরই একটা ল্যাজ আছে, কায়দামত সেই ল্যাজে যদি একটু সুড়সুড়ি দিতে পারেন তো হলে তাকে দিয়েও অসাধ্যসাধন হতে পারে। আর সুড়সুড়ি দিলে যদি না হয় তো ল্যাজে একটু মোচড় দিলেই...

গিরিজাপ্রসাদ হেসে বললেন, ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন।

অবিনাশ ডাক্তার বললে, ইস্কুল হবে।

—ইস্কুল? হবে? আকাশ থেকে পড়লেন গিরিজাপ্রসাদ।

আর অবিনাশ ডাক্তার বললে, অবনীবাবু আপনাদের গ্রামের জন্যে নাকি একটা পয়সা কখনো দিতে চাননি। ইস্কুলের জন্যে পাঁচ হাজার টাকাই উনি দেবেন, কথা আদায় করে এলাম।

—সত্যি? অবনী দেবেন? গিরিজাপ্রসাদ যেন বিশ্বাসই করতে চান না।

অবিনাশ ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, দেবেন। তবে ইস্কুলটা ও'র মায়ের নামে করতে হবে। হোক না, ইস্কুল নিয়ে কথা, নাম যারই হোক, ছেলেগুলো তো শিক্ষিত হবে।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, তা তো সত্যিই, কিন্তু অবনী দেবে এত টাকা?

—হ্যাঁ, দেবেন। তাই তো ছুটে এলাম খবরটা দিতে। ভেবেছিলাম, ও'র বুঝি ল্যাজ নেই, কিন্তু আছে...সব মানুষের আছে আর ও'র থাকবে না!

গিরিজাপ্রসাদও এবার প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন।

বললেন, বসুন, একটু চা করতে বলি।

অবিনাশ ডাক্তার বাধা দিলো। বললে, না। ভেরি সরি, এখুনি ফিরতে হবে। প্রভাকর আসবে বলেছে, হয়তো দেখা না পেয়ে চলে যাবে। জমা রইলো এখন, পরে যে-কোন সময় এসে খেয়ে যাবো—শুধু চা নয়, চা টা!

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অবিনাশ ডাক্তার আবার ক্রাচ দুটোকে ঠিক করে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলেন। গিরিজাপ্রসাদ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ধুতির ওপর খাকি বুশ শার্ট পরা মানুষটাকে দেখা যায়।

মনে মনে ভাবলেন, আশ্চর্য মানুষ!

খুশিতে উদ্বেল হয়ে তালতলার চটি টানতে টানতে ভিতর বাড়িতে এলেন গিরিজাপ্রসাদ। না, অবনীমোহন সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা বোধ হয় ভুল। গ্রামের লোকগুলোকে তিনি যেমন চিনে ফেলেছেন অবনীমোহনও তেমনি। তাই হয়তো ওঁচিছলা দেখাবার জন্যেই লোকগুলোকে বসিয়ে রেখেছিল। গিরিজাপ্রসাদও গেছেন দেখা করতে এ-খবর পেলে নিশ্চয় বেরিয়ে আসতো তাড়াতাড়ি!

সে যাই হোক, লোকটার হৃদয় আছে বটে, প্রায় সেই পুরোনো দিনের হৃদয় মোড়লের মত। সবাই বলে, গাঁয়ের জন্যে দুটো পয়সাও দিতে চায় না অবনীমোহন। তা যদি সত্যি হতো তা হলে এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী হতো কি সে? পাঁচ হাজার টাকা! ভাবতেও বিস্ময় জাগে। একটা মানুষ এতগুলো টাকা কিনা এক কথায় দিয়ে দিতে রাজী হয়েছে!

জীবনে কোনদিনই খুব বেশী টাকা দেখার সৌভাগ্য হয়নি গিরিজাপ্রসাদের। যা দেখেছেন চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর। সেও এমন কিছু মোটা টাকা নয়। তাই বিশ্বাস করতেও বাধে তাঁর। এত টাকা কেউ দিয়ে দিতে পারে, এক কথায়? যে পারে কত টাকাই না করেছে সে! আর গিরিজাপ্রসাদ ভাল ছাত্র হয়ে, পরীক্ষায় ভাল ফল করে কি করলেন? কি পেলেন?

তবু খুশী হয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ, আর এই খুশী হবার মত খবরটা নিভাননীকে না শুনিয়ে যেন তৃপ্তি নেই। তাই চটি টানতে টানতে ভিতর বাড়িতে একরকম ছুটে এলেন।

হাঁক ছাড়লেন, শুনছো?

কেউ সাড়া দিলো না। শুধু কম্বলে বসে বসে বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুললো বিমলা আর কমলা।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, তোর মা কোথায় গেল রে?

বিমলা ফিরে তাকালো দক্ষিণদুয়োরী ঘরখানার দিকে। গিরিজাপ্রসাদ দেখলেন নিভাননী এসে দাঁড়িয়েছেন খুঁটি ধরে। কিন্তু নিভাননীর মুখের দিকে তাকিয়ে দমে গেলেন। থমথমে মুখ নিভাননীর, রাগ থমকে আছে যেন মুখেচোখে।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে, কিংবা লক্ষ্য করেননি এমন ভান করে গিরিজাপ্রসাদ মুখে হাসি টেনে বললেন, অবনীর বুকটা দরাজ, বুঝলে! বুঝলি বিমলা....মেয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, অবনী হ্যাজ এ বিগ হার্ট। ইস্কুলের সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছে ও, ডাক্তার বলে গেল, পাঁচ হাজার টাকাই ও দেবে বলেছে।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি নিভাননী। এবার রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন, ঘরের খবর রাখার সময় তো নেই তোমার, বনের মোষ তাড়িয়েই বেড়াও।

গিরিজাপ্রসাদ বিমূঢ়ভাবে তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে। প্রশ্ন করলেন, কেন, কি হলো আবার?

—কি হতে আর বাকী আছে? বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠলো নিভাননীর, রাগে, অভিমানে। বললেন, তোমায় এখনও বলছি একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করো তুমি, তা না হলে কপালে অনেক দুঃখ আছে জেনে রেখো।

কথাটা গিরিজাপ্রসাদকে না বলে যেন শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। মোহনপুরের বউয়ের কাছ থেকে কথাটা শুনে অবধি রাগে গজরাচ্ছিলেন। রাগ মোহনপুরের বউয়ের বিরুদ্ধে। তাঁর দৃঢ় ধারণা, ও'র নামে অপবাদ রটাবার জন্যেই এমন একটা বিশ্রী কথা বলেছে মোহনপুরের বউ।

নিভাননী কিনা নিজে থেকে বিমলাকে...

ছি ছি ছি। এমন কথা কি করে বলতে পারলো মোহনপুরের বউ! আসলে কথাটা শুধু তাঁকেই নয়, হয়তো আরো অনেককে শুনিয়েছে সে! ওর ওই হাসি-হাসি মুখ দেখলেই তাই জ্বলে যান নিভাননী। এখন আর এতটুকু সন্দেহ নেই, ঠাকুরপোর মন ওই বিষিয়ে দিয়েছে। তাই কথায় কথায় আজকাল গিরীনও দাদাকে দু' কথা শোনাতে কসুর করে না। এতটুকু কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নেই।

গিরিজাপ্রসাদকে তাই কাছে ডাকলেন নিভাননী, এখন থেকেই সাবধান হতে বলতে হবে। বিমলার নামে, তাঁর নামে ঘরের লোক যদি এমন দুর্নাম দেয় তা হলে মেয়েদের বিয়ে দেবেন কেমন করে?

গিরিজাপ্রসাদকে কথাটা বলতে গিয়ে একবার দূরে রান্নাঘরের দিকে কটাক্ষ ফেললেন নিভাননী। দেখলেন, মোহনপুরের বউ উনোনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে ধোঁয়া-লাগা চোখে আঁচল ঘষছে।

আঁচলটা ঘষছিল মোহনপুরের বউ শুধু ধোঁয়ার জন্যে নয়, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবেই হয়তো চোখে জল এসেছিল তার।

নিভাননীকে বলেও যেন শান্তি পায়নি মোহনপুরের বউ। খবরটাই যে অশান্তির। বিমলার জন্যেই দুশ্চিন্তা নয়, সত্যি হলে যে টিয়ারও বিয়ে হবে না! লোকে বলবে, ওই বাড়িরই মেয়ে তো!

উদাসের কথাটা পাঁচ কান হয়ে যখন মোহনপুরের বউয়ের কানে এলো তখনই তার বুক কেঁপে উঠেছিল ভয়ে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি; তবু অবিশ্বাস করারও উপায় ছিল না।

বিকেল বেলায় পড়ন্ত রোদে বসে বসে কুলো হাতে নিয়ে চালের ক্ষুদ বাছছিলো মোহনপুরের বউ। এমন সময় গুপ্তদের মেজোগিন্নী এসে বললে, হ্যাঁ লা মোহনপুরের বউ, কি শুনছি সব?

কথার ধরন দেখেই চমকে উঠেছিল মোহনপুরের বউ। তাই চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, কি শুনছো?

—কালে কালে কতই দেখবো! শহর-বাজারের লোকদের ধরন-ধারনই আলাদা, বুঝলি। বলে মেজোগিন্নী ফিসফিস করে বললে, তোর বড় জা ভাল ফন্দি বের করেছে মেয়ের বিয়ের।

মোহনপুরের বউ বুঝতে না পেরে বললে, কিসের ফন্দি? কি বলছো তুমি?

গুপ্তদের মেজোগিন্নী এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, ওই যে বিডিও না কি, সোন্দর মত সেই ছিমছাম ছেলেটি আসে মটরে করে?

—হ্যাঁ, প্রভাকর। কি করেছে? মোহনপুরের বউ বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকায়।

—তাই হবে হয়তো, নামধাম কি আর জানি ছাই! তার সঙ্গে নাকি তোর জা মেয়েদের বেড়াতে পাঠায়।

হাজার হোক নিভাননী পর নয়। বিমলা রায়বাড়িরই মেয়ে। ভেতরে ভেতরে যত রাগবিদ্বেষই থাক অন্য কারো মুখে তাদের নিন্দে শুনতে ভাল লাগে না। মোহনপুরের বউয়েরও গায়ে এসে লাগে। দোষ-ত্রুটি যাই থাক, মোহনপুরের বউ নিজে বলতে পারে নিভাননীকে। তা বলে অন্যে এসে বলে যাবে?

মোহনপুরের বউ বিরক্ত হয়ে বলে, কি যা-তা বলছে!

গুপ্তদের মেজোগিন্নী হেসে বলে, বিশ্বেস না হয় উদাসকে ডেকে শুধো ক্যানে? মোড়লবউ বললে, গোপেন নাকি নিজের কানে শুনেছে।

—কি শুনেছে? মোহনপুরের বউ চটে যায় যেন।

উত্তর আসে, সব কি আর জানি ছাই! মটরে করে বেড়াতে পাঠায়, চিঠি লেকানিকি করে, আরো কত কি। শহর-বাজারের মেয়ে তো, মা-মেয়ে দুই সমান, টোপ ফেলে মাছ ধরছে লা টোপ ফেলে মাছ ধরছে!

বলে গটগট করে হেঁটে চলে যায় মেজোগিন্নী। কিন্তু মোহনপুরের বউয়ের মনের ভেতর যেন ঝড় বয়ে যায়। সত্যি?

হতেও পারে, সেই প্রথম দিনই তো দেখেছে সে, বাংলাবাড়িতে নির্লজ্জের মত কেমন হেসে হেসে বিমলা-কমলা গল্প করছিল প্রভাকরের সঙ্গে। টিয়া একবারটি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মারতে বাকী রেখেছিল মোহনপুরের বউ, অথচ কই বড়-জা তো মেয়েদের কিচ্ছু বলেনি! মেয়েগুলোও দিনরাত হইহই করে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায়, মানা তো করে না কেউ! না বটঠাকুর, না বড়-জা।

কিন্তু এও কি সত্যি হতে পারে?

ক'দিন ধরেই টিয়ার বিয়ের জন্যে স্বামীকে খোঁচাচ্ছে মোহনপুরের বউ। মেয়ে বড় হলে যে মায়ের বুকে চলতে ফিরতে খোঁচা লাগে, রাতে ঘুম হয় না—তা কি বোঝে পুরুষমানুষরা! তবু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্বামীকে পাঠিয়েছে সে, প্রভাকরের বাবার নাম-ঠিকানা যোগাড় করে আনতে, খবরাখবর নিতে। অট্টামা যখন ডাক্তারের কাছে শুনে এসেছে, টিয়াকে মনে ধরেছে প্রভাকরের তখন চেষ্টা করলে হয়তো......

কিন্তু গুপ্তদের মেজগিন্নীর কথা শুনে এ-ক'দিন আশায় আশায় যে স্বপ্নটা গড়ে তুলেছিল সেটা যেন হঠাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

কি আশ্চর্য! নিভাননী ভেতরে ভেতরে এমন কান্ড করছে টেরও পায়নি সে?

ঘাট থেকে কাপড়চোপড়গুলো কেচে এনে মেলে দিচ্ছিলো টিয়া। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অকারণেই যেন চটে গেল মোহনপুরের বউ। জবুথবু মত, শাড়িটা কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে টিয়া, কাপড় পরার মধ্যে এতটুকু শ্রী নেই ছাঁদ নেই। এমন স্বাস্থ্য, এমন বাড়ন্ত গড়ন, নাক-চোখ-মুখ এত ভাল, এক পিঠ চুল, হাত-পায়ের গোছা —কি নেই টিয়ার! রঙটাও তো মাজামাজা, পাড়াগাঁয়ে মানুষ রোদেজলেও এমন রঙ। অট্টামাও তো বলেছিল, বিমলার চেয়ে টিয়া অনেক সুন্দর। তবু মোহনপুরের বউয়ের মনে হয়, বিমলার চেহারাটা অনেক ছিমছাম, পোশাকে-আশাকে কত পরিচ্ছন্ন। কথাবার্তা, হাঁটা-চলায় কি এক ছন্দ আছে। দেখে ভালই লাগে মোহনপুরের বউয়ের। টিয়া কি বিমলার কাছ থেকে ওদের মত করে কাপড় পরতে শিখে নিতে পারে না? একটু চালাক-চতুর হতে পারে না? কেমন যেন বোকা বোকা চোখে তাকায়, পায়ে পা জড়িয়ে যায় হাঁটবার সময়! টিয়া যত সুন্দরই হোক, মোহনপুরের বউয়ের কেমন ভয় হয়, প্রভাকর কেন, যে কেউ মেয়ে দেখতে এলে বিমলাকেই পছন্দ করবে।

তাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল গিরীন ফিরে এলে বলবে, মেয়ের বিয়ের যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাড়াতাড়ি। গুপ্তদের মেজগিন্নীর কথায় ভয়টা আরো বেড়ে গেছে। কি জানি, বিমলার জন্যে শেষে না টিয়ার নামেও অপবাদ দিয়ে বসে লোকে। দূর দূর গাঁয়ের লোক কি আর এত খবর রাখবে! বলবে, রায়বাড়ির একটা মেয়ে বিডিওর গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। কোন মেয়ে, কার মেয়ে সে খবর কি আর রাখবে তারা!

তাই রাত্রের পাট চুকিয়ে শোবার ঘরটিতে এসে ঢুকেই স্বামীর মুখের দিকে তাকাল মোহনপুরের বউ। অন্যান্য দিন স্বামীর দিকে ফিরে তাকাতেও অনেক সময় মনে থাকে না তার। ছেলেমেয়েদের ঠিক করে শুইয়ে দেয়, মশারি গুঁজে দেয় বিছানার চারিধারে, বালিশ ঠিক করে দেয় কারো মাথার, তারপর বাটা থেকে একটা পান নিয়ে সেজে মুখে পুরে দিয়ে লম্ফটা নিবিয়ে

দিয়ে কোলের ছেলেটাকে বুকে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। আর শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু আজ একটা দুশ্চিন্তা ঢুকেছে মাথায়। পানটা মুখে পুরে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালো মোহনপুরের বউ। তারপর প্রশ্ন করলে, ঘুমোলে?

কোন সাড়া এলো না।

এবার কাছে এগিয়ে গেল মোহনপুরের বউ। তারপর স্বামীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, এই! ঘুমোলে নাকি?

—উঁ। ঘুমজড়িত স্বরে সাড়া দিল গিরীন।

মোহনপুরের বউ পান চিবোতে চিবোতে খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসলো; গিরীনের পাশে। বললে, শোন।

চোখ না খুলেই গিরীন আধো-ঘুম আধো-জাগা কণ্ঠে বললে, কি? বলে বালিশটার ওপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুলো, একখানা হাত রাখলে মোহনপুরের বউয়ের কোলের ওপর।

হাতখানা দু হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মোহনপুরের বউ বললে, আচ্ছা ঘুম বাপু তোমার! শোনো...

গিরীন সাড়া দিলো না, শুধু হাতখানা তার মোহনপুরের বউয়ের কোমরটা জড়িয়ে ধরলো।

মোহনপুরের বউ হেসে ফেললো। বললে, শোনো, খবর পেলে কিছু? সেই যে দেখতে আসবে বলেছিল যারা...

গিরীন এবার চোখ মেলে তাকালো।

বললে, প্রভাকরের খবরটা পেয়েছি আজ। কালনার ওদিকে বাড়ি, বাপ-মা আছে, ভাবছি এই সপ্তাহেই যাবো একবার ওর বাবার সঙ্গে দেখা করে...

মোহনপুরের বউ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

বললে, ছাই হবে গিয়ে।

—কেন?

—এদিকে ভেতরে ভেতরে দিদি যে কি চাল চেলেছে তা তো জানো না!

ফিসফিস করে একে একে গুপ্তদের মেজগিন্নীর কাছে শোনা সব কথাগুলো বললে মোহনপুরের বউ।

গিরীন হঠাৎ উঠে বসলো। ধমক দিয়ে বলে উঠলো, কি যা-তা বলছো? তোমারও মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

—রাগছো কেন? সত্যি কিনা উদাসকে ডেকে শুধিয়ে দেখলেই তো হয়!

গিরীন বলে উঠলো, কি বলছো তুমি? উদাস...উদাসকে ডেকে শুধোবো? রায়-বাড়ির মান ইজ্জত তাহলে থাকবে আর?

মোহনপুরের বউ বললে, ভাইঝির কীর্তি, গায়ে তো ফোস্কা পড়বেই তোমার। আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না, সময় থাকতে পৃথক হয়ে নাও তা নইলে শেষে...

গিরীন চুপ করে রইলো।

মোহনপুরের বউই বললে, ওই যে মেয়ে দেখতে আসবে কথা ছিল, তারাই যদি আসে...দিদিকে জানো না তো, দেখো ঠিক বিমলাকে তাদের সামনে কোন ছলছুতো করে পাঠিয়ে দেবে।

গিরীন বুঝতে না পেরে বলে, দিলেই বা!

—তা হলে আর টিয়াকে পছন্দ হবে তাদের?

গিরীন হেসে বলে, কি যে বলো! টিয়ার কাছে বিমলা! যারা বই-খাতাকে বিয়ে করতে চায় তাদের কথা আলাদা, কিন্তু মেয়ে দেখে যদি বিয়ে দিতে চায়...

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, ওই গরবেই থাকো। বলে গিরীনের পাশেই শুয়ে পড়ে মোহনপুরের বউ। তারপর গল্প করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে উঠে কিন্তু নিভাননীকে কথাটা না বলে স্বস্তি পায় না। হাজার হোক, তার নামটাও জড়িয়ে যাবে বড়-জায়ের সুনাম-দুর্নামের সঙ্গে। তাই সাবধান না করে পারে না।

আর সে কথাটা বলবার জন্যেই নিভাননীকে একসময় ডাকলে রান্নাঘরে থেকে। যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়।

দিদি! ডাকলে ঘাড় নেড়ে ইশারায়।

—বলছো কিছু?

—হ্যাঁ। নিভাননী কাছে আসতেই মোহনপুরের বউ বললে, বলছিলাম কি, আপনাদের বিমলে মানে তো আমাদেরও বিমলে দিদি।

নিভাননী চোখ কপালে তুললেন। মোহনপুরের বউয়ের হাবভাব কথা বলার ধরন দেখেই কেমন যেন বুঝতে পারলেন, এমন কিছু শুনতে হবে যা রীতিমত আতঙ্কজনক। দেয়ালে পিঠ দেওয়ার মত

ভিতরে ভিতরে রুখে দাঁড়ালেও গলার স্বর যথাসম্ভব বিনীত করে প্রশ্ন করলেন, কি বলছো? বুঝতে পারছি না ছোটবউ।

মোহনপুরের বউও যেন ঠিক কথাগুলো গুছিয়ে নিতে পারছে না। বললে, বলছিলাম কি, গাঁ সুদ্ধ লোক বলছে ওই প্রভাকর ছেলেটির সঙ্গে মটরে করে বিমলাকে বেড়াতে পাঠাচ্ছেন...

নিভাননী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অগ্নিবর্ষী চোখে তাকালেন মোহনপুরের বউয়ের দিকে।

মোহনপুরের বউ আমতা আমতা করলো।

—না, মানে দোষের কিছু না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোকদের তো চেনেন দিদি!

নিভাননী এবার রাগে ফেটে পড়লেন। এমন একটা অসম্ভব অবিশ্বাস্য কথা যেন কখনো শোনেননি নিভাননী।

কঠিন, ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, দেখো ছোট-বউ, এখানে আসার দিন থেকে পদে পদে তোমরা অনেক অপমান করেছো। কথায় বলে দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা, তাই। শেষে কিনা আমার মেয়ের নামে, আমার নামে এমন কথা তুমি বলতে পারলে?

বলেই রেগে উঠে চলে গেলেন নিভাননী।

হতভম্ব বিস্মিত মোহনপুরের বউ খানিক বসে থেকে নিজের কাজে চলে গেল। এত লোক যখন বলছে, কথাটা তো মিথ্যে নয়। আর এমন কিছু রাগারাগি করেও বলেনি মোহনপুরের বউ। তবে? না কি বড়জায়ের এও এক অভিনয়।

কিছুক্ষণ পরেই নাকি গিরিজাপ্রসাদ মহা খুশী মনে ইস্কুলের খবরটা নিয়ে এলেন স্ত্রীকে, নিভাননীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। ভাবলেন, প্রতিদিনের মতই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হয়তো কিছু খুঁটিনাটি নিয়েই থমথমে মুখ করে আছে।

গিরিজাপ্রসাদকে কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিলেন নিভাননী।

বললেন, ওরা আমাদের নামে কি নিন্দে রটাচ্ছে কানে এসেছে তোমার? শুধু ইস্কুল ইস্কুল করে...

কথা শেষ হলো না নিভাননীর। বাইরে থেকে ডাক এলো, মাস্টার মশাই, ও মাস্টার মশাই।

অবনীশ ডাক্তারের গলা। আবার ফিরে এলো কেন? হন্তদন্ত হয়ে চটি টানতে টানতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন গিরিজাপ্রসাদ।

ফিরে এলেন মিনিট কয়েক পরেই। বললেন, শুনেছো! দু' কাপ চা করে দাও, ...বিমলা, দু' কাপ...তিন কাপই দে মা, তিন কাপ। ডাক্তার প্রভাকরকেও ধরে এনেছে।

বলেই বেরিয়ে গেলেন আবার বাংলাবাড়ির দিকে।

বিমলা উঠে গিয়ে কেটলীটা তুলতে যাচ্ছিল, নিভাননী ঝাঁঝ দিলেন, তুই থাম। দে, আমি করে দিচ্ছি।

বিমলা অতশত বুঝলো না। মা যদি চা-টা করে দেয় ভালই তো। ও বই-খাতা তুলে রেখে সবে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, নিভাননী হাঁক ছাড়লেন, কোথায় যাচ্ছিস?

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে বিমলা। ইতিমধ্যে কোথায় কি ঘটে গেছে, কাকিমা কি বলেছে না বলেছে কিছুই কানে আসেনি তার। তাই বললে, বাইরে।

—বাইরে! বিমলার কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলেন নিভাননী, প্রায় ভেংচি কেটে উঠলেন। তারপর উষ্মার স্বরে বললেন, এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, বয়স বাড়ছে, না কমছে তোমার?

বলেই রাগে গজগজ করতে করতে এসে স্টোভ ধরালেন। স্টোভে পাম্প করতে করতে আগুনটা যত বেড়ে উঠছে, মোহনপুরের বউয়ের বিরুদ্ধে চাপা আক্রোশটাও যেন তখন তেমনিই বেড়ে উঠছে। যে কোন মুহূর্তে যেন ফেটে পড়বে।

না, মুখের মত জবাব দেবেন নিভাননী। কি ভেবেছে মোহনপুরের বউ! যা খুশি অপবাদ দেবে তাঁর নামে, বিমলার নামে? বেশ, তাই হোক, দেখুক মোহনপুরের বউ, দেখে জ্বলেপুড়ে মরুক।

দু' কাপ চা-ই ছাঁকলেন নিভাননী। এ বেলায় আর চা খেতে হবে না গিরিজাপ্রসাদকে, মনে মনে ভাবলেন।

তারপর ডাকলেন বিমলাকে।

বিমলা অভিমানে, অবোধ রাগে বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে বসেছিল। প্রথমটা সাড়া দিলো না।

বারকয়েক ডাকতে তবে মুখ তুলে তাকালো।

নিভাননী বললেন, শোনে যা।

উঠে এলো বিমলা।

নিভাননী হঠাৎ গলার স্বর নরম করলেন। বললেন, চা-টা দিয়ে আয় তো মা ওদের।

—আমি পারবো না। রাগ দেখালো বিমলা, বললে, কুমিকে ডাকো না!

—সে কোথায় গেছে কে জানে, যা লক্ষ্মীটি তুই দিয়ে আয়, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বিমলা অবশ্য বাইরে যাবার আগ্রহে এতক্ষণ মার ওপর চটছিলো; এবার কাপ দুটো তুলে নিলো, একটা কাঁসার থালার ওপর বসিয়ে নিয়ে চলে গেল বাংলাবাড়ির দিকে।

আর নিভাননী প্রতিশোধের আনন্দে ক্রুদ্ধ তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন রান্নাঘরের দিকে, মোহনপুরের বউয়ের দিকে।

দেখুক ও, দেখে জ্বলেপুড়ে মরুক। অদ্ভুত নৃশংস একটা আনন্দ অনুভব করলেন নিভাননী। (ক্রমশ)

উড়িষ্যার অধিবাসী নুলিয়াদের বলা হয় সমুদ্রের সন্তান। মাছ ধরাই এদের একমাত্র পেশা। তাই জীবিকার জন্য এরা সমুদ্রের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সমুদ্র কখন রোষবহ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কখন সে শান্ত সমাহিত—বাল্য থেকেই সমুদ্রকে দেখতে দেখতে তা তাদের জানা হয়ে গেছে। এখানে নুলিয়াদের জীবনের কয়েকটি ছবি তুলে ধরা হল।

১। সমুদ্রের সঙ্গে যারা পাঞ্জা লড়ে সেই নুলিয়াদের একজন। ২। ব্যাপারীর অপেক্ষায় সমুদ্রের ফসল অফুরন্ত মাছ। ৩। বেলাভূমিতে জাল মেরামতিতে ব্যস্ত। ৪। নৌকো বোঝাই করে মাছ নিয়ে আসা হচ্ছে ডাঙায়। ৫। আনন্দময় নুলিয়া ছেলেমেয়েরা। ৬। জালে বেশি মাছ পড়ার জন্য সমুদ্রের পুজো। ৭। জাল তৈরির কাজ পুরোদমে চলেছে।

আলোকশিল্পী

শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়

১

২

৩

৪
৫
৬
৭
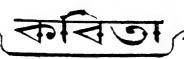
দূরের তারা

উমা দেবী

প্রথমে অনেক আলো—গান—হাসি—ব্যর্থ কোলাহল—
সময়ের রাজপথে ওরা মূঢ় মত্ত ও চঞ্চল—
কান্ত তুমি তারই মধ্যে এনেছিলে
নিশীথের তিমির প্রহর
আনন্দে গম্ভীর আর বেদনায় মন্থর—মন্থর।

প্রথমে তিমির শুধু—কিছু নাই আর।
তারপর হৃদয়ের তট ছুঁয়ে ধীরে ধীরে
জেগে ওঠা সৌরভের অদৃশ্য জোয়ার—
কায়াহীন অনুভূতি
অলক্ষ্যের সমস্ত আবৃতি—
ক্রমে রূপ-পরিগ্রহ করা এক সাকার পুষ্পের—
নাসা—চোখ—ঠোঁট—মুখ—ঘন ভ্রূযুগের
রেখা জেগে ওঠা এক দেহের সন্নিধি—
একটি নির্জন দ্বীপ—পার হয়ে সময়ের অকূল জলধি।

তারও পরে বাসনার রক্তিম কীটের
বিষরস কেন জমে ? কাটে প্রহরের
ক্লান্ত বেলা—সে নির্জন দ্বীপ হয় রাতের আকাশ—
তোমার সৌরভটুকু মরে গিয়ে জন্ম নেয় অস্থির বাতাস—
আর দেহরেখাটুকু দূরে দূরে চলে গিয়ে ক্রমে ক্রমে ধরে—
দুর্লক্ষ্য তারার রূপ বিরহী প্রহরে।

পবিত্র বাতাস

অনিরুদ্ধ কর

যেন ঝড়! যেন বৃষ্টি! না, কিন্তু কিছুই নয়! ঘরে
বাতাসের ঘোরাফেরা; বাতাসের নিশ্বাস ফেলার
শব্দ শুনলে মনে হয় বুঝি ঝড়, বুঝি বৃষ্টি, কার
চঞ্চল পল্লবে নীল রাত্রির শিশির শব্দহীন
ঝরে পড়েছে। কিন্তু না। না, এরা সমস্তই বাতাসের।

যে-মাঠে তখন ছিলে আকাশের বিশাল গম্বুজে
মাথার উপরে, দূরে কোনো প্রাচীন ঘণ্টার মতো
দোলকের মতো অস্তগামী শেষ সূর্য সম্মোহিত :
আসন্ন রাত্রিকে ছুঁয়ে সুরভিত বিপন্ন বাতাস
সেই মাঠ আকাশ সূর্যের দেহ ছুঁয়ে নির্বাসনে
যেতে চেয়ে পুনর্বার ফিরে আসছে তীক্ষ্ম শূন্যতায় ;
প্রহরীর মতো আছে শূন্যতায় বাতাসের স্মৃতি।

শতরূপে শতবার

তরুণবিকাশ লাহিড়ী

স্বর্গারোহণে কি সুখ জানা নেই, মহাভারতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, সে পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা, ভীষণা দানবী আর মেঘনাদ কিরাতের প্রতিকূলতা। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মে তাপদগ্ধ সমভূমি ছেড়ে হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নেওয়ায় যে নিরুপদ্রব সুখ তাতে তিলমাত্র খাদ নেই, এ আনন্দ অনির্বচনীয়। কণ্টকগুল্ম আর শালের বন পেরিয়ে দেখা দিল দেওদার আর পাইন, সুদীর্ঘ চির আর ইউক্যালিপটাসের সারি। কোশীর রজত-ধারা শতবাহু মেলে বেষ্টন করে রয়েছে কুমায়ুনকে, আবেগবিধুরা প্রণয়িনীর মত তার সারা অঙ্গে প্রিয় সঙ্গসুখের উন্মত্ততা। রূপসী কোশী আর তার সঙ্গীদের মঞ্জীরের গুঞ্জনে কুমায়ুন যেন এক অন্য জগৎ, এক কিন্নরলোক। প্রথম দর্শনেই চিত্ত আমার হারালো মনে হল,

'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

রানীক্ষেত। রাজা আর রানী এই চার অক্ষরের প্রতি আমাদের এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। কল্যাণী চট্ সিদ্ধান্ত করলেন, এবার গ্রীষ্মের অবকাশে আর কোথাও নয় রানীক্ষেতে যাব। ইতিহাসের ছাত্রী, ইতিমধ্যে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। রানীক্ষেত নামটি নাকি কাল্পনিক নয়। কোন এক বিস্মৃত অতীতে সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী এক রানী বাস করতেন সেখানে, দুর্ধর্ষ গুর্খাদের আক্রমণে তাঁকে রানীক্ষেত ছেড়ে চলে যেতে হয়। সরকারের খানদানী কর্মচারীদের জন্য যে প্রমোদ-ভবনটি নির্মিত হয়েছে তারই আশেপাশে রানীর দুর্গ ও বিলাস-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যাবে। কল্যাণীর কাছে রানীক্ষেতের সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন এক বিশেষ আকর্ষণ। কুমায়ুনের প্রাকৃতিক শোভার বিবরণ কতদিন মনকে উতলা করেছে তার ওপর এই উপরি লাভের আশা, ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখবার সুযোগ! নিজেকে আর বেঁধে রাখা গেল না। তবে শুধু রানীক্ষেত নয়, পথে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখন যতটা পারি দেখে আসব। কুমায়ুনের বুকে ত' শুধু একটি ঢেউ নয়, ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠেছে, তাদের চূড়ায় চূড়ায় অভিনবত্ব, কত না বৈচিত্র্য! কোথাও শৈল-সানুদেশে বিস্তীর্ণ সুনীল জলাধার, পরমরমণীয় নৈনিতাল কোথায়ও কোশীর অতলস্পর্শ খাদের কিনারে চির পাইন-দেওদারের নিবিড় ছায়াস্নিগ্ধ সুরম্য শহর আলমোড়া, আর গ্রামগুলি যেখানে গিয়ে স্তব্ধ হয়েছে, যেখানে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গগুলি রজত-কিরীট পরে যুগ যুগ ধরে হিমাদ্রির মহিমা ঘোষণা করছে, তারই অনতিদূরে বনভূমির মধ্যে একান্ত নির্জন তপস্বিনী কৌসানী। এই জায়গাগুলি না দেখে এলে কুমায়ুন-পরিক্রমা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

কাঠগুদাম যেন কুমায়ুনের প্রতিহারী। রহস্যলোকের পুরদ্বার। এখান থেকে শুরু হল প্রকৃত পার্বত্যপথ, পথের এক দিকে সুগভীর খাদ, তার এক দিকে খাড়া পাহাড়। চলেছি আর মনে পড়ছে গুরুদেবের একটি কবিতা, বিম্ববতী। রানী নিখুঁত ভাবে সাজলেন, রত্নখচিত পট্টবাস পরলেন, গলায় দোলালেন মুক্তার হার, কত যত্নে রচনা হল কবরী, তবু দর্পণকে জগতের সেরা রূপসী কে এই প্রশ্ন করতেই মুকুরে ভেসে উঠল একটি নিরাভরণ হাসিমাখা মুখ, তাঁর সতীন-কন্যা বিম্ববতীর আনন! তেমনি নগরকে নাগরী বানাতে কি আয়াস না স্বীকার করি, কিন্তু অট্টালিকার অরণ্যে, বিজলীবাতির রোশনাইয়ে আমাদের মন ত' ভরে না। শত যোজন অতিক্রম করে শহরের মানুষ আসে পাহাড়ের কোলে। পর্বতের শান্তশ্রীর মধ্যে লুকানো রয়েছে দুর্লভ ধন, শান্তি। তুষারমৌলি হিমালয়ের সমাহিত মৌনতায়, সুগভীর গিরিখাতের অশ্রুত বাণীতে কি যেন যাদু আছে, এখানে এলে বিক্ষুব্ধ মন আপনা হতেই শান্ত হয়ে যায়, হৃদয়ের তারে একটি গভীর সুর ঝঙ্কার তোলে, 'আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে'।

বাসের গতিবেগ দ্রুত হয়েছে। সর্পিল পথের ধারে ধারে অজস্র ফুল, বাতাস মিষ্টি গন্ধে মৌ মৌ করছে। ভাওয়ালী এসে গেল। বেশ ঠাণ্ডা। স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে ভাওয়ালী খ্যাতিমান। এখানে যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি বড় চিকিৎসা-কেন্দ্র আছে।

বাস থামতেই ছেঁকে ধরল ফলওয়ালারা, হরেকরকম ফল, আড়ু, খোমানী, স্ট্রবেরী,
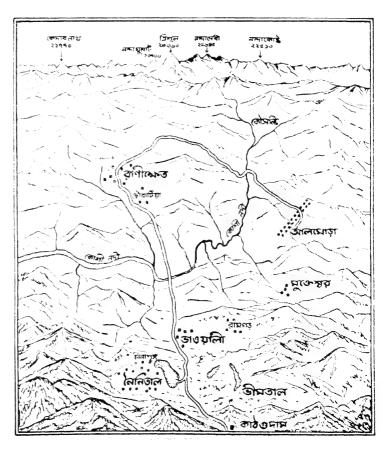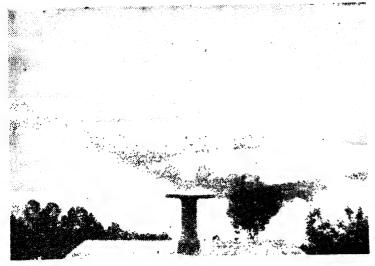
কোশানীর এক দৃশ্য

পলাম, পীচ আরও কত কি। কুমায়ুনের ঐশ্বর্য!

ভাওয়ালী ছাড়িয়ে বাস চলেছে কোশী পর্যটকের অভিমুখে নামতে হচ্ছে। চড়াইয়ের পর উৎরাই। ঠাণ্ডার রেশ কোথায় মিলিয়ে গেল! হিমালয়ের এই দিকে ছড়ানো পর্বতশ্রেণীগুলি পরস্পর সমান্তরাল, দুটি শৈলমালার মধ্যে গভীর উপত্যকার ব্যবধান। রানীক্ষেত যাওয়ার পথে কোশীর উপত্যকা অতিক্রম করতে হয়। অনেকটা নেমে আবার উঠতে হয়। রানীক্ষেত পৌঁছাতে পৌঁছাতে অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেল। বাসস্ট্যাণ্ডে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন দিনের আলোর শেষ রশ্মি গির্জার চূড়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। স্বাগত জানালেন ট্যুরিস্ট অফিসার শ্রীগর্গ, তাঁর সহায়তায় বাসস্ট্যাণ্ডের নিকটে এক সুন্দর হোটেলে আশ্রয় পেলাম। গর্গের সৌজন্য ভোলবার নয়, কথা দিলেন রানীক্ষেতের ভ্রমণসূচী তিনি আগামীকাল ঠিক করে দেবেন।

পরদিন কুরুগাঁ আর অপেক্ষা করতে সময় দিলেন না, সবাইকে নিয়ে চললেন কিংবদন্তীর রানীর নিদর্শনের খোঁজে। হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, ভবনের অনতিদূরে রয়েছে কয়েকটি পাথরের অবশেষ। জনশ্রুতি, ঐ জায়গায় পূর্বে রানীর প্রাসাদ আর দুর্গ ছিল। তিনজনে ইতিহাসের প্রেক্ষিত খুঁজতে লাগলেন গর্গ, কুরুগাঁ ও আমাদের অন্যতম বন্ধু সরকার। তিনজনেরই একমত, রানীক্ষেতের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শহরটিকে মোটামুটিভাবে ইংরাজদের সৃষ্টি বলেই ধরে নেওয়া যায়। প্রবাদ-কথিত রানীর পর যাঁরা এই অঞ্চল শাসন করতেন তাঁদের মনোযোগ আলমোড়ার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। গুর্খা কিংবা কুমায়ুনের চাঁদ রাজাদের বিশেষ কোনও স্মৃতিচিহ্ন এখানে দেখা যায় না। সুদূর অতীতে হিউ-এন-সাঙের বিবরণে এই এলাকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবরণে আছে, হিউ-এন-সাঙ কুমায়ুনে শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন, ফরিস্তার কাহিনী, আলেকজান্দারের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরু রাজা, তাঁর রাজত্ব নাকি কুমায়ুনেই ছিল। রানীক্ষেত ছিল সেই 'পুর' বা পুরু রাজার রাজ্যের অংশবিশেষ।

আধুনিক রানীক্ষেত শহরের (উচ্চতা ৬০০০ ফিট) পত্তন হয় ১৮৬৯ সালে। তৎকালীন সর্বাধিনায়ক স্যার উইলিয়ম ম্যানসফিল্ড বৃটিশ সৈন্যদের উপযোগী এক পার্বত্য বাসস্থান নির্বাচনের জন্য মেজর ল্যাঙকে আদেশ দেন। ল্যাঙ রানীক্ষেতকে মনোনয়ন করেন। তিনটি এলাকা, আলমা ব্যারাক, ছোবাটিয়া এবং দুলিক্ষেত সংযুক্ত করে রানীক্ষেত গড়ে ওঠে। এর মধ্যে আলমা ব্যারাক অঞ্চলই সর্বপ্রধান, এখানে রয়েছে সৈন্যদের শিবির ও বিভিন্ন দপ্তর। শহরের কেন্দ্রস্থলে সুপরিসর জায়গাটিতে বাসস্ট্যাণ্ড, তার দু ধারে দুটি প্রধান সড়ক একটি গিয়েছে নৈনিতাল-কাঠগুদামের দিকে, অপরটির লক্ষ্য আলমোড়া। অন্য সব পার্বত্য শহরের মত এখানেও সবচেয়ে আকর্ষণীয় সরণি ম্যাল রোড। তবে রানীক্ষেতের ম্যালে বিপণির ভিড় নেই, পথ জনবিরল। পথের ধারে ধারে ফুলগাছের দোলনাগুলি চেয়ে দেখবার মত। নিরালা বলেই পথচারীদের জন্য আয়োজনটা আরও চোখে পড়ে। কোথাও বড় গাছের ছায়ার নীচে প্রস্তরবেদী সাজানো রয়েছে, কোনও রডোড্রেনডনের কুঞ্জে দুটি মুখোমুখি বসবার জায়গা। দিনের আলো মিলিয়ে যায়, ঘন গাছের ছায়া আর নিয়নের মৃদু নীলাভ আলোয় রানীক্ষেতকে যেন স্বপনপুরী বলে মনে হয়। পথ চলতে চলতে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, শুধু নিরালা বীথির ধারে ধারে কোনও কুঞ্জ থেকে ভেসে আসে চুড়ির জলতরঙ্গের আওয়াজ, অস্ফুট কানাকানির একটু বা আভাস। সেখানে হয়ত সেই চিরন্তন প্রশ্নেরই পুনরুক্তি চলছে—

'তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া
এ কি সত্য?'

রাণীক্ষেতের সড়ক : ম্যাল রোড

প্রায় মাইল চারেক দূরে চৌবাটিয়া। এখানে সরকারের অধীনে এক বিরাট ফলের উদ্যান আছে। পাহাড়ের ঢালে ধাপ কেটে কেটে উদ্যান রচনা করা হয়েছে। এই প্রথায় চাষ করলে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। ধাপগুলি অবলম্বন করে উদ্যানটি কমপক্ষে দেড় শ' ফিট নীচে নেমে গেছে। বাগানে নানা রকমের ফল ফলেছে, আপেল নাসপাতি আর খোমানী প্লাম আঙুর। সুখের কথা, ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে সরাসরি চিঠি লিখে চৌবাটিয়ার ফল উপভোগ করা যায়। শুধু ফলের চাষ নয়, উদ্যানকে ভিত্তি করে চৌবাটিয়ায় ফলজ শিল্প গড়ে উঠেছে, এর পিছনে সরকারের যত্নের অন্ত নেই। উদ্যানের নীচে বিরাট গবেষণাকেন্দ্র, সেখানে মৃত্তিকার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। উত্তর প্রদেশ সরকার টুরিস্টদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতি যে কি দৃষ্টি রাখেন তা শিক্ষা করবার যোগ্য। সেখানেই হিমালয়ের দৃশ্য একটু ভালভাবে নয়নগোচর হয়। সেখানেই দেখি, সুন্দর একটি রঙীন মানচিত্র আঁকা রয়েছে, কি দেখছি তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। চৌবাটিয়ার উচ্চতা রানীক্ষেত অপেক্ষা বেশী। প্রায় ৭০০০ ফিট। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে দেখা যায় অনেকগুলি চূড়া, নন্দাদেবী, নন্দাঘুণ্টি, [illegible] মধ্যে একটি উপত্যকা [illegible] আছে। [illegible] উচ্চতার সঙ্গে [illegible] [illegible] সেই [illegible] নদীর [illegible] স্থির বিদ্যুৎরেখা [illegible] হয়। সব মিলিয়ে চৌবাটিয়া বড় রমণীয়।

রানীক্ষেতের অপর আকর্ষণ কালিকা দেবীর মন্দির। মাইল তিনেক দূরে আলমোড়া সড়কের উপর একটি পাহাড়ের চূড়ায় দেবীর দেউল। মন্দির সংলগ্ন একটি ঘরে রহস্যময় এক সাধু বাস করেন। বাংলাদেশের অনেক খবর তিনি রাখেন। সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার কাহিনী বললেন। স্বরূপ বুঝতে পারলাম না, প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছি, আশীর্বাদ করে সাধু দুটি ফল দিলেন, কুমায়ুনের নিজস্ব সম্পদ, দুটি আড়ু।

রানীক্ষেত থেকে বিদায় নেবার সময় গর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগল। ভাবলাম, কি উত্তর দি, ইনি আজন্ম পাহাড়ের বাসিন্দা, কি করে জানবেন সমতলের লোক পাহাড়ে এসে কি পায়, কি করে এঁকে বোঝাব 'আমার সুখ'। জবাব দিলাম,

'যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি তাহা তুমি পেলে নাকো।'

রাণীক্ষেতের বাসস্ট্যান্ড

উদ্দীপ্তির ব্যাখ্যা করলাম। প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, তাঁর সম্বন্ধে কি বলেছি তা আদপেই গায়ে মাখালেন না, কুমায়ুনের প্রশংসায় খুশী।

আলমোড়া চলেছি। আবার সর্পিল [illegible] বেশী। আলমোড়ার লোকসংখ্যা রানীক্ষেতের চেয়ে অনেক বেশী, শহরটি বেশ বড়। পাহাড়ের ঢাল ধরে [illegible] শহর গড়ে উঠেছে। আমাদের [illegible], রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্ট হাউসে আশ্রয় পেলাম। আলমোড়া [illegible] সুন্দর [illegible] থেকে দূরে কোশীর [illegible] ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্বামী তুরীয়ানন্দ রামকৃষ্ণ কুটীরের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ধীরে ধীরে এর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে, সুন্দর গ্রন্থাগার, ভজনালয়, বিশ্রামগৃহ নিয়ে রামকৃষ্ণ কুটীর আজ আলমোড়ার গর্বের বস্তু। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বামীজিরা এখানে আসেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক কর্মপথে [illegible] [illegible] করে আবার নিজের নিজের আশ্রমে ফিরে যান। আশ্রমের দৈনন্দিন জীবন নিয়মে বাঁধা। ঘণ্টা পড়লে আহার্য গ্রহণ করতে যেতে হবে, ঠিক সময়ে প্রতিদিন চলছে বেদ-বেদান্তের ক্লাস, ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণের আরতি। আশ্রমের প্রতিটি কার্য প্রত্যেকের নিয়মে। অতিথিদের ভার নিয়েছেন স্বামী [illegible]ানন্দ। এই নিরলস কর্মযোগীর কথা কোনদিন ভোলবার নয়।

নৈনিতাল হ্রদের শোভা

যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের প্রধান অবলম্বন ট্যুরিস্ট অফিসার। স্বাধীনতার এটি একটি দান। পরদিন প্রভাতে আলমোড়ার স্নায়ুকেন্দ্র বাসস্ট্যান্ডের কাছে ট্যুরিস্ট অফিসে গেলাম। অফিসার এ-দেশীয় শ্রী যোশী। হিমাচলের এমন নৈসর্গিক শোভার মধ্যেও কুরুপী তাঁর ইতিহাস-প্রীতি হারাননি। প্রথম সাক্ষাতেই প্রশ্ন করলেন, আলমোড়ার ইতিহাস বলুন? যোশী ঈষৎ হাসলেন, তারপর দূরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে যেন স্বগতোক্তি করলেন, তা হলে ত' আমাদেরই ইতিহাস বলতে হয়! এতক্ষণ আমি আর অধ্যাপক সরকার বিশেষ কোনও আগ্রহ বোধ করিনি, এবার কাছে এসে বললাম, বলুন। যোশী ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে চললেন। চাঁদ বংশের রাজারা সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে কুমায়ুনের ওপর অধিকার বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সোমচাঁদ এলাহাবাদের কাছে বাস করতেন। তিনি ৯৫৩ সালে কত্যুরি রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। যৌতুক হিসাবে সোমচাঁদ আলমোড়ার চম্পাবত জায়গাটি পান। প্রয়াগ থেকে চম্পাবতে আসার সময় তিনি যোশী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। আলমোড়ার ইতিহাসে সব সময়েই যোশী ব্রাহ্মণদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চাঁদ রাজারা কুমায়ুনে রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজধানী ছিল আলমোড়া। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর অন্তর্বিরোধে চাঁদ রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, গুর্খারা তাঁদের পরাজিত করে আলমোড়া দখল করে। কিন্তু গুর্খাদের আধিপত্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি (১৭৯০—১৮১৫)। পূর্বে কুমায়ুনে প্রচুর শন উৎপন্ন হ'ত। এই লাভজনক বস্তুটির প্রতি নজর পড়াতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধ হল। লর্ড গার্ডনারের অধীনে একদল সৈন্য কুমায়ুনে পাঠানো হল। ১৮১৫ সালের ২৬শে এপ্রিল আলমোড়ার পতন হয়।
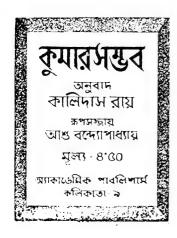
যোশী প্রস্তাব করলেন, চলুন না ঐতিহাসিক রণভূমি দেখে আসি। আলমোড়া থেকে আড়াই মাইল দূরে সিতোলী। এক দীর্ঘচূড়া অনতিউচ্চ পাহাড়। সিতোলীতেই কে হবে প্রভু আর কে প্রভু-ভক্ত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। সিতোলীর রণক্ষেত্রে গার্ডনার গুর্খাদের পরাজিত করেন।

আলমোড়া শহরের প্রধান গুরুত্ব দুরদুর্গম যাত্রাপথের প্রধান ঘাটি হিসাবে। দু' দলের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁরা কেনাকাটায় ব্যস্ত, দু' তিন দিনের মধ্যেই কৈলাস মানসসরোবরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। পিন্ডারী হিমবাহ দেখতে হলে আলমোড়া হয়ে যেতে হয়। পিন্ডারী যাওয়ার পথে পড়ে বাগেশ্বর। সরযূ আর গোমতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই গ্রামের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িত। বাগেশ্বরের মার্কণ্ডেয় শিলা বহন করছে সেই পুণ্য-শ্লোক ঋষির মহিমা। গ্রামের অধিদেবতা বাগেশ্বর মহাদেব। এই গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির রয়েছে, তার মধ্যে বাগনাথ, দত্তাত্রেয়, ভৈরবনাথ ও গঙ্গাজীর দেউল সত্যই দর্শনীয়। আলমোড়া থেকে মোটরে বাগেশ্বরে আসা যায়, কিন্তু যাঁরা হিমালয়ের অনিন্দ্য নৈসর্গিক শোভার নিবিড় পরিচয়

নৈনিতাল শহরের একাংশ

করছি, এক লহমার জন্যও হিমালয় তাঁর ওড়না খোলেন নি। সাহিত্যরস আছে দেখে সাহস হ'ল, ভাবলাম দূরে গিয়ে একটু কৌতুক করি, আবহাওয়ার এ কি বেয়াদবি, আপনি আছেন তবুও! কিন্তু বেশী এগোলাম না, শুনি ফৌজী অফিসারদের নাকি 'কাক-কাকুরা' জ্ঞান থাকে না, তাঁদের কাছে কাক আর কাকা একই পদার্থ! তিনি যা বলছিলেন, সবিনয়ে সব স্বীকার করে নিলাম।

কুমায়ুনের এমনই শোভা যে, সূর্যদেবেরও এখান থেকে বিদায় নিতে মন সরে না। সন্ধ্যা সাতটার পরও দিনের আলোর রেশ থাকে। বাংলোর কিনারে বসে অপেক্ষা করছি সূর্যাস্তের জন্য। এই আরামপ্রদ রাজকীয় গৃহটিতে কোনও বন্দোবস্তের ত্রুটি নেই, বসবার জায়গা বাঁধানো রয়েছে, সামনে সুন্দর ঝুলন্ত বাগিচা, সেখানে যেন রঙের প্রদর্শনী বসেছে, অজস্র ফুলের সমারোহ উদ্যানে, কত বর্ণের, কত বিচিত্র গঠনের। আকাশে মেঘের আনাগোনার বিরাম নেই, ধরিত্রী আর তপনের মিলনলগ্নের নিরাবরণ রূপটি যে দেখতে পাব, এ ভরসা আর রইল না। তবু একেবারে নিরাশ হতে হ'ল না। দেখলাম, একসময় মেঘের অন্তরালে আদিত্য স্পর্শ করলেন বসুন্ধরাকে, তাঁদের পুলকের ছোঁয়ায় আকাশ রাঙিয়ে গেল, শরমের আবির ছড়িয়ে পড়ল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ওপর। এক লাজরক্ত বধূর কাছে প্রণয়ভারনত দয়িতের ক্ষণ-অবস্থিতির যে মাধুর্য তার স্পর্শ মুছে দিল জলস্থলের যত গ্লানি, সোনালী আলোয় একটি সুরই বাজতে থাকল, 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় এ ধরণীর ধূলি'।

কিন্তু গিরিরাজের রজতকিরীট দেখবার যে বাসনা নিয়ে এসেছিলাম, তা সফল হ'ল না। পরদিন সকালে দেখি মেঘের আবরণে কোনও ছিদ্র নেই। কৌশানী থেকে ২১০ মাইল দৈর্ঘ্য জুড়ে অবস্থিত হিমালয়ের মহান চূড়াগুলি পর পর দেখা যায়। পশ্চিম থেকে পূবে কেদারনাথ, নীলকণ্ঠ, নন্দাঘুণ্টি, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দকোট, পঞ্চোলী। একটিরও দর্শন পেলাম না। আমাদের থাকবার মেয়াদ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার, শেষ হতে আর ঘণ্টা দুই বাকি, চলে যেতেই হবে। মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল না, কিন্তু তার জন্য খেদ নেই, কৌশানীর করপুটে ক্ষণকালের জন্যও যে ঠাঁই পেলাম তাতেই ধন্য। পুনঃদর্শনায় চ।

এর পর লম্বা পাড়ি। কৌশানী থেকে নৈনিতাল, প্রায় এক শ' মাইল পথ। উত্তর প্রদেশের পঞ্চপ্রধানের মধ্যে নৈনিতাল অন্যতম (অন্য চার শহর: বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা)। পাহাড়ের চূড়ায় একটি স্বাভাবিক জলাধার নৈনিতালকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এর ওপর শহরটি রাজ্য সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। স্বাভাবিকভাবেই এর জৌলুস রানীক্ষেত আলমোড়া অপেক্ষা অনেক বেশী। টুরিস্টদের ভিড় নৈনিতালেই সবচেয়ে বেশী হয়, আগন্তুকদের মধ্যে পাঞ্জাবীরা সংখ্যায় প্রধান।

নৈনি হ্রদকে ঘিরে শহর। হ্রদের এক প্রান্তের নাম তল্লীতাল, অপর প্রান্ত মল্লীতাল। তল্লীতাল আর মল্লীতালকে যুক্ত করছে ম্যাল রোড। ম্যালেই শহরের যত সম্ভ্রান্ত বিপণি আর হোটেলের মেলা। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, কুমায়ুনের তিনটি নৈনিতাল, রানীক্ষেত আর আলমোড়া, এই তিন শহরের ম্যাল রোডের নতুন নামকরণ হয়েছে মহাত্মা গান্ধী সরণি।

শুধু নৈনিহ্রদ নয়, নৈনিতালের আশেপাশে আরও অনেকগুলি জলাধার আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভীমতাল, সাততাল, ঘুরপা তাল, মালওয়া তাল আর নৌকাচিরা তাল বা তাল-হ্রদ। হ্রদগুলি কুমায়ুনের এক বিস্ময়। রূপবতী নৈনির প্রহরে প্রহরে নব নব বেশ, প্রভাতে পাল উড়িয়ে চলে ময়ূরপঙ্খীর দল, পিছনে আসে খেয়াতরীর বাহিনী, সারা দিন হ্রদের জলে চলে আলোছায়ার রঙ্গ, তার রাতে— নগরের কোলাহল একসময় স্তব্ধ হয়ে যায়, বিজলী বাতির নীলাভ আভা ঝাউয়ের নিষেধ মানতে চায় না, ফাঁক পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের বুকে, মোহিনী নৈনির কালো কবরী ঘিরে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মালা দুলতে থাকে। ঐ রূপ অপরূপ।

নৈনিতালের অধিষ্ঠাত্রী নৈনিদেবী। হ্রদের এক প্রান্তে দেবীর মন্দির। সুপরিসর মন্দিরটি শহরের এক বিশেষ আকর্ষণ। মন্দিরের অনতিদূরে নৈনিতালের ময়দান। অপরাহ্নে এখানে রঙের মেলা বসে। সুবেশ-সুবেশাদের অরণ্যে হারিয়ে যেতে হয়, পোশাকের জৌলুসে চোখে ধাঁধা লাগে। দুঃখবাদী বলে হয়ত নিন্দা কুড়োব, কিন্তু সত্যের খাতিরে একটা তুলনামূলক ছবির কথা না উল্লেখ করে পারি না। প্রাচুর্যের এই প্রদর্শনীতে এসে বারবার মনে হয় পাহাড়িয়াদের কথা। কি শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে তারা দিন কাটাচ্ছে, কি দীনতা তাদের বেশভূষায়, সামান্য মোট বহনের অধিকার পাওয়ার জন্য কি আকুতি! অমানুষিক পরিশ্রম করে তারা পাহাড় কেটে ধাপ বানিয়েছে, পাথুরে জমি থেকে আদায় করছে ধান আর জওয়ার। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ঐ ফসল কত সামান্য! হিন্দুস্থান হিমালয়ের নিকট অশেষ ঋণে ঋণী, হিমাচল না থাকলে উত্তর ভারত মধ্য এশিয়ার মরুভূমির অংশ হত। এই ঋণ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আর শোভন নয়। কুমায়ুনে কুটীরশিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে, সম্ভাবনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য উদ্যোগী হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।

বিদায় বেলার বাঁশির রাগ চিরকালই বেহাগ। একের পর এক মিলিয়ে যাচ্ছে হ্রদের দৃশ্য, পাহাড়ের শোভা, শ্যাম বনান্ত আর বারবার মনে হচ্ছে, এখন থেকে কুমায়ুন শুধু স্মৃতি, পুনরায় নগর-সংগীতে কণ্ঠ মিলাতে হবে। আবার সেই ক্লান্তিকর জনতাসংঘ, ছন্দহীন মহাঅসত্য। কাঠগুদাম ছাড়িয়ে এসেছি, পাহাড়ের শেষ তরঙ্গরেখাও বিলীন হয়ে গেল। সমভূমির ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। আকাশের চেহারা ফিরেছে। যাবার সময় দেখেছিলাম ধরণীর আঁচলখানি অধিকার করে জ্বলছিল প্রলয়রূপ চিতাগ্নিশিখা, লৌহ লৌহ বিরাট অম্বর। সে দগ্ধতাম্র দিগন্তের চিহ্নমাত্র নেই। থরে থরে মেঘ জমেছে, আসন্ন বর্ষণের আশায় প্রকৃতি উদ্‌গ্রীব, তমালের চূড়ায় চূড়ায় পুলকের শিহরণ, সমস্ত পেখমখানি মেলে ধরে ময়ূর আনমনা। কলাপের বিকাশে ছন্দ এল ময়ূরীর চরণে, সে ছন্দের সুর বাজল আমাদের মনে, বাজল আমাদের ভাবনায়, কর্মে বাজল, চেতনায় বাজল। এই সরসতা হিমালয়ের করুণার দান। মেঘের দল এলোমেলো বাতাসে ভর করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছিল, তাদের সংহত করে হিমাদ্রি, পাঠিয়ে দিলেন আর্যাবর্তে। গিরিরাজের দাক্ষিণ্যে আমাদের শস্যভাণ্ডার ভরে উঠল। ভারতের ধ্যান-মূর্তি, সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের উৎস-ভূমি, হিন্দুস্থানের পিতৃপ্রতিম নগাধিরাজ হিমাচলের বন্দনা করি, শতরূপে শতবার।

FAMILY FAVOURITES
The illustrated monthly journals, SOVIET UNION and SOVIET WOMAN, have become family favourites throughout the world. The magazines reflect the kaleidoscopic variety of life of a dynamic people building a happy society.
SOVIET UNION
(Monthly in English, Hindi and Urdu)
Annual Rs. 6.75 2-year Rs. 10.
SOVIET WOMAN
(Monthly in English and Hindi)
Annual Rs. 4.25 2-year Rs. 6.
adcrafts
SOVIET UNION
SOVIET WOMAN
UNIQUE Gifts
TO ANNUAL SUBSCRIBERS
A beautiful multicoloured pictorial calender of 1962 for every annual subscriber for each magazine, sent directly from Moscow with first issue.
Reduced subscription rates for every two-year subscriber and pictorial calenders of 1962 and 1963 sent with first issues of each year.
Renewal concession of 10% reduction in the subscription rates.
Send your subscriptions to :

চিত্রগ্রীব

সত্যব্রত ভৌমিকের চিত্রকলা

আর্টিস্ট্রী হাউস-এ গত সপ্তাহে শিল্পী সত্যব্রত ভৌমিক তাঁর প্রথম একক চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। সত্যব্রত ভৌমিক 'স্টুডিও' গ্রুপ-এর সভ্য হলেও তাঁর আঁকায় স্টুডিওর অন্যান্য শিল্পীদের প্রভাব পড়েনি। এঁর রচনার মেজাজ ষোল আনাই প্রাচ্য। সূক্ষ্ম রেখা, হাল্কা ওয়াশ, কিছুটা চীনা ধরনের টানটোন এসব দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় শিল্পী পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকের প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নি। যে গোষ্ঠীর প্রত্যেক শিল্পীই পাশ্চাত্ত্য শিল্পের অনুরক্ত সেই গোষ্ঠীর সভ্য হয়েও শিল্পী ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করেননি দেখে সত্যিই আশ্চর্য হই। তেল মাধ্যমের রচনা অপেক্ষা জলরঙের রচনাগুলিই অপেক্ষাকৃত রসোত্তীর্ণ বলে মনে হয় আমার। তেল

নিঃসঙ্গ—সনৎ কর

স্বনিঃসৃত স্রোতস্বিনী। —সত্যব্রত ভৌমিক

মাধ্যমেও শিল্পী একই ধারায় রচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার ধারণা শিল্পী তেলমাধ্যমের রহস্য সম্বন্ধে খুব ওয়াকেফ-হাল নন। শিল্পীর শারীরস্থান জ্ঞান নিভুল নয় তবে ইনি যে ধারায় চিত্র রচনা করেন সে ধারার নিভুল শারীরস্থানের প্রয়োজনীয়তা নেই। এই সঙ্গে শিল্পী কয়েকটি টালিও প্রদর্শন করেছিলেন। টালিগুলির ওপর ভারতীয় প্রথায় ফ্রেস্কো রচনা করা হয়েছে।

সনৎ করের একক প্রদর্শনী

পার্ক ম্যানসন্স এর প্রিন্টস আর্ট গ্যালারী এ সপ্তাহে শিল্পী সনৎ করের চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। সনৎ কর কলকাতার গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট-এর প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের শিল্প শিক্ষক। ছাত্রাবস্থা থেকেই বহু প্রদর্শনীতে যোগদান করেছেন। অধুনা লুপ্ত আর্টিস্টস সার্কল-এর সভ্য এবং বর্তমানে সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর যুগ্ম কর্ম-সচিব। বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন পরিচালিত বাংলার তরুণ সমকালীন চিত্রকরদের চিত্রকলা প্রদর্শনীতেও এঁর রচনা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। এ প্রদর্শনীতে যে কয়টি রচনা প্রদর্শন করা হয়েছে তার বেশীর ভাগই আমার দেখা। তিনটি কি চারিটি রচনা আগে দেখিনি। শিল্পীর আঁকার ধারায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ক্যাটালগ-এ যে শিল্পী পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে—সুররিয়ালিস্ট স্কুলের রচনাই হল এঁর অনুপ্রেরণা। সনৎ করের চিত্রকলার ক্রমবিবর্তন আমি শিল্পীর ছাত্রাবস্থা থেকেই লক্ষ্য করছি। শিল্পী কোনও কালে

সুররিয়ালিস্ট ধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। সুররিয়ালিস্টদের মতবাদের সঙ্গে এ'র মতবাদের কোনও মিল নেই। আকার ধারাতেও কোনও মিল নেই। কোনও কোনও রচনায় শিল্পী পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের চিত্রকলার সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। এই রচনাগুলি আকর্ষণীয় হয়েছে সন্দেহ নেই। প্রত্যেক রচনাই আবেগময়। প্রদর্শনীটি আমরা উপভোগ করেছি। আগামী ২০শে জানুয়ারী অবধি জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

তীর্থবাসরের বার্ষিক প্রদর্শনী—১০নং মেহের আলী স্ট্রীট-এ শ্রীমতী অমিতা ঘোষাল পরিচালিত তীর্থবাসরের বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় গত সপ্তাহে। এ প্রদর্শনীতে চিত্রকলা, কারু শিল্প, সূচি-শিল্প প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাজও প্রদর্শন করা হয়। ফেলে দেওয়া জঞ্জালের সাহায্যেও নানান রকম শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেছেন এ'রা, যেমন ডিমের খোলার পুতুল, ভাঙ্গা শিশি বোতলের পুতুল প্রভৃতি। শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের কাজগুলি আমরা উপভোগ করেছি সবচেয়ে বেশী।

একটি ঘরোয়া সংবাদ—দুর্গাপুরের এ আই সি সি-র সময় ব্যবস্থা ভাল ছিল, না এই অধিবেশনে (পাটনায়) ব্যবস্থা ভাল এই লইয়া তর্কের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীশরণ সিং নাকি বলিয়াছেন যে, পাটনার ব্যবস্থাই ভাল, দুর্গাপুরে—"বাপ রে, যে গরম"। তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া শ্রীঅনিল চন্দ মহাশয় নাকি বলিয়াছেন—"তা হলেই দেখুন পাটনায় যে শীতে কষ্ট পাচ্ছেন ওখানে তা পেতে হয়নি, আমাদের রিসেপশন ওয়াজ মোর ওয়ার্ম।" বিশুখুড়ো বলিলেন —"পাটনাবাসী কেউ বলতে পারতেন—দুর্গাপুরের "ওয়ার্ম" মানে কুসুমগরম, পাটনায় আমরা একেবারে গনগনে আগুন-রিসেপশনের ব্যবস্থা করেছি!!"

"**ক**ংগ্রেস মহাধিবেশনে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড" একটি সংবাদের শিরোনামা।—"বেরং কম্মে এমন হয়েই থাকে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

নেহরুজী তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন—একটি একটি করিয়া ইটের উপরে ইট গাঁথিয়া ৭৫ বৎসর ধরিয়া আমরা কংগ্রেসে

প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছি।—"আবার একটি একটি করে ইট খসিয়ে নিয়ে অনেকে তা খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির মাঠ পর্যন্ত ব্যবহার করছে।" মন্তব্য করেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

পাটনায় ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের এক সমাবেশে শ্রীঢেবর বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনার স্তম্ভ হইল চারিটি। যথা—বিদ্যুৎ, শ্রম, কৃষি ও নেহরুজী। প্রথম তিনটি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আর শেষেরটি জনগণকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে নেতৃত্ব দানের জন্য। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিল—"ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকরা বলেছেন—সবই ভাল, তবে আমাদের ভূমির কিছুটা ব্যবস্থা করলে খুঁটিটা আরো জোরদার হত!!"

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগ দিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলাহিড়ী বলেন—"খোলা মন নিয়েই আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাচ্ছি।" আমাদের খুড়ো বলিলেন —"শীতের দাপট সম্পূর্ণ যায়নি, সুতরাং একটু ঢেকেঢুকে চলাই ভালো!!"

গিলগিটের উপর চীনের দাবি সম্বন্ধে ভারতের কাগজে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া পাক নিয়ন্ত্রিত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান বলিয়াছেন যে, এই ধরনের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য হইল চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তোলা। "ভুল বললেন মেজদা, কারও সঙ্গে সম্বন্ধ তিক্ত করার মধ্যে আমরা নেই। তা ছাড়া, চাইনিজ রাইস আর বিরিয়ানি দুই যে আমাদের ভালো লাগার জিনিস!"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

১৮ই জানুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রমোদকরের জন্য সিনেমার টিকিটের দর বাড়িয়াছে। "কারও কারও মতে অর্ধ-গ্রহের ফলটা নাকি ১৫ই জানুয়ারী থেকেই ফলতে আরম্ভ করবে, উক্ত সংবাদে বয়েছে তারই ইঙ্গিত।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

প্রসঙ্গত মনে পড়িল, প্রেক্ষাগৃহের জন্য নাকি চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"মহা-

প্রলয়ে যদি মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল সাবাড় হয়ে যায়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ খাঁ খাঁ করতে থাকে, সিনেমা হাউসের সামনে গণেশ উল্টে থাকে, তা হলে ফাঁকা ট্রামে শুধু মাদুলি নিয়ে বসে থাকার জন্য বেঁচে থেকে লাভ কী!"

সিডনী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, সেখানকার সমুদ্রোপকূলে মাছেরা নাকি ব্যাপকভাবে আত্মহত্যা করিতেছে।—"আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে

কোন তদন্তও করা হয়নি, মাছেরা নাকি লিখে গেছে আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।"—কথাটা বলিলেন বিশুখুড়ো।

"**শিশু** সন্তানদের জন্য আরো কয়লা দরকার" একটি সংবাদ শিরোনামা।—"কয়লা চাই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দরকার উনুন ধরাবার জন্য কয়লার প্রয়োজন। কয়লা আগে না এলে গৃহ-বধূদের গৃহিণীর সঙ্গে বসে চোখের জল ফেলতে হবে এবং সেটা দেবার বুদ্ধির উদয় হয়।" মন্তব্য করে শ্যামলাল।

জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"রেডিওতে শুনলাম এবং সংবাদপত্রে পড়লাম, সরোজিনী নাইডুর নাতির শর্ট-সার্কিট তদন্ত দেবার কথা। হবেই হবে। আগের একজন যে উইকেট রক্ষক ছিলেন তিনি উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে বলটি ধরতে অতুলনীয় রান করতেন। শহরে সেটা ঘটে উঠবে কেন!"

অন্য সহযাত্রী বলিলেন—"এই সময় রাজনীতিবিদ সহকর্মীদের কথা বলতে হয়, বলতে হয় কনোজি যে কাজটি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করার কথা, আর বলতে হয়—বাপু, তোমাকে কেন যে ফেলে রেখেছিল এই কদিন।"

অন্য সহযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—"আর এই সঙ্গে রোভার্স কাপের কথাটাও বলতে হয়। তবে এখানে ইস্টবেঙ্গল নেই, আছে ই এম ই সেন্টার এই যা বাঁচোয়া!!"

রবীন্দ্রচর্চা

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ। আদিত্য ওহদেদার। এভারেস্ট বুক হাউস। এ১২-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। সাত টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের এক বিপুল অংশ নিবেদন করেছিলেন সাহিত্য সমালোচনায়। নিতান্ত কিশোর বয়সে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' সমালোচনায় তিনি যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন, কালে তা আরো ব্যাপ্ত ও পরিশীলিত রূপে, গ্রহণে ও বর্জনে পরিবর্তিত হয়ে, বিকাশ লাভ করে। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বাদ দিলে, বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনিই আদিপুরুষ। শেষ দিকে অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের আলোচনায় বিরতি দিয়ে সাহিত্যের মূলে তত্ত্ব উদ্ঘাটনেই তিনি তৎপর হয়েছিলেন এবং এই সময়ের রচনাগুলি অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হয়। পরবর্তী সমালোচনায় তাঁর প্রভাবও লক্ষণীয়; যদিও বর্তমানে বাংলা সমালোচনা যে-পর্যায়ে উপস্থিত, সেখানে ক্বচিৎ তাঁর ছায়াপাত ঘটে।

ডক্টর আদিত্য ওহদেদারের গ্রন্থটি সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পরিস্ফুট করে। রবীন্দ্রনাথের এই গুণটি এতদিন ছিল অনালোকিত, সমালোচকদের চক্ষে অবহেলিত। সেদিক থেকে গ্রন্থটিকে স্বাগত জানাতে হয়। প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সহযোগে, দেশী বিদেশী অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের সঙ্গে তুলনা ক'রে, ডক্টর ওহদেদার তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য এ-কথা মান্য যে বিশেষ ভূমিকায় কবি-সমালোচককে টেনে আনা সব সময় যুক্তি-যুক্ত হয়নি; তাতে গ্রন্থকারের প্রয়োজন মিটলেও আলোচিত বিষয়ের প্রতি সুবিচার হয়নি। উপরন্তু, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা মোটামুটি প্রণিধানযোগ্য হলেও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ যে কারণে 'প্রায়ই' অভিযুক্ত, তাঁর মাধ্যম বা রীতি সম্পর্কে লেখক বিশেষ যত্ন নেননি। আর একটি কথা, এলিয়ট ও রিচার্ডসের পরও 'সমালোচনা' অনেক দূর এগিয়েছে, এথিক্স ও এসথেটিক্স সম্পর্কিত ধারণারও বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবেশে বিচার করলে, বিশেষত গ্রন্থটি যখন সম্প্রতি রচিত, আলোচনার আয়তন কিছুটা সঙ্কীর্ণ। তথাপি, ডক্টর আদিত্য ওহদেদারের মূল্যবান প্রচেষ্টা পাঠকসাধারণের চোখে শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিবেচিত হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। **৬২৯।৬১**

জীবনী-সাহিত্য

বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসু শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১১৯।২, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

বর্তমান গ্রন্থে বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কর্মজীবনের অসম্পূর্ণ ইতিহাস অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উত্তর ভারতে গুপ্ত সমিতি গঠন করিবার পরে বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও তাঁহার আত্মগোপনের কাহিনী বর্ণনায়ও লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ভারতে অবস্থান নিরাপদ নয় বলিয়া রাসবিহারী জাপানে পলায়ন করেন এবং সেখানেও কিছুকাল আত্মগোপন করিয়া বসবাস করিবার পরে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার বৈপ্লবিক কর্মধারার সম্যক আলোচনা যথাযথভাবে করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে নেতাজী সুভাষ বসুর সঙ্গে জাপানে তাঁহার যোগাযোগ এবং আজাদ হিন্দ

ফৌজ সংগঠন ও ভারত অভিযান সম্পর্কে নেতাজীর দক্ষিণহস্তরূপে রাসবিহারীর কার্যকলাপের বিবরণ আরও নিপুণভাবে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল।

রাসবিহারীর মত অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন কূটনীতিক বিপ্লবী চিন্তানায়কের জীবনী-গ্রন্থ শুধু ইতিহাসসুলভ ঘটনাবলীতে পর্যবসিত হইয়াছে। জীবনীকারের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব গ্রন্থখানির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

৫৩২।৬১

গীতাভাষ্য

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—(রামানুজভাষ্য মূল ও বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস। শ্রীবলরাম ধর্ম সোপান, পোঃ খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৭॥০

গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। গীতা হিন্দুসমাজের নিকট সর্বাপেক্ষা সমাদৃত শাস্ত্র। এদেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ নিজ নিজ মতানুযায়ী গীতার বিভিন্ন ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। পুণ্যশ্লোক দার্শনিক বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের আচার্য রামানুজ কৃত ভাষ্য ইহাদের অন্যতম। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য কৃত গীতাভাষ্য বাংলা ভাষায় অনূদিত না হওয়াতে গীতানুরাগী সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙালী সমাজ ইহার আস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন। অনুবাদক এতদিনের সে অভাব পূর্ণ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং সাধক পুরুষ। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রথম আবির্ভাব নূতন নয়। শ্রীমৎ লোকাচার্য স্বামী কৃত শ্রীবচনভূষণ এবং যামুন মুনি বিরচিত গীতার্থ সংগ্রহ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তিনি বাংলাদেশের চিন্তাশীল সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বস্তুত বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে আচার্য যতীন্দ্র রামানুজের অবদান ইতিমধ্যে অভিনব উল্লেখযোগ্য অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছে। আলোচ্য অনুবাদে এক্ষেত্রে নূতন সম্পদ যুক্ত হইল। গীতার রামানুজভাষ্য অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ; শুধু পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তাহার অনুবাদ করা সম্ভব নয়, সেজন্য অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষানুভূতি থাকা প্রয়োজন। অনুবাদক তাদৃশ অনুভূতির অধিকারী। এজন্য তাঁহার অনুবাদ মূলানুগ হইয়াও সহজ এবং সরল হইয়াছে। অধ্যাত্মরস-পিপাসু সমাজে এমন গ্রন্থ সর্বত্র সমাদৃত হইবে। ছাপা, বাঁধাই সুদৃশ্য এবং মনোরম।

২৫।৬২

উপন্যাস

রায়মঙ্গল—শক্তিপদ রাজগুরু। সুরুচি প্রকাশনী। ২ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

অজানাকে জানাই মানবমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অজানাকে জানতে চায় মানুষ জীবনকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেই। তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদকে পরিপূরণ করার জন্যে ছোটে দুর্গম জঙ্গলের বিভীষিকার রাজত্বে। সেই রাজত্বে সংগ্রহ করে অরণ্য-সম্পদ। সুন্দরবন আমাদের বাংলাদেশেই। কিন্তু এই সুন্দরবনকে অবলম্বন করে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কৈশোরসুলভ রহস্য-রোমাঞ্চকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে শক্তি ব্যয় করেছেন। মহৎ সৃষ্টির জন্যে খুব কম লেখকই উৎসাহিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত রাজগুরু এই দলগোত্র অন্যতম মনে হয়। তিনি মানুষের বাঁচার সংগ্রামকে সার্থকভাবে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন। উপন্যাসের নায়ক ভিকন রোমাঞ্চে কঠোরে নির্মিত সংগ্রামী জীবনের প্রতিভূ। সবলের সাহচর্য সবাইকে নিয়ে সম অধিকারে সে বাঁচতে চায়। আবার, মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনকে স্বীকৃতি দেয় বাদাবনের বাউলিয়া—মধু, নৌকার কেরায়া মাঝি—আবাদের চাষী মানুষ। রায়মঙ্গল নদীর আশেপাশের মানুষদের মধ্যে কেউ হারিয়ে যায়, কেউ পালিয়ে যায়, কেউ বা ভেসে যায়; কিন্তু সাধারণ মানুষের ঐশ্বর্য ধনে নয়, মনে। বাঁচার জন্যে যে দক্ষিণ-রায় দেবতার প্রতিষ্ঠা—তিনিও মানুষকে নির্মমতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। তবুও মানুষের সংগ্রাম থামেনি। তারুণ্য তার অজেয়—এই সোচ্চার ধ্বনিই উপন্যাসটির প্রাণ। এই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে শয়তান-শিরোমণি হরিষদ পান এবং মানিক শিকারীর মানসিক রূপান্তর। উপন্যাসটি উপন্যাসিকের গভীর আন্তরিকতার গুণে ও জীবনানুভবের গভীরতায় সমৃদ্ধ, এ কথা অনস্বীকার্য।

৫০৩।৬১

ডালিম্বর: চিত্ত সিংহ। সুজনী, ৬১এ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা ৩৭। তিন টাকা।

জীবৎ সম্প্রতিকালে যে কয়জন তরুণ গল্পকার উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন, চিত্ত

সিংহ তাঁদের অন্যতম। কিন্তু লেখক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও শক্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ অবশ্য এখন পর্যন্ত তিনি দিতে পারেন নি; বরং এখনো দেখা যায়, বিষয় ও ভঙ্গী পরিবর্তনের নিরন্তর চেষ্টার মধ্য দিয়ে তিনি নিজস্ব একটি পরিমণ্ডল সন্ধানের চেষ্টা করছেন। এ-কথা বিশেষ-ভাবে মনে হলো তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জলবিম্ব' পাঠ করে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর যে-সকল গল্প পাঠকের চোখে পড়েছে, বিষয়ের দিক থেকে তার মধ্যে ছিলো গ্রাম-বাংলা এবং সেই দেশোদ্ভূত বিবিধ চরিত্রের সুখ, দুঃখ ও আশঙ্কার মধ্যে একটি সংহতি-সন্ধানের সংকল্প। সেইসব গল্পের বিরল মাধুর্য ও শ্রীমণ্ডিত সুষমা বর্তমান উপন্যাস 'জলবিম্বে' অনুপস্থিত।

'জলবিম্ব' শহর-কেন্দ্রিক উপন্যাস; এর চরিত্রগুলিও শহুরে, যেন একটু বেশি মাত্রায়। চরিত্রগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে আত্মবীক্ষণের ধরনে, ঘটনাও অনুসৃত হয়েছে সেইরূপে। আধুনিক সভ্য মানুষের বিশেষ-বিশেষ প্রবণতাগুলিও নায়ক শুভ ও নায়িকা ঋতুর চরিত্রে অবলোকন করা যায়। শুভ, জীবন সম্পর্কে যার ধারণা সম্পূর্ণ অনাস্থার উপর নির্মিত; ঋতু—যে শুভর মতো অতখানি অবিশ্বাসী না হলেও, একই-ভাবে নিয়ত ক্ষয়িত হচ্ছে। ক্রূর ও কোমল দুই বৃত্তির দ্বন্দ্ব উপন্যাসের সর্বত্র সোচ্চার। প্রসঙ্গত একটি উল্লেখ প্রয়োজন, চিত্ত সিংহের জীবন সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে কেউ যদি দ্বিমত হন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ব্যক্তিগত ধারণা নির্ভর করে বলা যায়, উগ্র আধুনিকতার বশে, নিজস্ব ধ্যান-ধারণার উপর লেখক একটু বেশি জোর দিয়েছেন।

তথাপি, অনস্বীকার্য যে, চিত্ত সিংহের 'জলবিম্ব' পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে মৌলিকতার গুণে। বিশেষত তাঁর গদ্য-রচনার সাবলীল ভঙ্গীর প্রশংসা না করে পারা যায় না। ২৬৬।৬১

মাটি ও মানুষ—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'মাটি ও মানুষ' উপন্যাসখানি পড়িয়া ভাল লাগিল। খুব বড় উপন্যাস নয়, গল্পাংশের পটভূমিও তেমন কিছু বিরাট বা অভিনব নয়; কিন্তু সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে এখানে মানুষের ছবিটি জীবন্ত এবং বেদনাকরুণ। গল্পাংশ উদ্বাস্তুদের লইয়া, সেই ক্যাম্প-জীবন যে আর এখন কিছু অজানা নয়; কিন্তু সেটামুটি জানা কথাকেও দরদের ছোঁয়া দিয়া কত নূতন ও জীবন্ত করিয়া তোলা যায় বইখানি তাহারই চমৎকার নিদর্শন। উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পজীবনকে লেখক কল্পনায় জানেন না—একেবারে চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মনের সহানুভূতিতে জানেন; নিজের মনের জানা কথাকে অপরের মনের কাছে তুলিয়া ধরিতে হইলে কি কৌশল গ্রহণ করিতে হয় তাহাও তাঁহার জানা আছে; ঘটনার বর্ণনায় ও চরিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্যে সজীব দৃশ্যগুলিই পাঠকের মনে আসিয়া ভিড় করে, করুণ আলোড়ন জাগায়। ঘটনা-বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কনের সঙ্গে দিগিন্দ্রবাবুর সংলাপের কথাটাও উল্লেখ করিতে হয়; এ ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের সঙ্গে একটা সৎসাহসও প্রশংসার্হ; পূর্ববঙ্গের জীবন পূর্ববঙ্গের মুখের ভাষা ছাড়া যেন সবটা প্রকাশ পায় না; সেই ভাষাকে সাহিত্যে কতখানি কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করা চলে, দিগিন্দ্রবাবুর এ বইখানি তাহার একটা দৃষ্টান্ত বলা চলে। ১৬৬।৬১

হিন্দুর বউ—শ্রীচরণদাস ঘোষ। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

গতানুগতিক ধারায় রচিত এই উপন্যাস-খানি ভাবপ্রবণতায় ভরপুর। কোন কোন চরিত্র চিত্রণে অতিনাটকীয়তাও স্থান-লাভ করিয়াছে। বৈচিত্র্যের অভাব ইহার সর্বত্র পরিলক্ষিত। তবে বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিতে লেখকের প্রয়াস আছে; বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে ইহার শেষ পরিণতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই কোনপ্রকার আকর্ষণের অভাবে এই উপন্যাসের কাহিনী নীরস বলিয়া মনে হয়। ৩৩২।৬১

ছোট গল্প

রুকমিনি বিবি—সুধীর করণ। প্রকাশক গ্রন্থ বন্ধু, ৫৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। দাম দু টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি মোট আটটি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলির মধ্যে 'রুকমিনি বিবি' গল্পটিই এই পুস্তকখানির নামের সার্থকতা বজায় রাখিয়াছে। অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'মুন্সীর লড়াই'-এর নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। লেখকের ভাষা সহজ এবং সাবলীল কিন্তু গ্রন্থটি বর্ণাশুদ্ধির ভারে ভারাক্রান্ত। ১৭২।৬১

রস-রচনা

বিউটি স্পট—জগন্নাথ সরকার। বেঙ্গল বুক ব্যাংক। ৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দু টাকা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে কয়েকটি ছোট গল্প ও প্রবন্ধাকারে লিখিত রচনা স্থানলাভ করিয়াছে। রস রচনায় লেখকের প্রচেষ্টা সর্বত্র সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। লেখক হাস্য-রসিকের দৃষ্টিভঙ্গি এখন পর্যন্ত সম্যকরূপে অধিগত করিতে পারেন নাই। লেখকের কয়েকটি রচনা নিতান্ত মামুলী ধরণের—তবে 'বিউটি স্পট', নামকরণ ইত্যাদি রচনাগুলি অনেকটা সার্থক। ভাবপ্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের এখনও অপরিণত। ছাপা ভাল। ৪৫১।৬১

বিবিধ

প্রবাসে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন—মুজফ্ফর আহ্‌মদ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২। দাম দু টাকা।

এই পুস্তকটির লেখকের মতে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি গড়িয়া ওঠে। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এ কথা সত্য। তবে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির গোড়া-পত্তন হইয়াছিল বিদেশে। ভারতে খিলাফত আন্দোলন শুরু হইবার পরে কিছুসংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান যুবক হিজরত (অত্যাচারের ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন) করিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করে। ইহার মধ্যে রফিক আহ্‌মদ নামে এক ব্যক্তি বিদেশে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁহার বর্ণনায় এই সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া লেখক আলোচ্য পুস্তকখানি সংকলন করিয়াছেন। তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত পাঠক-সমাজের তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ৫৩৮।৬১

প্রাপ্তি স্বীকার

জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হে ইতিহাস গল্প বলো—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

খোকা এল বেড়িয়ে—সুখলতা রাও।

কিশোর কাহিনী—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস।

টাকা গাছ—লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী।

নাট্যে প্রণাম—স্বপন বুড়ো।

পেয়ারার স্বর্গ—শিবরাম চক্রবর্তী।

পাখি আর পাখি—ইন্দিরা দেবী।

মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা—বাণী রায়।

শবযাত্রা—পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

রাতের রাগিণী—আশা দেবী।

আলিম্পন—প্রতিভাবালা বর্ধন।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

চন্দ্রশেখর

নিন্দনীয় রুচি

অতি আধুনিক কালের বাংলা ছবি নিয়ে যাঁদের গর্বের সীমা নেই, তাঁদের লজ্জায় অধোবদন হবার একটি কারণ ঘটেছে। বি আর সি সিনে প্রোডাকশনস-এর "সরি ম্যাডাম" ছবিটিই এই লজ্জার কারণ।

রস-রুচি বর্জিত হালকা আমুদে হিন্দী ছবির একটি বাংলা সংস্করণ যেন এই ছবি। ইংরেজী নামকরণ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ হিন্দী ছবির প্রায় সর্ব লক্ষণই ছবিটিতে বিদ্যমান। একটি গল্পহীন গল্প এই ছবির আখ্যান-ভিত্তি। বলা বাহুল্য, গল্পের বিষয়বস্তু প্রেম। হিন্দী ছবির নিয়মিত দর্শক যাঁরা, তাঁদের কাছে এই প্রেমের শুরু ও শেষ কোনটাই অপরিচিত নয়।

ছকে বাঁধা এই প্রেমোপাখ্যানের নায়কের সঙ্গে নায়িকার প্রথম অপ্রীতিকর সাক্ষাৎ ঘটে পথে। এর পর ছায়াছবির কাহিনীর দুর্বোধ্য বিধানে ওদের আরও একাধিকবার সাক্ষাৎ ঘটে। এমনকি চলন্ত ট্রেনের একই কামরায়। কলকাতা থেকে রাঁচী যাওয়ার পথে। কারণ ঘটনাচক্রে উভয়েরই পিত্রালয় রাঁচীতে।

ইতিমধ্যে নায়িকার প্রেমে পড়েছে নায়ক। কিন্তু নায়িকার মন তখনও নায়কের কাছে বাঁধা পড়েনি। তার ওপর যথারীতিভাবে ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে এক কুচক্রী যুবক, নায়িকার পাণিপ্রার্থী। শেষ পর্যন্ত নানা অবান্তর ও অবিশ্বাস্য ঘটনার ভেতর দিয়ে নায়িকার মনেও কীভাবে প্রেমের উন্মেষ ঘটল এবং কেমন করে ওরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল তা নিয়েই কাহিনীর পরিণতি।

এই তো গেল কাহিনী। তারপর ছবির উপকরণ। উপকরণরাজির মধ্যে প্রধান হল অভব্যতা। প্রকাশ্য মঞ্চে এবং অপ্রকাশ্যে নায়িকার সঙ্গে নায়কের কোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রক-এন রোল ও বল-এর ভেজাল ঢঙে নাচ এবং জনমানবহীন পাহাড়ী ঝরনার ধারে স্ল্যাকস-পরা নায়িকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে গান বাংলা ছবির রুচিবান দর্শকদের কাছে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। কোন শিক্ষিত বিদ্যার্থী যুবকের পক্ষে প্রেমে পড়া দোষের নয়, প্রেমাভিলাষীরূপে তার প্রাণোচ্ছলতাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ছবির নায়কের নাচ-গানের ঢঙ দেখলে মনে হয় শিক্ষা ও রুচির লেশমাত্র নেই তার চরিত্রে। তেমনি ছবির একটি দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার কোন এক নির্জন মিলনমুহূর্তে নায়িকার অশালীন বিদেশী বেশভূষা দর্শকদের পীড়া দেয়।

নায়কনায়িকার নাচ-গান ও বেশভূষাও হয়তো মানিয়ে নেওয়া যেত যদি এই সব উপকরণের অসুস্থ ও নির্লজ্জ উদ্দেশ্যটি ছবিতে উগ্রভাবে প্রকট হয়ে না উঠত। রুচির বিচারে কোন কোন উপাদানের ভাল-মন্দ তার উদ্দেশ্যের ওপরই সব চাইতে বেশী নির্ভর করে। এই ছবির যৌন-উপকরণের লক্ষ্যটি যে অসাধু, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ছবির অন্যান্য আমোদ-উপকরণের মধ্যে কৌতুক ও গানই প্রধান। বলা নিষ্প্রয়োজন, গান ও কৌতুক ছবির চিত্রনাট্যে সংগতির মধ্যে ছাড়িয়ে অতিরিক্তভাবে সংযোজিত। এবং ছবির গানের সুরারোপও বাংলা ছবির রীতি মেনে চলেনি। মনে হবে, হিন্দী ছবির গান বাংলা ভাষায় পরিবেশন করা হয়েছে ছবিটিতে। অবশ্য, চিত্রনির্মাতারা স্বেচ্ছাতেই তা মেনে নিয়েছেন এবং এর জন্য বোম্বের সুরকার ও কয়েকজন কণ্ঠশিল্পীর ওপরই ছবির সংগীতাংশের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

অন্য দিকে ছবির কাহিনী যেমনি বাস্তবের স্পর্শরহিত, এর বিন্যাসধারাটিও তেমনি বৈসাদৃশ্যে ভরা। তবে পরিচালক-কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার দিলীপ বসু ছবির মূল আবেদনটি সযত্নে রক্ষা করে গেছেন।

বিমল রায় প্রোডাকশন্সের "কাবুলিওয়ালা"-র একটি দৃশ্যে নাম-ভূমিকায় বলরাজ সাহনি

এক বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠবে হয়তো। সেদিক থেকে চিত্রনির্মাতাদের শ্রম সার্থক হতে পারে।

ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করছেন বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। চরিত্র দুটির যা দাবি তা তাঁরা সাধ্যানুযায়ী পালন করেছেন। তবে যে বেশবাস ও অংগ-ভংগিতে হিন্দী ছবির তারকারা বেশ মানিয়ে যান, বাঙালী ও বাংলা ছবির শিল্পী হিসাবে সেটাতে তাঁদের বেমানান লেগেছে। দুঃখের মুহূর্তে সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় সুন্দর। হালকা প্রণয়-মুহূর্তে নায়ক-নায়িকা উভয়েই সপ্রতিভ।

ছবিতে অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, অপর্ণা দেবী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপ রায় (নায়িকার প্রণয়াভিলাষী কাকা মুবক)। জহর রায় তাঁর কৌতুকাভিনয়ে আগাগোড়া দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছেন।

সঙ্গীত-পরিচালক ভেদ পাল সুরারোপিত ছবির গান (একটি রাগাশ্রয়ী গান বাদে) হালকা সুরের গুণে এক শ্রেণীর লোকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। গানগুলি গেয়েছেন মুকেশ, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুরী, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

কলাকৌশল ও আঙ্গিকের বিভিন্ন বিভাগে ছবির মান উন্নত। আলোকচিত্র গ্রহণ ও সম্পাদনার জন্য প্রশংসা পাবেন যথাক্রমে বিভূতি চক্রবর্তী ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

চিত্রতারকার প্রণয়

এস কে প্রোডাকশন্স-এর "মন দিল না বঁধু"-র শেষ পরিণতি কিন্তু নেতিবাচক নয়। "বঁধু" শেষ পর্যন্ত মন দিল তার বল্লভকে।

ছবির "বঁধু" এবং বল্লভ উভয়েই চিত্রতারকা। চিত্রজগতে ওরা শিখা ও সুবিমল-কুমার নামে পরিচিত। দুই জনপ্রিয় শিল্পী। শুধু স্টুডিয়ো ও স্যুটিং এবং সেই সংগে "ফ্যান"দের ভিড়ের মধ্যে ওরা হাঁপিয়ে ওঠে। প্রণয়ের মধুগুঞ্জনের জন্য ওরা অবসর প্রায় খুবই কম। অল্প অবসরটুকু ওরা ওদের স্বপ্ন দিয়ে ভরে তোলে। একটি সুখের ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

প্রণয়ীযুগলের দিনগুলি যখন এমনি-ভাবে রঙে ও রসে ভরে উঠছিল, তখন নায়িকার মনে হঠাৎ করে এক মহৎ ভাবের উদয় হয়। দুঃখী পিতা যাতে তার ঘরছাড়া ছেলেকে ফিরে পায়, সে উদ্দেশ্যে নায়িকা তার প্রণয়ীকে ছেড়ে থাকতে চায়। ফলে উভয়ের মধ্যে দেখা দেয় সাময়িক বিচ্ছেদ ও ভুল বোঝাবুঝি।

কিন্তু এই বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে ওরা কেমন

ফিল্‌ম-এজের ছবি "কুমারী মন"-এর একটি দৃশ্যে সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও সন্ধ্যা রায়

করে পরস্পরকে ফিরে পায়, তা নিয়েই চিত্র-কাহিনীর যবনিকা।

কাহিনীটি খুবই মামুলী এবং অনেক অংশে কষ্টকল্পিত। তদুপরি ছবির উপাখ্যানে রয়েছে সূত্রহীন বহু ঘটনার সমাবেশ। বাংলা চলচ্চিত্রলোক ছবির অন্যতম পটভূমি। কিন্তু চলচ্চিত্রলোকের কোন বাস্তব চিত্র ছবিতে ফুটে ওঠেনি।

ছবির চিত্রনাট্য মন্থরগতি। এর বিন্যাসটিও অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতিতে আকীর্ণ। ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, সংগীত পরিচালক এবং পরিচালক হলেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

প্রধান শিল্পীদের অভিনয় চরিত্রোচিত। কিন্তু কাহিনী ও তার বিন্যাসের দুর্বলতার জন্য তাঁদের অভিনয় মনে দাগ কাটে না। নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুটির রূপ দিয়েছেন বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও সবিতা বসু। এঁরা আন্তরিকতার সংগে অভিনয় করেছেন।

একটি বিশেষ চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় মনোজ্ঞ। জহর রায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী (স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায়) কৌতুকানন্দ পরিবেশন করেন। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য সুমনা ভট্টাচার্য, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বলু ধর, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালকের কাজে শ্রীমুখোপাধ্যায় ছবির কয়েকটি দৃশ্যের আবহসুরে রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গানের সুরারোপ বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে ও আঙ্গিক গঠনে উন্নতির অবকাশ ছিল।

চিত্রালোচনা

রাজকমল কলামন্দিরের "স্ত্রী", বিমল রায় প্রোডাকশন্‌স-এর "কাবুলিওয়ালা" ও এ জি ফিল্মসের "অপেরা হাউস" এই তিনটি হিন্দী ছবি এবারকার মুক্তি-তালিকায়।

মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" প্রথম ছবিটির আখ্যান অবলম্বন। প্রায় দুই দশক আগে রাজকমল কলামন্দিরের পতাকাতলেই এই মহাকাব্যের চিত্ররূপ তৈরি হয় এবং সিনেমানুরাগীদের প্রশংসা অর্জন করে। দীর্ঘ আঠারো বছর পরে সেই একই কাহিনী অবলম্বন করে প্রযোজক-পরিচালক ভি শান্তারাম তুলেছেন "স্ত্রী"। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন যে, প্রথম চিত্ররূপে তিনি কালিদাসের মহাকাব্যের অন্তর্লীন রস সম্বন্ধে সুবিচার

মুভিটক-এর "শিউলিবাড়ি"র একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস ও শ্রীমান অমর

করতে পারেননি। তাই এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। প্রথম চিত্রের মত এ ছবিতেও শান্তারাম রাজা দুষ্মন্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সে-ছবির নায়িকা ছিলেন জয়শ্রী, এ-ছবির সন্ধ্যা। শান্তারাম-তনয়া রাজশ্রীকে এক নর্তকীর ভূমিকায় এতে দেখা যাবে। সি রামচন্দ্র ছবিটির সংগীত পরিচালক। "স্ত্রী" আগাগোড়া টেকনি-কলারে তোলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিখ্যাত গল্প "কাবুলি-ওয়ালা" এতদিনে হিন্দীতে চিত্রান্তরিত হয়েছে। বিমল রায় ও লীলা দেশাইয়ের যৌথ প্রযোজনায় তোলা এই ছবির পরি-চালক '৪২-খ্যাত হেমেন গুপ্ত। বলরাজ সাহনী নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এ-ছবির বিস্ময় অবশ্য মিনি-চরিত্রে সোনু। পাঁচ বছরের এই ক্ষুদে মেয়েটি চিত্র-জগতে প্রথম পদক্ষেপেই যে জনসংবর্ধনা লাভ করেছে, তা অভূতপূর্ব বললে অত্যুক্তি হবে না। ছবির অন্যান্য ভূমিকায় আছেন উষা কিরণ, সজ্জন, অসিত সেন, আজরা প্রভৃতি। সলিল চৌধুরীর সুরে ছবিটি সমৃদ্ধ।

সন্তোষী পরিচালিত "অপেরা হাউস"-এর নায়িকা দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধা তারকা সরোজা দেবী। চিত্রগুপ্ত সুর সৃষ্টি করেছেন।

* * *

তারাশঙ্করের সুবিখ্যাত কাহিনী "বিপাশা"র চিত্ররূপ আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। জন্মের অবৈধতা এক তরুণ-তরুণীর মিলনের পথে কী অন্তরায় সৃষ্টি করল তাকে কেন্দ্র করেই এর নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তম-কুমার ও সুচিত্রা সেনের অনবদ্য অভিনয় ছবিটিকে স্মরণীয় করে রাখবে—নির্মাতা-দের তাই বিশ্বাস। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, লিলি চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, কেতকী দত্ত, গ্লোরিয়া ডাউইংটন প্রভৃতি। অগ্রদূত ও রবীন চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে এ-ছবির পরিচালক ও সুরকার।

"বিপাশা" ছাড়াও তারাশঙ্করের আরো দুটি গল্পের চিত্ররূপ মুক্তিযোগ্য হয়ে উঠেছে। একটি অগ্রদূত পরিচালিত "উত্তরায়ণ", অপরটি অগ্রগামীর "কান্না"। দুটি ছবিরই নায়ক উত্তমকুমার। নায়িকা অবশ্য আলাদা। প্রথমটিতে সুপ্রিয়া চৌধুরীকে এবং দ্বিতীয় ছবিতে নবাগতা নন্দিতা বসুকে দেখা যাবে।

তারাশঙ্করের আরো তিনটি গল্প অবলম্বনে তিনখানি ছবি বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে বাংলা দেশের তিন প্রখ্যাত পরিচালকের নির্দেশনায়। যথা—অভিযাত্রিকের "অভিযান" (পরিচালক সত্যজিৎ রায়), ...রের "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা" (পরিচালক তপন সিংহ) এবং ... "আগুন" (পরিচালক অসিত সেন)।

* * *

অন্যান্য মুক্তিকামী ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে বিমল ঘোষ প্রোডাকশন্সের "...", চিত্রযুগের "কাঁচের স্বর্গ", মুভিটক-এর "শিউলিবাড়ী", চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "...", আর ডি বি-র "...", ফিল্ম ক্রাফটের "..." এবং শ্রী এন সি এ প্রোডাকশন্সের "কাঞ্চনজঙ্ঘা"। বৎসরের প্রথমার্ধেই এদের মুক্তি পাবার সম্ভাবনা।

ছায়ানট চিত্রের "অগ্নি দেবতা"ও মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবিগুলির অন্যতম। বর্তমান সমাজব্যবস্থার ওপর কটাক্ষ করে এর কাহিনী লিখেছেন সুরকার সরোজ কুমার। ছবির পরিচালকও তিনিই। বিশ্বজিৎ, রঞ্জনা বন্দোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, তরুণ-কুমার, চন্দ্রাবতী, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি।

* * *

"সারথিকা"-খ্যাত এস সি প্রোডাকশন্স এতদিনে তাঁদের দ্বিতীয় ছবির কাজ শুরু করলেন। ছবির নাম "কাঁটা ও কেয়া"। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের রচনা। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে গত ৯রা জানুয়ারী থেকে চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। চিত্রনাট্য লিখেছেন মণি বর্মা, পরিচালনা করছেন চিত্ত বসু। অরুণ মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এ-ছবির নায়ক-নায়িকা। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে থাকবেন ছবি বিশ্বাস, গীতা দে, জহর গাঙ্গুলী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপকুমার। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আরো একটি নতুন ছবির চিত্র গ্রহণ চলছে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ছবির নাম "ফিরে পাওয়া"। তুলছেন পি

এস প্রোডাকশন্স। অসিতবরণ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এর দুই মুখ্য শিল্পী। পরিচালনা করছেন সুকুমার সেন।

• • •

অনেকগুলি নতুন ছবির তোড়জোড় চলছে। "আলিবাবা"র চিরন্তন কাহিনীকে আবার নতুন করে চিত্রায়িত করবার কথা ভাবছেন পরিচালক সুশীল মজুমদার।

এম কে জি'র পরবর্তী ছবি হবে একটি ক্রাইম-ড্রামা। পরিচালনা করবেন পিনাকি মুখোপাধ্যায়। ছবির এখনও নামকরণ হয়নি।

রমাপদ চৌধুরীর বহু-প্রশংসিত "লাল-বাঈ" উপন্যাসটি সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় তোলা হবে। নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন থাকবেন জানা গেল।

রমাপদবাবুর আর একটি গল্প—"দ্বীপের নাম টিয়ারং" চিত্রান্তরিত করবার সংকল্প করেছেন চিত্রযুগ। পূর্ণেন্দু পত্রীর পরিচালনায় ছবিটি তোলা হবে।

কনক প্রোডাকশন্স-এর পরবর্তী ছবির নাম "মায়ের সংসার"। কনক মুখোপাধ্যায় একাধারে এর লেখক, প্রযোজক ও পরিচালক।

"...." পরিচালক কমল

মজুমদার এবার তুলবেন "অভিসারিকা"। ছবির প্রাথমিক কাজ সমাপ্তপ্রায়। নায়ক-নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন নির্মলকুমার সুপ্রিয়া চৌধুরী।

নাট্যাভিনয়

নাটকলার প্রতি বাঙালীর অন্তরের টান আজ নতুন করে বিজ্ঞাপিত করার প্রয়োজন নেই। বাংলা দেশে তো কথাই নেই, ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় বাঙালী গেছে, সেখানেই গড়ে উঠেছে নাট্যাভিনয়ের কেন্দ্র। সাম্প্রতিক রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে নাটকলার এই প্রসার বিশেষভাবে উপলব্ধি করা গেল।

সর্বত্রই অবশ্য অভিনয়ের আয়োজন হয় অস্থায়ীভাবে। শৌখিন দলের অভিনয়, সুতরাং পালে-পার্বণে ছাড়া দর্শক আকর্ষণ করা কঠিন। মফস্বলে তাই নিয়মিত অভিনয়ের প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন না। যাঁরা পেশা হিসাবে একে গ্রহণ করতে চান, কলকাতা ছাড়া তাঁদের সে ইচ্ছা পূরণের অন্যত্র কোথাও সুযোগ নেই।

কলকাতা শহরেও আগে নিয়মিত অভিনয় হত শুধু পেশাদারী রঙ্গালয়ে। অপেশাদার সংস্থাগুলির অধিকাংশই "এক দিন কা সুলতান"-এর মত এক রাত্রি অভিনয় করতে পারলেই কৃতার্থ বোধ করতেন। হালে অবশ্য রেওয়াজ পাল্টাচ্ছে। এমন কয়েকটি সংস্থার উদ্ভব হয়েছে, যারা সপ্তাহের বা মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় করে থাকেন। যাঁদের একটু নাম হয়েছে, তাঁদের অভিনয় আসরে দর্শকেরও অপ্রতুলতা ঘটে না।

মফস্বল শহরে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের প্রবর্তন ব্যাপারে কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটার পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারেন। স্থানীয় রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউট মঞ্চে এই সম্প্রদায় ১৯৬১ সালের গোড়া থেকে প্রতি শনিবার অভিনয়ের আসর বসাচ্ছেন। তুলসী লাহিড়ীর "ছেঁড়াতার" দিয়ে এঁরা যাত্রা শুরু করেন। গত বারো মাসে সবসুদ্ধ ছখানি নাটক এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন—তুলসী লাহিড়ীর "দুঃখীর ইমান", পরেশ ধরের "শুধু ছায়া", শচীন সেনের "কৃষ্ণকান্ত", ইবসেনের "ডলস হাউস"-এর বাংলা রূপান্তর "মুক্তি" ইত্যাদি।

গত শনিবার এই আসরে আমাদের "ছেঁড়াতার"-এর অভিনয় দেখার সুযোগ হয়েছিল। নাটকটির সেদিন অষ্টাবিংশতি-তম রজনী। যে আন্তরিকতার সঙ্গে আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা সেদিন এই বহু-অভিনীত নাটকের অভিনয় করলেন, তা সত্যিই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। একই সেটে
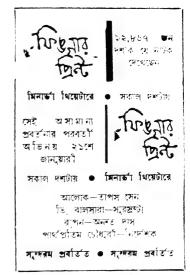
রাজকমল কলামন্দিরের "স্ত্রী"-র একটি দৃশ্যে শকুন্তলার রূপসজ্জায় সন্ধ্যা

দু'বার বিরতি দিয়ে নাটকটি অভিনীত হল। তার জন্যে নাটকের কয়েকটি চরিত্র ও দৃশ্য বাদ পড়েছে। একই দৃশ্যে সমস্ত ঘটনা কেন্দ্রীভূত করায় মাঝে মাঝে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। সকলকার মুখে উত্তরবঙ্গের ভাষাও স্বাভাবিক শোনায়নি। এ সমস্ত ত্রুটি কিন্তু ঢাকা পড়ে গেছে মুখ্য শিল্পীদের প্রাণঢালা অভিনয়ের গুণে।

এই প্রসঙ্গে গোড়াতেই নাম করতে হয় রহিম ও ফুলজানের ভূমিকায় সুনীল মুখোপাধ্যায় ও অণিমা মজুমদারের। এ'রা দু-জনেই উচ্চাঙ্গের অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই দুটি মুখ্য চরিত্রের রূপায়ণে। গোবিন্দর ভূমিকায় ননী দে গানে ও অভিনয়ে আসর জমিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ভৌমিক, সুবোধ সরখেল, ইন্দু মণ্ডল প্রভৃতি প্রশংসনীয় অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটারের এই সফল প্রচেষ্টা অন্যান্য মফস্বল শহরেও নিয়মিত অভিনয় আসর প্রবর্তনে উদাহরণস্থল হবে বলে আমরা মনে করি।

একটি আনন্দ অনুষ্ঠান

গত পৌষ-সংক্রান্তির দিন (১৪ই জানুয়ারী) শ্রীমতী কানন দেবীর রিজেন্ট গ্রোভস্থ বাসভবনে বাংলা চলচ্চিত্রলোকের সর্বজনপ্রিয় শ্রীহরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সানুবাবু নামে যিনি বিশেষভাবে পরিচিত) সাতষট্টিতম জন্মোৎসব পালিত হয়। উৎসবের আয়োজন করেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজপ্রতিম গুণগ্রাহীর দল।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাল্যভূষিত করেন শ্রী বি এন সরকার। শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "অরূপে তোমার বাণী" উদ্বোধন-গানের পর অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে শুভেচ্ছা-বাণী প্রেরণ করেন সেগুলি পাঠ করে শোনান অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ। সাতষট্টিতম জন্মদিনে অনুরাগীরা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনটি মানপত্র দেন। সেগুলি পাঠ করেন সর্বশ্রী বিকাশ রায়, নির্মলকুমার ঘোষ ও জ্যোতির্ময় বসুরায়।

অনুষ্ঠানে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাতষট্টি বৎসর পূর্তির স্মারক রূপে সাতষট্টিটি দীপ জ্বালানো হয়। এবং তাঁকে সাতষট্টি রক্তগোলাপের একটি গুচ্ছ উপহার দেওয়া হয়। এ বাদে জন্মদিনে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুন্দর উপহার-সামগ্রী দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান-শেষের গান করেন শ্রীউত্তমকুমার।

শ্রীহরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে" রবীন্দ্র সংগীতটি গেয়ে শোনান।

শ্রীমতী কানন দেবী ও তাঁর স্বামী শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে দিবাভোজে আপ্যায়িত করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী অসিত চৌধুরী, দীপ্তেন্দু প্রামাণিক, বিমল মল্লিক, অনিল বসু, সুবোধ মিত্র প্রভৃতি। বাংলা চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তক-এর ছবি "বন্ধন"-এর একটি দৃশ্যে গীতা দে ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

শোক সংবাদ

গত ৯ই জানুয়ারী বিখ্যাত চিত্র পরিবেশক ও প্রযোজক হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ রোগ ভোগের পর তাঁর শ্যামবাজারস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে স্বল্প সম্বল অবস্থা থেকে বাংলা চিত্রজগতে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্র পরিবেশক প্রাইভেট লিমিটেড ও এইচ এন সি প্রোডাকশনস—এই দুই প্রতিষ্ঠানের তিনিই ছিলেন কর্ণধার। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বহু চলচ্চিত্র পরিবেশন করে তিনি যেমন সুনাম অর্জন করেছিলেন, তেমনি প্রযোজক হিসাবেও দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে তিনি কয়েকটি সুন্দর ছবি চিত্রামোদীদের উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে "মন্ত্রশক্তি", "ইন্দ্রাণী", "একটি রাত" ও "ক্ষুধা" সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও সাতটি ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন।

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবীন্দ্রনাথ বসুও গত ৯ই জানুয়ারী তাঁর বালিগঞ্জস্থ বাসভবনে প্রাণত্যাগ করেছেন। তিনি নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র বর্তমান।

প্রভা পিকচার্সের সত্বাধিকারী মোহনলাল জালান গত ২৯শে ডিসেম্বর ইউরিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনিও নানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলেন। কটিহার ফ্লাওয়ার মিলসের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"র চিত্ররূপ দান করে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ প্রমাণ করেন। তাঁর দানশীলতাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিবিধ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তাঁর দানের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা।

আমেরিকার পুতুলনাচের দল

পুতুলনাচের ইতিকথা অনেকেরই জানা। প্রাচীন ভারতে এই শিল্পকলার জন্ম। বিদেশে পুতুলনাচের কদর দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। গত ৩০শে ডিসেম্বর আমেরিকার পুতুলনাচের একটি দল ভারত সফরে এসেছেন। ভারতের শিল্প বিদেশী শিল্পীদলের হাত ধরে বুঝি স্বদেশেই ফিরে এসেছে।

দলটি হায়দরাবাদে পুতুলনাচ দেখিয়ে মাদ্রাজ রওয়ানা হয়েছেন। কলকাতায় আসছেন আগামী ২৪শে জানুয়ারী। নিউ এম্পায়ারে প্রদর্শনী শুরু হবে ২৬শে জানুয়ারী তিনটা ও ছটায়। ২৮শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারীতেও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। দু দিনই তিনটা ও ছটায়।

এই পুতুলনাচের দলের নেতা হলেন বিল ও কোমার্ড। তা বাদে দলটিতে রয়েছেন আরও চারজন [illegible] পুতুলশিল্পী এবং দেড়শো পুতুল।

একলব্য
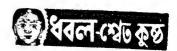
উপর্যুপরি দু'টি টেস্টে বিজয়ী হয়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বপ্রথম 'রাবার' লাভ এই সপ্তাহের শুধু খেলাধূলোরই বড় খবর নয়—এই জয়ের আনন্দ যেন ভারতের জাতীয় আনন্দের এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। সত্যিই খেলার ব্যাপারে সারা দেশ আর কখনো এমনভাবে মেতে ওঠেনি। কাগজে কাগজে এমন ফলাও করে খবরও ছাপা হয়নি। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম 'রাবার' জয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সারা দেশেই আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেছে।

এর কারণও আছে। টেস্টে আমরা আগেও জিতেছি। এই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেই জিতেছি। "রাবার"ও পেয়েছি—পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু ক্রিকেট-স্রষ্টা ও ক্রিকেটের কুলীন-প্রধান ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে "রাবার" লাভ এই প্রথম। এর মধ্যে যে আনন্দ, যে আত্মতৃপ্তি আছে অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে "রাবার" লাভে সে আনন্দ ও সে আত্মতৃপ্তি নেই। এমনকি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত আমরা একটি টেস্টেও জিততে পারিনি। সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার পেলেও এত আনন্দ হবে কিনা জানি না।

ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকরা ভারতের বিরুদ্ধে অনেক কটু মন্তব্য করে ভারতকে ক্রিকেট সমাজে অন্ত্যজ করে রাখতে চেয়েছিলেন। কলকাতা ও মাদ্রাজ মাঠ তার 'মুখের মত' জবাব দিয়েছে। তাই আত্মতৃপ্তি আরও বেশী। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আজ না তোলাই ভাল।

আত্মতৃপ্তির অন্য কারণ। ভারত এবার পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে এবং পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে অন্য কোনবার এমন খেলতে পারেনি।

প্রতিটি টেস্টেই ভারতের সুনিশ্চিত প্রাধান্য। বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে অবশ্য ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট করে বেশী রান তোলে। কিন্তু ৫০০ রানের সেই বড় ইনিংসের বিরুদ্ধে ভারত যে দৃঢ়তা নিয়ে খেলে ৩৯০ রান করে তার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় আছে। তারপর কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ডকে "ফলো অন" করতে হয়। দিল্লিতে তৃতীয় টেস্টে ভারতের ৪৬৬ রানের উত্তরে ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ২৫৬ রান করার পর বৃষ্টির জন্য শেষ দু'দিনের খেলা বন্ধ থাকে। কলকাতার চতুর্থ টেস্টে প্রতিপক্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ভারত বিজয়ী হয় ১৮৭ রানে।

তারপর মাদ্রাজের এই শেষ টেস্ট। মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থাকলেও ভারত "রাবার" পেত। কিন্তু ভারতের খেলোয়াড়রা কোন সময়ই আত্মরক্ষামূলক ব্যাটিং করেনি। উজ্জ্বল ক্রিকেটের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের মধ্যে তারা পরাজিত করেছেন ইংলণ্ডকে। ধাপে ধাপে যেমন ভারতের খেলায় উন্নতি দেখা দিয়েছে তেমনি

আধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর

দর্শক সমর্থকরাও ধাপে ধাপে আনন্দ পেতে পেতে মাদ্রাজ মাঠের আনন্দের মধ্যে পেয়েছেন পূর্ণ তৃপ্তি।

কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং:—সব বিষয়ে ভারতের খেলোয়াড়রা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে বিজয়-গৌরব করতলগত করেছেন। এ বিজয় ভারতের তারুণ্যের জয়। একমাত্র পলি উমরিগর ও বিজয় মঞ্জরেকর ছাড়া দলে বর্ষীয়ান খেলোয়াড় **নেই। দু'জনই তারুণ্যের সীমারেখা অতিক্রম করেছেন। কিন্তু আর সকলেই বয়সে তরুণ। কিন্তু ক্রীড়া-পটুতায় ইংলণ্ডের প্রবীণদেরও পর্যুদস্ত করেছেন।**

ভারতের তরুণদের মধ্যে এমন আরও কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন ন্যায্যভাবেই যারা টেস্ট টীমে স্থান পাবার যোগ্য। সুর্তি, সারদেশাই, কৃপাল সিং, মিলখা সিং, বিজয় মেহেরা, রঞ্জনে, ভি ভি কুমার—অনেকেই পঞ্চম টেস্ট টীমে স্থান পাননি। এদের কারো যোগ্যতাই কম নয়। সত্যিই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড়-নির্বাচক সমিতির সম্মুখে আজ এক মহাসমস্যা। তারা কাকে রেখে কাকে কোলে করেন?

ভারতীয় ক্রিকেটের এই তারুণ্যশক্তির কাছেই দুর্ধর্ষ ইংলণ্ডকে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। পরাজয় এড়াবার জন্য তারা কোন চেষ্টারই কসুর করেননি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন ভারতের বিপুল সম্ভাবনার কাছে।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে "রাবার" লাভের ফলে ভারতের টেস্ট ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা শুধু ইতিহাসের সূচনা। বহু নতুন অধ্যায় ভারতের ক্রিকেটের জন্য অপেক্ষা করছে। তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের এবারকার ক্রীড়াধারায়।

এই মাসের শেষ তারিখে ভারতীয় দল যাত্রা করছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট সফরে। ভারতের বিজয়ী অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর সেখান থেকে জয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে আসুন সারা ভারতবাসীর আজ এই কামনা।

• • •

মাদ্রাজে পঞ্চম টেস্ট খেলা শেষ হবার সঙ্গে ইংলণ্ড দলের ভারত সফরের উপর যবনিকা পড়েছে। সফরের সামগ্রিক ফলাফল, সেঞ্চুরী, নতুন রেকর্ড প্রভৃতি বিষয়ের কিছু কিছু তথ্য এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হচ্ছে। এখন খেলাটির আলোচনা করা যাক।

১৯৫২ সালে এই মাদ্রাজেই ইংলণ্ড দল সর্বপ্রথম ভারতের কাছে হার স্বীকার করেছিল। দীর্ঘ ১০ বছর পরে সেই মাদ্রাজ মাঠের ফলাফলের ভিত্তিতেই ভারত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম "রাবার" পেয়েছে। টেস্টে ইংলণ্ডকে হারিয়েছে—১২৮ রানে।

সুতরাং মাদ্রাজ মাঠ ভারতের টেস্ট খেলোয়াড়দের সুখস্মৃতির ক্রীড়াঙ্গন। এখানেই পংকজ রায় ও বিনু মানকড় নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একত্রে ৪১৩ রান করে প্রথম উইকেটের যে বিশ্ব রেকর্ড করে রেখেছেন তা আজও অম্লান। এখানেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গতবার ভারত যে ৫৩৯ রান করেছে টেস্টে আজ পর্যন্ত সেইটাই ভারতের বড় ইনিংস।

জানুয়ারীর ১০ তারিখে মাদ্রাজে **পঞ্চম টেস্ট আরম্ভের আগে ভারতীয় খেলোয়াড়**

দের মধ্যে এইসব ঘটনার কোন প্রেরণা ছিল কিনা জানি না। তবে টসে জিতে যেভাবে ভারত খেলা আরম্ভ করেছিল তার মধ্যে একটা প্রেরণা, একটা দৃঢ়তা, জয়লাভের অসীম আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

প্রথম দিনে ৭টি উইকেট পড়ল বটে, কিন্তু দিনের শেষে সংগৃহীত হল ২৯৬ রান যা টেস্ট খেলার ইতিহাসে কোনবার একদিনে ভারত সংগ্রহ করতে পারেনি। দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক দৃপ্ত ভঙ্গিমার ব্যাটিংয়ে মাত্র ১৬৮ মিনিটে পাতৌদির নবাব মনসুর আলী খাঁ করলেন ১০৩ রান। ১৯০ মিনিটে অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর জৌলুস-ভরা খেলায় ৮৬। শুধু তাই নয় মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর থেকে চা পানের সময় পর্যন্ত মাত্র ১২০ মিনিটে যোগ হল ১৩৫ রান। সত্যিই উজ্জ্বল ক্রিকেটের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। এর পর আরও আছে। প্রথম দিনের খেলাতেই হল ৪টি ওভার বাউণ্ডারী। পাতৌদি মারলেন দুটি, আর জয়সীমা ও কন্ট্রাক্টর একটি করে।

এখানে বলা প্রয়োজন ১৬৮ মিনিটে পাতৌদির নবাবের ১০৩ রান টেস্ট খেলার ইতিহাসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানের দ্রুততম সেঞ্চুরী। নবাবের জীবনের প্রথম।

দ্বিতীয় দিনের সূচনায় আরও উজ্জ্বল খেলা। প্রথম ওভারেই ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের ১৬ রান সংগ্রহ। ইঞ্জিনীয়ারের অনবদ্য ব্যাটিং এবং বাপু নাদকার্ণীর দৃঢ়তাপূর্ণ খেলায় মাঠ পাগল। ৩৫ হাজার দর্শকের ঘন ঘন হাততালির মধ্যে ১৪০ মিনিটে ১০২ রান যোগ হবার পর ৪২৮ রানে ভারতের ইনিংস শেষ। এর মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারের ৬৫ ও বাপু নাদকার্ণীর ৬৩—রানের নিজ নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষর। দুইয়ের কৃতিত্ব অষ্টম উইকেটের নতুন রেকর্ড। ১৯৩২ সালে লর্ডস মাঠে ভারতের একমাত্র টেস্ট খেলায় লাল সিং ও অমর সিং অষ্টম উইকেটে ৭৪ রান করে যে রেকর্ড করে রেখেছিলেন নাদকার্ণী ও ইঞ্জিনীয়ার এইদিন ১০১ রান করে তা ম্লান করে দেন।

দ্বিতীয় দিনের জন্য আরও কিছু নাটকীয়তা অপেক্ষা করছিল। সেটা ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ের সময় ভারতের স্বপক্ষে। মাত্র ৫৪ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের ৪জন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান—রিচার্ডসন, বারবার ব্যারিংটন ও ডেক্সটার আউট হয়ে যান। ফলে ইংলণ্ডের বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। অবশ্য শেষ দিকে মাইক স্মিথ ও পিটার প্যারফিটের দৃঢ়তায় খেলার গতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। দিনের শেষে ইংলণ্ডের ওঠে ৪ উইকেটে ১০৮ রান।

একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের খেলায় শেষার্দ্ধের ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তা এবং মাইক স্মিথের প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ের ফলে ইংলণ্ড ২১৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। পরে ৬৫ রানের মধ্যে ভারতের

পঞ্চম টেস্টে একমাত্র এবং দ্রুততম সেঞ্চুরীর অধিকারী পাতৌদির নবাব

তিনটি উইকেট পড়ে যাওয়ায় পঞ্চম টেস্টে পট-পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যায়। জয়সীমা, কন্ট্রাক্টর ও পাতৌদির নবাবের মত তিনজন ব্যাটসম্যান আউট হওয়ায় প্রথম ইনিংসে [illegible] রানে অগ্রগামী

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

হওয়ার আনন্দ অনেকখানি হাওয়ায় উড়ে যায়।

তৃতীয় দিনের খেলাতেও হয় তিনটি ওভার বাউণ্ডারী। একটি মারেন মাইক স্মিথ। দুটি ডেভিড স্মিথ।

মহা অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। উত্থান পতন এখানকার চিরাচরিত রীতি। চতুর্থ দিন আবার পট পরিবর্তন। ১৯০ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর ১২২ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রতিথযশা ৫ জন আউট।

বিজয় মঞ্জরেকারের দুর্ভাগ্য তিনি এই-দিন সেঞ্চুরী লাভের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। ৮৫ রানের মাথায় রান আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছেন। চতুর্থ টার্নিং উইকেটে ল্যাটা স্পিন বোলার টনি লকের বল খুবই মারাত্মক হয়। তিনি ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে পান ৬৫ রানে ৬টি উইকেট।

পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলা। মাঠে এক-দিকে যেমন উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ অন্যদিকে তেমন খুশীর আমেজ। ইংলণ্ডের সম্মুখে কঠিন সমস্যা। ভারতের সম্মুখে জয়ের হাতছানি।

উইকেট ইতিমধ্যেই জরাগ্রস্থ। ফাটল ধরেছে। সর্বাঙ্গে ক্ষতের চিহ্ন। বল পড়ছে আর ধুলোপাক খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে মাঠের দিকে। ছোঁয়া মাত্র ফোঁস করে উপরে ওঠার ভার। এ অবস্থায় শেষ দিকের পাঁচটি উইকেট সম্বল করে জয়ের জন্য ইংলণ্ডের ২৯৬ রান সংগ্রহ করার কল্পনা হিসাবের মধ্যে আসে না। বিশেষ করে স্পিন বোলিংয়ে ভারত যখন যথেষ্ট শক্তি-শালী। সুতরাং এক একটি করে উইকেট পড়তে আরম্ভ করলো ইংলণ্ডের। বোরদে দুরানীর সংহার মূর্তির কাছে কেউ বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে টিকতে পারল না। মধ্যাহ্ন ভোজের দশ মিনিট পরে শেষ জুটির একজন [illegible] টনি লক [illegible] রানের লোভ-[illegible] বলে পড়ে চালালেন—বল উঠল মিড উইকেটের আকাশে। দুরানীর দিকে চেয়ে নাদকার্ণী দু'হাত পাততে বল এসে পড়লো দু'হাতের মুঠোয়। যেন নাদকার্ণী পরম নির্ভরতায় 'রাবার' মুঠো করে ধরলেন হাতের মধ্যে। উত্তেজনায় সমস্ত মাঠ কেঁপে উঠল। আবার হারল ইংলণ্ড। দিকে দিকে সারা বিশ্বে সেই বারতাই পৌঁছে দিল বেতার বাণী।

• • •

ফলাফল, সেঞ্চুরী ও নতুন রেকর্ড

ভারত ও ইংলণ্ডের এই পর্যায়ের পাঁচটি টেস্ট খেলা সমেত মোট ১৫টি খেলার মধ্যে ইংলণ্ড একটি টেস্ট খেলাতেও জিততে পারে নি। উপরন্তু ২টি টেস্ট হার স্বীকার করেছে। বাকি ১০টি খেলার মধ্যে ইংলণ্ড জিতেছে ৪টি খেলায়। ৩টি টেস্ট সমেত মোট

৯টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে।

ইংলণ্ডের পক্ষে ৬ জন ব্যাটসম্যান ১১টি সেঞ্চুরী করেছেন, আর ভারতের পক্ষে ছয়টি সেঞ্চুরী করেছেন ৬ জন ব্যাটসম্যান।

উইকেট পার্টনারশিপে নতুন রেকর্ড (ভারত-ইংলণ্ড টেস্ট) হয়েছে ছয়টি। আর ইংলণ্ডের কেন ব্যারিংটন ও ভারতের বিজয় মঞ্জরেকার গড় রানে আগের সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন।

খেলাগুলির ফলাফল ঃ—

পুণায়—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের সঙ্গে—[ড্র]

আমেদাবাদে—পশ্চিমাঞ্চল দলের সঙ্গে—[ড্র]

বোম্বাইতে—রণজি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাইয়ের সঙ্গে—[ড্র]

বোম্বাইতে প্রথম টেস্ট—[ড্র]

পঞ্চম টেস্টে ১০টি উইকেটের অধিকারী সেলিম দুরানী

হায়দরাবাদে—ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির দলের সঙ্গে—

[এম সি সি ৪ উইকেটে বিজয়ী]

জয়পুরে—রাজস্থানের সঙ্গে—[ড্র]

নাগপুরে—মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে—[ড্র]

কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট—[ড্র]

জলন্ধরে—উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে—[এম সি সি ৯ উইকেটে বিজয়ী]

দিল্লিতে তৃতীয় টেস্ট—[ড্র]

কটকে—পূর্বাঞ্চল দলের সঙ্গে—[ড্র]

কলকাতায়—সার্ভিসেস দলের সঙ্গে [এম সি সি এক ইনিংস ও ৩৭ রানে বিজয়ী]

কলকাতায়—চতুর্থ টেস্ট

[ভারত ১৮৭ রানে বিজয়ী]

ব্যাঙ্গালোরে—দক্ষিণাঞ্চল দলের সঙ্গে [এম সি সি ৩৫ রানে বিজয়ী]

মাদ্রাজে—পঞ্চম ও শেষ টেস্ট

[ভারত ১২৮ রানে বিজয়ী]

বাপু নাদকার্নী

ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরী

কেন ব্যারিংটন—১৪৯ নট আউট (ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ), ১৫১ নট আউট (ভারতে প্রথম টেস্ট), ১৭২ (দ্বিতীয় টেস্ট), ১১৩ নট আউট (তৃতীয় টেস্ট)।

জিওফ পুলার—১০৪ (পশ্চিম অঞ্চল), ১১৯ (ভারতে দ্বিতীয় টেস্ট)।

টেড ডেক্সটার—১২৬ নট আউট (ভারতে দ্বিতীয় টেস্ট)।

পিটার পারফিট—১৬৬ নট আউট (মধ্যাঞ্চল), ১১১ (সার্ভিসেস)।

এরিক রাসেল—১০১ (মধ্যাঞ্চল)।

পিটার রিচার্ডসন—১৫৭ (পূর্বাঞ্চল)।

৮৫ রানের মাথায় রান আউট বিজয় মঞ্জরেকার

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরী

সেলিম দুরানী—১২৪ (রাজস্থান)।

সূর্যবীর সিং—১১২ (মধ্যাঞ্চল)

পলি উমরিগর—১৪৭ (দ্বিতীয় টেস্ট)।

এম এল জয়সীমা—১২৭ (তৃতীয় টেস্ট)।

বিজয় মঞ্জরেকার—১৮৯ নট আউট (তৃতীয় টেস্ট)।

পাতৌদির নবাব মনসুর আলী খাঁ—১০৩ (পঞ্চম টেস্ট—মাদ্রাজ)।

নতুন রেকর্ড

দ্বিতীয় উইকেটে জয়সীমা ও মঞ্জরেকারের ১৩১ রান (বোম্বাই প্রথম টেস্ট)।

পঞ্চম উইকেটে বোরদে ও দুরানীর ১৪২ রান (বোম্বাই - প্রথম টেস্ট)

অষ্টম উইকেটে নাদকার্নী ও ইঞ্জিনিয়ারের ১০১ রান (পঞ্চম টেস্ট—মাদ্রাজ)

প্রথম উইকেটে পুলার ও রিচার্ডসনের ১৫০ রান (বোম্বাই প্রথম টেস্ট)

দ্বিতীয় উইকেটে ব্যারিংটন ও পুলারের ১৬৪ রান (দিল্লি—তৃতীয় টেস্ট)

নবম উইকেটে বারবার ও অ্যালেনের ৮২ রান (কানপুর—দ্বিতীয় টেস্ট)

পাঁচটি টেস্টে কেন ব্যারিংটনের মোট ৫৯৪ রান (অ্যাভারেজ—৯৯·০০)

আগের রেকর্ড অ্যালান ওয়াটকিন্স। মোট—৪৫১ রান (অ্যাভারেজ ৬৪·৪২)—১৯৫১ সাল।

পাঁচটি টেস্টে বিজয় মঞ্জরেকারের ৫৮৬ রান (অ্যাভারেজ ৮৩·৭১), আগের রেকর্ড—পঙ্কজ রায়—মোট ৩৮৭ রান (অ্যাভারেজ ৫৫·২৯)—১৯৫১ সাল;

ইংলণ্ড টীমের ভারত সফর

১৮৮৯ সাল থেকে যতগুলি দল ভারত সফর করেছে তাদের ফলাফল দেওয়া হল ঃ

১৮৮৯—জি এফ—ভার্নেনের দল
জয়—১০, ড্র—২, পরা—১

১৮৯২ — লর্ড—হকের দল
জয়—১৫, ড্র—৬, পরা—১

১৯০২ — অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অথেনটিক্স দল
অধিনায়ক কে জে কী
জয়—১২, ড্র—৫, পরা—২

১৯২৬—আর্থার গিলিগানের দল
জয়—১১, ড্র—২৩

১৯৩৩ — এম সি সি-র সরকারী সফর
অধিনায়ক ঃ ডগলাস জার্ডিন
জয়—১৭, ড্র—১৬, পরা—১

১৯৩৭ — লর্ড টেনিসনের দল
জয়—৮, ড্র—১১, পরা—৫

১৯৫১ — এম সি সি-র সরকারী সফর
অধিনায়ক ঃ নাইজেল হাওয়ার্ড
জয়—৭, ড্র—১০, পরা—১ (টেস্ট)

১৯৬১ — এম সি সি-র সরকারী সফর
অধিনায়ক ঃ টেড ডেক্সটার
জয়—৪, ড্র—৯, পরা—২ (টেস্ট)

ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর

১৮৮৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় দল যতবার ইংলণ্ড সফর করেছে চুম্বকে তার ফলাফল দেওয়া হলঃ—

১৮৮৬ — প্রথম পার্শী দল
অধিনায়ক : ডাঃ ডি এইচ প্যাটেল
জয়—১, ড্র—৮, পরা—১৮

১৮৮৮ — দ্বিতীয় পার্সী দল
অধিনায়ক : পি ডি কাঙ্গা
জয়—৮, ড্র—১২, পরা—১১

১৯১১ — ভারতীয় দল
অধিনায়ক : পাতিয়ালার মহারাজা
জয়—৬, ড্র—৫, পরা—১৫

১৯৩২ — ভারতের সরকারী সফর
অধিনায়ক : পোরবন্দরের মহারাজা
জয়—১৩, ড্র—১৪, পরা—৯

১৯৩৬ — ভারতের সরকারী সফর
অধিনায়ক : 'ভিজি'
জয়—৪, ড্র—১২, পরা—১২

১৯৩৯ — রাজপুতনা দল
অধিনায়ক : ওয়াহিদুল্লা
জয়—২, ড্র—৫, পরা—১

১৯৪৬—ভারতের সরকারী সফর
অধিনায়ক : পাতৌদির নবাব
জয়—১১, ড্র—১৬, পরা—৪

১৯৫২ — ভারতের সরকারী সফর
অধিনায়ক : বিজয় হাজারে
জয়—৬, ড্র—২৯, পরা—৫

১৯৫৯ — ভারতের সরকারী সফর
অধিনায়ক : ডি কে গাইকোয়াড়
জয়—[illegible], ড্র—১৭, পরা—১১

(১৯৩২ সালে একমাত্র টেস্টে অধিনায়ক ছিলেন সি কে নাইডু এবং ১৯৫৯ সালে লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে গাইকোয়াড়ের অসুস্থতায় ভারতের অধিনায়কত্ব করেন পংকজ রায়)

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সেঞ্চুরী

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ভারতের যে ১২ জন ব্যাটসম্যান ১৯টি সেঞ্চুরী করেছেন নীচে তাঁদের নাম ও সেঞ্চুরীর তালিকা দেওয়া হলঃ—

বিজয় মার্চেন্ট — ১১৪ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৩৬), ১২৮ (ওভাল ১৯৪৬), ১৫৪ (দিল্লি ৫১-৫২)।

বিজয় হাজারে—১৬৪* (দিল্লি ৫১-৫২), ১৫৫ (বোম্বাই ৫১-৫২)।

পংকজ রায়—১৪০ (বোম্বাই ৫১-৫২), ১১১ (মাদ্রাজ ৫১-৫২)।

পলি উমরিগর—১৩০* (মাদ্রাজ ৫১-৫২), ১১৮ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৯) ১৪৭* (কানপুর ৬১)।

বিনু মানকড়—১৮৪ (লর্ডস ১৯৫২)।

ভারত-ইংলণ্ড টেস্ট অ্যাভারেজ

ভারত—ব্যাটিং

	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রান	মোট রান	গড়
মঞ্জরেকার ...	৮	১	১৮৯*	৫৮৬	৮৩·৭১
মেহেরা ...	২	১	৬২	৬৯	৬৯·০০
পাতৌদি ...	৫	০	১০৩	২২২	৫৫·৪০
উমরিগর ...	৬	১	১৪৭*	২৫৪	৫০·৮০
জয়সীমা ...	৮	০	১২৭	৩৯৯	৪৯·৮৭
বোরদে ...	৮	১	৬৯	৩১৪	৪৪·৮৫
নাদকার্নী ...	২	০	৬৩	৬৪	৩২·০০
কৃপাল সিং ...	৪	২	৩৮*	৬০	৩০·০০
সারদেশাই .	১	০	২৮	২৮	২৮·০০
ইঞ্জিনীয়ার ...	৬	১	৬৫	১০৫	২৭·০০
প্রসন্ন ...	২	১	১৭	২৬	২৬·০০
ডুরানী ...	৮	০	৭১	১৯৯	২৪·৮৭
কন্ট্রাক্টর ...	৮	০	৮৬	১৮০	২২·৫০
দেশাই ...	৬	১	২৯	৭৩	১৪·৬০
রঞ্জনে ...	৩	০	১৬	২৩	৭·৬৬
মিলখা সিং ...	২	০	১২	১৪	৭·০০
সুন্দরাম ...	১	০	৫	৫	৫·০০
কুমার ...	১	০	০	০	০
গুপ্তে ...	১	০	০	০	০

ইংলণ্ড—ব্যাটিং

	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রান	মোট রান	গড়
ব্যারিংটন .	৯	৩	১৫১*	৫৯৪	৯৯·০০
পুলার ...	৪	০	১১৯	৩৩৭	৮৪·২৫
ডেক্সটার ...	৯	২	১২৬*	৪০৯	৫৮·৪২
নাইট ...	৪	১	৩৯*	১০৩	৩৪·৩৩
রিচার্ডসন ...	৯	০	৭১	৩০৪	৩৩·৭৭
প্যারফিট ...	৪	০	৪৩	১২৫	৩১·২৫
বারবার ...	৮	১	৬৯*	১৮৪	২৬·২৮
লক ...	৭	২	৪৯*	১০৮	২১·৬০
মাইক স্মিথ ...	৭	০	৭৩	১২৬	১৮·০০
মিলম্যান ...	৪	১	৩২*	৫০	১৬·৬৬
এলেন ...	৬	০	৩৪	৮৯	১৪·৮৩
ডি স্মিথ ...	৫	১	৩৪*	৪৭	১১·৭৫
রাসেল ...	২	০	১০	১৯	৯·৫০

[তারকাচিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক]

ভারত—বোলিং

	ইনিংস	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
নাদকার্নী ...	২	১৮·১	৯	২৫	২	১২·৫০
ডুরানী ..	৯	২৪৯·৪	৭১	৬২২	২৩	২৭·০৪
বোরদে ...	৯	১৪৭	৫৫	৪৬০	১৬	২৯·৩৭
রঞ্জনে ...	৬	১০৮·৩	১৯	৩১৮	৯	৩৫·৩৩
গুপ্তে ...	৩	১০৯	৩৪	২৫৭	৭	৩৬·৭১
দেশাই ...	৭	১১১	১৭	৩১৯	৬	৫৩·১৬

(উমরিগর—২টি, প্রসন্ন—১টি ও কৃপাল সিং ১টি উইকেট পেয়েছেন)

ইংলণ্ড—বোলিং

	ইনিংস	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
এলেন ...	৯	৩০১·৫	১২১	৫৮৩	২১	২৭·৭৬
লক ...	৮	৩০৬·৩	১২৪	৬২৮	২২	২৮·৫৪
নাইট ...	৬	১০২·৪	২২	২৪৯	৮	৩১·১২
বারবার ...	৬	৭৯	১০	২১৫	৪	৫৩·৭৫
ডি স্মিথ ...	৮	১৭২	৪৭	৩৫৯	৬	৫৯·৮৩
ডেক্সটার ...	৬	৮৩	১৬	২৪০	৪	৬০·০০

(প্যারাফিট—২টি, রিচার্ডসন—২টি ও মাইক স্মিথ ১টি উইকেট পেয়েছেন)

বিজয় মঞ্জরেকার—১৩৩ (লীডস ১৯৫২), ১৮৯* (দিল্লি ৬১)।

এল অমরনাথ—১১৮ (বোম্বাই ৩৩-৩৪)।

ডি জি ফাদকার—১১৫ (কলিকাতা ৫১-৫২)।

মুস্তাক আলী—১১২ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৩৬)।

আব্বাস আলী বেগ—১১২ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৯)।

জয়সীমা—১২৭ (দিল্লী ৬১)।

পাতৌদির নবাব — ১০৩ (মাদ্রাজ ১৯৬২)।

ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের সেঞ্চুরী

১৯৩২-এর লর্ডস মাঠ থেকে আরম্ভ করে ১৯৬২-র মাদ্রাজ পর্যন্ত ভারত ও ইংলণ্ডের ২৯টি টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের ১৬ জন ব্যাটসম্যানের ২২টি সেঞ্চুরীর মধ্যে একটি 'ডবল সেঞ্চুরী' সমেত ওয়ালী হ্যামণ্ড করেছেন দুটি সেঞ্চুরী, লেন হাটন ও জিওফ পুলার দুটি করে। আর কেন ব্যারিংটন এবার তিনটি টেস্টে পর পর সেঞ্চুরী করেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের অপর ডবল সেঞ্চুরীর অধিকারী জো হার্ডস্টাফ।

ইংলণ্ডের স্পিন বোলার টনি লক

বি এইচ ভ্যালেণ্টাইন—১৩৬ (বোম্বাই ৩৩—৩৪)।

সি ওয়াল্টার্স—১০২ (মাদ্রাজ ৩৩—৩৪)।

ওয়ালী হ্যামণ্ড—২১৭ (ওভাল ৩৬), ১৬৭ (ম্যাঞ্চেস্টার ৩৬)।

জো হার্ডস্টাফ—২০৫* (লর্ডস)।

টি এস ওয়ার্দিংটন—১২৮ (ওভাল ৩৬)।

টম গ্রেভনি—১৭৫ (বোম্বাই ৫১-৫২)।

এলান ওয়াটকিন্স — ১৩৭* (দিল্লি ৫১-৫২)।

টি ইভান্স—১০৪ (লর্ডস ৫২)।

লেন হাটন—১৫০ (লর্ডস ৫২), ১০৪ (ম্যাঞ্চেস্টার ৫২)।

ডি শেফার্ড—১১৯ (ওভাল ৫২)।

কলিন কাউড্রে—১৬০ (লীডস ৫৯)।

পিটার মে—১০৬ (নটিংহাম ৫৯)।

জি পুলার—১৩১ (ম্যাঞ্চেস্টার ৫৯)—১১৯ (কানপুর—৬১)।

মাইক স্মিথ—১০০ (ম্যাঞ্চেস্টার ৫৯)।

কেন ব্যারিংটন—১৫১* (বোম্বাই ৬১)—১৭২ (কানপুর—৬১)—১১৩* (দিল্লি ৬১)।

টেড ডেক্সটার—১২৬* (কানপুর ৬১)।

[* তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক]

এক নজরে সমস্ত টেস্ট খেলার ফলাফল

ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউ-জিল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের সঙ্গে এইপর্যন্ত ৭৭টি অফিসিয়াল টেস্ট খেলার মধ্যে ভারতের জয়ের সংখ্যা আট। মোট ২৯টি খেলায় ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছে, আর অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে ৪০টি টেস্ট খেলা। বিদেশের মাটিতে আজ পর্যন্ত ভারত কোন টেস্ট খেলায় জিততে পারেনি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে জয়ের কোঠাও শূন্য থেকে গেছে।

লীগ টেবিলে সমস্ত খেলাগুলির জয়-পরাজয়ের হিসাব নীচে দেওয়া হল:—

ভারত : ইংলণ্ড

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৩২ ইংলণ্ডে	১	০	১	০
১৯৩৩-৩৪ ভারতে	৩	০	২	১
১৯৩৬ ইংলণ্ডে	৩	০	২	১
১৯৪৬ ইংলণ্ডে	৩	০	১	২
১৯৫১-৫২ ভারতে	৫	১	১	৩
১৯৫২ ইংলণ্ডে	৪	০	৩	১
১৯৫৯ ইংলণ্ডে	৫	০	৫	০
১৯৬১-৬২ ভারতে	৫	২	০	৩
	২৯	৩	১৫	১১

ভারত : অস্ট্রেলিয়া

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৪৭-৪৮ অস্ট্রেলিয়া	৫	০	৪	১
১৯৫৬ ভারতে	৩	০	২	১
১৯৫৯-৬০ ভারতে	৫	১	২	২
	১৩	১	৮	৪

ভারত : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৪৮-৪৯ ভারতে	৫	০	১	৪
১৯৫২-৫৩ ওঃ ইণ্ডিজে	৫	০	১	৪
১৯৫৮-৫৯ ভারতে	৫	০	৩	২
	১৫	০	৫	১০

ভারত : নিউজিল্যাণ্ড

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৫৫-৫৬ ভারতে	৫	২	০	৩

ভারত : পাকিস্তান

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৫২-৫৩ ভারতে	৫	২	১	২
১৯৫৪-৫৫ পাকিস্তানে	৫	০	০	৫
১৯৬০-৬১ ভারতে	৫	০	০	৫
	১৫	২	১	১২

[মোট খেলা ৭৭ : মোট জয় ৮ : মোট পরাজয় ২৯ : মোট ড্র ৪০]

স্কোর বোর্ড

ভারত—প্রথম ইনিংস

এম এল জয়সীমা ব নাইট	...	১২
নরী কণ্ট্রাক্টার ব বারবার	...	৮৬
বিজয় মঞ্জরেকার ক লক ব পারফিট		১৩
পাতৌদির নবাব ক লক ব নাইট	...	১০৩
পলি উমরিগার ক মিলমান ব এলেন		২
চান্দু বোরদে ব লক	...	৩১
সেলিম দুরানী ব এলেন	...	২১
বাপু নাদকার্ণী ব এলেন	...	৬৩
ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ক ডেক্সটার	...	৬৫

ডি এলেন ক উমরিগর ব সি বোরদে	২১
জি মিলম্যান ক কণ্ট্রাক্টার ব প্রসন্ন	১৪
জি এ লক ক নাদকার্নী ব সি বোরদে	১১
ডি স্মিথ নট আউট	২
অতিরিক্ত	৬
মোট	২০৯

উইকেট পতন—১।২ (রিচার্ডসন); ২।৩২ (বারবার); ৩।৪১ (ডেক্সটার); ৪।৮৪ (ব্যারিংটন); ৫।৯০ (মাইক স্মিথ); ৬।১৫৫ (নাইট); ৭।১৬৪ (পারফিট); ৮।১৯৪ (মিলম্যান); ৯।২০২ (এলেন); ১০।২০৯ (লক)।

বোলিং	ও	মে	রান	উইঃ
আর দেশাই	৪	০	১৬	১
পি উমরিগর	৬	১	১২	০
এস ডুরানী	৩৪	১২	৭২	৪
সি বোরদে	২৫	৮	৫৯	৩
নাদকার্নী	১২	৩	২৫	১
প্রসন্ন	১১	৩	১৯	১

মুকুল

প্রমীলা বসু

খেলাধুলো, হৈ-হল্লার মধ্য দিয়ে প্রথম জীবনে নিজের পূর্ণ আনন্দ, পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীদের সাফল্যে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি। বাঙলার স্পোর্টসের প্রথম ধাপের মেয়ে প্রমীলা বসু আজও স্পোর্টসের পরিচালিকা। দুটি স্কুলের স্পোর্টস ও গেমস-এর টিচার। সকালে গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয়ে, দুপুরে লেক স্কুল ফর গার্লস-এ। ওর উপরই দুটি স্কুলের মেয়েদের খেলাধুলোর সমস্ত ভার। কখনো ড্রিল করাচ্ছেন, কখনো অ্যাথলেটিকসের শিক্ষা দিচ্ছেন, কখনো শেখাচ্ছেন নিয়মানুবর্তিতা। সাজিয়ে গুছিয়ে দল বেঁধে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছেন অ্যাথলেটিকস অঙ্গনে। কোন সময় বা রোটারী ক্লাবের খেলার আসরে, কোন সময় শ্রীঅরবিন্দ ফিজিক্যাল ডিমনস্ট্রেশনে। মেয়েরা যখন প্রাইজ নিয়ে ঘরে ফিরছে, তখন খুশির আমেজে, আত্মতৃপ্তির আনন্দে নেচে উঠছে প্রমীলা বসুর মন—ছোটবেলায় নিজে যখন প্রাইজ পেতেন, ঠিক যেন সেই আনন্দ, সেই অনুভূতি।

নিজে স্পোর্টস করেছেন খুব ছোটবেলা থেকে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাঙলার মেয়েদের স্পোর্টসে ওর গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। ফিল্ড ইভেন্টে দু হাত ভরে রাশি রাশি প্রাইজ কুড়িয়েছেন বাঙলার বিভিন্ন স্পোর্টস ফিল্ড থেকে।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন প্রমীলা বসুর নামের সঙ্গে আর একটি নাম থাকত পাশাপাশি লেখা—হিরণ্ময়ী বসু। যেন দুটি বোন। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও এক হিসাবে বোনই বটে। শুধু সতীর্থ এবং সহ অ্যাথলীটই নয়, দুজনাই সরিষা রামকৃষ্ণ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী গণেশানন্দের মানসকন্যা।

১৯২৭ সাল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী গণেশানন্দ ঘুরে বেড়াচ্ছেন সরিষার আশপাশ পল্লীর মধ্যে। উদ্দেশ্য, মেয়েদের জন্য স্কুল গড়বেন। তাই মেয়ে চাই। কয়েকটি মেয়ে জুটল। তাদের মধ্যে প্রমীলা ও হিরণ্ময়ী বসুর সব বিষয়ে আগ্রহ। লেখাপড়া, খেলাধুলো, সূচীশিল্প—সব কিছুতে। অমিয় মহারাজ (স্বামী গণেশানন্দ) তাদের সেবার মন্ত্রেও দীক্ষা দিলেন। আর কানে কানে বললেন বাঙালী মেয়ের অবলার অপবাদ তোমাদের দূর করতে হবে—শক্তি প্রতিমূর্তি তোমরা, শক্তির আরাধনা করে সবলা হতে হবে।

তাই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরিষা আশ্রমে আরম্ভ হল শরীর চর্চার পাঠ—খেলাধুলোর অঢেল আয়োজন। হিরণ্ময়ী বসু দৌড়ে, প্রমীলা বসু লোহার বল, ক্রিকেট বল ও বর্শা ছোঁড়ায় নানা স্পোর্টস থেকে প্রাইজ এনে আশ্রম ভর্তি করতে আরম্ভ করলেন। ফিল্ড ইভেন্টে বিভিন্ন স্পোর্টসে প্রমীলা বসু কখনো ফার্স্ট, কখনো সেকেণ্ড, রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে অনেকবারের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রমীলা ও হিরণ্ময়ী বসুর কৃতিত্বে সরিষা রামকৃষ্ণ স্কুলের বহুবার চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রমীলা বসুর স্পোর্টসের রেকর্ডের কথা আজ আর লিখে লাভ নেই। তেইশ চব্বিশ বছর আগের

প্রমীলা বসু

রেকর্ড আজ নবাগতাদের নতুন কৃতিত্বে ম্লান হয়ে গেছে। তবু একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

১৯৫৫ সালে দেখি প্রমীলা বসু হাতে বর্শা নিয়ে প্র্যাক্টিস করছেন। বললাম—'বর্শা ছোঁড়ার বয়স কি আর আছে?' উত্তরে বললেন—'নেই সত্যি, তবে আজ যা স্ট্যাণ্ডার্ড দেখছি, তাতে একটু চেষ্টা করলে এখনো হয়তো কিছু করতে পারি।' সত্যি করলেনও। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে সেবার বর্শা ছোঁড়ায় অধিকার করলেন দ্বিতীয় স্থান।

লক্ষ্মীকান্তপুরের কাছাকাছি চাঁদপুর ঘাটেশ্বরের ৺বসন্তকুমার বসুর মেয়ে। অমিয় মহারাজের কাছে সেবামন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর সেবা ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে ছাত্রীজীবন কাটিয়ে এসেছেন। নিজে ঘর বাঁধেননি। বাঁধবার বাসনাও নেই।

বাবা চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। প্রমীলা বসু যখন সরিষা রামকৃষ্ণ স্কুলের ক্লাস ফোর-এর ছাত্রী, তখন একদিন স্কুলে খবর এল বাড়িতে বাবা ভীষণ অসুস্থ। এখনই প্রমীলাকে বাড়ি যেতে হবে। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখেন ধোপদুরস্ত পোশাকপরা দু তিনজন নতুন অতিথি বাড়িতে এসে গ্যাট হয়ে বসে আছে প্রমীলাকে দেখবে বলে। উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রমীলা বাড়ি ছেড়ে স্কুলে চলে এলেন। বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। মেয়ের বেয়াদপি তিনি সহ্য করবেন না। বহুদিন বাপ-মেয়ের দেখা নেই। প্রমীলা আশ্রমবাসিনী।

একদিন চ্যাটার্জিপাড়ার এক কৈবর্ত বাড়িতে রাত্রে আগুন লাগতে প্রমীলারা দল বেঁধে স্কুল থেকে গেলেন আগুন নেবাতে। প্রমীলার বাবাও এলেন অন্য পাড়া থেকে। আগুন নিবল। সেই সঙ্গে প্রমীলাকে দেখে বাবারও রাগ পড়ল।

তার একবার প্রমীলার বড়বোন মারা যেতে ভগিনীপতির সঙ্গে প্রমীলার বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেবাব্রতী প্রমীলা সে পথে পা বাড়াননি। ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর অমিয় মহারাজের আদেশে ঐ স্কুলেই নিয়েছিলেন শিক্ষার ভার। খেলাধুলো পরিচালনার সমস্ত ভারই মহারাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রমীলার উপর।

মহারাজ মর্তজগৎ থেকে সরে যাবার পর প্রমীলাও স্কুল থেকে সরে যান। কিছুদিন হাওড়ার একটি স্কুলে কাজ করবার পর এখন এসেছেন কলকাতায়।

নানা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গ শরীর শিক্ষক সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারী। বাৎসরিক শিক্ষার্থিনীদের [illegible] শিবিরাধ্যক্ষা, এন সি সি'র লেডি অফিসার, স্কুলস গেমে বাঙলা স্কুল টীমের পরিচালিকা।

মা ও বড়বোনের দুই ছেলেকে নিয়ে ছোট্ট সংসার প্রমীলা বসুর। অদৃষ্টের পরিহাস বলতে হবে। সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হবার ভয়ে যে ভগিনীপতিকে বিমুখ করেছিলেন, তাঁর দুই ছেলেকে নিয়েই আজ প্রমীলার সংসার। তবে খেলার ডাকে সব সময়ই প্রমীলার সাড়া মেলে। সেবার দীক্ষাও জীবনের মূল মন্ত্র।

মনোজ বসুর অসামান্য উপন্যাস

বন কেটে বসত ৯৲

"প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি শব্দে দক্ষিণ [illegible] দিকে বনবাদাড় ও জলমাটির গন্ধ আর তাঁর [illegible] বিচিত্র রূপ। ব্যঞ্জনায়, প্রকাশভঙ্গীতে, শব্দযোজনায়, [illegible] আচরণে কিম্বা সামাজিক প্রথায়, বারব্রতে, কুসংস্কারে বিশ্বাসে অথবা জীবন ধারণের আদিম তাড়না এবং [illegible] আত্মরক্ষার অনিবার্য দ্বন্দ্বে মনোজ বসু এই উপন্যাসকে দক্ষিণ বাংলার বাস্তবধর্মী রোমান্টিক কাহিনীতে পরিণত করেছেন।"
—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (যুগান্তর)

শঙ্কু মহারাজের আশ্চর্য ভ্রমণকাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ) ৬৲

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-গোমুখীর রোমাঞ্চকর ভ্রমণ বিবরণ
অসংখ্য ফোটোচিত্র মানচিত্র ও পথপঞ্জীতে সমৃদ্ধ

অবধূতের নূতন ভ্রমণকাহিনী

দুর্গম পন্থা ৪৲

পিয়ারী ৪৲ মায়ামাধুরী ৫৷৷৹

প্রবোধকুমার সান্যালের নবতম উপন্যাস

বিবাগী ভ্রমর ৭৲

মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲ বেলোয়ারী ৭৲

প্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ ১ম ৫৲ ২য় ৫৲

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৫৲

সুমথনাথ ঘোষের নবতম উপন্যাস

নীলাঞ্জনা ৭৲

জায়া ও জননী ৫৲
সর্বংসহা ৫৲
অহল্যার স্বর্গ ৩৲ সুদূরের পিয়াসী ৩৷৷৹

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিযান ৫৷৷ উত্তরায়ণ ৫৷৷

কালিন্দী (নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ) ৭৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

আদর্শ হিন্দু হোটেল উপন্যাস ৫৲ নাটক ২৲

আরণ্যক ৫৲ দেবযান ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস

বহ্নিবন্যা ২য় সংস্করণ ৮৷৷

অ্যাকাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত 'কলকাতার কাছেই'-এর পরবর্তী খণ্ড

উপকণ্ঠে ২য় সংস্করণ ৯৲

গল্প-পঞ্চাশৎ ৯৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲ দুটি ২৷৹

আশাপূর্ণা দেবীর

সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫৲

ছাড়পত্র ৫৷৷ গল্পপঞ্চাশৎ ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নবতম গ্রন্থ

রাত্রির ডাক ৪৲

সমুদ্র সফেন ৪৷৷৹ নবনায়িকা ৩৷৷৹
অলকাতিলকা ৪৷৷৹ সাত পাকে বাঁধা ৪৷৷৹

প্রশান্ত চৌধুরীর চলচ্চিত্রে রূপায়িত
ডাকো নতুন নামে ৪৲
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর দীর্ঘ উপন্যাস
নিশ্চিন্তপুরের মানুষ ৫৷৷৹
মানবেন্দ্র পালের মনোজ্ঞ উপন্যাস
দূর থেকে কাছে ৫৷৷৹
শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এই তীর্থ ৩৷৷৹
প্রভাত দেব সরকারের
এই দিন এই রাত ৩৷৷৹

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যসাহিত্যের ধারা ৪৲
কালিদাস রায়ের
সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫৲
শ্রীকুমার বন্দ্যোঃ : মোহিতলাল মজুমদার : কালিদাস রায়
কুমুদ কাব্য পরিচিতি ৩৲
প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ১২৷৷

৮১জন লেখকের ২০২টি গদ্যরচনার সুবৃহৎ সংকলন।
প্রমথ বিশীর ২২০ পৃষ্ঠার ভূমিকা সম্বলিত

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আপনি
কি
চান
না

সূচীপত্র

গান্ধী স্মারক নিধির বই

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

পল্লী-পুনর্গঠন

বিবেকানন্দ [illegible] গান্ধীজীর চোখে গ্রাম-ভারতই প্রকৃত ভারত। পল্লীর কল্যাণেই বৃহত্তর ভারতের কল্যাণ। গ্রাম-ভারতের জন্যে গান্ধীজীর মর্মস্পর্শী কল্যাণচিন্তার আকর এই গ্রন্থ গ্রামকর্মীমাত্রেরই পক্ষে দিগ্‌দর্শনস্বরূপ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় কার্যরত সরকারী গ্রামকর্মীর কাছেও এ বই অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

সর্বোদয় আন্দোলনের অন্যতম নিশিষ্ট কর্মী **শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** অনূদিত

মূল্য ৩.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি—১২

প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও প্রকাশনা বিভাগ ঃ

গান্ধী স্মারক নিধি

বাংলা শাখা

১১২/৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৬

জাগর দীপ! জাগর দীপ!!

দীপশিখার মত অনির্বাণ, প্রেমের, কুটিলতা কুশ্রীতা ও আবিলতার ঊর্ধ্বে ভাস্বর প্রেমের শাশ্বত কাহিনী!....দেহাতীত প্রেমের এই কাহিনী লইয়াই সুখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক অঞ্জলী বসুর নবতম উপন্যাস। তিন টাকা।

গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত এই গ্রন্থে আছে দৈনন্দিন সমস্যা-সমাধানে, নাগরিক সংগঠনে ও জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা রূপায়ণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে যথাযথ ও মনোজ্ঞ আলোচনা। দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

নবজীবন! নবজীবন!!

গল্প, প্রবন্ধ ও হুগলী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অজস্র তথ্যে সমৃদ্ধ এই বার্ষিকীখানিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা পড়ুন। দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

MY DAYS WITH GANDHI

Nirmal Kumar Bose, F.N.I.

গান্ধিজীর সম্বন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত মতামত এবং দেশ বিভাগের সময় গান্ধিজীর মানসিক দ্বন্দ্বের অপূর্ব বিশ্লেষণ বইখানিকে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে। সাত টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

মেরিট পাবলিশার্স

৫১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

বিদুষী লেখিকা **মায়া দাস** রচিত ভ্রমণকাহিনী

কী হেরিলাম নয়ন মেলে

কাশ্মীর দক্ষিণ ভারত, সিংহল, উড়িষ্যা ও বাংলা দেশের নানা স্থানের ও নানা তীর্থের কাহিনী। চিত্রশোভিত ও সুচারু প্রচ্ছদ মণ্ডিত। ২.৫০

গ্রন্থপীঠ ॥ ২০৯, কর্নোয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ॥

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত উক্ত বিষয়ের গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা ও শক্তি-সাধনার আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫,]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দুই শতাধিক পদকর্তা হইতে প্রায় চার হাজার পদের টীকা, ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। একটি গ্রন্থে পদাবলী সাহিত্যের সার সংরক্ষিত। [২৫,]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত বহু সুন্দর চিত্রাবলী সহ অনিন্দ্য প্রকাশন। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯,]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস মোট ছয়খানি একত্রে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯,]

সা হি ত্য স ং স দ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ কলিকাতা—৯

আমাদের বই সর্বত্র পাইবেন। পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক — নানা প্রশ্ন এসে আপনার মনে ভিড় জমিয়েছে। কিন্তু আপনি নিজেই এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন। পড়ুনঃ—

হিউ সেটন ওয়াটসনের
আধুনিক কালের বিপ্লব ·২৫

লিওনার্ড সেপিরোর
রাশিয়ার ভবিষ্যৎ ·২৫

আলফ্রেড জুবারম্যানের
আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ ·২৫

বি. জে. পি. উড্সের
অর্থনৈতিক সহযোগিতা ·২৫

জুলে ম্যানকেনের
প্রতিরক্ষার অর্থনীতি ·২৫

রকফেলার রিপোর্ট
গণতান্ত্রিক আদর্শের শক্তি ·২৫

পিটার হালাজের
আন্তর্জাতিক যুব উৎসব ·৩৭

অমলেন্দু দাশগুপ্তের
দেশোন্নয়নে গণতন্ত্র ·৩৭

লেস্টার বি. পিয়ারসনের
বিশ্ব রাজনীতিতে গণতন্ত্র ·৫০

হাওয়ার্ড ফাস্টের
নগ্ন দেবতা ·৭৫

এন্ডার হেলারের
আর কমরেড নই ১·০০

অশোক মেহতার
পরিকল্পিত অর্থনীতির রাজনীতি ১·১২

বার্ট্রাম ডি উলফের
সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা ১·৫০

ফাদার রিগনের
নয়াচীনের কারাগারে ১·৫০

ডেভিড কাশম্যান কয়েলের
যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতি ৩·০০

সর্বপ্রকার পুস্তক সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

পরিচয় পাবলিশার্স

২১নং হায়াৎ খাঁ লেন, কলি-৯

ফোন—৩৫-২৪১৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

ক্লান্তি
আর
মানসিক
অবসাদে...
ভাবনা চিন্তা আর অতিরিক্ত
পরিশ্রমে যখন দেহ ক্লান্তিতে
ভেঙ্গে পড়ে তখনই সে বিষয়ে
সুরবল্লী কষায়
KALPANA SK,2.B.

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

অমরেন্দ্র ঘোষ

মন দেয়া নেয়া

লেখকের সর্বশেষ উপন্যাস । ৩·০০

রূপমঞ্জরী । নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অগ্রণী কথাশিল্পীর বাস্তবধর্মী উপন্যাস । ২·৫০

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ।
পুলকেশ দে সরকার
রবীন্দ্র উপন্যাসের অন্তর্নিহিত চেতনার সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং সুগভীর বিশ্লেষণ । ৩·৫০

উর্বশী । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
লেখকের সার্থক গল্প সংকলন । ২·৫০

রাজযোটক । আশা দেবী
ঘরোয়া জীবনের অনুপম সরস কাহিনী । ২·০০

একটি সুরের কান্না । ভারতপত্রম্ ।
লেখকের সার্থক রসরচনা । ২·৫০

সাংনক । রমেশচন্দ্র সেন । ৩·৫০

পূর্বক্ষণ । নন্দী ভৌমিক । ২·০০

সাহিত্য । ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(সি ৩২৭১)

• • সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় শ্রেষ্ঠ

অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার
কবিতার কথা ... ৫·০০

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ
নাটকের কথা ... ৪·০০

ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য
সাহিত্যের কথা ... ৪·০০

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য
উপন্যাসের কথা ... ৬·০০

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সমালোচনার কথা ... ৫·৫০

ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য
শিল্পতত্ত্বের কথা ... ৬·০০

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়
ছোটগল্পের কথা ... ৫·০০

দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ
কবি ও নাট্যকার ১২·০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা—৬

(সি ৩২৯৪)

॥ আনন্দ - পাবলিশার্স - প্রকাশন ॥

উ প ন্যা স

প্রচ্ছদপট	৩·৫০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
যে যাই বলুক	৬·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রূপসী রাত্রি	৫·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
তিন দিন তিন রাত্রি	৫·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
পঞ্চশর	৩·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রতিধ্বনি ফেরে	৪·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপবতী	৩·০০	মনোজ বসু
মানুষ দেবতা হবে না	৩·০০	রবি গুহ মজুমদার
বহু যুগের ওপার হতে	২·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
মনের মানুষ	৩·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সারা রাত	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শর্তাকিয়া	৮·০০	সুবোধ ঘোষ

গ ল্প - সং গ্র হ

প্রেমের গল্প	৪·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
তিন শূন্য	৩·৫০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প	৪·০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ময়ূরী	৩·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
কহেন কবি কালিদাস	৩·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
গল্প-সংগ্রহ	৫·০০	সরলাবালা সরকার
ভারত প্রেমকথা	৬·০০	সুবোধ ঘোষ

অ ন্যা ন্য

চণক-সংহিতা	৩·৫০	কালিদাস রায়
চিন্ময় বঙ্গ	৪·০০	আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন
রহস্যময় রূপকুণ্ড	৩·৫০	বীরেন্দ্রনাথ সরকার
রবীন্দ্র মানসের উৎস-সন্ধানে	৩·৫০	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
বিবেকানন্দ চরিত	৫·০০	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

কি শো র - সা হি ত্য

ছেলেদের বিবেকানন্দ	১·২৫	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
পিন্‌কুর ডাইরি	২·০০	সরলাবালা সরকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 27th January, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ১৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৩ মাঘ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

প্রজাতন্ত্র

ভারতের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হল। ঘটনাটি একান্তভাবে আনুষ্ঠানিক নয়। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় পনের বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে; ১৯৫০-এ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর বারো বছর। এই পনের কী বারো বছরে অনেক কিছু ঘটেছে আমাদের দেশে এবং বিদেশে। কিন্তু আর যাই ঘটুক, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রসত্তা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। এমন নয় যে এই সময়ের মধ্যে বাইরে থেকে আমাদের উপর আঘাত আসে নি, ভিতরে বিরোধের উত্তাপ কখনও কখনও অসহনীয় হয় নি। তবু মোটের পর আমরা স্বাধীন ভারতের, আমাদের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আত্ম-বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি।

কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে টিঁকে থাকতে পারাই অবশ্য সব চেয়ে বড় কথা নয়; ইতিহাসের প্রগতির সূত্র হল ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গে যুগোপযোগী পরিবর্তন ক্ষমতা। একাধারে স্থায়িত্ব এবং অগ্রাভিমুখীনতা দুই-ই প্রয়োজন। প্রজাতন্ত্রী ভারত কি ঐতিহাসিক প্রগতি-সূত্রের এই দাবি পূরণে উদ্যোগী হতে পেরেছে? এ-বিষয়ে আমাদের মন থেকে অতিরিক্ত সন্দেহ এবং অসন্তোষ দূর হওয়াই মঙ্গল। স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার সদর্থক রূপ সৃষ্টির কাজে ভারতবর্ষ যে এগিয়ে চলেছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রথমে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রসত্তার মূল্য নিরূপণ। ব্রিটিশরাজ যখন এ দেশ ছেড়ে যায় সে-সময় অনেকের মনে ভাবনা ছিল, অনিশ্চিত আশংকা ছিল যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ঐক্য এবং স্থায়িত্ব বজায় রাখা হয়ত সম্ভব হবে না, অন্তত খুবই কঠিন হবে। ব্রিটিশ শাসকেরাই বহুকাল ধরে আমাদের মনে অল্পাধিক্তর এই ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, একতা বস্তুটা কোনদিনই ভারতবর্ষের ধাতস্থ নয়, স্বদেশের নিরাপত্তা ও সংহতিরক্ষা ভারতবাসীদের সাধ্যাতীত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের এই বিধান শিরোধার্য করে আমাদের দেশী বুদ্ধি-মন্তরাও কেউ কেউ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বলেছেন বিদেশী অভিভাবকত্ব বা আধিপত্য ছাড়া ভারতবর্ষের গতি নেই; তাঁদের মতে ভারতেতিহাসের নিয়তিই নাকি পরবশতার কল্যাণে (!) ঐহিক পারত্রিক মুক্তিলাভ! কথাটা যে কতখানি মিথ্যা তার প্রমাণ এশিয়ায় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয়; প্রমাণ স্বাধীন ভারতে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং ধারাবাহিক অগ্রগতি।

রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অর্থাৎ শুধু টিঁকে থাকাটা সবচেয়ে কৃতিত্বসূচক নয় মানি; কিন্তু তাহলেও আমাদের কালে, এই পারমাণবিক যুগে, মতসংঘাতবিক্ষুব্ধ অনিশ্চিত অস্থির পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্রী ভারত যে সুস্থ আত্মস্থভাবে গণতান্ত্রিক জীবনধারা রচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পেরেছে তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র কথাটা নিতান্ত পোশাকী বর্ণনা নয়। বিদেশী শাসনের অবসানে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এশিয়ার আরও অনেক দেশে। লাটিন আমেরিকার দেশগুলিও বহুকাল ধরে স্বাধীন; স্বাধীন কিন্তু নামেমাত্র প্রজাতন্ত্রী। ভারতবর্ষই সম্ভবত একমাত্র নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র যেখানে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র-বিধানে গণশক্তির সার্বভৌম অধিকার কার্যত এবং পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সমন্বয় ও পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান এ-পর্যন্ত খুব কম রাষ্ট্রে ঘটেছে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদিও নাগরিকদের সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃত, কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে নিগ্রোরা এবং এমন কী দরিদ্র শ্বেতাঙ্গরাও অবাধ ভোটাধিকারে বঞ্চিত। ব্রিটেনের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের চূড়ামণি হল রাজবংশ এবং তাছাড়া অভিজাত বংশীয়রাও উত্তরাধিকারবলে রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধা-ভোগী। আমাদের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বৈষয়িক এবং সামাজিক নানা বিষয়ে অনুন্নত, দুর্গত বা অভাব-পীড়িত হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধান রচনায় ও রূপায়ণে প্রজাতন্ত্রী ভারত ফরাসী ও মার্কিন গণতন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশী সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রশাসনের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা আর জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা, এই দুটি স্তম্ভের উপর ভারতের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। দুটি সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেছে ভারতের জনসাধারণ রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা ব্যাপারে উদাসীন নয়। অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও সংস্কারের জড়তা কাটিয়ে ওঠা অবশ্য দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। তবে জনসাধারণ যে তাদের ভালোমন্দ সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হচ্ছে তার লক্ষণ বর্তমানে সুস্পষ্ট। সে দিক দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাই জনশিক্ষা বিস্তারের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি। ব্রিটেনে এক সময়ে জনসাধারণ যখন তাদের রাষ্ট্রিক অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হতে শুরু করে তখন কোন কোন দূরদর্শী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রনেতা ঘোষণা করেন, "জনতামহারাজকে সুশিক্ষিত করা জরুরী প্রয়োজন।" ভারতবর্ষেও এই প্রয়োজনটা জরুরী, কারণ ভারতবর্ষের মত বহুভাষী, আঞ্চলিকগোষ্ঠীবিভক্ত দেশে "জনতামহারাজ"কে গণতান্ত্রিক পরস্পরসহিষ্ণু মনোভাব অনুশীলনে অভ্যস্ত না করতে পারলে রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থায় সংকট এবং গুরুতর বিপর্যয় পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রবিধানের গণতান্ত্রিক ঐক্যটা শুধু বয়ান কিম্বা ঠাট নয়। সচেতন জনশক্তি এই ঐক্যের আধার; নির্বাচিত নেতারা হবেন এই ঐক্যবোধের উদ্বোধক এবং সুসংহত রাষ্ট্রশক্তির পরিচালক। আশা করি এই আদর্শ সামনে রেখে প্রজাতন্ত্রী ভারত-বর্ষের ত্রয়োদশ বর্ষে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনা দেশের রাষ্ট্রিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের পথ প্রশস্ততম করতে সক্ষম হবে।

বিনা সংঘর্ষে পশ্চিম ইরিয়ান ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব থেকে ইন্দোনেশিয়ানদের কর্তৃত্বাধীন হবে বলে যে-আশা হয়েছিল, সে-আশা সফল নাও হতে পারে। ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার নৌ-বহরের একখানা মোটর টরপেডো বোট ওলন্দাজদের গোলায় বিনষ্ট হয়েছে। এই ঘটনার তাৎপর্য কী, এটা কী অবস্থায় ঘটল, ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। এই ঘটনাকে দু পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে কিনা, তাও বুঝা যাচ্ছে না। ইন্দোনেশিয়ান সরকার অবশ্য এই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন এবং পশ্চিম ইরিয়ান দখল করার জন্য সমরায়োজনও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে বলে সংবাদ আসছে।

আপোস মীমাংসার কথা সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ান সরকারের ভাব হচ্ছে এই যে, পশ্চিম ইরিয়ানের উপর সার্বভৌমত্বের অধিকার কার সেটা কোনো আলোচ্য প্রশ্নই নয়। সে-অধিকার যে ইন্দোনেশিয়ার তা ধরে নিয়ে অন্য কথা, অর্থাৎ ওলন্দাজরা কীভাবে ইন্দোনেশিয়ান সরকারের হাতে কর্তৃত্ব সমর্পণ করবে, সেই সম্পর্কিত প্র্যাকটিক্যাল সমস্যাগুলিই একমাত্র আলোচনার বিষয় হতে পারে। যেমন করে হোক পশ্চিম ইরিয়ানকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করা বা সেজন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে হল্যাণ্ডের জনমতের কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ আছে, এরূপ মনে হয় না। তবে পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব করার ইন্দোনেশিয়ানদের কোনো অধিকার নেই। যদি ছাড়তে হয়, তবে পশ্চিম ইরিয়ানকে ইউনাইটেড নেশনস-এর হাতে দেওয়া যেতে পারে, এই দিক দিয়ে চেষ্টা করার পক্ষে একটা মত আছে। পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীদের আত্মকর্তৃত্বের অধিকারের—সেলফ ডিটারমিনেশনের কথা একসময় ডাচেরা তুলেছিল, কিন্তু তার উপর আর বিশেষ জোর দিচ্ছে না, কারণ ডাচ শাসনের অধীনে পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীদের যেরকম "উন্নতি" হয়েছে, তাতে তাদের সেলফ ডিটারমিনেশনের কথা ডাচদের মুখে হাস্যকর শোনাবে। সুতরাং ইউনাইটেড নেশন্স-এর অভিভাবকত্বের কথা তোলা হয়েছে যদি তাতে কিছু সুবিধা হয়। কারণ যদি পশ্চিম ইরিয়ানের উপর ইউনাইটেড নেশন্স-এর অভিভাবকত্ব স্থাপন করার একটা ব্যবস্থা হয়, তবে তার মধ্যে কার্যত ডাচদের একটা বড়ো অংশ থাকার সম্ভাবনা আছে এবং তার ভিতর দিয়ে আরো কিছুকাল ডাচেরা কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে। ইউনাইটেড নেশন্সে প্রশ্নটা উঠলে অভিভাবকত্বের প্রস্তাব কিছুটা সমর্থন পাবে। ডাচদের সুবিধা হবে এবং ডাচ সরকারের মুখরক্ষা হবে, সেজন্য—

হল্যাণ্ডের মিত্ররা, পশ্চিমা গোষ্ঠীর অনেকের এই প্রস্তাব সমর্থন করার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া পক্ষ-বিপক্ষের কথা বাদ দিয়েও সকলের নিকট এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হবে না যে, পশ্চিম ইরিয়ান ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই সেটা ইন্দোনেশিয়ার অধিকারভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ ইন্দোনেশিয়া এবং পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে জাতি ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং ইউনাইটেড নেশন্স-এর মারফৎ মীমাংসার চেষ্টা হলে এই নিয়ে নানা বাকবিতণ্ডা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তবে ইউনাইটেড নেশন্স-এর কোনো সিদ্ধান্তই কেবল বা প্রধানত নৈতিক যুক্তির জোরে হয় না। ডাচ বা ইন্দোনেশিয়ানদের পক্ষে যারা যাবে, তারাও নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চিন্তার দ্বারাই পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে যদি কোনো আপোস মীমাংসা হয়, তবে সেটা ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যেই হবে, সাধারণত এটাই লোকে ধরে নিচ্ছে। ইউনাইটেড নেশন্স-এর অভিভাবকত্বের প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি কিছু থাক বা না থাক, সেটা একটা "কথার কথা" মাত্র, সেটাকে "প্র্যাকটিক্যাল" প্রস্তাব বলে কেউ ভাবছে কিনা সন্দেহ, যদিও ইউনাইটেড নেশন্সএ ব্যাপারটা উঠলে এই প্রস্তাবও হবে এবং তার আলোচনায় অনেক বাক্য ব্যয়ও হবে। পশ্চিম ইরিয়ানে ডাচ কর্তৃত্বের অবসান অবশ্যম্ভাবী এবং ডাচ কর্তৃত্ব গেলে তার জায়গায় ইন্দোনেশিয়ান কর্তৃত্ব আসবে। সেটা ঠেকানোর চেষ্টা করে একটা বড়ো গোছের আন্তর্জাতিক হাঙ্গামা বাধাবার ঝুঁকি কোনো বৃহৎ শক্তি নেবে বলে মনে হয় না।

ডাচ এবং ইন্দোনেশিয়ার নৌবহরের মধ্যে ১৫ই জানুয়ারি তারিখে যে-সংঘর্ষ হয়েছে, সে সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ান সরকার ইউনাইটেড নেশন্স-এর নিকট নালিশ করতে পারেন, এরকম উক্তি একজন ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তি করেছিলেন। কিন্তু ইউনোতে নালিশ করলে তর্কের জালে জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ান সরকার ১৫ তারিখের ঘটনার জন্য ইউনোতে নালিশ করবেন বলে মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয় যে, আরো ঘটনা কিছু ঘটলে ডাচ সরকারই বল প্রয়োগ থেকে ইন্দোনেশিয়ানকে নিরস্ত করার জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিলে আবেদন জানাবেন। তবে ইতিমধ্যে আপোস মীমাংসা করার জন্য ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ান সরকার উভয়ের উপরই এদিক ওদিক থেকে কূটনৈতিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। ডাচদের মিত্রদের মুশকিল হচ্ছে এই যে, তাঁরা জানেন যে, ডাচদের পশ্চিম ইরিয়ান ছেড়ে দিতে হবেই, তা আটকাতে গেলে বড়ো রকমের এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী সংঘর্ষের দায়িত্ব নিতে হবে। তার জন্য কেউ প্রস্তুত নন। ডাচেরা নিজেরাও নয়। অথচ ডাচদের হয়ে দুকথা বলা কারো কারো পক্ষে দরকার, কিন্তু এমন করে বলতে হবে যেন তা ডাচদের সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের সমর্থনের মতো না শুনায়। ফলে তারা যা করছে, তা হল ইন্দোনেশিয়ান সরকারের নিন্দা। ইন্দোনেশিয়ানদের পশ্চিম ইরিয়ানের কর্তৃত্ব পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। ইন্দোনেশিয়ানদের কর্তৃত্ব আর একরকমের সাম্রাজ্যবাদী শাসন হবে ইত্যাদি। এসব কথার দ্বারা ইন্দোনেশিয়ানদের ঠেকানো যাবে না, এগুলো বলে শুধু ইন্দোনেশিয়ান সরকারকে চটানো যায়। যাঁরা ডাচদের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নন, পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে যুদ্ধ বাধাতেও চান না, তাঁরা ইন্দোনেশিয়ান সরকারের কার্যনীতির সমালোচনা করে ইন্দোনেশিয়ানদের বিরাগ ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু লাভ করছেন না।

• • •

পাকিস্তান সরকার কাশ্মীর নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলে আবার খানিকটা হট্টগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। ভারত সরকারের মতলব ভালো নয়। কাশ্মীর সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার ইচ্ছা ভারত সরকারের নেই, ভারত সরকার কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করার উদ্যোগ করছেন। পাটনায় কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতা থেকে সেই আভাস পাওয়া যায়। শান্তি বিপন্ন ইত্যাদি কারণে অবিলম্বে কাশ্মীর সমস্যা বিবেচনা করার জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা হোক, এই বলে পাকিস্তান সরকার আবেদন জানিয়েছেন।

উত্তরে ভারত সরকার বলেছেন, পাকিস্তান যেসব যুক্তি দিয়েছে, সেগুলি সব ভিত্তিহীন, ভারতে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বক্ষণে যখন ভারতীয় নেতারা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময়ে কাশ্মীর সম্পর্কে সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকাবার এই পাকিস্তানী চেষ্টার উদ্দেশ্য হুল্লোড় এবং প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী ঝা সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের নিকট যে-চিঠি দিয়েছিল, তাতে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী সরকার কংগ্রেস সভাপতির

বক্তৃতা থেকে খাপছাড়াভাবে উদ্ধৃতি দিয়ে ভারত সরকারের নীতির কুব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। শ্রীঝার পত্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর গত ২৮শে ডিসেম্বরের একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে যে, কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করতে ভারত সরকার সর্বদাই প্রস্তুত আছেন, তবে কাশ্মীরে বর্তমান যে অবস্থা আছে, তার ভিত্তিতেই আলোচনা করা যেতে পারে, সব-কিছু উল্টিয়ে দেবার কোনো কথা ভারত শুনতে রাজি নয়, যে অবস্থা আছে তাই মেনে নিয়ে এদিক ওদিক অল্প-স্বল্প গোছ-গাছ — "অ্যাডজাস্টমেন্ট" করার কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

এইটাই যে ভারত সরকারের নীতি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতির পাটনাই বক্তৃতার যে-মিল নেই, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কাশ্মীরের যে-অংশ পাকিস্তানী দখলে আছে, সে অংশ পাকিস্তান ভালোয়-ভালোয় ছেড়ে না দিলে সেটা আমরা বল-পূর্বক দখল করে নেব যেমন গোয়া নেওয়া হয়েছে, এই ছিল শ্রীরেড্ডির কথার তাৎপর্য। শ্রীমেনন তো যখন তখন কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানী জবরদখলের উচ্ছেদের কথা বলে যাচ্ছেন। তবে শ্রীমেননের কথাগুলো আরো মজার। তিনি চীনাদের কথা উল্লেখ করতে হলেই তার সঙ্গে পাকিস্তানের কথাটা জুড়ে দেন চীনাদের যেমন হটাতে হবে, তেমনি পাকিস্তানী কবল থেকে কাশ্মীরকেও মুক্ত করতে হবে। একথায় আর কিছু না হোক চীনারা খুব আশ্বস্ত হয়। কারণ চীনারা জানে যে, কাশ্মীরের বর্তমান বিভাগ ভারত সরকার মেনে নিয়েছেন, বর্তমান অবস্থার ওলট-পালট ভারত সরকার চান না, একটু আধটু "অ্যাডজাস্টমেন্ট" চাইতে পারেন। কাশ্মীরের যে-অংশ পাকিস্তানী দখলে আছে, সে-অংশ বল-পূর্বক স্ব দখলে আনার কোনো অভিপ্রায় বা চেষ্টা ভারত সরকারের নেই। সুতরাং ভারতের আরক্ষা মন্ত্রী যখন চীনা এবং পাকিস্তানী আগ্রেসনকে এক পর্যায়ে ফেলে উভয়ের অবসান ঘটাবার সংকল্প ঘোষণা করেন, তখন চীনারা নিশ্চয়ই আশ্বস্ত বোধ করে, তারা নিশ্চিন্তে ধরে নিতে পারে যে, তাদের হটাবার মতলব ভারত সরকারের নেই, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে যেরূপ, ভারত-চীন সীমান্তেও সেরূপ একটু-আধটু "অ্যাড-জাস্টমেন্টের" বেশি ভারত সরকারের লক্ষ্য নয়।

পলিটিসিয়ানদের মধ্যে একটা আন্ত-র্জাতিক চুক্তি হওয়া উচিত যে, ইলেকশনের সময়ের কারো বক্তৃতা কোনো আন্তর্জাতিক মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করা যাবে না। ১৮।১।৬২

কংগো ও ভারতীয় সৈন্য

'দেশ' সম্পাদক সমীপেষু

গত ৯ই অগ্রহায়ণের 'দেশ'এ বৈদেশিকী পড়ে বিস্মিত হলাম। লেখকের মতে, "কংগো থেকে ভারতীয় সৈন্যদের অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা উচিত।"

ভারত সরকার ইউ এন এ'তে প্রস্তাব আনলে এবং সে প্রস্তাব পাশ হলেই আশা করা যায় না যে, কংগো থেকে ভাড়া করা সৈনারা চলে যাবে এবং কংগো বিদেশী প্রভাব হতে মুক্ত হবে।

প্রথমে বৃটেনের স্বার্থ ধরা যাক। কারণ বর্তমানে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শোম্বের পক্ষে ইউ এন এ'তে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে লড়াই করছে, বৃটেন তাদের পুরোগামী।

কংগোর মধ্যে কাটাংগা খনিজ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। ইউনিয়ন মিনিএয়র কোম্পানী খনিগুলির মালিক। Reynolds News এই কোম্পানী সম্বন্ধে লিখেছেন,

"They produce copper, cobalt, Tin, zinc, coal, radium, germanium (much in demand in Japan for transistors), and uranium. Until recently it also issued currency."

ছ'বছর পূর্বে এই কোম্পানীর শেয়ারের বাজার দর ছিল সাত শো মিলিয়ন পাউণ্ড। বর্তমানে প্রায় দু'শো মিলিয়ন পাউণ্ড। শোম্বের আয়ের শতকরা আশি ভাগ এই কোম্পানী জোগায় (যদিও 'শোম্বে সরকারের' কোন বাজেট কখনও প্রকাশ হয়নি)। আর একটি কাজের জন্য কোম্পানীটি 'বিখ্যাত'। প্রথম অ্যাটম বোমার জন্য ইউরেনিয়াম এরাই সরবরাহ করে।

Union Miniere du Haut Katangaর শতকরা উনচল্লিশটি শেয়ারের মালিক বেলজিয়ামের Societe Generale de Belgique। এই কোম্পানীর কেন্দ্রস্থল হল ব্রাসেলস। বেলজিয়ামের এক প্রাক্তন রাজা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান রাজা বদুয়ার পিতা লিওপোল্ড সম্ভবত অধিকাংশ শেয়ারের মালিক। বেলজিয়ামে ব্যাংক এবং জীবনবীমা কোম্পানী ছাড়া কয়লা, লোহা ইত্যাদির খনিগুলি এই কোম্পানীর কুক্ষিগত। কানাডাতেও এই Societeর ইউরেনিয়াম, কেমিকালস, যানবাহন এবং খনিজ দ্রব্য সংক্রান্ত ব্যবসার অংশ আছে। Rio Tinto (বৃটিশ) কোম্পানীতেও এর স্বার্থ আছে। 'Rio'র ডিরেক্টরদের মধ্যে Baron Rothschild, V. Cavendish-Bentik, এবং বৃটিশ লিবারেল পার্টির নেতা Frank Byens-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

কংগোর স্বাধীনতার পূর্বে বেলজিয়াম সরকারের মত ছিল যে কংগো সরকারকে শতকরা উনচল্লিশটি শেয়ারের মধ্যে চৌত্রিশটির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হবে। বর্তমান মতে মাত্র কুড়িটি শেয়ার কংগোর প্রাপ্য। কিন্তু কোন সরকার লিওপোল্ডভিলের আদুলা সরকার, না এলিজাবেথভিলের শোম্বে সরকার? বেলজিয়াম তাই ব্রাসেলসে সব শেয়ার রেখেছে এবং শোম্বেকে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড 'ডিভিডেণ্ড' দিয়েছে। আদুলা সরকার কিছুই পায়নি।

বৃটেনের 'Tanks' অর্থাৎ Tanganyika Concessions শতকরা পঁয়তাল্লিশটি শেয়ারের মালিক ছিল। বর্তমানে এই কোম্পানী মিনিএয়রের শতকরা প্রায় কুড়িটি শেয়ারের মালিক। কোম্পানীর কেন্দ্রস্থল সল্সবারী (রোডেশিয়া) এবং চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন চার্লস ওয়াটার হাউস। ১৯৫৪ সালে মিশর থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের প্রতিবাদে পদত্যাগ করে এদেশে টোরীমহলে 'শহীদ' হন। তাঁর মত,

"I suggest that the time has come when we have to say that what we have we hold, and that where we are we stay."

ক্যাপ্টেন ওয়াটার হাউস ইউনিয়ন মিনিএয়র এবং বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর ডিরেক্টর। এবং বারটি কোম্পানীর চেয়ারম্যান।

Tanks-এর তিনজন ডিরেক্টর মিনিএয়রের ডিরেক্টর বোর্ডেরও সদস্য। মিনিএয়রের অপর ডিরেক্টরদের মধ্যে তিনজন হলেন বেলজিয়াম কাউণ্ট, একজন ব্যারন, একজন মার্কুইজ এবং একজন প্রিন্স।

বৃটিশ লেবার পার্টির শ্রীফেনার ব্রকওয়ে যে তালিকা প্রকাশ করেছেন তা থেকে দেখা যায়—

আর্ল অব মেলবোর্ন—টোরী 'peer'। Tanks এবং মিনিএয়রের ডিরেক্টর। স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময় যে Committee of the United Christian Front জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করেছিল তিনি তার সভ্য ছিলেন।

লর্ড রোবিনস্—টোরী। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট এবং মিনি-এয়র, আফ্রিকান এক্সপ্লোসিভস, ইত্যাদি কোম্পানীগুলির ডিরেক্টর।

স্যার আলেকজান্ডার—'Keeper of the Privy Purse'। মিনিএয়র, বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানী 'Tanks, এবং 'Banque Belge'র ডিরেক্টর।

মার্কিজ অব সলসবারী—টোরী। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর ডিরেক্টর। সাতান্ন সালে আর্চ বিশপ মাকারিয়সের মুক্তির প্রতিবাদে বৃটিশ 'ক্যাবিনেট' হতে পদত্যাগ করেন।

জুলিয়ান অ্যামেরি—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলনের আত্মীয় এবং 'সেক্রেটারী অব স্টেট ফর এয়ার'। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর প্রাক্তন ডিরেক্টর।

পি এমরী-ইভানস। একত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত টোরী পার্লামেন্ট-সদস্য। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা এবং এ্যাংলো আমেরিকান কর্পোরেশন অব সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর ডিরেক্টর।

স্যার হার্ভি-ওয়াট—টোরী বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর ডিরেক্টর। লন্ডন এবং রোডেশিয়ান মাইনিং কোম্পানীর প্রাক্তন ডিরেক্টর।

স্যার হার্ভি-ওয়াট—টোরী। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা এবং ফেনিক্স গোল্ড মাইনিং কোংর ডিরেক্টর।

স্যার রোনাল্ড রিড—'Gentleman-Usher to the Queen'। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোংর ডিরেক্টর।

লর্ড ওয়ালসিংহ্যাম—বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ান কর্পোরেশনের ডিরেক্টর।

লর্ড রাথকাভেন—টোরী। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোংর ডিরেক্টর।

হ্যারি জোল—অ্যাঙ্গোলার 'De Beers' এবং অ্যাঙ্গোলা ডায়মন্ড কোং ডিরেক্টর।

হ্যারি ওপেনহাইমার—সাউথ আফ্রিকান। 'Tanks', 'De Beers' ইত্যাদি কোংর ডিরেক্টর।

দুটি বৃটিশ কোম্পানী, Angolea Holdings এবং Hull, Blyth & Co, আঙ্গোলায় তৈল খনিগুলিতেও অর্থ নিয়োগ করেছে। আঙ্গোলার মধ্য দিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার বন্দর লোবিটো পর্যন্ত বিস্তৃত বেনগুয়েলা রেলপথেরও মালিক হল 'Tanks'। এই রেলপথে রোডেশিয়া এবং কাটাংগা থেকে খনিজদ্রব্য চালান দেওয় হয়। পর্তুগালের উদ্দেশ্য যে কোন রকমে এই রেলপথ চালু রাখা।

পঞ্চাশ সালে 'Tanks'এর কেন্দ্রস্থল লন্ডন হতে সলসবারীতে স্থানান্তরিত করার সময় বৃটিশ সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে দশ বছরের মধ্যে মিনিএয়র এবং বেনগুয়েলা রেলপথের কোন শেয়ার 'Tanks' বিক্রি করবে না। তারপর বিক্রির

প্রশ্ন উঠলে বৃটিশ সরকারকে শেয়ার কেনার প্রথম সুযোগ দেওয়া হবে। রয় ওয়েলেনস্কির স্বার্থ হল সেখানেই।

ইউনিয়ন মিনিএয়র-এর কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। শোনা যায়, নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী নেলসন রকফেলরও মিনিএয়রের শেয়ারের অধিকারী। (Reyholds News, Oct 21, 1961)

মিনিএয়রের চেয়ারম্যান বেলজিয়ান পল গিলেটের মতে কোম্পানীর প্রায় ষাট ভাগ আয় ট্যাক্স এবং Public expenditure-এ এ ব্যয় হয়। শেষোক্ত এই ব্যয় হল শোম্বে এবং বেলজিয়ান সরকারের আয়।

কংগোতে ইউ-এন-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে কার স্বার্থে আঘাত লাগবে তা উপরোক্ত তথ্য থেকে অনায়াসে জানা যায়। অবশ্য প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কংগো এবং কাটাংগাতে ইউ-এন-এর অসামরিক বিভাগ কংগোতে কর্মীরা যেভাবে নিগৃহীত হয়েছেন বা হচ্ছেন, যে অমানুষিক অবস্থায় ভারতীয় সৈন্য এবং অন্য দেশের কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে, তারপরও অংশগ্রহণকারী এইসব দেশ নীরব থাকতে পারেন কিনা।

তার উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যায়, ইউ-এন-এর অসামরিক বিভাগ কংগোতে চিকিৎসা এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য যা করেছে তা অতুলনীয়। এই কর্মীরা চলে গেলে কংগোতে কোন সরকার থাকবে না এবং কংগো বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। অন্তত এই কর্মীদের রক্ষার জন্যও ইউ-এন-এর সৈন্য প্রয়োজন। কারণ কংগোর সৈন্যদের বিশ্বাস করা চলে না, এবং শোম্বের সৈন্যরাও যতদিন সাউথ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, ফ্রান্সের Ultraদের দ্বারা পরিচালিত হবে ততদিন বিশ্বাসের অযোগ্য। কংগো হতে ইউ-এন-এর চলে আসা শুধু সাম্রাজ্যবাদেরই জয় ঘোষণা করবে না, ইউ-এন-এর কর্মক্ষমতা এবং তার স্থায়িত্ব সম্পর্কেও গভীর সন্দেহ জাগাবে। মনে হয় না, কোন নিরপেক্ষ সেক্রেটারী-জেনারেল এইভাবে ইউ-এন-এর মৃত্যু ডেকে আনবেন।

রাশিয়ার প্রচেষ্টা ইউ-এন-একে ধ্বংস করা। বৃটেন এবং ফ্রান্সের প্রচেষ্টা ইউ-এন-একে বলহীন করে আর একটা লীগ অব নেশনস্ তৈরী করা। সাম্রাজ্যবাদী এবং কম্যুনিস্ট শক্তিদের লক্ষ্য একই। আজ ইউ-এন-একে বাঁচাতে হলে আরও সৈন্য এবং আরও অর্থের প্রয়োজন। কংগো থেকে ফেরা পরিচিত ইউ-এন কর্মীদের কাছ থেকে এইটুকু জেনেছি। প্রফেসর রিচি ক্যালডারও কংগো হতে ফিরে ইউ-এন-এর অনেক সুখ্যাতি করেছেন।

অতীতে বৈদেশিকীর লেখকের অনেক আলোচনা পড়ে আনন্দ পেয়েছি। তাঁর কাছে আমার অনুরোধ তিনি যেন এই প্রতিক্রিয়াজনক মতামতের প্রশ্রয় না দেন।

গুরুপ্রসাদ রায়
লণ্ডন।

জাপানের উপর পরমাণু বোমা

সবিনয় নিবেদন,

৭ই পৌষের দেশে প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলীর "রাজহংসের মরণগীতি" টীকায় দেখছি জাপানে পরমাণু বোমা ফেলার আগেই জাপান আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিল কিন্তু পরমাণু বোমার শক্তি পরীক্ষার এই সুযোগ আমেরিকা ছেড়ে দিতে রাজী নয় বলে ঐ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করে নি।

এ কথা জেনে স্তম্ভিত হয়েছি। পরমাণু বোমার সমর্থকরা এতদিন বলে এসেছেন যে জাপানে পরমাণু বোমা ফেলায় দেড় দুই লক্ষ লোক মরলেও যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বেঁচেছে অতএব পরমাণু বোমা ফেলা অন্যায় হয় নি।

কিন্তু এখন তাঁরা কি বলবেন? আত্মসমর্পণে প্রস্তুত জাপানকে পরমাণু বোমার পরীক্ষাক্ষেত্র করা হয়েছে অর্থাৎ জাপানী জনসাধারণকে গিনিপিগের মত ব্যবহার করা হয়েছে—এই অভূতপূর্ব বর্বরতার কৈফিয়ৎ তাঁরা কি দেবেন?

আইখম্যানের অপরাধ এর তুলনায় অনেক কম। অযৌক্তিক হোক অন্যায় হোক ইহুদী জাতের বিরুদ্ধে নাৎসীদের বিদ্বেষ ছিল এবং ইহুদী-উচ্ছেদ তাঁদের ঘোষিত নীতি ছিল।

কিন্তু আমেরিকা আত্মসমর্পণে প্রস্তুত একটা জাতিকে কি করে গিনিপিগের মত ব্যবহার করল?

সম্প্রতি কিছুদিন আগে ট্রুম্যান মন্তব্য করেছেন যে, পরমাণু বোমা ফেলার জন্য তিনি একটুও দুঃখিত বা অনুতপ্ত নন।

কুন্তলা দত্ত, বর্ধমান

কবীরের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াতে না ছড়াতেই বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেল:

কেহ কহে 'মোর রোগ দূর করি
মন্ত্র পড়িয়া দেহো',
সন্তান লাগি করে কাঁদা টি
বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে 'তব দৈব ক্ষমতা
চক্ষে দেখাও মোরে',
কেহ কয় 'ভবে আছেন বিধাতা
বুঝাও প্রমাণ করে'।

আপনি কবীর নন, আমিও নই। আমার কাছে পাড়ার বেকার ছোঁড়ারা আসে একটি মাত্র বস্তু জানবার জন্য, কি করে টু পাইস—থুড়ি, থ্রী ।।P'—কামানো যায়। পাড়া বেপাড়া কারোরই অনবগতি নেই যে, আমি হেন ফন্দি-ফিকির সন্ধিসড়ুক নেই যার মারফতে দু' পয়সা কামাবার চেষ্টা করিনি, এবং—এবং বারবার মেরেছি ডাহা ফেল। তাই পাড়ার ছোঁড়াদের বিশ্বাস আমার মত বিশেষজ্ঞ (বিশেষ-অজ্ঞ পড়বেন না) তারা আর কোথাও খুঁজে পাবে না। শহরের খানা-খন্দ জানে অন্ধ।

দু' পয়সা কি করে কামাতে হয় সঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু যাঁদের আছে তাঁদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার বিলক্ষণ সুযোগ আমার হয়েছে। যা বলতে যাচ্ছি, সেটি একেবারে নীট, খাঁটি—এই ভেজালের বাজারের মধ্যিখানে বুক ঠুকে বলছি, চৌকশ নির্ভেজাল।

একদা দিল্লী শহরে আমি একটি নিম্ন-সরকারী কর্ম করতুম। কর্তারা আমার জন্য বাসা যোগাড় না করতে পেরে রাখলেন আমাকে একটা 'গোশালায়'। সে হস্টেলে আরো প্রায় শ' দুই সরকারী, নিম্ন-সরকারী ইত্যাদি নানাপ্রকারের চিঁড়িয়া থাকেন। ডাইনিং রুমে প্রায় চল্লিশখানা চৌ-চেয়ারি টেবিল।

বিস্তর করিডর, ততোধিক প্যাসেজ। তারই একটাতে হঠাৎ দেখা একটি মহিলার সংগে—মনে করুন তাঁর নাম ভানুমতী। দক্ষিণ না পশ্চিম ভারত, কোথাকার যেন এক কোটিপতির মেয়ে। কলকাতায় একদিন ক্ষণতরে আলাপ হয়েছিল। তিনি সেখানে এসেছিলেন 'কলচরের' সন্ধানে—হিল্লী দিল্লী যতই বড়ফাটাই করুন না কেন, 'কলচরের' হজ্ করতে তাঁদের আসতেই হয়, এই কলকাতায়, হ্যাঁ স্যর, এই কলকাতায়। আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন, আমি যে চিনতে পারলুম সেটা কিছু বিচিত্র নয়, কারণ আমি জানতুম তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে মাসে দু'টি হাজার টাকা পান পকেট খর্চা বাবদ! বিস্তর 'নমস্তে-ফমস্তে' করার পর শুনতে পেলুম, তিনিও ঐ হস্টেলে থাকেন, সস্তা বলে (!), এবং এদানির সোশাল ওয়ার্ক করছেন দিল্লীতে। বড়লোকের কত না খেয়াল।

ডাইনিং রুমের এক প্রান্তে তিনি বসেন তাঁর 'কলচর্ড' ইয়ার-বক্সী নিয়ে, আমি বসি আরেক প্রান্তে, সচরাচর একা। ইশারাতে 'নমস্তে' চলে—ঐ পর্যন্ত।

একদিন লক্ষ করলুম, তাঁর খাস চাকর প্লেটে করে আঙুর, এপ্রিকট, আবার দিশী ফজ লি বোম্বাই আম, সিঙ্গাপুরী কলা তাঁর টেবিলে রেখে গেল। পুরুষ্টু, রসে টইটম্বুর। হায়, পয়সা থাকলে কি না হয়। ভানুমতী কিঞ্চিৎ খেয়ে ফ্রিজিডেরে প্লেট পাঠিয়ে দিলেন। তিন দিন ধরে প্লেট আনাগোনা করলো।

চতুর্থ দিনে হঠাৎ দেখি ও'র টেবিলবেয়ারা সেই প্লেট নিয়ে আমার সামনে হাজির! শুকনো আঙুরের ডালে গুটি কয়েক শুকনো আঙুর ঝুলছে, আর গুটিকয়েক
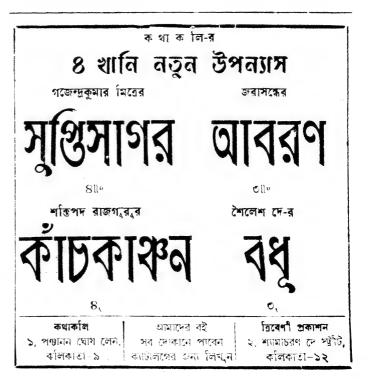
কলা—ফ্রিজিডেয়ার কলা বাঁচাতে পারে না বলে সেগুলো কালোশিটে মারা। বেয়ারা বললে, 'বাইসায়েব সেলাম দিয়ে পাঠিয়েছেন।'

অস্বীকার করবো না, আমি প্রথমটায় ক্রোধান্ধ হয়েছিলুম। একেই বলে সওগাত পাঠানো! তাও বুঝি আঙুরের ডালাটি কেটে সাফসুতরো করে, কলাগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে যদি কেউ পাঠায়। গল্প আছে, পাঁচো ইয়ারের চাপে পড়ে আকবর বাদশা যখন খুদ হুজুর কর্তৃক বেকসুর বিতাড়িত সভাকবি আব্দুর রহমান খান-ই-খানানকে অনিচ্ছায় পুনরায় ডেকে পাঠান তখন তিনি দোঁহা রচেছিলেন,

রহীমন! হমে না সুহায় অমি পিয়াবৎ
মান বিন।
জো বিষ দেয় বুলায়, মান সহিত মরিব
ভালো॥

হে রহীম! অনাদরে দেওয়া অমৃতও
আমাকে খেতে বলো না।'
যদি কেউ, আদর করে বিষও দেয়,
আমি সম্মানের সঙ্গে মরিব ভালো।'

তা সে যাক গে। মনকে বোঝালুম, ভানুমতী বড়লোক। এসব ট্রাইফ্‌ল গায়ে মাখতে নেই। মনও বিচক্ষণ লোক—যদিও আমার মত মূর্খের সঙ্গে ঘর করে—তাই তখনকার মত মেনে নিল। কিন্তু এটাও লক্ষ করলুম, আমাকে ফলগুলো ছুঁতে দিলে না, এবং আমার টেবিল-বেয়ারা যখন শুধলে, ওগুলো ফ্রিজে রাখবে কি না, তখন 'তুমি খেয়ে নিয়ো' বলে তাকে লাঞ্ছিতও করলে না। এই হল পয়লা নম্বর।

এর দিন কয়েক বাদে ভানুমতী বই আমার টেবিলে এসে বললেন, 'গুটি বারো মার্কিন ছেলেমেয়ে আসছে দিল্লীতে। স্টাডি ট্যুরে। আমি তাদের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেছি। আপনি যদি জইন করেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইত্যাদি।' আমিও 'বিলক্ষণ' 'বিলক্ষণ' বলে মেলা শুকরিয়া, মেহেরবানী, ধন্যবাদ জানালুম।

এখানে কিছুটা বুঝিয়ে বলতে হয়। মনে করুন, আপনি আমি একই মেসে বাস করি। একই সঙ্গে খাই। আপনি যদি আমাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেন—ঐ মেসেই—তা হলে তার কোনো মানে হয় না। কারণ আপনি দিচ্ছেন আপনার খাবার পয়সা, আমি দিচ্ছি আমার। কিন্তু যদি বাইরের কয়েকজনকে ডাকেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও, তাহলে ধরে নেব, আপনি নিশ্চয়ই 'মেষ-পালক'কে (অর্থাৎ মেসের ম্যানেজারকে) বেশ কিছু পয়সা দিয়ে দু' চারটে ভালো ভালো ডিশ করিয়ে নেবেন, মেসের যা ছাইভস্ম আছে তার সঙ্গে ঐ সব উম্দা চীজগুলোও থাকবে।

ইয়াল্লা—কোথায় কি!

গোটা চারেক টেবিল একসার করে, লম্বা টেবিল-ক্লথ পেতে, গুটি চারেক ফুলদানি সেজে সব কিছু তৈরী। বারোজন মার্কিন এল, ম্যাডাম তাঁদের রিসীভ করলেন, আমিও বসলুম। তারপর নিরাকার সে হস্টেলে যা খাই তাই। সুপ, মটন, পুডিং। একটি পদও ফালতো না।

আপনি বললেন, 'তবু বারোজন মার্কিনকে তো পয়সা ফেলে খাওয়ালে।'

ঐ তো মজা! পরে দেখলুম, মার্কিনরা উঠেছে আমাদের হস্টেলেই এবং তাদের খাই-খরচা দিচ্ছেন ভারত সরকার!

অর্থাৎ ম্যাডাম ভানুমতী বারোজন মার্কিন এবং আমাকে লাঞ্চ খাইয়ে দিলেন একটি কানা কড়ি খরচা না করেও! পারেন আপনি? পারি আমি? এই হল দুই নম্বর।

এর কিছুদিন পর মৌলানা আজাদ যাবেন বিলেত সফরে। হাওয়াই জাহাজে করে। আমরা সবাই গেলুম বন্দরে হাজির, মৌলানা সাহেবকে সী অফ করতে। পাণ্ডিতজী এসেছেন, কবীর সায়েবের তো কথাই নেই। হঠাৎ দেখি ভানুমতী একটি জীপ থেকে নামলেন। নেমেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন দেখে আমি দুড্ড চট করে একটা থামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তাঁকে লক্ষ করতে লাগলুম। ভানুমতী আস্তে আস্তে একখানা কাঁচি বের করলেন, তারপর বিমান-বন্দরের বাগানে—যেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে—'ভিজিটারস মে নট প্লাক ফ্লাওয়ারস', সোজা বাঙলায়, 'ফুল ছিঁড়বেন না'—সেখানে গিয়ে চটপট, কটকট করে কয়েকটি গোলাপ কেটে সুতো দিয়ে তোড়া বেঁধে, গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন যেখানে বহুজন পরিবৃত মৌলানা। সহাস্য আস্যে মৌলানাকে তোড়াটি এগিয়ে ধরলেন।

হৃদয়ঙ্গম করলুম, ম্যাডাম ভানুমতীর এ-কারদানি এই প্রথম না। কাঁচি সুতো হামেহাল সঙ্গে থাকে।

একদম সত্য কথা বললুম। রসসৃষ্টি না হয়ে থাকলে অপরাধ নেবেন না। সত্য সব সময় সুন্দর নয়। আমি কীট্‌স্‌ নই॥

১৫ জানুয়ারি, বিকেল

প্র. ব. সওদা করতে বেরোলেন, মাসু তাঁর সঙ্গিনী ও পরামর্শদাত্রী, আমি অগত্যা অনুচর।

ভিড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমার ধারণা হ'লো যে জাপানিরা ভারি সুদর্শন জাত। আমরা এদের বেঁটে ব'লে ভাবি—সেটা ভুল; আমরা ভাবি এদের নাক চ্যাপ্টা—সেটাও ভুল। লম্বা, সুগঠিত নাসা—এমন লোক রাস্তায় অগুনতি। গায়ের রং চীনেদের মতো হলদে নয়, বরং গোলাপির দিকে; চোখের কোল ফোলা-ফোলা কিন্তু আকার ছোটো নয়; মুখের ছাঁদ আমাদের পক্ষে অচেনা হ'লেও অনেক মুখ আমাদের বা অন্য যে-কোনো হিসেবে সুশ্রী। স্বাস্থ্য ভালো, পোশাক ভালো (বিলিতি সাজ মেয়ে পুরুষে সার্বিক); রোগা, মোটা বা বেঢপ বলা যায় এমন চেহারা প্রায় চোখেই পড়ে না (তার কারণ কি এদের স্বল্পাহার, রান্নার ধরন, জুডো ব্যায়ামের অভ্যাস?); সকলকেই দেখছি পুষ্ট, আঁটোসাঁটো, সতেজ, শীতের বিরুদ্ধে যথোচিতভাবে আচ্ছাদিত। একটা নতুন জিনিশ চোখে পড়লো: কেউ-কেউ নাকের ডগা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত এক টুকরো পাৎলা কাপড়ে ঢেকে নিয়েছে; অনুমান করছি এটা শীত ঠেকাবার একটি দৈশিক ও সাবেকি উপায়, এবং এই লোকেদের অবস্থা অসচ্ছল। কিন্তু এদের বসনও এমন নয় যাকে দীন বলা যায়, হ'তে পারে পশমি কাপড়টা জাতে নিচু, কিন্তু ছাঁটকাট সুদৃশ্য, তাপরক্ষায় অক্ষম ব'লেও মনে হয় না।

রাস্তায় যারা চলছে, দোকানে যারা কেনাবেচা করছে, তাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ সংখ্যায় সমান সমান। নিউ ইয়র্কে মেয়েদের সংখ্যা বেশি হ'তো, কলকাতায় (রাসবিহারী এভিনিউতে ছাড়া) মেয়েরা হ'তো পুরুষের দশমাংশ। 'নারী-প্রগতি'র ব্যাপারে জাপানে এখন ইংলণ্ডের মতো অবস্থা; প্রায় সব কাজেই মেয়েদের দেখা যায়, কিন্তু দেশটাকে মেয়েদেরই রাজত্ব ব'লে মনে হয় না (যা আমেরিকায় কখনো-কখনো হ'য়ে থাকে)। স্বভাবে প্রাচ্য, অথচ অন্তঃপুরজাত জড়িমার লক্ষণ একেবারেই নেই—এই হ'লো আজকের দিনের জাপানি মেয়ে। বোধহয় ভুল হ'লো কথাটা, কেননা জাপানি মেয়েদের কোনোকালেই ঠিক অন্তঃপুরে অন্তরীণ হ'য়ে থাকতে হয়নি, তাদের 'মুক্তি' সাম্প্রতিক ঘটনা হ'লেও তার কারণ শুধু প্রতীচীর অভিঘাত নয়। বরং এ-কথাই সত্য যে মধ্যযুগে (জাপানে সেটাই প্রাচীনকাল) জাপানি মেয়েদের যে-রকম সুপরিণত ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদা দেখা গিয়েছে সমকালীন ইতিহাসে তা অতুলনীয়।

আমরা জানি, কিন্তু সব সময় ভেবে দেখি না, যে ইংরেজ রাজত্ব আমাদের মনে কতগুলো দুর্বলতা গেঁথে দিয়ে গেছে। 'প্রাচী' বলতে শ্বেতাঙ্গের মনে যে-গতানুগতিক বিম্ব ভেসে ওঠে (ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী, নীতিজ্ঞানহীন, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন), অনেক সেটাকেই অন্ধের মতো মেনে নিয়েছিলুম। আজকের দিনেও, কেউ য়োরোপীয় সতীদাহের উল্লেখ করলে আমরা বড়ো লজ্জা পাই, মনে রাখি না যে য়োরোপে আঠারো শতকেও 'ডাইনি' পোড়ানো হ'তো*। কেউ বহুবিবাহের কথা তুললে আমরা কেমন ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে পড়ি, ভুলে যাই যে য়োরোপের রাজন্যসমাজেও ঐ প্রথা সম্মানিত ছিলো, শুধু অন্যান্যরা নামেও স্ত্রীর পদ পেতেন না, রক্ষিতারূপেই বিখ্যাত হ'তেন। কোনো ত্রয়োদশী বালিকা পিতার মনোনীত পাত্র বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে তার বরাদ্দ হ'তো বেত্রাঘাত; আঠারো শতকে সুইফট আক্ষেপ করেছেন এই ব'লে যে স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক মেলামেশা, প্যারিসে প্রচলিত হ'য়ে থাকলেও, লণ্ডনে অসম্ভব, আর সেইজন্যেই ইংরেজ ভদ্রলোকের আচার-ব্যবহার এমন স্থূল ও রুচিভ্রষ্ট। জানি, অন্য কারো অন্যায়ের দ্বারা নিজেদের অন্যায়ের সমর্থন হ'তে পারে না, আর এ-কথাও কে না মানবে যে মেয়েরা, শুধুমাত্র মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে ব'লেই আজকের দিনেও ভারতে যে-হীনতা ও নির্যাতন ভোগ ক'রে থাকে, তার অমানুষিকতা অকথ্য। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে সামাজিক অবিচার বা অত্যাচার কোনো একটি মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য নয়, সব দেশেরই ইতিহাসে তার কালো অধ্যায় অনেক ছড়িয়ে আছে; আর আজকের দিনে আমরা যাকে মানবধর্ম বলছি তার আদর্শে সমাজগঠন সর্বত্রই সাম্প্রতিক ঘটনা। জর্জ সাঁ, য়োরোপের প্রথম 'আধুনিক' বিদ্রোহিণী তাঁর মৃত্যুর পরে একশো বছরও এখনো কাটেনি; আর সেখানে মেয়েরা সামগ্রিকভাবে 'মুক্ত' হ'লেন মাত্রই প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। ভারতেও (অন্তত নগরগুলিতে) দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে ও পরে মেয়েদের অবস্থা যে-রকম দ্রুত ও বিপুলভাবে বদলে গেলো, তা চিন্তা করলে আমি পর্যন্ত অবাক হ'য়ে যাই, আর সেই পরিবর্তনের গতি যেহেতু স্বাধীনতার পরে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই মনে হয় যে আমাদের দেশে নারীনিগ্রহ অতীত হ'য়ে যেতে আর বেশি দেরি হবে না।

এই একটা বিষয়ে জাপান কিন্তু অনেক কাল দিয়েছে পৃথিবীকে: আর কোন দেশে মধ্যযুগেও শিক্ষিত উচ্চ মেয়েরা শিল্পকলা নিয়মিতভাবে চর্চা করতেন, নিজেদের উপলব্ধি করতেন—স্ত্রী, মা, প্রেমিকা বা সন্ন্যাসিনী না হ'য়েও একমাত্র কাজ ছিলোই? সে-কালে য়োরোপে বা এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাহিত্যিক ইতিহাসে মেয়েদের প্রায় অস্তিত্বই নেই, সেই এগারো শতকে জাপানি সাহিত্যের যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, অন্তত তার বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই মহিলা। শ্রীমতী মুরাসাকির 'গেঞ্জি কাহিনী', শেই শোনাগোনের ডায়েরি বা 'বালিশ-পুঁথি' (নামকরণে বোধহয় বোঝানো হয় যে বইখানা ঘুমের আগে শুয়ে-শুয়ে পড়বার যোগ্য), শ্রীমতী শিকিবুর কবিতা—এই সবই জাপানি সাহিত্যের চিরকালের অংশ ব'লে স্বীকৃত. উপন্যাসে তো মুরাসাকির নাম আজ পর্যন্ত দুই অর্থেই প্রথম। এঁরা তিনজন সমকালীন ও সমবয়সী, একই সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদে সখীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু এই তিনজন শ্রেষ্ঠ ব'লে ব্যতিক্রম নন; জাপানের এই হেইয়ান যুগে আরো অনেক মহিলা সাহিত্যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ডায়েরি লেখার প্রচলন করেন তাঁরাই, আরো আশ্চর্য যে কবিদের মধ্যেও পুরুষের চাইতে মেয়ের সংখ্যা কম নয়। ঐতিহাসিক অর্থে পৃথিবীর প্রথম গদ্য উপন্যাস যদি নাও বলা যায়, তবু গেঞ্জি মনোগাতারি'কে পৃথিবীর প্রথম আধুনিক উপন্যাস ব'লে মেনে নিতে আমরা বাধ্য, কেননা এটি শৃঙ্খলিত ছোটোগল্পের পর্যায় নয়, অলৌকিকেরও স্থান নেই এতে, আছে বাস্তব তথ্য, ঘটনাস্রোত ও চরিত্রচিত্রণ, আছে

---

* সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' দেখে আমি প্রচুর কেঁদেছিলাম, কিন্তু ভেবে পাইনি সতীদাহের দৃশ্যটি তিনি কেন দেখালেন। শেক্সপীয়রের জীবনী নিয়ে আধ ঘণ্টার ছবি তৈরি হ'লে তাতে ধর্মদাহের দৃশ্য কি অপরিহার্য?

কাহিনীর কেন্দ্রনির্ভর সংহতি। এবং এই উপন্যাস এতটাই 'আধুনিক' যে এক ঘণ্টা ধ'রে পড়লে তিনবার মার্সেল প্রুস্তকে মনে পড়ে। 'ভোরবেলা প্রণয়ীর কেমন ক'রে বিদায় নেয়া উচিত'—শোনাগনের ডায়েরির এই অধ্যায়টিকে, কিছু অনুপুঙ্খ বদল ক'রে, কোনো উনিশ-শতকী ফরাশি উপন্যাসের অংশ বললে কারো অবিশ্বাস হবে না। রচনা থেকে এই মহিলাদের যে-ছবি বেরিয়ে আসে তা সংস্কৃতির সর্বলক্ষণে প্রোজ্জ্বল; আমরা দেখতে পাই তাঁরা বুদ্ধিমতী, অন্তর্বীক্ষণে অভ্যস্ত, প্রণয়ে ও শাস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, মানবচরিত্রে ও মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ, নিজেদের ও অন্যদের বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সক্ষম। এঁরা প্রণয়প্রার্থীকে উৎসাহিত বা নিরস্ত করেন সাংকেতিক কবিতা লিখে, ডায়েরির পাতায় পরস্পরের মর্মভেদী সমালোচনা ক'রেও এঁরা পরস্পরের গুণগ্রহণে গভীর; পুরুষদের প্রতি এঁদের আগ্রহ যে-কারণে শমিত হ'য়ে আছে তা শুধু সাংসারিক সাবধানতা নয়, সেই সঙ্গে এমন একটি উন্নত রুচি যা তাঁদের পক্ষে চরিত্রেরই লক্ষণের। এবং এই সব গুণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যা তাঁদের চৈনিক সভ্যতার উত্তরাধিকার—প্রকৃতি বিষয়ে এমন একটি নিশ্চিন্ত ও স্বজ্ঞাজাত অনুভূতি, যা আমরা 'ইন্দোয়োরোপীয়' সাহিত্যের কোনোখানেই খুঁজে পাবো না। গাছ, ফুল, পাখি বা চাঁদের সঙ্গে এঁরা একটি সহজ, ব্যাকুলতাহীন, স্থায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ, চেতনে-অচেতনে সেন ভেদ নেই এঁদের মনে, তাই দ্বন্দ্ববোধের বেদনাও নেই। রোমান্টিক আকৃতির এটা ঠিক উল্টো পিঠ, এই ভাবটিকে আমাদের হঠাৎ মনে হ'তে পারে বড়ো বেশি শান্ত ও নিস্তাপ, কিন্তু এটাই হয়তো প্রধান কারণ যার জন্যে চীনে জাপানি কবিরা আধুনিক প্রতীচীকে এমন নিশ্চিতভাবে জয় ক'রে নিয়েছে। দান্তে, শেক্সপীয়র, ব্লেক, গ্যেটে, বোদলেয়ার প্রভৃতি কবিদের তীব্রতা ও ঐশ্বর্যে যখন ক্লান্তি আসে, বা তাঁদের পথে আর এগোবার উপায় থাকে না, তখন সেখানে অবাধভাবে শুশ্রূষা ও সুপরামর্শ পাওয়া যায় তা এই পূর্বতম পৃথিবীর আবেগহীন, গতিহীন, এমনকি প্রায় আয়তনহীন কবিতা—এক-একটি মুহূর্তের স্থির চিত্ররূপ যেন—যা প্রতীচীর পক্ষে ও আমাদের পক্ষেও, সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ বৈদেশিক ও অনাত্মীয়।

আর-একটা কথা উল্লেখ্য। এই মহিলারা, জর্জ সাঁ বা জর্জ এলিয়টের মতো, কখনো জেদ ক'রে 'পুরুষ ব'নে যেতে' চাননি (বরং একজন কবি-রাজপুরুষ মহিলা সেজে ডায়েরি লিখেছিলেন); পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এঁদের কল্পনায় ছিলো না। নারীর মন নিয়েই জগৎকে দেখেছেন এঁরা, জীবনযাপনেও 'পুরুষোচিত'কে গ্রহণ করেননি, এঁদের রচনার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে আমরা এঁদের নারীত্বের সুঘ্রাণ অনুভব করি। মনে হয়, এমন সম্পূর্ণরূপে নারী না-হ'লে এমন সার্থক শিল্পী এঁরা হ'তে পারতেন না। এশিয়ার এই অজ্ঞাত দেশে, প্রায় এক হাজার বছর আগে, এই অঘটন কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো, তা যত ভাবছি তত আমার অবাক লাগছে। এর আংশিক কারণ হ'তে পারে পুরুষদের মধ্যে চীনে ভাষার প্রতিপত্তি; মধ্যযুগের য়োরোপে যেমন লাতিন, তেমনি জাপানে 'সাহিত্যিক' ভাষা

হিসেবে স্বীকৃত ছিলো চীনে; সে-ভাষা মহিলাদের সাধারণত শেখানো হ'তো না;* আর তাই, পান্ডিত্যের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হ'য়ে তাঁদের মন ও হৃদয় মাতৃভাষার স্বাচ্ছন্দ্যাবেগে অমরতায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে। —কিন্তু মাতৃভাষাতেও তাঁদের যে বর্ণপরিচয় হ'তো, সেটাই বিস্ময়কর। এতেও প্রমাণ হয়—যদি নতুন প্রমাণের প্রয়োজন থাকে—যে সপ্রাণ ও সবীজ সাহিত্যের বাহন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কিছু হ'তে পারে না।

১৫ জানুয়ারি, রাত্রি

রাত্রিকালীন কিয়োটা দেখতে আয়োজিত সফরে বেরিয়েছি। বাস্-এ আমরা ছাড়া সকলেই শ্বেতাঙ্গ; বেশির ভাগ মার্কিন, দু-একজনকে ইংরেজ ব'লে বোধ হচ্ছে। জাপানি গাইডটি যুবক, মুখের চেহারা গোলগাল ভালোমানুষ গোছের; তার ইংরেজি আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি। অনর্গল ব'লে যাচ্ছে, সেটা এ-দেশের পক্ষে অসাধারণ, হয়তো একই কথা বার-বার ব'লে-ব'লে মুখস্থ হ'য়ে গেছে তার, তবু বলার ধরন ক্লান্তিকর নয়, উচ্চারণও বেশ বোঝা যায়—সেটাও এ-দেশের পক্ষে অসাধারণ। রোমে একজন গাইডের মুখে একবার যে-নমুনা শুনেছিলুম তার তুলনায় এর ইংরেজিকে ভালো বলতেও দ্বিধা হয় না। ভুল অবশ্য পদে-পদেই করছে, কিন্তু বাঙালি বা তামিল হ'লে যা হ'তো, এর ভুলগুলো সে-ধরনের নয়; ইংরেজ ও ফরাশির বাংলা বলাতেও ভিন্ন জাতের অশুদ্ধি আমরা লক্ষ ক'রে থাকি। বিদেশী ভাষায় কে কী-রকম ভুল করবেন তার নিয়ন্তা যার-যার মাতৃভাষা।

প্রথম দৃশ্য—চা অনুষ্ঠান। শহরের পুরোনো পাড়ার গলির মধ্যে কাঠের বাড়ি, বাড়িটির বয়স শুনলুম চারশো না পাঁচশো বছর। ছোট্ট উঠোন আর লম্বা বারান্দা পেরিয়ে এক নিরাসবাব ঘরে ঢোকানো হ'লো আমাদের। আরো দুটো সফর-বাস্ এসেছে, দর্শকসংখ্যার তুলনায় ঘর ছোটো, ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে মেঝের উপর ব'সে গেলুম সবাই—আসনপিঁড়ি, হাঁটু মুড়ে, হাঁটু ভেঙে, যার যেমন সুবিধে। (অনেক মার্কিন দেখলুম জাপানি কায়দায় হাঁটু ভেঙে বসতে শিখেছেন।) প্রথমে এক পরিচারিকা এসে আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে চায়ের বাসন রেখে গেলো, তারপর অতি মন্থর চরণে যিনি প্রবেশ করলেন তাঁর শুনলুম গেইশা-দের মধ্যে মর্যাদা খুব উঁচু, আর চোখে দেখেও তা বিশ্বাস হ'লো। মেয়েটির প্রসাধন এমন সোচ্চার এবং বসনভূষণ এত জটিল ও বিস্তারিত যে দেখতে সে বিপুল হ'য়ে গেছে; চুলের সঙ্গে অন্য নানা উপাদান মিলিয়ে তার খোঁপার ওজন হয়েছে তিন সের (না কি পাঁচ সের?) তার কিমোনো ও অন্যান্য বসনের স্ফীতি যেমন বিশাল তেমনি বর্ণবিলাসও বিচিত্র; চূর্ণপ্রলেপে মুখ তার শ্বেত, কালিমাপ্রয়োগে আয়ত তার চোখ—সব মিলিয়ে তাকে স্বাভাবিক মানুষী আর মনে হচ্ছে না, কথাকলি-নর্তকের মতো একেও বাস্তব থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতি মৃদু লয়ে বিরাট একটি পুতুলের মতো ঘুরে-ঘুরে সে দেখালে তার কবরী ও বসনভূষণ, তারপর চা-অনুষ্ঠান ধীরে-ধীরে এগোলো। উনুন ধরানো থেকে আরম্ভ ক'রে বাটিতে-বাটিতে চা ঢালা পর্যন্ত যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, তার প্রত্যেকটি অভিনয় ক'রে দেখালে মেয়েটি;—নৃত্য নয়, গতি খুব কম, ভঙ্গিসর্বস্ব মূক অভিনয় বলা যেতে পারে। সব সুদ্ধু সময় লাগলো আধ ঘণ্টা।

এর পরে পুরোনো একটি উদ্যানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেকালে ছিলো এক রাজন্যের বাগানবাড়ি, বর্তমান নাম গিস্কাকুজি বা রৌপ্যশিবির। নানা রঙের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে নকল পাহাড়, সরোবর, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন আকৃতির প্যাগোডা ও মণ্ডপ। জ্যামিতিক নয়, প্রতিসাম্যহীন, সামঞ্জস্য নেই এক অংশের সঙ্গে অন্যের, দীর্ঘিকাগুলিও ঠিক চতুষ্কোণ নয়, নিয়মহীন জাপানি উদ্যানশিল্পের বৈশিষ্ট্য হ'লো এই। ধরনটাকে আমরা য়োরোপের ভাষায় রোমান্টিক ব'লে জানি, কিংবা কিছুটা অত্যাধুনিকের আদল আসে মনে হয়—কিন্তু প্রাক্কালীন বিরাট কবরীর মতো জাপানের এটা নিজস্ব ও সনাতন, এবং ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকতার বিপরীত। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে আধুনিক রোমান্টিক শিল্প মর্মাহত হ'য়ে আছে (প্রাচীন 'মেঘদূতে'ও তার আভাস নেই তা নয়); কিন্তু জাপানি উদ্যানশিল্পের সঙ্গেও Zen-স্পৃষ্ট প্রকৃতিপ্রেমের সম্বন্ধ নিবিড়; চন্দ্রোদয়, চেরি মঞ্জরী, সূর্যাস্ত—এমনি সব নিসর্গশোভা অবলোকনের উপযোগী ক'রে বাগানবাড়ির বিভিন্ন অংশ রচনা করতেন এঁরা—আর যথাস্থলে যথাসময়ে উপস্থিতও হতেন। এ-কথা শুনে বিদগ্ধ পাঠকের অধর কুঞ্চিত হ'তে পারে, কেননা আনুষ্ঠানিক সৌন্দর্যচর্চার আজকের দিনে আর জাত নেই, কিন্তু 'গেঞ্জি-কাহিনী' প'ড়ে প্রতীতি জন্মে যে জাপানি জীবনে একদিন এটা খুবই সত্য ছিলো, আর এ-কথাই বা কেমন ক'রে বলি যে হাল আমলে সেই ধারা একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে? (একটি আধুনিক হাইকুর নমুনা: 'বইছে হাওয়া/তাকে শুধাও গাছ থেকে কোন পাতাটি/খসবে এর পরে।')

একটি প্রাচীরহীন মণ্ডপে আমরা বসেছি, কিছুটা দূর থেকে বাজনা ভেসে আসছে। জলের ধারে ছোটো প্যাগোডা, সেখানে দুটি কিমোনো-পরা কলেজের ছাত্রী যন্ত্র নিয়ে আসীন। যন্ত্রের নাম কোটো, এতে অনেক-গুলো ক'রে তার থাকে; কিন্তু খাঁটি জাপানি গান-বাজনায় আমাদের মন সাধারণত সাড়া দেয় না, কেমন দুর্বল আর একঘেয়ে ব'লে মনে হয়; প্রতীচ্য ওজস্বিতাও নেই, আবার ভারতীয় বিধুরতারও অভাব। মনে হয় এই সংগীতে এদের নিজেদেরই আর তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই এই বিষয়ে এরা আপন ক'রে নিয়েছে য়োরোপকে; প্রতীচীর সন্তান বা অধিবাসী বা নিকট আত্মীয় নয়, এমন জাত জাপানিরাই একমাত্র যারা তার সংগীতকলায় সুদক্ষ ও সৃষ্টিশীল।

সর্বশেষে অন্য এক গেইশা ভবন, এটিও খুব পুরোনো বাড়ি, রাত্রেও বোঝা গেলো একটি মনোরম বনস্থলীতে অবস্থিত। গেইশা প্রথা জাপানের একটি সামাজিক কলঙ্ক ব'লে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, এও শুনেছিলাম যে আধুনিক আমলে তার উচ্ছেদ হয়েছে। দুটো কথাই ভিত্তিহীন বা মাত্র অংশত সত্য ব'লে আমার ধারণা হ'লো। নৃত্য গীত অভিনয়ের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করেন এমন মেয়ের কোনো সমাজেই অভাব নেই; আজকের দিনের গেইশাদেরও তাই অবস্থা। এঁদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে, অল্প বয়সে ভর্তি হ'লে ললিতকলা শিখতে হয় সেখানে, য়োরোপের মুাজিক-হলের নটীদের মতো, এঁদেরও অন্য পেশা নেবার বা বিবাহ করার স্বাধীনতা অবাধ। জাপানি মেয়েদের মধ্যে এঁরাই এখন একমাত্র, যারা লম্বা চুল রেখে পুরোনো ছাঁদে খোঁপা বাঁধেন ও ঘরে-বাইরে কিমোনো ছাড়া কিছু পরেন না। পুরোনো জাপানের একটি চিত্রকল্প এঁরা, আর সেদিক থেকে বিদেশীর দ্রষ্টব্য। সেই-জন্যে খুব সুখী হ'তে পারলাম না, যখন দেখলাম এই সংস্থার আয়োজন শ্বেতাঙ্গের উদ্দেশেই নিবেদিত।

আমরা সব দেয়াল ঘেঁষে ব'সে গেলুম, তিনটি তরুণী জলযোগ পরিবেষণ করলেন, তারপর মেঝেতে তাঁদের নৃত্যগীত শুরু হ'লো। চা-অনুষ্ঠানের মহিলাটির মতো আড়ম্বর নেই এঁদের, রীতিমতো স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়—গানের সুরও

---

* শ্রীমতী মুরাসাকির ভ্রাতার জন্য চৈনিক শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন; তাঁর অধ্যাপনা শুনে-শুনে বালিকা মুরাসাকি চীনে ভাষায় এতটা দক্ষ হ'য়ে উঠেছিলেন যে, ভ্রাতার ভুল শুধরে না দিয়ে পারতেন না। তা জানতে পেরে পিতা একদিন বললেন, 'তুই ছেলে হ'লে কতই না গর্ব হ'তো আমার!' মুরাসাকির মন্তব্য ঃ 'পুস্তকপ্রিয় হ'লে পুরুষদের বদনাম হয়, অতএব মেয়েদের পক্ষে তা আরো নিন্দনীয়; আমি যে চীনে পড়তে পারি তা গোপন রাখতে সচেষ্ট হলুম।' —লক্ষণীয়, স্ত্রী পুরুষে এই প্রভেদ সত্ত্বেও মেয়েদের কাব্যচর্চা, নিসর্গচর্চা ও গ্রন্থরচনায় সমাজের সম্মতি ছিলো।

হালকা ধরনের বিলেতি। শ্বেতাঙ্গের পক্ষে চেনা সুর, কেননা তারা অনেকে আসন ছেড়ে উঠে করতালিসমেত নৃত্যে যোগ দিলেন। একটা ছিলো 'কয়লাখানির গান', তার প্রথম কথাটা বার-বার কানে আসছিলো—'ডিগ্‌ ডিগ্‌ ডিগ্‌।' প্রতিবেশিনী মার্কিন মহিলাকে জিগেস করলুম, জাপানিতে ঐ শব্দের অর্থ কী তা কি দৈবাৎ তাঁর জানা আছে? তিনি আমাকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ ক'রে জবাব দিলেন, ওটা ইংরেজি শব্দ, 'dig', পুরো গানটাই মার্কিনী ও মার্কিনীদের মাতৃভাষায় রচিত। আমি একাধিক কারণে ঈষৎ লজ্জা পেলাম।

১৬ জানুয়ারি

সন্ধ্যায় কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা, তারপর আমাদের বিদায়-ভোজ। বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি ভবনে টেবিলে বসে প্রতীচ্য ধরনে খাওয়া হ'লো। অনেক মহামহোপাধ্যায় উপস্থিত।

'ভিজিটিং কার্ড' নামক জিনিসটা আমার বরাবর অনর্থক মনে হয়েছে, কেননা বিদেশে নিয়োগ ভিন্ন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না, আর যাঁদের সঙ্গে নিয়োগ হয় তাঁরা সকলেই আমার নামটা অন্তত জেনেছেন। এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এও জেনেছিলুম যে ঐ বস্তু, চতুষ্কোণ নামলিপিকা সঙ্গে না থাকলেও পাশ্চাত্য দেশে অতিথির স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু এবারে কী মনে করে কিছু কার্ড ছাপিয়ে সঙ্গে নিয়েছিলুম। ভাগ্যিস নিয়েছিলুম—কেননা (আগে এটা আমার জানা ছিলো না) জাপান পৃথিবীর একটি দেশ যেখানে পকেট থেকে কার্ড বের করতে না-পারলে অপ্রতিভ হতে হয়। কোনো কোনো বিষয়ে প্রতীচীর চেয়েও কত বেশি পাশ্চাত্য এরা, তবু সেই সঙ্গে এদের জাপানিত্বও কেমন অক্ষুণ্ণ! এখানে কোনো ভদ্রলোক কার্ড ছাপাতে ও পকেটে নিতে ভোলেন না; একদিকে জাপানি, উল্টো পিঠে রোমান হরফে নাম ছাপানো থাকে তাতে; কারো সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'লে প্রথমে একবার বিনীত করেন, আবার বিনীতিসমেত কার্ড এগিয়ে দেন তাঁর হাতে, তিনি প্রতিদান দিলে পুনশ্চ বিনীতির বিনিময়। এবং যে-রকম চিত্রলভাবে জাপানি ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন, তা হয়তো বুর্বঁ সম্রাটের পারিষদের পক্ষে সম্ভব ছিলো, কিন্তু আজকের দিনে অন্য সকলেরই অসাধ্য। বিশেষত বাঙালিদের আদবকায়দার তেমন কড়াক্কড় নেই; আমার অনবরত মনে হ'তে লাগলো এই অত্যন্ত পরিশীলিত সুধীসমাজে আমাকে না জানি কেমন কদাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু রোমে রোমক হবার উপদেশ শিরোধার্য হ'লেও কোনো মানুষ কি রাতারাতি নিজেকে বদলাতে পারে, না কি সে-রকম চেষ্টা করলেই শোভন হয়?

কিন্তু শুধু শিষ্টাচার নয়, সব দেশেই (হয়তো ইংলণ্ডে ছাড়া) মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায় ব'লেই ঘর ছেড়ে বেরোনো সার্থক। ভোজের শেষে সেখানেই আমাদের বিদায় দিলে সৌজন্যে কোনো ত্রুটি হ'তো না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত এলেন হায়াশি, আর ওসাকার প্রবীণ অধ্যাপক মিয়ামোটো—এঁর সঙ্গে কলকাতায় আমার আগে একবার দেখা হয়েছিলো। দু-জনেই অনেক দূরে থাকেন, ট্রেনে ফিরতে হবে, বাইরে শীতও তীব্র। তবু, শেষ ট্রেনের সময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কাটালেন এঁরা। রেখে গেলেন প্র. ব.-র জন্য কিছু উপহার (সঙ্গে যে-সব ছোটো-ছোটো দিশি জিনিশ ছিলো তা-ই দিয়ে বিনিময় করলুম আমরা)—আর রইলো স্মৃতি, মানুষের সেই এক বান্ধব যা তাকে কখনো ছেড়ে যায় না।

কাল সকালে টোকিওর প্লেন।

(ক্রমশ)
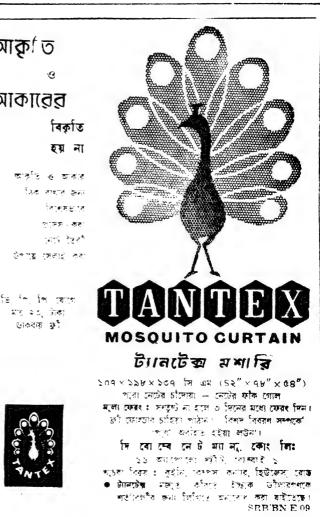
শ্যামল বাংলার পাশেই বিহার রাজ্য। ওখানকার আবহাওয়া একটু শুষ্ক ও তপ্ত হলেও গ্রামবাসীদের প্রাণে আছে সরলতা। এদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই জীবিকার জন্যে পরিশ্রম করে। ওদের গ্রাম্য জীবন-কাহিনীর সাক্ষ্য দিচ্ছে এই আলোকচিত্র-গুলি। (১) সুন্দরী বধূর লজ্জা-মধুর চাহনী। (২) গ্রামের প্রধান বলেই তো ঘোড়ায় চড়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া! (৩) সেচ খালের পাশে আছে গাছের সারি, আর তার পাশ দিয়ে চলে গেছে ছায়াশীতল পথ। (৪) গৃহস্থালীর সব সমস্যারই সমাধান করতে হয় এই প্রবীণাকে। (৫) কাচের চুড়ি গ্রামের বধূদের বড়ই প্রিয়, তাই গ্রামের হাটে চুড়ির পসরা নিয়ে বসেছে এক রমণী। (৬) হাটে বিক্রি হয় শাকশব্জী ও নানা তরিতরকারি। (৭) এর মনে এখনও কোন ভাবনা-চিন্তা স্থান পায়নি। (৮) দূরের গ্রামে হাট বসেছে। সেখান থেকে আনতে হবে সারা সপ্তাহের সওদা। (৯) সারা ক্ষেতের ধান পেকে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি সব কেটে গোলায় তুলতেই হবে।

আলোকচিত্রশিল্পী

অজিতমোহন সোম

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৩৯৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শরীরের অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কুয়াসা ছড়িয়ে পড়ে। সেই রকমের একটা দুর্বল ঝাপসা মুহূর্তে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম সেটা মুছে ফেলবার যোগ্য। মনে পড়চে তাতে আমার চেহারার বিকার নিয়ে আক্ষেপ করেছিলুম, ওটা একটা প্রলাপ। বাস্তবিক পদ্য ছাড়া খাঁটি সত্য লেখা যায় না—গদ্যে আমরা বানিয়ে বানিয়ে বকি, রাবিশ জমা হয়। —২৫শে তারিখে একটা অপেক্ষাকৃত বড়ো কবিতা লিখেছি—তার কথাগুলো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে। কপি করতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয় তাই সেটা আজ খাতায় অবগুণ্ঠিত রইল। দুটো ছোটো ছোটো কবিতা পাঠাই—কাব্য হিসাবে খুব দামী না হতে পারে কিন্তু চিঠি হিসাবে চলবে।

ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি মরণের প্রসাদ বহিয়ে,
কামনার আবর্জনা, ক্ষুধিত অহমিকার যত
উঞ্ছবৃত্তিসঞ্চিত জঞ্জালরাশি দগ্ধ হয়ে গিয়ে
ধন্য হোক আলোকের দানে, এ মর্ত্যের প্রান্ত পথ
দীপ্ত করে দিক, অবশেষে নিঃশেষে মিলায়ে যাক
পূর্ব সমুদ্রের পারে, অপূর্ব উদয়াচলচূড়ে
অরুণ কিরণ তলে একদিন অমর্ত্য প্রভাতে॥

এই জন্মে বিজড়িত স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্যাঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয় তোরণ চূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে
মেলিনু নয়ন, জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোন লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা সেথা যার তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, আমার আহ্বান সৃষ্টিকাজে
তাঁরি আসনের ছায়াতলে, বিরাট নেপথ্যলোকে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, আমারে রচিতে হবে রিক্ত হস্তে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়॥

২৯।৯।৩৭

এর উত্তর দেবার চেষ্টা কোরো না।

রবীন্দ্রনাথ

॥ ৪০০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

যমদূত যা অর্ধসমাপ্ত করে গিয়েছিল আজ সকালে তা আমি স্বহস্তে সমাপ্ত করেছি। কাল রাত্রিরে ভেবেছিলুম, যে পর্যন্ত না চুল ওঠে টুপি পরে কান ঢেকে জনসমাজে সঞ্চরণ করব। অবশেষে এই সংকোচের জন্যে মনে ধিক্কার জন্মালো—আজ ৭৭ বছরে মাথার আবরণ মোচন করলুম—তারি ছিন্ন শেষ তোমাকে পাঠাচ্ছি। বাগানে কোথাও পুঁতে এর উপরে শ্বেত করবীর একটা গাছ রোপণ কোরো। না যাক্—বৌমার এই উদয়নের বাগানেই আমি এর স্মরণচিহ্ন রাখতে বলব—মোহমুক্তির স্মরণচিহ্ন। মনে খুব আরাম পেয়েছি আজ হতে আমার মাথার উপর থেকে চিরদিন ব্রুশ টুপি পাগড়ির আধিপত্য সম্পূর্ণ নির্বাসিত। ২ অক্টোবর ১৯৩৭

রবীন্দ্রনাথ

॥ ৪০১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, তুমি বিবাহ ব্যাপারে দায়গ্রস্ত হয়ে ব্যস্ত থাকবে কিছুকাল, খবর পেয়ে আমার খবর তার উপরে চাপাই নি। মনে করচি ১০ই ১১ই তারিখে কলকাতার দিকে যাব। সে সময়ে তোমাদের বাড়ি নবদম্পতিদের ব্যবহারে নিযুক্ত থাকবে প্রশান্ত লিখেছিল—তাই আমার কথা লিখে তোমাকে চিন্তিত করতে চাইনি। জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘর আমার পক্ষে দুর্ব্যবহার্য নয়, খোলা আকাশ খোলা বাতাস যথেষ্ট পাব। চৌকিতে করে উপরে নিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য। এই নিয়ে তুমি লেশমাত্র সংকোচ বোধ করলে আমি যথার্থই ব্যথিত হব। তোমার সেবা যা পেয়েছি সে তো ভোলবার নয়—অনিবার্য সাংসারিক কারণে যদি ক্ষণকালের ব্যাঘাত ঘটে সেটা মনে নেবার নয়। ভাগ্যে শরীরটার জন্যে ছোটো খাটো কারণে এক একবার চিন্তার কারণ ঘটে নইলে কলকাতায় যাওয়া অনেকদিন পিছিয়ে দিতুম। ঐ সময়ে তোমার দিল্লী যাবার কথা—আমার কথা ভেবে একটুও ব্যস্ত হোয়ো না। স্নানের পর ক্লান্তিতে হাত কাঁপে, চিঠিতে তারই পরিচয় পাচ্ছ। ৪।১০।৩৭

কবি

॥ ৪০২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শরীর মন অত্যন্ত পেলব হয়ে গিয়েছে—অল্পমাত্র চিন্তা সংশয় দায়িত্ব দাবী সত্তাকে দুলিয়ে দেয়—মনের তারে যে ঝংকার জাগায় সে যেন মিশ্রিত ঝংকারের মতো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাঁতার দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘাটের কাছে এসেও মনে হয় উপরের দিকে ওঠবার শক্তি নেই, চেয়ে দেখি কেউ হাত বাড়িয়ে দিল কিনা। ভয় হয় কোথাও কারো উপর নির্ভর করতে। অবশেষে দেখতে পাই এই অবস্থাটা গদ্যের দেশেই, রাস্তায় হেঁটে চলতে হয়—সেখানে কোনো আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছন সহজ নয়—বন্ধুর পথ, কঠিন পথ, অনিশ্চিত পথ। এমন অবস্থায় পদ্যের আহ্বান কানে আসে, সেখানে ওড়বার রাস্তা

সেখানে কোনো দ্বন্দ্বের তাড়না নেই, হাওয়া বাতাসের আনুকূল্য একটা যেন আলো জ্বালা পথে আপনিই নিয়ে চলে। পদ্মার দেশে যে নির্জনে নিজেকে অকারণে পরিত্যক্ত মনে হয় পদ্মার আকাশে নির্জনতার মধ্যে শূন্যতার স্পর্শ পাওয়া যায়, নিজেকে ব্যর্থ মনে হয় না। তাই যখন দেখি তোমরা সবাই চুপ, সবাই যেন বহুদূরে তখন বলবার কথা খুঁজে পাই নে —একটা একটা কবিতা পাঠিয়ে দিই। ৬।১০।৩৭

কবি

॥ ৪০৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, বৌমা থাকেন তেতালায়, রথী দোতালায়, আমি একতলায়। ওঁদের মতলব আমার কাছে এসে পৌঁছয় না। ওঁরা কলকাতায় প্রোগ্রাম ঠিক করে রেখেছেন, অবশ্য তার মধ্যে আমিও জড়িত। আমি ভাবছি আমাকে বুঝি স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে হবে। তাই বোকার মতো তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। কিছুকাল পূর্বে প্রশান্তর একখানা চিঠি দেখেছিলাম, তার থেকে আন্দাজ করেছিলেম দেড়মাস দুমাস পরে গেলেই আমার যাওয়াটা সর্বদিক থেকে শ্রেয়। ভেবেছিলুম, তোমাদের কতকগুলো বাধা জুটেছে—সেইজন্যে আমার প্ল্যান আমি করেছিলুম। নভেম্বরে আমি স্টীমারে নদীতে যাব ভেবে রেখেছি তাই বেশি দেরি করতে মন যাচ্ছিল না। ইত্যাদি ইত্যাদি। মস্তিষ্কে কিছু কুয়াসাচ্ছন্ন রয়েছে—সব কথা স্পষ্ট কানে যায় না, চিন্তাগুলোও কিছু অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় আমাকে ক্ষমা কোরো—কিছু মনে কোরো না। আমি রথীদের উপর নির্ভর করে সব ভাবনা ছেড়েছুড়ে দিয়ে চুপচাপ করে থাকব একটা কোনো পরিণামে গিয়ে পৌঁছব।

আমি কী রকম এলোমেলো বুদ্ধি হয়ে পড়েছি। কিছুদিন সময় লাগবে মনটাকে গুছিয়ে নিতে।

কবি

৮ই অক্টোবর ১৯৩৭

॥ ৪০৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন
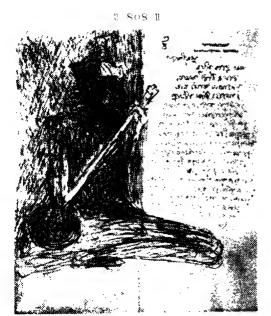
কল্যাণীয়াসু,

রথীর কাছে আজ তোমার চিঠি এসেছে তার থেকে আমাদের প্ল্যানটা স্পষ্ট হোলো। তোমার কন্যাদায়ের পরদিনেই তোমার উপর আতিথ্যদায় ধর্মবুদ্ধিতে বাধে, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি তার উপরেও প্রবল হোলো। ১১ই তারিখে সকালের গাড়িতে যাওয়া সংকল্প করেছি। আতিথ্যটা তোমার নিজের হাত থেকেই গ্রহণ করতে লোভ হয়। এজন্যে ঘণ্টাকয়েকের দুঃখ যদি বাড়িয়ে তোলো, তবে পুণ্যফলে তার পরিশোধ হবে। তা ছাড়া নিজের চেহারাটা তোমার গোচর করতে চাই—এতে যদি তোমার চক্ষের বিতৃষ্ণা জন্মে, সেও স্বীকার করে নেব। ইতি ৮।১০।৩৭

কবি

সম্প্রতি তোমার কোনো পীড়ার জন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কি না জানাবে।

॥ ৪০৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কাল ছিল বিজয়া দশমী। সন্ধ্যাবেলায় বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছিলেন তোমার জ্যোতিদাদা, সসন্ততি সত্যদাদা, সপরিজনে বুলা। অপ্রতিদ্বন্দ্বীর ভাণ্ডার থেকে সুধাকান্ত মিষ্টান্ন আহরণ করে রেখেছিল। যদিও গৃহকর্ত্রী অনুপস্থিত তবু আতিথ্যের ত্রুটি হয়নি।

কাল আরো এসেছিলেন বিবি প্রমথ আর দেবু। দেবুকে জানো বোধ হয়—অনেকদিন ছিলো পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে—ভালো ছবি তুলতে পারে, আর ছবি সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতায় তার রুচির প্রবীণতা জন্মেছে। তোমার ঘরের দেয়ালে আমার আঁকা ছবি সে প্রথম দেখল—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছে—বললে এমন কতকগুলি ছবি আছে, তার মতে যার তুলনা কোথাও নেই। শিল্পকলা সম্বন্ধে ওর মত শ্রদ্ধেয় তোমাকে আর বিশেষ কোনো খবর দেবার নেই—আমার খবর নিতান্তই একঘেয়ে। এই খবরটা দিলুম তার কারণ, তোমাকে জানাতে ইচ্ছা হোলো, তোমার ঘরে কিছু রেখে গেছি—আমার ক্ষয় হয়ে যাবে কিন্তু যার মূল্য ক্ষয় হবে না। সেই ভৃঙ্গরাজের রস দিয়ে যে একখানা মুখ এঁকেছি তার টেক্‌নিকে ও ভাবপ্রকাশে তাকে চমক লাগিয়েছি—তা ছাড়া ছোটো ও বড়ো কতকগুলো ভূদৃশ্য চিত্র দেখে ফিরে ফিরে বারবার সে বাহবা দিতে লাগল। খুশি হলুম। আজ একথা অসঙ্কোচে বলতে পারব, বিজয়ার বার্ষিক বরাদ্দ প্রণাম এখনো দাবী করতে পারি।

কাল সমস্তদিন জনতার ব্যাঘাতে একটা ছবি রচনা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, আজ সকালে সেটা সম্পন্ন হোলো—এ ছবিতে গাছপালা পাহাড়-নদীর সমবায়, ভালো হয়েছে বলে অনুভব করচি। ছবি আঁকার ভিতর দিয়ে নিজেকে নিজে দান করা যায়, সঙ্গ দান, আনন্দ দান। ভাগ্যে এ শক্তি অকালে জেগে উঠেছিল, তাই আয়ু যখন দেউলে তখনো এক জায়গায় নিজের মূল্য পাওয়া যায়।

আজ এখনই ডাক্তারবাড়ি যেতে হবে, শরীর মন সংকুচিত হয়ে আছে। ইতি বিজয়া দশমী ১[illegible]৪৪

কবি

॥ ৪০৬ ॥

ওঁ

বেলঘরিয়া

কল্যাণীয়াসু,

ঘড়ঘড়িয়ার উদ্যানবাটিকার নির্জনতা নির্জনতর করে চললুম শান্তিনিকেতনে।

তোমার সেটভাঙা বুরুশটির স্বজনবিচ্ছেদ নিবারণের উদ্দেশে সেখানি বুলার হাতে দিয়েছি। যতদিন প্রয়োজন ছিল তার সেবা শিরোধার্য করেছি—এখন তোমার কেশ-প্রসাধনে নিজেকে উৎসর্গ করুক—এই কামনা করি।

মনটা অকর্মণ্যতার ভারে মুহ্যমান। ওখানে গিয়ে রংমহালে চিত্রলেখার সাধনা করব আশা করচি। কোনো বুদ্ধিসাধ্য কাজের উপযোগী শক্তিতে ভাঁটা পড়ে গেছে।

রাজধানীতে আনন্দ এবং ঋদ্ধিলাভ করো এ আমার আশীর্বাণী। ইতি ৫।১১।৩৭। তারিখে যদি ভুল হয়ে থাকে সংশোধন করে নিয়ো। ইতি

কবি

'গুপ্তনিবাসটা' বেলঘরিয়া ডাকঘরের এলাকার মধ্যে ছিলো। বাড়ির সামনে দিয়েই রেলের লাইন—দিনরাত ট্রেন চলাচলের আওয়াজ তাই কবি ঠাট্টা করে ঐ বাড়ির ঘড়ঘড়িয়া নাম দিয়েছিলেন।

ও'রা যখন অক্টোবর মাসের ২১ তারিখে কলকাতায় আমাদের বাড়ি থাকতে আসেন তখন প্রতিমাদেবীর শরীরও খুব অসুস্থ; কবিকে তো তখনও চেয়ারে বসিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। রথীন্দ্রনাথও সুস্থ নন। তিনি উত্তরপাড়া ঘাটে তাঁদের বোটখানা আনিয়ে নিজে সেখানে চলে গেলেন। কবি, প্রতিমাদেবী এবং ও'দের অন্যান্য পরিজন সকলে "গুপ্তনিবাসেই" ছিলেন। ও'দের নিজেদের ভৃত্য পাচক সব সঙ্গে এসেছিলো, প্রতিমাদেবী নিজেই আমাদের বাড়িতে সংসার পেতে ছিলেন মাসখানেকের জন্যে। সে সময় পুজোর ছুটি—আমরা গিরিডি চলে যাই। তারপর অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে ফিরে এসে কয়েকদিন আমাদের নিজেদের বাড়িতেই প্রতিমাদেবীর আতিথ্যভোগ করে দিল্লী চলে যেতে হোলো। আমরা ফিরবার আগেই কবি আবার স্বস্থানে ফিরে যান। প্রতিমাদেবীও সেই সময় বোটে গিয়ে থাকেন।

॥ ৪০৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

বিধাতার ইঙ্গিত দুঃখযোগে। পুরুষের দাড়ি গোঁফ তাঁর শাশ্বত বিধান, তীক্ষ্ম অস্ত্রের অহংকারে যারা লংঘন করতে চায় সেই কাপুরুষের দল প্রতিদিন সময় জরিমানা দেয়, আর মাঝে মাঝে দেয় রক্ত—সাংখ্যিক যদি গণনা করেন তবে খুবই লম্বা বছরের অঙ্ক বেরিয়ে পড়বে। অতএব এখন থেকে—বলতে সাহস হচ্চে না। তুমি যদি উৎসাহ দাও তবেই স্পষ্টভাষা ব্যবহার করতে পারি। প্রশান্তর মুখমণ্ডলে হস্তক্ষেপ না করলেও তোমার হেড্‌নার্সীয় হাত পাকাবার অন্য ক্ষেত্র আছে—এমন কি অপেক্ষা কর যদি স্বয়ং আমিই তোমার অনুশীলনের সুযোগ স্বদেহে ঘটাতে পারি প্রবল অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে তোমার কাজ চলতে পারবে।

শ্রীনিকেতনের হর্ম্যচূড়ায় বাসগ্রহণ করব সেইখানেই সাতই পৌষ পার করে পরে কলকাতায় যাব। যদি ইতিমধ্যে উৎসব ক্ষেত্রে আশ্রমে আসতে পার আমার সেই স্বর্গারোহণ পর্ব গোচর হবে। স্নানে চললুম। শরতের ডবলসীটের মোটর সাইকেলে হেমন্ত এসে পৌঁচেছে। ১১।১১।৩৭

কবি

নিবেদনম্ অধ্যাপিকিনিসু,
কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু;
জানিয়ো তো সেই সংখ্যাতত্ত্বনিধিকে
ব্যর্থ যদি করেন তিনি বিধিকে,
পুরুষ জাতির মুখ্য বিজয়কেতু
গুম্ফ শ্মশ্রু ত্যজেন বিনা হেতু
গণ্ডদেশে পাবেন ক্ষুরের শাস্তি
একটুমাত্র সংশয় তায় নাস্তি।
সিংহ যদি কেশর আপন মুড়োয়
সিংহী তারে হেসেই [illegible] উড়োয়।
কৃষ্ণসার সে বদখেয়ালে হঠাৎ
শিং জোড়াটা কাটে যদি পটাৎ
কৃষ্ণসারুণী সইতে সে কি পারে
ছি ছি বলে কোন্ দেশে দৌড় মারে।
উলটো দেখি অধ্যাপকের বেলায়
দাড়ি গোঁফ সে অসংকোচে ফেলায়,
কামানো মুখ দেখেন যখন ঘরণী
বলেন না তো, দ্বিধা হও, মা ধরণী॥

কবিসম্রাট

১৪।১১।৩৭

দিল্লীতে আমার স্বামীর ক্ষৌরকার্যের সময় গাল কেটে গিয়ে পরে তাই বিষিয়ে উঠে কিছু ভোগ ভুগতে হয়েছিলো। সেই সংবাদে কবির এই পরিহাসজনক চিঠি।

পূর্বক্ষণ

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

কী করে হানবে তোমার প্রীতি-কুঠার
অচল শরীরে মনে?
যতই বাজুক আহ্বান ক্ষুরধার
আমি ডুবি অচেতনে।

চেতনা আমার চায় চেনা চেতনায়
মিলনের পূর্ণিমা;
তুমি এক দূর একাগ্র অমানিশা;
হৃদয় হতেছে ঢিমা।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবনকে যদি মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়—শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, প্রশাসনে এবং নাগরিক জীবনে, তা হলে এ সকল বিভাগের শিরা-উপশিরাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে বলা চলতে পারে: জটিলতা, অপুষ্টি এবং অবনীতির অস্বাস্থ্যকর হাওয়ায় সাধারণ মানুষ পীড়িত। পনের বছর আগে ইংরেজের বিরুদ্ধে যা ছিল প্রতিবাদ, যা ছিল বিদ্রোহী মনোভাব, আজ তা দেশপ্রেমে পরিণত হয়েছে। অথবা উগ্র স্বদেশ-বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যেখানে আশা করা হয়েছিল, নীতিবোধ দৃঢ় প্রবল আবেগে প্রেরণার উচ্ছ্বাস জাতির নৈতিকতাকে আত্মনিষ্ঠায় গঠিত করবে, সেই তুলনায় বর্তমানের নির্জীব নীতি অপরিমেয় বিস্ময় উদ্রেক করে।

এই সমস্ত আবেগ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতির নৈতিক উন্নতির স্পর্শ করতে না পেরে দেশের বেশ একটা উপযুক্ত সংখ্যক লোক প্রতিনিয়ত সরকারের সমালোচনা করে চলেছেন। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের অপরিসীম ক্ষোভ মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী ইত্যাকার কয়েক জন ব্যক্তিকে লক্ষ করে বর্ষিত হয়ে থাকে। যেন দেশের সমস্ত রকম বিপদ এবং দুর্দশার মূলে সন্দেহাতীতভাবে এঁরাই আছেন। সরকারের প্রতিও যে নিন্দা এবং আক্রোশ সক্রিয় আকারে মাঝে মাঝে প্রকটিত হয়ে উঠে, তাতে মনে হয় যেন সরকার নামে নিতান্তই গুটিকয়েক লোক কোন এক অফিস-কক্ষ থেকে দেশের সর্বস্তরের উন্নতি ও অবনতি নিয়ন্ত্রিত করছে।

কিন্তু এই ধারণা যে ভুল, দেশ সংস্কারের পক্ষে চিরস্থায়ী ফাটল, তাঁরা বুঝতে পারবেন না যতক্ষণ না সরকার অর্থে গুটিকতক লোকমাত্রের ধারণা তাঁদের অপসারিত হয় এবং তাঁদের আরো বুঝতে সাহায্য করতে হবে যে, গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকটি লোকই পরোক্ষভাবে সরকারের সঙ্গে যুক্ত। দেশের যদি কিছুমাত্র উন্নতি হয়ে থাকে সেই প্রশংসা যেমন প্রত্যেকটি মানুষের প্রাপ্য, অবনতির অপ্রশংসাও তাদেরই। ইংলণ্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থার যখন প্রশংসা করি, তখন শ্রমিক সরকার বা রক্ষণশীল সরকারের প্রশংসা করি না, করি সাধারণ মানুষের চরিত্রধর্মের (properties of character)। অবশ্য নীতি নির্ধারণের একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত মন্ত্রিমণ্ডলীর গুরু দায়িত্ব নিশ্চয় আছে, কিন্তু ঠিক তারপর থেকেই দায়িত্ব শুরু হল সাধারণ মানুষের। সেই দায়িত্ব কতটুকু প্রতিপালিত হয়েছে সেই প্রশ্নও আজ তুলবো।

সরকার পক্ষের বক্তব্য প্রকাশ অথবা তাদের নীতি সমালোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য হল: কোনো দেশে কোনো কালে একটি সরকারের প্রচুর ত্রুটি থাকতে পারে, ভ্রান্ত নীতি থাকতে পারে—এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও দেশের উন্নতি-অবনতিতে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা এবং দায়িত্বকে কোনো রকমেই অস্বীকার করা চলে না। এ কথাটাই আমরা সবচাইতে বেশী ভুলে থাকি। তাই জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যে কোন ভুল-ত্রুটি অনায়াসে সরকার নামে অবয়বহীন একটি ব্যক্তিত্বের উপর চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্বকে অম্লান বদনে অস্বীকার করি। আজ বোধ হয় সহজ অন্তঃকরণে স্বীকার করার সময় হয়েছে, নানান ছুতোনাতায় ব্রিটিশ সরকারকে দোষারোপ করার অন্তরালে যে চরিত্রহীনতা আমাদের মধ্যে গাঢ় হয়ে আসছিল এবং ইংরেজ বিরোধিতার ধুয়োতে যা ঢাকা ছিল, আজ তা দিনের আলোর মত প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

এ একেবারে তর্কাতীত সত্য যে, আজ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে যে সংখ্যাতীত, বিপুল এবং জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে, ব্যক্তির দায়িত্বহীনতাই সেই জন্য প্রধানত দায়ী। এই খাদ্যবস্তুতে ভেজাল মিশিয়ে দেশের দারিদ্র্যশীর্ণ মানুষগুলিকে শীর্ণতর করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বিবেকে সামান্যতম দংশন হয় না, ওষুধের নামে শিশিতে বিষ পুরে দিতে এদের বুক এতটুকু কাঁপে না। অন্যদিকে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলতে পারি না, তুলতে সামান্যতম চেষ্টা করি না। কোনো একটা স্তরে এই সমাজবিরোধী মানুষগুলো নিশ্চয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়। তা না হলে এমন নির্বিবাদে কালোবাজারীরা রাজত্ব চালাতে পারত না।

আমাদের দেশ এবং দেশের মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা নেই, জাতীয়তাবোধ নেই—আছে নিরন্তর আত্মস্বার্থ নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিযোগিতা। মোট কথা, চরিত্রহীনতার সমস্যাই আমাদের প্রধান সমস্যা। স্বীকার করি সরকারের ভুলত্রুটি আছে, নীতির মধ্যে সুপ্রচুর গলদ আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাবও লক্ষ করা যায়, তবু সরকারী নীতি রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর যতটুকু দায়িত্ব বা কর্মভার অর্পণ করেছে, তার কতটুকু সকল আন্তরিকতা বা ঐকান্তিকতায় প্রতিপালিত হয়েছে? সমস্ত ভারতবর্ষের কজন লোক মাতৃভূমির নামে শপথ করে বলতে পারবেন তাঁর অভাব-অভিযোগ ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি তাঁর দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করবার চেষ্টা করেছেন? সততা কথাটির উপর আমি জোর দিতে চাই। কারণ এই পোড়ার দেশে সততা একটি দুর্লভ বস্তু। যে যেখানে যতটুকু সুযোগ পাচ্ছে, নিজেকে স্ফীত করে নেওয়ার কাজে একটুও ত্রুটি নেই। কথাটা শুনতে খারাপ

লাগবে; কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ সত্য যে, ত্রৈকিক নিয়মের সাধারণতম ধারণার কাছে ধরা দেয়।

এই তো গেল একটু উপরতলার কথা—নীচুতলায় যাঁরা আছেন এবং যাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সকল মানুষেরই সহানুভূতি আছে, তাঁরাও এই ত্রুটিবিমুক্ত নন। আসুন মফস্বল শহরগুলোর কালেক্টরিতে, আসুন কোর্টে, আসুন পুনর্বাসন দপ্তরে, এমনি করে সরকারী যে-কোন দপ্তরেই যান না কেন, ক্ষুদে কর্মীদের দাপট আপনার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে কোন আবেদন নিবেদন নিয়ে যান, তাদের কথা বলার ভঙ্গি আপনাকে ক্ষুব্ধ করবে এবং না-বলার ভঙ্গি বিস্মিত করবে। আমি এ সম্পর্কে সচেতন যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ পদগুলোতে যাঁরা নিযুক্ত আছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার উপরে আর কোন আয়োজন তাঁদের জন্য হয়নি। কিন্তু মাইনে কম এই যুক্তিতে কাজে ফাঁকি দেওয়া, কাজ না-করা অথবা ভুল করা কিছুতেই দাঁড়ায় না। অথচ সরকারকে এঁরা কি কম গালি পাড়েন? জওহরলাল নেহরু, বিধানচন্দ্র রায় কি এঁদের হাতে কম নাস্তানাবুদ হয়ে থাকেন? আমার প্রশ্ন হল: কোন অধিকারে এই কটূক্তি? যাঁরা নিজেরা সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করতে পারেন নি, সামান্য কাজের পরিধিতে দশটা লোককে অসুবিধায় ফেলেছেন, দু শো টা লোককে দুঃখিত করেছেন, কোটি কোটি মানুষের হাজার বিচিত্র চিন্তায় যাঁরা বিভোর তাঁদের সমালোচনার অধিকার অন্তত সেই সমস্ত মানুষের নেই। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, সরকারী অফিসগুলোতে তিনখানা চারখানা রিমাইন্ডার দিয়েও যে চিঠির জবাব পাওয়া যায় না সেও কি জওহরলাল নেহরুর ইচ্ছায়? পাঁচ মাস অপরিসীম পরিশ্রম করেও যে একখানা এল পি সি পাওয়া যায় না, সেও কি বিধানচন্দ্র রায়ের কারসাজি? যে সমস্ত সরকারী গ্রান্টগুলো দু' মাস তিন মাস পর পর পাওয়ার কথা সেগুলো কখনো ছ' মাস কখনো ন' মাস কখনো এক দুই বছর বাদে পাওয়া যায়—কেন? কে এই প্রশ্নের জবাব দেবে? জানি না প্রশাসনের কোন স্তরে কোন নিষ্ঠুর মানুষগুলোর হাত এতে ক্রিয়াশীল তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ টাকার লেনদেনে প্রতিবারই 'ক্যাবিনেটের ডিসিসান' দরকার হয় না। তাই বলছিলাম, অসত্যের মধ্যেও বোধ হয় একটা সততা রক্ষা করা যায়। যে আমি ভাণ্ডার উজাড় করে খাব, সেই আমিই যদি ভাণ্ডারীকে শূন্য ভাণ্ডারের জন্য দোষারোপ করি—সেখানে আর অসৎ থাকি না, একেবারে খল হয়ে যাই।

আসলে জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় জাতীয় চরিত্র আমাদের গড়ে উঠেনি। এর পেছনে গবেষণাসম্ভব যে গূঢ় কারণই থাক না কেন, এ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়িত্ব পুরোপুরিই আছে। কারণ গত দশ বার বছর বড় ছোট সকল অভাব অভিযোগের ক্ষেত্রে জওহরলাল এবং বিধানচন্দ্র রায়কে কটূক্তি করার ব্যাপারে আমরা যতটা অনুশীলন করেছি নিজের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব বুঝতে তার ভগ্নাংশও প্রয়াস পাইনি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দায়িত্ব, নিষ্ঠা, সততা এবং দেশপ্রেমের যে যুক্ত মানসিকতাবোধের কল্পনা করা হয়েছিল সেখানে প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে আমরা সকলেই জল ঢেলে দিয়েছি।

দেশ নিয়ে আমরা যত বড় কথাই বলি না কেন, দেশ সম্বন্ধে আমাদের সামান্যতম সচেতনতা নেই। যদি থাকতো, আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে এত নির্বিকার থাকতে পারতাম না। আমাদের এই বোধটুকু অন্তত হত, আমার ক্ষুদ্র কাজটির সঙ্গে দেশের এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে পড়ার সম্পর্ক রয়েছে। এ সকল কথার পরেই দুটো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। প্রথমত, এ আমি নিতান্তই আইডিয়ালিজমের কথা বলছি। সাধারণ মেটিরিয়েল মানুষ কোন দেশেই আইডিয়ালিজমের ধার ধারে না। দ্বিতীয়ত, দেশময় এই সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস তো আমাদের সরকারের মধ্যে নেই। এই সচেতনতা যা শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা যায় সে শিক্ষারও কি কোন আয়োজন হয়েছে আমাদের দেশে? প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলতে পারি, উন্নত দেশগুলোর প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই আইডিয়ালিজম আছে তবে তা হয়তো প্রকট হয়ে চোখে পড়ে না, কারণ তা তাদের চরিত্রে অর্থাৎ রক্তের মধ্যে মিশে আছে। আছে বলেই তাদের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্তরে একটা ন্যূনতম সুবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় আমাদের দেশ এখন শৈশব দশায়, কাজেই এই গড়ে উঠা এবং বেড়ে উঠার পর্যায়ে আদর্শবাদিতা প্রায় অপরিহার্য বললে অত্যুক্তি করা হবে না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি: শিক্ষা মানুষকে দায়িত্বসচেতন করে তোলার একটা উপায় বটে, সব এবং শেষ উপায় নয়। প্রমাণ, সাধারণ শিক্ষিত মানুষেদের কথা ছেড়ে দিন, আমি তো দেখি, উচ্চশিক্ষিত মানুষের কর্তব্যে অবহেলা, গাফিলতি, দায়িত্বহীনতা এবং অপপ্রয়াস একটা রেকর্ড সৃষ্টি করতে চলেছে। দেশগঠনের ভিত কোথাও যদি ভীষণভাবে আলগা হয়ে গিয়ে থাকে, এটি হল তার উজ্জ্বলতম কারণ।

রাজনৈতিক নেতাদের কথাই ধরা যাক। এঁদের আচার আচরণ, বলা-কওয়ার ধরন পরিষ্কার প্রকাশ করে যে, দলগতভাবে নির্বাচন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দেশের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে তাঁরা বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের মত অনুন্নত দেশে, অতন্ত্র চিতখাওয়া ও ফাটলধরা দেশে, আইন করে যে সব সমস্যার, মানুষের বিচিত্র চারিত্রিক ত্রুটিকে পরিপূর্ণভাবে সংশোধন করা যায় না এ কথা তো সাধারণ ধারণার বাইরে নয়। ধরা যাক, দেশের এক শ্রেণীর তরুণসমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, উন্মার্গগামিতা, অশালীনতা, গুণ্ডামি ইত্যাদি যে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, কোথাও কোথাও তারা যে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে, এ কথা কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন? নির্বাক বিস্ময়ে ভাবতে হয়, কী অধঃপতন! একেবারে সেই মনুমেন্টাল ফল্। নেতাজী! তোমার উত্তরসাধক দিয়ে, তোমার সহকর্মী দিয়ে, তোমার শিষ্য দিয়ে যদি তোমাকে বিচার করতে হয় তাহলে তুমি ব্যর্থ। জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী! ফলই যদি গাছের আসল পরিচয় হয়ে থাকে, তা হলে তুমি মিথ্যা। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ভারতবর্ষের মহান নেতারা যে দেশপ্রেমের অনির্বাণ বহ্নিবুকে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মুক্তিকামনায় ঘুরে ফিরেছেন, তার কণামাত্রও যদি আজকের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে থাকতো এমন করে সর্বনাশের অতলে দেশটা রওনা হত না। নির্বাচনের

কথা মনে করে শুধুমাত্র ভোট পাওয়ার লোভে এক প্রদেশের মানুষের উপর অন্য প্রদেশের মানুষের বর্বরোচিত আক্রমণ, নারী-ধর্ষণের ঘৃণ্যতম অপরাধ একটি নেতার কম্বুকণ্ঠে ঘৃণিত হল না। এ লজ্জা রাখার স্থান আমাদের নেই। জানি এর পরই আজকের রাজনৈতিক নেতারা আমাকে থিওরী, ইডিওলজি এবং প্রসেস-এর কথা শোনাবেন। কিন্তু এ সব কিছুর উপরে ব্যক্তিগত দায়িত্ববুদ্ধি কি অনেক বড়ো নয়? ব্যক্তি যেখানে কলুষিত সেই মরুভূমিতে ইডিওলজির ফাঁকা আওয়াজ কি এক ফোঁটাও বৃষ্টি আনতে পারবে? পার্লামেণ্ট এবং বিধানসভায় আসন সংগ্রহ যেখানে প্রধান এবং প্রধান উদ্দেশ্য সে দেশের নেতাদের অন্তরে যে ইচ্ছাই দাউদাউ করে জ্বলুক না কেন, তা যে দেশের প্রতি শুভবুদ্ধি উৎসারিত নয়, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বঙ্কিম [illegible] যাঁদের চরিত্রশক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে একদিন বলেছিলেন: "[illegible] আদর্শবাদের [illegible] শক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ-সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে"—আজ তাঁদের একজনও যদি উত্তর-সাধক থাকতো, মন সান্ত্বনা পেত।

শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। এত বড় শূন্যতা, এমন বিষম অরাজকতা কোন দেশে কোন কালে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। শিক্ষা বিভাগের পরি-কল্পনা এবং প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত পদস্থ ব্যক্তিদের মমতাহীনতা ইতিহাস হয়ে থাকবে। কোন পর্যায়ে যদি এতটুকু আন্তরিকতা, এতটুকু বিবেচনা থাকতো তাহলে শিক্ষকদের বারবার করে পথে নামতে হত না। স্বাধীনতার পূর্বকালে আমরা দেখেছি সব চাইতে নিপীড়িত শ্রেণী আমাদের মাস্টারমশায়েরা। রাষ্ট্র এঁদের যা দিত তাতে কোনরকমে জীবন রক্ষা হত মাত্র। শিক্ষকতার পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি কোন দিন কোন অভিযোগ পর্যন্ত ওঁরা করেন নি—অথচ যেটুকু নিষ্ঠার প্রতি বিশ্বাস, সততার প্রতি বিশ্বাস, আদর্শবাদিতার প্রতি বিশ্বাস দেশ পেয়েছে, সে তো এঁদেরই কাছ থেকে। তবে কেন দেশ গড়ার লগ্নে তাঁদের এমন নির্মম অস্বীকৃতি? আমার বিশ্বাস পৃথিবীর কোন ইজ্‌মই এঁদের অস্বীকার করে না, অস্বীকার যদি করে সে ঘুণধরা কতগুলি মানুষের অশুভ বুদ্ধি।

এবার শিক্ষার মূল প্রাঙ্গণে নেমে আসা যাক। সেখানেও দায়িত্বহীনতার ছিদ্রহীন বাসা। আজকাল পত্রপত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়, হয় কথায় নয় কথায় ছাত্রদের লক্ষ্য-ভ্রষ্টতার উপর সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অধ্যক্ষ-অধ্যাপকরা একজনও কি বলতে পারবেন ছাত্রদের এই হীন অবস্থার জন্য তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই? যুক্তির জটিল কৌশলে জীবন এবং জগৎ, সমাজ এবং মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারে আত্মপক্ষ হয়তো সমর্থন করা যেতে পারে। কিন্তু নিতান্তই মোটাকথার কতগুলি প্রশ্ন তবু

তোমার হেঁজিপেঁজি জায়গা নয়। এর নাম কলকাতা, এ শহর কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না। এখানে সব সময় ট্যাক্সি পাওয়া যায়।"

ভদ্রমহিলা আমাকে ডেকে বললেন, "আমরা যখন খুশি ট্যাক্সি পেতে পারি?"

আমি মিথ্যেকথা বলতে পারলাম না। বললাম, "তাই তো আইনে বলে, কিন্তু কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের এত রাত্রে কোথাও যেতে রাজী করানো একটা সমস্যা। তবে আমার পক্ষে ঠিক করে বলা শক্ত।"

"কেন? কেন?" ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সাতপাঁচ না ভেবে বলে ফেললাম, "এখানে সাধারণত যাঁরা আসেন তাঁদের ড্রাইভাররা বাইরে গাড়ি নিয়ে সায়েবমেমদের জন্যে অপেক্ষা করে। ট্যাক্সি-ওয়ালারা এখানে অপেক্ষা করে করে, খদ্দের না পেয়ে এখন চালাক হয়ে গিয়েছে।"

এর উত্তরে ভদ্রলোক কী বলতেন কে জানে; কিন্তু তার আগেই বোসদা আমাকে [illegible] একটু দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। ফিসফিস করে বললেন, "কাকে তুমি ও-সব কথা বলছিলে? [illegible] বিশ্বাস। এক সময় লাখ লাখ টাকার মালিক ছিলেন। [illegible] একবার [illegible]। এখন সব গিয়েছে।"

"মিসেস বিশ্বাসকে দেখে [illegible] মনে হলো না [illegible] মুখে বা দেহে কোনো ছাপ ফেলতে পেরেছে।"

বোসদা হেসে ফেললেন। "কাকে তুমি মিসেস বিশ্বাস বলছো? মিস্টার বিশ্বাসের সঙ্গে যে ভদ্রমহিলা বসে রয়েছেন? [illegible] এই সংসারে আবার সম্পর্কের কথা কেন? [illegible], পরিবার, তুমি কার, কে তোমার?"

আমি বোসদার মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা বললেন, "[illegible] মিস্টার বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস হারিয়ে কবে কোথায় চলে গিয়েছেন। ঐ ভদ্রমহিলা [illegible] এক টুকরো [illegible]। নতুন লোক। কলকাতার বাইরে থেকে এসেছেন। ও তো কথা থেকেই বুঝলাম। কলকাতার রাত্রিকে তেমন চেনেন না। এই ট্যাক্সি করে তাড়াতাড়ি পালাতে চান। শাজাহানের এই পান্থশালায় এমন কত আসছে, কত যাচ্ছে, কে তার খোঁজ রাখে?"

সত্যসুন্দরদা বললেন, "তুমি দাঁড়াও। আমি ড্রিংকের খবরটা নিয়ে আসি। আর কতক্ষণ? এরই মধ্যে যতটা পারা যায় ড্রিংক সেল করে নিতে হবে। ড্রিংক বিক্রি না হলে শাজাহানের ক্যাবারেকে উঠে যেতে হবে।"

সত্যসুন্দরদা চলে যাবার পরমুহূর্তেই শুনলাম, একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর আমাকে ডাকছেন। "হ্যালো, স্যার, একটু শুনুন না।"

ফোকলা চ্যাটার্জির টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম। ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, "না-হয় সামনের টেবিলে বসিনি। তাই বলে একটু আমাদের কমফর্টের দিকে নজর দেবেন না!"

আমি বললাম, "সে কি! আপনাদের হুকুম তামিল করবার জন্যে আমরা সবাই রয়েছি।"

ফোকলা বললেন, "দেখুন না, ভাগনেকে নিয়ে কী বিপদে পড়েছি। শুধু বলছে, ফিরে চলো ফিরে চলো।"

মাস্টার পাকড়াশির দিকে তাকালাম। বেচারার চোখে ঘুম জড়ো হয়ে রয়েছে।

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন, "ভাগনেটাকে হাতেখড়ি দিতে নিয়ে এলাম, একটু আদর আপ্যায়ন করুন—না হলে শাজাহান হোটেল সম্বন্ধে খারাপ ওপিনিয়ন হয়ে যাবে।"

আমি জুনিয়ার পাকড়াশিকে নমস্কার করে বললাম, "আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? আপনার মামার সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের সম্পর্ক। নিজের মনে করে শাজাহান হোটেলকে ব্যবহার করবেন।"

মামা এবার ভাগনেকে বললেন, "খাঁ বাবাজী, স্পোর্টিং স্পিরিটে লাইফটা এনজয় করো। কতক্ষণের জন্যেই আর আমরা এই পৃথিবীতে ব্যাটিং করতে এসেছি। যতক্ষণ ক্রিজে থাকো, উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে খেলে যাও।"

শ্রীমান পাকড়াশি ক্রিকেটের উপমায় একটু হেসে ফেললে।

মামা বললেন, "তোমার বাবার সমালোচনা করা উচিত নয়। কিন্তু ওঁর নজর শুধু এক দিকে। শুধু বিজনেসের কথাই ভেবে গেলেন। উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে খেলবার চেষ্টা করলেন না।"

মামা এবার শূন্য গেলাসের দিকে নজর দিয়ে বললেন, "গেলাসে যে কিছুই নেই। তাই বলি, কথাবার্তায় ফ্লো আসছে না কেন। পেট্রল ট্যাংক খালি থাকলে গাড়ি চলবে কী করে? কিছু একটা কুইক্‌লি সাজেস্ট করুন। এখনই তো আবার শো আরম্ভ হয়ে যাবে।" ফোকলা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন।

"আদি অকৃত্রিম হুইস্কি। ওর মতো জিনিস নেই।" আমি বললাম।

ফোকলা চ্যাটার্জি সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "না মশাই, প্লেন অ্যান্ড সিমপ্‌ল্‌ হুইস্কি তো সেই অ-আ-ক-খ পড়বার সময় থেকে চালিয়ে আসছি। স্পেশাল ককটেল কিছু সাজেস্ট করুন।"

বললাম, "পিংক লেডি।"

"জিনের সঙ্গে ডিমের সাদাটা মিশিয়ে যা তৈরি হয় তো? না মশাই, ওটা আমার মোটেই ভালো লাগে না।"

"তা হলে হোয়াইট লেডি।"

"জিন আর লাইমের ভদ্র নাম! না মশাই। আপনার ইমাজিনেশন এমন পুওর হয়ে যাচ্ছে কেন? জিন ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছেন না। আমাদের বন্ধু স্যাটা বোসকে ডাকুন।"

সত্যসুন্দরদা আমার ইঙ্গিতে দ্রুতবেগে এগিয়ে এলেন।

ফোকলা চ্যাটার্জি হাসতে হাসতে বললেন, "যেমন আমার ভাগনে, তেমন আপনার এই শিষ্যটি। এখনও নভিস। একটা সুটেব্‌ল ড্রিংকের বুদ্ধি দিতে পারছে না। শ্রীমানের কাছে মামার প্রেস্টিজ আর থাকবে না।"

সত্যসুন্দরদার চোখ দুটো বুদ্ধির দীপ্তিতে দুলে উঠলো। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, "এই সব জেন্টলম্যানেরা নতুন আইডিয়া নিয়ে আসছে। আমরা আপনারা সেকেলে হয়ে পড়েছি। সেইজন্য আমি যে ড্রিংক সাজেস্ট করছি তার নাম ওল্ড ফ্যাশনড। কানাডার হুইস্কির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুট মেশানো।"

ফোকলা বললেন, "চমৎকার।"

বোসদা বললেন, "মাইন্ড করবেন, এই ড্রিংক আপনার পছন্দ না হলে আমি যা সাজেস্ট করতাম তার নাম মস্কো মিউল।"

"আঁ! এই বুড়ো বয়সে মিউল! ছি ছি, লোকে বলবে কী!" ফোকলা চ্যাটার্জি হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

শ্রীমান পাকড়াশি এবার আস্তে আস্তে বললে, "আমি কিন্তু মামা আর খাবো না।"

ফোকলা বিরক্ত হয়েই যেন বললেন, "কি মুশকিলেই যে পড়া গেল! ওরে, তুই আর খোকাটি নেই! বাড়িতে ফিরে গিয়ে তোর বার্থ সার্টিফিকেটটা একবার এক্‌জামিন করে দেখিস। সেই তো সেবার ভূমিকম্পের বছরে তোর জন্ম হলো। তোর বাবার তখন ঘোর দুর্দিন। ডিপ্রেসনে সব যেতে বসেছে। তুই হয়েছিস খবর পেয়ে পাকড়াশি সায়েবকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে বিলেত থেকে চিঠি পাঠালাম। তা তোর বাবা আমাকে কি লিখে পাঠালে জানিস? হা-হা-হা!" ফোকলা চ্যাটার্জি যেন অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন।

পাকড়াশি জুনিয়র মামার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

হাসির ঝড়টা কোনো রকমে সামলে নিয়ে ফোকলা বললেন, "তোর বাবা লিখলে কী করে সংসার চলবে জানি না। বোধ, মাধব পাকড়াশি নিজের হাতে লিখছে। সেই সব চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে কি বোকামিই না করেছি! বোস সায়েব, আমাকে দেখো
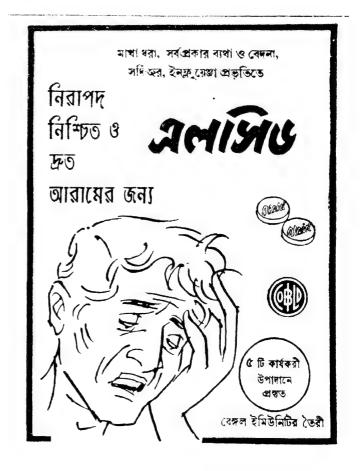
ড্রিংকটাই দাও। আমি ওল্ড-ফ্যাশানড্ নই। মস্কো মিউল ছাড়া আমাকে কিছুই মানায় না। ক্যালকাটা অ্যাস বলে যদি কিছু থাকে তাও দিতে পারো।"

"আর ওঁকে?" পাকড়াশি জুনিয়রের দিকে ইঙ্গিত করে আমি প্রশ্ন করলাম।

বোসদা বললেন, "মিস্টার চাটার্জি, এরা ইয়ংম্যান। জীবনটা এখন এদের কাছে স্পার্কলিং রাইন ওয়াইনের মতো। আপনার অনুমতি নিয়ে মিস্টার পাকড়াশিকে স্পার্কলিং রেড হক দিই। ওয়াণ্ডারফুল জিনিস। আমার জন্মবছরে বোতলে ভরা হয়েছিল।"

"ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল। এই-জন্যেই স্যাটা বোসকে না হলে আমার চলে না। শাজাহান হোটেল মাইনাস স্যাটা বোস ইজিকুয়াল্টু মাধব ইণ্ডাস্ট্রিজ মাইনাস মাধব, হ্যামলেট মাইনাস প্রিন্স অফ ডেনমার্ক, বাংলা সাহিত্য মাইনাস রবি ঠাকুর, রামকৃষ্ণ মিশন মাইনাস বিবেকানন্দ, অ্যাণ্ড লাস্ট বাট নট দি লিস্ট ফোকলা চাটার্জি মাইনাস ড্রিংক।"

হা-হা করে হাসছেন ফোকলা চাটার্জি। কিন্তু হাসতে হাসতেই যেন তিনি কেমন হয়ে পড়লেন। স্যাটাদাকে বললেন, "ড্রিংক ছাড়া আমি থাকতে পারি না, মশাই। কিছুতেই পারি না। বেলা পড়লেই, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার যেমনি কলকাতাকে ঘোমটা পরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে, আমি অমনি যেন কেমন হয়ে যাই। বেলা যে পড়ে এল জলকে চল, পুরনো সুরে কে যেন আমাকে ডাকতে আরম্ভ করে।"

ফোকলা চাটার্জির এই আকস্মিক পরিবর্তনে শুধু আমার নয়, পাকড়াশি জুনিয়রও যেন ভয় পেয়ে গেল। সে বললে, "মামা।"

মামা তখন সত্যসুন্দরদার হাতটা ধরে বলছেন, "আমার কেন এমন হয় বলতে

হয়তো ভাবছেন প্রতিদিনই এমন হয়। আর যাঁরা আগেও কনিকে দেখেছেন, তার নৃত্য উপভোগ করেছেন, হুইস্কি, জিন এবং রামের কল্যাণে তুলনামূলক সমালোচনা আজ তাঁদের ক্ষমতার বাইরে।

তবু দর্শকরা ফানুস ফাটালেন। সর্ব-জাতির আদিম উল্লাস যেন একদেহে মমতাজের এই ঐতিহাসিক কক্ষে লীন হয়ে গেল।

তবু সংক্ষিপ্ত। আজ যেন অনেক আগেই বিষণ্ণ নর্তকী দর্শকদের শিকারীচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আবার আলো জ্বলে উঠলো। মৃদু গুঞ্জনে মমতাজের হলঘর ভরে উঠলো। বাড়ি ফেরবার তাড়ায় কে আগে হলঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

তারই মধ্যে গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো অভ্যস্ত কায়দায় আমি লেডিজ অ্যান্ড জেণ্টলমেনদের উদ্দেশে শাজাহান হোটেলের বিদায় অভিনন্দন পুনরাবৃত্তি করলাম।

তাঁরা কেউ হয়তো আমার কথা শুনলেন না। আমার শুভ-রাত্রি জানানোতে তাঁদের কিছুই এসে যায় না।

হয়তো আমারও এসে যায় না। কনিরও এসে যায় না। ল্যামব্রেটারও এসে যায় না।

সেই মুহূর্তে, শুধু এক বিচিত্র পাগ-লামির প্রকোপে, আমার মনে হলো, যাঁদের আমি বিদায় জানালাম তাঁদের সকলের হাতেই বড়ো বড়ো নখ রয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন নয়, সবাই যেন একসঙ্গে কনিকে আক্রমণ করে জর্জরিত করেছে।

কনি আমার জন্যে অপেক্ষা করেনি। ল্যামব্রেটাকেও দেখতে পেলাম না।

মাইকটাকে যথাস্থানে সরিয়ে দিয়ে, বেয়ারাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে হল থেকে বেরোতে গিয়ে সত্যসুন্দরদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"কনি কোথায়?" সত্যসুন্দরদা প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "জানি না, আলো নেববার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে।"

সত্যসুন্দরদা বললেন, "বেশ গোলমেলে পরিস্থিতিতে পড়া গেল!"

"কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ম্যানেজার অসন্তুষ্ট হয়েছেন। লাস্ট সিকোয়েন্সের সময় জিমি দাঁড়িয়ে ছিল। সে বোধ হয় মার্কোর কাছে লাগিয়েছে।"

শুনলাম, ম্যানেজার কনির মনঃসংযোগের অভাব লক্ষ করেছেন। জিমির সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হয়েছে। জিমি বলেছে, "কম্পিটিশানের মার্কেট, একবার বদনাম রটলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্য হোটেলে তিন তিনটে মেয়ে গতকাল থেকে একসঙ্গে নাচতে শুরু করবে। ওরা বলে বেড়াচ্ছে, এক মায়ের তিন মেয়ে। তিন বোন না ছাই। একদম মিথ্যে কথা। আঠারো বছর বয়সের আগে ছুঁড়িরা কেউ কারুর মুখ দেখেনি। আর এখানে বিজ্ঞাপনের জোরে তিন বোন হয়ে গিয়েছে।"

বোসদা বললেন, "ম্যানেজার কি করে ল্যামব্রেটার কথা শুনলো? তুমি কিছু বলেছো?"

"আমি?" অবাক হয়ে বোসদার মুখের দিকে তাকালাম।

বোসদা বললেন, "ওঁদের ধারণা যত নষ্টের গোড়া ওই বেঁটে সায়েব। ওর জন্যেই কনির নাচ খারাপ হচ্ছে।"

আমি বললাম, "ও বেচারার কি দোষ? একজন পাবলিক তো কনিকে আঁচড়ে দিয়ে সব গণ্ডগোল করে দিল।"

বোসদা বললেন, "ম্যানেজার কিছু একটা করবেন। সেইজন্যেই আমাকে ডেকে-ছিলেন।"

"কী করবেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

বোসদা হাসলেন। বললেন, "এত উতলা হচ্ছো কেন? এত বড়ো হোটেল চালাতে হলে ম্যানেজমেণ্টকে কত কী করতে হয়।"

আমার কেন জানি না ভয় হলো, কনির কোনো ক্ষতি হবে। আমার অজ্ঞাতে কখন যেন ওদের আমি ভালবাসতে শুরু করেছি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোসদা যেন, সব বুঝতে পারলেন। হেসে বললেন, "বলে দিয়েছি না, এর নাম পান্থশালা। কেউ এখানে থাকবে না। কারুর উপর মায়া বাড়িয়ো না।"

আমি বোসদার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ দুটো সরিয়ে নিলাম।

বোসদা বললেন, "দোষ তো কনিরই। হোটেলের চাকরবাকরদের পর্যন্ত বামনটাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। জিমি নিজে বললে, কনি বামনের জন্যেও একটা এয়ারকণ্ডিশন ঘর দাবি করেছিল।"

আমি তখন ওসব শুনতে চাই না। ম্যানে-জার ও জিমি কি ফন্দি এঁটেছেন, তাই জানতে চাই।

কিন্তু জানা হলো না। বোসদা কিছু প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। আমিও বোসদার মুখচোখের ভাব দেখে আর জোর করতে সাহস করলাম না। (ক্রমশ)

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে

অসীমকুমার রায়

পঁচিশ তিরিশ বছর আগে আমার ছেলেবেলায় বাঙলা দেশে এক রকম খেলা ছিল। সাত আটজন ছেলেমেয়ে কয়েকটি উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াত, আর যে চোর বা কুমির হত সে এক এক-জনের কাছে গিয়ে বলত, 'খোকা খুকি দে না।' এর জবাবে বলতে হত, 'উসকো বাড়ি যা না।' আমরা যারা উত্তর প্রদেশে মানুষ হয়েছি তারা 'উসকো বাড়ি যা না' শুনে মনে মনে হাসতাম, বাঙালী ছেলে-মেয়েদের হিন্দী বলবার অক্ষম চেষ্টা দেখে। হিন্দী ব্যাকরণ অনুসারে 'উসকো' যে ভুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু 'উসকো বাড়ি যা না'-কে যদি ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে হয়, তা হলে দেখা যায় ভাষা-তত্ত্ববিদেরা এই পদটিকে ভুল না বলে হিন্দীরই কোন 'বোলী' হবে বলে মত দেবেন। বাঙলা ভাষার সম্বন্ধ পদে 'কো' বিভক্তি থাকতে পারে না, আর হিন্দীর বিশেষত্বই হল ষষ্ঠীর বিভক্তি হিসেবে 'কা', 'কো', 'কী', 'কে' ইত্যাদি থাকা।

শ্রীকিশোরীদাস বাজপেয়ী তাঁর 'হিন্দী শব্দানুশাসন' (নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী ১৯৫৮ খৃঃ) গ্রন্থে হিন্দী ভাষা চেনবার এই উপায় দিয়েছেন। বাজপেয়ীজির মতে যদি কোন ভাষার ষষ্ঠীর বিভক্তি 'কা', 'কী', 'কে', 'কো' হয় তা হলে সেই ভাষা হিন্দী। রাষ্ট্রভাষায় বলে হয় 'রাম কা লড়কা'। এখানে 'কা' ব্যবহার হয়েছে। অতএব রাষ্ট্রভাষা হিন্দী। বিদ্যাপতির মৈথিলীতে সর্বত্র 'ক' ব্যবহার হয়, তাই বিদ্যাপতির মৈথিলী হিন্দী। এমনিভাবে মগহী, ভোজপুরী, ছত্তীসগড়ী, অবধী, বঘেলী, বুন্দেলী, ব্রজভাষা, কৌরবী ইত্যাদিতে ষষ্ঠীর বিভক্তি 'ক' দিয়ে, তাই এরা সবাই হিন্দী। আরও পশ্চিমে গেলে 'ক' শেষ হয়ে গিয়ে 'দ' আরম্ভ হয়ে যায়। যেমন পাঞ্জাবীতে বলে, 'রাম দা পুত্তর'—রামের ছেলে। তাই পাঞ্জাবী এই নিয়ম অনুসারে স্বতন্ত্র ভাষা—হিন্দীর কোন উপভাষা নয়। তেমনি গুজরাটীতে বলে, 'রাম নো ছোকরো'; মরাঠীতে বলে, 'রামা চা মুলগা', তাই গুজরাটী বা মরাঠী হিন্দীর উপভাষা নয়, স্বতন্ত্র ভাষা।

বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা ব্রজভাষার ভাষা বানাবার চেষ্টায় যে ব্রজবুলির সৃষ্টি করেছিলেন, তাতেও ষষ্ঠীর বিভক্তি 'ক'। রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলীতে এই নিয়মই অনুসরণ করেছেন, "শ্যামকো পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে"।

প্রশ্ন হতে পারে, [illegible] ভাষা হিন্দী কেন? জয়পুরী অথবা আর কোন [illegible] অঞ্চলের হাড়ৌতী ভাষায় ষষ্ঠীর বিভক্তি 'ক' দিয়ে। তাই বাজপেয়ীজির নিয়ম অনুসারে এই দুই ভাষা হিন্দী। কিন্তু মারোয়াড়ী বা মেবাড়ীতে এই 'ক' নেই। এই দুই ভাষায় বলে, 'রাম রো ছোরো'। কাজেই মারোয়াড়ী বা মেবাড়ী এই নিয়ম অনুসারে হিন্দী নয়।

'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস' (ষোড়শ ভাগ) থেকে যে সব প্রাদেশিক ভাষায় ষষ্ঠীর বিভক্তিতে 'ক'-এর ব্যবহার আছে তাদের কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :—

(১) মৈথিলী (দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া)—"গমে গমে নদী কে পানী সুখল গেল"—পৃঃ ১০

(২) মগহী (পাটনা, মুঙ্গের ইত্যাদি)—"এক রাজা কে এগো রানী হল।"—পৃঃ ৪১

(৩) ভোজপুরী (পশ্চিম বিহার অর্থাৎ আরা, ছাপরা ইত্যাদি ও পূর্ব উত্তর প্রদেশ অর্থাৎ বেনারস, গোরখপুর ইত্যাদি—"বড়া ভইলা পর মানিক চন্দকে বিআহ এগো রাজা কে লড়কী সে ভইল।" —পৃঃ ৯৪

(৪) বঘেলী (রীওয়া অঞ্চল—"এক রহৈ ব্রাহ্মণ। উনকে এক ঠে লড়কে ভর রহে, বস।"—পৃঃ ২৬৯

(৫) ছত্তীসগড়ী (মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ—রায়পুর, বিলাসপুর ইত্যাদি) "পর টিরিয়া কে মুখ নই দেখোঁ"—পৃঃ ২৮

(৬) বুন্দেলী (মধ্যপ্রদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল—"রাজো এক লড়কা হতো"। —পৃঃ ৩২৫

(৭) ব্রজভাষা (মোরাদাবাদ, বরেলী, আগরা, মথুরা, ভরতপুর, ঢোলপুর)—"[illegible] কা [illegible] কৌ সওরদা"। —পৃঃ ৩৫৮

(৮) অবধী (ফয়জাবাদ, লখনউ, কানপুর অঞ্চল)—"[illegible] কা বাচ্চা কভী না মচ্ছা"।—পৃঃ ১৯১

(৯) মালবী (ইন্দোর ও নিকটবর্তী এলাকা—"উনকে দেখো কে উনকী থালী মেঁ খীর নে, বহু কী থালী মেঁ রাবড়ী হায়"—পৃঃ ৪৩২

(১০) কৌরবী বা কুরুজনপদের ভাষা (মেরঠ, দিল্লী, [illegible], পানীপত অম্বালা)

—"এক রাজা কী বেটী থী, নাম থা উসকা গোরা"।—পৃঃ ৪৮০

(২)

বিহারে মিথিলা থেকে আরম্ভ করে পাঞ্জাবে অম্বালা অবধি বিস্তৃত অঞ্চলের নানা রকম ভাষার সব কটিকেই হিন্দী বলা হয়। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে যে, যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলা হয় এই ভাষাগুলির মধ্যে কোনটি সেই হিন্দী? রাষ্ট্রভাষার একটি বিশেষত্ব এই যে, এতে অধিকাংশ পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে আকার থাকে, যেমন লড়কা, মীঠা, বড়া, খাতা ইত্যাদি। এই বিশেষত্ব আছে হিন্দীর উপভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র কৌরবী বা কুরুজনপদের (মেরঠ ডিভিশনের) ভাষায়। যেমন কৌরবীতে বলবে, "মীঠা পানী"; আর অবধীতে বলবে, "মীঠ পানী"; আর ব্রজভাষাতে বলবে, "মীঠো জল"। হিন্দীতে আকার লেখবার চিহ্নকে বলে, "খড়ী পাঈ"। তাই বোধ হয় কুরুজনপদের ভাষার সাধুরূপের নাম দেওয়া হয়েছে "খড়ী বোলী"। আমাদের রাষ্ট্রভাষা এই খড়ী বোলী, অর্থাৎ কৌরবীরই একটি সংস্কৃত রূপ।

কৌরবী কথা ভাষা। কৌরবীতে বলে, 'ধোত্তী', 'কাণ্টা', 'দেখ্খা', 'পড়্ডা'। খড়ী বোলী বা রাষ্ট্রভাষায় এই শব্দগুলিকে বলা ও লেখা হবে 'ধোতী', 'কাঁটা', 'দেখা', 'পড়া'। কৌরবীতে কতগুলি মহাপ্রাণ বর্ণ যেমন 'থ' বা 'ঝ' অল্পপ্রাণ অর্থাৎ 'ত', 'জ' ইত্যাদি ভাবে উচ্চারণ করা হয়, তা ছাড়া এই ভাষায় 'হ' উচ্চারণ স্পষ্ট নয়। যেমন কৌরবীতে বলবে "বেটী নে নাঈ বাম্মন কু বুল্লাকে কাম দিয়" বা "বর সিরজী মারাজ তে"। এই দুটি বাক্যকে রাষ্ট্রভাষায় লেখা হবে, "বেটী নে নাঈ ব্রাহ্মণ কো বুলা কে কহ দিয়া" আর "বহ শিবজী মহারাজ থে"। মোট কথা, বাংলাদেশের অঞ্চলের কথাভাষার সঙ্গে কলকাতাই বাঙলা ভাষার যে সম্পর্ক কৌরবীর সঙ্গে খড়ী বোলী বা রাষ্ট্রভাষারও অনেকটা সেই সম্পর্ক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "আমরা সকলেই বলি 'পাট', 'মেগ', 'শপত', 'শট', 'বাদ', 'দুব্বল', 'নেত্য'। কিন্তু লিখিতে হইবে 'স্পষ্ট', 'মেঘ', 'শপথ', 'শঠ', 'বাধ', 'দুর্বল', 'নৃত্য'।" (সহজ রচনা শিক্ষা)

(৩)

হিন্দীর অনেক উপভাষার মধ্যে এই খড়ী বোলী রাষ্ট্রভাষা হওয়াতে নতুন শিক্ষার্থীদের হিন্দী ভাষা শেখবার একটা বড় অসুবিধা হয়েছে। এই অসুবিধা ঘটিয়েছে 'নে' বিভক্তি।

সকলেই জানেন যে, হিন্দীতে ক্রিয়ার লিঙ্গ ও বচন সাধারণত কর্তার লিঙ্গ ও বচন অনুসারে হয়। যেমন "রাম যাতা হ্যায়", "সীতা যাতী হ্যায়", "লড়কে যাতে হ্যাঁয়"। ক্রিয়া অকর্মক হলে 'নে' ব্যবহার হয় না, যেমন "রাম গয়া" বা "সীতা গঈ"। শুধু সকর্মক ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমানে, আর সাধারণ ও পুরাঘটিত অতীতে ("রাম ভাত খেয়েছে", "রাম ভাত খেল", "রাম ভাত খেয়েছিল") "নে" ব্যবহার হয়। আর "নে" ব্যবহার হলে ক্রিয়ার লিঙ্গ ও বচন কর্তার মত না হয়ে কর্মের মতন হয়। যেমন, "রাম নে খানা খায়া", "সীতা নে খানা খায়া"। "খানা" শব্দ হিন্দী পুংলিঙ্গ। তাই রাম বা সীতা যেই খানা খান "খায়া" ব্যবহার হবে। তেমনি 'বাত' স্ত্রীলিঙ্গ। তাই "রাম নে বাত কহী" আর "সীতা নে বাত কহী"। অর্থাৎ রামের বেলাতেও 'কহী' হবে, 'কহা' নয়। যদি কেউ ভাবেন যে, নিয়মটা একটু গোলমেলে হলেও এমন কিছু শক্ত নয়, একটু সাবধানে কথা বললেই হবে, তা হলে এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম আর এক নিয়মের কথা বলতে হয়। এই পাঁচটি বাক্য দেখলেই বোঝা যাবে যে, এগুলিতে ক্রিয়া কর্তা বা কর্ম কারুর লিঙ্গ বা বচন অনুসরণ করেনি :—(১) রাম নে লড়কে কো দেখা, (২) রাম নে লড়কী কো দেখা, (৩) সীতা নে লড়কে কো দেখা, (৪) সীতা নে লড়কী কো দেখা, (৫) রাম ঔর সীতা নে লড়কোঁ কো দেখা। অর্থাৎ কর্তা আর কর্মের লিঙ্গ ও বচন যাই হোক না কেন, 'দেখা' সেই 'দেখা'ই আছে। হিন্দী বৈয়াকরণেরা বলেছেন, এখানে ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়েছে ভাববাচ্য, অর্থাৎ ভাবই এখানে প্রধান, কর্তা বা কর্ম নয়। যাঁরা বৈয়াকরণ নয়, শুধু কাজ চালাবার মত হিন্দী শিখতে পারলেই সন্তুষ্ট তাঁদের জন্য নিয়মটা সহজ করে বলা যায় : যদি কর্তায় 'নে' বিভক্তি আর কর্মে 'কো' বিভক্তি থাকে, তা হলে ক্রিয়ার সব সময় একবচন পুংলিঙ্গ থাকবে।

হিন্দীর সব উপভাষাতে 'নে' নেই। তুলসীদাস যে ভাষায় 'রামচরিত মানস' রচনা করেছেন সেই অবধীতে 'নে' একেবারে নেই। অবধী উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ অঞ্চলের ভাষা। লখনউর ভাষা স্ট্যাণ্ডার্ড না হয়ে দিল্লির ভাষা যে প্রাধান্য পেল তা একটু আশ্চর্য মনে হয়। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, মোগল আমলের শেষের দিকে খড়ী বোলী দিল্লির শিষ্ট সমাজের ভাষা ছিল। উর্দুর সঙ্গে খড়ী বোলীর নিকটসম্পর্ক। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর, উর্দুভাষীরা লখনউ আর উত্তর প্রদেশের অন্য শহরে ছড়িয়ে পড়েন। উর্দু আর খড়ী বোলী তখন উত্তর প্রদেশের শহুরে ভাষা হয়ে যায়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবধী, ব্রজভাষা প্রভৃতি কোনদিনই জাতে উঠতে পারেনি।

কারণ যাই হোক, খড়ী বোলীই এখন আমাদের রাষ্ট্রভাষা। তাই খড়ী বোলীর 'নে' চিরকালই থাকবে, আর নতুন হিন্দী শিক্ষার্থীদের বিপদে ফেলবে।

জন্ম হয়েছিল, অন্যতম। তাই এবারের তুষারপাত নানা দিক থেকেই খৃষ্টীয় উৎসবকে মহিমামণ্ডিত করে তুলেছিল।

এই Weihnacht-এর উৎসবে বিভিন্ন পরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে বিদেশীদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। আমার প্রিয়তম সহকর্মী Dr. Bayerকে দিয়ে আমি যাত্রা শুরু করি। এমন দিনে চোখে মুখে বরফ মেখে আমি তাঁর বাড়িতে সেদিন এসেছিলাম। ডক্টর বায়ারের প্রসংগ এখানে টানতে হচ্ছে এই জন্যে যে, এমন উৎসবের দিনে বরফের দৃশ্যে এদেশের অনেক মানুষের হৃদয়ে কি গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে, তা ডক্টর বায়ারকে না জানলে, জানা হত না। এ দেশের শীত ও বরফের আলোচনা হচ্ছিল। বাংলা দেশের মাটি আর মানুষের সুখ-দুঃখের চালচিত্র, তার ধর্ম, তার জীবনের ব্যাপক উৎসব দুর্গাপূজো, সেই সাথে কাশফুল আর শরতের নির্মল আকাশের বর্ণনা দিয়ে, তার সাথে এ দেশের তুষারমণ্ডিত বড়দিনের উৎসবের প্রতি আমার গভীর মনোভাব ব্যক্ত করতেই ডক্টর বায়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভগ্ন-কণ্ঠে বললেন—"সত্যি, আমাদের এই ভাইনাখ্‌ট্, সেই সাথে বরফ—এর তুলনা নেই। বাইরে তুষার-ঢাকা পথে পথে, পার্ক আর গ্রুনেভাল্ডে নর-নারী ও শিশুদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। কিন্তু মিঃ রাহমা, এই তুষার পড়তে শুরু করলেই আমি আর বাইরে তাকাতে পারি না। মনে পড়ে যায় ১৯৪১-৪২ সালের শীত আর বরফের কথা, রাশিয়ায় আমাদের জার্মান ফ্রন্টের কথা। সেবারের বরফে আমার স্কুলের সমস্ত বন্ধুরা একে একে মারা যায়। কেউ বাঁচে নি। উঃ, সে এক দুঃস্বপ্নময় বছর গেছে। আমি ছিলাম নৌ-বিভাগে। তাই বেঁচে রয়েছি। কিন্তু একে একে আমার বন্ধুদের মায়ের কাছ থেকে চিঠি পেতে শুরু করলাম—পেটার নেই, ক্লাউস নেই, নেই ওলফ্‌গাংগ, ইয়রগেন্, হান্স আরো অনেকে। ভাবতে পারো মিঃ রাহমা, যুদ্ধের গুলীতে নয়, খাদ্যের অভাবেও নয়, কেবল শীত—শুধু আকাশ-ভাঙা বরফের নীচে হাজার হাজার তাজা যুবকের রক্ত মাংস জমাট বেঁধে গেল। গরম জামা-কাপড়ের অভাবে অসহায়ের মত আমার বন্ধুরা মাত্র উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে মারা গেল।" বাইরে তখন তুষার পড়ছে। ডক্টর বায়ারের চোখ ছলছল করছে। এমনি বেদনাঘন মুহূর্তে এই মানুষটির কাছ থেকে জার্মানীর অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের আর পরিণামের অনেক ইতিহাস আর গল্প জানা যায়।

জার্মানদের কাছে আমার অনেক ঋণ। তাঁদের বন্ধুত্ব, পরোপকার আর হৃদয়বত্তার তুলনা হয় না। মাত্র সেদিন যে জাতটা ধ্বংসের স্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াল, তাঁদের কাছে এর বেশী কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু এই নয় দশ মাসের আমার প্রবাস-জীবনে জার্মানীর অতীত ও বর্তমান জানবার জন্য উত্তরে-দক্ষিণে, ছোট-বড় নানা শহরে, নানা মানুষের জীবনে আমি মিশবার চেষ্টা করেছি, খানদানী ও সাধারণ বহু পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ-পরিচয়ের মাধ্যমে অনেককেই জেনেছি, জানবার চেষ্টা করেছি। তাঁদের কাছ থেকে যেটুকু জেনেছি, তার অধিকাংশই ভাসা-ভাসা। এবং কোথায় যেন একটা একপেশে মনোভাব। সেই সাথে চিন্তা ও যুক্তির দৈন্য—যেটা ডক্টর বায়ার এই দীর্ঘ আট-দশ মাসের সহকর্মী জীবনের প্রতি পদে পদে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। সব চাইতে বড় কথা, এমন ধৈর্য নিয়ে কোন বিদেশীকে দিনের

পর দিন নিজের দেশের অতীত ও বর্তমান, তার মন-মেজাজ, খ‍ুঁটিনাটি, খ‍ুব কম লোকই চেনায়। বিশেষ করে, বর্তমানের ইয়োরোপের প্রতিটি মান‍ুষের জীবন যেখানে টাকা, গতি আর ভোগবিলাসে ব্যস্ত, সেখানে ধৈর্য দ‍ূরের কথা, নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধেও মান‍ুষ আজ ভীষণ উদাসীন। তা ছাড়া বিচার-বিশ্লেষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারায় এমন সমন্বয়বাদী মননশীলতাও প্রায় দ‍ুষ্প্রাপ্য। তা অনেকখানি সম্ভব হয়েছে—ডক্টর বায়ার নিজে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। একজন খাঁটি ক্যাথলিক, অথচ গোঁড়া নন। এ দেশে বর্তমানে ক্যাথলিকদের অবস্থা আমাদের দেশের ধর্মান্ধ গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মত। সেই দিক থেকে এই মান‍ুষটি ম‍ুক্ত প‍ুর‍ুষ। ধর্মের চোখ দিয়ে জগতের সমস্ত অগ্রগতি—বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে এমনভাবে দেখা খ‍ুব কম মান‍ুষই পারে। সব মান‍ুষেরই দ‍ূর থেকে অন্য একটা জাতির প্রতি রঙিন কল্পনা থাকে, যার বেশীর ভাগটাই হারাতে হয় সেই জাতির মধ্যে এসে দাঁড়ালে। তাঁদের ভালটার চাইতে মন্দটাই হয়ত চোখে পড়ে আগে। কিন্তু ডক্টর বায়ার এমন এক জাতের মান‍ুষ—কি গবেষণাগারে, কি নিজের গ‍ৃহে, পরিবারে, প্রতিটি কর্ম ও চিন্তায়, যাঁর নির্জন সান্নিধ্যে এলে সেই কল্পনার সার্থক প্রতিনিধি খ‍ুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর রক্তে অতীতের সেই জার্মান জাতির ঐতিহ্যের স্পন্দন। ইদানীং কালে বিভিন্ন সভা, অন‍ুষ্ঠান, চলচ্চিত্র ও প্রচারের মধ্য দিয়ে অনেক বিদেশীই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌত‍ূহলী হয়ে এগিয়ে আসেন, নানা প্রশ্ন করেন—কিন্তু তাঁদের খ‍ুব কম মান‍ুষের প্রশ্নেই আন্তরিকতা ও গভীরতা থাকে। অথচ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য—তার ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-অন‍ুষ্ঠানের প্রতি তাঁর এমন গভীর দ‍ৃষ্টি ও শ্রদ্ধার জন্যেই ডক্টর বায়ারের সম্বন্ধে আমাকে এতটা বলতে হচ্ছে। বার্লিন বা জার্মানী সম্বন্ধে কিছ‍ু বলতে গিয়ে জার্মান জাতির এমন জীবন্ত প্রতিনিধি এই মান‍ুষটির সম্বন্ধে কিছ‍ু না বলে থাকতে পারছি না।

গত মহায‍ুদ্ধ প্রসঙ্গে ডক্টর বায়ারকে বহ‍ুবার আক্ষেপ করতে শ‍ুনেছি—"জান মিঃ ব্রাহমা, মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে মা-বাবার একমাত্র সন্তান, আমাকে য‍ুদ্ধে যেতে হয়েছিল। স্কুলের পড়া শেষ করতে পারিনি, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে নৌ-বিভাগে যেতে হল। সমস্ত দ‍ুঃখের মধ্যে আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল এই বই দ‍ুটো।" তাঁর লাইব্রেরীর বই ঘেঁটে মহাকবি Goethe-র Faust-এর দ‍ুই খন্ড বই বের করে দেখালেন। এবং সেদিনের একমাত্র সাথী বার‍ুদ আর বহ‍ু দেশের মাটিমাখা বই দ‍ুখানা Weihnacht-এর উপহারস্বর‍ূপ আমাকে দিলেন। সেই সাথে হাইনের কয়েকটা কবিতা আবৃত্তি করা একটা Record। উনি জানতেন, বাংলা দেশ হাইনেকে ভালবাসে। দিয়ে বললেন—"একদিন গেছে, যখন আমরা এঁর সব বই প‍ুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই আজ এক এক সময় ভাবি, জার্মানী হেরে গিয়ে ভালই হয়েছে। তা না হলে, হিটলারের রাজত্বে যে কি অবস্থা হত, ভাবতে পারি না। তার রাজত্বে কোন ভাল মান‍ুষের স্থান ছিল না।"

যদি কখনো রসিকতা করে বলি—"কেন, আপনাদের তো ভালই হত। এতদিনে আপনি হয়ত ফ্রান্সে বা রাশিয়ায় কোন উচ্চ গদিতে বসে থাকতেন।"

"তুমি কি বিশ্বাস কর, চিরকাল একটা জাতি অন্য একটা জাতিকে পদানত করে রাখতে পারে? তার সব চাইতে বড় দ‍ৃষ্টান্ত তো তোমার দেশেই আছে। ইংরেজ, ফরাসী, আর দ‍ু' একদিন আগের ঘটনা গোয়া!"

গোয়া প্রসঙ্গে বলে রাখি, বড়দিনের বাজারে ইউরোপে সব চাইতে গরম খবর ছিল গোয়া। আর ডক্টর বায়ারের মত দরদী মান‍ুষ বর্তমানে ক'জন আছেন, জানি না। কেননা, ইদানীংকালে গোয়ার ঘটনায় পশ্চিমী জগতে যে আলোড়ন দেখা গেছে, তা এ দেশে না থাকলে বোঝা যেত না। তার জ্বলন্ত দ‍ৃষ্টান্ত ব্রিটিশ ও জার্মান পত্র-পত্রিকাগ‍ুলি, তাদের ক্ষোভসঞ্চারিত কার্ট‍ুন আর এ দেশের নর-নারীর ম‍ুখে অন্তহীন ব্যঙ্গোক্তি। কিছ‍ুদিন প‍ূর্বে এমনি একটা উত্তাপ দেখা দিয়েছিল, পন্ডিত নেহর‍ুর জার্মানী সম্বন্ধে বক্তৃতা, বেলগ্রেড ও মস্কো সফরের বির‍ুদ্ধে। কিন্তু গোয়ার ঘটনা সব কিছ‍ুকে ছাপিয়ে গেছে।

অথচ খ‍ুঁজে দেখলে দেখা যায়, আমাদের এই দ‍ুই দেশের মধ্যে চিরকাল একটা বন্ধ‍ুত্বের সম্পর্কই ছিল। য‍ুগ য‍ুগ ধরে এই দ‍ুই দেশের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী সমগ্র জার্মান জাতির মন জয় করে ভারতবর্ষকে তাঁরা এ'দের স‍ুন্দর কল্পনার রাজ্যে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। আর দ‍ু-দিন আগেও পন্ডিত নেহর‍ুর জন্য এক বিশেষ আসন ছিল এ'দের মনে। এই সেদিনও এ দেশে এসে সামান্য ভারতবাসী হয়ে এ'দের কাছ থেকে যে সম্মান আমরা পেয়েছি, তা ইংলন্ড আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের বির‍ুদ্ধে যেন জ্ব‍লন্ত প্রতিবাদ। কেননা, এ দেশের মান‍ুষে আমাদের কখনই চামড়ার রঙ বা রাজা-প্রজা সম্বন্ধের দ‍ৃষ্টিকোণে দেখেনি। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে, বেশ কয়েক মাস প‍ূর্বে কয়েকদিনের জন্য এক জার্মান বন্ধ‍ুর গাড়িতে উত্তর জার্মানীর প‍ূর্বসাগর তীরবর্তী কোন এক শহরে Weekend-এ ও'র বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সম‍ুদ্রসৈকতে কালো চামড়া শ‍ুধ‍ু আমারই ছিল। সন্ধ্যায় বন্ধ‍ুটির সাথে শহরের নাচের লোকালে গিয়ে যখন উঠলাম, তখন হলটি নর-নারীতে পরিপ‍ূর্ণ। সবাই পানীয় আর নাচে মত্ত। সেই উৎসবম‍ুখরিত বেপরোয়া আনন্দের মাঝেও কয়েকজন জার্মান ভদ্রলোক দ‍ূর থেকে হাসিম‍ুখে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "নেহর‍ু"? অর্থাৎ আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি কি না। আমি ঘাড় নাড়তেই ও'দের ম‍ুখে এক পরিতৃপ্তির হাসি ফ‍ুটে উঠল। নাচের শেষে ভারতবর্ষ ও নেহর‍ুর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এ জাতীয় অনেক ঘটনার মধ্যে নেহর‍ুর প্রতি শ্রদ্ধাপরিপ‍ূর্ণ সেই হাসিখ‍ুশী ম‍ুখগ‍ুলি আজও মনে পড়ে। দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন মহিলা তাঁর শিশ‍ু-সন্তানকে kinderwagen অর্থাৎ প্যারাম্ব‍ুলেটারে করে বরফের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অনেক সময় গল্প বলে—"Nach Indien, nach Indien!" ভাবটা,—চলো, র‍ূপকথার দেশ ভারতবর্ষে যাই। এই সেদিনের র‍ূপকথার দেশ ভারতবর্ষ, অহিংসার প্রতিম‍ূর্তি মহাত্মা গান্ধী, মানবতার অগ্রদ‍ূত রবীন্দ্রনাথ, আর সভ্যতার সংকটাপন্ন আজকের প‍ৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা পন্ডিত

নেহরুর দেশ ভারতবর্ষ আক্রমণকারী "Aggressor" হয়ে গেছে। কার বিরুদ্ধে? না, গোয়ায় অসহায় পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে! এ'দের অজস্র বিরূপ প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় ছাত্র ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের আজ নীরব থাকা ছাড়া উপায় নেই। কেননা, অতলান্তিক মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে পর্তুগালের পেছনে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলির সমর্থন, বিভক্ত জার্মানীর ব্যাপারে নেহরুর বক্তব্য, চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে উদাসীনতা, সেই সাথে এ দেশের পত্র-পত্রিকা ও বেতার-জগৎ সাধারণ নর-নারীর মনে এমন একটা প্রচার সঞ্চারিত করেছে, যার ফলে আজ আমরা এক বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন—যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ ও জার্মানীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আজ তা শুধু পররাষ্ট্রনীতির কূট বিচারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

অর্চনা আর দীপংকর গিয়েছিল কোথাও। অনেক রাত্রে বাড়ি এল। বাড়িতে এসে দেখে হুলস্থূল কাণ্ড। এত রাত্রে এই শীতের মধ্যে দালানের ওপর একজন ছেঁড়াখোঁড়া লেপ জড়িয়ে পড়ে আছে নিঃসাড়ে। মা নয় তো? দীপংকরের মা, অর্চনার মা শিউরে উঠল। মা কেন এরকম সময়ে এখানে এমন করে পড়ে থাকবেন? আর সকলে কেন ঘুমোচ্ছে? ডাকলে ডাকতে? কিন্তু সবাই যার যার আছেন যে যেমন থাকেন। কেমনই দেখে গিয়েছিল। অর্চনা ভয় চোখে দীপংকরের দিকে তাকাল। দীপংকর হাসল। কোথাও কোনো ভয়ের সম্ভাবনার দেখা পেলেই অর্চনা ভয় পায়। রাত্রে খুট করে যদি কোথাও শব্দ হয় তবে যত গাঢ় ঘুমই হোক দীপংকরের বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে তাকে। হয়ত এমন একটা ছোট জায়গা যেখানে বেড়াল ঢুকতে পারে না সেখানেও একটা আস্ত মানুষ সত্যি সত্যি বসে আছে কিনা তার তল্লাশ নিতে হবে। এ ছাড়া পথে ঘাটে ট্রামে বাসে রেস্তোরাঁয় সর্বত্রই অর্চনার অনুমান তার জন্যে কেউ একটি ভয় নিশ্চয় ওত পেতে আছেই। তবু দীপংকরেরও একটু অস্বোয়াস্তি হল। দালানে উঠতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। না, মা নন। অন্য কেউ। মাথার একপাশের চুল একেবারে সাদা। মুখের ওপর গাছা কয়েক ছড়িয়ে পড়েছে। মুখটা তেউড়ে মেউড়ে গেছে। চোখ দুটি যদিও বোজানো তবু মনে হয় তাকালেই অনেক জল টলটল করে উঠবে। শীতে হাত পা শিটিয়ে গেছে। ঠোঁট দুটি অল্প একটু ফাঁক করে ভারি অসহায় ভঙ্গিতে কে একজন বুড়ী পড়ে আছে। মাকে ডাকতেই মা অর্চনাকে বললেন, ও তো পুরুতবউ। পাঁচ বছর আগে ওর স্বামী মারা গেলে ও এ গলি ছেড়ে চলে যায়। অর্চনা ঘরে এসে চুপ করে চেয়ারে বসল। দীপংকর বলল, শোবে না? অর্চনা কিছু বলল না। পাঁচ বছর আগের এই পুরুতবউকে মনে করবার চেষ্টা করল। তখন এ গলিতে অর্চনার বিয়ে। ওকে আগে দেখেছে অনেকবার। গায়ের রঙ কি ছিল? কালোকোলো চাষাটে মানুষ। স্বাস্থ্যও গড়ে বেশ ভাল ছিল। ভালই। এ কি সেই লোক? মনটার ভেতর থেকে দীপংকর আবার বলল, শোবে না? আশপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে আলো নিবিয়ে বিছানায় ঢুকল অর্চনা। তারপর দীপংকরের আহ্লাদের কাছে নিজের শরীরটা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ শিউরে উঠল। পুরুতবউয়ের পাঁচ বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ায়। ওর স্বামীর মারা যাবার কয়েক মাস আগে ওর কোলে একটি মেয়ে আসে। ওর স্বামী তখন ঘরে ছিল না। পুরুতবউও ভীষণ ঘুমোচ্ছিল। এ গলির অনেকেই নাকি দেখেছিল এই জানলে, সদ্যোজাত মেয়েটির পাশে অসুখে ভুগে ভুগে কালো, করুণ ওরই একটা মরা ছেলে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

সকালে উঠেই পুরুতবউ বাড়ির পাশের ন্যাড়া বাড়ির ছাদে গিয়ে ছেঁড়া, তুলো বের করা লেপ জড়িয়ে চুপটি করে বসে আপন মনে অনেক গান গাইল। নানারকমের সব ছড়া কাটল। কিন্তু কাউকে শাপমন্যি করল না। উলটে বলল, এ গলির অখণ্ড পেরমায়ু হোক। এখানকার সব লোক ভারি ভালো। ভারি সোন্দর। এরা সব সুখে থাকুক। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক সকলের। বাড়ন্ত গড়নের মেয়েদের সব সকাল সকাল বিয়ে হয়ে যাক।

সে সব গান, ছড়া, কথা অর্চনা জানলার শক ধরে শুনল। দীপংকরের মা উনুনের পাশ থেকে বলল, পুরুতবউয়ের একটা ছেলেমেয়েও বাঁচেনি। তা সে ভালোই হয়েছে। নিজেরই জোটে না আবার শংকরাকে ডাক। বছর পাঁচেক আগে এখান থেকে কোথাকার কোন ধানকলে মুনিষ খাটতে গিয়েছিল। সেখান থেকে রানীগঞ্জে। রানীগঞ্জ থেকে এখানকার এক বাড়িতে। তা সেখানেও ও টিকলো না। অর্চনা বলল, —টিকলো না কেন? দীপংকর চা খেতে খেতে ফোড়ন কাটল—চোর ছ্যাঁচড় নিশ্চয়। অর্চনা ধমক দিল,—তুমি থামো।

ঠিকই। দীপংকরের মা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ গো বউমা। সত্যি গো হাতটান আছে। এখানেই সাকরাদের বাড়িতে ও রান্নাবান্না করছিল। রাতে ওদের বাড়ির বড় বউ রান্নাঘরে শব্দ শুনে উঠে এসে দেখে, ওমা বললে কি, সকালের জন্যে ভেজে-রাখা রুইমাছের বড় বড় পেটি ঐ বিধবা মাগী চিবুচ্ছে গো!

দীপংকর কাজে যাবার আগে বলল, একটু আশকারা কম দিও ওকে। অর্চনা কঠিন চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। দীপংকর কাছে এসে আদর করে অর্চনার চিবুকটা

তুলে ধরল, কাল থেকে হয়েছে কি! থমথমে মুখ। ভাবনা। আমার দিকে অমন করে তাকানো—এসব কি গো! আমাকে বুঝি তেমন পছন্দ হচ্ছে না। এর মধ্যেই বাসী হয়ে গেলাম তোমার কাছে!

ছোটলোক কোথাকার! ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখ। বলে অর্চনা হেসে ফেলল।

কিন্তু দীপংকর চলে যেতে হাসিটা মরে গেল। পুরুতবউকে কিছু একটা দেবার তার উপায় নেই। চোর সাজানো হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। চোরকে কিছু একটা দিতে ভীষণ ভয় করল। মা যদি জানতে পারেন?

বেলা যখন দুপুর তখন পুরুতবউ খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে বাড়িতে এল। অর্চনাকে দেখে বলল, দুটো চাল ভিক্ষে করে নিয়ে এনু যজমানদের বাড়ি থেকে। সে মানুষটাই ঘরে নেই। তা আমাকে মানবে কেন তেমন? দিলে কিছু কিছু। কি করেই বা দেয়? সকলেরই ত সমান অবস্তা। পারবে কেন? সকলের বড় কষ্ট, বড় কষ্ট গো। ভারি ভালো সব। বলতে বলতে

শীতে, সন্ধ্যে সাতটার প্রায়ান্ধকার নির্জন রাস্তায় নামলো। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে। সেই দিকে অর্চনা আর দীপংকর চেয়ে রইল। দীপংকর বলল, কি দেখছ? ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে অর্চনা বলল—ওর চলে যাওয়াটা দেখছি।

দীপংকর বোধ হয় বুঝতে পারল। হেসে বলল, কিন্তু তোমার ত ওরকম সম্ভাবনা নেই।

হয়তো সে সম্ভাবনা নেই। হয়তো আছে কিন্তু এই ছবিটি আর কোনদিন অর্চনা ভুলতে পারবে না। আর সে ভয় পাবে। ছিঁচকাঁদুনে ভয় নয়। অতি তীব্র, অতি মারাত্মক সম্পূর্ণ অন্য জাতের ভয়। সমস্ত কোলাহল, সংসারবেলায় সমস্ত তরঙ্গের মাঝখানে মাঝে মাঝে অর্চনা দেখতে পাবে একটি প্রায়ান্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে একটা নির্জন বুড়ী ছেঁড়া কানি জড়িয়ে খক্ খক্ কাশতে কাশতে কুঁকড়েমুকড়ে এক ভয়ংকর শীতের রাত্রে কোথায় যেন চলে গেল।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১০৫)

উপসংহার

একদিন যে-জীবন সুরু হয়েছিল ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের একটা অখ্যাত বাড়িতে, অনেক পথ-পরিক্রমার পর তারই উপসংহারে এসে পৌঁচেছি এখন। জীবনের উপসংহার, সংগ্রামেরও উপসংহার বটে। দীপঙ্করের জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ইতিহাসেরও উপসংহার। একদিন তার সংগ্রাম সুরু হয়েছিল ১৯১২ সালে। সেদিন জীবন ছিল শান্ত, সংগ্রাম ছিল মৃদু। তারপর আনন্দের প্রাচুর্যে, দুঃখের মহিমায় কখন যে মহাজীবনের সিংহদ্বারে তার অভিষেক হয়ে গিয়েছিল—তা সে নিজেই জানতো না। দীপঙ্করের এই মহাজীবন তো নদী নয়। নদীর মত পাহাড়-প্রান্তর-অরণ্য-নগর-গ্রামের উপকণ্ঠ ছুঁয়ে ধৌত করে অবশেষে আত্মা-অন্তরকে মহাসমুদ্রে উৎসর্গ করাও নয়। দীপঙ্করের জীবন যে আকাশ—মহাকাশ। মহাকাশের অনন্ত বিস্তার-বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করা। সেই বিস্তার-বৈচিত্র্যের সমুদ্রে অবগাহন করেই নিজেকে প্রকাশ করা। সে-প্রকাশ যেন অসীমের কাছে আত্মসমর্পণ। সে আত্মসমর্পণে যত প্রীতি, তত আনন্দ। যত উদ্বেগ তত নির্ভরতা। যত সংগ্রাম, তত জয়। কিন্তু বেদনা? সংসারে কোথায় বেদনা নেই? দীপঙ্কর তো ছোট নয়। দীপঙ্কর যদি ছোট হতো তো সংগ্রামে সে কাতর হতো, দুঃখ তাকে নিঃশেষ করে দিত। কিন্তু বেদনা আছে বলেই তো সংসারে ছোটর স্থান নেই। যে-বেদনা আঘাতে অটল, যে বেদনা দুঃখে স্থির—সেই বেদনা যে অনির্বচনীয়। সেই বেদনার অনির্বচনীয়তা দীপঙ্করকে যেন মহীয়ান করে তুলেছিল শেষকালে। এই মহত্ত্বই তার কাছে প্রমাণ করেছিল যে সোক্রেটিস যা বলেছিলেন তা ঠিক—

> And this one thing hold fast, that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the goods indifferent to his well-being.

আমরা জিজ্ঞেস করতাম—কিন্তু আপনি এত কষ্ট করে আছেন কেন স্যার?

দীপঙ্করবাবু তখন আমাদের স্কুলের টীচার। আর আমরা ছাত্র। আমাদের কথা শুনে তিনি হাসতেন। আমরা অনেক টীচার দেখেছি। অনেক টীচার আমাদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক শাসন করেছেন। কিন্তু এর আগে এমন করে কেউ আকর্ষণ করেন নি। আমরা ছুটির পর তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বাড়িতেও যেতাম। তাঁর তক্তপোষের ওপর বসতাম। এক-একদিন সবাই মিলে তাঁর খাবার ভাগাভাগি করে খেতাম। আর তাঁর মুখ থেকে গল্প শুনতাম। আর তাঁর বাড়িতে থাকতো কাশী। কাশীই ছিল তাঁর সব। কাশীকে কখনও মনে হতো তাঁর চাকর, কখনও মনে হতো তাঁর সখা, কখনও বা আবার মনে হতো তাঁর মনিব। দীপঙ্করবাবু কাশীকে হাসতে হাসতে ডাকতেন—কাশীবাবু—

স্কুলে আমাদের এক-একদিন প্রশ্ন করতেন—বড় হয়ে তোমরা কে কী হবে বলো তো?

আমরা কেউ বলতুম ডাক্তার হবো। কেউ বলতুম ইঞ্জিনীয়ার হবো। কেউ কেউ বলতো—ম্যাজিস্ট্রেট হবো, জজ হবো। কত সব অদ্ভুত সাধ থাকে মানুষের। উকীল, ব্যারিস্টার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের। আমরা সে-সব দিন দেখিনি। কেমন করে গোপীনাথ সাহা টেগার্ট সাহেবকে গুলী করতে গিয়ে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিলে, কেমন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেলখানার ভেতরে গুলী চালানোর পর কলকাতার ময়দানে মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। কেমন করে কিরণের মত ছেলেরা স্বার্থের কথা ভুলে ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতা আনলে, কেমন করে প্রাণমথবাবুর মত মহাপ্রাণ মানুষ কংগ্রেসের জন্যে আত্মোৎসর্গ করলেন, কেমন করে ছিটে-ফোঁটার দল সুবিধেবাদীর মত ঠিক সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে এসে ঢুকলো—সে-সব কথা আমাদের মতন বয়েসের ছেলেদের জানবার কথা নয়। কেমন করে মিস্টার ঘোষালরা সংসারে, প্রতিষ্ঠায়, প্রতিপত্তিতে সমাজের মাথায় উঠে গেলো আবার—তাও আমরা জানতাম না। কেমন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে আমরা ভুলে গেলাম স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে—তাও আমরা জানবার চেষ্টা করিনি। আমরা জানতুম এই দেশেরই নিয়ম। এই স্বার্থপরতা, এই নীচতা, হীনতা, এই ফাঁপাতাই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমরা জানতাম পরকে ঠকিয়ে, সমাজকে ফাঁকি দিয়ে সকলের ওপরে ওঠার নামই মনুষ্যত্ব। আমরা জানতাম জীবনে উন্নতি করতে গেলে ছিটে-ফোঁটার মত হওয়াই উচিত। আমরা জানতাম—অর্থই একমাত্র পরমার্থ। আমরাও অঘোরদাদুর মত জানতাম—কড়ি দিয়ে বুঝি সবই কেনা যায়। কিন্তু দীপঙ্করবাবু এসেই আমাদের সব ভুল ভাঙিয়ে দিলেন।

তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন—সে কি! তোমাদের মধ্যে একজনও কেউ মানুষ হতে চাও না?

তিনি যেন হতাশ হয়ে গেলেন আমাদের মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু আমরা সত্যিই বুঝতে পারতাম না। জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়ে কী হবে? স্বামী বিবেকানন্দ হয়েই বা কী হবে? আমরা হবো হেনরী ফোর্ড। আমরা হবো রকফেলার, আমরা হবো এণ্ড্রু কার্নেগী। কিম্বা হবো জি ডি বিড়লা, হবো গোয়েঙ্কা, হবো মাহীন্দ্র। তাও যদি না পারি তো হবো মিনিস্টার। কিছু কাজ করতে হবে না—শুধু বক্তৃতা দিয়েই বেড়াতে হবে, আর সরকারী গাড়ি করে উৎসবে-অনুষ্ঠানে সভাপতি হবো। তা-হলেই আমরা মাসে-মাসে ঠিক মাইনে পেয়ে যাবো। শুধু আমরা নয়, আমাদের গার্জেনরাও এই কথাই শেখাতো আমাদের। আমাদের স্কুলে আমরা লেখাপড়া করতাম ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ওই একই ধারাতে আমরা লেখাপড়া শিখছিলাম। হঠাৎ দীপঙ্করবাবু এসেই আমাদের সব ধ্যান ধারণা বদলে দিলেন।

কিন্তু গণ্ডগোল বাধলো কিছুদিন পর থেকেই। হেডমাস্টারের কানে কথাটা গেল। গার্জেনদের কানেও কথাটা গেল। নতুন ইংরেজীর টিচার ছেলেদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই একদিন তাঁকে ডেকে সাবধান করে দিলেন। বললেন—আপনি স্কুলের টেক্সট বুকের বাইরে আর কিছু শেখাবেন না ছেলেদের—

দীপঙ্করবাবু বললেন—কিন্তু টেক্সটবুকে যে সমস্ত ভুল লেখা রয়েছে—

হেডমাস্টার মশাই বললেন—থাক্ ভুল। সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ড এ-বই এ্যাপ্রুভ করেছে, আপনি কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? আপনি জানেন না এ-বই এক-জন ডক্টরেটের লেখা?

আমরা লুকিয়ে-লুকিয়ে সব দেখতে পাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম।

দীপঙ্করবাবু বললেন—যিনি ডক্টরেট তাঁর ডক্টরেট কেড়ে নেওয়া উচিত, যাঁরা এই অথরকে ডক্টরেট দিয়েছেন তাদেরও ডক্টরেট কেড়ে নেওয়া উচিত—

—তার মানে?

দীপঙ্কর বললেন—তার মানে এই বই তাঁর নিজের লেখা নয়, তিনি নাম কিনে দিয়েছেন, লিখেছে অন্য লোকে, আর তিনি নিজের নাম দিয়েছেন অথর হিসেবে অনেক টাকা পেয়ে—

—আপনি এ-কথা বলতে পারছেন?

দীপঙ্করবাবু বললেন—আপনি নিজেই জানেন সে-কথা, সুতরাং আমার বলাতে কিছু দোষ হয়নি—

কিন্তু আশ্চর্য! আমরাও পরে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। যে-সব বিখ্যাত লেখকের বই আমরা পড়ছি সে-সব তাঁদের নিজের লেখা নাকি নয়। যিনি আসলে বইটা লেখেন তাঁর নাম থাকে না। তিনি যদি পান আড়াই শো টাকা, যাঁর নাম ছাপা হয় লেখক হিসেবে তিনি পান হাজার টাকা। এ-সব আমরা জানতাম না। জানতাম না এই সব বই স্কুলে ধরাবার জন্যে দালাল থাকে। তারা হেড-মাস্টারের বউকে সাড়ি কিনে দেয়, স্কুলের সেক্রেটারিকে দামী-দামী জিনিষ ঘুষ দেয়। তবে বুক-লিস্টে সেই বই-এর নাম ওঠে। দীপঙ্করবাবুর ঘটনা না-ঘটলে আমাদের এসব জানবার উপায়ও ছিল না। কী জানি কেন, সেই দীপঙ্করবাবুকেই এক-দিন চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার নোটিশ এল। ছেলেদের তিনি মাথা খাচ্ছেন। ছাত্রদের মনে নাকি বিষ ঢোকাচ্ছেন—এই অভি-যোগ! আমরা স্কুলের সব ছেলেরা মিলে প্রতিবাদ করলাম। দরখাস্ত করলাম। কিছুতেই যখন কিছু হলো না তখন

স্ট্রাইক সুরু হলো আমাদের। আমরা স্কুলের গেটের সামনে শুয়ে পড়ে রইলাম। কেউ ঢুকতে পারবে না স্কুলের ভেতর। দীপঙ্করবাবুর ওপর বরখাস্তের নোটিশ প্রত্যাহার না করলে এমনি ধর্মঘট চলবে দিনের পর দিন। রাত্রে পোস্টার লিখে দেওয়ালে-দেওয়ালে এঁটে দিই। তুমুল আন্দোলন চলতে লাগলো। একদিকে সমস্ত স্কুল, সমস্ত গার্জেনরা, আর একদিকে আমরা সবাই ছাত্র। আমাদের দীপঙ্করবাবুকে আমরা চাই। তাঁকে অন্যায়ভাবে ছাড়ানো চলবে না।

আমরা রোজ ভোর বেলা উঠে গিয়ে স্কুলের সামনে গিয়ে চিৎকার করি—সেক্রেটারির বিচার চাই—

সবাই এক সুরে চেঁচিয়ে ওঠে—বিচার চাই—

শেষকালে পুলিস এল লাঠি নিয়ে। সেক্রেটারিই পুলিস ডেকে আনিয়েছিলেন। পুলিসে ছাত্রে লড়াই সুরু হলো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ধরা পড়লো। আর কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন দীপঙ্করবাবু। তাঁকে দেখেই আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। তিনি এসে বললেন—তোমরা চুপ করো ভাই। আমাকে নিয়েই যখন এত গণ্ডগোল তখন আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তোমরা মনে কোরনা এই এত বড় পৃথিবীতে আমার কোনও আশ্রয় মিলবে না। পৃথিবী অনেক বড়। তোমরা যত বড় কল্পনা করো তার চেয়েও বড়। আমি আর একদিন আর এক জায়গা থেকে চলে এখানে এসেছিলাম। এখান থেকেও আবার আর এক জায়গায় চলে যাবো। প্রয়োজন হলে পৃথিবীর সব জায়গায় আমি খুঁজবো—দেখবো কোথায় মানুষ পাই। আমি হতাশ হই না, হতাশ হবো না। সনাতনবাবু আমাকে শিখিয়েছেন হতাশ হতে নেই। আমি আশা নিয়ে সারা পৃথিবী খুঁজবো — কোথাও-না-কোথাও মানুষ পাবোই।

এই-ই হলো সূত্রপাত। আমাদের বারাসত স্কুলের টীচার দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে এই-ই হলো শেষ-সাক্ষাৎ। এর পর মাত্র কয়েকদিন ছিলেন। সেই ক'দিনের মধ্যেই তার সব পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ধর্মঘট আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁরই কথায়। তিনিই আমাদের ধর্মঘট বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন—আজকে এক মিনিটে তোমাদের সব অভিযোগের প্রতিকার হবে না। ইতিহাস পড়ে দেখো। সোক্রেটিসকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। গান্ধীজীকেও প্রাণ দিয়ে হয়েছে। আমি এতদিনের পর বুঝেছি—

To a goodman, whether alive or dead, no evil can happen.

আমি তোমাদের আশীর্বাদ করে যাচ্ছি। তোমরা ডাক্তার হয়ো, তোমরা ইঞ্জিনীয়ার হয়ো, তোমরা সব কিছু হয়ো, কিন্তু সকলের আগে মানুষ হয়ো—পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দরকার আজ মানুষের, মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে—

দীপঙ্করবাবুর ছোট ঘরের ভেতর ছোট তক্তপোষটার ওপর বসে আমরা ক'জন ছাত্র তাঁর কথা শুনছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম—মানুষ মানে কী স্যার?

দীপঙ্করবাবু বললেন—ওই দেখ—

আমরা চেয়ে দেখলাম। তিনি দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। ছবিতে কিছুই নেই, শুধু একজোড়া পায়ের ছাপ। দু'পায়ের পাতায় আলতা মাখিয়ে ছাপ নেওয়া হয়েছে। ওটা আমরা প্রায়ই দেখতাম। প্রায়ই কৌতূহল হতো। জিজ্ঞেস করলাম—ও কার পায়ের ছাপ স্যার?

দীপঙ্করবাবু বললেন—প্রাণমথবাবুর!

আমরা প্রাণমথবাবুর কথা আগেই শুনেছিলাম। বললাম—কেন স্যার? ওঁর পায়ের ছাপ রেখেছেন কেন?

দীপঙ্করবাবু যেন হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, বললেন—তবে শোন—

আজ দীপঙ্করবাবু কোথায় কতদূরে আছেন জানি না। তিনি তাঁর মানুষ খুঁজে পেয়েছেন কিনা তাও জানি না। আমাদের স্কুল আজো তেমনি চলেছে। টেক্সট্ বুকের ভুল আজো পড়ানো হচ্ছে আমাদের স্কুলে। সেই ভুল শিখেই ছাত্ররা ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার হচ্ছে, উকীল হচ্ছে, ব্যারিস্টার হচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো বিড়লা, গোয়েঙ্কা, মাহীন্দ্রও হচ্ছে। দূর ভবিষ্যতে কেউ-কেউ ফোর্ড, রকফেলার, কার্নেগীও হয়ত হবে। তারপর কলেজে ঢুকেছি। সংসারে ঢুকেছি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর আরো চোদ্দ পনেরো বছর কেটে গেল। দীপঙ্করবাবুর মত আর কেউ প্রতিকার করবার নেই, প্রতিবাদ করবার নেই। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অঘোরদাদুর মত আমরা সবাই কড়ি দিয়ে সব কিনেছি। পাপ কিনেছি, পুণ্য কিনেছি, ধর্ম কিনেছি, অধর্ম কিনেছি! গাড়ি বাড়ি রেফ্রিজারেটরের মত সম্মান প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কিনেছি। অঘোরদাদুর সব কথাই আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। অঘোরদাদু ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা। আজ এই 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর কাহিনী লিখতে লিখতে সেই সব দিনের শোনা কাহিনীগুলোই মনে পড়ছে বার বার।

—তবে শোন!

১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লিতে দরবার বসলো। ভারত সাম্রাজ্যেশ্বরী কুইন-ভিক্টোরিয়া বললেন- 'আমার আশা ও বিশ্বাস যে বর্তমান উপলক্ষ হইতে আমি ও আমার ভারতীয় প্রজাবৃন্দ ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর স্নেহের বন্ধনে পরস্পর মিলিত হইতে পারিব। এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি হইতে নিম্নতম স্তরের লোকরা পর্যন্ত সকলেই প্রাণে অনুভব করিতে পারিবেন যে আমার শাসনতন্ত্রে তাঁহাদের সকলের জন্য স্বাধীনতা সাম্য ও ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলি সম্যক রক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের সুখ-শান্তি বিধান, তাঁহাদের সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি বর্ধন ও তাঁহাদের কল্যাণ-সাধনই আমার সাম্রাজ্য পালনের চিরন্তন উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য।'

সেইদিন থেকে সুরু করে স্বাধীনতা সাম্য ও ন্যায়-বিচারের সাক্ষ্য ভূরি-ভূরি ছড়ানো ছিল ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত। সেই ১৫ই আগস্ট তারিখেই সেই একই দিল্লিতে আর এক দরবার বসলো রাত বারোটার সময়। সেই কুইন ভিক্টোরিয়ার সেই একই আসন থেকেই জওহরলাল নেহরু বেতারে বক্তৃতা দিলেন—

Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe out every tear from every eye.

ইণ্ডিয়ার কোটি কোটি লোক রাত জেগে সেই বক্তৃতা শুনেছিল। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অঘোর-সৌধের বাড়িতে রেডিও খুলে দিয়ে শুনেছিল ছিটে, শুনেছিল ফোঁটা, শুনেছিল লক্কা, শুনেছিল লোটন। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে শুনেছিলেন সনাতনবাবু, শুনেছিলেন নয়নরঞ্জিনী দাসী। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভাড়াটে বাড়িতে শুনেছিল লক্ষ্মণ সরকার আর ক্ষীরোদা। আর লেক হাসপাতালের ছোট্ট কেবিনটাতে শুয়ে শুয়ে শুনেছিল দীপঙ্কর। আর আরো একটা বাড়ির ছোট ঘরের মধ্যে বসে-বসে শুনেছিল কিরণ আর মাসীমা। আর গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে শুনেছিল.....

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মধুসূদনদের রোয়াকেও সেদিন রাত্রে ভিড় কম নয়। সারা কলকাতার রাস্তাতেই ভিড়। কেউ কাজ করবে না। অনেক কষ্টের পর স্বরাজ এসেছে। অনেক কষ্ট স্বীকার, অনেক জেল-খাটা, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে পরম সম্পদ পাওয়া গিয়েছে। পার্টিশান হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ার। নতুন এক রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে

পৃথিবীতে। তার নাম পাকিস্তান। সেদিন সেই কলকাতার বুকের ওপর দিয়ে মানুষের মৃত্যু হয়েছে কাতারে-কাতারে। সে-দৃশ্য সবাই দেখেছে। বাড়ির দরজা বন্ধ করে রুদ্ধ-শ্বাসে মুহূর্ত গুণেছে। রাস্তায় কখনও চিৎকার হয়েছে—বন্দে মাতরম। কখনও—আল্লা হো আকবর। গান্ধীজীর সঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবের কথাবার্তায় কোন ফল ফলোনি। ওয়ার্ধা থেকে হাসিমুখে ফিরে এলেন প্রাণমথবাবু। হাতে তার ফাইল। তাঁর সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। লর্ড ওয়াভেলও রাজি হয়েছেন গান্ধীজীর কথায়। সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। আর যারা অপরাধী তাদের বিচার হবে। বিচারও হলো, দোষী প্রমাণিত হলো। কিন্তু তবু ছাড়া পেলে সবাই। শা নওয়াজ খাঁ, কর্নেল ধীলন, লক্ষ্মী মেনন, সর্দার জীবন সিং। আর ছাড়া পেল কিরণ।

কিরণ ছাড়া পেয়েই সোজা চলে এসেছে একেবারে স্টেশন রোডে। দীপু আছে এ বাড়িতে? দীপঙ্কর সেন?

অচেনা মুখ। সামনের ঘরের জানালায় পর্দা টাঙানো। ভেতরের ঘর থেকে ছোট ছেলেমেয়ের গলা শোনা গেল। [illegible] আওয়াজ। বেশ জমিয়ে সংসার পেতেছে নাকি দীপু?

—না মশাই, এখানে তো দীপঙ্কর বলে কেউ থাকেন না। অন্য কোথাও দেখুন।

—আপনারা কতদিন এসেছেন এ-বাড়িতে?

—তা একবছর আগে, সেই হিন্দু-মুসলিম রায়টেরও আগে—

সে-সব কথা কিরণ জানতো না। তখন সে জেলের ভেতর। তাহলে কোথায় গেল সে? হয়ত ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে গেলে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

কিরণ আবার ট্রামে উঠল। আবার এসে দাঁড়াল সেই পুরোন পাড়ায়। যেখানে বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী করেছিল। ঠিক যেন চেনা গেল না। সব বদলে গিয়েছে। অঘোরদাদুদের বাড়িটাও আর চেনা যায় না। মাথার ওপরে বড় বড় করে সিমেন্টের কংক্রিটে লেখা রয়েছে 'অঘোর সৌধ'। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো সামনের উঠোনে। গেটে দারোয়ান। দারোয়ানের গায়ে খদ্দরের ইউনিফর্ম। কিরণের চোখে যেন আরব্য-উপন্যাসের মত মনে হলো সব। বাড়ির মাথায় লম্বা বাঁশের আগায় পত্-পত্ করে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ উড়ছে। এরা কংগ্রেসের মেম্বর হয়েছে নাকি? অঘোরদাদুর সেই বখাটে নাতি দুটো?

—কিরণ না?

কিরণ পেছন ফিরলো। ফটিক। ফটিকের মা মুড়ি ভাজতো পাথর পটিতে। বললে—তুমি তো জেলে ছিলে শুনেছি—কবে ছাড়া পেলে?

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—তোমার কী খবর?

—আমি তো ভাই একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করছি। তোমার খবর কী? কোথায় আছো এখন?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে কিরণ জিজ্ঞেস করলে—দীপু কোথায় আছে জানো তুমি? দীপুকে খুঁজছি—

ফটিক বললে—আমি তো ঠিক জানি না ভাই, একদিন একটা বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল, তারপর সেইদিনই শিলিগুড়ি চলে গিয়েছিল বদলি হয়ে, আর দেখা হয়নি—

—এ-বাড়িটাতে এখন কারা থাকে?

ফটিক বললে—বিয়েটা তো এই বাড়িতেই হলো। লক্ষ্মণ সরকারের বিয়ে হলো কি না! লক্ষ্মণ সরকারকে মনে আছে তো?

—আর প্রাণমথবাবু? প্রাণমথবাবুর কাছে গেলে হয়ত দীপুর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, কী বলো?

—তিনি তো মারা গেছেন! তুমি শোন নি?

প্রাণমথবাবুর মৃত্যুর খবর কিরণ জানতো না। ফটিক বললে—সে বড় প্যাথেটিক ভাই। বলতে গেলে ইলেক্শন করতে গিয়েই মারা গেলেন।

—কীসের ইলেকশন?

—কংগ্রেসের। ফোঁটাদাকে চেন তো? সেই ফোঁটাদাই তো এখন এখানকার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। প্রাণমথবাবু অত দিনকার প্রেসিডেন্ট, সকলকে ঘুষ দিয়ে ভোট ভাঙিয়ে প্রাণমথবাবুকে হারিয়ে দিলে।

সত্যিই সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। নিজের জীবনে কখনও প্রতিষ্ঠা চাননি প্রাণমথবাবু। শুধু চেয়েছিলেন ইণ্ডিয়া স্বাধীন হোক। ওয়ার্ধা আশ্রম থেকে ফিরে এসেছেন তখন। হঠাৎ ঠিক হলো ইলেকশন্ হবে। কংগ্রেসের নতুন মেম্বররা চায় ফটিক

ভট্টাচার্য হবে প্রেসিডেণ্ট। প্রাণমথবাবু বললেন—তা তুমিই প্রেসিডেণ্ট হওনা, আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমাদের দ্বারা আর কাজ চলছে না—

কিন্তু ফোটা বললে—না, তা হতে পারে না, ভোট হবে—

সেই ভোটই হলো শেষ পর্যন্ত। প্রাণমথবাবুর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ভোট হলো। ফটিক ভট্টাচার্য মেম্বারদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে ভোট চেয়ে বেড়াতে লাগলো। দেশের যুবশক্তিকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে। কদিন ধরে কালীঘাটের পার্কে দাঁড়িয়ে খুব বক্তৃতা দিলে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। ইণ্ডিয়াকে পার্টিশান করা চলবে না। গরম-গরম বক্তৃতায় অনেক হাততালি কুড়োলে কদিন ধরে। সেই মিটিং-এ প্রাণমথবাবুকেও বলতে বলা হলো। তিনি বলতে চাননি। বলবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন তাঁকে এবার সরতে হবে। এবার থেকে কংগ্রেসের ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করেছে লোভ আর স্বার্থপরতা। ক্ষমতার

গন্ধ পেয়ে যে যেখানে ছিল সবাই এসে জুটেছে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগের তলায়। এবার থেকে তাঁদের চিহ্ন মুছে যাবে। তবু তিনি দাঁড়ালেন। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল। তিনি টলে পড়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল একটা শতাব্দী। সেই ১৮৮৫ সালে যে-প্রতিষ্ঠানের একদিন পত্তন হয়েছিল ত্যাগ আর সহিষ্ণুতার ভিতের ওপর তার শেষ স্তম্ভটি এতদিনে ধূলিসাৎ হয়ে গেল কালিঘাট-পার্কের মীটিংএ।

দীপঙ্কর যখন খবর পেয়েছিল তখন সবে ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। কালি লেনের বাড়িতে যখন পৌঁছলো দীপঙ্কর তখন প্রাণমথবাবুকে নিয়ে আসা হয়েছে বাড়িতে। তিনি শুয়ে আছেন। অসংখ্য লোকের জটলা চারিদিকে। মাসীমা নিঃশব্দে বসে আছেন। দীপঙ্কর তারই এক ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখের সামনে থেকে যেন সব মুছে গেল। মুছে গেল সব ভিড়, সব কোলাহল, সব পৃথিবী। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন প্রাণমথবাবু। চোখ পলকহীন। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুলের হেড-মাস্টার যেন দীপঙ্করের দিকে চেয়ে-চেয়েই বলছেন—সারা জীবন সত্য কথা বলবে দীপু—সত্য কথার মার নেই সংসারে, সত্যেরই জয় সর্বকালে—

আরো কথা মনে পড়তে লাগলো। চোখের সামনে সমস্ত অতীতটা যেন একের পর এক স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে লাগলো। এতগুলো মৃত্যু দেখেছে দীপঙ্কর, কিন্তু প্রাণমথবাবুর মৃত্যুকে যেন প্রণাম করতে ইচ্ছে করলো সেদিন। মনে হলো মৃত্যু যে এমন মহিম-ময় হতে পারে তা যেন এর আগে তার জানা ছিল না!

মাসীমা তারপর প্রাণমথবাবুর দু'পায়ের ছাপ তুলে নিলেন একটা সাদা কাগজে। পায়ের ওপর আলতা লাগিয়ে তারই ছাপ ওঠানো হলো। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি মাসীমার কাছে গিয়ে বললে—ওটা আমাকে দিন মাসীমা, আমি ওটা পুজো করবো—

—ওই দেখ সেই পায়ের ছাপ! যেখানেই যাই সেখানেই ওটা আমার সঙ্গে থাকে!

—আর তারপর সেই আপনার বন্ধু কিরণ?

—কিরণ এখনও বেঁচে আছে। এখনও ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামায়। ইণ্ডিয়ার মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়ে দুর্ভাবনা করে! রাত জাগে, বই পড়ে, চেঁচায়, মিছিল করে, চাষী-মজুর নিয়ে দল বাঁধে। সে বলে—এ স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়। সে বলে—এ বড়লোকদের স্বাধীনতা, এ কোটিপতিদের স্বাধীনতা। মানুষের স্বাধীনতার জন্যে তাকে আরো লড়াই করতে হবে। সেই স্বাধীনতার জন্যেই সে এখনও যুদ্ধ করছে, বই লিখছে, প্যাম্ফলেট্ লিখছে, দরকার হলে মাঝে মাঝে জেলও খাটে—

—তারপর?

—তারপর কিরণ উনিশের একের বি'র বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো—লক্ষ্মণ!

যে দরজা খুলে সে লক্ষ্মণ নয়, সে ক্ষীরোদাও নয়, সে কিরণের মা। কিরণের মা'র তখন চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছে। ভালো করে দেখতে পায়নি। বললে—কাকে খুঁজছো বাবা? কাকে চাই?

কিরণ সেইখানে দাঁড়িয়ে মাকে দেখেই কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর বোধ হয় অনেক দেখার অনেক শেখার অনেক কষ্ট পাওয়ার ফলে মুখ থেকে বেরিয়ে এল—আমি কিরণ!

কিরণের মা আর থাকতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো ছেলেকে। বললে—তুই এসেছিস বাবা! তুই বেঁচে আছিস?

তারপর আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে অনেক আবেগে মাসীমার সব কথা যেন হারিয়ে গেল। বললে—তুই আমাকে এমনি করে ফেলে গেলি বাবা! পরের ছেলে দীপু, দীপুই আমাকে বাঁচালে। দীপু না থাকলে কে আর চোখে দেখতো, আমার কপালে থাকতো না বাবা

বলে অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলো মাসীমা। কিন্তু কিরণের সেদিকে খেয়াল নেই। সে দীপঙ্করকে খুঁজতে এসেছিল। বললে—দীপু, কোথায় তুমি জানো?

মাসীমা বললে—সে তো হাসপাতালে রে। রেলগাড়ীর ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল—

—কোন্ হাসপাতালে?

মাসীমা বললে—লেকের হাসপাতালে—

কিরণ আর দাঁড়াল না। মা'র হাত ছাড়িয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। পেছনে থেকে মাসীমা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছিস তুই?

কিন্তু যে উত্তর দেবার সে তখন আর চোখের সামনে নেই। রাস্তায় বেরিয়ে একেবারে চোখের আড়ালে চলে গেছে—

আর গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিংএর বাড়িতে আরো থম-থমে দিন কেটেছে আগে। সেই যখন কলকাতার উদ্বেগ আর অশান্তির রাজা। ক্রীপস্ মিশনের সময় থেকেই থম-থম করতো কলকাতা। যখন দীপঙ্কর সারা দিন অফিসের খাটুনির পর আসতো এ বাড়িতে আর অনেক রাতে ফিরে যেত। তখন থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মাথায় বোঝা হয়ে উঠেছিল ইণ্ডিয়া। বছরে বছরে সমস্ত ঘৃণা সমস্ত হিংসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। শেষে আর ধরে রাখা গেল না। যেটুকু বাকি ছিল সুভাষ বোসের শেষ কীর্তিতে তাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউটন-এ লেখা হলো: The British decision to leave India may bring the British more profit than they would win if they could scrape up power to remain for a time. By retiring with grace and expressions of goodwill they may preserve the bulk of their economic interests for a long period.

সতী দোতলার ওপর থেকে অনেক দূরে চেয়ে দেখে, অনেক দূর থেকে একটা ট্রেন আসে। গোল-গোল পেট্রল ভর্তি ওয়াগন-গুলো পশ্চিম দিক থেকে এসে পূব দিকে চলে যায়। দুম্ দুম্ করে শব্দ হয় আর অনেকক্ষণ পরে চোখের আড়ালে চলে যায়। আস্তে আস্তে ভোর হয়, আস্তে আস্তে

দিন হয়, তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যেও হয়। ওদিক থেকে যেন একটা হল্লা ওঠে—আল্লা হো আকবর। রাত্রের নিস্তব্ধতা সেই চিৎকারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তারপর সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে কারা চিৎকার করে ওঠে—বন্দেমাতরম্! সমস্ত কলকাতা যেন সচকিত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাস্তায় বেরোতে ভয় করে। ভোর বেলা কোন্ ফাঁকে খবরের কাগজওয়ালা নিঃশব্দে কাগজ দিয়ে আবার চলে যায়। সারাদিন ধরে পড়ে পড়ে কাগজখানা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সমস্ত কলকাতা যেন ভয়াল হয়ে উঠেছে। যাবার আগে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট শেষ সর্বনাশ করবে। শেষ বিষ ঢুকিয়ে দেবে। চলে গিয়েও তারা তাদের কারবার পাকা-কায়েম করে রেখে যাবে।

রঘুকে ডেকে সেদিন সতী জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, লোকে রাস্তায় বেরোচ্ছে?

রঘু বললে—না দিদিমণি, সেদিনও বাজারের কাছে একটা লোককে কেটে ফেলেছে, আপনি বেরোবেন না—

কিন্তু আর যেন বাড়িতে থাকতে ভাল লাগছিল না। কারোর কাছ থেকেই কোনও খবর আসে না। যেন সে হাঁপিয়ে ওঠে। লক্ষ্মীদির সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হয় না। সে সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকে। তাকেও পাহারা দিতে হয়। রাত্রে দরজার সামনে রঘু শুয়ে থাকে। যদি পালিয়ে যায়, কতবার লক্ষ্মীদি পালিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। অন্ধকারে কেউ কোথাও না থাকলেই লক্ষ্মীদি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সদর-দরজা খুলে রাস্তায় চলে যেতে চায়। এক-একবার রেল-লাইন পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, তারপর রঘু জানতে পেরে আবার ধরে নিয়ে এসেছে, ধরা পড়লেই বলে—আমি মরতে চাইনি, আমি শুধু বেড়াচ্ছি এখানে—

তারপর আবার ধরে নিয়ে এসে ঘরে পুরতে হয়।

সেদিন দুপুর বেলা। সমস্ত কলকাতা যেন তখন ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু ওই ঘুমন্ত কলকাতাই আবার জেগে ওঠে রাত্রে। রাত আরম্ভ হতেই আবার চিৎকার শুরু হয়। সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ বাইরে দরজায় কড়া নড়তেই সতী ভেতর থেকে বললে—কে?

বাইরে থেকে গলার আওয়াজ এল—আমি—

—আমি কে? নাম কী তোমার?

কী যেন উত্তর এল। কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। সতীর কী সন্দেহ হলো। তারপর দরজাটা খুলতেই দেখলে সামনে সনাতনবাবু দাঁড়িয়ে। সনাতনবাবুকে সামনে দেখে যেন কথা বলতেও ভুলে গেল সতী, তাড়াতাড়ি সম্বিত ফিরতেই সনাতনবাবুকে ঘরে ঢুকিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলে। বললে—কী করে এলে তুমি?

সনাতনবাবু বললেন—হেঁটে, গাড়ি পেলুম না—

—কিন্তু যদি কোনও সর্বনাশ হতো? কেন তুমি আসতে গেলে এই সময়ে?

সনাতনবাবু বললেন—অনেক দিন থেকেই আসবো ভাবছিলাম, কিন্তু সুবিধে হচ্ছিল না—

—কিন্তু এই সময়ে কেউ আসে? চারদিকে কত খুন-খারাপি চলছে খবরের কাগজে দেখনি?

সনাতনবাবু বললেন—তাতে আমার কিছু এসে যায় না, তুমি চলো, তোমাকে নিয়ে যেতেই এসেছি—

—আবার সেই পুরোন কথা তুলছো? একথা তো তুমি অনেকবার বলেছো, সেই একই কথা বলতে এসেছো আবার?

—কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেছিলুম আসবো, তুমি বারণ করলেও আসবো।

—কিন্তু কলকাতায় কী মারামারি কাণ্ড চলছে তুমি জানো না? এই সেদিন বাজারের কাছে একটা লোককে কেটে ফেলেছে, রঘু বলছিল—

সনাতনবাবু বললেন—সে আমি সব জানি। আমি জেনে শুনেই এসেছি এবার তোমাকে নিয়ে যাবোই। তুমি চলো।

—তুমি কি পাগল হয়েছো? এই অবস্থায় আমি যাবো? তুমি কী করে ভাবতে পারলে যে এত কাণ্ডের পরেও আমি তোমার সঙ্গে যাবো? তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে বলেই ধরে নিয়েছি, তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্কই নেই—

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু তবু তোমাকে যেতেই হবে আজ আর আমি তোমার কোনও কথা শুনবো না।

সতী সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে

অবাক হয়ে গেল। এত জোরের সঙ্গে কখনও তো কথা বলেন না।

সনাতনবাবু আবার বলতে লাগলেন—এতদিন আমি পরীক্ষাই করেছি শুধু, তোমাকে নিয়েও পরীক্ষা, নিজেকে নিয়েও পরীক্ষা। আমি আজ পর্যন্তও বুঝতে পারলুম না তোমাতে আমাতে অমিলটার সূত্র কোথায়? আমিই বা কীসে তোমার চোখে অপরাধী, আর তুমিই বা সে অপরাধ এমন বড় করে দেখছো কেন? এও কি তোমার এক অহংকার? আমি বুঝতে পারছি না—

সতী বললে—তুমি আমার অহংকার দেখলে?

সনাতনবাবু বললেন—অহংকে তুমি ত্যাগ করতে পারোনি বলেই অহংকার বলছি—! তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে পারতে তো এ অহং থেকেও তুমি কবে মুক্ত হয়ে যেতে! নিজেকে কি তুমি সাঁপেই বিলিয়ে দিতে পেরেছ? যেমন করে নদী নিজেকে সমুদ্রে বিলিয়ে দেয়?

—কিন্তু তুমিই সমুদ্র আর আমি নদী, এও তো তোমারও এক অহংকার!

সনাতনবাবু বললেন—আমি তো বলিনি আমি সমুদ্র। তুমি আমি এই সমস্ত মানুষ, সবাই তো আমরা এক অনন্ত সমুদ্রের দিকে চলেছি। যে মানুষ নিজেকে সেই অনন্তের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছে সেই তো মানুষ। মানুষের সার্থকতা তো সেখানেই।

সতী বললে—তুমি এখনও সেই পুঁথির মধ্যেই বাস করছো, আমার মত সংসারের জীব হতে পারোনি—

—কিন্তু পুঁথি তো সংসারী লোকেরই লেখা। মানুষ আর পুঁথি কি আলাদা?

সতী বললে—হ্যাঁ আলাদা! আলাদা না হলে কি তোমার কাছ থেকে আমি চলে আসি? আলাদা না হলে আমার সমস্ত জীবন এমন করে নষ্ট হয়? আলাদা না হলে তুমিই কি এমন কষ্ট পাও, না আমিই এমন ভুগি? তুমি আমার মত হতে পারো না? তেল-নুন-মশলার সাধারণ মানুষ হতে পারো না?

সনাতনবাবু বললেন—তাহলেই হলো, তুমি কথাটা আবার তুললে! তবু আমি বলছি আগে আমি যা ছিলাম তা-ছিলাম, আমি আজ সাধারণ হয়েই এসেছি, সাধারণ মানুষের মতই কথা বলছি, বলো কী করলে তুমি আমার হবে?

—কী করলে তুমি আমার হবে তা তুমি জানো না?

—বেশ, তাই-ই বলো। কী করলে আমি তোমার হবো? কী করলে তুমি আমায় নেবে?

সতী এবার যেন কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। এমন করে এমন সুরে সনাতনবাবু তার সঙ্গে আগে কখনও কথা বলেন নি। তবু যেন কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—আজকে আমি বাড়ি থেকে তোমাকে এই কথা বলবো বলেই বেরিয়েছি। ক'দিন ধরে খুব ভেবেছি। ক'দিন ধরে রাত্রে আমার ঘুম নেই। ক'দিন ধরে ঠিক করেছি আমি তোমার কাছে এসে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবো। বলবো—তুমি আমাকে নাও। একদিন তোমাকেই কেবল নিজের করতে চেয়েছি, এবার আমাকেই তোমার নিজের করে নিতে বলবো। তুমি অস্বীকার করলেও আমি শুনবো না। আমি শুনে যাবো তোমার মুখ থেকে তুমি আমাকে নিয়েছ কিনা!

সতী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—এত কথা তোমার মনে হয়? আমার কথা তুমি এমন করে ভাবো?

—ভাববো না? আমিও তো তুমি! আর তুমিও তো আমি!

—সত্যি বলছো?

—আমি কোনও দিন অসত্য বলি না। আগেও বলিনি, এখনও বলছি না।

—তোমার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে? সেই অনেক দিন আগে প্রথম যখন তোমাদের বাড়ি গেলাম, তার এক বছর পরেই ...

—এক বছর পরেই কী বলো?

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো সতীর সমস্ত মুখখানা।

সনাতনবাবু বললেন—কী বলছিলে, বলো। বলো না, আমার সব মনে আছে—

—সেই খোকা হয়েছিল ...

আর বলতে পারলে না সতী। বলতে গিয়েই যেন ভেঙে পড়লো। সনাতনবাবুর বুকের ওপরেই যেন ভেঙে পড়লো। সনাতনবাবু ধরে ফেললেন সতীকে। নইলে সতী বোধহয় পড়ে যেত তখনি। এতদিন পরে সনাতনবাবুর মনে হলো, সতী বাইরে যতই প্রখর হোক, ভেতরে ভেতরে যেন বড় দুর্বল। দুই হাতে তাকে ধরে রাখলেন অনেকক্ষণ। সতীও তাঁর বুকের মধ্যে মাথা লুকিয়ে দিয়ে আত্মনিবেদন করতে লাগলো। সনাতনবাবু সতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে। তারপর বললেন—কেঁদো না—চুপ করো—

সতী তেমনি করেই মুখ লুকিয়ে বলতে লাগলো—কিন্তু কেন সে থাকলো না বলো তো? আমি কী অপরাধ করেছিলুম ভগবানের কাছে? কার পাপে এমন হলো? কে এর জবাব দেবে? ভগবান আমাকে সব দিয়েছিলেন, মেয়েমানুষ যা চায় সব পেয়েছিলুম, কিন্তু কেন এমন করে সব হারালুম বলো তো? কেন আবার সব কেড়ে নিলেন তিনি?

সনাতনবাবু কিছু কথা বললেন না। তেমনি করেই সতীকে ধরে রইলেন।

—তুমি তো জানো, আমি ও-সব কিছুই চাইনি, অন্য মেয়েমানুষেরা যা চায় আমি

তো তা কিছুই চাইনি, আমি গয়না চাইনি, শাড়ি চাইনি, বাড়ি চাইনি, টাকা-কড়ি, চাকর-ঝি কিছুই চাইনি, তুমি তো তা জানো, শুধু চেয়েছিলুম আমাকে কেউ মা বলে ডাকুক......

বলতে বলতে সতী আবার কাঁদতে লাগলো, তারপর আবার বলতে লাগলো—লোকে বলে আমি খুব জেদী মানুষ, তুমিও হয়ত আমাকে তাই বলে জানো! রাগ হলে আমার নাকি জ্ঞান থাকে না, রাগের মাথাতেই তো আমি তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম, কিন্তু কেন আমার রাগ হলো তা তো তোমরা কেউ কোনওদিন জানতে চাইলে না? কেন আমি এমন রাগী হলুম তা তো আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করোনি কখনও? কই, আগে তো আমি রাগী ছিলুম না? আগে তো লক্ষ্মীদির সঙ্গে, দীপুর সঙ্গে কত ঝগড়া করেছি, কিন্তু এমন করে তো কখনও অন্য কাউকেও কষ্ট দিইনি, আর নিজেও এমন করে কষ্ট পাইনি? খোকা চলে যাবার পরেই বা কেন এমন হলো? সে-কথা তো তোমরা কেউ জিজ্ঞেস করলে না?

সমস্ত পৃথিবী তখন নিস্তব্ধ। সমস্ত চরাচর তখন সতীর মন থেকে মুছে গেছে। সতী যেন এতদিন পরে আবার নিজের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। বাইরে ঘড়ির কাঁটা কতখানি ঘুরলো তখন আর তা জানবার যেন প্রয়োজনও নেই। সতী নিজের মনের সব কথাগুলো যেন এই প্রথম-বার নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে।

বললে—ভেবেছিলাম সেবার তোমাকে অত অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি বোধ হয় আর আসবে না! জানো, একলা-একলা এ বাড়িতে থাকতে থাকতে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। তুমি না এলে আমি যে কী করতুম!

সনাতনবাবু বললেন—সেই জন্যেই তো আমি এলুম।

—তোমার মা জানেন যে তুমি এসেছ?

সনাতনবাবু বললেন—না।

—কিন্তু তুমি তো তোমার মাকে না জানিয়ে কোনও কাজই করো না। তাহলে আজ কেন এমন করলে?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার জন্যে!

—আমার জন্যে তুমি এত করতে পারো?

—তোমার জন্যে চিরকালই সব করতে পারতুম, তুমি শুধু বুঝতে পারতে না তাই কষ্ট পেতে!

—এবার থেকে আমি যা বলবো তুমি তাই-ই করবে?

—চিরকাল তুমি যা বলতে তাই-ই করেছি। তুমি শুধু ভুল বুঝতে আমাকে!

সতী সনাতনবাবুর বুকের মধ্যে আরো নিবিড় হয়ে এল। বললে—এবার আমি তোমাকে আর ভুল বুঝবো না, জানো! তুমি বিশ্বাস করো, তুমি যা বলবে আমি তাই-ই শুনবো। তোমার সব কথাই আমি রাখবো—

সতী একটু থেমে আবার বললে—তোমার বুকের মধ্যে মুখ রাখতে আমার খুব ভালো লাগছে—আমি আরো একটু রাখি আমার মুখটা—কেমন?

সনাতনবাবু বললেন—তা রাখো না, আমারও তো ভালো লাগছে—

বলে সতীকে আরো নিবিড় করে বুকে টেনে নিলেন।

প্যালেস-কোর্টের পৃথিবীতে আবার উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। উদয়াস্ত খেটেও পীরালি ঘোষাল সাহেবের মুখে হাসি ফোটাতে পারে না। সাহেবের মেজাজ যেন আরো গরম। আবার খানা ঠাণ্ডা হলে বিরক্ত হয়ে ওঠে। আট মাস ছিল না সাহেব। আট মাস যেন ঝিমিয়ে ছিল প্যালেস-কোর্ট। আবার হুইস্কি বীয়ার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ খেয়ে খেয়ে প্যালেস-কোর্টের চেহারা ফিরে গেছে। বড় খিট্-খিটে, বড় মেজাজী! মকবুল যতীন জগন্নাথের আমদানী-রপ্তানী আবার বেড়েছে। তারা আসে যায় আর সেলাম করে। দেখলেই বোঝা যায় তারা খুশী। ক'দিন গোলমালের চোটে সাহেব বেরোতে পারেনি। দিশী পাড়াতেই গোলমালটা বেশি। এ-পাড়ায় কিছু হয়নি, কিন্তু তবু গা ছম্-ছমে ভাব। রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিলই এখন আরো ফাঁকা হয়ে গেছে। রোজ সকালে কোম্পানীর বিরাট গাড়িখানা এসে দাঁড়ায় পোর্টিকোতে, তারপর মিস্টার ঘোষালকে নিয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে অফিসে পৌঁছে দেয়। রাস্তায়-রাস্তায় পুলিস-ভ্যান টহল দেয়। ওয়্যারলেস্ ভ্যানের ভেতরে আর্মড্ পুলিস রাইফেল উঁচিয়ে বাইরের দিকে তাক্ করে থাকে। লালবাজারে পুলিস-ব্রিগেড্ রেডি থাকে দিন-রাত। এমনি করেই সব কাজ-কর্ম চলে শহরের। খিল্-আঁটা মুখে রাস্তার দু'একজন লোক চলা ফেরা করে। ব্ল্যাক্-আউট উঠে গেছে, কিন্তু তবু শহরের ব্ল্যাক্-আউট্ বন্ধ হয়নি। সিভিক্ গার্ড, এ-আর-পি সব উঠে গেছে। তবু তারাই ইউনিফর্ম পরে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। পাড়ায়-পাড়ায় ডিফেন্স্ পার্টি হয়েছে। তারা সারা দিন-রাত পালা করে নিজের-নিজের পাড়া পাহারা দেয়।

—পীরালি!

—হুজুর!

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে এসে আবার বেরোয় সাহেব। গোলমালের জন্যে কয়েক-দিন বন্ধ ছিল। কিন্তু আবার সন্ধ্যেবেলা বেরোচ্ছে। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে আরো অনেক মিস্ মাইকেলের আমদানী হয়েছে। হোটেলে হোটেলে আরো অনেক 'বার' হয়েছে। সেখান থেকে অনেক রাতে ফেরে সাহেব। তারপর সাহেব ডাকে—পীরালি—

পীরালি বলে—হুজুর।

হুকুম দিতে হয় না। পাঁরালি জানে। ডাকলেই পাঁরালি বুঝতে পারে। শোবার পর ঘরের আলো নিবিয়ে দিতে হয়, স্লিপার-জোড়া পায়ের কাছে রাখতে হয়, টেবল্-ল্যাম্পটা বালিশের পেছনে গুছিয়ে রাখতে হয়। অ্যাশ-ট্রে, সিগারেট, ম্যাচেশ্—সব কিছু টিপয়ের ওপর রেখে দিয়ে তখন ছুটি। তারপর ভোর চারটে থেকেই পাঁরালির কাজ শুরু হয়। তখন হট্-ওয়াটার, টুথ-ব্রাশ, সিগারেট, ম্যাচেশ, কফি, সব কিছু রেডি করতে হবে।

কিন্তু সেদিন বিকেল বেলা অফিস থেকে এসে সাহেব বেরোল না আর। বললে—জগন্নাথকে ডাক্—

জগন্নাথ এল। একেবারে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। বললে—তৈরি?

—হ্যাঁ হুজুর।

—কে কে আছে দেখলি?

—দুজন আছে হুজুর, দু'বোন। আর একটা চাকর। বড় বোনটা পাগলের মতন। মাথা-খারাপের রোগ, প্রায়ই তো রেলের লাইনে মাথা দিতে যায়। তাকে ধরে পুরে চোখে-চোখে রাখে।

—আর কেউ নেই বাড়িতে?

—না হুজুর, আর কেউ নেই।

মিস্টার ঘোষাল চুরোট ধরালে একটা। বললে—আচ্ছা তোকে আজ আমার সঙ্গে যেতে হবে সেখানে, এখন যা তুই—আর মকবুল কোথায়?

মকবুল তৈরিই ছিল। ঘরে ঢুকেই সেলাম করলে। সাহেব বললে—শিলিগুড়ি গিছলি?

—গিয়েছিলুম হুজুর। সব দেখে এসেছি—

—পারবি তো?

মকবুল বললে—খুব পারবো হুজুর। বাঙলোর সামনে বাগান আছে হুজুর, পেছনেও বাগান আছে, লুকিয়ে থাকবার জায়গা আছে, জঙ্গল আছে, মাঠ আছে, কেউ ধরতে পারবে না—

—তাহলে ঠিক আছে, সঙ্গে কোনও লোক লাগবে তোর?

—না হুজুর, লোক কী হবে, আমি একলাই ফরসা করে দেব।

মিস্টার ঘোষাল যেন খুশী হলো। বললে—যা তা হলে এখন। কাল তোকে খবর দেব,—

মকবুল চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার বাইরে যেন কীসের হল্লা উঠলো।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—ও হল্লা কীসের রে?

—হুজুর, কাল থেকে ওই হল্লা সুরু হয়েছে। গুণ্ডারা কোতোয়ালীতে ঢুকে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে—

সত্যিই দাঙ্গা বটে। শ্যামবাজারের মোড়ে লক্ষ-লক্ষ লোক জড়ো হয়েছে। মিলিটারি ট্রাক দেখলেই কোথা থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে ঢিল এসে পড়ে তাদের গায়ে, তারা যেদিকে পারে গুলী চালায়। সেন্ট্রাল এভিনিউ আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে পাঁচখানা মিলিটারী-ভ্যান্‌কে ধরে কারা আগুনে জ্বালিয়ে দিলে। আগুন জ্বলতে লাগলো দাউ দাউ করে। কোথা থেকে আর্মির লোক এসে যাকে সামনে পেলে তাকেই গুলি করে রাস্তা ফাঁকা করে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এসে জড়ো হয়েছে সবাই। জগুবাবুর বাজারের মোড়ে ট্রাম রাস্তার মোড়ে ডাস্টবিন জড়ো করে ট্র্যাফিক বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথমে পুলিস টিয়ার-গ্যাস্ ছুঁড়লো কয়েক-রাউণ্ড, কিছু ফল হলো না। তখন গুলী চললো। একজন মরে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হাজরা পার্কের মোড়ে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো। আগুনের আলো দেখেই সবাই উঁকি মারলে আশে-পাশের বাড়ি থেকে, দেখলে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে একটা মিলিটারি-গাড়িতে। কলকাতার কোনও জায়গা বাকি নেই। বড়বাজার, ডালহৌসী-স্কোয়ার হাতী-বাগান, কালীঘাট—সবত্র শুধু আগুন আর ভিড়। শহরের জীবন অচল হয়ে গেছে একেবারে। ট্রাম-বাস চলে না। কালীঘাট ট্রাম-ডিপোটাই একদিন সন্ধ্যেবেলা আগুনে পুড়ে গেল। ন'খানা ট্রাম ছাই হয়ে গেল আগুনে পুড়ে। ধর্মতলার মেথডিস্ট্ চার্চটায় একদিন আগুন জ্বলে উঠলো—চারদিকে অত লোক, অত ট্রাম-বাস-রিক্সা-ট্যাক্সি, তারই মধ্যে কখন যে কে গাড়িটার ভেতর ঢুকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ জানতে পারেনি। আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার স্টুয়ার্ট কোর্টে যাচ্ছিল। তাকে ধরে গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিলে লোকে।

মিস্টার ঘোষাল টেলিফোনটা তুললে। পুলিস কমিশনারকে জিজ্ঞেস করতে হবে—ট্রাবল্‌টা কী? কেন এ-সব হচ্ছে?

কিন্তু এক্সচেঞ্জ থেকে কোনও উত্তর নেই। কেউ ধরছে না। ঝপাং করে নামিয়ে রাখলে রিসিভারটা। তারপর স্টেট্‌সম্যান-খানা টেনে নিলে। তার ওপর বড় বড় করে লেখা রয়েছে—মিলিটারি ওপন্ ফায়ার অন্ ক্রাউড্।

আর পড়া হলো না। কাগজখানাকে টেনে ফেলে দিয়ে মিস্টার ঘোষাল উঠলো। বললে—তুই জগন্নাথকে ডেকে দে—

জগন্নাথ আসতেই সাহেব বললে—চল্ আমার সঙ্গে—

—কোথায় হুজুর?

—গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে। গাড়ি রাখতে বল্—

জগন্নাথ বাইরে চলে গেল। মিস্টার ঘোষাল তৈরি হয়ে নিলে। সমস্ত কলকাতা পুড়ে যাক্, পুড়ে ছাই হয়ে যাক্, তাতে কিছু দুঃখ নেই। এর পেছনে আছে সেন। দ্যাট্ ব্যাস্টার্ড। দ্যাট্ রোগ্। সেই-ই একদিন প্যালেস-কোর্ট থেকে মিসেস ঘোষকে গড়িয়াহাটের বাড়িতে শেলটার দিয়েছে। সেই সেনই আবার হয়ত একদিন মিসেস ঘোষকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাবে। তার পথ বন্ধ করতে হবে! রিভলবারটা নিজের পকেটে পুরে নিলে। জেলে যাবার পরে লাইসেন্স্ ক্যানসেলড্ হয়ে গিয়েছিল, সেটা আবার পাওয়া গেছে।

গট্ গট্ করে মিস্টার ঘোষাল সিঁড়ি দিয়ে নিচের নেমে এল। বিকেল হয়ে আসছে।

চৌরঙ্গী দিয়ে বিরাট লম্বা প্রোসেসন্ চলেছে। মিস্টার ঘোষালের গাড়িটা এসে আটকে পড়লো। কিন্তু আর যেন দেরি সইছে না। সাহেব বললে—ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চলো—পার্ক স্ট্রীট্‌সে গাড়ি ঘুমাও—

পেট্রল কোম্পানীর ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিলে। বললে—জী হুজুর—

সনাতনবাবু বললেন—আমি তোমার অনেক দেরি করে দিলাম—

সতী বললে—এমনি করে তুমি যদি আগে দেরি করিয়ে দিতে তাহলে আমার কপালে এত কষ্ট আর হতো না—

সনাতনবাবু বললেন—তাহলে তুমি চলো—আর দেরি করছো কেন?

সতী হঠাৎ বললে—তার চেয়ে তুমিই এখানে থাকো না—

—আমি?

—কেন, আমার কাছে থাকতে তোমার আপত্তি আছে? তুমি তো বলেছ আমি যা বলবো তুমি তাই-ই শুনবে! এবার থেকে তুমি তো আমার!

সনাতনবাবু বললেন—ক'দিন সারা রাত ঘুমই হচ্ছে না কি না! চারিদিকে যা গোলমাল চলছে!

—তা আমার এখানেই ঘুমোও না। আমার এখানে কি ঘুমোবার বিছানা নেই ভেবো? আমি কি ঘুমোই না মনে করেছ? তুমি আমার বিছানাতেই শোবে চলো না। তুমি শুয়ে থাকবে আর আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব—

—কিন্তু বাড়িতে মা জানে না যে আমি এখানে আসবো। তারা হয়ত ভাববে!

সতী বললে—তাহলে তুমি চলে যেতে চাও?

সনাতনবাবু বললেন—না না তা কেন, আমি এখানে থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে হয়ত—

সতী বললে—আমাদের যতই অসুবিধে হোক, তোমাকে আমি এ-সময়ে কোথাও যেতে দেব না—

—কিন্তু খবর দিয়ে আসিনি যে আমি!

—সে তারা ভাবুক, কিন্তু এখন এই অবস্থায় আমি তোমাকে কী করে একলা ছেড়ে দিই বলো? তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি যে কিছুতেই মনে শান্তি পাবো না। তাহলে তুমি এলে কেন? না এলেই তো পারতে!

—তাহলে থাকি!

সতী বললে—হ্যাঁ থাকো তুমি। অনেক দিন পরে তুমি আমি এক সঙ্গে থাকবো, চলো ওপরের ঘরে চলো—আমাদের এ-বাড়িতে কেউ নেই, আমার দিদি আছে, তার ঘরের দরজায় শেকল লাগিয়ে দেবখন। আর আমি রঘুকে বলছি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসবে।

—তাহলে চলো!

রঘুকে বলতেই রঘু রাজি। বললে—কেন যাবো না দিদিমণি, আমি তো সে-বাড়ি চিনি—

—সামনে যাকে পাবি তাকেই বলে দিবি যে দাদাবাবু এখানে আমাদের বাড়িতে আজ রাত্রে থাকবে। পারবি তো?

রঘু চলে যেতেই সতী দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। তারপর তাড়াতাড়ি তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সনাতনবাবু তখনও বিছানার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। সতী পাশে বসলো গিয়ে। বললে—জানো কাল রাত্তির বেলা তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলুম—স্বপ্ন দেখলুম যেন তুমি আমার পাশেই শুয়ে রয়েছ—

সনাতনবাবু বললেন—আমিও তো সারা-রাত তোমার কথাই ভেবেছি—

—তুমি ভালো করে আরাম করে বোস না, অমন আড়ষ্ট হয়ে আছো কেন?

সনাতনবাবু পা তুলে বসলেন। বললেন—ক'দিন ধরে কলকাতায় খুব মারা-মারি হচ্ছে, খবরের কাগজে পড়ছিলুম, তখন থেকেই কেবল তোমার কথা ভাবছি, ভাবছিলাম তুমি একলা-একলা কেমন করে এ-বাড়িতে আছো—

সতী আরো কাছে সরে এল। বললে—এবার থেকে আমি তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবো না—তুমি তাড়িয়ে দিলেও যাবো না, তুমি চলে যেতে বললেও আমি তোমার কাছে থাকবো—

সনাতনবাবু বালিশের গায়ে হেলান দিলেন। সতী বললে—তুমি ভালো করে শোও না, ক'দিন ধরে তুমি রাত্রে ঘুমোওনি বলছিলে?

—না না, শোবনা এখন, তোমার সঙ্গে গল্প করবো!

—তা শুয়ে-শুয়েই গল্প করো না। তুমি শোও, আর আমি তোমার পাশে বসে গল্প করি—

বলে সতী সনাতনবাবুর পিঠ থেকে বালিশটা সরিয়ে দিলে। সনাতনবাবু বালিশে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে শুলেন। বললেন—বাইরে বোধহয় বৃষ্টি পড়ছে—না?

সতী বললে—বৃষ্টি হলে খুব ভালো হয়, বৃষ্টি হলে বেশ তাড়াতাড়ি রাস্তা খালি হবে। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়বে না তো? আজ কিন্তু সারারাত তোমায় জাগতে হবে তা বলে রাখছি—

সনাতনবাবু বললেন—আজকে আর আমার ঘুম পাবে না দেখো, দেখে নিও......

সতী কী যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো বাইরের সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। বোধহয় রঘু এসেছে। বললে—তুমি একটু শোও লক্ষ্মীটি, আমি আসছি—

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে তলায় নেমে এসেই দরজাটা খুলে দিয়েছে। কিন্তু খুলে দিয়েই হঠাৎ যেন ভূত দেখে দশ পা পেছিয়ে এল সতী। বাইরে এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। আর অন্ধকারের মধ্যেই বীভৎস মুখে জ্বলন্ত চুরোট নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে মিস্টার ঘোষাল। মিস্টার ঘোষালের বিরাট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। অন্ধকারে ভালো করে দেখা গেল না। কিন্তু সতীর মনে হলো গাড়ির ভেতরেও যেন আরো দু'একজন লোক ঘাপটি মেরে বসে আছে।

মিস্টার ঘোষাল ঘরের ভেতরে ঢুকে নিজেই সদর দরজাটা হাত দিয়ে বন্ধ করে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। সতী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মিস্টার ঘোষাল সতীর দিকে মুখ তুলে বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে—

সতী বসলো না। তেমনি পাথরের মূর্তির মতই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মিস্টার ঘোষাল বললে—কী হলো, বসবে না?

সতীর মুখে এতক্ষণে যেন একটু কথা বেরোল। বললে—আপনি কবে ছাড়া পেলেন?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিবাহপূর্বে প্রণয়ের বিচিত্র দৃষ্টান্ত

বিবাহপূর্ব প্রণয়ের কথা উঠলে ত্রিস্তান ডা কুনহা দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে কবছর আগে পর্যন্তও প্রচলিত একটা অদ্ভুত রীতির কথা উল্লেখ করা যায়। ওখানকার অধিবাসীদের ভাল ভাবে জানতেন এমন এক ধর্মযাজক এই বিষয়ে লিখে গিয়েছেন ঃ

"কেউ কোন মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলে মেয়েটির বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সে রান্নাঘরে একটি বেঞ্চে গিয়ে বসে। প্রায় কোন কথা না বলে সলজ্জভঙ্গীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকে। এইভাবে এসে রান্নাঘরের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে ঘণ্টা কতক করে কাটিয়ে দেওয়া চলতো মাস কতক ধরে। ছেলেটির পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল তার ভাবী বান্ধবীর পত্নীর জন্য একজোড়া মোকাসিন তৈরি করে দেওয়া। এর পর মেয়েটি তখন ছেলের মায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ কেচে দেবার অনুমতি প্রার্থনা করবে।

"কিন্তু রবিবার বিকেলে এই জুটিটি এক সঙ্গে বেড়াতে বের না হওয়া পর্যন্ত দ্বীপবাসীরা ওদের বিবাহ নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে বলে মনে করবে না।"

মাসের পর মাস ধরে এইভাবে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে পত্নী লাভ করার চেয়ে আকস্মিকভাবে নির্বাচন করে নেওয়ার কৌশল বহুস্থলে বেশী কার্যকরী বলে মনে করা হয়। মোরেনহো ডাও নামক এক অদ্ভুত প্রদেশের ধর্মযাজক এটা প্রমাণ করে দেন।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর তিনি এক প্রার্থনা সভায় ঘোষণা করেন ঃ "আমি বিবাহেচ্ছুক পাত্র। এই গির্জায় সমবেত মহিলাদের কেউ আমাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করলে, তিনি যেন উঠে দাঁড়ান।"

দুটি মহিলা উঠে দাঁড়ায়। ডাও দুজনের ওপর ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ "মনে হয় আমার সবচেয়ে যিনি নিকটবর্তিনী তিনিই প্রথম দাঁড়িয়েছেন। সে যাই হোক, ওকেই আমি আমার পত্নীর আসনে অধিষ্ঠিত করবো।" এবং কার্যত তিনি করেনও তাই।

প্রথম দর্শনেই প্রেমের বিচিত্র ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্কগামী ট্রেনের যাত্রী মেরী এবং এক সৈনিক সম্পর্কে। প্রথম পাঁচশত মাইল ওদের দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ পর্যন্ত ঘটেনি। রাত্রে যে যার শোবার জায়গায় উঠে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় এবং সকাল হতেই যে যার আসনে এসে বসে। সৈনিকই প্রথম কথা বলে। সলজ্জভাবে সে বলে ঃ "আমার নাম ফ্রয়েড।"

"আমার নাম মেরী।" লজ্জাবনত হয়ে মেয়েটি বললে।

"চল শিকাগো পৌঁছে আমরা বিয়ে করি।" ফ্রয়েড বললে।

"অতো দূরে যাওয়া কেন?" মেরীর স্বরে অধৈর্যতার আভাস ফুটে উঠলো।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতে ওরা নেমে গিয়ে সটান হাজির হলো বিবাহ রেজেস্ট্রি অফিসে।

এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে [illegible] বিমানে দক্ষিণ দিকে যাত্রী ক্যালিফোর্নিয়ার এক যুবক। বিমানটির ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দিতে সে যাত্রী প্যারাস্যুট ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে প্যারাস্যুটটি ওকে নামিয়ে দেয় একটি গাড়ীর ছাতের ওপর যাতে এক সুদর্শনা মেয়ে তখন বেড়াতে বেরিয়েছিল। গাড়ীর ছাদ থেকে নেমেই সে মেয়েটির কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা মঞ্জুর হয়ে যায়।

অনেকটা একই ধরনের রীতিনীতি-বহির্ভূত ব্যাপার ঘটে এক ক্যানাডিয় ব্যবসায়ী এবং টরন্টোর এক একুশ বছর বয়স্কা সুন্দরী মেয়ের মধ্যে। দুজনেই সাঁতার কাটতে গিয়েছে একই পুকুরে এবং একই সঙ্গে ডাইভ দেয়। ওদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে জলের নীচে পরস্পরের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে। উভয়কেই মস্তকে আঘাতজনিত অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ওরা আরো কাছাকাছি [illegible] বিবাহের সিদ্ধান্ত করে নেয়।

এক যুবকের কাছে কোন কোন ক্ষেত্রে মনের [illegible] করে। এলাবামার [illegible] একটি মেয়ের কারাদণ্ড হয় একটা সামান্য অপরাধের জন্য। সাময়িকভাবে ওকে যেখানে রাখা হয় ঠিক তার বিপরীত দিকের কারাকক্ষে বন্দী ছিল এক সুদর্শন যুবক।

মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসে, যুবকও হাসিমুখে চেয়ে দেখে। কিন্তু [illegible] এবং [illegible] অনেকদূর [illegible]।

যুবকের মাথায় একদিন এক বুদ্ধি খেলে যায়। মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করে একটুকরো কাগজে লিখে ছোট ঢেলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয় [illegible] বিপরীত দিকের কক্ষ থেকে উত্তর আসে, "ইভেলীন" এবং দিনের পর দিন ধরে এইভাবে ওদের আলাপ চলতে থাকে। যুবকের শেষ লিপি ছিল ঃ

রাইন নদীর তীরে ডুসেলডর্ফে পরিকল্পিত আধুনিক নাট্যালয়ের মডেল। নবতম এই নাট্যগৃহটির পরিকল্পনায় পৃথিবীর আটাশজন স্থপতি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। দুজন জর্মান স্থপতি ব্রকম্যান ও ফউ এবং আমেরিকার স্থপতি নিউট্রার মধ্যে প্রথম পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হয়। ডুসেলডর্ফের পৌরকর্তারা দীর্ঘ আলোচনা ও বিচার করে ফউয়ের নক্সা (ওপরের ছবি) গ্রহণ করেন। এই নাট্যালয়ে এগার শত আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ ছাড়া থাকবে সাড়ে তিনশ আসনযুক্ত মহলার জন্য একটি স্টুডিও।

"প্রিয়তমা, ইভেলীন, আমাকে তুমি বিয়ে করবে কি?" মুহূর্ত পরেই উত্তর আসে 'হ্যাঁ'। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা বিয়ে করে।

বিবাহে অনিচ্ছুক প্রণয়ীকে বাগে আনতে অনেক মেয়ে বড় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

ফ্রাঁসোয়া ব্ল্যাংক ছিল পেশাদার জুয়াড়ি। শার্লট হেনসেল নামক এক জর্মান মেয়ে ওর প্রেমে উন্মাদ হয়ে ওঠে, কিন্তু ফ্রাঁসোয়া একটা না একটা ছুতো তুলে বিয়ে এড়িয়ে যেতে থাকে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শার্লট কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী হতে বাধ্য করেছিল—রিভলবার দেখিয়ে। একদিন সকালে স্বয়ংক্রিয় একটা রিভলবার হাতে নাচাতে নাচাতে শার্লট উপস্থিত হয় ফ্রাঁসোয়ার অফিসে এবং তক্ষুণি বিয়ে করতে রাজী না হলে গুলি করবার ভয় দেখায়।

থতমত খেয়ে ফ্রাঁসোয়া রাজী হয়ে যায়। বিয়ে করে ফ্রাঁসোয়ার লাভই হয়; কারণ শার্লট ছিল ব্যবসায়ে তীক্ষ্ণমেধা মহিলা। ফ্রাঁসোয়া মণ্টিকার্লোর ক্যাসিনোর জুয়া পরিচালনস্বত্ব গ্রহণ করতে শার্লট সুযোগ্য সঙ্গিনীর পরিচয় দেয়। দুজনে মিলে ওরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে।

এস বাস্তিয়ো নামক এক ধনী ফরাসী তনয় বিবাহপূর্ব পরিণয় থেকে বঞ্চিত হয়। ১৮৮৯ সালে তার বাবা মারা যাবার সময় এই শর্ত রেখে যান যে, তিনি উইলে যে ছটি মেয়ের নাম করে যাচ্ছেন তাদের এক-জনকে বিয়ে করলে তবেই তার পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে। বিষয়টাকে আরো জটিল করার জন্য শর্তের একটি ধারায় নির্দেশ দেওয়া হয় যে, পুত্রকে নিজের চোখ বেঁধে পাত্রী বেছে নিতে হবে। ছটি মেয়েই বাস্তিয়োর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

উইলের শর্তে খুঁত বের করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষে শর্ত পালন করতে সে রাজী হয়ে যায়। কয়েকজন সাক্ষী এবং উইলের অছিদের সামনে বাড়ির লাইব্রেরি ঘরে এই অদ্ভুত নাটকটির অভিনয় হয়।

উকিল মেয়ে ছটিকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে চোখ-বাঁধা বাস্তিয়োকে ঘরে এনে হাজির করে দেন। হাত বাড়িয়ে পা পা করে এগোতে এগোতে বাস্তিয়ো একটি মেয়েকে স্পর্শ করলে।

ওর ভাগ্য ভালই ছিল। ছজনের মধ্যে সেই মেয়েটিই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী এবং চল্লিশ বছর ওরা সুখে বিবাহিত জীবন কাটায়।

আর কিছুতে যদি না হয় তো ধৈর্যের দাম কোন কোন সময়ে অবশ্যই পাওয়া যায়। বুকলিনের (যুক্তরাষ্ট্র) এক যুবক যতবার তার প্রণয়িনীকে বিবাহের প্রস্তাব করে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে। শেষে মরিয়া হয়ে সে মেয়েটিকে ফোন করে তার পত্নী হবার জন্য টেলিফোনে অনুনয় করতে থাকে।

মেয়েটি কেবলি প্রত্যাখ্যান করে রিসিভার নামিয়ে রেখে দেয়। যুবক আবার ফোন করে, কিন্তু সেই একই উত্তর, "না"। রাত্রেও সে টেলিফোন করতে থাকে এবং আগের সেই একই উত্তর 'না'। এগারো ঘণ্টা ধরে একটানা বার বার টেলিফোন করার পর শেষে সম্ভবত উত্তর দিতে দিতে পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হয়েই মেয়েটি বিয়ে করতে সম্মতি জানায়।

ইলেকট্রনিক যুগে অফিস সেক্রেটারির কাজ

রাইন নদীর উপকূলবর্তী কচলান শহরে পশ্চিম-জার্মানীর অফিস-যন্ত্রসরঞ্জামের পঞ্চম মেলা ও প্রদর্শনী সম্প্রতি হয়ে গেল। ২৪০টি জার্মান প্রতিষ্ঠান এবং বহু বিদেশী সংস্থার অভিনব যন্ত্রসম্ভারে প্রদর্শনীটিতে যেন যাদু-উৎসব লেগে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, স্বয়ংক্রিয় টাইপরাইটার যন্ত্রগুলি যেন ভূতে চালাচ্ছে; ইলেকট্রনিক হিসাব-যন্ত্রগুলি যেন মন্ত্রবলে আপনা-আপনি খচ্ খচ্ আওয়াজ করে নিজের কাজ নিজেই করে চলেছে, মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে ওদের গুপ্ত আলোর সংকেত। স্বয়ংক্রিয়াশীলতা ও যন্ত্রাভ্যাসে আধুনিক অফিসের রূপটি কেমন দাঁড়াবে তা দেখে দর্শকেরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

ভবিষ্যতে সর্বাধুনিক যন্ত্রসরঞ্জামবিশিষ্ট অফিসের সেক্রেটারিকে সাধারণ গতানু-গতিক চিঠিপত্র ছাপাবার জন্য বিশেষ সময় নষ্ট করতে হবে না। চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট নিপুণ যন্ত্রের দ্বারা অনেক কিছু কাজ আপনা-আপনি হয়ে যাবে। স্বয়ংক্রিয় টাইপ-রাইটার একটি বিশেষ 'কণ্ট্রোল স্ট্রাপের' সাহায্যে নিত্যকার সাধারণ চিঠিপত্র ছেপে দেবে—তার উপর সেক্রেটারিকে শুধু নাম-ধামগুলি ছেপে নিতে হবে।

প্রদর্শনীটিতে আর এক রকম অদ্ভুত ধরনের টাইপরাইটার দেখা গেল সেটা বৈদ্যুতিক প্রথায় চলে এবং আরও আশ্চর্য এই যে, এটির কোন টাইপ উত্তোলন দণ্ড নেই। বলের মত একটি গোলকশীর্ষে টাইপ-গুলি সাজান রয়েছে এবং কাপলিং ও স্প্রিংয়ের সাহায্যে ওগুলি ঠিক যেখানটিতে দরকার এসে ছেপে যাবে। আরও মজা এই যে, এই ধরনের টাইপরাইটারে কাগজকে টাইপের নীচে সরে সরে যেতে হবে না, টাইপ বলটিই সরতে সরতে কাগজের লাইনগুলি ভরিয়ে দেবে। অঙ্কের হিসেব অনুযায়ী এই টাইপরাইটারে প্রতি সেকেণ্ডে ৫০টি চিঠি ছাপান যেতে পারে।

এতক্ষণ শুধু টাইপরাইটারের কথাই হলো এছাড়াও প্রদর্শনীটিতে অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে ছিল একরকম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যাতে করে ঘণ্টায় ৯০০০ চিঠি খামে ভর্তি করা যাবে এবং ওটির সাহায্যে খামের উপরে যে কোন প্রচার-বিজ্ঞপ্তি ছাপা যাবে। আরেকটি যন্ত্রে প্রতি ঘণ্টায় ৪,০০০টি খাম বন্ধ করা যেতে পারে দেখা গেল। একটি টেলিফোন ছিল যাতে নিজেদের মধ্যে ৫০টি নম্বরে টেলিফোন করা চলবে এবং অভিপ্রেত কোন লাইন অন্য লাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেটি বিযুক্ত হলেই তার কাছ থেকে এ লাইনে সাড়া পাওয়া যাবে। খুচরো টাকা পয়সা গোনা, কিছুর মধ্যে বন্ধ করা ও তার হিসেব রাখার একটি নির্ভুল যন্ত্র ছিল।

ভবিষ্যতে অফিসে অতি সাধারণ স্তরের কয়েকজন মাত্র কর্মী হলেই চলবে, সেক্রেটারি ও ডাইরেক্টরেরা বড় বড় কাজের দিকে মাথা ঘামাবার অনেক বেশী সময় পাবেন।

(১৪)

গিরিজাপ্রসাদ আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ নন। সবই চোখ মেলে দেখেন, বোঝেনও সব কিছু, তবু মুখের কথা তো সব সময় হিসেব মেনে চলে না।

অবিনাশ ডাক্তারের ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন গিরিজাপ্রসাদ। দেখলেন প্রভাকরও সঙ্গে এসেছে।

ডাক্তার নিজেই বললে, ফিরে এলাম মাস্টার মশাই, মাঝপথেই দেখা হয়ে গেল বি ডি ও সাহেবের সঙ্গে তাই নিয়ে এলাম আপনার কাছে।

গিরিজাপ্রসাদ বসতে বললেন প্রভাকরকে। বেশ বোঝা গেল খুব খুশী হয়েছেন তিনি ডাক্তারের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে। মনে মনে ভাবছেন হয়তো, অবনীমোহনকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে আসবেন কিনা।

কাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে বাংলাবাড়ির দাওয়ায় উঠে বসলো অবিনাশ ডাক্তার, পিছনে পিছনে প্রভাকর।

ক্রাচ দুটো বগল থেকে নিয়ে পাট করে পাশে রেখে কম্বলটার ওপর বসলো ডাক্তার। আর প্রভাকরও। গিরিজাপ্রসাদ সেই ফাঁকে চায়ের কথা বলে এলেন।

খানিক পরেই কাঁসার থালায় দু' কাপ চা এনে নামিয়ে রাখলে বিমলা, আর কাপ দুটো তুলে প্রথমে ডাক্তারকে, তারপর প্রভাকরকে দিতে গিয়ে চোখাচোখি হলো, ঠোঁট টিপে হাসলো বিমলা।

প্রভাকর হাসলো লাজুক মুখ নামিয়ে। তারপর বললে, এত বেলায় আবার চা কেন!

বিমলা থালাটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে কৌতুকের সুরে বললে, তা হলে ভাত খেয়ে যান!

গিরিজাপ্রসাদও হেসে উঠলেন। আর বিমলার কথার জের ধরেই প্রভাকরকে বার-বার খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন, ফিরতে তো অনেক বেলা হয়ে যাবে......

প্রভাকর এড়িয়ে যাবার জন্যে বললে, আজ থাক, আরেকদিন এসে খেয়ে যাবো।

—কবে, বলে যাও। অবিনাশ ডাক্তারকেও সেই সঙ্গে অনুরোধ করলেন গিরিজাপ্রসাদ। মুহূর্তের জন্যে তিনি ভিতরবাড়ির সমস্ত আবহাওয়াটার কথা যেন ভুলে গেলেন। এমন কি একটু আগে নিভাননী কি বলতে চেয়েছিলেন, কেন রাগে থমথম করছিল তাঁর মুখ, হঠাৎ একটা বাইরের লোককে খেতে বললে গিন্নী কি বলবে—এসব কোন কথাই তাঁর মনে পড়লো না।

সকাল থেকেই খুশিতে ভরে আছে তাঁর মন, তাই অন্য কারো কথা ভাববার সময় পেলেন না।

জিজ্ঞেস করলেন, কবে আসবে বলো।

—রবিবার। অবিনাশ ডাক্তারই কথা দিয়ে দিলো প্রভাকরের হয়ে।—বলছেন যখন মাস্টারমশাই, চলে আসুন রবিবারে।

শেষ পর্যন্ত সে-কথাই ঠিক রইলো। আর বিমলা মুখে হাসির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো মাকে।—মা, মা, এই রবিবারে ডাক্তার আর ঐ যে জীপে করে আসে......ওরা দু'জনে এখানে খাবে।

—খাবে? আকাশ থেকে পড়লেন নিভাননী।

বিমলা হেসে বললে, হ্যাঁ, শুনে এলাম, বাবা নেমন্তন্ন করলো ওদের......এই রবিবারে!

নিভাননী কোন কথা বললেন না। শুধু একবার রান্নাঘরের দিকে তাকালেন। নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগলো তাঁর। দুটো লোককে খেতে বলেছেন গিরিজাপ্রসাদ, এমন কিছু অন্যায় করেন নি। সত্যিই তো, প্রভাকর ছেলেটি এই এত বেলায় ফিরে যাবে, কখন স্নান করে কখন খায় তার ঠিক নেই, পারলে আজই খেয়ে যেতে বলতেন নিভাননী। তাকে যদি একটা দিনের জন্যে খেতে বলেই থাকেন

গিরিজাপ্রসাদ এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নি। তবু কথাটা শোনার সংগে সংগে কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলেন নিভাননী। মোহনপুরের বউ শুনলে না জানি কি কান্ড করে বসবে! আর গিরীন?

বনপলাশিতে আসার পর থেকে যেন শান্তি নেই তাঁর মনে। প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্ক, প্রতিটি পদক্ষেপ ভেবেচিন্তে, কোন কথাটা কি ভাবে নেবে মোহনপুরের বউ, কোন কাজটার কি অর্থ করবে!

তবু না বলে পারলেন না নিভাননী। নাকি, ইচ্ছে করেই, সেই নৃশংস আনন্দটা উপভোগ করার জন্যেই বললেন, প্রভাকর আর ডাক্তার এই রবিবারে এখানে খাবে, মাছটাছ ধরাতে হবে, বলো ঠাকুরপোকে।

মোহনপুরের বউ শুনলো কথাটা, স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো নিভাননীর মুখের দিকে। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তারপর রুক্ষ স্বরে বললে, সে কথা নিজের মুখেই বলবেন।

নিভাননীও রুষ্ট গলায় উত্তর দিলেন, বলতাম, কিন্তু ঠাকুরপো যে কখন আসে কখন যায় তার খবরই পাই না। দেখা হলে তবে তো বলবো।

মোহনপুরের বউ এবার আরো চটে গেল। বললে কাজের মানুষের পাঁচ ঝঞ্ঝাটে ছুটতে হয়, ঘরে বসে বসে তামাক খেলে তো চলে না।

নিভাননী আর কোন কথা বললেন না। ভাবলেন, গিরীনকেই বলবেন।

কিন্তু তা আর বলতে হলো না। দুপুরে গিরীন যখন ভাত খেতে এলো মোহন-পুরের বউ-ই উষ্মার স্বরে বললে এ ঝামেলা আমি আর পোয়াতে পারছি না। ওদের রান্নাবান্নার আলাদা ব্যবস্থা করতে বলো।

—কেন? বুঝতে না পেরে থালা থেকে মাথা তুললো গিরীন।

—কেন আবার! ওদের সাতগুষ্টির রাঁধোবাড়ো আবার এখন একে-ওকে নেমন্তন্ন করতে শুরু করেছে।

একে একে সব খুলে বললে মোহন-পুরের বউ। আর সব শুনে গিরীন বললে, সে ভালই হয়েছে!

—ভালই হয়েছে! বিস্মিত না হয়ে পারে না মোহনপুরের বউ।

গিরীন হেসে বললে, প্রভাকরের বাপের কাছে তো যাবো, কিন্তু শিক্ষিত উপার্জন-ক্ষম ছেলে, বাপ কি বলবে তা তো জানাই।

—কি বলবে?

—বলবে ছেলের পছন্দই পছন্দ, আমার মতে কি আর নিয়ে হবে!

মোহনপুরের বউয়ের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটলো। বললে, তা হলেও তো বাঁচা যায়। আউমা তো বলছিল......

গিরীনও হাসলো। বললে, দাদা ওদের খেতে বলে ভালই করেছে, বুঝলে। মতামতটাও একটু টের পাওয়া যাবে, আর বাপকেও বর বলা যাবে, ছেলে মেয়ে দেখেছে।

মোহনপুরের বউয়ের মুখে তৃপ্তির হাসি নামলো। বললে, তা হলে শুক্কুর-শনি করে একদিন বদ্দমান যাও, দু-একটা তরি-তরকারি......

গিরীন বললে, হ্যাঁ, জেলেদেরও খবর দিয়ে রাখতে হবে।

একটু আগেই যে-কথাটা শুনে রীতিমত চটে গিয়েছিল মোহনপুরের বউ, এখন সেটাতেই যেন তার কাছে সবচেয়ে উৎসাহ।

এমন কি চিয়াকেও খবরটা না শুনিয়ে পারলো না। বললে, রুপোর বাসনগুলো মেজে রাখতে হবে চিয়া। এই রবিবারে আবার প্রভাকরকে খেতে বলা হয়েছে।

খবরটা গর্ব করারও। বি ডি ও সাহেব, যার কাছে কত সব গ্রামের লোক গিয়ে ধর্না দিয়ে বসে থাকে এটা-ওটার জন্যে, সেই মানুষটা রায়বাড়িতে আসবে, খাবে, সুতরাং পাঁচজনকে না জানিয়ে থাকবে কি করে মোহনপুরের বউ।

দেখতে দেখতে তাই খবরটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। আর তা শুনে লাঠি ঠক-ঠক করে এসে হাজির হলো আউমা।

দুপুরবেলায় দাওয়ার রোদে বসে বসে একটা কুলোর পিঠে বড়ি দিচ্ছিল মোহন-পুরের বউ, আর চিয়া পাশে বসে শিলের ওপর ডাল বাটছিল। মুখে তার হাসি লেগে ছিল এক টুকরো, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে মার সংগে গল্প করছিল চিয়া। ও কোন-দিন ভাবতেই পারে নি, প্রভাকর এ-বাড়িতে আসবে, খাবে। তাই খবরটা আচমকা জেনে থেকে মনটা গুনগুন করে উঠেছিল ওর। নিজের মনেই কত কি সব ভেবেও শুধু করেছিল। আর ভাবছিল খবরটা শুনে টাঙা নেলি, রেণুদি—সবাই কি ভাববে, কি বলবে ওকে! না, কিছু বলবে না ও নিজে থেকে। তার চেয়ে সেদিন আসবে প্রভাকর সেদিন কারো না কারো কাছে ওরা নিজেরাই শুনতে পাবে। কিন্তু প্রভাকর কেন আসছে, কে নিমন্ত্রণ করলো কিছুই বুঝতে পারে না চিয়া। ওর একবার ইচ্ছে হয় মাকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু পর-মুহূর্তেই লজ্জা পায়। মা যদি বুঝতে

পারে! তবু, মনে মনে ভাবতে ভাল লাগে, প্রভাকর আসছে তার জন্যেই। তা না হলে হঠাৎ আসবে কেন! এক একবার সন্দেহ হয়, প্রভাকর কি তাকে দেখতে আসছে? মেয়ে দেখতে? বিয়ের একটা কথা বলেছিল অট্টামা, সেদিন দরজার আড়াল থেকে তার কানে গিয়েছিল। আর রাত্রে শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতেও একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, আর চোখ বুজে বুজেই শুনতে পেয়েছিল বাবা-মা তার বিয়ের কথাই বলাবলি করছে, প্রভাকরের সঙ্গে বিয়ের কথা। তবে কি বাবা-মার সেই জল্পনা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, সত্যিই মেয়ে দেখতে আসছে প্রভাকর?

নিজের মনে মনেই একটা স্বপ্ন গড়ে তুলছিল টিয়া শিলের ওপর ডাল বাটতে বাটতে। আর মোহনপুরের বউ মাঝে মাঝে বাটা ডালটা একটা বাটিতে তুলে নিয়ে সেটা ফেনাচ্ছিল।

এমন সময় বাইরে থেকে অট্টামার গলা ভেসে এলো। কই গো মোহনপুরের বউ? দেখি ভেতরে ভেতরে এতদূর এগুলি, আর আমায় একটা কথাও বললি না বাপু!

বলে লাঠি ঠুকঠুক করে এগিয়ে এলো অট্টামা, লাঠির উপায় ভর দিয়ে। তারপর মোহনপুরের বউ আর টিয়া দুজনকেই দেখতে পেয়ে বাঁ হাতটা কাপড়ে আড়াল রেখে ফোকলা মুখে এক মুখ হেসে বললো, আহা হা, মিষ্টির তোর মুখের হাসি দেখ লা মোহনপুরের বউ। বলে কেউ নাচে মনে মনে, কেউ নাচে খোঁচা কানে।

টিয়া হেসে বললে, আমার কি খোঁচা-নাক নাকি অট্টামা?

অট্টামা পইঠের ধাপে বসে পড়ে লাঠিটা নামিয়ে রাখলো। কি যেন লুকিয়ে রাখলে কাপড় ঢাকা দিয়ে। তারপর বললে, খোঁচা নাক না খোঁচা নাক সে বিচার করবে নাত-জামাই এসে, আমরা তার কি জানি!

তারপর টিয়ার মাকে উদ্দেশ করে বললে, ধন্যি মেয়ে বটিস মোহনপুরের বউ, খপর দিলাম আমি, আর তলে তলে এতদূর এগিয়েছিস, আর আমায় কিনা......

মোহনপুরের বউ হেসে বললে না গো না সে-সব কিছু নয়। বলে টিয়ার দিকে ফিরে বললে, শিবু কাঁদছে বোধ হয়, দেখে আয় তো মা।

টিয়া মৃদু হেসে উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বুঝলে অট্টামার সঙ্গে কোন গোপন পরামর্শ আছে তাই টিয়াকে সরিয়ে দিলো মা।

টিয়া চলে যেতেই অট্টামা বললে, তবে যে ডাক্তার বললে, অবিবারে পেভাকর আসবে......

মোহনপুরের বউ হেসে বললে, সে এমনি। তেমন কিছু খপর হলে তুমিই আগে জানতে পারবে।

অট্টামা বললে, তবু ভালো। তাই ভাবছি, যার দৌলতে চুয়া-চন্দন তারই পাতে খোলার ব্যঞ্জন! খপর দিলাম আমি, আর পেভাকর আসছে মেয়ে দেখতে সে-খপর মোহনপুরের বউ আমায় দেবে না?

মোহনপুরের বউ হেসে ফেলে বললে, কোথায় কি, মেয়ে দেখতে আসবে ক্যানে? ও বটঠাকুর খেতে বলেছে তাই......

বটঠাকুরের নাম শুনেই অট্টামা গলার স্বর নামিয়ে বললে, হাঁ রে, শুনেছি বড়-জায়ের সঙ্গে নাকি খুব খিটিমিটি হচ্ছে তোদের!

মোহনপুরের বউ শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলো। কথা বললে না।

অট্টামা বললে, তবে আগে থেকে পেথক হয়ে যা না বাপু।

মোহনপুরের বউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তাই তো ভাবছি, এই বিয়ে নিয়ে বলছি, সম্বন্ধ আনলেও কি টিকবে ভেবেছো, ভেবে দাঁড়ালো, মেয়ে দেখাতে যদি কেউ আসেও ওই বিমলার মত বিদেশরী সামনে বড়ঘর করে ঘুরে বেড়ালে কার চোখে আর লাগে টিয়াকে!

অট্টামা ফোকলা মুখে হো হো করে হেসে উঠে বললে দাদা যে মরল তা তো ভাবি না, যমে যে বাড়ি চিনলো, তোর হয়েছে তাই।

বেশ তো, ওদেরটা পার হলেও তো শান্তি, সেও তো তোদেরই দেখতে হবে!

মোহনপুরের বউ মুখ ব্যাজার করে বললে, নিজের পারি না, আবার পরের চিন্তে!

অট্টামা এবার লাঠিটা তুলে নিয়ে উঠে পড়লো। বাঁ হাতটা তেমনি কাপড়ে ঢেকে রেখে বললে, যাই দেখি, পেসাদ উঠলো কিনা।

বলে ঠুকটুক করে বিমলাদের ঘরের দিকে চলে গেল। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতেই ডাকলে, কই গো বিমলে, পেসাদ উঠেছে?

ভিতর থেকে সাড়া পেয়ে ঘরের ভেতরই ঢুকে পড়লো অট্টামা। তারপর কাপড়ের আড়াল থেকে বাঁ হাতটা বের করলে।

হাতে দুটো কাঁচ কাঁচ শশা। বললে, বিকেল সাঁইদের মাচায় হয়েছিল, দিলে আমায়। বললে, দুটো শশা তুমি নিয়ে যাও অট্টামা। তা আমার কি আর দাঁত আছে রে ভাই, না খেতে স্বাদ আছে? তাই নিয়ে এলাম পেসাদের জন্যে।

বলে শশা দুটো বিমলার হাতে দিলো অট্টামা। বললে, মুড়ির সঙ্গে দিস লো পেসাদকে। ভুলে যাস না যেন।

নিভাননী বললেন, ডেকে দে না বিমলা তোর বাবাকে।

অট্টামা সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ করলেন হাত নেড়ে। বললেন, না-না-না, ঘুমুচ্ছে বেচারী, ঘুমুক।

বিমলার মনের মধ্যেও এদিকে একটা মধুর গুনগুনানি দেখা দিল সেদিন সকাল থেকেই। গ্রামে আসার পর থেকে দিনের হিসেব ভুলে গেছে বিমলা। সব বারই রবিবার।

তবু মনে মনে হিসেব রাখতে ভোলে নি সে। শনিবার থেকেই বার কয়েক মনে পড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য স্পষ্ট করে বলতে পারেনি, কোথায় একটা সংকোচ বোধ করেছে. তাই গিরীনকে কখনো জিজ্ঞেস

করেছে. আজ কি বার কাকা? কখনো বাবাকে বলেছে, তোমার যা ভুলো মন, লোকটাকে খেতে বলেছো মনে রেখো।

গিরীন অবশ্য শেষ অবধি ভুলে যায়নি। শনিবার বর্ধমান থেকে দই মিষ্টি তরি-তরকারি নিয়ে এসেছে। ভোরবেলায় উঠেই খোঁজ করেছে, জেলে এসেছে কিনা।

নিজেই তাদের নিয়ে গেছে ছোট গোড়ে পুকুরটায়। বলেছে, সের পাঁচেকের একটা মাছ ধরে দে তাড়াতাড়ি।

বিমলা নিজেও গেছে পিছনে পিছনে। অমরেশ আর কমলাও। তারপর মাছ নিয়ে ফিরে আসতেই মোহনপুরের বউয়ের মুখেও হাসি ফুটেছে।

ছাই নিয়ে বড় বঁটিটা ফেলে বসেছে, মাছ কুটতে কুটতে অমরেশের সংগে গল্প জুড়ে দিয়েছে মাছের। কবে কোন পুকুরে কত বড় মাছ ধরা হয়েছিল, কোন পুকুরের মাছের স্বাদ সবচেয়ে ভালো।

এত কাজের মধ্যে বিরক্ত আর বিরক্ত মুখেও মোহনপুরের বউয়ের হাসি ফুটে ওঠে যখনই ঘরে বড় মাছ আসে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা তেমন সাধারণ নয়। ভিতরে ভিতরে যে নতুন একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে। একটা সুন্দর আশা!

প্রভাকরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোয় যেন তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। তবু সাহায্য করার জন্যে নিভাননীও ছুটে আসেন। এমন যজ্ঞির ব্যাপার, মোহনপুরের বউ একা পারবে কেন।

দুই জায়ে পরামর্শ চলে কি কি রান্না হবে, মাছের কটা পদ। টিয়াকে দেখে বিমলা আর কমলাও রান্নাঘরে গিয়ে ভিড় করে, এটা-ওটা করে দেয়।

এক ফাঁকে গিরিজাপ্রসাদের কাছে এসে নিভাননী বলেন, যাই বলো, লোক মন্দ নয় মোহনপুরের বউ। তুমি প্রভাকরকে নেমন্তন্ন করেছো শুনে আমিই সেদিন ভয়ে মরছিলাম, না জানি কি রাগারাগি করবে।

গিরিজাপ্রসাদ হেসে বলেন, গিরীনকেও দেখো, দাদার মর্যাদা রাখার জন্যে সেই বর্ধমান গিয়ে সব দই মিষ্টি কপি টপি নিয়ে এলো তো।

গিরিজাপ্রসাদ আর নিভাননী দেখেন আর মনে মনে খুশী হন। মোহনপুরের বউয়ের বিরুদ্ধে দিনে দিনে যত কিছু আক্রোশ আর অভিমান সব যেন উবে গেছে।

বিমলা কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে উঁকি দিয়ে আসে বাংলাবাড়ির দিকে। কখনো খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে দূরের মেঠো রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে দেখে।

ক্রমশ বেলা বাড়ে। আর একসময় বিমলা দেখতে পায় অবিনাশ ডাক্তার আর প্রভাকর আসছে। দু' বগলে দুটো ক্রাচ এঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে ডাক্তার, আর পাশে পাশে প্রভাকর।

বিমলা দেখতে পেয়েই এক মুখ হেসে ছুটে গিয়ে গিরিজাপ্রসাদকে খবর দিয়ে আসে। তারপর কম্বলটা পেতে দেয় বাংলাবাড়িতে।

ইতিমধ্যে প্রভাকর আর ডাক্তার দুজনেই এসে পড়ে। চোখোচোখি হয় প্রভাকরের সংগে। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয় প্রভাকর; বিমলাও।

পরস্পর পরস্পরের চোখের দৃষ্টিতে যেন মৌনমুখর কোন ইশারা দেখতে পায়। মনের গোপনে দুজনেই বুঝি কোন তুচ্ছ আশা লালন করেছে।

আর বিমলা? বিমলার মনের পাতায় যেন নতুন রঙ ধরেছে, ধরতে শুরু হয়েছে তখন। তাই সময় পেলেই একবার এসে দেখা দিয়ে যায় বিমলা, যে কোন তুচ্ছ অজুহাতে।

সারা বাড়িতেই তখন একটা রীতিমত চাঞ্চল্য। প্রভাকরকে ঘিরে সকলেই যেন উৎফুল্ল। সকলেই তাকে খুশী করতে চায়।

গিরিজাপ্রসাদ তখন স্বপ্ন দেখছেন একটা নতুন ইস্কুলের। প্রভাকর খুশী হলে গ্রামে ইস্কুল হবে, গিরিজাপ্রসাদের বেকারজীবন আবার একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে, থেমে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ির কাঁটা আবার ঘুরতে শুরু করবে। নিভাননী ভাবছেন, গ্রামের লোক যখন তাঁর নামে তাঁর মেয়ের নামে অপবাদ দিতে চেয়েছে অকারণেই, তখন দেখুক তারা চোখ মেলে, আর জ্বলে পুড়ে মরুক। কি যায় আসে তাঁর গ্রামের লোকের কথায়! গিরীন আর মোহনপুরের বউ তখন ভাবছে অতিথি আপ্যায়নে না ত্রুটি হয়। এখন আর প্রভাকরকে তেমন লজ্জাও করছে না মোহনপুরের বউ। শুধু মনে হচ্ছে অবিনাশ ডাক্তার না থাকলে ভাল হতো, নিজে সামনে বসিয়ে খাওয়াতে পারতেন প্রভাকরকে।

আর টিয়া? সে বেচারী দুরে দুরে ঘুরে বেড়ায়। মার পায়ে পায়ে। এটা-ওটা ফাই ফরমাশ খাটে। তাতেই যেন আনন্দ। সব কাজ তো প্রভাকরের জন্যেই। তাই রূপোর থালা বাটি পরিষ্কার করতে করতে স্বপ্ন দেখে মনে মনে।

বাংলাবাড়িতে গিয়ে বসেছেন গিরিজাপ্রসাদ। গিরীনও প্রায়ই গিয়ে দেখা দিয়ে আসছে, দু-চারটে কথা বলছে।

এদিকে ভিতর-বাড়িতে তখন রান্না শেষ হয়ে এসেছে। বেলাও হয়েছে অনেক। বারকয়েক চা দিয়ে এসেছে বিমলা। বোধ হয় ওদের স্নান হয়েছে কিনা দেখতে যাচ্ছিল। মোহনপুরের বউ বললে, রান্না হয়ে গেছে, জায়গা কর।

বিমলা যাবার আগেই টিয়া ছুটে গেল। উলের আসন দুখানা তুরঙ্গ থেকে বার

করে আনবো মা? জিজ্ঞেস করলে সে মাকে।

মোহনপুরের বউ সায় দিলেন।

একটু পরেই আসন দুটো নিয়ে এল সে। দক্ষিণ-দুয়োরী ঘরের দাওয়ায় আমগাছটার ছায়া পড়েছে এখন। মাটির দাওয়াটা ন্যাতা দিয়ে পরিষ্কার করে আসন দু'খানা পেতে দিলো টিয়া, রূপোর সরু সরু গ্লাস দুটোয় জল এনে রাখলে। তারপর দু'খানা কম্বলের আসন পেতে কাঁসার গ্লাসে জল এনে রাখলে। এমন ধীর হাতে সযত্নে প্রত্যেকটি কাজ করে যায় টিয়া, যেন তার কাজের মধ্যে দিয়েই গোপন আশাটুকু ব্যক্ত করতে চায়।

মোহনপুরের বউ মুগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে তার। মনে মনে ভাবে, এ মেয়েকে নিশ্চয় পছন্দ হবে প্রভাকরের। সত্যি, মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে আবার কয়েক বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত।

আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে এবার ডাকলেন টিয়াকে। শোন।

টিয়া ছুটে এলো।

বললেন, জেঠীমাকে বল, ওদের এইবার ডেকে পাঠাতে। আর...

টিয়া থেমে দাঁড়ালো।

মোহনপুরের বউ মৃদু হেসে বললেন, লোকে দেখলে বলবে কি, কাপড়টা বদলে নে গা। আর চুপ করে এসে এইখানে বসবি, হুটহাট করে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হোস না।

মুহূর্তে টিয়ার মুখটা চুপসে গেল মার কথা শুনে। তারপর ধীরে ধীরে ও চলে গেল জেঠীমাকে খবর দিতে।

গিরিজাপ্রসাদ, গিরীনও বসলো প্রভাকর-দের সঙ্গে। মোহনপুরের বউ ঘোমটা টেনে একটার পর একটা থালা বাটি এনে দাঁড়ান কপাটের আড়ালে, আর নিভাননী তার হাত থেকে নিয়ে এসে নামিয়ে দেন। বিমলা আর কমলা সামনে বসে জিজ্ঞেস করে কে কি চায়, কখনো কখনো নিজেরাই উঠে গিয়ে এনে দেয়।

রান্নাঘরের অন্ধকারে বসে বসে টিয়া এটা-ওটা এগিয়ে দেয় তাদের হাতের কাছে। মা বারণ করেছে, তাই একবার উঠে গিয়ে দূর থেকে দেখে আসতেও ওর ভয়। শুধু কি ভয়? লজ্জাও।

একে একে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেল ওদের।

গিরিজাপ্রসাদ বিমলাকে বললেন বাংলো-বাড়িতে দুটো বালিশ দিয়ে আসতে। প্রভাকরকে বললেন, এই রোদ্দুরে যেতে হবে না প্রভাকর, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও, রোদ পড়লে চা খেয়ে যাবে।

প্রভাকর চোখ তুলে একবার গিরিজা-প্রসাদ, একবার অবিনাশ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালে, তারপর বিমলার অনুনয়ভরা চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মাথা নীচু করে সম্মতি জানালে।

প্রভাকরের মনের মধ্যেও তখন একটা নেশা ধরতে শুরু করেছে। বিমলাকে ঘিরে।

বাংলোবাড়িতে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে থাকার চেষ্টা করলো প্রভাকর। কিছুক্ষণ আগেই বিমলা পান দিয়ে গেছে। প্রভাকর আশা করছিলো বিমলা আবার আসবে।

কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে কখন যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল টেরও পায়নি প্রভাকর। বিকেলের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলে বিমলা চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। নাকি বিমলার হাতের স্পর্শ পেয়েই ঘুম ভেঙে গেছে তার!

প্রভাকরের দিকে তাকালো বিমলা, আর-একবার ডাক্তারের ঘুমন্ত মুখের দিকে।

প্রভাকর উঠে বসলো, তাকালো বিমলার মুখে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে। হাত বাড়িয়ে বিমলার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুল ঠেকলো। প্রভাকর আর বিমলা দু'জনেই যেন মুহূর্তের জন্যে হাত সরিয়ে নিতে ভুলে গেল। দু'জনের চোখেই যেন পরস্পরকে লজ্জা পেল এই স্পর্শের অনুভূতিতে।

বিমলার সমস্ত শরীরে যেন একটা বিচিত্র শিহরন খেলে গেল। ভয়, বিস্ময়, আনন্দ!

হাতখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলো বিমলা, ভিতর-বাড়িতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে। না, কেউ কোথাও নেই। সকলেই ঘুমিয়ে আছে। শুধু টিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রূপোর থালাবাসনগুলো ছেঁড়া নেকড়া ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে একমনে। আর কি যেন ভাবছে!

(ক্রমশ)

শার্ঙ্গদেব

রাগসংগীতের ঐতিহ্য

আকাশবাণীর প্রধান সংগীত প্রযোজকের বেতার ভাষণ

সাধারণত বেতারজগৎ-এ প্রকাশিত নিবন্ধাদি নিয়ে আমরা আলোচনা করি না, তার কারণ খুব অল্পসময়ের মধ্যে যে রচনা পড়তে হয় তাতে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুবিচারের আশা করা যায় না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা করতে হয় যখন বক্তার মতবাদগুলির কোনো সমর্থন পাওয়া শক্ত হয় এবং সে বক্তার যখন বিশেষ স্বীকৃতি থাকে। বর্তমান বেতার জগৎ-এর (৩৩বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৭ই জানুয়ারী ১৯৬২) প্রথম নিবন্ধ "রাগ সংগীতের ঐতিহ্য"—আকাশবাণী দিল্লী থেকে ইংরেজিতে প্রচারিত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। বক্তা ঠাকুর জয়দেব সিং আকাশবাণীর প্রধান সংগীত প্রযোজক। বলা বাহুল্য আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের মধ্যে বক্তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে; অতএব যে মতবাদগুলি তিনি অকুতোভয়ে প্রচার করেছেন সাধারণ শ্রোতা এবং বেতার জগৎ-এর পাঠকের ওপরে সেগুলির প্রভাব হতে পারে এবং অনেকে হয়তো সরলভাবেই তাঁর ভাষণের সব কথা সহজে বিশ্বাস করবেন। এই কারণেই প্রধান সংগীত প্রযোজক মহাশয়ের ভাষণটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একথা বলে রাখি যে, আকাশবাণীর প্রধান সংগীত প্রযোজকের মত চিন্তাশীল ব্যক্তিকে লঘু প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; তবে কোনো কোনো তথ্য সম্বন্ধে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হবার কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং এগুলি যথার্থ কিনা সে বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শ্রোতৃসাধারণ যাতে নিজেরা বিচার করে সত্য নির্ধারণ করতে পারেন সেই কারণেই এই আলোচনার অবতারণা।

প্রধান সংগীত প্রযোজক মহাশয় বলছেন —"ভরতের সময়ে সংগীতে সুনির্দিষ্ট কোনো স্বরগ্রাম ছিল না। পরিবর্তমান স্বরগ্রাম বা মূর্ছনাই "জাতি" (অনুবাদে "যতি" আছে—ওটা অনুবাদের ত্রুটি) ও পরবর্তী কালের রাগ নির্ণয়ের ভিত্তিরূপে গৃহীত হত। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ঐতিহ্য চলল। মুসলিম সংগীত ভারতে আসবার পর থেকেই নির্দিষ্ট স্বরগ্রাম তৈরি হল। কারণ এটি ছিল সহজ এবং অনায়াসে ব্যবহারযোগ্য। ফলে মূর্ছনার সমগ্র ঐতিহ্যই অবলুপ্ত হয়ে গেল।"

ভরতের সময়ে সংগীতে সুনির্দিষ্ট কোনো স্বরগ্রাম ছিল না—এটি বড় আশ্চর্য কথা। নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাবিংশ অধ্যায় খুললেই দেখা যাবে ষড়জ এবং মধ্যম দুটি গ্রামের উল্লেখ রয়েছে এবং তা যে সুনির্দিষ্ট তার প্রমাণ গ্রামে বাইশটি শ্রুতির আশ্রয়। 'সা' থেকে 'নি' পর্যন্ত স্বরগুলির শ্রুতি বিভাগও ভরত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে এমন উক্তি শুনলে স্বতই মনে হয় যে, বক্তা ভারত সম্বন্ধে পরমতের উপর নির্ভর করেছেন, নিজে অনুসন্ধান করে দেখেননি। মূর্ছনাকে পরিবর্তমান স্বরগ্রামই বা কেন বলা যাবে বোঝা গেল না। ষড়জ এবং মধ্যম গ্রামেই মূর্ছনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ষড়জ বা মধ্যম গ্রামকে আশ্রয় করে "জাতি" গঠিত হত। মূর্ছনা যে কেবল সপ্তস্বরের আরোহণ অবরোহণ তাই নয়, মূর্ছনা ষাড়ব, ঔড়বও হত। সেকালের তানও ছিল মূর্ছনা সংশ্রিত। এক কথায় একটি স্বরের একাধিক প্রয়োগ না করে নানারকম সন্নিবেশই ছিল মূলত তান বা মূর্ছনা। স্বরের আরোহণ এবং অবরোহণের ভিতর দিয়ে একটি রূপের প্রতিফলনকেই মূর্ছনা বলা যায়। "মুসলিম সংগীত" বস্তুটি যে কী তা বোঝা শক্ত। মুসলমানরা ভারতীয় সংগীতকেই গ্রহণ করেছিলেন—মুসলিম সংগীত বলে কোন বিশেষ গীতরীতি গঠন করতেও চাননি; তবে পারসিক এবং আরবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলে গান বাজনায় তাদের কিছু প্রভাব পড়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে যেসব পণ্ডিত বাকি ফার্সী ভাষায় ভারতে প্রচলিত সংগীত সম্বন্ধে লিখে গেছেন তাঁরা ভারতীয় সংগীতের বর্ণনাই করেছেন—পারসিক সংগীতের কিছু উল্লেখ, কয়েকটি মিশ্ররাগ এবং গীতরূপের কথা বলেছেন মাত্র। এরকম মিশ্রণ তো হবেই, কিন্তু মুসলিম সংগীত ভারতে এসেছে এমন কথা বললে যা বোঝায় তার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। মুসলিম সংগীতের প্রভাবে নির্দিষ্ট স্বরগ্রামটি কী তাও বলা হয়নি। বললে বক্তার উদ্দেশ্য কিছুটা আন্দাজ করা যেত।

এর পরে বলা হয়েছে "উত্তর ভারতে প্রথমে রাগের শ্রেণী বিভাগ হত গোষ্ঠীর ভিত্তিতে অর্থাৎ রাগ এবং তাদের পত্নীদের বলা হত রাগিণী· পরে পারসিক মোকামের প্রভাবে এই চিরপরিচিত শ্রেণীবিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ ঠাট, সংস্থান অথবা মেল-এ শ্রেণী বিভাগ হয়।"

পারসিক মোকামের প্রভাবে ঠাট-মেলএর পরিকল্পনা হয়নি। বরঞ্চ মোকাম, সুবা-র প্রভাবে রাগ, রাগিণীর পরিকল্পনা হওয়া সম্ভব ছিল। ফার্সী ভাষায় রচিত প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে মোকাম রাগের এবং সুবা রাগিণীর অনুরূপে। প্রত্যেকটি মোকামের দুটি করে সুবা ছিল। আসলে ঠাট-মেল পদ্ধতি শ্রেণী বিভাগের স্বাভাবিক পরিণতি। সুপ্রাচীন জাতি গান বিভিন্ন স্বরের গুরুত্ব অনুসারে সংগঠিত হয়েছে। প্রথমে ছিল সাতটি শুদ্ধজাতি; পরে মিশ্রণ অনুসারে আরও এগারটি জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী রাগগায়নে স্বরাদির প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও দেশ-দেশান্তরে বা বিভিন্ন জাতিতে রাগগায়ন পরিব্যাপ্ত হওয়ায় বহুতর মিশ্রণ ঘটল। এই মিশ্রণ অনুসারে যে পরিবর্তন সাধিত হল তার পরিণাম অনুসারে রাগসমূহের আখ্যা হল ভাষা, বিভাষা এবং অন্তর ভাষা। ক্রমে আরও পরিবর্তন ঘটতে লাগল এবং রাগসংগীত ভাষাঙ্গ, রাগাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ—এইসব নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। রাগসংগীত এইভাবেই দেশী সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। মিশ্রণ আরও বহুলভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং ক্রমে মূল দেশগত বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে গিয়ে এমন একটি সাধারণ শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়েছে যার ফলে কেবলমাত্র "রাগ" এই বৃহৎ শ্রেণী ছাড়া আর কোনো বিশেষ নাম দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিপুল রাগশ্রেণীকে গোষ্ঠীবদ্ধ করবার বহু চেষ্টাই হয়েছে—কেউ রাগ-রাগিণী, পুত্র পরিবারাদি পরিকল্পনা করেছেন—কেউ করেছেন ঠাট-মেল পরিকল্পনা। এর মধ্যে অনেক রকম উপায়ও গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের মতকে গুরুত্ব প্রদান করবার জন্য; যেমন ভরত মত বলে যেটি চলে তার সঙ্গে মহামুনি ভরতের কোন সম্বন্ধ নেই—হনুমান, ঈশ্বর প্রভৃতির সঙ্গে রাগ পরিকল্পনার কী সম্বন্ধ তা যাঁরা তাঁদের নামকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁরাই জানেন।

প্রধান প্রযোজক মহাশয় আমাদের সংগীতে কিঞ্চিৎ পারসিক প্রভাবকে ঐতিহ্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ বলেছেন, কিন্তু তাঁর যে মতটি উপরে বর্ণিত হল তাতে তো আমাদের সাংগীতিক কোনো ঐতিহ্য ছিল বলেই মনে হয় না। তাঁর মতে স্বরগ্রাম থেকে ঠাট-মেল প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারই তথাকথিত "মুসলিম সংগীত" ভারতে আসবার পর থেকে হয়েছে। ভারতীয় সংগীত এবং পরবর্তী কালে মুসলমানদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাঁরা প্রামাণিক গ্রন্থাদি এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে অনুসন্ধান করেন, তাঁরা এইরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন বলে আমাদের মনে হয় না। মুসলমানদের মধ্যে এক আমীর খসরু হয়তো কিঞ্চিৎ চ্যালেঞ্জের মনোভাব ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমান শিল্পীরা ছিলেন উঁচুদরের আর্টিস্ট—তাঁদের বরাবর চেষ্টা ছিল সংগীতকলার প্রকাশকে সুন্দর করে তোলা। আমাদের একটা মস্তবড় আর্টকে তাঁরা রক্ষা করে এসেছেন এবং সৌন্দর্য আরোপ করেছেন।

অতঃপর প্রধান প্রযোজক মহাশয় বলছেন, "ধ্রুবপদ প্রায় চারশো বছর ধরে উত্তর ভারতের চিরাচরিত কণ্ঠসংগীতের রীতি ছিল। কিন্তু এই গায়কী রীতি শেষ পর্যন্ত 'লয়' ও 'তাল'-এর কেরামতিতে পর্যবসিত হয়ে নষ্ট হয়। "স্বর"-এর সৌন্দর্য হল উপেক্ষিত। তাই আমাদের কয়েকজন সংগীতশিল্পী বিদ্রোহের ধ্বজা ওড়ালেন, কেবলমাত্র সময়ের আবর্তন রক্ষা করবার জন্য ব্যবহার করলেন তাল এবং সংগীতের রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও লাবণ্য সমৃদ্ধির দিকেই দিলেন নিজেদের সব মনোযোগ। এর ফলেই সৃষ্ট হল খেয়াল, কণ্ঠসংগীতের অতি মনোহর, আকর্ষণীয় গায়কী রীতি।"

এ সম্পর্কে বলা কর্তব্য যে, খেয়ালও চারশো বছরের অধিককাল ধরে উত্তর ভারতে চলে এসেছে। সুলতান হোসেন শর্কী চারশো বছরের আগে বিদ্যমান ছিলেন। খেয়ালের উদ্ভব ধ্রুপদের পরে নয় এবং ধ্রুপদের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ যে খেয়াল সৃষ্ট হয়েছে এমন ধারণা করবারও কোন হেতু নেই। তাছাড়া বর্তমানে খেয়ালও কি লয় ও তাল-এর কেরামতিতে পর্যবসিত হয়ে নষ্ট হচ্ছে না? কেবলমাত্র সময়ের আবর্তন রক্ষা করবার জন্য যে তাল খেয়ালে ব্যবহৃত হয় বলে বক্তা আমাদের জানিয়েছেন, সেই রীতি অর্থাৎ বিলম্বিত বড় খেয়াল কি কোনও নির্দিষ্ট ছন্দের স্পন্দন অনুভব করাতে সমর্থ হয়? বিলম্বিত একতাল, ঝুমরা, ঝাঁপতাল—কানে সবই এক ঠেকে। আর দ্রুত খেয়ালে গায়কী রীতি শেষ পর্যন্ত লয় ও তাল-এর কেরামতিতেই পর্যবসিত হচ্ছে। খেয়ালকে আকাশবাণী অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন বলে তার মনোহারিত্ব সম্বন্ধে অতিভাষণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। মধ্যলয়ের যে খেয়াল চিরপ্রচলিত; সংগীতের মূলরীতি, তাতেই অনুসরণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু বর্তমানে এই ধারাটির প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করা হচ্ছে না।

প্রধান প্রযোজক মনে করেন যে, বর্তমানে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যের প্রতি কয়েকটি দিক থেকে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি হার্মোনি, অর্কেস্ট্রা এবং পাশ্চাত্ত্য মতে কোরাস মিউজিক-এর উল্লেখ করেছেন। তাঁর আশঙ্কা, হার্মোনি রাগের কাঠামোকে অবিন্যস্ত করে রাগপদ্ধতিকে ধ্বংস করবে। আমরা এতটা আশঙ্কা করি না এবং বিশ্বাস করি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হার্মোনি আমাদের সংগীতে বৈচিত্র্য সম্পাদনে সমর্থ। প্রতিভাবান সুরস্রষ্টার হাতে পড়লে হার্মোনি আমাদের সংগীতের একটি নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথও একথা বিশ্বাস করতেন। তবে কোথায় হার্মোনি প্রয়োগ করা উচিত, সেটি অভিজ্ঞ-দৃষ্টিতে বেছে নিতে হবে।

প্রধান প্রযোজক বলছেন, "পাশ্চাত্ত্য রীতিতে অর্কেস্ট্রা রাগসংগীতের উপযোগী নয়। কিন্তু ভারতীয় সংগীতের উপযোগী করে নিজস্ব অর্কেস্ট্রা তৈরি না করবারও কোনো কারণ নেই। আকাশবাণী বাদ্যবৃন্দ এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবার চেষ্টা করছেন।" আকাশবাণী বাদ্যবৃন্দের প্রচেষ্টাকে আদৌ কোন বিশেষ প্রচেষ্টা বলা যাবে কিনা সন্দেহ, কেননা এই বাদ্যবৃন্দের অনুষ্ঠানে যা বাজানো হয়, তা প্রচলিত গৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই মেলডির দিক থেকেও এসব বাজনায় কোনো দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বৃন্দ সংগীত সম্বন্ধে আকাশবাণীর কোনো প্রচেষ্টা আছে কিনা জানি না—উদাহরণ না পেলে আলোচনা না করাই ভাল।

প্রধান প্রযোজক মহাশয়ের পরিশেষ বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত যে ঐতিহ্য আমাদের শিল্পের রক্ষণশীল উপাদান। তাঁর উক্তি আর একটু উদ্ধৃত করি—"কিন্তু কেউ যদি অন্ধভাবে একে আঁকড়ে থাকতে চান, নতুন যুগের এবং নতুন চিন্তার চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করেন, তাহলে অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। ভারতীয় সংগীতকে সাহসভরে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে, নতুন ভাবধারা ও গায়ন শৈলীকে গ্রহণ করে নিজস্ব কাঠামোতে নিজস্ব প্রতিভার উপযোগী করে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হবে।"

বারম্বার এই "নতুন" শব্দের প্রয়োগে একটি কথা মনে পড়ল। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের যুগে একবার এক ব্যক্তির লেকচার শুনেছিলাম, তিনি অনেক কিছু বক্তৃতা করে শেষে বললেন—"ভাইসব, এখন আমরা যা করেছি, তা করলে চলবে না, অন্যরূপে করতে হবে, অন্যরূপে ভাবতে হবে এবং অন্যরূপে চলতে হবে। সে এক নতুন রূপ, নতুন ভাবনা, নতুন কাজ এবং নতুন চলা। কিন্তু সেই অন্যরূপ যে কীরূপ এবং সেই নতুন রূপ যে কীরকম নতুন তা এখন বলা হবে না, পরে বলা হবে তো আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।"

বহুকাল অপেক্ষা করবার পর সে বৃত্তান্ত ভুলেই গিয়েছিলুম। এই ব্যাপারে মনে পড়ল। আবার অপেক্ষা করে রইলুম।

ভারত বনাম ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলায় ভারত রাবার লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের অধিনায়ক শ্রীডেক্সটার একটি ভোজ-সভায় পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে, "ভারত গুরুমারা বিদ্যা আয়ত্ত করেছে; এখন আমা-

দের অন্য কোন খেলা প্রবর্তনের কথা ভাবতে হবে।" বিশুখুড়ো বলিলেন—"প্রস্তাব উত্তম। তবে নতুন খেলাটা নেহাত বেলেখেলা না হলেই হয়।"

ক্রিকেট পণ্ডিতদের অনেক কথাই অনেকে শুনিয়াছেন, এই দুইটিও শুনিয়া রাখুন। একজন অফিস হইতে বাড়িতে গিয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন—"ইংলণ্ড কলকাতার ক্রিকেট খেলায় হেরে গিয়ে বলেছে তারা আর ক্রিকেট খেলবে না। মাদ্রাজে তারা তাই খেলেছে তাস। কিন্তু সেখানেও রাবার পেয়েছে ভারত!!"

অন্য সংবাদ—ক্রিকেট-পণ্ডিতের বিদূষী স্ত্রী। সাধারণত টিকিট সংগ্রহটা ম্যানেজ করেন। ভারতের টেস্ট বিজয়ের সংবাদ পাইয়া বলিয়াছেন—"মাত্র তো টেস্ট। এই নিয়ে এত হইচই কেন, ফাইনাল পাস আগে হোক, তবে ত বুঝব বাহাদুর।"

মাদ্রাজের টেস্ট খেলার শেষে একদল দর্শক নাকি একটি শবাধার আনিয়া শোভা-যাত্রা করিয়াছেন—অর্থাৎ ক্রিকেটে ইংরেজের

মৃত্যু হইয়াছে ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদ্য। ইহা কোন্ দেশী রসিকতা এই প্রশ্ন করিলে শ্যামলাল বলিল—"এর নাম Madরস" (মাড্রাস)!!

এক সংবাদে শুনিলাম পাকিস্তানের নাকি সিয়াটো ত্যাগের সম্ভাবনা আছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এ আর এমন একটা বড় কথা কী। তিনবার শুধু বলা—তালাক, তালাক, তালাক!!"

প্রার্থীদের অনেকেই সর্বসিদ্ধি ত্রয়োদশীতে মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন। সংবাদে শুনিলাম এই ত্রয়োদশীর সুযোগ দুইজন কমিউনিস্ট প্রার্থীও লইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"তা বেশ করেছেন। অবশ্য অনেকে বলছেন ওটা অনেকটা 'মরণকালে হরিনাম'-এর মত হল। কিন্তু ওরা দুষ্ট লোক, ওরা কী না বলে, ছাগলে কী না খায়!!"

প্রসংগত শুনিলাম জনৈক ভিক্ষুকে নাকি ভোটপ্রার্থী হইয়াছেন।—"এটাকে সংবাদ বলে যিনি প্রচার করেছেন তিনি মনে হয় ভোটের সভায় কোনদিন যাননি এবং কোন প্রার্থীও তাঁর কাছে ভোট প্রার্থনা করতে আসেন নি। এলে, বুঝতেই পারতেন না কোন্ জন কে।"—মন্তব্য করেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে বলা হইয়াছে সৈনিক, মন্ত্রী ও তাঁহার স্ত্রী, রাজনৈতিক বন্দী ও নির্বাচন কার্যে নিযুক্ত কর্মী ডাকযোগে ভোট দিতে পারিবেন—"ছ দিনের মধ্যে ইণ্টারভিউ করতে হবে নির্দেশ দিয়ে যে চিঠি ছাড়া হয়েছে তা কর্মপ্রার্থীর নিকট ছ মাস পরে পৌঁছেছে এমন নজীরের অভাব নেই। কাজেই যে-গোবিন্দরা উড়ো খই-এর আশায় আছেন তাঁরা সতর্ক হোন।" বললেন অন্য সহযাত্রী।

কলিকাতায় তেল ও ডালের সংকট দেখা দিয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পড়িলাম। আমাদের শ্যামলাল রসরাজ অমৃতলালের একটি নাটকের একটি অংশের উল্লেখ করিয়া বলিল—কিপটের জাসু নায়ক রাস্তা থেকে কিছু আলু আর পটলের খোসা কুড়িয়ে এনে গিন্নিকে একটা "মেওয়া রকম" তরকারি রাঁধার ফরমাশ দিল এবং বলে দিল—'এই আলু আর পটলের খোসা একত্র করে শুধু জল আছড়া, তেল ছুঁয়েছ কি মাটি করেছ।' আমাদেরই বা সংকটটা কোথায়, শুধু জল আছড়া তো আছেই!"

ডালের অভাবের প্রসংগে জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সত্যমিথ্যে জানিনে, আগামী বন মহোৎসবে সরকার নাকি শুধু হর্তুকীর গাছ রোপণ করবেন। খাদ্যবিশারদ-গণ বলছেন, পাকা হর্তুকীর সন্ধান পেলে খাওয়ার মতো একটা বর্বরোচিত প্রথার বিলয় আপনা থেকেই হয়ে যাবে, ডাল তো সামান্য কথা মাত্র!!"

দক্ষিণ ইংলণ্ডের কোন এক প্রস্তরখনিতে একটি সরীসৃপের পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে, ইহা আদিম

যুগের অতিকায় ডাইনাসোরের পদচিহ্ন। বিশুখুড়ো বলিলেন "সাপের পদচিহ্নও হতে পারে। অতীত যুগে ইংলণ্ডের অনেকেই পাঁচ-পা বিশিষ্ট সাপ প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই সাপ আর এখন নেই, স্মৃতি-রূপে রয়েছে পদচিহ্ন মাত্র!!"

ওয়াশিংটনের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ১৯৭০ সালের পূর্বেই চন্দ্রলোকে গমন সম্ভব হইবে।—"কিন্তু আমরা তো শুনেছি ১৯৬২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে চন্দ্রে না হোক, ঊর্ধ্বলোকে গমন সম্ভব হইবে, তবে তাবিজ মাদুলি যদি না ফেরো-ফেয়ার করে দেয়, সে কথা আলাদা।"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতা স্টেডিয়ামের কথাটা আমরা শুনি সাধারণত ফুটবল মরসুমের প্রাক্কালে। কিন্তু অকালে এই সেদিন আমরা আবার কেন স্টেডিয়ামের কথা শুনিলাম সেই প্রশ্ন করিলে বিশুখুড়ো বলিলেন—"ইলেক-শনের মরসুমটা কোন কিছুর জন্যেই অকাল নয়; বুদ্ধ লোক যে জান সন্ধান!!"
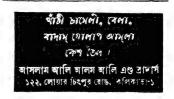
চড়ুইয়ের সঙ্গে লড়াই

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

১৯৪২ সালের জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যদের বন্দী করে রাখা হয় আহমেদনগর দুর্গে। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদও ছিলেন সেই দলে। ১৯৪২ সালের ১০ই আগস্ট থেকে ১৯৪৩ সালের ১৫ই জুন পর্যন্ত তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নবাব ইয়ার জঙ্গ বাহাদুরকে ছোট বড় উনিশটি পত্র লেখেন। তাঁকে দেবার সুযোগ না থাকায় পত্রগুলি ফাইলে একের পর এক জমা হতে থাকে। কারামুক্তির পর চিঠিগুলি তাঁর সেক্রেটারিকে দেন নকল রেখে মূল পাণ্ডুলিপি প্রাপকের নামে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। কপি করার কালে সেক্রেটারি দেখলেন পত্রগুলি চমৎকার সাহিত্যের উপাদান ও রসবস্তুতে ভরা। পুস্তকাকারে পত্রগুলি প্রকাশের অনুমতি তিনি চেয়ে নিলেন। এই পত্রগুচ্ছই আজ উর্দু সাহিত্যের অন্যতম সেরা গ্রন্থ 'গোবার-এ খাতের'। সম্প্রতি ভারত থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের বাংলানুবাদ 'অশান্তিহীন অভিনিবেশ' থেকে দুটি চিঠি পর পর দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

—সম্পাদক, দেশ

॥ ১ ॥

আহমদনগর
১৭ মার্চ ঃ ১৯৪৩

সুহৃদ্বরেষু,

জীবনে কত কাহিনী তো বললুম ঃ বলা যায় ঃ এ জীবনটাই কেটেছে যেন এক কাহিনী!

হায় আজ তু সম্মুখেতেই আপন
কার উদ্দেশে কাহিনী বলেছে!

আজকের এ সামান্য ঘটনা ঃ কাল হয়তো সে এক মজাদার কাহিনীর রূপ নেবে।

এসো, আজ চড়ুই-চড়ুইনীর একটা কাহিনী তোমায় শোনাচ্ছি।

এখানে যে কামরায় এবার আশ্রয় পেয়েছি, সে কোন শাহী আমলের পুরোনো ধরনে নির্মিত এক ইমারতের অংশ। কাঠের কড়ি-বরগার উপর পেটা ছাদ। কড়ি-বরগা ও ছাদের মাঝে এখানে-ওখানে পাখির বাসা বাঁধবার মতো বিস্তর ফাঁক-ফোকর। ফলে, সারা বাড়িটা হয়ে উঠেছে যেন চড়ুইদের একটা কলোনী। দিনভোর এদের শোরগোল লেগেই আছে।

কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকা বেশ খোলা-মেলা আর তরুলতায় ভরা। তাই ওখানেও বাড়ির বারান্দা ও কার্নিসে চড়ুইদের ভিড় দেখা যায়।

এখানকার হাল দেখে ঘরের কথা আজ বারবার মনে পড়ছে।

ওগ রহা হ্যায় দর্ ও দেওয়ারছে সব্জা,
গালেব
হম্ বিয়াবাঁ মে হায় উর্ ঘরমে বাহার
আয়ি হায়!

'আমি আজ কোথা আছি প্রবাসে অতিথি-
শালা মাঝে,
তব নীল লাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে
বাজে।'

গত আগস্ট মাসে এখানে যখন প্রথম আসি, তখন চড়ুইদের বাসা বাঁধবার উৎসাহ ও চেঁচামেচি প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

আমার কামরার পূব কোণে আমার প্রসাধন টেবিল। ঠিক এর উপরেই সে কোন অনিকালের পুরোনো একটা বাসা। এর মালিক সারাদিন মাঠ-ময়দান থেকে খড়-কুটো কুড়িয়ে এনে বাসার ভিতর ঢোকাতে চায়। আর টুকরো খড়-কুটো পড়ে পড়ে আমার টেবিলটা একশা হয়ে যায়।

কামরার অপর কোণে জাল-ভরা মোমবাতি। এর উপরও চলে খড়-কুটোর আবরণ বেলাবেলা! পশ্চিম দিকে, দেয়ালের ঠিক গা ঘেঁষে আমার বিছানা পাতা। ঠিক এর উপরেই শুরু হলো একটা নতুন বাসা বাঁধবার উদ্যোগ আয়োজন। আর এর ঠেলায় আমার প্রাণ বেরোবার যোগাড়! ছোট্ট চড়ুই পাখি। এক রত্তি এর চঞ্চু। আর দেহ?

সে তো হাতের মুঠোও ভরে না! অথচ নীড় বাঁধবার আগ্রহে এর কী অক্লান্ত প্রচেষ্টা! যেন ক্ষুদ্র চঞ্চুর ঘায়ে দিনেই দেয়ালটা ফুটো করে দেয় আর কি!

প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত আর্কিমিডিস ঘোষণা করেছিলেন ঃ

Dos moipousto kai tengen kinese.

"মহাশূন্যে পা জমাবার মতো একটু স্থান যদি পাই আর একটা জুতসই কপিকল, তা হলে বিশ্বজগৎ আমি কেন্দ্রচ্যুত করে দিতে পারি।"

ওই ক্ষুদ্র চড়ুই পাখিটার কাণ্ডকারখানা দেখে পণ্ডিত-প্রবরের দাবিটা আজ খুব বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে না তো!

চঞ্চুর আঘাতে আঘাতে চড়ুইটা প্রথমে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট ফোকর করে নেয়। ঐ ফোকরে পা জমিয়ে শুরু করে দেয়ালের গায়ে অবিরাম চঞ্চুর শাবল হানা। আর এমন জোরে সে শাবল হানতে থাকে যে, আঘাতের সাথে সাথে এর ক্ষুদ্র দেহটা থরথর কাঁপতে থাকে। কয় মিনিটের মধ্যে দেয়ালের বেশ খানিকটা সে খুঁড়ে ফেলে।

বাড়িটা কিনা খুবই পুরোনো! এর দেয়ালে কতবার চুন-বালির পোঁচ পড়েছে কে জানে? দলা দলা চুন-বালি জমে জমে দেয়ালে একটা পুরু আস্তরণই গড়ে উঠেছে। চড়ুইটার ক্ষুদ্র চঞ্চুর ঘায়েই সে আস্তরণ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এক একটা দলা ভাঙছে আর ধুলোয় চারদিক—মায় আমার বিছানা-পত্তর সব আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য এর প্রতিকার ছিল খুবই সহজ—মানে বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করা আর ফাঁক-ফোকরগুলো বন্ধ করে দেওয়া।

কিন্তু মিস্ত্রী ছাড়া তো ও কাজ করা যায় না! আর এখানে যে আবার বাইরের লোকের প্রবেশ একেবারেই নিষেধ!

ঐ তো সেদিনের কথা। এখানে আমাদের আগমনের পর-পরই জলের কল বিগড়ে গিয়েছিল। একটা সাধারণ মিস্ত্রীর কাজ। কিন্তু যতক্ষণ না একজন খাস বিলেতী ইঞ্জিনিয়ার কম্যাণ্ডিং অফিসার তশরিফ আনলেন, কলটা ততক্ষণ বে-মেরামত পড়েই থাকল।

কিছুদিন আমি ওসব অনাচার মুখ বুজে সয়ে গেলাম। কিন্তু সহ্যের তো একটা সীমা আছে! আর কাঁহা তক পারা যায়! এর একটা বিহিত ব্যবস্থা না করলেই নয়। অবশেষে অশেষ চিন্তার পর বুঝিলাম স্থির যে, এদের সনে যুদ্ধ-বিনে গতিরন্যথা!

মম ও গুর্জ ও ময়দান ও আফরাসিয়াব!

এবার আমার হাতে গুর্জ আর সামনে ময়দানে আফরাসিয়াব!

• •

এখানে আমার আসবাব-পত্তরের সাথে একটা ছাতাও রয়েছে। ছাতাটা হাতে নিয়েই 'যুদ্ধং দেহি' বলে তাল ঠুকে দাঁড়ালুম। কিন্তু অবিলম্বেই বুঝতে পারলুম যে, ও-রকম একটা ঠুঁটো হাতিয়ার নিয়ে অমন উঁচুতলার ধূর্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলা করা মোটে সহজ নয়। একবার এদের পানে আবার এদের উঁচু বাসাগুলোর পানে লক্ষ করে ছাতাটা ফাড়ুত ফুড়ুত করতে থাকি; কিন্তু সব বে-কার, পণ্ডশ্রম! বে-এখতিয়ার হাফেজের কবিতা মনে পড়ে যায়:

যেরোনে কন্দে বুলন্দ্ তু মীনুনাদ দিলে মন,
তু দস্তে কোতায় মন বিন ও আস্তিন দরাজ!

তুই কত বড় সে যদি বুঝতে চাস্ রে মন, তো এই ঠুঁটো হাত আর বিরাট আস্তিনটা চেয়ে দেখ!

না, দোসরা কোন মারাত্মক হাতিয়ার খুঁজে নিতেই হচ্ছে।

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, বারান্দার এক কোণে ঘরের ঝুল-কালি সাফ করার একটা বাঁশ খাড়া রয়েছে। এক দৌড়ে গিয়ে বাঁশটা হাতে তুলে নিই।

এবার শত্রু শিবিরেও বেশ সাড়া পড়ে যায়। শুরু হয় তুমুল লড়াই। চড়ুইগুলো তাড়া খেয়ে কামরার চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকে। ওদিকে বাঁশ হাতে আমিও পাগলের ন্যায় এদের পেছনে ধাওয়া করি আর নিজেরও অগোচরে ফেরদৌসী আর নিজামীর অনুকরণে ভীতিপ্রদ রণহুঙ্কার আওড়াতে থাকি:

ব-খঞ্জর জমিন রা নিস্তো কুনম:
ব নেজা হাওয়া রা নিস্তো কুনম।
খঞ্জর হেনে ধরার বক্ষ করিব ছিন্ন,
ন্যাজার খোঁচায় আকাশ করিব ছিন্ন।

আখেরে আমারই জয় হয়। সহসাই দুর্ধর্ষ শত্রুর দল রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়।

ব-এক [illegible]
চে গরদান-কুশাঁ বা সদ্ [illegible]—
[illegible]
লুটাইয়া পড়ে ভূমে অভাগা [illegible]...

[illegible] আমার এক [illegible] বিলাবল সাজে।

[illegible] এক [illegible] বাঁধে।

কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট! [illegible] চড়ুইয়ের চেঁচামেচি আর পাখার ফড়ফড়ানি কানে ভেসে আসে। [illegible] দেখি, এরা সে-যার বাসা দখল করে বসেছে।

অগত্যা উঠতেই হয়। বাঁশটা হাতে নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে ফের সংগ্রাম শুরু করি!

বরারম ও মার আজ হমা লস্করাস।
ব-আতশ ব-সুজম হমা কিশবরাস।
সিপাই লস্কর যত মারিয়া ডারিব।
ঘর বাড়ি যত সব জ্বালাইয়া দিব।

শত্রুর দল এবার সহজে হার মানতে চায় না। তাড়া খেয়ে এক কোণ ছাড়ে তো অন্য কোণে গিয়ে ডাঁট হয়ে বসে। কিন্তু আখেরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন এদের করতেই হয়। কামরা ছেড়ে এরা বারান্দায় পশ্চাদপসরণ করে। তবে সেখানে ফের লোক-লস্কর সমাবেশ করতে থাকে। আমি সেখানেও ধাওয়া করি। শত্রুর দল সীমান্ত ছেড়ে বহু দূরে ভেগে না যাওয়া তক এবার অস্ত্র সংবরণ করি না।
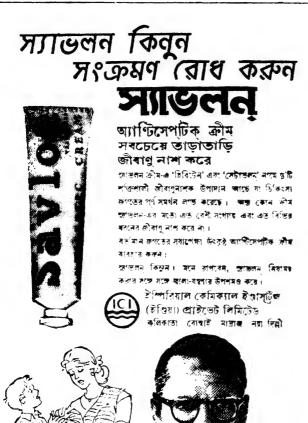
শত্রুর দল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল বটে। তবু জয় করে মোর ভয় যেন ঘুচতে চায় না। কে জানে, কখন এরা ফের হামলা শুরু করে।

অভিজ্ঞতার ফলে বোঝা গেল যে, বাঁশের ল্যাজাটা এদের খুব ভয় খাইয়ে দিয়েছে। যখন যে দিকে ল্যাজাটা তুলে ধরেছি, এরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে অন্য দিকে পালিয়েছে।

তাই ভাবলুম, এ মারাত্মক অস্ত্রটা আরো কিছুক্ষণ কামরায় রেখে দেওয়াই নিরাপদ। কোন অর্বাচীন শত্রু ফের যদি কামরায় ঢোকবার দুঃসাহস করেও, আকাশচুম্বী ওই ল্যাজার ফলাটা দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে সে বাধ্য হবেই।

তাই করি।

সবচেয়ে পুরনো বাসাটা আমার প্রসাধন টেবিল বরাবর। ল্যাজার ফলা ওই বাসাটার ঠিক মুখে মুখে রেখে বাঁশ খাড়া করে রাখি।

অবশ্য তাতেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব নিশ্চিন্ত মনে করি না। তবে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে থাকি যে, আমার তরফ থেকে যুদ্ধাস্ত্র সমাবেশে কোন ত্রুটি করি নি।

মীরের কবিতা কতবার কতভাবে স্মরণ করেছি। এ ক্ষেত্রেও ঐ দু'টো লাইন মনে পড়ে গেল!

সেকস্ত ও ফতেহ্ নসীবিয়োঁ হৈ ওয়ালী
এয় মীর,
মোকাবেলা তো দিলে না-ত ওয়া-নে খুব
কিয়া!
জয় পরাজয়, সে তো ভাগ্যের লীলাখেলা,
দুর্বল মন, হে মীর, যুঝেছো তবু তো
মেলা!

•   •   •

এগারোটা বাজতেই আমি খানা খেতে চলে যাই। ফিরে এসে ঘরে পা দিতেই চক্ষুস্থির!

দেখি কি—শত্রুর দল ঘরটা পুনর্দখল করে নিয়েছে।

শুধু তাই নয়! এরা এমন নিশ্চিন্ত মনে যে-যার কাজে মশগুল, যেন এখানে কোন কিছু ঘটেই নি।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, যে হাতিয়ারটার উপর অতখানি ভরসা করেছিলুম, সে এখন ওদেরই বেশ কাজে লাগছে।

বাঁশের মাথাটা কিনা বাসার মুখে মুখে, তাই বাসায় ঢোকবার পথে ওটা গাড়ি-বারান্দার কাজ দিচ্ছে।

মাঠ থেকে খড়-কুটো কুড়িয়ে এনে চড়ুইটা এর ডগায় বসে বসে পরম নিশ্চিন্তে বাসায় ঢোকাচ্ছে আর চোঁ চোঁ করে যেন কবিতা আওড়াচ্ছে :

'আদু সওয়াদ সবুবে খয়ের গরু খোদা
খাহেদ্
আল্লা যার নির্ভর, তার শাপে হয় বর।'

অত বড় বিজয়ের এ হেন শোচনীয় পরিণতি দেখে আমার সব উৎসাহ উবে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল : ক্ষণিকের তরে এই ধূর্ত শত্রুদের জব্দ করা হয়তো সহজ; কিন্তু এদের ধৈর্য ও স্থৈর্যের মোকাবেলা করা সহজ নয়। এখন পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া উপায় কি!

বিয়া, কে মা সপর আন্দাখতেম আগর জঙ্গ
আস্ত!
'এ গান তোমার শেষ করে দাও
নতুন সুরে বাঁধো বীণাখানি!'

•   •   •

অতঃপর ভেবে দেখলুম : ওই অবাঞ্ছিত অতিথিদের সাথে সহ-অবস্থান নীতি অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত।

শোবার বিছানাটার ব্যবস্থা করতে হলো সর্বাগ্রে। ওটা কিনা বাসাটার ঠিক নীচে দেয়াল ঘেঁষে পাতা—তাই দেয়ালের খসে পড়া চুন-বালি আর বাইরে থেকে কুড়িয়ে আনা খড়-কুটোর টুকরো যা পড়ে তো পড়ে এর উপরই। দেয়াল থেকে কিছু দূরে বিছানাটা সরিয়ে নিলুম। ফলে কামরার বিন্যাস বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলো।

আর ঘরের বিন্যাস! নিজের ঘরটাই যখন হাতছাড়া, তখন এর সাজ-বিন্যাসের কথা ভেবে কি লাভ?

সে যেন হলো। কিন্তু প্রসাধন টেবিলটার সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা গেল না। ঘরের যে কোণে ওটা পাতা ওই এর যথা-স্থান। একটু এধার-ওধার করার জো নেই।

অগত্যা বাজার থেকে খানকয়েক ঝাড়ন কিনে টেবিলের প্রতিটি বস্তু এক-একটা ঝাড়ন চাপা দিলুম। ক্ষণেক পর পর ঝাড়ন তুলে ধুলোবালি আবর্জনা বাইরে ফেলে দিই। একটা বড় ঝাড়ন দিয়ে টেবিলের আগা-পাশ-তলা মুছে দিই।

তাতেও কিন্তু আর এক মুশকিল দেখা দিল। বাইরে বারান্দায় ফেলে-আসা ও-সব আবর্জনা কে সরায়?

সকালের দিকে ঝাড়ুদার একবার ঘর-দোর সাফ করে যায়। কিন্তু সেই একবার ছাড়া এখন যে বারবার ঝাঁট দেওয়া প্রয়োজন!

এখানে অবশ্য প্রতি দু' কামরা ঝাড়-মোছ করার জন্যে একজন কয়েদী মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু সে তো সারা দিন ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না! আর সে রাজী থাকলেও তার উপর এ হেন বোঝা চাপানোও ঘোরতর অন্যায়।

অগত্যা 'আপনা হাত জগন্নাথ'।

একটা ঝাড়ু এনে আলমারির পেছনে রেখে দিয়েছি। এখন নিজেই, বন্ধুবান্ধবদের নজর এড়িয়ে, দিনে দু'-চারবার, কোনদিন এরও বেশী ঝটপট ঝাড়ু চালিয়ে নিই।

দেখ তো, এই অবাঞ্ছিত মেহমানদের খাতির-তোয়াজ করতে গিয়ে আমায় কিনা ঝাড়ুদার সাজতে হলো!

একেই বলে :

ইশ্‌কে আজই বাসিয়ার কারদস্ত ও কুনাদ :
যার সনে যার মজে মন,
কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম!
দিন যায়।

একদিন ভাবলুম : এদের সাথে সন্ধি হলো তো একটু ভাল করেই হোক। এ কেমন কথা যে, বাস করব এক-ই ঘরে অথচ রইব এমন অনাত্মীয় বেগানার মতো!

বাবুর্চিখানা থেকে তক্ষুনি কিছু চাউল

চেয়ে নিলুম। বসবার সোফার সামনে কার্পেটের উপর এর কয়টা দানা ছড়িয়ে দিয়ে ওত পেতে বসে রইলুম, শিকারী যেমন ফাঁদ পেতে দম মেরে বসে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে।

ফতাদম দাম বর-কুনজাস্কে ও সাদম ইয় আঁ হিম্মাত
কে গর সি-মোর্গ আমাদ ব-দাম আজাদ মী করদম।

চড়ুই ধরিব বলে পাতিয়াছি ফাঁদ।
অথচ মনে বড় সাধ,
সি মোর্গ পড়ুক ধরা, দেখাব হিম্মত
আমি তারে করিয়া আজাদ!

কিছুক্ষণ যায়। মেহমানদের নজর যেন এদিকে পড়েই না। আর নজর পড়ে তো এদের কেমন যেন ইতস্তত ভাব।

এদিকে কেউ পা বাড়ায় না।

আমার কিন্তু মনে হলো : এদের এ-তাচ্ছিল্য আসলে গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনির মত ছল করে দেখার একটা বাহানা। তা না হলে নীল কার্পেটের উপর ধবধবে সাদা চাউলের কণা এমন কোন অনাকর্ষণীয় বস্তু নয় যে, বেশীক্ষণ উপেক্ষা করা যায়।

হুর ও জিন্নাত জলোয়া বর্-জাহেদ দেহাদ দর্ বাহে দুস্ত,
আন্দক আন্দক ইশ্কে দর-কার আওর্দ বেগানারা।

হুর ও জান্নাতে যেন দেয় হাতছানি—
ধার্মিক সুজন
নিরধান্বিত মন,
ধীরে ধীরে ধরা দেয় সেই প্রেম-ফাঁদে—
ঠিক তেমনি, এ ক্ষেত্রেও হলো তাই।

একটা চড়ুই নেমে এল। এদিক-ওদিক সে ঘুরতে লাগল। মুখে চোঁ চোঁ আওয়াজ। দৃশ্যত মনে হলো, সে যেন আপন মনে গান গাইছে। আসলে এর নজর কিন্তু ঠিক চাউলের উপর।

এর পর আর একটা চড়ুই নেমে এল এবং দুটোয় মিলে কার্পেটের চারদিকে তওয়াফ করতে লাগল। একটু বাদে এক এক করে আরো কয়টা চড়ুই এসে এদের সাথে জুটে গেল।

একবার এরা চাউলের দানার পানে চায় আবার চাউল যে ছড়িয়েছে, তার পানে। এক একবার মনে হচ্ছিল যেন এরা নিজেদের মধ্যে কি সব শলাপরামর্শ করছে। কখনও মনে হচ্ছিল : এরা যেন কী গভীর চিন্তায় মগ্ন!

তুমি হয়তো লক্ষ করে থাকবে : চড়ুইরা যখন কোন কিছুর প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখে, এদের চোখে মুখে তখন এক গভীর চিন্তার ছায়া পড়ে। প্রথমে ঘাড় উঁচু করে এরা সামনের দিকে তাকায়। এর পর ঘাড় কাত করে ডানে বাঁয়ে দেখতে থাকে। কখন বা ঘাড় বাঁকা করে উপরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

এদের চোখে মুখে তখন এক অনুসন্ধিৎসার ভাব ফুটে উঠে। অপরিচিত পরিবেশে বা ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় মানুষ যেমন অবাক বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে চারদিকে তাকায় আর মনে মনে বলতে থাকে : এ কি কান্ড রে বাবা!

ঠিক তেমনি এই চড়ুইদের চেহারায়ও এমনি একটা ভাব ফুটে উঠল।

কিছুকাল এভাবেই কাটে।

এর পর এরা ধীরে ধীরে সামনে এগুতে থাকে। কিন্তু তা-ও ঠিক দানার দিকে এগোয় না। আঁকাবাঁকা পা চালিয়ে পাশ কেটে বেরিয়ে যেতে থাকে। যেন এরা আমায় বোঝাতে চায় যে, চাউলের কণার প্রতি এদের কণা মাত্রও লোভ নেই। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার কি চমৎকার বাহানা!

বে-এখতিয়ার জহুরীর কবিতা মনে পড়ে গেল :

ব-গো হাদিসে ওফা আজতু বাওরাম্ত, ব-গো
শওম ফিদায়ে দরুগে কে রাস্ত মনাদস্ত!

বল, ওরে ছলনাময়ী, বল :
তোর যত লীলা কলা ছল,
মেনে নেব খাঁটি প্রেম বলে?

তুমি জান, শিকারের চেয়েও শিকারীর কত বেশী সাবধান হতে হয়।

যেই দেখি, এরা চাউলের দিকে এগুচ্ছে, আমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে দম মেরে, নিশ্চল নিশ্চুপ প্রস্তরখন্ডবৎ বসে থাকি। যেন মানুষের বদলে আসলেই এক প্রস্তর-মূর্তি!

আমি জানি, এ সময়ে অতি উৎসাহবশে যদি সামান্যতম চঞ্চলতাও প্রকাশ পায় বা এক চুল নড়া-চড়া করি, তা হলে শিকার ফাঁদে পড়তে পড়তেও কেটে পড়বে।

আমাদের এ খেলা না—যেন আসলে মন দেওয়া-নেওয়া খেলায় নাগরীর ছলা-কলা ও নাগরের অধীর উৎকণ্ঠার আদি পাঠ!

খোদা খোদা করে এ খেলার আদি পর্ব শেষ হলো। পরম উৎসাহী এক চড়ুই এবার সত্যিই চাউলের কাছে এগিয়ে এল। তবে এর চোখে মুখেও দারুণ তাচ্ছিল্যের ছায়া—যেন চাউলের প্রতি এর বিন্দুমাত্র লোভ নেই!

নিশ্চল নিশ্চুপ বসে বসে আমি মনে মনে আওড়াতে থাকি :

ব-হর কুজা নাজ্ সর বর্ আরাদ
নিয়াজ হম্ পয়ে কম না দারাদ
তুয়ে খিরামে সদ্ তগাফিল
মান ও নিগাহে সদ্ তামান্না।
তুমি যে পথ দিয়ে চল গো ধনি,
আমি হব সেই পথেরই ধূলি।

তুমি যদি ফিরে না চাও,
আসার আশায় রইব নয়ন মেলি।

চড়ুইটা এক কদম আগে বাড়ে তো দু' কদম পিছু হটে যায়। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজের এ কী অপূর্ব লীলা খেলা!

আহ্! এর অতটুকু পরিবর্তনও কি হয় না?

দু' কদম আগে বেড়ে এক কদম পিছুও যদি হটে, তো কী মজাই না হয়!

* * *

একটা চড়ুই।

দীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, মদ-গর্বিত চেহারা—সমগ্র দলের মাঝে যেন সে অনন্য।

এতক্ষণ পরম নিস্পৃহ উদাসীনবৎ সে বসে ছিল। এদের গয়ংগচ্ছ ভাব দেখে ওর যেন আর সহ্য হলো না। সহসা পরম নির্ভয়ে সে সামনে পা বাড়াল, আর উন্মাদের ন্যায় একটা হুংকার দিয়ে চাউলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ওর ঐ এক পদক্ষেপের সাথে সাথে, মনে হলো যেন সবার পায়ের বন্ধন খুলে গেছে।

এর পর না রইল কারো পায়ে কোন আড়ষ্টতা, না কারো দৃষ্টিতে কোন অনিশ্চয়তা। দলকে-দল এক সাথে চাউলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইংরেজী ইডিয়ম অনুসরণে বলা যায় : এদের সন্দেহ লজ্জা ও সংশয়ের বরফ সহসা ভেঙে পড়ল, অথবা বলা যায়—গলে গেল।

একটু ভেবে দেখো!

এ সংসার-সমরাঙ্গনের প্রতি ক্ষেত্রেই অভিযাত্রীর দল এমনি এক অগ্রনায়কের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। যতক্ষণ না তিনি পা বাড়ান সবাই অচল, অনড়, জড়বৎ দাঁড়িয়েই থাকে। অগ্রপথিকের অভ্রান্ত পদক্ষেপের সাথে সাথে সারা দুনিয়া যেন চল-চঞ্চল হয়ে উঠে।

মানদর্মী-মদর্মী কাদমে ফাসেলা দারাদ।
মর্দামী, না-মর্দামী! ব্যবধান এই এক কদম।

জয়-পরাজয়ের এই সর্পিল দুনিয়ায় বিড়ালের ভাগ্যে কদাচিৎ শিকে ছেঁড়ে।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! এখানে জয় করে নেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেন যিনি, বিজয়লক্ষ্মী তার গলেই বরমাল্য অর্পণ করে!

সাদ আজীমাবাদী মরহুম কী সুন্দর বলেছেন :

ইয়ে বযমে মায় হায় য়াঁ কুতা-দস্তী মে হি মহরুমী
জু-বাঢ় কর্ উঠা লে হাত মে মিয়ানা ওসিকাহি।

সুরা সাকীর এ মজলিসে,
দুর্বল, ভীরু অসহায়ের ভাগ্যে কিছু না জোটে।
হস্ত প্রসারি পাত্র যে টেনে লয়,
সেই বাহাদুর বটে!

অসমসাহসী ওই চড়ুইটার নির্ভীক পদক্ষেপ আমার এত ভাল লাগল যে, সে আর কি বলব। ওর কথা একান্তই মনে গাঁথা হয়ে গেল।

ভাবলুম, এর সাথে সম্পর্কটা আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। আমি ওর নাম দিলুম 'কলন্দর' (উদাসী)। ভয়-ভাবনা-লেশহীন উদাসীনতার মাঝেও এক সহজ অনাড়ম্বর লাবণ্যবিলাস ওকে সত্যিই অনুপম করে তুলেছিল।

দু'-চার দিন এ ভাবেই মেহমানদের খাতিরতোয়াজ করা গেল। দিনে দু'-তিন বার কার্পেটের উপর চাউল ছড়িয়ে দিই। এক এক করে ওরা আসে আর দানা খুঁটে খুঁটে মুখে তুলে নেয়। চাউল ছড়াতে কোনদিন একটু দেরি হ'লেই কলন্দর এসে চিঁ চিঁ করে যেন বলতে থাকে : বন্ধু, বেলা যে যায়! ওদের হাব-ভাব দেখে মনে হলো : ওদের ভীতির শৃঙ্খল টুটেছে; এবার লাজের বন্ধন ছিঁড়তে আর দেরি হবে না।

কয়দিন পর আমি অন্য পথ ধরলুম।

সিগারেট-টিনের একটা ঢাকনায় চাউল ঢেলে ঢাকনাটা কার্পেটের এক কোণে রেখে দিলুম।

মেহমানদের নজর এড়াল না। ওরা এল এবং কেউ ঢাকনার কাছে বসে, কেউ ঢাকনার কিনারায় চড়ে পরম নিশ্চিন্তমনে খেতে লাগল। নিজেদের মধ্যে আপোসে ঝগড়া-বিবাদও করতে কসুর করল না।

এভাবে আমার দাওয়াত খেতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে দেখে ঢাকনাটা আমি আর একটু কাছে টেনে নিলুম। পরদিন আরও কাছে—ঠিক আমার পাশেই রেখে দিলুম। এবং এভাবে দূরকে ক্রমে নিকটে টেনে আনতে লাগলুম।

ঢাকনাটা আমার এমন গা-ঘেঁষা দেখে মেহমানদের কেমন যেন সন্দেহ হলো। কার্পেটে নেমে আসে যদিও, তবু কেমন যেন দ্বিধায় জড়িত পদে আর সন্দেহাকুল নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখে।

এবারও কলন্দরই সংস্কারে প্রথম পা বাড়াল। এবং এই দিওয়ানা সন্ন্যাসীর অসমসাহস দেখে সবার আড়ষ্টতাই দূর হয়ে গেল। ওরা সবাই যেন কলন্দরের অনুগামী। কলন্দর কদম বাড়ায়, তো সবাই ওর সাথে চলতে শুরু করে।

কলন্দর চাউলের এক-একটা দানা মুখে তুলে নেয় আর সিনা টান করে যেন বলতে থাকে :

ওমা-দু দাহ্‌রে ইয়া মিনু রাওয়াতে
কাসায়েদে
ইজ কুল্‌-তু সায়রাঁ আসাবিহিদ্‌ দাহ্‌রা
মানাসারা!

ব্যাপার যখন অত দূরে গড়াল, তখন আমি আরো এক কদম আগে বাড়লুম। দানা-ভর্তি ঢাকনাটা কার্পেট থেকে সরিয়ে তেপায়ার উপর রেখে দিলুম।

তেপায়াটা সোফার বাম পাশে, আমার ঠিক হাতের নাগালের মধ্যে। এই পরিবর্তনের সাথে পা মেলাতে ওদের বেশ একটু দেরি হয়। বারবার ওরা আসে যায়, তেপায়ার চারদিকে চক্কর লাগায়। অবশেষে কলন্দরই পহেলা কদম বাড়াল। এবং দল-সুদ্ধ সবাই এবারও এর তালেই তাল মেলাল।

শেষ পর্যন্ত আমার তেপায়াটা হয়ে উঠল এদের সভামণ্ড, কখনও বা এদের কুস্তির আখড়া।

আমার এত কাছাকাছি আসতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে দেখে ভাবলুম : আরো এক কদম অগ্রসর হওয়া যাক না কেন?

পরদিন চাউলের ঢাকনা সোফার উপর ঠিক আমার পাশেই রেখে এমন নিশ্চিন্ত মনে লেখায় মশগুল হয়ে রইলুম যেন লেখা ছাড়া অন্য দিকে আমার কোন খেয়াল নেই।

একটু বাদেই শুনতে পেলুম ঢাকনাটার কে যেন জোরে জোরে ঠোকরাচ্ছে। আড়-চোখে চেয়ে দেখি আমার পুরনো দোস্ত 'কলন্দর' এসে গেছেন আর ঢাকনার গায়ে অবিশ্রাম চঞ্চুর আঘাত হানছেন। ঢাকনাটা কিনা আমার ঠিক পাশেই, তাই ওর লেজ আমার জানু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

একটু পরে অন্যান্য বন্ধুরাও দ্রুত পক্ষ-সঞ্চারে এসে পৌঁছে গেল।

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, এক-এক সময় দু'-তিনটে চড়ুই কোন প্রকার লৌকিকতার পরোয়া না করে আমার গা ঘেঁষে উল্লাস-নৃত্য করতে থাকে। কেউ বা সোফার হাতায় চড়ে বসে, কখনও বা লম্ফ দিয়ে বই-পুস্তকের উপর উঠে দাঁড়ায়। মুখে চোঁ চোঁ আওয়াজ তুলে বারবার উপর নীচ করতে থাকে।

আনন্দ-উল্লাসে ওরা এমন মশগুল হয়ে যায় যে, আমার কাঁধটা গাছের ডাল মনে করে এর উপরও চড়ে বসতে চায়।

আবার সহসা কি ভেবেই যেন মন বদলায়। কাঁধটা একটু ছুঁয়েই ফুড়ুত করে উপরে উঠে যায়।

ক্রমে ওই হাওয়া-হরিণদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সোফার উপরে ওই যে মূর্তিটা হর-হামেশা পড়ে থাকে দেখা যায়, মানুষ হলেও সে মানুষের মত ভয়ঙ্কর তেমন কিছু নয়।

দেখ তো : প্রেমের কী মোহিনী শক্তি! মানুষকে সহসা বশ করতে না পারলেও বনের পাখিদের কেমন সহজে আপন করে তোলে!

অনেকবার এমনও হয়েছে : আমি হয়তো নিজ চিন্তায় বিভোর, অথবা তন্ময় তদ্‌গত চিত্তে কোন কিছু লিখছি। একটা সুন্দর কথা হয়তো কলমের মুখে এসে গেছে, নয়তো সুন্দর দু' লাইন কবিতাই মনে পড়ে গেছে আর সে আনন্দে মাথাটা একটু দুলে উঠেছে, নয়তো মুখ থেকে সামান্য 'হুম্' আওয়াজ বেরিয়েছে, আর অমনি ওরা ফুড়ুত করে উড়ে চলে গেছে।

আমার মনে হচ্ছিল : নাকি এই বেতাল পথিকের দল আমার ঠিক পাশেই ভোজের মজলিস বসিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে ছিল। সহসা যেই দেখল যে, পাথরটা দুলতে শুরু করেছে অমনি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে উড়ে চলে গেল!

পরে থেকে ওরা এমনভাবে আমার পানে তাকাতে লাগল যে, দেখে মনে হলো ওরা যেন ভাবছে : সোফার উপর ওই যে পাথরটা পড়ে থাকে, সেও বোধ মাঝে মাঝে মানুষ হয়ে যায়!

[আগামী সংখ্যায়]

অন্ধকার, কয়েকটি শব্দ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আমি তার পদশব্দে মধ্যরাত্রে জেগেছি যখন
অন্ধকার শুয়েছিল আমাদের পাশে,
ক্রমাগত নৈঃশব্দ্যের অন্তরালবর্তী উপবন
কেঁপে উঠল বিস্ময়ের বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে।

শব্দের তরঙ্গ থেকে আমি তার বাতায়নবিলাসী মুখের
প্রতিবিম্বে দেখি অন্ধকার,
সমৃদ্ধ স্তনের বৃন্তে নক্ষত্রখচিত অসুখের
স্তব্ধতার গাঢ় উপহার।

দূরে, বহু দূরে থেকে জলপ্রপাতের শব্দ,
উপত্যকা উদ্বৃত্ত প্লাবন
সমবায়ী স্বপ্নে কিংবা ক্লান্ত জনপথে;
শেষ রাত্রে দিগ্বিদিকে তমসা বিদীর্ণ জাগরণ
বিচলিত নিসর্গের হিম রক্তস্রোতে।

পল্লবিত ঐশ্বর্যের অতিথিরা একে একে ফিরে গেল কাল
কেউ তারা অর্ধমৃত, পরতন্ত্রী, তৃপ্ত, পলাতক;
তারা কেউ দেখল না শোণিতাক্ত নিবন্ত মশাল,
স্নান সেরে নিতে গেল আত্মহত্যাপ্রবণ স্নাতক।

মধ্যরাতে জেগে দেখি উপত্যকা কেঁপে উঠছে গরম নিঃশ্বাসে,
অন্ধকার শুয়েছিল আমাদের পাশে।

মানুষ, ১৯৬১

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ভাঙাঘরে মস্ত একটা হাওয়ায়
মানুষ কাঁপছে। একটা হাত পাশের মানুষটাকে
ধরে আছে, আরেকটা হাত
কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না।
পায়রা এসে বসেছে নিমগাছে।

সামনে শুধু রুগ্ন এক পাহাড়
সামনে এক প্রচণ্ড ঝামরানো
সমুদ্রের ক্লান্ত অন্ধকার।

আড়াল ক'রে দেখে নেবার মতো
কোথাও আর গোপন দৃশ্য নেই;

মস্ত একটা হাওয়ায়, ভাঙাঘরে,
মানুষ কাঁপছে॥

গল্প সংকলন

এই দশকের গল্প: বিমল কর সম্পাদিত: পলাশী প্রকাশিত: ৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : মূল্য ৪·০০ টাকা॥

যে-কজন লেখকের ছোটগল্প এই গ্রন্থে সংকলিত বয়সে তাঁরা সবাই তরুণ এবং এই দশকেই তাঁরা লেখা শুরু করেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে নাম এই দশকের গল্প হলেও সম্পাদক বেছে নিয়েছেন কেবল এই দশকের নতুন লেখকদের। কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এইসব নতুন লেখক বাংলা ছোটগল্পের আসরে নেমেছেন সেইটি পাঠকের চোখে তুলে ধরাই বোধ হয় সম্পাদকের লক্ষ্য।

ভূমিকায় সম্পাদক একথা স্বীকারও করেছেন। সমাজ জীবনে গত দুই দশকের অস্থির আলোড়নের পরে এসেছেন নতুন লেখকরা। সম্পাদকের ভাষায়—'যে-জ্বালায় আমরা পুড়েছিলাম এঁরা সেই জ্বালার তাৎক্ষণিক ক্লেশ থেকে মুক্ত, সুতরাং পোড়া চেহারার রূপটি অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিক চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের প্রাথমিক আপৎ থেকে মুক্ত বলে এঁরা আরও ব্যাপক জগৎকে দেখায় ব্রতী।'

সম্পাদকের এই উক্তি যদি শেষ পর্যন্ত সত্য হয় তাহলে আশার কথা সন্দেহ নেই।

আলোচ্য সংকলনের গল্পগুলি পড়ে প্রথমেই মনে হয়েছে লেখকদের নিষ্ঠা এবং কম-বেশী আংশিক সচেতনতার কথা। কোন রকমে একটি কাহিনী দাঁড় করানোর দিকে কারও তেমন বিশেষ নজর নেই। যা কিছু বলছি তাকে সুন্দর করে গুছিয়ে বলব। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ একটি ভঙ্গির উপস্থিতি লক্ষণীয়।

ভঙ্গির কথায় প্রথমেই মনে আসে দেবেশ রায়ের কথা। তিনি বিশেষ একটি ভঙ্গির অধিকারী। কিন্তু ভয়ের কথা তিনি এই ভঙ্গির হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়তে পারেন। সামান্য একটি দৃশ্য অথবা সামান্য একটি মানসিক অবস্থাকে তিনি যেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেন তা থেকে মনে হতে পারে এই বিশ্লেষণের আপাত আনন্দ ছাড়া তাঁর বোধ হয় অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। বিশ্লেষণের এই আপাত আনন্দের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর জীবনের আঙিনায় প্রবেশ করতে না পারলে আশংকার কথা। দেবেশ রায়ের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি এই কারণে যে, তরুণতর লেখকদের মধ্যে একটি বিশেষ বিশ্লেষণী ভঙ্গির তিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবক্তা।

সম্ভবত এ গ্রন্থের সার্থকতম দুটি গল্পের লেখক মতি নন্দী এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রতন ভট্টাচার্যের গল্পটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংকলনের কোন গল্পই এক লাইন পড়ে পাতা উল্টে যাবার মত নয়। তার কারণ বোধ হয় লিখন বিষয়ে লেখকের যত্ন এবং মোটামুটি একটি শিল্পিকুশলতা। এইটিই আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

অনেক গল্পেই পরীক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। এই পরীক্ষা যদি বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে লেখকদের নতুন কোন সার্থকতার সোপানে উত্তীর্ণ করে তাহলে খুশী হবার কারণ ঘটবে। আপাতত হয়তো অনেকেই ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে এঁদের সঙ্গে একমত হতে দ্বিধা করবেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন লেখকদের এই সংকলন প্রকাশের জন্য কিছুটা সাহসের প্রয়োজন ছিল। সে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন বলে প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

সম্পাদক বিমল করের লেখা ভূমিকাটি মনোযোগের দাবি রাখে।

[২৫২ ৬১]

রস রচনা

চণক-সংহিতা: কালিদাস রায়। অরুণ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৯। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রবীণ কবি ও রসজ্ঞ প্রাবন্ধিক। সত্যেন্দ্র রবীন্দ্র-ছায়ায় লালিত বাংলা কবিতার একটি বৃহৎ পর্বের সঙ্গে তিনি যুক্ত। কবি হিসেবে তাঁর প্রথম পরিচয় হলেও, তিনি একজন নিপুণ গদ্য লিখিয়ে: তাঁর গদ্যের ঢঙটি বড়ই মধুর। এই উল্লেখের একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'চণক-সংহিতা' গ্রন্থে।

'চণক-সংহিতা' গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের সংকলন নয়; অম্ল-মধুর কয়েকটি রস রচনা এর অন্তর্ভুক্ত। রম্য-রচনা বললেও বোধ হয় এর সঠিক চরিত্রটি প্রকাশ পায় না। প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি মৌল অভিজ্ঞতার সঙ্গে এইসব রচনায় যুক্ত হয়েছে প্রবীণ লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি। সমাজ-

জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা যেমন তাঁর লেখনীতে বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, তেমনি ফুটেছে তাদের জীবন্ত ও সরস করে তোলার পরিবেশন দক্ষতা। কথোপকথন ছলে তিনি অনেক বৃহৎ বিষয়কে পাঠকের চোখে স্পষ্ট করেন। গ্রন্থস্থ সতেরোটি রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তন্মধ্যে 'কবির বিবাহ' রচনাটি মনে রাখবার মতো। 'বইয়ের আদর', 'ছাপার ভুল', 'সাহিত্যিকের বিড়ম্বনা' ইত্যাদি রচনাগুলি আলাদা ধরনের, শিরোনাম থেকেই তা প্রকাশ পাবে। আমরা এই গ্রন্থের সমাদর কামনা করি।

৬৭৩।৬১

প্রবন্ধ-সাহিত্য

সাহিত্য ও সাধনা। বিপিনচন্দ্র পাল। যুগযাত্রী প্রকাশক, ৪১এ, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

মনীষী ও তেজস্বী বিপিনচন্দ্র পালের নতুন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বাংলার রাজনীতি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গৌরবময় পর্বের সঙ্গে যুক্ত থেকে জাতীয় জীবনকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা সুবিদিত। বেদান্তের ধারায় পুষ্ট ওজস্বী চিন্তা ও ক্ষুরধার রচনাভঙ্গী এক সময় তাঁকে অপ্রতিহত করে তুলেছিল। বাঙালী বিস্মরণ-বিলাসী। সম্ভবত সেই কারণে স্বর্গত বিপিনচন্দ্রের রচনাবলীকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এতদিন কেউ অনুভব করেননি। প্রকাশককে ধন্যবাদ, তাঁর বিস্মৃতপ্রায় কয়েকটি প্রবন্ধকে 'সাহিত্য ও সাধনা'র অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করেছেন। সংকলিত বারোটি রচনার মধ্যে 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা', 'রাখিবন্ধন' ও 'স্বদেশী ও বয়কট' বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এতদ্ব্যতীত বিপিনচন্দ্রের সমসাময়িক কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও 'বঙ্কিম' সম্পর্কিত আলোচনা যুগ-চরিত্রের সন্ধান দেবে।

৬৯৪।৬১

গল্পগ্রন্থ

এক রাত্রি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আড়াই টাকা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নতুন গল্প সংকলন 'এক রাত্রি'। কল্লোল যুগের লেখকদের কেউ কেউ গল্প রচনা প্রায় বন্ধ করেছেন, কেউ কেউ বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছেন। সুখের কথা, অচিন্ত্যকুমার এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি লেখেন; আর লেখক হিসাবে তিনি যে তাঁর পুরনো পোশাক অনেক দিনই বদলেছেন, পাঠকমাত্রেই তা অবহিত আছেন। বর্তমান সংকলনে সেই পরিবর্তনের চেহারা স্পষ্ট।

অচিন্ত্যকুমার মূলত রোমান্টিক। সংকলিত দশটি গল্পে তাঁর চিরাচরিত রোমান্টিকতার সঙ্গে মিশেছে প্রখর বাস্তববোধ। 'এক রাত্রি' গল্পটির কথা ধরা যাক। প্রায় কবিতার মতো, এই গল্পটিতে প্রেম সম্পর্কিত একটি ধারণা মধুর জন্ম নিয়েছে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষুর বাহিরে ক্ষণিকার সর্বজয়ী ভালোবাসার রূপ উন্মোচিত হ'লো ভবদেবের চোখে। 'আমি এসেছি' ক্ষণিকার এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে শুধু ক্ষণিকার জয় নয়, প্রেমের সর্বপ্লাবী শক্তিই বিজয়ী হ'লো। পরিবর্তে সে পেল বাগানের একটি বিহ্বল গোলাপ। 'এক রাত্রি' শুধু অচিন্ত্যকুমারের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'পাপ' ও 'ওভারটাইম' বিশেষ উল্লেখ দাবি করে।

৬৫১।৬১

ক্রীতদাস ক্রীতদাসী। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বয়সে তরুণ বলেই বোধ হয়। ইতিপূর্বে তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থ চোখে পড়েছে ব'লে স্মরণ করতে পারি না। তাহ'লে বলতে হবে, প্রথম গ্রন্থেই তিনি শক্তি ও প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতি পরিণত রূপে লাভ করলেই আমরা খুশি হবো।

'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গল্পগ্রন্থ। গল্প সংখ্যা চার; যথাক্রমেঃ বিজনের রক্তমাংস, দশ বছর পরে একদিন, মীরাবাঈ এবং ক্রীতদাস ক্রীতদাসী। গল্পগুলির প্রধান চরিত্র বিজন। তার জীবনের, বিশেষত কৈশোর ও যৌবনের কয়েকটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার চিত্র এইসব গল্প। অনুভূতিপ্রবণ, আপাত-নির্লিপ্ত এই চরিত্রের নিঃসঙ্গতার স্মৃতি পাঠকের মনে সহজেই দাগ কেটে যায়। 'দশ বছর পরে একদিন' গল্পের শেষাংশে এই বোধ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। 'মীরাবাঈ' এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প। অসংলগ্ন ভূমিকায় যারা মাতুর ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী পংক্তিটি গ্রন্থ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখক অন্তর্মুখী; এই গ্রন্থে তার প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর একটি কথা বলা সমীচীন হবে। লেখকের গদ্যভঙ্গী বাস্তবিক প্রশংসনীয়। এমন সুন্দর গদ্য সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রচ্ছদটি সুন্দর এবং সেখানে রবীন্দ্র-চিত্রকলার সাদৃশ্য প্রকট। ৪৯৪।৬১

ইতিহাস

প্রাচীন ইরাক—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ছয় টাকা।

ইতিহাস যে উপন্যাস অথবা কথা-

সাহিত্যের যে কোনো কল্পনাশ্রয়ী আখ্যান-বস্তুর মতোই রোমাঞ্চকর, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেটি একাধিকবার প্রমাণ করেছেন। প্রাচীন মিশর এবং মহাচীনের ইতিকথা নামক গ্রন্থদ্বয়ে সেই ক্ষমতা তিনি নিপুণরূপে প্রদর্শন করেছেন। 'প্রাচীন ইরাক' গ্রন্থে সেই শক্তি তীব্রতর ঔজ্জ্বল্যে দেখা দিয়েছে।

প্রাচীন বলতে আমরা বিশুদ্ধ ভারার্পিত ভারতবর্ষেরই একটি বৃহত্তর সংস্করণ মনে মনে বুঝতাম, এমন একদিন ছিলো। আজ একথা বুঝতে পারি, প্রাচ্য শুধু ভারতবর্ষীয় একটি ধারণা নয়, তার ঐতিহ্য শুধু একটি বর্ণেই রঞ্জিত নয়, এমনকি 'আর্যেতর' প্রভাব নির্ধারণ করে ফেললেই যে সেই বিচিত্র পথসঞ্চারী ঐতিহ্যের স্পষ্ট একটি কুলকিনারা মিললো, তা নয়। সেমেটিক সভ্যতার দূরপ্রসারী ধারাগুলিও এই প্রসঙ্গে জরুরী হতে পারে, প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে, এই বোধ যতক্ষণ যথাযথভাবে আমাদের জাগছে, ততক্ষণ প্রাচীন ভারতবর্ষ শুধু একটি ধারণা মাত্র হয়ে থাকবে। প্রাচীন ইরাকের কথা সবিস্তারে বলতে গিয়ে শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই সভ্যতার সুদূরসঞ্চারী প্রভাব-সূত্রগুলির কথাও সযত্নে পর্যালোচনা করেছেন। ইতিবৃত্ত তাঁর কাছে নিছক ভূখণ্ড-জনিত তথ্যাদিলিপি নয়—সাহিত্য, ধর্ম, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প প্রভৃতির সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাই তাঁর আলোচনা এত উদ্দীপক, এতই মনোগ্রাহী। যখন তিনি সামাজিক প্রথা প্রসঙ্গে চূড়ান্ত সংবাদ জ্ঞাপন ক'রেও গিলগামেশ মহাকাব্যের প্রসঙ্গে ব্যাপৃত হন, তখন তাঁর মনের ঔদার্য গুণ এবং রস-বিবেক পাঠককে কৃতজ্ঞ করে।

এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সাহিত্য শাখায় স্থায়ী সম্পদ। পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতির সমাহারে লেখক বিশিষ্ট। তাঁর ভাষা মাধুর্যে ও বৈদগ্ধ্যে সার্থক। বইটির অপর আকর্ষণ, অনেকগুলি রেখাচিত্র ও হাফটোন চিত্র।

(৪২৩।৬১)

পত্রিকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২—কার্তিক—পৌষ ১৩৬৮। প্রতি সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক সডাক ৫।০ টাকা। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ সুপরিকল্পিত হইয়াছে। পত্রিকাটির ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। এ সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্বন্ধে ফাদার পিয়ের ফালোঁর রচনা এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মবান্ধব সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকাটির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতী পত্রিকার এই উদ্যোগের জন্য সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদার্হ। ব্রহ্মবান্ধবের শতবার্ষিক এই বৎসর। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের 'সহধর্মী ও সহকর্মী'। এ কথা আমরাও স্বীকার করি। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির বছরে রবীন্দ্র-অনুরাগীদের শতবর্ষ পালন করিয়া বিশ্বভারতী পত্রিকা একটি মহৎ কর্তব্য পালন করিলেন। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে অনেকগুলি রচনা এই সংখ্যায় আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, বিনয় ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট মাতা, নষ্ট কন্যা'র স্বরলিপিও ছাপা হইয়াছে। এই পত্রিকা প্রত্যেকের অবশ্য-পঠনীয়।

একতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা। ১৩৬৮। রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা।

পত্রিকা প্রকাশনার জগতে একতার বিশিষ্ট স্থান আছে। সুরুচি ও সম্পাদনার সেই বিশেষ ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বর্তমান সংখ্যাটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। গল্প, কবিতা বা অন্যান্য রচনা এই সংখ্যাটিতে স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি বিশদ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। 'রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' বিষয়ক শ্রীকেশব চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি বিষয়ের উপর নতুন আলোকপাত করে। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য রচনার মধ্যে শ্রীশঙ্খ ঘোষের 'নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান', শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'কবিতার অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ' এবং শ্রী[illegible] দাসের 'গল্পগুচ্ছের গদ্যরীতি' প্রশংসনীয় প্রয়াস। আংশিকভাবে উন্নত আরো কয়েকটি রচনা আছে। কিন্তু এই সংকলনের বেশিরভাগ রচনাই দায়সারা ও অগভীর। বিশেষত রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বিষয়ক রচনাগুলি অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের: 'রবীন্দ্রোত্তর কবিতা' প্রবন্ধটি(!) অসংখ্য নাম-কণ্টকিত, সাপ্তাহিক সমালোচনামঞ্চ বলে ভ্রম হয়। তথাপি, রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় দানের এই সশ্রদ্ধ প্রয়াস বাস্তবিক প্রশংসনীয়। অঙ্গসজ্জায় ও মুদ্রণে অনবদ্য এই সংখ্যাটির জন্য সম্পাদককে সাধুবাদ জানাই।

প্রাপ্তিস্বীকার

ফেরারী ফৌজ—উৎপল দত্ত।

মিস বোসের কাহিনী—বাণী রায়।

ভারত আজ ও আগামী কাল—জওহরলাল নেহরু। অনুবাদক—অরুণ মিত্র।

আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস।

চারচোখ—কৃষ্ণ ধর।

যুগ পরিক্রমা (২য় খণ্ড)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

A History of Tamil Literature—C. Jesudasau & Hephzibati Jesudasau.

চন্দ্রশেখর

রবীন্দ্র-গল্পের হিন্দী চিত্ররূপ

ভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গল্প চিত্রায়িত হলে বাঙালী দর্শকরা স্বভাবতই আত্মতৃপ্তি বোধ করে থাকেন। তাই অনুমান করা অন্যায় হবে না, রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে বিমল রায় প্রোডাকশন্স-এর হিন্দী চিত্রোপহার "কাবুলিওয়ালা" বাঙালী চিত্র-রসিকরা প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করবেন। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর গুণে অবাঙালী দর্শকদের কাছে ছবিটির আবেদন স্বতন্ত্র।

"কাবুলিওয়ালা" রবীন্দ্রনাথের অসামান্য গল্পগুচ্ছের অন্যতম। একটি মহৎ গল্প হিসাবে চিহ্নিত। গল্পের অন্তর্লীন রসটি নিরুচ্চার। রসবেত্তার মৌন অনুভূতিতেই তার আস্বাদন। এই রস যদি সরবে উচ্চারিত হত তবে রসিকমন কলরব সইতে না পেরে অনুভূতির দ্বার বন্ধ করে দিত। সারি সারি অশ্রুবিন্দুতে যে কাহিনী সিক্ত তার অব্যক্ত আবেদন দুঃখের সুখানুভবে আলিপ্ত। "কাবুলিওয়ালা" গল্পের আনন্দ-করুণ ও বেদনার স্পর্শ সমস্ত অন্তর দিয়ে যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরা এই কাহিনীর চিত্ররূপে একটি বস্তুই খুঁজে নিতে চাইবেন। তা হল : চিত্রায়িত ঘটনাপ্রবাহে তাঁদের অন্তর-অনুভূতির সাক্ষ্য। মূল গল্পের রসধারা ও চিত্রের ঘটনাপ্রবাহ রসিক-চিত্তের পূর্ব-লালিত অনুভূতির সঙ্গে মিশে গিয়ে ত্রিবেণী-সঙ্গম যদি গড়ে না তোলে তবে মহৎ সাহিত্যের চিত্রায়ন ব্যর্থ।

হিন্দী চিত্র "কাবুলিওয়ালা" ব্যর্থ, কী সার্থক—এই বিচারের অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কল্পনা রুক্ষমরু-তনয় বিকটদর্শন বিরাটকায় এক আফগানের বিস্তৃত বক্ষপটের অন্তরালে একটি কোমল পিতৃহৃদয় আবিষ্কার করেছিল। শ্যামল, সুজলা বাংলার গৃহপ্রাঙ্গণে এই স্নেহময় হৃদয় বাঁধা পড়ল বাঙালী মেয়ে মিনির কাছে। দুই বিপরীত পরিবেশের দুটি হৃদয়। এদের বন্ধন ও বিচ্ছেদের মধ্যে জীবনের স্পর্শ আছে, দেশ-কাল-নিরপেক্ষ মানবিকতার সুর আছে, বাস্তবের সম্মতি আছে। তা যদি না থাকত তবে আফগানের অপত্যপ্রেম ও মিনির অন্তরের সাড়া রসিক-হৃদয়কে আলোড়িত করত না। কালের ব্যবধানে দুটি হৃদয়ের ছাড়াছাড়ি রসিক-মনকে উতলা করে তুলত না।

গল্পটি যে এই শিল্পসিদ্ধি লাভ করেছে তার কারণ এর কোন অংশেই স্থূল ভাবালুতার প্রলেপ নেই। এতে বেদনা

তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে রচিত চিত্রপ্রযোজকের ছবি "বিপাশা"-র নায়িকার রূপসজ্জায় সুচিত্রা সেন

আছে, বিচ্ছেদের শোকোচ্ছ্বাস নেই। স্নেহ-বুভুক্ষু কাবুলীর চরিত্রের মধ্যে মানবতার স্বভাব-সুন্দর রূপটি আছে, অতিমানবতার অস্বাভাবিকতা নেই। সুখ ও দুঃখ এই গল্পে অনুচ্চার অনুভূতিতে প্রকাশময়, সোচ্চারে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের এই সূক্ষ্ম শিল্প-রূপ ও ব্যঞ্জনা ছবিটিতে অনুপস্থিত। শিল্পরসিক যাঁরা, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গল্পের মর্মসঞ্চারী ভাবরসটি ছবির বহুবিস্তৃত চিত্রনাট্যের অনাবশ্যক ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে খুঁজে পাবেন না।

রসাধিক্যের প্রয়োজনেই ছবিতে ঘটনার বাহুল্য স্থান পেয়েছে। মিনি কাবুলি-ওয়ালার বিরহে ঘর থেকে বেরিয়ে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে নিউমোনিয়ায় ভুগেছে। মিনিকে চুরি করার মিথ্যা অপরাধে কাবুলি-ওয়ালা মার খেয়েছে, দিনের পর দিন মিনির

জন্য নামাজ পড়েছে। কাবুলিওয়ালা জেলে যাওয়ার পর মিনি স্বপ্নে বেশ কিছুক্ষণের জন্য তাকে ফিরে পেয়েছে, তার সঙ্গে নেচেছে, গান করেছে। বিয়ের কনে মিনিও কাবুলিওয়ালার দুঃখে কেঁদেছে এবং তার দুঃখমোচনের জন্য পিতাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সর্বোপরি এ ছবিতে কাবুলিওয়ালা সাধারণ মানুষ নয়, অতিমানুষ।

জন্মভূমিতে কাবুলিওয়ালার সংসার-যাপনের রূপটিও ছবিতে দেখানো হয়েছে। কাবুলিওয়ালার কন্যা আমিনাকে ঘিরে পিতা-পুত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখের ঘটনাও ছবিতে সংযোজিত। তা বাদে কলকাতায় কাবুলিদের সমাজ, অবসরবিনোদনের জন্য তাদের গানবাজনা এবং তাদের সাম্প্রদায়িক সমবেদনা প্রভৃতি নিয়েও ছবিতে একাধিক ঘটনার অবতারণা রয়েছে। তা বাদে হিন্দী ছবির পরিচিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে গানের আধিক্য।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর ভিত্তিতে চিত্রনাট্যের এই ঘটনা-বিস্তার অনাবশ্যক। তবে এইসব ঘটনা পীড়াদায়ক হয়ে ওঠেনি। বরঞ্চ সাধারণ দর্শকদের কাছে উপভোগ্যই হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছবিতে বিদগ্ধজনকে যা নিরাশ করবে তা হল কাবুলিওয়ালা ও মিনির সম্পর্ক নিয়ে "মেলোড্রামা" সৃষ্টির প্রয়াস। রবীন্দ্র-আখ্যানের চিত্ররূপে এই [illegible] প্রবেশাধিকার নেই।

তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই, পরিচালক হেমেন গুপ্ত ছবিটিতে কয়েকটি রস-মুহূর্ত গড়ে তোলার কাজে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এবং প্রয়োগ-কর্মে তাঁর নৈপুণ্যের প্রমাণও ছবির অনেক দৃশ্যগঠনে ও ব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

ছবিতে অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন বলরাজ সাহানি। কাবুলিওয়ালা চরিত্রের কড়িকোমল রূপটি তাঁর অভিনয়ে বিধৃত। কাবুলিওয়ালার বাক্‌রীতি ও আচার-আচরণ তিনি নিখুঁতভাবে দেখাতে পেরেছেন। মিনির ভূমিকায় শিশু-শিল্পী সোনুকে দর্শকরা ভালোবেসে ফেলবেন। মিনির শিশুসুলভ চাঞ্চল্য, কৌতূহল ও স্নেহ-কাতর মনটি সোনুর অভিনয়ে মরমী হয়ে উঠেছে।

মিনির পিতা-মাতার ভূমিকায় যথাক্রমে সজ্জন ও উষা কিরণের অভিনয় মনোজ্ঞ। তাদের গৃহভৃত্যের রূপসজ্জায় অসিত সেনও সুষ্ঠু অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে পল মহেন্দ্র, সরিতা দেবী, লক্ষ্মী, জয়শ্রী, পদ্মা, লীলা, আগা প্রভৃতির অভিনয় যথাযোগ্য।

সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী ছবির বিভিন্ন মুহূর্তের আবহ-সুর রচনায় কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গানের সুরারোপেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তবে একটি লোকসংগীতের সুররচনায় তিনি তাঁরই দেওয়া একটি বাংলা ছবির গানের সুর হুবহু নকল করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উন্নত। আলোকচিত্রশিল্পী কমল বসু এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য। ছবির আঙ্গিক সৌষ্ঠব পরিচ্ছন্ন ও শিল্পবোধের পরিচায়ক।

"শকুন্তলা"র নব রূপায়ন

চিরায়ত সাহিত্যের কণামাত্রও বুঝি সুখভোগ্য। এবং এই কারণেই হয়তো রাজকমল কলামন্দিরের নতুন চিত্রার্ঘ্য "স্ত্রী" রসিকজনকে নিরাশ করবে না।

ভি শান্তারামের এই নতুন ছবিটির আখ্যান-ভিত্তি মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম"। শ্রীশান্তারাম প্রায় দুই দশক আগে "শকুন্তলা" নামে দর্শকদের একটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন। তারও অবলম্বন ছিল কালিদাসের এই অমর সাহিত্য সৃষ্টি।

শ্রীশান্তারামের দুইটি চিত্রোপহারের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ আজকের দিনের নবীন দর্শকরা এ নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে পারেন। প্রবীনরা তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারেন। বিচার ফল যাই হোক, এ কথা অনস্বীকার্য যে "স্ত্রী" আধুনিককালের উন্নত কলাকৌশলের যে আনুকূল্য পেয়েছে, "শকুন্তলা" তা থেকে বঞ্চিত ছিল। তদুপরি চিত্রনির্মাতা "স্ত্রীকে" যুগোপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে অনেকটা বক্তব্যাশ্রয়ী করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

ছবির বক্তব্যটি কী? ছবির নাম "স্ত্রী" হল কেন? শ্রীশান্তারাম এই সত্যটি অনুভব করেছেন যে কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে ভারতীয় নারী তথা "সহধর্মিণী"র শ্রেষ্ঠতম আদর্শটি বিকশিত। ভারতীয় স্ত্রীর রূপ হল : তিনি প্রেয়সী, সতী এবং আদর্শ জননী। শকুন্তলা-চরিত্রে ভারতীয় নারীর এই সব মহত্বই প্রতিফলিত। শ্রীশান্তারামের সর্বাধুনিক ছবি ভারত-ললনার চরিত্র-মাধুর্যটি ফুটিয়ে তোলার সংপ্রয়াসে অনুপ্রাণিত। তাই কালিদাসের শকুন্তলা-উপাখ্যান ছবিটির ভিত্তি। এবং ছবিটির নাম "স্ত্রী"।

কিন্তু কালিদাসের একটি অনুপম চরিত্র-সৃষ্টি শকুন্তলা "স্ত্রী"-তে রূপান্তরিত

পশ্চিমবঙ্গ শিশুচিত্র সোসাইটি প্রযোজিত "ডাকাতের হাতে"-র অন্যতম শিশুশিল্পী পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়
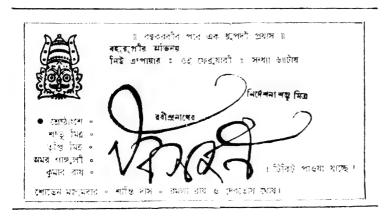
হওয়ার ফলে ছবিতে একটি মহৎ সাহিত্যের রসহানি ঘটেছে কি? বিদগ্ধ ও রসজ্ঞ দর্শকরা এই প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ। এবং তাঁদের উত্তর ছবিটির গৌরব বাড়াবে এমন মনে করবার কারণ নেই।

চিত্রপ্রযোজক-পরিচালক শ্রী শান্তারামের ছবি স্বভাবতই দর্শকমনে আশার সঞ্চার করে। নতুন কিছু দেখবার, অনুভব করবার আশা। কলাকৌশলের বৈভব ও আঙ্গিক গঠনের পারিপাট্যের দিকটা বাদ দিলে, দর্শকের এই আশা ছবিটিতে পূর্ণ হয়নি।

সাধারণ হিন্দী ছবির অতিব্যবহৃত কতক-গুলি উপাদান এই চিত্রে পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান। প্রেম যুগে যুগে কালে কালে নর-নারীর প্রাণে একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে। কিন্তু বিভিন্ন যুগে ও কালে, ভিন্নতর পরিবেশে যে তার বাইরের রূপ বদলায় না তা নয়। এই ছবির দুষ্মন্ত-শকুন্তলা যেন একালেরই এক প্রণয়ী-যুগল। তাদের মান-অভিমান, প্রেমালাপ, বিরহের অভিব্যক্তি, প্রেমোল্লাস, এবং সুখ-দুঃখের মুহূর্তে তাদের গান (বলা বাহুল্য, দুষ্মন্ত ছবিতে সুগায়ক) এই সব কিছুর মধ্যে কালিদাসের প্রাগৈতিহাসিক প্রণয়ী-যুগলকে খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং দুষ্মন্তের বিরহ-দৃশ্যটি নিয়ে ছবিতে গড়ে উঠেছে স্থূল আবেগের মেলোড্রামা।

চিত্রকাহিনী কালিদাসের কাহিনী "অবলম্বনে" গঠিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই চিত্রনির্মাতা শ্রীশান্তারাম বহুলাংশে মূল কাহিনী থেকে "বিচ্যুতি"র সুযোগ নিয়েছেন। "বিচ্যুতি"র অংশে ছবির রস-আবেদন মোটেই বাড়েনি। বরঞ্চ দর্শকরা নতুন করে হিন্দী ছবির কতকগুলি অতিপরিচিত উপকরণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। এই উপকরণরাজির মধ্যে প্রধান হল: পাহাড়ের গুহায় হিংস্র সিংহ-সমাজের মধ্যে শকুন্তলার "অলৌকিক" আশ্রয় গ্রহণ এবং সেখানেই নিরাপদে আত্মজ ভরতের জন্ম দান। এবং মাতুল সদৃশ সিংহদলের সমাজে লালিত শিশু ভরতের অসম সাহস ও অস্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা নিয়ে ছবিতে যে চমকপ্রদ ঘটনাবলী সংযোজিত তাও বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অলৌকিকের উপাদান কালিদাসের কাহিনীতেও আছে। কিন্তু এই উপাদান মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্বন্ধ নির্মাণের দুর্বোধ্য বিধানকে ব্যক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে এমন নিপুণভাবে সন্নিবেশিত যা সাহিত্যশিল্পের রসকে ক্ষুণ্ণ করে না। ছবিতে অলৌকিকের উপাদান যেন "স্টান্ট" হিসাবেই প্রযুক্ত। লক্ষ্য: রোমাঞ্চরসের বিস্তার।

আখ্যান-বিন্যাসের এমনি ধরনের আরও ত্রুটির দিক বাদ দিলে ছবিতে আর যা আছে তা সত্যিই দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে। তা হল ছবির নয়নাভিরাম পটভূমি ও পরিবেশ। কণ্বমুনির আশ্রম, আশ্রমবাসী ও আশ্রমপালিত পশুপাখী, বন-পর্বত—এই সব কিছুর দৃশ্যবিন্যাসে প্রাচীনকালের রূপটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। রাজপ্রাসাদ ও রাজকীয় পটভূমিও ছবিতে যথাযোগ্য আড়ম্বর ও প্রামাণিকতার সঙ্গে গঠিত। এক কথায়, বহিরঙ্গ শিল্পশোভা ও কলাকৌশলের কারুকীর্তির উৎকর্ষে ছবিটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। টেকনিকালারে রঞ্জিত ছবিটিতে রঙের বিন্যাস ও ব্যবহার সুষ্ঠু ও সুদৃশ্য।
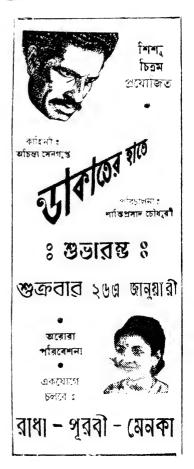
চিত্রকাহিনী সামগ্রিকভাবে দর্শকদের অভিভূত করে রাখতে না পারলেও চিত্র-পরিচালক শ্রীশান্তারাম ছবিতে কয়েকটি আবেগসমৃদ্ধ নাট্যমুহূর্ত রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এবং চিত্রনাট্যের গতি ও পারির্পার্শ্বিকতার প্রতি দর্শকদের কৌতূহল জাগিয়ে রাখার কাজেও তিনি সক্ষম হয়েছেন।

দুষ্মন্ত চরিত্রের রূপদান করেছেন শ্রীশান্তারাম নিজে। চরিত্রটির প্রণয়ী-রূপটি তিনি সুখে ও বিরহে সুন্দরভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। শকুন্তলার রূপসজ্জায় সন্ধ্যাকে কেমন যেন নিষ্প্রভ লাগে। তাঁর অভিনয়-কুশলতা সত্ত্বেও চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারেনি।

ভি শান্তারামের কন্যা রাজশ্রী শান্তারামের অনবদ্য নৃত্যাংশ ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ। দুটি দৃশ্যে তাঁর নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে। ছবির অন্যান্য চরিত্রে যথোচিত অভিনয় করেছেন পদ্মা চাভান, বাবুরাও পেন্ডারকার, ইন্দিরা, বন্দনা ও উমা। শিশু ভরতের ভূমিকায় বাবলুকে সকলেরই ভালো লাগবে।

সংগীত-পরিচালক সি রামচন্দ্র আবহ-সুরবরচনায় ছবির কোন কোন মুহূর্তে সুন্দর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আবার কোন কোন মুহূর্তে কাহিনীর কাল-পরিচর্যাটি বিস্মৃত হয়েছেন। গানের সুরারোপেও (একটি-দুটি বাদে) তিনি আধুনিকতার ঢঙ ও রেশ বর্জন করতে পারেননি। যা এ ছবির ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক।

কলাকৌশলের সর্ববিভাগের কাজ অতি উচ্চাঙ্গের তা আগেই বলা হয়েছে। তার মধ্যে আলোকচিত্র গ্রহণ ও সম্পাদনার উৎকর্ষ দর্শকদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করবে।

অনিতা গুহ সম্প্রতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। গত সপ্তাহে একটি প্রীতি-সম্মেলনে তাঁর কলিকাতার শুভানুধ্যায়ীরা নবদম্পতির দীর্ঘজীবন কামনা করেন

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে দুখানি বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত "বিপাশা" একটি। অপরটি ছোটদের জন্যে তোলা দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ ছবি "ডাকাতের হাতে"।

তারাশঙ্করের "বিপাশা" গল্প সাহিত্যে নিজের আসন করে নিয়েছে। এবার রজত-পটে তার জয়যাত্রা শুরু হল। দর্শকচিত্ত জয়ের আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখেননি এর নির্মাতা চিত্র-প্রযোজক। যে প্রণয়ী-যুগলকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী, তাদের রূপ দিয়েছেন বাংলা ছবির সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা-জুটি সুচিত্রা সেন ও উত্তম-কুমার। আরো যাঁদের নাম ভূমিকালিপির গৌরব বাড়িয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, কেতকী দত্ত, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছবিটির পরিচালনা করেছেন সুখ্যাত অগ্রদূত গোষ্ঠী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরসৃষ্টি করেছেন।

এ দেশে ছোটদের জন্যে ছবি তোলার কোন নিয়মিত প্রচেষ্টা হয়নি বললেই চলে। এই অভাব দূর করবার সাধু সংকল্প নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদেরই প্রথম ছবি "ডাকাতের হাতে"। সোসাইটির পক্ষে ছবিটি তুলেছেন শান্তি চৌধুরীর পরিচালনায় লিটল সিনেমা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী এর আখ্যান অবলম্বন। ছবিটি পুরোপুরি তোলা হয়েছে স্টুডিওর আওতার বাইরে—মাঠে, জঙ্গলে, নদীর ধারে, পোড়ো বাড়ীতে, ভাঙা মন্দিরে এমন সব জায়গায় যার প্রতি-ফলন সচরাচর ছবির পর্দায় দেখা যায় না। পরিচিত কয়েকটি মুখের সঙ্গে অনেক-গুলি নতুন মুখের সমাবেশ করা হয়েছে ভূমিকালিপিতে। নতুনদের মধ্যে আছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, বীথি সেনগুপ্ত, শৈলেন গাঙ্গুলী, অনুরাধা গুহ, রাণু গুপ্ত, শম্ভু ভট্টাচার্য, তরুণ রায়চৌধুরী প্রভৃতি। পরিচিতদের মধ্যে আছেন পল্লব বন্দ্যো-পাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, কালীপদ চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন। ছবি তুলেছেন গোপাল সান্যাল, সুর যুগিয়েছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং গানগুলি গেয়েছেনও তিনি।

• • •

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "অভিযান" সম্পর্কে দুটি চমকপ্রদ খবর আছে। একটি, ওয়াহিদা রেহমান নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন, কারণ তারাশঙ্করের কাহিনীর নায়িকা বাঙালী নয়। অপরটি এ ছবির কয়েকটি দৃশ্য উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকে তোলা হবে। বাংলা ছবির জগতে দুটিই নতুন ব্যাপার।

বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে কিছু বহির্দৃশ্য তুলে পরিচালক রায় সম্প্রতি টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে ছবিটির অন্তর্দৃশ্যের কাজ আরম্ভ করেছেন। ভদ্রবংশের এক বাঙালী ট্যাক্সি-চালক গল্পের প্রধান চরিত্র। এই ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করছেন। "তিন কন্যা"র মত এ ছবিতেও সত্যজিৎবাবু সুর-যোজনা করবেন।

• • •

অগ্রগামী পরিচালক-গোষ্ঠী নিজস্ব প্রযোজনায় এইবার "নিশীথে"র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মূলে কাহিনীর রোমাঞ্চকর পরিবেশ যাতে ছবিতে ঠিকমত বজায় থাকে সেদিকে এঁরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। নায়কের জীবনে এসেছেন দুটি নারী—দুজনেই তাঁর স্ত্রী। একের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন তিনি। প্রথমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বাকী দুজনের

জীবন কীভাবে প্রভাবান্বিত করে তারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছবিটিকে বৈশিষ্ট্য দেবে। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। তাঁর দুই স্ত্রীর ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নবাগতা নন্দিতা বসুকে দেখা যাবে। আর একটি মুখ্য চরিত্রে চিত্রাবতরণ করবেন রাধামোহন ভট্টাচার্য। সুধীন দাশগুপ্তের ওপর সুর-যোজনার ভার দেওয়া হয়েছে।

• • •

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের পৌরাণিক ছবি "তরণীসেন বধ" সমাপ্তপ্রায়। রামায়ণী যুগের বৈভব ও পরিবেশ এই ছবিতে যথাযথভাবে পরিবেশন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তরণীসেনের ভূমিকায় শ্রীমান তিলকের অন্তরস্পর্শী অভিনয় এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ হবে বলে প্রকাশ। অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যারাণী, সুনন্দা দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস প্রবীরকুমার, শ্যামল বসু এবং নবাগত ইন্দ্রাণী। চিত্রসারথী ছদ্মনামে একদল কলাকুশলী এর পরিচালক।

অ্যালায়েড প্রোডাকশন্সের প্রথম নিবেদন "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা"র চিত্রগ্রহণও শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বীরভূমে ছবিটির সমস্ত বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করে পরিচালক তপন সিংহ সদলবলে ফিরে এসেছেন। স্টুডিওতে আর কয়েকটি অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করলেই ছবিটি পুরোপুরি শেষ হবে। তারাশঙ্করের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাসের এই চিত্ররূপ চিত্রামোদীদের নূতন রসের সন্ধান দেবে বলে মনে হয়।

শুভ সূচনা

ওয়েস্ট বেঙ্গল চিল্ড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির হয়ে নিউ সিনেমা "ডাকাতের হাতে" নামে একটি সুন্দর ছবি দর্শকদের উপহার দিলেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী তথা বইয়ের নামও "ডাকাতের হাতে" এই ছবির আখ্যানভিত্তি। কাহিনীটির মধ্যে এমন একটি জাদু আছে যা অপ্রাপ্ত এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয় শ্রেণীর দর্শককেই আনন্দ দেবে। চিত্রপরিচালক শান্তি চৌধুরী আখ্যানবস্তুর নিগূঢ় জাদুমন্ত্রটি ছবিতে স্বচ্ছন্দে ও সহজেই প্রয়োগ করেছেন। ফলে ছবিটি বয়স-নিরপেক্ষে সর্বজন-উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এক বিত্তবান ঘরের দুই শিশু—ভাই-বোন—ডাকাতের হাতে পড়ে নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার ভেতর দিয়ে কীভাবে আবার উদ্ধার পেল সেটা গল্পের বাইরের কথা। অন্তরের কথাটি মধুর, মহৎ। শিশুমন জয় করল নিষ্ঠুর ডাকাত-সর্দারের হৃদয়। শিশুমনের শুচিতা ও সরলতার কাছে সুখের পরাজয় বরণ করে নিল ডাকাতের নৃশংসতা। ডাকাত-সর্দারই ভাই-বোনকে ফিরিয়ে দিতে এল তাদের বাড়িতে। তারপর পুলিস যখন ধরে নিয়ে গেল ডাকাতকে, তখন দুই শিশুর চোখে জল।

ছবিটি দর্শকদের একটি মহৎ অনুভূতির অংশীদার করে তোলে। মানবতার অনুভূতি। এমন মানবতা যা পবিত্রতার স্পর্শ পেয়ে পাপের পঙ্ক থেকে পঙ্কজের মত ফুটে ওঠে। পরিচালক শান্তি চৌধুরী কাহিনীর মর্মবাণীটি রূপ-রসের ভেতর দিয়ে চিত্তগ্রাহী করে তুলেছেন।

ছবির বিভিন্ন দৃশ্যগ্রহণে পরিচালকের রসবোধ ও কল্পনাশক্তি অকুণ্ঠ প্রশংসার

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিশুশিল্পী পূর্ণিমা হালদার নবগ্রাম (কোন্নগর) মহাদেশ পরিষদের রবীন্দ্র ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে "ঝর বায়ু, বয় বেগে" সংগীত সহযোগে একক নৃত্য প্রদর্শন করে সকলকে চমৎকৃত করে

দাবি রাখে। সম্পূর্ণরূপে স্টুডিয়োর বাইরে খোলা মাঠ-প্রান্তর-পোড়োবাড়ি ও নানা বহির্দৃশ্য ছবিটিকে এক অনবদ্য বহিরঙ্গ শিল্পশোভনতায় মণ্ডিত করে তুলেছে।

কাহিনী-বিন্যাসেও পরিচালক ছবির একাধিক দৃশ্যে নাট্য-কৌতূহল সঞ্চারের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এবং দুটি শিশুর অসহায়তাকে কেন্দ্র করে আবেগমধুর মুহূর্ত রচনায়ও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

ছবির ঘটনা-বিন্যাসে কোন ত্রুটি বা বৈসাদৃশ্য যে নেই তা নয়। ডাকাতির দৃশ্যটি ছবিতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বিন্যস্ত নয়। গাজনের গানের শ্রোতা হিসাবে গ্রামের লোক কাউকে দেখা যায়নি এবং গানের দলরূপী ডাকাত-দল বিনা বাধায় একটি বাড়ি থেকে দুটি শিশুকে অপহরণ করে প্রকাশ্য দিবালোকে স্বচ্ছন্দে চলে গেল —এটা অবিশ্বাস্য। ডাকাতের কবল থেকে

মিনার ০ বিজলী ০ ছবিঘর

মৃণালিনী (দমদম) — পদ্মশ্রী (যাদবপুর) — সুচিত্রা (বেহালা)
জয়শ্রী (বরানগর) — যোগমায়া (হাওড়া) — উদয়ন (শেওড়াফুলি)
মায়াপুরী (শিবপুর) — শ্রীকৃষ্ণ (বালী) — শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া)
মীনা (পাণিহাটি) — রূপালী (চুঁচুড়া) — জ্যোতি (চন্দননগর)
কল্যাণী (নৈহাটি) — রূপমহল (বর্ধমান)

ও সহরতলীর আরও কয়েকটি চিত্রগৃহে

দুই শিশুর পলায়নের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে ছবিতে শিশুসুলভ "অ্যাডভেঞ্চার" সৃষ্টির আরও অবকাশ ছিল। ছবির অন্যতম ত্রুটি এর গতির মন্থরতা। কিন্তু এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি অনায়াসে ঢেকে দেয় ছবির সামগ্রিক শিল্পগুণ ও কাহিনীর আবেদন।

ছবির দুটি শিশুচরিত্রে পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রিতা সেনগুপ্তের অভিনয় মর্মস্পর্শী। শিশু শিল্পী দুজনের অভিনয় ও অভিব্যক্তি দর্শকমনে মায়ার সৃষ্টি করে। বিশেষত রিতা সেনগুপ্ত তার অত্যাশ্চর্য অভিনয় ও বাচনভঙ্গিতে দর্শকমন জয় করে নেয়।

ডাকাত-সর্দারের ভূমিকায় শেখর চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় মর্মগ্রাহী। কঠোরতা ও কোমলতা—চরিত্রটির এই দুই বিপরীত-ধর্মী রূপ শ্রীচট্টোপাধ্যায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিশুদের দুই অভিভাবকের চরিত্রে শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু চৌধুরীর অভিনয় বেশ স্বচ্ছন্দ। দুজনকার স্ত্রীর ভূমিকা দুটিতে যথাক্রমে অনুরোধা গুহ ও রাণু গুপ্ত সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির দুটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন কালীপদ চক্রবর্তী ও গোবিন্দ চক্রবর্তী। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য মহাদেব বসু, গোপেন মুখোপাধ্যায়, বীরেন দাশগুপ্ত ও ভবতোষ মুখোপাধ্যায়।

সংগীত পরিচালনায় নির্মলেন্দু চৌধুরী দর্শকের সাধুবাদ পাবেন। ছবির বিভিন্ন ভাবমুহূর্তের আবহ-সুর রচনায় সুরকার রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। লোক-সংগীতের সুরারোপ মনমাতানো। গানগুলি শ্রীচৌধুরীর কণ্ঠদানে সুখশ্রাব্য।

ছবির কলাকৌশলের কাজ সুষ্ঠু। গোপাল সান্যালের আলোকচিত্র গ্রহণ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

নাট্যাভিনয়

রঙমহলের পুনরুদ্বোধন

রঙমহলে নিয়মিত অভিনয় চালু রাখবার দাবিতে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিল্পী ও কর্মীদের অবস্থান সত্যাগ্রহ জয়যুক্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যস্থতায় থিয়েটারের মালিকদের সঙ্গে সত্যাগ্রহী শিল্পী ও কর্মীদের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার প্রধান শর্ত এই যে, অভিনয় বন্ধ থাকবে না, আগের মতই প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে রঙমহলের নিজস্ব অভিনয়ের আসর বসবে, ফলে কর্মীদেরও বেকারত্ব বরণ করতে হবে না।

'নাইন আওয়ার্স টু রাম' চিত্রে মহাত্মা গান্ধী চরিত্রের অভিনেতা জে এস কাশ্যপ। বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে সান্তাক্রুজ বিমানঘাটিতে গৃহীত ফটো

নতুন ব্যবস্থায় শিল্পী ও কর্মীদের হাতে থিয়েটার পরিচালনার মূল দায়িত্ব এসে পড়েছে। এর জন্যে কিছুটা আর্থিক ঝুঁকিও তাঁদের নিতে হয়েছে। নাট্যামোদী সুধীজনের সাহায্য ও সহযোগিতায় এই নবলব্ধ দায়িত্ব শিল্পী ও কর্মীরা সুষ্ঠুভাবেই পালন করতে পারবেন বলে আমরা আশা করি।

গত শনিবার (২০শে জানুয়ারী) একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিল্পী ও কর্মীদের পরিচালনায় রঙমহলের নতুন করে যাত্রারম্ভ হল। শিল্পীদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী সরযূবালা ও শ্রীজহর রায় তাঁদের সকলকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানালেন যাঁদের অকৃপণ সাহায্যে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শুভ সমাপ্তি ঘটেছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী রঙমহলের শিল্পী ও কর্মীদের যুক্ত সত্যাগ্রহ ও তার শুভ পরিণতিকে পৃথিবীর নাট্যশালার ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা বলে অভিহিত করলেন। তিনি বললেন যে, লণ্ডনের সুপ্রাচীন সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারটি ভেঙে যখন সেখানে বসতবাড়ী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন তার প্রতিবাদে প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ভিভিয়েন লে-র নেতৃত্বে এমনিধারা একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু তা সাফল্যলাভ করেনি। পুলিস দৈহিক বল প্রয়োগ করে বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং থিয়েটার গৃহটি পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীচৌধুরী বললেন, যে ঐক্যবদ্ধতা রঙমহলের শিল্পী-কর্মীগোষ্ঠীকে জয়যুক্ত করেছে তা যেন ভবিষ্যতেও অটুট থাকে।

সেদিনকার অনুষ্ঠানে আরো যাঁরা শিল্পী ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নাট্যকার শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়, সুলেখক শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ), বিশ্বরূপার শ্রীরাসবিহারী সরকার, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি।

মঙ্গল অনুষ্ঠানের পর "চক্র" নাটক দিয়ে নিয়মিত অভিনয়ের আসর নতুন করে শুরু করা হল। গত ৩১শে ডিসেম্বর এই নাটকটির অভিনয় শেষে নিয়মিত অভিনয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল তা পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে।

রঙমহলের নতুন পরিচালকগোষ্ঠী শীঘ্রই নতুন নাটক নাট্যামোদীদের উপহার দেবেন বলে জানিয়েছেন। তার সঙ্গে কয়েকটি জনপ্রিয় পুরোনো নাটকের সম্মিলিত অভিনয় করবার সংকল্পও তাঁদের আছে।

বিবিধ সংবাদ

গত ১৮ই জানুয়ারী থেকে রাজ্য সরকার সিনেমার সকল শ্রেণীর প্রবেশপত্রের ওপর বর্ধিত হারে প্রমোদ কর ধার্য করেছেন। নতুন হার অনুসারে ২০ থেকে ৫০ নয়া পয়সার টিকিটের ওপর শতকরা ২৫ ভাগ, তদূর্ধ্বে এক টাকা পর্যন্ত শতকরা ৪০ ভাগ, তদূর্ধ্বে তিন টাকা পর্যন্ত শতকরা ৭৫ ভাগ, এবং তিন টাকার ওপর শতকরা ১০০ ভাগ করের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে। প্রমোদ কর বৃদ্ধির ফলে কলকাতার অধিকাংশ চিত্রগৃহের দর্শক সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে—বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেল।

একলব্য

ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম আয়োজিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার **খেলা** আমেদাবাদে সম্প্রতি শেষ হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য লীগ প্রথার খেলায় ১০টি দেশের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতই পেয়েছে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের গৌরব। শুধু চ্যাম্পিয়নশিপই নয়, অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ। আরও বড় কথা, ৯টি খেলার মধ্যে ভারত একটিও পয়েণ্ট হারায়নি, ৫১টি গোল করেছে, কিন্তু বিরুদ্ধে **একটিও** গোল হয়নি। এই ফলাফল আন্তর্জাতিক হকিতে ভারতের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের আর এক পরিচয় সন্দেহ নেই।

তবু মনের কোণে একটুখানি কিন্তু থেকে গেছে। অলিম্পিক বিজয়ী পাকিস্তান এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। রোম অলিম্পিকে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পর পাকিস্তান বিশ্বের এক নম্বর হকি দল হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের দেশে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক হকির আয়োজন। বিশ্বের আর নয়টি দেশ খেলায় যোগ দিল। আর আমাদেরই প্রতিবেশী এবং ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। এ যেন বড় ভাইয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে ছোট ভাইয়ের অভিমান করে বসে থাকা।

বলা বাহুল্য, পাকিস্তান না আসাতে প্রতিযোগিতার মাধুর্য ও আকর্ষণ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানের। প্রথমত বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াধারার সঙ্গে তারা ওয়াকিবহাল হবার একটা মস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিশ্ববাসী জেনে গেছে বর্তমানে পাকিস্তান হকি দল ভারতের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অনিচ্ছুক। রোম অলিম্পিকে যে গৌরব তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে তাকে কোনভাবে ম্লান করতে তারা নারাজ। যদি ভারতের কাছে পরাজয় স্বীকার করে তবে পাকিস্তানকে আর কেউ বিশ্ব শ্রেষ্ঠের সম্মান দেবে না এই ভয়ই পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক হকি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে একথা যদি কেউ মনে করে তবে তার উত্তরে পাকিস্তানের কি বলবার আছে? অবশ্য আন্তর্জাতিক হকিতে যোগদান সম্পর্কে পাকিস্তানের অন্য অসুবিধা থাকলে পৃথক কথা। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করাও অনেকটা পরাজয়ের সামিল, কিছুটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। বিশ্ব হকির শক্তিশালী আর দু' একটি দেশও যোগদান করেনি। যেমন স্পেন, গ্রেট ব্রিটেন। কিন্তু স্পেন, গ্রেটব্রিটেনের যোগদান না করা আর আমাদের প্রতিবাসী এবং বিশ্বশ্রেষ্ঠ পাকিস্তানের যোগদান না করা এক কথা নয়।

যাক সে কথা। আন্তর্জাতিক হকিতে জার্মানী দ্বিতীয় এবং অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। হল্যান্ড পেয়েছে চতুর্থ স্থান। এরপর পর্যায়ক্রমে স্থান পেয়েছে মালয়, নিউজিল্যান্ড, জাপান, বেলজিয়াম, ইউনাইটেড আরব ও ইন্দোনেশিয়া।

আন্তর্জাতিক হকি খেলা আরম্ভের সময় আবহাওয়া ছিল নির্মল। প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক। সহসা রাজনৈতিক আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ অধিকৃত পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে আরম্ভ হল হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে মন কসাকসি। তারই ছায়া এসে পড়ল হকির উপর। ইন্দোনেশিয়া হল্যান্ডের সঙ্গে খেলতে অসম্মত হল। ফলে খেলার দিন ভারতের দ্বিতীয় টিম হল্যান্ডের সঙ্গে এক প্রদর্শনী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল।

রাজনৈতিক কারণে ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকার এটি নতুন ঘটনা নয়। তবুও খেলাধুলার [illegible] নীতি তার সখাসূত্রের সঙ্গে এটা [illegible] না।

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ভারত এ খেলায় একই খেলোয়াড়ে [illegible] দল না গড়ে নতুন নতুন খেলোয়াড়দের [illegible] সুযোগ দিয়ে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। পূর্বতন লেফট আউট [illegible] সিংয়ের সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে আবিষ্কার ভারতের সবচেয়ে বড় লাভ। দর্শন সিং দুইবার হ্যাটট্রিক করবার কৃতিত্ব সমেত একা ২০টি গোল করেছেন। [illegible] সুযোগসন্ধানী খেলোয়াড়ের অভাবে অলিম্পিকে ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। [illegible] সিংয়ের [illegible] সে অভাব অনেকখানি পূরণ হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া লেফট [illegible] সিং, রাইট ইন গুরুদেব সিং, সেণ্টার ফরোয়ার্ড চরঞ্জিত সিং ও বাঙলার [illegible] খুবই ভাল খেলেছেন। ব্যাক পৃথিপাল সর্ট কর্নার থেকেই করেছেন ৯টি গোল।

মালয়ের সেণ্টার ফরোয়ার্ড [illegible], জার্মানীর রাইট ইন স্কুলার ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড কেলার, অস্ট্রেলিয়ার সেণ্টার ফরোয়ার্ড ই পি পিয়ার্স এবং জাপানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কানবের খেলায় উন্নত হকি নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মালয় হকিতে অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ভারতের কয়েকজন কোচের কাছ থেকে তারা খেলা শিখেছে, দলেও আছেন কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড়। একাধিক খেলায় মালয় উন্নত হকি নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। নীচে আন্তর্জাতিক হকির চূড়ান্ত লীগ টেবল ও খেলার ফলাফল দেওয়া হল:—

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী। কলকাতার সাউথ ক্লাবে ফাইন্যাল খেলায় মাদ্রাজ [illegible] খেলায় উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে

	খেঃ	জঃ	ড্র	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ভারত	৯	৯	০	০	৫১	০	১৮
জার্মানী	৯	৬	২	১	৩০	৩	১৪
অস্ট্রেলিয়া	৯	৬	১	২	৩০	৯	১৩
হল্যাণ্ড	৯	৫	২	২	১২	১৫	১২
মালয়	৯	৩	৩	৩	১৪	১২	৯
নিউজিল্যাণ্ড	৯	২	৪	৩	১৬	৯	৮
জাপান	৯	৩	২	৪	১০	১৮	৮
বেলজিয়াম	৯	৩	০	৬	১১	১৮	৬
ইউ এ আর	৯	০	১	৮	৪	৪২	১
ইন্দোনেশিয়া	৯	০	১	৮	২	৫৪	১

খেলার ফলাফল:—

ভারত—ভারত ১১—০ গোলে জাপানকে, ১১—০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে, ৩—০ গোলে মালয়কে, ৯—০ গোলে হল্যাণ্ডকে, ৪—০ গোলে নিউজিল্যাণ্ডকে, ৫—০ গোলে ইউনাইটেড আরবকে, ৩—০ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে, ৪—০ গোলে বেলজিয়ামকে ও ১—০ গোলে জার্মানীকে পরাজিত করে।

জার্মানী—জার্মানী নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ১—১ গোলে ও হল্যাণ্ডের সঙ্গে ০—০ গোলে খেলা শেষ করে; পরাজিত করে মালয়কে ৪—১ গোলে, ইন্দোনেশিয়াকে ১০—০ গোলে, জাপানকে ১—০ গোলে, ইউনাইটেড আরবকে ৭—০ গোলে, বেলজিয়ামকে ৪—০ গোলে, অস্ট্রেলিয়াকে ৩—০ গোলে; পরাজিত হয় ভারতের কাছে ০—১ গোলে।

অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়া হল্যাণ্ডকে ৩—১ গোলে, ইউনাইটেড আরবকে ৬—০ গোলে, নিউজিল্যাণ্ডকে ১—০ গোলে, ইন্দোনেশিয়াকে ১৫—০ গোলে, বেলজিয়ামকে ২—১ গোলে, জাপানকে ২—০ গোলে পরাজিত করে; মালয়ের সঙ্গে ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হয়; পরাজয় স্বীকার করে ভারতের কাছে ০—৩ গোলে ও জার্মানীর কাছে ০—৩ গোলে।

হল্যাণ্ড—হল্যাণ্ড বেলজিয়ামকে ২—১ গোলে, ইউনাইটেড আরবকে ৩—০ গোলে, জাপানকে ২—১ গোলে, মালয়কে ২—০ গোলে পরাজিত করে; ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ওয়াক ওভার পায়, নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ১—১ গোলে এবং জার্মানীর সঙ্গে ০—০ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে, আর অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১—৩ গোলে ও ভারতের কাছে ০—৯ গোলে পরাজিত হয়।

মালয়—মালয় ইন্দোনেশিয়াকে ৪—০ গোলে, বেলজিয়ামকে ২—০ গোলে, ইউনাইটেড আরবকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে; অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ০—০ গোলে, জাপানের সঙ্গে ১—১ গোলে ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ০—০ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হয়; পরাজয় স্বীকার করে জার্মানীর কাছে ১—৭ গোলে, ভারতের কাছে ০—৩ গোলে ও হল্যাণ্ডের কাছে ০—২ গোলে।

নিউজিল্যাণ্ড—নিউজিল্যাণ্ড পরাজিত করে ইউনাইটেড আরবকে ৭—০ ও ইন্দোনেশিয়াকে ৬—০ গোলে; অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে জার্মানীর সঙ্গে ১—১, জাপানের সঙ্গে ১—১, মালয়ের সঙ্গে ০—০ ও হল্যাণ্ডের সঙ্গে ০—০ গোলে; পরাজিত হয় বেলজিয়ামের কাছে ০—১, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০—২ ও ভারতের কাছে ০—৪ গোলে।

জাপান—জাপান ইন্দোনেশিয়াকে ৪—০ গোলে, বেলজিয়ামকে ১—০ গোলে ও ইউনাইটেড আরবকে ২—০ গোলে পরাজিত করে; নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ১—১ ও মালয়ের সঙ্গে ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হয়; পরাজিত হয় ভারতের

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী ইংলণ্ড দলের উইকেট কিপার জন মারে অসুস্থ হয়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন। রিচমণ্ড রয়াল হাসপাতালে তাঁকে নার্সের কাছ থেকে কফি গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন দিনে মার্চ পাস্টে প্রতিযোগীদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন বি ও এর সভাপতি এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার

কাছে ০—১১, জার্মানীর কাছে ০—১, হল্যান্ডের কাছে ১—২ ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০—২ গোলে।

বেলজিয়াম—বেলজিয়াম পরাজিত করে ইউনাইটেড আরবকে ৫—২ গোলে, নিউজিল্যান্ডকে ১—০ গোলে ও ইন্দোনেশিয়াকে ৩—১ গোলে; পরাজিত হয় মালয়ের কাছে ০—২, জার্মানীর কাছে ০—৪, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১—২, জাপানের কাছে ০—১ ও ভারতের কাছে ০—৪ গোলে।

ইউনাইটেড আরব—ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক কোন খেলায় জিততে পারে না। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে একটি পয়েণ্ট পায়, আর পরাজিত হয় বেলজিয়ামের কাছে ২—৫, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০—৬, হল্যান্ডের কাছে ০—৪, জার্মানীর কাছে ০—৭, নিউজিল্যান্ডের কাছে ০—৭, ভারতের কাছে ০—৫, মালয়ের কাছে ১—৫ ও জাপানের কাছে ০—২ গোলে।

ইন্দোনেশিয়া—ইউনাইটেড আরবের মত ইন্দোনেশিয়াও কোন খেলায় জিততে পারেনি। ইউনাইটেড আরবের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে মাত্র একটি পয়েণ্ট পেয়েছে, পরাজিত হয়েছে মালয়ের কাছে ০—৪ গোলে, ভারতের কাছে ০—১১ গোলে, জার্মানীর কাছে ০—১০ গোলে, জাপানের কাছে ০—৪ গোলে, বেলজিয়ামের কাছে ১—৩ গোলে, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০—১৫ গোলে, নিউজিল্যান্ডের কাছে ০—৬ গোলে, স্ক্র্যাচড হয়েছে হল্যান্ডের সঙ্গে না খেলার ফলে।

• •

ইংলন্ডের বিরুদ্ধে 'রাবার লাভ' করায় সারা ক্রিকেট বিশ্বেই আজ ভারতীয় ক্রিকেটের প্রশস্তি আরম্ভ হয়েছে। বিলেতের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং ক্রিকেট সমালোচক ভারতের তারুণ্য শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ক্রিকেটের অপর দুই অগ্রণী দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাগজেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যের সুখ্যাতি করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে।

কেউ বলেছেন ভারতের এ জয় যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার লাভ। কেউ বলেছেন—ব্যাট, বল, ফিল্ডিং সর্ববিষয়ে ভারত প্রতিপক্ষের উপর পর্যাপ্ত প্রাধান্য বিস্তার করে বিজয়ী হয়েছে, কেউ বলেছেন এই জয়ের ফলে একদিকে ভারত যেমন ক্রিকেটের প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছে, অন্যদিকে তেমন ক্রিকেট ক্ষেত্রে ইংলন্ডের সম্মানহানি ঘটেছে। কেউ আশা করেছেন ভারত ইংলন্ডের সঙ্গে যেভাবে খেলেছে এভাবে খেলতে পারলে তাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটপ্রিয় অধিবাসী ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দিকে আগ্রহ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে। 'সিডনী হেরাল্ড' পত্রিকা বলেছে—"ভারতের কাছে পরাজিত ইংলন্ড দলকে ইংলন্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী দল বলা যায় না; কারণ পিটার মে, কলিন কাউড্রে, ট্রুম্যান ও স্ট্যাথাম অনুপস্থিত।"

শুধু সিডনী হেরাল্ড নয় ইংলন্ড দলের শক্তি সম্পর্কে আরও অনেকে এই ধারণার বশবর্তী।

কিন্তু এ কথার উত্তর দিয়েছেন এম সি সির প্রেসিডেন্ট স্বয়ং স্যার উইলিয়াম উরসলে। তিনি বলেছেন—এটাই সম্ভবত ইংলন্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী টীম। সম্ভবত কথার অর্থ, এর চেয়ে শক্তিশালী টীম বর্তমান অবস্থায় ইংলন্ডের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয় স্যার উইলিয়াম ভারতীয় ক্রিকেটের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন ক্রিকেটের কুলীনদের মত এর পর ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে ভারতেরও ২টি ভোট থাকা প্রয়োজন। ভারত সে অধিকার পাবে কি না জানি না। তবে এম সি সির সভাপতির সমর্থনের যে যথেষ্ট নৈতিক মূল্য আছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

ইংলন্ডের ভারত সফর শেষ হয়েছে। ইংলন্ডের খেলা সম্পর্কে তাদের নিজের দেশের কাগজে বিরুদ্ধ সমালোচনা কম হয়নি। কিন্তু ইংলন্ডের পরাজয়ের মূলে যে কিছুটা দুর্ভাগ্য জড়িত আছে সে কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। প্রথমতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের নতুন আবহাওয়ায় ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের যেভাবে খেলতে হচ্ছে সেভাবে তারা অভ্যস্ত নয়। দ্বিতীয়ত ঢাকা টেস্ট নিয়ে ইংলন্ডকে পর পর ৭টি টেস্টের মধ্যে ৬টি টেস্টে টসে হারতে হয়েছে। ভাগ্যের খেলার এই পরাজয়ের মধ্যেই দুর্ভাগ্যের চিহ্ন বর্তমান। তৃতীয়ত যে দুটি টেস্ট ইংলন্ড ভারতের কাছে হার স্বীকার করেছে সে দুটি টেস্টে তাদের পরম নির্ভরযোগ্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান পুলার অসুস্থ থাকায় খেলতে পারেননি।

তবু বলবো ভারতের 'রাবার' লাভ খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই সিরিজে ইংলন্ডের সঙ্গে ভারত যেমন জয়লাভের আগ্রহ নিয়ে আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলেছে এর আগে এর চেয়ে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধেও তেমন খেলতে পারেনি।

মুকুল

জয়া ভট্টাচার্য

খেলা-পাগল বাবার খেলা-পাগল মেয়ে।

বাবা তারকনাথ ভট্টাচার্য যৌবনে হকি ও ক্রিকেট খেলেছেন ঢাকা উয়াড়ী ক্লাবে। ছিন্নমূল জীবন। দেশ বিভাগের ফলে ঢাকা ছেড়ে চলে এসে নতুন করে আস্তানা বেঁধেছেন সোদপুরে। কিন্তু মাথা গুজবার আস্তানার সংগে খেলাধুলোরও তো একটা আস্তানা চাই। তাই নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাবের সংগে। কাজের জোয়াল কাঁধে করা মানুষ। নিউ সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংএ ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে চাকরি। ডিউটির ঠিক ঠিকানা নেই। কখনো সকালে, কখনো দুপুরে, কখনো রাত্রে। কিন্তু খেলাধুলোর প্রয়োজনে ওতেই বুঝি ওঁর সুবিধা। আসা-যাওয়ার ফাঁকে ক্লাব ঘুরে আসা যায়। প্রয়োজন মত মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান। খাওয়া-নাওয়ার খেয়াল থাকে না। খেলা-ধুলোই তাঁর জীবনের বড় নেশা।

মেয়ে জয়া ভট্টাচার্য পাঁচ বছর আগে ইণ্টার স্কুল স্পোর্টসের জন্য গিয়েছিল পানিহাটি স্পোর্টিং মাঠে। প্রথম দর্শনের ভালবাসার মত সেই যে তার চোখে সবুজের ছোঁয়াচ লাগল এখন তার ধ্যানেই মগ্ন। সত্যিই ওর ধ্যান জ্ঞান পানিহাটি স্পোর্টিং। সোদপুর থেকে পানিহাটি স্পোর্টিং মাঠ পর্যন্ত রাস্তার দুধারের সবাই জানে জয়া আর তার বাবাকে। কখনো হাঁটা পায়ে, কখনো সাইকেলে তাদের গতায়াত।

খেলাধুলোয় বাঙলার প্রথম সারির মেয়ে-দের মধ্যে জয়াকে এখন দাঁড় করালে একটু বে-মানান ঠেকবে। কারণ সীমার মাঝেই তার লীলার সূচনা। সীমার বাইরে এখনো নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি। তবু একটি দিক দিয়ে ওর গর্বের কারণ আছে। সেটি হচ্ছে ইণ্টার ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে জয়াই একমাত্র মেয়ে যে প্রথম বাঙালী হিসাবে তিরুপাটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। পুরস্কার নাই বা হাতে এলো, প্রতিনিধিত্বের গৌরবই কি কম?

জয়ার নিজের ভাষায় এটা তার জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত আশা। যেদিন খবরের কাগজে সিলেকশান ট্রায়ালের রেজাণ্ট বেরুল এবং জয়া তার নিজের নাম চোখে দেখল সেদিনের মত এত আনন্দ নাকি জীবনে কমই পেয়েছে।

কাগজে তার নাম বেরিয়েছে বহুবার। প্রথম হয়েছে, চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব হাতে এসেছে রেকর্ডও কিছু কিছু না করেছে, এমন নয়। কিন্তু স্পোর্টসে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব তার অ্যাথলেটিক জীবনের বড় ঘটনা।

জয়ার অ্যাথলেটিকসের শিক্ষাগুরু পানি-হাটি স্পোর্টিংয়ের গৌরীপ্রসাদ রায়। অনু-প্রেরণা পিতা তারকনাথ ভট্টাচার্য। গুরু গৌরীপ্রসাদ অ্যাথলেটিকসের ট্রাক সাট থেকে আরম্ভ করে যোগাড় করে রানিং সু পর্যন্ত পরিয়ে দেন। কখনো বা নিজেই খানিকটা দৌড়ে যান মেয়ের সংগে।

১৯৫৭ সালে ছোট ছোট স্পোর্টস দিয়ে জয়ার আথলেটিক জীবন শুরু। ইণ্টার স্কুলে ব্যর্থতা, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জুনিয়র ইভেণ্টে প্রথম পুরস্কার, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন-শিপ। সভাপতি শ্রীভূপতি মজুমদার বললেন—নামেও জয়া, কাজেও জয়া, জয়া একাই সব পুরস্কার জয় করে নিল।

তারপর থেকে কঠিন অনুশীলন। ১৯৫৮ সালে ১০০ মিটার দৌড়ে জেলার প্রথম। ১৯৫৯-এ নমিতা ভট্টাচার্যের সংগে জেলার চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০০ মিটারের নতুন রেকর্ড। ইতিমধ্যে কটকের জাতীয় গেমসে বাঙলার প্রতিনিধিত্বের ডাক। ১৯৬০ সালে দিল্লীর জাতীয় গেমে আবার বাঙলার প্রতিনিধিত্ব। এবং সংগে ৫৮, ৫৯ ও ৬০ সালে জাতীয় স্কুলস গেমে জয়া ভট্টাচার্য বাঙলার স্কুল টিমে অপরিহার্য তো ছিলই।

১৯৬০ সালে কালীঘাট স্পোর্টসের চ্যাম্পিয়নশিপ পাবার পর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য বড় একটা স্পোর্টসে নামেনি। স্কুল ফাইন্যাল পাশের পর ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে ও এখন প্রি-ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। এই বছর এরিয়ান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকেও এক আধটি পুরস্কার ঘরে তুলেছে। তবে তার মধ্যে তেমন আনন্দ পায়নি জয়া। সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত বাঙলার রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান এবং ৮০ মিটার হার্ডল রেসে তৃতীয় স্থান লাভের মধ্যে তবু কিছুটা সান্ত্বনা আছে।

কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নয় জয়া ভট্টাচার্য। সে চায় আরও উপরে উঠতে। আগের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের পরাভূত করতে, চায় অগ্রবর্তিনীদের আগে আগে চলতে।

জয়া ভট্টাচার্য

দেশী সংবাদ

১৫ই জানুয়ারী—মাদ্রাজে টেস্ট খেলার পঞ্চম এবং শেষ দিনে ১২৮ রানে ভারত জয়ী হইয়া 'রাবার' লাভ করিল। এই খেলায় ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড়দের অসামান্য কৃতিত্ব এবং ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং প্রভৃতি সর্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী আজ বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কোনও কংগ্রেস-কর্মী কংগ্রেসপ্রার্থীকে ভোট না দিয়া কোন স্বতন্ত্র সদস্যকে ভোটদান করেন কিনা তাহা দেখিবার জন্য 'প্রবীণ পর্যবেক্ষকগণকে' নিয়োগ করিবেন।

১৬ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিশেষত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার বনভূমি এলাকার অধিবাসীরা এখন হইতে গরু চরানো ছাড়া বনে শুকনা পাতা কুড়ানো, লাঙ্গলের জন্য কাঠ সংগ্রহ প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা আগেকার মতই ভোগ করিতে পারিবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেণ্ট্রাল ওয়ার্কশপে কারিগরী শিক্ষানবিশের কাজে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সংশিলষ্ট বহু ছাত্র গত এক বছর হইতে কোন সার্টিফিকেট পান নাই বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অথচ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকি ঐ সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা। সার্টিফিকেট না থাকায় ঐ সকল ছাত্র যথাযথ যোগ্যতা সত্ত্বেও চাকরি পাইতেছে না।

১৭ই জানুয়ারী—কয়লার অভাবে পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলে এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। অবস্থা সবচেয়ে খারাপ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির। ইহাদের অনেকেই আংশিকভাবে কাজ বন্ধ করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

গতকল্য ভারত কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে প্রকারান্তরে কাশ্মীর বিভাগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর কাশ্মীরকে বিভক্ত করিয়া কাশ্মীর সমস্যা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ভারতের পত্রে পরোক্ষ-ভাবে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ দিন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রীসুন্দরম এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এই নির্বাচনের জন্য ২৪ কোটি ব্যালট পেপার প্রয়োজন হইবে।

১৮ই জানুয়ারী—কলিকাতা ও শহরগুলির ৪৫০টি তেল ও ডালকলের কর্মবিরতি আজও অব্যাহত থাকে। ধর্মঘটের এই চতুর্থ দিনে রাজ্য সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর বিরোধ মীমাংসায় সচেষ্ট হন। কিন্তু কোন কাজ হয় নাই।

শিবিরবাসী উদ্বাস্তুমাত্রই যাহাতে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের সুযোগ পায়, সেই জন্য এখনও পর্যন্ত দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণের কোন শেষ তারিখ ঠিক করিয়া দেওয়া হয় নাই। অদ্য এক সাক্ষাৎকারে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেন এই কথা বলেন।

১৯শে জানুয়ারী—অদ্য মধ্যাহ্নে বাটরা থানার অন্তর্গত বৃন্দাবন মল্লিক লেন ও কৈলাসচন্দ্র চন্দ লেনের তিনটি পরিবারের শিশু ও মহিলা সহ ১১ জন খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে অসুস্থ হইয়া হাওড়া হাসপাতালে ভর্তি হয় বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অসুস্থদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অদ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মার্চেণ্টমিলের উদ্বোধন করেন। এই মিলে প্রতি ঘণ্টায় ৩৫ হইতে ৭০ টন ইস্পাত প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২০শে জানুয়ারী—অদ্য অপরাহ্ণে পশ্চিম-বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষকদের একটি সংযত ও সুশৃংখল বিক্ষোভ অভিযান পরিচালিত হয়। কলেজ কোড প্রবর্তন, ইউ জি সি'র সাহায্য চালু রাখা, অধ্যাপকদের বেতনের হার বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক কারণে অধ্যাপকদের শাস্তিবিধান ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবি জানাইবার জন্য অধ্যাপকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে এই বিক্ষোভ অভিযানের ব্যবস্থা হয়।

২১শে জানুয়ারী—অবিলম্বে বেতনবৃদ্ধি এবং অন্যান্য দাবিতে হরিণঘাটা দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রে শনিবার মধ্যরাত্রি হইতে দুধের গাড়ির প্রায় শতাধিক কর্মী ধর্মঘট করায় অদ্য কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ বিঘ্ন ঘটে।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের অনশনরত নার্সদের সমর্থনে এই দুই হাসপাতালের প্রায় পাঁচশত রোগী আগামী ২৩শে জানুয়ারী একদিনের জন্য অন্নপথ্য গ্রহণ করিবেন না সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই জানুয়ারী—পশ্চিম ইরিয়ানের দক্ষিণ উপকূলে টহলদার ওলন্দাজ যুদ্ধ জাহাজগুলি আজ ইন্দোনেশীয় মোটর টর্পেডো বোটসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। ইহার ফলে একটি ইন্দোনেশীয় জলযানে আগুন ধরে। অপরগুলি আত্মগোপন করে।

কঙ্গোর উপপ্রধানমন্ত্রী ও লুমুম্বাপন্থী নায়ক শ্রীগিজেঙ্গা স্ট্যানলিভিলে নিজ বাসভবনে বন্দী অবস্থায় আটক আছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইথিওপীয় বাহিনী ও জেনারেল লুণ্ডুলার সৈন্যগণ তাঁহাকে পাহারা দিতেছে।

১৬ই জানুয়ারী—জাকার্তা হইতে রয়টার জানাইতেছেন—গতকল্য বিনা কারণে ইন্দোনেশীয় টর্পেডো বোটসমূহের উপর ওলন্দাজ যুদ্ধ-জাহাজ হঠাৎ যে বর্বরোচিত আক্রমণ চালায়, ইন্দোনেশীয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিশোধ লইবে স্থির করিয়াছে। ফরমোজার জনৈক রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে এজন্য ইন্দোনেশীয়া হয়ত তাহার রাশিয়ার নির্মিত দূরপাল্লার জেট বোমারু বিমানগুলিকে কাজে লাগাইবে।

১৭ই জানুয়ারী—কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছে, গতকাল ভারতবর্ষ নিরাপত্তা পরিষদকে সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে অনুরোধ করে।

প্রাক্তন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ মলোটভ অন্ধ সংস্কারবশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফের নিরুপদ্রব সহাবস্থান নীতির ঘোর বিরোধিতা করিতেছেন। আজ প্রাভদায় এই অভিযোগ করিয়া একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮ই জানুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট গতকাল ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট আমেদ সোকর্ন এবং হল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী জান দা কে'র নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিয়া পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিতে এবং "তাড়াতাড়ি কোন কাজ" না করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে (শান্তির সময়) বৃহত্তম বাজেট লইয়া অদ্য কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতিরক্ষা ব্যয়, মহাকাশ গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালন ইত্যাদির জন্য ১৯৬৩ সালের মোট বরাদ্দের তিন-পঞ্চমাংশ ব্যয়িত হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

১৯শে জানুয়ারী—পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার সহিত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্দেশ্যে হল্যাণ্ড রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের সহিত আলোচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে।

কাতাঙ্গার প্রেসিডেণ্ট চিশোম্বে এলিজাবেথ-ভিল হইতে অন্তর্ধান হইয়াছেন। নির্ভরযোগ্য মহল মনে করেন যে, তিনি প্রাক্তন ফরাসী কঙ্গোর রাজধানীতে আশ্রয় লইয়াছেন।

লাওসে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে তিন প্রিন্সের মধ্যে অদ্য এক চুক্তি হইয়াছে। প্রিন্স সৌভান্না ফুমা এই কথা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, গত বৎসরে জুরিখ এবং হিনহিউপের ইস্তাহারের ভিত্তিতে লাওসে এক জাতীয় ঐক্য সরকার গঠিত হইবে এবং তাঁহার দলই প্রধানমন্ত্রীর আসনটি লাভ করিবে।

২০শে জানুয়ারী—ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও কাশ্মীর সম্পর্কে যাহাতে শীঘ্র নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক হয়, তজ্জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র-পুঞ্জের লবী মহলে আরও বেশী করিয়া চাপ দিতেছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

২১শে জানুয়ারী—নেপালে নেপালী কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ রাজা মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম নেপালের দাং ও দেওখুরির জেলায় নেপালী কংগ্রেসকর্মী এবং সামরিক ও পুলিস বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের চারিজন সৈন্য ও পুলিস নিহত হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ আয়ুব খান গতকাল পশ্চিম পাকিস্তানের মর্দানে একটি জনসমাবেশে বলেন যে, জরুরী অবস্থার সময় "পাকিস্তান স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহার অস্ত্রাগারের সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করিবে।"

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২০—২২৪০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

২৯শ বর্ষ

(১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত)

—অ—

—আ—

—ই—

—এ—

—ঐ—

—ও—

—ক—

—খ—

—গ—

—চ—

—ছ—

—জ—

—ট—

—ত—

—দ—

—ধ—

—ন—

—প—

—ফ—

—ব—

—ভ—

—ম—

—য—

—র—

—ল—

—শ—

—স—

—হ—

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মাসিক ২০০৲ টাকা উপার্জন করুন

ইলেকট্রিক ও রেডিও গাইড

২০০টি চিত্রসম্বলিত একটি সম্পূর্ণ গাইড। বিদ্যুৎ ব্যতীত কার্যক্ষম মাত্র ১৫৲ টাকায় আপনার নিজস্ব রেডিও তৈরি করুন এবং রেডিও মেরামতি, অয়্যারিং, ইলেকট্রিক মেকানিজম শিখুন। মূল্য ৬৲ ফটোগ্রাফি ৩৲ টাকা, টেলারিং গাইড ৪৲ টাকা, সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং ৩ টাকা, ড্রইং এণ্ড পেণ্টিং ৫৲ টাকা। প্রত্যেক গ্রন্থের জন্য ডাক খরচা অতিরিক্ত ১৲ টাকা।

VANDANA BOOK DEPOT
(D-1) RAFATGANJ, ALIGARH
(U.P.)

(সি/এম ৩৬৭)

॥ নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ ॥

সারদা-রামকৃষ্ণ

● সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত ●

সারদা-রামকৃষ্ণ শুধু বই লেখা নয়, একটা ছবি আঁকা। শুধু ঘটনার প্রবাহ নয়, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি ও ভাবের মন্দাকিনী ভাসিয়ে নিয়ে পাঠককে পৌঁছে দেয় সারদা-রামকৃষ্ণের চরণতলে। যার একটু সুকৃতি আছে, এ যুগের যুগল-বিগ্রহের প্রতি কণামাত্র ভালবাসা ও আকর্ষণ আছে, সে-ই এই ভাগবত পাঠ করে প্রভূত আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে এবং সাধনজীবনে অনেক নির্দেশ পাবে। —লিখেছেন জনৈক **প্রবাসী বাঙ্গালী ॥**

বহুচিত্র শোভিত—ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬·০০

....

গৌরীমা

এই তেজস্বিনী মহামহিমময়ী মহিলা বাঙ্গালী নারীর চিরন্তন দুর্বলতার অপবাদ বিদূরিত করিয়াছেন। অসামান্য ইঁহার চরিত্র, অপূর্ব ইঁহার সাধনা, বিচিত্র ইঁহার জীবনকথা, রোমাঞ্চকর ইঁহার বিজয়াভিযান। এই পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় সরস, কাব্যের মত মাধুর্যমণ্ডিত।

—শিক্ষা ও সাহিত্য ॥

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ—৩·৫০

....

সাধনা

ভারতীয় সভ্যতার আদিকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যে সকল উচ্চভাবপূর্ণ স্তোত্র সংগীত ইত্যাদি রচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলগুলিই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য...তিন দিক দিয়াই ইহা মর্যাদা পাইবার যোগ্য।...যে পাঠক যেদিক দিয়াই ইহাকে গ্রহণ করেন উপকৃত হইবেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা ॥

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪·০০

....

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি ২৮৫৩)

র ফেব্রুয়ারী সংখ্যা

সুরক্ষিত রাখুন

মানসীর এ সংখ্যায় পাবেন—— •

একটি উপন্যাস, একটি ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনটি গল্প, মিষ্টি কবিতা, রম্য রচনা, সরল শিক্ষণীয় প্রবন্ধ, চলচ্চিত্রের পৃথিবী ও বিভিন্ন ফিচার।

লিখেছেন ঃ গজেন্দ্র মিত্র, বাণী রায়, সুশীল ঘোষ, দিলীপ মালাকার, জগদানন্দ বাজপেয়ী, চণ্ডী লাহিড়ী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, মায়া বসু প্রভৃতি আরও অনেকে।

● আপনার নিকটবর্তী হকারকে কপির জন্য বলে রাখুন

মূল্য মাত্র—৫০ নঃ পঃ।

(সি ৩৫৩৮)

জলসা

মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে

এই সংখ্যা থেকে জলসার বিশেষ আকর্ষণ

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রচয়িতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

[ধারাবাহিক রচনা]

এই সংখ্যার আর একটি আকর্ষণ

এখানে সেখানে ॥ সমরেশ বসু

এ ছাড়া নতুন ধরনের কয়েকটি বিভাগীয় রচনা এই সংখ্যা থেকে শুরু করা হচ্ছে।

উপন্যাস লিখেছেন

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

গল্প ও অন্যান্য রচনা

শচীন কর । শৈলেশ দে । অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই সংখ্যার দাম এক টাকা চার আনা।

জলসা ॥ ৫বি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলি-১৪

প্রচ্ছদ শিল্পী—শ্রীদিলীপকুমার দাস

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 3rd February 1962

২৯ বর্ষ ॥ ১৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২০ মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

পরাশ্রিত বিদ্যা

দিল্লিতে সম্প্রতি কমনওয়েলথ শিক্ষা-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে কতকগুলি সময়োপযোগী প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে। কমনওয়েলথের রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য আমাদের অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেও আসে না। তবে শিক্ষা ব্যাপারে অর্থাৎ আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে কমনওয়েলথের মধ্যমণি ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে অনেক কালের একথা মানতেই হয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে ১৯৪৭ সালে; তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে এশিয়া-আফ্রিকার নতুন স্বাধীন অন্যান্য দেশগুলির। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের পরনির্ভরতা এখনও অব্যাহত।

আধুনিক কালের প্রয়োজনের বিচারে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন অপ্রচুর, সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ। কাজেই বিদেশের সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া আধুনিক কালের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হওয়ার অন্য উপায় নেই। আধুনিক কালোপযোগী বিদ্যা মানেই পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা যার মূল সূত্র হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রকরণের সুপরিকল্পিত ব্যবহার। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা অর্জনে এবং আহরণে আমাদের উৎসাহ প্রচুর। উৎসাহ নতুনও নয়; য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আজ প্রথম শুরু হয়নি। ভারতবর্ষে অন্তত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদর্শ প্রেরণার সঙ্গে জাতীয় চেতনার সংযোগ ঘটেছে এক শতাব্দীরও পূর্বে। মোটের পর আমরা তাতে লাভবান হয়েছি; আধুনিক ভারতের ভাবসম্পদ, বৈষয়িক উদ্যোগ, ব্যবহারিক কর্মকৌশল, সবই প্রায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাবাহী। কিন্তু সেই সঙ্গে মানতে হবে যে, আমাদের দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারাটি এখনও আশানুরূপ পরিপুষ্ট, সুগভীর এবং নিজস্ব স্রোতবহ হতে পারে নি। বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিপুল প্রবাহ থেকে খাত কেটে এনে ছোট ছোট কৃত্রিম জলাধার মাত্র আমরা রচনা করেছি।

পরানুগ্রহ, পরনির্ভরতা, পরানুকরণ যেমন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাসূচক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি কোন দেশের পক্ষে চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা মানসিক দীনতা ও অসুস্থতার কারণ। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমরা কি এই একান্ত পর-নির্ভর মানসিক দীনতা থেকে মুক্ত হতে সত্যিই চেষ্টিত? এ প্রশ্ন কোনরকম উগ্র স্বাদেশিক গোঁড়ামিপূর্ণ মনোভাবপ্রসূত মোটেই নয়। কথা হল, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানকর্মীরা, শিক্ষাবিদগণ কি চিরকালই শুদ্ধ গ্রহীতা হয়ে থাকবেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ সৃষ্টিতে, বিস্তারে ও বিবর্ধনে তাঁরা কি কখনও স্বাধীন ও সক্রিয় ভূমিকা নিতে উদ্যোগী হবেন না?

ডঃ দেশমুখ কিছুকাল পূর্বে মন্তব্য করেন, আমাদের দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে গবেষণার উৎসাহ যৎসামান্য, গবেষণার ফলাফলও আশাপ্রদ নয়। একজন রমণ, একজন আচার্য জগদীশচন্দ্র অথবা ঐ রকম কোনও অসাধারণ প্রতিভার সাফল্যকে নজীর খাড়া করে জাতীয় কৃতিত্বে গৌরব বোধ করার সার্থকতা হয়ত এক-কালে ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায়, উদ্ভাবন ক্ষমতায় আমরা যে হীন নই, শুদ্ধ এ-কথা প্রমাণ করে কিম্বা ঘোষণা করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতিযোগিতায় আমরা কখনই সফল হতে পারব না। আমরা যে সফল হতে বিশেষ চেষ্টাও করছি না তার প্রমাণ পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার উপর এখনও আমাদের একান্ত নির্ভরতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে গবেষণা-কার্যে আমরা এখনও অনেকদূর পিছিয়ে আছি তার একটি প্রধান কারণ আমাদের বিদ্বজ্জনদের মানসিক জড়তা এবং পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার চর্বিতচর্বণে, রোমন্থনে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত আসক্তি।

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার বিবিধ ধারা অনুশীলন আমাদের দেশে শুরু হয়েছে অনেক কাল। ব্রিটিশ আমলে হয়ত এর বাধা ছিল অনেক, কিন্তু মৌল গবেষণার পথ যে একেবারে বন্ধ ছিল, তা নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অন্তত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র অনেক পরিমাণে প্রশস্ত এবং স্বচ্ছন্দ হয়েছে। কিন্তু তা হলেও সেই পুরানো আমলের অভ্যস্ত চর্বিতচর্বণ ও রোমন্থনের ধারাটি বদলায় নি। ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন কোন প্রখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানী আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বর্তমান গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাদের কৃতী ও মেধাবী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরা নতুন কিছু আবিষ্কার চিন্তায় ও চেষ্টায় উৎসুক নন। কাজেই তাঁদের অনেকেরই বিদ্যা এবং বিদ্যাচর্চা পরার্জিত, পরাশ্রিত ("derivative")। য়ুরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতেরা নিজেদের উদ্যোগে, অধ্যবসায় বলে যে জ্ঞানসম্পদ নিরন্তর সৃষ্টি করছেন আমাদের দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই সম্পদই একমাত্র মূলধন।

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার বিবিধ সম্পদ আহরণের জন্য আমাদের দেশ থেকে বহু ছাত্রছাত্রী বিদেশে যাচ্ছে, আগেও গিয়েছে। বিদেশ থেকে সংগৃহীত জ্ঞানসম্পদ, ব্যবহারিক কলাকৌশল কিছু কিছু কাজেও লাগানো হচ্ছে। কিন্তু তার বেশী নয়। বিদেশী ডিগ্রীর মর্যাদা, সরকারী, বেসরকারী চাকরিক্ষেত্রে এবং সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠার সুযোগ, এইসব গৌণ লাভই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এখনও প্রাধান্য পাচ্ছে। ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এমন কোনও বিভাগ দেখা যায় না যেখানে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের পুঁথিপত্র, গবেষণা-লব্ধ ফল ছাড়া আমাদের বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানকর্মীরা, বিদ্বজ্জনগণ নিজেদের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় বলে এক পা-ও অগ্রসর হতে সক্ষম। আমাদের জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানীরা নিজেরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি করায় উদ্যোগী না হলে ভারতবর্ষের পর-নির্ভরতা কোনদিনই ঘুচবে না।

কংগ্রেস ভোটারস
অতুল্য ঘোষ এবার রেকর্ড সংখ্যক নির্বাচনী প্রচার বক্তৃতা দিয়েছেন।
সাত ভাই চম্পা জাগো রে—
টি টি কৃষ্ণমাচারী এবার লোকসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
অর্থ-দপ্তর
মোরারজীর এখন উপায়?
ইংলণ্ডে পাকিস্তানীরা বসন্ত রোগের ভীতি সৃষ্টি করেছে।
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু—
কাশ্মীর প্রসঙ্গ
৩রা ফেব্রুয়ারী
সম্পাদক মহাশয়,
পৃথিবী আজ ধ্বংস হবার কথা। যদি তা না হয় আগামী সপ্তাহে আবার আমি যথারীতি কার্টুন পাঠাবো। ইতি
কুট্টি
Kutty
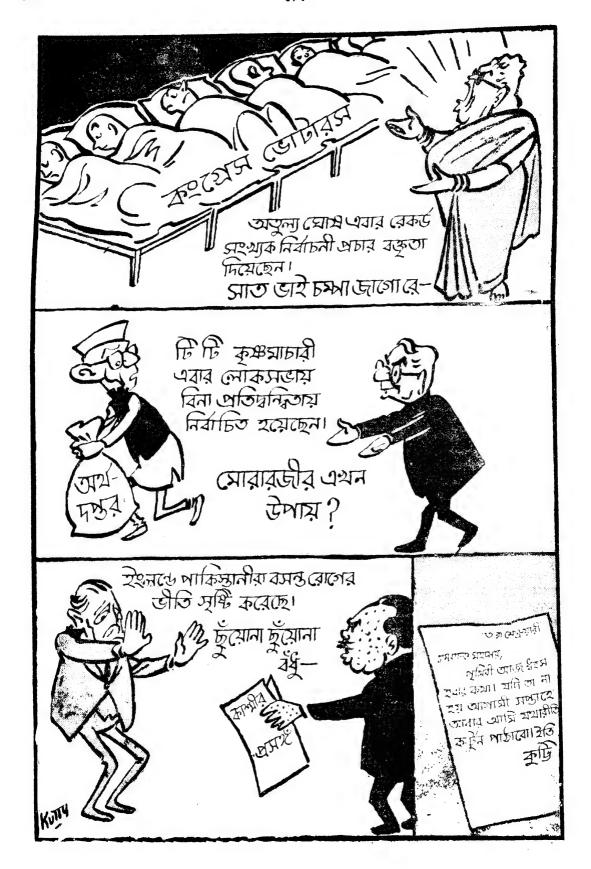
গোয়া দখলের ব্যাপারটাকে ইলেকশন দ্বন্দ্বের সংগে সংযুক্ত করে দেখা বা বিচার করা উচিত কিনা তাই নিয়ে অনেক কথা-কাটাকাটি চলেছে। কিন্তু তাতে প্রশ্নটি পরিষ্কার না হয়ে তার চারদিকে যেন আরো বিভ্রান্তিকর কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। ইলেকশনের সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের ভিতর দিয়ে নানা প্রশ্নের তাৎপর্য জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠার সুযোগ পায় এইরকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যার জন্য বলা হয় যে, ইলেকশনের সময়ে ভোটারদের "এডুকেট" করার সুযোগ আসে।

আসলে কিন্তু ইলেকশনের সময় ভোটারদের "এডুকেট" করার উপযুক্ত সময় এরূপ মনে করার সংগত কারণ নেই। বরঞ্চ উল্টো হবারই সম্ভাবনা। কারণ এক্ষেত্রে "এডুকেট" যারা করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয় তাদের অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলির এই সময়ে যেন তেন প্রকারেণ ভোট সংগ্রহ করাই প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। সুতরাং এ সময়ে বক্তৃতার যদিও সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে কিন্তু সেটা সত্যের অনুসন্ধানে নয়। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীর দোষত্রুটির ব্যাখ্যায় মুখর হয়ে উঠলেই যে সাধারণের পক্ষে সব কিছু বুঝা সহজ হয় তা নয়। দুইপক্ষের পরস্পরের বিরুদ্ধে—সমালোচনার যোগ-বিয়োগ করলেই আসল ব্যাপারটা কী বুঝা যাবে এরূপ মনে করাও ঠিক নয়, কারণ, সমালোচনার আসল লক্ষ্য যেখানে ভোট-প্রাপ্তি সেখানে পরস্পরবিরোধী হলেও দুপক্ষেরই সত্যকে এড়িয়ে যাবার দিকে ঝোঁক থাকে। একে যখন অপরের ত্রুটি ধরে তখন নিজের কিসে সুবিধা হবে সেই চিন্তাই মুখ্য হয়। সত্য কিসে সাধারণের বোধগম্য হবে সে চিন্তা নয়। নিজেদের দোষত্রুটির প্রকাশ্য আলোচনা কোনো রাজনৈতিক দলের কর্তারাই পছন্দ করেন না, তাহলেও অন্য সময়ে দলের মধ্যে আত্ম-সমালোচনার অল্পবিস্তর স্বাধীনতা হয়ত থাকে কিন্তু ইলেকশনের সময়ে দলের কোনো নীতি বা কার্যের স্বল্পতম সমালোচনাও বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হয়। আত্ম-সন্ধান বা আত্মসমালোচনা সত্যসন্ধানের একটা অপরিহার্য অংগ, রাজনীতিতে সেটা প্রায়শই অবশ করে রাখাই প্রথা এবং ইলেকশনের সময়ে একেবারে বাদ দেওয়া। রাজনৈতিক দলগুলির আত্মসমালোচনার যে-কথা মাঝে মাঝে শুনা যায় সেটা সত্যের সন্ধানে আত্মসমালোচনা নয়, কেন আরো

ভোট পাওয়া গেল না, কী করলে আরো ভোট পাওয়া যেত সেটা তারই সন্ধানে করা হয়ে থাকে। সুতরাং ইলেকশনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে যে-"এডুকেশন" পাওয়া যায় তাতে ভেজালের পরিমাণ অন্য সময়ের চেয়েও বেশি থাকে।

গোয়া দখলের ব্যাপারটা নিয়ে যে-তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তাতেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই গোয়া দখলের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছে। কেন গোয়া দখল করা হচ্ছে না তাই নিয়ে এতকাল কংগ্রেসের চেয়ে বিরোধী দল-গুলিই বেশি মুখর ছিল। কিন্তু যখন সৈন্য পাঠিয়ে গোয়া দখল করা হল তখন আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, এতদিন কিছু না করে হঠাৎ ঠিক এই সময়ে যে গোয়া দখল করার ব্যবস্থা হল এর সঙ্গে ইলেকশনের যোগ আছে, গোয়া দখলটা অনেক পরিমাণে একটা "ইলেকশন স্টান্ট", এটাকে ইলেকশনে কংগ্রেস পার্টি ভোট আদায়ের কাজে লাগাবে। এই আশঙ্কা করে বিরোধী দল-গুলির পক্ষ থেকে জনসাধারণকে সতর্ক করে বলা হতে লাগল যে, গোয়া দখলের ব্যাপারে কংগ্রেস পার্টির বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই, বরঞ্চ বিরোধী দলগুলিই গোয়ার মুক্তি-সাধনের জন্য সরকারের উপর চাপ দিয়ে এসেছে, গোয়ার মুক্তিতে জনসাধারণের মধ্যে যে-আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা গেছে সেটাকে কংগ্রেসী ইলেকশন প্রোপাগান্ডায় কাজে লাগানো অবৈধ হবে। গোয়ার ব্যাপারটা সমগ্র জাতির ব্যাপার, কোনো একটা বিশেষ দলের নয়, ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে বিরোধী দলের সন্দেহ স্বয়ং পণ্ডিত নেহরুর একটি মন্তব্যের দ্বারা দৃঢ়তর হয়। তিনি কটকে একটি বক্তৃতায় গোয়ার ব্যাপারটাকে একটা "ইলেকশন ইস্যু"র রূপ দেন, তবে একটু ঘুরিয়ে। গোয়ার মুক্তির জন্য সরাসরি কংগ্রেস পার্টির কৃতিত্ব দাবি করে ভোট তিনি চান না, তিনি ভোট চাইতে গিয়ে একটি আন্তর্জাতিক যুক্তি আমদানি করেন। তিনি বলেন যে, গোয়ার ব্যাপারে বিদেশী সমালোচকদের উত্তরস্বরূপ লোকের কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া উচিত, কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে বিদেশী সমালোচকদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, ভারতবাসীরা ভারত সরকার কর্তৃক গোয়া দখলের নীতি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পরে এই সমালোচনা আরো তীব্র হয়ে ওঠে যে, গোয়া দখলের ব্যাপারটা কংগ্রেস পার্টির একটা "ইলেকসন স্টান্ট"।

এই ধারণাকে বাড়তে দিলে ইলেকসনে কংগ্রেসের লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। সম্ভবত সেকথা বুঝতে পেরেই পণ্ডিতজী সুর বদলেছেন। তিনি বম্বের এক সভায় ঘোষণা করেন যে, তিনি আগে যা বলেছিলেন সেটা ঠিক নয়। বলা বাহুল্য, তিনি যে ভুল করেছিলেন সেটা সরাসরি স্বীকার না করে রাজনৈতিক কথা পাল্টাবার জন্য যে-রকম ভাষা ব্যবহার করেন পণ্ডিতজীও তাই করেন। গোয়া দখলের ব্যাপারটা "ইলেকশন ইস্যু" হতে পারে না, গোয়া দখলের ব্যাপারে অন্য সব পার্টিরও সমর্থন ও সাহায্য স্বীকার্য, অন্য কোনো পার্টির হাতে সরকারী ক্ষমতা থাকলে তারাও গোয়া সম্পর্কে এইরকম নীতি অনুসরণ করত, ইত্যাদি। পণ্ডিতজীর এই ঘোষণা অনেকের কাছে বাহবা পেয়েছে, এমন কি কংগ্রেস গোয়ার ব্যাপারে কোনো বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করছে না এবং গোয়া সকল পার্টির পক্ষেই সমান ইত্যাদি বলার জন্য পণ্ডিতজীর উদারতার প্রশংসাও কেউ কেউ করছেন। আসলে পণ্ডিতজী অত্যন্ত নিপুণ চতুরতার সঙ্গে একটা স্বকৃত ভুল শুধরেছেন এবং গোয়ার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দাবি যে করেন নি তাও কংগ্রেসেরই স্বার্থে। গোয়া সম্পর্কে বিদেশী সমালোচকদের উত্তর হিসাবে লোকদের "কংগ্রেসকে ভোট দাও" বলার মতো ভুল পণ্ডিতজী কেমন করে করলেন সেইটাই আশ্চর্য। বিদেশী সমালোচকদের পণ্ডিতজী যা বুঝাতে চান নিশ্চয়ই তা হচ্ছে এই যে, সমস্ত ভারতবাসী ভারত সরকারের গোয়া সম্পর্কিত নীতি সমর্থন করে। তাহলে গোয়াকে পার্টি ইলেকসন ইস্যু করা যায় না। গোয়ার ব্যাপারে সরকারের নীতির প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য লোকদের কংগ্রেসকে ভোট দিতে বলার অর্থ গোয়াকে ইলেকসন ইস্যু করা, পণ্ডিতজী তাই করেছিলেন। পণ্ডিতজী যদি কথা না পাল্টাতেন তাহলে ইলেকসনে কংগ্রেসের বিরোধীদের পক্ষে যে-সব ভোট পড়বে সেগুলির কী ব্যাখ্যা হতো? তাহলে যে-বিদেশী সমালোচকদের উপর দৃষ্টি রেখে পণ্ডিতজী লোকদের কংগ্রেসকে ভোট দিতে বলেছিলেন তাদের হাতেই কি একটা নূতন অস্ত্র তুলে দেওয়া হতো না? কারণ তারা তখন পণ্ডিতজীর ঘোষণার সঙ্গে এবং কংগ্রেস-বিরোধী ভোটের সংখ্যা যুক্ত করে বলতে পারত না কি যে, ভারতের জনগণের একটি বৃহৎ অংশ গোয়ায় ভারত সরকারের বলপ্রয়োগের নীতি সমর্থন করে না।

দ্বিতীয়ত, পণ্ডিতজী বোধ হয় পরে বুঝতে পারেন যে, গোয়ার ব্যাপার নিয়ে বিদেশী সমালোচকদের উত্তর দেবার জন্য দেশের লোকের কাছে পার্টির নাম করে ভোট চাওয়াটাই সম্মানজনক নয়। অবশ্য পণ্ডিতজীর এইরকম ব্যাপারে মানের মূল্যবোধটা একটু বিচিত্ররকমের। বিদেশীর দ্বারা সমালোচিত হলে তার উত্তরে তিনি তাঁর প্রতি দেশের লোকের আস্থার প্রমাণপত্র দাখিল করতে চান; অন্যদিকে তাঁর কোনো কার্য বা নীতির সম্পর্কে দেশে সমালোচনা হলে তিনি স্বপক্ষে বিদেশীর সার্টিফিকেট দাখিল করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এক্ষেত্রেও এই মনোভাব কাজ করে নি তা নয়। পণ্ডিতজী কটকে যখন বক্তৃতা দেন, তখনও গোয়ার ব্যাপার নিয়ে বিদেশী সমালোচনার প্রাবল্য ছিল, পণ্ডিতজী তখন বিদেশী সমালোচকদের উপর রেগে ছিলেন সুতরাং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে লোকদের বলেছিলেন কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে বিদেশী সমালোচনার উত্তর দিতে। বম্বের বক্তৃতার সময়ে বিদেশীর সমালোচকদের সুর অনেকটা বদলে গেছে, তখন থেকে আর বিদেশী সমালোচকদের উত্তর দেবার প্রয়োজনবোধ নেই।

গোয়াকে "ইলেকসন ইস্যু" না করা কংগ্রেসের দিক থেকে ঔদার্যের পরিচয় বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। পণ্ডিতজী বলেছেন যে, ভারতে যে-দলের হাতেই ক্ষমতা থাকত তারাই গোয়া সম্পর্কে এরূপ নীতি গ্রহণ করত। এরূপ বলা ঠিক নয়। গোয়ার উদ্ধার অবশ্য যে-কোনো দলই কর্তব্য বলে মনে নিত কিন্তু তাই বলে একথা বলা যায় না যে, যে-দলের হাতেই ক্ষমতা থাক না কেন গোয়া উদ্ধার চৌদ্দ বছরের আগে হত না অথবা এই ব্যাপারে ভারত সরকার যে সমস্ত উচ্চ-পর্যায়ের কথা বলে দেশে ও বিদেশে নানারকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন সেগুলো অপরিহার্য ছিল। গোয়া উদ্ধারের বৈধতা "ইলেকসন ইস্যু" না হতে পারে কিন্তু উদ্ধার সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারী কাজ এবং কথা ইলেকসনী বিতর্কের বিষয় কেন হবে না? গোয়ার উদ্ধার যখন হয়ে গেছে, তখন আর পুরাতন কথা ঘাটাঘাটি করে লাভ নেই, এরূপ বলাও ঠিক হবে না। কারণ গোয়ার চেয়েও ঢের বেশী গুরুত্বের আন্তর্জাতিক সমস্যা ভারতের সামনে চেপে আছে। যাঁদের হাতে সরকারী ক্ষমতা রয়েছে তাঁরা সেই গুরুত্বের সমস্যার সম্মুখে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখেন কিনা সেটা চিন্তার বিষয়।

এই প্রশ্নের বিচার করতে হলে গোয়া সম্পর্কিত ভারত সরকারের যাবতীয় বাক্য ও কার্যকলাপের বিশ্লেষণ আবশ্যক। গোয়া উদ্ধারের পরে জন-সাধারণের মধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে বিরোধী দলগুলির মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছে যে, গোয়ার নাম করলেই বুঝি লোকরা কংগ্রেসকে ভোট দেবে। সেই ধারণার বশে বিরোধী দলের অনেকে জওহরলালজীর বোম্বাইয়ের ঘোষণার তারিফও করেছেন। অর্থাৎ কি কংগ্রেসী কি বিরোধী কোনো দলই ভোটারদের "এডুকেট" করার জন্য ব্যস্ত নয়। সকলের লক্ষ্য ভোট পাওয়া। তবে ভোটের জন্য দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়ায় অনেক সময়ে কিসে ভোটের সুবিধা হবে তাও অনেকে বুঝতে পারে না।

২৭।১।৬২

নিবেদন, নেই। বাঙালী কি কি ধ্বনি জানে, কোন্ কোন্ ধ্বনি সে ইংরিজি পড়তে গিয়ে কিছুটা শিখেছে এই দৃষ্টি-বিন্দু থেকে লেখা কোনো রচনা নেই। যেমন মনে করুন, ইংরিজি অভিধানে আপনি পেলেন, জর্মন সংগীতকার Bach-এর ch উচ্চারণ করতে হবে স্কচ্ ভাষায় Loch-এর ch যেভাবে উচ্চারিত হয়। এ-তত্ত্বটি জেনে আপনার কি লাভ? আপনি সাদামাটা বাঙালী, হয়তো স্কচ্ হুইস্কির নাম পর্যন্ত শোনেন নি, চাখা দূরে থাক, Loch-এর ch কিভাবে উচ্চারিত হয় সে তত্ত্ব আপনি অবগত নন। এক অজানাকে অন্য অজানা দিয়ে 'বোঝালেই' তো আর সেটা জানা হয়ে যায় না—যদিও শুনেছি, আলজেব্রাতে নাকি দুটো মাইনাসে একটা প্লাস হয়! পক্ষান্তরে আমি যদি বলি, আমরা বিরক্ত হলে যখন বলি আ খ্ খ্ খ্! কেন জ্বালাতন করছো, তখন যে 'খ' উচ্চারণ করি সেটা খেলা বা খাঁটি শব্দের খ নয়, তখন, অর্থাৎ বিরক্তির আখ্-এর বেলা (ঘৃষ্ট—ঘসাঘসা fricative) যে 'খ' উচ্চারণ করি, সেই 'খ' আছে স্কচ Loch এবং জর্মান Bach-এ। আপনি যদি বিরক্তির আখ্ এবং খাঁটি বাঙলার খেলা, শব্দের দুই জাতীয় 'খ'-এ পার্থক্য ধরতে পারেন তবে স্কচ লখ এবং জর্মন বাখ উচ্চারণ করতে আপনার কণামাত্র অসুবিধা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি পরমানন্দে আরো মেলা ভাষায় এই ধ্বনিটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো। বলবো, উর্দুতে যখন 'খবর' বলবেন তখন ঐ বিরক্তির আখ-এর 'খ' উচ্চারণ করবেন; ফার্সী, আরবী, সিন্ধী, কাশ্মীরী ভাষাতেও ঐ 'খ' উচ্চারণ করবেন (ঐ ধ্বনি বোঝাবার জন্য ঐ সব ভাষাতে যে হরফ ব্যবহার করা হয় তার নাম 'খে')। তারপর বলবো, এই 'খ'-র আবার অল্প একটু অন্য শেডের (shade)-এর খ আছে; স্পানিশ লেখক Don Quixote-এর 'x' ঐ 'খ' উচ্চারণে বলা হয়। রুশ ভাষায় চেখফ, খুদ্‌জনিক (আর্টিস্ট) শব্দে যে 'খ' আছে সে ঐ খ। তুর্কী ভাষাতে নসর উদ্-দীন খোজার 'খ' উচ্চারণেও তাই। রোমান হরফে লেখার সময় তারা লেখে 'h' দিয়ে, এবং 'h'-এর নিচে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি হুক দেয়।

এবং সর্বশেষে বলবো, আমাদের খেলা, খাঁটি শব্দে আমরা যে বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ (aspirate) 'খ' উচ্চারণ করি সেটি ভারতবর্ষের বাইরে আজ আর কোথাও নেই। আমরা বাঙলায় বলি খাকী রঙের কাপড়; ইংরেজ উচ্চারণ করে 'কাকি', আমরা হাতি ধরার জন্য যে খেদা বানাই, ইংরেজ উচ্চারণ করে 'কেডা'। খলীফা উচ্চারণ করে কালিফ। ভারতবর্ষের বাইরে কেন, দক্ষিণ ভারতেও মহাপ্রাণ 'খ' নেই। দক্ষিণ ভারতের তামিলভাষী বলেন, 'কাবার কাও' অর্থাৎ 'খাবার খাও'। বস্তুত দক্ষিণ ভারত তথা পৃথিবীর আর সর্বত্র—অবশ্য উত্তর ভারত বাদ দিয়ে—মহাপ্রাণ 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঠ', 'ঢ', 'থ', 'ধ', ধ্বনি নেই। এতে করে আপনার ইংরিজি উচ্চারণ শেখারও খানিকটে সুবিধা হয়ে যাবে। যেমন মনে করুন, ইংরেজ যখন লেখে ghost, আপনি ভেবেছিলেন gh যখন লিখেছে তখন উচ্চারণ হবে ঘোস্ট, কিন্তু আসলে উচ্চারণ গোস্ট। ঠিক তেমনি Thomson দেখে আপনি ভাবলেন th যখন রয়েছে তখন ওটা হবে ঠম্‌সন্ কিংবা থম্‌সন্, কিন্তু আসলে উচ্চারণ টম্‌সন্। ঠিক তেমনি লিখবে Bhisti (জলদেনেওলা ভিস্তি), উচ্চারণ করবে বিস্তি; লিখবে thug (ঠগী, ঠক), উচ্চারণ করবে অদ্ভুত ধরণে সেই th—আমাদের ঠ নয়।

একেবারে কোনো প্রকারের কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনি উত্তর ভারতের বাইরে নেই, এ-কথা বললে হুবহু ঠিক ঠিক বলা হয় না। তার কাছাকাছি সামান্য একটুখানি ধ্বনি ইংরিজি এবং জর্মনে আছে। ইংরেজ যখন বলে time, তখন 't'-র উচ্চারণ খাঁটি বাঙলার 'ট' করে না, করে বাঙলা 'ট' ও 'ঠ'-র মাঝখানে (অবশ্য but বলতে তার 't' আমাদের খাঁটি 'ট'), জর্মন যখন বলে Pferd তখন তার 'Pf'-এর ধ্বনি আমাদের 'প' এবং 'ফ'-এর মাঝখানে। কিন্তু এগুলো অতি সূক্ষ্ম শেডের (shade) ব্যাপার।

আসল মূল সূত্র : উত্তর ভারতীয় ভাষা, অর্থাৎ আসামী, বাঙলা, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দু, সিন্ধী, কাশ্মীরী, গুজরাতী, মারাঠী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ; থ, ধ, ধ্বনি নেই।১

* * *

সাধারণ জনের বিশ্বাস পৃথিবীতে ধ্বনি অসংখ্য। আসলে তা নয়। ধ্বনির সংখ্যা সীমাবদ্ধ। আপনি যদি গোটা তিরিশেক ব্যঞ্জন ও গোটা চোদ্দ স্বর শিখে নেন—অর্থাৎ বাঙলাতে আপনি যে-সব স্বর-ব্যঞ্জন নিত্য-হামেশা উচ্চারণ করেন তার চেয়ে নূতন গোটা চোদ্দ বেশী— তা হলে আপনার আর ভাবনা নেই।

অবশ্য এটা প্রযোজ্য, ইয়োরোপীয় এবং এশিয়ার ভাষাগুলোর উপর। চীন-জাপান, তিব্বত-বর্মী ভাষা বাদ দিয়ে। এবং ওয়েলশ্, হাঙ্গেরিয়ন, ফিনিশ ভাষাও। এগুলোর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আমি অন্য ভাষাগুলো জানি। আসলে আমি বাঙলাটাই ঠিক মত জানিনে।

(ক্রমশঃ)

এই ঘৃষ্ট খ আধুনিক গ্রীকেও আছে। কিন্তু প্রাচীনকালে ছিল 'x' (এক্‌স্) এবং উচ্চারণ ছিল হুবহু সংস্কৃত 'ক্ষ' অক্ষরের মত। সংস্কৃত 'ক্ষ' বাঙলায় 'খ' হয়ে গিয়েছে (ক্ষুধা হয়ে গিয়েছে খুদা, ক্ষিতি, হয়ে গিয়েছে খিতি); গ্রীকেও প্রাচীন 'x'=Ks=ক্ষ হয়ে গিয়েছে 'খ'।

(১) পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, পটুহারী, নেপালী ভাষায় বোধ হয় আছে। সেগুলো উত্তর ভারতীয়।

মস্কোর ১০০নং বইয়ের দোকান। বই বেছে ক্যাশকাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছি টাকা দেবার জন্য। এক ভদ্রলোক এসে ক্যাশের মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, একটু গলা নামিয়েই, 'পাস্তেরনাকের নতুন বই বেরিয়েছে কি?' মহিলা বললেন, 'শুনেছি বটে বেরুবে। কিন্তু এখনো কিছুই জানি না।' তার কয়েক সপ্তাহ পরে শুনি সে-বই বেরিয়ে শেষ হয়ে গেছে। কারণ, অল্পসংখ্যায় বেরিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে বইটি তো জোগাড় হল। পাস্তেরনাকের নতুন কবিতার সংকলন এটি নয়, তাঁর সব কবিতা থেকে একটি চয়নিকা। পিছনের পাতাটা উল্টে দেখে নিলাম কত কপিতে ছাপান হয়েছে। ত্রিশ হাজার। এটা কি অল্প? হ্যাঁ, সোভিয়েত দেশের পক্ষে এটা অল্পই। কারণ এদেশে সাধারণ কবিতার বইও অন্তত ৬০।৭০ হাজার কপিতে বেরয়। আমাদের 'লেভদা', বাংলা জানা রুশদের কাছেও রুশ তিনি ঐ নামেই পরিচিত, বলেন পাস্তেরনাকের এই বইটি ত্রিশ হাজার কেন ত্রিশ লাখ কপিতে বের করা উচিত ছিল। এই ত্রিশ হাজার বই দু' সপ্তাহেই শেষ হয়ে গেছে। বিদেশী সাংবাদিকরা এ ঘটনাকে পাস্তেরনাকের অসীম জনপ্রিয়তার লক্ষণ বলে মনে করেছেন। পাস্তেরনাকের জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে অসীম। কিন্তু এ ঘটনাটি তার প্রমাণ নয়। কারণ মস্কোয় যে-কোন প্রতিষ্ঠিত লেখকের বইয়ের ত্রিশ হাজার কপি দু' সপ্তাহে অনায়াসেই শেষ হয়ে যায়। যে শহরে বছরে গড়ে প্রতিজন ১৪।১৫টি বই কেনে সে শহরে এ ঘটনা অত্যাশ্চর্য কিছু নয়।

পাস্তেরনাকের এই নতুন বইটি যে বেরল সাহিত্যক্ষেত্রে স্থৈর্য ও উদার মনোভাবের সেটিই একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রথমেই স্মরণীয় ডাঃ ঝিভাগো নিয়ে পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে যাঁরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সেই সময়েই একে একে তাঁদের

ক্ষমতাচ্যুত হন। যেমন 'লেখক সংঘের' প্রধানকর্তার পদ থেকে সরান হয় সুর্কভকে। 'নোভি মির' আর লিতেরাতুর্নায়া গাজেতার সম্পাদকীয় দপ্তরেও ঘটে রদবদল।

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, খ্রুশ্চেভের আমলে স্তালিনের পূজাবেদী যখন ভাঙতে শুরু করল, তখন থেকেই প্রায় সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা গেল উদারতার আভাস। তার প্রমাণ হল বিংশ কংগ্রেসের বছর কয়েক পরে স্তালিন কর্তৃক নিষিদ্ধ তিনটি সঙ্গীত রচনার পুনঃপরিবেশন। তার একটি হল শস্তাকোভিচের গীতিনাট্য 'ম্ৎসেনস্কের লেডি ম্যাকবেথ'। সেই সঙ্গে নানা গল্প, উপন্যাস, নাটক ও ছায়াছবিতে ক্রমশ সোভিয়েত সমাজের নানা দোষত্রুটির কড়া সমালোচনা শুরু হয়। মায়াকভস্কির ব্যঙ্গনাটকগুলি পুনরভিনীত হতে থাকে। এর মধ্যে হঠাৎ এল ডাঃ ঝিভাগো নিয়ে উন্মত্ততা। কিন্তু ক্রমশ সেই ঝড় থিতিয়ে এল। আগেই বলেছি পাস্তেরনাকের নিন্দায় যে কজন দিকপাল সাহিত্যিকেরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা আর আগের উচ্চ ক্ষমতায় রইলেন না।

বিগত একবছরের মধ্যে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য গত বছরেই ইলিয়া এরেনবুর্গের 'কাল, মানুষ ও জীবন' নামের স্মৃতিকথা। তাতে তিনি সেসব সাহিত্যিক বন্ধুদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানালেন, তাঁরা অনেকেই স্তালিনের আমলে নিহত, কেউ কেউ তার ফলে আত্মহত্যা করেছেন, কেউবা কলম সরিয়ে রেখেছেন। পাস্তেরনাক এবং তাঁর লেখার প্রতিও এরেনবুর্গ অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একথাও লিখেছেন যে, বক্তব্য বিষয় ও শিল্পকর্ম কোন দিক দিয়েই ডাঃ ঝিভাগো তাঁর ভাল লাগেনি। এই সঙ্গে এরেনবুর্গ আরেকজনের কথা গভীর প্রীতির সঙ্গে বলেছেন। তিনি হলেন বিখ্যাত নটগুরু মাইয়ারহোল্ড। স্তালিনের আমলে তাঁকে মঞ্চ ছেড়ে লেবার ক্যাম্পে কালাতিপাত করতে হয়। মাইয়ারহোল্ডের পুনর্মূল্যায়ন অবশ্য ঘটে কয়েক বছর আগেই এবং তাঁর জীবন ও মঞ্চ পরিচালনা কৌশল নিয়ে আলোচনার একাধিক বইও বেরিয়েছে। মঞ্চশিল্পীরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন।

বরিস পাস্তেরনাক

অনেক দিন পরে, বছর দুয়েক আগে, আন্না আখমাতোভার কয়েকটি স্বরচিত কবিতা বেরয় পত্রিকায়। বহু বছর ধরে আখমাতোভা নিজের লেখা থামিয়ে কেবল অনুবাদেই রত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। স্তালিনের আমলে তিনি ছিলেন নিষিদ্ধদের একজন। গত বছর তাঁরও কবিতা সংকলন বেরিয়েছে। আরো কয়েকজন নিন্দিত লেখকের বই গত বছর প্রকাশ পেয়েছে।

এই পরিবেশে একথা মনে করা চলে যে, পাস্তেরনাক ক্রমে তাঁর আসন ফিরে পাবেন। পাস্তেরনাকের যে নতুন বইটি বেরল তাকে হয়ত বসন্তের প্রথম পাখি বলা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কয়েকটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। বইটির প্রকাশ-সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। একটু যেন লুকিয়ে চুরিয়েই বইটি হঠাৎ বের করা হল বাজারে। ছাপানও হল এদেশের তুলনায় বেশ কম সংখ্যায়। সোভিয়েত দেশে অধিকাংশ বইয়ে, বিশেষ করে এ জাতীয় কাব্যসংকলনে, প্রথমেই থাকে লেখকের একটি ছবি আর তাঁর বিষয়ে একটি ভূমিকা। এ বইটি সে দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাই বোঝা যায়, সোভিয়েত সাহিত্যসমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ পাস্তেরনাকের প্রতি এখনো বিরূপ। পাস্তেরনাক এবং সেই সঙ্গে উদারনীতির পক্ষাবলম্বীদের তাঁরা ঠেকিয়ে রাখতে না পারলেও তাঁদের কাজকে কঠিন করে তুলেছেন। 'সোভিয়েত সাহিত্যসমাজ' কথাটি ব্যবহার করলাম এই কারণে যে, সরকার পক্ষ যদি পাস্তেরনাকের বিরোধিতা করতেন, তাহলে তাঁর বই মোটেই বেরত না। এবং যতদূর মনে হয়, বর্তমান নেতৃবৃন্দ সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে করপ্রসারে তেমন ইচ্ছুক নন। একথা আমরা জানি যে, সোভিয়েত দেশে দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত প্রভাবশালী স্তালিনপন্থী অনেকে ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা এখন পরাজয় মেনেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে স্তালিনপন্থীদের পরাজয় সম্পূর্ণ ঘটে কিনা সেটাই দেখবার। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত 'তেরকিন' উপন্যাস, সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের রচনা, আধুনিক ও তরুণ শিল্পীদের চিত্রকলা, চুখরাইয়ের চলচ্চিত্র, ওখলোপোভ কর্তৃক 'ইদিয়ান্দ' মঞ্চরূপ, ভাখতাঙ্গভ থিয়েটারে উকাতিমার কাহিনী, শস্তাকোভিচের নতুন রচনা কি সেই নির্দেশই দিচ্ছে না? বলশই থিয়েটার কর্তৃক বেলা বার্তকের সঙ্গীতে ব্যালে রচনা, বিশেষ করে লাভ্রভস্কির 'পাগানিনি' ব্যালেটি যার মঞ্চসজ্জা ও নৃত্যরচনা প্রচলিত সোভিয়েত রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত?

এখন প্রশ্ন, ডাঃ ঝিভাগো এদেশে বেরনর কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। উত্তর দেওয়া কঠিন। গুজব 'রমান' (উপন্যাস) পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যায় ডাঃ ঝিভাগো নাকি প্রকাশিত হয়েছে এবং সে সংখ্যা বাজারে না বেরিয়ে কিছু শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিক্ষক প্রভৃতির হাতে পৌঁছেছে। কিন্তু একথা সত্যি কি না সে বিষয়ে আপাতত কিছুই জানতে পারিনি। তবে একথাও বলা প্রয়োজন পরিচিত যে রুশরা বইটি পড়েছেন টাইপড্ স্ক্রিপ্টে বা বাইরে থেকে পেয়ে—তাঁরা কেউই সেটি পছন্দ করেননি। তাঁরা যে কেবল বাঁধাবুলি আওড়েছেন তা নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি তাঁদের বিচারবোধ, এমন কি রাজনৈতিক বিচারও—স্বতন্ত্র পথে চলে।

শুভময় ঘোষ

১৬ জানুয়ারি, রাত্রি

টোকিওতে আমাদের প্রথম দিন কাটলো। বিরাট নগর, পৃথিবীর মধ্যেই সবচেয়ে বড়ো আজকের দিনে, এক কোটি অধিবাসী নিয়ে ন্যু ইয়র্ক অথবা লণ্ডনকে ছাড়িয়ে গেছে। প্লেনে কিয়োটো থেকে এক ঘণ্টার পথ, তার মধ্যে পনেরো কিংবা কুড়ি মিনিট ধ'রে ফুজিয়ামা আমাদের দৃশ্য হ'য়ে রইলো। পাহাড়টি নিটোল ও ত্রিকোণ, ক্রমশ সরু হ'তে-হ'তে পরিচ্ছন্নভাবে উপর দিকে উঠে গেছে, এই শীতের দিনে প্রায় অর্ধাংশ তার তুষারে মোড়া। জাপানের অন্য সব-কিছুর মতো, এই বিখ্যাত পাহাড়টিও সুমিত ও সুচারু, এর সৌন্দর্য বেশ র'য়ে-স'য়ে ভোগ করা যায়, প্রবল আঘাতে নিশ্বাস কেড়ে নেয় না। রৌদ্রময় দিন ও তুষারময় চূড়া পরস্পরকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলছে; উভয় অর্থে দেখতে-দেখতে টোকিও এসে গেলো।

এয়ার-পোর্টে সস্ত্রীক এসেছেন সাবুরো ওটা। ইনিও অধ্যাপক, এবং জাপানি তুলনামূলক সাহিত্য-সংস্থার কর্মসচিব। স্বামী স্ত্রী দু-জনের মুখেই ভাঁজে-ভাঁজে হাসি, দু-জনের হাতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা। এঁদের সঙ্গে সুদীর্ঘ পথ গাড়িতে চলতে-চলতে টোকিওর বিশালতার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেলো। পথে পড়লো লৌহনির্মিত টোকিও-স্তম্ভ, ঈফেল-স্তম্ভের চেয়েও এর উচ্চতা বেশি। ইম্পীরিয়াল হোটেলে গাড়ি থামিয়ে আমার মনোমতো সিগারেটের টিন অনেকগুলো কিনে নিলুম; এ-বিষয়ে আমার ব্যাকুলতা দেখে ওটা কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করলেন। আমাকে স্বীকার করতে হ'লো—যা ইতিমধ্যেই আমার ব্যবহার থেকে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন—যে ঐ ক্ষীণ, শুভ্র ও বর্তুল ধূম্রশলাকা ব্যতীত আমার এক দণ্ড চলে না, অথচ আমার কণ্ঠনালী ও ফুশফুশে যে-সব সিগারেট সহ্য হয় তা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড ছাড়া অধিকাংশ দেশেই দুর্লভ। অতএব বিদেশে এসে আমার একটি প্রথম কর্তব্য হ'লো—আমার অনুমত ধোঁয়ার খোরাক সংগ্রহ করা; এবং এই কাজটি চুকে যাবার পরে এখন আমি টোকিওর জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত।

এক ঘণ্টায় অসংখ্য রাস্তা পেরোবার পর গাড়ি থামলো এশিয়া সেণ্টারের সামনে। এই আবাসটি ওটা আমাদের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, আমিও কলকাতায় ব'সে এতে সম্মতি জানিয়েছিলুম। কিন্তু এসে দেখি, বিজ্ঞাপনে ও বাস্তবে বেশি মিল নেই—কিংবা আমারই হয়তো বোঝার ভুল হয়েছিলো। যে-ঘরে নিয়ে গেলো তাতে শয়ন ভিন্ন অন্য কোনো কর্ম অসম্ভব, বাথরুমে শরিক একাধিক, বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে হ'লে জিমনাসটিক্সের কসরৎ ভিন্ন উপায় নেই। দামে শস্তা, আমরাও লক্ষপতি নই, কিন্তু সহনীয়রকম আরাম চাই তো। প্র. ব. ও আমি ম্লানভাবে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছি;

এদিকে ওটা তাগাদা দিচ্ছেন এক্ষুনি লাঞ্চ খেয়ে নিতে, নয়তো কাফেটেরিয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। কাফেটেরিয়া শুনে মনটা আরো দ'মে গেলো, ট্রে হস্তে বাঁধা-ধরা সময়ে লাইনে না-দাঁড়ালে খাবার জুটবে না? আসলে ভবনটি একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস; এবং যদিও আমাকে বিদ্যার্থী বললে ব্যাকরণের ভুল হয় না, এবং আমার হৃদয় এখনো তারুণ্যের দ্বারা আক্রান্ত ব'লে আমি দাবি ক'রে থাকি, তবু এক দল সচল, সশব্দ ও অত্যুৎসাহী যুবক-যুবতীর সংসর্গে এক অপরিসর স্বল্পাসবাব ঘরের মধ্যে সপ্তাহকাল যাপন করার প্রস্তাবটিকে কোনোরকমেই মনোরম ব'লে মানতে পারলুম না। কিন্তু আমরা এখানে থাকতে না-চাইলে ওটা যদি কিছু মনে করেন? বা তাঁকে বিব্রত করা হয়?— নাঃ, এ-সব বিষয়ে চক্ষুলজ্জাটা কিছু কাজের নয়, তাঁকে খোলাখুলি মনের কথা বলাই ভালো। মনস্থির ক'রে বেরিয়ে এসে দেখি, ওটা-দম্পতি লাঞ্চের মধ্য-পথে; আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে তাঁরা যে নিজেরা অভুক্ত থাকলেন না, এতেও প্রমাণ পেলুম জাপানিদের সংসারযাত্রা কত গভীরভাবে পশ্চিমধর্মী—বা আসলে হয়তো এই বাস্তবনিষ্ঠা তাঁদের নিজেদেরই স্বভাবসিদ্ধ। আমাদের আবেদন শুনে ওটার কোনো ভাবান্তর হ'লো না; খাওয়া শেষ ক'রে ছিপছিপে শরীরে কর্মঠভাবে তিনি

উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর তৃতীয় বা চতুর্থ টেলিফোন সফল হ'লো, আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে বদলি হলুম গিনজা টোকিও হোটেলে। তারপর চা, স্যাণ্ডুইচ, আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচির আলোচনা; এমনকি, কিছুটা হাস্যপরিহাস। 'এমনকি' বলছি এইজন্যে যে হাস্যপরিহাসের জন্য অনেকখানি ভাষার প্রয়োজন হয়, এবং ওটার ইংরেজি বেশ শড়োগড়ো। সন্দেহ নেই, এ-বিষয়ে তিনি জাপানিদের মধ্যে অসামান্য ব্যতিক্রম।

হোটেলের সামনেই গিনজা স্ট্রীট, শহরের বড়ো-বড়ো দোকানপাট সব এই রাস্তায়। সন্ধেবেলা সেদিকে আমাদের অভিযান হ'লো। প্রশস্ত পথ, বিপুল জনতা, অসংখ্য যান, অন্তহীন নিয়ন-চিহ্ন, প্রকাণ্ড সুশৃঙ্খল শব্দহীন ব্যস্ততা। কাউকে চোখ বেঁধে এনে ছেড়ে দিলে তার হঠাৎ মনে হবে কোনো মার্কিনী শহর। সবুজ সংকেতে রাস্তা পেরোবার ভিড় দেখলে মধ্য-নাগরিক মানহাটানের কথাই মনে পড়ে। আর বিভাগীয় বিপণীগুলি—আয়তনে ও ঐশ্বর্যে গিম্বেলস মেসির সমান না হোক, আকর্ষণে কারো চাইতেই কম যায় না। পণ্যবস্তু বহু ও বিচিত্র, সজ্জা নয়নহরণ, ব্যবস্থাপনা অনিন্দ্য। সব দেশেই, বেচা হ'য়ে গেলে, জিনিশটাকে কোনো বাক্সে বা ঠোঙায় পুরে ক্রেতার হাতে দেয়া হয়, আর সেই আধারগুলোকে সুদৃশ্য ও সুবহ করতেও সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু এই গৌণ ব্যবসায়িক বিষয়টিকে জাপানিরা যে-রকম একটি গৌণ ললিতকলায় পরিণত করেছে, সে-রকম অন্য কেউ পারেনি, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব হ'লেও আমার মনে হয় না। আছে একটি সূক্ষ্ম জাপানি স্পর্শ, তা বিশ্লেষণের অতীত, বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো যায় না, কিন্তু চলতে-ফিরতে সমস্ত ব্যাপারেই তা ধরা পড়ে। এখানে অনেক কিছুরই বাইরের চেহারা আমেরিকার মতো। এশিয়ার অন্য কোনো-কোনো দেশেও এখন এই ভাবটি দেখা দিচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য দেশে মনে হয় যে যথেষ্ট আমেরিকার মতো হচ্ছে না, আর জাপানে এলে দেখা যায় যে মার্কিনী ধরনের সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করা হয়েছে, যা খাশ মার্কিনীর পক্ষেও নতুন ও উপাদেয়।

ফেরার পথে ফুটপাতে একটি অন্ধ ভিখিরি দেখলাম। পাশে ভিক্ষাপাত্র, গায়ে শীতবস্ত্র নেহাৎ কম নেই, পিছনে এক ভক্ত কুকুর অটলভাবে আসীন। কুকুরটির চোখে করুণা, মাঝে-মাঝে সামনের পা তুলে সে এমনভাবে আবেদন জানাচ্ছে যে কিছু দেবার লোভ সংবরণ করা প্রায় অসম্ভব। পশুটির, এবং তার প্রভুর, দু-জনেরই বেশ পুষ্ট চেহারা, উপবাসজনিত কার্শ্যের কোনো লক্ষণ নেই। আবার আমার মার্কিনদেশ মনে পড়লো। এক বরফ-পড়া সন্ধেবেলা ন্যু ইয়র্কের সেভেন্থ এভিনিউতে একটি ভিখিরি দেখেছিলাম। কলকাতার পুলিশম্যানদের মতো একটা আঁটো কাঠের ঘরের মধ্যে সে ঢুকে আছে, যখন চলে ঐ ঘরটাকে ঘাড়ে নিয়েই চলে, ওভারকোট টুপি ইত্যাদির দ্বারা সে এমনভাবে আচ্ছাদিত যে চোখ দুটি ছাড়া তার মুখের প্রায় কিছুই দেখা যায় না; হঠাৎ দেখলে দৈত্য-দানব ব'লে ভুল হয়। শীতের দেশে ভিক্ষে করতে হ'লেও অন্ততপক্ষে জামা-জুতো যথেষ্ট চাই।

১৭ জানুয়ারি

কপালগুণে এই হোটেলটা চমৎকার। আইনমাফিক পয়লা-নম্বরি নয়, মার্কিনী তিন-তারার পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু হয়তো সেইজন্যেই বেশি উপভোগ্য। আড়ম্বর অফুরন্তভাবে বাড়িয়ে চলা যায়, কিন্তু অচিরস্থায়ী অতিথির আরাম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এর চেয়ে বেশি ব্যবস্থা আর কী হ'তে পারে, তা ভেবে পাওয়া শক্ত। সামনের কাচের দরজাটি দুই পাল্লার; ঢোকার ও বেরোবার সময় কাছে আসামাত্র নিজে-নিজেই খুলে যায়। প্রশস্ত লাউঞ্জ; কেরানি ও পরিচারকেরা সংখ্যায় যেমন বেশি মনোযোগেও তেমনি অক্লান্ত; যে-কোনো কাজ সম্পন্ন হ'তে দু-এক মিনিটের বেশি সময় লাগে না। হোটেলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের চারটি ভোজনালয়; তার মধ্যে যেটি লঘুপথ্যের জোগানদার সেটি দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। বেসমেন্টে সারি-সারি দোকান, আধ ঘণ্টা খুচরো সময় কাটাবার পক্ষে জায়গাটি বেশ। আমাদের ঘরে আছে বিশ্রামের সোফা, লেখার টেবিল, দেরাজে চার-পাঁচরকম চিঠির কাগজ, রাতে শুয়ে বই পড়ার জন্য যে-বাতি দিয়েছে তা অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল এই তিন রকম শক্তি ধারণ করে। বাথরুমের সাজ-সরঞ্জাম প্রায় বিলাসিতার পর্দায় বাঁধা, শয্যারচনা মনোরম, নকলীপশমের কম্বলটির উষ্ণতা, কেন্দ্রীয় তাপের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে, রাতে আমাদের গ্রীষ্মমণ্ডলে বদলি ক'রে দেয়। কাপড়ের আলমারিতে কিমোনো ও সুতির চটি রাখা আছে; ভোরবেলা চায়ের ট্রেতে খবর-কাগজ দিয়ে যায়, আর দেয়, সাবান তোয়ালে ইত্যাদির মতো, প্রত্যহ নতুন কয়েকটি দেশলাই। ও-রকম সুন্দর দেশলাই ও আর-কোনো দেশে আমি দেখিনি—কাজে অমন মজবুত, আর দেখতে অমন অসাধারণ ভালো।

হোটেলের লিফট চালায় মেয়েরা। বড়ো লিফট, ভিতরে রেডিও চলছে, তার আলো নয়নাভিরাম এবং চালিকারাও তা-ই। দিনের মধ্যে তিনবার সাজ-বদল করে এরা; সকালে দুপুরে আলাদা রঙের স্কার্ট, সন্ধ্যায় পরে কিমোনো। এদের কপোল অরুণবর্ণ, চোখ-মুখ অহরহ সহাস্য, একই লোক পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনবার ওঠা-নামা করলেও বিরক্তির রেখামাত্র পড়ে না, ধন্যবাদ জানালে পাৎলা লাল ঠোঁট খুলে উজ্জ্বল দাঁতে পাখির মতো গলায় বলে, 'You are welcome'। লিফটগুলো স্বতশ্চল, অর্থাৎ চালক অপরিহার্য নয়, এই মেয়েদের আসল কাজ হয়তো শোভাবর্ধন, এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে মানতেই হবে যে এই উদ্দেশ্য এরা প্রভূতভাবে সার্থক করেছে। ব্যাবসাদারি? হ্যাঁ—হয়তো—নিশ্চয়ই—কিন্তু আর কোন দেশে ব্যাবসাদারি এমন মনোমুগ্ধকর?

একবার 'কুইন মেরী' জাহাজে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলাম। কাকে বলে বিলাসিতা, 'রাজার হাল' কথাটার অর্থ কী, সেই পাঁচ দিনে সে-বিষয়ে কিছু ধারণা হয়েছিলো। সকালে চোখ মেলার মুহূর্ত থেকে রাতে ঘুমের সময় পর্যন্ত অফুরান সেবা ও সম্ভোগের ব্যবস্থা প্রতিটি ঘণ্টাকে চিহ্নিত ক'রে দিচ্ছে। শুধু পান-ভোজনের আয়োজন এমন বিপুল যে মনে হয় কোনো পুরাণকাহিনী বাস্তব হ'য়ে উঠলো। ভোজনশালার কাচের দরজা খুলে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে দুটি রাফায়েলের দেবদূত, আর ভিতরে এক রুবেন্সীয় জগৎ ঐশ্বর্যে ও ইন্দ্রিয়বিলাসে উদ্বেল। অন্তহীন উপচয়ের মধ্যে এই মর্তপ্রকৃতির কোনো সৃষ্টি বাদ পড়েনি: পশু, পাখি, অণ্ড ও জলজন্তু প্রাণী; শাক, শস্য, দুগ্ধদ্রব্য; পঞ্চাশ রকম 'অর্দভ' বা 'সৃষ্টিছাড়া' ছোটো-ছোটো খাবার; পঞ্চাশরকম সুপ ও পনির; অতিকায় আঙুর, আপেল ও হেমন্তের অন্য সব দান; যেন স্বর্গের চাবি কোমরে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গম্ভীরদর্শন মদিরা-রক্ষী; উচ্ছল পাত্র; নীল আগুনে সুবাসিত মাংস; আসব-রঙিন মিষ্টান্ন; কফির ঘ্রাণ, সিগারেটের ধোঁয়া—রূপে, রসে, তাপে, সৌগন্ধ্যে বিশাল কক্ষটি যেন বাষ্পাকুল হ'য়ে আছে। এক-একবার আহার শেষ ক'রে আপনি ডেক-এ গিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন, তক্ষুনি কোনো পরিচারক ছুটে এসে আপনার গায়ে কম্বল বিছিয়ে দিলে, পায়ের সামনে এগিয়ে দিলে চৌকি; আরামে হয়তো তন্দ্রা এসেছে আপনার, কিন্তু একটু পরেই সামনে নিয়ে এলো 'বীফ-টী' বা গোমাংসরস, অথবা বৈকালিক চা। প্রকাণ্ড জাহাজের মধ্যে যেখানেই আপনি যাবেন সেখানেই প্রাচুর্য ও বিলাসিতা, সেখানেই ভোগের আমন্ত্রণ অবারিত। কিন্তু আপনি যেহেতু ইন্দ্র অথবা জুপিটার নন, একজন মানুষমাত্র, এবং মানুষের শক্তি ও সময় যেহেতু শোচনীয়-রূপে সীমিত, সেইজন্য এই প্রাচুর্যই অবসাদের জন্ম দেয়, নিঃশ্রম নিশ্চিন্ত দিনগুলিতে যেন মৃতের প্রচ্ছদ নেমে আসে। আপনাকে তাই খুঁজে-খুঁজে বের করতে হয় কোথায় আছে একটু নির্জনতা, যেখানে দাঁড়িয়ে আটলান্টিকের বড়ো-বড়ো পাগল ঢেউগুলির উপর দিয়ে আপনি আপনার মনকে মেলে দিতে পারেন, বা দেখতে পান বিকেলের আলোয় রূপবান নাবিক যুবাদে

অবসর-যাপনের হিল্লোল; বা সূর্যাস্তের সময় পিছন দিকের ছোটো খোলা ডেকটিতে শক্ত ক'রে থাম আঁকড়ে দাঁড়াতে হয়, পাছে দারুণ হাওয়া উড়িয়ে ফেলে দেয় আপনাকে; বা বেশি রাত্রে পানশালা নৃত্যশালা এড়িয়ে উঠে আসতে হয় একেবারে উপরকার ডেক-এ, যেখানে নেই মানুষ আছে আকাশ, আর অন্ধকারে দিকদিগন্ত আবৃত, আর মাস্তুলের আলোতে আর তারাতে মিলে যেন কোন অনন্তকে মূর্ত ক'রে তুলছে, আর যেখানে বাতাসের ও সমুদ্রের গর্জনে আবার আপনি শুনতে পাবেন আপনার হৃদয়ের ক্রন্দন -সেই গোপন, সেই দুর্বোধ ভাষা, যা অকথ্য এবং অসহ্য হ'তো যদি না শুধু কবিতা থাকতো আমাদের স্মরণে ও সম্ভাবনায়।

কিন্তু আমাদের এই হোটেলটি কোথাও মরমের সীমা লঙ্ঘন করেনি; যা-কিছু থাকলে সুখ হয় তা সবই আছে, কিন্তু কোনো বিষয়ে আতিশয্য নেই ব'লে উপভোগের স্পৃহা অথবা শক্তি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে না। তাছাড়া বক্তৃতা ইত্যাদি ব্যাপারে টোকিও আমাকে বেশ খানিকটা খাটিয়েও নিচ্ছে, এবং পরিশ্রমের পরে এলেই সুখ সুস্বাদু।

অন্য একটা কারণে জাপান খুব আরাম-প্রদ; সারা দেশটা পারিতোষিকের উৎপাত-রহিত; হোটেলের বিল-এর মধ্যে যেটুকু ধরে নেয় তার উপরে এক ইয়েনও কারো প্রত্যাশা নেই। প্রতীচীর সঙ্গে তুলনায় এবং প্রতিতুলনায় অনেক ক্ষেত্রে জাপান নিশ্চয়ই জিতে যাবে।*

১৮ জানুয়ারি

আমাদের আজকের দিনটা টোকিওর বাইরে কাটবে; ওটা আমাদের সঙ্গী।

দৈনিক যাত্রীতে বোঝাই ট্রেনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চলেছি। কেজো সকালবেলা এখন; টোকিও আর য়োকোহামার মধ্যে দুই দিকে মিনিটে-মিনিটে ট্রেন ছুটছে; বিশ শতকের সমস্ত উদ্যম ও উপায়নৈপুণ্য এই দুই নগরকে মিলিয়ে দিয়ে প্রখর স্রোতে প্রবাহিত। ভিড়ের ধরনটা প্রতীচ্য; কেউ কথা বলছে না, প্রায় সকলের চোখই খবর-কাগজে নামানো, স্টেশনে-স্টেশনে নামা-ওঠার কাজটি নিঃশব্দে ও দ্রুতবেগে সম্পন্ন হচ্ছে। য়োকোহামা পেরিয়ে আমাদের অন্য একটা ট্রেনে উঠতে হলো; সেটা একেবারে ফাঁকা, বড়ো কোনো কর্মস্থলে যাচ্ছে না, বোঝা যায়। চোখে পড়লো কামরার প্রসাধন,

* কয়েকদিন পরে সান ফ্রানসিস্কোতে আমরা যে-হোটেলে উঠলাম তার নাম মার্ক হপকিন্স; আগে জানতুম না হোটেলটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। সেখানে আমাদের জানলার বাইরে ছিলো উপসাগর, পুলের উপর দিবা-রাত্রি স্রোতের মতো মোটরগাড়ি; ঘরের মধ্যেও অভাব কিছু ছিলো না। ভালো নিশ্চয়ই; কিন্তু বলতেই হবে যে গিনজা টোকিওর মতো সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে পাইনি, যদিও মূল্য দিতে হয়েছে তিনগুণেরও বেশি। জাপানি জিনিশপত্র দামে শস্তা, কিন্তু গুণ-পনায় অত্যুৎকৃষ্ট। আমি ধনবিজ্ঞানী নই, কেমন ক'রে জাপানিরা এই অসাধ্যসাধন করে বলতে পারবো না; অনুমান করি এর একটা কারণ এই যে মজুরির হার জাপানে তেমন উঁচু নয়। কিন্তু গুণের সঙ্গে কম-দামের এই সমন্বয় পশ্চিম জর্মানিতেও লক্ষ করেছি।

আসনের গদির রংটি গাঢ় নীল, হাতের কাছে ছাইদান আছে, মেঝে, জানলা, জানলার কাচ সব ঝকঝকে পরিষ্কার। পরিচ্ছন্নতার কোনো প্রতিযোগিতা হ'লে পৃথিবীর মধ্যে জাপানের জয় অনিবার্য।

যে-স্টেশনে নামলুম তার নাম মাচিদা-সিটি। ('City' শব্দের মার্কিনী অর্থ জাপানিরা মেনে নিয়েছে, দেখছি; যে-কোনো ছোটো শহর বা বড়ো গ্রামকে ঐ আখ্যা দিতে এদের বাধে না।) কাছেই টামাগাওয়া গাকোয়েন; 'গাকোয়েন' শব্দের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিদ্যায়তনটির সুখ্যাতি দেশে থাকতেই শুনেছিলুম। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কুনিয়োশি ওবারা; জনশ্রুতি থেকে মনে হয়েছে যে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর আদর্শ কিছুটা রবীন্দ্রনাথের মতো; শহরের বাইরে, 'প্রকৃতির বক্ষে' এই জাপানি আশ্রমের চেহারাটা চোখে দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিলো।

ওবারা গাড়ি পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য, পাঁচ মিনিটে বিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। কাছিমের পিঠের মতো একটি পাহাড়, তার ধাপে-ধাপে বিদ্যালয়টি ছড়ানো। পাহাড়ের মধ্যপথে গাড়ি থামলো, গাছপালা নিবিড় সেখানে, চূড়ায় দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের চ্যাপেল বা—শান্তিনিকেতনের ভাষায়—মন্দির। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ওবারা-পত্নী দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় ক'রে আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে উপস্থিত হলুম। প্রটেস্টান্ট গির্জের মতো কক্ষটি, সেই রকমই ঠাণ্ডা। দুই সারিতে আলাদা হ'য়ে বসেছে য়ুনিফর্ম-পরা ছাত্র ও ছাত্রীরা, তাদের বয়স আট-দশ থেকে পনেরো-ষোলোর মধ্যে; তাদের উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি থেকেই বোঝা গেলো তারা শৃঙ্খলায় অত্যন্ত বেশি অভ্যস্ত। বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি বাইবেল থেকে উপদেশ শোনাচ্ছেন, দৃষ্টিপাতমাত্রই বুঝতে পারলুম, ইনিই ওবারা। বৃদ্ধ, কিন্তু চেহারা যুবকের মতো সতেজ; পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ-কামানো, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; একমাথা রূপোলি চুলের তলায় মুখখানা সুগোল, স্নিগ্ধ ও গোলাপি রঙের; সব মিলিয়ে ও-রকম একটি সুদর্শন পুরুষ যে-কোনো দেশেই বিরল। বাইবেল থেকে নীতিশিক্ষাদান শেষ ক'রে তিনি আমাদের বিষয়ে ও উদ্দেশে দু-চার কথা বললেন; ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে নির্ভুল সুরে 'জনগণমন' গাইলো, তারপর আমাকে অল্প কিছু বলতে হ'লো, প্র. ব. শোনালেন কয়েক পংক্তি রবীন্দ্র-সংগীত। দেশপ্রেম বা রবীন্দ্র-ভক্তি কোনোটাই আমার পেশা নয়, কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানি ছেলেমেয়েদের মুখে 'জনগণমন' গান শুনে আমি ঈষৎ বিচলিত না-হ'য়ে পারলুম না। তার কারণ বোধহয় ভারতবর্ষ যতটা, তার চেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথ।

লাঞ্চের আগে ও পরে, ওবারার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বিদ্যালয় দেখলুম। দিনটা কনকনে ঠাণ্ডা; তার উপরে, কী কারণে জানতে পারিনি, ওবারা তাঁর আশ্রমের মধ্যে টুপি পরা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। আমি তাই যখনই যে-ঘরে ঢুকছি, প্রথমেই খানিক দাঁড়িয়ে নিচ্ছি চুল্লির ধারে, চেষ্টা করছি অন্ততপক্ষে হাত দুটোকে তাতিয়ে নিতে। আমরা যাকে লেখাপড়া বলি, বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা তাতে আবদ্ধ নয়; আছে নানা রকম হাতের কাজ ও যন্ত্রবিদ্যা, সব্জিখেত মাছের পুকুরও বাদ পড়েনি, কাচের ঘরে উত্তাপে লালিত হচ্ছে বিরল ও মূল্যবান গাছপালা। কলাভবন ও চিত্রশালাটি রীতি-মতো উল্লেখযোগ্য ব'লে বোধ হ'লো। ছাত্রদের ছবি দেখেও বোঝা যায় যে জাপানি চিত্র-কলার ঐতিহ্যে কখনো ভাঙন ধরেনি, বা এখানে 'ঐতিহ্য' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়নি 'অচলায়তন'—নিজেদের উপর আস্থা রাখে ব'লেই এরা জগতের দিকে সবগুলো দরজা-জানলা খুলে রেখেছে। জাপানের অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো, এখানেও ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যিক, শেখানো হয় অত্যাধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে। ক্লাশে শিক্ষয়িত্রী একজন থাকেন বটে, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের আসল কাজ হ'লো কানে যন্ত্র লাগিয়ে রেকর্ড শোনা। কয়েক মিনিট আমিও কান পাতলুম তাতে; ধীরে-ধীরে, স্পষ্ট ক'রে, মার্কিনী উচ্চারণে বলা হচ্ছে: 'Mary, Mary, get up from bed. It is time to go to school.' একই কথা আটবার, দশবার ক'রে বলা হচ্ছে, যাতে শিশুদের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যায়। শুধু যদি বলতে শেখানো উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে এই উপায় নিশ্চয়ই প্রশস্য; কিন্তু অনুমান করছি এটা জাপানে সম্প্রতি আমদানি হয়েছে, কেননা যাঁদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করছি তাঁরা অনেকে পণ্ডিত হ'লেও নামমাত্র ইংরেজি বলেন। স্বয়ং ওবারা তাঁদেরই একজন।

একটি পঞ্জাবি যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'লো; সে কোনো-একটা ফলিত বিজ্ঞান শিখছে এখানে, সামনের বছর দেশে ফিরে যাবে। জাপানি ভাষা বেশ রপ্ত হ'য়ে গেছে ছেলেটির, তা না-হ'লে এ-দেশে কিছুই শেখা যায় না। শুনলুম, প্রতি বছর একটি ক'রে বিদেশী ছাত্রের পড়া-খরচ অন্যান্য ছেলেমেয়েরা চাঁদা ক'রে জুগিয়ে দেয়, য়োরোপের অতিদূরবর্তী দেশ থেকেও মাঝে-মাঝে ছাত্র আসে এখানে, নানা দেশের সঙ্গে যোগস্থাপনে এঁরা নিত্যসচেষ্ট। যাকে বলে মানবিক বিদ্যা, এই প্রতিষ্ঠানের ঝোঁকটি ঠিক সেদিকে নয়; 'skills and technics' শিখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংসারের জন্য সক্ষম ক'রে তুলছেন এঁরা; ব্যায়াম তাই আবশ্যিক, ঘর পরিষ্কার বিছানাপাতা ইত্যাদি কাজ নিজেদেরই করতে হয়; প্রয়োজনমতো সমাজসেবাতেও ডাক পড়ে। আমি বালক বয়সে এ-রকম বিদ্যালয়ের ছাত্র হ'লে সুখী হ'তে পারতুম না; কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে বেড়াতে এসে বেশ ভালো লাগছে।

একটা জিনিশ আমার কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেলো: প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় কেন। ছাত্রছাত্রী অধিকাংশই নাবালক, এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকেও তেমন ব্যাপ্তি নেই; আমাদের হিশেবে এটি একটি অত্যুৎকৃষ্ট মহাবিদ্যালয়। কিন্তু জাপানে শিক্ষায়তনের পরিভাষা বোধহয় অন্য রকম; কেননা এক টোকিওতেই, শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় আছে পঞ্চাশটি, যা পৃথিবীর অন্য যে-কোনো নগরের পক্ষে কল্পনাতীত। এমন কি হ'তে পারে না যে অন্যান্য দেশে যাকে 'স্কুল' ব 'কলেজ' বলে, এখানে সেগুলোই আকারে বড়ো হ'লে বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে গণ্য হয় খোঁজ নিয়ে যতটা জানতে পেরেছি, মনে হয় ব্যাপারটা তা-ই।

অপরাহ্নে ওবারার বাসভবনে একটু বিশ্রাম। ঠাণ্ডায় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর চুল্লির ধারে বসতে পেরে কৃতজ্ঞ বো করলুম, এবং আমাদের পক্ষে সেই মুহূর্তে যার মতো বাঞ্ছিত জিনিশ আর-কিছু ছিলো না, সেই 'কাজো' বা ভারতীয় পরিবেশনে শ্রীমতী ওবারার তৎপরত আমাদের মুগ্ধ করলে। তাঁর কাছে, অন্যা বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা চারে পরে গাড়িতে উঠলুম। ওবারা আমাদে সঙ্গে চলেছেন, তিনিই নিমন্ত্রণকর্ত আমাদের রাত্রিবাস হবে হাকোনেতে।

চলেছি গ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু 'গ্র বলতে আমাদের ভারতীয় মনে যে-ছ জেগে ওঠে তার সঙ্গে এর কিছুই মেলে ন নেই উদার আকাশ অথবা সীমাহ প্রান্তর; পাহাড়ি দেশ শীতে ঘান নিসর্গ, কৃষকদের কুটির, মাঝে-মাঝে ছোে ছোটো শহরে কাচের দরজাওলা দোক সব-কিছুই প্রতীচীর সঙ্গে সুরে বাঁধা। পথ দিয়ে চলেছি তা গেছে টোকিও থে কিয়োটো পর্যন্ত; পুরোনো ঐতিহাসিক পথ এটি, ছবিতে ও কাব

বিখ্যাত, পূর্বযুগে যাত্রীরা যাতায়াত করেছে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চ'ড়ে। তখন এর নাম ছিলো টোকাইডো—যার অর্থ 'পূর্ব-সাগরের মুখোমুখি পথ'; এক-এক দিনের ভ্রমণের ব্যবধানে তিপ্পান্নটি বিশ্রামস্থল গ'ড়ে উঠেছিলো—পাহাড়ের কোলে, হ্রদের তীরে, পাইন-বনের শান্ত নির্জনতায়। অনেকবার মোড় নিতে-নিতে আমাদের সামনেও খুলে গেলো সেই 'পূর্বসাগর'—সন্ধ্যার ছায়ায় ইস্পাত রঙের প্যাসিফিক; তার ধার দিয়ে একটি রেলগাড়িকে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখলুম। আমাদের মোটরগাড়িও উপকূল ঘেঁষে চললো খানিকক্ষণ, নামলো রাত্রি, ধীরে এগিয়ে এলো পথের দু-ধারে আলো-জ্বলা বাড়ি আর দোকান;—এই জায়গাটাই হাকোনে।

দোতলা একটি কাঠের বাড়ির সামনে আমরা নেমেছি। তক্ষুনি সামনের ঠেলা দরজা খুলে গেলো, একটি ছিপছিপে যুবক বেরিয়ে এসে নতজানু হ'য়ে অভিবাদন করলেন। ওবারার প্রাক্তন ছাত্র ইনি, এই সরাইখানার মালিক; বোঝা গেলো, ওবারা আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন, আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। আমরা ভিতরে যেতেই একটি দাসী এগিয়ে এসে নতজানু হ'লো আমাদের জুতো খুলে নেবার জন্য, যথারীতি কাপড়ের চটি প'রে আমরা দোতলায় এলাম। বলতে পারবো না সিঁড়িটি কী সুন্দর ও নির্মল, ঘরটি কী সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তা বলা যাবে না। আভরণ স্বল্প, সেই স্বল্পতাই সবচেয়ে বড়ো আভরণ। জাপান বিষয়ে ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু শুনে আসছি, যা-কিছু পড়েছি, কল্পনা করেছি বা ছবিতে দেখেছি, ঐ ঘরটিতে ঢোকামাত্র হঠাৎ সব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো, যেন জাপানের অন্তরাত্মার একটি রূপ দেখতে পেলাম। মাদুরে মোড়া মেঝে, অর্ধেক মাদুরে মোড়া দেয়াল, দেয়ালের ও সীলিঙের কাঠে অল্প কারুকার্য, বসবার ব্যবস্থা মেঝেতে। পাশে ছোটো শোবার ঘর, পিছন দিকের লম্বা বারান্দায় হালকা চেয়ার অপেক্ষা করছে, তার ভোক্তা হবার ইচ্ছে থাকলেও এই শীতের রাত্রে কারোরই সাধ্য নেই। বারান্দার তলা দিয়ে, পাথরে-পাথরে প্রতিহত হ'য়ে, ছলচ্ছল শব্দে ব'য়ে চলেছে ক্ষীণকায় গিরি-স্রোতস্বিনী, তার ওপারে গাছপালার অন্ধকার। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার মনে হ'লো যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বাড়িগুলোতে সাজসজ্জার যে-বৈশিষ্ট্য দেখেছিলাম তার ধরনধারন কিছুটা জাপানি।

ফুজিয়ামা কাছেই। এখন আর অগ্নি-উদ্গিরণ নেই তার, শুধু জ্বালাময় স্মৃতি উপকারী উষ্ণ প্রস্রবণে নিহিত হ'য়ে এই অঞ্চলে প্রচুরভাবে ছড়িয়ে আছে। যাঁরা বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যের সন্ধানী, এবং যাঁরা দুশোর প্রেমিক, তাঁদের সকলের পক্ষেই হাকোনে একটি পীঠস্থান। আমাদের সরাইখানার তলাতেই একটি প্রস্রবণ লুকোনো। লুকোনো বলছি এইজন্যে যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই; নৈসর্গিক তপ্ত জলকে অনেকগুলো ছোটো-ছোটো কুঠুরির মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তার একটাতে ঈষৎ শঙ্কিত চিত্তে নাইতে ঢুকলুম। বাষ্পে ঘন হ'য়ে আছে কুঠুরিটা, চোখে ভালো দেখা যায় না প্রথমে, একটা চৌবাচ্চার মধ্যে অনবরত সধূমে জল প্রবেশ করছে, আর-এক পাশে টবে রাখা আছে ঠান্ডা জল। যদিও সব রকম ব্যবস্থাই ছিলো, আমি পায়ের মোজা ভিজিয়ে-টিজিয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে আঁচরেই ঘরে ফিরে এলুম; কিন্তু এটা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হ'লো না যে যারা হাত-পা ব্যবহারে আমার চেয়ে পটু, তারা এখানে স্নান ক'রে অগাধ আরাম পাবেন। বন্ধু ওটাকেই দেখলুম নগ্ন গাত্রের উপর কিমোনো জড়িয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত মুখে বেরিয়ে আসছেন।

এবার মেঝেতে ব'সে জাপানি ধরনে সান্ধ্য-ভোজ। নিচু, চৌকো টেবিলের চারদিকে চারজনে বসেছি, সকলের গায়েই সরাইখানার দেয়া কিমোনো। সুকোমল আসন, চেয়ারের মতো হেলান দেবারও ব্যবস্থা আছে। টেবিলের তলার দিকটায় কম্বল বিছোনো, সেই কম্বলের ভিতর দিয়ে পা গলিয়ে দেয়ামাত্র নিচে অতি সুখপ্রদ তাপ অনুভূত হ'লো। মেঝের তক্তা সরিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানে, তলায় তাপপাত্র জ্বলছে; যদি আমরা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতুম, আর টেবিলের তলায় থাকতো অগ্নিকুণ্ড, তাহ'লে যা হ'তো তার চেয়ে আরাম কিছুমাত্র কম মনে হ'লো না। পায়ের তলায় তাপ, পাশে তাপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে, হাঁটুর উপরে কম্বল, কণ্ঠনলীতে উষ্ণ সাকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে—সারাদিন পরে এতক্ষণে সত্যি-সত্যি শীত ভাঙানো গেলো। ওবারার গোলাপি রঙের মুখটি হাসিতে ও সরলতায় উদ্ভাসিত, আমাদের সুখী হ'তে দেখে আনন্দিত তিনি, আমরা যা-কিছু বলি তার ভাষা না-বুঝেই সারা মুখে প্রীত হ'য়ে ওঠেন, ওটা কথাটা বুঝিয়ে দিলে পরে তার যথাযোগ্য উত্তর দেয় আবার তাঁর অনাবিল হাসি ও চোখের উজ্জ্বলতা। এমনি বিকশিত মনে, মাঝে-মাঝে বিশ্রাম নিয়ে, কৌতুক ও প্রীতি-বিনিময়ের ফাঁকে-ফাঁকে, আমরা পাচকের প্রতি সুবিচার করতে লাগলুম;—এক ঘণ্টার আগে ভোজন শেষ হ'লো না। শুতে গিয়ে দেখি, রেশমের লেপের তলায় বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র দিয়েছে; ঘর অন্ধকার ক'রে দেয়ামাত্র শিয়রে নদীর কলতান ধ্বনিত হ'লো। সেই শব্দ শুনতে-শুনতে—ঘুমিয়ে পড়লুম বলতে পারলেই শোভন হ'তো, কিন্তু জানি না কেন, হয়তো ঘরে অত্যধিক তাপের জন্যই, অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না।

(ক্রমশ)

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪০৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

মনের যন্ত্রের তার ঢিলে হয়ে গেছে—কিছুতে ঠিক সুর লাগচে না—ঝন্‌ঝন্ করচে—তাই ঠাঁই বদল করে দেখবার জন্যে শ্রীনিকেতনে যাবার সঙ্কল্প মনের মধ্যে গুনগুন করচে। ভেবেছিলুম বৌমা এলে তাঁকে দেখে তার পরে যাব, কেননা দুই অচলের দেখা সম্ভব হয় না যদি পরস্পর তফাতে থাকি। কিন্তু তিনি ডাক্তারের জালে আটকা পড়েছেন খুব শীঘ্র ছুটি পাবার আশা নেই শুনেচি, তাই যাবার দিকে পা বাড়িয়েছি। তুমি যদি শীঘ্র পা চালিয়ে আসতে পারো তাহলে মন্দ হয় না—দেখা সাক্ষাৎ সেরে যাত্রা করতে পারি। খবর নিয়ে জানা গেল ওখানে স্থানাভাব। যদি তোমার আসা সম্ভব হয় তাহলে সেই ভরসায় আরো কয়েকদিন থেকে যেতে পারি।—জগদীশের (১) মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল। তাঁর শেষ অবসান অত্যন্ত অনুজ্জ্বল—কয়েক বছর আগে কে এমন কল্পনা করতে পারত। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য—ঐশ্বর্য যদি বা থাকে, পাত্র থাকে ভাঙা—অনেক আশা করেছিলুম, সেই আশা বাইরে হোলো বিলুপ্ত তার স্মৃতি রইল আমার কাব্যে। ২৩।১১।৩৭

কবি

১। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

॥ ৪০৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এতদিনে ফিরে এসেছি। আমি উঠেছি শ্রীনিকেতনের কেতন চূড়ার কাছে—আকাশ রয়েছে আমাকে ঘিরে—আলো আসচে সূর্যলোক থেকে সোজা আমার ঘরে পথে তাকে আটক করবার কিছুই নেই—ধরণীর সবুজ বেষ্টনী আছে দূরে—আমলকি গাছের উপরকার ডাল দেখা যায় ছাদের দক্ষিণ পাশে—হাওয়ায় দুলচে—পৃথিবীর হাঁকডাক চলা ফেরা কানাকানি সব নিচের তলায়, এখান থেকে সাড়া পাইনে—গান গাওয়া যে-পাখিদের সকাল বেলার হাওয়ায় অঞ্জলি দান তারা আছে মাটি মহলের পাড়ায়, আকাশে পাখা মেলাই যে পাখিদের গান-গাওয়ার সামিল তাদের দেখা যাচ্চে দিগন্তে দিয়েচে পাড়ি, আলোয় সাঁতার কেটে। আমার মনটাও সকালের আলোয় সেই সাঁতারে যোগ দেয়, দেহের ঘাট ছেড়ে দিয়ে যেন পাল তুলে যায় নীলের মধ্যে মিলিয়ে।

এখন বেলা হয়ে এল। এইমাত্র মহাদেব এক গ্লাস খেজুর রস দিয়ে গেল। এইবার সময় এলো আমার লেখার টেবিলে বসবার। সেই বিশ্বপরিচয়ের সংস্কার করতে বসেছি। সত্যেন্দ্রকে (১) যে চিঠি লিখেছিলুম, সাড়া পাইনে, বোধ হচ্চে গাণিতিক সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে—লজ্জা হয় ওকে ইস্কুলমাস্টারি সংশোধনের কথা বলতে। আমাকে যদি কোনো আনাড়ি তার কাব্য দেখে দিতে বলে তাহলে আমার কী দশা হয় সে তো জানি। আমি তাই এডিংটন প্রভৃতি ওস্তাদদের বই পাশে রেখে অতি সাবধানে মেরামতের কাজে লেগেছি—তবু কিছু কাঁচা থেকে যাবে। মাটির মিস্ত্রিকে কোটাঘরে লাগাতে গেলে কাজটা মনের মতো হবে না কিন্তু হয়তো ব্যবহারের মতো হবে। দুটো একটা জায়গায় জল পড়বে, নিচে সরা বসালেই চলবে। সত্যেন্দ্রকে শেষ যে চিঠি লিখেছিলুম তার জন্যে মন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে আছে।—তোমার বাবার শরীর কেমন আছে। ইতি ১১।১২।৩৭

কবি

১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

॥ ৪১০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কিছুদিন থেকে নানাবিধ কাজে অকাজে বিপরীত রকম ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ছুটি মিলল না। যত দিন যাচ্চে ক্ষুদে কাজের বোঝা কেবলি বেড়েই চলেছে, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। ছিলেম শ্রীনিকেতনের শিখর দেশে সেখান থেকে টেনে নিয়ে এল ৭ই পৌষের ডাকে এখানে আশ্রয় নিয়েছি বৌমাদের বাগান-কোণের ঘরটাতে। লালচে ভালো চারদিকে আকাশ আছে যথেষ্ট, আলোরও অভাব নেই।—জীবনের কাছে তোমার বাবার খবর পাওয়া গেল। কষ্ট পাচ্চেন শুনে ভাল লাগল না। চিকিৎসার অভাব হচ্চে না নিশ্চয় রোগের উপরে সেও এক উপসর্গ।—বৌমা গেছেন, বোটে, রথী পালিয়ে আছে শ্রীনিকেতনে। ৭ই পৌষ ১৩৪৪

কবি

॥ ৪১১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

বাস্তবতার কথা ক্লান্তির কথা বারবার বলে এত পুরোনো হয়ে গেছে বলতে বিতৃষ্ণা হয়। ইচ্ছে করে বলি, ফড়িঙের মতো লাফালাফি করচি আর প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। আমার এই শেষ দশার অবস্থাটা বর্ণনার অতীত এবং অযোগ্য হয়ে উঠেছে। শনিগ্রহ কাজ যা করাচ্চে তা অকথ্য। চিঠিতে অনুরোধ আসচে নানাবিধ, দর্শন করতে আসচে নানা জাতের লোক। সকালে উঠে যে চৌকিতে খাড়া হয়ে বসি সেটা ছাড়ি সূর্যাস্তের পরে আলোর অভাবে। রোজ প্রতিজ্ঞা করি, যে করে হোক ছুটি নেবই, রোজ তা ভাঙতে হয়।

প্রাণপণ চেষ্টায় বিশ্বপরিচয়ের সংস্কার সাধন করচি। ভুল আছে এ খবর পেয়েছি কিন্তু কোথায় ভুল নির্দেশ না

পাওয়াতে ডাইনে বাঁয়ে ওস্তাদ লেখকদের বইয়ের পাতা খুলে নিজের ত্রুটি হাতড়াচ্ছি। দু চারটে বড়ো বড়ো আগাছা নিড়িয়েছি। আরো কোথায় কী লুকিয়ে আছে তাদের খোঁজ পাওয়ার মতো সাধনা আমার নেই। আশা করছি, ত্যাজ্য জঞ্জাল বেশি বাকি নেই, সেটা নিজেকে ভোলাচ্ছি কি না তাও বলতে পারিনে। অব্যবসায়ীর এই অধ্যবসায়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। এদিকে অবিলম্বে সংশোধিত কপি নেবার জন্যে কিশোরী বসে আছে। জীবনে বিস্তর অসংগত কাজের বোঝা জমিয়ে কর্ম-ফল বাড়িয়ে তুলেছি এটারও কোনো জরুরী ছিল না। কিন্তু পরহিতের লোভ অহিতের উৎসাহের চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিজনক। আর এমন কাজ করব না বলে নাকে খৎ দেবার কোনো অর্থ নেই—কাজ যে করায় তার উপরে হাত চলে না।

নামজাদা অতিথিরা ভিড় করে আসবেন নামজাদার আকর্ষণে—৭৭ বছরের চুল মাথার থেকে কাটতে পেরেছি কিন্তু নাম কাটার উপায় নেই—এমন কি নিমতলায় গিয়েও ওকে পোড়াতে পারব না। এই দুর্দিনে সহায়রূপে তোমাকে ডাকতে সাহস করিনে—কেননা তুমিও কষে ভিড় টানচ—তারা কেউ ধনী, কেউ বা মানী, কেউ বা জ্ঞানী। তার উপরে তোমার বাবার শরীর ভালো নয়—এই সময়ে তোমার বাবার সঙ্গে আমার স্বাস্থ্য বদল করতে ইচ্ছে করচে তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারত। ছেলেবেলায় ইস্কুল পালাবার সময় শরীর খারাপ করতে পারিনি, আজো সম্মানের তাড়না এড়াবার ইচ্ছায় পারচিনে। ইতি ৩১।১২।৩৭

কবি

মৃ ন্ম য়ী

তারাপদ রায়

মৃন্ময়ী, এ কোন্ ফুল কিনে আনলে এমন বিকেলে,
কোন্ পাকে কোন মূর্খ লক্ষ্মীছাড়া কিসের অভাবে,
অথবা লক্ষ্মীর দায়ে এমন অমল পুষ্প ফেলে
চলে গেলো; কোন্ সূত্রে একে তুমি কোথায় সাজাবে?

এ ঘরে কি রাখা যায়, শ্রাবণের বৃষ্টির নিভৃতে
কোথায় উদ্যানে কার ফুটেছিলো; বহু যত্নভারে,
বহু জল সিঞ্চনের প্রসাধনে তীব্র আকুতিতে
অমল ধবল পুষ্প ফুটেছিল রাত্রির আঁধারে।

অমল কুসুম তুমি অলকে দিয়ো না, ফুলদানিতে
বড় স্থির, বড় তুচ্ছ মনে হবে, ঈশ্বরের ছবি
তোমার সংসারে নেই—গৃহকোণে, অলিন্দে, সিঁড়িতে
কোথায় মেলাতে পারো বনস্মৃতি, শ্রাবণসুরভি।

বৃষ্টিময় চতুর্দিক, মৃন্ময়ী বৃষ্টির অবেলায়
বনের কুসুম কেন নিয়ে এলে অন্ধকার ঘরে।
গোধূলির নগরীর সব আলো হঠাৎ হারায়,
আঁধার বিপিনে কার পুঞ্জ পুঞ্জ গন্ধ ঝরে পড়ে।

ঝরে বৃষ্টিধারা, ঝরে পুঞ্জ পুঞ্জ অস্পষ্ট শ্রাবণে।
কোথায় বাগান কার ভেসে যায় জলে একাকার;
ফোটায় ফোটায় গন্ধ, সেই গন্ধ কবেকার বনে
ঝরে আর্দ্র বৃষ্টিধারা; মৃন্ময়ী, তোমার অন্ধকার।

এরা আমাদেরই লোক।

শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, এই বাংলা দেশেরই। তুষার ঢাকা হিমালয় আর হিমেল হাওয়ার যে উপত্যকা, উত্তরের দার্জিলিং-কালিম্পং অঞ্চলে বিস্তৃত, যেখানে চায়ের বাগান, কমলা লেবুর 'অরণ্য', মেঘ-রৌদ্রের স্বর্ণাঞ্চলে ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী—তারই ফাঁকে ফাঁকে এদের বসতি। এরা নেপালী নয়, ভুটিয়া নয়। আমাদের চোখে হয়ত সে পার্থক্য তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে না। কিন্তু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে এই লেপচারা তাদের থেকে ভিন্ন। নাচে গানে, বেশবাসের বৈশিষ্ট্যে, কাঁধে ঝোলান এই বিচিত্র চর্মবাদ্যে আর ময়ূর পালকে সাজান এই বর্ণবহুল ময়ূরপংখী প্রতীকে তাদের রীতি নীতি ধর্মাচরণের যে ছন্দ বাজে তা উল্লাসময় কর্মময় জীবনের কথাই বলে। যে জীবন আমাদের।

এরা আমাদেরই লোক।

আলোকচিত্রশিল্পী
শ্রীবিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

জলাতঙ্ক
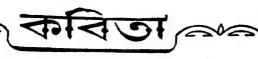
দিব্যেন্দু পালিত

স্নানার্থীরা সবাই মাপে জল—
কেউ ঝুঁকে, কেউ গভীরতর : কষ্টে, আরো নিচে।
প্রতিবিম্ব নিজেকে দ্যাখে স্বচ্ছ, অবিকল।
সারাটা দিন মিথ্যে ঘুরি পিছে।

অসম্ভবের বাষ্পে ভ'রে আচম্বিতে,
দু' চোখ যদি স্রোতের টানে বিলম্বিত তাকায়—
পুরনো জল উপচে পড়ে কলসটিতে।
অমল জাদু কলসটিকে উপুড় ক'রে রাখায়।

না হ'লে ওই মৃত্তিকার প্রান্ত ছুঁয়ে
ঢেউ-ভাঙা স্রোত তবুও কেন ভাসায় না কূল!
জোয়ার কারো উজান, কারো হৃদয় ধুয়ে—
মাল্য হ'তে হঠাৎ খসে দু' একটি ফুল।

স্বপ্ন শুধু স্বয়ংবৃত; বিবিধ ক্ষণ
যত্নে-আঁকা সিঁথির মতো একাকী রয়।
চিবুক ছুঁয়ে, তথাপি সে নিষিদ্ধ জন—
পেঁচিয়ে ওঠে সত্তা জুড়ে বিষাক্ত ভয়।

চির হরিৎ

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

মেহেদি ফুলের গন্ধে রঙে রঙে একটি স্বপন—
একটি স্বপন ভাসে সংগোপনে গোধূলি বাতাসে—
মহুয়ার বনে বনে—মেরুরেখা একটি তপন—
তনুরুচি অভিরাম, পুষ্পরাগ নয়ন রঞ্জন।
তটে তটে ওঠে ঢেউ, অনুরাগে বাঁধে বাহু পাশে,
নিটোল পেলব বাহু, বিদ্যুতের তীব্র শিহরণ,
অথচ জড়ানো মধু, অমৃতের উষ্ণ প্রস্রবণ,
আকুল বাঞ্ছনা তার, তৃণে তৃণে গুচ্ছবদ্ধ কাশে।

দুটি সে চোখের দৃষ্টি অনুচ্ছেদ—ভাষার অতীত,
অনুক্ষণ ফেরে সাথে—জাগরণে অথবা নিদ্রায়,
আবেগে ভাসায় নৌকা—অনন্তের মাধুরী সন্ধানে।
বাতিঘরে বাতি জ্বলে, কণ্ঠে তোলে জীবন সংগীত—
সে পূর্ণিমা অমারাতে, ভগীরথ মরুবালুকায়—
সে আমার ভালবাসা—বীজমন্ত্র—ঝলসানো ধ্যানে।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে বড়ো শুভার্থী শিশুর আর কেউ নেই। অনেক দুঃখে জন্ম দিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে মায়েরা বড়ো করে তোলেন তাঁদের শিশুদের। নিজেরা না খেয়ে সব চেয়ে ভালো জিনিসটি তাদের খাওয়ান, নিজেরা না ঘুমিয়ে তাদের সুস্থ অবস্থায় পরিচর্যা এবং রোগের সময় সেবা করেন, নিজেদের সুখ শান্তির চেয়ে শিশুর স্বাস্থ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বেশী মর্যাদা দেন তাঁরা। কিন্তু এত করেও তাঁরা যে সর্বদা সর্বতোভাবে শিশুর কল্যাণ করতে পারেন তা বলা যায় না। নিজেদের অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ, স্বার্থবুদ্ধি, নিরীশ্বর জীবনযাত্রার নানাপ্রকার হীনতা এবং চারিত্রিক নানা দৈন্য অনেক সময়ে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে অপরিণতবুদ্ধি শিশুদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন জীবনের যাত্রারম্ভের সময়, যার কুফল চিরদিন তাদের ভোগ করতে হয়। বাড়িতে সুশিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে না বলেই প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে গুরুগৃহবাসের ব্যবস্থা হয়েছে শিশুকে মানুষ করে তোলবার জন্য। চাণক্য পণ্ডিত আড়াই হাজার বছর আগে বলে গেছেন, যে বাপমা ছেলেকে লেখাপড়া না শেখায় তারা তার শত্রু; আজকের দিনের কবিও আক্ষেপ করেছেন, বঙ্গজননী তাঁর সাত কোটি সন্তানকে বাঙ্গালী করেই রেখেছেন মানুষ করেন নি। এই মানুষ করা বলতে যে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অবশ্য আজও নানা মুনির নানা মত। কেউ বলছেন, শিশুকে খেলার ছলে শেখাও, নিজের খুশিতে ইচ্ছামতো শিখতে দাও, চলতে দাও; কেউ বলছেন, জীবনটা শুধু খেলা নয়, শিশুকে কঠিন নিয়মে থেকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে শেখাও বড়ো হয়ে সে তাহলে কোনো কষ্টেই বিচলিত হবে না। অনেক দেশে শিশুর রুচি, শক্তি এবং প্রকৃতিভেদে তাকে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বড়ো হবার সুযোগ দেওয়া হয়। অনেক দেশে আবার রাষ্ট্র শিশুর শিক্ষার ভার নিয়েছে, অতীতের স্পার্টার মতো ছাঁচে-ঢালা রাষ্ট্রানুগত কর্মী ও নাগরিক তৈরির কারখানা খুলেছে সে সব দেশে। উদ্দেশ্য সকলেরই ভালো, কারো দৃষ্টি বর্তমানে বা অদূর-ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, ছোটো গণ্ডিতে বাঁধা, কারো দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যতে এবং অন্তহীন দেশে কালে বিস্তৃত, কিন্তু শুধু শিশুর দিকে এঁদের অনেকেরই দৃষ্টি নেই। নিজেদের প্রয়োজন এবং সদুদ্দেশ্য ভুলে শুধু শিশুর মুখ চেয়ে তার দেহ মনের প্রয়োজন মতো খোরাক যোগাবার ভার নিতে আজও অল্প লোকই পেরেছেন পৃথিবীতে। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে শুধু অন্যতম নন, প্রধানতম।

মানব সভ্যতার আদি যুগ থেকে বহু কবি এবং শিল্পীই শিশুকে ভালোবেসে নিজ নিজ রচনায় তাকে স্থান দিয়েছেন, বহু গুরুই শিশুর চরিত্র গঠনের জন্য আজীবন পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তি শিশুর সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ নিজের অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করে তার মনের কথা গল্পে, কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে এনে তার প্রতি সর্বসাধারণের সমবেদনা আকর্ষণ করতে—শিশুর জ্ঞান ও আনন্দের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার জন্য নিজের অলৌকিক সৃজনী প্রতিভার সঙ্গে অন্যের সংগ্রহশক্তিকে যুক্ত করতে, তার দৈহিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য—এক কথায় শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য—নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ সক্ষম হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। শিশুদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা, তাতে মাতৃস্নেহের মমত্ববোধ ও অসীম করুণার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল পিতৃস্নেহের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা, সেই সঙ্গে মহাগুরুর উপযুক্ত আদর্শনিষ্ঠা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে তাঁর ভালোবাসা একদিকে

যেমন শিশুকে তুচ্ছ বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিতে এবং তার ছোটোখাটো দোষত্রুটিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছে, তেমনি আর এক-দিকে তার স্থায়ী কল্যাণের দিকে, তার সুস্থ শরীর এবং সবল চরিত্রগঠনের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে সর্বদা সজাগ রাখতে সহায়তা করেছে। অতীতে শিশুদের বন্ধু কোনো কোনো কবির দেখা আমরা মাঝে মাঝে পেয়েছি, আদর্শ গুরুর দেখাও মাঝে মাঝে না পেয়েছি তা বলতে পারি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো একদেহে তাঁদের দুজনের সমাবেশ কখনও পাইনি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কবিগুরুর এই দুটি দিক নিয়েই আলোচনা করব।

আজ একথা অনেকেই জানেন যে, রবীন্দ্র-নাথের শৈশব খুব সুখের ছিল না। একদিকে ছিল নবাবী আমলের চালচলন ও অভিজাত পরিবারের অর্থহীন আদবকায়দাজনিত গুরুজনদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলাফেলার ঘড়িঘণ্টা বাঁধা কঠিন শিক্ষা ব্যবস্থার নিরন্ধ্র আয়োজন এবং শিক্ষকদের তর্জন-গর্জন, আর একদিকে ছিল ব্রজেশ্বর শ্যাম প্রভৃতি কঠোরচিত্ত লুব্ধ প্রকৃতি চাকরদের প্রভুত্বের দৌরাত্ম্য, যারা তাঁর ক্ষুধার অন্নে পর্যন্ত ভাগ বসাতে কুণ্ঠিত হত না—তাদেরই শাসনা-ধীনে দিন যাপনের গ্লানি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কলকাতার একটা ঘিঞ্জি গলির মধ্যে বহুজন-অধ্যুষিত একটা প্রকাণ্ড বাড়ির কলরব এবং বদ্ধ আবহাওয়া। এই ব্রাহ্মস্পর্শের চাপে সুকুমারমতি শিশুর প্রাণ যখন হাঁফিয়ে উঠত তখন তাঁর অনন্য-সাধারণ কল্পনাশক্তিই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখত —এখানে সেখানে দুচারটি ছুটির ক্ষেত্র দেখিয়ে দিয়ে। খাজাঞ্চিখানার এককোণে রাখা পুরনো পাল্কীখানাকে সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপ কল্পনা করে তিনি আনন্দ পেতেন, ছাদে উঠে মাঝে মাঝে বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য-সাগরে ডুব দিয়ে তিনি স্নিগ্ধ হতেন। সেখানে তুলসীগাছের টবের পাশে তাঁর নিদ্রাপুরীর রাজকন্যা ঘুমোত, সেখান থেকে মেঘলা দিনে তাঁর কল্পনার ময়ূরপঙ্খী ভাসত, চাঁদনী রাত্রে তাঁর পঙ্খীরাজ উড়ে চলত সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। এই সব বাহ্য আশ্রয়ের সঙ্গে ছিল তাঁর অবুঝ মমতাময়ী মায়ের স্নেহ,—যিনি অসুখের অজুহাত মিথ্যে জেনেও তাঁকে প্রশ্রয় দিতেন মাস্টারকে ফিরিয়ে দিয়ে; আর ছিল তাঁর দিদিমার গল্প বলার আসর, যেখানে সারা দিনের রুটিনবন্ধনাক্রুষ্ট শিশু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে কল্পলোকে মুক্তি পেতেন। ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক আব-হাওয়া, বড়োদের সাহিত্যসঙ্গীতের আসরের ছিটেফোঁটা নিঃসন্দেহে সেদিন তাঁর অবচেতন মনে কাজ করছিল। কিন্তু বড়োদের অবিচার অত্যাচারগুলো এবং চারিদিকের 'ইঁটের' পরে ইঁটই সেদিন সবচেয়ে পীড়া দিয়েছিল তাঁকে। কুস্তি, শারীরতত্ত্ব ও চিত্রাঙ্কণ শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য নানা বিদ্যা শিক্ষা দেবার নামে যে বিপুল বোঝা সেদিন তাঁর ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল তা ভাবলে আজকের দিনের গ্রন্থভারপীড়িত ছেলে-দেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। নিজে যে দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন সে দুঃখ যাতে তাঁর পরের যুগের ছেলেমেয়েরা আর না পায়, সেজন্য বড়ো হয়ে পর্যন্ত তিনি প্রাণপণে নানাদিক দিয়ে চেষ্টা করেছেন। শৈশব এবং বাল্যের সেই সব রুদ্ধশ্বাস দিন-গুলিকে তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেন নি, শিশু, শিশু ভোলানাথ থেকে আরম্ভ করে শেষ জীবনের লেখা পুনশ্চ এবং শেষ-সপ্তকেও সেদিনের স্মৃতির ছাপ রেখে গেছেন, তাঁর সেদিনের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষাকে—শিশু হৃদয়ের অনেক ব্যাকু-লতাকে রূপ দিয়ে গেছেন তাঁর সাহিত্যে। অবশ্য ঐসব পরিণত বয়সের রচনায় শৈশবের অভিজ্ঞতার উপর কবিত্বের মায়াতুলিকার স্পর্শ পড়েছে, ফলে কতকগুলির কাব্যরস শিশুদের চেয়ে পরিণত বয়স্কদের বেশী উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু তা বলে তাদের মূল্য কমেনি। যেসব শিক্ষক এবং অভি-ভাবক নিজেদের শৈশবের কথা ভুলে গিয়ে অভ্যাসবশে না বুঝে শিশুদের ওপর অত্যাচার করে থাকেন, তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে ঐসব কবিতা; শিশুদের প্রতি অনুষ্ঠিত অপরাধের বোঝা লাঘব হয়েছে তাতে নানা পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে। সাধারণত যেসব কথা শিশুদের মনে আসে অথচ তারা মুখে প্রকাশ করতে পারে না, কবি তাদের হয়ে আশ্চর্য সহৃদয়তার সঙ্গে সেই সব কথা শুনিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। তাঁর ডাকঘর নাটকের অমল বা শিশু কাব্য-গ্রন্থের 'মাতৃবৎসল' কবিতার খোকা—যে বলে 'মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে,—তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে', অথবা লুকো-চুরি বা বৈজ্ঞানিক কবিতায় যে শিশুটিকে আমরা দেখতে পাই সে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, সুতরাং তার কল্পনার দৌড় অনন্যসাধারণ; কিন্তু অতি সাধারণ শিশুর কল্পনালভ্য অনেক ছবি আমরা দেখতে পাই তাঁর 'দুয়োরানী, মূর্খু; রাজমিস্ত্রি, বনবাস, বিচিত্র সাধ' প্রভৃতি কবিতায়। মধুররস এবং করুণ রসের মিশ্রণে সমব্যথী একটি অপূর্ব কবিতা। বিশুদ্ধ করুণ রসের ক্ষেত্রে শিশুকাব্যের 'সন্ধ্যা হল গৃহ অন্ধকার' বা শিশু ভোলানাথের 'মাকে আমার পড়ে না মনে' বা পুতুল ভাঙার সঙ্গে মনে পড়ে পলাতকার সেই ছোট্ট মেয়েটিকে—যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ প্রদীপ নিবে যাওয়ায় 'হারিয়ে গেছি আমি' বলে কেঁদে উঠেছিল। 'পুনশ্চ' গ্রন্থের মাতৃহীনা অমলার বাপের উদ্দেশে লেখা না-ফেলা চিঠি 'তোমায় দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে' আমাদের মর্ম স্পর্শ করে, মনে পড়ে সেই কাঙ্গালিনী মেয়েটির কথা, যে ধনীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে সুসজ্জিতা দেবী প্রতিমাকে প্রশ্ন করছে, "তুই যদি আমার জননী, মোর কেন মলিন বসন?"—যে মাতৃহারা মা না পেলে কবির মতে সমস্ত উৎসবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। রাজর্ষি গ্রন্থের 'হাসি ও তাতা', কাবুলি-ওয়ালার 'মিনি', গল্পগুচ্ছের পথে পাওয়া যে গরিবের ছেলেটির আকাশে মেঘ দেখে ধনীর বাড়িতে মন টিকল না,—কাকে রেখে কার নাম করব? রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশু বিষয়ক ছবিতে মধুর, করুণ এবং অদ্ভুত রসের ছড়াছড়ি থাকলেও হাস্যরসও খুব বিরল নয়।' 'ছোটোবড়ো'র খোকা যেদিন হঠাৎ বড়ো হওয়ার অবস্থাটা কল্পনা করে বলে, "আমি তখন চাবি খুলতে শিখে যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে" এদিকে কিন্তু দাদার খাঁচাখানা কেড়ে নিয়ে তাতে পাখী পোষবার লোভ সামলাতে পারে না, বিজ্ঞ কবিতার শিশু যখন নিজের উদ্ভট মতামতে মায়ের সমর্থন খোঁজে, তখন হাসি সামলানো কঠিন হয়। শিশু ভোলানাথের 'সময় হারায়' খোকা যখন বলে, "যত ঘণ্টা যত মিনিট সময় আছে যত, শেষ যদি হয় চিরকালের মতো, তখন স্কুলে নাই বা গেলেম? কেউ যদি কয় মন্দ, আমি বলব দশটা বাজাই বন্ধ। তাধিন তাধিন তাধিন।" তখন বয়স্কদের মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। যে শিশুদের পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন ওকালতি করেছেন তারা অনেক সময় অনেক নির্দয় আচরণ করেছে তাঁর প্রতি, তার জন্য কান্নাকাটি না করে তিনি হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন তাই নিয়ে তাঁর কবিতায়। প্রহাসিনীতে উদ্ধৃত তাঁর কিশোর বয়সের লেখা 'খুড়ার পত্রে' দেখতে পাই আদরের ভাইঝি ইন্দিরা দেবীর নির্মম অত্যাচার তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করছেন না শুধু—উপভোগ করছেন। ভাইপোকে লিখছেন :

'মেরা উপর জুলুম করতা
তেরি বহিন বাই,
কি করেঙ্গা, কোথায় যাঙ্গা,
ভেবে নাহি পাই।
বহুৎ জোরসে গাল টিপতা
দোনো আংগুলি দেকে,
বিলাতী এক পিনি বাজনা
বাজাতা থেকে থেকে।
কভি কভি নিকট আকে
ঠোঁটমে চিমটি কাটতা।
কাঁচি লেকে কোঁকড়া কোঁকড়া
চুলগুলো সব ছাঁটতা।
জজসাহেব কুছ বোল্‌তা নেহি,
রক্ষা করবে কেটা?
কাঁহা গয়োরে কাঁহা গয়োরে
জজসাহেবেকা বেটা।

তুম ছাড়া কোই সমঝে না তো
হামরা দুরকস্তা,
বাহিন তেরি বহুৎ মেরি,
খিল খিল করকে হাসতা।'

এর টীকা নিষ্প্রয়োজন। কথা ও কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ কিশোরপাঠ্য যে-সব কবিতা রেখে গেছেন সেগুলি অর্ধশতাব্দীকাল আবালবৃদ্ধ বাঙালীকে আনন্দ ও প্রেরণা দিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শিশু এবং বৃদ্ধের সেগুলি আজ কণ্ঠস্থ। পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের পর তিনি ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা, অনুবাদচর্চা প্রভৃতি বিদ্যালয়-পাঠ্য বইগুলি লিখেছেন নিজের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে, ছবি ও ছড়া, ছেলেবেলা, সহজপাঠ প্রভৃতি লিখে শিশুদের পাঠ্যভীতি কমিয়ে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগসাধন করেছেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'যেখানে বেতের চাষ ছিল সেখানে আখের চাষ' করেছেন।

শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখার চেয়ে অন্য লেখকদের উৎসাহ দিয়ে বই লেখানোর কীর্তি কম নয়। আজ যাকে আমরা শিশুসাহিত্য বলি তাঁর সময়ে বাংলাদেশে তার অস্তিত্ব ছিল না। দু'চারখানা বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ছিল বটে এবং রবীন্দ্রনাথের মতো ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর শিশু সে যুগের সেই রকম একখানি শিশুপাঠ্য বই-এ 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র মধ্যে কাব্যমাধুর্য আবিষ্কার করেছিলেন এও সত্য, কিন্তু আজকের দিনের শিশুসাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় সে যুগের সে-সব বই অত্যন্ত নীরস ছিল, তা মানতেই হবে। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পুরোনো ছড়া এবং রূপকথাগুলির দিকে দেশের সুধিসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নিজে ছড়া সংগ্রহ করে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ছাপালেন, বিজ্ঞজনের উপহাসকে অগ্রাহ্য করে ঐসব অর্থহীন পূর্বাপরসঙ্গতিহীন গ্রাম্য ভাষার শ্লোকগুলিকে মর্যাদা দিলেন, দেশবাসীকে ডাক দিলেন সেগুলিকে সম্মান দেবার জন্য, রক্ষা করবার জন্য। তাঁর মতে 'জননী নিজের সন্তানের মুখে দেবদুর্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপাসনামন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।' যে ছড়ার ভাষায় 'মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত' এবং যার ছন্দে 'আমাদের পিতৃপিতামহগণের নূপুরনিক্কণ ঝঙ্কৃত' হচ্ছে সেগুলি সেদিন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের অবহেলায় লোপ পেতে বসেছিল, তার একটি বৃহৎ অংশকে তিনি সেদিন অবলুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে আমাদের জন্য ছাপার অক্ষরে চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন, সে জন্য প্রত্যেক বাঙালীর তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁর অনুপ্রেরণায় শিশুদের আনন্দ দেবার জন্য সেদিন তাঁর বন্ধুস্থানীয় যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বৈকুণ্ঠনাথ দাস, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুলেখকেরাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে কেউ সংগ্রহ করেছেন পুরোনো দিনের ছড়া রূপকথার মণিমুক্তো, কেউ এঁকেছেন অতীতের পুরাণ ইতিহাসের ছবি উজ্জ্বল রঙে কবিত্বময় ভাষায়, কেউ এনেছেন দেশ-বিদেশের গল্পপ্রবন্ধ শিশুবোধ্য ভাষায় লিখে পাতায় পাতায় ছবি দিয়ে সাজিয়ে। অনেকেই ঋণ স্বীকার করেছেন কবির কাছে, প্রত্যেকেই পেয়েছেন তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা। দক্ষিণারঞ্জনের সংকলিত ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকায় ১৩১৪ সালে আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'পাল-পার্বণ যাত্রা কথকতা এ সমস্ত ক্রমে ক্রমে মরানদীর মতো শুকাইয়া আসাতে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকেদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তার পরে দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল? তাহাদের সায়ংকালের শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়ার ঘরের কেরোসিনদীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়, তাহাতে কেবলই ব্যাকরণবহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলই তোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে? কেবলই বই-এর কথা? স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল? দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়?' শেষ পর্যন্ত তিনি প্রস্তাব করেছেন, বাংলাদেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য একটা স্কুল খুলে সেখানে দক্ষিণাবাবুর বইখানা পাঠ্য করা হোক। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'গল্পসঞ্চয়ের' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আজকের দিনের মা মাসিমা গেছেন গল্প ভুলে, কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলে নি। ছেলেরা আজো বলছে, গল্প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গল্প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাঁরা কোমর বেঁধেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকে কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করেছেন। ছেলেরা তো আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।" বর্তমান প্রবন্ধের নামটি (শিশুদের রবীন্দ্রনাথ) তাঁর সেদিনের নিজের প্রতি আরোপিত উপাধি থেকেই আমরা পেয়েছি, সে কথা বলা বাহুল্য। যোগীন্দ্রনাথের অপূর্ব ছড়াসংগ্রহ খুকুমণির ছড়া, অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী ক্ষীরের পুতুল প্রভৃতি এবং উপেন্দ্রনাথের

ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যকীর্তির পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা কতটা কাজ করেছে তা আজ কারও অবিদিত নেই। শিশুদের জন্য এক এক দিক দিয়ে কিছু আনন্দদানের সহায়তা অনেকে করেছেন, তাদের কল্যাণের জন্য চিন্তাও অনেকে করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন দরদ দিয়ে তাদের আনন্দ এবং কল্যাণের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা আর কেউ কখনো করেছেন বলে জানি না। কবির অনুবর্তীদের মধ্যে বহু শিক্ষাব্রতী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী সুলেখক যথা সতীশচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ংবদা দেবী, সুখলতা রাও, সুকুমার রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলার শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং মনোরঞ্জনের জন্য কলম ধরেছিলেন, পরবর্তী যুগের শিশুসাহিত্য-স্রষ্টারা অনেকেই তাঁর পরোক্ষ প্রভাবে শিশু-দেবতার মন্দিরে অল্পাধিক পরিমাণে পূজো-পচার পাঠিয়ে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

পূর্বে বলেছি, শিশুদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুটি কর্মধারার কথা,—একটি প্রচেষ্টা কিসে তাদের ভালো লাগবে তার জন্য, আর একটি প্রচেষ্টা কিসে তাদের ভালো হবে তার জন্য। এতক্ষণ সাহিত্যক্ষেত্রে শিশুদের জন্য তিনি যে ঐশ্বর্য রেখে এবং রাখিয়ে গেছেন তার কথা হ'ল; এবার বাস্তব জগতের শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের বেত্রদণ্ড-বিড়ম্বিত শৈশবকে অভয় দেবার জন্য তিনি কি করেছেন তার কথা কিছু বলব। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিশুদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার জন্য সবচেয়ে দরকার অনুকূল পরিবেশ, অনুকূল শিক্ষক ও অনুকূল শিক্ষা-ব্যবস্থা,—যাতে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধ উদ্বোধনের সুযোগ দেওয়া হবে। লোকালয় থেকে—শহরের বিলাসব্যসনের এবং রাজনীতির বিক্ষেপ থেকে দূরে প্রাচীনকালের গুরু-গৃহের আদর্শে তিনি যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বললেন তখন গণ্যমান্য নগর-বাসী অনেকেই কানে তুললেন না সে কথা। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের শক্তিতে যা পারেন করবেন ব'লে শান্তিনিকেতনের মাঠে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলে বসলেন। বলা বাহুল্য, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি তিনি এখানে করতে পেরেছিলেন, মনোমত সহকর্মী এবং শিক্ষকও কয়েকজন পেয়েছিলেন। প্রথম-দিকে বিনা পয়সায় পড়াবার জন্যও ছেলে ভিক্ষা ক'রে আনতে হ'ত। আমাদের বাড়ির তিনজন শিশু প্রথম বছরে এসেছিলেন তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররূপে, তাঁদের কাছে পড়ার এবং খেলার, বাগান করার এবং সন্ধ্যাবেলায় গাছতলায় বসে গল্প শোনার গল্প শুনে এক সময়ে আমার কলকাতার স্কুল বাড়ি এবং ছাত্রজীবন ব্যর্থ মনে হ'ত। আঠারো বছর বয়সে নিজে যখন শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষা ভবনের এবং কলাভবনের ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করলুম, তখন আবহাওয়া অনেক বদলেছে, তবু যা ছিল তাও আমাকে কম মুগ্ধ করেনি। এখানে বাইরের প্রকৃতি আজও ছাত্রদের মনে প্রভাব বিস্তার করে, এখানে আজও ছাত্রদের মধ্যে যতটা স্বাধীনতা আছে তা অন্যত্র বিরল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার কথা ছিল স্বাধীনতা এবং ভয়হীনতা : চিন্তার স্বাধীনতা, কাজের স্বাধীনতা, নিজের বুদ্ধি
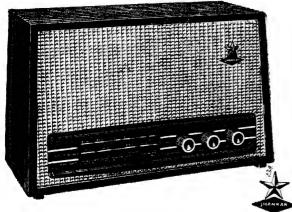
এবং শক্তিপ্রয়োগে জ্ঞান অর্জনের স্বাধীনতা, —এমন কি ভুল করবার স্বাধীনতা; আঘাত, অপমান, দন্ড এমন কি মৃত্যুর মধ্যে ভয়হীন থেকে কর্তব্য ক'রে যাবার শিক্ষা তিনি শৈশব থেকে দিতেন তাঁর ছাত্রদের। সুখাদ্যের প্রতি যেমন শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তেমনি জ্ঞানের প্রতি তার সহজ আকর্ষণ জন্মাবে এই তিনি চাইতেন, পরীক্ষার বা শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে ছেলেরা পড়বে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শিক্ষকদের পক্ষে কায়িক শাস্তিদান নিষিদ্ধ ছিল, শিশুরা কেউ কিছু অন্যায় করলে তাদের নির্বাচিত সমিতিতে তার বিচার হ'ত, শাস্তি স্বরূপ কোনো কায়িক পরিশ্রমের অতিরিক্ত কাজ তাকে করতে হ'ত। শিশুকাল থেকে এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়ে ছাত্রদের দায়িত্ববোধ বাড়ত। পড়ার ভয় না থাকায় পড়ায় আনন্দ ছিল তাদের। বইএর চেয়ে শিক্ষকের চরিত্রকে, তাঁদের আচরণ এবং মুখের কথাকে বেশী মূল্য দিতেন রবীন্দ্রনাথ, শিষ্যের সঙ্গে গুরুর অন্তরের যোগ না থাকলে শিক্ষাব্যবস্থাই ব্যর্থ হ'ল ব'লে মনে করতেন। শিক্ষক প্রতিদিন নিজের জ্ঞানভান্ডার বাড়াবার চেষ্টা করবেন, তবেই না তিনি অন্যের জ্ঞানার্জন-স্পৃহা জাগাতে পারবেন। গুরু নিজে অবসর পেলেই পড়েন, ঘরে বাইরে মানুষের এবং প্রকৃতির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেন দেখে ছাত্রের পড়তে ইচ্ছা হয়, শিল্পী নিজে মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেন এবং ছবি আঁকেন, দেখে দেখে ছাত্রেরও দেখবার এবং আঁকবার আগ্রহ জাগে। সেই সময় যখন কাজে নেমে ছাত্র কোথাও ঠেকে তখন গুরুর উপদেশ চায় এবং তিনি তাকে তা দেন। এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের মতে সার্থক শিক্ষাদান এবং গ্রহণ। ছেলেরা শিশুকাল থেকে শুধু ছাপা পুঁথি পড়ে বড়ো হবে না, নিজেরা দেশময় ঘুরে দেশের ভূগোল ইতিহাস জানবে, পুরো কথা সংগ্রহ ক'রে ইতিহাস রচনা করবে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ছাত্রেরা শিক্ষকদের সঙ্গে কোপাই নদীর উৎস আবিষ্কারে গেছে, আরও কতবার কত অভিযান করেছে তাঁর প্রেরণায়। এদিকে আবার রবীন্দ্রনাথ নিজে যে শুধু নানা বিষয়ের রাশি রাশি বই ঘরে বসে পড়তেন তাই নয়, পড়াতেনও প্রাণ মন দিয়ে। একদিকে যেমন তিনি আদর্শ গুরু আর একদিকে তেমনি তিনি আদর্শ ছাত্র; উইণ্টারনিট্জ সাহেবের ক্লাসে আমাদের আগে গিয়ে তিনি বসতেন খাতা পেনসিল নিয়ে। নীচু বাংলায় ছিলেন তাঁর অগ্রজ ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিবারাত্র জ্ঞানচর্চায় উন্মাদ, বনের পাখীদের যাঁর খাওয়ার সময় মাথায় কাঁধে হাতে ব'সে আহারে ভাগ বসাতে দেখেছি। ওদিকে শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পুঁথিপত্র নিয়ে, অ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন, নেপালচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, তেজেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি দেশবিদেশের কথা, জনসেবা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং গাছপালার পরিচর্যা নিয়ে, ওদিকে নন্দলাল বসু শিল্প নিয়ে এবং স্বয়ং কবিগুরু, দীনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী প্রভৃতি সঙ্গীতনাট্য নিয়ে তপস্যারত, এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গই ছিল শিশুদের আনন্দের এবং শিক্ষার অফুরন্ত প্রস্রবণ। শিশুরা অবাধ্যতা করেছে, তাদের শাস্তি দিয়ে আশ্রমসচিব জগদানন্দবাবু উপোষ ক'রে আছেন তাদের সঙ্গে দেখেছি। দণ্ডিতের সঙ্গে দন্ডদাতা যদি আঘাতের বেদনা না পেল তবে সে দন্ডের উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ, সে তো জুলুম, সে তো পাপ। প্রেস্টিজের ওজুহাতে রবীন্দ্রনাথ কখনও ছাত্র শিক্ষকের দ্বন্দ্বে সত্যভ্রষ্ট হননি, অপরাধী শিক্ষক হলেও তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে। একদিকে দেখেছি বৃষ্টির দিনে শিশুর দল নিয়ে তাঁকে মাঠে ঘুরতে শিশুসুলভ চাপল্যে, আর একদিকে দেখেছি তাঁকে বুধবারের মন্দিরে শান্তসমাহিত ঋষি মূর্তিতে, আবার আর একদিকে দেখেছি পাঠভবনের ক্লাসে ইংরাজী এবং বাংলা

সাহিত্য পড়ানোর ছলে সরস ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কঠিন তথ্য, অতীত ও বর্তমানের নানা মহাবাণী ও দুর্লভ বিদ্যা পরিবেশন ক'রে শিশুদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতে। শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর অবজ্ঞা বা দয়া ছিল না, তাঁদের তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন এবং দিতে বলতেন। শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের একই দিনে শিশুদের ক্লাস এবং কলেজের উচ্চতম ক্লাস নিতে হ'ত। গানের আসরে, গল্প উপন্যাসের আসরে শিশুদের দ্বার অবারিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজে শিশু বিভাগের সভায় সভাপতিত্ব ক'রে তাদের রচনায় এবং আবৃত্তিতে উৎসাহ দিতেন। শিশুরা দেখতুম নিজেরা সাহিত্য সভা করে, পত্রিকা সম্পাদনা করে, বিপদসূচক ঘণ্টা বাজলে দল বেঁধে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে জল বয়ে কাছাকাছি গ্রামের আগুন নেবায়, জীবজন্তু পোষে, পাখীদের জন্য উঁচুতে পাত্র করে জল রাখে, নিজেদের বাঁধা রংগমঞ্চে গুরুদেবের—এমন কি কখনও কখনও নিজেদের লেখা নাটক অভিনয় করে। ছবি, গান, নাচ, প্রতিরাত্রে এবং প্রভাতে বৈতালিক, প্রতি উৎসবে বিচিত্র সাজসজ্জা ও বিচিত্র আলপনা, সকলের উপর খোলা মাঠের এবং শাল, তাল, ছাতিম, আমলকী প্রভৃতি আশ্রমতরুর দাক্ষিণ্য তাদের চিত্তকে সরস এবং সমৃদ্ধ করে। শিশু বিভাগের দেয়ালে নানা শৈলীতে আঁকা নানা জীবজন্তুর রঙীন ছবি এবং নানা অলংকরণ-চিত্র দেখে দেখে শিশুদের চোখে-না-দেখা পশুপক্ষী সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়, সেই সঙ্গে শিল্পরসবোধ জাগ্রত হয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে কলাভবন এবং সংগীতভবনের যোগ, শান্তি-নিকেতনের পাঠব্যবস্থার সঙ্গে শ্রীনিকেতনের পল্লী উন্নয়ন ব্যবস্থার যোগ থাকাতে ছেলেদের নিজ নিজ রুচি এবং শক্তি বুঝে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করার ব্যাপক ক্ষেত্র মেলে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাষাভাষী ছেলেদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করতে উৎসাহ দিতেন। শিশুবিভাগে তখন 'মাসিমা' ছিলেন না, খুব ছোটো ছেলেদের দেখাশোনার কাজে পুরুষ শিক্ষকদের সাহায্য করতেন কলেজের এবং কলাভবনের বড়ো মেয়েরা, এতে সেই মেয়েদেরও শিশুপালন শিক্ষার কাজ হ'ত। রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রতিদিন বিদ্যালয় সংলগ্ন হাসপাতালে পীড়িত শিশুদের দেখতে এবং সান্ত্বনা দিতে যেতেন, অনেককে ছোটোখাটো অসুখে বাড়িতেই হোমিওপ্যাথিক বা বায়োকেমিক ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলতেন। শিক্ষকেরা অথবা তাঁদের বাড়ির লোক কেউ বেশী অসুস্থ হলে ছোটো বড়ো সব ছেলেই পালা করে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দিবারাত্র সেবা করত। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় সকলে মিলে আশ্রম পরিষ্কার করত, রাস্তা তৈরি করত, বাগান করত, বড়ো মেয়েরা রান্নাঘরের সম্পূর্ণ ভার নিতেন। এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশ সব সময়ে থাকত না, কর্তব্যবোধেই সকলকে ঐসব কজে যোগ দিতে দেখা যেত। মনে আছে, রাস্তার ধারে একটা শুকনো কুয়া বোজাবার কাজে অ্যান্ড্রুজ সাহেব নিজে আমাদের সঙ্গে মাটি কাটার এবং বহার কাজে লেগেছিলেন। সেদিন অধ্যাপক এবং অধ্যাপকপত্নীরা ছেলেমেয়েদের বহু অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করতেন, তাদের রোগে সেবা করতেন, যথা-কালে তালের বড়া, পিঠে, বাড়ির ফলমূল প্রভৃতির যোগান দিয়ে তাদের প্রবাসবাসের দুঃখ ভুলিয়ে রাখতেন। বনভোজনের দিনে শিক্ষক ছাত্র এক সঙ্গে উনুন গড়তেন, কাঠ কাটতেন, জল বইতেন, রান্না ও পরিবেশন করতেন। সমস্ত আশ্রমটাই ছিল যেন একটা পরিবার, সকলেই পরস্পরের সুখের সুখী, দুখের দুঃখী। সবার ওপরে জেগে থাকত একজন পরমপুরুষের অপার স্নেহ এবং অসীম আশা ঃ মানুষ গড়বার আশা, দেশ গড়বার আশা, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ তাই মিলিয়ে নতুন সমাজ, নতুন পৃথিবী গড়ার আশা। এই কাজে অনেক ত্যাগস্বীকার তিনি করেছেন, অনেক ত্যাগী পুরুষের সহায়তা তিনি পেয়েছেন, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সহায় ছিল তাঁর শিশু বন্ধুরা। তাদের চোখের ওপর বড়ো আদর্শ তিনি রেখে-ছিলেন: চেয়েছিলেন চারদিকের নিরীশ্বর জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে তারা উঠবে, অন্য পাঁচটা জীবজন্তু মশামাছির মতো কেবল খেয়ে পরে মরে যাওয়াটাকে তারা লজ্জাজনক মনে করবে, তারা বড়ো চিন্তা করবে, বড়ো কাজে জীবনপণ করবে। তাঁর আশা ছিল প্রভাতে সন্ধ্যায় নীরব ধ্যানে এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণে, বিশেষ ক'রে প্রতি বুধবারের মন্দিরে তাঁর উদাত্ত ভাষণ শুনে একদিকে শিশুরা ভারত-বর্ষের অতীতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার লাভ করবে, আর একদিকে প্রতীচ্যের নব্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে, প্রকৃতির এবং মানুষের বিচিত্র রহস্য জেনে এবং সেই জ্ঞান কার্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে তারা দেশকে সমৃদ্ধ করবে। তিনি বলতেন, "নিজেকে কখনো ছোটো মনে করো না, অক্ষম মনে করো না। আশা বড়ো রাখবে, দৃষ্টি বড়ো রাখবে। পরাজয়ে ভেঙে পড়বে না, শতবারের পরা-জয়ের পরেও ধুলো ঝেড়ে উঠবে, তবেই তোমরা জয়ী হবে।" বলতেন, "নিজের দেশের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রাখো, কিন্তু অন্য দেশকে অশ্রদ্ধা করো না। পৃথিবীতে এমন দেশ নেই, এমন গ্রাম নেই, যেখানে কোনো মহাপুরুষ জন্মান নি, কোনো মহাবাণী উচ্চারিত হয়নি।" বলতেন, "মন্দিরের ভিতের তলায় অনেক ইঁট পাথরকে মাটির নীচে থাকতে হবে, অনেককে নীরবে আত্মবিসর্জন করতে হবে, তবেই দেশের মন্দির উঠবে মাথা তুলে, দেশ বড়ো হবে। সকল দেশেই তাই হয়েছে। কোনো জাত সহজে বড়ো হয়নি। সবাই যদি মন্দিরের চূড়োয় ধ্বজা হ'তে চায় তবে আমাদের মন্দির আর কোনোদিন উঠবে না, সবাই যদি খ্যাতি চায়, প্রভুত্ব চায়, অর্থ চায়, তবে জাত কখনো বড়ো হবে না।" তিনি আমাদের গুরুরূপে গুরুদক্ষিণা দাবি করে-ছিলেন সেদিন। বলেছিলেন, "যখনি তোমরা অন্যের কল্যাণের জন্য বা কোনো মহৎ কাজের জন্য কোনো ত্যাগস্বীকার করতে পারবে তখনই আমি, দেখি বা না দেখি, আমার গুরু-দক্ষিণা পাব। যখনই তোমরা কোন অন্যায়কে বাধা দিতে দাঁড়াবে, কোন প্রলোভনকে জয় করতে পারবে তখনই আমি আমার গুরু-দক্ষিণা পাব।" রবীন্দ্রনাথ যুগগুরু ছিলেন, লোকগুরু ছিলেন। আজকের যুগের প্রত্যেক বাঙালী প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁর কাছে ঋণী। দেশের আজ বড়ো দুর্দিন, চারদিকে অন্যায়, চারদিকে প্রলোভন; বড়ো বড়ো মাথা তলিয়ে যাচ্ছে, বড়ো আদর্শ আজ হাসির কথা। আজকের দিনে আমাদের সকলের যিনি গুরু ছিলেন তাঁর সেই গুরুদক্ষিণার দাবিটি দেশ-বাসী সকলের কাছে জানিয়ে দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। নিজেদের যা হবার হয়েছে, আমাদের পরে যারা আসছে—সেই শিশুদের কাছে যেন শিশুদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের এই আশার কথা এই গুরুদক্ষিণার দাবির কথা তাদের বাবা মা'রা জানিয়ে দেন—এই অনুরোধ রইল।

॥ ২৬ ॥

ব্যাপারটা যে আর চাপা নেই, তা পরের দিনই বোঝা গেল। হোটেলের কাজে শ্রীমতী করবী গুহের সুইটে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী করবী গুহ তখন তাঁর প্রাত্যহিক কর্তব্য সেরে ফেলেছেন। ফুলের দোকানদারের প্রতিনিধি তাঁর অর্ডার নিয়ে গিয়েছেন। ন্যাটাহারিবাবু তারপর সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, "মা জননী, আজ আপনাকে কোন রঙের পর্দার কাপড়, বিছানার চাদর পাঠাবো বলুন।"

আমার সামনেই করবী দেবী বলেছেন, "নিত্যহরিবাবু, অন্য লোকদের বাড়িতে কত সুন্দর সুন্দর রঙের পর্দা দেখি, কত নতুন নতুন রঙ বেরোচ্ছে। আপনার ভাঁড়ারে সেই সেকেলে রঙগুলো পড়ে রয়েছে।"

ন্যাটাহারিবাবু সত্যিই যেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এই প্রশ্নের কোনো উত্তর যেন তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "মা জননী, আপনার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বাড়ি আর এই হোটেল কি এক জিনিস মা? গেরস্তর নিজের সংসারে, গেরস্তর নিজের বাড়িতে যদি দরজায় থলে টাঙিয়ে রাখে, তাও লোকের ভালো লাগবে।"

করবী দেবী তাঁর টানা টানা চোখদুটো দিয়ে নিত্যহরিবাবুর দিকে কেমন ভাবে তাকালেন। আস্তে আস্তে বললেন, "আমাকেও তো এই সুইটটা ভালো করে সাজিয়ে রাখতে হবে। রঙের সঙ্গে রঙ না মিললে এই গেস্ট হাউসের কী থাকবে বলুন?"

নিত্যহরিবাবু বললেন, "আমি যতক্ষণ আছি, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। নেত্যহরি যে করে পারে, রোজ আপনার রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে যাবে।"

নিত্যহরিবাবু এবার বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি বললাম, "করবী দেবী, আপনার কোনো অসুবিধে থাকলে আমাকে বলতে পারেন। আমি গিয়ে ম্যানেজারকে জানিয়ে দেবো। নিত্যহরিবাবু কি আপনার পছন্দমতো চাদর এবং পর্দা দিতে পারছেন না?"

করবী দেবী যে এই ভোরবেলাই স্নান সেরে ফেলেছেন, তা ওঁর চুলের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। নিজের চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে করবী দেবী বললেন, "আপনার কিছু বলবার দরকার নেই। নিত্যহরিবাবু মনে কষ্ট পাবেন। ভারি সুন্দর মানুষটি। আমার কিন্তু ওঁকে, কেন জানি না, খুব ভালো লাগে।"

আমি চুপ করে রইলাম। করবী দেবী বললেন, "একেবারে খাঁটি সোনা। আপনাদের এখানে এতোদিন থেকেও নষ্ট হয়ে যাননি। উনি মনে দুঃখ পাবেন, এমন কোনো কাজ আমার করতে ইচ্ছে করে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মিস্টার

পাকড়াশির অতিথিরা কবে এসে হাজির হচ্ছেন? তাঁদের জন্যে কোনো স্পেশ্যাল অ্যারেঞ্জমেণ্টের দরকার থাকলে আমাদের এখনই বলে দেবেন।"

করবী দেবী বললেন, "মিস্টার আগর-ওয়ালা আমাকে বলেছেন, যেন কোনোরকমে ও'দের সেবার ত্রুটি না হয়। আমি ঠিক করে রেখেছি দু'জনকে দুটো কেবিন দিয়ে দেবো। আর এইটাকেই আমার বেড রুম করে নেবো। অসুবিধের কোনো কারণ নেই। আগে চার পাঁচজন গেস্টও একসঙ্গে এখানে থেকে গিয়েছেন।"

তারিখের কথায় করবী দেবী বললেন, "ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ওটা জেনে রাখলে কাজের সুবিধে।" আমার সামনেই করবী দেবী টেলিফোনটা তুলে নিলেন। আমাকে বললেন, "দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বসে পড়ুন।"

আমি বসলাম। দেখলাম, করবী দেবীর পা দুটো যেন পদ্মফুলের মতো। তার উপর সোনালী রঙের হাল্কা চটি পরেছেন তিনি। পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো আলতার রঙে লাল হয়ে আছে। করবী দেবী বললেন, "আপনার সেই সভাপতির কীর্তি জানেন। ফিরে গিয়ে পার্সেল পোস্টে এই চটিদুটো পাঠিয়ে দিয়েছে। পায়ের মাপটা কখন জোগাড় করলে কে জানে। চটিদুটো চমৎকার ফিট করে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "আপনার পায়ে চটিদুটো মানিয়েছেও ভালো।"

করবী দেবী খিল খিল করে হেসে বললেন, "অতো বুঝি না। তবে সবাই যাঁকে মাথায় করে রেখেছিল, তাঁকে যে পায়ের তলায় রাখতে পারছি, এতেই আমার আনন্দ।"

আমি চুপ করে রইলাম। করবী দেবী টেলিফোনে মাধব পাকড়াশিকে পেলেন না। আর কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। কথা শেষ করে আমাকে বললেন, "কর্তাকে পেলাম না। তিনি এর মধ্যেই ফ্যাক্টরীতে বেরিয়ে গিয়েছেন। প্রথমে গৃহিণী ধরলেন; পরে পাকড়াশি জুনিয়র।"

পাকড়াশি জুনিয়রের কথায় কৌতূহলী হয়ে পড়লাম। করবী গুহ বললেন, "কেউ কিছুই খবর রাখেন না। তবে পুত্র পাকড়াশি অনুগ্রহ করে আমাকে ফোনে জানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

আমি বললাম, "খবরটা পেলে আমাদেরও একটু জানিয়ে দেবেন।"

আমি এবার চলে আসছিলাম। করবী দেবী বললেন, "উঠছেন কেন? একটু ওভালটিন খেয়ে যান।"

আমি অবাক হয়ে ও'র মুখের দিকে তাকালাম। এই হোটেলে কেউ কখনও আমাকে এমন আন্তরিকভাবে কিছু খেতে বলেনি।

করবী দেবী বললেন, "থাকি হোটেলে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে ছোট্ট সংসার পেতে বসেছি। আমার নিজের রান্নাবান্নার কিছু সরঞ্জাম জোগাড় করে রেখেছি। আপনাদের হোটেলের কফি আমার সব সময় ভাল লাগে না। তখন হিটার জেলে আমি নিজেই চা কফি বা ওভালটিন করে নিই।"

দেখলাম হিটারে করবী দেবী একটু আগেই জল চড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, "এর থেকে প্রমাণ হয় না যে, শাজাহান হোটেলের কফি খারাপ। এর থেকে এইটুকু প্রমাণ হয় যে, মাঝে মাঝে রান্নার সুযোগ না পেলে বাঙালী মেয়েদের ভাত হজম হয় না।"

করবী দেবী এবার হেসে ফেললেন

বললেন, "তা ভাই যা বলেছো। আমার মাঝে মাঝে বাঙালী মতে রান্না করে খেতে খুব ইচ্ছে করে।"

করবী দেবী অজ্ঞাতে আমার এক গোপন ক্ষতে হাত দিয়ে ফেললেন। সায়েবী খানায় ডুবে থেকে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি একদিন আমারও হাতপা ছড়িয়ে পিঁড়িতে বসে ভাত, ডাল, চচ্চড়ি খাবার সুযোগ ছিল।

আমি ছেলেমানুষের মতো বলে ফেললাম, "আপনি নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে রেঁধে খান।"

করবী দেবী বললেন, "মাঝে মাঝে ভাই হিটারে বাটি চচ্চড়ি রাঁধি। আমার মা খুব সুন্দর বাটি-চচ্চড়ি রাঁধতে পারতেন।"

চচ্চড়ির নাম শুনেই আমার রসনা যে সজল হয়ে উঠেছে, তা করবী দেবীর অভিজ্ঞ নারী দৃষ্টিতে ধরা পড়তে বেশিক্ষণ লাগলো না। হাসতে হাসতে বললেন, "যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তোমাকে একদিন খাওয়াতে পারি।"

"আপত্তি! আমার অবস্থা সেই লোভী শংকরার মতো। যাকে জিজ্ঞেস করা হলো— 'খাবি?' উত্তরে সে বললে—হাত ধোবো কোথায়?"

করবী গুহ স্নিগ্ধ হাসিতে মুখে ভরিয়ে বললেন, "তুমি না ভাই, বাউনের ছেলে। বেজাতের হাতে খেয়ে জাতটা দেবে?"

আমি সাহস পেয়ে বললাম, "হ্যাঁ, ভাটপাড়ার বাউনরা রোজ এখানে আমাকে পঞ্চ ব্যঞ্জন রেঁধে কলাপাতায় খাওয়াচ্ছে কিনা!"

করবী দেবী বললেন, "এটা যে হোটেল। 'হোটেলে চণ্ডালের হাতে খেলেও দোষ নেই' আমার মা বলতেন। তা বলে ঘরে খাওয়া!"

"আপনার মা তো খুব উদার ছিলেন।"

"বাবা যে ট্যুরের চাকরি করতেন। হোটেলে হোটেলে খেয়ে বেড়াতেন। উদার না হয়ে যে উপায় ছিল না।" করবী দেবী এবার ওভালটিন তৈরি করতে শুরু করলেন।

এক প্রসন্ন প্রশান্তিতে আমার মনটা যেন ভরে উঠছে। আমি যেন এতোদিনে এই হোটেলের মানুষগুলোকে ক্রমশ চিনতে আরম্ভ করছি।

করবী দেবীর নিজের হাতে তৈরি ওভালটিন খেতে গিয়ে যেন প্রথম বুঝতে পারলাম, ঘর আর হোটেল এক নয়। দুনিয়ার সেরা হোটেল সে ওয়ালডর্ফ, তাজমহল, যাই হোক না কেন—নিজের ঘরের কাছে (সে শিবপুর, শালকে, কিংবা বস্তী যেখানেই হোক) কিছুই নয়।

ওভালটিনের কাপে চুমুক দিতে দিতে করবী দেবী বললেন, "আসলে নিজের দেশের লোককে বিদেশে আমরা এতো ভালবাসি কেন জানেন?" (তুমি থেকে আমি আবার আপনি হয়ে গেলাম।) "নিজের ভাষায় কথা বলতে পারলে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আপনাদের লীডাররা যতোই বলুন, এর মধ্যে কোনো প্রাদেশিকতা নেই।"

করবী দেবীকে দূরে থেকে এতোদিন দেখে চিনিনি। উনি যে এতো চিন্তা করতে পারেন, এতো সুন্দর কথা বলতে পারেন, তা আজ ওঁর কাছে না এলে হয়তো আমার কোনোদিনই জানা হতো না।

করবী দেবী হঠাৎ ক্যাবারের কথায় এলেন। বললেন, "আপনি তো ওদের সঙ্গে ঘোরেন। ব্যাপারটা কী?"

ওঁর প্রশ্নের অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে আমি বললাম, "আমি ওঁদের সঙ্গে ঘুরতে যাবো কেন? তবে, আমি মিস্টার ল্যামব্রেটোর পাশের ঘরে থাকি, এই পর্যন্ত।"

"এবং সেই পাশের ঘরেই কনি দি উয়োম্যান সারাক্ষণ পড়ে থাকেন!" করবী দেবী এবার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন।

আমি বললাম, "হাজার হোক ওঁর সহশিল্পী। একসঙ্গে বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছেন।"

করবী দেবী বললেন, "কিন্তু তার মানেই যে একটা বামনের কথায় উঠতে বসতে হবে, এমন কোনো আইন নেই।"

"কী বলছেন আপনি?" আমি প্রতিবাদ করলাম।

"শোতে বামন তাঁর কৃপাপ্রার্থী, করুণাভিখারী। বাইরে ঠিক উল্টো। কনি বামনের সেবাদাসী। তার বদমেজাজের বিরুদ্ধেও কোনো কথা বলবার সাহস রাখে না মেয়েটা।"

আমি বললাম, "তাতে কী এসে যায়? শোতে কি করছেন ওঁরা সেইটাই আমাদের ভাববার কথা।"

"শো নিয়ে ভাববেন, আপনাদের কাস্টমাররা", করবী দেবী বললেন। "শোয়ের বাইরে ওঁরা যা করেন, তা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা। কারণ আমরাও এই হোটেলে থাকি।"

উত্তর দেবার কিছুই খুঁজে পেলাম না। ওদের জীবন নিয়ে আমরা কেন যে এমন কৌতূহলী হয়ে উঠছি, তা কিছুতেই বুঝতে পারি না।

করবী দেবী বললেন, "এটাও এক ধরনের বিলাস। ক্যাবারে নর্তকীর তো অর্থের চিন্তা নেই। কিছুক্ষণের আনন্দের জন্যে রাজা-মহারাজা, ধনী এবং ধনীপুত্রর
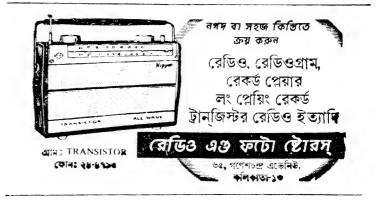
নর্তকীর পায়ের তলায় ডালি দিয়ে যায়। সুতরাং অবসরের একটা বিলাস না থাকলে খারাপ লাগে। কেউ বাঁদর পোষে, কেউ বামনকে লাই দিয়ে মাথায় তোলে।"

আমি চুপ করে রইলাম। করবী দেবী যে এমনভাবে কথা বলতে পারেন, তাই আমার জানা ছিল না।

কোনোরকমে বললাম, "বেচারা যে বামন, তার জন্যে আপনার কষ্ট হয় না?"

করবী দেবী বললেন, "ওরা আপনার মনেও কোনো অদ্ভুত উপায়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। এটা বোঝেন না কেন যে, বামন বলেই লোকটা করে খাচ্ছে। আপনার মতো লম্বা হলে কেউ ওকে কনির সঙ্গে স্টেজে অ্যাপিয়ার করতে দিতো না।"

আমি চুপ করে রইলাম।

করবী দেবী বললেন, "এ লাইনে আমি অনেক দিন রয়েছি। একটা কথা জেনে রেখে দিন। ভিক্ষে এবং এণ্টারটেনমেণ্টের জগতে বিকলাঙ্গ, বীভৎসদর্শনদের অনেক দাম। এদের জোগাড় করবার জন্যে শিল্পীরা অনেক দাম দেয়।"

করবী দেবী একটু থামলেন। তারপর বললেন, "দাম দাও, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে মাথায় তুলো না। তাতে জিনিসটা বীভৎস এবং কুৎসিত হয়ে ওঠে। তাতে যে হোটেলে তুমি নাচছো, তাদের ক্ষতি, আর নিজেরও সর্বনাশ।"

করবী দেবীকে নমস্কার করে এবার কাউণ্টারে এলাম। এবং সেখানের কাজকর্ম শেষ করে উপরে উঠে গেলাম।

কনিকে ছাদের উপরেই দেখতে পেলাম। যেন মুখ শুকনো করে বসে আছে মনে হলো।

রৌদ্রে পিঠ দিয়ে সে একমনে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে কনি সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিলে। তারপর সেটা ছুঁড়ে ছাদের এক কোণে ফেলে দিয়ে বললে, "গুড মর্নিং।"

জানি আজকের সকালটা কনির পক্ষে তেমন গুড নয়। তবু অভিবাদন ফেরৎ দিয়ে বললাম, গুড মর্নিং।

কনি এবার উঠে দাঁড়াল। উঁকি মেরে ল্যামরেটার ঘরের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল যে, ওকে দেখছে কিনা। তারপর কোনো কথা না বলে কনি সোজা আমার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

জামাকাপড় পাল্টিয়ে এবার একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসবো ভেবেছিলাম। কিন্তু কনির জন্যে তা হবার উপায় নেই। কনি একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, "তোমার ডিউটি কি শেষ হয়ে গেল?"

বললাম, "এখনকার মতো ছুটি। আবার সন্ধ্যাবেলায় যা হয় হবে।"

কনি এবার যেন একটু সংকোচ বোধ করতে লাগল। ওর যেন কিছু বলবার ছিল, অথচ বলতে পারছে না। ওর মুখে কেমন যেন অসহায়তার ছাপ ফুটে আছে।

"কিছু বলবে?" ওকে প্রশ্ন করলাম।

কনি উত্তর দিল, "যদি তোমার খুব অসুবিধে না হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে একটু বেরোতাম।"

"আমার সঙ্গে?" আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম।

"হ্যাঁ। এমন জায়গায় এলাম, অথচ কিছু না দেখেই চলে যাবো, ভাবতে কেমন লাগছে।"

বললাম, "কলকাতা দেখবার প্রশস্ত সময় তো এখন নয়। তবে, এ-সময় ছাড়া কখনই আর তুমি কলকাতা দেখবার সুযোগ পাবে?"

তবু প্রস্তাবটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। ক্যাবারে নর্তকীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে যদি কোনো গণ্ডগোলে পড়ি, তা হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। কনি বোধ হয় আমার এই মানসিক অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিল। সে বললে, "মিস্টার স্যাটা বোসের সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি। তোমার নিজের যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তা হলে উনি যাবার অনুমতি দিয়েছেন।"

আমি বললাম, "আপনি নিজের ঘরে

চলে গিয়ে জামাকাপড় পরুন। আমি আপনাকে ফোনে ডেকে পাঠাবো।"

কনি আর সময় ব্যয় না করে নিজের এয়ারকন্ডিসন ঘরের দিকে চলে গেল।

আমি আর কাল বিলম্ব না করে টেলিফোনে সত্যসুন্দরদাকে পাকড়াও করবার জন্যে ছুটলাম। সত্যসুন্দরদা সত্যিই অনুমতি দিয়েছেন কিনা সে-সম্বন্ধে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। কিন্তু সত্যসুন্দরদা বললেন, "হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে কলকাতা ঘুরে বেড়াতে আপত্তি কী? ভদ্রমহিলাকে একা ছেড়ে দেওয়াও মোটেই সেফ নয়।"

আর বাক্যব্যয় না করে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার ফোনটা তুললাম। কনিকে বলে দিলাম, "আমি আর তিন মিনিটের মধ্যে তার ঘরে গিয়ে নক করছি।"

কলকাতা ঘুরে বেড়াবার জন্যে প্রসাধন শেষ করে কনি যখন বেরিয়ে এল, তখন তাকে দেখে কে বলবে, ভোরের এই মেয়েটিই রাত্রের কনি দি উয়োম্যান। স্ট্র হ্যাট, ঐ কালো চশমা ও হাঁটু পর্যন্ত টাইট স্কার্ট পরা এই মেয়েটিকে দেখলে মনে হবে যেন কোনো ট্যুরিস্ট ললনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সবেমাত্র চুকিয়ে বাবার সঙ্গে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে।

কনির চোখেমুখে এখন ট্যুরিস্টসুলভ চঞ্চলতা। ছেলেমানুষীতে সে যেন পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে; অথচ অচেনা অজানা জায়গার ভীতিও সম্পূর্ণ কাটেনি। এইরকম দুজন আমেরিকান কুমারীর গল্প হবস সায়েবের কাছে শুনেছিলাম। বাবাকে বোম্বাইতে রেখে তারা একা একা ভারতবর্ষ ভ্রমণের জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল। দিল্লিতে তারা নাকি মেডেনস হোটেলে উঠেছিল। ট্যুরিস্ট মেজাজে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে সব টাকা খরচ করে ফেলে তারা বাবাকে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল—

"All money spent. Can stay maidens no longer"

কনি একবার নিজের মণিবন্ধের ঘড়িটার দিকে তাকালে। তারপর বললে, "চলো।"

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা চৌরঙ্গীতে এসে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "এবার কোথায় যাবে? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, না লাটসায়েবের বাড়ি?"

কনি ও-সব নামে কোনো আগ্রহই দেখালে না। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এবার সে স্লিপটা বার করে সে আমার হাতে দিলে, তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ। সেই কাগজের টুকরোতে শহরতলীর এক অখ্যাত গলির নাম লেখা আছে।

"এইখানে আপনি যেতে চান?" আমি কনির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

"হ্যাঁ, ওইখানেই যেতে হবে। না হলে, শুধু শুধু কি আমি কলকাতার সৌন্দর্য দেখবার জন্যে বেড়াতে বেরিয়েছি ভাবছো?"

একটা ট্যাক্সি ডাকলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে কনি অনেক কষ্টে উচ্চারণ করে বললে, "আমি সেই গ্রেট ম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই—প্রফেসর শিবদাস দেবশর্মা দি গ্রেট। যাঁর রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল, লর্ড কারজন কোনোদিন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। জঙ্গীলাট লর্ড কিচেনার কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত হয়েও যিনি কিচেনারকে জানাতে দ্বিধা করেননি যে, জাহাজডুবিতে তাঁর মৃত্যু হবে।"

আমি কনির মুখের দিকে তাকালাম। কনি দেখলাম, প্রফেসর শিবদাস দি গ্রেটের গৌরবময় ইতিহাস কণ্ঠস্থ করে রেখেছে। এঁর কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রয়েছে—রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ, লর্ড ব্রেবোর্নের অকাল মৃত্যু, জার্মানির অধঃপতন, গোয়েরিঙের আত্মহত্যা, সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ ও বিদেশিনী বিবাহ এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ। প্রফেসর শিবদাস কিন্তু এও জানিয়েছিলেন যে, অদূরভবিষ্যতে ভারত কমনওয়েলথের আওতা থেকে মুক্তি পাবে না।"

আমি আশ্চর্য হয়ে কনির মুখের দিকে তাকাতে কনি ব্যাগ থেকে একটা ছাপানো কাগজ বার করেছিল। কাগজটা আমাকে দেখানোর ইচ্ছা কনির ছিল না। কারণ ছাপানো বক্তব্য নিবন্ধটি চিঠির আকারে লেখা এবং চিঠির এক কোণে লেখা প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল।

যদি আপনার মনে থাকে, এই চিঠি প্রফেসর শিবদাস দি গ্রেট নিজে লিখছেন,

তা হলে খুবই ভুল করেছেন। কারণ চিঠির প্রথম লাইনে লেখা—এই মহাপুরুষ পাবলিসিটিতে বিশ্বাস করেন না। এবং কোনোরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে মহাপাপ বলে মনে করেন। মহাশক্তিধারিনী জগজ্জননী কালীর পূজো বাবদ যে প্রণামীর হার নির্ধারিত আছে, তাও আদ্যাশক্তি স্বয়ং স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনি সত্যিই প্রচার-লাজুক। নিজের নাম দেননি। আচার্যের গুণমুগ্ধ জনৈক বিদেশী পরিব্রাজক বলে তিনি সই করেছেন। বিশ্ব এবং ভারতবর্ষের অগণিত নরনারীর সুবিধার্থে তিনি নিজ খরচে এবং গোপনে এই মহাপুরুষের সংবাদ প্রচারের সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

চিঠিটা একদিকে ইংরেজি এবং অন্যদিকে হিন্দীতে ছাপা। সেখানে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেল। জানলাম, প্রফেসর শিবদাসই গোপনে মহাদেব দেশাই মারফত কস্তুরবাকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্বামীর একটি ভয়াবহ রিষ্টি আছে। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর চিন্তার কোনো কারণ নেই। স্বামীর কোলে মাথা রেখেই এই সতী রমণী ইহলীলা সংবরণ করতে পারবেন।"

'বিদেশী পর্যটক' গভীর দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন, অষ্টম এডোয়ার্ডকে এক্সপ্রেস চিঠি মারফত শিবদাস দি গ্রেট যে কবচ ধারণের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা যদি তিনি ধারণ করতেন, তা হলে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্যভাবে লেখা হতো। এই আনবিক শক্তিসম্পন্ন কবচ প্রস্তুতের জন্য যাগ-যজ্ঞে যে তিয়াত্তর টাকা চার আনা খরচ হয়, তার থেকে এক আনা কমিশন নেওয়াকে শিবদাস দি গ্রেট গো-মাংস ভক্ষণ পাপের সমান বলে মনে করেন!

এই অভাবনীয় প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল চিঠি কি করে কনির হাতে এসেছিল, তা আমি পরের দিনই জানতে পেরেছিলাম। কনি বললে, "বিলিভ মি, খামে আঁটা এই চিঠি আমার ঘরে এসেছিল। তাতে আমার ঘরের নম্বর পর্যন্ত লেখা ছিল।"

হোটেলের এই অদ্ভুত দিকটা আমার জানা ছিল না। গুড়বেড়িয়াকে একটু কড়া ভাষায় জেরা করতেই থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। গুড়বেড়িয়া প্রথমে বলেছিল, "না হুজুর, আমরা কিছু জানি না। কে কাকে কি চিঠি পাঠাচ্ছে, আমরা কী করে জানবো। চিঠি দিতে বললে, আমরা দিয়ে আসি।"

তারপর একটু চেপে ধরতেই জানতে পারলাম, খামে আঁটা এমন কিছু চিঠি বেয়ারাদের কাছে জমা আছে। নতুন কেউ এলেই তাঁর নাম এবং ঘরের নম্বর লিখে একটা খাম পাঠিয়ে দেয়। এই সার্ভিসের বদলে, সেই বিদেশী পর্যটকের বদলে জনৈক বাঙালী পণ্ডিতমশায় মাঝে মাঝে কিছু পয়সা দিয়ে যান। তবে এখন কম্পিটিসনের বাজার। আরও কয়েকজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষিও হোটেলের বেয়ারাদের কাছে চিঠি এবং খাম জমা রেখে যেতে শুরু করেছেন।

কনি তার হাতের ছাপানো চিঠিটা পড়তে পড়তে বললে, "তোমাদের ওয়াণ্ডারফুল কাণ্ট্রি। তোমাদের এইসব সাধু এবং সন্ন্যাসীরা মানুষের যা মঙ্গল করেন, পৃথিবীর কেউ তা পারে না।"

আমি চুপ করে রইলাম। কনি শিবদাস দি গ্রেটের ঠিকানাটা আর একবার উচ্চারণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে, "আর কতদূর।"

আমি বললাম, "এখন চুপচাপ বসে থাকো। ট্যাক্সি এখনও বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলবে। তারপর সময় হলে তোমাকে আমি বলে দেবো।"

স্ট্র্যান্ড রোড থেকে নদীর উপরের পোলটার দিকে কনির নজর পড়েছিল। আমি বললাম, "হাওড়া ব্রীজ। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার ব্রীজ।"

আমার কথা কনির কানে ঢুকলো না। তার মনে তখন কেবল শিবদাস দি গ্রেট। কনি বললে, "এই যে আমরা কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে যাচ্ছি, উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন?"

আমি বললাম, "তিনি তো দ্রষ্টা। আমরা না বললেও তো তিনি সব জানতে পারছেন।"

এই সামান্য কথাটা যেন কনির মাথায় আগে ঢোকেনি। সে উৎফুল্ল হয়ে বললে, "ইয়েস ইয়েস, তিনি তো সবই বুঝতে পারছেন।"

এদিকে ট্যাক্সিওয়ালা সর্দারজী রেগে উঠেছেন। আমরা যেখানে যাচ্ছি, কস্মিন কালে কোনো ট্যাক্সিওয়ালা যে বিনা রিটার্ন ফেয়ারে সেখানে যায় না, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিতে ভুললেন না।

কনি বললে, "ক্যাবম্যান তোমাকে কী বলছে?"

আমি বললাম, "ওয়েদারের প্রশংসা করছে। কলকাতার এমন সুন্দর আবহাওয়া সর্দারজীর মনেও কাব্যরস নিয়ে এসেছে।"

কনি দুঃখ করে বললে, "আমি কিন্তু পাথর হয়ে গিয়েছি। নেচার আমার মনের মধ্যে কিছুতেই আর ঢুকতে পারে না। কে

জানে। হয়তো এইসব দুশ্চিন্তা না থাকলে আমিও কলকাতার এই আবহাওয়ার জন্যে তোমাকে কংগ্র্যাচুলেট করতাম।"

কর্নি ঘুরে ফিরে আবার শিবদাস দি গ্রেটের কথায় চলে এল। বললে, "বোধ হয় আমি ভুল করেছি। আমার নিশ্চয় খালি পায়ে আসা উচিত ছিল। জুতো পরা থাকলে গ্রেটম্যান হয়তো আমার সংগে দেখাই করবেন না।"

আমি বললাম, "দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন হলে জুতো খুলেই ঢুকবে।"

গাড়ি এবার বড় রাস্তা ছেড়ে অলিতে-গলিতে পাক খেতে আরম্ভ করেছে। সর্দারজী একমনে আমাদের গালাগালি দিয়ে চলেছেন।

কর্নি আবার আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি বললাম, "আর দেরি নেই। আমরা প্রফেসর শিবদাস দি গ্রেটের গবেষণাগারের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছি।" (ক্রমশ)

চড়ুইয়ের সঙ্গে লড়াই

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

॥ ২ ॥

আহমদনগর
১৮ মার্চ : ১৯৪৩

সুহৃদ্বরেষু,

কাল যে-কাহিনী শুরু করেছিলুম, তার শেষ কোথায়? এসো, আজ ঐ তোতা-কাহিনীরই আর একটা অধ্যায় তোমায় শোনাব। জানি না, মুখোমুখি বসে এ কাহিনী শুনলে তুমি খুশী হতে, কি বিরক্ত হতে। তবে আমার দিক থেকে বলতে পারি—এ কাহিনী আমাকে পেয়ে বসেছে। কাহিনী বাড়ছে আর বাড়ছে; ওদিকে সে কাহিনী বলার জন্য মনও উতলা হয়ে উঠছে :

ফরখুন্দা শবে বায়েদ ও খোশ মাহতাবে
তা বা তু হিকায়েত কুনাম হর-বাবে।
মধুবী রাত, চাঁদ হাসে ঘরে গগনে,
যত কথা মোর কহি তব কানে কানে॥

উপর তলার এই বন্ধুদের ও আমার মাঝে আর যে সংকোচের হালকা আবরণ টুকু ছিল, দু'দিনেই সেটুকুও খসে পড়ল। বাসা থেকে সোফায় নেমে আসবার পথে ওদের কিনা দু-একটা বিশ্রাম মঞ্জিলেরও প্রয়োজন!

তাই এখন ওরা করে কি, একেবারে বাসা ছেড়ে পয়লা মঞ্জিল-পাখার হাতলে, সেখান থেকে আমার শিরে পর, না হয় কাঁধের উপর নেমে আসে।

বাইরে থেকে উড়ে এসে ওরা সোজা বাসায় ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখে। চোখ বুলিয়ে সারাটা কামরার আশ-পাশ-তলা একবার আচ্ছা-সে জরিপ করে নেয়।

তারপর ফুড়ুত করে উড়েই পাখার হাতায় নেমে আসে। ওখানে ক্ষণেক নেচে-কুঁদে সুরুৎ করে নেমে এসে আমার শিরে পদধূলি দেয়, না হয় চরণ-কমল-স্পর্শে আমার কাঁধটা ধন্য করে।

আহ্! আজ কতদিন বাদে কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে :

জওলাঁ কো হায় উস্ কে কসদ্-এ পা
মালে,
আয় খাক নুয়ীদ সরফরাজি!
'আমি ধূলি হব,
বধূ' চলে যেতে দলে যাবে,
সেই সুখে আজ ধূলি হব!'

ওদের অতর্কিত হামলার প্রথম দিন আমি খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বলতে লজ্জা নেই, সেদিন আমি হতচকিত হয়ে সোফার উপর ঢলেই পড়েছিলুম।

বন্ধুরাও হয়তো মনে মনে ভেবেছিল : এ কেমন ব্যাভার!

দু'দিনের মধ্যেই অবশ্য সব দুরস্ত। এর পর আমার শির আর কাঁধ দুই-ই পড়ে থাকে যেন অচল অনড় গাড়ি-বারান্দা।

পাখার হাতল ছেড়ে ওরা সোজা আমার কাঁধে নেমে আসে। কাঁধে বসে বসে ক্ষণেক চোঁ চোঁ করে। তারপর লম্ফ দিয়ে সোফায় নেমে পড়ে। কয়েকবার এমনও হয়েছে যে, কাঁধ থেকে লাফিয়ে ওরা আমার মাথায় চড়ে বসেছে!

বদায়ুনীর বইয়ে আতশী কান্দাহারীর কবিতার ঐ লাইন দুটো তুমি হয়তো দেখেছ, যেখানে তিনি বন্ধুর বিচ্ছেদের দরিয়ায় আঁখি-তরী ভাসিয়ে বন্ধুকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সে তরী বাইবার জন্যে।

সর-ই শিকম রফ্‌তা রফ্‌তা বে-তু দরিয়া
শুদ্, তামাশা-কুন!
বিয়া, দর্-কিশ্‌তিয়ে চশ্‌মে নশীন ও সয়র
দরিয়া কুন॥

আমাদের কবি সওদা-ও বলেছেন :

আখোঁ মে দো ওস্ আয়না-রুকো জগা, ওয়ে
টপকা করেঁহ বস্‌কে ইয়ে ঘর,
নম বহুতেঁহ যাঁ॥

তবে আমার মনের কথাই যেন বলেছেন শেখ (সাদী) শিরাজী :

গর্ বর্-সর্ ও চশ্‌মে মন নশিনী,
নাজত বকশম্ কে নাজ নয়নী!

তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে :

বন্ধু আমার চোখের কাজল,
তিলেক মাত্র না দেখিলে মন হয় রে পাগল।

এতদিন ভাবলুম, শ্রাদ্ধ যদি অত দূর গড়ালই তো আরও এক কদম অগ্রসর হতে দোষ কি? পরদিন ভোরবেলা চাউলের ঢাকনাটা ধরতে একটু দেরি করলুম। মেহমানদের বারবার আনাগোনা শুরু হলো। দস্তরখান খালি দেখে ওরা শোরগোল করতে লাগল। আমি তখন চাউলের ঢাকনা হাতের তালুতে রেখে, হাতটা সোফার উপর এলিয়ে দিলুম।

কলন্দরেরই নজর পড়ল সর্বাগ্রে। অমনি সে লাফিয়ে উঠল। একটা চক্কর মেরে সোজা আমার হাতের কব্জিতে এসে বসে আর বসে বসে টপাটপ দানা খেতে লাগল।

একে 'কলন্দর'—তায় আবার খানার ব্যবস্থা করতে সেদিন দেরি হয়েছিল। রাগে-গোস্বায় সে এমন জোরে জোরে দানা খুঁটতে লাগল যে, তার চঞ্চুর ঘায়ে চাউলের দানা ছিটকে ঢাকনার বাইরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একটা দানা পড়ল আমার দু আঙুলের ফাঁকে। ওটা তুলতে সে এমন জোরে এক ঠোক্কর বসাল যে, সে আর কি বলব!

নেহাত ওদের প্রেমের ফাঁস গলায় পরেছি বলে ওদের সব জোর-জুলুম গা-সহা হয়ে গিয়েছে। তা না হলে হয়তো মুখ

থেকে একটা করুণ চিৎকার বেরিয়ে পড়তঃ

'বাঁধতে তায় কেন সাধ যে মরেছে
ওই আঁখিবাণে!'

এর পর ঢাকনা হাতের মুঠোয় রেখে হাতটা আমি উপরে তুলে ধরলুম। এবার যে চড়ুইটা এল, তার নাম 'মোতি'। মোতির কথা আগে বলিনি বুঝি? বসো। একটু বাদে ওর সাথে তোমার পরিচয় করে দিচ্ছি।

মোতি ঢাকনাটার চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে হলো, সে যেন আঁচ করে নিতে চায় এ দ্বীপটায় অবতরণের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান কোনটা। আবার সে ঘরে ঢুকল এবং ঢুকেই সোজা আমার কনুইর উপর নেমে এল।

সেখান থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে হাতের কবজিতে এবং কবজি থেকে একেবারে হাতের তালুতে গিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সে কাঁটা চামচের সদ্ব্যবহার শুরু করল। চাউলের কয়টা দানা ঢাকনার বাইরে ছিটকে পড়তেই সেখানেও সে কাঁটা চালিয়ে দিল। দেখ তো, দরাজ-দাক্ষিণ্য দেখাতে গিয়ে আমার এ কেমন ভোগান্তি! কিন্তু কি আর করি, বলো?

দেখে দেখে রোখ আমার আরো বেড়ে গেল। ভাবলুম, নাচতে নেমে ঘোমটার আড়াল দেওয়া কেন? আমার হাতের তালুটা তো রয়েছে! এরপর আমি হতভাগা ওই ঢাকনাটা ইয়ার বন্ধুদের সামনে ধরে বসেছি কেন?

পরদিন হাতের তেলোয় চাউল রেখে হাতটা সোফার উপর আলতোভাবে বিছিয়ে দিলুম। মোতিই এল সবার আগে। ঘাড় বাঁকিয়ে সে দেখতে লাগল—আজ ঢাকনা নাই কেন?

* * *

চড়ুইয়ের এই কলোনীতে মোতিই হচ্ছে সবচেয়ে খুবসুরত।

আজকাল দেশে দেশে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা আকসর হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত মেয়েকে এক-একটা দেশের "বৎসরের সেরা সুন্দরী" খেতাব দেওয়া হয়। যেমন, কেউ হয় মিস ইংলণ্ড, কেউ বা মাদমোয়াজেল ফ্রান্স ইত্যাদি। যেন ওই একটি সুন্দর মুখাবয়বে সমগ্র দেশ ও জাতির সৌন্দর্য বাসা বেঁধেছে।

এখানে এই কলোনীতে যদি এমনধারা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে মোতিই পাবে সেরা সুন্দরী, মানে—"মাদাম কেন্দ্রা আহমদনগর" খেতাব।

* * *

ছুরির ফলার মতো তার ছিমছাম তনু-দেহ, বঙ্কিম গ্রীবা, নিভাঁজ সরু ঠোঁট, গোলগাল আয়ত চোখ দুটো না-বলা কথার আবেশে যেন সদা ঢলঢল। দানা খেতে সে আসে। এক একটা দানা সে মুখে তুলে নেয় আর আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে। দুজনার কারো মুখে রা নেই। ৩৩৮
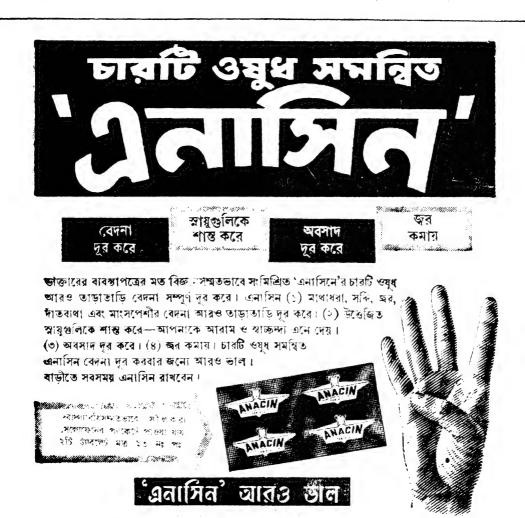
নীরবে দুজনের মাঝে কত না কথা হয়! সে আমার চোখের ভাষা বোঝে, আমিও তার চোখের ভাষা পড়তে পারি।

কারিশ্ মঃ গরমে সওয়ালস্ত,

লব ম-কুন-রনজা

কে ইহ্‌তিয়াজ ব-পুরছিদনে জবানি নিস্ত!

'নয়নে নয়ন দিয়ে সারা দিন বসে র'ব,

মনের গোপন কথা নয়নসলিলে ক'ব।

নিঃশংকচিত্তে সে আমার আঙ্গুলের ডগায় বসে তালু থেকে চাউল ঠুকরে ঠুকরে তুলে নেয়। তার ঠোঁট না, যেন চাকুর ফলা! এক-এক ঠোকরে হাতের তালু এপার-ওপার করে দিতে পারে। তবে ঠোকর বসাতে গিয়ে সে কেমন যেন থেমে থেমে যায়। দানা ঠুকরে তুলতে গিয়ে বারবার সে আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে। যেন সে বলতে চায়ঃ বন্ধু, ব্যথা পাওনি তো?

বলোঃ এর জবাব কি?

ব্যথা পাই কি পাই না, সে বলতে পারি না। তবে ওর ধারালো চঞ্চুর এক এক ঘায়ে হাতের তালুটা যেন জখম হয়ে যায়।

* * *

এ কলোনীর সব বাসিন্দার কথা তো আলাদাভাবে বলা যায় না। তবে বিশিষ্ট দু'একজনার কথা অবশ্যই বলতে হয়। কলন্দর আর মৌনীর সাথে তোমার পরিচয় করেছি। এবারে মোল্লা আর সুফীর কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

একটা চড়ুই দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর ভারি ঝগড়াটে এর স্বভাব। মুখে ফড়ফড়ানি হরদম লেগেই আছে। সব সময় ঘাড় তেড়া আর সিনা টান করে চলে। সামনে কেউ পড়ে তো ভয়ে দু' গজ সরে দাঁড়ায়। ওর সামনে এগোয় কার সাধ্য! দু' চারটে নওজোয়ান চড়ুই এর মোকাবেলা করতে চেষ্টা না করেছে এমন নয়, তবে পয়লা ধাক্কাতেই সব চিৎপটাং।

বাইরে, ময়দানে যখন কাকদের মেলা বসে, ও তখন রাগে-গোস্বায় গা-ঝাড়া দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে ওদিকে এগিয়ে যায় এবং লম্ফ দিয়ে কোন উঁচু জায়গাতে চড়ে চোঁ চোঁ করতে থাকে। সে অবস্থায় ওকে দেখলেই কাআনীর হাসির কবিতার জামে মসজিদে বাগ্মীপ্রবরের চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেঃ

বাঁ ওয়ায়েজেক আমাদ দর্ মসজিদ জামে,

চু বর্‌ফ হমা জামা সপেদ অজ-পা-তা-সর

চশ্‌মাস ব-সুয়ে চাঁপ ও চশ্‌মাস

ব-সুয়ে রাস্‌ত;

তা খোদ্ কে সালামে কুনাদ আজ

মুন্‌এম ও মজতর।

জে আ সামান কে খরামাদ ব-রুছন

মর্দে বছন-বাজ,

আহ্‌স্তে খরামিদে ও মউজ, ও মুআক্‌কর।

ফারক্ না সুদা খলক্ জে তসলিম ও

তশাহুদ

বর্ জিশ্ ও চু বাজিনা ও বে-নেশাস্ত

ব-মিম্বর।

জামে মসজিদে এক আসে বাগ্মীবর,

শ্বেতশুভ্র জামা জোব্বা পাগড়ি শিরোপর।

ডানে বামে চারিদিকে ইতি উতি চায়,

ছোট বড় সবে যাতে সালাম জানায়।

হেলিয়া দুলিয়া ধীরে চলে বাগ্মীবর,

তারের উপরে যথা নাচে বাজীকর।

তসবিহ্ শেষ দুদ সদা করে তিলাওৎ

লম্ফ দিয়ে মিম্বরেতে চড়ে কপিবৎ।

ইত্যাদি।

অতঃপর তুমিই বলো, এর নাম মোল্লা না রেখে আর কি রাখা যায়! এর ঠিক বিপরীত স্বভাবের আর একটা চড়ুই। যখনই চাও, দেখবে কিসের না কিসের চিন্তায় তন্ময় উদ্‌গত চুপচাপ বসে রয়েছে। বড়জোর এর মুখ থেকে মাঝে মাঝে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরোয়। চিন্তাভারে নত-শির মানুষ যেমন সময় সময় মাথা তুলে চায় আর হুম করে উঠে, ঠিক তেমনি।

দলের অন্যান্য চড়ুই ওর পেছনে লাগে। দুর্বল পেয়ে ওকে নানাভাবে জুলুম করে কিন্তু তাতেও ওর রা নেই। তবে ওর চোখের দিকে চাইলে মনে হবে যেন ওরা বলছেঃ

তু জবানে ফাহম না'

ব'রনা খামুশী সোখনস্ত।

হে মৌন, না যদি কও, নাই কহিলে কথা:

বক্ষ ভরি বইব আমি তোমার নীরবতা।

আমি ওর নাম দিয়েছি সুফী। নামটা কিন্তু ওকে খুব মানিয়েছে, যেন গায়ে রেখে সেলাই করা একটা জামা।

ভোরবেলা এই কলোনীর বাসিন্দারা বাইরে বারান্দা আর ময়দানে ভিড় জমায়। তখন এক ভারি মজার দৃশ্যের অবতারণা হয়। ফুলের টবে চড়ে কেউ নর্তন কুর্দন শুরু করে, কেউ বা ক্রোটন গাছের ডালে ঝোলাঝুলি খেলতে থাকে।

এক জোড়া চড়ুই গোছল করবে বলে, ফুল গাছে জল দেওয়া কখন শেষ হবে, সে আশায় বসে থাকে। জল ঢালা শেষ হতেই ওরা হাউজে নেমে জোরে জোরে গায়ের

পালক খোলা-বন্ধ করতে থাকে। আর এক দম্পতি জলের আশায় বসে না থেকে "ফাতাইয়াম্মামো ছইদান তইয়েবা" তেলাওৎ করে মাটিতেই নাহান শুরু করে। ঠুকরে ঠুকরে ওরা বুক ডোবাবার মতো মাটি খুঁড়ে নেয়। তারপর গর্তে গা ডুবিয়ে এমন জোরে পর-পাখ ঝাপটাতে থাকে যে, তাতে ধুলোর ঝড় বয়ে যায়।

মোল্লা হয়তো তখন ওর স্বভাবসুলভ কায়দায় কোন বিষয় মীমাংসার জন্যে কারো সাথে কুস্তি লড়তে শুরু করে। ওদের লড়াই দেখবার মতো। লড়াইও করে ওরা হাতিয়ার বিনে। তবে ঠোঁট দিয়েই ওরা হাতিয়ারের অভাব ঠিক পুষিয়ে নেয়।

রাগে-গোস্বায় ফেটে পড়ে এক অপরকে এমনভাবে ঠোকরাতে থাকে যেন কারো কোন খাতির নেই। শূন্যে লড়াই করে করে একে অপরকে এমন ভাবে জড়িয়ে জাপটিয়ে ধরে যে, কখন কোথায় গিয়ে পড়বে, সেদিকে কোন হুঁশ থাকে না।

কয়বার ওরা আমার মাথায়ও পড়েছে। একবার আমার কোলে পড়তেই আমি দু' হাতে দু'টোকে ধরে ফেললুম। সারাটা দেহ ওদের তখন আমার মুঠোর ভিতর। শুধু গলাটা বাইরে। বুক ধুকধুক করছে যেন 'এই ফাটে, এই ফাটে' অবস্থা। অথচ কী তেজ এদের! সে অবস্থায়ও একে অন্যকে ঠোকরাবার চেষ্টায় কসুর করছে না। আমার হাতের মুঠো খুলে দিতেই ওরা পাখার হাওয়ায় গিয়ে বসে এবং সেখানে বসে বসে চোঁ চোঁ করে এক অপরকে শাসাতে থাকে:

ভাগ্য ভাল যে, মানে মানে ফিরতে পেরেছিস!

আজ কয়দিন যাবৎ মোতির বাসায় ছোট্ট বাচ্চার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এখন সে দানা খেতে নামে আর একটা দানা মুখে পুরেই বাসার দিকে ছুটে দেয়। বাচ্চাটা ওকে দেখেই চিঁ চিঁ শুরু করে। দু'-চার সেকেন্ড পর মোতি ফের আসে এবং একটা দানা মুখে পুরে বাসায় ফিরে যায়। একবার আমি গুনে দেখলাম, এক মিনিটে ও সাত-বার এল গেল।

* * *

পক্ষী-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের বইপুস্তক পাঠে জানা যায় যে, চড়ুই পাখি দিনে আড়াই শ' থেকে তিন শ' বার বাচ্চাদের খাবার খাওয়ায়। একদিনে যে খাবার বাচ্চাদের মুখে তুলে দেয়, সে যদি এক সাথে বাচ্চার সামনে জড়ো করা হয়, তা হলে দেখা যাবে খাবারের স্তূপ আকারে বাচ্চাটার দেহের আকারের চেয়ে ছোট নয় কোন মতেই! পাখির বাচ্চাদের হজম-শক্তি এত বেশী যে, খাবার পেটে যেতেই হজম শুরু হয়। এই কারণেই চতুষ্পদ জানোয়ারের বাচ্চার তুলনায় পাখির বাচ্চার দেহ ত্বরিৎ বৃদ্ধি পায় এবং অল্প দিনের ভিতর এরা সাবালক হয়ে উঠে। মোতির আনাগোনা দেখে আমার বিশ্বাস হলো: পণ্ডিতগণ যথার্থই বলেছেন।

দিনে দিনে বাচ্চার 'পর-পালক' বড় হতে থাকে আর অদৃশ্য ফেরেশতা এসে মায়ের কানে সুসংবাদ দিতে থাকে: ওগো তোমার বাচ্চা বড় হলো, এবার ওকে উড়তে শেখাও। মোতির কানেও বুঝি মন্ত্র গুঞ্জরন শুরু হলো।

একদিন ভোরে দেখি, মোতি বাসা ছেড়ে 'উড়া' দিল তো ওর সাথে সাথে ছোট্ট একটা বাচ্চাও উড়বার চেষ্টা করেই নীচে পড়ে গেল। মোতি বারবার বাচ্চাটার কাছে যায় আর বাচ্চাটাকে ওড়বার ইশারা করে নিজেই উড়তে থাকে। বাচ্চার কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই। পাখা ঝুলিয়ে, চোখ বন্ধ করে নিঃসাড় নিশ্চল পড়েই থাকে। আমি উঠে গিয়ে বাচ্চাটাকে দেখি। মনে হলো, ওর পাখা ওড়বার মত তত শক্ত হয়ে উঠেনি। নীচে পড়ে গিয়ে বেচারা এমন শক্ত চোট খেয়েছে যে, ও আর এখন এপাশ-ওপাশ করতে পারছে না। ওকে তুলে আমি কার্পেটের উপর বসিয়ে দিলুম।

মোতি চাউলের দানা খুঁটে খুঁটে ওর মুখে তুলে দেয়। বাচ্চাটা মুখ খুলে, একটানা চিঁ চিঁ আওয়াজ করে দানা মুখে পুরেই দম মেরে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে।

সারাটা দিন এভাবেই গেল। পরের দিনটাও।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মা ওকে ওড়বার ইশারা করেছেই গেল। কিন্তু মুন্নুর কানে ছাড়া ও এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, ওর একদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়

না। আমার মনে হলোঃ বাচ্চাটা বাঁচবে না। পরদিন ভোরবেলা এক আশ্চর্য দৃশ্য আমার চোখে পড়ে। এক ফালি রোদ তির্যকভাবে ঘরের ভিতর বহু দূর এসে পড়েছিল। দেখলুম : বাচ্চাটা রোদে এসে দাঁড়িয়েছে। 'পর-পালক' তেমনি ঝুলে পড়া, পা মোড়া, চোখ আগের মতই বন্ধ।

সহসা দেখি—ও চোখ মেলে পিট্‌পিট্‌ করে চাইছে—গলা বাড়িয়ে বাইরে ময়দানের দিকে তাকাচ্ছে। 'পর-পালক' ঝেড়ে খুলে-বুজে নিচ্ছে। এর পর সহসা লম্ফ দিয়ে ও একটু সামনে এগুল এবং সাথে সাথে 'পর' মেলে তীরের মত উড়ে বাইরে ময়দানে ছিটকে পড়ল এবং সেখান থেকে হাওয়ার মত অসীম দিগন্তের পথে আমার দৃষ্টি-নাগালের বাইরে চলে গেল।

এ কী অসম্ভব ব্যাপার! যা দেখলুম তাতে মনে সন্দেহ হলোঃ এ কি ওই অসহায় চড়ুই বাচ্চাটা, না অন্য কোন পাখি! কিন্তু নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি নে!

গত দু দিন যাবৎ বাচ্চাটা এমন অসহায় অবস্থায় পড়ে ছিল যে, মা এত করে ওকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু মাটি ছেড়ে ও এক ইঞ্চিও উড়তে পারেনি। আর আজ অসীমের আহ্বানে ওর অন্তরে এমন কী বিপ্লব ঘটে গেল যে, প্রথম উড়নেই ও বিনা সব বাধা-বন্ধন পেছনে ফেলে অন্তহীন আকাশের নিঃসীম নীলিমায় মিলিয়ে গেল!

এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বে-এখতিয়ার এমন জোরে দু লাইন কবিতা মুখ থেকে টপকে পড়ল যে, তাতে আশপাশের সবাই চমকে উঠলঃ

নয়রুয়ে ইশ্‌কে দিন্‌ কে দরুই দাশ্‌তে
বে-কিরান,
গামে না রফ্‌তাএম ব-পায়ইয়া রসিদাএম।
দুস্তর মরু, ক্লান্ত চরণ চায় না যে পথ চলি,
বন্ধুর ডাকে উড়ে চলে যাই, সব বাধা
পায়ে দলি!

আসলে ও এক মামুলী ঘটনা মাত্র। জীবনের চলার পথে এ হেন তামাশা আমাদের চোখের সামনে হর-হামেশা ঘটে অথচ আমরা তা দেখেও দেখি না। ওই চড়ুইয়ের বাচ্চাটার ওড়বার শক্তি পুরোপুরি বিকশিত হয়েছিল। স্বীয় নিভৃত নীড়ের ক্ষুদ্র সীমা ছেড়ে অন্তহীন আকাশের নীচে অসীমের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়েও ছিল। কিন্তু ওর আত্ম-বোধ তখনও ছিল সুপ্ত, আপন সত্তা সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণ অচেতন।

মা ওকে বারবার ইশারা করেছে, হাওয়া এসে বারবার ওর পালক ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে, চল-চঞ্চল জীবনের কল-কোলাহল চারদিক থেকে ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে—

কিন্তু সব বে-কার, বে-অসর! বাইরের কোন আবেগ-উত্তেজনা ওর অন্তরের নির্বাপিত অগ্নিশিখা উদ্দীপিত করে তুলতে পারে নি।

কলীম, সেকোয়া জেত্‌ওফিক চন্দ?
সরমাত বাদ
তু চু' ব-রাহ্‌ না নিহি পায়ে, রহনুমা চে
কুনাদ?

হে কলীম,
বৃথা নিন্দ অদৃষ্টেরে, লজ্জায় মাথা কর নত,
কি করিবে রহনুমা, তুমি যদি না চলিবে
পথ!

আজ সহসা যেই ওর সুপ্ত আত্ম-চেতনা জেগে উঠল, আত্মোপলব্ধির পরম ক্ষণে যেই সে বুঝতে পারলঃ 'আমি মুক্তপক্ষ নভোচারী বিহঙ্গম, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে চলা আমার বিধিলিপি', অমনি ওর মৃতকল্প, নিরুত্তাপ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেগে উঠল নবজীবনের স্পন্দন।

দেহ-যষ্টি সোজা হয়ে উঠল, দেহভার বহনে অক্ষম, কম্পিত পদযুগল সহসাই দৃপ্ত হয়ে উঠল, জীবনের স্পর্শ-লেশহীন ঝুলে-পড়া 'পর-পালক' হাওয়ায় ফরফর করে উঠল। আকাশে ওড়বার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় নিমেষে ওর সারা দেহে এক পুলকশিহরন জাগিয়ে তুলল। আপন সত্তায় জেগে উঠে ও দেখতে পেল ওর দুঃখের নিশি ভোর হয়েছে। সব বাধা-বন্ধন টুটে গেছে। অন্তহীন আকাশের বিপুল বিস্তার ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে আহ্বানে, দুরন্ত বাজ-পাখির ন্যায় ও আজ আকাশের ঠিকানা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।

বলা যায়ঃ এ যেন শক্তিহীনের শক্তির উদ্বোধন। সুষুপ্তি থেকে জাগরণ। মৃত্যুর দেশে জীবনের জয়গান।—

যখন ঘটে, চক্ষের নিমেষেই এ বিপ্লব ঘটে যায়!

একটু ভেবে দেখো! নিমেষের ওই ক্ষুদ্র ঘটনার মাঝে জীবনজিজ্ঞাসারও একটা সদুত্তর খুঁজে পাবে।

চী মি শাওয়াদ ইঁ-রহ্‌ ব-দরখ্‌শিদনে
বরকী
না বে-খবর আঁ, ন্যুন্তখির শামা ও
চিরাগম॥
বিজলী আলোর রোশনিতে ভরা পথ, খবর
রাখি না, তাই।
মৃৎপ্রদীপ কবে, কোথা পাব, সে আশায় বৃথা
দিন গোঁয়াই॥

বল তো! জীবন-কারায় নবীন বন্দী ওই চড়ুইবাচ্চাটার কিসের অভাব ছিল? আকাশে উড়ে বেড়াবার সাজ-সরঞ্জাম প্রকৃতি ওর জন্যে পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। মা-ও দম-বদম ওকে ওড়বার জন্যে ইশারা করেছিল। কিন্তু সব বে-কার। যতক্ষণ না ও নিজে নিজেকে চিনতে পারল, ওর 'পর-পালক' সব বে-অসর পড়েই রইল।

ঠিক এমনি অবস্থা মানুষেরও। যতক্ষণ না সে নিজে নিজেকে চিনতে পারে, বাইরের কোন কল-কোলাহল তাকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারে না। কিন্তু যখনই সে আত্ম-সত্তা ফিরে পায়, আত্মচেতনায় জেগে উঠে যেই সে ঠিক বুঝতে পারে : সে কি, আর কি বা তার পরিচয়, অমনি চক্ষের নিমেষে এক মহা-বিপ্লব ঘটে যায়। মাটির বন্ধন ছেড়ে স্বীয় চেতনার আলোকে সে তখন মহাকাশের ঠিকানা খুঁজে বেড়ায়।

এই মহাসত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে মরমী কবি হাফিজ বলেছেনঃ

চে গোয়েমত কে ব-মায়খানা দোস মস্তে
খরাব,
সরোশে আ'লেমে গয়েবম চে মুজদাহা
দাদাস্ত
কে আয় বুলন্দ নজর, শাহবাজ সিদরা
নাশিন!
নশিমনে তু না ইঁ কুন্জে মেহনত
আবাদাস্ত।

তু রা আজ কংগোরহে আ'রশ মী জানাদ
সফীর,
না দানামত কে দরিঁ দমগাহ্ চে
উফ্ তাদাস্ত॥
কাল রাতে নেশাতুর পড়েছিনু পানশালা
মাঝে,
অলক্ষ্যে ফেরেশতা এসে দিল মোরে সে কি
সুখবরঃ

রে দুরন্ত শাহবাজ! সিদ্রা চূড়ে বাঁধা যার
ঘর,
দুঃখ-ভরা ক্ষুদ্র ওই গৃহকোণে তোরে নাহি
সাজে।
নন্দনের দ্বার হ'তে কে তোরে ডাকিছে
বারবারঃ
মিছে কেন ধরা দিলি মায়াফাঁদে হেথা বৃথা
কাজে।

[সমাপ্ত]

প্যারিসের চটকদার শিল্পী ক্লাইন

সলিল ঘোষ

প্যারিসের চিত্রকলার জগতে যে হিড়িকবাজ তরুণ শিল্পী একটার পর একটা চমক লাগিয়ে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছেন, সেই ইভ্‌স্ ক্লাইন-এর নাম আমি আগে কখনও শুনিনি নি। প্যারিসের আধুনিক চিত্রজগতের কথা বলতে গেলে বিগত ষাট বছর ধরে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিত্রকলায় যিনি কর্ণধাররূপে বিশ্বব্যাপী কীর্তি লাভ করেছেন, অশীতিপর চির তরুণ সেই পিকাশোর নামই সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে। আমাদের দেশে প্যারিস ও তার আধুনিক চিত্রকলার শেষ কথা এখনও পর্যন্ত পিকাশো। ভারতীয়দের কথায় কথায় পিকাশোর এই নামোল্লেখে বহু ফরাসীকে আশ্চর্যান্বিত হতে দেখেছি। কারণ প্যারিসের চিত্রজগতে পিকাশো আজ আর কোন force নয়, তিনি এখন আর হালে পানি পাচ্ছেন না। আধুনিক চিত্রকলার grand old man রূপে সমীহ ও সম্মান পেয়ে থাকেন। সেখানকার চিত্রজগৎ আজ আর পিকাশোকে নিয়ে মাতামাতি করে না, যতটা করে অন্য দেশে। শুধু মাঝে মাঝে তাঁর বিষয় ব্যক্তিগত খবর সব প্রকাশিত হয়। যথা বুড়ো বয়সে কাকে বিবাহ করলেন, বিভিন্ন পক্ষের পিকাশো-সন্তানরা কি করছে ইত্যাদি। সেখানে আজ আরও সব নতুন শিল্পী আলোড়ন তুলছে, ম্যাথিউ, দু বুফা, বেরনার বুফা প্রভৃতি আরও অনেকে। কিন্তু এদের মধ্যেও বয়সে সবচাইতে ছোট ক্লাইন-এর মত হইচই আপাতত আর কেউ শুরু করতে পারেনি।

ক্লাইনের কাছে নিয়ে যাবার আগে আমার ফরাসী বন্ধু ফ্রেদেরিক ওর কথা আমাকে এমনভাবে বলেছিল যে, আমি ভেবেছিলাম প্যারিসের ৫০।৬০ হাজার শিল্পীর অন্যতম কেউ হবেও বা। "ক্লাইনের কাছে আমার কাজ আছে, তুমিও চল আলাপ করবে, ওর বেশ এলেম আছে।" সিলেকত্-এর কাছেই ওর বাসস্থান। আশেপাশের সব বাড়িগুলি দেখে মনে হল, এ অঞ্চলের শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। ক্লাইনের ফ্ল্যাটে আওয়াজ দেবার পর, বেশ কিছুক্ষণ দরজার গোড়ায় অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে ক্লাইন হাত মুছতে মুছতে দরজা খুলল। রঙ গোলাচ্ছিল। বেশ সুন্দর চেহারা, বয়স অল্প, তিরিশের নীচে বলেই মনে হয়। চোখেমুখে গোবেচারা ভাব, কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে পেটে পেটে যে এত বুদ্ধি, পরে তা জেনে হতভম্ব হয়েছিলাম। ফ্রেদেরিক ইন্দিয়েন আর্ট ক্রিতিক্ বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দিল। বিরাট বড় ফ্ল্যাট, প্রকাণ্ড হলঘর, কোন আসবাবপত্র নেই। পুরোটা মেঝে ছাই-রঙের মূল্যবান কার্পেট দিয়ে ঢাকা, তলায় "ফোম-রাবার" দেওয়া। ভেতরে ঢোকার দরজার পাশের বিরাট দেয়ালে ঝুলছে একটি বড় তথাকথিত ছবি, ক্লাইন যার জন্য বিখ্যাত। শুধু নীল রঙের চৌকোনো একটি বিরাট ক্যানভাস। পাশে রয়েছে ওর বন্ধু ভাস্কর জাঁ টিংলী-র করা একটি মূর্তি। লোহালক্কড়, নানাপ্রকার ধাতুর অংশ দিয়ে তৈরী, এমনকি বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা বিভিন্ন অংশ সচল করাও চলে। যন্ত্রপাতির নানারকম অংশ দিয়ে মূর্তি গড়ায় টিংলী খ্যাতি অর্জন করেছেন। অপরদিকে দেয়ালের সামনে মেঝেটা একটু উঁচু করে বাঁধানো বেদীর মত, পাশে ফায়ার-প্লেস। আর কিছুই নেই এই হলে। পাশে দু-তিনটি ঘর রয়েছে। তারই একটা ঘরে দেখলাম মেঝের উপর কাগজে-রাখা একগাদা গুঁড়ো নীল রঙ, যা "ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইন ব্লু" বা "আই-কে-বি" নামে পরিচিত হয়েছে সর্বত্র। এর আগে যেসব ফরাসী শিল্পীর এতেলিয়ারে গিয়েছি, কারোরই এরকম এলাহি বন্দোবস্ত নেই। ফ্রেদেরিক জানালো যে, এই ফ্ল্যাটটা ক্লাইনের নিজস্ব, কয়েক মিলিয়ন ফ্রাঁ দিয়ে কেনা। ক্লাইন এখন খুবই অবস্থাপন্ন। প্যারিসের এখনকার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র

পিকাশোর স্কেচ। প্যারিসের চিত্রজগতে এঁর প্রভাব আজ আর তেমন নেই, তরুণ শিল্পীরা আসর জাঁকিয়েছে

জাপানী যুযুৎসুর পোশাকে শিল্পী ইভ্স্ ক্লাইন

বেরনার বুফেই খুব অল্প বয়সে প্রচুর বিত্তশালী হয়েছেন, যাঁর তুলনা মেলাই ভার। বিরাট স্যাঁতো, নানারকমের গাড়ির মালিক। এখনও অতটা না হলেও ক্লাইন শীগ্গির হয়ত ওকেও ছাড়িয়ে যাবে।

বেদীর উপর কার্পেটে বসে ক্লাইনের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। অল্পস্বল্প ইংরাজী জানে। অন্যান্য শিল্পীদের মতই ক্লাইনও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে ওঁর নিজস্ব মতামত অনেক কিছুই বললেন, সব শুনলাম। কিছুকাল আগে লণ্ডনে ওঁর চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। ইংলণ্ডের চিত্র-জগতেও তুমুল বিতণ্ডা এনেছিল ওই প্রদর্শনী। সে-সবের কাটিং, প্রদর্শনীর ছবি ইত্যাদি সহ একটা খাতাও এনে দিল আমাকে দেখতে। এর মধ্যে নিজেই কফি বানিয়ে আনল আমাদের জন্য। ফ্রেদেরিকের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় আলাপ-আলোচনা শুরু করল, ক্লাইন-পরিকল্পিত পুস্তক সম্বন্ধে। চিত্রকলার বিষয়ে ক্লাইন তাঁর ধারণা ও মত পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে চান। নিজে লেখক নন, ভাষায় তেমন দখল নেই, তাই ফ্রেদেরিকের সাহায্য তিনি চান। ফ্রেদেরিক ওঁর লেখা শুধরে বই প্রকাশে ও সম্পাদনায় সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। আমিও এই অবসরে বিখ্যাত সমালোচকদের ওঁর ছবি সম্বন্ধে মন্তব্য পড়ে বেশ বুঝতে পারলাম, ইউরোপের মডার্ন আর্টের হালচাল এবং সেখানে রাতারাতি বিখ্যাত হতে হলে কি করা উচিত।

ক্লাইনের বিষয়, তাঁর চিত্রকলা ও মতামত সম্বন্ধে ভালভাবে জানার পর ওঁর অনেক কিছুই মেনে নিতে দ্বিধা হলেও আমি ওঁর একজন গুণগ্রাহী হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল "ক্ষতি কি—এটাই বা ছবি হবে না কেন?"

ক্লাইন-এর ছবি হল, নানারকমের আকৃতির চতুষ্কোণ ক্যানভাস, সম্পূর্ণ নীল-রঙের মনোক্রোম। কিছু নেই তার মধ্যে। না আছে কোনো ডিজাইন, না আছে কোনো আঁকিবুকি। শুধু আছে ক্যানভাস ভর্তি নীল রঙ। অক্সফোর্ড ব্লু। কিন্তু ক্লাইন তার নামকরণ করেছেন "আই-কে-বি"। লণ্ডনের প্রদর্শনীতে এই রকম নানা আকৃতির ৩০টি নীল চতুষ্কোণ ছিল এবং তা চড়া দামে বিক্রিও হয়। ক্লাইন বলেন যে, প্রত্যেক রঙের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ছবিতে একসঙ্গে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে কোন প্রতিকৃতি, ফর্ম, ছবি ইত্যাদি আঁকার কোন মানে হয় না। তাতে রঙের নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্যই তিনি এই একরঙা নীল চতুষ্কোণ তৈরি করছেন। তিনি বলেন, ওই নীল রঙের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখনও তা নিজের কল্পনা অনুযায়ী লাল বা হলদে রঙে পরিণত হয়ে যায়। এই নীল চৌকোনো ক্যানভাসে কোনপ্রকার অংকন নেই। মন্দ্রিয়ান লাল, নীল, হলদে তিনটি মৌলিক রঙের চতুষ্কোণ দিয়ে যে ছবি করতেন, তারই আরেক ধাপ এগিয়ে ক্লাইন শুধু নীল চতুষ্কোণই গ্রহণ করেছেন। এমনকি মন্দ্রিয়ানের কালো লাইন দেওয়া বর্ডার বাদ দিয়ে। ক্লাইনের প্রথমদিকের কোন কোন ছবির নীল ক্যানভাসে একই রঙের নীলে চোবানো প্রবাল ধরনের বস্তু ক্যানভাসের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে দিতেন, কেপাসিং জাপানী ধরনে করা। জাপানী বাগানে মাটির উপরে ওরা যেভাবে অনেক সময় চলাফেরা করার জন্য পাথর বসায়, সেই ধরনে। এটা বোধ হয় ক্লাইন-এর জাপান বাসের প্রভাব। ক্লাইনের ছবি হল, বড় বড় চারকোনা নীল রঙের ক্যানভাস, কোনো কোনো ছবিতে নীল রঙে চোবানো প্রবাল জাপানী প্রথায় সেট করা। সাধারণ প্রথায় তুলি দিয়ে রঙ লাগানোতে অযথা সময় নষ্ট হয় বলে বড় রোলার দিয়ে ঘষে ঘষে ক্লাইন ক্যানভাসে রঙ লাগান। নিজস্ব পদ্ধতিতে

তরল বস্তুর সঙ্গে সে রঙ তিনি নিজের হাতেই গুলে নেন। এই হল প্যারিসের আধুনিকতম আর্টের চরম নিদর্শন। "মডার্ন আর্টের ধোঁকাবাজির চরম ও শেষ নমুনা" বলে একদল সমালোচক ক্লাইনের ছবিকে উল্লেখ করেছেন। আবার একদল বলেছেন "Not at all a hoax only logic is reduced to absurd."

"ভয়েস অব সাইলেন্স"-এর লেখক আঁদ্রে মালর'র মত বিদগ্ধ কলারসিক পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তরুণ শিল্পী ক্লাইনকে।

যে যাই বলুক, ক্লাইন তা নিয়ে আজ আর মাথা ঘামান না বা এখন ওসব থোড়াই পরোয়া করেন। তিনি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। প্যারিসে তাঁর উপযুক্ত ছবির যখন প্রথম প্রদর্শনী হয়, উদ্বোধনের দিন প্যারিসের আকাশে গুণগ্রাহীরা হাজার হাজার নীল বেলুন ওড়ায়। ক্লাইন নিজেও চিত্রশিল্প ও প্রচার-শিল্প, দুই ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণ শিল্পী। ফরাসী সরকারের বিশ্ববিখ্যাত ইন্টেলেকচুয়াল মন্ত্রী আঁদ্রে মালরো এই প্রদর্শনী উপলক্ষে সরকারী তরফ থেকে এক বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। শুধু একটি নীল চতুষ্কোণ ডাকটিকিটের আকারে যার মধ্যে দেশের নাম, টিকিটের দাম পর্যন্ত লেখা ছিল না। চারিধার শুধু পারফোরেট করা। ডাকঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। এমনই হৈচৈ তোলে ওঁর প্রদর্শনী। এর পর পশ্চিম জার্মানীতে ইউরোপের মধ্যে প্রায় সর্ববৃহৎ অতি আধুনিক একটি থিয়েটার গৃহের এক বিরাট দেয়ালে ক্লাইন অলঙ্করণের কাজ পান। থিয়েটারটির নাম "থিয়েটার বাউটেন ডার স্টাডট্ গেলসেনকিশেন"। বিভিন্ন দেশের স্থপতি ও শিল্পী এই থিয়েটার নির্মাণে জড়িত ছিলেন। যেমন স্থপতি ওয়ার্নার রুহনাউ, প্যারিসের ভাস্কর জাঁ টিংলী, ইংলণ্ডের রবার্ট আডামস্ প্রভৃতি আরও অনেকে। থিয়েটার গৃহের বিরাট দেয়ালে ক্লাইন প্রবাল জাতীয় জিনিস বসিয়ে এবড়ো-খেবড়ো এক ম্যুরাল অলঙ্করণ করেন। ক্লাইনের এই কাজে অভিনবত্ব আছে, দেখতেও খারাপ লাগে না।

এককালে ক্লাইন-এর পেশা ছিল আয়লাণ্ডে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে দৌড়তে শেখানো ও পরে জাপানে পেশাদার কুস্তিগীর রূপে জাপানী যুযুৎসু করা। প্যারিসে "যুদো" শিক্ষকরূপে ক্লাইন-এর নামও আছে। এখনও মাঝে মাঝে বক্তৃতাসহ 'যুদো' ব্যায়াম প্রণালী দেখান। এ বিষয়ে একটা বইও নাকি ক্লাইন লিখেছেন। ওঁর বাবা জাতিতে ডাচ এবং একজন বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি অঙ্কনশিল্পী ছিলেন। পিতার কাছেই চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর হাতেখড়ি। কিন্তু চিরাচরিত ধরনে ছবি আঁকার যে মেহনত তা ক্লাইনের মনঃপূত হয়নি। উপরন্তু রেসের ঘোড়া
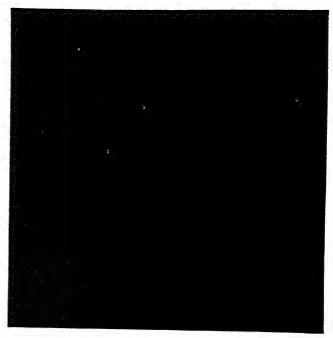
ক্লাইন কর্তৃক অঙ্কিত একটি নীল রঙের ছবি। অনেক সমালোচক 'মডার্ন আর্ট এর চরম ধোঁকাবাজি' বলে মন্তব্য করেছেন, আবার সংস্কৃতিমন্ত্রী আঁদ্রে মালরো করেছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কালো কালির পরিবর্তে 'অক্সফোর্ড ব্লু' নীল কালি কল্পনা করে নিতে হবে

শিল্পী ক্লাইন ও তাঁর 'সজীব তুলি'

তৈরি করা বা কুন্দিত করার চাইতে শিল্পী হওয়া যে অনেক সম্মানের সে কথাও ক্লাইন বুঝেছিলেন। কিন্তু রঙ তুলি দিয়ে ছবি আঁকা অহেতুক সময় নষ্ট ও অবান্তর কাজ। তাই একটি নতুন তত্ত্ব খাড়া করে, বড় বড় ক্যানভাসে রোলার দিয়ে ঝট্পট্ একরঙে ছবি আঁকা শুরু করলেন প্রথমে। সবুজ, লাল, কমলা লেবুর রঙে। কিন্তু পরে অন্য সব রঙ পরিত্যাগ করে নীল রঙই ধরলেন।

এই নীলরঙা ছবির দ্বারা খ্যাতি ও অর্থলাভে সন্তুষ্ট না হয়ে, মাথা খাটিয়ে ইদানীং ক্লাইন আবার এক নতুন পদ্ধতি ধরেছেন এবং অতি সহজে এখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন। আজ মাত্র ৩২ বছর বয়সে প্যারিসের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ক্লাইন এখন সবচাইতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন শিল্পী। সঙ্গে সঙ্গে অর্থও অর্জন করেছেন প্রচুর। বেরনার বুফাও আজ পিছনে পড়ে গেছেন। প্যারিসের মডার্ন আর্টের জগতে, হাজার হাজার শিল্পী এত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন যে, নতুন কিছু করা সত্যিই প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু ওরই মধ্যে মাথা খাটিয়ে একটা নতুন কিছু চালু করতে পারলেই সারা দুনিয়ায় হইচই পড়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যতদিন তা চালু থাকবে, বাজার সরগরম। যে-সব শিল্পী এই ধরনের

সম্ভ্রান্ত মডেল প্রিন্সেস্ এলেনা ভেরাচিয়ার অঙ্গে শিল্পী ক্লাইন সবুজ রঙ মাখিয়ে দিচ্ছেন

একটু নতুন কিছু করতে পারবে, তা সে যতই উদ্ভট হোক না কেন, চিত্রকলার পর্যায়ে পড়ুক বা নাই পড়ুক, রসোত্তীর্ণ হোক বা না হোক, লোকে তা নিয়ে মেতে উঠবেই। ক্লাইন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক। দু-দুবার এই রকম কিছু খাড়া করে, তার সমর্থনে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরে আসর মাতিয়েছেন। আর এখন ওঁকে পায় কে!

রোলার দিয়ে ঘষে নীল রঙ লাগিয়ে ছবি আঁকতে আঁকতে একঘেয়ে বোধ করার পর ক্লাইন "সজীব তুলি"র ব্যবহার আবিষ্কার করেন। এতদিন পর্যন্ত সব শিল্পীই মডেল সামনে বসিয়ে, নানান ভঙ্গীতে, নিজের পদ্ধতিতে প্রতিকৃতি আঁকত। ক্লাইন ভাবলেন ওসব নিতান্ত সেকেলে ব্যাপার। উনি তার বদলে নগ্ন মডেলের দেহে বুক থেকে পা পর্যন্ত রঙ লাগিয়ে মেঝেতে রাখা ক্যানভাসের উপর দিয়ে সাষ্টাঙ্গে বুকে হেঁটে, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত রং লাগিয়ে চলে যেতে বললেন, এতে শিল্পীকে নিজের ছবি ছুঁতেই হল না। একটা ছোট্ট মইয়ের উপর চড়ে শুধু মডেলকে নির্দেশ দেওয়া। ক্যানভাসের কোথায় কিভাবে নড়াচড়া করে ছাপ লাগাতে হবে মডেলকে দিয়ে এইটুকু করানোই শিল্পীর কাজ। ক্লাইন বলেন—"আমি শুধু একজন আম্পায়ার—প্রাণী,

গাছপালা ও খনিজ দ্রব্যের মধ্যে।"

এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকার টেক্‌নিক ক্লাইন দিনে দিনে আরও রপ্ত করেছেন, আরও দ্রুত বেশীসংখ্যক ছবি তৈরি করছেন। দু-চার মিনিটে তৈরি হচ্ছে হাজার হাজার টাকা দামের সব ছবি। ঝট্‌পট্ তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার চিত্রকলার বৃহৎ ব্যবসার আন্তর্জাতিক বাজারে। ক্লাইনের মডেলরাও সব সমাজের উচ্চ স্তরের মহিলা, এমনকি রাজবংশেরও। ক্লাইন আমাকে আরেকদিন নির্ধারিত সময়ে আসতে বলেছিলেন "লিভিং ব্রাশ" পদ্ধতিতে ছবি আঁকা দেখাবেন বলে। সময়মত গিয়েছিলাম। সেদিনের মডেল ছিলেন ক্লাইনের বিশেষ ভক্ত প্রিন্সেস এলেনা ভেরাচিয়া। তিনি নিজে একজন কবি। হলের কার্পেট তুলে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে পাতা আছে বিরাট ক্যানভাস। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজকুমারী সুন্দরী ভেরাচিয়া, সম্পূর্ণ নগ্ন। সুঠাম দেহ, একেবারে যৌবনে ঠাসা। অনভ্যস্ত চোখে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু শিল্পী বা মডেল বিন্দুমাত্রও সংকোচ বোধ করলেন না। ফরাসীরা দেহ সম্বন্ধে আমাদের মত লজ্জাসরমের বালাই করে না। ক্লাইন শিল্পীজনোচিত নির্লিপ্ততা নিয়ে নগ্ন দেহের স্তন থেকে হাঁটু পর্যন্ত রঙ লাগিয়ে পাশে মইয়ের উপরে উঠলেন। তারপর ফরাসী ভাষায় মডেলকে নির্দেশ দিলেন, কোথা থেকে কিভাবে ক্যানভাসের উপর দেহ থেকে রঙের ছাপ দিয়ে ছবি আঁকা শেষ করতে হবে। নানারকম নির্দেশ দিলেন। কোথাও বেঁকতে, কোথাও বেশী চাপ দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবি হয়ে গেল। ভেরাচিয়া স্নানের ঘরে গিয়ে গরম জলে শরীরের রঙ ধুয়ে একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। এই ধরনের সব ছবিই একটি রঙে আঁকা। ক্লাইন পরে কোন ফিনিশিংও করেন না। ছবিতে যদি শান্ত মধুর পরিবেশ আনতে চান তবে ক্লাইন নম্র লাজুক ঠান্ডা প্রকৃতির মডেল ব্যবহার করেন। আবার যদি জোরালো অনুভূতির কোন ছবি আনতে চান, তখন সেই অনুযায়ী উদ্দাম উদ্ধত যৌবনের মডেল ব্যবহার করেন। দু হাজার টাকা থেকে ছয় হাজার টাকার মধ্যে বিক্রি হয় ক্লাইনের এইসব ছবি। ক্লাইন ছবির নামকরণও করেন বেশ। একটি মডেলের, পায়ের আঙুল, হাঁটু ও হাতে রঙ লাগিয়ে ক্যানভাসে ছাপ দেবার পর যে ছবি হল, তার নাম রাখলেন—"ট্রায়াম্ফ অব ইন্‌টেলেকচুয়ালিজম"।

ক্লাইন-মডেল-এর বর্ণরঞ্জিত দেহ ক্যানভাসে চেপে দেবার পর শিল্পীর ছবি। আড়াই হাজার টাকা দামে বিক্রী হবে

আবার নীল রঙের একটি চতুষ্কোণ ছবিকে মোটর গাড়ির সামনে রেডিয়েটারে বেঁধে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে এলেন। ছবিতে বৃষ্টির জল পড়ে যে এফেক্ট হল, তার নাম দিলেন "দি উইণ্ড অব দি ভয়েজ" এবং মন্তব্য করলেন—"গাড়ি চালানোর সময় আমি যে আমার সময় নষ্ট করছিলাম না, ছবিটি আমাকে এটাই মনে করিয়ে দেয়।" উপর্যুক্ত প্রথায় "সজীব তুলি" ছবির আরও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেছেন, যাতে এখন ঘণ্টায় ৬০টি ছবি ক্লাইন করতে পারেন। মেঝেতে পাতা ক্যানভাসের উপর বুকে হেঁটে না চলে, দাঁড় করানো ক্যানভাসে দেহে রঙ লাগানো মডেল শুধু ছাপ দিয়ে দেয়।

ক্লাইন-এর বক্তব্য হল- "সেই একজন খাঁটি শিল্পী যে চাক্ষুষ দর্শনীয় কিছুই সৃষ্টি করে না।" তাঁর নিজের চিত্রকলা হল—"অবাস্তবের ফাঁকার মধ্যে দিয়ে তার যাত্রা।" ক্লাইন-এর এইসব বক্তব্য যতই গালভারি হোক, আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যে, শিল্পী নিজে তার এক বর্ণও বিশ্বাস করেন না। জেনে-শুনে এই শিল্পী যেন মানুষের ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রিটেনশনকে ইচ্ছে করেই ব্যঙ্গ করছেন। এর পরেও এসবের দ্বারাও যদি আমি খ্যাতি অর্জন করতে পারি, লোকে আমাকে নিয়ে নাচানাচি করে, আমার পকেটে "টু পাইস" আসে তাতে আমার কি দোষ এবং আমি তা কেন করব না? ক্লাইনের কাজকে আমি অবজ্ঞাও করতে পারি না। এটাও ত একটা পারিপার্শ্বিক ও যুগেরই প্রতিফলন। সমালোচকদের ভাষায় contemporary tension-এর প্রতিচ্ছবি। আর এটাও স্বীকার করতে হবে যে, প্যারিসের শিল্পকলার জগতে শিল্পীদের মধ্যে অনেকে সত্যিই ইন্‌টেলেকচুয়াল। এরা যা কিছু করে, তা সজ্ঞানে ভেবেচিন্তেই করে, নিজের মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন উঠেছে বলেই তার সমাধান করার চেষ্টা করে। 'কেন এভাবে ছবি এঁকেছি' তার একটা ব্যাখ্যা দেবেই, আমাদের তা মনঃপূত হোক বা না হোক।

কলাশিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপের এই উদ্‌ভ্রান্ত আধুনিকতায় ক্লাইনের দৃষ্টিভঙ্গি বিরাট প্রতিক্রিয়া বা প্রতিশোধ বলেই আমার কাছে মনে হয়েছিল। হয়তো ক্লাইন একজন আইকোনোক্লাস্ট আর সেইজন্যই হয়তো, আগেকার বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও এখন আমি একজন ক্লাইন ভক্ত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এককালে "সিলেক্‌ট"-এ আড্ডা দিলেও এখন আর সেখানে ক্লাইন পদক্ষেপ করেন না।

বিশুখুড়ো ট্রামে চড়িয়াই বলিতে লাগিলেন—"আমাদের এই দিনের আলোচনার খবর যেদিন পাঠকের কাছে পৌঁছুবে, সেদিন বারটা শনি, তারিখ ৩রা ফেব্রুয়ারি। খবর পৌঁছবার আগেই হয়ত মা বসুন্ধরা দ্বিধা হয়ে যাবেন, নয়ত প্রবল উচ্ছ্বাসে গঙ্গা এসে পৃথিবী গ্রাস করবেন, নয়ত দিকে দিকে বৈশ্বানরের সর্বগ্রাসী জিহ্বা লকলক করতে থাকবে। আর যদি নেহাৎ কেউ তাবিজ মাদুলির জোরে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত বেঁচে থাকেন (এর পর আর এক্সটেনশন দেওয়া চলবে না) তাহলে তাঁদের কাছে নিবেদন,—তাঁরা যেন বিশুখুড়োর জন্যে"—কিন্তু খুড়ো কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, শুধু সখেদে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"ওরে তোদের বিশুখুড়ো এবার বুঝি পটল তোলে!"

আমাদের শ্যামলাল বিশুখুড়োকে সান্ত্বনা দিয়া বলে "ভয় নেই খুড়ো: খবরে শুনলাম সরকারী আবহ অফিস নাকি অষ্টগ্রহ সম্মেলন সমর্থন করেছেন, সুতরাং মাভৈঃ!!"

কিন্তু আবহ অফিসের আভাস-বাণীতে বিশ্বাসী আমাদের জনৈক সহযাত্রী শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"জলপাইগুড়ির এক বাড়িতে একটি অষ্টমুখী বেগুন ফলেছে, সংবাদপত্রে তার ছবি পর্যন্ত বেরিয়েছে। এর পর মহাভারতের সেই মুষল-প্রসব উপাখ্যান মনে না করে উপায় নেই, কে জানে এই বেগুনের মধ্যে হয়ত রয়েছে পৃথিবীর মরণবাণ!"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম তাঁর এক নির্বাচনী ভাষণে নাকি বলিয়াছেন স্বতন্ত্র দল? ওর আয়ু ত ফেব্রুয়ারি

পর্যন্ত, তারপরেই নির্ঘাত শিশুমৃত্যু! শ্যামলাল শঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিল "সর্বনাশ, মন্ত্রী মশাই কোন রেল কলিশনের ইঙ্গিত দেন নি ত!!"

আমাদের অন্য সহযাত্রী অষ্টগ্রহ প্রসঙ্গটিকে ঘুরাইয়া দিয়া নির্বাচনে চালিয়া গেলেন। বলিলেন "সংবাদে শুনলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (পুলিস) দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর নস্কর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। বউনিটা ভালোই হল। জয় পুলিসের জয়।"

এক সংবাদে প্রকাশ দাউদ রহমানী নামে জনৈক পাকিস্তানী নাকি দাউদ রহমান নাম লইয়া ভারতীয় বনিয়া যান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে মতিহারী কেন্দ্রে মনোনয়ন পত্র পেশ করেন। তাঁহাকে অবশ্য পত্রপাঠ বিদায় দেওয়া হইয়াছে। সংবাদটা ভোটরঙ্গের।—"কিন্তু এটা শুধু রঙ্গতামাশার কথা নয়। নির্বাচনের ব্যাপারে অনেকেরই দাউদ রহমানীর মতো দাদের চুলকুনি হয়"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা কংগ্রেসের দ্বিতীয় এশীয় অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে

চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, জনসাধারণ যাহাতে এই নীলাকাশের নীচে ভালভাবে থাকিতে পারে সে জন্য তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"তাঁদের চেষ্টা ছাড়াই জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ নীলাকাশের তলাতেই আছে, মাথারওপরে এক ফালি ছাদও নেই!!"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ যে গঙ্গামাটি মিশ্রিত সিমেন্ট আগুন দরে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। "আশ্চর্য কিছু নয়: অষ্টগ্রহের প্রতাপে যদি মরতেই হয় তবে গঙ্গা না পাই অন্ততঃ গঙ্গামাটি চাপা পড়েও মরতে পারব। তার জন্যে কিছু খরচ-খরচা করতে হবে বৈকি"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

শুনিলাম হিমঘরে খাদ্যদ্রব্য রাখার সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণীত হইবার সম্ভাবনা আছে! "খুবই ভালো কথা। কিন্তু ভাবনা, এই আইন-প্রণয়নের সম্ভাবনাটাকে না অনির্দিষ্ট কালের জন্যে হিমঘরে রেখে দেওয়া হয়"—মন্তব্য করিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম শীতের বিক্রম শেষ হইয়া আসিল।—"আর এই সঙ্গে কাজে কাজেই মনে রাখতে হবে,—বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। আমাদের মরণ রাম আর রাবণ দুয়ের হাতেই" টীকা করে শ্যামলাল।

একটি প্রবন্ধে পড়িলাম—আমেরিকা নাকি খুব পুতুল-প্রিয়। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"ডলারের দেশে ডলের কদর হবে বৈ কি: পরিসংখ্যান বলে—ডলস হাউসের প্রভাবও আমেরিকাতেই সবচেয়ে বেশি।"

সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল মালিনোভস্কি তাঁর এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন, একটিমাত্র আণবিক আঘাতে আমেরিকা ও উহার মিত্রদের সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলিকে মুছিয়া দিতে পারে। "গাগারিন মহাকাশ পরিভ্রমণকালে নিশ্চয়ই একটি "সোয়াপ্" চুক্তি নিষ্পন্ন করে ফিরে এসেছেন।" খুড়ো মুচকি হাসিয়া বলিলেন "সোয়াপ্ মানে সোভিয়েৎ অর্থাৎ চুক্তি!"

দিল্লির জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহম্মদ তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান কাশ্মীরকে সর্বরোগের নিদান বলিয়া মনে করে—সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সর্বপ্রকার অকল্যাণ যেন ইহাতেই দূর হইয়া যাইবে। "স্বপ্নাদ্য মাদুলিতে কাটা মাথা জোড়া লাগে, অন্ধের চক্ষুদান হয়, এমন কি গরু হারালে খুঁজে পাওয়া যায়"—শ্যামলাল মাদুলি-বিশ্বাসী গাঁয়ের লোকেদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আবার লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া আমাদের জনৈক সহযাত্রী সহসা কবিতায়

মুখর হইয়া উঠিলেন—"যৌবন আমার, ফিরে ফিরে তব সাথে দেখা মোর হবে বারংবার।"

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বলেন—আমাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ: শুধু সেই ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলার জন্য আমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।—"সবিনয়ে নিবেদন করব, বর্তমানটা আগে গড়ে নিলে হত না?"—বলেন বিশুখুড়ো।

"জলকে আমি ভয় করতুম, সঙ্গে লোক না থাকলে কোনদিন বাড়ির পুকুরে যেতুম না। কতদিন দুপুরবেলা চারপাশের গাছ আগাছার জঙ্গলের মধ্যে নিঃসঙ্গ গভীর পুকুরটার দিকে তাকিয়ে আমার শরীর হিম হয়ে আসতো। মনে হত এখুনি গাছের ছায়ায় অন্ধকার কালো জল থেকে দুটো বিশাল কালো ডানা উঠে এসে আমাকে ঘিরে জলের মধ্যে টেনে নামিয়ে নেবে।"

সামনে সমুদ্র। পেছনে নারিকেলের বন। এখনও অন্ধকার হতে দেরী আছে। নারিকেল গাছের ভারি মাথাগুলো সমুদ্রের শান্ত হাওয়ায় দুলছিল। পেছনে নারিকেলের বন পেরিয়ে স্যানাটোরিয়াম। সমুদ্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে পরিতোষ তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। কালো ট্রাউজারের ওপর কালো চাদর জড়িয়ে পরিতোষের সঙ্গী সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসেছিল। হাতের লাঠি দিয়ে বালির ওপর দাগ কাটছিল। হেসে পরিতোষ আবার তার গল্প শুরু করলঃ "আমার জলে ভয় এ কথা মা বাবা দুজনেই জানতেন। বাবার কাছ থেকে মা আমার এই ভয়কে আড়াল করতে চাইতেন। বাবা কুড়ি মাইল দূরের শহরে চাকরি করতেন। সেখান থেকে মাসে দু-তিনবার আসতেন। এসেই আমাকে খুঁজতেন, পরি, পরি কোথায়! বাবাকে আমার ভয় হোত। বাবা সাঁতার শেখাতে চাইতেন, তাই ভয়। আমাদের বাড়ির পেছনে সরকারদের বড় জঙ্গল ছিল। বাবার আসবার সময় হলে আমি সেই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতুম। বাবা আমাকে খুঁজে বার করতেন। চান করিয়ে ছাগলটাকে কাঠগড়ার দিকে নিয়ে গেলে তার মনে কি হয় কে জানে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ঝোপঝাপের আড়াল থেকে বাবা যেই এসে আমাকে পাঁজা করে কোলে তুলতেন পুজোর সময় সরকার বাড়ির সেই ছাগলগুলোর কথা আমার মনে পড়ত। হাড়িকাঠে গলা ঢুকিয়ে দেওয়া ছাগলটার মত আমি বাবার কোলের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়তুম। গলার শিরা ফুলিয়ে চীৎকার করতুম। কত সময় বাবার বুকে হাতে এমন খিমচি কেটেছি যে আমার বড় বড় নোখের মাথায় বাবার চামড়া উঠে এসেছে। বাবা গ্রাহ্য করতেন না। পেছনে পেছনে মা নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে আসতেন। কতদিন মা কেঁদে ফেলেছেন। বাবা বোধকরি শুনতেই পেতেন না। আমাকে নিয়ে পুকুরের ধারে এসে দাঁড়াতেন।

পুকুরের জল স্থির। চারপাশ নিস্তব্ধ। আমি বাবার কোলের মধ্যে এদিক ওদিক দেখে নেবার মতো দু এক মুহূর্ত সময় পেতুম। সেই সময়টুকুর মধ্যে আমার মনে হত পুকুরের জল কী অবিশ্বাসী। পুকুরের চারধারের বেতঝোপ, আগাছার জঙ্গল মাথা উঁচু তালগাছ সব মিলিয়ে জঙ্গলটাকে আমার ভয়ানক লাগত। যেন স্বপ্নে দেখা কোন ভয়ংকর মূর্তি হাঁ করে আছে। যেন..... আর কিছু দেখা যেত না। তৎক্ষণে সেই উঁচু পাড় থেকে দুহাতে আমায় তুলে ধরে বাবা এক নিষ্ঠুর অশেষ শূন্যতার মধ্যে আমায় ছুঁড়ে দিয়েছেন। আমি হাওয়া কেটে নিয়ে জলে পড়েছি। জল। আমার চারপাশে জলের নিঃশব্দ সহস্র কুটিল রেখা। আমার কোন অনুভূতি কি বেদনা থাকতো না। বাবার হাতে ধরা পড়ার পর থেকে যে ভয়ে অস্থির হতুম, সেই ভয়টাও থাকতো না। শুধু বাঁচতে চাইতুম। এই সুবিশাল পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে পাগলের মত বাঁচতে চাইতুম। যন্ত্রণাবোধ নেই। শরীর নেই। মাথা নেই। পৃথিবী নেই। কোথাও কেউ নেই। শুধু বাঁচতে চাওয়া। একটুখানি শক্ত মাটির স্পর্শ।

অনেক দূরে থেকে, অনেক উঁচু থেকে পড়তুম বলেই বোধকরি জলের অনেক নীচে তলিয়ে যেতুম। ফুসফুস খালি হয়ে যখন শেষ হাওয়াটুকু প্রায় গলার কাছে এসেছে—এসেছে, এখুনি বেরিয়ে যাবে ঠিক তখনই জল থেকে মাথাটা বেরিয়ে আসতো। আঃ। বুকের মধ্যে যেন সহস্র দামামা গুড়ু গুড়ু করে উঠতো। আলো আলো। আলো। হাওয়া। কিন্তু সব এক মুহূর্তের জন্যে। হাত ছুঁড়তুম, পা ছুঁড়তুম। অথচ দেহটা ঠিক তলিয়ে যেত। এই এক দেহকে জাগিয়ে রাখা যে কি শক্ত সেই ছোটবেলাতেই বুঝে ফেলেছিলুম।

জল থেকে প্রথম মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর আমার কানে আসতো। কার স্বর আমি চিনতে পারতুম না। মানুষ যখন মরতে বসেছে তখন সে কাউকে চিনতে পারে না। তার মনে হয় সে এক অন্ধকার মাঠের মধ্যে শুয়ে আছে। যেন অনেক দূর থেকে মানুষের স্বর শুনতে পাচ্ছে। আমার এ রকম হত। ঠিক

মরছে, মরছে এমন একটা মানুষের মতো আমি আমার অস্তিত্বকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিতুম। আর সেই স্বরটাকে আমার অপরিচিত লাগতোই। অপরিমিত। হাওয়া আর কুয়াশায় ভারি কোন তুহিন নিশীথে দূরাগত গীর্জার বিলম্বিত ঘণ্টা ধ্বনির মত।

তারপর আচমকা আমি সেই স্বরটি চিনতে পারতুম। বাবার কণ্ঠ। যেন আমরা কোন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি বাবা এমনি ভারি অচেনা গলায় বলতেন, পরি ভয় নেই। এইতো...এই যে আমি।

ততদিনে আমি জেনে গেছি বাঁচবার জন্যে বাবার দিকে এগিয়ে গিয়ে লাভ নেই। বাবা ঠেলে সরিয়ে দেবেন। কিংবা নিজেই সরে যাবেন। বাবা চাইতেন আমি একেবারে একা একলা হাত-পা ছুড়ে ছুড়ে যে ভাবে হোক ঘাটের দিকে এগোই। বাবা তাই চাইতেন, কেননা কোনদিন আমি ক্লান্ত হয়ে ডুবতে ডুবতে জল খেতে খেতে ঘাটে গিয়ে উঠলেও তিনি হাত বাড়িয়ে দেননি। বলেননি, এই যে পরি, এই আমার হাত। ধরে উঠে আয়। বাবা বলতেন, হাত ধরে উঠে পার নেই। তোমাকে পুকুর থেকে কেউ হাত ধরে তুললো, কিংবা নদীতেও। নদীতেও তুমি অন্য কারও হাত ধরে উঠে এলে। কিন্তু সমুদ্রে...? বাবা তাই চাইতেন আমি যেন সাঁতারটা শিখতে পারি। যেন কোনদিন কারও হাতের ওপর আমাকে না বাঁচতে হয়। কিন্তু আমি... আমি যে জলকে ভয় করতুম।

তখন আমি ক্লাস সেভেন এইট্-এ পড়ি। একদিন হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। মৃত্যু সম্পর্কে তখনও আমার কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। আমি জানতুম না মরে গেলে কি হয়। আমি টিফিনের সময় একা শীতের মাঠে ছুটে ছুটে খেলছিলুম। কে যেন বলেছিলেন, পরি তোম বাড়ি যাও। তোমার বাবার অসুখ।

তখন পর্যন্ত আমি কোনদিন হিসেব করে দেখিনি আমি বাবাকে ভালোবাসি না ঘৃণা করি। আমার কোনদিন মনে হয়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ...হঠাৎ আমার ভীষণ কষ্ট হল। আমার মনে হয়েছিল বাবা আর কোনদিন আগের মত আমায় খুঁজে এনে উঁচু করে তুলে ধরে জলে ছুঁড়ে ফেলতে পারবেন না।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে দেখলুম মা শহরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকে মোচড় দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। মা দুহাতে আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, ছিঃ কাঁদে না।

আমি কেন কাঁদলুম আমি জানি না। আমি যে কেঁদে ফেলবো তা আমি আগের মুহূর্তেও জানতে পারিনি। কেন কাঁদলুম। বাবার অসুখের সংবাদ নিয়ে শহর থেকে গণেশ কাকা এসেছেন। গণেশ কাকা বাবার বন্ধু। বাবার সঙ্গে অনেকবার আমাদের গ্রামে এসেছেন। খুব স্ফূর্তিবাজ লোক। এক একটা রোববার চীৎকার করে, মাছ ধরে, গান গেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। বাবার বন্ধু কিন্তু বাবার চেয়ে আমার অনেকদিন মনে হয়েছে গণেশ কাকার বয়েস অনেক কম। আমার সোনা জ্যেঠিমা চাইতেন গণেশ কাকার সঙ্গে তার বড় মেয়ের বিয়ে হোক। আমি কতদিন শুনেছি সোনা জ্যেঠিমা বাবাকে বলেছেন, দিননা ঠাকুরপো মেয়েটার হিল্লে করে। আপনি বললেই হবে।

বাবা সোনা জ্যেঠিমাকে বলতেন, বলবো। কিন্তু আমার মনে হত বাবা গণেশ কাকাকে কোনদিন কিছু বলবেন না। এর আগে গণেশ কাকা আমাদের বাড়ি একলা কোনদিন আসেননি। গণেশ কাকা মাকে বললেন, তাড়াতাড়ি করুন বৌদি, বলে আমার হাত ধরলেন। মা আমাদের ঘর বন্ধ করে চাবিটা সোনা জ্যেঠিমার হাতে দিলেন। আমি আর গণেশ কাকা তখন নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। নদীর ধার দিয়ে এক মাইল হাঁটলে আমরা মোটর পাব। মোটরে শহর দু ঘণ্টার রাস্তা। সোনা জ্যেঠিমা সোনা জ্যেঠিমার বড় মেয়ে দুর্গাদি নদীর ধার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন। নদীর ধারে এসে সোনা জ্যেঠিমা মাকে দুহাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরলেন। আমার মনে হল সোনা জ্যেঠিমার কাঁধে মুখ রেখে মা কাঁদছেন।

আমরা যখন শহরে পৌঁছোলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমার খুব শীত করছিল। এর আগে আমি আর মা অনেকবার শহরে এসেছি। আমরা সিনেমা দেখতে, দুর্গাঠাকুরের বিসর্জন দেখতে শহরে আসতুম। একবার বাবার থিয়েটার দেখতেও এসেছিলুম। সেই থিয়েটারে বাবা একটি মেয়েলোক সেজেছিলেন। অনেক রাত্রে বাবার বাসায় ফিরে এসে মা খুব হেসেছিলেন। অত হাসতে মাকে আমি আর কোনদিন দেখিনি। বাবাকে মেয়েলোক সাজতে দেখে আমার একদম হাসি পায়নি।

শহরে অনেকবার এলেও আমি শহরের রাস্তাঘাট চিনতুম না। মোটর থেকে নেমে বাবার বাসা কোনদিকে আমি কোনদিন ঠিক করতে পারিনি।

একবার অফিসের কি একটা কাজে বাবাকে কলকাতা যেতে হয়েছিল। পর পর দু-সপ্তাহ বাবা বাড়ি আসেননি। কোন চিঠি নেই। মা আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, পরি, মোটর থেকে নেমে বাবার বাসা চিনতে পারবি। আমি বলেছিলুম, পারবো। তারপর আমি আর মা একদিন শেষ বিকেলে মোটর থেকে নেমে একদিকে হাঁটতে থাকলুম। শহরের সব রাস্তাই একরকম। আমরা ডান দিকে গেলুম। বাঁ দিকে গেলুম। আবার ডান দিকে গেলুম। কিন্তু থানা আর পোস্ট অফিস

পেরিয়ে বাবার বাসার সেই গলিটা খুঁজে পেলুম না। রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে মা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। আমরা এখন কি করবো ঠিক করতে পারছিলুম না। আমি দু-একবার মাকে বললুম, কাউকে কেন জিজ্ঞেস করুন না।

মা ভয় পেয়ে বলেছিলেন, কাউকে জিজ্ঞেস করে দরকার নেই। না। কপালে যা আছে হবে। আমার মনে হয়েছিল আমরা একটা অন্ধ আবর্তে পড়ে গেছি। এই তলহীন তরল অন্ধকার আবর্ত থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে আমাদের উদ্ধার করবে না। আমার গলা শুকিয়ে কান্নার মত হচ্ছিল।

সেদিন অবশ্য আমরা বাবার বাসা পেয়েছিলুম। দৈবক্রমে বাবার অফিসের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা তখনও কলকাতায় আছেন। আমরা বাবার ঘরের তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিলুম। বাড়িওলার [illegible] আমাদের আর মাকে [illegible] হয়েছিল তার...

এই যে [illegible] পরে আমরা এসে [illegible] থেকে [illegible] আমরা [illegible] একটা [illegible] মধ্যে ঢুকলুম। অন্ধকার গলি। [illegible] বাবার বাসা। অন্ধকারে আমি মায়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটছিলুম। মা আমায় এক হাতে জড়িয়ে ছিলেন।

অন্ধকারে বাবার বাসার সামনে কয়েকজন লোক বসে আছে। দাঁড়িয়ে আছে। বিড়ির আগুনে আমি তিন চারটি চকচকে মুখ দেখলুম। তাদের কাউকে চিনি না। এই তো এসে গেছে ওরা। কে যেন বলল। সেই অন্ধকার ভিড় থেকে বাড়িওলার বৌ উঠে এল। সঙ্গে তার মেয়ে। নদীর ধারে সোনা জেঠিমা যেমন করে মাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বাড়িওলার বৌ ঠিক তেমনি করে জড়িয়ে ধরল মাকে। বাড়িওলার মেয়ে আমার হাত ধরল। আর আমি চমকে উঠলুম। কেননা তৎক্ষণে মা পাগলের মত ছুটে গিয়ে বাবার মৃত শরীরটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে অমানুষিক করুণ চিৎকারে ভেঙে পড়েছেন। বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি থর থর করে কাঁপছি। কেন যে কাঁপছি জানি না। মা অমন চিৎকার করে কাঁদছিলেন বলে, না বাড়িওলার মেয়েটা একপাশে সরে গিয়ে অন্ধকারে তার চাদরে আমার সর্বাঙ্গ ঢেকে আমায় দুহাতে জড়িয়ে তার অদ্ভুত বুকের ওপর চেপে ধরেছিল বলে আমি ঠিক করে বলতে পারব না। বাড়িওলার মেয়ে আমার গালে মুখে রেখে কি রকম খোনা খোনা ভিজে গলায় বলেছিল, পরি, কাঁপছিস কেন?

আসলে বাবা আগেই মরে গেছলেন। বাবা মারা যাবার পর গণেশ কাকা আমাদের আনতে গেছলেন। খেয়ে দেয়ে অফিসের সিঁড়ি বেয়ে বাবা ওপরে উঠছিলেন। তখনও সিঁড়ির অনেকই বাকী। বাবা মুখ থুবড়ে সিঁড়ির ওপর পড়লেন। সেই শেষ পতন। ডাক্তার, লোকজন সবাই এল। বাবার শরীরটাকে ধরে তার বাসায় নিয়ে আসা হল। কিন্তু বাবা আর উঠলেন না। এখন আর ইচ্ছে থাকলেও কারও হাত ধরে তিনি উঠে আসতে পারতেন না। মৃত্যুই কি সমুদ্র? যেখান থেকে কারও হাতে ভর দিয়েই আর উঠে আসা যায় না। না মৃত্যু সমুদ্র নয়। মৃত্যুর কথা বাবা কোনদিন বলেননি।

শহরের নদীর ধারে অন্ধকার শ্মশানে বসেছিলুম। বাবার সমস্ত শরীর জ্বলছে। আমি জ্বেলেছি সে আগুন। চিতার আগুনে অনেক দূর পর্যন্ত আবছা আবছা আলো হয়ে আছে। বাবার অফিসের লোকেরা বাবার সম্পর্কে সব ভালো ভালো কথা বলছিলেন। আমি চুপ করে বসে ভাবছিলুম এ পৃথিবীতে আমাদের কেউ নেই। আমি আর মা। আমরা একলা। বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন সাঁতার শিখি। বাবা জানতেন সাঁতার না শিখলে এই দেহটাকে আমি ভাসিয়ে রাখতে পারবো না। কিন্তু আমার যে জলে বড় ভয়। আমি সাঁতার শিখবার আগেই যে বাবা মরে গেলেন।"

পরিতোষ ক্লান্ত হয়ে চুপ করে সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার সঙ্গী হাঁটু ভাঁজ করে তার ওপর ঘাড় গুঁজে বসেছিল। পরিতোষ চুপ করলেও সে মুখ তুলল না। পরিতোষ কিছু বলছিল না। চারপাশ জুড়ে সন্ধ্যা নামছিল। সাদা কাগজের ওপর উপুড় করে ঢেলে দেওয়া পাতলা জোলো কালির মত সন্ধ্যা। সমুদ্র এখন প্রথম বিকেলের মত নয়। হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে। দিনের আলো যত মরে এসেছে বাতাসের জোর ততই বেড়েছে। এই মত্ততার মধ্যে বিশ্বচরাচর যেন শ্রান্ত হয়ে শিথিল হয়ে আছে।

দূর থেকে স্যানাটোরিয়ামের ঘণ্টা বাজছিল। বিকেলের হাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া তার ছেলেগুলোকে স্যানাটোরিয়াম ফিরে পেতে চাইছিল। ঘণ্টা বাজিয়ে সে ডাকছিল সকলকে। পরিতোষের সঙ্গী উঠে দাঁড়াল। পরিতোষও। তারপর তারা চর থেকে মুখ ফিরিয়ে স্যানাটোরিয়ামের দিকে এগিয়ে গেল।

"আমি ষোল বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করলুম।" পরদিন পরিতোষ আবার তার গল্প শুরু করেছে। পরিতোষের সঙ্গী রোজকার মত আজও ট্রাউজারের ওপর কালো চাদর জড়িয়ে বসে আছে। হাতের কাঠি দিয়ে বালির ওপর দাগ কাটছে। প্রজাপতি আঁকতে চাইছে। আঁকছে কিন্তু হচ্ছে না। আজ প্রথম বিকেলের হালকা, হলুদ রঙের রোদ বিস্তৃত বেলাভূমির ওপর নারকেল গাছের লম্বা লম্বা ছায়া ফেলেনি। আজ গভীর কুয়াশায় সমুদ্র আকাশ সব ঢাকা পড়েছে। "আমি পাশ করলুম।" পরিতোষ কুয়াশার মধ্যে ডুবে গিয়ে তার গল্প বলছিল: "তখন কলকাতায় থাকি। গতকাল আমি ঠিক বলিনি। আমি

বলেছিলুম, আমার আর মায়ের কেউ ছিল না। ঠিক বলিনি। একজন ছিলেন। বড় মামা। আমার মায়ের বড়দা। বড় মামাকে আমি আগে দেখিনি। কোনদিন আসেননি তিনি আমাদের বাড়ি। বাবা পছন্দ করতেন না। আমরাও যাইনি।

যে রাত্রে বাবা মারা গেলেন তার পরদিনই গণেশকাকা টেলিগ্রাম করেছিলেন কলকাতায়। বড় মামা এসেছিলেন দুদিন পর। অদ্ভুত লোক। কথাবার্তা বেশী বলেননি। কি রকম চুপচাপ গম্ভীর প্রকৃতির। বাড়িওলার বড় মেয়ে আমায় ছাদের ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছিল, তোর বড় মামা মদ খেয়েছে।

আমি এর আগে মদ খাওয়া লোক দেখিনি। সকলেই বড় মামার দিকে কেমন অবাক চোখে তাকাচ্ছিল। বাড়িওলার বৌ দুপুরের দিকে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার আপন ভাই?

আমার মনে হয়েছিল সবাই বড় মামার সংগে আমাদের কলকাতা যেতে বারণ করছে। অথচ একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা শহরে ষ্টেশনে এসে কলকাতার গাড়িতে চেপেছিলুম। বাড়িওলার বড় মেয়ে খেয়ে দেয়ে পুকুর ঘাটে মুখ ধুতে গিয়ে বোকার মত আমার হাত ধরে বলেছিল, পরি, আমাকে আমাদের ভুলে যাবি তো?

ঘাটে এসে জলের দিকে তাকিয়ে আমার বাবার কথা মনে পড়েছিল। তাই ভয়ে বাড়িওলার মেয়ের কাছ থেকে আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিইনি। আমি বলেছিলুম, না। ভুলবো না।

বাড়িওলার মেয়ে জলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, যখন বড় হবি আমার কথা মনে থাকবে তোর?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলুম, হাঁ।

আমরা বাঁশঝোপের পাশ দিয়ে হাঁটছিলুম। বাড়িওলার মেয়ে হঠাৎ আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। বসে আমার হাতটা তার বুকের ওপর নিয়েছিল। নিয়ে বলেছিল, ঠিক বলছিস আমার কথা তোর মনে থাকবে? ঠিক? কিসের ভয়ে জানি না আমার সর্বশরীর শীত লাগার মত কাঁপছিল। আমি কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম। তারপর বাড়িওলার মেয়ে আমায় সামনে টেনে বুকে চেপে আমার মুখে চুমু খেয়েছিল। আমরা শুকনো পাতার ওপর পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলুম। বাড়িওলার মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, কাউকে বলিস্ না। আমি মাথা ঝেঁকে বলেছিলুম, আচ্ছা। তারপর আমরা একটি কাঠবেড়ালি দেখেছিলুম। আমার কাঠবেড়ালিটিকে খুঁচিয়ে মারবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। মাটির ঢালা নিয়ে আমি কাঠবিড়ালিটাকে মারবো বলে ছুটে গিয়েছিলুম।

একবার আমাকে নিয়ে মা বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন। বড় মামা রাজী হননি। বড় মামা চেয়েছিলেন আমরা যেমন আছি তেমনভাবে তাঁর সংগে যেতে হবে। মায়ের না গিয়ে উপায় ছিল না। তাই একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা কলকাতার গাড়িতে চাপলুম। কলকাতায় বড় মামার তিনতলা বাড়ি। মা বলেছিলেন, বাড়ি বড় মামার নয়। বাড়ি মায়ের বাবার। আমার দাদুর। বড় মামা একতলার সবটা ভাড়া দিয়েছিলেন। দোতলায় বড় মামার ছিল তিনখানা ঘর। আমরা যেতে দোতলার একখানা ঘর আমাদের ছেড়ে দিলেন। নীচে অনেক ঘর। কিন্তু তখন নীচের সব ঘরেই ভাড়াটে ছিল। না হলে আমার মনে হয়েছিল বড় মামা আমাদের নীচেই একখানা ঘর দিতেন।

বড় মামার ঘরে কোন মেয়েছেলে ছিল না। ঘরে মেয়েছেলে নেই এমন লোক এর আগে আমি দেখিনি। বড় মামার ঘরে একটা বড় খাট ছিল। আলমারি ছিল। অথচ মেয়েছেলে ছিল না। বড় মামা তার ঘরে কোনদিন ঢুকতে দেননি।

থাকবার মধ্যে বড় মামার একটা চাকর ছিল। তার নাম শ্রীনাথ। আমি শ্রীনাথকে দাদু বলতুম। মা বলেছিলেন, শ্রীনাথ খুব পুরোন চাকর। আমার দাদুর আমল থেকে আছে। আমরা যাওয়ায় সে খুশী হয়েছিল। আমরা যাওয়ায় তার কাজ অনেক কমে গেছল। এমনকি মা তাকে বাসন মাজতেও দিতেন না।

শ্রীনাথ শুধু বাজার করতো। বাজারের সময় শ্রীনাথ আমাকে তার সংগে নিত। বড় মামার কি কাজ ছিল জানি না। মা রাত্রিবেলা রান্নার পর শ্রীনাথ দাদুকে বলতেন, দাদাটা কেমন হয়ে গেছে। মা আর শ্রীনাথদাদু অনেক পুরোন দিনের গল্প করতেন। আমি একদিন শুনেছিলুম, বড় মামা যে শুধু মদ খায়, তা নয় রেস্‌ও খেলে। রেস কি খেলা আমি জানতুম না।

এই এত বড় বাড়িতে আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান ছিল তিনতলার ছাদ। পুরোন শ্যাওলাধরা ছাদ। মা চাইতেন না আমি একা ছাদে উঠি। কিন্তু দুপুরে মা ঘুমুলে আমি চুপি চুপি ছাদে উঠে আসতুম। এখানে এসে আমার মনে হত আমি আকাশের কোলের কাছে চলে এসেছি। এই একলা শীতের দুপুরে ছাদে উঠে এলে আমার হঠাৎ হঠাৎ বাড়িওলার মেয়ের কথা মনে পড়ত। আমি চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতুম। আমার চারপাশে হাজার হাজার বাড়ির ছাদ। আমার সমুদ্রের কথা মনে হত। বাবা যে সমুদ্রের কথা বলতেন সেই সমুদ্র। এই উঁচু নীচু বাড়ির পর বাড়ি, হাজার হাজার ছাদ, ছাদের পর ছাদ দেখতে দেখতে আমার মনে হত আমি হঠাৎ কঠিন হয়ে যাওয়া তরঙ্গময় কোন সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমি আকাশের দিকে চাইতুম। আমার খুব একলা লাগতো। হাড়ের মধ্য থেকে কম্পন উঠতো। সর্বশরীর কেঁপে উঠলে আমার মনে পড়ত, আমি কোনদিন আর সাঁতার শিখবো না।

নতুন বছরে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হোল। আমি গ্রামে ক্লাস এইট্‌এ পড়তুম। এক মাস বাদে আমার পরীক্ষা ছিল। আমি পরীক্ষা দিইনি। কলকাতায় তাই আবার ক্লাস এইট্‌এ ভর্তি হলুম। আমাদের একতলার ভাড়াটেদের একটি ছেলের সংগে আমি স্কুলে যেতুম। সে আমার সংগেই পড়তো। কিন্তু তার সংগে আমার কোনদিন বন্ধুত্ব হয়নি। ছেলেটি রোজ স্কুলের রাস্তায় আমাকে অনেক খারাপ কথা শোনাত। সে চাইত যেন আমি তার কাছ থেকে কথাগুলো শিখে নিই। মেয়েদের শরীর সম্পর্কেও তার অনেক জ্ঞান ছিল। রাস্তায় মেয়ে দেখলেই সে একচোখ বুজে তাকিয়ে থাকতো। কিভবে মেয়েদের ভোলাতে হয় সে আমায় শেখাতে চাইত। আমি কোন মেয়েকে ভালোবেসেছি কিনা অনেকদিন সে জানতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলুম, আমি বাড়িওলার মেয়েকে ভালোবাসি।

একদিন ছেলেটি স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে মরে গেল।

তারপর থেকে আমাকে একাই যেতে হত। বাড়ি থেকে স্কুল প্রায় এক মাইল দূরে ছিল। যাবার সময় আমি সোজা যেতুম। কিন্তু ফেরবার সময় অনেক ঘুরে ঘুরে বড় রাস্তা দিয়ে চৌরাস্তা দিয়ে ফিরতুম বলে দেড় মাইল দু মাইলও হাঁটা হয়ে যেত।

স্কুলেও আমার কোন বন্ধু ছিল না। আমি একা একা থাকতুম। সবাই আমাকে মেয়েছেলে বলতো; বলে আমাকে খেপাতে চাইত। আমার তাতে কোন রাগ দ্বিধা হত না। দু-একজন মাস্টার মশাই আমাকে স্নেহ করতেন। কোনদিন পড়া না করলে জিজ্ঞেস করতেন আমি কেন পড়া করিনি। একদিন একজন মাস্টার মশাই আমার দেশ কোথায় জানতে চেয়েছিলেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি চৌরাস্তার ফুটপাতে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতুম। এখানে দাঁড়িয়ে লোকজন, মানুষ, গাড়ি ঘোড়া দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষ দেখতুম। কত মানুষ। কত রকমের মানুষ। আমার মনে হত মানুষগুলো সব ছুটছে। একটা অন্ধঝোঁকে একদিক থেকে আর একদিকে ছুটছে। কি কাজ, কি করবে কোথায় যাবে যেন কারও জানা নেই। বাবা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর অনেক নীচে তলিয়ে গিয়ে জলের ওপর ভেসে উঠলে যে অবস্থা হত চৌরাস্তার ভিড় ভেঙে এগিয়ে যাওয়া মানুষগুলোরও যেন সেই অবস্থা। আমি যত দেখতুম, আমার তাই মনে হত। যেন সাঁতারসাঁতা মানুষগুলোকে কেউ জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। আর আমার মত ওরাও কেউ সাঁতার জানে না। শেখেনি।

এখানে দাঁড়িয়ে আমার আরও অনেক কথা মনে হত। একদিন মনে হয়েছিল এরা আমাকে চেনে না। আমি কে, রোজ এখানে কেন দাঁড়াই এ কথা কেউ জানে না। এইখানে দাঁড়িয়ে এই সহস্র মানুষের ভিড়, হট্টগোলের মধ্যে অনেকদিন আমার গ্রামের কথা মনে পড়ত। দুর্গাদি। সোনা জ্যেঠিমা। আমাদের ঘরখানা এখন কেমন হয়েছে। ঘরের জিনিসপত্র। সরকার বাড়ি। নদীর ঘাট। এই সব মনে পড়তো। আমি মনে মনে আমাদের গ্রামটাকে পুকুরের সঙ্গে তুলনা করতুম। আর এই শহরটাকে আমার মনে হত সমুদ্র।

সন্ধ্যের আগে আগে বাড়ি ফিরলে দেখতুম মা খুব ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিছু বলতেন না। নিঃশব্দে আমাকে খেতে দিতেন। আমি বইপত্তর ছুঁড়ে দিয়ে সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতুম। সে সময় রোজ নীচতলায় ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া হতো। নীচতলার সব কজন ভাড়াটের ঘরের সামনে এক সঙ্গে উনুন জ্বালানো হয়েছে। আমাদের বাড়ীটা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। সেই একরাজ্য ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে নীচের চেঁচামেচি, গালাগালি, ঝগড়া শুনলে আমার মনে হত আমি নরকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। নরক কি আমি জানতুম না। আমার মনে হয়েছে নরক এইরকম। এরকম এক সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ বাড়ি ফিরে বড়মামা মাকে বলেছিলেন, যমুনা, বাড়ি বিক্রি করে দিলাম। আমার শেষ পরীক্ষার তখন এক মাস বাকী।"

অনেকক্ষণ ধরে স্যানাটোরিয়ামের ঘণ্টা বাজছিল। ঘণ্টা কানে যেতে পরিতোষ থেমেছিল। পরিতোষ দেখেছিল তার সঙ্গী উঠে দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরিতোষের সঙ্গী বালির ওপর গভীর ক্ষতের মত একটা গর্ত খুঁড়েছিল। ঘাড় গোঁজ করে, এক চোখ বুজে সে সেই গর্তের দিকে তাকিয়েছিল। তার সঙ্গী গর্তের মধ্যে কি দেখছে পরিতোষ বুঝতে পারে নি। স্যানাটোরিয়ামের ঘণ্টা তাদের ডাকছিল। তারা সমুদ্র, হাওয়া আর নারকেলের বন থেকে মুখ ফিরিয়ে স্যানাটোরিয়ামের দিকে চলে গেছল।

"আমি যে করে পাল্টে গেলুম, বড় হলুম আমার মনে পড়ে না।" তৃতীয় দিনে পরিতোষ তার গল্প এইভাবে শুরু করল: "হঠাৎ যেন একদিন মনে হল বড় হয়ে গেছি।"

আজ সমুদ্র উত্তাল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ বেলাভূমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের অনেক ভেতর থেকে হু হু করে হাওয়া এসে নারকেলের পাতায় পাতায় ঝড় তুলছে। পরিতোষ আর তার সঙ্গীর চাদর চুল বাতাসে উড়ছিল। আজ আকাশ পাতলা মেঘে ঢাকা। সমস্ত আকাশের চেহারা ছেঁড়াখোঁড়া। কালো মেঘে আকাশটাকে পুরোনো ক্ষতের মত বীভৎস দেখাচ্ছিল। আজ পরিতোষের সঙ্গী বালিতে আঁচড় কাটছে না। কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে হাঁটু মুড়ে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

"একদিন আবার আমি জানলুম আমাদের কেউ নেই।" পরিতোষ তার গল্প শুরু করল। "আমি আর মা। আমরা এ পৃথিবীতে একলা। এখন আমি নিজেকে চিনেছি। এতবড় সমুদ্রের মত এই শহরে আমাকে কেউ তার হাত বাড়িয়ে দেবে না। আমি যতক্ষণ পারব নিজের দেহটাকে ভাসিয়ে রাখতে চেষ্টা করব। তারপর দম ফুরিয়ে গেলে তলিয়ে যাব।

বড়মামা বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছেন। বড়মামা যাবার আগেই আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি। যারা বাড়ি কিনেছিল তাদের কাছ থেকে বড়মামা তিন মাসের সময় নিয়েছিলেন। হয়তো আমার পরীক্ষার জন্যেই। বড়মামা আমাকে পছন্দ করতেন কিনা আমি বলতে পারব না। একদিন শ্রীনাথ দাদু মায়ের কাছে বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর সেও কোথায় তার দেশ সেখানে চলে গেল।

তখন নীচের একখানা ঘর ফাঁকা হয়েছে। নতুন বাড়িওলা যেদিন এল মা আমাকে নিয়ে নীচের সেই ঘরখানায় চলে এলেন। আমরা আমার দাদুর তিনতলা বাড়ির নীচতলার ভাড়াটে হয়ে গেলুম।

আমি একটি ওষুধ কোম্পানীতে কাজ পেলুম। আমাদের পাশের ঘরের লোকটা সেই কোম্পানীতে চাকরি করত। সেই একদিন নিয়ে গিয়ে কাজটা ঠিক করে দিল। লোকটা ছিল মালিকের খাস চাকর। আমার কাজটা খুব ভালো লেগেছিল। একটা বড় অন্ধকার গুদোমের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা এই আমার কাজ। সেই ঘরে নানা বয়সের পনেরোটা মেয়ে ছিল। তারা নানা আকারের সব শিশি জল সোডা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করত। আঠা দিয়ে লেবেল লাগাত। আমার কাজ ছিল এই পনেরোজন মেয়ের মধ্যে বসে ওদের কাজ দেখা। তাদের কাজের হিসেব রাখা। তারা কাজ কামাই করে গল্প করছে কিনা লক্ষ্য রাখা।

মেয়েগুলো প্রথমদিন আমাকে দেখে হেসে ফেলেছিল। আমাকে বয়সের অনুপাতে খুব ছোট দেখাত। তারা একদিন জানতে চেয়েছিল আমি এখনও দুধ খাচ্ছি কিনা। আমি বলেছিলুম, খাই। তাতে তারা সবাই সবাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে হেসেছিল। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হত আমাকে। ভোরে এক জায়গায় দুটো ছেলেকে পড়াতুম। পড়ানো হয়ে গেলে বাজারে ছুটতুম। বাড়িতে বাজার নামিয়ে চান খাওয়া করে আসতুম এখানে। এসে এই অন্ধকার গুদোমের মধ্যে বসলেই আমার খুব হাই

উঠত। গা ভেঙে ঘুম আসত। চোখের পাতা যেন কেউ আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে চাইত। তখন এই মেয়েগুলোই আমাকে জাগিয়ে রাখত। তারা নানারকম মজার মজার কথা বলত। আমাকে তারা কখনও আলাদা ভাবত না। তারা কখনও নিজেদের গুনতে গিয়ে মজা করে আমাকে গুনে ফেলত। বলত আমরা ষোলটা মেয়ে। মাঝে মাঝে তারা নিজেদের মধ্যে খুব খারাপ খারাপ আলোচনা করত।

এই ঘরের অনেক উঁচুতে একটা পঁচিশ পাওয়ারের ডুম ছিল। এত কম আলোয় মেয়েগুলোকে আমি কোনদিন পুরোপুরি তাদের নাক চোখ সমেত দেখিনি। কিন্তু যখন তারা খারাপ কথা আলোচনা করত আমার মনে হয়েছে আমি তাদের চোখ মুখ সব স্পষ্ট দেখতুম। তারা সবাই খারাপ কথা বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসত।

একদিন আমি তাদের অনেক বানিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বাড়িওয়ালার মেয়ের গল্প-বলেছিলুম।

বিকেল পাঁচটায় আমাদের ছুটি হত। আমি রাতের কলেজে ভর্তি হয়েছিলুম। কাজ থেকে বেরিয়েই আমাকে কলেজের দিকে ছুটতে হত। কলেজ আমার তেমন ভালো লাগেনি। বোধ হয় সারাদিন খাটা খাটুনির পর কারোও ভালো লাগে না। কলেজে আমার কোন বন্ধু ছিল না। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। কলেজ থেকে আমাদের বাড়ি কাছেই ছিল। নটার সময় কলেজ বন্ধ হলে হেঁটে বাড়ি ফিরতে আমার পনেরো কুড়ি মিনিট লাগত। সেই রাত সাড়ে নটায় বাড়ি ফিরে আমাকে ওপরে বাড়িওলার ছেলেকে পড়াতে হত। এর জন্যে আমি কোন পয়সা পেতুম না। বাজারে বাড়িওলার দুটি মুদিখানা দোকান ছিল। তবু পয়সা দিয়ে ছেলের জন্যে সে মাস্টার রাখতে চাইনি।

কলেজ থেকে ফিরে আমার শরীরে আর জোর থাকতো না। এক একদিন আমার ইচ্ছে হত আমি ভাড়াটেদের মত ঝগড়া আর চীৎকার করি। বাড়িওলার ছেলে ঝিমিয়ে পড়ত। রাত নয়টায় মাস্টার ঘরে ঢুকলে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে বাকী থাকতো। সে বাছুরের মত সরল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমি জানতুম সে কোনদিন পরীক্ষায় পাশ করবে না।

খেয়ে দেয়ে উঠতে আমার এগারোটা বাজতো। কোন দিন তারও বেশী। তখন শহরের সমস্ত বিচিত্র শব্দ একটু একটু করে মিলিয়ে আসছে। এক একদিন আমার মাথা খুব গরম হয়ে যেত। ঘুম আসতো না। আমি উঠে এসে বাইরের অন্ধকার রকে ঘুরে বেড়াতুম। আমার গল্প শেষ হয়ে আসছে।" পরিতোষ দম নিয়ে তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল, "প্রায় শেষ। আর একটু খানি।"

পরিতোষের সঙ্গী ঘাড় গুঁজে বসে রইল। কোন কথা বলল না। পরিতোষের দিকে ফিরে তাকাল না।

"সকালবেলা ......" পরিতোষ হেসে তার গল্পের শেষ শুরু করল ঃ "একদিন সকালে ওষুধ কোম্পানীতে যাবার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমার কলেজে শেষ পরীক্ষার তখন দু মাস বাকী। একদিন একটা লোক ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে ট্রামের তলায় চলে গেল। ট্রাম থেকে নেমে দেখলুম লোকটা দু আধখানা হয়ে ট্রামের তলায় শুয়ে আছে। আমার হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। আমার মনে হল অন্য কেউ নয় ট্রামের তলায় আমিই দু আধখানা হয়ে শুয়ে আছি। ট্রামটা দাঁড়িয়ে রইল। আমি ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা বাসে উঠলুম। বাসে উঠে আমার মনে হল সেই লোকটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সে সময় গুদোম ঘরে বইপত্তর নিয়ে পড়াশুনো করছি। ওষুধ কোম্পানীর মালিক একদিন ডেকে বলেছেন, পাশ করে ফেল। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে নেব। গুদোমের পঁচিশ পাওয়ারের ডুমটা পাল্টে তিনি একটা একশো পাওয়ারের ডুম দিয়েছেন। সেই একশো পাওয়ার আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি মেয়েদের রাস্তার লোকটার কথা বললুম। তারা শুনে খুব দুঃখ পেল। একজন তার বাবার কথা বলল—যে ঝড়ের সময় গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে।

আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছিল। আমি লোকটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না। এর আগেও আমি দুবার মৃত্যু দেখেছি। বাবাকে মরতে দেখেছি। আর সেই ছেলেটা ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছল। আমার কখনও এমন হয়নি। আমার কখনও মনে হয়নি তারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই লোকটি ছিল। এই লোকটা ছুটতে ছুটতে এসে ট্রামে উঠে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারপর থেকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে হয়েছিল লোকটিকে যেন আমি আগেও কোথাও দেখেছি। কত চিনি।

পরীক্ষার দুদিন আগে থেকে আমি রাত জেগে পড়তে থাকলুম। পড়তে পড়তে পড়া থামিয়ে আমি বাবার কথা ভাবতুম। বাড়ি-ওলার মেয়ের কথা মনে পড়ত। দুর্গাদি। সোনাজ্যেঠিমা। সকলের শেষে মনে পড়ত লোকটার কথা। লোকটাকে মনে পড়ার কিছু ছিল না। সে সব সময় আমার মনের মধ্যে থাকতো। বাবা, স্কুলের ছেলেটা, আর লোকটা তিনজনে যেন আমাকে তিন দিক থেকে ঘিরে ছিল।

পরীক্ষার দিন সকালে একটু পড়েছি। তারপর চান করে খেয়ে বেরুব। চান হয়ে হয়ে গেছে। খেয়েছি। বেরুচ্ছি। মা বললেন ওপরে বাড়ীওলাদের ঠাকুর প্রণাম করে আয়। আমি ওপরে উঠেছিলুম। যখন উঠছিলুম তখনই আমার সর্বপ্রথম কষ্টটা হল। কি যেন বুকের মধ্যে আটকে গেছে। পরে যখন তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, আমার ফুসফুস শুকিয়ে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল। আমি কাশতে কাশতে সিঁড়িতে বসে পড়লুম। সকলে ছুটে এল। তখন আমার গলা দিয়ে তাজা গরম রক্ত বেরুচ্ছে। আমি....."

বাক্য শেষ না করে পরিতোষ মরা চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ করল। পরিতোষের সঙ্গী বালির ওপর শুয়েছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরিতোষ একটু জিরিয়ে নিল। নিয়ে বললে, "আমি এক সময় ভাবতুম পৃথিবীতে কত লোক। কেউ আমাকে চেনে না। আমি একলা। আজ একমাস এখানে এসেছি। এখন পৃথিবীকে ছোট করলে সকলকে চেনা যায়। আমি এখন যে পৃথিবীতে আছি তার সকলকেই চিনি।"

পরিতোষের সঙ্গী হঠাৎ কেন যেন উঠে বসল। সে কিছু বলতে যাবে পরিতোষ বাধা দিয়ে বলল, "এখানে আমার সকলেই চেনা। সকলেই আমার মতো। সাঁতার না জেনে কেবল হাত পা ছুঁড়ে বাঁচতে চেয়েছিল। আমি আপনাকেও চিনি।" পরিতোষ তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করে হাসল।

দূরে স্যানাটোরিয়ামের ঘণ্টা বাজছে। সমুদ্র থমথমে। বাতাস বিষণ্ণ। চারপাশ জুড়ে গভীর অন্ধকার নেমেছে। পরিতোষের সঙ্গী উঠে দাঁড়িয়েছিল। পরিতোষ হেসে বললে, "কি, শুনতে চান না কে আপনি?"

পরিতোষের সঙ্গী কি বলল বোঝা গেল না। হয়তো কিছু বলেনি। হয়তো......।

পরিতোষ অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে হাসল। হেসে বলল, "আপনি সেই লোক যে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে ট্রামের তলায় চলে গিয়েছিলেন।"

পরিতোষের সঙ্গী কিছু বলল না। তারা চরাচর থেকে মুখ ফিরিয়ে স্যানাটোরিয়ামের দিকে এগিয়ে গেল।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১০৬)

মিস্টার ঘোষাল বললে—একদিন আগেও না, একদিন পরেও না—

আর কোনও প্রশ্ন সতীর মুখ দিয়ে বেরোল না। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে যেন সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো তার। সেই রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মিস্টার ঘোষালের চোখে মুখে যে তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠতে দেখেছিল, আজ জেল থেকে ছাড়া পাবার পর যেন আবার সেই বিষাক্ত দৃষ্টি তার চোখে। কিন্তু তবু যেন সন্দেহ হলো। ছাড়া পাবার পর আবার কী উদ্দেশ্যে এখানে। কী চায় মিস্টার ঘোষাল আজ তার কাছে? মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে সেইটেই ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করলে সতী। মিস্টার ঘোষাল তখন আরাম করে বসে পড়েছে। চুরোটটা নিবে গিয়েছিল। আবার দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিলে মুখে। পোড়া কাঠিটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কিন্তু আবার এলাম কেন, এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, না?

সতী বোবার মত এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমি বেশী কথার লোক নই, আর আমারও সময়ের দাম আছে, গোড়াতেই তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, তুমি যে আমার এগেনস্টে সাক্ষী দিয়েছিলে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ—

—ধন্যবাদ? কেন?

—আমার কনভিকশন না হলে রেলের চাকরি আমার ছাড়া হতো না। ওই হাজার টাকা স্যালারিতে আমার আর কুলোচ্ছিলও না। তা ভালোই হয়েছে, আমি এখন তিন হাজার টাকা স্যালারি পাচ্ছি এক মার্কেন-টাইল ফার্মে! খবরটা শুনে তুমি খুশী তো? কী? কথা বলছো না যে? কথা বলো! যাকে তুমি চিরকালের মত ক্রাশ করতে চেয়েছিলে, এখন দেখ তার কী অবস্থা হলো? তুমি খুশী হলে কি কষ্ট পেলে সেটা খুলে বলো?

সতী আর পারছিল না। বললে—আপনি আর কিছু বলবেন?

—বলবো না মানে? আমারই তো এখন বলবার দিন এসেছে। তোমরা তো সবাই ভেবেছিলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যাচ্ছে, এবার আমাদের দশা কী হবে। আমরা বুঝি সবাই উপোস করবো! এখন উপোস করবার নমুনাটা দেখলে তো? না কি বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বাস যদি না হয় তো আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সঙ্গে করে এনেছি। তাও দেখতে চাও?

নীল পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করলে। কাগজখানার ভাঁজ খুলে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেখ, মুখের কথায় বিশ্বাস না হয়, পড়ে দেখ ভালো করে—

সতী বললে—আমি বিশ্বাস করেছি, আপনার মুখের কথাই আমি বিশ্বাস করেছি, আপনার আর কিছু বলবার আছে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—কেন, তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও?

—না, তা নয়, আমার এখন একটু কাজ আছে!

—কিন্তু কাজ থাকলে তো শুনবো না। যেদিন আমার অনেক কাজ ছিল সেদিন তো তোমার কথা আমি শুনেছি।

সেজন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন সত্যিই আমি একটু ব্যস্ত, আপনি পরে একদিন আসবেন।

মিস্টার ঘোষাল বললে—পরে তো আমার নিজের সময় হবে না। যা কিছু করবার আজকেই করতে হবে।

—আর একদিনও দেরি করতে পারেন না?

—না।

—কিন্তু এখন যে আমি বড় ব্যস্ত। আমার যে মোটে সময় নেই।

—তা সময় না থাক্‌। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি অনেক দিন ওয়েট করেছি, এতদিন রিভলবারটার লাইসেন্স পাইনি। আমার কনভিকশনের সময় ওটা ওরা ক্যানসেল করে দিয়েছিল, এবার পেয়েছি—বলে মিস্টার ঘোষাল পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে টেবিলের ওপর শুইয়ে রেখে দিলে।

তারপর সতীর দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলো—তোমার সময় আজ থাক আর না থাক, আমার কথা তোমাকে এখানে দাঁড়িয়ে এখন শুনতেই হবে, আর আমি যা জিজ্ঞেস করবো তার উত্তর দিতে হবে—

সতী রিভলবারটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো। মিস্টার ঘোষাল বললে—

মনে রেখো আমি আজ একলা আসিনি, গাড়িতে আরো লোক আছে আমার। দেখেছ নিশ্চয়ই! এখন আমার প্রথম প্রশ্ন হলো তুমি এবার আমার প্যালেস কোর্টে যাবে কি না!

সতী চমকে উঠলো। বললে—প্যালেস কোর্টে? আমি?

—কেন? তুমি প্যালেস কোর্ট চেনো না? নতুন করে তোমাকে চিনিয়ে দিতে হবে?

সতী আড়ষ্ট হয়ে উঠলো—তা চিনি! কিন্তু আবার?

—হ্যাঁ, আবার। আমার রিকোয়েস্ট নয়, আমার অর্ডার। তোমার সাক্ষীতেই আমি জেল খেটেছি। তোমার সাক্ষীতেই আমার কনভিকশন্ হয়েছে, তাই তার কম্পেনসেশন আমি চাই, খেসারত চাই—আজই—

সতী মুখ তুলে চাইল মিস্টার ঘোষালের দিকে। আবার সেই তীক্ষ্ণ চাউনি, আবার সেই বিষাক্ত দৃষ্টি। মিস্টার ঘোষাল বললে—এ খেসারত না দিলে আমি তোমায় ছাড়বো না আজ। আজ এখনই। গোল ক্যালকাটায় আজ আগুন জ্বলছে, কোনও ল নেই, কোনও অর্ডার নেই, আসবার সময়ই রাস্তায় প্রোসেসান দেখে এসেছি, এসপ্ল্যানেডের কাচের শো-কেসগুলো সব ভেঙে দিয়েছে সব, ক্যালকাটা আজ আউটরেজড, আজ আমিও তোমার আউটরেজ করবো—

—বেরিয়ে যান এখান থেকে, বেরিয়ে যান আপনি! আপনি আজ মদ খেয়েছেন খুব। আপনার সংগে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না।

মিস্টার ঘোষালের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। রিভলবারটা তুলে নিয়ে আবার টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

—আপনি বেরিয়ে যান বলছি। বেরিয়ে যান এখুনি!

মিস্টার ঘোষাল গম্ভীর গলায় বললে—চেঁচিও না, তাতে তোমার খারাপ হবে। আমি একলা নই, আমার সংগে আরো লোক আছে—

—কিন্তু আমি আপনার আর কোনও কথা শুনতে চাই না, আপনি এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

—তা হলে চেঁচাও, পরে রিপেন্ট করতে হবে তোমাকে, অনুতাপ করতে হবে!

—কিন্তু আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেন না?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না।

—আপনি ভদ্রভাবে কথা বলুন, আমিও চেঁচাবো না।

—ভদ্রতা সেকেলে জিনিস। ওটা কাওয়ার্ডিস। আজকের দিনে যারা দুর্বল তারা ভদ্রভাবে কথা বলবে। আমি কোন দুঃখে ভদ্র হবো? আমি সোজা কথা সোজা করে বলবো, তাতে তুমি খুশী হও বা অখুশী হও, আমার কিছু এসে যায় না।

—তা হলে আপনি কী চান বলুন?

—আই ওয়াণ্ট ইউ! আমি তোমাকে চাই।

সতীর সমস্ত শরীর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। মুখ দিয়ে কড়া কথা বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিলে। বললে—সেই জন্যেই আপনি রিভলবার নিয়ে এসেছেন? আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না, ওটা সেন-এর জন্যে। দ্যাট দীপঙ্কর সেন এখন শিলিগুড়িতে, সে আমার পোস্ট নিয়েছে, আমার চাকরি নিয়েছে, আমাকে জেলে পাঠিয়েছে সেই, এখন তোমাকে নেবার মতলব করেছে। আমি এবার তাকে দেখে নেব,—কালই আমার লোক ভোরের প্লেনে শিলিগুড়ি যাবে এই রিভলবার নিয়ে—

—আপনি তাকে খুন করবেন?

—সোজা বাঙলায় তো তাকে তাই-ই বলে!

—কিন্তু সে আপনার কী ক্ষতি করলো? দীপু তো আপনার কোনও অপকার করেনি। সে তো আমাকে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বলে নি। আমি নিজেই সব করেছি, সে এ-সমস্ত কিছুর মধ্যেই নেই! তাকে আপনি কেন শাস্তি দিতে যাবেন মিছিমিছি? কী করেছে সে আপনার? আপনাকে জেলে পাঠানোর জন্যে তো আমিই দায়ী, আর কেউ নয়! একলা আমি!

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমি জানি সে-ই তোমাকে পেছন থেকে ইনস্টিগেট করেছিল, উত্তেজিত করেছিল—

—না, সত্যিই না, সে এর বিন্দু-বিসর্গও জানতো না। আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করুন, সে কিছুই জানতো না! তার কোনও দোষ নেই। তাকে আপনি চেনেন না মিস্টার ঘোষাল, তার মতন ছেলে হয় না। সে সকলের ভালোই চায়, সে আপনার ভালো চায়, সে আমার ভালো চায়, সে পৃথিবীর সব লোকের ভালো চায়, জীবনে কখনও সে মিথ্যে কথা বলেনি, জীবনে কারোর সে ক্ষতি করেনি, কোনও অন্যায় করেনি কারো, আপনি তার ওপর রাগ করবেন না। আপনার কাছে আমি হাত-জোড় করে বলছি, আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না—

মিস্টার ঘোষালের চোখে যেন একটা কটাক্ষ খেলে গেল। বললে—তার ওপর তোমার এত দরদ কেন শুনি?

—দরদ?

—হ্যাঁ, তার জন্যে তুমি আমার কাছে হাত-জোড় করছো কেন? এত দরদ তো ভাল নয়! সে তোমার কে?

সতী বললে—কেউ নয় মিস্টার ঘোষাল, দীপু আমার কেউ নয়, আমার ভাই নয়, আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, আমার কেউই নয়। আমার কাছে আপনিও যা, সে-ও তাই।

—তা হলে তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

সতী বললে—তা আমি বলতে পারবো না, তবু তার আপনি কোনও ক্ষতি করবেন না দয়া করে। সে নিষ্পাপ। আমি আপনাকে বলছি মিস্টার ঘোষাল, পৃথিবীর সকলের কিছু-না-কিছু পাপ আছে, আমার মনে পাপ আছে, আমার স্বামীর মনে পাপ আছে, আমার বোনের মনেও পাপ আছে, আমার নিজের বাবার মনেও হয়ত সামান্য পাপ ছিল, কিন্তু ভগবানের মনেও যদি কোনও পাপ না থাকে তো দীপুর মনেও কোনও পাপ নেই, সে একেবারে নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ, সে এই পৃথিবীর মানুষই নয়—

—এতখানি? মিস্টার ঘোষালের কটাক্ষ

ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে উঠলো গলার স্বরে। তারপর বললে—তা হলে তুমি চলো—

—কোথায় ?

—প্যালেস কোর্টে। তুমি যদি প্যালেস কোর্টে যাও তো আমি সেন-কে ছেড়ে দেব। যে-কোনও একটা বেছে নাও—

সতী হতবাক হয়ে গেল। মিস্টার ঘোষাল বললে—খেসারত আমার চাই-ই। হয় তুমি চলো, নয় তো সেন উইল পে দি পেনাল্টি—এনি ওয়ান অব দি টু! আমার কম্পেনসেসন চাই-ই চাই—আজই—

সতী থরথর করে কাঁপছিল। মিস্টার ঘোষাল বললে—তুমি ভাবছো কী? আমার সময় নেই, আমি বেশীক্ষণ সময় দেব না তোমাকে। কোনটা বেছে নেবে বলো—

সতী হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের আরো কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। বললে—আপনি এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন কী করে?

—আমাকে জেলে পাঠানোর সময় তো তোমরা নিষ্ঠুর হতে পেরেছিলে? তখন তো মায়া-দয়া করোনি?

সতী বললে—কিন্তু দীপুকে দোষ দিচ্ছেন কেন, সে তো এর মধ্যে নেই, এর মধ্যে একলা আমিই আছি, আমিই দায়ী—

—তা হলে ঠিক আছে, ইউ মাস্ট পে দি পেনাল্টি—তুমি প্যালেস কোর্টে চলো—

—কিন্তু...কিন্তু আমি কী করে যাই!

মিস্টার ঘোষাল রিভলবারটা তুলে নিয়ে একবার নাচিয়ে আবার পকেটে রেখে দিলে। বললে—তা হলে উঠি, কালকে ভোরের প্লেনেই আমার লোক এই রিভলবার নিয়ে শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছে—

সতী ছটফট করে উঠলো। মিস্টার ঘোষাল তখন দরজার দিকে যাচ্ছে। সতী বললে—দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান—

মিস্টার ঘোষাল পেছন ফিরে বললে—কী হলো?

সতী বললে—একটু দাঁড়ান, কিন্তু আপনি এইভাবে শাসিয়ে যাবেন? ভেবেছেন কলকাতা শহরে পুলিস, গভর্নমেণ্ট কিছু নেই? আপনি গুণ্ডামি করবেন, আর বাধা দেবার কেউ-ই নেই?

মিস্টার ঘোষাল বললে—যা ঘটছে এখন কলকাতায় তা তো দেখতেই পাচ্ছো, পুলিস, গভর্নমেণ্ট, মিলিটারি কিছু কি করছে? আর গুণ্ডার কথা বলছো, কিন্তু কে গুণ্ডা নয়? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গুণ্ডা নয়? মুসলিম লীগ গুণ্ডা নয়, কংগ্রেস গুণ্ডা নয়?

কিন্তু আমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে আপনি এইভাবে ভয় দেখিয়ে যাবেন?

—আমি তো ভয় দেখাচ্ছি না। আমি সোজা সরল ভাষায় তোমাকে সারেণ্ডার করতে বলছি। আর তা যদি না পারো তো সারেণ্ডার কোরো না। সেন আছে, হি উইল পে

সতী বললে—না, না, মিস্টার ঘোষাল, আপনি যাবেন না। আমাকে একটা রাত সময় দিন, একটা রাত ভাবতে সময় দিন শুধু। কালকে সকালটা পর্যন্ত আমি একটু ভাবি, তারপর যা হয় আপনি করবেন।

মিস্টার ঘোষাল কী যেন ভাবলে একবার। তারপর কী সুমতি হলো কে জানে। বললে—একটা রাত? কিন্তু কাল ভোর সাতটায় যে শিলিগুড়ির প্লেন ছাড়বে?

—তার আগেই আপনি আসবেন, তখন আপনি যা বলবেন আমি তাই-ই করবো।

—ঠিক?

—হ্যাঁ, ঠিক। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, একটা রাত মাত্র!

—আচ্ছা, ঠিক আছে—বলে মিস্টার ঘোষাল উঠলো। তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে বললে—আমি কাল সকাল ছটার আগেই আসবো—

মিস্টার ঘোষাল বাইরে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ হলো গাড়িটা ছেড়ে দিলে। তখনও সতী সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হলো সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দরজাটা বন্ধ করতেও ইচ্ছে হলো না। মনে হলো কোথায় দীপু রয়েছে কোন সুদূরে শিলিগুড়িতে, সে কিছু জানতেও পারলে না। অথচ কাল সকালে তার চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটে যাবে। পৃথিবীর কেউ জানবে না কেন, কীসের জন্যে তাকে চরম দণ্ড নিতে হলো। কেন নিজের জীবন দিয়ে অন্য আর একজনের সতীত্ব কিনতে হলো, অন্য একজনের জীবনের শান্তি, সংসার, সম্ভ্রম, মর্যাদা বাঁচাতে হলো। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কারোর কাছে কোনও কালে ধরা পড়বে না এ মূল্য কিসের? এ মূল্য কেন? মিস্টার ঘোষালের লোকও ধরা পড়বে না। তারা অভ্যস্ত। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট থেকে শুরু করে সভ্য সমাজে সর্বত্র তারা মানুষের চোখের সামনে এই কাজই করে বেড়াচ্ছে, এই-ই তাদের জীবিকা। বিংশ শতাব্দীর বোম্পদ্বেদ্য সভ্যতার তারাই বাহন। তাদের কেউ কিছু বলবে না। শুধু একলা জানবে সতী। আর সতী সমস্ত জেনে শুনেও এই সংসারে বেঁচে থাকবে!

কী মনে হতেই সতী তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে উঠলো। সনাতনবাবুর কথা এতক্ষণ যেন ভুলেই গিয়েছিল। সব শুনেছেন নাকি তিনি? কিন্তু ঘরের দরজার সামনে এসেই দেখলে সনাতনবাবু তেমনিভাবেই বিছানায় শুয়ে আছেন।

সতীকে দেখে একটুও নড়লেন না। সতী আরো কাছে সরে এল। দেখলে সনাতনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন! ক'দিন ধরে ঘুমোন নি। জীবনে এই যেন প্রথম শান্তি পেয়েছেন, প্রথম সহানুভূতি পেয়েছেন।

— ওগো, শুনছো?

কিন্তু ডাকতে গিয়েও সতী থেমে গেল। সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে আর তার ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হলো না।

হঠাৎ সতীর মনে হলো কেমন করে দীপুকে খবরটা দেওয়া যায়! টেলিগ্রাফ করা যায় না? টেলিফোন? ট্রাঙ্ক-টেলিফোন? টেলিফোন করে সাবধান করে দেওয়া যায় না? বলে দেওয়া যায় না যে, মিস্টার ঘোষালের লোক যাচ্ছে শিলিগুড়িতে? সাবধানে থেকো, কিংবা তুমি ওখান থেকে চলে যাও। অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকো। কিংবা পুলিসে খবর দাও। কিছু করা যায় না দীপঙ্করের জন্যে। কিছুতেই দীপুকে বাঁচানো যায় না? চারিদিকে চেয়ে দেখলে সতী! জানালার বাইরে বৃষ্টিটা বুঝি আরো জোরে পড়তে শুরু করেছে। ঘরটা অন্ধকার। হঠাৎ সতীর মনে হলো কেউ নেই ঘরে। সনাতনবাবুও নেই যেন। পাশের ঘরে লক্ষ্মীদিও নেই। এমন কি এই বাড়িটাও নেই। এক অনির্বচনীয় শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সতী যেন নিঃশব্দে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে বাঁচাবে না আজ, কেউ তাকে রক্ষা করবে না। সতীর অন্তরাত্মার অন্তস্তলে একটা সৃষ্টিছাড়া আর্তনাদ যেন ভেতর থেকে ঠেলা মারছে। কোথায় তার প্রতিকার? কোথায় তার পরিত্রাণ? কাকে ডাকবে সে? কাকে সে বাঁচাতে বলবে?

— ওগো, শুনছো? তুমি ঘুমিয়ে পড়লে?

কিন্তু ডাকতে গিয়েও যেন গলা আটকে গেল। ডেকে কী বলবে তাকে? কেন সে শাসাবার সাহস পায় এমন করে? কোন্ অধিকার সতী দিয়েছে তাকে? কোন্ সম্পর্কের অধিকারে সে এমন করে এসে শাসন করে গেল? পুলিসে খবর দেবে? কিন্তু পুলিসকে খবর দিতে গেলেও তো থানায় যেতে হবে। থানায় গিয়ে সমস্ত বলতে হবে। সমস্ত খুলে বলতে হবে। কিন্তু কেমন করে যায় সে সব ফেলে?

বাড়িতে যে কেউ নেই। কিন্তু টেলিগ্রাফ। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ তো করে আসতে পারে পোস্ট অফিসে গিয়ে! কাছাকাছি কোথাও পোস্ট অফিস আছে নিশ্চয়ই।

কথাটা মনে পড়তেই সতী আলমারি খুলে শাড়িটা বদলে নিলে। নতুন শাড়ি একটা। কোনও দিন পরা হয়নি আগে। তারপর পাশের ঘরে গেল। লক্ষ্মীদি বিছানায় ঠিক তেমনি শুয়ে আছে। ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। আবার রাত্রে আর একবার খাওয়াতে হবে। আস্তে আস্তে আবার বাইরে এল। বারান্দায় দাঁড়াল খানিকক্ষণ। তারপর কী মনে করে আবার নিজের ঘরে ঢুকলো, সনাতনবাবু তখনও ঘুমোচ্ছেন।

—শুনছো, আমি একটু বেরোচ্ছি, আমি এখুনি আসবো—

তবু গলা থেকে যেন কথাগুলো বেরোল না।

— আমি যাবো আর আসবো। এসে সারা রাত আমরা গল্প করবো দুজনে। আজ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি এখুনি চলে আসবো বুঝলে?

গলা দিয়ে কথা বেরোল না সতীর। তবু যেন সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে ওই কথাগুলোই বলতে চাইলে। তারপর আর একবার বাইরের দিকে চাইলে। জানালার বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার। বৃষ্টি পড়ছে টিপ্‌টিপ করে তখনও। কিন্তু রঘু আসছে না কেন? এত দেরি হচ্ছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে খবর দিয়ে আসতে? সে থাকলে তাকে রেখে নিশ্চিন্তে যাওয়া যেত।

তারপর তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সদর দরজা খুলে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। অনেক দূরে চেয়ে দেখলে। কোথাও কেউ নেই। রঘুর কোনও চিহ্নই নেই কোথাও। রাস্তায় লোকজন চলাও কম হয়ে গেছে। কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ি থেকে শেষ রাত্রে একদিন পালিয়ে আসবার সময় কিন্তু এমন ভয় করেনি। প্যালেস কোর্টে যাবার সময়ও এমন ভয় করেনি সতীর। কিন্তু আজ যেন গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠলো। তারপর সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো সোজা।

চারিদিকে অন্ধকার। কোথাও কোনও সাড়া-শব্দ নেই কারো। হাঁটতে হাঁটতে সোজা লেভেল ক্রসিং-এর দিকে চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন মনে হলো পেছনে কার পায়ের শব্দ হলো। ভয়ে ভয়ে পিছনে ফিরতেই মনে হলো অনেক দূরে কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। তাকে পেছন ফিরতে দেখেই পাশের অন্ধকার গলির মধ্যে আত্মগোপন করলো। কে ও? কেন তার পেছন পেছন আসছে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই আর পা চললো না। মিস্টার ঘোষাল যদি কাউকে এখানে রেখে দিয়ে গিয়ে থাকে? কাউকে পাহারা দেবার জন্যে রেখে দিয়ে গিয়ে থাকে? এমনও তো হতে পারে যে লোক দুটো গাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে ছিল তাদেরই একজনকে যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানে। বলেছে—নজর রাখিস একটু, দেখিস যেন কোথাও না পালায়—

সতী অনেকক্ষণ চেয়ে রইল একদৃষ্টে। গলির ভেতর থেকে লোকটা আর বেরোল না। স্পষ্ট ঝিঁ-ঝির আওয়াজ কানে আসছে তখন দু'পাশ থেকে। তারপর আবার চলতে লাগলো। মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল সে। হয়ত অন্য লোক। পাশের গলির ভেতর বাড়ি। নিজের বাড়িতে গিয়েই ঢুকেছে লোকটা—ঘোষালের লোক নয় সে।

আবার পা চালিয়ে দিলে। আবার আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। সতীর মনে হলো এ যেন তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু বাধা, শুধু ষড়যন্ত্র, শুধু শত্রুতা। জীবন তার প্রয়োজন, সুখ তার প্রয়োজন, স্বামী সংসার সবই আজ তার প্রয়োজন। আজ সবাইকে নিয়ে তার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করছে। এ পৃথিবী বড় সুন্দর, এ সংসার বড় মধুর। এমন সময় আবার কেন এই উৎপাত! আজ এই মুহূর্তে কেন এলে? এর আগে আসতে পারতে না? যখন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না? যখন আমি মৃত্যু কামনা করেছি প্রতি মুহূর্তে? যখন সংসার আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে, যখন বঞ্চনা অভিশাপ কলঙ্ক আমার নিত্যসাথী, তখন এলে না কেন?

অন্ধকারে সামনের সব কিছু অস্পষ্ট ঝাপসা দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে লেভেল ক্রসিংটা পার হলো সতী। এখন বোধ হয় কোনও ট্রেন নেই। গেটটা ওঠানো। আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললো সতী। দীপুর ঠিকানা জানা নেই। তবু শিলিগুড়ির নাম দিলেই চলে যাবে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই পৌঁছবে। নাম বললেই সবাই চিনবে নিশ্চয়ই। এতদিন যে কেন চিঠি দেয়নি রাগ করে! কেন চিঠি দেয়নি তাকে। দু-একজন লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ মনে হল রাস্তার মোড়ে যেন একটা পুলিস দাঁড়িয়ে। পুলিসকে খবর দেবে? খবর দেবে যে, তাকে শাসাতে এসেছিল মিস্টার ঘোষাল! আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু পুলিস তো নয়, একটা গাছ! একটা ছোট গাছ। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়নি।

না, পোস্ট অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাফ করে দেওয়াই ভালো। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ। আজ শেষ রাত্রেই হয়ত পৌঁছে যাবে দীপঙ্করের হাতে। কিন্তু কোথায় পোস্ট অফিস! রাস্তার মোড়ে এসে ডান দিকে যেতে হবে। ডান দিকে ফিরতেই হঠাৎ নজরে পড়লো সেই লোকটা যেন আবার আসছে। যে লোকটা সেই তখন থেকে পেছন-পেছন আসছিল, সেই লোকটা।

সতী এবার সাহস করে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। একেবারে সামনাসামনি। মুখোমুখি। সামনে এলেই বললে—কেন আপনি আমার পেছনে-পেছনে আসছেন? কী দরকার আপনার? কী চান আপনি?

বৃষ্টিটা বোধ হয় আরো জোরে নামলো। কিন্তু সতীকে থামতে দেখে লোকটাও হঠাৎ থেমে গেছে। আর এগোল না। তারপর পাশের একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো লোকটা। কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সতী এবার আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এবার যেন আর তার ফেরবার উপায় নেই। সামনে পেছনে সব দিকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তির ষড়যন্ত্র তাকে ঘিরে ফেলেছে। সতী যেন অসহায়ের মত আষ্টেপৃষ্ঠে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আর্তনাদ করতে চাইলো সেই নির্জন অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

রঘু প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সদর দরজা খোলা কেন? দিদিমণি কি দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে?

—দিদিমণি!

রঘু দরজাটায় খিল বন্ধ করে ভেতরে গিয়ে আবার ডাকলে—দিদিমণি—

কারো কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাইরের বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল রঘুর জামা-কাপড়। তবু সেই ভিজে জামা-কাপড়েই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। সমস্ত ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালেনি কেন দিদিমণি? অন্ধকার করে ঘরের মধ্যে বসে আছে কেন? কী হলো?

—দিদিমণি!

বড়-দিদিমণির ঘরও অন্ধকার। রঘু গিয়ে ঘরের ভেতরের আলোটা জ্বালাতেই লক্ষ্মীদি যেন চমকে উঠেছে।

—কে?

—আমি বড়-দিদিমণি! আমি!

—আলো নেব, আলো নিবিয়ে দে। আলো ভাল লাগে না আমার, জানিস না?

লক্ষ্মীদির আজকাল আলো ভালো লাগে না। সারা দিনরাত ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে রাখে। পৃথিবীর সব আলোকে যেন ভয় লাগে। ভয় লাগে সভ্যতাকে, ভয় লাগে মানুষকে। সভ্য মানুষ-সমাজের ওপরেই তার যেন ঘেন্না ধরে গেছে।

বললে—শীগ্‌গির আলো নিবিয়ে দে, শীগ্‌গির—

রঘু আলো নিবিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছোট-দিদিমণির ঘরে ঢুকলো। এ ঘরের মধ্যে অন্ধকার। আলোটা জ্বালতেই সনাতনবাবু জেগে উঠলেন। একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধ হয়। কয়েক রাত ঘুমোননি।

রঘু জিজ্ঞেস করলে—আলো জ্বালা থাকবে দাদাবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—তা থাক্।

রঘু আবার বললে—আপনার বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছি যে, আপনি আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবেন—তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—দিদিমণি কোথায়?

সনাতনবাবু বললেন—দিদিমণি! তা তো জানি না।

রঘু বললে—যাবার সময় তো বাড়িতে দেখে গেছি, এখন হঠাৎ কোথায় গেলেন—

সনাতনবাবু বললেন—কোথায় আর যাবেন! আমি একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই হয়ত এখানেই কোথাও গেছে, তুমি ভেবো না—

তা হবে! রঘুও আর ভাবলো না। ভিজে জামা-কাপড়টা ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। আজ দাদাবাবুও খাবে এখানে। উনুনে আগুন দিলে। তরকারি কুটলো—এখন অনেক কাজ। দিদিমণি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ রঘুকেই সব করতে হবে!

তখন আরো জোরে বৃষ্টি পড়ছে। সতী তাড়াতাড়ি আবার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলো। কয়েকটা গাড়ি হুশ হুশ করে চলে গেল পাশ দিয়ে। সেই লোকটা আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে সেখানে। যেদিকে সতী গিয়েও সেদিকেই পিছু নিয়েছে। সেই অন্ধকার সন্ধ্যাবেলায় সতী যেন বড় বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কোথায় যাবে সে? কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইবে? কে তাকে বাঁচাবে? বাড়ি ফিরেই বা যাচ্ছে কেন সে? সেখানে সনাতনবাবুকে দিয়ে তার কতটুকু সাহায্য হবে? তাঁর কাছে গিয়েই বা কী লাভ? দীপুকে খবর দেওয়া যাবে কেমন করে?

ধাতের কাছে পোস্ট অফিস নেই একটাও। থাকলেও এখন কি খোলা আছে? এই সন্ধ্যে ছটার পর?

সতীর মনে হলো এই সময়ে একলা বেরোলো তার উচিত হয়নি হয়ত। হয়ত রঘুকে দিয়েই পোস্ট অফিসে টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিলে হতো! কিন্তু রঘুই বা এত দেরি করছে কেন? প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে খবরটা দিয়ে আসতে কি এত সময় লাগে? বাড়ি ফিরলে তো রাস্তাতেই তার সঙ্গে দেখা হতো। তবু রঘু আসছে কিনা পেছন ফিরে দেখতে গিয়েই হঠাৎ আবার নজরে পড়লো। সেই লোকটা! সেই লোকটা আবার তাকে অনুসরণ করছে।

সতী থমকে দাঁড়াল!

সতীর মনে হলো লোকটা যেন সতীকে তার জন্ম থেকে অনুসরণ করে আসছে। যেদিন তার জন্ম হয়েছিল এই পৃথিবীতে, সেইদিন থেকেই। ওরই নাম বোধ হয় মৃত্যু। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝি ভগবান মৃত্যুকে মানুষের পেছনে লেলিয়ে দেন। মৃত্যুর সঙ্গে বারবার তাই মুখোমুখি হয়ে যায় মানুষ। বারবার মৃত্যুকে দেখে তাই আঁতকে উঠি আমরা। বারবার তাই তাকে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু কার সাধ্য মৃত্যুকে এড়াবে? তার বাবা কি মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছেন? পৃথিবীর কেউ কি এড়াতে পেরেছে? সতী কি তার খোকাকেও মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে নিতে পেরেছিল সেদিন?

লেভেল-ক্রসিং-এর ওপর তখন এসে পড়েছে সতী। সামনে দু' জোড়া লাইন। ইস্পাতের মজবুত লাইন। এইখান দিয়েই প্রতিদিন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কত ট্রেন কত মানুষ বয়ে নিয়ে যায়। সেই সমস্ত মানুষগুলোর পেছনেও তো মৃত্যু অনুসরণ করে চলেছে ছায়ার মত! মৃত্যু কোথায় নেই? এই সংসারে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে করতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মানুষ! সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত

মৃত্যু তাকে কি এই প্রথম অনুসরণ করেছে? লোভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে, রোগ-শোক-কামনা-বাসনা সমস্ত কিছুর সঙ্গেই তাকে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তারা কি মিস্টার ঘোষালের চেয়ে কিছু কম হিংস্র, কিছু কম নিরাপদ, কিছু কম ভয়ংকর?

একেবারে গুমটি-ঘরটার তলায় এসে দাঁড়াল সতী।

গুমটি-ঘরটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আর একবার পেছন ফিরলো। তাকে অনুসরণ করতে করতে সেই লোকটাও যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো আবার। যেন কুটিল-জটিল এক ষড়যন্ত্রের জালে তাকে ঘিরে ফেলেছে মিস্টার ঘোষাল। এরাই কাল যাবে শিলিগুড়িতে। এরাই শিলিগুড়িতে গিয়ে দীপুকে নিঃশেষ করে দেবে।

হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো মিস্টার ঘোষালের রিভলবারটা।

হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো ছোরাটা।

সতী চিৎকার করে উঠলো—না—না—

সেই অন্ধকারের পটভূমিকায় সতীর চিৎকার যেন হাহাকারে রূপান্তরিত হয়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। না, না, না! কিছুতেই না। দীপু কোনও দোষ করেনি। দীপু নিরপরাধ, দীপু নিষ্পাপ, দীপু নিষ্কলঙ্ক! দীপুকে মারবেন না! দীপুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। দীপু আমার কেউ নয়, দীপু আপনার কোনও ক্ষতি করেনি। দীপু কারোর কোনও ক্ষতি করেনি। দীপু আমাদের সকলের ভালো চায়। আপনার ভালো চায়, আমার ভালো চায়, আমার স্বামীর, আমার শাশুড়ীরও ভালো চায়।

হঠাৎ নিজের উত্তেজনায় সতী নিজেই যেন অবাক হয়ে গেল। কই, তার গলা দিয়ে তো এতটুকু শব্দ বেরোচ্ছে না! সে যদি এখন চিৎকার করে কাউকে ডাকে তো হলেও তো কেউ শুনতে পাবে না। সে কী তবে পাগল হয়ে গেল, উন্মাদ হয়ে গেল লক্ষ্মীদির মতন?

অনেক দূরে যেন কাঁসের একটা আলো দেখা গেল!

ট্রেন আসছে নাকি? ইস্পাতের লাইনের ওপর যেন ট্রেনের চাকার শব্দের প্রতিধ্বনি শুরু হলো। প্রথমে মৃদু, তারপর একটু স্পষ্ট। তারপর আরো স্পষ্ট হলো! অনেক দূর থেকে যেন হুইশল্ বাজলো ইঞ্জিনের। তবে কি ট্রেনটা আসছে এই লাইন দিয়ে? এই গুমটি-ঘরের সামনে দিয়ে?

সতী গুমটি-ঘরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ওপরে গুমটি-ঘরের ভেতরে সেই বুড়ো গেট-ম্যানটা বোধ হয় টেলিফোনে কথা বলছে।

—হাঁ হুজুর, আমি ভুষণ! লাইন ক্লিয়ার হয়েছে!

তারপর সজোরে যেন একটা কাঁসের শব্দ হলো। বোধ হয় লিভার টানলে। তারপর ক্রিং ক্রিং করে গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। আর কোনও গাড়ি আসতে পারবে না। টপ্‌টপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো জোরে। হাওয়া দিচ্ছে পুব দিক থেকে। জলো হাওয়া। সমস্ত শরীর যেন শিরশির করতে লাগলো। থরথর করে কাঁপতে লাগলো। শাড়িটাকে আরো এঁটে গায়ে জড়িয়ে নিলে সতী। মাথার ওপর ঘোমটা টেনে দিলে। তারপর সেইখানে গুমটির নিচে দাঁড়িয়েই ট্রেনের চাকার প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলো একমনে। ট্রেনটা আসছে অনেক দূর থেকে। সতীর মনে হলো, ও যেন ট্রেন নয়, ও যেন মিস্টার ঘোষালের পাঠানো মৃত্যু-দূত। সতীর অনাদি অতীত আর অনন্ত ভবিষ্যৎ আজ যেন তার এক মুহূর্তের বর্তমানের কাছে হঠাৎ একেবারে নিরর্থক হয়ে উঠলো। আর সতী সেই অনবহিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুহূর্ত-পল-দণ্ড হিসেব করতে লাগলো অধীর আগ্রহে।

মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাতে লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আলো হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে ছোট একটি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বের কোনও মূল্য নেই। কে মরলো কে বাঁচলো তা দেখবার দায় নেই মহাকালের। মহাকালের নিরিখে একটা যুগ কি একটা শতাব্দীর ইতিহাস হয়ত বড়ই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সে জানে যে প্রবল আকর্ষণ সূর্য থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে সূর্যে প্রসারিত তার মহাবিক্রমে মানুষের ইতিহাস অনাদিকাল ধরে অব্যাহত চলবে। সে জানে মানুষের অস্তিত্বরাজ্যের বিনাশ হতে পারে না। তাই গ্রহ-তারা-চন্দ্র-সূর্যের দল আলো হাতে বারবার মানুষের দরজায় এসে উঁকি দেয়। উঁকি দিয়ে দেখে কোথায় কোন্ মানুষ জেগে আছে, কোথায় কোন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। ওরা বলে—কোথায় তুমি? তোমার জন্যেই তো অনাদিকাল ধরে আমাদের যাত্রা, তোমার সন্ধানেই তো আমাদের অনন্ত পরিক্রমা! এমনি অনাদি-কালব্যাপী সন্ধানের পর কোটি কোটি বছর পার হয়ে যায়। পার হয়ে যায় যুগ-যুগান্তর। হঠাৎ কয়েক শতাব্দীর পরে আবির্ভাব হয় একজন বুদ্ধদেবের, আবির্ভাব হয় একজন যিশু খৃষ্টের, আবির্ভাব হয় একজন মহম্মদের, আবির্ভাব হয় মহাত্মা গান্ধীর। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলোকে জয়ডঙ্কা বেজে ওঠে, মর্ত্যলোকে জয়-শঙ্খ।

দীপঙ্করবাবুর চলে যাবার আয়োজন হয়েছিল। রাত্রি দশটায় ট্রেন। আমরা তাঁর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর গল্প শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন—আমি মৃত্যু দেখেছি। মৃত্যুকে অনুভব করেছি, মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তা-ও নয়। আমি মৃত্যুকে কিনেছি

মৃত্যুকে দীপঙ্করবাবু কিনেছেন! আমরা যারা শুনছিলাম তারা সবাই অবাক হয়ে গেলাম।

—হ্যাঁ, আমার টাকা ছিল, আমার ধার করা লক্ষ টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমি সতীর সুখ কিনতে চেয়েছিলাম, সতীর শান্তি কিনতে চেয়েছিলাম। শুধু সতীর নয়, পৃথিবীর সকলের মঙ্গল কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হলো না। আমি টাকা দিয়ে জীবন কিনতে পারিনি, মৃত্যু কিনলাম—অঘোরদাদু আমাকে ভুল শিখিয়েছিল—

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন—যাঁরা তোমাদের টেক্সট বই লেখেন যাঁরা তোমাদের টীচার, যাঁরা তোমাদের গার্জেন, তাঁরা সবাই অঘোরদাদু। সেই অঘোর-দাদুরাই আজ আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সব জায়গাতেই আছেন অঘোর-দাদুরা। আমি বাঁকুড়া থেকে চলে এসেছি, বর্ধমান থেকে চলে এসেছি, হুগলী থেকে চলে এসেছি, সব জেলা থেকেই চলে এসেছি, এবার এখান থেকেও চলে যেতে হচ্ছে। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। পৃথিবীর এক জায়গায় আমি মানুষ খুঁজে পাবোই। আমার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার দলও আলো হাতে খুঁজতে বেরিয়েছে। কোটি কোটি বছর ধরে তারা খুঁজছে, আরো খুঁজবে। আমি হতাশ হই না, আমি হতাশ হবো না—

বললাম—তারপর?

—তারপর?

যে অমৃতময় পুরুষ বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন, তিনি সেদিন সাক্ষী রইলেন। সাক্ষী রইল অনন্ত আকাশ, অসীম দিগন্ত। আর সাক্ষী রইল 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর অসংখ্য পাঠক। তারা জানলো সতী সেদিন মৃত্যু চায়নি। সতী সেদিন সুখ চেয়েছিল, শান্তি চেয়েছিল,

স্বামী চেয়েছিল। আর আর একটি জিনিস চেয়েছিল। সে চেয়েছিল মাতৃত্ব। সে চেয়েছিল সন্তান।

হুড়মুড় করে ট্রেনটা আসছে। সামনের হেডলাইটটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষতর। সতী গুমটি-ঘরের নিচে থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল এক জোড়া চকচকে ঝকঝকে লাইনের দিকে। চাকায় চাকায় তখন দুর্দান্ত বেগ, শিরায় শিরায় তখন দুর্দম উন্মাদনা! কাল সকাল সাতটা! কাল সকাল সাতটার মধ্যেই মিস্টার ঘোষাল এসে শেষ জবাবদিহি চাইবে। তার খেসারত চাইবে। হয় দীপংকরের মৃত্যু, নয় সতীর সতীত্ব!

এবার ট্রেনটা আরো কাছে এসে পড়েছে।

তুমি আমায় ক্ষমা করো। আজ সারা রাত বৃষ্টি হবে। তুমি বলেছিলে ঘরের ভেতরে আমরা দুজনে মিলে এক বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করবো। তুমি বলেছিলে তুমি অনেক রাত ঘুমোওনি। আমার কথা ভেবে-ভেবে তোমার ঘুম আসেনি অনেক দিন। আজ তুমি তোমার মাকে না বলে হাঁটিতে হাঁটিতে চলে এসেছিলে আমার কাছে। আমি তোমাকে আমার বিছানায় শুইয়ে এসেছি। আমি তোমাকে বলেছি—আমি এখনই আসবো। আমি বলেছিলাম—আমি যাবো আর আসবো! কিন্তু দীপু? দীপু যে শিলিগুড়িতে, কাল যে ওরা যাবে, কাল যে ওরা শিলিগুড়িতে যাবে। দীপু যে খবর পায়নি, দীপুকে যে সাবধান করে দেওয়া হয়নি! দীপু যে......

হঠাৎ সতীর মনে হলো পূব দিকের লাইনের ওপর দিয়ে কে যেন চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে—

—কে? কে ও? মিস্টার ঘোষাল? ঘোষাল কি জানতে পেরেছে? তার চারদিকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলেছে ঘোষাল!

সতী চিৎকার করে উঠলো না, না, দীপুর কোনও ক্ষতি কোরো না তোমরা, দীপু আমার কেউ নয়, দীপুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, দীপু কিছু জানে না। সে নিষ্পাপ, সে নিরপরাধ, সে নিষ্কলংক......

ট্রেনটা তখন আরো কাছে এসে পড়েছে। আর ওদিকে মিস্টার ঘোষাল দৌড়তে-দৌড়তে তার দিকে আসছে......আরো কাছে এসে পড়লো......

তখন অনেক রাত। রঘু রান্না সেরে আবার গিয়ে ওপরে উঠলো। সনাতনবাবু চুপ করে তখনও বসে ছিলেন। রঘু আসতেই সনাতনবাবু চেয়ে দেখলেন। রঘু বললে—এখনও দিদিমণি তো এল না দাদাবাবু—

সনাতনবাবু বললেন—আসবেন ঠিক, তুমি কিছু ভেবো না—

—আপনি কি খেয়ে নেবেন? অনেক রাত হয়েছে—

—দিদিমণি আসুন, তারপর খাবো না-হয়।

—কিন্তু তাঁর যদি আসতে দেরি হয়?

সনাতনবাবু বললেন—দেরি হবে কেন? তিনি তো জানেন আমি এখানে আছি—

—তা হলে আমি একটু খুঁজে দেখবো? হঠাৎ নিচেয় সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়লে। রঘু বললে—ওই দিদিমণি এসেছে, যাই—

বলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে সদর দরজাটার খিল খুলে দিলে। বললে—কী আক্কেল আপনার দিদিমণি, এত দেরি করতে হয়! আমরা ভাবছি কত। কোথায় গিয়েছিলেন?

—এ-বাড়িতে তোমাদের কোনও মেয়ে-মানুষ ছিল? সবাই বলছিল—এই বাড়িতে থাকতেন তিনি......

এক দল লোক। সবাই হাঁফাচ্ছিল। এত লোক দেখে রঘু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। বললে—কী চান আপনারা? কাকে চান?

—তোমাদের বাড়ির কোনও মহিলা রেলে কাটা পড়েছে? জানো তুমি?

—রেলে কাটা পড়েছে? কে?

—তা জানি না! সবাই বলছে তিনি এই বাড়িতে থাকতেন, শীগগির চলো, দেখবে চলো...

রঘুর মাথায় তখন যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। দরজা খোলা পড়ে রইল। রঘু সেই অবস্থাতেই ছুটলো লেভেল-ক্রসিং-এর দিকে। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে তখনও। অনেক লোকের ভিড় জমেছে লাইনটার কাছে। ট্রেনটা খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনটা যেন রাগে লজ্জায় অপমানে আঘাতে আপন মনেই ফুঁসছে তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

রাত যখন আরো অনেক গভীর হলো, তখন হঠাৎ নদিদির টেলিফোন বেজে উঠলো। নদিদি বললে—কে?

—আমি নয়ন। সর্বনাশ হয়েছে নদিদি, আমার বউমা রেলের তলায় কাটা পড়েছে—

—বলিস কী তুই?

নয়নরঞ্জিনী বললে—হ্যাঁ নদিদি, এই তো এখন পুলিস এসে আমায় খবর দিয়ে গেল। এখন কী করি? হাত-পা আমার থরথর করে কাঁপছে, তাই তোমায় টেলিফোন করলুম—। আমার ছেলেও সেখানে রয়েছে—

নদিদি কী বলবে যেন হঠাৎ বুঝতে পারলে না। বললে—তোর ছেলেকে সেখানে পাঠালি কেন আবার?

—আমি কি পাঠিয়েছি নদিদি! কখন গেছে খোকা টেরই পাইনি। বিকেল বেলা একটা লোক এসে খবর দিয়ে গেল খোকা নাকি সেখানে রাতে থাকবে। ভাবলুম সকাল-বেলাই তোমার কাছে পরামর্শ চেয়ে নেব, তা এখন এই কাণ্ড! এখন কী করি বলো দিকিনি! যদি একটা পুলিসের হাঙ্গামের মধ্যে পড়ে যাই! তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি আমার কি যাওয়া উচিত?

—তা তোর বউয়ের তো অনেক টাকা আছে শুনেছিলুম। বাপের অনেক টাকা তো পেয়েছিল?

—তা তো পেয়েছিল। দেড় লাখ টাকার মতন—

নদিদি বললে—তা হলে এক্ষুনি যা, এক্ষুনি যা, দেরি করিস নে। টাকাকড়ির ব্যাপার, মরে যাবার পর টাকা হাতছাড়া হয় হামেশা। এমন ভুল করিস নে, কোথা থেকে কে এসে জুটবে শেষকালে, তখন হাত-পা কামড়াবি, যা—

নয়নরঞ্জিনী দাসী টেলিফোন রেখে দিলেন। তারপর সেই রাত্রেই শম্ভুকে ডেকে ট্যাক্সি ডাকতে বললেন।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খবর পৌঁছুলো ঊনিশের একের-বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভাড়াটে বাড়িতে। লক্ষ্মণ সরকার অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। লক্ষ্মণ বলেছিল—তুমি বরং খেয়ে নাও, দীপঙ্কর আর আসবে না হয়ত আজকে—

ক্ষীরোদা সমস্ত দিন ধরে রান্না করেছে। কত দিনের সাধ তার! লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমি না-হয় খবর নিয়ে আসছি, একটু দাঁড়াও—

তারপর অফিসে টেলিফোন করে খবর পেলে জেনারেল ম্যানেজারের স্পেশ্যাল ক্যান্‌সেলড্ হয়ে গেছে। এবার হয়ত দীপু সোজা এখানেই আসবে। বাড়িতে এসে বললে—তোমার সব তৈরী তো? দীপু এই এসে পড়লো বলে—

কিন্তু তারপর রাত সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, ন'টা বাজলো। শেষকালে ঢং-ঢং করে দশটাও বাজলো। আর খাওয়া হলো না। লক্ষ্মণ একলাই খেয়ে নিলে। বললে—তুমি খাবে না? কতক্ষণ আর তার জন্যে বসে থাকবে?

ক্ষীরোদা কিছু বললে না। সারা রাত জেগেই হয়ত কাটতো। কিন্তু অনেক রাত্রে কে যেন দরজার কড়া নাড়লে। গায়ে একটা ঠেলা লাগতেই লক্ষ্মণ ধড়ফড় করে উঠলো। বললে—কে? কে ডাকছে?

ক্ষীরোদা বললে—নিচেয় কে কড়া নাড়ছে—দেখো না—

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি নিচেয় যেতেই সব শুনে অবাক। বললে—সেন সাহেব? গাড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এ? কী হয়েছিল?

কিন্তু খবরটা ক্ষীরোদার কানে যেতেই কেমন যেন টলে উঠলো মাথাটা। সেইখানেই পড়ে গেল মেঝের ওপর। সেদিন যে কী বিপদের মধ্যেই পড়েছিল লক্ষ্মণ! এদিকে ক্ষীরোদার মাথায় জল দিয়ে জ্ঞান ফেরানো, ওদিকে দীপঙ্করের অ্যাকসিডেন্ট। দীপঙ্কর যে কেন ওদিকে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল, কিছুতেই বুঝতে পারেনি সেদিন লক্ষ্মণ সরকার। শেষ পর্যন্ত ক্ষীরোদার যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন লক্ষ্মণ সরকার একলাই যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্ষীরোদা ছাড়েনি। বলেছিল—আমিও যাবো, আমাকেও নিয়ে চলো—

মিস্টার ক্রফোর্ড নিজে এসেছিল খবর পেয়ে। জিজ্ঞেস করেছিল—এখানে তুমি কী করতে এসেছিলে সেন? হোয়াট ব্রট্ ইউ হিয়ার?

দীপঙ্কর তখনও কিছু উত্তর দেয়নি। উত্তর দেবার কী-ই বা ছিল! কেউ তো বুঝবে না কেন সে এসেছিল এখানে। সেই অল্প অন্ধকার জায়গাটা তখন লোকে লোকারণ্য। পুলিস এসেছে। মানুষের ভিড়ে জায়গাটা জমজমাট হয়ে উঠেছে। নয়নরঞ্জিনী দাসী এসেছেন। শম্ভু এসেছে। সনাতনবাবু এসেছেন, রঘু এসেছে। লক্ষ্মণ সরকার এসেছে। ছিটে-ফোঁটাও খবর পেয়ে এসেছে। নদিদিও এসে দেখে গেল দীপঙ্করের তখন স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। পায়ে খুব আঘাত লেগেছিল। রেলের লাইনের ওপর সতীর দেহটা তখন আড়াআড়ি পড়ে আছে। চাকাগুলো বোধ হয় একেবারে বুকে

ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। সমস্ত জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে ভিজে গেছে। মুখখানা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে। মাথার কোঁকড়ানো চুলের খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে ব্যালাস্টের ওপর। দু' পাশে দুটো হাত পাতা। সব চাওয়া সব পাওয়া সব কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষার যেন সমাধি হয়ে গেছে এক মুহূর্তে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দীপঙ্করের চোখে জল পড়েনি সেদিন। শুধু মনে হয়েছিল—এই মৃত্যুর মধ্যেই যেন তার জীবনের চরম জিজ্ঞাসার শেষ উত্তরটি পেয়ে গেছে সে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভই যেন তার হয়ে গেল একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যেন জীবনের পরম অর্থ সে খুঁজে পেলে। যে প্রশ্ন সে অমলবাবুকে করেছিল, যে প্রশ্ন সে প্রাণমথবাবুকে করেছিল, যে প্রশ্ন সে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে বিশ্ববিধাতার কাছে নিবেদন করতো, সেই চরম প্রশ্নের পরম উত্তর যেন তাকে সতীই জানিয়ে গেল। সতীই যেন তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল কড়ি দিয়ে জীবন কেনা যায় না। কড়ি দিয়ে মৃত্যুই কেনা যায় শুধু......

তারপরেই তারা দীপঙ্করকে লেক হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিস রিপোর্ট দিলে—এ কেস্ অব্ সুইসাইড।

তারপর বছরের পর বছর হোসেনভাই কাশেমভাই-এর অফিসে প্রতি মাসে মনি-অর্ডারে টাকা এসে পৌঁছেছে। কখনও বাঁকুড়া থেকে। আবার কয়েক মাস পরে বর্ধমান থেকে। আবার কখনও হুগলী থেকে। বাঙলার নানা জেলা, নানা গ্রাম থেকে মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠিয়েছে দীপঙ্কর সেন। লক্ষ টাকার ঋণ। সারা জীবন ধরেই হয়ত ঋণ শোধ করে যাবে দীপঙ্কর। সতীর ঋণ সারা জীবন ধরেই শোধ করে যাবে সে। রেলের এত বড় চাকরির পর অল্প মাইনের চাকরি। কোথাও আশী টাকা মাইনে, কোথাও এক শো, কোথাও দেড় শো। সেই মাইনে থেকে মাসের পয়লা কিংবা দোসরা তারিখে মনি-অর্ডার এসে পৌঁছোয়। কোনও মাসে পঞ্চাশ, কোনও মাসে চল্লিশ, কোনও মাসে ষাট। একদিন এই টাকা দিয়েই সতীর শাশুড়ীকে ঋণমুক্ত করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, এই টাকা দিয়েই সতীকে সুখী করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, এই টাকার ঘুষ দিয়েই সতীর ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর। কিন্তু দীপঙ্কর তখন জানতো না যে, পরিবার-বোধের চেয়ে বিশ্ববোধে যতই মানুষ বড় হয় ততই তাকে আত্মবিলোপ করতে শিখতে হয়। ততই বৃহৎ ত্যাগের জন্যে তৈরী হতে হয়। ঐক্যবোধের চেষ্টার মধ্যেই যে মনুষ্যত্বের সাধনা নিহিত তা যেন সতীই তাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রাত দশটায় ট্রেন ছাড়বে। আমরা সবাই স্টেশনে গেলাম তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে।

কাশী জিনিসপত্র নিয়ে আগেই উঠেছিল। দীপঙ্করবাবু গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনে কোনও ক্ষোভ নেই, মনে কোনও দুঃখ নেই। বললেন—তোমরা যারা এখন ছোট, তোমাদের কাছেই আমার বেশী আশা। তোমরা একদিন বড় হবে। তোমরা আমারই মত আরো জীবন দেখবে। আমারই মতন ছিঁটে-ফোঁটাদের দেখবে, লক্ষ্মীদি, সতীকে দেখবে, নয়নরঞ্জিনী দাসীকে দেখবে, লক্ষ্মণ সরকার, ক্ষীরোদা, কিরণ, সবাইকে দেখবে। দেখবে বিন্তী, লক্কা, লোটন, সবাইকে। আজও যদি গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর সেই বাড়িতে যাও তো দেখবে সেখানে দাতারবাবু আছেন, লক্ষ্মীদি আছে। তাঁদের ছেলে মানস আজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে ইণ্ডিয়ারই কোনও জেলখানায়। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে গেলে দেখবে সনাতনবাবু আজও মানুষের লেখা পুঁথির মধ্যে মনুষ্যত্বের সূত্র বার করবার চেষ্টা করছেন। দেখবে নয়নরঞ্জিনী দাসীর মেজাজ এখন আরো উগ্র হয়েছে। বাতাসীর মা, ভূতির মা, কৈলাস, শম্ভু আজও সেই শাসনের আওতায় জীবিকার যন্ত্রণা পাচ্ছে। রেলের অফিসে, পেট্রল কোম্পানীর অফিসে আজও ঘোষাল সাহেবেরা সশরীরে শাসন-দণ্ড হাতে নিয়ে বিশ্বজয় করে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি না-ও দেখতে পাও তো তাদেরই মতন আরো অনেক লোক দেখতে পাবে। দেখবে অঘোরদাদুরা আজও বেঁচে আছে কড়ি দিয়ে সব কেনবার জন্যে। আজকের অঘোরদাদুরাও ঘরের মধ্যে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে পচিয়ে ফেলছে, তবু দেবতার ভোগ দেবতাকেও দিচ্ছে না, মানুষকেও খেতে দিচ্ছে না। শুধু আমিই তোমাদের মধ্য থেকে চলে গেলাম। আর এক জেলায়, আর এক গ্রামে আমি আবার আশ্রয় চাইবো, আবার হয়ত সেখান থেকেও আমায় চলে যেতে হবে। তবু আমি হতাশ হবো না, তবু আমি আশা ছাড়বো না—মানুষ আমি খুঁজে বার করবোই।

আর বেশী সময় ছিল না। প্লাটফরমের ঘণ্টা পড়লো।

একটু থেমে বললেন—একটা কবিতা সেদিন পড়েছিলুম, কবিতাটা বড় ভালো লেগেছিল, সেটার খানিকটা তোমাদের শুনিয়ে যাই। এক বিখ্যাত ইংরেজ কবির লেখা—তাঁর নাম ডবলিউ-এইচ-অডেন—

All that I have is a voice
To undo the folded lie,
The romantic lie in the brain
Of the sensual Man in the Street,
The lie of Authority
Whose buildings scrape the sky;
There is no such thing as the State
And no one exists alone:
Hunger allows no choice
To the citizen or the police.
We must love one another or die

সমাপ্ত

চিত্রগ্রীব

বছরখানেক আগে খোলা রাস্তায় নিজের ছবির প্রদর্শনী করে শিল্পী প্রকাশচন্দ্র কর্মকার শহরে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেই নতুন ধরনের প্রচেষ্টার ফলে শিল্পরসিক জনসাধারণ চিন্তা ও দক্ষতায় বলিষ্ঠ কৃতিত্বসম্পন্ন এক শিল্পীর আঁকা ছবির সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ করে। স্বনামখ্যাত স্বর্গত শিল্পী প্রহ্লাদ কর্মকারের পুত্র হলেও প্রকাশচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হন এবং ছবি আঁকায় তিনি প্রথম শিক্ষালাভ করেন গবর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। দু'বছর মাত্র সেখানে থেকে আর্থিক অনটন হেতু আর্ট স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও চর্চা তিনি ত্যাগ করেন নি। স্টুডিওতে যোগদান করে তিনি দিলীপ দাশগুপ্তের অধীনে তেলরঙের মাধ্যমে ছবি আঁকা আয়ত্ত করেন এবং ১৯৫৭ সালে প্রথম একক ছবির প্রদর্শনী করেন। সে সময়কার তাঁর ছবি ছিল বাস্তবধর্মী—তেল ও জলরঙের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রতিকৃতি আঁকাতেই তাঁর কাজ নিবদ্ধ ছিল।

প্রায় বছরখানেক হলো প্রকাশচন্দ্র শিল্পী নীরদ মজুমদারের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই থেকে তাঁর প্রভাবে নিজস্ব একটি বলিষ্ঠতর ভঙ্গীর উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। গত ২৭শে জানুয়ারি ৩১, পার্ক স্ট্রীটের আর্টস এণ্ড প্রিণ্টস গ্যালারীতে উদ্বোধিত প্রকাশ কর্মকারের ছবির একক প্রদর্শনীতে তাঁর নিজস্ব নতুন ভঙ্গীর চমৎকৃত হবার মতো দৃষ্টান্ত দেখা গেল। প্রদর্শিত মোট কুড়িখানি ছবিতেই ভারতের আদি হিন্দু শিল্পধারার অনুগামী জ্যামিতিক রেখার সঙ্গে বাঙলার পটশিল্পের রঙের প্রয়োগ-ধারার সমাবেশে এমন একটা নিজস্বতা আয়ত্ত করেছেন যা চট করেই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত ছবিগুলি। গোপিনীদের বস্ত্রহরণ (১৯নং), দশভুজা (১৫নং), ননী চোর (১৭নং), রাসলীলা (২০নং) এবং মহিষমর্দিনী (১৬নং) প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলি যেমন, তেমনি তীরে বাঁধা নৌকা (৮নং), জীর্ণ পাটাতন (১৩নং), ভাঙা জেটি (১নং) প্রভৃতির পরিচ্ছন্ন রচনাগুণে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। পূজারিণী (১০নং), দেবদাসী (৩নং), জেলেনী (১৪নং) প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিকৃতিতে ভাস্কর্যের গঠন লক্ষ্য করা যায়।
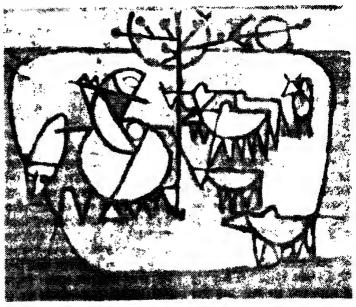
গোপাল

সামগ্রিক বিচারে শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এবং রেখা ও রঙের নতুনভাবের

প্রসাধন

সমন্বয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যধারাকে পরিস্ফুট করে তোলার দিক থেকে প্রকাশ কর্মকারের ছবিগুলি সাম্প্রতিক কালের অতি উল্লেখ-যোগ্য সৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায়। প্রদর্শনীটি আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

বনপলাশির পদাবলী

রমাপদ চৌধুরী

(১৫)

দেখতে দেখতে পুজোর দিন ঘনিয়ে এলো।

সকাল হলেই বুড়ী অট্টামা লাঠি ঠুকঠুক করে এসে হাজির হয় কালীতলায়। গাঁয়ের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও ভিড় করে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্‌গ্রীব বড় বড় চোখ মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

কবে সেই চাটুজ্যেরা কালীতলার ঘর দুখানা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিল, বেঁটে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল সামনের চত্বরটা। তারপর থেকে আর খাঁড় পড়েনি দেয়ালে, চুনসুরকি খসে খসে পড়েছে। এখানে ওখানে দেয়ালের গায়ে বট অশত্থের চারা গজায়, গরুতে খেয়ে দেয় তাই রক্ষে। তা না হলে কবে দেয়াল ভেঙে পড়তো। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে লোকের পায়ে পায়ে সামনের চত্বরটা জলকাদায় প্যাচ প্যাচ করে। ক'বছর ধরেই চেষ্টা হচ্ছে ইঁট পেতে দিয়ে সিমেণ্ট করবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই জল্পনা কল্পনাই হয়।

অট্টামা মাঝে মাঝে বলে, অ গুপেন, কালীতলাটা বাবা শান বাঁধিয়ে দে তোরা, বুড়ো মানুষ কবে পা হড়কে পড়ে মরবো সেই ভালো হবে!

গোপেন মোড়ল শুনে হাসে। বলে, হবে, হবে।

অট্টামা সান্ত্বনা পায় না সে কথায়। বলে, ও তোমার পাঁচজনে মিলে হবে না, তুই দে বাবা, ওটুকু বিলিতি মাটি ফেলে বাঁধিয়ে দে!

গোপেন মোড়ল হাসে।—অত টাকা কোথায় গো!

—হেই মা! গালে হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে অট্টামা, ফোকলা মুখে হেসে উঠে বলে, রিদয় মোড়লের ছেলের কথা শোনো। সেবার, আমরা সব পোষলা করতে বেরিয়েছি। উপুরঝুপুর বিষ্টি, কালীতলা থেকে ফিরতে পারি না এমন কাদা। তোর বাপ করলে কি জানিস, মুনিষ দিয়ে পাঁচ বস্তা ধান ঢেলে দিলে কাদা মারতে।

গোপেন হেসে বললে, সেই সব নবাবীর জন্যেই তো আজ এই হাল হয়েছে গো অট্টামা।

অট্টামা আপত্তি করে বলে, ও কথা বলিস না গুপেন, মানুষের দেয়া ফুরোয় না, ভগবানের দেয়া ফুরোয় না। তোর বাপের তো কই কোন অভাব ছিল না বাবা।

গোপেন কোন জবাব দেয় না, মনে মনে শুধু বলে, বাপকে বোকা পেয়ে যা পেরেছো করিয়ে নিয়েছো, তা বলে আমাকে অত বোকা পাওনি।

অট্টামা অবশ্য শুধু গোপেনকেই নয়। যাকে কাছে পায় তাকেই বলে—হংসকে, গিরীনকে, এবার পেসাদকেও বলবে। শুধু দুর্গা পুজোর সময়েই নয়, কালী পুজোয় পাঁঠা বলির রক্তে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলেও ওই একই দশা।

কালীতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেইসব কথাই ভাবছিল অট্টামা, আর মনে পড়ছিল চলে-আসা-জীবনের সেইসব দিনগুলোর কথা। ওই বাচ্চা ছেলেগুলোর মত অট্টামাও যখন বড় বড় চোখ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো কুমোরদের কারসাজি।

এখন আর তেমন ধানও নেই, ধ্যানও নেই। তেমন কুমোরও আসে না আজকাল, তেমন পিতিমেও হয় না।

বেদীর ওপর খড়ের গায়ে মাটি লেপছে কুমোরের দল। একমেটে শেষ হয়ে এসেছে।

বাচ্চা ছেলেগুলো আব্দার ধরে, গণেশের ইঁদুরটা করো না আগে।

কেউ বলে, মোরটা আগে করো।

কুমোরের দল কান দেয় না সেসব কথায়, এক একবার বিরক্ত হয়ে ছেলেগুলোকে তাড়া করে। তারা ছুটে পালায় হাসতে হাসতে, আবার আসে।

অট্টামার মনে পড়ে সেইসব আগেকার দিনগুলো। খাওয়া দাওয়া ভুলে সকাল-সন্ধ্যে সব দাঁড়িয়ে থাকতো দিনের পর দিন। দেখতো, চোখের সামনে কেমন একে একে হাতের আঙুল, নাক মুখ চোখ, চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠতো প্রতিমার।

এদের মত কুমোরের দল তখন দুদিন কাজ করেই অন্য গাঁয়ে পালাতো না। প্রথম থেকে শেষ অবধি থাকতো, কাজ সেরে তবে ছুটি নিতো। এখন আর পুজোয় প্রাণ নেই যেন। সব ব্যবসাদার হয়ে গেছে, মনে মনে ভাবে অট্টামা। দশটা কাজ এক সঙ্গে হাতে নেয়, একমেটে করেই আবার পালাবে, হঠাৎ একদিন এসে দোমেটে করবে। তারপর আবার একদিন হয়তো রঙ করবে প্রতিমার

গায়ে, ঘামতেল দেবে। ডাকের সাজ—তাও কাচিৎ কদাচিৎ হয়। ওসবের নাকি অনেক খরচ।

লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর টাটিয়ে ওঠে, লাঠি নামিয়ে বসে পড়ে অট্টামা।

ছেলেগুলোকে বলে, মা দুগ্গার পুজো তোরা আর কি দেখলি মানিক। এখন আর পুজো বলে মনেই হয় না।

সত্যি, তখন এমনভাবে ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দিতো নাকি কুমোররা। বরং ডেকে ডেকে কাউকে সাপ, কাউকে ইঁদুর, প্রজাপতি, টিকটিকি সব গড়ে দিতো কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে অট্টামা। কুমোরদের বলে, ডাকের সাজ না হলে মানায় না মাকে, বুঝলে গো।

কুমোররা হাসে। বলে, টাকা না দিলে কি ডাকের সাজ হয় মা।

কখনো অট্টামা বলে, তখন সব কুমোর আসতো, পিতিমে গড়া শেষ করে, মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তবে ছুটি নিতো। তোমাদের মত এমন খেপে খেপে কাজ করে পালাতো না।

কুমোররা হেসে বলে, তখন যে একটা গাঁয়ের প্রতিমে গড়েই পেটের ভাত জুটতো!

টাকা আর পেটের ভাত! এ ছাড়া যেন কথা নেই। কই তখন তো এসব কথা তারা বলতো না। অট্টামার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মা দুগ্গার প্রতিমা গড়ছে, এ কি কম পুণ্যির কথা! ওদের মুখে পেটের ভাতের কথায় মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। চোখের সামনে কাঠের পাটায় খড়ের মেড় বাঁধা হ'ল, তার ওপর মাটি, একমেটে, দোমেটে, রঙ-সাজ... এ যে কি আনন্দ। ভাসুরের ছোট্ট এক ফোঁটা মেয়ে ননীকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে যেদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বিয়ে দিলে সেদিন যেমন আনন্দ হয়েছিল, এও যেন তেমনি!

বসে থেকে থেকে কুমোররা যখন পুকুরে ডুব দিতে যেতে গেল তখন উঠলো অট্টামা। লাঠিটা তুলে নিয়ে ঠুকঠুক করে বাড়ির পথ ধরলে। ভাবলে, আর কটা দিনই বা আছি। পেসাদকে একবার ডাকের সাজ করাতে বললে হয়।

পরমুহূর্তেই কি ভেবে মাঝপথেই থমকে দাঁড়ালো। না, গিরিজাপ্রসাদকে বলা উচিত হবে না। কি ভাববে পেসাদ কে জানে। হয়তো ভাববে মাথা খারাপ হয়ে গেছে অট্টামার। তা না হলে কালীতলা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন তার। যেন একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে বলেই সব কিছু ভুলে যেতে হবে। রক্তমাংসের মানুষ তো অট্টামা, ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা ভুলবে কি করে! কালীতলায় দাঁড়িয়ে পুজো দেখতে দেখতে এখনো নেশা হয় যেন।

নিজের মনেই বিড়বিড় করে অট্টামা। পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে যায়, স্বামীর কথা, ভাসুরের ছেলেমেয়েদের কথা। আর বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কথা বলার লোক পেলেই মুখর হয়ে ওঠে অট্টামা, হাসে, কথা বলে অনর্গল। অপরের আনন্দ দেখে নিজেও আনন্দ পায়। কিন্তু একা হলেই দুঃখে বেদনায় মুষড়ে পড়ে। সমস্ত বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে।

গিরিজাপ্রসাদ ভাবে, বংশী ভাবে, তেমন মানুষটা কেমন করে এমন হয়ে গেল। দিনরাত যার চোখ দুটো ছলছল করতো কোন এক লুকোনো ব্যথায়, বুড়ো হয়ে এমন হয়ে গেল কি করে সে।

অট্টামা নিজেও হয়তো ভাবে কখনো কখনো। আর নিজের মনকেই বলে, বদলে কি আর গেছি আমি? না, বদলায়নি। হাসি ঠাট্টা, অনর্গল কথার আড়ালেই বুঝি নিঃস্ব জীবনটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে।

নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে কখন যে কোটালপাড়ার দিকে ঠুকঠুক করে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে অট্টামা, নিজেই টের পায়নি।

উদাসের বউয়ের চিৎকারে চমক ভাঙলো।

পুকুর পাড়ে চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে শুনলো অট্টামা। দূর থেকে উঁকি দিলো বংশীর বাড়ির দিকে।

দেখলে উদাস সাইকেলটা মাটিতে ফেলে বসে বসে কি করছে, আর উদাসের বউ লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে।

বংশীকে কি যেন বলতে এসেছিল অট্টামা। লক্ষ্মীমণির চিৎকার শুনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির পথ ধরলো।

বাবলার কাঁটা লেগে সাইকেলের চাকা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। তাই বসে বসে সারাচ্ছিল উদাস। আর লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছিল।

পয়সাকড়ি দেবার নাম নেই, সংসারের ওপর এতটুকু মায়া নেই; আর লক্ষ্মীমণির কোলে একটা ছেলেও দেয়নি উদাস। তাই সদাসর্বদাই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে থাকে।

কিন্তু এমন তো ছিল না উদাস। পদ্মকে দেখার পর লক্ষ্মীমণির মেজাজও যেন আরেক পর্দা চড়ে গিয়েছিল।

বনপলাশিতে উঠে এলো পদ্ম আর পদ্মর বাপ পাঁচু কোটাল। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলো বংশীর সঙ্গে।

সেই প্রথম পদ্মকে দেখলো উদাস। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতর পর্যন্ত একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এ যেন সোনা ফেলে দিয়ে ধুলোমুঠি আঁচলে বাঁধার মত। চেয়ে চেয়ে পদ্মর রূপ দেখলো উদাস, তার হাসি, তার কথা বলার ঢঙ। এমন মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেছিল বংশী। অথচ মেয়েটাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে চায়নি উদাস। ড্রাইভারীর নেশায় তখন ডুবে আছে ও। ভেবেছে লক্ষ্মীমণিকে বিয়ে না করলে ড্রাইভারী শেখার সুযোগ কেড়ে নেবে লক্ষ্মীমণির বাপ।

পদ্মর মনেও একটা কৌতূহল ছিল। বাপের কাছে শুনেছিল ও, বনপলাশির উদাস কোটালের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

মনে মনে তা নিয়ে এক-আধটু স্বপ্নও হয়তো দেখেছিল।

পাশের গাঁয়ে মামার বাড়িতে গিয়েছিল ও। হঠাৎ খবর এলো উদাস আর তার বাপ এসেছে মেয়ে দেখতে। গাড়ি জুতে তখনই পদ্মকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তার মামা।

কিন্তু এসে পৌঁছলো যখন, শুনলো, উদাস চলে গেছে। মেয়ে দেখবে না সে, বিয়ে করবে না এখানে।

সেদিন কথাটা শুনে মনে আঘাত পেয়েছিল পদ্ম। ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছে, সে দেখতে রূপসী, কোটালদের ঘরে এমন মেয়ে মেলে না। যেমন তেমন মেয়ে পেতেও যেখানে মুঠো মুঠো টাকা লাগে, সেখানে তার মত মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না উদাস, ভাবতেই পারেনি পদ্ম।

কি আছে উদাসের! ড্রাইভারী শিখছে এই যা। উদাসের বিয়ের খবরটাও পদ্মর কানে গিয়েছিল, আর তাই লক্ষ্মীমণিকে দেখার এত উৎসাহ ছিল। ভেবেছিল, না জানি পদ্মর চেয়েও সুন্দর বুঝি। তা না হলে পদ্মকে ফেলে সে মেয়েকে বিয়ে করবে কেন উদাস।

আর, আর ভেতরে ভেতরে উদাসের ওপর একটা প্রতিশোধ নেবার বাসনাও যেন জেগে উঠলো পদ্মর মনে।

তাই সময় পেলেই এসে হাজির হতো ও উদাসের কাছে। গ্রাম্য সম্পর্ক টেনে লক্ষ্মীমণিকে বলতো, বুন। আর উদাসকে ডাকতো বোনাই বলে। ঠাট্টা রসিকতা লেগেই থাকতো মুখে।

ভোর বেলাতেই একবার ঢু মেরে যেত বলতো, কি গো বোনাই, নেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছো নাকি? বলি বুনটাকে আমার ছেড়ে দাও গো, ওর কাজ আছে অনেক।

কখনো ঘরে গিয়ে উঁকি দিতো। লক্ষ্মীমণিকে বলতো, রোদ উঠলো মাথার ওপর আর ফিসফিস করিস না লো।

সব ব্যাপারেই রসিকতা করে কথা বলতে পদ্ম। আর রাগে জ্বলে যেত লক্ষ্মীমণি উদাসও রাগতো; তবু বলতো না কিছু।

রাগ হবারই তো কথা। মনের মি নেই যাদের, দুজনে দুজনকে যখন একে বারেই সহ্য করতে পারে না, তখন কে পীরিত ভালবাসা নিয়ে রসিকতা করলে চ উঠবে না?

উদাস কোন কোন দিন আড়ালে বলতো, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না পদ্ম, বুকের জ্বালাটা তোমার ব্যঙ্গ শুনে আরো দপ করে ওঠে।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠতো পদ্ম। বলতো লটের মতন কথা কইছো তুমি বোনাই। বুকের জ্বালাটা কিসের বটে, শুনি।

উদাস বিষণ্ণ মুখে বলতো, সে জ্বালা তুমি বুঝবে না গো বুঝবে না। ফুল-কাঁটার শয্যায় শয়ন আমার, যেদিক পানে ফিরে শুই না ক্যানে, কাঁটা ভুঁকবে গায়ে।

শুনে আরো সশব্দে হেসে উঠত পদ্ম। বলতো বুনকে আমার বলে দোব!

উদাস জবাব দিতো, সে আমিই বলি তাকে, লুকোছুপো নেই গো আমার। পষ্ট কথার মানুষ আমি।

কথাগুলো বলার সময় উদাস কোন কোনদিন রেগে যেত। আর তা দেখে পদ্ম বুঝতে পারতো জ্বালাটা কোথায়। আর উদাসকে অসুখী দেখে হয়তো খুশীই হতো পদ্ম। যেন নিজের অপমানটার প্রতিশোধ নিচ্ছে এমনি ভাবে রসিকতা করতো আবার। একদিন তাকে যে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিল উদাস, চোখের দেখাও দেখতে চায়নি, তারই জবাব যেন।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি ধৈর্য ধরে থাকতে পারতো না। প্রথম প্রথম পদ্মর ঠাট্টা শুনে উদাসকেই গালাগাল দিতো। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে যেন একটা সন্দেহ উঁকি দিতে শুরু করলো লক্ষ্মীমণির মনে। এত হেসে হেসে কথা বলে কেন সে উদাসের সঙ্গে। আর উদাসও যেন পদ্ম এলেই খুশী হয়। রসিয়ে রসিয়ে কথা বলে, গল্প করে।

প্রথম প্রথম তাই একটু ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলতো লক্ষ্মীমণি, আড় চোখে তাকিয়ে দেখতো পদ্মকে আর উদাসকে। হাসি হাসি মুখে তাদের গল্প করতে দেখতো, আর জ্বলে যেত ভেতরে ভেতরে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর রাগ চেপে রাখতে পারলে না। হাজরাদের বাড়িতে ধান ভাঁচা নিতে গিয়েছিল সে, ফেরার পথে দেখলে, ঘাটে বসে বাসন মাজছে পদ্ম, আর উদাস তার সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে!

দূর থেকে দুজনকে দেখেও কিছু বললে না লক্ষ্মীমণি, মনের রাগ মনেই পুষে রাখলে। ভাবলে, পদ্মকে মুখের ওপরই একদিন বলবে। এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেবে।

আরেকদিন বাড়ি ফিরেই দেখলে কোলে পুনকো শাকের ঝুড়ি নিয়ে শাক বাছছে পদ্ম ঘরের পৈঠেতে বসে, আর উদাস একটু দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

লক্ষ্মীমণিকে দেখেই মুখচোখের ভাব বদলে গেল উদাসের। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে ফেটে পড়লো লক্ষ্মীমণি। কর্কশ রুক্ষ গলায় চিৎকার করে উঠলো সে।

বললে, আমার ঘরকে আর আসবি না তুই পদ্ম।

—ক্যানে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে পদ্ম।

লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে উঠলো আবার। —এটা পীরিত করার ঠাঁই লয় তোর, লাগরকে নিয়ে রসের কথা কইতে হয়তো খড়ি লদীর পাড়কে যেয়ে কর।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে, লজ্জায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো পদ্ম। তারপর একবার উদাসের মুখের দিকে তাকিয়েই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আর সেইদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করলে লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে উদাসকে সে ছিনিয়ে নেবে। উদাসের জন্যে সেই প্রথম যেন একটা সহানুভূতি বোধ করলে। মনে হলো, মানুষটার মনে সত্যিই বুঝি কোন শান্তি নেই।

দিনে দিনে উদাসের ওপর মায়া পড়ে গেছে পদ্মর। মনে হয়েছে মানুষটার মন থেকে দুঃখটুকু যদি মুছে নিতে পারে।

আর উদাস অনুরোধ করে বলেছে, ও ডাইনীর কথাটা তুমি কানে নিও না পদ্ম। আমার ঘর আর তোমার ঘর পেথক নয়।

তা শুনে হাসি হাসি মুখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় উদাসের চোখে চোখ রেখে। বলে, আমার লেগে তোমার ঘর ভাঙবে, আমি চাই না বোনাই।

উদাস পদ্মর হাতখানা চেপে ধরে। বলে, আমার ভাঙা বুকটা জোড়া লাগবে পদ্ম। বলে অসহায়ের মত তাকিয়েছে উদাস।

তা দেখে পদ্মর বুকেও ব্যথা লেগেছে, চোখ ছলছল করে উঠেছে তার। উদাসের অনুনয় ভরা চোখের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

ধীরে ধীরে পরস্পর পরস্পরের কাছে এসেছে, দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হয়েছে দুজনে।

তারপর সেই অন্ধকার রাত্রি। গোপনে বেরিয়ে এসেছে উদাস তার ঘর থেকে। এসে অপেক্ষা করেছে পুকুরের পাড়ে, অন্ধকারে।

পদ্মর ছায়াশরীরটাও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে। আর অন্ধকারের মধ্যে দুটি ছায়া-শরীর আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে গেছে।

পরদিন থেকেই উদাস জেগে উঠেছে একটা নতুন মানুষ হয়ে। দামু পালের আড্ডায় গিয়ে বলেছে, একটা যাত্রা লাগিয়ে দাও দামুদাদা!

এমনিভাবেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ একদিন লক্ষ্মীমণিকে এসে বললে উদাস, পদ্মকে আমি বিয়ে করবো।

স্তম্ভিত বিস্মিত চোখ তুলে উদাসের মুখের দিকে তাকাল লক্ষ্মীমণি।

উদাস আবার বললে, পদ্মর বাপকে বলেছি, মত দিয়েছে পাঁচু কোটাল।

কোন কথা বললে না লক্ষ্মীমণি; কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল উদাস। একটা ক্ষ্যাপা বেড়াল যেন রোঁয়া ফুলিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হঠাৎ চালা থেকে কাটারীটা বের করে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল লক্ষ্মীমণি। পাঁচু কোটালের ঘরের দিকে। অন্ধকারে তাকে দেখতে পেল না উদাস।

কিন্তু পদ্ম কেন যে শেষ পর্যন্ত উদাসকে একটা কথাও না জানিয়ে চলে গেল, কোথায় গেল, খুঁজে পায় না উদাস।

কালীতলার সামনে দিয়ে যেতে যেতে প্রতিমার দিকে চোখ পড়ে তার। কুমোরের দল মাটি দিচ্ছে প্রতিমার গায়ে। আর কটা দিন তো মাত্র বাকী। ওদিকে যাত্রার রিহার্সাল চলছে প্রতি রাত্রে। কিন্তু কই, আগের মত কোন উৎসাহই পাচ্ছে না যেন উদাস।

কার জন্যে গলা ফাটিয়ে অভিনয় করবে সে। কেউ তো মুগ্ধ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে না, তোমার দুঃখে কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা করেচে সবাই, তুমি লট বট গো বোনাই, পেকিতো লট!

(ক্রমশ)

পরিচ্ছদে শালীনতা

মাননীয় 'দেশ' সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পরিচ্ছদে শালীনতা' নামক প্রবন্ধে শ্রীমতী এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় শাড়ী পরিহিতা ভারতীয় নারীসমাজ থেকে শুরু করে কবি ও সাহিত্যিকদের পর্যন্ত তাঁর কলমের আঁচড়ে মসীলাঞ্ছিত করেছেন। সর্বশেষে তিনি একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, 'সভ্যতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে আমাদের এখনো বহু যুগ বিলম্ব আছে।'

এই জাতীয় উক্তির আকস্মিকতায় হতচকিত মনে অনিবার্যভাবেই একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে : সভ্যতার সংজ্ঞা তবে কি? তার নিদর্শন কি শুধু বাইরের আবরণেই পরিস্ফুট এবং কেবলমাত্র বেশ পরিবর্তনেই আয়ত্ত করা যায়, সভ্যতা কি এতই অনায়াসলভ্য? সভ্যতার এই বিশ্ববিদ্যালয়টিই বা পৃথিবীর কোন্ মহাদেশে অবস্থিত? শাড়ী পরে তার তোরণদ্বার অতিক্রম করার এত বড় দুর্লঙ্ঘ বাধা কি? সভ্যতার এই তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কি একহাঁটু কাদাজল? তা যদি হয়, তা হলে বলব যে, উক্ত প্রবন্ধের লেখিকা সেই কাদাজল নির্বিচারে ও নিঃসংকোচেই চারদিকে ছিটিয়েছেন।

প্রাচ্য আদর্শের দোহাই দিয়ে, বিবর্তনের ঢেউকে পাশ কাটিয়ে আজও যাঁরা শাড়ীকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, লেখিকা যে শুধু তাঁদের উদ্দেশেই বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হয়েছেন, তা নয়। বৈষ্ণব মহাজনদের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত কবি, যত সাহিত্যিক শাড়ীর কথা প্রসঙ্গক্রমেও উল্লেখ করেছেন, তাঁরাও এর থেকে নিষ্কৃতি পাননি। অরসিকের কাছে রসের নিবেদন যুগে যুগেই ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই।

আমাদের সাহিত্য থেকে শাড়ীকে বাদ দিলে যা থাকে তা হ্যামলেটবিহীন নাটকেরই সমতুল্য—এটিও আর একটি অতিশয় উপমা। ভারতীয় সাহিত্যিকেরা চিরদিনই অন্তরের সৌন্দর্যকে বাইরের রূপের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে যেহেতু ভারতীয় মেয়েরা শাড়ী পরে থাকেন, সেই কারণেই ভারতীয় সাহিত্যে শাড়ীর প্রসঙ্গ বারেবারে উল্লেখিত হয়েছে। কারণ, শাড়ীর মতন এমন সুন্দর ও লাবণ্যময় পরিচ্ছদ যে শিল্পীর মনে সাড়া জাগাবে না, এ কথা মনে করাই ভুল। সেইজন্যে মেয়েদের শাড়ী পরার জন্য সাহিত্যিকদের দোষী করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ বা বৈষ্ণব কবিদের কেউ যে Christian Diar-কে জীবনের আদর্শ করেন নি, সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কলকাতার রাজপথে শাড়ী পরিহিতা মহিলাদের দুর্দশা উক্ত প্রবন্ধে লেখা ও রেখায় সযত্নে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে যখন থার্মোমিটারের পারা শূন্যের নীচেও তিরিশ ডিগ্রি নেমে যায়, অথবা সারা রাতের তুষারপাতে রাস্তায় প্রায় এক ফুট বরফ জমে যায়, তখন কেবলমাত্র স্বচ্ছ নাইলনের মোজায় পদযুগল আবৃত করে রাস্তায় হাঁটার কষ্ট কি তার চেয়ে কম?

আমাদের দেশের শাড়ীকে লেখিকা অভিহিত করেছেন 'অতি বিষম অঙ্গাবরণ' বলে। কেননা, তাঁর মতে শাড়ীর লালিত্যের আড়ালে আমাদের সাবলীলতা, আত্মপ্রত্যয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সব কিছু চাপা পড়েছে। শাড়ী পরে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দেওয়া অবশ্যই অসম্ভব—সে ক্ষেত্রে তদুপযোগী পোশাক পরিধান করলে কেউ আপত্তি তোলেনি বা তুলবে না। কিন্তু ঐ শাড়ী পরেই আমাদের দেশের কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ক্ষেতের কাজ করছে, কারখানায় খাটছে, দরকার হলে ইঁট মাথায় করে ভারার ওপর দিয়েও উঠে যাচ্ছে। তৎসত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করব যে, অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে শাড়ী অসুবিধার সৃষ্টি করে। কিন্তু যে-জাতীয় আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শুধু একখানি কাপড়ের আড়ালেই চাপা পড়ে যায় তা চাপা থাকাই ভালো, তা প্রকাশের যোগ্য নয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—রূপের গভীরতা চর্ম পর্যন্ত। কিন্তু হতভাগ্য ভারতরমণীদের আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কি তার থেকেও অগভীর? তা কি শুধু বাইরের আবরণেই প্রকাশমান, তার সঙ্গে কি মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের কোন সংযোগ নেই? শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের মতে শাড়ীই আমাদের সলজ্জ, সংকুচিত ও দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। লজ্জা জিনিসটা নিন্দনীয় কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেদের স্বভাবের সংকোচ ও দ্বিধার জন্য লেখিকা কাকে দায়ী করবেন? চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য পরিচ্ছদকে দোষী করাটা উঠোনের ওপর অনর্থক দোষারোপের পর্যায়ে পড়ে। চরিত্র জিনিসটা দরজীকে ফরমাশ দিয়ে বানানো যায় না, তার জন্যে প্রয়োজন বহুদিনের সাধনা। আর লালিত্য ও আত্মপ্রত্যয় কথা দুটি পরস্পরবিরোধী নয়।

জাপানের অমৃতত্ব এতদিন কিমোনো চাপা ছিল এবং এখন তার পুনরুদ্ধার হয়েছে এ সংবাদটি কোন সূত্রে প্রাপ্ত তা না জানা সত্ত্বেও বলব যে, খবরটি অত্যন্ত আশ্বাসজনক। তা হলে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে, তা হলে নিউক্লিয়ার বোমা কেন, মেগাটন বোমা পর্যন্ত জাপানে ব্যর্থ হবে। অধুনা অব্যবহার্য কিমোনো দিয়েই জাপান আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি চিহ্নের অন্তর্গত 'যাহা লইয়া আমরা যুগের উপযোগী হইব না......' এই বাক্যটিও কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বোঝা গেল না। কিন্তু এটি যদি মৈত্রেয়ীর সেই বিখ্যাত বাণী 'যে নাহং নামৃতা স্যাম...'এর প্যারোডি হয়, তা হলে দুঃখের সঙ্গেই বলতে বাধ্য হব যে, ভারতীয় দর্শনের এ জাতীয় বিকৃতিসাধন না করলেই ভাল হত।

বিশেষত, 'যুগের উপযোগী' এই কথাটি আধুনিককালে অত্যন্ত ভয়াবহ। পশ্চিমের মেয়েদের বেশভূষায় যুগোপযোগিতার ধুয়া আজ উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে। সেখানে আজ যা লেটেস্ট স্টাইল, কাল তা আউট-অফ-ডেট। সেখানে বসন্তের ফ্যাশন হেমন্তে মরাপাতার মতন ঝরে পড়ে যায়। পরের বসন্তে আবার প্রয়োজন হয় নতুন পোশাকের। আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় এ-জাতীয় যুগোপযোগিতা সহ্য হবে না। শাড়ীর সপক্ষে একটি প্রচণ্ড যুক্তির অবতারণা লেখিকা নিজেই করেছেন। 'শাড়ী পরতে দরজীর শরণাপন্ন হতে হয় না। শরীরের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে শাড়ীর মাপের কোন তারতম্য হয় না।' এক কথায় শাড়ী সর্বজনীন। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ পল্লীরমণীর মধ্যে কজনের তাঁতী ও দরজী উভয়ের চাহিদা মেটাবার মতন সামর্থ্য আছে? এই নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর সত্যটি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হবার সময় এসেছে।

কর্মক্ষেত্রে শাড়ীর অনুপযুক্ততার জন্য যদি কেউ বিদেশী পোশাক পরতে চান ও তদনুযায়ী আর্থিক সচ্ছলতা যদি তাঁর থাকে, তা হলে তা নিয়ে আপত্তি করব না। সমালোচনা যা হয় তা হয় পরিচ্ছদে যাঁরা বিকৃত রুচির পরিচয় দেন তাঁদের বিরুদ্ধে। অনেক আধুনিকা এমন ধরনের শাড়ীজামা পরে থাকেন—যার চেয়ে সুরুচিসম্মত বিদেশী পোশাক অনেক শোভন। যে শাড়ীকে শালীনতার প্রতীক বলা হয়ে থাকে, তা স্ফটিকস্বচ্ছ নাইলনের শাড়ী নয়। রুচিবিকৃতি সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয় এবং তা বিদেশী মেয়েদের গ্রীষ্মবেশের নজির দেখিয়ে সমর্থনযোগ্যও নয়। অপর পক্ষে ওদের দেশের মেয়েদের পোশাকের যে নয়নাভিরাম বর্ণসম্মিলন ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তা তো এখানে বিশেষ দেখা যায় না। অন্যের মন্দটাই অনুকরণ করতে হবে আর ভালটা গ্রহণ

করার বিষয়ে উদাসীন থাকব—এটাই বা কেমন মনোভাব?

শাড়ীর বিপক্ষে হয়তো আরো অনেক চমকপ্রদ যুক্তি খাড়া করা যায়, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশী পোশাক পরতে বলা হবে কাদের? বিবর্তনের স্রোতে গা ভাসাবার সামর্থ্য ক'জনের আছে? যাদের পায়ে ছেঁড়া চটিই জোটে না, তাদের হাইহীল জুতো পরতে উপদেশ দেওয়াটা রুটির অভাবে কেক খেতে বলার মতনই হাস্যকর। সমগ্র দেশের জনসাধারণের কথা ধরলে দেখা যাবে যে, আমাদের দেশে যাঁরা ছাতি বা বর্ষাতি ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরা অসাধারণ। সাধারণ লোকের অধিকাংশেরই একটি বস্ত্রই অদ্বিতীয়—কি শীতে, কি বর্ষায়, ভারতীয় নারীদের শাড়ি পরার সমস্যায় আজ যাঁরা কাতর হয়ে পড়েছেন, তাঁদের পাশ্চাত্ত্যের ঔজ্জ্বল্যে বিভ্রান্ত চোখের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করি ভারতের গ্রামাঞ্চলের সেইসব দরিদ্র মেয়েদের প্রতি, যাদের শাড়ীতে তালি দেবার বস্ত্রখণ্ডটিও ভিক্ষা করে নিতে হয়, অথবা কলকাতারাই অন্তর্গত সেইসব গোকুলে—যেখানে ঘুঁটের স্তূপের পাশে গোরুমহিষের শাবকের সাথে একসঙ্গে বেড়ে উঠছে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সেখানে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করলেই শালীনতা রক্ষার নিদারুণ অক্ষমতা দেখে ইচ্ছাকৃত অশালীনতা আপনা থেকেই লজ্জা পাবে।

অমিতা রায়
কলকাতা

২

সম্পাদক "দেশ",

সবিনয় নিবেদন,

গত এগার সংখ্যার দেশে শ্রীমতী এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় পরিচ্ছদে শালীনতা প্রসঙ্গে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা একাধিক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ লাইন থেকে শুরু করা যাক। "পরিচ্ছদে হ্রস্বতার চিহ্ন দেখে আজকে যাঁরা কৃষ্টি কৃষ্টি বলে আর্তনাদ করছেন, কে জানে ইতিহাস হয়তো তাঁদের প্রতি কৌতুকভরে দৃক্‌পাত করছে।" এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। এক বিশেষ পরিচিতাকে হ্রস্বদৈর্ঘ্যের জামা কেন পরেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে বলেছিলেন, উনি কনভেণ্টে পড়া মেয়ে, গ্রাম্য নন। কথায় কথায় ভেনেজুয়েলা-ফেরত এক বিদেশী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, সেখানে পুরুষদের শর্টস্ পড়ে রাস্তায় বেরোনো বেআইনী। এবার প্রশ্ন করি, লেখিকা যখন "হ্রস্বতার" কথা লিখেছেন তখন পরিচ্ছদে "স্বচ্ছতার" কথা কেন লেখেননি? পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একাধিকবার এক মহিলাকে দেখেছি যাঁর ব্লাউজ্ স্বচ্ছতার এক অপূর্ব নিদর্শন। দৃশ্য অন্তর্বাস প্রদর্শনে প্রকট। পূর্বোক্ত মতের বিরোধী "বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর লোক যস্মিন দেশে যদাচারে বিশ্বাসী নন।"

শাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েও লেখিকা বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেলেছেন। একবার বলেছেন, "শাড়ীর অগণিত সুবিধা সম্বন্ধে আমাদের মতদ্বৈধ থাকার কথা নয়।" তারপর আর এক জায়গায় বলেছেন, "কিন্তু এই অতি বিষম অঙ্গাবরণ আবৃত করেছে মেয়েদের আত্মপ্রত্যয়, রুদ্ধ করেছে তাদের স্বাভাবিক সাবলীলতা, অংকুরে বিনাশ করেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বীজ।" উচ্ছ্বাসোক্তি। যতদূর জানি, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক শাড়ী পরেই দরবার করেন; এবং বিদেশ ভ্রমণও শাড়ী পরে করেন। শাড়ী ওনার আত্মপ্রত্যয় আবৃত করেছে কিংবা স্বাভাবিক সাবলীলতা রুদ্ধ করেছে এমন কোন সংবাদ আমরা পাইনি।

সব বক্তব্যের পর উনি যে লাইন—"যাহা দ্বারা আমরা যুগের উপযুক্ত না হইব তাহা লইয়া আমরা কি করিব?" (লেখিকা জানিয়েছেন, দুরাত্মার কোটেশনের অভাব হয় না)—উদ্ধৃত করেছেন তাতে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, "জাপানকে অমৃতত্ব লাভ করতে কিমোনো উৎসর্গ করতে হয়েছে" সেইজন্য ভারতবর্ষকে অমৃতত্ব লাভ করার জন্য উনি কি শাড়ী উৎসর্গ করতে সুপারিশ করেন?

যদিও লেখিকা অত্যাধুনিক বীট্‌নিকদের আলোচনা থেকে বাদ দিতে বলেছেন, তথাপি মনে হয় এই বীটনিকদের বহুল প্রভাব ওনার অবচেতন মনে। কারণ প্রবন্ধ পাঠের পর মনে হয় পরোক্ষে উনি অত্যাধুনিকতার পক্ষেই ওকালতি করেছেন। বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার মাধ্যমে পরিচ্ছদের অসুবিধা দূর করার চেষ্টা গ্রহণীয়। নকলনবিসীতে প্রবৃত্ত হওয়ায় কোন কৃতিত্ব নেই। ইতি

নরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৪০

বাংলা ছন্দ : পয়ার

"দেশ" সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

"দেশ"-এর ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু "মানসী"-কাব্যের ছন্দ প্রসঙ্গে বাংলা ছন্দের তানপ্রধান রীতিকে পয়ার নামে পরিচিত করতে চেয়েছেন। তার উত্তরে ১০ম সংখ্যায় নীলরতন সরকার এবং ১২শ সংখ্যায় সামসুল হক মহাশয় আলোচনার সূত্রপাত করে বিষয়টিকে কৌতুকপ্রদ করে তুলেছেন। এ বিষয়ে নীলরতনবাবু বিষয়টিকে অনেকখানিই স্পষ্ট করে তুলেছিলেন কিন্তু সামসুল হক মশায় আবার অনেকখানি ভ্রান্তিবিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন বলেই সংক্ষেপে কিছু বলতে চাইছি।

নীলরতনবাবু ঠিকই বলেছেন, পয়ার বাংলা ছন্দের কোন প্রকৃতি নয়, আকৃতি। অপভ্রংশের ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ থেকে বাংলা উচ্চারণ রীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে (আদ্য শ্বাসাঘাত ও অন্ত্যস্বরবর্জন) ১৪ মাত্রার পয়ারের জন্ম। এই পয়ারের ৮, ৬-এর বন্ধন সুনির্দিষ্ট এবং অন্ত্যমিল অবশ্য-কর্তব্য। জাতি বিচারে বাংলা ছন্দ তিন প্রকার: শ্বাসাঘাতপ্রধান বা স্বরবৃত্ত, ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত এবং তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত। এই তিন প্রকৃতিতেই পয়ার লেখা হয়েছে, তার কিছু কিছু উদাহরণ নীলরতনবাবু দিয়েছেন এবং বহু দেওয়া যায়। সুতরাং পয়ার কোন ছন্দ নয়, ছন্দোরূপ বা প্যাটার্ন। সোনার অলংকারের ওপর যে নকশা কাটা যায়—তা আবার রূপোর অলংকারের ওপরও কাটা যায়—তাতে যে পার্থক্য ঘটে তা ধাতুগত, নকশাগত নয় অর্থাৎ প্রাণগত, দেহগত নয়। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু দেহকেই প্রাণ বলে গণ্য করে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

তবে এ ভ্রান্তিও কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য নয়। পয়ারের একটি শক্তি আছে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "শোষণশক্তি"। তার ফলে যথেচ্ছ যুগ্মধ্বনি ব্যবহার করলেও ছন্দের কোন ত্রুটি হয় না অর্থাৎ ১৪ মাত্রা বজায় থাকে। আবার তানপ্রধান ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য যুগ্মধ্বনির সংকোচন ও একমাত্রা প্রাপ্তি। তার ফলে তানপ্রধানের অন্তর্নিহিত তানপ্রবাহে যুগ্মধ্বনিগুলি খাপ খেয়ে যায়। এই যোগাযোগের ফলেই পয়ার ও তানপ্রধান একাত্ম হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও আকৃতি, প্রাণ ও দেহের মূলগত পার্থক্য আজ আর লক্ষিত নয়। তাই তানপ্রধানকে পয়ার বললে সে অপরাধ অমার্জনীয়ও নয়। ইতি—

করুণাময় মজুমদার
বাগজলা, দমদম

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র

"দেশ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

বিগত ১০ম সংখ্যা (২৯ বর্ষ) 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় লিখিত "লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র" নামক পত্রটি পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সিদ্ধার্থবাবুর সমালোচনা নিশ্চয়ই সময়োপযোগী। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমি বলিতে বাধ্য যে, বি বি সি টেলিভিসানে সেই আলোচনা সভায় সিদ্ধার্থবাবু এবং অন্যান্য ভারতীয় ছাত্র যথেষ্ট প্রশংসনীয়ভাবে মিঃ মোরেস-এর বক্তব্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই—যাহার জন্য সমস্ত ভারতীয় দর্শক হতাশ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। মিঃ মোরেস ভারত সরকারের গোয়া নীতি সম্পর্কে যে মতামত বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তা অতিশয় নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই মতামতের প্রকৃত সমালোচনা করার সুযোগ সেই সভায় ছিল, কিন্তু

সিম্ধার্থবাব্ কিংবা কোনও ছাত্রই তীব্রভাবে সমালোচনা করেন নাই। তা করিলে আমরা সকলে আরও আনন্দিত হইতাম। দেশ পত্রিকাতে পত্র লিখিয়া মিঃ মোরেস-এর সমালোচনা করা সময়োপযোগী বটে কিন্তু যথাস্থানে সামনাসামনি বসিয়া সমালোচনা করা অধিকতর প্রশংসনীয় হইত।

রানী এলিজাবেথের ভারত যাত্রার প্রাক্কালে লেখেন মিঃ মোরেস। কলিকাতা মহানগরী সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচার করেন। এবং প্রতিটি ফিল্ম-এর চিত্রনাট্য লেখেন মিঃ মোরেস। কলিকাতা মহানগরী সম্পর্কে যে ফিল্মটি দেখানো হয়, তাহা দেখিলে বাঙ্গালী কেন, যে কোনও ভারতবাসী লজ্জাবোধ করিবেন। অবিলম্বে কলিকাতার মাননীয় মেয়র মহাশয়কে অনুরোধ জানাইয়া একটি পত্র লেখা হয়—তিনি যেন এর প্রতিবাদ করেন এবং পত্রের আর একটি অনুলিপি লন্ডনের হাই কমিশনারকে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ দূরের কথা, কেহ পত্র প্রাপ্তির সংবাদটুকুও জানান নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক কিছুদিন আগে চিকাগো সম্পর্কে অনুরূপ একটি ফিল্ম বি বি সি টেলিভিসানে দেখানো হয়। চিকাগোর মেয়র শুধু প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অ্যাটলান্টিক অতিক্রম করিয়া বি বি সি-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যান। কলিকাতার মেয়র প্রতিবাদ না করুন, কোনও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কী? আমাদের হাই কমিশনারই বা কী করিয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করে। ভারতবর্ষ এবং ভারত সরকার সম্পর্কে মিঃ মোরেস-এর বিভিন্ন বিবৃতি নিন্দনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের নিষ্ক্রিয়তাও কী নিন্দনীয় নয়?

ইতি -

ডাঃ চুনীলাল রায়

নিউ ক্যাসেল

বাংলার গ্রাম

'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

'বাংলার গ্রাম' সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা আরও ব্যাপকভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পল্লীগ্রামের বর্তমান দুর্দশার জন্য আমার পূর্ববর্তী লেখকগণের কেহ গ্রামবাসীদের স্বার্থপরতাকে দায়ী করিয়াছেন, কেহ প্রাণহীন আমলাতান্ত্রিক নীতি ও অকর্মণ্যতার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরের উপর ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার হিসাবে গ্রামাঞ্চলে কাজ করিবার পর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় একথা বলিতে পারি যে, পল্লীগ্রামের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য বিশেষ কোন পক্ষকেই এককভাবে দায়ী করা চলে না। এ পাপ আমাদের সকলের।

অনেকদিনের পুঞ্জীভূত অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা আমাদের গ্রামগুলিতে সংকীর্ণতা, দলাদলি ও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির জন্ম দিয়াছে। এই বিভেদ ও স্বার্থপরতা গ্রামের উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা একথা যেমন সত্য, গ্রামোন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতাও তার জন্য সমানভাবে দায়ী একথাও তেমন সত্য। গ্রামবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রামজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও পরিপূর্ণ বিকাশই সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলকথা। কিন্তু অজস্র অর্থব্যয় ও এতদিনের চেষ্টায়ও এই পরিকল্পনা গ্রামজীবনে কোন উল্লেখযোগ্য সাড়াই আনিতে পারে নাই। অনেক স্থলেই কেবলমাত্র সরকারী কর্মপ্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া এই পরিকল্পনা "শিবহীন যজ্ঞে" পরিণত হইয়াছে।

আমার বিগত কর্মজীবনে এই ব্যর্থতার দুইটি প্রধান কারণ বিশেষভাবে অনুভব করিতাম। প্রথম কারণ, রাজনৈতিক দলাদলি। গ্রামের সাধারণ লোক রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামায় না কিন্তু তাহাদের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন প্রভাব রহিয়াছে। ফলে দলীয় স্বার্থে গ্রামের বৃহত্তর কল্যাণপ্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রে বানচাল হইয়া যায়। উন্নয়ন ব্লকের কর্মচারীদের উপরও প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক কর্মীর প্রভাব অনিবার্যভাবেই আসিয়া পড়ে। রাজনীতির এই প্রভাব হইতে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে দূরে সরাইয়া না রাখিলে ব্যর্থতার বোঝা বাড়িয়াই চলিবে।

দ্বিতীয় কারণ, যোগ্য ও উপযুক্ত গ্রামকর্মীর অভাব। গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন ও গ্রামজীবনের পূর্ণ বিকাশের পথে যাঁহারা সাহায্য করিবেন তাঁহাদের যে বিশেষ শিক্ষা ও দরদী মনের প্রয়োজন, অনেক গ্রামকর্মীরই তাহা নাই। ফলে গ্রামবাসীদের নিকট তাঁহাদের পরিচয় 'চাকুরীজীবী' একদল সরকারী কর্মচারী হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। কতিপয় সুবিধাবাদী 'তথাকথিত নেতৃস্থানীয়' গ্রামবাসী ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাময়িকভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন, আবার স্বার্থের প্রতিবন্ধক হইলে তাঁহারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রামকর্মীদের বিপক্ষে দাঁড়ান। গ্রামে দেশ ও দশের কল্যাণকামী প্রকৃত সৎ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা নিজেরাই দূরে সরিয়া থাকেন। ফলে পরিকল্পনা মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়। সমস্ত কিছুই 'ভস্মে ঘি ঢালিবার' সামিল হইয়া উঠে। বাস্তব অবস্থার চাপে আদর্শনিষ্ঠ সৎ ও গ্রামের প্রকৃত কল্যাণকামী সরকারী কর্মচারীদেরও (যদিও সংখ্যায় তাঁহারা নিতান্তই অল্প) উদ্যম ও উৎসাহ স্তিমিত হইয়া আসে। অন্য দশজন সরকারী কর্মচারীর মত তাঁহারাও কোনমতে চাকুরী রক্ষা করিয়া 'দিনগত পাপক্ষয় করাকেই' প্রধান দায়িত্ব বলিয়া ভাবিতে শুরু করেন।

এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন কি সম্ভব নহে? গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অথবা কোন নীতিগত পরিবর্তনে কি এই বাস্তব সমস্যার সমাধান হইবে? সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার কোনও উপায় কি নাই?

ভবদীয়

সত্যদাস চক্রবর্তী

২

সবিনয় নিবেদন,

'বাংলা দেশের গ্রাম' শীর্ষক আলোচনায় (দেশ, ৩০ অগ্রহায়ণ) শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির জঘন্য প্রবৃত্তির জন্য অন্যান্য গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার অভিযোগ এনেছেন। সরকারী অর্থ নিজ স্বার্থে ব্যয় করে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির বাড়ি তৈরী করার দৃষ্টান্ত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। উক্ত চিঠি থেকে মনে হচ্ছে যে, একজনের স্বার্থপরতার কলংক বহুবচন হয়ে আর সকলের অগৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুনেছি অর্থ বরাদ্দ করবার পর সেই অর্থ যথোচিতভাবে ব্যয় হল কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সরকারী রীতি আছে। যদি সেই রীতি থেকে থাকে তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বরাদ্দীকৃত অর্থ ব্যক্তিবিশেষের বাড়ি তৈরীর তহবিলে পরিণত হয় কী করে? এজন্য পক্ষপাতিত্ব না করেও বোধ হয় জিজ্ঞাসা করা যায় এই অন্যায় কাজ প্রতিরোধে সরকারী দায়িত্ববোধ কি জাগরূক ছিল না? যে কোনও জনকল্যাণমূলক কাজে রাষ্ট্র থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার ভূমিকায় থাকেন জনসাধারণ, বিশিষ্ট কোনও একজন বা দুজন নন। জনসাধারণকে বঞ্চনা করবার অবাঞ্ছিত সুযোগ যদি কেউ পান এবং তার ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপব্যয় ঘটে তাহলে সেই অনর্থের কলংক অবহেলিত গ্রামবাসীরা বহন করবেন কেন? সরকারী সাহায্য প্রকৃতির করুণা বর্ষণের মত অনুগ্রহরূপে আসে না। এতে আছে সকলের সমান অধিকার এবং সেই অধিকারভোগে যদি কোনও ব্যত্যয় ঘটে তাহলে সেই বঞ্চনার জন্য জনসাধারণই কৈফিয়ৎ চাইবেন।

দিলীপকুমার দাস

কসবা, কলিকাতা-৩২।

॥ স্মৃতির পাতা ॥

ডাঃ নিশীথচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ শো ছেচল্লিশের বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব, দিল্লি আর বিহারের ভয়াবহ স্মৃতি আজও কেউ ভুলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। নোয়াখালিতে দাঙ্গা বেধেছে। প্রতিদিন কাগজের শিরোদেশে সেই বীভৎস অত্যাচার আর নির্যাতনের সংবাদ দেখতে দেখতে দিনরাত্রিগুলি যখন বিভীষিকাময়ী হয়ে উঠেছিল সেই সময়কার একটি স্মৃতি আজও মনে আছে। এই পাশবিক অন্ধকারের মধ্যে মানবিক জ্যোতি। কাগজেই পড়লাম গান্ধীজী দিল্লি থেকে নোয়াখালি এসেছেন। নভেম্বর মাসে চৌমোহিনীতে এসে পৌঁছেছেন। সেই সময় আমি I N A C-তে একজন কর্মী। দুপুর-বেলায় মেসে বসেছিলাম। হঠাৎ এক বন্ধু এসে বললে, নোয়াখালি যেতে হবে। তৈরী হতে হবে এক্ষুনি, পারবে?

পারব না বলার সাহস ছিল না। পারব তাও বলতে দ্বিধা ছিল। বন্ধুটি চোখের দিকে দুবার তাকাতে আর কোন কথা না বলে কীডব্যাগের মধ্যে জামাকাপড় ঢোকাতে শুরু করলাম। দশ মিনিট পরে আমরা দুজন বেরিয়ে এলাম। সামনেই আমাদের একটি জীপ্ অপেক্ষা করছিল। আমি নিঃশব্দে উঠে পড়লাম। তখন ভয় বা উদ্বেগের চেয়েও একটা রোমাঞ্চকর নেশাই যেন মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। জীপ থামল এলগিন রোডে, নেতাজীর বাড়ির সামনে। বন্ধু বললেন, চল, সামনের ঘরে বসি। শরৎচন্দ্র বোসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বড় বড় লোকের সামনে কখনও যাইনি। একটু সংকোচে, একটু শঙ্কায় ঘরে ঢুকলাম। দু এক মিনিট পরে শরৎচন্দ্র ঢুকলেন। হেসে অভ্যর্থনা করলেন। দু চারটি কথায় জানিয়ে দিলেন যে, ওখানে প্রচুর কাজ করতে হবে। বিপদের সম্ভাবনা কম নয়। চুপ করে শুনলাম। তারপর বললেন, একটু পরেই রওনা হতে হবে।

দমদম থেকে উড়োজাহাজ ছাড়ল। সঙ্গে কে কে ছিলেন মনে নেই, তবে শরৎচন্দ্র, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের দেবনাথ দাস এবং সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সী ছিলেন মনে আছে। উড়োজাহাজের মধ্যের কথাবার্তা কিছুই আজ মনে নেই। আসলে তখন বিধ্বস্ত নোয়াখালির কথাই মন জুড়ে ছিল। কলকাতা হত্যাকাণ্ডের পর নোয়াখালিতে শুরু হয় ভয়াবহ দাঙ্গা, সরকারী হিসেবেই (আর সরকার তখন মুসলিম লীগ) প্রায় দু' শো বর্গমাইলব্যাপী লুটপাট হয়েছে, হাজারখানেক বাড়ি পুড়েছে। মরেছে প্রায় দু' শো। অবশ্য সবই সরকারী হিসেব। নোয়াখালিতে একটি ব্যাপারের সুযোগ

নিয়েছিল মুসলিম লীগ। নোয়াখালিতে বেশীর ভাগ হিন্দু ছিল অবস্থাপন্ন, জমি-জমা ছিল। আর মুসলমানেরা ছিল ভাগ-চাষী। অন্যের ক্ষেতখামার করেই দিন কাটাতে হয়। ফলে মনে মনে অনেকদিনের অসন্তোষ, অভিযোগ সব জমা হয়ে ছিল। আর মুসলিম লীগের উস্কানিতে এই রায়ত আর জমিদারের দ্বন্দ্ব রূপ নিল সাম্প্রদায়িক বীভৎস কলহে। সেই অসভ্য বর্বরতার মধ্যে আবার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করতে সেই বৃদ্ধ মহাত্মা এলেন হিংসায় উন্মত্ত পূর্ব-বাংলায়। প্লেনে বসে ভাবছিলাম, যেখানে ঐ মহাত্মা গেছেন নির্ভয়ে সেখানে আমার যেতে এত ভয় কেন। কতটুকু আমার প্রাণের মূল্য। কিন্তু স্বার্থবাদী মানুষ আমরা—মহাত্মার অগ্নিপ্রেরণা তখনও প্রাণের মধ্যে কোন নির্ভয় আহ্বান জাগাতে পারল না।

উড়োজাহাজ কুমিল্লায় এল। শরৎচন্দ্রকে দেখার জন্য বেশ ভিড় হয়েছে। শরৎ বোসের সঙ্গে আছি দেখে আমাকেও অনেকে কেষ্ট বিষ্টু ভাবেনি এমন বলা চলে না। ওখান থেকে ট্রেনে চলে এলাম চাঁদপুরে—আমাদের Base Camp-এ। শত শত ছিন্ন-মূল উদ্বাস্তু এসেছে সেখানে। কোন ভাষায় তাদের বেদনা প্রকাশ করা যায় না। ভয়ার্ত বৃদ্ধ, অসহায় নারী, ক্লান্ত যুবক, ক্ষুধার্ত শিশুর সেই সকরুণ দুর্দশার ভয়াবহ ছবি। তার ওপর শীত এসেছে। সন্ধ্যের পর ফাঁকা মাঠ থেকে হু হু করে হাওয়া আসে আর এই অসহায় মানুষগুলি সেইখানে বস্ত্রহীন, খাদ্যহীন, সহায়হীন অবস্থায় রাত-দিন কাটায়। রামকৃষ্ণ মিশন একটি রিলিফ শিবির খুলেছে—সেই একমাত্র আশার আলো। চাঁদপুরেই আমার কাজ। এইখানে এক গণ্যমান্য ধনী ভদ্রলোক চালা-ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ঐখানে থাকুন—আপনাদের I N A C-র ছেলেরা ঐখানেই থাকে। রান্নাবান্না নিজেদেরই করতে হবে। প্রথম অবস্থায় অবশ্যই ব্যবহারটা বড় রূঢ় মনে হয়েছিল। যাই হোক, পরদিন থেকে outdoor-এ কাজ শুরু করলাম।

ভোরবেলায় সে কী করুণ দৃশ্য। শ্মশানের মত ভয়াবহ। কী ক্লান্ত, নগ্ন জীবনের সর্বশূন্য বিড়ম্বনা। এরই মধ্যে

আবার দু-চারজন অবস্থাপন্ন লোকও বিনা পয়সায় ওষুধ নিতে আসার মত পুরু চামড়াওয়ালা ছিলেন। আমার চেনা একটি ভদ্রলোক দেখি একদিন লাইনে দাঁড়িয়েছে। তিনি বোম্বাইতে থাকেন। বেশ ধনী। তিনিও বিনা পয়সায় ওষুধের জন্য লাইনে।

ইতিমধ্যে আদেশ এল মধুপুর ক্যাম্পের ভার নিতে হবে। ট্রেনে করে চৌমোহিনী এলাম। এখানেও অবস্থা ভয়াবহ। চারদিকে দোকানপাটের ভগ্নাবশেষ। সব লুটপাট হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন কম। এক ধনী কংগ্রেসকর্মীর শরণাপন্ন হলাম। তিনি অর্ধচন্দ্র দিলেন। সেই অচেনা জায়গায় অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে মরিয়া হয়ে এক মাঝির কাছে দুঃখ নিবেদন করলাম। চালের নৌকা নিয়ে সে চলেছিল। তার মনুষ্যত্ব সেই কংগ্রেসসেবীর চেয়ে বেশী ছিল তাই অপরিচিতকে সে তার নৌকায় আশ্রয় দিল। সারা রাত্রি চালের বস্তায় শুয়ে এলাম। ভোরে একটি জায়গায় নৌকা থামল। আমরাও নামলাম। হঠাৎ কয়েকটি মুসলমান পথচারী আমাদের ঘিরে ফেলল। আমরা মাত্র দুজন। আমাদের পরনে খাকী পোশাক। ওরা ভাবল বুঝি মিলিটারীর লোক। আমরা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে স্টেথিসকোপ দেখিয়ে বললাম, আমরা ডাক্তার, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সেবার জন্য আমরা এসেছি। আমাদের পকেটে ছোরাছুরিও নেই, পিস্তলও নেই। বোধ হয় দয়া করেই ওরা আমাদের ছেড়ে গেল। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বিনিদ্র রাতের ক্লান্তি দূর করার জন্য চায়ের সন্ধানে বেরুলাম। এই সময়ে সঙ্গী চেঁচিয়ে বললে যে, দূরে একটি জীপ আসছে। তার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝলাম না। তবে জীপটি কাছে আসতেই সে হাত দেখিয়ে থামাল এবং এক নিশ্বাসে বলল, আমরা মধুপুর যাব। আমরা Indian National Ambulance Corps-এর চিকিৎসক। তোমরা পৌঁছে দিতে পারবে কিনা। তারা মিলিটারী মেজাজে বলল, যাও, তোমাদের মালপত্র নিয়ে এস। সময় পাঁচ মিনিট। রুদ্ধশ্বাসে আমরা ওষুধের ভারী বাক্সটি নামালাম এবং জীপে উঠে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তারপর নিশ্চিন্তে মধুপুর বাজারে পৌঁছলাম। এখান থেকে কিছু দূরেই আমাদের শিবির। সেই কংগ্রেসকর্মীরই বাড়ি—দুটি ঘর পাওয়া গেছে। একটিতে outdoor—অন্যটিতে আমরা থাকব। সকাল থেকেই কাজে লেগে গেলাম। বেশীর ভাগই জ্বর বা পেটের রোগ। একটি প্রসবের কেসও ছিল একদিন। এইভাবে দিন কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে খবর এল : গান্ধীজী ডাকছেন।

গান্ধীজী আছেন দু মাইল দূরে একটি গ্রামে শ্রীরামপুরে। তিনি ডাক্তার খুঁজছেন—তাই অধমের ডাক পড়েছে। গান্ধীজীর প্রতি তখন আমার মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। তাঁর অহিংস পন্থা আমার প্রাণে সাড়া তোলেনি। কিন্তু সেই ক্ষোভ ভেদ করে তাঁর ডাক এল। যে ডাকে সারা দেশ উতলা—সে ডাক উপেক্ষা করার শক্তি কি আমার আছে! এক সকালবেলায় তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। শীর্ণ দেহ, শান্ত চোখ, মুখে বলিরেখা। গায়ে সাদা খদ্দরের চাদর। ভাবলাম, প্রণাম করব না। স্যালুট করে বললাম—জয় হিন্দ। মহাত্মাজী উত্তর দিলেন : জয় হিন্দ। তারপর হেসে বললেন : বৈঠো।

এ আমি আশা করিনি। এত সহজ মানুষ হতে পারে। সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর অভিমান যেন আমার মিলিয়ে গেল। মহাত্মাজী বললেন : তোমাকে রোগী দেখতে হবে মুসলমান পাড়ায়—যাবে? আমি বললাম, যাব। গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু আমাকে মুসলমান পাড়ায় নিয়ে গেলেন। একটি মেয়ের বাচ্চা হবে, anaemia-তে ভুগছে। তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে শিবিরে ফিরে এলাম। পরদিন আবার সন্ধ্যেবেলায় শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য গেলাম। তিনি তখন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর অনুচরবৃন্দ। বলাই বাহুল্য, কেউ আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। হঠাৎ গান্ধীজী আমাকে স্মরণ করলেন—ডাক্তার কোথায় কেউ জান? তখন আবার সেই অনুচরবৃন্দই আমাকে পথ করে দিলেন। গান্ধীজী মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কী খবর? তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এমন ভয়াবহ সম্পর্ক যে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করে। হিন্দু ডাক্তার মুসলমানের বাড়িতে যাবে—এমন পরিবেশ তখন ছিল না। আমি বললাম : ভালই। রোগী ভাল আছে। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাকে দেখতে দিল। আমি হ্যাঁ বলতে গান্ধীজীর মুখে প্রশান্ত তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। যেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। বললেন, নিজের দিকে নজর দিও। ভুলে গেলাম ইনি ভারতবর্ষের মুকুটহীন রাজা। মনে হল, আমার বন্ধু। ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব কোথাও আমার আর ওঁর মাঝখানে দূরত্ব রচনা করেনি। জয় হিন্দ বলে শিবিরে ফিরে এলাম। অন্ধকারে নির্জনে মনে হত একা নই নই—আমার সঙ্গে অনেকে আছে।

রোজ দেখা হত না। কারণ আমার সময় ছিল অল্প, কাজ ছিল প্রচুর। কিন্তু যখনই যেতাম, সেই প্রশান্ত হাসির অভ্যর্থনা। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি খবর তিনি জানতে চাইতেন। আমার অজ্ঞাতে আমাকে জয় করে নিয়েছিলেন—জানি না কী তাঁর মন্ত্রগুপ্তি। আমি যখনই বলতাম মুসলমানদের চিকিৎসা করতে গিয়ে ভাল ব্যবহার পেয়েছি, অসুস্থতা তাদের দুর্বল করেছে বটে, মনুষ্যত্বে আঘাত করেনি—তখন তিনি তৃপ্তির হাসি হাসতেন।

ধীরে ধীরে সেই দুঃসময় শেষ হল। আমার যাবার সময় এল। এমন সময় সেবাকার্যে এলেন দুই বিলেতফেরত ডাক্তার। হাতে তাঁদের প্রচুর টাকা, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। আমার outdoor দেখে তাঁরা হেসেই আকুল। এ কী ডাক্তারি হচ্ছে! আমি বললাম, এসেছি দুর্গতদের চিকিৎসা করতে। আমি ত আর হাসপাতাল তৈরি করতে পারব না। তাঁরা হেসে বললেন, ধরুন যদি acute appendicitis-এর case আসে তা হলে? আমি বললাম, তা হলে কিছুই করার নেই। আমি কি করতে পারি? যতটুকু আমার ক্ষমতা তাই করছি করব। তাঁরা উপহাসের হাসি হাসলেন।

যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি এমন সময় আবার মহাত্মার ডাক এল। তাঁর ঘরের পাশেই কয়েকজন খবরের কাগজের প্রতিনিধি থাকতেন। তাঁদের একজনের অসুখ। আমি এলাম—গান্ধীজী অভ্যর্থনা করলেন। বললেন : চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, দেখে আসি। গান্ধীজী এলেন—কিছুক্ষণ সেখানে কথাবার্তা বললেন—রসিকতা করলেন। আমি থেকে গেলাম তিন দিনের জন্য। তারপর বিদায়ের পালা। মহাত্মাজী আশীর্বাদ করলেন আমার প্রতিষ্ঠানকে এবং আমাকে।

তারপর আবার সেই চৌমোহনী। এবার সেই কংগ্রেসকর্মীর ব্যবহার বদলে গেছে। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর দৈনন্দিন খবরের মধ্যে আমার নামটিও খবরের কাগজে ছড়িয়েছে। কাজেই এখন আমি গান্ধীজীর স্নেহধন্য—এবার তাই আমার জন্য ভোজের ব্যবস্থা হল।

পরে অনেকবার কলকাতায় গান্ধীজীর অনুচরদের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তাঁরা অতি কষ্টে চিনেছেন। কিন্তু গান্ধীজী যখন বিহার যাচ্ছেন (৪ঠা মার্চ, ১৯৪৭ সালে) তখন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে তাঁকে জয় হিন্দ্ বলতে তিনি হেসে বলেছিলেন, ডক্টর, ইহাঁ ভি আ গয়া!

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বিহারেও গিয়েছিলাম পরে—কিন্তু দেখা হয়নি। কিন্তু জানি দেখা হলে তিনি

বিদুর

'সাহিত্য সংবাদ' দেশ পত্রিকায় নতুন সংযোজন। গাছের নতুন পাতার মতন সদ্য দেখা দিল। আপাতত চরিত্র বিচার অপ্রয়োজনীয়। ক্রমে, আশা করা যায়, আকার অবয়বে এটি পূর্ণ পত্রের রূপ পেলে নিজ গোত্র প্রকাশ করবে।

তবু একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হয়ত প্রয়োজন। মোটামুটি এই বিভাগের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হবে। ইদানীং বিভিন্ন পত্রিকায় সাহিত্য সমাচার পাওয়া যায়। আগ্রহীজন জ্ঞাতব্য তথ্য পেয়ে থাকেন। 'সাহিত্য সংবাদ' সেই একই বিষয়ের পুনরুক্তি নয়। যদিচ সাহিত্য এবং সাহিত্যিক দুইই আমাদের সংবাদের বিষয়, তথাপি পার্থক্য এই যে, নিছক তথ্য কিংবা সংবাদ জ্ঞাপন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিঞ্চিৎ অধিকের বাসনা রাখি।

সাহিত্য সর্বাগ্রে, কিন্তু এ-কথা কে না জানেন, শিল্প সর্বদা একটি বিশেষ মানুষের মনের ফসল, এই মনটির স্থান কাল আছে, কোনো শিল্পীই তাঁর অন্য শিল্পকর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নন, একের সম্পর্কে একাধিকের যোগ, কখনো তত্ত্ব উৎস বা উদ্দীপনার কিংবা প্রেরণার, প্রশ্ন জাগে ঐতিহ্যের, রুচির এবং ব্যক্তিত্বের। সাহিত্যের অন্তরালে যিনি তিনি শিল্পী, শিল্পীর পিছনে তাঁর যুগ ও যুগোপযোগী পৃষ্ঠপট। সম্ভবত, সাহিত্যপাঠে এই পৃষ্ঠপটের কিছু মূল্য আছে। আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে এই পৃষ্ঠপটেরও পরিচয় দেবার, স্বদেশ এবং বিদেশেরও।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সম্পর্কে অনেক সংবাদ নানা কারণে দৈনিক পত্রিকার যোগ্য হয় না, যদিবা হয়, পত্রিকার কিঞ্চিৎ কালি শুষে নিয়ে ফুরিয়ে যায়। সেখানে বাস্তবতা, বহুভজনা। একটু স্বতন্ত্র করে সব সময় কিছু দেওয়া যায় না, দেওয়া সম্ভব হয় না। এখানে অন্তত স্বতন্ত্র করে সেই সংবাদগুলি থাকবে।

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

"ইনি অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। 'চর কাশেম'-এর লেখক।" কয়েক বছর আগে একজন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে অমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে। তাকিয়ে দেখেছিলাম, শীর্ণ অসুস্থ বিষণ্ণ এক ভদ্রলোক; বয়সের অনুপাতে বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। উনি হাঁপাচ্ছিলেন যেন, মুখে সামান্য হাসি, বোধ হয় জোর করে টেনে আনা। নমস্কার বিনিময়ের পর সামান্য কয়েকটি কথা হল। স্বল্পকালের সাক্ষাতেই তিনি বলেছিলেন, "আমার 'চর কাশেম' এক সময়ে খুব প্রশংসা পেয়েছিল, এখন আর আমার লেখার কদর নেই।" কথাটা আমার মনে আছে। কারণ একমাত্র এই বাংলা দেশেই বোধ হয় কোনো সাহিত্যিক রেসের ঘোড়ার মতন প্রতিটি বাজি না জিতলে দুয়ো পান। অমরেন্দ্রবাবুর কথা থেকে আমার মনে হয়েছিল, তিনি যেন অজ্ঞাতসারে এই কথাটা বলতে চেয়েছিলেন, দু একখানা বই ভাল লেখায় বাঙালী সাহিত্যিক বাঁচে না, তার অন্নকষ্ট মেটে না; রাশ রাশ লিখতে হয়, এবং সেই রাশিকৃতের সাহিত্য বিচারের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পাঠকের। পাঠক যাঁকে নেয় তিনি থাকেন, পাঠক যাঁকে খারিজ করে সাহিত্যরসিকের প্রশংসা তাঁকে রক্ষা করে না। 'চর কাশেম' 'দক্ষিণের বিল' 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-র লেখক তাঁর সাহিত্য জীবনের একাংশে বহু গুণী জনের সমাদর লাভ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে অসফল সাহিত্যিকের মর্ম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাঁর কুণ্ঠা ও হতাশা দেখে মনে হত, ক্ষমতার অতীত প্রাচুর্যের নিজেও যেন সংকুচিত। গ্রামের মানুষ; পূর্ববঙ্গের পল্লী জীবনের সঙ্গে নাড়ির যোগসূত্র, মাটি জলের সঙ্গে সংযোগ। স্বাভাবিক প্রেরণায় আন্তরিকভাবে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার সাহিত্যরস বহুজনকে প্রীত করেছিল। পরে তিনি হয়ত ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু বাংলা তাঁর একদার সার্থকতাকে কেন যে প্রায় সম্পূর্ণ ম্লান করল জানি না।

'চর কাশেম'-এর লেখক ছিলেন বরিশাল জেলার অধিবাসী। দেশ বিভাগের পর সপরিবারে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। দুর্ভোগ ও দারিদ্র্যের পীড়ন সহ্য করে সাহিত্য-পেশায় ব্রতী থাকেন। গত ১৯ই জানুয়ারী ৫৫ বছর বয়সে তিনি দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁর জীবনাবসানে মর্মাহত।

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : চর কাশেম, দক্ষিণের বিল, একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী, ভাঙছে শুধু ভাঙছে, পদ্মাদিঘীর বেদিনী।

শান্তিনিকেতন : অধ্যাপক সম্মেলন (!)

কানু বিনা গীত নেই, বাংলা দেশে সাহিত্য উপলক্ষে অধ্যাপক বিনা বুঝি গতি নেই। সভা সম্মেলনে আলোচনা অনুষ্ঠানে দু চারজন অধ্যাপক সম্ভবত গৌরব বৃদ্ধির কারণ হন। সিনেমায় যেমন 'স্টার কাস্ট'—শতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তেমনি 'অধ্যাপক সংগ্রহ'। কোন উদ্যোগী কত ডক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হাজির করতে পেরেছেন তারই প্রতিযোগিতা। কর্মোদ্যোগীদের মধ্যে অধ্যাপক-দুর্বলতার কারণ খুঁজে পাই না। হয়তো এতে গরিমা বাড়ে, বিচক্ষণ হবার ক্লেশ লাঘব হয়, দায়িত্ব পালনের ত্রুটি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাহিত্যসভায় মঞ্চের তাকিয়া একমাত্র অধ্যাপকরাই পেতে পারেন, এমন মনে করার হেতু দেখি না। এ এক ধরনের কুসংস্কার।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের কিছু সংবাদ আমাদের গোচর হয়েছে। গত ২৪, ২৫, ২৬শে জানুয়ারী এই সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশন হয়ে গেল। সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে কিছু বাঙালী সাহিত্যিকের কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজন ছাড়া কেউই এ-সভায় যোগ দিতে যাননি। মনে হয় না, এর ফলে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয়েছেন। কেননা, এই সম্মেলনের বোধ হয় পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল অধ্যাপক সম্মেলন। কিংবা উদ্যোক্তারা হয়ত ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞানদান অধ্যাপকবৃন্দ দ্বারাই হতে পারে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ অধ্যাপক-ভীতি ছিল। সেদিন সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা নিজেরা অধ্যাপক নন, অথচ সাহিত্যানুরাগী, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক-ভীতির যথার্থ মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন বলে মনে হল। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, এঁদের সকলেরই ত ছাত্রপাঠ্য বই আছে, সারা বছর ধরে কাগজে কাগজে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সুযোগে রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখলেন, আবার এখানেও সেই একই কথা কেন? কথাটা অযৌক্তিক নয়। তা ছাড়া, এমন কথা উদ্যোক্তারা কি করে জেনে নিলেন যে, অধ্যাপক-বাণী সর্বক্ষেত্রে অমৃত সমান উপাদেয় হবে। এই অধ্যাপকদের সুবচন শুনতে ত শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা সভায় আসেনি। বোঝা ভার, এই সাহিত্য সম্মেলনের ফলে কোন শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হল।

দু একজন প্রবীণ সাহিত্যিক অবশ্য এই সভায় কিছু বলেছেন। স্বাদে সেগুলি যে ভিন্ন ছিল শ্রোতা মাত্রেই স্বীকার করবেন।

সঙ্গীতের অধিবেশনটি আমাদের কাছে সর্বোত্তম বলে মনে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অধিবেশনের বক্তারা ছিলেন গুণী, সঙ্গীতরসিক এবং শিল্পী, এঁরা শুষ্ক কাষ্ঠ নয়, ফলে শ্রোতারা তৃপ্ত হয়েছেন।

পদ্মশ্রী তারাশঙ্কর

শিল্পীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দার, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। এ-বছরে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার যে-সব 'ভূষণ' 'রত্ন' ও 'শ্রী' বিতরণ করেছেন তার মধ্যে বঙ্গ-

দেশের শ্রদ্ধেয় ও খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান আছে। সরকারী সম্মানশালার তালিকায় এখন থেকে তিনি 'পদ্মশ্রী' যুক্ত। তাঁর এই সম্মানের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু, সরকারী বহুবিধ রহস্যময় কর্ম এবং অবিবেচনার আরও একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে এই সম্মান প্রদান আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকল। উর্দু কবি শ্রীজাফর আলি খান, মারাঠী ঔপন্যাসিক শ্রীনারায়ণ সীতারাম ফাতকে, উর্দু কবি শ্রীনিরাজ মহম্মদ খান, হিন্দীসাহিত্যের লেখক শ্রীরাধিকারমণ প্রসাদ সিংহ রাষ্ট্রীয় সম্মানের আরও এক ধাপ ওপরের খেতাব 'পদ্মভূষণ' লাভ করেছেন। এঁদের যোগ্যতা অথবা স্ব স্ব সাহিত্যে তাঁদের নিষ্ঠা ও সেবা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু স্বভাবী সাহিত্যিকের যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পারি 'পদ্মশ্রী' সম্মান তারাশঙ্করবাবুর যোগ্যতা ও মর্যাদার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাংলা ভাষা ও বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি ভারত সরকারের অনুদার দৃষ্টি, বিরূপ মনোভাবের প্রতিবাদ বহুবার করা হয়েছে। পুনরুক্তিতে লজ্জা বোধ করি। গুজরাট এবং উড়িষ্যার অপর দুই সাহিত্যিকের কপালেও অনুরূপ 'পদ্মশ্রী' সম্মান জুটেছে। আশা করি, এঁদের যোগ্যতাও কিছু কম নয়।...তারাশঙ্করবাবু বহুকাল পূর্বে তাঁর নামের পূর্বে 'শ্রী' বিসর্জন দিয়েছিলেন, আবার সেই 'শ্রী' এল, অবশ্য 'পদ্ম'যুক্ত হয়ে। এই সম্মানলাভের কথা শুনে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'সম্মান বোঝা হয়ে উঠেছে, নামাতে পারলেই বাঁচি।' হয়ত তারাশঙ্করবাবু রবীন্দ্রনাথের গানের কথাটি ভেবেছিলেন : "এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও।"

আধুনিক উপন্যাস

আধুনিক উপন্যাস প্রসঙ্গে ইলিয়া এরেনবুর্গের সংক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য চোখে পড়ল। উপন্যাসের আচার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের জ্ঞাতার্থে এরেনবুর্গের মতামত বলা যেতে পারে। এরেনবুর্গ মনে করেন : ফর্ম হিসেবে উপন্যাস খুবই জীবন্ত। প্রতিটি শিল্প শাখারই নিজের নিজের গুণ এবং ধর্ম আছে, তার নিজস্ব আচার রয়েছে। উনিশ শতকের উপন্যাস আর আজকের দিনের উপন্যাস একই ধরনের হতে পারে না। উপন্যাসের রাজ্যে সর্বপ্রকার পরীক্ষাই সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত; বরং পুরোনো কাসুন্দি চমৎকার করে তৈরী করার চেয়ে অগোছালো আড়ষ্ট ভাবে নতুন কিছু তৈরী করাই ভাল। উনিশ শতকের উপন্যাসে কি হত? সে যুগের উপন্যাস কোনো একটি পরিবার কিংবা কোনো ব্যক্তির ভাগ্য নিয়ে রচিত হয়েছে। সে-যুগের জীবনের সঙ্গে তার যোগ ছিল। আমাদের যুগে মানুষের ভাগ্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। তুমি স্বীকার কর আর না কর তোমার ভাগ্য বহুজনের ভাগ্যের সঙ্গে অনেকখানি জড়ানো। আগে একের সঙ্গে অন্য-অনেকের ভাগ্য এতটা জড়ানো থাকত না। উপন্যাসের গঠন কৌশল বা রীতির যে পরিবর্তন প্রয়োজন তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

নিজের উপন্যাসের প্রসঙ্গ তুলে এরেনবুর্গ দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রতিটি উপন্যাস বিভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা। 'সেকেন্ড ডে' বা '১৯২৫-এর গ্রীষ্ম' এক ধরনের নয়। 'দি থ' বা 'দি ফল অফ প্যারি'-র শিল্পকর্মের প্রকৃতি এক নয়।

"পায়ে উত্তাপদানকারী" মেঝে

ভারতের বহু পুরনো বাড়িতেই এখনও কাঠের মেঝে দেখতে পাওয়া যায়, তবে আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতে অবশ্য কনক্রীটের মেঝেই করা হয়। এ থেকে অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে কাঠের মেঝে কি কনক্রীটের মেঝের তুলনায় ভালো? পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞানীগণ এই সামান্য প্রশ্নটি নিয়েই গবেষণা করছেন; এবং ব্যাপারটি অবশ্য প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণতঃ পাথর ও কনক্রীটের মেঝেকে ঠাণ্ডা বলে মনে করা হয় এবং কাঠের মেঝেকে গরম বলা হয়। দুই রকম মেঝের যদি একই রকম উত্তাপ হয় অর্থাৎ কক্ষের উত্তাপ যদি একই রকম রাখা যায় তাহলে এটা কি করে সম্ভব। বসতবাড়ি, কারখানা ও অফিস-বাড়ি তৈরী করার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে কি ধরনের উত্তাপে তিনি আরাম বা বিরক্তি অনুভব করেন সে সম্পর্কে স্টুটগার্টের টেকনিক্যাল পদার্থ-বিদ্যা গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করে দেখে। কি ধরণের মেঝেতে, পায়ের কোন উত্তাপে মানুষ পায়ের আরাম অনুভব করে এবং এগুলির মধ্যে সম্পর্কই বা কি তা নিয়েও তাঁরা পরীক্ষা করেন।

একটা নির্দিষ্ট উত্তাপযুক্ত কক্ষে আপনি যদি জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটেন তাহলে ঠাণ্ডা বা গরম মেঝের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না আর যদিই বা কেউ কোন প্রভেদ অনুভব করেন তা হবে সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজেরই কল্পনাপ্রসূত। মেঝের উত্তাপ যদি যথেষ্ট বেশী থাকে (১৭ থেকে ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) তাহলে পাথরের মেঝেই হোক বা কাঠের মেঝেই হোক তাতে পায়ে কোন বিরক্তিকর অনুভূতি হয় না। এই রকম মেঝেতে যদি খালি পায়ে হাঁটা যায় তাহলেই শুধু খানিকটা অস্বস্তি বোধ হতে পারে। পাথর বা কনক্রীট যে দ্রুততর গতিতে উত্তাপ শোষণ করে নেয় এই ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয়। ঐ একই উত্তাপে কাঠের মেঝেতে ঠাণ্ডা অনুভূত হয় না।

স্টুটগার্টে যাঁদের নিয়ে এই পরীক্ষা চালানো হয়, তাঁরা পারলেন মোজা ও পাতলা চামড়ায় তৈরী জুতো পায়ে দিয়ে পরীক্ষা গৃহে ৪ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ পায়ের বলের উত্তাপ এবং চামড়ার মধ্য দিয়ে উত্তাপ পরিশোধন সম্পর্কে লক্ষ্য রাখেন। ডাঃ ফ্রাঙ্ক এই পরীক্ষা পরিচালনা করেন। তিনি বলেছেন যে পায়ের বলের ঠাণ্ডা হওয়ার ওপরেই আরাম বা বিরক্তির অনুভূতি নির্ভর করে। দুটি পৃথক উত্তাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র দিয়ে কক্ষ ও মেঝের উত্তাপ বিভিন্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছিল। মেঝে যদি ঠাণ্ডা রাখা হয় তাহলে পায়ের বলের ঠাণ্ডা হওয়ার ওপরেই আরামের অনুভূতি নির্ভর করে। ৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী যদি ঠাণ্ডা না করা হয় তাহলে মানুষ আরাম অনুভব করে। ৬ থেকে ৯ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ হ্রাসে তাঁরা "আরামদায়ক" থেকে ঠাণ্ডা বলে বর্ণনা করেন, ৯ থেকে ১১·৫ ডিগ্রীতে তাঁরা শীতল থেকে "হিমশীতল" বলে বর্ণনা করেন।

পাথরের মেঝে বা কাঠের মেঝেই হোক, মোজা এবং জুতো ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করার পক্ষে তা যথেষ্ট। একটা নির্দিষ্ট উত্তাপে, উত্তমরূপে আবৃত পা কাঠের মেঝের তুলনায় কনক্রীটের মেঝেতে বেশী ঠাণ্ডা মনে হয় না। তবে যে জিনিস দিয়েই মেঝে তৈরী হোক না কেন অবস্থিতিকালই হল প্রধান কথা। স্টুট-গার্টের বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মেঝের উত্তাপ যদি ১৮ ডিগ্রী এবং তার বেশী থাকে তাহলে চার ঘণ্টা থেকেও কোন অসুবিধে বোধ হয় না। ১ থেকে ৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে প্রথম থেকে দ্বিতীয় ঘণ্টাতেই অসুবিধে বোধ হতে থাকে এবং ৮ থেকে ১৭ ডিগ্রীতে তৃতীয় ও চতুর্থ ঘণ্টা থেকেই অসুবিধে বোধ হয়। এর অর্থ হল দীর্ঘকালের ঠাণ্ডা মেঝেতে জুতো পায়ে দিয়েও বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাযুক্ত বাড়িতেও এ কথা খাটে। কিন্তু যেখানে কক্ষগুলি মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত করা হয় সেখানে মেঝে কি জিনিস দিয়ে তৈরী তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কনক্রীটের তৈরী মেঝে একটা বাঞ্ছনীয় উত্তাপ মাত্রা পর্যন্ত গরম করতে অনেক বেশী সময় লাগে। কনক্রীটের মেঝের ১৭ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে যেখানে ১৮ ঘণ্টা সময় লাগে, সেক্ষেত্রে কাঠের মেঝে ৪ ঘণ্টার মধ্যেই গরম হয়ে যায়। কাজেই এই দিক দিয়ে কাঠের মেঝে ভালো।

বাসগৃহের পক্ষে কাঠের মেঝে এইজন্য ভালো যে শিশুদের হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়াও আমাদের মধ্যে মধ্যে খালি পায়ে হাঁটতে হয়। আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়িতে যেখানে কক্ষে উত্তাপ দেওয়ার পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কাঠের মেঝে বেশী সুবিধে-জনক। তবে অফিসে বা দোকানে যেখানে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা আছে, সেখানে দুই রকম মেঝেই সমান, তাছাড়া ঐ সব জায়গায় সকলেই জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটে।

মেঝে যদি কার্পেট বা আধুনিক প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢাকা থাকে সেক্ষেত্রেও এই পরীক্ষার ফলগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া আপনি যদি জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়ান বা চলাফেরা করেন এবং মেঝে বা কার্পেটের উত্তাপ যদি অন্ততঃপক্ষে ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয় তা হলে যা দিয়েই মেঝে ঢাকা থাক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। প্লাস্টিকও সহজে উত্তপ্ত হয় না তবে প্রাচীনকাল থেকে খাটের পাশে কার্পেট বা চামড়া রাখার যে ব্যবস্থা আছে, প্লাস্টিক দিয়েও সেই কাজ চলে। যদি যথেষ্ট পুরু করে প্লাস্টিক দিয়ে মেঝে ঢেকে দেওয়া যায় তাহলে কনক্রীটের মেঝের অসুবিধেগুলি এড়ানো যায়।

টেলিফোন এ্যাম্‌প্লিফায়ার

এক হাতে টেলিফোন ধরে অন্য হাতে কিছু লেখা বা কোন কাগজপত্র খুঁজে দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। স্বভাবতঃই সেইভাবেই অবস্থান খুব আরামদায়ক নয়। বর্তমানে এমন এক ধরনের টেলিফোন এ্যাম্‌প্লিফায়ার তৈরী হয়েছে যাতে শ্রোতাকে সব সময়েই টেলিফোনটি কানের ধারে রাখতে হয় না। শ্রোতা ইচ্ছে করলে টেলিফোনটি রেখে দিয়ে কিছু লিখতে পারেন বা খুঁজতে পারেন। পশ্চিম জার্মানীর এসেনের একজন উৎপাদক দুটি বিভিন্ন আকারের নতুন এক ধরনের টেলিফোন এ্যাম্‌প্লিফায়ার তৈরী করেছেন। এগুলির দাম হল ৯৮ এবং ১২৮ মার্ক যথাক্রমে ২৫ ও ৩২ ডলার বা ৯ ও ১২ পাউণ্ড। এই এ্যাম্‌প্লিফায়ার দিয়ে টেলিফোনের আলোচনা এতো বাড়ানো যায় যে, সেই ঘরে উপস্থিত সকলেই তা শুনতে পারেন।

রবীন্দ্রচর্চা

Tagore : A life : Krishna Kripalani 1961. Malancha, 7, Allenby Road, New Delhi-1.

মহৎ কবির জীবনীও এক মহৎ কাব্য এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই জীবনের কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থে বড় সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন অল্প পরিসরে এক দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র বৃত্তান্ত সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সেই নৈপুণ্যের পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এত ব্যাপার যে জীবনীকার কি রাখিবেন, কি ছাড়িবেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। শ্রীকৃপালনী যে এইরূপ সমস্যায় বিহ্বল হন নাই তাহা তাঁহার গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝিতে পারি। গ্রন্থখানি পড়িয়া মনে হইবে যে, গ্রন্থকার প্রথমে স্থির করিয়াছেন যে সব কথা বলিতে গেলে কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে না। এই দৃষ্টিতে জীবনীকারের এক বিশেষ গুণ তাঁহার সংযম ঃ শ্রীকৃপালনীর গ্রন্থ এই গুণের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বাংলা জীবনীসাহিত্যে এখনও কোন প্রকৃষ্ট রচনারীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথ্যাংশে নির্ভরযোগ্য এবং মূল্যবান জীবনীর বড় অভাব নাই। কিন্তু কেবল তথ্য সমাবেশে জীবনী হয় না। বস্তুত বাংলা জীবনী এখনও ঠিক জীবনীসাহিত্য হইয়া উঠে নাই। গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের কেশব জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০০। কিন্তু তথ্যের আসর হইলেও গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য নয়। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের ভূদেব-চরিত তিন খণ্ডে প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থও তথ্যে সমৃদ্ধ; কিন্তু সে সমৃদ্ধিতে মানুষটির মূর্তি চাপা পড়িয়াছে। অবশ্য বৃহদাকার জীবনীগ্রন্থও সুলিখিত হইতে পারে—যেমন মেসন-কৃত মিল্টন-জীবনী সাত খণ্ডে ৪৪৪৪ পৃষ্ঠা। কিন্তু এই গ্রন্থও আয়তনের জন্য নিন্দিত। বৃহৎ জীবনীর বড় দোষ ইহাতে ইতিহাস ব্যক্তিকে পরিস্ফুট না করিয়া তাহাকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিতে চায়। পটু জীবনী-লেখক যত জানেন তত লেখেন না। শ্রীকৃপালনী বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন; তাঁহার গ্রন্থখানি শ্রমলব্ধ সামগ্রী। সেই শ্রমের ভার পাঠককে বহন করিতে হইল না।

এই গ্রন্থের তথ্য-বিন্যাসের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে ইংরাজীতে লিখিত তাঁহার অন্যকোন জীবনীতে তেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া জানি না। ঐ ভাষায় এই গ্রন্থ কবির সর্বোৎকৃষ্ট জীবনী। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত শ্রীপুলিন সেন-কৃত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থের তালিকায় যে কয়খানি জীবনীর উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে রীস ও টমসনের গ্রন্থ দুইখানিই উৎকৃষ্ট। তথ্য ও সমালোচনার সার্থক সমন্বয়ে শ্রীকৃপালনীকৃত জীবনী উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হইয়াছে।

শ্রীকৃপালনী রবীন্দ্র-ভক্ত। কিন্তু তিনি ভাবে অধীর হইয়া হরি হরি বোলাইয়া চরিত-কথা লিখেন নাই। তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা বিফল হয় নাই। অন্য দিকে তিনি বেশি বুঝাইতে যাইয়া সব গুলাইয়া ফেলেন নাই। তিনি আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের কথাই বলিয়াছেন। পাণ্ডিত্য বা চিন্তাশীলতার অভিমানে কোথাও প্রসঙ্গ হইতে সরিয়া আসেন নাই।

এই গ্রন্থের ভাষা আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। এমন সরল পরিচ্ছন্ন ইংরাজী একালে এদেশে দুর্লভ। বস্তুত সমগ্র গ্রন্থখানিতে যে চরিত্র ইহার ভাষারও সেই চরিত্র। আমরা হয় ইংরাজী লিখিতে পারি না, নয় বড় বেশি ভাল ইংরাজী লিখি। বেশি ভাল ইংরাজী মন্দ ইংরাজীর পর্যায়ে পড়িতে চায়। এই গ্রন্থের স্টাইল দেখিয়া আশা করিতে পারি গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের যে বৃহৎ ইংরাজী জীবনী লিখিতেছেন তাহা দেশে বিদেশে সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ১৬ খানি চিত্রই সুনির্বাচিত। শ্রীকৃপালনী এই গ্রন্থ রচনায় যে দায়িত্বজ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-আলোচনার ক্ষেত্রেও একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সে আদর্শের মূল কথা—প্রযত্ন ও পরিচ্ছন্নতা। ৪৬৯।৬১

Rabindra Prabaha : Edited by Tarini Sankar Chakravarty, Tagore Centenary Celebrations Committee Wheelers Building 15, Elgin Road, Allahabad. Price Rs. 2.50 only.

রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির চেষ্টায় যে সমস্ত রবীন্দ্রাঞ্জলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রপ্রবাহ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রধানত দুটি কারণে—ইংরেজি বাংলা ও হিন্দী এই তিনটি ভাষায় আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে এবং সুলভ মূল্যে পরিবেষিত হয়েছে বলে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি এবং জীবন সমালোচনাই কেবলমাত্র এই গ্রন্থে স্থান পায় নি, রবীন্দ্ররচনা ও রচনাংশের হিন্দী এবং ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া কিছু স্মৃতিকথা ও পত্রাংশও সংযুক্ত হয়েছে। কয়েকটি বিরল-দৃষ্ট আলোকচিত্রের সঙ্গে কয়েকজন বিদেশী মনীষী-লেখকের অভিনন্দন ও অভিমত সংগ্রহ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত প্রতিকৃতি-আত্মপ্রতিকৃতি এবং হস্তলিপির ছবিও রয়েছে। বাংলায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অসিতকুমার হালদার, ডাঃ হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাসব ঠাকুর, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ও ডাঃ শশধর দত্ত; ইংরেজিতে সুপ্রোভাংশু মুখোপাধ্যায় এবং হিন্দীতে ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সুমিত্রানন্দন পন্থ উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন। বিজ্ঞাপন ও উৎসর্গীকৃত কবিতা এই গ্রন্থ থেকে বাদ দিলে সম্পাদক ভালো করতেন বলে মনে হয়। ৬৫২।৬১

Homage To Rabindranath Tagore. Editor : B. M. Chaudhuri, Indian Institute of Technology, Kharagpur. Rs. 3.50.

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একক ও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের ধুম পড়েছিল; এখনো তা শান্ত হয়নি। তাদের সবগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার করেছে বলতে পারি না; তা আশা করাও সম্ভবত অনুচিত হবে। খুশি হতে হয়, যখন দেখি ব্যবসায়ী প্রচেষ্টার বাইরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী হন। বর্তমান সংকলনটি সেইরকম এবং উন্নত রুচির দিক থেকে দেখলে, নিশ্চয় সাধুবাদযোগ্য।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত চৌধুরী সাধ্যমতো সংকলনটিকে পূর্ণাঙ্গ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ প্রতিভার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট দিকগুলি যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরাও প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে ডক্টর প্রভাসজীবন চৌধুরীর 'এসথেটিক' বিষয়ক রচনাটি, ডক্টর আর্নল্ড বেক্-এর সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনার গুণে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্রীযুক্ত অপূর্ব চন্দের 'কানাডা ভ্রমণ' তথ্যসমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণু দে, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি আবশ্যকীয় গ্রন্থরূপে এর সমাদর কামনা করি। মুদ্রণ ও প্রকাশনার দিক থেকেও গ্রন্থটি সুরুচি বহন করে।

৬৭০।৬১

উপন্যাস

প্রাচীর—মীরা মজুমদার। নবযুগ সাহিত্য মন্দির; ৩, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা ১০। প্রাপ্তিস্থান : ডি এম লাইব্রেরী ও শ্রীগুরু লাইব্রেরী। মূল্য : তিন টাকা।

শ্রীমতী মীরা মজুমদার সাহিত্যে নবাগতা। তাঁর এই উপন্যাসে নবাগতার সমস্ত লক্ষণই পরিস্ফুট। কাহিনীর মধ্যে একটি তীব্র বক্তৃতাধর্মী আদর্শকে তুলে ধরবার চেষ্টা রয়েছে। আমাদের সমাজে এখনো নারীর যথার্থ মূল্যায়ন হয় নি; ফলে সে তার প্রাচীন পরিচয়ের মধ্যেই এখনো সীমাবদ্ধ। নায়িকা বিভা এই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসে; তার সহযোগিতা করে বিপ্লবী যুবক শংকর। লেখিকার হৃদয়ে উদ্দীপনা রয়েছে, উপন্যাসে তা সোচ্চার। এ-সম্পর্কে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর প্রয়াস সফল হলেই আমরা খুশী হবো। ৪৭৬।৬১

পথ অন্তহীন। অমিয়া চক্রবর্তী। প্রকাশক—প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী। সন্যাল এণ্ড কোং, ৮৫, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯, মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

আত্ম-জৈবনিক ধারায় লিখিত 'পথ অন্তহীন' একটি উপন্যাস। আরম্ভে প্রেম; এবং অনিবার্য কারণে স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে বড়ন শিক্ষা অর্জনের জন্য শহরে আসায় ও বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পাওয়ায় বিচ্ছেদ; এবং পরিণতিতে উভয়ের একত্রে সেবাব্রতী রূপে অন্তহীন পথের উদ্দেশে যাত্রা। কাহিনী ও চরিত্রচিত্রনে বৈচিত্র্য না থাকিলেও লেখিকার সৎ ও সরল প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রন্থটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ৬৪।৬২

তীর ভাঙা ঢেউ—প্রসাদ ভট্টাচার্য। ডি এম লাইব্রেরী; ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য : দুই টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ না হলেও মধ্যভাগের পরের কথা। সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। সেই সময়ের কাহিনীই 'তীর ভাঙা ঢেউ'-এ বিধৃত। মুঙ্গেরের তখন সারা ভারতকে যেমন বিস্মিত করেছিল তেমনি উপযুক্ত গ্রন্থটিকেও ঋদ্ধ করেছে। আবার সেই প্রসঙ্গে যে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে, তাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণদাস, পীর সাহেব, দীপক বর্ষা প্রভৃতি। সেকালের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটি, স্বল্প পরিসরে বলা হলেও, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক চেতনারই পরিচয় দান করে। গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলা ভুল হবে মাত্র বড় গল্প বলা যেতে পারে। ৬১০।৬১

অভিসারিকা— অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : তিন টাকা।

একালে বাংলা সাহিত্যের একটি মুখ্য অংশকে অধিকার করে রেখেছে ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বর্তমান উপন্যাসটিতে, ব্রাহ্মণধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের জনমানসে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ঘটনাবহুল কাহিনী চমকপ্রদ করে লিখিত হয়েছে। যে মণিভদ্রের বাবা দুর্লভভট্ট মহারাজ আদিত্যবর্মার সভাসদ, সেই মণিভদ্রের মানসিক পরিবর্তন উপন্যাসটির মূল উপাদান এবং মণিভদ্রের চরিত্রকে সমৃদ্ধতর করেছে যে-শান্তি—তারই আদর্শ উপন্যাসটিকে সার্থকনামা করে তুলেছে। অবশ্য, একথা বলা অন্যায় হবে না, উপন্যাসটিতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনা, কল্পনা অপেক্ষা ইতিহাস-চেতনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। ৫৫৫।৬১

কুন্দসী — শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কল্লোল প্রকাশনী; এ-১৩৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম : দু'টাকা।

বাংলা সাহিত্যে দু'চারটি উৎকৃষ্ট রহস্যোপন্যাস বের হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এ দুজন এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রয়োজনে এঁদের অনুসরণ করাই উচিত। কিন্তু কার্যকারণ-হীন অপাঠ্য অপ্রয়োজনীয় রহস্যোপন্যাস যদি কেউ লেখে এবং তাকে কেউ অনুসরণ করে থাকে, তবে লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে যায়। 'কুন্দসী' সেই অপাঠ্য পুস্তকের অনুকারী-সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু নয়। ডিটেকটিভ মশায় হঠাৎ-পরিচিত মেয়েটির সঙ্গে তদন্তের কিনারা করতে গিয়ে কিভাবে গাঁটছড়া বাঁধলেন, সেটাই লেখকের প্রধান বক্তব্য বিষয়। রাহাজানি, খুন, আত্মহত্যা, প্রায়-মোটর-চাপা পড়া অবস্থা—সব কিছুই আছে; নেই শুধু শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মূল্যবোধ। বলা বাহুল্য, রহস্যোপন্যাস রচনার জন্য চাই কার্যকারণ সঙ্গতি, বিজ্ঞান-চেতনা ও সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রগাঢ় নৈপুণ্য। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে এর একটি গুণও থাকলে খুশি হতাম। ৫৮৫।৬১

কবিতা

গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—মোহিত চট্টোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ২২ শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। দু'টাকা।

তরুণ ও তরুণতর কবিদের হাতে বাংলা কবিতা ইদানীং নতুন রূপ লাভ করছে। পূর্ববর্তীরা নন, এমন কি চল্লিশের কবিরাও নন, এঁদের কবিতার সঙ্গে একমাত্র এঁদেরই তুলনা হতে পারে। কবিতার সাম্প্রতিক পর্বে যে কজন কবি ক্রমশ উল্লেখ্য হয়ে উঠছেন, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন। এবং যা সহজেই আশা করা যায়, এই গ্রন্থে মোহিত চট্টোপাধ্যায় পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত কাব্যশক্তির পরিচয় রেখেছেন। সংকলিত কবিতার সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক; এবং এই সব কবিতায় একজন বেদনা-বিহ্বল, পরিমিত-বাক্, কল্পনায় স্বচ্ছন্দ, চেতনার নিভৃতচারী স্বপ্ন-বিলাসী কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উদ্ধারযোগ্য অসংখ্য পংক্তির মধ্য থেকে তাঁর কাব্য-স্বভাবের উপযোগী দুটি পংক্তি উদ্ধার করা যাক্ :

'বিলাপ কোর না দুঃখ,
তুমি বাম পার্শ্ব থেকে বুকে এসে বোস,
কলহে কণ্টক, ঊর্ধ্বে গোধূলির আলো
বড় নির্জনতাপ্রিয়।'

আমরা এই কাব্যগ্রন্থের সমাদর কামনা করি। রুচি-সুন্দর প্রচ্ছদটিরও প্রশংসা করতে হয়।
৫৯৭।৬১

উত্তর তরঙ্গের নায়ক—শ্রীদিলীপকুমার সেন। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১সি রানী শঙ্করী লেন, কলিকাতা-২৬। দাম : আড়াই টাকা।

কবি নবাগত এবং যথার্থ 'আধুনিক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি কাব্য নাটক 'শ্বেত আকন্দ' ও অন্যান্য কবিতার মধ্য দিয়ে কবির কাব্যপ্রয়াস স্পষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবিতার রীতি প্রায় নির্ভুল ভাবে তাঁর আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও, এই গ্রন্থে তাঁর চরিত্র নির্দ্বিধায় আবিষ্কার করা যায় না। মাঝে-মাঝে সমকালীন তরুণ কবিদের প্রভাব লক্ষণীয়। তথাপি, আমরা নিশ্চিত যে উত্তরকালে ইনি কিছু ভালো কবিতা উপহার দিতে পারবেন। 'শ্বেত আকন্দ' কাব্য নাটিকায় তাঁর শক্তির ছাপ রয়েছে। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত ও শোভন।
৬৯৯।৬১

নাটক

এবাড়ি ওবাড়ি—জরাসন্ধ। কথাকলি, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। পরিবেশক : ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—দু টাকা।

'জরাসন্ধ' তাঁর কাহিনীতে প্রভূত নাটকীয় ঘটনার সমাবেশে পাঠকের নির্লিপ্ত অনুভূতি উদ্দীপ্ত করে তোলেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থখানি নাটক, তাই তিনি এই গ্রন্থে পরিমিতি বোধের সাহায্যে তাঁর নাটকীয় নৈপুণ্যকে যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। তিন অঙ্কের এই নাটকটি খুব সিরিয়াস নয়। এর মূলে রস হাস্য। তবু প্রহসন জাতীয় কোনো ভাঁড়ামিও এতে প্রশ্রয় পায়নি। একতলা বাড়ির ডাক্তার, আর দোতলা বাড়ির ডাক্তারের প্রতিযোগিতামূলক দ্বেষ-বিদ্বেষের দ্বারা নাটকটির ভিত রচিত হয়েছে। তারপর নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে নতুন নতুন স্ত্রী-পুরুষ চরিত্র, থানা আদালত এবং কলেজে অনুষ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রীদের থিয়েটার প্রভৃতি। একতলা বাড়ির মালিক হরিনাথের ছেলে কলেজ ছাত্র অশোক, এবং দোতলা বাড়ির মালিক হরনাথের মেয়ে কলেজ-ছাত্রী নীলিমা কিভাবে অমিল থেকে মিলে গিয়ে পৌঁছাল মূলত রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাকে অবলম্বন করে—তার সাহায্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বকেই যেন উদ্ঘাটিত করেছেন। তবে, তাদের মিলনের মধ্য দিয়েই নাটকটির যবনিকাপাত হয়নি। নাটকীয় রস ধীরে ধীরে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে তখন—যখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর হরনাথ ও হরিনাথ অধ্যাপিকা মিস সোমা গাঙ্গুলীর কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে তার ওপরেই নিজেদের বৈষয়িক বিদ্যার আকস্মিক প্রয়োগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। অবশ্য এর উপসংহার ঘটে আদালতে হরিনাথ আর হরনাথের Peaceful coexistenceএর মধ্যে। নাটকটিতে একটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় গণেশ-চরিত্রাঙ্কনে। এটি অনাবশ্যক। জেল ফেরত দাগী আসামীর ওপর লেখকের মোহই অবশ্য এজন্য দায়ী।
৫১১।৬১

একাঙ্ক নাটিকা

যবনিকা—শ্রীনীরেন গুপ্ত। ভবানীপুর বুক ব্যুরো: ২বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য : আড়াই টাকা।

চারটি ছোট নাটিকার সংকলন। 'যবনিকা', 'অমীমাংসিত' ও 'ত্রয়ী' নাটিকা তিনটি বেতারে অভিনীত হয়েছে। 'যবনিকা'য় ভালবাসা এবং বিশ্বাসের মূল্যায়নে নিরঞ্জন, অলকা ও সুললিত চরিত্র তিনটির যবনিকাপাত হয়েছে। 'অমীমাংসিত' নাটিকাটিতে রেস্তরাঁয় অনুষ্ঠিত একটি সহজ আড্ডাকে কেন্দ্র করে লিখিত। 'ত্রয়ী'তে মাত্র তিনটি চরিত্র। নাটিকাকারের অসামান্য দক্ষতায় ভালবাসার মাধ্যমে জীবনের বাস্তব দিকটিকে চরম নাটকীয়তায় রূপায়িত করে তোলা হয়েছে। চতুর্থ নাটিকাটি, সর্কিল-গরল তেল, বক্তব্য তেমন অভিনব না হলে বিভিন্ন জাতীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র। নিছক ভূমিকা নয়, ঐতিহাসিক বক্তব্য এবং কবির স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে, তা একটি মূল্যবান প্রবন্ধ।
৬০৪।৬১

গল্প সংকলন

চলার পথে—মানিক গঙ্গোপাধ্যায়। সিলভার-এ্যারো, ১নং ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১। মূল্য : তিন টাকা।

পনেরটি গল্পের সংকলন। জীবনে চলার পথে লেখক যে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন—তাকেই তিনি বিভিন্ন মূর্তিতে 'ভাষাদান' করেছেন। বৌদির গল্প, মুড়িওয়ালা, ওদের মন চিনি প্রভৃতি প্রসঙ্গ ঐ পরিপ্রেক্ষিতেই উপস্থিত হয়েছে। দু-একটি গল্পে লেখক মনোবেদনাকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যেমন, শেষস্মৃতি, ব্যর্থ প্রতীক্ষা প্রভৃতি গল্পে। কিন্তু অন্যপক্ষে মনোবেদনার কারণ এই যে, বর্তমান গল্পের ধারা সম্পর্কে লেখক একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। তাই প্রাচীন মামুলি ধারাটিকে তিনি অপ্রয়োজনীয়ভাবে অনুসরণ করেছেন। আশা করি, এ সম্পর্কে তিনি সচেতন হবেন।
৪৮১।৬১

প্রাপ্তি-স্বীকার

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা—শঙ্কু মহারাজ।

বাহাদুর শা'র সমাধি—বারীন্দ্রনাথ দাশ।

অংশীদার—গঙ্গাপদ বসু।

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানস—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত।

অভয়ের কথা ও ঠাকুরানীর কথা—'ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখর

রাম না হতে রামায়ণ

মার্কিন পরিচালক মার্ক রবসন "নাইন আওয়ার্স টু রাম" নামক একটি আন্তর্জাতিক ছবি এ-দেশের পটভূমিতে তোলবার জন্যে এসেছিলেন—এ খবর পাঠকদের অজানা নেই। দিল্লী ও বম্বেতে এর বহির্দৃশ্য তোলা সম্পূর্ণ হয়েছে। কথা ছিল, বম্বের মেহবুব স্টুডিওতে এর অন্তর্দৃশ্যগুলি গৃহীত হবে। কিন্তু তা না করেই পরিচালক রবসন তাঁর দলবল নিয়ে লণ্ডনে গেছেন ওখানকার এলস্ট্রি স্টুডিওতে ছবিটি শেষ করতে।

লণ্ডনে পৌঁছেই পরিচালক রবসন ভারতবর্ষে ছবিটি তোলবার ব্যাপারে সকলকার কাছ থেকে যে সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়েছেন তার তারিফ করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। বম্বের একটি নাম-করা সংবাদপত্রে মার্ক রবসন নিজের জবানীতে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভারত সরকার ও ভারতীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন প্রত্যেকের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্যে।

কিন্তু রবসনের দল ভারত ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে বম্বের চলচ্চিত্র মহলে তাঁদের বিরুদ্ধে বেশ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

বম্বের চলচ্চিত্রকর্মীদের প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ তার সভ্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে যাতে "নাইন আওয়ার্স টু রাম" ছবিতে কেউ কাজ না করে। বম্বের যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী ঐ ছবিতে অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের ওপরও এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে।

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণগোপাল একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, ঐ ছবিতে যেসব বিদেশী কলাকুশলী কাজ করছিলেন তাঁরা যাতে নির্দিষ্ট চাঁদা জমা দিয়ে এখানকার কলাকুশলী প্রতিষ্ঠানগুলির অস্থায়ী সভ্য হন তার জন্যে দাবি জানিয়েছিলেন ফেডারেশন। কিন্তু এই দাবি পালিত না হওয়ায় ফেডারেশন এই নিষেধাজ্ঞা জারী করতে বাধ্য হয়েছে। এ থেকে রবসন দলের আকস্মিক ভারতত্যাগের আসল কারণ খানিকটা আঁচ করা যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানে শেষ হয়নি। পাঠকরা জানেন যে, মহাত্মা গান্ধীর জীবনের শেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনীর অনেকখানি অংশ রচিত। সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মাজীর জীবনের অন্তিমকালের চিত্রায়ণে গান্ধীজীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে-কে নাকি এই ছবিতে গৌরবের আসনে বসানো হয়েছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বম্বের ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি এক বিশেষ সভায় এই সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তা ভারত সরকারের নিকট পেশ করেছেন। "নাইন আওয়ার্স টু রাম" ছবিতে মহাত্মাজীর চরিত্রের অবমাননার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে আই-এম-পি-পি-এ তাঁদের সিদ্ধান্তে বলেছেন, বিদেশী চিত্রপ্রযোজকরা ভারত সরকারের কাছে যে চিত্রনাট্য দাখিল করেন, সরকারের তা আরও বেশী সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এবং এই সব বিদেশী ছবির চিত্রগ্রহণকালেও সরকারের বিশেষ সতর্ক থাকা কর্তব্য।

আলোচ্য বিদেশী ছবিতে মহাত্মাজীর

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতির পাশে গান্ধীজীর রূপসজ্জায় জে এস কাশ্যপ (দক্ষিণে)। "নাইন আওয়ার্স টু রাম" নামক যে ইংরেজী ছবিতে শ্রীকাশ্যপ অভিনয় করছেন তা নিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে

চরিত্রকে খর্ব করা হয়েছে বলে আই-এম-পি-পি-এ তাঁদের সিদ্ধান্তে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, গান্ধীজীর জীবনের কাহিনী যাতে ছবিতে শ্রদ্ধাবুদ্ধি সহকারে বিন্যস্ত হয় সে ব্যাপারে সরকারের অবহিত থাকা উচিত ছিল। ছায়াছবির শিল্পী কর্তৃক মহাত্মার চরিত্রাঙ্কনের অনুমতির বিরুদ্ধেও আই-এম-পি-পি-এ তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মহাত্মার স্মৃতির প্রতি ভারতের অগণিত জনসাধারণ যে শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকেন, এই ছবিতে তাকে আঘাত করা হয়েছে বলে আই-এম-পি-পি-এ মনে করেন। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে বলেছেন, যতই বিলম্ব হোক, ভারত সরকারের কর্তব্য সংশ্লিষ্ট বিদেশী সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই অন্যায়ের প্রতিকারে অগ্রণী হওয়া।

ছবিটি সম্পর্কে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার একটি প্রেস-নোট প্রকাশ করেছেন। এই নোটে বলা হয়েছে, ১৯৬১ সালে লণ্ডনের রেড লায়নস ফিল্মস ভারতে ছবিটির চিত্রগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এবং সেই সংগে ছবির চিত্রনাট্যটিও পেশ করেন। আইনত চিত্রগ্রহণের জন্য বর্তমানে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগ কর্তৃক ছবির চিত্রনাট্যটি পরীক্ষা করে দেখা হয়। চিত্রনাট্যটি একটি উপন্যাসের ভিত্তিতে রচিত। মূলত চিত্রনাট্যের সংগে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের কোন যোগ নেই। কেবলমাত্র মহাত্মার মৃত্যুর পূর্বের কয়েক ঘণ্টা নিয়ে ছবির একটি অংশ রচিত। এবং এই অংশে গডসের কার্যকলাপ এবং ফ্ল্যাশ-ব্যাকে তার জীবনের কয়েকটি কাল্পনিক ঘটনা প্রধানত বিবৃত। চিত্রনাট্যে কতকগুলি তথ্য সংক্রান্ত ভুল ছিল। এই বিষয়ে রেড লায়নস ফিল্মস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁরা ১৯৬১ সালের অক্টোবরে সংশোধিত চিত্রনাট্য পেশ করেন। সংশ্লিষ্ট চিত্রপ্রযোজক সংস্থাকে এটাও জানানো হয় যে, চিত্রগ্রহণে ভারত সরকারের আপত্তি নেই বলে চিত্রনাট্যটিও যে তাঁরা অনুমোদন করেছেন তা নয়। এই সংগে তাঁদের আরো জানানো হয় যে, সাধারণ প্রদর্শনীর আগে ভারত সরকারকে অথবা লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনারকে ছবিটি দেখাতে হবে এবং প্রয়োজন হলে ভারত সরকার অথবা লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনারের পরামর্শ অনুযায়ী ছবিটির অদল-বদল করতে হবে। এটাও তাঁদের জানানো হয় যে, সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর-এর সার্টিফিকেট সাপেক্ষেই ছবিটি ভারতে প্রদর্শিত হতে পারে।

চিত্রালোচনা

প্রণয়-বিরহ-মিলন

চলচ্চিত্র সাহিত্যের সগোত্র। সব ক্ষেত্রে, সব মুহূর্তে নয়। চলচ্চিত্র যখন জীবন-ভাবনার স্পর্শ পেয়ে আর্টের পর্যায়ে উঠে আসে শুধু তখনই। সাহিত্যের ভেতর দিয়েই চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক দায়টি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী চিত্রপ্রযোজকের "বিপাশা" ছবিটি এই বিশুদ্ধতার অধিকারী কিনা তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। মতভেদ দেখা দিতে পারে কাহিনী নিয়ে—যা ছবিটির অবলম্বন। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্র এটা নয়। এই আলোচনা তাই স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে গিয়ে বলা চলে, যে চিত্রনাটকটি "বিপাশা"-য় পরিবেশিত তা সম্পূর্ণভাবে চলচ্চিত্রধর্মী। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের যে ধর্ম শিল্পের বিশুদ্ধতা বর্জন করে বাণিজ্যের দণ্ডকারণ্যে সোনার

হরিণ ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, এই ছায়াছবির গল্পে তা-ই প্রতিফলিত। ফলে জনমনোরঞ্জনের যে শর্ত এই চিত্রকাহিনীতে অনুসৃত, তা জীবনের স্বভাবধর্মটিকে অনুসরণ করেনি।

নায়িকার নামেই কাহিনীর তথা ছবির নামকরণ। নাম তার বিপাশা। বিপাশা ও দিব্যেন্দু দর্শকদের কাছে অপরিচিত নয়। অর্থাৎ তাদের চারিত্রিক লক্ষণ ও মানসিকতার সঙ্গে এর আগেও দর্শকদের অনেকবার না হলেও একাধিকবার পরিচয় ঘটেছে। প্রথম সাক্ষাতে নায়কের প্রতি নায়িকার অভদ্র অশিষ্ট আচরণ ও ক্লীবের মত নায়কের তা মেনে নেওয়া—এই ধরনের ঘটনা দর্শকরা এর আগেও প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষের পর যে ভবিতব্যটি তারা অনুমান করে নিয়েছেন তাও এই চিত্রকাহিনীতে যথাসময়ে রূপ নিয়েছে। অপ্রীতিকর সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে প্রণয়, সাময়িক বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এই সব কিছুই।

তবে চিত্রকাহিনীটি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের লেখনী নিঃসৃত। তাই নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা ও প্রণয় গতানুগতিকের ধারায় গড়ে উঠলেও তাদের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন যে সব ঘটনার আশ্রয় নিয়েছে তা চমকপ্রদ। নায়ক যখন জানতে পারে যে, সে তার পিতামাতার বিবাহিত জীবনের সন্তান নয়—অবৈধ সন্তান—তখন সে তার কলঙ্কিত জীবনের সঙ্গে নায়িকাকে জড়াতে চায় না। বিয়ের লগ্নেই সে নিরুদ্দেশ হয়। অন্যদিকে এই তত্ত্বটি জানার পর প্রেমাস্পদের প্রতি নায়িকার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নায়িকার একনিষ্ঠতা সার্থক হল। নায়কের নিদারুণ মনোযন্ত্রণারও অবসান ঘটল। তাদের ঈপ্সিত মিলনটি কী-ভাবে ঘটল তার মধ্যে নায়কের জন্ম-বৃত্তান্ত ও তার পিতামাতার উপাখ্যানটি বিবৃত।

দেখা গেল, নায়কের পিতা-মাতা উভয়েই জীবিত। পিতা সন্ন্যাসী। প্রথমা স্ত্রীর অর্থাৎ নায়কের গর্ভধারিণীর সঙ্গে তিনি নিষ্ঠুর প্রবঞ্চকের মত ব্যবহার করেছিলেন। এই অনুশোচনার জ্বালা সইতে না পেরে তিনি সন্ন্যাস নেন। আর নায়কের জননী স্বামীর মর্যাদা রক্ষায় নিজেকে তার রক্ষিতা বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। পরে নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য তিনি পুরী চলে যান এবং সেখানেই দীর্ঘকাল ঈশ্বর-উপাসনায় দিন কাটাতে থাকেন। তাঁদের জীবনে এই বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছিল এলাহাবাদ আদালতে। আদালতে গিয়ে উভয়কে দাঁড়াতে হয়েছিল নায়কের পিতার দ্বিতীয়া স্ত্রীর অভিযোগে। তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী। যখন তিনি জানলেন যে, তাঁর স্বামীর প্রথমা স্ত্রী বর্তমান, তখন তিনি আদালতের আশ্রয় না নিয়ে পারেন নি। আদালতেই নায়কের পিতা অস্বীকার করলেন তাঁর পিতৃত্ব। কারণ বিয়ের আট

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অভিযান"-এর নায়কের রূপসজ্জায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মাস পর যে সন্তানের জন্ম হয়েছে সে তার পুত্র নয়। বিশেষ করে, বিয়ের পর দু' মাসের মধ্যেই তিনি বিলেত চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং নায়কের মাতা বিয়ের আগেই গর্ভবতী ছিলেন। হতভাগিনী নারী স্বামীর সম্মান রক্ষায় আদালতে এই অপবাদ স্বীকার করে নেন। এবং তাঁর শিশুপুত্র সেই থেকেই দিদিমার কাছে মানুষ হতে থাকে।

চিত্রযুগের "কাঁচের স্বর্গ" চিত্রের একটি প্রধান ভূমিকায় মঞ্জু দে। আগামী সপ্তাহে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে

নায়ক যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সন্তান এই তথ্যটি নায়কের পিতা ছবির শেষাংশে স্বীকার না করে পারলেন না। নায়ক কলঙ্কিত জন্মপরিচয়ের গ্লানি সইতে না পেরে এলাহাবাদের পথে যখন আত্মহত্যায় ব্রতী হল, তখন তাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন এক সন্ন্যাসী। তিনিই নায়কের ছদ্মবেশী পিতা। পরে সন্ন্যাসী দেখা পেলেন নায়িকার। দাঙ্গায় সকলকে হারিয়ে যখন ভারতের মাটিতে এসে পৌঁছয় তখন এই সন্ন্যাসীর কাছেই সে আশ্রয় পায়, লেখাপড়া শেখে। সন্ন্যাসীরূপী নায়কের পিতা নিজের সন্তান ও ভাবী পুত্রবধূর দুঃখ-ব্যথার কথা ভেবেই নিজের পূর্ব অপরাধের কথা সব স্বীকার করলেন। স্বীকার করে নিলেন নিজের সন্তানকে। একটি চিঠিতে তিনি সব কথা লিখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। এই চিঠি তাঁরই আইন-ব্যবসায়ী বন্ধু হাসপাতালে নায়কের হাতে দিয়ে গেলেন। নায়ক এই চিঠিতেই তার মায়ের সন্ধান পেল। মাকে ফিরিয়ে আনতে গেল নায়ক ও তার ভাবী সহধর্মিণী। দুঃখিনী জননী পুত্র ও পুত্রবধূকে জড়িয়ে ধরলেন।

ছবির এই বিষয়বস্তুর মধ্যে একাধিক উপকাহিনী সংযোজিত। কেমনভাবে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন-লগ্নটি ব্যর্থ হল, নায়ক তার বিড়ম্বিত জন্ম-বৃত্তান্ত কার কাছ থেকে কী-ভাবে জানতে পারল, দাঙ্গার দাবানলের ভেতর দিয়ে নায়িকা কী করে ভারতে এসে পৌঁছল ইত্যাদি নিয়েই অন্যান্য উপকাহিনী।

বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত এই আখ্যান-তোলার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চিত্রনাট্যকার বস্তুকে একটি চিত্রনাট্যে সুগ্রথিত করে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রনাট্যটি স্বচ্ছন্দ-গতি। নায়ক-নায়িকার জীবনের প্রণয়-

জালান প্রোডাকসন্সের "দাদাঠাকুর" চিত্রের একটি দৃশ্যে তরুণকুমার ও দাঠাকুর-বেশী ছবি বিশ্বাস

মুহূর্ত কল্পনায়ও চিত্রনাট্যকার রসজ্ঞানের অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠী তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন।

অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠী তাঁদের স্বভাব-সিদ্ধ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ছবিটিতে। প্রয়োগ-কর্মের গুণে এই চিত্র-কাহিনীকে দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য যতটুকু সমৃদ্ধ করে তোলা সম্ভব, পরি-চালকগোষ্ঠী [illegible] তা সম্পাদন করেছেন। দৃশ্যগঠনে, পরিবেশ রচনায় এবং কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত গড়ে তোলার কাজে তাঁদের রসবোধ ও কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয়। পাঞ্চেত ও মাইথনের পট-ভূমিতে ছবির বহির্দৃশ্যাবলী মনোরম।

চিত্রকাহিনীর বিন্যাসে যে কোন অসংগতি নেই তা-নয়। এর মধ্যে প্রধান হল, বিয়ের লগ্নে নায়কের অন্তর্ধান। নায়ক যে তার পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান এ-সংবাদ সে তার কুচক্রী মামার চিঠিতে জানতে পারেনি। জেনেছে কলকাতায় এসে মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর। এই সংবাদ যদি নায়ক চিঠির মারফৎ জানতে পারত এবং নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় ও অন্তর্গ্লানিতে প্রেয়সীকে বিয়ের আসরে লগ্নভ্রষ্টা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসত তবু ঘটনাটি না-হয় মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু একটি চিঠি পেয়েই (চিঠিতে কী লেখা ছিল তা দর্শকেরা জানতে পারেন না) প্রেমাস্পদাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে বিয়ের লগ্নে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ার মত দুর্বল চরিত্র এই ছবির নায়কের নয়। তাই ঘটনাটি খুবই বিসদৃশ। নায়ক নিজেকে অবৈধ সন্তান জেনেও নায়িকাকে বিয়ে করতে চায়নি,— এই কারণেই নাকি নায়কের প্রতি নায়িকার শ্রদ্ধা বেড়েছে। (নায়িকার সংলাপে যা প্রকাশ পেয়েছে।) এই যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নায়ক নিজেকে অবৈধ সন্তান জানবার আগেই নায়িকাকে লগ্নভ্রষ্টা করেছে। তারপর লগ্ন-ভ্রষ্টা অবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে নিজেকে প্রেমাস্পদের স্ত্রী বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দেওয়ার যে একনিষ্ঠতা নায়িকার মধ্যে দেখা যায় তা ভাবালুতার আতিশয্য বৈ কিছু নয়। চড়া সুরের "মেলোড্রামা"র প্রয়োজনেই হয়ত ছবিতে এটা সম্ভব হয়েছে।

ছবির অন্যান্য ছোট-খাটো ত্রুটির মধ্যে একটি নৃত্য-নাট্যের অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য পীড়াদায়ক। আর অবিশ্বাস্য হল, কবিতার আবৃত্তি শুনেই অপরিচিতের ঘরে এসে ঢুকে কোন শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে তাকে কর্কশ ভাষায় গালাগালি দিয়ে অপমান করা—ছবির নায়িকা যা করেছে। কবিতা শোনার পর প্রতিবেশী যুবকের রীতি-নীতি লক্ষ্য করে দেখার স্বাভাবিক ধৈর্যটি নায়িকার চরিত্রে অনুপস্থিত।

ছায়াছবির গল্পে "আকস্মিক যোগা-যোগ" খুবই দেখা যায়। বাস্তবে যা দুর্লক্ষ্য। এই ছবির কাহিনীতে "আকস্মিক যোগাযোগে"র ছড়াছড়ি। এবং এই সব যোগাযোগের সাহায্যে ছবিতে এমন একটি রূপকথা গড়ে তোলা হয়েছে যা

শিল্পের বিচারে সার্থক নয়। তবে রূপকথা যাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের এ-ছবিও ভাল লাগবে। এক্ষেত্রে যুক্তি-বিচারের কথা তোলা বাহুল্য।

ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। এই শিল্পীজোড় শুধুই জনপ্রিয় নন, অভিনয়-নৈপুণ্যেরও অধিকারী। কোন কোন ছবিতে ইতিপূর্বে তাঁদের অভিনয় অসাধারণ, অতুলনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই ছবিতেও তাঁদের এই অনন্য দক্ষতার আভাস মেলে কোন কোন দৃশ্যে।

নায়কের প্রাণোচ্ছল, প্রণয়ী রূপটি উত্তমকুমার সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্র-কাহিনী প্রেমিক-নায়কের পৌরুষ অনেকখানি হরণ করে নিলেও, উত্তমকুমার তাঁর স্বাভাবিক শিল্পীনিষ্ঠা দিয়ে চরিত্রটির এই দুর্বলতা ঢেকে দিয়েছেন। চরিত্রটির বেদনা ও বিড়ম্বনা তাঁর অসামান্য অভিনয়ে বিধৃত।

সুচিত্রা সেন চিত্রনাট্যের আনুকূল্য অপর্যাপ্তভাবে পেয়েছেন। প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম পর্বে তাঁকে অযথা নির্জীবতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রণয়াভিলাষে যে মুহূর্তে তিনি নায়কের কাছে প্রণয়িনী রূপে আত্মনিবেদন করেছেন, তাঁর সেই মুহূর্তের অভিনয় মর্মস্পর্শী। নায়কের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটিতে তাঁর অভিনয় নিরবচ্ছিন্ন। হয়তো একঘেয়ে বলে। নায়িকার বিরহবেদনায় তাঁর অভিব্যক্তি ও অভিনয় মর্মস্পর্শী। কাহিনীতে বিপ্রলব্ধা হবার পরই তিনি তাঁর অনবদ্য অভিনয় মাধুর্যে দর্শকের মন জয় করে নিতে থাকেন। ছবির প্রথমার্ধে তাঁর বেশবাস চরিত্রটিকে যেন অনাবশ্যকভাবে উন্নাসিক করে তুলেছে।

নায়কের পিতা তথা স্বামীজীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনোগ্রাহী। একটি দৃশ্যে নায়কের জননীর রূপসজ্জায় ছায়া দেবীর অভিনয় মনে দাগ কাটে।

স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর অভিনয়ের জন্য দুটি বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে দর্শকদের প্রশংসা পাবেন জীবেন বসু ও কেতকী দত্ত। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য হলেন কমল মিত্র, লিলি চক্রবর্তী, আভা মণ্ডল, পেনেলিয়া ডাওনিংটন, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী।

সংগীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির বিশেষ কয়েকটি নাট্যমুহূর্তের রূপটি তাঁর রচিত আবহ-সুরে ফুটিয়ে তুলেছেন। গানের সুরারোপ সুশ্রাব্য।

ছবির নৃত্য-নাট্যের শিল্পীরা তাঁদের নৃত্যকুশলতার জন্য সাধুবাদ পাবেন। সুন্দর নৃত্য-পরিচালনার জন্য অতীন্দ্র-নারায়ণ গাঙ্গুলি ধন্যবাদার্হ।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সুষ্ঠু। বিশেষ করে ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বাঙ্গীন আঙ্গিকগঠন পরিচ্ছন্ন ও শিল্প-শোভামণ্ডিত।

সপ্তক-এর সদ্য-সমাপ্ত চিত্রার্ঘ "বন্ধন"-এর একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায়, সংগীতা মুখোপাধ্যায় ও জহর রায়

ভারতের পটভূমিতে আর একটি বিদেশী ছবি

আমেরিকান লেখক রবিন হোয়াইট দক্ষিণ ভারতের মাদুরা শহর ও শহরতলীর পটভূমিতে একখানি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজের গল্পের ভিত্তিতেই ছবিটি তৈরী হবে। শ্রীহোয়াইট

বেয়ার্ড পুতুল নাচ দলের দুটি পুতুল-চরিত্র। গত সপ্তাহে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বেয়ার্ড দলের পুতুলনাচ ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সকলে উপভোগ করেছেন

মাদুরাতে তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পিতা ছিলেন একজন খৃষ্টীয় ধর্মযাজক। দক্ষিণ ভারতের এই শহরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বহুদিনের। তাই তামিলনাদ শহরের ও শহরাঞ্চলের জীবন-ধারা ও প্রাকৃতিক শোভাই তিনি তাঁর রঙীন ছবিতে কাহিনীর পটভূমি রূপে ফুটিয়ে তুলতে চান। ছবির দৃশ্যাবলী সম্পূর্ণভাবেই এই শহর ও শহরতলীতে গ্রহণ করা হবে। ছবিটি তৈরী হবে সিনেমাস্কোপে। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে বাস্তবধর্মী ছবি তৈরীর প্রেরণা তিনি সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" থেকে গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল।

"অল দি রুমস্ আর ডার্ক" ছবির কাহিনীকার হিসাবে রবিন হোয়াইট প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। ছবি তৈরীর প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ ভারত ঘুরে গেছেন।

চিত্রনির্মাণে স্বাবলম্বনের প্রয়াস

চিত্রনির্মাণে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প কীভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এ নিয়ে শিল্পমহলের নেতৃবৃন্দ ও ভারত সরকারের মধ্যে কিছুকাল ধরে আলাপ-আলোচনা চলছিল। সম্প্রতি এই আলাপ-আলোচনা একটি কার্যকর ধাপে এসে পৌঁছেছে।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বম্বেতে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ ও চলচ্চিত্রশিল্পের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক আলোচনায় স্থির হয়, সরকার কর্তৃক চলচ্চিত্রশিল্পের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করা হবে। কমিটির সভ্যরা চিত্রনির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে ভারতের চিত্রশিল্প কীভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেবেন। প্রস্তাবিত এই কমিটি সম্প্রতি গঠিত হয়েছে।

কমিটিতে বোম্বাই চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরূপে রয়েছেন শ্রীমেহবুব খাঁ ও শ্রী বি এম টাটা। বাংলা চিত্রজগতের প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন শ্রীতপন সিংহ। শ্রীসিংহ বাদে একজন কলাকুশলীকেও কমিটিতে নেওয়া হবে। মাদ্রাজের চিত্র-শিল্পের পক্ষ থেকে আছেন শ্রী এস এস ভাসান এবং দক্ষিণ-ভারতের সিনে টেকনিসিয়ান্স এ্যাসোসিয়েশন-এর জনৈক প্রতিনিধি।

চিত্রনির্মাণের প্রয়োজনে যে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল অবশ্য প্রয়োজনীয় তার একটি তালিকা পেশ করার জন্য ভারত সরকার এই কমিটিকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্টুডিওতে সঙ্কট

এ বৎসরে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা যদি তিরিশের কোঠায় ওঠে তাহলে তার অর্ধ সংখ্যক ছবি ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে মুক্তির অপেক্ষা করছে। যেসব ছবি এখন নির্মীয়মাণ রয়েছে তাদের সংখ্যা সামান্য নয়। এ অবস্থায় নতুন ছবি শুরু করতে কারুরই বিশেষ গরজ নেই দেখা যাচ্ছে। ফলে স্টুডিওতে নতুন কাজের একান্তই অভাব।

কলকাতায় স্টুডিওর সংখ্যা দিন দিন ক্ষীয়মান। তার ওপর বর্তমানে আরো একটি স্টুডিওতে তালা পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত ১২ই জানুয়ারী থেকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর কর্মীরা চারমাসের বকেয়া বেতনের দাবীতে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন। শ্রম দপ্তরের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটির আশু প্রতিকার করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি।

ধর্মঘটকারী কর্মীরা সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিও রক্ষা কমিটি নামে একটি সংসদ গঠন করেছেন। সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার, অসিত চৌধুরী প্রভৃতি ফিল্মশিল্পের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি মণ্ডলীকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এই কমিটি। তাঁদের দাবী—বকেয়া বেতন শোধ, অসমাপ্ত ছবিগুলির সমাপ্তিকরণ এবং সমবায় প্রথায় কলাকুশলী-দের হাতে স্টুডিওর পরিচালনার ভার সমর্পণ।

রেনেসাঁস ফিল্মসের মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি "ঢেউয়ের পরে ঢেউ"-এর একটি দৃশ্যে দুই নবাগত শিল্পী সুহৃদ রায় ও শঙ্কর

নাট্যাভিনয়

সত্যজিৎ রায়ের ইস্টম্যান কলার ছবি "কাঞ্চনজঙ্ঘা"-র একটি দৃশ্যে পিতা ও পুত্রের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

অনুষ্ঠান সংবাদ

আগামী সোমবার (৫ই ফেব্রুয়ারী) স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের সভ্যরা রঙমহল মঞ্চে অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক "উদ্বাস্তকী"র অভিনয় করবেন। এটি একটি ব্যঙ্গ-নাট্য। হাস্যকৌতুকের ভেতর দিয়ে বর্তমান বাঙালী জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক এর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পরিষদের পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে অভিনয় করে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের একলকেই প্রায় এ-নাটকেও দেখা যাবে। তাছাড়া কয়েকজন নতুন শিল্পীও এতে আত্মপ্রকাশ করবেন। নাটকটি পরিচালনা করবেন নাট্যকার স্বয়ং।

• • •

হাওড়ার বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি স্থানীয় দুই প্রধান নাট্যশিল্পী শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীগণপতি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়দের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে যে দুটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করলেন তার মধ্যে রমেন লাহিড়ী রচিত "রূপসার তীরে" নাটকটি রচনা ও প্রয়োজনা উভয় দিক থেকেই প্রশংসিত হয়েছে। ষড়রিপুর প্রভাবকে পর্যুদস্ত করে মানুষ তখনই অমৃতের লাভ করতে পারে যখন সে অনাবিল ভালোবাসার আলোকে তার চিত্তকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে—এই তত্ত্বধর্মী কাব্যনাট্যটি যাদের অভিনয়ে সার্থক হয়ে ওঠে তাঁরা হলেন 'জীবন'রূপী বিভু ভট্টাচার্য, 'মরণ'রূপী বিশ্বনাথ আঢ্য ও ষড়রিপুর শিকার 'ক' 'খ' 'গ' এই তিনটি চরিত্রের অভিনেতাত্রয় রমেন লাহিড়ী, অশোক রায় ও সুধাময় লাহিড়ী। শৈলেশরঞ্জন রচিত 'মেঘলা আকাশ' নাটকটিও পরিচ্ছন্ন বক্তব্য ও সুঅভিনয়ের গুণে দর্শকসাধারণের চিত্ত জয় করে। বিশেষ করে এই নাটকের একমাত্র অভিনেত্রী বীণা সরকারের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেন প্রকাশ হালদার, গোপাল মাইতি, হারাধন বসু, লালমোহন ভাদুড়ী, অশোক রায়, সুধাময় লাহিড়ী ও রমেন লাহিড়ী।
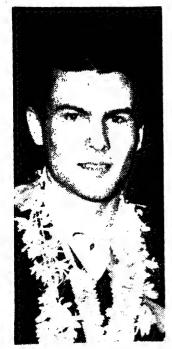
• • •

বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ কর্তৃক "ক্ষুধা" শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচিত হওয়ায় নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যকে গত শনিবার ২৭শে জানুয়ারী বিশ্বরূপায় পরিষদ কর্তৃক আহূত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে "মঞ্চমুগ্ধ" প্রদত্ত এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি কবিশেখর কালিদাস রায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমন্মথ রায়।

জার্মান অভিনেতা হরস্ট বুখোলজ "নাইন আওয়ার্স টু রাম" চিত্রে নাথুরাম গডসের ভূমিকায় অবতীর্ণ

যাদু-প্রদর্শনী

সম্প্রতি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তরুণ যাদুকর ডি সি দত্ত নতুন ধরণের কয়েকটি ম্যাজিক দেখিয়ে দর্শকদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করেন। প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন খেলার মধ্যে "জঙ্গল-রহস্য" নামক যাদুক্রীড়াটি সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল। করাত দিয়ে স্টেজের ওপর একটি মেয়েকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্যে
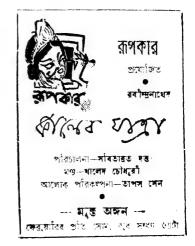
ফিল্ম এজ-এর "কুমারী মন"-এর একটি দৃশ্যে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

আজ হয়তো কোন নূতনত্বের চমক নেই। যাদুকর দত্ত ইলেকট্রিক করাতের বদলে সাধারণ হাতে-চালানো করাত ব্যবহার করে এই রোমহর্ষক খেলাটির বৈচিত্র্য সাধন করেছিলেন। স্টেজের ওপর একটি জীবন্ত মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ এবং সেই অবস্থায় তার চলাফেরা যাদুকর দত্তের আর একটি চমকপ্রদ খেলা। তাঁর ব্ল্যাক আর্টের খেলাগুলিও তারিফ করবার মত।

সমস্ত খেলাগুলি দেশী ধাঁচে পরিবেশন করে যাদুকর দত্ত বেশ খানিকটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। নিউ এম্পায়ারে প্রথম প্রদর্শনীতেই তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন তাতে সেখানে তাঁর ম্যাজিকের আসর আরো বসবে—এ আশা অনুচিত হবে না। তবে কয়েকটি প্রোগ্রাম পরিচালনায় আরো তৎপর হবার অবকাশ আছে।

ব্রিটেনের চলচ্চিত্র শিল্প

ব্রিটেনের চলচ্চিত্র শিল্পের নানা দিক আছে। কাহিনী চলচ্চিত্র ছাড়াও এই শিল্পে নির্মিত হচ্ছে প্রমাণচিত্র, বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং টেলিভিশনের জন্য নানা ধরনের চিত্র। ব্রিটেনে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ কাহিনী চিত্র দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে নির্মিত হচ্ছে, তার প্রায় দ্বিগুণ নির্মিত হচ্ছে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন টেলিভিশন কর্তৃক।

এ থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু জানতে হলে অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে কি ধরনের কাজ-কর্ম হচ্ছে তারও সন্ধান রাখা দরকার, যদিও আমরা জানি কাহিনী চিত্র সম্পর্কে যে ধরনের আগ্রহ সাধারণের মধ্যে লক্ষ করা যায়, ঠিক সেই ধরনের আগ্রহ এইসব চিত্র সম্পর্কে লক্ষ করা যায় না।

ব্রিটেনে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দুটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়—একটি হল নূতন ধরনের কাহিনী চিত্র যা তরুণ পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে এখন নির্মিত হচ্ছে, এবং নূতন ধরনের সচিত্র চিত্র যা প্রধানত টেলিভিশন কেন্দ্রগুলির উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে।

ব্রিটেনে কোন যুবক যদি চলচ্চিত্র শিল্পে প্রবেশ করতে চায়, তা হলে তাকে প্রথম স্থির করতে হবে, তার আগ্রহ মনস্তত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা, আবিষ্কার, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিশুদের জন্য অথবা বয়স্কদের জন্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা—কোন দিকে। কারণ উল্লিখিত সমস্ত বিষয়েই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে থাকে এবং সেজন্য আছে বহুরকমের প্রতিষ্ঠান।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে : বি-বি-সির উদ্যোগে দু' বৎসর ধরে নির্মিত হয়েছে সিমেননের মাইগ্রেট কাহিনীর (Simenon's Migret Stories) ওপর ভিত্তি করে কতকগুলি নূতন ধরনের চিত্র। স্বনামখ্যাত কাহিনী চিত্র পরিচালকরা কয়েকটি গোষ্ঠী গঠন করেছেন যাতে অবসর সময়ে তাঁরা টেলিভিশনের জন্য চিত্র নির্মাণ করতে পারেন। একটি বিশেষ ফিল্ম্ ইউনিট বিজ্ঞানী ডেভিড অ্যাটেনবরোর অধীনে নির্মাণ করছে টেলিভিশনের জন্য ভ্রমণ ও আবিষ্কার অভিযান সংক্রান্ত নানা ধরনের চিত্র। বব হোপ এবং বিং ক্রস্বি কাজ করছেন লণ্ডনের নিকটে শেপার্টন স্টুডিওয় "দি রোড টু হংকং" চিত্রে। জন অসবোর্ন-এর "দি এন্টারটেইনার" চিত্রের মঞ্চ ও চিত্র পরিচালক টনি রিচার্ডসন সম্প্রতি শেলাগ ডেলানির "এ টেস্ট অব হানি" নাটকটি চিত্রায়িত করেন। শেল অয়েল গ্রুপ গত বৎসর আফ্রিকার প্রধান প্রধান পীড়াগুলির ও সাম্প্রতিক বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান কিভাবে সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে একটি রঙিন চিত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে অনেক আছে, কিন্তু তাতে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রয়োজন উৎসাহ, প্রতিভা এবং কল্পনা-কুশলতা। এই তিনটি গুণ ছাড়া সাফল্য সম্ভব নয়।

চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির পথ খুব সহজ নয়। ব্রিটেনে গত কয়েক বৎসর বহু সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ হল টেলিভিশনের প্রতিযোগিতা এবং জনসাধারণের রুচির পরিবর্তন। কিন্তু টেলিভিশন অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় এবং বড় পর্দায় নাটকাভিনয় দেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলচ্চিত্র শীঘ্রই তার স্থান করে নিতে পারবে বলে এখন আশা করা যাচ্ছে।

ব্রিটেনে এখনও প্রায় ৩,০০০ সিনেমা রয়েছে। "স্যাটার্ডে নাইট অ্যাণ্ড সাণ্ডে মর্নিং"-এর ন্যায় ভাল ছবি এবং "ডক্টর ইন লাভ"-এর ন্যায় জনপ্রিয় ছবির আদর এখনও রয়েছে। এই ধরনের ছবির সমাদর কেবল ব্রিটেনে নয়, বৈদেশিক বাজারগুলিতেও লক্ষ করা যায়। অনেক সময় দেখা যায়, ব্রিটিশ চলচ্চিত্র ব্রিটেনের চেয়ে বিদেশে আদৃত হয়েছে বেশী।

ব্রিটেনে উপন্যাস, নাটক অথবা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যে রূপ-বিপ্লব লক্ষ করা যাচ্ছে তার কারণই হল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে বিপ্লব। এই বিপ্লবের সূচনা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। আমরা আমাদের পুরাতন সমাজব্যবস্থায় ক্লান্ত হয়ে উঠি এবং নূতন মূল্য এবং নূতন চিন্তাধারা গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠি। আমাদের এজন্য কিছুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হলেও এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় এবং তা সর্বক্ষেত্রে লক্ষ করা যেতে থাকে—নাটকে এবং উপন্যাসে এই বিপ্লব সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। নাটকের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব আসে জন অসবোর্ন, আর্নল্ড এবং শেলাগ ডেলানির ন্যায় লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব আসে জন বেইন এবং এলান সিলিটোর ন্যায় লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে।

এই শৈল্পিক জোয়ার সম্প্রতি এসে পৌঁছেছে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও।

সেন্সরশিপ ব্যবস্থার কঠোরতা কিছুটা শিথিল হওয়ায় চলচ্চিত্রের শিল্পগত পুনরুজ্জীবন অনেকটা সহজ হয়েছে সন্দেহ নেই। নূতন "এক্স" সার্টিফিকেট বাবস্থাধীনে বয়স্কদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত চিত্রগুলি অনুমোদন লাভ করছে; এই সকল চিত্র ১৬ বৎসরের কম বয়স্কদের দেখা নিষিদ্ধ। সেন্সরশিপের কঠোরতা আজ শিথিল যদি না হত তা হলে "স্যাটার্ডে নাইট অ্যাণ্ড সানডে মর্নিং", "এ টেস্ট অব হানি" এবং এমন কি "দি ট্রায়াল অব অস্কার ওয়াইল্ড" চিত্রের তির্যক সংলাপ থেকে দর্শকদের বঞ্চিত হতে হত।

যাঁরা আজ নূতন ধরনের চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা সকলেই প্রায় তরুণ; ত্রিশ বা চল্লিশের কোঠায় তাঁদের বয়স। এঁদের মধ্যে আছেন কারেল রীজ-এর ন্যায় পরিচালক যিনি গবেষণাকর্মী এবং চলচ্চিত্র সমালোচক এবং দলিল চিত্র নির্মাতা হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন; টনি রিচার্ড-সন—যিনি টেলিভিশনে এবং রঙ্গমঞ্চেও একসময় পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন; এবং জ্যাক ক্লেটন—যিনি ফিল্ম স্টুডিওর সঙ্গে বহুকাল ধরে যুক্ত আছেন এবং যিনি প্রথম "রুম অ্যাট দি টপ্" কাহিনী চিত্রের পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবন রূপায়ণ সম্পর্কে স্যার মাইকেল ব্যালকন প্রভৃতি প্রযোজকগণ লক্ষণীয়ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের চিত্র সম্পর্কে দর্শকদের আগ্রহও যথেষ্ট বলে মনে হয়। চিত্রগুলিতে সৌন্দর্য বা জীবনের সৌকুমার্যের চেয়ে ভাবের আন্তরিকতা এবং প্রকাশের সরলতাই বেশী মাত্রায় লক্ষ করা যায়।

মুভিটেক-এর "শিউলি বাড়ী"-র দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে উত্তরকুমার ও মিহির ভট্টাচার্য

চিঠিপত্র

চলচ্চিত্রগৃহের সমস্যা

মহাশয়,

রঙ্গজগৎ বিভাগে প্রকাশিত বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনাদের ও শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের আলোচনা পড়লাম। রাধামোহনবাবু বহু লোকের ভুল ধারণা যুক্তি দিয়ে ভেঙেছেন। তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশ করে পাঠকদের খুব উপকার করেছেন।

১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৭০টি চিত্রগৃহের মধ্যে ১৭টিতে কেবলমাত্র বাংলা ছবি দেখানো হত। এই প্রসঙ্গে রাধামোহনবাবু বলেছেন, "বর্তমান মরণাবর্ত হইতে বাংলা চলচ্চিত্র প্রয়াসকে টানিয়া তুলিতে একটি বিশেষ কর্মধারার প্রয়োজন।...এই বিশেষ কর্মের একটি হইতেছে আরো অনেক অধিক সংখ্যায় চিত্রগৃহ। তদুদ্দেশ্যে বর্তমানে যে সকল বাধা আছে তাহা অপসারণের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা।" কিন্তু তিনি বাধাগুলিকে অপসারণের জন্য বিস্তারিত কিছু আলোচনা করেননি। আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে কিছু জানাচ্ছি।

অধিক সংখ্যায় চিত্রগৃহ নির্মিত হলে সেখানে যে বাংলা ছবি স্থান পাবে তা জোর করে বলা যায় না। সেটা নির্ভর করে চিত্রগৃহের মালিক ও চিত্র-পরিবেশকদের ওপর। শহরের কয়েকটি বড় চিত্রগৃহ ছাড়া সমস্ত চিত্রগৃহই সম্পূর্ণভাবে চিত্র-পরিবেশকদের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশকরা ২।৩টি বাংলা ছবি প্রদর্শনীর পর হিন্দী অথবা অন্য ছবি প্রদর্শনীর জন্য পাঠান। এসব চিত্রগৃহে পুরানো ভাল বাংলা ছবি অথবা নতুন বাংলা ছবি পাঠালে দর্শকের অভাব হয় না।

তা ছাড়া কলকাতার বাইরে সমস্ত চিত্রগৃহে রবিবারে মর্নিং শোতে হিন্দী ছবি দেখানো হয়। তাই দর্শকরা (বিশেষত চাকুরে) বাধ্য হয়ে হিন্দী ছবি দেখতে যান।

দেখে দুঃখ হয় যখন একটি নতুন বাংলা ছবি মাত্র ৩।৪টি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। তাই আমার অনুরোধ, চিত্রগৃহের সংখ্যা বাড়াবার আগে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের চিত্রগৃহের মালিকদের ও চিত্র-পরিবেশকদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি প্রযোজক, চিত্রগৃহের মালিক ও চিত্র পরিবেশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতি

প্রণবানন্দ গুহ,
ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগনা।

ভারতের ত্রয়োদশ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অন্যান্য গুণীজনদের সঙ্গে এবার ৪ জন খেলোয়াড় ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্বের নিদর্শন হিসাবে সরকারের কাছ থেকে 'পদ্মশ্রী' খেতাব পেয়েছেন। এ'রা হচ্ছেন অতীত দিনের কীর্তিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রাবার জয়ী ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগর ও ভারতের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণন।

এ বছরের ৪ জনকে নিয়ে এ পর্যন্ত ১৫ জন খেলোয়াড় ভারত সরকারের কাছ থেকে খেতাব লাভ করলেন। এই ১৫ জনের মধ্যে ছয়জন ক্রিকেট খেলোয়াড়, তিনজন হকি বিশারদ, দুইজন সাঁতারু, একজন পোলো, একজন টেনিস ও একজন ফুটবল খেলোয়াড় এবং একজন অ্যাথলীট। ১৫ জনের মধ্যে ৪ জন পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ' এবং ১১ জন পেয়েছেন 'পদ্মশ্রী' খেতাব। নিচে খেতাবপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হলঃ—

'পদ্মভূষণ'

সি কে নাইডু (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
বিজয়নগরের মহারাজকুমার (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
ধ্যান চাঁদ (হকি খেলোয়াড়)
রাও রাজা হনুৎ সিং (পোলো খেলোয়াড়)

'পদ্মশ্রী'

বলবীর সিং (হকি খেলোয়াড়)
মিহির সেন (ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু)
মিলখা সিং (অ্যাথলীট)
'বাবু' (হকি খেলোয়াড়)
বিজয় হাজারে (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
জেসু প্যাটেল (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
আরতি সাহা (ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী)
গোষ্ঠ পাল (ফুটবল খেলোয়াড়)
নরী কণ্ট্রাক্টর (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
পলি উমরিগর (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
আর কৃষ্ণন (টেনিস খেলোয়াড়)

* * *

ভারতের কাছে 'রাবার' হারার পর ইংলণ্ড দল ঢাকায় গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা 'ড্র' করে এখন করাচীতে তৃতীয় টেস্ট খেলার তোড়জোড় করছে। ভারত সফরের আগে লাহোরে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড ৫ উইকেটে জয়লাভ করেছিল। সুতরাং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এখনো তাদের 'রাবার' লাভের সম্ভাবনা। ফেব্রুয়ারীর ২ তারিখ থেকে আরম্ভ হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে ইংলণ্ডের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট খেলা। বলা বাহুল্য, এ খেলায় পাকিস্তান জিততে না পারলে ইংলণ্ডই রাবার পাবে।

একলব্য

ঢাকার টেস্টে চারটি সেঞ্চুরী হলেও পাকিস্তান এবং ইংলণ্ড কোন দলের খেলারই সুখ্যাতি করা চলে না। বিশেষ করে ভারতে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় ক্রিকেটের পর ঢাকা টেস্টের মন্থরতা বেশী করে চোখে পড়েছে। চারটি সেঞ্চুরী ও দুই দলের প্রথম ইনিংসের বড় রানের দিকে চোখ পড়লে আপাতদৃষ্টিতে খেলাটিকে মন্থর খেলা বলে মনে হবে না। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে চারটি সেঞ্চুরীর দুটি সেঞ্চুরী করেছেন একা হানিফ মহম্মদ। বাকি দুটির একটি জাভেদ বার্কি আর একটি জিওফ পুলার। বাকি খেলোয়াড়দের মধ্যে পাকিস্তানের সয়িদ আমেদ ও আলীমুদ্দিন এবং ইংলণ্ডের বব বারবার ও কেন ব্যারিংটন ভাল রান করেছেন। আর সবাই দিয়েছেন রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয়। সুতরাং ঢাকা টেস্ট অল্পের সাফল্য এবং বহুর ব্যর্থতায় চিহ্নিত। যাঁরা ব্যাটিংয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরাও রান করতে এত বেশী সময় নিয়েছেন যে, দর্শকরা খেলা দেখে মোটেই তৃপ্তি পাননি। প্রথম টেস্টে পরাজিত পাকিস্তানের জয়লাভের প্রচেষ্টায় এ খেলায় অনেক দ্রুত রান সংগ্রহ করা উচিত ছিল।

টসে জেতবার পর প্রথম দিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় ২টি উইকেট হারিয়ে পাকিস্তানের মাত্র ১৭৫ রান সংগ্রহ মোটেই প্রশংসার কথা নয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পর্যন্ত খেলার মধ্যে কোনই প্রাণ ছিল না। মধ্যাহ্ন ভোজের পর সয়িদ আমেদ অবশ্য মেরে খেলতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর ৬৯ রান দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দান করে। হানিফ মহম্মদ সারাদিন ব্যাটিংয়ের পর ৬৪ রান করে নট আউট থাকেন, সঙ্গে নট আউট থাকেন জাভেদ বার্কি ৩০ রান করে।

প্রয়োজন মত মন্থর ক্রিকেটেরও আদর আছে। কিন্তু দুটি উইকেট পড়ার পর হানিফের এত মন্থর খেলার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। বিশ্ব ক্রিকেটে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে যে হানিফের নাম উঠেছিল তার পক্ষে এই ক্রীড়ারীতি শোভনও নয়।

যাই হক দ্বিতীয় দিন পাকিস্তান ৭ উইকেটে ৩৯৩ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করবার পর ইংলণ্ড কোন উইকেট না হারিয়ে সংগ্রহ করে ৫৭ রান। বলা বাহুল্য, হানিফের এইদিন শত রান পূরে যাওয়ায় তিনি সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরীর অধিকারী হন। আর জাভেদ বার্কি, যিনি লাহোর টেস্টে ১৩৮ রান করেছিলেন, তিনি এ খেলাতেও ১৪০ রান করে পর পর দুটি টেস্টেই সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। এইদিনের আর একটি ঘটনাও উল্লেখ করার মত। ইংলণ্ডের নাটা স্পিন বোলার টনি লকের এইদিন টেস্ট খেলার দেড়শত উইকেট পূর্ণ হয়।

ইংলণ্ড দলের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার ও বব বারবার দ্বিতীয় দিনের শেষে বেশ মারবার মন নিয়েই খেলা আরম্ভ করেছিলেন। তৃতীয় দিনের শেষে শুধু বারবারের উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ড সংগ্রহ করে ৩৩৩ রান। জিওফ পুলার ১৬০ রান করেও নট আউট থাকেন।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলায় ইংলণ্ডের ব্যাটিং বিপর্যয় দেখা যায়। যাঁরা ১ উইকেটে ৩৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল তাঁদের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৪৩৯ রানে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ২৯ রান সমেত বাকি ৯টি উইকেটে ইংলণ্ড চতুর্থ দিনে সংগ্রহ করে মাত্র ১০৬ রান। প্রত্যুত্তরে দিনের শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে পাকিস্তান ২৬ রান করলে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয়।

তৃতীয় দিন থেকেই খেলার আকর্ষণ কমে আসছিল। চতুর্থ দিনের শেষে আর কোনই আকর্ষণ থাকে না। খেলাটির ফলাফল যে অমীমাংসিত থাকবে এ বিষয় সবাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে নেয়।

তবুও শেষ দিন এক সময়ে পাকিস্তান বেশ একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। হানিফ এ ইনিংসেও সেঞ্চুরী করেন, কিন্তু পাকিস্তানের শেষ চটি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৮৯ রানের মধ্যে। যখন পাকিস্তানের ইনিংস ২১৬ রানে শেষ হয় তখন খেলা শেষ হবার সামান্য সময় বাকী। তার মধ্যে ইংলণ্ড কোন উইকেট না হারিয়ে ৩৮ রান করলে খেলার উপর যবনিকা পড়ে।

ঢাকা মাঠের টেস্ট হিসাবে এ টেস্ট নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত কোনদিন ঢাকা মাঠে এত বেশী রান হয়নি। ১৯৫৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ২৫৭ রানই ছিল এ মাঠের বড় ইনিংস। এবার প্রথমে পাকিস্তান ৩৯৩ রান করে সে রেকর্ড ম্লান করে দেয়, পরে ইংলণ্ড ম্লান করে পাকিস্তানের ইনিংস ৪৩৯ রান করে। দ্বিতীয়ত নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হানিফের ১০৩ রানই ছিল এ মাঠের ব্যক্তিগত বড় রান। এবার হানিফ নিজেই ১১১ ও ১০৪ রান করেছেন, বার্কি করেছেন ১৪০, সবচেয়ে বেশী রান করেছেন জিওফ পুলার ১৬৫। তৃতীয়ত এর আগে এখানে যে চারটি টেস্ট খেলা হয়েছে তার কোন টেস্টেই চারটি সেঞ্চুরী হয়নি। আর দুই ইনিংসে একজনের পক্ষে সেঞ্চুরী তো সম্ভব হয়নি।

হানিফ মহম্মদ এই টেস্টে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করায় তাঁর অষ্টম সেঞ্চুরী পূর্ণ হয়েছে। এর আগে তিনি ভারতের ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দুবার করে এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে একবার করে সেঞ্চুরী করেছেন। এবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একই খেলায় দুটি সেঞ্চুরী করলেন। টেস্ট খেলায় এ এক অনন্য সম্মান। দুই ইনিংসে এর আগে আর যে ১৭ জন সেঞ্চুরী করেছেন, টেস্টের ফলাফলের শেষে তাঁদের তালিকাও প্রকাশ করা হল:—

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) ৩৯৩ (জাভেদ বার্কি ১৪০, হানিফ মহম্মদ ১১১, সঁয়দ আমেদ ৬৯, মুস্তাক মহম্মদ ২৬; টনি লক ১৫৫ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৪৩৯ (জিওফ পুলার ১৬৫, বব বারবার ৮৬, কেন ব্যারিংটন ৮৪; আন্টাও ডিসুজা ৯৪ রানে ৪ উইকেট, সুজাউদ্দিন ৭৯ রানে ৩ উইকেট)

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস ২১৬ (হানিফ মহম্মদ ১০৪, আলিমুদ্দিন ৫০; ডেভিড এলেন ৩০ রানে ৫ উইকেট, টনি লক ৭০ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—কোন উইকেট না হারিয়ে ৩৮।

[খেলা অমীমাংসিত]

দুই দলের পক্ষে যাঁরা খেলেছেন:—

পাকিস্তান—ইমতিয়াজ আমেদ (অধিনায়ক), হানিফ মহম্মদ, সঈদ আমেদ, আলিমুদ্দিন, সুজাউদ্দিন, জাভেদ বার্কি, মুস্তাক মহম্মদ, ইন্তিখাব আলম, মহম্মদ মুনাফ, নাসিমুল গনি ও এ ডিসুজা।

দ্বাদশ ব্যক্তি—আফাক হোসেন।

ইংলণ্ড—টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক), মাইক স্মিথ, ডেভিড এলেন, বব বারবার, কেন ব্যারিংটন, জেফ্রী মাইট, টনি লক, মিলম্যান, পিটার পারফিট, জিওফ পুলার ও রিচার্ডসন। দ্বাদশ ব্যক্তি—রাসেল।

খেলার তারিখ: ১৯শে, ২০শে, ২১শে, ২৩শে ও ২৪শে জানুয়ারী '৬২।

টেস্টের দুই ইনিংসে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন

ঢাকায় পাকিস্তান ও ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্টে হানিফ মহম্মদের দুই ইনিংসের সেঞ্চুরী নিয়ে এ পর্যন্ত টেস্ট খেলার দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছেন মোট ১৮ জন ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্লাইড ওয়ালকটের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ তিনি একই সিরিজে দুটি টেস্ট খেলায় দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন, আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ হেডলী ও ইংলণ্ডের এইচ সাটক্লিফ জীবনে দুবার এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। নীচে ১৮ জন খেলোয়াড়ের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরীর খতিয়ান দেওয়া হল:—

ডরিউ বার্ডসলে (অস্ট্রেলিয়া) ১৩৬ ও ১৩০ বনাম ইংলণ্ড, পঞ্চম টেস্ট (ওভাল-১৯০৯)

এ সি রাসেল (ইংলণ্ড) ১৪০ ও ১১১ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, পঞ্চম টেস্ট (ডারবান ১৯২২—২৩)

এইচ সাটক্লিফ (ইংলণ্ড) ১৭৬ ও ১২৭ বনাম অস্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় টেস্ট (মেলবোর্ন—১৯২৪—২৫) এবং ১০৪ ও ১০৯* বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (ওভাল ১৯২৯)

ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড) ১১৯* ও ১৭৭ বনাম অস্ট্রেলিয়া—চতুর্থ টেস্ট, (এডিলেড—১৯২৮—২৯)

জর্জ হেডলী (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১১৪ ও ১১২ বনাম ইংলণ্ড তৃতীয় টেস্ট (জর্জটাউন ১৯২৯—৩০) এবং ১০৬ ও ১০৭ বনাম ইংলণ্ড প্রথম টেস্ট (লর্ডস ১৯৩৯)

হানিফ মহম্মদ

ই পেন্টার (ইংলণ্ড) ১১৭ ও ১০০ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট (জোহানেসবার্গ—১৯৩৮—৩৯)

ডেনিস কম্পটন (ইংলণ্ড) ১৪৭ ও ১০৩* বনাম অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্ট (এডিলেড ১৯৪৬—৪৭)

আর্থার মোরিস (অস্ট্রেলিয়া) ১২২ ও ১২৪* বনাম ইংলণ্ড, চতুর্থ টেস্ট (এডিলেড ১৯৪৬—৪৭)

এ মেলভিল (দক্ষিণ আফ্রিকা) ১৮৯ ও ১০৪* বনাম ইংলণ্ড, প্রথম টেস্ট (নটিংহাম ১৯৪৭)

বি মিচেল (দক্ষিণ আফ্রিকা) ১২০ ও ১৮৯* বনাম ইংলণ্ড, পঞ্চম টেস্ট (ওভাল ১৯৪৭)

ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ১৩২ ও ১২৭* বনাম ভারত চতুর্থ টেস্ট (মেলবোর্ন ১৯৪৭—৪৮)

বিজয় হাজারে (ভারত) ১১৬ ও ১৪৫ বনাম অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্ট (এডিলেড ১৯৪৭—৪৮)

এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১৬২ ও ১০১ বনাম ভারত, তৃতীয় টেস্ট (কলকাতা—১৯৪৮—৪৯)

জে এ আর মরোনী (অস্ট্রেলিয়া) ১১৮ ও ১০১* বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, চতুর্থ টেস্ট, (জোহানেসবার্গ ১৯৪৯—৫০)

ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১২৬ ও ১১০ বনাম অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট (পোর্ট অব স্পেন ১৯৫৫) এবং ১৫৫ ও ১১০ বনাম অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্ট (কিংস্টন ১৯৫৫)

গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১২৫ ও ১০৯* বনাম পাকিস্তান চতুর্থ টেস্ট (জর্জটাউন ১৯৫৮)

রোহন কানহাই (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১১৭ ও ১১৫ বনাম অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্ট (এডিলেড ১৯৬০—৬১)

হানিফ মহম্মদ পাকিস্তান (১১১ ও ১০৪ বনাম ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেস্ট (ঢাকা ১৯৬১—৬২)

(* তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক)

• • •

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত অন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি মাঠে শেষ হয়ে গেছে। ছেলেদের মধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৫৯ পয়েণ্ট পেয়ে এবং মেয়েদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন ৩৫ পয়েণ্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী হয়েছেন। ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী হয়েছেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ডি বীর, ছাত্রীদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের কুমারী জয়া ভট্টাচার্য।

এবার ছাত্রীদের মধ্যে কেউ নতুন রেকর্ড করতে না পারলেও ছাত্রদের ছয়টি বিষয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করেছেন ডি বীর তাঁর নিজের পুরনো রেকর্ডকেই ম্লান করে। ৮০০ মিটার দৌড়ে সেণ্ট জেভিয়ার্সের পি সি হাউইয়েরও একই কৃতিত্ব। অর্থাৎ তিনিও নিজের রেকর্ড ম্লান করে নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। ডিসকাস ছোড়াতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এখানেও সেণ্ট জেভিয়ার্সের ডি নগ তাঁর আগের রেকর্ডের উন্নতি করেছেন। বাকি দুটি রেকর্ড হয়েছে উঁচু লাফ ও দীর্ঘ লাফে। দুজনেরই নতুন কৃতিত্ব। উঁচু লাফে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের বি তালুকদার জি কে মেননের আগের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। দীর্ঘ লাফেও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের শিশুদেব মুখার্জি সিটি

কলেজের এস মুখার্জির রেকর্ড অতিক্রম করেছেন।

ছাত্রীদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের কুমারী জয়া ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। জয়া ৫০ মিটার, ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়, ৮০ মিটার হার্ডল এবং দীর্ঘ লাফে প্রথম স্থান অধিকার করা ছাড়াও ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড়েও বিজয়ী ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের পুরস্কারের অংশীদার। সুতরাং জয়ার হাতেই গিয়েছে ছয়টি প্রথম পুরস্কার।

জয়ার সংগে আর একটি মেয়ের কথাও উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রী, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। বাদকুল্লায় বাড়ি। নাম নমিতা সান্যাল। সত্যিই ন্যাচারাল অ্যাথলীট। অ্যাথলীটের সহজাত গুণ রয়েছে নমিতার মধ্যে। অ্যাথলেটিকসের উন্নত শিক্ষা বিশেষ কিছু পায়নি। কিন্তু একাধিক বিষয়ে নমিতা দিয়েছে কৃতিত্বের পরিচয়। নমিতাও ছয়টি পুরস্কারের অধিকারিণী। উঁচু লাফ ও ডিসকাস ছোঁড়ায় প্রথম, ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়, ১০০ মিটার দৌড় ও দীর্ঘ লাফে তৃতীয়, রিলে রেসে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ৪ জনের একজন। প্রধানত নমিতা সান্যালের কৃতিত্বে কৃষ্ণনগর কলেজের স্থান কলেজ চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের পরে।

আন্ত কলেজ অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের আর এক নাম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৩৫টি কলেজের আড়াইশো ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এই স্পোর্টস প্রতিযোগিতার দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পোর্টস শেষে ছাত্রদের উচ্ছৃংখল ও অশোভন আচরণের মধ্যে যেভাবে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে গেছে সেটা খুবই দুঃখের বিষয়।

জিওফ পুলার

৪×১০০ মিটার রিলে রেসের পর থেকেই এই গোলমালের সূচনা হয়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্ররা সমস্বরে দাবী করে রিলে রেসের বিচারে ভুল হয়েছে। বিচারকদের বিচারে রিলেতে প্রথম স্থান অধিকার করে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ অধিকার করে দ্বিতীয় স্থান, তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয় আশুতোষ কলেজ।

কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের দাবী আশুতোষ কলেজকে জোর করে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে, তারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বিচারকদের কেউই এ দাবী স্বীকার করেন না। এমন কি আশুতোষ কলেজের খেলাধুলার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকও স্বীকার করেন তাঁর কলেজ রিলেতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

তবু মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের দাবীর কারণ এই ফলাফলে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ রিলেতে তৃতীয় স্থান অধিকার করলে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজই চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী হত।

মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্রদের ধৈর্যচ্যুতির আরও কারণ, বিগত দু' বছরও নাকি রিলে রেসের ভুল বিচারে তারা পয়েণ্টের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যাই হক খেলাধুলার বিষয়ে বিচারে ভুল হওয়াও যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমন ছাত্রদের অশোভনীয় আচরণ এবং নিয়মানুবর্তিতার অভাবের পরিচয় দেওয়াও উচিত নয়। প্রতিবাদ করারও একটা বিধি আছে। সে ক্ষেত্রে উচ্ছৃংখল আচরণ নিন্দনীয়, বিশেষ করে ছাত্রদের পক্ষে। ক্রীড়াক্ষেত্র শুধু দৌড়ঝাঁপের স্থান নয়, শিক্ষাক্ষেত্রের মতই সেটা পবিত্র অংগন। সেখান থেকেও শিক্ষা নেবার এবং সেখানে শিক্ষা দেবার অনেক কিছু আছে।

মুকুল

মায়া দে (গাঙ্গুলী)

১৯৪০ সাল। উনিশ কুড়ি বছরের একটি তন্বী মেয়ে হাফ প্যাণ্ট পরে সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে ঘুরতে অবলীলাক্রমে বংগোপসাগরের উত্তাল তরংগমালার মধ্য দিয়ে আধমাইলখানেক সাঁতার কেটে ঢেউ ভাংগতে ভাংগতে আবার কূলে ফিরে এল।

প্রথিতযশা সাঁতারু যেটি করলে সংবাদপত্রের খোরাক হত, কাগজে কাগজে ছবি বেরোত, একটি অজানা বাঙালী মেয়ের সে কৃতিত্ব অনেকের কাছে অজানা রয়ে গেল। পুরীর সমুদ্র সৈকতে মায়া দে-র সাঁতার কাটার সেই স্মৃতি আজো আমার চোখে ভাসছে।

মায়া দে তখন ছিলেন বেথুন কলেজ ও স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস।

তারপর মায়া দেকে দেখলাম জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর (ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) প্রথম 'ব্যাচের' মেয়ে হিসাবে। ১৯৪৯ সালে তার কাঁধে একটি তারা—সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট। ১৯৫২ সালে কাঁধে উঠলো দু'টি তারা হলো লেফটেন্যাণ্ট। ১৯৫৭ সালে তিনটি তারার অধিকারিণী। মায়া দে (গাংগুলী) এখন ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের ক্যাপ্টেন।

তারকা চিহ্ন শুধু অংগেই শোভা পায়নি। লেখাপড়ার কৃতিত্বের জন্যও ওর খাতায় আছে তারকা চিহ্ন। ওর শিশুজীবনের বিদ্যাপীঠ ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস স্কুলের নিয়ম ছিল, যে মেয়ে লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেবে তার প্রমোশন কার্ডে থাকবে তারকা চিহ্ন। ক্লাশ সেভেন-এর প্রমোশন কার্ডে দুটো সোনার তারকা চিহ্ন থাকায় মায়া দে-র এক ক্লাস ডিংগিয়ে ক্লাস নাইনে প্রমোশন। ম্যাট্রিকে প্রথম ডিভিশনের সংগে ভূগোলে লেটার। আই-এ এবং বি-এ পাস প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী হিসাবে এবং কৃতিত্বের সংগে।

ক্রীড়াপটু মেয়ে বললে হয়তো ঠিক বলা হবে না। বলা উচিত খেলাপ্রিয় মেয়ে। তার চেয়েও জুৎসই কথা হবে খেলাধুলার পোক্ত পরিচালিকা। ব্যবহারিক শিক্ষা, পুঁথিগত বিদ্যা এবং হাতে কলমে কাজের পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাঙলার স্বনামধন্যা ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস।

যখন বেথুন কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস ছিলেন তখন, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত উপর্যুপরি ৪ বছর উইমেনস স্পোর্টস ফেডারেশন পরিচালিত কলেজ স্পোর্টসে বেথুন কলেজ চ্যাম্পিয়ান। যখন বেথুন কলেজ থেকে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে গেলেন তখন ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত উপর্যুপরি ছ' বছর চ্যাম্পিয়ন লেডি ব্রাবোর্ন। সুতরাং পরিচালনার কৃতিত্ব আছে বৈকি। লেডি ব্রাবোর্ন থেকে মায়া দে (গাংগুলী) এই জানুয়ারীতেই আবার ফিরে এসেছেন বেথুনে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মিসেস মায়া দে (গাঙ্গুলী)

নিজে সবরকমের খেলাধুলো করেছেন। সাঁতারের কথা আগেই বলেছি। টেনি-কোয়েট, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, অ্যাথ-লেটিক স্পোর্টস সব কিছুতেই বেশ কিছু দখল আছে। স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় হাউস সিস্টেমের খেলায় টেনিকোয়েটের বিজয়িনী ও বাস্কেটবলে স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী দলের অন্যতমা। এবং বাস্কেটবলকে কেন্দ্র করেই ক্রীড়াজীবনের সূচনা।

১৯৩৬ সাল। ম্যাট্রিক টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আগে লা-মার্টিনিয়ার স্কুলকে হারিয়ে ইউ-নাইটেড মিশনারী স্কুলের যে টীম বাস্কেট-বলের স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ পায় মায়া দে ছিলেন সেই দলের খাটি প্লেয়ার সবচেয়ে খ্যাতনাম্নী মেয়ে। মায়া দে-র খেলার উন্নত ছলাকলা দেখে মিস বার্টন ওকে তাঁর ডিপ্লোমা কোর্সে যোগ দিতে আহ্বান করেন। মিস বার্টন ছিলেন বাংলা সরকারের মেয়ে স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক-ট্রেস। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ওয়াই ডব্লিউ সি এ-তে মেয়েদের খেলাধুলোর চর্চার জন্য প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়। মায়া দে প্রথম গ্রেডের ডিপ্লোমা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ফিজিকাল ইনস্ট্রাকট্রেস হিসেবে চাকরি নেন বেথুন কলেজ ও স্কুলে। ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম গ্রুপের আর তিনজন বাঙালী মেয়ের মধ্যে হেমলতা সরকার একজন ইংরেজকে বিয়ে করে খেলাধুলোর চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন, সরলা চক্রবর্তী এখন ইউনিভার-সিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেডি হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সাধনা বসু জলপাইগুড়ি স্কুলের অ্যাসিস্টেন্ট হেড মিস্ট্রেস।

ডিপ্লোমা কোর্সে ওদের পড়তে হয়েছে—(১) থিওরী অব গেমস, (২) থিওরী অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, (৩) থিওরী অব সুইমিং, (৪) হিস্ট্রি অব ফিজিক্যাল এডুকে-শন, (৫) অ্যানাটমি ও (৬) হাইজিন। হাতে কলমে করতে হয়েছে জিমন্যাস্টিকস, মাইনর ও মেজর গেমস, অ্যাথলেটিক, সুইমিং ও ধনুর্বিদ্যা ও ফার্স্ট এড।

এ তো গেল খেলার কথা। ১৯৪৯ সালে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য মেয়েদের কাছে যখন প্রথম ডাক এল তখন আর দুটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে মায়া দে সাড়া দিলেন সে ডাকে। অপর দুজন ইন্দিরা দত্ত ও নীলিমা সিংহ। ইন্দিরা দত্ত এখন লেডি ব্রাবোর্নের ফিল-সফির অধ্যাপিকা, নীলিমা সিংহ ঐ কলেজেরই বোটানীর ডিমনেস্ট্রেটর।

দিল্লিতে আরম্ভ হল আবার শিক্ষা। এবার লড়াইয়ের কাজকর্ম। বন্দুক চালনা, ফিজিক্যাল ট্রেনিং, স্কোয়াড ড্রিল, টেলি-ফোন এক্সচেঞ্জ পরিচালনা। ওয়ারলেস অপারেটিং, সাংকেতিক পরিভাষা শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে হাসপাতালে রোগীদের শয্যা পাতা পর্যন্ত।

তারপর মায়া দে এন সি সি'র কত ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন, কত প্যারেড চালিত করেছেন তার হিসাব নিকাশ নেই। হুগলীর সাইগাছি, রাঁচির দীপাতলা, দার্জিলিং-এর দরবার হল, নামকুম, ব্যারাক-পুর, আগ্রা যেখানেই এন সি সি'র বার্ষিক শিবির বসেছে সেখানেই মায়া দে মেয়েদের কমান্ডার। তিন শো থেকে পাঁচশ মেয়ের পরিচালনার ভার ওঁর উপর। এবং সেই পরিচালিকা হিসাবে সবাই সুনাম। শুধু ১৩ বছর রামগড় ক্যাম্পে উনি যোগ দেননি। কে জানে, ওঁর অনুপস্থিতির ফলেই 'রামগড়' মহিলা সমর শিক্ষার্থীদের ক্যাম্প জীবনের এক কালো অভিজ্ঞতা কি না!

ক্যাম্প কমান্ডার হিসাবে জোগাতার পুরস্কারও পেয়েছেন মায়া দে। ১৯৫৪ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দিল্লিতে ১৫ দিনের জন্য এন সি সি-র যে ক্যাম্প বসেছিল, সেই ক্যাম্পে সর্বশ্রেষ্ঠ দল হিসাবে বাঙলা দল পায় শ্রেষ্ঠ দলের 'ব্যানার'। ছেলে মেয়েদের চালচলন, কথা-বার্তা, পোশাক-আশাক, ভদ্রতা, শিষ্টাচার নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের যাচাইয়ের পর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত বাঙলা আর এই 'ব্যানার' ঘরে আনতে পারেনি, এক মায়া দে ছাড়া।

হুগলীর মেয়ে। পাণ্ডুয়ার কাছাকাছি [illegible] দাসপুরে পৈত্রিক বাড়ি। বাবা ছিলেন যোগেন্দ্র দে। বাবার মৃত্যুর পর মা শিক্ষিকার চাকরী নেন বর্ধমান মিশনারী গার্লস স্কুলে। কিন্তু মায়া দের স্কুল জীবনের সূচনা হয় কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস স্কুলে। এখন বিধবা মা ও স্বামী অনন্তকুমার গাঙ্গুলীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার।

এন সি সি'র ক্যাপ্টেন মিসেস মায়া দে (গাঙ্গুলী)

খেলাধুলোই জীবনের প্রধান ব্রত। নিজের জীবনের মতই মনে করেন খেলা ধুলায় বড় হবার জন্য সাধনা ও সংযম একান্ত প্রয়োজন।

মায়া দের মতে কলেজেই হোক, স্কুলেই হোক আর ক্লাবেই হোক, যদি উপর থেকে আরম্ভ করে নীচে পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি খেলাধুলোকে হৃদয় দিয়ে ভাল না বাসে তবে সে প্রতিষ্ঠানের কোন বড় সাফল্য সম্ভব নয়।

দেশী সংবাদ

২২শে জানুয়ারী—আজ সকালে সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে, শিলং হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা কেন্দ্রের নিকটে একটি বিস্ফোরণের ফলে ঘটনাস্থলে ৫জন শ্রমিক নিহত ও আরও ১১জন আহত হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর দমবন্ধ-ভাবে অত্যাচার চালাইবার জন্য পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর লোককে উত্তেজিত এবং প্ররোচিত করিবার কার্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

২৩শে জানুয়ারী—অদ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৬তম জয়ন্তী উপলক্ষে মহানগরী কলিকাতা যেন উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠে। প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা ছাড়াও নগরীর বিভিন্ন অংশে সকাল সন্ধ্যায় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজীর গৌরবদীপ্ত জীবনের আলোচনা হয়।

আজ নয়াদিল্লির ওয়াকিবহাল মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট শ্রী কেনেডি মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রী জন কেনেথ গলব্রেথের মারফত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর নিকট এক মৌখিক বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

২৪শে জানুয়ারী—কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে সালিশীর কোন প্রস্তাবে ভারত সরকার সম্ভবত রাজী হইবেন না। প্রেসিডেন্ট শ্রীকেনেডী মার্কিন সালিশীর প্রস্তাব করিয়াছেন। নয়াদিল্লির সরকারীমহল হইতে এই সংবাদের কোন সমর্থন না পাওয়া গেলেও সংবাদে জানা গিয়াছে যে, তিনি ভারত ও পাকিস্তানের নিকট এই ধরনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুগোশ্লাভিয়ার নিকট হইতে ২০০টি গভীর নলকূপ ক্রয় করিতেছেন। এই দুই শত নলকূপের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা যাইবে। নলকূপগুলির জন্য মোট দাম পড়িবে প্রায় দুই কোটি টাকা।

কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে কয়েকজন সচিব আছেন ভারত সরকার তাঁহাদিগকে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে সকল অঞ্চল আছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে মাঝে মাঝে পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৫শে জানুয়ারী—আসাম সরকার অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেডকে তৈল উত্তোলনের লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই হেতু আসামে তৈল নিষ্কাশনের কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ এক বছর পিছাইয়া গিয়াছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ৩জনকে পদ্মবিভূষণ, ২৭জনকে পদ্মভূষণ ও ২৫জনকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন। এই বৎসর কেহ ভারতরত্ন সম্মান লাভ করেন নাই।

অদ্য কলিকাতায় একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় সরকারের কয়লাখনি সংক্রান্ত নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ডাঃ রায় বলেন যে, এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আসল কাজ ব্যাহত করিবার নীতি।

২৬শে জানুয়ারী—দেশের বিভিন্ন স্থানে

বিপুল উৎসাহে আজ ত্রয়োদশ প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কোন কোন কেন্দ্রে আবহাওয়া খারাপ ছিল এবং সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। কিন্তু এজন্য উৎসবে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নাই।

অদ্য প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে জাতীয় পতাকাটির নীচে দাঁড়াইয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সেনা ও পুলিস বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন সেই পতাকাটি উল্টা করিয়া টাঙানো হইয়াছিল।

২৭শে জানুয়ারী—প্রয়োজনীয়তা এবং সামর্থ্য থাকিলে রাজ্য সরকারগুলিকে জাতীয় কয়লা উত্তোলন কাউন্সিলের সহযোগিতায় অথবা পৃথকভাবে খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া উচিত। অদ্য কলিকাতায় কয়লা উত্তোলন এবং সেই নানা সমস্যা সংক্রান্ত তিন-দিনব্যাপী আন্তঃ রাজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিকিমের মহারাজকুমার গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, নেপাল সীমান্তে বিপুল সংখ্যক চীনা সেনা সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের আঁতাতের বাঁধন যে ক্রমেই আলগা হইয়া আসিতেছে, নয়াদিল্লির কূটনৈতিক মহলের নজর তাহা এড়ায় নাই।

২৮শে জানুয়ারী—গত কয়েক সপ্তাহকাল পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীর যুদ্ধবিরতি রেখার অপরদিক ও রাজ্যের সীমান্ত হইতে উহার অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া নয়াদিল্লিতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

অদ্য প্রত্যূষে স্বামী বিবেকানন্দের শত তম জন্মদিনে শুরু করিয়া সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কলিকাতায় এই মহামানবের জন্মজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

বিদেশী সংবাদ

২২শে জানুয়ারী—আজ তেহরানে নিরাপত্তা বাহিনী এবং ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের পর পুলিস তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিনশত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। পুলিস ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ ও গ্যাস প্রয়োগ করে। ১৮০জন ছাত্র আহত হয়।

বৌদ্ধ [illegible] সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া পশ্চিম ইরিয়ানের বিরোধ শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে আপস আলোচনা করিতেও সে প্রস্তুত। তবে শর্ত এই : পশ্চিম ইরিয়ানের উপর ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

২৩শে জানুয়ারী—আজ বৈকালে নেপালের রাজপ্রাসাদ হইতে প্রচারিত এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, গতকাল জনকপুরে রাজা মহেন্দ্রের মোটর গাড়িতে একটি বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে যে, রাজার কোনও ক্ষতি হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা লাভের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদকে পর্তুগালে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ এবং পর্তুগালের বিরুদ্ধে অন্যান্য বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করেন।

ইটালীর প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, শনিবার রাত্রির নিকট বুলগেরিয়ার যে জেট জঙ্গী বিমানখানি অবতরণ করিতে গিয়া ভাঙিয়া পড়ে, তাহা গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছিল বলিয়া কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

২৪শে জানুয়ারী—সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল মালিনোভস্কী ঘোষণা করিয়াছেন—রাশিয়া একটি মাত্র আণবিক আঘাতের দ্বারা আমেরিকা ও উহার মিত্রদের সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলিকে মুছিয়া ফেলিতে পারে।

যে সমস্ত জাতি এখনও ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আছে, স্বাধীনতা লাভের পথে তাহাদের অগ্রগতির ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভাপতি শ্রীমঙ্গী স্লিম গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারতবর্ষ সমেত ১৭টি রাষ্ট্রকে এই বিশেষ কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৫শে জানুয়ারী—বর্তমান মাসে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে বৃটেনের স্থায়ী প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীন বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা কাশ্মীরের বিষয় আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বান করিতে উৎসাহী নহেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী তাঁহার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, তিনি বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট শ্রীইউজিন ব্ল্যাককে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন, “কাশ্মীর সমস্যা” আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে। এই ব্যাপারে আমরা উভয় দেশকেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

২৬শে জানুয়ারী—নিউ ইয়র্কের কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে কাশ্মীর লইয়া অদূর ভবিষ্যতে নিরাপত্তা পরিষদের কোন বৈঠক হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না। তবে করাচী হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, “কাশ্মীর সম্পর্কে” নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন ডাকিবার পরি-কল্পনায় কোন রদবদল হয় নাই।

২৭শে জানুয়ারী—পর্তুগাল অন্তরীণ পর্তুগীজদের সহিত ভারতীয়দের বিনিময় করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত সকল ভারতীয় ও তাহাদের পরিবারবর্গকে অবশ্যই পর্তুগীজ এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। পর্তুগাল এক পত্রে এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী—সিংহল গবর্নমেন্ট আজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকারের উচ্ছেদের জন্য “সতর্কতার সহিত পরিকল্পিত” এক সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র গবর্নমেন্ট বানচাল করিয়া দিয়াছেন। কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিস ও সামরিক অফিসার এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

বাংলা ভাষার বৃহত্তম উপন্যাস

বিমল মিত্র

বিরচিত

কড়ি দিয়ে কিনলাম

প্রকাশিত হইয়াছে

॥ মূল্য ষোল টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কাজের
ফাঁকে
কফি
খেয়ে নিন
সংসারে ঝামেলার অন্ত নেই। নানা কাজের ফাঁকে সুবিধামত একটু সময় করে কফি খেয়ে নিন। শ্রান্তি দূর করতে কফির কাছে আর কিছু লাগেনা। কফির চমৎকার স্বাদ আর মিষ্টি গন্ধ, সহজেই একটা স্ফূর্তির আমেজ এনে দেয়। কফি★ তৈরি করাও খুব সহজ। আজই পরখ করে দেখুন।
COFFEE BOARD
কফি তৃপ্তিদায়ক
কফি বোর্ড
বাঙ্গালোর
★"কি করে সর্বদা ভাল কফি তৈরী করা যায়"—এবিষয় পিনামূল্যের পুস্তিকার জন্য লিখুন
FDS-CB-1B5

সূচীপত্র

অশোক গুহের অবিস্মরণীয় উপন্যাস

গোরা কালার হাট

মূল্য — ৮.৫০ নঃ পঃ

আনন্দবাজার বলেন : 'উপন্যাসের চরিত্র ও আখ্যানভাগের নাট্যপ্রবাহ চিরকালীন অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত ও একটি নির্দিষ্ট যুগের জীবনধারা-নিরপেক্ষ। সানন্দে লক্ষ্য করা যায় যে, লেখক সব প্রশ্নকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এর ফলে বইটির কোথাও সমাচার সাহিত্যের আদল আসেনি।

যুগান্তর বলেন : একালের বাংলা উপন্যাস বিষয়বস্তু ও রূপকর্মের বিচিত্র পথে পদসঞ্চার করেছে। ভৌগোলিক পরিধির বিস্ময়কর আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক পটভূমির সংকীর্ণ গলিপথের কৌতূহলী অনুসন্ধান যেমন এর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে, তেমনি এর ফর্ম ও টেকনিক নিয়েও নূতন পরীক্ষা চলেছে। "গোরা কালার হাট" পড়তে পড়তে এই কথাই মনে হলো।

স্বাধীনতা বলেন : স্বতন্ত্র শিল্পকীর্তি হিসেবে অশোক গুহের সাহিত্য শক্তির স্বাক্ষর তার প্রথম উপন্যাস 'গোরা কালার হাট' সত্যই আমাদের বিস্মিত করেছে। আরও সবাই বলেন ১৯৬১ সালে প্রকাশিত অনবদ্য ক্লাসিক উপন্যাস।

* * *

লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির বঙ্গ-সাহিত্যের
অধ্যাপক **শিশিরকুমার দাশের**
আরও একটি মননশীল উপন্যাস

সীমান্ত

মূল্য — ৩, টাকা

* * *

'আর বিশ্বনাথনের' ছদ্মনামে ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের দৈনন্দিন জীবনের মধুর আলেখ্য

চৌধুরী বাড়ী

মূল্য — ৪, টাকা
(সিনেমায় রূপান্তরের পথে)

মাইকেলের

মেঘনাদ বধ কাব্য

মূল কাব্যসহ টিকাটিপ্পনী ও নানাবিধ মৌলিক সমালোচনাসহ এম এ ও বি এ এবং বিশেষ বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের অপরিহার্য গ্রন্থ। সম্পাদনা করেছেন : অধ্যাপক কমল গঙ্গোপাধ্যায় এম এ

মূল্য : চার টাকা

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

॥ আনন্দ - পাবলিশার্স - প্রকাশন ॥

উ প ন্যা স

প্রচ্ছদপট	৩·৫০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
যে যাই বলুক	৬·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রূপসী রাত্রি	৫·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
তিন দিন তিন রাত্রি	৫·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
পঞ্চশর	৩·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রতিধ্বনি ফেরে	৪·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপবতী	৩·০০	মনোজ বসু
মানুষ দেবতা হবে না	৩·০০	রবি গুহ মজুমদার
বহু যুগের ওপার হতে	২·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
মনের মানুষ	৩·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সারা রাত	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শতকিয়া	৮·০০	সুবোধ ঘোষ

গ ল্প - স ং গ্র হ

প্রেমের গল্প	৪·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
তিন শূন্য	৩·৫০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প	৪·০০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
ময়ূরী	৩·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
কহেন কবি কালিদাস	৩·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
গল্প-সংগ্রহ	৫·০০	সরলাবালা সরকার
ভারত প্রেমকথা	৬·০০	সুবোধ ঘোষ

অ ন্যা ন্য

চণক-সংহিতা	৩·৫০	কালিদাস রায়
চিন্ময় বঙ্গ	৪·০০	আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন
রহস্যময় রূপকুণ্ড	৩·৫০	বীরেন্দ্রনাথ সরকার
রবীন্দ্র মানসের উৎস-সন্ধানে	৩·৫০	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
বিবেকানন্দ চরিত	৫·০০	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

কি শো র - সা হি ত্য

ছেলেদের বিবেকানন্দ	১·২৫	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
পিনকুর ডাইরি	২·০০	সরলাবালা সরকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 10th February, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ১৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়াপয়সা
শনিবার, ২৭ মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

জনশক্তি ও জনশিক্ষা

আগামী পক্ষকালের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন। এইবার তৃতীয়বার। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের রীতিনীতির সংগে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পরিচয় গত দশ বছরে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রায় একুশ কোটি ভোটার সকলেই যে নির্বাচনের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সম্পর্কে সচেতন বা সমপরিমাণে আগ্রহী তা নয়। কোন গণতন্ত্রী দেশেই তা হয় না। তবে ভারতবর্ষের এই সুবৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর বেশ কিছু অংশ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে তাদের ভোটাধিকারের অর্থ কী, ভোট দেওয়ার মূল্য কী। শিক্ষায় বৈষয়িক সম্পর্কে উন্নত গণতন্ত্রী দেশগুলির সংগে তুলনা করে আমরা অনেকে আমাদের দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে এবং সে-কারণে নির্বাচন ব্যবস্থা অর্থাৎ ভোটযুদ্ধ সম্পর্কেও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকি। কথাটা দাঁড়ায় এই যে, ব্রিটেন কিম্বা আমেরিকার সংগে ভারতবর্ষের তুলনা হয় না। কিন্তু ব্রিটেন কিম্বা আমেরিকায় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের শুরু একশ বছর অথবা তারও বেশী আগে; আমাদের মাত্র চৌদ্দ বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর বাধা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের নির্বাচকমণ্ডলী তাদের ভোটাধিকার ব্যবহারে যে পরিমাণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

নির্বাচন ব্যাপারে খুব বেশী ভোটারের আগ্রহ দেখা যায় না, এরকম অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। ভোটদাতাদের চেয়ে ভোটপ্রার্থীদের উৎসাহ বেশী; সব গণতন্ত্রী দেশেই তাই। ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল নির্বাচকমণ্ডলীর একান্ন শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু বেশী; দ্বিতীয় নির্বাচনে সাড়ে সাতচল্লিশ শতাংশ। এর থেকে অনেকের ধারণা ভোটারদের ভোটদানে আগ্রহ ক্ষীয়মান। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে মাত্র দুটি সাধারণ নির্বাচনের ভোট-সংখ্যা দেখে এরকম নৈরাশ্যসূচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সংগত নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ভোটার গ্রামবাসী; গ্রামাঞ্চলে ভোটদান ব্যবস্থার উন্নতি হলে ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। এবার প্রতি নয় শ' ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র খোলা হবে; নির্বাচন কমিশনের আশা নির্বাচকমণ্ডলীর ষাট শতাংশ এবার ভোট দেবে। ভোটদানে অনাগ্রহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কম নয়; সেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধেক প্রায় ভোট দেয় না। কাজেই তুলনামূলক বিচারে বলা যায় না যে ভারতবর্ষের ভোটারদের উদাসীনতাটা অস্বাভাবিক পরিমাণে বেশী।

নির্বাচনী যুদ্ধকালে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং উত্তাপ স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। তবে যেমন ক্রিকেট খেলার তেমনি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আচরণবিধি পরিচ্ছন্ন হওয়াই নিয়ম। ভারতবর্ষে এ নিয়মের শোচনীয় ব্যতিক্রম কিছু কিছু এখনও ঘটছে। এর প্রতিকারের দায়িত্ব প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলির। ভোটযুদ্ধে হার-জিতটাই বড় কথা নয়, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের রাজনীতিক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল পরস্পর সহনশীলতার অনুশীলন। ব্রিটেনেও এককালে নির্বাচন-যুদ্ধ উপলক্ষে বহু অনাচার, বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি ঘটত। আজকাল ঘটে না। তার কারণ দ্বিবিধ; প্রথমত রাজনৈতিক দলগুলির পরিচ্ছন্ন সুপরিণত দায়িত্ববোধ ও সুশৃঙ্খল সংগঠন, দ্বিতীয়ত ভোটারদের আত্ম-সম্ভ্রম জ্ঞান। আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় এই দুটি বস্তুরই এখনও যথেষ্ট অভাব।

সাধারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্য কেবল ভোট সংগ্রহ নয়। নির্বাচন হল একাধারে জনশক্তির স্বীকৃতি এবং জনশিক্ষার উপায়। জনশক্তির স্বীকৃতি এ-কারণে যে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল জনশক্তির প্রতিনিধি। দল মত এবং প্রার্থীর গুণাগুণ যাচাই করে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ভোটদাতাদের। ভোটদাতাদের বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে অশ্রদ্ধা পোষণ করা মানে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ। এ কথা ঠিক যে, সব ভোটদাতার বিচারবুদ্ধি সমান নয়, কোন দেশেই নয়। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সব কিছু গূঢ় তত্ত্ব ও তাৎপর্য ভোটদাতারা হৃদয়ংগম করবে, কোন গণতন্ত্রী দেশেই তা আশা করা হয় না। মোটামুটিভাবে দেশের ভালোমন্দ, বাস্তব জীবনের প্রয়োজন এবং দাবি সম্পর্কে ভোটদাতারা অল্পবিস্তর সচেতন; সাধারণ নির্বাচনকালে ভোটদাতাদের এই আটপৌরে বাস্তব জ্ঞানকে ভিত্তি করে ভোটপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের নানা দল এবং মতের ভালোমন্দ যাচাইএ উদ্যোগী হওয়াই গণতান্ত্রিক বিধি। এর জন্য বলা যায়, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচন হল একাধারে জনশক্তির স্বীকৃতি এবং জনশিক্ষার সুসংহত প্রয়াস। অবশ্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাতেও বাস্তবক্ষেত্রে নানারকম ফাঁক ও ফাঁকির সুযোগ থাকতে পারে; কিন্তু তা হলেও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে এমন আর কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই যেখানে জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে তাদের রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে। অতএব, সাধারণ নির্বাচনের সার্থকতা সর্বতোভাবে স্বীকার্য।

নির্বাচনী প্রচার জোর চলেছে!
'দেখো, যেন ধোপে টেঁকে'
ভোটদাতা
কংগ্রেস পার্টি

সুচেতা কৃপালনী প্রত্যেককে কংগ্রেসে ভোট দিতে বলছেন।
উত্তর-বোম্বাইতেও কি?
কংগ্রেসকে ভোট দিন

সুরাবর্দী গ্রেপ্তার।
বাংলার বাঘ এবার 'খাঁচায়'।

নেপালের রাজার সন্নিকটে পটকা নিক্ষিপ্ত।
কে ছুঁড়েছে?
মহেন্দ্র

পাকিস্তান সরকারের অনুরোধক্রমে কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। অধিবেশনের কার্যসূচীও গৃহীত হয়েছিল, অর্থাৎ কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তারপরে স্থির করা হয় যে, ভারতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত থাকবে। পাকিস্তানের অভিযোগ হচ্ছে যে, ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা ভারত সরকারের নেই, সিকিউরিটি কাউন্সিল তৎপর না হলে অচিরে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, ইত্যাদি। উত্তরে ভারত সরকার অভিযোগ এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, যদি কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা করতেই হয় তবে তা ভারতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পরে হতে পারে। বর্তমানে ভারতীয় নেতারা সাধারণ নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

সোভিয়েট সরকার সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকার পক্ষপাতী ছিলেন না। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদে খোলাখুলিভাবে এক পক্ষকে সমর্থন করে অন্য পক্ষের বিরাগভাজন হতে পশ্চিমা শক্তিদেরও বোধ হয় বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবে আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে বৃটেনই বোধ হয় পাকিস্তানের মন রাখার জন্য একটু বেশী ঝুঁকেছিল। বিষয়টিকে নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলে আবার তর্ক-বিতর্কের অবতারণা না করে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তান সমস্যাটি মিটিয়ে নিক, এই ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট শ্রীইউজিন ব্লাকের নাম মধ্যস্থ হিসাবে প্রস্তাব করে শ্রী নেহরুকে চিঠি লেখেন। এই প্রস্তাবে ভারত সরকার রাজী হন না। খালের জল নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে-বিবাদ ছিল শ্রী ব্লাক তার নিষ্পত্তি করতে সাহায্য করেন। কিন্তু খালের জল সম্পর্কিত বিবাদ এবং কাশ্মীর সম্পর্কিত বিবাদ এক পর্যায়ে পড়ে না। ভারত সরকার বলেন যে, যে-মামলার সঙ্গে সার্বভৌমত্বের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন জড়িত আছে তার নিষ্পত্তির জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষকে সালিশ মানতে ভারত গবর্নমেন্ট রাজী হতে পারেন না। কেনেডির প্রস্তাবে রাজী হলেই যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হতো তা বলা যায় না। কাশ্মীরের ব্যাপারে রাশিয়ার যে-কূটনৈতিক সমর্থন ভারতবর্ষ লাভ করেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবে রাজী হলে তার শিকড় আলগা হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া সম্প্রতি গোয়ার ব্যাপারে সিকিউরিটি কাউন্সিলে সোভিয়েট সরকার ভারত সরকারের কার্য সমর্থন করে ভেটো প্রয়োগ পর্যন্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীরের ব্যাপারে শ্রী ব্লাককে মধ্যস্থ মেনে নিলে সোভিয়েট সরকার নিশ্চয়ই খুশী হতেন না। প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে এ-কথাও শ্রী নেহরু হয়ত ভেবেছেন।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরেই মার্কিন সরকারও তাড়াতাড়ি পাকিস্তানের কথামতো সিকিউরিটি কাউন্সিল ডাকার পক্ষপাতী হলেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির প্রস্তাব শ্রী নেহরু মানলেন না, সেজন্য স্বভাবতই আমেরিকার জনমত ভারত সরকারের উপর কিছুটা রুষ্ট হলো। অবশ্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডি প্রস্তাবটি প্রকাশ করার পূর্বে যদি একটু চিন্তা করে দেখতেন তা হলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, তাঁর প্রস্তাবে ভারত সরকার রাজী হবেন না। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি যে সে-চিন্তা করেন নি তাও নিশ্চিত বলা যায় না। ভারতের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবে এ-কথা জেনেও তিনি তাঁর প্রস্তাব করে থাকতে পারেন। ভারত সরকারকে একটু বেকায়দায় ফেলা, ভারত সরকারের সম্বন্ধে একটু প্রতিকূল ভাব সৃষ্টি করে রাখার মতলবও মিঃ কেনেডির থাকতে পারে। রাশিয়ার উপর ভারত সরকার বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন এটা প্রকাশ পেলে পণ্ডিত নেহরু নিজেই অস্বস্তি বোধ করবেন। সেইটি করানোও মিঃ কেনেডির একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এই বুঝি একদিকে ঝুঁকে পড়লাম—'নিরপেক্ষ' নীতির অনুসরণকারী বলে যাঁরা খ্যাত তাঁদের পক্ষে এইটাই সবচেয়ে বড়ো আতঙ্ক। মিঃ কেনেডি হয়ত বুঝে ফেলেছেন 'নিরপেক্ষ'দের দুর্বলতা কোথায়। যাই হোক, সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডেকে যখন পাকিস্তানের গোসা নিবারণ করা হয়েছে তেমনি মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করে ভারত সরকারেরও কিছুটা মন রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার নিশ্চয়ই জানেন যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাহায্যে তাঁরা কাশ্মীরের "উদ্ধার" করতে পারবেন না, যেমন তাঁরা জানেন যে, কাশ্মীরের পাকিস্তান-অধিকৃত অংশ "উদ্ধারের" জন্যও ভারত সরকার বলপ্রয়োগ করতে অগ্রসর হবেন না। সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই পুরাতন মামলাটাকে আবার খুঁচিয়ে তোলার উদ্দেশ্যটা তবে কী? শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি এবং শ্রীকৃষ্ণ মেননের বাগাড়ম্বরে এবং গোয়া-যুদ্ধের সময়ে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি কিছু ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করার জন্য পাকিস্তান সত্যই ভয় পেয়ে গিয়েছিল এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত অংশ "উদ্ধার" করার জন্য ভারত সরকারের যুদ্ধ করার যে কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই, এমন কি বিনা যুদ্ধে পেলেও ভারত সরকার 'আজাদ কাশ্মীরকে' লুফে নেবার জন্য মোটেই ব্যস্ত হবেন না, এ-কথা রাওলপিণ্ডির কর্তারা অবশ্যই জানেন। সুতরাং সিকিউরিটি কাউন্সিলে যাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করা। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটা প্রোপাগাণ্ডা করার সুযোগ খোঁজার পিছনে পাকিস্তানের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই কি? প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা আর যাই হোক, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের দিক থেকে পাকিস্তানের কোনো বাস্তব লাভ হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে আর কোন্ লাভের জন্য এই চেষ্টা?

ভারতের সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই ব্যাপারের যোগ থাকতে পারে কি? বর্তমান সাধারণ নির্বাচনে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই সময়ে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটা প্রোপাগাণ্ডার প্রবাহ চালাতে পারলে তাতে সেই চেষ্টা আরো জোরদার হতে পারে। এইভাবে পরোক্ষভাবে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানী প্রভাব আমদানি করার আয়োজন হচ্ছিল কিনা সেটা ভাববার কথা। তবে বাইরের লোকের চেয়ে ঘরের লোকের উপরে নজর রেখেই হয়ত পাকিস্তানী কর্তারা এই সময় সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর নিয়ে একটা হইচই সৃষ্টি করতে গিয়েছিলেন।

শ্রীসুরাবর্দী সাহেবের গ্রেপ্তারের সংবাদ পড়ে সেই কথাটাই বিশেষ করে মনে হচ্ছে। সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন যাতে ঠিক এই সময়ে হয় তার জন্য পাকিস্তান সরকার মনে হয় খুবই চেষ্টা করছিলেন। অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসুরাবর্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বোধ হয় এই আশা করা হয়েছিল যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর বিতর্ক আরম্ভ হলে লোকের মন সেইদিকেই যাবে। শ্রীসুরাবর্দীর গ্রেপ্তার থেকে পাকিস্তানের আভ্যন্তর অবস্থার একটা সংকটের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীসুরাবর্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে, তিনি পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কাজে লিপ্ত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে 'পাকিস্তানের শত্রুদের' সঙ্গে তিনি নাকি ষড়যন্ত্র করছিলেন। এই অভিযোগ কতটা সত্য তা বোঝা মুশকিল। কিন্তু শ্রীসুরাবর্দীর সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা সত্যই হোক অথবা সত্যকে বিকৃত করে এই অভিযোগ বানানো হয়ে থাক্, পাকিস্তানের ভিতরে যে একটা সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীসুরাবর্দী সাহেবের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্র-ধর্মঘট হয়েছে। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর ঢাকায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যে ছাত্র-ধর্মঘট হয়েছে এই থেকে বুঝতে হবে যে, আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে জনমত বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। তা না হলে এই ধর্মঘট করার সাহস আসত না। এই আভ্যন্তর সংকটের দাওয়াই হিসাবেই বোধ হয় কিছু ভারত-বিদ্বেষী প্রোপাগাণ্ডার প্রয়োজন হয়েছে।

২।২।৬২

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধ্বনি (২)
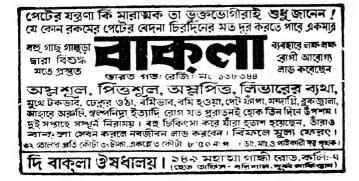
কাইরোতে আমি জনৈক নামী শব্দ-তাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করি ফলানা শব্দটি আরবী কি না। উত্তরে তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'বৎস, নেতিবাচক কথা বলা বড় শক্ত। আমি কি আরবী ভাষার তাবৎ বই পড়েছি না বিস্তীর্ণ আরবভূমির গ্রামে গ্রামে প্রতিভাষা, উপভাষা শুনেছি যে বুক ঠুকে বলবো, এ শব্দটি আরবী নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমি এটি কোনো কেতাবে দেখিনি এবং শব্দটি আমার কানেও কখনো আসেনি।'

তাই নিম্নের নেতিবাচক বাক্যগুলো অতি সভয়ে লিখছি :—

ভারতবর্ষের বাইরে কোনো ভাষাতেই 'ট' বর্গ এবং 'ত' বর্গে পার্থক্য করা হয় না। অর্থাৎ টোটা (বন্দুকের গুলি) ও তোতা পাখিতে অভারতীয়েরা কোনো পার্থক্য শুনতে পায় না। বস্তুত এই ভারতবর্ষেই যাদের গায়ে বিদেশী রক্ত বেশী তারা এদেশে বহু শত বৎসর থাকার পরও 'ট' 'ত' এবং 'ড' 'দ'-য়ে তফাত করতে পারে না। খাঁটি আসামী, পার্সী ও বোরা মুসলমানেরা (রাধাবাজারে এদের ব্যবসা—আসলে গুজরাতের সুরট অঞ্চলের লোক এবং গায়ে প্রচুর আরব রক্ত) এখনো পারে না।

ইংরেজ ফরাসী জর্মান ইত্যাদি রোমান t, d পড়ে কখনো 'ত' 'দ', কখনো বা 'ট' 'ড'। ফরাসী রুশরা 'ত' 'দ' পড়ে, কিন্তু কেউ 'ট' 'ড' উচ্চারণ করলে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারে না, আর খুব ভালো কান থাকলে অনেকক্ষণ পরে আবছা আবছা বুঝতে পারে উচ্চারণে যেন কিছু-একটা গোলমাল হচ্ছে। জর্মনরা 'ট' 'ড' উচ্চারণ করে, কিন্তু বেভেরিয়ার উপভাষায় আমি 'ত' 'দ'-ই শুনেছি।

ইংরেজির thing, this-এর th আমাদের থ, ত, দ কোনোটাই নয়। এদের উচ্চারণের সঙ্গে আরবী 'সে' ও 'দোয়াদ' ধ্বনির মিল আছে।

মোটামুটি বলা যেতে পারে লাতিন গোত্রীয় ভাষাতে (ফরাসী, ইটালিয়ান ইত্যাদি) 'ত' 'দ' উচ্চারণ হয়; স্যাকসনে ট, ড।

আন্তর্জাতিক ডায়াক্রিটিকাল চিহ্ন দেবার সময় 't' এবং 'd'-র নিচে ফুটকি দিলে 'ট' 'ড' বোঝায়।

রোমান লিপির প্রধান দোষ, স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ বোঝাবার জন্য কোনো চিহ্ন নেই। তাই ডায়াক্রিটিকাল চিহ্ন দেবার সময় a, e, i, o, u-র উপর একটি সোজা টান দিয়ে দীর্ঘ বোঝানো হয়, ইণ্টারনেশনাল ফনেটিক সিমবলে স্বরের পর কলোনের মত দুটি ফুটকি দেওয়া হয়। একই স্বর পর পর দু'বার লিখেও দীর্ঘ স্বর বোঝাবার চেষ্টা জর্মনে কিছুটা আছে। Aal (বাণ মাছ), Boot (নৌকা), Beethoven=বেটোফেন। আরো দু' একটি ভাষা এই পদ্ধতি পুরো-পুরি গ্রহণ করেছে।

এইবারে আরেকটি ধ্বনি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। এ ধ্বনিটি বাঙলায় এবং আসামী ওড়িয়ায় নেই। তবে কেউ কেউ যখন ব্যস্, ব্যস্ (অর্থাৎ হয়েছে, হয়েছে আর না) বলেন তখন ঐ উচ্চারণটি শোনা যায়। হিন্দী 'হম্'—আমরা—বলার সময় এই স্বর আসে। ইংরিজি ফরাসী জর্মন (বর্তমান দিনের সংস্কৃত উচ্চারণেও এই ধ্বনিটি আছে) ও অন্যান্য ভাষায় এই ধ্বনিটি আছে প্রচুর—সবচেয়ে বেশী বললেও অত্যুক্তি হয় না—অথচ এর জন্য কোনো চিহ্ন নেই! একমাত্র হীব্রুতে আছে বলে তার হীব্রু নাম Schwa (উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃত 'শ্ব'-র মত) গ্রহণ করা হয়েছে ও ফনেটিক সিমবলে রোমান e অক্ষরটি উল্টো করে লেখা হয়। ইংরেজির the, polite, bird, about-র যথাক্রমে e, o, i, a-তে এই স্বর উচ্চারণ আছে। (But Cut-এর u-তে অন্য উচ্চারণ, এবং সেটি ফরাসী জর্মন ও অন্যান্য ভাষায় নেই)। ফরাসী le-এর e-তে, জর্মান gegeben-এর প্রথম ও তৃতীয় e-তে ঐ স্বর উচ্চারণই হয়। এ ধ্বনিকে vague indistinct vowel বলা হয়—মতান্তরে half-vowelও বলা হয়।

বাঙলাতে আমরা সচরাচর mayor-কে মেয়োর বা মেয়র উচ্চারণ করি। আসলে mare (ঘোটকী) ও mayor উচ্চারণে কোনো তফাত নেই। অর্থাৎ mayor-এর 'o' উচ্চারণে স্বর ধ্বনি, এবং r-টি দক্ষিণ ইংলণ্ডে কেউ বড় একটা উচ্চারণ করে না।

এই স্বর ধ্বনিটি কোনো হিন্দীভাষীর কাছ থেকে প্রত্যেক বাঙালীর শিখে নেওয়া উচিত। আমি যে-কটি ভাষা অল্পবিস্তর জানি তার সব-কটাতেই এ ধ্বনি আছে।

বাঙালী 'পাঁচ'—উচ্চারণ করার সময় যে অনুনাসিক উচ্চারণ করে সেটির ছড়া-ছড়ি ফরাসীতে—ইংরিজী, জর্মন, ডাচ ইত্যাদিতে এটি নেই, এবং বর্তমান ফার্সী থেকেও এটা লোপ পেতে চলেছে। Restaurant (রেস্তোরাঁ), pince-nez (পাঁস-নে)-তে যে অনুনাসিক আছে ইংরেজ জর্মন উচ্চারণ করে রেস্টোরাং, পেংসনে। Romain Rolland উচ্চারণ দেখাতে লেখে Romang Rollang এবং উচ্চারণ করে রোমাং রোলাং।

বস্তুত মোটামুটিভাবে বলা চলে ফরাসীতে একই সিলেবলে যদি n, বা m অক্ষর কোনো স্বরের পরে আসে তবে সে n m চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। main (মাঁ=হাত), pain (পাঁ=রুটি)*, entree (আঁত্রে=সাইড ডিশ, অর্থাৎ কি না যে খাদ্য সুপের পরই enter করেছে— ফরাসী ভাষায় soup-এর প্রথম শব্দ potage, পতাজ, তার পর soupe, এবং তার পর bouillon=বুইয়োঁ, i-এর পর ll উচ্চারণ হয় না, এবং consomme=কঁসমে, clear soup, হাল্কা সুপ, অর্থাৎ সাদামাটা হাল্কা ডালের জল, মাদ্রাজী রসম্), monde (মঁদ=পৃথিবী=রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' লা মোঁদ এ লা মঁদ), ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের চন্দননগর ফরাসীরা লেখে Chandernagore, উচ্চারণ করে শাঁদে নাগো।

এই ch-এর ঝামেলা এই বেলা চুকিয়ে ফেলা ভালো।

বাঙলার 'চ' ও 'জ' ইংরিজীতে আছে, ফরাসী জর্মনে নেই, ইটালিয়ানে বিস্তর (Count Ciano=কাউণ্ট চানো; Tucci= অধ্যাপক তুচ্চি; Vermicelli=ভের্মিচেল্লি; ঈদের দিন মুসলমানদের সেওই ঐ একই বস্তু)। আরবীতে 'চ' নেই (অতএব বাঙলাতে যদি কখনো কোনো যাবনী শব্দ দেখেন যেটাতে 'চ' রয়েছে তবে নিঃসন্দেহে বুঝে নেবেন, ওটা আরবী হতে পারে না, ফার্সীই হবে; যেমন চশমা eye glasses, চাকর=ভৃত্য) হাঙ্গেরিয়ানে 'চ' আছে, লেখা হয় cz দিয়ে।

ফরাসী 'চ' বোঝাতে হলে লেখে tch. যেমন চেকোস্লোভাকিয়া লিখতে লেখে Tchecoslovakie. স্বয়ং চেকরা লেখে শুধু C দিয়ে, উপরে একটা হুক টেনে। জর্মনরা 'চ' বোঝাতে হলে tsch লেখে। ফলে জর্মন ফরাসীতে মিলে রুশ লেখক চেখফ (রুশ ভাষায় 'চ' বোঝবার জন্য পরিষ্কার আলাদা হরফ আছে) লেখে Tchkhov, Tschekhoff, ইত্যাদি বহু পার্মুটেশন কম্বিনেশনে।

ফরাসী আমাদের বাঙলা জ বোঝাতে হলে লেখে dj. জর্মন লেখে dsch. আমাদের মহারাজা তাই ফরাসী লেখে Maharadja; জর্মন লেখে Maharadscha. কিন্তু যার রক্তে, অর্থাৎ যার জিহ্বায় যা নেই তা হবে কি করে? জর্মন উচ্চারণ করে মহারাট্শা।

মোটামুটি তাই ধরে নিতে পারেন, আপনার নাম যদি চারুচন্দ্র চাটুয্যে হয় তবে ফরাসী জর্মন উচ্চারণ করবে, শারুশন্দ্র শ্যাটার্শী! আপনার নাম যদি যামিনী ব্যানার্জী হয়, তবে উচ্চারণ করবে শামিনী বানার্শী!

এতে আশ্চর্য হবেন না। শুনেছি, আমাদের 'ধ্রুব' চীনা ভাষায় 'দুলুফো' হয়, ইংরেজি Trafalgar জাপানীতে তাফারুগারু হয়! (ক্রমশ)

* পোর্তুগীজরা লেখে pao; এবং o-র উপর একটি ঢেউখেলানো লাইন কাটে—অনুনাসিক (চন্দ্রবিন্দু) বোঝাবার জন্য। সেই পাঁউ নিয়ে আমরা বানালুম পাঁউরুটি; 'পাঁউ' মানেই রুটি। দ্বিরুক্তিদোষ হয়ে গেল, লক্ষ্য করলুম না। ঠিক তেমনি নান—রুটি। 'নান' ফার্সী শব্দের অর্থ রুটি। আমি শিলং-এ বনরুটিও শুনেছি।

আলোচনা

ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা

দেশ সম্পাদক সমীপেষু,

গত ১৩ই মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায় 'ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা' শিরোনামায় এক প্রবন্ধ লিখেছেন। বলাই বাহুল্য যে, প্রাগুক্ত প্রবন্ধের বিশেষ কয়েকটি মতামত যুক্তিসম্মত হয়নি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দেশ জনতার, দেশ জাতির। কিন্তু এই দেশের শাসনভার, শুভাশুভ প্রভৃতির দায়িত্ব বিশেষ বিশেষ দলের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং দলের প্রতিভূ হিসেবে যিনি বা যাঁরা কাজ করেন, তাঁদেরকেই সমালোচনা শুনতে হবে।

পথ চলতে চলতে মোটরগাড়ি যদি দুর্ঘটনা ঘটায়, তবে সে দোষ মোটরগাড়ির নয়—চালকের।

খাদ্যে যারা ভেজাল দিয়ে জাতির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাবার অপচেষ্টা করছে, একদা তাদের ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দেবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন দেশের সর্বজনবন্দিত নেতা। ফাঁসি দেওয়া তো দূরের কথা, ভেজালকারী অথবা চোরাকারবারীদের একটি কেশাগ্র স্পর্শ করার প্রয়াস অদ্যাবধি করা হয়নি। আজ যদি কেউ ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রশ্ন তোলেন, 'এ দোষ কার? কেন খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয়, কেন দেশে চোরাকারবার প্রশ্রয় পাচ্ছে?' তবে কি কেউ ভেজালকারী অথবা চোরাকারবারীদের ওপর সমস্ত অপরাধ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন? বিবেকবান দুষ্কৃতকারী যেমন হতে পারে না, তেমনি দুষ্কৃতকারীদের বিবেক বলে কোন পদার্থ মনের অন্তরালে কাজ করে না। দেশের শাসনভার যাদের হাতে, তাদেরকেই দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

বিবেক বা আদর্শ কোন অলৌকিক বস্তু নয়। বিবেক ও আদর্শ শিক্ষানির্ভর। দেশের নেতৃবৃন্দ যদি বিবেক ও আদর্শের পরাকাষ্ঠা না দেখাতে সমর্থ হন, তবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিবেক ও আদর্শ আশা করা বাতুলতা মাত্র। জনতাকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব দেশের নেতৃবৃন্দের। আপামর জনসাধারণ যেখানে বুভুক্ষু, যেখানে পরিকীর্ণ মৃত্যুময়তা আর হতাশার অন্ধকার, সেখানে সৎ সুস্থ জীবনবোধের পরিচিতি কামনা করা দুরূহ। আজকে দেশের সামনে ব্যক্তির দায়িত্বের চেয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্বই বড়ো। রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির সত্তা নিতান্ত নগণ্য। রাষ্ট্রই আজ চালক, ব্যক্তি চালিত। কাজেই ব্যক্তি আজ সমালোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং তাঁদের রাজনীতি, এই-ই হওয়া উচিত সমস্ত সমালোচনার উৎস।

সবিনয়ে একটা কথা উল্লেখ করছি যে, শ্রীমুখোপাধ্যায় আসল সমস্যার ওপর আলোকপাত না করে, সমস্যা থেকে উদ্ভূত কারণগুলোকে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করেছেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় সরকারী অফিসের ক্ষুদে কর্মীদের কর্তব্যবোধ ও সততা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ কতখানি সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ, তার কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীমুখোপাধ্যায় জানেন কিনা জানি না যে, আমাদের সরকারী শাসনযন্ত্রে 'লালফিতা'র দৌরাত্ম্য বলে এক অদৃশ্য যন্ত্র আছে। সে যন্ত্রটি এমনই যে, তার কল্যাণে হওয়া জিনিস হতেও সময় নেয়। স্পষ্ট করে বলা যাক্। একটি চিঠির উত্তর দিতে হয়তো বেশী সময় লাগে না, কিন্তু সেই চিঠিটি পাঁচ হাতের স্বাক্ষর ও পাঁচ টেবিলের হাওয়া খেয়ে, তবে আসল ব্যক্তির হাতে গিয়ে পৌঁছয়। প্রশাসনযন্ত্রের এই ঢিলেমির জন্য ক্ষুদে কর্মীরা দায়ী নয়।

সুধা দাস
কলকাতা

২৬শে জানুয়ারী এবং আকাশবাণী

মাননীয় 'দেশ' সম্পাদক সমীপেষু,—
মহাশয়,

এবার ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আকাশবাণীর বাংলা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানে কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ করলাম। একজন বাঙালী শ্রোতা হিসাবে আমার কানে এগুলি বেসুরো লেগেছে।

২৬শে জানুয়ারী রাত্রি ১০॥টায় 'এক জাতি, এক প্রাণ' বলে একটি বেতার রূপক প্রচারিত হয়, বাংলা ভাষায়। সেটাতে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ভারতে বহু বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস হলেও, এই বৈচিত্র্য নিয়েও ভারত এক। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা একতার সুর রয়েছে। খুবই ভাল কথা। বহু মনীষী বহুবার এ-কথা বলে গিয়েছেন। এখানে বক্তা সেই কথাটাই বোঝাতে গিয়ে কাশ্মীর, পাঞ্জাব থেকে শুরু করে নাগাদেশ, মণিপুর, এমন কি ত্রিপুরা রাজ্যেরও লোক-সংগীতের একটু করে নমুনা পরিবেশন করেছেন। এমন কি সৌরাষ্ট্রের আদিবাসীদের লোক-সংগীতও মনোমুগ্ধকর বলে বক্তা আমাদের জানালেন—কেবল জানালেন না পশ্চিম বাঙলার লোক-সংগীতের কথা। তিনি ভুলে গেলেন বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি ও কীর্তনের কথা উল্লেখ করতে। ওগুলি বোধ হয় বক্তাকে মুগ্ধ করে না, আর না হয় তিনি সতর্কতার সংগে ওগুলির উল্লেখ পরিহার করে গিয়েছেন দিল্লিকে খুশী করবার জন্য। কথাগুলি যখন বাংলা ভাষায় প্রচারিত—তখন তা নিশ্চয়ই বাঙালী শ্রোতাদের উদ্দেশেই। বাঙলা কি ঐ 'এক জাতি, এক প্রাণে'র একটা অংশ নয়? না কি ভারতের ঐ খণ্ডিত অংশটুকুকে বাদ দিলেও ক্ষতি নেই!

এবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২৬শে জানুয়ারী উৎসবে পশ্চিম বাংলা অংশ গ্রহণ করেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। কারণ, ঐদিনেরই দিল্লি থেকে প্রচারিত সর্বভারতীয় বাংলা সংবাদে ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলিরই নাম শুনতে পেলাম, কেবল শুনলাম না পশ্চিম বাঙলার নাম। এবার শোভাযাত্রায় কি পশ্চিম বাংলা অংশ গ্রহণ করেনি? নাকি পশ্চিম বাঙলার নাম উল্লেখ করতে ভুল হয়ে গিয়েছে?

২৩শে জানুয়ারীর আকাশবাণীর প্রচারিত অনুষ্ঠানের কথা না বলাই ভাল। শুনে মনে হয় আকাশবাণী ঐ অনুষ্ঠানটুকু করে সুভাষচন্দ্রকে যেন ধন্য করছেন। ইতি—

রমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
জামসেদপুর

'চড়ুইয়ের সংগে লড়াই'

সবিনয় নিবেদন,

'চড়ুইয়ের সংগে লড়াই' পড়লাম। এ-জাতীয় স্বচ্ছ ঝরঝরে অনুবাদ আমি খুব বেশী পড়িনি। আমাদের ঘরের পাশেই এত রত্ন পড়ে রয়েছে যার অনুবাদ হওয়া উচিত সর্বাগ্রে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনুবাদকরা বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত গ্রন্থের অংশবিশেষ এভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করলে এবং আমাদের মত যারা ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাদের গোচরে আনলে আপনারা ধন্যবাদভাজন হবেন। আয়ুবশাহী রাজত্বে ও-ধারের সংবাদ জানার কোনো উপায় নেই।

'অংগবিহীন আলিংগন' গ্রন্থের অনুবাদকের নাম আপনার পত্রিকায় আশা করেছিলাম কিন্তু পেলাম না। অনুবাদকের নাম জানতে চাই। ইতি—

নিতাইচরণ দে
গ্রন্থাগারিক, সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর।

আমাদের বক্তব্য

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর এই গ্রন্থগুচ্ছের অনুবাদক নাম গোপন রেখে ছদ্মনাম নিয়েছেন 'তাজাকলম'। এই অনুবাদগ্রন্থের প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা প্রদত্ত হল: এন হক, ৩৩ ইসলামপুর, ঢাকা-১, পূর্ব পাকিস্তান। —সম্পাদক

ভ্রম সংশোধন

শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিত 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী' শীর্ষক প্রবন্ধের (৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত) সম্পর্কে ১০ম সংখ্যা 'দেশ'-এ প্রথম যে পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে লেখকের নাম ভ্রমক্রমে নীলরতন সরকার ছাপা হয়েছে। পত্র-

গণেশ হালদার ডায়েরি লিখছিলেন।

"যে দেশে আমাদের বাড়ি ছিল, যে দেশের ক্ষেত-খামার, পুকুর-বাগান, যে দেশের আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, পশু-পক্ষী, নদী-প্রান্তর, যে দেশের লোকজন (এমন কি মুসলমানরাও) আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল, সে দেশ এখন আমাদের দেশ নয়। আমরা সে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছি। ভারতবর্ষের গণ্যমান্য লোকেরা একদিন আমাদের ভালোর জন্যেই নাকি দেশ ভাগ করে নিজেরা গদিতে বসেছিলেন। তাঁরা এখনও গণ্যমান্যই আছেন, কিন্তু আমরা, যারা নগণ্য তারা আরও নগণ্য হয়ে গেছি। এমন কি আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষায় কারও সঙ্গে কথা বলি, সবাই হাসে, ঠাট্টা করে। তাই আপনাদের ভাষাতেই আমার ডায়েরি লিখছি, আপনাদের যদি কেউ কখনও এ ডায়েরি পড়েন সহজে বুঝতে পারবেন।

আমাদের দুঃখ-দুর্দশার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে আপনাদের মনে অনুকম্পা সঞ্চার করবার বাসনা আমার নেই। লিখছি সময় কাটাবার জন্যে, আর কিছু করবার নেই বলে। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করি। সকাল-সন্ধ্যা হাতে অনেক সময় থাকে। যা মনে আসে লিখে যাই। আমাদের দুর্দশার অনেক বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে, আমাদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ অনেক প্রবন্ধও আমি পড়েছি, আমাদের মতো গৃহহারাদের পুনরায় গৃহস্থ করবার জন্য সদাশয় গভর্নমেণ্টেরও চেষ্টার অন্ত নেই, খরচও নাকি অনেক করছেন তাঁরা—এ সবাই জানে, এ-ও জানে যে, তবু আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। এ দেশের উপর যেন আমাদের কোনও দাবি নেই, আমরা সকলেরই কৃপা-পাত্র, আমরা কারও আপন জন হ'তে পারি নি, এমন কি যাঁরা আমাদের রক্তসম্পর্কের আত্মীয় তাঁরাও আমাদের আপন-জন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। তাঁরাও আমাদের দূরে থেকে দয়া করেন, কাছে টেনে নিতে চান না। না, কারও মনে করুণা উদ্রেক করবার ইচ্ছা আর আমার নেই। ওই সব লোক-দেখানো বা কর্তব্য-প্রণোদিত করুণার উপর ঘৃণা জন্মে গেছে। গাছের ফুলকে বৃন্তচ্যুত করে শৌখীন ফুলদানিতে যাঁরা তাঁদের জলে ডুবিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাঁরা শৌখীন দয়ালু লোক হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরা ফুলের আপন লোক নন। কিন্তু তবু এই অনাত্মীয় শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়দের মধ্যেই বাস করতে হচ্ছে। প্রাণপণে চেণ্টা করতে হচ্ছে আমার যোগ্যতা প্রমাণ করবার, এ দেশের উপর আমারও যে একটা দাবি আছে, আমি যে কতকগুলো খামখেয়ালী বা স্বার্থপর লোকের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র নই—এই বোধটা জাগ্রত রাখবার।

হ্যাঁ, আমি যে যোগ্য সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে আছি। এ যোগ্যতার প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। জমিটা যে উর্বর তা প্রমাণ করবার জন্যে যুক্তির দরকার হয় না। যখনই সে জমিতে সবুজ ঘাস গজায় তখনই বোঝা যায় সে জমির উর্বরতা আছে, ভালো সার দিলে সে জমিতে ভালো ফসলও ফলানো যাবে। কিন্তু আমার জীবনের মরুভূমিতে একটি তৃণাঙ্কুরও গজায় নি এখনও। বিস্মিত হয়ে ভাবি, কেন গজায় নি! আমার জীবনের সব রস কি নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে? আমার জীবন তো সত্যই মরুভূমি ছিল না। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক স্নেহ, অনেক ভালবাসা, অনেক

বশবর্স, অনেক স্বপ্ন...না, মনে হচ্ছে আমি যেন নিজের উপর রাশ টেনে রাখতে পারছি না।

আমার জীবন কেমন ছিল তার একটু নমুনা দিচ্ছি। পদ্মার ধারে একটি ছোট গ্রামে বাড়ি ছিল আমার। গ্রামের নাম নাই জানলেন। আমাদের বাড়ি পাকা ছিল না। মাটির দেওয়াল, টিনের ছাদ। বাড়ির উঠান ছিল প্রকাণ্ড। উঠানের চারি ধারে ঘর। পূবের কোঠা, পশ্চিমের কোঠা, দক্ষিণের কোঠা আর উত্তরের কোঠা। তা ছাড়া ছিল ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর। রান্নাঘর দুরকম—আমিষ এবং নিরামিষ। বাড়ির চারিধারে অনেকখানি জমি। সামনে পুকুর, পিছনে পুকুর। তা ছাড়া একটা বাগান। সে বাগানে না ছিল কি। আম, জাম, কাঁটাল, গোলাপ জাম, জামরুল, গাব, কাউ, চালতা, লেবু, সফেদা, সাপটু, পেয়ারা। সেই বাগানে জন্মাত নানা জাতের অজ্ঞাত-কুল-শীল লতা, যার ডগে ফুটত কত অদ্ভুত সুন্দর ফুল। সেই বাগানে কত নিস্তব্ধ দুপুর কাটিয়েছি, আমি আর আমার বোন বুলি। গাছে উঠে ফল পেড়ে খেয়েছি, অজানা বনলতার ফুল পেড়ে দিয়েছি বুলির খোঁপায়। পাখির বাসার সন্ধানে ফিরেছি উদ্দেশ্যহীন ঘুরে। জলে নেমে গামছা দিয়ে ছোট ছোট মাছ ছেঁকে তুলেছি খালের জল থেকে, ছোট ছোট মাছও ধরেছি পুকুরে বসে ছিপ দিয়ে। বুলি যখন একাগ্র দৃষ্টিতে নীরবে ফাৎনাটার দিকে চেয়ে বসে থাকত তখন তাকে মনে হত যেন মাছরাঙা পাখি। জামদানী ঢাকাই শাড়ি আঁটসাঁট করে পরা, খোঁপায় একগোছা [illegible] ফুল, ভুরু আর নাক ঈষৎ কোঁচকানো, একাগ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফাৎনার উপর, তারপর ছিপ ধরে আকস্মিক টান এবং বঁড়শির মুখে জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব—বাটা বা পুঁটি-মাছের ছটফটানি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ওর নাম ছিল বুলবুলি, কিন্তু ওকে আমি মাছরাঙাই ভাবতাম মনে মনে। আর একটা কথাও মনে পড়ছে। বেত-বন থেকে পাকা বেত-ফল এনে সে ঝাঁকাতো নানারকম মসলা দিয়ে। খিড়কি পুকুরের ঘাটে বসে তাই তারিয়ে তারিয়ে খেতাম দুজনে। বুলি পা নাচিয়ে নাচিয়ে খেত, আর খেতে খেতে চোখমুখ কুঁচকে যেভাবে চাইত আমার দিকে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে তা এখনও ভুলি নি।

আর মনে পড়ছে মা-কে। স্বয়ং লক্ষ্মীকে কখনও দেখি নি, আমার মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর তুলনা চলবে কি না জানি না। কিন্তু আমার মা যা ছিলেন তা বর্ণনার সীমায় ধরবার ক্ষমতা আমার নেই। টকটকে লাল-পেড়ে গরদ পরে তিনি যখন ঠাকুরঘরে রাধাবল্লভের সামনে পুজো করতেন তাঁর চারিপাশে পুজোর উপচার আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি—নানারকম ফুলের মালা, চন্দন, ধূপ, শ্বেতপাথরের থালায় নৈবেদ্য, রুপোর ছোট ছোট থালায় রকমারি ফল, রুপোর গ্লাসে গঙ্গাজল, মধু, আর দুধ, চকচকে তামার পরাতে অজস্র ফুলের রাশি—সে যে কি অবর্ণনীয় মহিমা—সে মহিমা রাধাবল্লভের, না মায়ের, না আমার কল্পনার তা জানি না—কিন্তু তা অপরূপ। হ্যাঁ, যদিও এই প্রসঙ্গে অবান্তর বলে মনে হবে, কিন্তু এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেটা—গোয়ালন্দগামী স্টীমারের ভোঁ। মা যখন পুজো করতেন তখন পদ্মার উপর দিয়ে স্টীমারখানা যেত, ভোঁ দিয়ে যেত, সাড়া দিয়ে যেত, মাকে যেন অভিনন্দন জানিয়ে যেত। যেন বলে যেত, আমিও বন্দরে চলেছি, তুমিও চলেছ, আবার দেখা হবে। রোজই ডাক দিয়ে যেত স্টীমারটা। গভীর নিশীথে ঘুমের ঘোরেও তার ডাক শুনেছি। এখনও হয়তো ডাকে সে। আমরা আর শুনতে পাই না। মা কি শুনতে পান? কে জানে! মা এখন কোথায়? বুলিই বা কোথায়? এই দুটো প্রশ্ন অনেকদিন আমার দিবসের শান্তি এবং রাত্রের নিদ্রা হরণ করেছে, কিন্তু এখন আর করে না। মনের সে শাণিত ফলাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। একদিন যা এক কোপে মানুষের মাথা কেটে ফেলতে পারত এখন তা সামান্য তরকারিও কাটতে পারে না। সব যেন অসাড় হয়ে গেছে। যারা আমাদের দেশের সর্বনাশ করেছে তাদেরই অধীনে চাকরি করছি, যে দেশের লোকেরা [illegible] আমাদের [illegible] পায়ে ঠেলেছে সেই দেশের লোকেদের সঙ্গেই আত্মীয়তার দাবি করছি এবং আমার এই দাবিটা যে মুখোশের দাবি নয়, অন্তরের দাবি, এ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি নিজের কাছেও। কিন্তু দাবি কি নেই? ভালবাসার দাবিই তো। কিন্তু না, এ দাবির কথা মুখ ফুটে বলবার নয়। যে অতীত আমার জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, যার ধ্বংসাবশেষের সম্বলও আমার
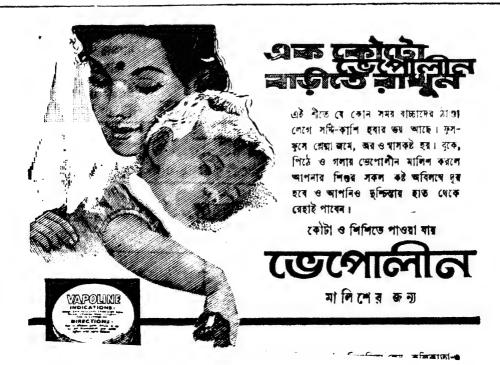
কাছে আর নেই, যার কয়লা আর ছাইগুলো পর্যন্ত নিঃশেষে গ্রাস করেছেন মহাকাল—আমার সেই অতীত জীবনে যখন বাস করতাম তখন তো এ ধরনের দাবির কথা মনেও হয় নি কখনও—মাছেদের যেমন মনে হয় না জলের উপর দাবির কথা যতক্ষণ তারা জলের ভিতর থাকে, জল থেকে টেনে তুললেই তাদের মনে হয়, এ কি হ'ল—এ কি দুর্দৈব—এ কি চক্রান্ত। ডাঙায় উঠে ছটফট করতে করতে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তার মনে হয়, যেখানে এসে পড়েছি সেখানে কি আমার কোনও দাবি আছে এবং এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর পাওয়ার আগেই হয়তো তার মৃত্যু হয় এবং ঝাল ঝোল অম্বল কাটলেট ফ্রাই চপে রূপান্তরিত হয়ে হয়তো সে, না খেই হারিয়ে ফেলছি। দাবির কথা আর তুলব না। একটা কথা মনে হচ্ছে—যখন আমার বাড়িতে পিশাচদের তাণ্ডব চলছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম না। বিলেতে তখন আমি ডিগ্রী অর্জনের চেষ্টা করছিলাম। বিধবা মায়ের সমস্ত গয়না বিক্রি করে বিলেত যাওয়ার দুর্মতি আমার কেন হয়েছিল বারবার এই কথাটাই মনে হয় এখন। কিন্তু যদি সে সময়ে আমি বাড়িতে থাকতাম তা হলে কি হ'ত? ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিতাম? ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতাম? না, কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতাম? ঠিক জানি না, কি করতাম। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কে কি করবে তা আগে থাকতে কেউ ঠিক করতে পারে কি? অনেকগুলো সম্ভাবনা থাকে, যে কোনও একটাকে সে আঁকড়ে ধরে। আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত বাঁচবে বলেই। কখনও বাঁচে, কখনও বাঁচে না। বুলি কি বেঁচে আছে? আমার মা? কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল তারা। আমিও তো অবলুপ্ত হয়ে গেছি আমার গ্রামের লোকেদের কাছে। হরি, আবদুল, ফজলু, মিঠি, বদা এরা কি আমার খবর রাখে আর? মিঠিকে আমি যে বাঁশিটা দিয়েছিলাম সেটা বাজাবার সময় আমার কথা কি তার মনে পড়ে? কিন্তু আমি তো দিব্যি বেঁচে আছি। বুলি আর মা কি তেমনি কোথাও. সহসা মনে হচ্ছে, বেঁচে আছে কি না তা জানবার জন্যে আমার ততটা আগ্রহ নেই, আমার কৌতূহল কেমন করে বেঁচে আছে তাই জানবার জন্য। অর্থাৎ তারা না, কথাটা স্পষ্টভাবে ভাবতেও ভয় করে। অথচ কেউ যদি প্রশ্ন করে ভয়টা কিসের, ওসব ঝুটো কুসংস্কার যে কতটা মূল্যহীন তা কি তুমি জান না, বিলেতে তুমি কি দেখ নি যে, যে সমাজকে আমরা আদর্শ করেছি, হিন্দুরা যাকে সতীত্ব বলে সে জিনিসের কোনও কদর নেই সে সমাজে? সেখানে রাস্তায় ঘাটে পার্কে গার্ডেনে নর-নারীর মিলনের অবাধ সুযোগ কি দেখে আস নি তুমি? জাত নিয়ে, সতীত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা কি

প্রাদেশিকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার মতো হাস্যকর জিনিস নয় একটা? এসব নিয়ে কিছু ভাবা অনর্থক, কিছু লেখা বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। এ বিষয়ে একটিমাত্র সত্যই আমার কাছে একমাত্র সত্য—কাঁটার মতো বিঁধে আছে কথাটা বুকের ভিতর। সে কাঁটা তোলবার উপায় নেই, কাউকে দেখাবারও উপায় নেই।

......হঠাৎ চীনে মুরগী দুটো ডেকে উঠল তারস্বরে। চীনে মুরগীরা যখন ডাকে মনে হয় আর্তনাদ করছে। অন্য মুরগীরাও ডাকতে শুরু করেছে, কোলাহল করছে বিশেষ করে লাল বড় মোরগটা। তারপর খুব সরু গলায়—"বাবু, মুর্গি আন্ডা দেলকে, আন্ডা দেলকে—"

ডাক্তারবাবুর বুড়ী দাইয়ের নাতি বিজয়ের গলা। উঠতে হল। মুরগীর ঘরের চাবি আমার কাছে। উঠে বেরিয়ে এলাম আর একটা জগতে, বাইরের জগতে, যে জগতে এখন আমি আছি।

এ জগৎটা খারাপ নয়, অতি সুন্দর। শহর থেকে দূরে, গঙ্গার তীরে। ছেলেবেলা উদ্দাম পদ্মার তীরে কেটেছে, যৌবনে টেমসের সুসজ্জিত সৌন্দর্য উপভোগ করেছি, জীবনের আসন্ন অপরাহ্নে এসেছি গঙ্গার তটে। আমি যেখানে আছি সেখানে গঙ্গা দুকূল-প্লাবিনী নয়, সন্ন্যাসিনী। তার বিরাট খাতে কখনও জল থাকে, কখনও থাকে না। শীতকালেই সে বৈরাগিনীর মূর্তি ধারণ করে। সামান্য শীর্ণধারা বইতে থাকে এদিকে-ওদিকে, তবু তারই চারধারে নামে শীতের অতিথি পাখিরা। খঞ্জন, কাদাখোঁচার দল, সোয়ালোর ঝাঁক, কখনও কখনও ছোটবড় হাঁসও নানারকম। এই হাঁসেরা আসে গভীর রাত্রে। অন্ধকারে-শিহরন-জাগানো তাদের ডাক শুনে সেটা বুঝতে পারা যায়। কাছাকাছি মানুষ এলেই কিন্তু উড়ে যায় অদ্ভুত পাখার শব্দ করে। বন্দুকধারী মাংসাশী মানুষদের ওরা চিনে ফেলেছে। মানুষরাই মানুষদের কাছ থেকে পালায়, পাখিরা তো পালাবেই। জলের স্রোতে অসংখ্য ছোট ছোট মাছ, প্রতিবেশী বালকবালিকাদের মনের এবং দেহের খোরাক জোগায়। ওদের দেখে মনে পড়ে যায় আমার ছেলেবেলার কথা। মনে পড়ে যায় মাছ-রাঙাকে। গঙ্গার চরে শুধু বালি নয়, পলি-মাটিরও প্রাচুর্য খুব। শীতকালে জমি চষে, গম যব বুট বুনে দেয়, কিছুদিন পরেই ধূসর চর শ্যামল হয়ে ওঠে। তারপর যখন শস্য পাকে তখন চরের আর এক রূপ। দিগন্তের নীলে গিয়ে মিশেছে পাকা ফসলের তরঙ্গিত স্বর্ণ-কান্তি। সকালে-বিকালে ভরদ্বাজ পাখিদের আকাশ-বন্দনা, কৃষকের কণ্ঠে প্রাণ-খোলা গান, আশপাশের গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে ফসল চুরি করা, স্তূপীকৃত কাটা ফসলের রূপ, গরু দিয়ে ফসল মাড়ানো, তার চারিধারে শুধু মানুষ নয়, শালিক-কাক-ফিঙেদের ভিড়, মাথার উপর নীলকণ্ঠের কর্কশ-কণ্ঠের প্রেয়সী-বন্দনা, নিঃশব্দ দুপুরে চিল আর শকুনদের নিঃশব্দ আকাশ-পরিক্রমা—এই সমস্তটা মিলিয়ে গঙ্গার চরের যে শোভা আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে, তা গঙ্গারই শোভা, কিন্তু সে গঙ্গা প্রবলা প্রত্যক্ষবর্তিনী নয়, তা রহস্যময়ী নেপথ্যবাসিনী, গঙ্গা এখানে যেন উদাসিনী সন্ন্যাসিনী, কর্মচঞ্চলা তরুণী নয়। তার রাজত্ব সে যেন ছেড়ে দিয়েছে চরকে, তার চিরপরিচিত রূপ লুকিয়ে দেখা দিয়েছে যেন নূতন রূপে। দেখা দিতেই হবে, রূপ লুকিয়ে রাখা যায় না। চরের ওপারেই কিন্তু গঙ্গার সাবেক রূপ, তরঙ্গ-মুখরা স্রোতস্বিনী। লোকে সেখানে স্নান করছে, পান করছে তার জল, পূজার অর্ঘ্য রচনা করছে, সাঁতার কাটছে, নৌকা ভাসাচ্ছে। একই গঙ্গার দুই রূপ। গঙ্গার ওই তরঙ্গ-মুখর রূপ মাঝে মাঝে দেখব বলে বেরিয়ে পড়ি, হেঁটে চর পার হয়ে যাই। শুধু গঙ্গা দেখব বলে নয়, মাছরাঙা দেখব বলে। ওখানে মাঝে মাঝে মাছরাঙা দেখা যায়।

বিজয় সরু গলায় আবার বললে, "বাবু আন্ডা দেলকে মুর্গি।"

"চল, কোথায় দেখি।"

বিজয়ের বয়স চার বছর। তার দৈনন্দিন কর্মসূচী বিবিধ এবং বিচিত্র। সে কোনও ছুতোয় জল ঘাঁটা, ধুলো ঘাঁটা, বারবার গুলি আর বল হারানো, তার পোষা শালিকের সঙ্গে খুনসুটি করা, লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে তার পিসি রুক্মিণীর কাছে খাবার খেয়ে আসা (কখনও কখনও মারও), ডাক্তারবাবুর মোটরটা যখন তাঁর ড্রাইভার ধরে ধরে পরিষ্কার করে তখন তার চারদিকে ঘুরঘুর করা এবং সুযোগ পেলেই তাতে চড়ে বসা, গিনিপিগ আর খরগোশের খাঁচার কাছে বসে তাদের সঙ্গে আলাপ করা এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ছোলা পেলে এদিক-ওদিক চেয়ে সেটা মুখে পুরে দেওয়া, একটা ভাঙা তোবড়ানো ছোট টিনের মোটরে দড়ি বেঁধে সেটা টেনে নিয়ে বেড়ানো, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য মুরগীর ঘর থেকে ডিমটি সংগ্রহ করে মাইজিকে দিয়ে আসা। মাইজি মানে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। মুরগীর ঘরের চাবিটা থাকে আমার কাছে, কারণ তার সঙ্গে গেটের চাবিটাও থাকে এক রিং-এ। ডাক্তারবাবুর বাড়ির প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের এক ধারে যে 'আউট-হাউস'টা আছে তাতেই আমি থাকি। কিছুদিন আগে যখন এখানে চাকরি নিয়ে এসেছিলাম, তখন বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ডাক্তারবাবু তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর 'আউট হাউস'টাতে। আমি ভাড়ার কথা তুলেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন, আমি বাড়িভাড়া দিই না। তবে আপনি যতদিন খুশি থাকতে পারেন। আমি

বললাম, এভাবে কি থাকা যায়! তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তা হলে থাকবেন না। তাঁর চোখে একটা চাপা কৌতুকহাস্য যেন লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু তখন আর কিছু বলতে সাহস পাইনি।

ডাক্তারবাবু লোকটি একটু অদ্ভুত ধরনের। তাঁর সঙ্গে বেশী কথা কইতে সাহস হয় না। প্রায় সমস্ত দিনই বাইরে থাকেন। রোগীর সন্ধানে ঘোরেন না, রোগীরাই তাঁর সন্ধানে ঘোরে, তিনি থাকেন ঘাটে মাঠে পথে প্রান্তরে। ডিসপেনসারিতে যান অবশ্য খানিকক্ষণের জন্য, যদি দৈবাৎ সে সময় রোগী থাকে, তার চিকিৎসাও করেন, কিন্তু রোগীর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে তাঁকে কেউ কখনও দেখে নি। প্রথম প্রথম আমার অবাক লেগেছিল, কিন্তু কারণটা কখনও জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি। একদিন তাঁরই এক বন্ধু এসে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। আমি তখন তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে আলোচনাটা শুনেছিলাম। শুনে আরও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ইনি বোধ হয় আমাদের মতো লোকের নাগালের বাইরে থাকেন। বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি প্র্যাকটিস যখন ছেড়ে দাওনি তখন রোগীদের অমন করে অবহেলা কর কেন? ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা-ক্রেতা খুঁজি না, খুঁজি প্রণয়ী বা প্রণয়িনী। আমার মনের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে বলে গেছেন—'যে জন আমার লাগি উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে'। যারা ঠং ঠং করে ডাক্তারের ফি গুনে দিয়ে মনে করে ডাক্তারের মাথা কিনে নিলুম, তারা কখনও আমার রোগী হবে না। যে সব ঘাটে হাজার হাজার ডাক্তার বিদ্যের বুদ্ধির ডিগ্রীর ছিপ ফেলে নিজের নিজের ফাৎনার দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে সে সব ঘাটের ত্রিসীমানাও আমি মাড়াব না। ছিপ ফেলার ইচ্ছেই নেই আমার। রোগী আমাকে খুঁজবে, প্রয়োজন তার। বন্ধু বললেন, কিন্তু এ মনোভাব নিয়ে বসে থাকলে ব্যবসা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু, আমি ডাক্তার, বেনে নই। আমার ডাক্তারির উপর যাদের আস্থা আছে, তারা আমার জন্য অপেক্ষা করবে, অপেক্ষা করেও যদি না পায়, আবার ফিরে আসবে। এতে টাকা কম পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দ অজস্র। ওইটেই আমি চাই। আমার বাবার কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার দৈনন্দিন সংসারযাত্রার সম্বল তিনি রেখে গেছেন। উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে আমাকে চাল ডাল কেনবার পয়সা রোজগার করবার জন্য বেরুতে হয় না। আমি সারা জীবন যদি কিছুই না করে বেড়াই তা হলেও আমার চলে যাবে। তাঁর বন্ধু এখন প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তোমার সময় কাটে কি করে? বাড়িতেও তো তোমাকে পাওয়া যায় না। আবার হেসে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু, ঘুরে বেড়াই, মনের আনন্দে, চোখ কান খোলা রেখে। তাতে কি যে আনন্দ তা তোমাদের বোঝাতে পারব না।

এই অদ্ভুত প্রকৃতির খামখেয়ালী লোকটির আওতায় আমি বাস করি। দশটা পাঁচটা স্কুল করি, বাকী সময়টা এখানেই কাটাই। কারও সঙ্গে আলাপ করতে সাহস পাই না। ভয় হয় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বলে পাছে কেউ করুণা করে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই করুণা তাড়া করে এসে আমার ঘরে ঢুকল। প্রথম প্রথম হোটেলে খেয়েছিলাম কয়েকদিন। কিন্তু একদিন ডাক্তারবাবুর বুড়ী ঝি এসে বললে, মাইজি বললেন, আপনি আজ থেকে এখানেই খাবেন। আমি আপনের খানা দিয়ে যাব। কুছু তকলিফ হোবে না। আপনি হোটেলে খাবেন না, ওখানে তর্কারিতে খুব মশালা দেয়, ভাত ভি শকত্ থাকে। ওখানে নীরদবাবু খেতেন, পেটের অসুখে তিনি খতম হয়ে গেলেন। আপনি ওখানে আর খাবেন না, মাইজি মানা করে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে আমি কখনও দেখি নি। তিনি বোধ হয় আধুনিকা নন, বাইরে কখনও বেরোন না। অসূর্যম্পশ্যা হয়তো নন, কিন্তু গোঁড়া অন্তঃপুরিকা। তাঁর ছেলেমেয়ে হয় নি। বিয়েও শুনেছি অল্পদিন হয়েছে। আপাতত বুড়ী ঝিয়ের মাতৃহারা নাতি-নাতনীদের নিয়েই তাঁর সংসার। তা ছাড়াও আছে জন দুয়েক চাকর। তারাও বাড়ির পরিজনের শামিল। আর আছে মুরগী, কুকুর, গিনিপিগ, খরগোশ, ভেড়া আর গরু। গিনিপিগ, খরগোশ আর ভেড়া ডাক্তারবাবুর ল্যাবরেটরির। তিনি মাঝে মাঝে এদের রক্ত নেন রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য। অবশ্য তা কচিৎ। কারণ, রোগীরা প্রায়ই তাঁর নাগাল পায় না।

বুড়ী ঝিয়ের মারফত ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে আমি প্রথমে অবাক এবং পরে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আত্মসম্মান-শজারুর কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম ডাক্তারবাবুকে বলব, 'আমার আর এখানে থাকা পোষাচ্ছে না। আপনি বাড়িভাড়াও নেবেন না, তার উপর বিনা পয়সায় খেতেও দেবেন, এত দয়া আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। আপনি হয় আমাকে পেইং গেস্ট করে রাখুন, না হয় আমাকে ছেড়ে দিন, আমি অন্য একটা আস্তানা খুঁজে নি। এখানে 'চন্দ্রগুপ্ত' হোটেলে একটা ঘর খালি আছে শুনেছি।'

কিন্তু দেখলাম এ কথা ভাবা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। ডাক্তার-

বাবু সকালের দিকে অবশ্য বাড়িতে থাকেন, দশটার আগে বেরোন না কোথাও, যতক্ষণ থাকেন বাড়ির বাইরে মাঠেই থাকেন, কিন্তু তাঁর চতুর্দিকে এমন একটা অদৃশ্য দুর্ভেদ্য দেওয়াল সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকে যে, সে দেওয়াল পেরিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া শক্ত। সাধারণত, এ সময় তিনি তাঁর জন্তু-জানোয়ারদের নিয়েই থাকেন। তাদের সংগে কথা কন। প্রায়ই ইংরেজীতে।

"Hallo, Jamboo, what is your opinion about things in general ?"

'কি হে জাম্বু, দুনিয়ার হাল-চাল সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম?'

তাঁর উচ্চকণ্ঠের এ উক্তি প্রায়ই শোনা যায়। জাম্বু তাঁর পোষা কুকুর। স্প্যানিয়েল জাতের। গা ভরতি কুচকুচে কালো লোম। ভালুকের মতো দেখতে ছিল বলে ডাক্তারবাবু নাকি ওর নাম রেখেছিলেন জাম্বুবান। শুনেছি জাম্বুবানের এককালে খুব প্রতাপ ছিল। কিন্তু এখন ও স্থবির। বোধ হয় কানেও শুনতে পায় না। কিন্তু ডাক্তারবাবু যা বলেন তা ও বুঝতে পারে। কারণ, দেখা যায় ওর মুখে অদ্ভুত একটা স্মিত হাস্য ফুটে উঠেছে, ধীরে ধীরে ল্যাজ নাড়ছে। ডাক্তারবাবু যখন ওর মাথা চাপড়ে আদর করেন—"জাম, জাম, জামটু, জামলিশ"—তখন ও যেন বিগলিত হয়ে যায়, চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ যেন ঝরে পড়ে, তারপর হঠাৎ মাথাটা নেড়ে কান চট্‌পট্‌ করে হেঁচে ফেলে সে। ওইটে ওর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গি। ডাক্তারবাবু যখন জাম্বুকে আদর করেন তখন ভুটানটা তাঁর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার ভাবটা যেন, আমার দিকে মন দেবে কখন। ভুটান ছোট কুকুর, কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর। খাঁদা নাক চ্যাপ্টা মুখ, গা ভরতি সাদায় কালোয় লোম। ল্যাজটি ঠিক ক্রিসানথিমাম্‌ ফুলের মতো, সর্বদাই নড়ছে।

(ক্রমশ)
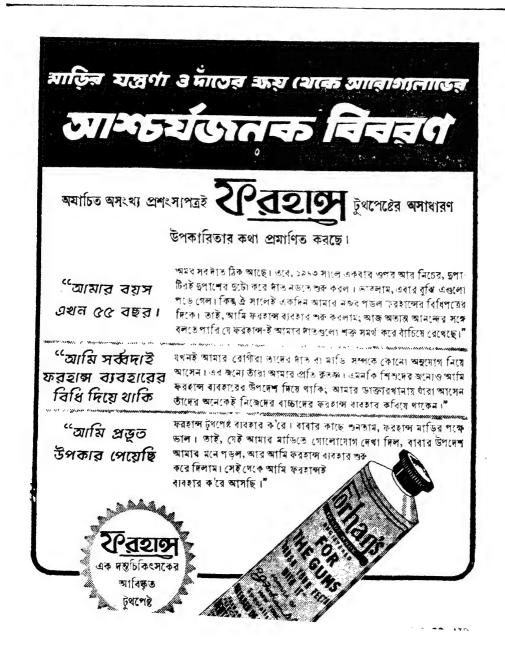
আমি তখন বোর্ডিংএ থেকে ইস্কুলে পড়ি। ফাস কেলাসে।

একদিন শীতের সকালে বোর্ডিংয়ের উঠোনে কয়েকজনে মিলে আরাম করে বসে রোদ পোহাচ্ছি, এমন সময়ে বাড়িংয়ের সামনে রেলের এক পার্শেল-ভ্যান এসে হাজির! ভ্যান থেকে একটা লোক নেমে এসে খনখনে গলায় জিগেস করল—'সিটারাম চকরবরতি বলে কেউ আছে এখানে?'

'না, সিটারাম কেউ নেই তবে শিবরাম বলে একজন আছে বটে।' আমি বললাম।

'না, সিটারামকে চাই।'

কেনরে বাবা, ধরে নিয়ে যাবে নাকি? সেই সময়ে গান্ধির আন্দোলনের হিড়িকে খুব ধড়পাকড় চলছিল চারধারে। গান্ধিজীর দলের বলে সন্দেহ হলে ধরে নিয়ে পুরে দিচ্ছিল জেলে। ভ্যানে চাপিয়ে সটান আমায় জেলখানায় নিয়ে যাবে নাকি? জেলখানায় আর পাহারোলায় আমার ভারী ভয়। পাছে ধরে জেলে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দেয় সেই ভয়ে গান্ধিজীর ভলাণ্টীয়াররা যে পথে হাঁটে আমি সেদিকে পা বাড়াইনে। ভয়ে ভয়ে শুধালাম—কেন, কী দরকার সিটারামকে?'

'নেপাল থেকে রেলোয়ে পার্শেল এসেছে তার নামে হোমডেলিভারির।'

'কিসের পার্শেল?'

'তা আমি বলতে পারব না। কোন প্রেজেণ্ট হবে হয়ত।' লোকটা বলে।

প্রেজেণ্টের নাম শুনে আমার উৎসাহ জাগে। তখন ইস্কুলের রেজেস্ট্রি বইয়ে প্রেজেণ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন প্রেজেণ্ট আমাদের জীবনে নেই, কখনো আসেনি, তাই অপ্রত্যাশিত উপহার প্রাপ্তির আশায় উল্লসিত হলাম।

'সিটারাম নেই তবে শিবরাম একজন আছে এখানে।' আমি জানালাম। 'আমিই সেই ভদ্রলোক। আমাকে দেবে তোমার প্রেজেণ্ট?'

'শিবরাম ছিলিস বটে, কিন্তু এখন ত তুই সিটারাম।' বলল আমার এক বন্ধু: 'আরাম করে বসে আছিস তো এখন। sit plus আরাম is equal to সিটারাম।' 'তাছাড়া চকরবর্তীতেও মিলে যাচ্ছে।' বলল আরেকজন।—'ওরই নাম শিবরাম ওরফে সিটারাম চকরবর্তি বুঝলে হে বাপু!'
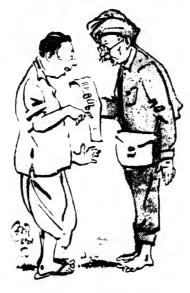
মুখের সামনে মেলে ধরে

'ওই হবে—ওতেই হবে।' বলে ভ্যান-ওলা একটা রেলোয়ে রসিদের কাগজ আমার মুখের সামনে মেলে ধরল। 'আধঘণ্টা ধরে ঘুরে মরছি এই মহল্লায় তোমার খোঁজে। নাও, এখন দু'টাকা দশ আনা বার করো। পার্শেলের রেলোয়ে মাশুলটা দিয়ে তোমার মালের ডেলিভারি নাও।'

বলে সে ভ্যান থেকে উত্তমরূপে প্যাক করা একটা পেল্লায় পার্শেল এনে খাড়া করল উঠোনের ওপর। বলল—'চটপট খালাস করো—গন্ধ ছাড়ছে বেজায়।'

'গন্ধ বেরিয়েছে মালের? কিসের মাল গো?' আমরা সবাই জানতে চাই।

'মাংস। মণ খানেক মাংস। হরিণের মাংস লেখা আছে পার্শেলে। পচে গেছে মাংসটা।' সে বলে।

'পচা মাংস নিয়ে আমরা কী করবো?' আমার উৎসাহ নিভে আসে।

'হরিণ তো পচিয়েই খায় মশাই!' সংক্ষেপে সে জানায়।

'নিয়ে নে নিয়ে নে।' আমার বন্ধুরা উৎসাহ দিতে থাকে—'আজ শনিবার তো। কালকে ছুটি। রাত্তিরে খাসা ফিস্টি হবে এখন।'

'দিনের পর দিন ঘাস চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে ত পেটে চড়া পড়ে গেল। মুখ বদলানো যাবে আজকে।' বল্লে অন্যজন।—'নিয়ে নে মাংসটা আড়াই টাকায় এক মণ, সস্তাই তো রে।'

'আড়াই টাকা নয়, দু টাকা দশ আনা।' মনে করিয়ে দেয় লোকটা।

'এই [illegible] যাহা বহমান তাহা [illegible]'

দু টাকা দশ আনা খসিয়ে মাল তো খালাস করা গেল। তারপর আমরা পার্শেলের পর্যবেক্ষণে লাগলাম। এই যৎসামান্য ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের কারো নামে

আস্ত একটা হরিণের শবদেহ বেরিয়ে আসে

এত বড় পার্শেল কখনো আসতে দেখিনি।

'নেপাল থেকে পাঠিয়েছে।' পার্শেলের গায়ের লেখা দেখে বলল একজন—'কি এক রানা নাকি? সেই পাঠিয়েছে।'

'রানা বলে আমরা এক কাকা আছে, নেপালে চাকরি করে।' আমি জানাই: 'আমার সঙ্গে ভারী ভাব ছিল তার। অনেকদিন তাকে দেখিনি। আমার ছোট কাকা।'

'তাহলে সেই পাঠিয়েছে তোকে আদর করে।'

'এতো দেখছি রানা জং বাহাদুর।' খুঁটিয়ে দেখে আমি বললাম: 'আমার কাকা ত চকরবরতি হলে, সে বাহাদুর হতে যাবে কেন?'

'নেপালে যে যায় সেই বাহাদুর হয়।' ছেলেটা ব্যাখ্যা করে দেয়: 'কিছুদিন থাকলেই নেপালী হয়ে যায় কিনা। যেমন আমাদের পশ্চিমা বন্ধুরা বাংলা দেশে থেকে বাঙালী হয়ে যায় তেমনি। আর নেপালী মাত্রই বাহাদুর। নেপালী হলেই বাহাদুর হতে হবে।'

'আর জং?' আমি জিগেস করি। এই প্রশ্নটাই জবর বলে আমার মনে হয়।

'বেশিদিন বাহাদুরি করলেই জং ধরে যায়।' তার জবাব। 'পুরনো লোহায় যেমন মরচে পড়ে।'

এর ওপর আর কথা নেই। সব জলের মতন পরিষ্কার।

তারপর আমরা জং ধরা সেই জবর পার্শেলের প্যাকিং ছাড়াতে লাগি। লোহার পাতগুলো কেটে ছাড়িয়ে ফেলে চাড়া দিয়ে পেরেকগুলো তুলে শক্ত পাতলা কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে আস্ত একটা হরিণের শবদেহ বেরিয়ে আসে।

'ওরে বাবা! এ যে অনেকখানিরে।' মাংসের চেহারা দেখে আঁৎকে উঠলাম আমরা।—'এত খাবে কে?'

'কেন, আমাদের হোস্টেলে রাক্ষোস কি কম নাকিরে?'

'তাহলে মনিটারকে ডাকি? রান্নার ব্যবস্থা করা যাক।' রাক্ষসদের একজন উৎসাহ দেখায়। মনিটারকে ডাকতে যায়।

'আচ্ছা মনিটারকে দিয়ে এটা হোস্টেলে গছিয়ে দিলে কেমন হয়?' আমি বলি: 'মানে, বেচে দিলে কী হয় হোস্টেলে? খাওয়াও হয়, আবার সেই সঙ্গে দুটো পয়সাও আসে। আমার কাকা যখন আমাকে পাঠিয়েছে...'

'বারে, খাচ্ছিস তো পেটভরে।'

'সেত সবাই খাচ্ছে—যাদের কাকা পাঠায়নি তারাও।' আমি প্রকাশ করি। 'তাছাড়া, আমরা বামুনের ছেলে ভেবে দ্যাখ। খাওয়ার সঙ্গে আমাদের দক্ষিণে চাই। আমি বরং কিছু লাভ নিয়ে মনিটারকে বেচে দিই। মনিটার তার ওপর আরো কিছু বসিয়ে হোস্টেলকে দিক।'

ছোটবেলার থেকেই ব্যবসা বুদ্ধিটা আমার বেশ প্রখর।

মনিটার আমাদের সঙ্গেই পড়ে। ফাস কেলাসের ছেলে এবং ফাস কেলাস ছেলে। পড়াশোনায় ভালো, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। বোর্ডিং-এ ওর হাফ ফ্রি। হোস্টেলে আমাদের খবরদারী করা ওর কাজ। আমাদের খবরাখবর—মানে, কে পড়ছি না পরছি কি করছি না করছি তার সব বার্তা হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কানে পৌঁছে দেয়।

মনিটার আসতেই আমি বললাম—দ্যাখ যোগেন, এই আস্ত হরিণটা আমার কাকা আমাকে উপহার পাঠিয়েছে।

যোগেন দেখল। চোখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে। তারপর বলল—'বিচ্ছিরি গন্ধ বেরিয়েছে ভাই!'

'হরিণ যে রে! হরিণ ত পচিয়েই খায়। জানিসনে?'

'শুনেছি বটে। তা আমি এই মৃতদেহ নিয়ে কী করব?' যোগেন শুধায়: 'পোড়াতে হবে নাকি? কি করে হরিণের সৎকার করে?'

'অতিথি সংকার করে।' বলল উৎসাহী একজন।—'এটা হোস্টেলে দিয়ে রাঁধিয়ে ফিস্টি লাগা আজকে। আমাদের সবার সংকার হয়ে যাক।'

'না না। এমনি নিয়ে নয়।' আমি বাধা দিয়ে বলি : 'কিনে নিতে হবে। মণ দেড়েক মাংস আছে। পনের টাকায় ছাড়তে পারি। তাহলেও হোস্টেলের লাভ, ভেবে দ্যাখ তুই। চার আনা করে সের পড়ল মোটে। চার আনায় কি মাংস পাওয়া যায়? তার ওপর হরিণের মাংস? হরিণ খেতে পাওয়া দূরে থাক দেখতে পায় কটা লোকে? কি রকম লাল রঙের মাংসটা দেখেছিস? লাল মাংস দেখেছিস কখনো?'

বলতে গিয়ে বলতে কি উদাহরণ স্বরূপ আমার মুখ দিয়ে লাল পড়ে যায়। সুড়ুৎ করে সেটাকে টেনে নিয়ে আমি বললাম।—'তুই কিনে নে না হয়। তারপর পনের টাকায় কিনে এর ওপর আরো একটু লাভ চড়িয়ে পঁচিশ টাকায় বেচে দে বোর্ডিংকে।'

ওর লালসাকে চাগাড় দেবার চেষ্টা পাই।

'হোস্টেল এই লাশ কিনতে যাবে কেন? হোস্টেলের কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই?' সে বলে।

'তাহলে তুইই এটা কিনে নিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে অমনি দিয়ে দে। প্রেজেন্ট করে দে না হয়।'

'আমার লাভ?'

'তোর পনের টাকা যাবে বটে, কিন্তু কেমনি মাস মাস তিরিশ টাকা করে বেঁচে যাবে। হাফ ফ্রি তো তোর আছেই। তার ওপর সুপারিন্টেন্ডেন্ট খুশি হলে পুরো ফ্রি হয়ে যাবে তোর। তাছাড়া আরো একটা সুবিধা তুই করতে পারিস।'

'কি সুবিধা?'

'আরে, এই ত তোর মোকা রে' পুরনো হেড মাস্টার বদলি হয়ে নতুন হেড মাস্টার এসেছে ইস্কুলে কদিন হল। এখন যদি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন করে হোস্টেলে এনে খুব কসে খাওয়ানো যায় আর তিনি যদি জানতে পারেন—মানে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মশাই নিশ্চয়ই বলবেন তাঁকে তোর বাড়ির থেকে মাংসটা পাঠিয়েছে আর তুই সবাইকে খাওয়াচ্ছিস তা হলে তুই কি তাঁর দয়ায় ইস্কুল ফিটাও হয়ে যাবে তোর।' আমি বিস্তারিত করি—'ভাই যোগেন, ডবল গেন করবার এমন যো তুই ছাড়িস নে ভাই।'

যোগেন একটু চিন্তা করে। তারপর ছুট মারে সটান—'আমি সুপারিন্টেন্ডেন্ট মশাইকে ডেকে আনি গে।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট মশাই এসে দ্যাখেন—'এ যে আস্ত একটা হরিণ দেখছি। চমৎকার! কোত্থেকে এল।'

'যোগেনের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে সার।' ও যে পাবার আগেই আমি বলে দি। যোগেন, ছেলে হিসেবে যতই ভালো হোক, মনিটার হিসেবে আমাদের কাছে একটা ডেভিল। কিন্তু যখন পনের টাকা দিচ্ছে তখন তাকে তার due দিতে হবে বইকি।—'ও এটা আপনাকে উপহার দিতে চায়।'

ডেভিলস ডিউ দিয়ে আমার ডিউটি করলাম।

শুনে সুপারিন্টেন্ডেন্টের মুখ লালসায় লাল হয়ে ওঠে—মাংসটার মতই টকটকে। মুখ থেকে লাল ঠিক না পড়লেও লালায়িত হয়ে তিনি বললেন—'বেশ বেশ। তা অনেকখানি মাংস আছে এটার।'

'মণ দুয়েক ত হবেই সার।' যোগেন বলল।

সুপারের ভ্রূকুঞ্চিত হল, একটু যেন দোমনা দেখা গেল তাঁকে।—'না, দুমন নয়। তা, দুমন ঠিক না হলেও এক মণ ত বটেই।'

হরিণটাকে তিনি একমনে পর্যবেক্ষণ করলেন।

'এখন এটাকে পুঁতে ফেলা দরকার।' জানালেন তিনি। 'গর্ত খোঁড়ো সবাই মিলে।'

'পুঁতে ফেলবেন?' শুনে আমরা দমে গেলাম। 'পুঁতে ফেলবেন কেন সার?'

গোর দেওয়া ত পোড়ানোরই নামান্তর—আমার মনে হয়। ঐভাবে হরিণটার শেষকৃত্য করবার প্রস্তাব আমাদের মনঃপূত হয় না।

'তা, মাসখানেক ত পুঁতে রাখা দরকার। ভালো করে না পচলে হরিণের মাংস তেমন উপাদেয় হয় না।'

'এমনিতেই বেশ পচেছে সার। যা পচা গন্ধ ছেড়েছে! আবার কেন ওকে পুঁততে যাবেন?' যোগেন বলে।

'যথেষ্ট পূতিগন্ধ বেরিয়েছে সার!' আমি যোগ করি।

'তা বটে। গন্ধটা বেশ জবর রকমের বটে!' বলে তিনি নাকে রুমাল চাপা দিলেন 'তা, যোগেন, তুমি এটা আমাকে উপহার দিতে যাচ্ছ কেন?'

'আপনাকে উপহার দেওয়া সার, তার মানে আমাদের নিজেদেরকেই দেওয়া।'

ওর হয়ে আমাকেই বলে দিতে হল আবার—'দেবতাকে যেমন পুজো দিয়ে প্রসাদ পায় মানুষ। আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আর সব মাস্টারকেও আমাদের পুজো দেওয়া। তাছাড়া, আমাদের নতুন হেড-মাস্টার মশাই এসেছেন। যোগেন চায় যে, মানে আমরা সবাই চাই; আপনি আমাদের হয়ে হোস্টেলের ফিস্টে তাঁকে নেমন্তন্ন করুন।'

'তবে এই ভোজটা আমরা হেডমাস্টার মশাইয়ের সম্বর্ধনা উৎসব বলেই ঘোষণা করি না কেন?' —উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন।—'তাঁর জন্যই এই প্রীতিভোজ!'

'সেই ত আমরা বলতে চাইছি সার। শুধু ভাষায় ফুটিয়ে উঠতে পারছি না কেবল।' আমি বলি—'এই সুযোগে নতুন হেডসারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হবে। সেটা মধুরেণ সমাপয়েৎ করেই সুরু করা উচিত নয় কি? আপনিই বলুন সার!'

'তাহলে বেশ। কাল রবিবার ছুটির দিন আছে। কাল দুপুরের মধ্যাহ্নভোজে হেড-মাস্টার মশাইকে হোস্টেলে নেমন্তন্ন করা যাক। সেই সঙ্গে আর সব টীচারকেও। কী বলো?'

'হাঁ সার। শিবহীন যজ্ঞ যেমন হয় না তেমনি শিবের সঙ্গে আর সব—'

বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই। ভূতপ্রেত কথাটা উচ্চারণ করাটা ঠিক আমার অভিপ্রেত ছিল না।

নেপালের হরিণ আরো উপাদেয় হয়

'শিবের সঙ্গে আর সব দেবতাকেও আমাদের যজ্ঞস্থলে...'

যোগেন বলে। এতক্ষণে একটা যোগ্য কথা বলে যোগেন।

ডাকো ঠাকুরকে। হরিণের মাংস ত রোস্ট করে খেতে হয়। সে কি পারবে রোস্ট করতে? অন্ততঃ রোস্ট করা দরকার।'

ঠাকুরকে ডেকে আনা হল। দেখে শুনে সে বলল—'রোস্ট করতে পারি তো! কিন্তু গোটা একটা হরিণ ধরবে এত বড় হাঁড়ি পাব কোথায়? তার চেয়ে বড় বড় টুকরো করে হাণ্ডিকাবাব বানিয়ে দিই। সেও খুব খাসা হবে খেতে।'

পরদিন দুপুরে সারি সারি পাতা পড়ল আমাদের খাবার ঘরে। টীচাররা বসলেন, আমরাও বসলাম। হেডমাস্টার মশাই বসলেন মধ্যমণি হয়ে।

পোলাও পড়ল পাতায় পাতায়। হাণ্ডিকাবাবের হাঁড়ি এসে নামল আমাদের সামনে। সৌরভে সারাঘর মাত।

পাতে পাতে পড়তে লাগল বড় বড় টুকরো হরিণ মাংসের। হেডমাস্টার মশাই এক গাল কামড়ে বললেন—'বাঃ! বেশ খাসা হয়েছে ত!'

'আরো খাসা হত যদি আরো কিছুদিন পচতে পেত!' বললেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। 'তা তেমন না পচলেও সুপাচ্য হবে আশা করি সার।' আমি অনুযোগ করি।

'আমিও একদিন খাওয়াব আপনাদের হরিণের মাংস।' হাসিমুখে বললেন হেড সার : 'নেপালের এক রানার ছেলে আমার ছাত্র ছিল। সে একটা হরিণ আমায় রেল পার্শেল করে পাঠাবে বলে লিখেছে। দু চার হপ্তার মধ্যেই এসে পড়বে সেটা। খেয়ে দেখবেন তখন। নেপালের হরিণ আরো কত খাসা হয় দেখবেন।'

সটকালাম

শুনে আমার টনক নড়ল। হাত আর নড়ল না। পাতের মাংস পাতেই পড়ে রইলো। অতি কষ্টে এক আধটু চাখলাম।

আঁচানোর পরে যোগেনকে শুধালাম আড়ালে—নতুন হেডসারের নাম কিরে? জানিস?'

'তোদের চক্রবর্তীই ত রে!' যোগেন জানায় : 'শ্রীযুক্তবাবু সীতারাম চক্রবর্তী। এম-এ বি এ—পিটি।'

শুনে আমার চারধার খাঁ খাঁ করে, সব যেন এক মিনিটে এমনি হয়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে কাকচিল ডাকবার আগেই উঠে আমি হোস্টেল ছেড়ে পালালাম। ইস্কুলে ইস্তফা দিয়ে সটান গান্ধিজীর ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লেখালাম গিয়ে।

* * *

মনে পড়লো আর-এক দিনের কথা। এই প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে ক্যালিফর্নিয়া, সেখানে আমি দু-এক সপ্তাহের ভ্রাম্যমাণ। ঘুরতে-ঘুরতে উপস্থিত হয়েছি বিগ সুর-এ, হেনরি মিলারের আমন্ত্রণে। সান ফ্রান্সিস্কো ও লস এঞ্জেলস-এর মধ্যবর্তী এই 'বড়ো দক্ষিণ'; মন্টেরে এয়ারপোর্ট থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে এর সীমানা আরম্ভ। পথে পড়ে কার্মেল শহর, খানিকটা বেঁকে গেলে সাণ্টা ফে; যেমন ডি. এইচ লরেন্সের স্মৃতিজড়িত নিউ মেক্সিকো তেমনি এই অঞ্চলও এমন অনেকের বাসভূমি যাঁরা লেখক অথবা চিত্রকর, কিংবা যাঁরা শিল্পকলার প্রেমিক, বা অন্য কোনো কারণে সমাজে খাপছাড়া। তার একটা কারণ, এ-সব পাড়ায় প্রকৃতি এখনো কিছু পরিমাণে বন্য; আর-এক কারণ পর্যটকের বা যে-কোনো নগরের তুলনায় খরচ অনেক কম এখানে।

কয়েকদিন আগে ক্ষণিকের জন্য নিউ মেক্সিকোতেও থেমেছিলাম। শুকনো হাওয়া লাল মাটির দেশ, পথে যেতে-যেতে বিহার বা উত্তরপ্রদেশ মনে পড়ে। আলবাকার্কে থেকে বাস্-এ করে টাওস-এ যখন পৌঁছলাম তখন ভর সন্ধে। আমি বাস্ থেকে নামামাত্র আমার কাঁধের উপর একখানা হাত পড়লো; মুখ ফিরিয়ে যাঁকে দেখতে পেলাম তিনি ডরথি ব্রেট। আদিতে ছিলেন 'অনারেবল' উপাধিধারিণী অভিজাত ইংরেজ মহিলা; ডি. এইচ. লরেন্সের অনুগামিনী হ'য়ে আটলান্টিক পাড়ি দেবার পর আর ইংলণ্ডে ফিরে যাননি। লরেন্সের প্রথম ভক্তমণ্ডলীর অন্যতম ইনি, তাঁর বিষয়ে প্রথম যুগের একটি পুস্তকের রচয়িত্রী। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে আমি নির্ভুলভাবে লরেন্সীয় নায়িকাকে চিনতে পারলাম। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে আঁটো প্যাণ্ট ও কোর্তা, মাথার চুল ধূসর, চোখ তীক্ষ্ণ, মুখের প্রতিটি বার্ধক্যজনিত রেখাতে বুদ্ধি ও উদ্যম প্রকাশ পাচ্ছে। করমর্দনের সময় দেখা গেলো যে তাঁর হাতখানা আকারে আমার দ্বিগুণ। 'আমাকে ব্রেট ব'লে ডাকবে, সবাই তা-ই ডাকে আমাকে। পুরুষের মতো পোশাক পরি ব'লে এখানকার কেতা-দুরস্ত রেস্তোরাঁয় আমাকে যেতে দেয় না, কিন্তু অন্য আরো ভালো জায়গা আছে—চলো।' এই ব'লে আমাকে তাঁর স্টেশন-ওয়াগনে তুললেন। গাড়ির পিছন দিকে আসন নেই, আছে উঁচু একটা বিছানার মতো ব্যাপার, তাতে বিবিধ কুশানে কম্বলে পরিবৃত হ'য়ে এক বিরাট কুকুর রাজার মতো আসীন। যে-রেস্তোরাঁয় খাওয়া হ'লো সেটা কাঠের বাড়ি, এ-দেশে যাকে লগ্-কাবিন ব'লে সেই গোছের, মনে হয় যেন হেলাফেলা ক'রে বানানো, কিন্তু বসবাসের অযোগ্য নয়। ইলেকট্রিক আলো নেই কিংবা জ্বালেনি, টেবিলে-টেবিলে নরম আলো মোমবাতির, আর অগ্নিকুণ্ডে জ্বলন্ত কাঠ লাল আভায় গনগনে। আমরা ঢুকতেই চারদিকে রব উঠলো- 'হ্যালো, ব্রেট! হ্যালো! কী খবর?' এই ছোটো শহরে এঁকে না চেনে এমন কেউ নেই। আমেরিকার অন্য এক চেহারা দেখা যায় এখানে, সেটা পুরো-পুরি নাগরিক বা য়োরোপীয় নয়, নূ ইয়র্ক বা শিকাগোর চাইতে এখানকার অনেক বেশি কাছের দেশ মেক্সিকো; যে-স্বল্প-

সংখ্যক 'ইণ্ডিয়ান' এখনো ম্রিয়মাণভাবে টিকে আছে তারা অনেকেই এখানকার অধিবাসী। লরেন্স যে এই মহাদেশের মধ্যে নিউ মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছিলেন, স্বাস্থ্য-করতাই তার একমাত্র কারণ ব'লে মনে হয় না। ইংলণ্ডে যা নেই, এবং যার অভাবে লরেন্স কষ্ট পেতেন, সেই প্রসার এখানে অপর্যাপ্ত, ভৌগোলিক ও চারিত্রিক দুই অর্থেই। আহারের পরে ব্রেট আমাকে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সেখানে কিছুটা বাঙালি ধরনে গা ছেড়ে দিয়ে আড্ডা হ'লো। যে-হোটেলে রাত কাটালুম সেখানেও হোটেলিয়ানা খুব কম; ভিড় নেই, অতএব ব্যস্ততাও নেই, চালচলন ঢিলেঢোলা গোছের; দিন-রাত্রির যে-কোনো সময়ে বিনামূল্যে ধোঁয়া-ওঠা কফি বা চা পাওয়া যায়; সকলেরই সকলের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে এবং সময় আছে; যাঁরা কুঁড়েমি করার শক্তি ধারণ করেন তাঁদের পক্ষে আদর্শ জায়গা।

পরের দিন সকালে ব্রেট আমাকে নিয়ে গেলেন একটি 'ইণ্ডিয়ান' 'পোয়েবলো' বা গ্রাম দেখতে। সেখানেও অনেকে তাঁর পরিচিত; যাঁরা ইংরিজি জানে (সকলে জানে না) তারা কেউ-বা এগিয়ে এসে আলাপ করলে। বাড়িগুলো মাটির, একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত তাদের উচ্চতা; লোকগুলোর হাব-ভাব গম্ভীর, মুখে হাসি নেই, কথাও কম; আমাদের সাঁওতালদের মধ্যে যেমন একটি প্রফুল্ল সরব কর্মিষ্ঠতা দেখা যায়, এখানে তার বদলে যেন একটা নির্বেদের ভাব ছড়িয়ে আছে; এদের অনিবার্য অবলুপ্তির অচেতন জ্ঞান তার কারণ হ'তে পারে। আমরা একটা পুকুরের দিকে যাচ্ছিলুম; একটি ছোটো মেয়ে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে তার ভাষায় এবং হাত-মুখ নেড়ে, আমাদের নিষেধ করলে; বোঝা গেলো, ঐ পুকুরটা ট্যাবু, কোনো বিজাতীয় লোক তার ধারে গেলে অপদেবতার দৃষ্টি পড়বে। ও-রকম পবিত্রতা অবশ্য বাড়িগুলোর নেই; এক গৃহস্থের ঘরের মধ্যে, ব্রেট যেহেতু পরিচিত, ঢুকে পড়া গেলো। দেখলাম, অতীতে ও বর্তমানে মিলে এক জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে; মোষের শিং, মাদুলি, পাথির পালকের সাজ, অব্যবহৃত তীর-ধনুক—এ সবের সঙ্গে সাজানো আছে ইলেকট্রিক টর্চ, চামড়ার বেল্ট, এলুমিনিয়মের বাসন, আর আরো অনেক কলে তৈরি কম দামের জিনিশ। করুণ লাগলো দৃশ্যটা; আমার মনে পড়লো এক লাল সর্দার, এদেরই পূর্বপুরুষ, সদ্য-আসা শ্বেতাঙ্গদের কাছে কয়েক পয়সায় বেচে দিয়েছিলেন—পুরো মানহাটান দ্বীপ। সে দৃশ্য আজ মুাজিয়মে দেখানো হয়; এই 'পোয়েবলো', আর স্বল্পভাষী বিমর্ষ মানুষেরা এদেরও মনে হয় মুাজিয়মের সপ্রাণ প্রতিমাণ যেন; ম'রে গেছে, কিন্তু এখনো সৎকার করা হয়নি; গোধূলির ছায়ায় অর্ধলীন হ'য়ে অস্পষ্টভাবে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে।

এর পরে ব্রেটের বাড়িতে আধ ঘণ্টা কাটলো। ছাত্র বয়সে যখন ঢাকায় ছিলুম, রমনার নীল-খেতের একটি বাড়িকে আমি মনে-মনে নাম দিয়েছিলুম 'পৃথিবীর সীমা'। তারপরে আর বাড়ি ছিলো না, শহর ছিলো না, শুধু দিগন্তকে বিদীর্ণ ক'রে একটি রেল লাইন চ'লে গেছে। ব্রেটের বাড়ি দেখে সেই স্মৃতি আমার মনে জাগলো—কিন্তু এর নিঃসঙ্গতা ঢের বেশি তীব্র। প্রতি-বেশী বাড়ি একটিও নেই, চারদিকে শুধু ঢেউ-খেলানো বৃক্ষবিরল মাটির বিস্তার, রোদ্দুরে তাদের ধূসর-ব্রাউন রংটিকে বেশ কড়া লাগছে। চারদিক এমন শব্দহীন, গতিহীন ও আকাশের দ্বারা আপ্লুত যে মনে হয় সত্যি বুঝি পৃথিবী এখানে শেষ হ'য়ে গেলো। একা, শুধু একটি কুকুরকে সঙ্গী ক'রে, এই নির্জনে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন প্রৌঢ়া চিরকুমারী। লম্বা ছাঁদের একতলা কাঠের বাড়ি, মার্কিনীরা যাকে 'লিভিংরুম' বলে সেটি বেশ বড়ো, আর সেখানে যেমন-তেমন ছড়িয়ে আছে শেষ-করা, আরম্ভ করা, অর্ধসমাপ্ত ছবি, আর রং তুলি ইজেল ইত্যাদি সরঞ্জাম। ছবি আঁকেন ব্রেট, তাঁর রচিত কয়েকটি ক্যান-ভাসের সোনালি-নীল পটভূমি থেকে লরেন্সের তীক্ষ্ণ চোখ আমাকে বিদ্ধ করলে। জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরে এক পাহাড়, মাথায় তার টুপির মতো মণ্ডপ; লরেন্সের স্মৃতিস্তম্ভ সেটি, তাঁর পত্নী ফ্রীডার নিবেদন। 'তোমাকে নিয়ে ওখানে যেতে পারতাম, কিন্তু এখনো পুরোপুরি বরফ গলেনি, পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা যাবে না।...আমি লরেন্সকে অনেক বলেছিলুম য়োরোপে ফিরে না-যেতে, এখানে এসে তাঁর শরীর অনেক সেরেছিলো, থেকে গেলে অমন অকালে মৃত্যু হ'তো না।...তোমার সঙ্গে লরেন্সের দেখা হওয়া উচিত ছিলো; তোমার ভালো লাগতো তাঁকে, ভালো লাগতো।' যে-অল্প কয়েকটা বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার তিলতম সন্দেহ নেই এটা তারই একটা, তাই আমি এ কথার কোনো জবাব দিলুম না।...'আমার একটা ছবি উপহার দিই তোমাকে, দেশে নিয়ে যেয়ো। এইটে—?'

ব্রেটকে নিয়ে শহরে ফিরে এলুম লাঞ্চ খেতে। যেখানে-সেখানে ছবির মেলা, রেস্তোরাঁর মালিকও কিছু আর্টের চর্চা করে; এর মধ্যে যে সবটাই খাঁটি তা বিশ্বাস করতে হ'লে অত্যন্ত বেশি আশাবাদী হ'তে হয়। তবে যাকে বলে একটা আবহাওয়া আছে। রাস্তায় মাঝে-মাঝে ভিখারি, রঙিন ঘাঘরা আর কম্বল জড়ানো অলস 'ইণ্ডিয়ান', খুব একটা কেজো অথবা

পোশাকি ভাব কোনোখানেই নেই। এই বিমিশ্র ও চিত্রল আমেরিকার মধ্যে ডরাথি ব্রেট—পুরোনো পৃথিবী থেকে ছিটকে-পড়া; লরেন্সের প্রতিভার প্রভাবে যে-সব মেয়েদের জীবন ব্যর্থ অথবা সার্থক হয়েছিলো তাঁদেরই একজন—তাঁর উচ্চবর্ণশোভন ইংরেজ উচ্চারণ,* কাটাছাঁটা ইংরেজ হিউমার, তাঁর বিদ্রোহী পোশাক, ব্যবহারে মার্কিনী স্বাচ্ছন্দ্য, আর সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সহজ আত্মপ্রত্যয়—আমি ব'সে-ব'সে এই সব উপভোগ করলুম আরো ঘণ্টাখানেক, আমার স্মৃতিতে টাওসের সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেলেন।

তেমনি আমার পক্ষে, বিগ সুর-এ হেনরি মিলার। আশ্চর্য মানুষ, জায়গাটিও আশ্চর্য। টাওসের সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতিতে মিল থাকলেও, বাইরের দৃশ্য একেবারে আলাদা। মিলারের এক বন্ধুর সঙ্গে গাড়িতে আসতে-আসতে দেখি, রাস্তার একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, আর একদিকে সারি-সারি পাহাড় উঠে গেছে। ছোটো পাহাড়, আমাদের হিসেবে টিলাও বলা যায়, কিন্তু গায়ে-গায়ে অরণ্য এত ঘন যে দেখতে গম্ভীর। ধাপে-ধাপে নয়, এক-একটি পাহাড়ের মাথার উপর এক-একটি বাড়ি, নিচে থেকে সবটা তার চোখে পড়ে না। মালিকেরা রাস্তার উপরে স্বনামাঙ্কিত মস্ত লোহার চিঠির বাক্স বসিয়েছেন, ডাক-পিওন সেখানেই চিঠিপত্র রেখে চ'লে যায়, আর তাতেই বোঝা যায় কোন বাড়ির বাসিন্দা কে। নেই রাস্তার নাম অথবা বাড়ির নম্বর; এমনি কয়েকখানা বাড়ি বনানীর মধ্যে, পাহাড়ের চূড়ায়, সমুদ্রের মুখো-মুখি—এই নিয়ে বিগ সুর। এমন এক পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়েছি, যার আদিম রূপ এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি; ইংরেজিতে যাকে বলে 'ঈশ্বরের প্রাচুর্য', এ যেন তাই; মনে হয় এখানে একটি আস্ত পাহাড়ের উপরে বাড়ি তুলে বসবাস করতে লেগে গেলেই হ'লো, কাঠখড় হাতের কাছেই ছড়িয়ে আছে; কেউ কিছু বলবার নেই। এখানে যেন এখনো বিশ্বাস করা সম্ভব যে প্রকৃতি স্নেহময়ী।

ছোটো-বড়ো গাছ, ঝরা পাতা, লম্বা ঘাস;—মধ্যখানে আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি পাহাড়ে উঠলো, বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পৌঁছলাম। কাঠের বাড়ি—এখানেও সেটাই রেওয়াজ, বাঁধানো উঠোনে আমার নিমন্ত্রণ-কর্তা দাঁড়িয়ে। তিনি এগিয়ে এসে যে-ভাবে আমার করমর্দন করলেন, তা আমি এখনো ভুলিনি। অনেক আর তাঁদের মধ্যে মহিলা বেশি—এই প্রথাটিকে শিষ্টাচারের কংকালমাত্রে পর্যবসিত করেন, এমনভাবে দু'টি নিষ্প্রাণ আঙুলের ডগা বাড়িয়ে দেন যেন কোনো অবাঞ্ছিত স্পর্শের সংকোচ কাটাতে পারছেন না। এটা সাধারণত ঘটে বড়ো পার্টিতে সদাপরিচিত মহলে, কোনো মানবিক সম্বন্ধের সম্ভাবনার বাইরে; সেখানে হয়তো নিতান্ত নিয়মরক্ষাই যথেষ্ট, কিন্তু যাকে আমরা হৃদয় দিতে পারি না তাকেও আমাদের কিছু দেবার আছে, এ-কথাটার প্রমাণ ওতে পাওয়া যায়

* 'Trout' শব্দের তিনি উচ্চারণ করলেন 'ট্রাউট'। এটা আমি আর কারো মুখে শুনিনি, অক্সফোর্ড অভিধানেও বলে না।

না। আবার অনেক মার্কিনী পুরুষ, করতল সুদ্ধু পাঁচটি আঙুল টান ক'রে দিয়ে, সমস্ত বাহুটিকে সোজা তলোয়ারের মতো বাড়িয়ে দেন; এটাকেও কেমন সামরিক ভঙ্গি ব'লে মনে হয়, বা অস্তিত্বহীন হৃদ্যতার দেখানোপনা। কিন্তু মিলারের হাতের চাপ একেবারে পূর্ণ, সপ্রাণ ও সবল, তার মধ্যে কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা 'হাতে রাখা' নেই, আছে উষ্ণ ও অব্যবহিত হৃদয়ের সম্ভাষণ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তাঁর পরিবারের অন্তর্ভূত হলাম।

যদি না বার্ধক্যে আমার স্মৃতিলোপ ঘটে তাহ'লে, যতদিন বেঁচে আছি, বিগ সুর-এ হেনরি মিলারের গৃহস্থালির কথা ভাবতে আমার ভালো লাগবে। কৃশ, ঋজু, দীর্ঘাকার হেনরি, ষাটের কাছাকাছি বয়স; স্ত্রী, ঈভ, সুন্দরী ও প্রৌঢ়যৌবনা; দুটি চার ও পাঁচ বছরের সন্তান, ভাল ও টোনি, নীল চোখ ও পটবর্ণ চুলে নয়নহরণ। ঈভ আগে ছিলেন অভিনেত্রী; এটি তাঁর তৃতীয় ও হেনরির দ্বিতীয় বিবাহ। ছেলেমেয়ে দুটি হেনরির পূর্বপক্ষের, তারা পালা ক'রে বছরে ছ-মাস বাপের ও ছ-মাস মায়ের কাছে থাকে। হেনরির মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা; কথা বলেন ধীরে ও ঈষৎ শ্লথভাবে; ঘাড় হেলিয়ে মনোযোগপূর্বক অন্যের কথা শোনেন। ইনি খাশ আমেরিকান, এঁর জীবনেও মার্কিনদেশের চরিত্র প্রতিফলিত। জন্ম গরিবের ঘরে, কলেজে পড়াশুনোর সুযোগ পাননি, যৌবনে টেলিগ্রাফের কেরানিগিরি ক'রে জীবিকা চালাতেন। এমন দিন গেছে যখন ন্যু ইয়র্কে শীতের শেষে নগণ্য দামে গা-ছাড়া করেছেন ওভারকোট। সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ ক'রে প্যারিসে; সমবয়সী অন্য অনেক মার্কিনী লেখকের মতো, উদ্বেল ও বিপদসংকুল বোহেমিয়ায় নিমজ্জন। ফিরে এলেন যৌবনের শেষে কুখ্যাত ও বিখ্যাত হ'য়ে; তাঁর প্যারিসে ছাপা দুটি উপন্যাস এখনো অ্যাংলো-স্যাক্সন জগতে ঢুকতে পায় না। লেখা, ছবি আঁকা, বিগ সুর-এর নিসর্গ ও সংসর্গ—এই দিয়ে আপাতত রচিত তাঁর জীবন। কদাচ পূর্বতটে যান, বিশ্ববিদ্যালয় বা ফাউন্ডেশনগুলির সঙ্গে সংস্রব নেই; তাঁর অবস্থা কোনো-কোনো মধ্যবয়সী বাঙালি লেখকের মতো—কিছুটা খ্যাতি হ'য়ে থাকলেও অর্থ আসেনি, 'এক-একদিন এমনও হয় যে বিদেশে একটা চিঠি লেখার জন্যে দশ সেন্ট জোটে না।' হয়তো য়োরোপে দীর্ঘ প্রবসনের জন্য, বা স্বভাবেরই প্রভাবে, তাঁর কয়েকটা অভ্যেস লক্ষণীয়ভাবে অমার্কিনী: ইনি চিঠি লেখেন সর্বদা 'লম্বা হাতে', তাও অনাধুনিক ফাউন্টেন-পেনে: জেট প্লেন ও কাফেটেরিয়ার জগৎকে অন্য যে-সুবিধাজনক ও নিশ্চরিত্র লেখন-যন্ত্র জয় ক'রে নিয়েছে, সেই তথাকথিত ডট-পেন ব্যবহার করেন না এমন আমেরিকান আমি এঁকেই শুধু দেখেছি। এবং বন্ধুতার স্থাপনে ও লালনে ইনি যদিও প্রতিভাবান, তবু এঁর ব্যক্তিত্বটি সংবৃত; আমাকে ভালোবেসেও 'মিস্টার বোস' ভিন্ন আর-কোনো সম্বোধন করলেন না; সেটা আমার পক্ষে বেশ মনোমতো হ'লো।

পক্ষান্তরে, ঈভ দু-লাইন চিঠি লিখতে হ'লেও টাইপরাইটার খুলে বসেন, তাঁর কথা উচ্ছল, চলাফেরা দ্রুত, সরলতায় ও কৌতূহলে ভরা চোখ, নিজেকে এমন সহজভাবে প্রকাশ করেন যা শুধু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। আমি যেন তাঁকে 'ঈভ' ব'লে ডাকি, এই ইচ্ছাটি তিনি অনেকবার ব্যক্ত করলেন, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে আমার সঙ্গে বরং হেনরির মিল অনেক বেশি। কিন্তু এই দুই ভিন্ন চরিত্রের মানুষের যুগপৎ সঙ্গ আমার পক্ষে খুব আনন্দের হ'লো। যাতে রান্নার সময়ে স্ত্রীকে নির্বাসিত হ'তে না হয় সেইজন্য লিভিং রুমেরই এক অংশে রান্নাঘর পেতে নেয়া হয়েছে; কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কথা চলে, কিছু-একটা চাপিয়ে ঈভ এসে বসেন আমাদের সঙ্গে। হয়তো ঈভ কথা বলেন, হেনরি এলিয়ে ব'সে সিগারেট খান, টোনি, ভাল ও আমাকে নিয়ে হেনরি বেরোন বেড়াতে আর ঈভ বাড়িতে থাকেন স্বামীর পছন্দসই ক'রে মুর্গি রাঁধার জন্য; আবার কখনো ঈভ গাড়ি চলান, হেনরি একটু ঘুমিয়ে নেন সেই ফাঁকে। গাড়ি না থাকলে ক্যালিফর্নিয়ায় বাস করা দুঃসাধ্য, বিগ সুর-এ অসম্ভব। এখান থেকে নিকটতম বাজার সেই কার্মেল শহরে, নিকটতম ড্রাগ-স্টোর কোন না পাঁচ-সাত মাইল দূরে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হ'য়েও বিগ সুর-এ টেলিফোন নেই,* যে-কোনো ছোটো কাজেও নিজে না-বেরোলে চলে না। তাই গাড়ি চাই, আর এখানে গাড়ি মানেই স্টেশন-ওয়াগন। হেনরিরও আছে একটি; সেই যানে, রাত দশটার পরে, তিনি আমাকে আমার শয়নাগারে পৌঁছিয়ে দিলেন।

হাকোনের মতো, বিগ সুরও স্বাস্থ্যকর স্নানের জন্য নামজাদা। একটা জায়গায় প্যাসিফিক একটু দ্রুত রেখায় বেঁকে গেছে, তার কাছে এলে তীব্র একটা গন্ধ পাওয়া যায়। প্রকৃতি এই জলের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে গন্ধক; জল তাই তপ্ত, ফেনিল ও সধূম; তট ঘেঁষে, শিলাখণ্ডগুলিকে ঝাপসা ক'রে দিয়ে, এক বুদ্বুদময় আলোড়ন চলছে সব সময়। কাছেই আছে স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভাড়া নেবার জন্য কয়েকটি কাঠের কুঠুরি; তার একটি, হেনরি মিলারের গরজে, আমার জন্য ঠিক করা ছিলো। উদ্ভিদের

---

* আমি ১৯৫৪-র কথা বলছি; এখনকার অবস্থা জানি না।

সবুজে ও ঘনতায় বেষ্টিত পাহাড়, তার তলায়—বড়ো হোটেল বা বিলাসী বাংলো নয়, সরল কুঠুরিতে বহুদিন পর রাত্রিকে খুব গভীরভাবে অনুভব করলাম। বাঁকা চাঁদ, কুয়াশায় চ্যাপ্টা, সমুদ্রের উপর ঝুলে আছে; তাকে দলিত ক'রে অন্ধকারের তোরণ উঠেছে আকাশ পর্যন্ত; শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসে, ঘুমন্ত লোকের পাশ ফেরার মতো, বোবা গাছগুলোর অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়। ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়ামাত্র কালো রাত্রির প্লাবন নামলো আমার উপর; আমার পিছনে অরণ্য আর সামনে মহাসাগর; আমার চেতনার মধ্যে পশ্চিমতম আমেরিকা, মধুর বন্ধুতা, অন্য কত বন্ধুতার স্মৃতি, কত হারিয়ে-যাওয়া, ফিরে-পাওয়া এবং আবার যাকে হারাতে হবে এমনি সব স্বপ্ন; মনে হ'লো এই রাত্রিটি ঘুমের জন্য তৈরি হয়নি। এই কথাটাকেই বলার জন্য কবিতার লাইন ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে সমুদ্রের সঙ্গে ভালো ক'রে দেখা হ'লো। এখানে আধো চাঁদের আকার নিয়েছে প্যাসিফিক, যেন দুই হাত বাড়িয়ে মাটিকে আঁকড়ে আছে; আর তট যেখানে ঢাল, হাতে-হাতে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে ঠিক সেখানেই কুঠুরির মালিক রেস্তোরাঁ বসিয়েছেন। আমার প্রাতরাশ শেষ হ'তে-হ'তেই হেনরি মিলার আমাকে নিতে এলেন।

কাঠের কুঠুরিতে দুই নিস্তব্ধ রাত্রি আর মিলার-দম্পতির সঙ্গপূর্ণ দুই আনন্দিত দিন দ্রুত কেটে গেলো। দেখলাম রেড-উড বৃক্ষের অরণ্য, সবুজ অন্ধকারে তারা আবণ্যক দুপুরে, ড্রাগ-স্টোরের জানালা দিয়ে পথপ্রান্তে সবুজ বিশাল নদী—অনেকটা আমাদের পূর্ববঙ্গের খালের মতো, কিন্তু দুই দিকের তরুপল্লব অনেক বেশি নিবিড়—মিলারের উঠোন থেকে আবছা লাল সূর্যকে নেমে যেতে দেখলাম সমুদ্রের মধ্যে। গন্ধক-জলে স্নানও করা হ'লো*। কিন্তু সবচেয়ে আমার যা বেশি মনে পড়ে তা গৃহস্বামী ও স্বামিনীর আতিথ্য, তাঁদের আলাপ, আগ্রহ, হেনরির স্বতঃস্ফূর্ত, মনোযোগী ও উচ্ছ্বাসহীন বন্ধুতা। আমাকে একটি তাম্র-মুদ্রাও তিনি খরচ করতে দিলেন না; কুঠুরির ভাড়া, এমনকি প্রাতরাশের দাম—আমার ব্যাকুল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সবই তিনি মিটিয়ে দিলেন; এর প্রেরণা, আমি জানি, নেহাৎ সৌজন্যবোধ নয়, হৃদয়ের পরামর্শ। নিশ্চয়ই তাঁর হাতে তখন অনেক কাজ ছিলো, কিন্তু এই দু-দিনের সবটুকু সময় তিনি আমার জন্য ক্ষয় করলেন—একেবারে প্লেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গদানে বিরাম ছিলো না। অথচ তিনি আমাকে জানেন শুধু চিঠিপত্র এবং ক্ষণিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে; আমার ভাষা তাঁর অজানা; আমার রচনা, চেষ্টা, সংকল্প সবই তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে; যাকে অর্থ তাঁর কিছু না ক'রে আমি বলবো, আমার আসল অংশ, তা তাঁর পক্ষে প্রদোষান্ধকারে আবৃত। কিন্তু তাঁর কিছু লেখা আমি পড়েছি, তাঁর পটভূমি ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বিনা আলাপেও তাঁকে ধারণা ক'রে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব। এ-দিক থেকে আমাদের সম্বন্ধে সাম্য নেই, তাঁর দিকে পাল্লা অনেক ভারি। ভারি এই অর্থে যে আমাকে এমন সহজে ও সম্পূর্ণভাবে তিনি গ্রহণ করলেন, যেন আমার কোনো লেখা না-প'ড়েও, আমার অন্তর তিনি দেখতে পেয়েছেন, যেন তিনি নিশ্চিতরূপে জেনেছেন যে কাছে বসে, কথা শুনে যেটুকু পাওয়া যায়, তা পেরিয়েও

* এই স্নানের একটা বর্ণনা সংক্ষেপে দেয়া যেতে পারে। সমুদ্রে যেখানে গরম ধোঁয়া উঠছে, তার ধার ঘেঁষে স্নানের ব্যবস্থা—মেয়ে ও পুরুষের জন্য আলাদা। একটা টবে গরম গন্ধক-জল, পাশে আর-একটাতে সাধারণ জল রাখা আছে পরে পরিষ্কৃত হবার জন্য। হেনরি আমাকে নিয়ে এসে বললেন, নেমে পড়ো। কোনোরকম আবরু নেই, সারি-সারি টব সাজানো আছে; হেনরি আধ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ অনাবৃত হ'য়ে গন্ধক-জলে দেহ ডুবিয়ে শুয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, ভারতীয় অভ্যাসবশত তাঁর অনুকরণ করা আমার পক্ষে সহজ হ'লো না; আমি কোনোরকমে একটুখানি গা ভিজিয়ে পুনশ্চ দ্রুত সবস্ত্র হ'য়ে নিশ্বাস ফেললুম। দেখলুম, এক পিতা এলেন শিশুপুত্রকে নিয়ে; দু-জনেই আদমের বেশে অনায়াসে স্নানে নামলেন। আমার অবশ্য অজানা ছিলো না যে পাশ্চাত্ত্য সমাজে অনাবরণ নিষিদ্ধ হয় শুধু মেয়ে-পুরুষ একত্র থাকলে, কিন্তু অন্য দু-একটি সংস্কারের মতো, আমাদের শারীরিক লজ্জা এখনো দুরপনেয়।

আমার কিছু মূল্য আছে। আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে, অন্যদের কাছেও এই রকম বন্ধুতা আমি মাঝে মাঝে পেয়েছি, এখন জাপানে এসেও তা ভাগ্যে জুটে গেলো। আমার ব্যর্থ জীবনের এই একটি অমল উপার্জন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি।

১৯ জানুয়ারি

সকাল: প্রাতরাশ শেষ: আমাদের যাবার সময় হ'লো। দু-চারটে ছড়ানো জিনিশ গুছিয়ে নিয়ে নিচে নামলুম।

আমাদের অপেক্ষায় সামনের দরজার কাছে সিঁড়ির উপর ওবারা ব'সে আছেন সকাল-বেলা তাঁকে ঈষৎ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাপড়ের চটি ছেড়ে জুতো পরে নিলুম আমরা; সরাইখানার মালিক ও দাসী তেমনি আনত হ'য়ে অভিবাদন করলো। ওবারা এলেন আমাদের সঙ্গে গাড়ির দরজা পর্যন্ত; এই সদাশয়, সদানন্দ, বৎসল মানুষটির কাছে অবশেষে বিদায় নিতে হ'লো। গাড়ির ব্যবস্থা তিনিই করেছেন, যাতে টোকিওতে ফেরার আগে হাকোনের ন্যাশনাল পার্ক আমরা দেখতে পাই। এই ভ্রমণ ও রাত্রিযাপনের সমস্ত ব্যয়ও তিনি বহন করলেন।
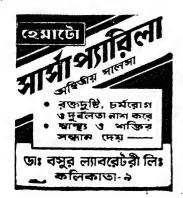
এঁকে-বেঁকে অম্বরবেগে গাড়ি চলেছে; আমাদের চোখ চারদিকে চপল। ডাইনে ও বাঁয়ে, সামনে ও পিছনে—সবই দ্রষ্টব্য, সবই সুন্দর। পাহাড় ও হ্রদ, স্রোতস্বিনী ও বনভূমি, সবুজের কোলে সিঁদুরে রঙের মন্দির অথবা সরাইখানা; যেখানে স্বচ্ছ নীল আশি হ্রদের মুকুরে শুভ্র ফুজিয়ামা নিজেকে অবলোকন করছে ঠিক সেখানে, তুষার-চূড়ার মুখোমুখি, একটি চিত্তহারী হোটেল। পথে-পথে প্রস্রবণ, কোথাও পাহাড়ের গা ফেটে উত্তাপের ধোঁয়া উঠছে, কোথাও হ্রদের মধ্যে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য স্টীম-লঞ্চ অপেক্ষমাণ; আর কোথাও বা সেডার পাইন মেপলের রহস্য দুইদিকে ছায়া ক'রে আছে। হিমালয়ের মতো ভীষণ বা আল্পসের মতো উত্তুঙ্গ নয় দৃশ্য; বিগ সুর-এর মতো বন্যতাও নেই;—সাজানো, গোছানো, পরিপাটি ও ত্রুটিহীনরূপে রমণীয়। য়োরোপের কোনো-কোনো ছোটো দেশের যা বর্ণনা পড়েছি, তার সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়।*

১৯ জানুয়ারি, রাত্রি

এই সপ্তাহে টোকিওতে কোনো নো নাটক দেখানো হচ্ছে না; ওটা-দম্পতিকে নিয়ে একটা কাবুকি দেখতে এসেছি। উৎসাহ আমারই, কেননা আগে একবার ন্যু ইয়র্কে কাবুকি নামাংকিত নৃত্যাভিনয় উপভোগ করেছিলাম।—কিন্তু সেটা যে খাঁটি জিনিশ ছিলো না, আর তার মিশোলের অংশে যে প্রতীচীর অবদান ছিলো অনেকখানি, তা বুঝতে, টোকিওর থিয়েটারে পরদা ওঠার পর, কয়েক মিনিট মাত্র সময় লাগলো।

আমাদের হোটেলের প্রায় পাশের বাড়ি এই থিয়েটার, এখানে কাবুকি ভিন্ন আর-কিছু অভিনীত হয় না, এবং শীত ঋতুতে প্রত্যহ অনুষ্ঠান থাকে। এ থেকেই বোঝা যাবে কাবুকি কতদূর জনপ্রিয়। নো যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত, কাবুকি তেমনি লৌকিক ধারার আশ্রয়স্থল। এতে মেয়েদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন পুরুষরা—বালক নয়, বয়স্ক পুরুষ; নাটকে থাকে হাস্য, শোক, ত্রাস প্রভৃতি নানা রসের আবেদন, সংগীতের অংশ প্রচুর, এবং সাধারণত সমাপ্তি হয় সুখের। অনেকটা আমাদের যাত্রার মতো ব্যাপার—যদিও রঙ্গ-মঞ্চের গঠন পুরোপুরি প্রতীচ্য; এতেও আছে এমন গায়কবৃন্দ যারা নাটকের কুশীলব নয়, শুধু গানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। ন্যু ইয়র্কের কাবুকিতে এই গায়কবৃন্দ ছিলো না, মেয়েদের ভূমিকায় ছিলেন নটীরা, কাহিনী ছিলো ব্যালে-র মতো সরল, আর নাচের কোনো-কোনো ভঙ্গির মধ্যেও ধ্রুপদী ব্যালের আমেজ ছিলো। সেই স্মৃতি নিয়ে এখানে এসে প্রতিহত হলাম।

বেশ বড়ো প্রেক্ষাগৃহ, একটি আসনও তার খালি নেই। নাটকের প্রধান নায়িকা প্রথম থেকেই উপস্থিত। এই ভূমিকায় যিনি নেমেছেন তিনি বর্তমানে জাপানের সবচেয়ে বিখ্যাত 'নারী-অভিনেতা'। তাঁর কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি অবিকল মেয়েলি, তাঁর কাঁধ চওড়া, কটি ক্ষীণ নয়, কিন্তু নায়িকাটিও প্রৌঢ়া ব'লে তা মানিয়ে গেছে। তাঁর অভিনয়, ও নাটকের অগ্রগতি, প্রভৃত আনন্দ দিচ্ছে সকলকে, শুধু আমরা দুই অদীক্ষিত বাঙালি কাষ্ঠপুত্তলির মতো ব'সে আছি। নাটকের কাহিনীটি যেমন দীর্ঘ, তেমনি জটিল, আর তার মধ্যে অর্থ-গৌরবও বেশি কিছু নেই—অন্তত ইংরেজি চুম্বক প'ড়ে তা-ই মনে হচ্ছে আমাদের; জাপানকে এত ভালোবেসেও এই অভিনয়ের আমরা রসগ্রহণ করতে পারছি না; বর্বর ঘুমের আক্রমণে আমি তো থেকে থেকেই বিহ্বল হ'য়ে পড়ছি; প্র[illegible] আমাকে পীড়ন ক'রে জাগিয়ে দিচ্ছিলেন ব'লে কিছুটা তবু দেখতে পেয়েছিলাম। খুব লজ্জা পেলাম ওটা-দম্পতির কাছে, আপ্রাণ সচেষ্ট হলাম মনঃসংযোগে; কিন্তু দুটো অংক ধ'রে কসরৎ করার পরে হার মানতে হ'লো, আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করা ভিন্ন উপায় রইলো না। হোটেলে ফিরে জাপানি বন্ধুদের নিয়ে যখন আহারে বসলাম, তৎক্ষণে আমার নিদ্রালুতা অবশ্য সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

যা অসংখ্য জাপানির পক্ষে উপভোগ্য, আমরা কেন তা থেকে কিছুই নিতে পারলুম না? ভাষা জানি না ব'লে? কিন্তু জর্মান ভাষাও আমি জানি না, তবু হ্বাগনার-এর অপেরাতে গিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরতে হয়নি। আসল কথা, হ্বাগনার-এর জগৎ আমার পরিচিত, তাঁর পাদপীঠের জীবনী আমার অজানা নেই, আর য়োরোপীয় গান, তাতে আমার রক্তের টান না-থাকলেও আমার পক্ষে তা একেবারে অনভ্যস্ত নয়। কিন্তু এই কাবুকির অভিনয় যে-সব প্রচলের উপর নির্ভর করছে সেগুলি শুধু জ্ঞানের নয়, আমার ধারণার পর্যন্ত বাইরে। সেই পট-ভূমির অভাবে, তার ভঙ্গি বা ভাব বা সংগীত আমার মনে লেশমাত্র সাড়া জাগাতে পারলে না। জাপানি ভাষায় অজ্ঞ হ'লেও ক্ষতি ছিলো না, যদি এর অভিনয়ের ভাষা আমি জানতুম। সেই গভীরতর সাংকেতিক ভাষা জানা নেই ব'লে, একবার এর্নাকুলমে গিয়ে, আমি কথাকলি নৃত্যের সামনে নিস্তাপ ও অসহায়ভাবে ব'সে ছিলুম। শুধু 'প্রেমে'র অভাবেই 'গানভঙ্গ' হয় না, তার জন্য অশিক্ষাও দায়ী। 'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আরেকজন গাবে মনে'—এটা নিশ্চয়ই পরম গুণগ্রহণের শর্ত, কিন্তু চরম শিক্ষা না-থাকলে এই অবস্থাটি অসম্ভব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

* পরে, ডেনমার্কে ও ব্যাভারিয়ায় গিয়ে, হাকোনের কথা আমার মনে পড়েছে।

॥ ২৭ ॥

দুটো সাইন বোর্ডে একজন সায়েব এবং একজন মেমের ছবি দেখেই বুঝলাম আমরা লক্ষ্যস্থলে হাজির হয়েছি। কোট-প্যান্ট-পরা সায়েব এবং বহুবর্ণে বিচিত্রিত মেমসায়েব এক সঙ্গে আঙুল দিয়ে একটা দরজার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। সেখানে লেখা—'এই যে, আদি ও অকৃত্রিম জ্যোতিষ গবেষণা কেন্দ্র। দুষ্ট দালালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অন্য কোথাও যাবেন না।' বাংলা ছাড়াও ইংরিজী, হিন্দী এবং আরও কয়েকটি ভাষায় সেই একই সাবধান বাণী সযত্নে লেখা রয়েছে।

কনি ট্যাক্সি থেকে নেমে নিজের কালো চশমাটা খুলে একবার সাইন-বোর্ডের দিকে তাকালে। ইতিমধ্যে আমরা আবার 'দুষ্ট' দালালের হাতে পড়লাম। 'গুড মর্নিং, মেমসাব', বলে একটা হাফপ্যান্টপরা রোগা এবং বেঁটে লোক কনির সামনে এসে দাঁড়াল।

ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে সে যা বললো তার অর্থ এই যে 'ম্যারেজ প্রবলেমে' স্পেশ্যালিস্ট জ্যোতিষী প্রফেসর হরিদাস দি গ্রেট কাছেই রয়েছেন। তিনি এক হিসেবে অদ্বিতীয়। কারণ তিনি সার্জিক্যাল জ্যোতিষী। প্রয়োজন হলে হাতের রেখা শল্য-চিকিৎসায় পরিবর্তন করেন।

দালালের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে, কনিকে নিয়ে আমি সোজা শিবদাস দি গ্রেটের গবেষণাগারে ঢুকে পড়লাম। ঘরের মধ্যে আগন্তুকের সংখ্যা কম ছিল না। আর দেওয়ালের চারিদিকে ঘোড়ার ছবি। মাঝে মাঝে সস্তা ক্যালেন্ডার থেকে কাটা সুখী দম্পতির ছবি। সবচেয়ে অবাক হলাম গোটা কয়েক চটের থলি দেখে। সেগুলোকেও পরম যত্নে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

কনিও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার মনের অবস্থা ভাল নয়। অনেক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে শাজাহান হোটেল থেকে এই নোংরা গলিতে সে এসেছে। শিবদাস দি গ্রেটের একজন সহকারী এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ভদ্রলোকের মুখের ভাব দেখে মনে হলো তাঁর ইংরিজী বাচনভঙ্গীর উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু ভদ্রলোকের জগাখিচুড়ি ভাষা থেকে কিছুই বুঝতে না পেরে কনি আমার মুখের দিকে তাকালে।

ভদ্রলোকের কাছে নিবেদন করলাম, "আপনার যা বক্তব্য তা মাতৃভাষায় পেশ করুন।" ভদ্রলোক একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বললেন, "ওয়েলেসলী স্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, এবং এন্টালির কত আচ্ছা আচ্ছা মেম-সায়েবের সঙ্গে রোজ বোম্বাই মেলের স্পিডে ইংরিজী চালাচ্ছি, আর আপনি কিনা বলছেন বাংলায় কথা বলতে।"

আমি বললাম, "ইনি এলিয়ট রোডের মেমসায়েবদের মতো ভাল ইংরিজী জানেন না। উনি যে আসছেন খোদ স্কটল্যান্ড থেকে।"

স্কটল্যান্ড কোথায় এবং সেখানে কি ভাষায় কথা চলে তা ভদ্রলোকের যে জানা

নেই তা একটু পরেই বুঝলাম। ভদ্রলোক বললেন, "তাই বলেন, ইংরেজী বোঝে না। আমাদের এখানে মাঝে মাঝে দু'একটা এমন সায়েব আসে। তাদের নিয়েই আমার মুশকিল। তারা না বোঝে ইংরিজী, না বোঝে বাংলা। শুধু মুখ দিয়ে সাঁই সাঁই আওয়াজ করে। তারপর একজন বলে দিলে, সায়েব ফরাসী। এখন বুঝে গিয়েছি সাঁই সাঁই আওয়াজ হলে ফরাসী, আর ভট ভট আওয়াজ হলে জার্মান।"

কনি এবার আঙুল দিয়ে থলেগুলোর দিকে দেখাতেই লোকটা বললে, "আপনাদেরও কি বি-টুইল? গানিব্যাগ, হেসিয়ান, উলপ্যাক, কিংবা বি-টুইল হলে এখনই ওঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। উনি এখন মারওয়াড়ী ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ঐ সাবজেক্টেই কথা বলছেন।"

কনিকে অনুবাদ করে বলতেই সে যেন ভয় পেয়ে গেল। বললে, "গানি ব্যাগ দিয়ে আমি কি করবো?"

বললাম, "পাটের থলে নিয়ে যাঁরা ফাটকা-বাজী করেন তাঁরা এখানে জ্যোতিষের সাহায্য নিতে আসেন। যাঁরা রেসের মাঠে যান তাঁরাও আসেন। শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক তাঁরাও আসেন। আগামীকাল স্টক এক্সচেঞ্জে এ'রা ষাঁড়ের মতো সামনে তেড়ে যাবেন, না ভাল্লুকের মতো পিছু হটে আসবেন তা এইখানেই পণ্ডিত মশায় আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে দেন।"

কনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কনিকে বললাম, "আপনার এখানে কী দরকার?"

কনির সুন্দর মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো। বুঝলাম, ওর বলতে লজ্জা হচ্ছে। হয়তো কষ্টও হচ্ছে।

মহাত্মা শিবদাস এবার আমাদের ডেকে পাঠালেন। একটা বড় ঘরের কোণে পূজার উপকরণ নিয়ে তিনি কার্পেটের আসনে বসে রয়েছেন। তাঁর গায়ে গরদের চাদর। উপবীতটাও গলার কাছে সামান্য একটু দেখা যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই, শিবদাস দি গ্রেট পৈতে বার করে কনিকে আশীর্বাদ করলেন। কনি বাইরে জুতো খুলে রেখে এসেছিল। নাইলনের মোজা সমেত পা দুটো এবারও যেন লীলায়িত ভঙ্গীতে দরজার কাছ থেকে পণ্ডিতের দিকে এগিয়ে গেল। নিজের স্কার্টটা সামলে নিয়ে, কনি পা মুড়ে একটা আসনের উপর বসে পড়লো। ওর স্নিগ্ধ, ভক্তিনম্র মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলবে কনি আমাদেরই ঘরের কেউ নয়। আমাদের মা, মাসিমা, দিদি হয়তো স্কার্ট পরলে হয়তো এমনি করেই দেবতার মন্দিরে নিজে-দের পূজো নিবেদন করতে আসতেন।

শিবদাস দি গ্রেট এবার তাঁর ধূর্ত অনুসন্ধানী চোখে কনিকে যাচাই করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শিবদাস দি গ্রেটের বয়স পাঁচের কোঠায়। তার বেশী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এবং সেই হিসেবে, মায়ের কোলে শুয়ে শুয়েই এই শিশু ঋষি লর্ড কার্জনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শিবদাস এবার কনির মাথায় হাত রাখলেন। চোখ বুজে কীসের যেন ধ্যান করতে লাগলেন। তারপর তাঁর পূর্ববঙ্গীয় ইংরেজীতে বললেন, "মাদার, মাদার নো ফিয়ার। শিবদাস উইল সেভ ইউ।"

কনি এবারও কিছু বুঝতে না পেরে, আমার দিকে মুখ ফিরে তাকালে। আমি এতোক্ষণ খালি পায়ে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি কনিকে বুঝিয়ে বললাম, "উনি বলছেন, ভয় পেয়ো না। চিন্তা করো না। শিবদাস দি গ্রেট তোমাকে সব দুঃখ থেকে রক্ষে করবেন।"

কনি কোনো কথা বলতে পারলে না। সে যেন পরম নির্ভয়ে শিবদাসের হাতটা জড়িয়ে ধরলে। তার চোখে হঠাৎ যেন অশ্রুর মেঘ জমতে শুরু করলে।

শিবদাস দি গ্রেট-এর বৈশিষ্ট্য তিনি প্রথমে কোনো প্রশ্ন করেন না। আগন্তুকের মুখ দেখেই তিনি তাঁর ভূত এবং ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেন। কিন্তু ওইখানেই যত মুশকিল। ঐ প্রথম বাণীতেই তো ভক্তদের মন জয় করতে হবে। অথচ কাজটা যে বিপজ্জনক তাতে সন্দেহ নেই। কেউ আসছে হারিয়ে-যাওয়া সোনার গয়না কে চুরি করেছে তার খোঁজ করতে, কেউ জানতে চায় পাশের বাড়ির সেই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত তাকে হৃদয়ে স্থান দেবে কিনা। প্রথমে ধরতে ভুল হলেই বিপদ।

শিবদাস দি গ্রেট কনির বয়স, কনির হাবভাব, কনির বেশবাস থেকে তার সমস্যা সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন। এ-মেয়ে যে বি-টুইল, হ্যাণ্ড-ক্যাপ বা ইণ্ডিয়ান আয়রন সম্বন্ধে খোঁজ করতে আসেনি তা জ্যোতিষ না জেনেও যে কেউ বলে দিতে পারে। তবু শিবদাস কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন। সেই অবসরে ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে কনি তাঁর পায়ের গোড়ায় ভক্তিভরে রেখে দিল।

শিবদাস এবার অর্থপূর্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। তোমার মন যা চাইছে তাই পাবে।"

সে কথা শুনে কনির মুখ যেন একশো ওয়াটের বাতির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সে যেন এইটুকু জানবার জন্যেই এতোটা পথ ভেঙে এখানে হাজির হয়েছে।

শিবদাস দি গ্রেট কনিকে বললেন, "তোমার দুটো হাতই সোজা করে আমার সামনে মেলে ধরো।" কনি তাই করলে। শিবদাস সেখানে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আবার কনির মুখের দিকে ফিরে তাকালে। তারপর বললেন, "আমাদের দেশে যে মেয়ে সহ্য করতে পারে না, তাকে আমরা মেয়েই বলি না। তা তুমি মা, অনেক সহ্য করেছো। আরও তোমাকে সহ্য করতে হবে।"

কনি যেন ভুলেই গিয়েছে আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। জ্যোতিষীর আন্দাজে-ছোড়া ঢিল বোধহয় ঠিক জায়গাতেই আঘাত করেছে। কনি যে অনেক সহ্য করেছে, তা তো আমার নিজের চোখেই দেখেছি।

কনি বললে, "আমি আরও অনেক সহ্য করতে রাজী আছি প্রভু। হ্যারির যদি মঙ্গল হয়, তবে সারা জীবনই আমি এমনি-ভাবেই মুখ বুজে সহ্য করে যেতে রাজী আছি।"

ফাঁদে পড়েছে! শিকার তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছে বুঝতে পেরে মহাত্মা শিবদাসের মুখও এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি চোখ বন্ধ করে, স্থূল দেহটাকে আমাদের সামনে ফেলে রেখে সূক্ষ্মদেহে যেন কনির ভবিষ্যৎ সমীক্ষায় পাড়ি দিলেন। কনি অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল। তার দেহ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলবার মতো সাহস যেন তার নেই।

শিবদাস দি গ্রেট এবার চোখ খুললেন। মৃদু হেসে বললেন, "সব বুঝেছি। তোমার কি চাই, আমার আর জানতে বাকি নেই। কিন্তু তবু সেটা তোমার নিজের মুখেই আমি একবার শুনতে চাই। নিজে আব্দার করে মায়ের কাছে চাইলে মা যে খুশী হন।"

শিবদাসের বক্তব্য কনিকে ইংরিজীতে বোঝালাম। আমার রাগ হচ্ছিল। তবু দোভাষীর কাজ করতে এসে উপদেশ দেওয়াটা যে উচিত নয় তা আমি সর্বদা মনে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

"আমি কেন এসেছি? কী আমার চাই? আমার দেহ, আমার মন, আমার আত্মা প্রতি মুহূর্তে কীসের আকাঙ্ক্ষা করছে?" কনি সরল গ্রাম্য মেয়ের মতো ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে।

শিবদাস দি গ্রেট ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। কনি যেন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। আর সেই মুহূর্তে কনির অতীতটা যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। নাটকে, নভেলে, ছোট গল্পে কতবারই তো সেই পুরনো কাহিনীর কথা পড়েছি। অবাক হবার, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু অনেককে উপন্যাস পড়েই থেমে যেতে হয়, আমার ভাগ্যে চোখের দেখা হলো। কানে যা শুনেছি, চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় যার ছায়া দেখেছি এবার তার রক্তমাংসের রূপে দেখলাম। জীবন। লাইফ। ট্রু-লাইফ-স্টোরি।

কনি যা বলবে তা যেন বলতে পারছে না। তার কণ্ঠে যেন লজ্জা নেমে এসেছে। জন-পদের চিত্র-বিনোদিনী যেন অবগুণ্ঠনবতী বালিকা বধূর সলজ্জদ্বিধায় আক্রান্ত হয়েছে। তবু কনি বলবে। যা না বললেও চলতো, তাই সে মুখ ফুটে বলবে।

কিন্তু হঠাৎ কনি যা বললো তার জন্যে আমি কেন, স্বয়ং শিবদাস দি গ্রেটও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সুদীর্ঘ জ্যোতিষী জীবনে এমন অনুরোধ বোধ হয় কেউ কোনোদিন তাঁকে করেনি।

কনির ঠোঁটটা একবার কেঁপে উঠলো। হয়তো আমি না থাকলে তার পক্ষে আরও সুবিধে হতো। আরও সহজে মনের কামনাটি জ্যোতিষীর কাছে সে নিবেদন করতে পারতো। কিন্তু আমি না হলে জ্যোতিষীকে কে তার ভাষা বুঝিয়ে দেবে? আস্তে আস্তে সে বললে, "প্রভু, আপনারা ইচ্ছে করলে সব পারেন। আমার যা আছে সব আপনার গডের পুজোর জন্যে আমি হাসিমুখে দিয়ে দেবো, আপনি হ্যারিকে একটু লম্বা করে দিন। আমি সুখ, সম্পদ স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই চাই না। শুধু হ্যারি যদি সাধারণ হয়ে উঠতে পারে, তা হলে আমি আর কিছু চাইবো না। সে বেঁটে হোক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লোকে যেন তাকে বামন না বলে।"

মানুষের এই সংসারে, দেখে দেখে হৃদয় আমার অসাড় হয়ে গিয়েছে। দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান, অবজ্ঞা আজ আর আমাকে তেমন-ভাবে অভিভূত করে না। তবু বলতে লজ্জা নেই, হঠাৎ মনে হলো যেন আমার দেহের সমস্ত লোমগুলো এক সঙ্গে বিষাদের বিচিত্র অনুভূতিতে খাড়া হয়ে উঠছে। মন যেন কনিকে এতোদিনে বুঝতে পারলে। নিঃশব্দ কণ্ঠে আমার অন্তরাত্মা যেন বলে উঠলো, 'ও, এই জন্যে। ওরে অবুঝ, বোকা মেয়ে, এই জন্যে তুমি আমাকে নিয়ে এখানে ছুটে এসেছো। আমার সময় নষ্ট করেছো। আমার ভোরের বিশ্রামটুকু জলাঞ্জলি দিয়েছো। তা বেশ করেছো। আমি মোটেই অসন্তুষ্ট হইনি। যদিও ছেলেমানুষী, যদিও লোকে শুনলে তোমাকে এবং আমাকে

দ্বুজনকেই পাগল বলবে, তবু আমি রাজী আছি, তুমি যেখানে যেতে চাইবে—আমার সব কাজ ফেলে তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি আমি।'

শিবদাস দি গ্রেট কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "মেমসায়েব কী বলছেন?" ভূত-ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা শিবদাসও তাঁর বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না।

আমি বললাম, "হ্যারি বলে ও'র এক সঙ্গী আছে। সে বামন। তার সঙ্গে......"

"বলতে হবে না। বুঝে নিয়েছি," শিবদাস বললেন। "সেই বামনকে বড়ো করতে হবে। তাকে টেনে হেঁচড়ে প্রমাণ সাইজের করে দিতে হবে।"

"হ্যাঁ প্রভু। তার জন্যে আপনি যা চাইবেন, তাই দেবো। দরকার হয়, আমি আস্তে আস্তে আরও অনেক টাকা রোজগার করে আপনার দেবতার পুজোর জন্যে পাঠাবো।"

এমন সুবর্ণ সুযোগ প্রফেসর শিবদাস দি গ্রেট বোধ হয় অনেক দিন পাননি। এমন একটি শিকারকে নিজের হাতের গোড়ায় পেয়ে তাঁর মনটা যে বেশ খুশী খুশী হয়ে উঠছে, তা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম। মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, "এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। বামন থেকে দৈত্য, দৈত্য থেকে বামন আমাদের দেশে পুরাকালে অনেকবার হয়েছে।"

ভদ্রলোক যে এই সরলপ্রাণ মেয়েটিকে সর্বস্বান্ত করবার একটা মতলব ভাঁজছেন তা বুঝতে দেরি হলো না। আমি কিছুতেই এই দৃশ্য নিজের চোখের সামনে দেখতে পারছিলাম না। আমার চোখ দুটো যে ক্রমশ রাগে লাল হয়ে উঠছে, তা প্রফেসর শিবদাসের সাবধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল।

আমার চোখ এড়িয়ে নিজের মনেই যেন শিবদাস দি গ্রেট বললেন, "এর নাম বামনাবতার যজ্ঞ। খুবই দুরূহ এবং শ্রমসাধ্য যজ্ঞ। সাতদিন সাত রাত প্রধান পুরোহিতকে একভাবে হোম করতে হবে।"

শিবদাস দি গ্রেট হয়তো এবার খরচের বিরাট ফিরিস্তি দিতেন। কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটু ভয় পেয়ে গেলেন। আমার মনের অবস্থা জানবার জন্যেই যেন বললেন, "কিছু বলবেন?"

আমি গম্ভীরভাবে আমাদের কাসন্দের ডায়ালেক্টে বললাম, "একটা কথা মনে রাখবেন আমি শাজাহান হোটেলের কর্মচারী। ভবিষ্যতে আপনি নিশ্চয়ই চান শাজাহান হোটেলের ভিজিটররা এখানে আসুক। এই ভদ্রমহিলাও আমাদের সহকর্মী।"

কনি আমাদের কথা বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি এবার ইংরিজীতে বললাম, "হ্যারির অসুবিধের কথাগুলো ও'কে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

কনি বললে, "থ্যাংক ইউ। তোমাকে কী করে যে ধন্যবাদ দেবো জানি না।"

আমি যে কী ধরনের চীজ তা শিবদাস দি গ্রেট বেশ বুঝে গিয়েছেন। ইচ্ছে করলে, ও'র ভবিষ্যৎ ব্যবসা যে আমি প্রায় বানচাল করে দিতে পারি তাও তিনি আন্দাজ করতে পারলেন। এবার তাঁর কথার মোড় ফিরতে লাগল। নিপুণ ড্রাইভারের মতো ভদ্রলোক এবার গাড়ির গতিপথ পরিবর্তন করলেন। কনিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "বামনাবতার যজ্ঞ একালে হয়তো একমাত্র আমিই করতে পারি।"

কনি অধীর হয়ে বললে, "তাহলে, প্রভু, আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি শাজাহান হোটেলে শো বন্ধ করে দিয়ে আপনার এখানে বসে থাকবো। হ্যারিকেও হাতে পায়ে ধরে, কোনোরকমে মত করিয়ে এখানে নিয়ে আসবোখন।"

আমার দিকে তাকিয়ে কনি বললে, "আমাদের তো সাপ্তাহিক কন্ট্রাক্ট। প্রত্যেক সপ্তাহে মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে হয়, আমি আর বাড়াবো না। তুমি গিয়ে মার্কো-পোলোকে বুঝিয়ে বোলো।"

শিবদাস-দি-গ্রেট কিন্তু মাথা নাড়তে লাগলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "এই যজ্ঞের কিন্তু একটা কুফল আছে। হোমের পর বামন লম্বা হবে, প্রমাণ আকারের মানুষের সঙ্গে তার কোনো তফাৎই থাকবে না। কিন্তু......"

কনি বলতে যাচ্ছিলো, "কোনো কিন্তু নয়, হ্যারির জীবনের সব দুঃখ শেষ হবে, সে যদি আর একটু বড়ো হয়ে উঠতে পারে।"

শিবদাস-দি-গ্রেট এবার আমার দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিপাত করলেন, তারপর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বললেন, "যজ্ঞের পর সে কিন্তু বেশীদিন বাঁচবে না। তার পরমায়ু ক্ষয় করেই তাকে আকারে বড়ো করে তুলতে হবে। ছ'মাসের বেশী কাউকে এখনও আমি বাঁচতে দেখিনি।"

কনির মুখটা এবার যেন নীল হয়ে উঠলো। সে যেন ভয়ে শিউরে উঠলো। "হ্যারি, মাই ডিয়ার হ্যারি, বাঁচবে না। হয় না। না না আমি কিছুই চাই না।"

কনি নিজের স্কার্টটা সামলে এবার তড়াং করে শিবদাসের সামনে থেকে উঠে পড়লো।

শিবদাস বললেন, "ঈশ্বর যাকে যা করতে চেয়েছেন সে তাই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে গেলে তিনি প্রায়ই কুপিত হন।"

কনি মন দিয়ে তাঁর কথা শুনলে। ঝুঁকে পড়ে ভারতীয় প্রথায় তাঁর পা স্পর্শ করলে।

শিবদাস দি গ্রেট একটা বাক্স খুলে ছোট্ট একটা মাদুলি বার করলেন। সর্ব-শান্তি

কবচ। বললেন, "এক্সট্রা পাওয়ারফুল কবচ। আণবিক শক্তিসম্পন্ন। স্নান করে খালি পায়ে ধারণ কোরো। আর ধারণের দিনে কারণ পান বা অনাচার নিষেধ।"

কনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কবচটা নিয়ে বললে, "আমি ড্রিংক করি না।" আরও দশটা টাকা শিবদাস-দি-গ্রেটের হাতে দিয়ে কনি প্রশ্ন করলে, "আমি পরলে, হ্যারি শান্তি পাবে তো?"

"নিশ্চয়ই পাবে। সেইজন্যেই তো এই এক্সট্রা-স্পেশাল কবচ।" শিবদাস-দি-গ্রেট শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন।

সারা পথ কনি গম্ভীর হয়ে রইল। একবারও কথা বললে না। হ্যারিকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তোলার শেষ আশা সে যেন শিবদাস-দি-গ্রেটের জ্যোতিষ গবেষণাগারে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। একবার শুধু সে বললে, "এবার বোধহয় আমি শান্তি পাবো। তাই না?"

আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, 'বেশ তো ছিলে। সংসারের জটিলতায় ইচ্ছে করে অমনভাবে জড়িয়ে পড়লে কী আর শান্তি পাওয়া যায়?' কিন্তু আমি বলতে পারিনি। মিথ্যারই আশ্রয় নিয়েছি। কনিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, "এই সর্বশান্তি কবচ তোমার সব অশান্তির মূল উৎপাটিত করবে।"

কনি আর কথা বলেনি। সমস্ত পথ কবচটা নিয়ে দু'হাতে নাড়াচাড়া করেছে।

হোটেলে ফিরে এসেই দেখলাম কেমন একটা থমথমে ভাব। সত্যসুন্দরদা একমনে কাউণ্টারে কাজ করে যাচ্ছেন। কনিকে তিনি দেখেও দেখলেন না। কনি লিফটে উপরে চলে গেল। আমি সত্যসুন্দরদার কাছে ফিরে এলাম।

রোজীটাও ওখানে বসে টাইপ করছিল। একটা চিঠি টাইপ করা শেষ করে সেটা পড়তে পড়তে রোজী বললে, "হ্যালো ম্যান, তাহলে সকালটা খুব ফুর্তিতে কাটালে। জলি গুড্ টাইম।"

আমি উত্তর দিলাম না। রোজী এগিয়ে এসে আমার কানে কানে বললে, "পুওর ফেলো, যতই চেষ্টা করো, কিছুই হবে না। কনির বুকের ভিতর যিনি বসে রয়েছেন তাঁর নাম ল্যামব্রেটা। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাও তাহলে তোমাকে অনেক বেঁটে হতে হবে!"

বোসদা গম্ভীরভাবে বললেন, "রোজী, মিস্টার মার্কোপোলো এই চিঠিগুলো সই করবার জন্যে আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন।"

রোজী বুঝলে স্যাটা বোসের সামনে শ্রীমান শংকরানন্দকে নাস্তানাবুদ করা যাবে না। সুতরাং সে এবার চিঠিগুলো নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে স্কার্ট দুলিয়ে, জুতোর খট-খট আওয়াজ করে কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে গেল।

সত্যসুন্দরদা বললেন, "তোমরা না বেরোলেই পারতে। হ্যারিটা বেশ বিপদ বাধিয়েছে। শুধু চিৎকার করছে। বেয়ারাদের গালাগালি করেছে। বলেছে, যেখান থেকে পারো মদ নিয়ে এসে দাও। গুড়বেড়িয়া বলেছে, ডেরাই ডে। তাও শোনেনি। শেষ-পর্যন্ত চরম বোকামি করেছে। জিমির কাছে গিয়েছে। জিমিটা এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বলেছে, এখনই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করো, কিছু ব্যবস্থা হবে। ল্যামব্রেটা বোকার মতো সোজা ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে নক করেছে। তারপর বুঝতেই পারছো। কোনো ক্যাবারে গার্ল-এর ডান্সিং পার্টনার যে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে হল্লা করতে পারে তা মার্কোপোলো সায়েবের জানাই ছিল না।"

বোসদা একটু থামলেন। তারপর বললেন, "হয়তো কিছু হতো না। এদিকে জিমি খবর এনেছে অন্য হোটেলে দশদিন ফ্লোরশোর সীট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টিকিটের জন্য মারামারি চলছে। আমাদের অথচ তেমন চাহিদা নেই। কয়েকটা অ্যাডভান্স বুকিং ক্যানসেলও হয়েছে।"

"তাহলে?" আমি বোসদার মুখের দিকে তাকালাম।

"যত নষ্টের গোড়া তো ওই বামনটা। কনির একমাত্র দোষ বামনটাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলে রেখেছে। জিমি প্রথমে যা সাজেশন দিয়েছিল ম্যানেজার তাতে কান দেননি। এখন আবার অনেক কথা হয়েছে বোধ হয়। হয়তো কনিকে এখনই ডেকে পাঠাবেন।"

বোসদার সন্দেহ যে অমূলক নয় তা একটু পরে রোজী ফিরে আসতেই বোঝা গেল। রোজী খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললে, "ফল ফলেছে। স্বয়ং মার্কোপোলো দি ম্যান এবার কনি দি উয়োম্যানকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমাকে ঘর থেকে উনি বার করে দিলেন। আমারই হয়েছে মুশকিল। তোমাদের কাছে দাঁড়ালে, তোমরা বলো ম্যানেজার ডাকছে। ম্যানেজারের কাছে গেলে তিনি বলেন, কাউণ্টারে বোসকে হেল্প করোগে যাও। বেচারার অনেক কাজ। তোমরা কেউ আমাকে পছন্দ করো না।"

আমি বললাম, "অনেক কাজ হয়েছে, এবার একটু বিশ্রাম নাও।"

রোজী বললে, "বেশ।" কাউণ্টারের ভিতরে ঢুকে পড়ে সে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চকোলেট বার করে চুষতে লাগল।

বোসদা বললেন, "রোজী, তুমি এতো চকোলেট ভালবাসো কেন?"

রোজী বললে, "আমার গায়ের রঙ আর চকোলেটের রঙ এক বলে!"

আমি দেখলাম রোজী রেগে উঠছে। বোসদাকে বললাম, "আমি তা হলে যাই।"

বোসদা বললেন, "হ্যাঁ যাও। মেয়েটার কী হলো দেখা দরকার। হাজার হোক বিদেশ বিভুঁই।"

আমি বললাম, "নিশ্চয়।"

বোসদা বললেন, "আমিও যেতাম। কিন্তু হেভি প্রেসার। এখনই পঁচিশটা লোকের একটা পার্টি রিসিভ করছি। আর একটা দল এখনই আসবে। এরা আবার ইটালিয়ান। কী বলতে চায় তাই বুঝতে আড়াই ঘণ্টা লেগে যাবে।"

"ফুল ট্যারিফ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

বোসদা বললেন, "না, সব বেড অ্যান্ড
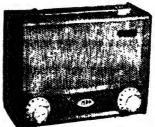
ব্রেকফাস্ট। যাক ও-সব কথা পরে হবে। তুমি এখন ওপরে চলে যাও।"

চলে যাও বলা সত্ত্বেও চলে যেতে পারলাম না। কনির ভাগ্যাকাশে যে মেঘ জমা হয়েছে তা কোনদিকে যাবে তা জানবার জন্যে মনটা তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বোসদা বোধ হয় আমার মনের অবস্থাটা বুঝলেন। খাতায় লিখতে লিখতে বললেন, "এখন আর চেপে রাখবার কোনো মানে হয় না। ও'রা ঠিক করেছেন, ল্যামব্রেটাকে আর নাচতে দেবেন না। কনিকে একাই আসরে হাজির হতে হবে। ল্যামব্রেটার সংগে ও'দের কোনো কণ্ট্রাক্ট নেই। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে।"

চমকে উঠে আমি বোসদার মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা কিন্তু মোটেই অবাক হলেন না। কাজ করতে করতেই বললেন, "কাউকে দোষ দিতে পারো না তুমি। কনিকে দেখবার জন্যেই লোকে পয়সা দিচ্ছে—ল্যামব্রেটার নাচ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।"

আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। নিজের

মনেই লিফটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তারপর কী ভেবে লিফটে না চড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছি।

কনি। কনির সঙ্গে আমার সত্যিই দেখা হয়েছে। হোটেলের কর্মচারীর জীবনে ড্রাই-ডেগুলো সত্যিই শুকনো। ও-গুলো কোনো দিনই নয়। কিন্তু সেদিনের মতো অমন সজল শুকনো দিন বোধ হয় কোনো-দিন আমার জীবনে আসবে না। মানুষকে যারা সহজে আপন করে নিতে পারে, অপরের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে আমি তাদের দলে নই। দূর থেকে মানুষের শোভা-যাত্রা দেখেই আমি সন্তুষ্ট। তবু কেমন করে জানি না সেদিন বিদেশিনী নর্তকীর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের সুতোটা কিছুক্ষণের জন্য জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তাই এতোদিন ধরে মানবতীর্থের মন্দিরে মন্দিরে পরশ পাথরের সন্ধানে পাগলের মতো কার্প হয়ে ঘুরবার পরও, সেই মেয়েটিকে ভুলতে পারলাম না।

ড্রাই-ডের সেই বিষণ্ণ মধ্যাহ্নে কনির ঘরে আচমকা অমনভাবে ঢুকে পড়াটা নিশ্চয়ই আমার উচিত হয়নি। ভব্যতার ব্যাকরণে অভ্যস্ত আজকের আমি নিশ্চয়ই তেমন দুঃসাহস দেখাতে পারতাম না। কিন্তু সেদিন পেরেছিলাম। কনিকে ম্যানেজমেন্ট কী বলেছে তা জানবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল।

আজ আমার কোনো দুঃখ নেই। সেদিন কনির ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে আমার কোনো ক্ষতিই হয়নি। বরং লাভ হয়েছিল। প্রচুর লাভ। পৃথিবীর দুর্লভ বিত্তবানদের মধ্যে আমি একজন বলে নিজেকে মনে করি। মানুষের মনের জগতে যারা জগৎ শেঠ, রোথসচাইল্ড, নিজাম, কিংবা টাটা, বিড়লা হয়ে বসে আছে আমি যেন তাদেরই একজন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। চিবুকে হাত দিয়ে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে কনি বসে আছে। তার পোষমানা চুলগুলো হঠাৎ দুরন্ত ঝড়ে মুখের উপর এসে পড়েছে। কনি আমাকে দেখেও কোনো কথা বলছে না। যেন রেনেসাঁস যুগের কোনো দক্ষ ভাস্করের প্রস্তরকন্যা এই মৃত্যুমুখের সভ্যতার যাদুঘরে কাঁচের শো কেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যেন সব বুঝতে পারলাম। নিজের বুদ্ধিতে নিজেই যেন অবাক হয়ে গেলাম। এমন বুঝবার ক্ষমতা যদি ইস্কুলে পড়বার সময় থাকতো তাহলে এতোদিনে আমার জীবনের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে রচিত হতো। আর যেখানেই থাকি, শাজাহান হোটেলের ত্রিসীমানায় আমাকে আজ দেখা যেতো না।

বুঝেছি। অথচ কী বলবো আমি? বলতে হলো না কিছু। কে যেন আমার সঙ্গে পরা-মর্শ না করেই আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে, "আই অ্যাম স্যরি। বিশ্বাস করো আমি দুঃখিত।"

কনি বললে, "আমিও যাচ্ছি। হ্যারিকে একলা ফেলে রেখে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমি শুধু একটা অনুরোধ করেছি। আই হ্যাভ্ আস্‌ক্‌ড্ ফর ওয়ান ফেভার। হ্যারি যেন এর কিছুই না জানতে পারে। ওকে বলবো, আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে আমিই চুক্তি বাতিল করে দিয়েছি। আই হোপ, ওরা ওদের কথা রাখবে। ওরা হ্যারির জীবনকে ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবে না। ও চেষ্টা করছে। ওর সব শক্তি দিয়ে ও নিজের খর্বতার উর্ধ্বে উঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। বিশ্বাস করো, ও পারছে না। যদি এ-সব কথা ওর কানে যায়, চির-দিনের জন্যে ও হেরে যাবে। কোনো দিন আর পারবে না।"

কনি একটু থামলো। "ওরা ভেবেছে, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছি। তোমা-দের জিমি এমনভাবে হাসলো যে আমার সমস্ত গা-টা রি রি করে উঠেছিল। ফর এ ডোয়ারফ্! একটা বামনের জন্যে আমি নাকি আমার ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিচ্ছি—

কিন্তু। ওরা জানে না। ওদের দোষ নেই।"

কী বলছে কনি? কনির কথার অর্থ কী?

কনির হাতের মধ্যে যে ছোট্ট একটা ফটো ছিল, তা এতোক্ষণ আমার নজরে পড়েনি। আমাকে দেখেই কনি বোধহয় আড়াল করে রেখেছিল। এখন যেন কনির আর কোনো লজ্জা নেই। অন্তত আমার কাছে তার যেন কিছুই লুকোবার নেই। আমারই সামনে সে একমনে ছবিটা দেখতে লাগলো।

আমিও দেখলাম। লবণাম্বুর অপর পারে, সমুদ্র ও পর্বতে ঘেরা স্কটল্যান্ডের কোনো অখ্যাত শহরতলীর কোনো অখ্যাত মহিলার ম্লান ছবি। তাঁর কোলে এক নবজাত শিশু। তাঁর পাশে আর একটি ছেলে। সাত আট বছর বয়স হবে।

কনি বললে, "চিনতে পারো?"

কেমন করে চিনবো আমি?

কনি সজল নয়নে বললে, "আমার মা।"

তারপর একটু দ্বিধা করে, কোনোরকমে বললে, "হ্যারির মা।"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ। আমি কোলে রয়েছি। হ্যারি, আমার ব্রাদার হ্যারি, মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন? তখন কেউ কী জানতো হ্যারি আর বড়ো হবে না।"

কনি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না। কান্নার বন্যা এসে ক্যাবারে নর্তকীর রহস্যময় ব্যক্তিত্বকে যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কনি বললে, "হ্যারি বড়ো হয়নি। কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক করেছে।"

সেদিন কনির মুখেই সুদূর ইংলন্ডের এক মা, ভাই এবং বোনের গল্প শুনেছিলাম। সংসারে কেউ দেখবার ছিল না। বামন ভাই-ই রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ করেছে। বেঁটে বয় টেবিলের নাগাল পায় না। তাই গেটে কাজ নিতে হয়েছে। বিনয়ে বিগলিত বামন অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে সুইং-ডোরের দরজা খুলে দিয়েছে। অতিথিরা আমোদ পেয়ে হাতে কিছু বকশিস গুঁজে দিয়েছেন। আর এমনি করেই বিধবা মা এবং ছোট বোনের সংসার চালিয়েছে হ্যারি।

কিন্তু বয়স বাড়ার সংগে সংগেই হ্যারি কেমন যেন পাল্টাতে শুরু করেছে। হ্যারি 'ডিফিকাল্ট' হয়ে উঠেছে। মদ খেতে শুরু করেছে।

কেউ পারতো না। একমাত্র মা ছাড়া, কেউ ওকে সামলাতে পারতো না। কত রাত্রে মা ওকে বার থেকে তুলে এনেছেন। কনি লেখা-পড়া শেখেনি। তেমন লেখাপড়া শেখবার সুযোগও ছিল না। কিন্তু দাদার কাছে গান শিখেছিল। মেজাজ ভাল থাকলে দাদা গান শেখাত। মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় মেয়েরা কেমনভাবে নাচে তা দেখিয়েছে। অন্য অনেকে সে নাচ দেখে হা হা করে হেসেছে। কিন্তু কনি কিংবা তার মা কোনো-দিন হাসতে পারেননি।

নিজের অজান্তেই কনি একদিন নিজের জন্য নর্তকীর জীবন বেছে নিয়েছে। দাদাকে সে আর চাকরি করতে দেয়নি। বলেছে, তুমি বাড়িতে থাকো। মার সংগে গল্প করো, তাহলেই হবে। হ্যারি রাজী হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার লোকের যাওয়া আসার পথের ধারে রেস্তোরাঁর সুইং-ডোরটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে তার মোটেই ভাল লাগতো না।

মাকে লুকিয়েই হ্যারি কনির কাছে পয়সা চাইতো। সেই পয়সা নিয়ে খুব করে মদ গিলতো। তারপর মদে চুর হয়ে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরে আসতো। মা কিছুই বলতেন না। তবু হ্যারি ভয় পেতো। মা রাগ করলে, কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু গম্ভীর-ভবে বাড়ির সব কাজ করে দিতেন। হ্যারি তখন আর চুপ করে থাকতে পারতো না। মার হাত ধরে ক্ষমা চাইতো। কাঁদতে কাঁদতে বলতো, "মা, আমি কখনও তোমার অবাধ্য হবো না।"

"মা আমার নেই। তবুও আজও হ্যারি মাকে ভয় করে।" কনি চোখের জল মুছতে মুছতে আমাকে বললে। "মরবার আগে মা বিছানার পাশে হ্যারি এবং আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হ্যারিকে বলেছিলেন, 'তুমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে তো? কনি যা বলবে তাই শুনবে তো?' ছোট্ট ছেলের মতো হ্যারি রাজী হয়েছিল। মা বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু সব দেখতে পাবো।' মা তারপর আমাকে বলেছিলেন, 'হ্যারি যদি অবাধ্য হয়, যদি তোর কথামতো না চলে তা হলে চোখ বন্ধ করে, মনে মনে তুই আমার সংগে কথা বলিস।'"

কনি বললে, "আজও যখন ওর সংগে আর পেরে উঠি না, যখন দাদা আমার নেশার ঘোরে পাগল হয়ে ওঠে, তখন ওকে ভয় দেখাই, বলি—মাকে বলে দেবো।

আজও মন্ত্রের মতো কাজ হয়। হ্যারি সংগে সংগে ভালো ছেলে হয়ে ওঠে। যেন সে তার সম্বিত ফিরে পায়। কিন্তু তারপরই ওর অভিমান হয়। গুম হয়ে বসে থাকে। আমার সংগে কথা বলে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

তখন, দাদাকে আদর করতে আরম্ভ করি। দাদার অভিমান ভাঙতে আমার অনেক সময় লাগে। বলতে হয়, আমি না তোমার ছোটো বোন। আমি অতো বুঝবো কী করে? যদি আমার কোনো ভুল হয়ে যায়, তুমিই তো আমাকে বকবে। দরকার হলে, ইউ সুড্ বক্স মাই ইয়ারস।

দাদা তখন আবার পাল্টিয়ে যায়। আমাকে আদর করতে আরম্ভ করে। বলে, 'ইস্। দেখি। কে আমার বোনের কান মলে দেয়! কার এতোবড়ো আস্পর্ধা। আমার লক্ষ্মী বোন, আমার সোনা বোন, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার খুব ঘুম পেয়েছে। তুমি এবার ঘুমোতে যাও।'

আমি বলি, 'তুমি না ঘুমোলে, আমি ঘুমোতে যাবো না।'

দাদা হেসে ফেলে। বলে, 'বেশ, বেশ।' তারপর আমার দাদা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে।"

কনি একটু হাসলো।

আর সেই মুহূর্তে কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে ছাদের উপর কনি এবং ল্যামব্রেটোর যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তার রহস্য যেন স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কনি এতোক্ষণে যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে। মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে সে বললে, "হ্যারিকে একলা ফেলে, কোথায় আমি ঘুরে বেড়াই বলো? স্কট-ল্যান্ডে ওকে রেখে, পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবো না। তাই ওকে নাচের সংগী করে নিয়েছি। কিন্তু হ্যারি পারে না। মাঝে মাঝে আমার অবস্থা দেখে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। অথচ বোঝে না অভিনয় অভিনয়ই।" কাঁদতে কাঁদতে কনি বললে, "আমার নিজের দাদা, তবু বলবার উপায় নেই। এমন এক প্রফেশনে আমরা জড়িয়ে পড়েছি।"

হয়তো আরও কথা হতো। কিন্তু ল্যামব্রেটো হঠাৎ কনির ঘরে এসে ঢুকলো। তার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।

ল্যামব্রেটোর সংগে ছাদে আমার আবার দেখা হয়েছে। নিজের ব্যাগ গোছাতে গোছাতে ছোট্ট ছেলের মতো আমাকে ডেকে ল্যামব্রেটো বলেছে, "ওহে ছোকরা, শোনো। হলো তো। যেমন আমাদের রাগিয়ে দিলে, এখন মজাটা টের পাচ্ছো তো? আমরা তোমাদের শাজাহানকে কলা দেখিয়ে চলে যাচ্ছি।"

ল্যামব্রেটো বলেছিল, "মার্ক মাই ওয়ার্ডস। তোমাদের এই পচা শহরে, আমরা আর কোনোদিন ফিরে আসবো না।"

সত্যিই ওরা কোনোদিন আর কলকাতায় ফিরে আসেনি। কিন্তু কেই বা আসে? যৌবনের মরসুমী ফুল হাতে করে কোন্ পান্থশালার প্রিয়াই আবার ফিরে আসে? তবু আজও আমার কনির কথা মনে পড়ে যায়। ভোরের আলোয়, দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতায়, সন্ধ্যার কোলাহলে এবং রাত্রের অন্ধকারে যাকে দেখেছি সে যেন একটা কনি নয়। কনি দি গার্ল, কনি দি মাদার, কনি দি সিস্টার মিলিয়েই যে কনি দি উয়োম্যানের সৃষ্টি, তা ভাবতে আজও আমার কেমন আশ্চর্য লাগে।

এই বৃহৎ পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে আজ কনি তার ভাইকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে কে জানে। কোনো প্রখ্যাত হোটেলে আজ নিশ্চয়ই তার স্থান হবে না।

'দেশ' পত্রিকায় লেখার প্রধান আনন্দ তার বিচিত্র পাঠকমণ্ডলী। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। কোনো অবসন্ন সন্ধ্যায় কোনো অখ্যাত পানশালায় 'দেশ'-এর প্রবাসী পাঠক যদি কোনো বিগত যৌবনা নর্তকীকে কোন বামনের সংগে নাচতে দেখেন, তবে একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন তার নাম কনি কিনা। যদি সত্যিই সে কনি হয় তবে অনুগ্রহ করে আমাকে একটা চিঠি লিখবেন।

আমি বড় সুখী হবো। আমি সত্যিই আনন্দিত হবো। (ক্রমশ)

রাংচিতার বেড়া অবধি এগিয়ে এসেছিল সোনাবউ, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, খোকার মা দাওয়ায় বসে ছেলে নাচাচ্ছে। তেলের বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে বুকে পিঠে তেল মাখাচ্ছে। পাশেই একটা দোলনা। দোলনায় বসে সাদা রংয়ের ধবধবে একটা বেড়াল একটু একটু দোল খাচ্ছে।

দেখতে দেখতে জুলজুলে চোখের তারায় চুইয়ে চুইয়ে রক্ত উঠে এল ওর। হাতের রোগা রোগা আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল। সারাটা দিন এমনধারা ক্লান্ত লাগে, অথচ এখন যেন অসুর এসে ভর করল রক্তমাংসে। এক চুলও নড়তে পারছে না সোনাবউ। যেন মাটির মধ্যে পা ডুবিয়ে গাছের মতো দাঁড়িয়েছে এখন। নড়াচড়া একেবারেই আয়ত্তে নেই।

কারণ নেই, অকারণ নেই, তবু ইচ্ছে হচ্ছে বাচ্চাটার চোখ দুটো খুবলে নেয়। ঘাড়টাকে মুচড়ে মুচড়ে আখের মতো নিংড়ে ছাড়ে। তারপর পুঁটলি বেঁধে খালধারে ফেলে আসে।

অথচ, হুট বলতে এখনি যদি এগিয়ে যায় সোনাবউ তেড়ে আসবে খোকার মা। পাগলী বলে চেঁচিয়ে উঠে ধুয়ো ছাড়বে। ফলে দৃষ্টিতে কিছু বিষ জড়িয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন পথ পেল না ও। তাকিয়ে রইল সোনাবউ। খোকার মা তার ছেলে নাচাচ্ছে। দাওয়া বিছিয়ে খড়ি-গোলা একপ্রস্থ রোদ পড়েছে।

খোকার মার কান্ড দেখে সোনাবউ উশ-খুশ করে হাঁপাতে লাগল। বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। হাতের চেটো ঘেমে আসছে। নাক দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল, মুখ দিয়ে বাতাস টানল সোনা-বউ। ভাবল, একবার একটু চোখ ছাড়া করলে হয়, চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নেব। একবার যদি পাই! অস্থিরভাবে সময় গুনতে লাগল সোনাবউ।

শীতের এই সাত সকালে এপথ দিয়ে আসছিল বলেই না এমন একটা দৃশ্য ওর চোখে পড়েছে। হয়ত ও হাঁটতে হাঁটতে হাটখোলার দিকেই চলে যেত। কিংবা সেই পাঁচমারির খালের দিকে। হাটখোলায় গেলে সারাটি দিন হাটুরেদের সঙ্গে বচসা করত, জনে জনে ধরে ধরে টাকিয়ে তুলত। কিংবা সেই পাঁচমারির বাঁশের সাঁকোয় খুট খুট করে এপার ওপার করত। এ পারে থাকবে, না ওপারে যাবে এই সমস্যা মেটাতে মেটাতেই সমস্ত দিন কাটিয়ে আসত। অথচ তেমন কোন সুরাহা নেই দেখে থুঃ থুঃ করে থুতু ছেটাত।

বাচ্চাটা কেমন ছটফট করে মাছের মতো লাফাচ্ছে। রোস না বাপু, মজা দেখাচ্ছি। একবার একটু চোখ ছাড়া করুক খোকার মা, চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে পালাব। হিঁ হিঁ......নাক টেনে হাসতে চেষ্টা করল সোনাবউ। কারণ নেই, অকারণ নেই মাঝে মাঝে ও হাসে।

দোলনায় বসে দুলতে দুলতেই বেড়ালটা এবার চোখ বুজেছে। সোনাবউ ওর রকম দেখে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। কত ঢংই শিখিয়েছে ওকে বাড়ির বউ। সব ঢং আজ ভেঙে দিয়ে মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

ওদিকে জামরুল গাছের মাথা অবধি সূর্য উঠেছে। ডাল পাতার ফাঁক গলিয়ে পিচকিরির মতো আলো ছুটেছে। ইচ্ছে হল দু হাত দিয়ে গাছের বাধাটা ও সরিয়ে দেয়। বাধা দেখলেই দমটা কেমন ফেটে আসে সোনাবউয়ের। মনে হয়, ফুসফুসটা দু হাত দিয়ে কে যেন চেপে ধরেছে। যতক্ষণ না দম ফাটে ততক্ষণ আর ছাড়ান নেই। ফলে পিচকিরির মতো

আলো ছোটা দেখে ভীষণ ধারা নষ্ট হতে লাগল ওর। চোখ ফিরিয়ে দাওয়ার দিকেই তাকাল। ঝাপসা ঝাপসা কেমন যেন ধোঁয়ায় ঢাকা বোধ হচ্ছে। যেন রাত্রিবেলার কুয়াশা-গোলা পুরোপুরি এখনো কেটে ওঠে নি। কুয়াশার মাঝেই নলের মতো আলো ছুটেছে। তাড়াতাড়ি চোখ কচলে নিয়ে আবার ও তাকাল। ধোঁয়াটে ভাবটা একটু একটু করে কেটে যেতেই আবার ও দোলনায় বসা বেড়ালটা, বাচ্চাটা আর বাচ্চার মাকে দেখতে পেল।

উঁহু, কেমন ভাবে কুঁই কুঁই শব্দ করে হাসছে দেখ। ডাঙায় যেন হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটছে। রোস, মজাটা টের পাওয়াচ্ছি খানিক বাদে। এত সুখ ভাল না খোকার মা, একটুখানি চোখ ছাড়া করে দেখ না, চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে পালাব। হিঁ হিঁ......কেমন ধারা মজা হবে বল দি' নি! সোনাবউ হাসতে গিয়ে চমকে উঠল। চট করে কাপড়ের পুঁটলিটা তুলে ধরে মুখ চাপল। এখন যদি শব্দ হয় টের পেয়ে যাবে খোকার মা। আর, তা হলেই পাগলী বলে চেঁচিয়ে উঠে একাকার করবে। কর্তাবাবু ঘরে থাকে তো লাঠি নিয়ে দৌড়ে বেরুবে। লাঠি সোটায় বড় ভয় পায় সোনা-বউ। লাঠির কথা মনে আসায় হাত পা যেন জমে আসতে লাগল। রক্তের মধ্যে ঝিমঝিম করে থিতোনি নামল। কেমন একটা অবসাদে তলিয়ে যাচ্ছে সোনাবউ। হাঁটু দুটো ভাজ হয়ে নেমে আসছে। টলতে টলতে বেড়ার ওপাশে বসে পড়ল সোনাবউ।

হঠাৎ, চিতার আগুনে খুঁচিয়ে দিলে যেমনিধারা ফুলকি ওড়ে তেমনিধারা আলোর ফুলকি ফুর ফুর করে চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নিমাইচাঁদের কথা মনে করিয়ে দিল। পুরনো সেই কসাইখানার দিকে অনেকদিন যায় নি ও। যেন এখন স্মৃতির পাতালে ডুবতে ডুবতে একটুখানি আলো দেখতে পেয়েছে, এমনিভাবে আবছা আবছা কসাই-খানার ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কসাইখানার চাতাল জোড়া চর্বির ছাট, মাংসের কুচি, রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। অথচ যে লোকটা মুণ্ডহীন পাঁঠার গা থেকে মোজার মতো চামড়া ছাড়াচ্ছে সে লোকটাকে ও কিছুতেই চিনতে পারল না। নিমাই নয়। নিমাইচাঁদ তো মারা গেছে ওলাওঠায়। একরাত্রের বমি দাস্তে।

ঝিমঝিম করে ঢোল বাজছে মাথায়। আপাদ অঙ্গ ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠছে। আলোর ফুলকিগুলো উবে যেতে লাগল। সোনাবউ বুঝতে পারল বসে পড়ার চোখের সামনে বাঁশচাতার বেড়াখানা এখন পাহারার মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাঁশচাতার সবুজ পাতা চোখের সামনে জড়িয়ে যাচ্ছে। আঁচড়ে আঁচড়ে কয়েকটা পাতা ও ছিঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বমির মতো সাদা থকথকে দুধ বেরুল ডাল বেয়ে। অথচ, সেদিকে ওর চোখ না পড়ে ফোকর গলিয়ে দাওয়ার ওপর লাফিয়ে এল। বেড়ালটা এবার হাই কাটছে। হাই কেটে মুখের উপর একখানা পা তুলে ঘসে নিচ্ছে। উঁহু, ঢং দেখে আর বাঁচি না বাপু! রোস না সব, মজা দেখাচ্ছি। খোকার মা উঠরে উপর বাচ্চাটাকে তুলে ধরে কুতকুত করে তাকিয়ে

আছে। কানের পাশে টকটকে এমন একটা লালের আভা, যেন নিমাইচাঁদের কসাইখানা থেকে এইমাত্র কেটে আনা একটা পাঁঠার জিভ ওখানে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। খোকার মার চোখের মণি আরশির মতো, আলো পড়ে ঠিকরে ঠিকরে ছেলের গায় ঝিলিক কাটছে। উঁহু, কেমন ধারা হাটু ছুড়ছে দেখ না! পেলে হয় একবার চোখ দুটো খুবলিয়ে গর্ত করে নেব, মাথাটাকে আখের মতো নিংড়ে ছাড়ব, তারপর পুঁটলি বেঁধে খাল পারে ফেলে আসব। হিঁ হিঁ ......কেমন সুখ হবে তা'লে!

সুখ! সোনাবউয়ের, কারণ নেই, অকারণ নেই কাঁদতে ইচ্ছে করল। সামনে এই বেড়াটা কেন? বাধা দেখলেই বুকটা কে যেন চেপে ধরেছে মনে হয়। সারা দেহ ঘামতে থাকে। ঘামতে ঘামতে সোনাবউ দেখল, রাংচিতার গা বেয়ে দুধ গড়াচ্ছে টসটস করে। দুধের ফোঁটা ফুটকি ফুটকি শ্মশান খোঁচান ফুলকির মতো ভুরভুর করে উড়তে লাগল। আবার সেই ঝিমঝিম করা কুয়াশা নামল। কুয়াশার মাঝে ডুবতে ডুবতে সোনাবউ হারিয়ে যাচ্ছে। উঁহু, একটুখানি ঠাঁই নেই গো, কেমনধারা জ্বালা বলো!

স্বামীর কথা মনে পড়ছে। স্বামী ছিল সিঁধেল চোর। ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে ঘরে ঢুকত। সমস্ত গা তেল জবজবে করে নিত। ফলে ধরবার আগেই পিছলে পড়ে পালিয়ে আসত। নিজের হাতেই কতবার ও তেল মাখিয়ে দিয়েছে। হাসতে হাসতে কখনো সখনো লোকটা বলত, এটা আমার বাপের বাড়ি বুঝলি সোনাবউ আর জেল-বাড়িটা আমার নিজের বাড়ি। কোন বাড়িই টিঁকলো না ওর। পাঁচমারির খাল ধারে সেই যে-বচ্ছর জোড়া খুন হল সেই থেকেই ওর ফেরার হয়ে গেছে। নিরুদ্দেশ গেছে।

সেই থেকেই সোনাবউয়ের নিমাইচাঁদের কসাইখানায় আনাগোনা। নিমাইচাঁদের আদর কি! পারলে যেন ছবির মতো টাঙিয়ে রাখে ওকে। আহা, এমন আমার সাধের দিনে এমন আমার সুখের দিনে কে এসে ছাই ছড়াল বল দেখি! সুখের কথা মনে পড়ায় হু হু করে কান্না আসছে।

খোকার মার দিকে তাকিয়ে সোনাবউ কান্না চাপল। এত সুখ ভাল না খোকার মা, কাঁদতে হয়। হিঁ হিঁ......খোকার মাকে কাঁদিতে হলে কেমন মজা হয় বল দি' নি! সোনাবউ খুশী হয়ে একটুক্ষণ চোখ বুজল।

আবার এক গাদা শ্মশান ফুল বনবন করে পাক খাচ্ছে! কসাইখানার দাওয়ায় বসে নতুন একটা ছোকরা মোজার মতো পাঁঠার গা থেকে চামড়া ছাড়াচ্ছে। কিছুতেই ওকে চিনতে পারছে না সোনাবউ। দাওয়া জুড়ে খাসির লোম, রক্তের দাগ। রক্তে লোমে একাকার হয়ে জেবড়ে গেছে। কসাইখানার ভেজা ভেজা আঁশটে আঁশটে গন্ধটাও নাকে লাগছে। নিমাইচাঁদ তো মারা গেছে ওলাওঠায়। একরাত্রের বমি দাস্তে। অথচ, ওরই সঙ্গে ভাব জন্মেছিল সোনাবউয়ের, লগিডুব পানির মতো অতল হওয়া ভাব। অথচ লোকটা মরল ওলাওঠায়। মরার আগেই সোনাবউয়ের পেটে একটা বাচ্চা এল। নিমাইচাঁদের চিতার পাশে চেঁচিয়ে কেঁদে শোনাল ও, "তুই তো একটা ছেলের বাপ, কোথায় যাচ্ছিস শুনি? ছেলের মুখটাও দেখবি না।" পটপট করে হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলে ছড়িয়ে দিল চিতার উপর। খানিকটা যেন রাগ করেই এমন করল।

এতক্ষণ যেন পায়ের নিচে মাটি ছিল। হঠাৎ সব উবে যেতে শুরু করেছে। সোনা-বউ যেন শূন্যে ভাসছে। কুয়াশার মতো স্মৃতির মধ্যে ডুবতে ডুবতে তলিয়ে যাচ্ছে আবার। সাঁতার কেটে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক সময় ও ককিয়ে উঠল। চার পাশে কি একটু আধটু আলো নেই গো। কেমন করে এগোই বল দেখি! হিঁ হিঁ করে কাঁপতে লাগল। একটু আধটু ঠাঁই নেই গো, কোথায় গিয়ে দাঁড়াই বল দেখি!

দিন এলে ছেলেটা হল। কিন্তু কেমন ধারা ছেলে! সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সোনাবউ চমকে ওঠে, যেন গুটি কয় হাড়ের ওপর চামড়ার একটা খোলস চড়িয়ে ছেলে ভুলানো-ছেলে। ধড়টা কেবল মরা পাখির ধড়ের মতো ঢুলতে থাকে। ছেলের মুখে মাই দিয়ে সোনাবউ চমকে ওঠে। বোঁটা খোঁচালে রক্ত বেরোয়, দুধ কোথায়? দুধ বিনেই ছেলেটা একদিন হারিয়ে গেল।

স্বামী গেল নিরুদ্দেশ, নিমাইচাঁদ ওলা-ওঠায়, ছেলেটা কেন থাকবে বল। খালের ধারে ছেলেটাকেও রেখে এল সোনাবউ। খালের কথায় সাঁকোর কথা মনে পড়ল। সাঁকোটাই যত বিপদ বাধায়। এপার কর ওপার কর, কিছুতেই যেন স্বস্তি নেই। এপারে থাকবে না ওপারে যাবে ভেবেই পায় না সোনাবউ। থুঃ!

হু হু করে কান্না আসছে। হাতের কাছে কিছু একটা পেলে হয় এখন। মনের ঝাল মিটিয়ে নেব। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবল সোনাবউ। ধীরে ধীরে আবার সম্বিৎ ফিরে পেতে লাগল। দেখল, পিচকিরির মতো আলো এখনো ছড়িয়ে আছে দাওয়ার ওপর। বেড়ালটা কি নড়বে না নাকি! ইচ্ছে হচ্ছে দোলনাটাকে টান দিয়ে ছিঁড়ে নামায়।

বাচ্চাটা কেমন গড়গড় করে শব্দ করছে। বাচ্চার দিকে চোখ পড়তেই সোনাবউ শক্ত

হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাড়ে মজ্জায় কেমন যেন অসুর চাপল। খোকার মা-টা গেল কোথায়! নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সোনাবউ। ঠোঁট জোড়া থরথর করে কাঁপতে লাগল। মাথার মধ্যে চনচন করে রক্ত ছুটল। ছেলেটা এখন একলা একলা ঝুমঝুমি নাড়ছে। খোকার মা-র সাহস দেখে যেন ও নিজেই শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। এই ফাঁকে, যা হয় হোক এই ফাঁকেই এগিয়ে যাবে ও। এই ফাঁকেই ছোঁ মেরে তুলে নিতে হবে। হাতের আঙুলে তুর তুর করে কাঁপতে লাগল। ঘেমে উঠছে সোনাবউ। হুমড়ি খেয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। চারদিকে একপলক নজর বুলিয়ে দেখে নিল, জনপ্রাণীর গন্ধ নেই। অথচ ঐ বেড়ালটা অমন তাকিয়ে আছে কেন! দোলনাটা যেন চিরকালই দুলতে থাকবে। থামিয়ে দিলে বেশ হয়।

ঘরের মধ্যে চোখ পাতল সোনাবউ। সুমসুম করছে ফাঁকা। রোস না এবার, মজা দেখাচ্ছি। চোয়াল দুটো শক্ত করে চেপে ধরে দাওয়ার কাছে এগিয়ে এল ও। ছেলেটাকে খুঁচিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। 'এই শয়তান', ক্ষীণ গলায় ডাকল সোনাবউ। ছেলেটা যেন সব বোঝে এমনভাবে মুখ করে ওর দিকে তাকাল। বেড়ালটা তবু নির্বিকারে দোল খাচ্ছে। 'এই ছেলে' হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে জাপটে ধরল সোনাবউ। এক থাবলা তুলতুলে মাংসের মতো ছেলেটা ওর সমস্ত বুক ভরে গেল। চোরের মতো চোখ তুলে তাকাল সোনাবউ। জনপ্রাণীর গন্ধ নেই। বেড়ালটা শুধু সাক্ষীর মতো তাকিয়ে আছে। সোনাবউ চোরের মতো পা টিপে টিপে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে এল। রাংচিতার বেড়া ডিঙোতেই ছেলেটা কেমন কুঁই কুঁই করে কেঁদে উঠল। হাত তুলে মুখে চাপল ওর সোনাবউ। চিৎকার দিয়ে ঝিকিয়ে উঠল বাচ্চাটা। হাত থেকে খেলনাখানা পড়ে গেল। চুলোয় যাক্। এখনি হয়ত কেউ এসে দেখে ফেলবে। 'এই চুপ, চুপ যা বলছি।' মুখের মধ্যে নুন ঠেসে ধরলে যেন শান্তি হয়। হাত দিয়ে মুখটাকে চেপে রাখায় কান্নাটা এবার গোল গোল হয়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে লাগল।

হন হন করে খানিকটা দূর এগিয়ে এসে সোনাবউ স্বস্তি পেল এবার। কাকপক্ষীও টের পায় নি, হিঁ হিঁ......কেমন মজা হল বল দি'নি। হাঁটতে হাঁটতে সরকার বাগানের মাঝ বরাবর এগিয়ে এল ও। ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁপাতে লাগল এবার। জায়গাটা বেশ জঙ্গল মতো বলে ভাল লাগছিল যেন। ওদিকটায় ঢালুর মধ্যে বেতের ঝোপ দেখা যাচ্ছে। আম তেঁতুলের ঘন ছায়ায় আকাশটা কেমন ঝাপসা মতন। সামনেই একটা কোমর অবধি উঁচু হওয়া উইয়ের ঢিবি। ঢিবির পাশে একটু বসলে হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে সোনাবউ বুঝতে পারল, বাচ্চাটা ওর গা থেকে পিছলে পড়ছে। দু হাত দিয়ে সাপটে আবার ওকে তুলে ধরল। বুকটা এত কাঁপছে কেন! যেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাৎ ও পড়ে মরবে। দাঁড়াতে আর সাহস না হওয়ায় ঢিবির পাশে এগিয়ে এসে বসে পড়ল সোনাবউ। ঢিবির দিকে পিঠ ঝুঁকিয়ে ঝোপের দিকে তাকাল। ছোট্ট একটা রক্তশোষা সাপ পোকা খুঁজছে। কাকপক্ষীও টের পেল না, হিঁ হিঁ......আকাশের দিকে চোখ তুলল। ফিনকির মতো আলো ছুটেছে। বাধার দিকে তাকিয়ে থাকলে বুকটা বড় টনটন করে ওঠে। ফুসফুসটা কে যেন চেপে ধরেছে মনে হয়। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর উপর চোখ পাতল সোনাবউ। চোখ কেমন বিজলীর মতো ঝলসে উঠল। সামান্য একটু রোদের দিকে তাকাতেই এই, আর আগুনে যখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিমাইচাঁদকে শেষ করল,—হায়রে, ছেলের মুখটাও দেখলি না তুই। শত্তুর, তুই আমার শত্তুর ছিলি! রাজ্যি-ময় শত্রু ঘুরছে, কিলবিল করে হাত বাড়াচ্ছে রাক্ষসগুলো।

বেতের ঝোপে আবার ওর চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বরফের মতো এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস মুখের উপর লাফিয়ে পড়ে ঝাপটা কষাল। চোখ দুটো কুঁচকে ধরে শক্ত হয়ে তাকাল ও। বাড়ির সেই সাদা বেড়ালটা কেমনভাবে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে ওখানে। হারামজাদা পিছু ধরেছিস! ভুল দেখছে না তো সোনাবউ। আবার খুঁটে খুঁটে লক্ষ্য করল। প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখ না। নাঃ, বসতে' পারল না সোনাবউ। পুঁটলির মতো বাচ্চাটাকে বগলে ধরে উঠে পড়ল।
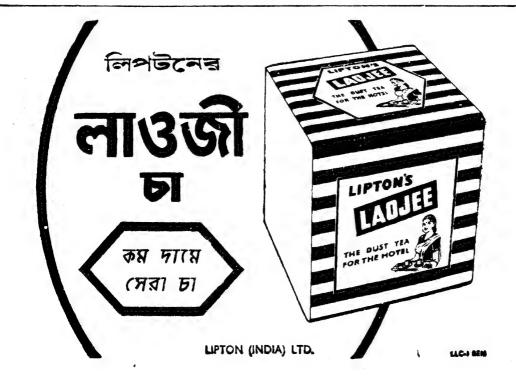
দু' পা হাঁটতেই মনে পড়ল, স্বামীর গায়ে তেল ডলে পিছলে করে দিত সোনা—বউ। স্বামীটা ছিল সিঁধেল চোর। ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে ঘরে ঢুকত। ধরা পড়ার আগেই আবার পিছলে পড়ে পালিয়ে আসত। হায়রে, শেষটায় কিনা নিজের হাত থেকেই পিছলে গেল!

কুঁজো হয়ে হাঁটতে লাগল সোনাবউ। বেড়ালটার চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হবে। সামনেই একটা মজা পুকুর। কাদার উপর নাক ভাসিয়ে কি যেন একটা নড়ছে চড়ছে। শুকনো একটা বেলের খোসা পায়ে লেগে গড়িয়ে গেল। চমকে লাফিয়ে উঠেছিল প্রায় সোনাবউ। আবার একটু কুঁজো হয়ে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বেতের ঝোপটা চোখের বাইরে চলে যেতেই হিঁ হিঁ করে হেসে উঠল সোনাবউ। হিঁ হিঁ...... বেড়ালটা এবার বুঝতেই পারবে না ও কোন দিক দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এই, এই, চুপ! চুপ যা বলছি। কান্নাটা আবার গুলিয়ে গুলিয়ে পেটের সুড়ঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে ছেলেটার। এত সুখ ভাল না খোকার মা, কাঁদতে হয়। হিঁ হিঁ......সামনের পোড়ো জমিটুকু এক ছুটে পেরিয়ে এল সোনাবউ। ডাইনে হাটিজে সর্দার পাড়া, বাঁয়ের দিকে হেঁটে চলল। আধ পোড়া ইটের পাঁজাটাকে এখান থেকে একটা ধ্বস ভাঙা দালানের মতো মনে হচ্ছে। পাঁজার উপর রোদ শিষছে। এতক্ষণে রোদের তেজটা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারল সোনাবউ। এই, এই......চুলের মধ্যে বাচ্চাটার আঙুল ঢুকে যাচ্ছিল, ঝটকা মেরে হাতটাকে ও ছাড়িয়ে নিলে। ইস্ আবার হেঁচকি তুলছে দেখ! বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল সোনা-বউ। কাঁদতে কাঁদতে কেমনভাবে ফুলে উঠছে, দেখতে দেখতে সমস্ত মন ঝিমঝিম করে দুলতে লাগল। গায়ের থেকে আঁতুড় গন্ধটাও মরেনি গো! দেখতে দেখতে সমস্ত চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

কারণ নেই অকারণ নেই টস টস করে চোখ ভিজে জল এল ওর। খাল ধারে এমনি একটা ছেলেকে ও কবর দিয়ে রেখে এসেছে। নাক টেনে কান্না চাপবার চেষ্টা করল সোনা-বউ। ইটের পাঁজায় পিঠ ঠেকিয়ে সামনের দিকে শূন্য চোখে তাকাল। শীতের মাঠে রোদ পড়ে চকচক করে কাঁপছে। আকাশটা কেমন ভুষো ভুষো শ্মশানখোলার আকাশের মতো ঝাপসা দেখাচ্ছে। ধোঁয়ার ফাঁক গলিয়ে হঠাৎ কয়েকটা শকুন বেরিয়ে এল। লাট খেতে খেতে শকুনগুলি নিচের দিকে ঝুঁকে আসছে। সোনাবউ উশখুশ করে নড়ে বসল, শকুনের দিকে চোখ রাখতে কেমন যেন ভয় লাগছে ওর। কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে মনে হল। ভয়ে ভয়েই পিছন ঘুরে ইটের পাঁজার দিকে চোখ রেখে কাঠ হয়ে রইল। কাঁচা ইট গলে গলে ঝলসে ওঠা চামড়ার মতো লাগছে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল সোনাবউয়ের। এমন সময় ইঁটের পাঁজার উপর দিকে চোখ পড়তে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কে যেন একটা চাবুক কশেছে বুকের উপর। দরদর করে ঘাম ছুটতে লাগল সোনাবউয়ের। চোখ ফেরাতে পারল না। পাঁজার উপর বাঘের মতো থাবা পেতে চকচক করে তাকিয়ে আছে বেড়ালটা। এইবার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে সোনাবউকে। বেড়ালটার দিকে চোখ রেখেই পিছন দিকে পা ফেলে ফেলে খানিকটা দূরে হেঁটে এল ও। হঠাৎ তারপর উলটো দিকে ঘুরে ছুটতে শুরু করল। সামনেই হোগলা বন। হোগলা বনে বাতাস কাঁপছে। সরসর করে খই ফোটার শব্দ হচ্ছে। বনের ভিতর হামা কেটে ঢুকে পড়ল সোনাবউ। হোগলা পাতা করাতের মতো গায়ের উপর ঘষা খাচ্ছে। ছেলেটাকে পুঁটলির মতো আঁচলের মধ্যে বেঁধে নিয়ে দু' হাত দিয়ে পাতা সরাতে সরাতে অনেকটা দূরে ঢুকে পড়ল ও। চারদিকে যখন বনের আবডাল পুরো হল, সোনাবউ পা বিছিয়ে বসে পড়ল। হোগলা বন পেরিয়ে গেলেই খাল পড়বে। খালের সেই সাঁকোটার কথা মনে এল।

নিমাইচাঁদের চিতার উপর খুঁজলে হয়ত সাদা সাদা দাঁতের মতো শাঁখার গুঁড়ো এখনো কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু, নিমাই-চাঁদের হাড়ের কুচি আর শাঁখার কুচি দুটোরই যে এক চেহারা। আলাদা করে চিনবে কিভাবে সোনাবউ।

জালের মতো হোগলাপাতার জঙ্গলের মধ্যে ডুবে বসে আছে সোনাবউ। জালের মতো বাধা দেখেই বুকটা কেমন টনটন করে উঠল। হাঁপাতে লাগল সোনাবউ। মুখ দিয়ে শ্বাস টানল।

বাতাস লেগে পাতার ডগায় শিরশির করে কাঁপুনি আসছে। বাতাসটা যেন হৈ হৈ করে ছুটে যাচ্ছে খালের ধারে। কান পেতে সোনাবউ বাতাসের ইচ্ছে বুঝতে

চাইল। মনে হল বাতাসের মধ্যে একদঙ্গল ক্ষ্যাপা কুকুর হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে মরছে। শব্দটায় ওর সন্দেহ হল। চারপাশটা দেখবার জন্য ইচ্ছে হচ্ছে। পাতার ডগা এমনভাবে কাঁপছে কেন! ইচ্ছে হল হাত বাড়িয়ে কাঁপুনিগুলো থামিয়ে রাখে।

বাতাসের মধ্যে শব্দটা যেন ঘন হচ্ছে। সোনাবউ উশখুশ উঠে দাঁড়াল। হাত জাপটে হোগলা পাতার কাঁপুনি থামাল। থামিয়ে, চার পাশে চোখ বুলোতেই দেখতে পেল একদঙ্গল লোক লাঠি হাতে ছুটে ছুটে এগিয়ে আসছে। সর্বনাশ, টের পেয়ে গেছে সবাই। মানুষগুলোই তাহলে কুকুরের মতো শব্দ করছিল। রাক্ষস, মরণ হয় না তোদের। সোনাবউ বিড়বিড় করে গালি পাড়ল। কিন্তু এভাবে এখন দাঁড়িয়ে থাকলে দেখে ফেলবে রাক্ষসগুলো। হুমড়ি খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ডুবে বসল সোনাবউ। যেন মাটির সঙ্গে মিশে থাকলে সবচেয়ে এখন ভাল হয়, এমনভাবে উবু হয়ে পড়ে রইল। লোকগুলো বোধ হয় পাঁজা অবধি এগিয়ে এল। ঘাড়ের কাছে কুচ করে কি যেন একটা পোকায় কামড়ে ধরেছে। হাত তুলতে সাহস হল না। চোখ ঘুরিয়ে দেখল, শকুন দুটো সোঁ সোঁ করে খালের দিকে ছুটে যাচ্ছে। খরগোশের মতো কান তুলে ধরল সোনাবউ। থুতু ছেটাতে ইচ্ছে হল। থুঃ থুঃ কয়েক চাপ থুতু ছেটাল হোগলাপাতায়। বাকিগুলো কোঁৎ করে গিলে ফেলল।

লোকগুলো কেমন ঝড়ের মতো ছুটে আসছে। হোগলা বনেই ঢুকবে নাকি! দেখবার জন্য উঁচু হল সোনাবউ। ভাল করে বুঝবার আগেই টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ছুটতে শুরু করল।

লোকগুলো সব ছড়িয়ে পড়ে চারপাশ থেকে ঢুকতে চাচ্ছে, এক পলকে সোঁ সোঁ করে ওর দিকেই যেন ছুটতে লাগল। থুঃ থুঃ, থুতু ছেটাল সোনাবউ। আরো জোরে জোরে ছোটা যায় না। হাওয়ায় ভর দিয়ে যদি পাখির মতো উড়ে পালান যেত! বাপরে, কেমন ধারা রাক্ষসের মতো আসছে দেখ। পাতায় পাতায় পা জড়িয়ে আসছে। ইস্, পেলে যেন ছিঁড়ে খাবে আমাকে। কেন? তোদের আমি কোন পাকা ধানে মই দিয়েছিরে শয়তান। দাঁড়া না, গায়ের ওপর এসে পড়বি তো কামড়ে ধরব। ঝোপের গায়ে কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিল সোনাবউ। আরো খানিকটা ছুটে এসে খালধারের সাঁকোটাকে দেখতে পেল ও। নাক দিয়ে ছরছর করে জল গড়াচ্ছে। চোয়াল বেয়ে কস নামছে বুঝতে পারল সোনাবউ। থুঃ থুঃ করে আবার ও থুতু ছেটাল।

লোকগুলো সবাই বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হুটপাট করে উপরদিকে লাঠি তুলছে। সোনাবউয়ের মনে হল কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে চ্যাঁচাচ্ছে ওরা। যেন

কতকাল কিছু খায় নি। হঠাৎ একটা মরা দেখে চোখ তাতিয়ে ছুটে আসছে।

ছুটতে ছুটতে বন পেরিয়ে খাল-পাড়ে এসে পড়ল সোনাবউ। হাত প'চিশেক চওড়া খাল। মাঝামাঝি, রোজকার মতো জল দেখা যাচ্ছে। ওপারে, উপুড় করে রাখা একটা নৌকা। হয়ত তলী সারাইয়ের কাজের জন্য ওঠানো হয়েছে। ওটার মধ্যে ঢুকে বসলে হয় না। বাপরে, লাঠি খুঁচিয়ে জ্বালিয়ে মারবে। সাঁকোটা কেমন এপার ওপার জোড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে লাগল সোনাবউ। হয়ত এক-পলক দাঁড়িয়েছিল, অমনি আবার রাক্ষসগুলোর কথা মনে পড়ায় তীরের মতো সাঁকোর উপর উঠে এল সোনাবউ। খানিকটা যেন সাহস পেল এখানে। পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, আর একটু হলে লোকগুলো ওকে ধরে ফেলত। সাঁকোর গোড়া অবধি ছুটে এসেছে রাক্ষসগুলি।

কে একজন বাঁশ ধরে এগোবার চেষ্টা করছে দেখে সোনাবউ চেঁচিয়ে উঠল, 'আর এগোবি না বলছি, এই দ্যাখ জলে ফেলে দেব। হি' হি'......' বাচ্চাটার ঘাড় ধরে জলের উপর তাক করে ধরে রাখল সোনাবউ। 'হি' হি'......দেই, দেই......।'

যে লোকটা এগিয়ে আসছিল সে এবার শিউরে উঠে পিছিয়ে এল। সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ঝিমিয়ে গেছে। চোখগুলো যেন দপ দপ করে নিবে গেছে। শুনতে পেল কে যেন পিছন থেকে বলছে, 'এই, এই ওভাবে নয়। পিছিয়ে আয়। পিছিয়ে আয়। 'পিছিয়ে আয়।'

'হি' হি', দেই, দেই, ফেলে দেই.....' খিল খিল করে হেসে উঠল সোনাবউ। সত্যি সত্যি ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে সোনাবউয়ের। জলের দিকে একবার ও তাকাল। শিরশির করে জল কাঁপছে। বাঁশের সাঁকোর ছায়াটা চাবুকের মতো নড়ছে যেন। 'চাবুক মারবি বুঝি? আয়, আয় না।' ঝুলন্ত অবস্থায় বাচ্চাটা শক্ত ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। খুশীতে চোখের তারা নাচতে লাগল সোনাবউয়ের।

লোকগুলো এখন রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করছে। যেন মন্ত্র ছিটিয়ে গণ্ডী টেনে দিয়েছে সোনাবউ। আয় না আর একটু, কেমন তোদের মজা দেখাচ্ছি। ছেলেটার মধ্যে মানুষগুলোর প্রাণবায়ু ধুক ধুক করে কাঁপছে যেন, লক্ষ্য করল সোনাবউ। টুপ করে ফেলে দিলেই একসঙ্গে দম বন্ধ করে মরে যাবে ওরা। হি' হি'......

'এই, এই পাগলী—', কে যেন ডাকছে ওকে। 'ইস্, আমি পাগলী', সোনাবউ বকতে শুরু করল, 'পাগলীর পিছনে ছুটছিস কেন শুনি! আমি পাগলী, কেন তুই পাগলী হতে পারিস না? তোর বাপ পাগল, তোর চোদ্দগুষ্টি পাগল। থুঃ!' থুতু ছেটাল সোনাবউ।

'আহা, বাচ্চাকে একটু তুলে ধর না, মরে যাবে যে।'

'যাবে তো যাবে। আমার কি। আমি পারব না।'

'মা হয়ে তুই এমন কথা বলছিস?' কে যেন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল।

কথাটা ঝট করে ওর কানে লাগল। বাচ্চাটাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে হাত বুলোতে লাগল সোনাবউ। লোকগুলো গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে ওকে।

আহা ষাট ষাট, সোনাবউ বাচ্চাটাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। উথলে উথলে কান্না বেরুচ্ছে। পেটের মধ্যে অনেককালের কান্না যেন জমিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ সব স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে। বুকের উপর চেপে ধরে চাপড়াতে লাগল। 'আহা থাম, থাম, পারি না আর।'

সত্যি সত্যি আর পারছিল না সোনাবউ। হাতে পায়ের সবটুকু শক্তি যেন ক্ষয় করে সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে আছে এখন।

'আহ্, আহ্ থাম। এই নে খা।' মাই গুঁজে ধরল মুখের উপর। মাইয়ের ভারে কান্নাটা চাপা পড়ে আবার পেটের সুড়ঙ্গে ঢুকতে লাগল। 'তা, আর কিইবা করতে পারি।' বিরক্তিতে দূরে হোগলা বনের দিকে তাকাল সোনাবউ। হোগলা পাতা থর থর করে কাঁপছিল। কে যেন একটা ছুটে আসছে না! চিনতে পারল সোনাবউ। নির্ঘাৎ খোকার মা।

'এই, বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দেনা, শাড়ী কিনে দেব, পেট ভরে খেতে দেব।' কে যেন আবার ওকে লক্ষ্য করে অনুনয় বিনয় করছে, বুঝতে পারল সোনাবউ। না-শোনার ভান করে ছেলেটার গায় হাত বুলোতে লাগল সোনাবউ। আহা, বুকে পিঠে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে দাগ দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ যেন বিষ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে গো। আহা, সোনাবউ করুণভাবে তাকিয়ে রইল।

'খেতে পরতে যা চাস সব দেব, ফিরিয়ে দে মা লক্ষ্মীটি।'

'না। দেব না।' রুখে উঠল সোনাবউ। 'দেখছিস না কে আসছে। ঐ দ্যাখ, হি' হি'......'

ভিড়ের সকলে চমকে পিছন ফিরে তাকাল, দেখল, হোগলাবনের ভিতর দিয়ে খোকার মা আঁচল উড়িয়ে ছুটে আসছে। উত্তেজনায় টলতে লাগল সবাই। এবার কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন মস্ত একটা অঘটন ঘটবে। কি এখন করা উচিত না উচিত কিছুই যেন ঠিক মতো ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। লোকগুলো কেমন নড়ে চড়ে গণ্ডীর বাইরে হাত পা ছুঁড়ছে, দেখতে দেখতে আবার ওর হাসি এল। হি' হি'......চোয়াল ভিজে কস গড়াচ্ছে বুঝতে পারল সোনাবউ। চোখের কোণে পুঁজের মতো পিঁচুটি জমেছে। পিঁচুটি সরিয়ে সোনাবউ আবার ওদিকে তাকিয়ে দেখল খোকার মাকে, গণ্ডীর বাইরে দেখা যাচ্ছে। চারদিক থেকে খোকার মাকে ছেঁকে ধরেছে লোকগুলি। সাঁকোর দিকে আসতে দেবে না।

'কেন? এই, এই, ছেড়ে দে বলছি।' সোনাবউ ধমকে উঠল।

ছেড়ে দিয়েছে। খোকার মাকে ছেড়ে দিয়েছে, 'হি' হি'...আয়, আয়...' ডাকতে লাগল সোনাবউ।

'আয় না।' যেন, কেবলমাত্র খোকার মার গা থেকে মন্ত্র তুলে নিয়ে একটু একটু করে ওকে টেনে নিচ্ছে সোনাবউ। 'আয় না বাপু, মাজায় জোর নেই নাকি!'

বাঁশের উপর ভর দিয়ে দিয়ে সাঁকোর উপর উঠে এল খোকার মা। বাবা, বাঁচা গেল। যেন এতক্ষণ বাচ্চাটাকে বাঁচাবার দায়-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও, এখন স্বস্তি পেল। ছেলেটাকে মাই ছাড়িয়ে উঁচু করে তুলে ধরল সোনাবউ। 'নে তো বৌঠান, আমার বুকে দুধ নেই। একটুও টানল না। একটু মাই দিয়ে শান্ত কর দেখি।'

বাচ্চাটাকে দু' হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তরতর করে সাঁকো থেকে নেমে এল খোকার মা। গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে লোকগুলো কেমন পুতুল হয়ে দেখছে, সোনাবউ লক্ষ্য করল।

এক এক করে সব ক'টি লোক হোগলা বনের ভিতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল। হোগলা পাতায় বাতাস খেলছে। সাঁকোর উপর দাঁড়িয়েছিল বলেই অনেক দূরের পাঁজাটা এতক্ষণে ওর নজরে এল। শকুনগুলো গেল আবার নজরে এল। শকুনগুলো গোল হয়ে আছে এখনো।

কেমন একটা অসাড় ভাব সারা দেহে চেপে বসল সোনাবউয়ের। এতক্ষণকার উত্তেজনা হঠাৎ যেন নিভে জল হয়ে যাচ্ছে। হায় হায়, ছেলেটাকে কেন ফিরিয়ে দিলাম। কপাল চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। ছেলেটাকে কেন ফিরিয়ে দিলাম, নখ বসিয়ে নিজের বুকটাই চিরে ফেলতে ইচ্ছে হল। ক্ষোভে দুঃখে জলের দিকে তাকাল সোনাবউ। জলের উপর সাঁকোর ছায়াটা থর থর করে কাঁপছে। চিতার আগুন যেমন ভাবে বাতাস কাঁপায়, তেমনি ধারা কাঁপছে যেন ছায়াটা। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল সোনাবউ। দেখতে দেখতে আবার ও শক্ত হয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। শিউরে উঠে দেখল, জলের মধ্যে বেড়ালটাকে দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থেকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। বার কয়েক চোখ ঘষল সোনাবউ। হাতের আঙুল থরথর করে কেঁপে উঠল। ইস্, কি ভুলটাই না করেছি। তখন যদি বেড়ালটাকে আছড়ে মারতাম। বাঁশের উপর মাথা ঠুকে দাপাতে লাগল সোনাবউ।
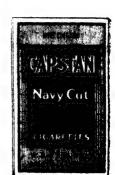
নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

এত ভোরে কেউ জাগেনি। পুরোহিত নেই, সেবাইত নেই—মন্দিরদ্বার বন্ধ। ভাঙা অতিথিশালার ফাটা মেঝেতে কটা কুকুর শুয়ে ঘুমচ্ছে। আশেপাশে কোনো বাড়ির দরজাও খোলেনি। একটি দুটি লোক পথে হাঁটছে। মন্দিরের সামনেই পাকা রাস্তার ধারে ঘনপল্লব একটি কাঁঠাল গাছ—মোটা কাণ্ডটি ঘিরে একটি ত্রিকোণ-কৃতি বাঁধানো বেদী। ঝোলা নামিয়ে সেই বেদীতে পা মুড়ে বসলাম। অদূরে স্কুল বাড়ির মাঠ। কাঁচা রোদ্দুরে ঘাসের আস্তরণ চিকচিক করছে। রাত্রে ট্রেনে ঘুম হয়নি। মায়ের দরজার দিকে মুখ করে কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ফুরফুরে বাতাসে দেহমনে বড়ো আরাম হলো। জুড়িয়ে এল ক্লান্ত চোখ।

পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী নাতি-উচ্চ পর্বত-ধারা। লাল কাঁকর, শুকনো পাথর, ফাটলে ফাটলে বন্য গাছের জটলা। সেই ধারার পূর্ব সানুতে পূর্বমুখ মাতৃমন্দির। দু-পাশে রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো আম কাঁঠাল গাছ কয়েকটি—গ্রীষ্মকালে ঘন ছায়ার আশ্রয়। মন্দিরের পিছনে পর্বত-ধারার এপারে ওপারে নতুন নতুন লাল মাটির রাস্তা। স্বাস্থ্যকর স্থান—বায়ু পরিবর্তনের উপযুক্ত।

শোকোন্মাদ মহাদেবের স্কন্ধলগ্ন সতী-দেহকে নারায়ণ তাঁর চক্র দিয়ে কাটেন। সতীর দেহ একান্নটি কর্তিত অংশে বিভক্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। সেই থেকে একান্নটি সতীপীঠ।

এইখানে সতীর কণ্ঠনালী পড়েছিল। অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা নলেশ্বরী। পাশে আছেন বাবা যোগীশ ভৈরব। তন্ত্র-চূড়ামণি পীঠ নির্ণয়ে উল্লিখিত আছে :

নলহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা॥

বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ এই নলহাটি।

ঘুমিয়ে পড়িনি, তবে আধা-সজাগ থেকে ঝিমুচ্ছিলাম। লক্ষ্য করিনি, কখন দুটি শিশু সঙ্গে নিয়ে বাউরি স্ত্রীলোকটি অতিথিশালার মেঝে ঝাঁট দিতে শুরু করেছে, কখন মন্দিরদ্বার খুলেছে। হঠাৎ তন্দ্রা টুটল—কানে এল মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি। সুমিষ্ট উদাত্তকণ্ঠে কে যেন আবৃত্তি করছে। চমকে উঠে ভিতরে ঢুকলাম।

অতিথিশালাটি জীর্ণ দোতালা বাড়ি। তারপরই সুউচ্চ মন্দির। মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপ্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মাঝখানে যূপকাষ্ঠ, বাঁ দিকে সামান্য কয়েকটি ফুলের গাছ। বড়ো গাছ প্রাঙ্গণে তিনটি—স্বর্ণ-চাঁপা, কাঞ্চন আর একটি নারিকেল। মন্দিরে উঠতে প্রশস্ত লাল সিঁড়ি। সিঁড়ির প্রথম ধাপে ত্রিশূলে যোনি। ডান দিকে বিশাল এক বেদী-বাঁধানো আমগাছ।

মন্দিরটি ইঁটের তৈরী। পুরোনো দিনের বালুর আস্তরণ, তার উপর সাদা চুনরঙ। সামনে মোটা মোটা উঁচু থাম। মন্দির-প্রকোষ্ঠের সামনে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা কাঠের দরজা, দরজা জুড়ে লোহার কোলাপ-সিবল গেট। চূড়াটি স্বর্ণবর্ণ।

মন্দিরের পিছন দিকে দক্ষিণ কোণে একটি চাতাল। এটি নাকি সিদ্ধাসন। কোনো সিদ্ধপুরুষের পঞ্চমুণ্ডি আসন একদা

দ্বারকানদী : তারাপীঠ

সতী মন্দির : নলহাটি

ওখানে ছিল। মন্দিরের পিছনেই পাহাড়ের শুরু—নানা বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছের জটলা। সদ্য পিছনেই বিরাট দুটি নিমগাছ—তাদের উচ্চতা মন্দির-চূড়াকে প্রায় স্পর্শ করেছে।

এই মন্দিরের মধ্যে আছেন সতী নলেশ্বরী। কোনো বিগ্রহ নেই। দেয়ালে শিলার গোলাকার অংশে সিন্দুর-লেপিত প্রতীক মূর্তি। এই দেবীর আনন। মাঝখানে ওষ্ঠের একটু আভাস। দু-পাশে স্বর্ণনির্মিত দুই চোখ। মুখমণ্ডলের নিম্নে একটি সরু গহবর, সেই গহবরে জল ঢাললে সে জল অদৃশ্য হয়ে যায়। এই গহবর সতীর নলা বা কণ্ঠনালীর প্রতীক। সিন্দুর-লেপিত রক্তমুখমণ্ডল ফিরে রক্তবসনের পাড়।

আবৃত্তির স্বর অনুসরণ করে লাল সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম। মন্দির প্রকোষ্ঠের সামনের সংকীর্ণ বারান্দার এক পাশে একটি কম্বলের আসনে বসে আছে একটি কিশোর। ফরসা একহারা চেহারা, পরনে তসরের জীর্ণ ধুতি, খালি গায়ে সাদা উপবীত। প্রশস্ত কপাল, টানা টানা স্বপ্নালু চোখ, ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কোঁকড়া চুলে সদ্যস্নানের আর্দ্রতা। কোলের সামনে লাল-বাঁধাই একটি বই। বইটির দিকে নতদৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে, মাঝে মাঝে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইছে মার মুখপানে। গম্ভীর সুমিষ্ট কণ্ঠে বলছে :

ওঁ কালীং—
কাঞ্চীরম্ন দুকুলহারললিতাং নীলাং
ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।
আবন্ধা মৃত্তরশ্মি রত্ন মুকুটাং বন্দে
মহেশপ্রিয়াম্॥

একেবারে কচি কিশোর! সবে দাড়ি উঠেছে। কোথা থেকে এসেছে এই মন্দিরে এত ভোরবেলা? নিবিষ্ট চিত্তে আপন মনে মার পদতলে বসে চণ্ডীপাঠ করছে। আপন আনন্দে আত্মহারা!

লাল সিঁড়ির উপরের ধাপে বসলাম। চুপটি করে শুনতে লাগলাম চণ্ডীপাঠ। মন্দির মধ্যে পুরোহিত তাঁর নিত্যক্রিয়া শুরু করেছেন। মাকে স্নান করিয়ে নূতন রক্তাম্বরে সাজানো হলো। নূতন করে সিঁদুর পরানো হলো মুখমণ্ডলে। পুরোহিতের একজন সহকারী এসে গোছাতে লাগল নিত্যপূজার আয়োজন। চণ্ডীপাঠ শুনতে শুনতে দেখতে লাগলাম মাতৃমন্দিরের এই সব প্রভাতী কর্তব্য।

নিঃশব্দে এক পাশে বসে আছি। দু-একজন স্থানীয় পূজার্থী আসছে। অর্ঘ্য রেখে যাচ্ছে পুরোহিতের কাছে। কেউ বা চুপটি করে বসছে সিঁড়ির ধাপে। কারও মুখে কথা নেই। স্তব্ধ হয়ে শুনছে চণ্ডীপাঠ।

হে গৌরী, হে নিত্যা, হে সর্বগুণনির্গুণ সর্বশক্তিস্বরূপা সর্বমঙ্গলদায়িনী ত্রিনয়নী জগন্মাতা, তোমাকে নমস্কার। শ্রেষ্ঠাস্ত্রধারিণী, অসুরবিনাশিনী তুমি, বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বপালিনী, বিশ্ববন্দিতা তুমি, তোমাকে নমস্কার। তুমি কল্যাণরূপিণী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, বিদ্যাপ্রজ্ঞামেধারূপিণী তুমি সরস্বতী, তুমি বিশ্বার্তিহারিণী তমিস্রারূপিণী মহামায়া, তোমাকে নমস্কার!

বড়ো করুণা করেছেন মা আমায়। আজ শ্রাবণ সংক্রান্তি। শারদ সূচনার প্রভাতে ভক্তি সমন্বিত চিত্তে চণ্ডীমাহাত্ম্য যে শ্রবণ করে, সমস্ত দুঃখকষ্ট তার দূর হয়, শান্তি ও সন্তোষের পরমপ্রসাদ সে লাভ করে।

চণ্ডীপাঠ শেষ করে ছেলেটি ভূমিতে দেহলুণ্ঠিত করে মাতৃপদে প্রণাম করল। তারপর আসনটি গুটিয়ে নিয়ে মন্দির ত্যাগ করল।

পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলাম ঠাকুর মশাই, ছেলেটি কে?

জানিনে। এই প্রথম দেখলাম।

শুধু এই ছেলেটি বলেই নয়- কোনো নূতন যাত্রী বা ভক্ত নলেশ্বরী মন্দিরে এলে সহজে চোখ এড়িয়ে যায় না। যাত্রী-সংখ্যার বিরলতাই এর কারণ।

বীরভূম পীঠস্থানের জন্য বিখ্যাত। এই জেলায় সতীপীঠই অন্তত চারটি। অট্টহাস, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর ও নলহাটি। এছাড়া কংকালী ও দক্তিনদীঘিকেও সতী মাহাত্ম্যমণ্ডিত উপপীঠ বলা হয়। প্রতিটি পীঠস্থানই অতি জাগ্রত। অন্যান্য পীঠগুলি ভক্ত সমাগমে সারা বৎসরই পূর্ণ থাকে—মেলা বা উৎসবের সময় তো কথাই নেই। অবজ্ঞাত হয়ে আছেন কেবল সাঁইথিয়া-নন্দীপুরের দেবী নন্দিনী আর নলহাটির দেবী নলেশ্বরী। এই নলেশ্বরী মন্দিরে এক [illegible] সময় কিছুটা ভিড় হয়, তা ছাড়া নিতান্ত স্থানীয় মেয়েছেলে ছাড়া

কদাচিৎ বহিরাগত কোনো যাত্রী এখানে আসে।

মন্দিরটি অবশ্য মোটামুটি সুরক্ষিত, তবে সামনের পাকা দ্বিতল অতিথিশালাটি ভেঙে ভেঙে পড়ছে। [illegible] নিশ্চিহ্ন, ফুটিফাটা, আবর্জনা ভরা মেঝে সাপখোপের আড্ডা, ফাটলধরা দেয়াল, ছাদ-ভর্তি ঝুল। ছাদ থেকে ঝুলোনো ঘণ্টাটি ফাটা, যেহেতু মাঝের ঘণ্টিটি হারিয়ে গেছে অতএব সে ঘণ্টা বাজাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কুশলানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধু এই মন্দিরে বহুদিন ছিলেন। সে প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। তাঁর ভক্ত ও শিষ্যরা গুরু নির্দেশে এই অতিথিশালা নির্মাণ করেন। তারপর এ পর্যন্ত সংস্কারের হাত পড়েছে বলে মনে হয় না।

নিত্যপুজো শেষ হলো। জনশূন্য মন্দিরে সঙ্গী কেবল প্রৌঢ় পুরোহিত দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। কথা বলবার একজন লোক পেয়ে আনন্দ তাঁর ধরে না। চক্রবর্তী মশাই বললেন দেবী নলেশ্বরীর কাহিনী।

মারাঠা বর্গীদের প্রতিরোধকল্পে বাংলার নবাব রাঢ় অঞ্চলে যে সব সৈন্য মোতায়েন করেন তাঁদের অধ্যক্ষ ছিলেন 'শাহ' উপাধি-ধারী এক পশ্চিমদেশীয় হিন্দু সেনাপতি। রাঢ়ের এই অঞ্চল তখন গভীর অরণ্যভূমি, হিংস্র শ্বাপদরা পার্বত্য গুহায় মহানন্দে বাস করে। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই বললেই চলে। বর্গী-প্রতিরোধের জন্যে নিভৃত ঘাঁটি হিসেবে শাহ সেনাপতি এই স্থানটি বেছে নিলেন। স্থায়ী ঘাঁটি পেতে তিনি এখানে বসবাস শুরু করলেন। ইতিহাস-বিস্মৃত এই সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি এক রাত্রে মার আশ্চর্য করুণা বর্ষিত হলো। স্বপ্নাদেশে তিনি এই মহাপীঠে সতীর দেহাবশেষের পরিচয় লাভ করলেন। এই মহা সতীতীর্থে তিনিই আদি মাতৃ-মন্দির নির্মাণ করেন।

পরে স্থলপথে গয়া যাত্রাকালে নাটোরের রানী ভবানী এই স্থানে আসেন ও তাঁর কল্যাণে এই তীর্থ প্রসিদ্ধ হয়। তিনি এই মহাল ক্রয় করেন। মাতৃসেবার জন্যে তিনি সেবাইত নিযুক্ত করেন ও সেবাইতদের পুরুষানুক্রমে ভরণপোষণের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করেন। পরে বহু সেবাইত পরিবার দেবীসেবার পরিবর্তে নামমাত্র খাজনায় বিনা দায়ে ও বিনা কর্তব্যে জমি ভোগ করতে থাকেন। তারপর এই মহাল হস্তান্তরিত হয় ও জমিদার হন নসীপুর রাজবংশ। নসীপুরের অনুগ্রহে এতদিন মাতৃসেবার ব্যয়ভার নির্বাহ হচ্ছিল। কিন্তু এখন জমিদারি গেছে। সাহায্যের পরিমাণও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সম্প্রতি মন্দির পরি-চালনার ভার এক স্থানীয় কমিটির হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এই কমিটি সক্রিয় নয়।

মহা দুঃখ নিয়ে চক্রবর্তী মশাই বললেন, মায়ের নামে কয়েক ঘর সেবাইত এখনো

তারা মন্দির

রানী ভবানীর দেওয়া মাটি কামড়ে পড়ে আছে। পালা করে মার দৈনিক পুজোপাট আর নিত্যভোগটুকু সারা হয়। আয়ের সব পথই রুদ্ধ। সাধারণের দয়াভক্তিই এখন সম্বল।

বললাম—দয়াভক্তির বিশেষ প্রাচুর্যের চিহ্ন তো দেখছিনে চক্রবর্তী মশাই!

কোথা থেকে দেখবেন বলুন? চক্রবর্তী সখেদে উত্তর দিলেন—মেলা নেই, উৎসব নেই, প্রচার নেই। পাড়ার মেয়েছেলেরা যা পুজো দিয়ে যায়, তা ছাড়া ক'জন ভক্তই বা বাইরে থেকে আসে? যদিই বা আসে, এক রাত্রি থাকার ব্যবস্থাটুকুও যে নেই! আগে থাকতে মূল্য ধরে দিলে এক বেলার মতো বাড়তি ভোগ রান্না হয়। নইলে অভুক্ত ফিরতে হয় সাধুকেও। নিতান্ত শহর-বাজার তাই, নইল নলেশ্বরী মা আমার আবার জঙ্গলেই আত্মগোপন করতেন।

ভোগের দক্ষিণা ভোরেই দিয়ে দিয়ে-ছিলাম। নিত্যভোগের সঙ্গে আর একজনের মতো ব্যবস্থা হয়েছিল। অতিথিশালার নোংরা মেঝের এক কোণ কিছুটা পরিষ্কার করে প্রসাদ সাজিয়ে দিলেন পুরোহিত। বললেন—আসন কিন্তু নেই, মাটিতেই বসতে হবে।

তাতে কী? মায়ের প্রসাদ মায়ের ঘরের মাটিতে বসে খাব, এ তো পরম ভাগ্য চক্রবর্তী মশাই!

এমন সময় পায়ে পায়ে সেই ছেলেটি আবার ঢুকল। পরনে খদ্দরের একটি খাটো ধুতি আর ফতুয়া। হাতে একটা মুখ খোলা র‍্যাশন-ব্যাগ—বইখাতায় ভর্তি।

পুরোহিত বললেন—এসো এসো বাবা, ভোগপ্রসাদ পাবে নাকি?

লাজুক অথচ কেমন নির্লিপ্ত গলায় প্রশ্ন—জুটবে?

জুটবে না? কী বল বাবা? বোঝাটা নামাও, চট করে ইঁদারায় মুখহাত ধুয়ে এসো।

মায়ের মৎস্যভোগ হয়। আতপ চালের

ভাত ডাল ও তরকারির সঙ্গে একটুকরো মাছের পাতলা ঝোল। ঘৃত ও একটু পরমান্ন। আমার পাশে বসে নিঃশব্দে আহার সারল ছেলেটি। মাকে প্রণাম করে তেমনি নিঃশব্দে বিদায় নিচ্ছিল—আমি ডাকলাম—এখান থেকে কোথায় যাবে ভাই?

স্টেশনে।

দাঁড়াও একটু, আমিও যাব। এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

পথে নেমে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কলকাতায় যাবে নাকি?

আজ্ঞে না, রামপুরহাটে নামব, সেখান থেকে তারাপীঠ।

এই শচী। শচীপদ চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়ায় বাড়ি—সেখানে বাবা মা থাকেন। রামপুরহাটে আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে কলেজে পড়বার জন্যে। রামপুর-হাট কলেজের খাতায় নাম লেখা আছে। এখন গন্তব্যস্থান তারাপীঠ।

আবার শুধোলাম—তারাপীঠে যাবে কেন?

মা ডেকেছেন যে!

কলেজ কামাই হবে না? পড়ার ক্ষতি হবে না?

গর্বভরা কণ্ঠের উত্তর—মার দয়ায় সব পড়া মুখস্থ হয়ে যাবে। চণ্ডী পড়তে সত্যিই আমার বই দেখতে হয় ভেবেছেন নাকি? যাবেন তারাপীঠে?

যাব শচী, তবে এখন নয়। মায়ের মেলার সময় যাব।

খুব ভাল হবে। আমাকে পাবেন। ঠিক দেখা হবে আমার সঙ্গে। আমি সব আপনাকে দেখিয়ে দেব। মনে থাকবে তো?

নেমে গেল রামপুরহাট স্টেশনে। বই-এর ব্যাগটা বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে প্ল্যাটফর্ম ধরে চোখের আড়ালে চলে গেল। বড় ভাল লেগেছিল সরল সুন্দরকান্তি তরুণটিকে। আবার আশ্চর্যও লেগেছিল।

এ কেমন মা-পাগল ছেলে!

॥ ২ ॥

আশ্বিনের শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রে আবার চড়লাম সেই বহু-পরিচিত ট্রেনে—শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গয়াগামী রাত্রের সেই ঢিক-ঢিক যাত্রী-গাড়িতে। খাসা গাড়ি—একটি স্টেশনকেও ভোলে না, একটু অন্য-মনস্ক থাকলে বোঝাই যায় না কখন চলেছে আর কখনই বা থাড়া আছে। যাত্রীও এই আছে তো এই নেই। গঙ্গা পেরিয়ে ব্যাণ্ডেল পৌঁছতেই বিলকুল ফাঁকা। গায়ের চাদরের কোঁচড়ে জুতো জোড়া পুরে নিয়ে বাড়তি চাদরটা পাগড়ি করে মাথায় বেঁধে নাও—দুর্ভাবনা গেল, আরামও হলো। ফাঁকা বেঞ্চিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ো, ঘাড়ের নিচে চাদর-মোড়া জুতোর বালিশ। জুতো-চুরির ভয় নেই—এক ঘুমে রাত কাবার।

ঘুম অবশ্য আমার ট্রেনে আসে না। তাছাড়া উৎসাহী সহযাত্রীদের কল্যাণে একটু ঝিমুনির আশাও বোধহয় নেই। ব্যাণ্ডেলে গাড়ি ফাঁকা হতেই বেশ হাত পা ছড়িয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। হাতে হাতে ধূম্র-কেশিনী ভাণ্ডবাহিনী চা। বালিগঞ্জের বাসিন্দা অনিমেষবাবু ও তাঁর স্ত্রী—উভয়েই আমার অন্তরঙ্গ। অনিমেষবাবু অধ্যাপক—সারা দিন বকবক করে দিনান্তে যখন বাড়ি ফেরেন তখন মুখ খোলেন আমার বিদুষী বউঠান। এখন পা ছড়িয়ে বসে মুখ খুলেছেন দুজনে। আদিসপ্তগ্রাম থেকে উঠেছেন ভূপতি ঘোষাল মশাই। পরনে গেরুয়া লুঙ্গির উপর ভূষো ফ্লানেলের পাঞ্জাবি। হাতে তারের ব্যাগের মধ্যে মস্ত এক রাংতার মালা। কামরায় পা দিয়েই সকলকে শুনিয়ে হেঁকেছেন—আমার কাছে চুরি করবার মতো কিছু নেই মশায়! শুধু এই মালাটি—দুধের বোতলের ছিপির রাংতা দিয়ে তৈরী, একটি পয়সাও দাম নয়। এটির দিকে নজর দিয়ে কোনো ফয়দা নেই!

ইনিও বাঁকিয়ে লোক। দুটি স্টেশন পার না হতেই রতনে রতনে চেনাচেনি হয়ে গিয়েছে। আলাপের আর বিরাম নেই।

আলোচনা চলেছে বীরভূম কথাটির উৎপত্তি নিয়ে। অধ্যাপক বলছেন—বীরভূম নামের মূলে আছেন রাজা বীরচন্দ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন। বাংলার মুসলমান সুবেদারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন। আমি নিজে চোখে অবশ্য দেখিনি সিউড়ির ছ-সাত মাইল পশ্চিমে তাঁর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আছে। অদূরে গভীর ভাণ্ডীরবন। সেই বনের মধ্যে বিরাজ করছেন অনাদিলিঙ্গ মহাদেব ভাণ্ডেশ্বর।

কথার পৃষ্ঠে কথা বলার জন্য তৈরী ছিলেন বিদুষী বউঠান। তিনি বললেন—এ তো হলো রাজকীয় নামকরণ। এবার লৌকিক নামকরণ শোনো। বীরভূম ছিল সাঁওতাল-প্রধান অঞ্চল। এখনও সাঁওতাল গিজ গিজ করছে। ধান কাটার সময় বীরভূমের সাঁওতালরা সারা বাংলা জুড়ে খেত-মজুরের কাজ করে। সাঁওতাল ভাষায় 'বীর' মানে জঙ্গল। সাঁওতালরা তাদের ঐ জঙ্গল-রাজ্যের নাম দিয়েছিল বীরভুঁইয়া। সেই বীরভুঁইয়াই এখন হয়েছে বীরভূম।

গলার কম্ফর্টারটা একটু আলগা করে নিয়ে ভূপতি ঘোষাল বললেন—তথ্যকথা তো দুজনে শোনালেন, এখন একটা গল্পকথা শুনুন। এও অবশ্য বহু শত বছর আগেকার গল্প। বিষ্ণুপুরের এক রাজা এলেন বীরভূম অঞ্চলে শিকার করার অভিলাষ নিয়ে। আপনার ঐ সাঁওতালরা ঠিক নামই দিয়েছিল। বীর-ভূমের জঙ্গল কঠিন জঙ্গল—শাল, অর্জুন,

বাবলা, কেন্দ আর মহুয়া গাছের জটলা। মাটিতে রোদ পড়ে না। দিনদুপুরে ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় কত হিংস্র শ্বাপদ। অরণ্যের সেই ভয়ংকর জন্তুদের সংগে মোলাকাত করার ইচ্ছা নিশ্চয়ই রাজার ছিল না। হিংস্রতর বন্য অধিবাসীদের বশ করবার মানসেও তিনি আসেননি। তাহলে সংগে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকত, কাড়া-নাকাড়া বাজত। তাহলে কাঁধে পোষা বাজপাখিটি নিয়ে নদীর ধারে ধারে তিনি ঘুরবেন কেন?

বউঠান ফস করে বললেন—মতলবটা তাহলে কী? গুপ্তচরবৃত্তি? সরেজমিন তদন্ত?

পাগল হয়েছেন? নিতান্ত নিরাপদ নিরীহ ইচ্ছা। পাখি শিকার করবেন। তাও নিজে হাতে তীরধনুক দিয়ে নয়—শিক্ষিত শিকারী বাজপাখি দিয়ে। নদী-তীরে স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বক। রাজা বকটিকে মারবার জন্যে বাজ-পাখি ছেড়ে দিলেন। মাথার উপর এক পাক ঘুরে বাজপাখি বকের সামনে যেতেই বক ঘুরে দাঁড়াল। পালালো না, ডাক ছাড়ল না, উল্টে লম্বা ঠোঁটের একটি নির্ভুল ঠোকরে বাজপাখিকে কাহিল করে দিল। বাজপাখি দ্বিতীয়বার ছোঁ মারতে গিয়ে দেখে বকের দুই ঠোঁটের সাঁড়াশিতে নিজের মাথাটা আটকে আছে। চিঁচিঁ করছে প্রাণ।

সত্যি? তাজ্জব ব্যাপার!

তাজ্জবই বটে। দৌড়ে গিয়ে বকের কবল থেকে সাধের বাজপাখিকে মুক্ত করলেন রাজা। পাখি শিকারে ক্ষান্ত দিয়ে বললেন—যে দেশে পাখির এত সাহস, সে দেশের মানুষ না জানি কত বড় বীর! তিনিই এ অঞ্চলের নাম রাখলেন বীরভূমি বা বীরভূম।

নিরেনব্বই মাইল দৌড়বার পর বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে বীরভূমের মাটিতে দাঁড়াল ট্রেন। তখন মধ্যরাত্রি পার—তৃতীয় প্রহরে তিন সংগীই গভীর নিদ্রামগ্ন। আমারই চোখে ঘুম নেই। ট্রেনের চাকার শব্দে মনের মধ্যে চিন্তার চাকা চলতে থাকে।

সত্যই বীরভূমি এই বীরভূম। সংঘাত না হলে সমন্বয় হয় না। সেই আদিকাল থেকে বীরভূম বহিরাগত সংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে বারেবারে যুদ্ধ করেছে। পরাজিত হয়েও আত্মবিসর্জন দেয়নি। সমন্বয়ের মধ্যে আত্মাদরকে জাগ্রত রেখেছে। সেই সংঘাত ও সমন্বয়ই রাঢ় দেশের বিচিত্র সংস্কৃতিরূপ। এখানকার প্রাক-আর্য লোকধর্ম আর গণসংস্কৃতি আর্যসভ্যতার সংগে লড়াই করেছে। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংগ্রামে সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবিকে নিশান করে উড়িয়েছে। মুসলিম শাসনের দিনে ইসলামী সংস্কৃতিকেও মাথা নিচু করে মেনে নেয়নি। আর বৃটিশ যুগে বিদ্রোহের প্রথম বিষাণ বাজিয়েছে এখানকার কৃষি-জীবী—যার নাম সাঁওতাল বিদ্রোহ।

তাই ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানের লোকক্ষেত্রে আর্যব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানের চেয়ে আর্যপূর্ব লোকবিশ্বাসগুলি এখনও এখানে প্রবলতর। তাই এখানকার অধিবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা ধর্মঠাকুর। তার পরেই শিব মনসা চণ্ডী ও কালী। বীরা-চারী তান্ত্রিক এখানকার অরণ্যের নিভৃতে নদীতীরের নির্জনে শ্মশানের অন্ধকারে যে কঠোর সাধনা করেছে তার সংগে শেষ পর্যন্ত নিরুপায় রফা করেছে আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। বর্ণহিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাকে অস্বীকার করেছে এখানকার সহজ সাধক। এখানকার পীরের দরগায় মানত করে হিন্দু, ধর্মঠাকুরের পুজো দেয় মুসলমান—আর আউল আর বাউল এক সুরে একতারা বেঁধে নিয়ে বিবাগীজীবনের পথে পাশাপাশি হাঁটে।

নিবে এল রাত্রের জ্যোৎস্না। আমেদপুর পার হতে না হতেই দিগন্তে উষার আভাস। মল্লারপুরে পূর্ব আকাশ টুকটুকে লাল।

ভরা শরৎকাল। প্রত্যুষের স্নিগ্ধ পুবালি বাতাস। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে যত-দূর চাও চক্রবাল-জোড়া সবুজ খেত। প্রভাত-সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে ধানের পুরন্ত শীষে—ধরিত্রীর হরিৎ অঞ্চলে জ্বলজ্বল করে উঠছে সোনালী চুমকির কাজ। হ্যাঁ—হবে না হবে না করেও এবার ধান হবে বটে বীরভূমে।

ভোরবেলাতেই মনটা খুশী হয়ে উঠল। আবার তো পৌষের শেষেই আসব। কাঁধে কম্বল ফেলে হাঁটব লাল মাটির রাস্তায় আর শুকনো মাঠের শুকনো আলে আলে। দিনান্তে কৃষাণের ঘরে ঠাঁই নেব। দেখব গোলাভরা ধান, বুকভরা আনন্দ, মুখভরা হাসি। আশ্রয় পাব প্রসন্ন পরিতৃপ্ত সংসারের আতিথেয়তায়।

আপাতত আমাদের গন্তব্যস্থল বিখ্যাত পীঠস্থান তারাপীঠ—বীরভূম জেলার প্রসিদ্ধ তীর্থ। শুক্লাচতুর্দশীর দিন তারা-পীঠে মহামেলা।

তারাপীঠে পৌঁছবার রাস্তা রামপুরহাট

বা মল্লারপুর স্টেশন থেকে। তবে রামপুরহাট থেকে যাওয়াই সুবিধে। রাস্তাটা চওড়া—গ্রামের পর গ্রাম আর মাঠের পর মাঠ পাড়ি দিতে দিতে শর্টকাটের সন্ধানে পথ হারিয়ে যাবার ভয় অবশ্য আছে। তখন দীর্ঘ পথ দীর্ঘতর হয়। তা নইলে মোটামুটি সহজ পথ। শীতকালে এই রাস্তায় গরুর গাড়ি চলে। তখন বিশীর্ণা দ্বারকা নদীর উপর গোযান নির্ঝঞ্ঝাটে এপার ওপার হয়ে যায়। এখন বর্ষাশেষে জোয়ারের সময় নদীতে প্রায় এক কোমর জল। রাস্তাও কোথাও কোথাও কাদায় ডোবা। আড়াই তিন ঘণ্টার পথ—মাইল আট নয় হবে সবসুদ্ধ।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য মল্লারপুর ও রামপুরহাটের মাঝখানে সম্প্রতি একটি 'হল্ট' স্টেশন হয়েছে। স্টেশনটির নাম তারাপীঠ রোড হল্ট হলেও সেখান থেকে তারাপীঠ যাবার কোনো 'রোড'-এর চিহ্ন নেই। তবে আড়াআড়ি তিন সাড়ে তিন মাইল মাঠ ভেঙে গেলে কবিচন্দ্রপুর গ্রাম

ছাড়িয়ে দ্বারকা নদীতে পৌঁছনো যায়—যার ঠিক অপর পারেই তারাপীঠ। শীত গ্রীষ্মে এই মেঠো পথ সুবিধাজনক। তখন শুকনো মাঠ, মাথা-উঁচু শুকনো আল। অন্য সময়ে আলভাঙা জলভরা ধান জমিতে অনভ্যস্ত যাত্রীর মহাবিপদ। আলের মাথা যেমন পিছল, আলের কিনার তেমনি কর্দমাক্ত গভীর। অনেক জায়গাতেই আল ভেঙে গেছে—এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে জল দৌড়াচ্ছে তীব্র বেগে। সেই সব তীব্র বেগবতী নালার জল হাঁটু ডোবানো। কোথাও গভীর খন্দের মাঝখানে গাছের একটা আঁকাবাঁকা গুঁড়ি ফেলা আছে। দু হাত উঁচুতে সমান্তরাল একটা নড়বড়ে বাখারি। সেই বাখারি ধরে কাদামাখা এবড়োখেবড়ো পিছল গুঁড়ি পার হতে পদে পদে মৃত্যুভয়।

রেল-যাত্রার সমাপ্তির মুখোমুখি এসে সঙ্গীবিচ্ছেদ হলো। ও'রা পথ-সংক্ষেপ চান। তাই হস্ট স্টেশনে নামলেন। আমি এগোলাম রামপুরহাট পর্যন্ত। শচীর কথা মনে ছিল। বলেছিল, রামপুরহাট স্টেশনে ওর এক আত্মীয় কাজ করেন। ভাবলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে হোটেলের খবর নিয়ে যাই। নিরাশ হলাম, ভদ্রলোক এখন ভোরে ডিউটিতে নেই। হেঁটেই শুরু করলাম তারাপীঠের পথে।

সাবধান করে দিয়ে অনিমেষ-বউঠান বলেছিলেন—আমাদের সঙ্গে তো নামলেন না—একলা একলা ডবল রাস্তা হাঁটবেন, দেখবেন কী দুর্ভোগ হয়! মাঝপথে ঠিক হারিয়ে গিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরবেন!

উত্তরে কিছু বলার ছিল না। মুচকি হেসে তাঁর ঐ উদ্বেগটুকুর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু পথ আমি হারাতে যাব কেন? আজ এ পথ তো যাত্রীতে যাত্রীতে ভর্তি। আজ বীরভূমের সব পথ গিয়ে মিশেছে তারাপীঠের মহামেলায়। আজ তারামায়ের চরণে সহস্র সহস্র ভক্তের সম্মিলিত হৃদয়ের পূজা।

তা ছাড়া এই পথ তো আমার অচেনা নয়। প্রথম যৌবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে একলা হাঁটতে শুরু করেছিলাম অচেনা পথে। শীতের শুরু, কৃষাণদের ফসল কাটার দিন। মাঠ আর মরাই জুড়ে কর্মব্যস্ততা। আমারই কোনো কাজ নেই। একলা চলেছি গ্রাম-ছাড়ানো মন-ভোলানো রাঙামাটির পথে। সংসার-পালানো বাঁধন-খসানো বৈরাগ্যের পথে। সেদিন আসন্ন অপরাহ্নে পৌঁছেছিলাম চণ্ডীদাসের নান্নুর গ্রামে।

তারপর কতবার একলা একলা আমি হেঁটেছি এই পথে। পথে পাওয়া কত সঙ্গী পথেই হারানো। এই পথে পিছনের হাতছানি নেই—আনন্দ প্রান্তে পৌঁছবার নয়, আনন্দ শুধু চলার। এই পথ আমার বড় চেনা। বৈশাখের খর রৌদ্রে প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরে এ পথে আমি হেঁটেছি, পথপাশে হেমন্তের শীর্ণা নদীর ধারে সায়াহ্নে আমি বসেছি, পথের প্রান্তে আকাশের নিচে তৃণ-শয্যায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আমি কাটিয়েছি শীতের অন্ধকার রাত।

এই পথ যেন বাউলের একতারা। সেই একতারার সুর আমি বুঝি শুনেছি, তাই বীরভূমের সব পথই ক্রমে ক্রমে আমার নিত্যচেনা একটি পথ হয়ে গিয়েছে। সে পথ মহাতীর্থের পথ। সে পথ গিয়েছে কংকালী-অট্টহাসের মেলায়, গিয়েছে বক্রেশ্বরের কুণ্ডে আর তারাপীঠের শ্মশানে, গিয়েছে নান্নুর-কেন্দুলির বাউল-বিপিনে, একচক্রার নিত্যানন্দ-নিকেতনে।

॥ ৩ ॥

তারাপীঠং মহাপীঠং গন্তবাং যত্নতঃ সদা।
বশিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী॥

তারারহস্যম্ গ্রন্থে তারাপীঠের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই পীঠ মহাপীঠ। অতি দুর্গম পথ, তাই বহু যত্নে এখানে আসতে হয়, বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এই তীর্থযাত্রায়। এইখানে শিলাময়ী মূর্তিতে বশিষ্ঠ আরাধিতা তারা-দেবী বিরাজমানা।

গ্রাম চণ্ডীপুর, পোস্ট অফিস তারাপুর। বড় রাস্তার ডান দিয়ে বয়ে চলেছে উত্তর-দিকবাহিনী নদী দ্বারকা। শীতকালে এই নদীর জলধারা খুঁজেই পাওয়া যায় না,—এখন বড় জোর কোমর-জল। নদীতীরে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ মহাশ্মশান। শ্মশান ছাড়িয়ে বর্তমান তারামন্দির।

পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে সুউচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যস্থিত পাথর-বাঁধানো বিশাল চত্বরের মাঝখানে উত্তর-মুখী মন্দির। বাংলার চারচালার রীতিতে মন্দিরটি গঠিত। বড় চারচালার উপর ছোট চালা—তার উপর চূড়া। ইঁটের তৈরী, সাদা রঙ—সামনের দেয়ালে লাল নকশা কাটা পোড়া ইঁটের বাহার। মন্দিরচূড়াটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। মন্দিরের ভিতরে প্রায় সমস্ত ছাদ জুড়ে লাল শালুর চাঁদোয়া। শ্বেতপাথরের বেদী। বেদীর উপরে মায়ের আসন।

তারামন্দিরের ঠিক সামনে প্রশস্ত নাট-মন্দির। নাটমন্দিরের মাঝখানে মাতৃদৃষ্টির ঠিক মুখোমুখি যূপকাষ্ঠ।

নাটমন্দিরের ঠিক উত্তরদিকে রয়েছেন চন্দ্রচূড় শিব। শিবমন্দিরটির দেয়াল আট-কোণবিশিষ্ট। নাটমন্দির ও চারদিকের প্রাচীর ঘেরা উঁচু প্রাঙ্গণ বহু যাত্রীর আশ্রয়স্থল। পশ্চিম দিকে রাস্তার ঠিক উপরেই বিরাট তোরণ। তোরণের মাথায় যাত্রীনিবাস ও নহবৎখানা। তোরণমুখে থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে মাতৃপ্রাঙ্গণ পর্যন্ত। সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উঠেই ডান দিকে মার বিশ্রামমণ্ডপ। এই উচ্চ মণ্ডপে মা যখন বসেন তখন পথের ও নদীতীরের অগণিত ভক্তদের উপর তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়ে।

মন্দিরের উত্তর দিকে কোন প্রাচীর নেই। একটি ছোট গেট। গেট থেকে সিঁড়ি নেমে গিয়ে পড়েছে চতুষ্কোণ এক দীর্ঘিকায়। স্বচ্ছ জল, এক গাদা নাল ও পদ্মফুল ফুটে আছে। দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে আরও তিনটি বাঁধানো ঘাট। এক প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে এই দীর্ঘিকার নাম জীবৎসকুণ্ড বা জীবিতকুণ্ড।

মন্দিরের পিছনে চণ্ডীপুর গ্রাম। তারা-মায়ের পাণ্ডারা এই গ্রামে থাকেন। ছাব্বিশ সাতাশ ঘর। আদি পাণ্ডারা চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের দৌহিত্র বংশীয় মুখোপাধ্যায় পাণ্ডা পরিবারও এখন অনেক। মাটির কাঁচা বাড়ি, কয়েকটি দোতলা। নিকোনো দাওয়া, পাশে ধানের মরাই। পাণ্ডারা অতি সরল, সজ্জন ও অতিথিবৎসল। স্বাভাবিক

সৌজন্য ও কর্তব্যবোধে তাঁরা যাত্রীদের সেবা ও সাহায্য করেন। দাবির চাপ দেন না, ভিক্ষার হাতও পাতেন না।

আগামীকাল শারদীয়া লক্ষ্মীপুজো। আজ শুক্লা চতুর্দশী। এইদিন মহামুনি বশিষ্ঠ এখানকার মহাশ্মশানে সিদ্ধ হন। ত্রিনয়নী তারার নয়নতারা তিনি লাভ করেন। ব্রহ্মার নির্দেশে এই তারাপীঠে মহামাতৃকা সাধনা করেন তিনি। যে মহামাতৃকা এই মহাযোগীর সামনে আবির্ভূতা হন তিনি শুধু সৃষ্টিস্থিতির নন, প্রলয়েরও মহাজননী। তিনি শিবানী, কিন্তু প্রলয়দেব মহাদেবেরও তিনি মাতৃরূপা। বশিষ্ঠারাধিতা ধ্যানমূর্তিতে তারা স্তনদাত্রী শিবপালিনী। বশিষ্ঠের ধ্যান তারার প্রস্তরময়ী মূর্তিতে প্রকাশিত। সেই প্রস্তরময়ী ধ্যানমূর্তি মন্দিরবেদীতে উপবিষ্ট। প্রতি দিন সকালে কারণস্নানের পর ভক্তগণ স্নানোদক পান করেন। এই মহোৎসবের দিন অন্ধকার প্রত্যূষে কারণস্নানের পর সেই ধ্যান মূর্তিকে বিশ্রামমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তার উপর লোকপূজিতা মাতৃমূর্তিতে সজ্জিত হয়ে তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের চোখে দেখা দিয়েছেন।

তারা বিগ্রহমূর্তি রৌপ্যময়ী। রৌপ্যমুখে, রৌপ্যদ্রংষ্ট্রা, মাথার কারুকার্যখচিত, রৌপ্যমুকুট। রৌপ্যচতুর্ভুজা, রৌপ্যমুণ্ডমালিনী। জিহ্বাটি স্বর্ণনির্মিত, মুকুটের ললাটকেন্দ্রে স্বর্ণতারা। দক্ষিণ ও বাম উভয় উন্নত হস্তেই অস্ত্র—খড়্গ ও কৃপাণ। সন্নত হস্ত দুটিতে পদ্ম ও বরাভয়। অঙ্গে রক্তাম্বর, গলায় রক্তপদ্মের সুদীর্ঘ মালা। মার শুভ্রমুখে হাসির আলো, পিছনে সারা পিঠে ছড়ানো কৃষ্ণকুঞ্চিত আলুলায়িত ঘন কেশপুঞ্জের অন্ধকার।

শ্মশান থেকে তারাদেবীকে তুলে জীবিতকুণ্ডের দক্ষিণে মন্দির স্থাপন করে প্রথম যিনি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি এ'ড়োল গ্রামের পত্তনিদার ভক্ত রামজীবন। তারপর মাতৃপুজোর ভার গ্রহণ করেন বাঘডাঙ্গার জমিদার বংশ। এ অঞ্চল মুসলমান অধিকারে আসার পর স্থানীয় সাপুরের জমিদাররা মায়ের সেবার ভার নেন। নাটোরের রানী ভবানী মুসলমান জমিদার আসাদুল্লা খাঁর সঙ্গে অন্য মৌজা বিনিময় করে তারাপীঠের ভার নেন ও মার নিত্যপুজোর স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। নাটোরাধিপতি সাধক রাজা রামকৃষ্ণ তারাপীঠে এসে কিছুদিন সাধনা করেন। তারাদেবীর বর্তমান বিরাট মন্দিরের নির্মাতা মল্লারপুরের জগন্নাথ রায়। বংশধরগণ সহ তাঁর নাম মন্দিরগাত্রে শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ আছে।

সিঁড়ি থেকেই ঠাসাঠাসি ভিড় শুরু। মার বিশ্রামমণ্ডপ ঘিরে তো কথাই নেই। পাঁচিল ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাণ্ডাবাড়ির ছেলেরা ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। বিশ্রামমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে মায়ের দর্শন লাভ করে ভক্তরা যেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান, সেই অনুরোধ জানিয়ে কাতর চিৎকার করছে। সেই চিৎকার ডুবে যাচ্ছে ভক্তদের উৎফুল্ল জয়ধ্বনিতে—জয় তারা, জয় মা জগজ্জননী! সামনে ভিড়, পিছনে ভিড়—মার সামনে এক মিনিটও দাঁড়াবার জো নেই। তারই মধ্যে পুরোহিতের হাতে দিচ্ছেন সিন্দুর ও প্রণামী, পদ্ম ও রক্তজবার মালা। মায়ের শুভ্র ললাট সিঁদুরে সিঁদুরে লাল, গলায় মালার পর মালা। ভক্তের মালায় মালায় মুণ্ডমালা ঢেকে গেছে, ফুলের আস্তরণের নিচে লুকিয়ে রক্তবেনারসী।

মায়ের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হঠাৎ সামনেই দেখি ভূপতি ঘোষাল মশাই। পায়ে কাদা, গায়ে কাদা, মুখে মাথায় কাদার ছাপ। কাদা ভর্তি কাপড়, গরম পাঞ্জাবির পিঠটা ফাটা। ব্যাকুলভাবে হাত বাড়িয়েছেন মায়ের দিকে। হাতে সেই রাংতার মালাটি। সাদরে মালাটি নিলেন পাণ্ডা-পুরোহিত—পরিয়ে দিলেন মায়ের গলায়।

এই পাণ্ডা ঠাকুর আমার পরিচিত। সেই আশ্চর্য চেহারাটি—একবার দেখলে আর যা ভোলা যায় না। সকলের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা সেই ছ ফুট লম্বা কুচকুচে কালো দেহযষ্টিটি। যষ্টিই বটে—খটখটে হাড় আর টানটান চামড়ার মাঝখানে মাংসের শীর্ণতর প্যাকিংটুকুও নেই। কঠোর একটি কঙ্কালের গায়ে অঙ্গারকৃষ্ণ চর্মের টাইট করে সাপটানো আবরণ। কাঁচাপাকা চুল, খঞ্জনাক, চাপা ঠোঁট। আমার দিকে চোখ পড়তেই এক পা এগিয়ে এলেন। চিমটের মতো লম্বা হাতখানা টিপে ধরল আমার ঘাড়—হাসির সঙ্গে কাশির ধমকে নগ্ন বক্ষের পাঁজরগুলো কেঁপে উঠল ক'বার, রক্তচক্ষু ছলছলিয়ে উঠল। কাশি থামতে কাশীনাথ এক গাল হেসে বললেন—কী বাবা, এসে গেছ দেখছি!

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তারামায়ের প্রবীণতম সেবাইত ও পাণ্ডাদের অন্যতম। প্রথম যেবার তারাপীঠে আসি তাঁর নাম শুনে এসেছিলাম বক্রেশ্বরের ভোলানাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে। সেই থেকে আমি তাঁর স্নেহের পাত্র। সেদিন তারামার চরণে আমার প্রথম পুজোর পুরোহিত হয়েছিলেন এই কাশীপাণ্ডা। মহার্ঘ দক্ষিণা দিয়েছিলাম তাঁকে। তুষ্ট পুরোহিত নির্মাল্যস্বরূপ মার গলা থেকে বড় একটি মালা খুলে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমারই পরে পুজো দিল একটি গ্রাম্য বধূ। তারও পুজো অনুরূপ যত্নে কাশীপাণ্ডা সম্পন্ন করলেন। বাতাসার প্রসাদটুকু আঁচলে বেঁধে মেয়েটি চলে যাচ্ছে, কাশীনাথ হেঁকে বললেন—নির্মাল্য নিলি না মা?

তেমনি মোটা একটি প্রসাদী মালা তিনি বধূটির হাতে দিলেন। সে দক্ষিণা দিয়েছিল দুটি মাত্র পয়সা।

ঘোষাল মশাইয়ের মুখভঙ্গি দেখবার মতো। কাশীনাথের হাত ধরে তিনি বলছেন—মায়ের পায়ে ছোঁয়ালে ধন্য হতাম, একেবারে গলায় পরিয়ে দিলেন বাবা! ও যে ঝুটো রাংতার মালা, আমার ছোট মেয়েটির খেলাঘরে তৈরী!

ঘোষালের কর্দমাক্ত বিধ্বস্ত মূর্তির দিকে একবার তাকালেন কাশীনাথ। বললেন—মায়ের কাছে ভক্তের সব মালারই সমান দাম বাবা। অত বড় যে রুপোর মুণ্ডমালা দেখলেন না—ঐ মালা দিয়েছিলেন রাঙামাতা ঠাকুরানী। কেতাবে তাঁর নাম ছাপা আছে। মার চোখে ঐ মালা আর আপনার রাঙা মেয়ের হাতে তৈরী মালা দুইই সমান।

ভাবাবেগে ঘোষালের মুখে আর কথা সরে না।

কাশীনাথ বললেন—বলুন, জয় তারা!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মনুষ্যদেহের 'স্পেয়ার পার্টস' ডিপো

কাঁকড়ার এক বা একাধিক পা খসে গেলে অত্যন্ত দ্রুত তাদের নতুন পা গজিয়ে ওঠে। ব্যাঙাচির ক্ষেত্রেও তাই, যদিও বড় হয়ে ব্যাঙ হলে সেটা আর ঘটে না।

অনেক পোকামাকড়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতির অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখা যায়। অনেক পোকাকে দু আধখানা করে কেটে ফেলার পরও নতুন দেহ পুনর্গঠিত হতে দেখা যায়।

প্রকৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত অদ্ভুত কৌশলও অবলম্বন করে। যেমন, কোন খণ্ডিত অঙ্গ পুনর্জাত হওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকা কালেই জীবটি দেহের দু প্রান্তেই মস্তকযুক্ত হয়ে গুড়ি মেরে চলতে পারে, কিম্বা চোখের বদলে শুঁড় গজিয়ে ওঠে।

কিন্তু মানুষের ক্ষতস্থানে নতুন চামড়া গজিয়ে ওঠলেও বা হাড় ভেঙে গেলে তা জোড়া লাগা সম্ভব হলেও কোন অঙ্গ বিচ্যুত হলে নতুন করে তা আর গজায় না।

তবে মানুষের ক্ষেত্রে 'স্পেয়ার পার্টস' বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বেলফাস্টের কুইন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জি এম বুল সম্প্রতি প্রকাশ করেন যে, "অদূর ভবিষ্যতে মনুষ্য অঙ্গের 'স্পেয়ার পার্টস' ব্যবসা সুরু হয়ে যেতে পারে।"

এর উদ্দেশ্য হবে জীবন্ত মানুষের অঙ্গের স্টক রাখা যাতে প্রয়োজন মতো একজনের কোন অঙ্গ অপর কারুর দেহে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

অবশ্য অধ্যাপক বুল এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই জাতের চিকিৎসা কতক পরিমাণ ব্যক্তিগত অবস্থা কি দাঁড়াবে সেটা বিবেচনা করে তবেই তা কার্যকর করে তোলা যাবে। তবে কোন অশক্ত রোগীর দেহে সুস্থ অঙ্গ জোড়া লাগালে সেটা বিশেষ সুফলপ্রদ হবে না।

হাসপাতালসমূহে অঙ্গের 'স্পেয়ার পার্টস' ডিপো প্রতিষ্ঠিত হলে আহত রোগীরা নতুন অঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে—নতুন দেহ বলতে হয়তো জন কয়েক বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে 'ধার' নেওয়া অঙ্গ।

এই ধরনের শল্য কারসাজিতে বৈজ্ঞানিকরা একদিন হয়তো আস্ত মানুষই, অথবা তার চেয়েও কঠিন, আস্ত স্ত্রীলোকই গড়ে তুলতে পারবে।
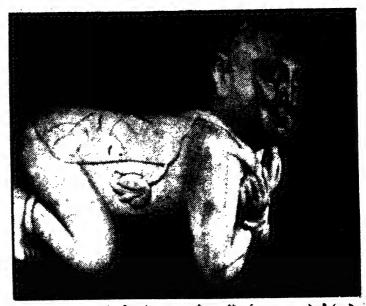
সবুজ মসৃণ পাথরে তৈরী অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বালিস। এক ফুট দীর্ঘ এই বালিসের পিঠে খোদাই করে রয়েছে একটি পদ্ম পাতা আর তার গা বেয়ে রয়েছে একটি পদ্মফুল

স্বরযন্ত্র হাতে নিয়ে শোনা

যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা ইলেকট্রনিক কণ্ঠনালীর উদ্ভাবন করেছেন যার সহায়তায় পক্ষাঘাত বা কণ্ঠের কোন ব্যাধিতে যাদের বাকশক্তি নষ্ট হয়েছে তারা কথা বলতে সক্ষম হবে। এটি দেখতে টর্চের মতো এবং কথা বলার সময় গলার বাইরে ঠেকিয়ে ধরতে হয়।

যন্ত্রটির দ্বারা কিভাবে স্বরোৎপাদন সম্ভব? যাদের স্বর বের হয় না তারাও ঠিক স্বাভাবিক ব্যক্তির মতোই ঠোঁট ও জিভের সাহায্যে কথা কয়, আর ইলেকট্রনিক স্বর স্বরতন্ত্রীর মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে স্বরোৎপাদনের বদলে কণ্ঠে শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়ে দেয়।

দুটি মডেল তৈরী হয়েছে এই যন্ত্রটির। একটি হচ্ছে মেয়েদের উপযোগী উঁচু পর্দায় বাঁধা, আর অপরটি পুরুষদের জন্য নিচু খাদের স্বরোৎপাদনের উপযোগী। আঙুলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের একটা ব্যবস্থায় পুরুষ বা নারী তার স্বর আট মাত্রার ধ্বনির পর্দায় ঠিক করে নিতে পারে।

কৃত্রিম স্বরোৎপাদন কিন্তু পৃথিবীতে এই প্রথম নয়। ১৮৯৯ সালে নিউ ক্যাসল-অন-টাইনের এক বাকশক্তিহীন ব্যক্তির কণ্ঠে একটি কৃত্রিম কণ্ঠনালী যুক্ত করে দেওয়া হয়—এবং তাতে কাজও হয়।

সংবাদপত্রের এক রিপোর্টার লেখেন: "স্বরযন্ত্রের স্থলে সূক্ষ্ম রীড বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার সাহায্যে লোকটি স্পষ্ট একঘেয়ে স্বরে কথা বলতে সক্ষম হচ্ছে।

"লোকটির উঁচু পর্দার ফিসফিসানি পনের গজ দূর থেকে স্পষ্ট শোনা যায় এবং পরিষ্কার একটানা স্বরে বিশ গজ দূর থেকে সে কথা বলতে পারে।"

মানুষের স্বরের উৎপত্তি হয় ফুসফুস থেকে স্বরতন্ত্রী দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হতে পারলে। এই স্বরতন্ত্রী হচ্ছে বাকযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত স্থিতিস্থাপক অংশুল শিরা-গুচ্ছে তৈরী দুটি বন্ধনী। স্বরযন্ত্র বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে স্বরযন্ত্র দীর্ঘতর হতে থাকে। পুরুষের স্বরতন্ত্রী নারীর স্বরতন্ত্রীর চেয়ে দীর্ঘতর। এই কারণেই পুরুষের স্বর নারীর চেয়েও গভীরতর শোনায়।

আমেরিকার কোটিপতি ধনী স্বর্গত টমাস কোলমান ডুপোর গলক্ষত রোগের জন্য স্বরতন্ত্রী ও স্বরযন্ত্র অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়ার ফলে তিনি কৃত্রিম স্বর ব্যবহার করতেন।

তাঁর সেই যান্ত্রিক স্বরযন্ত্রটি দেখতে ছিল অর্ধচন্দ্রাকার একটা পাত্রযুক্ত ধূমপান করার পাইপের মতো। ঐ পাত্রটির মধ্যে থাকতো স্পন্দিত হবার উপযোগী রবারের ঝিল্লি যা মানুষের স্বরতন্ত্রীর কাজ করতো। ডুপো ওটি সব সময়েই তাঁর পকেটে রাখতেন এবং ব্যবহার করতেন কেবল কথা বলার সময়—জিভ, ঠোঁট এবং তালুর * সাহায্যে কথা তৈরি করতেন আর বাকি কাজ সম্পন্ন করতো তাঁর ঐ যন্ত্রটি।
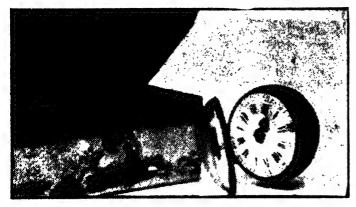
দক্ষিণ-পশ্চিম ফিনল্যান্ডে ডুবুরিরা জলের ১৩১ ফিট নীচে সপ্তদশ শতাব্দীর এক ওলন্দাজ জাহাজ চমৎকারভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় পায়। অফিসারদের কেবিনগুলি থেকে উপরের চিত্রে প্রদর্শিত জিনিসের মতো বহু সামগ্রী উদ্ধার করা হয় এবং সেগুলি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রয়েছে। এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছে যে কেবিনে প্রাপ্ত সুরার গন্ধ চমৎকার রয়েছে এবং পানের উপযোগী।

পশ্চিম জার্মানীতে কণ্ঠনালীর ক্যানসারের চিকিৎসা আজকাল এত উন্নত হয়েছে যে ওখানে এখন শতকরা পঁয়ষট্টিজন রুগীই আরোগ্য লাভ করে। আরোগ্য লাভ অর্থে, চিকিৎসার পর অন্তত পাঁচ বছর তারা বেঁচে থাকবেই। এক্স-রে রেডিয়াম-বিকীরণের ব্যবহার ছাড়াও এই সব চিকিৎসায় অনেক সময় কণ্ঠতন্ত্রীর উপর অস্ত্রোপচার করতে হয়, এমন কি, সম্পূর্ণ বাক্‌যন্ত্রটিই কেটে বাদ দিতে হয়।

হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, যারা এই রোগে আক্রান্ত তারা বেশীর ভাগই বয়স্ক লোক। কি করে এই রোগটি তাড়াতাড়ি ধরা যায় তার জন্যে বহু প্রচেষ্টা চলেছে, কেন না যত শীঘ্র রোগ নির্ণয় হবে রুগীর নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশী। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি বিশেষজ্ঞ অধিবেশনে পশ্চিম জার্মানীর একজন কণ্ঠ-বিশেষজ্ঞ, মেঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লীচের, এই সম্পর্কে বলেছেন যে, এমন কি কয়েক সপ্তাহ পরে যদি কোন রোগ সামান্য গল-ক্ষত বলে মনে হয় তাহলেও সেটাকে বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ। অধ্যাপক লীচের একরকম নতুন ধরনের ল্যারিংগোস্কোপ অর্থাৎ কণ্ঠ পরীক্ষার দর্পণ-যন্ত্র বের করেছেন যেটা এমন কি সাধারণ চিকিৎসকেরা পর্যন্ত অতি সহজে ব্যবহার করতে পারবে এবং গলদেশের কোথাও ফোঁড়া হচ্ছে কিনা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে কণ্ঠনলীর ক্যানসার এবার থেকে খুব তাড়াতাড়ি ধরা যাবে।

কণ্ঠনালীর ক্যানসার-অস্ত্রোপচারের সব ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বাক্‌যন্ত্রটিকে কেটে বাদ দেওয়া না হলেও এ সম্বন্ধে সবারই দারুণ ভয়। বাক্‌শক্তি হারিয়ে জটিল কারিগরী সাহায্যের মাধ্যমে ভাঙা ভাঙা আওয়াজ নিয়ে বেঁচে থাকা বড়ই বিড়ম্বনা। সেদিক থেকেও অধ্যাপক লীচের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। তিনি একরকম বৈদ্যুতিক কণ্ঠের পরিকল্পনা করেছেন যেটা দিয়ে কথা বললে খুব স্পষ্ট শোনাবে এবং ওটির ব্যবহারকারীরও কোন কষ্ট হবে না। গবেষক লীচের আশা করেন যে তাঁর এই বৈদ্যুতিক কণ্ঠ বর্তমান বছরেই মানব সেবায় ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হতে পারবে।

শহরবাসীদের জন্য গ্রাম্য-জীবন

বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ভারত সরকার শহরেও ছোট-খাটো সব্জীবাগান তৈরী করার জন্য শহরবাসীদের উৎসাহ দেন। কিন্তু ভারতের কজন শহরবাসী এই রকম বাগান তৈরী করতে উৎসাহ দেখান? তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্যই হবে। এ বিষয়ে জার্মানীর শহরবাসী অত্যন্ত সচেতন। ওদেশের ঘন-বসতিপূর্ণ শহরগুলিতেও অনেকে বাগান করাটাকে একটা সখে পরিণত করেছে।

জার্মানীর প্রায় সব শহরের মধ্যভাগে ও চতুর্দিকে শত সহস্র এই ধরনের বাগান দেখতে পাওয়া যায় এবং বাগানের মালিক তার গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ অপরাহ্ণ ও হেমন্তের স্বল্পস্থায়ী শনিবারের অপরাহ্ণ বাগানেই দিন কাটান। জার্মানীতে নামমাত্র ভাড়ায় অথবা নিজের কেনা এই ধরনের বাগানকে 'শ্রেবার বাগান' বলা হয়। কি করে ঐ নাম হলো সেটা হয়তো অনেকেই বলতে পারবে না। কিন্তু যারা তা জানে তারা সম্প্রতি শহরের বাগানের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ড্যানিয়েল গটলিয়েব মরিটস শ্রেবারের শতবার্ষিক তিরোধান অনুষ্ঠানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ড্যানিয়েল শ্রেবার ছিলেন চিকিৎসক। তিনি লাইপজিগের একটি চিকিৎসাগারের পরিচালক ছিলেন, কিন্তু সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির দিকেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিলো। এই সম্পর্কে তিনি যে সব প্রবন্ধাদি লিখতেন তাতে তিনি ক্রমবর্ধমান শিল্পমুখীন শহরগুলিতে শ্রমিকদের জন্য ছোট ছোট জায়গা আলাদা করে রাখার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলতেন যে এই রকম ছোট ছোট জায়গা শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিতে সাহায্য করবে।

'শ্রেবার বাগান' দেখে যেতে পারেননি। তবে তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর লাইপজীগে প্রথম 'ক্ষুদ্র উদ্যান সমিতি' গঠিত হয়; এবং শ্রেবারের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়।

জার্মানীতে শ্রেবার উদ্যান আন্দোলনের প্রথম দিকে বাগান করতে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে আলুবীজ বিতরণ করা হতো। যখন দেখা গেল যে, ৮০০০ বর্গফিট আকারের একটি জমিতে চারজনের পরিবারের উপযোগী যথেষ্ট সব্জী উৎপাদন করা যায় তখন থেকেই এই বাগান খুব জনপ্রিয় হয়। বর্তমানে সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর ৫০০০ ছোট বাগানের ৫ লক্ষেরও বেশী সদস্য সমিতিবদ্ধ হয়েছেন।

মঙ্গলগ্রহে পৌঁছানো সম্পর্কে

পশ্চিম জার্মানীর ব্রেমেন শহরে রকেট অনুসন্ধান সমিতির যে দশম অধিবেশনটি সম্প্রতি হয়ে গেল, সেখানে মহাকাশ-বিচরণের সর্বাধুনিক কারিগরী উন্নতি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ পড়া হয়। হামবুর্গের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, মিঃ হ্যান্স-কাইজার বলেন, এখন পর্যন্ত রকেট-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর যতদূর অগ্রগতি হয়েছে তাতে উপস্থিত মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ এবং চাঁদ ছাড়িয়ে মহাকাশের পথে আর বেশীদূর এগোন যাবে না।

মিঃ কাইজার বলেন,—মানুষ এখন চাঁদ কিংবা মঙ্গল গ্রহে যদিও যায় সে সমস্তই কেবল ঐ বড় বড় মহাকাশচারীদের মহান কীর্তি ও ক্ষণিক স্থিতির মধ্যেই সীমিত থাকবে; ওখানে কায়েমী বসবাস মানুষের পক্ষে এখন সম্ভব হবে না। মহাকাশচারী পারমাণবিক জাহাজের বর্তমান উন্নতির হার অনুযায়ী আশা করা যায় এক বছরের মধ্যেই মানুষ চাঁদে গিয়ে ফিরে আসতে পারবে। এই জাহাজের আফটাতকুল্লার বিহীন রীঅ্যাক্টরটি হবে ঘূর্ণি জাতীয় এবং গ্যাস জাতীয় শক্তিদ্বারা চালিত।

মহাকাশ পথে মানুষের পরিবর্তে একটি চিন্তাশীল যন্ত্র পাঠান যে কি পরিমাণ জটিল ব্যাপার হতে পারে উপরোক্ত অধিবেশনটিতে সেকথা ভাল করে বুঝিয়ে দেন পশ্চিম জার্মানীর জীববিদ্যাবিৎ ডঃ লোৎজ্। তিনি বলেন,—পৃথিবীর বৃহত্তম ইলেকট্রন-মজগটিকে শুধু হ্যালো বলবার জন্য তাকে দশ লক্ষ টুকরো টুকরো সংবাদের আধার করে তৈরী করা হয়েছে; সে জায়গায় মানুষের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের প্রায় ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক টুকরো টুকরো সংবাদ সঞ্চয় করে রাখার ক্ষমতা আছে। সুতরাং বর্তমান কারিগরী-বিদ্যার পর্যায়ে মানব-মস্তিষ্কের অনুরূপ শক্তিযুক্ত একটি চিন্তাশীল যন্ত্র তৈরী করলে তার আয়তন হবে আমাদের পৃথিবীর মত।

আর একজন বক্তা, মিউনিক কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পেৎজোল্ড, মানুষের জীবন, জল-বায়ু ও আবহাওয়া, উচ্চস্তরের তাপমাত্রা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির উপর মহা-জাগতিক বিকিরণ ও ক্রমপ্রক্ষিপ্ত পরিবর্তনশীল সৌরবিন্দুর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আমেরিকার একজন মহাকাশবিৎ ডঃ ডইনজেন্ বলেন,—আজকের দিনেও আদি প্লাস্টিক-বেলুনের কার্যকারিতা সমানই রয়েছে, আমেরিকাতে দু কোটি আঠারো লক্ষ কিউবিক ফিট মাপের এমন একটি বেলুন তৈরী হচ্ছে যেটি একটি দুটনের মহাকাশরথকে নিয়ে ত্রিশ ঘণ্টা মহাকাশে ঘুরে বেড়াবে।

হরমোন প্রয়োগে আপেলের আকার বৃদ্ধি

পশ্চিম-জার্মানীর শ্লেষউইগহলস্টীনে এলবে নদীর ধারে ৩৭০০ একর ফলের জমি রয়েছে। আবার ওদিকে হামবুর্গ থেকে উত্তর সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত ফলের বাগান ছুটির দিনে দর্শকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এলবে নদীর ধারের জলাভূমিগুলি ফলচাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত, তবে মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ওখানে রোদ্দুর অত্যন্ত কম।

এলবে নদীর ধারের ফলচাষীদের আরও একটি ভাবনা রয়েছে—সেটি হচ্ছে ফলের আকার। উপযুক্ত রোদ না পেলে ফল যথেষ্ট বড় হয় না—অথচ আপেল অথবা নাসপাতি বড় না হলে ক্রেতাদের মন ভরে না। সুতরাং এ-সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাহায্য চাই। বহু বছরের পরীক্ষার ফলে হরমোনযুক্ত একটি পদার্থ তৈরী করা হয়েছে যেটি গাছে ছিটিয়ে দিলে গাছটিতে অযথা বেশী ফলধরা বন্ধ হয়ে গিয়ে যে-সমস্ত ফলগুলি ধরে সে-গুলি আকারেও বড়, খেতেও মিষ্টি এবং দেখতেও বেশ সুন্দর হয়।

শ্লেষউইগহলস্টীনের ফলের বাগানগুলিতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে ফল বড় করান হয়, কেননা ওখানকার জলহাওয়া ফলচাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়। এদিক থেকে বিজ্ঞান আরও এগিয়ে গেছে। উক্ত হরমোনের দ্বারা ফল, ফুল, গাছগাছড়া ইত্যাদি ইচ্ছেমত তৈরী করা যায়। এখন নতুন পদ্ধতিতে বীজোৎপাদন হচ্ছে। অক্সিন পদার্থের দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী লতাগুল্মের আকার বাড়ান কমান হচ্ছে—গাছের উপর এই জিনিসটি ছড়িয়ে দিলে তার পাতা ও ফল এমনভাবে পড়বে মনে হবে ব্যাপারটি যেন কারুর আদেশ অনুযায়ী হচ্ছে। অক্সিন যদিও ৩০ বছরেরও আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল, গাছগাছড়া নিয়ন্ত্রণে এখন যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার হচ্ছে সেগুলি হলো ওরই মত সমগুণসম্পন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ। আবার এই সমস্ত পদার্থের অনেকগুলিতেই কয়েক রকম অক্সিজেনের ভাগ রয়েছে। ইচ্ছা অনুযায়ী ফল পেতে হলে সামান্য মাত্র হরমোনেই কাজ হয়ে যায়। গাছগাছড়ার জন্য যে সব রাসায়নিক জিনিস ব্যবহার করা হয় তাদের বেশীর ভাগই এসেটিক অ্যাসোউর মিশ্রনে তৈরী এবং ওগুলো খুব অল্প পরিমাণেই ব্যবহার করতে হয়। এমনও হয় যে, ৫০,০০০ গ্যালন জলে হয়তো মাত্র এক গ্রেন মেশাতে হয়েছে।

রমাপদ চৌধুরী

[১৬]

ষষ্ঠীর দিন ভোর হতে না হতেই ঢাকের আওয়াজে সারা গাঁ মেতে ওঠে। ঢাকে কাঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় সকালের।

সিরসিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে তখন। অন্য সকলের মত লক্ষ্মীমণিও বিছানা ছেড়ে উঠে গোবর জলের ছিটে দেয় উঠোনে। ক'দিন আগেই পাশের গাঁ থেকে রাঙা মাটি আনিয়ে রেখেছে সে। টিনের 'কেটো' থেকে রাঙা মাটির ডেলা বের করে জলে গুলে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে দেয়ালে আলপনা আঁকে।

পুজোর এ ক'টা দিন অন্তত উদাসের সঙ্গে ঝগড়া করবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে লক্ষ্মীমণি। আর প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা তার খুশী হয়ে ওঠে।

উঠোনে গোবর লেপে আলপনা এঁকে বেরিয়ে পড়ে সে ঘাটের পথে। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে দাঁড়ায় ভিজে কাপড়ে। তারপর ঘিয়ের বাটি থেকে সামান্য কয়েক ফোঁটা ঘি নিয়ে সিঁদুর গুলে ঘরের দরজায় পাঁচটা ফোঁটা দেয়।

ষষ্ঠীর দিনে কপাটে সিঁদুরের ফোঁটা দিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়, ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে লক্ষ্মীমণি। সব রকম চেষ্টাই তো করেছে উদাসের মঙ্গলের জন্যে। স্বামীর মন পাবার জন্যে কি করতে বাকী রেখেছে সে! তবু কেন যে উদাসের মন পায়নি লক্ষ্মীমণি, নিজেও সে খুঁজে পায় না। উদাসের বাপও তাকে ডাইনী বলে, পাড়ার লোকও তাকে দোষ দেয়। আর সেই দুঃখে ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরে লক্ষ্মীমণি। ভাবে, ভগবান তাকে রূপ দেয়নি বলেই উদাস তাকে সহ্য করতে পারে না।

প্রথম প্রথম সন্দেহ হয়নি তার। বরং তার বাপ দশরথ যেদিন কাটোয়ার বস্তির ঘরে উদাসকে নিয়ে এসেছিল সেদিন উদাসকে ঘিরে কত স্বপ্নই না সে দেখেছিল। তারপর বিয়ে হলো, নতুন সংসার পাতার উল্লাসে সব কিছু দেখেও দেখেনি সেদিন। নাকি উদাস তখন সত্যিই ভালবাসতো তাকে, পদ্ম আসার পর থেকেই তাদের মধ্যে এই ভাঙন দেখা দিয়েছে!

না। লক্ষ্মীমণি বেশ বুঝতে পারে, তাকে কোনদিনই ভালবাসেনি উদাস। কোনদিনই তাকে পছন্দ করেনি। শুধু নিজের কাজ হাসিল করার লোভেই তাকে বিয়ে করেছে উদাস, ড্রাইভার শিখে লাইসেন্স যোগাড় করার নেশাতেই বুঝি লক্ষ্মীমণিকে সহ্য করেছে।

কপাটের গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা দিতে দিতে মনে মনে তবু প্রার্থনা জানায় লক্ষ্মীমণি। বলে, ঘরের দিকে স্বামীর মন ফিরিয়ে দাও মা, সংসারের মঙ্গল হয় যেন।

ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসে ফেলে লক্ষ্মীমণি। মনে হয়, আসলে দোষ তারই। উদাসের প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ব্যবহারে সে যদি এমন তিরিক্ষি হয়ে না উঠতো! কিন্তু কেন যে এমন হয়, বুঝতে পারে না। মনে মনে তাই প্রতিজ্ঞা করে, পুজোর এ ক'টা দিন অন্তত ভালভাবে কাটাবে। না স্বামী, না শ্বশুর, কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না।

ভিজে কাপড়টা ছেড়ে লক্ষ্মীমণির হঠাৎ ইচ্ছে হলো, ঘুমন্ত উদাসকে তুলে দিয়ে আজ পুজোর দিনে একটা গড় করবে।

উদাস হাসবে হয়তো, ঠাট্টা করবে। তা করুক, তবু—

কাপড় ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে লক্ষ্মীমণি। কিন্তু চৌকাঠে পা দিয়েই বিস্মিত হয়। বিছানায় কেউ নেই।

এদিক ওদিক তাকায় লক্ষ্মীমণি। না, কোথাও নেই উদাস। ও যখন পুকুরে ডুব দিতে গেছে, সেই ফাঁকে কখন চুপি চুপি বেরিয়ে গেছে সে!

হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মনটা বদলে গেল তার উদাসের

বিরুদ্ধে, রাগে অভিমানে সমস্ত মন তার বিষিয়ে উঠলো।

মিউ মিউ করতে করতে একটা বেড়াল ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, বেড়ার গা থেকে একটা চেলা কাঠ তুলে নিয়ে সজোরে সেটা ছুঁড়ে মারলো সে বেড়ালটার দিকে।

যেন উদাসের দিকেই ছুঁড়ে মারলে খুশী হতো।

ঢাকের আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল উদাসের। বিছনা ছেড়ে উঠে দেখলে, কাছ-পিঠে কোথাও লক্ষ্মীমণি নেই। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলে তা দেখে।

সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা নিয়ে দামু পালের বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়লো। ভোরের নিস্তব্ধ বাতাসে তখন একটানা ঢাক বেজে চলেছে। বাগ্দীপাড়ার একটা ছেলেকে দেখলে নাচতে নাচতে চলেছে কালীতলার রাস্তায়। ছেলেটা নাচছে আর চিৎকার করে বলছে, ঢাক কুড়কুড় কুড়, ঢাক কুড়কুড় কুড়।

দেখে হাসলো উদাস। মনটা খুশী হয়ে উঠলো অকারণে।

তাই দামু পালের বাড়িতে ঢুকেই ফিরুকে কাঁধে তুলে নিলো, তারপর নাচতে নাচতে সুর টেনে টেনে বললে, ডাং ডাং ড্যাডাং ড্যাডাং...

হাত-পা নেড়ে এমন ভাব করলে যেন উদাস নিজেও ঢাক বাজাচ্ছে। আর তা দেখে পালবউ হেসে গড়িয়ে পড়লো।

উদাস নাচ থামিয়ে বললে, চা দাও গো বউঠান, ঘুম থেকে উঠেই পালিয়ে এয়েচি।

দামু বললে, বোস বোস, চা দিচ্ছি। তারপর চল্ আজ বাঁশ দড়ি নিয়ে আসর বেঁধে ফেলি।

আসর, অর্থাৎ যাত্রার আসর। যাত্রার কথায় উদাসের মনটা মুহূর্তের মধ্যে মুষড়ে পড়লো।

এবার পুজোয় সত্যিই যেন কোন আনন্দ নেই তার, যাত্রায় কোন উৎসাহ নেই।

অথচ এবার সময় থাকলে থিয়েটারও করা যেত, দামুদাদা বলেছে। তা থিয়েটার না হোক, চারদিন যাত্রাও আনা যেত অপেরা পার্টির। কিন্তু সব কটা ভাল অপেরা পার্টিরই বায়না হয়ে আছে অনেক আগে থেকে। তবে দামী ড্রেস আনা হয়েছে এবার, ভালো বেশকারী এসেছে। টাকা দিয়েছেন অবনীমোহন।

শুনে সবাই বিস্মিত হয়েছে। অমন কৃপণ মানুষটা হঠাৎ যেন রাতারাতি বদলে গেছে। ইস্কুলের জন্যে টাকা দিয়েছে, বলগাঁর বড় রাস্তার ধারে হাসপাতালের বাড়ি করে দেবে বলেছে, দরাজ হাতে টাকা দিয়েছে গ্রামের বারোয়ারী পুজোয়।

মনে মনে সবাই খুশী হয়। প্রশংসা করে অবনীমোহনের। শুধু গোপেন মোড়ল হেসে বলে, কি ব্যাপার গো দামু, যাত্রার জন্যেও টাকা দিচ্ছেন বেনে চাটুজ্যে?

আড়ালে আড়ালে এতদিন সকলেই অবনীমোহনকে বেনে চাটুজ্যে বলে বিদ্রূপ করতো। কিন্তু এখন আর সে বিদ্রূপ যেন দামু পালের ভালো লাগলো না। বললে, না গো, মানুষ ভালো উনি, ত না হলে...

গোপেন হেসে বলে, ওর বাবা জিলিপির প্যাঁচ পেটে পেটে, এমনি দিচ্ছে? ও আমি নারায়ণ সাক্ষী করে বললেও বিশ্বেস করবো না।

কথাটা উদাসের কানে গেল। নারকেল-দড়ি দিয়ে বাঁশ বাঁধতে বাঁধতে গোপেন মোড়লের দিকে ফিরে তাকালো উদাস। গোপেন মোড়লকে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। লোকটা যেন কারো ভাল দেখতে পায় না।

বিরক্ত হয়ে হাতের কাজ ফেলে প্রতিমার দিকে এগিয়ে গেল। ষষ্ঠীকল্প হচ্ছে, পুকুর থেকে ঘট এনে দাঁড়িয়েছে গাঁয়ের বউরা। ঘণ্টা বাজছে পুরুতের হাতে, আর ঘণ্টা থামলেই ঢাকের আওয়াজ উঠছে।

নতুন নতুন রঙবেরঙের জামাকাপড় নতুন জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলে-মেয়ের দল, বউঝিদের পরনেও নতুন কাপড়। আর তাদের পিছনে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাগ্দী-বাউড়ি-কোটালদের মেয়েরা। তাদের সবাই লাল পাড় নতুন কোড়া শাড়ি পরেছে। বাউড়ি-বাগ্দীদের ছেলেমেয়ে-গায়েও নতুন জামা।

তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লক্ষ্মীমণির দিকে চোখ পড়ে উদাসের। ভিড়ের মধ্যে সেও দাঁড়িয়ে আছে তন্ময় হয়ে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে। সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর টেনেছে। কিন্তু...

হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা আঘাত লাগে উদাসের, লক্ষ্মীমণির কাপড়খানার দিকে

তাকিয়ে। নোংরা পুরোনো একখানা কাপড় পরে আছে লক্ষ্মীমণি।

উদাসের হঠাৎ নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো। ছি ছি, লক্ষ্মীমণিকে একখানা শাড়িও দিতে পারেনি উদাস! না কি দিতে ইচ্ছে হয়নি। পুজোর দিনে সকলেই বাবুদের বাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় পার্বণী পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীমণি?

লক্ষ্মীমণি বলে, চাষী কোটালের বউ নই আমি যে, পাটকরুনীর কাজ করবো বাড়ি বাড়ি।

মিস্ত্রীর মেয়ে সে, তাই অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে সম্মানে বাধে তার। তাই পার্বণীও পায়নি।

কিন্তু উদাস নিজে কি একখানা কাপড় দিতে পারতো না পুজোর সময়?

উদাস বাঁশের খুঁটিতে ঠেসিয়ে রাখা সাইকেলটা নিয়ে দামু পালের কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, পাঁচ টাকা ধার দেবে দামুদাদা?

—পাঁচ টাকা? কেন রে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে দামু।

উদাস ধীরে ধীরে বলে, দেবে কিনা বলো।

উদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দামু, তারপর পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেয়। যাত্রাদলের খরচ-খরচার হিসেবের টাকা। ভাবে টাকা না পেলে হয়তো শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসবে উদাস।

টাকাটা পেয়েই কিন্তু হাসি ফোটে তার মুখে। সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বলগাঁর স্টেশনের দিকে। স্টেশনের ধারের পোশাক-আশাকের দোকানের উদ্দেশে। বলে যায়, রাসো, এই এলাম বলে।

দুপুরের আগেই ফিরে আসে একখানা ডুরে শাড়ি নিয়ে। ডুরে রঙিন শাড়িখানা অনেক খুঁজে পেতে পছন্দ করে এনেছে।

বাড়ি ফিরেই সাইকেলটা বেড়ার গায়ে ঠেসিয়ে রেখে চিৎকার করে ডাকে উদাস, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

এ ডাক যেন বহুদিন শোনেনি লক্ষ্মীমণি। সেই কবে বিয়ের আগে এ নামে ডাকতো উদাস, এ নাম ভুলেই গিয়েছিল। ডাকটা তাই অনভ্যস্ত লাগলো দুজনের কানেই।

তবু ফুর্তির গলায় উদাস চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকলো।—লক্ষ্মী, শোনে যা, দ্যাখ, কি এনেচি, দেখে যা।

বিস্ময়ে কৌতূহলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো লক্ষ্মীমণি। অবোধ্য দৃষ্টিতে উদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

উদাস বললে, এই দ্যাখ! বলে শাড়িখানা লক্ষ্মীমণির হাতে দিলে।

বোকা বোকা চোখ মেলে লক্ষ্মীমণি একবার উদাসের মুখের দিকে তাকালে, একবার শাড়িখানার দিকে। যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। যেন স্বপ্ন দেখছে সে জেগে জেগে।

তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, আমার নেগে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর নেগেই আনলাম।

—আমার নেগে? আবার প্রশ্ন করলে লক্ষ্মীমণি! আর সংগে সংগে তার দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো শাড়িটার ওপর।

* * *

বিমলা আর কমলা কখনো যাত্রা দেখেনি। তাই তাদের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশী। সন্ধ্যে থেকেই মাঝে মাঝে এসে যাত্রার

আসরটা ঘুরে ঘুরে দেখে যায় দু'জনে। খানকয়েক পুরোনো ভাঙা করোগেটের টিন আর ধানের বস্তার চট দিয়ে ঢেকে সাজঘর তৈরী হয়েছে আসরের সামনেই। দু'পাশে বাঁশ বেঁধে আসরে যাতায়াতের পথ তৈরী হয়েছে। ওপাশে মেয়েদের বসার জায়গা, এপাশে পুরুষদের।

যাত্রার কথা অনেক শুনেছে বিমলা, তবু চোখে দেখার সুযোগ হয়নি এর আগে। তাই যা দেখে তাতেই কৌতুক বোধ করে দু'জনেই, হেসে ওঠে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহলও কম নেই।

সাজঘরে পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলতেই একবার এসে উঁকি দিয়ে গেল বিমলা।

দেখলে, বেশকারী এক সারি বাটি সাজিয়ে রঙ গুলছে। লাল, কালো, গোলাপী...

দেয়ালে ঝকমকে পোশাক টাঙানো হয়েছে। কোনটা রাজার, কোনটা মন্ত্রীর, নিয়তি আর সৈনিক—আরো কত কি। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে চট তুলে উঁকি দিয়ে দেখলে বিমলা। দেখলে বেশকারীর সামনে চুপ করে বসে আছে উদাস, আর তার গালে লাল রঙ ঘষছে লোকটা, চোখে কাজল টেনে দিচ্ছে। অন্যান্য অনেকেও সাজপোশাক নিয়ে ব্যস্ত। ধীরেন সাঁই দাড়িগোঁফ কামিয়ে রানী সাজছে। তাকে দেখে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে এলো বিমলা।

ওখান থেকে সরে এসে প্রতিমার আরতি দেখতে লাগলো সে। আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজছে তখন একটানা, ধুপধুনোর চাপ চাপ ধোঁয়া আর স্নিগ্ধ একটা গন্ধ, সমস্ত পুজো-মণ্ডপের আবহাওয়াটা যেন বদলে গেছে। গ্রামের সবাই এসে হাজির হয়েছে কালী-তলায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছে সকলে।

বিমলা একবার ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গেল। কাকে যেন খুঁজলো ও। ক্রাচে ভর দিয়ে বুশ শার্ট পরা অবিনাশ ডাক্তার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে। সামনের লোক সরে গিয়ে ডাক্তারকে আরতি দেখার সুযোগ করে দিলো।

বিমলাও এগিয়ে গেল ডাক্তারকে দেখে। ডাক্তারকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমলার মুখে যেন হাসি ফুটে উঠলো, আশে পাশে তাকিয়ে দেখলে। না, প্রভাকর আসেনি।

গিরিজাপ্রসাদ বারবার করে বলে দিয়ে-ছিলেন প্রভাকরকে। গাঁয়ের সকলেই যাত্রা দেখতে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছে তাকে। আর যাত্রা দেখতে আসবে কথাও দিয়েছিল নাকি প্রভাকর। তাই সন্ধ্যে থেকেই বারবার লক্ষ করেছে বিমলা, প্রভাকর এসেছে কিনা। ভেবেছিল, ডাক্তার এলেই তার সঙ্গে প্রভাকরও আসবে। কিন্তু অবিনাশ ডাক্তারকে একা আসতে দেখে হতাশ দেখালো বিমলাকে।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো বিমলা। আসরের এক পাশে মেয়েদের বসার জায়গা হয়েছে সতরঞ্চি বিছিয়ে, আরেক দিকে পুরুষদের। বাউড়ি-বাগদী-কোটালবাড়ির মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তখন থেকেই ভিড় করতে শুরু করেছে। আগে না এলে জায়গা পাবে না, পিছিয়ে বসতে হবে এই ভয়। পুরুষদের দিকেও অনেকে এসে গেছে। কিন্তু দুদিকেই খানিকটা করে জায়গা খালি রেখেছে সবাই, খালি রেখেই বসছে। অর্থাৎ গাঁয়ের ভদ্রলোকদের জন্যে, তাদের বাড়ির মেয়েদের জন্যে।

ওদিকে এর ওর বাড়ি থেকে চেয়ে আনা কয়েকখানা ভাঙা পুরোনো চেয়ার এনে সবচেয়ে ভালো জায়গাটুকুতে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো তখনও খালি পড়ে আছে। কেউই হয়তো বসতে সাহস পাচ্ছে না।

অবিনাশ ডাক্তার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তারই একটাতে বসে পড়লো, গিরিজা-প্রসাদকেও ডাকলে।

আসরটা হয়েছে ঠিক প্রতিমার সামনেই, ওখান থেকে বসে বসে আরতি দেখা যায়। কিন্তু আরতি দেখার চেয়ে যাত্রা দেখার জন্যেই যেন উৎসাহ সকলের।

বিমলা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কমলাকে বললে, চল, ওদিকে যাই।

বলে গিরিজাপ্রসাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। আর ঠিক সেই সময়েই দেখতে পেল প্রভাকর আসছে, অবনীমোহনকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রথমটা সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে বিমলা ভেবেছিল প্রভাকরকে দেখেই বুঝি সকলে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর ভুল ভেঙে গেল। দেখলে সকলেই যেন অবনীমোহনকেই খুশী করতে ব্যস্ত। এমন কি গিরিজাপ্রসাদও এগিয়ে গেলেন হাসি মুখে। গোপেন মোড়ল আর হংস মাঝখানে রাখা সবচেয়ে ভালো আর বড় চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললো অবনী-মোহনকে। আর অবনীমোহন পাশের চেয়ারটায় প্রভাকরকে বসতে বললেন।

সমস্ত আসরটা যেন মুহূর্তের মধ্যে গমগম করে উঠলো।

আসরের ভিতরে চারপাশ ঘিরে বসে গেছে তখন গাইয়ে-বাজিয়ের দল। গিরিজা-প্রসাদ দেখলেন, বংশীও আছে তার মধ্যে। চোখোচোখি হতে হাসলো বংশী। বাজনা শুরু হয়ে গেল। আর গিরিজাপ্রসাদের মন চলে গেল শৈশবের সেই দিনগুলিতে। মনে হলো যেন কিছুই বদলায়নি, গ্রামটা ঠিক তেমনিই আছে। শুধু সেই জমিদার নেই, দারোগা নেই। হ্যাঁ, মনে পড়লো গিরিজাপ্রসাদের—মাঝখানে একটা নকশাকাটা দামী চেয়ারে বসতো গাঁয়ের জমিদার হৃদয় মোড়ল, আর দারোগাবাবুকে ঠিক অবনী-মোহনের মতই পাশে বসতে বলতো হৃদয় মোড়ল। ঠিক যেভাবে প্রভাকরকে বসতে বললেন অবনীমোহন। কই, আর তো কিছুই বদলায়নি।

দেখতে দেখতে যাত্রা শুরু হয়ে গেল। গান গাইতে গাইতে আসরে এলো মণিপুরের রানী। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বিমলা। সাজপোশাক দেখে চোখ ঝলসে যায়, আর কি সুন্দর মানিয়েছে।

কমলা ফিসফিস করে বললে, সত্যি মেয়ে নাকি রে দিদি!

বিমলা চাপা গলায় ধমক দিলে।—চুপ!

তার বোকামিটা চাপা দেওয়ার জন্যে, না বিমলা সত্যিই যাত্রা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছে!

কমলা শুধু ফিরে তাকিয়ে দেখলে অবনীমোহন উঠে চলে গেল এক সময়।

গোপেন মোড়ল, হংস আরো দু'একজন তাঁর পিছনে পিছনে খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এলো।

আসরের আর সকলেই তন্ময় হয়ে দেখছে। রাত্রি অনেক হয়েছে তখন, চতুর্দিক অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। মেয়েদের এলাকায় মাঝে মাঝে দু'-একটা কোলের ছেলে কে'দে উঠছিল, তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিস্পন্দ বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলে দেখছে সকলেই। আর নিস্তব্ধতার মাঝে অভিনেতাদের গলার স্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে সকলে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই অভিনয় করে চলেছে উদাস। আর তার অভিনয় দেখতে দেখতে চোখে জল এসে পড়ে লক্ষ্মীমণির। অন্য সকলের মত সেও ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল মোছে। উদাসের অভিনয়কে কোনদিনই বুঝি এমন চোখে দেখেনি লক্ষ্মীমণি। আজ একটা দিনেই মানুষ বদলে গেছে সে। এতদিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ আর বিরূদ্ধ-ভাব যেন মুছে গেছে।

পাশের ভিড় থেকে কেউ বলে উঠলো, উদাসের মত যাত্রা করতে বাবুরাও পারে না গো!

আরেকজন কে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, রাজা হয়েছে উদাস? ও মা, আমি চিনতেই নারতাম না বলে দিলে!

লক্ষ্মীমণি শোনে সে-সব কথা, আর গর্বে বুক ফুলে ওঠে ওর। মনে হয় কি ভুলই না করেছিল সে, কি অবিচার করেছে স্বামীর ওপর।

তা না হলে হঠাৎ তার জন্যে একখানা শাড়ি কিনে এনে দেবে কেন উদাস? কোন-দিন যা আশাও করেনি সে, মুখ ফুটে বলেনি কোনদিন...

লক্ষ্মীমণি মনে মনে ভাবে, এবার থেকে খুব ভাল ব্যবহার করবে সে উদাসের সঙ্গে। সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনবে। না, উদাসের কোন দোষ নেই। সব দোষ পদ্মর।

সাবিত্রীও বলেছিল লক্ষ্মীমণিকে। বলেছিল, ভাতারকে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখ লো লক্ষ্মী, তা নইলে পদ্ম তুক করবে।

তখন শুনে রেগে গিয়েছিল লক্ষ্মীমণি। কিন্তু তুকই করেছিল পদ্ম, নিশ্চয় করে-ছিল। তাই পদ্ম চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর মন ফিরে এসেছে উদাসের।

তন্ময় হয়ে যাত্রা দেখে সে, আর গর্বে বুক ফুলে ওঠে আশপাশের লোকের মুখে উদাসের প্রশংসা শুনে।

তন্ময় হয়েই অভিনয় করছিল উদাস। যাত্রায় এবার আর ওর একটুও মন ছিল না। নেহাত দায়ে পড়েই পার্ট নিতে হয়েছে। দামুদাদাকে খুশী করার জন্যে। বেশ-কারীর সামনে বসেও বারবার পদ্মর কথাই মনে পড়েছে তার। বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। বেশকারী অতশত বুঝতে পারেনি। যত্ন নিয়ে উদাসের গালে মুখে রঙ মাখিয়েছে সে, চোখে আর ভুরুতে কাজল টেনে দিয়েছে। তারপর রাংতা মোড়া ঝলমলে চূড়া পরিয়ে দিয়েছে মাথায়, গায়ে জোড়া বুক ছতরী। ঝলমলে মখমলের পোশাক, নকল মুক্তোর মালা, হাতে ধনু নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কিন্তু অভিনয়ে নেশা জেগে উঠেছে। সমস্ত শিরা উপশিরা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে মুখস্থ করা পার্ট মনে পড়তেই। মুহূর্তে নিজেকে ভুলে গেছে উদাস। পদ্মকে, লক্ষ্মীমণিকে, তার ভাইভাবি শেখার নেশা, তার দিনচক্র বাহন, সব ভুলে গেছে। উদাস যেন বংশী কোটালের ছেলে নয়, সূতপুত্র কর্ণ—মহাবীর!

তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, গ্রাম্য উচ্চারণে বড় বড় শব্দ—যার অর্থও ভাল করে বোঝে না সে—তার অভিনয় যেন উদাসকে সত্যিই মহাভারতের যুগে নিয়ে গেছে।

আসরে নেমেই তাই অভিনয়ের নেশায় ডুবে গিয়েছিল সে। বাঁশ দিয়ে ঘেরা চৌকো আসরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে করতে অতি পরিচিত মুখ-গুলোর ওপর দিয়ে চোখের দৃষ্টি ঘুরছিল তার, কিন্তু কাউকেই যেন চিনতে পারছিল না। বনপলাশির মানুষ নয় যেন ওরা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র সৈনিকেরা যেন ঘিরে আছে তাকে।

অভিনয় করতে করতে অনর্গল পার্ট বলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ আস্ফালনের মাঝখানে থেমে পড়লো উদাস। হই হই করে উঠলো সকলে, প্রম্পটারের গলা শোনা গেল। বার-বার পার্ট মনে পড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু উদাস অপ্রতিভ, বিস্মিত—অস্বস্তিতে ঘেমে উঠেছে সে।

হাসাহাসি শুরু করলো অনেকে। কেউ কেউ চিৎকার করে ঠাট্টা করলে।

আবার অভিনয়ের চেষ্টা করলে উদাস, পারলে না। গ্রামের লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ চিৎকার কানে গেল তার।

লজ্জায় অস্বস্তিতে দু' চোখ ছাপিয়ে জল এলো তার। কোন রকমে পার্ট শেষ করে ছুটে বেরিয়ে এলো সে আসর থেকে।

অভিনয় করতে করতে কেন যে দৃষ্টি পড়েছিল সাজঘরের পাশের আবছা অন্ধকারে! কেন যে...

ছুটতে ছুটতে সেদিকে এসে পদ্মর হাত দুখানা মুঠোর মধ্যে ধরলে উদাস।—পদ্ম, পদ্ম এসেছিস তুই?
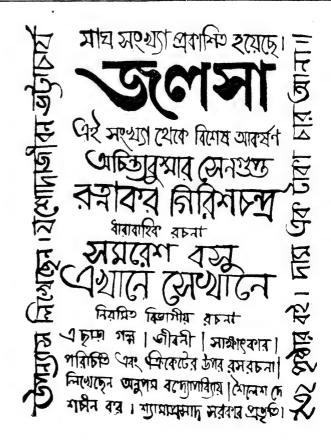
(ক্রমশ)

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪১২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজ ৬ই। আজ বিকেল থেকে বিজ্ঞানীদের অভ্যর্থনার পালা। সন্ধ্যার সময় নাচগান দেখানো হবে। মিষ্টভাষণ প্রভৃতির দায়িত্ব বৌমার মিষ্টান্ন পরিবেষণেরও ভুখবচ। আমি ক্ষণকালের জন্যে দর্শন দেব ও দর্শন করব। একজন মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে খুশি করা সহজ, কিন্তু পাইকারি হিসাবের অভ্যর্থনায় মাথা ঘুরে যায়। যা হোক সায়াহ্নেই য়ুরোপীয়েরা চলে যাবে না, কিন্তু আমার ছুটি নেই। বৌমা আগামী অভিযানের জন্যে চণ্ডালিকা তৈরি করতে চান। তাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমার উপরে ফরমাস আছে রিহার্সেলের কর্তৃত্ব আমাকে নিতে হবে। তা ছাড়া সামনে ১৬ই তারিখে এখানে হিন্দী ভবনের প্রতিষ্ঠা হবে। চিকিৎসা উপলক্ষে রাজধানী অভিমুখে যাবার সংকল্প ছিলো। কিন্তু গিয়ে আবার ফিরে আসার মতো শক্তি নেই। মারোয়াড়ী বন্ধুরা শুভদিন দেখে ১৬ই তারিখ স্থির করেছে। যদি সম্ভব হয় তোমরা ফিশরকে নিয়ে এখানে দেখা দিয়ে যেতে পারো; আমি বন্দী। হয়তো ১৭ই যেতে পারতুম কিন্তু ৬ই ফেব্রুয়ারিতে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব। আমাকে সহজে ছাড়বে না। তারপরে ১৭ই আসবেন গভর্নর। ১৮ই নাগাদ বেঁচে থাকব কিনা নিশ্চিত জানিনে। যাই হোক ১৮ই থেকে প্রায় হপ্তা তিনেক সময় পাওয়া যেতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে চিকিৎসা সেরে আসবার ইচ্ছে তখন যদি হেড্ নর্স নার্সিং হোমে স্থান দেন তাহলে আশ্বস্ত হব। কিন্তু তোমার উপরে আজকাল যে রকম উপদ্রব চলচে তাতে কোনো রকমে তোমাকে ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না। সম্প্রতি আমার দেহটা খুব যে খারাপ তা নয়, কিন্তু মনটা কী রকম উত্যক্ত হয়ে আছে ভালো লাগচে না। মনে হচ্ছে আমার ভাগ্যে যেন পাঁচই মে-র করুণা নেই। ইতি ৬।১।৩৮

কবি

॥ ৪১৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এবার কলকাতা অভিমুখে যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। এই সেদিন পর্যন্ত যে সব বিজ্ঞানীদের বই নিয়ে দিনরাত্রি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি তাদের সঙ্গে দেখা হবে। এই আশা ছিল মনে, কলকাতার মুরুব্বিরা ফাঁকি দিলে, সেই সঙ্গে লোকসান করালে প্রচুর। কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কেননা আমাদের তরফ থেকে উপরোধ অনুরোধ করা হয় নি, একেবারে গায়ে পড়ে ঠাট্টা, অথচ আমি বাংলাদেশের সরকারী ঠাট্টার সম্পর্কীয় নই। আমার বিশ্বাস, সম্মেলনের যারা ছিল অবজ্ঞাশ্রেণীর, তাদেরই অভ্যর্থনার ভার আমার উপর দিয়ে চালিয়ে বুদ্ধিমানরা নিজেদের বোঝা কমিয়েছিলেন। এই শোকাবহ প্রহসনের পরদিনেই দৌড় দিতে পারতুম, কিন্তু বৌমা চণ্ডালিকার উপসর্গে আমার ঘাড়ে এমন এক দায় চাপিয়েছেন, সকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মাথা চলচে চরকার মতো। সমস্ত চণ্ডালিকার গদ্য অংশটাকেও গানে রূপান্তরিত করতে হবে—ব্যাপারটা কী দুঃসাধ্য তা বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। কবে খালাস পাব ঠিক বলতে পারচি নে। সতেরোই তারিখ পেরিয়ে যেতেও পারে। তুমি জানো বৌমার কথা ঠেলবার শক্তি আমার নেই, বিশেষত তিনি যখন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেন আপনার যদি কষ্ট হয় তো করবেন না।

এইতো আমার অবস্থা, একদিকে দেহ অচল আর একদিকে দায়িত্বও অনড়। এ অবস্থায় তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি কোনোমতে একটু সময় করে নিয়ে ফিশারকে নিয়ে এখানে দেখা দিয়ে যেয়ো খুশি করে দেব এই সত্য করচি। টমাস এসেছিলেন, আজ চলে গেলেন, তিনি আমার সাক্ষী, জিজ্ঞাসা করে দেখো। কিছুকাল ধরে বাজে লোক বিস্তর আসচে। মানব সমাজে অনাবশ্যক লোকের এত বাহুল্য, তা আগে জানতুম না। সৃষ্টিকর্তার খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না ইতিমধ্যে ক'দিন বাদলা করে সমস্ত আকাশটা যেন মন খারাপ করে গোঁ হয়েছিল তুমি তো জানো সূর্যের আলোয় আমার মৌতাত। আকাশের এই অসৌজন্যও মনে হয় বিশেষ করে আমার প্রতিই অন্যায় আচরণ আজোও আবহাওয়াটা সন্দিগ্ধভাবে আছে। সম্প্রতি নেবে এসেছি শ্যামলীর মাটির ঘরে বাড়িটা পঙ্গু হয়ে আছে কিন্তু আমার 'পরে এই খোঁড়ার টান আছে বলে মনে হয়। আমার অভিভাবকেরা এটাকে ধ্বংস করবার সংকল্প করচেন। সংসারে আমার পরাভবের তালিকায় এও একটি গণ্য হোলো। মনে হয় জীবনের উপসংহারের এ একটা পূর্ব সংকেত। আমার বড়ো চিঠি দেখে তুমি মনে করতে পারো—আমি বুঝি ফর্লোয়া আছি। একেবারে উল্টো। মনে আমার বিশ্বাস আছে, হয়তো তোমার কাছ থেকে দরদ পাওয়া যাবে। তাই মনের মধ্যে নালিশ জমলে খালাস করতে আসি। অবকাশ থাক বা না থাক। বকুনি শেষ হোলো, এখন চললুম কাজে। আমার সামনের সেই চৌকো ঘড়িতে ইঙ্গিত করচে বেলা দেড়টার। ইচ্ছে করলে ফাঁকি দিতে পারি বলেই ফাঁকি দিতে পারিনে। অতএব চল্লুম সন্ধেবেলার রিহার্সেলের জোগান দিতে হবে। শীতকালের রোদ্দুর যখন গাছের তলায় ছায়া মেলে দেয় তখন মন কেমন করে, কিসের জন্যে তা জানিনে। ১১।১।৩৮

কবি

॥ ৪১৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

লেফাফার উপরে আমার হস্তাক্ষর দেখে মনে খটকা লাগতে পারে যে কাল তো হালের খবর দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলুম আজ আবার কেন।

দুঃখের কথা জানাই কাকে তাই এ চিঠিখানা পাঠাচ্ছি ঘড়ঘড়িয়ায়, মন খোলসা করবার জন্যে। কালা হয়ে আসছি তাই একদা স্থির করেছিলুম কানে-ধরা ডাক্তারের আকর্ষণে যাব সাতই পৌষের পরের দিনে কলকাতায়। জরুরি খবর এল বিদেশী বিজ্ঞানীরা আশ্রমে আসবার ইচ্ছা করেছেন। এবং ফরমাস এলো তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হবে। বৌমা ছিলেন

বোটে, আমি নিলুম ভার। বারে বারে আসচে টেলিগ্রাম। প্রথমে শোনা গেল সমুদ্র পাড়ি দেওয়া পাঁচজন বিদ্বানের কথা, তারপরে বারোজনের। উদয়নের সবাই রুগীর দল, কর্ত্রী এলেন প্রায় শেষদিনে, তাঁর অবস্থা চিরদিনই টলমলো, কখন শয্যা আশ্রয় করবেন দু ঘণ্টা আগে বোঝা যায় না। তবু কোমর বেঁধে লাগতে হোলো। বারোজনের মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হোলো মান্য অতিথিদের মর্যাদারক্ষার উপযুক্ত, এমন কি তার চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ বেশি। মধ্যাহ্নে স্টেশন থেকে মোটর এলো ফিরে—পাশ্চাত্যদেশীয়ের মধ্যে একজন অখ্যাতনামা মার্কিন ও তাঁর স্ত্রী; পাণ্ডারূপে সঙ্গে এলেন সুপরিচিত "—"। স্বদেশী এলেন ৬৩ জন, বোধহয় তাঁরা অধিকাংশই রবাহূত, তাঁদের কারো নামের মধ্যে বিজ্ঞানের রেডিয়মের ছোঁয়া কিছু আছে কিনা জানিনে, কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনি। আমাদের কাছে তো সবাই অচেনা, জগজ্জনের কাছে কী রকম তার খবর জানিনে। অভ্যর্থনার দায়িত্ব যাঁদের উপর তাঁদের একজনো সঙ্গে নেই। অতিথিদের নামের গৌরব না থাকতে পারে, কিন্তু আতিথ্যের দায়িত্ব যা আছে সেটা যথেষ্ট গুরুভার। বাংলাদেশে বোধ হয় দ্বিতীয় আর কোনো নির্বোধ নেই আমি ছাড়া, যার উপরে এত বড়ো অকারণ বোঝা অকস্মাৎ অম্লানবদনে চাপানো যেতে পারে। কিছুই বুঝতে পারলুম না। পৃথিবীতে আমারো তো একটা সম্মানের স্থান আছে যেটা রক্ষা করার দায়িত্ব তো দেশবাসীর আছে। এ কি ভুল পাঁজির পয়লা এপ্রিল, যাকে বলে কেজো ঠাট্টা সমস্ত বাংলাদেশে একমাত্র আমিই কি তার যোগ্য পাত্র? জন্মমুহূর্তে বিধাতা আমাকে যখন বাংলাদেশে নির্বাসন দিয়েছেন তখন কোনো দুর্গতিতেই বিস্মিত হব না, এ কথা বারবার মনে করি—কিন্তু বারবার ভুলে যাই। একটা কথা জোর করে বলতে পারি বিদেশের মানী লোকেরা যে মূল্যের আতিথ্য এখানে লাভ করতেন ভারতের আর কোথাও তা সম্ভব ছিল না—যেটাতে বাংলাদেশেরই নাম রক্ষা হোতো। যদি এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রয়োজন থাকে তবে অল্প কিছুদিন আগে শিক্ষা সম্পর্কে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাছে খবর নিতে পারো। তাঁদের সঙ্গেও বহুসংখ্যক অনাহূত ভারতীয় এসেছিলেন, আমরা আনন্দের সঙ্গে তাঁদের পরিচর্যা করেছি। কিন্তু কালকে ধূমকেতুর উজ্জ্বল মুণ্ডটি রইল অন্যত্র, পুচ্ছটি পড়ল ঝাঁটার মতো আমাদের পিঠের উপর! আমাদের দেশেও এতটা প্রত্যাশা করিনি। এই প্রহসন রচনাটা হোলো কোথা থেকে তার নেপথ্যের খবর তোমরা কিছু জান কী? প্রশান্ত এর মধ্যে থাকলে আমার এই জীর্ণ দেহের উপর এত বড়ো অসম্মানের অত্যাচার ঘটতে দিত না, এ কথা বারবার মনে পড়চে। কিন্তু সেও বুঝি এবারকার যজ্ঞে একঘরে।

এইমাত্র ভারতপ্রত্নতত্ত্ববিৎ টমাসের কাছ থেকে সুন্দর একখানি চিঠি পেয়ে সান্ত্বনা পেলুম—তিনি আসতে চেয়েছেন। তিনি যে ভাষায় সম্মান জানিয়েছেন সেটা তাঁর মতো বিদ্বানেরই উপযুক্ত—কিন্তু তিনি বাঙালী নন। যাকগে—তোমাকে লেখার একটা সার্থকতা এই যে মনটা খোলসা হোলো, তাই এখন মনে হচ্ছে হয়তো আমার অজানিতে অনেক অত্যুক্তি রয়ে গেছে, হয়তো অনিবার্য কারণগুলো অগোচরে আছে। অভিমানী স্বভাবটাকে প্রশ্রয় দিলে অনেক অবাস্তবের সৃষ্টি হয়—এমন কি কারণ থাকলেও মনটাকে নির্লিপ্ত ও প্রশান্ত রাখতে পারলে আত্ম সম্মান রক্ষা হয়—কথায় কথায় বাইরের নাড়া খেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলে তার পরে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই। কবিসুলভ স্বভাব নিয়ে জন্মেছি, এটা যেন ভাগ্যের প্রশ্রয় পাওয়া স্বভাব—বড়োমানুষের ঘরের ছেলের মতো। অযাচিত ঐশ্বর্যের অধিকার পেয়ে সর্বত্রই তার স্বীকৃতি দাবি করে বসি—ভুলে যাই ভিতরে যার দাম পেয়েছি বাইরে তার উপরি পাওনার জন্য হাত বাড়ানো নির্লজ্জ গরিবিয়ানা। দেবতা যাকে সম্মান দিয়েছেন সে কেন ভিড়ের লোকের সম্মান চেয়ে চেয়ে দেবতার দানের অবমাননা করে? অতএব এ চিঠির প্রথম অংশটাকে দিলুম বাতিল করে মনের মধ্যে কুয়াসার পরে যেন রোদ্দুর উঠল, আনন্দিত হোলো সমস্ত আকাশ। ইতি ১২ই জানুয়ারি ১৯৩৮

কবি

দৈহিক কান কালা হয়ে আসছে। বিধাতার ইঙ্গিত, বাজে কথায় কান বন্ধ করা।

সেপ্টেম্বর

কেতকী কুশারী

প্রথম হাওয়ার ঝাপটা ছুঁয়ে যায় পত্ররোমকূপ,
মেঘেরা চলিষ্ণু অতঃপর,
অকস্মাৎ কেঁপে ওঠে পরিণত বৎসরের রূপ,
অভিমানে শোনায় মর্মর।

প্রথমে সময় ছিলো, সময়ের অন্ত নেই শেষে,
মাঝামাঝি বাৎসরিক খেলা,
কখনো সে ঋতুদের দুর্নিবার সারথির বেশে,
কখনো মন্থর যায় বেলা।

জল ছলছল তীরে মনে হয় অশ্রুর আভাস,
মুহূর্তে রোদের রেখা নামে,
কিঞ্চিৎ-শিথিল-হওয়া ফিরে আসে পুরোনো বিশ্বাস,
শরবনে সরু নৌকা থামে।

হায় হেমন্তের হাওয়া, এ কথা কি ঘুণাক্ষরে জানো
আরও আছে দিবসরজনী,
চতুর্দশ বর্ষ আর অরণ্যকাণ্ডের দুঃখ আনো,
রামায়ণ কিছুই বোঝোনি।

ওয়াশিংটনের চিঠি

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যে উৎসব-অনুষ্ঠান হয়েছিল তা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান তখন, ঐ বছরে ঐ সময় কিছু আগে কিছু পরে, চলছিল—এ খবর নিশ্চয় "দেশ"এর পাঠকমাত্রেই জানেন। ছোট বড় প্রতিষ্ঠান যে যেরকম মাপে পেরেছে সে সেরকম মাপে উৎসব করেছে। নিউইয়র্ক শহরে সেই সময়ে যে "রক্তকরবী" নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল তা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। নিউইয়র্কের টাউন হলে শতবার্ষিকীর কেন্দ্রীয় সমিতি বড় মাপের সম্মিলনীর আয়োজন করেছিলেন, সেখানে বিখ্যাত মার্কিনী কবি রবার্ট ফ্রস্ট ভাষণ দিয়েছিলেন। এই সময়ে ইলিনয়, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া ও অন্যান্য বড় বড় শহরে নানা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রদর্শনী, উৎসব, অভিনয় চলে। এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সূত্র ধরে এক সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ারকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নাম দেওয়া হয়। এ সমস্ত খবরই, মনে হয়, এতদিনে জানাজানি হয়ে পুরনো হয়ে এসেছে এবং এ সব তথ্যের পুনরুল্লেখ করবার কোনো দরকার নেই। কিন্তু বাইরে থেকে যা জানা যায় না, খবরের কাগজে যে সব হিসেব বেরোনো শক্ত সত্যিকারের হিসেবে তার পরিমাণই তো ঢের বেশী! অনুষ্ঠান হলো—এ একটা খবর। কিন্তু এই একটি অনুষ্ঠানকে সাজিয়ে গুছিয়ে গড়ে তোলার পিছনে যে অসংখ্য মানুষের দীর্ঘদিনের চেষ্টা, সময় এবং উৎসাহ খরচ হতে থাকে, তার তো কোনও খবর নেই। বিশেষত, যেখানে বাইরে থেকে শিল্পী আনানো যাচ্ছে না, স্থানীয় ছাত্রদের নিয়ে কাজ চলছে, সেখানে সমস্যার শেষ নেই, সে সমস্যার খবরই কে রাখছে? অথচ, এক নিউ ইয়র্ক কি ওয়াশিংটনের মতো ঐ রকম একটি-দুটি জায়গা বাদে সর্বত্রই কাজ চলেছে ছাত্রদের নিয়েই। কর্নেলের কথা বলি।

বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রী শহরে যে-সব ভারতীয়ের সম্প্রতি কিছুকাল বসবাস করবার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরাই জানেন অল্প কিছুদিন কাটালেই ছ' মাসে বছরে দেশ থেকে নতুন-আসা-মানুষের মুখ দেখা কি-রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এই সমস্ত সদ্যাগত স্বদেশীয়দের নানা অভ্যাস, ধরন-ধারন, চাল-চলন নিয়ে পুরনো বাসিন্দারা দু-চার দিন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, তারপর আবার নতুনেরাও পুরনো হয়ে মিলেমিশে নতুনতর অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করবার জন্য তৈরী হয়ে থাকেন। নিউ ইয়র্ক স্টেটের ছোট শহর ইথাকায় যখন এসে পৌঁছেই পট্টনায়ক মশাই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে, কখন, রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এবং কোন এক সন্ধ্যায় বেলী সভাগৃহে তাঁর ভাষণ শোনা গিয়েছিল, তার নথিপত্র সমেত ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন তখন একে আনকোরা দেশছাড়ার খামখেয়াল ছাড়া বেশি কিছু ভাবা যায়নি। মনে হয়েছিল, এই নতুন-আসা মানুষটির এই উদ্ভট খেয়াল ঐ রকম পাঁচজনের দু-চার দিনের বলাবলির মধ্যেই থিতিয়ে আসবে। উনি উৎসাহ সহকারে সেই আদিকালের 'কর্নেল ডেলী সান'-এ রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের বিবরণী সংগ্রহ করতে লাগলেন, অন্যেরা এ নিয়ে বেশীদিন বলাবলি করাটাকেও বাহুল্য মনে করে নিজের নিজের কাজে ব্যাপৃত হলেন। এ রকম সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের পিছনে যে আমাদের এই বন্ধুটির কোনও রকম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কাজ করছে—এ কথা তখন কারো মনে ওঠেনি, অথচ এর সুফল দেখা গেল শতবার্ষিকীর বছরে। কর্নেলের প্রধান পাঠাগারে রবীন্দ্রপ্রদর্শনীতে ওখানকার বিশিষ্ট অতিথিভবনের পুরনো পুঁথিতে রেখে আসা রবীন্দ্রনাথের নিজের দস্তখতের প্রতিলিপি দেখানো হয়েছিল। সে যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত মুকুল দে এবং পিয়ার্সন। তাঁদের দস্তখতও এই প্রতিলিপিতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিকবার আতিথ্য নিয়েছেন এ কথা শুকনো বিবরণে জানা এক আর ঐ দূর প্রবাসে বসে পুরনো খাতায় তাঁর নিজের হাতের লেখা চোখে দেখা হল অন্য। এটি দেখতে পাওয়ার পিছনে আমাদের ঐ পূর্বোক্ত বন্ধুটির বহুদিনের অধ্যবসায় গেছে যা ঐ ব্যস্ত কাজের মহলে ঠেকান দিয়ে রাখা শক্ত।

কর্নেলের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল ৫ই মে অধ্যাপক বার্টের বেতারবার্তা দিয়ে, শেষ হলো আমন্ত্রিত অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর ভাষণ দিয়ে ১০ তারিখে। এর মাঝখানে ৬ তারিখে ঋতু-উৎসব। এটির দায়-দায়িত্ব সবই ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের, যেমন আবার মাস-জোড়া প্রদর্শনীর সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন পাঠাগার কর্তৃপক্ষ। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা তাল। আজ জুডি আসবেনা নাচের মহড়ায় কেননা কাল ওর "প্রিলিম" পরীক্ষা। কাল স্যু আসবে না, কেননা এটা পেরেন্টস্ উইক এণ্ড, ওর বাবা-মা আসছেন কাল। আমাদের সংগতকার মাথুর পড়তে এসেছে ইঞ্জি-

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন: পটভূমিতে গগনচুম্বী ওয়াশিংটন মনুমেন্ট

নির্ধারিং, 'কোর্স' সামলাবে, না তবলা? অথচ তবলা ছাড়া দীপ, নাচ অভ্যাস করেই বা কি করে, করায়ই বা কি করে? ওদিকে ডায়ান সেতার বাজাতে চায় গানের সঙ্গে, কিন্তু সুর তুলছে কখন, ওর সায়েন্স পরীক্ষা নিয়ে কেবল ভয়, প্রথম বছর, কেমিস্ট্রিতে যদি ঠেকে, কর্নেলে টিকতে দেবে না। অথচ ওর হাতে ছাড়া নাচের মেয়েরা আবার আর কারু হাতে শাড়ি পরবে না, কী সুন্দর পরায় ও!!

বাংলা গানের দলে লোক কম পড়বে বলে সকলে ভয় করেছিল, দেখা গেল তার ভিত্তি নেই। উচ্চারণের সংকোচ কাটিয়ে গলা ছাড়লে শোনা গেল মহারাষ্ট্রী মেয়ে উমার গলায় রবীন্দ্র-সংগীত অপূর্ব খেলে। কাজেই যদিও চার-চারটে কোর্স, একটি স্বামী (সে-ও ছাত্র) এবং পুরো সংসার ও মেয়ের ঘাড়ে, তবুও ওকে দিয়ে দুটোর জায়গায় তিনটে গান করাও।

এই সমস্ত অসুবিধে স্বীকার করেও সকলের যে ধৈর্য, যে-আগ্রহ দেখা গেছে, তার তুলনা নেই। গত বছর এপ্রিল মাসেও বরফ ঝরছে। তবু, একটিমাত্র ছুটির দিন হাতছাড়া করে প্রতি রবিবার এসে জড়ো হতে হবে মহড়ায় তো তাই সই। হাঁড়ি-হেঁশেল তুলে কফি খাইয়ে এই মহড়ার দলকে জিইয়ে রাখার জন্য আছে আমাদের মাথুরের বউ ফ্লোরেন্স আর সবেরওয়ালের বউ ইডি। ফ্লো আবার ওরই মধ্যে অনুষ্ঠান-লিপিতে ভারতীয় নকশা আঁকছে। গানের অনুবাদের ইংরেজীটা ইংরেজীর মতো শোনালো কি না এ পরীক্ষার ভারও তার ওপরে। হাড় রং মিলিয়ে শাড়ি-জামা সংগ্রহ করে আনছে। ভারী ভারী শাড়ি পরে ওই আমেরিকান মেয়েরা শুদ্ধ পৌষের দলবাঁধা নাচ নাচতে পারবে তো? পায়ে-পায়ে বেধে যদি পড়ে যায় শেষে? পায়ের কথায় মনে পড়লো ঃ পায়ে দেবার মল কই? এখন নামো ডাউনটাউনে, কিছু একটা কিনে আনতে হবে তো ওসব নকল গয়না তৈরী করবার জন্যে! এমনি সহস্রবার ছুটোছুটি আর হাজার উদ্বেগ পেরিয়ে যেদিন সন্ধ্যায় ঋতু-উৎসব শেষ হল, মনে হল যেন একশ' ঝাড়ের বাতি এক ফুঁয়ে নিবল, নিরবলম্ব অন্ধকার।

তবু, তখনো অমিয়বাবুর বলা বাকি। যেদিন এলেন বস্টন থেকে, বৃষ্টিতে বাদলে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। উড়োজাহাজ উড়েছে এই আবহাওয়ায় সেই কত, এখন কখন এসে মাটি ছোঁয়! সারা দিনের পরিশ্রমের পর অধ্যাপক স্মক সস্ত্রীক এসেছেন ওঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। টার্মিনালে সবাই শুকনো মুখে বসে। শেষ অবধি উনি এসে পৌঁছালেন। ভয় ছিল ক্লান্ত হয়ে থাকবেন, দেখি পাইলটের প্রশংসা করতে করতে হাসি-মুখেই এগিয়ে আসছেন। পরের দিন ১০ই সভায় লোক ভরে গেছে। বক্তার উঁচু ডেস্ক, আর তার ধারে ঐ ছোট্ট মানুষটি, দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনলো। বার্ট বেতার-ভাষণে ইংরেজী গীতাঞ্জলি থেকে কবিতা পড়েছিলেন, বিশেষতঃ 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' কবিতাটি অপূর্ব লেগেছিল শুনতে। আর, এদিন অমিয়বাবুও আবৃত্তি করলেন, কিন্তু শুধু অনুবাদে নয়, কিছু কিছু বাংলা কবিতার ছোট ছোট অংশ। বিদেশীর কানে বাংলা শব্দ-ঝংকারের যে আবেদন আছে তা জানলাম সেদিন।

"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা" —অমিয়বাবুর মুখে এ শুনে যেমনি আমরা মুগ্ধ, তেমনি মুগ্ধ দেখি আমাদের অসংখ্য বিদেশী বন্ধু। ফ্লো, ইডি—এদের কথা ধরিনে। হোক ওরা মেয়ে ক্যানেডার, আমেরিকার, ওরা ভারতের ঘরের বউ তো বটে, ওদের ভাল লাগবেই, কিন্তু অ্যাডা? আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পরে যখন কফি নিয়ে জমায়েত সবাই, অ্যাডা গিয়েছিল আবৃত্তি শুনবার আশায়। বেরিয়ে বলেই ফেলল ঃ "ভেবেছিলুম আরও কিছু বাংলা কবিতা শুনব। কী যে ছাই অনুবাদ নিয়ে সব কথা তুলে দিলে!! আজ কি ও শোনা হবে?"

হবে না, হওয়া শক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হয়ে থাকা—টাইপ-রাইটার, কাজ-খাতার ভিড়ে যে মাস চলে যেতে কতক্ষণ? শেষ পরীক্ষার সপ্তাহ ঘনিয়ে আসে। তবু, ওরই মধ্যে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে গান জেগেছিল, কথা বেজেছিল, এই আশ্চর্য!

মানসী দাশগুপ্ত

গো প ন র হে না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আজ প্রত্যেকেই যেন বড় বেশী সংরাগে বিরহে
কাছে আসে, দূরে যায়।
রজনীগন্ধার সাদা যেন আজ দ্বিগুণ প্রকট।
গোলাপ দ্বিগুণ লাল। সন্ধ্যার আকাশ
অধিক নিবিড়। অন্য দিকে
শীতের মলিন পত্র গত বৎসরের তুলনায়
দ্রুত ঝরে।
নক্ষত্র নিথর হয় ভীষণ অস্বস্তিকর শব্দহীনতায়।

আজ প্রত্যেকেই যেন নিজের ইচ্ছার ঘোষণায়
সমান উৎসুক। 'আমি কবে সেই বালকবয়সে
মুকুন্দ দাসের যাত্রা দেখেছি।' বৃদ্ধের এই দারুণ বিলাপ
না ফুরোতে যাত্রাদল তাই চলে যায়
অন্য পথে।
উলঙ্গ আলোর ঝড়ে সন্ধ্যাযাপনের পিপাসায়।

গোপন রহে না কিছু। আজ খুব স্পষ্ট হয় জলের করুণা।
[illegible] শরীর, মেঘ, নারী।
বৃক্ষ মানবীয় হয়। জাহাজ গম্ভীর হয়। অন্য দিকে
প্রেমিকের বাম অঙ্গ টলে যায়, দুই চক্ষু অপার উজ্জ্বল।
গলায় মঙ্গল-মালা, হাতে রাজ-অঙ্গুরীয়, আজ
প্রত্যেকেই সুন্দর ভূষণে
সেজেছে। সবাই যেন প্রতীক্ষায় নিরত। সবাই
বারবার হেরে গিয়ে, বারবার হেরে গিয়ে, তবু,
দারুণ উৎকণ্ঠ এক অবসন্নতায়
টেবিলের চার ধারে ঝুঁকে আছে। যেন
আজ প্রত্যেকেই তার স্বভাবকে শেষ বাজি রেখে
জুয়ার অন্তিম দানে জিতে যেতে চায়।

আজ চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে সুস্পষ্ট মনে হয়,
নানাবিধ অন্ধকার, প্রণয়, প্রকৃতি,
চরিত্রলক্ষণ তার শেষ পরিণতির ভিতরে
এসে দাঁড়িয়েছে।
তা না-হলে সূর্য এত বিশাল প্রভায়
প্রত্যহ সকালে কেন দেখা দেয় ইদানীং? কেন
নিশীথ ক্রমেই আরও ঘোর অন্ধকার হয়ে আসে?
হয়ত প্রত্যেকে আজ আপন সত্তার শেষ পরিণতি চায়।
না-হলে মানুষ আজ একখানি আলোকিত অথবা আঁধার
হত না। সূর্যাস্ত তার চূড়ান্ত বিষণ্ণ শোভা দেখাবার আগে
খানিক সময় নিত। মনে হয়,
পঞ্চম অঙ্কের পাট উত্তোলিত হবে, এই প্রত্যাশায়
আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপরাজি দেখাবার তরে
সবাই প্রস্তুত হয় আপন ভূমিকা অনুযায়ী।
সবাই। মানুষ, মেঘ, ফুল, তরুলতা।
না-হলে আকাশ তার রূপ-রচনায় আরও মিতব্যয়ী হত।
তবুই দেখাত না তার সর্বাধিক কলঙ্কহীনতা।

আজ প্রত্যেকেই যেন বড় বেশী সংরাগে বিরহে
কাছে আসে, দূরে যায়।
রজনীগন্ধার সাদা যেন আজ দ্বিগুণ প্রকট।
গোলাপ দ্বিগুণ লাল। সন্ধ্যার আকাশ
অধিক নিবিড়। অন্য দিকে
শীতের মলিন পত্র গত বৎসরের তুলনায়
দ্রুত ঝরে। যেন আর
গোপন রহে না কিছু। মনে হয়,
সর্বশেষ ঘোষণার মুহূর্ত ক্রমেই কাছে আসে
বি-বি-সি'র থেকে আরও শক্তিশালী কোনও-এক সংবাদদাতার।

যে আ গু নে পু ড়ি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমরা প্রত্যেকে পাখি, ব্যাধ খুঁজি
যার তূণে তীর আছে সেই ব্যাধ,
ব্যাধের নিরিখে আমরা পাখি হই ব্যাধের নিরিখে।
আমাদের কথাগুলি রক্তাক্ত প্রার্থনা সব
রক্তের বীজের মতো,
অবাক তাদের মুখে সারি সারি তারকার জ্বলে,
বৃষ্টির আঘাত খুঁজে সেই দিকে নত হয় কথার কুঁড়িরা।
মৃতেরা যেখানে শোয় নগ্নদেহে সেখানেও কথাগুলি ফোটে
কারণ, মৃত্যুও শুধু মৃত্যু নয়, আরো কিছু:
জীবিতেরা বেঁচে আছে শুধু কি জীবন নিয়ে? হয়তো না।
মৃত্যুকেও মাঝে মাঝে পেতে হয়—মাঝে মাঝে।
ক্রমাগত চাঁদ ওঠে এমন আকাশী রাত মেঘশাদা—নেই;
বৃক্ষের শাখায় শুধু পাখি আর পাখি আর পাখি,
না বৃক্ষ না নীড়—নেই।

আমরা আগুনে পুড়ি
যে-আগুন ঘাসের মতন শান্ত নিরবধি সবুজ শীতল।
খেলনা-ছড়ানো নীল উঠোনে প্রথম
সে-আগুন পোহাই দুহাতে।
খোঁপার ফুলের ঘ্রাণে মুগ্ধ তারপর
ঝাঁপ দিই আগুনের হ্রদে,
দগ্ধ এই দ্বিতীয় আগুনে।
কার্নিশের শেষ প্রান্তে রোদ হেঁটে গেলে
আরামকেদারা পিঠে রোমন্থন করি সুখ
পুরোনো এলবাম ঘাঁটি, তারপর তৃতীয় আগুনে
ছাই হই, ঘুমের মতন সাদা।
জ্বলন্ত মোহর এক রক্তের স্রোতের মধ্যে কেবলই গড়ায়,
দগ্ধ করে, দগ্ধ হয়, দগ্ধ করে।
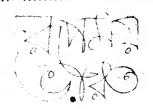
সমুদ্র বক্ষ থেকে প্রায় এগারো হাজার ফিট উঁচুতে উত্তর গাড়োয়ালের অখ্যাত গ্রাম- মালারি। বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় প্রায় আট মাস গ্রামটি শীতের প্রকোপে বরফে ঢাকা থাকে। অধিবাসীরা তখন নেমে আসে নীচের সমতলভূমিতে আর আরম্ভ হয় তখন ওদের কর্মময় জীবন যার মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

১। দূর পাহাড় সংলগ্ন বন থেকে জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসা; ২। শস্য কেটে; ৩। মহিলারা শস্য বার না মুখে ঘাস কোটায়; ৪। কর্ষণের কাজ পুরুষরাই করে; ৫। শস্য ঘরে তোলার আগে ঝাড়াই করা; ৬। হাতে সময় অল্প তাই কাজ করতে হয় পরিবারের সবাইকে।

আলোকচিত্রশিল্পী

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪
৫
৬

বিশু-খুড়ো কহিলেন : "ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এই শেষ ঘুম থেকে ওঠা, তারপরেই মহানিদ্রা। কিন্তু কথাটা বুঝি আমি একাই ভাবলাম। কলকাতার কাংস্য ঝঙ্কার আর

সেই সঙ্গে চিরাচরিত প্রথা মতোই গিন্নির ঝঙ্কার শোনা গেল। মাসের তিন তারিখ। কাগজওয়ালা, কয়লাওলা, গয়লা সবাই এসে কড়া নাড়ল, জানাতে লাগল পাওনার কথা। মূর্খ আর কাকে বলে, ক'ঘণ্টা পর কার টাকা কে খাবে। কিন্তু মোহমুদ্গর কাজে লাগে না, টাকা তাদের দিতেই হয়। আর ওদেরই দোষ কী। ঘর শত্রু বিভীষণ (বিভীষণা বলব কি?) গিন্নি রয়েছেন, রাম নামের বদলে তাঁর মুখেও মামুলি ফরমাশ—কিছু বেগুন, সজনে ডাঁটা, ভেটকীর কাঁটা যেন অবশ্যই আনি। ভেবে-ছিলাম তরিতরকারি আর মাছ আজ জলের দরে বিকোবে। ভুল করেছি। ভেবেছিলাম ট্রাম আজ ফাঁকা থাকবে। সেখানেও ভুল। লেডীসরা জায়গা থাকলে পাশে বসতে দেবেন। তেমন পুণ্যি করিনি। ভেবে-ছিলাম দেরি হয়ে গেলেও অফিসে লেট মার্ক করবে না—তেমন বাপের ব্যাটাই নয় বড় সাহেব, লেটমার্ক ত হলোই, ফাউ দাঁত-খিঁচুনিও জুটল। অষ্টগ্রহের নিকুচি করেছে বলে লেজার নিয়ে বসলাম।

সংবাদে শুনিলাম নির্বাচনের প্রার্থীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সহস্রাধিক।—"হতেই হবে। এখানে উদ্বাস্তু কলোনিতে ভিড়, স্কুল কলেজে ভিড়, খেলার মাঠে ভিড়; ট্রামে-বাসে ভিড়; সুতরাং নির্বাচনের আসনই বা ফাঁকা থাকবে কী করে। কিন্তু আমরা ভাবছি আমাদের কপালের কথা। এত সব দেশসেবক থাকতে এক কড়ার পুঁটি মাছের সমস্যা পর্যন্ত মিটল না"—সখেদে বলে শ্যামলাল।

নির্বাচনী সংবাদে শুনিলাম অন্তর্বাম রাজনৈতিক জনৈক মহিলা প্রার্থী নাকি হরিজন পল্লীতে ঘরে ঘরে গিয়া

মেয়েদের মাথায় তেল মাখিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিতেছেন, কপালে সিঁদুর পরাইতেছেন, পায়ে আলতা দিতেছেন—"তেল সিঁদুরে যে ভবী ভোলে না সেটাই শুধু তিনি জানেন না, নইলে ভোট ভিক্ষার কৌশলটা তাঁর অভিনবই হয়েছিল"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

নির্বাচনী সভায় সবাই ভাইগণ, বন্ধুগণ বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিতেছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী

বলিলেন—"এটা তো সেই মামুলি সম্বোধন। আমার মনে হয়, এর চেয়ে মাতুলগণ বলে সম্বোধন করলে আব্দারটা বোধহয় আরো জোরদার হয়!!"

সংবাদে শুনিলাম যে-সকল কংগ্রেস-কর্মী কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করিয়া লোকসভা অথবা বিধান সভায় নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।—"কিন্তু তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না। তাঁরা হয়ত ছোট-বেলা পড়েছিলেন—একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কিত ব্যাপারে জনৈক ফরাসী বিশেষজ্ঞ নাকি বর্তমানে তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।—"এবং অবিলম্বে 'ফেঞ্চ লীভ' নেওয়ার কথাও হয়ত চিন্তা করছেন"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেণ্ট্রাল স্টোরে রক্ষিত দ্রব্যাদি শুনিলাম খাতাপত্রে লেখা একরকম, আর আসলে নাকি অন্য-রকম। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন "আমরা কোন মন্তব্য করব না, শুধু বলব—তোমায় পিতা বলে যেন জানি, তোমায় নত হয়ে যেন মানি!!"

এক সংবাদে শুনিলাম লণ্ডনে গৃহ-নির্মাণের একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হইয়াছে, ইহাতে গৃহের ছাদ নির্মিত হইবে আগে এবং সর্বশেষে ভিত।—"অতঃপর বিলেতে ভি আই পি-রা আর ভিত্তি স্থাপন না করে ছাদ-ঢালাই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছে, এইগুলিতে ভারত হইতে নীত প্রচুর সিমেণ্ট ব্যবহার করা হইয়াছে।—"তোবা, তোবা, ভারতের সিমেণ্টে যে সবই গঙ্গামাটি, ও ছুঁলেও যে গুনাহ্ হয়," বলেন বিশু খুড়ো।

কোথায় কত মৎস্যভক্ষী আছে তার নাকি একটি সরকারী পরিসংখ্যান নেওয়া হইয়াছে। জানা গেল মৎস্যভক্ষী হিসাবে কেরল-এর স্থান প্রথম, বোম্বাইর দ্বিতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয়। শ্যামলাল ছড়া স্মরণ করাইয়া দিল—"সকল পক্ষী মৎস্য-ভক্ষী, মৎসরাঙা কলঙ্কিনী?"

গান্ধীজীর স্কুলের বন্ধু ও সঙ্গী নাকি বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী ক্রিকেট খেলিতেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"অসম্ভব নয়, হয়ত স্পীন বোলিং তাঁর আসত, যা থেকে হয়েছে চরকার!!"

প্রাক্তন পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী সুহরাবর্দী সাহেবকে নাকি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।—"হায় ছোরাভর্দী, হায়

নসীবের মস্করা", শ্যামলাল হায় হায় করিয়া উঠিল।

এম সি সি-র জনৈক খেলোয়াড় নাকি পাকিস্তান হইতে বোর্খা কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বোর্খা কেনাতে আর আপত্তি কী, পরিয়ে না দিলেই হলো!!"

লাল পাশ — শ্রীবারীন রায়

গত সপ্তাহে দুটি একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় আর্টিস্ট্রি হাউসে হায়দরাবাদের শিল্পী জেহরা রেহমতুল্লা এবং ফাইন আর্ট আকাদমিতে খড়গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির শিক্ষক বারীন রায়ের চিত্রের প্রদর্শনী।

বর্তমানে দিল্লি প্রবাসী কুমারী জেহরা রেহমতুল্লা হায়দরাবাদের ফাইন আর্ট কলেজ থেকে অনার্সের সংগে পাস করবার পর ১৯৫৫ সালে দুটি নিখিল ভারত চিত্র-প্রদর্শনীতে পদক পুরস্কার লাভ করেন। সেই বছরই তিনি ভারত গবর্নমেণ্টের বৃত্তি লাভ করে আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য রোম যাত্রা করেন। সেখানে আন্তোনিও কর্পোরার অধীনে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে অধ্যাপক কার্লো ফেরোত্ত ও অধ্যাপক মাইকেলোঞ্জালোর কাছে ফ্রেস্কো ও মোজাইক টেকনিকে ছবি আঁকা আয়ত্ত করেন। ইতিপূর্বে রোম, হায়দরাবাদ ও দিল্লীতে তাঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং কলকাতায় তাঁর ছবির এই প্রথম প্রদর্শনী।

প্রদর্শিত মোট একুশখানি ছবির মধ্যে অত্যন্ত মোটা কালো রেখায় রঙের বিন্যাস চাতুর্যের ভিতর দিয়ে বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্পধারার ছাপ স্পষ্ট এবং রোমে শিক্ষা লাভের জন্য সেটা হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলেও ছবিগুলির মধ্যে ভারতীয়ত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট এবং মোটা রেখা ও রঙের প্রয়োগে সূক্ষ্ম ছন্দোময় ভাব ফুটিয়ে তোলায় বেশ বলিষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। "আত্মনিবেদন", "মমতা", "প্রার্থনা", "পূজা", "গল্পগুজব" প্রভৃতি ছবিগুলি প্রধানত কালো মোটা রেখার অন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। "রাজস্থানী মহিলা", "শীতের সকাল", "জ্যোৎস্না ও আগুন" প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যে রেখার চেয়ে রঙের প্রাধান্য। "ঘুড়ি হাতে বালক", "জল ভরণে" (ইয়েলাম্মা মম্মাম্মা) প্রভৃতি কখানি ছবিতে জ্যামিতিক রেখায় পরিস্ফুট বিষয়বস্তুটি শিল্পীর বহুমুখী কৃতিত্বের পরিচায়ক।

শিল্পী জেহরা রেহমতুল্লা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ নিজস্ব একটি প্রকাশধারা আয়ত্ত করে নিয়েছেন—একটি কৃতিত্ব যা অনুভূতি ও ভাবকে রেখা ও রঙের ছন্দে মূর্ত করে তোলায় সক্ষম।

শিল্পী বারীন রায় বছর পাঁচেক পূর্বে কলকাতার আর্ট কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ইতিপূর্বে কণ্টেম্পোরারি আর্টিস্টদের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রথম দেখা যায়। এবারেরটি তাঁর ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী।

প্রদর্শিত মোট বাইশখানি ছবির সবকখানিতে তেলরঙের প্রয়োগে 'ইম্প্রেসানিস্টিক' ধারার অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। পান খেতে খেতে মেয়েদের গল্প করা "তাদের নিজেদের জগৎ" (১৩নং), গাঁজাকাসেবীদের নিয়ে "ট্রায়ো" (৭নং), "যাদুকর" (১৯নং),

কথা নয় —শ্রীমতী জেহরা রেহমতুল্লা

পূর্ব আফ্রিকার মাসাই শিকারী —শ্রীঅভয় খাটাও

"ফুল ও বালক" (৯নং), "জ্যোতিষী" (১১নং) ছবিগুলির মধ্যে ঐ ধারাটিই বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। রেখার চেয়ে রঙকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রঙের প্রয়োগে কোনরকম অসাধারণত্ব প্রকাশ না পেলেও মনেও কোন ছাপ দেয় না। রঙের মধ্যে নীল রঙের প্রতি একটু বেশী ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। শুধু রঙের প্রয়োগে ছবি তৈরী যাতে রেখা নেই বললেই চলে, তেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে একমাত্র "চাঁদ" (১২নং) একটি প্রশংসনীয় সৃষ্টি। শিল্পীর মৌলিকত্ব এখনও তেমনভাবে ফোটেনি কোন ছবিতেই, তবে যথেষ্ট সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রদর্শনীটি আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকবে।

* * *

গত সপ্তাহে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ বম্বের সমকালীন শিল্পী অভয় খাটাওর চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বম্বেতে অভয় খাটাওর নাম খুব। এক সময়ে সেখানকার বড় বড় সমালোচকেরা এঁকে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

অভয় খাটাওর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচুর প্রশংসা পেয়ে ইনি বেরিয়ে পড়েন দেশভ্রমণে। সঙ্গীতের দিকেও এঁর ঝোঁক আছে, তাই বিভিন্ন দেশের ব্যালে, ব্যালেরিনাদের পোশাক, তাদের অঙ্গভঙ্গী এঁকে আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশী। এঁর রচনার বিষয়বস্তু বহুবিধ। বিভিন্ন দেশের সমকালীন চিত্রকলার প্রভাব থাকলেও

সৌরাষ্ট্র চাষী শ্রীঅভয় খাটাও

শিল্পী নিজের দেশকে অস্বীকার করেননি কখনও—বরং সবার ওপরেই রেখেছেন এবং সব রচনাতেই লক্ষ্য করা যায় পাশ্চাত্তোর দ্বিমাত্রিক চরিত্র। বেশ গাঢ় বর্ণের প্রতি এঁর ঝোঁক। আফ্রিকার আদিম শিল্পের অনুসরণে রচিত চিত্রগুলির আবেদন আমার মনে হয় সর্বাপেক্ষা প্রবল। কিছু রচনায়, যেমন 'রাবণ ও সীতা', 'যশোদা এবং কৃষ্ণ' প্রভৃতি রচনায় নন্দলাল বসুর প্রভাবটা খুব প্রবল। শৈশবে অভয় খাটাও থাকেন পুলিনবিহারী দত্তের শিক্ষাধীনে; মনে হয় সেই কারণেই নন্দলালের প্রভাব পড়েছে এঁর রচনায়।

বম্বের বিখ্যাত খাটাও পরিবারে এঁর জন্ম এবং উত্তিওর মত এঁরও মায়ের কাছেই সর্বপ্রথম শিল্পশিক্ষা শুরু হয়। কলকাতায় এঁর একক প্রদর্শনী এই প্রথম হলেও বম্বে, দিল্লী, কলোম্বো, রোম প্রভৃতি শহরে এঁর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে একাধিকবার। প্রদর্শনীটি কলকাতার শিল্পানুরাগীদের প্রশংসা লাভ করেছে।

শার্ঙ্গদেব

রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার

সম্প্রতি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেননা বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে এখনো যে খুব ভাল ধারণা আছে তা মনে হয় না, বাইরের জগতের কথা ছেড়েই দিলাম কেননা তাদের পক্ষে আমাদের সংগীতকেই বোঝা শক্ত। কিন্তু গোড়াতেই প্রচার বলতে আমরা কী বুঝি সেটা স্পষ্ট করে বলা দরকার। প্রচার শব্দটার সংগে মিশনারিদের কার্যাবলীর খুব মিল আছে। সংগীতের ক্ষেত্রে যেন তেন-ভাবে এই প্রচার হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। অবাঙালীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শোনবার জিদটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতকে সকলের মর্মংগম করা। কেন রবীন্দ্র-সংগীত মহৎ সেইটা বুঝিয়ে দেওয়া। তা না হলে যে প্রচার হবে তা সাময়িক আবার দুদিন বাদে উচ্ছ্বাসটা কেটে গেলে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আকর্ষণ থাকবে না। ভীমরাও শাস্ত্রী রবীন্দ্রসংগীতের এই মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তাই তিনি আজীবন রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা করে গেছেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় একজন মারাঠী তরুণ শান্তিনিকেতনে থাকতেন। তিনি চমৎকার বাংলা আয়ত্ত করেছিলেন এবং বাংলা ভাষায় দখল হবার পর তিনি রবীন্দ্রসংগীতকে প্রকৃত ভালবাসতে শিখলেন। এই যে উপলব্ধি এর গৌরব সবচেয়ে বড় অর্থাৎ ইনটেলেক্ট দিয়ে বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা যাঁরা বাংলা জানেন না তাঁদের রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং সুরের মর্ম গ্রহণ করতে হবে—এই গ্রহণ করানটাই আমাদের দায়িত্ব।

দীর্ঘদিন কাব্যসংগীতের শ্রীবৃদ্ধির ফলে বাঙালীদের পক্ষে কাব্য এবং সংগীতের সম্পর্ক কত নিবিড় এবং কত বিচিত্র হতে পারে তা বোঝা সম্ভব হয়েছে। আবার কথার তাৎপর্য যেখানে গভীর নয়—সেখানে সুরের মধ্য দিয়ে সাধারণকে অসাধারণ করে তোলার প্রচেষ্টার সংগেও বাঙালীর যথেষ্ট পরিচয় আছে। অর্থাৎ হিন্দী-রাগসংগীতের চর্চাও বাংলাদেশে প্রচুর হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। উভয় ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার ফলে বাংলায় সংগীতের নবরূপায়ণ যেভাবে হতে পারে অন্যত্র সেভাবে হওয়া হয়ত সম্ভব নয়। এই কারণেই রবীন্দ্রসংগীতকে বাংলা যেমনভাবে উপলব্ধি করতে পারে অন্য দেশ তেমনভাবে পারে না; কিন্তু যখন পারবে তখন সেখানেও কাব্যসংগীতের নতুন চিন্তা জাগ্রত হবে এবং নবরূপায়ন সম্ভব হবে। এইখানে প্রসংগত একটা কথা বলি,—হিন্দী রাগসংগীত সাধারণভাবে কথার দিক দিয়ে দরিদ্র এমন ধারণা বাঙালীদের মধ্যে অনেকের আছে। এই ধারণা সর্বৈব সত্য নয় এবং হিন্দী রাগসংগীতের সাহিত্যের দিকটা আমরা এতদিন অনুধাবন করে দেখিনি এইটাও গৌরবের বিষয় নয়। বস্তুত এক সদারঙ্গের নামাঙ্কিত খেয়াল গানগুলি বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে তাতে এমন কত বস্তু রয়েছে যার সাহিত্যিক উপাদান সমাদরের যোগ্য। বিশেষ করে খেয়াল গানে বহু ক্ষেত্রেই কাব্য এবং সাহিত্যের স্বাদ অপূর্ব হয়ে উঠেছে। যে সময়ে হিন্দী খেয়ালের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সে সময়ে ভারতের অধিকাংশ অংশেই কাব্যসংগীত পরিকল্পিত হয়নি। কিন্তু রাগসংগীতের সর্বাধিক প্রভাবের ফলে খেয়ালে কাব্যের দিকটা কাব্যসংগীতের মত করে তুলে ধরা

হয়নি—কথাকে বিস্তারের অবলম্বন স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। এই কারণে কাব্য-গুণসম্পন্ন খেয়াল গান এবং বিশেষত্ব বর্জিত খেয়াল গান—একভাবেই গাওয়া হয়ে এসেছে, আর কেবলমাত্র গায়নবৈশিষ্টেই তাদের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। ফলে যাতে কাব্যগুণ আছে তা আপনা থেকেই মনোহর হয়ে উঠেছে আর যাতে কাব্যের উৎকর্ষ ছিল না রাগসংগীতের আরোপে তা ভাবসমন্বিত হয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে সমুন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে সংগীতকে সাধারণত এইভাবেই দেখা হয় তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষা পেলে অনেকে তানবিস্তার সহযোগে তাকে রূপায়িত করে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে বলে মনে করেন। এমন কি কলকাতাতেও কেউ কেউ এইভাবে গেয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি সুবিচার করছেন বলেই বিশ্বাস করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, বাহিরবাংলায় রবীন্দ্র-সংগীত প্রচারের সময় আমাদের সেটি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। এটি করতে গেলে হিন্দী এবং অপর ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন। অবাঙালীদের মধ্যে যেসব সুধীজনের রবীন্দ্রসংগীতের মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁদের আমরা অনুরোধ করব তাঁদের ভাষায় রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনার সূত্রপাত করুন। বিশ্ব-ভারতীর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধীয় আলোচনার গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হতে পারেন—এতে সর্বত্র রবীন্দ্র-সংগীতের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

ভারতীয় সংগীতের প্রকাশ ঘটেছে তান-বিস্তারে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রূপকল্পের দিক দিয়ে এই চিরাচরিত তানবিস্তারের পদ্ধতি গ্রহণ করলেন না। কেন গ্রহণ করলেন না, এটা যাঁরা তান-বিস্তারের আশ্রয়ে সাংগীতিক জীবন যাপন করে এসেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ কথার সঙ্গে মানিয়ে প্রস্তুত করেছেন ছোট ছোট সুরের অলংকার। তাঁর কাব্যের সুরম্য পরিবেশও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সেই কাব্যলোকের পথ, ঘাট, উপবন, সরোবর সব তিনি নিজেই নির্ণয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সুদক্ষ শিল্পী মনের চিন্তাধারাকে পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারলেই যাঁরা এভাবে সংগীতকে বোধ করতে সক্ষম নন তাঁদের কাছে রবীন্দ্র-সংগীতের সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্যকভাবে প্রতিভাত হবে।

কয়েক বৎসর পূর্বে একটি ইংরেজী দৈনিকে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে একটা তীব্র আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনেকের সেই সব চিঠিপত্রের কথা মনে পড়তে পারে। সেই সময় আমার বার বার মনে হয়েছিল এটা ঘটেছে প্রকৃত অ্যাপ্রিসিয়েসন বা তাৎপর্য নির্ধারণের অভাবে। বহির্বাংলার অধিবাসীরা যখন একটি রবীন্দ্রসংগীত শোনেন তখন তাতে চিরাচরিত রাগসংগীতসম্মত গায়নপদ্ধতির অভাবটা তাঁরা বিশেষভাবেই অনুভব করেন। তখনই তাঁদের কাছে মনে হয় এ গান তো খুব সাদামাটা এ নিয়ে বাঙালীরা এত মাতামাতি করে কেন!—এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য পরিশ্রম করবেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। বেশীর ভাগ লোকেই মনে করেন বাঙালীরা রাগসংগীতে কাঁচা তাই তারা গানকে সহজভাবে গাইতে পারলে বা শুনতে পেলেই খুসী হয় আর এই সহজ গান নিয়ে হৈচৈ করাটা নিছক উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘজীবন নানাভাবে এই সহজ হবার সাধনা করে এসেছেন এবং সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য যে সহজের মধ্যেই রয়েছে- আর সুরের বিচিত্র লীলা যে প্রকৃতির মত সহজে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সে খবর রাগসংগীতের চোখধাঁধানো চাকচিক্যে অভ্যস্তদের কাছে ধরা পড়াটাও শক্ত।

অবাঙালীর মধ্যে যাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছেন বা বাংলার ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের মাধুর্য উপভোগ করেছেন—তাঁরা জানেন কেন রবীন্দ্রসংগীত বিশ্বের মহৎসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা এ পরিচয় পাননি রবীন্দ্রসংগীতকে তাঁদের গোচর করতে হলে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে ফল হবে না, রবীন্দ্রনাথের এস্থেটিক চিন্তাকে তাঁদের কাছে উদ্ঘাটিত করতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে উপভোগ করতে পারলে ভারতীয় সংগীতে চিন্তার নব নব উন্মেষ সম্ভব। প্রচারের এই গুরুদায়িত্বকেই আমাদের স্বীকার করতে হবে।

বিদুর

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুণ্য-কীর্তি পুরুষ। ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে তিনি অন্যতম অগ্রগণ্য পণ্ডিত হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও বঙ্গসাহিত্যের এমন সর্বগুণসম্পন্ন সাধক দুর্লভ। সম্প্রতি কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে হরপ্রসাদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেনে আমরা আনন্দিত। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও আরো প্রাচীন-কালের বহু নিদর্শন, পাথর এই সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে; উপরন্তু কুশান যুগের কিছু মুদ্রা এবং চব্বিশ পরগণা থেকে প্রাপ্ত পুরোনো আমলের মৃৎ-শিল্পের কিছু নমুনা এখানে রাখা হয়েছে। প্রাচ্য-বিদ্যা সম্পর্কে উৎসাহীরা এই সংগ্রহশালার দ্বারা উপকৃত হবেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানা বিষয় চর্চা করেছেন। কিন্তু প্রধানত তাঁর চর্চার বিষয় ছিল : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃত কাব্য সমালোচনা, বৌদ্ধধর্ম। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও তার মর্মোদ্ধার শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ কর্মকুশলতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'-ই হরপ্রসাদের সাহিত্য চর্চার শুরু। তিনি বঙ্কিমের যোগ্য শিষ্যরূপে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন; অপরদিকে প্রবীণ প্রাচ্যবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযোগিতা তাঁকে প্রাচ্য-চর্চায় আকর্ষণ করে। মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনের পর থেকেই হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি-সংগ্রহ-কার্যের পরিচালক-রূপে নিযুক্ত হন। তদবধি সারা জীবনই তাঁকে পুঁথি সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন পুঁথি সংগ্রহার্থে, নেপালের মতন দূর দেশেও তাঁকে একাধিকবার যেতে হয়েছিল। বাংলা পুঁথি আবিষ্কার করে হরপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তার জন্য বঙ্গবাসী তাঁর কাছে ঋণী। হাজার বছরের পুরোনো বাঙলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা (চর্যাপদ-গুলি যার অন্যতম) আবিষ্কার তাঁর অপর এক কীর্তি।

রবীন্দ্রনাথ এই মনীষীকে সম্মান জানিয়ে বলেছিলেন : "অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না... হরপ্রসাদ,...জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে পেরে-ছিলেন।"

বঙ্গভাষার চর্চায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ছিল : "বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব, তাহাই বাঙ্গলা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব ?" অবশ্য নয়। তাই তিনি বৌদ্ধস্তোত্র সংস্কৃত একটু সহজ নাগাল দেবার চেষ্টাকেও যেমন বাংলা ভাষা বলে মানতে রাজী ছিলেন না, তেমনি বড় রাস্তাকে 'রাজমার্গ', বাঁশ বয়ে নিয়ে যাওয়াকে 'বংশ পরিচালনা' বলতে রাজী হননি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গলা রচনা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র পরিহাস করে বলেছিলেন, সংস্কৃত কলেজ থেকে এমন বাঙ্গলা কি করে বেরিয়ে এল ? সম্ভবত, পরবর্তীকালের অন্যান্য বহু মনীষী ভেবেছিলেন, সংস্কৃতের প্রাচীন রুদ্ররুক্ষ শুষ্ক আবহাওয়া থেকে এমন বাঙালী কি করে বেরিয়ে এল যিনি প্রাচীনের চর্চা করেন বলেই পাশ্চাৎমুখী নন, শোধনবাদী এবং আধুনিক, যিনি বঙ্গ-ভাষার অকৃত্রিম সাধক, সহস্রবার যিনি বলেছেন : যাহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে তাহাদের আশীর্বাদ করি।

রুশ কবি

'বেটার এ রেভলুসান দ্যান এ পোয়েট।' কবির চেয়ে বুঝি বিপ্লবই ভাল ছিল। মস্কো শহরের জনৈক পুলিসের এমন বাক্য শুনে আমার কিছু পুরোনো কথা মনে পড়ছে। পাঁচ সাত বছর আগে কলকাতার রাস্তায় কিছু তরুণ কবি 'কবিতা পড়ো' ডাক দিয়ে মিছিল তুলে পথে পথে ঘুরেছিলেন। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কোনো একদিনের 'কবি-মিছিলে' আমি কবিবন্ধুদের সঙ্গে ছিলাম তবে পুরোভাগে নয়, সর্বপশ্চাতে মুখ লুকিয়ে। এর কারণ এই নয় যে, আমি কবিতা লিখি না। আমার ভয় ছিল, কলেজ স্ট্রীটের জনারণ্যে অপরাহ্ন-বেলায় অনেক মজাদার লোক যদি বা এই অদ্ভুত মিছিলে মজা পেয়ে ঢিল নাও বা ছোঁড়েন কোনো পুলিস গাড়ি নিশ্চয় পিছু নেবে। পুলিসে আমার অতীব ভয়। পুলিস

কবিতা বোঝে কি বোঝে না, জানি না, মিছিল বোঝে। ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ, সেদিন সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বসে, ভীত পারাবতের পরীষে লিপ্ত হয়ে যেসব কবি কাব্যপাঠ করেছিলেন তাঁদের জন্য পুলিসের রথ আসে নি। পথ-চলতি-লোক থমকে দাঁড়িয়েছে, ট্রাম বাসের জানালা দিয়ে লোকে গলা বাড়িয়েছে এবং কলকাতা শহরের এই কবি-মিছিলকে উন্মাদের কর্ম বলে গণ্য করেছে।

মস্কো কলকাতা নয়। সেখানে সিনেট হল আছে কিনা জানি না। হাতের কাছে যে সংবাদটুকু রয়েছে তাতে দেখছি, মায়াকভোস্কি স্কোয়ারে পাঁচ হাজার কাব্যপ্রেমিক জমায়েত হয়েছেন ইভজেনি য়েভতুসেংকো (Evgeny Yevtushenko)-র লেখা কিছু নতুন কবিতা শুনতে। কবির কবিতা পাঠ চলছে এবং সেই পাঁচ হাজার শ্রোতা ঘন ঘন চিৎকার করে বাহবা দিচ্ছেন কবিকে। আনন্দ হর্ষ উত্তেজনার সে-দৃশ্য পাঠক কল্পনা করে নিতে পারবেন। কিন্তু এমন দৃশ্য কল্পনাতীত, কাব্যপ্রেমের উচ্ছ্বাসবশে কবির বসনভূষণ ছিঁড়ে নিচ্ছে শ্রোতারা, টানা হেঁচড়া করছে কবিকে, চুমু খাচ্ছে, বলছে, তোমার জন্যে প্রাণমন দিয়ে দিলাম। ফলে হৈ হট্টগোলে ভিড়ে পথঘাট বন্ধ, যানবাহন গতিহীন, ট্রাফিক পুলিস গলদঘর্ম, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ক্ষেপে গিয়ে বলছে : "বেটারা এ রেভলুসোন দ্যান এ পোয়েট।"

এমন অঘটন কলকাতায় কি ঘটবে কোনোদিন? পাঁচ হাজার শ্রোতা কি জুটবে কোনো পার্কে বা মাঠে? যদি বা জোটে কবিরা কি তাঁদের ধুতি পাঞ্জাবী ছিঁড়তে দেবেন?

মস্কোবাসীর এই কাব্যপ্রেম সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ জেনে রাখা দরকার। ইভজেনি য়েভতুসেংকো কোনো প্রখ্যাত কবি নন, তরুণ নবীন কবি। অধুনা রাশিয়ায় যে ছ সাত জন "রাগী কবি ছোকরা" দেখা দিয়েছে তাঁদের অন্যতম। সমাচার বলছে, আজকাল মস্কো শহরের হালচাল এই রকম, যে কোনো কবি তাঁর কাব্যপাঠ শুনিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি ঘোড়া রাস্তাঘাট বন্ধ করে রেখে দিতে পারে। ১৯৫৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে স্ট্যালিনের প্রেতমূর্তির বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভ তাঁর আক্রমণ শুরু করার পর, রাশিয়ায় কবিরা যেন বিদ্রোহের সংগত প্রতিভূ হিসাবে ক্রমে দেখা দিচ্ছেন। এই বিদ্রোহ অবশ্য সোভিয়েট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, কারণ ক্রুশ্চেভ সেখানে হাত দেননি, কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্বের অনেক কুফল, ক্রুশ্চেভ যার সমালোচনা করেছেন তীব্রভাবে, কবিরা সংগত ভাবে তারই আওতায় আছেন।

সুখের কথা, রাশিয়ায় ইদানীং গীতি কবিতা, ছোট ছোট কবিতা, নব-অর্থে লিখিত কাব্য ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পত্রিকায়, সংবাদপত্রে এগুলি নিয়মিত ছাপা হচ্ছে। প্রকাশ্যে পঠিত হয় বার বার। সরকারী নির্দেশ মত তৈরী করা সাহিত্য-ফর্মুলার প্রতি অপরিসীম উপেক্ষা নতুন কবিদের। তারা আর কারখানা আর ট্রাক্টারের গুণগানে মুখর নয়। কবিরা, কী আশ্চর্য, রাশিয়ার কবিরা এখন প্রেমের জয়গান করে কবিতা লিখছে, কবিতা লিখছে মানুষের অনুভব অনুভূতির।

অরণ্যে রোদন

শেষ পর্যন্ত লেখকের বিচার প্রকাশকের বই বিক্রির খাতায়। বাংলা দেশে নয়, সর্বত্র। হয়ত উনিশ বিশ তফাত। ওরা আরও একটু সদয়, সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ বেশী পালিশ পেয়েছে। আমরা পাইনি।

এক ইংরেজ লেখক বড় দুঃখে আরেক কবিকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, বন্ধু দুঃখ করো না, আমিও তোমার দলে। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্যে তুমি লণ্ডনের প্রকাশক পাড়ায় পত্রের পর পত্র দিয়েছ, প্রত্যাখ্যাত হয়েছ; শত প্রত্যাখ্যান পত্রের পর তোমার মন ভেঙে গেছে, তুমি পত্রিকায় চিঠি লিখে মর্মব্যথা জানিয়েছ। কিন্তু আমারও সেই অবস্থা, আমার কাছেও শতাধিক ফেরত-চিঠি আছে।

আমার নাম এনটনি এলিঅট। আমেরিকা, কানাডা, বেলজিয়াম, ডেনমার্কে আমার অনেক কবিতা প্রকাশ পেয়েছে, ছ' ছটি কবিতা সংকলনে আমার কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কি, আমি কোনো প্রকাশক পাইনি।

সাহিত্যের যাঁরা দ্বাররক্ষী তাঁরা আমায় উৎসাহ দিয়েছেন বিস্তর, কিন্তু আমার লেখার বাজার দর নেই বলে কোনো বই কেউ ছাপেননি। তাঁদের সহৃদয় মন্তব্যের কিছু নমুনা দিলাম।

এক প্রকাশক লিখেছেন : লেখক হিসেবে আপনার প্রতিভা আমাদের পাঠকরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু......

অন্য প্রকাশকের কথা : আপনি যে প্রতিভাবান সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই :

আর এক সাম্প্রতিক প্রকাশক লিখেছেন : আপনার উপন্যাসটি সুলিখিত, খুবই আকর্ষণযোগ্য; আমাদের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে সময় লাগল। শেষ সম্পাদক বৈঠকে সকলে আমরা একমত হতে পারলাম না, কাজেই আপনার উপন্যাস ছাপা সম্ভব হল না। আমার নিজের ধারণা, আপনার উপন্যাসে চরিত্রগুলির সম্পর্ক সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। আরও অনেক জিনিস আছে যা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু খুবই দুঃখিত, কিছু করা গেল না।

এনটনি অতঃপর বলেছেন : কত ভাল হলে তবে প্রকাশকরা বই ছাপেন আমি জানি না। জানার বাসনায় লাইব্রেরীতে গিয়ে সদ্য প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ তুলে নিয়ে পাতা উলটেছি। দেখলাম, কোনো সিক্ত বিকেলে এইসব বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখে বলে বলে এক নাগাড়ে লিখিয়ে নেওয়া যায়।

কবি এনটনি উপন্যাস লিখেও বাজার পাননি। আমাদের বাঙালী তরুণ কবিরা কি লিখবেন আমি জানি না, বোধ হয় উপন্যাস। একই হাল হবে।

উপন্যাস

প্রতিধ্বনি ফেরে। প্রেমেন্দ্র মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা ৯। চার টাকা।

দীর্ঘকাল পরে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন উপন্যাস 'প্রতিধ্বনি ফেরে' হাতে এলো। রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী লেখকদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র, যাঁর গ্রন্থ পাঠ করে পাঠককে, বিশেষত সমালোচকদের পড়তে হয় দ্বিধায়, অনেক ভেবেচিন্তেও প্রযোজ্য কোনো মন্তব্য বা বিশেষণ সহজে মনে আসে না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রায় একই ধরনের—কিঞ্চিৎ অস্থির ও রহস্যময়, কিন্তু ভিতরে তাকালে দেখি মানসিকতায় তারা আদ্যন্ত পরিবর্তিত, এবং সে-পরিবর্তন এত বেশি সূক্ষ্ম যে, যে-মুহূর্তে একটি চরিত্র সম্পর্কে মনে যা-হোক একটি ধারণা জন্ম নেয়, পর-মুহূর্তেই নতুন মোচড়ে সে-ধারণার মৃত্যু ঘটে। বলা বাহুল্য, এই বিপর্যয় এড়িয়ে গেলে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হয় না। অবশ্য 'প্রতিধ্বনি ফেরে' নামকরণে লেখক পাঠকের কিছুটা সুবিধে ক'রে দিয়েছেন; ফলে এক উদ্‌ভ্রান্ত যুগের প্রতীক, ছিন্নমূল, উপন্যাসের রহস্যময় চরিত্রগুলির লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেকটা সহজ হয়ে আসে।

উল্লিখিত বক্তব্য মনে রেখে আরো একটি মন্তব্য সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখকও তাঁর সমস্ত চিন্তার সঙ্গে পরিবর্তিত হবে, এটা স্বাভাবিক। প্রেমেন্দ্রবাবুর বিষয়বস্তু—কি কথাসাহিত্যে, কি কবিতায়—গত এক দশকের বিবর্তনে নতুন রূপ গ্রহণ করেছিল, তা তাঁর অনুরাগী ও সচেতন পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়েছিল। বছর কয়েক আগে প্রকাশিত, তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মৌসুমী'-তে যে লেখক এক বেদনা-বিহ্বল, কিঞ্চিৎ আবেগমধুর রোমান্টিক বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; সেই লেখকই পরবর্তী উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আবির্ভূত হবেন, একদিকে তা যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনি সুখকর ও শ্রদ্ধেয়। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে-লেখককে আমরা প্রায় হারাতে বসেছিলুম, নতুন ক'রে তাঁকে আবিষ্কার করার আনন্দ এই উপন্যাসের পাঠককে যে বশীভূত করবে, তা সুনিশ্চিত।

'প্রতিধ্বনি ফেরে', সংক্ষেপে, বিপ্লবী উমাপতি ঘোষালের কাহিনী। সূর্যকণার সঙ্গে তুলনীয় উমাপতি তার ব্যক্তিত্বের ধর্মে হঠাৎ উদ্ভাসিত হ'য়ে, তার আশেপাশের

কয়েকটি নারী ও পুরুষকে জড়িয়ে দিয়ে, হারিয়ে গেল বিস্মৃতির মধ্যে। সেই উমাপতির স্মৃতিসভায় তাঁর সম্পর্কে জানবার কৌতূহল নিয়ে গিয়েছিল সাংবাদিক অসীম রাহা। স্মৃতিসভা; কিন্তু উমাপতির সংস্পর্শে এসেছিল, এমন কয়েকজন ছাড়া, এ-সভার স্বল্প জনসমাবেশ দেখে উমাপতির আগুন স্পর্শ করা যায় না। এই ক্ষোভ শাণিত হয়েছে নিশীথ পাত্রের বক্তৃতায়: 'মুষ্টিমেয় ক'টি অনুরাগী আজ এই দীন সভায় উমাপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি জানাতে যে সমবেত হয়েছে এটা ভাগ্যের পরিহাস আমি মনে করি না; এ পরিহাস উমাপতির নিজেরই: পরিহাস আমাদের সঙ্গে, এই যুগের সঙ্গে, মূঢ় উদাসীন জনসমাজের সঙ্গে। ......এক আশ্চর্য-মিছিলের মশাল সে জ্বালাতে চেয়েছিল, তা পারেনি বলে নিজের শিখায় নিজেকেই সে ভস্মীভূত করে গেছে। কোন চিহ্ন যেন তার কোথাও না থাকে।' নিশীথবাবুর কথা সত্য হ'তে পারে; কিন্তু জয়ার মনের মধ্যে এর প্রতিবাদ উত্থিত হয়। উমাপতিকে জানা কি অতই সহজ! জয়ার নিস্তাপ স্মৃতির রোমন্থনে উমাপতির অতীত পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। উমাপতির রহস্য যেন জয়া এবং নীরজাদেবী, মলি, বিপিন ঘোষ, রামবাবু সকলকেই গভীর রহস্যের মধ্যে টেনে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অসীমের কাছেও উমাপতির ব্যর্থতার কাহিনী প্রশ্ন হ'য়ে রইল।

'প্রতিধ্বনি ফেরে' তার সমৃদ্ধ সম্পদ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে সম্মানিত হবে। শুধু প্রেমেন্দ্রবাবুরই নয়, এই উপন্যাস সম্প্রতি-কালে প্রকাশিত বিবর্ণ সাহিত্য তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

৬৫২।৬১

গল্পগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠগল্প। সৈয়দ মুজতবা আলী। বাক্‌ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। চার টাকা।

নাম 'শ্রেষ্ঠ-গল্প'; তার উপর লেখক স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী; যিনি প্রিয় লেখকদের অন্যতম। অবশ্য বইয়ের বিক্রির মধ্যে লেখকের গুণপনার পরিচয় লুকিয়ে থাকে না, বাংলা দেশে তো নয়ই। তবু প্রায় নিশ্চিতরূপেই বলা যায়, আলী সাহেবের বর্তমান গ্রন্থটি হাতে পেয়ে তাঁর অনুরাগী পাঠকমাত্রেই উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত হবেন। কেননা, মুজতবা আলী সেই বিরল সংখ্যকদের মধ্যে বিরাজ করেন, পাঠকদের বশীভূত করার ক্ষমতা যাঁদের অপরিসীম; যাঁরা, সাঁতার কাটতে, পুলকিত পাঠকসত্তার পরতে পরতে মুহূর্তে সময়ে মিশে যেতে পারেন। অনাবিল হাস্যরসের সঙ্গে শাণিত বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে অত্যন্ত সহজে তিনি যা পরিবেশন করেন, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে মেলে না। 'শ্রেষ্ঠগল্প' হাতে নিয়েও সে-কথা মনে হলো।

এই সংকলনে আলী সাহেবের বারোটি রচনা স্থান পেয়েছে। 'নোনাজল' গল্পটি বিষয়ের সারবত্তার গুণে অসাধারণ। শুধু তা নয়, অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রচনাগুলির সঙ্গে এই গল্পটির সাদৃশ্য কম; জাহাজের খালাসিদের জীবনের একটি বিষাদাচ্ছন্ন করুণ আলেখ্য পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে:

প্রমথনাথ বিশীর
অনেক আগে অনেক দূরে ৪৲ **কেরী সাহেবের মুন্সী** ৮৷৷৹ **গল্প পঞ্চাশৎ** ৮৲ **নিকৃষ্ট গল্প** ৫৲ **ভূতপূর্ব স্বামী** (নাঃ) ২৲ **মাইকেল মধুসূদন** ৪৲ **রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ** ১ম ৫৲ ২য় ৫৲ **রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প** ৫৲ **রবীন্দ্রসরণি** (যন্ত্রস্থ)

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ৬৷৷৹ ২য় ৬৷৷৹ **প্রাণকুমার** ৬৷৷৹

প্রাণতোষ ঘটকের
বাসকসজ্জিকা ৪৲

প্রেমচাঁদের
প্রেমচাঁদের গল্প ২৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ধূলিধূসর ৩৲ **পা বাড়ালেই রাস্তা** ৪৲ **বেনামী বন্দর** ২৲

বনফুলের
রচনাসংগ্রহ ৭৷৷৹

বাণী রায়ের
বর্ষাবিজয় ৩৲ **প্রেম** ৪৲ **রঞ্জনরশ্মি** ২৷৷৹

বিক্রমাদিত্যের
দিল্লীর ডাকে ৩৷৷৹

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
সমীক্ষা ৫৲

বিভিন্ন লেখকের রচনা সংকলন
আমার প্রিয় গল্প ৫৲
নবজীবনের প্রান্তে ৩৲
কুমুদকাব্য-পরিচিতি ৩৲

বিভিন্ন কবির
ঐ ক তা ন ২৷৷৹

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের
অভিযাত্রিক ৪৷৷৹ **আদর্শ হিন্দু হোটেল** (উপন্যাস ৪৷৷৹ নাটক ২৲) **আরণ্যক** ৫৲ **উৎকর্ণ** ৪৲ **কিন্নর দল** ৩৲ **কুশল পাহাড়ী** ৪৷৷৹ **গল্প পঞ্চাশৎ** ৯৲ **দেবযান** ৫৲ **পথের পাঁচালী** ৫৷৷৹ **মুখোশ ও মুখশ্রী** ৩৷৹ **মেঘমল্লার** ৩৷৷৹ **যাত্রাবদল** ২৷৹ **লবটুলিয়ার কাহিনী** ২৷৷৹

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম ১৬৲

বিমল করের
খোয়াই ৩৲

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)র
মায়ের বাঁশী ৪৷৷৹

বিশ্বপতি চৌধুরীর
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৷৷৹

বিহারীলাল গোস্বামীর
কুমারসম্ভব ৩৷৷৹

ভূপেন্দ্রমোহন সরকারের
জমি শিকড় আকাশ ২৲

মণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের
অমৃত কন্যা ৩৷৷৹ **পরিশোধ** ৪৷৷৹

মনোজ বসুর
বন কেটে বসত ৯৲
গল্পপঞ্চাশৎ ৯৲

মহাত্মা গান্ধীর
আমার ধ্যানের ভারত ৩৲
ছাত্রদের প্রতি ৪৷৷৹

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
অনুপূর্বা ৬৲

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
কাব্যমালঞ্চ ৫৲

রমেশচন্দ্র সেনের
গৌরীগ্রাম ৫৲
মালঙ্গীর কথা ৪৷৷৹

রাজশেখর বসুর
চলচ্চিন্তা ৩৲

রামনাথ বিশ্বাসের
জার্মানী ও মধ্য ইউরোপ ৩৷৷৹
পৃথিবীর পথে ৪৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
জীবন জাহ্নবী ৫৷৷৹

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কথাচিত্র ৬৲ **কবি ও অকবি** ৩৷৹ **গল্প পঞ্চাশৎ** ৮৲ **নয়ান বৌ** ৫৷৷৹ **মিলনান্তক** ৪৷৹ **সরস গল্প** ৫৷৷৹

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এই তীর্থ ৩৷৷৹

ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের
নিরীক্ষা ৪৲ **টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ** ৪৲

শশিশেখর বসুর
যা দেখেছি যা শুনেছি ৩৷৷৹

ডঃ শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬৲

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভারত ও বর্তমান মহাযুদ্ধ ২৲

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কুহু ও কেকা ৬৲
বেণু ও বীণা ৪৲

সন্তোষকুমার ঘোষের
রেণু তোমার মন ২৷৷৹

সরলাবালা সরকারের
সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ৩৷৷৹

সুনির্মল বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪৲

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
চরিত্র সংগ্রহ ২৷৹ **ভারতীয় সংস্কৃতি** ৫৲ **পশ্চিমের যাত্রী** ৫৲

সুবাদার সীতারাম
সিপাহী থেকে সুবাদার ৩৲

সুমথনাথ ঘোষের
অহল্যার স্বর্গ ৩৲ **ছায়াসঙ্গিনী** ২৷৹ **জটিলতা** ২৷৹ **জায়া ও জননী** ৫৲ **দিগন্তের ডাক** ৩৲ **নীলাঞ্জনা** ৭৲ **পরপূর্বা** ৪৷৷৹ **মর্নাবানময়** ২৷৹ **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫৲ **সর্বংসহা** ৫৲

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের
কাব্যবিচার ৬৲ **দার্শনিকী** ৪৲ **রবিদীপিতা** ৫৷৷৹ **ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা** ৩৲

ডঃ সুশীলকুমার দের
নানা নিবন্ধ ৫৷৷৹

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
শরৎ নাট্য সম্ভার ৮৲

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের
লীলাভূমি ৫৲

হরপ্রসাদ মিত্রের
সাহিত্য পরিক্রমা ২৷৷৹

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

দিয়ে ভাগ্য ও ঈশ্বরের নির্দয়তার বিরুদ্ধে 'অক্ষম' প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে হারিয়ে যায় নোনাজলের গর্ভে। সৈয়দ সাহেবের সার্থক সৃষ্টি, এই গল্পটি আমাদের সাহিত্যের স্মরণীয় সম্পদ বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে আছে, বিষের বিষ, সুর, ত্রিমূর্তি, বেঁচে থাকো সর্দি কাশি ও গাঁজা-র মতো নির্মল কৌতুক কাহিনী—আড্ডার মেজাজে লেখা এই গল্পগুলি বার বার পড়েও পুনর্বার পড়তে ইচ্ছা করে, ব্যবহারে পুরনো হয়ে যায় না। 'বিষের বিষ' গল্পটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। আগা আহমদ ও তার বৌ মালিকা খানমকে নিয়ে রূপকথার ধরনে যে কাহিনীটি পরিবেশিত হয়েছে, তা পড়তে পড়তে হাস্য রোধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

স্বল্প পরিসরে প্রতিটি গল্পের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নয়। তথাপি, সংকলন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। প্রকাশক লেখকের কয়েকটি গল্প গ্রন্থবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, একজন প্রথম শ্রেণীর সুরসিক লেখক প্রসঙ্গে, অন্তত এইরকম সংকলনে, একটি ভূমিকা যোগ করলে কি ক্ষতি ছিলো! আর কিছু না হোক, গ্রন্থটি তাহলে সম্পূর্ণ হতো। পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধন করলে খুশি হবো। 'শ্রেষ্ঠগল্প' সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করবে।

৭।৬২

পত্রিকা

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ—সম্পাদক শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য। মার্টিন বার্ন কর্মচারী রবীন্দ্র শতবার্ষিক কমিটি কর্তৃক ১২ মিশন রো, কলিকাতা-১।

বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অসংখ্য স্মারক-পত্র প্রকাশ দেশের সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার কথাই প্রকাশ করে। আলোচ্য প্রকাশনটি তারই একটি সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত। বাংলা ও ইংরাজিতে বিশিষ্টজনের রচনা সংকলন, যার মধ্যে এদেশের সঙ্গে বহু বিদেশী মনীষীরও রচনা একত্রে পাওয়া যায়। কর্মীদের লেখা মৌলিক প্রবন্ধও কতকগুলি আছে। বহু চিত্রশোভিত এই স্মারক সংকলনখানি সাহিত্যরসিকদের খুশী করবে।

প্রাচী—সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত। ৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। প্রতি সংখ্যা ২৫ নয়া পয়সা।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক 'প্রাচী' প্রবন্ধ ও আলোচনাদির মাধ্যমে বাঙলার বর্তমান চিন্তাধারার প্রতিফলনে যে সচেষ্ট তার পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রথম সংখ্যাখানিতে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে খুব একটা কৃতিত্বের ছাপ না দিলেও পত্রিকাখানিকে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য সাময়িকের মতো উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনাদিও স্থান পেয়েছে। তবে কলেবরের তুলনায় মূল্য কিছু বেশী।

প্রাপ্তি স্বীকার

কথা দিয়েছিলেন—দেব সেনাপতি।

বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০—১৯০০)—আশাদেবী।

বিপুল সুদূর—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পাপী—শ্রীমাধব রায়।

ব্রহ্মাবিদগুরু শ্রীশ্রীভূপতিনাথ সন্নিধানে (২য় ভাগ)—শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী।

সীমান্ত—শ্রীশিশিরকুমার দাশ।

রতি-বিলাপ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর।

আরশি-নগর—রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী।

লগনশুদ্ধ—প্রবোধকুমার সান্যাল।

চন্দ্রশেখর

শিল্পশোভন চিত্রসৃষ্টি

তরুণ রূপকারদের যে-কোন নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস চিত্ররসিকদের প্রসন্ন ঔৎসুক্যের দাবি রাখে। আর প্রয়াসটি যদি সুন্দর হয় তবে অভিনন্দনের বরাভয় তাঁদের প্রাপ্য। যাত্রিক রূপকার-গোষ্ঠী তাঁদের তৃতীয় চিত্রোপহার "কাচের স্বর্গ"-র (চিত্রযুগ নিবেদিত) ভেতর দিয়ে জন-সংবর্ধনার বরলাভের অধিকারী হয়েছেন।

চিত্রকাহিনীর রচয়িতা ও চিত্রনাট্যকারের যুগল দায়িত্বটিও যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী সম্পাদন করেছেন। সংলাপও তাঁদেরই রচনা। চলচ্চিত্রের এই সাহিত্য-অংশের সমুদয় কাজে তাঁরা কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন তা বিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু প্রয়োগ-কর্মে যাত্রিক-গোষ্ঠী যে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন তা যথার্থই অভিনন্দনীয়।

চিত্রকাহিনীর ভাব-কেন্দ্রবিন্দু আশ্রয় করেছে বেঁচে থাকার সংগ্রামে বিভ্রান্ত এক তরুণের জীবনকে। জীবনের স্বপ্ন ও সাধ এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম তাকে কেমন করে পদে পদে মূল্যবোধের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সত্য-মিথ্যার কঠিন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলে তা নিয়েই কাহিনীর রসকণার বিস্তার। আখ্যান-ভাগের এই রস-ভিত্তি রচনায় যাত্রিক-গোষ্ঠী কল্পনাশক্তি ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

কাহিনীর নায়ক অসাধারণ শল্য-চিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জন করে। মফস্বলের এক হাসপাতালে সে চাকুরি পায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত সে, তাই চিকিৎসকরূপে কাজ করবার আইনগত অধিকার তার নেই। তবুও সে চিকিৎসক, খ্যাতিমান সার্জন।

জীবন-সংগ্রামের কোন পর্যায়ে এসে এই মিথ্যা পরিচয়ের আশ্রয় তাকে নিতে হল তা চিত্রনাট্যের প্রথমাংশে বিবৃত। মিথ্যা-পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা তার জীবনকে পলে পলে কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বের তিক্ততায় ভরে তুলল এবং দুর্বলতা ক্ষণে-ক্ষণে তার সত্যবোধকে কেমন করে গ্রাস করে নিল তার মধ্যেই কাহিনীর মনোবীক্ষণ-ভিত্তিক নাট্যরসের বিস্তার। পথভ্রষ্ট নায়ক শেষ পর্যন্ত কী করে জীবনের সুন্দর মূল্য-বোধটি ফিরে পেল এবং আদালতে অপরাধের শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে সমস্ত গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেল তা নিয়েই চিত্র-নাটকের পরিণতি।

কাহিনীর গতি ও পরিণতির পথে

চিত্রযুগের "কাচের স্বর্গ"-র একটি আবেগময় মুহূর্তে কাজল গুপ্ত ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

একাধিক উপকাহিনী গড়ে উঠেছে। অনেক চরিত্র ভিড় করে এসেছে। নায়কের জীবনে মাধুর্যের সুর এনে দিয়েছে এক তরুণী। ভ্রষ্টলগ্নে নায়কের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। একটি মধুমাসের আশায় সে দিন গুনতে থাকে। সে জানে, নায়কের কারাবাসের পর তার জীবনের অন্ধকারার কপাট খুলে যাবে, একদিন তা আলোয় ভরে উঠবে।

চিত্রকাহিনীর মূল রসবিন্দুটি ছবিতে পরিমিতি-জ্ঞানের ভেতর দিয়ে বিনাস্ত করেছেন পরিচালক-গোষ্ঠী। সারা ছবিটি তাঁদের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের এমন একটি

প্রসাদগুণে আলিপ্ত যা অনিবার্যভাবে দর্শকমনকে আকর্ষণ করে। ছবির যে আখ্যান-অংশ দুর্বলতায় আকীর্ণ, তার বিন্যাসটিও প্রয়োগ-শিল্পের নৈপুণ্যে এমনভাবে উদ্ভাসিত যার ফলে যুক্তি ও সঙ্গতির অভাব সহজেই ঢাকা পড়ে যায়।

নায়ক শেষ পর্যন্ত কেন ও কী ভাবে মিথ্যা-পরিচয়ের আশ্রয় নিল তার "বিশ্বাসযোগ্য" প্রস্তুতি নেই ছবিতে। প্রস্তুতি হয়ত আছে, কিন্তু তা কষ্টকল্পিত। দর্শকের যুক্তিবোধকে তৃপ্ত করে না। নায়ক চাকুরি পায় না। অভাবের তাড়নায় অশান্ত, জীবন-সংগ্রামের ব্যর্থতায় ম্রিয়মাণ। আর্থিক অনটনের জনাই অসামান্য মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বুঝি সে তার অসম্পূর্ণ ডাক্তারি পড়া সম্পূর্ণ করে নিতে পারল না। কিন্তু এর আগে এত বছর সে কলেজে পড়ল কী করে, কার দাক্ষিণ্যে? যুদ্ধে কী সে অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দিয়েছিল? হয়ত তাই। তা না হলে যুদ্ধ থেকে ফিরে তাকে এত অভাবে পড়তে হয় কেন? সংসারে সে একা। সুস্থ, প্রতিভাবান যুবক সে। তার মত যুবক কী সামান্য উপায়ের ব্যবস্থা করে নিজের পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারে না? বিশেষ করে যখন ফাইন্যাল ইয়ারেই তাকে অধ্যয়ন ছাড়তে হয়েছিল? চিকিৎসা-শাস্ত্রে তার যখন এত শ্রদ্ধা? ডাক্তার হবার শখ যখন এত প্রবল?

এর পরিবর্তে আমরা ছবিতে কী দেখলাম? একজন মেধাবী, সুস্থ, সবল যুবক—সংসারে যার আর কারোর জন্যে কোন দায় নেই, দায়িত্ব নেই—চাকুরি যোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে! তারপর চাকুরি নিল আসল পরিচয় গোপন করে। আত্মাভিমানী যুবক বড়লোক পরোপকারীর কাছে নিজের দুর্দশার কথা বলতে যার বাধে—কিনা মিথ্যার আশ্রয় নিল!

ছবির কাহিনীকার-পরিচালক চেয়েছিলেন একজন নকল ডাক্তার এবং তাকে কেন্দ্র করে একটি মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। গল্প গড়ে তোলবার জন্যে প্রয়োজন ছিল নায়কের জীবনের অবস্থা-বিপর্যয়। এই "বিপর্যয়" রচনা করতে গিয়ে কাহিনীকার-পরিচালক গোষ্ঠী যে ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন তা শুধু মামুলীই নয়, অযৌক্তিক।

অথচ কষ্টগ্রাহ্য এই অংশের বিন্যাস-ধারাটি মামুলী নয়। গতানুগতিকতার নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কলকাতার পথে পথে নায়কের জীবিকা অনুসন্ধানের ঘটনাটি ছবিতে এমন এক শিল্পসুন্দর প্রয়োগ-সিদ্ধির ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত যা দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে।

ছবিতে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতালের পরিচালনাকে কেন্দ্র করে এক উপকাহিনী সংযোজিত। এই উপকাহিনী ছবির মূলে আখ্যানবস্তুকে কক্ষচ্যুত করেছে। মূলে বিষয়বস্তুর রস ও আবেদন অনেকখানি গ্রাস করে নিয়েছে। আলোচ্য উপকাহিনীতে রয়েছে এক কৃত্রিম চরিত্র-গোষ্ঠী। ছায়াছবিতে এদের অস্তিত্ব আছে, চলচ্চিত্রপটে হয়তো এরা বাস্তব। কিন্তু মাটির পৃথিবীতে এদের দেখা পাওয়া কঠিন। চরিত্ররাজির মধ্যে রয়েছে এক আদর্শবাদী ডাক্তার যে যক্ষ্মায় মারা-যাওয়া তার বাবা-মা-বোনের করুণ স্মৃতিকে সার্থক করে তুলতে চায় যক্ষ্মা-রোগীদের সেবা ও চিকিৎসায়। বিষয়-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে তার চিন্তারাজি ঘুরে বেড়ায়। তথাকথিত বিষয়বুদ্ধির চাইতে আদর্শবাদের বোকামিই তার কাম্য। দুঃখের কাহিনী বলার সময় সে করুণভাবে হাসে। কিন্তু তাই বলে অনাসক্ত পুরুষ সে নয়। বন্ধু সত্যের পথ থেকে পিছিয়ে গেল বলে তার তীব্র অভিমান। বন্ধুর সম্বর্ধনা-

সভায় সকলের শেষে হাততালি দিতে দিতে সে প্রবেশ করে। তার চোখে-মুখে ক্ষোভ, গঞ্জনা ও বিদ্রূপ। বিপরীতধর্মী ও কৃত্রিম উপাদানে গঠিত এই চরিত্রের শত্রু দুই কুচক্রী। একজন মালিক, অপরজন তার কর্মচারী। যক্ষ্মা-হাসপাতালের মাধ্যমে কুচক্রীর ব্যবসায় প্রচেষ্টা তথাকথিত হিন্দী-ছবিতে দেখা গেলে দুঃখের কারণ থাকে না। এই ছবিতে যেন এটা অমার্জনীয়। এবং যেভাবে কুচক্রীদ্বয় ছবিতে উপস্থাপিত তাও বাংলা ছবির পক্ষে সুলক্ষণ নয়। তদুপরি মালিক-দুর্বৃত্তকে শেষের দিকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে (এমনকি তার ম্যানেজারের সংগে কথা বলার সময়) তাতে মনে হয় সে যেন হিন্দী ক্রাইম-ছবির পাপ-চক্রের নেতা। হয়ত পাপ-চক্রের নেতার মতই তার চরিত্রের লক্ষণ; কিন্তু এ-ধরনের ছবিতে এই সাসপেন্স উপাদান খুবই বেমানান। অসার্থকও বটে। কারণ এই ভূমিকার শিল্পীর কণ্ঠস্বর দর্শকদের কাছে অপরিচিত নয়।

অপ্রধান ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রমাণও ছবিতে অনেক রয়েছে। যেমনঃ চাকুরীদাতা নায়কের বাসস্থানের সন্ধান পেল কী-করে, মফঃস্বলের হাসপাতালে এতজন ডাক্তার থাকা সম্ভব কি-না ইত্যাদি।

ছবির অতি সুচারু প্রয়োগ-ধারায় বহু ব্যবহৃত উপকরণও অনুপ্রবিষ্ট। পূর্ব সংলাপের বার বার নেপথ্য-উচ্চারণ ছবির প্রয়োগ-কর্মে গতানুগতিক ধারারই পরিচয় দেয়। কোন ঘটনা বা চরিত্রের মর্মকথাটি দর্শকের অন্তরে পৌঁছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই সংলাপ বারবার উচ্চারিত। এই বিন্যাস-ধারা রসিক দর্শকের বিরক্তি ঘটায়। মেলোড্রামার দিকে পরিচালকবৃন্দের অকারণ ঝোঁকটিও ছবিতে লক্ষণীয়। নার্সের সিঁথিতে রক্ত পরিয়ে দিয়ে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া এবং স্ত্রীর পক্ষে পূর্ব-প্রস্তুতি নিরপেক্ষ হঠাৎ করে কুচক্রী স্বামীর অপরাধ ফাঁস করে দেওয়ার ঘটনা দুটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘটনা দুটি সুস্থ রসবোধের পরিচয় বহন করে না। আলংকারিক সংলাপ অর্থাৎ সুন্দর সাজানো কথা—বাস্তবে যা চলে না—ছবিতে খুবই বেশী। এবং জীবন-সংগ্রামে জর্জরিত নায়কের সংলাপ ও মিছিলের শ্লোগানের দূরাগত অস্পষ্ট ধ্বনিতে একটি বিশেষ মানসিকতার পরিচয় মেলে। যার মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামজনিত প্রতিক্রিয়ার সুরটি ধ্বনিত। এই ছবিতে এই সুর অবাঞ্ছিত, অনেকটা যেন প্রচার-ধর্মী।

এত দোষদর্শন সত্ত্বেও বলতে বাধা নেই, এই ছবির গুণের সূচীপত্রটি অনেক বড়। মূল কাহিনীর ভাবরূপটি বাদেও, কাহিনী-কার হিসাবে যাত্রিক-গোষ্ঠী এই ছবিতে বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রকাহিনীতে **নায়িকা হয়ত নেই, কিন্তু যে তরুণী**

মাধুর্যের ডালি সাজিয়ে শান্তচরণে, নম্র নেত্রপাতে, কম্পিত আশায় নায়কের জীবনে এসে দাঁড়িয়েছে দর্শকরা তাকে ভুলবেন না। নায়ক ও তার উপখ্যানটির মধ্যে এক নিরুচ্চার রসের আস্বাদ মেলে। এই উপাখ্যানের অনুচ্চার সুরটি শেষ দৃশ্যে তরুণীর অতিরিক্ত কথায় কিছুটা কেটে গেলেও, তা দর্শকের মন ভরে তোলে। অন্যদিকে হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ও বৃদ্ধা নার্সের দুটি আপাত-সাধারণ চরিত্রকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে তোলার মত রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন যাত্রিক-গোষ্ঠী।

যাত্রিক-গোষ্ঠী যে রসসৃষ্টির ক্ষমতারও অধিকারী তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ছবির একাধিক দৃশ্যে। রবীন্দ্রনাথের "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে" গানটি দিয়ে নায়কের জীবনবেদনা ও দ্বন্দ্বের সুরটি ফুটিয়ে তোলার এবং "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না" গানটি দিয়ে একটি ভাব-পরিমণ্ডল রচনা করার এক সুন্দর, সার্থক রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন যাত্রিক-পরিচালক দল।

তাঁদের লাবণ্য-বীক্ষনের আরও অনেক শিল্পমধুর মুহূর্ত রয়েছে ছবিটিতে। আর সেই সঙ্গে নয়নাবিমোহন শিল্পশোভনতা রূপ নিয়েছে ছবির বহিরঙ্গ দৃশ্যগঠনে ও পরিবেশ রচনায়। বহিরঙ্গ শিল্পসৌন্দর্যে এমন বাংলা ছবি বিরল।

নায়ক-চরিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় এই ছবির এক বিশেষ সম্পদ। বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে চরিত্রটির মর্মমূলে তিনি স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেছেন, এবং সংবেদনশীল অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি এর বেদনা ও বিভ্রম আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রটিতে যথোচিত ব্যক্তিত্ব আরোপের ক্ষমতাও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর বাচনভঙ্গী সুন্দর। শক্তিশালী অভিনেতারূপে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের এই আত্মপ্রকাশকে চিত্ররসিকরা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানাবেন।

এক আদর্শবাদী তরুণ ডাক্তারের চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন ছবিটিতে। চরিত্রটির প্রাণোচ্ছলতা ও বিড়ম্বনার মুহূর্তে তাঁর অভিনয় স্মরণীয়।

নায়কের জীবনে পদক্ষেপ ঘটেছে যে তরুণীর, তার শান্ত, মধুর চরিত্রটিকে মরমী করে তুলেছেন কাজল গুপ্ত। শ্রীমতী গুপ্ত'র নম্র, নির্বাক অভিব্যক্তি মনে দাগ কাটে।

ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায় ও ছায়া দেবী ভিন্ন ধরনের তিনটি চরিত্রের রূপায়ণে অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে ছায়া দেবীর সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকদের কাছে

অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে অল্প অবকাশে অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন জীবেন বসু, মঞ্জু দে, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত, তরুণ কুমার ও গীতা দে। ছবির একটিমাত্র দৃশ্যে দেখা দিয়ে যে-প্রখ্যাত শিল্পীরা মনে দাগ রেখে যান তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত ও অসিতবরণ। এক কুচক্রী ম্যানেজারের চরিত্রে নবাগত সোমনাথের অভিনয় আতিশয্যের দোষে দুষ্ট। অন্যান্য ছোট চরিত্রে উল্লেখযোগ্য হলেন অমর মল্লিক, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শিশির বটব্যাল, শিশির মিত্র, আরতি দাস, ধীরাজ দাস প্রভৃতি।

সংগীত-পরিচালক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছবির আবহ-সুর রচনায় রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের আবহ-সংগীত মনকে নাড়া দেয়। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়" গানটি দর্শকদের অভিভূত করে রাখে।

আলোকচিত্র-পরিচালনায় অনিল গুপ্ত এবং চিত্রগ্রহণকারী জ্যোতি লাহা এই ছবিতে বিরল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিতে তাঁরা আলো-আঁধারের যে রূপমায়া সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা দুর্লভ। ছবিটির বহিরঙ্গ শিল্পবৈভবের মূলে তাঁদের অবদান সর্বাধিক। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগে যাঁদের কাজ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে তাঁরা হলেন দুলাল দত্ত (সম্পাদক), মৃণাল গুহঠাকুরতা (শব্দধারক) ও সুবোধ দাস (শিল্পনির্দেশক)।

খেলার মাঠে, গ্রহ নয়, তারকা সমাবেশ

অষ্টগ্রহ সমাবেশের বিভীষিকার মধ্যে গত রবিবার চলচ্চিত্রলোকের শিল্পী ও কলা-কুশলীরা বহুজনকে আতঙ্ক থেকে আনন্দের মধ্যে উত্তীর্ণ করেছিলেন—অভিনয়ে বা কলাকৌশলের কারুকৃতিতে নয়—ক্রিকেটের মাঠে নেমে, ক্রিকেট খেলা দেখিয়ে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সত্যজিৎ রায়ের ও ছবি বিশ্বাসের দল দুটির মধ্যে। শিল্পী ও কলাকুশলীরা খেলেছিলেন চলচ্চিত্রের দুঃস্থ কলাকুশলী-দের সাহায্যার্থে।

সত্যজিৎ রায়ের দলের অধিনায়ক ছিলেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাসের দলের জে ডি ইরানী। শানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, অরুণ দাস ও রণজিৎ সিংহ এই চারজন আম্পায়ারের দায়িত্ব সম্পাদন করে-ছিলেন। ধারাবিবরণী দেন কমল ভট্টাচার্য ও অজয় বসু। খেলায় জয়লাভ করেন সত্যজিৎ রায়ের দল।

শিল্পীদের বিশেষ করে জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই মাঠে এসে উপস্থিত হননি। যে অভিনেত্রীরা মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা খেলেননি বটে, তবে খেলার চাইতে ছোট কাজও তাঁরা করেননি। রোদের মধ্যে সারা মাঠ ঘুরে ঘুরে তাঁরা

ক্রিকেট খেলার মাঠে (বাম থেকে) জহর গাঙ্গুলী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অসিত সেন

স্মারক পুস্তিকা বিক্রী করেছেন। স্মারক পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ টাকা কলাকুশলীদের সাহায্যেই দান করা হবে। তাই তারা প্রেরণা পেয়েছিলেন পরিশ্রম করতে। এ'দের মধ্যে ছিলেন রমা গুহঠাকুরতা, সুলতা চৌধুরী, অনুভা গুপ্তা, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী গোরী দেবী ও সন্ধ্যা রায়। স্মারক পুস্তিকা বিক্রয় প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল একটি গীটার। কিন্তু বিজয়িনীর সম্মান আলাদা করে কেউ নিতে চাইলেন না। সকলের মত নিয়ে অবশেষে গীটারটি নীলামে চড়ানো হল। দাম উঠল দেড়শো টাকা। গীটারের মূল্য দান করা হয়েছে কলাকুশলীদের সাহায্য-ভাণ্ডারে।

খেলার শেষে শুরু হল পুরস্কার বিতরণ। পুরস্কার বিতরণ করলেন মধু বসু। বেশী রান তোলার জন্যে ও বেশী উইকেট নেবার জন্যে একটি করে মারফি রেডিও পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে ইন্দর সেন ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায় ও ছবি বিশ্বাস তাঁদের নিজেদের দলের হয়ে দুটি শিল্ড হাত পেতে নিলেন মধু বসুর কাছ থেকে। দুই দলের অধিনায়ক পেলেন একটি করে কাপ। তা-বাদে খেলোয়াড়, আম্পায়ার, স্মারক পুস্তক বিক্রেতারা সকলেই পেলেন স্মারক-ব্যাজ। ক্রিকেট খেলার আয়োজনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য স্মারক-ব্যাজ পেলেন অসিত চৌধুরী। কানু বিনা যেমন গীত নেই, চলচ্চিত্রমহলেও বুঝি অসিত চৌধুরী বিনা বড় কিছুর আয়োজন নেই। মাঠে স্বেচ্ছা-সেবকদের পরিচালনা করা থেকে আরম্ভ করে বিরতির সময়ে খেলোয়াড়দের লাঞ্চের তদারক করা, এবং যাবতীয় আর সব ব্যবস্থা-পনার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত দেখা গেল। স্বেচ্ছাসেবকরা—যাঁদের অধিকাংশই তরুণ কলাকুশলী—আন্তরিকতার সঙ্গে অমানুষিক পরিশ্রম করে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেছেন, শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। সুশৃঙ্খল এই ক্রিকেট খেলার আয়োজনটি বাংলা চলচ্চিত্রজগতের একটি বড় ঘটনা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্রীড়ামোদীদের কৌতূহল মেটাবার জন্য ক্রিকেট খেলার স্কোর নীচে দেওয়া হল:

চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের ক্রিকেট খেলায় প্রতিযোগী দুই দলের অধিনায়ক ছবি বিশ্বাস ও সত্যজিৎ রায়। ফটো : অলোক মিত্র

স্কোর : ছবি বিশ্বাসের একাদশ

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ক অজয় বিশ্বাস ব প্রমোদ লাহিড়ী ৮
বিকাশ রায় ক বলাই সেন ব দিলীপ মুখোপাধ্যায় ২
বিশ্বজিৎ ক সৌমেন্দু রায় ব দিলীপ মুখোপাধ্যায় ০
গোপাল সান্যাল ক সুজিৎ সরকার ব দিলীপ মুখোপাধ্যায় ... ১৩
অসিতবরণ ব দিলীপ মুখোপাধ্যায় ... ৭
দীপক ব দিলীপ মুখোপাধ্যায় ... ২
সুধীর মুখোপাধ্যায় ক প্রমোদ লাহিড়ী ব দিলীপ মুখোপাধ্যায় ১১
তরুণকুমার রান আউট ৬
জে ডি ইরানী ব প্রমোদ লাহিড়ী ১৪
জহর গঙ্গোপাধ্যায় ব সত্যজিৎ রায় ... ০
ধীরাজ দাস নট আউট ১৫
অসিত সেন ব প্রমোদ লাহিড়ী ... ১০
অজয় কর ব দিলীপ মুখোপাধ্যায় ... ০
বীরেন চট্টোপাধ্যায় ব দিলীপ মুখোপাধ্যায় ৫
বুলু দাশগুপ্ত নট আউট ... ০
অতিরিক্ত ... ১৩

মোট (১৩ উইকেট) ... ১০১

বোলিং : প্রমোদ লাহিড়ী ৯-১-২৭-৩; দিলীপ মুখোপাধ্যায় ১৩-৩-২৯৮; সত্যজিৎ রায় ৫-০-২০-১; বলাই সেন ১-০-৮-০; এন বিশ্বনাথন ২-০-৭-০; অজয় বিশ্বাস ২-০-৮-০; সৌমেন্দু রায় ৩-২-৩-০।

সত্যজিৎ রায়ের একাদশ

ইন্দর সেন ক জহর গঙ্গোপাধ্যায় ব গোপাল সান্যাল ৩৮
এন বিশ্বনাথন ব বিশ্বজিৎ ... ১২
অনিল চট্টোপাধ্যায় ব গোপাল সান্যাল ৩
প্রমোদ লাহিড়ী ক বিশ্বজিৎ ব গোপাল সান্যাল ৩
দিলীপ মুখোপাধ্যায় ব ধীরাজ দাস ১৬
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এল-বি-ডবলিউ ব বিশ্বজিৎ ০
অজয় বিশ্বাস নট আউট ... ৩৮
বলাই সেন ব বিশ্বজিৎ .. ২
সুজিৎ সরকার নট আউট .. ২
অতিরিক্ত .. ৬

মোট (৭ উইকেট) ... ১২৪

অনুপকুমার, অরূপ গুহঠাকুরতা, সৌমেন্দু রায়, গণেশ বসু ও সত্যজিৎ রায় ব্যাট করেননি।

একলব্য

অস্ট্রেলিয়া যে বিশ্বটেনিসের শীর্ষস্থানে এতদিন সে খবর আমরা কাগজেই পড়ে এসেছি। আজ সাউথ ক্লাবে আয়োজিত এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় তা চোখে দেখলাম।

অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ ও মহিলা বিভাগের দুই নামকরা খেলোয়াড় গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রড লেভার এবং মার্গারেট স্মিথ এশিয়ান টেনিসে যোগ দেননি। টেনিস বিশেষজ্ঞের হিসাব মত বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে এই দুইজনের দুই বিভাগে দ্বিতীয় স্থান। তবু এশিয়ান টেনিসের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি পুরস্কার নিয়েই ঘরমুখো হয়েছে। এ ছাড়া দুটি বিষয়ের রানার্সের পুরস্কারও তাদের দখলে। এ থেকেই তাদের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় মেলে।

সিংগলসের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন রয় এমারসন, বিশ্ব টেনিসে আজ যাঁর এক নম্বর স্থান। ফাইন্যালে ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় এবং ১৯৫৯ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন রামনাথন কৃষ্ণনকে স্ট্রেট সেটে হারাতে এমারসনকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। কৃষ্ণন যে ভাল খেলেননি একথা বলব না। স্ট্রেট সেটে হারলেও কৃষ্ণন ভাল খেলেছেন; কিন্তু এমারসন খেলেছেন অত্যন্ত ভাল। এমেচার টেনিসে আজ তার জুড়ি কম। তার ডাবল স্পিনের মারের কাছে কৃষ্ণনের প্রসিদ্ধ ব্যাক হ্যাণ্ডের মার কার্যকরী হয়নি।

রয় এমারসন এবং রামনাথন কৃষ্ণন দুজনই একরকম বিনা বাধায় ফাইন্যালে ওঠেন, তাই চ্যাম্পিয়নশিপের উল্লেখযোগ্য খেলাগুলির মধ্যে কোন খেলাতেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যায়নি, খেলা দেখে দর্শকেরও চোখ ভরেনি। তবু পাকিস্তানের তরুণ খেলোয়াড় হাইয়ের বিরুদ্ধে বর্ষীয়ান সুমন্ত মিশ্রের জয়, জাপানের মিয়াসীর বিরুদ্ধে নরেশ কুমারের উন্নত খেলা এবং গ্রেট ব্রিটেনের দুই নম্বর খেলোয়াড় বিলি নাইটের বিরুদ্ধে জয়দীপ মুখার্জির জয় দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দিয়েছে।

আগেই বলেছি এমারসন এখন বিশ্ব টেনিসের পয়লা নম্বর খেলোয়াড়। খেলোয়াড় জীবনের গৌরবদীপ্ত ক্ষণে এর আগে এ ধরনের কোন খেলোয়াড় সাউথ ক্লাবে খেলে যাননি। অতীতে বিগ বিল টিলডেন বা কোশে যখন এখানে খেলে গেছেন তখন তাঁদের প্রতিভা ছিল ভাটার দিকে। উজান স্রোতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এমারসন আসা সত্ত্বেও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ভাল জমেনি তার কারণ এমারসনের খেলার সঙ্গে কেউই তাল রেখে খেলতে পারেননি। তবু আমরা দেখেছি বিশ্বের খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়দের উন্নত ছলাকলা। মিক্সড ডাবলসের খেলার সময় দেখেছি এক সঙ্গে তিনজন উইম্বলডন বিজয়ীকে খেলতে। ফ্রেড স্টোলি ও মিস টার্নার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন, প্রতিপক্ষে এমারসন ও মিস স্যাচের মধ্যে এমারসন উইম্বলডনের ডাবলস বিজয়ীর পার্টনার। অস্ট্রেলিয়ায় মিস লেসলী টার্নার মেয়েদের মধ্যেই শুধু চ্যাম্পিয়ন হননি; হয়েছেন মেয়েদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসেও বিজয়ীর অংশীদার। সুতরাং একাই পেয়েছেন তিনটি পুরস্কার।

নীচে ফাইনালের ফলাফল ও আগের বিজয়ীদের তালিকা দেওয়া হলঃ

পুরুষদের সিংগলস—ফাইন্যাল—রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে আর কৃষ্ণনকে (ভারত) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল—রয় এমারসন এবং ফ্রেড স্টোলি (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২ ৯-৭ গেমে আর কৃষ্ণন এবং নরেশকুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল—মিস এল টার্নার এবং মিস এম স্যাচ (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-১ গেমে মিস পি বেলিং (ডেনমার্ক) ও মিস আপ্পিয়াকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইন্যাল—মিস এল টার্নার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২ গেমে মিস স্যাচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল—ফ্রেড স্টোলি ও মিস এল টার্নার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৩-৬ ও ৬-১ গেমে রয় এমারসন ও মিস এম স্যাচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

এশিয়ান টেনিসের পূর্ববর্তী বিজয়ী

পুরুষ বিভাগ

১৯৪৯—দিলীপ বসু (ভারত), ১৯৫০—জে ড্রবনী (মিশর), ১৯৫১—ফ্রাঙ্ক সেজম্যান (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৫২-৫৩ খেলা হয় নাই; ১৯৫৪—লেনার্ট বার্গলিন (সুইডেন), ১৯৫৫—কুর্ট নিয়েলসন (ডেনমার্ক), ১৯৫৬—খেলা হয় নাই; ১৯৫৭—জে ড্রবনী, ১৯৫৮—টি উলরিচ; ১৯৫৯—রামনাথন কৃষ্ণন।

মহিলা বিভাগ

১৯৪৯—মিসেস পি সি টড (যুক্তরাষ্ট্র); ১৯৫০—মিস ডরোথি হেড (যুক্তরাষ্ট্র) ১৯৫১—মিস ডোরিস হার্ট (যুক্তরাষ্ট্র), ১৯৫৪—মিস এস কামো (জাপান), ১৯৫৫ ও ১৯৫৭ মিস এলথিয়া গিবসন (যুক্তরাষ্ট্র), ১৯৫৮—মিস লাউর্স স্নো (যুক্তরাষ্ট্র),

এশিয়ান টেনিসে মিক্সড ডাবলস ফাইন্যালের ৪ জন প্রতিযোগী। বাঁদিক থেকে—রয় এমারসন, মিস এম স্যাচ, মিস লেসলী টার্নার ও ফ্রেড স্টোলি।

১৯৫৯ — মিস মোরিন হেলিয়ার (অস্ট্রেলিয়া)।

• • •

কথা হচ্ছিল গভর্নমেণ্ট প্লেসে ইস্টার্ন রেলের পাবলিক রিলেশন অফিসে। কিভাবে রেল দল এবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে সেই সম্পর্কেই কথাবার্তা। ঘরোয়া আলোচনা। একদিকে বিজয়ী রেল দলের কয়েকজন খেলোয়াড়, তাদের 'কোচ' ও শ্রী কে কে দাশ, একাধারে যিনি ইস্টার্ন রেলের পাবলিক রিলেশন অফিসার, স্পোর্টস ক্লাবের সেক্রেটারী এবং ভারতীয় রেল দলের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান। অন্যদিকে কয়েকজন সাংবাদিক।

বর্তমানের ফুটবল খেলা এবং ফুটবলের কোচিং নিয়েই প্রথমে আলোচনা। পরে রেল দলের সর্বপ্রথম সন্তোষ ট্রফি লাভের পেছনে তাদের দলগত সংহতি এবং কোচিং সম্পর্কে দু'-চারটি কথা।

আলোচনা শেষে আমরা সবাই এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলাম যে, এখনকার ফুটবল শারীরিক পটুতার এক চরম ও পরম নিদর্শন আর বৈজ্ঞানিক প্রথার উন্নত শিক্ষা এবং অনুশীলনের ফলে ফুটবল খেলা দেহ মনের আনন্দ লাভের উপকরণ হিসাবে থেকে থাকলেও বিশ্বব্যাপী শিক্ষা প্রয়াসের ফলে ফুটবলের মধ্যে এসেছে যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজী।

জয়লাভের জন্য ক্রীড়াক্ষমতা এবং পারস্পারিক সহযোগিতা তো প্রয়োজনই, তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন এখন কূটনৈতিক চাল। প্রতিপক্ষ কেমন খেলছে, তাদের দুর্বলতা কোথায়, তাদের তিন ব্যাক প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের দুই ব্যাক প্রথার খেলা ফলপ্রসূ হবে, কি 'কোর টু কোর' সিস্টেমে ভাল ফল পাওয়া যাবে, এ সব বিবেচনা করে ক্রীড়াধারার পরিবর্তনই এখনকার ফুটবল খেলার প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। আমাদের নাম-করা সেন্টার ফরোয়ার্ডের প্রতি প্রতিপক্ষের সদাজাগ্রত তৎপরতা, অতএব তাকে এক প্রান্তে ঠেলে দিয়ে প্রতিপক্ষের মজবুত রক্ষাব্যূহে ফাটল ধরাও, তারপর সেই ফাটল পথে আক্রমণ চালিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করা।

ইস্টার্ন রেলের ফুটবল কোচ শ্রীস্বরাজ ঘোষ, যিনি কয়েক মাস আগে ইংলণ্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে কোচিং-এর সনদ নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন, তিনি বললেন, ইউরোপের প্রতি ফুটবল ক্লাবে এইসব স্ট্র্যাটেজী নিয়েই এখন আলোচনা এবং যুদ্ধোদ্যোগের গোপনীয়তার মত নিজেদের ক্রীড়াধারা সম্পর্কে গোপনীয়তা।

বলা বাহুল্য, রেল দলের সর্বপ্রথম সন্তোষ ট্রফি লাভের মূলেও রয়েছে এই ধরনের কিছু কিছু স্ট্র্যাটেজী। কোচ স্বরাজ ঘোষ এবং অধিনায়ক প্রদীপ ব্যানার্জী অকপটেই তা স্বীকার করেছেন। অবশ্য পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং পারস্পারিক সঙ্গতিপূর্ণ ক্রীড়াধারাই যে তাঁদের সাফল্যের মূল সূত্র এ কথা বলতে তাঁরা দ্বিধা করেননি। ১৯৫৯ সাল থেকে একটি রাজ্য দলের অনুরূপ মর্যাদায় ভারতীয় রেল দল জাতীয় ফুটবলে খেলার অধিকার পেয়েছে। তৃতীয় বছরেই তাদের জয়লাভের মূলে কৃতিত্বেরও পরিচয় আছে।

• • •

জাতীয় ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল এবার বোম্বাইতে। মূল প্রতিযোগিতার ৮টি দলের মধ্যে রেল দল অপরাজিত থেকেই লাভ করেছে জাতীয় ফুটবলের বিজয়ীর পুরস্কার। শুধু অপরাজিত নয়, তাদের বিরুদ্ধে কোন গোলও হয়নি।

জাতীয় ফুটবলের বিজয়ীর পুরস্কার সন্তোষ ট্রফি

অবশ্য এক মহারাষ্ট্র ছাড়া রেল, বাঙলা ও সার্ভিসেস কোন গোল না খেয়ে লীগ প্রথার খেলায় সেমি-ফাইন্যালে ওঠে। সেমি-ফাইন্যালে ১০ বারের বিজয়ী বাঙলাকে রেলের কাছে একটি গোল খেয়ে হার স্বীকার করতে হয়। গতবারের বিজয়ী সার্ভিসেস মহারাষ্ট্রের সঙ্গে দুই দিন খেলা ড্র করে তৃতীয় দিনে পরাজয় স্বীকার করে। রেলের কাছে বাঙলার পরাজয় অবশ্য ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল নয়। বাঙলার পরাজয়ের মূলে কিছুটা অদৃষ্টের পরিহাস ছিল। কিংবা রেলের কূটনৈতিক চালে বাঙলার হার স্বীকারও অসম্ভব নয়। ফাইন্যালে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রেলের ৩—০ গোলে জয় যোগ্য দলের যোগ্য পুরস্কার লাভ। মহারাষ্ট্র রেলের সঙ্গে আদৌ এঁটে উঠতে পারেনি।

কিভাবে চারটি দল সেমি-ফাইন্যালে উঠেছে সেইভাবে সাজিয়ে জাতীয় ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলার ফলাফল নীচে দেওয়া হল:—

রেলওয়ে (০) : সার্ভিসেস (০)
রেলওয়ে (৫) : আসাম (০)
রেলওয়ে (০) : অন্ধ্র (০)
বাঙলা (৪) : মহীশূর (০)
বাঙলা (৩) : মহারাষ্ট্র (০)
বাঙলা (৫) : দিল্লী (০)
সার্ভিসেস (৩) : আসাম (০)
সার্ভিসেস (২) : অন্ধ্র (০)
সার্ভিসেস (০) : রেলওয়ে (০)
মহারাষ্ট্র (২) : দিল্লী (০)
মহারাষ্ট্র মহীশূর
(০) (৩) (৫) : (০) (৩) (১)
মহারাষ্ট্র (০) : বাঙলা (৩)
[মহীশূর (১) : দিল্লী (০)
অন্ধ্র (২) : আসাম (০)]

সেমি-ফাইন্যাল

রেলওয়ে (১) : বাঙলা (০)
মহারাষ্ট্র সার্ভিসেস
(৩) (১) (৩) : (৩) (১) (১)

ফাইন্যাল

রেলওয়ে (৩) : মহারাষ্ট্র (০)

জাতীয় ফুটবলের বিজয়ী ও রানার্স

সাল	বিজয়ী	রানার্স
১৯৪১	বাঙলা	: দিল্লী
১৯৪২-৪৩	খেলা হয়নি	
১৯৪৪	দিল্লী	: বাঙলা
১৯৪৫	বাঙলা	: বোম্বাই
১৯৪৬	মহীশূর	: বাঙলা
১৯৪৭	বাঙলা	: বোম্বাই
১৯৪৮	খেলা হয়নি	
১৯৪৯	বাঙলা	: হায়দরাবাদ
১৯৫০	বাঙলা	: হায়দরাবাদ
১৯৫১	বাঙলা	: বোম্বাই
১৯৫২	মহীশূর	: বাঙলা
১৯৫৩	বাঙলা	: মহীশূর
১৯৫৪	বোম্বাই	: সার্ভিসেস
১৯৫৫	বাঙলা	: মহীশূর
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	: বোম্বাই
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	: বোম্বাই
১৯৫৮	বাঙলা	: সার্ভিসেস
১৯৫৯	বাঙলা	: বোম্বাই
১৯৬০	সার্ভিসেস	: বাঙলা
১৯৬১	রেলওয়ে	: মহারাষ্ট্র

* * *

হকি লীগের দীর্ঘ ইতিহাসে এবার সর্বপ্রথম দুটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা পরিচালনা করা হবে। ১৯০৫ সাল থেকে হকি লীগের খেলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ৫৬ বছরের মধ্যে দুটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথম ডিভিসনের খেলা পরিচালনা করা হয়নি।

শুধু দু'টি গ্রুপই নয়, এবার লীগে ফিরতি খেলারও ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথম ডিভিসনের ২০টি টীমকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করে ১০টি করে টীমের প্রতি গ্রুপেই থাকবে ফিরতি খেলার ব্যবস্থা। অর্থাৎ গ্রুপের

প্রতি ক্লাবকে প্রতি ক্লাবের সঙ্গে দু'বার করে খেলতে হবে। তারপর দু'টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দু'টি করে মোট ৪টি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ ও রানার্সের জন্য আবার লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ৪টি ক্লাবের লীগ প্রথার এই খেলায় অবশ্য ফিরতি খেলার ব্যবস্থা থাকবে না।

যেভাবে দু'টি গ্রুপ ভাগ করা হয়েছে তাতে 'এ' গ্রুপে আছে গতবারের রানার্স কাস্টমস, মোহনবাগান, ইস্টার্ন রেল, পুলিস, অ্যাভেরিয়ান্স, পাঞ্জাব স্পোর্টস, রেঞ্জার্স, এরিয়ান, পোর্ট কমিশনার্স ও আর্মেনিয়ান্স।

'বি' গ্রুপে আছে গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, গ্রীয়ার, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস, খালসা ব্লুজ, উয়াড়ী, আদিবাসী, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, রাজস্থান ও ভবানীপুর ক্লাব।

দু'টি গ্রুপের এই ২০টি ক্লাবের মধ্যে ভবানীপুর ও পোর্ট কমিশনার্স এবার প্রথম ডিভিসনে নবাগত। নবাগত মানে এরা দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গিয়েছিল গতবার ভবানীপুর দ্বিতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ন এবং পোর্ট কমিশনার্স রানার্স হওয়ায় আবার প্রথম ডিভিসনে খেলার অধিকার পেয়েছে।

গত বছর প্রথম ডিভিসনে ছিল ১৯টি ক্লাব। এবার হয়েছে ২০টি। একটি ক্লাব বাড়ার কারণ দ্বিতীয় ডিভিসনে অবনমিত আর্মেনিয়ান্স ক্লাবকেও প্রথম ডিভিসনে খেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অবনমিত অপর ক্লাব মেসারার্স এই অধিকার পায়নি।

এখন আর্মেনিয়ান্স কেন প্রথম ডিভিসনে খেলার অধিকার পেল আর মেসারার্স পেল না এর পেছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। এবং সেই ইতিহাস লীগ পুনর্গঠনের অনেকখানি কার্যকারণ।

হকির সম্বন্ধে যারা কিছুটা ওয়াকিবহাল তাদের জানা আছে, গত মরসুমেই আর্মেনিয়ান্স ক্লাব বি এইচ এ অর্থাৎ বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এই যুক্তি দেখিয়ে এক প্রতিবাদ পেশ করে যে, তাদের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলায় বলবীর সিং নামে পাঞ্জাবের যে ছেলেটি মোহনবাগানে খেলেছে তার বাঙলার কোন ক্লাবের পক্ষে খেলার অধিকার নেই। অতএব বলবীরকে খেলাবার দরুন মোহনবাগানকে স্ক্র্যাচ করে আর্মেনিয়ান্সকে দু'টি পয়েন্ট দেওয়া হোক। বলা বাহুল্য, এই দু'টি পয়েন্ট পেলে আর্মেনিয়ান্সকে আর দ্বিতীয় ডিভিসনে নামতে হয় না, নামতে হয় রাজস্থান ক্লাবকে।

এর পর আই এইচ এফ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান হকি ফেডারেশন ঘোষণা করেন, বলবীর সিংয়ের সত্যিই বাঙলার কোন ক্লাবের পক্ষে খেলার অধিকার নেই। কারণ বলবীর বাঙলায় খেলার আগে ঐ মরসুমেই পাঞ্জাবে খেলেছেন এবং বাঙলায় খেলার 'ছাড়পত্র' গ্রহণ করেননি। সুতরাং তিনি বাঙলার অবৈধ খেলোয়াড়। আই এইচ এফ-এর এই ঘোষণা আর্মেনিয়ান্স-এর প্রতিবাদ-পত্রের যুক্তিকে জোরদার করে তোলে। ফলে বি এইচ এর কর্তৃপক্ষ এক মুশকিলে পড়েন।

কারণ মোহনবাগানে খেলার আগে বলবীর সিং 'অঙ্গীকার' করে বলেছিলেন পাঞ্জাবের এক ডি এ ভি কলেজের খেলা ছাড়া অন্য অন্য কোন খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। এবং সেই অঙ্গীকারের বলেই বি এইচ এ-র সম্পাদক তাঁকে মোহনবাগানে খেলবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কোন কলেজ টীমে খেলা অন্য রাজ্যে খেলার প্রতিবন্ধক নয়। এখন উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া বি এইচ এ বলবীরকে অবৈধ ঘোষণা করেন কি ভাবে? তাই ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কাছে তাঁরা জানতে চান, বলবীর সিং কোন্ ক্লাবের পক্ষে, কোথায় এবং কোন্ প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। কিন্তু বারবার লেখা সত্ত্বেও হকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনীকুমার এর কোন উত্তর দেন না। মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে তিনি শুধু জানান, ১৯৬১ সালে বলবীর বাঙলার পক্ষে অবৈধ খেলোয়াড়। তবে যেহেতু বলবীর একজন উঠতি ও সম্ভাবনাপূর্ণ হকি খেলোয়াড় সেহেতু তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়নি, তাঁর অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৬১ সালে বলবীরের যদি বাঙলায় খেলার অধিকার না থাকে তবে আর্মেনিয়ান্সের প্রতিবাদকেও গ্রাহ্য করতে হয়। অথচ বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন কার্যত বলবীরের বা মোহনবাগান ক্লাবের কোন দোষ খুঁজে পাননি। তা ছাড়া খবর নিয়ে জানা গেছে, বলবীর সত্যি সত্যি পাঞ্জাবের কোন ক্লাবে খেলেননি। পাঞ্জাব টীমে মনোনীত হয়ে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার জন্য এসেছিলেন হায়দরাবাদে। কোন খেলায় অংশ গ্রহণের আগে হায়দরাবাদ থেকে মোহনবাগানের চাঁইরা তাকে নিয়ে আসেন কলকাতায়।

বি এইচ এ-র ৭টি সভায় বলবীর এবং আর্মেনিয়ান্সের প্রতিবাদ সম্পর্কে আলোচনার পর আর্মেনিয়ান্স এক শর্তসাপেক্ষে তাদের প্রতিবাদ তুলে নেয় এবং পরে আর্মেনিয়ান্সকে দ্বিতীয় ডিভিসনের অবনমিত টীম হিসাবে ধরে নিয়ে তাদের প্রথম ডিভিসনে খেলার অধিকার দেওয়া হয়। 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে' এই ভাবেই বি এইচ এ-র এই সিদ্ধান্ত। না করে উপায় ছিল না। কারণ আর্মেনিয়ান্স আজ যদি আইনের আশ্রয় নেয় তা হলে অনেক বিপদ। আপাতদৃষ্টিতে তাদের প্রতিবাদ যুক্তিযুক্ত। অপর দিকে মোহনবাগান এবং বলবীর নির্দোষ।

তা হলে বলবীর প্রসঙ্গের জন্য দায়ী কে? যত দূর জানা গেছে, পাঞ্জাবের উঠতি খেলোয়াড় বলবীর পাঞ্জাবে না খেলার জন্যই ভারতীয় হকি ফেডারেশনের পাঞ্জাবী সভাপতি অশ্বিনীকুমার ব্যাপারকে ঘোরালো করে তুলেছেন এবং বি এইচ এ-র প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেননি। শেষ পর্যন্ত 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না' গোছের সিদ্ধান্ত করে বলেছেন বলবীর ১৯৬১ সালে বাঙলার অবৈধ খেলোয়াড় ছিল কিন্তু তার অপরাধ ক্ষমা করা হ'ল।

যাক সে কথা। এখন প্রথম ডিভিসন হকি লীগের খেলা আরম্ভ হচ্ছে ফেব্রুয়ারীর ১২ তারিখ থেকে। ফিরতি লীগের খেলার ব্যবস্থা থাকায় খেলার সংখ্যা বেড়ে যাবার কথা। কিন্তু দু'টি গ্রুপে ভাগ করে খেলা পরিচালনা করা হবে বলে খেলার সংখ্যা ঠিকই থাকবে, শুধু চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের জন্য দুই গ্রুপের উপরের চারটি দলের লীগ প্রথায় ছয়টি খেলা বেড়ে যাবে। এবার তাড়াতাড়ি লীগ শেষ করার জন্য শনিবার এবং ছুটির দিন প্রতি মাঠে দু'টি করে খেলার ব্যবস্থা থাকবে। এটাও লীগের নতুন নিয়ম। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডিভিসনে ফিরতি খেলার ব্যবস্থা থাকবে না। প্রথম ডিভিসনের দুই গ্রুপের সর্বনিম্ন স্থানের দু'টি দল আগামীবার দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবার বিধানে পড়বে।

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগেও দু'টি গ্রুপ করার কথা বহুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে। ফুটবল মরসুম আরম্ভের আগে হকি লীগে গ্রুপ প্রথার এই প্রবর্তন আগামী দিনের ফুটবলের পূর্বাভাস কিনা কে জানে?

মুকুল

নমিতা সান্যাল

লম্বা গড়নের পাতলা মেয়ে। চোখে মুখে গ্রাম্য সরলতা, চালচলনে সাদাসিধে। দেখলে মনেই হয় না ও স্পোর্টসে পোক্ত। বরং উল্টোটাই মনে হয়। ওর মধ্যে যে শক্তির জ্যোতি আছে, গতিবেগ আছে, তার প্রমাণ মেলে মাঠের দৌড়ঝাঁপে।

প্রথম প্রমাণ পাই গত বছর ইউনিভার্সিটি মাঠে ইন্টার কলেজ স্পোর্টসে। মাত্র দুটি মেয়ে এসেছিল কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে। তার মধ্যে নমিতা সান্যাল একাই নিয়ে গেল চারটি পুরস্কার। যার ফলে কৃষ্ণনগর কলেজের স্থান হল কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপে চতুর্থ।

এবার ইন্টার কলেজ স্পোর্টসে কৃষ্ণনগরের স্থান দ্বিতীয়। এবং নমিতার একার কৃতিত্বে। মেয়েদের ক্রমপর্যায়েও নমিতা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারিণী। একারই ১৫ পয়েন্ট। উঁচু লাফ ও ডিসকাস ছোঁড়ায় প্রথম দু' শো মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়, এক শো মিটার দৌড় ও দীর্ঘ লাফে তৃতীয়, রিলে রেসে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ৪ জনের একজন, আগের দুজন মেয়েকে গতিবেগে মেরে শেষ সীমারেখায় দৌড়ের সমাপ্তি।

সত্যিই 'ন্যাচারেল' অ্যাথলীট। উন্নত শিক্ষা নেই, চর্চার সুযোগ নেই, গ্রাম্য পরিবেশে বাস তবুও বাঙলার শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব। আরও বড় কথা, সব বিষয়েই ওর দক্ষতা। ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টে প্রায় সমান কৃতিত্ব। বিষয়গুলির কোনটার সামঞ্জস্য নেই। দৌড়ের জন্য প্রয়োজন গতিবেগ ও স্টেপিংয়ের কলানৈপুণ্য, ডিসকাস ছোঁড়ার জন্য প্রয়োজন বাহুবল, উঁচু লাফের জন্য প্রয়োজন দেহের সংহত শক্তি, দীর্ঘ লাফের জন্য ভিন্ন ধরনের কলাকৌশল। এর সব কিছুতেই নমিতার কিছু কিছু দখল রয়েছে।

খেলাধুলায় দেশের খ্যাতি বাড়াবার জন্য অন্যান্য দেশে এমন মেয়েরই তো খোঁজ পড়ে। অ্যাথলেট বিশারদেরা তাকে ধরে এনে ভিন্ন শুধরে দিয়ে তার উপযোগী একটি কি দুটি বিষয়ে উন্নত শিক্ষা দিয়ে বিশ্ব দরবারে পাঠাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের দেশে সে চেষ্টা কোথায়?

নমিতা সান্যাল বাদকুল্লার মেয়ে। বাবা স্বর্গীয় জ্ঞানেশনারায়ণ সান্যাল ছিলেন নাটোরে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' নিজস্ব প্রতিনিধি। দেশবিভাগের ফলে নাটোর ছেড়ে এসে ঘর বাঁধেন নদীয়ার বাদকুল্লায়। বাদকুল্লাতেই নমিতার স্পোর্টসের প্রথম পাঠ আরম্ভ। অজয় সঙ্ঘের সভ্য হিসাবে ওখানে প্রীতিরঞ্জন আচার্যের কাছে স্পোর্টসের হাতেখড়ি।

নমিতা যখন ওখানকার ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস এইটের ছাত্রী তখন কল্যাণীতে আয়োজিত নদীয়া জেলা স্পোর্টসে প্রীতিবাবু ওর নাম দিয়ে দেন। ৮০ মিটার স্কিপিং দৌড়ে থার্ড হয়ে নমিতা পায় জীবনের প্রথম স্পোর্টসের প্রাইজ। তারপর ক্লাস নাইনে উঠে চলে আসে রানাঘাট ব্রজবালা বালিকা বিদ্যালয়ে। সহপাঠিনী পায় বন্দনা বিশ্বাসকে। যে বন্দনা গতবার ইন্টার কলেজ স্পোর্টসে পেয়েছে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ।
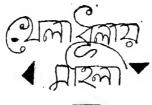
তারপর বন্দনা ও নমিতা নদীয়ায় বিভিন্ন স্পোর্টস থেকে দু হাত ভরে পুরস্কার কুড়োতে থাকে। রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, আড়ংঘাটা, কল্যাণী, বগুলা, চাকদার মাঠে মাঠে ওদের নাম। এর মধ্যে ১৯৫৯-৬০ সালে নমিতা নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ান, ১৯৬১ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলাধুলোয় সর্বশ্রেষ্ঠ মেয়ের সম্মান। নমিতা এখন কৃষ্ণনগর কলেজে ডিগ্রী কোর্সে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

বাদকুল্লা থেকে কলেজের ক্লাসের জন্য ডেলি প্যাসেঞ্জার। এর মধ্যে স্পোর্টস চর্চার সুযোগ কোথায়?

তবু ভাবতে ভাল লাগে পাড়াগাঁয়ে এখন স্পোর্টসের কদর বেড়েছে এবং মেয়েদের মধ্যেও তার বহুল প্রচলন। নমিতার কাছে শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেছি নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট ইন্টার কলেজ স্পোর্টসে শ' খানেক মেয়ে প্রতিযোগিতা করেছে। নদীয়ায় অবশ্য এখন কলেজের সংখ্যা কম নয়। রানাঘাট, কলেজ, শান্তিপুর কলেজ, কৃষ্ণনগর গবর্নমেণ্ট কলেজ, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ও বগুলা কলেজ—মোট ছয়টি। কিন্তু এই ছয়টি কলেজ থেকে শ' খানেক মেয়ের স্পোর্টসে যোগদান তাদের স্পোর্টস প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত ইন্টার কলেজ স্পোর্টসেও এক শো মেয়ে দেখা যায় না।

আমার জিজ্ঞাস্য যেখানে মেয়েদের মধ্যে স্পোর্টসের এত কদর এবং বাছাই করলে যেখান থেকে উজ্জ্বল সম্ভাবনার মেয়ে খুঁজে বার করা যায় সেখানকার স্পোর্টসের কর্তৃপক্ষ এদের উন্নত শিক্ষার কি ব্যবস্থা করছেন?

নমিতা সান্যালের হাইজাম্পের দৃশ্য ফটো: দেশ

দেশী সংবাদ

২৯শে জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর নিকট লিখিত এক পত্রে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার দ্বারা কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের মনোভাবের পুনরুক্তি করিয়াছেন। ঐ পত্রে আরও জানাইয়াছেন, এই ব্যাপারে অপর কেহ হস্তক্ষেপ করুক ইহা ভারত চাহে না।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়িতে শিথিলতা না থাকা সত্ত্বেও সংযুক্ত মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য এলাকায় প্রচুর নাগা বিদ্রোহী অনুপ্রবেশ করিতেছে বলিয়া বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

...৩০শে জানুয়ারী—কলিকাতা ও শহরতলিতে নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্যের সহিত অদ্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৪৮ সালের এই দিবসটিতে এই মহামানব মৃত্যুবরণ করেন।

যে সকল কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করিয়া লোকসভা অথবা বিধানসভায় নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

৩১শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের নির্ভীক নেত্রী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার অদ্য মধ্যরাত্রে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কুমিল্লার প্রখ্যাত নেতা স্বর্গত বসন্তকুমার মজুমদার তাঁহার স্বামী ছিলেন।

মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং সংস্থার পক্ষ হইতে স্বল্পবিত্ত এক হাজার পরিবারের জন্য মানিকতলা অঞ্চলে একটি কর্মসংস্থান আশ্রয়কেন্দ্র খোলার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী—বাঙলা ও বিহারের কয়লা-খনি এলাকা হইতে পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে আরও তাড়াতাড়ি—আরও বেশী পরিমাণে কয়লা চালান দেওয়ার জন্য ভারত সরকার কতকগুলি বিদেশী জাহাজ ভাড়া করার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ যখন সাধারণ নির্বাচনের উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত তখন বনগাঁর অপর পারে পূর্ব পাকিস্তানের বেনাপোল সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন হইতে দেখিয়া ঐ অঞ্চলের ভারতীয়দের মধ্যে দারুণ আতঙ্ক দেখা দিয়াছে।

২রা ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কয়লা সম্মেলনে রাজ্য সরকারগুলিকে জাতীয় কয়লা উন্নয়ন পর্ষদের আওতার বাহিরে স্বাধীন-ভাবে নিজ নিজ রাজ্যে কয়লাখনি খুলিতে দিবার যে দাবি জানান হইয়াছিল ভারত সরকার তাহা মানিয়া লইবেন বলিয়া মনে হয় না।

দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ভূমিক্ষয় দামোদর উপত্যকার নদী ব্যবস্থায় বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকাশ, এ ব্যাপারটিকে মাসানিংহ কমিটি ডি ভি সি-র জলধারাগুলির অস্তিত্বের প্রতি "প্রকৃত আশঙ্কা-জনক" বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।

কানপুরে ভারত সরকারের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ভূতপূর্ব সহকারী ডিরেক্টর শ্রীভি ভি ঝিংগান তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০০ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আসামী ঝিংগান ১০০০০ টাকা ঘুষ দাবি ও গ্রহণ করিবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছিলেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী—তৃতীয় পাঁচসালা যোজনা-কালে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ব্যয়ের পরিমাণ সকল স্তরে এক-চতুর্থাংশ কমাইতে হইবে বলিয়া মনে হয়। এ যোজনায় রাজ্য সরকার শিক্ষার জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছিলেন, তাহা পরি-কল্পনা কমিশন পুরোপুরি অনুমোদন করেন নাই বলিয়া জানা যায়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—ভারত সরকারের স্পেশ্যাল পুলিস বিভাগ একুশ জন গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য তদন্ত শুরু করিয়াছেন। এই অফিসারদের মধ্যে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দুইজন কমিশনড্ অফিসার এবং একজন অন্য অফিসার আছেন। মোট ১৩৮ জন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রকাশ্য তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের দাদার অঞ্চলে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়া পুলিস যে আদেশ জারি করে তাহা অমান্য করিয়া কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অভিযোগে পুলিস গতকাল কম্যুনিস্ট নেতা ও সংসদ সদস্য শ্রীএস এ ডাঙ্গে এবং সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির কয়েকজন নেতা সহ তিন শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে জানুয়ারী—সিংহল সরকার বিদ্যুৎগতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এক সুদূর-বিস্তৃত চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। সামরিক ও পুলিসচক্র ক্ষমতা দখলের সুযোগটির জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত হইতে সম্প্রতি যোগবিদ্যা আমদানী করিতে শুরু করিয়াছে। পূর্ব ইয়োরোপীয় মহলের সংবাদে প্রকাশ, প্রধান-মন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ সহ অন্যান্য রুশ নেতারা যোগ-বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন।

৩০শে জানুয়ারী—পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীএইচ এস সুরাবর্দীকে রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক কার্যের অভিযোগে আজ সকাল সাড়ে সাতটায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, এক বৎসরকাল তাঁহাকে জেলে আবদ্ধ রাখা হইবে।

নিউইয়র্কের হেইডেন প্লানেটোরিয়াম হইতে গত রাত্রিতে ঘোষণা করা হয় যে, পেছনের দিকে যতদূর দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে, পূর্ণ সূর্য গ্রহণের কালে কদাপি সূর্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতির এরূপ নিবিড় সমাবেশ ঘটে নাই।

মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের জন্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডী কংগ্রেসের নিকট আজ একটি পরিকল্পনা দিয়াছেন। এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একজন নিগ্রো মন্ত্রিসভার অফিসারের মর্যাদা পাইবেন।

৩১শে জানুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জের কূটনৈতিক মহল হইতে গতরাত্রে বলা হইয়াছে, নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি বৃটেনের স্যার প্যাট্রিক ডীন অদ্য অপরাহ্ন তিনটায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার পূর্বেই রাষ্ট্রপুঞ্জের ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বৃটেন এবং পরিষদের অন্যান্য সদস্যকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, এখন কোন বৈঠক হইলে ভারতের জনমত তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট চেষ্টা বলিয়া মনে করিবে।

শাসন সংস্কারের ভিতর দিয়া অ্যাঙ্গোলাকে স্বায়ত্তশাসন দিবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, অন্যান্য ৯৭টি রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা সমর্থন করেন।

১লা ফেব্রুয়ারী—গতকল্য ইয়োরোপের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়া প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝা বহিয়া যায় এবং কোন কোন দেশে তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও অনেক নীচে নামিয়া যায়। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে কোন কোন স্থানে বাতাস বহিতে থাকে। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলকান এলাকা।

পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীএইচ এস সুরাবর্দীকে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা আজ সকালে ধর্মঘট করেন।

২রা ফেব্রুয়ারী—কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য গতকাল নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের বৈঠক শুরু হয় এবং ভারতের সাধারণ নির্বাচনের জন্য আগামী ১লা মার্চের পর কোন তারিখ পর্যন্ত আলোচনা মুলতবী রাখা হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী—আজ বিকালে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় হলে ছাত্রদের এক সভায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমনজুর কাদের যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময় প্রায় ৪৫ মিনিট ধরিয়া সভায় তুমুল হট্টগোল হয়। ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সভায় আসিয়াছিলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—প্যারিসের খ্যাতনামা জ্যোতিষী মাঁ দদোন বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মহাযুদ্ধ, মহাপ্রলয় এবং আরও অনেক কিছু ঘটিবে। অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষীর মতেও সেপ্টেম্বর মাসে মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী।

রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রধান পর্তুগীজ প্রতিনিধি ডঃ গারিন আজ নিউইয়র্কে বলেন যে, অ্যাঙ্গোলা পর্তুগালের অংশ। উহাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের ন্যায় বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা করা পর্তুগালের দায়িত্ব। গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপুঞ্জ অ্যাঙ্গোলাকে স্বাধীনতাদানের জন্য পর্তুগালকে আহ্বান জানায়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা

মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি
উপহারযোগ্য কাব্যগ্রন্থ
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কখনো মেঘ ৪·০০
[প্রচ্ছদ ও গ্রন্থন পারিপাট্যে সমুজ্জ্বল]
আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
সাগর থেকে ফেরা ৩·০০
[নবম মুদ্রণ]
সম্প্রতি প্রকাশিত
৭ই কার্তিক, ৭ই অগ্রহায়ণ ও ৭ই পৌষের বই
'রবীন্দ্র-জীবনী'-কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
রবি-কথা ৩·৫০
বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কবি-প্রণাম ৫·০০
[কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কবিতা-সঙ্কলন]
নবেন্দু ঘোষের গল্পগ্রন্থ
পাপুই দ্বীপের কাহিনী ৩·৩০
[এই গ্রন্থে সঞ্জয় উবাচ, অরণ্য, কাকভুশণ্ডি-কথা প্রভৃতি গল্পগুলি আছে]
আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ
উপন্যাস
'বনফুল'-এর
হাটে বাজারে ৩·৫০
উপন্যাস
আশাপূর্ণা দেবীর
মেঘ পাহাড় ৩·০০
উপন্যাস
প্রবোধ সান্যালের
ইস্পাতের ফলা ৩·৫০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এক ছিল কন্যা ৬·৫০
চিত্রিতা দেবীর
দুই নদীর তীরে ৬·৭৫
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সর্সোমিরা ৩·৫০
লীলা মজুমদারের
ঝাঁপতাল ২·৭৫
দীপক চৌধুরীর
নীলে সোনায় বর্সাত ৩·৫০
আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

(সি-৪৪০৫)

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

মনোবিজ্ঞান - সমাজবিজ্ঞান - জীব-
বিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক পত্র

মানব মন

জানুয়ারী সংখ্যার বিশিষ্ট রচনাঃ
* আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রয়েডবাদ ও প্রয়োগবাদ
* জনাতঙ্ক বা নব-ম্যালথাসতত্ত্ব
* মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে, ইত্যাদি

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ও অন্যান্য স্টলে প্রাপ্তব্য।

প্রতি সংখ্যাঃ ১.০০ সডাক বার্ষিকঃ ৪.৮০

পাভলভ ইনস্টিটিউট
১৩২/১এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিঃ-৪

(সি ৪০৫৯)

সদ্য-প্রকাশিত রহস্য-উপন্যাস

রায়বাড়ি ৪॥০

কুন্তীবাঈ ৪॥ (২য় মুদ্রণ)

সুলতার বিয়ে ৪৲ (২য় মুদ্রণ)

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

অভিজাত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

সপ্তর্ষি

পঞ্চম বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা—১৩৬৮
প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—এক টাকা।

এই সংখ্যায় লিখেছেনঃ

প্রবন্ধ : হরপ্রসাদ মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবন্ধু ভট্টাচার্য।
স্মৃতিকথা : সুধাকান্ত রায় চৌধুরী।
বিশেষ আকর্ষণ : শক্তিমান কথাশিল্পী দেবেশ রায়ের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

"কালীয় দমন"

গল্প : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।
কবিতা : বিষ্ণু দে, নলিনী গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা।

কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত বুকস্টলে পাওয়া যায়—
টাকাকড়ি, চিঠিপত্র সম্পাদকীয় দপ্তর — এন. কিউ. ১০/২, নিউ ল্যাণ্ড, বাটানগর, ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

(সি ৪১২৪)

সবেমাত্র প্রকাশিত হইল

স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী ৭.৫০
ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৭.৫০

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ
শ্রীঅজয়কুমার রায় ৪.০০

ভারত-ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ
শ্রীরণজিৎকুমার সেন ৪.০০

অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ
ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ৬.০০

*

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রণীত
ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস

রম্যাণি বীক্ষ্য

সৌরাষ্ট্র পর্ব মূল্য ৭.০০
সবেমাত্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।
মহারাষ্ট্র পর্ব (১ম) টাঃ ৭.৫০
দ্রাবিড় পর্ব (২য়) ৭.০০
কালিন্দী পর্ব (৩য়) ৫.০০
রাজস্থান পর্ব (৪র্থ) ৭.০০

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

কাশ্মিরী শাল, আলোয়ান, র্যাগ ও স্কার্ফ

* লেডিজ শাল
* পশমী জামার কাপড়
* মেয়েদের ... (অস্পষ্ট)

বিষয় লেখক

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 17th February, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ১৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

নির্বাচন ও আচরণ

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশের নানা জায়গায় কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমর্থকগণের সংঘর্ষে প্রাণহানিও ঘটেছে। কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্য ১৪৪ ধারা অনুযায়ী আদেশ জারী করতে হয়েছে। এরকম ঘটনার সংখ্যা সারা দেশে হয়ত খুব বেশী নয়; নির্বাচন উপলক্ষে অশান্তি নিবারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হয়ত খুব বেশী জায়গায় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে না। তবুও সুস্থবুদ্ধি নাগরিক-মাত্রেই আশা করি স্বীকার করবেন যে ভোটের লড়াই উপলক্ষে মারামারি রক্তারক্তি ঘটা খুবই অসংগত। এরকম সব ব্যাপার ঘটা গণতন্ত্রের বিকাশ ও স্থায়িত্বের পক্ষে কখনই অনুকূল নয়।

নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে শিষ্টাচার, শোভনতা এবং পরস্পর সহিষ্ণুতার নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি সকলেরই মান্য করা উচিত। সকলেরই মানে যাঁরা নির্বাচন দ্বন্দ্বে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত—প্রার্থী, প্রার্থীর প্রচারক ও সমর্থকগণ, ভোটাররা এবং নির্বাচনী অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার যাঁদের উপর সেই কর্মচারীমণ্ডলী। নির্বাচনী-অনুষ্ঠান পরিচালক সরকারী কর্মচারী মণ্ডলীর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অপক্ষপাত আচরণ সম্বন্ধে আপাতত কোনও গুরুতর অভিযোগ নেই। অন্তত গত দুটি সাধারণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, তাঁরা মোটের পর যথেষ্ট সতর্কতা এবং সততার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ভোটাররাও নির্বাচন উপলক্ষে নিজেরা কোনরকম অশান্তি বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেন না। গোলমাল যা ঘটে তার মূল কারণ নির্বাচন-প্রার্থীদের প্রচারক ও সমর্থকগণের অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং উৎসাহের আতিশয্য।

নির্বাচনীদ্বন্দ্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট আচরণবিধি কাগজেপত্রে অনুমোদন করে সুফল প্রত্যাশা বৃথা। যতদূর জানি কোন কোন রাজ্যে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী দল নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় শিষ্টাচার ও শালীনতা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাকে বলা হয় "ভদ্রলোকের চুক্তি" তাকে মান্য করাই ভদ্র রীতি। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ছলে বলে কৌশলে জব্দ করার লোভও কখনও কখনও দুর্নিবার হয়। তারপর ভোটের লড়াই-এর অস্বাভাবিক উত্তেজনাও অনেক সময়ে হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মারামারি, রক্তারক্তি, ছাড়া আরও নানা-রকম অশোভন ব্যাপার ঘটে থাকে। ব্যক্তিগত কুৎসাপ্রচারও শালীনতা-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক রীতি-বিগর্হিত। আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সব রকম গর্হিত আচরণই অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে। সাময়িক সুবিধার উপর নজর রেখে এই সব নীতিহীন, অশালীন কিম্বা শান্তিভঙ্গকারী আচরণকে উপেক্ষা করলে বা প্রশ্রয় দিলে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই লোকে ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ ও বীতরাগ হবে।

প্রয়োজন সুদ্ধ লিখিত পঠিত আচরণ বিধি রচনার নয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রয়োজন রীতিমত দায়িত্ব শীল চেতনা-সম্পন্ন ঐতিহ্য সৃষ্টির। অন্যান্য বহু গণতন্ত্রী দেশের কথা জানি, সেখানেও সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে তীব্র প্রচার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এবং তাঁদের সমর্থকগোষ্ঠীদের মধ্যে মারামারি, রক্তা-রক্তি কাণ্ড ঘটে না; প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসার কাদা ছোড়াছুড়ির দৃষ্টান্তও বিরল। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচন যে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, ভোট-দাতাদের নিয়ে টানাটানি, মারামারি হয় না তার প্রধান একটি কারণ সাধারণ নাগরিকমাত্রেই রাজনীতি - সচেতন, নির্বাচনের উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন দলের কর্মসূচী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমাদের দেশের অধিকাংশ ভোটার এখনও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ গ্রহণে অনভ্যস্ত; কাজেই নির্বাচন-প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীরা এবং তাঁদের অত্যুৎসাহী সমর্থকরা ভোটারদের নিজে-দের দিকে টানবার জন্য গলার জোর অথবা গায়ের জোর খাটাবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। ভোটের লড়াইয়ে শোভন ও সুপরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক আচরণের ঐতিহ্য সৃষ্টির সব চেয়ে বড় বাধা অধিকাংশ ভোটারের অসহায় মনোভাব এবং অপরিণত আত্মমর্যাদা-বোধ।

সন্দেহ নেই যে এর প্রতিকার সহজে সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মারামারি, বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন এবং প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার ইত্যাদি বন্ধ করা বিষয়ে সুদ্ধ গভর্নমেন্টের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা বৃথা। আমরা চাই সাধারণ নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হোক অর্থাৎ নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রার্থীদের সঙ্গে ভোটারদের যোগাযোগ স্বচ্ছন্দ এবং অবারিত হওয়াই গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রার্থীরা এবং তাঁদের সমর্থকগণ যদি এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন, এমন অবস্থা সৃষ্টি করেন যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিম্বা ভোটাররা সন্ত্রস্ত, লাঞ্ছিত বা অপমানিত হন তাহলে সমস্ত নির্বাচনী উদ্যোগটাই মারাত্মক পরিহাসে পরিণত হয়। যতদূর দেখা যায় এ-অবস্থা সৃষ্টি করা ব্যাপারে প্রধানত দায়ী এমন কোন কোন রাজ-নৈতিক দল এবং প্রার্থী গণতন্ত্রের প্রতি যাঁদের প্রকৃত অনুরাগ নেই, যাঁদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করাটা দেশের অথবা জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য জনচিত্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও গূঢ় দলীয় স্বার্থ সাধন।

আয়ুব এবার বাঘের ন্যাজ ধরেছেন।
ধরে রাখাও শক্ত আবার ছেড়ে দেওয়াও শক্ত !
পূর্ব পাকিস্তান
পশ্চিমী গোষ্ঠী নতুন করে আবার আনবিক পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
অশোক স্তম্ভ, এবং অশোক সেন
কমিউনিস্ট পার্টি
শীর্ষ সম্মেলনের পথটা হয়ত সুগম হল !
Kutty

নেপালে রাজা মহেন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে ক্রমশ বিস্তারলাভ করছে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নেপালের পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় খণ্ডেই জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে রাজকীয় সৈন্য বা পুলিসকে হটে আসতে হয়েছে। রাজা এবং তাঁর পক্ষীয় প্রচারকদের একটা বাঁধা বুলি আছে যে, বিদ্রোহীরা ভারতভূমি থেকে কাজ করার সুবিধা পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এরূপ প্রচারও চলছে যে, বিদ্রোহীরা ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রশ্রয় এবং সাহায্য পাচ্ছেন। এরূপ প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ধারণার সৃষ্টি করা যে, রাজার স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁরা বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক, বিদেশী শক্তির কাছে তাঁরা নেপালের জাতীয় স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত, ইত্যাদি। রাজা মহেন্দ্রের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ তুলসী গিরি ভারত সরকারকে সোজাসুজি নেপালের স্বাধীনতার শত্রু বলতেও দ্বিধা করেন নি।

আসলে কিন্তু রাজা মহেন্দ্র এবং তাঁর অনুচরগণ যে-নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সেটাই নেপালের কেবল স্বাধীনতা নয়, ভালো সব-কিছুরই শত্রু। ভারত সরকার নেপালের স্বাধীনতার শত্রু নন, বন্ধু। নেপালে বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতার সৃষ্টি হয়, এটা ভারত সরকার আদৌ চান না। তার একটা বড়ো কারণ এই যে, বর্তমানে নেপালের কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের বুদ্ধি, চরিত্র এবং দায়িত্বজ্ঞানের উপর কোনো ভরসা নেই। এঁদের অদূরদর্শী স্বার্থবুদ্ধি নেপালে চীনা অনুপ্রবেশের কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছে এবং কোনো সময়ে একেবারে চীনাদের জন্য সদর রাস্তা খুলে দিতে পারে। তখন যে অবস্থার উদ্ভব হবে এবং যে-দায়িত্ব ভারতের উপর এসে পড়বে সেটা ভারত সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই খুব স্পৃহনীয় নয়। সুতরাং সে-রকম অবস্থার উদ্ভব যাতে না হয় ভারত সরকারের সেই দিকেই লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক।

কার্যত বিদ্রোহীদের কোনোরকম সাহায্য ভারত সরকার করছেন না, বরঞ্চ নেপাল-ভারত সীমান্ত দিয়ে বিদ্রোহীদের অনুকূল অস্ত্রশস্ত্রের বা লোকজনের চলাচল বন্ধ করার জন্য অনেকগুলি নূতন চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। তবে ভারতবাসীদের নৈতিক সহানুভূতি যে বিদ্রোহীদের দিকে আছে এবং থাকবে একথা কেউ অস্বীকার করে না। নেপালের মঙ্গলকামীদের পক্ষে

এইটাই স্বাভাবিক। নেপালী কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে-সংগ্রাম বর্তমানে চলছে নেপালে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। নেপালের জাতীয় স্বাধীনতা সংরক্ষার দিক দিয়েও সেই নেতৃত্ব মহেন্দ্রের মতো রাজা এবং ডাঃ তুলসী গিরির মতো মন্ত্রীর চেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু নেপালে গৃহযুদ্ধ চলুক এটা ভারতবাসীরা চায় না। তারা এখনো রাজা মহেন্দ্রের সুবুদ্ধির উদয়ের আশা করছে।

বিদ্রোহের নেতাদের বিদেশী সাহায্যপুষ্ট দেশদ্রোহী বলে প্রচার করে নেপালী জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা সফল হবে না, এটা রাজা মহেন্দ্রের এতোদিনে বুঝতে পারা উচিত। রাজাকে সরাবার মতলব নেপালী কংগ্রেসের কোনদিন ছিল না, কনস্টিটিউশনাল রাজতন্ত্র বজায় রেখে গণতান্ত্রিক শাসনের সুপ্রতিষ্ঠাই নেপালী কংগ্রেসের বরাবরের লক্ষ্য। রাজা মহেন্দ্র কৈরালা মন্ত্রিমণ্ডলীর নামে নানা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁর প্রাসাদরক্ষী সৈন্যদলের সাহায্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উল্টে দিয়ে রাজকীয় স্বৈরাচারী শাসন চালু করেন। গণতান্ত্রিক নেতাদের কারারুদ্ধ, নির্বাসিত বা কর্মহীন করে রেখে রাজকীয় একাধিপত্য চালিয়ে রাজা নেপালের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেননি, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রেই যা সমস্যা ছিল তা এখন সংকটের আকার নিয়েছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যারা সংগ্রাম করছে তাদের উপর শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে রাজা মহেন্দ্র পারবেন না, আর তাদের উপর জয়ী হওয়া যদি সম্ভবও হয় তবে তা নেপালের পক্ষে--নেপালের কেবল আভ্যন্তর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পক্ষে নয়, নেপালের জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষেও মারাত্মক হবে। শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালাকে মুক্ত করে তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে বসে নেপালের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের আলোচনা করার সদিচ্ছা যদি এখনো রাজা মহেন্দ্রের হয়, তবে সেটা যেমন নেপালের পক্ষে তেমনি তাঁর নিজের পক্ষেও মঙ্গলকর হবে। বিদ্রোহীদের উপর জয়ী হয়ে নেপালকে এবং নিজেকে বাঁচাতে রাজা মহেন্দ্র পারবেন না, নেপাল এবং নিজেকে বাঁচাতে হলে রাজা মহেন্দ্রকে নিজের উপর অর্থাৎ নিজের ক্ষমতার লোভের উপর, নিজের নিরঙ্কুশ একাধিপত্যের লোভের উপর জয়ী হতে হবে। রাজা মহেন্দ্রের কাছ থেকে সেটা প্রত্যাশা করা অত্যন্ত কঠিন, সেইজন্য নেপাল সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এতো বেশী।

* * *

সুরাবর্দী সাহেবের গ্রেপ্তার এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহের দ্বারা সূচিত পাকিস্তানের আভ্যন্তর অবস্থার সঙ্গে সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর নিয়ে খানিকটা হৈচৈ সৃষ্টি করার চেষ্টার যোগ ছিল বলে অনুমান হয়। এই সম্পর্কে গত সপ্তাহের বৈদেশিকীতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছিল। তবে পাকিস্তান সরকারের অনুরোধ যদি পুরোপুরি পালিত হোত এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশনে কাশ্মীর প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা স্থগিত না রেখে সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দেওয়া হোত তাহলে পাকিস্তানী কর্তারা যা চেয়েছিলেন তার উল্টো ফল হোত অর্থাৎ পাকিস্তানের আভ্যন্তর অবস্থার দিক থেকে পাকিস্তানীদের মনোযোগ সরে যাওয়ার পরিবর্তে পৃথিবীর মনোযোগ সেইদিকে আরো বেশী আকৃষ্ট হোত। সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর আলোচনা আরম্ভ হলে ভারত বিদ্বেষী প্রোপাগাণ্ডার জোয়ারে পাকিস্তানের ভিতরে জমা অসন্তোষ ভেসে যাবে, এরূপ আশা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের সেই অসন্তোষের পরিমাণ সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর পুরো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যতটা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বুঝা যায় যে, যে অসন্তোষ জমে ছিল তার বাহ্য প্রকাশ কোনো প্রোপাগাণ্ডার কৌশলের দ্বারাই ঠেকিয়ে রাখা যেতো না।

সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা এবং পূর্ব পাকিস্তানের এই গোলমাল এক সঙ্গে চললে খ-এসে আয়ুবশাহীর কর্তারা নিশ্চয়ই খুব স্বস্তিবোধ করতেন না এবং কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানী দাবীকে সমর্থন করতে পাকিস্তানের মিত্রদের আর কিছু না হোক একটু বাধো-বাধো অবশ্য ঠেকত। যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সেলফ ডিটারমিনেশন নীতির কথা কাশ্মীরীদের সম্পর্কে করাচীর কর্তারা তুলতে চান, সেই নীতির পুনঃপ্রয়োগের দাবী যে পাকিস্তানের ভিতর থেকেও উঠতে পারে, পৃথিবীর সামনে এই ব্যাপারটা প্রকট হওয়া পাকিস্তানী প্রচারকদের পক্ষে মোটেই রুচিকর নয়। সুতরাং সিকিউরিটি কাউন্সিলে যে কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায় সেটা পাকিস্তানী কর্তাদের পক্ষে ভালোই হয়েছে, তা না হলে যে অস্ত্র তাঁরা ভারত সরকারকে লক্ষ্য করে ছোড়ার আয়োজন করছিলেন সেটা উল্টে এসে তাঁদেরই আঘাত করত।

কিন্তু পাকিস্তানী কর্তাদের যেন ঐ একটি ভারত-বিদ্বেষী প্রচার ছাড়া অস্ত্র নেই। পাকিস্তানের যা কিছু মুশকিল সবের মূলেই যেন বাইরে অর্থাৎ ভারতে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে যারা গোলমাল করছে তাদের প্রতি বলপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আর যা প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তাদের সঙ্গে ভারতের নাম যুক্ত করে কুৎসা রটনা। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থায় যারাই বিষাদগ্রস্ত, যারাই পাকিস্তানের পূর্ব খণ্ডের উপর পশ্চিম খণ্ডের আধিপত্যের লাঘব চায়, যারাই মিলিটারী ডিক্টেটরশিপের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী, তারাই বিদেশী প্রভাবের দ্বারা পরিচালিত, বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িত, আয়ুবশাহীর বিরোধীরা পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিপন্ন করছে, ইত্যাদি রটনা চলছে।

এই ধরনের প্রোপাগাণ্ডা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান সমস্যার সমাধানের সহায়ক হতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বাধিকার এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা চাওয়ার সঙ্গে বাইরের কোনো শক্তির প্ররোচনা আবশ্যক করে না। যারা মিলিটারী ডিক্টেটরশিপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চায় না তারা নিজেদের স্বাধীনতা বুদ্ধিই চায়, অন্য কোনো শক্তির তাঁবেদারি করতে চায় না। আর ভারত সম্বন্ধে বলা যায় যে, যারা ভারত সরকারের মনের গতির কোনোরকম খবর রাখে তারাই জানে যে পূর্ব পাকিস্তানকে কবলিত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নয়াদিল্লীর কর্তাদের মনে নেই, এমন কি পূর্ব পাকিস্তান সেধে এলেও ভারতের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব বর্তমান ভারত সরকার বিবেচনা করতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই। পূর্ব পাকিস্তানের সুখ দুঃখের সহানুভূতি আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম এবং নৈতিক কর্তব্য। পূর্ব পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ভারতের প্রতি আরোপ করে সেই সহানুভূতির নির্মলতা নষ্ট করার চেষ্টা যেন সফল না হয়।

১৩।২।৬২

ধ্বনি (৩)

ইংরিজী ধ্বনি

ইংরিজী সব ক'টি ধ্বনি ভালো করে শিখে নিলে কণ্টিনেণ্টাল তথা আরবী ফার্সী ইত্যাদি ভাষা শিখতে প্রচুর সুবিধা হয়।
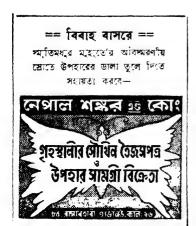
ইংরিজী f, v, z ধ্বনি পশ্চিম বাঙলায় নেই, কিন্তু পূর্ব বাঙলায় আছে। 'ফাল মারা' (লম্ফ দেওয়া) বলার সময় পূর্ব বাঙলার লোক ইংরিজী f উচ্চারণ করে; পশ্চিম বাঙলার মহাপ্রাণ ফ নয়। (পশ্চিম বাঙলার আমি শুধু একটি শব্দে ইংরিজী f শুনেছি, সেটি 'প্রফুল্ল' শব্দের 'ফ'-তে একমাত্র মারোয়াড়ীরাই প্র-ফু-ল্ল—অর্থাৎ মহাপ্রাণ 'ফ' দিয়ে ঐ শব্দটি উচ্চারণ করে বলেন, 'প-র-ফু-ল্ল বাবু কাঁহা গায়া?' ঠিক তেমনি বলতে পারো না। (পরশুরাম পশ্য।) খাঁটি ইংরিজী v পূর্ব বাঙলায়ও কম শোনা যায়।

আরেকটি ধ্বনি ইংরিজীতে ঘন ঘন আসে, কিন্তু তার জন্য বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই। Pleasure, Vision বলতে যে z জাতীয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেটি z নয়। এ ধ্বনিটি ভালো করে শিখতে হয়, কারণ ফরাসীতে এর ছড়াছড়ি এবং রুশ ভাষায়ও কমতি নয় (ফরাসী Bon Jour 'বঁ' 'জুর' রুশ পজালুস্তা—দুই স্থলের 'জ'-ই উপরের রীতিতে উচ্চারণ করতে হয়।) খাঁটি জর্মানে এ উচ্চারণ নেই, ফার্সীতে একদা ছিল, এখন নেই।

এ ছাড়া thin এবং there-এ যে th-এর দুই ভিন্ন উচ্চারণ আছে, সেগুলোও অল্প-স্বল্প কাজে লাগে, তবে ফরাসী, জর্মন, রুশ, ইতালিয়ানে নয়।

ফরাসী ধ্বনি

প্রথমেই মনে রাখা উচিত, ফরাসীতে স্বরধ্বনি প্রচুর। গুরুর সাহায্য বিনা সেগুলি আয়ত্ত করা কঠিন।

ফরাসীতে একদা শব্দের শেষ ব্যঞ্জন আদপেই উচ্চারিত হত না। দ্যুপ্লে যখন এ-দেশে আসেন, তখন তাঁর নামের শেষ Xটি উচ্চারিত হত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী দেশে সব অক্ষর উচ্চারণ করার বাই দেখা দেয়। ফলে দ্যুপ্লে এবারে দ্যুপ্লেক্‌স্ হয়ে গেলেন—এখন ফরাসী দেশে গিয়ে দ্যুপ্লে বললে সাধারণ জন ধরতে পারে না, কার কথা বলা হচ্ছে। একদা তাই Aix-la-Chapelle (জর্মন

তি ন টি ক বি তা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কু য়া শা য়

॥ ১ ॥

আজ ভোরে বাড়িঘর কুয়াশায় নিয়েছে কবর,
পৃথিবী মৃতের স্থান মনে হয় তাই,
কিম্বা রোগী হাসপাতালের সাদা সিক্ত বিছানায়।
আমার মনের প্রান্তে মৃত কথা মৃত ছবিগুলি
এনে দেয় বুলিয়ে কে সাদা-রং তুলি!
তার হাতে হায়
নবতন কিছু নেই পুরাতন স্পর্শ শুধু পাই,
আর্ততায় এ হৃদয় কাঁপে থরথর!

ভয়ের শরীর
আমার হৃদয়ে করে ভিড়
মৃত পৃথিবীর কথা আনে।
জানে মন জানে
অমৃতের পুত্র নেই কেউ,
শুধু মৃত্যু ঢেউ ভাঙে আর তোলে ঢেউ॥

রৌ দ্র - মে ঘ

॥ ২ ॥

আশ্বিনের রৌদ্রভরা মেঘে
কৈশোরের দূর স্মৃতি লেগে
ছবি কি আঁকায় মনে-মনে!
যে ছবি পালিয়ে যাওয়া এক বালকের,
শহরের ঘের
যাকে ধরে রাখতে পারেনি!—
চলে গেছে গ্রামে!
সেখানে হঠাৎ বুঝি থামে
দ্যাখে এক বালিকার বেণী!
দুজনের দু'টো কথা থাকে শুধু জেগে
সমস্ত আশ্বিনময় বুঝি!

হৃদয়ে সে কথা আজও খুঁজি
প্রৌঢ়তায় এসে।
সে কিশোর-কিশোরীকে আমি ভালোবেসে
রেখে কি দিইনি মনে ছবির মতন?
আশ্বিনের রৌদ্রমেঘে করে তারা এখনো উন্মন॥

প্র তী ক্ষা য়

॥ ৩ ॥

পূবের সূর্য যে গেল পশ্চিম আকাশে,
আর কত দীর্ঘ হবে বলো এ জীবন,
তোমার চিতার ভস্ম স্মৃতিকে করবে নিপীড়ন
যেন মৃত্যু-গ্রাসে
আর কত দীর্ঘকাল বলো!
রক্তে ছলছলো
করত যে ভালোবাসা তা-ও শুষ্ক আজ।
তেমনি ত আছে সব রমণী-সমাজ
তবু সব ছেপে কালো চিতাধূমে শুধু
ওঠে ভবিষ্যৎময় ধূ-ধূ।
তোমার প্রতীক্ষা আছে আর কিছু নেই
অন্য আকাশের তলে শুধু তোমাকেই
পাব বলে আছি।
মনে মনে গাঁথি আজ ফেলে-যাওয়া ছিন্ন মালাগাছি॥

পারবো না, কিন্তু আমার ধারণা হ'লো যে জাপানি মানস একান্তভাবে জাগতিক, যাকে ইংরেজিতে বলে secular. 'আপনার ধর্ম কী?' এই কথা অনেককে জিগেস ক'রে স্পষ্ট কোনো জবাব পাইনি; 'হয়তো বৌদ্ধ—হয়তো শিন্টো ঠিক জানি না।' অর্থাৎ, বিষয়টা চিন্তার বা আলোচনার যোগ্য নয়। ভারতের কথা ছেড়েই দিই, ধর্ম বিষয়ে এ-রকম মনোভাব প্রতীচীতেও বিরল।

কিন্তু এই কি জাপানিদের বিষয়ে সবটুকু কথা? তা যদি হ'তো, তাহ'লে এদের আমরা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নিতুম জগতের সেরা কেজো লোক ব'লে, বণিকবৃত্তির চরম চূড়ায় বসিয়ে দিতুম একেবারে—আর তার পর এদের বিষয়ে আর-কিছু বলার প্রয়োজন হ'তো না। সত্য, এরা অনেক বিষয়ে ইংরেজের মতো, কিন্তু আগন্তুকের মনের উপর লন্ডন যে-নিস্তাপ ধূসরতা ছড়িয়ে দেয়, টোকিওতে তা অকল্পনীয়; এবং এদের শত্রুরাও কখনো বলেনি যে এরা 'দোকানদার' বা 'লেজার-পূজারি' মাত্র। আশ্চর্য এই যে এদের কেজো দিকটা, অনিবার্যভাবে লক্ষণীয় হ'লেও, কখনোই যেন বড়ো হ'য়ে দেখা দেয় না; সবচেয়ে আগে যা চোখে পড়ে এবং সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা মনে থাকে, তা এই যে এরা সুন্দর। আগে একবার লিখেছি : 'পাশ্চাত্ত্য জাতির যে-সব সামরিক অভ্যাস এখন সামাজিক গুণে পরিণত হয়েছে, সেগুলো সবই জাপানিদের আয়ত্ত, এমনকি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচ্য লাবণ্য এদের [illegible], এবং এ-দুয়ের মিশ্রণের জন্যই [illegible] জাপান এমন [illegible] নন্দনের বর্তিয়ে এমন-কিছু [illegible]। এই কথাটির প্রমাণ না দিয়ে একটি ছোটো উদাহরণ দিই : পরিচ্ছন্নতা। এই বিষয়েতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে ব'লে আমি দাবি করতে পারি, কেননা আমি যেখানেই যে-টেবিলে লিখি, বা যে-চেয়ারে ব'সে বিশ্রাম করি, সেখানেই দুর্দমনীয়ভাবে জমে ওঠে সিগারেটের ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি, বই, চিঠিপত্র, ছেঁড়া কাগজ, বাজে লেফাফা—দরকারি ও বেদরকারি জিনিশের এমন একটি বিমিশ্র ও বিবর্ধমান স্তূপ, যাতে সৌন্দর্য বা সুবিধে কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার এই অভ্যাসের জন্য দেশে-বিদেশে বিবিধ মহিলাদের দ্বারা আমি তিরস্কৃত হ'য়ে থাকি, এবং যদিও আমি সব সময় জবাব দিই যে এই অবস্থাই আমার পক্ষে আরামদায়ক, তবু কোনো করুণাময়ী কোনো-এক সকালে আমার টেবিলটি গুছিয়ে দিয়ে গেলে, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি কত বড়ো একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। মন হালকা লাগে তখন, কাজে আরো উৎসাহ পাই, শ্রম তেমন কাতর করে না। অর্থাৎ, আমার নিজের স্বভাবে তা নেই ব'লেই, পরিচ্ছন্নতা আমার ঈপ্সিত, এবং আর কোনো দেশে ঐ গুণটিকে আমি এমন ব্যাপক, শ্রীমণ্ডিত ও মানবিকভাবে অনুভব করিনি, যেমন করেছি জাপানে। কিয়োটোর রাস্তা এত পরিষ্কার যে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার [illegible] সংকোচ হয়েছে; এবং বিরাট [illegible] কোনো রাস্তা [illegible] ইস্কুল বা অফিসঘরের [illegible] কোনো অংশের মতো [illegible] সব বাড়ি দোকান হোটেল ট্রেন ট্যাক্সি, সবই একেবারে ঝকঝকে তকতকে—এদের বিষয়ে বেশি বলা বাহুল্য। কিন্তু হাকোনের সেই সরাইখানাটিকে আর-একবার স্মরণ না-ক'রে পারছি না, কেননা তার পরিচ্ছন্নতা বর্ণনাতীত—প্রায় অনির্বচনীয়। সেখানে গিয়ে যেন বুঝেছিলাম প্রতীচীর সঙ্গে জাপানের মৌলিক তফাৎটা কোনখানে। আমেরিকাতেও এক-এক জায়গায় দেখেছি পরিচ্ছন্নতাকে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—কিন্তু তার [illegible] ও [illegible] এমন [illegible] ও [illegible] হাসপাতালের আদর্শ [illegible] প্রাণের সাড়া সব সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু জাপানি পরিচ্ছন্নতায় এমন একটি সৌন্দর্যবোধ আছে, আর মানুষের হাতের সেবা তার মধ্যে এমনভাবে মিশে থাকে যে মনে হয় যে তাকে আমরা বলতে পারি মর্মস্পর্শী; অর্থাৎ, তা শুধু আমাদের চোখের ও দেহের পক্ষেই প্রীতিকর নয়, যেন অন্তরের কাছেও তার আবেদন আছে।

[illegible] হয়তো অন্য কথাটা ভুল হ'লো, সবটাই সাজানো, বানানো, 'শিল্পিত', এইটেই হ'লো জাপানি স্টাইল। তা-ই যদি হয়, তাহ'লে কথাটা এইখানে দাঁড়ায় যে জাপানিদের নিজস্ব একটা স্টাইল আছে, যা আমাদের নেই, বা থাকলেও বহির্জগতে এখনো প্রকাশ হয়নি। একদিন ওঁরা আমাদের নিয়ে গেলেন এক জায়গায় এদের বিখ্যাত 'টেম্পুরা' বা মাছ ভাজা খাওয়াবার জন্য। খাশ জাপানি ধরনের ভোজনালয় [illegible] দেখেই [illegible]; কিন্তু [illegible] পরিচর্যা [illegible] আমাদের [illegible] ও ভিড় দেখলুম, রান্নার জন্য খ্যাতি আছে জায়গাটার। তুলনীয় কোনো রেস্তোরাঁ কি আছে কলকাতায়? এমন কোনো ভোজনালয়, যেখানে মলিন বাসন, অধ্যবসায়ী মাছি, বা অত্যধিক মশলা-প্রণোদিত অগ্নিমান্দ্যের আশংকা না-ক'রে আমরা বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে খাওয়াতে পারি ধনেপাতা-সুবাসিত মুসুরির ডাল, কালোজিরে-চর্চিত স্নিগ্ধ লাউ, দই দিয়ে রাঁধা রুই মাছ, আর মিষ্টি-আম-টোমাটোয় সম্পন্ন তীব্র চাটনি? না কি এমন কোনো ভদ্রগোছের হোটেল বা সরাইখানাই আছে, যার ধরনটাকে যে-কোনো অর্থে বাঙালি, বা ভারতীয় বা এমনকি প্রাচ্য বলা যায়? থাকলেও, আমি তার ঠিকানা জানি না; বিদেশীরাও তার সন্ধান না-পেয়ে অনবরত এমন সব হোটেলে ওঠেন, যা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর বিলেতি। সেখানকার 'পাশ্চাত্ত্য' ভোজ বিস্বাদ ও বিকল্পহীন, আর 'ভারতীয়' আমিষ [illegible] যেখানে অনেক বিদেশীরা সভয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার যেটা এমন করুণ, যে সে বিষয়ে মন্তব্য করার প্রয়োজন দেখি না। পোল্যান্ড বা ইস্রায়েল বা মেক্সিকো থেকে হঠাৎ কোনো অতিথি এসে [illegible] হন—তাই তো, এদের কি নিজস্ব বলে কিছু নেই? ভারত-পথিক বিদেশীরা একমাত্র যা নতুন দেখতে পান তা হ'লো কোনো-কোনো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু দেখাতে পারছি না, যা [illegible] জীবনধারার বিশিষ্ট সৃষ্টি। আমি বলছি না যে সে-রকম কিছু নেই, নিশ্চয়ই অনেক আছে;—কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই আমাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ; সেগুলোকে—চীনে বা জাপানিদের মতো নৈপুণ্যে—বহির্বিশ্বের উপযোগী ক'রে তুলতে পারছি না আমরা, আর সে-জন্যে কোনো মহলে আক্ষেপও নেই। যদি এর পরে আমাদের দেশে গোমাংসভোজন নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়, সেটাও একটা নূতনত্ব হবে বটে, কিন্তু সেটাতেও হাঁ-এর দিকে কিছু থাকবে না। এখনো কি সময় আসেনি, যখন আমরা—কলকারখানা নৌবহর বিমানবাহিনী ব্যাপারে শুধু নয়—দৈনন্দিন জীবনযাপনে বর্জনের চাইতে অর্জনের দিকে উন্মুখ হবো? এখন পর্যন্ত, অন্তত বাংলাদেশে আমাদের জীবন বড়ো বেশি পারিবারিক; জীবিকার ক্ষেত্রটুকু বাদ দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ তা-ই; আমাদের জীবনের যে অংশটায় সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে তার পরিচ

কোনো বিদেশী লোক কখনোই পাবে না। কিন্তু সত্যি কি আমরা শুধুই গৃহস্থ, জগতের আমরা কেউ নই?

জাপানি মেয়েদের বিষয়ে আগে উল্লেখ করেছি, কিন্তু যথেষ্ট বলা হয়নি। এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো যে রূপের দীপ্তিতে যদিও উত্তরভারতের কন্যারা শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রতিযোগী হ'তে পারেন, তবু সংস্কৃত কবিরা যে-ভাবে তাঁদের মানসীদের চিত্রিত ক'রে গেছেন, নম্র, পেলব, সুকুমার ও ক্ষীণকায়—তার আংশিক প্রতিরূপ যদি কোথাও দেখা যায় তো পূর্ব-ভারতে হয়তো বাংলায়, বা তার চেয়েও বেশি, আসামে। কিন্তু এখন দেখছি, জাপানি মেয়েরা—'শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্' না হোক কোমলতায় অতুলনীয়, যাকে বলেছি প্রাচ্য লাবণ্য তা এদের মধ্যে অবিকল্পভাবে মূর্ত। লাবণ্য, লালিত্য, কমনীয়তা যে সব লক্ষণ আমাদের কাছে বিশেষভাবে ললনাশোভন, এ-দেশের প্রতিটি মেয়েকে স্বভাবতই তার অধিকারিণী ব'লে মনে হয়, বয়স, রূপ অথবা সামাজিক মর্যাদা যেমনই হোক না। পূর্বোল্লিখিত মাসু, তরুণী ও সুরূপা হ'লেও ব্যতিক্রম নন; গলার আওয়াজ বাতাসের মতো, মুখে ও সমস্ত দেহে একটি সংবৃত ও শোভন বিনয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে জাপানি মেয়েদের সামান্য লক্ষণ হ'লো এই। অথচ এদের প্রায় প্রত্যেকেরই ছাঁটা চুল, সাজ পাশ্চাত্ত্য, বহির্জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না এমন কেউ নেই। দুই বিপরীতকে যেন মন্ত্রবলে মিলিয়ে দিয়েছে এরা: দেখলে মনে হয় পুষ্পাঘাতে মূর্ছাপ্রবণ, কিন্তু ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে এদের ক্ষমতা ও দার্ঢ্যের পরিচয় অনবরত পাওয়া যায়। চলাফেরায় দ্রুত, ব্যবহারে হিন্দু রমণীর 'লজ্জা' অথবা আড়ষ্টতা নেই, কিন্তু কখনো এমন কোনো ভঙ্গি করে না যা মুহূর্তের জন্যও মনে হ'তে পারে খর, বা অসুন্দর, বা পুরুষালি। বরং, যে-ভঙ্গিটি এদের পক্ষে সহজাত ও নিত্যনৈমিত্তিক, তা হ'লো আত্মোৎসর্গের; যখন যে-কাজটুকু করছে তার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছে যেন; আর এটা যে কোনো আভিজাতিক শিক্ষার ফল তাও নয়, কেননা হোটেলের পরিচারিকা বা দোকানের কর্মিণীরাও, তাদের নিরন্তর ব্যস্ততার মধ্যে, ব্যবহারে নিরন্তর স্নিগ্ধ ও অবনম্র। চিত্রলতায় জাপানি মেয়েদের জুড়ি নেই।

জাপানি জীবনের যে-দিকটি আমার মনে গভীরতম রেখাপাত করেছে, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। তা হ'লো—এ-দেশে ইংরেজি ভাষার অবস্থা। আগেই বলেছি, জাপানিরা ইংরেজি বলাতে পটু নয়; সেই অপটুতা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয়দের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও আলোচনাযোগ্য। বিদগ্ধ, উচ্চপদস্থ ও পণ্ডিতদের মধ্যেও এমন মানুষ অত্যন্ত বিরল, যিনি স্বচ্ছন্দে ও নির্ভুলভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে ইংরেজিতে আলাপ চালাতে পারেন। পারেন না;—তার চেয়েও জরুরি কথা হ'লো, চেষ্টাও করেন না, অত্যধিক চেষ্টাপ্রয়োগের উপযোগী ব'লেই ভাবেন না বিষয়টাকে। সাধারণ লোকেরা অনেকেই এক ধরনের কেজো ইংরেজি ব্যবহার করে: অর্থাৎ নিজের কর্মের পক্ষে যেটুকু ভাষা প্রয়োজনীয়, সেই গণ্ডির মধ্যেই তারা সীমিত; তার বাইরে পরভাষার অস্তিত্ব নেই এদের কাছে। অনেক মেয়েকে দেখেছি, হাতব্যাগে প্রসাধনদ্রব্যের সঙ্গে একটি ইংরেজি অভিধান সঙ্গে রাখে সব সময়; কোনো কথা বুঝতে না-পারলে তক্ষুনি অভিধান খুলে জেনে নেবার চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, পড়ান ইংরেজি বা ফরাশি সাহিত্য, এমন অধ্যাপকও আমার কোনো-কোনো প্রশ্নের উত্তরে শুধু মৃদু-হাস্য করেছেন, আমার কথাটা তিনি যে বুঝতে পেরেছেন এমন কোনো লক্ষণও দেখতে পাইনি।

এই শেষের কথাটায় আমাদের দেশে অনেক ভুরু কপালে উঠবে, মনে হয়। ইংরেজি পড়ান, কিন্তু ইংরেজি বলেন না—এ কী-রকম হ'লো? খুব সোজা উত্তর: জাপানে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন অনন্যরূপে জাপানি। স্কুলে ইংরেজি একটি আবশ্যিক বিষয়—য়োরোপেও অনেক দেশে আজকাল তা-ই; কিন্তু সেটুকু অভ্যাসের ফলে সত্যিকার শেখা কতটুকু হয় তা আমরা হাল-আমলের সাধারণ ম্যাট্রিক-পাশ বাঙালি ছেলের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবো। আমাদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে ইংরেজি কম জানলে জীবিকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধে হয় আমাদের; এদের তাতে কিছুই এসে যায় না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা—সব এ-দেশে পড়ানো হয় মাতৃভাষায়; পাঠ্য-পুস্তক ও প্রশ্নোত্তর মাতৃভাষায়; গবেষণা, গ্রন্থরচনা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা—সব মাতৃ-ভাষায়। মাতৃভাষাতেই সম্পাদিত হয় বাণিজ্য, সরকারি কার্য, শাসন, বিচার, বিধান-রচনা—সব-কিছু। এক কথায়, যা স্বাভাবিক, আর সবচেয়ে বেশি ফলদ, আর সমগ্র আধুনিক জগৎ যা মেনে নিয়েছে, সেই ব্যবস্থাই জাপানে বদ্ধমূল। তাই বলে বিদেশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার ভাবটি একেবারেই নেই; পণ্ডিতেরা তাঁদের বৈশেষিক নিবন্ধ মাঝে-মাঝে ফরাশি বা ইংরেজি বা জর্মান ভাষায় প্রকাশ ক'রে থাকেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন চেষ্টাও এদের থাকে যাতে বিদেশীরা জাপানি

শিখতে উৎসাহ বোধ করে। অনেক গবেষণা-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি ছাপা হয় জাপানিতে, কিন্তু তার ইংরেজি বা ফরাশি চুম্বক অন্যদের কৌতূহল জাগিয়ে দেয়। নিজের বিষয়ে, জ্ঞানের কোনো বিশেষ উপবিভাগ নিয়ে বিদেশী ভাষায় কিছু লিখতে হ'লে এ'রা পরাঙ্মুখ হন না, কিন্তু সেই ভাষা কানে শোনার, বা মুখে বলার উপলক্ষ জাপানি বিদ্বজ্জনদের জীবনে অল্পই ঘটে থাকে। অনেকেই য়োরোপে বা আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁদের সমগ্র জীবনের পরিমাপে সেই কিছুদিনের প্রভাব আর কতটুকু! বৈদেশিক সাহিত্য বা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশত এ'রা প্রয়োজনীয় ভাষাটিকে গভীরভাবে পড়তে শেখেন, এবং ছাত্রদেরও তা-ই শেখান; কিন্তু সেই ভাষায় স্বাচ্ছন্দে কথা বলা যে তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত, বা তাঁদের অধিকারভুক্ত, এমন চিন্তা ছাত্র বা অধ্যাপকের মনে কালে-ভদ্রে উদিত হয়। সাম্প্রতিক মার্কিনী প্রভাবের ফলে "ইংরেজির প্রতি ঔৎসুক্য যদিও বর্ধিষ্ণু (ওটার, দেখলুম, বিশেষ চেষ্টা যাতে তাঁর যুবক পুত্র ইংরেজিতে পাকা হয়ে ওঠে), তবু এমন কথা সারা জাপানে অভাবনীয় যে শিক্ষা বা সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি জ্ঞানের কোনো সম্বন্ধ আছে।

পক্ষান্তরে, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার প্রচলন বিপুল। বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না, যে ইংরেজি যেখানে মাতৃ-ভাষা নয়, এমন সব দেশের মধ্যে ঐ ভাষায় সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখা যায় সাধারণভাবে ভারতবর্ষে। এ-কথাও সত্য যে আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজি পড়া, লেখা ও বলার ক্ষমতা ততদূর পর্যন্তই আয়ত্ত করেছেন যতদূর কোনো বিদেশীর পক্ষে সম্ভব। (বিদেশীর পক্ষে একটা সীমা থাকবেই : এই পর্যন্ত, কিন্তু তার বেশি আর না।) এই অস্বভাবী অবস্থার ফলে আমরা স্বদেশে ও বিপুল বিশ্বে অনেক-গুলো সুবিধে ভোগ করছি, সে-কথাও অনস্বীকার্য। শুধু এই সুবিধেগুলোর জন্য নয়;—বম্বাইতে বা বার্লিনে ক-উকে-না-কাউকে জিগেস ক'রে হোটেলের পথ জানতে পারি ব'লে নয়; লণ্ডনে বা বস্টনে বা মণ্ট্রিয়ালে মাস্টারি, ডাক্তারি অথবা কেরানিগিরি করতে পারি, শুধু সে-জন্যে নয়,* মনের মধ্যে এমন কোনো কথা যদি কপাল কোটে যা অবাঙালিকেও জানাতে চাই, সেটা কোনোরকমে প্রকাশ ক'রে উঠতে পারি, সে-জন্যেও নয়;—ইংরেজি ভাষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কেননা জগতের উপর ঐ একটিমাত্র জানলা আমাদের খোলা আছে। যে-শুভদিনে আমাদের মধ্যযুগ-মানসতা সর্বতোভাবে লুপ্ত হ'য়ে যাবে, তার আগেই যদি ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষ থেকে স'রে যায়, তাহ'লে আমরা পুনর্বার যে-অন্ধকারে তলিয়ে যাবো তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। ইংরেজি ভাষার জন্য নয়, তার মধ্য দিয়ে বিশ্বের যে-বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে, আবহমান মানবসভ্যতার যে-বীজময় সংস্পর্শ আমরা পাচ্ছি, তারই জন্য তা মূল্যবান। তারই জন্য আমরা মানতে বাধ্য যে আমাদের জীবনের মধ্যে ইংরেজির অস্তিত্ব মঙ্গলজনক, আর যাতে অকস্মাৎ কোনো অন্ধতার ফলে তা দূরে হ'য়ে না যায় তার জন্যও আমাদের প্রযত্ন বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই প্রশ্নটাই আসল আজকের দিনে ইংরেজি যে-ভাবে আমাদের অধিকার ক'রে আছে, সেটা কি ভালো? ভালো কেমন ক'রে বলি, যখন দেখছি পৃথিবীর মধ্যে হত-ভাগ্য আমরাই শুধু এক পরভাষার পুতুল-পুজো করছি এখনো, তার দ্বারা লভ্য আত্মার সন্ধান না-ক'রে শুধু খোলশ নিয়ে মহোৎসাহে মেতে আছি? সাড়ম্বর, মধ্য-ভিক্টোরীয়, ক্লিশে-পুষ্পিত, বহুমাত্রিক লাতিন শব্দে মরচে-পড়া শিকলের মতো ঝনৎকৃত, ব্যাকরণে এমন অভ্রভেদী-ভাবে নির্ভুল যে মনে হয় কোনো মুখস্থ-করা মৃত ভাষা আওড়ানো হচ্ছে এমন ইংরেজি তো ভারত-বর্ষীয় অধ্যাপকের মুখে ছাড়া আজকের দিনে আর কোথাও শোনা যাবে না। আমরা যারা নিজেদের ভাবি ইংরেজিতে ওস্তাদ, বা অন্যদের তা ভাবতে দিই আমাদের বিষয়ে—সেই আমাদের ইংরেজিতে ভুল হয়তো কমই থাকে, কিন্তু তেমনি থাকে না গতি অথবা জীবনীশক্তি, ভুল এড়াবার কঠিন চেষ্টাতেই অবসন্ন হ'য়ে পড়ি আমরা, আক্ষরিকতার কচুরি-পানায় আমাদের বক্তব্য

দম আটকে ম'রে যায়। আর আমাদের মধ্যে যাঁরা কয়েক মাস 'ইউ কে'-তে* কাটিয়ে এসেছেন, এবং হয়তো পাঠ নিয়েছেন জ্যোতিষ্মান অক্সফোর্ডে অথবা কেম্ব্রিজে, তাঁরা ইংরেজি ভাষার কুটিল অ্যাকসেণ্ট-গুলিকে কণ্ঠে খেলাবার জন্য এমন কঠিন সাধনা করেন যে কখনো কোনো সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচ্যুতি হয়েছে টের পেলে তাঁরা হয়তো—চেখভের গল্পে সেই কেরানির মতো, যে বড়োবাবুর টাকের উপর হেঁচে ফেলে তারপর আর মনের শান্তি ফিরে পায়নি—কে জানে, হয়তো বা সেই কারণে কেরানির মতোই তাঁরা শয্যা নিয়ে শয্যা ছেড়ে আর উঠবেন না।

তুলনা করলে মনে হয়, আমরা এত যত্ন নিয়ে ইংরেজি শিখেও—বা সেই জন্যেই—জাপানিদের কাছে মৌলিকভাবে হেরে আছি। এদের মৌখিক ইংরেজির কোনো দাবি-দাওয়া নেই; তার ব্যাকরণহীনতা ও অস্পষ্ট উচ্চারণ সরলভাবে বৈদেশিকতা ঘোষণা করছে, আর এদের খবর-কাগজের মার্কিনী-ঘেঁষা ইংরেজি অন্ততপক্ষে সচল ও ঝকঝকে—পাঠ্য-বইয়ের এটোকাঁটায় ছিটোনো নয়। বিদেশীরা ভারতে এসে অর্জন করে ধনমান, কিছুটা সামাজিক মেলামেশাও ক'রে থাকে, বছরের পর বছর বা সারাজীবন কাটিয়ে দেয় হয়তো—অথচ তার জন্য (হয়তো দু-কুড়ি ভুতাভাষিত হিন্দি শব্দ ছাড়া) আমাদের কোনো ভাষার একটি অক্ষরও তাদের শিখতে হয় না। আর জাপানে জাপানি না-জানলে কিছুই করা যাবে না;—না ব্যবসা, না অধ্যয়ন বা শিক্ষকতা, না বিবাহ বা বসবাস। এটাই আসল কারণ, যার জন্য নানা ভাষায় জাপানি সাহিত্যের এত বেশি অনুবাদ হয়েছে ও হচ্ছে, আনকোরা আধুনিক সাহিত্যও বাদ পড়ছে না; এদিকে বিদেশীর ভারতবিদ্যা বা ইণ্ডলজি এখনো প্রত্নতত্ত্বের জাদুঘরেই আবদ্ধ। দুটি তরুণ আমেরিকানের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো, তারা অনর্গল জাপানি বলছে, দেশটাকে খুব ভালো লাগছে ব'লে এখানেই দীর্ঘকাল তাদের থাকার ইচ্ছে। আমেরিকায় জাপানি-জানা লোকের সংখ্যা আজকের দিনে নেহাৎ নগণ্য নয়; বড়ো-বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি বিভাগ-গুলি জীবন্ত;—এর একটা কারণ নিশ্চয়ই যুদ্ধ, বা কিছুটা অ্যাটম-বোমার 'বিবেক-মূল্য'ও হ'তে পারে, কিন্তু এর প্রধান কারণ এই যে জাপানের সঙ্গে যে-কোনো প্রকার স্থায়ী ও ফলপ্রসূ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হ'লে প্রথমেই তার ভাষায় অভিজ্ঞতা চাই। এরা জাপানি শিখতে বাধ্য করেছে বিদেশী-দের, আমরা ইংরেজি শিখে নিজের ভাষাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছি না;—আর সেই জন্যে আমাদের মনের কথা, হৃদয়ের কথা

---

* কথাটা লিখেই মনে হ'লো যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে য়োরোপ থেকে সম্প্রতি-আসা এমন অনেক প্রবীণ অধ্যাপক আছেন, যাঁরা আসবার সময় প্রায় কিছুই ইংরেজি জানতেন না, আর বসবাসের ফলেও যেটুকু শিখেছেন তাকে যথোচিত বললে বেশি বলা হয়। কিন্তু তাঁরা নিজ-নিজ বিষয়ে অসামান্য পণ্ডিত ব'লে, তাঁদের ক্ষীণ শব্দকোষ ও অদ্ভুত উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের অন্তরায় হয়নি। অবশ্য তাঁরা অধিকাংশই বিজ্ঞানী ব'লে আমার ধারণা—আর বিজ্ঞানে ভাষার ব্যবধান দুরপনেয় নয়, কিন্তু সাহিত্যেরও এমন অধ্যাপক দেখেছি, যাঁরা জর্মান বা ইটালিয়ান সাহিত্যে পারঙ্গম, কিন্তু যাঁদের ইংরেজি এখনো বাধো-বাধো।

* হায় ব্লেক, ব্রাউনিং, চেস্টার্টনের ইংলণ্ড—শেষ অবশেষে 'ইউ কে'তে অধঃপাতিত হ'লে।

এখনো বিশ্বজগতে পৌঁছলো না। কোন-দিকে পাল্লা ভারি তা না-বললেও চলে।

কিন্তু হয়তো ইংরেজিকে 'অবহেলা' করার ফলে জাপানের অন্য দিকে ক্ষতি হয়েছে? হয়তো জগতের জ্ঞানে ও বিদ্যায় আমরাই বেশি ওয়াকিবহাল?—দুঃখিত, ঠিক উল্টো কথাটা সত্যি। শুধু বিজ্ঞানে নয়, সাহিত্যেও এরা বিশ্বনাগরিক, এদের তুলনায় আমরাই বরং প্রাদেশিক হ'য়ে আছি—যে-আমরা ইংরেজি ইস্কুলমাস্টারের চোখ দিয়ে এখনো দেখি জগৎটাকে, যাদের কাছে 'ইংরেজি' ও 'প্রতীচ্য' প্রায় সমার্থক। যে-ইংরেজি ভাষা জগতের উপর আমাদের জানলা, সেটাই—এমনি ভাগ্যের বিদ্রূপ—আমাদের জগতের উপর পরদা টেনে দিয়েছে। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হয় তাদের মধ্যে আছে ইংরেজি ছাড়া ফরাশি, জর্মান, ইটালিয়ান, গ্রীক-ও-লাতিন। এতগুলো প্রতীচ্য সাহিত্য পড়ানো হয় এমন কোনো ভারতীয় বিদ্যালয়ের কথা আমার জানা নেই, কিন্তু জাপানে আরো বেশি উদার আয়োজন দুষ্প্রাপ্য নয়। এদের তুলনামূলক সাহিত্যসংস্থার সভ্যসংখ্যা বিপুল, এবং এই সংস্থার একটি কাজ হ'লো বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগসাধন। দেখে, শুনে ও পত্রিকাদি পাঠে অনুমান করছি যে প্রতীচ্য সাহিত্যের অনুশীলন নিয়ে অন্য কোনো প্রাচ্য ভাষা জাপানির কাছে দাঁড়াতে পারে না। আমাকে এক সভায় নিয়ে যাবার জন্য একদিন একটি মেয়ে এলো, সে সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে, গাড়িতে যেতে-যেতে তাকে জিগেস করলুম যে য়োরোপীয় সাহিত্য কিছু পড়েছে কিনা। সে তার যৎসামান্য ইংরেজিতে আমাকে জানালে যে ডস্টয়েভস্কির সে প্রগাঢ় ভক্ত, টলস্টয়, ফ্লোবেয়ার, স্তাঁদাল তার অজানা নেই। আর এ-সব বই সে পড়েছে তার মাতৃভাষাতেই, অন্য বহু শ্রেষ্ঠ লেখক অনুবাদে তার অধিগম্য, 'ইউলিসিস'-এর মতো দুর্ধর্ষ পুস্তকের একাধিক অনুবাদ প্রচলিত আছে। এই অনুবাদগুলোর গুণপনা বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা অবশ্য অসম্ভব, কিন্তু জাপানে সাহিত্যচর্চার ব্যাপ্তি ও নিবিড়তা দেখে বিশ্বাস হয়* যে দেড়শো পৃষ্ঠায় একটি তথাকথিত 'আনা কারেনিনা' প্রকাশ করা এদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা বাঙালিরা সাহিত্যপ্রেমিক ব'লে শুনতে পাই, কিন্তু আমাদের ভাষায় অনুবাদ কেন সাধারণত যত্নহীন ও পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর? তার কারণ আমাদের এই অদ্ভুত ও অর্ধোচ্চারিত ধারণা যে অনুবাদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই, কেননা ইংরেজিতে প্রায় সমগ্র য়োরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ পাওয়া যায়, আর দেশের মধ্যে শিক্ষিত লোকমাত্রেই ইংরেজি পড়েন। শিক্ষিত লোকমাত্রেই ইংরেজি পড়েন? না কি, যাঁরা ইংরেজি পড়েন তাঁরাই শুধু শিক্ষিত ব'লে গণ্য? না কি—আরো মারাত্মক কথা—যাঁরা ইংরেজি জানেন না তাঁরাই অশিক্ষিত ও ডস্টয়েভস্কি পড়ার অযোগ্য? এই সবগুলো কথাই আমাদের মনের তলায় কাজ করছে। আমরা যেন ভাবতেই পারি না—যদিও এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা মাত্র—যে ভারতবর্ষে এমন লোক অসংখ্য যারা মাতৃভাষায় ডস্টয়েভস্কির জন্য ক্ষুধিত হ'য়ে আছে, আর এমন লোকেরও অভাব নেই যারা উত্তম ইংরেজি জেনেও বুদ্ধির ব্যায়ামের জন্য শুধু অগাথা ক্রিস্টি পাঠ করেন। তাছাড়া, মাতৃভাষায় যদি বা কোনো যত্নসাধিত অনুবাদ দৈবাৎ বেরিয়ে যায়, আমরা কেমন বাঁকা চোখে তাকাই তার দিকে; কোনো-এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা যেন সম্ভব হয় না যে সুধীন্দ্র দত্তর অনুবাদে পেল ভালেরি ধরা পড়েছেন, বরং তার তুলনায় অক্ষম কোনো ইংরেজি অনুবাদ হাতে এলে আমরা বর্তে যাই। কিন্তু জাপানিদের মনের কথাটা অনেকটা এই-রকম: ইংরেজিও অনুবাদ, জাপানিটাও তা-ই, অতএব যদি মূলে পৌঁছতে না পারি নিশ্চয়ই আমার নিজের ভাষাতেই পড়া ভালো। আর-এক কথা: যদি ইংরেজিতে অনুবাদ সম্ভব হ'য়ে থাকে নিশ্চয়ই জাপানিতেও হ'তে পারে। জাপানিরা অন্য যে-কোনো জাতির সমকক্ষ ব'লে ভাবে নিজেদের, বরাবর তা-ই ভেবেছে, আর আমাদের এখনো কল্পনা করার সাহস হয় না যে আমরা শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ। তলিয়ে দেখলে, একেবারে ভিতরকার কথাটা হ'লো এই।

এমন একদিন ছিলো যখন গঙ্গাতীরবাসী তীক্ষ্ণচক্ষু সংস্কৃত-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সহনশীল সমালোচকের দৃষ্টিতে নবাগত শ্বেতাঙ্গদের দেখেছিলেন। সেই সহজ ও অনাক্রমণীয় আত্মমর্যাদাবোধ, যা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরে মূর্ত হয়েছিলো, কোথায় তার স্মৃতিচিহ্ন আজকের দিনে? এখন, স্বাধীনতার পরে, বক্তৃতায় ও বুলিতে ফেনিল হ'য়ে উঠছে দেশাত্মবোধ, কিন্তু বাস্তবে আমাদের আত্মসম্মানবোধ কত দুর্বল, কী-রকম প্রায় অস্তিত্বহীন আমাদের আত্মবিশ্বাস, আর সেইজন্য আমরা যাকে বলি 'আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি', তার নাবালকদশা কী-রকম দুর্গতিকর—এই সবই আমরা জানতে পারি বক্তৃতা ভুলে তথ্যের দিকে মনোযোগ দিলে। মহাত্মা গান্ধী যাকে বলেছিলেন দাস-মনোভাব তা যে আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি তার প্রমাণ দিচ্ছে আমাদের ইংরেজির প্রতি অসহায় ও কাতরতাময় মুগ্ধতা। ইংরেজির সামাজিক মর্যাদা বা মান-মূল্য, কমে যাওয়া দূরে থাক, সম্প্রতি বরং আরো বেড়েছে, এবং ভাষা থেকে এই মোহ সঞ্চারিত হয়েছে নতুন ক'রে তাদের প্রতি, যারা শ্বেতাঙ্গ, আর অতএব আমাদের চেয়ে উন্নত। ঐ 'অতএব'-এর যুক্তি কী, তা জিজ্ঞাসা বা আলোচ্য নয়, কেননা সরকারি ও বেসরকারি, সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়িক, উচ্চ ও নীচ—সব মহলে এই কথাটিকে নিঃশব্দে মেনে নেয়া হয়েছে যে শ্বেতাঙ্গেরা সমগ্র ও স্বতন্ত্রভাবে
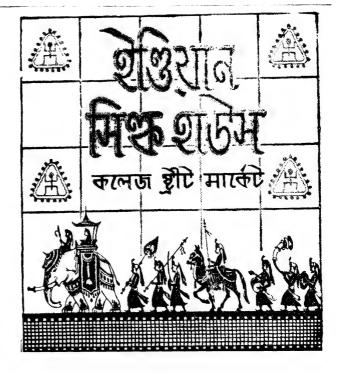
* পরে এক সুইস জর্মান-আমেরিকান অধ্যাপকের মুখে শুনলাম যে জর্মান সাহিত্য বিষয়ে গবেষণায় জাপানিরা আজকাল অন্যতম অগ্রণী।

আমাদের নিজেদের চাইতে অধিক শ্রদ্ধাভাজন। কোনো বিদেশী গুণী ক্ষণকালের জন্য আগত হ'লে তাঁকে বিশেষ আতিথ্য ও অভিনিবেশ নিশ্চয়ই দেবো আমরা—সেটাই স্বাভাবিক ও সেটাই সভ্য আচরণ; কিন্তু যে-কোনো দিকে ঈষৎ নামজাদা কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কলকাতায় এলে আমরা যে-রকম বিহ্বল হ'য়ে পড়ি তাতে তাঁরাই হয়তো মনে-মনে লজ্জাবোধ করেন। আমাদের ভাবটা হয় ভক্তিভরে করজোড়ে কাছে যাওয়ার মতো, যেন তাঁকে মাস্টারমশাইয়ের চেয়ারে বসিয়ে আমরা সদ্য-কলেজে ঢোকা ছাত্রের মতো বাছা-বাছা প্রশ্ন করছি—আর আমাদের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক নেতা, কেউ বা দিগ্বিজয়ী অধ্যাপক, অন্য কারো সাহিত্যিক হিশেবে খ্যাতি আছে! পশ্চিম বাংলার যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় জীবনানন্দ দাশ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে কখনো কবিতা শোনাতে আহ্বান করেনি, বা ক'রে থাকলেও তাঁদের উপস্থিত করেছেন শূন্যপ্রায় কাষ্ঠাসনশ্রেণীর সামনে, সে-সব বিদ্যালয়েই কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজ কবি উদিত হ'লে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকেরা পুঞ্জিত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় কাব্যসুধা পান করেছেন—সেই সব ছাত্রেরাও, যারা দুই পংক্তি রবীন্দ্রনাথ নির্ভুলভাবে মুখস্থ বলতে পারে না, এবং সেই সব অধ্যাপকও, যাঁরা সমকালীন কবিতার বিষয়ে 'গর্ভিণীর অরুচি' নিয়ে সাধারণত স্বাস্থ্যকরভাবে কালাতিপাত ক'রে থাকেন।* এ-রকম অবস্থায় কী ক'রে বলি যে মনের দিক থেকে আমাদের স্বাধীনতা-লাভ সার্থক হয়েছে?

ভারতে উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হ'তে পারে কি পারে না, এ নিয়ে অফুরন্ত বিতর্ক চলছে দেখে আমি অফুরন্তভাবে বিস্মিত হ'য়ে আছি। কেমন সন্তুষ্টচিত্তে অনেকেই বলছেন বা ভাবছেন যে পৃথিবীর সব দেশেই যা সম্ভব হয়েছে, যার কোনো ব্যতিক্রম আধুনিক জগতে অচিন্তনীয়, তা অসম্ভব শুধু ভারতবর্ষে, যে-দেশের অবিচ্ছেদ সভ্যতার বয়স অন্তত্পক্ষে তিন হাজার বছর! বিতর্কের কোনো কারণ নেই আমি তা বলি না, নিশ্চয়ই একটি বিপুল বাধা আছে, তার নাম জাড্য। 'আমি ইংরেজিতে শিক্ষালাভ করেছি, আমার পিতা ও পিতামহও তা-ই করেছেন, এবং আমি যে পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে শিক্ষাদান ক'রে আসছি তাও ইংরেজিতে; আমার ছাত্রকুল নানা স্থলে ছড়িয়ে ইংরেজিতে শিক্ষাদানে নিযুক্ত, আবার তাদের ছাত্রেরাও তা-ই করছে অথবা করবে—অতএব কী ক'রে কল্পনা করা যায় যে, ইংরেজির বদলে হঠাৎ এসে জুড়ে বসবে বাংলা অথবা মরাঠি অথবা তামিল?' এটা কোনো যুক্তি নয় অবশ্য, কিন্তু তা নয় বলেই মনোজ্ঞ—অন্তত এটা সবচেয়ে অপ্রতিরোধের রাস্তা, এটাকে মেনে নিলে নতুন ক'রে কোনো চেষ্টা অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংলগ্ন অন্য একটা প্রশ্ন আছে—আসলে বোধহয় সেটাই মৌলিক : মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয় কিনা, সত্য কিনা এই ধারণা যে ইংরেজের ছেলে যেমন ইংরেজিতে, তেমনি বাঙালির ছেলে বাংলায় পড়লে যা শিখবে তা যে-ভাবে তার মনে, প্রাণে, রক্তে গিয়ে মিশবে, সে-রকম কোনো পরভাষার দ্বারা হ'তেই পারে না। আর যদি প্রমাণ হয় যে এই ধারণায় ভুল নেই, তাহ'লে আর তর্ক কিসের। তাহ'লে বাকি থাকে শুধু জাড্যকে জয় করার প্রশ্ন, আর কিছু ব্যবস্থাপনার সমস্যা। সে-বিষয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমরা যদি স্থিরচিত্তে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করি, তাহ'লে সেই ভাষার বর্তমান অভাব পূরণ হ'তে দেরি হবে না, অনিবার্যভাবে দেখা দেবে পাঠ্যপুঁথি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, এবং কালক্রমে ঐ ভাষাতেই নতুন জ্ঞান সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হবে। অর্থাৎ, যুগপৎ আমাদের ভাষা হবে আরো পরিণত, এবং শিক্ষা আরো প্রাণবন্ত ও সারবান। কিন্তু যদি আমরা ভীরুতাবশত কেবলই পেছিয়ে যাই, যদি আমরা অনবরত ভাবি যে আমাদের মাতৃভাষা এখনো 'উপযোগী' হয়নি, তাহ'লে তার পরিণতির সম্ভাবনাকেও বিনষ্ট করা হবে। যেমন জলে না-নামলে সাঁতার শেখা যায় না, এও তেমনি।

* ভারতে প্রকাশিত একখানা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থে দুটি প্রশংসাপত্র ফ্যাকসিমিলিতে ছাপা হয়েছে, তাদের প্রণেতা রবার্ট ফ্রস্ট ও আলবের্ট শোয়াইটজার। শোয়াইটজার 'ভারতের গোটে' রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তার একটি হ'লো 'charming'; মরণোত্তর রবীন্দ্রনাথকেও শ্বেতাঙ্গরা পিঠ না-চাপড়ালে আমরা পুরোপুরি স্বস্তিবোধ করি না।

এ-বিষয়ে আমাদের পক্ষে উজ্জ্বলতম উদাহরণ জাপান। উজ্জ্বলতম এইজন্যে যে জাপানও এশিয়া, আর এশিয়ার মধ্যে তার অভ্যুত্থান বিস্ময়কর। এই অভ্যুত্থানের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে এখানে নব্যতম, প্রতীচ্যতম বিদ্যাও মাতৃভাষাতে বিকীর্ণ হয়েছে; জাপান প্রতীচীকে আমাদের চাইতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েও, কখনো পরভাষার দাসত্ব করার মতো আত্মঘাতী ভুল করেনি! অসংখ্য বার, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সুস্পষ্ট ভিন্ন মত সত্ত্বেও, এ-রকম কথা বলা হ'য়ে থাকে যে মাতৃভাষায় শিক্ষা-দান সাহিত্য প্রভৃতি মানবিক বিদ্যায় যদি বা সম্ভব হয়, বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় ইংরেজি নাকি অপরিহার্য। কিন্তু বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় অধিক অগ্রসর কে : ইংরেজিনবিশ আমরা, না কি এই জাপানিরা, যারা মাতৃভাষায় শিক্ষিত হ'য়ে তার দ্বারাই সব কর্ম চালনা ক'রে থাকে? (আমার অনুরোধ : এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রে কেউ যেন নিজেকে বিব্রত না করেন।)

২৩ জানুয়ারি

সকাল। গোছগাছ ক'রে তৈরি হচ্ছি এমন সময় জাপান এয়ার-লাইন্স থেকে টেলিফোন এলো : প্লেন বিলম্বিত। লোকটি প্রীতিকর কণ্ঠে জিগেস করলে আমাদের ন্যাশনালিটি কী, এবং আমরা কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্য ইচ্ছা করি কিনা। আমি জানিয়ে দিলুম আমরা শাকাহারী নই।

সুন্দর দিন; যে-পোর্টারটি গাড়িতে আমাদের মাল তুলে দিলে সে স্ত্রী; এয়ার পোর্টের যুবক কেরানিটি, আমার মনে হ'লো, আমাদের মালের ওজন কিঞ্চিৎ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কোনো আপত্তি করলে না। উঠে আসতে হ'লো দোতলায়, আমাদের দেখামাত্র শ্রীমতী ওটা এগিয়ে এলেন। তাঁর স্বামী আজ জরুরি কাজে ব্যস্ত; তিনি এসেছেন দু-জনের হ'য়ে আমাদের বিদায় জানাতে। জানতেন না আজ প্লেনের দেরি হবে; ট্রেনে, বাস্-এ বহুদূরবর্তী বিমান-বন্দরে এসে দু-ঘণ্টা ধ'রে অপেক্ষা করছেন। তাও মাত্র দশ মিনিটের জন্য দেখা হ'লো। কিন্তু সময়ের অভাব, ভাষার অভাব, উভয় পক্ষের বিদায়বেদনাকে কিছুই অবাক্ রাখতে পারলে না।

এমন একটা সময় আসেই যখন আর পিছনে তাকানো যায় না, বা তাকালেও চেনা মানুষ হারিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, হস্টেসের হাসি, যাত্রীদের স্বর, প্লেনের ভিতরে সুগন্ধ ও রেডিওর গান, হাত-মালগুলো গুছিয়ে রাখার চঞ্চলতা। তারপর দরজা বন্ধ করার শব্দ, উপসাগরের উপর দিয়ে প্লেন উঠলো মহাশূন্যে।

সমাপ্ত

সা ড়া

আলোক সরকার

সাড়া দিতে কেন যে পারি না। আর একবার ডাকো
সমস্ত বিকেল ব'সে আছি।
আলো সরে গেছে উ'চু গাছের মাথায়, ক্লান্ত মলিন আকাশ।
শেষবার কৌতুকে ফেরাও মুখ, দুই চোখে আঁকো
পুরোনো দিনের সেই সলজ্জ মিনতি। রুদ্ধ গোপন উচ্ছ্বাস
দেখি সাড়া দিতে পারি কিনা।

যে-টুকু এখনো বাকি আঁধার হবার, তার আগে
প্রিয় হাতে দরজা খুলে এসো।
সাড়া দিতে কেন যে পারিনি! উষ্ণ অনুরাগে
সেইদিন ডেকেছিলে, আমার নামের শব্দ যেন প্রতিধ্বনি
বসন্তের প্রতিটি পাতার উচ্চারণে। শেষবার ভালোবেসো
নাম ধ'রে ডেকো, দেখো অন্তরাল, দ্যুতিমগ্ন খনি।

হাওয়া আসলেই পাতা দুলে ওঠে, কত যে সহজ সাড়া দেওয়া।
কেন জেগে উঠতে পারবো না?
চিরদিন আচ্ছন্ন স্থবির ম্লান রুগ্ন অবসাদ।
শেষবার আঁধার হবার আগে সাড়া দেব, রক্ত উন্মাদনা
সমস্ত বিকেল ভ'রে কেঁপে ওঠে। আর একবার ডাকো
অন্তরালে এখনো জাগ্রত আছে হীরার বিষাদ।

চী ৎ কা র

দীপক মজুমদার

হে প্রকাশ নিষ্ঠুর নিশ্চয়
অতন্দ্র ছিলাম আমি জেগে
তুমি গূঢ় নিরুদ্দিষ্ট ভয়
দুর্নিবার অভিপ্রায় বেগে

ঘূর্ণির চূড়ায় দিলে ছুঁড়ে।
ক্লান্ত নীল আলোর হৃদয়
কম্পমান নভতল জুড়ে
তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো 'নয়

নয় নয়' বৃক্ষেরা নীরব
নতমুখ, প্রতিধ্বনিময়
শূন্যতায় আর্ত কলরব,
দুঃসময়, একী দুঃসময়!

প্রণতির উৎসর্গ প্রণয়
খোলে স্তব্ধ মন্দিরের দ্বার
এ কী তীব্র, পঙ্গু অস্থিসার
স্রষ্টার অমোঘ চীৎকার।

অ র ণ্যে র অ ন্ত রা লে

পরেশ মণ্ডল

পরবাসী চেতনায় ক্লান্তি নেমে এলো
দ্রিমি দ্রিমি মাদলের নির্মজ্জিত তালে,
শিথিল চরণে লজ্জা শুধু এলোমেলো
পাহাড়ী গাছের শান্তি বুকের আড়ালে।

জরিপের শামিয়ানা বিছিয়ে বিছিয়ে
কঠিন এ-শিলাতলে কার বৃন্দাবন?
কে তুমি অমল জলে গোপনতা দিয়ে
আঁচলে কুন্তলে বাঁধো হরিণের মন?

সারা মাঠ জুড়ে কেন ধূসর বাসনা—
অনাবৃত অন্ধকার, নৈঃশব্দ্যের ভিড়:
সিঁড়িতে অস্থির যত পদশব্দ গোনা
কোথাকার অনুচ্চার গৃহে হবে স্থির!

অরণ্যের অন্তরালে শুনি বারংবার
প্রাথমিক রৌদ্রে বোনা করুণ চীৎকার।

শেষ পর্যন্ত

রাজলক্ষ্মী দেবী

'পারিনি—' শ্রেয়া নিজেকেই বলল, 'অনীতার সঙ্গে কোনোদিনই আমি পারিনি। নামেই শ্রেয়া, কাজে শ্রেয়া হতে পারিনি। দ্বিতীয়া থাকতে হয়েছে সর্বত্র, সর্বদা।'

অ্যাংলো-স্কুলের ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড। ম্যানেজার সাহেব আর তাঁর বিদেশিনী পত্নীর একমাত্র দুহিতা অনীতা। গমের মতো বাদামী তার চুল, গমের চেয়েও একটু বেশী বাদামী, লালচে গায়ের রং। চোখ দুটোতে নীল আর কালো অপরূপভাবে মিশে গেছে। নাম বলে, অ্যানিটা।

'ইংলিশ নাম, না, বাংলা?' বোকার মত প্রশ্ন করে বসেছিল বীরেশ।

'অবশ্যই ইংলিশ। নয়তো আবার এ রকম নাম কেন হবে?' অনীতা হাসছিল।

'অনীতার বাংলা মানেও হয় কিন্তু। অভিধানে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'Really? How interesting?'

অনীতা তার বাদামী চুল ঝাঁকিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল।

টেকনিসিয়ান, ফোরম্যান, এমন কি মিস্ত্রীদের কলোনি থেকেও, আঙুলে-গোনা কটা ছেলে অ্যাংলো-স্কুলেই পড়তে আসে। মাইনে যুগিয়ে আর বাসভাড়া কুলোনো যায় না মিস্ত্রী কি টেকনিক্যাল পার্সোনেলের সামান্য আয়ে; ছেলেগুলো তাই সাতসকালে উঠে দু মাইলের ওপর পথ হেঁটেই আসে। অপুষ্ট দুর্বল শরীর; রোগা মুখগুলো ক্লান্তিতে শুকিয়ে থাকে। পড়াশোনায় তবু ওদেরই আগ্রহ বেশী। সাহেবপাড়ার ভালো পোশাক পরা ছেলেগুলো বিরক্ত মুখে ক্লাসে বসে, জানালার বাইরে থাকে তাদের চোখ। অবকাশে নিরীহদের ঠ্যাঙায়, মেয়েদের খেপায়,—চোস্ত উচ্চারণে বিলিতী টিপ্পনী কাটে পড়ায় ভালো উজবুকগুলোর সম্বন্ধে। ব্যতিক্রম শুধু অনীতাদের ক্লাসে। অনীতা যেন সাহেবপাড়ার গোবরে পদ্মফুল, কিংবা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। নীলাভ কালো চোখ বিস্তার করে ক্লাসের পড়া শোনে, পড়া শেখে নির্ভুল। ফার্স্ট হওয়া নিয়ে লেবার অ্যাসিস্টান্ট তারাবাবুর মেয়ে শ্রেয়ার সঙ্গে তার বিষম আড়াআড়ি।

'পারিনি শেষ পর্যন্ত। যত উঁচু ক্লাসে উঠতে শুরু করলাম, অনীতাই বেশীবার ফার্স্ট হতে লাগল।'

অ্যাংলো-স্কুলের সিক্সথ্ স্টান্ডার্ড। তখন বীরেশ কোথায়। বীরেশ তখন ভর্তিও হয়নি। অনীতা দশ পেরিয়েছে, পুরন্ত হয়ে উঠেছে তার শরীর ওই বয়সেই। স্কার্ট ব্লাউজ ছাপিয়ে যেতে চাইছে এক রাশ বিদেশীয় কৈশোর। আর সুন্দর হচ্ছে সে দিন থেকে দিনে। কালো, ছোট্ট, রোগাটে মেয়ে শ্রেয়া ভাবত, আর কত সুন্দর হবে অনীতা?

সবার মুখেই 'অ্যানিটা' আর 'অ্যানিটা'। তবু শ্রেয়া একবার ফার্স্ট হয়েছিল সেই ক্লাসেও। কী কান্নাই তার পর কেঁদেছিল অনীতা, ঢলঢলে চোখে যেন প্লাবন নেমেছে, ফর্সা মুখ চাপা অভিমানে রক্তিম। পিরিয়ড থেকে পিরিয়ডে টীচার বদলি হল, সবার মুখেই প্রথম প্রশ্ন, 'অনীতার কী হল? কাঁদছে কেন?'

'ও এবার ফার্স্ট হতে পারে নি যে!' ছেলেরা চীৎকার করে জানাল প্রত্যেকবার।

'সত্যি?' সহানুভূতিতে কোমল সবাই, 'আচ্ছা গে। সামনের বার তুমি ফার্স্ট হবে নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই!' সোৎসাহে সায় দিত ছেলেরা। মেয়েরাও। শ্রেয়ার জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই। শ্রেয়ার দলে কেউ নেই। শ্রেয়া একলা।

পরের বার শ্রেয়া সেকেণ্ড হয়েছিল। ক্লাস খুশী হয়েছিল। অনীতা উজ্জ্বল হয়েছিল। শ্রেয়া ভাবতে বসেছিল, রেশিওর অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত সে ভুল করে কেটে দেয় নি ত, অঙ্কে তার দশ নম্বর কাটা গেল কেন? কাঁদত না শ্রেয়া। কেঁদে যে জীবনের অনেক যুদ্ধে জেতা যায়, শ্রেয়া তাই জানত না।

'পারি নি। তার কারণ এই নয় যে, আমার ক্ষমতা ছিল না। আমি কয়েকটা সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাই নি।'

'রূপ'—এই কথাটা বীরেশ একদিন শ্রেয়ার মুখের ওপর বলেছিল—'ঈশ্বরের দেওয়া এক সৌভাগ্য। ঠিক যেমন সুন্দর গানের গলা।'

বীরেশ আসার আগে থেকেই কি শ্রেয়া তা টের পায় নি? গান শিখতে তার দেরি

হত না, সুর শুনলে তার হৃদয় ময়ূরের মতো পাখা মেলত, পা আপনিই নেচে উঠত। তবু তার চেহারার দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরাতেন টীচাররা, নির্বাচিত হত অনীতা আর ওদের দলের অন্য মেয়েরা। তা শ্রেয়ার সয়ে গিয়েছিল।

মিসেস রহমান ওদের নাচ শেখাতে না এলেই বুঝি ভালো হত। শ্রেয়ার মধ্যে কেন যে তিনি আশ্চর্য কিছু খুঁজে পেলেন, তাঁর নৃত্যনাট্যের প্রধান ভূমিকায় শ্রেয়াকেই নামাবার সংকল্প করে রিহার্সাল শুরু করলেন তিনি। আর শ্রেয়া হঠাৎ অনভ্যস্ত গৌরবে, অসম্ভব খুশীতে উচ্ছল হল তার নিভৃত অন্তরপ্রদেশে।

ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রী তাঁর সাদা গাড়ি নিজে চালিয়ে রিহার্সাল দেখতে এলেন একদিন। হেড মিস্ট্রেস থেকে সবাই সন্ত্রস্ত। মূক অভ্যর্থনা কার্পেটের মতো বিছিয়ে গেল মান্য অতিথির সামনে।

'তুমিই শ্রেয়া?' সোনালী চুল, টকটকে ঠোঁট, ভদ্রমহিলা নিরীক্ষণ করলেন তাকে—'অ্যানিটা তোমার কথা খুব বলে।'

রিহার্সাল মন দিয়ে দেখলেন, ইতিউতি তাকালেন, বললেন নীচু গলায় হেড মিস্ট্রেসকে—'শ্রেয়া মেয়েটি নাচে ভালো, কিন্তু প্রধান ভূমিকার পক্ষে চেহারাটা বড্ডো সাদামাটা নয় কি?'

দুই চুমুক দেবার পর নামিয়ে রাখলেন চায়ের অসমাপ্ত পেয়ালাটা। হেসে বিদায় নিলেন।

পরের দিনই পার্ট বদলি হল। শ্রেয়ার জায়গায় অনীতা। শ্রেয়ার ছোট্ট এক পার্শ্ব-ভূমিকা। মিসেস রহমান থমথমে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন সমস্ত দিন। জনরবে শোনা গেল, তাঁর অনেক প্রখর আপত্তি হেড মিস্ট্রেসের নির্দেশের সামনে কুটোর মতন ভেসে গেছে।

'এই ছোটো পার্ট, এই বিচ্ছিরি পার্ট—' তারাবাবু রাগে তোতলাতে শুরু করলেন, 'তোকে দিয়ে, শেষে তোর পার্ট ম্যানেজারের মেয়েকে? কী অন্যায়!'

'কালকে গিয়ে ফিরিয়ে দেব পার্ট?' শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল, 'বলব, আমি প্লে করব না? আমার আর করতে ইচ্ছে হচ্ছে না বাবা।'

'ফিরিয়ে দিবি?' রাগ নেমে গেল তারাবাবুর। 'দাঁড়া, ভেবে দেখি। চট করে ও রকম করা ঠিক নয়। কী থেকে কী দাঁড়ায়! তুই বরং করে যা এখন, 'প্লে'র দিন সরে দাঁড়াবি। শরীর খারাপের ছুতো করবি। ওদের বলার কিছু রইল না, আর 'ড্রামা'ও হলো ভরাডুবি। ঠিক হবে।' হেসে উঠলেন জোর গলায়।

'কিন্তু বাবা—' শ্রেয়ার গলা করুণ শোনাল, 'মিসেস রহমানকেই যে ডোবাতে হবে তা হলে। তা আমি পারব না কিন্তু।'

'পারি নি। এই রকম সব ইতস্তত, মানসিক খুঁতখুঁতি, আমাকে প্রত্যেকবার টেনে এনেছে অনীতার পাশাপাশি, নির্বিবাদে দ্বিতীয় হবার জন্যে। কতবার ওকে ঘষে মেজে আমিই তৈরি করেছি প্রধান ভূমিকায় ঝলমল করে হাসিমুখে সোনার মেডেল নেবার জন্যে।'

অ্যাংলো-স্কুলের সেভেনথ স্ট্যান্ডার্ড। লেজার-পিরিয়ডের ঘণ্টা দিয়েছে। শশিকলা জৈন ছুটতে ছুটতে এল, 'নিউজ! একটা নতুন ছেলে বসে আছে প্রিন্সিপালের ঘরে।' সবাই কৌতূহলী, 'কোন ক্লাসে আসবে ছেলেটা— কোন্ ক্লাসে?'

পিকলিকে রোগা, শান্ত মুখের ছেলেটা ওদেরই ক্লাসে এল। চোখ দুটো নিরীহ, মুখের ভাবে আর শরীরের নেতানো ভঙ্গিমায় ভালোমানুষি সুস্পষ্ট। ক্লাসের ছেলেগুলো চাপা গুঞ্জন ওঠাল, টিটকিরির মতো সেই গুঞ্জনের সুর। তারা টের পাচ্ছিল, তাদের নিষ্ঠুর সব কৌতুকের শিকার জুটেছে। বাঘ বুঝি এমনি করেই লুকিয়ে-থাকা ভীরু হরিণের গন্ধ পায়। লেজার-পিরিয়ডের আগেই তাদের সুযোগ এসে গেল

অঙ্কের টীচার নাম জিজ্ঞেস করলেন ছেলেটার।

'বীরেশ জোয়ারদার ' রিনরিনে মেয়েলী গলায় জবাব দিল সে।

আর হাসির বান ডাকাল ছেলেমেয়েরা।

'হরজিন্দর!' সস্নেহ ধমক দিলেন সার, 'অত হাসি পেল কিসে?'

ঢিলে-হওয়া পাগড়ি সামলালো হরজিন্দর, অবাধ্য আরেক ঝলক হাসি দাঁত কষে গিলে নিল। উঠে দাঁড়াল তারপর। 'ঐ চেহারা নিয়ে ও যদি 'বীরেশ' হয়, তবে ওপর আবার জোরদার, তো হাসি পাবে না? ওকে তো টোকা দিলে উড়ে যাবে।'

বীরেশ জোয়ারদার তাই শুনে কটমট করে তাকাল। তখনকার মতো 'সার' দুজনকেই বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী লেজার পিরিয়ড থেকেই লেগে গেলো ওদের শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই। 'চুহা—' এই নামে ওকে ডাকতো সর্বদাই হরজিন্দরের দল—'ইঁদুরের মতন রোগা, তেমনি কিচকিচে গলার আওয়াজ। নাম হচ্ছে বীরেশ জোয়ারদার! লাগতে আয় না, দেখিয়ে দেব।'

খেপার মতো দুই হাতে লক্ষ্যহীন ঘুঁসি ছুঁড়ে লড়াই করতে যেত বীরেশ। চোখ খুলে তাকাত কি না কে জানে,—ওর বেশীর ভাগ মার শূন্যেই পড়ত। হরজিন্দররা সত্যিই কিন্তু ওকে মারত না, নেহাতই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এক-আধটা চড়চাপড় হয়ত না দিত, শুধু ফ্যাকফ্যাক করে হাসত, বলত—'চুহা যে বাঘসিংহদের কামড়াতে আসছে রে! বাঘসিংহেরা গর্ত খুঁজবে এবার।'

একদিন রাগের মাথায় একটা পাথর তুলে ছুঁড়ে মেরেছিল বীরেশ হরজিন্দরের দিকে। যদি ওর লক্ষ্য ঠিক হত, তা হলে হরজিন্দরকে ফাটা মাথা নিয়ে সেদিন হাসপাতালে যেতে হত নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রায় চল্লিশ ডিগ্রীর ব্যবধান রেখে পাথরটা একটা গাছে গিয়ে লাগল; আর হরজিন্দররা খেপানো হাসির ধুয়ো ওঠাল।

সেইদিন শ্রেয়া বীরেশকে অভিভাবিকার মতো শাসন করেছিল, 'উচিত হয়নি ওইভাবে পাথর ছুঁড়ে মারা। রাগ হয় মানি। তাই বলে খুনীর মতো রাগ হবে তোমার!'

'শ্রেয়া—' বীরেশ হঠাৎ ভয়-পাওয়া গলায় বলেছিল 'রাগ হলে কিছু মাথার ঠিক থাকে না আমার। অত খেপালে ঠিক পাগল হয়ে যাব আমি।'

'দূর!' শ্রেয়া বীরেশের হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। মেয়েলী হাত, ফর্সা আর পাতলা হাতের চামড়া, রক্তের আসা-যাওয়া দেখা যায় যেন। সরু আঙুলের ডগা, লম্বা লম্বা ডিমের মতো নখ। 'ওসব বাজে ভয় ভুলে যাও।' বীরেশকে বলেছিল শ্রেয়া—'ওদের কথায় কান না দিলেই হল।'

মনে মনে অবশ্য শ্রেয়া জানত, বীরেশের ভয়টা একেবারে বাজে নয়। জোয়ারদারবাবুদের কথা শ্রেয়া তার বাবার কাছ থেকে এর আগে শুনেছিল। কোন এক বড়ো কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ভদ্রলোক, মাথা খারাপ হয়ে চাকরিটা যায়। পাঁচ বছর চিকিৎসা-খরচ চালাবার পরে ভাইয়েরা এমন বিরক্তি দেখাল যে—একটু ভালো সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করারও সুবিধা পেলেন না ভদ্রলোক। এই সামান্য চাকরি নিতে হল। দুঃখের, ব্যর্থতার একটা মর্মান্তিক ইতিহাস।

বীরেশের জন্যে প্রথম থেকেই তাই কেমন মায়া হতো শ্রেয়ার। এই ছেলেটার ত আজ কথা ছিল ওদের মতই বড়ো মোটর চড়ে স্কুলে আসার, হরজিন্দরদের দলে সুবেশ ময়ূর সেজে ঘুরে বেড়াবার। কী ভাগ্যে আজ ওর এই দাঁড়কাক-দশা? মায়া হবার মতো চেহারাটাও ছিল বীরেশের। লতানো ছিপছিপে একটা শরীর; ফর্সা লম্বাটে মুখ; আঁকা ভুরুর নিচে টলটল করত অসহায় চোখ দুটো; চোখের পাতাগুলি এত বড়ো যে, মনে হত হাওয়ায় কাঁপছে।

শ্রেয়া বীরেশের পাশাপাশি হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। বলছিল, 'ওদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। ওরা বড়োমানুষ, আমরা গরীব। তেলে জলে মিশ খায় না। তার চেয়ে, আমরা নিজেদের মনেই থাকব।'

'পারিনি। বীরেশকে সেই কথা দিয়ে আমি বেঁধে রাখতে পারিনি।'

ধীরে ধীরে শ্রেয়া বীরেশের বাড়িকে বুঝতে পেরেছিল। স্কুল থেকে এসে নিঃশব্দে বইগুলো রেখেই বেরিয়ে যায় বীরেশ, এতটুকু আওয়াজ না করে। মনের ধ্যানভাঙানোকে তার ভয়। সন্ধেবেলায় জোয়ারদারবাবু ফেরেন, হাতমুখ না ধুয়ে আগে সুজি তৈরি করেন, চা ছাঁকেন। রেবা-কাকিমা তখন একমনে ছবি আঁকছেন।

'বীরু কোথায় গেল?'

অপার্থিব লোক থেকে যেন ভারি অনিচ্ছায় নেমে আসেন—বীরেশের মা। 'তাই তো—ও তো আমাকে কিছু বলেওনি।'

'আচ্ছা, তুমি চা খাও। আমি দেখছি।'

দরজা খুলে বেরিয়ে জোয়ারদারবাবু হাঁক দিতে গিয়েই থামেন। শ্রেয়ার সঙ্গে ফিরত বীরেশ, রোজ। শ্রেয়া তাকে জোর করে জল-খাবার খাওয়াত, রোজ। বীরেশ অভিমানী, বীরেশ সংকোচের অহংকারে হরধনুর মতো অনমনীয়, শ্রেয়া তাই মনের অনিচ্ছা লুকিয়ে সেই অদ্ভুত বাড়িতে যেত, রোজ।

তার পড়ার ঘরে শ্রেয়াকে একটা চেয়ারে বসাত বীরেশ। কী একটা অস্বস্তিতে নিজেও উসখুস করতো, শুধু শ্রেয়া যেতে চাইলে অপমানে বড় হত তার মুখ। শ্রেয়াকে তাই অনেকক্ষণ ধরে বসে বীরেশের অন্যমনস্ক দেখতে হত। ফিসফিসিয়ে গল্প করতে হত।

'জোরে কথা বললে—' বীরেশ বলতো, 'মার অসুবিধে হয়। মা রাগ করেন।'

আরেকদিন অসময়ে সময়ে বীরেশকে খুঁজতে গিয়ে শ্রেয়া বীরেশের মা-র রাগ দেখতে পেয়েছিল। এই দেখার জন্যে বীরেশ তাকে ক্ষমা করবে না—সেই ভয়ে চোরের মতো লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিল শ্রেয়া। এই দেখার কথা বললে বীরেশকে ভাবতে ভয়, শ্রেয়া তাই সে কথা কোনোদিনই মুখে আনেনি।

'পারিনি। এত সাবধানে থেকেও আমি বীরেশকে নিজের করে রাখতে পারিনি।'

অ্যাংলো-স্কুলের অ্যানুয়েল স্পোর্টস। এইখানে বড়োমানুষ-পাড়ার ছেলেরা দিক-পাল। পড়ায় না হোক, খেলায় ওরা উজ্জ্বল। স্বাস্থ্য ভাল, অভ্যাস-আয়োজনের ত্রুটি হয়নি কখনো। হার্ডল রেস, জাম্পিং, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, বেসবল সবেতেই ওরা জিতছে। মেয়েদের দিকটা জমজমাট করেছে অ্যানিটা, বারো বছরেই যার মাথা বীরেশকে ছাড়ায়।

বাদামী চুল ওড়াতে ওড়াতে অনীতা শ্রেয়ার মুখোমুখি এসে বীরেশকে সম্বোধন করলো, 'খেলাধুলো করো না কেন? একটা ইভেন্ট-এও তোমার নাম নেই।' পট করে বীরেশের হাতটা নিয়ে পাঞ্জা ঘোরানোর ভঙ্গি করে হেসে উঠলো, 'কী লিকলিকে রোগা কব্জি, তোমার তো মেয়ে হওয়া উচিত ছিল বীরেশ।'

হরজিন্দরের অসহিষ্ণু গলা শোনা গেল, 'অ্যানিটা, এর পরে আমাদের দুজনের থ্রি-লেগেড রেস, ভুলে গেলে নাকি?'

'ভুলিনি।' নীল চোখ ভরপুর করে হাসল অনীতা বীরেশের দিকে তাকিয়ে। হাত নেড়ে বীরেশকেই বলল, "Bye -" তারপর ছুটে চলে গেল মাঠে।

পরের সপ্তাহেই কী কৌশলে ফুটবল টিমে জায়গা যোগাড় করল বীরেশ। সাধারণ একটা অভ্যাসের খেলা, তবু তারই মধ্যে হরজিন্দরের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে বসে পড়েছিল 'উঃ' বলে।

তার পরে কনকনে শীতেই সাঁতার শেখার শখ হল বীরেশের।

তার পরের ব্যাপারে শ্রেয়া আরও অবাক। ব্যাডমিন্টন খেলতে অনীতার বাড়ি যাবে বীরেশ রোজ বিকেলে। শ্রেয়া বীরেশকে থামাতে চাইল, 'তোমার কি খেলোয়াড় হবার মতো সুবিধে আছে বীরেশ? ভেবে দেখো, স্কুলের দু মাইল পথ হেঁটে যাওয়া-আসাটাই কি কম পরিশ্রম?'

'হরজিন্দররা সবাই অনীতাদের কোর্টে খেলতে যায়।' বীরেশ জেদী মুখ করল। 'অনীতা আমাকে নিজে বলেছে। না গেলে কী ভাববে শুনি?'

শ্রেয়া চুপ করে রইল, মনের মধ্যে অসহ্য ছটফটানি নিয়ে। তবু ঈশ্বর সদয়, কয়েক-দিনেই বীরেশ ইস্তফা দিল। —'দূর, নিজের র‍্যাকেট না থাকলে বিশ্রী লাগে ওদেরটা চাইতে।'

তারপর কতদিন, কতকাল ধরে যে এই টানাটানি চলেছে বীরেশকে নিয়ে! সুন্দর-মতো এই হাবাগোবা ছেলেটাকে অনীতা নিশ্চয় চোখ চেয়েও দেখত না, যদি সে শ্রেয়ার দখলী জিনিস না হত। শ্রেয়া বীরেশকে যদি দামী না ভাবত, তবে অনীতা নিশ্চয় দাম দিত না তাকে। বীরেশ শ্রেয়ার খুব বন্ধু বলেই বীরেশের দিকে নীল চোখে জ্বলজ্বলে আগ্রহ নিয়ে তাকাত অনীতা, তাকে ডাকত গানের দোসর হতে, খেলার সঙ্গী হতে।

অ্যাংলো-স্কুল থেকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ। শ্রেয়া আর অনীতার পড়ার প্রতিযোগিতা ফুরিয়েছে ততদিনে। মেডিক্যালের ছাত্রী শ্রেয়া অনীতাকে অনেক সহজেই হারিয়ে দিচ্ছে, হারাচ্ছে বীরেশকেও।

'পারিনি। তার অনেক আগেই আমি অনীতার সৌন্দর্যের সামনে মনে মনে চির-কালের মতো হেরে গিয়েছিলাম। মেডিক্যালের গানের জলসায় ওদের জুটি সবই জানত, শ্রেয়াকে চিনত কে?'

তবু, অনীতাই সরে গেল। অন্তত শ্রেয়া তখন ত তাই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

পাকিস্তানের প্ররোচনায় অন্তর্ঘাত-মূলক কার্যকলাপ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ধর্মস্থানে বোমা স্থাপন করা হইয়াছে—বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ মেনন। —"আবার ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগেও বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

বেতারে নির্বাচনী প্রচার বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম—"কুছ পরোয়া নেই,

মাইক তো হ্যায়, আর নেই তো হাতের পাশে চোঙা।"—বলেন আমাদের শ্যামলাল।

স্যার জন সার্জেন্টের রিপোর্টের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিলেন সাংবাদিকগণ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নাকি বলিয়াছেন—যা চাও তা দিতে পারব না, তবে এই নাও, দুটোই আছে—এই বলিয়া দুটি চকোলেট সাংবাদিকদের দিলেন। —"অতঃপর সাংবাদিকগণ সংবাদের বদলে চকোলেট পেলাম বলে ডাকডুমাড়ুম করেছেন কি না, তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি সংবাদে জানা গেল, পৃথিবীর পরমায়ু আর তিন হাজার বৎসর। খুড়ো বলিলেন—"অকাল মৃত্যু সত্যিই মর্মান্তিক। যাহোক, ভোটদাতাদের দুধের

পুকুরে স্নান করবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তার খনন কার্য অবিলম্বে আরম্ভ না করে দিলে পৃথিবীর পরমায়ুর মধ্যে পুকুর হলেও, পুকুর প্রতিষ্ঠা আর হয়ে উঠবে না!!"

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী, কংগ্রেস যাহাতে কর্মযজ্ঞ চালাইয়া যাইতে পারে, সেই ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। —"কিন্তু

যজ্ঞের ঘৃত যে অষ্টগ্রহ শান্তিতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

অষ্টগ্রহের কল্পিত মহাপ্রলয়ের আগে জনৈক বামপন্থী নেতা নাকি তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—প্রলয় কাণ্ড ঘটিতে যাইতেছে, 'তাঁহারা' কী করিতেছেন, জোড়া বলদ দিয়া কি প্রলয় থামানো যায়। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত মর্দনেই কি প্রলয় থামে!!"

কংগ্রেসের অগ্রগতির রথ বজায় রাখিবার জন্য ডাঃ রায় আবেদন জানাইয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন "কিন্তু এদিকে যে রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, এই ধাঁধার উত্তর কে দেবে!!"

পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সাহেবের ঢাকা হইতে গোপনে করাচী চম্পট—বলিয়াছেন সংবাদ-পরিবেশক। —"কিন্তু

ভুল বলেছেন, মিলিটারি কখনও পালায় না, পশ্চাদপসরণ করে"—বলে শ্যামলাল।

নাটক-অভিনয়াদি কোথায় কী হইতেছে, খবর দেওয়ার জন্য 'আনন্দবাজার' পত্রিকার একটি বিভাগ আছে—"এ সপ্তাহে কোথায় কী।" আমাদের জনৈক সহযাত্রী জবাবে বলিলেন—"টালিগঞ্জে নির্বাচন, টালাতে নির্বাচন, খিদিরপুরে নির্বাচন, বালিগঞ্জে নির্বাচন, বৌবাজারে, পার্ক সার্কাসে, চৌরঙ্গী সর্বত্র শুধু নির্বাচনের বাদ্যি।"

খেলা প্রসঙ্গের সংবাদে শুনিলাম, ভারতীয় দল তাহাদের পূর্ব সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জামাইকাতে প্রথম জয়লাভ করে। —"জামাই-কা মাটিতে আমরা সত্যিই বীর"—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

বাংলার তিনশত চিকিৎসককে উড়িষ্যার স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়োগ করা হইবে বলিয়া উড়িষ্যা সরকারের সিদ্ধান্তে কটকে সাত শতাধিক মেডিক্যাল ছাত্র নাকি প্রতীক ধর্মঘট করিয়াছে। —"কিন্তু তাঁদের জানা উচিত—চিকিৎসকরত্নং দুষ্কুলাদপি" মন্তব্য করে শ্যামলাল।

ভোটদাতাদের আঙুলে দাগ দেওয়ার জন্য চার লক্ষ শিশি কালির প্রয়োজন হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"ভোটপ্রার্থীদের পরস্পরের গায়ে ছিটনোর জন্য কতটা কালির দরকার হবে, তা এখনও জানা যায়নি!!"

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও কুয়াশার জন্য এইবারে পানের বরোজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। শুনিলাম, সরকার এ বিষয়ে সাহায্য করার কথা বিবেচনা করিতেছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী পুরাকালের একটি গান শুনাইলেন—"পান দিলে সুপারি লাগে, আরো লাগে চুণ, খয়ের দিয়া মসলা দিয়া জ্বলে পিরিতের আগুন।"

কোন এক বৈদেশিক সংবাদে জানা গেল যে, জনৈক জজ সাহেব একটি তরুণীকে (স্বেচ্ছা বিবাহের মামলায়) বলিয়াছেন যে, আগে তাঁহাকে রন্ধন-বিদ্যা শিখিতে হইবে, এই জন্য তিন মাস সময় দেওয়া গেল; তারপরে তিনি বিবাহে অনুমতি দিবেন। —"তরুণী কী বলেছেন বা কী করছেন, জানা যায়নি। তবে ব্যাপারটা আমাদের দেশে হলে 'রান্না করা চলবে না—চলবে না' মিছিল বেরিয়ে যেত"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফররত ভারতীয় দল লণ্ডনে উপস্থিত হইলে এম সি সি তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ভারতীয় হাই-কমিশনের পক্ষ হইতে কেহই উপস্থিত হন নাই, তাঁরা নাকি কোন খবরই পান নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—"খেলা ছেড়ে শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে পড়ে থাকাতেই জ্যাক ডাল বনে গিয়েছিল।"

বম্বের "উইমেনস অউন উইকলি"তে বাঙালীদের সম্বন্ধে নাকি নানা কুৎসা রটনা করা হইয়াছে। একটি নমুনা: —"বাঙালীরা মনে করে ভারতের একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই দান।" বিশু খুড়ো বলিলেন—"মোটেই নয়, মোটেই নয়, রবীন্দ্রনাথ তো 'উইমেনস অউন উইকলি'র দান!!"

॥ ২ ॥

ডাক্তারবাবু এই সব নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে থাকেন যে, তাঁর কাছে গিয়ে নিজের কথা বলতে সংকোচ হয়। একদিন তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মনে হল তিনি যেন আমাকে দেখতেই পেলেন না, মনে হল তিনি যেন অনেক দূরে আছেন। এইটেতেই আমার আরও বেশী কষ্ট হয়। আমি যে তাঁর বাড়িতে তাঁরই আমন্ত্রণে তাঁর কাছাকাছি আছি, তাঁর আশ্রয়ে নিজেকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করছি, সেটা যেন তিনি লক্ষই করেন না। আমার অস্তিত্বই তিনি যেন স্বীকার করতে চান না, এইটেতেই আমার আত্মসম্মানে আরও আঘাত লাগে। যে দেশ একদিন আমার নিতান্ত আপন ছিল আজ দেখছি তা আর আমার নয়, তা পরের। অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকাতে গিয়ে বরং বাস করতে পারি, কিন্তু পাকিস্তানে গিয়ে বাস করা আর সম্ভব নয়। কোথায় কি যেন ছিঁড়ে গেছে, আর জোড়া লাগবে না। যে মুসলমানদের কখনও পর ভাবতে পারি নি, তারা আজ পর। বিতাড়িত হয়ে এখন আমরা যে হিন্দুস্থানের লোকেদের আপন করে নিতে চাইছি তারা যদি ভদ্রভাবে আশ্রয় না দেয় তা হলে আমরা যাব কোথায়? ডাক্তারবাবুর মতো লোক কুকুরের সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু আমার দিকে একবার ফিরে চাইতেও তাঁর ইচ্ছা হয় না। যে অনুকম্পাভরে তিনি রাস্তায় ভিখারীকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দেন বোধ হয় তার চেয়ে বেশী অনুকম্পাভরে তিনি আমাকে থাকতে দিয়েছেন, খেতে দিতেও চাচ্ছেন। অথচ আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেন না। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এটা কি সহ্য করা যায়? আমিও তো শিক্ষিত লোক, তাঁর মনোযোগের উপর আমার একটু দাবিও কি নেই!

একদিন মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি তখন ভুটান নামক ছোট্ট জাপানী কুকুরটাকে নিয়ে মেতে ছিলেন। 'ভুটান, ভুটান, ভুটানি ভুটান' বলে চুমকি দিচ্ছিলেন। আর ভুটান তার পিছনের দু' পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে নাচছিল।

"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।" সসংকোচে এগিয়ে গিয়ে বললাম। তিনি এমনভাবে আমার দিকে চাইলেন যেন আমাকে এর আগে আর কখনও দেখেন নি। খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "ও আপনি। কি বলবেন বলুন!"

এর পর খানিকক্ষণের জন্য বাক্‌সংকট হল আমার। কিভাবে কথাটা বলব তা সহসা ঠিক করতে পারলাম না।

"কি বলবেন, বলুন!"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার এখানে এরকমভাবে কতদিন থাকব?"

"কি রকম ভাবে?"

"আপনার অনুগৃহীত হয়ে। বিনামূল্যে আপনার বাড়িতে থাকবার খাবার দাবি তো আমার কিছু নেই—"

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু। মনে হল তাঁর কণ্ঠ থেকে শব্দের তুবড়ি বিস্ফোরণ হল যেন। আমি হকচকিয়ে গেলাম। এত জোরে তাঁকে আর কখনও হাসতে শুনিনি।

হাসি থামিয়ে তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছে ফেললেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তারপর বললেন, "আপনি দাবিদাওয়া নিয়ে খুব মাথা ঘামান দেখছি। ওকালতি পড়েছিলেন না কি?"

"সত্যিই আমি ওকালতি পড়েছিলাম। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত সুবিধে হবে না ভেবে অন্য পথ ধরেছি। বিলাতী বি-এ ডিগ্রির জোরে এখানে চাকরি করছি। মাস্টারি।"

"ওকালতি পড়েছিলাম। কিন্তু যারা উকিল নয় তাদেরও তো আত্মসম্মান থাকা উচিত।"

"তাই শুনেছি। শুদ্ধ ভাষায় ছেলেবেলায় প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম, মনুষ্যত্বের

সহিত আত্মসম্মান ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কিন্তু বড় হয়ে সন্দেহ জেগেছে। মনে হয়েছে আমি কি এমন একটা কেওকেটা যে নিজেকে ক্রমাগত সম্মান করে যাব? ওই যে শালিক-দম্পতি আমার বারান্দায় বাসা বেঁধেছে ওরা আমার অনুমতি নেয়নি, আত্মসম্মান নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না, ওরা নিজেদের ধান্দাতেই ব্যস্ত, ওরা সুখী। আপনি শুধু শুধু আত্মসম্মানের ঝামেলা তুলে কেন কষ্ট পাচ্ছেন তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এখানে যদি আপনার কোন অসুবিধা থাকে বলুন, সেটা দূর করবার চেষ্টা করতে পারি।"

"আমি শালিক পাখি নই, মানুষ। তাই আপনার বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে আর বিনা খরচায় খেতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"টাকা আমি নিতে পারব না আগেই বলেছি। এতে আপনার যদি অসুবিধে হয় অন্যত্র যেতে পারেন। কিন্তু যাবেনই বা কেন আমি ভেবে পাচ্ছি না!"

"আমার অস্বস্তি হচ্ছে আমাকে দিয়ে অন্তত কিছু কাজ করিয়ে নিন। সকালবেলা আর বিকেল পাঁচটার পর আমার ছুটি। সে সময় আপনার কোনও কাজে যদি লাগতে পারি তা হলে আমার সঙ্কোচের কারণ থাকবে না।"

"আপনাকে কি কাজে লাগাব? কাজ বলতে লোকে যা বোঝে তা তো আমি কিছু করি না। আমি যা করি তাকে লোকে বলে অকাজ। এই যে এখন কুকুরদের সঙ্গে আলাপ করছি এর মধ্যে আপনাকে কাজে লাগাব কি করে?"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা ছাড়া আমি সমস্ত দিন যে সব জায়গায় ঘুরি, যেখানে যাই, যা করি সেখানে দ্বিতীয় লোকের স্থান নেই। আমার ড্রাইভার বেচুও সেখানে থাকে না।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার ডিস্পেন্সারীর হিসাবপত্র আমি রাখতে পারি। যদি বলেন—"

আবার তাঁর গলায় হাসির তুবড়ি ছুটল।

"আমার ডিস্পেন্সারী নেই, আমি ওষুধ বিক্রি করি না। যা আছে তা বেহিসাবী ব্যাপার। ওর জন্য কোনও হিসাব-রক্ষক দরকার নেই। এই রকেট, রকেট ডোন্ট ডু দ্যাট। কাম্ হিয়ার।"

প্রকাণ্ড আলসেসিয়ান কুকুর রকেট ছুটে এল। তার মুখে একটা কাঠের টুকরো, চক্ষু উদ্ভাসিত। প্রকাণ্ড ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে দাঁড়াল, যেন কাঠের টুকরোটা কুড়িয়ে এনে মহা কীর্তি করেছে একটা।

"ফেল্, ফেল্, ওটা ফেলে দে।"

কাঠের টুকরোটা রকেট কিছুতে ফেলবে না। ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল চার বছরের বিজয়। সে কিন্তু রকেটকে তর্জনী তুলে শাসন করে যেই বলল, "রকেট রকেট কাম্ কাম্ ছিট (Sit) ছিট্"—কি আশ্চর্য অমনি রকেট তার সামনে এসে বসল আর তার সামনের পা-টা তার কাঁধের উপর তুলে দিল। কাঠের টুকরোটাও পড়ে গেল তার মুখ থেকে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা টেনিস বল বার করে ছুঁড়ে দিলেন সেটা। বিদ্যুৎবেগে রকেট ছুটল সেটার পিছু পিছু এবং নিমেষে সেটাকে নিয়ে এল।

"দে, আমাকে দে ওটা।"

কিছুতেই দেবে না রকেট। ডাক্তারবাবু তাকে খোশামোদ করতে লাগলেন। রকেট

দুষ্টু ছেলের মতো বলটা মুখে করে ছুটে বেড়াতে লাগল।

বিজয় চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুলে এবারও বলল, "লকেট কাম ছিট" কিন্তু এবার রকেট বিজয়ের কথাও শুনলে না। কারণ সে জানে ওই বলটার উপর বিজয়েরও লোভ আছে, বিজয়ের হাতে পড়লে বলটা হয়তো ও আর দেবে না। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খেয়াল হ'ল বিজয়কে তিনি যে স্যান্ডাল-জোড়া দু দিন আগে কিনে দিয়েছিলেন সেটা তো ওর পায়ে নেই।

"বিজয়, তোর জুতো কই?"

আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে বিজয় বলল, "হালা গেলে।" অর্থাৎ হারিয়ে গেছে। এর জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নয় সে।

"এই পেট্‌কি, এই পেট্‌কি কোথা যাচ্ছিস?"

একটা লেগ হর্ন মুরগী ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল একবার, ঘাড়টা একবার কাত করে চাইল তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, তারপর ছুটতে লাগল।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি বললে বুঝতে পারলেন?"

"না—"

"ও বললে আমি ডিম দিতে যাচ্ছি, আমাকে পিছু ডাকছ কেন? এখনই ও ডিম দেবে। বিজয় যা।"

বিজয় চলল মুরগীর পিছু পিছু। এই সব ছেলেমানুষি কাণ্ড কারখানার মধ্যে আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, চলে যাচ্ছিলাম। ডাক্তারবাবু ডাকলেন।

"আপনাকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। আপনার আহত আত্মসম্মানে কি মলম দিলে সুফল ফলবে তা তো মাথায় আসছে না। আপনাকে যদি ঝি চাকরের কাজ করতে বলি তা হলে তো আপনার আত্মসম্মান আরও কাহিল হয়ে পড়বে—"

"কি কাজ?"

"ধরুন যদি আপনাকে সুপুরি কুচুতে বা তরকারি কুটতে বলি?"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না।"

"আমি জানতাম। আমিও পারি না ওসব।"

ভুরু কুঁচকে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আপনাকে কাজ দিতে হলে আমাকেও কাজ করতে হয় কিছু। কখনও করি নি, কিন্তু আপনার যদি সুবিধা হয় করা যাবে না হয়।"

"কি রকম কাজ সেটা—"

"পাঠোদ্ধার। আমি সমস্ত দিন যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই তখন নানারকম আইডিয়া মাথার মধ্যে আসে। আসে আর উড়ে যায়। কখনও তাদের কথার খাঁচায় বন্দী করবার চেষ্টা করিনি। আপনার যদি সুবিধা হয় করব। লিখে ফেলব না হয়। কিন্তু আমার হাতের লেখা এমন যে পরদিন হয়তো নিজেই আমি পড়তে পারব না। আপনি যদি পারেন পরিচ্ছন্ন করে লিখতে পারেন সেগুলো—"

"তাতে কি হবে?"

"আপনি একটা কাজ পাবেন। আপনাকে একটা কাজ দেওয়াই লক্ষ্য। আপনার আত্ম-সম্মানকে সজীব রাখবার আর তো কোনও উপায় ভেবে পাচ্ছি না। লিখবেন?"

ভদ্রলোককে হঠাৎ খুব ভাল লেগে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

"লিখব। কিন্তু পরিষ্কার করে লিখে তারপর কি করব ওগুলো?"

"আপনার যা খুশি। রেখেও দিতে পারেন, যদি আপনার ভাল লাগে। অনেক ফোটোগ্রাফার নিজের তোলা ফোটোর কপি রেখে দেন, আমার মনের নানা মেজাজের ফটো যদি পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারেন, রাখুন, আমার আপত্তি নেই। ভাল যদি না লাগে, ফেলে দেবেন, ফেলেই বা দেবেন কেন, দাইকে দিয়ে দেবেন, সে বাড়ে কাগজ দিয়ে ঘুঁটে ধরায়। দেখুন, দেখুন, ওটাকে চেনেন?"

একটা সবুজ রঙের ছিপছিপে পাখি এসে টেলিফোনের তারের উপর বসল।

"না, আমি চিনি না।"

"বাঁশপাতি। ওদের সঙ্গে ভাব করুন না। ওরা লোক ভাল।"

মুচকি হেসে চলে আসছিলাম। আবার ডাকলেন ডাক্তারবাবু।

"রাঘব ঘোষালের সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?"

"না। কে তিনি?"

"তিনিও একজন ডাক্তার। এবং একজন উদ্বাস্তু। সে হিসাবে আপনার সম-গোত্র। আমার বাড়ির পশ্চিমে ওই যে ছোট্ট বাড়িটা দেখছেন, ওতেই উনি থাকেন। তাঁর চেহারা দেখে মাঝে মাঝে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়—বোধ হয় একবার এসেওছিলেন আমার কাছে—কিন্তু আমি সময় করে উঠতে পারিনি। আলাপ-টালাপ করা আমার ধাতে নেই। আপনাদের দেশের লোক, আলাপ করলে হয়তো ভালো লাগবে। আলাপ করুন না গিয়ে একদিন। আর কিছু না হোক, সময় তো কাটবে—"

"তার কপালের উপর কি একটা আব আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক।"

"আচ্ছা, গিয়ে আলাপ করব একদিন।"

চলে এলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। একটা অপরূপ সুর যেন বাজতে লাগল মনের তন্ত্রীতে।

গণেশ হালদার সেদিন এই পর্যন্ত লিখে তাঁর ডায়েরি বন্ধ করলেন। নিয়মিতভাবে না হলেও প্রায়ই তিনি তাঁর ডায়েরি লেখেন, আর এই ডায়েরিতেই তাঁর স্বরূপ চেনা যায়। বাইরে তিনি ভীরু, স্বল্পবাক এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

হিন্দী ভাষায় যাকে বলে 'চাল্‌তা পুরজা', রাঘব ঘোষাল লোকটি তাই। বলিষ্ঠ-গঠন দীর্ঘাকার ব্যক্তি। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, পিছনের দিকে গোছা-গোছা চুল, কটা রঙের। চোখের তারাও কটা। আর একটা বৈশিষ্ট্য, চোখের পলক কম পড়ে। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর একবার মাত্র পলক পড়ে, তখন অন্য দিকে তাকান। কপালের উপর আবটা প্রকাণ্ড। গায়ের রং তামাটে। গোঁফ দাড়ি কামানো। বেশ ভারী-ভরাট মুখ। মিলিটারি ছাঁটের খাকি কোট-প্যাণ্ট পরতে ভালবাসেন। পায়েও মিলিটারি বুট। যৌবনে নাকি মিলিটারিতে কাজও করেছিলেন। এখন তার বয়স প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। এ শহরে কিছুদিন আগে এসেছেন। এসেই জমিয়ে ফেলেছেন বেশ। ভাল ডাক্তার বলে নয়, নিরঙ্কুশ ব্যক্তি বলে। পয়সা রোজগার করবার কোন উপায়কেই তিনি হেয় মনে করেন না। মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন, অবৈধ গর্ভপাত করেন, জুয়া খেলেন, ফ্লাশ খেলাতে দক্ষতা আছে, অনেক চোরা-কারবারে টাকা খাটান। তা ছাড়া, ডাক্তারির জোরে যতটা উপায় করা সম্ভব তা তো করেনই। যে অসুখ তিন দিনে সারার কথা সেটা সারাতে তাঁর প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে যায়, প্রেস্‌কৃপ-শনের পর প্রেসকৃপশন বদলান। লোকে বলে, ডাক্তারবাবুর ওষুধের দাম না কি শস্তা, কিন্তু রুগীরা বুঝতে পারে না যে তিনি অনেক-দিন ধরে চিকিৎসা করে ওষুধের দাম শেষ-পর্যন্ত অনেক বেশী নিয়ে নেন। কিন্তু তবু তিনি জনপ্রিয়, তার কারণ তাঁর নাটকীয় ধরন-ধারন। ডিসপেন্সারীতে যখন অনেক রোগীর ভীড় তখন হয়তো শুনলেন শহর থেকে দশ মাইল দূরে কোন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে, গরীব লোক, ফি দেবার সামর্থ্য নেই, আসতে পারছে না। অমনি রাঘব বলে উঠলেন, কুছ পরোয়া নেই। আমি গিয়ে দেখে আসছি। ঝরঝরে সেকেলে ফোর্ড গাড়িটা বের করে চলে গেলেন সেখানে। তার চিকিৎসা করলেন, একটি পয়সা নিলেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিসুকে আড়ালে মৃদু হেসে বললেন, একটু পাবলি-

সিটি হল। বিসু হিন্দু নয়, মুসলমান। পুরো নাম বিসমিল্লা। মোটর মেকানিক। রাঘব ঘোষালের গাড়িটা ওই সচল রেখেছে। তবে এটা বললেও অন্যায় হবে যে, তিনি সব সময়ে পাবলিসিটির জন্যেই উদারতার ভান করেন। বিলুবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার টাকা তিনি লুকিয়েই দিয়েছিলেন তাঁকে। বিলুবাবু তাঁর তাস খেলার সংগী, প্রায়ই হেরে যান ঘোষালের কাছে। এইটুকুই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক। ঘোষালের মধ্যে সত্যিই দিলদরিয়া ভাব আছে একটা। শুধু দিলদরিয়া নয়, বেপরোয়া মরিয়া ভাব। যখন ঠিক করেন কিছু একটা করবেন, একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন তার মধ্যে, তা সে ভাল মন্দ যাই হোক। অনেক সময় প্রাণ তুচ্ছ করেও। এইজন্যেই বোধহয় স্ত্রীলোকেরা আকৃষ্ট হতেন তাঁর দিকে। ডাক্তার ঘোষালের গৃহিণী নেই। পরকীয়া নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনে একাধিক নারী এসেছে। কেউ দু চার দিন থেকেছে, কেউ দু চার মাস, কেউ বা দু চার বছর। ঘোষাল যদিও এখানে নিজেকে উদ্বাস্তু বলে পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু উদ্বাস্তু বলতে ঠিক যা বোঝায়, তিনি তা নন। তিনি [illegible] সময় কিছুদিন পূর্ববঙ্গে ছিলেন অবশ্য, [illegible] ছিলেন তা সত্য, কিন্তু তবু তিনি উদ্বাস্তু নন। কারণ পূর্ববঙ্গে তাঁর কোনও বাস্তু ছিল না। [illegible] শোনা যায় তিনি অনেক দেশে ঘুরেছেন। রেঙ্গুনে ছিলেন, [illegible] ছিলেন, চীনদেশেও নাকি ছিলেন। আসলে তিনি [illegible] লোক। [illegible] কিংবা বড় জোর বাসা ভাড়া করে কাটিয়েছেন সারা জীবন। কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে উদ্বাস্তুদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি আদায় করেছেন। কোথায় কি তৈপরবী করলে কাজ হাসিল হবে তা তিনি ভাল করেই জানেন। এখানকার যে অফিসারটি উদ্বাস্তুদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা সেই মিস্টার সেনের সঙ্গে ঘোষালের গলায় গলায় ভাব। সুতরাং উদ্বাস্তুদের প্রাপ্য সমস্ত সুবিধাই তিনি পেয়েছেন। এখানকার উদ্বাস্তু কলোনীর ডাক্তার তিনি। [illegible] কিছু ভাতা পান এবং [illegible] একটি বাসা ভাড়া করে আছেন শহরে। তিনি উদ্বাস্তু কলোনীর ভিতর থাকতে চান না। কেন চান না, সেটা একটা রহস্য। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ও কলোনীতে যারা থাকে তাদের সঙ্গে মেলে না আমার। তিনি শহরে যে বাসাটি ভাড়া নিয়েছেন সেটি ডাক্তারবাবুর বাসার কাছেই। ছোট বাসা, একখানি শোবার ঘর। সেইটেই আসবাবপত্রে ঠাসা। দ্বিতীয় ঘরটি বড়, সেটি আড্ডাঘর। এক ধারে একটি গোল টেবিল আর তার চারপাশে চেয়ার, আর এক ধারে দেশী ব্যবস্থা, প্রকাণ্ড একটা তক্তাপোশ পাতা, তার উপর [illegible] সতরঞ্চি আর গোটাকতক তাকিয়া। এখানেই সাধারণত তাস-পাশা খেলা হয় বাজি ধরে। শোনা যায় শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকও নাকি আসেন এখানে। ডাক্তার ঘোষালের নিজের কোনও ডিসপেন্সারী নেই। শহরের একটি ডিসপেন্সারীর সঙ্গে তাঁর 'বন্দোবস্ত' আছে। সেইখানেই তিনি সকাল-বিকাল বসেন। সেইখান থেকেই তাঁর সমস্ত প্রেসকৃপশন বিক্রি হয়। ডাক্তার ঘোষালের নির্দেশ অনুসারে তাঁর প্রেসকৃপশনের দাম বাজারদরের চেয়ে কিছু কম নেওয়া হয়। ডাক্তার ঘোষাল এ শহরে এসেই তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন। খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন প্রথমেই, কিন্তু তাঁর ধরন-ধারন কথাবার্তা শুনে আর দ্বিতীয়বার যাননি। বুঝেছিলেন এঁর পালক অন্যরকম, এঁর সঙ্গে মেশা যাবে না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গণেশ হালদার থাকেন, এ তিনি জানতেন। গণেশ যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এ-ও তাঁর অবিদিত ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন নি। বোধ হয় পূর্ববঙ্গের লোক বলেই করেননি। পূর্ববঙ্গের লোককে পারতপক্ষে তিনি এড়িয়ে চলতে চান। কিংবা শিক্ষক বলেই তাঁকে এড়িয়ে গেছেন। শিক্ষকদের সান্নিধ্য সাধারণত তিনি সহ্য করতে পারেন না। বলেন, ওরা এক অদ্ভুত ভিন্নভেদ্ জাত, নাইদার ফিশ্ নর ফ্লেশ (neither fish nor flesh)। সমাজের সম্মানিত এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে রাঘব ঘোষালের এই ধারণা গণেশ হালদারের জানা ছিল না, থাকলে তিনি তাঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে যেতেন না। তিনি প্রথমত মুখচোরা লোক, দ্বিতীয়ত, বিলেতে কিছুদিন বাস করার ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে বিলাতি ছাপটা তাঁর মনে বসে গেছে তাতে যখন তখন যার তার সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ করা শক্ত তাঁর পক্ষে। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে (ইংরিজীতে যাকে introduce করিয়ে দেওয়া বলে) কারও সঙ্গে আলাপ করতে পারেন না তিনি। স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষককেই এড়িয়ে চলেন। ভাব একমাত্র ভবতোষ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। তা-ও খুব মন-খোলা ভাব নয়। পরস্পর দেখা হলে মুচকি হাসেন কেবল। তবু গণেশ হালদার রাঘব ঘোষালের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে গেলেন একদিন। যাওয়ার আসল কারণটা তাঁর মনে স্পষ্ট হয়নি সম্ভবত। গেলেন খামখেয়ালী ডাক্তার-

বাবুকে তাঁর হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল বলে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যখন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছেন তখন সেটা করা উচিত। তাঁর কথাটা অমান্য করাটা ঠিক হবে না।
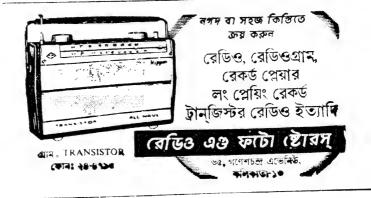
হালদার মশায় সন্ধ্যার পর ডাক্তার ঘোষালের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বাইরের ঘরটা খোলা রয়েছে, আর ঘোষাল এক প্যাকেট তাস নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যেক তাসের পিছনগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন। সন্তর্পণে উঁকি দিলেন হালদার মশায়, তারপর গলা-খাঁকারি দিলেন, তাও খুব আস্তে। ঘোষাল তাসের পিছন দিকে চেয়ে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি ছোট্ট গলা-খাঁকারিটা শুনতে পেলেন না। আর একটু জোরে কাশলেন হালদার। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টবৎ লাফিয়ে উঠলেন ঘোষাল এবং বলে উঠলেন, 'কাউ'। হালদার মশায়ের মনে হল একটা বাঘ যেন 'হাঁউ' করে উঠল। 'কাউ' ঘোষাল ডাক্তারের অনুচর। ঠিক ভৃত্য নয়,

গিয়েছেন। আরও অনেক নিত্যহরিবাবু বালিশ বগলে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছোটাছুটি করেছেন; আরও অনেক স্যাটা বোস দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাউন্টারে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খবরাখবর নিয়েছেন। আরও অনেক কনি তাদের শুভ্র নগ্নদেহের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গীতে প্রমোদকক্ষকে মোহময় করে তুলেছে, আরও অনেক প্রভাতচন্দ্র গোমেজ তাদের শব্দযন্ত্রে নিস্তব্ধ রাত্রিকে মুখর করে তুলেছে। কিন্তু কেউ তাদের মনে রাখেনি। মনে রাখবার কথাও নয়।"

"ভাবছো, কাব্য করছি, তাই না?" বোসদা হেসে বলেছিলেন, "হবস সায়েব তো তোমাকে অতো ভালোবাসেন। পুরনো কলকাতা সম্বন্ধে তো ওঁর অতো আগ্রহ, সেকালের সঙ্গে একালের একটা যোগসূত্র উনিই তো রক্ষে করছেন, উনিও বলেন—টু-ডে এন্ড টু-মরো; আজ আর আগামী কাল; এই নিয়েই আমাদের হোটেল। বিগতযৌবনা ইয়েস্টারডের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গতকাল সম্বন্ধে আমাদের একটুও মাথা ব্যথা নেই।"

বোসদা দাড়ি কামানো শেষ করে রেডটা তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বলেছিলেন, "আমার যে সাহিত্য আসে না। মাতৃভাষায় দখল থাকলে মনের ভাব কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারতাম। সোজা বাংলায় বলতে গেলে আমাদের গুড মর্নিং শুরু হয় টু-ডে দিয়ে। দিনের শেষে রাত্রের অন্ধকারে টু-ডের তলানিটুকু যখন ডাইনিং হলে পড়ে থাকে, তখন আমরা টু-মরোর জন্যে পরিকল্পনা করতে বসি। টু-ডেটাই যে কখন ইয়েস্টারডে হয়ে জীবনের বোঁটা থেকে ঝরে পড়ে তার খোঁজই রাখি না।"

শুধু শাজাহান হোটেলের কর্মচারী কেন, শাজাহানের পৃষ্ঠপোষকরাও ইয়েস্টারডের খবরাখবর নিতে ভালবাসেন না। খবরের কাগজে নতুন নর্তকী আসছে, তার বিজ্ঞাপন পড়েই তাঁরা আবার খোঁজখবর করতে লাগলেন। কনি যে কোথায় গেল তা কেউ একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করবেন না। এবার আসছেন মধ্য এশিয়া থেকে আর এক নর্তকী।

আমাদের বিজ্ঞাপন পড়েই ফোন আসতে শুরু করেছে। "হ্যালো, শাজাহান হোটেল? হ্যাঁ মশায়, এতোদিনে তাহলে আপনাদের সুমতি হলো। এতোদিনে একটা বেলি ডান্সার আনাচ্ছেন।"

আমি বলছি, "হ্যাঁ, আপনারা আসতে পারেন।"

ফোনের ওদিক থেকে উত্তর এসেছে, "দেখবেন মশায় জেনুইন বেলি ডান্সার তো? যা ভেজালের যুগ পড়েছে, কিছুই বিশ্বাস নেই।"

আমি ভদ্রলোকের কথার অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। পাশেই বোসদা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নিলেন। বললেন, "হ্যাঁ স্যার, এটা শাজাহান হোটেল। এটা কলকাতার সস্তা রেস্তোরাঁ নয় যে, বাজারবাজারের জিনিস ইজিপ্সিয়ান বলে চালিয়ে দেবো।"

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "আমাদের কী দোষ মশায়? ঠকে ঠকে আমরা শিখছি। জেনুইন বেলি ডান্সার বলে টিকিট কিনে দেখি প্যাকিং বাক্সের নাচ হচ্ছে। বডির কোনো মুভমেন্ট নেই। জানেন, একটা জেনুইন বেলি ডান্সারের পেটের মাসল্ প্রতি মিনিটে কতবার মুভ করে?"

বোসদা বিরক্ত হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। কিন্তু টেলিফোন নামিয়ে রাখলেই মুক্তি পাওয়া যায় না। চোখ বন্ধ করে থেকে কোন হরিণ যেমন ভেবেছিল শিকারীর হাত থেকে ছাড়া পাবে, আমরাও তেমনি মাঝে মাঝে ভাবি টেলিফোন ছেড়ে দিলেই রক্ষে পাওয়া যাবে।

একটু পরেই আবার টেলিফোনটা বেজে উঠলো। বোসদা বললেন, "আমি আর ধরছি না, তুমি ম্যানেজ করো। শাজাহান হোটেলে এতোদিন চাকরি করে কেমন ওস্তাদ হয়েছো দেখি।"

টেলিফোন তুলেই বুঝলাম, সেই পুরনো ভদ্রলোক। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো। উনি বললেন, "ব্যাপার কী মশাই? হঠাৎ কথা বলতে বলতে লাইন কেটে গেল।"

বললাম, "ভেরি স্যরি। মাঝে মাঝে কেন যে এমন হয়।"

ভদ্রলোক বললেন, "টেলিফোনে কমপ্লেন করে দিন।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম, "তা হলে স্যার, আপনি কবে আসছেন?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "আগামী কালের জন্যে দুটো চেয়ার রেখে দিন।"

আমি বললাম, "আমাদের নতুন নিয়ম স্যার, টেলিফোনে টেবিল রিজার্ভ ফার্স্ট উইকে সম্ভব নয়। কাউকে পাঠিয়ে টিকিটটা কাটিয়ে নিয়ে যাবেন।"

ভদ্রলোক যেন আমার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝলেন। বললেন, "হেভি ডিমান্ড বুঝি? তা তো হবেই। জেনুইন বেলি ডান্সার হলে কালকাটার লোকেরা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেই।"

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই বোসদা বললেন, "ওরে। চেষ্টা করলে এ-লাইনে টিকে থাকতে পারবে।"

"আমরা তো চেষ্টা করেও টিকে থাকতে পারছি না।" কে যেন বোসদার কথার সূত্র ধরেই মন্তব্য করলেন। চেয়ে দেখি বুশ-শার্ট-পরা এক ভদ্রলোক। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক হাসছেন।

"আরে, কী সৌভাগ্য। অনেকদিন অধম-দের মনে করেননি কী ব্যাপার?" বোসদা ভদ্রলোককে প্রচুর খাতির করে বললেন।

"মনে করেও কী হবে? যা কৃপণ মানুষ আপনারা। হাজার সাধ্যসাধনা করলেও আপনার হাত দিয়ে তেল গলবে না। কিছুতেই মুখ খোলেন না।" বোসদার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন।

বোসদা সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললেন, "গরীবকে এবং শাজাহান হোটেলকে যদি মারতে চান, তাহলে মারুন। আপনার যা ইচ্ছে হয় তাই বলুন। তবে একটা কথা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এই দাসানুদাস আপনাদের সেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।"

ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "যাক আপনার শাজাহানী বিনয় ছাড়ুন। কোনো ইন্টারেস্টিং মাল এসেছে নাকি?"

আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোনো গোপন রহস্য আছে নাকি? কিসের জন্যে বোসদা এতো আগ্রহের সঙ্গে কথা বলছেন, লেনদেনই বা কিসের?

বোসদা একটু যেন চিন্তা করলেন। তারপর পেন্সিলটা কানে গুঁজে বললেন, "না এখন একটাও ইন্টারেস্টিং কেস নেই। কাল বোধ হয় আসছে।"

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, "না, মিস্টার বোস, আমি প্রফেশন্যাল লোক। আপনার বেলি ডান্সার লায়লা তে ইন্টারেস্টেড নই।"

বোসদা হাসতে হাসতে বললেন, "না না ওসব নয়। আমরা কি আর মানুষ চিনি না? আপনি যাতে ইন্টারেস্টেড, এমন কিছুই কাল আসছেন।"

ভদ্রলোক এবার চলে গেলেন। বোসদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী অমন বোকার মতো চেয়ে আছো কেন? ভদ্রলোককে খাতির করবে। উনিও আমার মতো মিস্টার এস বোস। খবরের কাগজের নাম-করা রিপোর্টার। মাঝে মাঝে খবরের খোঁজে আসেন। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন সুন্দর ব্যবহার। এখান থেকেই কত খবর যোগাড়

কলিকাতা শিল্পমেলায় (১৯৬২) ফিলিপস্ ডিলার্স প্যাভিলিয়ন দেখুন

করে নিয়ে গিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনেই খবরগুলো ঘটেছে অথচ বুঝতে পারিনি। পরের দিন মিস্টার বোসের রিপোর্ট পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছি। মিস্টার বোস বলেন, "ইন্ডিয়ার আট আনা খবর তো এখন এয়ারপোর্ট এবং হোটেলে তৈরি হচ্ছে। ভদ্রলোক কাল হয়তো আবার আসতে পারেন। যদি আসেন সাহায্য কোরো।"

"কী সহায্য করবো?"

আমার মনে ছিল না। কিন্তু দেখলাম সত্যসুন্দরদার মনে আছে। তিনি বললেন, "কেন কালই না পাকড়াশিদের অতিথিরা করবী দেবীর গেস্ট রুমে এসে হাজির হচ্ছেন।"

পাকড়াশিদের অতিথির কথা আবার মনে পড়ে গেল। কলকাতায় তাঁদের দিনপঞ্জীর বিবরণ করবী দেবীর অনেক আগেই পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। নতুন আগন্তুকদের আবির্ভাব প্রতীক্ষায় শ্রীমতী করবী গুহ নিশ্চয়ই তাঁর গেস্টহাউস যথাযথভাবে সাজিয়ে তুলেছেন।

তদন্তের জন্যে টেলিফোনে দু'নম্বর স্যুইটকে ডাকলাম। করবী দেবী টেলিফোন ধরলেন। "কে? শংকর? বা আপনি তো বেশ

লোক। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে টেলিফোন করছেন। তবু আসবেন না।"

বললাম, "আপনারই তো খবর দেবার কথা ছিল। তাছাড়া এখন আপনার কোনো অতিথি থাকতে পারেন।"

করবী দেবী বললেন, "কবে যে মুক্তি হবে জানি না। কবে যে পৃথিবী থেকে বিজনেস ট্রানজাকসান উঠে যাবে বলতে পারেন? আমি তো সেইদিনের জন্যে দিন গুনছি।"

বললাম, "হঠাৎ এ-সব প্রশ্ন করছেন কেন? বিজনেস ট্রানজাকসন, সাংস্কৃতিক সফর, আন্তর্জাতিক সম্মেলন এ-সব যদি উঠে যায়, তাহলে আমাদের তো আবার পথে দাঁড়াতে হবে।"

করবী দেবী বললেন, "হয়তো আপনাদের চাকরি থাকবে না। কিন্তু শান্তি পাবেন। আমার দু'একটা অতিথির নমুনা যদি দেখতেন।"

আজকাল আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে। বললাম, "কেন আপনার তো সিলেকটেড গেস্ট। আমাদের মতো সার্বজনীন পুজোর নৈবেদ্য তো আপনাকে সাজাতে হচ্ছে না।"

করবী দেবী বললেন, "গেস্টরুমে চলে আসুন। তখন আপনার সঙ্গে কথা হবে।"

আমার হাতে কাজ ছিল না। আমার ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছে। আট ঘণ্টা ধরে অতিথিদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা এবং বিমর্ষ মুখে বিদায় জানিয়েছি। একটা টি-পার্টির ব্যবস্থা করেছি। কোন্ এক কোম্পানীর মালিক বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসেছেন। তাঁরই সম্মানে কলকাতা শাখার ম্যানেজার টি-পার্টি দিচ্ছেন। এমন চা-চক্র আমাদের এখানে লেগেই আছে। প্রায় প্রতিদিনই ব্যাংকোয়েটে হল প্রখ্যাতদের পদধূলিতে ধন্য হয়ে ওঠে। আমাদেরও কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মাইক ঠিক করে দেওয়া, যিনি পার্টি দিচ্ছেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য করা, এ-সব আমাদের প্রতিদিনের রুটিন। তারপর একটু বিশ্রাম মন্দ লাগে না।

সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে করবী দেবীর স্যুইটে এসে হাজির হলাম।

করবী দেবীর তখন সান্ধ্যস্নান শেষ হয়ে গিয়েছে। মূল্যোবান এবং দুর্লভ ফরাসী সেন্ট দেহে ছড়িয়ে করবী দেবী একটা রকিং চেয়ারে বসেছিলেন, আমাকে দেখেই তাঁর দোদুল্যমান দেহ যেন থমকে দাঁড়াল। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আজ যেন মনে হলো ওঁর বয়স বুঝতে ভুল করেছিলাম। আগে যা ভেবেছি উনি তত বয়সিনী নন!

করবী দেবী বললেন, "সমস্ত দিনটা আজ যেভাবে গিয়েছে, তা ভাবতে আমার গা ঘাম ঘাম করছে।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। করবী দেবী বললেন, "আপনাদের স্বাধীন ভারতবর্ষে কয়েকটা জিনিস খুব বেড়েছে। কণ্ট্রাক্ট, কণ্ট্রাক্টর, পারচেজ অফিসার, অ্যাকাউণ্টস অফিসার এঁদের জন্যেই যেন পৃথিবী এখনও সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মিস্টার আগরওয়ালাকেই বা কী বলবো। অতিথি নির্বাচনে তাঁর কোনো রুচি নেই। যারা হোটেলের ভিতর দেখেনি কোনো দিন, যারা কোনোদিন ড্রিংকের ড শোনেনি, তাদেরও তিনি দু'নম্বর স্যুইটে নেমন্তন্ন করছেন, তাদেরও তিনি বার-এ ঢোকাচ্ছেন।"

করবী দেবী এবার রকিং চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, কফি তৈরি করবার জন্য হিটারে গরম জল চড়িয়ে দিলেন। সুইচটা অন করে দিয়ে করবী দেবী একবার ড্রেসিং আয়নায় নিজের দেহটাকে যাচাই করে নিলেন। নিজের রাঙানো ঠোঁটটা আয়নাতে একটু খুঁটিয়ে দেখলেন। মাথার খোঁপায় যে রজনীগন্ধা ফুলগুলো সযত্নে সাজানো ছিল সেগুলো অবহেলাভরে খুলে খুলে টেবিলের উপর রাখতে লাগলেন।

তারপর দুঃখ করে বললেন, "ছুরি কাঁটা ধরতে জানে না, চা কিংবা সুপ খেতে গিয়ে চোঁ চোঁ করে আওয়াজ করে, খাওয়ার শেষে বিশ্রী শব্দ করে ঢেকুর তোলে, এমন সব লোকদের আগরওয়ালা সাব সার করেন। আশ্চর্য!"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে কফির অপেক্ষায় বসে রইলাম।

করবী দেবী বললেন, "আমার এক এক-জন মানুষের দুঃখে কিন্তু কি ধাতু দিয়ে যে ভগবান এদের তৈরি করেছেন তা আজও বুঝতে পারি না।"

আমি অনেকটা ভয়ে বললাম, "একদিন হয়তো এই অদ্ভুত রহস্য বুঝতে পারবো। সেদিন হয়তো শাজাহান হোটেল আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠবে। সেদিন হয়তো মিস্টার আগরওয়ালা এই হোটেলের এই স্যুইটের মধ্যে আপনাকে ধরে রাখতে পারবেন না।"

করবী দেবী বললেন, "যদি আমার এই ঘরে অদৃশ্য কোনো কোণ থেকে দিনকয়েকের জন্য নজর রাখেন তবে মানুষ সম্বন্ধে কিছুই জানবার বাকি থাকবে না। আমার যদি লেখার ক্ষমতা থাকতো, তা হলে এতোদিনে আর একখানা মহাভারত তৈরি হয়ে যেতো।"

করবী দেবী বললেন, "অথচ ছোটবেলায় ভাবতাম মানুষ কত মহৎ। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন। এখন কী ধারণা হয়েছে জানেন?" হিটারের সুইচটা বন্ধ করে দিতে দিতে করবী দেবী প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "আপনি হয়তো ভাবছেন মানুষ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

করবী দেবী হেসে ফেললেন। বললেন, "আমার এখন ধারণা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে হয়তো ঈশ্বর নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই একজন পারচেজ অফিসার আছেন। তিনি সংসারের সব কিছু পারচেজ করতে চান। কিন্তু দাম দিতে মোটেই ইচ্ছে নেই। শুধু স্যাম্পেল আর নমুনা ব্যবহার করে করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবার বুদ্ধিতে এঁরা অদ্বিতীয়।"

করবী দেবী এখনও হাসছেন। কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বললেন, "আজ যে ভদ্রলোককে মিস্টার আগরওয়ালা এনে-ছিলেন, তিনি বেশী কথা বলেন না। মদ খাবার লোভও আছে, অথচ মাতাল হবার ভয় আছে। মদও খেলেন। তারপর এখন অন্য এক হোটেলে ক্যাবারে দেখতে গিয়েছেন, মিস্টার আগরওয়ালা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারণ ভদ্রলোক দক্ষিণদেশ থেকে মাঝে মাঝে আসেন, আর প্রচুর মাল কিনে নিয়ে যান। এ হোটেলের মদ খাবার জন্যে ওঁরা খাওয়াচ্ছেন যত, পেট ভরে নিয়ে এসেছেন থাকো, কিন্তু তাই বলে ভানতাগুলো। বিশ্বাস করবেন না ভদ্রলোক ড্রিংকের মধ্যেই একবার জুতো খুলে আহ্নিকটা সেরে নিলেন। মিস্টার আগরওয়ালা আবার সন্তুষ্ট করবার জন্যে বললেন, মিস্টার রঙ্গনাথন, আপনার কাছে এইটেই শেখবার। যেখানেই থাকুন গড্‌কে কিছুতেই ভুলতে পারেন না।' রঙ্গনাথনের তখন নেশা ধরেছে। আহ্নিকে বসবার আগে পর্যন্ত ক্যাবারে মেয়েদের নাচ

সম্বন্ধে খবরাখবর নিচ্ছেন। আগরওয়ালার কথা শুনে বললেন, 'কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আমার ওয়াইফের ভয়ে। ফিয়ারফুল লেডি। সন্ধ্যেবেলায় পুজো না করলে আমাকে খেতে দেবে না।'

রঙ্গনাথনের নাম শুনে আমি যেন একটু অবাক হলাম। মনে পড়ে গেল মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি একবার মমতাজ রেস্টুরেণ্টে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

করবী দেবী বললেন, "ফোকলার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে মিস্টার রঙ্গনাথন এখন মিস্টার আগরওয়ালার স্কন্ধে ভর করেছেন। মিস্টার আগরওয়ালা আমাকে টেলিফোনে মনে করিয়ে দিলেন রঙ্গনাথন বড় শক্ত বাদাম, কিছুতেই ভাঙতে চায় না। মাঝে মাঝে ওকে শুধু কন্ট্রাক্টের কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। এক লক্ষ কন্ট্রাক্টের অর্ডার ওর হাতে রয়েছে। তাছাড়া এই অর্ডারটা বাগাতে পারলে রিপিট অর্ডার আসতে বাধ্য।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে করবী দেবী বললেন, "এক এক সময় খুব মজা লাগে। জানেন, আগরওয়ালা বলে রঙ্গনাথনটা একটা সাইলক। ব্যাটাচ্ছেলে সব বোঝে। মার্কেটের ওঠা নামা ওর নামতার মতো মুখস্ত। এই মালটা যে বাজারে অনেক রয়েছে তা রঙ্গনাথন জানে। তাই আগরওয়ালাকে পিষে যতো পারে রস বার করে নেবার চেষ্টা করছে। আগরওয়ালা সুবিধে করতে না পেরে, শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে আমার এখানে পাঠিয়েছে।"

করবী গুহ এবার শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিলেন। বললেন, "এই জন্যেই মনে হয় পৃথিবীতে বেচা এবং কেনার হাঙ্গামাটা না থাকলেই ভাল হতো।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনার মিস্টার রঙ্গনাথন কী বললেন?"

"রাজী হয়ে গিয়েছেন। আগরওয়ালার সমস্ত স্টকটাই কিনে নেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। রঙ্গনাথন যাবার সময় কী বললে জানেন? বললে, ক্যালকাটা, বম্বে এই কারণেই ফ্লারিশ করছে। বিজনেস এই দুই গ্রেট সিটিতে অনেক সায়েন্টিফিক লাইনে রান করছে। এই ক্যালকাটাওয়ালা এবং বম্বেওয়ালারা জানে কী করে সেল করতে হয়। এখানকার বিজনেসম্যানরা মুদিখানার দোকান থেকে সেলসম্যানসিপ শেখেনি। রঙ্গনাথনের নেশা হয়েছিল।"

"রঙ্গনাথনকে আউট করবার জন্যে কী ড্রিংক আনিয়েছিলেন? জন হেগ?" আমি কফির কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

করবী দেবী হেসে বললেন, রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে যেমন আমি লিনেন ব্যবহার করি, তেমনি যেমন লোক তেমন ড্রিংক সিলেক্ট করবার চেষ্টা করি। ওঁর জন্যে আনিয়েছিলাম, ওল্ড স্মাগলার।"

ওল্ড স্মাগলারের রঙীন নেশায় ভদ্রলোক বোল্ড আউট হয়ে যাননি। কিন্তু টলমল করছিলেন। সেই অবস্থায় বলেছিলেন, মিস্টার আগরওয়ালা আপনি একটা ইস্কুল খুলুন। এই ক্যালকাটারও বহু বিজনেসম্যান সেল করতে জানে না। তাদের সঙ্গে ডীল করতে গেলে আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। মনে হয় ঠিক যেন আমার ওয়াইফের সঙ্গে ডীল করছি। আমাকে যেন ওঁরা অনেকদিন আগে থেকেই কিনে রেখেছেন।"

রঙ্গনাথন থেকে আমরা আবার মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের অতিথিদের কথায় ফিরে এলাম।

করবী গুহ বললেন, "অভ্যর্থনার সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এখন কেবল ফোন করে সব ঠিক করে নেওয়া। মিস্টার অনিন্দ্য পাকড়াশিকে আপনি চেনেন নাকি?"

বললাম, "সামান্য পরিচয় আছে।"

"আগে থেকেই ওঁকে চিনতেন?" করবী দেবী প্রশ্ন করলেন।

"না, এইখানেই আলাপ হয়েছিল", আমি উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা! এই হোটেলে? উনি কি এখানে আসেন? কেমন লোকটি বলুন তো?"

আমি বললাম, "কেন বলুন তো?"

করবী দেবী হেসে বললেন, "আছে, প্রয়োজন আছে। ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।" করবী দেবী এবার ওঁর টেলিফোনটা তুলে ধরলেন।

[ক্রমশ]

জাপানের সাধারণ মানুষের স্বার্থ-জড়িত ঘরোয়া ঘটনাবলীর কিছু বিবরণ নীচে উল্লেখ করছি :

গুপ্তহত্যা

এদের জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'চুয়ো কোরনে' প্রকাশিত একটি ছোটগল্পের 'স্বপ্ন' অংশে সম্রাটকে ঘৃণ্যভাবে আক্রমণ করার ফলে—কাগজটির সম্পাদকের স্ত্রী গুরুতরভাবে জখম হন, এবং সম্পাদকের পরিচারিকাও উগ্র-দক্ষিণপন্থী এক যুবক কর্তৃক নিহত হয়। অতি সম্প্রতি, রাজকীয় প্রতিরোধ সংস্থার জাপানের আত্মরক্ষা-বাহিনীর সঙ্গে এরা যুক্ত নয়। সদস্যদের—প্রধানমন্ত্রী, উদার গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের হত্যা করবার এক চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এই চক্রান্তের মজার দিকটি হল, শীর্ষস্থানীয় জনৈক সদস্য এই ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এবং ইনি সেই একই ভদ্রলোক যুদ্ধপূর্ব কালে প্রধানমন্ত্রী ইনুকাইকে যিনি খুন করেন। সে সময় এঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ করেছিলেন মাত্র এক বছর পরে 'সদাচরণের' জন্য এবং অবশেষে এক মাঝামাঝি মাপের প্রতিষ্ঠানে প্রধান কর্মপরিচালক হিসাবে বহাল হয়ে বসেন।

যা-হোক, এই চক্রান্তগুলিকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করে দেখা দরকার। আধুনিক জাপানে এই সব ধরনের দক্ষিণপন্থী গুপ্তহত্যার প্রথা যদিও স্বচ্ছভাবে দেখতে গেলে কিছুটা সমর্থন পায় তবে যুদ্ধপূর্ব যুগের থেকে জাপানী জনসাধারণের মনোভাব এ ব্যাপারে খুবই বদলে গিয়েছে। এবং জাপানী সমাজ খুব সম্ভবত রাতারাতি দক্ষিণপন্থী সরকারের আওতায় আসবে না অর্থাৎ যেমনটা ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়।

সরকারের দায়িত্ব

গোটা বিগত বছরব্যাপী অজস্র যানবাহন দুর্ঘটনা ঘটেছে—আর এ সবই পথচারী, মালবাহী লরী, নানা ধরনের মোটরগাড়িকে জড়িয়ে। শতকরা পঞ্চাশটির মত দুর্ঘটনার উৎস হরদম অতিরিক্ত মালবোঝাই দেওয়া এই সব ট্রাক এবং এদের চালায়ও এমন একধরনের বেপরোয়া যুবক যাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বলে মগজে কোন পদার্থ নেই। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল উত্তরাধিকারীদের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অত্যন্ত কম। নিহতদের জীবন-বীমারও কোন বালাই পর্যন্ত নেই। ছোকরা ড্রাইভাররা তাদের যুক্তি দেখায় গাড়ি চালনায় অনভিজ্ঞতার জন্য এদের নিয়োগ-কর্তামশাইরা দিন। এটাই হল [illegible]। হামামাৎসুর একটি [illegible] খবর দিচ্ছি, —একটি মাটিভর্তি বিশালকায় ট্রাক তার পিছনে একজন ভদ্রমহিলাকে পঞ্চাশ ফুট হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যায় যখন তাঁর স্বামী লরিতে ট্রাকে আরোহণ করে [illegible] ড্রাইভারকে ট্রাক থামানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। ড্রাইভারটি [illegible] বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর জন্য নয়, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু এতসত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত এই সব [illegible] গাড়ি-চালকদের বা তাদের নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে তাদের [illegible] ঠাণ্ডা করার মত জোরালো জনমত গড়ে ওঠেনি।

হুবহু একই ধরনের শোকাবহ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাবে ফুকুয়োকা-কেন-এর ৯ই মার্চ এবং ১৬ই মার্চের দু দুটো কয়লা-খনির দুর্ঘটনায়, যাতে ১০৫ জন খনি-শ্রমিকের প্রাণনাশ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারীভাবে সাবধান করা সত্ত্বেও সেফটি ইনস্পেক্টরদের নির্ধারিত আইন অমান্য করার ফলেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার উৎপত্তি। আর আশ্চর্য, প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যানেজাররা এখনো সশরীরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের কারোর ওপর কারা-দণ্ডাদেশের কোন হুকুমই চাপানো হয়নি।

১৯৬১ সালের এই সব ঘটনাগুলি কিন্তু নৈমিত্তিক কোন ব্যাপার নয়। আসলে [illegible] নিয়োগকর্তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে [illegible] ট্রাক-চালক,—তাদের [illegible] ব্যাপারেও যে সরকারের পুরো-পুরি দায়িত্ব রয়েছে, এই বোধের অভাবই এই সব বিপত্তির জন্যে দায়ী। ইংল্যাণ্ডের [illegible] সমসাময়িক কালের সঙ্গে এবং [illegible] গোড়াকার যুগের সঙ্গে এই অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে, [illegible] জাপান এ বিষয়ে [illegible] সংস্কারপন্থী। প্রকৃতপক্ষে [illegible] পুঁজিবাদী দেশগুলির [illegible]। অথচ কোন-কোন ক্ষেত্রে [illegible] বরং মার্কিনদেরই মনে হয় [illegible]। আর হয়ত এর থেকেই জাপানে দক্ষিণপন্থী [illegible] প্রভাব [illegible]।

খেলাধূলার খবর

[illegible] ক্রীড়াঙ্গনের একটি খবর—[illegible] প্রতিযোগিতায় [illegible] (উচ্চতা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি ; ওজন ১৯৮ পাঃ) [illegible] (উচ্চতা ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি ; ওজন ২৬২ পাঃ) কাছে শোচনীয় পরাজয়। জাপানী জনসাধারণ এবং ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ মহল এই পরাজয়ে খুব বিস্ময়-বোধ করেছেন, বিশেষ করে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার মাত্র সাত মিনিট পরে [illegible] ভূপাতিত করার ব্যাপারে কেননা শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে এই ধরনের কৌশল প্রয়োগ কখনো দেখাই যায় না এবং তারাও নিজেদের এভাবে কখনোই আক্রান্ত হবার সুযোগ দেয় না। এই লড়াই-এর স্থায়িত্বকাল নির্ধারিত হয়েছিল বিশ মিনিট।

যা হোক, ঘটনাটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে পরাজয়ের ব্যাপারে আনুষঙ্গিক কারণ বা বাধা দেখানো হয়েছে। [illegible]

জাপানের নৃত্যকলা

থেকেই জুদো-র উৎপত্তি। জুদো-র বিপরীত যুযুৎসুতে কতকগুলি মারাত্মক আক্রমণ স্বীকৃত হয় এবং এই সব আক্রমণ যথাযথ প্রযুক্ত হলে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। এইভাবে যুযুৎসুতে প্রতিপক্ষ বৃহৎ বপু কি ক্ষুদ্র বপু তা গণ্য করা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অপরজনের মুষ্টোঘাতের সীমার মধ্যে থাকে ততক্ষণই নিরাপদ। এদিকে জুদো ক্রীড়া-জগতে আবির্ভূত হবার পর থেকেই এর প্রতিযোগিতায় যাতে মারাত্মক ঘুসি প্রযুক্ত না হতে পারে সেজন্য শারীরিক ওজনগত অসামঞ্জস্যকে গণ্য করা হয়। জুদো-প্রবর্তক হানো-র সংস্কারসাধনগুলি প্রধানত এই সব বিশেষ-বিশেষ আক্রমণগুলি রহিতকরণের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অলিম্পিকে জুদো-র প্রথম সূচনাপর্বে ওজনগত বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে তিনটি বিভাগ প্রস্তুত করা হয়—জুদোপ্রবর্তকের সাবেক পদ্ধতির সঙ্গে বৈষম্য সত্ত্বেও এই সংস্কার-সাধন দরকার হয়ে পড়ে।

জাপানী যুযুৎসু

১৯৪৬ সনে জুদো দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের একটি টোকিওর কোদোকান গোষ্ঠী, অপরটি কিয়োটোর বুতোকুকাই গোষ্ঠী। মোটামুটি-ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, সাবেক দল প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করার ওপর গুরুত্ব দেয় এবং নয়া দল দাঁড়িয়ে জড়াজড়ি-হাতাহাতি লড়াইয়ে। সমরাধিনায়ক ম্যাকআর্থার জাপানের প্রধান জুদোগোষ্ঠী পরিত্যাগ করে বুতোকুকাই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। বুতোকুকাই গোষ্ঠীর শিক্ষকরা সাগরপারের দেশে পাড়ি দেন জুদো শিক্ষা-সম্প্রসারণের জন্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স আর হল্যাণ্ডে জুদো জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে খুব। এদিকে কোদোকান গোষ্ঠীর পেশাদারদের জীবন ধারণের নিচু মান অনুযায়ী তাদের বেতন সবিশেষ কম, অধিকন্তু জাপানী জুদো খেলোয়াড়দের সাবেক সুযোগ-সুবিধেগুলি থেকেও তারা বঞ্চিত হতে থাকে। গীসিংক-এর ক্ষেত্রে এ-কথা স্পষ্ট, ক্রীড়াজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়—এবং সেই জনাই তাঁর জয়লাভকে খুব বিস্ময়কর বলা যায় না, তবু নিশ্চয়ই খুব অপ্রত্যাশিত। অধিকন্তু ১৯৬৪ সনে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জাপানের বিজয়কে সুনিশ্চয়ভাবে গণ্য করাও যাবে না, তবে ওজনগত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ঘটানোর ফলে সম্ভবত অন্তত একটা প্রতিযোগিতায় সে জয়ী হবে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিগত বছরটি জাপানের পক্ষে একটি মন্দ বছর। কম্যুনিস্ট চীনের আসনলাভের প্রশ্নটির মত যাবতীয় আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাপান আমেরিকার পক্ষাবলম্বন করেছে। জাপানের আপন সমুদ্রের বিপরীত দিকের দেশগুলির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বললেই হয় এমনকি জাপানী সমাজতন্ত্রী-গোষ্ঠী, চীন অথবা সোবিয়েত রুশিয়ায় কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল প্রেরণেও অসমর্থ হয়। ডবলিউ. এফ. টি ইউ—সাংবাৎসরিক সাক্ষাৎকারে, সোহিও (সর্ববৃহৎ শ্রমিক সঙ্ঘ সংগঠন)। সদ্য-অবাধ্য মনোভাব-পর্ব অগ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করে কারণ রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে রাশিয়ার ৫০ মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোকে সমর্থন করে না।

জাপানী প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে একটি সৌহার্দ্যসূচক ভ্রমণ-পর্ব চুকিয়ে এসেছেন। প্রত্যাবর্তনের পর বিবৃতি দান প্রসঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেন যে, বাস্তবিক পক্ষে জাপান এশিয়ারই একটি দেশ, জাপান এশীয় নীতি বলতে নিরপেক্ষতা এবং শক্তিজোটে অসম্বদ্ধতাকে সমর্থন করে কি না জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নে, প্রধানমন্ত্রী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি পরিবর্তনের যে কথা ভাবা হচ্ছে তাকেও সরাসরি অস্বীকার করেন।

১৯৬১ সনের মত জাপানের ১৯৬২ সনও শান্ত-ভাবে অতিবাহিত হবে বলে মনে হয় না। অধিকাংশ জাপানীই আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলির চাইতে নিজেদের ঘরোয়া সমস্যা, জীবন ধারণের মান, বেতনের পরিমাণ ইত্যাকার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহশীল, অবশ্য অন্যান্য দেশগুলির যে-কোন দাম্ভিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে, জাতীয় সম্মানের দিকে তারা সব সময় একত্রিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ হবে। বর্তমান বছরটি আলোড়িত হবে বাণিজ্যিক স্বাধীনতা, হস্তগত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ, এবং লাল চীনকে সরাসরি ভোট দানের প্রসঙ্গের মত কতকগুলি দুরূহ সমস্যায়। এর যে কোন একটি পর্ব থেকেই গোলমাল ঘটতে পারে॥

প্রশান্ত গুপ্ত

আকর্ষণ। বড়ো বড়ো কথা, ধর্ম বলো, সাধনা বলো, ভূভারতের তন্ত্রমন্ত্র বলো, সব কিছুরই সবজান্তা। সেই সঙ্গে আত্মম্ভরিতায় ডগমগ। আবার ভিক্ষার জন্যে লোক বুঝে বুঝে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা,—একেবারে তৃণাদপি সুনীচেন। সংস্কৃত ধর্মবচন আর অশ্লীল হিন্দী গালাগাল পাশাপাশি ছোটে। মহাষ্টমীর দিন হালিশহরে সাধক রামপ্রসাদের পঞ্চবটীমূলে বেশ সেজেগুজে জমিয়ে বসেছিল। যাত্রী বুঝে কাছে ডেকে ডেকে লাগসই কথায় মুগ্ধ করেছিল। দিনান্তে বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়ে হাঁটা দিয়েছিল কাঁচড়াপাড়ার দিকে। আমার উপর বিশেষ নজর পড়েছিল কেন জানিনে। নগদ পাঁচটি সিকে খসিয়েছিল এই দুর্মূল্যের বাজারে। নাম বলেছিল অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল কোন ভেকধরা ফেরারী আসামী।

আমি বললাম—তা হো হলো ব্রহ্মচারী, এলেন কবে?

ক'দিন থেকেই আছি দাদা। আপনারই প্রতীক্ষায় আছি। তা আপনার সঙ্গীদের সঙ্গে তো পরিচয় হলো না!

পরিচয়ের অপেক্ষা না রেখেই আত্মপরিচয়ে মুখর হয়ে উঠল অভয়ানন্দ। অধ্যাপক মশাই আর আমার বউঠান যে স্বামী-স্ত্রী একচোখ দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল।

বউঠানকে উদ্দেশ করে সে হেঁকে উঠল—আমি ঠাকরুন, অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী। কথা একটু এলোমেলো বলি, শুনে ভাববেন লোকটা পাগল। কিন্তু জানবেন দৃষ্টি আমার স্বচ্ছ। আমার নজর ঐ নদীর পার ছাড়িয়ে যায়, আকাশ ছাড়িয়ে যায়, বর্তমান ছাড়িয়ে ভবিষ্যতে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে কি দেখছি জানেন? শুনবেন? বিশ্বাস করবেন?

অচেনা সন্নিসিটির মুখে এ কী নাটকীয় সংলাপ? বউঠান একটু ঢোঁক গিলে বললেন—কী দেখছেন?

লাঠিটা বাগিয়ে অধ্যাপকের দিকে কটমটিয়ে তাকালো ব্রহ্মচারী। তারপর খাঁকখাঁক করে হেসে উঠে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখাতে লাগল।

—নেই, নেই মশাই, ঐ আদ্দির পাঞ্জাবির তলে সোনার বোতাম, কাঁচি ধুতি আর মসমসে জুতো—কিচ্ছু নেই, সব ফরসা! মাথায় জটা, গায়ে ছাই আর পরনে লেংটি। চিমটে হাতে ফাটা পায়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মশাই—বোম্ বোম্ হাঁক ছাড়ছেন! আ তব কান্তা কস্তে পুত্র!

ভ্রূকুঞ্চিত করে অধ্যাপক বললেন—তার মানে?

—তার মানে? পষ্ট করে বলতে হবে? আর বেশী দেরি নেই! বিলকুল বাউরা হো যায় গা! মহামায়া কান পকড় কে লে যায় গা!

অভয়ানন্দর ভেল্কি আমার জানা ছিল। কড়া ধমক দিলাম—থামুন, কী বাজে বকছেন পাগলের মত? যেতে দিন আমাদের!

সঙ্গে সঙ্গে ভোল পালটাল। এ একেবারে অন্য গলা।

—জয় তারা, জয় মা, জয় রক্ষাকালী! বউঠানকে উদ্দেশ করে বিগলিত কণ্ঠে বললে—আমি অভয়ানন্দ বলছি মা, ভয় নেই। আপনিই টেনে রাখবেন, বেঁধে রাখবেন সাতপাকের বাঁধনে। তবে সাবধান, একলা ছেড়ে দেবেন না, সর্বদা পাশে পাশে থাকবেন। আহা উনিবনের সাধনভজনে ঠিক যেন ভৈরবের পাশে ভৈরবী!

অনিমেষদার মুখে হাসি ফুটল, কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—যাক্, বাঁচলাম!

বাঁচবেন না মশাই? হো-হো হেসে অভয়া বললে—আপনি যে কঠিন যোগী, আপনাকে মারে কে? বামাক্ষেপার শ্মশানে এসেছেন, তাও যোগিনীকে সঙ্গে করে। এবার একটু নিভৃতে আসন করে বসে গেলেই হয়!

লোকটার মুখের আগল নেই। তাকে আর কেউ না চিনুক আমি চিনি। প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে বললাম—আমাদের সঙ্গে ঘুরবেন? তা হলে চলুন, এখানে কোথায় কী আছে, ভাল করে দেখিয়ে দিন। এঁরা সব নতুন এসেছেন!

—জরুর!

অভয়ানন্দ এইটিই নিশ্চয় চাইছিল। মহানন্দে আমাদের সঙ্গ নিল।

রাস্তা দিয়ে মন্দিরের দিকে আসতে ডান হাতে প্রথমেই পড়বে বামা মিশন প্রতিষ্ঠিত বামা মন্দির। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে এই স্থানে এক কৌশিকনন্দমূলে মহাসাধক বামাক্ষেপা দেহরক্ষা করেন। সেই পুণ্যময় স্থানে তাঁর ভক্তরা এই মন্দির গড়ে তুলেছেন। মন্দিরে বামার প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত। মিশনের সভ্য ও সংশ্লিষ্ট ভক্তরা মন্দির সংলগ্ন কক্ষে আশ্রয় পান। শিবরাত্রির দিন এখানে বামার জন্মোৎসব পালিত হয়। সমবেত শত শত ভক্ত প্রসাদ লাভ করে পরিতৃপ্ত হন।

কয়েক পা এগিয়ে শ্মশানের কোলে আরো দুটি মধ্যমাকৃতি শ্বেত মন্দির। ওই মন্দির দুটিকে ঘিরে তারাপীঠের সুপ্রাচীন কিংবদন্তী।

অভয়ানন্দ বললে—কলিযুগে তারামার আবির্ভাবের পুণ্য কাহিনী শ্রবণ করুন। এ শত শত বছর আগেকার

কথা—এই দ্বারকা নদী তখন ছিল গভীর-সলিলা বেগবতী স্রোতস্বতী। নদীর উপর দিয়ে নৌকা বজরা চলাচল করত। এই শ্মশানতীরে জয়দত্ত নামে এক বণিক দিনাবসানে নৌকা বাঁধলেন। নৌকা ভর্তি বাণিজ্যপণ্য। মাঝিরা আহারের আয়োজনে তীরে ব্যস্ত, নৌকার মধ্যে বণিক জয়দত্ত আর তাঁর পুত্র ব্যস্ত হিসাবনিকাশে। জয়দত্তের এমনই ভাগ্য—সেই রাত্রেই পুত্রটির ভেদবমি শুরু হলো এবং ভোর না হতেই সে মারা গেল। কোথা থেকে কী অপঘাত ঘটে গেল! কোন্ মুখে বণিক স্বগৃহে ফিরবেন, কী বার্তা তিনি নিয়ে যাবেন স্ত্রীর কাছে? প্রিয় পুত্রের এই হঠাৎ মৃত্যু এ যেন বজ্রাঘাত!

কপালে করাঘাত করে পিতা কাঁদছেন, এমন সময় দলের এক বৃদ্ধ মাঝি এসে পুত্রের মৃতদেহটি নিয়ে টানাটানি শুরু করল। কী ব্যাপার? না দেহটি নিয়ে চলুন অদূরের ঐ কুণ্ডের জলে। কেন, কী লাভ হবে? শুনুন তা হলে, গত রাত্রে ঐ কুণ্ডের জলে একটি কাটা শোলমাছ ধুতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই কাটা শোল ঐ কুণ্ডের জলের স্পর্শলাভে জীবিত হয়ে উঠেছিল।

সত্যিই তাই হলো। কুণ্ডের জলে অবগাহন স্নান করাতেই প্রাণ ফিরে পেল বণিকপুত্র। জীবিত কুণ্ড ঐ কুণ্ডের সার্থক নাম।

বলেন কি মশাই? অধ্যাপক বললেন—ঐ কুণ্ডের জলে স্নান করলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে?

না ওঠে না, কে বললে ওঠে? চোখ পাকিয়ে বললে ব্রহ্মচারী ঐ কুণ্ডে জল ছিল না মশায়, ছিল অমৃত। সেই অমৃত-স্পর্শে মরণশীল জীব হতো মৃত্যুঞ্জয়। মানুষের পাপ আর অবিশ্বাস জীবিত-কুণ্ডের সেই অমৃতকে পানা পুকুরের জলে পরিণত করেছে। তাই এখন বলির পাঁঠাকে ওখানে স্নান করায়!

বউদি বললেন, তারপর?

—ধন্য জয়দত্ত! ধন্য সেই প্রহেলিকাময় আশীর্বাদ! দ্বিতীয় রাত্রেও পুনর্জীবিত পুত্রকে নিয়ে ঐ শ্মশানভূমে রয়ে গেলেন জয়দত্ত। মধ্যযামিনীতে ভাগ্যবান বণিকের গভীর স্বপ্নের মধ্যে আবির্ভূতা হলেন দেবী তারিণী। পরদিন প্রত্যুষে উঠে দেবী-নির্দিষ্ট একটি প্রাচীন শ্বেতশিমুল গাছের তলার মাটি খুঁড়তে লাগলেন জয়দত্ত। ঐ শিমুলবৃক্ষমূলে ছিল ত্রেতা যুগের বশিষ্ঠ মুনির পঞ্চমুণ্ডির আসন। এই আসনের নিচে থেকে প্রকাশ পেলেন বশিষ্ঠের শিলাময়ী তারা দ্বিভুজা, সর্পযজ্ঞোপবীত ভূষিতা, বাম ক্রোড়ে শিশুরূপী মহাদেব। প্রকাশ পেলেন অনাদিলিঙ্গ চন্দ্রচূড় শিব। আর আবির্ভূত হলো দেবীর শ্রীচরণশিলা।

ঘোষাল মশাই সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও এত-

বামাক্ষেপার সমাধি মন্দির : তারাপীঠ

ক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। তাঁর অকিঞ্চন মনটি দেবীর কণ্ঠলগ্ন হবার পর থেকেই তিনি যেন কেমন ভাবে-ভোলা হয়ে গিয়েছিলেন। দেবীর প্রভাতী স্নানোদক বোধ হয় তিনি একটু বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। তারই ফলে এই নির্বাক নিস্তব্ধতা। হঠাৎ তিনি ভাবের ঘোরে ভাঙা গলায় গেয়ে উঠলেন—

মন, চল চল শিমুলতলা!

ব্রহ্মচারী বললে, ঠিক বলেছেন দাদা, ঐ শিমুলতলাই মানবসাধনার কল্পবৃক্ষ। ত্রেতায় যেমন বশিষ্ঠ, কলিতে তেমনি বামা-ক্ষেপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এই শিমুল-তলায়। এইখানে বশিষ্ঠের যে পঞ্চমুণ্ডের আসন ছিল, বামা তাকে লক্ষমুণ্ডের আসনে পরিণত করেছিলেন। এই শ্বেতশিমুল গাছটিকে চোখে দেখেছে এমন লোক এখনও আছে। সেই বৃক্ষমূলেই গড়ে উঠেছে এই বশিষ্ঠ-মন্দির।

কয়েকটি চওড়া সিঁড়ি। যাত্রীরা সেই সিঁড়ির ধাপে ধাপে আশ্রয় নিয়েছেন। সিঁড়ির উপরে উঁচু চাতালের উপর বশিষ্ঠ-মন্দির। গাছের ছায়ায় ঢাকা। মন্দিরের মধ্যে পাথর-খোদা তারাদেবীর চরণচিহ্ন।

অধুনালুপ্ত শ্বেতশিমুল গাছটির পাশে জয়দত্ত তারাপীঠের প্রথম তারামন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কালক্রমে সে মন্দির জীর্ণ ও ধ্বংস হয়। তারা-মা ও চন্দ্রচূড় শিব শ্মশানের বাইরে জীবিতকুণ্ডের দক্ষিণে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। দেবীর শ্রীচরণশিলার উপর গড়ে ওঠে বশিষ্ঠ-মন্দির। শ্বেতশিমুলের পাশেই ছিল একটি প্রাচীন নিমগাছ। শিমুল গাছ ধ্বংস হবার পর এই নিমগাছটি হয়েছিল বামাক্ষেপার বড় প্রিয়। দেহরক্ষার পর এই নিমগাছের কোলে যেন তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এইরূপ নির্দেশই নাকি বামাক্ষেপা দিয়ে গিয়েছিলেন। যথাকালে ভক্ত ও শিষ্যরা যখন

সমাধির জন্য নিমগাছটির নিচে খনন করেন, তখন সেইখানে ভূগর্ভে জয়দত্তের সেই প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তিমূলে প্রকাশিত হয়। নিমগাছও নেই, কয়েক বছর আগে দ্বারকার মহাবন্যায় ধ্বংস হয়েছে। তার কোলে গড়ে উঠেছে বামার সমাধি-মন্দির। মন্দিরের মধ্যে বামার কোনো মূর্তি নেই, আছে ধাতু-নির্মিত একটি উন্নত-ফণা সর্প।

বামার সমাধি-মন্দিরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ ছটফট করে উঠলেন ঘোষাল মশাই। চিৎকার করে তিনি বলতে লাগলেন —যাব না, কিছুতেই আমি যাব না ওখানে। বয়ে গেছে আমার! কোথায় গেল আমার শ্বেতশিমূল, আমার বাঞ্ছাকল্পতরু! জানেন কোথায় গেল?

উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। বাবার সমাধি-মন্দিরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—সেই শিমুল গাছকে গাঁজার আগুনে পুড়িয়ে খাক করেছে ঐ ক্ষেপা! জানেন সে কথা?

খাঁক খাঁক করে উঠল ব্রহ্মচারী।

—চুপ, চুপ! মুখ চেপে ধরল ঘোষালের। আমি ভাবলাম লেগে গেল বুঝি দু-জনের মধ্যে। ঘোষালের কথা কানে গিয়েছিল

অনেকের। ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠল আমাদের ঘিরে। আসলে ব্রহ্মচারীর একটা সুযোগ হলো বক্তৃতার।

—ছোট মুখে বড় কথা বলবেন না দাদা। সাবধান, সাবধান! বাবার মাহাত্ম্য হিমালয়ের চূড়ো—আপনার আমার বাজে কথার ঢিল সেখানে পৌঁছয় না। এই যে যুগযুগান্তের শ্বেতশিমুল গাছ ভস্ম হলো, সে কি যে সে ব্যাপার? তার পিছনে কত বড় রহস্য, মায়ের কী বিচিত্র লীলা, তা জানেন?

ঘোষাল তো ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ! ব্রহ্মচারী চারদিকে চোখ বোলালো। শ্রোতাদের মুখে আগ্রহ।

ব্রহ্মচারী শুরু করলে সেই বিকট শ্মশান, সেই ভীমা ভয়ংকরী রাত্রি! চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, খটখট করে হাঁটছে কংকাল, বাতাসে শন্‌শন্ করছে প্রেত-প্রেতিনীর দীর্ঘশ্বাস। পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে আছেন বামদেব, সাধনার শেষ লক্ষ্যসন্ধানে, আমরণ উপবাসে। হঠাৎ সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে আলো জ্বলল। এ আলো সাধকের আপন ললাটের আলো। সেই আলোকে তারাদেবীকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। সেই তারা যিনি যুগযুগান্ত ধরে আত্মগোপন করে ছিলেন সেই শ্বেতশিমুল বৃক্ষে। সাধকের আহ্বানে অবার তিনি মূর্ত হলেন। শিমুলবৃক্ষ ত্যাগ করে তিনি বামার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলেন। বামা হলেন মহাভৈরব। সেই মহাযোগী মহাভৈরবের অন্তরের মধ্যে তারা যখন বসলেন, তখন ঐ শিমুলগাছ অনিবার্য হলো।

আমি বললাম, এই নাকি কাহিনী?

—কাহিনী নয় দাদা, এই সত্য। আপনার আমার মত ভক্তের জন্য মূর্তির প্রয়োজন, প্রতীকের প্রয়োজন। সিদ্ধ মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের প্রতীক লাগে না, মহাশক্তিকে তাঁরা বুকের মধ্যে পুরে নেন। যে প্রতীককে তাঁরা অবলম্বন করেন, সিদ্ধির পর সে প্রতীক থাকলেই বা কী আর পুড়লেই বা কী?

দ্বারকা নদীর ও পারে কবিচন্দ্রপুরের সন্নিকটবর্তী আটলা গ্রামে ১২৪৪ সালের শিবচতুর্দশীর রাত্রে সচল শিব বামাক্ষেপা জন্মগ্রহণ করেন। আদি নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। বালককালেই তিনি তারামন্দিরের সেবার কাজ শুরু করেন। মাতৃপূজার নিত্যকর্মে তিনি বেশী দিন বদ্ধ থাকতে পারেন নি। মা তাঁকে লৌকিক সব কর্ম থেকে বিমুখ করে মাতৃসাধনায় উন্মাদ সাধকে পরিণত করলেন। বামাচরণ হলেন বামাক্ষেপা। বামার চরণ-সন্ধানী বামাক্ষেপা। ত্রিপুরার মেহারকালীর সাধক সর্বানন্দের মতো বজ্রকঠিন বীরাচারী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি হয়েছিলেন বামদেব। সাধনা-উত্তীর্ণ বামাক্ষেপার সাক্ষাৎ শিষ্যগণের মধ্যে ব্রহ্মচারী তারানাথ বা তারাক্ষেপা, নিগমানন্দ সরস্বতী ও পূর্ণানন্দ স্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বামার সমাধি-মন্দির দেখে আমরা রাস্তা দিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে লাগলাম। তারা-মন্দির ছাড়িয়েই বামার নামধন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান। বামদেব সঙ্ঘ। এঁর যাঁরা কর্ম-কর্তা ও সভ্য তাঁরাও বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত সম্প্রদায়। অনেকখানি জায়গা ঘিরে নিয়ে এঁরা সঙ্ঘের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। আশ্রমের প্রথমেই যে প্রকোষ্ঠটি তাতে বামার মর্মরমূর্তি। পিছনের ঘরগুলি ভক্তদের আশ্রম-কক্ষ। শিবচতুর্দশীর দিন এখানেও ভক্তরা মহা আড়ম্বরে বামার জন্মোৎসব পালন করেন। বামাক্ষেপার অলৌকিক জীবন-কাহিনীকারদের মধ্যে হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'তারাপীঠ ভৈরব' নামে বামাক্ষেপার যে জীবনী প্রকাশ করেছেন সেটি একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। বামার ভক্তদের বিশ্বাস যে, যিনি বামা তিনিই ভৈরব, কলিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন ক্ষেপা রূপে। মনুষ্যদেহধারী এই ক্ষেপা ভৈরবের মহাশক্তিলীলা এই গ্রন্থে বিধৃত।

নূতন এক বামা-প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে আর এক ভক্তদলও কোমর বেঁধেছেন। তাঁদের অভিলাষ বামার জন্মভূমি আটলা গ্রামে একটি বামা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। মেলার ভিড়ে ভিড়ে এই আবেদন তাঁরা প্রচার করছেন, আটলার বামা-মন্দির স্থাপনে অর্থ সাহায্য করে যাত্রীদের ধন্য হবার সুযোগ তাঁরা দিচ্ছেন।

সাহায্যের আর একটি আবেদন মহত্তর। এই আবেদন করেছেন তারাপীঠের প্রবীণতম পান্ডা যতীন পান্ডা মহাশয়। তারাপীঠে একটি যাত্রিনিবাস হওয়া প্রয়োজন। পাকা যাত্রিনিবাসের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সাধারণ ভক্ত ও যাত্রীদের সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ হবে

বশিষ্ঠ মন্দির : তারাপীঠ

না। যাত্রিনিবাসটি তৈরি হলে সত্যিই সাধারণ তীর্থযাত্রীদের বড় উপকার হবে।

বেলা দ্বিপ্রহর। ঘুরে ফিরে আবার মার মন্দিরের কাছে এলাম। জনসমুদ্র বেড়েই চলেছে। বহুত সাধু এসে জুটেছে, গেরুয়া-ধারী, রক্তাম্বরধারী, শ্মশ্রুধারী, জটাধারী। বেশ গরম, মাথার উপর চনচনে রোদ। লাল হয়ে উঠেছে ভক্তদের চোখ। বিশ্রামমণ্ডপের ঠিক নিচেই রাস্তার ধারে পাঁঠাবলি হচ্ছে। যূপকাষ্ঠের চারদিক ঘিরে উন্মত্ত জনতা, সিঁড়ির উপর, চাতালের উপর ভিড়—পেষা-পেষি। তোরণদ্বারের পাশের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে যাত্রী-ঘরের কার্নিসে চড়ে একগাদা লোক পাড়ি-কি-মারি করে ঝুলছে। ভিড় সরাতে হিমশিম খাচ্ছেন পাণ্ডারা। পাঁঠা পড়ছে আর সম্মিলিত ভক্তকণ্ঠে বজ্রগর্জন উঠছে জয় তারা! একটু কায়দা করে অধ্যাপক-দম্পতির কাছ থেকে কিছুটা তফাত হয়ে গিয়েছি আমি আর ঘোষাল মশাই। এক-কোণে দাঁড়িয়ে এই চাঁদি-জ্বলা গরমে পরম ভক্তিভরে কিছুটা মহাপ্রসাদ পান করে নিয়েছি—ভক্তির উল্লাস দেহের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে। সহস্র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে [illegible] চিৎকার করছি—জয় তারা!

॥ ৫ ॥

এই তারাপীঠে যে আদি মহাসাধক তারা-সিদ্ধ হয়েছিলেন সেই বশিষ্ঠ কে? কোন্ যুগে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল? তারাপীঠে এসে এই প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। পুরাণোক্ত বশিষ্ঠ মুনি যে স্মরণাতীত মহা-প্রাচীন কালের লোক তা বলার নয়। হরি-বংশে উল্লিখিত যে বশিষ্ঠ ঋষি ইনি ব্রহ্মার সপ্তমানসপুত্রের অন্যতম। রামায়ণ অনুসারে ইনি ত্রেতাযুগের সূর্যবংশের কুলগুরু। রাজা দশরথের ইনি কুলপুরোহিত ছিলেন। বনবাস ও লংকাজয় শেষ করে রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজসিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তিনি রামকে আশীর্বাদ করলেন। রামরাজ্যের ইনি ছিলেন বিশিষ্ট মন্ত্রী। পতিগতপ্রাণা পরমসাধ্বী অরুন্ধতী এঁর স্ত্রী। বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজ দেখে মহাক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রশক্তিকে ধিক্কার দেন ও বশিষ্ঠের সমকক্ষ হবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন।

ত্রেতাযুগের সেই বশিষ্ঠই কি তারাপীঠের সিদ্ধ মুনি বশিষ্ঠ? প্রবাদ এই যে, বশিষ্ঠ কামরূপ কামাখ্যা প্রভৃতি নানা তীর্থে বহু যুগ ধরে মাতৃসাধনা করেন। কিন্তু এত সাধনা সত্ত্বেও সিদ্ধিলাভ তাঁর হয় না। শেষ পর্যন্ত তন্ত্র-মহাদেব শিবের নির্দেশে সাধন-শিক্ষার জন্য তিনি মহাচীনে গমন করেন ও সেখানে ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। মহাচীনে তন্ত্রোক্ত চীনাচার সাধন পদ্ধতি আয়ত্ত করে তিনি এই তারাপীঠে আসেন। এখানে উগ্রতারার কঠোর বীরাচারী সাধনা করে তিনি সিদ্ধ হন। এই প্রবাদ যদি মানতে হয় তাহলে এই বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই দশরথগুরু ত্রেতাযুগের বশিষ্ঠ নন। উগ্রতারা বৌদ্ধ-তন্ত্রের এক প্রধানা দেবী বলে স্বীকৃত। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই বৌদ্ধ উগ্রতারা থেকেই হিন্দু দেবী তারার উদ্ভব। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার যুগে মহাচীন বলতে হিমালয় সমীপবর্তী নেপাল-ভুটান-তিব্বত অঞ্চলকে বোঝাত। তিব্বতই বৌদ্ধতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

এই কিংবদন্তী বৌদ্ধধর্মের বহির্ভারতে প্রচার, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বিচিন্তার আদান-প্রদান এবং হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের সাংস্কৃতিক সমন্বয়—এই তিনটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। এই কিংবদন্তী অনুসারে এই বশিষ্ঠ কলিযুগেরই লোক। তাঁর তারাসিদ্ধি দেবীর প্রতি মহাদেবের সেই বাণীরই প্রতিধ্বনি করে—বিনা অগাম মার্গেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।

ইতিহাসের ধূসর দিগন্তপারে যার অবস্থিতি তাই পুরাণ। পুরাণ সেই স্মরণাতীত যুগের কল্পকাহিনী, কালের ঐতিহাসিক মাপকাঠি দিয়ে যাকে মাপা যায় না। সেই নিরূপণবিহীন পৌরাণিক যুগের আর একটি বিখ্যাত কাহিনীর সঙ্গে তারা-পীঠ যুক্ত হয়ে রয়েছে। বিষ্ণু চক্র কর্তনের ফলে সতীদেহের ঊর্ধ্ব নয়নতারা এই তারাপীঠে পতিত হয়েছিল। অনেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে এই কথা বিশ্বাস করেন। তারামন্দিরে ডিম্বসদৃশ অত্যুজ্জ্বল একটি পাথর সযত্নে রক্ষিত আছে। পরমবিশ্বাসী ভক্তরা আগ্রহ প্রকাশ করলে পাণ্ডারা অতি ভক্তিভরে এই পাথরটি হাতে তুলে নিয়ে দেখান এবং বলেন যে, এই সতীর ঊর্ধ্ব নয়নতারা। কিন্তু এই বিশ্বাস সর্বজন গ্রাহ্য নয়। প্রবীণ পাণ্ডাদের মধ্যেও অনেকে এ বিশ্বাস করেন যে—বলেন, তারাপীঠ যে সিদ্ধপীঠ তা অবশ্যই, কিন্তু সতীপীঠ নয়। পীঠ নির্ণয় খণ্ডে যে একান্নটি মহা-সতী-পীঠের তালিকা আছে, সেই তালিকায় বীরভূমের অন্তর্গত নলহাটি, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর ও অট্টহাসের নাম আছে, কিন্তু তারাপীঠের নাম নেই। শিবচরিতে যে ছাব্বিশটি উপ-পীঠের নাম আছে, সেখানেও তারাপীঠ উল্লেখহীন। পীঠনির্ণয়ের তালিকায় সবার উপরে হিংগুলার নাম—সেখানে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়েছিল। হিংগুলার পরেই নাম করবীরের। এই করবীরের সতীতীর্থে সতীর ত্রিনেত্র পতিত হয়েছিল। পীঠনির্ণয় মতে—

'করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দিনী
ক্রোধীশ ভৈরবস্তত্র......'

এখানে দেবী মহিষমর্দিনী নামে খ্যাতা, এবং মহাদেবের নাম ক্রোধীশ। সতীর ঊর্ধ্বনেত্র আলাদা করে অন্য কোথায় পড়েছিল তার কোনো পৌরাণিক উল্লেখ আছে কি?

বঙ্গদেশে পালযুগের সূচনা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে। রাজা শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলায় যে অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় চলতে থাকে, তার প্রতিরোধ-কল্পে জনমতপ্রতিভূ রাজা গোপাল এই পাল রাজবংশের প্রবর্তক। গোপালের পুত্র ধর্মপাল ও পৌত্র দেবপাল বহু যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে পাল রাজ্যকে বিস্তীর্ণ ও রাজ-শক্তিকে সুদৃঢ় করেন। পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। দেবপাল বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মগধ, নালন্দা ও বুদ্ধগয়ার মন্দির ও মঠ-গুলির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন। দেশে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারও তাঁর আনুকূল্যে কার্যকরী হয়—বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ভার প্রধানত বাংলার বৌদ্ধ পণ্ডিতরাই গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ-সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির যোগাযোগ ঘটে। দেবপালের আমলে তিব্বত থেকে এক রাজকীয় অভিযান বাংলা আক্রমণ করে ও দেবপালের সামরিক শক্তির কাছে পরাস্ত হয়। পরে দশম শতাব্দীতে তিব্বতীরা আবার উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করে ও সেখানে এক তিব্বতী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

দক্ষিণে নেপাল ও উত্তরে চীনের সংস্পর্শে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রবেশ করে সপ্তম শতাব্দীতে। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের সঙ্গে তিব্বতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নবম দশম শতাব্দীতে। এ সম্পর্ক শুধু যুদ্ধবিগ্রহের নয়, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানেরও। রাজা নয়পালের রাজত্বকালে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী আচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধ দর্শন প্রচারের জন্য তিব্বতে আমন্ত্রিত হন। তাঁর অবদান আজও তিব্বতে স্বীকৃত। পালযুগের শেষভাগে বাংলায় তান্ত্রিক বৌদ্ধপন্থার উদ্ভব হয় ও বাংলা থেকেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা তিব্বত ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আমার কল্পনা করতে ইচ্ছা করে যে, তারাপীঠের এই বশিষ্ঠ বাংলাদেশেরই একজন সাধক ছিলেন এবং যে যুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে বেশ কিছুটা অপাংক্তেয় হয়েছিল, রাজন্যবর্গ ও উচ্চ সমাজের লোকেরা উভয়েই এই তান্ত্রিকতার উপর বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই সময়েই তিনি জন্মেছিলেন। এই যুগ বাংলায় পাল যুগের পরবর্তী যুগ। যে যুগে বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা সবচেয়ে মার খেয়েছিলেন, সেই সেন রাজযুগ। সেই যুগের মাতৃসাধক বশিষ্ঠ তিব্বতে যান ও সেখান থেকে তন্ত্র সাধনায় নূতন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে বীরভূমের গভীর অরণ্য ও শ্মশানভূমিতে সাধনা করেন। সাধনস্থল দুর্গম, সাধনাও নিভৃত। সেই সাধনা পূরণের সিদ্ধপীঠই এই তারাপীঠ।

তন্ত্র কোনো ধর্মমত নয়,—তন্ত্র সাধনা। সাধনা কোনো ধর্মমতের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকার নয়। তন্ত্রও থাকেনি—তন্ত্রের পরিধি সীমাহীন। এই সাধনা সুদূর অতীত কাল থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দু চেয়েছে মোক্ষ, বৌদ্ধ চেয়েছে নির্বাণ, তন্ত্র চেয়েছে মুক্তি—যে-সে মুক্তি নয়, শক্তির মধ্যে মুক্তি। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান—সর্ব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ যুগে যুগে তন্ত্রসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তন্ত্রসারগ্রন্থে নানা দেবদেবীর ধ্যানমন্ত্র [illegible] থাকলেও তান্ত্রিকের শ্রেষ্ঠ সাধনা শক্তি সাধনা। বীরাচার এই শক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ মার্গ।

সাধারণ মানুষ সাধনার অধিকারী নয়, সে পূজা করে। দেবতার পায়ে বিশ্বাস ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করে সে পরিতৃপ্ত হয়। পূজা-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সৎকর্ম করে পুণ্যকামী হয়। এই শক্তিপূজা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। বঙ্গবাসীরা শক্তিসাধকদের শ্রেষ্ঠ সাধক বলে সম্মান করেছে ও সেই সাধন-লব্ধ শক্তির আশায় শক্তিপূজা করেছে। বাঙালীর দেশপ্রেমও তার শক্তিপূজার অর্ঘ্য। দেশমাতৃকা শক্তিরূপে বাঙালীর বন্দনীয়। বাঙালীর দেশাত্মবোধক মহামন্ত্র — বন্দে মাতরম্।

এই শক্তিই জগজ্জননী মহামাতৃকা। দশ-মহাবিদ্যা তাঁর দশরূপ। প্রতিটি রূপেই দাক্ষায়ণী সতীর প্রকাশ। প্রতিটি বিদ্যাই পরমশক্তিদেবী দুর্গার অংশ। সেই দশমহা-বিদ্যার প্রথমা কালী ও দ্বিতীয়া তারা। হিন্দুতন্ত্রে কালীর সঙ্গে তারা ষোড়শী ভৈরবী বগলা প্রভৃতি সকল মহাবিদ্যারই ধ্যান ও মন্ত্র রয়েছে। কিন্তু "কালিকা বঙ্গদেশে চ"। বাংলাদেশে আদ্যাশক্তিরূপে প্রধানত কালীরই পূজা। এবং বাঙালীর সাধক-প্রাণ কালীর পরেই তারাকে প্রধানা তন্ত্রমাতৃকা বলে গ্রহণ করেছে। একই মন্ত্রে কালী ও তারার পূজা—একই ধ্যানে একই ভাবনায়। বাঙালীর সাধনায় কালী ও তারায় কোনো ভেদ নেই। সাধক রামপ্রসাদ তাঁর অন্তরনিবাসিনী মহামাতা কালীকেই সম্বোধন করেছিলেন যখন তিনি গেয়ে-ছিলেন—

এমন দিন কি হবে মা তারা!

দেবী শিবানী হিমালয়কন্যা পার্বতীরূপে শিবলাভের জন্য যে কঠোর তপস্যা করে-ছিলেন সেই তপস্যায় তাঁর স্বর্ণগৌরী দেহকান্তি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল। তপস্বিনী শিবানীর সেই কৃষ্ণরূপ কালী। এই কালীই মহামায়ার অঙ্গসম্ভূতা মহাকালী—মহাবিক্রমশালিনী, অসুরদলনী। শক্তিরূপিণী শক্তিদায়িনী। তিনি তামসী রাত্রি—কিন্তু তাঁর কালো রূপের আলোয় সাধকের অন্তরের সমস্ত আঁধার বিদূরিত

হয়। ভক্ত তাঁর কাছে চায় শক্তির প্রসাদ, সাধক তাঁর কাছে চায় শক্তির আলোক। ভক্তের যিনি কালী, সাধকের তিনিই তারা। তিনিই ব্রহ্মময়ী — তিমিরে তিমিরহরা। সাধক যখন তারাসিদ্ধ হন, তখনঃ

> হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে
> মনের আঁধার যাবে টুটে,—
> তখন ধরাতলে পড়ব লুটে
> তারা বলে হব সারা॥

বেলা গড়িয়ে এসেছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ছায়া। অধ্যাপক-দম্পতি পাণ্ডাবাড়িতে বিশ্রাম করতে গেছেন। বশিষ্ঠ মন্দিরের সিঁড়িতে বসে কথা বলছি কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সারাদিনের ব্যস্ততার মধ্যে একটু অবসর পেয়ে কাশীনাথ আমাদের কাছে বসেছেন। তাঁর বাড়িতে অতিথি যাত্রীদের মধ্যাহ্নভোজন শেষ হতে অপরাহ্ন গড়িয়ে এসেছে। একমাত্র কয়েক ফোঁটা মহাপ্রসাদ ছাড়া এ পর্যন্ত তাঁর পেটে কিছুই পড়েনি। সন্ধ্যাবেলা তারামূর্তিকে বিশ্রামমণ্ডপ থেকে আবার মন্দিরে তোলা হবে। তারপর মায়ের আবার স্নান। স্নানের পর সান্ধ্যবেশে তিনি সজ্জিতা হবেন। তখন আবার পূজারতি। এই বশিষ্ঠ মন্দিরেও মাতৃচরণে সান্ধ্যপূজা ও আরতি হবে। সব মিটতে রাত দশটা। তারপর কিছু অন্নপ্রসাদ মুখে দেবেন কাশীনাথ।

অদূরে কয়েকজন যাত্রী বানরভোজ করাচ্ছেন। তারাপীঠে যতো বাঘা কুকুর ততো ঝুনো বাঁদর। বাঁদরে কুকুরে দিনের বেলা পরম হৃদ্যতা। যাত্রীদের দেওয়া খাদ্য তারা পাশাপাশি খায়। রাতে হৃদ্যতা কুকুরে আর শিয়ালে। তখন শ্মশানের অন্ধকারে তাদের নরমাংস ভোজ।

কাশীনাথ বললেন— আজকের এই দিনটিই আমাদের সংবৎসরের মূলধন বাবা। কতো যাত্রী, কতো যজমান! যজমানদের নাম আমাদের খাতায় লেখা থাকে। তাঁদের আমরা চিঠি দিই, তাঁরাও উত্তর দেন। তাঁরা এলে তাঁদের হয়ে পূজা দিই, ঘরে রাখি, খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা করি। অনেক যজমান আছেন, এদিনটিতে আসতে না পারলেও মাকে ভোলেন না, ভোলেন না মার সেবককে। পূজা পাঠান, প্রণামী পাঠান, আলাদা করে পাণ্ডার জন্যে দক্ষিণাও পাঠান। তারপর যাত্রীদের দক্ষিণা তো আছেই! জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বছরে বছরে যাত্রীদের ভিড়ও বাড়ছে। মার ভক্তরাই আমাদের রেখেছেন!

আগের চেয়ে মেলার ভিড় বেড়েই চলেছে তাহলে— কী বলেন?

নিশ্চয়ই। তারপর ধরো পাকারাস্তা যখন হবে তখন তো কথাই নেই। মার মন্দিরের চুড়ো সোনার চুড়ো হোলো বলে! তবে একটা কথা বলব বাবা—এতো ভিড়, এতো পূজো, পাণ্ডাদের ঘরে ঘরে এতো যাত্রী,— এ সব বাহ্য! ভক্তের প্রণামী আর যজমানদের উপঢৌকন কুড়োতে কুড়োতে পাণ্ডাপুরুতেরা নিশ্বাস ফেলতে পারছিনে আজ সারাদিন। হাজার কাপ চা আর পাঁচ হাজার করে বেগুনি ফুলুরি বেচেছে এক একটা দোকান। মায়ের নামে সন্ধ্যে হতে না হতেই শাড়িখানা লোপাট হয়ে যাবে। আজকের এই চেহারা কিন্তু তারাপীঠের আসল রূপ নয়!

আমি তা কিছু কিছু জানি। তারাপীঠের জনবিরল সুগম্ভীর রূপ আমি দেখেছি। মনে হয়েছে তারাপীঠ যেন এক ধ্যানমগ্ন তপস্বী। ঘোষাল মশাই নূতন, সকালবেলা ঝাঁঝালো স্নানোদক পান করে ভক্তি-বিস্ময়ে সেই যে চোখ কপালে তুলেছেন, দৃষ্টির সে বিস্ফারণ এখনো নামেনি। তিনি শুধোলেন— আসল রূপ তা হলে কী ঠাকুর মশাই?

আসল রূপ তা হলে কী ঠাকুর মশাই?

এ তো শুক্ল পক্ষ বাবা, আসল রূপ কৃষ্ণ পক্ষে! তারা মা হাজার ভক্তের প্রণামী লুটতে চান না, মা চান বিরল সাধকের সাধনা। এ মেলার ভিড়ে সেই সাধকের খোঁজ পাবে না। এখনো কত দূরে দূরে থেকে সাধকরা আসেন এই মহা তীর্থে। নামহীন পরিচয়হীন তাঁরা। সমাজ সংস্কারের সব বন্ধনমুক্ত তাঁরা। ঐ শ্মশানে তাঁরা বাস করেন। শ্মশানের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁরা সাধনা করেন। কেউ থাকেন তিন রাত্রি, কেউ তিন বছর! আবার প্রয়োজন সিদ্ধ হলে কখন্ তাঁরা অন্তর্ধান করেন! আজ কিন্তু তাঁরা কেউ নেই! আজ সাধনার দিন নয়, আজ যে পূজার দিন!

অ্যাঁ, ভৈরব ভৈরবী কারুর দেখা পাব না?

মৃদু হাসলেন কাশীনাথ, ভৈরব-ভৈরবীর খোঁজে এত দূর এসেছেন বাবা? এত কষ্ট করে? আপনাদের শহর-বাজারে নেই?

ঘোষাল মশাই একটু অপ্রতিভ হলেন। তবু শুধোলেন—কী সাধনা তাঁরা করেন, ঠাকুর মশাই?

সাধনা বড়ো গূহ্য জিনিস বাবা! তা কি কথায় প্রকাশ করা যায়? ও প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে এই তারাপীঠের সাধনা মহা কঠিন— বড়ো সহজ বলেই বড়ো কঠিন। তারিণী তারা নাকি বামাক্ষেপাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই মহাপীঠে মাত্র তিন লক্ষ জপ করলেই সিদ্ধিলাভ হবে। তিন লক্ষ জপের কথা বাদ দাও, ত্রিশ বার জপ করতে কে পারে? জপ কি সোজা কথা? অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে যেখানে সব দৃষ্টি মুছে গেছে সেখানে আলোকের একটি মাত্র শিখা যেমন বাসনা কামনা স্বপ্ন-চেতনা যেখানে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে সেখানে একটি জপ তেমন। যেখানে জপ সেখানে আর কিছু নেই। ধ্যান যখন একটি মাত্র বিন্দুতে সন্নিহিত হয়, সেই বিন্দু জপ।

কেউ না কেউ এখানে সিদ্ধিলাভ করেন তো?

করেন বইকি বাবা। নিশ্চয়ই করেন। অতীতে কত সাধক করেছেন, ভবিষ্যতে কত সাধক করবেন। তবে আমার অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি— সিদ্ধ তো চোখে দেখা যায় না, চোখে দেখা যায় সিদ্ধাই! এই শ্মশানের ধারে জীবন কাটিয়ে সিদ্ধাই দেখে দেখে চোখ পচে গেছে বাবা!

ঘোষাল মনের কথা আর চাপতে পারলেন না। ভক্তিগদগদ কণ্ঠে কাশীনাথের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে বললেন—যা হোক, ঐ যে কী বলে—ঐ বীরাচারী সাধনার পথটা একটু বাতলে দিতে পারেন বাবা?

কাশীনাথ হেসে বললেন, এও আমি অনেক দেখেছি। এই তারাপীঠে এলেই বহু সংসারী লোকের মাথায় সাধনার ভূত চাপে। সাধনপথ গুরুই বলতে পারেন, আমি তো গুরু নই। গুরু যদি পান, তাহলে সাধনার ঠিকানাও পাবেন। তবে তারাপীঠে বসে

এ সব কথা যখন হচ্ছে তখন কুলার্ণব তন্ত্রের একটি সাবধানবাণী বলে দিই—মদ্যপান করলেই সিদ্ধি হয় না, মাংস ভক্ষণ করলেই পুণ্যগতি হয় না, আর স্ত্রী-সম্ভোগ করলেই মোক্ষ হয় না।

ঘোষাল মশাইয়ের মনটা কোন্ দোলায় দুলছে তা বুঝতে আমার বাকি নেই। আমি একটু চতুর হাসি হেসে তাঁকে বললাম —আমাকে যদি গুরু করেন দাদা, তা হলে একটি মন্ত্রে আপনার মনস্কামনা আমি সিদ্ধ করে দেব। শুনবেন সে মন্ত্র? ভৈরব-তন্ত্রের একটি মাত্র মোক্ষম লাইন—মদিরায়াং মৈথুনে চ জাতিবর্ণং ন চাচরেৎ।

হো-হো করে হেসে উঠেই নিজেকে সংবরণ করলেন বৃদ্ধ কাশীনাথ। বললেন—এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ভালো নয় বাবা। যাও বরং বেলাবেলি শ্মশানটা ঘুরে দেখে এসো।

॥ ৬ ॥

তারাপীঠ মহাশ্মশান। মহা ইঙ্গিতময় মহা বীভৎসতার লীলাভূমি। যে ভীতুর্শংকিত, এ স্থান তার জন্য নয়—এ স্থান বীরাচারীর বিহারক্ষেত্র। দ্বারকা নদীর তীরে প্রায় এক মাইলের অধিক দৈর্ঘ্য জুড়ে এই শ্মশান বিস্তৃত। শুধু শ্মশান নয়, গভীর অরণ্য। পায়ের নিচে রাঢ়ের শুষ্ক রুক্ষ ভূমি, মাথার উপর উচ্চ উচ্চ গাছের ঘন শাখা বিস্তারের জটিলতা। শাল, মহুয়া, নিম, বাবলা, কেন্দ, পিটুলি, শ্যাওড়া ও বুনো জামের জড়াজড়ি। কাক চিল শকুন ও পেঁচকের আবাস। দিনের বেলাতেও আধো অন্ধকার। দুপুরে বেলাতেও গা ছমছম করে।

গ্রামগ্রামান্ত থেকে সৎকারার্থে মৃতদেহ আসে দ্বারকা তীরবর্তী এই মহাশ্মশানে। দিনের বেলা এলে শব-যাত্রীরা মৃতদেহের মুখাগ্নিটুকু অন্তত করে, রাত্রির শব বাহকেরা শবকে কোনোরকমে মাটি চাপা দিয়ে সরে পড়ে। সেই সমস্ত অর্ধদগ্ধ শবের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্যে সারা শ্মশান জুড়ে শিবা-শ্বাপদরা যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার উপর ঘুরছে শকুন আর গৃধ্রের পাল। শ্মশানযাত্রীরা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শবের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাকেরা তাদের তীক্ষ্ণ ঠোঁট ঠুকরে চোখগুলো খুবলে নেয়। কুকুর-শিয়ালে দেহ থেকে মাংস টেনে টেনে ছেঁড়ে। শকুনরা মহানন্দে খায় নাড়িভুঁড়ি। শেষ পর্যন্ত শুধু মুণ্ড আর কঙ্কালটা পড়ে থাকে মাটিতে। কত শত শত বছর ধরে কত সহস্র সহস্র মড়া এই শ্মশানে এসেছে, ঠিক এমনিভাবেই গতি হয়েছে তাদের।

যেখানে সেখানে কালিমাখা চিতা, যেখানে সেখানে শব পোঁতার গর্ত। গর্তের ফাঁকে ফাঁকে পুড়ে আছে কঙ্কাল, সর্বত্র ছিটিয়ে আছে হাত পা আর পাঁজরের অসংখ্য লম্বা লম্বা হাড়, পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে নরমুণ্ড। কোথাও আধ-খাওয়া একটা দেহ নিয়ে খেচর ভূচর চণ্ডাল দলের মারামারি।

এই শ্মশান ভু-ভারতের তান্ত্রিকদের বড়ো প্রিয়। তান্ত্রিকই বলো আর কাপালিকই বলো, বেতাল-সিদ্ধই বলো আর পিশাচ-সিদ্ধই বলো—এমনি কেউ-না-কেউ মানুষ অন্তত দু-চারজন প্রতিদিন রাতেই এই শ্মশানে আছে। তাদের শীর্ণ উলঙ্গ দেহ, মাথাভরা জটা আর মুখভরা দাড়ি-গোঁফ আর বিঘূর্ণিত রক্ত-চক্ষু। কেউ মড়ার মাথার বেড় সাজিয়ে তার মাঝখানে চোখ বুজে বসে আছে। কেউ কাদামাটির দেয়ালে নরমুণ্ড গেঁথে সেই নরমুণ্ডের কুটিরে বসে জড়িত বিকৃত কণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় বকছে। তাদের কোনো আভরণ নেই, কোনো আয়োজন নেই, কোনো পূজা নেই। তাদের দেশ নেই, পরিচয় নেই, হয়তো ভাষাও নেই। অন্তত অপরিচিত কৌতূহলীর প্রতি তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কী খেয়ে তারা বাঁচে জানি নে, কোন্ সাধনা তারা করে জানি নে, তাদের রক্তবর্ণ নেশাচ্ছন্ন ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে কোন্ দিগন্তের অন্বেষণ, তাও বুঝিনে। জানিনে, নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলে কিনা। জানিনে লোকচক্ষুর অগোচরে কোন্ অনুষ্ঠান তারা পালন করে—কোন্ চক্রে তারা বসে সুগভীর মধ্যযামে! বামাক্ষেপা না হলেও তারাও ক্ষেপা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখে কিছুটা ভয়ে ভয়ে নতুন সঙ্গী ঘোষাল মশাইকে সঙ্গে নিয়ে শ্মশানে ঢুকলাম। তাজ্জব হতে দেরি হলো না। আজকের এই মহা মেলা এই ঘোর বিভীষণ শ্মশানভূমিরও ভোল পালটেছে। সেই সব ক্ষেপার দল উধাও, সেই নরমুণ্ড নির্মিত কুটিরের চিহ্ন মাত্র নেই। কিছু কিছু সাধু এসেছে বটে—কিন্তু এরা একেবারে নির্জলা মেলা-মার্কা সাধু। তা এদের পোশাকে পরিচ্ছদে আয়োজনে আড়ম্বরেই বোঝা যায়। দিব্যি গৈরিক বা রক্তাম্বর পরনে, গলায় সরু মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে বিভূতি, কারুর আবার হাতে ত্রিশূল। কেউ আবার সযত্নে গোটা কতক মড়ার খুলি যোগাড় করে বেশ সাজিয়ে বসেছে—চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বকছে আর মাঝে মাঝে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। একজন বেশ শাঁসালো মেক্-আপ তো করেছেই, তার উপর আবার সামনে একটা বাঁশের খুঁটিতে মা-কালীর একটা পট ঝুলিয়ে সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তারস্বরে শংকটা-স্তোত্র আওড়াচ্ছে!

কয়েক বছর আগে এক ঘোর অমাবস্যায় এই তারাপীঠ মহাশ্মশানে তান্ত্রিকদের গোপন চক্র দেখতে এসেছিল এক তত্ত্বাভিলাষী। এক পলক কী দেখেছিল তা সেই জানে, কিন্তু মুহূর্ত পরে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল এই শ্মশান ছেড়ে। আজ কিন্তু অমাবস্যা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু একটু পরেই শারদ-শশীর রুপোলী রশ্মিতে সারা ভুবন আলো হয়ে উঠবে। আজ সারা শ্মশান জুড়ে চক্রের অবধি নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে চক্র—দিন-দুপুরে থেকেই শুরু হয়েছে চক্রসাধন। নদীর ধার থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত অরণ্যভূমির সমস্ত অলিগলি জুড়ে গাছের ছায়ায় ঘাস-পাতার আসনে গোল হয়ে বসে গেছে চক্রের পর চক্র। ছেলের সঙ্গে বুড়ো, কচির সঙ্গে ঘাগী, কোথাও কোথাও মদ্দার সঙ্গে মাদী। মাঝখানে দিশী ঢোলাইয়ের বোতল আর তেলে-ভাজা আর ছোলা সেদ্ধ, নুন আর কাঁচা লংকা। সারা শ্মশান জুড়ে অসংখ্য মদ্যপায়ী। কেউ খাড়া বসে আছে, কেউ গড়িয়েছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে, কেউ পড়েছে লুটিয়ে। তাই বলে এ স্থান মদের আড্ডা নয় —এখানকার সব মদই যে মায়ের পায়ে উৎসর্গ করা কারণ। তারাপীঠের এই শ্মশানে কারণ পান নিশ্চয়ই মহাপুণ্য, মাতৃপূজার অঙ্গবিশেষ। শাস্ত্রে বলেছে—এই কারণ পান করতে করতে উলটে পড়বে, আবার উঠে পান করবে, আবার পড়বে, পান করতে করতে আর পড়তে উঠতে উঠতে পড়তে শেষ পড়া যখন পড়বে তারপর পুনর্জন্ম ন ভবেৎ।

সন্ধ্যা নামছে, ছায়া ঘনাচ্ছে, জমায়েত হচ্ছে অন্ধকার কারণ-পায়ীদের জটলা ঘিরে ঘিরে। এতক্ষণে গা সিরসির করতে শুরু করেছে, ঘেঁষাঘেঁষি করে পাশাপাশি ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি আর ঘোষাল মশাই। পায়ের তলার

মাটি দেখা যায় না, মানুষের হাড় মাড়িয়ে চলেছি, ঠোক্কর লাগছে নরমুণ্ডে। ভয়ের ঠাণ্ডাটা আয়েশ করে বুকের মধ্যে অনুভব করবার জন্যই বুঝি আড়াআড়ি আর লম্বা-লম্বি শ্মশান মাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। এ এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগৎ—এ জগতের কোনো তুলনা নেই, কোনো উপমা নেই। এই অন্ধকার জগতে যারা বিরাজ করছে, তারা সংসারকে ভুলেছে, সমাজকে ভুলেছে। আইন তাদের স্পর্শ করে না, নীতি-দুর্নীতির ভেদাভেদ তাদের জন্যে নয়। পাপী আর পুণ্যাত্মা, চোর জুয়াচোর, ভণ্ড আর সাধু সজ্জন ভক্ত, বিজ্ঞ আর বাতুল, সংসারী আর বৈরাগী সবাই মিলেছে এই মহাশ্মশানে, সবাই বসেছে এই কারণ-চক্রে।

হঠাৎ দূরে নদীর কাছাকাছি একটি আলোকের শিখা চোখে পড়ল। ঘোষালের হাতটা চেপে ধরে সেই আলোক লক্ষ্য করে এগোলাম। এদিকটা অনেক ফাঁকা, বন্য-গুল্ম নেই বললেই হয়, জনাবরল, শুধু চিতা আর কবরের ভিড়। মড়ার হাড় মড়মড় করতে লাগল পায়ের নিচে।

ডাঁই করা মড়ার খুলি। সেই খুলির পাহাড়ের উপর একটি প্রদীপ। কে যেন বসে আছে প্রদীপের সামনে। পায়ে পায়ে আরো এগোলাম।

শকুন একটা কাঁদছে। দুটো বাঘা কুকুর একটা আধ-খাওয়া মড়া নিয়ে চিৎকার করে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করেছে। মোটা একটা গুঁড়ির নিচে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে দুটো মানুষ। প্রদীপের যেটুকু আলো এসে পড়েছে তাতে চিনবার উপায় নেই, মেয়ে-মদ্দা হতে পারে। পায়ের শব্দে কোনো হুঁশ নেই।

পাশ কাটিয়ে প্রদীপের কাছে এগোলাম। কে ওখানে বসে একলা? কী করছে প্রদীপ জেলে? তান্ত্রিক না কাপালিক?

প্রদীপের আলোটা মুখে এসে পড়েছে। বড়ো বড়ো চুল ঘাড় ছড়ানো, গালে দাড়িও বেশ ঝোপজঙ্গল সৃষ্টি করেছে। উলঙ্গ দেহ। কোথাও লেংটি একটা হয়তো আছে, আসন করে বসে আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। চোখ দুটো বন্ধ।

আরো কাছে এগোলাম। ডান হাত দিয়ে খুলিটা ঠোঁটের কাছে তুলল। পান করল এক চুমুক। চোখে চোখ পড়ল। ভাষাহীন বাতুলের চোখ। সে চোখ দিয়ে আমাকে চিনতে পারবে কেমন করে?

কিন্তু আমি চিনেছি। ও আমার অজানা নয়। সারাদিন মেলার পথে পথে ওকে খুঁজেছি, মনে মনে ভেবেছি হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়।

ও সেই রামপুরহাটের ছাত্র শচী। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি। নলহাটিতে একটি মেলার আলাপেই বড়ো ভালো লেগেছিল যাকে।

সেই ভালোভোলা মা পাগল ছেলে শচী। তারাপীঠে এসে শচীক্ষেপা হয়েছে।

বাদামের উপকারিতা

ইংরাজীতে উন্মাদের মতো আচরণকে বলা হয় 'গোইং নাটস্' কিন্তু 'নাট' অর্থে বাদাম ধরলে প্রবচনটির উৎপত্তির সূত্রটি জানা যায় না। তবে বাদামের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতার কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই।

বিভিন্ন পঞ্চাশ রকমের বাদাম আছে যা গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহের লক্ষ লক্ষ লোকের দেহপুষ্টির প্রধান খাদ্যের স্থান পূরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও গত যুদ্ধের পর থেকে বাদামের ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে চলেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রাজিল বাদামের কথা উল্লেখ করা যায়। এই বাদাম ইউরোপে প্রথম রপ্তানি হয় ১৬৩৩ সালে। গত যুদ্ধের পর উত্তর আমেরিকা হঠাৎ এই বাদামটি 'আবিষ্কার' করে এবং এখন আমেরিকার লোকে ব্রাজিলের মোট উৎপাদনের অর্ধেক কিনে নেয়। চীনা বাদাম বা মাটকড়াইও আমেরিকায় প্রভূত জনপ্রিয়।

আমেরিকার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ও তাঁর সহযোগীরা মিলে চীনা বাদাম থেকে তিন হাজার রকমের উপকরণ প্রস্তুতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারতে এক কোটি একর জমিতে বাদামের চাষ হয় এবং আমেরিকায় হয় পঞ্চাশ লক্ষ একর জমিতে।

আমেরিকা এবং ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয় একটি বাদাম হচ্ছে 'cashew' যা পর্তুগীজ শব্দের অনুসরণে ভারতে 'cajut' বা কাজু বাদাম নামে পরিচিত।

যুদ্ধের আগে ভারতই ছিল কাজু বাদামের সবচেয়ে বড় রপ্তানি স্থান। আমেরিকায় পাঠানো হতো বছরে সাত হাজার টন এবং বৃটেনে এক হাজার টন।

আলজিরিয়া ও মরক্কোতে ওক গাছের ফল সিদ্ধ অথবা মরা-আঁচে সেঁকে নেওয়া হয়, তারপর মাটিতে পুঁতে রেখে, পরে ধুয়ে নিয়ে গুঁড়ো করে শুকোতে দেওয়া হয়। তার পর তার সঙ্গে চিনি ও মসলা যোগ করে এক ধরনের সুস্বাদু মিঠাই তৈরী হয়।

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কতক রেড ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় ওক ফল গুঁড়ো করা ময়দায় চমৎকার রুটি ও কেক তৈরি করে। এই ময়দা এমন পুষ্টিকর যে, গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনে খাদ্যের চরম অনটন আশঙ্কায় খাদ্য-মন্ত্রী এটির ব্যাপক ব্যবহারের এক পরিকল্পনা করেছিলেন।

সাধারণত বাদামকে মাংসের একটা উত্তম বিকল্প বলে গ্রাহ্য করা হয় না। তার কারণ আগেকার দিনের পথ্যবিদরা বলতেন বাদামে যে প্রোটিন আছে তা দ্বিতীয় শ্রেণীর।

কিন্তু গত যুদ্ধের আমল থেকে খাদ্য ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীতেই একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ বলে পরিগণিত, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরী সি শেরম্যান প্রমাণ দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে ব্রাজিল বাদাম ও চীনা বাদামে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বিদ্যমান।

পাশ্চাত্ত্যের গৃহকর্ত্রীরা বাদামে প্রোটিন বেশী কি কম, অথবা কোন্ শ্রেণীর তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামান না, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় বাদামের ব্যবহার প্রভূত মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে। বাদাম পিষে তা থেকে মার্গারিন বা বনস্পতি তেল যা নিষ্কাশিত হয়, রান্নার কাজে তার প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক। চর্বির চেয়ে সস্তা বলে আইস-ক্রীম, চকোলেট, কোকো, কেক প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়। সুন্দর মাখনও তৈরি হয় এ থেকে।

দুর্গন্ধবিহীন মাছের কারখানা

ব্রেমেনের হাইন্‌ৎস্ ডাকেন্‌সুপেক একজন উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার। তিনি জার্মানী এবং বহু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাছের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় অসংখ্য কারখানা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। বিদেশে, বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবস্থানের সময় ডাকেন্‌সুপেক একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর পক্ষে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলি এমন ধরনের মাছের কারখানা স্থাপন করতে চায়, যে সব কারখানায় অতি অল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব অধিক ভাইটামিন ও প্রোটিনযুক্ত মাছে চর্বি ও তেল সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইঞ্জিনীয়ার ডাকেন্‌সুপেক অবশ্য নিজেই কারখানার

স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টিকর কেবল সেইসব খাদ্যসামগ্রীর প্রথম দোকান বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হয় পঁচাত্তর বৎসর আগে। আজ এই 'হেলথ শপ'-এর সংখ্যা যেমন বহু হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি খরিদ্দারের সংখ্যাও। এইসব দোকানে যেসব সেলসওমান কাজ করে তাদের শিক্ষা দেবার একমাত্র স্কুলটি অবস্থিত পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত হমবুর্গের নিকটবর্তী ওয়ার্স্টেডটেন। এখানে শিক্ষাসূচীর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি, নিরোগ জীবন, প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নিরাময় ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য। ছবিতে মধ্যের মহিলা কনিপ পদ্ধতিতে দেহের রক্তচলাচলকে সুস্থ করে নিচ্ছে। রেভারেন্ড সেবাস্টিয়ান কনিপের (১৮২১--১৮৯৭) নামে প্রচলিত এই পদ্ধতিটি মুখ্যত হচ্ছে ঠান্ডা জলের সাহায্যে দেহের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দহন প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতি করা এবং দেহে সঞ্চিত আবর্জনাকে দ্রুত বিনষ্ট করা। বাঁদিকে তরুণীকে দেখা যাচ্ছে কাদার আবরণে আচ্ছাদিত অবস্থায়—এরদ্বারা গাত্রত্বক সুপুষ্ট হয়। সামনে রয়েছে ভিটামিন ও খনিজ সামগ্রী সমন্বিত খাদ্যবস্তু যা 'হেলথ শপ'গুলিতে বিক্রী করা হয়

পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম এবং স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি সাধারণত ইউরোপ অথবা আমেরিকা থেকে কারখানার সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। কিন্তু এশিয়ার বিশেষ কারখানাগুলির জন্য যে ধরনের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সে সব ইউরোপ ও আমেরিকায় খুঁজে না পাওয়ায় অগত্যা তাঁকেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামের নকশা প্রভৃতি করতে হয়। এই ঘটনার পর হাইন্‌ৎস ডফেন্‌স্‌পেক স্নেহ রসায়ন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবের মতে তিনি স্নেহ রসায়ন সংক্রান্ত বই পুস্তকের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যান। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁর গবেষণাগার প্রয়োজনীয় বইপত্র আর তাঁর পরিকল্পনার নানারকম নকশায় ভরে ওঠে। নতুন কারখানার কার্য প্রণালী সম্পর্কেও তিনি একটি বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। মাছের সাধারণ কারখানায় প্রধানত বায়ুবহুল পদ্ধতিতে মাছ ও মাছের অবশিষ্টাংশ রন্ধন করা হয়।

ডাফেন্‌সপেক এই সব পদ্ধতির পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে ইলেকট্রনের আঘাতের সাহায্যে মাছ থেকে অনায়াসে তেল ও প্রোটিন সংগ্রহ করা সম্ভব। ইঞ্জিনিয়ার ডাফেন্‌সপেক তাঁর আদর্শ কারখানায় এই নতুন পদ্ধতির কার্যকারিতা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন।

তিনি এ কথা বেশ ভালো করেই প্রমাণ করেন যে, মাছের কারখানায় মাছ রন্ধনের কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়ার ফলে কারখানা এলাকার বায়ু আর দূষিত হবে না এবং মানুষ অসহ্য দুর্গন্ধের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সত্যি কথা বলতে কি, ডাফেন্‌সপেকের এই আবিষ্কার সারা দুনিয়ার অসংখ্য মৎস্য-কারখানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাছের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য এইসব কারখানা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। যদিও মাছের কারখানাগুলি নদী বা সমুদ্রের তীরে এবং মাছের বন্দরের অতি নিকটে অবস্থিত, তবুও মাছের দুর্গন্ধ পার্শ্ববর্তী শহরের আবহাওয়া অনায়াসে দূষিত করে ফেলে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই সব শহরে বাস করা দায় হয়ে পড়ে। সাধারণ দুর্গন্ধ দূরীকরণ পদ্ধতি বড়ো একটা কার্যকরী হয় না। তাই সবাই আজ সাহায্যের জন্য অনেক আশা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হাইন্‌ৎস্‌ ডাফেন্‌সপেকের দিকে তাকিয়ে আছে।

ডাফেন্‌সপেক ইতিমধ্যেই তাঁর ব্রেমেন বন্দরের গবেষণাগারে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করেছেন এবং গবেষণাগারটি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রেমেনের সেনেট তাঁর গবেষণার সাফল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সেনেটের কাছ থেকে এক বিশেষ নির্দেশ পেয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, ১৯৬২ সালের প্রথম দিকেই ডাফেন্‌সপেকের নয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত মাছের কারখানায় কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। এই কারখানার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ যথেষ্ট আশাবাদী। ডাফেন্‌সপেকের মতো তাঁরাও মনে করেন যে, এই নয়া পদ্ধতি সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। কারণ মাছের কারখানার নিকটে যে সব মানুষ বসবাস করে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সে সব মানুষকে আর মাছের দুর্গন্ধ সহ্য করতে হবে না। তাছাড়া এই পদ্ধতির আর্থিক দিকটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাফেন্‌সপেকের পরিকল্পনা অনুসারে মাছের কারখানা নির্মাণ করতে মোটেই খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না। নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হলে পুরাতন কারখানা যে একেবারে বাতিল করে দিতে হবে, তা নয়। পুরাতন কারখানা থেকে শুধুমাত্র উত্তাপ সঞ্চারকারী যন্ত্রটি সরিয়ে ফেলতে হবে।

দুনিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে ডাফেন্‌সপেকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক মাছের কারখানা স্থাপনের গুরুত্ব সত্যিই অসামান্য। কারণ, এই সব দেশ রন্ধন ও পেষণ পদ্ধতির আশ্রয় না নিয়ে মাছ থেকে তেল ও প্রোটিন সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক।

মূল্যবান হস্তলিপি

এ বছরের শরৎকালে পশ্চিম জার্মানীর এক স্বলেখনালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রায় ১২০০ শিরোনামার হস্তলিপি-নিলাম এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে এত বড়ো হস্তলিপি-নিলাম আর অনুষ্ঠিত হয়নি। এই নিলাম উপলক্ষে জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ইটালী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বহু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লানের তীরবর্তী মারবুর্গে আসেন।

প্রথম দিন শুধু সংগীত ও বিজ্ঞান-বিভাগে ১৯৬০ সালে পরলোকগত সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট আম্মানের বিশ্ববিখ্যাত হস্তলিপি-সংগ্রহের নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ খ্যাতনামা সুরকারগণের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ও চিঠি বেশ চড়া দামে বিক্রয় করেন। এই নিলামে কোনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই স্বতন্ত্রভাবে মূল্য দিয়ে কোন হস্তলিপিই ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। এটা সত্যিই একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য বস্তুর নিলাম-অনুষ্ঠানে অনেক বছর থেকে এমনটি আর দেখতে পাওয়া যায়নি।

তবে লুডোবিগ ফান বেথোফেনের স্বহস্তলিখিত দুই পৃষ্ঠার এক সংগীত পাণ্ডুলিপি একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে। প্রথমে এই পাণ্ডুলিপির মূল্য ১২ হাজার মার্ক স্থির হয়। কিন্তু শেষে জার্মানীর জনৈক ব্যবসায়ী ৪২ হাজার মার্ক দিয়ে বেথোফেনের এই স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি ক্রয় করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর কোনো হস্তলিপিই আর এতো অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়নি।

জার্মানীর কৃতী সন্তান ইয়োহান জেবাস্টিয়ান বাখের একটি পত্রও নিলামে বিক্রয় করা হয় এবং জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ী ৩৫০০০ মার্ক দিয়ে এই হস্তলিপিটি ক্রয় করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বাখ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়োহান এলিয়াস বাখের কাছে এই পত্র লেখেন। জার্মানীর এই অমর সুরকারের আর একটি পত্রের জন্য জনৈক জার্মান চারুশিল্প ব্যবসায়ীকে ২৬০০০ মার্ক মূল্য দিতে হয়।

অন্যান্য সংগীত স্বলেখনের মধ্যে মোৎসার্টের একটি বিখ্যাত পিয়ানো-সোনাটা ও ইয়োসেফ হাইড্‌ন্‌-এর একটি অজ্ঞাত পিয়ানো-সোনাটার পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ প্রয়োজন। জনৈক ইংরেজ চারুশিল্প ব্যবসায়ী যথাক্রমে ২৭০০০ ও ২০০০০ মার্ক দিয়ে এই পাণ্ডুলিপি দুটো ক্রয় করেন। তা ছাড়া ব্যারন-পত্নী বান্ড স্টেটেনের কাছে লেখা মোৎসার্টের একটি পত্র (১৮০০০ মার্ক) ও ফ্রান্‌ৎস শুবার্টের দুটো স্বহস্তলিখিত সংগীত-পাণ্ডুলিপিও (একত্রে ২৪৫০০ মার্ক) মারবুর্গের এই নিলাম-অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্যের পরিমাণ ৪০৫০০ মার্ক এবং আধুনিক জ্ঞান-তত্ত্বের জনক দেকার্তের ছয় পৃষ্ঠার এক চিঠি এই মূল্যে বিক্রয় হয়। প্যারিসের একজন প্রাচীন-বস্তু বিক্রেতা ২২০০০ মার্ক দিয়ে ইগনাটিউস ফন লয়োলার একটি পত্র ক্রয় করেন। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে বার্সেলোনা মঠের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে তিনি এই পত্র লেখেন। মার্টিন লুথারের দুটি পত্রও নিলামে বিক্রয় হয় এবং বেলজিয়ের জনৈক ব্যবসায়ী পত্রটির জন্য ১১ হাজার মার্ক মূল্য দেন। মার্টিন লুথার তাঁর এক বন্ধুর কাছে এই পত্র লেখেন এবং পত্রে তিনি তাঁর বন্ধুকে মঠ থেকে পলাতকা কাথারিনা ফন বোরাকে বিয়ে করার অনুরোধ জানান।

দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য বিভাগের নিলামেও অনেক হস্তলিপি বিক্রয় হয়। এগুলোর মধ্যে হাইনরিস হাইনের কবিতার বই "নতুন প্রেম"-এর মূল রচনা (৪৭০০ মার্ক), রিলকের কবিতা "মালী" ও "ঐশ্বরিক পূর্ব-স্মৃতি"-র লিখিত কপি (৩০০০ মার্ক) এবং খৃষ্টিয়ান গটফ্রীড করনার ও প্রকাশক ইয়োআখিম গাশেনের কাছে লেখা শিলারের দুটো পত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্র দুটো যথাক্রমে ৪৫০০ মার্ক ও ৪৩০০ মার্ক মূল্যে বিক্রয় হয়।

বিজ্ঞান বিভাগে শোপেনহাওয়ারের কয়েকটি পত্র (২৫০০ মার্ক) উপস্থিত নারী-পুরুষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা ছাড়া বান্ধবী লুইজে ওটের কাছে লেখা ফ্রীডরিস নীটশের সাতটি পত্র (৪২০০ মার্ক) ও হেগেলের একটি বিখ্যাত দার্শনিক রচনার কিছু কিছু অংশও মারবুর্গের এই হস্তলিপি-নিলামে বিক্রয় করা হয়।

হিমানী

হিমসার
আয়ুর্বেদিক কেশতৈল ও

গ্লিসারিন সাবান

দিনের সুরুতেই হোক কি শেষেই হোক হিমানী গ্লিসারিন সাবান দিয়ে স্নান করে দেখুন—কি চমৎকার লাগে! এতে গাত্র চম সজাগ হয়, গাত্রবর্ণ সতেজ হয় এবং মনের তৃপ্তিবোধ ফিরে আসে।
আর স্নানের শেষে—শীতল সুরভিত হিমানী হিমসার কেশতৈলে কেশের জৌলুস আনে।

হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

কাঁচালঙ্কা ও বাঙালী সমাজ

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী সান্যাল বাজারের ঠোংগা থেকে জিনিসপত্র নামাবার আগেই টেলিফোনের দিকে ধাবিত হলেন। সেভেন সিক্স ফোর এইট ফোর। এই যে অণু, এইমাত্র দেখে এলাম আই জি এ-তে কাঁচালংকা এসেছে। ও মা, জানি না তো? আজই এসেছে বলল। তাড়াতাড়ি যাও, দেরি হলে আর পাচ্ছ না। থ্যাংকস দিদি। ইউ আর ওয়েলকাম।

সত্য ঘটনা কখনো কখনো গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। মিসেস দত্ত অতঃপর কোট হাতে গাড়ির দিকে ছুটলেন। ইতিমধ্যেই টেলিফোনযোগে বাড়ি বাড়ি এই বার্তা রটি গেল ক্রমে। আই জি এ-তে কাঁচালংকা, আই জি এ-তে কাঁচালংকা। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে ফ্লোরিডা থেকে আমও চালান এসে থাকে বটে, কিন্তু মধ্যপশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের এই শহরের ভারতীয় জনসমাজের চাহিদা এত অল্পে মেটে না। সুতরাং ট্রাক থেকে নামতে না নামতেই আধ ঘণ্টায়, কাঁচালংকার কাউন্টার শূন্য, পট্টবর্ধন, ভাস্কররাও ও ঘোষাল গৃহিণীরা দোকান উজাড় করে স্টেশনওয়াগন ভর্তি করেছেন। ভগ্নমনোরথ মিসেস দত্ত অগত্যা বাড়ি ফিরলেন। ইতিমধ্যে বারোটা বেজে গেছে। লাঞ্চটাইম। গৃহকর্তা ফিরে এসে দেখেন দুই পুত্র টেলিভিশনের কলকব্জা নিয়ে নানাপ্রকার কারিকুরি করতে ব্যস্ত, রান্নাঘরের দিক থেকে সন্দেহজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গৃহিণী অবশ্য তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ড ফুলকপি চড়িয়ে প্রায়ই প্রতিবেশিনী-দের বাড়ি কফি খেতে গিয়ে থাকেন। দত্ত সাহেব দার্শনিক লোক, সপ্তাহে চার দিন স্যান্ডউইচ বা হট ডগে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছেন।

কিন্তু কাঁচালঙ্কা তো নিমিত্ত মাত্র। বিদেশে বাঙালী বহু বিঘ্নবিপদ দুঃখদহনের সম্মুখীন হয়েছে কেবলমাত্র ভোজন-বিলাসের জন্য। একে ভোজনরসিকতা নাম দিলেও অত্যুক্তি করা হবে না। সুমেরু থেকে কুমেরু, কার্যব্যপদেশে যেখানেই বঙ্গবাসী প্রবাসী হয়েছেন সেখানেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ফোড়নের চমৎকারিত্ব অন্যে উপলব্ধি করতে অক্ষম, দেওয়ালে রান্নার চিহ্ন আবিষ্কার করে বাড়িওয়ালী ক্রোধে অগ্নিশর্মা। অদৃষ্টদোষে যদি বাড়ি ছাড়তে হয় তাতে ক্ষোভ নেই, নিগ্রো পল্লী

থ্যাংক্‌স্ দিদি!

এ তো সব সময়েই আছে। কিন্তু তাই বলে মাছের ঝোল আর চচ্চড়ি খাওয়া ছেড়ে দেব বাঙালী হয়ে? নৈব নৈব চ। বাঁড়ুয্যে মশায় রাত্রে স্বপ্ন দেখেন কলাই-এর ডাল, আলু-পোস্ত আর কুলের অম্বলের। গৃহিণী যস্মিন দেশে যদাচারে বিশ্বাসী সুতরাং বার্ষিক আট হাজার ডলার সত্ত্বেও বাঁড়ুয্যে মশায়ের মনে সুখ নেই। কি হবে রেফ্রি-জারেটর আর গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন আর টেলিভিশনে? ডলারের বিনিময়ে বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, কড়াপাকের সন্দেশ? গুরুদেব রক্ষা করুন।

কোনো কোনো জাতির ব্যক্তিত্ব তার আচার-ব্যবহারে প্রকট, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য তার আহারপ্রিয়তায়। আলী সাহেব কি উপায়ে টিনের প্যাক রসগোল্লা দিয়ে কাস্টমস-রূপী শত্রু দমন করেছিলেন রসসাহিত্যে তার উল্লেখ আছে। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রতি বিলাসপুরের শ্রীমতী ঘোষকে শিকাগো এয়ারপোর্টে বিষম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মূল্যবান বেনারসী শাড়ির ভাঁজের মধ্য থেকে প্যাকেটবন্ধ সাদা কালো বিচি বেরোতে দেখে কর্তৃপক্ষের তো চক্ষুস্থির। নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য মনে করে তাঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকেন আর শ্রীমতী ঘোষ ওয়ার্ডবুকের সমস্ত ভুলে যাওয়া শব্দ একত্র করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই অর্ধ-সভ্যদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন না যে এগুলো কালোজিরে আর কাটা সুপুরি —জীবনধারণের অপরিহার্য উপকরণ।

বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে। কিন্তু অনেক বিষয়ে এখনো বিস্তৃততর গবেষণার প্রয়োজন আছে। জীবিকার ও ক্ষয়রোগের মত ভোজনরসিকতা ও অর্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কিনা সে সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারেন এমন যোগ্য ব্যক্তি আমাদের বংশধরেরা বঙ্গদেশে নিশ্চয় যথেষ্ট আছেন। আমাদের জাতীয়তা-বোধ, পরশ্রীকাতরতা, মানসিক উৎকর্ষ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি দোষগুণ কিভাবে মুড়িঘণ্ট, বাটিচচ্চড়ি ও আলুপোস্তর সঙ্গে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে তার পুনরুদ্ঘাটনের ইতিহাস হবে এক অনুন্নত জাতির সভ্যতায় উপনীত হবার অবতরণিকা। বাঙালীর সামাজিক, রাজ-নৈতিক, ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রকার চিন্তা-ধারার অবচেতনে এই অতি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ বর্তমান। কেবলমাত্র সমাজচেতনাই যে শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তার মূলে

এই অর্ধসভ্যদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন না যে...

নেই তাও প্রমাণ করা যে কোনো সাহসী ব্যক্তির পক্ষে বোধ করি দুঃসাধ্য হবে না।

সময়ের অকুলানবশত আজকাল জীবনের নানা ক্ষেত্রে বহুবিধ সময় সংক্ষেপকারী উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। মার্কিন দেশের বিজ্ঞানবুদ্ধি এই দিকে নিয়োজিত হয়ে মেয়েদের রন্ধনগৃহের অধীনতাপাশ থেকে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছে। এক মিনিটে চা, আধ মিনিটে কফি, এক লহমায় কেক, তিন সেকেণ্ডে পুডিং প্রভৃতি পূর্বাপর আহার্যের ভিড়ে সময় অনেক বেঁচে যাচ্ছে বটে কিন্তু কিছু কিছু দিক থেকে বিলাপের সুরও ধ্বনিত হচ্ছে যে, এর ফলে মার্কিন মেয়েরা রান্নাঘরে সৃষ্টিকার্যের মত পুণ্যকর্ম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মেয়েরা স্বভাবতই প্রিয়জনকে রান্না করে খাওয়াতে চান। বৈদ্যুতিক উপায়ে টিন কেটে গরম করার মধ্যে সুবিধে যতই থাক, রন্ধনকৌশল দেখাবার তেমন সুযোগ নেই, এতে আধুনিক হলেও গৃহকর্ত্রীর মন খুঁত-খুঁত করা স্বাভাবিক। এই আদিম ও অকৃত্রিম মানসিক অবস্থার গুরুত্ব অবলোকন করে মার্কিন শিল্পপতিরা এক নতুন পদ্ধতিতে সমস্যার মীমাংসা ও তৎসঙ্গে ব্যবসায় লাভবান হবার চেষ্টা করলেন। ফল হল অচিন্তনীয়। এতদিন এক সেকেণ্ডের কেকের প্যাকেট খুলে কেবল জল মিশিয়ে সেঁকা হলেই কেক প্রস্তুত হচ্ছিল, এখন এর মধ্যে রান্নার জটিলতা বাড়াবার জন্যে জলের সঙ্গে একটি ডিমের ভগ্নাংশ যোগ করার নির্দেশ দেওয়া হল। তৈরী খাবার খাওয়াচ্ছি মনে করে এতদিন যেসব মহিলারা নিরুদ্যম হয়ে ছিলেন, এবার তাঁরা মহোৎসাহে নিজে নিজে কেক তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। 'কেক-মিক্স' একাধারে সময় বাঁচিয়ে ও মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করে সমগ্র মার্কিন জাতিকে এক মহাসংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ করল।

কোথায় আমার ঝাল-দেওয়া সরষে-ইলিশ?

এইরকম সব রন্ধন সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নবযুবকেরা নানা-প্রকার সাধু সংকল্প নিয়ে দেশে ফিরে থাকেন। অবশ্য পাছে ভারতভূমিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেসব মহৎ উদ্দেশ্য অন্য চিন্তার ভিড়ে হারিয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। জুড়-ইন্টিনেন্টালের কফি-কক্ষে প্রায়ই এই জাতীয় উত্তপ্ত আলোচনা শুনতে পাওয়া যায়। স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে এক যুবক সঙ্গীদের কাছে সগর্বে ঘোষণা করছিলেন দেশে ফিরে প্রথম কাজ হবে রান্নাঘরে বিপ্লব বাধানো। অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল লোকে বাধা দিলেন, ওহে, যেদিন রান্নাঘরে বিপ্লব হবে সেদিন সারা ভারতবর্ষেই বিপ্লব হবে। মন্দ লোকে টিপ্পনী কাটলেন, খুব তো বড় বড় কথা বলা হচ্ছে এখন, কিন্তু দেশে ফিরে ইনিই প্রথমে বলবেন, কোথায় আমার চিংড়ি মাছের মালাইকারি, কই-এর দইমাছ আর ঝাল দেওয়া সর্ষে ইলিশ। সেগুলো কি টিন কেটে বার করা হবে? প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, উচ্চশিক্ষার্থ ছেলেদের বিদেশে পাঠিয়ে পিতামাতারা নিশ্চেষ্ট হয়ে নানাবিধ সুখাদ্য খেয়ে কালাতিপাত করছেন এ কথা ঠিক নয়। বাঙালীর ভোজনরসিকতা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যে গুণীজনেরা বিস্তৃততর গবেষণা করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের থীসিসে এই পিতৃসম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। কেননা, প্রবাসে উপবাসে ক্লিষ্ট পুত্রের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে এঁরা বছরে অন্তত একবার বায়ুশূন্য টিনে সোলোটি করে রসগোল্লা পাঠিয়ে থাকেন। কখনো কখনো স্বাধীনতা মূর্তির পদস্পর্শ করার আগেই তারা আহারের অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অপার বাৎসল্যরসও তাদের রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছে এমনও ঘটতে দেখা গেছে। অবশ্য সেটা কচিৎ কদাচ। মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ীদের টিন-শিল্প জয়যুক্ত হোক।

আমাদের রন্ধনব্যবস্থার আশু পরিবর্তন সম্পর্কে যথোচিত মন্তব্য করার সময় এখনো হয়নি তবে সম্ভবত ভারতীয় কৃষ্টির প্রধান পরিবেশক শাড়ির মত বাঙালীর রান্নাঘরের বর্তমান ব্যবস্থার মেয়াদ এখনো অনির্দিষ্ট-কাল ধরে চলবে। চলা উচিত কি না তা নিয়ে শ্রী ও শ্রীমতি দত্তের মত তর্ক করা যেতে পারে, যদিও তা দ্বারা সমস্যার সমাধানের আশা সুদূরপরাহত। শ্রীযুক্ত দত্ত একে সমস্যা বলে মনে করেন কিন্তু যার জন্য এত দুর্ভাবনা সেই মিসেস দত্ত দিনের অর্ধেক সময় পাকশালাতে কাটাতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি বোধ করেন না। রুষ্ট দত্তসাহেব আক্ষেপ করেন, এইজন্যই তো ভারতবর্ষের এই দুর্দশা। দত্তজায়া নির্বিকার চিত্তে বলেন—বেশ, তা হলে আজ থেকে দুপুরে রুটি করে হ্যাম-বার্গার বরাদ্দ রইল, তাতে যদি ভারতবর্ষের কিছু উন্নতি হয়। এর পর থেকে দত্তসাহেব স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে মহাজনবাক্যে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন ভারতীয় সংস্কৃত আপ্তবাক্যে তাঁর প্রচণ্ড অনাস্থা সত্ত্বেও।

সম্ভবত প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীনত্বের লক্ষণই এই রক্ষণশীলতা। চীনারা পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েও বংশানুক্রমে নিজেদের চীনিক ঐতিহ্য সযত্নে রক্ষা করে যাচ্ছেন। অবশ্য এ কথাও খুবই সত্য যে কোনো ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে আহারের অভ্যাস বদলানো দু-এক দিন বা মাসের কর্ম নয়। আসমুদ্র বিস্তৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সুপারমার্কেটে বীজাণুমুক্ত জমানো চিংড়ির প্যাকেট খুঁজে দেখতে পাওয়া যাবে না, অথবা অন্য মাছের কাঁটা। ছাঁচড়ার সমাদর করার মত উচ্চস্তরের সভ্যতায় এখনো বহু দুঃসাহসী জাতির হাত পৌঁছয়নি। বিদেশের অতিপরিচ্ছন্ন মুদীর দোকানে এইরকম নানা জিনিসপত্র দেখতে পেয়েই কোনো খাদ্যরসিক ব্যক্তি দেশ থেকে কিছু পায়েসের চাল এবং সর্ষের তেল আনাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তা আর অতলান্তিক পার হবার সুযোগ পায়নি।

সমস্ত বিশ্বকে শান্তির বন্ধনে বেঁধে ফেলা যায়...

আন্তর্জাতিক লোক ছোটাছুটি দ্বারা সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হতে পারে কিনা এক কথায় বলা কঠিন তবে চৌষট্টিকলার অন্যতম প্রধান বিদ্যা রন্ধনকলা দিয়ে যে সমস্ত বিশ্বকে শান্তির বন্ধনে বেঁধে ফেলা যায় এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। এইখানেই সমস্যা ও সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ। এইজন্যই অন্যান্য রাষ্ট্র ভারত-বর্ষ থেকে এখনো বাবুর্চিদের প্রচুর পরিমাণে প্রত্যাশী।

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪১৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, হাতে বেশি সময় তো রাখচ না। আসবে ৭॥—৮টায় ডিনার খাবে কতক্ষণ জানিনে—তার পরে একটু নাচ-গান। এই রকম তো। পরদিন কখন দৌড় দেবে? লক্ষ্ণৌ যাওয়া তো এইখান থেকেই। বৌমা হাঁপানি নিয়ে চিকিৎসা করাতে দৌড়লেন কলকাতায়। তুমিই নিয়ো কর্তৃত্বের ভার। ঘর দুয়োর অশন শয়ন তৈজসপত্রের অভাব হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঘোষো আনাই বিরাজমান থাকবেন। কুচো কাচাদের মধ্যে পুপু সুনন্দা। বড়ো দরের মানুষের মধ্যে এন্ড্রুজ। হাঁক ডাকের জন্যে সুধাকান্ত। গাণিতশাস্ত্রের জন্যে কোনো জোগাড় করতে পারব না। আমি অগণিতের কারবারী। বুড়ি তার দলবল নিয়ে থাকবে মন ভোলাবার কাজে। ইতি ১৫।১।৩৮

কবি

প্রফেসর আর এ ফিশারের যাওয়া নিয়ে।

ওঁ

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র

জীবন ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়,
সংসার যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
নির্বিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয় মালা তার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২রা মাঘ, ১৩৪৪

আমার পিতৃদেবের মৃত্যু সংবাদে এই কবিতাটি লিখে কবি আমাকে পাঠিয়ে দেন।

॥ ৪১৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

পূর্ণ পরিণত জীবনের প্রায় চরম প্রান্তে মৃত্যু যখন নিশ্চিত অবধারিত, এবং যখন প্রতিমুহূর্তে জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, তখন মৃত্যুকে যিনি কখনো ভয় করেন নি, তাঁর পক্ষে মৃত্যুকে শোকাবহ বলে গণ্য করতে পারি নে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যাঁরা তাঁর সঙ্গে সুখদুঃখ স্নেহ প্রেমের নানা সম্বন্ধে জড়িত, বিচ্ছেদ দুঃখ তাঁদের বেদনা দেবে জানি, কিন্তু যিনি চলে গেছেন তাঁর শান্তি ও নিষ্কৃতির দিকে লক্ষ্য করলে এই দুঃখকে তার তুলনায় সামান্য বলেই স্বীকার করতে হবে।

ফিশার এসেছেন। সময় ছিল সংকীর্ণ, কিন্তু তাঁকে যা দেখিয়েছি, তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। এন্ড্রুজকে বলেছেন এই সংগীতের সঙ্গে এই নাচকে এখনি ফিল্মে তুলে নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, এই জিনিসের ভিতর দিয়ে এদেশের যে পরিচয় য়ুরোপকে দেওয়া যেতে পারবে, তা খুব মূল্যবান। জেনিভা থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বলে গিয়েছেন এ জিনিসটি অতুলনীয়। কেবল একজন রোগা মতন বাঙালী দর্শক বলে গেলেন, এই রকম নাচে গানে বলহানি করচে। কন্‌গ্রেস কমিটির পরিহাসে এই জাতের দলবলের জন্যে এত আয়োজন করতে হোলো—খরচ করেচি ঢের পরিশ্রম করেচি ঢের, দুঃখ পেয়েছি কম নয়। ফিশার এই ব্যাপারটা শুনে বিস্মিত হয়েছেন। লোকটি খুবই ভালো। ইতি ১৭।১।৩৮

কবি

॥ ৪১৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার বাবার স্মরণার্থ আমি একটি চৌপদী কবিতা পাঠিয়েছিলুম, বোধ করি, যথাসময়ে সেটা পেয়েচ। আরো দু লাইন ছিল চৌপদীর সীমা বাঁচাবার জন্যে কেটে দিয়েছিলুম, তবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলুম।

দৃষ্টি যবে আবরিল ছিল তব আত্মার আলোক,
ওরা আচ্ছাদন তলে চিত্তে ছিল নিত্য সে আলোক।

আজ ১১ই মাঘ। অনুষ্ঠান হবে সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে আমাকে আসন নিতে হবে। ইতি ১১ই মাঘ, ১৩৪৪।

কবি

॥ ৪১৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এতদিনে তোমাদের ক্রিয়াকর্ম বোধ করি সমাধা হয়ে গিয়েছে এবং মনে শান্তি পেয়েছ। অমলের চিঠি থেকে তোমার বাবার শ্রাদ্ধের খবর পেলুম, আমার ছোটো কবিতাটুকু তাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু আমি এখনো ছুটি পেলুম না। চণ্ডালিকা দিনের অষ্টপ্রহর অধিকার করে আছে। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বৌমা না থাকাতে আমার বোঝা আরো ভারি হয়ে উঠেছে। জিনিসটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে ভালো হবে এই উৎসাহেই দায়িত্বে আমাকে বেঁধে রেখেছে—আর্টের বন্ধন—উৎকর্ষ সাধনের নেশা এতেই পরিশ্রমকে দুঃসহ বোধ হয় না। বোধ করি সাংখ্যিকদেরও এই অভিজ্ঞতা আছে। এইমাত্র খেয়ে উঠে একটু অবকাশ নিয়েছি। হেমন্তীদের রচিত সেই ছোট ঘরে আমার বাসা দরজা জানলার ফাঁকে রৌদ্রে ঝলমল গাছ-পালার ইশারা আমাকে কাজ ভোলাবার চেষ্টায় আছে। দূরের কথা যখন মনে পড়ে তখন নেত্রকোণার ঘরের কোণটাই মরীচিকা বিস্তার করে—ঘড়ঘাড়িয়ার রাজকীয় ঘরগুলো মনটার দখল নিতে পারে নি। চণ্ডালিকার দল চলে গেলেও নিষ্কৃতি পাব না—অন্তত ২৪।২৫শে পর্যন্ত আতিথ্যের উপসর্গ আছে। ততদিনে জলে স্থলে আসন্ন ফাগুনের ডাক পড়বে—অকারণে মন উতলা করে দেবে। এখনো শীতটা তার মুঠো আলগা করে নি—গরম কাপড়ের খোলোস ছাড়বার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি। ইতি ২১ মাঘ ১৩৪৪

কবি

কবির অনেক সময়েই নেত্রকোণার জন্যে মন কেমন করতো। ওঁর চিরকালই ছোট-ঘর পছন্দ ছিল। বলতেন, ছোট-ঘরে ঘরটা খাঁচা

বোধ হয় না—সমস্ত পৃথিবীকে, আকাশটাকে সে ঘরের মধ্যেই এনে দেয়। বড়-ঘর নিজে খাঁচা হয়ে বাইরেটাকে আড়াল করে রাখে। তাই বেলঘরিয়ার গুপ্ত নিবাসের প্রকান্ড ঘরটা ওঁর নেত্রকোণার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হোতো। বারে বারে ওটাকে রাজবাড়ি বলে ঠাট্টা করতেন; কারণ ওঁর ভৃত্য বনমালী প্রথম দিন গুপ্ত নিবাসে এসে তার প্রকান্ড বাঁধানো আঙিনা, লম্বা রান্নাবাড়ি, প্রকান্ড প্রকান্ড থামওয়ালা লম্বা বারান্দা এবং মস্ত মস্ত উঁচু ছাঁদের ঘরগুলো দেখে বলেছিল, "এ যেন একেবারে রাজবাড়ি। কী প্রকান্ড উঠোন, কী চমৎকার বারান্দা, ঘর, রান্নাবাড়িটাই বা কতো বড়" ইত্যাদি। সেই থেকে কবি বার বার ঠাট্টা করে বলতেন, "আমার নীলমণির তোমার এই রাজবাড়ি ভারি পছন্দ। আমাকে কিন্তু সেই নেত্রকোণার জানলার কোণটিই বেশী মুগ্ধ করেছিল। এই বাড়ির এই মস্ত মস্ত ঘরগুলো বিশ্রী লাগে এই জন্য যে, এর মাঝখানে বসে বাইরেটা কিছু দেখতে পাই না। বাইরের আকাশকে পেতে হলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় এটাকে কি ভালো বলে? হোলোই বা রাজ-বাড়ি। আমার ঐ বোকা বাঁদরটা বড় বড় ঘরদোর দেখেই ভুলেছে। ও তো কবিতা লেখে না, তাই বুঝবে কি করে যে, কেন এই রাজবাড়িতে আমার মন ভোলে না।

॥ ৪১৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের ঘরের খবর তো একটুও ভালো নয়। প্রশান্তর যে চিকিৎসাই চলুক না, তার সমান্তরালে বায়োকেমিক ফেরাম ফস ও কেলি সলফ্ পালাক্রমে এক ঘণ্টা অন্তর দিয়ে দেখতে পারো। বড়ো জোর যথোচিত ফল না হতে পারে, কিন্তু ঐ খুদে বড়ি কয়টিতে পালোয়ানি চিকিৎসা বিধ্বস্ত করতে পারে না। আমি জানি জীবন এ রকম দৈবরাজ সইতে পারে না—কিন্তু আমাদের দৈহিক জীবনে বহুরোজকতা আহার বিহার নানা উপলক্ষ্যে সর্বদাই ঘটচে, সেই জন্যে আমি বিরুদ্ধপক্ষের গা ঘেঁষে চলতেও কুণ্ঠিত হইনে। ডাক্তার হিসাবে তাতে মর্যাদা লাঘব হতে পারে, কিন্তু যে হেতু আমার উপাধি সাহিত্য ডাক্তার সেই হেতু আমার লজ্জা নেই। কলকাতায় অভিনয়ের দিন পিছিয়ে গেল। মার্চের আরম্ভ দিকে স্টেজ পাওয়া গেছে। সময় পাওয়াতে সুবিধা হলো কেননা চণ্ডালিকা অত্যন্ত দুরূহ, দীর্ঘ অভ্যাস ও শিক্ষা সাপেক্ষ। তা ছাড়া কলকাতার বাহিরের জন্যে চিত্রাঙ্গদা প্রস্তুত করা চাই—এই দুটোতে মিলে নিঃশেষে আমার সময় অপহরণ করেছে। এর উপর অতিথি সমাগমের ফাঁক নেই—কেউ এপারের কেউ ও-পারের। তৎসত্ত্বেও যখন দুপুর বেলায় আহারান্তে সংকীর্ণ ছুটিতে নতুন বোল-ধরা আমগাছের ছায়ায় শালিকের অকারণ চাঞ্চল্য চেয়ে চেয়ে দেখি জানিনে কেন প্রাণধারণকে সার্থক বলে মনে হয়। কাল দুপুর বেলা মনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, এ আনন্দ কিসের আনন্দ, মন বললে, বুঝে ওঠা তোমার কর্ম নয়। ইতি ১০।২।৩৮

কবি

॥ ৪২০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

১লা মার্চ তারিখে মধ্যাহ্নে তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হব এমন আশঙ্কা করতে পারো।

দুর্বাসা তপোবনের কুটীর-প্রাঙ্গণে এসে ডাক দিয়েছিলেন। অন্যমনা শকুন্তলা সাড়া দেন নি। মুনি শাপ দিয়ে প্রস্থান করলেন। যদি তুমি সাড়া না দাও তাতে তোমার ডাক টিকিট খরচা বাঁচবে, কিন্তু আমি শাপ দেব না, প্রস্থান করবই না, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ব। আমার ক্ষমাও যেমন আমার সাহসও তেমনি।

কুঁড়েমি করতে যতই ইচ্ছে করচি কাজ করচি ততই বেগে। একটার পর একটা তাগিদ অনাহূত এসে পড়চে। বৌমা অশুভ লগ্নে আমাকে চণ্ডালিকা সমর্পণ করে নিজে সরে পড়েছেন—ত্যাগ করে মুক্তি নিতে পারচি নে। সকলের চেয়ে বিরাট একটা তাগিদ আমার মাথার উপরে ঝুলচে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্বীকার করেচি মহাভারতের উপর একখানা বই লিখব। তাই মন খারাপ হয়ে আছে।

শীত প্রচণ্ড—স্তরে স্তরে গরম কাপড়ে আবৃত হয়ে আছি মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের মত—তুলনাটাতে বিনয়ের অভাব বোধ হচ্চে—কিন্তু আমার নামের সঙ্গে যোগ থাকাতে ওটাকে নমিন্যাল বলা চলে। ইতি ২৩।২।৩৮

কবি

॥ ৪২১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

চণ্ডালিকার দলের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্চি শুনে আত্মীয় বন্ধু সকলেই নিরতিশয় দুঃখিত ও আশঙ্কিত—বিবি(১) শোকাবহ একখানা চিঠি লিখেছে। আমি বলচি মাভৈঃ—আমার উপর ছায়াপাত বাঁচিয়ে চলব—সমস্ত কলকাতা জুড়ে তো ছায়া পড়বে না—যাব না সেই প্রলয় বঙ্গভূমিতে। ভেবেছিলুম অভিনয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ করে যাব তা হলে সকলের মন সুস্থ থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক। শান্তির২ও সেই অনুনয়। সেই জন্যেই ঐ কয়দিন জোড়াসাঁকোয় থাকতে হবে—অর্থাৎ যদি কোনো কারণে কোনো অন্তিম স্পর্শ অর্থাৎ last touch-এর দরকার হয় সেজন্যে আমাকে প্রয়োজন আছে। জিনিসটা অত্যন্ত দুরূহ। এর জন্যে অনেক খাটতে হয়েছে। দলবল যাবে ২রা তারিখে আমিও সেই তারিখেই যাচ্চি।

হাবলের৩ মায়ের জন্যে মনে খুবই একটা পরিতাপ রইল। কী জানি হয় তো এই দারুণ পরিণাম থেকে রক্ষা করা যেতে পারত। কিন্তু সে কথা যখন নিশ্চিন্ত নয় তখন আক্ষেপ করাটাও অনাবশ্যক। যদি পারো জোড়াসাঁকোয় দেখা কোরো। আমার কর্মসূচি এখনও পাকা করতে পারিনি। ইতি ২৮।২।৩৮

কবি

---

১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, ২ শান্তিদেব ঘোষ, ৩ হিরণকুমার সান্যাল

॥ ৪২২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

অভিনয়ের কুষ্টিতে কুগ্রহের দৃষ্টি পড়েছে—দিনক্ষণ নিয়ে কেবলি চলচে গোলমাল। অবশেষে স্থির করেছি পরশু অর্থাৎ সোমবারে যাব। আপাতত তোমারই আশ্রয় স্বীকার করেছি। তার পরে মেয়েরা যখন খুলনা থেকে ফিরে এসে কলকাতার অভিনয়ের জন্যে তৈরি হবে তখন কয়েক দিন তাদের নিকটবর্তী হতে হবে তার দেরি আছে। সবসুদ্ধ বড়ো জীর্ণ হয়ে পড়েছি চোখ হয়েছে ঝাপসা, কান হয়েছে রুদ্ধ, পা **হয়েছে অচল, মন হয়েছে অকর্মণ্য। এদিকে মহাভারতের**

মহাভার গিয়েছে মাথায়। তোমার ওখানে কাজটা আরম্ভ করব।

যাতে আপন খেয়ালে চলতে চলতে দুর্গতির গর্তর মধ্যে অপঘাত না ঘটে এই জন্যে সাবধান করবার ভার বিধি তোমার উপর অর্পণ করেছে। এতে বিস্মিত হবার কী কারণ আছে? তোমার অনুরোধ আমি মানি এ কথা তুমিই মানো না, সংসারে আর সকলের মনে কোনো সংশয় নেই। পরীক্ষা করে দেখো— তুমি অনুরোধ করবামাত্র ছায়া রংগভূমিতে যাওয়া আমি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করব। ইতি ৫।৩।৩৮

কবি

পেঁছব মধ্যাহ্নে, জোড়াসাঁকোয় উঠে বৌমার সংগে ভাবী কর্তব্যের আলোচনা করতে হবে।

॥ ৪২৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্চে আমি যেন সপ্তম শতাব্দীর একটা ভগ্নাবশেষ—অধিকাংশ মহলটাই কাজের বার হয়ে গেছে, কেবল একটা অংশে শেলাই করা চট আর কেরোসিনের টিনে মিলিয়ে একটা বাসা তৈরি করা আছে, উইয়ে কাটা প্যাক-বাক্সোর উপরে বসে আছি। বসে বসে চেয়ে আছি বাইরের দিকে—গরমে ফলের গুটি ঝরে পড়া আমগাছ ছেয়ে গেছে নিবিড় কচি পাতায়; ফুলের অর্ঘ্য আকাশের দিকে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাতাহীন গোলকচাঁপার বাঁকা ডালের গাছ, লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে অশোক গাছে দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর প্রথম অশোকগুচ্ছ ধরেছে ঐ কাঁকরেরই মতো ঘন লাল রঙের। আমার এই জীর্ণ দেহের জানলার ফাঁক দিয়ে এখনো মোকাবিলা চলচে বাইরের জগতের সংগে, কিন্তু মনে হচ্চে ওর উপরে ক্রমে আড়াল করে আসচে একটা ঝুঁকে পড়া ভাঙা ছাতা। অকস্মাৎ দৃষ্টি ঝাপসা হতে আরম্ভ করেছে। শেষ বয়সে মস্তিষ্ক যখন ক্লান্ত হবে তখন ছবি এঁকে দিন যাবে এই ভরসা করে ছিলুম, কিন্তু সন্দেহ ধরিয়ে দিয়েছে। ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু কেমন আমার মনে হয় এক্স্-রে প্রয়োগের পর থেকেই আমার দেহ-দুর্গের হঠাৎ এই পতনদশা ঘটেছে। বাইরের সংগে আনাগোনার রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে আপন অন্তর্লোকে নির্জনবাসের একটা পালা আরম্ভ হবে, হয় তো তাতে মৃত্যুর উপক্রমণিকার একটা অভিজ্ঞতা লাভ করব—হয় তো তারো একটা কোনো রকমের সার্থকতা আছে—আগাম কল্পনায় যে শূন্যতার আশঙ্কা করি সেটা হয় তো মিথ্যা। কিন্তু যেটা মনে করতে সকলের চেয়ে খারাপ লাগে সে হচ্চে দেহযাত্রায় পরের উপর নির্ভরতা,—আশা করি এঞ্জিন একেবারে বিগড়াবার পূর্বেই শেষ টার্মিনাসে এসে থামব; অসমাপ্ত পথের মাঝখানে ঠেলাগাড়ির জন্যে কুলি ডাকতে হবে না।

এখানে এসে দেখি দুখানা কালির আঁচড়-কাটা ছবি আমার অনুবর্তন করেছে। এমন দুর্মূল্য নয় যার জন্যে তোমাকে বঞ্চিত করতে পারি—অথচ মাশুল খরচ করে ফেরৎ দেবার মর্যাদাও তার নেই—পয়লা বৈশাখ তোমাদের আগমন প্রত্যাশা করতে সাহস করিনে বিশেষত গরম অসহ্য—অতএব যদি মনে থাকে তবে ঐ দুটো হরিজন জাতীয় ছবি নিয়ে যাব।

খুবই গরম। কিন্তু গরম নিয়ে নালিশ করতুম না যদি আমার চোখের দুর্বলতার জন্যে ঘর অন্ধকার করে থাকতে না হতো। জীবনে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকে এই প্রথম দরজার বাইরে খেদিয়ে রেখেছি।

প্রশান্ত কেমন আছে? বৌমার প্রত্যাশায় আছি অথচ এই গরমে এখানে তাঁর আগমনটা স্পৃহনীয় মনে হচ্চে না। ইতি ৩১।৩।৩৮

কবি

॥ ৪২৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এবার সর্বসম্মতিক্রমে আমার জন্মোৎসব ১লা বৈশাখে। বলা বাহুল্য তোমাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয় কিন্তু প্রত্যাশনীয় কিনা জানিনে। প্রশান্তর জ্বর যদি বেলা চারটে থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত প্রবল এ প্রায় তা হলে হোমিয়োপ্যাথি লাইকোপোডিয়াম ৩০× দিতে পার, যদি জ্বরের বা জ্বালার সময়টা হয় সকালে দশটা এগারোটা, তা হলে হোমিয়োপ্যাথি নেট্রম ম্যুর। বায়োকেমিকটা বন্ধ কোরো না আধ ঘণ্টা অন্তর পালা করে ফেরম ফস ও কেলি সলফ্ দেবে—সকালের দিকে কেলি ফস্। বুলা এসেছিল, তার সামনে তার বউদিদির সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সাবধানে করেছি। ইতি ৪।৪।৩৮

কবি

॥ ৪২৫ ॥

ওঁ

গৌরীপুর লজ, কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

কোথায় আছ আন্দাজ করতে পারচিনে। মনে হচ্চে যেন ছুটির মেয়াদ শুরু হয় নি। যখন হবে তখন কোথায় যাবে তার একটা নিশ্চিত আভাস পাবার সম্ভাবনা হয়েছে কি? যদি দার্জিলিঙে আসা হয় তা হলে সেটাতে আমাদের ব্যবধান কতকটা হবে জোড়াসাঁকো বেলঘরিয়ারই মতো—নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের আয়ত্তের মধ্যেই পড়বে। এক-তরফা হবে, কারণ আমি গিরিরাজের মতোই অচল, তোমরা মহম্মদের শ্রেণীয়। চোখের দুর্বলতার জন্যে কলম চালানো প্রায় বন্ধ—কেবল ইতিমধ্যে জন্মদিন উপলক্ষ্য করে একটা কবিতা লিখেছি। কিছুই না করার যখন ভদ্র কৈফিয়ত থাকে তখন সেটাকে সৌভাগ্যের দান বলেই গ্রহণ করা চলে, কিন্তু সেটাকে দৃষ্টি-শক্তির দাম দিতে হলে বেহিসেবী হয়। মন্দের ভালো জাতীয় সামগ্রী পৃথিবীতে কিছু কিছু আছে, মন্দের পরিমাণটা যদি সহ্যমতো হয়। ২১ বৈশাখ ১৩৪৫

কবি

চিত্রপ্রদর্শনী

মাতৃত্বের উন্মেষ   শিল্পী : সুধীররঞ্জন ভূষণ

গত সপ্তাহে কলকাতায় তিনটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী মোগল আমলের 'মিনিয়েচার পেইন্টিং'-এর এক অনবদ্য সংগ্রহের প্রদর্শনীটি আকাদমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ। প্রদর্শিত ছবিগুলি, যার সব ক'খানিই এই প্রথম জনসাধারণ দেখবার সুযোগ লাভ করছে, সেগুলি মাননীয় শ্রীপ্রকাশেরই পারিবারিক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ছবিগুলির ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল রাজত্বকালে জাহান্দর শা বারানসীতে এসে আত্মগোপনকালে তাঁর কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে প্রচুর ছবি কিনে নেন শ্রীপ্রকাশের পূর্বপুরুষ সীতারাম শা। তারও প্রায় একশ বছর পরে, ১৯০৯ সালে বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক স্বর্গত আনন্দ-কুমারস্বামীকে দেখাতে তিনি ছবিগুলির ব্যাখ্যা এবং মূল্য নির্ধারণ করেন। সীতারাম শার বংশধরেরা এমন যত্নে ছবি-গুলি রক্ষা করে এসেছেন, যে দেখে অতি সাম্প্রতিককালে আঁকা বলে ভুল হতে পারে। প্রদর্শনীটিতে ঐ পারিবারিক সংগ্রহের সব ছবি নেই, তবে যে কখানি আছে, সেগুলির প্রত্যেকখানিই প্রাচীন ভারতের নিরক্ষর শিল্পীদের অতুলনীয় কৃতিত্ব উপলব্ধি করার একটা সুযোগ দেয়।

এই সূত্রে একটি কথা বলতে হয়। এ ধরনের প্রাচীন শিল্প-কৃতিত্বের নিদর্শন-সমূহের স্থায়ী প্রদর্শনী যাতে হতে পারে সেদিকে চেষ্টা করা দরকার। তাতে এখনকার শিল্পী এবং শিল্পরসিকেরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনি ভারতের গর্ব করার মতো শিল্পৈতিহ্য সম্পর্কে দেশের সাধারণ লোকেও জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

• • •

৮ই ফেব্রুয়ারী আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে একক চিত্রের দশম প্রদর্শনী উদ্বোধিত হয় বিজন চৌধুরীর ছবি নিয়ে। 'মন্দিরের চারধারে' আখ্যায় যে দশখানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, তার প্রত্যেকখানির মধ্যে ভারতীয় ধারার ভিত্তির উপর আধুনিক শিল্প-প্রগতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়।

কালিঘাট অঞ্চলে জন্ম এবং লালিত হওয়ায় ছবিগুলির বিষয়বস্তুতে কালি মন্দিরের চত্বর, নকুলেশ্বর তলা, মন্দিরে মেয়েদের সিঁদুর খেলা, গাজন, বাঙলা নববর্ষে মন্দিরের দৃশ্য, প্রভৃতিই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ছবিগুলির বিন্যাসে পট ও পোড়ামাটির কাজের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। ছবিগুলিতে সিঁদুরে লাল, সবুজ,

সিঁদুর খেলা   শিল্পী : বিজন চৌধুরী
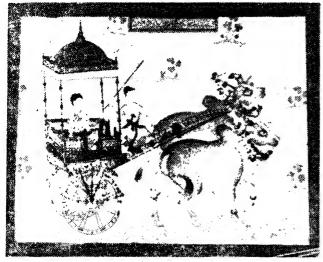
মোগল আমলের শিল্পকৃতিত্বের একটি নিদর্শন

নীল, গেরুয়া এবং ধূসর বর্ণের প্রয়োগে শিল্পী এমন চমৎকার একটা মৌলিকত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, অতি সাধারণ দৃশ্য ও পরিবেশও অসাধারণ শিল্পমাধুর্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

সহজ জ্যামিতিক রেখা—কোথাও বাঁকা, কোথাও বৃত্তাকার এবং স্থানে স্থানে সরল অথচ বিচ্ছিন্ন রেখা—কিন্তু ওরই সাহায্যে বেশ একটা কাব্যিক ছন্দের প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়। রঙের সুসমঞ্জস সমন্বয় ছবিগুলিতে একটা স্বকীয় দীপ্তি ফুটিয়ে তুলেছে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে বেশ একটা আনন্দ ধরিয়ে দেয়। বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে 'শান্তির জল' 'নীল পদ্ম' ও 'ফলবতী বৃক্ষ' শিল্পীর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

বিজন চৌধুরী চিত্রাঙ্কনে শিক্ষালাভ করেন কলকাতা এবং ঢাকার আর্ট কলেজে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষাটাই তিনি শেষকথা ধরে নিতে পারেননি। একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী উদ্ভাবনের সুযোগ লাভ করেন প্রখ্যাত শিল্পী নীরোদ মজুমদারের কাছে শিক্ষালাভ করে। শ্রী মজুমদারের অনুসৃত ধারায় বিজন চৌধুরী প্রাচীন ধারার সঙ্গে আধুনিক চিন্তার সমন্বয়ে তাঁর এই নিজস্ব ধারাটির উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন, যা দৃষ্টিপাত মাত্রেই একটা অসাধারণত্ব প্রতিভাত করে তোলে।

শিল্প মাধুর্যে বিশিষ্ট এবং বলিষ্ঠ দক্ষতাসম্পন্ন এই ছবিগুলি শিল্পরসিক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করবে। প্রদর্শনীটি আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকবে।

* * *

৭ই থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলিয়াঁস ফ্রাঁসেতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ শিল্পী সুধীরঞ্জন ভূষণের ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী। বাল্যকাল থেকেই নিজের চেষ্টায় ছবি আঁকা শিখে কলাভবন থেকে ফাইন আর্টসে স্নাতক হয়ে বেরিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে। তিনি শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিংকরের সংস্পর্শে আসেন। তাহলেও শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট ধারা বলতে যা বোঝায়, সুধীরঞ্জনের ছবিগুলি তা থেকে অনেকটা সরে দাঁড়িয়েছে এবং এটা তাঁর ইচ্ছাকৃত বলেই প্রতীয়মান হয়।

'ইংক অ্যান্ড ওয়াশ', জলরঙ এবং তেলরঙের মিলিয়ে মোট তেত্রিশখানি ছবি প্রদর্শিত হয়, যা প্রথম দর্শনে মনে একটা অদ্ভুত কিছু দেখার অভিজ্ঞতা এনে দেয়। পাশ্চাত্যের এক্সপ্রেসানিস্ট ধারায় চরিত্রের বিমূর্তনের একটা ঝোঁক প্রায় সব ছবিতেই। একটা অদ্ভুত, দুর্বোধ্য জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস। কোন কোন ছবিতে গগনেন্দ্রনাথের প্রভাবও স্পষ্ট। রেখার চেয়ে রঙের প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেলেও চরিত্রের রূপকে উদ্ভট করে তোলার প্রবণতাটাই বড় হয়ে উঠেছে। ছবিগুলি দেখে এটা বোঝা যায় যে, শিল্পী প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম একটা নিজস্ব ধারা বা প্রকাশভঙ্গীর উদ্ভাবনে পরীক্ষা ও অনুশীলনের পর্যায়ে রয়েছেন। এই চেষ্টার মধ্যে একটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসও তাঁর আছে, যা হয়তো একদিন তাঁর ঈপ্সিত পথের সন্ধান এনে দেবে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো বিমলা, এসে লাফিয়ে পড়লো প্রভাকরের গায়ের ওপর।

মুহূর্তের জন্যে। মুহূর্তের জন্যে বিমলার কোমল যৌবনের শরীরটা জড়িয়ে ধরলো প্রভাকর। ছেড়ে দিলো।

শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে টর্চ ফেললো বিমলা। গিরিজাপ্রসাদও থেমে পড়েছিলেন।

বললেন, এদিক দিয়ে সরে আয়।

আবার পাশাপাশি হেঁটে এসে খিড়কির দরজা খুলে ঢুকলো সকলে।

বিমলার মনের মধ্যে তখন একটা তোলপাড় চলছে। সাপের কথা শুনে একটু আতঙ্ক যে হয়নি তা নয়। কিন্তু অতখানি ভয় সে ও পায়নি, কপট আতঙ্কেই যে লাফিয়ে এসে প্রভাকরের ওপর পড়েছিল তা যেন প্রভাকরও বুঝতে পেরেছে।

প্রভাকর যখন ওকে জড়িয়ে ধরলো, হোক ক্ষণিকের জন্যে, তবু ঐ স্পর্শটুকুর মধ্যেই যেন স্বীকৃতির ইশারা শুনেছে বিমলা। তবে কি প্রভাকরের মনের গোপনেও ঐ একই স্বপ্ন!

লণ্ঠন জ্বালাতেই কেমন যেন লজ্জা পেলো বিমলা। চোখ নামিয়েই রইলো।

গিরিজাপ্রসাদ গল্প জুড়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। শিষ্ট ছাত্রের মত শুনছে প্রভাকর।

একবার আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকালো বিমলা, আর সেই মুহূর্তে চোখোচোখি হলো।

লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলো ও।

বারান্দায় টিনের চেয়ারটায় বসে গল্প করতে করতে বিমলাকে লক্ষ্য করে প্রভাকর। একটা মুগ্ধ আবেশের চাদর যেন ধীরে ধীরে তার সমস্ত চেতনাকে মুড়ে দেয়।

লণ্ঠনের আলো পড়েছে উঠোনে। ঝোপ ঝোপ অন্ধকার আমগাছটার ডালে, ঢেঁকিঘরের ওপাশের স্তূপীকৃত জঞ্জালে, টিয়াদের ঘরের বারান্দায়, পশ্চিমের রান্নাঘরে। সদর দরজাটা বন্ধ, কিন্তু তার পাঁচিলের ওপারে খড়ের পালুই, মরাইয়ের গোল চুড়োটা—সবই আবছা আলোয় ছায়া ছায়া—কাঠকয়লা ঘষে আঁকা দেয়ালের ছবির মত দেখায়।

স্টোভ ধরালো বিমলা। কেটলী ধুয়ে জল বসালো। পেয়ালা পিরিচ ধুলো বারান্দায় বসে বসেই। চামচ, ছাঁকনি, চা চিনির কৌটো এনে রাখলো। দুধের বাটি। খুব ভোরে উঠে চা খাওয়া অভ্যাস গিরিজাপ্রসাদের। গাই দোয়াতে বাগালটা আসে অনেক বেলায়, তাই রাত্তিরের খানিকটা দুধ রেখে দেন নিভাননী। গরুর দুধ যেদিন থেকে ভাগাভাগি করে চায়ের পাট আলাদা করে দিয়েছে গিরীন, সেদিন থেকেই এই ব্যবস্থা।

চায়ের জল ফুটে উঠতেই স্টোভটা নিবিয়ে দিলো বিমলা। তিনটে পেয়ালায় চা ছেঁকে চামচ নাড়লে। নিঃশব্দতার মধ্যে ঠুংঠুং শব্দ উঠলো, আর দূর থেকে যাত্রার আসরের চিৎকার। নতুন দৃশ্য শুরু হয়ে গেছে।

চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলো প্রভাকর। গিরিজাপ্রসাদের হাতের কাছে আরেকটা পেয়ালা এগিয়ে দিলো বিমলা।

তারপর নিজের পেয়ালাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-টুকু প্লেটে ঢেলে খেয়ে নিলো। ফুঁ দিয়ে দিয়ে।

কেটলীটা ধুয়ে বাড়তি এক কাপ চা তাতে ঢেলে নিবন্ত স্টোভে বসিয়ে রাখলো।

গিরিজাপ্রসাদ উঠলেন। —দাঁড়াও, একবার ঘরগুলো দেখে যাই।

টর্চ নিয়ে সব ঘরগুলোর শিকলের তালায় হাত দিয়ে দিয়ে দেখলেন। গিরীনদের ঘরটাও। সব ঠিক আছে।

বিমলাকে বললেন, চাবিটা দে তো মা।

—কেন?

—মরাইতলাটা একবার দেখে আসি।

চাবি নিয়ে টর্চ হাতে চলে গেলেন।

প্রভাকরও উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে রইলো। গিরিজাপ্রসাদের চটির শব্দ, সদর দরজার খিল খোলার শব্দ—মিলিয়ে গেল। মরাইতলায় ঘুরে ঘুরে দেখছেন গিরিজাপ্রসাদ।

প্রভাকর আর বিমলা। বিমলা আর প্রভাকর।

পাশাপাশি দুজন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। টর্চের আলোটা বিদ্যুতের মত এদিক থেকে ওদিকে সরে যাচ্ছে।

বিমলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা অবোধ্য অস্বস্তি, ভয়, ভালো লাগা। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে বিমলার। বুক কাঁপছে।

বিমলার হাত ছুঁয়েছে প্রভাকর। প্রভাকরের হাতের মুঠোয় বিমলার হাত। কাঁপছে বিমলা, তবু হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

হারিকেন লণ্ঠনটায় কালি উঠছে। তেল কমে গেছে হয়তো। কাঁচটা কালো হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কাঁচটা হয়তো ফেটে যাবে। তবু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পলতেটা কমিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

চিমনিতে কালি পড়ে পড়ে আলোটা কমে আসছে। অন্ধকার হয়ে আসছে যেন চতুর্দিক।

পিঠের ওপর হাত রেখেছে প্রভাকর। প্রভাকরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে যেন বিমলা। মুখের ওপর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ।

প্রভাকর বললো, চলো।

মরাইতলার দিকেই পা বাড়ালো প্রভাকর। পিছনে পিছনে বিমলা।

আর সেই মুহূর্তে গিরিজাপ্রসাদের গলা শোনা গেল। —বিমলা! বিমলা! আতঙ্কের ডাক।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে পলতেটা কমিয়ে দিয়ে ছুটে গেল বিমলা।

দেখলে, বিস্ময়ের চোখে একটা মরাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বড্ড কেটে ধান নিয়ে গেছে।

—ধান নিয়ে গেছে?

হাঁ, যাত্রা দেখতে গেছে সকলে। এই সুযোগে মরাই থেকে ধান চুরি করে নিয়ে গেছে কে। সামনে তখনো ধান পড়ে রয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে মরাইয়ের ভিতর থেকে।

—ছি ছি ছি। গিরিজাপ্রসাদের গলার স্বর কান্নার মত শোনালো। —যাত্রা দেখতে গেছে সব, পুজোর দিন। ছি ছি ছি, তারই মধ্যে চুরি করতে এলো!

হতাশ শোনালো গিরিজাপ্রসাদের কণ্ঠস্বর।

বললেন, কত নিয়েছে কে জানে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গিরিজাপ্রসাদ।

প্রভাকর মুখ নীচু করে রইলো। বিমলাও। ও যেন কিছুতেই মুখ তুলে তাকাতে পারছে না প্রভাকরের দিকে।

জীবনের প্রথম পুরুষস্পর্শের আনন্দে ধিক্কারে বিমলার সারা শরীর তখনো রোমাঞ্চিত।

পানের ডিবে নিয়ে গুছিয়ে বসেছিল মোহনপুরের বউ। পাশে টিয়া। একমনে যাত্রা দেখছিল। সারা বছরে এই ক'টা দিন মাত্র ছুটি। না, ছুটি নয়। পুজোর সময়েই কাজ বাড়ে সংসারের। তবু কাজকে কাজ মনে হয় না। সদা সর্বদা একটা চাপা ফুর্তিতে মার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় টিয়া। আর মোহনপুরের বউয়ের মনটাও হালকা থাকে। সেই প্রথম যখন বিয়ের পর নতুন বউ হয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল, পায়ে মল পরে যখন ঘুরে বেড়াতো ঘোমটা টেনে টেনে, আর মলের আওয়াজের মত খুশিতে ভরা মনটুকুও ঝুমঝুম করে বাজতো, ঠিক সেদিনকার মত একটা অদ্ভুত আনন্দে যেন সারা মন ছেয়ে থাকে এই পুজোর ক'টা দিন।

তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ভাত-তরকারি ঢাকা দিয়ে রেখে মোহনপুরের বউ বেরিয়ে পড়েছিল যাত্রা দেখার জন্যে। তোরঙ্গ খুলে বের করেছিল অনেক কাল আগে কেনা দামী বিষ্টুপুরী শাড়িখানা। নেড়েচেড়ে দেখে হেসেছিল। এতকাল আগের কাপড় তবু যেন নতুনই আছে। ক'দিনই বা পরতে পেয়েছে মোহনপুরের বউ। বিয়ের নিমন্ত্রণে দু'-চারবার পরেছে, একবার একটু ল্যাংচার রস লেগেছিল। জলে ধুয়েও দাগটা ওঠেনি। টিয়াকেও পুজোয় কেনা নতুন শাড়ি-ব্লাউজ বের করে দিয়েছিল মোহনপুরের বউ। আর টিয়া নিজে কাপড় বদলে এসে মাকে বিষ্টুপুরী শাড়িখানা পরতে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মৃদু হেসে বলেছিল, কি সুন্দর মানিয়েছে মা তোমাকে।

বলে চুল বেঁধে দিয়েছিল, খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল সোনার বাগান।

মোহনপুরের বউ লজ্জা পেয়ে হেসে বলেছিল, তুই কি আমায় কনেবউ সাজাবি নাকি?

টিয়া হেসে বলেছিল, সাজলে মানায় তোমাকে, সাজবে না কেন?

সিঁদুরের কৌটো এনে মার কপালে একটা বড় করে টিপ পরিয়ে দিয়েছিল টিয়া, সিঁথিতে টেনে দিয়েছিল লম্বা রেখা, তারপর সেই সিঁদুরটুকুই হাতের নোয়ায় ঠেকিয়ে দিয়েছিল।

আর মোহনপুরের বউ টিয়ার কপালেও টিপ পরিয়ে দিতে দিতে কৌতুকের হাসি হেসে আশীর্বাদ করেছিল, এই অঘ্রানেই বিয়ে হোক্।

লজ্জার হাসি হেসেছিল টিয়া। তারপর ঘরদোরে তালা দিয়ে মার পিছনে পিছনে এসে বসেছিল যাত্রার আসরে। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে।

বিমলা আর কমলাকে মোহনপুরের বউও লক্ষ করেছিল। পুরুষদের দিকে গিরিজাপ্রসাদের পাশে বিমলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু বিরক্ত হলো মোহনপুরের বউ। ফিসফিস করে বললে, ধিঙ্গি মেয়ে, ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখ!

টিয়াও দেখেছিল। দেখে ওরও ইচ্ছে হচ্ছিল বিমলার কাছে যেতে। কিন্তু সাহস হয়নি।

তারপর প্রভাকর যখন এলো তখনো দেখেছে টিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে কনুইয়ের কাছে একটা চিমটি কেটেছে কে।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকিয়েই ফিক্ করে হেসে ফেলেই হাসি চেপেছে টিয়া। তারপর যথাসম্ভব গাম্ভীর্য টেনে এনেছে মুখে।

রেণুদি আর রাঙাবউদি। কোথায় ছিল কে জানে, কখন টিয়াকে দেখে কাছে সরে এসে বসেছে।

পালবউকে দেখে টিয়ার মা বলে উঠেছে, ও মা অধিকারীর বউ, এত পেছনে বসলে কি লো। বলে তাকে সামনে জায়গা করে দিয়েছে।

দামু পালই যাত্রা-দলের প্রাণ। দামু পাল না থাকলে যাত্রা হয় না সেবার। তাই সবাই ঠাট্টা করে তাকে যাত্রা-দলের অধিকারী বলে।

পালবউ তা শুনে খুশীই হয়।

মোহনপুরের বউকে তার সঙ্গে গল্প করতে দেখে রেণুদি ফিসফিস করে টিয়াকে বলে, তাই বুঝি এত সেজেগুজে এয়েছিস?

ফিরে তাকিয়েছে টিয়া রেণুদির মুখের দিকে। চোখের ইশারায় মাকে দেখিয়েছে।

অর্থাৎ মা শুনতে পাবে।

কিন্তু প্রভাকরের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি ও। অস্বস্তি, লজ্জা—তবু ইচ্ছে হয়েছে প্রভাকর ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুক। ওর চোখে চোখ পড়ুক প্রভাকরের।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে প্রভাকর। আশ-পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু কিছুতেই ওর চোখজোড়া যেন টিয়ার দিকে আসছে না।

আগে দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রভাকরকে দেখতো টিয়া। গোপনে গোপনে রেণুদি আর রাঙাবউদির সঙ্গে হাসাহাসি করতো। কিন্তু শুধু প্রভাকরকে দেখতে পেয়েই যেন তৃপ্তি নেই আর, দেখা দিতে চায় টিয়া। চোখে চোখ পড়লে বুকের ভেতর অবধি কেমন করে ওঠে টিয়ার আজকাল। তবু দেখা না দিয়েও যেন শান্তি নেই।

যাত্রা শুরু হওয়ার পর কখন যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল টিয়া। প্রভাকরের কথাও যেন ভুলে গিয়েছিল। দামুদাদার অভিনয়, উদাসের অভিনয় বুঝি প্রভাকরের কথাও ভুলিয়ে দেয়।

তন্ময় হয়েই যাত্রা দেখছিল টিয়া। হঠাৎ আবার চিমটি কাটলে রেণুদি। ফিসফিস করে বললে, ঐ দেখ তোর জন্যে পাশে একটা খালি চেয়ার রেখেছে।

টিয়া তাকিয়ে দেখলে। অবনীমোহন উঠে গেছেন, তাই প্রভাকরের পাশের চেয়ারটা খালি পড়ে আছে। স্থির চোখে প্রভাকরের দিকেই তাকিয়ে রইলো টিয়া। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চোখে চোখ পড়লো। ক্ষণিকের জন্যে টিয়ার সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো আনন্দের আবেগে।

আর সেই সময়েই সকলে হইহই করে উঠলো। টিপ্পনী ছুঁড়লো উদাসের উদ্দেশে। পার্ট ভুলে গেছে উদাস, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না তার।

একটু পরেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে এলো বিমলা, নিভাননীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ফিরে গেল।

গিরিজাপ্রসাদকে উঠতে দেখেই টিয়াও উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনপুরের বউ ধমক দিলেন, কোথায় যাচ্ছিস!

—জ্যাঠামশাই বোধ হয়......

অর্থাৎ জ্যাঠামশাই বোধ হয় বাড়ি ফিরছেন, যদি কোন কিছু খুঁজে না পান, যদি কোন প্রয়োজন হয়।

মোহনপুরের বউ ধমক দিলেন, তুই বোস।

আবার বসে পড়লো টিয়া। তাকিয়ে দেখলে গিরিজাপ্রসাদ উঠলেন, প্রভাকর উঠলো। আর পিছনে পিছনে বিমলা।

একটা খালি চেয়ারে গিয়ে কমলা বসলো।

এদিকে ধীরে ধীরে আবার যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু যাত্রায় যেন আর মন নেই টিয়ার।

বারবার খালি চেয়ারটার দিকে, প্রভাকরের খালি চেয়ারটার দিকে তাকায় টিয়া। ওর বুকের মতই ফাঁকা যেন। এত লোক, এত ভিড়, রেণুদি, রাঙাবউদি, মা—তবু কেউ যেন নেই। টিয়া যেন একা, নিঃসঙ্গ। সমস্ত বুকটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে অসহ্য এক শূন্যতায়। যাত্রায় মন বসে না, কানে যায় না কে কি বলছে।

এতক্ষণ প্রভাকর ছিল, সমস্ত মন ভরে ছিল টিয়ার। প্রভাকর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সব আকর্ষণ চলে গেছে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পরে গিরিজাপ্রসাদ ফিরে এলেন, পিছনে পিছনে প্রভাকর। আর বিমলা ভিড়ের মধ্যে পথ করে করে এগিয়ে এলো টিয়ার মার কাছে।

এসে বললে, কাকীমা, ধান চুরি হয়ে গেছে মরাই থেকে।

—চুরি হয়ে গেছে? চমকে উঠলো মোহনপুরের বউ।

সঙ্গে সঙ্গে চাবিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। টিয়াও। কোলের ছেলেটা গিরীনের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে, অন্যগুলোও গিরীনের পাশেই বসে আছে ওদিকে।

তাকে ইশারায় ডাকলে মোহনপুরের বউ, তারপর টিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। গিরীনও।

পথে যেতে যেতে মোহনপুরের বউ বললে, ধন্যি বাবা, ধান চুরি হয়ে গেছে দেখেও আবার যাত্রা দেখতে এলো বাপ-বেটীতে!

গিরীন বললে, যত দায় যেন আমাদেরই।

টিয়া কিছু বললে না। আহা, বেচারী বিমলা, জ্যাঠামশাই, ওরা কি কখনো যাত্রা দেখেছে! দেখতে পায়!

ধান চুরি গেছে কারও দোষে নয়। সারা বছরে তো এই পুজোর ক'টা দিন হাসি আহ্লাদ, যাত্রা দেখার আনন্দ। ঘরে বসে কে মরাই পাহারা দেবে!

যতে কোটালকে তবু বলেছিল গিরীন। যতে ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল, কি কথাই বললেন গো, সম্বচ্ছরে তিনটে দিন যাত্রা হয়, আমি এখন ঘর পাহারা দিই।

গিরীন হেসে বলেছে, আহা, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবি।

যতে তবু অসম্মতিতে মাথা হেঁট করে থেকেছে। জবাব দেয়নি। আর গিরীনও বেশী ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। যা দিনকাল পড়েছে, রাখাল-বাগাল মুনিস-মাহিন্দারদের কি কিছু বলার উপায় আছে, মনে মনে গজরায় গিরীন। এমনিতেই গাঁয়ে ঘরে লোক পাওয়া যায় না চাষে খাটার। যা দু-চার ঘর আছে, তারাও একে একে চলে যাচ্ছে শহরের দিকে। কেউ কলকারখানায় কাজ নিয়ে, কেউ ইস্টিশনে চায়ের দোকান খুলে, কেউ বা উদাসের মত ড্রাইভারি শিখে নয়তো রেলের কাজ নিয়ে। দূরের মুসলমানদের গাঁ থেকে লোক আনিয়ে কোন-কোনবার চাষ হয়, সাঁওতালের দল না এলে ধান কাটা পড়ে থাকে।

মাঝে মাঝে সে-কথা বলেও গিরীন। বলে, আমাদের ভদ্দরলোকদেরই হয়েছে জ্বালা। লাঙল ধরলে জাত মান দুই যায়, লাঙল না ধরলে চাষ হয় না। জমিজমা ক'টা ও গরমেণ্ট কেড়ে নিলেই বাঁচি।

মোহনপুরের বউ শুনে হাসে। —কেড়ে নিলে নিজে দাঁড়াবে কোথায়? চাকরি দেবে গরমেণ্ট?

গিরীন বলে, কেড়ে তো নেবে না, টাকা দেবে যা-হোক কিছু।

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, সে টাকা তোমার নাতি পেলেও ভাগ্যি বলতে হবে।

চায়ের ঝামেলা আর নিজের দুর্ভাগ্যের

ওপর বিরক্ত হয়েই অবশ্য গিরীন বলে, জমি ক' বিঘে ঘুচে গেলেই বাঁচি। কিন্তু সত্যিই যদি তা হবে তা হলে ঐ ক' বস্তা ধান চুরি যাওয়ার জন্যে এমন মুষড়ে পড়বে কেন?

দোষ কারও নয়। পুজোর দিনে কেউ যে ধান চুরি করতে আসবে কেউ কি ভেবেছিল! তবু মোহনপুরের বউয়ের সব রাগটা গিয়ে পড়লো নিভাননীর ওপর, গিরিজাপ্রসাদের ওপর।

চুরির খবরটা মেয়েকে দিয়ে বলে পাঠিয়ে দিব্যি নিজে গিয়ে বসে বসে যাত্রা দেখলো! যেন ওরা এ-বাড়ির মানুষ নয়। দায়দায়িত্ব নেই কোন। আর সারা বছরে এই একটু আনন্দ, যাত্রা দেখার নাম করে গাঁয়ের সকলের সংগে একজোট হয়ে গল্প করা, সেটুকুও বুঝি কপালে নেই।

মোহনপুরের বউয়ের টিপ্পনী পরের দিন সকালে গিরিজাপ্রসাদের কানে এলো। শুনে একটু আঘাত পেলেন মনে মনে। মুখে কিছু বললেন না। কি আর বলবেন, গ্রামে ফিরে আসার পর থেকে শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

কিন্তু, কিন্তু প্রভাকরকে ছেড়ে চলে আসবেনই বা কি করে? ফিরে এলেও কি চুরি যাওয়া ধান ফিরে পেতেন?

নিজের মনকে বোঝাবার জন্যেই হয়তো গিরিজাপ্রসাদ তাই নিভাননীকে বললেন সে-কথা।

আর নিভাননী মনে মনে মোহনপুরের বউয়ের ওপর চটেই আছেন। বনপলাশিতে ফিরে আসার পর থেকেই যে ব্যবহার পেয়েছেন তাতে চটে থাকারই কথা। কিছুতেই যেন মন থেকে বিরুদ্ধ ভাবটা দূর করতে পারছেন না। তাই বলে উঠলেন, চুরি তো শুধু তোমার ধানই যায় নি বউ, ও ধান আমাদেরও!

সংসারের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোন খবরই রাখে না অমরেশ। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নিজের খেয়ালে। ক'টা দিন তো, তারপরই কলেজ খুলবে, কলকাতায় চলে যাবে। এ-সব সাংসারিক ঝগড়াঝাঁটি তার ভালও লাগে না।

মার কথা শুনে তাই সেও বলে উঠলো, ভারী তো দু' বস্তা ধান......

মোহনপুরের বউ নিভাননীর কথা শুনে যত না চটেছিল, অমরেশের কথা শুনে আরো চটে গেল। ভারী তো দু' বস্তা ধান?

নিভাননীর কথার জবাবে তাই ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, ধানে ভাগ আছে, সে-কথা তো জানেন, বলি কাজের ভাগটার কথা মনে থাকে না কেন?

(ক্রমশ)

মোগল আমলে সপ্তগ্রাম

সঞ্জীবকুমার বসু

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সপ্ত-গ্রামের সীমানা ছিল বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর চিরন্তন রীতি অনুসারে সকল দেশেরই যেমন সমাজজীবন পরিবর্তন হয় তেমনি করে সপ্তগ্রামেরও সমাজজীবন পরিবর্তন হয় প্রাকৃতিক অবস্থান ও গঠনের উপর। মোগল আমলের সপ্তগ্রামের যে সব চিত্র আজও অনেকের কাছে অজানা রয়ে গেছে তার কিছু কিছু তথ্য ও ঘটনা সম-সাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকদের এবং সেকালের ভারতীয় লেখকদের রচনা হতে জানা যায়। সপ্তগ্রাম বহু পুরোনো শহর। মোগল আমলে দেশ-বিদেশ থেকে এই শহরে দলে দলে বণিক ও নাবিক আসা যাওয়া করত। টলেমির (Ptolemy 150 A. D) গ্রন্থ হতে জানা যায়, তিনি প্রাচীন কালে সপ্তগ্রামকে 'ত্রিবেণু' বলে গেছেন এবং সে যুগে এটা একটি [illegible] শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি বারো লিখেছেন "বাণিজ্য-তরীর আসা ও যাওয়া সম্বন্ধে যদিও চট্টগ্রাম বণিকদের সুবিধা-জনক, তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব সুন্দর ও সপ্তগ্রাম একটি শ্রেষ্ঠ শহর।" সম্রাট আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমল্লের কথা হতে জানা যায় যে, আকবরের সময় সপ্ত-গ্রাম সরকার সাতগাঁও নামে পরিচিত ছিল এবং এর মধ্যে ছিল তিপ্পান্নটি পরগনা। এমন কি বর্তমান কলিকাতাও একদিন সপ্ত-গ্রাম সরকারের অধীন ছিল।

ইংরেজ বণিকেরাও এই সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ বঙ্গে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অতীতে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে বিভিন্ন বাণিজ্য-তরী সপ্তগ্রামের বন্দরে এসে কোলাহল সৃষ্টি করত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনী লিখে গেছেন যে, বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক জাহাজগুলি কেপপালিমারাস থেকে কলকার অপর দিকে টৌলিনগেল হয়ে ত্রিবেণীতে যেত এবং সেখান থেকে পরে জাহাজগুলি পাটনার বন্দরে ভিড়ত। ১৫৩৯ সালে সপ্তগ্রামের ব্যবসায়ীরা চরম উন্নতি লাভ করে। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক I-Tsing-এর গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা দেশ থেকে চীন পর্যন্ত নিয়মিত জাহাজ চলাচল করত এবং মালয় দ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন দ্বীপে বাংলা ও উড়িস্যার উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। জল-পথের মাধ্যমে এই সকল দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। তখনকার বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা জাহাজে করে বিভিন্ন দেশ থেকে সোনা, রূপো, তামা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করে সপ্তগ্রামের বাজারে বিক্রি করত এবং তখনকার দিনে এই করে বহু বাঙ্গালী বড়লোক হয়েছিল।

এ দেশের মানুষ যখন লোহার ব্যবহার জানত না তখনও বেতের নৌকা বা জাহাজ চড়ে বাঙ্গালীরা নানা দেশে যাতায়াত করত। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই সকল জাহাজের নাবিকগণ কম্পাসের ব্যবহার জানত। M. Prothero-র 'History of India' গ্রন্থে উল্লেখ আছে "The Hindus made use of a compass in the form of an ironfish floating in oil and magnetised so as point to the north." জাহাজের যোগাযোগ থাকার দরুন তখনকার বাঙ্গালীরা যবদ্বীপেও বসতি বিস্তার করেছিল। বিখ্যাত বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দর ও বেহুলার বিবরণে জানা যায় সপ্তগ্রামের কাছে বেহুলা নদী প্রবাহিত। মনসামঙ্গলে যে সব জাহাজের বিবরণ আছে তা থেকেই বোঝা যায় প্রাচীনকালে বাংলার বাণিজ্য ও সভ্যতা কত উন্নত ছিল। সদাগরদের সারিবদ্ধ জাহাজ যখন ভাগীরথীর কূল দিয়ে পাল তুলে সমুদ্রে পাড়ি দিত তখন সপ্তগ্রামের হাজার হাজার লোক ভাগীরথীর দু' কূলে দাঁড়িয়ে আনন্দে তাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাত। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন পর্তুগীজগণ সপ্তগ্রাম অঞ্চলে বাণিজ্য করতে আসে তখনও ভাগীরথীর তীরে পর্তুগীজ জাহাজ পাল তুলে অপেক্ষা করত। এই সপ্তগ্রামেই মোগলদের জাহাজ নির্মাণের ঘাঁটি ছিল। মোগলেরা বড় বড় জাহাজ তৈরি করে দেশ-বিদেশে পাড়ি দিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালপত্র চালান দিত। এ ছাড়া যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন রকমের যুদ্ধের জাহাজ তৈরি করত।

যে সময়ে সপ্তগ্রামে মোগলেরা রণপোত তৈরি নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় পর্তুগীজদেরও বাণিজ্যজাহাজ সরস্বতী নদী দিয়ে সপ্ত-গ্রাম পর্যন্ত যাতায়াত শুরু করে এবং 'বন্দর' নামে একটি স্থানে তাদের বাণিজ্য দপ্তর স্থাপন করে। কিন্তু ১৫৩০ সালের

মোগল আমলে সপ্তগ্রাম অঞ্চলে নির্মিত রণপোত
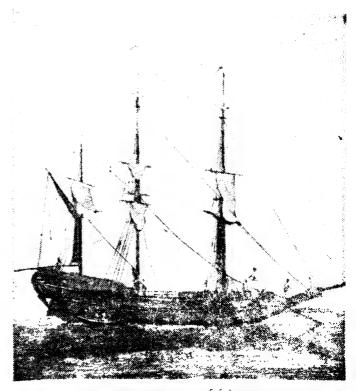
পর এই সব নদী বাণিজ্যের অযোগ্য হয়ে পড়ে, কাজেই পর্তুগীজরা হুগলীকে এবং ওলন্দাজরা চুঁচুড়াকে বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলে। সেই সময় থেকে যমুনার মুখে বিভিন্ন ব-দ্বীপগুলি এক হয়ে বড় বড় গ্রামগুলি শহরে পরিণত হয়। এই কারণের জন্য অচিরেই যমুনা জাহাজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

সপ্তগ্রাম এককালে হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল। শোনা যায়, রাজা শত্রুজিতের বংশের কোন রাজার রাজত্বকালে ১২৯৮ সালে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। তিনি ছিলেন তুরস্কের লোক। সপ্তগ্রাম জয় করে তিনি হিন্দুদের অনেক দেবমন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ তৈরি করেন। এই ভাবে সপ্তগ্রাম হতে হিন্দুদের প্রাচীন ঐতিহ্য বিলুপ্ত হতে থাকে। জাফর খাঁর অত্যাচারে দলে দলে হিন্দু সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে চলে আসে। ১২৯৮ সালে আরবী ভাষায় লেখা একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি কাফেরদের তরবারি ও বল্লমের দ্বারা বিতাড়িত করে সপ্তগ্রামে মসজিদ তৈরি করেন।

বাংলার শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজিত করার জন্য জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে এসেছিলেন। সপ্তগ্রাম জয় করার আগে তিনি ছিলেন দেওকোটের শাসনকর্তা। বাংলাদেশ যখন গায়সুদ্দীন বুলবনের পৌত্র রুকনুদ্দীন কৈকায়ম শাহ শাসন করছিলেন, সেই সময় জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। হিন্দুদের উপর বহু অন্যায় ও অত্যাচার করার পর অবশেষে তিনি ১৩১৩ সালে মারা যান। স্যার উইলিয়াম হান্টার বলেন যে, জাফর খাঁ হিন্দু রাজা ভূদিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

জাফর খাঁ নিহত হওয়ার পর তাঁর পুত্র বারখান গাজি হুগলীর হিন্দু রাজাকে জয় করে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন। ১৩২৩ সালে ইজুদ্দীন ইয়াহ খাঁ "আজম-উল-মুলুক" উপাধি ধারণ করে সপ্তগ্রাম শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে সৈয়দ ফকরউদ্দীনের সঙ্গে ইজুদ্দীনের যুদ্ধ হয় এবং তাঁকে পরাজিত করে সৈয়দ ফকরউদ্দীন সপ্তগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই নাকি সপ্তগ্রামে প্রথম টাকশাল স্থাপিত হয় এবং ১৫৫০ সাল পর্যন্ত শের শাহের পুত্র ইসলাম শা'র রাজত্বকালেও সপ্তগ্রামে টাকশাল ছিল।

আকবরের আমলে ১৫৯২ সালে আফগানরা এসে সপ্তগ্রাম লুঠ করে এবং সেই সময় সপ্তগ্রামের হিন্দুদের বহু প্রাচীন নিদর্শন নষ্ট হয়ে যায়। একদিকে আফগানদের অত্যাচার, আবার অপর দিকে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামের উপর হামলা শুরু করে। তখন সম্রাট শাজাহান পর্তুগীজদের দমনের জন্য বাংলার শাসক কাসিম খাঁকে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আদেশ দেন। তিন মাস যুদ্ধের পরে পর্তুগীজরা পরাজিত হয় এবং মোগল সৈন্যরা সপ্তগ্রামের শান্তি ফিরিয়ে আনে। সেই থেকেই হুগলী জেলায় মোগলদের কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়।

মোগলদের দাপটে তখনও ইংরেজরা বাংলা দেশে প্রবেশ করতে পারে নি। কয়েকজন ইংরেজ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ডাঃ বাউটন নামে জনৈক ইংরেজ শাজাহানের কাছ থেকে বাংলা দেশে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেন। এর মূল কারণ ছিল শাজাহানের কন্যা একবার গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয় এবং ডাঃ বাউটনের চেষ্টায় শাজাহানের কন্যা সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন শাজাহান ডাঃ বাউটনকে একটি পুরস্কার দিতে চান। সেই পুরস্কারস্বরূপ ডাঃ বাউটন শাজাহানের কাছ থেকে বাংলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং শাজাহান তাঁকে অনুমতি দেন। ১৬৫১ সালে ইংরেজরা হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে, সেই সময় ইংরেজ বণিক দলপতি জব চার্নকের সঙ্গে রাজকর্মচারীদের প্রবল বিরোধ দেখা দেয়, এমন কি বিরোধ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হয়। কিন্তু চতুর ইংরেজেরা বুঝতে পারল, রাজকর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধ করে হুগলীতে বসবাস করা যাবে না; তাই ইংরেজরা আওরঙ্গজেবকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে সুতানটিতে কুঠি স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে সুতানটি ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই সময় সপ্তগ্রাম ও আশেপাশের লোকেরা বিশেষ করে ধনী, বিদ্বান ও সমর্থ ব্যক্তিরা নিজের বাসভূমি ত্যাগ করে সুতানটিতে বসবাস আরম্ভ করে। এইভাবে সপ্তগ্রাম ক্রমে ক্রমে জনশূন্য ও সম্পদশূন্য হয়ে পড়ে।

আজকের যে সপ্তগ্রামের দুর্দশা আমরা দেখতে পাই, তার কারণ মোগল আমলে সপ্তগ্রামের উপর প্রতিবেশী শাসকেরা বারবার হামলা করেছে। মুসলমানদের অত্যাচার, পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব এবং শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহকালীন অত্যাচার, এমন কি বর্গীদের হাঙ্গামা প্রভৃতি ঘটনাগুলি সপ্তগ্রামকে জরাজীর্ণ করে ফেলেছে। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত ও বঞ্চিত মানুষগুলির জীবনে ইতিহাস যে নির্মম আঘাত হেনেছিল, আজকের অবহেলিত সপ্তগ্রাম তারই জন্য দায়ী। আজ সপ্তগ্রামের জলে, জঙ্গলে ও ভাঙ্গা প্রাচীরের গায়ে ইতিহাসের সেই ঘটনাগুলিকে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে। একদা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর আজ বহুভাগে বিভক্ত। বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সপ্তগ্রাম নূতন রূপ নিয়েছে। সেখানে আজ গেলে মনে হয় তার আকাশ বাতাস যেন নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

সজনীকান্ত দাস

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বিকেলে পরলোকগমন করেছেন। এই দুঃসংবাদ খুবই অপ্রত্যাশিত, মাত্র পক্ষকাল পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তখন কে বা বুঝেছিল এই বিতর্কিত পুরুষটি, যিনি দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে বহু ঝড়ের উদয়ের কারণ, এত দ্রুত এত আচমকা মরলোক থেকে প্রয়াণ করবেন; ঝড়ের সকল ইঙ্গিত থেমে যাবে সহসা।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন একথা অত্যুক্তি নয়। একদা এই পত্রিকার প্রতিপত্তি পাঠকবর্গ স্বীকার করেছিলেন। 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে সজনীকান্ত নিজেই লিখেছেন : "যৌবনের উত্তেজনা বড় ভয়ংকর, শক্তির উন্মাদনাও কম ভয়ঙ্কর নয়। আমরা একে একে প্রবল বাংলা সংবাদপত্রকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলাম। এই কালের 'শনিবারের চিঠি' যাঁহারা দেখিবার সুযোগ পাইবেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন, কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণই না আমরা মাত্র তিন-চারজনে ঘটাইয়াছিলাম।...চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল।" বস্তুত যৌবনের উন্মাদনায় শনিবারের চিঠি অনেক বিস্ফোরণই ঘটিয়েছিল সে কালে।

সজনীকান্তের সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভ অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই। কিশোরকালে লিখেছিলেন জাতীয়তামূলক বিপ্লবাত্মক কবিতা। যৌবনে কাব্য, গদ্য কবিতা ও বিভিন্ন প্রকারের গদ্য রচনা। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের হাতে খড়ি, পরে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যোগদান। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তিনি বহুকাল লিখেছিলেন। অবশেষে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকরূপে তাঁর আবির্ভাব। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন।

সজনীকান্ত কেবলমাত্র সম্পাদক নন; তিনি কবি, সমালোচক, সঙ্গীত রচয়িতা, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের গবেষক। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সজনীকান্তের যোগাযোগ ছিল দীর্ঘকালের, তিনি বহুদিন এই পরিষদের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরী ও আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের বেশীর ভাগের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর কাছে [illegible] পাল্লা ছিল সমান ভারী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল,

বিদুর

প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর, বনফুল ও অন্যান্য বহু ক্ষমতাবান সাহিত্যিক ছিলেন সজনীকান্তের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও বন্ধু। এই যোগাযোগের দ্বারা শনিবারের চিঠি বহুকাল লালিত হয়েছিল।

সজনীকান্তের কর্মময় জীবনের অবসানে আমরা মর্মবেদনা অনুভব করছি। তাঁর জীবন, কবির নিজ কবিতা থেকেই বলি :

"আমার জীবন শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।"

সজনীকান্তের রচিত কয়েকটি গ্রন্থ :

অজয়, পথ চলতে ঘাসের ফুল, বঙ্গরণভূমে, মনোদর্পণ, মধু ও হুল, অঙ্গুষ্ঠ, রাজহংস, কেডস্ ও স্যান্ডাল, উইলিয়ম কেরী, পঁচিশে বৈশাখ, মানস সরোবর, বাঙলার কবিগান, মধুপ্রস্তুত (?), রাজমোহনের স্ত্রী, আকাশ বাসর, পথের সন্ধান, আত্মস্মৃতি প্রভৃতি।

উগো পিরো

নামটি ছোট, উগো পিরো; ইটালির লেখক। সাহিত্যিক কুলপঞ্জীতে এযাবৎ স্থান হয় নি। অনুমান করি, যুদ্ধোত্তর কালে এঁর আবির্ভাব; এখনও খ্যাতির চরমে সমাসীন নন।

পিরোর একটি উপন্যাসের ইংরেজী তর্জমা 'দি ক্যাম্প ফলোয়ার্স' হাতে এসেছিল, সম্প্রতি পড়লাম। বাঙালী পাঠক মহলে ইটালির মোরাভিয়া জনপ্রিয়; প্রাটোলিনিও কিছু লোক নিশ্চয় পড়েছেন। পিরো এঁদের কনিষ্ঠ। এই তিনের তুলনা আমার কাম্য নয়। প্রয়োজন বোধে একটি মাত্র কথা উল্লেখ করব, পিরো-কে বহুলাংশে প্রাটোলিনির সমগোত্রীয় বলে মনে হবে। ইটালিয় সাহিত্যে নিও-রিয়ালিজমের যে আন্দোলন, প্রাটোলিনি যার অন্যতম পুরোধা, উগো পিরোকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে আমার আপত্তি খুঁজে পাচ্ছি না। মোরাভিয়ার রচনার রীতিবিলাস পাঠককে ক্লান্ত করে, প্রাটোলিনির লেখায় বিষয়টি কেবলমাত্র ত্বকের উপরিভাগ উষ্ণ করে না, প্রায়শই অংশগ্রহণকারী হয়ে হৃদয়কে বেদনাসিক্ত করে। উগো পিরোর লেখায় এই গুণ না থাকলে 'দি ক্যাম্প ফলোয়ার্স' অপাঠ্য হত।

গত মহাযুদ্ধের শেষভাগটি আর বিষাক্ত আবহাওয়া 'দি ক্যাম্প ফলোয়ার্স'-এর পটভূমিকা। মুসোলিনির প্রভা তখন অস্তাচলগামী। কালো কোর্তাদের প্রতাপ যদিও তবু ফ্যাসিস্ট রক্ত শীতল হয়ে আসছে। জার্মানির সহায়তায় ইটালির সমর বাহিনী গ্রীস দখল করে বসে আছে, পরাভূত দেশের মাটিতে একদিকে দখলদার সৈন্য, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। এরই মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক দুর্বল পার্টিজানরা লুকিয়ে চুরিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

উগো পিরোর লেখা কাহিনী; নায়ক এক তরুণ ইটালিয়ান সৈনিক, বয়স বুঝি বছর বাইশ। গ্রীসের এক প্রান্তে ভোলস শহর এই শহরে দখলদার ইটালি ফৌজের ঘাঁটি পড়েছে। নায়ক সেখানে সৈন্য-ব্যারাকে অধিবাসী। এই সৈন্যদের দুটি বস্তু কাম্য সারাদিন সামরিক আদবকায়দায় ব্যস্ত থাকা আর অপরাহ্নে কয়েক গ্রাস খাদ্য মুখে দি তাঁবুতে এসে পড়ে থাকা, আর অপেক্ষা ক কখন সেই কম্প আসবে। রাত্রের অন্ধকার সাথে সাথে সে আসে—ম্যালেরিয়া জ্বর জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য সব, কুইনাইন বড়ি গিলে এ-জ্বর ভোরের আলোয় দূর দিতে হয় কোনো রকমে। নতুন সকাল, কি সেই পুরোনো বিস্বাদ জীবন। এই জীব একটি মাত্র বৈচিত্র্য সামরিক পতিতাল গমন, যদি না জ্বর আসে সাত বিকেলে তবেই। ভোলস-এর পতিতালয় মাত্র দ সামরিক পতিতালয় অবশ্য। একটি কুল পদদের জন্যে বরাদ্দ, অন্যটি সাধারণ সৈ দের। অনেক নারীদেহ হয়তো য নারীদের থেকেই বিপজ্জনক। কিন্তু চেয়ে বড় ভয়, বেনারী ভাণ্ডারী

পরীক্ষিত নয় তার সঙ্গদোষে যদি নিষিদ্ধ ব্যাধি জুটে যায় তবে ছুটির দরখাস্ত ক্রমশই কাগজ চাপা পড়ে পড়ে নীচুর দিকে নেমে যাবে; মুসোলিনী তোমায় সংক্রামক রোগ নিয়ে স্বদেশ ফিরতে দেবে না। গৃহপ্রাণ নির্বাসিত সৈন্যদের কাছে এর চেয়ে নির্মম শাস্তি কল্পনাতীত। তারা তাই নির্দিষ্ট একটি ঘরের কয়েকটি নির্দিষ্ট নারীর ক্লান্তিকর সাহচর্য স্বস্তবং গ্রহণ করে পড়ে আছে।

এই একঘেয়েমি, বিশ্রী জীবন যাপন সকলেই বীতরাগ; নায়কও। কিন্তু খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে নায়কের একটা সুযোগ জুটে গেল, কর্তার আদেশ—তাকে একটা কাজে এথেন্স যেতে হবে। বাঁধা গণ্ডী ছেড়ে কোথাও একটু যেতে পাওয়ায় সৌভাগ্য। এথেন্স যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া কি কিছু কম। কিন্তু কেন যেতে হবে, কি কাজে, নায়ক জানে না; সামরিক শাস্ত্র সাধারণ সৈনিককে হুকুম দেয়, কারণ দর্শায় না। মস্ত এক খোলা ট্রাক আর ড্রাইভার নিয়ে নায়ক চলল এথেন্সে, পথ কিছু দীর্ঘ।

এথেন্সের তখন বর্ণনাতীত অবস্থা। এক টুকরো রুটির জন্যে দলে দলে ছেলেরা ছুটে আসে, মেয়েরা বেশ্যা হয়ে ঘিরে ধরে। দুর্ভিক্ষের পাশবিক গ্রাসে, যুদ্ধের নৃশংস ইন্ধনে মানুষ নীতি ন্যায়ের কথা ভুলে গেছে। এক দিকে এই মন্বন্তর, অন্যদিকে 'ব্ল্যাক টাইফাস'-এর আতঙ্ক। নায়ক এথেন্সে এসে তার সদরদপ্তর থেকে জানতে পারল তাকে পনেরো জন যাত্রী নিয়ে এথেন্স থেকে নিজের তাঁবুতে ফিরতে হবে। নায়ক ভেবেছিল, এই পনেরোজন বোধ হয় পনেরোটি সৈনিক, বন্দীশালা থেকে সদ্য বের করে দেওয়া হবে।

অচিরে এই ভ্রম তার ভাঙল। পনেরোজন সৈনিক নয়, পনেরোটি গ্রীক যুবতী তার সঙ্গী হবে। এদের বয়স অল্প, দু একজন বাদে বিশের ঘর কেউ পেরোয় নি। এরাই সামরিক পতিতালয়ের জন্য সদ্য সংগৃহীত। মাত্র তিন পাউণ্ড গো-মাংসের বিনিময়ে এরা ইটালির সামরিক পতিতালয়ের খাতায় নাম লিখিয়েছে। বাড়িতে যারা এক টুকরো রুটি জুটোতে না পেরে দিনের পর দিন উপবাসে কাটাত তারা আজ নতুন বৃত্তি নিয়ে ক্ষুধার সমস্যা থেকে মুক্ত।

পনেরোটি পতিতাকে সংগ্রহ করে ট্রাকে চাপিয়ে আবার ভোলাস-এর পথে ফিরে চলল নায়ক। পথ দীর্ঘ, ঝামেলাও প্রচুর। পথের মাঝে মাঝে ইটালি ফৌজের ছোট ঘাঁটি, ঘাঁটিতে একটি দুটি করে পতিতা নামিয়ে দিয়ে আসতে হয়, যে-ঘাঁটির যা প্রয়োজন, যেখানের যা সরকারী প্রাপ্ত-যোগ।

এই যাত্রা নির্বিঘ্নের প্রমোদ-ভ্রমণ নয়। এক ট্রাক ভেড়া বোঝাই করে কষাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়ত সহজ, কিন্তু পনেরোটি গ্রীক যুবতীকে ইটালি ফৌজের সামরিক পতিতালয়ে নিয়ে যাওয়া আর ট্রাক বোঝাই করে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় একই রকম। সমান বিপজ্জনক। বাধা বিঘ্ন, পার্টিজানদের আক্রমণ, দুর্ঘটনা, মৃত্যু—একটির পর একটি অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে নায়ককে অবশিষ্ট মেয়েদের নিয়ে ফিরতে হল ভোলাস-য়ে। কিন্তু কর্তা খুশী হলেন না, এ কেমন দায়িত্বহীন সৈনিক, যে, বাদ বিচার করে সর্বোত্তম যুবতীদের আনতে পারে নি নিজেদের রেজিমেন্টের জন্যে, বিশেষ করে তার কর্নেলের জন্যে, যার অক্ষমতার জন্যে পতিতাদের কেউ মারা গেল, কেউ পালিয়ে গেল পথ থেকে। এত বড় অপদার্থের জন্যে সামরিক শাস্ত্রে শাস্তির বিধান অবশ্যই ছিল। সাত দিনের সামরিক হাজত ত নিশ্চয়ই।

উগো পিরো, আমার ধারণা, তাঁর বিষয়-বস্তুকে নিরাসক্ত ভাবে দেখার চেষ্টা করেন নি, সম্ভবত তা সম্ভব ছিল না। উত্তম পুরুষে লিখিত বলেই নয়, বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর চেতনা ও অভিজ্ঞতা মিশ্রিত হয়ে যে সম্ভার গড়ে তুলেছে তার পরিণাম ভাল বই মন্দ হয় নি। গ্রীসের যে হতশ্রী রূপ, যুদ্ধোত্তর বিকার, নীতিহীনতা স্বল্প কথায়, প্রায় রূঢ় নির্মম ভাবে তিনি ফুটিয়েছেন তার প্রশংসা করতে বড় বাধে না, এবং কখনো মনে হয় না গ্রীসের শত্রু এখানে এই সৈনিক বিশেষ পটু। যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত অবসরে গ্রীক পতিতাদের সঙ্গে নায়কের এমন একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে যার মধ্যে সহানুভূতি, ভালবাসা, ঘৃণা, বিরক্তি, স্বার্থবোধ ও স্বার্থত্যাগ বিচিত্র ভাবে মিশে আছে। যে-মেয়েটির নিদারুণ কাঠিন্যে, অহংকারে, দৃঢ়তায় তরুণ সৈনিক আহত হয়েছে ও আকর্ষণ বোধ করেছে—যার প্রতি অশ্চর্য প্রেম অনুভব করেছে সেই Eftichia-কে মনে রাখা কষ্টকর নয়। Eftichia শব্দের অর্থ সুখ। পদ্মপাত্রে জলবিন্দুর মতন এই সুখ নায়কের জীবনে একটি মাত্র রাত্রের মতন এসেছে, পরদিন হারিয়ে গেছে। বহু চরিত্রের মধ্যে এক মেজর, অন্য এক সহযাত্রী গ্রীক যুবতী, এক ধর্মযাজক—এদের কথা মনে থাকে।

যে সরল মানবিক বোধে মানুষ সহৃদয় সহানুভূতিশীল হয়, নীতি বোধে পীড়িত হয়, উগো পিরোর নায়ক সেই বোধে পীড়িত ও ব্যথিত হয়েছে। আর এই অসহায়ত্বের বোধই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটিকে বাঁচিয়েছে যে:

Something collapsed around us.. without our being to blame or able to prevent it, without it even being right for us to try to prevent it..

সাহিত্য ও সমালোচনা

The Modern Writer and His World—G. S. Fraser. Rupa & Co., 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. Price : Rs. 8.00.

Key To Modern Poetry—Lawrence Durrell. Rupa & Co. 15, Bankim Chatterjee Street. Price : Rs. 5.

আধুনিক সাহিত্যের সম্পর্কে প্রচলিত অভিযোগ এই যে, তা হলো বিশেষজ্ঞের সাহিত্য। হঠাৎ জানান্ না দিয়ে সেই সাহিত্যের যে-কোন মহলে ঢুকে পড়ার উপায় নেই। এর উত্তরে আধুনিক সাহিত্য-সাধকের একটি যুক্তি আছে। বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, নৃতত্ত্ব তথা যাবতীয় গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় অনুধাবনের জন্য যদি বিশেষিত কৌতূহল অথবা অভিনিবেশ দরকার হয়, তবে সাহিত্যের জন্যই বা কেন সেই প্রয়োজন স্বীকৃত হবে না? বিংশ শতাব্দীর মানুষের জটিল মানস-রসায়ন এবং স্নায়ুপ্রেত মননকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে আর কোনো শিল্পকর্ম অথবা সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগ ঐ জটিল মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য, কিন্তু পাঠক সেই যোগসূত্র সম্পর্কে কখনো কখনো অবিশ্বাসী, এমন কি, সন্দিগ্ধ। লেখক চান, পক্ষান্তরে পাঠকের কাছে গভীরতর একটি সহানুধ্যান, আর কিছু নয়।

এই প্রসঙ্গে মূল্যবান দুটি স্মরণযোগ্য সমালোচনাগ্রন্থ হাতে এল। আধুনিক লেখকের বহুলক্ষ্যবিশিষ্ট মানস-সদনের স্বরূপ নির্ণয়ে রত দুইজন অগ্রণী সমালোচক, ফ্রেজার ও ডারেল, পাঠকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সাহায্যে উদ্যত হয়েছেন। এঁদের উভয়েরই সাদৃশ্য-সূত্র আধুনিকতার সংজ্ঞা ও চরিত্র নির্ধারণে। প্রথানুগত সাহিত্য-বিতানের মসৃণ স্বভাব থেকে আধুনিকতা কোথায় স্বতন্ত্র এবং অগ্রসর—দুজন লেখকই এ বিষয়ে প্রচুর আলোকসম্পাত করেছেন। এঁদের কৃতিত্ব নিছক আত্মপক্ষসমর্থনে নয়, সপ্রমাণ ভূমিকাগ্রহণে।

ফ্রেজার আধুনিকতার সমস্যাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছেন : কবিতা, নাটক, সমালোচনা, উপন্যাস প্রায় সমস্ত কিছুই তাঁর আলোচ্য। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত ঐতিহাসিক। ইতিহাস বলতে ফ্রেজার বোঝেন মননের ইতিহাস। বস্তুভূমিকে তিনি অস্বীকার করেননি, সতর্কভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এবং তাঁর অপর সার্থকতা, সাহিত্যে প্রকরণের মর্যাদা তিনি সসম্মানে স্বীকার করেছেন, আলোচনা করেছেন। এমনকি, প্রকরণকেও তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করেন না—তাকেও তিনি নানাবিধ আপেক্ষিক যোগাযোগের আলোয় নিরীক্ষণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরও প্রত্যাবর্তন 'আইডিয়া'র কাছে, কিন্তু সে-আইডিয়া কোথাও অমূর্ত নয়, ব্যক্তিঘনিষ্ঠ। লরেন্স ডারেল অবশ্য আইডিয়ার প্রতিই অধিক আসক্ত। জেমস্ জিনসের Physics and Philosophy থেকে আলেকজান্ডারের Space, Time and Deity পর্যন্ত তাঁর অবাধ ভাব-বিহার। বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি সহজ স্বস্তি পান, ফলে পাঠক তাঁর কাছে শ্রদ্ধা লাভ করেন এবং সেই সব চিন্তার দ্বারা উদ্বোধিত হন। ডারেলের বক্তব্য অবশ্য ফ্রেজারের মত সর্বগম্য নয়, কিন্তু ডারেলের ভাষায় যে দার্শনিক আত্মস্থতা আছে সেটি বিবেকবান পাঠকের কাছে পরম মহার্ঘ। ১৮৯০ থেকে তিরিশের যুগ পর্যন্তই তাঁর মূল পরিধি প্রসারিত। কিন্তু তারপরেও যে আধুনিকতা বিচিত্র হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলতে পারেন। সাঙ্কেতিক কবিদের জন্যও তাঁর মন তেমন অভিভূত নয়। এ বিষয়ে পিটার কেনেল অথবা এডমান্ড উইলসন আরো সংবেদনশীল হয়তো।

রূপা প্রকাশনীকে ধন্যবাদ, গ্রন্থ দুটিকে সহজলভ্য এবং সুদৃশ্য করে প্রকাশ করেছেন বলে। এঁরা আমাদের জন্য একটি দায়িত্ব পালন করেছেন।

(৪০৮।৬১ ও ৪০৯।৬১)

গল্প

পেয়ারার স্বর্গ—শিবরাম চক্রবর্তী। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা, ৭। দাম—২·৩০ নঃ পঃ।

আলোচ্য গ্রন্থটি এগারোটি হাসির গল্পের সংকলন।

শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প বলতে যা বোঝায়—'পান্', হাস্য উদ্রেককারী সংলাপ এবং সর্বোপরি একটি কৌতুকময় কাহিনী—এর সবগুলিই লেখকের অন্যান্য গল্পের মত এই সংকলনের গল্পগুলিতেও উপস্থিত। তবু, এই সংকলনের অধিকাংশ গল্পই লেখকের হাসির গল্প লেখার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়। শুধু গুটি-তিনেক গল্প—'ঋণং কৃত্বা', 'নিকুঞ্জ কাকুর গল্প' এবং 'গিনিপিগ আর গিনিপিগ'—এর প্রমাণ। এই তিনটির মধ্যে শেষোক্ত গল্পটি একটি বিদেশী গল্পের অনুসরণ।

এই গল্প-সংকলনটি, আশা করা যায়, সাধারণ পাঠকদের কাছে, বিশেষত ছোটদের কাছে, সমাদর লাভ করবে। হাসির গল্পের ক্ষেত্রে শিবরাম চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে এখনও অনন্য।

(১৬/১৬)

বিচার কাহিনী

বিখ্যাত বিচারকাহিনী—বিশু মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

আটটি চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে এই বই রচিত হয়েছে। আমাদের চারিদিকের বাস্তব জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে, উপন্যাসের ঘটনা থেকে সেসব যে কত বিচিত্র—এই গ্রন্থে তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইজন্যে এইসব বিচারকাহিনী পাঠ করতে বসলে এর বৈচিত্র্যের আকর্ষণে একটানা প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতায় এসে পৌঁছতে হয়। এবং সেই সঙ্গে বোঝা যায় যে, মানুষ কত বিচিত্র জীব। এ বইতে কাহিনীর সংখ্যা আট, কিন্তু এরই মধ্যে দেখা মেলে অষ্টোত্তর শত প্রকারের মানুষে। প্রেম, প্রণয় বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধচেতা নারী যে কি জঘন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে "রত্নেনাষ্ট জৈনের ফাঁসি" কাহিনীতে; "রাজার কামলীলা" কাহিনীতে নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে রাজারাজড়ার অত্যাচারের অনেক বিবরণ আছে। তেমনি আছে অন্যান্য কাহিনীতেও অনেক আশ্চর্য বিবরণ। "ক্লার্ক ফুলাম হত্যারহস্য", "বাওলা হত্যাকাণ্ড", "সামসেনবাষ্ট হত্যা", "প্লেগ-জীবাণুঘটিত হত্যাকাণ্ড", "পাগলা খুনের মামলা", "সতীদাহ রহস্য" ইত্যাদিতে যেসব মানুষকে আমরা পাই তারা যে সত্যিই আমাদেরই মত রক্ত-মাংসেগড়া মানুষ—এ কথা বিশ্বাস করতে যেন কষ্ট হয়।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় এইসব বাস্তব কাহিনী এমন দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন যে, এতে কাহিনীগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে বইটির আদর হবে।

উপন্যাস

যে তাপে রঙ বদলায়—যজ্ঞেশ্বর রায়। এভারেস্ট বুক হাউস। কলিকাতা-১২। মূল্য—২৲।

এ উপন্যাসের নায়ক এক যুবক, কর্তব্য আর শারীরিক ক্ষুধার পারস্পরিক দ্বন্দ্বে যে বিধ্বস্ত এবং নায়িকা এক বিবাহিত যুবতী—বেঁচে থাকার মৌল প্রয়োজনের কাছে সে সর্বদা ত্রস্ত এবং দীন। আধুনিক জীবনের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এই দুই নাগরিক চরিত্রের পরিণতি ঘটেছে এক শান্ত, নির্মল ও শুভ মানসিক উত্তরণে। বুঝি ভালবাসার এক ভিন্নতর উপলব্ধির জন্যই তাদের এই নিয়মিত চেতনার সংশয়ব্যাকুল পদচারণা।

উপন্যাস রচনায় লেখক চিরাচরিত ধারা বর্জন করে নতুনতর এক আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। দুটি চরিত্রের জটিল মনোবিশ্লেষণে লেখকের দক্ষতা স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য লেখকের শিল্পসাধনার পরিচায়ক। এই উপন্যাসপাঠে লেখকের পরবর্তী রচনার জন্য পাঠক স্বভাবতই উৎসাহিত হবেন। ৬৫৪।৬১

এইসব আলো প্রেম ঃ অসিত গুপ্ত। পরিবেশক এম· সি· সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

সম্ভবত এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস। পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ—এই তিনটি পর্বে উপন্যাসটি বিভক্ত। প্রধান চরিত্র আমি এবং তাকেই কেন্দ্র করে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল। এই প্রধান চরিত্রটি অস্তিত্বের দ্বন্দ্বে পীড়িত এবং বিষাদাচ্ছন্ন। জীবনের প্রতি তার দৃষ্টি জিজ্ঞাসুর, অস্তিত্বের গভীর থেকে সে আহরণ করেছে জীবনের সত্য। সুখের অবকাশটুকু ক্ষণস্থায়ী হয়েছে তার জীবনে, একে একে চলে গেছেন তার মা-বাবা, ললিতা বউ, মীনাক্ষী। এক-একটি মধুর ভ্রান্তির মত তারা চলে গেছে। জীবনের এ-হেন পরমলগ্নে এসেছে সরস্বতী। এই প্রথম রচনায়ই লেখক সৃষ্টি করেছেন কয়েকটি বিচিত্র চরিত্রকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। উপন্যাস রচনার পুরাতন ধারাটি বর্জন করে নতুনতর এক আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন লেখক। প্রধান চরিত্রটির জটিল মনোবিশ্লেষণে লেখকের দক্ষতা স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। ভাষা ব্যবহার নিপুণ এবং বিশেষ কাব্যময়তাও লক্ষণীয়। ও সি গাঙ্গুলী অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ৬৯৮।৬১

চৌধুরী বাড়ি—বিশ্বনাথ রায়। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

এ উপন্যাস পাঠে যে কোন সচেতন পাঠক মাত্রেরই এ কথা ভাবা স্বাভাবিক যে, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের যে ঐতিহ্য রচিত হয়েছে তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণের রচনায় এবং পরবর্তী কথাকারদের সৃষ্টিতে যার পরিপূর্ণ রূপ সূচিত হয়েছে সেই ভাষায় কী করে এ জাতীয় একটি উপন্যাস নামধেয় বস্তুর প্রকাশ ঘটল। সম্ভবত লেখকের বাসনা ছিল একটি চিত্রকাহিনী রচনার এবং সে ভূমিকায়ও তিনি সাফল্য লাভ করেননি। লেখকের কাছে একটি বিনীত নিবেদন যে, অতঃপর পরবর্তী রচনার পূর্বে তিনি যেন বাংলার উপন্যাসের ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী ঔপন্যাসিকদের রচনা পাঠ করে নেন।

৬৬৮।৬১

ভ্রমণ

উত্তরা খণ্ডের পথে (১ম খণ্ড)—উত্তর-পথিক। বাসন্তী প্রকাশনী; ১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা আশ্রম, কলিকাতা-৯। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা।

ভ্রমণের উদ্দেশ্য সকলেরই এক জাতীয় নয়। কেউ দেখেন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে ইতিহাসের মহিমা অথবা বর্তমান জনপদ। 'উত্তরা খণ্ডের পথে'র লেখক ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাত্রা করেছেন উত্তরাঞ্চলে। তাই তাঁর গ্রন্থে স্থানাধিকার করেছে যমুনোত্রী, বারণাবত, গোমুখ প্রভৃতি। প্রকৃতিকে দেখাই তাঁর মূলোদ্দেশ্য নয়, প্রকৃতির মাঝখানে পরম পুরুষ দর্শন করাই তার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা-আকুতি। চরম দুঃখের অভিসারের মধ্য দিয়ে পরমাত্মাকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর অভিযানে কায়ক্লেশের কথা যেমন আছে, তেমনি প্রকৃতির মাঝখানে সৌন্দর্যোপভোগের কথা বাদ যায় নি। আবার অজস্র শ্লোকের সহজ ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি তাঁর তত্ত্বকে ব্যাখ্যাও করেছেন। অব্যক্ত জীবন এবং ব্যক্ত জীবনের গভীর জিজ্ঞাসার রূপ-রেখায় একটি টানে তিনি গ্রন্থ শেষ করেছেন। লেখকের পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য, কিন্তু তা অনর্থক ভারাক্রান্ত নয়।

৫৯২।৬১

বিবিধ

দেশ-বিদেশের বনৌষধি (১ম খণ্ড)—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, ডি-এস-সি (আয়ুর্বেদ) আরোগ্য নিকেতন; ৭১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ঃ ৩·৫০ নয়া পয়সা।

গ্রন্থটির বাংলা নাম শুনে অনেকে হয়তো যথাযথ মূল্য দিতে দ্বিধা বোধ করবেন। কিন্তু একেই যদি Hand book of Materia in Bengali বলা যায়—তাহলে ইংরেজি নামের গুণে এর মূল্য কেউ কেউ কিছুটা উপলব্ধি করবেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সেনের এটিই প্রথম গ্রন্থ নয়, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'রসসার তন্ত্র' গুণীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। ডঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সেনের উক্ত গ্রন্থকে পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন, যা অবশ্য তিনি নিজেই সচেষ্ট হয়ে করতে পারেন। আলোচ্য গ্রন্থে বসাক, শতমূল্যো, নিসিন্দা, আতাইচ, গুগগুলে প্রভৃতি তেত্রিশ রকম গাছ-গাছড়ার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে প্রতিটি গাছের রাসায়নিক উপাদান, প্রয়োগবিধি, গুণ ও ক্রিয়া, ঔষধার্থ ব্যবহার প্রভৃতি বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট ও সহজ করে তোলা হয়েছে। 'দেশ-বিদেশের বনৌষধি' গ্রন্থটি সকলেরই পরম উপকারে লাগবে, তা বলাই বাহুল্য। নিত্য প্রয়োজনীয়

গ্রন্থের তালিকায় এই গ্রন্থের নাম সর্বাগ্রে থাকা উচিত—বিশেষত জাতির স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এ কথা না বলে উপায় নেই। যে-কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি-ও শুধু প্রয়োগবিধি শুনেও নিজেই ঔষধাদি তৈরী ও ব্যবহার করতে পারবেন। ৭০১।৬১

মুক্তিপথে শিক্ষা-সংস্কার—মাস্টারমশাই প্রকাশক : শ্রীবিদ্যুৎকুমার রায়চৌধুরী; ৬৯।১, ডাক্তার লেন, কলিকাতা-১৪। দাম : এক টাকা চারি আনা।

যথার্থ শিক্ষা-সংস্কারের জন্য কোন পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং বাঙালীর প্রকৃত মুক্তির পথ কি—এই বক্তব্যটিকে উপস্থাপিত করে লেখক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সমাধানের পথটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান শাসক-গোষ্ঠী ও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ বাঙালীর জীবনকে মুক্তি না দিয়ে ভারগ্রস্ত করে রেখেছে—বিভিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে তা প্রমাণ করে—সেই সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তির উপায় কি—সে সম্বন্ধে লেখক নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন। লেখকের চিন্তার সততা ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি যতোখানি প্রবল, ভাষা ততোখানি সবল হলে খুশি হওয়ার কারণ হোত। ২৮।৬১

সমুদ্র কাহিনী

নীল সমুদ্রের পাণ্ডুলিপি—ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য। পুরোগামী প্রকাশন। ১১৪, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : টাঃ ৪·২৫ নঃ পঃ।

বাংলা সাহিত্যে সমুদ্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু সমুদ্র-জীবনের তেমন আলোড়ন কচিৎ অনুভব করা যায়। হয়তো এর মূলে কারণ দূরে থেকে আমরা সমুদ্র দেখে মুগ্ধ, বিস্মিত ও সম্মোহিত হয়েছি। সমুদ্রে যাদের ঘর তাদের বিক্ষিপ্তভাবে দেখেছি। উপর্যুক্ত গ্রন্থের লেখক সেই দেখাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাহিনীর অভিনব পরিবেশে রঞ্জন বাচস্পতি, লেফটেন্যান্ট 'স', ওয়াকী, ইব্রাহিম, জোসেফ, যোগিন্দর যশবন্ত, মিডলটন, প্রেসটন, সুরেশ এক নতুন জীবন নিয়ে এসেছে। সম্মিলিত জীবনের এক কোটিতে আছে উদ্বেল, অন্য কোটিতে প্রশান্তি। তথাপি ত্রুটিও আছে: গভীর সমুদ্রে জীবনের গাম্ভীর্য ততোখানি বাঞ্ছিত হয়ে ওঠেনি। ৬৩৭।৬১

কবিতা

শবযাত্রা—শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-২৬। দু'টাকা।

পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত পবিত্র মুখোপাধ্যা কবিতা চোখে পড়ে। 'শবযাত্রা' একটি সুদীর্ঘ কবিতা, পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। যন্ত্রণা, হতাশা, স্মৃতি ও মৃত্যু-এর বিষয়-বস্তু। প্রয়াস হিসাবে প্রশংসা করতে হয়। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু-কিছু উপমা ও পংক্তি প্রশংসনীয় হলেও, গভীরতার অভাব চোখে পড়ে। প্রতিশ্রুতিবান এই কবি ভবিষ্যতে সফল হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ১১।৬২

অনুবাদ

একটি প্রেমের কাহিনী— গুড়িপাটি ভেংকটচলম। অনুবাদক : বোম্মানা বিশ্বনাথম। মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম—দু' টাকা।

অনূদিত উপন্যাসটির তেলুগু নাম ময়দানম, লেখক গুড়িপাটি ভেংকটচলম। এই উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তেলুগু সাহিত্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। লেখককে একাধারে সাধুবাদ ও নিন্দাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ-হেন একটি আলোড়নকারী উপন্যাসের অনুবাদ করে বোম্মানা বিশ্বনাথম আমাদের প্রশংসার পাত্র হলেন। বিবাহিত এক নারীর অবৈধ প্রণয় নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনী। কাহিনীর নায়িকার মানসে বেঁচে থাকার মৌল প্রয়োজনের কাছে সতীত্বকেও অবান্তর মনে হয়েছে, তাই সে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছেড়েছে, এবং এক ভয়ংকর সমাপ্তির মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে তার জীবনের পরিণাম।

অনুবাদকের ভাষা ঝরঝরে ও সাবলীল। কাহিনীর স্বচ্ছন্দগতি কোথায় ব্যাহত হয়নি। ৬১৭।৬১

প্রাপ্তি স্বীকার

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়—নীলরতন ধর।

লিপিবিবেক—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য।

রাইট ব্রাদার্স—হেনরী টমাস—অনুবাদক—সবুজ সাথী।

রকফেলার—রেমণ্ড বি ফসডিক।

ভারতে সমাজতন্ত্র রূপায়নের উপায়—অনির্বাণ হালদার নাথন।

শিমুল ফুলের ছায়া—নৃপেন্দ্র সান্যাল।

চন্দ্রশেখর

একটি সুন্দর পুতুল-চিত্র

চলচ্চিত্রপটে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে অতি আধুনিক কালে। শিল্পনিষ্ঠ চিত্রনির্মাতার আত্মপ্রকাশও ঘটেছে সেই সঙ্গে। এমন শিল্পীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, যাঁরা শুধু শিল্পসৃষ্টির আনন্দেই চলচ্চিত্রপটে তাঁদের সৃজনীশক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিল্পী অজয় চক্রবর্তী এঁদের গোত্রভুক্ত।

"নানহে-মুন্নে সিতারে" নামে একটি পুতুল-চিত্র তিনি তৈরি করেছেন। কিছুকাল আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি সচল পুতুল-চিত্র দেখার সময় তাঁর পাঁচ বছরের ছেলের চোখে-মুখে যে বিস্ময় ও আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছিল, তিনি তা লক্ষ্য করেছিলেন। এর পর থেকেই তিনি শিশুদের আনন্দ দেবার জন্য একটি সচল পুতুল-চিত্র তৈরি করার প্রেরণা অনুভব করেন। তাঁর সেই প্রেরণারই ফলশ্রুতি এই পুতুল-চিত্র।

একটি ষোল মিলিমিটারের ক্যামেরা নিয়ে তিনি তাঁর বাড়িতেই কাজ শুরু করেন। শিক্ষাবিদ্ ডাঃ মন্টেসরির সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। তাঁর চার বৎসরের সাধনার ফল এই পুতুল চিত্র।

এই চিত্রে অচল পুতুলরা সচল হয়ে উঠেছে। পুতুলে পুতুলে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। পুতুলের সমাজ গড়ে উঠেছে। সমাজ ছেড়ে তারা থাকতে পারে না। গৃহস্থের বাড়ি থেকে তারা পালিয়ে আসে। শেষে দুই পুতুল বন্ধু তাদের দেশে চলে যায়।

এই ছবি দেখে শিশুরা আনন্দ পাবে। ছবিটি রঙীন। অনন্য-সংগীত ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গত সোমবার লাইটহাউস মিনিয়েচারে চিত্র-সাংবাদিকদের জন্য ছবিটির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর নাম নাট্যামোদীদের কাছে সুপরিচিত। মাত্র চৌদ্দটি নাট্য-সংস্থার যুক্ত প্রয়াসে এই সংগঠনীর অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল। সংগঠনীর কর্মীদের নীরব নিরলস সাধনায় আজ তা সহস্রদলে বিকশিত। পশ্চিমবঙ্গের সহস্রাধিক নাট্য-গোষ্ঠী আজ বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর অন্তর্ভুক্ত।

গত শারদোৎসবের আগে বঙ্গীয় নাট্য-সংগঠনী "নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসব"-এর আয়োজন করে রসিকসমাজের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছিলেন। তারপর থেকেই তাঁদের নতুন সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস সম্বন্ধে জনসাধারণ আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী নাট্য সংগঠনীর কার্যালয়ে (৩৮-সি, রামধন মিত্র লেন, কলি—৪) অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার মুখপাত্র শ্রীদেবব্রত সুর-চৌধুরী ঘোষণা করেন, নৃত্যনাট্যের প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংগঠনী বর্তমানে "নিখিল বঙ্গ নৃত্যনাট্য উৎসব"-এর আয়োজনে উদ্যোগী হয়েছেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সংগঠনীর উদ্যোগে সুবর্ণবণিক-সমাজ গৃহে "নিখিল বঙ্গ নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী সম্মেলনে"র যে আয়োজন করা হয়, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীসুর-চৌধুরী বলেন, বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের মান আজ নিঃসন্দেহে উন্নত। কিন্তু তা উন্নততর করা যায় কীভাবে এবং উন্নতির পথের সমস্যাগুলি কী ও তার সমাধান কী করে সম্ভব, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা ও গবেষণার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনীর মুখপাত্র তাঁদের সংস্থার আদর্শ ও পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ও বাংলার বাইরে সংগঠনীর চৌদ্দটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। লক্ষ্য ও আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সংগঠনী যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেই সম্পর্কেও সংস্থার মুখপাত্র সাংবাদিকগণকে অবহিত করেন। সংগঠনীর আশু পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে নাট্যকলার চর্চা ও অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থশালা স্থাপন, সার্থক নাটক-রচনার আয়োজন, মঞ্চাভিনয় ও মঞ্চ-কলাকৌশল সম্বন্ধে উৎসাহী শিল্পী ও কলাকুশলীদের জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা নাটক, নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংবলিত একটি বৃহদায়তন নাট্য-কোষ রচনা প্রভৃতি।

দেশের অগণিত নাট্যসংস্থার একটি সক্রিয়, সাংগঠনিক মিলন-ভূমি হিসাবে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর গুরুত্ব ও সার্থকতা যে কত ব্যাপক, সংস্থার মুখপাত্র সেই বিষয়েও সাংবাদিক বৈঠকে মূল্যবান আলোচনা করেন।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের জীবনী-চিত্র "ভগিনী নিবেদিতা"র একটি দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অমরেশ দাশ ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে দুটি বহুপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের জীবনী-চিত্র "ভগিনী নিবেদিতা" একটি। অপরটি চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নবতম চিত্রোপহার "সূর্য-স্নান"।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনাকালে "ভগিনী নিবেদিতা" ছবিটি এক বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। স্বামীজীর মানস-কন্যা ও শিষ্যারূপে ভগিনী নিবেদিতার নাম সারা বিশ্বে পরিচিত। ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে এই মহীয়সী বিদেশিনী গুরুর আদর্শ ও আশীর্বাদের আলোকে

মোহগ্রস্ত জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দেন। ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যময় ও কর্মবহুল জীবনের প্রধান ঘটনারাজি এই ছবিতে রূপায়িত। দীর্ঘ গবেষণার ভিত্তিতে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিজয় বসু ছবিটির পরিচালক। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ছবির নাম-ভূমিকায় অবতরণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের রূপসজ্জায় দেখা যাবে অমরেশ দাশকে। ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন চন্দনা আদিত্য, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, অসিতবরন, রবীন মজুমদার, কালী সরকার ও দিলীপ রায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন অনিল বাগচী।

নির্যাতি ও ক্লৈব্য যখন মানুষকে অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন আত্মনিগ্রহ ও সমাজের লাঞ্ছনাই তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। নৈতিক ও মানসিক অবক্ষয় এবং সামাজিক অবহেলা থেকে তার মুক্তির উপায় কী, এবং কোন্ পথে? এই গভীর মানবিক সমস্যার অবতারণা ও এর সমাধানের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করে "সূর্য-স্নান"-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। ছবির ভূমিকালিপির পুরোভাগে রয়েছেন শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র। অন্যান্য প্রধান শিল্পীরা হলেন ছবি বিশ্বাস, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, সবিতাব্রত দত্ত ও দিলীপ চক্রবর্তী। সুর-সংযোজনা করেছেন জি বালসারা।

• • •

ক্যালানা প্রোডাকশন্সের "হাঁসুলি বাঁকের উপকথা"র চিত্রগ্রহণ আগামী সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে। এই বহিদৃশ্য-প্রধান ছবির অধিকাংশই তোলা হয়েছে বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলে। অন্তর্দৃশ্যগুলি তোলা হচ্ছে স্টুডিও কো-অপারেটিভের সাউণ্ড স্টেজে। এই সপ্তাহ থেকে এর শেষ সেটে কাজ শুরু হয়েছে। তারাশংকরের এই অনন্য কাহিনীর চিত্ররূপে যাঁদের বিভিন্নরূপে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, নিভাননী, লিলি চক্রবর্তী, প্রশান্তকুমার ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তপন সিংহ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে এ ছবির পরিচালক ও সুরকার।

রাজেন তরফদারের পরিচালনায় শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্র "অগ্নিশিখা" সমাপ্তপ্রায়। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে এর শেষ পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এর কাহিনী মানবীয় আবেদনে সমৃদ্ধ। কণিকা মজুমদার ও বসন্ত চৌধুরী এর দুই নতুন শিল্পী। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার বসু, নিভাননী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন ও নবাগতা শর্মিষ্ঠা। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "সূর্যস্নান"-এর একটি দৃশ্যে শম্ভু মিত্র ও ছবি বিশ্বাস

• • •

দেবী চিত্রমের প্রথম ছবি "ওরা কারা" বীরেশ্বর বসুর পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর
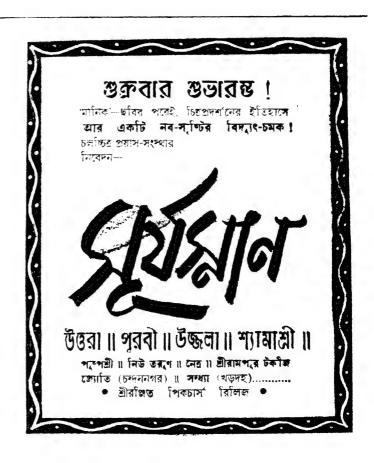
বাদল পিকচার্সের "আগুন"-এর দুটি মুখ্য ভূমিকায় কণিকা মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

হচ্ছে। নায়িকার ভূমিকায় একটি নতুন শিল্পীকে এতে দেখা যাবে। নাম নন্দিতা দে। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন অসীমকুমার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা গুহ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্বর্গত তুলসী চক্রবর্তীকেও একটি ছোট ভূমিকায় দেখা যাবে।

বীরেশ্বর বসু পরিচালিত একটি পরিচ্ছন্ন ডকুমেন্টারি ছবি দেখার আমাদের সম্প্রতি সুযোগ হয়েছিল। ছবিটির নাম **"মাটি ও শিল্পী"**, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের নিয়ে তোলা। কেমন করে সুদূর অতীতে কৃষ্ণনগরে এই চারুশিল্পের পত্তন হয়, ভারতের বাইরেও কৃষ্ণনগরের পুতুল কী সমাদর লাভ করে—এই ধরনের বহু মূল্যবান তথ্য-সংবলিত এই প্রামাণিক ছবির প্রধান আকর্ষণ কিন্তু মৃৎশিল্পীদের তৈরী নানা ধরনের মূর্তি ও অন্যান্য হাতের কাজ। ছবি তোলার নৈপুণ্যে মৃৎশিল্পের এই নিদর্শনগুলিকে মনে হয় যেন রক্তমাংসের মানুষ, প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপাদান, সত্যিকারের ফল-পাকড়—এমনি সব। ধারাবিবরণীতে রবীন্দ্র-কাব্যের বাছা-বাছা অংশের উদ্ধৃতি প্রশংসনীয়, তবে উদ্ধৃতির মাত্রা একটু কম করতে পারলে ভাল হত। অল্প পরিসরে বহু কথা বলতে যাওয়ার যা ফল, ছবিটির অংশবিশেষে তা ঘটেছে। দ্রুত আবৃত্তির ফলে একটি পঙ্‌ক্তির রস মনে সঞ্চারিত হবার আগেই পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি শ্রবণকুহরে এসে ভিড় জমিয়েছে, ফলে রসোপলব্ধিতে বাধা ঘটেছে। এ সত্ত্বেও ছবিটি দর্শকদের খুশী করবে এর অন্যান্য গুণের জন্যে। ছবিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তুলেছেন উদয়ন প্রোডাকশন্স। গণেশ বসু এর আলোকচিত্রশিল্পী এবং সম্পাদনা করেছেন অজিত দাশ। দুজনেই প্রশংসার পাত্র।

• • •

গত এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে দুটি নতুন ছবির কাজ শুরু হয়েছে।

ফিল্ম ফোলিও নামক একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান **"ছাদিয়াঁ দি ডোলি"** নামে একটি পাঞ্জাবী ছবির মহরত সম্পন্ন করলেন গত ৩রা ফেব্রুয়ারী। লাল এস কালসি এর পরিচালক। সুর যোজনা করবেন বেদ পাল।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সুচিত্রমের সদ্য-আরব্ধ ছবি **"ময়ূরাক্ষীর ধারে"র** কয়েকটি গান বাণীবদ্ধ করা হল নবীন সরকার অমল দাশগুপ্তের পরিচালনায়। গানগুলি গাইলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রচনার কৃতিত্ব মোহিনী চৌধুরীর।

• • •

আঠারো বছর আগে ভি শান্তারামের প্রযোজনা ও পরিচালনায় রাজকমল কলা-মন্দির **"শকুন্তলা"** নামে যে ছবি তোলেন, তাতে দুষ্মন্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পরলোকগত নায়ক-অভিনেতা চন্দ্রমোহন। ঐ ভূমিকায় শান্তারাম চিত্রাবতরণ করেন বলে যে খবর ছাপা হয়েছিল তা ঠিক নয়।

মেট্রোয় "স্পার্টাকাস"

বহুপ্রতীক্ষিত এবং চারটি অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত "স্পার্টাকাস" ছবিটি বর্তমান সপ্তাহে মেট্রোয় মুক্তিলাভ করেছে। কার্ক ডগলাস, লরেন্স অলিভিয়ার, জীন সীমনস, চার্লস লটন, পিটার উস্টিনভ, টনি কার্টিস ও জন গেভিন এই ছবির শিল্পীদের পুরোভাগে রয়েছেন।

হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী এই ছবিতে থ্রেস দেশীয় ক্রীতদাস স্পার্টাকাসের বীরত্ব ও প্রণয়ের কাহিনী রূপায়িত। স্পার্টাকাসের সংগ্রাম ছিল ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে। প্রায় দুই হাজার বছর আগে নিপীড়িত ক্রীতদাসদের সুশিক্ষিত সেনানীরূপে গড়ে তুলে রোমের রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহী নেতা কেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াল, তা নিয়েই ছবির রোমাঞ্চপূর্ণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-পর্বটি রূপ নিয়েছে। স্পার্টাকাস ও এক ক্রীতদাস-কন্যার প্রণয় ও বিবাহ নিয়ে গড়ে উঠেছে ছবির মধুর প্রেমোপাখ্যান। রোমের রাজশক্তির কাছে পরাজিত হল স্পার্টাকাস। ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হল তাকে। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেল তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র। রোম থেকে পালাবার পথে ক্রুশবিদ্ধ স্পার্টাকাসের সামনে এসে দাঁড়াল তার স্ত্রী, কোলে নবজাত শিশু। পরম দুঃখের মধ্যে স্ত্রী জানাল তার মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে—তাদের সন্তান স্বাধীন। ক্রীতদাস হয়ে তাকে বাঁচতে হবে না।

মহৎ বেদনায় চিত্র-কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বেদনার প্রস্তুতিতে দানা বেঁধে ওঠে মানবিক অনুভূতি ও দুর্বার নাট্য-

কৌতূহল। দর্শকের মনকে আবেগে আপ্লুত ও দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ করে রাখার মত একটি রসোত্তীর্ণ ছবি "স্পার্টাকাস"। প্রতিভাবান শিল্পীদের অত্যাশ্চর্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই ছবিটি সুপার টেকনিরামায় গৃহীত এবং টেকনিকালারে রঞ্জিত।

নাম-ভূমিকায় অভিনেতা কার্ক ডগলাস ছবিটির অন্যতম প্রযোজক। স্টেনলি কুবরিক এর পরিচালক।

নাট্যাভিনয়

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রঙমহলে স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-পরিষদের সভ্যরা অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নতুন হাস্যরসাশ্রিত ব্যঙ্গ নাটক "উদ্বার্ষিকী" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। ভিন্নধর্মী ও সমাজচেতনায় সমৃদ্ধ এই নাটকের অভিনয়াংশে ছিলেন নাট্যকার অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়, পূরবী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, বিমান গুপ্ত, সমীর চট্টোপাধ্যায়, কুসুমিকা বাগচী, কাজল ঘোষ ও ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার স্বয়ং।

*

শ্রীমা'র জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির ও শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আগামী রবিবার (১৮ই ফেব্রুয়ারী) নিউ এম্পায়ারে সকাল দশটায় শ্রীমা রচিত একাঙ্ক নাটিকা "ভাবীকালে" ও গলস্ওয়ার্দির "জাস্টিস"-এর ছায়াবলম্বনে সত্যেন অধিকারী রচিত "মানদণ্ড" মঞ্চস্থ হবে। আলোকসম্পাত ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনায় থাকবেন যথাক্রমে তাপস সেন ও মুকুল দাশ।

*

"শ্রেয়সী"র পর স্টার থিয়েটারের নতুন নিবেদন "শেষাগ্নি"র প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত-প্রায়। শক্তিপদ রাজগুরুর "শেষনাগ" উপন্যাস অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকটি রচনা করেছেন। বর্তমান যুগ-সমস্যার পটভূমিতে রচিত এই নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলিতে রূপ দেবেন কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, সুখেন দাশ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার ও শীলা পাল। নাটকের শিল্পী-গোষ্ঠীতে নতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বাসবী নন্দী, আশিসকুমার, বীরেশ্বর সেন, সাধনা রায়চৌধুরী ও আশা দেবী। নাটকটি পরিচালনা করবেন নাট্যকার। দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন অনিল বসু। আগামী মার্চ মাসের প্রথমেই নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি অভিনীত নূতন নাটক "উদ্বার্ষিকী"র একটি দৃশ্যে কেয়া চক্রবর্তী, কাজল ঘোষ ও নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায়

*

গত ৫ই জানুয়ারী মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র দপ্তরের নাট্য-সমিতির উদ্যোগে ধনঞ্জয় বৈরাগীর "রূপোলী চাঁদ" সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ হয়। নিত্যানন্দ, শংকরনারায়ণ, সমীর ঘোষ, সুভাষরঞ্জন গুহ, মুরারি ধর, জিতেন ধর ও রানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

*

ফেব্রুয়ারী মাস থেকে রূপকার সম্প্রদায় প্রতি সোম ও বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রবীন্দ্রনাথের "কালের যাত্রা" নিয়মিতভাবে মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চস্থ করছেন। নির্দেশনা ও মঞ্চ-পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে সবিতাব্রত দত্ত ও খালেদ চৌধুরী।

*

গত রবিবার (১১ই ফেব্রুয়ারী) সকাল সাড়ে দশটায় মিনার্ভা থিয়েটারে পঞ্চমিত্রমের প্রযোজনায় অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রমত্ত প্রহসন" ও "আজকের উত্তর" নাটিকা দুটি অভিনীত হয়। শ্যামল রায় পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন।

*

রূপকৃৎ-এর উদ্যোগে রঙমহলে সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের "বিপ্রদাস" নাটকাকারে অভিনীত হল। নাম-ভূমিকায় নাট্য-পরিচালক দিলীপ-কুমার নাগের অভিনয় উচ্চ প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল।

*

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনাধীনে নির্মীয়মাণ "অভিযান" ছবির একটি দৃশ্যে রুমা গুহঠাকুরতা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

শৌভনিক প্রযোজিত "ল' ল' না"র আদালত দৃশ্যে বিনতা রায়, নিবেদিতা দাশ, সুমিত্র গুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও টুলু মুখোপাধ্যায় —ফটো ঃ অলক মিত্র

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আটলান্টিক (ইস্ট) রেকিট অ্যান্ড কোলম্যান রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা "জব চার্নকের বিবি" নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। ডাঃ প্রতাপ চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছেন মণি দত্ত। গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় নাটকটি পরিচালনা করেন।

শৌভনিক-এর "ল' ল' না"

ললনা নয়। "ল' ল' না"—অর্থাৎ আইন নয়, আইন নয়। আইন, আদালত ও আইনজীবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না। মেজর রায়ের এই কঠিন পণ। তাঁর জীবন-দর্শনও বলা চলে। নিজের দুই পুত্র ও একমাত্র কন্যাকে তিনি এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, সংসারে একবার যদি আইনের অনুপ্রবেশ ঘটে, তবে তা ছারখার হয়ে যাবে। অতএব আইনজীবীর সংস্রব বিষবৎ বর্জন করে চলতে হবে।

মেজরের দুই পুত্র কিন্তু এদিকে হৃদয়দান করেছে দুই আইনজীবী তরুণীকে। বড়জনের প্রণয়িনী অ্যাটর্নি, অনুজের প্রেয়সী ব্যারিস্টার। ওরা সহোদরা। মেজর এই দুঃসংবাদ জানতে পেরে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত দুই সহোদর তাদের ভাবী শ্বশুরের সহায়তায় কীভাবে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পেল, অর্থাৎ কেমন করে দুই আইনজীবী তরুণীকে পুত্রবধূরূপে সানন্দে স্বীকার করে নিলেন মেজর তা নিয়েই শৌভনিক-এর "ল' ল' না"র রসকাহিনী রচিত।

"ল' ল' না" নাট্য প্রহসনটি রচনা করেছেন নিবেদিতা দাশ। প্রহসনের যা ধর্ম, তা এই নাটকে পুরোপুরি বিদ্যমান। স্বতঃস্ফূর্ত রঙ্গরসে নাটকটি উপভোগ্য।

দক্ষিণ কলিকাতার মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চস্থ এই নাটকটির পরিচালক বীরেশ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নাট্য-পরিচালনার বৈশিষ্ট্য এই, নাটকের গতি কোন দৃশ্যে বা অংশে মন্থর হয়ে পড়েনি। স্বচ্ছন্দগতি এই নাটকের প্রতি দৃশ্যে তিনি কৌতুকের উপকরণ জড়ো করে তুলেছেন। কৌতুকের উপাদান সব ক্ষেত্রে বাস্তবের যুক্তি ও সঙ্গতিকে অনুসরণ করে চলতে পারে না। এই নাটকেও তা পারেনি। কিন্তু সার্থক কৌতুকের যা স্বরূপ—যা অতিমাত্রায় স্থূল বা কষ্ট-কল্পনাশ্রয়ী নয় তা এই প্রহসন-নাটকের প্রয়োগ-কর্মে লক্ষণীয়। এক কথায় নাটকটি নাট্যরসিকদের সান্ধ্য-আমোদের একটি সুখভোগ্য সুন্দর আয়োজন।
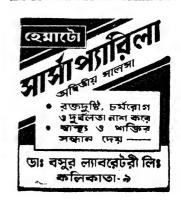
সম্মিলিত অভিনয়-উৎকর্ষের দিক থেকেও নাটকটি সমৃদ্ধ। তবুও শিল্পীদের মধ্যে যিনি নিপুণ কৌতুকাভিনয়ে দর্শকদের সর্বাধিক আনন্দ দেন, তিনি নাট্য-পরিচালক বীরেশ মুখোপাধ্যায়। মেজরের চরিত্রটিকে তিনি প্রাণবান করে তোলেন। মেজরের দুই পুত্রের চরিত্রে সুধাংশু মন্ডল ও গোপেন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী। এঁদের দুই প্রণয়িনীর রূপ-সজ্জায় নিবেদিতা দাশ ও বিনতা রায়ের অভিনয় সুচারু, ও স্বচ্ছন্দ। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে নিখুঁত অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন মিনতি চক্রবর্তী, গোবিন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, পতাকী মুখোপাধ্যায় ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্যা মজুমদার, প্রণতা নন্দী, রমা গোস্বামী, সুমিত্র গুপ্ত, নিমু ভৌমিক, চিনু মুখোপাধ্যায় গোপাল সান্যাল, অমিয় বসু ও বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটকের মঞ্চসজ্জা রসবোধ ও কল্পনা-শক্তির পরিচায়ক।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রবেন-দবে প্রোডাকশন্স-এর "আশিক" চিত্রের দুই প্রধান শিল্পী পদ্মিনী ও রাজকাপুর

অভিনব সংগীত-বাসর

গত রবিবার (১১ই ফেব্রুয়ারী) সকালে নিউ এম্পায়ারে একটি অভিনব সংগীত-বাসরের আয়োজন করেন "সাজ ও আওয়াজ" সংস্থা। এই সংস্থার কর্ণধার প্রখ্যাত যন্ত্র-সংগীতশিল্পী ভি বালসারা। সুরকার শ্রী বালসারা তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিল্পী ও কয়েকজন অতিথি শিল্পীর সহযোগে যে সুর-বৈচিত্র্য পরিবেশন করেন, তার বিষয়বস্তু ছিল রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস"।

সিমফনি-রীতিতে রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত কবিতাটির যে সুরধ্বনি-রূপ তিনি পরিবেশন করলেন, সেটি একটি বিরল 'পরীক্ষামূলক প্রয়াস'। এই প্রয়াসে তিনি সুধীজনের সাধুবাদ অর্জন করেছেন। কবিতাটির সাংগীতিক রূপায়ণে প্রায় চল্লিশ জন শিল্পী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে

সপ্তক প্রাইভেট লিমিটেডের "বন্ধন"-এর একটি দৃশ্যে রেণুকা রায়, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। কবিতার বিশেষ বিশেষ অংশের ভাবরস অনুযায়ী সুর-রচনায় রাগসংগীতের সংগে লোক-সংগীতের সুন্দর সমন্বয়টি কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। যন্ত্রসংগীতের মধ্যে একক বাঁশি ও সম্মিলিত বেহালার ব্যবহার খুবই চিত্তাকর্ষক হয়।

কবিতাটির সংগীত-রূপ শুরু হবার আগে এটি আবেগদীপ্ত ও মরমী অভিব্যক্তিতে আবৃত্তি করে শোনান বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এর পূর্বে ইংরেজীতে কবিতাটির সারাংশ পাঠ করে শোনান শম্ভু মিত্র। কবিতার সুর-রূপায়ণের সংগে সংগে কবিতার চরণ পর্দায় পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা করা হয়। এ-কৃতিত্ব তাপস সেনের।

অনুষ্ঠানের প্রথমে ভি বালসারা "আহীর ভৈঁরো" রাগটি পিয়ানোতে বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। পিয়ানোর সংগে বেহালা ও তবলার ঐকতান খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্ত্য রীতিতে ভারতীয় সংগীত-রচনার এই প্রয়াস বিরল। বিশেষত সুর-রচনায় কবিতার মর্মরূপ ফুটিয়ে তোলার এই প্রচেষ্টা সত্যিই অভিনব। এই মনোগ্রাহী ও অভূতপূর্ব সাংগীতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ভি বালসারা রসিকজনের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন।

অগ্রগামী-গোষ্ঠীর নির্মীয়মান ছবি "নিশীথে"-র অন্যতম প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের রূপ-সজ্জায় সুপ্রিয়া চৌধুরী

অনুষ্ঠান সংবাদ

শৈল-শহর সিমলায় সম্প্রতি আইস স্কেটিং ক্লাবের বাৎসরিক কার্নিভ্যাল মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সব দিক দিয়েই উপভোগ্য হয়েছিল। সিমলার প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেই বহু দর্শক এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

জনৈক পত্রপ্রেরক জানাচ্ছেন যে, ভারত-বর্ষের আর কোথাও সিমলার মত উন্মুক্ত আকাশের তলে স্কেটিং রিঙ্ক নেই। সিমলা আইস স্কেটিং ক্লাবের সভাপতির পদে পাঞ্জাবের প্রাক্তন বিচারপতি জি ডি খোসলা বহুকাল যাবৎ অধিষ্ঠিত আছেন। পত্রপ্রেরক আরো জানাচ্ছেন, শীতকালে সিমলায় স্কেটিংই একমাত্র স্পোর্টস। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বয়স্করা পর্যন্ত দুই বেলা মনের আনন্দে জমাট বরফের ওপর স্কেটিং করেন।

আর জি কর মেডিক্যাল হোস্টেল য়ুনিয়ন সরস্বতী পূজা উপলক্ষে একটি চলচ্চিত্র-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী এই উৎসব শুরু হয়। উৎসবে প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে ছিল পূর্ব জার্মানীর "অ্যাডভেঞ্চার অব লিটল মুক", আইজেনস্টাইন-এর "আলেকজান্ডার নেভস্কি" এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার "ক্যাপ্টেন দাবাচ"।

আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী সাড়ে চারটায় 'জালান-কুঞ্জে' (৩।১, কুইনস পার্ক, বালীগঞ্জ) শিল্পশ্রীর শিল্পিদল 'ক্ষত্রবীর' যাত্রাভিনয় পরিবেশন করবেন।

রূপান্তরী গোষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত 'প্রাগৈতিহাসিক' (৮ মিঃ) ছবিটি প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বিনা প্রবেশমূল্যে সংঘের কার্যালয়ে (২৯।১, পণ্ডিতিয়া রোড) প্রদর্শিত হবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী।

রেখা চিত্রের রঙীন ছবি "কোবরা গার্ল"-এর নায়িকা রাগিনী

সংগীত সম্মেলন

পার্ক ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্সের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন কয়েকদিন যাবৎ পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রতিবারের মত এবারেও ভারতবিখ্যাত বহু গায়কগায়িকা ও যন্ত্রশিল্পী এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম—তারাপদ চক্রবর্তী, বিলায়েৎ হোসেন, আলি আকবর খাঁ, ভীমসেন যোশী, সলামৎ আলি ও নজাকৎ আলি, রাম মারাঠে, নয়না দেবী, সুনন্দা পট্টনায়ক, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস খাঁ, ইমরাৎ হোসেন, কেরামতুল্লা খাঁ, শান্তা প্রসাদ, নিখিল ঘোষ প্রভৃতি।

কথক নৃত্যে রোশনকুমারী ও ভারত-নাট্যমে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শিল্পী-ভগিনীদ্বয় সুধা ও পুষ্প শিল্পানুরাগী-দের আনন্দ বর্ধন করবেন।

কনফারেন্সের কর্ম পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রাক্তন মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত হিন্দী ছবি "সংগীত সম্রাট তানসেন"-এর নায়িকা অনিতা গুহ

একলব্য

করাচীতে পাকিস্তান ও ইংলণ্ডের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার ফলে ইংলণ্ড পাকিস্তানের বিরুদ্ধে "রাবার" পেয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের এটা প্রথম "রাবার" লাভ। এর আগে ১৯৫৪ সালে ইংলণ্ডের মাটিতে দুই দেশের মধ্যে প্রথম যে টেস্ট খেলার আয়োজন হয় তার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। চারটি টেস্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড একটিতে ও পাকিস্তান একটিতে জয়লাভ করে, দু'টি খেলার ফলাফল থাকে অমীমাংসিত। এবার লাহোরের প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড পাঁচ উইকেটে বিজয়ী হয়। সেই জয়ের ফলেই তাদের রাবার লাভ। কারণ করাচীর মত ঢাকার টেস্ট খেলাতেও জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি

লাহোরে ইংলণ্ডের জয় শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই জয় না, ভারত ও পাকিস্তান সফরের মোট ৮টি টেস্ট খেলার মধ্যে একমাত্র জয়। তাও দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে। প্রথম টেস্টে পাকিস্তান এক রকম শুকনো মাটিতেই আছাড় খেয়েছিল। পরে ঢাকায় এবং করাচীতে আর মাটির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। চেষ্টাও করেনি। আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াধারার মন্থর ব্যাটিংয়ে খেলার জলুস নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে "রাবার"ও হারাতে হয়েছে। অন্ততঃ ঢাকা টেস্টে পাকিস্তানের মেরে খেলে জয়ের জন্য চেষ্টা করা উচিত ছিল। ভারতের কাছে রাবার হারাবার পর ইংলণ্ডের মনোবলও ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সে সুযোগ গ্রহণ করেনি।

করাচীতে অবশ্য ঘটনা অন্য রকম। এখানে জেতার চেষ্টা করা উচিত ছিল ইংলণ্ডের। কিন্তু প্রথম দিনে ২৫৩ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৫০৭ রান করতে পুরো দুইদিন ও ১০ মিনিট সময় চলে যায়। এ ধরনের খেলা কি জয়ের সহায়ক?

তারপর দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তান তাদের প্রথম ইনিংসের ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে ৫০।৫৫ রানের মত এগিয়ে গেছে—তখনও ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডেক্সটার জেতার চেষ্টা করেন নি। অনিয়মিত বোলার দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে খেলাটিকে হাল্কা করে তুলেছেন। অথচ একটু চেষ্টা করলে করাচী টেস্টে হয়তো ডেক্সটারের জেতা অসম্ভব হত না।

কিন্তু হারবার ভয়েই তিনি জিততে চান নি। একেই ভারতের কাছে "রাবার" হারাবার ফলে ইংলণ্ডের যথেষ্ট সুনাম হানি হয়েছে। তারপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিততে গিয়ে যদি হেরে যান সেটা হবে আরও দুঃখের। তার চেয়ে প্রথম টেস্টে জয়ের জোরে "রাবার" হাতে রাখাই শ্রেয়ঃ [illegible]

ডেক্সটার করাচীতে কোন ঝুঁকি নেন নি। মন্থর ক্রীড়ানীতিতে কাল কাটিয়ে খেলা ড্র করেছেন।

লাহোর এবং ঢাকার মত করাচীতেও ডেক্সটারকে টসে হারতে হয়। শুধু লাহোর, ঢাকা, করাচী বলি কেন? ভারতের পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যেও এক বোম্বাইতে প্রথম টেস্টে টসে জয় ছাড়া ডেক্সটার দুই দেশের মোট ৮টি টেস্টের মধ্যে ৭টি টেস্টেই টসে

করাচী টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরীর অধিকারী টেড ডেক্সটার

হেরেছেন। ভাগ্যের খেলায় এই পরাজয় কিছুটা তাঁর দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

যাই হোক, করাচীতে টসে জিতে পাকিস্তান প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও সূচনায় তাদের ব্যাটিং বিপর্যয় দেখা দেয়। মাত্র ৫৬ রানের মধ্যে ইমতিয়াজ, সায়িদ আমেদ, জাভেদ বার্কি ও মুস্তাক মহম্মদের মত তাদের ৪জন কৃতী ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যান। পঞ্চম উইকেটে হানিফ ও আলীমুদ্দিনের দৃঢ়তায় খেলার মোড় ঘোরে। হানিফ ৬৭ রান করে আউট হন। আলীমুদ্দিন করেন জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী। ১৯৫৪-৫৫ সালে এই করাচীতেই ভারতের সংগে টেস্ট খেলায় আলীমুদ্দিন ১০৩ রান করে নট আউট ছিলেন। এ খেলায় ১০৯ রান করে আউট হন। ২৫৩ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় ইংলণ্ড সংগ্রহ করে ১ উইকেটে ২২৯ রান। এর মধ্যে পুলারের ৬০ রান উল্লেখের দাবি রাখে। অধিনায়ক ডেক্সটার ৮৭ ও সহ-অধিনায়ক মাইক স্মিথ ৪২ রান করে নট আউট থাকেন। এইদিন টেস্ট খেলায় ডেক্সটারের দু' হাজার রান পূরে যায়।

পরের দিন ইংলণ্ড আর দু'টি উইকেট হারিয়ে আর ২৩৪ রান সংগ্রহ করায় দিনের শেষে তাদের ৪ উইকেটে ৪৫৩ রান ওঠে।

অধিনায়ক টেড ডেক্সটারের পক্ষে লাহোরে তৃতীয় দিনের খেলাটি বিশেষভাবেই স্মরণীয়। কারণ এইদিন তাঁর সফরের সহস্র রানই শুধু পূর্ণ হয় না, টেস্ট খেলায় ডবল সেঞ্চুরীও লাভ করেন। তাঁর জীবনের প্রথম, পাক-ভারত সফরে দুই দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যেও প্রথম এবং একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরী। এতদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৮০ রানই ছিল ডেক্সটারের সবচেয়ে বড় টেস্ট রান। এ খেলায় ২০৫ রান করে তিনি আউট হন এবং জীবনের সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরী পূর্ণ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন, ১৯৫৩-৫৪ সালের পর ইংলণ্ডের কোন ব্যাটসম্যান টেস্ট খেলায় ডবল সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। ১৯৫৩-৫৪ সালে জামাইকায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে হেন হাটনও ২০৫ রান করেছিলেন।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিন ইংলণ্ড আবার ব্যাটিং করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এদিন তারা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ১৫ রানের মধ্যে শেষ ছয়টি উইকেট হারিয়ে ৫০৭ রানে ইনিংস শেষ করে। মিডলসেক্সের উদীয়মান খেলোয়াড় পিটার পারফিটের সেঞ্চুরী এদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পারফিট তৃতীয় দিনের শেষে ৮৮ রান করে নট আউট ছিলেন, চতুর্থ দিন টেস্ট সেঞ্চুরীর অধিকারী হন। ন্যাটো উদীয়মান ব্যাটসম্যান পারফিট ভারতে মধ্যাঞ্চল দলের বিরুদ্ধে ১৬৬ রান করে নট আউট ছিলেন, সার্ভিসেস দলের বিপক্ষে করেছিলেন ১১৬ রান। পাক-ভারত সফরে এটা পারফিটের তৃতীয় এবং টেস্ট খেলার প্রথম সেঞ্চুরী।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৫৪ রানের ঘাটতি নিয়ে পাকিস্তান অত্যন্ত সতর্কতার সংগে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে চতুর্থ দিনের শেষেই সংগ্রহ করে ২ উইকেটে ১৪৭ রান। পঞ্চম এবং শেষ দিনেও তাদের ইনিংস শেষ হয় না। ৮ উইকেটে ৪০৪ রান উঠলে খেলার উপর যবনিকা পড়ে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের প্রায় সবাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে ব্যাট করে বিপর্যয় এড়িয়েছেন। এবং হানিফ মহম্মদ মাত্র ১১ রানের জন্য এবং অধিনায়ক ইমতিয়াজ আমেদ ১৪ রানের অভাবে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড :—

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ২৫৩ (আলী-

মুদ্দিন ১০৯, হানিফ মহম্মদ ৬৭; নাইট ৬৬ রানে ৪ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৫০৭ (টেড ডেক্সটার ২০৫, পিটার পারফিট ১১১, জিওফ পুলার ৬০, মাইক স্মিথ ৫৬, পিটার রিচার্ডসন ২৬; অ্যান্টাও ডিসুজা ১১২ রানে ৫ উইকেট, নাসিমুল গনি ১২৫ রানে ৩ উইকেট)।

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস (৮ উইকেটে) ৪০৪ (হানিফ মহম্মদ ৮৯, ইমতিয়াজ আমেদ ৮৬, আলীমুদ্দিন ৫৩, জাভেদ বার্কি ৪৪, মুস্তাক মহম্মদ ৪১, নাসিমুল গনি ৪১; টেড ডেক্সটার ৮৬ রানে ৩ উইকেট, বব বারবার ১১৭ রানে ৩ উইকেট)।

(খেলা অমীমাংসিত)

ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেন জিওফ পুলার, পিটার রিচার্ডসন, মাইক স্মিথ, টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক), পিটার পারফিট, বব বারবার, বেরী নাইট, ডেভ এলেন, জিওফ্রে মিলমান (উইকেটকিপার), টনি লক ও ডেভিড হোয়াইট।

পাকিস্তানের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেন ইমতিয়াজ আমেদ (অধিনায়ক ও উইকেট-কিপার), হানিফ মহম্মদ, সঈদ আমেদ, জাভেদ বার্কি, মুস্তাক মহম্মদ, আলীমুদ্দিন, সুজাউদ্দিন, নাসিমুল গনি, অ্যান্টাও ডিসুজা, ফজল মামুদ ও হাসিব আসান।

খেলার তারিখ—২রা, ৩রা, ৪ঠা, ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারি।

*   *   *

আলীমুদ্দিন

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের খেলার সূচনা শুভ বলতে হবে। কারণ যদিও অপ্রধান দল তবুও ত্রিনিদাদ কোল্টের সঙ্গে উদ্বোধনী ম্যাচ তারা ভাল খেলেছে। উঠতি ব্যাটসম্যান সারদেশাই সেঞ্চুরী করেছেন। উমরিগর, সারদেশাই, দুরাণী মিলে দিয়েছেন চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের পরিচয়। দু দিনব্যাপী খেলায় জয়পরাজয়ের আশা করা যায় না। কাজে কাজেই খেলার ফলাফলও অমীমাংসিত থেকে গেছে।

ত্রিনিদাদ কলোনীর সঙ্গে সফরের দ্বিতীয় ম্যাচও অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পথে। এ খেলাটি ছিল ৪ দিনের। কিন্তু বৃষ্টি খেলাটির স্থায়িত্বকাল হ্রস্ব করে দিয়েছে। তবু ভিজে মাঠে ভারতের ব্যাটস-ম্যানরা খারাপ খেলেন নি। কন্ট্রাক্টর, মঞ্জরেকার, উমরিগর, সারদেশাই, দুরাণী সবাই ভাল রান করেছেন। কিন্তু ত্রিনিদাদ কোল্ট বা কলোনীর বিরুদ্ধে ভাল খেলা আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেস্টে ভাল খেলা এক কথা নয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের প্রথম টেস্ট খেলা। এ খেলাতেই হবে ভারতের অগ্নি-পরীক্ষা। দলের মধ্যে কতটুকু খাদ আছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলে প্রাণোচ্ছল ক্রিকেট। তারা হারাজেতার ধার ধারে না। ক্রিকেট তাদের জীবনবেদ, বলিষ্ঠ ক্রীড়ারীতি তাদের ক্রিকেটের ধারা। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জাতীয় খেলা। ক্রিকেট নিয়ে এত হই-হল্লা এত মাতামাতি সারা বিশ্বে আর কোথাও নেই। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের জাতীয় জীবনের এক প্রধান অঙ্গও বটে। ছোট বড় শহরে তো বটেই, গ্রামে গ্রামেও ছেলে বুড়ো, মামা-ভাগ্নে মিলে ক্রিকেট খেলে। ক্রিকেট ওদের খুশির নেশা, ফুর্তির ফোয়ারা। মাঠে খেলা, আশে-পাশে নাচগান হল্লা, সঙ্গে প্রচুর পানভোজন। প্রচুর—প্রচুর খায় তারা।

অন্যান্য দেশের রক্ষণশীল ক্রীড়াধারায় ক্রিকেট প্রায় মরতে বসেছিল। চিন্তাশীল লেখকরা বলতে আরম্ভ করেছিলেন—গেল,

সিংহলে সফরকারী ভারতীয় মহিলা হকি টীম। ভারতীয় দল সিংহলে তিনটি টেস্ট সমেত সাতটি খেলায় বিজয়ী হয়

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ত্রিনিদাদ কোল্টের সঙ্গে ভারতের উদ্বোধনী খেলায় রামকান্ত দেশাই ও পলি উমরিগর ফিল্ডিং করতে মাঠে নামছেন

গেল, সব গেল। এমন যে প্রাণোচ্ছল খেলা—ক্রিকেট-কসাই খেলোয়াড়দের হাতে তা জবাই হতে বসেছে। এই সময়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দেখিয়ে দিয়েছে—না, ক্রিকেট এখনো মরেনি। রূপে, রসে, বর্ণে, ছন্দে ক্রিকেট এখনো প্রাণবন্ত।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সেই প্রাণবন্ত খেলা খেলেই [illegible] হেরে এসেছে। কিন্তু হারার মধ্যে পেয়েছে তারা জয়ের চেয়েও বেশী আনন্দ। চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলার জন্য সারা বিশ্বে তাদের ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যে সম্মান ও সংবর্ধনা পেয়ে এসেছে বিশ্বের খেলাধুলোর ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। কেউ কখনো শুনেছে একটি পরাজিত দলের বিদায়বেলায় পাঁচ লাখ দর্শক-সমাগমের কথা? কেউ কখনো দেখেছে পরাজিত অধিনায়ককে এমন হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে? পরাজিত অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেলের নামে 'ওরেল কাপ' প্রবর্তনের ইতিহাসও অভিনব। এত সম্মান, এত সংবর্ধনা, এত ভালবাসা—সব কিছুর মূলে কিন্তু ব্রাইট ক্রিকেট। ক্রিকেটের মধ্যে নতুন জীবন ফিরিয়ে এনেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কালা-ধলা খেলোয়াড়রা।

সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় দল খেলতে গিয়েছে নতুন উৎসাহ নতুন উদ্দীপনা নিয়ে। ইংলণ্ডের কাছ থেকে সদ্য-লব্ধ "রাবার" তাদের হাতে। আমরা সবাই আশা করব ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের খেলার সঙ্গে তাল রেখে ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়রাও "ব্রাইট" ক্রিকেট খেলবেন। এবং তার মধ্যেই পাবেন প্রচুর আনন্দ। কারণ প্রতিপক্ষ অতি দুর্ধর্ষ। তাদের বিরুদ্ধে জিতলে গৌরব, হারলে লজ্জা নেই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের টেস্ট খেলা হয়েছে তিন সিরিজে। প্রথম ১৯৪৮ সালে ভারতে। সেবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটি খেলা জিতে আর ৪টি খেলা ড্র করে রাবার পায়। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরেও একই ফলাফল। এবারও পাঁচটি টেস্টের মধ্যে একটি টেস্ট জেতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। তবে ভারতের খেলোয়াড়রা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে যথেষ্ট সুনাম নিয়ে দেশে ফেরেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতীয় দল অবশ্য ভাল খেলতে পারে নি। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে তিনটি খেলাতে হার স্বীকার করতে হয়। দুটি খেলার ফলাফল থাকে অমীমাংসিত। তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে আজও আমরা একটি টেস্ট জিততে পারি নি। আর বিদেশের মাটিতে টেস্ট জয়ের আশা আজও আমাদের অপূর্ণ আছে! সেই অপূর্ণ সাধ এবার পূর্ণ হয় কি না তার জন্য আমরা সবাই আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছি।

মুকুল

জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবী

সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম। চেহারায় স্বর্ণদ্যুতি। বিশ্বের প্রথম দশজন সুন্দরীর একজন। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সব মিলিয়ে ভারতজোড়া খ্যাতি।

রাজার দুহিতা, রাজার দৌহিত্রী, রাজার ঘরনী।

না, রাজার নয়-মহারাজার। কোচবিহারের পরলোকগত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের কনিষ্ঠা কন্যা এবং বরোদার মহারাজার ভাগিনেয়ী গায়ত্রী দেবী এখন জয়পুরের মহারানী।
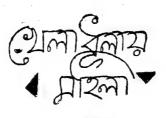
তিন কুল সুদ্ধ মহারানী, আবার ক্রীড়াকুলেও কীর্তিমতী। নানা খেলাধুলোয় পারদর্শিনী তো বটেই, সংগঠনেও সদাব্যগ্র।

টেনিস, টেবল টেনিস, পোলো, ব্যাডমিন্টন, গলফ—সব রকমের খেলাধুলোয় গায়ত্রী দেবীর কিছু না কিছু দখল আছে। আবার তিনি সাঁতার কাটেন, শিকারও করেন। নৌকো চালনাও অন্যতম নেশা।

অবশ্য খেলার জন্যই খেলা। দেহ-মনের আনন্দলাভের উপকরণ হিসাবেই খেলা। খেয়াল চরিতার্থের জন্য শিকার। কোন কিছুতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা নেই, প্রাইজের লোভ তো নেই-ই।

খেলাধুলোর নেশা তো ও'দের রক্তের সঙ্গেই মিশে আছে। বাবা শুধু ক্রিকেট খেলতেন না, ক্রিকেটের জন্য কোষাগার খুলে রেখেছিলেন। আলীপুরে রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গণেই তৈরি করেছিলেন ক্রিকেটের মনোরম ক্রীড়াভূমি—'উডল্যাণ্ডস'। ইডেন উদ্যানের বর্তমান প্যাভেলিয়ন

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের অর্থেই তৈরী হয়েছিল। কাকা প্রিন্স হিট্টি ছিলেন ক্রিকেটের নাম-করা মারমুখী খেলোয়াড়। দাদা কোচবিহারের বর্তমান মহারাজা জগৎ দীপেন্দ্র নারায়ণ তো বাঙলার প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক। তা ছাড়া ফুটবল, টেনিস, পোলো, গলফ সব খেলাতেই সিদ্ধহস্ত।

গায়ত্রী দেবীর মাতৃকুল বরোদার রাজপরিবারও চিরদিন ক্রীড়ানুরাগী। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ-সভাপতি বরোদার মহারাজার উপরই পড়েছিল ১৯৫৯ সালের ইংলন্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজারের ভার।

শ্বশুরকুলেও ক্রীড়াপ্রীতি। স্বামী জয়পুরের মহারাজা নিজে একজন বিশ্বখ্যাত পোলো খেলোয়াড়। সুতরাং গায়ত্রী দেবীর অঙ্গে শুধু সোনা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটাই নয়- খেলাধুলোও অঙ্গের ভূষণ।

যখন জয়পুরে তখন একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তদারকি করেন আঠারোটা ঘোড়ার। সবগুলো তাঁর পোলো খেলার। সাঁতার কাটেন প্রাসাদের সুইমিং পুলের স্ফটিকজলে। যখন কলকাতায় তখন টেনিস খেলেন সাউথ ক্লাবে। যখন ইংলন্ডে কিংবা সুইজারল্যান্ডে তখন পালতোলা নৌকোয় পরী হয়ে উড়ে যান। আর যখন খেয়াল হয় ভারতের বাগানে বাগানে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়ান শিকারের উদ্দেশে। গায়ত্রী দেবী নিজের হাতে সাতাশটি বাঘ মেরেছেন শুনে ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথ তো অবাক।

প্রতিযোগিতামূলক খেলা বলতে তাঁর শুধু টেনিস। বেশী দূর এগুতে পারেননি। তবু খেলেছেন জাতীয় প্রতিযোগিতায়, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে। কিছুদিন যুক্তও ছিলেন পরিচালকদের সঙ্গে। অনেকেরই জানা আছে টেনিস খেলোয়াড় আখতার আলীর প্রথমবারের বিদেশ সফরের সব খরচটাই এসেছিল গায়ত্রী দেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে।

তবে টেনিসের চেয়েও ব্যাডমিণ্টনে মহারানীর দান অনেক বেশী। ১৯৫৫ সাল। জয়পুরে জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আসর। লাখখানেক টাকা খরচ করে অশোক ক্লাবে মহারানী আধুনিক ধরনের শুধু একটি কভার্ড কোর্টই তৈরি করে দিলেন না, প্রতিদিন নিজে কোর্টে উপস্থিত হয়ে কোর্ট ঝাঁট দেওয়া থেকে আরম্ভ করে প্রতিযোগিতার সব ব্যবস্থা নিজের হাতে করতে লাগলেন। ফলে প্রতিযোগিতার শেষে ব্যাডমিণ্টনে ওঁর আন্তরিকতা দেখে বিভিন্ন রাজ্যের ব্যাডমিণ্টনের মাতব্বররা ওঁকে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সভানেত্রীর পদে বরণ করে নিল। দু' বছর যোগ্যতার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করবার পর স্বেচ্ছায় সভানেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

ফারপো রেস্তোরাঁয় ব্যাডমিণ্টনের এক ভোজসভায় মহারানী কোচিং সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তা শুনে সত্যিই আমরা ওঁর প্রগতিশীল মনোবৃত্তির প্রশংসা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন-"আমি চাই না বিভিন্ন কেন্দ্রে বড় বড় প্রতিযোগিতার আয়োজন হোক আর দেশের নাম-করা খেলোয়াড়রা সেখানে ভিড় করুক। তার চেয়ে জেলায় জেলায় শহরে শহরে ভূরি ভূরি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কর, আর উপযুক্ত কোচ এনে সেখানকার খেলোয়াড়দের উন্নত শিক্ষায় পটু করে তোলো। এতে খেলার জনপ্রিয়তা বাড়বে, দেশে খেলোয়াড় বাড়বে। তৈরি হবে গুণী ও কৃতী খেলোয়াড়।

মহারানী গায়ত্রী দেবী ক্রিকেটের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠলেও নিজে কিন্তু ক্রিকেট পছন্দ করেন না। ক্রিকেট মাঠে বড় একটা দেখাও যায় না তাঁকে।

শিক্ষা-দীক্ষা ইংলন্ড ও সুইজারল্যান্ডে। শান্তিনিকেতনেও পড়েছেন কিছুদিন। আগে বলেছি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। গুণ তো এক রকমের নয়। খেলাধুলো নাচ-গান বাদ দিচ্ছি। এ ছাড়া প্রজাদের জন্য দরদ আছে, ছাত্রদের জন্য সহানুভূতি। মেয়েদের জন্য একটি স্কুল করে দিয়েছেন জয়পুরে, যার নাম মহারানী গায়ত্রী দেবী স্কুল। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিয়েছেন হোস্টেলের জন্য। থাকেন প্রাসাদের এক পাশে। প্রজারা বলে মহারানী। এই মা-রানীই এবার রাজস্থান থেকে লোকসভার প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মহারানী এখন রাজাজীর দলে। স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থী।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৫শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় 'খেলাধুলোর মহিলা' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীনমিতা সান্যালের পিতার নাম জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল। মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ জ্ঞানেশ নারায়ণ সান্যাল প্রকাশিত হইয়াছে।

জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবীর টেনিস খেলার ভঙ্গি

দেশী সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারী—স্যার জন সার্জেণ্টের রিপোর্ট অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছয় হাজারের অধিক হইতে দেওয়া উচিত নহে। এক একটি কলেজে কয়েকটি শিফ্‌টে কয়েক হাজার ছাত্র পড়ান হইবে, তাহাও কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

চাষ আবাদের মরসুম ছাড়া বৎসরের অন্যান্য সময় চাষীদের কর্মসংস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় ১০টি করিয়া এবং ত্রিপুরায় ৩টি, মোট এই ৪৩টি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার কল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

৬ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগী-দের ক্ষতিপূরণ দিবার কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভি-যোগ এই যে, সরকারী আমলাদের 'অব্যবস্থা' এবং অনেক ক্ষেত্রে 'কর্তব্যে অবহেলা'র দরুন এই ব্যাপারে সরকারী আশ্বাস প্রহসনে পরিণত হইয়াছে।

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ২৭ জন কংগ্রেসকর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ঐ সব ব্যক্তি আগামী ৬ বৎসরের জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী—যে সকল ঐতিহাসিক, অধ্যা-পক এবং গবেষণাকারী জাতীয় মহাফেজখানা ও ভারত সরকারের তথ্যাদি ও নথিপত্র ব্যবহার করিতে চান তাঁহারা যে অসুবিধায় পড়িয়াছেন সে সম্পর্কে মহাফেজখানা ও সরকারী নথিপত্র পাওয়া সংক্রান্ত নিয়মকানুন সংশোধনের জন্য বৎসরাধিক কাল আগে একটি কমিটি সরকারের নিকট সুপারিশ করা সত্ত্বেও এ যাবৎ কিছুই করা হয় নাই।

১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি শিয়ালদহ-রাণাঘাট এবং দমদম-বনগাঁও লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন যাতা-য়াত করিবে। ভারতের রেলের বৈদ্যুতিকরণ বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার এবং চীফ ইঞ্জিনীয়ার অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে উক্ত তথ্য বিবৃত করেন। তিনি জানান, শিয়ালদহ ডিভিশনের দক্ষিণাংশের বৈদ্যুতি-করণ ১৯৬৫ সালে শেষ হইবে।

গতকাল সন্ধ্যায় হারদয় জিলায় সান্ডিলা তহশিলের এক গ্রামে কংগ্রেস ও জনসংঘ কর্মীদের মধ্যে এক নির্বাচনী সংঘর্ষের ফলে তিনজন নিহত এবং চৌদ্দ জন গুরুতর আহত হইয়াছে। একজন কনস্টেবলও বন্দুকের গুলীতে সামান্য আহত হইয়াছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী—দাশ কমিশন রিপোর্ট দিয়াছেন যে, তাঁহাদের সম্মুখে যে সব তথ্য পেশ করা হইয়াছে তাহাতে পাঞ্জাবের শিখদের প্রতি পক্ষ-পাতিত্বের অভিযোগ প্রকাশিত হয় নাই।

ভারতের রেলমন্ত্রীর নিকট হইতে 'সবুজ সিগন্যাল' পাইয়া গতকাল (শুক্রবার) দুপুরে পূর্ব রেলপথের নবনির্মিত বারাসত-বসিরহাট-হাসনা-বাদ লাইনে যাত্রীভর্তি একটি বিশেষ ট্রেন হাসনাবাদের পথে প্রথম যাত্রা শুরু করে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ভোট-গণনার কাজ পাঁচ দিনের মধ্যেই শেষ করা হইবে বলিয়া জানা যায়। উহা ২৫শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইয়া ১লা মার্চ পর্যন্ত চলিবে। কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের কোন কোন কেন্দ্রে ১লা মার্চ ভোট গণনা হইবে।

ফালাকাটা হইতে নেতাজীর কয়েকজন পুরা-তন সহকর্মীর আগমনের ফলে কোচবিহারে জন-সাধারণের মধ্যে পুনরায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে শৌলমারী আশ্রমের রহস্যজনক সাধুকে অনেকে নেতাজী বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহার চেহারা, দৈর্ঘ্য এবং দেহের কয়েকটি চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, তিনিই নেতাজী।

পশ্চিমবঙ্গে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০টি গ্রামে শিশুদের জন্য পার্ক নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী— বাংলার খ্যাতিমান কবি, সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস অদ্য বিকালে তাঁহার বেলগাছিয়ার বাড়িতে পর-লোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

ব্যক্তি হিসাবে ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিলের সেক্রেটারী হিসাবে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এবং স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসরোজ মুখার্জি ও ঐ পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীসন্তোষ চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী এ কে সেন কলিকাতা হাইকোর্টে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

বিদেশী সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিন সরকার হল্যাণ্ডকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিমানযোগে পশ্চিম ইরিয়ানে সৈন্য প্রেরণের জন্য মার্কিন এলাকা ব্যবহারের কোন সুযোগ অতঃপর দেওয়া হইবে না। সম্ভবত জাকার্তাস্থ মার্কিন দূতাবাসের উপর হামলার ফলেই মার্কিন সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ওয়াশিংটনে নির্ভরযোগ্য মার্কিন মহল হইতে বলা হইয়াছে যে গত এক বৎসরের মধ্যে কিউবা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের নিকট হইতে ৫০ হইতে ১০০টি সোভিয়েট জেট জঙ্গী বিমান এবং ১৫০ হইতে ২০০টি ট্যাঙ্ক পাইয়াছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাহাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিবার প্রতিবাদে শোভাযাত্রা বাহির করিতে গেলে ছাত্রদের সহিত পুলিসের তুমুল সংঘর্ষ হয়। শুধু পুলিসের লাঠি নহে, রমণা গেটে সৈন্যদল তাহাদের উপর তিন রাউণ্ড গুলীও চালায়।

গোয়ায় ভারতের অভিযান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউমের বিরুদ্ধে সরকার-বিরোধী শ্রমিক দল যে নিন্দা-প্রস্তাব আনিয়াছিল, কমন্সসভায় তাহা ২২৮-৩২৬ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—পূর্বপাকিস্তানে জঙ্গী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অদ্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করিয়া যে মিছিল বাহির হইয়াছিল তাহা আয়তনে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মিছিল অপেক্ষাও বড় হইয়াছিল। ক্ষুব্ধ জনতা আয়ুবের ছবি রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কোথাও কোথাও আবার আয়ুবের ছবিতে জুতার মালা পরাইয়া দিয়াছে। দন্দপী আয়ুব খাঁ গোপনে পূর্বপাকিস্তান হইতে করাচীতে চম্পট দিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, গত মঙ্গলবার ঢাকা শহরে ছাত্রদের মিছিলে মিলিটারী যে গুলী চালায় তাহাতে দশজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহতদের মধ্যে তিনজন বুধবার হাসপাতালে মারা যায়। পূর্ব পাকিস্তান হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, বুধবার সকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল বরিশালের সুবিখ্যাত মহাত্মা অশ্বিনীকুমার টাউন হলে অগ্নিসংযোগ করে। সামরিক শাসনের আমলে এই হলটির নাম 'আয়ুব খাঁ হল' রাখা হয়।

সংবাদে জানা গেল, সৈন্যবাহী একটি ডাচ বিমানকে টোকিওতে অবতরণ করিতে দিতে জাপান গতরাত্রে অস্বীকার করে। হল্যাণ্ডের সরকারী বিমান কোম্পানী কে এল এম-এর এই বিমানটি সাদা পোশাক পরিহিত ৬০—৭০ জন সৈন্য লইয়া পশ্চিম ইরিয়ানে যাইতেছিল।

১০ই ফেব্রুয়ারী—গতকাল অধিকরাত্রে সর-কারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলেও নূতন করিয়া হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িতেছে। নরসিংদি ও ফিরোজপুরে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া 'আপত্তিকর' শ্লোগান দেয়। বরিশালে দ্বিতীয় দিনেও ছাত্র বিক্ষোভ চলিতে থাকে।

রাশিয়া আজ ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্সকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিরাইয়া দিয়াছে শ্রীরুডল্ফ আবেলকে। পাওয়ার্স ছিলেন এক মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের চালক এবং গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগে তিনি রাশিয়ায় দশ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আবেল গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগে ত্রিশ বৎসর দণ্ডিত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

১১ই ফেব্রুয়ারী—গত শুক্রবার এবং শনিবার চট্টগ্রামে ছাত্রদের ব্যাপক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ হয়। শনিবার নন্দনকাননে পুলিস ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ কালে পুলিস লাঠি ও গুলী-চালনা করে। গুলীতে একজন নিহত ও ১৫ জন আহত হয় বলিয়া প্রকাশ।

নির্ভরযোগ্য মহলে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, নেপাল সরকার যে হেলিকপ্টারখানি ক্রয় করিয়াছিলেন বিপ্লবীরা তাহা গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে। সরকারের হেলিকপ্টার মাত্র একখানিই ছিল।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৪০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 24th February, 1962.

২৯ বর্ষ॥ ১৭ সংখ্যা॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১২ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

হিন্দী জবরদস্তি

আমাদের দেশে সরকারী, বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাধরগণের কাজ-কর্মের ধারা প্রায়ই দেখা যায় বাস্তব কান্ডজ্ঞানবর্জিত। অথচ এ-সব প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার সংগে দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের ভালোমন্দ এবং ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ক্ষমতাধর যাঁরা তাঁদের কাছে লোকে সুবিবেচনা ও সুবিচার প্রত্যাশা করে। কিন্তু অনেক সময়েই সুবিচারের চেয়ে অবিচার ঘটে বেশী। "আমরা হুকুম আর অন্যের তামিল" এই তুঘলকী ঐতিহ্য আমাদের দেশের জনস্বার্থসংশিলষ্ট বহু প্রতিষ্ঠানের সংগে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এরজন্য সাধারণত আমলাতন্ত্রের উপর দোষ দেওয়া হয়। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান স্বয়ংশাসিত, পুরোদস্তুর আমলাতন্ত্রের আওতায় নয়, সেগুলির অবস্থাই বা কি? কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা-বোর্ড, গ্রামপঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষাপর্ষদ, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাধরগণও খুব সোজা জিনিসকে নিজেদের খুশীমত ঘোরালো করে কম অনর্থ ঘটান না। ফলে লোকের অশ্রদ্ধা বাড়ে, অসন্তোষ প্রবল হয় এবং কখনও কখনও অন্যায়ের প্রতিকারে ব্যর্থ হলে দেখা দেয় আন্দোলন, বিক্ষোভ।

কর্তৃপক্ষগণ কোনও বিষয়ে অসংগত আবদার বা দাবি পূরণ করুন, আমাদের বক্তব্য তা মোটেই নয়। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এবং পরে তার ফলাফল কী হতে পারে সেটা বিবেচনা করা নিশ্চয়ই ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের কর্তব্য। একটি দৃষ্টান্ত। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি নির্দেশ দেন যে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রকেই মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে হিন্দীতে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে হবে। নির্দেশটার উদ্দেশ্য এক কলমের খোঁচায় উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রশ্ন হল, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা যে-পরিমাণ হিন্দীপ্রেমী- সে পরিমাণ বিদ্যানুরাগী কি না। আরও কথা, এইসব বিদ্বান ব্যক্তিরা ক্ষমতা প্রয়োগের সময় ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ সম্পর্কে কিছুমাত্র সহানুভূতি পোষণ করেন কি না।

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত কলেজগুলির বহু ছাত্রছাত্রী অহিন্দী ভাষী; বাংলা ও তেলেগু-ভাষী এবং আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হিন্দী-ভাষী ছাত্রছাত্রীর তুলনায় নিশ্চয়ই কম নয়। সংখ্যায় কম-বেশীর প্রশ্ন অবশ্য অবান্তর। কারণ অহিন্দীভাষীদের সমস্ত পাঠ্য বিষয়ে হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করাই ঘোরতর অন্যায়, মারাত্মক জবরদস্তি। পশ্চিম বাংলার স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্রছাত্রী অবাঙালী, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী পশ্চিম বাংলায় লেখাপড়া করে। আজ যদি হুকুম জারী করা হয় যে এই রাজ্যের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে যাবতীয় পাঠ্য বিষয়ে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তাহলে অবস্থা কী দাঁড়ায়? এর ফলে অবশ্যই বিহারের এবং অন্যান্য রাজ্যের বহু অবাঙালী ছাত্রছাত্রী যারা পশ্চিম বাংলায় শিক্ষার্থী, তাদের অবিলম্বে লেখাপড়ায় ইস্তফা দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। হিন্দীপ্রেমীদের সৌভাগ্য যে পশ্চিম বাংলায় এ-ধরনের তুঘলকী হুকুম চালু হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীপ্রেমী কর্তারা মূঢ়তা ও ক্ষমতান্ধতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে লজ্জিত নন।

কিন্তু রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই হিন্দীওয়ালাদের একচেটিয়া সম্পত্তি গণ্য হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞান অনুশীলন ও বিদ্যার প্রসার। আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী, বাংলা বা আর যাই হোক, তার প্রয়োজনমত চর্চায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই উদ্যোগী হতে পারে; তাতে আপত্তির কারণ নাই। আপত্তি তখনই যখন বহু ভাষী ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ হিন্দীর সাম্রাজ্যভুক্ত করায় চেষ্টিত হন। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ-ধরনের চেষ্টা কেবল ভাষামোহান্ধতার পরিচায়ক নয়, কান্ডজ্ঞানহীন ক্ষমতামোহান্ধতার দৃষ্টান্ত হিসেবেও এর তুলনা মেলা ভার।

সরকারী, বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাধরগণ বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য না রেখে যদৃচ্ছা হুকুম জারী করে থাকেন, এ-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দীতে পরীক্ষা দেওয়ার হুকুম দিয়ে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছেন তা এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জঘন্যতম নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারাও সম্ভবত জ্ঞানবান, বিদ্বান, কিন্তু তাঁরা প্রকৃতিস্থ কি না সন্দেহ হয়। নতুবা বহু সহস্র অহিন্দী-ভাষী ছাত্রছাত্রী যারা হিন্দী ভাষার মাধ্যমে তাদের পাঠ্য বিষয়গুলি চর্চা করে নি, তাদের অকস্মাৎ শুদ্ধ হিন্দীতে পরীক্ষা দেওয়ার হুকুম জারী করা হল কোন্ যুক্তিতে? রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী চান—ছাত্রছাত্রীদের অধীত বিদ্যা ও বুদ্ধির মূল্যে বিচারের জন্য পরীক্ষা, না হিন্দীর ফাঁসে বহু সহস্র অহিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীর সর্বনাশ? একেই বলে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের অসহনীয় মূঢ়তা, যার প্রতিবাদে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অহিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীরা অন্য উপায় না দেখে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছে।

ছাত্রদের আন্দোলন ও বিক্ষোভের প্রয়োজন হত না রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুগ্র হিন্দীপ্রেমী কর্তৃপক্ষ যদি ন্যায়-পরায়ণ হতেন, সময়োচিত বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছু পরিমাণ নরম হয়েছেন, ঘোষণা করেছেন যে, এক বৎসরের জন্য পরীক্ষায় হিন্দী মাধ্যম প্রবর্তন স্থগিত রইল। কিন্তু একে ন্যায়বিচার বলা যায় না। হিন্দীকে শিক্ষা ও পরীক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে চালু করা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সময়েই উচিত হতে পারে না। বিহারের হিন্দীপ্রেমীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অহিন্দীভাষীদের উপর এরকম জবরদস্তি করায় ক্ষান্ত না হলে গুরুতর অনর্থ ঘটবে; অহিন্দীভাষীদের মাতৃ-ভাষায় কিম্বা ইংরেজীতে পঠনপাঠন ও পরীক্ষার অধিকার যদি হরণ করা হয় তাহলে পশ্চিম বাংলায় হিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীরাও তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিষ্কার-ভাবে সুদৃঢ় নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য যে, কোন রাজ্যেই শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যাপারে হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা চলতে পারে না।

নির্বাচন প্রথমে পশ্চিমবঙ্গেই শুরু হইয়াছে
গোখেলের বানী সিদ্ধান্তময়
এ রাজ্য সর্বব্যাপারেই
অগ্রনী।
শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ন একটি
বিবৃতি দিয়াছেন:
ঘোলা জলে মৎস্য শিকারের
উদ্যোগ।
নেহরুর পরে কে?
শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতীয় নির্বাচনের
ফলাফল এখন বৃহৎ
শক্তি গোষ্ঠীও
খুব আগ্রহভরে
লক্ষ্য করিবেন।
কৃপালনীকে ভোট দিন
মেননকে ভোট দিন
অন্তত একটি
কেন্দ্রের ফলাফল
ত বটেই
প্রস্তাবিত ইউরোপীয় রাজনৈতিক
ঐক্যসাধনে দ্য গলের সম্মতি মিলিয়াছে
উদ্যোগটা আডেনাওয়ারের

বৈদেশিকী

মানুষ মানুষের প্রতি কোথায় কী করছে সেই খবরই এখন মনকে সর্বদা ব্যস্ত বা ত্রস্ত করে রাখে। ভালোমন্দ যা কিছু সবেরই কর্তা মানুষ। আশা বা ভয় সবই মানুষের কাছ থেকে এই ভাবনাতেই মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ঝড় ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন এখনো ঘটে, তার খবরও কাগজে বেরোয়, কিন্তু সেগুলি এখন (সাক্ষাৎ ফলভোগীদের নিকট ছাড়া) "মার্জিনাল" খবর অর্থাৎ সেগুলি মনের প্রত্যন্তভাগ মাত্র ছুঁয়ে যায়। পূর্বে মানুষের মনে প্রাকৃতিক ঘটনার গুরুত্বের বোধ অনেক বেশী প্রখর ছিল। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ বশ করতে পেরেছে (আসলে মানুষ ভাবছে যে বশ করতে পেরেছে) বলে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের সমীহের ভাব আর নেই। সেজন্য মানুষের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার নিজস্ব গুরুত্ব যেন আর নেই। প্রাকৃতিক শাস্তি মানুষের ভালোমন্দ এমন কিছু করতে পারে যাকে দান বা শাস্তি বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—এই ধারণা চলে গেছে বা চলে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে কুসংস্কার দূর হওয়া নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে একটু ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রম থাকাও বোধহয় মানবসমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে দরকার। "অস্টগ্রহ" নিয়ে যে হল্লাটা হোল তাতে যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিন্তু সেই ধরনের সম্ভ্রম মোটেই নয়। নামকীর্তন করে বা যজ্ঞে ঘি পুড়িয়ে প্রলয় আটকাবার ভরসা যাঁরা করেন তাঁদের মনোভাবের যথার্থ বর্ণনা করলে সেটা সুশ্রাব্য হবে না। প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে যে স্বাস্থ্যকর ভয় বোধের কথা আমরা বলছি সেটা অন্য রকম জিনিস। সে ভয়বোধ যাঁদের হয় তাঁরা আর্তনাদ করেন না। তাঁরা মানব শক্তির সীমানা সম্বন্ধে যেমনি সচেতন তেমনি অনমনীয় তাঁদের আত্মসম্ভ্রমবোধ। তাঁরা জানেন যে প্রকৃতির শক্তি এমন রূপেও প্রকাশ পেতে পারে যাকে অলংঘ্য বিধান বলে মেনে নেওয়া—আর্তনাদ না করে, প্রাণভিক্ষা না চেয়ে মেনে নেওয়াই মানবাত্মার পক্ষে সম্মানকর এবং গৌরবজনক।

এই ধরনের যে "অদৃষ্টে বিশ্বাস" বা "অদৃষ্টকে" মানা, তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ পুরুষকারের কোনো অসঙ্গতি নেই, বরঞ্চ বলা যায় যে, এই ধরনের "অদৃষ্টে বিশ্বাস" ছাড়া মানুষের পুরুষকারও পূর্ণ হতে পারে না। তাগাতাবিজের সাহায্যে যাঁরা অদৃষ্টকে বশীভূত করতে চান তাদের মনোভাব এবং এ জিনিসের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান। আবার তাগাতাবিজে বিশ্বাস এবং মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ে যা খুসি করতে পারে এই বিশ্বাস, এ উভয়ই কিন্তু কুসংস্কার—অবশ্য দুটো দুরকমের এবং দুটোর বাস্তবে ফলও দুরকমের।

এসব কথা মনে এলো আজকের কাগজে উত্তর ইউরোপে ঝড়ের কবর পড়ে। জার্মানীর উপর দিয়ে যে বেগে ঝড় বয়ে গেছে সেটা নাকি অভূতপূর্ব। উদ্বেলিত সমুদ্রের আঘাতে বহু বাঁধ ভেঙেগেছে, বহু শহর প্লাবিত হয়েছে, কত সম্পত্তি যে বিনষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, মানুষজনও অনেক মারা গেছে। ধ্বংসের পরিমাণের পুরো খবর এখনও পেতে বাকী।

(মোট কথা এই রকম কাণ্ড যদি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতবর্ষে ঘটত তাহলে বহুলোক নিঃসন্দেহে ভাবত যে, এটা "অষ্টগ্রহ সংযোগের" ফল এবং অস্টগ্রহের কারবারীদের পসার বেড়ে যেত। এদের পসার এখনো বাড়তে পারে। নামকীর্তন এবং যাগযজ্ঞকারীদের চেষ্টায় পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে একথা বিশ্বাস করতে যারা প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের বুঝানো কঠিন নয় যে, যে-বিপদ সারা পৃথিবীকে প্রায় ঘিরে ফেরেছিল সেটাকে নামকীর্তন ও যাগ-যজ্ঞের দ্বারা মোটামুটি সরানো গেছে এবং

বিপদটা যে মোটেই অলীক ছিল না সেটা প্রমাণ করার জনাই পৃথিবীর এক অংশকে একটু ছুঁয়ে দিয়ে গেল।)

কিছু কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর কাগজে হামেশাই থাকে, কিন্তু মনের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, মনুষ্যকৃত দুর্যোগ ছাড়া অন্য দুর্যোগ যেন আলোচ্য বিষয় বলেই বোধহয় না। জার্মানী সম্বন্ধে আজ কিছু লেখার কথা ভাবা গিয়েছিল। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে পৃথকভাবে একটা মিটমাটের সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা করছেন বলে শুনা যায় সে বিষয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কিছু লেখা যেতো। সেই সঙ্গে পশ্চিমা শক্তিদের নিজেদের মধ্যে যে কত এবং ভাববিরোধ রয়েছে তাঁর কথাও এসে পড়ত। প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের প্রসঙ্গ উঠলে তার সঙ্গে আলজেরিয়ার কথা এবং বর্তমানে ফ্রান্সে যে প্রায়-গৃহ-যুদ্ধের অবস্থা উপস্থিত হয়েছে সে বিষয়েও উল্লেখ না করে পারা যেতো না। এবং যেহেতু খবরের কাগজী কায়দা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে লিখতে হলে সর্বশেষ ঘটনার উল্লেখ করে শুরু করতে হয়· অতএব নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্সে পশ্চিমা, কম্যুনিস্ট এবং নিরপেক্ষ মিলে আঠারোটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের যোগ দিতে আহবান করে শ্রীক্রুশ্চভ যে প্রস্তাব করেছেন তার উল্লেখ প্রথমেই করতে হোত।

কিন্তু জার্মানির ঝড়ের সংবাদ পড়ে হঠাৎ কেন জানি না মনে পড়ে গেল যে মানুষ কে কোথায় কাকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে কেবল সেই আলোচনাই তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ করে যাচ্ছি, সে আলোচনা থেকে প্রকৃতির কথা তো এক-রকম নির্বাসিত বলা যায়। কেন? মানুষের উপর মানুষের শক্তি, প্রকৃতির উপর মানুষের শক্তি কেবল মানুষ এবং তার শক্তি, এই নিয়েই আলোচনা। জার্মানীর ভয়ংকর ঝড়ের খবর পড়ে হঠাৎ মনে হোল, ঝড়ের ধাক্কাটা কি কেবল মানুষের দেহ, ঘরবাড়ির উপরই লেগেছে, মানুষের মনে লাগাবার মতো কি তাতে কিছু নেই?

মানুষ মনে করে প্রাকৃতিক শক্তিকে আর ভয় করার দরকার নেই। প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় করা এবং ভূতপ্রেতকে ভয় করা একই জিনিস বলে আমরা মনে করতে শিখেছি। মানুষ মনে করে যে সে প্রাকৃতিক শক্তিকে দাসীতে পরিণত করেছে। এখন সে ভয় করে নিজের শক্তিকে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যেটা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছে সেটা কি মানুষের শক্তি অথবা মানুষ যে-প্রাকৃতিক শক্তিকে আবিষ্কার করেছে তাকে স্ববশে আনতে পারছে না বলেই সে ভীত? নিউক্লিয়ার শক্তি মানুষ আবিষ্কার করেছে, কিন্তু নিউক্লিয়ার শক্তিকে স্ববশে রাখার শক্তি তার নেই। মানুষ বস্তুজগতের শক্তিকে করায়ত্ত করেছে, কিন্তু সে তার নিজের প্রকৃতিকে বশে আনতে পারেনি। মানুষ জড়বিজ্ঞানের শীর্ষদেশে আরোহন করেছে, কিন্তু তদনুযায়ী তার নৈতিক অগ্রগতি হয়নি, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মানব সমস্যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই বর্ণনা কি ঠিক? আসলে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে স্ববশে এনেছে, এই কথাটাই ঠিক নয়। আসলে নিউক্লিয়ার শক্তিকে মানুষ বশ করতে পারেনি, মানুষের পক্ষে নিউক্লিয়ার শক্তিকে কোনোদিন বশ করা সম্ভব হবে কিনা, এ প্রশ্নও করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক জয় এবং নৈতিক পরাজয় এই সূত্র দিয়ে বর্তমান অবস্থার যে বিশ্লেষণ করা একটা ফ্যাশান হয়েছে, এই ফ্যাসানটার একটু গোড়া খুঁড়ে দেখা আবশ্যক।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধ্বনি

ইংরিজি পড়ে পড়ে আমাদের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, একই অক্ষরের বুঝি সাতান্ন রকমের উচ্চারণ হয়। Cat, bald father, about-এর একই a চার রকম উচ্চারিত হচ্ছে। গল্প শুনেছি, এক ফরাসীকে fish শব্দ লিখতে বলা হলে সে লেখে ghoti. বললে, প্রথম gh=f কারণ laugh শব্দে gh-এর ঐ উচ্চারণ আছে। তারপর o=i কারণ women-এ o অক্ষর i-এর মত উচ্চারিত হয়। ti=sh, কারণ nation-এ ti-এর sh উচ্চারণ আছে!

কিন্তু লাতিন, ইতালিয়, রুশ এবং জর্মন ভাষা যেভাবে লেখা হয় মোটামুটি সেই-ভাবেই পড়া হয়। সংস্কৃত ও হিন্দীর বেলাও তাই। এমন কি যদিও ফরাসী শিখতে আরম্ভ করার সময় মনে হয় ভাষাটা বড় গোলমেলে তবু, কয়েকদিন পরে কয়েকটি আইন নিজের থেকেই ধরা পড়ে। তখন ফরাসী পড়তে মোটামুটি আর কোনো ভুল হয় না। বাঙলা ইংরিজির মতই বিদঘুটে। আরবী ফার্সী এবং উর্দু, না বুঝে পড়ার উপায় নেই, কারণ হ্রস্ব স্বর-বর্ণগুলো এসব ভাষায় দেখানো হয় না — কুরান শরীফ ও দু-একখানা ধর্মগ্রন্থ ছাড়া।

বাঙলার অ, ই এবং ঈ, উ এবং ঊ উচ্চারণ হ্রস্ব নয়, দীর্ঘও নয় — মাঝামাঝি।

জর্মন ধ্বনি

জর্মন বানান ও উচ্চারণ খুব আইন মেনে চলে, ব্যত্যয় অতি অল্প।

a=hat, আমাদের বাঙলা 'আ'-এর চেয়ে হ্রস্বতর। জর্মন ভাষা (এবং ফরাসীতে) a কখনোই ইংরিজি হ্যাট (a) উচ্চারণ ধরে না। অবশ্য অন্য স্বরের সঙ্গে যুক্ত হলে আলাদা। পূর্বেই বলেছি লাতিন অক্ষর হ্রস্ব দীর্ঘ দেখায় না। তাই জর্মনে ঐ a কখনো হ্রস্ব কখনো বা দীর্ঘ হয়।

i-এর বেলাও তাই : কখনো হ্রস্ব ই কখনো সংস্কৃতের দীর্ঘ ঈ।

হ্রস্ব এ জর্মনে নেই, সংস্কৃতেও নেই। দীর্ঘ এ আছে। কখনো ee দিয়ে কখনো বা eh দিয়ে দেখানো হয়।

পূর্ব বাঙলায় যখন ক্যান্ বলা হয় তখন যে a উচ্চারিত হয় সেটা ফরাসী জর্মন উভয় ভাষাতেই আছে, কিন্তু বোঝবার জন্য একাধিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম

বাঙলায় 'কেন' বলতে যে যা উচ্চারিত হয় সেটি অন্য ধ্বনি।

ঘর বলতে যে 'অ' উচ্চারণ করি সেটি জর্মনে আছে। কিন্তু 'o' অক্ষর দিয়ে 'অ' এবং 'ও' দুই-ই বোঝানো হয়।

u অক্ষর দিয়ে হ্রস্ব দীর্ঘ দুই উকারই বোঝানো হয়।

ie এক সঙ্গে এলে দীর্ঘ ঈ হয়। যেমন Kiel (কীল) শহর। ei এক সঙ্গে থাকলে অনেকটা বাঙলা 'আই'য়ের মত হবে। যেমন Heidelberg (হাইডেলবের্গ)। General Keitel (গেনেরাল কাইটেল)। eu=অয়।

j অক্ষর জর্মনে য় (অর্থাৎ সংস্কৃত য) উচ্চারণ হয়। সংস্কৃতে পণ্ডিত Hermann Jacobi (হেরমান য়াকোবি)। এ্যারোপ্লেন নির্মাতা Junkers (য়ুনকার্স)।

দীর্ঘ বোঝাবার জন্য aa, ee, oo ব্যবহার হয়। uu-র উচ্চারণ কিন্তু আলাদা আলাদা হয়। যেমন vakuum (ভাকুউম)।

স্বরের পর r অক্ষর এলে ইংরিজিতে সেই স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন Garden. জর্মনে ঠিক সেইরকম h দিয়ে অনেক সময় স্বরকে দীর্ঘতর করা হয়। যেমন Bahn (বা ন, রেল)।

a, o, u-র উপর দুটি ফুটকি দিলে উমলাউট হয়। এর আলোচনা ফরাসী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কিছুটা হয়েছে। a-র উপর দুটি ফুটকি দিলে অনেকটা পূব বাঙলার 'ক্যান্'এর য ফলার মত। ফরাসী faire-এর ai-তে এই উচ্চারণ। উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে উমলাউটগুলো ভালো করে শিখে নিতে হয়।

পশ্চিম বাঙলায় বাঙালী বলতে যে 'ঙ' উচ্চারণ হয় সেটা জর্মানে আছে। যেমন Dinge (ডিঙে)।

শ বোঝাতে হলে জর্মন sch ব্যবহার করে। যেমন অর্থনৈতিক Schumpeter (শুমপেটার), Schacht (শাখ্ট্)। জর্মন শ আমাদের বাঙলা শ-এর চেয়ে অনেক বেশী কর্কশ।

ch যদি a, o বা u'র পরে আসে তবে বাঙলার বিরক্তিসূচক 'আখ্‌থ্'-এর মত হয়। সিলেটিরা যখন 'কেনে' উচ্চারণ করেন তখন অনেকটা ঐ ch. আরবী ফরাসী উর্দুর খে অক্ষর একটু বেশী ঘষা হয়। সংগীতকার Bach (বাখ্)।

ch যদি e, i (এবং স্বভাবতই উমলাউটের পরে, কারণ উমলাউটের দুটো ফুটকি e চিহ্ন-জ্ঞাপক)-এর পর আসে, তবে সেটা অন্য রকম উচ্চারণ হয়। অনেকটা যেন শ, হ্ এবং উপরের খয়ে মেশানো। কাজেই Kirche (কির্শে) এবং Kirsche উচ্চারণে পার্থক্য মন দিয়ে শিখতে হয়। রাইনল্যাণ্ড-বাসীরা প্রায়ই এই পার্থক্য করতে পারে না। বার্লিনের উপভাষাতে এই ch প্রায় কয়ের মতই শোনায়। ich শোনায় ik! অন্তে-ig-র উচ্চারণ (যেমন Koenig) উপরের ch-র মত।

জর্মান W-র উচ্চারণ অনেকটা ইংরিজি V-র মত।

SS-এর উচ্চারণ ইংরিজি SS বা সংস্কৃত 'স' মত। তবে জর্মন দ্বিত্ব করে না। হেরমান Hesse (হেসে)। S অক্ষর স্বরের পূর্বে এলে তার উচ্চারণ অনেকটা ইংরিজি Z অর্থাৎ পূর্ব বাঙলার 'জ'-এর মত।

জর্মন Z-এর উচ্চারণ ৎস-এর মত। Nazi=নাৎসি। শব্দের গোড়ায় এই Z এলে উচ্চারণ করতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়। জর্মন c-র উচ্চারণ জর্মন Z-এর মত।

জর্মন V'র উচ্চারণ সাধারণত জর্মন f অর্থাৎ ইংরিজি f-এরই মত। Baron Von Rothschild (বারন ফন্ রোর্টশিল্ট্)। তবে মাঝে মাঝে জর্মন W অর্থাৎ ইংরিজি V-এর মতও হয়।

সিলেবলের শেষে জর্মন b ও d যথাক্রমে p ও t উচ্চারিত হয়।

শেষের e জর্মনে উচ্চারিত হয়। এখন শিখে গিয়ে থাকলে বলতে পারিনে, তবে আমার ছেলেবেলায়ও জর্মানরা টাগোরে (Tagore) বলতো।

* * *

এ ছাড়া accent, intonation ইত্যাদিও আছে। তবে ইংরিজির চেয়ে সোজা॥

ধ্বনি
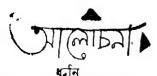
শ্রীযুক্ত 'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বিনীত নিবেদন, মহাশয়, শ্রদ্ধেয় মুজতবা আলী গত ১৪শ সংখ্যা 'দেশে' মুমুক্ষু জনসাধারণের নিমিত্ত ধ্বনিশাস্ত্রের অবতরণিকা করেছেন। এবং ক্রমশর অব্যবহিত পূর্বে মঙ্গোলীয় এবং দ্রাবিড় ভাষা ব্যতীত অন্যান্য (ইন্ডো-ইউরোপীয়, সেমেটিক এবং যাযাবর ভাষাগুলি কি?) ভাষার একমাত্র দিগ্‌দর্শক হিসেবে রেফারেন্স কেতাবগুলির প্রান্তে প্রবন্ধটি রাখা কর্তব্য, এবংবিধ বিধান দিয়েছেন।

আমি মুমুক্ষু, সুতরাং অজ্ঞ। শিক্ষণীয় বিষয়ে উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। তবু ধৃষ্টতা প্রকাশে তৎপর হচ্ছি, কেননা গুটিকয়েক ব্যাপারে মনে হল এতদিন যা শুনে এসেছি বা কুড়িয়েছি সব অতি স্থূলে। বিনীত অনুরোধ, জনাব আলী সাহেব যেন সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ (প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ; আলী সাহেবের ইতঃপূর্বে বিশেষজ্ঞ-র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ব্যক্তিদের সুবিধার্থে যৎসামান্য আলোকসম্পাত করেন।

ইংরিজীতে তথা যাবতীয় ইন্ডো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে (এক ভারতীয় ভাষা ভিন্ন) শুধু 'ট' বা 'ড' নেই, এইটেই এতাবৎকাল জেনেছিলাম। হিন্দুস্থানী (হিন্দুস্তানীও বলা চলে) ভাষাসমূহে (দ্রাবিড়-গোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত) 'ট' 'ড'-র উচ্চারণ স্থানকে lingual (যদিও paleto-dental বা তালব্য-জিহ্বা বলা আরও সমীচীন) বলা হয়। ইন্টারন্যাশন্যাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশন (API) চিহ্ন অনুযায়ী 't' 'd' অথবা সচরাচর 'টি' নিচে ফুটকি 'ডি' নিচে ফুটকি লেখা হয়। সাহেবদের অর্থাৎ ইংরেজদের 't' 'd' উচ্চারিত হয় 'ত' 'দ' হিসেবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ dento-lingual, কিন্তু তারপর জিবের কাঠিন্যের জন্যে আমাদের অনভ্যস্ত কানে 'ট' এবং 'ঠ'-র মাঝখানে একটা-কিছু হয়ে দাঁড়ায়। (একসঙ্গে স-ট-অ ('স' নয়) উচ্চারণ করলে বা স্টেশন সঠিক বললে পার্থক্য ধরা পড়বে।) জার্মানে 'ট' কয়েক জায়গায় উচ্চারিত হয়। যেমন, s-এর আগে বা শব্দের শেষে -t, d, বা dt থাকলে। যথা, erste, streber, nacht, abend, Schmidt ইত্যাদি। তবে মধ্য (ভৌগোলিক অর্থে) জার্মানীতে এবং বাভারিয়ায় ওরা ফরাসী বা ইংরিজী মতে শুধু 't' 'd'-ই বলে, যদিও তা উৎকৃষ্ট জার্মান নয়। Heidelberg হাইদেলবার্গকে মান ধরলে সেখানে প্রথমোক্ত ধরনে উচ্চারণ করে।

ইউরোপীয় (ইংরিজী সমেত) ভাষায় যে

শব্দে 'ত' বা 't', 'দ' বা 'd' ব্যবহৃত হয় তার একটি প্রমাণ (নজির দেখানোটা পেডান্টি-সিটী, তবু) পেশ করছি। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী ৎ+শ=চ্ছ। ওদের t (ৎ)+sch (শ)=ch। যেহেতু ইংরেজদের শুদ্ধ ব্যঞ্জন বর্ণ নাস্তি (সবই সার্ধ-মহাপ্রাণ, এবং এইটেই একমাত্র ভাষা যাদের এই বিশেষত্ব আছে) ওদের কাছে 'চ' হয়ে যায় 'চ্ছ' আর এই ওদের একক শুদ্ধ উচ্চারণ। 'চ' 'জ' শব্দ ইউরোপীয় কিছু কিছু ভাষায় নেই; যেমন, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ ইত্যাদি। সুতরাং একই নিয়মে d (দ্)+zh ('শ'-র ঘোষ বর্ণ, হিন্দুস্থানী ভাষায় এর প্রতিশব্দ নেই, দ্রাবিড় গোষ্ঠীতে বিদ্যমান, যদিও উচ্চারণ পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে পড়েছে)='জ' বা 'জ্ঝ'।

আলী সাহেব গ্রীক পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। ওটা আমাদের কাছে নিতান্তই গ্রীক। তবু, গ্রীকে যাকে থীতা (দেশী মতে 'থিটা') বলা হয়, সেটার উচ্চারণ ইংরিজীর thank-এ 'th'-এর মত নয়, হিন্দুস্থানীর মহাপ্রাণ 'থ'-র মতই। যদিও বর্তমানে API এই 'থিটা' ইংরিজী 'th' বা আরবীর একটি বর্ণের ধ্বনি (যথা, 'সদর' বা 'খাস'-এর 'স' যেটা ফারসীর প্রভাবে 'স' এবং আমাদের জিবে 'শ' হয়ে দাঁড়িয়েছে) প্রকাশের জন্যে ব্যবহার করেন। ওল্ড ইংলিশে 'থ' ছিল এবং বর্তমানে বদলে that-এর 'th' হয়েছে। API সেই প্রাচীন অক্ষরই চিহ্নরূপে ব্যবহার করেন।

ইংরিজীর 'th' (thank) এবং th (that)-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য চিঠির স্বল্প পরিসরে বোঝানো সম্ভব নয়, যদিও ব্যাপারটা আদৌ কঠিন কিছু নয়। ইংরিজীর সঠিক উচ্চারণ ধরবার প্রকৃষ্ট উপায় ওদের স্বরবর্ণের 'r' এবং উপর্যুক্ত 'th'-দ্বয়।

আমরা ইংলিশে বুক পড়ে কথঞ্চিৎ রে-প্লে করি। সে ক্ষেত্রে এক'জন'-কে ভাঙিয়ে তামাম ইউরোপে কী করে ভাবলে প্রথমে জিবের এবং অনধিক পরেই মাথার নাড়ী ছেড়ে যাবার দাখিল হয়। উচ্চারণে কেবলমাত্র ইঙ্গিত দেওয়া হল। যথা, স্প্যানিশ Juan (হুয়ান), রুশ Ivan (ঈভান, 'ভ' কেন, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ পশ্য), ফরাসী Jean (জাঁ), রোমান্স অন্য কয়েকটি ভাষায় Ion (ঈয়ন), জার্মান এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষাগুলিতে Johann (য়োহান) ইত্যাদি। এইরকম আরও প্রচুর আছে। ব্যাকরণ অনুযায়ী Mendes France মাঁদ্যা নন, মাঁদ্যাস, Henri Bergson বের্গস' নন, বের্গসন্, George Sand ফরাসী প্রক্রিয়ায় জর্জ তৎপরে সাঁ নন, স্যান্ড (আঁদ্রে মোরোয়ার 'লেলিয়া' পশ্য)।

আলী সাহেব 'খ'-য়ের জন্যে অনেক সুপারিশ করেছেন। আমিও 'খ'-য়ের খয়ের খাঁ (যদিও কথাটা খয়েরখোসহ্, মানে শুভানুধ্যায়ী) সুতরাং একটি মাত্র নিবেদন করবো। হিন্দুস্থানী ভাষার 'খ' এবং উক্ত বিতর্কাধীন 'খ' এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। একজন কণ্ঠবর্ণ, অপরজন আরও গভীরে, এদিকে জ্ঞাতিমাত্র মূর্ধন্য 'ষ'। সুতরাং উষ্মাভরে 'আখ্' বললেই ঠিক চলবে না। প্রতিশব্দ না থাকায় 'কাঁচি'-র 'ক', 'খবর'-এর 'খ', 'গাফিলতি'-র 'গ' ভাটপাড়া প্রথায় করলে ক্ষতির পরিমাণে তারতম্য ঘটবে না। Chaim Weizmann এবং Heinrich Heine একই 'ch' নিয়ে খাইম এবং হাইনরিখ (হাইনরিঃ লেখা বাংলায় আরও সমীচীন)। আবার 'h' নিয়েও (রোমক বানানে Tchehov (যাকে Chekhov লিখলেই চলে) শেহভ হয়ে গেলেন। তবে গ্রীক 'ক্সাই' (ইংরিজীর 'X') এবং X 'খাই' (ঐ গোলমেলে 'খ') অনেকাংশে এই গোলযোগের জন্যে দায়ী।

পরিশেষে একটা কথা নিবেদন করে পত্র শেষ করছি। বিভিন্ন অথরিটীবৃন্দ ফাউলর, জোন্স ইত্যাদি বলেন, বৎস, তোমার উচ্চারণ যেন তোমার প্রতিবেশী অপেক্ষা বেশী ভাল না হয়। তাই বলছিলাম ছোচ্ছেবেকে যাই করা হোক, সিরোলীন রুশে ('রুশ' নয়) যে দোকানেই বিক্রি হোক, 'গ্যেটে' গয়ঠী হন, রস উপলব্ধি করবার জন্যেই ভাষা। মেৎসো-ফান্তি সাকুল্যে সোয়া তিন শ' ভাষা এবং উপভাষা নিয়েও সৃষ্টি কিছুই করেন নি। শেক্স্পীয়র সেক্ষপীর হলে বা ক্রীস্তফ্ জীন ক্রাইস্টফ্ হলে বা রেইয়্যাভিঃ (বা '—ভিগ') রিক্জেভিক্ হলে বা ওদ্কলোঞ্ ইউডিকলোন হলে রসের ভিয়েনে ঘাটতি পড়বে না। ইতি—

দেবব্রত চক্রবর্তী
দিল্লি—৬

সজনীকান্ত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
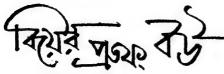
সজনীকান্ত যে এমন অকস্মাৎ চলে যাবে সেকথা ভাবতে পারিনি। সেও কি ভাবতে পেরেছিল? এই সেদিনও সে বললে, 'খবরের কাগজটা ওলটাবার উপায় নেই। একজন-না-একজনের মৃত্যুসংবাদ আছেই।'

এই বলে সজনীকান্ত সেদিন একটি একটি করে প্রত্যেকটি নাম আমাকে বলে গেল—গত কয়েক মাসের মধ্যে যাঁরা লোকান্তরিত হয়েছেন।

কিন্তু সে কি নিজেই জানতো বারোই ফেব্রুয়ারী সকালের খবরের কাগজে তার নিজের ছবিটি ছাপা হবে?

এমনিই মানুষের জীবন! এই জীবনের রহস্য।

মৃত্যুর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। সবাই আমরা ফাঁসির আসামী। শুধু জানি না—কবে কোন্ সময় আমাদের ফাঁসি হবে।

মৃত্যুকে ভুলিয়ে রাখাই জীবনের ধর্ম।

আজ কত কথাই-না মনে হচ্ছে তার সম্বন্ধে। মাসখানেক আগে আমি ছিলাম হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে। ধরা পড়লো আমি হাই প্রেসারের রুগী। ডাক্তার বললেন 'প্রেসার না কমলে অপারেশন হবে না।' চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। ভাবলাম—থাক্ অপারেশন। পালাই এখান থেকে। সজনী গিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে এলো। নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত আমার শিয়রের কাছটিতে বসে হাতে হাত রেখে বলে এলো, 'ভয় কিসের? ভয় পেয়ো না।'

কিন্তু আমার দুঃখ রয়ে গেল—আমি গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না তার শেষ সময়ে। আমাকে বাড়িতে বসিয়ে রেখে সে চুপিচুপি পালিয়ে গেল।

তবে শুনলাম নাকি ভয় সে পায়নি। আমি ছিলাম না, কিন্তু তারাশঙ্কর ছিল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে অক্সিজেন যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন নাকি সজনীকান্ত ডাক্তারদের বলেছিল, 'এই কি আমার শেষ নাকি? বলুন তাহলে, কিছু কাজ আছে, সেরে নিই।'

ডাক্তারেরা কিছু বলেননি।

কাজেই হাতের কাজ সে সেরে যেতে পারেনি। •

কেউ-ই পারে না। কত অসমাপ্ত কাজ পেছনে পড়ে থাকে। মানুষকে চলে যেতে হয় অকস্মাৎ। তাকেও চলে যেতে হলো।

এই সবে সে আরম্ভ করেছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সঙ্কলনের কাজ। সে কাজ শেষ করা আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে কিনা জানি না।

ব্যক্তিগত সংসারের কাজের কথা নাই-বা বললাম! দুঃসাধ্য তার সীমান্ত নির্দেশ।

সজনীকান্ত

ভাস্কর দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্মিত

পেছনে থাক পড়ে রইলো তার পরমাত্মীয় পরিজন—জীবন-নাট্যের সে অশ্রুসজল নিরবচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদ শুধু তাদেরই জানা।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় ছিল আমাদের 'কালি-কলম' পত্রিকার আপিস। রোজ বিকেলে সেখানে একটি আড্ডা বসতো। আড্ডায় অনেকেই আসতেন, শুধু একটি দিনের জন্যও কামাই করতেন না মোহিতদা। (কবি মোহিতলাল মজুমদার)

কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করলাম—মোহিতদা আসছেন না। যদি-বা আসছেন—দেরি করে আসছেন।

হঠাৎ একদিন তিনি নিজেই এসে বললেন তাঁর দেরি করবার কারণ। বললেন, প্রেমে পড়েছি।

—কার?

—নতুন একজন কবির।

—কোথায় তিনি? কি নাম?

সেকথা কিছুতেই বললেন না মোহিতদা। অথচ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তাঁর নিজস্ব ভাষায় ক্রমাগত বলতে লাগলেন, তার কবি-প্রতিভায় আমি শুধু মুগ্ধ হইনি, বিস্মিতও হয়েছি।

মোহিতদা বললেন, তাকে একদিন ধরে আনবেন 'কালি-কলম' আপিসে।

আমরা তারই প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছি, এমন দিনে একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটে গেল আমার জীবনে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দোতলায় তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিস। পরশুরাম (রাজশেখর বসু) ম্যানেজার। আমি একদিন গেছি সেখানে। পরশুরাম জিজ্ঞাসা করলেন, লেখার জন্যে 'কালি-কলম' টাকা দেয়?

বললাম, যৎসামান্য।

—চলছে কেমন করে?

বললাম, অতি কষ্টে।

তিনি বললেন, চাকরি করবেন?

—পেলেই করি।

তৎক্ষণাৎ 'বেল' বাজালেন। বেয়ারা এলো। কাকে যেন ডাকতে বললেন।

অপরিচিত এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়াতেই

পরশুরাম বললেন, এ'কে নিয়ে গিয়ে কোথাও এক জায়গায় বসিয়ে দিন। আজ থেকে ইনি এখানে কাজ করবেন। লেখক—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

তাঁর সঙ্গে যেতে হলো আমাকে। যেতে যেতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাইপ্ জানেন?'
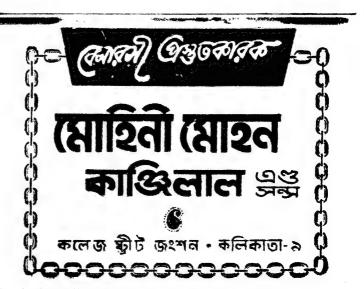
বললাম, জানি।

একটা টাইপ্‌রাইটারের সামনে আমাকে বসিয়ে দিয়ে তিনি একখানা ছাপা ক্যাটালগ্ এনে আমার হাতের কাছে ধরে দিয়ে বললেন, 'এইটে দেখে দেখে যতটা পারেন টাইপ্ করুন।'

বুঝলাম আমার কাজ বলতে কিছু নেই। দশটা পাঁচটা আপিস। থাকি ভবানীপুরে। যখন খুশী আসি, যখন খুশী চলে যাই। কেউ কিছু বলে না।

মোড় পেরিয়েই 'কালি-কলম' আপিস। এদিকে 'কালি-কলম', ওদিকে কল্লোল। একদিন টিফিনের সময় কল্লোল-আপিসে গিয়ে দেখি জমজমাট আড্ডা। কথায় কথায় চারটে বেজে গেল। ভাবলাম, পরশুরামকে গিয়ে বলি—করবার মত কিছু কাজ দিন, নইলে মন বসছে না, ফাঁকি দিচ্ছি। মাসের শেষে মাইনে নিতে পারব না।

রাস্তায় অশোকবাবুর সঙ্গে দেখা। অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে। সবে তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরেছেন। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি সুগঠিত দেহ। মুখে হাসি লেগেই আছে। দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।—'কোথায় যাচ্ছেন হন্ হন্ করে?'

'বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিসে। চাকরি করছি যে!'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

অশোকবাবু ধরলেন একখানা হাত।

'চলুন প্রবাসী-আপিসে!'

বললাম, বড্ডো ফাঁকি দিচ্ছি। পরশুরাম কি ভাববেন?

অশোকবাবু বললেন, 'সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি দেখে নেবো।'

অশোকবাবুর কব্জির জোর অসাধারণ। ছাড়ানো বড় শক্ত। যেতে হলো তাঁর সঙ্গে। সার্কুলার রোডের যে-বাড়িতে এখন প্রবাসী-আপিস, সে-বাড়িতে নয়। এর আগে যে-বাড়িতে ছিল সেই বাড়িতে।

সেখানে যাবামাত্র যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো—তারই নাম সজনীকান্ত দাস। সে তখন বসে বসে 'মহাভারত' এডিট্ করছে। কিছুক্ষণ পরেই মোহিতদার আবির্ভাব। বুঝতে দেরি হলো না—তাঁর নবাবিষ্কৃত কবি-বন্ধুটি কে।

সজনীকান্তের সঙ্গে এমনি করেই [illegible] পরিচয়।

কল্যাণে। সেই যে কলেজ-স্কোয়ারে শক্ত মুঠোয় আমার হাতখানা তিনি ধরেছিলেন সে-হাত আর ছাড়লেন না। বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকরি আমার সেইদিন থেকেই খতম হয়ে গেল। পরশুরামকে যা বলবার অশোকবাবুই বললেন। বহাল হয়ে গেলাম প্রবাসীআপিসের চাকরিতে। মাইনে পেতাম, কাজেই চাকরি বলতে দোষ নেই। কিন্তু চাকরির চেয়ে আড্ডা বলাই ভালো। কাজ ছিল ফর্মা-খানেক প্রবাসীর প্রুফ দেখা, আর সজনীর সঙ্গে এক-টেবিলে মুখোমুখি বসে গল্প করা।

বিকেলে বসতো জমাট আড্ডা। ক্ষুদুবাবু (অশোক চাটুজ্যে) গল্প বলতেন চমৎকার। হাসাতেন অথচ নিজে হাসতেন না। আড্ডা ভাঙবার পর একখানা রিক্শা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম সজনী আর আমি। কোনোদিন বসতাম গিয়ে কোনও পার্কে, কোনোদিন-বা দিলখুশা কেবিনে।

এইখানেই হয়েছিল 'শনিবারের চিঠির' আবির্ভাব।

তারপর জীবনের এই সুদীর্ঘ পথ বেয়ে চলেছিলাম আমরা পাশাপাশি। তখনকার দিনে এমন কোনও সাহিত্যিক ছিল না—সজনীকান্তের সংস্পর্শে যাঁরা আসেননি। সাহিত্যসেবীর সে এক বিরাট মিছিল।

পরবর্তীকালে সজনীকান্তের ঘনিষ্ঠতর বন্ধু ছিল তারাশঙ্কর। তাই সেদিন এই কথা জেনে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন—সজনীকান্ত যখন চলে যায়, তারাশঙ্কর ছিল তার শিয়রের কাছে বসে।

সজনীকান্তের কথা বলতে হলে বলা আর আমার শেষ হবে না। তার নিজের ভাষায় বলি—

"পরশমণি, সোনার খনি, হারিয়ে গেলে পথে
একটু সোনা দিচ্ছে আভাস তব,
কি যে পেলাম কি হারালাম বুঝতে কোনো মতে
নিজেই নারি কারে কি আর কব।"

সজনীকান্তের উদ্দেশে

বনফুল

ভাই সজনী,
তুমি চলে' গেলে?
আমরা সবাই তো দাঁড়িয়ে আছি
রাস্তায়, গাড়ীর অপেক্ষায়,
ভীড় করে' দাঁড়িয়ে আছি
পাশাপাশি ঘেঁসা-ঘেঁসি।
একটু আগেই তো তুমি পাশে ছিলে
করছিলে তোমার রসিকতা,
ডায়াবিটিস আর করোনারিকে তুচ্ছ করে।
হাসছিলে আর হাসাচ্ছিলে।
বলছিলে, এখন চিনি দোকানে শস্তা নয়
বাথরুমে শস্তা,
বলছিলে, এটা পরনারী আর করোনারির যুগ।
এই সেদিনই তো দুজনে একসঙ্গে
খেলাম ছানার জিলিপি
মহানন্দে
ডায়াবিটিস সত্ত্বেও!
হঠাৎ চলে' গেলে!
আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছি
ট্রাম-বাসে অসম্ভব ভীড়
লোক ঝুলছে
ট্যাক্সির জন্যে তপস্যা করতে হয়।
এর মধ্যে কখন কোন ফাঁকে এল তোমার রথ?
তুমি চলে' গেলে!

যে কীর্তি তুমি রেখে গেছ
তা ভবিষ্যতের সম্পত্তি
ভবিষ্যতই তার হিসাব রাখবে।
আমি বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত
আমি কেবল ভাবছি
তুমি চলে' গেলে?
সত্যিই চলে গেলে?
আর দেখা হবে না?

ঘাটশিলার এক আদিবাসীরা ছাড়া, মানে, যারা সেখানকার অনাদি বাসিন্দে তারা কেউ সেখানে পায়ে হাঁটে না। তাদের সবার সাইকেল আছে। কি ছেলে কি বুড়ো সবাই সাইকেলে চেপে বেড়ায়।

আর, মিষ্টির দোকানের মেঠায়ের মত যারা কয়েকদিনের বাসী মানে আমাদের মত যারা সেখানে দিন কয়েকের জন্যে হাওয়া বদলাতে যায় তাদের বিপদ সেখানে পদে পদে।

সাইকেল চাপা পড়ার বিপদ।

সেখানে যারা সাইকেল চেপে বেড়ায় তাদের কেবল সাইকেল চাপাতেই সুখ নেই, সাইকেল সমেত আরেকজনের ঘাড়ে গিয়ে চাপতে পারলে আরো সুখ। কিন্তু রাস্তার হাঁটারা সেটাতে ঠিক সাইকেল চাপার আনন্দ পায় না।

একখানা মোটর যাওয়ার মত চওড়া একটুখানি পিচের রাস্তা—তা দিয়ে হরদম মোটর ট্রাক যাতায়াত করছে। আর তার দুপাশ ঘেঁষে সাইকেলারোহীরা চলেছে! সাইকেলে ঘণ্টা নেই, আলোর বেলায় ঘণ্টা! রাত্তিরে রাস্তায় আলো জ্বলে না, সাইকেলে ত নয়ই। কাজেই প্রাণ বাঁচিয়ে যতই পথের

মজা করে হাত বুলোই

ধারে ধারে চলো না, সাইকেল তোমার ঘাড়ে এসে চাপবেই!

হর্ষবর্ধন সেই দুঃখের কথা ব্যক্ত করছিলেন আমার কাছে।

'আপনার কথায় তো মশাই বেড়াতে এলুম ঘাটশিলায়। কিন্তু কী ফ্যাসাদেই যে পড়েছি এসে! প্রাণ নিয়ে যদি বা ফিরতে পারি ভুঁড়ি নিয়ে ফিরতে পারব কিনা সন্দেহ!'

'কেন, কী হয়েছে আপনার ভুঁড়ির? অক্ষতই তো আছে দেখছি।' আমি শুধাই।

'আর অক্ষত! আহত আছে কিন্তু অক্ষত কী বলব?' বলে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

'কই, ক্ষতি ত কিছু দেখছি না?' হাত দিয়ে ভুঁড়ির মাপ নিয়ে দেখলুম।—'তেমনিই ভূরি ভূরি রয়েছে ত? একটুও কমেনি।'

'কমেনি বটে, কিন্তু দমে গেছে বেশ।' তিনি জানালেন: 'দস্তুর মতন দমে গেছে। যা একখানা সাইকেলের গোঁত্তা লেগেছে এইখানে—।'

'আপনাদের যে বললাম সব সময় রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে। সাইকেল এখানে ভারী মারাত্মক, বলেছি তো আপনাকে।' আমি স্মরণ করিয়ে দিই।—'এখানে আর কোন যানবাহন নেই, কেবল ঐ সাইকেল।'

'তাই ত যাচ্ছিলাম মশাই। কিন্তু সাইকেলটা যে তেড়ে এল রাস্তার কিনারায়। আমি যেদিকে ঘুরি ওটাও সেদিকে ফেরে। শেষটায় আমি পাশের খাদে নেমে গেলাম। ব্যাটা সেইখানে নেমে গিয়ে আমাকে গোঁত্তা লাগাল। ভুঁড়ির এইখানটায়।'

'ভুঁড়িটা দাদার কেমন চুপসে গেছে দেখুন না।' পাশে থেকে গোবর্ধন চুপ করে থাকতে পারে না।

দেখি। হাত বুলিয়ে দেখি। এমন সুযোগ হাত ছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। নাড়া মাথা আর নাদুসনুদুস ভুঁড়িতে হাত বোলাবার আরাম কম না। তার শখ আমার চিরকালের। কোনো ছেলের পৈতে হচ্ছে খবর পেলেই আমি হাত ধুয়ে বসে থাকি। তার পরে দণ্ডীঘরে গিয়ে সেই নবীন ব্রহ্মচারীর নাড়া মাথায় মজা করে হাত বুলোই। ভারী মজা! এবং......এবং আর কি! প্রত্যেক সদ্য উপবীতগ্রস্ত বালকই বড়লোক, মানে বড় বালক। তার ভিক্ষের ঝুলিতে দেবার টাকা পয়সা। তার মাথায় হাত বুলিয়ে ঝুলির দিকেও তাকে নাড়া করার চেষ্টাও যে না পাই তা নয়! যার নাম সোজা কথায়, পকেটের ক্যাশ-উৎপাটন!

কাজেই হর্ষবর্ধনবাবুর হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটি বেহাত হতে দিলাম না।

—'হ্যাঁ, এইখানটা বেশ দমে গেছে দেখছি। গর্ত মতন হয়ে গেছে।'

'ওটা তো আমার নাইকোণ্ডল! আঃ ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন। করছেন কি? বেসা সুড়সুড়ি লাগছে!'

তা, ভুঁড়ি বটে ওঁর। যত ধার ঘেঁষেই চলুন না, রাস্তার আধখানা জুড়ে থাকবেন। যেমন রাস্তা জোড়া তেমনিই লোভনীয়। যে কোন সাইকেলওয়ালার পক্ষেই এই লোভ সম্বরণ করা শক্ত। এমন উপাদেয় লক্ষ্য ভেদ না করে যাওয়া দুষ্কর।

গোবরা ভায়াকে দেখতেই পাইনি। ওর দিকে ভালো করে নজর পড়েনি এতক্ষণ। এখন হর্ষবর্ধন ভুঁড়ি সরিয়ে নিতেই গোবর্ধন প্রকাশিত হলেন।

'এ কি! গোবর্ধন ভায়া অমন করে চোখ বুজে কেন?' আমি বিচলিত হয়ে জিগেস করি।—'কী হল চোখে?'

'চোখ বুজে হাঁটছে ও।' হর্ষবর্ধন জানান।

'কেন, কী হল ওর চোখে?' আমি শুধাই : 'যদি কোন অসুখ টসুখ করে থাকে ত আমার সঙ্গে চলুক। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। ডাক্তারখানায় যাব বলেই বার হয়েছি।'

'না না। অসুখ করবে কেন? এমনি যাচ্ছে চোখ বুজে।...আমরা সিনেমায় যাচ্ছি কি না তাই।'

'সিনেমায় গেলে কি চোখ বুজে যেতে হয় নাকি? সে আবার কি কথা?' শুনে আমি অবাক হই।

'সিনেমা হলের ভেতরটা ভারী অন্ধকার যে। ভেতরে ঢুকলে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। কোথায় সীট কোথায় কী, নজরে পড়ে না কিছু। খানিকক্ষণ থাকবার পর অন্ধকারটা চোখে সয়ে গেলে তখন আবার সব দেখতে পাওয়া যায়।' হর্ষবর্ধন অন্ধকার খোলসা করেন—'তাই ও এখন থেকেই চোখ বুজে চলেছে। ও দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু আমি ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। হলের ভেতর গিয়ে ও চোখ খুলবে তখন ও সব দেখতে পাবে, কিন্তু আমি কিছু দেখতে পাব না। তখন ও আমাকে সীটে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে। বুঝলেন এখন?'

'বুঝলাম। কিন্তু চোখ বুজে চলা ত ভারী মুস্কিল।'

'ও কিন্তু যাচ্ছে ঠিক, একটুও হঁদিক উদিক হয়নি। পূর্ব জন্মে কানা ছিল মনে হয়।' দাদা জানান।

'আমি কানা ছিলাম? বটে?' চোখ বুজেই গোবর্ধন ফোঁস করে ওঠে : 'তুমি তা হলে হাবা ছিলে। এই জন্মেই ছিলে। নইলে এত লোক থাকতে সাইকেল বেছে-বেছে তোমাকেই কেন গোঁত্তা লাগায়।'

'আহা! ভায়ে ভায়ে ঝগড়া কেন? ওটা একটা কথার কথা। যাই বলুন হর্ষবর্ধন-বাবু, গোবরা ভায়াকে এতক্ষণ চোখ বুজে থাকার জন্য বাহাদুরি দিতে হয়।'

'তা বাহাদুর বটে?' ভ্রাতৃগর্বে হর্ষবর্ধন বিগলিত হন।—'সেদিক দিয়ে ও বেশ হুঁশিয়ার। আমি যে গর্তের মধ্যে পড়ে এত বড় একটা গুঁতো খেলাম ও কিন্তু পলকের তরেও একবার চোখ তুলে চেয়েও দেখল না। সমানে চোখ বুজে রইল।'

'জানেন শিব্রামবাবু! দাদার কপালে এই সাইকেলই আজ প্রথম ধাক্কা নয়। দাদার আজ ধাক্কা খাওয়ার কপাল। আমি চোখ খুলে থাকলেই কি আর দাদাকে বাঁচাতে পারতাম! দাদার কপালে আজ একটা পাথরের ধাক্কাও গেছে।'

'সে কি মশাই?' আমার পিলে চমকে যায়।

'ফুলেডুংরির কাছ দিয়ে আসছিলাম তো এমন সময়ে প্রকান্ড একখানা পাথর...' হর্ষবর্ধন বলতে বলতে থেমে যান।

বেজায় সুড়সুড়ি লাগছে!

'খসে পড়ল নাকি পাহাড়ের থেকে?' আমার দম আটকে আসে।

মাধ্যাকর্ষণ বলে একটা জিনিস আছে জানি। আর ভুঁড়িটাও দেহের মধ্যখানে তাও ঠিক। কিন্তু তাই বলে ভুঁড়ির মাধ্যাকর্ষণে টিলার ওপর থেকে শিলাবৃষ্টি হবে একথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়।

'না না। খসে পড়েনি, আমার চোখে পড়ল।' বলে তক্ষুনি তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন—'মানে, আমার এই চোখের ওপর নয়। চোখের ভেতরেও না। রাস্তার একধারে পড়েছিল পাথরটা, আমি দেখতে পেলাম। দেখলাম পাথরটার ওপরে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় করে লেখা 'উলটাইয়া দেখ'। চারদিকে বর্ডার দিয়ে আবার।

'কোন গুপ্তধনের ইঙ্গিত বোধ হয়?' আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনি।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওলটাতে গেলাম পাথরটা, কিন্তু সেই পেল্লায় ভারী পাথর কি নড়ানো যায় মশাই? গোবরাকে বললাম, আয়, তুইও হাত লাগা। ও বললে, আজেবাজে পাথর নেড়ে কী হবে।'

'তারপর?'

'তারপর আমি তাকে বোঝালুম—বাবা কী বলে গেছেন জানিসনে? 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পারো লুকোনো রতন।' এর তলায় নিশ্চয় কোনো ধনরত্ন লুকোনো আছে। উলটে দেখা যাক। গোবরা বলল...গোবরা বলল... গোবরা যা বলল তা আর বলবার কথা নয়।'

'এমন কি খারাপ কথাটা বলেছি?' গোবরা আবার গজরে ওঠে—'আমি বলেছি যে বাবা তো ছাইয়ের কথা বলেছিলেন, পাথরের কথা ত বলেনি। এত ছাই নয়, পাথর।' বলে সে আবার মুখ বেঁকিয়ে বলে: 'পাথর না ছাই!'

'কথাটা মন্দ বলোনি গোবরা ভায়া।' আমাকে দুই কূল রাখতে হয়—'তবে এটা কোন কাজের কথা নয়। ভাজা মাছের মতন সব কিছুই উলটে দেখতে হয়।'

'সেই কথাই ত আমি বললাম। বলে লাগলাম ওটাকে ওলটাতে। অনেক কষ্টে ত উলটাতে পারলাম পাথরখানা। তখন দেখি সে পিঠেও আবার লেখা রয়েছে।'

'কী লেখা রয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করি, 'গুপ্তধনের নির্দেশ?'

কিন্তু সে কথা আর হর্ষবর্ধন ভাঙলেন না। কেবল বললেন, 'আমি ফের সেই পাথরখানা আবার সেখানে তেমনি উলটে রেখে এসেছি। আগের মতই।'

'আর গুপ্তধন?'

'সে কথা আর ব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই।' বলে রহস্যময় হাসি হেসে নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিলেন একবার।—'সিনেমা শুরু হবে এক্ষুনি, দেরি নেই খুব। আমরা চললাম। আপনিও আসুন না কেন আমাদের সঙ্গে?'

'আচ্ছা যাচ্ছি। ডাক্তারকে একবার আমার রক্তের চাপটা দেখিয়েই সোজা সেখানে চলে যাব। এগোন আপনারা।'

স্টেশনের কাছাকাছি ডাক্তারখানাটা। গিয়ে দেখি ডাক্তারবাবু তখনো তাঁর চেম্বারে আসেননি। আর অপেক্ষা না করে সিনেমার দিকে পা বাড়াই।

পৌঁছতে পৌঁছতে ছটা বেজে যায়। ছবি শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তখনো দেখি হর্ষবর্ধনবাবুর টিকিট কেনা হয়নি—এত আগে এসেও। গোবর্ধনবেচারা সিনেমা হলের প্রবেশ পথে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে।

'এ কি! এখনো কেনেন নি টিকিট?' হর্ষবর্ধনবাবুকে শুধোই।

'আর বলবেন না মশাই! ভালো এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। হলে ঢুকবার মুখেই পাগলটা খাড়া রয়েছে। যাওয়া মাত্রই টিকিটগুলো কেড়ে নিয়ে আধখানা করে ছিঁড়ে দিচ্ছে। কি করি বলুন, আবার কিনছি টিকিট। আবার ঢুকতে গিয়ে আবার সেই দৃশ্য! আবার এসে কিনতে হচ্ছে টিকিট।

'বলেন কি!' আমি ত হতবাক।

'তবে আর বলছি কি? এই নিয়ে সাত-বার কেনা হল।' তিনি বললেন: 'আপনারও একখানা কিনি তাহলে এবার?'

'না থাক। ডাক্তার দেখানো হয়নি

তুমি তাহলে হাবা ছিলে

এখনও। সেখানে ফিরে যাবো ফের।' বলে আমি সরে পড়ি।

সটান চলে যাই ফুলডংরির দিকে। আমারও ত পাথর চাপা কপাল। দেখি গে, পাথরখানা নাড়িয়ে যদি কোন রত্নখনির কিনারা পাই।

অকুস্থলে পৌঁছে দেখি একটা ভারী পাথরের পিঠে বর্ডার দিয়ে কালো আল-কাতরার লেখা—

কিন্তু ওলটানো কি যায়? আমার সামান্য সামর্থ্যে ত কুলায় না। হাতের চাড় দিই, ঘাড় লাগাই, দূর থেকে তেড়ে এসে ধাক্কা মারি, টলানো যায় না পাথরকে। উঠে পড়ে লাগি—হন্তদন্ত হয়ে। ঘেমে নেয়ে একশা! একাই এক শ হয়ে চেষ্টা করি।

করতে করতে পাথরটা একটুখানি নড়ে। নড়ার মুখেই নাড়া দিই বেদম। প্রাণান্ত চেষ্টায় উল্টে ফেলি পাথরটাকে।

ওলটাতেই সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়। হর্ষবর্ধনের রহস্যময় হাসির হদিশ পাই।

হর্ষবর্ধনের রহস্যময় হাসির হদিশ পাই।

পাথরখানার অপর পৃষ্ঠের পরোয়ানাও নজরে পড়ে। সেখানে লেখা:

'আবার ফের উলটিয়ে রাখো। তোমার মতন আরো তো ঢের আহম্মক আছে এই পথ দিয়ে যাবে।'

একটি মাছি, একটি মশা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আমি যেন সেই মাছিটা
কাচের জারের গায়ে
বারবার যে হয়রাণ হচ্ছে—
ভেতরে অঢেল চিনি, মিছরি, পে'ড়া আর বাতাসা:
বারবার যে উড়ে এসে বসছে,
ঠোঁট, জিভ আর পায়ে পা ঘসছে;
কিছুই, অথচ কিছুই ছু'তে পারছে না কিছুতেই;

যদিও সবই সাজানো থরে-থরে
চোখের ওপর—
চিনি, মিছরি, পে'ড়া আর বাতাসা:
তার অফুরন্ত আগ্রহের ক্ষুধা আর লোভ,
তার জন্ম-জন্মান্তের আশা-দুরাশা,
তার সর্বৈশ্বর্য।

একটি মশাকেও আমি দেখেছিলাম
এক চলন্ত ট্রামের কামরায়।
উজ্জ্বল আলোয়—
যাত্রীদের মাথার ওপর
চক্রাকারে যে পাক দিয়ে ফিরছিল।
বোধহয় এই ধারণায়:

ট্রামটাই এই পৃথিবী—
এবং সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে
সেও একটা গ্রহট্রহ কিছু
সেই তার সাধের পৃথিবীর আকাশে।

অথচ জানলার বাইরেই
ঠিক তখনি হাঁ-হাঁ করছিল
অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রে স্পন্দমান
নিস্তরংগ নীল মহাশূন্য:
পৃথিবী—যেখানে চোখেই পড়ে না
এমন এককুচি বালুকণা মাত্র।

অস্থিত পঙ্ক

দুর্গাদাস সরকার

প্ল্যাটফর্ম খাঁ খাঁ করে। লোহার ঘন্টাটা আজো ঝোলে
আশ্চর্য নিরুপদ্রব। বুকিং আপিসে নেই ভিড়।
আসে না একটাও ট্রেন। আধঢাকা লাইনের তলে
ঘাস মাটি সমস্তই স্থির।
তিনটে কামরা আছে: ভাঙা বগী: স্থায়ী বাসস্থান ভাগাভাগি।
দূরের কেবিন শূন্য। নেই চোরকানা সে-লণ্ঠন।
তবু যেন আজো এক অবসরপ্রাপ্ত অনুরাগী
খুঁজে ফেরে সেই ট্রেন, মাঝরাতে ব্যস্ত লোকজন।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪২৬ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

শূন্যের দিকে তাকিয়ে আন্দাজের যোগে হাওয়ায় তোমার ঠিকানা হাতড়াচ্ছিলুম, বোধ করি সেই হাওয়ার একটা আলোড়ন তোমার মনে গিয়ে পৌঁচেছিল। তাই কাল হঠাৎ টেলিগ্রামে তোমার ঠিকানা পাওয়া গেল। ইতিপূর্বে একখানা চিঠি দৈবের উপর ভর করে তোমার বিশ্বগৃহকে বাসায় পাঠিয়েছিলেম, বোধ হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। খুব মূল্যবান জিনিস নয়, আমার তরফে চার পয়সা মাত্র লোকসান, সয়ে যাবে।

কাল এখানে আমার আদি জন্মোৎসব হলো। অল্প লোক থাকাতে সকলের পরিতৃপ্তি হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োযোগে আমার একটি নূতন রচিত কবিতা বিশ্বগগনে চালান করে দিয়েছিলেম, তোমার কর্ণকুহরের নাগাল পেয়েছিল কি না জানিনে।

এখানে জায়গাটি নির্মল নির্জন, বাড়িটি আলোকে উজ্জ্বল, নানা কোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে উদারতার আহ্বান। যদি কখনো আগমন সম্ভব হয়, হয়তো ভালোই লাগতে পারে। তোমাদের ওখান থেকে আমাদের এখানে যাতায়াত সুসাধ্য কিনা জানিনে, সেই জন্যে কুণ্ঠিত কণ্ঠে আমন্ত্রণ করলুম।

রাশিকৃত পত্র উত্তর প্রত্যাশায় আছে। প্রশান্তকে বোলো বেদে রাশি বলে শব্দ আছে, তার অর্থ সংখ্যাতত্ত্ব—রাশি শব্দের মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্সের যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৪৫

কবি

॥ ৪২৭ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

রানী, এ জায়গাটা ভালো লেগেছে, নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না—মংপু যদি আরো ভালো লাগে তা হলে সেখান থেকেও নড়তে চাইব না—কিন্তু Babu changes mind। তুমি যদি হাওয়া পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করো তা হলে এখানকার হাওয়া পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

কাগজে দেখতে পাই, দার্জিলিঙে পুলিস যদি বা প্রসন্ন হোলো, দেবতার অপ্রসন্নতা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে উঠেছে। শুনে মন খুশী হয়—নিজের সৌভাগ্যের পরিমাপ করা যায় অন্যের দুঃখের তুলনা হিসাব করে—ভেবেছিলুম তোমার চিঠি থেকেই সেই আনন্দ লাভ করব, ক্ষতি হয় নি, স্টেটসম্যান নিয়ে থাকি। ইতি ৩১ বৈশাখ ১৩৪৫

কবি

॥ ৪২৮ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

নির্মল নীল আকাশ, কাচা সোনা-রঙের রোদ্দুর, পাতলা বেগনী চাদরে ঢাকা ছোটো পাহাড়গুলির ঊর্ধ্বে নগাধিরাজের তুষার-কিরীটি মহিমা, মহাদেবের ধ্যানোদীপ্ত শুভ্র ললাট; আমাদের কাছে অধিত্যকার বনে বনে স্নিগ্ধ চিক্কণ পুঞ্জীভূত সবুজে লেগেছে পরশমণির স্পর্শ, পাতায় পাতায় জেগেছে সোনার রোমাঞ্চ, নীল নিস্তব্ধতার উপর পাখিদের মিশ্রিত কাকলি ঝিলিমিলি করছে। এইমাত্র খেয়ে উঠলুম, একটা আম, গোটাকতক লিচু, টোস্ট-করা রুটি, পাহাড়ী গোষ্ঠের মাখনে আর পাহাড়ী মৌচাকের মধুতে লিপ্ত। এসে বসেছি আমার মুকুন্দবার ঘরে, প্রচুর আলোতে আমার মন গিয়েছে তলিয়ে—আমার উড়ো ভাবনা ঝাপসা বেগনী কুহেলিকায় অস্পষ্ট, কর্তব্যবুদ্ধিটা যেন নেশা করে ভোলানাথ হয়ে বসে আছে।

ঈর্ষা হচ্ছে না? সেই জন্যেই লেখা। সোমবারে সদলে হপ্তা খানেকের জন্যে মংপু যাব, মৈত্রেয়ীর অনুনয় জয়ী হোলো। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

কবি

॥ ৪২৯ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

গতকালকার চিঠির প্রান্তে তোমাকে যা লিখেছিলুম তার সংক্ষেপ এই, আরামের চরম আরাম হচ্ছে অন্যের অনারাম উপলব্ধি করে। অন্য অর্থে এই ধরনের একটা ইংরেজী বাচন আছে, তাতে কবি বলছেন দুঃখের চূড়ান্ত দুঃখ হচ্ছে সুখীতর দিনকে স্মরণ করতে। পূর্ববাক্য আজ আমি চার পয়সা খরচ করে শোধন করতে চাই—বলতে চাই আরামের পরম আরাম হচ্ছে অন্যকে সেই আরামের শরিক করতে ডাক দেওয়া, এর থেকে যা বোঝো তাই বুঝো। দেবতার সোনার রঙের মদের পাত্র ভোর থেকে উল্টে পড়ে গেছে—মাতাল হয়ে উঠল গাছপালাগুলো, নীল আকাশের চোখে লেগেছে বিহ্বলতা, আর ক্ষীণ কুয়াশায় আবছায়া করা পাহাড়গুলোর গদগদ ভাষা।

এখানে এসে শরীর কিছু ভালো হয়েছে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি সেটা ধরা পড়ল কাল! প্রতিবেশীর বাড়িতে চা খেতে গিয়েছিলুম কাল, বেশী কিছু নয়, তবু ফিরে এসে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা অনুভব করেছি, বুঝতে পেরেছি শরীরটাকে স্পর্ধা করে বেড়ানো অন্তত আরো কিছুদিন চলবে না—তাই মৈত্রেয়ীর ওখানে যাওয়া আপাতত নির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে দিয়েছি—খুব সে কলরব করবে, কিন্তু আমি সেটাকে নীরবে সহ্য করব।

পরে পরে তিনটে চিঠি লেখা বাড়াবাড়ি—এর অপরাধ হচ্ছে অপর পক্ষকে লজ্জা দেওয়া, কিন্তু লজ্জা পাবার শক্তি—

এইখানে অসমাপ্ত রাখা গেল, অপরাধের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে দ্বিতীয় অপরাধের সৃষ্টি করা বুদ্ধিহীনের লক্ষণ। একটা কথা বলে রাখি, ধ্বনি প্রেরণ করি প্রতিধ্বনির প্রত্যাশায় তা মনে কোরো না। বাচালতা যাদের স্বধর্ম তাদের বকুনি অহৈতুক আবেগে—বাইরে থেকে এর মজুরি সব সময়ে মেলে না, দরকারও নেই। ইতি ১লা কিংবা ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

কবি

॥ ৪৩০ ॥

ॐ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

শনিবার যাব মংপু। সোম মঙ্গলবার তক হয় তো থাকব —যদি সুস্থ থাকি, শান্তিতে থাকি, যদি কাজের ব্যাঘাত না ঘটে, যদি আদর যত্নের অতি পরিমাণবশত বিরল অবকাশের পরিমাণ কমে না যায় তাহলে যতদিন খুশি থাকতে পারি। কিন্তু Babu changes his mind. মৈত্রেয়ী তোমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে শুনেছি—এই শুভ সময়েই যদি সেই নিমন্ত্রণ সার্থক করো, তাহলে সেই সিনকোনা ক্ষেত্রে একটা পিক্‌নিক জমে উঠতে পারে—পিক্‌নিকের আনন্দই হচ্চে অনভ্যস্ত জায়গা এবং চিরাভ্যস্ত লোক নিয়ে। বেলঘরিয়ায় তোমাদের ছিল ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়ানি, দার্জিলিঙে টিক টিক টিক টিকানি—একটা হচ্চে কামারের এক ঘা গোছের, অন্যটা স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্‌। ইতি ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

কবি

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর আমাকে নিমন্ত্রণ করার কথা কবি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন জানি না, কিন্তু তখনও সে নিমন্ত্রণ আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি। পরে কবি আরো ২।১ বার মংপু যাবার কথা লেখায় তাঁকে জবাব দিয়েছিলাম যে, যদি তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ি বা শান্তিনিকেতন হোতো তাহলে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম। কিন্তু বাড়ি যখন তাঁর নয় তখন তাঁর নিমন্ত্রণও গ্রাহ্য নয়, বিশেষত যাঁদের উপর আতিথ্যভার চাপাবো, তাঁরা যখন সম্পূর্ণ নীরব এ বিষয়ে। তার পরেই মৈত্রেয়ী দেবীর কাছ থেকে এক লাইন পত্র পেলাম কবির চিঠির মধ্যে "আপনারা এখানে এলে খুশি হবো"। বুঝলাম ব্যাপারটা কি — কবির আগ্রহের আতিশয্যে বেচারীকে লজ্জায় খাতিরে ওটুকু লিখতেই হয়েছে। তাদের যে সে সময় বাড়িতে ডাকতে অসুবিধা আছে তা কবির পরের পত্রেই বোঝা গেল। কবি না ভেবেচিন্তে আমাদের ডাক দিয়ে পরে কি রকম বিপদে পড়েছেন দেখে আমার স্বামী খুব হেসেছিলেন।

কবির মৃত্যুর পর মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা "মংপুতে" বইখানি যখন বেরোলো, তাতে আমাদের মংপু যাবার নিমন্ত্রণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্য আকারে অংকিত হয়েছে দেখে বিস্মিত হয়েছি—আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

"Babu changes his mind" সম্বন্ধে একটি ইতিহাস আছে —সেটা বোধ হয় এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। একদিন কবির কাছে শুনলাম তিনি অবনীন্দ্রনাথদের বাড়ি থেকে একখানি খাতা উদ্ধার করেছেন তাতে কবির পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেতে ছিলেন সেই সময়ে তাঁর কোনো সহচর বাড়িতে নিয়মিত চিঠি লিখে তাঁর যে খবর দিতেন তা লিপিবদ্ধ করা আছে। সেই রকম কোনো একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "Babu changes his mind always"। কবি তাই পড়ে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন এবং আমাদের কাছে বলেছিলেন, "আর আমার কোনো লজ্জা নেই, শেষ মুহূর্তে আমি মত বদল করি বলে। আমার যোগ্য পিতামহ যখন এ কাজ করে গিয়েছেন, তখন তাঁর পৌত্রই বা তা না করবে কেন?" পরে অনেক সময়েই হাসতে হাসতে বলতেন, "বুঝলে কিনা Babu changes his mind; অতএব আমার উপর বেশী নির্ভর করা ভালো না।"

॥ ৪৩১ ॥

ॐ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

কালিম্পঙ লেগেছিল ভালো, এ জায়গাটা আরো ভালো লাগচে। পাহাড়ের চূড়াগ্রে কালিম্পঙের চেয়ে উচ্চতর উচ্ছ্রায়ে, সুন্দর বাগানের মধ্যে, উন্মুক্ত আকাশে। বাড়িটা তোমার ঘড় ঘড়িয়ার চেয়ে বৃহৎ উচ্চ উদার সুসজ্জিত—জানিনে বনমালীর আদর্শকে স্পর্শ করেছে কিনা। দেখেছি তোমার সম্বন্ধে তার একটা মুগ্ধচিত্ততা আছে — আমার বিশ্বাস যে কেবলমাত্র তোমার মাধুর্যগুণে নয়, ততোধিক কারণ তোমার দাক্ষিণ্য। আমার মতো অকিঞ্চনের কাছে থেকে, তাই তোমার ঐশ্বর্যে হতভাগার মন অভিভূত। কাল মৈত্রেয়ী তুমি দার্জিলিঙে এসেছ শুনে আমাকে বললে তুমি যদি তার এখানে আসো, সে খুশি হবে। তাই তারি দৌত্য বহন করচি, সংকোচের কারণ নেই—সঙ্গে রাশিকারকে এনো—রাশিকরণের সমস্যা তিনি সঙ্গে আনতে পারেন—জায়গাটা কঠিন মনোনিবেশের পক্ষে ভালো, কবিত্বের পক্ষেও বটে।

এখানে ছুটি কাটিয়ে যেতে সানুনয় অনুরোধ পেয়েছি। বেশি পীড়াপীড়ি করতে হয়নি। বৌমাকে আনবার চেষ্টা করছি। রথীর এ জায়গা খুব ভালো লেগেছে। ইতি ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

কবি

কবির এই চিঠির মধ্যেই শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী এক লাইন লিখে জানান যে, আমরা গেলে তিনি খুশি হবেন। আমরা তার উত্তরে জানাই যে, যদি মংপু যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের বহুদিনের পুরাতন বন্ধু সুরেশ সেনের কাছে গিয়েও আমরা থাকতে পারি।

॥ ৪৩২ ॥

ॐ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

ইচ্ছার ঔদার্যে তোমাদের আহ্বান করেছিলুম — স্থানের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে তখন আমার অভিজ্ঞতা ছিল না। তোমার সুরেশ সেনের বাসা গ্রীষ্মাভিঘাতকাতর আত্মীয়স্বজনপরিপূর্ণ এই রকম জনশ্রুতি। এ বাড়িতে গৃহস্বামী এক অংশে আছেন সপত্নীক সকন্যক, আমার আছে নন্দীভৃঙ্গী যুগল, আমি আছি উপরতলার এক অংশে অপর অংশ রথীর জন্যে নির্দিষ্ট। কালিম্পঙ থাকাকালে যদি দর্শন দিতে তাহলে কোনো দিক থেকে কোনো সংকীর্ণতা থাকত না। বোধ করি ছুটির শেষাংশে সেখানে যাব—যদি সম্ভব হয়, সেখানে অবতীর্ণ হতে পার—না হয় ত কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী:।

এখানে মোটের উপর ভালোই আছি। লোকশিক্ষা সংসদের জন্যে বাংলা ভাষাপরিচয় একটা লিখতে আরম্ভ করেছি। আজকাল লিখতে শরীর মনে ক্লান্তি আসে, তবু মৃদু মন্দ গমনে চলচে। লেখবার বিষয় সম্বন্ধেও মনে খুব উৎসাহ নেই। কর্তব্য।

রাশিকারের কাজ বোধ হয় নিরন্তর টক্‌টকায়মান। আরো তোমাদের আতিথ্যের কাজ বোধ করি ওখানকার মেঘের মতই অত্যন্ত ঘনীভূত। আজ সুরেন করের সঙ্গে রথী এখানে আসবেন। ইতি ২৬।৫।৩৮

কবি

শার্ঙ্গদেব

তিমিরবরণ ও তাঁর অর্কেস্ট্রা

অর্কেস্ট্রার বিপুল সম্ভাবনা আমাদের দেশে রয়েছে অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা খুব মামুলি বলেই মনে হয়। ইতিপূর্বে অর্কেস্ট্রার ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় যে পাওয়া যায়নি এমন নয়; কিন্তু অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে কৌতূহল আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। সম্মিলিত বাদ্যধ্বনির মধ্য থেকে একটা পরম আকৃতির প্রকাশ আমাদের বিহ্বল করেছে কিন্তু নিতান্ত সাময়িকভাবে —যন্ত্রসংগীতকে অর্কেস্ট্রার স্বরূপে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিক উৎসাহে সমর্থন করিনি।

অনুসন্ধান নিলে জানা যাবে গত শতাব্দী থেকে এ শতাব্দী পর্যন্ত বহু ব্যক্তি অর্কেস্ট্রা সংগঠন করতে চেয়েছেন এবং সঙ্গীতে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও কম ছিল না; কিন্তু পরিবেষণ ও প্রয়োগের দিক থেকে এমন কিছু ত্রুটি ছিল যাতে আমাদের দেশে যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কৌতূহল পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুরূপ হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সাধারণ দেশীয় ঐকতানে পরিণত হয়েছে। উভয় সঙ্গীতের মূল্যায়ন এমনভাবে হতে পারেনি যাতে করে শ্রোতাদের মনে যন্ত্রসংগীত সম্বন্ধে একটা নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। ক্ষেত্রবিশেষে শ্রোতারা পুলকিত হয়েছেন—তাঁদের ভাল লেগেছে কিন্তু অর্কেস্ট্রার মধ্যে তাঁরা এমন কিছু দেখেননি যাতে ভারতীয় সঙ্গীতে অর্কেস্ট্রার প্রবর্তনকে তাঁরা আবশ্যিকভাবে দাবী করতে পারেন। আমাদের সঙ্গীতানুষ্ঠানে এখনো অর্কেস্ট্রার কোন চাহিদা নেই—যন্ত্রসঙ্গীতের একক অনুষ্ঠানই আমাদের পরিতৃপ্ত করে চলেছে।

সম্প্রতি তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা শুনে মনে হল এবিষয়ে আমাদের চিন্তার বিস্তৃতি প্রয়োজন। অর্কেস্ট্রার যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক বেশী সচেতন হওয়া আবশ্যক। আমাদের অর্কেস্ট্রা আমাদের নিয়মে গড়ে তুলতে হবে; কিন্তু বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বে যে বিভিন্ন ধারায় সমবেত যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান চলেছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে নতুবা আমরা পেছিয়ে থাকব। আজ সমগ্র পৃথিবীর দ্বার ভারতের কাছে উন্মুক্ত। বর্তমানে বিশ্বময় শিল্পীদের আনাগোনা ভাবের আদান-প্রদান যেভাবে চলেছে এমন খুব কম যুগেই ঘটবার অবকাশ হয়েছে। অতএব মুক্ত মনে সংগীত সংস্কৃতির নব এবং সার্থক প্রচেষ্টার এই উত্তম সুযোগ।

তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা শোনবার সুযোগ হল কোনও বৃহৎ সংস্কৃতি সম্মেলনে নয় ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনীয়ার্স (ইণ্ডিয়া)-এর দ্বিচত্বারিংশৎ বাৎসরিক অধিবেশনের একটি নাতিবৃহৎ কালচারেল প্রোগ্রামে ঘটনাচক্রে উপস্থিত হয়েছিলাম গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁর এই নিভৃত অনুষ্ঠান শোনবার জন্য। শুনে মুগ্ধ হয়েছি। শুধু মুগ্ধ নয়—সঙ্গীতচিন্তায় একটা নতুন প্রেরণা পেলাম। যে অনুষ্ঠান চিন্তার প্রেরণা দেয় তা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ। তিমিরবরণ শোনালেন ছটি কম্পোজিশন—বসন্ত-পঞ্চম, মানভঞ্জন, অপরিচিতা, লুপ্তোদ্ধার, ললিতা - গৌরী - মারোয়া, আরবাররজনী। তিমিরবরণের রচনা একদিকে ভাবধর্মী অপরদিকে আখ্যানমূলক। রাগসংগীতের বৈশিষ্ট্যকে তিনি রক্ষা করে গেছেন এবং মেলডির বিচিত্রবিকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন যন্ত্রে। তাদের সমন্বয় সাধনও করেছেন। যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে তিনি কণ্ঠসংগীতও যোজনা করেছেন সার্থকতার সঙ্গে। এটি সিম্ফনি নয়—পাশ্চাত্ত্যসংগীতে যাকে পলিফোনি বলে তিমিরবরণ সেইদিকেই গেছেন নইলে ভারতীয় সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য রাগসংগীতের ব্যক্তিত্ব বা পরিচয় থাকে না। তাঁর এই ধরনের রচনায় সুরের প্রত্যেকটি ধারার একটি মেলডি-বৈচিত্র্য বর্তমান : একটির সঙ্গে অপরটি দক্ষতার সঙ্গে যোজিত হয়েছে এবং সমবেতভাবে উৎকৃষ্ট মিলিত ধ্বনিতে অপূর্ব আবেদন নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তিমিরবরণের এই অর্কেস্ট্রায় কর্ডের প্রয়োগ দেখিনি, সোনাটার গতিভঙ্গিও তিনি গ্রহণ করেননি—তার কারণ হার্মনির পুরোপুরি প্রয়োগে আমাদের সঙ্গীতের যে বিকাশ তাঁর অভীষ্ট, তার পরিচয় নাও মিলতে পারে। তবে কণ্ঠার্টের পদ্ধতিতে একক বাদন ও বহু যন্ত্রে তার প্রতিফলন তাঁর পরিকল্পনায় আছে।

“বসন্তপঞ্চম” তাঁর প্রথম রচনা। এই রচনায় আমাদের সঙ্গীতে পলিফোনির সুদক্ষ প্রয়োগ দেখা যায়। “লুপ্তোদ্ধার” সঙ্গীতশাস্ত্রের এক লুপ্তরাগের এক টুকরো স্বরলিপি থেকে তাঁর নিজের পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে নানা বৈচিত্র্যে। “অপরিচিতা” মালকোশকে কেন্দ্র করে একটি আখ্যান-পরিকল্পনা যাতে মালকোশের সঙ্গে অপর এক সম্ভ্রান্ত অথচ অজানা রাগিণীর মিলন ঘটেছে। “ললিতা-গৌরী-মারোয়াও” এই ধরনের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাগুলিই ভাবধর্মী এবং কর্ডের চেয়ে মেলডিতেই এদের পরিচয় নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। মানভঞ্জন ও আরব্যরজনীকে রচনা হিসাবে “ফ্যান্সি” বলা যায়।

থীম বা আখ্যানবস্তুকে অবলম্বন করে অর্কেস্ট্রা গঠনের মধ্যেও একটা বিপুল বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তিমিরবরণ প্রমুখ শিল্পীগণ যে সেই সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলছেন তার জন্য তাঁরা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। বহুদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প ক্ষুধিত-পাষাণকে অবলম্বন করে তিনি একটি অর্কেস্ট্রা গঠন করেছিলেন তা

প্রতিভাধর সংগীতস্রষ্টা তিমিরবরণ

আমাদের এখনও স্মরণ থাকবার কথা। রাগ-সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে কয়েক শত বৎসর পূর্বে চিত্ররূপের পরিকল্পনা হয়েছিল যাকে শাস্ত্রে বলা হয় দেবময়রূপ। মালকোশের রূপের কথা ধরা যাক। মালকোশ রূপবান যুবক; মধুপানে সে প্রমত্ত কিন্তু বীর্যবান হলেও স্বভাবত সে শান্ত। পরিধানে তার নীলবসন, গলায় মুক্তোরমালা। হাতে কুসুম-রচিত যষ্ঠি। তাকে পরিবেষ্টন করে আছে লাস্যময়ী তরুণীরা। এই পরিকল্পনাটি একটি স্থায়ী চিত্রেই রয়ে গেল। শিল্পীরা অনেকে এই চিত্রকে বাদনকালে তাঁদের ধ্যানে আনতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই বাদন বা গান প্লেন-সং-এর মধ্যেই রয়ে গেছে তা নভলেট,র‍্যাপসডি বা ফ্যানটাজিয়াতে পরিণত হতে পারেনি। নাটগীতির দিকে আমাদের পরিকল্পনা অনেকটা বিস্তৃত হয়েছিল কিন্তু তা অভিনয়ের প্রগতি নির্দেশ করে। আজকের যুগে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে আমরা এই বর্ণনাত্মক সঙ্গীতকে বিবিধ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। তবে কণ্ঠ-সঙ্গীতে নিছক বর্ণিত-বস্তুকে প্রকাশ করতে চাইলে কোনও নতুনত্ব প্রকাশ পাবে কিনা সন্দেহ কেননা কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ আবেদন হচ্ছে সাজেস্টিভ প্রকাশভঙ্গিতে। আজকাল গ্রামোফোন সিনেমায় বর্ণনাত্মক গান প্রচুর গাওয়া হচ্ছে কিন্তু তাদের চমক ক্ষণস্থায়ী। কণ্ঠসঙ্গীতে আমরা কিছুটা বলে অধিকাংশ না বলা হিসেবে রাখতে চাই, সুরে তার ইঙ্গিত দিয়ে যাই। কিন্তু যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা আখ্যানবস্তুকে ফোটাতে চাই এই কারণে যে বিভিন্ন যন্ত্রের আবেদন বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে চায়। কণ্ঠে বলার যে মামুলিভাব আছে যন্ত্রের বলায় সেটা নেই। এখানে ধ্বনি বৈচিত্র্যে স্বতই মনে এক একটা রূপের রহস্য ধরা দিতে থাকে। এই যে বিচিত্র প্রকাশের আকুতি যন্ত্রসঙ্গীতের সুরলহরীতেই তার উত্তম অভিব্যক্তি হতে পারে। আমাদের ভারতীয় বিবিধ যন্ত্রে এই অভিব্যক্তির উত্তম সুযোগ আছে। তিমিরবরণ সেই সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর অসামান্য প্রতিভায় একটি নতুন পথ প্রস্তুত করে চলেছেন। বহুদিনের বিচক্ষণ শিক্ষা, বিপুল অভিজ্ঞতা, বহু দেশের শিল্পমানসের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তিনি যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন তার ভিত্তি সুদৃঢ়। এই সার্থক পরিকল্পনার জন্য আমরা তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ প্রদান করছি এবং আমরা আশা করব দেশবাসী যন্ত্র-সঙ্গীতের এই নতুন অভিযানকে অভিনন্দিত করবেন, এর গৌরবমূল্য চিন্তান্বার নির্ধারণ করবেন। যাঁরা এই অর্কেস্ট্রাগুলিতে বিভিন্ন বাদ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁর সার্থক সহযোগিতার জন্য বিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

শিল্পকৃতিত্বে বিশিষ্ট এবং প্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টি বলে পরিগণিত হবার মতো দক্ষতা-সম্পন্ন ক'জন শিল্পীর আঁকা ছবির একক প্রদর্শনী পর পর এ বছরের শুরু থেকেই দেখা গিয়েছে। একেবারে 'মাস্টার' পর্যায়ে তাদের কাউকে গণ্য করা না গেলেও বৈচিত্র্যের প্রতি ঝোঁক এবং প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে একটা মৌলিকত্ব অভিব্যক্ত করার প্রচেষ্টা এদের অনেকের মধ্যেই দেখা গিয়েছে। চিত্ররচনার দক্ষতা প্রকাশে এরা যেমন বিষয়বস্তুর নির্বাচনে রকমারিতার দিকে ঝোঁক দেখিয়েছেন, তেমনি রঙের প্রয়োগ কৌশলের দিক থেকেও। তারই আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা গেল গত সপ্তাহে ফাইন আর্ট আকাদেমিতে অনুষ্ঠিত নরেশ সেনগুপ্তের একক প্রদর্শনীতে।

কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা আরম্ভ করার পর শ্রীসেনগুপ্ত কোলোনো গভর্নমেন্ট সেকেণ্ডারী স্কুলে এবং শিয়োনি ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫১ সালে উগাণ্ডায় যাবার পর তিনি পাশ্চাত্য ধারায় আঁকতে আরম্ভ করে আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ওখানকার বিভিন্ন স্থানে নানাজাতির ও নানাভাবে কার্যরত স্ত্রী-পুরুষের প্রতিকৃতি আঁকায় দক্ষতা প্রকাশে সক্ষম হন। উগাণ্ডা আর্টস ক্লাবে তাঁর ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী হয় এবং দেওয়াল-পঞ্জী প্রতিযোগিতায় তিনি কতকগুলি পুরস্কারও লাভ করেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল তাঁকে উইম্বলডন স্কুল অব আর্টসে মণ্ড বিষয়ক ডিজাইন শিক্ষার জন্য একটি বৃত্তি দেয়। লণ্ডনে থাকাকালে গত বছরের জানুয়ারী মাসে লণ্ডন কমনওয়েলথ গ্যালারিতে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী হয়। কলকাতায় তাঁর ছবির প্রদর্শনী এই প্রথম।

প্রদর্শিত মোট চুয়াল্লিশখানি ছবির অধিকাংশই গুয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা। প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে সব ক'খানিকেই উচ্চশ্রেণীর বলে অভিহিত করা যায় না। রঙ পিষবার ছুরির সাহায্যে ছবি তৈরির ক্ষেত্রে সিজানের অনুকরণ (নং ১১) লক্ষ্য করা যায় কয়েকখানি ছবির ক্ষেত্রে। জ্যান গোর তাহিতির অধিবাসীদের নিয়ে আঁকা ছবির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় (৪ নং) কতকগুলি ছবির ক্ষেত্রে। 'মা ও সন্তান' (নং ১) প্রভৃতি কয়েকখানি ছবির ক্ষেত্রে অতি নিষ্প্রভ বা অত্যন্ত হালকা রঙের প্রয়োগ এবং 'মোরগের লড়াই' (নং ১২), 'টিরোলের প্রাকৃতিক দৃশ্য' (নং ১৫)

সমুদ্রোপকূলে জেলেনীর দল — শিল্পী : নরেশ সেনগুপ্ত

প্রভৃতির ক্ষেত্রে চড়া রঙের ব্যবহার একটু যেন ছন্দপতন ঘটিয়েছে বলে মনে হবে। শিল্পী মুখ্যত ইম্প্রেসানিস্টিক ধারার অনু-রাগী কিন্তু কিউবিজমেও তিনি পরীক্ষায়

আলাপ — শিল্পী : নরেশ সেনগুপ্ত

হাত দিয়েছেন দেখা যায় (নং ১৭)। দর্শককে ধাঁধায় পড়তে হয়, সুন্দর একটা ছন্দোময় রেখা ও রঙের প্রয়োগ সত্ত্বেও 'অনির্দিষ্ট হাসি' (নং ৮) ছবিখানি দেখে। সমগ্র প্রদর্শনী থেকে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, শিল্পী এখনও নানা পরীক্ষা নিয়ে আছেন এবং সব সময়ে তাঁর চেষ্টা রয়েছে বিষয়-বস্তু ও রঙের বিন্যাসে একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ বৈচিত্র্য নিয়ে আসার।

আফ্রিকার দৃশ্য ও চরিত্র নিয়ে ইম্প্রেসানিস্টিক ভঙ্গীতে আঁকা 'মাসাই যোদ্ধা' (নং ৩), 'বাগাণ্ডা নারী' (নং ৪), 'কিকুয়ু সর্দার' (নং ৯), 'সমুদ্রোপকূলে জেলেনী দল' (নং ১৬), 'আফ্রিকার গ্রাম' (নং ২১), 'কর্মরতা নারী' (নং ৩৩ ও ৪০), 'ধান কাটা' (নং ৩৯), 'ঙ্গারিয়ামা নারী' (নং ৩৭) প্রভৃতি ছবিগুলি তাঁর শক্তির পরিচয় দেয়। 'জিরাফ' (নং ২৩) এবং 'ন্যাশনাল পার্কে হরিণ দল' (নং ৩২) প্রভৃতি বন্য জীবনের ছবিগুলিও সুন্দর। তুলি বা রঙপেষা ছুরির সাহায্যে বর্ণবিভব চমৎকার গতিময় ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। রঙের বিক্ষিপ্ত আঁচড়ে 'আতসবাজি'-র (নং ২৫ ও ২৬) উজ্জ্বল প্রভা ফুটিয়ে তোলায় তাঁর কল্পনা ও উদ্ভাবন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে ছবিগুলি থেকে শিল্পীর প্রতিভা, দৃষ্টিশক্তি এবং ছন্দোময় রঙের প্রয়োগে ব্যক্তিত্বপূর্ণ চিত্রসৃষ্টির বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

"অন্য সাড়ম্বর শুভারম্ভ; টেকনিকলার শো; প্রবেশমূল্য একটি ভোট; কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য"—বিজ্ঞাপনের ড্রাফ্‌টটি বলাবাহুল্য বিশুখুড়োর।

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র জনবিক্ষোভ চলিতেছে। জঙ্গী সরকার বলিতেছেন সব ঠিক হ্যায়। শ্যামলাল বলিল—"একদিন কে যেন কোথায় বলেছিল 'সব ঝুট হ্যায়'—সে-ই কি বুলি পালটিয়ে বলছে সব ঠিক হ্যায়!!"

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকার নাকি তাঁহাদের জন্য স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করিবেন।—"অবিভক্ত পূর্ব বাংলার কবি একদিন বলেছিলেন আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ"—স্মরণ করাইয়া দিলেন জনৈক সহযাত্রী।
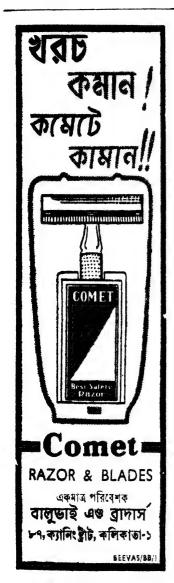
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ভ্রমণোৎসব সপ্তাহ চলিতেছে। "ভ্রমণকারীরা মোয়া নিয়ে ভুলে আছেন; ভারত বনাম এম সি সি-র খেলা শেষ হয়ে গেছে, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা এখনো বহুদূর—ভ্রমণে তবে কোন্ অষ্টরম্ভা দেখবেন!!"

বারাসাত-বসিরহাট ট্রেন চলাচলের সংবাদ পাঠ করিলাম। সংবাদে বলা হইয়াছে—নির্ধারিত সময়ের প্রায় একঘন্টা পরে রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম হাতল টানিলে লাল বাতির বদলে সবুজ বাতি জ্বলিয়া উঠিল। সমবেত জনতার আনন্দধ্বনি ও করতালির মধ্যে ট্রেন চলিতে আরম্ভ করে।—"ভাগ্যিস একঘন্টা দেরী করেছিলেন স্বয়ং রেলমন্ত্রী, ড্রাইভার-গার্ড একঘন্টা দেরীতে গাড়ি নিয়ে এলে সমবেত জনতা কী করতেন সেটা হয়ত রেলমন্ত্রী জানেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

চার্ণকের 'নগরদর্শনে' পড়িলাম—সার্কুলার ক্যানেল বুজিয়ে ফেলা হবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তার চেয়ে কুমীর আগমনের জন্য যে-সব খাল কাটা হয়েছিল সেগুলি আগে বুজিয়ে ফেললেই জনসাধারণ উপকৃত হতো!"

পৃথিবীর কি ধূমকেতুর মত পুচ্ছ আছে? বিজ্ঞানীদের একটি জিজ্ঞাসা। শ্যামলাল বলে—"ধূমকেতুর মতো না হোক, কোন কোন প্রাণীর মতো লাজ তার নিশ্চয় গজিয়েছে আর তা নইলে এত অব্যাপারেষু ব্যাপারং-এর ঘটা কেন!!"

সংবাদে শুনিলাম নিউ ইয়র্কে নাকি হাম-এর টিকা আবিষ্কার করা হইয়াছে।—"খুব ভালো কথা। অতঃপর হাম-বড়াই রোগের টিকা আবিষ্কৃত হলে আরো ভালো হবে"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

একটি অপূর্ব সংবাদ পাঠ করিলাম—"প্রেম ধর্মঘট"। অস্যার্থঃ স্বামীরা যদি আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী না হন, তবে তাঁহাদের সহিত ভালবাসার অবসান ঘটাইবার জন্য বৃটেনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ত্রীদের নিকট আবেদন জানান হইবে।—"কিন্তু তাতে কাজ হবে কি? আণবিক না হতে পারে, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তায় ফুলশরটিও তো বড় কম যায় না"—রসকষহীন শ্যামলালের মন্তব্য, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, কাজে কাজেই!

সংবাদে প্রকাশ, পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব-এর প্রায় পাঁচশত ছবি নাকি কর্ণফুলিতে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বিসর্জনের পর পুণরাগমণায় চ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়েছে কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি!!"

উত্তর কলিকাতায় কোন স্থানে জঞ্জালের 'পাহাড়' জমিয়াছিল। সংবাদে বলা হয় সেই পাহাড়ের উপর একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়া তাহাতে বলা হয়—এই জঞ্জাল সরাইবার দায়িত্ব যাঁর তিনি নির্বাচনপ্রার্থী। পরের দিন সকালে নাকি দেখা যায় জঞ্জাল উধাও,—বিজ্ঞপ্তিটিও বলাবাহুল্য সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী ছড়া কাটিলেন—"সেই মামা সেই মামী, সেই পুকুর পাড়ে ঘর, এখন কেন গো মামী দখে পড়ে সর!"

ডেলিমেল"এর বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক শ্রীব্যানিস্টার বলিয়াছেন যে পার্সেলে বিলাত হইতে খেলোয়াড়দের খাবার না পাঠান মারাত্মক ভুল হইয়াছে—ভারত ও পাকিস্তানের সৌজন্যের জন্যই খাবার পাঠান হয় নাই।—"যা হোক এম সি সি-র পরাজয়ের একটা কারণ পাওয়া গেল। হীরমটরের ব্যবস্থা হবে কি না বলা শক্ত"—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক।

কলিকাতায় ফুটবল খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে—"এবং অচিরেই এলেনবরো মাঠে স্টেডিয়াম নিয়ে নির্বাচনের হুড়োহুড়ি আরম্ভ হল বলে, রাহুধৈর্যং"—বলেন বিশুখুড়ো।

এক সংবাদে প্রকাশ জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে শ্রীনেহরু যোগদান না-ও করিতে পারেন।—"এক সাম্প্রতিক সংবাদে শুনেছি নেহেরুজীর গলা খারাপ হয়েছে বলে তিনি অনেক স্থানে নির্বাচনী বক্তৃতা সংক্ষেপে সেরেছেন। এর সঙ্গে জেনেভা না যাওয়ার কোন যোগাযোগ আছে কি না তা বলা শক্ত"—বলেন বিশুখুড়ো।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী শহর—সফরে একস্থানে উদ্যোক্তাদের অনুরোধে পায়রা উড়াইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—পায়রাটি লক্কা জাতীয় হলে উড়িয়ে দেওয়াই সমীচীন হয়েছে!!"

লণ্ডনে এইবার ভারতীয়গণ কর্তৃক সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।—"লণ্ডনবাসী সতর্ক হোন, বিদ্যার বহর না বাড়লেও চাঁদার মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা অনিবার্য"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

॥ ২৯ ॥

টেলিফোনে আবার অনিন্দ্য পাকড়াশির খবর পাওয়া গিয়েছিল। পাকড়াশি জুনিয়র আজকাল অনেক কাজ করছেন। মাধব ইন্ডাস্ট্রিজ নামে শিল্প সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তাঁকে একদিন বসতে হবে। তার জন্যে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন। "শিক্ষা নয় অগ্নিপরীক্ষা"—একদিন অনিন্দ্য পাকড়াশি নিজেই আমাদের বলেছিলেন।

আজও অনিন্দ্য পাকড়াশিকে আপনারা দেখে থাকবেন। দেশের তরুণতম শিল্পপতি-দের তিনি একজন। বিভিন্ন ব্যবসায়িক কনফারেন্সের পর ফিনান্সের উত্তাপে অনেকক্ষণ সেদ্ধ করা তাঁর মুখের যে ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তা দেখে আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না এই অনিন্দ্য পাকড়াশিই একদিন আমাদের সঙ্গে সরস প্রাণে গল্প করবার জন্যে সুযোগ খুঁজতেন। লুকিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতেন আমাদেরই এই শাজাহান হোটেলে। বলতেন, "সিগারেট খাওয়াও আমার বারণ। মা মোটেই পছন্দ করেন না।"

পাকড়াশি জুনিয়রও তখন রোজীর মতো চকোলেট খেতে ভালবাসতেন। তাঁর পকেটে সর্বদা চকোলেটের বার থাকতো। আমাদের একটু একটু ভেঙে দিতে দিতে অনিন্দ্য পাকড়াশি বলতেন, "আমার বাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না। বাবা বলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে, ট্রেডে, কমার্সে শান্তি নেই। জীবনকে যদি উপভোগ করতে চাও, তা হলে এর থেকে দূরে থাকা ভাল। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমি আরও কয়েক বছর স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করি; ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের দেশে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই। তারপর রুটিনের ঘানিতে একদিন তো বাঁধা পড়তেই হবে। কিন্তু মা রাজী হলেন না।"

একটু থেমে পাকড়াশি জুনিয়র বলে-ছিলেন, "জানেন আমার ছবি আঁকতে এতো ভালো লাগে, অথচ একটুও সময় পাই না। গাড়ি করে যেতে যেতে যখন দেখি গড়ের মাঠে, সবুজ ঘাসের উপর বসে বসে কোনো শিল্পী ছবি আঁকছে, তখন আমার মনটা উদাস হয়ে ওঠে। জানেন, এলিয়ট, অডেন আর পাউন্ডের কবিতা পড়া আমার নেশার মতো ছিল। বাংলাও পড়তাম। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন এঁদের কবিতাও আমার খুব ভাল লাগতো। সমর সেন পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমার খুব দুঃখ হতো। আমাদের দেশের লোকরা সত্যিই এতো কষ্ট পায়? জানেন, মাকে একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। মা তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। মা বললেন, 'ওঁরা যে কবি। হয়তো জীবনে ওঁদের যথেষ্ট সুখ আছে, শান্তি আছে, তবুও লেখবার সময় চোখের জল ফেলতে হয়। কাব্যের নিয়মই এই। পৃথিবীতে যারা সামান্য একটু সুখে আছে, স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, দারিদ্রের আদালতে তাদের অভিযুক্ত না করলে, সাধারণ লোক পয়সা দিয়ে ওদের কবিতার

বই কিনে পড়বে কেন? ও'দের সঙ্গে যদি আলাপ হয়, দেখবে এ'রা আমাদেরই মতো সাধারণ জীবন যাপন করছেন।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি ছেলেমানুষের মতো বলেছিলেন, "মা, যাই বলুন, সমর সেনের কবিতা পড়তে পড়তে আমার ভয় হয়। এক এক সময় মনে হয়, তিনি যা লিখেছেন তা সত্যি হলেও তো হতে পারে। সামান্য একটু জনপ্রিয়তা পাবার জন্যে কেন তিনি মিথ্যে কথা লিখতে যাবেন?"

এই অনিন্দ্য পাকড়াশিকেই আমরা চিনতাম। আমি চিনতাম। আবার আমার থেকে অনেক বেশী চিনতেন মিস্টার আগরওয়ালার হোস্টেস শ্রীমতী করবী গুহ।

দু'নম্বর সুইট থেকে ফোন তুলে ধরতে ফোনের ওধার থেকে মাধব পাকড়াশি প্রথমে কথা বললেন। মাধব পাকড়াশি বললেন, "এই যে ডেলিগেশন আসছে, এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব মিস্টার এ পাকড়াশির। যা কথাবার্তা বলবার তা ও'র সঙ্গেই বলবেন। একটু ধরুন, আমি ও'কে ডেকে দিচ্ছি"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "ভালই হয়েছে। আমিই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম আমি নিজেই একবার শাজাহান হোটেলটা ঘুরে আসবো।"

করবী দেবী বললেন, "তাহলে তো খুবই ভাল হয়।"

টেলিফোনটা নামিয়ে করবী দেবী আমাকে বললেন, "একটু যে শান্তিতে থাকবো তার উপায় নেই। ধনীর দুলাল এখনই পান্থশালা পরিদর্শনে আসছেন! এ'রা নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে হয়তো এখনই হুকুম দেবেন হি'য়া কা মাটি হু'য়া ফে'কো, আর হু'য়া কা মাটি হি'য়া ফে'কো। আমাদেরও তাই করতে হবে। এ'দের কাছে আমাদের শিখতে হবে কেমন করে অতিথি আপ্যায়ন করতে হয়!"

ঝলমলে টি-শার্ট এবং কাঠকয়লা রঙের ট্রপিকাল ট্রাউজার পরে এবং একটা টেনিস র‍্যাকেট হাতে নাচাতে নাচাতে অনিন্দ্য পাকড়াশি একটু পরেই নিউ আলিপুর থেকে এসে হাজির হলেন। সত্যসুন্দরদা তাঁকে কাউন্টার থেকে সোজা করবী দেবীর সুইটে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে আমাকে বসে থাকতে দেখে অনিন্দ্য বললেন, "আরে আপনি এখানে? মমতাজ-এ একদিন ঢুকে বেরিয়ে গেলে আন্দাজ হয় না, শাজাহান হোটেল কত বড়ো। আজকে ভিতরে ঢুকে এখানে আসতে আসতে বুঝলাম হোটেলের মধ্যে একটা শহর ঢুকে যেতে পারে।"

করবী দেবী অনিন্দ্যকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, "খাতায় কলমে যদিও এটাকে একটা সুইট বলা হয়, আসলে এটা হোটেলের একটা উইং। বেশ কয়েকজন গেস্টকে আমি অ্যাকোমোডেট করতে পারি।"

"অ্যাকোমোডেট্ নয়, আশ্রয় বলুন।" অনিন্দ্য হেসে উত্তর দিলেন। ঘরের ব্যবস্থাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "বিশ্বাস করবেন, আমি কখনও হোটেলে থাকিনি। মা মোটেই পছন্দ করেন না। এই ক'বছর তো বোম্বাই রাজ্যে ছিলাম, তা সহজেই হোটেলে থাকতে পারতাম। কিন্তু মা মাসিমার ওখানে ব্যবস্থা করে দিলেন। মেসোমশাই ওখানকার এজেন্ট। ও'র আণ্ডারেই আমার চাকরি।"

করবী দেবী বললেন, "আমাদের ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি ছোটোছেলের মতো হেসে ফেললেন। বললেন, "এই যে বাঁধা

আসছেন এ'রা জার্মানির এক বিরাট কারখানার মালিক। এ'দের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। বাবা সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছেন। এখন কোথাও পান থেকে চুন খসলে, আমাকেই তার জন্যে দায়ী হতে হবে। সুতরাং কী করি বলুন? এ-সবের আমি কী বুঝি? বাবার কাছে আমার যাতে মুখ রক্ষে হয়, সে ব্যবস্থা আপনাদেরই করতে হবে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি কিছুই দেখলেন না। সব দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হলেন। করবী দেবীর রকিং চেয়ারে বসে পড়ে অনিন্দ্য বললেন, "সামনের কয়েকটা দিন আমার কাটলে হয়! মা বলছিলেন, 'বাবার তখন তেমন অবস্থা ভাল নয়। এক বিলিতী কোম্পানির এজেন্সি পাবার জন্যে বাবাকে নাকি পরপর তিনদিন লাঞ্চ ড্রপ করতে হয়েছিল।' আমার ভাগ্যে আবার দেখা যাক কী আছে। কিন্তু লাঞ্চ ড্রপ করতে আমার মোটেই ভাল লাগবে না।"

করবী দেবী গম্ভীরভাবে বললেন, "এখন দিন কাল পাল্টিয়েছে। লাঞ্চ না খেলেই যে কাজ সমাধা হবে তার কোনো মানে নেই।"

অনিন্দ্য বললেন, "ঠিক বলেছেন। মাকে আমি কথাটা শুনিয়ে রাখবো। কাল ভোরে আমি এরোড্রোমে যাবো, সেখান থেকে এখানে আসবো, ও'দের সঙ্গে আঠার মতো লেগেও থাকবো। তারপর যা-হয় তা হবে।"

আমি উত্তর দিলাম, "এর পরে আপনার মায়ের আর কিছু বলবার থাকবে না। তবে, আগে থেকে আপনার বক্তব্যটা জানিয়ে রাখা মন্দ নয়!"

অনিন্দ্য পাকড়াশি আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। বললেন, "আমার মাকে আপনি চেনেন না। মা ভাববেন কাজলের আমার কাজে মন বসেনি। ও-হরি, আপনাদের বলাই হয়নি, কাজল আমার ডাক নাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার বন্ধুরা আমাকে কাজলা দিদি বলে রাগাতো। দেখা হলেই দূর থেকে চিৎকার করতো—বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মাগো, আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই।"

করবী দেবী গম্ভীর হয়ে রইলেন। আমি কিন্তু হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলাম, "আপনি বুঝি খুব শ্লোক আওড়াতেন?"

"মোটেই নয়। মাঝে মাঝে শুধু কোটেশন দিতাম। কবিতায় উত্তর দিতে আমার খুব ভাল লাগতো। এখন কিন্তু আমি কাঠ হয়ে যাচ্ছি। বাবার হোটেলে থাকা এক জিনিস, সবাই সেই অভিজ্ঞতাটি উপভোগ করে। কিন্তু বাবার আপিসে চাকরি, সে যেন রিগারাস ইমপ্রিজনমেন্ট, গুরুতর অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড। বড়ো বড়ো স্টেটমেন্ট বাবার টেবিল থেকে আমার টেবিলে আসছে, সেগুলো পড়ে তার থেকে রস বার করতে হচ্ছে। এর থেকে বোম্বাই ব্রাঞ্চে আমি অনেক ভাল ছিলাম। মেশোমশায় এতো খাটাতেন না। হাজার হোক জানতেন একদিন আমার ঘাড়েই সব দায়িত্ব পড়বে। মায়ের কিন্তু ইচ্ছে ছিল, আমি আরও কিছুদিন বাইরে থাকি। বাইরে কাজ করলে ট্রেনিং ভাল হয়, মায়ের ধারণা। না হলে, নিজের পেটের ছেলেকে কে আর বাইরে রাখতে চায়, বলুন? বাবা আগে দু'একবার আমাকে নিয়ে আসবার কথা তুলেছেন, মা মত দেন নি। এবার, বাবা প্রায় জোর করলেন। বাবার ধারণা, মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের ঘরানা শিখে নেবার সময় এসেছে। বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজের এখন দুটি প্রবল শত্রু, জানেন তো।"

করবী দেবী এবং আমি উৎসুকভাবে ও'র মুখের দিকে তাকালাম।

"কথাটা কিছু আমার নিজের নয়। আমার বাবাই প্রায় বলেন—পাবলিক সেকটর আর করোনারি থ্রম্বসিস। এ'রা দু'জনেই রাতারাতি আচমকা প্রাইভেট সেকটরকে নিজের এক্তিয়ারে টেনে নেবার তালে আছেন।" অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "এবার উঠি। মায়ের অর্ডার, ক্লাবে গিয়ে একটু টেনিস খেলতে হবে। বাবা কোনো খেলাধুলো করেন না, দিনরাত কাজে ডুবে থাকেন। আমারও এই সন্ধ্যেবেলায় টেনিস খেলতে মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু এখন মাঠে অনেককে দেখতে পাবেন। ওই যে বললাম, জীবনের অপরাহ্ন বেলায় প্রাইভেট সেকটরের ইডেন উদ্যানে করোনারি থ্রম্বসিসের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।"

করবী দেবী বললেন, "আপনার তো এই ব্রেকফাস্টের সময়। এখন থেকে ডিনারের সময়কার ছায়ার কথা ভাবছেন কেন?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি করবী দেবীর বলার ভঙ্গীতে খুবই আনন্দিত হলেন। বললেন, "বাঃ চমৎকার বলেছেন তো। সুন্দর কথা বলতে পারেন বলেই তো এমন ধরনের কাজ করতে পারেন। তবে আমিও সুন্দর করে উত্তর দেবার চেষ্টা করছি! ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ডিনারের কথা ভাবার নামই তো দূরদর্শিতা। না হলে তো লোকে বলবে, এর মস্তিষ্কে গোবর। শ্রীযুক্ত গোবর যখন পড়ছেন, শ্রীমান গোবর তখন হাসছেন।"

আজও মনে পড়ে, অনিন্দ্য পাকড়াশি সেদিন বিদায় নেবার পর, আমরা দু'জন অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসেছিলাম। সত্যি ছেলেটাকে ভাল লেগেছিল।

নাম কাজল, কিন্তু আসলে যেন শুভ্র। অনিন্দ্য পাকড়াশি আমাদের হোটেলের এই

অশুচি পরিবেশে যেন কিছুক্ষণের জন্যে স্নিগ্ধশুচিতার ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন।

করবী দেবীও চুপ করে থাকতে পারলেন না। আস্তে আস্তে বললেন, "চমৎকার।"

আমিও যেন তখনও অনিন্দ্য পাকড়াশির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কোনো-রকমে বললাম, "হুঁ।"

করবী দেবী বললেন, "এমন ছেলেকে মিসেস পাকড়াশি কেমন করে যে বছরের পর বছর বাইরে রেখেছিলেন।"

"ভাবী রাজার মায়ের মতো, ভাবী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মাকেও অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।" আমি উত্তর দিলাম।

করবী দেবী নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন, "আশা করি তাই যেন হয়।"

করবী দেবীর কথাতে আমিও খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। এমন এক একটা সময় আসে, যখন কাউকেই হিংসে করতে ইচ্ছে করে না। এক একজন মানুষ থাকে, সবাই যাঁর মঙ্গল কামনা করে। তাঁর ভাণ্ডারে অন্তহীন ঐশ্বর্য দেখে সাধারণরা আনন্দিত হয়; ঐশ্বর্যের আরও বৃদ্ধি কামনা করে। শ্রীমতী করবী গুহ শাজাহান হোটেলে ঐশ্বর্যের সমারোহ কম দেখছেন না। আমিও দেখছি। আমার নিম্নমধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমিও যেন হ্যামিল্টন কোম্পানির মণি-মাণিক্যের শোরুমে চাকরি করতে এসেছি। অনিন্দ্য পাকড়াশিকে আমাদের ভালো লাগবার কথা নয়। তবু ভাল লেগেছিল।

আমি মনে মনে আনন্দিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, যাক কিছু ভালও দেখলাম। হোটেল মানে তো শুধু খারাপ নয়। অসংখ্য ভালোর স্রোতে দু'একটা খারাপের মৃতদেহ ভেসে আসে; সেইটাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সাবধানী পরি-সংখ্যানবিদের কাছে তার তেমন মূল্য নেই —অসংখ্য ভালর মধ্যে সে-যে একটা খারাপ; শত, হাজার কিংবা লক্ষর মধ্যে একটা। আমাদের স্মৃতির অ্যালবামে, জীবনের সরোবরে একটা মরা গরুর দেহ ভেসে থাকলেই সব অপবিত্র হয়ে যায়। এতোদিন অন্তত তাই ভেবেছিলাম। আজ যেন অন্য রূপ দেখলাম—আমাদের সরোবরে পদ্ম-ফুলও ফোটে। সেই শুভ্র নিষ্পাপ পদ্মই যেন আমাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল।

এখন গভীর রাত্রি। আমার ক্লান্ত অবসন্ন মন স্মৃতির অতল থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে বহুদিন আগের হারিয়ে-যাওয়া পরিচিতদের ফসিলগুলো উদ্ধার করে আমারই চোখের সামনে সাজিয়ে রাখছে। এই রাত্রে বহুদিন আগের শাজাহান হোটেলের কোনো নাটকীয়তাই আমাকে চঞ্চল করে তুলতে পারছে না। পর্দার দেখি, আজ যেন তারই শততম রজনী। নতুন দর্শকদের কাছে নতুন; আমার কাছে পুরনো, প্রাণহীন। শাজাহান হোটেলের সব যে আমার জানা হয়ে গিয়েছে। শেষ না জেনে, যে পবিত্র কুমারী-বিস্ময়ে একদিন করবী দেবী এবং অনিন্দ্যকে দেখেছিলাম, আজও সেই একই বিস্ময়ে যদি তাঁদের কথা লিখতে পারতাম! কিন্তু যা হবার নয়, তা নিয়ে দুঃখ করি না। এই রাত্রে ওঁদের দু'জনের প্রথম পরিচয়ের কথা লিখতে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছে সেদিন অনিন্দ্যর সঙ্গে করবী দেবীর সাক্ষাত না হলেই ভাল হতো।

এই কলকাতায় অনেক হোটেল আছে। বিখ্যাত ভি আই পিদের সেবার জন্যে অনেক অতিথিশালা আছে। তারই কোনো একটাতে ইউরোপের কয়েকজন শিল্প-প্রতিনিধি কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করলে পৃথিবীর কারুরই কোনো ক্ষতি হতো না। মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের সমৃদ্ধির পথে কোনো বাধা তাতে সৃষ্টি হতো না। মিসেস পাকড়াশি, অনিন্দ্য পাকড়াশি, মাধব পাকড়াশি, করবী দেবী, আমি—আমরা সবাই হয়তো ভালো থাকতাম। দু'জন বিখ্যাত অতিথিকে আতিথ্য দিতে অস্বীকার করলে শাজাহানেরও কিছুই এসে যেতো না। এই তো, প্রতিদিন মার্কোপোলো সাহেব রোজীকে ডেকে কত 'রিগ্রেট' ডিক্টেশন দিচ্ছেন। এখন আর পুরো ডিক্টেশনও দেন না। হোটেলকে লেখা চিঠিটা ফেলে দিয়ে শুধু বলেন, 'অ্যাকসেপ্ট' না হয় 'রিগ্রেট'। বাঁধাগৎ আছে। অ্যাকসেপ্ট মানে—'প্রিয় মহাশয় অমুক তারিখে আপনি আসছেন জেনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হলাম। আপনাকে সেবা করবার মধুর সুযোগটির জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

রিগ্রেট মানে—'আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এশিয়ার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেলে বহুদিন আগে থেকে সব ঘর বুক হয়ে যায়। আর আপনার মতো একজন মহান অতিথিকে আমরা তো কষ্টের মধ্যে রাখতে পারি না। আমাদের দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই, না হলে, আপনার মতো একজন মহান মানবের সেবা-সুখ থেকে আমরা বঞ্চিত হবো কেন?"

এমনি রিগ্রেট চিঠি তো রোজী প্রতিদিনই টাইপ করছে। আর একটা বাড়লে, পৃথিবীর এমন কী ক্ষতি হতো?

কিন্তু তখনও বুঝিনি। আমি কেন করবী গুহও বোঝেন নি। তারপরের দিনও বোধ হয় না।

পরের দিন ভোরে আমি উঠে পড়েছিলাম। তখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। ছাদের উপর নিশ্চল পাথরের মতো একটা লোক তখনও বসেছিলেন। তাঁর নাম প্রভাতচন্দ্র গোমেজ। ওই ভোরবেলাতেই প্রভাতচন্দ্র গোমেজ যে ব্রাহ্মের প্রদর্শিত পথে কালো কফি নিজে হাতে তৈরি করে পান করেছেন, তা তাঁর পাশের শূন্য কাপটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন ছাদের কোনে ঐভাবে কিসের অপেক্ষায় বসে আছেন কে জানে?

প্রভাতচন্দ্র এবার আমাকে দেখতে পেলেন। ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "আমার জীবনে এই একটাই বিলাসিতা

আছে। সূর্যের জন্য পূর্বদিগন্তে তাকিয়ে থেকে আমি নতুন চিন্তার খোরাক পাই। সূর্যের শব্দহীন শিশুরা হঠাৎ যেন কলরবে মুখরিত হয়ে এই মুহূর্তে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।”

আমি বললাম, “আপনার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। শুধু একটা গেঞ্জি পরে বসে আছেন।”

প্রভাতচন্দ্র গোমেজ আমার কথায় যেন কানই দিলেন না। নিজের মনেই বললেন, “ঠাণ্ডা লেগে এখান থেকে আমি বিদায় নিলে পৃথিবী একটুও গরীব হবে না। অনেকদিন আগে ঠাণ্ডা লাগিয়ে অবহেলায় একজন মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—সেদিন কিন্তু পৃথিবী সত্যিই গরীব হয়ে গিয়েছিল। আজও সে ক্ষতি পূরণ হয়নি।”

প্রভাতচন্দ্রের কথার মধ্যে এমন এক বিষণ্ণ
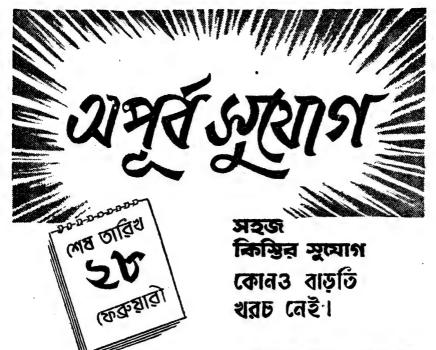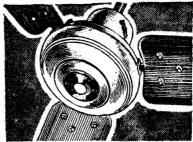
শব্দঝংকার আছে যা আমার মতো বেসুরো মানুষকেও সহজে আকৃষ্ট করে। আমি ও'র মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

প্রভাতচন্দ্র বললেন, "তিনি সংগীতের সেক্সপিয়র; তাঁর নাম বীঠোফেন। আমার যদি সামর্থ্য থাকতো, আমার যদি তেমন একটা রেকর্ড লাইব্রেরি থাকতো, তা হলে আজ এই মুহূর্তে আপনাকে শোনাতাম বীঠোফেনের নাইনথ্ সিমফনি— the most gigantic instrumental work extant."

আমি বললাম, "ঈশ্বরের আশীর্বাদে একদিন আপনার যেন সব হয়।"

"তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর বিচার?" প্রভাতচন্দ্র গোমেজ প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। "তাহলে হাণ্ডেল এবং বাক্ কী দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন? তা হলে কী বীঠোফেন কালা হয়ে যান? মানব সভ্যতার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে আর একজনও বীঠোফেন সৃষ্টি হয়নি। যদি আপনি পৃথিবীর মধুরতম সিমফনি শুনতে চান তাহলে বীঠোফেন যে ন'টি রেখে গিয়েছেন তাই আপনাকে শুনতে হবে; যদি আপনার এমন পিয়ানো শোনাটা শোনবার লোভ থাকে যার কোনো তুলনা নেই তাহলে বীঠোফেনের বত্রিশটার মধ্যেই একটা পছন্দ করতে হবে। আর স্ট্রিং কোয়ার্টেট? সেখানেও আপনার ভরসা তাঁর সতেরোটি রচনা। আর অতি সাধারণ উপায়ে যদি অসাধারণ শব্দঝংকার সৃষ্টির রহস্য আপনি আবিষ্কার করতে চান, তা হলে ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে নির্জনে বসে বসে আপনাকে হাণ্ডেলের পুজো করতে হবে। একবারে তিনি হয়তো আপনাকে অনুগ্রহ করবেন না। কিন্তু আপনাকে হতাশ হলে চলবে না। ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। তারপর একদিন এমনই কোনো অন্ধকার এবং আলোর মিলন মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন বীঠোফেন কেন বলেছিলেন—

Go and learn of Handel how to achieve great effects with simple means.

প্রভাতচন্দ্র হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তাঁর পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণ ভুলে তিনি আবার পূর্বদিগন্তের দিকে তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে সরিয়ে নিলেন। সহজ পথে অসাধারণকে পাবার গোপন মন্ত্রটি যেন ওই আকাশের এক কোনে কোথাও অদৃশ্য কালিতে লেখা রয়েছে।

আমি আর কোনো কথা না বলেই, ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। হোটেলের সবাই তখনও গভীর ঘুমে ডুবে রয়েছে। কিন্তু আমার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। করবী দেবীরও। তিনি এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন। মার্কোপোলোর
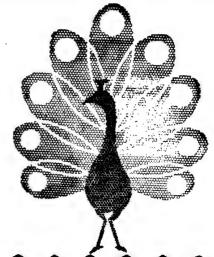
সঙ্গে তাঁর এবং আগরওয়ালার কথা হয়েছে। ক'দিন আমাকে বিশেষ অতিথিদের জন্যে বিশেষ ডিউটি দিতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার কিন্তু শুধু প্রভাতচন্দ্রের কথা মনে হচ্ছিল। সহজ পথে মহানকে পাবার জন্যেই যেন আমরা সবাই কাঙালের মতো রাস্তায় পাতা পেতে বসে আছি।

করবী দেবীর ঘরে টোকা মারতেই, তিনি দরজা খুলে দিলেন। তাঁর অতিথিশালা তখন অতিথি অভ্যর্থনার জন্যে প্রায় প্রস্তুত। ঘরের কোনে এবং টেবিলে কেমন সুন্দর ফুলের গুচ্ছ সাজিয়ে দিয়েছেন করবী দেবী।

রঙের সঙ্গে রঙ মিলেছে। করবী দেবী বললেন, "এক এক সময় ভাবি, ইনটিরিয়র ডেকরেটরের কাজ করবো। কেমন দেখছেন?"

বললাম, "চমৎকার।"

করবী দেবী বললেন, "বেচারা ন্যাটাহারি-বাবুকে কাল খুব খাটিয়েছি। যে রঙের পর্দা এনে দেখান তাই আমার পছন্দ হয় না।"

শেষে ন্যাটাহারি বাবু নিবেদন করলেন, "মা জননী, যদি অপরাধ না নেন, তা হলে একটা কথা বলি। আমি তো লাটসায়েবের বিছানাও করেছি। রয়েল ফ্যামিলির মেম্বাররা যখন ইন্ডিয়ায় এসেছেন, তখনও বিছানা বালিশের জন্যে এই ন্যাটাহারি ভট্টাচার্য্যিকেই ডাকতে হয়েছে। এই অধমের হাতে তৈরি বিছানাতেই শুয়ে লর্ড রিডিং এমন সুখ পেয়েছিলেন যে, ঘুম থেকে উঠতে এক ঘণ্টা দেরি করেছিলেন। সকালের সমস্ত প্রোগ্রাম একঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। আর এমনই অদৃষ্ট আমার যে এখন দুটো জার্মান সায়েবের জন্যে ঘর সাজাবার পর্দা পছন্দ করতে পারছি না।"

করবী দেবী তখন বলেছিলেন, "এই সব ব্যবস্থার উপর একজন ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—খারাপ কিছু ঘটলে তাঁর বাবার কাছে তিনি ছোটো হয়ে যাবেন।"

ন্যাটাহারিবাবু তখন কান থেকে পেন্সিলটা খুলে বলেছিলেন, "ব্যাপার যদি এতোই গুরুতর হয়, তাহলে মা জননী একটা কথা বলি। ঘরের পর্দা, টেবিলের কাপড়ের জন্যে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। সমস্ত নজরটা বিছানার উপর দিন। ফর্টি ইয়ার লিনেনের কাজ করে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি, তাতে বলছি, বিছানাটা হোটেলের সবচেয়ে ইম্পর্টান্ট আইটেম। বিছানাটা যদি ভাল পায়, খারাপ খাবার হলেও লোকে কিছু বলবে না। বিছানা এমনভাবে করতে হবে, যাতে সবাই ভাবে সে নিজের চেনা বিছানাতেই শুয়ে আছে। দোষ দিতে পারেন না, মা জননী। লাইফের সবচেয়ে ইমপর্টান্ট সেন্টার এই বিছানা। এই বিছানাতেই আমরা হাসি, এই বিছানাতেই শুয়ে শুয়ে আমরা কাঁদি, এই বিছানাতেই আমাদের জন্ম, এই বিছানাতেই আমাদের মৃত্যু। অথচ মা লক্ষ্মী, আজকালকার আপনারা এ-দিকটা একেবারেই নজর দেন না। ন্যাটাহারি যখন থাকবে না তখন এই হোটেলের যে কী হবে!"

ন্যাটাহারিবাবু তারপর তাঁর যত রঙের পর্দা আছে, তার একটা করে নমুনা মাথায় করে করবী দেবীর ঘরে হাজির হয়েছিলেন। এবং তার মধ্যে থেকেই করবী দেবী একটা পছন্দ করেছেন।

"কেমন দেখছেন?" করবী দেবী আমাকে এক কাপ চা দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন।

আমার মাথায় তখনও হাণ্ডেল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বললাম, "সহজ অথচ সুন্দর হয়েছে।"

করবী দেবী হাসলেন। বললেন, "সব সৌন্দর্যের রহস্যই তো ওই। এই যে অনিন্দ্য পাকড়াশি। ও'র জন্যেই বা আমরা দু'জনে এতো পরিশ্রম করছি কেন? উনি সহজ অথচ সুন্দর বলে, তাই না?"

সেদিন ব্রেকফাস্টের একটু আগেই দমদম বিমানঘাটি থেকে দু'জন বিদেশী অতিথিকে নিয়ে মাধব ইণ্ডাস্ট্রিজের বিরাট ক্রাইসলার গাড়ি শাজাহান হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির মধ্যেই এ'দের সঙ্গে ছিলেন মিস্টার অনিন্দ্য পাকড়াশি।

ভদ্রলোক দু'জনের আকার বিশাল, এবং গুরুত্ব ততোধিক। শাজাহান হোটেলের দরজাগুলোর উচ্চতা সম্বন্ধে মনে মনে আমাদের কিছু দম্ভ ছিল। কিন্তু সেই দরজাগুলোও যেন আর একটু হলে ডক্টর রাইটার এবং মিস্টার কুর্ট-এর মাথার কাছে ছোটো হয়ে যেতো!

করবী দেবী আজ মুর্শিদাবাদ সিল্কের একটা শাড়ি পরেছেন। মাথার খোপা রজনীগন্ধার গোছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। অনেকদিন আগে সরস্বতী পুজোর দিন আমার অলকাদিকে এমনি দেখাতো। এমনি সহজ অথচ গম্ভীর বেশে অলকাদি গার্লস কলেজের পুজো-মণ্ডপে যেতেন।

করবী গুহ আমাদের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। অতিথিদের দেখে ভারতীয় প্রথায় হাতজোড় করে অভ্যর্থনা জানালেন। অনিন্দ্য পাকড়াশি আমার ঘাড়ে ও'দের মালপত্তরের দায়িত্ব চাপিয়ে করবী দেবীকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

পোর্টারের ঘাড়ে সব মালগুলো চাপিয়ে, আমি যখন দু'নম্বর সুইটে এসে হাজির হলাম, তখন চমকে যাবার অবস্থা। দু'নম্বর সুইটের মেঝেয় কখন আলপনা এ'কে ফেলেছেন, করবী দেবী।

ও'রা বলছেন, "এ-গুলো কী?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বলছেন, "আমাদের ট্রাডিশনাল পেন্টিং। সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে আমাদের গৃহবধূরা এই আলপনা দিয়ে থাকেন।"

ডক্টর রাইটার বললেন, "বঃ চমৎকার!" তারপর তিনি নিজের ক্যামেরা মেঝের উপর ফোকাস করতে আরম্ভ করলেন।

ছবি তোলা শেষ করে রাইটার বললেন, "অ্যামেচার ঘরের মেয়েরা এমন আর্ট-ওয়ার্ক করতে পারে! কোনো প্রফেশনাল শিল্পী এ-গুলো করেন নি?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "মোটেই না। অবশ্য মিস্ গুহকে আপনি একজন ট্যালেন্টেড শিল্পী বলতে পারেন।"

মিস্টার কুর্ট জুতোর ডগা নাড়তে নাড়তে বললেন, "মে আই হ্যাভ এ গ্লাস অফ্ বীয়ার?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "নিশ্চয়ই।"

কিন্তু আমাকে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে হলো, আজ ড্রাই-ডে।

"হোয়াট?" অসন্তুষ্ট মিস্টার কুর্ট প্রশ্ন করলেন।

অনিন্দ্য পাকড়াশি ব্যাপারটা এতোক্ষণে বুঝতে পেরে গিয়েছেন। বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমরা খারাপ দিনে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছো। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন আমাদের এই স্টেটে মদ বিক্রি বন্ধ। সেদিন বার এবং রেস্তোরাঁর ম্যানেজাররা সব স্পিরিচুয়াস লিকার তালাবন্ধ করে রাখেন।"

মিস্টার কুর্ট যেন এমন কোনো সংবাদ জীবনে শোনেন নি। বলছেন, "ইউ মিন টু সে, একদিন তোমরা পুরোপুরি ড্রাই! ইচ্ছে করে ইণ্ডিয়ার নরম্যাল লাইফ একদিনের জন্যে তোমরা পংগু করে দাও? এবং তুমি বলতে চাও, এইভাবে, এই সব লাস্ট সেঞ্চুরির পচে যাওয়া আইডিয়া নিয়ে তোমাদের কাণ্ট্রি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুসনের সূচনা করবে?"

এই অশুভ সূচনায় অনিন্দ্য পাকড়াশি যে বেশ ঘাবড়ে গেলেন, তা ও'র মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। কিন্তু তখন কে জানতো, আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে।

(ক্রমশ)

টানলেই বোঝা যায়

ক্যাপস্টান

ক্রাশপ্রুফ ২০ টির প্যাকেট

ক্যাপস্টান সিগারেট এখন ২০টির 'ক্রাশপ্রুফ' মজবুত প্যাকেটে কিনতে পারেন—দুমড়ানোর ভয় নেই। নীল ও সোনালী রঙের চলতি ১০টির প্যাকেটে চান তা-ও পাবেন। যে প্যাকেটই নিন, প্রত্যেকটি ক্যাপস্টান সিগারেট বরাবর যেমন, আজো তেমনি স্বাদে ও গন্ধে সমান উপাদেয়…টেনে সুখ। তাইতো বরাবরই লোকে বলে "ক্যাপস্টান যে ধরেছে সে-ই মজেছে"।

উইলস্-এর ক্যাপস্টানের তুলনা নেই

নীল ও সোনালী রঙের চলতি ১০টির প্যাকেটেও পাবেন

IWTCC 144A

এক ইংরেজ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন—জানো, কে ফেব্রুয়ারী মাস ৩০ দিনের বদলে ২৮ দিনে করেছে?

বলি—কে?

—কেন, স্বনামধন্য ইংরাজ।

—নেপোলিয়ান কোনো এক জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন বটে Nation of Shopkeepers', কিন্তু তাদের দোকানে যে ইতিহাসও ম্যানুফ্যাকচার করা যায় জানা ছিল না।

—সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভদ্রলোকই বলেছিলেন—

"History is nothing but facts agreed upon."

সুতরাং তুমি আর আমি যদি রাজী থাকি, এইটেই ইতিহাস।

—ইতিহাসকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হল, এখন তোমার হাসির কথাটা বল।

এবার তূণীর থেকে বেরোয় দ্বিতীয় বাণ—স্বীকার করবে কি ফেব্রুয়ারীই বছরের দীর্ঘতম মাস?

—আর একটা ডিসকভারি বটে! দুই আর দুয়েই চার-এর মত সহজ। এ উপপাদ্য প্রমাণের দরকার হয় না। স্বতঃসিদ্ধ!

—ইউক্লিডের সরল রেখার সঙ্গেও উপমা দিতে পার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন সত্যি, এও তাই।

—ও হোঃ হোঃ, বুঝেছি তোমার কথা। দেখতে কনিষ্ঠ কিন্তু দুর্ভোগ ভোগাতে জ্যাঠামশাই। এক-একটা দিন নয় ত যেন এক-এক যুগ, ঠিক বলেছ স্থায়িত্বে মনে হয় দীর্ঘতম। ক্ষুদে হলেও বিষপুঁটুলি। সকল মাসের শিরোমণি।

একটু থেমে আবার শুরু করেন—এতক্ষণে তা হলে মাথা খুলেছে। ওই ত তোমাদের দোষ, একটু দেরিতে বোঝ।

উত্তর দিই—প্রকৃত জ্ঞানটা ধীর স্থির।

সূর্যদেবের সপ্তাশ্ব রথ সেপ্টেম্বরে বিষুবরেখা মাড়িয়ে ছোটে দক্ষিণ দিকে। সময়ের কড়াক্রান্তি হিসেব করে 'মকর' পাতিয়ে আসে ডিসেম্বরে ঠিক বড়দিনের আগে। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে তখন সবচেয়ে ছোট দিন। সূর্যদেব তাদের কাছে দক্ষিণ দুয়ারের কাছাকাছি। জবাকুসুম সংকাশং তখন মহাদ্যুতি হারিয়েছেন। দেখলে মনে হয় যেন টিমটিমে লণ্ঠনের আলো। তাও একনাগাড়ে পাঁচ-সাত দিন হয়ত দেখাই নেই—হয় নবাবপুত্তুর, না হয় তুমুরের ফুল। যদি বা দর্শন দিলেন, সে তেরচা আলোয় তাপ থাকে না। ফলে আমরা থরহরি কম্পমান। এ দেশে কাঁপুনি দিয়ে ক্ষান্ত নয় রক্ত জমে বরফ হওয়া শীত। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বিলেতের রক্তজমা শীত ডিসেম্বরে নয়। ফেব্রুয়ারী পড়লেই বুক দুরুদুরু করে—ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—বর্ষা নয় শীত।

ভাবছিলাম আমাদের সাহিত্যে শীতের প্রাচুর্য নেই। তুষারপাতের একটা ভালো বিবরণ খুঁজে পাওয়া ভার। পদ্মা নদীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে গ্রাস করেছিল। মসৃণ, চিক্কণ, কৃষ্ণ, কুটিল, নিষ্ঠুর জল দেখেছেন। রুদ্র বৈশাখের রুক্ষ পিঙ্গল জটাজাল উপলব্ধি করেছেন। নীল নবঘন আষাঢ় গগনের তিনি মুখোমুখি হয়েছেন, ঈশান কোণের বিষাণও শুনিয়েছেন। কিন্তু শীত তাঁর সাহিত্যিক মনে উপেক্ষিতা।

আর কবি কালিদাস আসর জমিয়েছেন উজ্জয়িনীতে। পাহাড় বা শীতের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল না। তাই তাঁর হিমালয়ের বর্ণনা উপভোগ্য বটে, তবে ভাসা ভাসা মেঘদূতের মত কল্পনার পাখা মেলে এগিয়ে চলা। তাঁর কাছে হিমালয় ঋষি, দেবতাত্মা, নগাধিরাজ, খেলার সাথী নয়। তাঁর বর্ণনায় বেণুঃ মুহুঃকম্পিত দেবদারু হিমালয়ের মনোহর রূপ—তুষারপাত মহাকাব্যের ত্রিসীমানায় নেই।

মনে আছে বিলেতে প্রথম দেখা তুষারপাত। ফেব্রুয়ারী মাস। রবিবার স্বভাবতই দেরি করে উঠি, তায় শীতের দাপট। বেশ বেলা হয়েছে। উঠে জানলার পর্দা খুলতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সাদায় সাদা। যেদিকে দু চোখ যায় শহরের রজতশুভ্র রূপ। কোন যাদুমন্ত্রে যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় চলে এসেছি। হেলানো ছাদ, টেলিগ্রাফ পোস্ট, গাছপালা, পথঘাট সব যেন রাশি রাশি বকুল ফুলে ছেয়ে গেছে। তখনও ঝুরঝুর করে পড়ছে হেলেদুলে। বসন্তের হাওয়া লেগে শিমুল গাছের তুলো যেমন ভাসতে ভাসতে চলে। একে কি বলতে পারি পুষ্পবৃষ্টি? কালিদাসের কথায় পৌরকন্যার খই ছড়িয়ে মঙ্গলাচরণ!

জানলাটা তুলে হাত বাড়িয়ে দিলাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা শিউরে উঠল। মনে জাগল শিহরন। অঞ্জলি ভরে গেল, মনটাও। চটপট বেরিয়ে পড়লাম পথে। ছোট ছেলে-মেয়েদের মহোৎসব। এ ওকে ছুঁড়ে মারছে বরফের বল। আনন্দের আতিশয্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে। নির্জনে পথের কোণে একটা মেয়ে আপন মনে গড়ছে তুষারমানব। মাঠে গিয়ে বুঝলাম তুষারপাগল আমি একা নই। বেশ লোকের ভিড়। ঝিলে আর জল নেই, বরফ। একদল স্কেটিং পায়ে লাগিয়ে নেমে পড়েছে। কেউ কেউ অনভিজ্ঞতার আছাড় খাচ্ছে—তাতেও আনন্দ।

এ রূপ নাকি সাহিত্যিকের মনের রঙ। বাস্তবে গাড়ি-ঘোড়া অচল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। সে সময় ট্রেন চলে, তবে অতি ধীরে এবং সামান্য কয়েকটা। বাস বা মোটর চলে না বললেই হয়। যানবাহনের মধ্যে কেবল মাটির নীচে টিউব চলে। সময়মত চিঠি বিলি হয় না। খাবারদাবার পাওয়া ভার। অফিস-আদালতে অব্যবস্থা। মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়স্বজন ব্যর্থ আশায় বসে থাকে ডাক্তারের পথ চেয়ে। সবার বেশী বিপদ যে এলাকায় বিজলীবাতি বিকল হয়ে যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। শীতে জমে

বরফ-জমা শীতের লণ্ডন। ক্রিস্ট্যাল প্যালেসের সন্নিকটে তুষারাবৃত রাস্তায় পথভ্রষ্ট গাড়িটাকে ঠেলে পথে নামানো হচ্ছে। অদূরে অচল অবস্থায় [illegible]

যাচ্ছে অথচ ঘরে ফায়ার জ্বলছে না। গরম জল করে এক কাপ চা খাবে তার উপায় নেই। এই নরকযন্ত্রণা থেকে কতক্ষণে অব্যাহতি মিলবে কে জানে!

বরফ যখন গলতে থাকে, আরও বিপদ। রাস্তা প্যাচপেচে। অতি সাবধানীও পা পিছলে আছাড় খায়। পুলিসবাহিনী আর রাজপুরুষ নয়। বালির বস্তা কাঁধে রাজপথে শোভা করে। জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে দেয় পিছল কমাবার জন্যে। মোটর আরোহীরও নিস্কৃতি নেই। সোজা পথে না গিয়ে স্কিড করে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারে।

ঋতুশ্রেষ্ঠের অভিযান ত্রিমুখী। ঠান্ডা, স্মগ আর তুষারের ত্রিশূল নিয়ে এর তান্ডব। মাঝেরটা মধ্যমণি। উল্কার মত আবির্ভাব, দুদিন বাদে বিদায় নেয়। কিন্তু পিছনে ফেলে যায় আতঙ্ক। শুধু কুয়াশা নয়, কুয়াশা ও ধোঁয়ার সমন্বয়। স্মোক ও ফগের সমাস। সন্ধি বা ষড়যন্ত্র যা বলেন। হঠাৎ দেখা গেল পূর্বদিকের আকাশ একটু ঘোলাটে।......ধোঁয়া আরও এগিয়ে আসছে। দূরের ঘরবাড়ি অস্পষ্ট। ক্রমে তাও অদৃশ্য হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে দু-হাত দূরের লোককে দেখা যায় না। একেবারে সূচিভেদ্য অন্ধকার। অমাবস্যার রাতে শরৎচন্দ্র শ্মশানের যে রূপ দেখেছিলেন তার চেয়ে ভয়ঙ্কর। এর আভাস পেলে অফিস আগে ছুটি হয়ে যায়। লোকজন উর্ধশ্বাসে চলে বাড়িমুখো। শুধু অন্ধকার নয়, এ বায়ু বিষাক্ত। অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়। অনেকে মারাও যায়।

শীত উপভোগ করি বা নাই করি তার পরিভাষা জানতে হয়। না হলে আলাপ-আলোচনায় যোগ দেওয়া যায় না। আবহাওয়ার প্রথম স্তর মাইল্ড, আমাদের দেশের পৌষ মাস। অর্থাৎ চমৎকার। তারপর কোল্ড, সিভিয়ার কোল্ড, তদুপরি ফ্রস্ট এবং ডীপ ফ্রস্ট। সে ঠান্ডায় জল বরফ হয়ে যায়। কলের জলের পাইপ ফেটে যায়, গাড়ির কলকব্জা বিকল হয়। এই ঠান্ডা যখন কমে, বরফ আবার গলে জল হয় তাকে বলা হয় 'থ'। সময় সময় একনাগাড়ে কয়েক দিন ধরে ফ্রস্ট থাকে। তখন পুরু পশমের মোজা ভেদ করে পা চিনচিন করে। হাতের আঙুল জ্বালা করে, মনে হয় বুঝি বা পুড়ে যাচ্ছে। আর সুগ্রীব সখা উত্তর-পূর্ব বায়ু তীব্র বেগে বইতে থাকে। কান দুটোকে যেন ভোঁতা ছুরি দিয়ে খোঁচায়। বুড়ো লোকদের দুর্দশা আরও বেশী। হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে, সুযোগ বুঝে বাতব্যাধি জেঁকে বসে। সভ্য দেশ। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র। একটু বড় হতেই ছেলে মানুষ করার বড় দায়িত্ব সরকারের। ফলে, বাবা-মার প্রতিদানের প্রত্যাশা অবান্তর। ছেলে বিয়ে করে আলাদা ঘর-সংসার পাতবে। তার সমাজ সুখ দুঃখ আলাদা। বুড়ো বাপ মা তার জীবনে অতীত অধ্যায়। বেচারা বৃদ্ধ। সামর্থ্য নেই—ঝি-চাকর রাখা নবাবি-পনার সামিল। দু-দন্ড গল্প করবে তেমন সংগী-সাথীও নেই। আর যারা সরকারী পেন্সনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে তাদের ঘরে আগুন জ্বালাবার পয়সা কুলোয় না। মাংসের দাম বেশী, খেয়ে শরীরের রক্ত গরম রাখবে, সে দুরাশা। বয়েসটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনটা বাঁচা নয়, পাপক্ষয়। শাপমুক্তির একমাত্র পথ ইনফ্লুয়েঞ্জা বা নিউমনিয়ার সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করা।

বাসের লাইনে দাঁড়িয়েছি। বিলেতের বাসও সময়বিশেষে মানুষের মনোবৃত্তিতে গ্রিগেরিয়াস হতে চায়, দল বেঁধে বাস করবে। পনের-বিশ মিনিট ধরে সাড়াশব্দ নেই, তারপর চার-পাঁচখানা লাইনবন্দী। পেছনের বুড়ো আলাপ করতে এগোল। বুঝলাম বাস কোম্পানির আদ্যশ্রাদ্ধ করবে। তা নয়, বেশ হাসিখুশী। ঠান্ডাও কাবু করতে পারেনি। বলে—কেমন লাগছে? সূর্যিমামার দেশের লোককে একটু অনু-কম্পা মেশানো সহানুভূতি জানায়।

আমার পাকাপাকি উত্তর আছে। বলি—তোমাদের দেশের আবহাওয়াই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে।

এই বুঝি মারতে আসে—কি বললে? এই মেঘে ঢাকা দিন, প্যাচপেচে বৃষ্টি, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, খোলা আকাশের নিচেও ঘুলঘুলির মত অন্ধকার, আর তুমি বলছ কিনা...

—অনন্তযৌবনা উর্বশী আর চিরবসন্ত দুটোই আলেয়ার আলো।

—ঠিক বলেছ। তোমরা আর কি দেখলে? সেন্ট জেমস পার্কের ঝিলে হ্যাম্পস্টেড হীথের দশ ফুট পরিধি গোল পুকুরে একটু বরফ জমলে সাংবাদিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নথিপত্র ঘেঁটে প্রমাণ করে গত এক শো বছরের রেকর্ড। আমি ১৮৯৫ সালে দেখেছি টেমস নদী জমে গেছে। রিচমন্ডের কাছে আমরা দু-বেলা হেঁটে পার হতাম নদীটা। অবশ্য ১৮৩২ সালের আগে লন্ডন ব্রিজটা ছিল ১৯টা আর্চের ওপর। জলের গতিবেগ ছিল কম। বরফ জমা সহজ ছিল। তাই বলে শীতের দাপট কম ছিল না। সারা টেমসটা জমে যাওয়া যে-সে কথা নয়। অনেকবার গিয়েওছে। আর মজার ঘটনা, ওই বরফের ওপর মেলা বসত। দূরে দূরে থেকে লোক আসত। ঘোড়ায় টানা কোচ এসে জড়ো হত টেমসের ওপর। আলোর মালা পরিয়ে সাজানো হ'ত। দোকানপাট বসত। আগুন জেলে বড় বড় বিফ-রোস্ট করা হ'ত। দর্শকের দল এসে ভিড় জমাত। এই ধরনের প্রদর্শনীতে এক সুভেনিরের গায়ে লেখা ছিল :

জ্যাক ফ্রস্ট,

তুমি অন্যায় এবং হিংসাত্মক উপায়ে টেমস নদী জবরদখল করেছ। এতদ্দ্বারা তোমাকে সাবধান করা হচ্ছে, অবিলম্বে এ রাজ্য পরিত্যাগ কর। ইতি

তোমার শত্রু 'থ'

বলি—বেরসিক থ। ঐ দেখ বাসের টিকি দেখা গিয়েছে। এই ফাঁকে আমার ছেলের প্রিয় গানটা তোমায় শুনিয়ে দি :

Over the pond where we
used to play,
Jack Frost has spread a
white carpet today;
Let's put on our skates,
how quickly it's done,
Isn't it fun, oh isn't it fun,
Sliding, gliding to and fro
Over the shining ice we go.

—হিরন্ময় ভাট্টচার্য

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি -

সুধীর করণ

॥ ১ ॥

কোপাই একটি নদীর নাম।

যৌবনের চাঞ্চল্য আর সীমাহীন ... বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন পদ্মার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছিলেন। পদ্মার 'আভিজাত্যিক ছন্দ' তাঁর আভিজাত্যকে আকর্ষণ করেছিল গভীর প্রেমের পরিবর্তিতে। এই প্রমত্তা নদীর পরিবেশ-বৈপরীত্যে কোপাই একটি মেঠো সুর মাত্র। কিন্তু এর মূল্যও রবীন্দ্র-কাব্যে অল্প নয়। রবীন্দ্রনাথের যৌবন-চেতনায় কোপাই নদী মুখ্য নয়, কিন্তু শেষের যৌবনের প্রশান্তিতে সম্পদতুল্য। 'পদ্মার ছন্দের মধ্যে তার ছন্দ আভিজাত্যিক নয়, ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—, তাকে সাধুভাষা বলে না। জলস্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে, রেষারেষি নেই তরলে-শ্যামলে।' এই কোপাই একদিন 'কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে।'

"তারপর যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে
ছায়াবৃত সাঁওতালপাড়ার পুঞ্জিত সবুজ
দেখা যায় অদূরে।
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি
কতকালের সাঁওতালনারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।

এই নদীর 'ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;—পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি, আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে; হাটে যাবে কুমোর বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে; পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা; আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু,—ছেঁড়া ছাতি মাথায়।'

কোপাই নদীর নামটিকে সংস্কৃত করে 'কোপবতী' বলেননি রবীন্দ্রনাথ। তাতে কোপাই নদীর সম্মান বাড়তো না। তা ছাড়া কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর কলভাষার সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে আছে, তাকে পরিশুদ্ধ করে সভ্যতার মুখোশ পরানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। কোপাই গঙ্গা নয়, পদ্মা নয়, একান্তভাবে কোপাই। 'ছিপছিপে ওর দেহটি বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয় হাততালি দিয়ে সহজ নাচে। বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি, মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো,— ভাঙে না, ডোবায় না, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।'

এর চেয়ে অনায়াসে কোপাই নদীর রূপকে পরিস্ফুট করা যেতো না, এমনকি কোন সাঁওতাল দেবী তরুণীর রূপকেও নয়। কোপাই, তাই শুধু একটি নদীর নাম নয়, একটি সাঁওতাল মেয়েরও নাম।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্র-কাব্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা-কাহিনী-ছড়া-ছবি অস্পষ্ট। শান্তিনিকেতনের বৈরাগী-প্রান্তরের শালবনের ছায়ায় এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত। সাধারণত আমাদের কাছে এই সম্প্রদায়টি বিশেষ এক ধরনের রোমান্টিক আলোকে বিধৃত। জটিল এবং বহুলাংশে কৃত্রিম একটি সভ্যতার নখ-দন্ত পেষণে নগর-পুষ্ট জীবন যখন রোম্যান্সের মায়াডোরকে একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করে, তখন সেই রোমান্টিক চিন্তা-কল্পনার মধ্যে সাঁওতালদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সারল্য, আদিম নৃত্যগীতের প্রাক-পৌরাণিক স্পর্শ এবং নারী-পুরুষের দ্বৈত-শ্রমচর্যার অনভিজাত ছন্দও একটি মোহের সঞ্চার করে। বর্তমানে নানাবিধ অনিবার্য কারণে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনে ছন্দোপতন ঘটলেও আমাদের মানসক্ষেত্রে তা আজও চাঁদনী রাতের চৈতী হাওয়া, মাদলের মাতাল সুর আর মহুয়াবনের মদ-গন্ধকেই উজ্জীবিত করে। শালফুলের সুবাসে অভিষিক্ত হয়ে চৈত্র-জ্যোৎস্নায় যখন সরহুল উৎসবের নাচ-গান নাকাড়া-মাদলের সরল রেখা একটি অকৃত্রিম জীবনের চিত্র প্রায় গতানুগতিক রীতিতেই প্রকাশ করতে থাকে, তখন আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সীমাহীন বিস্ময়।

বলা বাহুল্য, রোম্যান্স-দৃষ্টির আতিশয্য বাস্তব জীবনবোধের অনেক বেশী অন্তরায়। কিন্তু এ কথা একেবারে হাস্যাস্পদরূপে অস্বীকার করা চলে না যে, রোম্যান্স-চেতনায় আমাদের জন্মগত অধিকার এবং তা অতিমাত্রিক বাস্তববাদীর কাছেও কোন-না-কোনরূপে অনিবার্য।

শান্তিনিকেতনের আশেপাশের সাঁওতাল-পল্লীর সান্নিধ্যে বসবাস করেও রবীন্দ্রনাথের সাঁওতাল-সম্পর্কিত দৃষ্টি কিন্তু আশ্চর্যভাবে রোমান্টিকতার আতিশয্য-বর্জিত ছিল। তার কারণ সম্পর্কে এ কথাই মনে হতে পারে যে, রবীন্দ্র-কাব্য-জীবনের রোমান্টিকতা কোন ছদ্ম-রোমান্টিকতার পোশাকে মগ্ন নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনায়

সাঁওতাল রমণী

দিনশেষে—

গভীর উপলব্ধি তাঁর কাছে আত্মানুভূতিরই সমতুল্য; এবং এই অনুভূতির মধ্যেই সাঁওতাল-জীবনের প্রাকৃত-ছন্দ বিধৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধ এমন গভীর এবং ব্যাপক ছিল যে, এর মধ্যে খণ্ডচেতনা অলব্ধ। বোধের সমগ্রতায় তাঁর ব্যক্তি-মানস সমুজ্জ্বল ছিল। তাই নাগরিক কবিকুলের সম্প্রদায়-চেতনা রবীন্দ্রনাথে অসম্ভব।

বলা বাহুল্য, 'সম্প্রদায়-চেতনা' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থেই প্রয়োগ করেছি। সাঁওতাল-সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে আমরা বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবেই ভাবতে অভ্যস্ত। তাদের জীবনযাত্রা এবং ভাষা-সংস্কৃতি আমাদের কৌতূহলের বস্তু। রোম্যান্টিক বিস্ময়-দৃষ্টিতে আমরা তাঁদের পরিচয়লাভে উৎসুক। ফলে ব্যবধান আমাদের স্বকৃত।

একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই যে সাঁওতাল নরনারী রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন প্রমাণ রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যে নেই। সাঁওতাল-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা কোনদিনই নৃতাত্ত্বিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না অথবা সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতাতেও তিনি এদের পরিচয় খুঁজে বেড়াননি। পরিবর্তে এ কথা মেনে নেবার সংগত কারণ আছে যে, ঠিক এই ধরনের সম্প্রদায়-চেতনা রবীন্দ্র-মানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বোধ, বিশ্ববোধ এবং মানবতা-বোধের মধ্যে যে সামগ্রিকতার ব্যঞ্জনা, তা-ই তাঁকে সাঁওতাল সম্প্রদায়কে 'সাঁওতাল' হিসেবে না দেখে 'মানুষ' হিসেবে দেখতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-সংগঠনের পরিধির মধ্যে বেশ কিছু সাঁওতাল-গ্রামও ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা যেভাবে 'উপজাতিক কল্যাণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি-শিক্ষা-দীক্ষার ওপর বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে আমাদের নানাবিধ কৌতূহল নিবৃত্ত করে থাকি, সে ধরনের প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার মধ্যে সাড়া জাগায়নি। তাই গ্রাম-সংগঠনের ক্ষেত্রে সাঁওতাল অ-সাঁওতাল গ্রামের মধ্যে তিনি কোন সীমারেখা টেনে দেননি। একদা শান্তি-নিকেতনের ছাত্রগণ একটি সাঁওতাল বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন বলে রবীন্দ্রজীবনীকার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পরিচালনা-বিধির বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল কি না, তা জানা যায়নি।

তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, রবীন্দ্র-নাথের প্রকৃতি-দৃষ্টির মধ্যেই এদের স্থানও নির্দিষ্ট ছিল, যে-দৃষ্টিতে তাঁর ছোট গল্পের উদ্বোধন।

তবে এ কথা ভাববার দিকেও আমাদের প্রবণতা দেখা দিতে পারে যে, সাঁওতাল নর-নারীর চিত্রকে তিনি তাঁর ছোট গল্পে স্থান দেননি কেন? এমনকি রবীন্দ্রকাব্যেও এদের স্থান গৌণ কেন? শিলাইদহের সান্নিধ্যে এসে যে-জীবনবোধের পরিচয় তিনি দিয়ে-ছিলেন, শান্তিনিকেতনে এই সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে এসেও সেই জীবনবোধকে ফিরে পাননি কেন, এ কথার উত্তরে হয়তো এই কথাই সত্য যে, বাঙলা দেশের সমতল ভূমির সমাজজীবনের সংগে সাঁওতাল-সম্প্রদায়ের যে বাহ্যিক অনৈক্য, তার বেড়াটুকু ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি রবীন্দ্রনাথ। বরং বৃহৎ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করেই এদের স্বাভাবিক সারল্য এবং অনাড়ম্বরতাকে গ্রহণ করে-ছিলেন। এমনকি হলকর্ষণ উৎসবে সাঁওতাল নরনারীদের যোগদান এবং নৃত্যানুষ্ঠানও প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর অংগস্বরূপ।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কোন কোন কবিতায় এদের উল্লেখ আছে। এই উল্লেখের মধ্যে সাঁওতাল নরনারী বৃহৎ প্রকৃতি-পরিবেশের অন্যতম অংশের মতোই গৃহীত।

পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত
মিলে গেছে দূরে বনান্তে বেগনী বাষ্পরেখায়;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুল ঢাকা
সাঁওতাল পাড়া—
....

এই শালবন এই একলা-মেজাজের তালগাছ—
এই সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙা মাটির মিতালি,—
....

নদীর ধারে পায়ে চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয়
বাতাবি-লেবু ফুলের গন্ধ ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে;

রবীন্দ্রনাথের ভাষা, এই পর্বে প্রায় সাঁওতাল নারীর মতোই নিরাভরণা; অথচ সহজ লাবণ্যে পূর্ণযৌবনার অধিশ্বরী।

কোপাই নদীর মতো তার গতি অনহংকৃত, প্রকৃতির আপন সৃষ্টির মতো মধুময়। শাল-মহুয়া-কুড়চি-জারুল-পলাশ-মাদারের সঙ্গে এ ভাষার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। এই ভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটিও প্রণিধানযোগ্য। 'গদ্য-কাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য-কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে-একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্য-রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।'

বলা বাহুল্য, সাঁওতাল নারীদের মধ্যে সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা নেই, অথচ একটি স্বাভাবিক মধুর লাবণ্যের ব্যঞ্জনা তাদের দেহে-মনে পরিস্ফুট। গদ্য-কবিতার মতোই তাদের স্বাধীন এবং স্বাভাবিক সঞ্চরণ। অলঙ্কারের বাহুল্য তাদের কাছে নিরর্থক; কবরী বন্ধনে একটিমাত্র ফুলের স্পর্শ তাদের কাছে লোভনীয় এবং এই একটিমাত্র ফুলের অন্তহীন ব্যঞ্জনা রবীন্দ্র-কাব্যের একটিমাত্র চরণে অতুলনীয় রূপেই প্রকাশিত। ক্যামেলিয়া কবিতার কমলা এবং তনুকা বহু ভাষণেও অস্পষ্ট, কিন্তু শুধু রান্নার কাঠ যে সাঁওতাল মেয়েটি এনে দিতো, তাকে চিত্রিত করার জন্য বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন হয়নি। প্রকৃতির রাজ্যে সেও একটি ফুল মাত্র।

দার্জিলিঙের সমুন্নত পরিবেশে যে তনুকা একদিন বলেছিল, 'একটি জিনিস দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা—, একটি ফুলের গাছ।'—তার কথাও তুচ্ছ হয়ে গেছে সাঁওতাল পরগণার কাছে, যেখানে বাসা বাঁধা যায় শালবনের ছায়ায়, কাঠ-বিড়ালীর পাড়ায়। 'সেখানে নীলপাহাড় দেখা যায় দিগন্তে, অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে, পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে, মহিষ চরছে হরতকি গাছের তলায়—উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।...'

এই পরিবেশে কমলাও বাসা বেঁধেছিল, শালবাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে। মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে, কিন্তু সে চেয়ে দেখে না।

এই পরিবেশের মধ্যেই আর একটি ছবি, কিংবা নিজেই সে একটি পরিবেশ। ক্যামেলিয়া কবিতায় তার কথা শিশির-বিন্দুর মতো স্বল্প, কিন্তু তারই বুকে অনন্ত আকাশ। অর্বাণীতা এই সাঁওতাল নারী। কারণ সে তনুকা নয়, কমলা নয়, সে আনে রান্নার কাঠ। তারই হাত দিয়ে কমলার কাছে ক্যামেলিয়া ফুল পাঠানো হবে। কমলার মতো এই নারী অন্তরঙ্গা নয়, বহি-প্রকৃতি। তাই বাইরে থেকেই তার মিষ্টি

স্বরের আওয়াজ এলোঃ 'বাবু, ডেকেছিস কেনে।'

'বেরিয়ে এসে দেখি, ক্যামেলিয়া সাঁওতাল মেয়ের কানে, কালো গালের উপর আলো করেছে।

সে আবার জিজ্ঞেস করলে, ডেকেছিস কেনে।

আমি বললুম, এই জন্যেই।'

॥ ৩ ॥

বাঙলা দেশের মেয়ের চোখে এই মাটির শ্যামল অঞ্জন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে সমস্ত বিকার-বিদ্রূপকে ঢেকে দিয়ে শেষ-বেলাকার ঘর-খানির নাম দিয়েছিলেন শ্যামলী। কালো মেয়েকে গাঁয়ের লোকে কালো বললেও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কৃষ্ণকলি। এই কৃষ্ণ-কলি কামিনীদেরও তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একীভূতা করে দেখেছিলেন। এইজন্যই রবীন্দ্র-কাব্যে কৃষ্ণসার হরিণী সাঁওতালিনী কোন সাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্যে বিধৃত হয়নি। প্রকৃতির আদিম বর্ণরেখার ও বস্তু-কান্তির সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তিনি মাত্র একটি বারের জন্য সাঁওতাল মেয়ের সম্পর্কে পুরো একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এ কবিতায় সাঁওতাল-সমাজের চিত্র অল্প, কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের অন্তর-প্রীতিতে তার ঔজ্জ্বল্য সমধিক।

শিমুল গাছের তল দিয়ে কাঁকর বিছানো পথে তার আনাগোনা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তন্বী শ্যামলীর দেহখানিতে মোটা শাড়ির দৃঢ় বন্ধনী। নিটোল হাতে সাদারঙা গালার চুড়ি। মাথায় মাটির ঝুড়ি নিয়ে সে বার-বার যাওয়া-আসা করছিল। বিধাতার কোন ভোলা-মন কারিগর কালো পাখি গড়তে গড়তে আকস্মিকভাবে শাঙন মেঘের ও বিদ্যুতের উপাদান নিয়ে ওকে রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের কবিতায় মাটির গন্ধ সহজলভ্য। মাটির কোলঘেঁষা সন্তানদের চিত্রও তাই অনায়াসলব্ধ। শিমুল এবং সজনের ঋণও কবি কর্তৃক স্বীকৃত। রঙীন শাড়ীপরা কলসী মাথায় গ্রামের মেয়েও চিত্রায়িত। মাটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে স্বীকৃতিদানের জন্যই বুঝি শ্যামলীর সৃষ্টি! "কবির মন এখন মেতে উঠেছে মাটির ঘর 'শ্যামলী' নিয়ে। তার মাটির দেওয়াল, মাটির ছাদ হবে—আলকাতরা মাটি-গোবর মিলিয়ে-মিশিয়ে ও পচিয়ে একটা মসলা তৈরি হচ্ছে ঘরের জন্য।" শেষ সপ্তকের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মাটির প্রেমকে অনবদ্য মহিমা দান করেছেন: 'আমার শেষবেলাকার ঘরখানি বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে। তার নাম দেব শ্যামলী।...আমার দু-চোখ ভরে মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে...আজ আমি তোমার ডাকে ধরা দিয়েছি শেষবেলায়। এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে, যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে, নব-দূর্বা শ্যামলের করুণ পাদস্পর্শে চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়, নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।'

এই 'শ্যামলী'র উপাদান যোগানোর কাজে সাঁওতাল মেয়ে এসেছিল। 'আমার মাটির ঘরখানা, আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।' সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নারীরা গৃহবন্দিনী নয়। তাদের কোমল-কঠিন হাতের স্পর্শে মাটির ঝুড়িও স্মৃতিচকিত হয়। কিন্তু এ-জাতীয় রোম্যান্টিক কল্পনার সৌন্দর্য অতুলনীয় হলেও দারিদ্র্যপীড়িত সাঁওতাল-সমাজের অন্যতম করুণ চিত্রকে ঢেকে রাখারই প্রয়াস মাত্র। আদিম কুসংস্কার, শিক্ষাহীনতা ও অত্যধিক শ্রমের নিষ্পেষণে
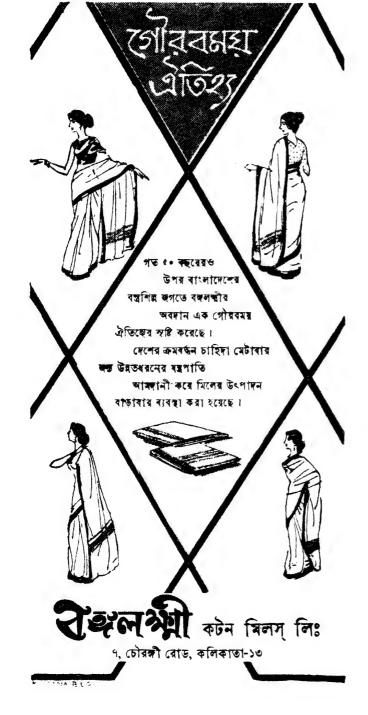
পিষ্ট এই সম্প্রদায়ের একটি অন্য ছবিও অস্বীকার্য নয়।

শ্রমজীবী মানুষের উপর রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আমাদের অজ্ঞাত নয়। 'ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল; ওরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে পাকা ধান কাটে। ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।...ওরা কাজ করে, দেশে দেশান্তরে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে, পাঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।......'

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশী তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ-সুবিধে সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

শ্রমিক-জীবনের করুণ অসহায়তা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করেছিল। অন্ততপক্ষে নারীর নিরুপায় শ্রমচর্যা তাঁকে পীড়িত করেছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যে নারীর জন্য একটি সচ্ছন্দ গৃহকোণ প্রাত্যহিক পরিমার্জনার শুচিতা নিয়ে বর্তমান থাকতে পারতো, সেই নারীকেও উদরের উৎপীড়নে অতি অল্প বয়সের সন্তান মাঠের কোন গাছতলায় শুইয়ে রেখে নির্বিকারচিত্তে রোদে পুড়ে কাজ করতে হয়। এ দৃশ্য আমাদের অ-দেখা নয়।

রবীন্দ্রনাথের মানসপটে এই দৃশ্যই হয়তো বেদনার রেখাচিত্র এঁকেছিল। বীথিকা কাব্যের অন্তর্গত সাঁওতাল মেয়ে কবিতাটির মধ্যে কবির এই সংবেদন গভীরতর। গৃহলক্ষ্মীর যে সৌন্দর্য-কল্পনা রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে বহুবার, সাঁওতাল নারীর মধ্যেও তা তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, কারণ সাঁওতাল নারীও চিরন্তন নারী। বাইরের জগতে অস্বাভাবিক শ্রমের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকলে গৃহকোণের পারিপাট্য এবং শুচিতা রক্ষার ভার নেবে কে? তাই স্বাভাবিক সংকোচে কবির মন ক্লিষ্ট।

'আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি,—এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে—
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজশক্তি আত্মনিবেদন পরা
শুশ্রূষার সুধাস্নিগ্ধভরা
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে
করিতে মজুরি—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ঐ ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।'

পয়সার সিঁধকাঠি দিয়ে এমনিভাবে নারীর শ্রম কেনার ওপর রবীন্দ্রনাথের অনাস্থা সাঁওতাল রমণীকে সৌমা-সুন্দর মর্যাদা দান করেছে।

বলা বাহুল্য, এই-ই একটি মাত্র কবিতা, যাতে সাঁওতাল রমণী প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্র-কাব্যে স্থান লাভের অধিকার লাভ করেছে।

গীতবিতানে সংকলিত একশো পঁচিশ সংখ্যক গানটির বিষয়বস্তু, নিঃসন্দেহে, নববর্ষা। 'সাঁওতালী ছেলে' এখানে নির্বস্তুক আইডিয়া মাত্র; নববর্ষার প্রতীক হিসাবেই তার আবির্ভাব। সে 'শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত।' ধানের খেতের পারে শালের ছায়ার ধারে সে হৃদয় মেলে দেয়। কবির দ্বারপ্রান্তে সে রেখে যায় কেয়াফুল।...

আসলে, এ গানে সাঁওতাল ছেলের নাম আছে বটে, কিন্তু সাঁওতাল ছেলের উপস্থিতি মুখ্যত প্রকৃতির প্রতীকরূপেই। মেঘের ছায়ায় ছায়া ফেলে চলার ভাবটিই এখানে প্রত্যক্ষ।

॥ ৪ ॥

চেয়েছে শালবনের নিভৃত ছায়া কবির ভালো লেগেছিল। কিন্তু ভালো-লাগার সবটুকুকেই কি প্রকাশ করা যেতে পারে। সাঁওতাল নর-নারী কবির সেই অপ্রকাশিত অন্তর-পালক, যার স্পর্শ আমরা পেয়েছি, কিন্তু আরো বেশী করে যা পেতে ইচ্ছে করে।
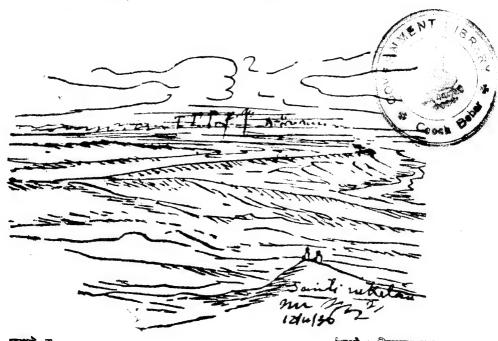
কোপাই নদী

শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

পূর্ণাঙ্গ স্নানের সামগ্রী
HIMANI
Transparent
Glycerine Soap
MADE IN INDIA
HIMANI
GLYCERINE
SOAP

AYURVEDIC
HIMASAR
OIL
হিমসার তৈল
HIMANI PRIVATE LTD.
CALCUTTA-2
MADE IN INDIA

॥ ৩ ॥

"বসুন। আপনাকে অন্য নামে চিনতাম। আপনার আসল নামটা আজ প্রথম শুনলাম।"

গণেশ হালদার বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলেন, "আমার তো দ্বিতীয় নাম নেই। কি নাম শুনেছেন আমার?"

ঘোষাল আবার তাঁর সেই হাসি হাসলেন।

"রাগ যদি করেন বলব না। আই শ্যাল কিপ্ মাম্।"

"না, রাগ করব কেন?"

"এখানে সকলে আপনাকে 'ফোর্থ ডগ্' বলে ডাকে।"

"তার মানে?"

"ডাক্তার মুখার্জির তিনটে আসল কুকুর আছে, লোকে বলে আপনি তাঁর মনুষ্যবেশী চতুর্থ কুকুর।"

হালদারের মনে হল কে যেন তাঁর গালে ঠাস্ করে চড় মারলে একটা। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও ঘটল, নিজের অজ্ঞাতসারেই ডাক্তার মুখার্জিকে যেন আরও ভালোবেসে ফেললেন তিনি, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গণেশ হালদার। তাঁর মনে হল তিনি যেন জমে গেছেন। হাত-পা নড়ছে না, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু জাগ্রত হল তাঁর স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধ, তাঁর গর্ভের গোপন সত্তা থেকে যেন উৎসারিত হল একটা উষ্ণ প্রস্রবণ, গলে গেল যেন অপমানজনিত হিম-শীতলতা। তিনি স্বস্থ হলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর মনে রসিকতা জাগল।

বললেন, "আপনারা আমাকে এ সম্মান দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ। কুকুর-প্রেমিক একজন বিখ্যাত লোক বলে গেছেন—The more I see of men, the more I love my dog. (মানুষের যত পরিচয় পাচ্ছি আমার কুকুরটাকে তত বেশী ভালো লাগছে)। যে দেশের মানুষেরা অধঃপতিত সে দেশে কুকুর নামে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্য মনে করি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর মানুষরা কুকুরের চেয়েও অনেক নীচে নেমে গেছে।"

"আরে মশয়, আপনি দেখছি গুণী লোক। বসুন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

ডাক্তার ঘোষাল এগিয়ে এসে হালদারের দুই কাঁধে হাত দিয়ে জোর করে তাঁকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। গণেশ হালদারকে অনুভব করতে হল রাঘব ঘোষাল শক্তিমান ব্যক্তি। তাঁর হাত দুটো যেন বাঘের থাবা।

"কাউ কাউ, জলদি এস। Put in your appearance immediately, please."

কাউ আসতেই বললেন, "পাঠানী হালুয়া আর কফি নিয়ে এস এক পেয়ালা। আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না।"

কাউ চলে গেল ভিতরের দিকে।

"কফির চেয়ে উগ্রতর কিছু চলে নাকি আপনার? জানি না হয়তো, ভুল করে সিংহকে সন্দেশ খেতে দিচ্ছি. I wonder, if I am offering fodder to a cat.

—একটু হুইস্কি আছে, যদি অনুমতি করেন—"

"না, ওসব আমার চলে না। আমি নিরামিষ মানুষ—"

"বাই জোভ, তাই নাকি? পাঠানী হালুয়া মুরগীর মাংস আর ডিম দিয়ে তৈরী যে—"

"মাংস ডিম আমি খাই। পাঠানী হালুয়ার নাম কিন্তু আগে শুনিনি।"

"শোনবার কথা নয়। ও জিনিস আমারই সৃষ্টি, অনাসৃষ্টিও বলতে পারেন। More carricature than a creation. পাঠানকোটে একটা হোটেলে খেয়েছিলাম, ওঃ, সে এক স্বর্গীয় ব্যাপার! কিন্তু বাবুর্চিটা কিছুতেই রান্নার সিক্রেটটা আমাকে বললে না। কিন্তু আমি তো যেটা ধরি ছাড়ি না, নিজেই মাথা খাটিয়ে বানিয়ে ফেললাম। তবে সেটা ওর মতো 'পারফেক্ট' খানা হয়নি। দেখুন, আপনার কেমন লাগে—"

ফাউ ফিরে এসে বললে, "মিনুকে দিদি হালুয়া দিচ্ছে না। বলছে তার একটু আছে, সেটা আপনি খাবেন, আপনি তো খান নি।"

লাফিয়ে উঠে পড়লেন ঘোষাল এবং ভিতরের দিকে ছুটে চলে গেলেন।

পরমুহূর্তেই নারীকণ্ঠের এক তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল।

"আমি দেব না, দেব না, কিছুতেই দেব না।"

তারপরই দড়াম করে শব্দ একটা।

"ওগো মাগো—"

করুণ আর্তরবটা হঠাৎ থেমে গেল।

গণেশ হালদার আর বসে থাকতে পারলেন না। উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন ভিতরে ঢোকা সমীচীন হবে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করলেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। দেখলেন একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে মেঝেতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে, আর ডাক্তার ঘোষাল হাঁটু গেড়ে তার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন।

"এ কী ব্যাপার? কী হ'ল?" গণেশ হালদার বললেন।

ঘোষাল ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন, তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "টেবিলের উপর প্লেটে হালুয়াটা আছে, আপনি আগে খেয়ে নিন তো মশাই। এ রাক্ষুসীর জ্ঞান হলে আর আপনাকে খেতে দেবে না। টপ্ করে খেয়ে নিন।"

অবাক হয়ে গেলেন গণেশ হালদার।

"এ অবস্থায় কি খাওয়া যায়, মশাই! কি যে বলছেন—"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ঘোষাল। "আপনাকে খেতেই হবে। ইউ মাস্ট্।

মাই ওয়ার্ড ইজ্ ল ইন্ মাই হাউসহোল্ড। আমার বাড়িতে আমি ডিক্টেটর—"

গণেশ হালদারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। তারপর হালুয়ার প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বললেন, "খান।"

"কি যে করছেন আপনি!"

"ঠিকই করছি।"

তারপর তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস্ করে বললেন, "খেয়ে নিন। না খেলে নুলুর কাছে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না। খান—"

নিজেই খানিকটা হালুয়া তুলে গুঁজে দিলেন হালদার মশায়ের মুখে।

"চিবুন। চিউ। বাঃ, দ্যাট্স্ গুড!"

হালুয়াটা মুখে ঢুকতেই খুব ভালো লেগে গেল হালদারের। তিনি যন্ত্র-চালিতবৎ চিবুতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বিবেকও দংশন করতে লাগল খুব।

"বেশ। আপনার অনুরোধ ঠেলব না। চলুন প্লেটটা নিয়ে বাইরে যাই। কাউ, বাইরে কফি নিয়ে এস।"

"কিন্তু এ ভদ্রমহিলাকে এরকমভাবে ফেলে রেখে—"

"নুলুকে ভদ্রমহিলা বলে অপমান করবেন না। ডোন্ট ইনসাল্ট হার প্লীজ, শী ইজ্ এ ফিমেল বাইসন। ওই ঝুপঝুপে সুন্দর চেহারার ভিতরে একটি গণ্ডার লুকোনো আছে। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার মারপিট হয়। আমার সঙ্গে পারে না। অজ্ঞান হয়ে পড়লেই একটা কোরামিন ইনজেকশন দিয়ে দিই। আজও দিয়ে দিয়েছি। ওর জ্ঞান ফেরার আগে হালুয়াটা শেষ করে ফেলুন। এখনই ও উঠে বসবে।"

কাউ লোকটি নীরব। এত যে কাণ্ড হল সে একটি কথা বলে নি, একটু বিচলিত হয়নি। নীরবে এসে কফির খালি পেয়ালা আর খালি প্লেট নিয়ে গেল। তারপর বেরিয়ে এসে বললে, "আজ আমার রাতে ডিউটি পড়েছে। এখন চললুম।"

"খেয়েছিস কিছু?"

"দোকানে খেয়ে নেব।"

"পয়সা নিয়ে যা। শস্তা হোটেলে খেয়ে যেন শরীরটা নষ্ট কোরো না।"

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে দিলেন। গণেশ হালদার উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। এরকম লোক তিনি আগে কখনও দেখেননি। এরকম লোক যে থাকতে পারে তা-ও তাঁর কল্পনায় ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল ডিকেন্স বা স্টিভেন্সনের নভেলের কোনও আজগুবি চরিত্র বুঝি হঠাৎ মূর্ত হয়েছে এসে। মনে মনে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন, বাইরে সহজ হবার চেষ্টা করলেন তবু।

"এ লোকটি বুঝি অন্য জায়গায়

'প্রিয়ে, একটিবারের জন্যেও কি তোমার মুখ দেখতে পাবো না?'

চাকরি করে? আমি ভেবেছিলাম আপনারই চাকর।"

"না, ও আমার চাকর নয়, আমার ছেলে। হি ইজ্ মাই সন্। তবে ও সেটা জানে না। বহুকাল আগে ওর মা ওকে আমার কলকাতার বাসার বারান্দায় বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। ভেগেছে বোধ হয় কারও সঙ্গে হারামজাদী। মহা বজ্জাত ছিল।"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে নিষ্পলক হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "কাউ খুব ভালো ছেলে, ওয়াণ্ডারফুল বয়। কিন্তু ও যদি জানতে পারে আমি ওর বাবা, তা হলে আর ওয়াণ্ডারফুল থাকবে না। বাই দি বাই, কথাটা আপনাকে বললাম। দেখবেন কাউ যেন না জানতে পারে।"

গণেশ হালদার হেসে বললেন, "কথাটা আমাকে না বললেই পারতেন। আমি অবশ্য কাউকে বলব না। কিন্তু এ কথা আমাকে জানিয়ে লাভ কি—"

"আপনাকে আপনার করে নেওয়া। অন্তরের গোপন কথা বললেই ফট্ করে তার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে যায়। এ এক আজব তামাশা। তবে আসল কথাটা কি জানেন?"

"কি?"

"আমি কিছু চেপে রাখতে পারি না। আরও অনেককে বলেছি কথাটা। কাউ সম্ভবত শোনেনি এখনও। ওর চাল-চলনে

অন্তত সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না।"

"যদি প্রকাশ পায় তখন কি করবেন?"

"দূর করে দেব। আই শ্যাল সিম্প্‌লি টার্ন হিম আউট।"

নির্বিকারভাবে কথাগুলি বলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি গণেশ হালদারের মুখের দিকে, তারপর অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পলক ফেলে শিস্ দিলেন একটু। তারপর আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, "মায়াটায়া আমার কিছু নেই। কঠিন প্রস্তর দিয়ে গড়া এ হৃদয়। আমার আপন লোক, আই মীন ব্লাড্ রিলেশনস্, কেউ নেই। বন্ধুরাই আমার আপন। আমিও তাদের জন্যে জান দি, তারাও আমার জন্যে জান দেয়। আপনি কি রেফিউজি?"

"হ্যাঁ। শুনেছি আপনিও তাই।"

"হ্যাঁ, খাতায়পত্রে তাই বটে। কিন্তু আসলে আমি হোমলেস্ ভ্যাগাবন্ড। আফ্রিকাতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলুম না। পূর্ববঙ্গে আমি দাঙ্গার সময় ছিলাম। তারপর এখানে পালিয়ে এসেছি, আর মিস্টার সেনের দৌলতে যতটা টাকা টানা সম্ভব তা টেনে নিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসে আছি।"

তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, "আপনারও তাই করা উচিত। ওই পাগল ডাক্তারটার পিছু পিছু ঘুরে মরছেন কেন? ওর দ্বারা কিছু হবে না। ও খালি কাব্য করে। আপনি আমার দলে ভিড়ে যান। তাস খেলতে জানেন? তাস মানে অবশ্য জুয়া। ওর অনেক গুণ। যদি ইচ্ছে করেন আসতে পারেন আমার আড্ডায়। নানারকম পংখী আসে এখানে। মিস্টার সেন, যিনি উদ্বাস্তুদের দন্ডমুন্ডের কর্তা, তিনিও আসেন। তাঁর নেক-নজরে যদি পড়ে যেতে পারেন, অনেক বাজি মাত করতে পারবেন। গভর্নমেণ্ট অজস্র টাকা ধার দিচ্ছে। ইজি ইনস্টলমেণ্ট। জমি কিনুন। স্বনামে কিনুন, বেনামে কিনুন। বাড়ি করুন। যতটা পারেন আদায় করে নিন ওদের কাছ থেকে। ওরা আমাদের পথে বসিয়ে নিজেরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, আমরাও যতটা পারি কেড়ে-বিগড়ে নিয়ে নি আসুন। উচিত নয়? শুড্ উই নট্?"

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ঈষৎ-ব্যায়ত আননে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাঘব ঘোষাল।

গণেশ হালদার মৃদু হেসে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "আমি তো তাস খেলতে জানি না—"

"শিখুন। শুধু তাস খেলা শিখলেই হবে না। তাস খেলে কি করে টাকা রোজগার করতে হয় তা-ও শিখতে হবে। ইউ জাস্ট জয়েন মাই গ্যাং—আমার দলে চলে আসুন—আমি আপনাকে ওস্তাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। এটা ভুলবেন না, আমরা উদ্বাস্তু, দয়াটয়া কেউ করবে না, আমাদের লড়তে হবে। লড়বার প্রধান অস্ত্র টাকা—" তর্জনীর উপর বুড়ো-আঙুলের টোকা দিয়ে দিয়ে টাকা বাজাবার মুদ্রাটা দেখিয়ে দিলেন—"দ্যাট উই মাস্ট্ আর্ন, সেটা রোজগার করতে হবে সৎ অসৎ যে কোনও উপায়ে হোক। মর‍্যালিটির ছুচিবাই নিয়ে ধানাই-পানাই করেন, 'মৃত্যুরেব ন সংশয়'। ভিড়ে যান আমার দলে—"

গণেশ হালদার কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পারলেন না। সেই
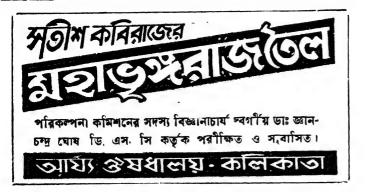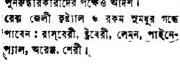
সুন্দরী মেয়েটি (যে মূর্ছা গিয়েছিল) পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে ঝনাত করে চাবির একটা গোছা ফেলে দিল টেবিলের উপর।

"আমি চললাম।"

বলেই বেরিয়ে গেলে সে।

তার প্রস্থান-পথের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে রাঘব ঘোষাল বললেন, "হারামজাদী—"

বলা বাহুল্য, গণেশ হালদারও কম বিস্মিত হননি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে স্বভাবতই তিনি ইতস্তত করছিলেন।

রাঘব ঘোষাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "মনটা উস্‌খুস্‌ করছে, না? বয়লিং?"

গণেশ স্মিত হেসে তখন সসঙ্কোচে জানতে চাইলেন, মেয়েটি কে। রাঘব হাসি-মুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "ও হচ্ছে আমার রাখনি, শুদ্ধ ভাষায় রক্ষিতা, কাব্যের ভাষায় প্রেয়সী। রাম-হারামজাদী এবং হাড়-হারামজাদা। এরকম সাক্সেস্‌ আমি আর জীবনে পাইনি।"

বাইরে একটা গাড়ি আসার শব্দ হল এবং পরমুহূর্তেই "ঘোষাল আমরা এসে গেছি" বলে এক বেঁটে ফরসা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পিছু পিছু আরও দুজন।

"আসুন, আমি রেডি হয়ে বসে আছি।" তারপর গণেশের দিকে চেয়ে বললেন, "এইবার আমরা মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হব। অর্থাৎ তাস খেলব। আপনি কি বসবেন?"

"না।"

"তা হলে আলাপ করিয়ে দি আসুন। ইনি মিস্টার সেন—আমাদের ভাগ্য-বিধাতা, ইনি দরবেশ পান্ডা—এখানকার স্টেশন-পতি, আর ইনি সুবেদার খাঁ ইঞ্জিন-চালক। আর ইনি হচ্ছেন, কি নাম মশাই আপনার?"

"গণেশ হালদার।"

"গণেশ, দি গ্রেট সিদ্ধিদাতা। কিন্তু এঁর আসল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ইনি উদ্বাস্তু। গণেশ গৃহহারা। গণেশ ইজ্‌ হোমলেস্‌।"

মিস্টার সেন এবং দরবেশ পান্ডা মুচকি হাসলেন। কিন্তু হো হো করে উঠলেন সুবেদার খাঁ।

"আমি মুসলমান, উদ্বাস্তু দেখলেই একটু অস্বস্তি বোধ করি। মনে হয়, আমার জাতভাইরা এঁদের দুর্দশার কারণ। বিহারে অনেক মুসলমানও মারা গেছে, অনেকে উদ্বাস্তু হয়েছে। তাদের দেখলে আপনাদেরও মনের অবস্থা বোধ হয় এইরকমই হয়। কিন্তু আমি সান্ত্বনা পেয়েছি স্পেনের বুল-ফাইটের গল্প শুনে। ষাঁড়ে আর মানুষে লড়াই হয় সেখানে। দুর্বল মানুষরাই সাধারণত মরে। অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মরে। এর জন্যে ষাঁড়েরা দায়ী নয়, যারা দায়ী তারা সমাজে সভ্য বলে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কথাটা মনে রাখলে হালদার মশায়ের আমার উপর আর রাগ থাকবে না। আদাব—"

এই বলে তিনি হাতটা বাড়িয়ে উদ্ভাসিত মুখে করমর্দন করলেন গণেশ হালদারের।

"এখনই চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। পরে আবার দেখা হবে।"

নমস্কারাদি বিনিময় করে চলে এলেন হালদার মশাই।

ডাক্তার মুখার্জির পুরো নাম সুঠাম মুখোপাধ্যায়। একটু অদ্ভুত গোছের নাম। তাঁকে এ নামে এখানে কেউ কোনদিন ডাকেনি। তাঁর বিহারী এবং মারোয়াড়ী রোগীদের কাছে সুটোম ডাক্তার নামে পরিচিত। কেউ কেউ পাগলা ডাক্তারও বলে। বাঙালীরা তাকে ডাক্তার মুখার্জি বলেই ডাকেন। নিজের লোকেরা কেউ থাকলে হয়তো তাঁকে স্বনামে ডাকতে পারতেন, কিন্তু তাঁর তিন কুলে কেউ ছিল না।

'জান কাল সকালে তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে। তা বলে কি আজ রাত্তিরটাও ঘুমোতে পারব না?'

বিবাহ করেছেন মাত্র কিছুদিন আগে, দেশ স্বাধীন হবার পর। শ্বশুরকুলের পরিচয়ও কেউ জানে না। বস্তুত, তাঁর সম্বন্ধে কোনও কথাই কেউ জানে না। তিনি নিজের কথা কাউকে বলেন নি, নিজের কথা বলতে তিনি ভালবাসেন না। তাই তাঁর সম্বন্ধে সত্য খবর জানা নেই কারও। সেইজন্য নানারকম গুজব প্রচলিত আছে। সবাই বলে তিনি বিলেত-ফেরত ডাক্তার। এখানকার এক সাহেব সিভিল সার্জন নাকি একবার প্রকাশ করেছিলেন যে, ডক্টর মুখার্জি বিলেতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ধাত্রীবিদ্যায় এবং প্যাথলজিতে তিনি পারঙ্গম। অথচ তাঁর ছাপানো প্যাডে শুধু লেখা আছে ডক্টর এস মুখার্জি। কোনও ডিগ্রীর ল্যাজ নেই। এ-ও শোনা যায়, তাঁর ব্যাংক ব্যালান্স নাকি কয়েক লক্ষ টাকা। এ খবরটা সম্ভবত মিথ্যা নয়, কারণ

ব্যাংকেরই এক কর্মচারী কথাটা প্রচার করেছেন। এত টাকা তিনি কোথা থেকে পেলেন তা নিয়েও লোকে মাথা ঘামাতে কসুর করেনি। এ বিষয়ে সর্ববাদীসম্মত যে মতটি জনসাধারণ মেনে নিয়েছে সেটি এই : কলকাতায় তাঁর যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল (খান কয়েক বাড়ি এবং প্রায় পনর বিঘা জমি) সেইটে দাঁও মাফিক বিক্রি করেই তিনি নাকি লক্ষপতি হয়েছেন। তাঁর বাবা ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁরও ব্যাংক ব্যালান্স নিন্দনীয় ছিল না। এই শহরে তাঁর পিতৃবন্ধু হরিশঙ্করবাবু থাকতেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জি। যে বাড়িতে ডাক্তার মুখার্জি এখন থাকেন সেটা হরিশঙ্কর-বাবুরই বাড়ি। হরিশঙ্করবাবু দার-পরিগ্রহ করেন নি। তিনি এই শহরে ওকালতি করতে এসেছিলেন। বেশ ভালো পশার ছিল তাঁর। তিনি এই বাড়িতে সারা জীবন ঝি চাকর নিয়ে কাটিয়ে গেছেন। ডাক্তার মুখার্জি যখন এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন (তাঁর বুড়ো চাকর রঘুবীরের রিপোর্ট এটা) তিনি নাকি বলে-ছিলেন, 'এই বাড়িটা আমার মৃত্যুর পর কে ভোগ করবে তা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা হয়েছে আমার। আমার একমাত্র উত্তরাধি-কার ভাই-পো থাকে বম্বেতে। তার সেখানে সিনেমার কারবার। সে এখানে এসে বাস করবে না। সে এ বাড়ি বিক্রি করে দেবে। যে সবচেয়ে বেশী দাম দিতে রাজি হবে সেই নেবে বাড়িটা। কাবুলী, মারোয়াড়ী, মুচি, মুদ্দফরাস যে কেউ ক্রেতা হতে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছে এ বাড়িতে ব্রাহ্মণ বাস করুক। এটা আমার কুসংস্কার বলতে পার, কিন্তু ওইটেই আমার ইচ্ছে।' এ কথা শুনে ডাক্তার মুখার্জি নাকি বলেছিলেন, 'আপনি যদি অনুমতি করেন এবং আমার সাধ্যে যদি কুলোয় বাড়িটা এখনই আমি কিনে নিতে পারি। কথা দিচ্ছি, আপনার মৃত্যুর পর আমি এসে বাস করব এখানে। আপনার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, বাড়িটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দেবেন, কারণ এখনও পর্যন্ত আমার উত্তরাধিকারী কেউ নেই।' হরিশঙ্করবাবু নাকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আর আমি কি তোমার বাড়িতে অমনি থাকব?' সুঠামবাবু উত্তর দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ—'নিশ্চয়, আপনি আমার বাবার বন্ধু, পিতৃতুল্য, আমার বাড়িতে আপনার থাকবার ষোলআনা অধিকার আছে।' সেই সময় হরিশঙ্করবাবু জলের দামে বাড়িটা বিক্রি করে দেন সুঠাম ডাক্তারকে। বাড়ি বিক্রি করবার পর তিনি বছর দুই বেঁচে ছিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে এক ইঞ্জিনিয়ার এসে বাড়িটার মেরামত করে, রং ফেরায়। তারও প্রায় বছরখানেক পরে সুঠামবাবু এসে এ বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করেন। যেদিন তিনি প্রথম এলেন, একাই এলেন, তখনও তিনি বিয়ে করেন নি। শোনা যায়, তিনি নাকি দেশ-ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। বহু স্থান বেড়িয়ে তারপর এখানে এসে

'রাত-বিরেতে বাড়ি ফেরা? দেখাচ্ছি মজা!'

প্র্যাকটিস শুরু করেন। তিনি এসে যখন বাজার থেকে কুলি এনে বাড়িঘর পরিষ্কার করাচ্ছিলেন তখন দেখলেন গেটের সামনে একটি বালিষ্ঠাকৃতি কালো-কালো আধবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিছনে দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আর একটি লম্বা গোছের ছোকরা। সুঠামবাবু
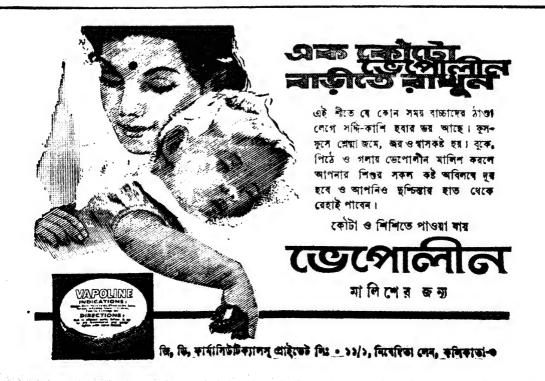
গেটের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কে, কি চায়। সেই লম্বা ছোকরাটি বললে, 'এ হচ্ছে রঘুবীরের বউ আর আমি হচ্ছি রঘুবীরের শালা। আর এ দুটি হচ্ছে রঘুবীরের নাতি আর নাতনী. এদের মা নেই। আর এইটি হচ্ছে আমার ছেলে।' পরিষ্কার বাংলায় বললে কথাগুলি। বিহারীর মুখে এরকম বাংলা শুনবেন প্রত্যাশা করেন নি ডাক্তার মুখার্জি। রঘুবীরের স্ত্রীও বাংলা ভাষাতেই কথা বলল। তবে তার ভাষা যদিও বাংলা কিন্তু উচ্চারণে বিহারী টান আছে। সে বলল, 'হরিবাবুর কাছে হামরা ছিলাম। হামি পাকাতাম। হরিবাবু মরে গেল, হামাদের আশা-ভরোসা চলে গেল।' সুঠামবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আমারও তো লোক দরকার। তোমরা ইচ্ছে কর তো আমার কাছেও থাকতে পার হরিবাবুর কাছে যেমন ছিলে।' সেইদিন থেকেই দাই, তার নাতি-নাতনী (বিজয় আর শালিয়া) এবং ভাই রংলাল ডাক্তার মুখার্জির পরিবারভুক্ত হয়ে গেল। রংলালই দিনকতক পরে দুর্গাকে জুটিয়ে আনলে। বাহাল হয়েই দাই প্রশ্ন করেছিল, 'মাইজি কোথায়, কবে আসবে?' ডাক্তার মুখার্জি একটু দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাইজি এখনও আসেন নি। এইবার আসবেন।' তখনও তিনি যে বিবাহ করেন নি এ কথা স্পষ্ট করে জানান নি দাইকে। প্রথম প্রথম তিনি ব্যস্ত ছিলেন নিজের ল্যাবরেটরি নিয়ে। এসেই তাঁর খুব নাম হয়ে গেল, কারণ তিনি ল্যাবরেটরির সাহায্য না নিয়ে কোনও রোগী দেখতেন না। এসেই তিনি যে ক'টা রোগী দেখেছিলেন, সবগুলোই ভালো হয়ে গিয়েছিল। হইহই নাম হয়ে গেল তাঁর। তিনি কিন্তু হইহই করে সাড়া দিলেন না। তাঁর নিজস্ব গয়ংগচ্ছ চালে চলতে লাগলেন। দশটার, কখনও কখনও এগারটার, আগে ল্যাবরেটরিতে যেতেন না। মেরে-কেটে ঘণ্টা দুই থাকতেন সেখানে। তারপর বেরিয়ে পড়তেন মোটর নিয়ে। জেলের ডাক্তার প্রিয়বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে পেলেন জাম্বুবানকে। ক্রমশ ভুটানও এসে জুটল এবং সবশেষে রকেট। ল্যাবরেটরির জন্য ভেড়া, গিনিপিগ আর খরগোশও তাঁকে কিনতে হয়েছিল। মুরগী আর গরু তখন তিনি কেনেন নি, কিনেছিলেন স্ত্রী আসার পর। তারপরই গোয়াল আর মুরগী রাখবার ঘর তিনি তৈরি করান। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হঠাৎ একদিন নিয়ে এলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তাঁর আসার কথা কাউকে বলেন নি, এমন কি দাইকেও না। তিনি দাইকে বলে গিয়েছিলেন কলকাতায় ওষুধ কিনতে যাচ্ছেন। ফিরবার সময় ওষুধের সঙ্গে স্ত্রীকেও নিয়ে এলেন। দাই চমকে গিয়েছিল বউয়ের রূপ দেখে। এমন রূপসী সে আগে কখনও দেখে নি।

ডাক্তারবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন সে বিষয়ে। দাই অবাক হয়ে যেত। বোসবাবু যখন নতুন বিয়ে করে এনেছিলেন তখন কত কাণ্ড। বাজনা বেজেছিল, ভোজ হয়েছিল, আত্মীয়-স্বজন এসেছিল কত। কিন্তু ডাক্তারবাবু বউ নিয়ে এলেন, কিছুই হল না, সব 'শুন্‌শান' (ফাঁকা)। বাইরের লোকেও এই পাগলা ডাক্তারের মতি-গতি বুঝতে পারেনি, ঘরের লোকেও পারেনি। তবে একটা জিনিস দেখে দাইয়ের খুব ভালো লেগেছিল। ডাক্তারবাবু মাইজিকেই শুধু গয়না-কাপড়ে মুড়ে দেন নি, তাদেরও দিয়েছিলেন। তাকে, তার নাতনীকে কিনে দিয়েছিলেন রুপোর গয়না, দামী জামা-কাপড়ও। থেলো সস্তা জিনিস কেনা পছন্দই করেন না ডাক্তারবাবু। অন্য বাড়িতে

এমন জামা-কাপড় দাই-চাকরকে কেউ দেয় না। আর একটা জিনিসও তিনি করেছিলেন মাইজিকে আনবার সঙ্গে সঙ্গে। মঙ্গলা গাইকে ঘরে এনেছিলেন। তখনও মঙ্গলা গাই হয় নি, বকনা ছিল। একটা কসাইয়ের হাত থেকে চতুর্গুণ দাম দিয়ে নাকি কিনেছিলেন তাকে। মঙ্গলা যখন ঘরে আসে তখন তাকে তেল সিঁদুর জল দিয়ে বরণ করেছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, তাকে ভিতরের উঠোনে নিয়ে এসে। বাইরে তিনি বড় একটা বেরুতে চান না। সেইদিন বাড়িতে শাঁখও এসেছিল। মঙ্গলার মাথায় তেল সিঁদুর আর খুরে জল দিয়ে শাঁখ বাজিয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। দাই আর একটা জিনিসও লক্ষ করেছে। মাইজির যদিও জাত-বিচার নেই, মুরগী-টুরগী সবই খান, কিন্তু ঠাকুরদেবতায় তাঁর খুব ভক্তি। একটা ঘরে নানারকম ঠাকুরদেবতার পট টাঙিয়ে, লক্ষ্মীর আসন বসিয়ে সেটাকে চমৎকার ঠাকুর-ঘরে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। সেইখানেই অধিকাংশ সময় হাত জোড় করে চোখ বুজে বসে থাকেন। ধূপ-ধুনো আর ফুলের গন্ধ আমোদিত করে রাখে ঘরখানাকে।

এখানে আসবার কিছুদিন পরেই ডাক্তারবাবু এখানকার স্কুলে দশ হাজার টাকা দান করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে কিছু সম্মান লাভ করেছিলেন। স্কুলের ভালো লাইব্রেরি ছিল না, লাইব্রেরি করবার জন্যেই তিনি টাকাটা দিয়েছিলেন। মাসে দশ টাকা করে চাঁদাও বরাবর দিচ্ছেন। তাঁকে স্কুল কমিটির মেম্বার এবং প্রেসিডেন্ট করবার প্রস্তাব করেছিলেন স্কুলের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রাজি হন নি তিনি। বলেছিলেন, আমি নেপথ্যেই থাকতে চাই। মাসে মাসে নিয়মিত স্কুল কমিটির মিটিং-এ আমি যেতে পারব না। আমার সময় নেই, ওসব ব্যাপারে সামর্থ্যও নেই তেমন। তবে মাঝে মাঝে যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয় বলবেন, তখন যতটা পারি করে দেব। স্কুলের ইংরেজী পড়াবার মাস্টারের যখন দরকার হল, তখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিলেন। তারপর স্কুলের সেক্রেটারি অমলবাবু একদিন একগোছা দরখাস্ত এনে ডাক্তারবাবুকে বললেন, কাকে বহাল করা উচিত এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মত-ভেদ হয়েছে, মিস্টার সেন তাঁর একজন আত্মীয়কে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। আমাদের তাতে আপত্তি আছে। শেষে কাল মিটিং-এ ঠিক হয়েছে আপনি যাকে বেছে দেবেন তাকেই আমরা বাহাল করব। ডাক্তারবাবুও এ গোলমেলে ব্যাপারে মাথা গলাতে চান নি। কিন্তু অমলবাবুর আগ্রহাতিশয্যে শেষকালে তাঁকে রাজী হতে হল। ডাড়ারবাবু কিন্তু নিজে নির্বাচন করেন নি। নির্বাচন করতে দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। খুব বিদুষী না

হলেও তাঁর স্ত্রী মোটামুটি বাংলা ইংরেজী জানতেন। তিনিই নির্বাচন করেছিলেন গণেশ হালদারকে। এ কথা অবশ্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ বা গণেশ হালদার কেউ জানতে পারেন নি। গণেশ হালদার অবশ্য যোগ্যতম প্রার্থীই ছিলেন। মফস্বলের স্কুলে যে একজন অক্‌স্‌ফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট আসবেন এবং এসে টিকে থাকবেন এ আশা স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা করেন নি, তাই তাঁরা গণেশ হালদারকে বাহাল করতে ইতস্তত করেছিলেন প্রথমে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যখন তাঁকে মনোনীত করলেন তখন আর কেউ আপত্তি করেন নি। ডাক্তারবাবু বললেন, ইংরেজী পড়াবার জন্য এই লোকই ভাল হবে। মাইনেটা অবশ্য কম। আচ্ছা, আসুন তো, ওঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না-হয় আমার ওখানেই হবে। আমার আউট হাউসটা তো খালিই পড়ে থাকে। (ক্রমশ)

ডেকচির দুধ উথলে ওঠে উঠুক। যে জ্বলন্ত সাপটা হিটারের স্প্রীঙে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, গা ভিজে সেটা উঠুক ফোঁস করে। সুমনা তবু উঠবে না। ঢাকা বারান্দার পড়ন্ত রোদে চেয়ারে এলানো নিজের গাটাকে টেনে তুলবে না। রোদটা এসে পায়ে পড়েছে। সারাদিন জলে জলে পাটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে। বেশ আরাম লাগছে। অশোক রাগ করবে দুধ পড়ে হিটারটা বিগড়োলে। ওকেই সারাতে বসতে হবে। তবু লুকিয়ে এই অবাধ্যতাটুকু করতে সুমনার ভাল লাগছে। কেমন আচ্ছন্নের মতো মনে হচ্ছে সব কিছু। যেন সুমনার নয়, তাকে ঘিরে রোদের বেষ্টনী পরা তবু ছায়াময় ওই পথ মাঠ রাস্তার লোকগুলো, ওদেরই চোখের পাতা আলস্যে জড়িয়ে এসেছে। তবু হাতের অবশ আঙুলগুলো যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করে। উলটো আর সোজা, সোজা আর উলটো। মেরুন পশমের বান্ডিলটা ক্ষীণতর হচ্ছে। কিন্তু কোনো স্পষ্ট আকার নিয়ে সুমনার নিমীলিত চোখের অন্ধকারে ফুটে উঠছে না সেই লোকটা, ভোর সাড়ে ছটায় যে রোজকার ধূসর রঙের কোটটা গায়ে দিয়ে ডিউটিতে বেরিয়ে গেছে সাইকেল করে, স্টেশনের দিকে। ফিরবে সন্ধ্যায়। মাঝে এক ঘণ্টার ছুটিতে ভাত খেয়ে গেছে। ধূসর। প্রাত্যহিকতায় ধূসর সুমনার সব কিছু। সন্ধেটুকু মেজাজ ভাল থাকলে পুরোনো হাসিঠাট্টা। তারপর সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ে দিনের ফাঁকা গহ্বরটার মুখ চাপা দেওয়া। কাল রাত্রিতেই তাদের কথাগুলো সুমনার বিবাহিত জীবনের যে কোনো মুখর সন্ধ্যার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

—মিসেস চৌবের ছেলে হয়েছে। ঠিক মায়ের মতো দেখতে হয়েছে। ও মনে করেছিল মেয়ে হবে।

—চৌবের ছেলে হয়েছে? বললে না কাল?

—বলেছি? ও!

তারপর স্তব্ধতাটাই সুমনার সারাদিন দিন ছাড়িয়ে সারা জীবন ছেয়ে ফেলছে। দুটি লোকের কথা কতক্ষণ বা অফুরন্ত থাকে!

চেয়ার থেকে উঠে, যেন একটা আচ্ছন্নতার ভেতরেই, হিটারের সুইচটা নিবিয়ে দিলে সুমনা। না দুধটা ওথলায়নি, অবহেলায় ফুঁসছিল। ওটা ঘন হবে। সুইচটা আবার জ্বেলে দিয়ে, একটা চামচে দিয়ে নাড়তে লাগলো সে...আর তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চোখ থেকে কেটে যেতে লাগলো, তন্দ্রা-রেশটুকু। থিতিয়ে পড়া দুধটা আবার ফণা তুলে উঠলো।

এখানে সুমনার একমাত্র ঘনিষ্ঠ পরিচয় যার সঙ্গে সে স্বামী অশোক। গল্প বলতে সে বোঝে কাজের গল্প, অফিসের গল্প। সবচেয়ে মুখরোচক ফোরম্যান মিস্টার মিত্রের গল্প। ফোরম্যানের গল্প মানে ওই একমাথা-সুদর্শন, টাক-মাথা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির মুক্তকণ্ঠে অপকীর্তন। সাইকেল করে ভদ্রলোক সামনের পীচের রাস্তা দিয়ে গেলে মাঝে মাঝে অশোক যাকে এ বাড়ির বারান্দা থেকে একমুখ হেসে নমস্কার করেছে। পেছন ফিরলে সুমনাকে ডেকে দেখিয়েছে। লোকটা রেল কোম্পানীর জিনিস বাড়িতে দু'হাতে এনে বোঝাই করছে। উনুন ধরাতেও রেলেরই কোক লাগিয়ে বয়ে আনাচ্ছে। ওর

কোয়ার্টারের বেডরুম টুইনকুলেন্স, অশোক বলে, আসলে রেলের গেস্টরুম। পাঁচ শ' আট শ' অবধি ঘুষ নিয়ে লোককে কাজে ঢোকাচ্ছে, তারপর নিজের ফাইফরমাশ খাটাচ্ছে। অশোকের অভিযোগের অন্ত নেই। সুমনাও কি দেখেনি খালাসীদের ছাঁটিয়ে নিয়ে তাদের মালী বানিয়ে কোয়ার্টারের সামনে যে অভিজাত শৌখীন ফুলের বাগানটা করেছেন ফোরম্যান সাহেব? বাঁকের নিচুতলা লাল রাস্তার এক দিকে সূর্যমুখী ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকার রঙবাহার আর এক দিকে বাঁধাকপি ফুলকপির শ্যামল সিল্ক ক্ষেতটা: পাশ দিয়ে হাঁটলে চোখ জুড়িয়ে যায়। অথচ সুমনার চোখে জ্বালা ধরায়। রাগ করে লাভ নেই। মাঝে

মাঝে অশোকই বলে। রেলে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি এই দস্তুর।

সেদিন তো 'অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যানের বাড়ি আলাপ করতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছে সুমনা। ঠিক তাদের কোয়ার্টারের যেমনি আলোর শেড তেমনি শেড দিয়ে ওদের টেবিলে খাবার তরকারি সব ঢাকা দেওয়া। অবশ্য টেবিলটাও কোম্পানীর লোক বেগার বানিয়েছে নিঃসন্দেহে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, মুখ ছুটিয়ে ধমকাতে পারে না। একটা বৃহৎ পরিবারের মতো নিজেদের ভেতর বোঝাপড়া করে সবাই বেশ আছে।

নিয়মের ব্যতিক্রম অশোকের। বিবেকের দংশনটা প্রবল। অন্তত বাড়িতে অতিথি-সমাগম ঘটলে তার কলকণ্ঠে তাই প্রমাণ হয়। অবশ্য ব্যাপারটা যে উপহাসের নয়, তা সুমনা জানে। শুধু জানলেও উপহাস করা যেত, সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। তাকে যদি আজ বলো খাবার ঘরের বালবটা ফিউজ হ'য়ে গেছে, তিনদিন একনাগাড়ে ফেউ লেগে থাকার পর সেটা আসবে। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, নগদ দাম দিয়ে কিনে আনবে অশোক, সবাইকার চোখের ওপর দিয়ে দুলিয়ে। সহকর্মীরা জানলে হাসিঠাট্টা করবে। সুমনা জানে তাতে অশোকের স্ফীত বুক আরো ফুলে উঠবে।

সেনও তো একট চার্জম্যান, বি গ্রেডেরই। অথচ তার বাড়ি যাও ড্রইংরুমে সোফাসেট আসবাব। শুধু ঘরসজ্জার বহরই নয়, ঘরনীর দেহসজ্জার বাহারেও মনে হবে, বুঝি কোথায় না এলুম! মিসেস সেনকে অবশ্য কথাটা কায়দা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছে সুমনা। যখন সরু আঙুলের সুক্ষ্মতর নখাগ্র দিয়ে সুমনার তৈরী পুডিংটার দেহ বিদ্ধ করছিলেন মিসেস সেন আর গৃহসজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রেফ্রিজারেটার না হলে 'কিচেন'কে কেমন ন্যাড়া লাগেই, সুমনার লাগে না? অ্যাকুইরিয়ম না হলে আবার কিসের ড্রইংরুম! দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুমনা বলেছিল, 'আমার তো এমন লজ্জা করে এ-ঘরে এনে কাউকে বসাতে।' খানিক স্তব্ধতার পর যোগ করেছিল, 'কত বলি—সবাই যা করছে, তুমি তা করলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

মহাভারত অশুদ্ধ হোক আর না-হোক, মিসেস সেনের মুখের শুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়নি দেখে তৃপ্তিলাভ করেছিল সুমনা। জোর করে মিসেস সেনকে সবটুকু পুডিংই খাইয়েছিল সে। অশোক সম্বন্ধে এ নিয়ে একটা গর্বও যে তার নেই তা নয়। তার এই শুচিবায়ুতাটা মাঝে মাঝে অন্তত সুমনার কাজে লাগে, স্বীকার করতেই হবে।

আসানসোলে থাকতে থাকতে বাবার মুখে তাঁর আণ্ডারের এই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের গল্প শুনেছিল সে। অবশ্য সে জনশ্রুতির ভিত্তি যে রন্ধ্রহীন ছিল, সেটা পদে পদে প্রমাণ করেছে অশোক।

সামান্য রিকশা ভাড়া বা আনাজপত্রের দাম নিয়ে একটু দরাদরি করলেও অনেক কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তিক্ততারও সৃষ্টি হয়।

ন্যায্য! ন্যায়! তবে চোখের ওপর আউট-হাউসটায় কেন জমাদারটাকে সহ্য করছে অশোক! ওটার স্বত্ব কি তাদের নয়? মানে এই সতেরো নম্বর বাংলোটা যাদের। অথচ লোকটার হাবে ভাবে মনে হয়, সে তার পিতৃপুরুষের ভূমিতেই বিচরণ করছে। জমাদার, না জমিদার। প্রজা অগুনতি। আট দশটা ঘেয়ো কুকুর, ডজন খানেক মোরগ মাঠটা চষে খাচ্ছে, পাতিহাঁসগুলো বেড়াচ্ছে নর্দমায় মুখ দিয়ে নয়তো পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে। একবার এঁটো-কাঁটা ফেলতে সুমনা যদি খিড়কির দরজাটা ফাঁক করেছে, অমনি পঙ্গপালের দল ছেঁকে ধরবে সুমনাকে... গলা বাঁচিয়ে দরজা বন্ধ করতে পথ পাবে না সুমনা। কুকুরগুলো পাহারাদার। ঘরে কি সম্পত্তি আছে কে জানে......ধনমণির রূপেশ্রী

এমন সতর্ক প্রহরায় আর যাই হোক, চেড়ী-বেষ্টিত জানকীর মতো দেখায় না, তবে অশোককাননের আমজাম গাছগুলো বাঁদরদের হাত থেকে ওরাই অবশ্য রেখেছে! রেখেই বা সুমনার কি এমন মাথাটা কিনেছে? গত বছরই যখন গাছে হাজার বার শ' আম ফললো, আর জমাদারটা গোটা পঁচিশ আম এনে মা-জী বলে বিকট শব্দে বাড়ি কাঁপিয়ে বিগলিতভাবে হেসে সুমনার সামনে ধরলে, রসিকতায় বিমূঢ় না হলে সুমনা তার কি অভ্যর্থনা করতো বলা যায় না। খিড়কির দরজা খুললেই চিক্কণপল্লব আমবাগানের শ্যাম ও হরিৎশ্রীর দৃশ্যে তার বুক এখনো হু-হু করে। অশোক বলে, ওরকম একটা দুর্দান্ত লোক কাছে পিঠে থাকা ভাল, চোর-ডাকাতের ভয় থেকে নিশ্চিন্দি। আর তা ছাড়া কে যাবে ছোটলোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে। লোকটার মুখ খারাপ, ওরকম লোককে ঘাঁটানো ঠিক না। অগত্যা নোংরা মুরগীগুলো ডানা ঝটপট করে যখন-তখন গায়ে ওঠে, হাঁস-গুলো অকস্মাৎ এমন প্যাঁক প্যাঁক করে যে, বোনার কাঁটাটা গলায় ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সুমনার, ঘেয়ো কুকুরগুলো নিঃশব্দে খিড়কির দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে, সুমনা বারান্দাটায় একটু দাঁড়ালে।

তবু এই প্রতিপক্ষ আছে বলে সুমনার দিনগুলোর যেন একটা স্বাদ আছে। হঠাৎ অন্যমনস্কতা ভেঙে রান্নাঘরে ছুটে আসতে হয়। চামচে, খুন্তি বা হাতের কাছে পাওয়া রুটি বেলার বেলুন নিয়ে অনধিকার প্রবেশকারীর পেছনে ধাওয়া করতে হয়। দরকার হলে ছিটকিনি দিয়ে নিজেকেও বন্দী রাখতে হয়। নোংরা, ভীষণ নোংরা জাত এরা। শ্বশুরবাড়ির লোকরা কেমন করে জানতে পেরেছে সুমনার জল ঘাঁটা আর পরিচ্ছন্নতার ওপর পক্ষপাতটুকু। কিন্তু কি নিয়ে থাকবে সুমনা? সত্যি, বড়ো নিঃসঙ্গ সে। একা একা ভাবতে ভাবতে সুমনা যেন তার সব ভাবনার বিস্বাদ তলানিটুকুর স্বাদ পেয়েছে। ভাবতে সে আর চায় না।

ঝি যেদিন কামাই করে সুমনা বাঁচে। আটটা অবধি অপেক্ষা করে কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নেয়। দুটি প্রাণী, কিন্তু কতো প্রয়োজন। একটি একটি করে সব কাজ নিজের হাতে সারে। এখানকার ঝিরা সপ্তাহে অন্তত দু' দিন করে তো কামাই করবেই। এ-হাড়হাভাতে দেশে চাকর নয়, ঝিয়েরই রেওয়াজ। মরদগুলো বসে বসে বউয়ের ভাত খায়। ছাড়ালে আর লোক পাবে না, এমনি শক্ত ওদের য়ুনিয়ন।

সকালে উনুন আর সন্ধ্যায় হিটার। ঝি না এলে রান্নাঘরের গনগনে আগুনটাই সুমনার মন্থর দিনের অনেকখানি গ্রাস করে। হিটার আর কলতলা। চমক ভাঙে সেই অশোক যখন ডিউটি থেকে আসে। ন'টার পর থেকে সতর্ক থাকতে হয়, থেকে থেকে ছুটে আসতে হয় বারান্দায়, তখন সব্জী-ওলা হেঁকে হেঁকে যাবে ঝুড়ি নিয়ে, বিরাট কাঁপানো বেলুনের মতো কালো কুচকুচে বেগুনগুলো যেন তেলে পালিশ করা, সাদা পাহাড়ী আলু, ক্ষেত থেকে সদ্য তোলা কপি কড়াইশুঁটি...একটি একটি করে হাত দিয়ে দর করে সুমনা নিজের ঝুড়িতে তোলে। তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে আসবে মাছওলা, মর্জি হলে। বাজারে যা দাম, ওরা তার চেয়ে বেশী নেয়, দোরে পৌঁছে দিয়ে যায় বলে। রেলের আর সব চাকুরেরা কোম্পানীর লোক বাড়িতে রেখে খাটায়, বাজার করায়। অশোক নিজে বাজারে যেতে চায় না, ওরকম কোনো লোকও রাখেনি। সুমনাকেই যতো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়।

ওখানকার দুধটা বেশ ভাল......হলদে দুধটার ওপর এবার পুরু সর পড়ছে...ওর বুদ্বুদগুলো আর অতো ক্ষণভঙ্গুর নয়... এবার নামাতে হবে।

বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। কি হবে বন্ধুতে? চলে যেতে হবে তো, যে-কোনো দিনই নোটিশ এলে। আবার ঘুরে ফিরে সেই চিন্তাটাই শেষে মনে এলো, যেটা সুমনার আর সব ভাবনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যেটাকে দূরে সরাবার জন্যে এতো কাজের তাড়া।

বাড়ির সামনের পোড়ো জমিটা কেটে বাগান করায় আর অতোটা গা করেনি সুমনা। মাটির মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। একটা লোকের মায়ায় পড়ে আর সব মায়া কাটাতে হবে যে। হাতে করে কিনতে ইচ্ছে করে না একটা জিনিস, একটা আসবাবপত্র বাড়লেও মনে হয়, কাঁধে বোঝা চাপলো, টেনে টেনে নিয়ে যেতে হবে কোথায় কে জানে, বেনারস, আসানসোল, মোগলসরাই কোথায়। সেখানে দু'দিন থাকতে না থাকতে আবার ডাক আসবে রেল-লাইনের। অমনি আবার বাঁধাছাঁদো, প্যাকিং বাক্সর ভিড়, এটা ফেলো, সেটা রাখো। এটা ওকে দিয়ে দাও, ওটা নিতে ভুলো না!

স্টেশন কাছেই, যেখানে অশোক যায়। আরো কাছে, বারান্দা থেকে দেখা যায় ভীষণ চওড়া নুড়ির রাস্তাটা, যার ওপর সারি সারি রেল লাইন গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে আছে......রাস্তার ওপর কত লোহার কাটাকাটি......হঠাৎ গিয়ে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে ওঠে। পা দিতে ভয় হয়। তার ওপর দিয়ে ভীষণ লম্বা মালগাড়ি আস্তে আস্তে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে তো চলেছেই। বন্ধ ছোট ছোট কামরাগুলো প্যাকিং বাক্সর মতো দেখতে। সুমনা যেন হাত দিয়ে থামিয়ে দিতে পারে ওদের চলা। দেখতে দেখতে জেদ চাপে ওর শেষ দেখতে। ঘুরে ঘুরে অনেক পরে যেন খেলায় হেরে যাওয়ার লজ্জায় আরো আস্তে শেষ খোলাগাড়িটা আসে।

তবু সমস্ত গাড়িটা অনেকক্ষণ দৃষ্টির বাইরে যেতে চায় না......ওর সঙ্গে সুমনার প্রতিদিনকার জীবনের কোথায় যেন মিল আছে।

বারান্দায় রোদের তেজটা মিইয়ে এসেছে... চেয়ারটাকে ছায়ায় ফেলে সেটা অনেকদূরে স'রে গেছে। চেয়ারটায় নয়, সিঁড়ির ধাপের ওপর গিয়ে বসলো সুমনা। ...শর্মাজীর ছোট্ট সুন্দর পুতুলের মতো মেয়েটা বেড়াতে বেরিয়েছে বাহাদুরের হাত ধ'রে। বাহাদুরকে ডেকে ও চাচাজীকে দেখায়। ওকে দিয়ে জোর করে হিন্দী কথা বলাতে ভাল লাগে সুমনার। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কোলে নিতে......কিন্তু কাপড় নোংরা হবার ভয়ে ইচ্ছা দমন করে আরো জোরে তার সঙ্গে হাসে, গল্প করে। ঘেন্নাটা সুমনার বোধ হয় বেশীই। এই শীতেও আধ-হৌস জল ফাঁক করে কি করে সে প্রাতঃস্নান করে, সেটা বিস্ময়ের। একলা একলা থেকে থেকে এই জল-খরচটা যেন বাড়ছে। কিন্তু কি নিয়ে থাকা যায়! এত ছোট্ট শহরটা যে, ওই সামনের রাস্তা দিয়ে যদি একটা লোক চকবাজারের দিকে যায়, ভাতের হাঁড়িটা উপুড় করে দিয়ে সুমনা যখন আবার এসে দাঁড়াবে বারান্দায়, ঠিক দেখতে পাবে লোকটা ফিরছে। একটু সতর্ক হয়ে থাকলেই বোধ হয় মুখস্থ হয়ে যাবে ক'টা লোকের আনাগোনা এদিকে, তাদের মতো ক'জন হতভাগ্য থাকে পৃথিবীর এই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে। তাদের বউরাও কি অমনি সুমনার মতো রাস্তার লোক গুনে সময় কাটায় নাকি? সময় কাটাবার আর ক'টাই বা উপায় আছে এখানে? একটা ভাল সিনেমা হল না, একটু পার্কে বসতে গেলেও বার আনা খরচ করে রিকশা কর। ওই যে সাইকেল করে দুটো লোক দু মুখে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে কথা বলছে, ওরা কি কথা বলছে, না শুনেও সুমনা নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। 'কেমন আছ', 'ভাল আছি'র অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সোজা বক্তব্যের মর্মবিন্দুতে।

—তোমার কখন ডিউটি পড়েছে? আমার আবার এমন বিপদ জানো, সেনটা এমন পেছনে লেগেছে......কাল রাত্রি দুটোর সময় ঘুম ভাঙিয়ে শালা জিজ্ঞেস করছে, মেহেত্রা আসেনি তো কি করবো—See the fun!

—সেনটা! আর ব'লো না, এমন বদমাইসি শুরু করেছে, নিজে সব নিয়ে ফাঁক করছে, আর স্টাফের লোক যদি—

জীবন আর মানুষের ওই একই রূপ তো সুমনা দেখেছে ছোটবেলা থেকে। সে রূপটা আবার প্রত্যক্ষ করতে পারে এখনই, অশোকের পাওনা পি টি ও নিয়ে শৈশব যেখানে কেটেছে, সেই আসানসোলে গেলে। বাবার ডিজেলের চাকরি, বদলির ভয় নেই। এখন নিশ্চয়ই ফিরেছেন সাইকেল করে......কালিঝুলি মাখা প্যাণ্ট ...ঘামে ভিজে এইটুকু মুখ......কি কাজ করতে হয়, কে জানে।

অশোকের একটা পা সিঁড়ির ধাপে, আর-একটা সাইকেলের পা-দানিতে। একটা ঘর্ঘর শব্দ করে সাইকেলটা নিষ্ক্রিয় হল। সুমনা দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে......কিন্তু মনে কোনো সাড়া আসেনি। প্রতিদিনের একটা অপরিহার্য আগের মতো কে জানে এটা কবে থেকে মনে আর কোনো বিশেষ অনুভূতি জাগায় না, কোনো নিভৃত তন্ত্রীতে আঘাত করে না।

নিঃশব্দে উঠে গিয়ে সদর ঘরের ছিটকিনি খুললে সে...অশোক সাইকেলটা ঢোকালে। —চায়ের জল চাপাও, এখুনি সেন আসছে বুঝলে। সঙ্গে একটা কিছু করো। নোংরা প্যাণ্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে খিড়কির দরজাটা খুলে তের নম্বর রেলওয়ে কলোনীর সেই অতিপরিচিত পশ্চাৎপটের

যবনিকা উন্মোচন করলে সে। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। —ডিউটি থেকে চায়ের জল না ফোটা পর্যন্ত এই-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। ......জমাদারের আস্তানাটা ছাড়িয়ে বারো নম্বর কোয়ার্টারের বড়ো বাগানে নানারকম ফুল দেখা যায়......ওদের বড়সড় মেয়েটা সেখানে দাঁড়িয়ে রাজ্যের লোকের সঙ্গে চেঁচিয়ে গল্প করে......গলাটা যতখানি দরাজ, ততখানি মধুবর্ষী নয়। সুমনা বলে, ও মেয়েটার হুটোপাটি করা স্বভাব, লোক দেখলে স্বভাবটা বাড়ায়। পাছে ওর সঙ্গে গল্প করতে হয়, এই ভয়টা কুকুরগুলো ছাড়া সুমনার খিড়কির দরজাটা বন্ধ রাখার আর একটা কারণ। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, এখুনি দরজাটা বন্ধ করতে হবে, ইলেকট্রিকের আলো জ্বলবে এখানটা। শীতের ছোট বেলা, দেখতে দেখতে বাইরেটা গাঢ় অন্ধকারে একাকার হয়ে যাবে। অশোক নির্বিকার চোখে রোজ কি দেখে ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে? সূর্যাস্তের পল্লীশ্রী? না। তের নম্বরের বাচাল মেয়েটা? না। মিত্র সাহেবের বাগানের খুব বড়ো মানুষের মুখের মতো সূর্যমুখীটার দিকে বড় জোর এক পলক চেয়ে অন্য কিছুর অনুসন্ধান করে তার বিকেলের নির্জীব দৃষ্টি। জমাদারের ছেলে দুটো একপাশে কুকুরবাচ্চার সঙ্গে খেলছে......জমাদার-পত্নীর বহুবর্ণ শাড়িটা গাঁদাফুলের বেড়ায় আটকে এখনো শুকোচ্ছে, তোলা হয়নি। হয়তো কে জানে, অশোক এ সব কিছুই দেখে না, স্টোভের সোঁ-সোঁ শব্দ শোনে শুধু।

চায়ের জলে পাতা ফেলে ঘিয়ের কড়াটা স্টোভে চড়ায় সুমনা। নিমকি ভাজাটাই সবচেয়ে নিঝঞ্ঝাট। ডিম ভেজে দিতে পারা যেত সেনকে। এখানে মাছের ঠিক নেই বলে ডিমটা মজুত রাখতে হয়। কিন্তু না, একটা মামলেটে হবে না কিছু......ডিউটি থেকে ফেরার এই রাক্ষুসে ক্ষিদেটাকে ইন্ধন দেওয়া ছাড়া। তার চেয়ে রাতির জন্যে মাখা আটাটায় একটু সোডা আর বাকোলজিনে মিশিয়ে নেওয়া ভাল।

অশোকের বন্ধুদের সামনে সুমনা বড় একটা বেরোয় না। দু-একজনের সঙ্গে মৌখিক আলাপটুকু আছে।......তারপর থেকেই ওদের কাছে সুমনার অস্তিত্ব রান্নাঘরের ঠুং-ঠাং শব্দ আর পর্দার অবশিষ্টাংশ দিয়ে দেখা সঞ্চরমাণ দুটি পায়ের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। সুমনার কি ছবি ওরা মনে মনে এঁকেছে? অশোক কি বলেছে ওর কথা তাদের কাছে? মাঝে মাঝে গরম ডিম আর ধূমায়িত চায়ের পেয়ালার আবির্ভাবে সেই নেপথ্যচারিণীর যে মুখের অবগুণ্ঠন সরে যায়, সে মুখশ্রীটি কেমন? সেনের হাসিটা বড় সুন্দর। ওর হাসিটাই শুধু শোনা যায়, কথাগুলো কথাবার্তার ভেতর ডুবে থাকে। অশোকের গলাটাই সুমনা শুনতে পায়। ওরা দুজনে কথা বলছে, মাঝখানে রেডিওটা নিজের মনে প্রাণ খুলে বকবক করছে, কেউ শুনছে না তবু। সেন হাসছে, অশোক কথা বলছে, রেডিওতে মেয়েটা কি করছে—কাঁদছে, না কান্নার অনুষ্ঠান তো লিখিতভাবে থাকে না, তবে—নাটক......না, কড়াটা নামিয়ে নিমকি ওলটাতে কলকলানি যখন থামলো, বোঝা গেল, গান, আধুনিক বাংলা গান।

গরম নিমকি ডিশে সাজালো সুমনা। খাবার ঘর থেকে চায়ের কাপ নিয়ে ফিরতে টের পেলে ভারি সুন্দর একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে......নিমকির। এবারে চায়ের ঠুং-ঠাং শব্দ।

সেন লোকটা বড় শান্ত। মেসে থাকে একটা দুপাচির মতো ঘরে। বউ নেই। তাই বাড়িতে একটা কিছু ভালমন্দ রান্না হলে অশোক ফেরার সময় সঙ্গে আনে সেনকে।

খাবার পাঠিয়ে সুমনা খানিকক্ষণ শুয়ে পড়বে খাটে। রাত্রির রান্না সব হ'য়ে আছে। খাবার সময় গরম করতে হবে। কখন উঠবে সেন কে জানে। কিসের এত গল্প আজ! একটা হাই তোলে সুমনা। অশোক বলছে, ড্রাইভারটা সিগন্যাল দেখতে পায়নি, হয়তো কুয়াশার জন্যে, নয়তো লোকটা টং হ'য়ে ছিল। তবে অ্যাক্সিডেন্টই। তখনই তো ওদের ভেতর বেশ একটা সাড়া দেখা যায়। নির্জীব ভাবটা ঝেড়ে ফেলে সবাই গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

বাফার...কাপলিং...রিবাউন্ড...বাম্পার... ওদের জীবনটা খানিকক্ষণের জন্যে কতকগুলো বিচিত্র শব্দের ঝংকারে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। আঃ, লেপের ভেতর শরীরটা গরম হতে হতে সুমনা ভাবে। আরো একটু ওরা গল্প করুক, এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না। কবে একবার ট্রেন লেট করে এসেছিল

বলে কোন্ স্টেশনের অধৈর্য জনতা ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে দিয়েছিল। হু হু করে ছুটেছিল গাড়ি। প্যাসেঞ্জাররা কেউ জানে না, তারা কোথায় চলেছে। আচ্ছা, ট্রেন লেট শুনলে সুমনার এত হাসি পায় কেন? কেন, ট্রেনগুলো কি দুষ্টু ছেলে যে, রাস্তায় খেলা করে তারা দেরি করে আসে? সুমনা এত সব কি ভাবছে পাগলের মতো, একলা থাকলেই সে এত সব কি ভাবে...সে পাগল হয়ে যাবে নাকি? পাগল তো হয়ে গিয়েছিল অনুদি। গয়া থেকে লিলুয়ায় বদলি হবার অনেকদিন পরও কিছু বোঝা যায়নি। আবার বদলি হবার সময় বেঁকে বসলে, আমি যাবো না। তারপর আস্তে আস্তে বোঝা গেল, প্রকাশদা, সেই পাতলা মতো প্রবাসী ভদ্রলোকটি আসতেন যেতেন। হ্যাঁ, সেই লোকটিই। বদলি হবো না। কেন? পৃথিবীতে কত মেয়ের স্বামীই তো রেলে কাজ করে, কত মেয়ের জীবনের ওপর দিয়েই তো রেলের চাকা চলে।

মাঝে মাঝে যেন শুধু স্টেশনে থেমেছে গাড়ি। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাল করে দেখবার আগেই আবার বাঁশি বেজেছে। সেই ক্ষণিকের শুভদৃষ্টিতে কি দেখেছে সুমনা? নিজের জীবনের বঞ্চনা কে যেন দু' ধারে দু' হাতে সাজিয়ে রেখেছে। সারি সারি কুঁড়েঘর, পুকুরের কচুরিপানা সরিয়ে কাপড় কাচছে বা বাসন মাজছে সেই ঘরগুলোর কোনো বউ। সে ও তাকিয়েছে সুমনার দিকে, সুমনাও তাকিয়েছে তার ঘোমটা-খসা মুখে, চকিতেই দৃশ্যবদল হয়েছে।

সুমনা যদি নামতে পারতো এমনি একটা কোনো নাম-না-জানা স্টেশনে...... স্টেশন থেকে একটা পায়ে-চলা পথ যদি এঁকেবেঁকে যেতো, গিয়ে থামতো অমনি একটা কোনো ঘরের মাটির সিঁড়ির সামনে, তবে? ঘর, সুমনার নিজের ঘর! পাশেই জমাদারের বউটা কেমন সুমনাদের আউট-হাউসটাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। ওই সবুজ সতেজ কলাগাছগুলো মাটি-দিয়ে-নিকোনো উনুন, ঘুঁটে-দেওয়া দেওয়ালের প্রাচীরের ভেতর ওই ছোট্ট সাম্রাজ্যটুকু থেকে কেউ সরাক দিকিনি ওকে।

এই কোয়ার্টারগুলো একেবারে এক রকমের কেন...কেন সুমনাদের কোয়ার্টারের সঙ্গে মিত্রদের কোয়ার্টারের শুধু নম্বরের তফাত? একই রান্নাঘর, শোবার ঘর, এমন কি চৌবাচ্চার প্যাটার্ন। আগে থেকে না জানলে সুমনা সেদিন মিত্রদের বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়ে যেত...ম্যাজিক বলে মনে হত। কোথাও একটু তফাত নেই, ওইটুকুকে আমার বলে আঁকড়ে ধরার। সব ফেলে চলে যাওয়ার সময় শুধু ওইটুকুর জন্যে বারবার চোখে আঁচল চাপা দেওয়ার।

ওদের কথাবার্তার শব্দ কখন থেমে গেল? কখন সব এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল? অশোক নিশ্চয়ই সেনকে এগিয়ে দিতে গেছে। আর একটু আসতে দেরি হলে ভাল। ...ওটা কি পড়লো ধুপ্ করে? শব্দটা খাবার ঘর থেকে এলো..... নিশ্চয়ই ইঁদুর। .....সারা বাড়িতে সুমনা এখন একা, না, অশোক আসুক। ...ওই লাইনটা থেকে থেকে মনে আসছে কেন—'তোমারি ঝর্ণাতলার নির্জনে'। রেডিওতে হচ্ছিল...কখন শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো সুমনা? এখন ইংরেজীতে খবর হচ্ছে......সুমনার রেডিয়ো

বন্ধ করতে আর ইচ্ছে করছে না।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলে? রবারের চটি পরে নিঃশব্দে ঢুকেছে অশোক।

—না। ধড়মড় করে উঠে বসলো সুমনা দু' চোখ মুছে।

—বাইরে কি ঠাণ্ডা!

—আজ এত দেরি হল যে, কিসের গল্প করছিলে?

অ্যাক্সিডেণ্টের গল্পটা আবার ফে'দে বসে অশোক। কাপড় ঠিক করতে করতে সুমনা উঠেছে, হিটারের সুইচ জেবলেছে। ইন্সপেকশনে দলবল নিয়ে বেরিয়েছিলেন জেনারেল ম্যানেজার......তাঁর স্পেশ্যাল বগিটাই নাকি গ'ুড়িয়ে গেছে। নাটকীয়ভাবে উদ্ঘাটন করলে অশোক। একটা মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা...এবার মরলো সবাই। তবু ভাগ্যিস ম্যানেজার তাঁর দলবল নিয়ে কামরার বাইরে ছিলেন। সুমনা ভ্রূ কুঞ্চিত করে, পরোটাগুলো সব জুড়িয়ে জমে গেছে, প্রত্যেকটাকে ভাল করে সে'কতে হবে, শুয়ে পড়তে পারলে সে বাঁচে। শর্মা, গুপ্ত সব গেছে ঘটনাস্থলে, ড্রাইভারটা বরখাস্ত হয়েছে। তাওয়াটা নামাতেই হিটারের গনগনে আঁচটা এসে লাগলো চোখে-মুখে। ......বেশ লাগলো।

অশোক বসেছে খাওয়ার টেবিলে। ফোঁটা কয়েক জল সন্তর্পণে গেলাস থেকে ঢেলে হাত ধুয়েছে। বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে ওকে, চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। তর্কে ওই জিতেছে নাকি? অন্তত দিন দশেক ড্রইংরুমটা মশগুল হয়ে থাকবে ওই নিয়ে। একই কথা বলে বলে কেন ক্লান্তি আসে না ওদের মনের, মুখের? ক্লান্তি এলে ওরা পারতো না। পারতো না এই ছক-বাঁধা পথে নিত্য প্রদক্ষিণ করতে। উদ্দীপ্ত চোখে-মুখে বকেই চলেছে অশোক। —কথার মোড়টা হঠাৎ কখন ঘুরলো কে জানে—অশোক বলছে, ওই ফোরম্যান লোকটা একটা নর্দমা। আজও, কাজের ক্ষতি হচ্ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, দুটো ট্রলিম্যানকে বাড়িতে পাঠিয়েছে কয়লা পেণছে দেওয়ার জন্যে। অথচ যখন কাজের জন্যে কয়লা দরকার, এমন গরজ ঠাউরে লোক দেয় যেন—

ঘুমন্ত চোখে সুমনা তাকিয়ে ছিল অশোকের থালার দিকে। পরোটা ফুরোলে দেবে—হঠাৎ সচেতন হয়ে বললে, লোকটা সত্যি ভাল না। সেদিন কৃষ্ণানের স্ত্রী আমায় বলছিল, লোকটা নাকি অফিসারদের কাজে আটকে দিয়ে তাদের কোয়ার্টারে এসে হানা দেয়। —সেদিন সন্ধ্যের মুখে মিসেস কৃষ্ণানের কাছে এসেছিল, চা দাও...... বাড়িতে কেউ নেই।

—ছোটলোক! কত বড় বড় কীর্তি আছে ওর, সবাই এতো যা-তা বলে, তবু চোখ ফোটে না। মানুষ যে কি করে এত হীন হয়।

অশোকের সম্ভবপর বক্তৃতাটা, মানুষের অপরিমিত হীনতার ওপর বিস্ময়ে, না, গলায় ডিমের তরকারি আটকে সাময়িক-ভাবে বন্ধ হয়ে গেল বোঝা গেল না।

অশোক উঠলে সুমনা বসবে। তখন অশোক ঘরে গিয়ে রেডিওটা খুলে খবরের কাগজ নিয়ে বসবে। খানিকক্ষণ পরে নিজে মশারি টাঙিয়ে তার ভেতর ঢুকবে, ঝি না এলে ওই একটা কাজ করে সে, স্ত্রীকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করবে। না, অশোককে হৃদয়হীন, এ কথা কেউ বলতে পারবে না, সুমনা না, তার আণ্ডারের লোকেরা না, বন্ধুবান্ধব না। অশোকের বন্ধুরা এলে, সুমনা চা দিতে দেরি করলে বা না দিলে, যখন সে ঝি-এর কামাই-এর দোহাই পাড়ে, তখন কি অশোক তাকে বলে না, 'I feel for you, but—'

রাত্রির চেহারাটাও সেই এক, দিনেরই মসীবর্ণ ও-পিঠ। আস্তে আস্তে তন্দ্রার ঘোরটা কখন কেটে গেছে সুমনার চোখের পাতা থেকে। যেন আজ না ঘুমোলেও চলে, বালিশে মাথা দিয়ে সারারাত আকাশপাতাল ভাবলেও কিছু যায় আসে না তার। ভেবে ভেবে মনে আনতে পারে ছেলেবেলাকার এলোমেলো টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি, সেগুলো সাজাতে পারে আবার ভাঙতে পারে। অজস্র কাজ খ'ুজে খ'ুজে বের করে সুমনা, এটা অনর্থক নাড়ায়, সেটা সরায়। বাসনের ঝনঝন্ শব্দে অবশিষ্ট ঘুমটাকেও যেন সে এখুনি মনের চৌহদ্দি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

সব শেষে শোবার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলা। অশোক ঘুমোয়নি। বন্ধ দরজার ভেতরে সুমনা। আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে এগিয়ে আসছে মশারির দিকে।

—ওটা কি পড়লো ঝন্‌ঝন্ করে খাবার ঘরে......চোর না তো?

—হোক, কি বা পাবে ওখানে।

ডেকচির দুধটা কখন নামিয়ে রেখে এলো সুমনা, আবার এসে বসলো এই পড়ন্ত রোদের আমেজে? —এত মনের ভুল কেন তার, কে বলবে! দুটি লোকের এই সংসার ফেলে তার মন কোথায় উড়ে চলে, নাগাল খ'ুজে খ'ুজে হয়রান সে। না, সুমনা এখন আর উঠবে না এখান থেকে, বসে বসে রোদ পোয়াবে। কে ঢুকবে এই ঠাণ্ডা ঘরগুলোর হিমের ভেতর, যেন ভিজে

জাব হয়ে আছে সব, এমনকি লেপটাও। শীতের বেলা, কতটুকুই বা, এক্ষুনি চোখের পলক পড়বে না রোদ মিইয়ে আসবে...... মাঠের ওপরকার লম্বা লম্বা ছায়াগুলো এই আবছা হয়ে এলো বলে। আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে, মাথায় হ্যাট পরে, ডিউটি থেকে লোক ফিরবে, অশোক আসবে। এত শিগগির ঘড়ির কাঁটাগুলো একই ঘরে ফিরে আসে! অঞ্জু দু'দিন দিদির কাছে বেড়াতে এসে হাঁপিয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় দিনেই—কি করে বরদা গড়লে তুই সময় কাটাস রে, মানুষ থাকে এখানে!' ওর জামাইবাবু বলেছিল, 'মজা তো আমাদেরই, কত দেশবিদেশ ঘুরেছি, আসানসোলের বাইরে কি আছে, জানো তোমরা?'

কতো বিচিত্র, কিন্তু সেই এক চিত্র। কোথাও গেলে দু'দিন একটু ধোঁকা লাগে, তারপর ঘর গুছিয়ে বসতেই এনামেল খসে নিকেল ফুটে বেরোয়। গয়া, বেনারস, মোগলসরাই, রেলওয়ে ডাইরেক্টরী খাতা যে অদ্ভুত নামই তুমি বের করো না কেন তার ঝংকারে সুমনাকে ঠকাতে পারবে না, সে জানে সব আওয়াজই মেকী।

সোজা আর উল্টো। উল্টো আর সোজা। উলের বাণ্ডিলটা কোলের ওপর রেখে সুমনা বুনে চলে। না ভেবে, না তাকিয়ে সে কাঁটা চালাতে পারে। সামনের মাঠের ওদিকে এক দঙ্গল রাস্তার ছেলে ক্রিকেট খেলছে। কে জানে ওদের লক্ষ্য হয়তো বল নয়, সুমনাই। অনর্থক কাপড়টা সামলায় সে।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে ধুলো উড়িয়ে দুটো কুকুর নিমিষে প্রকাণ্ড মাঠটা পার হয়ে গেল। চেন-বাঁধা জমাদারের কুকুরটা উদ্দাম হয়ে উঠলো......তারপর লুব্ধ ব্যাকুল দৃষ্টিতে ওদের নিষ্ক্রমণ পথের দিকে তাকিয়ে রইল। বোনাটা নামিয়ে রাখলে সুমনা! হয়তো নিজের অজান্তে।

খুঁটিবাঁধা ছাগলটাও তিন পাক ঘুরেছে। রুক্ষ কটা চুল যে ছেলেটা মাঠে সকাল থেকে ছাগল-বাঁধা দড়িটা ধরে পড়ে থাকে, কখনো ছেড়ে দেয়; খেলা দেখছিল, ছুটে এলো।

এবার বলটা গড়িয়ে এলো কাছে। জমাদারের মুর্গীটা দুটো বড় বড় পা ফেলে হনহন করে পালিয়ে এলো নিরাপদ দূরত্বে।

কিন্তু এলো সুমনার কাছে। এই প্রথম মুর্গীটা ভাল করে দেখলে সুমনা। দেখলে প্রতিবেশী শত্রুকে। রং-বেরঙের গা, ঢেউ-খেলানো পুচ্ছ, সেই বাহারে পুচ্ছটা উঁচু করে, মাথার মুকুটটা ধুলোয় লুটিয়ে, ঠোঁট দিয়ে কি একটা সূক্ষ্ম আহার্য তুলে নিলে সে। তারপর ক্ষুদ্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সুমনাকে নিরীক্ষণ করলে। ও আরো কাছে এলে যে সুমনাকে চান করতে হবে, ও কি তা জানে?

সাইকেলের ঘর্ঘর। অশোক ফিরছে। এখুনি উঠতে হবে। সুমনার ভাল লাগছিল নাকি তাকিয়ে তাকিয়ে মুর্গীটাকে দেখতে?

অশোক পেছন দিক দিয়ে ফিরছে কেন? খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে সুমনাকে চমকে দেবে নাকি? কিন্তু নিজেই যে চমকে উঠবে, যদি দেখে জমাদারের মুর্গীটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে সুমনা। তখন কি অবস্থা হবে ওর? হঠাৎ একটা বৈচিত্র্য, জীবনের ছক-বাঁধা রেল-লাইনের ওপর একটা মস্ত বড় ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট, কিংবা আরো রোমাঞ্চকর ঘটনা। একটা মোরগকে আশ্রয় দিয়েছে সুমনা। কোলে নিয়েছে ভয়ার্ত একটা জীবকে। আশ্রয়, নীড়। অশোক কি জানে তার মানে? যা অশোক দিতে পারেনি সুমনাকে।

চমকেই উঠলো অশোক। কাজে আটকে পড়েছিল, ফিরতে বেশ দেরি হয়েছে। শালা ফোরম্যান, মিথ্যে কাজ দিয়ে আটকে রেখেছিল। কিন্তু ও কি, ফোরম্যান মিত্রকে চা দিয়ে সুমনা কি সবে গেছে ভুলে গেছে নাকি? তার হাতের নাগালের খুব ভেতরে যে দাঁড়িয়ে আছে ও সুমনাই তো?

(১৪)

হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল।

মোহনপুরের বউ নিজে, সুখ-সুবিধের কথা ভেবে বলেনি কথাটা। বলেছিল স্বামীর কথা ভেবে। গিরীনের দিকে তাকিয়ে এক-একদিন তার চোখের পাতা ভিজে আসে। এত বড় সংসারটার ভার মানুষটার ঘাড়ে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। এক-একদিন মোহনপুরের বউ যখন রান্নাঘরের কাজ সেরে বাসনকোশন তুলে লম্ফ হাতে নিজের ঘরটিতে ফিরে আসে, ফিরে এসে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকায়, তখন বড় মায়া হয়। কোন কোনদিন ক্ষণিকের জন্যে ভুলে-যাওয়া, মুছে-যাওয়া অতীতের দু-এক টুকরো ছবি ভেসে উঠেই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কপালের ওপর দু' ভাগ করে পাতাকাটা ধরনে আঁচড়ানো, গায়ে গিরিজাপ্রসাদের কিনে দেওয়া চাঁদনির দোকানের ডোরাকাটা ছিটের কোট, কোটের বুকপকেটে রুমাল। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সেই যুবক চেহারাটার সঙ্গে কত হাসি-আনন্দ অভিমান-বেদনার ইতিহাস যে জড়িয়ে আছে মোহনপুরের বউয়ের জীবনে! ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতেও যেন কষ্ট হয়। আজ গিরীনের কপাল বিস্তৃত হয়ে গেছে টাক পড়ে, শরীর শুকিয়ে দড়ির মত, গাল বসে গেছে, চোখের কোলে ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা।

শীত-গ্রীষ্ম নেই, সারাটা বছর ছোটাছুটি লেগেই আছে। কখনো মুনিষ জোগাড় করতে, কখনো ভিন-জেলা থেকে মুসলমান কিষাণ নয়তো সাঁওতালদের দল ডেকে আনতে হয় ধান কাটার সময়ে। ভাগ্য ভাল থাকলে তবেই সে-বছর কাস্তে হাতে তাদের দল নিজে থেকেই এসে হাজির হয়। দিনে দিনে মজুরী বাড়ছে, তবু লোক পাওয়া যায় না। তার ওপর আজ যাও কৃষি-আপিসে ধর্না দিয়ে সার আনতে নয়তো কাল অ্যামোনিয়া কিংবা বীজ ধান আনতে। দুপুর রোদে মাথায় ভিজে গামছা বেঁধে এতটা পথ গিয়েও বাবুদের দেখা মেলে না। দেখা মিললে মেজাজ তাদের যেন লাটসাহেবের। ফিরে এসে তাই এক-একদিন রাগে গজ গজ করে গিরীন, কখনো কখনো মোহনপুরের বউয়ের ওপরই অকারণে চটে যায়। তার ওপর সেস, ক্যানাল ট্যাক্স, খাজনা—হাজারো গণ্ডা ঝামেলা। সে-সবের নোটিশ দেবার নাম নেই, হঠাৎ হয়তো নীলামের হুমকি এসে হাজির। জমিতে মই দেয়া হলো কি না হলো ক' আনা পয়সা দেবার জন্যে ছোটাছুটির অন্ত নেই। চাষের মুনিষদেরও বিশ্বাস নেই এতটুকু, রোদে জলে ঘুরে ঘুরে মাঠে মাঠে তাদের দেখে বেড়াও। এত সব করে তবে তো ক' মরাই ধান ওঠে। চাষের খরচখরচা বাদ দিয়ে, যে-কটা টাকা বাঁচে, একটা সংসারকে সারা বছর টানতে গিয়ে সে-কটা টাকা কোন দিক দিয়ে যে উড়ে যায় টেরও পায় না মোহনপুরের বউ। চাষের সময় ছেলেমেয়েদেরও খাটুনি, তার নিজের কাজও কি কম নাকি। দশ বিশটা মুনিষের ভাত রাঁধতে হয়, জলখাবারের মুড়ি ভাজো। বাউড়ি-বাগ্দী অনেকেরই দু'পাঁচ বিঘে জমি আছে, যাদের নেই তারাও ভাগে জমি নেয়, তাই মুড়ি ভাজার লোকও মেলে না।

মোহনপুরের বউও তাই মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে চোখের জল ফেলে বলে, ভারী আমার চাষ, রাঁধুনীর মাইনে দিতে হতো আমাকে তো চাষের পাট কবে ঘুচে যেতো।

গিরীনও তাই মাঝে মাঝে যখন বলে, 'জমি ক' বিঘে গরমেণ্ট নিয়ে নিলেই বাঁচি', তখন ক্রোধটা কিসের জন্যে, কার বিরুদ্ধে তা বোঝে মোহনপুরের বউ। এরই ফাঁকে যে বছর ধান ভালো হয়, কিংবা ধানের দর বাড়ে সে-বার আনন্দ হয়, মনে হয় এইবার বুঝি দুঃখ ঘুচবে। আবার যখন ধানের দর

কমানোর জন্যে শহরবাজারের লোক হৈ চৈ করে তখন মুখ শুকিয়ে যায় সকলের।

এত পরিশ্রম, এত দুশ্চিন্তার পর ক'মরাই ধান ওঠে। অথচ নিভাননীর ধারণা জমির ভাগটাই বড় কথা। যেন চাষ আপনি হয়।

সেইজন্যেই জমির ভাগের কথাটা শুনেই দপ করে জ্বলে উঠেছিল মোহনপুরের বউ। গিরিজাপ্রসাদ যখন প্রথম এসেছিলেন তখন ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, অনেক টাকা নিয়ে এসেছেন তিনি, একটা লাঙল বাড়ানো যাবে, দুটো মোষ কেনা যাবে। তারপর ভাগে-দেওয়া আরো কিছু জমি ছাড়িয়ে নিয়ে খাসে আনবে। কিন্তু গিরিজাপ্রসাদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই তো পেলে না গিরীন। এদিকে এত বড় একটা সংসারের খাইখরচই কি কম? তাও সেই গিরীনের ওপর।

এত সব দেখেশুনেই গিরীন বলেছিল, শুধু চাষের রোজগারে আজকাল আর চলে না। বুঝলে? ভাবছি...

মোহনপুরের বউ হেসে বলেছিল, চাকরী নেবে?

—চাকরী আর কে দেবে বলো। গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, চাকরী নয়। কিছু টাকা ধারধোর করে একটা হাস্কিং মেশিন যদি করা যায়...

পাশের গাঁয়ের যশদের সঙ্গে মিলে একটা হাস্কিং মেশিন বসিয়েছিল গিরীন, বসন্তপুর স্টেশনে। কিন্তু মনে একটা ভয় ছিল, ব্যবসারও অর্ধেক না চেয়ে বসেন গিরিজা-প্রসাদ! যৌথ পরিবারের টাকায় মেশিন কেনা হয়েছে বলে একদিন যদি গিরিজা-প্রসাদের ছেলেরা মামলা-মকদ্দমা জুড়ে দেয়...

নিভাননীর কথাটায় তার সূত্রপাত হয়ে গেল। বেশ খানিকটা চেঁচামিচি ঝগড়া-ঝাঁটির পর গিরীন রাগের মাথায় বলে বসলো, জমির ভাগ আছে যখন তোমাদের, ভাগাভাগিই করে নাও। বলে দুম দুম করে পা ফেলে মোহনপুরের বউয়ের কাছে এগিয়ে এসে রান্নাঘরের দিকে আঙুল তুলে বললে, আর এই তুমি—তোমাকে বলে রাখছি, আজ থেকে ওদের জন্যে এক মুঠো ভাতও সিদ্ধ করে দাও তো আমার মরা মুখ দেখবে!

অন্য যে কেউ সে-সময় গিরীনের ভাব-ভঙ্গি দেখলে হয়তো হেসে উঠতো। কিন্তু মোহনপুরের বউ স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাগ হলো চণ্ডাল। কিন্তু তা বলে এমন একটা দিব্যি দিয়ে বসবে গিরীন, মোহনপুরের বউ ভাবতেই পারেনি।

নিভাননীর ওপর তারও রাগ কম হয়নি। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কথা বলে বসবে গিরীন?

গিরীন চিৎকার করে অভিশাপ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই অসহায়ের মত নিভাননীর দিকে, কমলা-বিমলার দিকে

ঢাকালো মোহনপুরের বউ। দেখলে ওরা থামের মত দাঁড়িয়ে আছে, আর গিরিজাপ্রসাদ দক্ষিণদুয়োরীর বারান্দায় বসে আছেন মাথা হেঁট করে। লজ্জায়, না অপমানে, বোঝা গেল না।

আঁচলে চোখ মুছে অনেকক্ষণ পরে মোহনপুরের বউ টিয়াকে ধীরে ধীরে বললে, টিয়া, জেঠীকে বল উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি।...

কথা শেষ করতে পারলো না মোহনপুরের বউ, সশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ছেলেমানুষের মত।

হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল, দুভাগ হয়ে গেল রান্নাঘরখানাও। মুনিষ ডেকে রান্নাঘরের মাঝখানে একটা কাদার দেয়াল তুলে দিলেন গিরিজাপ্রসাদ। এখন এই থাক, এরপর ধীরেসুস্থে পৃথক রান্নাঘর তুলে দেবেন।

মাঝখানে দেয়াল তুলতে দেখে গিরীন মুখে বলেছিল, যাক বাঁচা গেল!

কিন্তু ঘরের বারান্দায় সন্ধ্যের অন্ধকারে বসে রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন গিরীনের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো।

দু' তরফের কথাবার্তা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল, চোখাচোখি হলে দু' পক্ষই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ঘাটে যেতে একজন আরেকজনকে পার হয়ে যায় অচেনা লোকের মত। গিরীন ভেবেছিল দু'দিন পরেই বুঝি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। হলো না।

নিত্যদিন মন কষাকষি, ঝগড়াঝাটি, বাঁকা বাঁকা কথা জীবনে স্বস্তি ছিল না এতটুকু। গিরীনের মনের ভেতর সদা-সর্বদাই একটা দুঃসহ জ্বালা যেন তাকে পুড়িয়ে ফেলছিল তিলে তিলে। জীবনে এতটুকু শান্তি ছিল না গিরিজাপ্রসাদ ফিরে আসার পর থেকে। তাই ভেবেছিল সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল, পৃথক হয়ে গেলেই বুঝি সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।

কিন্তু শান্তি ফিরলো না। একটা চাপা ক্রোধে আর অভিমানে বুকের ভেতরটা যেন ফেটে পড়তে চাইছিল এতদিন। অথচ পৃথক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিরীনের মনে হলো জীবনের সব রস যেন নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে। অসহ্য একটা অস্বস্তি, বুকের ভেতর নিঃস্বতার জ্বালা। সেই শৈশবের দিন থেকে গড়ে ওঠা বন্ধনটা যেন পলকা সুতোর মত হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। তুষের আগুনের জ্বালা বুঝি একেই বলে! এমন তো চায়নি গিরীন। ও তো ভাঙতে চায়নি, চেয়েছিল জোড়া লাগাতে। কিন্তু এ কি হয়ে গেল মুহূর্তের ভুলে। কোন কাজে আর মন বসাতে পারে না গিরীন, রাত্তিরে ঘুম হয় না। বারবার এই ক'দিনের ঘটনাগুলো, কথাগুলো মনের মধ্যে উঁকি দেয়, সারা মন তোলপাড় করে।

পৃথক হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও গিরীন বুঝতে পারেনি গিরিজাপ্রসাদ-নিভাননী-কমলা-বিমলাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কত গভীর, কত আন্তরিক। আজ তাই মনে হয় জীবনের সব আনন্দ যেন হারিয়ে গেছে। যা হারিয়ে গেছে তা বুঝি আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

গিরীনের ইচ্ছে হয় নিজে থেকে গিয়ে গিরিজাপ্রসাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসে। নিভাননীকে বলে, বৌঠান, ঘাট হয়েছে আমার...

নিঃস্বতার দুঃখে চোখে জল আসে গিরীনের। বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গিরীন। দেখে একদিকে মোহনপুরের বউ রান্না করছে, অন্যদিকে নিভাননী।

কমলা-বিমলাকে ডেকে দু'একবার কথা বলে বুকের ভারটা হাল্কা করতে চেয়েছে গিরীন। কিন্তু কমলা-বিমলা দু'একটা সংক্ষিপ্ত 'হাঁ' 'না' উত্তর দিয়ে সরে গেছে। গিরীন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ওরা গিরীনের সঙ্গে কথা বলতেই ঘৃণা বোধ করছে। কথা বলতে চায় না ওরা। বুকের ভেতর নতুন করে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছে।

বাড়ি থেকে পালাতে পারলেই বুঝি স্বস্তি পাবে সে, ভেবেছে গিরীন। কখনো

মনে হয় বনপলাশি থেকে দূরে সরে গেলে স্বস্তি পাবে। তাই শেষ পর্যন্ত কালনায় চলে গিয়েছিল প্রভাকরের বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

পুজোর দিন ক'টাই নয়, পুজোর পর একটা মাস কেটে গেছে এই মানসিক দাহ নিয়ে। রান্নার পাট পৃথক হওয়ার পরও এতখানি ব্যথা লাগেনি বুকে, কিন্তু যেদিন মতে কোটালকে ডেকে [illegible] পশ্চিমদুয়োরী আর দক্ষিণদুয়োরী ঘর ক'খানার মাঝখানের উঠোনে কাদার পাঁচিল তুলে দিতে বললেন, সেদিন মোহনপুরের বউয়ের চোখেও জল এসেছিল।

আর গিরীন? বেচারী ভাবতেই পারেনি পৃথক হওয়ার মধ্যে এত ব্যথা, এতখানি বেদনা লুকিয়ে আছে। আশ্চর্য, কোন মানুষই বুঝি সেটা আগে বুঝতে পারে না। জানে না, হাজারো দ্বন্দ্ব বিবাদের মধ্যেও

একটা স্বস্তি আছে, আনন্দ আছে।

শুধু কি তাই। প্রথম প্রথম একটা অসীম লজ্জা এসে গিরীনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। যেন সব দোষটুকুই তার। যেন পৃথক হওয়ার চেয়ে লজ্জা নেই। তাই কথাটা স্পষ্ট করে গ্রামের কাউকে বলতে পারেনি সে। কিংবা তাদের প্রশ্নের সামনে থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে। আর তাই একদিন চলে গিয়েছিল কালনার পথে।

রান্নাঘরের বাঁশের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিরিজাপ্রসাদকে দেখছিল টিয়া। রান্নাঘরের দাওয়াটা অনেকখানি উঁচু, সেখান থেকে নতুন পাঁচিলটার ওপাশেও চোখ যায়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে টিয়া। কমলা-বিমলা কাছে পিঠে নেই, হয়তো আত্মীয়ার বাড়ি গেছে গল্প করতে। এপাশে মা রান্না করছে, ওপাশে জেঠীমা। শুধু অমরেশ অমুদা, মা'র কাছে বসে গল্প করছে। দুটো পরিবারের মধ্যে এত ঝগড়া-ঝাঁটি, কথাবার্তা বন্ধ, তবু অমুদার ভ্রূক্ষেপ নেই। সকলের সামনেই সে মাঝে মাঝে টিয়ার সঙ্গে, টিয়ার মা'র সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু টিয়া যদি এক মুহূর্তের জন্যেও ওদের কারো সঙ্গে কথা বলে, টিয়ার মা যেন রাগে জ্বলে ওঠে।

একই বাড়ির মধ্যে কি একেবারে কথা না বলে থাকা যায়। অভিমানে ঠেলে উঠে জল আসে টিয়ার। মা যেন কি!

গিরিজাপ্রসাদকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল টিয়া। বারান্দায় বসে বসে একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। মা দেখে হাত দুটো নিশপিশ করছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল গিয়ে কাপড়টা কেড়ে নিতে। কেড়ে নিয়ে নিজে সেলাই করে দিত। ভিতরে ভিতরে কমলা-বিমলার ওপরও রাগ হচ্ছিল তার। একটা কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেটুকু রিপু করে দিতে পারে না ওরা?

মা একটু অন্যমনস্ক হতেই পা টিপে টিপে গেল টিয়া, কিন্তু সবে ওদের চৌকাঠে পা দিয়েছে অমনি পিছন থেকে ডাক এলো। টিয়া!

চমকে ফিরে তাকালো টিয়া।

বাবাকে দেখেই ভয় পেয়ে গেল সে।

গিরীন ঘামতে ঘামতে ফিরে এসেই জামাটা খুলে ফেললে। তারপর জামাটা টিয়ার হাতে দিয়ে বললে, কোথায় যাচ্ছিলি?

—কই না তো!

গিরীন নিজের ঘরটির সামনে উঁচু বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসলো। গরমে ঘামে চিড়চিড় করছে সারা শরীর। খাটো ধুতিটা হাঁটুর ওপর গুটিয়ে তালপাতার পাখাটা নিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললে, গাড়ুটা নিয়ে আয় তো মা, আর ঘাটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বাবাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে, তার ডাক শুনে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল টিয়া। কিন্তু তারপরই একটা কৌতূহল জেগে উঠলো ওর মনে।

গিরীন কালনায় গেছে সে খবর শুনেছিল টিয়া, বুঝেছিল কেন গেছে! তাই কলাফল জানবার জন্যে ওর বুকের ভেতরটা যেন ছটফট করে। প্রভাকরের বাবার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে? কি বলেছেন তিনি? জানবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে টিয়া। অথচ জানবার উপায় নেই।

গিরীনের জামাটা দেয়ালের আলনায়

টাঙিয়ে রেখে গাড়ুটা খিড়কির পুকুরে ডুবিয়ে এনে রাখলে টিয়া। গামছা এনে দিলে।

গিরীন দাওয়া থেকে পা ঝাড়িয়ে সেখানেই পা ধুলো, গামছায় মুছলো পা দু'খানা।

একটা মাদুর পেতে দিলো টিয়া। ক্লান্তিতে সেখানেই শুয়ে পড়লো গিরীন।

টিয়া খানিক পাখা করলে, তারপর প্রশ্ন করলে, খাবে কিছু?

—না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পাখাটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে মার কাছে রান্নাঘরে চলে এলো। বললে, বাবা এয়েছে।

—হুঁ। অর্থাৎ দেখেছে মোহনপুরের বউ।

টিয়া বললে, চা করে দেব বাবাকে?

—দে। ছোট্ট একটা অবহেলার উত্তর। আর কোন কথা বললে না মোহনপুরের বউ।

বসে বসে পাশের উনোনে পাটকাঠি জেলে জল গরম করলে টিয়া। চা ছেঁকে গিরীনকে দিয়ে এলো।

একটার পর একটা কাজ করে চলে সে, একটার পর একটা ফরমাশ খাটে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহল চেপে রেখেছে যেন। একটা আশঙ্কাও। বাবা গিয়েছিল তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে, প্রভাকরের বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কি বলেছেন তিনি। মেয়ে দেখতে আসবেন? কবে আসবেন? আরো হাজারো প্রশ্ন এসে জড়ো হয় তার মনে। কিন্তু মুখ ফুটে তো জিগেস করতে পারে না।

মা কেন আসছে না, খোঁজ নিচ্ছে না বাবার কাছে? তা হলে তো দরজার আড়াল থেকে সব কথা শুনতে পাবে সে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে, রাত গভীর হয়। হারিকেন জেলে গিরীন রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে খেতে বসে এক সময়। মার হাতের কাছে এটা ওটা জুগিয়ে দেয় টিয়া। বাটি গেলাস। মা পরিবেশন করে পাখা নিয়ে বসে। টিয়া রান্নাঘরের ভিতরে দুধ জ্বাল দেয়। দুধ জ্বাল দেয় আর কান খাড়া করে রাখে। যদি বাবা কোন কথা বলে, মা কোন প্রশ্ন করে।

না, কেউ কোন কথা বলছে না। দু'জনেই চুপচাপ।

—ডাল দেব আর? মা'র কথা শুনতে পায় এক সময়।

কোন উত্তর আসে না। হয়তো মাথা নেড়েই জবাব দিয়েছে বাবা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এক সময় মা জিজ্ঞেস করে, গিয়েছিলে?

—হুঁ।

—দেখা হলো?

—হুঁ।

একটু থেমে আবার গিরীনের গলার স্বর।—পরে বলবো।

অর্থাৎ দেয়ালের ওদিকে জেঠীমা আছে, যদি তার কানে যায় এই ভয়।

পরে বলবো। কি বলবে বাবা? কি বলতে পারে! সাতপাঁচ নানা কথা ভাবতে ভাবতে কড়াইয়ের দুধে হাতা নাড়তে ভুলে যায় টিয়া।

মা এক ফাঁকে এসে বাটিতে কয়েক হাতা দুধ ঢেলে নিয়ে চলে যায়।

একে একে সব কাজ সারা হয়। বাসন-কাসন তুলে রেখে টিয়া ঘুম-জড়ানো চোখে বলে, ঘুম পেয়েছে।

—বেশ তো, যা না তুই, শুয়ে পড়বি যা।

টিয়া চলে আসে খুশী মনে। আসলে ঘুম তো ওর পায়নি, পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা আর মা'র কথা শুনতে পাচ্ছে।

দেয়ালগিরির আলোটা কমিয়ে দিয়ে ভাই-বোনদের পাশে শুয়ে পড়ে টিয়া। শুয়ে পড়ে চোখ বুজে থাকে।

সময় যেন পার হচ্ছে না। টুং টাং শব্দ, ঝাঁটার সপ্‌সপ্‌ শব্দ। কান পেতে থাকে টিয়া। অনুভবে বুঝতে পারে বাবা বারবার পাশ ফিরছে। অর্থাৎ জেগে আছে। নিশ্চয় বলবার মতই কোন খবর এনেছে বাবা, মা ফিরে এলেই বলবে।

অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ কখন যেন একটু তন্দ্রার মত এসে পড়েছিল। কতক্ষণ পার হয়ে গেছে কে জানে, মা কখন ফিরে এসে বাবার কাছে খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছে টেরও পায়নি ও। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ওদের কথাবার্তা কানে এলো।

মা বলছে, আজকালকার দিনে এমন ছেলে দেখা যায় না। বাপ বলছে, তার মতেই ছেলে বিয়ে করবে?

বাবা উত্তর দিলে, সব ছেলেই বিয়ের সময় ভাল, তা না হলে যে পণের টাকাটা বাড়ানো যায় না।

—পণ কে না নেয় বলো।

—সব নিয়ে প্রায় আট দশ হাজার।

—কেন চাইবে না, অমন পাত্র—শিক্ষিত, ভাল চাকরী করছে, তারপর আমাদের মেয়ে যখন পাড়াগেঁয়ে, শিক্ষিত নয়, তখন একটু বেশী তো চাইবেই।

কান পেতে প্রত্যেকটি কথা শোনে টিয়া, অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে। কিন্তু আসল কথাটা কিছুতেই জানতে পারে না।

মোহনপুরের বউ এক সময় বললে, ছেলেরা শিক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু পণ নিতে তো ছাড়ছে না বাপু।

গিরীন চুপ করে রইলো। তারপর বললে, প্রভাকর নাকি বাপকে বলেছে বোনের বিয়ের জন্যেও তো টাকা লাগবে, সেইজন্যেই পণ নেবে বিয়েতে।

মোহনপুরের বউ হাসলে। বললে, সবাই তাই বলে। যাদের মেয়ে নেই বিয়ে দেবার মত, তারা নিচ্ছে না?

এত সব তর্ক শুনতে চায় না টিয়া। ও শুধু জানতে চায় অত টাকা পণ দিতে বাবা রাজি হয়েছে কিনা।

মোহনপুরের বউ জিজ্ঞেস করলে, কি করবে?

গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—যেমন করে হোক টাকা জোগাড় করতেই হবে। বিয়ে তো দিতেই হবে মেয়ের। আর ওর চেয়ে কমেই বা কোথায় হবে, এই পাত্র তো পাবো না।

মোহনপুরের বউ বললে, তা বলে সব টাকা নিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি ওরা? তা হলে ওখানে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। গয়নাগাটি দেবে না?

—তা দেবে কিছু। ঘুম জড়ানো চোখে বললে গিরীন।

মোহনপুরের বউ আবার প্রশ্ন করলে, কি করবে তা হলে? টাকার?

—দেখি। ব্যবস্থা যেমন করে হোক করতে তো হবেই।

মোহনপুরের বউ হঠাৎ হেসে উঠে বললে, ওরা বা চটবে না!

—কারা? বুঝতে না পেরে গিরীন প্রশ্ন করে।

—তোমার দাদা গো। দাদা, বৌঠান......

হেসে ওঠে মোহনপুরের বউ।

গিরীন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, দেখো আবার, শোনে না যেন কেউ, শেষে দেবে ভাঙিয়ে। গুণের তো ঘাট নাই ওদের।

বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো গিরীন। মোহনপুরের বউ নেমে এলো নিজের বিছানাটিতে। কোলের ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে টিয়ার পাশেই শুয়ে পড়লো।

টিয়া চোখ বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলো। মা যেন বুঝতে না পারে টিয়া জেগে আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে টিয়া হঠাৎ টের পেল মা'র একখানা হাত এসে পড়লো তার গায়ের ওপর। হাতখানা নরম করে টিয়ার পিঠে বুলিয়ে বুলিয়ে টিয়ার গাল ছুঁলো। আদরের স্পর্শ যেন।

টিয়া বুঝতে পারলো মা খুব খুশী হয়েছে, ও যতখানি খুশী হয়েছে ঠিক ততখানিই।

মার হাতখানা ছুঁতে ইচ্ছে হলো টিয়ার। পারলো না, তা হলেই যে মা বুঝতে পারবে টিয়া ঘুমোয় নি, সব শুনেছে কান পেতে পেতে।
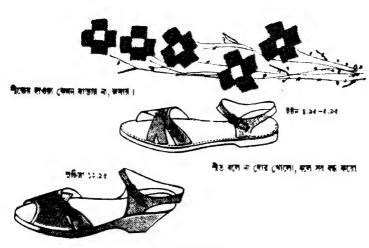
ছি ছি কি লজ্জা, কি লজ্জা। তা কি কখনো পারে টিয়া!

(ক্রমশ)
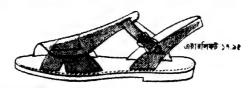
গুপ্তধনের সন্ধানে শতবর্ষ

উপকথাখ্যাত চীনা দস্যু সাম পু অস্ট্রেলিয়ার ক্ষুদ্র শহর গুলেগঙ্গোর অধিবাসীদের প্রায় একশ বছর ধরে তার খোঁজে নিরত রেখেছে।

সাম যে সোনা লুকিয়ে রেখেছে বলে সকলের ধারণা তার সন্ধানে এবছর ঐ শহরের সমস্ত অধিবাসীই বের হবে। এই সোনার মূল্য যে বহু লক্ষ টাকা সে বিষয়ে ওদের কারুর সন্দেহ নেই।

সাম পু তার ডাকাতি বৃত্তি আরম্ভ করে ১৮৬৫ সালে। পিটাপটে চওড়া চীনাটির বিশেষ দক্ষতা ছিল প্রচুর সোনাবহনকারী গাড়ি বেছে বের করার।

গোড়ায় সে কিছুকাল মাটি খুঁড়ে সোনা আবিষ্কারে মেতে ছিল এবং সম্ভাব্য সোনার খনির ধারে তাঁবুতে বাস করতো। পরে, প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, সাম পু সোনার খনির সংবাদও পেয়েছিল।

খোঁড়ার কাজে সাম পু কারুর সাহায্য নিতে চায়নি এবং ওর চীনা প্রতিবেশীরা ওকে উন্মাদ বলে ধরে নেয়।

ওয়ার্ড নামক এক পুলিস একে ধরবার জন্য পিছু নেওয়ার আগে পর্যন্ত ডাকাতিতে সাম পু বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে থাকে। সাম পু পিছনে পুলিস আসছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই গুলী চালিয়ে ঝোপের আড়ালে সরে পড়ে। ওয়ার্ড পরাজিত মারা যায়।

সারা অস্ট্রেলিয়া ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং দলে দলে লোক ওকে ধরবার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোন একজন অপরাধীর খোঁজে এমন বিপুল উদ্যোগ অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে আর ঘটেনি।

কিন্তু সেই ধূর্ত চীনা সর্বদাই তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকে এবং ওরা দেখতে পেতো শুধু ওর আগুন পোয়াবার চিহ্নগুলি।

শেষে এক আদিবাসীকে সাহায্যের জন্য নিয়োগ করা হয়। সে লোকটি সাম পুর সন্ধান পায় বারনীজ রীফ পর্বতের ঘন ঝোপের মধ্যে।

সাম নিশ্চয়ই তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল কারণ ওরা দৃষ্টিপথে আসা মাত্রই সাম পু গাছের আড়াল থেকে গুলী ছোড়ে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ও ফাঁদে পড়ে এবং পালাবার কোন উপায় নেই দেখে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে অবিশ্রান্ত গুলী বর্ষণ করতে থাকে।

সাম পুর প্রাণটা সম্ভবত মন্ত্রপূত ছিল কারণ ওর আক্রমণকারীরা অজস্র ধারায় গুলী বর্ষণ করলেও একটিও ওর দেহ বিদ্ধ করতে পারেনি।

কিন্তু শেষবারের মতো বন্দুক নামিয়ে গুলী ভরতে উদ্যত হতেই এক ব্যক্তি গাছের আড়াল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গুঁড়ি মেরে পাহাড়ের একটা ধাপে উঠে পিছন থেকে সজোরে মাথায় আঘাত করে ওকে ধরাশায়ী করে দেয়।

সাম পুর অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু দীর্ঘ ন'মাস ধরে ধৈর্যসহকারে সেবা করে ওকে সুস্থ করে তোলা হয়। পরে ওয়ার্ডকে খুন করার অপরাধে বিচারে ওর ফাঁসি হয়ে যায়।

ডাকাতি করে যে প্রচুর সোনা ও নিয়েছে সেগুলি দিয়ে কি করেছে কেউ বলতে পারে না। সম্ভবত ওকে ধরবার জন্য লোকে তাড়া করাতে পালাবার পথে কোথাও সে লুকিয়ে রেখে থাকবে।

এবছর দু'হাজার লোকের এক জনতা সেই সোনার সন্ধানে বের হবে।

পেরেক, স্ক্রু বা জোড় লাগাবার অন্য কোন যান্ত্রিক উপায় অবলম্বন ছাড়াই, সম্পূর্ণ কাগজের তৈরি বাড়ি

নিউ ইয়র্কের লঙ আইল্যান্ডে তৈরি এই বাড়িটির নির্মাতা হচ্ছে প্যারামেট্রিকস রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। বাড়িটি ওয়াটার প্রুফ এবং ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগের ঝড় সহ্য করতে পারে। দুটি শয়নঘরবিশিষ্ট বাড়িটি তৈরি করতে খরচ মাত্র পৌনে পাঁচ হাজার টাকা। বাড়িটি তৈরিতে ব্যবহৃত দুই ইঞ্চি পুরু স্তরান্বিত কাগজ পরীক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে ওপরের ছবিতে

ডাকপিয়নদের বিপদ

ডাকপিয়নরা যখন সরকারি পোশাক পরতো সে আমলে ওদের অনেককে পাড়ায় কুকুরের তাড়া খেতে হতো।

কোন কোন দেশের গ্রামাঞ্চলে পেচক ডাকপিয়নদের কাছে একটা উৎপাত হয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চা জন্ম দেবার সময় ডাক বিলি ব্যাহত করার কেমন যেন একটা প্রবণতা ওদের মধ্যে দেখা দেয়।

ডাকপিয়নদের সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়ে নাকাল হতে হয় আমেরিকায়। সম্প্রতি আইডাহো রাজ্যের বুহ্‌ল নামক এক স্থানের এক ডাকপিয়ন দেখে তার নির্ধারিত এলাকায় একটি বাড়ির সদরের সামনে কুকুরের এক আস্তানা তৈরি হচ্ছে। তৈরি শেষ হবার পর একদিন ডাকবিলিতে বেরিয়ে সেই বাড়িটির সামনে যেতেই তার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। কারণ যেটাকে সে কুকুরের জন্য বাড়ি বলে মনে করেছিল তাতে রয়েছে একটা পরিণত মাপের পার্বত্য সিংহ।

ডাকপিয়নটির ভাগ্য ভাল যে সিংহটি খুবই নম্র প্রকৃতির এবং বাড়ির কর্তার পোষা। ডাকপিয়ন প্রথম প্রথম চার পাঁচ দিন ওর পাশ ঘেঁষে যেতে একটু ইতস্তত করলেও এখন ওদের মধ্যে যাকে বলে 'অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ' সম্পর্ক।

আমেরিকার আর এক ডাকপিয়নের ভাগ্য কিন্তু অতোটা সুপ্রসন্ন ছিল না। সে লোকটি ডাক বিলি করে দক্ষিণ ক্যারোলিনায়। একদিন একটি বাড়ির সামনে উপস্থিত হতেই এক ক্রুদ্ধ লড়াইয়ে মোরগের সামনে পড়ে। ডাকপিয়নটি ভাবলে, একটি পাখিকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া এমনকি আর ব্যাপার!

কিন্তু মোরগটি, সম্ভবত শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ায়, তার কর্তৃত্বকে অবমাননা করা হয়েছে ধরে নেয়। ক্ষিপ্ত হয়ে বিকট রব তুলে সে নির্মমভাবে ডাকপিয়নটিকে আক্রমণ করে।

বেচারা ডাকপিয়ন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলে না। অতি নৃশংস ঠোকর খাওয়া অবস্থায় এম্বুলেন্সে করে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়।

কিন্তু সে ব্যক্তির কপাল, রাগে গরগর এক ব্লাডহাউন্ডকে দেখে একটা লাঠি কুড়তে যেরকম বিপদে পড়েছিল একজন ডাকপিয়ন, তার চেয়ে ভাল।

আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে সে দেখে "লাঠি" বলে যা সে তুলে নিয়েছে সেটা জীবন্ত হয়ে পাক খেয়ে ওর বাহুতে ছোবল বসিয়ে দিলে। পিয়নটি একটা সাপ আঁকড়ে ধরেছিল।

সাপটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে লাথি মেরে মেরে তার মাথাটাকে সে থেঁতলে দেয়, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেও অচৈতন্য হয়ে যায়।

সৌভাগ্যবশত পিয়নটি চিঠি দিতে এসেছিল এক ডাক্তারকে এবং তৎক্ষণাৎ সাপের বিষক্রিয়া নিরোধক ইঞ্জেকসন এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রবাহের ব্যবস্থা হওয়ায় লোকটি প্রাণে বেঁচে যায়।

ঘাস—উপাদেয় একটি খাদ্য

ইওরোপের কয়েকটি দেশে অল্পকালের মধ্যেই ঘাস ও গাছের পাতা থেকে প্রস্তুত খাদ্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাভুক্ত হবে বলে অনেকের ধারণা। বিজ্ঞানের উন্নয়নে নিয়োজিত বৃটিশ সংস্থার রথামস্টেডস্থ বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে, যার সাহায্যে গাছের পাতা থেকে প্রোটিন তৈরি সম্ভব এবং অনতিকাল মধ্যে এই যন্ত্রটি বাজারচালু হবার মতো সংখ্যায় নির্মিত হয়ে যাবে।

বৃটেনের সরকারী বিজ্ঞান গবেষকরা বহু বছর ধরেই ঘাসকে উপাদেয় খাদ্যে পরিণত করা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছেন। বৈজ্ঞানিকরা বিভ্রান্তও হয়েছেন, কিন্তু এখন তারা উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন।

ঘাসে অতিপ্রয়োজনীয় অনেকগুলি ভিটামিন, প্রোটিন এবং খনিজ লবণ আছে যা যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নিষ্কাষণ করা সম্ভব।

গত মহাযুদ্ধের সময় জাপানী বন্দী-শিবিরে আটক থাকাকালে বৃটিশ চিকিৎসকরা ভিটামিন-বি অভাবগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ঘাস থেকে নিষ্কাশিত একটা ওষুধ ব্যবহার করতেন। এই দৃষ্টান্ত থেকেই বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে বৃটেনে প্রোটিনের অভাব ঘাসের দ্বারা মেটানো যেতে পারবে। আর তারপর থেকেই পরীক্ষা শুরু হয়।

সমস্যা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে কিভাবে আকর্ষণীয় রূপ দিয়ে উপস্থিত করা যায়। কতক স্বেচ্ছাব্রতী ঘাসের কেক রুটি ও মার্গারিন সহযোগে খেয়েছেন।

অবিরাম পায়ে হাঁটার কৃতিত্বের অধিকারিণী ডঃ বারবারা মুর বহু বৎসর ধরে ঘাস খেয়েছেন—যাকে বলে কাঁচা ঘাস। লণ্ডনে যখন থাকতেন সে সময়ে তিনি প্রতিদিন সকালে কেনসিংটন উদ্যান ও হাইড পার্ক থেকে তাঁর দৈনিক 'খাদ্য' আহরণ করে আনতেন। ডঃ মুর দাবি করেন যে, ঘাস খাওয়ার ফলে তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পারবেন।

কানাডার সামরিক বিভাগ সৈন্যদের জন্য ঘাসের 'বার' তৈরি করান। কিন্তু সেগুলি অত্যধিক মিষ্টি হওয়ায় জনপ্রিয়তা হারায়। তাদেরও ঘাসের বিস্বাদ চাপা দেওয়ার সমস্যায় পড়তে হয়।

নাৎসী গবর্নমেণ্ট ১৯৪৫ সালের মধ্যে ঘাসকে সব্জীরূপে ব্যবহার্য করার আদেশ ঠিক করে রেখেছিল—এবং সেটা অর্থনীতিক কারণে নয়। তখনকার জর্মান গবর্নমেণ্টের বিশ্বাস ছিল যে ঘাস এবং পাতা-স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

বিদুর

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ। একে একে নিবিছে দেউটি। সজনীকান্তের পরলোকগমনের মাত্র চার দিন পরে হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেই একই পথের পথিক হলেন। গত ১৬ই তারিখে (বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রের পর) যশস্বী ও প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি। অধুনাকালের পক্ষে এই পরমায়ু অবশ্য দীর্ঘ। তাঁর দীর্ঘ জীবনের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হবে, এই প্রবীণ ব্যক্তি পূর্বতন যুগ এবং এ-যুগের মধ্যে সেতুর মতন বিরাজ করছিলেন। তাঁর পরলোকগমনে সেই যোগাযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন হল।

১৮৭৬—১৯৬২

হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেই যুগের মানুষ যে-যুগ বঙ্গদেশের সবিশেষ গৌরবের যুগ। ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতন আদর্শবাদী ও কর্মবাদীরা এই যুগের নৈতিক আবহাওয়া উন্নত করে রেখেছিলেন। নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সেই গুণ হেমেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে উপ্ত হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথমভাগের বঙ্গ-প্রকৃতির এই বিশেষ গুণের জন্যই তিনি সে যুগের, এবং এ-কালের দুর্দৈবের দর্শক হিসেবে তিনি এ-কালের। বস্তুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের কাছে বিগত পুরুষদের শেষ প্রতিনিধি।

যশোহর জেলায় তাঁর জন্ম (১৮৭৬), স্বগ্রামে, কৃষ্ণনগরে ও পরে হেয়ার স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষা লাভ; কলকাতার কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে রাজনীতি সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ। 'আর্যাবর্ত' নামে তিনি একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটলে অন্যান্য তদকালীন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন—এর মধ্যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' 'সন্ধ্যা' বিপ্লবী দলের পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজনীতিক লেখাগুলি খুবেই সমাদৃত হত।

'বন্দে মাতরম' ও 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদানের পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে বরাবরের মতই যেন জড়িয়ে পড়েন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে দৈনিক বসুমতীর প্রকাশ হয়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন তার নেপথ্য সম্পাদক। দীর্ঘকাল তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন ইংরেজী ও বাঙলা সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

সাংবাদিক হিসাবে হেমেন্দ্রপ্রসাদকে বলা হত 'লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া'। প্রকৃতপক্ষেই তাই। তাঁর মতন তথ্যের ও তত্ত্বের ভাণ্ডারী অন্য কেউ ছিলেন না।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিকরূপে অগ্রগণ্য হলেও সাহিত্যের অনুগত সেবক ছিলেন। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন, একদা সেগুলি পাঠককে তৃপ্ত করেছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের পরলোকগমনে আমরা বিয়োগ বেদনা অনুভব করি।

অগ্র-পশ্চাৎ বলে একটা কথা আছে। বাঙালীদের বড় দুর্নাম তার বিবেচনা বোধ নেই, অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখে না। একদা আমাদের প্রকাশকরাও জাতীয় চরিত্রে নিষ্ঠা রেখেছিলেন, বই কাটত লেখকের লেখার গুণে। এখন দিনকাল বদলেছে; প্রকাশক লেখার গুণের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে ভয় পান, তাঁদের 'অগ্র' বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ প্রচ্ছদ বিষয়ে। প্রচ্ছদ থাকে সামনে তাই অগ্র। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে যেমন করে কন্যা নির্বাচনের আসরে বসানো হয়, এবং উদ্বিগ্ন পিতার নাভিশ্বাস ওঠে কি হয় কি হয় করে, তেমনি প্রকাশক পিতা কন্যা-সজ্জার মতন পুস্তকের অঙ্গসজ্জা করে নির্বাচন আসরে পৌঁছে দেন, ভয়ঙ্কর উদ্বেগ, প্রচ্ছদটা লোকে নিল কি নিল না। নিলে, মানে পছন্দ হয়ে গেলে বাজি মাৎ, না নিলে অপরিসীম মনোবেদনা।

বাঙালী প্রকাশকরা যে ইদানীং, 'অগ্র' বিষয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা কেন যে 'পশ্চাৎ'-এর প্রতি বিমুখ বোঝা মুশকিল।

বিদেশে এখন এই 'ব্যাক্-কভার' নিয়ে বহু গবেষণা এবং পরীক্ষা চলছে। বড় বড় প্রকাশকরা ঠেকে শিখেছেন, এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার দিনে পিঠ না সামলাতে পারলে ভরা ডুবি।

সামান্য বিশদ করে বলিঃ আজকের দিনে সাধারণ পাঠক চপলমতি। সাহিত্য-পাঠক আর সাধারণ পাঠক এক জিনিস নয়। প্রথম জনের কাছে সাহিত্য অনুরাগের বিষয়, দ্বিতীয় জনের কাছে সময় কাটানোর খেলা। সাধারণ পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এদের মনের কথা বোঝা ভার, রুচি বিচার বোধ বিবিধ প্রকার, একজন যদি

Francis Pollini was born in 1930 in a small coal-mining town in north eastern Pennsylvania. He studied at Pennsylvania State University from which he was graduated in 1951. He was in the United States Airforce from 1953-1957. At the present time he is living in England with his English wife. Night, his first novel, was rejected by many American publishers to whom it was offered because of the realism of its language and because the setting was not very comforting for American readers. Subsequently it was accepted for publication in English by Olympia Press of Paris, who had previously published Samuel Beckett, Lawrence Durrell and Vladimir Nabokov's *Lolita*. It was reviewed by many English papers on French publication as a masterpiece and this, the first English edition, is published simultaneously with the first American edition [illegible]

একটি বিদেশী গ্রন্থের পৃষ্ঠপট

ঐতিহাসিক রোমান্স চায়, অন্য জন চাইবে মেরু অভিযান।

প্রকাশক ব্যবসা করতে বসেছে। ক্রেতার মন না বুঝলে তার চলে কি করে। অনেক গবেষণা করে দেখা গেল, এ-যুগের মানুষ লেখার চেয়ে প্রথমত লেখকের সম্পর্কে জানতে পছন্দ করে, তারপর জানতে চায় কি লিখেছে বইয়ে—কেমন ধরনের কাহিনী। তারপর শুনতে চায় লোকে কি বলছে বইটা সম্পর্কে।

ওরা বলে, 'পটেড বায়োগ্রাফি', চলতি বাংলায় আমরা বলব 'জীবনী চুম্বক'। এই জীবনী চুম্বকই এখন শতকরা পঞ্চাশজন পাঠককে প্রথমে লেখকের প্রতি আকর্ষণ করে; শতকরা ষাটজন জানতে চায় বইয়ের মধ্যে কোন ধরনের কাহিনী আছে; একটু খুঁতখুঁতেরা পরে হয়ত এ-কথাও জানতে চাইবে, অন্যে কি বলছে বইটা সম্পর্কে।

পৃষ্ঠপটের প্রয়োজন 'জীবনী চুম্বকের' না, যার চুম্বকে যত জোর তার কপালে : পাঠক।

পাঠকের সঙ্গে লেখকের এই ব্যক্তিগত রচয় (পৃষ্ঠপটের মাধ্যমে) যে খুবই র্যকরী তার প্রমাণ যে কোনো বিদেশী য। এতে নিছক কৌতূহল মেটে না, টখাটো বিষয়ও জানা হয়ে যায়।

একটি ছোট ছবি, তাতেই যেন মনে হয় খককে দেখলাম; ছ সাত লাইনের জীবনী, ন হবে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল; ইয়ের উপজীব্য বিষয় নিয়ে কয়েক ছত্র খা, পড়ার পরই পাঠক আকর্ষণ বোধ রবেন।

পৃষ্ঠপটের ছবি কি জীবনীচুম্বক যে ঠকের আকর্ষণ বিকর্ষণ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত রতে পারে তার একটি দুটি উদাহরণ ওয়া যেতে পারে। ...এক লেখক সম্পর্কে লখা হল : "ইনি ছিলেন নাৎসী সৈনিক। আফ্রিকায় লড়েছেন। যুদ্ধে তাঁর একটি পা গেছে। এখন নিজের গ্রামে শিক্ষকতা রেন।"

আর এক লেখকের বইয়ে লেখা হল: দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে ইনি ছিলেন সঙ্গীতের ছাত্র; যুদ্ধ বাধলে সৈন্যদলে যোগ দেন; পরে এঁকে গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়, জার্মানীর ফুয়েরারকে সামনাসামনি দেখবার সৌভাগ্য এঁর হয়েছে। একবার ফরাসী সৈন্যদের হাত এড়িয়ে পালাবার সময় এঁর চোখে আঘাত লাগে। এখন ইনি অন্ধ। স্ত্রীকে সামনে বসিয়ে উনি ধীরে ধীরে বলেন, স্ত্রী লেখেন।"

এই দুটি উদাহরণ সামনে রেখে যদি পাঠককে বলা হয়, কোনটি বেছে নেবেন, বেশীর ভাগ লোক শেষেরটি পছন্দ করবে। কারণ 'সঙ্গীতের ছাত্র' 'গুপ্তচরবৃত্তি' 'ফুয়েরারকে দেখার সৌভাগ্য' 'অন্ধ'—এইসব বিশেষণ বা অলঙ্কার 'সৈনিক' 'খোঁড়া' 'শিক্ষকতা'র চেয়ে অনেক আকর্ষণীয়।

বিদেশে এই জীবনী চুম্বকের বাড়াবাড়ি অনেক সময় নিছক প্রচারকর্মের কেরামতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম্য মদের দোকানে চেয়ার ছুঁড়ে উগ্র কবি কাচের শার্সি ভাঙছে, মুখে কপালে অগোছালো চুল পড়েছে—এমন ছবি দিয়ে প্রকাশকরা লিখে থাকেন : ক্ষুব্ধ অসুখী অতৃপ্ত তরুণ কবি। অবশ্য এ-প্রচার সর্বক্ষেত্রে হয় না। বাঙালী প্রকাশকরা প্রচার এবং প্রয়োজন এই দুইয়ের সামঞ্জস্য রেখে 'পৃষ্ঠপটে'র ব্যাপারে কিঞ্চিৎ নজর দিতে পারেন। মনে হয় না, পৃষ্ঠপট বিফলে যাবে। অবশ্য, এ-সবই অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত লেখকদের জন্যে, অন্তত তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। প্রখ্যাতদের বই নিয়ে ত দুশ্চিন্তা নেই, দপ্তরিখানা থেকে আসতে না আসতে ফুরোয়।

পুশকিন

দশই ফেব্রুয়ারী আলেকজাণ্ডার পুশকিনের ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। রুশ

১৭৯৯—১৮৩৭

কাব্যসাহিত্যের 'স্বর্ণযুগে'র প্রভাময় প্রথম পুরুষ হিসেবে তিনি স্বদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাহিত্যের পথিকৃত হিসেবে কবি পুশকিনের যে সম্মান ও শ্রদ্ধা তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু সর্বদেশেই তাঁর সাহিত্যের সমাদর থেকে প্রমাণিত হয়, পুশকিনের সাহিত্য দেশ অথবা কালের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল না। মূলত কবি হলেও পুশকিন কাব্যনাট্য, উপন্যাস, কাহিনী—সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। পুশকিন-বিশেষজ্ঞরা বলেন, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রায় সমস্ত রকম অঙ্গ ও ধারা তাঁর জানা ছিল। তিনি সেক্সপীয়ার, বায়রন ও স্কটের বিশেষ অনুরাগীই ছিলেন না, বিদেশের সাহিত্যকে রুশ দেশের মাটিতে রুশ ভাষা ও রুশীয় সৃষ্টি প্রতিভার দ্বারা আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। পুরোপুরি য়ুরোপীয় হয়েও তিনি এ-দিক থেকে সম্পূর্ণ রুশ ছিলেন। পুশকিনের এই বিশ্বমানসিকতা পরবর্তী প্রত্যেকটি মহৎ রুশ সাহিত্যিকের আত্মিক সম্পদ হয়েছে।

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনা—শংকু মহারাজ। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছ' টাকা।

সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালই নতুন লেখকদের মধ্যে মুষ্টিমেয় শক্তিশালী স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটে যাঁরা প্রথম পদক্ষেপেই তাঁদের কুশলী হাতের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন। কিন্তু সেদিক থেকে প্রথম সূচনায় শংকু মহারাজ বাংলা সাহিত্য পাঠকের, বিশেষ করে ভ্রমণ-সাহিত্যে উৎসাহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবেন।

'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' ভারতের অন্যতম সুবিখ্যাত তীর্থকেন্দ্র যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী ও গোমুখীর বিস্তৃত ভ্রমণ কাহিনী। হিমালয়ের সুবিখ্যাত উক্ত তীর্থপথ ভারতের দীর্ঘতম এবং বলা বাহুল্য, দুর্গমতম তীর্থপথ। হিমালয়ের এই দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা অত্যন্ত শ্রম-সাপেক্ষ—সেই অনন্য কারণে বহু পর্যটক বা তীর্থকামীদের নিকট এখানকার রহস্যময় সৌন্দর্য-উৎস অপ্রকাশিত। বর্তমান গ্রন্থের লেখক শংকু মহারাজ সামান্য কয়েক বছর পূর্বে আশ্চর্য রূপময় এই তীর্থকেন্দ্রটি পরিক্রমা করে এসেছেন—তারই মনোরম বিবরণী 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র ছত্রে ছত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে তথাকথিত ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন নি। লেখকের চোখের আলোয় তীর্থপথ পরিক্রমায় দু' পাশের অনুপম রূপলাবণ্যের পাশাপাশি নানা-শ্রেণীর যাত্রীহৃদয়ের হাসি-কান্না, দুঃখ-সুখের আলোছায়া সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। ভ্রমণ-সাহিত্যের আধারে উপন্যাসের উপকরণ সংযোজিত হওয়ায় এবং লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে প্রকৃতি ও জীবন পাশাপাশি সুপ্রকাশিত হওয়ায় পাঠক পুলকিত বোধ করবেন। লেখকের সার্থকতা এখানেই।

শংকু মহারাজের উপস্থাপনা এবং ভাষা সুন্দর। 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' নিঃসন্দেহে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। (২৬৭।৬১)

পুরাতনী

বিদেশী ভারত সাধক—সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য—৩·৫০ নয়া পয়সা।

যে সকল বিদেশী ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নতি-বিধানে তৎপর হইয়া এ-দেশের জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন তাঁহাদের বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা। উইলিয়ম জোন্স কয়েকজন প্রাচ্যবিশারদকে লইয়া রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধন করেন। চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া শকুন্তলার অনুবাদ করেন ও বাঙলা হরফের প্রবর্তন করেন এবং তাঁহারই ফলে হ্যালহেড রচিত বাঙলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে উইলকিন্স মনুর হিন্দু আইনের কিছু অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে কাজ পরে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন হেনরী টমাস কোলব্রুক। বাংলা ভাষা শিখিয়া শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সাহায্যে প্রেস খুলিয়া বাংলা গদ্যের প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন উইলিয়াম কেরী। তাহার পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হইয়া তিনি রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতদের সাহায্যে বহু বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত করেন। আলেকজাণ্ডার সোমা তিব্বতীদের মধ্যে বাস করিয়া এবং তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষার একটি ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করিয়া তিব্বতের সহিত ভারতের যোগসূত্র রচনা করেন। পরে তিনি বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এ-দেশের ঐতিহ্য বুঝিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। জেমস প্রিন্সেপ ভারতের শিলালিপিগুলি উদ্ধারের কার্যে অগ্রণী হন। ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম প্রভৃতি প্রধান ধর্মগুলির মূল কথা অনুধাবন করিয়াছিলেন মনিয়ার উইলিয়মস, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যকে যথার্থভাবে পাশ্চাত্যের নিকট উদ্ঘাটিত করা।

বিদেশী প্রাচ্যব্রতীদের একত্র সন্নিবেশের এই প্রথম প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। তবে আলোচনা সর্বক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত, আরো বিস্তারিত হইলে পুস্তকটির মূল্য বাড়িত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও এই বিদেশী ভারত সাধকদের সাধনার আন্তরিকতা ও দানের যথার্থ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। ৩২৪।৬১

চন্দ্রশেখর

সার্থক জীবনীচিত্র

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ও শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার নাম এ-দেশে প্রাতঃস্মরণীয়, বিশ্বের মহীয়সী নারীর ইতিহাসে স্বতন্ত্র-চিহ্নিত। বিশ্বমানবতার যে আদর্শ মহৎ চিন্তা ও ভাবের অংশীভূত, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তারই জীবন্ত বিগ্রহ। বিশ্বের দরবারে যেদিন ভারতের স্থান ছিল না এবং ভারতবাসী যেদিন বিদেশীর কাছে ছিল অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত—সেইদিন এই বিদুষী বিদেশিনী ভারতের এক মহাত্যাগী সন্ন্যাসীকে গুরু বলে বরণ করে নিলেন। নিজের আজন্ম সংস্কার ও বিশ্বাস, সমাজ ও পরিবেশ, এবং স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে নিবেদিতা কেমন করে মনে-প্রাণে ভারত-ললনা হয়ে উঠলেন তা বিশ্ব-ইতিহাসের এক বিস্ময়-বস্তু।

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যময় জীবনচরিত নিয়ে বহু আগেই বাংলা ছবি তৈরী হতে পারত, হওয়া উচিত ছিল। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন এই বাঞ্ছিত সংপ্রয়াসে সফল হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসবের সূচনা-লগ্নে অরোরার শ্রদ্ধার্ঘ "ভগিনী নিবেদিতা" দেশবাসী একটি পরম ঈপ্সিত উপহাররূপে গ্রহণ করবেন এবং এই ছবিটির জন্য চিত্রনির্মাতা-দের আন্তরিক সাধুবাদ জানাবেন।

"ভগিনী নিবেদিতা"-র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পূর্বাশ্রমে ভগিনী নিবেদিতার নাম ছিল মার্গারেট নোব্‌ল্‌। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পূর্বে মার্গারেটের জীবনে শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণকালের মধ্যে যে-সব উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটে তারই কয়েকটি চিত্রনাট্যে সংযোজিত।

যুক্তিবাদী মন নিয়ে সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্বকে জয় করার যে বিরামহীন আস্পৃহা মার্গারেটকে ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক-তার প্রতি অনুরক্ত করে তোলে, তাঁর জীবনে শৈশবেই তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। প্রণয়ীর মৃত্যুর পর তাঁর ঈশ্বরজিজ্ঞাসা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। মার্গারেটের অন্তর-জীবনের মহৎ দ্বন্দ্ব ও সংশয় এবং সত্যলাভের ব্যাকুলতার রূপটি তাঁর স্বদেশ ও সংসারত্যাগের পূর্বের ঘটনারাজিতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। সত্যসন্ধানীর জীবনের বাইরের ঘটনাই যে বড় নয়, বড় তার মানসিক প্রতিক্রিয়া ও জিজ্ঞাসা—এই সত্যটি চিত্রনাট্যকার নির্ভুলভাবে অনুসরণ করেছেন। তাই নিবেদিতার পূর্বাশ্রম-জীবনের অন্তর-রূপটির সঙ্গে দর্শকরা সহজেই একাত্ম হতে পারেন।

স্বদেশের পটভূমিতে মার্গারেটের জীবনের যে ঘটনাগুলি ছবিতে বিন্যস্ত তা আরও কিছুটা সংক্ষিপ্ত হতে পারতো। এবং তার পরিবর্তে ভারতে নিবেদিতার কাহিনীকে আরও বিস্তৃত করা যেত। এর ফলে দর্শকরা ছবিটির প্রতি আরও বেশী

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য "অগ্নিশিখা"-র প্রধান দুটি চরিত্রে কণিকা মজুমদার ও বসন্ত চৌধুরী

আকৃষ্ট হতে পারতেন। তা বাদে চিত্রনাট্যের এই অংশে অতি পরিচিত শিল্পীদের মার্গারেটের পিতা-মাতা ও শিক্ষয়িত্রী এবং প্রণয়ীরূপে দেখানোর ফলে পটভূমি ও পরিবেশের বাস্তবানুগত্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ভারতে নিবেদিতার আধ্যাত্মিক ও কর্মজীবনের বিন্যাসে চিত্রনাট্যকার স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ে গঠিত নিবেদিতার অসাধারণ আধ্যাত্মিক চরিত্র-রূপটির আভাস অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন চিত্রনাট্যকার। নিবেদিতার মহৎ চরিত্র বিশ্লেষণের জন্যই যেন তিনি চিত্রনাট্যে ঘটনারাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাঁর এই অনুভূতিপ্রবণ প্রয়াস অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

ভারতের সমাজ, রাজনৈতিক জীবনের সমস্যা ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবেদিতা মনে-প্রাণে যে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন সেই সত্যটি ছবির চিত্রনাট্যে উদ্ভাসিত। ভারতের নবজাগরণে নিবেদিতার দান কত গভীর তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটি ছবিতে অপরূপভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি চিত্রনাট্যকার নিবেদিতার জীবন-কাহিনী বর্ণনায় "মিস্টিসিজম্‌" অথবা আধ্যাত্মিক ভাবালুতার আশ্রয় নেন নি। যুক্তি এবং ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি একটি অসামান্য জীবন-কাহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর চিত্রনাট্যে।

স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মণ্ডলীর সান্নিধ্যে নিবেদিতার জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ছবিতে হয়ত প্রয়োজনবোধেই বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রনাট্যকার নিবেদিতার জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, তার পরিধির মধ্যে এই মহীয়সী নারীর জীবনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্থান পেতে পারত। ছবিতে নিবেদিতার সংস্পর্শে যে কৃতী পুরুষদের দেখানো হয়েছে তাঁদের মধ্যে তখনকার দিনের এমন বিশেষ কয়েকজনকে দেখা যায় নি যাঁদের জীবনে ও জীবনবিকাশে এই বিদেশিনী ভারত-কন্যার ভূমিকা ছিল অনেক ব্যাপক। ছবিতে আচার্য জগদীশ বসুকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীর জীবনে ও কর্মে নিবেদিতা যে কত বড় প্রেরণা ছিলেন ছবিতে তার আভাস নেই।

চিত্রনাট্যটিকে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সংযমের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রপটে রূপায়িত করে তোলার কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পরিচালক বিজয় বসু। আধ্যাত্মিক ভাবাতিশয্যকে পরিচালক প্রশংসনীয়ভাবে পরিহার করে চলেছেন। মার্গারেটের প্রণয় ও প্রণয়ীর মৃত্যুর পর তাঁর বিরহের ঘটনা-বিন্যাসে পরিচালক পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির বহু ঘটনা ও দৃশ্য-বিন্যাসে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নিবেদিতার দীক্ষাগ্রহণ ও দেহত্যাগের দৃশ্য দুটি। এই দুটি দৃশ্যে পরিচালক শুদ্ধাবুদ্ধি ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। বিগত-দিনের বাংলার পরিবেশ রচনায় ও ছবির বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনে পরিচালকের তথ্যনিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে ছবির প্রয়োগকর্ম মামুলি।

ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। নিবেদিতা দেহত্যাগ করেছেন সবে পঞ্চাশ বছর হল। নিবেদিতাকে দেখেছেন এমন অনেক ব্যক্তি আজ জীবিত। তাই এই যুগেরই এক অসামান্য ঈশ্বর-সাধিকা-চরিত্রের রূপসজ্জায় কোন অতিপরিচিত অভিনেত্রীকে মেনে নেওয়া দর্শকের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না। বলতে দ্বিধা নেই, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অর্থাৎ বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে ভগিনী নিবেদিতার একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সহজগ্রাহ্য চরিত্রাংকনের কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছেন। চিত্রনাট্যের নিবেদিতার অন্তরদ্বন্দ্ব, সংশয়, সত্যলাভের ব্যাকুলতা, দুঃখ-দহনে মানসিক স্থৈর্য, গুরুভক্তি, কর্মযোগে নিষ্ঠা ও ভারত-প্রেম শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যথাযথ বিধৃত।

স্বামীজীর ভূমিকায় অমরেশ দাসকে মানিয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনয়ে ফুটে ওঠেনি।

অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন, অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, রবীন মজুমদার, দিলীপ রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, কালী সরকার, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল ও ছন্দা আদিত্য।

অনিল বাগচী ছবির আবহ-সুর রচনায় রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি স্তোত্রগানের সুরারোপ সুন্দর এবং গানগুলি সুগীত।

ছবির সর্বাঙ্গীণ কলাকৌশল ও আঙ্গিকগঠনের কাজে উন্নতির অবকাশ ছিল।

নাটকীয় ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার তৃতীয় চিত্রোপহার "সূর্যস্নান" নাট্যধর্মী। অর্থাৎ ছবিতে যে কাহিনী রূপায়িত তার মুখ্য উদ্দেশ্য ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে দর্শকের মনকে নাটকের আমেজে উদ্দীপ্ত করে তোলা। চলচ্চিত্রে এই প্রয়াস নতুন নয়।

"শুভবিবাহ" ও "মানিক" ছবি দুটি দেখার পর যাঁরা এই সংস্থার তৃতীয় চলচ্চিত্র প্রয়াসটি সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন, অথবা নতুনতর ও বলিষ্ঠতর শিল্পরূপ ও আখ্যানরস আস্বাদনের জন্য যাঁরা আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা "সূর্যস্নান" দেখে কিছুটা আশাহতই হবেন। কারণ কাহিনী ও তার বিন্যাসের দিক দিয়ে বিশেষ কোন নতুনত্ব পাবেন না তাঁরা এই ছবিতে। তবে যে কাহিনী এর মধ্যে চিত্রায়িত, তার গতিপথের বাঁকে বাঁকে রয়েছে চমক, অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব। তদুপরি নাট্যসংঘাতে ছবির ঘটনারাজি আলোড়িত। তাই নাট্যরস

দে প্রোডাকসন্সের "সঞ্চারিণী"-র একটি দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার

সম্ভোগের সুখ থেকে দর্শকেরা বঞ্চিত হন না এতে। সেই দিক থেকে কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার এবং নবাগত চিত্রপরিচালক অজয়কুমারের প্রয়াস সফল।

ছবিটি দেখার পর দর্শকের মনে যখন বিচারবোধ জাগবে তখন এর অনেক ঘটনার অপরিহার্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। যেমন—নায়কের সঙ্গে বাসন্তীর বৃষ্টির দিনে দেখা হয়ে যাওয়া, বাসন্তীকে নায়কের গাড়িতে তুলে নেওয়া, গাড়ি হঠাৎ বিকল হয়ে পড়া, বেশী রাত্রিতে ফেরার অপরাধে বাসন্তীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, নায়কের সঙ্গে

বাসন্তীর এক বাড়তে রাত কাটানো এবং উভয়ের একত্রে নির্জন বাড়িতে রাত্রিযাপনের ফলে বাসন্তীর সন্তানসম্ভবা হওয়া। এই সব ঘটনা অবাস্তব নয়। কতকগুলি বাস্তব-সমর্থিত ঘটনাকে সুবিধে মত সাজিয়ে নেওয়া মাত্র। এই ধরনের ঘটনাপ্রবাহে দর্শক যে অবাস্তবতার স্পর্শ অনুভব করেন সেটা হল আসলে প্রস্তুতি-নিরপেক্ষ আকস্মিকতা। ছায়াছবিতেই বুঝি এই আকস্মিকতা সম্ভব। এই আকস্মিকতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বাসন্তীর সৎ-পিতা স্বার্থপর, লোভী, কুচক্রী, দয়া-মায়াহীন। শহরের উপকণ্ঠে নিজের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও নায়কের একটি নিজস্ব ফ্ল্যাট রয়েছে যেখানে আইনজীবী নায়ক রাত্রি-বাসও করে।

নায়ক জয়ন্ত বিবেকহীন নয়। বাসন্তীর দুর্ভোগের জন্য সে দায়ী। তাই বাসন্তীকে সে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে বিয়ে করবে বলে। এমন একটি সময়ে সে বাসন্তীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যখন তার ধারণা যে, শকুন্তলা অর্থাৎ তার প্রণয়িনী তাকে প্রবঞ্চনা করেছে।

বি এ পি প্রোডাকসন্সের মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র "কাজল"এর একটি স্ত্রীচরিত্রে কমলা মুখোপাধ্যায়

কিন্তু এই ঘটনার পরেই শকুন্তলা ফিরে আসে এবং জয়ন্ত জানতে পারে যে, তার প্রেমাস্পদা স্বৈরিণী নয়।

পরের উপাখ্যান সহজেই অনুমেয়। বিবেক ও বাসনা, কর্তব্য ও প্রণয়ের দ্বন্দ্বে নায়ক জর্জরিত। দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা তার কী-ভাবে শেষ পর্যন্ত এল এবং বাসন্তীর প্রতি তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী করে ঘটল তা নিয়েই চিত্রকাহিনীর পরিণতি। ছবির দুটি প্রণয়োপাখ্যানের একটিতে রয়েছে বাসন্তী ও নায়কের বন্ধু প্রকাশ, অপরটিতে জয়ন্ত ও শকুন্তলা। ওদের প্রণয় মিলনে সার্থক হবে—এই আভাসের মধ্যেই চিত্র-নাট্যের যবনিকা।

চিত্রপরিচালক অজয়কুমার সুষ্ঠু প্রয়োগ-ধারার ভেতর দিয়ে চিত্রকাহিনীর নাট্য-আবেদনটিকে উচ্ছল করে তোলার কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির দু-একটি দৃশ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেও পরিচালক কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যে রাত্রে নির্জন বাড়িতে বাসন্তীর সান্নিধ্যে নায়কের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, তার পরের দিন সকালে নায়কের প্রতিকৃতি মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া এবং তাতে কাদামাটির প্রলেপ লাগার ব্যঞ্জনাটি সুকল্পিত।

চিত্রনাট্যে কষ্টকল্পিত ঘটনা রয়েছে একাধিক। অনাবশ্যক ঘটনাও আছে। যেমন হোটেলে এক উন্নাসিক আধুনিকার সঙ্গে নায়কের সাক্ষাৎকার। এই ঘটনার প্রয়োজনীয়তা দুর্বোধ্য। ছবির আদালত-দৃশ্যগুলি সুবিন্যস্ত। চিত্রনাট্য স্বচ্ছন্দ-গতি।

ছবির নায়ক-চরিত্রের রূপ দিয়েছেন শম্ভু মিত্র। নায়ক-চরিত্রে তাঁকে মানায়নি। বিশেষ করে ছবিতে তাঁর অল্পবয়সীয়া প্রেমাস্পদার পাশে। শ্রীমিত্রের অভিনয়-দক্ষতা এ-ছবিতে লক্ষণীয়। তবুও তাঁর অভিনয় যদি দর্শকের মন তেমন করে নাড়া না দেয় তবে তার জন্য দায়ী অভিনেতার অস্বাভাবিক বাচনভঙ্গি।

বাসন্তীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রর অভিনয় কয়েকটি নাট্যমুহূর্তে সংবেদনশীল। আদালতের কাঠগড়ায় তাঁর নিরুচ্চার অভিব্যক্তি সুন্দর। কিন্তু তাঁর কথা বলার ভঙ্গি কৃত্রিম। অকারণে তিনি ছবিতে জড়িয়ে জড়িয়ে অস্ফুটস্বরে তাঁর সংলাপ উচ্চারণ করেছেন। প্রণয়-মুহূর্তে তাঁর অভিনয় এই কারণেই বিশেষ করে মরমী হয়ে উঠতে পারেনি। লিপস্টিকে চর্চিত তাঁর ওষ্ঠ একাধিক দৃশ্যে দৃষ্টিকটু লেগেছে। তাঁর অভিনীত চরিত্রের জন্য প্রসাধন মোটেই উপযোগী নয়।

শকুন্তলার রূপসজ্জায় লিলি চক্রবর্তীর অভিনয় সুন্দর, স্বচ্ছন্দ। বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে তিনি তাঁর আবেগমণ্ডিত অভিনয়ে দর্শকমনকে অভিভূত করেন। একজন

শক্তিশালী অভিনেতার পাশে থেকে চরিত্রটিতে তিনি যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রকাশের চরিত্রে সবিতাব্রত দত্তের অভিনয় সাবলীল ও মনোজ্ঞ। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস ও অপর্ণা দেবী। অন্যান্য চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন সীতা মুখোপাধ্যায়, আরতি মৈত্র, তুলসী চক্রবর্তী ও শিশির বটব্যাল।

সংগীত-পরিচালক ভি বালসারা ছবির বিভিন্ন নাট্যদৃশ্যের জন্য মনোরম আবহ-সুর রচনার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। একটি বিশেষ দৃশ্যে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রয়োগ পরিচালকের কল্পনাশক্তি ও রসজ্ঞানের পরিচায়ক। রিনি চৌধুরীর গাওয়া "সর্ব খর্বতারে দহে" রবীন্দ্র-সংগীতটি সুশ্রাব্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে প্রশংসা পাবেন আলোকচিত্রশিল্পী দেওজীভাই ও চিত্রসম্পাদক মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের শব্দগ্রহণ সুষ্ঠু। ছবির সর্বাঙ্গীণ আঙ্গিকগঠন পরিচ্ছন্ন।

"নানুহে মনুহে সিতারে" নামক পুতুল চিত্রের স্রষ্টা অজয় চক্রবর্তী

ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের সংগীত-পরিচালনায় ছবির আবহ-সুর রচনার কাজ শেষ হয়েছে।

জন্ম-কলঙ্কে বিড়ম্বিত এক বাঙালী যুবক ... বাইরে গিয়ে পরম ... কীভাবে উপনিবেশ ... মর্মসহচরী দয়িতা ও আত্মজাকে নিয়ে তৈরী তার সুখের সংসারে কেমন করে একদিন বেদনার কালোছায়া নেমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত কী করে প্রসন্ন প্রভাতের আলোয় আবার তা ভরে ওঠে তা নিয়েই চিত্রকাহিনীর রসকেন্দ্র-বিন্দু গড়ে উঠেছে। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তপন সিংহ।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে দুটি ছবি মুক্তিলাভ করছে। একটি বাংলা, অপরটি হিন্দী। বাংলা ছবিটির নাম "সঞ্চারিণী", হিন্দীটি হল : "সারা জাহাঁ হামারা"।

দে প্রোডাকসনস-এর **সঞ্চারিণীর** আখ্যান-ভিত্তি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মর্মস্পর্শী গল্প। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের আনন্দ-বেদনা ও আশা-নিরাশার পরিমণ্ডলে এই কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। সুশীল মজুমদার ছবিটির পরিচালক। বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রের রূপদান করেছেন। অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, লিলি চক্রবর্তী, শোভেন লাহিড়ী, বিধায়ক ভট্টাচার্য ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন কালীপদ সেন।

ইণ্ডিয়া ফিল্মস-এর **সারা জাহাঁ হামারা** ছবিটির কাহিনী প্রেম ও মানবতার আদর্শে আবেগমণ্ডিত। ছবির তিন প্রধান শিল্পী হলেন প্রেমনাথ, শ্যামা ও আজরা। প্রকাশ ছাবরা ছবির প্রযোজক-পরিচালক।

* * *

সুবোধ ঘোষের বহুপঠিত উপন্যাস "নাগলতা" অবলম্বনে তৈরী মুভী টক-এর প্রথম নিবেদন **শিউলি বাড়ি** ছবিটির মুক্তি-লগ্ন আসন্ন। এই সপ্তাহে ইণ্ডিয়া

পীযূষ বসু পরিচালিত এই ছবির মুখ্য চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, মণি শ্রীমানী, অমল চট্টোপাধ্যায়, চন্দন রায়, তরুণকুমার, নীহার ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীরা।

* * *

অসিত সেনের পরিচালনায় বাদল পিকচার্স-এর আগামী নিবেদন "আগুন"-এর চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। নারীমনের গূঢ় কামনা, তার বেদনা, বিভ্রম ও অবক্ষয় এবং পুরুষের প্রাণবৈচিত্র্য ও প্রণয়াধিকারকে ঘিরে রচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ কাহিনী "আগুন"-এর চিত্ররূপের প্রধান ক'টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, নির্মলকুমার ও পাহাড়ী সান্যাল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

* * *

নটরাজ প্রোডাকশনের প্রথম প্রয়াস নৃত্যশালা ছবিটির শুভ মুহূর্ত-অনুষ্ঠান সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। নৃত্যগীতবহুল এই ছবির পরিচালনা, সুর-রচনা ও নৃত্য-পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন গুরু হীরালাল। চিত্র-কাহিনীর রচয়িতাও তিনি। ছবির মূল চরিত্রগুলির শিল্পী হলেন পাহাড়ী সান্যাল, গণেশ হীরালাল, তন্দ্রা বর্মণ ও নৃত্যরাজ হীরালাল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ছবির গানে কণ্ঠদান করেছেন।

* * *

গত সপ্তাহে ইণ্টারন্যাশনাল মুভিজ-এর "অনামিকা" ছবিটির শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ছবিটির পরিচালক হলেন হেমেন গুপ্ত। ছবির শুভ-সূচনা অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দেন দেবকীকুমার বসু।

নাট্যাভিনয়

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা কথাকলি গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নিউ এম্পায়ারে পরশুরাম রচিত তিনটি গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করেন। গল্প তিনটি হল : "সরলাক্ষ হোম", "বটেশ্বরের অবদান" ও "রাতারাতি"। গল্প তিনটির নাট্যরূপ রচনা করেন প্রকাশ পাল।

পরশুরামের তিনটি গল্পেই ব্যঙ্গের উপকরণ আছে। কিন্তু এই উপকরণকেও ছাড়িয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ, সরল হাস্যরস। বলতে দ্বিধা নেই, কথাকলির শিল্পীরা তাঁদের প্রাণোচ্ছল অভিনয়ে এই রস আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

সাবলীল স্বচ্ছন্দ অভিনয়, সুরচিত নাট্যরূপ ও সুষ্ঠু প্রয়োগকর্ম—এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে নাটক তিনটি মরমী ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। দর্শকরাও অনাবিল আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করেন। ভিন্নধর্মী নাট্যবস্তু নিয়ে কথাকলি-গোষ্ঠীর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাধুবাদের অধিকারী।

অভিনয়ে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন প্রকাশ পাল, ভূপেন মিত্র, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব মিত্র, উমা দাশগুপ্ত, ইলা বসু ও সুনীল বসু। অন্যান্যদের মধ্যে সুঅভিনয় করেছিলেন অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুশীল দে, ভৌমিক অমিত দে, অনুপম দাশগুপ্ত, সীতেন চৌধুরী, রমেন সরকার, সুরেন চক্রবর্তী, রথীন রায়, অমিত বসু, মীনাক্ষী রায় প্রভৃতি।
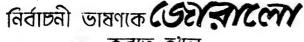
তাপস সেন ও সুরেন চক্রবর্তী যথাক্রমে আলোকসম্পাত ও আবহ-সুর রচনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন।

* * *

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বরূপায় পেটেণ্ট অফিস ক্লাবের সভ্যরা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত "ঊনপঞ্চাশ নম্বর মেস" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিশেষ চরিত্রে সু-অভিনয় করেন অজিতেশ্বর দাশগুপ্ত, সুধীর সেন, সুনীল গুপ্ত, চণ্ডী রাম ও সূর্য শেঠ। সঙ্গীত-পরিচালনায় ছিলেন নলিনীকান্ত করণ। নাটকের পর বিচিত্রানুষ্ঠানে নৃত্য ও আবৃত্তিতে যথাক্রমে অংশ গ্রহণ করেন মালঞ্চ সেন ও রণেন ঘোষাল।

* * *

সরস্বতী পূজো উপলক্ষে প্রবাসী বাঙালী সম্প্রদায় অন্যান্যবারের মত এবারেও বরোদায় স্থানীয় হোম সায়েন্স কলেজ হলে বরুণ সেনের পরিচালনায় ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের "উল্কা" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেন বরুণ সেন, দিলীপ সেনগুপ্ত, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর বসু, রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়, জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্প সরকার ও বিভা হালদার।

* * *

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর দিন সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (মধ্যপ্রদেশ) বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ স্থানীয় টাউন হলে প্রমথনাথ বিশীর "ঋণং কৃত্বা" সুখ্যাতির সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। মুখ্যচরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন সুব্রতা লাহিড়ী, ভানু ভট্টাচার্য, সরিৎ ভাদুড়ী, বকুল ভাদুড়ী, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ দত্ত, অমিতাভ সান্যাল ও সুগত লাহিড়ী। এ বাদে বিচিত্রানুষ্ঠানে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন জগদীশ শ্রীবাস্তব।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (শ্যাম পার্ক) শিল্পীমহল-এর শিল্পীরা সুষ্ঠুভাবে "যুগসূর্য" নাটকটি অভিনয় করে দর্শকদের আনন্দ দেন। গত ২৬শে জানুয়ারী শিল্পীমহল দমদম এয়ার পোর্ট ক্লাবের মঞ্চে "চিরকুমার সভা" অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন। আগামী ১০ই মার্চ এই সংস্থা বিশ্বরূপায় গিরিশ নাট্য উৎসবে কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "নটী" মঞ্চস্থ করবেন।

ভারতে লণ্ডন অর্কেস্ট্রা

আগামী সপ্তাহে লণ্ডনের সুবিখ্যাত ফিলহার্মোনিক অর্কেস্ট্রা দল ভারত সফরে আসছেন। প্রথমে বোম্বাইয়ে ও পরে দিল্লীতে কনসার্ট পরিবেশন করে এই দল

সার ম্যালকম সার্জেন্ট

কলকাতায় আসছেন ২রা মার্চ।

ত্রিশ বছর পূর্বে এই অর্কেস্ট্রা তৈরী করেন স্যার টমাস বীচাম। বর্তমানে সুখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী স্যার ম্যালকম সার্জেন্ট অর্কেস্ট্রার পরিচালক। প্রথম জীবনে অর্গানবাদক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বর্গত স্যার হেনরী উড তরুণ শিল্পী ম্যালকম সার্জেন্টকে নিজের তৈরী একটি সঙ্গীত "ইমপ্রেশনস অব এ উইণ্ডি ডে" প্রোমেনেড কনসার্ট পরিচালনার সুযোগ দেন। এই সুযোগটিই ম্যালকমের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেয়। তিনি বৃটেনের "সঙ্গীতের দূত" হিসাবে জনগণের চিত্তে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৬।

অনুষ্ঠান সংবাদ

জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের (বালীগঞ্জ) প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে আগামী ২রা মার্চ সত্যজিৎ রায়ের "রবীন্দ্রনাথ", আশিস মুখোপাধ্যায়ের "মুর্শিদাবাদ" এবং "অ্যাডভেঞ্চার অব দি লিটল মুক" (জার্মানী) এবং ৩রা মার্চ আইজেনস্টিন-এর "ব্যাটলশিপ পটেমকিন" ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে। ৪ঠা মার্চ নাট্যাভিনয় পরিবেশন করবেন "সায়ম" সম্প্রদায়।

বিদ্যাসাগর বাণীপীঠে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী দরবারী সংস্থা একটি মনোজ্ঞ "শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনের" আয়োজন করেন।

• • •

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী যান্ত্রিক সংস্থা মিনার্ভায় ছোট্ট গল্প ও কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা এবং "বিসর্জন" নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে মুস্তাক আলী ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড়। ক্রিকেটের এক সুনিপুণ শিল্পী। ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডে মুস্তাক আলীর খেলা দেখে বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট লিখিয়ে নেভিল কার্ডাস বলেছিলেন—'কল্পনায় ও প্রতিভায় পূর্ণ'। শিথিল ও ললিত সৌন্দর্যে আবৃত মুস্তাকের ভিতরকার শক্তি, যেমন আরণ্য শ্বাপদের দেহের চিক্কণতা আবৃত রাখে তার অগ্নিচক্ষু ও তীক্ষ্ন দন্তের ভয়াবহতাকে'।

সেই মুস্তাক ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বর্তমান অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল সম্বন্ধে দিল্লি থেকে সদ্য প্রকাশিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' ইংরেজী সাপ্তাহিকে লিখেছেন—'ওরেল আমার প্রিয়তম খেলোয়াড়'।

ওরেল সম্বন্ধে মুস্তাকের সব বক্তব্যই এখানে তুলে দিচ্ছি।

মুস্তাক বলেছেন—"ক্রিকেট যারা খেলেছেন তারাই জানেন ক্রিকেটারদের আসল ব্যথা কোথায়। যে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের খ্যাতি তার কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে সেই জানে তার নিজের দুঃখ। কেননা তাকে শুধু তার খ্যাতি বজায় রাখলে চলে না—প্রতিটি খেলায় আগের কৃতিত্বকে ম্লান করে এগিয়ে যেতে হয় নতুন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

ফ্রাঙ্ক ওরেলকে আমি যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেইদিনই তার শারীরিক সৌন্দর্য, পুরু ওষ্ঠযুগলে আত্মনির্ভরতার ছাপ আমাকে মোহাবিষ্ট করে তুলেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বলিষ্ঠ জৈব সত্তার প্রতীক

একলব্য

এক সুন্দর পুরুষ ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে উইকেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং উইকেটের খামখেয়ালীপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে অনতিবিলম্বে সম্রাটের মত মহীয়ান হয়ে উঠে নিজের কিরণ বিকীরণ করতে শুরু করলেন। ওরেল অতি সহজে যে কোন দুরূহ মার মারতে পারতেন। জোর বলের বিরুদ্ধে তার দুর্বলতা ছিল স্পষ্ট। আবার সেই বলের মার থেকেই বেরিয়ে আসত শক্তির জ্যোতি। সবল এবং নিখুঁত সোজা ড্রাইভের সাহায্যে তিনি যখন বাউন্ডারীর সীমানায় বল পাঠাতেন তখন মনে হত একটা দগ্ধাবশিষ্ঠ ধুমকেতু প্রচন্ড গতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুন্দর, সাবলীল এবং বলিষ্ঠ ক্রিকেটের ওরেল শুধু উপাসকই নন, নিজের খেলার মধ্যে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর আক্রমণাত্মক ক্রীড়ারীতি সেই রাইট ক্রিকেটের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সার্থক অল-রাউন্ডার হিসাবে আমার তো ওরেলের চেহারাই প্রথম চোখে ভেসে ওঠে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—হাটাচলা, বল কুড়নো সব কিছু 'ক্যালিপসো' সংগীতের মত সুর ও ছন্দে বাঁধা। ওপনিং ব্যাটস-ম্যান হিসাবে বিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করতে

ফ্রাঙ্ক ওরেল

ওস্তাদ, বোলার হিসাবে বিপক্ষকে বিব্রত করতে সদাব্যগ্র, ফিল্ডসম্যান হিসাবে জুড়ি পাওয়া ভার। শিকারী বিড়াল যেমন করে ইঁদুর শিকার করে ওরেল ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে থেকে তেমন সতর্কতার সঙ্গে ফিল্ডিং করেন, বলের জলুস কমে গেলে সে বলে সাপখেলা দেখান। নিজে বড় খেলোয়াড় বলে নবাগতদের প্রতি অসীম অনুরাগ। ওরেল আমাকে তিনবার আউট করে দিয়েছেন তবু আমি তার প্রধান ভক্ত।

সাফল্যের শেষ সীমায় এসেও ওরেল তার 'টুপি' বদলান নি। অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সহজ, অসম্ভব পরিহাস প্রিয়, সবার সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করেন, হার-জিতে সমানভাবে করেন হাস্যকৌতুক।

অবশ্য রৌদ্র ঝিলমিল ক্যারিবিয়ান দীপপুঞ্জে ফ্রাঙ্কই একমাত্র জ্যোতিষ্ক নন—জর্জ হেডলী (বর্তমান নাইট উপাধিভূষিত) লিয়ারি কনস্টানটাইন, উইকস, ওয়ালকট, সোবার্স, কানহাই—সবারই কালো দেহে ক্রিকেটের উজ্জ্বল জ্যোতি। তবুও ওরেলের সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। ওরেল নিজের মহত্বে মহীয়ান। ফ্রাঙ্ক 'আমার প্রিয়তম খেলোয়াড়। ক্রিকেটের সত্যিকারের যাদুকর। যাদুকরের মতই তিনি দর্শকদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখেন। ওরেলের খেলা দেখার জন্যে

'পদ্মশ্রী' গোষ্ঠ পাল সম্বর্ধনায় ফুটবলের তিন দিকপাল—গোষ্ঠ-সামাদ-কুমার

আমি একশো মাইল পথ হাঁটতে রাজি আছি।"

ওরেল কত বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় সবাই জানেন। তাঁর খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির কথাও কারো অজানা নয়। তবু 'গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গা পুজো' করার মত মুস্তাকের মুখ থেকে ওরেল সম্বন্ধে দুই এক কথা শোনার মধ্যে আনন্দ আছে বই-কি।

* * *

ফুটবল ক্ষেত্রেও 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো'র এক নিদর্শন উপস্থিত করতে পারি এবং সেটা অতীত দিনের দিকপাল ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পালের 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভকে কেন্দ্র করে।

খেলাধুলোয় কৃতিত্বের নিদর্শন হিসাবে প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারত সরকারের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করায় এখানকার কয়েকটি ক্লাব শ্রীগোষ্ঠ পালকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে শ্রীপালকে জানিয়েছেন অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা। এর মধ্যে অনেকেই অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়।

গোষ্ঠ পালের অতীত ক্রীড়াশৈলী ও অবিকম্পিত শৌর্যের কথা উল্লেখ করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অভিনন্দন পত্রে বলা হয়েছে "তোমার অতীতের কীর্তি ভবিষ্যতকে অনুপ্রাণিত করুক—আগামী দিনের নবাগতদের মধ্যে তোমার আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠুক—আচারে, আচরণে, ভদ্রতায়, শালীনতায়, শৃঙ্খলাবোধে, ক্রীড়াচাতুর্যে বাঙলার খেলোয়াড়দের মধ্যে ফুটে উঠুক তোমার প্রতিচ্ছবি-ভারত ক্রীড়াগগনের হে চিরভাস্বর জ্যোতিষ্ক, তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ কর।"

মোহনবাগান ক্লাব তাদের অভিনন্দন পত্রে বলেছে—"হে দেশবরেণ্য ক্রীড়াবিদ, তোমার অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীর জন্য রাষ্ট্রপতি তোমাকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিদানে সম্মানিত করেছেন। সে আনন্দে আমরা আনন্দিত। সে গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত। তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন নাও।

মোহনবাগান দলের রক্ষণব্যূহে প্রধান ছিলে তুমি পর্বতের মত অটল, চীনদেশের মহাপ্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য, তোমার সম্মুখে এসে বিপক্ষের আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। বলক্ষেপণে তোমার চরণযুগল ছিল শত্রুদলনে নিষ্পেষিত শাণিত তরবারির মত, তোমার সমসাময়িক যাঁরা সেই অপূর্ব নৈপুণ্য, অপূর্ব শক্তিমত্তা দেখে ধন্য হয়েছেন তারা আজও সে কথা স্মরণ করে বারবার রোমাঞ্চিত হন।

কিন্তু তুমি তো শুধু খেলোয়াড় নও। বাংলা দেশে তুমি একটা নাম, একটা অধ্যায়। ইংরেজ শাসিত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-স্পৃহার একটা মূর্ত প্রতীক ছিল মোহনবাগান দল। খেলার মাঠে তুমি ছিলে তারই দৃপ্ত নায়ক, অগ্নের অগ্রদূত।

জব্বলপুরের জাতীয় অ্যাথলেটিকসের বালক বিভাগে তিনরকমের লাফে নতুন রেকর্ডের অধিকারী রাজস্থানের কে পি সিং লাম্বা

শ্বেতাঙ্গ সৈনিক দলের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা তখন ছিল একটা সংগ্রামের মত...সেদিনের রণভূমিতে তোমার ঐ উন্নত বীর বক্ষপঞ্জরের নীচে নায়কের দায়িত্বে যে হৃদয় সাহসে সংকল্পে নিশ্বাসের তালে তালে উঠত, নামত; সে শুধু তোমার হৃদয় নয়—সমস্ত বাঙালী জাতির হৃদয়।

শুধু কৌশল ও শক্তি নয়, খেলার মাঠে ধৈর্য, ন্যায়বোধ ও অপক্ষপাতের তুমি ছিলে এক অতি অপূর্ব নিদর্শন।..."

বলা বাহুল্য, প্রবীণ ক্রীড়াবিদদের সংঘ ভেটারেন্স ক্লাবের অভিনন্দন পত্রেও একই ধরনের প্রশস্তি করে গোষ্ঠ পাল সম্বর্ধনা করা হয়েছে। আজকের শ্রদ্ধাভাজন খেলোয়াড়রা আগামী দিনের খেলোয়াড়দের জীবনে গোষ্ঠের শিক্ষা গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

এরিয়ান ক্লাবের পরলোকগত শিক্ষাগুরু দুঃখীরাম মজুমদার বলতেন—গোষ্ঠ যখন মাঠে খেলে তখন মনে হয় মাঠের মধ্যে মস্ত সিংহ বিচরণ করছে আবার মাঠের বাইরে সে অপূর্ব শান্ত মহিমা, শ্বাশ্বত শান্তির অগ্রদূত।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে বাঙলার মহিলা রিলে টিম — প্রভা ঘোষ, তৃপ্তি মুখার্জী, মোরীন হ্যাকস ও জয়া ভট্টাচার্য

এই তো খেলোয়াড়ের জীবন। আজকের দিনে এই জীবন থেকে শিক্ষালাভেরই তো সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। দেশের চিন্তাশীল ক্রীড়াবিদদের সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই গোষ্ঠ পালের চারিত্রিক মাধুর্য সব খেলোয়াড়ের মধ্যে মূর্ত হোক।

* * *

জব্বলপুরের 'রাইট টাউনে' এবার ভারতের বিংশতি জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, ভলিবল, কাবাডি, ভারোত্তোলন, মল্লযুদ্ধ, খোকো প্রভৃতি খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের ৪ হাজারের মত পুরুষ অংশ গ্রহণ করলেও এবারকার জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে অগ্রগতির তেমন পরিচয় পাওয়া যায়নি আর পরিচালকদের ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতিও দর্শক সমর্থকদের মধ্যে এক মলিন স্মৃতির চিত্র এ'কে রেখেছে।

অন্য খেলাধুলার কথা বাদ দিচ্ছি। অ্যাথলেটিক স্পোর্টসই জাতীয় খেলাধুলার বড় আকর্ষণ। সেই অ্যাথলেটিক স্পোর্টসেও অগ্রগতির পরিচয় নেই।

এবার অ্যাথলেটিকসে নতুন রেকর্ড হয়েছে ১২টি। পুরুষ বিভাগে চারটি, বালক বিভাগে সাতটি, আর বালিকা বিভাগে একটি। মহিলাদের বিষয়ে কোন রেকর্ড হয়নি।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসের বালিকা বিভাগে একটি রেকর্ড ও পাঁচটি স্বর্ণপদকের অধিকারিণী মহারাষ্ট্রের ক্রিস্টাইন ফোরেজ

পুরুষদের মধ্যে রেকর্ড করেছেন লোহার বল ছোঁড়ায় মহারাষ্ট্রের দীনশা ইরানী (দূরত্ব ৫০ ফুট ৮ ইঞ্চি), ১৫০০ মিটার দৌড়ে সার্ভিসের মহেন্দ্র সিং (সময় ৩ মিঃ ৫১·৩ সেকেণ্ড) ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে মহারাষ্ট্র দল (সময় ৪১·৯ সেকেণ্ড) এবং ডেকাথলনে দিল্লির গুরবচন সিং (৬৭৬৭ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগের সাতটি রেকর্ডের মধ্যে রাজস্থানে দুটি ছেলেই করেছে পাঁচটি রেকর্ড। উ'চু লাফ, দীর্ঘ লাফ ও হপ স্টেপ ও জাম্পে কে পি সিং লাম্বা একারই তিনটি রেকর্ড, লোহার বল ও লোহার চাকতি ছোড়ায় রেকর্ড গুরমেদ সিং-এর। ৪×১০০ মিটার রিলে রেসের অধিকারী উত্তর প্রদেশের ছেলেরা। আর ৪০০ মিটার দৌড়ে সার্ভিস দলের সংগ্রাম সিং। তিন রকমের লাফে লাম্বার নতুন রেকর্ড নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক, তবে অগ্রগতির দিক দিয়ে গুরমেদের কৃতিত্বের গুরুত্ব বেশী। কারণ ডিসকাস ছোঁড়ায় গুরমেদ আগের রেকর্ডকে ৩০ ফুট ৫ ইঞ্চি পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে আর লোহার বল ছোঁড়ায় আগের রেকর্ডকে ম্লান করেছে ৬ ফুট ৬½ ইঞ্চিতে।

বালিকা বিভাগের একমাত্র নতুন রেকর্ডের অধিকারিণী মহারাষ্ট্রের ক্রিস্টাইন ফোরেজ। লোহার বল ছোঁড়ায় ফোরেজ আগের রেকর্ডকে ম্লান করেছে ২ ফুট ২½ ইঞ্চিতে। এ ছাড়া উ'চু লাফ বর্শা ছোঁড়া, ডিসকাস ছোঁড়া ও হার্ডল রেসে বিজয়ী হয়ে পেয়েছে পাঁচটি সোনার মেডেল।

মুকুল

ভারতী সাহা

আরতি ও ভারতী। নদীমাতৃক বাঙলা দেশের মাতৃহারা দুই সাঁতারু মেয়ে। অনেকে মনে করতেন সাঁতারের দুই জমজ মেয়ে। কিন্তু যমজ নয়। বরং 'জলজ বলা যায়। অবশ্য ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নয়—কার্যকারণে।

জলের কুলে বাস। গঙ্গার কুলে প্রথম সাঁতার শেখা। জলের বুকে কলতান তুলে দুজনের যশ ও খ্যাতি।

আর স্বভাবে? প্রায় যমজের মত। দুজনেরই নেশা খেলাধুলো। সাঁতারেই অনুরাগ বেশী। সাঁতারের সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্রতিষ্ঠিত ক্লাব হাটখোলা ব্যায়াম সমিতিতে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তরবারি খেলা, সাইকেল চালনা—সব কিছুতে পারদর্শিনী হবার চেষ্টা।

দুয়ের মধ্যে আরতি বড়, ভারতী ছোট। বয়সের ব্যবধান আড়াই বছর। উচ্চতার ব্যবধান দেড় ইঞ্চি। এখানে কিন্তু বড় ভারতী। দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। আরতির ৫ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি। আবার নামে আরতি অনেক অনেক উ'চুতে। দুরন্ত সাগর ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী এশিয়ার প্রথম মেয়ে। ভারত সরকারের কাছ থেকে সাগর জয়ের কৃতিত্বের নিদর্শনে 'পদ্মশ্রী' খেতাব প্রাপ্তা ভারতের কৃতী কন্যা।

আর ভারতী? শুধু কি দিদির গরবে গরবিনী?

না। সুযোগ ও সুবিধা পেলে ভারতীও হয়তো আরতি হতে পারত। আরতির সঙ্গে সঙ্গেই উড়ত তার পরিচয় পতাকা। কিন্তু সে সুযোগ ভারতীর জীবনে আসেনি।

সাঁতার সম্পর্কে যারা একটু ওয়াকিবহাল তাদের সবারই জানা আছে ফ্রি স্টাইলে এক সময়ে আরতির চেয়ে ভারতীর সুনাম ছিল বেশী। ১৯৫২ সালে হেলসিংকি অলিম্পিক থেকে ফিরে এসে ছোট বোন ভারতীর কাছেই আরতিকে হার স্বীকার করে ফ্রি স্টাইলের প্রতিযোগিতা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রথম বাঙালী মেয়ে হিসাবে সর্বভারতীয় সাঁতারে ভারতী রেকর্ড করেছিল ভারতে আরতির সুনাম প্রতিষ্ঠারও আগে।

বাঙলার সাঁতারে অবশ্য আরতির সুনামই ভারতীকে সাঁতার শিখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। দিদির মত বড় হব, দিদির চেয়েও এগিয়ে যাব এই সংকল্প নিয়ে ভারতীও গঙ্গার বুকে সাঁতার শিখতে আরম্ভ করে কাকা বিশ্বনাথ সাহার কাছে। পরে হাটখোলা ক্লাবে ওকে সাঁতারে সুপটু করে তোলেন দাদা যোগেন্দ্রনাথ সাহা, পরলোকগত বিজিতেন বসু ও শচীন নাগ।

ভারতী যখন শিশু পাঠশালার ক্লাস ফাইভের ছাত্রী—তখন ইন্টার স্কুল সাঁতারে ওর প্রথম যোগদান। যখন সাধক রামপ্রসাদে পড়ে—তখন স্কুলের সাঁতারে ও প্রধান। ইতিমধ্যে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বেশ কিছু হাতে এসে গেছে। ১৯৫১ সালে ওর সিনিয়র সাঁতারুর মর্যাদা এবং বিভিন্ন পুকুর ও পুলে দিদির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রায় সব বিষয়েই দিদি ফার্স্ট ও সেকেণ্ড। দুবোনের ৪ হাত ভরে পুরস্কার আহরণ। তবু ভারতীর মন ফাঁকা। দিদি যখন অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনে বাঙলার একমাত্র মেয়ে প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লি বোম্বে যায় ও

দিদিকে 'সী-অফ' করতে গিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। ওর যাবার সুযোগ হয় না।

১৯৫২ সালে মাদ্রাজের মেরিনা সুইমিং পুলে জাতীয় সাঁতার এবং তার ফলাফলের উপর হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে প্রতিনিধি নির্বাচন। এতদিন আরতি একাই গেছে জাতীয় সাঁতারে বাঙলার প্রতিনিধি হয়ে, এবার আরতি-ভারতী দু'বোন বাঙলার প্রতিনিধি। লম্বা লম্বা হাত টেনে, লম্বা পায়ে জল ঠেলে তরতর করে এগিয়ে গিয়ে ভারতী ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম হল, নামের পাশে নতুন রেকর্ডে'রও কৃতিত্ব। তবুও অলিম্পিক টীমে স্থান হল না। এবারও দিদির ডাক পড়ল অলিম্পিকে। সুতরাং আর এক দফা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভারতী। কিন্তু সংকল্প হল আরও দৃঢ়। দিদি ওর পথের কাঁটা। তাকে ওর মারতেই হবে। সত্যি মারলও। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের পর বাঙলার রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে পাল্লা বদল। একশ ও দুশো মিটার ফ্রি স্টাইলে ভারতী ফার্স্ট, আরতি সেকেন্ড। ছোট বোনের কাছে মার খেয়ে সেই যে আরতি ফ্রি স্টাইল ছেড়েছে আর কোনদিন ফ্রি স্টাইলে প্রতিযোগিতা করেনি।

১৯৫২-র পর সাঁতার ক্ষেত্রে ভারতীর প্রতিষ্ঠা বেশী। সাঁতারের বিভিন্ন আসরের তো কথাই নেই, গঙ্গার বুকে ৪ বার ৭ মাইল সাঁতারে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট। একবার বোম্বের সাঁতার সম্রাজ্ঞী ডলী নাজির এবং আরতিরও ওর কাছে পরাজয়। একবার বালি ব্রিজের স্টার্টিং পয়েন্টে নৌকোর সঙ্গে নৌকোর সংঘর্ষে ভারতীর আঙ্গুল ছেঁচে গেল। সেই জখমী আঙ্গুল নিয়ে সাঁতার কেটেও ফার্স্ট হল। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে। শ্রীরামপুরে, চাতরায় এবং এখানে ওখানে নানা সাঁতারেই ভারতী কৃতিত্ব দেখাতে লাগল। সর্ব-ভারতীয় সাঁতারেও বাঙলার পক্ষ সমর্থনের জন্য ডাক এল পরপর কয়েক বছর। বাঙলার সাঁতার গগনে সন্ধ্যা চন্দ্রের উদয় না হওয়া পর্যন্ত ভারতী সাহাই ছিল মেয়েদের সাঁতারে সবার শ্রেষ্ঠ।

১৯৫৯ সালে আরতি যখন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের জন্য লন্ডন যাবার জন্য প্রস্তুত তখন আবার ভারতীর মন নেচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেহও। কারণ যে বিমান দমদম থেকে আরতিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেই বিমানের দিকে ও দৌড়ে গিয়েছিল লন্ডন যাবে বলে। কে যেন দেহটাকে ধরে রেখেছিল, মনটা নাকি ওর দিদির সঙ্গেই চলে গিয়েছিল লন্ডনে। স্বপ্নে দেখতো ও'ও নাকি ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে।

দিদি আরতি গুপ্তার ঘরে বসেই এসব কথা হচ্ছিল ভারতীর সঙ্গে। কথা শুনে দিদি, মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন, আর

ভারতী সাহা

ঘুরে ঘুরে ভারতীর চোখ পড়ছিল দেওয়ালে টাঙ্গানো প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দিদির ছবির উপর, একবার রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামাঙ্কিত 'পদ্মশ্রী' খেতাবের সনদের উপর। কতবার কতদিন ভারতী এ ছবি দেখেছে, কিন্তু ওর এ চাউনি দেখে মনে হল এমন করে আর বুঝি দেখে নি। ওদের ১৪।৪ বলরাম মজুমদার স্ট্রীটের বাড়িতে যে শ'দুই আড়াই স্পোর্টসের প্রাইজ আর এক গাদা প্রশংসাপত্র আছে তার সবের মূল্যের চেয়ে এর একখানার মূল্য যে অনেক বেশী ভারতী হয়তো সেই কথাটাই ভাবছিল ওর কৃতিত্বের হিসাব নিকাশের ক্ষণে।

অতুলনীয় অধ্যবসায়, অদম্য উৎসাহ আর অফুরন্ত প্রাণশক্তির গুণে দিদির সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে, দিদি হয়েছে পদ্মশ্রী। এই পদ্মশ্রী দিদিকেই ভারতী একদিন পরাজিত করবে বলে সংকল্প করেছিল। ভারতীর সংকল্পও সিদ্ধ হয়েছে। তাই বাঙলার সাঁতারে আজও আরতি-ভারতী দুই যমজ নামের জয়গান।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৬শ সংখ্যা দেশ-এ 'খেলাধূলোয় মহিলা' বিভাগে জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবীর পিতার নাম ভ্রমক্রমে নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গত নৃপেন্দ্রনারায়ণের মধ্যম পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর গায়ত্রী দেবীর পিতা।

দেশী সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য সকালে হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনে বেগমপুর রেল স্টেশনে অত্যধিক ভিড়ের জন্য হাওড়াগামী একখানি লোকাল ট্রেনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় একদল বিক্ষুব্ধ যাত্রী এই গাড়িখানিকে স্টেশনে আটক করে এবং ইহার ফলে ১১ ঘণ্টারও অধিককাল ডাউন কর্ড লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

ইটিন্ডাঘাটের ইছামতী নদী হইতে তিন মাইল দূরে ভারত ইউনিয়নের গোহাড়াঙ্গা সীমান্তের ঠিক বিপরীত দিকে পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর প্রায় ৫০০ পাঠান সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—ভূমি-সংস্কার আইন অনুযায়ী যে জমি রাজ্য সরকারের, উহার অন্তর্গত খনিগুলির অধিকার করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে এক মামলা রুজু করিয়াছেন।

শিশু-সাহিত্যের কদর সব দেশেই। বাংলা দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ইদানীং এক শ্রেণীর সোভিয়েত লেখকের রচনা "শিশু-সাহিত্যে"র বাজারে খুব চলতি। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তার ভাব-ভাষা সব কিছুই অনায়াসে রুক্-সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। অনুবাদও অনেক জায়গায় দুর্বোধ্য।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—গত শুক্রবার রাত্রে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মহিলা কামরায় দুইজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত উঠিয়া তিনজন যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করে। শাহগড় ও মালা স্টেশনের মধ্যে যখন ট্রেনটি চলিতেছিল, তখন দুর্বৃত্তরা ঐ তিনজন যাত্রীর মধ্যে একজনকে কামরা হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের খনি অধিকার ক্ষমতা "চ্যালেঞ্জ" করিয়াছেন এবং যে রাজ্য সরকারের ভূমির মধ্যে খনি অবস্থিত, সেই রাজ্য সরকারই খনির উপর দাবি করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের ১৬১৪৪৬৪৫ জন ভোটদাতা আজ হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লোকসভায় ৩৬ জন এবং বিধানসভার ২৫২ জন প্রতিনিধি প্রেরণে উদ্যোগী হইয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের খাদ্যে ভেজাল-বিরোধী অভিযানে রাঘব বোয়ালরা ছাড়া পাইয়া ছোট ছোট খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতারা নাজেহাল হইতেছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতার মুদি-দোকান-গুলির ব্যবসায় অচল হইবার আশংকা দেখা দিয়াছে। জনসাধারণও ভেজাল খাদ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অদ্য রাত্রি সওয়া দুই ঘটিকায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৬ বৎসর।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য সারা ভারতে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের উদ্বোধন করিয়া পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এই দিন পশ্চিম-বঙ্গের ৪৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে পুরোপুরি এবং ঐগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ১৯টি লোকসভা কেন্দ্রে আংশিকভাবে ভোটগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য বলেন, শিবিরে বসবাস-কারী নয় এরূপ উদ্বাস্তুরা যাহাতে দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার সুযোগ পান সেজন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন এবং আশা করেন কেন্দ্রীয় সরকার ইহাতে রাজী হইবেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে তিরচৌর নিকট সিরুগানুর থানায় যাহারা হানা দিয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল-মাত্র ডাকাতি ছিল না। জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী আজ বলেন, ৬ জন মুসলমান ভারতের মুসলমানদের মুক্ত করিবার জন্য মুক্তিফৌজ গঠনের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য থানা আক্রমণ করিয়াছিল।

কলিকাতার এক বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া মন্থরগতি যান চলাচল বন্ধ করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদে শুক্রবার শহরের ঠেলাওয়ালারা সকাল ৮টা হইতে বার ঘণ্টার জন্য প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। "ঠেলা-মালিক ও মজদুর ইউনিয়ন" ঐ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারী—পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রগণ যে আন্দোলন শুরু করে তাহা ক্রমশ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং অবশেষে সৈনদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দেয়। পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর বড় একটা অংশ পাঠান সৈনদের দাপট মানিতে অস্বীকার করে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও প্রজাতন্ত্রী চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি দুইটির মধ্যে আদর্শ ও রাজ-নীতির ক্ষেত্রে শীঘ্রই একটি বোঝাপড়া হইয়া যাইতে পারে। কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী সম্পর্কে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের নিকট ইহা জানা গেল।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—শ্রীবন্দরনায়ক সিংহলের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, একজন পুলিস অফিসারের বিবৃতি লওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, সামরিক অভ্যুত্থানের একজন নেতা তাঁহাকে জানান, স্যার কোটলেওয়ালা এবং শ্রীডাডলে সেনানায়ক (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী) সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের কথা জানেন।

রুশ বিজ্ঞানীরা পক্ষাঘাতের চিকিৎসার এক অভিনব পদ্ধতি লইয়া গবেষণা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে দেহ-বিদ্যুৎ লইয়া পক্ষাঘাত রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব। এক দেহ হইতে অন্য দেহে দেহ-বিদ্যুৎ সঞ্চারের উপযোগী একটি যন্ত্রও তাঁহারা তৈয়ারী করিয়াছেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিন প্রেসিডেন্ট শ্রীকেনেডী রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেফের আঠারটি রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ-শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার আয়ুবশাহী চণ্ডনীতিতে ক্ষুব্ধ এক বিরাট জনতা লাকসাম স্টেশনের সাউথ কেবিনের নিকট চট্টগ্রাম-চাঁদপুর মেলের গতিরোধ করিয়া ইঞ্জিনটির কাঁচ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চুরমার করিয়া দেয়। ঐ ঘটনার ফলে মঙ্গলবার ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রেন-সার্ভিস বন্ধ থাকে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান নিরাপত্তা আইনে আটক ব্যক্তিদের হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনের অধিকার নাকচ করিয়া এক অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। করাচীর উর্দু দৈনিক "জং"-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিন মাসের জন্য কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র পূর্ব-পাকিস্তানের খুলনা জেলার বাগেরহাট কলেজের দরজা-জানালা ভাঙিয়া চুরমার করে, কলেজের আসবাব-পত্র তছনছ করে এবং গ্রন্থাগারের ক্ষতি করে। পুলিস ছাত্রদের উপর লাঠি চালায় এবং প্রায় ৪০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—গতকল্য পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়া জিলার আদমদীঘি থানা একদল ক্ষুব্ধ ছাত্র কর্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া যায়। প্রকাশ, ঐ সময় ছাত্র এবং পুলিসের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। ফলে একজন পুলিস সহ ২৫।৩০ জন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়।

নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ তুলসী গিরি আজ নেপাল রেডিও হইতে এক বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, "ভারতের দিক হইতে বিপদের আশংকা দূর করার জন্য" ভারত-নেপাল সীমান্ত বরাবর নেপালী সৈন্য মোতায়েন করা হইবে। নেপালের বর্তমান গণ-অভ্যুত্থানের সহিত ভারত সরকারের যোগসাজস রহিয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—স্ক্যান্ডিনেভিয়া হইতে বৃটেন পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ জুড়িয়া গতকাল ও আজ অভূতপূর্ব ঘূর্ণিবাত্যা ও প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। পশ্চিম জার্মানীর হ্যামবুর্গে ভয়াবহ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অন্তত ১৬ জনের জীবনান্ত ঘটে, হাজার হাজার লোক গৃহহারা হয়। বন্যায় বহুলোক ভাসিয়া গিয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ আদলাই স্টিভেন-সন গতকাল বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণের বিরোধী।

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি স্যার জাফরুল্লা পাকিস্তান সরকারের আহ্বানে আজ নিউইয়র্ক হইতে বিমানযোগে করাচী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এখানে আগমনের পর তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, কাশ্মীর সম্পর্কে নূতন নির্দেশ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক— ১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 3rd MARCH, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ১৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

জয়-পরাজয়

ভোটযুদ্ধের ফলাফলে বড় রকমের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। না পশ্চিমবঙ্গে, না ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে। পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচনেই জনসাধারণের রায় সর্বসাকুল্যে কংগ্রেসের পক্ষে গিয়েছে। নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি হল দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, প্রথমে রাজ্য বিধানসভায়, তার পর লোকসভায়। ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচনে যে-ভাবে ভোট নেওয়া হয় তাতে বিধানসভার আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে লোকসভায় আসন লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একসূত্রে বাঁধা। বিধানসভার পাঁচ-সাতটি আসনের নির্বাচকমণ্ডলী লোকসভার এক একটি আসনের প্রার্থীদের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন। কাজেই রাজ্য বিধানসভার আসনের জন্য যে দলের প্রার্থীরা বেশী ভোট পান সাধারণত সেই দলের প্রার্থীরাই লোকসভার আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন। এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, কখনও কখনও ঘটেও, যদি কোন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটদাতারা অনেকে বিধানসভার আসনের জন্য একদলের প্রার্থীকে, আবার লোকসভার আসনের জন্য অন্য দলের অথবা নির্দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেন। সে যাই হোক, ভোটদাতাদের পছন্দ ব্যাপারে বিধানসভা এবং লোকসভার প্রার্থী নির্বাচনে খুব বেশী বৈপরীত্য দেখা যায় না। বিধানসভার নির্বাচনে ভোট যেখানে কংগ্রেসপ্রার্থীর পক্ষে বেশী সেখানে লোকসভার কংগ্রেসপ্রার্থীর পক্ষেও প্রায় সমান পরিমাণে বেশী ভোট পড়ে। কাজেই লোকসভায় কংগ্রেসদলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ প্রত্যেকটি সাধারণ নির্বাচনেই অবধারিত; যতদিন অধিকাংশ রাজ্যের বিধানসভায় কংগ্রেসদল সবচেয়ে বেশী আসন জিতছে ততদিন লোকসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকবেই। এবারের সাধারণ নির্বাচনেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, কারণ কংগ্রেস-বিরোধী কোন দলই কোন রাজ্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় প্রচারযুদ্ধ অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে, সাধারণের মনে ভোটযুদ্ধে হার-জিত সম্পর্কে নানারকম অবাস্তব ধারণা সৃষ্টি করে। সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিম বাংলাতেই সেটা সবচেয়ে বেশী পরিমাণে অনুভূত হয়েছে। তার একটা কারণ, সারা ভারতবর্ষে এই একটিমাত্র রাজ্যেই কংগ্রেস দলকে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জোটের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও কংগ্রেস-বিরোধী দল যে নেই তা নয়। তবে অন্য কোন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বামপন্থী জোটের মত সংগঠিত কংগ্রেস-বিরোধী কোন প্রতিপক্ষ ভোটের লড়াইএ নামেনি। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে স্বতন্ত্র দল, জনসংঘ, প্রজাসমাজতন্ত্রী এবং সোস্যালিস্ট পার্টি। পাঞ্জাবের অকালী দল অথবা মাদ্রাজের দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাঘম দলের কংগ্রেস-বিরোধী ভূমিকা তুচ্ছ করবার মত নয়। কিন্তু কংগ্রেস-বিরোধী এই সব দলের একটিও আশা করেনি যে তারা ভোটযুদ্ধে জিতে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। সেরকম আয়োজন বা প্রস্তুতিও তাদের ছিল না; তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল কোন কোন রাজ্যে কতকগুলি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিকল্প সরকার গঠনের দীপ্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল কেবল পশ্চিমবঙ্গে। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও প্রভাবাধীন ষড়বাম জোট পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনের ধুয়া তুলে নির্বাচনী আসর সরগরম করেছিল। বামপন্থী জোটের নির্বাচনী প্রচার কৌশলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কিছু অংশ বিভ্রান্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবে বামপন্থী জোটের এই চ্যালেঞ্জের ফলে অন্যবারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সংগঠন যে অনেক বেশী শক্তিশালী ও কর্মকুশল হয়েছে তার প্রমাণ নির্বাচনের ফলাফল। ভোটযুদ্ধে জিতে কম্যুনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থী জোটের ক্ষমতা দখলের আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের রায় কেবল কংগ্রেসের পক্ষে যায়নি, উপরন্তু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, কম্যুনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থী জোটের বিকল্প সরকার গঠনের ফাঁদে ধরা দিতে পশ্চিমবঙ্গবাসী আদৌ রাজী নয়।

সাধারণ নির্বাচনে অন্য সব রাজ্যে কংগ্রেসের জয় সম্পর্কে কিছুমাত্র অনিশ্চয়তা ছিল না। কংগ্রেস দলের সব কটি রাজ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কাজেই অপ্রত্যাশিত নয়। ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন প্রার্থীর, যেমন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কাটজুর পরাজয় বিস্ময়কর। ডঃ কাটজু সামান্য ভোটে পরাজিত হয়েছেন তাঁর পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী একজন জনসংঘ দলীয় প্রার্থীর কাছে। মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অন্যান্য বিরোধী দলের তুলনায় জনসংঘই কংগ্রেসের প্রবলতম প্রতিপক্ষ। তবে দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনসংঘের এবার পরাজয় ঘটেছে; নির্বাচন বিশেষজ্ঞগণের অনুমান ভোটের গতি এবার দেশের সর্বত্রই কংগ্রেসের দিকে। অবশ্য পাঞ্জাবে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও মন্ত্রিমণ্ডলীর অনেকে ভোটযুদ্ধে হয় অল্পের জন্য পরাজিত হননি কিম্বা পরাজয় স্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপসিং কাইরোঁ মাত্র চৌত্রিশ ভোটে জয়ী হয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায়ের অসাধারণ সাফল্যই এবারের সাধারণ নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহানগরী কলকাতায় এবং সুদূর শালতোড়ায়, দুটি নির্বাচন কেন্দ্রেই ডঃ রায় তাঁর কম্যুনিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপুল ভোটে পরাজিত করে অভূতপূর্ব শক্তিমত্তা ও জনপ্রিয়তার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায়, জনসাধারণের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি বিস্তারে তদ্গত প্রাণ অক্লান্ত কর্মী বর্ষীয়ান এই মহাশক্তিধরকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

নির্বাচন দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হল।
ভারতের চেহারা এবারও অপরিবর্তিত।
আগামী এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে।
গোপন ব্যালটের দ্বারা কি?
আয়ুব
বিরোধীদল
মহাশূন্য আবিষ্কারে যৌথ প্রচেষ্টার জন্য ক্রুশভ কেনেডিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
'আমি তোমার যাত্রীদলের রব দিচ্ছে—'

গত বছরের এপ্রিল মাসে মানুষ—শ্রীগ্যাগারিন—প্রথম মহাশূন্য পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। "প্রদক্ষিণ করেন" বলা ঠিক হলো কিনা জানি না। প্রদক্ষিণ করার মৌলিক অর্থ—দেবমূর্তি বা পূজ্য ব্যক্তিকে ডাইনে রেখে পরিক্রমণ করা। বাংলায় অবশ্য প্রদক্ষিণ এবং পরিবেষ্টন আজকাল একই অর্থে চালু হয়ে গেছে। যাই হোক শ্রীগ্যাগারিন পৃথিবীকে ডাইনে রেখে ঘুরেছিলেন না বাঁয়ে রেখে, জানি না। হয়ত কাগজে বেরিয়েছিল, পড়েছিলাম কিন্তু মনে নেই। অথবা হয়ত মহাশূন্য পথে পৃথিবী পরিবেষ্টনের ক্ষেত্রে ডাইনে বাঁয়ের কথাটাই প্রযোজ্য নয়। হয়ত মহাশূন্যে ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক দিকটার চেয়ে তার কাব্যিক দিকটার আকর্ষণ লেখকের কাছে বেশি, সেইজন্য ঐ সব তথ্য যেগুলি খবরের কাগজের সাধারণ পাঠকের বোধগম্য সেগুলিও যেন মনের উপরে কোনো দাগ রেখে যায় না।

শ্রীগ্যাগারিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্যে যে-কথাটা মনে বসে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে অন্ধকার আকাশে গ্রহরূপে পৃথিবীকে দেখার কথাটা। পৃথিবীর বাতাবরণের বাইরে থেকে পৃথিবীকে সেইরকম করে দেখতে ইচ্ছা করে। সেই দেখা থেকে, পৃথিবীর শোভা বলতে যা বুঝায় তা পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর শোভা বলতে যা বুঝায় সেটা নিকটের জিনিস। নিকট থেকেই পৃথিবী সুন্দরী। তিন, চার, পাঁচ হাজার ফুটের বেশি উঁচু থেকে তার রূপ ক্রমশ 'রিলিফ ম্যাপের' সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠতে থাকে। চাঁদ এবং নদী, সমুদ্র, গাছপালা জীবজন্তুপূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে কত তফাত কিন্তু বেশি উঁচু থেকে পৃথিবীকে খালি চোখে দেখলে ছেলেবেলায়-পড়া বই-এ চান্দ্র দৃশ্যের ছবির কথা মনে পড়ে। কিন্তু মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখে মুগ্ধ হবার যে কথা শ্রীগ্যাগারিন বলেছিলেন সেটা পৃথিবীর 'দৃশ্য' দেখে মুগ্ধ হবার কথা নয়। আকাশে পৃথিবীকে একটি গ্রহরূপে দেখলে যে-রূপের অনুভূতি হয়—তার কথা। পৃথিবী থেকে চন্দ্র, সূর্য, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতিকে দেখলে যে-রকম অনুভূতি হয় এটা বোধ হয় তার সঙ্গে তুলনীয় যদিও এপর্যন্ত মহাশূন্যবিহারী মানুষ পৃথিবী থেকে যতদূরে গিয়েছে সেটা পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহ উপগ্রহের দূরত্বের তুলনায় কিছুই নয়।

যাই হোক মহাশূন্যে মানুষের গমনাগমনের সংবাদ পড়ে বর্তমানে লেখকের মনে 'অসাধ্য সাধন', 'মহাশূন্যে মানুষের জয়যাত্রা' ইত্যাদি বড়ো বড়ো কথা কিছুই মনে আসে নি যদিও ঘটনাটা যে খুবই চমকপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান লেখকের মনে প্রথমেই যে-কথাটা এসেছিল সেটা হল 'একবার ঐ রকম ঘুরে আসতে পারলে হোত।' অসম্ভব কল্পনা। মহাশূন্যে বিহার করতে হলে শরীরটাও যে নানা পরীক্ষায় পাশ করা একটা অত্যন্ত উঁচুদরের যন্ত্রের মতো হওয়া চাই সেটা কোথায় পাব? আধিব্যাধিপূর্ণ সাধারণ মানুষ যাত্রী হতে পারে এমন মহাশূন্যবিহারী যান কবে—কতদিনে তৈরী হবে?

বলা যায় না, যতদিন লাগবে বলে আমরা অনেকে ভাবছি ততদিন না লাগতেও পারে। আসলে বর্তমান বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক যুগে কোন ব্যাপারের উন্নতি বা অগ্রগতি কত তাড়াতাড়ি হবে সে-বিষয়ে কোনো ধারণা করাই মুশকিল। কোনো একটা দিকে কিছুটা চলার পরে গতির বেগ হঠাৎ এমন বেড়ে যেতে পারে যে তার হিসেব রাখা কঠিন হয়ে উঠে। তখন মনে হয় উন্নতির বা অগ্রগতির যেন কোনো সীমা নেই। কিন্তু সেটা হয়ত ভুল ধারণা। অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলেও কোনো একটা ক্রিয়া বা প্রসেস্ এক জায়গায় এসে থেমে যেতে পারে। তবে মহাশূন্যোবিহারী যান নির্মাণের ব্যাপারে মানুষের শক্তির যে-বিকাশ দেখা যাচ্ছে সেটা অন্তত আরো বেশ কিছুদূর না এগিয়ে নিশ্চয়ই থামবে না।

মহাশূন্যে বিচরণ করার শক্তিলাভের ব্যাপারে বৃহৎ জয় প্রথম রাশিয়ার হয়। এই কীর্তির বৈজ্ঞানিক গৌরব যাঁদের প্রাপ্য তাঁদের নাম সাধারণ লোক জানে না, তাঁদের জানানো হয় না। পৃথিবীর কাছে শ্রীগাগারিনের নামই মানুষের প্রথম মহাকাশবিহারের গৌরব বহন করবে। গত বছরের এপ্রিল মাসে শ্রীগাগারিন প্রথম মহাকাশপথে পৃথিবী পরিবেষ্টন করেন। তার চার মাস পরে শ্রীটিটভ শ্রীগাগারিনের চেয়েও অনেক বেশি সময় মহাশূন্যে বিচরণ করে আসেন। শ্রীগাগারিন পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে গেলে, তাতে বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগেছিল। শ্রীটিটভ একদিন এক রাত্রি মহাশূন্যে থেকে সতেরোবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। মহাশূন্যে মানুষ পাঠিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করানোর কীর্তি অর্জনের চেষ্টা আমেরিকায় চলছিল কিন্তু বারবার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অমুক দিন অমুক সময়ে হবে বলে ঘোষিত যাত্রা কোনো না কোনো কারণে অনুষ্ঠিত থেকে গেছে অথবা আরম্ভ করতে গিয়ে গোলমাল হয়ে গেছে। এজন্য আমেরিকানদের লজ্জা এবং ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ভয়ও কম হয় নি, কারণ এই মহাকাশ যানের সংগে রকেট-বিদ্যার এবং তার সংগে দূর পাল্লার মারণ অস্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া এই ব্যাপারে যে আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে এই আশঙ্কায় আমেরিকানরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারীর পর থেকে তারা বোধ হয় একটু স্বস্তি বোধ করছে। ঐ তারিখে আমেরিকার শ্রীগ্লেন মহাশূন্যে পথে পৃথিবী পরিবেষ্টন করেন। তিনি প্রায় পাঁচ ঘণ্টা মহাশূন্যে ছিলেন এবং তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। রাশিয়ার স্পেস্-বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রীরা এখনো নিশ্চয়ই আমেরিকানদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছেন কিন্তু আমেরিকানদের মনে এতদিন যে আতঙ্ক ছিল তার দেখা বোধ হয় এখন কিছুটা, অন্তত সাময়িকভাবে, উপশম হলো।

কারো কারো মতে এতে নাকি রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্বের আপোসচেষ্টার সুবিধা হবে। একটা থিয়োরি আছে যে, দুপক্ষেরই কর্তাদের আপোস করার আগ্রহ আছে, কিন্তু তাঁরা যতটা এগুতে চান স্বদেশের জনমত এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্য ততটা এগুতে পারেন না। এই থিয়োরি অনুসারে শ্রীক্রুশ্চেভ পশ্চিমাদের সংগে একটা মিটমাট চান, এবং সেই জন্যই নাকি রাশিয়া আবার নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করেছে। একশ মেগাটনের বোমা ফাটিয়ে রাশিয়ার অস্ত্রশক্তি সম্বন্ধে সোভিয়েট প্রজাদের আশ্বস্ত করা হল, এখন যদি কোনো কোনো ব্যাপারে পশ্চিমাদের কিছু ছেড়ে দিয়েও শ্রীক্রুশ্চভ একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন তাতে সোভিয়েট জনমত আতঙ্কিত হবে না বা শ্রীক্রুশ্চেভের নীতির যারা বিরোধী তারা সোভিয়েট জনমতকে আতঙ্কিত করার সুবিধা পাবে না। তেমনি আমেরিকায় যদি নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েও হোক অথবা মহাশূন্যে গমনাগমনের শক্তির প্রমাণ দেখিয়েই হোক মার্কিন প্রজাদের মার্কিন অস্ত্রবলের প্রাচুর্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত করা যায় তবে প্রেসিডেন্ট কেনেডি শ্রীক্রুশ্চেভের সংগে আপোসের কথা বলতে সুবিধা পাবেন—প্রেসিডেন্ট কেনেডি দুর্বলতাবশত মার্কিন-স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে মিটমাট করতে যাচ্ছেন, এরূপ যুক্তি দিয়ে শ্রীকেনেডির রাজনৈতিক বিরোধীরা মার্কিন জনমতকে আতঙ্কিত করতে পারবে না। দুই পক্ষই যে অস্ত্রশক্তির বৃদ্ধির নূতন নূতন প্রমাণ উপস্থিত করতে এতো আগ্রহশীল তার কারণ দুই পক্ষের কর্তারাই পরস্পরের মধ্যে আপোস চান—এই সান্ত্বনাদায়ক থিয়োরিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারলে আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু সকলের সেরূপ বিশ্বাস করার শক্তি নেই।

যাই হোক, নিউক্লিয়ার যুদ্ধের দ্বারা সর্বনাশই যদি মানুষের ভাগ্যে লেখা থাকে তাহলেও সেটা ঘটার আগে মহাশূন্যগামী যান নির্মাণের ব্যাপারে এমন উন্নতিও হয়ে যেতে পারে যে, আমাদের মধ্যে সাধারণ লোকেরাও একবার পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীর গ্রহরূপ দর্শন করে আসতে পারে।

* * *

আলবেনিয়া, কঙ্গো, পাকিস্তান—নানা জায়গার পরিস্থিতি উল্লেখ এবং আলোচনা-যোগ্য হয়ে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে মহাশূন্যের কথা না তুলে আজ সেইগুলোর সম্বন্ধে দু-চার কথা লেখা উচিত ছিল। তবে সুবিধার কথা এই যে, উপরোক্ত কোনো পরিস্থিতিই পালিয়ে যাবার মতো নয়, এক সপ্তাহ পরেও মন খারাপ করার মতো যথেষ্ট লেখার বিষয় থাকবে।

২৬-২-৬২

অ্যানালগ

বাতায়নিক

নাম নিয়ে সত্যি ফাঁপরে পড়েছিলাম। কি নাম দেওয়া যায় এই পাতাটার? কি নাম দিলে এ পাতার সাড়ে বত্রিশ ভাজা মেশানো ভাবনা চিন্তা জল্পনাকল্পনার কিছু হদিস মিলতে পারে। [illegible] ভেবে অনেক নামই মাথায় এসেছিল। নাম খোঁজার হাঙ্গামা যেমন, তেমনি একটা বিলাসও আছে। এক-আধটা নাম বেশ চমৎকার লেগেছে। কিছুক্ষণের জন্যে মনে ধরেছে। যেমন সমাচার সমুচ্চয়। মানে না হোক [illegible] ছিল বেশ [illegible] নামটায়। সেকেলে শব্দের একটা ধরন! সেকেলে শব্দের এই ধরন অবশ্য নানা রকমের। কখনো সে শব্দ [illegible] একটা আবেশ আনে কল্পনা ও স্মৃতির সঙ্গে মেশানো। ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় কি [illegible] [illegible]কারিকা নাম শুনলে যেমন এর শব্দগুলির অর্থ জানি বা না জানি। প্রবোধ নামের একটি বই ও [illegible] গ্রন্থ, এ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেও সে আবেশ কাটে না। বিনিশ্চয় ও কারিকা শব্দের প্রয়োগ আর আমাদের ভাষায় নেই বলেই তারা যেন মধুর এক রহস্যে মণ্ডিত হয়ে গেছে। আরেক ধরনের পুরোনো সেকেলে শব্দের অনুষঙ্গ আলাদা। তারা মনে যেন ঈষৎ কৌতুকের হাসি জাগায়। সমাচার সমুচ্চয় নাম ছেড়েছিলাম সেই রকম। সমুচ্চয় ত নেই, সমাচার শব্দেরও এক কবিতায় ছাড়া আমাদের যুগের ভাষায় [illegible] বিধি আর নেই। সমাচার কথাটা খৃষ্টান প্রচারকরাই বোধহয় প্রথম চালু করেছিলেন বাংলায়। লুক কি মথি লিখিত সুসমাচারের সাহায্য পেয়েও সে শব্দ বেশী দিন কাল-স্রোত পার হতে পারেনি। বাতিল শব্দের চোরকুঠরিতে জমা হয়ে আছে। সেই চোরকুঠরি থেকে উদ্ধার করে প্রথমটা খুশিই হয়েছিলাম। যাঁদের শোনালাম তাঁদের কেউ নাক সেঁটকালেন না, কিন্তু কেউ বললেন বড় ভারী কেউ বা বললেন বেমানান। সুতরাং নিজের মমতাটুকু বিসর্জন দিয়ে আবার চোরকুঠরিতেই ফেরত পাঠাতে হল। নাম কিন্তু একটা না দিলে ত নয়। নাম নিয়ে অত ভাবনা কিসের যাঁরা বলেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। নামে কি আসে যায়, বলে সেই বিখ্যাত কবিতার কলিটি সত্ত্বেও। আসে যায় বই কি! গোলাপ গন্ধ ঠিকই দেয় বটে, রূপ আর গন্ধের সঙ্গে মিশেই গোলাপ শব্দটা হয়ত মধুর হয়ে উঠেছে। তবু বিদঘুটে একটা নাম যদি তার

থাকত মনের সুর কেটে যেত না কি! সুন্দর জিনিসের বিদ্ঘুটে নাম হয় না যদি কেউ মনে করেন, তাহলে কানের সামনেই জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে। পৃথিবীর মধুরতম একটি বস্তুর বিদ্ঘুটে বেসুরে একটি আখ্যা,—বিদ্ঘুটে অন্তত পাত্র বিশেষে। হিন্দি ছবি এক-আধবারও যিনি দেখেছেন মহব্বৎ শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়েছে নিশ্চয়ই। মহব্বৎ মানে প্রেম জেনে প্রথমে ত প্রায় মূর্ছা যাবার জোগাড়। বিদ্ঘুটে লাগাটা হয়ত কানের অভ্যাস, কিন্তু ভাষায় কানের অভ্যাসটাই ত সব। না, নামে অনেক কিছু আসে যায়। শুধু নাম নিয়ে বাড়াবাড়িটা ভালো নয় নিশ্চয়। যেমন ছেলেমেয়ের নামকরণ নিয়ে আমরা অনেকে করে থাকি। ছটির পর সাতটি কন্যা রত্ন হলে আগে ঘেন্না পিত্তি ডেকে মনের ক্ষোভ মিটত জানি। এখন আশা করি তার প্রয়োজন হয় না। এখন কিন্তু উল্টো আতিশয্যই, যাকে বলে আদিখ্যেতা বেড়েছে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ কত হাজার কবিতা লিখেছেন ঠিক জানি না, কিন্তু নামকরণের তাগাদা তার চেয়ে বোধহয় কম পাননি। রবীন্দ্রনাথ নেই, তাঁর জায়গায় ছোট ন' কবি সাহিত্যিক যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউ বোধহয় রেহাই পান না। বাপ মার পরিচিত হলে ত আর কথাই নেই। নামের ফরমাশ রাখতে নাকালের শেষ। নাম আবার যেমন তেমন হলে চলবে না। ভীড়ে হারিয়ে যাবার মত না হয়। তার মধ্যে বিশেষের ছাপ চাই অর্থাৎ অসাধারণত্ব। বাংলা দেশের জন্মহার নিশ্চয়ই পড়তি নয়। সবাই অসাধারণ নাম দিতে চাইলে ত অভিধানেও কুল পাওয়া যায় না। আর অসাধারণ ত অনেক প্রকারের হতে পারে। প্রায় আঁতকে ওঠবার মত। এ যুগের নয় আরেক যুগের সেরকম নাম একটি অন্তত জানি। বিশ্বাস কেউ করুন বা না করুন স্বর্গত এক ভদ্রলোকের নাম ছিল নির্দুঃখীচরণ। নির্দুঃখীচরণ বেশ পরিণত বয়সে গত হয়েছেন বলে জানি। বাপমার দেওয়া নামের মধ্যে যে আশীর্বাদ প্রচ্ছন্ন ছিল, তা অন্য সব ক্ষেত্রে যতই ফলুক এই নামের ব্যাপারে তাঁকে আজীবন কাঁদিয়ে ছেড়েছে বলেই সন্দেহ হয়। নির্দুঃখীচরণ অবশ্য যাকে বলে একেবারে চরম উৎকট দৃষ্টান্ত, কিন্তু বাপমার নামকরণের সোহাগে ছেলেমেয়ের চিরবিড়ম্বিত হয়ে থাকার ব্যাপার এ যুগেও বিরল নয়। ছেলেমেয়ের নামের বেলা এস্পারওস্পার দুই এড়িয়ে মাঝারি মানানসই নাম দেওয়াই সংগত নয় কি? ছেলেমেয়ে কেউকেটা হলে নামটা যাতে সোনার কলসীতে ভাঙা সরার ঢাকনি না হয় আবার তারা সামান্য সাধারণ হলে কাকতাড়ুই-এর মাথায় জরির তাজ হয়ে না বিদ্রূপ করে। চেনবার জন্যে, চিহ্নিত করবার জন্যেই নাম, সে নাম সহজ সংক্ষিপ্ত হলে ত সব দিকেই সুবিধে। অবশ্য পুরোপুরি যান্ত্রিক সুবিধার জন্যে রক্তকরবীর রাজোর ক তিন ছ দশ নামের কথা বলছি না। নামের একটা ধ্বনিমূল্য ও মাধুর্য না থাকলে নয়। নামের অর্থ থাকাটা কিন্তু একেবারে অপরিহার্য কি? নামের অর্থ ধরে কাউকে নিশ্চয় আমরা স্মরণ করি না। অর্থ-গৌরবে দামও বাড়ে না কারুর। সুতরাং নামটা শুধু সুশ্রাব্য হলেই যথেষ্ট নয় কেন? সব দেশেরই নামের বিবর্তনের ইতিহাস নিশ্চয়ই মজার। আমাদের দেশে গত পঞ্চাশ বছরেই ত চোখের সামনে সব ধারা বদলাতে দেখছি। ক্ষেমঙ্করী, কাদম্বিনী, অঘোরময়ী কি মোক্ষদার মত নাম এখনকার মেয়েদের মধ্যে অভাবনীয়, ছেলেদের হেমেন্দ্র, রবীন্দ্র, নরেন্দ্র জাতের নাম এখনো সচল আছে, কিন্তু পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, বিহারীলাল যদুপতিরা বিলুপ্ত না হলেও এখনকার কিশোর তরুণদের মধ্যে একান্ত বিরল। ঠাকুর দেবতার নামের ভিত্তিতে কিংবা কোন একটা অর্থ মনে রেখেই নামকরণ করার রীতি চলে আসছে এতকাল। সে অর্থ যদি বাদ দেওয়া হয়, এমন কিছু লোকসান হয় বলে ত মনে হয় না। আমাদের মন যখন দেশকালের সংকীর্ণগণ্ডিতে আর বদ্ধ নয়, তখন নাম সংগ্রহের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে দিতে আপত্তি কিসের? যতই ওকালতি করি আপত্তি সহজে যাবার নয় জানি। এক সোদরপ্রতিম বন্ধুর পুত্রসন্তানের নামকরণ করে কোন এক সাহিত্যিকের বিপদের কথা জানি। আদ্যাক্ষর মিলিয়ে বৈশিষ্ট্য আর নতুনত্ব দেবার জন্যে তিনি নাকি প্রস্তাব করেছিলেন নবজাতকের সিন্ধবাদ নাম দেবার। ভেবেছিলেন আরব্য উপন্যাসের সমস্ত রহস্য রোমাঞ্চমণ্ডিত এ নাম পেয়ে বন্ধু-দম্পতির আনন্দের আর সীমা থাকবে না। শুনেছি বন্ধুজায়া সে সাহিত্যিকের মুণ্ডপাত করে তাঁর মস্তিষ্কের চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। না, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাশিয়ার বিপ্লবের যত বড় নজিরই থাক নামের রাজ্যে ছোটখাট অদলবদল হলেও যুগান্তকারী বিপ্লব সহজে হবার নয়। জগজ্জন হিতায় একটা বিপ্লবের প্রয়োজন যদিও একান্ত বলে মনে হয়। সে বিপ্লব ঠিক নামের ক্ষেত্রে নয়, পদবীর ব্যাপারে। এই পদবীরূপ লেজুড়টি দুনিয়ার অনেক অনর্থের মূল। এই পদবীর ছলে মিথ্যা জাত্যাভিমান থেকে শুরু করে আমাদের মনের অনেক সংকীর্ণ দম্ভ ও আত্মম্ভরিতাই লুকিয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত মূল্য বংশপরিচয়ের ঠেকোয় ঠেলে তোলা হয়। যে সাম্যের সমাজ আমাদের আদর্শ, পদবীর এই লেজুড়টুকু খসালে অলীক ভেদাভেদ ঘুচে সেদিকে অগ্রসর হবার রাস্তা যে সুগম হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অমুক জানা, কি অমুক চক্রবর্তী, অমুক মিত্র কি সিংহ না হয়ে আমরা যদি শুধু স্বনামের পরিচয়টুকুই বহন করি, তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ ও দুনিয়া অচল হবার কোন কারণ নেই। কোন কোন ধর্মে ও সমাজে এ রেওয়াজ আগে থাকতেই আছে। অবশ্য পদবী না থাকলেও তার জড় সেখানে একেবারে নেই এমন কথা বলতে পারব না। তবু তাও মন্দের ভালো।

ধৈর্য ধরে এতদূর পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম বলে যদি তাঁদের মনে হয় তাহলে বুঝব, শেষ পর্যন্ত এই পাতার যে শিরোনামটি পেয়েছি তা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

পদবী বিলোপ কোনদিন সত্যি সম্ভব হবে কি না জানি না, কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামি ও ব্যক্তিগত অহমিকার উস্কানি ছাড়াই একটি দল প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধতা করবেন বলে মনে হয়। তাঁরা হলেন সামাজিক নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী। মাটির তলায় যেমন লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকে এই পদবীর ভেতরেও মানবগোষ্ঠীর অনেক বিস্মৃত ইতিহাস তেমনি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের দেশের সামাজিক নৃতত্ত্বের গোড়াপত্তনই ভালো করে হয়নি বললে হয়। তাঁদের সন্ধানী গবেষণার একটা বড় সূত্র কাজের শুরুতে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনায় বৈজ্ঞানিকদের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। সেই উভয় সংকট যদি সত্যিই দেখা দেয়। কার দাবি আগে মানবার! অতীত না ভবিষ্যৎ?

শান্তিনিকেতন ঃ সাহিত্য সম্মেলন

সম্পাদক দেশ
সবিনয় নিবেদন,

গত ২০শে মাঘ ১৪ সংখ্যা 'দেশ'-এর নতুন শুরু হওয়া বিভাগ 'সাহিত্য সংবাদ' উৎসাহের সঙ্গে পড়তে গিয়ে রীতিমতো নিরাশ হলাম।

একথা ঠিক যে তিনদিনের সম্মেলনে যাঁরা নিবন্ধ পাঠ করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু অধ্যাপক নন যাঁরা তাঁদের সংখ্যাই বেশী ছিল। অনেক সাহিত্যিককেই যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তা আমরা সম্মেলনের আয়োজকের বিবৃতির দীর্ঘ তালিকা থেকেই জানতে পারি।

লেখকের যদি সম্মেলনটি ভালো না লেগে থাকে, তাহলে তিনি সঠিক সংবাদ সেটি জানিয়েই তো যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারতেন।

পরিশেষে একটুই জানাতে চাই যে, একাধিক অধ্যাপক আছেন যাঁরা সাহিত্যের প্রবেশদ্বার খুলে দিতে পারেন, ঘরে ঘরে দেখাতেও পারেন উন্মোচিত সেই সম্পদকে। আবার এমন বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকও আছেন যিনি কোনো দরজাই খুলতে পারেন না। এতেও কিছুই প্রমাণিত হয় না। সু-অধ্যাপক এবং প্রতিভাবান সাহিত্যিক একই ব্যক্তি, এমনও অনেক আছেন।

বিনীত
দীপক মজুমদার
শান্তিনিকেতন

আমাদের বক্তব্য

অধ্যাপকদের সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনও কটাক্ষ করবার অভিপ্রায় বিন্দুরের ছিল না। তবু যদি তাঁর লেখা থেকে কারও মনে হয় যে, সমগ্র অধ্যাপক সমাজই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য, তবে বিন্দুর তার জন্য দুঃখিত। আসলে 'অধ্যাপকসুলভ মনোভাব' বলে একটা কথা আছে। বিন্দুর মনে করেন যে ওই কথাটার দ্বারা এমন একটা মনোভাব আভাসিত হয়, যার মধ্যে ঔদার্য কম, [illegible] পরিধি সংকীর্ণ, এবং নিজের গণ্ডীর বাইরের ভাবনাকে যা বিচার করেও দেখতে

চান না। বন্দুরের ধারণা, শান্তিনিকেতনের সম্মেলনে আহূত অধ্যাপকরা যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কয়েকটিতে সেই গণ্ডী-বদ্ধ আত্মতুষ্ট মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছিল। বস্তুত, অধ্যাপকসমাজকে নয়, বিদুরে সেই অনুদার মনোভাবকেই নিন্দা জানাতে চান।

—সম্পাদক দেশ

[এ সম্পর্কে আর কোনও পত্র প্রকাশিত হবে না।]

চটকদার শিল্পী

সবিনয় নিবেদন,

গত ৩রা ফেব্রুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসলিল ঘোষ 'প্যারিসের চটকদার শিল্পী ক্লাইন' শীর্ষক প্রবন্ধটির এক জায়গায় লিখেছেন, "ক্লাইনের ছবি হল, নানারকমের আকৃতির চতুষ্কোণ ক্যানভাস, সম্পূর্ণ নীল রঙের মনোক্রোম। কিছু নেই তার মধ্যে। না আছে কোনো ডিজাইন, না আছে কোনো আঁকিবুঁকি। শুধু আছে ক্যানভাস ভর্তি নীল রঙ।" প্রবন্ধটি পড়ে খুব আমোদিত হলাম ও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত কিছুদিন আগেকার এক বিখ্যাত চিত্র-প্রদর্শনীর কথা—যেখানে জনৈক শিল্পী ক্যানভাসে ছবি না এঁকে শুধু ছুরির ফলা দিয়ে আঘাত হেনেছিলেন।

ক্লাইনের মতে, ক্যানভাসের নীল রঙের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখনোও তা নিজের কল্পনা অনুযায়ী লাল বা হলদে রঙে পরিণত হয়ে যায়। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে যে, ক্লাইনের মতানুসারী শিল্পীরা ক্যানভাসে কোনো রঙ না দিয়েই শূন্য ক্যানভাস ঝুলিয়ে রেখেছেন ও বলছেন যে, দর্শকের নিজের কল্পনানুযায়ী ক্যানভাস রঙীন হয়ে উঠবে। আর ক্লাইনের নীলরঙা ছবিগুলোর মতই ঐ ক্যানভাস-গুলো প্রচুর দামে বিক্রী হবে। অনেকদিন আগে একজন বিখ্যাত সমালোচকের প্রবন্ধ পড়েছিলাম। এই ধরনের তথাকথিত চটকদার লেখকদের উদ্দেশে লেখা। ঐ প্রবন্ধকার লিখেছিলেন, "তোমাদের খাতির ক্ষমতার খাতিরে। গুরুদেব অলৌকিক মহিমা যেমন শিষ্যদের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে, যাহারা ঠকে তাহারাও স্বীকার না করিয়া প্রচারে সহায়তা করে—ইহাও তাহাই। তোমরা কাপড় বোনার ভান করিয়া কৌশলে প্রচার করিয়া দিলে—সৎ সন্তান যাহারা তাহারাই কেবল তোমাদের বোনা কাপড় দেখিতে পাইবে। কেহই দেখিতেছে না, কিন্তু অসৎ হওয়ার ভয়ে সকলেই তারিফ করিতেছে চমৎকার, অপূর্ব, অসাধারণ! অসাধারণ বটে, কিন্তু অসাধারণ যে ঠকিয়া ঠকিয়া পাগল হইয়া গেল। তাই বলিতেছি —ওগো বাবুমশায়েরা, তোমাদের মধ্যে ..."

এই উক্তি ক্লাইনপন্থী শিল্পীদের প্রতিও সমান প্রযোজ্য।

প্রবন্ধ লেখক প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন যে তিনি একজন ক্লাইন ভক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়, 'দেশ' পত্রিকার অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা ফ্রান্সের অনেক সমালোচকের সঙ্গেই একমত হবেন যে, শিল্পী ক্লাইনের নিদর্শন হল 'মডার্ন' আর্টের চরম ধোঁকাবাজি।"

সুশান্ত লাহিড়ী
নয়াদিল্লি

সুনীত বলল, "যাই বলুন, জারক লেবুর চাইতে পেটের পক্ষে উপকারী আর কিছু নেই। আমি তো বেশ ভালই ফল পেয়েছি। আর ওটার আর একটা সুবিধে কি জানেন, ফল-কে ফল আবার মেডিসিন-কে মেডিসিন। যত ইচ্ছে খান, শরীরও খারাপ করবে না, ফরেন এক্সচেঞ্জেও টান পড়বে না। আপনি জারক লেবুটা একবার ট্রাই দিতে পারেন।"

"রাখুন মশাই আপনার জারক লেবু!" সুনীল খেঁকিয়ে উঠল। "দেখছেন অম্বলে মরছি আর তার উপরে আপনি আবার লেবু কচলাচ্ছেন। কন্‌সিডারেশন বলতে যদি কিছু থাকে।"

"আমি উপকার পেয়েছি কি না তাই।" সুনীত থতমত খেল।

"উপকার পেয়েছেন? কিসে শুনি?"

"কেন জারক লেবুতে। প্রথমে বড়বাজার থেকে কিনতাম। এখন ঘরেই তৈরি করছি। বাড়িতে প্রচুর লেবুগাছ লাগিয়েছি। একেবারে ফ্রেশ্ জিনিস পাচ্ছি। টাটকা লেবু, সে যে কি জিনিস, আপনারা আইডিয়া করতে পারবেন না।"

"ধুত্তোর আপনার টাটকা লেবু। বলি আপনার ব্যামোটা কি ছিল?"

"কেন," সুনীত চটপট জবাব দিল, "পেটের ট্রাবল্।"

"ও কি কোন কথা হল মশাই," সুনীল কটমট করে চাইল। "পেট বলতে অনেক কিছু বোঝায়। তার ট্রাবল্ও হরেক রকম।"

"আহা আমি যেন আর সেটা জানিনে। পেটের পলিটিক্যাল মানে হল বর্তমানে ইলেকশন, অর্থনৈতিক অর্থে বিদেশী মুদ্রার ঘাট্‌তি—"

সুনীত পাছে আরও এগিয়ে যায় তাই সুনীল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। "আর এই সব ট্রাবলের জন্যই আপনার স্পেসিফিক হচ্ছে জারক লেবু। বলুন, বলে যান।"

সুনীত ঘাবড়ে গিয়ে চুপ মেরে গেল। তারপর মিনমিন করে বললে, "যাঃ আমি কি তাই বলেছি নাকি? জারক লেবুতে আমার উপকার হয়েছে, তাই বললাম। তা বেশ তো, আপনি ডাক্তার দেখান। কোন স্পেশালিস্টকে—"

"এবং তার কথা মত ওষুধ খেয়ে ড্যাং ড্যাং করে ভবসিন্ধুপারে যান।" বলতে বলতেই ব্রজদা ধপাস করে পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মুছে সুনীতের দিকে চেয়ে বললেন, "খুব সরেশ পরামর্শ দিচ্ছিস তো কলিগকে। আত্মহত্যা করিবার জন্য প্ররোচিত করার অভিযোগে তোকে তো দায়রায় সোপর্দ করা উচিত।"

তার মানে! আপনি কি ডাক্তারীও করেছেন নাকি?

"কিন্তু আমি তো অন্যায় কথা কিছু বলিনি।" সুনীত দস্তুরমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

"তার চাইতেও মারাত্মক কাজ করেছ," ব্রজদার গর্জন শোনা গেল। "তুমি সুনীলকে ডাক্তারের খপ্পরে ফেলবার প্ররোচনা দিচ্ছিলে। ওর পিছনে লেগেছ কেন বাপু। জীবন যৌবন ওর কিছুই তো চাখা হয়নি। এখনও সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরিয়ে দিতে চাস নাকি?"

সুনীত বলতে গেল, "কিন্তু ডাক্তার—"

"দাম দিতে," ব্রজদার এক দাবড়ানিতেই সুনীত কুঁচকে গেল। "আমাকে ডাক্তার চেনাস নি। এই ব্রজরাজ কারফরমা সব ডাক্তারকে গুলে খেয়েছে, তা জানিস। এই শর্মা সবার অন্ধিসন্ধিই জানে। তোদের বিধান ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখিস। এখনও ওস্তাদ বলে মানে। আমার জন্য সার্জারিই ছেড়ে দিলে। তা জানিস্।"

সুনীতের চোখ কপালে উঠল।

"তার মানে! আপনি কি ডাক্তারিও করেছেন নাকি?"

"আপনি তো কিছুই খবর রাখেন না মশাই," সুনীল টাইপ-রাইটারের বারে টিক টিক টিক টিক করে তবলা বাজাতে বাজাতে বলল। "এত বড় সার্জেন আর জন্মেছে

নাকি? একেবারে ডবল এফ আর এস। তাই না ব্রজদা?"

"ব্রজদার তোদের মত হ্যাংলামি নেই, বুঝলি। ব্রজ বিলাতী জিনিস বহুকাল বর্জন করেছে। বলে নোবেল প্রাইজই ফিরিয়ে দিলুম, আর এ তো তুচ্ছ এক ফাঁকা ডিগ্রি! ডিগ্রির মোহে স্বদেশপ্রেম জলাঞ্জলি দেব, আমাদের কাছে এমন ভেজাল কর্ম পাবে না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ছিটেফোঁটাও গ্রহণ করি নি। হুঁ হুঁ বাবা।"

"তবে সার্জারি শিখলেন কি করে?" সুনীত প্রশ্ন করল। "মেডিকেল সায়েন্স কি পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা নয়?"

"বয়ে গেছে আমার মেডিকেল কলেজে পড়তে। ওখানে যে কি শেখানো হয়, আমার জানা আছে। সার নীলরতনের মত ডাক্তারের চোখও চড়কগাছে তুলে দিয়েছিলাম, তা জানিস।"

যদুদা এতক্ষণে বললেন, "ব্রজদা, সিগারেট?"

সিগারেট ধরিয়ে ব্রজদা জুত হয়ে বসলেন।

"তবে হিস্টিটা শোন। তখন আমাদের ন্যাশানাল মুভমেন্ট খুব জমে উঠেছে। সর্বক্ষেত্রে অসহযোগ, এই প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। দাস সাহেব একদিন ডেকে বললেন, 'ব্রজদা, এ ভারটা তোমায় নিতে হবে। অফিস কাছারি ইস্কুল কলেজ সব ছাড়াতে হবে। এত বড় কাজ করবার মত

মুহূর্তের মধ্যে ভাঙ্গা হাড়গুলো জয়েন হয়ে গেল

লোক, তুমি ছাড়া আর তো কাউকে দেখছি নে।' এই প্রসঙ্গেই সার নীলরতনের সঙ্গে আমার রীতিমত ঠোকাঠুকি বেধে গেল। তিনি বললেন, 'মেডিক্যাল কলেজ ছাড়লে দেশের সর্বনাশ হবে। ডাক্তার না তৈরী হলে দেশে চিকিৎসা করবে কে?' বললুম, দাদা, এই পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণের মোহই আমাদের খেয়েছে। মেডিকেল কলেজ হবার আগে, আমাদের দেশে লোকের কি রোগ হত না? তাদের চিকিৎসা করত কে? এই নিয়ে তুমুল গোলমাল। শেষ পর্যন্ত আমি আঁতে ঘা দিলাম। বললাম, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির চাইতে অনুন্নত এক পদ্ধতি ধরে বেঁধে চালু করা আমি দেশের সর্বনাশ বলেই মনে করি। সার নীলরতন একেবারে ফায়ার। বললেন, 'এত বড় কথা। প্রমাণ দাও।' আমি তো তাই চাইছিলুম। বললুম, বেশ। যে যে রোগীকে আপনারা আজও সারাতে পারেন নি, তাদের কাছে আমাকে নিয়ে চলুন। কলকাতায় হইহই পড়ে গেল। বুঝলি। চারদিক থেকে সব বড় বড় ডাক্তার এসে জড় হল। সাহেবসুবোও বাদ গেল না।

"তারপর নির্দিষ্ট দিনে, আটাশটা রোগীর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রত্যেককেই ডাক্তাররা জবাব দিয়েছিল। আমার এক মেডিসিনেই সব ক'টা চাঙ্গা হয়ে তক্ষুনি বাড়ি চলে গেল। অন্য লোক হলে, ওতেই কনভার্ট হয়ে যেত। কিন্তু এ বাবা সার নীলরতন, অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্তর নন। তিনি বললেন, 'মেডিসিনের সাইডটায় না হয় ভেল্কি দেখালে, বুঝলাম, এবার সার্জারিতে এসো তো, তোমার বিদ্যেটা দেখি।' বললুম, বেশ, আনুন রোগী।

"সঙ্গে সঙ্গে সতেরোটা রোগী এনে হাজির করলে। প্রত্যেকটা অ্যাকিউট কেস্। কোনটাকে রেখেছিল পেটের অপারেশনের জন্য, কোনটা বুক, কোনটা পিঠ, কোনটা হাত, কোনটা পা। ইস্তক ব্রেন অব্দি ছিল। আমি এক এক করে ধরছি, মোক্ষম দাওয়াই দিচ্ছি, আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই রোগীটা বেড্ ছেড়ে গটগট করে ট্রাম বাস ধরতে ছুটছে। একদিনেই সব বেড্ খালি। এই দেখে, সাহেব ডাক্তাররা পর্যন্ত যখন হ্যান্ডশেক করতে আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তখন সার নীলরতন বললেন, 'ওয়েল ব্রজ, তুমি জিনিয়াস, তা স্বীকার করছি। তোমার এই পদ্ধতির—'

"সার নীলরতনের কথা শেষ হতে না হতেই এমার্জেন্সি থেকে এক ডাক্তার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। 'সার, দারুণ অ্যাক্সিডেন্ট। বাসের ধাক্কায় একটা লোকের হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রাণটুকু ছাড়া আর আস্ত কিছু নেই। ডঃ রায় একবার মিঃ কারফরমাকে যেতে অনুরোধ করলেন।' সবাই মিলেই গেলাম। আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে পকেট থেকে ওষুধের শিশিটা বের করে একটি ফোঁটা নাকের ডগায় ধরলাম। শেষ নিশ্বাসটা ফেলবার আগে যেটুকু বাতাস টানতে পারল, তাতেই কম্ম ফতে। মুহূর্তের মধ্যে ভাঙ্গা হাড়গুলো খট্‌খট্ করে জয়েন হয়ে গেল। চামড়াও টান টান। ঠিক যেন একটা ছাতি কেউ মেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে, বললে বিশ্বাস করবি নে, লোকটা হাই তুলে তুড়ি মেরে কার্ভালোর সংলাপের ভাষায় বলে উঠল, 'হামি কোটায়? হামার ঘ্যাবি কই?' বুঝলাম, বাটা সায়েব।

"তারপর সব শুনে, সাহেব বললে,
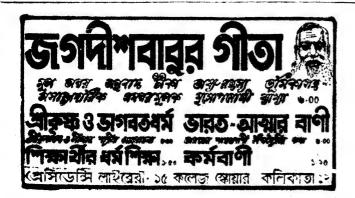
অ্যাটমিক অয়েল বা সাদা বাংলায় তেলাণু

'বাবু টুমি হামাকে কিওর করিয়েছ, টোমাকে ছাড়িব না, হামার ঘ্যাবিকেও কিওর করিটে হইবে। ঘ্যারি হামার স্ত্রীর আছে। ঘ্যারি যদি ঠিক করিয়া দিটে না পার টবে পুনরায় হামাকে মারিয়া ফেল।'

"কি করব? একে দুর্বল মানুষ, তার উপরে প্রাণভয়ে এমন কান্ড শুরু করে দিলে যে, আর স্থির থাকতে পারলুম না। দিলুম ওর গাড়িটাকেও এক ডোজ্। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। ভারতের প্রাচীন চিকিৎসার মাহাত্ম্যই এই। আমাদের যে কল্যাণের বাণী, তা সর্বজীবের জন্য। এ তোদের পাশ্চাত্ত্য মেডিসিন নয়।"

সুনীত একটা হেঁচকি তুলতেই ব্রজদা তার দিকে শান্তভাবে চেয়ে বললেন, "এক গ্লাস জল খা, নিতে। কপালের শিরা ছিঁড়ে যেতে পারে।"

সুনীল বলল, "আয়ুর্বেদ যদি এতই পাওয়ারফুল—"

"এটা আয়ুর্বেদ তোমায় কে বললে?" ব্রজদা সুনীলকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিলেন। "আয়ুর্বেদ তো সেদিনকার জিনিস। আমার পদ্ধতি সব চাইতে প্রাচীন। আয়ুর্বেদ তো হরেক রকম ওষুধ ব্যবহার করে; আমার ওষুধ অদ্বৈত। একটাই। ইতিহাস বলে, এর আবিষ্কারক ব্রহ্মা, মতান্তরে বিষ্ণু। তারপর থেকে নানা জনে নানাভাবে এটা ব্যবহার করেছে। আমি রিসার্চ করে এটাকে পারফেকশনে নিয়ে গিয়েছি। গন্ধ বর্ণ অদৃশ্য করেছি। আছে শুধু এফেক্ট। তাইতেই কার্যসিদ্ধি। এখন ঠিক মত লাগালে মরা মানুষও চেঁচিয়ে ওঠে।"

"জিনিসটা কি ব্রজদা?"

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, "পেটেন্টটার নাম রেজেস্ট্রি হচ্ছে কি না, নামটা তাই ইংরাজী রাখতে হয়েছে। কারফরমাস্ অ্যাটমিক অয়েল বা সাদা বাংলায় ব্রজদার তেলাণু (তেলের অণু-তেলাণু, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)।"

"তেল!" সুনীত একটু অবাক হল। "আমি ভাবলাম, না জানি কি। তেল দিয়ে কি মরা বাঁচে? দুর!"

"তুই তো চিরকেলে গবেট, তোর কোনও আইডিয়া নেই। সাধারণ তেলে যেখানে ইয়া ইয়া জাঁদরেল লোকই গলে জল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তেলের অ্যাটম লাগালে মরা মানুষ চাঙ্গা হয়ে উঠবে, এ আর বেশি কথা কি? আর ব্যাপারটা কি জানিস্, দিনকাল যা হয়ে উঠেছে, অর্ডিনারি তেলে আর তেমন এফেক্ট হচ্ছে না, এখন অ্যাটমিক তেলই চাই।"

টেলিফোনের চেয়ে আমার কণ্ঠ দূরে যায়। পত্রের উত্তর নন্দিনীর বকলমে দিতে পারো। রাশি করণিকের তপস্যা ভঙ্গ কোরো না। —আজ শরৎকালের রৌদ্র আগাম দাক্ষিণ্য শুরু করছে। ইতি ৬।৮।৩৮

কবি

কিশোরীর মরাফত নন্দগোপালের ঠিকানা পেতে পারবে।

---

১ শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ২ স্বর্গত পি এন রায়

তখন সবেমাত্র আমার টাইফয়েডের জ্বর থেমেছে। তাই কবি আমাকে নিজে হাতে চিঠি না লিখতে ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি সর্বদাই আমার উচ্চকণ্ঠস্বর নিয়ে ঠাট্টা করতেন। কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে শুনলেই বলতেন "বাবা, কী কণ্ঠস্বর! টেলিফোনটা নিতান্তই বাহুল্য। ওদিক থেকে তারা অমনিই তোমার গলা শুনতে পাচ্ছে" ইত্যাদি। যে রাত্রে ডাকাত পড়েছিল তার পরদিন সকালে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "আর কখনো তোমাকে গলার জোর নিয়ে খোঁটা দেবো না। চিরকাল যেন ঐ গলা বজায় থাকে। কাল তো শুধু গলার জোরেই প্রশান্তর প্রাণ বাঁচিয়েছ, নইলে কি আমরা কেউ জাগতুম? ঐ মেঘের গর্জন, ঝড়ের আর্তনাদকে ছাপিয়ে দিয়ে চীৎকারে পাড়া সচকিত করে তুলতে পেরেছিলে বলেই তো তারা ভয় পেয়ে পালালো? বিধাতার কাছে কী অস্ত্রই পেয়েছিলে! আর কক্খনো ঠাট্টা করবো না, বজায় থাক ঐ কণ্ঠস্বর।" আমি শুনে যখন খুব হাসছি, বললেন "আবার হাসছো? আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনা ঐ গলা না থাকলে কাল রাত্রে কি কাণ্ডই না হয়ে যেতে পারতো। প্রশান্তকে খুন করে রেখে দিয়ে যেতো, আমরা কেউ জানতেও পেতুম না। আজ সকালে তাহলে ঐ হাসি থাকতো কোথায়?"

॥ ৪৪০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

খবর পাওয়া গেল তোমার ঘুষঘুষে জ্বর চলচে। আমিও তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছিলুম—কিছুদিন থেকে জিবে থার্মমিটার দেওয়া চলছিল—শেষকালে হার মানতে হলো —উত্তাপ ৯৮-এর তলায় নেমে এসেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কালিম্পং যাব মনে করচি—দেহের অবসাদ মনকেও আক্রমণ করেছে। তোমরা যদি ও-অঞ্চলে যাও তবে ভুটানের রানীর বাড়িটা নেবার চেষ্টা দেখতে পারো—১২৫ টাকা ভাড়া দাবি করেছিল—বাড়িটা হোটেল বিশেষ, ঘর বিস্তর, পুরো পাহাড়টা তাঁর অধিকারে। বউমার ওখানে জায়গা হবে না। —ভুটানের বাড়িটা রাশিকরণিকের উপযুক্ত। বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল দিচ্চি—উৎসাহ পাচ্চিনে মনে। ইতি ২৪।৮।৩৮

কবি

॥ ৪৪১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজই তোমাকে চিঠি লিখতে যাচ্ছিলুম এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। এখনো তোমার জ্বর চলচে আমারো চলত ঠিক তোমার মত যদি ডাক্তারি মতে চলতুম। আমি নিজের চিকিৎসা নিজেই করেছি। সকালে বিকেলে লাইকোপোডিয়ম ৩০ দুদিন খেলুম—ভেবেছিলুম লাইকোপোডিয়ম ২০০x খেতে হবে। কিন্তু তা আর হোলো না—দুদিন দু ডোজে আমার জ্বর গেল, আর এ পর্যন্ত এলো না। অবশ্য আমার ঐ ওষুধের লক্ষণ ছিল—বিকেলের দিকে বাড়ত, রাত্রে হোতো উপশম। বুঝেছিলাম এটা যকৃতের গোলমাল। এখন তো কাজ করচি সকাল থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত। তোমার শরীর-তন্ত্রের কোন্ মহলে কল খারাপ হয়েছে তা তো জানিনে—খুব সম্ভব লিভারে। মুখ যে-রকম তিতো হচ্ছিল তাতে বোঝা যায় ওটা পিত্তের বিকৃতি। Kali Mur, Nat. Sulf দিয়েছিলুম সেই লক্ষণ দেখে। ম্যালেরিয়ায় Nat. Sulf প্রধান ওষুধ—তার সঙ্গে Fer. Phos.।

তুমি তো আসতে পারবে না পরিশেষে। আরো কিছুদিন পরে ১৫ই সেপ্টেম্বরে বর্ষার নাচ গান দিয়ে একটা সত্যিকার বর্ষার উৎসব করব ঠিক করেছি। কিন্তু বোধ হয় তাতেও আসা ঘটবে না। একটা তার নতুন গান লিখে পাঠাই। সুরটা ভালোই হয়েছে।

আমার প্রিয়ার হিয়া বাতাসে আজ ভাসে
বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো
স্মরণে তার আসে।
বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণ-মালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়,
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে॥

ইতি ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

কৃষ্ণচূড়া

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

জানি কোনোখানে তুমি জেগে উঠছো বসন্তে...বাতাসে।
আজ সেই কথাগুলি উড়ে যায় নরম, নীরব
শরীরের নীলিমায়; দূরে দূরে সজল উৎসব
কে যেন ঝরায়ে গেছে শুধু খেলে, খেলা করে ঘাসে।

এখন শহরশীর্ষে বুরুজের উপর বিকেল
শায়িত বিস্তর শীতে...শব্দহীন, রৌদ্রে ম্রিয়মাণ
টার্মিনাসে পড়ে আছে নগরীর নিস্তেল অঘ্রাণ।

পিপাসা, প্রথম রক্তে একবার গোপন উদ্বেল
ডাকো বিস্ফারিত মাঠে, স্ফীত...লাল চৈত্রের বাগান।

কলকাতার ভাষা প্রসঙ্গ

বুলবন ওসমান

কলকাতার সাহিত্যে নিশ্চয় ভাষা বলে একটা বস্তু আছে, যা একান্তই কলকাতার (তবে বাংলা বিগর্হিত বলার আমার উদ্দেশ্য নেই)। যেহেতু কলকাতা বাংলার নবজাগরণের কেন্দ্র, তার ভাষা অনাত্র বাহিত হয়ে গেলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এবং অনেকাংশে হয়েছেও তাই। আঞ্চলিক ভাষা কলকাতা-সাহিত্য-ভাষা-শিক্ষিত-বিদ্বজ্জনদের হাতে আজ আর কলকে পায় না। বিশেষ করে শহরে।

কিন্তু কলকাতা কালচারের এক অংশ—তার ভাষা—হুগলী, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার ওপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। উপর্যুক্ত অঞ্চলসমূহের শহুরে ও গ্রাম্য ভাষার মুদ্রাগত ও ধ্বনি-সংগত পার্থক্য ছাড়া ভাষাগত পার্থক্য প্রবল নয়। আমার উদ্দেশ্য সেই ভাষাগত দিকের ওপর কিছু আলোকপাত করা।

নদীয়া এবং শান্তিপুরের কথাকে আদর্শ হিসাবে ধরা হত বিশেষ এক কারণে। এবং বিশেষ এক সময়ে। সময়টা কলকাতা গজিয়ে ওঠার আগে। আর কারণটা, নদীয়া অনেক বৈয়াকরণ সৃষ্টি করেছে এবং এই সৃষ্টির পেছনে ছিল নদীয়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। এক কথায় নদীয়া 'কলকাতা কালচারের' আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বলে।

বাংলা বর্তমানে দ্বি-রাষ্ট্রবিভাগে বিভক্ত হলেও তার ভাষা বিভক্ত হয়নি। বিভাগ ত হয়নিই, 'কলকাতা কালচারের' ভাষা আজও বরং অনুকরণ করছে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি-কেন্দ্র ঢাকা—বৃহত্তরভাবে বললে লেখক মহল এবং ন্যায়সংগতভাবেই অনুমান করতে পারেন, সমগ্র শিক্ষিত সমাজ সে ধারায় প্রবাহিত। তবে ব্যাপারটা এমন নয় যে, এখানকার আঞ্চলিক কথা সাহিত্যে স্থান নিচ্ছে না। নিচ্ছে, এবং নেওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাষা অনুশীলনের ব্যাপারটা যে কলকাতামুখী, অস্বীকার করার উপায় নেই। পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা-সচেতন ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল একমাত্র সাহিত্যশিল্পী হলেন শওকত ওসমান সাহেব। ভাষা-সচেতনতার ব্যাপারে তিনি উভয় বাংলার যে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-কর্মীর মাঝে বিশিষ্ট।

যাক, এসব আলোচনা। মূল উদ্দেশ্য আমার দু' দেশের সাহিত্য আলোচনা নয়। পূর্বের প্রতিপাদ্যের সূত্রে এসে যাই।

'কলকাতা কালচারের' ভাষায় 'লম্প' একটা শব্দ। শুধু কলকাতায় নয়, অন্যান্য জায়গাগুলোর নাম আগেই বলে নিয়েছি। ভাবছেন, হঠাৎ 'লম্প' নিয়ে লম্ফ-ঝম্প শুরু করলাম কেন। আমার লম্ফ-ঝম্পে আপনাদের কম্প দিয়ে জ্বর আসার কোন কারণ নেই।

'লম্প', অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের বাতি। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র একে ও-নামে ডাকা হয় কিনা জানি না, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে 'লম্প'কে কেউ চিনবে না। এখানে 'লম্প' জাতীয় বাতিকে বলে 'ডিপা' বা 'কুপি' ইত্যাদি। 'কুপি'টা হয়ত একেবারেই এ-মাটির ভাষা। কিন্তু 'ডিপা'কে চেনা যায়, দীপা বা দীপ (শুদ্ধ বাংলায় ডিবাও আছে)—তারই নামান্তর হয়ত। তেমনি 'লম্প'কে বুঝতে দেরি হয় না, যদি ইংরেজীতে লিখি 'Lamp'—'লম্প'। তেমনি, ঝম্প বা ঝাঁপকে মনে হয় যেন 'Jump' (জাম্প)-এর ঝাঁপ থেকেই লাফিয়ে পড়ল তড়াক করে।

অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যায়। কিন্তু কেঁচো কি দিয়ে খুঁড়ছেন, সেটা লক্ষ্য করার বিষয় (কঞ্চি দিয়ে খোঁজার সময় সাপ বেরোয় না)।

খননের জিনিসটা নিশ্চয় শক্তিশালী কিছু। সাধারণত কোদাল ব্যবহার হয় কোপাতে, আর খুঁড়তে খুন্তি। কিন্তু, কুন্তী-তনয় কর্ণ যেমন বাকী পাঁচ ভায়ের কাছে অপরিচিত ছিল, 'খুন্তি' ছাড়া 'শাবল'-ও পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের কাছে তেমনি। কলকাতা কালচারে 'শাবল' অবশ্য মানানসই। লম্পর মত 'Shovel', 'শাবল' হবে এতে আর আশ্চর্য কি! তা ছাড়া 'কলকাতা কালচার' কথাটাও প্রণিধানযোগ্য। 'কলকাতা সংস্কৃতি' নয়, 'কালচার'—এটার রহস্য কিন্তু উল্টো দিকে—'Culture' আর 'কুলাচার' (অবশ্যই কুলের (ফল) আচার নয়) ব্যাপারটা ভাববার মত। কুল বা বংশগত আচার ব্যবহার, কুলাচার বা কালচার।

উইলিয়াম ক্যারী বাংলায় এসেছিলেন মিশনারীর উদ্দেশ্যে—ব্যাপটাইজড্ করার জন্যে, নেটিভদের। অবশ্য ছাপাখানা ও বাংলা ভাষার বা সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য তাঁর একটা বেশ ভূমিকা আছে। বাংলা দেশে প্রথম ছাপাখানা হয় ১৭৭৮ খ্রীঃ হুগলীতে আর কলকাতায় তার দু বছর পর।

মিশনারীর ব্যাপার যখন, মিঃ ক্যারীকে প্যাদ্রী বলায় দোষ নেই। ঐ পাদ্রী শব্দটা নিয়েও দেখতে পারেন, ছিল 'Father'—রোমানে 'Pater'—প্যাটার-এর 'পা', আর ফাদারের 'দ', এবং 'er' উল্টে হল 're' অর্থাৎ 'রী'—সুতরাং 'পাদরী, পাদ্রী, পিতৃ' ইত্যাদি ঘষাঘষির ফল। ঘষাঘষি অর্থে, 'আর্য' দলগত পরিচয়ে যদি বিশ্বাসী হন।

ইংরেজ আসার আগেই ফরাসীরা বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল এ-দেশে। কলকাতার কথার মাত্রা, 'কি মশাই, কেমন আছেন'-এর সাথে মঁশিয়ের কোথায় যেন এক ভিয়েনের গন্ধ পাওয়া যায়। তবে 'রেস্তরা' একেবারে পরিষ্কার। অবশ্য রেস্টুরেণ্টও বলতে পারেন, কোন আপত্তি নেই।

অন্যদিকে 'মুই', 'Me'—আমি, ইত্যাদি। দক্ষিণ বাংলা, বলা ঠিক হবে না, পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বদক্ষিণের জেলা চট্টগ্রামের 'আই' অর্থাৎ 'আমি' I—একটু ফরাসী উচ্চারণের ঢং মাখা যেন। তা ছাড়া পুজোর বাজারে 'প্যাণ্ডেল' ('মণ্ড' নয়), 'ফাংশান' (অনুষ্ঠান নয়), 'দে-লাইট' বাতি—ফর্দ লেখার জন্যে 'হ্যাণ্ডেল' (কলম নয়), দিদির 'স্যাণ্ডেল' (চটি নয়)—যদি কিনতে ভুল মেরে থাকেন, 'মাইরি বলছি' বলে দিব্যি কাটেন। কিন্তু মাইরি খৃষ্টমাতা মেরীর ছায়া কি ? 'মামাইরি' হলে দিব্যিটা আরো জবর হয়—আর তাতে খবরটাও জবর হবার সুযোগ পেল। ঘরে রঙীন কাগজ সাঁটার জন্যে আঠা ঘোলা দরকার, তাই

'মগের' (Mug) প্রয়োজন, বা একটা কাজে লাগে না এমন জগ (Jug) পেলেও হয়।

বিদ্যুৎ-বাতিকেও ভরসা নেই, তাই চাই 'লণ্ঠন' (Lantern)। বাড়ির সবার জুতোগুলো 'বুরুশ' (Brush) করা দরকার। দিদির 'কুরুশ' (Cross) কাঁটাটাও কাজের ভিড়ে কোথায় রেখেছেন, মনে আসছে না, তা-ও কেনা চাই—আর ভাঙা শার্সিগুলো (Sash) এই হুজুগে মেরামত হয়ে গেলেই ভাল।

বড়দিনের বাজারে সস্তায় পাওয়া যায় 'তেমতি' Tomato। আপনি যেমতিই বলুন, পূর্ব-পাকবাসী কলকাতার 'তেমতি'র সাথে পরিচিত নয়। তাদের আছে 'টক বেগুন' বা 'বিলেতী বেগুন' বা শেষে খাঁটি 'টম্যাটো'। আর 'টক' কথাটাই ধরুন না, বাঙালী মুসলমানরা ত প্রায় সবাই বলে 'খাটা' পূর্ব-পাকে আবার 'চুকা'। যেমন 'তেঁতুল' আর 'আমলি'র ব্যাপারটা। 'পেয়ারা'র ব্যাপারেও তাই। 'পেয়ারা,'আঞ্জির, গয়াম' ইত্যাদি।

কলকাতা একটা 'হরেকরকমবা' শহর। দুনিয়ার তাবৎ দেশের লোকের বাস। বিশেষ করে যাদের 'কলকাতিয়া' বলা হয়, যারা বাংলা বলে না। বলে হিন্দী। যেমন ঢাকায়, কুট্টী। বলে উর্দু। 'কলকাতিয়ারা' বলবে 'বয়ের', 'কলকাতার কালচারড্' বা নন-কলকাতিয়ারা বলবেন 'কুল', আর পূর্ব-পাকে সবাই 'বরই'। তেমনি পূর্ব-পাকে 'মরিচ' কলকাতিয়ারা বলে 'মির্চা'—আর সবাই 'লংকা'। ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল। বাংলার ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লংকা জয় করে সিংহল নাম রাখল। আজ অবশ্য সিলোন—রাবণ রাজের স্মৃতি রক্ষার্থেই যেন 'লংকা' বেঁচে আছে।

মায়ের কোল থেকে বেরিয়ে সেখানে আর ফেরা যায় না—কিন্তু মাটির পেটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবাইকেই যেতে হয়। তাই 'লংকা'ওয়ালারা পুকুর থেকে পালালেও বংগোপসাগর থেকে পালাতে পারেনি—লংকার আকার গোল হলেই গণ্ডগোল—বলতে হয় 'গোলমরিচ'—লংকার ভূমিকা সেখানে মরীচ সদৃশ। শুধু কি তাই। 'সিংহ' পদবী আজ জনারণ্য দেখে ঘাবড়ে গেছে। 'সিংহ' বললে মানুষ চিনতেই পারবে না, বলতে হবে,—আরে ভাই চেনেন না—'অমুক সিনহা'। এবার।

আহা, এসব ছেড়ে স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকেই ধরুন না। ছেলে বুড়ো সবার মুখে 'ট্যাগোর' শুনতে শুনতে আপনার কি মন হয় না, ঠাকুরকে গোর দিয়েই দিল।*

তা ছাড়া আজকাল ত ডাঁট মেরে নিজের নাম বলার কায়দা হল, আই অ্যাম মিস্টার 'ডাট', বা 'বোস' বা 'চোড্রী'। আর পূর্ব-পাকে বলে, আই অ্যাম মিস্টার 'হাক', বা

'আমেদ' ইত্যাদি। আপাতত এ 'দোর' (DOOR) বন্ধ করে আলোচনার মূলে ফিরে যাওয়া যাক।

কাটাকাটির কথা উঠলে ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি নাম আপনার মুখে উথলে উঠতে পারে। কিন্তু তার সাথে যদি বলেন 'কাটারি' বোঝা যাবে আপনি 'কলকাতা-কালচারের' প্রোডাক্ট। 'কাটারি' ভাগীরথীর তীরেই সাজে। পদ্মাপারের মানুষেরা 'দা' নিয়েই সন্তুষ্ট। 'কাটারি'র ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন, CUTTER—'কাটার'। পাদ্রী-র 'RE'-র মত কাটারের 'ER' আড়ি দিয়ে দাঁড়ায় 'RE'-তে—তাই 'কাটারি'। কিন্তু মরিচ 'লংকা' হলেও 'গোল-মরিচ' যেমন গোল-লংকা নয়, 'রামদা'-ও নয় 'রামকাটারি'। 'দা-কুমড়ো' নয় 'কাটারি-কুমড়ো' সম্পর্ক।

ব্যাপারটা আরো তলিয়ে দেখা যায়। ইংরেজীতে 'কেন্দ্র' লিখতে হয় 'CENTRE' কিন্তু মার্কিনী ইংরেজী লেখে 'CENTER' —এখানে মার্কিনী ইংরেজী ধ্বনি শুদ্ধ, তার 'TER' কিন্তু ব্রিটিশ ইংরেজী অন্যায়সঙ্গত — তাদের তার 'TRE'; সুতরাং 'CENTRE' 'সেণ্টার' না হয়ে যদি 'সেণ্টার' হতে পারে 'কাটার' (CUTTER) 'কাটারি' হওয়ায় কারো এতটা ধারে দই দেওয়া হয়নি।

এবার 'টুকরী' নিয়েও ব্যাপারটা দেখানো যেতে পারে। 'টুকরী' অর্থাৎ পূর্ব-পারের 'টুকরি' বা শুদ্ধ বাংলায় ঝুড়ি; ঝুড়ি বললে ঠিক ভাবটা প্রকাশ পায় না—'চুপড়ি' বলা চলে। অবশ্য চুপড়িও 'কলকাতা-কালচারের' ফল—এটাকে অবশ্যই আঞ্চলিক উদ্ভূত শব্দের দলে ফেলতে হবে। 'টুকরী', টাইপ মেসিন যেমন 'টাইপ-রাইটার' তেমনি 'TOOKER' পূর্বউল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী 'টুকরী' হওয়া স্বাভাবিক। 'টুকরী'কে অনেকেই আবার বলে 'ঠেকা' অর্থাৎ দাঁড়-দুলোনো যে পাত্রে জিনিস ঠেকাই, অর্থাৎ, স্থাপন করি। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী 'ঠেকা' ঠেকাতেই শেষ নয়, ওটা 'ঠেকারী'ও হয়েছে।

এতক্ষণ যে সমস্ত 'ফর্দ' তৈরি করলাম তার উদ্দেশ্যটা আপনারা নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন। অর্থাৎ, আমি দেখাতে চেয়েছি, কলকাতা এবং তার আশপাশের ভাষা কিভাবে ইংরেজী ভাষা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজস্ব একটা ভংগী গড়ে তুলেছে।

ইংরেজ আসার আগে ভারত যাদের আওতায় ছিল (বিশেষ করে বাংলার কথা—কেননা বাংলা ভাষার উপর যখন আলোচনা) তাদের ভাষা স্থায়ী কিছুমাত্রায় এখনও টিকে আছে। কিন্তু ইংরেজীর প্রভাব প্রচুর। এবং এটা আমাদের জীবনে প্রচুর বলে মনে হচ্ছে, কেননা ইংরেজ মাত্র ক' বছর হল রাজ্যভার হস্তান্তর করেছে। আমাদের প্রায় সবার জীবনই ইংরেজ শাসনের মাঝে বর্ধিত। কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে পূর্বশাসকদের চিহ্ন

দঢ়ে হয়ে রয়েছে এখনও। 'অফিস' বলার সাথে আমরা 'আদালত'কেও সহগ হিসাবে আনি। 'কোর্ট' বলার সাথে বলি 'কাচারি'। তা ছাড়া, মারফত, যাবত, সিপাই, আমিন, খাজনা ইত্যাদি শব্দ এখনও বহুল প্রচারিত।

ইংরেজের সাথে ভারতে পর্তুগীজ ও ফরাসীরাও আসে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকায় তাদের ভাষাও টিকতে পারেনি। না হয় আমরা আজ 'বোতাম' না বলে বলতাম 'বোতাও'। কেননা 'BUTTON' ইংরেজী শব্দ, 'BOTAO' পর্তুগীজ। তেমনি 'BOTTLE', বোতল—'BOTELHA' 'বোতেলা' নয়। যেমন 'VIOLIN' নয় 'VIOLA'। অবশ্য 'বাহুলীন' উল্লেখ করে কেউ তর্ক তুলতে পারেন। তবে পাঁউরুটি পর্তুগীজ ভাষাজাত।

কলকাতা ও তার আশ-পাশের ভাষায় ইংরেজী প্রভাবের যে সব নমুনা দিয়েছি তার সবই যে ইংরেজী প্রভাবান্বিত তা নয়। এতে দু' বাংলার পার্থক্যটা দেখিয়েছি—এবং কিছুটা রস করাও এর উদ্দেশ্য। যেমন 'লঙ্কা', 'কঞ্চি', 'বাখারি'-ও উল্লেখ করতে পারি; পূর্ব-পাকে ওটাকে অনেক জায়গাতেই বলে 'কায়েম'। 'লঙ্কা', 'কঞ্চি', 'বাখারি' পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দ, ইংরেজীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

'কলকাতা' শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হওয়ায় তার উপরেই ইংরেজীর প্রভাবটা বেশী হওয়া স্বাভাবিক। এবং তাই বাংলার অন্যান্য অংশে প্রাচীন বহু আঞ্চলিক শব্দ আজও অকৃত্রিমভাবে টিকে আছে।

'কলকাতা কালচারে' কিছু কথা হুবহু ইংরেজী—কিন্তু ইংরেজীই আজ বাংলা হয়ে গেছে. যেমন চেয়ার, বেঞ্চ, পেন, পুলিস, কোর্ট, শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি। এ-সব শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার সারা অংশেই প্রায় এক রকম। তবু সংখ্যাতত্ত্বের আশ্রয় নিলে অন্যান্য জায়গা থেকে কলকাতায় যে বেশী হবে, অনুমান করা যায়।

কিছু শব্দ সামান্য রূপ বদলে বাংলা হয়েছে। যেমন 'কাটারি', 'লম্প', 'শাবল', ইত্যাদি। কলকাতা কালচারের আওতায় যাদের বাস, মনে হতে পারে এ শব্দগুলোই আসল বাংলা শব্দ। তারা এর বাইরে ভাবতেই পারে না। কেননা, ব্যক্তি যে-সমাজ-সংস্কৃতির সৃষ্টি সে-সমাজের সংস্কৃতিকেই চরম বলে ধরে নেয়।

আর একভাবে দেখানো যায়, যেখানে হুবহু অনুবাদ। যেমন 'গুড মর্নিং'-এর বদলে 'সুপ্রভাত' বা শিবরাত্রির মত 'শুভরাত্রি' (Good Night), 'ইণ্টারভেল'-এর জায়গায় বিশ্রাম বা বিরতি—'ফাউণ্টেন-পেন', ঝরনা-কলম ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর এই প্রবণতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক—সব কিছু বাংলা হবে। জাতীয়তা বড় করে দেখা দেওয়া কোন হীনমন্যতার ব্যাপার নয়। যেমন 'ক্লাইভ-রো' হল 'সুভাষ রোড'—কিন্তু তা বলে পুরো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কেননা, পূর্বেই বলেছি, যে-সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ বড় হয়, সেটাকেই চরম (Unique) বলে ধরে নেয়। 'সুভাষ রোড' করলেও 'রো' বা 'রোড' ত থেকে গেল। সুতরাং পরিমার্জন করায় উদ্ধার নেই। 'কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট'কে 'নাসিকাওয়ালিস

স্প্রীট' করলেও পুরো রেহাই নেই। যেমন, 'পকেট' (Pocket)কে অনেক জায়গায় 'জেব' বলে। কিন্তু 'পকেটমার' শব্দটা 'জেবমারে' রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। 'পকেটমার' শব্দটার এমনি একটা 'গুণ' (Connotation) স্থায়িভাবে গেড়ে বসেছে, যা অন্য শব্দে সফল হবে না। 'পকেট' এবং 'মার' সমস্যামান শব্দগুলো লক্ষ্য করুন—এখানে ইংরেজী ও বাংলা যোগে নূতন শব্দ।

কলকাতা কালচারের অংশ, তার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে তুলনামূলকভাবেই করা হয়েছে। সুতরাং এবার এ অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। না হলে আলোচনা অপূর্ণ থাকবে বলে আমার ধারণা। আলোচনার পদ্ধতিগত রূপের জন্যেই এটা অপরিহার্য। সুতরাং আলোচনায় আসতে পারি।

কোট-প্যান্ট, রাউজ, ব্লেড, ব্লটিং পূর্ব-পাকেও আছে। তবে বিশেষ একটা শব্দ আছে, যেটা শুধু এখানেই, কলকাতায় নেই। ধরুন, টিনের ডিবে জাতীয় পাত্রকে কলকাতা কালচারের আওতার অধিবাসীরা হয় শুধু টিন বা ডিবে বলবে। কিন্তু পূর্ব-পাকে সেটা বেমালুম 'পট' (Pot) হিসাবেই রাজত্ব চালাচ্ছে।

তেমনি রূপ পরিবর্তনেরও অভাব নেই। চট্টগ্রামে 'বাঁশখালী' নামে একটা জায়গার নামই আছে, অথচ লোকেরা 'বাঁশ'কে বলে 'বাম্বু' Bamboo। 'কাচারা' অর্থাৎ ময়লা বা অপরিষ্কার—এটা যে 'Catarrah' থেকে আসেনি, হলফ করে বলি কি করে!

অনুবাদেও পিছিয়ে নেই এ-অঞ্চল। কলকাতার 'উড্' বা 'উটপেন্সিল' এখানে 'কাঠ্‌পেনসিল' হিসাবে খ্যাত।

তবে পার্থক্যটা, কলকাতা কালচারের মত এখানে ইংরেজী প্রভাবে গড়া শব্দ অত ব্যাপক নয়। আর তাই আঞ্চলিক ও খাঁটি বাংলা ভাষা এখানে বহুলভাবেই টিকে আছে।

কিছু ব্যতিরেকেও আছে। দিয়াশলাই বা দেশলাই আসলে হিন্দী শব্দ হলেও বাংলাও হয়ে গেছে—দিয়া কাঠি বা দীপশলা. অর্থাৎ যে কাঠি আলো দান করে। যদিও দেশলাই কাঠি ও বাক্স সবই বোঝায়—আমাদের আলোচনা সে ব্যাপারে নয়। পূর্ব-পাকে শিক্ষিত বা শহুরে লোক বাদে দেশলাইকে কেউ চিনবে না, যদি 'ম্যাচিস', 'মাসিস' বা 'ম্যাচ' না বলেন।

আরো মজার ব্যাপার হল, কলকাতার 'পানতোয়া' বর্ডার পেরিয়ে আর পানতোয়া থাকতে পারবে না—হবে 'লেডিকেনি'—অর্থাৎ ঐতিহাসিক পুরুষ লর্ড ক্যানিং-এর বেগমের নামে 'লেডিকেনি' (অনুস্বারটুকু শুধু বাদ পড়েছে)। জানি না পানতোয়ার সাথে লেডি কেনিং-এর রঙের কোন মিল ছিল কিনা।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল ও একাল' কেতাবে স্কুলে ইংরেজী শেখাবার নূতন ফন্দীর বেশ নমুনা দিয়েছেন। ধরুন, স্কুলে ইনেস্পেক্টর এসেছেন। শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞেস করবেন, 'কি ঘোষাব? গার্ডেন ঘোষাব, না স্পাইস ঘোষাব? যদি গার্ডেন ঘোষাবার (কি বলব, অর্থে, 'ঘোষাব'—বা ঘোষণা করবও বলতে পারেন) পালা আসে, ছাত্রদের আগে থাকতেই শেখান থাকে—তারা গড়গড় করে বলে যাবে ঃ

পামকিন্ লাউ কুমড়ো, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন্ চাষা॥

পূর্ব-পাকেও হাটে-বাজারে বিক্রেতারা কিছু কিছু ইংরেজী ভাষা রপ্তর প্রমাণ দেখায়। যেমন দামে না বনলে অনেককেই বলতে শোনা যেত 'টেক টু টেক, নো টেক টু গো' – 'নিলে নেন, না নিলে যান' যার অর্থ।

তা ছাড়া চাঁটগাঁর বাজারে এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ ওঠে—আঁশহীন, রক্তহীন জেলি সদৃশ নমনীয়, শুভ্র এক প্রকার মাছ যার নাম স্থানীয় কথায় 'লইট্টা'। সাহেবরা বাজারে এসে এই মাছের রূপ দেখে নিজেদের গোত্রীয় ভেবে আকৃষ্ট হত। হয়ত জিজ্ঞেস করল ঃ

হোয়াট ইজ্ দিস?

লইট্টা ফিশ। মাছওয়ালার উত্তর।

কলকাতা কালচারের মত পূর্ব-পাকেও খোঁজ চালালে অনেক নজির পাওয়া যাবে যা ইংরেজীর বিভিন্ন মমি। কিন্তু আজও পর্যন্ত সে-রকম কোন অনুসন্ধান হয়নি যা আমাদের অলসতা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতার ফল। যাকগে, কি হবে, কার বা কে করবে, সে সম্বন্ধে বলে লাভ নেই কেননা, যে জাতি নিজেদের জানার জন্যে হৃদয় থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে না তাদের উপর থেকে বলেই বা কতটুকু করানো যায়।

এ-রচনার শেষ অনুচ্ছেদে একটা মাত্র অনুরোধ পেশ করে কলম বন্ধ করব। কলকাতা কালচারের কতটুকুই বা জানি। তাই অনুরোধ, এ ব্যাপারে ভাষার ব্যাপারীরা তাঁদের বিজ্ঞতার আলোক কিছু পরিমাণ যেন ব্যয় করেন। পূর্ব-পাকের ব্যাপারটা এ অধমের জন্য তোলা থাকতে পারে।

রকমবিরকমের doll

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

এ পৃথিবীতে কত রকমের ডল্ আছে, এ প্রশ্ন করলে দেখবেন, আপনি এক গভীর গাড্ডায় গিয়ে পড়েছেন। সারা পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিন, এক আমেরিকাতেই কত রকমের আছে, কেউ তা গুনে শেষ করতে পারবে না, হিসেব করে কুলতে পারবে না, ভেবে কুলকিনারা পাবে না। শুধু জেনে রাখা ভাল—ডল্ রকমবিরকমের। এখানে এখন তিন রকম ডল্-এর কথাই বলা যাক। প্রথমে ভি ডল, এর পর মোবাইল-ডল এবং সবশেষে স্লিপিং-ডল্-এর সব কথা। আমেরিকায় গার্ল না বলে মিষ্টি করে বলে ডল্। শী ইজ্ এ ডল মানে মনোমত ঠিক একটি পুতুলের মত সুন্দর কিছু জিনিস। ধাড়ি, ছোকরা, মাঝবয়সী সবাই একটা-না-একটা এমন পুতুল পেতে চায়। মোমের বা প্লাস্টিক পুতুলের মত এসব পুতুল ঢলঢলে হলেও তারা নির্বাক নির্জীব কিছু নয় যে, আলমারিতে শুধু শোভা বর্ধনের কাজে লাগে। এসব তাক-লাগানো মন-ভোলানো রক্তমাংসের রকমবিরকম পুতুলরা স্কার্ট-পরা, রং মাখা, কথা-বলা, পায়ে-হাঁটা চনমনে, সেয়ানা, সোমত্ত সব চীজ, যাদের দিয়ে পুরুষমানুষ মাত্রেরই সাধ হয় একটা পুতুল পুতুল খেলা করি, নামে সংসার পাতি। অসাবধান হলে এ-পুতুল ভাঙে না, তখন সংসারটাই ছরকুটে যায়। ডল যখন অতিরিক্ত প্রিয় হয়ে ওঠে, তখন সে প্রিয়া ডল থেকে এঞ্জেল-এর ধাপে ওঠে। তখন বুঝতে হবে, ফলার রীতিমত পেকেছে। ঘনঘটা করে এবার কিছু ঘটবে।

'ভি'-ডল্‌স অর্থে চার্চিলের 'ভি' ফর ভিক্টরি নয়, 'ভি' অর্থে এখানে ভাইস। রকফেলারের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়েইস্-এর তাঁরা কেউ নয়। এরা ভাইস ডলস। এদের সম্পর্ক ভাইস-এর সঙ্গে। তারা ঘরমুখো শান্তশিষ্ট স্কার্টবিশিষ্ট জীব নয়। বাইরেই তাদের ঘর, বাইরের জনই তাদের আপন জন। নিঃসন্দেহে তারা মেয়েমানুষ ভাল। কিন্তু ভাল মেয়েমানুষ অর্থে ভাল কিনা তা বলা শক্ত। ডলার পেলেই তাদের মন হয়ে ওঠে কুঞ্জবন—সেখানে মধুর লোভে লোভী নানারকমের ভ্রমর গুনগুন করতে আসে।

আমেরিকায় দিনের মধ্যে একশো বার রেডিও ও টেলিভিসনের মতন উচ্চারিত হচ্ছে এফ বি আই। এফ বি আই বলতে কী বোঝায় তা জানতে খুব বেশী দেরি হয় না—কিছু দিনের মধ্যে জানতে পারবেন এর অর্থ। অর্থটা হলো ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন। অর্থাৎ মার্কিনী টিকটিকি বিভাগ। যাদের কাজ হলো যত কিছু জাল, জুয়োচুরি, বদমাইসি, খুন-খারাবি, নারীঘটিত ব্যাপার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো ও এই রকম যাবতীয় ঘুরোনো যত রাজ্যের দুষ্কর্মের পিছনে ধাওয়া করা। এফ বি আই ঠিক নিউ ইয়র্কে দুটি অ্যাটম বম ফাটানোর মত কাজ করে বসলেন। কথা নেই, বার্তা নেই, পর পর সম্ভ্রান্ত বংশের দুজন উচ্চস্তরের রমণীর উপর পরোয়ানা জারি করে গ্রেপ্তার করে বসলেন। এই দুই মহিলা নিউ ইয়র্কের যে অংশে বসবাস করতেন, সেণ্ট্রাল পার্কের ইস্ট সাইডে, সেখানকার কারুর গায়ে আঁচড় কাটা স্বপ্নাতীত ব্যাপার। তবু তাঁরা পুলিসের হাতে গিয়ে পড়লেন। কী, কেন, কিসের জন্য এই রকম একটা ঘটনা ঘটল , তার সম্পর্কে হাজার প্রশ্ন উঠল! যখন এই গ্রেপ্তারের পিছনে যে নিগূঢ় কারণ আছে জানা গেল, তখন তা শুনে সবাই হতবাক। এই দুজন উচ্চকুল

শী ইজ্ এ ডল্

সম্ভবা মহিলা ভি-ডল্ নিয়ে তেজারতি কারবার করে প্রচুর ডলার উপার্জন করেন। আমেরিকায় ব্যবসার নামে সবাই পাগল—কোন পথ দিয়ে ডলারের বান ঘরে এসে ঢুকবে, তার ঠিকানা নেই। তাই ডলার উপার্জনের জন্য নব নব পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত। কিন্তু এই মহিলা দুজন যে সুড়ঙ্গ-পথ আবিষ্কার করেছেন, তা যত রমণীয়, তত পিছল এবং সেই সঙ্গে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁরা নিজের ঘরে বসে শুধু টেলিফোন তুলে প্রতি বছর হাজার হাজার ডলার রোজগার করে থাকেন। অন্য লোকে ফরমাশ করে, তাঁরা শুধু পরের ইচ্ছাটুকু তামিল করে দিয়ে প্রচুর মুনাফা খান। দুজনারই ব্যবসার

ভি-ডল্ নিয়ে তেজারতি কারবার করে......

মূলধন বলতে এমন কিছুই হাতী-ঘোড়া নেই। শুধু যা বিশ-তিরিশ জন সতের-আঠার বছরের নড়েচড়ে এমন ধারাল গোছের ডল ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নয়। তাতেই তাঁদের বাজিমাত। এই যে দুজন রমণী পুলিসের খপ্পরে পড়েছেন তাঁদের প্রথম জনের শুভনাম মাডাম এলিজাবেথ স্পিডিং। মহিলাটি জাতে ক্যানাডিয়ান, পরে তিনি এক রুমানিয়ান কাউন্টকে বিবাহ করেন। কিন্তু পিছল পথের পথিক তিনি, তাঁর সে বিবাহ বেশী-দিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পর তাঁদের সম্পর্ক ফুটিফাটা হয়ে যায়। তিনি রুমানিয়ান কাউন্টকে সাগ্রহে ছুটি দিলেও বিয়ে করে যৌতুক হিসাবে পাওয়া তাঁর কাউণ্টেস লেজুড়টি আপ্রাণ আটকে ধরে থাকেন। সেই থেকে তিনি বন্ধুমহলে ম্যাডাম খ্যাত। নিউ ইয়র্কে এসে মহিলাটি নানারকমের ডল্ ঃ শো-গার্ল, মডেল ও

অভিনেত্রীদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দেন। গোপনে গোপনে নিউ ইয়র্কের সমাজের উচ্চতম মহলে ম্যাডামের চাহিদা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, নিউ ইয়র্ক থেকে বহু দূরে দূরে জায়গায়, যেমন মায়ামি, আটলান্টিক সিটি, ভেনেজুয়েলাতেও তাঁর রসগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয় না। যাঁরা হুকুম করলেই নিউ ইয়র্ক থেকে তাঁদের মনোমত কাউকে না কাউকে ম্যাডাম পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় মহিলাটির নাম ডেবোরা ড্রেসি--তাঁরও ডলার উপার্জনের পথ এবং পাথেয় একই উপায় অবলম্বনে। তাঁরও টেলিফোন এক চোখ সর্বদা পড়ে থাকে। যদি কোন রকমে গড়নপিটন, চাকচিক্য, মণিমাণিক্যের দোহাই দিয়ে মুভিতে একটা চান্স পাওয়া যায়। এই মোবাইল ডল্ হলেন বারবারা মুরে। আমেরিকা এসেই তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চললেন। কিন্তু একেবারে অন্য কারণে। আমেরিকার এই দুর্জয় গতির রাজ্যে উনি কিনা হয়ে এলেন অগতির দূতী। উনি বললেন--এ ছোটার দেশে আমি ছুটব না। হাঁটি হাঁটি পা পা করে সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক এই ৩২৫০ মাইলের দূরত্ব আমি পায়ে হেঁটে আস্তে আস্তে পার হব। সবার চক্ষু চড়কগাছ। এ কী দুর্দান্ত ফরমাশ! তা ছাড়া এই মহিলাটির বায়নাক্কা অনেক। ওঁকে ছাপ্পান্নবার বসন্ত ইতিমধ্যেই পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেছে। আর এই পদব্রজে যাবার সময় উনি মাছ, মাংস, ডিম এসব কিছু স্পর্শ করবেন না। স্রেফ দুধ আর কচি ঘাসের উপর থাকবেন। উনি সব রকম কামনা জয় করেছেন ইচ্ছাকে নির্বাসন দিয়ে। পুরুষ-সংসর্গ চান না, নানারকম পানপানীয় বর্জন করেছেন, মায় আমিষ-নিরামিষ সব রকম লোভনীয় আহার-বিহার ত্যাগ করেছেন। শুধু হাঁটার মধ্যেই অকারণ পুলক খুঁজে পেয়েছেন।
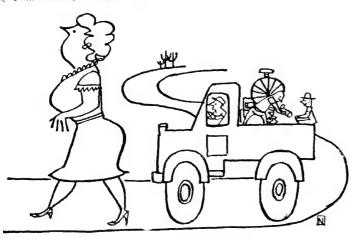
হাজার মাইল পথ শুধু ঘাসের রস খেয়ে......

আসত নানারকম লোকের মন-মর্জির দাবি-দাওয়া নিয়ে। শুধু ব্যবস্থাপনা করে দিয়েই মোটা টাকা তিনি আত্মসাৎ করে থাকেন। স্কার্সডেলের একজন মাঝবয়সী স্টক-ব্রোকার ড্রেসির পুরোনো খদ্দের। তিনি একদিন ফরমাশ করলেন--লোলিতা-টাইপ। এফ বি আই ড্রেসির ফোন ট্যাপ করে সমস্ত কিছু ষড়যন্ত্র হাতেনাতে ধরে ফেলেন। 'ভি'-ডল্-এর মৌচাকে বেরসিক পুলিস এসে হানা দিলে। মধুর বদলে যারা করে খাচ্ছিল, তারা সবাই পেল হুলের জ্বালা!

বাঙালী মাত্রেই বলবে--এতে আর নতুন কী আছে। এ তো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম পেশা। নতুন পৃথিবীতে এরা এদের ম্যাডাম বলছে, আমাদের শরৎ চাটুজ্যে বহুদিন আগে এদের মাসি আখ্যা দিয়ে গেছেন। হতে পারে এরা ডলারে ঘড়া ভর্তি করা শাঁসাল গোছের মাসি--কিন্তু মাসি ঠিকই।

এয়ার হোস্টেসদের অনেক সময়ে খাতির করে ফ্লাইং ডল্ বলা হয়। কিন্তু আমি যে মোবাইল-ডল্‌টির কথা এখন বলছি, তিনি কিন্তু বড় বিচিত্র জীব। অনেক বাসনা নিয়ে লোকে আমেরিকায় পদার্পণ করে। মহিলা হলে তো কথাই নেই--হলিউডের দিকে

বারবারা মুরে জাতে ইংরাজ। ইতিমধ্যেই ওঁর খাওয়ার এই অদ্ভুত থিয়োরীর প্র্যাকটিক্যাল নিদর্শন দেখিয়েছেন। স্কটল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ড প্রায় হাজার মাইল পথ শুধু ঘাসের রস খেয়ে সার্থকভাবে উনি অতিক্রম করেছেন। অগত্যা সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক পদব্রজে কবুল করবার জন্যে উনি পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। ওঁর সঙ্গে পিছু পিছু গাড়িতে তের জোড়া জুতো ও ঘাস মাড়ার একটি কল চলল। কলোম্বাসও এমনভাবে আমেরিকা জয় করেননি, যেমনভাবে বারবারা মুরে শেষ পর্যন্ত করলেন। উনি হেঁটে নিউ ইয়র্ক এসে পৌঁছলেন। নিউ ইয়র্ক পৌঁছবার শেষের ছয় মাইল নিয়ে গোল বাধল। পথ চলতে চলতে রাস্তায় উনি গাড়িতে ধাক্কা খান এবং তাই নিউ জারসি থেকে হল্যান্ড টানেল পর্যন্ত ওঁকে পুলিসের গাড়িতে করে তুলে আনা হয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য। পরের দিন তিনি সামান্য সুস্থ বোধ করলেই নিজে গিয়ে নিউ জারসি থেকে হল্যান্ড টানেল পর্যন্ত আবার হেঁটে এসে পথপরিক্রমা সাঙ্গ করলেন।

উনি এত বড় একটা অসাধ্য সাধন করে আনন্দে যে ফিস্ট করলেন, তাতে মেনু ছিল কী? বেক্‌ড্ টোমাটো, সেদ্ধ গাজর, ব্রোকলী (এক রকম শাক), টারনিপ (আর এক রকম উদ্ভিদ্‌জাত ব্যাপার)। আমিষ কিছু নয়, সবই নিরামিষ ব্যাপার।

পরের দিন তাঁর কৃতিত্ব নিয়ে কাগজে কাগজে নানান শিরোনামা বার হল--মুভিং-ডল্-এর জয়জয়কার। উনি এবার অ্যাডেলাইড থেকে সিডনী পায়ে হেঁটে যাবেন, এই ইচ্ছা করেছেন। তাই ওঁর পরের যাত্রা অস্ট্রেলিয়ায়। সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। ভারতবর্ষে কি উনি আসবেন না? শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত হলে মন্দ কি। আর এখানে কত রকম শাকসব্জীর ছড়াছড়ি!

নিউ ইয়র্কের বাঙালী সমাজের একজন মাথা বললেন ওঁকে নেমন্তন্ন করে চিঠি দেওয়া যাক টেগোর সোসাইটির পক্ষ থেকে, যাতে উনি একবার ভারতপথিক হন।

নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত হাসপাতাল মাউন্ট-সিনাই-এ সেদিন আর এক রকমের ডল্ এসে উপস্থিত তারা দুটি স্লিপিং ডল্। একজন হল তিন বছরের বারনাডেট আর অন্যজন পাঁচ বছরের ভেরনিকা--দুজনে দিনরাত নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকে। স্ফূর্তি করে ওঠে না, চলাফেরা করতে পারে না। এমনিতে তাদের শারীরিক কোন দোষত্রুটি আছে বলে কেউ জানে না। কিন্তু দিন নেই, রাত্রি নেই, তারা দুটিতে অবসন্ন অচৈতন্য হয়ে শুধু বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কেন পড়ে থাকে? তাদের ২৯ বছরের মা লিলিয়ান ফ্রাটানটোনিও সঙ্গে করে দুটিকে এনেছেন পৃথিবীর রথী মহারথী সব ডাক্তারদের কাছে বাচ্চা দুটোর এমন অবস্থা কেন হল জানবার জন্য। কত রকম পরীক্ষা হল, কিন্তু কিছুই জানা গেল না। তাদের শরীরের অসুস্থতার কোন লক্ষণও পাওয়া গেল না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে বাচ্চা দুটিকে সঙ্গে করে তাদের মা নিজেদের থাকবার জায়গা ক্লিভল্যান্ডে ফিরে গেলেন। কিন্তু ফিরে গিয়েও তাদের শারীরিক কোন উন্নতি দেখা গেল না--তারা যেমন ঝিমিয়ে থাকত, তেমনিই রইল--কিসের ঘোরে যেন তারা অচল হয়ে থাকে। লিলিয়ানের স্বামী

সমস্ত পরিবার নিয়ে আবার নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে আর একবার ধর্না দিতে এলেন। বাবা-মার ঐকান্তিক ইচ্ছা শিশু দুটির যদি কোন ব্যবস্থা করা যায়। শিশু হাসপাতালে তাদের রেখে আবার রক্ষণাবেক্ষণ চলল। তাদের মা লিলিয়ান প্রত্যহ হাসপাতালে এসে শিশুদের কাছে সারাদিন থাকেন, আবার রাত্রে ফিরে যান। এবারও পরীক্ষা করে নির্ভুল জানা গেল, তাদের দেহের মধ্যে কোন গঠনের বা ক্রিয়াকলাপের অসংগতি নেই। তখন সমস্ত ডাক্তাররা তাদের মা লিলিয়ানের উপর কেমন সন্দেহ করতে লাগলেন। এবং একদিন হাসপাতালে তিনি আসার পর তাঁর অজান্তে তাঁরই ভ্যানিটি ব্যাগটি তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা হল। ব্যাগ থেকে বার হল নিজের মুখে কারুকার্য করার জন্য পাউডার, লিপস্টিক, রুজ, ভুরু-টানা ব্রাশ আর তা ছাড়া একটি ছোট ড্রপার। এই ড্রপারের গায়ে তখনও সাদা সাদা পাউডারের মত কী যেন লেগে ছিল। তা পরীক্ষা করে জানা গেল, তা হল বারবিটিউরেটস। সেই সূত্র ধরে শিশু দুটির রক্ত বিশদভাবে পরীক্ষা করে তার ভিতরেও বারবিটিউরেটসের সম্মিশ্রণ দেখতে পাওয়া গেল।

মাকে জেরার পর জেরা করা হল। কেন এমন কাজ করেছ? এমন ফুটফুটে শিশু দুটিকে তুমি কেন ঘুমের ওষুধ খাওয়াও? প্রথমে মহিলা কোনমতে স্বীকার করবেন না। তারপর অনেক জেরার ভয় ইত্যাদির পর মানলেন যে, নিজের স্নায়বিক দুর্বলতার কথা বলে ডাক্তারের কাছ থেকে উনি এই ঘুমের ওষুধ প্রথম নিয়ে আসেন ও নিজে খাওয়ার বদলে তাঁর শিশু দুটিকে দুধের কিংবা ফলের রসের সঙ্গে নিয়মিত তা খাইয়ে থাকেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্য, কি কারণে?

—বারবিটিউরেটস

কারণ আর কিছুই নয়। উনি বললেন যে, গৃহস্থালী কাজ করার সময় এরা বড় চুলবুল করে, নানান বায়না, নানান আবদার ধরে। তাই নির্ঝঞ্ঝাটে সংসারের কাজ সারবার জন্যে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগ সহজে তা মেনে নিতে রাজী নয়। তাঁরা বলছেন—তাই কি আর ঠিক? এর ভিতরেও অন্য ব্যাপার থাকতে পারে। সকালে ওঁর স্বামী কাজে বেরুবার পর শিশু দুটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার পেছনে হয়তো অন্য কোন পুরুষের নিজের ফ্ল্যাটে আনাগোনার ব্যাপার থাকতে পারে। স্বামী চলে যাওয়ার পর শিশু দুটি যদি ঘুমিয়ে থাকে, তা হলে তার সুবিধা অনেক রকমের হতে পারে।

ইতিমধ্যে মহিলার তৃতীয় সন্তান এসে হাজির। ডাক্তাররা নবজাত শিশুকে মার হেপাজত থেকে সরিয়ে এনে 'দেশের সন্তান' করে অন্যত্র রাখলেন। মহিলাকে মানসিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে দেওয়া হল, যাতে তাঁর স্বাভাবিক মানসিক প্রবৃত্তি ফিরে আসে। মহিলার স্বামী এই ব্যাপারে সবচেয়ে হকচকিয়ে যান—ভাবখানা, আমি তো এসবের কিছুই জানি না, এত কাণ্ড এর ভেতর চলছে। সব স্বামী যদি সব স্ত্রীর সব কাণ্ডকারখানা জানতেন!

কিছু দিনের মধ্যেই ঘুমন্ত শিশু দুটি আর আগের মত যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ত না। দেখতে দেখতে তারা স্বাভাবিক হয়ে চলাফেরা করতে পারল। কিন্তু তাদের মার জন্যে কিছু দিনের শ্রীঘর বসবাসের ব্যবস্থা হল।

যেদিন অকুণ্ঠ প্রেম

মনীশ ঘটক

ম্যামথের দিন গেছে। ডাইনোসর টেরা ডিক্‌টিল
লুপ্ত ভূমণ্ডল থেকে। নর্দমায় করে কিলবিল
জোঁক কেঁচো কেন্নোর দল। ঘরে ঘরে ছুঁচোর কেত্তন,
আরশোলা গন্ধপোকা গুবরে চামচিকের নর্তন।

ঈশ্বর মেনেছে হার, বৃথা চেষ্টা মহৎসৃষ্টির,
অশক্ত অথর্ব বুড়ো, সে জৌলুস নেইক দৃষ্টির।
দু'একটা ভূমিকম্প, দু'একটা হিমানিঃস্রবণ,
দু'একটা অগ্ন্যুৎগার বিধাতারে করায় স্মরণ।

করার যা কিছু সব মানুষেই করে আজকাল।
আতঙ্কসৃজন থেকে ভরাডুবী করা বানচাল,
কলিশনে লোক মারা, কেড়ে নেওয়া ক্ষিদের আহার,
জিভ্ কেটে বন্ধ করা অধিকার মাকে ডাক্‌বার।

মানুষই করছে আজ ভ্রূণগর্ভা নারীর সংহার
দুর্বলের পরে আজো থামে না বলীর অত্যাচার।
বিশ্বাসের স্বর্গপুর যে মানুষ নিজ হাতে গড়ে,
বালুর কেল্লার মতো নিজেই সে ভাঙে গুঁড়ো করে।

আরো কত কী যে করে ফিরিস্তিতে কুলোনো যাবে না,
মানুষ নিয়েছে ভার শুধ্‌বারে বিধাতার দেনা।
তবুও স্রষ্টার কাছে মানুষের ছিল অঙ্গীকার
নব নব সৃষ্টি দিয়ে স্রষ্টারে সে করবে স্বীকার।

তাই আজ চাঁদে লোক যায়। সাইবেরিয়ার হিম
দ্রব হয়ে নদী পথে মরুগিরি করে শ্যামলিম।
রুদ্ধরেতঃ তপস্বীর অপ্রমেয় শক্তির সঞ্চয়
অনাচারী শাক্তের ব্যভিচারলিপ্সা করে জয়।

সূর্যলোকে যে জ্যোতিষ্ক আজো চোখে পড়েনি কাহারো
মনে হয় একদিন খুঁজে পাবে সন্ধান তাহারো
বীর্যব্রতধারী নর মেধা ও মস্তিষ্কে বলীয়ান,
যেদিন অকুণ্ঠ প্রেম অন্তর্লোকে হবে দীপ্যমান।

সেদিন পড়বে ধরা মহাকাশ করে অন্বেষণ
সে অমরা যার খোঁজে ব্যর্থ অনুসন্ধিৎসার পণ,
প্রতীচিত্তে নিত্য সেই দিব্যলোক অকান্ত প্রহর
জেগে আছে দিন গণে কে জাগাবে উন্মেষ শিহর॥

চাঁদের আগুনে পুড়ি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আগুনেতে সব পোড়ে
কেউ বা আঙার হয়, কেউ বা ছাই
ভাবলাম তাই
চাঁদের আগুনে পুড়লে কী দশা আমার
হবে আজ মাঝরাতে এই শনিবার?

ধীরে-ধীরে পুড়ে-পুড়ে যাই
অতীত ও বর্তমান নাই।
আশ্চর্য দহন
মনে হয় মানে বুঝি জীবনের এই প্রহসন।

এ-জন্ম, আগের জন্ম, পরের জন্মের সব কথা
অপ্সরা ও গণিকার ঘুঙুরের ছন্দবিহ্বলতা

পুড়ে-পুড়ে সব হয় ছাই
কী যে ছিলো, কী যে আজ নাই!

এদিকে বাঁশের পাতা কাঁপছে
কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল ধরছে।
মেঘ থেকে বৃষ্টি, তাই থেকে সৃষ্টি
তারপর তার কথা মনে যেন পড়ছে।

চাঁদের আগুনে আমি ধীরে-ধীরে পুড়ি
স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা ঝরণার নুড়ি।
শান্ত চোখের পাতা হিম-স্নিগ্ধ দেহ
সে-দেশে যাবার পথ আজিও দুর্জ্ঞেয়।

॥ ৪ ॥

এসব খবর গণেশ হালদার কিছুই জানতেন না। প্রথম প্রথম তাই তিনি একটু সংকোচ অনুভব করছিলেন। কিন্তু খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুকে ভালো লেগে যাবার পর এ ভাবটা আর থাকে নি, বিশেষ করে তাঁর স্বরচিত খামখেয়ালী রচনাগুলি পরিষ্কার করে লেখার সুযোগ পেয়ে তিনি আরও যেন ভালবেসে ফেলেছিলেন এই লোকটিকে। গণেশ হালদার ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র। শুধু তাই নয়, তিনি সাহিত্যরসিকও। তাই তিনি সুঠাম ডাক্তারের দুষ্পাঠ্য লেখার পাঠোদ্ধার করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ লোকটি কেবল ডাক্তার নন, কবিও। পেপিস-এর (Pepys) লেখা ডায়েরি এখন যেমন ইংরেজী সাহিত্যের আসরে সমাদৃত হয়েছে, ওঁর লেখাও হয়তো তেমনি একদিন হবে। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা, কিন্তু ওর উপর শাশ্বতের আলো পড়েছে।

সেদিন সকালে গণেশ হালদার ডাক্তার-বাবুর কাছে গিয়েছিলেন একটা কথার পাঠোদ্ধার করবার জন্যে। একটি রোগীর জরুরি দরকারে সেদিন ডাক্তারবাবুকে একটু সকাল সকালই ডিসপেন্সারিতে যেতে হয়েছিল। লোকটি বাইরে থেকে এসেছিল, রক্ত-পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে ট্রেন ধরবে। সেদিন রবিবার, গণেশ হালদারেরও ছুটি ছিল। তিনি এগারোটা নাগাদ ডিসপেন্সা-রিতে যখন গেলেন তখন ডাক্তারবাবু রিপোর্ট লিখছিলেন। গণেশবাবুকে দেখে বিস্মিত হলেন।

"কি খবর?"

"একটা কথা পড়তে পারছি না।"

"ও। আচ্ছা, বসুন।" তারপর চোখে-মুখে হাস্য বিকীর্ণ করে বললেন—"আমিও পারব কি না সন্দেহ।" গণেশ হালদার বসলেন। তারপরই ঢুকলেন একটি অপরিচিত লোক। রোগা-রোগা লম্বা চেহারা, মুখখানা ধূর্ত শৃগালের মতো। ডাক্তারবাবুকে সেলাম করে সে বললে,

"বসন্তলালের রিপোর্টটা নিতে এসেছি।"

"বসন্তলাল কই?"

"সে আসতে পারল না। আমাকেই রিপোর্টটা নেবার জন্য পাঠাল। এই চিঠি দিয়েছে।"

ডাক্তারবাবু চিঠিটা পড়ে রেখে দিলেন একধারে। তারপর রিপোর্টটা শেষ করে দিলেন তার হাতে। সে লোকটা ফি দিয়ে বলল, "একটা টাকা কম আছে।"

"কম কেন? বসন্তলাল তো গরীব নয়। তার অনুরোধে তাকে চার টাকা ছেড়েও দিয়েছি। আবার কমাচ্ছে কেন? আর কমাব না।"

"একটা টাকা ছেড়ে দিন।"

"আর এক পয়সাও ছাড়ব না।"

"ছেড়ে দিন একটা টাকা। আমি হিলসা-পুরে প্র্যাক্‌টিস করি। আপনাকে অনেক রোগী পাঠাব।"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন ডাক্তারবাবু।

"আমি রোগী চাই না। আপনি বাকি টাকাটা দিয়ে তবে রিপোর্ট নিয়ে যান।"

লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

"ছাড়বেন না একটা টাকা?"

"না। বসন্তলাল আমাকে বারো টাকা দেবে বলে গেছে।"

"আমি চেয়ে নিচ্ছি একটা টাকা।"

"তোমাকে চিনি না, তোমাকে দেব কেন? তোমার চেয়ে গরীব লোকের অভাব নেই, দিতে হলে তাদের দেব।"

লোকটা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিড়বিড় কি যেন বললে। তারপর টাকাটা বার করে দিয়ে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেল।

সে চলে গেলে ডাক্তারবাবু গণেশ হালদারের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "আমাকে চামার মনে হচ্ছে, না? কিন্তু ও লোকটা দালাল। ডাক্তারের টাউট, দু' একটা কেস এনে দিয়ে মনে করে মাথা কিনে নিয়েছে। ওদের আমি কখনও প্রশ্রয় দিই না। ওই টাকাটা ও নিজেই গাপ করত।

কই দেখি কোনখানটা পড়তে পাচ্ছেন না?"

গণেশ হালদার দেখালেন।

ডাক্তারবাবুও অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে রইলেন লেখাটার উপর। তারপর হাসি-মুখে চোখ তুলে বললেন, "আপনার কি মনে হচ্ছে কথাটা?"

গণেশ সসঙ্কোচে বললেন, "যা পড়তে পারছি তার থেকে তো কোন মানে হচ্ছে না। ল, জ, ভু, ও কাঁনথবং, কোনও ডাক্তারি কথা না কি?"

"না, সংস্কৃত কথা। গজভুক্তকপিত্থবৎ। আমার নিজেরই পড়তে একটু সময় লেগে গেল। মোটর যখন চলছিল তখনই লিখে ছিলাম। কলমের কালি ফুরিয়ে যেতে পেন্সিল দিয়েই লিখেছি ওখানটা। আমার 'গ'-গুলো প্রায়ই 'ল'য়ের মতো হয়ে যায়, আর 'প'-গুলো দন্ত্য 'ন'য়ের মতো। আবার 'ল'য়ে আর তালব্য 'শ'য়ে অনেক সময় কোনও তফাত থাকে না।"

বলেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

গণেশ হালদার বললেন, "ও, এখানটাও এবার পরিষ্কার হল তো হলে। 'অহঙ্কারের লজ্জ' আমি বুঝতে পারছিলাম না। ওটা হবে 'অহঙ্কারের গজ'। এইবার ঠিক হয়েছে।—"

আর একটি লোক এসে প্রবেশ করল। দীন-দরিদ্র চেহারা, মাথার চুল উসকো-খুসকো, জামা কাপড় তালি দেওয়া। বললে, "আমার উরুতে, আর হাতের অনেক জায়গায় অসাড় হয়ে গেছে। সাদাও হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। ঠাণ্ডার আর গরমের তফাতও বুঝতে পারি না।"

ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হচ্ছে কুষ্ঠ হয়েছে। রক্তটক্ত পরীক্ষা করতে ষোল টাকা খরচ হবে।"

সে তখন একটা চিঠি বার করে ডাক্তার-বাবুর হাতে দিলে। চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন, "ও, তাই না কি? আচ্ছা, তোমাকে কিছু দিতে হবে না। কাল দশটার পর এসো।"

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন। গণেশ হালদারও উঠলেন।

"চলুন, বাড়ি যাওয়া যাক। এখুনি খেয়েই আমাকে বেরুতে হবে।"

খেয়েই বেরিয়ে এলেন।

"বেচু, রেসকোর্সে যাব।"

"চলুন।"

বেচু ডাক্তারবাবুর ড্রাইভার। এ-দেশের লোক নয়। কলকাতা থেকে এনেছিলেন। সে-ও বাড়ির পরিজনদের মধ্যে। তবে সে বাড়িতে খায় না। সে মাইনে ছাড়া নগদ দু' টাকা করে খোরাকি পায়। তাই নিয়ে পথেঘাটে যখন যেখানে যেমন সুবিধা পায় খেয়ে নেয়। ওতেই ও খুশী। বেচুর প্রধান গুণ ও নির্বাক। ডাক্তারবাবু বাক্যবাগীশ চাকর পছন্দ করেন না। ডাক্তারবাবু সাধারণত লোকালয়ের বাইরে যান। মাঠে, গঙ্গার তীরে, জঙ্গলে যেখানে যখন খুশি। জায়গাটা জনবিরল হলেই হল। বেচু তাঁকে সেই জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা একটু দূরে নিয়ে চলে যায়। যতক্ষণ ডাক্তারবাবু না ফেরেন ততক্ষণ সে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে থাকে ধৈর্যভরে। সব সময় ঘুমোয় না। অনেক সময় পড়ে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। বেচু ম্যাট্রিক পাস, ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস পড়বার মতো বিদ্যে তার আছে। সে কিছুদিন কলকাতার ট্যাক্সি চালিয়েছিল। এক ট্যাক্সিতেই ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারপর ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখেছিল সে একটা। ডাক্তারবাবুর প্রয়োজন আর মাইনের বহর শুনে সে ট্যাক্সির চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। সুখেই আছে।

ডাক্তারবাবু গিয়ে নামলেন পীরবাবার সমাধিটার কাছে। অনেককাল আগেকার সমাধি, কতকালের কেউ তা জানে না। হিন্দু মুসলমান সকলেরই ভক্তি আকর্ষণ করেছেন

পীরবাবা। সমাধিটিকে ছায়া করে আছে দ্বটি গাছ। অদ্ভুত গাছ দ্বটি। চিরশ্যাম। ভাল করে দেখলে তবে বোঝা যায় দ্বটি গাছ দ্ব' জাতের, কিন্তু আপাত-দ্বষ্টিতে তারা যেন সহোদর। একটি গাছ ভগ্ন-কান্ড, কুব্জদেহ, বিধ্বস্ত। শোনা যায় একবার নাকি বাজ পড়েছিল তার উপরে। কিন্তু পীরবাবার সেবক বলে তার নাকি মৃত্যু হয় নি। বস্তুত, গাছটি তার খণ্ডিত ন্যুব্জ দেহ নিয়ে কি করে যে বেঁচে আছে তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ডাক্তারবাব্ব যখনই এখানে আসেন তখনই গাছ দুটোকে বারবার পরিক্রমণ করেন। তাঁদের সঙ্গে কথাও কন। সেদিন এসে বললেন, "কি ভায়ারা, কেমন আছ? না, ঠিকই আছ দেখছি, দমে যাও নি। কিন্তু যা যুগ পড়েছে, তোমাদের আদর্শ সব বানচাল হয়ে গেল। এখন মুখোশেরই আস্ফালন। তোমরা কেউ হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, অথচ সেবা করে চলেছ এক মুসলমান পীরের। যাই হোক, বেড়ে আছ তোমরা। আমিও যদি তোমাদের দলে ভিড়তে পারতুম! কিন্তু তা অত সহজ নয়।"

গাছের পাতায় পাতায় হাত দিয়ে আদর করলেন তাদের। তারপর চেয়ে রইলেন পাশের সর্ষে ক্ষেতটার দিকে। রেলের লাইন চলে গেছে মাঠের ধার দিয়ে। দুটো লাইন। ছোট লাইন, বড় লাইন। তারপরই ছোট একটি সর্ষে ক্ষেত। সেটির দিকে ডাক্তারবাব্ব এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন কোন আত্মীয়কে দেখছেন। বড় ভালো লাগে তাঁর জায়গাটি। চলে গেলেন ক্ষেতের মধ্যে। ক্ষেতের মাঝখানেই একটি ছোট অশ্বত্থ গাছ। সেও ডাক্তারবাব্বর বন্ধ্ব। গিয়ে তাকেও একবার পরিক্রমণ করলেন। কাঁচ কাঁচ পাতাগ্বলো থেকে আলো যেন পিছলে পড়ছে। তারপর একটা বসবার জায়গা খ্বঁজতে লাগলেন। একটা পাথর ছিল। তার উপরই গিয়ে বসলেন প্রথমে, কিন্তু তেমন জ্বত হল না। তাঁকে লিখতে হবে, চাই একটা ঠেস দেওয়ার মতো জায়গা! তিনি ইচ্ছা করলেই ভালো করে বসবার এবং লেখবার সাজসরঞ্জাম আনতে পারেন, বেচু একটা ভালো জায়গা দেখে তাঁর বসবার এবং লেখবার বন্দোবস্তও করে দিতে পারে, কিন্তু এ ব্যবস্থা স্তোম ম্বখ্বজ্যের মনোমত নয়। তিনি যখন প্রকৃতির কোলে এসে বসতে চান, এক জামা কাপড় ছাড়া মানবসভ্যতার অন্য কোন আড়ম্বর তিনি সঙ্গে আনতে চান না। তাঁর মনে হয় ওগ্বলো যেন প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের বাধা। ওসব আনলে প্রকৃতির ঠিক কোলটিতে বসা যাবে না। এতদিন তিনি কোনও অস্ববিধা ভোগ করেন নি, কিন্তু যেদিন থেকে গণেশ হালদারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতিদিন তাঁর জন্যে কিছু লিখবেন সেদিন থেকে একটু অস্ববিধা বোধ করছেন। সর্ষে ক্ষেতের মাঝে তিনি টেবিল চেয়ার আনতে রাজী নন। অথচ লিখতেই হবে। প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ তিনি করতে পারবেন না। হঠাৎ চোখে পড়ল রেলের ওপারে একটা কাটা গাছের গ্বঁড়ি রয়েছে। তাতে ঠেস দিয়ে বসলে লেখার খ্বব অস্ববিধা হবে না। সেইখানেই গেলেন। গিয়েই দেখতে পেলেন কয়েকটা ঘেঁটু-গাছও রয়েছে সেখানে, আর আশে-পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। 'বাঃ!' বলে বসে পড়লেন তিনি সেইখানেই চাপটালি খেয়ে। তাঁর পায়জামা খ্বব ঢিলা-ঢালা সেজন্য বসবার কোনও অস্ববিধা হল না। পকেট থেকে বার করলেন কয়েক টুকরো কাগজ—ওষ্বধের বিজ্ঞাপন। উত্তোলিত জান্বর উপর সেগ্বলো রেখে ভাবতে লাগলেন কি লিখবেন। বিজ্ঞাপনের ভালো ভালো কাগজে অনেক সাদা জায়গা থাকে। সেই সব ফাঁকগ্বলোই ভরিয়ে ফেলবেন ঠিক করলেন। লেখার বিষয় আগে থাকতে ভেবে আসেন না। ওখানে বসে যা মনে হয় লেখেন। খানিকটা লেখা নিয়ে কথা। এদিক ওদিক চেয়ে ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ঘেঁটুগাছগ্বলোর দিকে চেয়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। আর একটু এগিয়ে গেলেন সে দিকে এবং অনেকক্ষণ ঝ্বঁকে কি যেন দেখলেন। তারপর ফিরে এসে লিখলেন।

"এতক্ষণ ধরে যা দেখলুম, তা আগেও দেখেছি, পরেও দেখব। কিন্তু এখন যে কথাটা মনে উদ্ভাসিত হল তা হয়তো আর কখনও মনে হবে না। তাই লিখে রাখাই ভালো। হালদার মশাইও হয়তো এর থেকে চিন্তার খোরাক পাবেন কিছু। ব্যাপারটা কিছু নয়, একটা মাকড়সার জাল। ভোরে বেড়াতে এসে আগে এরকম জাল অনেক দেখেছি। জালের উপর শিশিরবিন্দু পড়ে অপরূপ দেখায় তখন ওগ্বলো। মনে হয় মণি-মাণিক্য-খচিত ওড়নার টুকরো পথে-ঘাটে ফেলে গেছে বোধ হয় রাতের পরীরা। কিন্তু এখন, দ্বপ্বরে, দেখছি ওটা সত্যিই জাল। দ্বপ্বরের রোদে শ্বধ্ব ওর একটা নয়, দুটো রূপ খ্বলেছে। স্বচ্ছ স্বতো দিয়ে তৈরী গোল চাকার উপর মোটা সাদা স্বতোর তৈরী কার্বকার্যও এখন দেখা যাচ্ছে। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সোজা চলে এসেছে এই মোটা স্বতোর কাজ তির্যক রেখায়। একটি চমৎকার স্বতোর চাকা, যার শুদ্ধ বাংলা চক্র। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শ্বধ্ব চক্র নয়, চক্রান্তও। সকাল বেলায় শিশিরের পরিমণ্ডলে যে জীবটিকে দেখতে পাওয়া যায় না, আমি অন্তত আগে দেখি নি, এখন রৌদ্রকিরণে তাঁর তিনটি রূপ দেখলাম। তিনি জাল স্বষ্টি করেছেন তাই তিনি ব্রহ্মা, তিনি ছোট ছোট পোকাকে ধ্বংস করছেন তাই তিনি মহেশ্বর এবং ওই পোকাগ্বলি খেয়ে নিজেকে তিনি
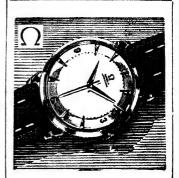
পালন করছেন, সুতরাং তাঁকে পালনকর্তা বিষ্ণু বললেও অন্যায় হবে না। হঠাৎ মনে হল সকলের মধ্যেই এই ত্রয়ী বিরাজ করছেন। তা হলে আমরা কি সকলেই ভগবান? একটু তফাত অবশ্য আছে। একটু নয়, মস্ত তফাত। এই সব ক্ষুদে ভগবান ত্রয়ী হয়েছেন স্বার্থের প্রেরণায়। বৃহৎ ভগবানের প্রেরণা আনন্দ। একটু আগে জালে নিপতিত ছোটো পোকাটাকে যখন ছটফট করতে দেখলাম, আর তার সঙ্গেই যখন দেখলাম জালাধিপতি মাকড়সা-টার বিপুল আনন্দ—তখন হঠাৎ, কেন জানি না, পোকাটার দুঃখে মনটা গল-গল হয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের আর একটা অংশ প্রথম অংশটার গালে এক চড় মেরে বললে, ওরে বেকুব, গল-গল হবার কি আছে এতে? প্রকৃতির ওই নিয়ম, ওরা নিয়ম পালন করে চলেছে, ওর ল-অ্যাবাইডিং সুতরাং সাত-খুন-মাপ। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও আছে, নিয়মভঙ্গ করবার ক্ষমতাই ওদের নিয়ে। এই যে কোটি কোটি খুন-

জখম হচ্ছে প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি হয় না। ওদের সে প্রয়োজনও নেই।"

এই পর্যন্ত লিখে ডাক্তারবাবু হঠাৎ দেখতে পেলেন দুটো বুলবুলি পাখী উড়ে এসে সামনের একটা নাম-না-জানা গাছের সরু ডালে বসে ডাকছে—কুন্ট' প্রিয়, কুন্ট' প্রিয়। দেখে ডাক্তারবাবু সন্তর্পণে একটি ঠোঙা বার করলেন পকেট থেকে। তাতে পাঁউরুটির গুঁড়ো,, লজেন্সের গুঁড়ো, বুট ভাজা, বাদাম ভাজা, নানারকম ডাল, ধান একসঙ্গে মেশানো আছে। তিনি তার থেকে একমুঠো বার করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন বুলবুলি দুটোর দিকে। একটু এগিয়েই ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন গুঁড়োগুলো। তাঁর ইচ্ছে বুলবুলিরা ওগুলো খাক। বুলবুলিরা কিন্তু খেল না, উড়ে গেল। বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন সুঠাম মুখুজ্যে। খানিকক্ষণ বসে থেকে পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল্ বার করে বাজালেন সেটা। এটা বেচুকে গাড়ি আনবার সঙ্কেত। একটু পরেই দেখা গেল, বেচু গাড়ি আনছে। গাড়ি আসতেই চড়ে বসলেন তাতে।

"চল গঙ্গার ধারে কোথাও। যে দিকটায় ইঁটের ভাটাগুলো আছে, সেই দিকে চলো।"

গণেশ হালদার যে আউট-হাউসটাতে থাকেন তার সঙ্গে ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে বাইরের রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। বাইরের দিকে ছোট একটা ঘরও আছে। সেইটেতেই একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার পেতে গণেশ হালদার নিজের পড়াশোনার ঘর করেছেন। খুব ভোরে ওঠেন তিনি। উঠেই ছোট একটা স্টোভ জেলে চায়ের জল চড়িয়ে দেন তাতে। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্বহস্তে প্রস্তুত এক কাপ চা খেয়ে তিনি খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকেন ধ্যানাসনে। ঠোঁটগুলো নড়তে থাকে। মনে হয় কোনও স্তোত্র পাঠ করছেন। একটু পরেই তাঁর ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। ঠিক পাঁচটার সময় হালদার মশাই টেবিলে এসে বসেন। শীতকালে আলো জ্বালাতে হয়, গ্রীষ্মকালে সামনের ছোট জানলাটি খুলে দিলেই আলো আসে। প্রথমেই হালদার মশাই স্কুলের ছেলেদের খাতাগুলি সংশোধন করেন। তিনি এখানে এসে 'হোম টাস্ক' (home task) ব্যাপারটার পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। খাতাগুলো দেখে, সময় থাকলে, তিনি নিজের ডায়েরি লেখেন। সম্প্রতি ডাক্তারবাবুর লেখাগুলো পরিষ্কার করে টোকাও তাঁর আর একটা কাজ হয়েছে। প্রথমে তিনি নিজের ডায়েরিই লেখেন। তারপর ডাক্তারবাবুর লেখাটার পাঠোদ্ধার করেন।

সেদিন তিনি ডায়েরিতে লিখছিলেনঃ— "এক দেশ থেকে উন্মূলিত হয়ে দলে দলে মানুষ অন্য দেশে গেছে ইতিহাসে একথা নূতন নয়। কিন্তু আমাদের বেলায় একটু নতুন ধরনের ব্যাপার হয়েছে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের তদারকে এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন হল, পাকিস্তানের হিন্দুরা তাদের বিষয়সম্পত্তির মূল্যও পেল, কিন্তু বাংলা দেশের ক্ষেত্রে সেটা হল না। বাংলা দেশের উদ্বাস্তুরা জলে-স্থলে অনলে-অনিলে ছড়িয়ে পড়ল অসহায় গরু-ভেড়ার মতো। কেন? এ কেন'র উত্তর কর্তৃপক্ষেরা দিয়েছেন কি না আমার জানা নেই। আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত তাই আমার কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমাদের মর্মের উপর দিয়ে এই যে তপ্ত লোহার রোলার চালানো হল এর কি কোনও প্রতিকার নেই? কিন্তু ইতিহাস পড়তে পড়তে এ সব কথা মনে হয় নি, এত কষ্ট পাইনি। কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে মানুষেরই হাতে, এই তো মানুষের ইতিহাস। আমি যখন ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম, তখন চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুরলঙের রক্তাক্ত কাহিনী পড়ে কি শিউরে উঠতুম? ইজিপ্টের ফারাও যখন জুদের ইজিপ্ট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তা পড়ে কি মনে কোনও শিহরন জেগেছিল আমার? ওলড্ টেস্টামেণ্টের এ সব কাহিনী তো উপন্যাসের মতো পড়েছি। আমাদের নিয়ে কি কোন ওলড্ টেস্টামেণ্ট রচিত হবে? আমাদের মধ্যে কি মোজেস্ আছে কেউ? কে জানে! ইতিহাসের স্তরে স্তরে কিন্তু জমা হচ্ছে অনেক জিনিস। এই ইহুদীদের উপর কি কম অত্যাচার হয়েছে? হয়ে শেষ হয়ে যায়নি, যুগে যুগে হচ্ছে। কিন্তু কি বিচিত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ ওদের জাতীয় ইতিহাস! মানব সভ্যতার এমন কোন বিভাগ আছে কি যা ওদের দানে সমৃদ্ধ নয়? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প, নৃত্যকলা, খেলাধুলো এমন কি সার্কাসে পর্যন্ত ওদেরই কৃতিত্ব। অথচ হিটলার ওদের উপর কি পাশবিক অত্যাচারই না করেছিল! আজ হিটলার কোথায়? কিন্তু জর্মন-সভ্যতার অঙ্গে অঙ্গে আজ ওদের দেওয়া মণি-মাণিক্য ঝলমল করছে। তা কি কেউ কখনও মুছে দিতে পারবে? পারবে না। কিন্তু কথায় কথায় আমি প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। যে কথাটা আমি এখনি ভাবছিলাম তা হচ্ছে ইহুদী নরনারীর উপর নাৎসী জার্মানীর যখন অকথ্য অত্যাচার চলছিল তখন আমি কি মুষড়ে পড়েছিলাম? হিরোশিমায় জাপানীদের উপর যখন মার্কিনী অ্যাটম্‌বোমা পড়ল সে খবর পড়ে কি আমার
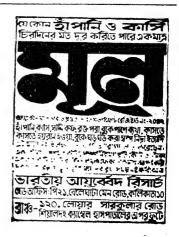
রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত হয়েছিল? লজ্জার সহিত স্বীকার করতে হচ্ছে হয়নি। সে খবর শোনবার পরও আমি ঘুমিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়। আমার চোখের সামনে একবার একটা ছেলে মোটর চাপা পড়েছিল, তার রক্তাক্ত দেহটা আমি দেখেছিলাম। তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। তার ঘাড় লটকে পড়েছিল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার গালটা আর কপালটা। কিন্তু এসব প্রত্যক্ষ করেও আমি তেমন বিচলিত হইনি। তারপর বাড়ি গিয়ে স্নান করেছিলাম, খেয়েছিলাম, একটা ফুটবল ম্যাচও দেখেছিলাম এবং তার দু'দিন পরে সব ভুলেও গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়ছে। আর একটা জিনিসও লক্ষ করেছিলাম তখন। মোটর চাপা পড়তেই খুব ভিড় হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, রাস্তার কয়েকটা গুন্ডা গোছের ছোকরা ড্রাইভারটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নৃশংসভাবে মারধোর করেছিল, পুলিস এসেছিল, কিন্তু যে-ই এটা নিঃসংশয়ে জানা গেল যে, ওই ছেলেটি কারও আত্মীয় নয়, তখনই ভিড় কমে গেল, আস্তে আস্তে সরে পড়ল সবাই। এখন মনে হচ্ছে ছেলেটির কি মা বাবা ছিল? ভাই বোন ছিল? কোথায় ছিল তারা তখন? তাদের বুক-ফাটা আর্ত হাহাকার শুনতে পাইনি বলে মনে হচ্ছে সেই দুর্ঘটনার মধ্যে যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল, যা হওয়া উচিত ছিল যেন হয়নি। এরকম ঘটনা পৃথিবীতে অহরহ ঘটছে, কিন্তু এ কথা কি আমাদের অহরহ মনে থাকে অত্যন্ত নিকট আত্মীয় ছাড়া কেউ হাহাকার করে না? অনাত্মীয়ের বিয়োগে কেউ আন্তরিক শোক-প্রকাশ করে না এইটেই নিয়ম। তবু আমি আশা করছি কেন যে, আমাদের শোকে ভারতবর্ষ-সুদ্ধ লোক হাহাকার করবে? করা তো নিয়ম নয়। কিন্তু তবু আশা করছি, কামনা করছি, দাবি করছি, আন্দোলন করছি ওরা আমাদের নিতান্ত আপন লোক, আমাদের ক্ষতিপূরণ করুক। ওরা করছেও, তবু আমরা সন্তুষ্ট হচ্ছি না। হচ্ছি না, কারণ মনে করেছিলাম ওরা আমাদের আত্মীয়, ওরা আমাদের নিতান্ত আপন লোক, আমাদের দুঃখের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু এখন আবিষ্কার করেছি ওরা আমাদের অনাত্মীয়, ওরা পর, ওরা যা করছে তা বাইরের শোভনতা বজায় রাখবার জন্য করছে, অভিনয় করছে (আমাদের নেতাদের মধ্যে যে অনেক উঁচুদরের অভিনেতা আছেন তাতে সন্দেহ কি) সত্যিকার দরদ ওদের মধ্যে নেই, থাকতে পারে না, থাকা নিয়ম নয়। আসলে ওরা মনে মনে জানে আমরা সব অবাঞ্ছিত জঞ্জাল, কিন্তু বাইরে ভান করছে অন্যরকম। সাপ ছুঁচোকে ধরেছে, গিলতেও পারছে না, ফেলতেও পারছে না। এ রকম ধরনের নানা কথা মনে হয়। আবার এ-ও মনে হয়, আমার এ সব ধারণা হয়তো ভুল। হয়তো ওরা......কিন্তু আমার এই মনে-হওয়াটাকে আবৃত করে ফেলে একটা নিদারুণ ছবি। শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুদের ছবি। বুলিকে আর মাকে খোঁজবার জন্যে অনেকদিন সেখানে ঘুরেছি। যে সব মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখেছি তা ভোলবার নয়, মনুষ্যত্বের এত বড় লাঞ্ছনা, এত বড় অপমান যারা নির্বিকার হয়ে সহ্য করছে তাদের আপন লোক বলে ভাবি কি করে? একদল অসহায় নরনারী, শিশু, পীড়িত জলে ভিজছে, রোদে পুড়ছে, শীতে কাঁপছে, উঞ্ছবৃত্তি করছে সুসভ্য কলকাতা শহরের বুকে। লোকে যেমন সার্কাসের জন্তু-জানোয়ার দেখতে যায়, তেমনি তাদের দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল দর্শক। মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করছে, কিন্তু কেউ ক্ষেপে উঠছে না, কেউ জোর গলায় বলছে না, আমরা এ অত্যাচার সহ্য করব না—যতক্ষণ না এর প্রতিকার হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কলকাতা-বাসীরা অন্নজল ত্যাগ করব, আমরাও ওদের সঙ্গে মরব। দেখেছি, উপহাসও করছে অনেকে! এরা কি সভ্য? এরা কি আপনার লোক? প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাখী-বন্ধন উৎসব হয়েছিল শুনেছি, সেই ইংরেজ রাজত্বের আমলেও অচেনা লোকের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে একান্ত আত্মীয়তার দাবি জানিয়েছিল বাঙালী। কবি গান গেয়েছিলেন, 'বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান'। এ সব কি স্বপ্ন? ভাঙা বাংলা জোড়া লেগে আবার ভেঙে গেল। বিদেশী রাজনৈতিকের চালে হেরে গেল আমাদের শিক্ষিত প্রতিভাবান আদর্শবাদী নেতারা। অস্বীকার করবার উপায় নেই, হেরেই গেছে। ডিভাইড অ্যান্ড-রুলের শাণিত খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড হয়ে গেছে

প্যারিস, ফেব্রুয়ারী। শীত আর বসন্ত ঋতুতে যত চিত্রপ্রদর্শনী হয়, তেমনটি অন্য ঋতুতে নয়। শীতকালে প্যারিসে প্যারিসিয়ানরা ঠাণ্ডার ভয়ে প্যারিসের বাইরে পা বাড়াতে চায় না। একটু গরম পড়া শুরু হলেই প্যারিসিয়ানদের দল সুড়সুড় করে এধারে ওধারে ছিটকে পড়ে। গ্রীষ্মকালে প্রদর্শনী খুললে যদি খোদ প্যারিসিয়ান দর্শক না পাওয়া যায় তা হলে তেমন প্রদর্শনীর সার্থকতা কোথায়? তাই শীত আর বসন্তকালে যত চিত্রপ্রদর্শনীর ভিড়। প্যারিসে আর্ট গ্যালারি আর আর্ট মিউজিয়মের সংখ্যা একটা দুটো নয়। কম করে হাজারখানেক। কলকাতায় ক'টা? যাই হোক, কয়েকটা আন্তর্জাতিক আর বিলিতী আর্ট প্রদর্শনীর হিসেব দিচ্ছি।

'পেতি পালেতে' হয়ে গেল সাত হাজার বছরের পারস্যের আর্ট প্রদর্শনী। জানুয়ারীর শেষ পর্যন্ত চলেছিল 'ম্যুজে আর নুশি'তে কোরিয়ান আর্ট-এর প্রদর্শনী। 'ম্যুজে দার মদার্ন'-এর চলেছে যুগোশ্লাভ চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। কিউবিজম-এর পুরোহিত চিত্রকর জর্জ ব্রাক্-এর চিত্রকলা প্রদর্শনী চলছে ল্যুভ্র্ মিউজিয়মে। কোনো জীবিত ফরাসী চিত্রকরের চিত্রকলা প্রদর্শনী ল্যুভ্র্ মিউজিয়মে তার জীবদ্দশায় হয়েছে বলে জানা নেই। ব্রাক্-ই তার ব্যতিক্রম। বিশেষ করে অতি আধুনিক কিউবিস্টদের ল্যুভ্র্ মিউজিয়মে প্রদর্শনী কম ভাগ্যের কথা নয়। সাধারণত কোনো শিল্পীর পক্ষে, তিনি আধুনিক বা পুরোনো যে ঢঙেই আঁকুন না কেন বেঁচে থাকতে ল্যুভ্র্ মিউজিয়মে স্থান পাওয়া সোজা কথা নয়। সে অনেক ভাগ্যের কথা। অনেকে বলছেন, সাহিত্যিক ও শিল্পরসিক মঃ আঁদ্রে মালরো ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেই তা সম্ভব হয়েছে। অন্য কোনো গোঁড়াপন্থী মন্ত্রী হলে সম্ভব হত না। তাই মডার্ন আর্টপন্থীদের জয়-জয়কার চলছে। আর্ট-জগতের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর স্পেনের গইয়া-র চিত্রকলা প্রদর্শনী চলছে ম্যুজে জাক্‌মার আঁদ্রেতে। সপ্তদশ শতকের গইয়া-র আঁকা চিত্রপট দেখলে মনে হবে যেন পঞ্চাশ বছর আগেকার আধুনিকপন্থীদের আঁকা ছবি। গইয়া-র আঁকা 'মায়া নু' ছবিখানি অবলম্বন করে মার্কিনরা তো বছরখানেক আগে সিনেমা ছবি তোলে।

ম্যুজে গাইয়েরাতে চলছে 'পথ-ঘাট'কে বিষয়বস্তু অবলম্বন করে খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীদের আঁকা চিত্রপটের প্রদর্শনী। প্রতি বছরে এই সময়ে ম্যুজে গাইয়েরাতে অর্ডার মাফিক চিত্রপ্রদর্শনী হল এর বৈশিষ্ট্য, ফ্রান্সে এর জুড়ি নেই। অর্ডার দিয়ে আর্ট হয় না তা জানেন শিল্পীরা। কিন্তু এই প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষরা

এ এল দ্যপ্যুই-য়ের ভাস্কর্য : গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছে তিন বুড়ি।

বিষয়নিষ্ঠ আর্টের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন যে, আজকের দিনে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা নিয়ে এক এক বছরে শিল্পীদের অর্ডার দিয়ে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। প্রতি বছরে হচ্ছেও তাই। এক এক বছরে এক এক ঢঙয়ের চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে থাকে। এ বছরে হচ্ছে 'পথ-ঘাট' নিয়ে। গ্রামের পথ, জংলী-পথ, বন-পথ, শহরের পথ, এইসব নিয়ে বিভিন্ন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীরা যা এঁকেছেন তারই প্রদর্শনী চলছে।

আরেকটি প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেল এই ক'দিন আগে, 'ম্যুজে দার মদার্ন'-এ। এটি হল তরুণ শিল্পীদের আঁকা চিত্রকলার প্রদর্শনী। তাতে দেশ-বিদেশের অনেক তরুণ শিল্পীর আঁকা চিত্রপট স্থান পেয়েছিল। চার-পাঁচটি ভারতীয় শিল্পীর আঁকা চিত্রপটও ছিল তাতে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল কলকাতার আর্টিস্ট শ্রীশাঁক বর্মণের আঁকা একটি তৈলচিত্র। শ্রীশাঁক বর্মণ প্যারিসে বছর কয়েক কাটিয়ে গেছেন।

আভেন্যু রাপ্-এর দ্যুলাক্ আর্ট গ্যালারিতে চলছে এক মজার ভাস্কর্য প্রদর্শনী। মঁ দ্যপ্যুই নামে এক ভাস্কর পুরোনো লোহা-লক্কড়, এমন কি পুরোনো লম্বা পেরেক বা ইস্ক্রুপ দিয়ে যে সব 'মূর্তি' সাজিয়েছেন তা সত্যি দেখবার মতন। তিনটে পেরেককে গেঁথে এমনভাবে দাঁড় করিয়েছেন তিনি, যার নাম হয়েছে, 'গির্জা হতে বেরিয়ে আসছে তিন বুড়ী'। এমনি সব বিষয়বস্তু। কিন্তু তার মালমসলা এসেছে পুরোনো লোহা-লক্কড় থেকে।

আর্ট চর্চার শহর প্যারিস। আর্টিস্ট নয় এমন অনেকের আঁকা চিত্রপটের প্রদর্শনী চলছে গ্যালারি শারবানতিয়ের-এ। তবে যাদের আঁকা চিত্রপট এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে তারা কিন্তু যে সে লোক নয়। তারা প্রায় সবাই কেষ্ট বিষ্টু গোছের। যেমন, সাহিত্যিক ফ্রাসোঁয়া সাঁগ, নাট্যকার মার্শেল আশার, সিনেমা তারকা জঁ মারে, 'মিশেল মরগ', পিয়ের ব্রাশার ইত্যাদি। আর আছেন যাঁরা সাহিত্য বা শিল্পের ব্যবসাদার নন। যেমন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ল্যব্রান্স র‍্যাংগ (ইনি ফরাসী আকাদেমির সভ্য), দাঁতের ডাক্তার লোবাডা, কোটিপতি রথ্‌শিল্ড-এর স্ত্রী। তবে আশ্চর্য করেছে মঁ ভিবো। মঁ ভিবো ছিলেন প্যারিসের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা। তিনি যে পুলিসের লাঠি-বন্দুক ছেড়ে চিত্রকরের তুলি ধরেছেন তা অনেকের জানা ছিল না। তিনি যদি পুলিস বাহিনীর হাতে লাঠির বদলে আরবার তুলি তুলে যদি দেন তা হলে আর কাউকে হাসপাতালে যেতে হবে না। পুলিসকর্তার লাঠিচর্চা ছেড়ে তুলিচর্চা কি মানায়? কথায় বলে, 'যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।' শুধু এদের নিয়ে চিত্রপ্রদর্শনীটি মেতে থাকলে কোনো কথা ছিল না। এদের মধ্যে যোগ দিয়েছে চিত্রকর হিসেবে প্যারিসস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ গ্যাভিন, বেলজিয়ামের রাজমাতা এলিজাবেথ প্রভৃতি। শুধুই কি এদের আঁকা চিত্রপ্রদর্শনী? এইসব ছবি নিলামে বেচে উঠেছে লাখ খানেক টাকা। সেই টাকা পাঠানো হবে ইস্রায়েল-এর এক দাতব্যখানায়।

আর্ট-এর কথা যখন উঠেছে তখন আর্টের আরেক সরকারী খবর দেওয়া যাক। তবে এ খবর আর্টিস্টদের নিয়ে। প্যারিসে আর্টিস্টদের জন্যে একটি ছোট কলোনি বানাবার ব্যবস্থা করেছে ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর। আর্টিস্টদের

বাসস্থান ও স্টুডিও নিয়ে কয়েক শত ফ্ল্যাটের বাড়ি শীঘ্রই নির্মিত হবে প্যারিসের পৌরভবনের পাড়ায়। সেখানে আর্টিস্টরা অল্প খরচে থাকতে যেমন পারবে তেমনি অল্প খরচে স্টুডিওর সুবিধেও পাবে। আর্টিস্টরা বাসস্থানের সমস্যা সমাধান করতে পারলে তারা আরও বেশী সময় দিতে পারবে তাদের আর্টচর্চায়।

প্যারিসে এখন দুটো জিনিসের কাটতি সবচেয়ে বেশী। একটি হল বই আর আরেকটি হল গ্রামোফোন রেকর্ড। এবং এই দুইটি ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গলকে নিয়ে। দ্য গলকে ব্যঙ্গ করে লেখা বইটির নাম 'লা কুর' বা রাজসভা, বইটি লিখেছেন কাটুর্ন সাপ্তাহিক 'কানার অ্যাশেইনে' পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখক মঁ আঁদ্রে রিবো (লেখক নাম রোজে ফ্রেসো)। এই বইতে দ্য গলকে বিগত দিনের ফরাসী সম্রাট বলে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রথম দুই মাসে বই-এর কাটতি হয়েছে ৮০,০০০ কপি। আর দ্বিতীয়টি হল গ্রামোফোন রেকর্ড। এটি হল দ্য গলের বক্তৃতার অনুকরণ। মঁ আঁরি তিজো নামে এক প্রাক্তন থিয়েটার অভিনেতা দ্য গলের গলার স্বর, বলার ভঙ্গী সব কিছু অনুকরণ করে প্যারিসের রাস্তায় মোটর গাড়ির ভিড় নিয়ে শ্লেষাত্মক রেকর্ড বাজারে ছেড়েছেন। ইতিমধ্যে বিশ লাখ রেকর্ড বিক্রি হয়ে গেছে।

ইউরোপে এক এক বছরে এক একটা নতুন নাচের ঢেউ এসে লাগে। এতদিন ছিল রক অ্যান্ড রোল, চা-চা ইত্যাদি আরও কত কি। এবার মাস কয়েক হল 'ট্যুইস্ট' নাচের ঢেউ সব ভাসিয়ে দিয়েছে। শুধু কি নাচ? 'ট্যুইস্ট' নাচ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে আমেরিকায় ও য়ুরোপে। কিন্তু বলছে 'ট্যুইস্ট' নাচ ভাল। তাতে ডন বৈঠকের কাজ হয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। কেউ বলছে তাতে শরীরের কোনো অংশ জখম হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুবার 'ট্যুইস্ট' নাচ নাচলে পেটের ভাত হজম হতে বাধ্য। একশ'টা ডন-বৈঠকের কাজ। নিউ ইয়র্কের এক ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেছেন যে, ছাত্ররা ক্লাস শুরু করার আগে রোজ সকালে যদি 'ট্যুইস্ট' নাচ নাচে তা হলে তাদের ব্যায়াম করার কাজ হয়ে যাবে। এই নিয়ে ইউরোপে এখন বেশ বাক্-বিতণ্ডা চলছে। তবে ট্যুইস্ট নাচের রেকর্ড খুব বিক্রি হচ্ছে।

প্যারিসে এখন 'ওত্ কুতুর' বা উচ্চ বিলাসিতার পোষাক—দোকানের বাৎসরিক পোশাক প্রদর্শনী চলছে। এবারকার পোশাকের অনেক নতুন মডেলের নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্যুইস্ট'। এর থেকেই বোঝা যাবে 'ট্যুইস্ট' নাচের জনপ্রিয়তা। 'ট্যুইস্ট' নাচের জয়জয়কার চলছে।

প্যারিসিয়ান

পত্রগুচ্ছ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(দেবপ্রসাদ সিংহকে লিখিত)

[ধূর্জটিপ্রসাদের সংগে আমার পরিচয় অল্প কয়েক বছরের হলেও তিনি আমাকে আপন হৃদয়ের মহত্ত্বের দ্বারা ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছিলেন। সে আমার সৌভাগ্য। এমন সদালাপী মজলিসী সহৃদয় মানুষ যে কোন সময়েই দুর্লভ। ধূর্জটিপ্রসাদকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত যে একটা মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয় কেমন সুন্দরভাবে যুক্ত হতে পারে।

সেই আন্তর মানুষটিকে জানবার পথে সাহায্য হতে পারে ভেবেই বিভিন্ন সময়ে আমাকে লেখা তাঁর কয়েকটা চিঠি প্রকাশের জন্য দিলাম। বিশেষত, পাঠক এগুলির ভেতর দিয়ে তাঁর শেষজীবনের ভাবনাচিন্তার সংগে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।

—দেবপ্রসাদ সিংহ]

=১=

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম। আমার রচনা তোমার ভালো লেগেছে শুনে ভালো লাগল। 'মনে এলো' সম্বন্ধে অনেকেই রায় দিয়েছেন; কিন্তু কিনছে কিনা বুঝতে পারছি না। 'অন্তঃশীলা' সম্বন্ধে অথৈবচ। সে যাই হোক, অনেকের পছন্দ হয়েছে জানি, এবং আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ।

'মনে এলো' ঠিক কিভাবে লিখেছি জানি না। একটা অংশ ডায়েরী, অন্য অংশ নোট; তাও আবার ভিন্ন ধরনের ডায়েরী, অন্য ধরনের নোট। সবচেয়ে বেশী হল খেলা, খামখেয়ালের খেলা। মাথায় যেসব বই নিয়ে এসেছে আলোচনা নয়, নিয়ে আসা—তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, ঠিক হালকাভাবে নয়, কারণ বক্তব্যের মধ্যে ফাজলামি নেই, অথচ নিতান্ত গুরুগম্ভীরভাবেও নয় কারণ তা হলে প্রবন্ধ হতো। ঠিক কিভাবে বলতে পারি না, অথচ খানিকটা আমার মতো ভাবে। এইটুকুই আমার।

'অন্তঃশীলা' একটি মাত্র অংশ, বাকী আরো দু'টি। একসংগে তিনটি নভেলই পেলে পোড়ো। একত্রে তিনটি পর্যায়ের আলোচনা শুনব। খগেন, সাবিত্রী, রমলা সম্বন্ধে বিপরীত মনোভাব দেখে রাগ না হয়ে ভালো লাগছে শুনে তোমার সাহিত্য-প্রীতি স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমটা রাগ হয়, তারপর সামঞ্জস্যটা বুঝতে পারলে রাগ থাকে না। তিনজনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমান—অন্তত তাই চেয়েছি। রমলা দেবীর নীরবতা কথা বলার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

সোসিওলজী সম্বন্ধে দু' কথা লিখতে বলেছ। ও-সম্বন্ধে 'দু কথা' লেখা যায় না সেইজন্য লেখাও অচল। অর্থনীতি সম্বন্ধেও আমার অজ্ঞানতা অসীম। কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়

২২।১।৫৭

=২=

দেবপ্রসাদ,

তোমার মনে অনেক অজানা মনোভাব ওঠে আবার চলে যায়। তাদের খানিকটা আমার কাছে ধরা পড়ে। সব জিনিস ফুটে ওঠে না, আবছা ধরনের খানিকটা। যেটুকু ফুটে ওঠে, সেইটুকুই যথেষ্ট।

আমার কাছে ওয়ার্লড ফেডারেশন সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। বিদ্যার ওজন নিরর্থক; আমি যা বুঝেছি তারই খানিকটা বলছি। খানিকটা এই জন্যে যে, আমি সত্যই অসুস্থ, আমার মস্তিষ্কে আলোচনা করা উচিত নয়, করতে পারিও না।

(১) কুত্রাপি ওয়ার্লড ফেডারেশন হয়নি, কখনও নয়, এখনও নয়।

(২) কিন্তু সর্বদাই ওয়ার্লড ফেডারেশনের দিকে চেষ্টা চলছেঃ প্রথম চেষ্টা প্রোফেটদের কাছ থেকে, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি। দ্বিতীয় চেষ্টা য়ুরোপীয়ান যুগের প্যাপাসি। তারপর এম্পেরর, দুয়ের চেষ্টা। তারও পর পণ্ডিতবর্গের খেলা, যেমন কাণ্ট প্রভৃতির। এর উদ্দেশ্য ইউনিভার্সাল পীস্ আন্ড হারমনি। মিস্টিকদের সমীকরণ প্রচেষ্টা বরাবরই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তাদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ—প্রফেটদের বেশী।

(৩) ওয়ার্লড ফেডারেশন-এর প্রতি আকর্ষণ ওঠে এক প্রকারের অনুষ্ঠানের জন্য, যেমন লীগ অব নেশনস, ইউনাইটেড নেশনস ইত্যাদি। পিছনে যুদ্ধের সরঞ্জাম থা[illegible] এবং তারও পেছনে revolutionary fervour—যেমন ফরাসী বিপ্লব, রুশ, চীনে ও ভারতীয়। এই ক'টার টানাপোড়েন চলে। আইডিয়ার জগতে ওয়ার্লড ফেডারেশন খানিকটা এসে যায়, যেমন বিজ্ঞানের বেলা, দর্শনের বেলাতেই খানিকটা। কিন্তু সেই ভৌগোলিক কিংবা আঞ্চলিক ন্যাশনালিজম্ এসেই পড়ে। ভারতে খানিকটা সামঞ্জস্য চলছে, বেশী দূর নয় কিন্তু।

মোটামুটি যৎসামান্য কিছু লিখলাম।... আমার ইচ্ছে হয় বেশী লিখতে, কিন্তু লেখা অন্যায়।

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়

২১।২।৫৭

=৩=

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার শরীর কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না......

চৌর্যবৃত্তি সকলেরই, কারুর বেশী কারুর কম। চিন্তার গোড়াতেই চুরি, তারপর সড়গড় হলে চুরি নিজের হয়ে যায়, তারও পরে, সহজ হবার পর, আবার চুরি। এই চক্রটা চিরটা কাল। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ

নিজের কথা কয়, সবই ধার করা। যেখানে নতুন সেখানে ভাষার পরিবর্তন। আমার জীবনে দশ-বারজনই সত্যকারের নতুন চিন্তার প্রণয়ন করেন। হয়ত যা কিছু নতুন তার পিছনেও সেই পুরাতন, কেবল জানতে পারি না বলেই নতুন হতে পারে। আমার পরিমাণ ক্ষুদ্র বলেই এই কথা মনে হয়। নতুন মানে নতুন সাজানো। অনেক বই পড়লাম, অনেক কথা শুনলাম—সেই বই, সেই কথা শুনে মন একরকম ভাবে সেজে উঠল, তখন মনে হল নতুন কথা কইছি। সেজে ওঠাটাই আদত কথা। শাস্ত্রে বলে, নতুন পুরাতনের জের।

"মনে এলো" কিভাবে পড়ছ? তার কতটা 'নিজের' জানতে চাই না। কতটা 'জানা' সেটাই চাই। ওয়ার্লড ফেডারেশন সম্বন্ধে এক সময় নাড়াচাড়া করতাম, এখন ভালো লাগে না। জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ, এই সব নিয়ে চিন্তা করতে ভালো লাগত, এখন তাদের সীমা বুঝি। কখনও যদি সময় পাই, লিখব। "আমরা ও তাঁহারা" বইখানির নতুন
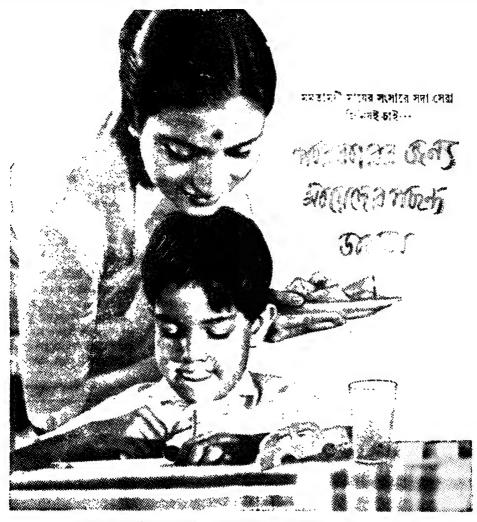
সংস্করণ বেরিয়েছে, পড়ে দেখো কিছু না কিছু মিলবে।

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়
৬।২।৫৭

— ৪ —

দেরাদুন

দেবপ্রসাদ,

তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েছি।......

আশীষ বর্মণের রচনাটি পড়লাম। বেশ ভাল লেগেছে। আমার সম্বন্ধে লেখার জন্য ত বটেই, অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন সেজন্যও। ......আমাকে হেনরী জেমস্ আর মার্সেল প্রুস্ত-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন দেখে কৃতজ্ঞ হলাম বটে, কিন্তু ঠিক খুশী হতে পারলাম না। ওদের দুজনের বিশেষত প্রুস্ত-এর প্রভাব আমার উপরে বেশী। তবে প্রভাব—এর বেশী নয়। আবর্ত ও মোহানাতে কিছু কম। অবশ্য রয়েছে বেশ।........

আমাদের উপন্যাস সত্যিই অ-বিচিত্র। কোনো শাঁস নেই, ও নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা যায় না। মাতামাতি করাই চলে।......এখনও উপন্যাসের হাত আমাদের নিতান্ত কাঁচা। গোরা মন্দ নয় নিশ্চয়। অবশ্য বিদেশী উপন্যাসের তুলনায়। এবং সে তুলনা আমাদের করতেই হবে।

এক হিসেবে তুমি ঠিকই বলেছ যে, "মনে এলো" পুরনো কালের কথা। তা ত হবেই। আমার অনেক 'ভ্যাল্যুজ' গুলি পুরাতন ধরনের। এক জায়গায় লিখেছি "এক কালে আমাদের মা ছিল।" নিতান্ত ছোট কথা, কিন্তু আমার মনের কথা। কিন্তু ভবিষ্যতেরও উল্লেখ করেছি অনেক স্থলে। সে ভবিষ্যৎকে সমালোচনা করেছি। আমি বার্ক-এর উল্লেখ করেছি। আমার মধ্যে কিছু অংশ রক্ষণশীল রয়ে গেছে। বুদ্ধি দিয়ে এক্সপেরিমেণ্টাল ভাবি বেশীর ভাগ সময়, কিন্তু 'ভ্যালুজ'-গুলি ট্র্যাডিশনাল হয়ে যায় কিছু পরিমাণে। বিশেষত ইমোশান-এর বেলায়।

"মনে এলো" ঠিক কিভাবে তৈরী করেছি জানি না। সত্যই জানি না। অবশ্য একটা প্রকাণ্ড অংশ বই-এর আশ্রিত। সেটাই বোধ হয় প্রথম। তারপর অভিজ্ঞতা এসেছে। ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না।

'মনে এলো' ভালো লেগেছে তোমার এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

৭।৬।৫৭

— ৫ —

দেবপ্রসাদ,

তোমার চিঠি পেলাম। প্রুস্ত পড়তে আরম্ভ করেছ জেনে খুশী হলাম। অতি ধীরে, তারিয়ে-তারিয়ে, রস উপভোগ করে পড়তে হয়, তাড়াতাড়ির কর্ম নয়। তোমার পক্ষে একটু তাড়াতাড়িই হলো। আমার নিজের একটু দেরি লেগেছিল। অবশ্য ১৯২০।১৯২৪ সালের রচনা। আমি ঐ বয়সে য়ুরোপীয়ান সাহিত্যের সঙ্গে যোগ-সাধন করেছি মনে হয়। তা হলেও প্রুস্ত পড়া নিতান্ত দরকার। ওঁর নিজের একটা পৃথক জগৎ আছে—সেটা এতই পৃথক যে, পৃথিবী ছাড়া। অথচ বুর্জোয়া ডিকাডেন্ট সবটাই। প্রায় সেই হিসেবে আমরাও প্রুস্তীয়ান—তবে ছবিটা তাঁর বেশী সম্পূর্ণ। আমরা সবটাই যেন খাপছাড়া।

"প্রবণতার একাগ্রতার আধিক্য সর্বথা পরিত্যাজ্য।" কথাটা খুব ঠিক। এবং এও ঠিক যে, "চিন্তার দিক থেকে রক্ষণশীল হলে অনেক সুবিধের মধ্যে এই একটা সুবিধে যে তুলনা করা সহজ—মনটা অবশ্য নানান ভাবে চালু হয়ে থাকা দরকার।" ভাব-প্রবণতাকে কিন্তু কিভাবে চালুই করা যাবে? বুদ্ধির সাহায্যে নিশ্চয়। রক্ষণশীল বস্তুটার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধির দিক আছে—মধ্যযুগের হিন্দুদর্শন, বার্ক এমন কি—টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট এখন কিন্তু নেই, এখন ভারতবর্ষে যেটা আছে সেটা নিছক সংস্কার। বিলেতের কনসারভেটিজম্ আর আমাদের কনসারভেটিজম এক জিনিস নয়। তবু বুদ্ধির অংশটা আছে নিশ্চয়। তাই যদি থাকে তবে ভাবপ্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধির একটা বিরুদ্ধ ভাব রয়েছে। তার বোঝাপড়া কেমন করে হবে? তবে ভাব-প্রবণতার ঘাটা পড়ে যাবে, বয়সের সঙ্গে?
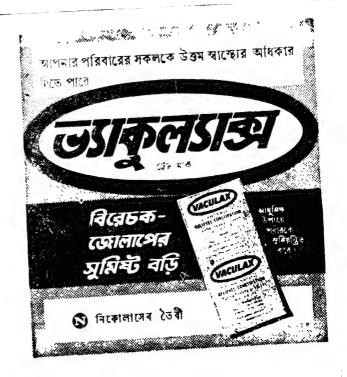
তাই মনে হয় সর্বদাই বুদ্ধি-বিচারের প্রয়োজন।

......তোমার কাজ তুমি পড়ে যাও, আর ভাবো, ভালো মন্দ না ভেবে। ভালোমন্দ সঙ্গে সঙ্গে আসবে। একটু উপদেশ দিলাম—আমার অভ্যাসই তাই।

আমরা আপাতত ভালো আছি। ১০।১২ই নাগাদ আলিগড় যাবো। ইচ্ছা কর ত আগেই চিঠি লিখো।

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

দেরাদুন
১।৭।৫৭

— ৬ —

দেবপ্রসাদ,

......"মনে এলো" সত্যই অসংলগ্ন; অবশ্য সেইটাই ভারচু অফ এ নেসেসিটি করতে চেয়েছি। একটা মূলে ব্যক্তিগত সূত্র আছে। সেটা মন বলাই চলে। "মনে এলো"র এল অংশটি আসা-যাওয়ার খেলা।

......আমি গত সপ্তাহে "অষ্টাদশী" নামে ১৮টি গল্পসঞ্চয় পড়লাম। তিনটি ছাড়া একটারও যোগ্য নয়। সে যাই হোক, কোনোটাই আমার ধরনের নয় কেন? আমি "রিয়ালিস্ট" বলে একটা ছোট গল্পের বই বার করি। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লেখেন। সেটা কেউ পড়ে না। কেন? এর কারণ কি বুঝি না। একটা কারণ যে, আমি লেখা নিয়ে পড়ে থাকিনি। লিখেছি, আর ফেলে দিয়েছি। প্রথম ছিলাম অধ্যাপক, পরে সাহিত্যিক। দেখি কি হয় আবার!

আমি ২০শে আলিগড়ে যাব মোটরে। সেই দিনই ৭।৮ ঘণ্টা পরে পেঁছব। সেখানেই চিঠি দিতে পার। আশা করি ভালো আছ। —ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

দেবপ্রসাদ,
১১।৭।৫৭

— ৭ —

দেবপ্রসাদ,

তোমার চিঠি পেলাম কালই। আলিগড়ে আসবার সময় কোনো কষ্ট পাইনি। কেবল ২॥ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। এখানে শীত একেবারেই নেই বললেই চলে—অবশ্য কোলকাতার চেয়ে।

বক্তব্য শেষ করেছ শুনে খুব আনন্দ হলো। বইটা, অন্তত তার বেশ খানিকটা অংশ, শক্ত হয়েছে নিশ্চয়। ইতিহাস সম্পর্কে যা লিখেছি তার মধ্যে মার্কসিজম্ ভরা। তবু সবটা নয়—পুরো অংশ লিখতে পারিনি। সকলে শক্ত বলেছিলেন। মোটা-মুটি আমার মত ঠিকই আছে।......

গ্যেটের সম্পর্কে যা বলেছিলাম এখনও তাই বলি। ভদ্রলোকের হিউমার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আছে। গ্যেটের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা উঁকিঝুঁকি মারে। (অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তাই) অবশ্য বিশ্বের তিনটি পর্যায়, ক্লাসিকাল, মধ্যযুগ ও আধুনিকই গ্যেটের মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে মধ্যযুগ নেই। আমার মনে হয় তিন পর্যায়ের সংযোগে হিউমার খুলতে পারে না। ওটা একরকম ভারসাম্যের অবস্থা; হিউমারে দুটি যুগের সংযোগ হয়, একটা বাকী থাকে।......

-ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়
৩১।১।৫৮

= ৮ =

দেবপ্রসাদ,

তোমার ১৬।২ তারিখের চিঠি পেয়েছি। নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম।......

পলিটিকস্ ও কবিতার স্বন্দ্ব সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছি মনে পড়ে। এখন ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখি। পলিটিকস্ মানে যদি ডেমোক্রেসী হয়, আর ডেমোক্রেসীর অর্থ ম্যাস্ হয়, তবে ডেমোক্রেসীর সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক ওঠে দুই দিকে : (১) এক এলিট গ্রুপ-এর সঙ্গে; সেখানে বড় কিংবা ছোট এলিট গ্রুপ থাকলেই চলে; সেই গ্রুপ-এ একটা কালচার সৃষ্টি করে; সেই কালচার-এর অংগ হলো কবিতা। (২) আরেক ডেমোক্রেটিক প্রোসেস-এর সঙ্গে; সে প্রোসেস-এ উঁচু-নীচুর লেনদেন চলে; নীচু ওঠে উঁচুতে এবং উঁচু নামে নীচুতে, সেই লেন-দেনের ফলে একটা কালচারের (কবিতার) মানদণ্ড তৈরী হয়; সেটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের নিশ্চয়ই। প্রথমটার ইতিহাস পূর্বেকার; দ্বিতীয়টির ইতিহাস এখনকার এবং পরবর্তী যুগের। ভালো-মন্দ বিচার নিশ্চয়ই করতে হয়, কিন্তু এ যুগের বিচার আরও পরবর্তী যুগের। আমার ভালো লাগে না আমি জানি, কিন্তু বহু পরে নতুন আচার-ব্যবহার জন্মাবে, যার ফলে নতুন কবিতা ফুটে উঠবে। এই হরাইজন অফ টাইম দেখা ছাড়া অন্য গতি নেই।

......তুমি কেমন আছ?

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়
২৬।২।৫৮

= ৯ =

দেবপ্রসাদ,

তোমার চিঠি পেলাম। আজ ছুটি ছিল, তাই সময় পেলাম।......

রাস্তায় খুব পূজোর ভিড় আরম্ভ হয়েছে তুমি লিখেছ। কেন এত ভিড় জান, বলতে পার? এবং সেই ভিড় বেড়েই চলেছে! অথচ দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। মানুষে কি দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই চায়? মাত্র কটা দিনের জন্য অব্যাহতি পায়, কথাটা ঠিক নয়। বরঞ্চ দুঃখ ও সুখের চরম দুরত্ব গ্রহণ করে ভুলে থাকে। লোকে সুখী হয় জানি : লোকে দুঃখী হয় তাও জানি। কিন্তু সুখ ও দুঃখের অতিরঞ্জিত আকারকে ভোলাই স্বাভাবিক। ভুলতে গিয়ে বেশী আনন্দ করছে—এই যা। ঠিক বলতে পারলাম না বাংলায়; ইংরেজীতে বলতাম পোলারাইজেশন। তার ফলেই আনন্দের মাত্রাটা ফিকে। আনন্দের মাত্রা বড়ই ঠুনকো, বেলোয়ারী, এবং বারোয়ারী।

......লেখাটা কিন্তু পারছি না। ওটা আটকে গেছে। শীতকালে আবার চেষ্টা করে দেখব।

তুমি কেমন আছ?......

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়
২৭।৯।৫৮

= ১০ =

দেবপ্রসাদ,

তোমার চিঠি পেয়েছি।......

"ঝিলিমিলি" দিয়ে এলাম। এটা 'নতুন' বই। দেখতে "মনে এলো"র মতন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ধরনটা নতুন। বই-এর আশ্রিত লেখা মোটেই নয়। নিজের কথা নিশ্চয়ই, যদিও তার দাম অল্প। কিছু গল্প আছে, যথা সত্যেনের* সম্বন্ধে। আসল ব্যাপার—আমারই কথা।......

শান্তিনিকেতনে ১১২° দেখে নিশ্চয়ই পালিয়ে এলে। এই সময়টা অত্যন্ত গরম হয়। এখানে চমৎকার ঠাণ্ডা। রাত্রে দোর জানলা বন্ধ করে শুতে হয়। তবে দুপুরবেলা বাড়ির বাইরে উত্তাপ উঠছে দেখছি।...

আমরা চারদিন লক্ষ্ণৌ ঘুরে এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়টা একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। তবু যেন লক্ষ্ণৌ এখনও লক্ষ্ণৌ—কাঁকড়ীর বদলে কাঁকড়া, শেরওয়ানীর বদলে বুশ্ শার্ট, এবং আমের হিসেব ওজন করা—সব যাচ্ছে, তবু যেন লক্ষ্ণৌ এখনও লক্ষ্ণৌ রয়েছে। ৩০ জন বন্ধু এল দেখা করতে, মুখে চোখে হাসি ফুটে বেরুচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার!

রাজশেখর বসু মারা গেলেন শুনলাম। এককালে খুবই ভালো লিখতেন।......বয়স ছিল ৮০,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের?

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

দেরাদুন
২৯।৮।৬০

---

* বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ইন্দোর থেকে বাষট্টি মাইল পথ অতিক্রম করে মাণ্ডুতে পৌঁছান যায়। দিল্লি-বোম্বাই রেলপথে রতলাম থেকে ধার এবং সেখান থেকে মাণ্ডু পৌঁছানো যায়, তবে ইন্দোর থেকে সোজা ট্যাক্সীতে যাওয়াই সুবিধাজনক। যাবার প্রকৃষ্ট সময় বর্ষার ঠিক পরই। ইন্দোর থেকে যেতে পথের দু'ধারে মাণ্ডুর প্রাকৃতিক শোভা পর্যটককে মুগ্ধ করে। (১) ঘাটের পথে, (২) রূপমতীর স্মারক কীর্তিক্ষেত্রে; বাসনা জাগবে তার (৩) রেওয়া কুণ্ডে অবগাহনের। আর সেই সঙ্গে চমৎকৃত হবেন প্রাচীন স্থপতিদের শিল্পকৃতিত্ব দেখে যার পরিচয় অগণিত ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে (৪) হিন্দোলা মহলের খিলান পথে বা (৫) মাহমুদ খিলজীর কবরে।

আলোকচিত্রশিল্পী
বীথি সরকার

৩
৪
৫
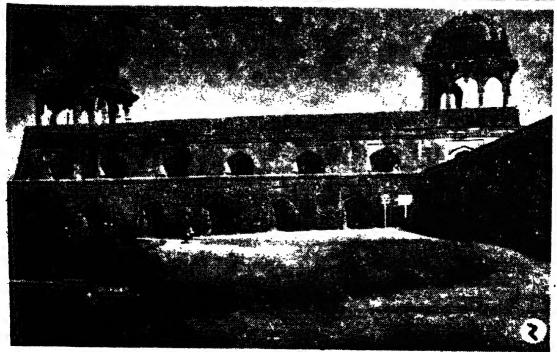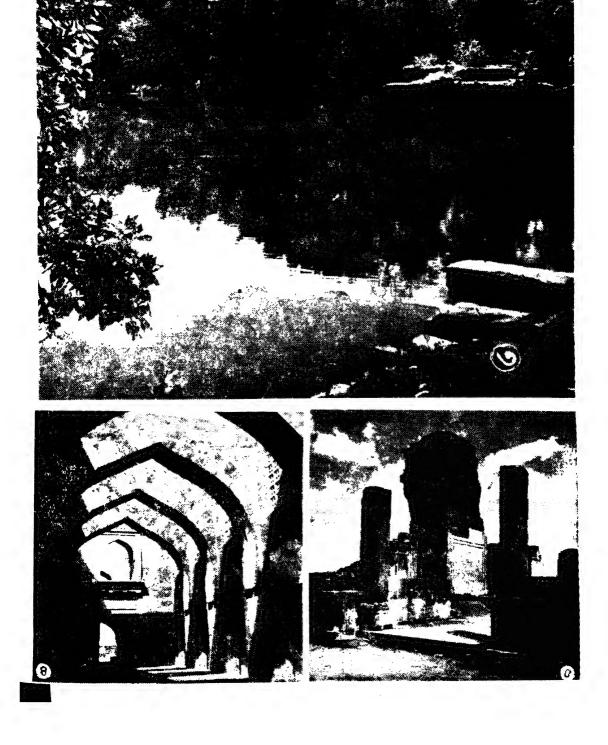
বিশুখুড়ো বলিতে লাগিলেন—"আমাদের আজকের ট্রামবাসের আলাপ-আলোচনা যে-দিন পাঠকের শ্রুতি-গোচর হবে সেদিন নির্বাচনী ঢাকের বাদ্যি থেমে গেছে। বারোয়ারিতলা ফাঁকা। কালনেমিরা আর লংকাভাগ নিয়ে লংকাকাণ্ড করছেন না। দুর্দিনের অভাজন চন্দ্ররা অর্থাৎ ভিপ্‌রা আর জীপ চড়ে ছুটোছুটি করছেন না। গায়ের বিনয়ী নামাবলীখানা ফেলে দিয়ে তাঁরা আবার গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিতে পরিশোভিত হয়েছেন। বস্তি-বাসীরা (একদিন ভিপ্‌রা বস্তির পথে হরদম যাতায়াত করেছেন, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন) অবাক হয়ে শুনছেন, ভিপ্‌দের ভেঁপুর সুরে পালটেছে, এসেছি এনেছি বঁধু আর নেই, আছে—পড়বে না আর পায়ের চিহ্ন এই বাটে; আবার মাঝে মাঝে আখর, পাঁচ বছর ত বটেই বটে, পাঁচ বছর।"

একটি বৈদেশিক, সংবাদে শুনিলাম ফ্রান্সের জনৈক চিকিৎসক তাঁর এক রোগীর মধ্যে একটি অদ্ভুত রোগ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেটি হইল মাছিতে আতংক রোগ। শ্যামলাল শুনিয়া বলিল—"অসম্ভব হয়ত নয়, নির্বাচন মরশুমে আমরা অনেককে মশকাতংকে ভুগতে দেখেছি এবং মশক

নিধনে কামান নিয়ে টানাটানি করতেও দেখেছি!!"

প্রাক-নির্বাচন সংবাদে পড়িলাম—কোন একস্থানে সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের জন্য সংরক্ষিত একটি চেয়ারে কোথা হইতে একটি মুরগী আসিয়া না কি বসিয়া পড়ে। ডাঃ রায় বলিলেন—ও তো বৈঠ গিয়া, হাম ক্যা করে। তাঁর কথা শুনে শ্রোতারা হেসেছিল কিনা জানিনে। হেসে থাকলে বলব, "এটা হাসি-তামাশার কথা নয়, এটা বোধ হয় 'শেপ্ অব থিংগ টু কাম!!"—আতংকিত হইয়াই বুঝি মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

মাদ্রাজের খবরে প্রকাশ সেখানে ৬জন মুসলমান নাকি ভারতের মুসলমান-দের "মুক্ত" করিবার জন্য মুক্তিফৌজ গঠনের উদ্দেশ্যে তিরুচির নিকট সিরুগানার "মাত্র ছ'জন। বরং ১৭জন অশ্বারোহী হলে জুজু-জুজু খেলাটা ভালো জমে উঠত!"

লণ্ডনে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয় বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। বিক্ষোভকারীদের

অনেকেই না কি পূর্ব ও পশ্চিম পাকি-স্তানের অধিবাসী। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখ শুনে পাক প্রেসিডেন্ট নাকি আর্তনাদ করে উঠেছেন—'দাউ টু, ব্রুটাস'।"

শ্রীনেহেরু প্রস্তাবিত শীর্ষ বৈঠকটি এপ্রিলে আহ্বান করিবার জন্য নাকি শ্রীকুশ্চফের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন।—"আশা করি, প্রস্তাবে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারিখটা যেন ১লা এপ্রিল না হয়"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

মার্কিন মহাকাশচারী জন গ্লেন নাকি পৃথিবী পরিক্রমাকালে চারবার সূর্যাস্ত দর্শন করিয়াছেন।—"চারবার! যেখানে সূর্য মোটে অস্ত যেত না সেখানে একবার অস্তের ঠেলাতেই যে অস্থির" বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

মহাকাশ পরিক্রমার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—এক মিনিটের মধ্যে

রকেটটি সাদা ধূমের পুচ্ছ রচনা করিয়া ৭৮ মাইল ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়।—" এবং অতঃপর সবাই হয়ত চীৎকার করে শোনাতে চেষ্টা করেছেন,—'সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় একটি ইলেক-ট্রোনিক রবোট শিক্ষক-নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"আশা করা যায় যান্ত্রিক শিক্ষক সর্বত্র আমদানি করা সম্ভব হলে মাইনে আর মাগগিভাতার দাবিতে মিছিল করতে হবে না"—বলেন বিশুখুড়ো।

ভারতে মহাশূন্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য সরকার কর্তৃক জাতীয় কমিটি গঠনের সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল ডি এল রায়ের একটি গান রকমফের করিয়া শুনাইল "মাটিটা তো দেখা গেল, শুধুই একটা কোলাহল, এখন যদি সাহস থাকে শূন্যটাকে দেখবি চল।"

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বিতর্ক-সমিতির সভায় এতদিন নারীরা কেবল সভ্যদের আমন্ত্রণক্রমে পাবলিক গ্যালারীতে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন। গত সপ্তাহে, একশত ষাট বছর পরে, তাঁহা-দিগকে ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বিতর্ক-সভাকে শ্রীমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে যদি নারীদের সদস্য করা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য বলবার কিছু নেই। কিন্তু বিতর্কে নারীদের হারাতে পারবেন বলে যদি মনে করে থাকেন তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল!!"

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন, মিছিল ও ধর্মঘট আন্দোলন লইয়া করাচীতে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে এবং একটি তত্ত্ব তাঁরা আবিষ্কার করিয়াছেন, —'কোন পাশ্চাত্ত্যশক্তির গোপন হস্ত এই সকল ঘটনার পিছনে রহিয়াছে'।—"না ছাহেব, না, পাশ্চাত্ত্য শক্তি নয়, ওটা "টাইম বম" এর প্রভাব"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ শ্রীগোষ্ঠ পালের "পদ্মশ্রী" লাভে মোহনবাগান একটি সম্বর্ধনা সভার ব্যবস্থা করেন। সভায় সমুপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রীপাল নাকি কলিকাতা স্টেডিয়াম নির্মাণে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া জনৈক ক্রীড়ারসিক বলিলেন—"ডাঃ রায় শ্রীপালের কথা শুনে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলেন—ও নাম করো না উচ্চারণ!!"

॥ ৩০ ॥

অনিন্দ্য পাকড়াশি তাঁর দেশের সব অপরাধ যেন নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বিদেশী অতিথিদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন! যেন সপ্তাহে একদিন বাংলা দেশকে তাঁর হুকুমেই ড্রাই করে দেওয়া হয়। মাথা নিচু করে বিরক্ত অতিথির কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ডক্টর রাইটার এবার যেন তাঁর বন্ধুকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। ইংরেজীতেই বললেন, "কলকাতা তবু তো মন্দের ভাল। ভারতের পশ্চিমে, আরব সাগরের তীরে বোম্বাই বলে একটা শহর আছে, সেখানে প্রত্যেক দিনই শুকনো দিন। শুনেছি, এক বোতল বীয়ারের জন্যেও সেখানে তোমাকে পারমিট নিতে হবে।"

মিস্টার কুর্ট এবার হতাশ হয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। করবী দেবী এই অবস্থা দেখেই বোধ হয় ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। আমার মনে হলো, অনিন্দ্য যাতে তাঁর সামনে বিব্রত বোধ না করেন সেই জন্যেই তিনি সরে গিয়েছেন। কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো একটু পরেই। করবী দেবী একটা নরম রবারের চটি পরে, বেণী দুলিয়ে আবার ড্রইং-রুমে এসে ঢুকে অতিথিদের ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করলেন।

ও'রা দুজনেই অবাক হয়ে করবীর মুখের দিকে তাকালেন। ও'র পিছনে ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে দুটো ডাব।

বিদেশী দু-জন জীবনে এমন অদ্ভুত ফল দেখেন নি। ডক্টর কুর্ট একটু অবাক হয়ে বললেন, "কী জিনিস?"

করবী দেবী হেসে বললেন, "নেচার আমাদের জন্যে ইন্ডিয়াতে এই ড্রিংকের ব্যবস্থা করেছেন। ড্যাব।"

"ড্যাব! নেভার হার্ড অফ ইট!" ডক্টর রাইটার বলে উঠলেন।

করবী দেবী দুটো ডাব ও'দের দিকে এগিয়ে বললেন, "গ্রীন কোকোনাট কী তোমরা এর আগে দেখোনি? ইন্ডিয়ানরা প্রচুর পরিমাণে এই ডাব খেয়ে থাকে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি তাঁর অতিথিদের মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখে যেন একটু আশ্বস্ত হলেন। ডাবের সুযোগ নিয়ে বললেন, "নেচার এখানকার দরিদ্রদের জন্যে একটা স্বাস্থ্যসম্মত কৌটোয় দু-খানা রুটি এবং এক গেলাশ জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়া কুর্টও এবার যেন লাফিয়ে উঠলেন। তিনি একমনে ডাবটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

করবী দেবী মোহিনী হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "এই ডাব ড্রিংক করাও একটা আর্ট। ইচ্ছে করলে এর জল গ্লাসে ঢেলে আপনাদের দিতে পারতাম। কিন্তু তা আমি চাই না। আমি চাই, আমাদের গ্রামের লোকরা যেভাবে ড্রিংক করে তোমরা সেই ভাবে খাও।"

কুর্ট একটু উৎসাহ বোধ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কীভাবে ড্রিংক করতে হবে বলো?"

করবী দেবী হাসতে হাসতে বললেন, "আমাদের গ্রামের লোকরা এমনভাবে ফুটোতে মুখ রেখে খায় যে, এক ফোঁটা জল গায়ে বা জামায় পড়ে না। কিন্তু সেটা বেশ শক্ত ব্যাপার।"

কুর্ট সঙ্গে সঙ্গে করবী দেবীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। ডাবে মুখ দিয়ে তিনিও যে খেতে পারেন, তা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন ডাবটা এক মিনিটের জন্যে করবী দেবীর হাতে দিয়ে তিনি নিজের কোট খুলে ফেললেন।

করবী দেবী এবার বললেন, "মিস্টার কুর্ট, যথেষ্ট হয়েছে। এইভবে খেতে গিয়ে তোমার জামায় দাগ হবে, এবং আমাদের দেশের দুর্নাম হবে। আমি তোমাদের জন্যে স্ট্র পাইপের ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

ডক্টর রাইটার বললেন, "আমাকে একটা পাইপ দাও। যে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই, সে-বিষয়ে তোমাদের কাছ থেকে 'নো-হাউ' নিতে আমার মোটেই আপত্তি নেই।"

মিস্টার কুর্ট বললেন, "হে ভারতীয় সুন্দরী, আমরা জার্মান—অত্যন্ত গোঁয়ার। মাথায় যখন খেয়াল চেপেছে তখন আমি ট্রাই করবই।"

করবী দেবী বললেন, "হে বিদেশী পুরুষ, তোমার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ; আর তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্যে আমার বকুনি রইল।"

কুর্ট এবার ভারতীয় প্রথায় ডাব খেতে গিয়ে গন্ডগোল বাধিয়ে বসলেন। প্রথমে এক ঝলক জল এসে ও'র জামা কাপড় ভিজিয়ে দিল। তারপর ভদ্রলোক বিষম খেয়ে কাসতে লাগলেন।

করবী দেবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কুর্টের হাত থেকে ডাবটা কেড়ে নিলেন। কুর্ট তখন কাসছেন এবং কাসতে কাসতে হাসছেন।

করবী দেবী বললেন, "আর নয়, অনেক হয়েছে। শেষে হয়তো রটে যাবে, ইন্ডিয়াতে

আপনাদের মেরে ফেলবার ফন্দি আঁটা হয়েছিল।"

কুর্ট এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন। ভিজে জামার দিকে তাকাতে তাকাতে যেন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। একটু লজ্জিত হয়েই যেন বললেন, "মিস গুহ, আমি সত্যিই দুঃখিত। ঘরে ঢুকেই প্রথমে ড্রিংকের জন্যে মাথা গরম করা উচিত হয়নি।"

ডক্টর রাইটার গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার দুর্ব্যবহারের জন্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছো। হয়তো মিস গুহ আরও শাস্তির ব্যবস্থা করছেন।"

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। এবার কুর্ট এবং রাইটার বিশ্রামের জন্যে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ও'রা চলে যেতেই অনিন্দ্য পাকড়াশি যেভাবে করবী গুহের দিকে কৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন তা আজও যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমারই সামনে অনিন্দ্য পাকড়াশি বলেছিলেন,

"সত্যি, আপনার তুলনা নেই। প্রথমেই আমাদের সম্পর্কটা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। আপনি কী আশ্চর্যভাবে অবস্থার মোড় ফিরিয়ে দিলেন।"

করবী গুহ যেন মুহূর্তের জন্য লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন। শাড়ির খুঁটটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, "ওসব কথা থাক। আপনি কি এখন কিছু খাবেন? ও'দের তো তৈরী হতে অনেক সময় লাগবে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বলেছিলেন, "রাজী আছি, এক শর্তে। ও'রা নিজেদের ঘরে বিশ্রাম করুন। আমরা চলুন মমতাজে গিয়ে কিছু খেয়ে নিই।"

করবী দেবী একটু যেন লজ্জা পেলেন। কিন্তু জোর করে না বলতে পারলেন না।

অনিন্দ্য পাকড়াশি আমাকে বললেন, "আপনিও চলুন। খেতে খেতে আড্ডা দেওয়া যাবে।"

আমি বলেছিলুম, "ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমার কাজ আছে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি হয়তো সরল মনেই আমার কথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু, করবী দেবী সব ফাঁস করে দিলেন। বললেন, "না, ও'র খাবার অসুবিধে আছে। হোটেলের কর্মচারী তো। গেস্টদের সঙ্গে একসঙ্গে চেয়ারে বসে খাবে কী?"

অনিন্দ্য বললেন, "হোটেলের স্টাফ তো কী হয়েছে? উনি তো আমার গেস্ট।"

করবী দেবী বললেন, "তা হয় না। ম্যানেজমেন্ট গেস্টদের সঙ্গে অতটা মেশামেশি পছন্দ করে না।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি তার তখনকার ছেলেমানুষি নিয়ে বলেছিলেন, "তা কিছুতেই হয় না। আমি এখনই ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছি।"

যে অনিন্দ্য পাকড়াশি সেদিন সামান্য একজন হোটেল কর্মচারীর অপমানে বিচলিত হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন, তিনি আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন কে জানে! আজ তাঁর বক্তৃতা পড়লে মনে হয় মানুষ সম্বন্ধে সব শ্রদ্ধা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর এখন ধারণা, পৃথিবীর সাধারণ মানুষরা যেন মাধব ইন্ডাস্ট্রিকে ঠকাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। তারা শুধু শিল্পপতিদের কাছে মাইনে নেয়, টিফিন খায়, ওভারটাইম পায়, বোনাস আদায় করে, কিন্তু প্রতিদানে কিছুই দিতে চায় না। গভর্নমেণ্টের প্রশ্রয় পেয়ে, এবং কম্যুনিস্টদের উস্কানিতে সমস্ত কাণ্ট্রি যেন ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংস করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

এই অনিন্দ্য পাকড়াশিই হোটেলে বসে বসে একদিন করবী গুহ এবং আমাকে বই বার করে শুনিয়েছিলেন—

"মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে
জন্মেছে
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে,
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপ্নের সফলতা—নবীনতা—
শুভ্র মানবিকতার ভোর?"

করবী দেবী বলেছিলেন, "দাঁড়ান, আপনার মাকে টেলিফোন করে বলে দেবো। কাজে মন না দিয়ে ছেলে ব্যাগে করে কবিতার বই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বলেছিলেন, "আপনাকে আমি বাছাই-করা কবিতার বই দিয়ে যাবো। তারপর দেখবো আপনি কেমন না কবিতার ভক্ত হয়ে ওঠেন।"

কাজের অছিলায় আমি বেরিয়ে এসেছি। ও'রা দু-জনে সোজা মমতাজ-এ চলে গিয়েছেন, ব্রেকফাস্টের জন্যে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে ও'রা দু-জন আবার সুইটে ফিরে গিয়েছেন। একটু পরেই অনিন্দ্য পাকড়াশি বেরিয়ে এসে আমাদের কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, "ও'রা দু-জনেই এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। একটু পরে যা হয় করা যাবে। এখন আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে হবে।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এর পর কত সময়ই তো অনিন্দ্য পাকড়াশি নষ্ট করেছেন। আমরা কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করে গিয়েছি, উনি চুপচাপ দেখে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে বলেছেন, "সত্যি, অদ্ভুত চাকরি আপনাদের। কত রকমের মানুষকে দেখবার সুযোগ পান আপনারা। এখন বুঝছি, ইংরেজী উপন্যাসে হোটেল থাকলে তা কেন সহজেই জমে যায়।"

সত্যসুন্দরদা বলেছিলেন, "মিস্টার পাকড়াশি একটা নতুন হোটেল করুন না। সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায় এমন হোটেল যার কোনো তুলনা থাকবে না। সেখানে ক্যাবারের বদলে দেশী নাচ হবে, ভারতীয় সঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পীরা অতিথিদের সঙ্গীতে আপ্যায়িত করবেন। বড় বড় শিল্পীদের অনেকেই তো আমাদের হোটেলে এসে ওঠেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি ম্লান হেসে বলেছিলেন, "এখন বাবার নজর ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিকাল ইন্ডাস্ট্রিতে।"

পাকড়াশি হয়তো আরও কথা বলতেন। কিন্তু করবী দেবী হঠাৎ লাউঞ্জে হাজির হলেন। পাকড়াশিকে বললেন, "আপনি বেশ লোক তো! বলা নেই কওয়া নেই, আমি নিজের বেড-রুমে একবার ঢুকেছি, আর আপনি বেরিয়ে এসেছেন!"

অপ্রতিভ অনিন্দ্য বললেন, "আপনারও তো একটু বিশ্রাম দরকার?"

"আমার? এই সকাল বেলায়?" করবী দেবী যেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, "কষ্ট করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের ঘর মনে করে সব সময়েই আপনি ওখানে বসে থাকতে পারেন।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি এর উত্তরে যা বলেছিলেন, তা যে করবী গুহকে এমনভাবে আঘাত দেবে বুঝতে পারিনি। অনিন্দ্য বলেছিলেন, "এই জন্যেই হোস্টেস হিসেবে আপনার এত সুনাম।"

করবী গুহ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ও'র টানা টানা চোখ দুটো ধীরে ধীরে ওপরের দিকে তুলে বলেছিলেন, "হোস্টেস বলেই বুঝি আপনাকে ভিতরে এসে বসতে বললাম?"

অনিন্দ্য বুঝতে পারেন নি। কিন্তু আমি ও'র মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম, করবী গুহ দুঃখিত হয়েছেন। সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের সদাহাস্যময়ী অভ্যর্থনাকারিণী যেন মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছেন যে, তিনি ডিউটিতে রয়েছেন।

কিন্তু কাজের কথা মনে পড়তে অন-ডিউটি মেয়েদের বেশীক্ষণ লাগে না। করবী দেবী বললেন, "আপনার অতিথিরা এতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। আপনি এ'দের নিয়ে এখন নিশ্চয়ই বেরোচ্ছেন! কিন্তু লাঞ্চের সময় ফিরবেন কী?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বলেছিলেন, "লাঞ্চের প্রয়োজন নেই। বাবাও ক্লাবে আসবেন, সেখানে নিয়ে যাবো।"

ও'রা চলে গেলে বোসদা আমাকে বলেছিলেন, "আগেকার দিনে রাজারা আসতেন; এখন বাণিজ্য প্রতিনিধিরা আসেন। খাতির এ'দের রাজাদের থেকেও বেশী। কারণ এ'দের ব্যাগের ভিতর সাত রাজার ধন এক মানিক সেই 'নো-হাউ' আছে।"

আমি বোসদার মুখের দিকে তাকাতে, তিনি হাসতে আরম্ভ করলেন। "বুঝলে না? হাঁউ মাঁউ খাঁউ-এর নো-হাউ! আলিবাবার রত্নশালার চাবি-কাঠি। গতর আর বুদ্ধি খাটিয়ে এই চাবি তৈরি করে নেবার মতো উদাম আমাদের নেই। তাই ধার করে, অন্য লোকের চাবি নিয়ে দরজা খোলবার চেষ্টা করছি আমরা।"

আমি বোসদার মুখের দিকে আবার তাকালাম। বোসদা বললেন, "ভয় নেই। শাজাহান হোটেলের পক্ষে ভাল। সব ঘর বোঝাই হয়ে থাকবে। আমরা আবার ভাড়া বাড়িয়ে দিতে পারব। বেলি ডান্সারদের পিছনে আরও টাকা ঢালতে পারবো।"

একটু থেমে বোসদা বলেছিলেন, "মনে থাকে যেন, পুলিস রিপোর্টগুলো আজই পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।"

বিকেলের দিকে অনিন্দ্য পাকড়াশি তাঁর অতিথিদের নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। কোনো বাড়ি থেকে বোধ হয় ও'দের প্রচুর মদ খাইয়ে এনেছিলেন অনিন্দ্য পাকড়াশি। ফলে ও'দের দাঁড়িয়ে বা বসে থাকার মত অবস্থা ছিল না। ও'রা টলতে টলতে কোনো রকমে নিজেদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পুলিস রিপোর্টের ফর্মগুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে আমিও করবী দেবীর সুইটে হাজির হয়েছিলাম।

করবী দেবী প্রশ্ন করলেন, "কেমন কাজ-কর্ম হলো?"

অনিন্দ্য বললেন, "খুব। এখান থেকে অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আধ ঘণ্টা পরেই মিসেস চাকলাদারের ফ্ল্যাট। আমি জানতাম না, কলকাতায় এমন অনেক গৃহস্থবাড়ি আছে যা ড্রাই ডে-তে হঠাৎ বার-এ পরিবর্তিত হয়। সেখান থেকে এ'রা এই উঠলেন।"

"কী করে জানলেন?" করবী দেবী প্রশ্ন করলেন।

"আমি জানতাম না। আমার মামা ফোকলা চ্যাটার্জি খবর দিলেন। উনিই মিসেস চাকলাদারকে ফোনে জানিয়ে দিলেন। উনি আবার অজানা পার্টিকে আপ্যায়ন করেন না।"

করবী দেবী আর কোনো কথা বললেন না। অনিন্দ্য এবার নিজেই মনেই বললেন, "আপনাকে বলতে সাহস হচ্ছে না। একটু চা খাওয়াবেন?"

আমি বললাম, "এতে লজ্জার কী আছে? এখনই বেয়ারাকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি।"
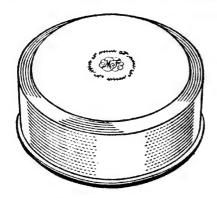
করবী দেবী বাধা দিলেন। "হোটেলের মধ্যেও যে ঘর থাকে, এবং সেখানে যে ঘরোয়া চা পাওয়া যায় তা আজ প্রমাণ করে দিই।"

করবী দেবী চা করে অনিন্দ্যকে দিয়েছিলেন। সেই চা শেষ করতে করতে তাঁরা যে অনেক গল্প করেছিলেন তা আমি পরে শুনেছিলাম। সে-সব আমার শোনবার কথা নয়, কিন্তু একদিন এই নাটকের সবটুকুই আমাকে শুনতে হয়েছিল।

চা-এর শেষে করবী দেবী বলেছিলেন, "আপনার অতিথিদের সঙ্গে দেখা করবেন না?"

অনিন্দ্য বলেছিলেন, "এখন আমি গাড়ি নিয়ে নদীর ধারে চলে যাবো। বাবা এবং মা জানবেন, ছেলে সায়েবদের সঙ্গে ঘুরছে। আমি ততক্ষণ দিনের কলকাতা কেমন করে রাতের মোহিনী-মায়া ধারণ করে তাই দেখবো। আলোর গহনা পরা এই কলকাতাকে কে যেন সারা দিন সযত্নে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখে।"

করবী দেবী বলেছিলেন, "এত সুন্দর কথা কোথা থেকে শিখলেন?"

"কেন, নিজে কবিতা লিখি না বলে অন্যের কথা জানবো না?"

এ-সব কথা করবী দেবী নিজেই আমাকে বলেছিলেন। আমার শোনবার কথা নয়, কিন্তু তিনি নিজেই বোধ হয় কাউকে বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

করবী দেবী হঠাৎ যেন আনন্দে ঝলমল করছিলেন। গম্ভীর প্রকৃতির মহিলা বলেই তাঁকে জানতুম। কিন্তু এখন তিনি অনেক কথা বলতে চাইছেন। আমাকে বলেছিলেন, "বসুন না, এখনই কোথায় যাবেন?"

আমি বলেছিলাম, "এখন একবার কাউন্টারে গিয়ে বসতে হবে, উইলিয়মকে ছেড়ে দেবো কথা দিয়েছি।"

"উইলিয়মের ডিউটির সময় আপনি বসতে যাবেন কেন?"

"বিশেষ করে রিকোয়েস্ট করেছে। তাই দু ঘণ্টা ওর হয়ে ডিউটি দেবো কথা দিয়েছি।" আমি বললাম।

এর বেশী আমার কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু করবী দেবীর জেরাতে তাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। উইলিয়ম আজ রোজীকে নিয়ে ডিনারে যাচ্ছে! অনেক দিনের সাধ্যসাধনায় এই পরমাশ্চর্য সুযোগ পেয়েছে। শাজাহান হোটেলের দুই কর্মী চৌরঙ্গীর কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে রাতের ডিনার সেরে আসবে। শাজাহানে ওরা দু জনেই ফ্রি খেতে পারতো। তবু বেচারা উইলিয়ম পকেট থেকে পয়সা খরচ করতে রাজী হয়েছে।

করবী দেবী ব্যাপারটা জেনে সামান্য হেসেছিলেন।" বলেছিলেন, "তাহলে এখনই যান। আপনাকে বাধা দিতে পারি না।"

আমি বলেছিলাম, "ছাদে উঠবার আগে আর একবার দেখা করে যাবো। দু নম্বর সুইটের শেষ সংবাদ নিয়ে তবে আমি রাত্রের ছুটিতে যাবো।"

"আসা চাই কিন্তু। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

উইলিয়ম ঘোষ তখন আমার জন্যেই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল। বললে, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমাকে আবার টয়লেটে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিতে হবে।"

আমি বললাম, "কলকাতার সব রেস্টুরেন্ট কী এখনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?"

উইলিয়ম বললে, "বেশী দেরি হলে তোমারই মুশকিল। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে হবে।"

আমি বললাম, "রাত বারোটার আগে কলকাতার শাজাহান হোটেলে কি আর হাই তোলবার সুযোগ পাওয়া যাবে?"

নিশ্চিন্ত কণ্ঠে উইলিয়ম বললে, "তোমাকে কেমন করে জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু যাঁর জন্যে ডিউটি করছি, তিনি কোথায়?"

উইলিয়ম হেসে বললে, "উনি এখন আমার সঙ্গে বেরোবেন না। [illegible] হোটেলের তলায় অপেক্ষা করবেন। এখান থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি ধরবো, তারপর পার্ক স্ট্রীটে যাবার পথে রোজীকে তুলে নেবো।"

আমি বললাম, "অতি উত্তম পরিকল্পনা।"

হাতমুখ ধুয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার পথে উইলিয়ম আর একবার কাউন্টারে এসে দাঁড়াল। আমাকে চুপি চুপি বললে, "একটা রিকোয়েস্ট—কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে। একবার যদি ব্যাপারটা ডিমির কানে ওঠে, তা হলে কী হবে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছো।"

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "সব জানি। এখন আমি তোমার জন্যে একটি আনন্দময় সন্ধ্যা কামনা করছি।"

প্রতি কাজেরই একটা নেশা থাকে, হোটেলের কাজে তো বটেই। তাতে মেতে গেলে আর কিছুই মনে থাকে না। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে শাজাহানের অতিথিস্রোত নিয়ন্ত্রণ করতে করতে ওদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। খেয়াল হলো যখন দেখলাম, রোজী আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সোজা লিফটের ভিতরে ঢুকে গেল। রোজীকে রাতের ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় আজ যেন অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

প্রায় আরও পনেরো মিনিট পরে উইলিয়ম ফিরে এল। বললে, "হে কাণ্ডারী, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমাকে হাল ধরতে দাও।"

"তোমার এত দেরি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"রোজী কিছুতেই একসঙ্গে আসতে দিল না। বললে, আমি ঢোকবার পাক্কা আধ ঘণ্টা পরে তুমি আবার শাজাহান হোটেলে নাক গলাবে। তাই সেন্ট্রাল অ্যাভিনুর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বিনামূল্যে সান্ধ্য বায়ু সেবন করছিলাম।"

উইলিয়মকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আমি আবার করবী দেবীর সুইটের সামনে হাজির হলাম। এমন সময়ে ও'র সুইটে যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কথা দিয়েছি,
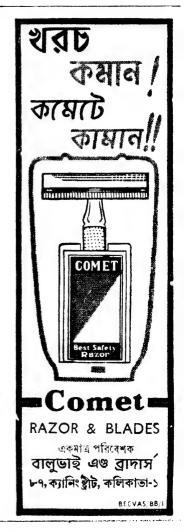
হয়তো আমার জন্যেই তিনি জেগে বসে রয়েছেন।

টোকা মারতেই করবী দেবী মৃদু কণ্ঠে বললেন, "আসুন।"

ঘরের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের মরণ-বাঁচন যুদ্ধ যেন এইমাত্র শেষ হয়ে গিয়েছে। সম্মুখসমরে পরাজিত আলো যেন মুমূর্ষু অবস্থায় টেবিলের এক কোণে ধুঁকছে। ঘরের আর সবটুকু জুড়ে আঁধারের রাজত্ব। আলোর সেই মৃত্যুপথযাত্রী দেহের সামনে চোখে হাত দিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে রয়েছেন করবী গুহ।

আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যেই করবী দেবী বোধ হয় আস্তে আস্তে মুখ ঘোরালেন। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন চমকে উঠলাম। এই ক' ঘণ্টায় করবী দেবী যেন একেবারে পাল্টিয়ে গিয়েছেন। যাঁকে দু' নম্বর সুইটে রেখে আমি উইলিয়ম ঘোষের ডিউটি দিতে গিয়েছিলাম তিনি যেন আর নেই। এ যেন অন্য কেউ। (ক্রমশ)
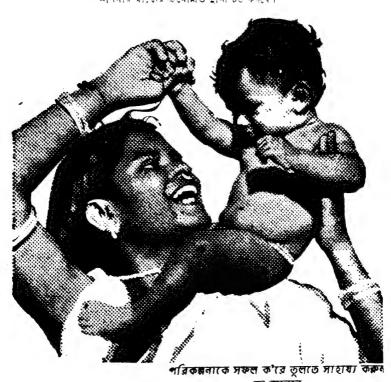
[ইভো আন্দ্রিচ্ নোবেল পুরস্কার পাবার পর বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্য পত্রিকার এক প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণীর সঙ্গে আন্দ্রিচ্-এর একটি ছোট গল্প উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের ইংরেজি অনুবাদ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় মূল ফরাসী থেকেই অনুবাদ করেছেন শ্রীপৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়।—স : 'দেশ']

উজীর হবার চার বছর পরেই খ্যাতনামা উজীর ইয়ুসুফ এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়ে ভারি বেইজ্জত হলেন। টানা-পড়েন চলল গোটা শীতকাল গোটা বসন্ত-কাল; বসন্তকালে অমন শীত সচরাচর পড়ে না; গ্রীষ্মের নামগন্ধও কোথাও তখনো নেই। শেষ পর্যন্ত যে মাসে ইয়ুসুফের অদৃষ্ট প্রসন্ন হল; তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন। ফিরে এল আবার জমকালো জীবনের শান্ত একঘেয়ে ছন্দ। অথচ, শীত-কালের সেই দিনগুলো, জীবন আর মৃত্যুর, গৌরব আর অখ্যাতির সেই দ্বন্দ্ব অতীতের কোঠায় তখনো পড়েনি, যার চিন্তাকুল গাম্ভীর্যের ছাপ উজীরের ব্যক্তিত্বে আজও খানিকটা পরিস্ফুট। অব্যক্ত সেই সম্পদ নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন যা কিনা অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ পুরুষেরা নিজেদের মনের আড়ালে সর্বদা লুকিয়ে নিয়ে ফেরেন, কিন্তু সামান্য কটাক্ষে, মৃদু অঙ্গভঙ্গীতে, তুচ্ছ কথার মধ্যেই যা চকিতে ঝিলিক মারে কালে-ভাদ্রে।

লাঞ্ছনা এবং নির্জনতার মধ্যে, কয়েদ-খানায়, উজীরের বারে বারে মনে পড়েছে তাঁর শৈশবের আর তাঁর স্বদেশের কথা; কারণ ব্যর্থতা আর ব্যথাই তো মানুষের কাছে জাগিয়ে তোলে তার অতীতটাকে। ওঁর মনে পড়েছে বাবার কথা, মায়ের কথা—দুজনেই বেহেস্তে গিয়েছেন যখন উজীর তখনো রাজবাড়ির আস্তাবলে মোড়ল-সহিসের সাকরেদি করছেন; তাঁদের কবরে ইয়ুসুফ সাদা পাথরের ফলক বসিয়ে দিয়ে-ছিলেন। মনে পড়েছে তাঁর বোসনি আর তাঁর গ্রামের, জেপা গ্রামের কথা, যেখান থেকে মাত্র ন' বছর বয়সে তাঁকে চলে আসতে হয়।

এ-বছরই, গরমকালে দৈবক্রমে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল বোসনি ফেরতা কারো কারো সংগে। তাদের তিনি কতো কথাই জিজ্ঞেস করলেন। শুনলেন, এতদিনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর লড়াইয়ের শেষে গ্রামের চারি-দিকে এখন শুধু বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ আর নানারকম অসুখ-বিসুখ সার হয়েছে। বিচলিত উজীর মোটারকম সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জেপা-য় তাঁর যেসব আত্মীয়-স্বজন এখনো মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তাদের সেবায়। আর শুনলেন যে, চেংকিচ্ বংশের চারটে পরিবার এখনো ওখানেই আছে, আর তারাই আছে সবচেয়ে বেশী সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে; কিন্তু গোটা গ্রাম কেন সারা অঞ্চলেই এসে পড়েছে দারিদ্র্য; গ্রামের মসজিদটায় আগুন লেগেছিল, এখন পড়ে আছে তার ধ্বংসাবশেষটুকু; ইঁদারাটা গিয়েছে শুকিয়ে; আর, সবচেয়ে অসুবিধের কথা, জেপা নদীর ওপরে নেই একটাও সাঁকো।

ছোট্ট পাহাড়ের গায়েই গ্রামটা, জেপা আর দ্রিনা-র মোহনায়; আর ভিষগ্রাদ যেতে গেলে একমাত্র পথ হল জেপা পার হয়ে যাওয়া। যত চেষ্টাই হোক না কেন পুল বানানোর, জলের তোড়ে সব ভেসে যায়; হয় জেপা সব পাহাড়ে নদীর মতোই হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে ওঠে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় তক্তাগুলো; নয় বাদ সাধে দ্রিনা। আর শীতকালে রাস্তার

ওপর এমনই এক পুরু বরফ পড়ে যে গোরু মানুষ আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙে। যদি কেউ সত্যিকারের একটা ব্রিজ বানিয়ে দিতে পারে, গ্রামবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবে সে।

উজীর ছ'টা গালিচে দান করলেন মসজিদের জন্যে, বলে দিলেন তার সামনে সুন্দর একটা ফোয়ারা বানিয়ে দিতে। আর, সংকল্প নিলেন জেপার বুকে সাঁকো তোলবার।

*

কন্স্টান্টিনোপল-এ তখন এক ইতালীয় স্থপতি বাস করতেন যিনি শহরের আশে পাশে কয়েকটা সেতু বানিয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁকেই উজীরের লোক গিয়ে ধরল, এবং রাজসভার দুজন লোকের সঙ্গে তাঁকে পাঠাল বোস্নিতে।

ভিষ্গ্রাদ গিয়ে ওঁরা যখন পৌঁছলেন, তখনো বরফ পড়ছে। দিনের পর দিন ওখানকার অধিবাসীরা দেখতে লাগল, স্থপতি তাঁর বয়োভারেনুব্জ দেহ অথচ তরুণসুলভ মুখে গিয়ে হাজির হচ্ছেন পাথরের প্রকাণ্ড সেতুটার কাছে ; জয়েন্টগুলোর প্ল্যাস্টারিং ভেঙে নিয়ে কখনো তিনি আঙুলের চাপে সেগুলো গুঁড়িয়ে ফেলেন, কখনো মুখে দিয়ে কী সব পরখ করেন, আর লম্বা লম্বা পা ফেলে মেপে দেখেন খিলানগুলোর দৈর্ঘ্য। তারপর কিছু দিন তিনি চলে গেলেন বাঞ্জা-য়। সেখানেই সেই পাথরের খনি, যার পাথর নিয়ে বানানো হয়েছিল এই সেতু। খনির চারপাশ এখন জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। দিন-মজুর খাটিয়ে স্থপতি সেসব সাফ করিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে খুঁজে পেলেন নতুন এক থাক পাথর, ভিষ্গ্রাদের সেতুর পাথরের চেয়েও সাদা, মজবুত আর বেশ বড়-সড়। তাই দেখে তিনি দ্রিনা বরাবর গিয়ে পড়লেন জেপা নদীতে, বেছে নিলেন নতুন সেতুর উপযুক্ত জায়গা। আর উজীরের লোক দুজনের একজন প্ল্যান আর টাকাকড়ির হিসেব নিয়ে ফিরে গেল কন্স্টান্টিনোপল্-এ।

স্থপতি তার ফেরবার পথ চেয়ে দিন গুনতে লাগলেন, কিন্তু না ভিষগ্রাদে, না ধারে কাছের কোনও খৃস্টান বাড়িতে তিনি থাকতে রাজী হলেন। দ্রিনা আর জেপা নদীর মোহনায় যে-টিলাটা, তারই ওপর এক ছাউনি বানিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন। তাঁর তোভাযীর কাজ করতে লাগল উজীরের অন্য লোকটা, আর একজন কেরানী। নিজে-হাতেই রান্না-বান্না করতেন তিনি; চাষীদের কাছে কিনতেন ডিমটা, দুধটা, পেঁয়াজ আর শুকনো ফল। লোকে বলত, ওঁকে কখনো মাংস কিনতে দেখা যায়নি। সারাটা দিন উনি ছেনি আর বাটালি নিয়ে হয় পাথর কাটতেন, নয় প্ল্যান আঁকতেন, নয়তো রকমারি পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে কাটতেন। এইভাবেই চলল যতদিন না উজীরের লোক কন্স্টান্টিনোপল থেকে উজীরের সম্মতি এবং প্রয়োজনীয় অর্থের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরল। তারপর কাজ শুরু হয়ে গেল।

সবাই অবাক না হয়ে পারল না। কাজ যা দিয়ে শুরু হল, কে বলবে তা সেতু বানানোরই কাজ! ভারি ভারি পাইন-কাঠের গুঁড়ি পোঁতা হল জেপার ওপর আড়াআড়ি করে, তারপর ডালপালা বিছিয়ে দেওয়া হল আর এক পুরু; সব কিছুর ওপর বিছিয়ে দেওয়া হল এক-পুরু মাটি। এই-ভাবে জলের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হল যাতে করে নদীর বুকের অর্ধেকের বেশীটাই শুকনো রইল। এ-কাজ কিন্তু শেষ হতে না-হতে পাহাড়ের কোথায় যেন দারুণ ঝড় হল, হঠাৎ জেপা ক্ষেপে উঠে ফেঁপে ফুলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল একরাতের মধ্যে মাঝ-নদীর বাঁধ। পরদিন নদী শান্ত হলেও, দেখা গেল সব কিছু ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে। মজুরেরা আর গ্রামবাসীরা কানাকানি করতে লাগল, জেপা সেতুটা চায় না। কিন্তু তিন দিনের দিন স্থপতি হুকুম দিলেন নতুন করে গুঁড়ি বসাতে, আরো গভীরে, আর আগের যে গুঁড়িগুলো অবশিষ্ট আছে, সেগুলোকেও ভালো করে পুঁতে ফেলতে। নতুন করে আবার নদীর শুকনো বুক থেকে ভেসে আসতে লাগল হাতুড়ির ঠুকঠাকি, আর তার তালে তালে মজুরদের চিৎকার।

সব যখন তৈরী, বাঞ্জা থেকে এল প্রকাণ্ড সেই পাথরের চাঁই, এল হার্জেগোভিনা আর ডালমাশিয়া থেকে পাথর-কাটিয়ে আর মিস্ত্রীর দল। তাদের জন্যে কাঠের ছাউনি ফেলা হল, যার সামনে বসে ওরা পাথর কাটতে কাটতে তার ধুলোয় সাদা হয়ে উঠল। যেন ছাতু-ময়দার কলের শ্রমিক।

স্থপতি তাদের কাজ দেখতে যান, ঝুঁকে পড়ে ওদের কাজ দেখেন, হাতে তাঁর হলদে ধাতুর একটা ত্রিকোণ, আর সবুজ একটা ওলন। নদীর দু-ধারের পাথুরে ঢালু জমি বেশ একটা শ্রী নিতে শুরু করেছে, এমন সময় টাকায় টান পড়ল। মজুরেরা তাদের অসন্তোষ দেখাতে লাগল; গ্রামবাসীরা গজ-গজ করতে লাগল, এ কাজ ব্যর্থ না হয়ে পারে না। কেউ কেউ আবার কনস্তান্তিনোপল থেকে ফিরে এসে রটাতে লাগল, আগেকার উজীর আর নেই সেখানে। কী হল তাঁর? অসুখ? ভাবনা-চিন্তা? কেউ জানে না। যাই হোক, উত্তরোত্তর তিনি অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছেন, তফাতে চলে যাচ্ছেন, এমন কি কনস্তান্তিনোপলের কাজ-কর্মও ঠিক মতো চলছে না। কিন্তু উজীরের লোক তো গেল আর শহর থেকে নিয়ে এল বকেয়া টাকার খানিক। কাজ এগিয়ে চলল।

সেণ্ট-মিতার উৎসবের পক্ষকাল আগে, যাতায়াতের পথে লোকে হঠাৎ দেখল, জেপা নদীর দু' ধারের ছাই-ছাই স্লেটের বুক চিরে জেগে উঠেছে পাথরে খোদা ধব্‌ধবে সাদা এক দেয়াল যার সারা গায়ে মাকড়শার জালের মতো অসংখ্য মই আর ভারা খাটানো। বরফ যতদিন না পড়তে শুরু করল, পাঁচিলটা একনাগাড়ে গড়ে উঠতে লাগল। তারপর কাজ থেমে গেল; মজুর-মিস্ত্রীরা যে যার ঘরে ফিরে চলল শীত-কালের মতো; রইলেন স্থপতি কেবল, দিন-রাত হিসেব-নিকেশ আর আঁক-জোকে মগ্ন; মাঝে-সাঝে গিয়ে ভারাগুলোকে ঠিকঠাক করে দেন শুধু। বসন্তের সূচনায়, বরফ যখন গলতে শুরু হল, ঘন ঘন তিনি পাঁচিলের কাছে যেতে লাগলেন, এমনকি গভীর রাতেও, হাতে একটা মশাল নিয়ে।

সেণ্ট জর্জ উৎসবের কিছুদিন আগে, মজুরেরা ফিরে এসে কাজে হাত দিল। ঠিক গরমকালের মাঝামাঝি কাজ শেষ হয়ে গেল। খুশী মনে মজুরেরা ভারা-টারা খুলে ফেলল, আর সেতুটা, মসৃণ, ধবধবে সাদা, হেসে উঠল মুক্তি পেয়েঃ একটানা পাথরের সেতু আগে-পাশের দশ-বিশটা গ্রাম উজাড় করে লোক এল সেতু দেখতে। যারা ভিবগ্রাদ কিংবা রোগাতিকা থেকে এল, তারা আক্ষেপ করল, তাদের শহরের বদলে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে এমন সেতু বানানো আর বেনা-বনে মুক্তো ছড়ানো একই কথা!

জেপার অধিবাসীরা বললোঃ এমন উজীর একটা যোগাড় করো না! দুঃখ থাকবে না!

বলে তারা হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করে খাড়া পাঁচিলটার গায়ে আর সেতুর দু-ধারে—যা দেখে কে বলবে পাথরে বানানো? যেন পেল্লায় একতাল মাখন দিয়ে গড়া!

বিদেশী পথচারীরা যখন যাতায়াত শুরু করল সেতুর ওপর দিয়ে, প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা অনেকটা যখন সামলে নিল ওখানের বাসিন্দারা, মজুরদের হিসেব-নিকেষ মিটিয়ে দিয়ে, নিজের কাগজ-পত্র যন্ত্রপাতি গোছগাছ করে স্থপতি পা বাড়ালেন কন্‌স্তান্তিনোপলের পথে। আর, সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর নামে রটতে শুরু হল কত-না কাহিনী। চালচুলোহীন ওই সেলিম, যে কিনা ঘোড়ায় চড়ে ভিষ্‌গ্রাদ থেকে সাহেবের জন্যে এটা-সেটা এনে দিত আর সাহেবের ছাউনিতে একমাত্র যে যাতায়াত করত, মুদিদের দোকানের বেঞ্চে বসে কতবারই না শোনাল ওই বিদেশীর কাহিনীঃ

—"সত্যি বলতে কি, সাহেব মোটেই আর দশজনের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। সেবার শীতকালে, সবাই যখন কাজ বন্ধ রেখে ঘরে ফিরে গেল, আমি গেলাম না। একদিন সাহেবের ঘরে গিয়ে দেখি, আগেরবার যেমন সব অগোছাল দেখেছিলুম, তেমনটিই রয়েছে। উনি বসে বসে মাথা থেকে বগল অবধি ভালুকের ছালের পোশাকে ঢেকে, অনবরত পাথর ঘষে চলেছেন, নয়তো কাগজে আঁক-জোক কাটছেন; দুই হাত ঠান্ডায় নীল। সবুজ চোখ দুটো তুলে আমার দিকে উনি তাকালেন; পুরু অবিন্যস্ত ভ্রূ দেখলে মনে হয়, গিলে খাবে বুঝি! কখনো ও'কে কথা বলতে দেখিনি।

"সে কি অমানুষিক খাটনিটাই না খেটে গেলেন সাহেব দেড়টা বছর ধরে! আর, হাতের কাজ যেমনটি খতম, অমনি বলা নেই কওয়া নেই চলে গেলেন আবার কনস্তান্তি-নোপলে; নদীর ওপার অবধি ও'কে আমরা এগিয়ে দিয়ে এলাম। ঘোড়ায় চেপে বসলেন উনি; ফিরেও তাকালেন না দ্বিতীয়-বার পেছন-পানে, না আমাদের দিকে, না ও'র সাঁকোর দিকে।"

স্থপতি সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলের আর শেষ নেই; নতুন নতুন প্রশ্ন রোজ করে তারা সেলিমকে, রোজই বেড়ে চলে তাদের বিস্ময়, আর অনুতাপ হয়, এত কাছে পেয়েও আরো ভাল করে দেখেনি কেন সাহেবকে!

ওদিকে স্থপতি বের হলেন দেশ-ভ্রমণে। কিন্তু কন্‌স্তান্তিনোপল্ থেকে দু-রাত পথ চলবার পর হঠাৎ তাঁর ওলাউঠা হল। জ্বর-গায়ে, বহু কষ্টে ঘোড়া নিয়ে তিনি শহরে ফিরলেন। তখুনি ইতালীয় যাজকদের হাসপাতালে ও'কে ভর্তি করা হল। পরদিন এক পাদ্রীর কোলে মাথা রেখে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন সাহেব।

সেদিন সকালেই ও'র মৃত্যু-সংবাদ পেলেন উজীর-সাহেব, যখন কিনা তিনি সেতু বাঁধার হিসেব নিকেশ বুঝে নিচ্ছিলেন স্থপতিকে মাত্র প্রতিশ্রুত অর্থের সিকিভাগ দেওয়া হয়েছিল, অথচ ও'র নামে কোনও ঋণ, কোনও টাকাকড়ি, কোনও উত্তরাধিকার কিংবা অধিকারীর হদিস মিলল না। উজীর তখন বকেয়া টাকার তিন ভাগের এক-ভাগ হাসপাতালকে এবং বাকি দু-ভাগ গরীব-দুঃখীকে দান করতে মনস্থ করলেন।

গ্রীষ্মকালের সুন্দর এক সকালে এই মর্মে তিনি যখন আদেশ জারী করতে যাচ্ছেন, এমন সময় বোস্‌নি-র তরুণ এক মুসলমান

লোকের ভিড়ে। কৃষি-আপিস, ব্লক-আপিস, ক্যানাল আপিস। ট্যাক্স-আপিস। জমি আর জমিদারী যদি যায় ক্ষতি নেই, কিন্তু লাভ কি হবে গ্রামের? বড় বড় আপিস খোলা হবে হয়তো, একটা গোমস্তার বদলে সতেরোটা লোক চাকরী পাবে!

যারা চাষের কিছুই বোঝে না, জানে না, শহরে বসে তারা কলমের খোঁচায় যেমন মুনাফা কষে দিয়ে ট্যাক্স বসিয়ে দেয়, সারা বছরের একটা চাষী পরিবারের খোরাকীর খবরটাও রাখে না, এরাও তখন হয়ত এমনি সব নিত্যি নতুন কাজীর বিচার দেবে।

কাজীর বিচার!

কালীমোহনও বুঝি কাজীর বিচার দিয়েছিলেন! একাধিক বিয়ের রেওয়াজ ছিল বলে, বিয়ের দৌলতে সম্পত্তি বাড়ানোর রীতি ছিল বলেই ব্রজমোহনকে বুঝতে চেষ্টা করেন নি, বুঝতে পারেন নি।

বিসর্জনের দিন দুর্গা-প্রতিমার সঙ্গে গ্রামের মাত্র তিরিশ-চল্লিশটি লোকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চলতে শৈশবের সেই হারিয়ে যাওয়া উচ্ছল আনন্দের, ঢাক-ঢোল-হাসি-উল্লাসের দিন কটির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

সেই সুখের দিনগুলির স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর তারই ফাঁকে হঠাৎ একসময় একটি বিষণ্ণ করুণ মুখ মনে পড়ে গিয়েছিল বুড়ি অট্টামার দিকে তাকিয়ে।

পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরছে গিরিজা। ছোট লাইনের ট্রেনটা তাকে নামিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বাঁশি বাজিয়ে চলে যেতেই গিরির নিজেরই লজ্জা বোধ করলো নিজের পোশাকপরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে।

মাত্র কটা মাসের মধ্যে গিরি যেন একেবারেই বদলে গেছে। কলেজের সাহেব অধ্যাপকের নির্দেশে তখন ও ধুতির নীচে কামিজ গুঁজতে শিখেছে।

ধুতি পরায় আপত্তি ছিল না টৌনি সাহেবের। শুধু চটে যেতেন ধুতির ওপর শার্টের প্রান্তটুকু লটপট করতে দেখলে। বলতেন, শার্ট বা পাঞ্জাবি যা খুশি পরো, কিন্তু ধুতি পরবে তার ওপর। ঠিক যেমনভাবে প্যান্ট পরতে হয়।

গিরিজাও সেইভাবেই কাপড় পরেছিল। কামিজের ওপর কোট। পায়ে মোজা, নিউ কাট জুতো।

হাতে ব্যাগ নিয়ে ধুলোটে রাস্তা ধরে গ্রামে ফিরছিল গিরিজা। পুজোর ছুটিতে গ্রামে ফিরছে, মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উল্লাস।

বাজ-পড়া অশ্বত্থ গাছটার তখন এমন চেহারা হয়নি। শাখাপ্রশাখায়, পাতায় পাতায় সারা সাঁওতাল পল্লীটাকে ছায়ায় ঘিরে রেখেছে।

ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সাঁওতালদের পুকুরটায় মুখ-হাত ধুয়ে নিলো গিরিজা, তারপর ব্যাগটা আবার তুলে নিয়ে সবে আলপথ ধরে দু'চার পা এগিয়েছে পিছন থেকে গম্ভীর গলার ডাক এলো।—গিরিজা!

গিরিজা ফিরে তাকালো।

দেখলে কালীমোহন আসছেন। কাঁধে পাট করে রাখা চাদর, কপালে সিঁদুরের তিলক, হাতে রুপোর সিংহাসনে রক্তবস্ত্রে ঢাকা দেওয়া কি যেন।

গিরিজা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, তারপর মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে কালীমোহনকে।

কালীমোহন বিড় বিড় করে কি যেন আশীর্বাদ করলেন।

তারপর কঠিন স্বরে বললেন, তুমি, তুমিও ম্লেচ্ছ পোশাক পরলে গিরিজা!

গিরিজা কোন উত্তর দিলো না। কিন্তু সারা শরীর তার শিউরে উঠলো ব্রজমোহনের কথা মনে পড়তেই।

কালীমোহন ধীরে ধীরে কুশল প্রশ্ন করলেন। আর পরক্ষণেই কেন একটা আতঙ্ক অনুভব করলো গিরিজা। কালীমোহনের কাছ থেকে যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে সে।

ব্রজমোহনের সঙ্গে তার দেখা হবে, কোনদিন ভাবেনি গিরিজা। দেখা করার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেছে, আর একটা আতঙ্কের, রহস্যের ঘর খুলে দিয়েছে ব্রজমোহন তার চোখের সামনে।

সে-রহস্যের হদিস পেয়ে সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল, ব্রজমোহনের সঙ্গে বুঝি দেখা না হলেই ভাল হতো।

আলপথ ধরে তখন আগে আগে চলেছেন কালীমোহন, পিছনে পিছনে গিরিজা।

অনেকখানি পথ চুপচাপ এগিয়ে এসে হঠাৎ এক সময় থেমে দাঁড়ালেন কালীমোহন। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, ব্রজর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল গিরিজা?

সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠলো গিরিজার। কোনরকমে উত্তর দিলো, না।
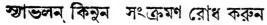
গিরিজা লক্ষ্য করলো, প্রশ্ন করার সময় কালীমোহনের মুখেচোখে যে উৎকণ্ঠা, যে ভয় দেখা দিয়েছিল, উত্তর শোনার সংগে সংগে তা যেন অন্তর্হিত হলো। যেন নিশ্চিন্ত হলেন কালীমোহন।

কিন্তু ভয় গেল না গিরিজার। গ্রামের সকলেই কালীমোহনকে ভয় পেতো, শ্রদ্ধা করতো। আর যখন রাগে সর্বশরীর ফুলে ফুলে উঠতো তাঁর, খড়ম পায়ে খটখট শব্দ করে পায়চারি করতেন কালীমোহন, তখন কেউ সাহস করে তাঁর কাছে যেতে চাইত না।

সবচেয়ে বেশী ভয় ছিল ছোটমার। অসহায়ের মত নির্বিবাদে কালীমোহনের প্রতিটি আদেশ মেনে চলতো।

গিরিজা সে-রাত্রে ঘুমোতে পারলে না। কেবলই ভয়, যদি কালীমোহন কোন ক্রমে জানতে পারেন, তার সংগে ছোটঠাকুরের দেখা হয়েছে। যদি জানতে পারেন গোপনে ছোটমার নামে চিঠি পাঠিয়েছে ব্রজমোহন!

নিজের ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখা চিঠিখানা বার বার দেখে গিরিজা, স্পর্শ নেয়। ভয় হয়, যদি কারো হাতে পড়ে এ-চিঠি!

চিঠিতে কি লেখা আছে, কি এমন নিষিদ্ধ কথা লেখা থাকতে পারে ভেবে পায় না গিরিজা। তবু পড়ে দেখতে চায় না। যে-চিঠি বিশ্বাস করে তার হাতে তুলে দিয়েছে ব্রজমোহন সে-চিঠি খুলবে কি করে!

কিন্তু চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ারও সুযোগ পায় না। কি করে পৌঁছে দেবে চিঠিটা, যে-কথা বলতে বলেছে ব্রজমোহন সে-কথা ছোটমাকে কি করে শোনাবে।

শেষে সুযোগ পেয়ে গেল একদিন।

প্রতিদিনের মতই গোঁসাইদিদি সেদিনও খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে এসে ঢুকলো ঘরে।

ডাকলে, কই গো আমার গিরিগোবর্ধন এসেছে নাকি!

হাসিহাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো গিরিজা।

গোঁসাইদিদি জয় মাধব, জয় রাধে বলে ঝনক ঝনক দু'বার খঞ্জনী বাজিয়ে বললে, মথুরো থেকে এলেন গোপাল, বিদের জন্যে কি এনেছেন গো!

গিরিজা দেখলে গোঁসাইদিদির কথা শুনে মা হাসতে হাসতে ঘাটের দিকে চলে গেল।

আর সংগে সংগে গোঁসাইদিদি ফিসফিস করে বললে, সই যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে গোপাল।

গিরিজা বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের চোখে তাকালে তার মুখের দিকে।

গোঁসাইদিদি এদিক ওদিক তাকলে, কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে চাপা গলায় বললে, ছোটঠাকুরের বউ অমিত্তের পাড়ে যেতে বললে তোমায়। কথা আছে তার।

সংগে সংগে চিঠিটা বের করে নিয়ে ছুটলো গিরিজা। ছুটে ছুটে......একেবারে অমিত্তের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে দেখলে খরী নদীর ধার বরাবর খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে কুঞ্জের দিকে হেঁটে চলেছে গোঁসাইদিদি। বনতুলসী আর নয়নতারার ঝোপের ধারে ধারে।

আর কিছুক্ষণ পরেই কলসী নিয়ে ছোটমাকে তরতর করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখলে।

তাড়াতাড়ি এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো ছোটমা। আর গিরিজা ছুটে গিয়ে তার হাতে চিঠিখানা দিলো।

চিঠিটা পড়লো ছোটমা, পড়তে পড়তে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ বেয়ে। তারপর হঠাৎ ঘাড় নেড়ে বলে উঠলো, না, না, পেসাদ, তা হয় না বাবা, তা হয় না।

গিরিজা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলো ছোটমার মুখের দিকে। কত আশা নিয়ে, কত

বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তার এ-চিঠি পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে সে। সে তো শুধু ছোটমার বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্যেই। ছোটমার ব্যর্থ জীবনকে নতুন করে ভরে তুলতে পারবে বলেই।

আর ছোটমা কিনা......

ছোটমা বলে উঠলো, না পেসাদ, তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো, তা হয় না। আমার জীবন তো নষ্ট হয়েছে, বটঠাকুরের সুনাম, বংশের সুনাম আমি নষ্ট হতে দেবো না। লোকে হাসবে, অপমান করবে বটঠাকুরকে, হয়তো......

হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো গিরিজা।

বললে, ছোটঠাকুর খ্রীষ্টান হয়েছেন এ-কথা তুমি বলোনি কেন, কেন চেপে রেখেছিলে?

চমকে উঠলো ছোটমা। মুখে আঙুল দিয়ে অনুনয় করলে, চুপ, চুপ করো পেসাদ।

রাগে ফেটে পড়লো গিরিজা। বললে, না, চুপ করবো না আমি। বলো তুমি, কেন বারবার মিছে কথা বলেছো, কেন জানতে দাওনি তুমি খ্রীষ্টানের বউ।

গিরিজার রাগ দেখে সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ছোটমার।

ধীরে ধীরে বললে, না না পেসাদ, এ-কথা তুমি আর কাউকে জানতে দিও না বাবা। এ তুষের আগুনে আমাকেই শুধু জ্বলতে দাও। বটঠাকুরের সম্মান, বটঠাকুরের মেয়েদের বিয়ে......সবই যে আমাকে ভাবতে হয়েছে পেসাদ। আমার নিজের সুখের সঙ্গে যে আরো অনেকের জীবন জড়িয়ে আছে—অনেকের!

দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরিজা সে-কথা শুনে। বিস্ময়ের চোখে ও শুধু তাকিয়ে রইলো ছোটমার মুখের দিকে। কি আশ্চর্য, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নিজের জীবনকে আহুতি দিয়ে চলেছে ছোটমা শুধু সংসারের আর পাঁচজনের কথা ভেবে?

ছোটমা খানিক চুপ করে থেকে বললে, ও কেন নিজের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হতে গেল পেসাদ, কেন, কেন!

গিরিজা ধীরে ধীরে বললে, ছোটঠাকুর তোমাকে নিয়ে যাবেন, জোর করে নিয়ে যাবেন ছোটমা। শুধু তুমি যদি রাজি হও।

শিউরে উঠলো ছোটমা। বললে, না, না, তুই ওকে নিষেধ করিস বাবা। আমার এই সিঁথির সিঁদুরটুকুই অনেক সুখ পেসাদ, এটুকুও তুই মুছে দিতে চাস?

গিরিজা চমকে উঠলো সে-কথা শুনে। বললে, কি বলছো ছোটমা?

—হাঁ, বাবা, ও যদি এ গাঁয়ে ফিরে আসে, যদি জোর করে নিয়ে যেতে চায় আমাকে... তা হলে......

—তা হলে বড়ঠাকুর ওকে খুন করাবেন?

মাথা নীচু করে রইলো ছোটমা। কোন উত্তর দিলো না। গিরিজা দেখলে ছোটমা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখে আঁচল দিয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে গিরিজা বললে, কিন্তু রজকাকা যে তোমার সঙ্গে দেখা করবেই ছোটমা। রজকাকা যতদিন ভেবেছে তোমার কাছে ধর্মই বড়ো ততদিন তোমার ওপর অভিমানে দূরে সরে থেকেছেন। কিন্তু সে ভুল যে তুমিই ভেঙে দিয়েছো! তোমার জন্যেই যে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন তিনি, তোমার জন্যেই......

—আমার জন্যে? কি বলছিস পেসাদ? বিস্ময়ে অবিশ্বাসে চোখ কপালে তোলে ছোট মা।

গিরিজা উত্তর দিল, হ্যাঁ, ছোটমা, তোমার জন্যেই। বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরিজা। তার চোখের সামনে সেদিনের দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল, যেদিন ব্রজমোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সরু গলির সেই মেসের ঘরে একান্তে বসে সব কথা খুলে বলেছিল ব্রজমোহন।

বলেছিল, স্ত্রীর মর্যাদা রাখার জন্যেই আমি ধর্মত্যাগ করেছিলাম গিরিজা।

স্ত্রীর মর্যাদা! গিরিজার মনে পড়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল কালীমোহনের তিন তিনটি বিবাহের কথা। তিন সপত্নীর পরিবার নিয়ে বাস করতেন কালীমোহন। সে কালে এর মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখতো না, কোন অসামাজিকতা ছিল না।

সম্পত্তির লোভে তাই ব্রজমোহনেরও দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন কালীমোহন। বিবাহের দিন পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ব্রজমোহন অসম্মতি জানালো।

ব্রজমোহনের চিঠি পেয়ে সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কালীমোহন। ক্রুদ্ধ হয়ে চিঠি লিখেছিলেন তাকে, জানিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় রাজি না হলে, তাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন তিনি, কন্যাপক্ষের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা তিনি রাখবেনই।

কালীমোহনকে ভয় পেত ব্রজমোহন। পিতার স্নেহ দিয়ে অগ্রজ তাঁকে মানুষ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর শাসনকে, তাঁর প্রতিজ্ঞাকে অমান্য করার সাহস ছিল না। জানতেন, জ্যেষ্ঠ কালীমোহনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস নেই কারো। পিতৃহীন ব্রজমোহন ভয় পেয়েছিল, তাই পরিত্রাণ পাবার জন্যে......

ব্রজমোহন বলেছিলেন, তাই ধর্মান্তর গ্রহণ করলাম আমি গিরিজা। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আমি, দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের কথা আমি ভাবতেও পারিনি। কিন্তু......

সপ্রশ্ন চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছে গিরিজা।

আর ব্রজমোহন বলেছেন, অথচ তোমার ছোটমার কাছে ধর্মই বড় হলো গিরিজা!

— ছোটমা জানে সে-কথা? প্রশ্ন করলে গিরিজা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে ব্রজমোহন, বললে, না। একটু থেমে আবার বললে, না গিরিজা, কোনদিন তাকে জানাই নি সে-কথা।...... আমারও তো অভিমান আছে গিরিজা, কেন ভুল বুঝলো সে, কেন জানতে চাইলো না... তবু বার বার আমি তাকে নিয়ে আসতে চেয়েছি, ফিরে পেতে চেয়েছি তাকে!

ব্রজমোহনের সেই কথাটাই ধীরে ধীরে বললে সে ছোটমার কাছে। আর তা শুনে বিস্ফারিত চোখ মেলে গিরিজার মুখের দিকে তাকালো ছোটমা।

গিরিজার দু খানা হাত ধরে আবেগের কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, সত্যি? সত্যি বলছিস পেসাদ?

সঙ্গে সঙ্গে ছোটমার দুটি বিস্ফারিত চোখ বেয়ে ঝরঝর করে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়লো।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু পেসাদ, বংশের, পরিবারের মানসম্মান তো আমি নিজের স্বার্থের খাতিরে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারবো না বাবা! না, না, তা আমি পারবো না।

প্রথম প্রথম তাই ব্রজমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও রাজি হয়নি ছোটমা।

বারবার ছোটমার চিঠি বয়ে নিয়ে গেছে গিরিজা, ব্রজমোহনের হাতে সে-চিঠি পৌঁছে দিয়েছে, মিথ্যা স্তোকে ভুলিয়েছে তাকে। আর বারবার ব্রজমোহনের অনুনয় ভরা চিঠি এনে দিয়েছে ছোটমার হাতে। গোপনে গোপনে।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু সাহস বাড়েনি ছোটমার। শুধু গিরিজার এনে দেওয়া চিঠিগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ছোটমা, আর চোখের জল ফেলেছে।

প্রশ্ন করলেই বলেছে, না, না পেসাদ, তা হয় না। এত বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই তার সংগে, এ বেশ আছি। দেখা হলে জ্বালা বাড়বে বই কমবে না।

তারপর কখনো কখনো একটু থেমে বলেছে, আমার সুখ আনন্দই তো সব নয়, এত বড় একটা গুরুবংশ, কত সম্মান সুখ্যাতি, সে-বংশের গায়ে কলঙ্কের দাগ আমি দিতে পারবো না পেসাদ।

—কলঙ্ক? গিরিজা বিস্মিত হয়েছে। কলেজে পড়ে, শহরের মানুষের সংগে মিশে ওর মন তখন অনেকখানি মুক্ত হয়েছে। তাই বুঝতে পারেনি ও।

ছোটমা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, কলঙ্ক নয়? ভটচায বাড়ির ছেলে খৃীষ্টান হয়েছে এ-কথা শুনলে যে অপমানের শেষ থাকবে না পেসাদ, ভাসুরের মেয়েগুলোর বিয়ে হবে না! তুই কাউকে বলে ফেলিসনি তো পেসাদ?

গিরিজা সান্ত্বনা দিয়েছে।—না, না। সে-কথা কি বলতে পারি ছোটমা। কিন্তু তুমি যদি রজকাকার কাছে চলে যাও, তা হলে...

ছোটমা গম্ভীর হয়ে গেছে। চোখ ছলছল করে উঠেছে।—কেউ যে বিশ্বাস করবে না রে। কত কি মন্দ কথা ভাববে। সেও যে বংশের দুর্নাম।

তারপর, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে ছোটমা। বলেছে, না, না, আমি সব ছাড়তে পারবো, আমি ধর্ম ছাড়তে পারবো না পেসাদ। ধর্ম ছাড়তে পারবো না।

কি আশ্চর্য সে-কথা শুনে মনে মনে খুশী হয়েছে গিরিজা, ছোটমার কথায় নিজেও যেন গৌরব বোধ করেছে। ধর্ম। গিরিজার মনে পড়ে প্রথম যেদিন ব্রজমোহন বলেছিল, আমি খৃীষ্টান হয়েছি গিরিজা, সেদিন ভিতরে ভিতরে ব্রজমোহনকে কিছুতেই যেন পছন্দ করতে পারেনি সে। সেদিন একটা অন্ধ ক্রোধে যেন জ্বলে উঠেছিল সে ব্রজমোহনের বিরুদ্ধে।

অথচ, আশ্চর্য, গোঁসাইদিদির মনে তার জন্যে কোন ক্ষোভ ছিল না। কোন ক্রোধ ছিল না।

নতুন গোড়ের পাড়ে দাঁড়িয়েছিল গিরিজা। পুকুর পাড়ের বাঁশ কাটছিল ঘরামির দল। চাটুজ্যেদের ঘর ছাওয়াবার জন্যে।

হঠাৎ চাপা গলার গুনগুনানি শুনে ফিরে তাকালো গিরিজা। দেখলে গোঁসাইদিদি আসছে। শ্যামলা রঙের মসৃণ গোলগাল মুখখানা তৃপ্তির হাসিতে ভরা। নাকে কপালে ফোঁটা-তিলক, উন্মুক্ত দুখানা সুডোল কালো কালো বাহুতে গঙ্গামাটির ছাপ, হাতে খঞ্জনী।

খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এলো গোঁসাইদিদি। কণ্ঠে মৃদুসুরের গান, কিঙ্কিনি কংকন বাজে শ্যাম অনুরাগে......

তারপর কাছে এসে হঠাৎ খঞ্জনী থামিয়ে বললে, কি গোপাল, কুঞ্জে যাবে আমার সংগে, চলো বড়ো গাছের কৃষ্ণফল পেকেছে।

কৃষ্ণফল অর্থাৎ জাম। গোঁসাইদিদি রহস্য করে বলতো আমার শ্যামের ছটায় এমন রঙ হয় গো, এ ফল কৃষ্ণফল।

গিরিজা হাসলো। ইচ্ছেও হলো খরি নদীর ধারের সেই নয়নতারা বনতুলসীতে ঘেরা কুঞ্জটা দেখে আসতে। বহুকাল ওদিক পানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, তাই বললে, চলো। যাবো তোমার সংগে।

গোঁসাইদিদি খুশীতে হেসে বললে, চলো গোপাল চলো। বলে আলপথ ধরে মাঠের মধ্যে দিয়ে এ'কেবে'কে চললো তরতর করে, পিছনে পিছনে গিরিজা।

গিরিজার কাছে গোঁসাইদিদি চিরদিনই এক রহস্য। গ্রামের সব মেয়েদের মুখেই দুঃখের ছাপ, কান্না, ব্যথা। অথচ গোঁসাই-দিদির ঢলোঢলো মুখে সব সময় তৃপ্তির হাসি।

গিরিজা তাই হঠাৎ এক সময় বলে বসলো, তোমার কোন দুঃখ নেই, না গোঁসাইদিদি।

গোঁসাইদিদি ফিরে তাকালো, হেসে বললে, গোবিন্দ তো দুঃখ কাউকে দেন না। বলেই গান ধরলো, শ্যামেরে পাইলে কাছে সে যে গো অতীব সুখো, শ্যাম-বিচ্ছেদে সে যে আনন্দ-দুঃখ!

আর গিরিজার মনে হল, ছোটমার মনেও যদি এমনি আনন্দ থাকতো, এমনি তৃপ্তি!

কাঁটাকুলের ঝোপ এড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছিল গিরিজা। হঠাৎ গোঁসাই-দিদি বললে, গোপাল, শোন একটা গোপন কথা আছে তোর সংগে।

—কি কথা? বিস্মিত হলো গিরিজা।

গোঁসাইদিদি বললে, ছোটঠাকুরকে একবার লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কুঞ্জে আনতে পারিস গোপাল?

গিরিজা চমকে উঠলো কথা শুনে। কোন উত্তর দিতে পারলো না।

আর গোঁসাইদিদি বললে, একবার আসতে বল গোপাল, সইকে এনে একবার দেখা করিয়ে দিই।

গিরিজা স্তম্ভিত হয়ে বললে, কি বলছো গোঁসাইদিদি?

গোঁসাইদিদি হাসলো। বললে, সব জানি রে, সেই কবে থেকে—সব জানি। সই আমায় সব বলেছিল।

তারপর ধীরে ধীরে গাইলে,

হৃদয়ের ভূষণ-আমার চিন্তামণি ধন,
নয়নের ভূষণ আমার রূপ-দরশন।
কাজল দিয়ে কি সাজাবি?

পরক্ষণেই হঠাৎ গান থামিয়ে বললে, জীবন হলো কুসুমের বন, কাঁটা ফেলে দিয়ে গাঁথো চিকণ মালা।

গিরিজা তাকালো গোঁসাইদিদির মুখের দিকে।

বললে, কিন্তু ছোটমা যে রাজী হবে না গোঁসাইদিদি!

—হবে গোপাল হবে। কেত্তন শোনার নাম করে নিয়ে আসবো 'আমি। বড়ঠাকুর জানতেও পারবে না।

কিন্তু বড়ঠাকুর জানতে পারলেই হয়তো ভাল ছিল।

আজ; এখন সেই কথাটাই ওরা ভাবছিল। ওরা চারজন—নন্দ, রমেশ, সুব্রত আর নিতাই।

এখন দুপুর। শেষ দুপুর। বিকেল আসে নি, দুপুরও শেষ নয়; যেন মধ্যিখানে একটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ি সামনে নিয়ে মুখোমুখি দু'জন এসে দাঁড়িয়েছে: দুপুর আর বিকেল; দুই পোশাকের দুই ভদ্রলোক। আর ওরা, ওরা চারজন হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। জানলার কোণে কাচ-পোকার পাখা লটকানো দেখল মাকড়সার জালে, লেজখসা টিকটিকির দিকে চোখ তুলে চুপ হল, ভেন্টিলেটারে চড়ুই-বাসার আবর্জনায় মানিক্য খুঁজল এবং হতাশ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে রোদ-পোড়া পথে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে গিয়ে ফেলল না—যেহেতু এখন দুপুর, শেষ দুপুর—বিকেল আসতে আরও সামান্য বিলম্ব।

সামনে আরশি নেই, জল নেই; তবু নিথর জলে নিজের মুখ দেখার মতন ওরা যার যার মুখ দেখে চুপ। জানে, জলে বাতাস খেলবে। জল নড়বে। ঢেউ উঠবে। এবং এই নিটোল মুখ দুলতে দুলতে চিরে যাবে—যেমন যায় তেফাটা কি ঢিল খাওয়া আয়নায়। তেমনি করে ফেটে যেতে যেতেও ওদের চোয়াল শক্ত হবে, দাঁতে দাঁত পড়বে। ভীরু বুক পাথর হয়ে উঠবে।

অল্প বিশ্রাম। দুপুর মরে আসা পর্যন্ত। তারপর সত্যি যখন দুপুর মরবে, উঁচু উঁচু বাড়ির ছাদে, চিলেকোঠায় প্রদীপের নরম আলোর মতন নিস্তেজ মোলায়েম হয়ে আসবে রোদ। গাছের মাথায় হলুদের সঙ্গে সবুজের একটু ভাব ফুটবে, তখন ওরা [illegible]। পাল্লা টেনে দিয়ে দরজায় তালা লাগাবে নন্দ, হাসবে। এবং তখন এ-ঘরের রাত থেকে ওরা বাইরের দুপুরে পা দিয়ে আসন্ন সন্ধ্যা সময়ের খুশীর হাসি হাসবে।

নন্দ কথাটা বলতে গিয়েছিল, বলল না; যেহেতু সে লক্ষ্য করেছে ওরা তিনজন, প্রত্যেকেই বেওয়ারিশী মালের মত বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে। শুয়ে রয়েছে। কেউ এ-দিকে তাকিয়ে কেউ অন্যদিকে—তবু ওরা সকলে কিছু বলবে। বলতে চায়। আর সেই কথাটা ভেবে কারো মুখে কথা নেই।

দুই তক্তপোশ এক করে ঢালা বিছানা। তেল্চিটে নোংরা। বিড়ির ছাই, পোড়া দেশলাই কাঠি, পায়ের ধুলো এবং মাথার নোংরা তেলে কুষ্টি বিছানা বালিশ। তারই মধ্যে ওরা গড়াচ্ছিল। নিতাই চিৎ হয়ে ছাদে চোখ রেখেছে, রমেশ এতক্ষণ গত বছরের ক্যালেণ্ডারের পুরনো সিনেমা-ছুকরির ছবি দেখছিল, এখন বালিশে মুখ গুঁজে কানা হল। নন্দ বিছানায় শরীর রেখে পা তুলে দিয়েছে দেওয়ালে, একটা বিড়ি ধরিয়ে সুব্রত ধোঁয়ার চাকতি ছুঁড়ছিল। যেন রেলের থার্ড ক্লাশ মুসাফিরখানায় চারজন অচেনা যাত্রী গাড়ির প্রতীক্ষা করছে।

পাশের ফালি বারান্দার কোণ থেকে অল্প ধোঁয়া আসছিল। পড়ন্ত আঁচে কিছু খুচরো কয়লা ঢেলে দিয়ে এসেছে নিতাই। চা হবে। বেরুবার আগে। মেঝেয় ডাঁইমারা এঁটো বাসনের কাঁড়ি। ভাত এঁটোকাটা এখনও ছড়ানো রয়েছে। থাক। সপ্তাহের এই একটি দিনের আলসেমি যেন উপভোগের আনন্দের খুশীর।
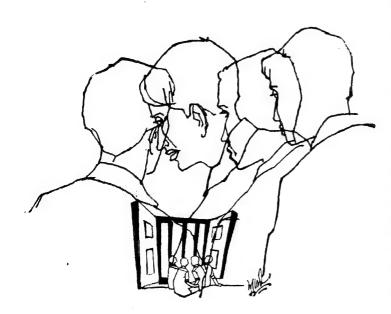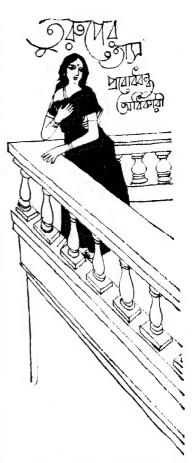
ভোর ভোর সকালে দুধের গাড়িটা এই গলিতে আসে। কদর্য আওয়াজ করে। অন্তিম কালের রোগীর শেষ টান ওঠার মতন শব্দ করে ইঞ্জিন থেমে যায়। চুপ। আর সেই বিকট আওয়াজে ওদের ঘুম ভাঙে। প্রথমে একজন কি দু'জন ওঠে। সবাইকে ডেকে তোলে। তারপর চারজন, চার সহবাসী হাত তুলে হাই তোলে। গায়ের আড়মোড়া ভাঙে। বাইরে তাকায়। কোনো-দিন এক-আধ-চিলতে রোদের মুখ দেখে, কোনও দিন বাসি চোখে সকালের নি-রোদ পবিত্র আলো লুফে নেয়।

রোজ ওদের ঘুম ভাঙে এমনি করে, এক শব্দে; যেন হরিণঘাটার দুধের গাড়ি ভোর ভোর রাত্রির বুড়ো বৈরাগীর গলায় ঘুম-জাগানিয়া গান গেয়ে যায় ভাঙা কর্কশ গলায়। রোদ উঠলে আলো, নইলে অপরিসর এই নোংরা ছোট গলির মুখ ঘন ধোঁয়া প্রায় চাপ বেঁধে থাকে। ছোট উঠোন কি রাস্তা অথবা বারান্দা এবং আনাচে কানাচে ভোরের উনুনে তখন আঁচ উঠি উঠি করছে; ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ কানা। তখন ওরা ওঠে। একজন বাসিমুখে ঝুলকালি বারান্দার কোণে কয়লা ভাঙে, পালা হিসাবে অন্যজন আঁচের সেবায় ব্যস্ত।

সকালের চা-বাটি হাতে নিয়ে সময় নেই। বেলা চড়তে থাকে; অফিসের তাড়া সুতরাং কেউ বাজারে, কেউ উনুনে, কলতলায় কেউ—কেউ বা মশলা পেশার আয়োজনে ব্যস্ত। সারা সপ্তাহ এমনি; ঘড়ি চোখে নিয়ে বসে থাকা। কেবল রবিবার, এই একটিমাত্র দিন যেন হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া বেদাবীদার দশ টাকার নোটের মতন। বেলায় ওঠ ক্ষতি নেই। অফিস বন্ধ। চার বাটি চা আর বাড়তি তলানি-অলা কেটলি সামনে নিয়ে সময়কে অতি হেলায় ওরা বধ করতে পারে। যেহেতু শনিবারের বিকেল থেকে বাতাসে, পথে ছুটির গন্ধ। এবং বেলায়, চড়ুই-ভাতিতে আসা তারুণ্যের মন নিয়ে ছুটির দিনের পাঁচ বেনুনের রান্না আছে, দুপুর থেকে বিকেল-আসা সময়টুকু বিশ্রাম আছে। এবং সবশেষে আছে সপ্তাহের দেখা-সাক্ষাতের পালা—মাসির বাড়ি, বৌদির বাপের বাড়ি, আর মামীর সংগে দেখা করার চুক্তি, বেড়ানোর—যেন সারা শহরে ওদের আত্মীয় পরিজনের অভাব নেই।

আজও ওরা বেলায় উঠেছিল। শীতের সকাল মেঘলা হয়ে ছিল খানিক। ধোঁয়ার কুয়াশায় পথঘাট আবছা, দূরের ছোটবড় এবং উঁচুতলা বাড়ির মাথা ঘোলা কুয়াশায় ডুব দিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। পরে, রোদ উঠলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নিতাই চা করেছে, নন্দ নিশ্চুপে কাপ বাটি ধুয়েছে, রমেশ এরই মধ্যে মোড়ের দোকান থেকে একঠোঙা তেলেভাজা আনল। তারপর চারজন গত রবিবারের সকল গ্লানি মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে জোড়া তক্তপোশের ওপর পাতা ঢালা বিছানায় জাঁকিয়ে বসল। কাছাকাছি।

কথা নেই। গ্লাসে প্রথম চুমুক দিতে গিয়ে সুরত ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। আচমকা বিষম খেয়েছিল সুরত। এবং সংগে সংগে মুখের অদ্ভুত শব্দ আর গিলতে-না-পারা চা ছড়িয়ে পড়ল চারজনের গায়ে।

'হুত...' নন্দ প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল। 'কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে তোর...'

'ইডিয়েট!' একহাতে চা-বিন্দু ছড়িয়ে পড়া চাদর ঝাড়া দিচ্ছিল রমেশ। 'ইয়ার্কির একটা সীমা থাকা দরকার...'

নিতাইও খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আত্মসমর্পণ। 'আমার দোষ নেই...' ওদের দিকে পাশ তাকানোর মতন করে সুরত ইশারায় বাইরেটা দেখাল।

ওরা চারজন গলা বাড়াল। জানলার দিকে।

সকালের আবছাভাব কেটেছে খানিক আগে। কুয়াশা মরে শীত-সকালের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ির মাথায় মাথায়, গাছের মগডালে এবং ফাঁকা পথে ইতস্তত। শীতল এবং তুহিন হওয়ায় উষ্ণতা জেগেছে সামান্য। পথের কোলাহল এখন চরম। চারটি ভিন্ন মাথা ঔৎসুক্যে, আগ্রহে এবং কৌতূহলে কাছে সরে আসতে আসতে ঘন হল, শেষে এক; লাগালাগি।

শশী লেনের ঠিক মোড়ের বড় বাড়িটার ছাদ ওদের লক্ষ্য। ছাদে একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে নয়, মেয়েটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল রোদ গায়ে মেখে। পিঠময় এলানো চুল থেকে থেকে উড়ছিল, অযত্ন আঁচল লুটোচ্ছিল, তা জড়িয়ে নিতে গিয়ে মেয়েটি এ-দিকে ফিরল।

'খুব ফরসা রে......' নন্দ নিশ্বাস চেপে বলল।

'নাইস ফিগার......' রমেশের চাপা গলায় উচ্ছ্বাস।

'আঃ, কী চুল দেখেছিস?'

'চোখ দুটো নিশ্চয়ই......' নিতাই খুব আবেগের গলায় মেয়েটির অদেখা চোখের বিবরণ দিতে গিয়েছিল। কিন্তু সুরত আচমকা ওর পিঠের জামা মুঠো করে ধরে
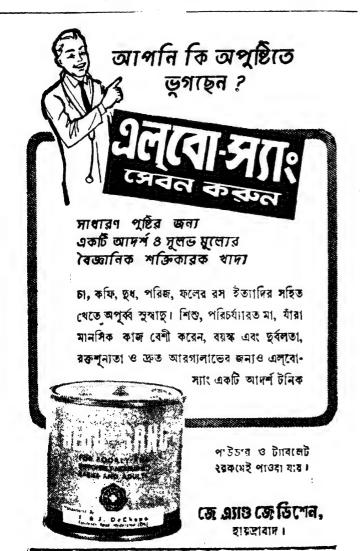
অনেকে গলায় এমন করে ধমক দিল, যেন মেয়েটি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

কার্নিসের ধার থেকে সরে গেল মেয়েটি। ঘুরছিল, কোথাও খানিক দাঁড়াচ্ছিল, তাকিয়ে দেখছিল দূরে দূরের বাড়ির সারি, আকাশ মেঘ পাখি...

'হাঁসের মতন গলা...'

'শাড়িটা চমৎকার খেলেছে...'

'চাঁদটা কাছে থাকলে না...'

কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না, অথচ কথা বলছিল। আর মেয়েটি চারজোড়া চোখের চাউনি লুফে নিয়ে ছাদময় পায়চারি করতে করতে একসময় নেমে গেল।

ফস্ ফস্ করে চারটি দীর্ঘশ্বাস এক সঙ্গে পড়লেও চারমাথা লেগে থাকল। আলাদা হল না। যেন মেয়েটি আবার আসবে, আসতে পারে এমন আশা ওদের জড়িয়ে রেখেছে।

'এল না!' অনেক পরে রমেশ মাথা সরিয়ে নিল। তার গলায় আক্ষেপ এবং দুঃখ ছিল।

'আমাদের দেখে ফেলেছে নিশ্চয়', নন্দ আহত বিক্ষুব্ধ গলায় বলল।

'হবে না!' সুব্রত মাথা সরিয়ে নিয়ে বিরক্তের গলায় বলছিল, 'এমন অদেখলার মতন ও কালে...'

'সত্যি গিলে খাওয়ার মতন...'

'তুই থাম!' রমেশ জোর গলায় ধমক দিল। 'ভগবানের দুনিয়ায় চোখ বুজে চলা কোন শালা? একশবার তাকাব আমরা। হাজারবার। সে রাইট আমাদের আছে।'

চুপচাপ। রমেশের ধমক ওদের মুখের কথা, মনের আবেগ কেড়ে নিয়েছিল। হেঁটমাথা হয়ে ওরা যে-যার চায়ের বাটিতে চোখ নামাল। জুড়িয়ে-যাওয়া চা-কাপে চুমুক দিল নিশ্চুপে, নিঃশব্দে। যেন হাতের কাছে কোনো জিনিস পেয়েও ধরতে না পারার যন্ত্রণা নিয়ে লোভনীয় সেই দৃশ্যের কথা ওরা ভুলতে পারছিল না।

'দিনটা খুব খারাপ যাবে...'

'হেতেরি, মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে...'

'আজ যদি রেণুর দেখা না পাই না......' নন্দ এমনভাবে কথাটা বলল, যেন আজ বিকেলে রেণুর দেখা না পেলে ও আত্মহত্যা করবে।

নিতাই অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলবে বলে ঠিক করেছিল। সেই কথাটা। দিদির কথা। কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না পাছে নন্দ আবার ধমকে ওঠে। নন্দকেই যা ভয়। হঠাৎ ও চার্জ করে বসবে হয়ত।

ওরা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। আবার চুপচাপ। রমেশ পা ছড়িয়ে দিয়ে গা আলগা করল, নন্দ আবার ও-দিকে তাকিয়েছে...... অতএব এই সময়। 'ওর চুল দেখে দিদির কথা মনে হচ্ছে আমার...' নিতাই তিনজন সঙ্গীর কারো দিকে না তাকিয়ে জানলায় চোখ রাখল।

রমেশ বিড়ি ধরাচ্ছিল। ধরিয়ে হাতের জ্বলন্ত কাঠিটা আঙুলের টোকায় জানলা গলিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিল, 'আসলে চুলটুলই হল মেয়েদের সৌন্দর্য...'

'ঠিক ঠিক...' নন্দ রমেশের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়েছিল, 'চুলফুল না থাকলে মেয়েদের মাইরী মন্দা মন্দা দেখায়।'

এতক্ষণে কথাটা নিজের হাতের মুঠোয় পেয়েছে নন্দ। চট করে রমেশের হাত থেকে বিড়িটা কেড়ে নিয়ে সুখ টানের মত লম্বা দম দিয়েছিল। 'তা হলে শোন', নন্দ গল্প বলতে শুরু করে দিয়েছেঃ 'সেবার এক পাত্রপক্ষ এসেছিল। খুব বড়লোক। রেণুর চুল দেখে না মাইরী একেবারে কাৎ। বলে কিনা পছন্দ...'! একটা ভুরু কপালের দিকে তুলে তাচ্ছিল্য এবং কারুণ্যের হাসি

হাসছিল নন্দ। 'পছন্দ হলেই হল? জানে না মেয়ে আগেই আর এক জনকে...।' থেমে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল নন্দ, 'জানিস, গত রোববারে ও আমাকে না বলছিল সে-কথা। বলে, আমার সংগে চলে আসবে...' যেন এ-চারজন ছাড়াও এ-ঘরে কেউ উপস্থিত আছে, তার কান বাঁচিয়ে নন্দ চাপা গলার রেণুর কথাটা ওদের শোনাল।

রেণু কে—এ-ঘরের বাকি তিনজন সঙ্গী কোনোদিন চাক্ষুষ না দেখতে পেলেও, রেণুকে সকলে চেনে। নন্দর বৌদির বোন। সুন্দরী। নন্দকে ভালবাসে। শুধু এইটুকুই না, রেণু নামের সেই পরীর মতন সুন্দরী মেয়েটির কত বয়স, কতটা লম্বা, তার শরীরের রঙ, মুখের ডোল কি গড়ন-পিটন কোন কিছুই অজানা নেই ওদের। যেহেতু রেণু এক সুন্দরী অবিবাহিত যুবতী অতএব তার হাসি, চলাফেরার ছন্দ, অভিমানের ভঙ্গির বিবরণী শুনতে এ-ঘরের কৌমার্য আগ্রহী।

'এক রোববার যদি না-যাই না, তা হলেই লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়।' নন্দ রেণুর অভিমানের গল্প শোনায়। 'বড়লোকের মেয়ের মেজাজই ওই রকম।'

একজন বলে, বাকি তিনজন শ্রোতা। এবং এই বলা শুনতে শুনতে ওরা এক হয়ে গেছে। নন্দর বৌদি কবে প্রেম করে দাদাকে বিয়ে করেছিল, বৌদিদের বাড়ি ক-তলা, কেমন, কটা দেউড়ি, ক-জন দারোয়ান সব জানা। সব ওরা জেনেছে, চিনেছে; যদি নন্দর বদলে রমেশ নিতাই কি সুব্রত হঠাৎ গিয়ে ও-বাড়ি ওঠে তবে কোথাও তাদের ভুল হবে না। ঘর চিনতে নয়, কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে, কোনটা রান্নাঘর আর কোনটাই বা ড্রেসিং রুম অথবা কোথায় কি রাখা আছে সব ওদের নখ-দর্পণে।

নন্দ কি ভাবতে থামল। আর ওদের মন কচুপাতার ওপরে একবিন্দু জলের মতন টলমল করছিল। রমেশ নিতাইয়ের দিকে তাকাল, পরে সুব্রতর চোখে—তিন দুগুনে ছ-চোখ এক হল। হয়ে নীচু হল। বাস্তবিক ছ'টি চোখের নীল বিন্দু জ্বলছিল। নিতাই তৈরী হয়ে নন্দকে দেখছিল। নন্দ থেমেছে, এবার নিতাই বলবে। ও-কিছু বলার আগেই নিতাই তার দিদির কথাটা বলে নেবে ভাবছিল।

'ননীমাসির মতন...'। রমেশ আচমকা নন্দর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়েছে। 'মেয়েদের মন না, সব বয়েসে এক।' তুরুপের তাসটি ঠিকমত পেতে দেওয়ার আনন্দ রমেশের গলায়, 'তা নইলে মাইরী রেণুর সংগে ননীমাসীর এমন মিল হয়? কি জানিস?' রমেশ পকেট হাতড়াচ্ছিল। বিড়ির জন্যে। সুব্রত তার ভাগের বিড়ি থেকে একটা বাড়িয়ে দিল। রমেশ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ল। 'আমি অনেক ভেবে দেখেছি, মেয়েরা হল গিয়ে মাটির মতন। সব এক। আসলে নরম থাকার সময় ভগবান আলাদা আলাদা করে গড়েছে। তাই ননীমাসির সংগে রেণুর অমন মিল।'

'ঠিক, ঠিক'...' নন্দ রমেশের কথায় সায় দিল। 'ভাগ্য খারাপ, নইলে তুই নির্ঘাৎ পণ্ডিত হতিস রে রমা।'

'খালি পণ্ডিত? বড়লোক বল।' রমেশ ভাগ্যকে ধিক্কার জানাল। 'ননীমাসি তো সে দিনও বলছিল। বলে, থাক। তোরা তো জানিসই মাসিটা জন্মবাঁজা। ছেলেপুলে নেই। থাকলে একেবারে লাট হতে পা'র। কিন্তু সত্যি ও-সব আমার ধাতে সয় না।'

ঠোঁট উলটে, ভুরু কুঁচকে রমেশ অর্থ এবং দৌলতকে তুচ্ছ করল। 'আদর-ফাদরই ভাল। হপ্তায় একদিন যাই, ননীমাসির আদরের জন্যে। কী আদর যে করে না... আমার মাইরী লজ্জা করে।'

ওরা কেউ না। কেউ অর্থ চায় না। দৌলতও না। আদর চায়। আত্মীয়তা চায়। তা নইলে এইখানে, চারবন্ধুর এই খেলার ঘরের মতন ফালতু মেসে ওদের দিন কাটত না। সুব্রত মামীর কাছে থাকতে পারত। নিতাই দিদির কাছে। রমেশ মাসির ঘরে ছেলের আদর পেতো। আর নন্দ রেণুকে বিয়ে করলে দু' লাখ টাকার সম্পত্তির মালিকানা পেত।

'টাকা সব নয়...' রমেশ একদিন বলেছিল। 'মুচি মুন্দাফরাস মাইরী এ-শহরে পাঁচতলা বাড়ি করেছে। আগে জাত ছিল টাকার। এখন শালা বেজাত হয়েছে। তার চেয়ে আমরা সুখে আছি। অনেক সুখে। বড়লোক হওয়ার চাইতে, টাকাঅলা আত্মীয়ের আদর টু-পাইস ফালতু ইনকামের মতন।'

দিদির কথাটা বলা হচ্ছে না কিছুতে। হয় না। নিতাইকে ওরা বলতে দেয় না। যেহেতু নিতাই ছোট, মুখের কাঁচভাবে এখনও বয়সের ছাপ পড়ে নি। এই দুনিয়ার কীইবা দেখেছে সে? কিছু না। তবু সে বন্ধুত্ব পেয়েছে। তিনবন্ধুর মেসে আশ্রয় পেয়েছে। আর করুণা। ওরা তিনজন, রমেশ নন্দ আর সুব্রত আত্মীয়ের গল্প বলতে বলতে যখন ক্লান্ত, তখন নিতাইয়ের পালা। নিতাই তখন দিদির গল্প বলে। বলে যায়; আর ওরা, ওরা তিনজন এমন-ভাবে শোনে, যেন ছোট ছেলের মুখে রূপকথার গল্প শুনছে।

বাস্তবিক সংসারে তখন মাথার ওপরে দিদিকেই দেখেছে। দিদি। নিতাই খুব আবেগ দিয়ে দিদির কথা বলে।...বাবার মুখ মনে নেই। আমি ছোট, কোল-ন্যাওটা প্রায়: বাবা তখন চোখ বুজেছিল। দিদি কাঁদছিল, কাঁদত। মা তার পাঁজর-ওঠা বুকে ধাই ধাই করে কিল মারতে মারতে কিছুদিনের মধ্যেই বিছানা নিয়েছিল। সংসারে আর কেউ নেই, দিদি আর আমি। রাতে আমি দিদির কাছে শুতাম। গল্প শুনতাম। খুব ভাল গল্প বলতে পারত দিদি, রূপকথার গল্প। বাস্তবিক, বাবা নেই, মা থেকেও না থাকার মতন; দিদিকেই আমি মা-বাপ বলে ভেবে নিয়েছিলাম...' নিতাই থেমে যায়। চুপ করে। রোজ। এবং ওরা তিনজন, নন্দ রমেশ আর সুব্রত নির্বাক। যদিও ওরা জানে এ-গল্পের শেষ এখানে নয়, দূরে; আরও পরে। নিতাই রোজ এখানে থেমে যায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ছলছল চোখ মুছে নিয়ে একটু চুপ করে থাকে। আর ওদেরও চোখের পাতা ভিজে আসে। খানিক পরে নিতাই আবার মুখ খোলে।... খুব সুন্দরী ছিল দিদি। কলকাতার এক বড়লোকের ছেলে বেড়াতে গেল গ্রামে। দিদিকে দেখে তার পছন্দ হয়েছিল। তারপর বিয়ে।

শ্রোতা তিনজন চুপ। আগে চুপ-চাপ থাকত। এখন, দিদির ব্যথা, নিতাইয়ের দুঃখ ওদের চোখ ভেজায় না, মন দ্রব করে আনে না। নিতাইয়ের হাতে লাটাইয়ের সুতো ছেড়ে দিয়ে ওরা বিড়ি টানে, বাইরে তাকায়, ছাদের কড়িকাঠ গোণে কিংবা চোখে চোখে অন্য কথা বলে। *কারণ ওরা জানে, ওদের মাসী কি মামীর মত নিতাইয়ের দিদি হপ্তায় এই একটি দিনের জন্য পথ চেয়ে থাকে।* যেমন থাকে নন্দর রেণুও। এবং নিতাই গেলে, দিদি কিছুতে ছাড়তে চায় না। বলে, তুই থাক না এখানে। থাকলে তোর অভাব কিসের? কিন্তু মন টানে না। দিদি সুখে থাক, তার পয়সায় বাহাদুরী করে সুখ নেই।

নন্দ বলে, নিজের পায়ে না দাঁড়ালে বেঁচে থেকে সুখ নেই। নইলে শালা, বৌদির বোনটাকে বিবি করে আমি রাজার হালে থাকতে পারতাম।

সুব্রতরও এক কথা। এবং রমেশেরও। তাই চারজন তিন গাঁয়ের ছেলে এক হয়েছে। এক মেসে আছে। সারা সপ্তাহ ধরে খেটেখুটে একটা দিনের আত্মীয়-সুখ ওদের কাছে মোটা অঙ্কের নগদ কিছু ফালতু ইনকামের মতন।

চার চাকাঅলা একটি চলন্ত গাড়ির মতন। *ওরা চারজন চাকা, আত্মীয়-চর্চা সেই গাড়ি, যা চার চারটি বছর ধরে দ্রুত গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাওয়ার মতন হয়েছে। চলারও একটা সীমা আছে, দূরত্ব আছে।* তাই হঠাৎ, হঠাৎই ওরা আবিষ্কার করেছে, এই গাড়ি আর চলছে না; চলবে না। তবু ঢিমে তালে চলছিল, দু-তিন রোববার থেমে থেমে এসে গত রবিবারে ওরা বুঝেছে,

গাড়ি অকেজো। এবং আজ, এখন, ওরা চারজন, প্রায় শেষ হয়ে আসা দুপুরে নোংরা তেলচিটে ঢালা বিছানায় তৃতীয় শ্রেণীর মুসাফিরের মতন গা এলিয়ে দিয়ে সেই কথাটাই ভাবছিল। ভাবতে গিয়ে ওদের চোয়াল শক্ত হয়ে আসছিল, চোখ জবলছিল, তবু ওরা কিছু বলছে না; যেহেতু এখন দুপুর, শেষ দুপুর, বিকেল আসতে আরও খানিক বাকি।

পশ্চিমের ভাঙা-পাললা একটিমাত্র জানলা খোলা রয়েছে। মেঝেয় লেপটে যাওয়া চৌকণা রোদের ফালি ঝকঝক করছিল। এবং ফালিটা যত সরে যাচ্ছিল ওদের বুকের মধ্যের হাতুড়িটা তত বেশি জোরে জোরে শব্দ তুলছিল। নন্দ আড়চোখে নিতাইকে দেখে নিচ্ছিল। নিতাই রমেশকে। রমেশ সুব্রতকে। এবং সুব্রত যত না তাকাতে চাইছে, তার চোখ তত বেশি নন্দর দিকে সরে যাচ্ছিল।

ঘর স্তব্ধ, চারজন প্রাণী নিশ্চুপ নির্বাক। ছাদ, জানলা, ভেন্টিলেটার আর পথ দেখা চোখগুলো তপ্ত, প্রখর হয়ে আসছিল। জান্তব ক্ষিপ্ততায়, মনের দৈন্যে, বিমর্ষ ক্ষুধতায় ওদের প্রকম্পিত ভুরুগুলো বেঁকে বেঁকে আসছে। আর ওরা চাউনিতে, চারজন চারজনকে এমনভাবে দেখে নিচ্ছিল, যেন আদিগন্ত মরুভূমিতে কত কাল ধরে চলতে চলতে নিঃস্ব ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে একে অন্যের শরীরকে তীব্র লোভের জিভে চেটে নিচ্ছে।

হঠাৎ, আচমকা এ-ঘরে বাজ পড়ল। নিতাই তার গুটোনো পা ছড়িয়ে নিতে গিয়েছিল, নন্দর মাথায় ঠোকা লাগতে সে বাঘের মতন লাফিয়ে উঠল, 'শালা শুওরের বাচ্চা......' ভীষণ আক্রোশে নন্দ ঝাঁ করে নিতাইয়ের মাথার চুল মুঠি করে ধরে ফেলেছে, 'চালবাজ...'। নিস্তব্ধ, থম ধরে থাকা ঘরে নিতাইয়ের গলা গমগম করে উঠল, ফেটে পড়ল। 'এক কোৎকা মেরে শালা তোর গোছা ভেঙে দেব। বড় বাড় বেড়েছে না?' নন্দ হাঁপাচ্ছিল।

সুব্রত আর রমেশও ততক্ষণে লাফিয়ে উঠেছে। ওরা নন্দকে থামাতে গিয়েছিল। সরিয়ে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু এক ঝটকা মেরে নন্দ ওদের সরিয়ে দিল। 'গিধরের বাচ্চাকে আজ আমি শেষ করব। দিদি? শালার আবার দিদি...' চোখে মুখে হিংস্র এক বীভৎসতা। নন্দর মুখ বেঁকে গিয়েছে। হাপরের মতন বুকের খাঁচাটা ওঠানামা করছিল। 'কোথায় তোর দিদি...?' নন্দ ধাই ধাই করে নিতাইয়ের পিঠে চড় চাপড় ঘুসি মারছিল, 'ফালতু আদমীর আবার দিদি। চা দোকানে শালা তের টাকা মাইনে পাস, দেশে তোর মা-বোন খেতে পায় না, শহরে এসে তোর বাড়-ফাট্টারী বেড়েছে? আয়...আয়...তোর দিদিগিরি আজ...'

নিবু নিবু ফুলকিটা দপ্ করে জবলে উঠবে ওরা জানত। চারজনই জানত। কিন্তু এখন, এখনই হঠাৎ তা দাউ দাউ হয়ে উঠবে ভাবে নি। রমেশ আর সুব্রত নন্দর কিলঘুসি খেয়ে ওকে সরিয়ে এনেছে। নিতাই বালিশে মুখগুজে কাঁদছে। নন্দ বাঁহাতের তালুতে কপাল রেখে হেঁটমাথা হয়ে থাকল খানিক। বাকি দুজন চুপ, পাথর। নন্দ এতক্ষণে একটা বিড়ি ধরিয়ে বাইরে তাকাল।

থম ধরে থাকা ঘরে কান্নার সুর। নিতাই কাঁদছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, শরীর মুচড়ে। বাস্তবিক বয়সে ছোট বলে, এ-ঘরের তিনজনের সকল আক্রোশ তার ওপর। ...আমি না হয় তের টাকা মাইনেয় চা-দোকানে বয়গিরি করি, কিন্তু তোমরা? নিতাই আহত, ক্ষুব্ধ হয়ে মনে মনে বলছিল ...তোমরা এমন কিছু বড় চাকুরে নও। তিন অফিসের বেয়ারা, চাল্লিশের ওপর কেউ পাও না। পাবে না...

দু' হপ্তা আগেও এমনি এক দুপুরে এ-ঘরের ফুলকিটা আচমকা দপ্ করে জবলে উঠেছিল। দুপুরে। ওরা চারজন বাতিল জঞ্জালের মতন বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। নন্দ রেণুর গল্পটা তখন সবে শেষ করেছে। নিতাই দিদির কথা পেড়েছে সবে। ঠিক এমন সময়, তিনটি নিরুদ্ধ বারুদে আগুন লাগল। চ্যালেঞ্জ, বাজি; সত্যতা প্রমাণের। তোমার দিদি আছে? বেশ, প্রমাণ চাই। মাসী, মামীর প্রমাণ চাই, রেণু যে ভালবেসেছে নন্দকে তারও যোগ্য প্রমাণ দিতে হবে। সবাই, ওরা চারজন, নন্দ-রমেশ-সুব্রত আর নিতাই একমত। ওরা প্রমাণ চায়, প্রমাণ দেবে। এবং সেই থেকেই এ-ঘরে সজাগ শিকারী বিড়ালের চোখ ওৎ পেতে আছে। কারণ, ওরা চারজন চারজনকেই চিনেছে, চিনে ফেলেছে।

আজ আর এ-ঘরে অন্য ঘটনা ঘটেনি। প্রায় প্রত্যেক রবিবারের মতন নিতাই চোখের জল মুছে চুপচাপ উঠেছে। আঁচ-রান্না উনুনে চা করেছে। কেটলি নিয়ে বিছানায় বসে ওদের বোবা মুখে কথা আসেনি। এবং দুপুর মরে এলে, যখন বিকেলের নম্রতায় কলকাতা শহর মোলায়েম

হয়ে এসেছে, ব্যাটারীর তেজ কমে আসা টর্চের আলোর মতন রোদ বিষণ্ণতা পেয়েছে, তখন ওরা আশপাশের ছাদ থেকে রেণু, মামী, মাসী কি দিদির মতন দেখতে মেয়েদের দেখার পালা সাঙ্গ করে হপ্তার সাজা সেজেছে। নন্দ ভাঙা পাল্লা জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে কপাটে তালা লাগিয়ে তিন বন্ধুকে নিয়ে পথে নামল। নেবুতলা মোড় পর্যন্ত এক সঙ্গে, তারপর পথ ভিন্ন, আলাদা।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলে কলকাতা শহরের আলাদা রূপ। দোকানে দোকানে আলোর চেকনাই, রঙ-বেরঙের। রেডিও বাজছে। ঘণ্টি মারতে মারতে ট্রামগুলো যাচ্ছে যেন ঢোঁড়া সাপের মতন। ট্যাক্সির হর্ন, রিক্সার ঠুনঠান, সাজাগোজা মেয়েরা সব বেড়াতে বেরিয়েছে। গল্প, কথা, কলরব, কত শব্দ! নিতাই হাঁটছিল, গ্রাম থেকে আসা নতুন ছেলের মতন। বাস্তবিক রাতের কলকাতা ফিরিঙ্গীপাড়ার মেয়েদের মতন চপল উচ্ছল।

হাওড়ার পুল থেকে নেমে এসে, স্ট্র্যান্ড রোড ধরল নিতাই। ব্র্যাবোর্ন রোডের মোড়ে ঘুগনীঅলা খুব ঘুঘনি বেচছে।

অনেক খদ্দেরের ভিড় ওখানে। পকেটে হাত দিল নিতাই।......দু পয়সার ঘুগনি খাবে সে ভেবেছিল, কী ভেবে খেল না। পা চালাল। একটি সুন্দর মেয়ে ও-পাশের অন্ধকার অন্ধকার শেডের নীচে দাঁড়িয়ে এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে রসিকতা করছে। নিতাই ভাবল, থামবে। কথা শুনে নেবে ওদের। কিন্তু এখানে অনেক লোক। চাই কি নন্দ কিংবা রমেশের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

নিতাই হাঁটছিল। জোরে।...না নন্দ নয়, রমেশও না; নির্ঘাত সুব্রত। সুব্রতই। হাওড়ার পুলের রেলিঙে কনুই রেখে ও আকাশ দেখছিল। আর জাহাজ। গঙ্গার বুকে জোছনা পড়েছে! ছোট ছোট ঢেউয়ে চাঁদ নাচছে। লঞ্চ কি নৌকো যাতায়াত করছিল। নিতাই আচমকা দাঁড়াল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আড়াল করে নিয়ে নিশ্চুপে সরে এসেছে। নিশ্চয় সুব্রত দেখতে পায়নি—নিতাই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

কোথাই যাই, কোথায়? নিতাই কত কথা ভাবতে ভাবতে ইডেনে ঢুকতে গিয়ে আবার চমকাল। সরে এল। হ্যাঁ, রমেশ। বাদাম কিনছে।...মাসের প্রথম সপ্তাহ, হাতে পয়সা আছে। নিতাই পকেট হাতড়াল কিন্তু দাঁড়াল না। পারলে ছুটত। দৌড় মারত। ইস, রমেশের চোখে চোখ পড়ে গেছে! কিন্তু ও কি ধরতে পেরেছে! না, অত আচমকা দেখে লোক ঠাহর করা যায় না। না দৌড়লেও প্রায় ছোটার মতন পায়ে নিতাই নিজেকে আড়াল করার জন্য হাঁটছিল।

পালাই পালাই করে নিতাই কার্জন পার্কে যখন এল, মেট্রোপলিটান বাড়ির গম্বুজ ঘড়িতে তখন ন-টা বাজে। বসবে ভেবে বসা হ'ল না। নন্দ বড় গাছটার তলায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে। এ পাশে ও-পাশে আরও কয়েকজন লোক। নিতাই দেখল, নন্দ তোলা দু'হাঁটুর ওপর হাত রেখে কোলের অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে।

কোমর ব্যথা ব্যথা করছিল। বিকেল থেকে অনেক পথ হেঁটে এসে পা দু'টোও আর চলতে চাইছে না। নিতাই তবু বসল না। ত্রস্ত পায়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে ধর্মতলা, তারপর ওয়েলিংটন, বৌবাজার মোড়—নিতাই এক আনার ছোলা-মটর চিবোতে চিবোতে পথ হাঁটছিল। এবং থেকে থেকে আজ বিকেলের কথা মনে করে ক্ষেপে উঠছিল। বিকেলে নন্দ মেরেছে। কিল চড় ঘুসি। চুলের মুঠি ধরে নন্দ শালা তের টাকা মাইনের বয় বলে গালাগাল করেছে। বলেছে, 'কেউ নেই, থাকলে কোন শুয়ারের বাচ্চা এই গোয়ালে পড়ে থাকে!'...সত্যি কি সংসারে আমার একটা দিদি থাকতে নেই? এত লোক, পথেঘাটে গিজগিজ

করছে। দুনিয়া ভরে কত মানুষ...মানুষ ...মানুষ...নিতাই ভেজা চোখ মুছে নিতে গিয়ে হোঁচট খেল আচমকা। হাড়কাটা লেনের শিবমন্দিরের কাছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে, সামনের গলি চিনতে পেরে নিতাই থামল। তার চোখ দু'টো আচমকা জ্বলে উঠেছিল।

এক এক করে ওরা ফিরল। নন্দ, রমেশ সুব্রত আর নিতাই।

শেষ ট্রামটা এইমাত্র চলে গেল কদর্য আওয়াজ তুলে। তারপর গোটা পাড়া চুপ-চাপ। ততক্ষণে ওরা রোববারের ধার-করা পোশাক ছেড়ে লুঙ্গি, ছেঁড়া প্যান্ট, নোংরা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বসেছে। চুপচাপ। নন্দ বিড়ি ধরিয়ে দু'টান মেরে রমেশকে দিয়েছে। রমেশ সুব্রতকে। এবং সুব্রত অনিচ্ছার টান টেনে ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে বিড়িটা ছুঁড়ে দিয়েছে। বাইরে।

অনেকক্ষণ ধরেই ওৎ পেতে ছিল নিতাই! পোশাক ছাড়েনি। নন্দ ওকে বার বার দেখ-ছিল। 'কিরে, উনুন ধরা...'

'না'। নিতাই বেপরোয়া। খিদে নেই। দিদি কিছুতে ছাড়ল না, তাই...'

'আবার দিদি? শালা...'

'হ্যাঁ, দিদি...' নিতাই বুক চেতিয়ে এগিয়ে এল। 'এস, এস, দেখ।' নিতাই ওদের তিনজনের নাকে পিঠ আর বুক ঘষে দিয়েছে, 'দিদির গন্ধ...দিদির...'

সত্যি গন্ধ। তিন জোড়া চোখ গোল ছানাবড়া প্রায়। নিতাই হাসছিল। আর ওরা তিনজন, নন্দ রমেশ আর সুব্রত বারবার নিশ্বাসে আত্মীয়ের বাসনা নিচ্ছিল। শুঁকছিল ভুখা শুওরের মতন নাক বাড়িয়ে।

উনুন ধরেনি। পেটে খিদে নিয়ে অন্ধকারে ওরা কাতরাচ্ছিল। ঘুমের আরাধনা করছিল। কিন্তু ঘুম আসেনি। ক্ষুধার্ত, নিঃস্ব ভাগ্যহীন চারজন মানুষ ঘুম ডেকে ডেকে যখন ক্লান্ত, ঠিক তখন এই নিস্তব্ধ ঘরে কান্না উঠল। হ্যাঁ কান্না।

...কে কাঁদে? নন্দ উঠে বসল, সুব্রত আর নিতাইও। এবং অন্ধকারের চার মাথা কাছাকাছি হলে চার হাতে ওরা চারজনের চোখের শুষ্কতার প্রমাণ নিতে গিয়ে পাথর, কাঠ।

'কেউ নেই...' নিতাই নন্দর চোখ থেকে ভেজা হাত নামিয়ে নিয়েছে। অন্ধকারে ওদের গা হাতড়ে নিতাই ক্ষুব্ধ ক্ষিপ্তপ্রায় গলায় বলল। 'দিদির গন্ধ কিনতে শালা একমাসের টাকা বেশ্যার ঘরে দিয়েছি...'

'কেউ নেই...' সুব্রত ফোঁপাচ্ছিল।

শেষরাতের অন্ধকারে, সহায় সম্পদহীন চারজন যুবক, ঘৃণায়, বিরক্তিতে, হতাশায় এবং চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে জড়াজড়ি করে নোংরা বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের ফাইন আর্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সত্যেন ঘোষালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ২১শে ফেব্রুয়ারি আর্টিস্ট্রি হাউসে কলকাতায় তাঁর ছবির প্রথম একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় এবং ২৭শে পর্যন্ত খোলা থাকে। মোটা তুলির রেখা ও বিষয়বস্তুর ভাবানুসারে রঙের সমাবেশে ছন্দোবন্ধ দৃশ্যসৃষ্টিতে এখনকার দিনের দক্ষ শিল্পী-দের মধ্যে সত্যেন ঘোষাল যে অসাধারণ কৃতী তা তাঁর প্রত্যেকখানি ছবিই অভিব্যক্ত করে।

আঁকার রীতি—রেখার টান ও রঙের পরিকল্পনা ঠিক ভারতীয় নয়, আবার পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য ধারার অনুগামীও বলা যায় না। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অবশ্যই আছে এবং সেটা এসে পড়ার কারণও রয়েছে। কল-কাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে লণ্ডনের গোল্ডস্মিথ কলেজ স্কুল অফ আর্ট এবং স্লেড স্কুল অফ আর্ট শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইওরোপের বহু স্থানে ব্যাপক ভ্রমণের সঙ্গে ছবি এঁকে যান এবং ইওরোপের আধুনিক শিল্পধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন।
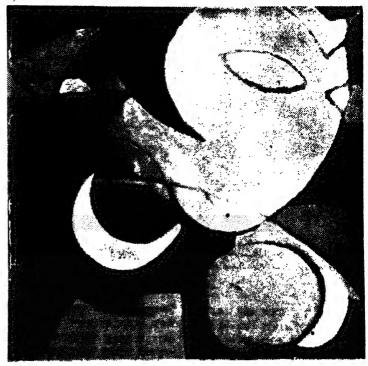
প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে তাঁর প্রাক-পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব আমলের কাজও রয়েছে এবং তা থেকে তাঁর বর্তমান স্টাইলে পৌঁছানর বিবর্তনের ধারাটা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় আগের স্টাইল ছেড়ে পাশ্চাত্ত্যে লব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অবলম্বনে তিনি একটা নিজস্ব স্টাইলের উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। আগে-কার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি (জব্বলপুরের মার্বেল পাহাড়) তিনি তুলির বিক্ষিপ্ত মোটা আঁচড়ে ধরে ধরে রঙ প্রয়োগ করে মনোরম রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, আবার মডেল থেকে আঁকা নেপালী মহিলার নগ্ন-দেহের কয়েকখানি প্রতিকৃতির মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যরীতির ছন্দোময় গঠনসৌকর্য একটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে।

আগেকার আঁকা ছবিগুলি শিল্পীর স্টাইলের বিবর্তন লক্ষ্য করার সুযোগ দেয়,

জ্যোৎস্না — শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল
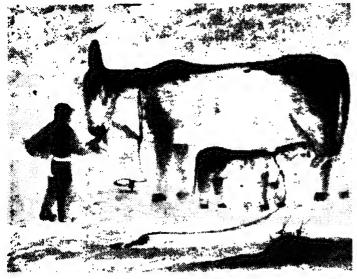
মমমর্মী — শিল্পী : সমর ভৌমিক

ভবে প্রদর্শনীটি আসলে তাঁর বর্তমান স্টাইলের সাতাশখানি ছবি নিয়ে। এ ছবিগুলি ১৯৬০ থেকে এ বছর পর্যন্ত আঁকা। তাঁর এখনকার স্টাইলের ভিত্তি হচ্ছে বৃত্তাকার ও সরল জ্যামিতিক রেখা যা অধিকাংশ ছবিতে একটা কাব্যিক ছন্দ মূর্ত করে তুলেছে (যেমন 'জ্যোৎস্না'—১৫নং)। বিমূর্তন ধারার প্রতি প্রবণতা (যেমন, 'সান্ত্বনা'—২০নং) কতক ছবিতে স্পষ্ট। ছবিগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং বিন্যাসেও বেশ একটা কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায় যা দর্শকমনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে।

সম্মিলিত প্রদর্শনীতে পৃথিবীর বহু শিল্পকেন্দ্রেই সত্যেন ঘোষালের ছবি প্রশংসা অর্জন করেছে ব্যক্তিত্বপূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীর জন্য। কলকাতার শিল্পরসিকদের কাছেও তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য সমাদর লাভ করবে।

* * *

আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত দিনে সমর ভৌমিকের ছবির একক প্রদর্শনীটি একটু ভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য পরিবেশন করে। তরুণ শিল্পীর তেলরঙের ছবি, রেখাচিত্র এবং লিনো-কাটের কাজগুলি একান্তভাবেই ভারতীয় রীতির অনুসরণ।

একটা সময় ছিল, যখন পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত ভারতীয় বা প্রাচ্যরীতির ছবি প্রদর্শনে শিল্পীরা গর্ববোধ করতেন এবং ঐ ধারায় এক সময়ে অনন্যকৃতিত্বের এবং মৌলিক-সৃষ্টির দর্শনলাভ করাটাই সাধারণ নিয়ম ছিল। কিন্তু ইদানীং এর ব্যতিক্রমই লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ থেকে, কিংবা এদেশের মানুষের ধর্ম ও সামাজিক জীবন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বিষয়বস্তু হিসেবে অবলম্বন করেও রেখা ও রঙের প্রয়োগে এবং বিন্যাসে পাশ্চাত্যের আধুনিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর শিল্প-মনীষার অনুসরণ বা অনুকরণ দেখা দিয়েছে। কারুর ছবিতে সরাসরি অনুকরণ না থাকলেও পাশ্চাত্যের প্রভাবে নিজস্ব এটকা মৌলিক ভঙ্গীর উদ্ভাবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সমর ভৌমিকের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, মুঘল ও রাজপুত ধারার অনুসরণ দেখা যায় এবং সূক্ষ্মভাবে রেখা ও রঙের প্রয়োগে

মুমূর্ষু দানব — শিল্পী : সমর ভৌমিক

মনোরম চিত্রসৃষ্টিতে তিনি দক্ষতাও প্রকাশ করেছেন।

চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো উজ্জ্বল বর্ণ প্রয়োগের চেয়ে স্নিগ্ধ রঙের সমাবেশে দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টাই তিনি করেছেন। কালিদাসের কাব্য থেকে গ্রহণ করা বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'উত্তরমেঘ', (৬নং) চীনা পর্যটক 'হুয়েন সাঙ' (৫নং), রাজপুত মিনিয়েচার পেইন্টিং রীতির 'ধ্যানস্থ' (৪নং), মুঘল মিনিয়েচার রীতির 'কবরস্থানে' (১৭নং) প্রভৃতি ছবিগুলি অংকনরীতি ও রঙের প্রয়োগে চমৎকার একটা ভারতীয় সুর ফুটিয়ে তোলে।

অন্যান্য টেকনিকে কাজের মধ্যে চীনা রীতিতে সিল্কের কাপড়ের ওপর আঁকা দুখানি ছবি, লিনোকাট, উডকাট ও ড্রাই-পয়েন্টের কতকগুলি কাজও উল্লেখযোগ্য। 'মুমূর্ষু দানব' (১নং) ছবিখানিতে বলুকোর সাহায্যে চিত্রবিন্যাস আর একটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব।

মানিক লাঁজ: 'ফরাসী ফ্লু'

আর্থার কোয়েসলার একদা একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সাহিত্যের যাঁরা কর্ণধার, যেমন পত্রিকার সম্পাদক সমালোচক প্রবন্ধকার, তাঁরা হামেশাই এক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই রোগের নাম 'ফরাসী ফ্লু'। খুব সতর্ক ব্যক্তিও এর হাত থেকে রেহাই পান না। চোখের সামনে একটি ফরাসী কবিতা বা গদ্যের লাইন ভেসে উঠলেই তৎক্ষণাৎ তিনি হাঁচতে থাকেন, গদগদ হয়ে পড়েন, রক্তস্রোতে উৎসাহের রসক্ষরণ হতে থাকে। অর্থাৎ একটি মাত্র ফরাসী শব্দ—ইনফ্লুয়েঞ্জার একটি নিশ্বাসের মতনই এই ভয়ঙ্কর রোগ শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কোয়েসলারের এই নিদারুণ পরিহাসের লক্ষ্য ছিলেন অবশ্য ইংলণ্ডের সাহিত্যশাসকরা, কিন্তু সব দেশের সাহিত্যঅলাদের প্রতিই এটা প্রযোজ্য। আজও।

ফরাসী দেশ থেকে যা আসে তাই 'বৎসরের বিস্ময়'। যেমন ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ। বহু বিস্ময়ের ফুলঝুরির জন্মালয়ে এখন নিষ্প্রভ। এখন বিলেতী সমালোচক, তাঁর মধ্যে ক্ষুদ্র তারকার মৃত্যু অবলোকন করছেন।

মানিক লাঁজ আর-এক সাগাঁ। কথাটা আমি বলছি না, অনেকে বলছেন বলে মানিক লাঁজ-এর প্রকাশক দাবি করছেন।

মানিক লাঁজ ফরাসী দেশের নতুন সাহিত্যিকদের অন্যতম। মাত্র দুটি উপন্যাস এ যাবৎ তাঁর প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস লিখেই পাঠক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন বিস্তর। এখন তিনি পারি শহরের প্রিয় লেখিকা, নব-তারকা। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস পুরস্কার পেয়েছে

বিদুর

(Prix Ducaz)। ইংরেজী তর্জমা হয়েছে দুটিরই, প্রথমটি 'দি ক্যাট্ ফিশ' নামে অনূদিত, দ্বিতীয়টির নাম হয়েছে 'দি গ্লেন ব্রিজ'। দ্বিতীয় উপন্যাসের—যেটি পুরস্কার-

প্রাপ্ত গ্রন্থ—ইংরেজী তর্জমা সম্প্রতি পড়লাম। প্রথমটি সংগ্রহ করেছি, এখনও পড়া হয়নি।

শুনেছি, ফরাসী সাহিত্যের রস ইতর-জনের জন্য নয়। আমরা যারা নিতান্ত শাকান্নে পালিত কলকাতাবাসী বাঙালী তাদের পক্ষে ফরাসী সংস্কৃতি এবং সেই সংস্কৃতির শোভাযাত্রীদের অনুধাবন করা নাকি ধৃষ্টতা। হতে পারে, নাও পারে। কে বলতে পারে, যাঁরা ফরাসী শুনলে 'ফ্লু'তে আক্রান্ত হন তাঁদের তুলনায় আমরা সতর্ক।

মানিক লাঁজ যদি ভুল করে বাঙালী মহিলা হতেন, বাহবা দিতাম। কেননা আর কিছু না হোক লেখায় পালিশ থাকত, কোনো কোনো জায়গা পড়ে হৃদকম্প হত, বলতে বাধ্য হতাম, কী দুঃসাহস! এখানের পক্ষে অবশ্য সেটা নতুন হত বলেই বাহবা দেওয়া। কিন্তু ফরাসীর কাছে মানিক লাঁজ কোন কারণেই নতুন নন। অথচ জনপ্রিয় হয়েছেন।

'দি গ্লেন ব্রিজ' আকারে ছোট। এক শ' পাতাও নয়। বিষয় প্রেম। কাহিনীর সময়কাল দু-তিনটি বেলার বেশী নয়। চরিত্রও মাত্র দুটি—নায়িকা ক্লদিয়া, নায়ক দিয়েগো। পরোক্ষে আরও একটি চরিত্রের উপস্থিতি সব সময়ই অনুভব করা যায়, নাথালি।

যদি কাহিনীর সারল্যের কথা ওঠে, তবে 'দি গ্লেন ব্রিজ'-এর কাহিনী অতি সরল। গ্রীষ্ম সমাগত পারি শহরে ছুটির হাওয়া লেগেছে। দিয়েগো তার গাড়ি নিয়ে তৈরী, পথের নিশানা ঠিক করে নিচ্ছে, দূরে পাড়ি দেবে, দক্ষিণের দিকে। ক্লদিয়া বিদায় জানাতে এসে অনুরোধ করল, তোমার সঙ্গে খানিকটা যাই চলো। না বলো না। আমি কাছাকাছি কোনো উপকণ্ঠ থেকে ফিরে আসব ট্রেনে।

দিয়েগোর ইচ্ছে ছিল না, ক্লদিয়া তার সঙ্গে যায়। তবু এই সামান্য প্রার্থনা সে মঞ্জুর করল। গ্রীষ্মের বাতাস পারিতে এসেছে, গ্রীষ্ম যেন অনেকটা দূরে—নগরীর বাইরে, দক্ষিণে, সমুদ্রতীরে।

যাত্রাশুরু থেকে ক্লদিয়ার ফিরে আসা পর্যন্ত মাত্র একটি বিকেল ও রাত্রি এবং পরের দিন সন্ধ্যাকাল—এই সময়টুকু পক্ষে

হয়ে গেছে; ছটেন্ত পুরোনো গাড়িটার মধ্যেই বেশীর ভাগ যা কথাবার্তা। কদাচিত কোনো সরাইখানায় বিশ্রাম অল্পের জন্যে, হোটেলে এক রাত এক কক্ষে একই শয্যায় বাস—ক্লদিয়া এবং দিয়েগোর হৃদয় সম্পর্ককে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে লেখিকা অন্য সুযোগ নেন নি।

ক্লদিয়ার প্রেম যেন দিয়েগোর পদপ্রান্তে ভিক্ষুকের মতন সর্বক্ষণ কামনা করেছে, আমায় তুমি গ্রহণ কর। অবশ্য, গ্রহণের অতিরিক্তও কিছু ছিল, তোমার প্রেম আমায় দাও।

দিয়েগো প্রতিদান দিতে অক্ষম। তার প্রেম, ক্লদিয়ার ধারণা, নাথালি শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিঃশেষ করে শুষে নিয়েছে। ক্লদিয়া যে-প্রেমের প্রতিদান পাবে না, তাকে আর অনর্থক পুষে রাখতে চায় না—অতএব এইখানে সম্পর্কের যতিপাত!

"I can't go on giving myself for ever unless there's some return. With you there can be no return. I have to leave."

সমুদ্রের কাছাকাছি পর্যন্ত দিয়েগোর সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল ক্লদিয়া, বাসনা ছিল এই সমুদ্র সে স্পর্শ করতে পারবে। ফিরে এল প্রত্যাখ্যাত হয়ে। ভোরের আলোয় পারিতে নেমে ক্লদিয়ার মনে হয়েছিল, যেন তাকে খদ্দের না-পাওয়া বেশ্যার মত দেখাচ্ছে।

ক্লদিয়া, আমার ধারণায়, অভীপ্সা এবং আদিবৃত্তির প্রকাশে যতখানি উন্মাদ, তার আত্মিক বিষাদ তত ক্ষীণ। কেন? লেখিকার যদি উদ্দেশ্য ছিল, নারী প্রেমপ্রত্যাখ্যাত হয়ে বিষাদ-ভোগকেই জীবনের প্রাপ্য বলে গ্রহণ করতে পারে কি না—তবে এই প্রশ্নের অর্থ অনুসন্ধানে বিষাদের মাত্রা অত কম কেন?

এই গ্রন্থের কোনো কোনো অংশে চিত্ত-দৈন্যের হাহাকার অনুভব করা যায়। কখনও কখনও জীবনের কোনো কোনো গুহাশ্রিত কামনাও সৌন্দর্যের আগুনে দগ্ধ হয়ে তৃতীয় তাৎপর্য যুক্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য মানুষের প্রলাপ যেমন কৌতূহলের বিষয়, অধিক কিছু না, তেমনি ক্লদিয়ার প্রেমকে অস্বাভাবিক অবস্থাজাত হৃদয় দৌর্বল্যের বেশী মূল্য দিতে পাঠকের বাধবে।

ফরাসী দুঃসাহসের যাঁরা ভক্ত তাঁরা অবশ্য এ-গ্রন্থে নানা জায়গায় সেই দুঃসাহসিকতা দেখতে পাবেন। যেমন ক্লদিয়া মনে করে, মেয়েদের জন্যে বেশ্যাখানা থাকা উচিত—'জাস্ট টু গেট্ রিড্ অফ দি ডিজায়ার।' অথচ এই ক্লদিয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল সে সেই বৃক্ষ দেখবে, সমুদ্রের নিকটে যার জন্ম, যা আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যে-বৃক্ষ একমাত্র তাদেরই পত্রচ্ছায়া দেয় যারা সূর্যকে ভালবাসে। এই বৃক্ষই 'প্লেন ট্রিজ'।

ক্লদিয়া তেমন বৃক্ষ হতে চেয়েছিল হয়ত, কিন্তু তার পত্রচ্ছায়ায় কেউ আশ্রয় নিতে আসে নি।

বইয়ের সংস্করণ

বাংলা বইয়ের সংস্করণ সম্পর্কে জনৈক পাঠক তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে বলেছেন। প্রথমত বলে নেওয়া ভাল, বিষয়টি ব্যবসাগত, এবং আমার পক্ষে নিঃসংশয়ে কিছু বলা মুশকিল। সাধারণভাবে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি।

আমরা যাকে সংস্করণ বলি তাকে ঠিক সংস্করণ বলা উচিত নয়। সংস্কার বিনা সংস্করণ হয় না। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা অনেকেই বইয়ের প্রথম প্রকাশ এবং পরবর্তী মুদ্রণের সময় মুদ্রিত পুস্তকের পরিমার্জনা করতেন। এখনও কেউ কেউ করে থাকেন শুনেছি, তবে সকলে নন। বস্তুত কোনো গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সময় যদি লেখক কোনো সংস্কার করেন তবে সেই মুদ্রিত গ্রন্থ সংস্করণ বিশেষণে অলংকৃত হতে পারে, নয়ত নিছক পুনর্মুদ্রণকে মুদ্রণ বলাই উচিত। আমরা সংস্করণ বলতে অভ্যস্থ, মুদ্রণ বললে যেন সন্তুষ্ট হই না।

বাংলা বইয়ের মুদ্রণ সংখ্যা সীমীত। সাধারণত এগারো শ' বাইশ শ'র বেশী কোনো বই ছাপা হয় না। আগে প্রতিবারের মুদ্রণকে এক একটি সংস্করণ হিসেবে ধরা হত। এখন সব সময় এটা হয় না।

কোনো বই প্রকাশ করার সময় লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির একাধিক শর্ত। সেই শর্তের অন্যতম একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, প্রকাশক কত বই ছাপবেন, লেখক কত বই ছাপাতে দিতে রাজী আছেন। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে হাজারের কম কোনো বই ছাপা হয় না। হাজারের বেশী হলে দু হাজার কি তিন হাজার।

বাংলা বইয়ের বাজারে এই নিয়মেরই চল ছিল, এতকাল। সম্প্রতি কিছু অদল বদল ঘটেছে। এখন অনেক প্রকাশক দু হাজার বই একসঙ্গেই ছাপেন, কিন্তু লেখকের সঙ্গে শর্ত করেন প্রতি হাজার বই এক একটি সংস্করণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে। এর কারণ এই, এই দুর্দিনে এক সঙ্গে বেশী বই ছাপাতে পারলে আনুপাতিক খরচা অনেক কম পড়ে। তা ছাড়া এক হাজার বই বেচা হয়ে গেলে নতুন দফায় সংস্করণ শব্দ ব্যবহার করা যাবে। প্রকাশক সম্ভবত মনে করেন বইয়ের সংস্করণ পাঠককে কিছুটা প্রলুব্ধ করবে, লেখক ভাবেন, সংস্করণই তো অলংকার।

অনেক গুরু প্রবন্ধের বই, ছবির বই অবশ্য অনেক সময় হাজারের কমও ছাপা হয় ব্যবসায়িক ক্ষতির কথা ভেবে, সেখানে পাঁচশোতেও সংস্করণ হয়। তরুণ কবিদের কবিতার বইও বেশীর ভাগ সময় পাঁচশো করেই ছাপা হয় এবং সেটি সংস্করণ হিসেবেই গ্রহণ করা হয়।

বস্তুত সংস্করণ ব্যাপারটি লেখক এবং প্রকাশক নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ঠিক করে নেন। এটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক চুক্তি। সাধারণ নিয়ম সব সময় পালন করা হয় না।

গ্রন্থ পরিচয়

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্র প্রতিভা—কানাই সামন্ত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ—শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন। সম্পাদক—গোপাল হালদার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র শতবর্ষ-পূর্তিতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক ঘটনাটি চিন্তাশীল লেখকদের বহুমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার আলোচনায় প্রবৃত্ত করেছে। আলোচ্য দুটি গ্রন্থ রবীন্দ্রপ্রতিভা বিশ্লেষণের দুই সার্থক ফলশ্রুতি।

কানাই সামন্তর "রবীন্দ্রপ্রতিভা" বিদগ্ধজনের কাছে সহজেই আদরণীয় হয়ে উঠবে। কবি, শিল্পী ও সুরকার রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয়টি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রয়াস এই বইটিতে লক্ষণীয়। বইয়ে "রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবর্তিনী" প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রকৃতি ও রবীন্দ্রপ্রতিভার ওপর এধরনের একক প্রবন্ধ সংকলন সাধুবাদার্হ। প্রচ্ছদে ও অন্যত্র কয়েকটি অনবদ্য পেন্সিল স্কেচ বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

"রবীন্দ্রনাথ" বইটি দশজন প্রবন্ধকারের লেখায় সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্রদর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁরা তাঁদের প্রবন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা নিয়েও দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই বইতে সংযোজিত। বইয়ের প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে জানবার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। (৪৮৩।৬১) (২৫৮।৬১)

গীতবিতান পত্রিকা—রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। ২৫/বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। আট টাকা।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে গীতবিতান সংগীত প্রতিষ্ঠান এই সঙ্কলিত জয়ন্তী গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটি দুই অংশে বিভক্ত—সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য ও স্মরণ।

প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসাধনা কর, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীনীহারবিন্দু সেন, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার, শ্রীসুধীরচন্দ্র কর এবং শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমধু বসু, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবার্ণিক রায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এবং শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। মায়ার খেলা সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথা বর্ণিত করিয়াছেন শ্রীক্ষিতীশ রায়। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিন্তা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য লেখক ও লেখিকা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীহেমন্তবালা দেবী এবং শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুইটি স্বরলিপিও প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে রবীন্দ্রস্মৃতি এবং

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে। লেখকবৃন্দের মধ্যে আছেন — শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীনূপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়, শ্রীসুধাময়ী দেবী প্রভৃতি।

সঙ্কলনটি তথ্যসম্ভারে উৎকৃষ্ট এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্র উপলব্ধির সার্থক পরিচয় বহন করিতেছে। মনোজ্ঞতায় এবং প্রয়োজনীয়তায় গ্রন্থটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা মনোরম। (৬৬৭/৬১)

লেখকস্মৃতি

লেখালিখি—রমাপদ চৌধুরী। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২। মূল্য দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

জীবনস্মৃতি বলতে যা বোঝায় বইটি তা নয়। জীবনের স্মৃতি-মন্থনে যে-কয়টি অমৃত মুহূর্ত লেখকের মনে ভেসে উঠেছে, তাই তিনি গল্পের ভঙ্গিতে এই বইয়ে পরিবেশন করেছেন। এই মুহূর্তরাজির মধ্যে অতি আধুনিক সাহিত্যযুগের একটি নেপথ্য পরিচয় বিধৃত। এবং একটি সাহিত্যিক মনের আশা ও অভীপ্সা, প্রস্তুতি ও বিকাশের ইতিকথাটি সুপরিস্ফুট।

গল্পশিল্পে রমাপদ চৌধুরী সিদ্ধহস্ত। তাই যে অভিজ্ঞতা ও ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন তা গল্পের স্বাদ ও রস নিয়ে বইটিতে উপস্থিত হয়েছে। লেখকের সুন্দরমাসী গল্পের নায়িকা হয়ে উঠেছে, সুকুল একটি চরিত্র নিয়ে দেখা দিয়েছে। এক কথায়, লেখকের স্মৃতিচারণ যেন একটি সুন্দর সুপাঠ্য গল্প। যা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে রাখা যায় না।

নানা ঘটনা ও পরিবেশের উপর লেখকের মনস্তাত্ত্বিক আলোকসম্পাত স্বচ্ছ। অভিজ্ঞতা বর্ণনায় লেখক কোন জটিল দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নেন নি। তিনি যা দেখেছেন এবং যা অনুভব করেছেন তা সহজ, সরল ও মরমী হয়ে ব্যক্ত করেছেন। রমাপদ চৌধুরীর এই ভিন্ন-ধর্মী রচনা পাঠকের অভিনন্দন লাভ করবে। (১৫৮।৬১)

উপন্যাস

অতল জলের আহ্বান—প্রতিভা বসু। এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উপন্যাসটিতে একটি সুখানুভূতির স্পর্শ মেলে। এই সুখানুভব বেদনার আলপনায় অঙ্কিত। যৌবনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারেনি এক প্রণয়ী-যুগল। অপূর্ণ প্রেমের স্মৃতিটুকু বুঝি ওরা যক্ষের ধনের মত সঞ্চয় করে রাখে মনের গোপন কোণে। আবার যখন ওদের দেখা হয় তখন ওরা যৌবন অতিক্রম করে জীবন-মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছেছে। মনের কোণে যা ছিল নিরুদ্ধ, নিরুচ্চার আবেগে বুঝি তা আবার উচ্ছল হয়ে ওঠে। ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকার অনুচ্চার প্রণয়াবেগ সার্থকতা খোঁজে তাদের নিজেদের পুত্র-কন্যার মিলনের ভেতর দিয়ে।

কিন্তু উপন্যাসের অন্যতম ত্রিভুজ প্রেমোপাখ্যানের পরিণতিতে তাদের সাধ পূর্ণ হয়ে ওঠে না।

একদা-ব্যর্থ প্রণয়ী যুগলের পুত্র-কন্যা জয়ন্ত ও লোটি এবং জয়ন্তর আশ্রিতা সাবিত্রীকে ঘিরে উপন্যাসে যে ত্রিকোণাত্মক প্রণয়োপাখ্যানটি রূপ নিয়েছে তা গতানুগতিক। এবং উপন্যাসের এই অধ্যায়টি জীবনের স্পর্শরহিত।

কাহিনীর রসকেন্দ্র-বিন্দু গড়ে উঠেছে জয়ন্ত ও লোটির পিতা-মাতার উপাখ্যানে। সেদিক থেকে উপন্যাসের নামকরণটিও সার্থক। লেখিকার ভাষা ঝরঝরে। কাহিনী-বিন্যাস সুষ্ঠু। (২৬৮।৬১)

অনুবাদ

ফাউস্ট। (প্রথম ভাগ)। য়োহান ভোলফ্‌গাঙ গোয়েটে। অনুবাদ : শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ৬ টাকা।

বাংলা ভাষায় গোটের ফাউস্টের অনুবাদ ইতিপূর্বে একটি প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত সে-গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে যে অনুবাদটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন, আমরা তার অভ্যর্থনা করি।

মহাকবি গোটের ফাউস্ট সম্পর্কে কোনো পরিচয় জানানো বাতুলতা। বিশ্বসাহিত্যে এমন গ্রন্থ আর কটিই বা আছে। কানাই-লাল গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টা ও সাধনা মহৎ। অনুবাদক লিখেছেন : "জীবনের বিভিন্ন সময়ে জার্মেনীতে দীর্ঘকাল বাস করে জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের উপর 'ফাউস্টে'র যে কী প্রভাব তা প্রত্যক্ষ করেছি। ...আমার কেবলই ইচ্ছা হত, এই অপূর্ব সাহিত্য আমার মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করে বাঙালীর হাতে তুলে দি।" লেখকের

এই বাসনার ও দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল বর্তমান অনুবাদ।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুলিখিত ভূমিকা, অনুবাদকের গ্রন্থ সম্পর্কে পরিচিতি এই অনুবাদের মূল্য বৃদ্ধি করেছে এবং পাঠকের পক্ষে উপযোগী হয়েছে।

অনুবাদের প্রশংসা করি। তবে কোনো কোনো জায়গায় তিনি শব্দ ব্যবহারে আরও একটু স্বচ্ছন্দ হলে ভাল হত।

(৪৭২।৬১)

শিশু সাহিত্য

ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—দু' টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি ইতিহাসের তিনটি কাহিনীর সংকলন। এগুলির মধ্যে প্রথমটি পশ্চিম আফ্রিকার ডাহোমি রাজ্যের এক বীরবালিকার কাহিনী। নাম এর নান্সিকা—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই মেয়েটি ফরাসীদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল তার অসমসাহসী নারী সৈন্য-বাহিনী নিয়ে। দ্বিতীয়টি বাংলা দেশে বর্গীদের অত্যাচারের বহুখ্যাত কাহিনী, এবং তৃতীয়টি একাদশ শতাব্দীর আমেরিকার কুখ্যাত বোম্বেটে "কালোদেড়ে"র কাহিনী।

উপযুক্ত কাহিনীত্রয়ের মধ্যে শেষোক্ত কাহিনীটিই সুলিখিত, বাকী দুটি যেন নিহাতই ইতিহাস বলে মনে হয়; বিশেষ করে দ্বিতীয় কাহিনীটি। তবু যদি এই গ্রন্থটি যাদের জন্যে লেখা সেই ছোটদের ভালো লাগে, আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। কারণ, এর রচয়িতা এমন একজন খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক, যাঁর অসংখ্য রচনা দীর্ঘকাল ধরে তাদের মনোরঞ্জন করে আসছে।

(১০/৬২)

গল্প

মনোনীতা — শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। মুকুন্দ পাবলিশার্স, ৮৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য তিন টাকা।

এগারটি গল্পের সংকলন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙলার পল্লী, কলিকাতা, দিল্লি—নানা পটভূমিকায় নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের জীবনের নানাবিধ সমস্যামুখরিত গল্পগুলি যে-কোন পাঠকের অবসরক্ষণকে উপাদেয় করিয়া তুলিবে। বাঙলা ছোটগল্প আজ বিশ্বসাহিত্যসভায় সম্মানিত অতিথির দাবি রাখে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও সে-গৌরবের অংশীদার, ছোটগল্প রচনার সার্থক আঙ্গিকের লিপি-কুশলতা তাঁর মধ্যে আছে। প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র, এটিও লক্ষণীয়। কেবল 'একটি জীবন, একটি দীর্ঘশ্বাস' গল্পটি মামুলী বিষয় লইয়াঃ সেই ব্যর্থপ্রেম আর টি-বি।

৬০২/৬১

বিবিধ

দুর্গে দুর্গে—বেণু গঙ্গোপাধ্যায়। বলাকা প্রকাশনী; ৫৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। দাম ঃ দুই টাকা।

বাঙালীকে ঘরমুখো বলা হয়। কিন্তু একালে সে কথা সত্য নয়। শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই নয়, ইতিহাসকে জানবার জন্যে তাঁরা আজ সারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ করছেন। শ্রীযুক্ত বেণু গঙ্গোপাধ্যায় কবির মত মন নিয়েও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছেন ঝাঁসি, চুনার, আগ্রা, গোয়ালিয়র, অম্বর, জিনজী প্রভৃতি দুর্গ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতের অতীত এবং বর্তমানকে দেখেছেন। দেখাটাই তাঁর কাছে বড় নয়, তিনি আমাদের দেখিয়েছেন—আরো কৌতূহল বাড়িয়েছেন। অতীতের সাজানো পাথর তাঁর অনুভূতিতে কথা কয়ে উঠেছে। ভ্রমণকারীদের কাছেও এই গ্রন্থ 'গাইড' হিসেবে প্রয়োজনে লাগবে।

৬২৩।৬১

মেদিনীমঙ্গল — শ্রীগোরাচাঁদ গিরি। মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ, ৩৩।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২·২৫ নয়া পয়সা।

মেদিনীপুর জেলার গৌরবময় ইতিহাস সর্বজনবিদিত। স্থানীয় অঞ্চলগুলির ইতিবৃত্ত ছন্দাকারে অতি সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে 'মেদিনীমঙ্গলে' লিখিত হয়েছে।

কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ছন্দে রূপায়িত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিশেষত পাঁচ শতাধিক ঐতিহাসিক নামকে তিনি এমন নৈপুণ্যে প্রয়োগ করেছেন যে, তা আমাদিগকে বিস্মিত করে। ঐ দুঃসাধ্য প্রয়াস-মাধ্যমে লেখকের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯।৬১
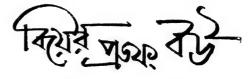
সে তো আজকে নয়—এস কে মজুমদার। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এই বিচিত্র আত্মকাহিনীর পট-ভূমিকার দুই আনা অংশ ভারতে এবং বাকী চৌদ্দ আনা ইউরোপে। বেশী অংশ অবশ্য ইংল্যাণ্ডে। তা ছাড়া সিনফিন দলের বোমা-কণ্টকিত ডাবলিনের রাজপথে লেখক ও এক আইরিশ কুমারীর নিশীথ অভিযান আছে। আছে অ্যান্টোয়ার্পে বেলজিয়াম পরিবারের নিমন্ত্রণরক্ষা। আছে ব্রাইটনে স্নানার্থীদের অভিজাত হোটেলে পিয়ানোয় লেখকের "যমুনে এই কি তুমি" সুরটি আত্মহারা হইয়া বাজানো। (তাহার পূর্বে অবশ্য তিনি উদয়শঙ্কর ও পাবলোভার হরপার্বতী নৃত্যের সঙ্গে লণ্ডনেই পিয়ানো বাজাইয়া ছিলেন।) এ ছাড়া আছে ও দেশে ব্রাহ্ম-সমাজের অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে মেয়ে বনাম পুরুষ ক্রিকেট খেলা। আছে রাজকীয় পোশাকে লেখকের সম্রাটের লেভি-তে যোগদান।

আর পুস্তকটির পাতায় পাতায় ভিড় করিয়া আছে ফুল্লাননা ইলিনোর, আদ্রিয়েনদের দল। তাহা ছাড়া যাঁহাদের দেখা পাইলাম তাঁহারা নমস্য। যথা জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি।

লেখক প্রৌঢ়, কিন্তু তিনি তাঁর সেই যৌবনের কাহিনী বলিতে গিয়া বর্ণনা-ভঙ্গিতে আনিয়াছেন আমেজী স্বাদ। শীতের সন্ধ্যায় পায়ের উপর আলোয়ান টানিয়া দিয়া লেখকের সহিত মনোরথে লণ্ডনের পথে পথে ঘোরা যায়।

৬১৩/৬১

সাময়িক পত্রিকা

যুক্তিবাদী—সম্পাদক শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত। ৪১এ, বলদিয়াপাড়া রোড, কলিকাতা-৬। "একাধিক ধারণা, বিশ্বাস, মতবাদ কিংবা বস্তু অথবা পথের মধ্যে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে মহত্তর সমাজব্যবস্থা ও অসুখী থেকে সুখী কিংবা সুখী থেকে আরো সুখী জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে প্রধানত যেটি, তার চর্চাই হলো যুক্তিবাদ।... এই নবকথিত মতবাদটির যারা ধারক, বাহক, প্রচারক এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বাসীও, তারাই যুক্তিবাদী।" সম্পাদক কর্তৃক ব্যাখ্যাত সংজ্ঞা মতে স্থাপিত সংঘের মুখপত্র এই পত্রিকা। এদের ঘরোয়া আলোচনা ও প্রকাশ্য সভায় পঠিত রচনা সমাবেশে এই শ্রীপঞ্চমীস্মারক সংখ্যাখানি প্রকাশিত।

প্রাপ্তি-স্বীকার

সাঁওতাল ছেলে—শ্রীঅবনীনাথ চক্রবর্তী।
দিনরাত্রি—সুরজিৎ দাশগুপ্ত।
ভারত—সাবিত্রী—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।
সুন্দরবন—শিবশংকর মিত্র।
চৈত্রে রচিত কবিতা—উৎপলকুমার বসু।
বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস (২য় খণ্ড)—শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।
ভৌতিক কাহিনী—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।
বাস্তবের দু' পৃষ্ঠা—দেমুখং।
রূপং দেহি ধনং দেহি—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
তিন প্রহর—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
ঘরে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।
উত্তরালাপ—আশাপূর্ণা দেবী।

বিজ্ঞপ্তি দেশ

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক

২৪ পরগণা জেলার অধীন দমদম পোস্ট অফিসের অন্তর্গত বাগুইআটি গ্রামের বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিক শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১ কলিকাতা-৫ এর বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিক শ্রীঅশোককুমার সরকার কর্তৃক সম্পাদিত।

শতকরা এক ভাগ বা তাহার বেশীসংখ্যক অংশের মালিকগণঃ—

অশোককুমার সরকার প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১, কলিকাতা-৫।

নির্ঝরিণী সরকার প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১, কলিকাতা-৫।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, 'সুরেশচন্দ্র মজুমদারের এস্টেটের এক্সিকিউটর, ৬এ, অভয় গুহ রোড, কলিকাতা-৬।

আমি শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর
প্রকাশক—শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়
তারিখ—১।৩।৬২

চন্দ্রশেখর

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

এই সপ্তাহে আঞ্চলিক এওয়ার্ড কমিটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য তালিকাভুক্ত ছবিগুলি দেখা শুরু করেছেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁদের রায় প্রকাশিত হবে। তাঁদের বিচারের সমর্থনে অথবা প্রতিবাদে পাঠকদের চিঠি আমাদের দপ্তরে এসে জমতে শুরু করবে। প্রতিবার যা ঘটে আমরা তারই পুনরাবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

ছায়াছবি সম্পর্কে 'নানা মুনির নানা মত' প্রবাদ-বাক্যটির সারবত্তা আমরা স্বীকার করি। অর্থাৎ একজনের মতে যে ছবি অদ্বিতীয়, অপরের মতে তাই হয়ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এক কথায়, কোন ছায়াছবির বিচার সম্পর্কে একই মতাবলম্বীর সংখ্যা সাধারণত খুবই বিরল। তাই কোন বিচারক-গোষ্ঠী কোন ছবিকে যখন শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন, তখন চিত্ররসিকমহলে প্রতিবাদের গুঞ্জন শোনা যায়। আঞ্চলিক অথবা কেন্দ্রীয় এওয়াড কমিটির বিচার নিয়ে এই ধরনের গুঞ্জন আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার শুনেছি।

আঞ্চলিক অথবা কেন্দ্রীয় এওয়ার্ড কমিটির বিচার চিত্ররসিকসমাজ নির্বিবাদে মেনে নেবেন এমন আশা করা অন্যায়। যদি এমন ঘটনা ঘটে, তবে তা শুভলক্ষণ বলে মেনে নেওয়া কঠিন হবে। ছায়াছবির গুণাগুণ বিচারে কোন কমিটিই কোন কালে জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে তুষ্ট করতে পারেননি, পারবেন না।

তবু ও এওয়ার্ড কমিটির কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। তাঁদের আমরা শুধু এই একটি কথাই বলতে চাই, চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির মূলে তাঁদের বিচারের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প যাতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্যই চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পুরস্কারে সম্মানিত হবার জন্য এবং সম্মানিত হয়ে চিত্রপ্রযোজক ও চিত্রপরিচালকরা শিল্পসমৃদ্ধ সুন্দর ছবি তৈরীর কাজে যাতে উৎসাহ বোধ করতে পারেন তাই সরকার এই পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। এওয়ার্ড কমিটির সভ্যরা যদি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করেন, তবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

বি আর ফিল্মসের হিন্দী ছবি "ধর্মপুত্র"-র নায়িকা মালা সিংহ

এওয়ার্ড কমিটির রায় নিয়ে জনসাধারণের অভিযোগ বছরের পর বছর এত সোচ্চার হয়ে উঠছে যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা না করে আমরা পারছি না। পূর্বেই আমরা বলেছি, বিচারকমণ্ডলীর নির্বাচন যে জনসাধারণ একবাক্যে মেনে নেবে তা নয়। কিন্তু উভয়পক্ষের মতের অমিলটি প্রায় প্রতি বছরেই বড় বেশী উগ্র হয়ে উঠছে। এওয়ার্ড কমিটির নির্বাচন যদি যথাসম্ভব নিখুঁত হয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ চিত্ররসিকদের সমর্থন তাঁরা নিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভের সৌভাগ্য থেকে

কমিটি বঞ্চিত হয়েছেন এই ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

তাই কমিটির সভ্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন তাঁদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকে এবং চলচ্চিত্রশিল্পের প্রগতির প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তাহলেই রসজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিনন্দন তাঁরা নিঃসন্দেহে লাভ করবেন।

চিত্রালোচনা

বি আর ফিল্মস-এর বহুপ্রতীক্ষিত হিন্দী ছবি 'ধর্মপুত্র' এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবি এ-সপ্তাহে একটিও মুক্তি পাচ্ছে না।

আচার্য চতুরসেন শাস্ত্রীর একটি হিন্দী উপন্যাসের ভিত্তিতে **'ধর্মপুত্র'** ছবিটি তৈরী। মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ ও বক্তব্যাশ্রয়ী একটি কাহিনী এই ছবিতে রূপায়িত।

'ধুল-কা-ফুল'-খ্যাত যশ চোপরা ছবিটি পরিচালনা করেছেন। মালা সিংহ, শশী কাপুর, রেহমান, মনোমোহন কৃষ্ণ, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও নিরুপা রায় ছবিটির প্রধান শিল্পী। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন এন দত্ত। বি আর চোপরা ছবিটির প্রযোজক।

* * *

বিমল ঘোষ প্রোডাকশন্স-এর **বধূ** মুক্তি-প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। শৈলেশ দে রচিত একটি আবেগপূর্ণ পারিবারিক কাহিনী এ ছবির আখ্যান-ভিত্তি। ভূপেন রায় পরিচালিত এ-ছবির শিল্পিদলের পুরোভাগে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অনুভা গুপ্তা। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

প্রযোজক বিমল ঘোষ আরও দুটি ছবি তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। শৈলেশ দে'র কাহিনীর ভিত্তিতে **অগ্নিস্বাক্ষর** একটি, অপরটি পৌরাণিক ছবি **বামনাবতার**। ছবি দুটির প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় সমাপ্ত।

* * *

'লুকোচুরি'-খ্যাত কমল মজুমদার বর্তমানে টাস ফিল্মস-এর **অভিসারিকা** ছবিটি পরিচালনা করছেন। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্টুডিওতে ছবিটির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'পর্বোচল' ছবিটির ভিত্তি। ছবির মুখ্যচরিত্রগুলিতে রয়েছেন নির্মলকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, মিণ্টু দাশগুপ্ত ও রাজলক্ষ্মী।

* * *

সপ্তক প্রাঃ লিঃ-এর প্রথম নিবেদন **বন্ধন**-এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ছবিটির চিত্রনাট্যকার-পরিচালক। প্রশান্ত চৌধুরীর লেখা 'ডাকো নতুন নামে' গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরী। ছবির নায়কের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং নায়িকা চরিত্রের রূপ দিয়েছেন সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, শ্রীপতি চৌধুরী, জহর রায়, রেণুকা রায়, গীতা দে, সংগীতা মুখোপাধ্যায় ও শিশুশিল্পী জয়। রাজেন সরকার ছবির সংগীত-পরিচালক।

* * *

নবগঠিত চিত্রসংস্থা শিল্পভারতী প্রোডাকশন্স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য বনফুল-এর **কাঞ্চ সরস নাটিকা অবলম্বনে তৈরী হচ্ছে।**

মার্ক রবসন পরিচালিত ইংরেজী ছবি "না ইন আওয়ার্স টু রাম"-এর একটি দৃশ্যে হর্স্ট বুশোলজ ও অচলা সচদেব। ভারতে বহির্দৃশ্য গ্রহণের পর লণ্ডনের একটি স্টুডিওতে এর আভ্যন্তরীণ দৃশ্যাদি তোলা হচ্ছে

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিটির পরিচালক। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে ছবির সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া চারটি গান রেকর্ড করা হয় এবং তার ভেতর দিয়ে ছবির শুভসূচনা-মুহূর্ত পালিত হয়।

দুই পুরুষের কাহিনী

ভারতবর্ষে একদা গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আধুনিককালেও কি এমন নারীর আবির্ভাব সম্ভব নয়?

এই ধরনেরই একটি কল্পনা হয়ত 'সঞ্চারিণী'র (দে প্রোডাকশন) কাহিনীর উৎস। এবং কাহিনীর নায়িকার নামও হয়ত সেই কারণেই গার্গী।

গার্গী তার শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত পিতার কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে। তার পিতা প্রাচীনকালের শিক্ষাগুরুর মত নিজের বারাণসীস্থিত বসতবাটিতে টোল স্থাপন করে বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদান করেন। হঠাৎ তিনি সংস্কৃত শ্লোক ভুলে গেলে গার্গী এসে তা আবৃত্তি করে দেয়। অবশ্য গীতার শ্লোক তিনি ভুল বললে, গার্গী তা শুধরে দিতে পারে না। সেটা দর্শকের কানে খট করে বাজে। তিনি গীতার শ্লোক আবৃত্তিকালে 'গুণকর্মবিভাগশঃ'-এর জায়গায় 'গুণকর্মবিভাগমঃ' বলেছেন। গীতার শ্লোকের এই ভুল আবৃত্তি ক্ষমার্হ নয়। চিত্রপরিচালক এক্ষেত্রে সচেতন থাকতে পারতেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিবাহযোগ্যা গার্গী ও তার পিতার এই উপাখ্যান ভারতের স্বাধীনতালাভের অল্পকাল পূর্বের ঘটনা।

ভারতের সনাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত গার্গী ও তার পিতাকে কেন্দ্র করে ছবির এই উপকাহিনীতে আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের অবতারণা রয়েছে। দর্শকেরা ছবির এই অধ্যায়ে কতকগুলি মহৎ বাণী শোনবার অবকাশ পান।

পিতার কাছ থেকে আদর্শ ভারতীয় নারীর মূলমন্ত্রটি নিয়ে গার্গী যথাসময়ে স্বামীর ঘর করতে আসে। গার্গীর স্বামী দীনেশ বিদ্বান নয়। পিতার মৃত্যুর পর অল্প বয়স থেকেই পৈত্রিক ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছে। লোহার ব্যবসা করতে করতে তার মনটিও নাকি লোহার মত নিরেট হয়ে গেছে। অন্তত চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকার

এই তত্ত্বটিই দীনেশের আচরণ ও ব্যবহারে (বলা নিষ্প্রয়োজন, নবপরিণীতা স্ত্রীর প্রতি) ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট। দীনেশের উকিল বন্ধু মন্মথর ব্যঙ্গোক্তিতেও এই তত্ত্ব স্বপ্রকাশ। মন্মথ বন্ধু দীনেশের একটি বিপরীত চরিত্ররূপে কল্পিত। স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, সদারসিক।

লোহার ব্যবসায়ে একাগ্রচিত্ত দীনেশের মন লোহার মত নীরস হয়ে উঠতে পারে। জীবনের রস ও স্বাদের প্রতি সে বিগতস্পৃহ হতে পারে। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হওয়াও তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ছবিতে যে দীনেশের সাক্ষাৎ মেলে সে এক অদ্ভুত চরিত্র। অকারণে রুক্ষ, দয়ামায়াহীন, বিবেকবোধশূন্য, মাতৃভক্তিহীন, গোঁড়া ও পারেট। স্ত্রীর প্রতি তার ব্যবহার অত্যাচারেরই সামিল। তার দুর্ব্যবহারের জন্য গার্গীর রক্তপাতও ঘটে।

ছোটবেলা থেকে অভিভাবক বলতে তার বিধবা মা। ছবির প্রথমার্ধে দেখা যায় ও বোঝা যায়, তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না। একমাত্র পুত্রের ওপর তাঁর অধিকার অপরিসীম। বিয়ের পর স্ত্রীর ওপর যখন দীনেশের 'অত্যাচার' শুরু হয় তখন দেখা যায় যে, বাড়িতে দীনেশের মার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। পুত্রের ভয়ে তিনিও যেন কাতর। তারপর একদিন তিনি তীর্থবাসিনী হয়ে ছবিতে অদৃশ্য হয়ে পড়েন। বিদায় নেওয়ার আগে পুত্রবধূর কাছে (নাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষাসংক্রান্ত আলাপে ও তীর্থযাত্রার জন্য টাকার প্রস্তাব করার কালে) খুব সুন্দর ব্যবহার পেয়ে গেছেন এ-কথা বলা চলে না। ছবির মধ্যভাগ থেকে আদর্শ ভারতীয় নারীর জীবন্ত বিগ্রহ গার্গীকে তার শাশুড়ীর প্রতি যে-রকম উদাসীন দেখা যায় তাও বিসদৃশ। স্বামীর ভয়ে সে হয়ত শাশুড়িকে বাড়িতে আটকে রাখতে পারেনি। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের মাধুর্যে শাশুড়ীকে শান্তি দেওয়ার কোন চেষ্টা তার চরিত্রে ছবির শেষের দিকে অনুপস্থিত। এবং দীনেশের মা'র মত একটি প্রধান চরিত্রের প্রতি চিত্রনাট্যের যে উপেক্ষা দেখা গেল তা নিন্দনীয়।

আবার কাহিনী-পর্বে আসা যাক। গার্গী মনে-প্রাণে-স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করল। স্বামীর সকল অন্যায় আদেশ ও নির্দেশ সহ্য করে সে আদর্শ সতীর জীবন যাপন করতে লাগল। যথাসময়ে তাদের একটি ছেলে হল। অল্পকাল পরেই দীনেশের বন্ধু মন্মথর ঘর আলো করে এল একটি কন্যা। বলা হয়নি, ইতিমধ্যে গার্গীর পিতার মৃত্যু ঘটেছে। তার বিধবা মায়ের কী গতি হল ছবিতে তা জানা যায় না।

দীনেশের পুত্র শুভ ও মন্মথর কন্যা সুলতা যে পরস্পরের প্রেমে পড়বে তা দর্শকের অনুমানের বস্তু ছিল। তাই সত্য হল। পরস্পরকে চাইল ওরা। ছোটবেলা থেকে একই সঙ্গে ওরা পড়াশুনা করেছে। সকল পরীক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দুটি ওরাই ভাগ করে নিয়েছে। সুলতা মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নিরক্ষরদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করার প্রস্তাব করে। পিতা নতুন দিনের আদর্শবাদের কাছে মাথা নত করেন। সুলতা নিজের পড়াশুনা ছাড়ল কিনা বোঝা গেল না। তবে তার কাঁধে একটি ব্যাগ ঝুলতে দেখা গেল। কোন একটি রাজনীতিক দলে সে যোগ দিয়েছে। (দেখা গেল, স্বাধীন ভারতে রাজনীতিক দলের আস্তানার সামনে সর্বক্ষণ গুপ্তচর দাঁড়িয়ে আছে। এবং আস্তানাটি একটি মেয়েদের হস্টেলের মত।)

রাজনীতিক আদর্শ গ্রহণ করার পর বিয়ে করার ব্যাপারে সুলতার কথায় সাময়িকভাবে আত্মত্যাগ ও ঔদাসীন্যের সুরটি দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত দেশসেবিকা প্রেমাস্পদকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ দেখাল। এবং প্রণয়ীকে বিয়ে করার সংকল্পে অটল থেকে হাসিমুখে সে গৃহত্যাগ করল।

শুভ ও সুলতার বিয়ের ব্যাপারে যে

গোলযোগ দেখা গেল তার কারণ পাত্র ব্রাহ্মণ, পাত্রী বৈদ্যকুলজাত। অসবর্ণ বিয়েতে মত নেই গার্গীর। (বলা হয়নি, ইতিমধ্যে দীনেশ মারা গেছে।) স্বামীর বংশকে সে অপবিত্র করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত নাটকীয় মুহূর্তে কীভাবে গার্গীর মত ফিরল এবং শেষ পর্যন্ত ঝড়ের রাতে গাছের নীচে চাপা পড়ে আহত শুভর হাতটি সে কেমন করে সুলতার হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দিল তা-নিয়েই দুই পুরুষের চিত্রকাহিনীর যবনিকা।

বহু কল্পকল্পিত ঘটনায় আকীর্ণ এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। চিত্রনাট্যের ভিত্তি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী।

চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার স্থলে মেলোড্রামাকেই ছবিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। ছবির অনেক দৃশ্যে তাঁর প্রয়াস সফল। যাঁরা মেলোড্রামার রস আস্বাদনে উৎসুক তাঁদের কাছে এই ছবি উপভোগ্য হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে পরিচালক ছবিতে মহৎ ভাবকণার বিস্তার করেছেন। রসজ্ঞ দর্শকদের এই মুহূর্তগুলি ভালো লাগবে। ছবির প্রেমোপাখ্যানটি রুচিসম্মত।

ছবির প্রধান স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করেছেন কণিকা মজুমদার। এই চরিত্রের যে ব্যক্তিত্ব—বিশেষত জননী হবার পর—তা তাঁর অভিনয়ে অপরিস্ফুট। উপেক্ষিতা কুলবধূর দুঃখ ও বেদনা তাঁর একাধিক অভিব্যক্তিতে অনুভব করা যায়। তবে চরিত্রটির শাস্ত্রজ্ঞান ও আদর্শবাদ শ্রীমতী মজুমদারের অতি-অধুনিকতায় মার্জিত বাচনভঙ্গি, চাহনি ও হাব-ভাবে ফুটে উঠতে বাধা পেয়েছে।

বসন্ত চৌধুরী যে একজন সুঅভিনেতা এই পরিচয় তিনি ছবিতে দিয়েছেন। তাঁকে যদি কোন অংশে দর্শকের ভালো না লাগে, তবে সেজন্য দায়ী তাঁর অভিনীত অস্বাভাবিক চরিত্রটি। কিন্তু অস্বাভাবিকতার বেড়াজাল কাটিয়ে উঠে শ্রীচৌধুরী তাঁর অভিনয়-কুশলতায় দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

একটি সুন্দর ভিন্নধর্মী চরিত্রে বিকাশ রায়কে দর্শক দেখতে পাবেন এই ছবিতে। এবং মুগ্ধ হবেন তাঁর অতুলনীয় অভিনয় দেখে। ছবিতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দর্শকদের মুহূর্তে আকৃষ্ট করে নেন।

গার্গীর পিতার চরিত্রটি পাহাড়ী সান্যাল তাঁর সংযত ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে মনোগ্রাহী করে তুলেছেন।

ছবির তরুণী প্রণয়িনী সুলতাকে ভালো লাগার মত একটি প্রাণধর্মী চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন লিলি চক্রবর্তী। চরিত্রটির অবাস্তবতা প্রতি পদে শিল্পীর অভিনয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(সি ৪৭০৬)

শ্রীমতী চক্রবর্তী অনায়াসে এই বাধা জয় করেছেন।

তাঁর প্রণয়ীর ভূমিকায় শোভন লাহিড়ীর অভিনয় যথাযথ। ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন ছায়া দেবী, দুর্গা দে প্রভৃতি।

কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পারিজাত বসু, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শম্ভু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

কালীপদ সেন ছবির আবহ-সুররচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সুরারোপিত একটি কীর্তনাঙ্গ গান সুশ্রাব্য। ছবির রবীন্দ্র-সংগীত দরদভরা কণ্ঠে গেয়েছেন সুমিত্রা সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিমা মুখোপাধ্যায়।

ছবির আলোকচিত্রগ্রহণে বিমল মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনায় সুবোধ রায়, শিল্প-নির্দেশে সুনীতি মিত্র এবং শব্দগ্রহণে সুনীল সরকারের কাজ প্রশংসনীয়।

লণ্ডনে 'ক্ষুধিত পাষাণ'

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রপরিবেশক সংস্থা হারগেট তপন সিংহ পরিচালিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিটির পরিবেশন-স্বত্ব ক্রয় করেছেন বলে জানা গেল। অনতিবিলম্বেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছবিটি লণ্ডনে মুক্তি পাবে। ইংরেজী 'সাব-টাইটেল' সহ ছবিটি লণ্ডনে প্রদর্শিত হবে। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্পের ভিত্তিতে তৈরী এই ছবি বিদেশে সমাদৃত হবে বলে প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায় আশা প্রকাশ করেন।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনের সোলার ফিল্ম প্রোডাকশনস-এর 'টার্জন গোজ টু ইণ্ডিয়া' ছবির চিত্রগ্রহণ মহীশূরের জঙ্গলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ভারতের আরণ্যক জীবনের বিচিত্র-রূপ ও [illegible] এই ছবিতে দেখা যাবে! টেকনিকালার ও সিনেমাস্কোপে নির্মীয়মান এই ছবির পরিচালক জন গুইলার মিন। আমেরিকান শিল্পী জক ম্যাহোনি ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সিমি নামে এক সুন্দরী ভারতীয় অভিনেত্রী ছবির রাজকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। গজেন্দ্র নামে একটি বিরাট হস্তী ছবির অন্যতম শিল্পী। মাদ্রাজ ও মহীশূরের বান্দিপুর জঙ্গল, সেরিঙ্গাপট্টম, ফ্রেঞ্চ রকস্, মাসানাগুড়ি, বৃন্দাবন গার্ডেনস, ললিতা প্যালেস প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানের বহু নয়নাভিরাম দৃশ্য এই ছবিতে সংযোজিত হচ্ছে।

সর্বপ্রথম ফিল্মস ডিভিশন-এর একটি হিন্দী ছবি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য এ-বছরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করেছে। ছবিটির নাম 'মাট্টি বনুগেয়ী সোনা'। গ্রাম্য পটভূমিতে তৈরী ফিল্মস ডিভিশন-এর এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন শান্তারাম আথাভালে। এই কাহিনী-চিত্রটি বাদেও ফিল্মস ডিভিশন-এর বারোটি প্রামাণিক ছবি (পাঁচটি এর মধ্যে রঙগীন) এবং পাঁচটি শিক্ষামূলক ছবি

এলিট প্রত্যহ : ৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়

আইন যেখানে স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নিয়েছে...... প্রেম যেখানে ডেকে আনে উচ্ছৃংখলতা আর প্রতিহিংসার বহ্নি—সে দেশেরই নরনারীর রোমাঞ্চকর জীবনকাহিনী :

(ইউ) সহ-ভূমিকায়
ষ্টুয়ার্ট হুইটম্যান - ইনা বালিন

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

সরস গল্প সংগ্রহ ॥ ২·০০ ॥

একটি অভিনব নাট্য সংকলন
সরস নাটক ॥ ৪·০০ ॥
প্রথম খণ্ড

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ । সধবার একাদশী । অলীকবাবু । য্যায়সা কি ত্যায়সা । আলিবাবা । কৃপণের ধন । পুনর্জন্ম ।

শুক্লা
১৫৯এ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-১২

এক মাসের মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করলে প্রকাশিতব্য নাট্যসংকলন ও তৎপরবর্তী খণ্ডগুলি ডাকযোগে পেতে পৃথক খরচ লাগবে না

(সি-৪৪৭৫)

(১৬ মিলিমিটারে তোলা) রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

উদয়ন প্রোডাকশন্স প্রযোজিত ও বীরেশ্বর বসু পরিচালিত 'মাটি ও শিল্পী' প্রামাণিক ছবিটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

শিশুশিল্পীর লোকান্তর

'অবাক পৃথিবী' ছবির শিশুশিল্পী শ্রীমান টুকাই লিউকোমিয়া রোগে মাত্র আট বৎসর বয়সে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রাণত্যাগ করে। শিল্পীর আসল নাম ছিল অরিজিৎ রায়। বেতার-নাটক অরিজিৎ নিয়মিত অংশগ্রহণ করত। অরিজিৎ সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র ছিল। মাত্র একটি ছবিতে অভিনয় করে এই শিশুশিল্পী দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল।

অনুষ্ঠান সংবাদ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী থিয়েটার সেণ্টার হলে শিল্পী-পরিষদের সভ্যরা একটি প্রীতি-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে মন্মথ রায়ের 'এক টিন বার্নিশ' ও গিরিশংকরের 'শহীদ স্মৃতি' মঞ্চস্থ হয়।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার এস্টাব্লিশমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট ড্রামা কমিটি (কলিকাতা বিভাগ) গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে বিদ্যুৎকুমার বসুর 'লার্নিং ফ্রম দি বার্নিং ঘাট' নাট্যাভিনয় ও বিনয় দত্তর যাদুপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার স্টেশনারি ডিপার্টমেণ্টে রিক্রিয়েশন ক্লাব বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

চিঠিপত্র

"বিপাশা" প্রসঙ্গে

মহাশয়,

আপনাদের নির্দেশিত ত্রুটী ছাড়াও দু-একটি বড় ত্রুটি ছবিতে ("বিপাশা") আছে। যত পতিব্রতাই হোক না কেন, স্বামীর সম্মান বা তার জেল হওয়া বাঁচাতে গিয়ে কোন মা সন্তানের মাথায় মিথ্যা "জারজ" অপবাদ তুলে দিয়ে তার জীবন বিষময় করে তুলতে পারে না—না, কখনোই না। যদি স্বামীর প্রাণ বিপন্ন হত তা হলে না হয় তা সম্ভব ছিল। এই অনুচিত ও বিকৃত আদর্শ কেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলেন এ'রা (চিত্রনির্মাতা)?

স্বামীজীর সঙ্গে দিব্যেন্দুর রক্ত মিলে যাওয়াটা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয় যে, ডাক্তারকে দিয়ে তার উল্লেখ করাতে হবে। চিত্রনির্মাতারা ভাবতে পারেন যে, এতে করে স্বামীজী যে দিব্যেন্দুর পিতা তারই ইঙ্গিত করা হল। কিন্তু আসলে রক্তের এ ধরনের মিল থেকে রক্তসম্বন্ধ প্রমাণ করা তো দূরের কথা, অনুমানও করা যায় না। নিঃসম্পর্ক, ভিন্ন জাতের লোকের মধ্যে রক্তের মিল থাকতে পারে। তা না হলে "ব্লাড ব্যাঙ্ক" স্থাপন করা নিষ্ফল হত।

মানবশিশুর গর্ভবাসকাল সৌরমাসের হিসাবে নয় মাস বা দু শো আশি দিন। কিন্তু কাহিনীতে খুঁটিনাটি তথ্য দেবার সময় বলা হয়েছে দশ মাস। বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এ রকম ভ্রান্ত ধারণার প্রচার কি বক্স-অফিস হিটের জন্য অপরিহার্য?

"বিপাশা"র নায়ক-নায়িকার অভিনয় একেবারেই একঘেয়ে। অবশ্য এই একঘেয়েমির জন্য পরিচালকও দায়ী কম নন। তারকা-প্রথার এই দোষ যে, অভিনয়ের মান এতে নেমে যায়। তারকার আকর্ষণে দর্শক আসেন। হলই বা অভিনয় নিম্নস্তরের? ছবির নায়িকার পরনে ডীপ-কাট ব্লাউজ ও স্বচ্ছ শাড়ি থাকলেই হল!

দর্শকের রুচি উন্নত করার দায়িত্ব সমালোচকেরও কিছুটা আছে। যদিও আসল দায়িত্ব চিত্রনির্মাতার। আমরা তারকার মোহের চেয়ে ভাল ছবির আকর্ষণই বেশী অনুভব করি। তাই আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছি।

ইতি
কুন্তলা দত্ত
বর্ধমান।

একলব্য
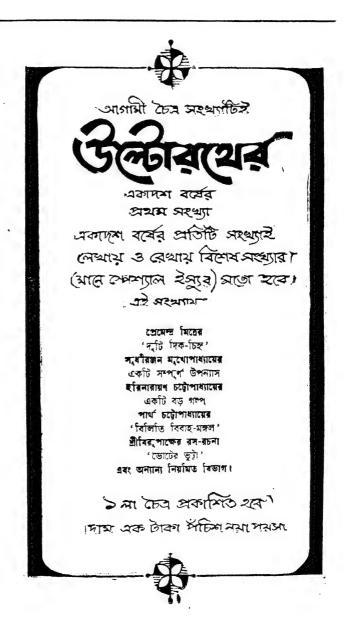
পোর্ট অব স্পেনের 'কুইনস পার্ক ওভাল' মাঠে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০ উইকেটে ভারতকে পরাজিত করেছে। দেশের মাটিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে গৌরবজনক 'রাবার' লাভের পর বিদেশের মাটিতে ভারতের এই পরাজয় গৌরবের আংশিক অন্তর্ধান বলা যেতে পারে। ১০ উইকেটে পরাজয় একরকম ইনিংস পরাজয়ের নামান্তর। বস্তুত ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাত্র ১৩ রানের প্রয়োজন ছিল। কোন উইকেট না হারিয়েই ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই রান করেছে। খেলার খেলা দেখে এই পরাজয় স্বীকার করলে বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু ভারতের ব্যাটিংয়ে সেই ফাস্ট বল ভীতি এবং সেই আত্মবিশ্বাসের অভাব আবার প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের খেলার সে মলিন স্মৃতি আজও আমাদের চোখের উপর ভাসছে।

প্রথম টেস্টের পরিপ্রেক্ষিতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১৯৫৩ সালের প্রথম টেস্ট খেলার চিত্রও চোখের উপর ভেসে উঠছে। ১৯৫৩ সালে পোর্ট অব স্পেনের প্রথম টেস্টেও ভারত প্রথম টসে জিতেছিল এবং প্রথম ইনিংসে করেছিল ৪১৭ রান। পলি উমরিগর সেঞ্চুরী করেছিলেন। এম এল আপ্তের ৬৪, জি এস রামচাঁদের ৬২, দীপক সোধনের ৪৫, ডি কে গাইকোয়াড়ের ৪৩ রান ক্রিকেটের জলুসে ভরা ছিল। প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৩৮ রান করলেও সুভাষ গুপ্তে একাই নিয়েছিলেন সাতটি উইকেট। খেলার ফলাফল ছিল অমীমাংসিত। ১৯৫৩ সালের প্রথম টেস্টের স্কোরবোর্ডের পাশে যদি ১৯৬২-র প্রথম টেস্টের স্কোর বোর্ড দেখা যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, সে দল ছিল কত শক্তিশালী।

অথচ এবারকার দল সম্বন্ধে আমরা মনে মনে কত রঙীন স্বপ্নের জাল বুনেছি। এখন মনে হচ্ছে, সেটা সত্যিই স্বপ্ন। বাস্তবে পরিণত হবে কিনা সন্দেহ। হারার জন্য এ মন্তব্য নয়, যেভাবে হারতে হয়েছে, তার জন্যই এ মন্তব্য।

অবশ্য ভারতকে প্রথম টেস্টে বেশ অসুবিধার মধ্যে পরম শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ওপেনার জয়সীমা এবং সহ-অধিনায়ক পাতৌদির নবাব অসুস্থ থাকায় প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি। পাতৌদির কুঁচকির শিরায় টান ধরেছিল। জয়সীমার হাতের বুড়ো আঙুলে জখম ছিল। ফলে বিজয় মেহেরাকে দিয়ে ভারতের ইনিংসের সূচনা করতে হয়, যে মেহেরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের আবহাওয়ার সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নন এবং টেস্টের আগের দুটি অপ্রধান খেলাতেও অংশ গ্রহণ করেননি। তারপর ভিজে মাঠও ভারতের পক্ষে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করে। যদিও বৃষ্টির সময় উইকেট ঢাকা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, তবুও ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভিজে আবহাওয়ায় খেলতে একেবারেই অভ্যস্ত নয়। তবু বলব, দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, ইংলণ্ডের কাছ থেকে 'রাবার' পাবার পর তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতের দুর্বলতার কথা কারোরই অজানা নয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল সম্পর্কেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মনে একটা ভীতি আছে। কিন্তু কেবল ফাস্ট বোলিংই নয়, স্পিনেও ভারত শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং বিশেষজ্ঞের মতে অকারণেই এই ব্যাটিং বিপর্যয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত তিন 'ডব্লিউ'—উইকস-ওরেল-ওয়ালকটের অন্যতম ক্লাইড ওয়ালকট বলেছেন, টসে জিতে ভিজে আব-

ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেটকিপার জ্যাকি হেন্ড্রিকস জখমী আঙুল দিয়ে ব্যাট করে সবচেয়ে বেশী রান করেছেন। এখানে হেন্ড্রিকসকে দুরানীর অফব্রেক বলে বাউন্ডারী মারতে দেখা যাচ্ছে।
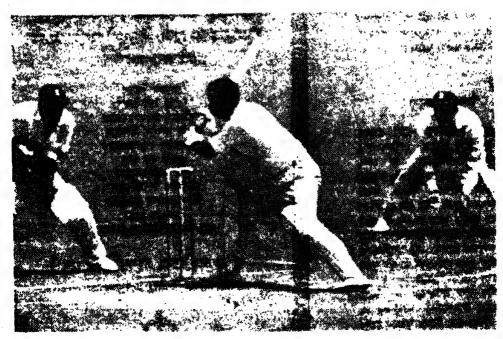
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চৌকস খেলোয়াড়
গারফিল্ড সোবার্স

ইডেনে ভারতের প্রথম ব্যাটিং নেওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে এবং সেইটাই পরাজয়ের প্রধান কারণ। কথাটা যখন ওয়ালকটের মত খেলোয়াড়ের, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু যুক্তি আছে। কিন্তু শত শত মাইল দূরে থেকে এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।

খেলাটি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাক। টসে জিতে ভারত প্রথম ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত করে এবং মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির মধ্যে মাত্র ৪১ রানে ৪জন খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। দিনের শেষে সংগৃহীত হয় ৬ উইকেটে ১২৩ রান। বিজয় মেহেরা কোন রান না করে হলের বলে উইকেটকিপার হেণ্ড্রিকসের হাতে আউট হন। অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর হলের বাউন্সার আটকাতে গিয়ে সোবার্সের হাতে ক্যাচ দেন। মঞ্জরেকার স্টেয়ার্সের বলে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে বিদায় নেন। উমরিগর ২রানের বেশী করতে পারেন না। দিলীপ সারদেশাই, যিনি ট্রিনিদাদ কোল্টের বিরুদ্ধে ১১৮ এবং কলোনীর বিরুদ্ধে ৫০ এবং নট আউট ৭৩ রান করেছিলেন, তিনিও ১৬রান করে আউট হয়ে যান। চাঁদু বোরদেও ১৬ রানে প্যাভেলিয়নে ফিরে যান।

পরের দিন দুই নট আউট খেলোয়াড় রুসি সুর্তি ও সেলিম দুরানীর সহযোগিতায় সপ্তম উইকেটে ৮১ রান যোগ হবার ফলে ভারত ২০৩ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। অবশ্য এক্ষেত্রে কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা আছে। কারণ সুর্তি তিনবার এবং দুরানী দুবার ক্যাচ তুলেও আউট হননি। তবু এ'দের ব্যাটিং ছিল সাহসে ভরা।

বৃষ্টির জন্য প্রথম দিনের খেলা হয় তিন ঘণ্টা। কিন্তু দ্বিতীয় দিন প্রায় পুরো সময় খেলা চলে। এবং ২০৩ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হবার পর ৬ উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সংগ্রহ করে ১৪৮ রান। ভারতের মত ওয়েস্ট ইণ্ডিজও সূচনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে ৩৭ রানের মধ্যে দুটি উইকেট হারায়। রোহন কানহাই ও ক্যামি স্মিথ আউট হয়ে যান। কিন্তু কনরাড হাণ্ট ও গারফিল্ড সোবার্সের তৃতীয় জুটিতে খেলার গতি পরিবর্তিত হয়। দুজনে তৃতীয় উইকেটে সংগ্রহ করেন ৯৯ রান। আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পতন শুরু হয়। হাণ্ট ৫৮ এবং সোবার্স ৪০ রান করে আউট হবার পর অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল কোন রান না করে এবং চার্লি স্টেয়ার্স মাত্র ৪ রান নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। দিনের শেষে জো সলোমান ৪ রান করে নট আউট থাকেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উইকেটকিপার জ্যাকি হেণ্ড্রিকস দ্বিতীয় দিনের সূচনায় হাতে আঘাত পান। তাঁর বাঁ-হাতের অনামিকার হাড় সরে যায়। ফলে তাঁর ব্যাটিং করা সম্বন্ধেই সংশয় থাকে। ৬ উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৪৮। প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এক সলোমান ছাড়া সবাই আউট। তারপর হেণ্ড্রিকস যদি ব্যাট করতে না পারেন, তাহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতের [illegible] নাগাল পাবে কিনা এবিষয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সেলিম দুরানীর স্পিন বোলিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংসে বিপর্যয়ে কারণ হয়। ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতের দুর্বলতা যেমন প্রকট, ভারতের স্পিন বোলিংয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যর্থতাও তেমন প্রকট হয়ে ওঠে।

কিন্তু একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের খেলায় জখমি আঙুল নিয়েই

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার
ওয়েসলী হল

ভারতের প্রথম ইনিংসে বিজয় মঞ্জরেকার কে ব্যাকফুটে একটি বল ড্রাইভ করতে দেখা যাচ্ছে

হেণ্ড্রিকস ব্যাট করতে সলোমনের সঙ্গে মাঠে নামেন। এবং দুজনেই অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে থাকেন। দেখতে দেখতে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান অতিক্রম হয়ে যায়। সপ্তম উইকেটে সলোমন ও হেণ্ড্রিকস সংগ্রহ করেন ৭৯ রান। সলোমন ৪৩ রান করে এবং ল্যান্স গিবস কোন রান না করে আউট হয়ে যাওয়ায় ২১৭ রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৮টি উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু এর পর ওয়েসলী হল ব্যাটিং করতে এসে হাত খুলে মারতে আরম্ভ করেন। ফলে নবম উইকেটে হেণ্ড্রিকস ও হল সংগ্রহ করেন ৭০ রান। ভাঙা আঙুল নিয়ে খেলতে এসে হেণ্ড্রিকসের ৬৪ রান করার তুলনা কম। যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৪৮ রান করতে তাদের প্রতিষ্ঠিত ৬জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়েছিল হেণ্ড্রিকস, সলোমন ও হলের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ে শেষ ৪ উইকেটে ১৪১ রান যোগ করে সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসে করে ২৮৯ রান। ফলে তারা ৮৬ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। ভারতের ব্যাটিংয়ে এবার আরও শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৪৯ রানের মধ্যে পরপর আউট হন নরী কন্ট্রাক্টর, বিজয় মেহেরা, বিজয় মঞ্জরেকার ও দিলীপ সারদেশাই। ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হলের মারাত্মক বোলিংই এই বিপর্যয়ের কারণ। চা-পানের পর এক ওভারে মাত্র ৪ রান দিয়ে হল পান তিনটি উইকেট। বাকিটি স্টেয়ার্স। তবু কিছুটা ভরসা পলি উমরিগর ও চাঁদু বোরদের হাতে ব্যাট। তৃতীয় দিনের শেষে দুজনেই থাকেন নট আউট।

চতুর্থ দিন উমরিগর ও বোরদে আউট হবার পর ভারতের কোন ব্যাটসম্যানই বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেন না। সোবার্স ও ল্যান্স গিবের স্পিন বোলিংয়ে তারা শুকনো মাটিতে আছাড় খাবার মত একে একে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসতে আরম্ভ করেন। মাত্র ৯৮ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। সুতরাং জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাত্র ১৩ রানের প্রয়োজন হয়। কোন উইকেট না হারিয়ে ১৫ রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জেতে ১০ উইকেটে।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে উমরিগর, বোরদে ও নাদকার্নী ছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রানে পৌঁছুতে পারে না। চতুর্থ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের ২৫ মিনিট আগেই খেলার উপর যবনিকা পড়ে।

প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড—

ভারত প্রথম ইনিংস—২০৩ (রুসি সুর্তি ৫৭, সেলিম ডুরানী ৫৬, দিলীপ সারদেশাই ১৯; স্টেয়ার্স ৬৫ রানে ৩ উইকেট, সোবার্স ২৮ রানে ২ উইকেট, ওয়েসলী হল ৩৮ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস—২৮৯ (জে হেণ্ড্রিকস ৬৪, কনরাড হান্ট ৫৮, জে সলোমান ৪৩, গারফিল্ড সোবার্স ৪০, ওয়েসলী হল নট আউট ৩৭; সেলিম ডুরানী ৮২ রানে ৪ উইকেট, আর দেশাই ৪৬ রানে ২ উইকেট)।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস—৯৮ (চাঁদু বোরদে ২৭, পলি উমরিগর ২৩; সোবার্স ২২ রানে ৪ উইকেট, ওয়েসলী হল ১১ রানে ৩ উইকেট, ল্যান্স গিব ১৬ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৫ (কোন উইকেট না হারিয়ে)।

(ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে বিজয়ী)

ভারতের পক্ষে খেলেন—নরী কন্ট্রাক্টর (অধিনায়ক), বিজয় মেহেরা, দিলীপ সারদেশাই, বিজয় মঞ্জরেকার, পলি উমরিগর, চাঁদু বোরদে, সেলিম ডুরানী, রুসি সুর্তি, বাপু নদকার্নী, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (উইকেটকিপার) ও রামকান্ত দেশাই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে খেলেন—কনরাড হান্ট, ক্যামি স্মিথ, রোহন কানহাই, গারফিল্ড সোবার্স, ফ্রাঙ্ক ওরেল (অধিনায়ক), জো সলোমান, চার্লি স্টেয়ার্স, জ্যাকি হেণ্ড্রিকস (উইকেটকিপার), ল্যান্স গিবস, ওয়েসলী হল ও সি ওয়াটসন।

খেলার তারিখ—১৬ই, ১৭ই, ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী।

মুকুল

তপতী ব্যানার্জী

গত সপ্তাহের ঘটনা। যাদবপুর কলেজ মাঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিক স্পোর্টস। ছেলেদের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা তাদের বহু রকমের স্পোর্টস ইভেণ্ট মেয়েদের জন্য মাত্র পাঁচটি। কেউ একটি কেউ দুটি, কেউ বা তিন চারটি ইভেন্টে নাম দিয়েছে। একটি মেয়ের নাম রয়েছে পাঁচটি ইভেণ্টেই। স্পোর্টস শেষে দেখা গেল মেয়েটি লোহার বল ছোঁড়ায় প্রথম হয়েছে। একশো মিটার দৌড়, তিন পায়ে দৌড় ও মিউজিক্যাল চেয়ারে হয়েছে দ্বিতীয়। ব্যালান্স রেসে প্রথম হবার মুখে ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কোন স্থান পায়নি। কিন্তু সব মিলিয়ে 'বেস্ট আমোঙ্গ উইমেন' স্পোর্টসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রীর পুরস্কার। মেয়েটির নাম তপতী ব্যানার্জি।

খতিয়ে দেখতে গেলে তপতীর খ্যাতি সুবিস্তৃত নয়। কলকাতার অনেকেই তার নাম প্রথম শুনলেন। কিন্তু জামসেদপুরের স্পোর্টস ক্ষেত্রে তপতী ব্যানার্জি একটি সুপরিচিত নাম। ১৯৫৭ সালে জামসেদপুরের আন্তঃস্কুল স্পোর্টসে তপতীই পেয়েছিল ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার। এছাড়া জামসেদপুরের 'জি' টাউন অর্থাৎ বিস্টুপুর এলাকার সবচেয়ে বড় ক্রীড়া সংঘ জামসেদপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের স্পোর্টসে পরপর তিন বছর ওর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। যে বিষয়ে শক্তির প্রয়োজন তাতেও যেমন যোগ্যতা, যে বিষয়ে গতিবেগ দরকার, তাতেও তেমন পটুতা, আবার যাতে গতিশক্তি ও নৈপুণ্যের সংমিশ্রণ তাতেও তপতীর প্রাধান্য। অর্থাৎ লোহার বল ছোঁড়া, ডিসকাস ছোঁড়া, হার্ডলস, হাই জাম্প দৌড় সব কিছুতেই পারদর্শিতা। বিহার রাজ্য স্কুল অ্যাথলেটিকসের দুই একটি রেকর্ডও না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পড়াশুনোর চর্চা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে এবং ক্লাসে কোনদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় না হয়ে স্পোর্টসেও পারদর্শিনী হওয়া তপতীর জীবনের বৈশিষ্ট্য।

বাবা শ্যামাকান্ত ব্যানার্জি ছিলেন জামসেদপুরে টাটা লেবরেটরীর কেমিস্ট। এখন অবসরপ্রাপ্ত। একমাত্র ভাই উৎপল ব্যানার্জি জামসেদপুর স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। এখন ডিফেন্স অ্যাকাউণ্টের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলার। বড় বোন স্বর্ণা ব্যানার্জিও জামসেদপুর থেকে স্কুল ফাইন্যালে স্কলারশিপ পেয়েছেন।

স্পোর্টসের কয়েকটি প্রাইজ নিয়ে তপতী ব্যানার্জি

তপতীর বাবা মা চেয়েছিলেন তাঁদের ছোট মেয়েও বড় ছেলে ও বড় মেয়ের মত লেখাপড়ায় নাম কিনে ঐতিহ্য বজায় রাখুক। তাই পড়াশুনো ছাড়া অন্য কোনদিকে যাতে তপতীর মন না যায় সেদিকে তাঁদের ছিল সদাজাগ্রত তৎপরতা।

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই স্কুলের বই পড়তে পড়তে তপতী খবরের কাগজের খেলার পাতাটা আগাগোড়া পড়ে ফেলে, অংক কষতে কষতে স্পোর্টসের দৌড়-ঝাঁপের সময় ও দূরত্বের ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড এবং গজ ফুট ইঞ্চি নিয়ে গবেষণা করে, স্কুলের ছুটির পর খেলার খোলা মাঠ তার মন টানে।

বাবা মা অনেক সময় বিরক্ত হন। বলেন—'আগে লেখাপড়া, পরে খেলাধুলো।' দাদা উৎসাহ দেন। বলেন—'পড়াশুনো বজায় রেখে খেলাধুলো করলে ক্ষতি কি? ক্লাসে তো ও ফার্স্টই হয়।'

প্রধানত দাদার উৎসাহে তপতী এক একটি স্পোর্টসে নামে আর এক গাদা প্রাইজ নিয়ে ঘরে ফেরে। খালি হাতে কোনদিনই ঘরে ফেরে না। এদিকে ডি এম মাডান গার্লস হাই স্কুলেও ভাল মেয়ে বলে তপতীর সুনাম। ফলে দাদা ও দিদির চেয়েও জামসেদপুরে ওর জনপ্রিয়তা। স্পোর্টসে রাশি রাশি প্রাইজ পেল, স্কুল ফাইন্যালেও পেল স্কলারশিপ। কিন্তু ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট না থাকায় আইনের মারপ্যাঁচে সে স্কলারশিপ তপতীর হাতে আসেনি। ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর তপতী লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে ভর্তি হয়। ১৯৬১ সালে আই এস-সি পাশের পর ভর্তি হয় যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। ওখানে এখন ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের টেলি কম্যুনিকেশনের ছাত্রী।

সাতাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না স্পোর্টসের পোক্ত মেয়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্পোর্টসের প্র্যাক্টিস কোনদিন সম্ভব হয়নি। সহজাত প্রবৃত্তি ওকে স্পোর্টসের দিকে টেনে এনেছে। শিক্ষা পেলে হয়তো এখনো অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে।

দেশী সংবাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে পাটের দর নিম্নাভিমুখী হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত আপৎকালীন মজুতদারী সংস্থার পক্ষ হইতে শীঘ্রই পাট ক্রয় ও মজুত শুরু করার সম্ভাবনা আছে। ঐ সংস্থা গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ঐ সংস্থার পক্ষ হইতে কিছুমাত্র পাট ক্রয় বা মজুত করা হয় নাই।

জীবনবীমা কর্পোরেশনের কলিকাতা ডিভিশন ১৯৬১ সালে ৬৫ কোটি টাকার 'বিজিনেস' করিয়া সর্বভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইহা মোট 'বিজিনেস'-এর শতকরা ১০ ভাগ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ৩৫টি ডিভিশন আছে। বোম্বাই ৫৮ টাকার 'বিজিনেস' করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য টিটাগড় এলাকার একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সম্মুখে পটকা বিস্ফোরণের ফলে ৩ ব্যক্তি আহত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়। কয়েকটি কেন্দ্রে অন্যের পরিচয়ে ভোট দিবার চেষ্টার অভিযোগেও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোয়ালিয়র লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত নির্বাচন প্রার্থী গোয়ালিয়রের মহারানী বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া। তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন সমাজতন্ত্রী দল সমর্থিত প্রার্থী ঝাড়ুদার রমণী শ্রীমতী সুকাও।

২১শে ফেব্রুয়ারী—আজ রাজ্য সদর দপ্তরে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব উত্তর প্রদেশের বলরামপুর কেন্দ্রে জনসংঘ ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে দুই ব্যক্তি নিহত এবং ১২ জন আহত হইয়াছে। পুলিস বলরামপুর শহরে কার্ফু জারী করে এবং ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু শ্রীক্রুশ্চেফের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি (শ্রীক্রুশ্চেফ) ১৮টি রাষ্ট্রকে লইয়া যে শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, এপ্রিল মাসের শেষাশেষি সেই সম্মেলন আহ্বান করা যাইতে পারে।

২২শে ফেব্রুয়ারী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কোর্সে বহিরাগত ছাত্র হিসাবে আই-এ, বি-এ এবং বি এস-সি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ সম্ভবত ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। এখন উহা এই বৎসর পর্যন্ত বহাল আছে।

ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের পাঁচটি প্রকল্পে আমেরিকার ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্তকে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন যে কিছু কম্যুনিস্ট সদস্য কর্তৃক অশোক সেন এবং তাঁহার নিজের সম্পর্কে আপত্তিকর বিবৃতি দেওয়ার সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। এই সকল বিবৃতির মর্মার্থ : আসামে বাঙ্গালী নিধনের জন্য তিনি (নেহরু) নাকি দায়ী এবং অশোক সেন তাঁহার সহযোগী। বেরুবাড়ি হস্তান্তর প্রসঙ্গও বিকৃতভাবে উল্লেখ করা হইতেছে। প্রধানমন্ত্রীর মতে কিছু নির্বাচনী পোস্টারও আপত্তিজনক।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—নির্বাচনের পর কাশ্মীরের একজন সংসদ সদস্যকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় লওয়া হইতে পারে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানান হয়। কাশ্মীর রাজ্য বিধানসভা লোকসভার জন্য পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত করিলে রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের মনোনীত করেন।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এক রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ যে সঠিক হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে প্রকাশ, শ্রীনেহরু তাঁহার একত্রিশ দিনের নির্বাচনী সফরে বিমানে ১৬৩৬২ মাইল সড়ক পথে ১৩০০ মাইল ও রেলে ১৩০ মাইল অতিক্রম করেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া কেন্দ্র হইতে বিপুল ভোটাধিক্যে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতার ২৬টি বিধানসভার আসন এবং ৪টি লোকসভার আসনের জন্য অদ্য ১৯৫৭টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এইদিনের জন্য ৯৭৮৫টি ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন হয় এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য ১২ হাজার কর্মচারী, ১৫০০০ পুলিস এবং ৬০০ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক কর্মী নিযুক্ত করা হয়। খাস কলিকাতার ভোটদাতার সংখ্যা হইতেছে ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৯২।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনে অবস্থিত শত শত পাকিস্তানী (ইহাদের অধিকাংশই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী ছাত্র) কাল রাতে পাকিস্তানে আয়ুব খার সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের নকল লণ্ডনে পাকিস্তানের হাই-কমিশনের অফিসে দাখিল করেন।

নেপালের জনৈক বিদ্রোহী নেতার মারফত প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, নেপালী কংগ্রেসের বিদ্রোহীগণ গতকাল দুইঘণ্টাব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের পর খোখা জেলা দখল করিয়াছেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী—গতকাল লাহোরে ছাত্রগণ জনৈক পাকিস্তানী মন্ত্রীকে কাশ্মীর সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার সময় নাজেহাল করিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিস ডাকা হয়। ঘটনাটি ঘটে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায়।

আজ একটি অ্যাটলাস রকেট মার্কিন মহাকাশচারী জন গ্লেনকে লইয়া গ্রীনউইচ সময় অপরাহ্ণ ২টা ৪৮ মিনিটে পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষ পরিক্রমার জন্য মহাকাশের দিকে যাত্রা করে। জন গ্লেনের মহাকাশ যান তিনবার পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মহাকাশে ভ্রমণকালে তিনি তিনবার সূর্যাস্ত দেখিয়াছেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য পূর্ব পাকিস্তানে সর্বত্র শহীদ দিবস পালনের মধ্য দিয়া বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এইদিন গোয়ালন্দ জাহাজঘাটের নিকট একটি বিক্ষুব্ধ ছাত্র মিছিলের উপর পুলিস লাঠি চার্জ করে এবং ঘটনাস্থলে প্রায় ৫০।৬০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া জানা যায়।

বিশ্বের সর্বত্র উপনিবেশবাদের দ্রুত অবসান ঘটাইবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৭ জন সদস্য লইয়া যে কমিটি গঠন করিয়াছেন, আজ রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সি এস ঝা সর্বসম্মতিক্রমে তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন।

২২শে ফেব্রুয়ারী—গ্লেন পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে মহাকাশ পরিক্রমাকালে তাঁহার জানালার পাশে 'জোনাকি পোকার ন্যায়' পদার্থ ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন।

আজ কাঠমাণ্ডুতে সরকারীসূত্রে বলা হইয়াছে যে, গত মঙ্গলবার ভোরে বিদ্রোহীরা পশ্চিম নেপালের তাং জেলার বাগিজ্য শহরে কৈলাবাস আক্রমণ করিলে একজন নেপালী বিদ্রোহী নিহত ও ৪ জন আহত হইয়াছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় পুনরায় ঢাকা শহরে গুলীবর্ষণ করা হয়। ফলে একজন সরকারী বাসের ড্রাইভারসহ ৩ জন লোক ঘটনাস্থলেই মারা গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গেল।

নেপাল বেতারে বলা হইয়াছে যে, কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণে অবস্থিত বীরগঞ্জ শহর হইতে সাত মাইল দূরবর্তী এক শুল্ক ঘাটিতে বিদ্রোহীরা গত মঙ্গলবার হানা দেয়। উক্ত বেতারবার্তায় বলা হইয়াছে যে, দুষ্কৃতকারীরা ভারত হইতে আসে এবং উক্ত ঘাট লুণ্ঠন করিয়া তথায় পলাইয়া যায়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—ওয়াকিবহাল মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, শীর্ষ সম্মেলন আহ্বানের জন্য শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডী তাহা কার্যতঃ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আজ জাকার্তা হইতে প্রচারিত এক নির্দেশনামায় বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের পরামর্শ অনুসারে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিয়াছেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে জানান হয় যে, গত বৃহস্পতিবারের সামরিক বিদ্রোহের নেতা কর্ণেল তালাত আয়দেমীর ও অপর তিনজন অফিসারকে নিরাপত্তার জন্য আটক করা হইয়াছে।

আজ আলজিয়ার্সে সামরিকসূত্রে সংবাদ পাওয়া যায় যে, গতকল্য আলজিরিয়ার সর্বত্র বন্দুক, ছুরিকা ও বোমার আক্রমণে ৪০ জন নিহত ও ২১ জন আহত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **পঞ্চতপা ৬॥০**	গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **উপকণ্ঠে ৯,**	আশাপূর্ণা দেবীর **গল্প পঞ্চাশৎ ৮,**	টলস্টয়ের **ওআর এণ্ড পীস ১৩,**	[illegible] মিত্রের **[illegible] ৫॥০**

যাঁদের রচনা প্রকাশের সুদুর্লভ সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল

বিদ্যাসাগর
ভূদেব মুখোপাধ্যায়
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অনুরূপা দেবী
অপূর্বমণি দত্ত
অবধূত
অটলবিহারী বসু
অজ্ঞাত সৈনিক
অখিল নিয়োগী
আপটন সিনক্লেয়ার
আশাপূর্ণা দেবী
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্রজিৎ
এমিল লুডভিগ
এলিজাবেথ ইয়েটস্
ইলিনর রুজভেল্ট
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
কালিদাস রায়
কালীপদ ঘটক
কুমুদরঞ্জন মল্লিক
কৃষ্ণদয়াল বসু
কৃষ্ণেন্দ্রকুমার মিত্র
ক্লাইসলার
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
গর্ডন ডীন
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
চরণদাস ঘোষ
জয়দেব
জর্জ অরওয়েল
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
জি. গ্লেনউড ক্লার্ক
জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
টমাস হার্ডি
টলস্টয়
টুর্গেনেভ

মাইকেল
বিহারীলাল
ডস্টয়ভস্কী
তপতী রায়
তরু দত্ত
তরুণকুমার ভাদুড়ী
তারাপদ মুখোপাধ্যায় (ডঃ)
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তুলসীদাস সিংহ
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
দক্ষিণারঞ্জন বসু
দেবেশ দাশ
দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নিরুপমা দেবী
নির্মলা দেবী
নির্মলকুমারী মহলানবীশ
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
পরিব্রাজক
পরিমল গোস্বামী
প্রদীপকুমার মিত্র
প্রফুল্ল রায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রভাত দেবসরকার
প্রমথনাথ বিশী
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রশান্ত চৌধুরী
প্রাণতোষ ঘটক
প্রেমচাঁদ
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বনফুল
বাণী রায়
বিক্রমাদিত্য
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (ডঃ)
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিমল মিত্র
বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

রমেশ দত্ত
রজনী সেন
বিশ্বপতি চৌধুরী
বিহারীলাল গোস্বামী
ভূপেন্দ্রনাথ সরকার
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোজ বসু
মনোজিৎ বসু
মহাত্মা গান্ধী
মার্গারেট ওহাইড
মার্গারেট কাজিনস্
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
রমেশচন্দ্র সেন
রাজশেখর বসু
রামনাথ বিশ্বাস
রামপদ [illegible]
রোমানফ
শংকু মহারাজ
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ডঃ)
শশিশেখর বসু
শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায় (ডঃ)
শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সন্তোষকুমার ঘোষ
সন্তোষকুমার দে
সরলাবালা সরকার
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সুখলতা রাও
সুনির্মল বসু
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডঃ)
সুবাদার সীতারাম
সুমথনাথ ঘোষ
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (ডঃ)
সুরেন্দ্রনাথ সেন (ডঃ)
সুশীলকুমার দে (ডঃ)
সৈয়দ মুজতবা আলি
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
হরপ্রসাদ মিত্র
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
হেলেন কেলার

আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন : শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের নূতন রচনায় সমৃদ্ধ এই ক্যাটালগ বিনামূল্যে প্রেরিত হইবে।

নিরুপমা দেবীর **শ্যামলী ৩,**
প্রমথনাথ বিশীর **কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০**
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পথের পাঁচালী ৫॥০**
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **কবি ৪॥০**
প্রবোধকুমার সান্যালের **মহাপ্রস্থানের পথে ৩,**
অবধূতের **মরুতীর্থ হিংলাজ ৩**

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের **ঠাকুরমার ঝুলি ৪,**
অনুরূপা দেবীর **জ্যোতিঃহারা ৩॥০**
নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥০**
প্রেমেন্দ্র মিত্রের **ধূলিধূসর ৩,**
বিমল মিত্রের **কড়ি দিয়ে কিনলাম ১৬,**
মনোজ বসুর **বন কেটে বসত ৯,**

সুমথনাথ ঘোষের **জটিলতা ২৮০**	সুখলতা রাওর **গল্প আর গল্প ৪,**	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **আরাকান ৫॥০**	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ** প্রতি খণ্ড ৬,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 10TH MARCH, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ১৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৬ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

গণতান্ত্রিক দায়ভাগ

ভোট যুদ্ধের চুলচেরা বিচার বাদ দিলে সাধারণ নির্বাচনের মোটামুটি ফল হল, এক, শাসন ক্ষমতা কোথায়ও হাত বদল হয়নি; দুই, কংগ্রেসের সমতুল কোন শক্তিশালী বিরোধী দল দেখা দেয়নি। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে সর্বত্রই কংগ্রেস তৃতীয়বার রাষ্ট্রশাসনভার গ্রহণের অধিকার পেয়েছে। দু তিনটি রাজ্যে অবশ্য কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চিত নয়। যেসব রাজ্যে এককালে সামন্তরাজদের প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, যেমন রাজস্থান এবং মধ্য প্রদেশ, সেখানেই কংগ্রেস আপাতত এই রকম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। তবে সমস্যাটা এমন কিছু বৃহদাকার নয়। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যে, যেমন উড়িষ্যায়, কংগ্রেসকে এরকম সমস্যায় ইতিপূর্বে পড়তে হয়েছে। রাজস্থান কিম্বা মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস দলের মন্ত্রিত্ব গঠন সমস্যা সে তুলনায় খুব দুরূহ নয়। সাধারণ নির্বাচনের পর রাজস্থানে কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে স্বতন্ত্র দল; আর মধ্যপ্রদেশে জনসংঘ। উত্তর প্রদেশেও জনসংঘের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র দল বা জনসংঘ এখনও এতটা শক্তিশালী হয়নি যে কংগ্রেসের জায়গায় রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে বা উত্তর প্রদেশে শাসনভার নিতে পারে। সাধারণ নির্বাচনের রায় কোথায়ও ক্ষমতা হাত বদলের পক্ষে নয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেও কোন সর্বভারতীয় শক্তিশালী বিরোধী দল দেখা না দেওয়ায় দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কংগ্রেসের সাফল্যে এ'রা কেউই অখুশী হননি; এ'দের আফসোস অনেকটা এই যে, য়ুরোপের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ধরনধারনের সঙ্গে আমাদের নির্বাচনী ফলাফলের মিল দেখা যাচ্ছে না। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকাই নিয়ম এবং থাকাটা জনস্বার্থের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। আদর্শ হিসেবে যুক্তিটা অনস্বীকার্য। সংখ্যাগরিষ্ঠতাবলে ক্ষমতাসীন হলেও রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে যথেচ্ছাচার গণতন্ত্রে অচল। অচল এই কারণে যে ক্ষমতাসীন দলকে প্রতি পদে বিরোধী দলের কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয় এবং অবস্থা কখনও সঙীন হলে বিরোধী দল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আবেদন করতে পারে ক্ষমতাসীন দলের কাজকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিচারের জন্য। কাজেই শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব গণতান্ত্রিক রাজনীতির সুস্থ ও স্বাভাবিক গতি-নিয়ামক সন্দেহ নেই। কিন্তু এও ঠিক যে কোন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেই শক্তিশালী বিরোধী দল হঠাৎ গজায় না। আর যাই হোক এর জন্য কংগ্রেস দলের গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কারণ নেই।

ব্রিটেনে, য়ুরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একই দলকে দীর্ঘকাল একটানা ক্ষমতাসীন থাকতে দেখা গিয়েছে। জনতার রায় একাধিকবার একটি দলের অনুকূলে যাওয়া আপত্তিকর গণ্য হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাব্লিকান পার্টির মত ক্ষমতাশালী দলকেও এই শতাব্দীর মধ্য-ত্রিশ থেকে মধ্য-পঞ্চাশ পর্যন্ত ক্ষমতা-চ্যুত থাকতে হয়েছিল। ব্রিটেনে লেবার পার্টির অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তফাৎ এই যে, আমেরিকার রিপাব্লিকান পার্টি কিম্বা ব্রিটেনের লেবার পার্টি যথেষ্ট ক্ষমতাশালী বিরোধী দল; রাষ্ট্রশাসনের অভিজ্ঞতাও তাদের প্রচুর, যা ভারতের কোন গণতান্ত্রিক বিরোধী দলেরই প্রায় নেই বলা যায়। নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছাই স্থির করে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে কোন্ দল শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের স্বেচ্ছায় শাসনক্ষমতা থেকে অবসর গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। যে দল নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের সর্বাধিক আস্থা অর্জন করে তার পক্ষে রাজনৈতিক বৈরাগ্য সাধনের পথ বেছে নেওয়ার উপায় নেই, কোন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেরই নেই।

রাজাজী অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেসের পক্ষে একটানা শাসনক্ষমতা অধিকার একদলীয় শাসনের নামান্তর। ঠিক কি তাই? কোন বিরোধী রাজনীতিক দলের অস্তিত্ব নেই কিম্বা অস্তিত্ব থাকলেও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগবঞ্চিত যে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রকেই একদলীয়তন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের অধীন বলা যায়। কংগ্রেস শাসন যে মোটেই একদলীয় তন্ত্র নয় তার প্রমাণ প্রত্যেকটি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধীরা স্বচ্ছন্দে অবাধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছে। কংগ্রেস-শাসন যে একদলীয় স্বেচ্ছা-বিধান নয় তার আরও প্রমাণ এবারের সাধারণ নির্বাচনে কোন কোন রাজ্যে স্বতন্ত্র দল এবং জনসংঘ কংগ্রেস-বিরোধী দল হিসাবে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে। জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধানের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দলগুলির উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি হলে যথাসময়ে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার হাত বদল সম্ভব হবে। সে রকম কোনও দায়িত্বশীল বিরোধী দল যতদিন দেখা না দিচ্ছে ততদিন নির্বাচনের রায় অনুযায়ী কংগ্রেসের শাসনই আমাদের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলকর বলে মানতে হবে।

নেহরুর সঙ্গে নির্বাচন দ্বন্দ্বে ডঃ লোহিয়া ৫০হাজারের অধিক ভোট পেয়েছেন।
'নেহরুর পর কে?' এই সমস্যার একটা সমাধান মিলল।
পশ্চিম বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে বামপন্থীরা সাফল্য লাভ করেছে।
ভোটদাতারা কি তাদের পোস্ট-ডেটেড্ চেক দিয়েছেন?
৩-৩-৬৭
বামপন্থী ...
বিকল্প সরকার
স্বতন্ত্রদল ১৫০টি আসন দখল করেছে
[প্রথম মাচে নেমেই সেঞ্চুরী!]
CR. 167
পাকিস্তানে এবার নতুন শাসনতন্ত্র চালু হবে।
সেই পুরোনো কাসুন্দী
স্বৈরতন্ত্র
গণতন্ত্র
KUTTY

আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ফরাসী সরকারের দীর্ঘদিন-ব্যাপী বিরোধের একটা মীমাংসা হলো। কিন্তু আলজেরিয়ায় এখনো শান্তি আসে নি এবং কবে পুরোপুরি শান্তি আসবে তাও একেবারে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আলজিরিয়ার 'প্রভিশনাল' সরকার এবং ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার যে-সব সর্ত স্থির হয় সেগুলি উভয় দিকের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন। সুতরাং যুদ্ধবিরতির পথে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এখন অশান্তি সৃষ্টি করছে দ্য গল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ফরাসী সৈন্যের দল যারা এক শ্রেণীর গোঁড়া ফরাসী ঔপনিবেশিকদের সমর্থক। এরা কিছুতেই আলজিরিয়া থেকে ফরাসী আধিপত্য হ্রাস হতে দিতে চায় না। এরা এখনো আশা করছে যে, সন্ত্রাসসৃষ্টি দ্বারা তারা বর্তমান মীমাংসা ভণ্ডুল করে দিয়ে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা ঠেকাতে পারবে। ফ্রান্সে দ্য গলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তাদের ষড়যন্ত্র চলছে এবং খাস ফ্রান্সেও তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য খুনোখারাপি চালাচ্ছে। সুতরাং সব মিলে একটা অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থা চলছে।

তবে খাস ফ্রান্সেই হোক অথবা আলজিরিয়াতেই হোক সন্ত্রাসবাদীরা খুব বেশি দিন অশান্তি জীইয়ে রাখতে হয়ত পারবে না। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, আলজিরিয়া সম্পর্কে মীমাংসার যে-সব সর্ত হয়েছে সেগুলি আলজিরিয়ার ইউরোপীয় অধিবাসীদের অর্থাৎ ফরাসী ঔপনিবেশিকদের পক্ষে খুবই ভালো। এ বিষয়ে আলজিরিয়ান জাতীয়াবাদীরা খুবই ঔদার্য দেখিয়েছেন! ইউরোপিয়ান অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপার ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়েও মীমাংসার সর্ত ফরাসী সরকারের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। এই সব সর্ত যখন স্পষ্টভাবে লোকের সামনে উপস্থিত করা হবে তখন গোঁড়া ফরাসী ঔপনিবেশিক মতের সমর্থক বেশি লোক থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসার বিরোধীদের প্রভাব এবং তাদের অশান্তি সৃষ্টি করার শক্তিও কমে যাবে। তবে আপাতত হয়ত আরো কিছুদিন আলজিরিয়া এবং খাস ফ্রান্স থেকেও সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংবাদ আসবে। এতোদিন পরে আলজিরিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়ে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে যখন আনন্দ করার কথা সেই সময়ে এই দুর্বৃত্তদের কাজ যে কতদূর নিন্দনীয় এবং ফরাসী-জাতির পক্ষে লজ্জাকর ও বিপজ্জনক তা বলা যায় না।

*

নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা কীভাবে হতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ইউনো'র জেনারেল অ্যাসেম্ব্লী একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। আঠারোটি রাষ্ট্র ঐ কমিটির সদস্য, তার মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম এবং নিরপেক্ষ তিন গোষ্ঠীরই রাষ্ট্র আছে। নিরপেক্ষদের মধ্যে ভারতবর্ষও আছে। ১৪ই মার্চ জেনেভায় এই কমিটির বৈঠক আরম্ভ হবে। কিছুদিন পূর্বে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকুশ্চভ প্রস্তাব করেন যে, এই কমিটির বৈঠক একটি শীর্ষ সম্মেলন রূপে আরম্ভ হোক। অর্থাৎ

যে-সব রাষ্ট্র কমিটির সদস্য তাদের গবর্নমেণ্টের যাঁরা বড়ো কর্তা তাঁরা স্বয়ং বৈঠকে যোগ দিতে জেনেভায় আসুন।

শ্রীকেনেডী এই প্রস্তাবে রাজী হন নি। তিনি বলেন যে, প্রথমে খোদ বড়ো কর্তাদের জেনেভায় গিয়ে কোনো লাভ নেই। একটা মীমাংসার পথ পরিষ্কার হয়েছে এরূপ যখন দেখা যাবে তখন বড়ো কর্তারা যেতে পারেন, প্রথমে পররাষ্ট্রসচিবৃন্দের মধ্যে আলোচনা চলুক। কমিটিতে যে-সব রাষ্ট্র আছে তাদের প্রত্যেকের প্রধানমন্ত্রী বা তদ্‌স্থানীয় ব্যক্তির নিকট শ্রীক্রুশ্চভ পত্র দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু উত্তরে জানান যে, ভারতে সাধারণ নির্বাচন এবং তার পরে নূতন গবর্নমেণ্ট গঠন সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে তাঁর পক্ষে মার্চ মাসে ভারতের বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে যদি তাঁর যোগদান সম্মেলনে কাজের সহায়ক হয় তবে তিনি পরে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে জেনেভায় যেতে পারেন। রাষ্ট্র প্রধানদের যোগদান ফলপ্রদ হতে হলে তার আগে কমিটির দ্বারা পথ পরিষ্কারের কাজ আবশ্যক, এরূপ ইঙ্গিতও পণ্ডিত নেহরুর চিঠিতে আছে। যদিও তাঁর চিঠি পড়লে এরকমও মনে হবে যে, যদি তাঁকে এখন ভারতবর্ষে অন্য কাজে আটকে থাকতে না হোত এবং অন্য রাষ্ট্রপ্রধানরাও উপস্থিত হতে রাজী থাকতেন তাহলে শ্রীনেহরুর পক্ষে বৈঠকের প্রারম্ভেও যোগদান করতে আপত্তি হোত না। অর্থাৎ শ্রীনেহরু শ্রীকেনেডীকেও (এখনই শীর্ষসম্মেলন আবশ্যক নয়—এই মতে) সমর্থন করেছেন আবার শ্রীক্রুশ্চভের প্রস্তাবেরও তারিফ করেছেন।

শ্রীক্রুশ্চভ শ্রীকেনেডীর উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর পূর্ব প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের মিলিত হবার আগে অনেক বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার বলে শ্রীকেনেডী যে আপত্তি তুলেন সেই সম্পর্কে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গত পনেরো বছর ধরে তো কথাবার্তা, যোগাযোগ অনেক হয়েছে, তার পরেও যখন অনেক বিষয় অপরিষ্কার রয়েছে তখন অন্যের দ্বারা পরিষ্কার করাবার চেষ্টা না করে রাষ্ট্রপ্রধানদের পরস্পরের মধ্যে মুখোমুখি কথা বলা দরকার। কিন্তু শ্রীকেনেডীর মত পরিবর্তন হয় নি। প্রথমে পররাষ্ট্রসচিবরা মিলিত হয়ে আলোচনা করুন, তারপর যদি পথ পরিষ্কার হয় তবে রাষ্ট্রপ্রধানরা যাবেন—এই মতেই তিনি স্থির রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট সরকার তাতেই রাজী হয়েছেন।

নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার প্রশ্নটিকেও এই জেনেভা কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষিত হয়েছে যে, এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ও আবার অস্ত্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ (কেবল মাটির তলায় ন মণ্ডলেও) আরম্ভ করবে। যদিও না সোভিয়েট রাশিয়া নিউক্লিয়ার নিষেধাত্মক চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি করতে রাজী আছে। কিন্তু সর্ত পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার কোনো আন্তর্জাতিক পরিদর্শকের ব্য সে রাজী নয়। আমেরিকার দাবি—আন্তর্জাতিক পরিদর্শকের ব্যবস্থা করতে তা না হলে চলবে না। রাশিয়া যদি রাজী না হয়, তবে আমেরিকা কর্তৃক মণ্ডলে আর এক দফা নিউক্লিয়ার বিস্ফো শুরু হবে। তার প্রস্তুতি নিশ্চয়ই রে এগিয়েছে।

মনে হয় আমেরিকা যে-প্রোগ্রাম সেটা বন্ধ হবে না। রাশিয়া আন্তর্জা পরিদর্শকের ব্যবস্থা স্বীকার করে সেটা বন্ধ করতে পারে এটা বলা হচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা অত সরল নয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল, সেটা সাধ লোকের বোধগম্যই নয়। নিজে অপরা বলে রাশিয়া বোধহয় ভাবছে যে, চুক্তি য থাক নিজের শক্তির প্রশ্ন যখন উঠবে, তখ আমেরিকা নিরস্ত্র থাকবে না, যেমন রাশিয় থাকে নি। সুতরাং আন্তর্জাতিক পরি দর্শকের ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে নিজের যথেচ্ছাচরণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ কেন করি।

গত বছর রাশিয়া যখন নূতন করে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ আরম্ভ করেছিল তখন কেউ কেউ এমন থিওরিও প্রচার করে-ছিলেন যে, রাশিয়ার নিউক্লিয়ার অস্ত্রশক্তির এই নূতন প্রমাণদানের পরে শ্রীক্রুশ্চভের পক্ষে পশ্চিমাদের সঙ্গে মিটমাট করার সুবিধা হবে। কারণ অতঃপর রাশিয়াতে শ্রীক্রুশ্চভের বিরোধীরা বলতে পারবে না যে পশ্চিমাদের সঙ্গে লেনদেন করতে গিয়ে রাশিয়া দুর্বলতা প্রকাশ করছে অথবা রাশিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে। তাই যদি হয় তবে বলতে হবে যে, রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাটের উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীকেনেডী নূতন একদফা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাবার ব্যবস্থা করছেন, কারণ আমেরিকার বোমা রাশিয়ার বোমার চেয়ে কম বিধ্বংসী নয় এটা প্রমাণ করার পরে যদি তিনি রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাট করতে অগ্রসর হন তাহলে আমেরিকার দৌর্বল্য প্রকাশ অথবা আমেরিকার নিরাপত্তাহানির কথা তুলে কেউ তাঁর নীতির সমালোচনা করতে পারবে না। মার্কিন জনমতও উদ্বিগ্ন হবে না! বিশ্ব শান্তির দিকে শ্রীকেনেডীর এই নূতন পদক্ষেপের পরে শ্রীক্রুশ্চভও নিশ্চয়ই বোধ করবেন যে তাঁরও এবার আর এক পদক্ষেপ করা উচিত—সেটা কোন্‌ মেগাটনী পদক্ষেপ হবে তা এখনো আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

৬।৩।৬২

অসংলগ্ন

বাতায়নিক
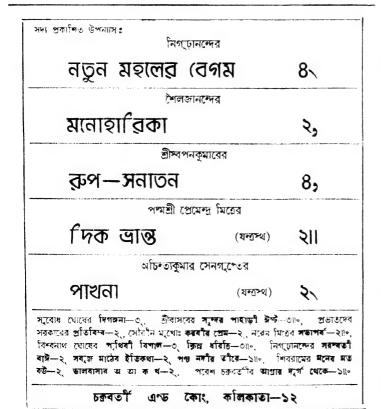
ভোরে উঠে সেদিন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সন্দেহ হল সত্যি জেগে উঠেছি না এখনো ঘুমের ঘোরেই আছি। সন্দেহের কারণ আমার পরিচিত জগৎ চারিধারে কোথাও দেখতে পেলাম না। ঘুমের মধ্যে আমার দোতালার ঘরটা আমায় নিয়ে কোন অজানা লোকে যেন চলে এসেছে। এ শুধু অজানা লোক নয় প্রায় নিরাকার আদি সৃষ্টির জগৎ। পরমশিল্পী যেন সবে বস্তুর ধ্যানে বসেছেন। শূন্য পটে আবছা রঙের প্রলেপ পড়েছে, এখনো তা রূপ নেয়নি স্পষ্টতার। সংগীতের যেমন তালমান গৎ বাঁধা ছকের আগে সুরের আলাপ, এও যেন তেমনি আলাপ সৃজনের।

এটুকু লিখতে যতক্ষণ লাগল তার আগেই আমি অবশ্য বুঝেছিলাম যে ব্যাপারটা কুয়াশা ছাড়া কিছু নয়। ঘন-কুয়াশায় দিগ্বিদিক বিলুপ্ত হয়ে আমার নিত্য পরিচিত পরিবেশের এই চেহারা হয়েছে। সকাল বেলার এ কুয়াশা বৎসরের এই সময়টায় বিরল নয়। কিন্তু এই বিশেষ প্রভাতে তার এমন একটি প্রকাশ ছিল যা সচরাচর দেখবার সৌভাগ্য হয় না। এ কুহেলিকা নগরের সেই ধুলো ধোঁয়ার ভেজাল মেশানো নোংরা আবরণ নয়। এ কুয়াশাও অস্বচ্ছ কিন্তু নির্মল। রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত গ্লানি মুছে রেখে এসে একটি শুদ্ধ প্রসন্নতা সে বুঝি অর্জন করেছে।

শুধু নির্মল প্রসন্নই নয় এ কুজ্ঝটিকা আরেক দিক দিয়ে আশ্চর্য দোতনাময়। অবগুণ্ঠন টেনে তা যেন সব কিছুকে আরো গূঢ় অর্থে প্রকাশ করেছে।

আমার পরিচিত চারিদিকের দিকচিহ্ন এমন অর্ধবিলুপ্ত না হলে তাদের সত্যকার বাস্তবতা এমন করে আমার কাছে ধরা পড়ত না বলে মনে হ'ল। অভ্যাসের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েই সব কিছুর অবহেলিত প্রচ্ছন্ন মর্ম উদ্ঘাটিত হয়েছে।

খালের মত সংকীর্ণ যে নদীটি ঐতিহাসিক গৌরব হারিয়ে নগরের পয়োনালীর বদলী বেগার খাটে, তার বাষ্পাচ্ছন্ন ছায়ামূর্তি মানুষের বর্তমান বিশৃংখল সভ্যতার নিগড়ে বান্দিনী সমস্ত নদীর ব্যথিত অভিযোগ ফুটিয়ে তুলে যেন নির্মলতার নীরব কান্না হয়ে উঠেছে। ওপারের যে বিষণ্ণ লোহিত প্রাকার বেষ্টিত বিরাট সব আয়তন প্রতিদিনের অতি

পরিচয়ে তাদের উপস্থিতিটুকুও জ্ঞাপন করতে ভুলে যায় রক্তাভ অস্পষ্টতায় তারা শুধু একটা জেলখানা নয়, মানব সমাজের সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রতীক যেন হয়ে উঠল।

এসব হয়ত আমার অলস অলীক অসার কল্পনা মাত্র।

কিন্তু প্রখর দিবালোকই শুধু নয়, জীবন ও সৃষ্টির অনেক গূঢ় মর্ম সন্ধানে কুজ্ঝটিকার অন্তরালও যে পরম সহায় হয় মনের অযৌক্তিক ভ্রান্তি বলে এ ধারণা বাতিল করতে পারছি কই?

নারীর মধ্যে চিররহস্যমধুর নববধূকে আবিষ্কার করবার জন্যে যেমন তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই অবগুণ্ঠনই যথার্থ উন্মোচনের রহস্য কুঞ্চিকা কি নয়?

যা নিত্য পরিচিত তা অতি ঘনিষ্ঠতায় তার যে অর্থটুকু আমাদের সামনে মেলে রাখে তা নেহাৎ প্রয়োজনের সীমায় সংকীর্ণ। তাকে তার সম্পূর্ণ সত্যে চেনবার জন্যেই আধেক ঢাকা প্রয়োজন।

শুধু আমাদের নগরের ওপরই নয় জীবনের অনেক কিছুর ওপরই এমনি ইঙ্গিতময় কুয়াশার আবরণ বুঝি মাঝে মাঝে পড়া দরকার।

অজ্ঞান্তে আধুনিক কবিতারই বড় বেশী ওকালতি করে ফেললাম বলে আশংকা হচ্ছে।

নববধূর গুণ্ঠনের কথাটা উপমা হিসেবে উল্লেখ করার পর ভেবে দেখছি এই রীতিও শুধু আমাদের দেশে বা সমাজেই আবদ্ধ নয়। মানুষের মনের মধ্যেই এর অলক্ষ্য বীজ কোথাও আছে। যে দেশে নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন আবরুহীন, সেই পাশ্চাত্য দেশেও অন্তত পরিণয়ের এই একটি দিনে নববধূর যত সূক্ষ্মই হোক কুহেলিকার মত একটি ওড়না ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত বলেই জানি। বধূত্বের পরম রহস্য মহিমায় প্রকাশের জন্যেই একটি সংকেতময় আবরণ তাকে দেওয়া হয়।

ও দেশের বিবাহ অনুষ্ঠানের আর একটি আচারও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। যতদূর জানি বিবাহ অনুষ্ঠানের পর গির্জা থেকে নবদম্পতী বার হয়ে আসার সময় তাদের ওপর চাল ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথা পশ্চিমের কোথাও কোথাও এখনো বর্তমান। জন্ম মৃত্যু বিবাহের মত মানুষের জীবনের পরম ঘটনার সঙ্গে যেসব বহু যুগের আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার জড়িত, অগ্রসর সভ্যতার যুক্তিবাদী সম্মার্জনীতেও তা ঝেড়ে ফেলা প্রায় অসাধ্য। এইসব সংস্কারের মধ্যে মানুষের সুদীর্ঘ বিবর্তনের অতীত আদিম সব পদচিহ্ন মিশে থাকে। আধুনিক মনের অবজ্ঞা বা উপহাস অগ্রাহ্য করেই প্রত্যেক দেশের দশকর্মের ভেতরে তা প্রকাশ পায়। বিবাহের অনুষ্ঠানে চাল ছড়াবার এই রীতি পাশ্চাত্ত্য জাতির কোনো বিলুপ্ত অধ্যায়ের ইঙ্গিতবহ কি নয়?

এ সংস্কারটি এই দিক দিয়ে রহস্যময় যে আজকের দিনে ধান্য শস্য পাশ্চাত্ত্য দেশের মোটেই অপরিচিত না হলেও শুনেছি এই শস্যটি ইতিহাসের বিচারে সেদিকে নবাগত। খাদ্যশস্য হিসেবে পশ্চিম প্রধানত গমের দেশ। যতদূর জানি আফগানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলেই তার বন্য পূর্বপুরুষদের এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। সেখান থেকে বা অন্য কোন আদি জন্মভূমি থেকে এই শস্যটি মিশরের নীলনদীতটে বাৎসরিক বন্যার প্রসাদ পেয়ে সমস্ত পশ্চিমের কৃষি-জীবনের সূচনা করেছে। ধান্য শস্যের আদি জন্মস্থান কিন্তু পশ্চিমে নয় প্রাচ্যে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেই সম্ভবত। এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে সমুদ্র পর্বত অরণ্য পার হয়ে সে শস্য বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল কি করে এবং কবে? এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ওদেশে থাক বা না থাক যেখানে যেটুকু তার অস্তিত্ব দেখা যায় তা প্রাচ্যের সঙ্গে কোনো বিলুপ্ত সম্পর্কের স্মৃতি কি ধরে রাখেনি? ধানদূর্বো না হোক ইওরোপের বর কনের মাথায় এসিয়ার তন্ডুলকণা কোন সুবাদে গিয়ে বর্ষিত হয়?

বিজ্ঞানের কল্যাণে দুর্গমতা ও দূরত্ব বিজিত হয়ে পৃথিবী ছোট হওয়ার একটা উল্টো ফল হয়েছে এই যে দূর দুর্গম সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে যন্ত্রবিজ্ঞানের জয়-যাত্রার আগের যুগের পৃথিবী সম্বন্ধে। এখনকার সুগমতা আগেকার দুর্গমতার বিভীষিকা আমাদের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছে। দু-মাসের পথ দুদণ্ডে যাই বলে আমাদের মনে হয় অরণ্য পর্বত সমুদ্রের বাধা বুঝি সে যুগে এমন অনতিক্রম্য ছিল যে নেহাৎ যুদ্ধ জয়ের অভিযান, তীরন্দাজ সদাগরী সমুদ্রযাত্রা কি মরু প্রান্তরের কাফিলায় ছাড়া এক জায়গার মানুষ আরেক জায়গায় নড়ত না। দুস্তর বাধা তুচ্ছ করে তখনকার মানুষ কি অসাধ্য সাধন যে করেছে আমরা বেশীর ভাগই ভুলে যাই। নৌ-বিদ্যা আয়ত্ত হবার আগে শুধু ভেলায় ভেসেই মানুষ যে সমুদ্র পারে উপনিবেশের পত্তন করেছে, লোহার ব্যবহার না শিখেই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের বিশাল বিস্তৃতি শুধু নিরক্ষ ও হামবোল্ড স্রোতের সাহায্যে যে পশ্চিমের এসিয়া ও পূর্বের দক্ষিণ আমেরিকা থেকে জয় করেছে তা অনেক সময়ে নতুন করে হাতেনাতে প্রমাণ করবার জন্যে Thor Heyderdahl-এর মত নৃতাত্ত্বিককে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শুধু দাড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের ভেলা অকূল সমুদ্রে ভাসাতে হয়, Erie De Bisschop-এর জ্ঞানোন্মাদকে প'ইষট্টি বৎসর বয়সে সেই চেষ্টায় প্রাণ দিতে হয়। শুধু সমুদ্র নয় অরণ্য পর্বত মরুর বাধাও যে সেই আদিম যুগেও মানুষ মানেনি পৃথিবীময় নানা নরগোষ্ঠীর আশ্চর্য মিশ্রণই তার সাক্ষ্য দেয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দরজায় বারবার বিদেশীর হানা দেওয়ার খবর আমরা যতটা রাখি এই পথেই ভারতের মানুষের নবদিগন্ত সন্ধানের নেশায় বার হওয়ার খবর বোধহয় ততটা নয়। সমস্ত ইওরোপ হয়ে ইংলণ্ড পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য জগতে যে বেদেরা ছড়িয়ে আছে, তারা যুদ্ধবিগ্রহে নয়, একরকম অকারণ পুলকেই যে ভারতবর্ষ ছেড়ে প্রথম প্রায় ছ'শ বছর আগে সূর্যাস্তের দেশে পাড়ি দিয়েছিল একথা স্মরণ করলে মানুষের রক্তের মধ্যেই চিরন্তন দুরন্ত অস্থিরতার আর একটা প্রমাণ পাই। মাত্র ছ'শ বছর আগে কেন, ইওরোপের মাটিতে ভারতবাসীর পদচিহ্ন আরো অনেক আগেই পড়েছে। পণ্ডিতদের কাছে শোনা দুটো দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। ১৮৩৫-এ ইংলণ্ডের Cirencester-এ একটা সমাধি-শিলা আবিষ্কৃত হয়। সেটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর। তার লাটিন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, Dannicus Indiana নামে একজন বল্লম-ধারী সওয়ার সৈনিকের দুই রোম্যান বন্ধু তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুসারে সে সমাধি শিলাটি স্থাপন করেন। Dannicus ভারতের লোক, রোমের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তাঁর সমাধি-শিলাটি দেখতেও নাকি দক্ষিণ ভারতের এই ধরনের খোদিত শিলাখণ্ডের মত। এ ছাড়া Julius Indus নামে আরেক সেনানায়কের নাম পাওয়া যায় তখনকার গল-এ। এ'রা ভারতীয় বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। মিশরের আলেক-জান্দ্রিয়ায় ভারতবাসীর প্রাচীন উপনিবেশের প্রমাণও আছে।

ভারতের নামে বড়াই করতে এসব উদ্ভট খবর ঘাঁটাঘাঁটি করছি না, স্পুটনিক কি অ্যাটলাস ডি-তে মহা-শূন্যে পাড়ি দিয়ে মানুষ হঠাৎ সৃষ্টি ছাড়া যে কিছু করে বসেনি, তার জৈব ইতিহাসেরই ধারা অনুসরণ করছে এইটুকু শুধু নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।

শার্ঙ্গদেব

শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ও নৃত্য সম্মেলন

শান্তিনিকেতনে ১৯—২২ ফাল্গুন পর্যন্ত একটি মনোরম সংগীত ও নৃত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উৎসবের অন্যতম।

যেসব শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত সাধনা করেন এবং শান্তিনিকেতনের বাইরে থাকেন, এমনকি যাঁদের শান্তিনিকেতনের সংগে প্রত্যক্ষ যোগসাধন হয়নি তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে শান্তিনিকেতন বিশেষ ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। যে বৃহত্তর পরিবেশে আজ রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন হচ্ছে এবং তার সার্থকতাও প্রমাণিত হচ্ছে তার স্বীকৃতি প্রদান করে শান্তিনিকেতন গুণ-গ্রাহিতারও পরিচয় প্রদান করেছেন। অপর-পক্ষে শিল্পিগণ শান্তিনিকেতনের সংগে যোগস্থাপনের যে সুযোগ লাভ করলেন তাতে উপকৃত হবেন। পরিচয়ের এই আদান-প্রদানের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্যই মিলনসাধন। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বাইরের অনেক শিল্পীর মনে হয়ত অভিমান জমা ছিল যে শান্তিনিকেতনে তাঁরা অস্বীকৃত আবার সবাইকার সংগে মিলতে নানাকারণে শান্তিনিকেতনেরও দ্বিধা এবং সংকোচ ছিল। একটি বলিষ্ঠ পরিকল্পনায় সেই সব বাধা অপসারিত হতে দেখে আমরা আনন্দিত। বহিরাগত শিল্পীরা যে সমাদর পেয়েছেন তা আন্তরিক। বিচিত্রামণ্ডপের প্রশস্ত প্রাংগণ জনসমাবেশে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এবং সমাগত শিল্পীরা অসংকোচে সংগীত পরিবেশন করে সাধুবাদ অর্জন করেছেন। শান্তিনিকেতনে শিল্পীদের এই যে মিলন প্রত্যক্ষ করেছি এ থেকে সংগীত-জগতে নতুন সম্ভাবনার সূত্রপাত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বিচিত্রা-মণ্ডপের এই আসর শান্তিনিকেতনের চিরাচরিত প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাংগণে খুশির খেয়ালে গান জমে ওঠে শান্তি-নিকেতনে। তার পরিচয় বহিরাগত শিল্পীরা পেলে আনন্দের বিরাট প্রেরণা পেতেন। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়;

এই ধরনের সম্মেলন এইভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এবার তো শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অনেকের পরিচয় ঘটল—এরপর তাঁরা অসংকোচে শান্তিনিকেতনের স্বাভাবিক পরিবেশের মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। শান্তিনিকেতনকে এইভাবে জানাটাই কিন্তু আসল জানা। আমাদের এক বন্ধু ব্যক্তি বলছিলেন কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীত বিদ্যালয় থেকে যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করছেন তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য কিছুকাল শান্তিনিকেতনে থাকা প্রয়োজন। তাহলে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সংগীতকে জীবনধারার সংগে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে এবং তাহলেই রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে। এটি সত্যই অতি সুন্দর প্রস্তাব কিন্তু তা কার্যকর হওয়া সম্ভব কিনা জানি না। তবে, ব্যক্তিগত চেষ্টাতে সবই সম্ভব হয়। যাদের উপায় আছে তাঁরা কিছুকাল যদি শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে যেতে পারেন তাহলে যথার্থই তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

শান্তিনিকেতনের এই মিলনোৎসবের মধুর রসটি আমরা যখন হৃদয়ের পাত্রে সঞ্চিত করতে উৎসুক তখন তাতে ঈর্ষা-কুটিল বিষাক্তরস উন্মুক্ত করে দেবার প্রবল আগ্রহ একজনের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হয়েছি। এ ক্ষোভ শুধু আমার নয়, শান্তিনিকেতনের প্রতি শিষ্টজন অনুভব করেছেন যে তাঁর স্পর্ধিত ব্যবহারে শিষ্টাচার অতিমাত্রায় লঙ্ঘিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়,—এই ব্যক্তি সভাপতির ভাষণের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে বিশ্বভারতী প্রদত্ত গৌরবের অবমাননা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নিন্দা ছাড়া আর কোনো উপাদান ছিল বলে মনে হয় না। সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিকভাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পীবিশেষের নামোল্লেখ করে তিনি যেভাবে বিদ্বেষবর্ষণ করলেন তাতে শান্তিনিকেতনের আতিথ্যকে বিব্রত করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। তাঁর ভাষণে সংগীত রত্নাকর, বৃহদ্দেশী, সংগীত পারিজাত প্রভৃতি গ্রন্থের একাধিক উল্লেখ ছিল, কিন্তু মূর্ছনা এবং তান সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞ উক্তি শুনে মনে হল তিনি এসব গ্রন্থে এতটুকু প্রবেশ করেননি। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে ভুল সুরের উল্লেখ, তাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মন্তব্য, শাস্ত্র সম্বন্ধে অপ্রবুদ্ধ উক্তি—অতি দীর্ঘ ভাষণে এই সমস্তই তিনি শ্রোতাদের উপহার দিয়ে গেলেন। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার এই যে তিনি উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সংগীত সম্মেলন কোন ব্যক্তির উপদেশ বা সমালোচনার জন্য আয়োজিত হয়নি—ছাত্রছাত্রীদের ভাষণ দেবার উপলক্ষ্যও এটা নয়; বক্তা মহাশয় নিন্দার উৎসাহে এটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

যাই হোক, আমরা এই সম্মেলনের সুস্থ মনোভাব এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিশেষ সুখী হয়েছি। শিল্পীদের এই মিলনে অনেক ভুল বোঝার অবসান হবে এবং উভয়পক্ষে এক অন্তরঙ্গ যোগসূত্র গ্রথিত হবে। এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদের আন্তরিক সমর্থন ঘোষণা করি।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রসংগীত ভিন্ন রাগ-সংগীত ও নৃত্যের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজনও হয়েছিল। শ্রোতারা এই অনুষ্ঠানাদিতে বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন।

বৈকুণ্ঠ বাগল

বনফুল

বৈকুণ্ঠ বাগল বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়। অন্তত বছর পাঁচেক বড় তো বটে। আমার বড়দাদার তিনি সহপাঠী ছিলেন। দেখিলে কিন্তু মনে হয় আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি অনেক ছোট। আমার দাঁত পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, এমন কি ভুরুও আর কালো নাই। কিন্তু বাগলদার একটি দাঁত পড়ে নাই, চুল দাড়ি ভুরু মিশকালো। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমি সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া নানা ঘাটের জল খাইয়াছি, এখনও খাইতেছি, বিপর্যস্ত হইয়া যখনই বাগলদার কাছে গিয়াছি তিনি সাহায্য করিয়াছেন। আমার জীবন-কাহিনী অনেকটা বহু-বিচিত্র ছিটের মতো। একটু তফাত আছে, ছিটের প্যাটার্ন একটা কাপড়ে এক রকমই থাকে। কিন্তু আমার জীবনে ছিটের প্যাটার্ন একরকম নয়। মনে হয় নানারকম ছিট জুড়িয়া জুড়িয়া আমার জীবনের কাহিনী-কন্থা আমার ভাগ্যদেবতা সকৌতুকে প্রস্তুত করিয়াছেন। কত রকম চাকরি আর ব্যবসা যে করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমার কথা থাক, বাগলদার কথাই বলি। বাগলদা আমাকে স্নেহ করিতেন। আমি সব সময় তাঁহার স্নেহের মর্যাদা রাখি নাই, একাধিকবার টাকা ধার লইয়া ফেরত দিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু বাগলদার স্নেহ তাহাতে নিষ্প্রভ হয় নাই।

বাগলদা সেকেলে মানুষ। বিলাসিতার ধার ধারেন না। তাঁহাকে কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নাই। থান কাপড় পরেন। বাড়িতে খড়ম আর বাহিরে চটিজুতা ছাড়া অন্য কোন পাদুকা পছন্দই করেন না, মুখে মিশমিশে কালো গোঁফদাড়ির জঙ্গল।

আমি যখন জুতার দোকান করিয়াছিলাম তখন বাগলদাকে চটি জুতা তো দিয়াছিলামই, এক জোড়া চকোলেট রঙয়ের গোঁফওলা পাম্‌শুও গছাইয়াছিলাম। পাম্‌শুর কথা বলিতে বাগলদা বলিলেন, "জানিসই তো আমি ও-সব পরি না।"

"পরুন না' এক জোড়া, দেখি—"

জোর করিয়া পরাইয়া দিলাম, পায়ে ঠিক ফিট করিয়া গেল।

"এ নিয়ে আমি কি করব—অন্য খদ্দের পাচ্ছিস না?"

"না। গোঁফ-ওলা পাম্‌শু আজকাল পছন্দ করে না কেউ। কুড়ি টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছিলাম তখন, ওর গোঁফটার কথা ভাবি নি—"

"তবে দে—"

বাগলদা পাম্‌শু জোড়া লইয়া গেলেন। কিন্তু এক দিনও সেটা পরেন নাই। মাস দুই পরে তাঁহার বাড়ি গিয়া দেখি তাকের উপর জুতা-জোড়া সযত্নে রাখা আছে। বাগলদার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই তিনি বলিলেন, "ও দুটো আমার ভারী কাজে লেগেছে।"

"কি কাজে?"

"ও দুটোর ভিতর টুকিটাকি জিনিস রাখি। ছুঁচ, সুতো, ছুরি, ছোট কাঁচি, কাঁসার ডিবে, দেশলাই, চমৎকার কাজে লেগেছে আমার।"

ইহার কিছুদিন পরে একটা সেফটি রেজর কোম্পানীর এজেন্ট হইয়াছিলাম। বাগলদার সহিত দেখা হইলে বলিলাম, "বাগলদা, এবার আর আপনাকে আমার খদ্দের করতে পারব না—"

"কেন, কি করিস আজকাল?"

"সেফটি রেজার বিক্রি করি।"

"কই। কেমন দেখি?"

বেশ কাজে লেগেছে আমার

প্ল্যাস্টিকের চমৎকার বাক্সে চকচকে সেফ্‌টি রেজরটি দেখাইলাম।

"দাম কত?"

"সাড়ে সাত টাকা।"

"আচ্ছা, দিয়ে যা একটা।"

বাগলদা সেটাকে পেপার-ওয়েট হিসাবে ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন।

ইহার পর আমি 'রেডিও'র এজেন্ট পদে বাহাল হই। একটা রেডিও বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ কিছু কমিশন থাকিত। বাগলদার কাছে গেলাম।

"বাগলদা, একটা রেডিও কিনুন না।"

"রেডিও নিয়ে কি করব? তোমার বউদি তো বদ্ধ কালা। আমি নিজের লেখা-পড়া আর পুজোটুজো নিয়ে থাকি। ছেলেমেয়েরা কেউ এখানে থাকে না। কে রেডিও শুনবে?"

ইঁদুর আরশোলা সব পালায়

যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আমি দালাল, তবু একবার চেষ্টা করিলাম।

"আপনারা যদি কেউ না কেনেন, তা হলে এ ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়। অকূলে পাথারে ভাসছি দাদা, পরশু দিন আবার একটা মেয়ে হয়েছে।"

"কত দাম?"

"বেশী নয়, পাঁচ শ' পঁচাত্তর টাকা আর সেলস ট্যাক্স।" বাগলদা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, দিয়ে যাস একটা—"

রেডিও দিবার মাসখানেক পরে বাগলদার সহিত দেখা হইয়াছিল।

"কি দাদা, কেমন চলছে রেডিও?"

"ওটাতে ভারী উপকার হয়েছে ভাই। ভাঁড়ারঘরে লাগিয়ে দিয়েছি ওটা। চালিয়ে দিলে ইঁদুর আরশোলা সব পালায়। চমৎকার!"

বাগলদার স্তিমিত মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৪২ ॥

ওঁ
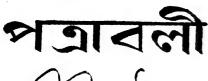
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী তোমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি অনেক দিন হবেও না বোধ হচ্চে। এখানে ছুটি। আমাদের বাড়িতেও সমস্ত ফাঁক। বাংলাভাষার উপরে যে বই লিখছিলুম সেও শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু লেখার মতো প্রবৃত্তিও নেই। কর্মে মন বিমুখ অথচ অকর্মের বোঝাটাও বুকে চেপে আছে। কোথাও যাব কি যাব না স্থির করতে পারচি নে। যাবার হাঙ্গামাও মন মানতে চায় না অথচ না যাবার নিষ্ক্রিয়তাও মনকে উদ্বেজিত করচে, আকাশে শরতের রৌদ্রের প্লাবন, সেই আলোয় কেবল এখানকার মাঠ ধুধু করচে তা নয়, আমার প্রকান্ড ছুটির উপরেও ছড়িয়ে পড়েছে দূরে বিস্তারিত আলস্য। হাতের কাছে যা তা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাই—এই আকাশ জোড়া রোদ পোহানো অবকাশের উপযুক্ত বই পাইনে—বই ফেলে দিয়ে পাদপীঠে পা মেলে কেদারায় হেলান দিয়ে কিছুই না করার সাধনা করি। বেলা বয়ে যেতে থাকে—এর মধ্যে দিয়ে কিচিমিচি পাখির ডাক উজ্জ্বল নিস্তব্ধ নীলাকাশে আওয়াজের শিল্পকাজ বুনতে থাকে। মনটা হুহু করে। হাওয়া দিচ্চে ঈষৎ গরম—দক্ষিণ বাগানটাতে গাছে গাছে ঝিলিমিলি হেলা দোলা চলচে। বেলা এখন সাড়ে দুপুর—কোনো সাড়াশব্দ নেই—অনুচর পরিচরেরা বোধ হয় মধ্যাহ্ন…নের পর চিত হয়ে পড়ে চোখ বুজিয়েছে। কিম্বা নিভৃতে তামাক টানচে।

এতদিন কাজের ফাঁক ছিল না কলকাতায় কিছুতেই যেতে পারি নি—এখন যেতেই হবে চোখের জন্যে। হয়তো আশ্রয় নেব ফালতার বাগানে—হয় তো তাও ঘটবে না—এইখানেই থাকব পড়ে। যদি মন যায় তবে ছবি আঁকব।

চল্লুম কেদারাটার দিকে। বিলিতি খবরের কাগজ এসেছে। ইতি ২৫-৯-৩৮

কবি

॥ ৪৪৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

…ণীয়াসু,

অসাধারণ গরমে মনের জোর আলগা হয়ে গেছে। ভাদ্দুরে তাকে উপেক্ষা করব বলে এতদিনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই ছিলেম। এমন সময়ে হঠাৎ কাল মৈত্রেয়ী এসে পীড়া…ড় লাগিয়ে দিলে পাহাড়ে যাবার জন্যে। যথেষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করেছিলুম, কিন্তু পিছন থেকে ঠেলা দিলে গরমে, আর সামনের থেকে টান দিলে সেখানে বউমার উপস্থিতি। টিঁকল না আমার জেদ, কথা দিয়েছি আগামী সোমবার যাব শৈলাভিমুখে। আমি এখন নিঃসহায়—সেক্রেটারী শিলচরে, সুধাকান্ত রোগশয্যায়, তুমি আছ গিরিডিতে—ছন্দোবন্ধনে অভ্যস্ত হাতে মালপত্র বাঁধতে বিপদ ঘটবার আশঙ্কা। স্মৃতি-পটে তোমাদের চিত্র এঁকে রেখে অপটু হাতে নিজেই যা পারি করব, তদ্দ্বারা এখন লাগবে তাপ, ঠান্ডা দেশে গিয়ে যথেষ্ট অনুতাপের সময় পাওয়া যাবে। মনের মধ্যে দ্বিধা কিছুতেই মিটচে না—শারদশ্রীর প্রসন্ন মুখ নিশ্চয়ই আসন্ন হয়েছে। কিন্তু আত্মীয়রা সবাই তাড়া লাগাচ্চে—শেষ মুহূর্তে মন বদলাতে লজ্জা বোধ হচ্চে। ইতি ৭।১০।৩৮

কবি

॥ ৪৪৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার হিমালয়ের ভ্রমণের পালা কলকাতার বেশি এগোলো না। ফিরে চললুম স্বস্থানে। দুর্বল দেহ পথিক বৃত্তির দায়িত্ব নিতে অসম্মত। সকল রকম অধ্যবসায়ে আমার মনটা বিমুখ। কোনো একটা শান্ত নিভৃত জায়গায় গভীর বিশ্রামের মধ্যে ডুব দিতে ইচ্চে করে কিন্তু আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে পথটাকে যদি অবলুপ্ত করতে পারতুম তাহলে দ্বিধা করতুম না। নিজের উপর কি রকম বিরক্তি ধরে গেছে—মনে হচ্চে যেন অত্যন্ত বেশি দিন বেঁচে আছি। দুর্বলতাটা যেন একটা অপমান, জীবনকে প্রতিনিয়ত বঞ্চনা করা। যার জোর নেই তার বাঁচবার অধিকার নেই।

১২।১০।৩৮ **কবি**

॥ ৪৪৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণী,

পথিকরা ফিরে এসেছে তোমার জয়ধ্বনি করচে, রাণী দেবী রাণী দেবী ছাড়া আর কথা নেই। এতো নতুন নয়। যাদের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় ঘটে তারা এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে, তোমার সঙ্গে যদি যশস্বী লোক কেউ থাকে তাঁদের যশ একেবারে ম্লান হয়ে যায়, তাঁরা চোখেই পড়ে না—এবারেও তার প্রমাণ পাওয়া গেল, তোমার নিকটবর্তী কোনো প্রধান ব্যক্তির কেউ নামও করলে না। সমুদ্রপার থেকে মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ওস্তাদ যারা আসে, বড়ো বড়ো রাশী-কর্ণিকের দল, আমার বিশ্বাস তাঁদেরও মনের ভাব এতদ্রূপ। রাণী দেবীর ক্ষিপ্র হস্ততা এবং অতিথিদের আভ্যন্তরিক প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁদের ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস দেখে বোধ হোলো সেই সব নীরব কবিদের নীরব কবিতা অন্তর গহনে অশ্রুতিগোচর চতুর্দশপদীতে উদ্বেল হয়ে উঠচে। স্বভাবত তনয় কথা বলে কম, তুমি তার কথার উৎস ছুটিয়ে দিলে কোন্ গুণে। এবারে যখন তুমি এখানে আসবে তখন তোমার নতুন ভক্তদলের ভিড়ে আমরা পুরোনো পরিচিতরা জায়গা পাব না।

কাল রাত্তিরে গেছে ফার্স্ট প্রাইজ পাবার মতো গরম। আশ্বিন যায়, কার্তিক এলো বলে, কিন্তু ভাদ্রমাস আকাশের টুঁটি চেপে ধরেছে—হিটলারের মতো তার সর্বগ্রাসী দাবি—শীতের দিনকে সে বোধ হয় ইহুদী বলে স্থির করেছে। গিরিডিকেও সে যে ছাড়বে এমন পাত্র সে নয়।

ধবলীতে এসেছি, নিজের কোণের টানে, ঈর্ষা করতে পারি এমন ঠান্ডাতর জায়গা কাছাকাছি কোথাও নেই। ইতি ১৬।১০।৩৮

কবি

॥ ৪৪৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

অত্যন্ত ভুল কথা বলেছ। প্রথম চেনার চমক এবং পুঞ্জীভূত শেষের চেনার নিশ্চিত নির্ভর এই দুইয়ে মিলিয়ে যথার্থ পরিচয়ের পাকা গাঁথুনি। শেষের দিকে যে স্তব্ধতা আসে সেটা গভীরতা বশতই। ঝরনা যখন ঝরতে আরম্ভ করে তখন সে কলমুখরা, আর সরোবরে এসে যখন তার সম্পূর্ণতা হয় তখন তার প্রকাশ হয় সংযত। তখন তার আত্মপ্রমাণ কোনো কোলাহল করে না। এই জন্যে পত্র রচনার আরম্ভে থাকে সাদর সম্ভাষণ, আর শেষকালে থাকে অলমতি বিস্তরেণ। এখনো পথে যেতে যেতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দেখা হলে যদি কোমরে আঁচল বেঁধে খিচুড়ি আর মাছ চচ্চরি স্বহস্তে রেঁধে খাওয়াও তাহলে মনের মধ্যে পথিক তনয় বাবুর মতোই আন্দোলন উঠবে—কিন্তু স্তুতিবাদটা এতই অযথা মনে হবে যে, হয়তো রান্নার নিন্দে করার দ্বারাই আনন্দ নিবেদন করব। এই ব্যাখ্যাটা হয়তো বাহুল্য হচ্চে, অর্থাৎ তুমি ঠিক কথাটা জানো না সেটাও একটা ভান—আসল কথা, চলতি ভাষাটা ব্যবহারে অত্যন্ত মলিন, মাঝে মাঝে তাকে উলটো পিঠে পরতে হয়, যা না বলবার তাই বলা দরকার হয়ে পড়ে।—ইতিমধ্যে গরমও একটু কমেছে। ১৯।১০।৩৮

কবি

॥ ৪৪৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

চোখ কানের উপর পর্দা পড়ে গেছে বলে অত্যন্ত একলা বোধ হয়। '—' তোমার কাছে আমার চিঠি দেখে নিজের পাওনার দৈন্য উল্লেখ করে একটু খোঁটা দিয়েছে। শক্তির সম্বল যখন ক্ষয় হয়ে আসে তখন সকলের প্রতি সমপরিমাণের দাক্ষিণ্য অসাধ্য হয়ে ওঠে। তখন কৃপণতার অপবাদ আত্মরক্ষার উপায়। জনশ্রুতি এই যে তুমি ভালোই আছ।

কাল থেকে এখানে সুনীতি ও সজনীর সমাগম। আমাদের এখানে "মুক্তির উপায়" অভিনয়ের ব্যবস্থা চলচে। ৬।১১।৩৮

কবি

॥ ৪৪৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শ্রীনিকেতনে আমাদের উৎসব শেষ করে ফিরে এলুম। রথীর পঞ্চাশবার্ষিকীটা উপলক্ষ্য বটে কিন্তু মনের মধ্যে যে একটা উদ্বোধনের প্রসারতা এনে দিলে সেটার দ্বারা আমার এই সকাল বেলাটা সার্থক হোলো। আমার প্রৌঢ় বয়সের সদ্য আরম্ভে যে সংকল্পকে এই আশ্রমের মধ্যে আহ্বান করে এনেছি বহু দুঃখ-লালিত তার বহু শাখায়িত ইতিহাসের মধ্যে আজকে আমি দাঁড়াতে পেরেছিলুম। আমার জীবনের যথার্থ কেন্দ্রস্থলের থেকে প্রভাতের শঙ্খধ্বনি আমার হৃদয়ের গভীরে এসে পৌঁছল। অনেক ক্ষতি অনেক ব্যর্থতা অনেক অভাবের ভিতর দিয়ে এসেছি, সহজ হয় নি পথ—বোধ করি সেই জন্যেই ভিতর থেকে আমার এই আনন্দধ্বনি মন্দ্রিত হয়ে উঠল যে, আমার কী সৌভাগ্য। যখন ছোট করে কাজ আরম্ভ করেছিলুম তখন এর দুরূহ দাবির কথা ভাবতে পারিনি—কিন্তু সেই দুঃসাধ্য দাবিই আমাকে মস্ত বড়ো সুযোগ দিয়েছে। ত্যাগের ভিতর দিয়ে দুঃখের পথ দিয়ে আমি আপনাকে আপনি সম্মানিত করেছি এমন অবকাশ সহজে ঘটে না। ব্যক্তিগত সংকীর্ণ জীবনের সুখ দুঃখের দেনা পাওনার মাকড়শার জাল বিস্তার করে দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম, দিনের প্রথম আরম্ভে সেই কার্যসূচিই তো মানুষ ঠিক করে। তাকে যেন না বিচার করে এড়িয়ে গেছি। বাঁচিয়েছি আপনাকে আপনার ছোট আমন্ত্রণ থেকে, মাঝে মাঝে দেহ মনের দুর্বল অবস্থায় ভোগবঞ্চিত জীবনের জন্যে পরিতাপ করেছি; মনে হয়েছে সাধারণত ভোজ্যের যে পরিবেষণ মানুষের ভাগ্যে বরাদ্দ হয়ে থাকে তার চেয়ে আমার অনেক বেশি পাবারই আয়োজন ছিল, মনে করেছি হয় তো অসম্পূর্ণ সম্ভোগের কৃচ্ছ্রতায় উপবাসী অন্তরাত্মাকে শীর্ণ করেছি। ভেবেছি কবির কর্তব্য, যে কবিত্ব, তাতেই যদি অবিক্ষিপ্ত নিষ্ঠায় মন দিতে পারতুম সেটাতেই আমাকে ধন্য করত। কিন্তু যদি আমার স্বভাবে তা সম্ভব হোতো তবে সহজেই তাই আমি করতুম। কিন্তু সমগ্র মানুষকে কবিত্বের কুঠুরিতে ধরে না। সে বন্ধনে অন্তত আমি আপনাকে ভর্ৎসনা করতুম, একদা করেওছি ভর্ৎসনা। আজ সকালে অনুষ্ঠানের আসনে বসে স্পষ্ট অনুভব করলুম আমার দৈব আমাকে উত্তীর্ণ করেছেন সেইখানে, যেখানে কেবল কবিত্বের রচনাভূমি নয় যেখানে আমার আপনাকে সম্পূর্ণ করবার আত্মসৃষ্টির ক্ষেত্র। আত্মীয়মণ্ডলী থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। আজ যাঁরা আমার তপঃসাধনার পরিবেশবর্তী, তাঁরা অনেকেই আমার অন্তরের স্বাভাবিক সহচর নন। তাঁরা অনেকেই নানা অবান্তর কারণে আমার কাছে আকৃষ্ট হয়েছেন। তার চেয়ে বেশী আশা করা অন্যায় মনে করি। সেই জন্যেই রথীর পঞ্চাশবার্ষিকী উৎসব আমার মনে এমন বিশেষ পরিতৃপ্তি দিয়েছে। কেননা সাধনার যথার্থ উত্তরসাধক দুর্লভ। আমার সত্তা এই সাধনাক্ষেত্রেই দেহ পেয়েছে, এখানে ভাগ্যক্রমে যে আমার একাঙ্গ হতে পারে তার চেয়ে আত্মীয় আর কেউ নেই।

আশ্রমের উৎসবের এই প্রধান কাজ, প্রত্যেক বারে সেটা জেনেছি। এই উপলক্ষে আপনার সঙ্গে সত্য পরিচয় ঘটে। বার বার তার প্রয়োজন আছে। কেননা বার বার জড়তা এসে আমাদের নিজেকে আচ্ছন্ন করে ভুলিয়ে দেয়। তখন প্রমাদ ঘটে; কী আমার সবচেয়ে চাবার বিষয় সেইটে ভুলিয়ে দেয়। কেননা চাওয়া বড়ো না হলে পাওয়া ছোটো হয়ে যায়, আপনাকে আপনি বঞ্চিত করি।

বাকি রইল, আজ রাত্রে তাসের দেশের অভিনয়। সেটাকে এতদিন ধরে নতুন করে দিয়েছি। এখন সেটা নৃত্যনাট্যের রূপ নিয়েছে, অনেক নতুন গান জুড়ে দিতে হোলো। ভালো লেগেছে যাঁরা দেখেছেন। আমি জানি বউমা তোমাদের সশরীরে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি এই আশঙ্কায় তোমাকে আহ্বান করিনি, পাছে অসুবিধা ও অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তোমাকে আসবার জন্যে তাগিদ দেয়। এ-রকম কাজে সেটা কর্তব্য হয় না।

ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে অনেকখানি লিখেছি—আর চলচে না। ইতি ২৭।১১।৩৮

কবি

হা ও য়া য় হা ও য়া য়

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওয়ায় হাওয়ায় এত আকুলতা—কার আকুলতা?
দুরন্ত বৃষ্টির খরধারায় সমস্ত
নিঃশেষে হারিয়ে গেছে ঃ দরোজার নির্ভরতা
দেয়ালে দেয়ালে দীপ্ত ক্যালেণ্ডারের ঝিলিমিলি
আলোর দুর্মর দম্ভ অর্থহীন রাস্তার জনতা
দুরন্ত বৃষ্টির খরধারায় সমস্ত
নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। সারি সারি সৌধ ও মিনার,
সারথীবিহীন রথ, বর্ষায় অঝোরে ভিজছে, তার
জঠরের শূন্য থেকে অকূল কুয়াশা পুঞ্জে পুঞ্জে
অকূল কুয়াশা যেন এমন কি আমার
চশমার আগল ঠেলে অপ্রাপনীয়ের মেঘভার
আমার দুচোখে সারা দেহে সেই পরার্থপরতা
সংকীর্তিত করে দিতে চায়।
আর মুহূর্তের মধ্যে সহসা যেন আমারও সর্বাঙ্গ অসাড়
হয়ে এল...যেন কবেকার শুক্লবিতান জ্যোৎস্নায়
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় ধুধু করে...যেন কার অপরূপ চিত্রপট...
...প্রমতি-প্রমতি...ডাকতে গিয়ে
বুকের পাষাণ ঠেলে একবিন্দু রক্ত অলৌকিক একবিন্দু
রক্ত উঠে এল, যেন নিরশ্রু দুচোখ রক্তে ঝাপসা হয়ে এল!

দুরন্ত বৃষ্টির খরধারায় সমস্ত
নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। শুধু আকুলতা যেন কার আকুলতা
অবিশ্রান্ত আকুলতা কেঁপে ওঠে হাওয়ায় হাওয়ায়!

হি ং সা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যেন কিছু বাকী নেই কিছুই ছিল না বলে বাকী
বহু শব্দ-শতাব্দীর ওপারে এখন তুমি, স্থির
দণ্ডিতের মত কবেকার কলকাতায় একাকী।
বিশ্বাস স্থাপত্যে জড় গম্বুজের অহংকারে মূলত গম্ভীর
উদাসীনতার ভানে, তবু একই শয্যার ওপর
আবার জাগবো জেনে নিদ্রাকে বিশ্বাস করে যাওয়া।
কোন দিকে কবির নিশ্বাসে কোন জানলা খোলা নেই,
কোন মুখোমুখি ঝড় ফুলের স্ফুরণবেলা করে না ঘোষণা।
বহু শব্দ শতাব্দীর আঁধার পেরিয়ে তুমি জেনেছো সাধনা
পাষাণপ্রণীত বাঁচে অনড় সত্যের সব প্রান্ত শূন্যতায়;
মানুষ শূন্যতা পেলে অন্য কিছু চায় না দ্বিধার।
কবে রাত্রি রক্তে ছিল অবিশ্বাসী স্বপ্নে দগ্ধ প্রতিভাপ্রতিম.
তীব্রতম হিংসা কবে নাম ধরে ডেকেছিল "অসীম! অসীম!"
—মানুষ বিশ্বাস পেলে স্বপ্ন আর দেখে না নিদ্রায়।

যে ফুটে ওঠাকে একদিন নীলিমার আশ্চর্য অবাধে
নিয়ে যাবো ভেবেছিলাম, আমি চাই যে জাগুক হিংস্র বজ্রপাতে।
কেননা বিদ্যুৎ ছাড়া যোগ্য কোন আলো নেই স্পষ্ট চিনে নিতে
শিল্পের অস্থির দুঃখ চুম্বনের মত খুঁজে এক মুখ থেকে
অন্য মুখের নিভৃতে।
আজ কিছু বাকী নেই, কিছুই থাকেনি বাকী বলে
হিংসা, তীক্ষ্ণ হিংসা চাই অস্থিতে মজ্জায় শেষ নৃশংস দংশন,
যেন পড়ে যেতে যেতে যেতে শুনতে পারি
শুদ্ধতম শব্দের ক্রন্দন
"অসীম কখনো কোন মানুষের নাম নয়; তবু ডাক এলে
এ ঘরের অন্ধকার সারা পৃথিবীর অন্ধকার
দেয়ালের ছোট অবরোধে ফিরে পায় পুনরাবৃত্তির ভয়।"

ছোট, কিন্তু কত ছোট জানতে হলে আকাশে তাকিয়ে
ভাবতে হয়॥

ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্তির অসংখ্য নিদর্শন যে দেশের বহু পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হয়ে আছে একথা জানা থাকলেও সেগুলি সাধারণের পক্ষে দেখার কোন সম্ভাবনা ঘটতে পারে না, যদি না যাদের সম্পত্তি তারা সে-সুযোগ দেন। প্রাচীন কীর্তিসমূহকে আইনবলে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ভুক্ত করে নেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই এবং সেসব সম্পত্তির অধিকারিরাও সরকারী সংগ্রহশালায় দান করার মতো উদারতা দেখাতে অনিচ্ছুক। এ অবস্থায় একদিকে আমরা দেশের বহু প্রাচীন অমূল্য কীর্তির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হয়ে রইছি, অপরদিকে শিল্পপ্রগতির ধারা সম্পর্কিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সুখের কথা, সম্প্রতি কয়েকটি পরিবার তাঁদের পারিবারিক সংগ্রহগুলিকে জনসমক্ষে উপস্থিত করার মতো উদারতা দেখাতে আরম্ভ করেছেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীপ্রকাশের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে মোগল আমলের আঁকা ক্ষুদ্রাকার চিত্রের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন আকাদমি অফ ফাইন আর্টস। তাঁদেরই উদ্যোগে গত ২রা ফেব্রুয়ারি আকাদমি ভবনে উদ্বোধিত হয় রাজস্থানী চিত্রশিল্পের এক প্রদর্শনী। প্রদর্শিত একশ একুশখানি ছবি শ্রীগোপীকৃষ্ণ কানোরিয়া কর্তৃক বহু বৎসর ধরে সংগৃহীত। ১৫৮০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত আঁকা এই ছবিগুলি বিভিন্ন শিল্পীর কাজ শুধুই নয়, সেই সঙ্গে রাজস্থান-মালওয়া অঞ্চলের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ দেয়। মেবার, যোধপুর, বিকানীর, জয়পুর, উদয়পুর, বুন্দি, কৃষ্ণগড়, কোটা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পধারার নিদর্শনগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রচুর রকমারিতার সঙ্গে আঞ্চলিক শিল্পবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণলীলা, পঞ্চতন্ত্র, শিকারের দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, রাণাদের প্রতিকৃতি, প্রাচীন কাব্য ও লোকগাথা অবলম্বনে নর-নারীর প্রণয় ও অভিসারের দৃশ্য প্রভৃতি অনেক কিছুই শিল্পীদের তুলিতে চিত্রিত হয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলি ছবিতে শিল্পীর নাম স্বাক্ষরিত দেখা যায় যা তার চেয়ে প্রাচীনতর ছবিগুলির ক্ষেত্রে দুর্লভ।

সম্পূর্ণভাবে রাজস্থানী রীতির ছবির সঙ্গে মোগল যুগের ক্ষুদ্রাকার চিত্রাঙ্কন

রাজস্থানী চিত্র কলার নিদর্শন

রীতিপ্রভাবিত ছবিও কিছু রয়েছে। কতক ছবিতে পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে বিষয়বস্তু ছাড়া রেখা ও রঙের প্রয়োগে পূর্ণ মাত্রায় মোগল ক্ষুদ্রাকার ছবির রীতির অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। রাজস্থানী ও মোগল রীতির সংমিশ্রণে আঁকা ছবির চমৎকার দৃষ্টান্ত রাজস্থান-মালওয়া অঞ্চলের শিল্পীদের কাছে পাওয়া যায়। রাজস্থানের কতকগুলি রাজ্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবির জন্য খ্যাতি অর্জন করে। এই সময়কার ছবি-গুলির মধ্যে ভারতীয় সংগীতের রাগমালার অন্তর্গত কাহিনী অবলম্বনে আঁকা ছবি রয়েছে পঁচিশখানি। এছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা 'আমন শতক' অবলম্বনে নারী-পুরুষের প্রেম বিষয়ক দৃশ্যাবলী, সুরদাসের কাব্য 'সুরসাগর' অবলম্বনে আঁকা কতকগুলি ছবি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অঙ্কন রীতির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যও বেশ পরিস্ফুট। কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে আঁকা কৃষ্ণগড়ের ছবিগুলিতে প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত প্রণয় কাব্য, লোকগাথা ও পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে দ্বিমাত্রিক ধারার কতকগুলি ছবির মধ্যেও দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বারো মাস এবং বিভিন্ন ঋতুর রূপ অবলম্বনে আঁকা কতকগুলি ছবিও তৎকালীন শিল্পীদের কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। এছাড়া রাজপুত রাণাদের প্রতিকৃতিও দেখা গেল কতকগুলি। উজ্জ্বল রঙে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কতকাংশে বিমূর্তন ঘটানো, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা এবং কতকগুলি রোমাণ্টিক ছবিতে ময়ূরকে প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করে রাজপুত শিল্পধারার একটা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে। লাল, গোলাপি, সবুজ, হলদে রঙের সঙ্গে সোনালি রঙের আঁচড় বা চুমকির কাজ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রঙকে বাস্তবানুগ করার চেয়ে বিষয়বস্তুর কাব্যিক ভাব ফুটিয়ে তোলায় প্রতীক হিসেবে প্রয়োগেই শিল্পীদের লক্ষ্য যে ছিল, সেটা উপলব্ধি করা যায়।

প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে সবই 'মিনিয়েচার' বা ক্ষুদ্রাকার নয়। অবশ্য অধিকাংশই তাই হলেও যোধপুরের একখানি পট রয়েছে ১৬ ফিট×৪½ ফিট মাপের। কোটার একখানি ছবির মাপ ২৫ ফিট×১৯ ফিট। সবচেয়ে বড়ো ছবি হচ্ছে মেবারের রাণার এক প্রতিকৃতি যার মাপ হচ্ছে ৫ ফিট ১ ইঞ্চি×৩ ফিট।

শিল্পরসিক মাত্রেরই মন ভরিয়ে তোলার এবং সেই সঙ্গে রাজপুত চিত্রকলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার প্রভূত সুযোগ এনে দেয় এই প্রদর্শনীটি।

* * *

বালিগঞ্জের বালিকা শিক্ষা সদনে ওখানকার ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক নানা ধরণের কাজের একটি প্রদর্শনী গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শিল্পকর্মের মধ্যে সূচের কাজ এবং বোনার কাজ ছাড়া মাটির জিনিসের ওপর আঁকা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মেয়েদের আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এই সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদের, প্রাক্তন ছাত্রীদের এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রীদের মায়েদেরও আঁকা ছবি ও হাতের নানা রকমের কাজও প্রদর্শিত হয়।

ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই রাজস্থান ও উত্তর ভারতের অধিবাসী বলে ওদের ছবিতে উজ্জ্বল রঙের সমাবেশই লক্ষ্য করা যায়। ছবি ছাড়া পোস্টার আঁকাতেও ছাত্রীদের প্রচেষ্টা দেখা গেল। ছবি ও পোস্টারে শিক্ষানবীশীর ছাপ থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু তাহলেও এমন কতকগুলি কাজ দেখা গেল যা শিল্পীদের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট আভাস দেয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্পবিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা লাভের নিদর্শন হিসেবে এ ধরনের প্রদর্শনীর একটা সার্থকতা আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এতে উৎসাহিত হয়।

বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ বৃটিশ আমলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের অন্তরীণ স্থানরূপে ব্যবহৃত হতো। ভারত স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা ওখানে এক নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলে। আজ ওখানকার অধিবাসী সংখ্যা চৌত্রিশ হাজার।

আন্দামানের নেগ্রিটো শ্রেণীর আদিবাসীদের অন্যতম ওঙ্গে। তাদের সুপ্রাচীন জীবনধারা যে আজো রক্ষা করে চলেছে, তার দৃষ্টান্ত ১। মা ও সন্তান; ২। ওঙ্গেদের নৃত্য; ৩। ওঙ্গে যুবক। আন্দামানের উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় ৪। রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের মুখ্য বাণিজ্য কেন্দ্রটি দেখে আর নতুন অধিবাসীদের ৫। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিবিষ্টমনে কাজে আত্মনিয়োগ করা দেখে।

আলোকচিত্রশিল্পী

বীথি সরকার

১

২

৩

৪

৫

ট্রামে বাসে

নির্বাচন পর্ব শেষ হইয়াছে। বিশু খুড়োকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম —[illegible] কিম? খুড়ো ফোকলা দাঁতে হ[illegible] বলিলেন—"ততঃ কচ্চাণ্ড, কচুর অণ্ড ই[illegible]। তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই সংবাদ-[illegible] নির্বাচন কেন্দ্রকে রণক্ষেত্র এবং প্রার্থী-[illegible] এক একজনকে সেপাইর সঙ্গে তুলনা [illegible] হয়েছে। আর যা দেখেও বুঝতে পারনি, [illegible] হল প্রতীক চিহ্নে মার্কা দেওয়ার সেই [illegible]টি। মনে করে দেখ ওটা একটা কাটা [illegible] অর্থাৎ সবাইকে কাটা সৈনিক করে ছেড়ে এসেছি আমরা। সুতরাং আমাদের ভাগ্যে কচ্চাণ্ড ছাড়া আর কী জুটবে!!"

এই নির্বাচনে কার কী লাভ হইল সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের শ্যামলাল বলিল—"লাভ যাদের হয়েছে তারা হল ময়লা কাগজওলা, লরিট্রাকওলা, ফুলওলা আর কলকাতা কর্পোরেশন। শেষে যাঁদের নাম বলা হল তাঁরা এরি মধ্যে একদিন ফুকটসে ছুটি মেরেছেন!"

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া নির্বাচনের ফল দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন—আমাদের উচিত হবে "এণ্ড" করা অথবা "মেণ্ড" করা। —"ঠিক বলেছেন। আমরা ক্রিকেটেও বলে থাকি—হিট আউট অর গেট আউট"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ঘোড় দৌড়ের মাঠে গেল শনিবারে একটা ঘোড়া জিতেছে, তার নাম "গুড সিলেকশন"। নির্বাচনের সঙ্গে এই ঘোড়ার নামের কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা বলা শক্ত।"

পশ্চিমবঙ্গে ছয়জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে আসন লাভ করেছেন। —"আপত্তিটা আমাদের শুধু মহিলাদের ট্রামে বাসে আসন ছাড়তে, আইন পরিষদের আসন দিতে আমরা একেবারে দাতা কর্ণ"—ট্রামের ভীড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বলে শ্যামলাল।

নির্বাচন পর্ব শেষ—এবার ক্ষমতার রাজনীতি খেলা'—একটি সংবাদের শিরোনামা। খুড়ো বলিলেন—"এ আর নতুন কথা কী। ক্রিকেটের পর হকি, হকির পরে ফুটবল, নির্বাচনের পর ক্ষমতার কপাটি—এ তো চিরকালই চলে আসছে।"

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে শ্রীকৃষ্ণ মেনন আচার্য কৃপালনীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সংবাদে বলা হইয়াছে এই সাক্ষাৎকারে কোন রকম রাজনৈতিক আলোচনা হয় নাই।—"হয়ত শুধু আবহাওয়া আর অষ্টগ্রহ সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে"—বলে শ্যামলাল।

সংবাদে বলা হইয়াছে "চীনপন্থী" আর "রুশপন্থী"দের মধ্যে বিবাদ (বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে) আর ঢাকিয়া রাখা গেল না।—"কী করেই বা যাবে। শাক দিয়ে মাছ যদি-বা ঢাকা যায়, দলীয় লাটুমাটুম কখনো যায় না। তবে আমরা ভাবছিলাম ছুঁচোর কেত্তনটা একটু বয়েসেই শুরু হবে"—বলেন, জনৈক সহযাত্রী।

কমিউনিস্ট পার্টির সংকট প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—এই বিপর্যয়ের জন্য নাকি নেতৃত্বের নিকট জবাবদিহি দাবীর সম্ভাবনা।—"এবারে মিছিলের নব রূপায়ন; চলবে না—চলবে না অচল, এবারে জবাব চাই। জবাব চাই। মন্দ কী, একটু মুখ বদলানো যাবে"—বলেন এক সহযাত্রী।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে জানাইয়াছেন আলীপুর কেন্দ্রে এক কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ির সম্মুখে শোভাযাত্রীরা নাকি "বস্ত্র ত্যাগ করে নৃত্য করতে থাকেন"। শ্যামলাল বলিল—"তথাপি চোংড়া ন চ ভদ্রলোকাঃ ছাড়া কী আর বলতে পারি!!"

এক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, সুখী স্বামীরা পথের দুর্ঘটনায় কম পতিত হন। —"হতে পারে, তবে একথাও ঠিক, অসুখী স্বামীরা পথের দুর্ঘটনার চেয়ে বাড়ির দুর্ঘটনাতেই মরেন বেশী, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন"—বলেন বিশু খুড়ো।

এই সংবাদেই বলা হইয়াছে যাঁহারা বধির তাঁহারা নাকি ভাল গাড়ি চালায়।—"এইবারে বোঝা গেল চীৎকার করে ডাকাডাকি করলেও কেন ট্যাক্সি ড্রাইভাররা শুনতে পায় না"—বলেন এক সহযাত্রী।

লালবাজারে শুনিলাম ভূতের উপদ্রব চলিতেছে।—"তা হলেই বুঝুন, লাকি-মিতাদের কেরামতি শুধু খুনী ধরায়, ভূতের কাছে সব টিট"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ভারতীয় মেডিক্যাল রিসার্চ আহার্য-বিধির একটি অ্যাটলাস রচনা করিতেছেন। শরীর পুষ্টি যে খাদ্যে সহজে নিষ্পন্ন হয় সেই খাদ্যের পরিচয় ও বিবরণ এই আহার্য পঞ্জিকায় থাকিবে।—"এই পঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসামগ্রী কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে তার একখানা ডাইরেক্টরীও ছাপা দরকার, দামের কথাটা এখন [illegible] নাই [illegible]"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নে গুরুত্বের পরিবর্তনের সংবাদ পাঠ করিলাম। শুনিলাম বাংলা ও অন্যান্য মাতৃভাষা হইতে অনুবাদ করিতে না বলিয়া এখন হইতে নাকি গল্প লিখিতে বলা হইবে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"গল্পগুলি বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত করে রাখবেন কিনা তা এখনও সংবাদে বলা হয়নি; [illegible], তা নইলে প্রকাশকদের গাত্রজ্বালা ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা!!"

বিলাতে কলের নার্স তৈয়ারির একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"এই নার্সারি (নার্স-তৈরি) রাইনের ঢেউ কোথায় গিয়ে শেষ হয় কে জানে। সেবারত দুটি হস্তের কল্যাণ স্পর্শের বদলে কলের স্পর্শের কথা ভাবতেই যে মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম হয়!!"

পূর্ব পাকিস্তানে সংস্কৃত ও পালি বোর্ড গঠনের সংবাদ শুনিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"খুবই ভাল কথা। কিন্তু সংস্কৃতে নর শব্দের পরিবর্তে আদমী শব্দের রূপ শেখানো হবে কিনা জানা যায়নি!!"

সংবাদের শিরোনামা দেখিলাম,—'বিকল্প' একটি শব্দ মাত্র।—"তাই হবে। আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাই ভাবছিলাম—এতটুকু শব্দ হতে, এত হয়ে হয়"—বলে শ্যামলাল।

গঙ্গা পারাপারের জন্য শুনিলাম নূতন সেতুর ব্যবস্থা হইতেছে। বুড়ো খুড়ো বলিলেন—"হয় ভালোই, না হলে বক্না তো আছেই, বৈতরণী পারের আর ভাবনা কী!!"

জাপানী জর্নাল

'দেশ'-সম্পাদক সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সে-দেশে ইংরেজী ভাষার স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, আমাদের দেশের ভাবুকমাত্রেরই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত বলে মনে করি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব জাপানের অতি-গভীরে প্রবেশ করেছে। এ প্রভাব সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয়, বহুকাল থেকেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে জাপান স্বীকার করে আত্মস্থ করে নিয়েছে। এ-কথা প্রায় সকলেরই জানা। অথচ এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে যে ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, তা নয়। বুদ্ধদেববাবু জাপানের এই মহৎ কীর্তিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে আমাদের মনোযোগ সেদিকে ফেরাবার চেষ্টা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছে। স্বদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করলে আমরা সংকীর্ণ ও প্রাদেশিক হয়ে পড়ব। আধুনিক চিন্তার বায়ুপথ আমরা রুদ্ধ করব এবং উচ্চতর বিজ্ঞান এবং কারুশিল্পের প্রকাশ ভাষার দীনতা ঘটবে।

এইসব যুক্তিই বুদ্ধদেববাবু জানেন কিন্তু তিনি বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে জাপানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে একটা মূল প্রশ্নকে আমাদের সামনে উত্থাপিত করেছেন, "মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয় কিনা, সত্য কিনা এই ধারণা যে ইংরেজের ছেলে যেমন ইংরেজীতে, তেমনি বাঙালীর ছেলে বাংলায় পড়লে যা শিখবে তা যে-ভাবে তার মনে প্রাণে রক্তে গিয়ে মিশবে, সে-রকম কোনো পর-ভাষার দ্বারা হতেই পারে না।"

কথাটা নিছক চিন্তাবিলাস নয়। কারণ যদি ভেবে দেখি 'আধুনিক ভাবধারা'কে গ্রহণ করার অর্থ কি তা হলে এর সার্থকতা বুঝতে পারি। আধুনিকতা বস্তুটা কি শুধু নাগরিক-সমাজের জন্যে, যারা ইংরেজী পড়ে ভালো ভালো সরকারী অথবা বে-সরকারী চাকরি করবে এবং যারা নিজেদের একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে তুলে সমগ্র দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে? যারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্তরে ইংরেজী শিক্ষা পাবে না, তাদের কি প্রয়োজন নেই আধুনিক চিন্তায়, মনন-প্রণালীতে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠার? যাঁরা বলেন ইংরেজীকে শিক্ষায় বাহন না করলে দেশের সর্বনাশ হবে, তাঁরা কি সমগ্র দেশের মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে এ কথা বলেন? আমাদের দেশের সামনে এখন যে লক্ষ্য আছে অগণিত জনসাধারণের মধ্যে মধ্যযুগীয় অন্ধকারকে ঘুচিয়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার তার উপায় কি মাতৃভাষার সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক চেতনাকে নিঃশ্বাসের মতোই সহজ করে নেওয়াতেই নিহিত নেই। বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, "এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে উজ্জ্বলতম উদাহরণ জাপান। উজ্জ্বলতম এইজন্যে যে, জাপানও এশিয়া, আর এশিয়ার মধ্যে তার অভ্যুত্থান বিস্ময়কর। এই অভ্যুত্থানের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, এখানে নব্যতম প্রতীচ্যতম বিদ্যাও মাতৃভাষাতে বিকীর্ণ হয়েছে; জাপান প্রতীচীকে আমাদের চাইতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ করে নিয়েও কখনো পর-ভাষার দাসত্ব করার মতো আত্মঘাতী ভুল করে নি।"

এই প্রসঙ্গে লেখক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতের কথা বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদবী-সম্মান-

বিতরণ' সভার সম্ভাষণ পর্যন্ত বারবার এই কথাই বলে গিয়েছেন। জাপানের দৃষ্টান্তও রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ দিয়েছেন। ১৯১৫-তে লেখা 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে সম্ভবত প্রথম তিনি এর উল্লেখ করেন; তারপর ১৯৩৩-এ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' প্রবন্ধেও জাপানকে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যবহার করেন। এমন কি বুদ্ধদেববাবুর ব্যবহৃত 'পরভাষা' এই শব্দটিও রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। বুদ্ধদেববাবু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করে এই প্রসঙ্গটির সময়োচিত অবতারণা করলেন, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সেদিন যা ইংরেজী শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"

পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ ক্রমে ক্রমে দেখা দিচ্ছেন, এটাই বড়ো ভরসার কথা।

ভবতোষ দত্ত, কলিকাতা।

তৃতীয় রায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

এবছরের সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণের রায় নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের পক্ষে। গত দুটো নির্বাচনেও (১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালে) কংগ্রেসের দিকেই রায় দিয়েছিল জনসাধারণ। তবু এবারের নির্বাচনে যে-উত্তেজনার ঢেউ উঠেছিল, তা বোধহয় আগে আর দেখা যায়নি।

এই উত্তেজনা মুখ্যত সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী দলগুলোর তীব্র রাজনৈতিক লড়াইয়ের ফলে। প্রজাতন্ত্র ভারতের শাসনতন্ত্র রাজনৈতিক মতবিরোধ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে। ভারতের গণতন্ত্রেই বিরুদ্ধ মতবাদের সহঅবস্থান সম্ভব। কিন্তু আদর্শগত সেই বিরোধ যখন শাসনযন্ত্র অধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তখন সংঘাত আসবেই। উত্তেজিত হবার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হবেই।

সেই আবহাওয়াই এবারের সাধারণ নির্বাচনকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে ভারতের একুশ কোটি স্ত্রী-পুরুষকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাদের মনোনীত সরকার গঠন করতে রাজ্যে ও কেন্দ্রে। সে-মনোনয়নের পালা যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল কংগ্রেস নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে লোকসভায় এবং দুটি রাজ্য ছাড়া আর সব ক'টি রাজ্যে।

তবু এই নির্বাচনের আলোড়নের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে ছোট বড় মহীরুহ। যেমন তলিয়ে গিয়েছে কংগ্রেসের দিকপাল শ্রীবলবন্তরাই মেহতা গুজরাটে, কিম্বা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু মধ্যপ্রদেশে অথবা লোকসভায় আসনপ্রার্থী ডাঃ বি ভি কেশকার এবং কম্যুনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গে।

আর গিয়েছেন আচার্য কৃপালনী উত্তর বোম্বাই কেন্দ্রে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন শুধু কংগ্রেসেরই নয়, কম্যুনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সমর্থন নিয়ে লড়েছিলেন আচার্য কৃপালনীর সঙ্গে। উত্তর বোম্বাই কেন্দ্রের লড়াই তাই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আদর্শগত সংঘর্ষ ছিল বলেই উত্তর বোম্বাইয়ের নির্বাচন এত আলোড়ন তুলেছিল। ঠিক এমনি একটা সংঘর্ষ ছিল বলেই এবারের নির্বাচনে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল এই পশ্চিম বাংলায়। সংঘর্ষটা লেগেছিল কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে।

রাজ্যের বিধান সভায় দলগত শক্তিই যদি নির্বাচনে হার-জিতের মাপকাঠি হয়, তবে বলতেই হবে পরাজয় কারো ঘটেনি। কংগ্রেসের ত নয়ই। কম্যুনিস্ট পার্টিরও নয়। কারণ, দল হিসেবে কম্যুনিস্ট পার্টি কিছু বেশী শক্তিশালী নিশ্চয়ই হয়েছে। এবং কংগ্রেস যে শুধু নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে তা নয়, দলবৃদ্ধিও করেছে।

তাই দেখা যায়, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ২৫২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দখল করে ১৫২টি আসন (কংগ্রেস সমর্থিত ও নির্বাচিত নির্দলীয় প্রার্থীর একটি আসন নিয়ে) এবং কম্যুনিস্ট পার্টি দখল করে ৪৬টি আসন। এবারের নির্বাচনের ফলে, কংগ্রেস পেয়েছে ১৫৭টি আসন, অর্থাৎ গতবারের তুলনায় আরও পাঁচটি আসন কংগ্রেসের হাতে এসেছে। আর কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছে ৪৯টি, অর্থাৎ অতিরিক্ত তিনটি আসন।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে এটাই সমগ্র পটভূমি নয়। তার কারণ, প্রাক-নির্বাচনী-কালে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং আরও পাঁচটি ছোটখাট রাজনৈতিক দল যে জোট গড়ে তোলে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে এবারের ভাঙাগড়া। তাছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিম বাংলায় "বিকল্প" সরকার গঠনের যে স্লোগান তুলেছিল, সেটাই ছিল এবারের

পশ্চিম বাংলার নতুন বিধান সভা

উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল। বললে ভুল হবে না যে, এই শ্লোগানই নির্বাচনের প্রধান 'ইস্যু'। এই 'ইস্যু'কে ভিত্তি করেই পশ্চিম বাংলার ভোটদাতারা তাদের সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল। সেই সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনভাবে কংগ্রেসের অনুকূলে গিয়েছে বলেই তৃতীয় নির্বাচনের রাজনৈতিক খতিয়ান একমাত্র আসন দখল বা বেদখল দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়।

এই রাজনৈতিক বিচার বা বিশ্লেষণের আগে নির্বাচনের সমগ্র ছবিটা জেনে রাখা ভাল। সেই হিসেবটা সামনে রাখলে পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য দেখা যাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ১৫৭ জন কংগ্রেস সদস্য দখল করেছেন স্পীকারের ডানদিকের আসনগুলো; শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে ৫০ জন (মার্ক্সিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য শ্রীঅমর বসুকে নিয়ে) সদস্য দখল করেছেন বাঁদিকের বেশীর ভাগ আসনগুলো। আর যারা থাকবেন বাঁদিকের আসনে, তাঁরা হলেন শ্রীহেমন্ত বসুর নেতৃত্বে ১৩ জন ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্য; সাতজন আর-এস-পি সদস্য; দুজন আর-সি-পি-আই সদস্য (এই প্রথম তাঁরা এলেন বিধান সভায়); চারজন লোক-সেবক সংঘ সদস্য; দুজন গোর্খা লীগ সদস্য; পাঁচজন (ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বহীন) প্রজা-সোস্যালিস্ট; এবং ১২ জন নির্দলীয়।

এই হিসেব থেকে দেখা যাবে যে, যদিও কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, সমগ্র বিরোধী দলের শক্তি কমেছে, ১৯৫৭ সালের নির্বাচন ফলাফলের তুলনায়। সে-সময় সমগ্র বিরোধী দলের শক্তি ছিল ১০০ জন সদস্য। এবার দাঁড়িয়েছে ৯৫। বিরোধী পক্ষের এই ঘাটতি কংগ্রেস পক্ষের লাভ হিসেবে দেখা দিয়েছে। অথচ দলগতভাবে দলবৃদ্ধি ঘটেছে কম্যুনিস্ট পার্টির, ফরোয়ার্ড ব্লকের, আর-এস-পি'র এবং নির্দলীয় গুচ্ছের।

স্বভাবতই তা হলে প্রশ্ন ওঠে: এই দলবৃদ্ধি ঘটল কি করে? বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির ক্ষতি দিয়েই সব ক'টা দলের স্ফীতি ঘটেছে। এবং আরও বড় প্রশ্ন: দলগত শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট মহল নিরুৎসাহ কেন?

এই প্রশ্নের রাজনৈতিক অংশ একটা নিশ্চয়ই আছে এবং পরে সেটা আলোচনা করা যাবে। আপাতত ভোটদাতাদের মেজাজের (ইংরেজীতে যাকে swing বলা হয়) দিকে তাকালে প্রশ্নটার সংখ্যানুপাতিক একটা সদুত্তর পাওয়া সম্ভব।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এবারের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভোটদাতার রাজনৈতিক চেতনা। সারা পশ্চিম বাংলায় দেখা গেছে, ভোটদাতারা দলে দলে এসেছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাদের সুচিন্তিত রায় জানাবার জন্যে। প্রতি কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ এসেছে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ভোট দিতে। ফলে সামগ্রিকভাবে শতকরা ভোটের হার বেশ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত দুটো নির্বাচনের হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫২ সালে পশ্চিম বাংলার মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১,২৪,১৫,১০৭ এবং তাদের প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭৪,৪৪,২২৫, অর্থাৎ শতকরা ৪২টি ভোট পড়েছিল। ১৯৫৭ সালে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১,৫২,১৬,৫৩২ এবং তাদের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ১,০৪,৬৯,৮০৩ অথবা শতকরা ৪৭·৭৩। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটদাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১,৬১,৮৪,৬৮৫ এবং তাদের মধ্যে ভোট দিয়েছিল ৯৫,৪৩,২১৫ অর্থাৎ শতকরা ৫৮·৮৬ জন।

ভোটদাতাদের মধ্যে এই উৎসাহ ছিল

বলেই হয়ত ভোটদানের সময় রাজনৈতিক চেতনা এত তীব্রভাবে ফুটে উঠেছিল। সেই চেতনার যে ছায়া পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর, তা থেকে দেখা যায় যে, যারা এবার ভোট দিয়েছিল, তাদের মধ্যে ৪৫,২২,৭২৬ জন ভোট দিয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষে। অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৭·৪০ অংশ গিয়েছে কংগ্রেসের দিকে। গতবারের তুলনায় কংগ্রেসের ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১·২৬, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, গতবারের তুলনায় এবারে কংগ্রেসের প্রার্থী-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র একজন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কংগ্রেস প্রার্থী-সংখ্যা প্রায় সমান থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভাগে বেশী ভোট পড়েছে শতকরা ১·২৬।

অপরদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে তাকালে দেখা যাবে, গতবারের নির্বাচনে এদের প্রার্থী-সংখ্যা ছিল ১০৩ জন। এবার সেই সংখ্যা ছিল ১৪৩ জন, ৪০ জন বেশী। ফলে, কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে ভোটের ভাগ পড়েছে ২৩,৭১,৬৬৮টি, অর্থাৎ শতকরা ২৪·৯৪ ভোট। গতবারের তুলনায় কম্যুনিস্ট পার্টির শতকরা ভোটের ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭·১২। এই বাড়তি ভোট এসেছে দুরকমে। প্রথমত, বাড়তি ৪০ জন প্রার্থী নতুন কেন্দ্র থেকে ভোট জুগিয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, এবং প্রধানত এসেছে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের এবং অংশত নির্দলীয় ও অন্যান্য ছোটখাট দলের কাছ থেকে।

কারণ, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির ভোটাংশ এবার শতকরা পাঁচ। গতবারের তুলনায় এবার কমেছে শতকরা ৪·৮৫। এই তিনটি দল ছাড়া বাকি যারা নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের ভোট-সংখ্যা এবার কমেছে, গতবারের তুলনায় শতকরা ৩·৯০। তা হলে সব মিলিয়ে এই ঘাটতি দাঁড়ায় শতকরা ৮·৭৫। এই ঘাটতি দিয়েই লাভের ঘর পূর্ণ হয়েছে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির। কিন্তু এই লাভের অংশে ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর-এস-পি দলের কিছু ভাগ আছে বলেই দেখা যায় যে, এবার ভোটদাতাদের সামগ্রিক মেজাজ ঝুঁকেছে কংগ্রেসের দিকেই। এই ঝুঁকির পরিমাণ এবার দাঁড়িয়েছে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১·৬৩। গতবারের নির্বাচনে এই ঝোঁক ছিল খুবই সামান্য। প্রায় শতকরা ০·১৬।

এটাই হল এ-নির্বাচনের মূল তাৎপর্য। বাকি সমগ্র অংশটাই রাজনৈতিক। সেখানেও এবার চটকের অন্ত ছিল না। সেই চটকের চমক লেগেছে প্রধানত কলকাতায় এবং আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে। কারণ এই অঞ্চল জুড়েই দেখা গিয়েছে কংগ্রেসের চমকপ্রদ বিজয় অভিযান।

কলকাতায় গতবার কংগ্রেস ৮টি আসন হারিয়েছিল। এবার ছটি আসন পুনরুদ্ধার করেছে। শুধু তাই নয়, দেখা যায়, এই উদ্ধার কার্যের চাপে পড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়েছেন জাঁদরেল কম্যুনিস্ট ও বামপন্থী নেতারা। যেমন হেরেছেন শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন কালীঘাটে কংগ্রেস সদস্যা শ্রীমতী বিভা মিত্রের কাছে। শ্রীসোমনাথ মৈত্র হেরেছেন কাশীপুরে ডাঃ সুশীল দাশগুপ্তের কাছে। আর সবাইকে তাক লাগিয়ে জিতেছেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মুচিপাড়ায়। তিনি হারিয়েছেন শ্রীযতীন

জেলাগুলোর রাজনৈতিক ছবি

চক্রবর্তীকে। ফলে গত নির্বাচনে কলকাতায় কম্যুনিস্টদের হাতে যে ১২টি আসন ছিল, তার একটি একটি করে হাতছাড়া হয়ে এবার মোট এসে দাঁড়িয়েছে ৮টিতে।

এবং এই নির্বাচনে কলকাতায় যদি সবচাইতে বেশী কোন দলের ক্ষতি হয়ে থাকে, সে-দল হল প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি। গতবারের নির্বাচনে এই দল কলকাতায় পেয়েছিল ৪টি আসন। এবার একটিও না।

কলকাতার বাইরে, শিল্পাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলেও বিরোধী দলের বিপর্যয় ঘটেছে। যেমন ঘটেছে হাসনাবাদে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীহেমন্ত ঘোষালের পরাজয়ে; কিম্বা বজবজ বা মহেশতলায় কংগ্রেসের সাফল্যে। এমনকি, শ্রীদাশরথি তা-এর মত জাঁদরেল প্রজা-সোস্যালিস্টকেও কংগ্রেস হারিয়ে দিয়েছে বর্ধমানের রায়না কেন্দ্রে, যেখানে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস কোন আসন পায়নি। সর্বোপরি বর্ধমানের মহারানী অধিরানী যেভাবে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীবিনয় চৌধুরীকেও এবার বিপুল ভোটাধিক্যে হারিয়ে দিয়েছেন, তা কংগ্রেস সমর্থকদেরও চমকে দিয়েছে। এই সাফল্য থেকে যা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে সেটা এই যে, মহানগরী ও শিল্পাঞ্চল আজ আর লাল ঝাণ্ডার কুক্ষিগত নয়। এই সব অঞ্চলে কংগ্রেসের অনুপ্রবেশ অত্যন্ত নিঃশব্দে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

এটাই কংগ্রেস পক্ষের প্রধান রাজনৈতিক লাভ। ক্ষতি যে কংগ্রেসের হয়নি, তা নয়। হয়েছে এবং বেশ ভালভাবেই হয়েছে কোচ-বিহারে, মুর্শিদাবাদে ও নদীয়ায়। কংগ্রেসের অধিকারে এই সব জেলায় যে আসন ছিল, তার বেশীর ভাগই হারাতে হয়েছে এই নির্বাচনে। তবু এই লাভক্ষতির খতিয়ান বিচার করলে দেখা যায় যে, সবগুলো জেলায় কংগ্রেস যেমন হারিয়েছে ২৬টি আসন, তেমনি লাভ করেছে ৩১টি আসন। ফলে, কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা এবার বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচটি।

তা হলে মূল প্রশ্ন দাঁড়ায়, এবারের নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক চেহারায় যে পরিবর্তন ঘটে গেল, তা ঘটল কি কারণে। যদি মনে করা হয় যে, কোন একটা কারণে এই পরিবর্তন ঘটেছে, তা হলে ভুল মনে করা হবে। অনেকগুলো রাজনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থার সংযোগেই ঘটেছে এই পরিবর্তন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

॥ ৫ ॥

চিঠিটা পড়ে ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন গণেশ হালদার। রূপ মানুষকে অভিভূত করে। অভিভূত হয়েই বসে রইলেন খানিকক্ষণ। এ রকম রূপ আগে কখনও দেখেন নি তিনি। বুলবুলিও দেখতে সুন্দর ছিল, তার সৌন্দর্যের মধ্যেও একটা শিকারীভাব ছিল যার জন্যে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন মাছরাঙা, কিন্তু ঝিনুকের সৌন্দর্য আরও তীক্ষ্ণ, ও যেন আসল ইস্পাতের একখানা ঝকঝকে তলোয়ার, আর সেই তলোয়ারের উপর প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। গণেশ হালদার কৌতূহলী হলেন। এ মেয়ে দেবানের পাল্লায় পড়ল কি করে? সেদিন তো চাঁদের পেছু ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, আবার কি ফিরে গেছে? পর পর এই ধরনের চিন্তার ঢেউ তাঁর মনে এসে লাগতে লাগল খানিকক্ষণ। তারপর যে কথাটা বিদ্যুৎ-চমকের মত অভিভূত করে ফেলল তাঁকে তা ঝিনুকের চিঠির একটি লাইনেই ছিল—'ডাক্তার মুখার্জির জোরে আপনি এখানে এসেছেন।' ডাক্তার মুখার্জির জোরে? তিনি তো স্কুল কমিটিতে নেই। তাঁর টাকাতেই যে স্কুলের লাইব্রেরিটি হয়েছে এ খবরও তিনি জানতেন না। লাইব্রেরিতে ডাক্তার মুখার্জি নিজের নাম দিতে দেন নি। স্কুল কমিটির একটা অধিবেশন এই দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল কেবল। কিন্তু এ সব খবর হালদার জানতেন না। ডাক্তার মুখার্জিও তো তাঁকে কিছু বলেন নি। অন্য লোক হলে আস্ফালন করত, নানা ছুতোয় প্রকাশ করত আমিই তোমার চাকরিটা করে দিয়েছি। কিন্তু উনি ঘুণাক্ষরেও এ প্রসঙ্গ তোলেন নি একদিনও। উনি এত অন্যমনস্ক থাকেন যে, সে কথা হয়তো ওঁর মনেও নেই। হঠাৎ গণেশ হালদারের ইচ্ছা হল ডাক্তার মুখার্জিকে একটা প্রণাম করে আসেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। উনি এখন তাঁর কুকুর-মুরগী-বাগান-আকাশ নিয়ে এমন একটা নিশ্ছিদ্র পরিবেশে বসে আছেন যে, তার মধ্যে ঢোকা শক্ত, ঢোকা উচিতও নয়, কারণ হালদার মশায়ের ধারণা, এ সময়ে কেউ গেলে তিনি বিরক্ত হন। তাই তিনি তাঁর সেই খাতাটা বার করলেন যাতে তিনি তাঁর লেখা টোকেন। ওই লেখার মধ্যেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন, ওইগুলো পড়লেই তাঁকে যেন ঠিক চেনা যায়, এই তাঁর ধারণা। তাঁর ইচ্ছে খাতাটার একটা নামকরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও পছন্দসই নাম তাঁর মাথায় আসে নি। মাত্র তিনটি লেখাই তিনি দিয়েছেন এ পর্যন্ত, তিনটি লেখা তিন রকম। সেইগুলোই আবার পড়তে লাগলেন তিনি। সেই পড়ার ভিতর দিয়েই যেন তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে লাগলেন। লেখাগুলো তিনি সাজিয়েছেন 'অ' 'আ' প্রভৃতি বর্ণমালা দিয়ে। তিনি ভেবে রেখেছেন শেষ পর্যন্ত বইটার নাম 'বর্ণমালা'ই দেবেন। নানা রঙের খেলা আছে লেখাগুলোর মধ্যে। তা ছাড়া আর একটা মানেও হয়। ওঁর রহস্যময় চরিত্র-গ্রন্থ এই সব বর্ণমালাতেই বিধৃত হয়ে আছে। পড়তে লাগলেন।

মানুষ বিদ্যায় বুদ্ধিতে অনেক বড় হয়েছে, সে মাটির নীচে শহর বসাবার কল্পনা করেছে, আকাশে উঠে চাঁদের সঙ্গে মিতালি জমাবার চেষ্টায় আছে, তার এ ক্ষমতাও নাকি হয়েছে যে, সে নিজের ঘরে বসে সুইচ টিপে আর একটা দেশ ধ্বংস করে দিতে পারে। সবই হয়েছে, কিন্তু বিনয়ের বড়ই অভাব। আমাদের এখানকার পণ্ডিতজীর অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি সংস্কৃতে সপ্ত-তীর্থ তো বটেনই, ইংরেজী, বাংলা, এমন কি উর্দুতেও তাঁর প্রচুর জ্ঞান। কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই। মুখে

সর্বদাই স্নিগ্ধ মধুর হাসি। তাঁর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় গঙ্গায় অবগাহন করলাম। সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বিনয়ী। কেন জানি না, ইংরেজী-নবীসরা একটু যেন উদ্ধত। তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধ একটু যেন বেশী কঠোর। তারা আঙুরের মতো নয়, বেলের মতো। বেলটিকে কিন্তু অহঙ্কারের গজ গ্রাস করেছেন। এ শিক্ষার বাইরের চেহারাটা হয়তো বজায় থাকবে কিছুকাল, কিন্তু সেটা থাকবে ... অন্তঃসারশূন্য। এত কথা লিখলাম একটি লাল সুতোর জন্য। সেদিন মাঠে একপাল শালিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করছিলাম। ওরা সমাজবাসী মানুষের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত। ভাবছিলাম, হয়তো আমল দেবে, কিন্তু দিলে না। দেখলাম, ওদের সঙ্গে আলাপ করাও সহজ নয়। শুনেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাখিদের সঙ্গে ভাব করেছিলেন, কিন্তু আমি পারলাম না। দেখলাম, একটু কাছাকাছি এলেই ওরা 'পিড়িং' করে উড়ে পালাচ্ছে সদলবলে। তবু কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নি, ওদের পিছু পিছু সন্তর্পণে যাচ্ছিলাম ধান গম ছড়াতে ছড়াতে, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লাল সুতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে মাঠের মধ্যে। কুড়িয়ে নিলাম। দেখলাম শুধু লাল নয়, হলদে এবং জরির সুতোও জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। আর সুতোর দুই প্রান্তে দুটি রঙীন থোপনা। বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা রাখী, এর আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালবাসা অনেক ঐতিহ্য। মনে হল কোথা থেকে এল এটা এখানে? এমন সময় সুট্ করে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা সাইকেল। দেখলাম তরুণ প্রফেসার হরেন চট্টখণ্ডী যাচ্ছেন। পরনে সাহেবী পোশাক, চোখে কালো গগল্স। কিছুদূরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আমার দিকে, তারপর যেমন যাচ্ছিলেন যেতে লাগলেন। একটা নমস্কার করলেন না, আমাকে যে চেনেন তারও কোনও আভাস ফুটল না তাঁর মুখে। অথচ উনি আমাকে খুব চেনেন, ওঁর ছেলেমেয়ের চিকিৎসা করেছি বিনা পয়সায়, কিন্তু তাঁর ব্যবহার থেকে মনে হল, আমি তাঁর অপরিচিত। মনে হল দেখতে পান নি। তবু আমি ডাকলাম। সাইকেল ঘুরিয়ে ফিরে এলেন তিনি। সবিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ডাকছিলেন? কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তার সুর একটুও বাজল না, বরং মনে হল বিরক্তই হয়েছেন। বললাম, 'এই রাখীটা এখানে কি করে এল বলুন তো?' শুনে তিনি বিলিতী কায়দায় শ্রাগ (shrug) করলেন, তারপর বললেন, 'এ বিষয়ে কোনও আলোকপাত করতে পারলাম না, সরি।' এই বলে আর একবার শ্রাগ্ করে চলে গেলেন। তাঁর কথার মধ্যে কোনও অভদ্রতা নেই, কিন্তু কেমন যেন সহৃদয়তার অভাব। ব্যবহারটা অনাত্মীয়-সুলভ। অথচ, ভগবান জানেন, ওঁর সঙ্গে আমি বরাবর আত্মীয়সুলভ ব্যবহারই করে এসেছি। অনেকক্ষণ সাইকেলটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখি শালিকগুলো ফিরে এসে আমার ছড়ানো খাবারগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আমি সেদিকে চাইতেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেল। ওরা চুরি করে খাচ্ছিল! আমার সঙ্গে ওদের কোন আত্মীয়তার বন্ধন হয় নি। আত্মীয়তা হওয়া সত্যিই সহজ নয়। তার জন্যে তপস্যা করতে হয়। দস্যু রত্নাকর যতদিন দস্যু ছিল, কেউ তার কাছে আসে নি। কিন্তু
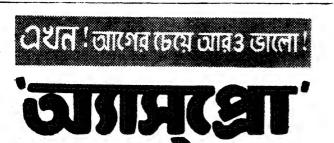
যেই সে তপস্যা শরুর করল অমনি বল্মীকরা এসে বাসা বাঁধল তার চারদিকে, তাকে আপন লোক মনে করে। বাল্মীকি সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে দিতে পেরেছিল নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে। বল্মীকরা তাঁর মধ্যে বেসুরো কিছু পায় নি, পেলে আসত না। একটু দূরেই দেখতে পাচ্ছি কাক, শালিক আর ফিঙেরা একসঙ্গে চরে বেড়াচ্ছে, একটুও ঝগড়া করছে না। কেউ কারো কাছ থেকে পালাচ্ছে না। সকলেই নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করছে না। এই সব ভাবছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম পণ্ডিতজী আসছেন মাঠামাঠি। মাঠের ও-পারেই তাঁর বাড়ি। হে'টে রোজ শহরে আসেন। স্কুলে পড়ান, নানা জায়গায় টিউশনি করেন। সব পায়ে হে'টে। তাঁর দাড়ি-গোঁফ কিছুদিন বেশ পরিষ্কার কামানো থাকে, কিছুদিন পরেই আবার দেখা যায়, তাঁর সারা মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ির জঙ্গলে ভরে গেছে। এর অর্থ, নাপিতের যখন দেখা পান তখনই কেবল কামিয়ে নেন। স্থান কালের বিচার নেই। কখনও বা ঘোর দুপুরে রাস্তার ধারে কারও বারান্দায় বসে, কখনও বা কোনও সকালে রাস্তার ধারে ইটের উপর বসে, কখনও বা সন্ধ্যার সময় কোনও গাছতলায়। নাপিত পেলেই তাকে ধরে ফেলেন। কিন্তু যে নাপিত তাঁর প্রিয় নাপিত—বিষ্ণু ঠাকুর—তার দেখা কালে-ভদ্রে পান। যোগাযোগটা প্রায়ই হয় না। আমাকে দেখেই নমস্কার করে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি। তাঁকেও রাখী সমস্যার কথা বললুম। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'রাখী কোথা থেকে এল তা ভেবে আর কি হবে। রাখী পেয়েছেন, রাখী বে'ধে দেবার লোকও পেয়ে গেলেন, আসুন আপনার হাতে বে'ধে দি ওটা।' বললাম, 'যদি বাঁধতেই হয় আমিই আপনার হাতে বাঁধব।' পণ্ডিতজী হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বে'ধে দিলাম তাঁর হাতে রাখী। তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন। তাঁর দাঁড়াবার সময় নেই। তিনি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে এম এ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যন্ত পড়ান। বললাম, 'মাপ করবেন, দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অনেক জায়গায় যেতে হবে।' নমস্কার করে চলে গেলেন। পণ্ডিতজীর সঙ্গে হরেনবাবুর তফাত আছে। তবে আর একটা কথাও গোপনে লিখে রাখছি। পণ্ডিতজী শিক্ষিত, সহৃদয়, সদাহাস্যমুখ, কিন্তু সংস্কারমুক্ত নন। আমাকে অবশ্য খাতির করেন খুব, কিন্তু আমি 'মাছিখোর' বাঙালী বলে আমার প্রতি তাঁর ঈষৎ বিরূপতা আছে। মুখে সেটা বলেন না কখনও, কিন্তু বুঝতে পারি।

তিনটি ছোট ছোট গাছ, পাশাপাশি ঘে'ষাঘে'ষি করে রয়েছে, যেন তিনটি যমজ ভাই। দেখেছিলাম নহরপুরে মাঠে। প্রথমে দেখতে পাই নি, পরে দেখেছিলাম। সেদিন দুপুরবেলা মাঠে গিয়ে প্রথমেই তাক লেগে গিয়েছিল আকাশে মেঘের কাণ্ডকারখানা দেখে। যত রকম মেঘের কথা বইয়ে পড়েছি সব সেদিন হাজির ছিল আকাশে। স্তর মেঘ, স্তূপ মেঘ, পালক মেঘ, ফড়িংয়ের মতো হালকা মেঘ, পাহাড়ের মতো ভারী মেঘ, ঝরনার মতো মেঘ, প্রপাতের মতো মেঘ, সব ছিল। এ ছাড়া ছোট ছোট তুলোর টুকরোর মতো দুষ্টু মেঘও ছিল কয়েকটা, তারা ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। মেঘ নিয়েই আত্মহারা হয়ে ছিলাম, গাছ তিনটিকে দেখতেই পাই নি। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে হে'টে বেড়াচ্ছিলাম, হোঁচট খেলাম হঠাৎ, ওই গাছ তিনটেতেই হোঁচট খেলাম। ওরা যেন নিজেদের দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিলে। দেখলাম, বাঃ, কি চমৎকার! ছোট ছোট তিনটি গাছ, কিন্তু কি রূপ তাদের! কতদিন নহরপুরে মাঠে এসেছি, এদের তো দেখতে পাইনি। চোখেই পড়ে নি। দেখলাম ভাল করে। মনে হল, ওরা যেন মুচকি হেসে বলছে, আকাশের দিকে সমস্তক্ষণ চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছ, মাটির দিকেও দৃষ্টি নামাও একটু, আমাদের সঙ্গেও আলাপ কর, আমরা কি ফেলনা? এতদিন এদের দেখতে পাইনি বলে অনুতাপ হল। ঝুঁকে ভাল করে দেখলাম। পাতার রং শুধু সবুজ নয়, সবুজের ভিতর থেকে সোনালী আভাও বেরুচ্ছে। পাতাগুলি গোল গোল, অনেকটা সেকালের দু-আনির মতো। পাতা দিয়ে গাছগুলি আপাদমস্তক ঢাকা। পাতাগুলির ধারে ধারে খুব সরু সরু

দাতের মতো। কিন্তু দাত মনে হয় না। মনে হয় যেন গানের গিটকিরি। প্রত্যেক পাতার মাঝখানে একটি করে সাদা ফোঁটা আর তার থেকে পাঁচটি করে সরু শির সরল রেখায় চলে গেছে পাতার ধারের দিকে। মনে হয় যেন ছোট ছোট সোনালী-সবুজ জাপানী ছাতা। তিনটি গাছ ভরতি এ রকম জাপানী ছাতা। অবাক লাগল এ জিনিস আগে দেখতে পাইনি কেন। এর নাম কি? কি এর পরিচয়? জানবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, একটু দূরে মাঠে চাষারা জমি চষছে। তাদের একজনকে ডেকে এনে দেখলাম গাছগুলো। বললে, জংলী গাছ। এর বেশী আর কৌতূহল নেই তাদের। আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে মনে করি, তাই জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়াতে চাই। আমি তাই গাছের ছোট একটি ডাল কেটে নিয়ে গেলাম বোটানির প্রফেসার হর্ষনাথ-বাবুর কাছে। তিনি উল্টে পাল্টে দেখলেন, তারপর বললেন, এর ফুল ফল না দেখলে বলা যাবে না এটা কোন্ ন্যাচারাল অর্ডারের। শুধু ডাল বা পাতা দেখে বলা যাবে না। আমার কেমন যেন রোখ চড়ে গেল, গাছটার নাম জানতেই হবে। তার পরদিন আবার গেলাম সেখানে। দুর্গাকে নিয়ে গেলাম। পচা গোবর আর পাতার সারও নিয়ে গেলাম সঙ্গে করে। দুর্গা গাছ তিনটি বেশ ভাল করে খুঁড়ে সার দিয়ে দিলে। মনে হল গাছ তিনটি খুশী হয়েছে, তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা তৃপ্তির স্নিগ্ধ ভাতি বিকীর্ণ হচ্ছে। আশা হল, এইবার তাড়াতাড়ি ফুল ফুটবে। প্রায় রোজই যেতাম গাছ তিনটিকে দেখতে। সানন্দে লক্ষ করতাম সার পেয়ে বেশ সতেজ হচ্ছে। পাতাগুলো আরও সুন্দর হয়েছে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতাম, বড় ভাল লাগত। ক্রমশ কেমন যেন স্নেহ জন্মে গেল গাছ তিনটের উপর। রোজ যেতে আরম্ভ করলাম। মাস খানেক পরে মনে হল কুঁড়ি হয়েছে যেন। আনন্দে অধীর হয়ে পড়লাম। কিন্তু, হায়, আমার ভাগ্য লাউথার সাহেবের ভাগ্যের মতো নয়। লাউথার সাহেব এ-দেশে চাকরি করতে এসে অনেক পাখির ছবি তুলেছেন। শুধু পাখির নয়, পাখির বাসার, ডিমের আর বাচ্চার। সহজ কাজ নয়, খুবই কঠিন। এর জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন ভদ্রলোক। একবার মানভূমে গিয়ে তিনি 'ক্রেস্টেড সুইফট' নামক পাখিটি দেখতে পেলেন। এ পাখির কথা আগেই তিনি হিউম সাহেবের কেতাবে পড়েছিলেন। পাখিটিকে দেখতে পেয়েই তাঁর মনে বাসনা হল, এ পাখির ছবি তুলতে হবে। শুধু ছবি নয়, পাখি ডিমে বসে তা দিচ্ছে—এই রকম একটি ছবি। পাখিটি তেল-চোঁচ জাতীয় পাখি, মাথায় কিন্তু বুলবুলির মতো ঝুঁটি আছে, খুব ছটফটে ছোট্ট পাখি। অনেক খুঁজে খুঁজে,

হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন একটা গাছের ডালে ওর বাসা রয়েছে, একটা পাখি বসে তা-ও দিচ্ছে। কাছেই মাচা বাঁধলেন। অনেক উঁচু মাচা বাঁধতে হয়েছিল, পাখিটাকে ক্যামেরার নাগালের মধ্যে আনতে। ভয় ছিল এই সব তোড়জোড় দেখে পাখিটা না উড়ে যায়। কিন্তু সে উড়ল না। সাহেব ঠিক করলেন, তার পরদিন এসে ফটো তুলবেন। কিন্তু তারপর দিন এসে দেখলেন পাখি নেই, ভাঙা ডিমটি নীচে পড়ে রয়েছে। তাঁর শিকারী 'সকুর' আরও বাসার খবর নিয়ে এল, কিন্তু সে সব জায়গায় মাচা বাঁধবার সুবিধা নেই। কিন্তু তিনি থামলেন না, ক্রমাগত সন্ধান করে যেতে লাগলেন। এক বছর সন্ধানের পর তবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। চমৎকার ফটো তুলেছিলেন তিনি, ফটোটা তাঁর বইয়ের প্রথমেই আছে। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না। একদিন গিয়ে দেখলাম কুঁড়িগুলি প্রায় ফোট-ফোট হয়েছে, পাপড়িগুলির স্বর্ণাভা ফুটে বেরুচ্ছে সবুজের ধার দিয়ে দিয়ে। আশা করলাম, কাল এসে নিশ্চয়ই পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলগুলি দেখতে পাব। কিন্তু পেলাম না। এসে দেখি গাছ নেই। সেখানে কতকগুলি মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। বুঝলাম, গাছগুলি তাদের উদরে গেছে। খুব কষ্ট হয়েছিল। অনেক দিন আগের ঘটনা এটা তখন কষ্ট হয়েছিল, এখন হাসি পায় নিজেকেই বলি, গাছকে দেখে আনন্দ পেয়েছিলে এই যথেষ্ট, যতটুকু পেয়েছিলে ততটুকুতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। তুমি ওর নাম জানবার চেষ্টা করতে গেলে কেন? তাইতেই কষ্ট পেলে। জ্ঞানের কি শেষ আছে? কত জানবে? তারপর, তারপর, তারপর......এ যে অশেষ!

মাস্টার মশাই, আমার এই সব রাবিশ টুকে যাচ্ছেন এ কথা ভেবে আমি বড়ই সংকোচ বোধ করছি। কিন্তু কি করব, যা করছি তা আপনারই অনুরোধে। আপনাকে কাজ দেবার জন্যে আমাকে এই অকাজ করতে হচ্ছে!

আজ একটা বড় মজার লোক দেখেছি। আমি যা দেখব বলে মাঠে আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে গিয়েছিলাম, সেটাও দেখেছি, অগস্ত্য নক্ষত্রকে, এ লোকটা ফাউ। আমার বাড়ি থেকে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দেখা যায় না। কারণ, আমার বাড়ির দক্ষিণ দিকটায় লম্বা লম্বা গাছ থাকাতে দক্ষিণ আকাশটা ঢাকা থাকে। তাই অগস্ত্যকে দেখবার জন্য আমি মাঠে যাই মাঝে মাঝে। এ নক্ষত্রটির উপর আমার পক্ষপাতিত্ব আছে। এর কারণ, ওর সঙ্গে ইতিহাস জড়িত আছে খানিকটা। পাথুরে-প্রমাণ-ওলা ইতিহাস নয়, পুরাণ-কথা। শোনা যায়, অগস্ত্য মুনির শিষ্য বিন্ধ্য পর্বতের নাকি খুব বাড় বেড়েছিল, সে নাকি আকাশ ছোঁয়ার বাসনায় ক্রমাগত মাথা উঁচু করে চলেছিল। যখন সূর্য-চন্দ্রের গতি রুদ্ধ হবার মতো হল তখন অগস্ত্য ঋষি তাঁর শিষ্যের কাছে গেলেন। এখন ভাল শিষ্যেরাও সবাই গুরুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে না, তখন উদ্ধত শিষ্যরাও গুরুর পায়ের কাছে মাথা নোয়াত। গুরুদেবকে দেখে প্রণাম করলেন বিন্ধ্য মাথা নুইয়ে। অগস্ত্য বললেন, আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, যতদিন সেখান থেকে না ফিরি তত দিন তুমি মাথা নত করেই থাক। অগস্ত্য আর দক্ষিণ থেকে ফেরেন নি। বিন্ধ্য পর্বতের উচ্চ শিরকে চিরকালের মতো অবনত করে দিয়ে গেছেন তিনি। এই পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে তাল রেখে অনেকে কল্পনা করেন যে, অগস্ত্য নামক ঋষি দাক্ষিণাত্যে আর্য-সভ্যতা প্রচার করতে গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে দুরারোহ বিন্ধ্য পর্বত লঙ্ঘন করতে হয়েছিল। এখন এভারেস্ট লঙ্ঘনকারীকে আমরা যে মর্যাদা দিই তখন তাঁকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়ে-

ছিল। তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে আর ফিরতে পারেন নি, তাই দক্ষিণ আকাশের ওই উজ্জ্বল নক্ষত্রটার নাম দেওয়া হয়েছিল অগস্ত্য। কিংবা এ-ও হতে পারে, বিন্ধ্য পর্বত নামে কোনও শক্তিমান অনার্য নেতা ছিলেন, অগস্ত্যের কাছে হার মেনেছিলেন তিনি। এ সব সত্য কি মিথ্যা তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না কখনও। এ কাহিনী আমার মানসকাননে কল্পনার ফুল ফোটায়, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শিশুরা যেমন ঠাকুমাদের মুখে রূপকথা শুনে আত্মহারা হয়, আমিও তেমনি পুরাণের রূপকথা শুনে হই। আমি যেন একজন পিঙ্গলকেশ নীল-চক্ষু গৌরবর্ণ যুবককে কল্পনা-নেত্রে দেখতে পাই। তিনি বিরাট বিদ্বান, নিপুণ বিচারক, ক্লান্তিহীন পর্যটক। দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার করছেন আর্য ধর্মের মহিমা। যে দাক্ষিণাত্যকে আজ আমরা দেখছি, কন্যাকুমারীতে, মীনাক্ষী মন্দিরে, চিদম্বরমে, যার অপরূপ প্রকাশ মূর্ত হয়ে আছে অসংখ্য মন্দিরে, যে বাণী পরে নূতন ভাষা পেয়েছিল শঙ্করাচার্যের জীবনে—এ সবের আদি জনক হয়তো অগস্ত্য, তিনি যে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তাই পরে মূর্ত হয়েছে এক নূতন সভ্যতায়। অগস্ত্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সেদিন এই সব কথাই মনে হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল বেচুর হয়তো শীত করছে। বেচুকে মোটরটা রবিনসন সাহেবের বাড়িতে রাখতে বলেছিলাম। রবিনসন অনেক দিন আগে মারা গেছে। এখন তার প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা বাড়িটা একজন মারোয়াড়ীর বাগান-বাড়ি। কয়েকটা মালী ছাড়া আর কেউ থাকে না। বেচু সঙ্গী পাবে বলে ওইখানে গাড়িটা রাখতে বলেছিলেম। হুইসল্ বাজিয়ে পা চালালাম রবিনসনের বাড়ির দিকে। অনেক দূর চলে এসেছিলাম আকাশ দেখতে দেখতে, মনে হল বেচু হয়তো হুইসল্ শুনতে পাবে না এতদূর থেকে। অগস্ত্যের কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলছিলাম।......হঠাৎ অনুভব করলাম আমার সামনে আরও দুটো লোক যাচ্ছে। অন্ধকারে তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রথমে যার কথা শুনতে পেলাম তার গলা খুব মোটা। মনে হল হিসেব দিচ্ছে। বলছিল, এই শোন না, টিকে দু' আনার, তামাক ছ' আনার, আলু আধ সের চার আনার, কপি একটা পাঁচ আনার। হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটি সরু গলায় বলে উঠল—আরে, হয়েছে, হয়েছে, অত হিসেব দিতে কে বলছে তোকে। তোর কাছ থেকে আমি সাড়ে তিন টাকা পাব, বাস্ সোজা কথা। মোটা গলা প্রতিবাদ করল তৎক্ষণাৎ—কি করে সাড়ে তিন টাকা পাবে তুমি! দিয়েছিলে তো চার টাকা। হিসেবটা শোন না : টিকে দু' আনার, তামাক ছ' আনার, আলু চার আনার, এই তো বারো আনা হল। তা ছাড়া কপি একটা পাঁচ আনার, সতেরো আনা হল, বুটের ডাল এক পো ছ' আনা, তেইশ আনা হল, এক আনা পালং শাক, চব্বিশ আনা, তার মানে দেড় টাকা। আবার সরু-গলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, আরে বাবু কে চাইছে তোর কাছে হিসেব, তুই আমার আপন লোক, তুই কি ঠকাবি, না, তোকে আমি অবিশ্বাস করছি? অত হিসেবে কাজ কি, আমি তোর কাছে সাড়ে তিন টাকা পাব—এই তো সোজা হিসেব বাপু। তোর কাছে হিসেব চাইছে কে? কেন বকে মরছিস? মোটা গলার তখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলে উঠল, এ শালার কাণ্ড দেখেছ! এর পর লোক দুটো রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হল। তাদের কথা আর শুনতে পেলাম না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার মোটরের আলোও দেখা গেল। এতদূর থেকে বেচু হুইস্‌লের শব্দ শুনেছে দেখে মনে মনে তার শ্রবণশক্তির প্রশংসা করলাম। বেচু যখন পড়ে না, অপেক্ষা করে, তখন দুটো হাঁটুর মধ্যে তার মুণ্ডটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার উপর একটা চাদর ঢাকা দিয়ে কূর্মাকৃতি হয়ে বসে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু ওই অবস্থাতেও ও সব দেখতে পায়, সব শুনতে পায়। পাতলা রোগা লোক শরীরটাকে যেমন খুশি দোমড়াতে মোচড়াতে পারে। সার্কাসেও অনায়াসে ভাল চাকরি পেতে পারত। সেদিন মোটরে যেতে যেতে অগস্ত্য এবং সাড়ে তিন টাকার হিসাব দুটোই পাশা-পাশি মনে ফুটে উঠতে লাগল। মনে হল এই আমাদের জীবন। গাম্ভীর্য এবং হাস্য-রস, উচ্চ এবং তুচ্ছ, জীবন এবং মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ পাশাপাশি ফুটে উঠছে সর্বদা। কখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি, কখনও পাচ্ছি না। আর একটা মজাও আছে। যেটাকে আমরা হাস্যরস ভাবছি, তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করছি সেটা আসলে হয়তো হাস্যরসও নয়, তুচ্ছও নয়। তা হয়তো খুব করুণ, খুব গম্ভীর গভীর ব্যাপার। ওই সাড়ে তিন টাকার সম্পূর্ণ রহস্য যদি উদ্ভেদ করতে পারতাম তা হলে হয়তো দেখা যেত যে, ওই সরু-গলার কাছে সাড়ে তিন টাকা হয়তো জীবন-মরণ সমস্যা, লোভে পড়ে নানারকম জিনিস কিনে ফেলেছে, কিন্তু সাড়ে তিনটে টাকা ওর নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সাড়ে তিন টাকা যে নেই, থাকতে পারে না এ কথা ও কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না, স্বীকার করতে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে।

(ক্রমশ)

ছেলেবেলায় ভূগোল বই-এর পাতায় চীনের প্রাচীরের ছবি দেখেছি, আরো বড় হয়ে নিজের দেশকে বিভক্ত হতে দেখলাম, সেই উদ্বাস্তু জীবনের অসহায় দুই চোখ দেখল পৃথিবীর আরো কয়েকটা দেশকে খণ্ডবিখণ্ডিত হতে। এতকালের সব অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে জীবনের প্রায় মধ্য বয়সে অবাক হয়ে চোখের সামনে দেখলাম —রাতারাতি একটা নগরীর বুকে কিভাবে ইঁটের সারি আর কাঁটাতার হৃদয় বিদীর্ণ করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে নয়, একান্নভুক্ত পরিবারের ভাই ভাই ঝগড়া করে রাতারাতি ঘর-বাড়ি ভাগ করে নেয়, কেউ কারো মুখ দেখে না, তবুও নিজেদের মধ্যে একটা লেখাপড়া থাকে। কিন্তু বার্লিনের এই প্রাচীরকে কি সেই আখ্যা দেওয়া যায়? না। তার জলন্ত দৃষ্টান্ত—প্রতিদিন অজস্র মানুষ পশ্চিম বার্লিনে প্রাচীরের পাশে গিয়ে অশ্রুসজল নয়নে উঁকিঝুঁকি মারে, যদি ওপারের মা-বাবা, ভাই-বোনদের দেখা যায়। দেখা যায়, বন্ধু-বান্ধবী আর বাগ্‌দত্তাকে। না, আপনি তা দেখতে পাবেন না। কেননা, রাজনীতির বলির একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনার মাথা ততটুকু মুক্ত আকাশের দিকে তুলে ধরতে পারবেন না, যতটুকু তুলে ধরতে পারলে আপনি বর্তমান সভ্যতার দুই মতবাদের নগ্নতম আত্মপ্রকাশ এই কাঁটাতারের প্রাচীরের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেই এ কথা বলছি। কেন প্রাচীর উঠল, কোন পক্ষের দোষ, এ প্রসঙ্গে আমার যাবার ইচ্ছে নেই। কেননা, এই কয় মাসে, অর্থাৎ ১৩ই আগস্ট ১৯৬১ সালের আগে ও পরে, যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে দুই পক্ষের বিরুদ্ধেই কিছু না কিছু বলতে হয়। এক পক্ষ প্রাচীর তুলেছে, আর পক্ষ প্রাচীর তোলার কারণ। কিন্তু মাঝখানে পড়ে বলি হল মানবতার।

বিশাল রাজপথ, ১৭ই জুন-স্ট্রীট ধরে আপনি মনোরম টিয়ার গার্টেনের মধ্য দিয়ে, ভিকট্রি কলাম-কে অতিক্রম করে আরো এগিয়ে আসুন, সামনে পড়বে বিশাল সিংহদ্বার Branden-burger Tor। এবার এখানে আপনাকে থামতে হবে। কেননা, এবার আপনি পৃথিবীর দুই মতবাদের চরম কেন্দ্রবিন্দুতে। ওপাশ থেকে পূর্ব বার্লিন শুরু। মাঝখানে দুই বার্লিনকে ভাগ করে দাঁড়িয়ে আছে ৪৫ কিলোমিটার প্রাচীর। আপনাকে পূর্ব বার্লিনে যেতে হলে, কাছেই ফ্রিডরিখ্‌স্ট্রাস্, সেখানে যেতে হবে। বর্তমানে ওটাই একমাত্র পূর্ব বার্লিনে যাওয়া-আসার পথ।

S Bahn (পূর্ব বার্লিনের সম্পত্তি) ট্রেন থেকে নামলেই তরতর করে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। এবার কন্ট্রোল শুরু হল। কতটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে, সেটা নির্ভর করছে আপনার ভাগ্যের ওপর। সাধারণত এশীয় ও আফ্রিকান নর-নারীদের প্রবেশাধিকার সহজতর। সাদা চামড়া দেখলেই ওদের সন্দেহটা একটু বেশী মাত্রায় চাগা

বার্লিন শহরের প্রধান রাস্তার মাঝে বিখ্যাত ব্র্যান্ডেনবুর্গ গেট। এই তোরণের ডানদিকে পশ্চিম বার্লিন, বাঁদিকে পূর্ব বার্লিন।

হয়ে ওঠে। তার কারণও যথেষ্ট রয়েছে। ১৩ই আগস্টের পর পূর্ব বার্লিনের বহু নর-নারীকে আমেরিকান, ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নরনারীরা কখনো গাড়ির পিছনে, কখনো জাল পাসপোর্টের সাহায্যে পূর্ব বার্লিন থেকে লুকিয়ে-ছাপিয়ে পশ্চিম বার্লিনে নিয়ে এসেছে। তারপরের পথটুকু সুগম। টেগেল বা টেম্পেলহপের এয়ারপোর্ট থেকে পশ্চিম জার্মানি বা পৃথিবীর যে কোন স্থানে চলে যেতে পারেন। এভাবে প্রাচীরের পরেও বহু নরনারী, কখনো রাত্রির অন্ধকারে, কখনো কাঁটাতার ছিঁড়ে পশ্চিমে চলে এসেছে। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা পশ্চিম বার্লিনে টেকনিকেল ইউনিভারসিটি বা ফ্রি ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনো করত। তাদের কাহিনী শুনেছি—সে সব কথা সময় মত ব্যক্ত করা যাবে। তবে এ কথা সত্য, জীবনকে পণ করে শেষ পর্যন্ত এভাবে চলে আসাটা একটা অ্যাডভেঞ্চারিজ্‌মে পরিণত হয়েছিল। তাতে কেউ কেউ মারাও গেছে।

তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাবেন এপারের কয়েকটা সমাধিতে, সেখানটা আজও অজস্র ফুল ও মালা আবৃত করে রেখেছে। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, ৪৮ নং Bernauer Strasse-এর সেই অশীতি বছরের বৃদ্ধা মহিলা, যিনি কয়েকতলা উঁচু জানলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নীচে এক বিচিত্র নাটকীয় পদ্ধতিতে। রাস্তাটা পশ্চিম বার্লিনের, সেখানে অনেক মানুষের বাহুতে ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। এ ধরনের বিচিত্র ঘটনার শেষ নেই। পূর্ব বার্লিনের এমনতর মানুষের মনোভাব ব্যক্ত করতে হলে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতে হয়।

কিছুকাল পূর্বে, গত বছর, এক ভদ্রমহিলা পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিমে বেড়াতে এসেছিলেন। খেতে বসে বসে আলু মুখে দিয়েই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে-

বার্লিন শহরের পূব - পশ্চিম সীমানা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

ছলেন—পশ্চিমের আলু কি মিষ্টি আর বাদের। যখন তাঁকে বলা হল, এই আলু তাঁর দেশ, অর্থাৎ পূর্ব জার্মানি থেকেই এসেছে, তখন তিনি হতাশ হলেন। পূর্ব বার্লিনের এক ডাক্তার বলছিলেন—সামান্য অ্যানাসিন জাতীয় ট্যাবলেটে পর্যন্ত মানুষের বিশ্বাস নেই। দশটা ট্যাবলেট অ্যানাসিনের মূল্য পূর্ব বার্লিনে যেখানে ৩০ ফেনিগ, পশ্চিমে তা প্রায় ১ মার্ক। পূবের মানুষকে পশ্চিমে এসে সেই ট্যাবলেট কিনতে হয়েছে। সেই দশটি ট্যাবলেট পূর্ব জার্মানির ৪ মার্কেরও বেশী পয়সা দিয়ে। অর্থাৎ প্রায় একই ট্যাবলেট পশ্চিম বার্লিনে কেনার জন্য তাঁকে প্রায় বারোগুণ পয়সা বেশী দিতে হয়েছে শুধু বিশ্বাসের জন্য। আর এক ভদ্রমহিলাকে জানি—যিনি পশ্চিম থেকে চার পাঁচগুণ বেশী টাকা দিয়ে বর্ষাতি কিনে কয়েকদিন বাদে দেখলেন, বর্ষাতির ভেতরের কাপড়ে পূর্ব জার্মানির মিলের ছাপ রয়েছে। এ ধরনের ঘটনার অন্ত নেই। প্রশ্নটা হচ্ছে সেইখানে—মানুষ কতখানি বিশ্বাস হারালে এমনটি ঘটতে পারে।

ক্রুশভের ভাষায় পশ্চিম বার্লিন শো-কেস্ কিনা জানি না, তবে পশ্চিম বার্লিনের শো-কেসগুলির সাথে পূর্ব বার্লিনের দৈন্যের তুলনা কোন প্রকারেই চলে না। তার ঐশ্বর্য, জীবন ও জীবনবেগ পূর্ব বার্লিনকে অনেক পেছনে অন্ধকারে ফেলে চলে এসেছে। কোন একদিন পূর্ব বার্লিনের অগ্রগতি পশ্চিমকে কতটুকু ছাড়িয়ে যাবে, সে ভবিষ্যৎ-ইতিহাস কালের হাতে। তবে এ কথা সত্য, ১৩ই আগস্টের পর পশ্চিমের সেই মোহ যেন আর নেই—কোথায় যেন ভাঁটা পড়েছে!

তার একটা প্রধান কারণ, পূবে থেকে লোক আসা বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা পশ্চিমের একটা মস্ত ক্ষতি। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও অনেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাই অনেক নর-নারী তাঁদের সাধের সংসার বিক্রি করে দিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে চলে যাচ্ছেন। S-bahn স্টেশনের দোকানগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আর সাধারণ মানুষের কাছে একটা মস্ত ক্ষতি—সেই আগের মত পশ্চিমের টাকা ১ : ৪-এ পূবের টাকায় ভাঙিয়ে পূর্ব বার্লিনে গিয়ে দু হাত ভরে খরচ করা—সে আর এখন সম্ভব নয়। কেননা, ফ্রিডরিখ্ স্ট্রাসের কন্ট্রোল অফিসে আপনার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে—Unser Geld? অর্থাৎ, পূবের টাকা আছে সঙ্গে? আপনাকে তখন মানিব্যাগ খুলে দেখাতে হবে, কোন পূবের টাকা আপনার সাথে নেই। যদি আপনাকে কিছু কেনাকাটা করতে হয়, তবে পশ্চিমের টাকা পূবের ব্যাংক থেকে ১ঃ১-এ ভাঙিয়ে, তা করতে হবে। তাই পুরনো ছাত্রদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—দাদা, যখন যা খাবার, আমরা খেয়ে নিয়েছি। আগের মোহ আর পশ্চিম বার্লিনে এখন নেই। অর্থাৎ পূর্ব বার্লিন থেকে প্রচুর ভাল ভাল বই, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, গানের রেকর্ড—যা কিছু লোভনীয়, পশ্চিমের লোক তা কিনে এনেছে। ১৩ই আগস্টের আগে পর্যন্ত পূর্ব বার্লিনের থিয়েটার আর অপেরাগুলি পশ্চিমের লোকে ভর্তি থাকত। আজ কন্ট্রোল অফিসে দাঁড়িয়ে কম্যুনিস্টদের গালাগালি দিতে গিয়ে কোথায় যেন বিবেকে বাধে—হয়ত পশ্চিমের স্বার্থে বিরাট আঘাত পড়েছে বলেই আমাদের এতখানি উষ্মা। কেননা, এই প্রাচীর ডিঙিয়ে এখন আর ৫০ হাজার শ্রমিক পূবে থেকে পশ্চিমের কারখানাগুলিতে কাজ করতে আসতে পারে না—যেটা পূবের লাভ, পশ্চিমের ক্ষতি।

তবে এ কথা সত্যি, পূব ও পশ্চিমের এই সব লাভক্ষতি হিসাবের অনেক ঊর্ধ্বে মানুষের বেদনা। কারণ, এই প্রাচীর দুটো জাতি বা দেশের মধ্যে নয়। একই নগরীর ছেলেমেয়ে, মা-বাবা, ভাই-বোন—পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাবে না, এ কঠিন মূল্য রাজনীতির মানদণ্ডে ধরা পড়তে পারে না। তাঁদের কথা ও বেদনা তুলে ধরতেই হবে। নয়ত শুধু বার্লিন বা জার্মানি কেন, গোটা ইউরোপে শান্তি আশা করা অনর্থক। হের ভিলি ব্রাণ্ডট্ প্রায়ই সক্ষোভে বলেন—Die Mauer (মাওয়ার মানে প্রাচীর) muss weg, অর্থাৎ প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে। কিন্তু প্রাচীর তুলে আর ভেঙে ফেলে, কিংবা ঘন ঘন অজস্র Panzer অর্থাৎ ট্যাঙ্ক উভয় পক্ষ থেকে ফ্রিডরিখ স্ট্রাসের দিকে ছুটে গেলেই শান্তি আসবে না। পণ্ডিত নেহরুর বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়ে আমার অধ্যাপক ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—প্রাচীরের ব্যাপারে তুমিও কি পণ্ডিত নেহরুর মত চিন্তা কর? উত্তরটা খুবই কঠিন। তবু বলতে হল—শুধুমাত্র আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, পৃথিবীর একজন অন্যতম শান্তিকামী নেতা হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি। আর জানি আমার দেশের মানুষের কথা, যারা বিশ্বাস করে জার্মানির সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান আর মেধাকে। বিগত দুটো যুদ্ধের মধ্যে জার্মানি অনেক হারিয়েছে। তার সেই হারানোর পরও আজ সে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তবে এ কথা সত্যি, বার্লিনকে কেন্দ্র করে আবার যদি একটা যুদ্ধ বাধে, তবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি, তা পরের কথা, কিন্তু জার্মানির ধ্বংস অনিবার্য। সে কথা আমরা ভারতবাসীরা কোনমতেই ভাবতে পারি না।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

॥ ৩১ ॥

দু' নম্বর সুইটের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও আমার নাকের ডগায় যেন কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে উঠলো। করবী দেবী কেন এমনভাবে বসে আছেন?

করবী দেবী আমাকে বসতে বললেন না। শুধু আমার দিকে একবার তাকালেন। তাঁর চোখটা এবার ঘরের কোণে রাখা টেলি-ফোনের দিকে ঘুরে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বলবেন?"

বোধ হয় তাঁর কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় যেন মত পরিবর্তন করলেন। বললেন, "না। একবার ভেবেছিলাম ওঁকে ফোন করতে বলবো। কিন্তু ভাবছি, ফোন না করাই ভাল।"

আমি ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, "আপনার অতিথিরা কোথায়?"

করবী দেবী বললেন, "ওঁরা আবার মিসেস চাকলাদারের বাড়িতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মিসেস চাকলা-দার ও'দের নিতে পারলেন না—গবরমেণ্টের কয়েকজন হোমরাচোমরা অফিসার এ বেলায় আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এঁদের দুজনকে মিসেস চাকলাদার তবুও জায়গা করে দিতে পারতেন; কিন্তু কন্ট্রাক্টর মিস্টার কানোরিয়া রাজী হলেন না। উনি তাঁর সরকারী অতিথিদের কথা দিয়েছেন, মিসেস চাকলাদারের বাড়িতে তাঁরা ছাড়া বাইরের আর কেউ উপস্থিত থাকবেন না। যা দিন-কাল পড়েছে। কাগজের রিপোর্টাররা যে-ভাবে লোকের পিছনে লাগছে, হয়তো সার্কুলেশন বাড়াবার জন্যে একতক্তা লিখেই দিলে। অফিসাররা তাই আজ কাল অনেক সাবধান হয়ে গিয়েছেন।"

একটু থেমে করবী গুহ বললেন, "তোমাকে একটা কথা হয়তো বলতে হবে। কিন্তু এখন নয়। আজকের মতো আমি নিজেই ম্যানেজ করে নিয়েছি।"

করবী দেবীর মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। বললাম, "আমার তেমন ভাল লাগছে না, মিস গুহ। যদি আপনার কোনো উপকারে লাগি, তা হলে বলতে দ্বিধা করবেন না।"

করবী দেবী এবার হেসে ফেললেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, "একদিন আমারও ভয় লাগতো। এখন আর লাগে না। এখন জানি আমার কিছুই করবার নেই। একদিন তোমারও হবে। তুমিও এক-দিন এই হোটেলের ইট-কাঠ-পাথরের মতো নিস্পৃহ হয়ে উঠবে, তখন আর ভয় লাগবে না।"

ছাদের উপরে আমার আপন বিশ্বে ফিরে এসেছি। ছাদের ইলেকট্রিক আলোটাও আজ গুড়বেড়িয়া বোধ হয় নিবিয়ে দিয়েছে। আকাশে আজ সংখ্যাহীন তারার উজ্জ্বল সমারোহ। ড্রাই ডে-র রাত্রে কোনো অরসিক নভঃলোকবাসী যেন আকাশ-হোটেলে ব্যাংকোয়েটের ব্যবস্থা করেছেন। ছাদের ঘরের সব আলোগুলোও নিবে গিয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হোটেলের কর্মচারীরা মধ্যরাত্রের আগে ঘরে ফিরে আসার বিরল আনন্দ আজ যেন উপভোগ করছেন।

প্রভাতচন্দ্র গোমেজের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। একটা টুল নিয়ে নিজের ঘরের সামনে তিনি বসে আছেন। আমার মনটা ভাল নয়। করবী দেবী আমাকে বেশ চিন্তিত করে তুলেছেন। এমন রহস্যময় উদ্বেগের মধ্যে রেখে দু নম্বর সুইট থেকে করবী দেবী আমাকে বিদায় দিলেন কেন?

অবাক লাগছে আমার। আমারই অজ্ঞাতে কেমনভাবে শাজাহানের জগতে জড়িয়ে পড়েছি আমি। এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখ কখন যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। দু নম্বর সুইটের রঙ্গমঞ্চে যেন কোনো নাটক অভিনীত হচ্ছে, আরও অনেকের মতো আমিও তার একজন নীরব দর্শক। শাজাহানের ঘরে ঘরে রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও কত নাটক এমনই ভাবে অভিনীত হচ্ছে কে জানে? কে তাদের খবর রাখে? সে-নাটক হয়তো প্রতিদিনই পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতি-দিন নতুন নায়ক নতুন নায়িকা সেখানে অংশ গ্রহণ করছেন।

যাঁদের আমি চিনি না, জানি না, তাঁদের পরিণতি বিয়োগান্ত না মিলনান্ত হলো তা নিয়ে আমার চিন্তা নেই। কিন্তু দু নম্বর সুইট? সেখানে এই মুহূর্তে করবী দেবীকে কোনো বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা ভাবতে আমার মন যেন অজানা ভয়ে শিউরে উঠলো।

প্রভাতচন্দ্র গোমেজ ইশারায় আমাকে ডাকলেন। ও'র কাছে গিয়ে বললাম, "এখনও জেগে রয়েছেন!"

প্রভাতচন্দ্র হাসলেন। "ঘুম আসে না। রাত্রিটাকে দিনের মতো ব্যবহার করে করে অভ্যাসটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। ড্রাই ডে-র

কাটিটা তাই তারাদের সঙ্গে ভাব করে কাটিয়ে দিই। বেশ লাগে।"

আমি আর একটা টুল নিয়ে ও'র পাশে বসে পড়লাম।

প্রভাতচন্দ্র বললেন, "আপনাদের বয়স কম। শরীরের এখন ঘুমের প্রয়োজন। বয়স বাড়লে আপনাকেও ঘুমের জন্যে সাধ্যসাধনা করতে হবে।"

আমি নীরবে হাসলাম। বললাম, "মিস্টার গোমেজ আপনি তো এত চিন্তা করেন। রাতের নক্ষত্র, ভোরের সোনালী সূর্য তো একান্তে আপনার মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। বলতে পারেন, আমাদের জীবনে কেন সাসপেন্সের সৃষ্টি হয়েছিল? কেন আমরা অনাগত আশংকায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ি?"

গোমেজ বললেন, "শুনেছি, হিন্দুদের শাস্ত্রে এর উত্তর আছে। কিন্তু আমি অশিক্ষিত খৃীস্টান বাজনদার, তার খবর রাখি না। আমি আপনাকে গানে উত্তর দিতে পারি। সামান্য ছায়াছবির গান, কিন্তু সেখান থেকেই আমি আমার জীবনদর্শন খুঁজে পেয়েছিলাম—কে সারা, কে সারা।"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"মানে", গোমেজ এবার মৃদুকণ্ঠে ইংরিজী গান ধরলেন, "কে সারা, কে সারা। The future is not ours to see—যা হবার তা হবে।"

গান শেষ করে গোমেজ বললেন, "একজন আমেরিকান ভদ্রলোক এই হোটেলে এসেছিলেন। তিনি আমাকে এ গানের রেকর্ডটা দিয়ে যান। একদিন আপনাকে শুনিয়ে দেবো। আমি শিখেছি, ভবিষ্যতের খোঁজ নেওয়া আমাদের কাজ নয়—কে সারা, কে সারা।"

গোমেজের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন সত্যিই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। রাত্রের তারারা যেন গোমেজের কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছে—কে সারা, কে সারা।

অনিন্দ্য পাকড়াশি পরের দিন আবার এসেছিলেন। সেদিন ভোরেই তিনি করবী দেবীকে একলা পেয়ে বলেছিলেন, "মিস গুহ, যদি আপনি কিছু না মনে করেন, তবে একটি বিশেষ ব্যাপারে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।"

করবী বলেছিলেন, "আপনাদের বন্ধু মিস্টার আগরওয়ালার আমি হোস্টেস। সুতরাং বলতে গেলে আপনারই স্টাফ আমি। সুতরাং অনুরোধ নয়, হুকুম করুন।"

অনিন্দ্য এমন উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু একটু পরেই হেসে বললেন, "ও বুঝেছি, আপনি কালকের প্রতিশোধ নিলেন। কিন্তু আমি রাগ করছি না। কালকে এখান থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে বেশীক্ষণ বসিনি। সোজা দোকানে চলে গিয়েছিলাম। একলা হোটেলে বন্দী হয়ে থাকেন, তাই ভাবলাম, আমার প্রিয় কবিদের বইগুলো হয়তো আপনাকে আনন্দ দেবে।"

এসব কথা করবী দেবীই পরে আমাকে বলেছিলেন। ওঁরা দুজনে যখন কথা বলছিলেন, তখন সেখানে অন্য কেউ ছিল না। করবী গুহরও সাহস বেড়ে গিয়েছিল। বইগুলো হাতে নেবার আগে অনিন্দ্যর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আপনার প্রিয় কবি যে আমারও প্রিয় কবি হবে, সেটা কেমন করে ধরে নিলেন অনিন্দ্যবাবু?"

অনিন্দ্য হেসে বললেন, "এর উত্তর জীবনানন্দ বা সমর সেন কেউ দেননি। কিন্তু আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া খুবই সহজ। স্পেকুলেশন। ব্যবসাদার লোক আমরা, ফাটকায় সিদ্ধহস্ত।"

করবী দেবী বলেছিলেন, "বাংলা সাহিত্যের সেবা করলে আপনি সত্যিই অনেক কাজ করতে পারতেন।"

"দাঁড়ান, এখন এই জার্মান সায়েবদের সেবা করে মাধব ইন্ডাস্ট্রীজ-এর কাজ করি।" অনিন্দ্য পাকড়াশি হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন, "তবে জেনে রাখবেন, চিরকাল আমি এমন থাকবো না। আমি একদিন এইসব হুজুগ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের খুশিমতো কবিতা আর ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকবো।"

সেদিন সকালেই খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এই বিশিষ্ট অতিথিদের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 'কলকাতায় জার্মান শিল্প প্রতিনিধি' এই শিরোনামায় যে সংবাদ ছাপা হয়েছিল, তাতে মাধব ইন্ডাস্ট্রীজের নামও প্রকাশিত হয়েছিল। মাধব পাকড়াশি শারীরিক অসুস্থতার জন্য যে দমদম বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং অসুস্থ স্বামীর সেবার জন্য শ্রীমতী পাকড়াশিও যে দমদম পর্যন্ত যেতে পারেননি, তাও খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল।

কাগজ পড়তে পড়তে করবী গুহ যখন অনিন্দ্যর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, তখন আমিও সেখানে বসে রয়েছি। করবী দেবীই আমাকে জোর করে সেখানে রেখে দিয়েছিলেন। অনিন্দ্য বললেন, "আমি জানি না, ওসব মায়ের নিজের পরিকল্পনা—আমাদের পি-আর-ও সেনকে ডেকে নিজেই প্রেসনোট তৈরি করে দিয়েছেন। বাবা বলেছিলেন, তিনি দমদমে যাবেন। কিন্তু মা বললেন, আমাকে সুযোগ দিতেই হবে। সুতরাং ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন। সুতরাং বাবার 'অসুস্থ' হয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না।"

করবী দেবীর ইচ্ছা ছিল আমি দু নম্বর সুইটের ড্রইং রুমে ওঁর সঙ্গে বসে থাকি। কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। দু নম্বর সুইটে আমার স্পেশ্যাল ডিউটি থাকলেও প্রতিদিনের কাজ থেকে একেবারে ছুটি পাইনি।

কাউন্টারে ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করেছি। এমন সময় রিপোর্টার মিস্টার বোসের আবির্ভাব ঘটলো। মিস্টার বোস বললেন, "কেমন আছেন শংকরবাবু? আপনার গুরুদেব মিস্টার স্যাটা বোসই বা কোথায়? ওই জার্মান পার্টি সম্বন্ধে কিছু নতুন খবর চাই-ই।"

আমি বললাম, "মাধব ইন্ডাস্ট্রীজের জনসংযোগ অফিসার মিস্টার সেন নিশ্চয়ই তাঁদের বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে আপনাদের অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।"

"সেই বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করে কাগজ চালাতে পারলে মালিকরা আর আমাদের মতো রিপোর্টারদের মাইনে দিয়ে রাখতেন না। বনস্পতি নয়, আসল ঘি চাই আমি। এখন সেই নির্ভেজাল খবরের উৎস কোথায় বলে দিন।"

আমি চুপ করে রইলাম। মিস্টার বোস কিন্তু নীরব হলেন না। তিনি যে অনেক খবর রাখেন তা পরের কথা থেকেই বুঝলাম। মিস্টার বোস প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের ডিলাক্স সুইটের মিস গুহ যদি ইচ্ছে করেন আমাকে খবর দিয়ে বড়লোক করে দিতে পারেন।"
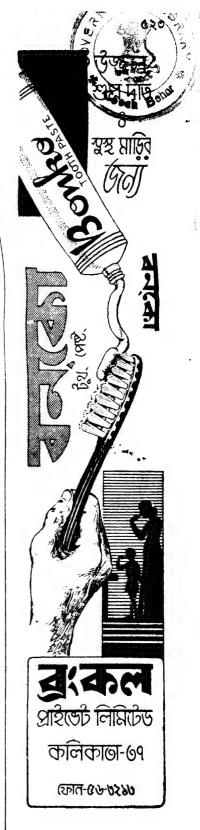
বললাম, "ও'র ঘরে এখন বাইরের লোক আছে। যদি একটু পরে আসেন।"

"কোনো আপত্তি নেই। আমি ততক্ষণ এসপ্ল্যানেডে রেলের পাবলিসিটি অফিসে একটু ঢু মেরে আসি।"

মিস্টার বোস যেতেই করবী দেবীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলাম। "বিখ্যাত হবার এই সুযোগ। সংবাদপত্র প্রতিনিধি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

করবী দেবী বললেন, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না, আপনি সুইটে চলে আসুন।"

ওখানে অনিন্দ্য তখনও বসে রয়েছেন। আমার কথা শুনে করবী দেবী বললেন, "হোস্টেসদের সব সময় নেপথ্যে থাকতে হয়। প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন অনিন্দ্যবাবু।"

কাগজের নাম শুনেই অনিন্দ্য একটু ঘাবড়ে গেলেন, বললেন, "পি-আর-ওকে সঙ্গে না নিয়ে বাবা কিংবা মা কেউ কাগজের লোকদের সঙ্গে কথা বলেন না। আমার ভয় লাগছে।"

করবী দেবী বললেন, "ভয়ের কিছুই নেই। আমি তো থাকবো।"

মিস্টার বোসকে করবী দেবী কিন্তু দু নম্বর সুইটে আসবার অনুমতি দেননি। যে কয়েকজন লোক সোজা দু নম্বর সুইটে এসে ঢুকতে পারেন, তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। লাউঞ্জের এক কোণে মিস্টার বোসের সঙ্গে ও'রা দুজন সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমাকে ডেকে করবী দেবী বলেছিলেন, "প্লিজ, আমাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন না।"

চায়ের অর্ডার দিয়ে আমি কাউন্টারে ফিরে আসতে আসতে শুনেছিলাম, করবী দেবী বলছেন, "মিস্টার পাকড়াশি নতুন ইন্ডাস্ট্রীতে আসছেন। বাংলা দেশকে তিনি ভালবাসেন। এই ভারত-জার্মান শিল্প-সহযোগিতার উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "আপনারা যদি এই অতিথিদের সম্বন্ধে ভালো করে লেখেন, আমাদের সুবিধে হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের এই কারখানা চালু হলে আমরা অনেক বেকার যুবককে চাকরি দিতে পারবো—সেই সব বেকার যুবকে যাদের দুঃখের কথা আপনারা কাগজে লিখে থাকেন।"

যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিস্টার বোস সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন। এবং পরের দিন সত্যিই তাঁর কথামতো কাজ করেছিলেন। কলকাতার অন্যতম প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় মাধব ইন্ডাস্ট্রীজের মুখপত্র শ্রীঅনিন্দ্য পাকড়াশির সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের সুদীর্ঘ বিবরণ ডবল কলম শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই কাগজ হাতে অনিন্দ্য পাকড়াশি প্রায় লাফাতে লাফাতে শাজাহান হোটেলে হাজির হয়েছিলেন। করবী দেবীকে উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছিলেন, "বাবা এবং মা দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। ও'রা ভাবছেন, খোকা কী করে এমন পাবলিসিটি করলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি এখানে। কেন জানেন? যে মহিলার দূরদর্শিতায় এই প্রচার সম্ভব হয়েছে, তাঁকে—"

"আপনার ধন্যবাদ জানাতে, তাই তো?" করবী দেবী অনিন্দ্যর মুখ থেকে কথাটি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই শেষ করে দিলেন।

অনিন্দ্য হেসে বললেন, "আমাকে এতই অন্তঃসারশূন্য ভাবছেন কেন? অন্তরের কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাবার ইচ্ছে আমাদের হয় না?"

করবী দেবী চুপ করে গেলেন। অনিন্দ্য

জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার অতিথিরা নিশ্চয় আপনাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে।"

"মোটেই নয়। যেসব দেশী ভি আই পিদের আমাদের সেবা করতে হয়, সে তুলনায় এ'রা ডেমি গড। বার-এ গিয়ে ড্রিংক করেন, ক্যাবারে নাচ দেখেন, তারপর নিজেরাই ঘরে এসে শুয়ে পড়েন। নিজের খেয়ালে নিজেরা থাকেন, আমাকে বড় একটা জ্বালাতন করেন না।"

অনিন্দ্য বললেন, "এখন তাঁদের দেখছি না কেন?"

"হল-এ ব্রেকফাস্ট করছেন।" করবী দেবী বললেন।

অনিন্দ্য খুশী মেজাজে বললেন, "যাক, আমি আর চিন্তা করি না। এ'কদিন সব সময় এ'দের কথাই ভাবতে হচ্ছিল। আজ থেকে নরম্যাল হয়ে যাবার চেষ্টা করবো। তারপর যেদিন ও'রা আমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট সই করবেন, সেদিন থেকে আমি তো মুক্তবিহঙ্গ, অনিন্দ্য পাকড়াশির প্রথম শিল্প-প্রচেষ্টা।"

শাজাহান হোটেলের দু' নম্বর সুইটের নিপুণা হোস্টেস অন্য সময় হলে হয়তো পেশাদারী হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিতেন। এখন কিন্তু তেমন কিছুই করলেন না। ছোট্ট মেয়ের মতো প্রশ্ন করলেন, "বাড়িতে আপনার তখন অনেক দাম বেড়ে যাবে, তাই না?"

"বাড়তে বাধ্য। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের রিপোর্ট ছিল লোকগুলো তেমন সুবিধে নয়। এ'দের মেজাজ মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন।"

করবী গুহ তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন করেছেন। অনিন্দ্য সরল মনেই উত্তর দিয়েছেন।

আমরা হোটেলে কাজ করি, কোনো কিছুতেই বেশী জড়িয়ে পড়া আমাদের পেশার অলিখিত আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ। বোসদা বোধ হয় দু নম্বর সুইটের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা লক্ষ করেছিলেন। আমাকে সোজাসুজি কোনো উপদেশ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাই হাসতে হাসতে একদিন বললেন, "হোটেল-জগতের গুরুদেবরা রিসেপ্‌শনিস্টদের বলে গিয়েছেন—বৎস, তোমার এবং তোমার অতিথির মধ্যে একটা কাউণ্টার রয়েছে, এ কথা সর্বদা মনে রাখবে।"

"এই দূরত্ব রাখাটাই কী বুদ্ধিমানের কাজ?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"আমারও আগে তাই মনে হতো।" বোসদা বলেছিলেন। "কিন্তু এখন দেখে দেখে শিক্ষালাভ করেছি। যে এই ব্যবধান সরিয়ে ফেলেছে, সেই ঠকেছে। নিজের গণ্ডির বাইরে গিয়ে সীতা রাবণের হাতে পড়েছিলেন। নিজের এলাকার মধ্যে বসে থাকলে পৃথিবীর কেউ সীতার কোনো ক্ষতি করতে পারতো না।"

পুরনো দিনের এই কথা লিখতে বসে আজ বারবার মনে পড়ছে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে শাজাহানের ছাদের একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই ঘটনা যদি আজ ঘটতো, তা হলে করবী দেবীকে নিশ্চয়ই বোসদার সাবধানবাণী স্মরণ করিয়ে দিতাম।

সারা দিনের কাজ শেষ করে সবেমাত্র নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিলাম। এমন সময় দরজায় টোকা মেরে করবী দেবী যে আমার ঘরে ঢুকবেন, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই হোটেলের কোনো কর্মচারী কোনোদিন মিস করবী গুহকে ছাদে অন্য কারও ঘরে আসতে দেখেনি। আমিও চমকে উঠেছিলাম।

করবী দেবী আমার ঘরের চেয়ারে এসে বসলেন। দেখলাম দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। "কী ব্যাপার?" আমি প্রশ্ন করলাম। "আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন।"

করবী গুহ তখনও হাঁপাচ্ছেন। "না, নিজেই চলে এলাম। আমার ঘরে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলা চলতো না।"

আমি করবী দেবীর মুখের দিকে তাকালাম। করবী দেবী বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার কী করা উচিত বলুন তো?"

করবী দেবীর দেহ কাঁপছে মনে হলো। কোনো রকমে বললেন, "সেদিন বুঝতে পারিনি। সন্দেহ হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম, মিস্টার পাকড়াশির জন্যেই মিস্টার আগরওয়ালা আগ্রহ দেখাচ্ছেন।"

করবী দেবীর কাছেই শুনলাম, দু নম্বর সুইটের মালিক মিস্টার আগরওয়ালা করবী দেবীকে ফোনে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, 'খুবই গোপন—টপ সিক্রেট। রাইটার এবং বুর্টের উপর একটু নজর রাখতে হবে। ওদের মনের অবস্থা কেমন বুঝছো?'

করবী গুহ বলেছিলেন, 'বিজনেস ব্যাপারে ও'দের সঙ্গে কথা বলিনি।'

'বলতে হবে: না হলে সুইট এবং হোস্টেস রেখে আমার কী লাভ হলো?' আগরওয়ালা উত্তর দিয়েছিলেন।

করবী গুহ তখনও ভেবেছিলেন, স্যর মাধব পাকড়াশির জন্যেই মিস্টার আগরওয়ালা খোঁজখবর নিচ্ছেন। ফোন নামিয়ে রাখবার আগে আগরওয়ালা বলেছিলেন, 'এ'দের সেবা-যত্নের যেন কোনো ত্রুটি না হয়, এ'দের খুশী থাকার উপর ভবিষ্যতে অনেক কিছু নির্ভর করবে।'

করবী দেবীর কথার তখনও কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। করবী দেবী বললেন, "এই মাত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আগরওয়ালা এ'দের সঙ্গে আলাদা দেখা করতে চান। মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের ভিতরের খবরাখবর জেনে নিয়ে উনি এখন নিজেই আসরে নামতে চান। পাকড়াশির পরিবর্তে আগরওয়ালার সঙ্গে নেগোসিয়েশন চালালে ক্ষতি কী? সবার অলক্ষ্যে আগরওয়ালা আসতে চান। যখন পাকড়াশিদের কেউ থাকবে না, তখন গোপনে তিনি এ'দের সঙ্গে দেখা করে কাজ হাসিল করতে চান, আমাকে কয়েকবার ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন অনিন্দ্য কতক্ষণ হোটেলে থাকে। গত কালও ফোন করেছিলেন, আজকের প্রোগ্রাম জানবার জন্যে। আমি মিথ্যে করে বলেছিলাম, যতদূর জানি রাত্রে অনেকক্ষণ থাকবেন। কিন্তু বোধ হয় ধরা পড়ে গিয়েছি। মিস্টার আগরওয়ালাকে গোপন খবরাখবর দেবার জন্যে কে একজন মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি আছেন, তিনি বলেছেন, অনিন্দ্য যাতে সন্ধ্যায় হোটেলে না যায় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। মিস্টার আগরওয়ালা বলেছেন, সে জন্যে যা খরচ হয় তা তিনি দেবেন। বাগানবাড়ি, মদ এবং অন্য কিছুর জন্যে মিস্টার চ্যাটার্জি যেন কার্পণ্য না করেন।"

"কী নাম বললেন, ফোকলা চ্যাটার্জি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম।" করবী দেবী বললেন। "এখন কী করি বলুন তো, এমন অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি। এতদিন ভাবতাম যাঁর চাকরি করি আমি তাঁর। এই অনিন্দ্যবাবুর কথাবার্তা আর কবিতা শুনে শুনে মনে হচ্ছে আমার নিজের সত্তা আছে। আমার সব কাজের জন্যে অন্তরের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে গিয়েই করবী গুহ যেন হাঁপাতে লাগলেন। বললেন, "আমার সাহস হচ্ছে না। আপনি একবার ও'কে ফোন করবেন?"

বললাম, "আমি ফোন ধরে দিতে পারি, কিন্তু আপনাকেই কথা বলতে হবে।"

ফোনে আর একটু দেরি হলে অনিন্দ্যকে আর পাওয়া যেতো না। অনিন্দ্য বললেন, "ব্যাপার কী?"

বললাম, "এখানে মিস গুহর সঙ্গে কথা বলুন।"

অনিন্দ্য বললেন, "আজ আর হোটেলে আসছি না। তার বদলে মামার সঙ্গে বেরবো। মামা বলেছেন, কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। উনি নিজে কবিতা পড়ে শোনাবেন। তারপর গঙ্গার ধারে যাবো। মামার হঠাৎ কবিতা শোনবার ইচ্ছে হয়েছে। আমি পড়ে যাবো, মামা শুনে যাবেন। মামা যা কাঠখোট্টা মানুষ —এমন সুযোগ আর কখনও না আসতে পারে।"

করবী দেবীর ঠোঁট দুটো দেখলাম কাঁপছে। বললেন, "ও-সব অন্য একদিন হবে। আজ আপনি এক্ষুনি, এই মুহূর্তে চলে আসুন।"

"কী বলছেন আপনি?"

"আপনাকে আমার এখনই দেখতে ইচ্ছে করছে।" করবী দেবী কোনো রকমে বলেই টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তাঁর সমস্ত দেহ যেন ম্যালেরিয়া রোগীর মতো ঠকঠক করে কাঁপছে।

করবী দেবী আর কালবিলম্ব না করে নিচেয় নেমে গিয়েছিলেন। আমিও স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। নিচেয় নেমে, কাউন্টারে উইলিয়মের সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলাম। উইলিয়ম এখন আমার উপর সদয়—আমাকে সে খুশী রাখতে চায়। যদি আবার কোনো দিন ডিনারে শ্রীমতী রোজীর সঙ্গ পাবার সম্ভাবনা থাকে, তখন কে তার বদলে ডিউটি দেবে?

আমাদের সামনেই যে ব্যাপারটা ঘটে যাবে তা বুঝতে পারিনি। কারণ মিস্টার অনিন্দ্য পাকড়াশি এবং আগরওয়ালা প্রায় একই সঙ্গে হোটেলের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

(ক্রমশ)

পকেটমারদের ঠকানো

লিভারপুলের ডেপুটি চীফ কনস্টেবল মিঃ হার্বার্ট আর বামারের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তের সবচেয়ে বন্ধু হচ্ছে যে গোয়েন্দা তাকে পাকড়াও করে—ধরা পড়ার সময় সেই চোর যতোই ক্ষুব্ধ হোক না কেন।

মিঃ বামার বলেন, অপরাধী কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর যে-ব্যক্তির সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করার তার সম্ভাবনা বেশী সে হচ্ছে যার সাক্ষ্য তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে। লিভারপুলের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান থাকা কালে মিঃ বামার অপরাধী ধরায় বৃটেনের সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তি বলে খ্যাতি অর্জন করেন।

মিঃ বামার বলেন, "'সৎ পুলিস' থাকার ঐতিহ্য দুষ্কৃতিকারীদের জগতে এখনও স্বীকৃত। কিন্তু আর যে একটা ঐতিহ্যের কথা প্রায়ই বলা হয়—'চোরদের কথা রাখা' সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা।

"বহু দুর্বৃত্ত দরকার হলে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকেও অর্থের বিনিময়ে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু যে গোয়েন্দা তাকে ধরিয়ে দেয় তার প্রতি ওদের শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়।"

"পাঁচ-হাতওয়ালা" পকেটমারের দল, যারা অত্যন্ত ভিড়ের সময় বাসে এবং ট্রেনে "কর্ম" সারতো তারা মুখ্যত মিঃ বামার ও তাঁর দলের চেষ্টাতেই উৎখাত হয়েছে।

কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম ও লন্ডনে এখনও তাদের কতকজন হাতসাফাই চালিয়ে যাচ্ছে।

"মাঝে মাঝে ওরা এক-আধ দিনের জন্য লিভারপুলেও আসে," মিঃ বামার সতর্ক করে বলেন, "এবং ফুটবল মাঠে বহু মনিব্যাগ ও নোট সাফ হয়ে যায় যখন সেসবের মালিকরা খেলা দেখায় মত্ত হয়ে থাকে।"

পকেটমারদের সম্পর্কে এবং কিভাবে তাদের ব্যর্থ করতে হয় সে সম্পর্কে মিঃ বামারের বক্তব্য হচ্ছেঃ "সর্বদা মনে রাখবেন যে, দুটি মাত্র পকেট মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে না। একটি হচ্ছে ঢাকা দিয়ে বোতাম আঁটার ব্যবস্থা সহ ওয়েস্টকোটের ভিতরকার পকেট, আর অপরটি ট্রাউজারের কোমরের পট্টির ভিতরদিককার পকেট।

"সর্বদা ঐখানে টাকা রাখলে পকেটমারদের জব্দ করতে পারবেন। আপনার টাকা নিতে গেলে আপনাকে আঘাত করে অচেতন না করে ফেললে সে কাজ হাসিল করতে পারবে না।"

পাইপে ধূমপানে মেয়েদের ঝোঁক

ফ্রান্সে তামাক তৈরি এবং বিক্রী রাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসা হওয়ার দেড়শ বৎসর পূর্তি এবং ওদেশে ধূমপানে আসক্তির চারশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে "শিল্পকলা, ইতিহাস ও জীবনে তামাক" এই পর্যায়ে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। প্যারিসের লোক ভেঙে পড়ছে কৌতূহলোদ্দীপক বিবিধ সরঞ্জাম দেখতে।

পৃথিবীর বহু মিউজিয়াম এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে আহরণ করা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যবহৃত বহু প্রকারের পাইপ এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পাইপের মধ্যে রয়েছে মেয়েদের পায়ের আকারবিশিষ্ট তামাকাধার। একটি পাইপের আধারটি মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুখাকৃতির অনুরূপ। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উপস্থিতিতে কেউ ঠোঁটে পাইপ রাখতে সাহস করতো না।

স্পেনে ফ্রান্সের দূত থাকাকালে জাঁ নিকোট তাঁর দেশে তামাকের প্রচলন করেন। দ্বিতীয় হেনরীর স্ত্রী ক্যাথরিন দ্য মেডিসির মাথাধরার ওষুধ হিসেবে তিনি একটি প্যাকেটে "গোপনীয় সামগ্রী" লিখে কয়েকটি তামাক পাতা পাঠিয়ে দেন।

পাতাগুলি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। এই নতুন নিরাময়কটি নিকোটের নামে নিকোটিয়ানা টাবাকুম নাম গ্রহণ করে।

অল্পকালের মধ্যেই লোকে ধূমপান করতে আরম্ভ করলেও প্রাচীনকালে অনেকে নস্যরূপেও ব্যবহার করতে থাকে।

তিনশ বছর আগে লন্ডন ও প্যারীসে "ফুৎকারে ধূম নিঃসরণ কলার অধ্যাপক" ছিল। তাঁরা চমৎকার কারুকাজ করা কাঠের বা হাতির দাঁতের তৈরী অমসৃণ খলে তামাক পাতা গুঁড়ো করতেন এবং সেই গুঁড়ো ব্যবহার করতেন নস্য হিসেবে। তাঁরা বলতেন ঐ তামাকচূর্ণ দাঁত ও পেটব্যথা এবং বায়ুজনিত রোগের প্রতিষেধক।

বৃটেনে আজকাল অদ্ভুতদর্শন পাইপ ব্যবহারের একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। ডেনমার্কের একটা ফ্যাশন ধরে গেলে পুরনো আমলের গির্জাধ্যক্ষদের পাইপ আবার প্রচলিত হতে পারে।

ডেনমার্কে সাড়ে-চার-ফিট লম্বা সৈনিক

বামনদেশের মহিলা নয় বা অতিকায় মানুষের দেশের সোফাও নয়—বস্তুত মহিলাটি স্বাভাবিক আকৃতির এবং শিকাগোর এক আসবাব নির্মাতা যারা বপুবৃদ্ধির কামনা করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে এই সোফাটি তৈরী করে শো-কেসে রেখেছেন।

পাইপ, যা বিদেশীরা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক সামগ্রী হিসেবে সংগ্রহ করে, ওদেশে তার পুনর্ব্যবহার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

দু ইঞ্চি গভীর এবং মুখের কাছটা আধ ইঞ্চি চওড়া পোর্সিলিনের তামাকাধার এতে যুক্ত রয়েছে। বিশেষভাবে প্রস্তুত তামাক জ্বালিয়ে ডেনমার্কের লোকে এটাকে টেলিভিসন দেখার সময়কার আদর্শ সাথী বলে গণ্য করে।

তামাকাধারটি পায়ের কাছে বসিয়ে ধূমপায়ী পাইপটা তার দু-হাঁটুর মাঝে রেখে টেলিভিসন পর্দার ওপর চোখ রেখে তৃপ্তির সঙ্গে ধূমপান করে যায়।

তার স্ত্রী বা মেয়ে মাঝে মাঝে আগুনটা জ্বালিয়ে দেয়। অতীতে ডেনমার্কের সৈন্যরা ব্যারাকে থাকার সময় স্নায়ুকে দৃঢ় করার জন্য এইভাবে ধূমপান করতো।

প্যারীসে পাইপে ধূমপায়ীদের একটি নতুন ক্লাব সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ অনুমতি নিয়ে এবং দু-একটান মাত্র দিতে রাজী এমন মহিলাদেরই কেবল এই ক্লাবে প্রবেশাধিকার।

একই গ্রাম কিন্তু দুটি দেশ

ইউরোপের মধ্যে অদ্ভুত এই গ্রাম। ওলন্দাজ সীমানায় ঘেরা কিন্তু এর অনেকাংশ পড়ে বেলজিয়ামে। কতকগুলি বাড়ি নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি বহুস্থানে পরস্পর দেশের সীমান্তকে ছেদ করে রয়েছে।

বিচ্ছিন্ন এবং প্রাকৃতিক শোভাময় এই বার্লে-হার্টগ গ্রামটি বেলজিয়ামের টার্নহাউট এবং হল্যান্ডের ব্রেডার মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। সম্পূর্ণভাবে ওলন্দাজ ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেও তেত্রিশটি আলাদা আলাদা প্লট বেলজিয়ামের সম্পত্তি এবং আরো কতকগুলি জমি রয়েছে যার মালিকানা কোনদিনই নির্ধারিত হয়নি।

কতক বাড়ির অর্ধেক একদেশে, অর্ধেক আর একদেশে পড়েছে। আবার কতক বাড়ি বেলজিয়াম এলাকায় হলেও সেই বাড়ি সংলগ্ন বাগান হল্যান্ডের এলাকায় বা তার বিপরীত। একটা কাফেতে বিলিয়ার্ড টেবিলটা রয়েছে ঠিক সীমান্তে এবং বলগুলি প্রতি মারে আন্তর্জাতিক এলাকা ঘুরে আসে। অনেকে ঘুমোয় দুদেশের এলাকা জুড়ে।

সীমান্ত এ... সব অসম্ভাব্য স্থানে অবস্থিত যে কোন আগন্তুকের পক্ষে কোন্ দেশে সে রয়েছে জানা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। বাড়ি চিনতে হয় রাস্তার নাম দেখে—সাদার ওপরে কালো লেখা বেলজিয়ান বাড়ি, কালোর ওপর সাদা অক্ষরে লেখা ওলন্দাজ এবং দুই দেশের এলাকায় পড়ে যে-সব বাড়ি সে-সবের রাস্তায় থাকে একটি কালো ও একটি সাদা অক্ষর। শাসন চালানো অত্যন্ত জটিল ব্যাপার, তবে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই কাজ চালিয়ে যায়।

দুটি কাউন্সিল চেম্বার আছে যদিও ওলন্দাজ মেয়রকে তার চেম্বারে যেতে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। দুটি যাজক-পল্লী আছে, অবশ্য মিশে রয়েছে কিন্তু বেলজিয়ান গির্জা যেখানে সে-জমিটি কার এলাকাভুক্ত আজো তা নির্ধারিত হয়নি।

দুটি বিদ্যালয় আছে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়েই নিজেদের জাতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়। দুটি ফায়ার ব্রিগেড পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে কাজ করে এবং কার

পৃথিবীর পঞ্চম মহাশূন্যচারি জন গ্লেন

এলাকায় আগুন লেগেছে সে-বিচার না করেই ডাক পেলেই তারা ছুটে যায়।

ওলন্দাজ এবং বেলজিয়ান—দু-দেশেরই পুলিস আছে এবং ওদের কাজ বড়ো কঠিন। কতক আইন তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হয়। যেহেতু সেগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। যেমন বেলজিয়ামে কেউ সাইকেল চড়ে সঙ্গে কুকুর নিয়ে গেলে পশুটিকে ছাড়া অবস্থায় রাখতে হবে, কিন্তু হল্যান্ডে ওকে একটা শিকলে বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে চলতে হবে।

যার যেদেশে জন্ম সেই মতোই স্থানীয় অধিবাসীদের জাতি নির্ধারিত হয়। অনেক পরিবার এ-এলাকা থেকে ও-এলাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করতে থাকায় অনেক পরিবারে ভাই ও ভগিনীরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিভুক্ত হয়। দুজন ভাইয়ের কথা জানা আছে যারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের সৈন্যবাহিনীভুক্ত।

আসলে বেলজিয়ানদের এই ভূভাগ যা ওলন্দাজ এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত তার মূলে হচ্ছে দ্বাদশ শতাব্দীর একটি ঘটনা। একবার এক যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ব্রেডার ব্যারন ব্রাবান্টের ডিউককে তাঁর যাবতীয় অকর্ষিত জমি দান করেন এবং সেই থেকে দুটি দেশের মধ্যে অবস্থাটা আয়ত্তে আনার সমস্ত রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে আসছে।

পৃথিবীর পঞ্চম মহাশূন্যচারি গ্লেন

যুক্তরাষ্ট্রের জন এইচ গ্লেন (জুনিয়ার) গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৭ম ফ্রেন্ডশিপ আধারে তিনবার ভূপ্রদক্ষিন করে ফিরে এসেছেন। মহাশূন্যচারীদের মধ্যে তিনি পঞ্চম ব্যক্তি। বয়সে তিনি প্রথম দু-জন মহাশূন্যচারি, রাশিয়ার উরি গাগারিন ও ঘেরমান টিটভ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এলান বি শেফার্ড ও ভার্জিল গ্রিসমের চেয়েও বড়।

চল্লিশ বৎসর বয়স্ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গ্লেনের এই যোগ্যতা অর্জনের পিছনে রয়েছে ছেলেবয়েস থেকেই আকাশে ওড়ার তাঁর উৎসাহ। ছ-বছর যখন বয়স তখনই ওর দৃষ্টিতে পরবর্তীকালে বৈমানিকের জীবন অবলম্বনের আকাঙ্খা ফুটে উঠতে দেখা যেত। এই আকাঙ্খা আরো তীব্র হয়ে ওঠে স্কুলে ছাত্র থাকা কালে এবং ওর শৈশবের আশা ফলবতী হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মেরিন কোরের পাইলট হতে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল এবং পরে কোরিয়ায় দুঃসাহসিক কৃতিত্বের জন্য পাঁচবার ডি-এফ-সি এবং সতের বার বিশিষ্ট বৈমানিক পদক লাভ করেন।

১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম তিনি শব্দের চেয়ে দ্রুততর গতিতে জেট বিমানে মাত্র তিন ঘণ্টা তেইশ মিনিটে নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেসে পৌঁছান। বিভিন্ন ধরনের বিমানে এবং সমস্ত রকম অবস্থার মধ্যে গ্লেনের সবশুদ্ধ পাঁচ হাজার ঘণ্টা বিমানে ওড়ার কৃতিত্ব আছে। গ্লেন বলেন, আকাশচারি হতে গেলে "আত্মবিশ্বাসের দরকার, যে বিশ্বাস আসতে পারে কেবল অভিজ্ঞতা থেকে......অনুকূল অবস্থার চেয়ে বিপজ্জনক ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাই আরো বেশি মূল্যবান।"

নিজের সম্পর্কে গ্লেন বলেন, তাঁর "হিরো বা অতিমানব হওয়া সম্পর্কে কোন মোহ নেই। আমি আগে যেমন ছিলাম আজো ঠিক তাই আছি—শুধু আগের চেয়ে আরো কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে।"

ভূপ্রদক্ষিণের পর গ্লেন আরো একটি উক্তি করেন: "এটাকে কোন মতেই একটা স্টান্ট বলে ধরা যেন না হয়। সমগ্র অভিযান প্রচেষ্টাটিকে আমরা এমনভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করছি যাতে এটা আগামী অভিযানগুলির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দৃঢ় করে তুলতে পারে।"

দুই কবি : জয়দেব ও রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে যে-দু'জন সংস্কৃত কবি সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁরা কালিদাস ও জয়দেব। রবীন্দ্রসাহিত্যের আদ্যোপান্ত কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট; তার একটি কারণ এই দুই মহাকবির ভাবনায় একটি ঐকাত্ম্য ছিলো, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কালিদাসের গ্রন্থাবলিতে নিজের ভাবনার সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। কালিদাসের শব্দ, অলংকার এবং চিত্রকল্প যথেচ্ছ গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ; কুণ্ঠাহীনভাবে, নিঃসংকোচে, তাদের প্রয়োগও করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে; এবং এই পূর্বসূরির ভাব ও ভাবনাকে তিনি কেবল আত্মীকরণই করেননি, স্বকীয়তায় এমনভাবে সমৃদ্ধ ও নবীকৃত করেছেন যে, মনে হয় যেন পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলির আশ্চর্য শব্দঝংকার ও ছন্দঃস্পন্দনও তেমনি সমানভাবে বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলো। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের মধ্যমণি তিনি, তাঁর দীপ্তিচ্ছটায় মধ্য ও নব্যভারতীয় সাহিত্য নিরীক্ষমান ; বিশেষত মৈথিল এবং বাংলার সাহিত্যে সেই বিচ্ছুরণ এখনো ক্রিয়াপরায়ণ হ'য়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানেও জয়দেবের শব্দ, চিত্রকল্প, অনুষঙ্গ, উল্লেখ এবং ছন্দঃস্পন্দন ইতস্তত পরিব্যাপ্ত ও অনুস্যূত হ'য়ে আছে; কিন্তু এটা ঠিক যে জয়দেবের কবিভাবনা রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের মতো প্রভাব বিস্তার করেনি। কালিদাসের প্রকৃতিচেতনা ও চিত্রলোকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-স্বাভাবিক সাযুজ্য ঘটেছিলো, জয়দেবের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিলো না, যদিও এটা লক্ষণীয় যে 'গীতবিতানে'র প্রকৃতিবিষয়ক গানগুলির ভিতর বর্ষা ও বসন্তের অবিশ্রাম উচ্চারণ কোনো-কোনো সময় 'গীতগোবিন্দ'কে স্পষ্টভাবেই মনে পড়িয়ে দেয়।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বসন্তরাসের কাব্য; তাঁর কাব্যের পত্রে-পত্রে বসন্ত প্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ও স্পর্শ পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু অনেক সময়েই মনে হয় প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন তাতে বড়ো কম; শব্দের ঝংকারে তার যেন অনেকটাই হারিয়ে গেছে; মেঘের মতো কেবল যেন কতগুলি ধ্বনিই সেখানে ক্রিয়াশীল, তার অন্তরালে এই বসন্ত তার সমস্ত নিয়েও কিছুটা যেন কুণ্ঠিত ও বিশীর্ণ। কালিদাসের অকাল বসন্ত বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করলেই প্রভেদটুকু ধরা পড়ে, এবং বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেন কালিদাসকেই নিকটতর আত্মীয় ব'লে জেনেছিলেন। যেটা সেখানে প্রত্যক্ষ, অবারিত ও অসংকোচ, জয়দেব সেখানে বড়ো বেশি নির্ভর করেছেন ব্যবহৃত, আলংকারিক, কৃত্রিম উল্লেখ ও ধ্বনিমালার উপর। অথচ ক্ষমতা তাঁর কম ছিলো, এমন নয় : 'গীতগোবিন্দে'র প্রারম্ভশ্লোকে জয়দেব একটিমাত্র চরণে বর্ষার এমন একটি বিধুর, ধূসর ও মলিন মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলো; বারে-বারে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতায় বা গানে এর ধ্বনি-গৌরবকে প্রয়োগ করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য জয়দেবের বসন্ত বর্ণনার বিলাসবিহ্বলতা রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিনই তেমনভাবে আকৃষ্ট ও মগ্ন করতে পারেনি— কেননা বস্তুত সেই বসন্ত-বাতাস মধ্যযুগ থেকে এতদূরে তার পরিমল ও স্নিগ্ধতা পাঠাতে পারেনি, কেননা হৃদয়ের বদলে সে একান্তভাবে নির্ভর করেছিলো আমাদের শ্রবণের উপর।

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করেছিলেন জয়দেব; তার জন্য শব্দঝংকার ও ছন্দঃ-

স্পন্দনের প্রয়োজন ছিলো, এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য। এবং পরবর্তী বৈষ্ণব কবিকুল যে বহুক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা বিহ্বল ও মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন, বৈষ্ণব পদাবলিই তার সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের উপক্রমে তিনি বলেছেনঃ
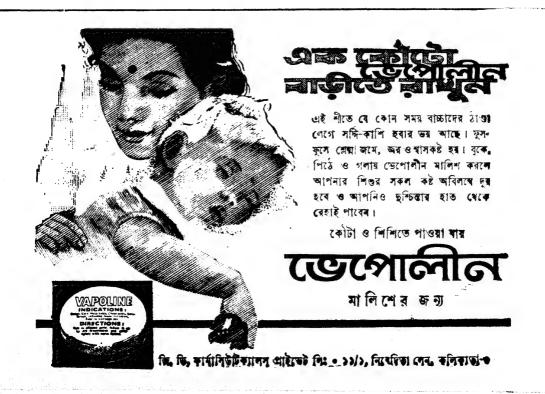
যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥'

এই 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী' ছন্দোরসিক রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিলো, কিন্তু উপনিষদের ভাবরসে পরিপুষ্ট 'সুপরিশীলিত' রবীন্দ্রমানসে রসবিলাসকলা কুতূহল জাগায়নি। সেইজন্যই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমভক্তিমধুরভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করলেও জয়দেবের কবিভাবনাকে রবীন্দ্রমানস স্বীকার করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জয়দেব রাধাকৃষ্ণবিষয়ক লৌকিক প্রেমকবিতার ধারাকে আধ্যাত্মিকতার ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিত করলেও, শ্রীচৈতন্যের স্বীকরণ ও আস্বাদনের দ্বারাই 'গীতগোবিন্দ' আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভ করেছিলো।

জয়দেবের পদাবলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবতেন, তা নিম্নোধৃত মন্তব্যেই সর্বাধিক স্পষ্টঃ

"জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে 'কুমারসম্ভবে'র একটি শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক—

"আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা-
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥"

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে।......এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে, যে-সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।"

কিন্তু জয়দেবের কবিভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার না-করলেও 'গীতগোবিন্দে'র অপূর্ব ধ্বনিশিল্প ও শব্দসম্পদ যে বাল্যবয়সেই তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো, সে-কথা 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত আছেঃ

"সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল, তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহংগতয়া নিশিরহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং' এই পদটি ঠিক মতো যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।"

'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতায় কবি প্রসঙ্গক্রমে জয়দেবের প্রতিও শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন। 'গীতগোবিন্দে'র মঙ্গলাচরণ শ্লোকের প্রথম পদটি রবীন্দ্রনাথের মনে এত গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিলো যে, 'মেঘদূতে'র বর্ষাবর্ণনার ভাবানুষঙ্গে জয়দেবের কথা তাঁর মনে পড়েছিলোঃ

'ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি; যে-শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর-এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।'

'সোনারতরী'র 'বর্ষাযাপন' কবিতাতেও 'গীতগোবিন্দে'র স্মৃতি মনে পড়েছিলোঃ

'খুলিয়া প্রথম পাতা গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি "মেঘৈ অম্বর মেদুর"।'

সংস্কৃতে রচিত হ'লেও শব্দে-ছন্দে-ভাবে 'গীতগোবিন্দ' বাংলাসাহিত্যেরই সমধর্মী, এবং অব্যবহিত পরের বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও বহুস্তর। গীতিকবিতায় আরম্ভ অপভ্রংশ থেকে; চর্যাপদে এবং তৎকালীন অন্যান্য লোককবিতায় এই গীতিধর্মিতা ছিলো, যার পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় জয়দেবের পদাবলিতে।

বৈদিক এবং সংস্কৃতের ছন্দ অক্ষরসংখ্যাত (বৃত্ত)। অবশ্য এটা ঠিক যে সংস্কৃতে মাত্রাকৃত জাতিছন্দও আছে। কিন্তু সাধারণভাবে প্রাকৃত-অপভ্রংশেই মাত্রাবৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছিলো। এই অপভ্রংশ ও লোকসাহিত্য থেকেই জয়দেব গীতিকবিতার রূপকল্প ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর গীতগুলিতে তা সর্বোত্তমভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

উপরন্তু 'গীতগোবিন্দ' হ'লো বৈষ্ণবপদাবলির আকর। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, শশিশেখর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের উপর জয়দেবের প্রভাব বিলক্ষণ স্পষ্ট; তার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, ব্রজবুলি মূলতই জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত।

বৈষ্ণবপদাবলির ভাবনা যেমন রবীন্দ্রমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিলো, তেমনি বৈষ্ণব কবিতার ছন্দ—বিশেষ ক'রে ব্রজবুলি—স্বভাব-ছন্দোরসিক রবীন্দ্রনাথের কানে ঝংকার তুলেছিলো। জয়দেব এবং ব্রজবুলির অনুপ্রাণনার প্রত্যক্ষ ফল 'ভানুসিংহের পদাবলী'।

সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উচ্চারণরীতির অনুসরণে আদি বাংলায়—যেমন 'চর্যাপদে'—এবং বিশেষ ক'রে জয়দেবের অনুসরণে বৈষ্ণবপদাবলিতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হ'লেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যাদি সাহিত্যে অক্ষরবৃত্ত পয়ার-ত্রিপদীই সাধারণত প্রযুক্ত হয়েছিলো। বাংলাসাহিত্যের আধুনিক পর্বের প্রারম্ভেও ওই ছন্দোধারাই প্রচলিত ছিলো। ভারতচন্দ্র কিংবা তৎপরবর্তী কোনো-কোনো কবি, এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, সংস্কৃত উচ্চারণরীতির অনুসরণে বাংলায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে বাংলা উচ্চারণরীতি এবং ধ্বনিবৈশিষ্ট্য অনুসরণ ক'রে 'নতুন' মাত্রাবৃত্তছন্দ (বা সত্যিকার বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ) ব্যবহার করেন*। এই ছন্দের প্রয়োগের বেলায় গীতি-নিপুণ ছন্দঃশিল্পী রবীন্দ্রনাথের শ্রুতি-অনুভূতি সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে তখন বিশেষ ক'রে 'গীতগোবিন্দ' ও 'বৈষ্ণব পদাবলি'র ছন্দসুষমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—তাও সহজেই অনুমান করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বিবিধ-পর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা দ্বারা বাংলা গীতিকবিতার স্রোতময়তাকে বহুমুখে প্রবাহিত করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতাকেও পঞ্চমাত্র-পর্বিক এবং ষণ্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্তছন্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

এই পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দ রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের অনুসরণে প্রবর্তন করেছেন, এ-কথা বলতে বাধা নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেনঃ 'আমার বক্তব্য এই যে, পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য থেকে নিয়েছেন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।' কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' এই ছন্দের অতি সুন্দর আদর্শ রয়েছে। যেমনঃ

'অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণং।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥' বা,

'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতিদর তিমিরমতিঘোরম্।'

উপরন্তু 'জীবনস্মৃতি'র পূর্বোদ্ধৃত অংশটিতে প্রথম পদটির সৌন্দর্য বালক রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে আকৃষ্ট করেছিলো, তার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। অধ্যাপক সেন মহাশয় বলেছেন, 'তাঁর বাল্যরচনাতেই যে এ-ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নয়।'* তাঁর মন্তব্যের সপক্ষে তিনি যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, তার একটি এখানে উল্লেখ করা হ'লোঃ

ভ্রমর কহে, "হোথায় বেলা, হোথায় আছে নলিনী,
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলিনি!
মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।"
[শৈশব সংগীত]

জয়দেবের ছন্দের দ্বারা মুগ্ধ, সম্মোহিত ও আকৃষ্ট বালক রবীন্দ্রনাথ 'তাঁর বাল্যরচনাতেই' যে পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের প্রয়োগ করেছিলেন, তারই সুষ্ঠু সুন্দর ও পরিণত সুষমা তাঁর পরবর্তী রচনায় দ্রষ্টব্য। একটি প্রসিদ্ধ কবিতাকেই এখানে মনে করা যাকঃ

'পরশ কাব পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে।
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।'
[মদনভস্মের পর : কল্পনা]

জয়দেবের পদাবলির ধ্বনি, শব্দ, চিত্রকল্প, অনুষঙ্গ ও উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিলো, তারা ধারাটিকে লক্ষ্য ক'রে দেখা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বর্ষা ও বিরহ, বসন্ত ও তার সুষমা, ধূসর দিগন্ত ও মিলন-বিহ্বলতা—'গীতবিতানে'র অজস্র গান জয়দেবের এই গীতসুধার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এটা সর্বক্ষেত্রেই স্মরণীয় যে ভিক্টোরীয় রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন ছিলেন ব'লে রবীন্দ্রনাথ ও জয়দেবের ভিতর যে যোগাযোগ ও আত্মীয়তা লক্ষ্য করা যায় তা একান্তভাবে মানসিক না হ'য়ে বহুক্ষেত্রেই বরং সহচার হ'য়ে পড়েছে। অবশ্য 'ভানুসিংহের পদাবলী' তার ব্যতিক্রম, কেননা রবীন্দ্রনাথের এই বাল্যরচনায় জয়দেবের প্রভাব অধিকতর প্রত্যক্ষ এবং অবারিত।

'গীতগোবিন্দে' রাধাবিরহ এইভাবে আরম্ভ হয়েছেঃ

'বসন্তে বাসন্তীকুসুম সুকুমারৈরবয়বৈ-
র্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিত কৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দকন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী॥'

'ভানুসিংহের পদাবলী' ও বসন্ত দিয়ে শুরু; বিরহকাতরা রাধামাধবকে অনুসন্ধান করছেন। প্রথম দুটি পদে যে-রাধাবিরহ ও বসন্তবর্ণনা আছে, তা মূলত জয়দেবেরই ভাবানুসরণে রচিত।

'বসন্ত আওল রে।
মধুকর গুনগুন, অমুয়া মঞ্জরী,
কানন ছাওল রে।'...

......ইত্যাদি পদটিতে ব্রজবুলির কোমল ধ্বনির ভিতরে 'গীতগোবিন্দে'রই গুঞ্জরণ শোনা যায়। 'রভসরস', 'ললিতগীত' প্রভৃতি শব্দ তো সরাসরি জয়দেবকে মনে করিয়ে দেয়।

'গীতগোবিন্দে'র পঞ্চম সর্গে সখী এসে রাধাকে সাকাঙ্ক্ষ মাধবের কথা বলছেন এবং তাঁকে কুঞ্জে যাবার জন্য ত্বরান্বিত হ'তে পরামর্শ দিচ্ছেনঃ

'নামসমেতং কৃতসংকেতং বাদয়তে
মৃদু বেণুম্।......
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি
তব পন্থানম্।......
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয়
নীল নিচোলম্।'

'ভানুসিংহের পদাবলী'র পঞ্চম পদটি তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায়ঃ

'সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহু চাহিয়া,
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুমহার,
পিনহ নীল আঙিয়া।'...

অষ্টম পদটিও প্রসঙ্গত স্মরণীয়ঃ

'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।'...

এবং নবম পদের

'সতিমির রজনী, সচকিত সজনী,
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে,
বালা বিরহ বিষণ্ণ।...'

......প্রভৃতি পংক্তির সঙ্গে 'গীতগোবিন্দে'র পূর্বোদ্ধৃত পংক্তিগুলির ভাব, ভাষা ও

* কবি বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা এবিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। 'দেশে' প্রকাশিত 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন 'মানসী' কেবল তার ভাবনার দিক থেকেই নয়, ছন্দ ও মিলের অচিন্ত্যপূর্ব ব্যবহারেও বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছিলো। এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে মুদ্রিত 'রবিশস্য' এবং 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দুটি স্মর্তব্য।

* দ্রষ্টব্যঃ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।

ধ্বনির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উপরন্তু,

'আজু সখি মুহুমুহু
গাহে পিক কুহুকুহু
কুঞ্জবনে দুঁহুদুঁহু
দোহার পানে চায়।'
(১৯/ভানুসিংহের পদাবলী)

বা

'বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
বিজুলী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।'...
(১৪/ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

প্রভৃতি পংক্তির ছন্দ, ধ্বনিস্পন্দন ও ভাবনায় জয়দেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এরকম দৃষ্টান্ত অনায়াসেই আরো উদ্ধৃত করা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেহেতু বলেছেন যে, 'ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই', এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে' তিনি 'বহন করে' এসেছেন, সেইজন্য তাঁরই কথা মতো 'একে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত ব'লেই গণ্য' করা উচিত। আসলে 'পদাবলীর যে-ভাষাকে পদাবলী বলা হোত' রবীন্দ্রনাথের 'কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে।' 'শব্দতত্ত্বে' তাঁর 'ঔৎসুক্য স্বাভাবিক।' কিন্তু শব্দতত্ত্ব পেরিয়েও জয়দেব কোনো-কোনো জায়গায় তাঁর অধিকার খাটিয়েছেন এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা' ব'লে দু-একটি চিত্রকল্পের নজির বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে। নবম পদের ওই বিরহ-বিষণ্ণ বালার চিত্রকল্পটি জয়দেবের 'সা বিরহে তব দীনা' এবং 'সীদতি তব বিরহে বনমালী' এই দুটি বাকপ্রতিমার সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে, এটা বলা যায়।

জয়দেবের আসল প্রভাব পড়েছিলো রবীন্দ্রনাথের গানে; 'ভানুসিংহের পদাবলী'র সুরসুষমাও স্মর্তব্য, এবং গানের সুরকে যেহেতু সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয় শব্দ ছন্দ ও ধ্বনির তানে-লয়ে, সেইজন্য জয়দেব 'গীতবিতানে'র রবীন্দ্রনাথকেই সবচেয়ে কাছে পেয়েছিলেন। 'গীতবিতানে'র প্রকৃতি বিভাগের একটি বসন্তসংগীতে (১৮৯নং) আছে ঃ

'এসো থরথর কম্পিত মর্মরমুখরিত
নবপল্লবপুলকিত
ফুল আকুল মালতী বল্লী বিতানে—
সুখছায়ে মধুবায়ে।
এসো বিকশিত উন্মুখ এসো চিরউৎসুক
নন্দনপথ চিরযাত্রী।
এসো স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে
গানে-গানে, প্রাণে-প্রাণে॥'

এর ছন্দ ও ধ্বনিস্পন্দন 'গীতগোবিন্দে'র বসন্তবর্ণনার অনুসারী। তুলনার জন্য দুটি চরণ উদ্ধৃত করছি ঃ

'উন্মাদ মদনমনোরথ পথিকবধূজন-
জনিত বিলাপে।
অলিকুলসংকুল কুসুমসমূহ নিরাকুল
বকুলকলাপে॥'

অন্তর্মিলের এই বিচিত্র ও তরঙ্গোন্মুখ ব্যবহার—যা জয়দেবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এমনকি 'গীতবিতানে'র 'বিচিত্র' পর্যায়ের ১২৩নং গানটিকেও প্রসঙ্গক্রমে মনে করিয়ে দেয় ঃ

'হায় হায় হায়
দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহচঞ্চল চাতকদল চল
চল' চল' চলহে।
টগ'বগ'-উচ্ছল কাথলিতল-জল
কল' কল কল হে॥'

কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার ভিতর জয়দেবের শব্দ এবং চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, এখানে তার কয়েকটি নিদর্শন উপস্থাপিত করা হ'লো। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণ করা যাক বর্ষার সেই বিখ্যাত চিত্রটিকে ঃ জয়দেবের সেই প্রসিদ্ধ 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ' এই শ্লোকটিকে রবীন্দ্রনাথ বহুবার নানাভাবে তাঁর কবিতায় ও গানে ব্যবহার করেছিলেন, এবং উদ্ধৃত অংশগুলিকে তাদের স্মারক হিসেবেই গ্রহণ করা বিধেয়।

'আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের
সজলমেঘমেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা।'
'তিমিরমেদুর বনান্তলে'......
'দেখায় শ্যামলতর শ্যামবনশ্রেণী।'
'শ্যামল তমাতল।'

এবং এটা অনস্বীকার্য যে এই ছোটো গানটিও তো জয়দেবেরই সঙ্গে একটি গোপন আত্মীয়তা অনুভব ক'রে থাকে ঃ

'নীলাঞ্জনছায়া,
প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত,
বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ
পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা
কান্তাবিরহ কান্তারে॥'

আরো যে-সব শব্দ বা চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ অসংকোচে গ্রহণ করেছেন, নিম্নে তারই একটি ছোটো তালিকা দেওয়া হ'লো।

এই বাক্যাংশগুলির সাদৃশ্য বিলক্ষণ। কিন্তু এটা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ এদের স্বীকরণ ক'রে নিয়েছিলেন, কেননা তাঁর ভাষা ও ভাবনার সঙ্গে এগুলি এমন মসৃণ ও মোলায়েমভাবে মিশে গিয়েছে যে, আমরা সাধারণত লক্ষ্যই করি না এই সব চিত্র বা শব্দের জন্য তাঁকে জয়দেবের কাছে ঋণ স্বীকার করতে হয়েছিলো; আসলে এরা বাইরে থেকে চাপানো কিছু নয়, নয় কৃত্রিম কিংবা চর্চিত; ফলে এই স্বীকরণ এমন সার্থক ও অব্যর্থ হয়েছে যে, এই সব প্রয়োগের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রতিভাব শোষণ-ক্ষমতা, বিনয় ও স্পর্শাতুরতাই ধরা পড়ে। 'মুকুল-আকুল বকুলপুঞ্জ,' 'আকাশ আলোক পুলকপুঞ্জ', 'মধুকরগুঞ্জিত কিশলয়পুঞ্জিত', 'নিবিড় তিমিরময়কুঞ্জ,' 'তমালকুঞ্জতিমিরে,' 'মুখরবনমর্মরগুঞ্জিত, কুন্দকুসুমরঞ্জিত, ফুলপল্লবপুঞ্জিত' প্রভৃতি শব্দচিত্রণে জয়দেবের পদাবলির কেবল ধ্বনিস্পন্দনই নয়, শব্দসম্ভারের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

এই আলোচনাটি দিগ্‌দর্শনমাত্র। অবক্ষীয়মাণ প্রাচীন বাংলার কবি জয়দেব, আর উদীয়মান নবীন বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ—দুজনের কবিসত্তায় প্রভেদ বিস্তর, ভাবনা ও মানসলোকে যোজনপ্রতিম ব্যবধান। কিন্তু দুজনাই বাঙালী দুজনেরই মাতৃভাষা বাংলা—এই তথ্যটিই হ'লো সেই সূত্র যা, মনের দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও, দুজনকে কাছাকাছি এনেছিলো, আত্মীয় করেছিলো, সম্পর্কিত করেছিলো। এই সাযুজ্য কতদূর ব্যাপক, এবং কী পরিমাণ গভীর, তা ভাষাবিদরা বিবেচনা করবেন। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাটি কেবল আরেকবার স্মরণ করি ঃ 'সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।'

জয়দেব	রবীন্দ্রনাথ
কুঞ্জিত কুঞ্জকুটীরে ললিত গীতে	কুসুমঝরা নিকুঞ্জকুটিরে। ললিতগীতকলিত কল্লোলে। ললিতগীত গাহিরে।
পথিকবধূ	পথিকবধূ; পথিককললনা প্রভৃতি।
সচকিত নয়নম্	চকিতনয়না।
মৃগমদসৌরভরভসে	ক্ষিতিসৌরভ রভসে; রভসরস গান।
নিভৃত নিকুঞ্জ	আসন বিছায়ো নিভৃতকুঞ্জে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জম্	বঞ্জুলে নিকুঞ্জতলে; অন্থরমঞ্জুল ছন্দে; বঞ্জুলমঞ্জরী; চাহিয়া বঞ্জুলবনে; অতিমঞ্জুল, অতিমঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে।
সজল জলদ	সজলঘন; সজলসমীর।
নবপল্লবঘন	ঘনপল্লবপুঞ্জে।

নিঃশব্দ আহ্বান

শ্রী রমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

[সত্য ঘটনা অবলম্বনে : পুলিসের ডায়েরী থেকে]

"কোথায় যাচ্ছিস, খোকা?"

শার্টের হাতাটা গুটিয়ে নিতে নিতে উচ্ছ্বসিতভাবে সুব্রত বলল, "দীপাদের বাড়ি যাচ্ছি মা।"

"না। যাবি না।"

ছোট্ট কথা; সুব্রত স্তব্ধ হয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার সমস্ত উৎসাহ এক-মুহূর্তে হারিয়ে গেছে। মার চোখে মুখে পরিবর্তন। সুব্রত ধীর গলায় জিজ্ঞেস করে, "কেন মা?

কিছুটা সময় যায়। মার দিক থেকে কোন সাড়া নেই। সুব্রত আবার জিজ্ঞেস করে, "তুমি চুপ করে রইলে—?"

মার যেন সংবিৎ ফিরে আসে। "তোর সেকথা শুনে কাজ নেই।" মা মুখ নত করে বললেন।

সুব্রত চিন্তিত হল। তবে কি দীপা......।

"মা, কি এমন কথা—। তুমি বল।"

"দীপার বিয়ে হয়ে গেছে।" মা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন। বলতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

"বিয়ে হয়ে গেছে!" সুব্রত বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"বছর খানেক আগে।" মা বললেন; একটু চুপ করে থেকে ছেলেকে বোঝাবার মতন করে বললেন, "শুধু তাই নয় খোকা; দীপার আজ খুব বিপদ।"

বিপদ! সুব্রতর মন ফাঁকা। ভাবতে-পারছিল না কিছু। "তুমি কি কোন কথা স্পষ্ট করে বলতে পার না?"

মা একবার মুখ তুলে তাকালেন। সুব্রত তাঁর একমাত্র পুত্র। মার মন দুর্বল হল। সুব্রত কেমন মুষড়ে পড়েছে।

"দীপার বরের কাল ফাঁসি।" কথাটা বলেই মা আবার মাথা নিচু করলেন।

"ফাঁসি! বিয়ে হতে না হতেই ফাঁসি।"

সুব্রত বসে পড়ল। ছেলেবেলার স্মৃতি ভাসছিল চোখের সামনে। ছোটবেলা থেকে সে ছিল তার খেলার সাথী। সবাই কেন, দীপার মা তো বলেই বেড়াতেন, দীপার বিয়ে দেবেন সুব্রতর সঙ্গে। ওর মা প্রতিটি পুজোপার্বণে দীপাকে নতুন কাপড়চোপড় দিতেন। সেও পেত দীপার মার কাছ থেকে। যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে এসে দাঁড়াল ওরা, দীপার চাঞ্চল্য কমল, এল ধীর স্থির ভাব। ওকে দেখলে ছুটে পালিয়ে যেত। কত লজ্জা, সংকোচ। তবুও তারা একে অন্যেকে ভালবাসা।

একদিন দীপার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সুব্রতকে সুদূর এলাহাবাদে চলে যেতে হয়—মাত্র ছ মাসের জন্যে। ছ মাস ফুরোতে অফিস থেকে হুকুম হল আরও ছ মাস থাকতে হবে। ভারত সরকারের চাকরি। চাকরি যদি করতে হয় হুকুম মেনে নিতে হবে। ছ মাসের জায়গায় বছর কাটল এলাহাবাদে। এই একটা বছর তার মনে কত রঙিন স্বপ্ন বাসা বেঁধেছে। দীপা ছাড়া অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে, একথা শুধু ওর দিক থেকেই নয়, দীপাও ভাবতে পারেনি কোন দিন। সেই অসম্ভব কথাটা আজ কঠোর বাস্তবে সম্ভব হয়ে দাঁড়াল। দীপা যে আজ বিপদ-গ্রস্ত শুধু তাই নয় সে আজ তার সব কিছু হারাতে বসেছে। দীপার আশু বৈধব্য কল্পনা করে, সুব্রতর মন অপরিসীম সহানু-ভূতিতে ভরে উঠল।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে চলতে শুরু করে।

"খোকা!"

সুব্রত দাঁড়াল, "আমায় কিছু বলবে?"

"না গেলেই কি নয়?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুব্রত। বলল, "যেতেই হবে, মা।"

সুব্রত চলে গেল।

মা এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সুব্রতর যাওয়ার দিকে। সুব্রত তার একমাত্র সন্তান। সুব্রত যখন চার বছরের তখন ওর বাবা সুশান্ত চৌধুরী মারা যান। তিনি বন-বিভাগে রেঞ্জার ছিলেন। গাঁয়ের জমিজমা কিছু বিক্রি করে চাটগা শহরে নন্দনকানন পল্লীতে পাকা বাড়ি করেছিলেন। বাড়ির ভাড়া এবং গাঁয়ের জমিজমা থেকে যে আয়, সে আয়ে ওরা দুটি প্রাণী সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তা ছাড়া সুব্রত সরকারী অফিসে চাকরি করে। অতটুকু থেকে সুব্রতকে এত বড় করেছেন। কত স্নেহে কত যত্নে তিনি ওকে মানুষ করেছেন। সুব্রত বি এ পাস করে ওর মনের আশা পূর্ণ করেছে। তিনি আজ বুঝতে পারলেন সুব্রতর মনের কথা। তিনি বাধা দিলেন না।

ওর মনেও দুঃখ কম নয়। দীপার বাবা শক্তিপদ রায়কে তিনি কত অনুরোধ করে ছিলেন। কিন্তু শক্তিবাবু কোন কথা রাখেননি। এমন কি ওঁর স্ত্রী সুনন্দারও নয়। তাড়াতাড়ি করে একজন রেলওয়ে অফিসারের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন দীপার। বিয়ের আগের দিনও দীপা তার মাথাটা তাঁর পায়ের উপর রেখে কত কেঁদেছিল। সে দুঃখটা তাঁর রয়েই গেল। দীপার জন্য বড় দুঃখ হয়, কিন্তু তাঁর করবার কিছুই ছিল না। তিনি ভয়ে এ খবরটা সুব্রতর কাছে চেপে গিয়ে-

ছিলেন। হয়ত ছেলে একথা শুনে বিদেশে একটা কিছু করে বসবে। দীপার এত বড় একটা বিপদে সুনন্দা মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। ওদের বাড়ির একটু দূরেই, ছোট দুটি ঘর ভাড়া করে রয়েছেন ওঁরা। শক্তিপদবাবু পোস্ট অফিসের কেরানী, সামান্য আয়। দীপা ও গোপা ওঁর দুটি মেয়ে।

(২)

"মাসিমা, মাসিমা!"

শক্তিপদবাবুর ছোট্ট বাড়িটার প্রতিটি প্রাণী যেন ঐ ডাকে শত অপরাধে অপরাধীর মতো বাইরের দরজাটার দিকে চেয়ে থাকে।

ওদের মধ্যে একটি প্রাণী অভ্যাসবশত দরজা খুলে দিতে এগিয়ে এসে থেমে যায়। কাপড়ের আঁচলটা দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখে। চোখের জল আসে হুহু করে।

"মাসিমা, মাসিমা।"

বাইরের দরজাটা এবার বেশ জোরে জোরে নড়ে। দাঁতের ফাঁক থেকে কাপড়ের আঁচলটা টেনে নিয়ে দীপা ঘরের মধ্যে চলে গেল।

আস্তে আস্তে এসে সুনন্দা দরজা খুলে দিল। অতদিন পর এসে সুব্রত সুনন্দাকে প্রণাম করল। অন্য সময় সুনন্দা কত কথা জিজ্ঞেস করত। দীপা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে একটু একটু হাসত। সেই চাপা হাসির মধ্যে ফুটে উঠত কী যেন! সুনন্দা বুঝতে পারত, সুব্রত মুখে কিচ্ছু না বললেও, ওর ভিতরের মানুষটি পাশের ঘরে যাবার জন্য ছটফট করছে। হেসে বলত সুনন্দা, ঘরে গিয়ে বস বাবা। সুব্রত খুশী হয়ে পাশের ঘরে চলে যেত।

আজ ভেজা গলায় সুনন্দা বলল, "বেঁচে থেক, বাবা। আজই বুঝি এলে?"

সুব্রতর মুখে কোন কথা নেই। শুধু মাথা নেড়ে জানাল, হাঁ।

অতদিন পর সুব্রত অনুভব করল, সে ইতিমধ্যে কত পর হয়ে গেছে ওদের কাছে। দীপার কাছেও। কি করে সে আত্মপ্রকাশ করবে, আর কি করেই বা অতদিন পর দীপাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে যাবে? কোন দিক থেকেই কোনো সূত্র খুঁজে পেল না সুব্রত। হঠাৎ তার গোপার কথা মনে পড়ল। সুনন্দাকে এড়িয়ে, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে ডেকে উঠল, "গোপা থোকায় রে, গোপা?"

হঠাৎ সেখানে বজ্রাঘাত হলেও বুঝি সুব্রত অতটা বিস্মিত হত না। সুনন্দা শুধু যে সশব্দে কেঁদে উঠল তা নয়, কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সুব্রত বুঝতে পারে না। তবে কি গোপার কিছু হয়েছে? কই মা তো এমন কিছু ইঙ্গিত করেননি। সুনন্দার অবশ দেহ উঠাতে চেষ্টা করে সুব্রত। দীপা এসে সাহায্য করে। শুধু এক পলক চেয়ে দেখে দীপাকে, তার পরেই চোখ নত করে সুনন্দাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয় বিছানার উপর। দীপা হাত পাখা নিয়ে মাকে হাওয়া দিতে থাকে। এবার সুব্রত ভাল করে দীপার পরিচিত মুখখানি দেখে। দীপার আনত মুখে ওর সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণা পরিস্ফুট। সুব্রত অতি পরিচিত, কত আপনজন দীপাকে একটি কথাও জিজ্ঞেস করতে পারে না। সিঁদুরের শীর্ণ একটু রেখা তাকে শত যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে। সে আজ পরপুরুষ।

কতক্ষণ পরে সুনন্দা উঠে বসল। দীপা চলে গেল পাশের ঘরে। একটা কথাও সে বলতে পারল না। শক্তিপদবাবু তখন বাসায় নেই। তিনি অফিসে। সুনন্দা নীরব। সুব্রত চুপচাপ কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে সোজা চলে যায় পাশের ঘরে।

দীপা পাশের ঘরে ছিল। চোখ তুলে তাকাল।

সুব্রত মাথা নীচু করে জিজ্ঞেস করে, "গোপা কোথায়, ওকে তো দেখছি না?"

দীপা চুপ। সুব্রতর কথার কোন উত্তর দেয় না। মাথা নীচু করে শুধু কাঁদে।

সুব্রত সমস্যায় পড়ে। দীপার কাছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য। সুব্রত বেরিয়ে আসছিল।

"একটা কথা ছিল।"

সুব্রত ফিরল, "বল।"

"তুমি বুঝি আজই এলে, না?"

সুব্রত পাশের চেয়ারে বসে বলল, "হাঁ, আজই।"

"সব কথাই তুমি শুনেছ বোধ হয়?"

"মার কাছে খানিক শুনলাম, কোন কথাই
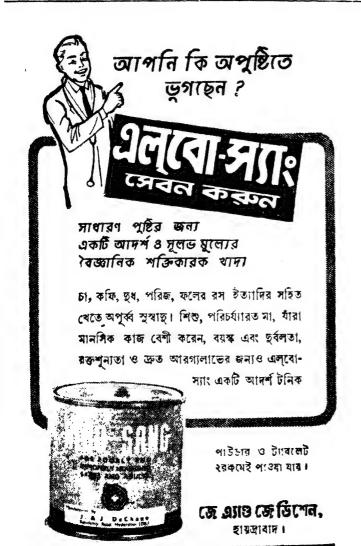
আমি বুঝতে পারছি না। মনে হয় গোপাকে নিয়ে বোধ হয় একটা কিছু হয়েছে।"

দীপা অনেকক্ষণ নীরব থাকল। তারপর নীচু গলায় বলল, "মানুষের বিপদ যে এমনিভাবে আসতে পারে, সেকথা আমার জানা ছিল না।

তুমি চলে গেলে, কয়েক মাস পরেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। ওঁর নামটা শুনে রাখ। অলোক দে। পাহাড়তলি আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে তিনি চাকরি করেন। অতদিন ওখানেই ছিলাম। ওঁর কাছ থেকে কোন দিনই খারাপ ব্যবহার পাইনি। সব কথাই তিনি জানতে পেরেছিলেন। তোমার এবং আমার সম্পর্ক জানার পর থেকেই উনি খুব অস্বস্তির মধ্যে থাকতেন। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, গোপাকে তিনিই খুন করেছেন।"

'খুন করেছেন! কথাটা দীপার মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথে সুব্রতর চোখ বিস্ময়ে থমকে যায়।

একটু পরে দীপা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "গোপার সঙ্গে ওর খুব মাখামাখি ছিল। গোপনে গোপাকে যে দু একবার কথাটা বলিনি, তা নয়। কোনও ফল হয়নি। গোপার দেহটা টুকরো টুকরো করে তিনি কেটে ফেলেছিলেন। টুকরোগুলো পুলিস কয়েকটা জায়গা থেকে কুড়িয়ে আনে। মা, বাবা এবং আমি টুকরা-জোড়া-দেওয়া দেহটা দেখে সনাক্ত করেছিলাম। যে সময় গোপাকে খুন করা হয়, তখন আমি মার কাছে ছিলাম। আমার অবর্তমানে তিনি গোপাকে পাহাড়তলির বাসায় খুন করেন। গোপাকে যখন সে রাত্রে পাওয়া গেল না, তখন খবরটা দেবার জন্য আমি মার কাছ থেকে পাহাড়তলি চলে যাই। বাসায় গিয়ে দেখি তিনি অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, ওঁর মনটা ভাল নেই। তিনি খবর শুনে বেশ ব্যস্ততা দেখিয়ে আমাকে নিয়ে মার ওখানে চলে আসেন। আবার কতক্ষণ পরেই আমরা বাসায় ফিরে আসি।

সেদিন সন্ধ্যার সময়, আমাদের পাড়ার প্রবোধদা পাহাড়তলি গিয়ে খবর দিলেন যে, কোতোয়ালি থানাতে গোপার শরীরের দুটো পা টুকরো টুকরো করে পাওয়া গেছে। তিনি খবরটা দিয়েই চলে গেলেন। খবরটা শোনার সাথে সাথে ওর মধ্যে বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। তখন ভেবেছিলাম, অমন একটা খারাপ খবর শুনে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। আমরাও তো ঐ একই অবস্থা। প্রথমটায় অনেক সাধাসাধনা করেও ওর সম্মতি পেলাম না মার ওখানে যাওয়ার জন্যে। অনেক কান্নাকাটির পর তিনি আমার সাথে যেতে রাজী হলেন। উনি বলছিলেন, অমন একটা বীভৎস ব্যাপার দেখবার মতো ওঁর মনের বল নেই।

কাজেই আমাদের রওনা হতে একটু দেরি হল। আমরা যখন বাসা থেকে বের হয়ে আসি, তখন দেখলাম একটা পুলিসের গাড়ি আমাদের কাছে এসে থামল। পুলিসের গাড়ি দেখে আশ্চর্য যে হইনি তা নয়, তবে ওঁর মুখ দেখে আমি রীতিমত অবাক হয়েছিলাম। প্রবোধদা পুলিসের গাড়ি থেকে নেমে এলেন আর তার সাথে একজন পুলিস অফিসার।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম বুঝি অলোকবাবু?

তিনি বললেন, হাঁ।

আমি আপনার বাসাটা একবার দেখব, দরজা খুলে দিন।

চাবি দিয়ে আমিই তালাটা খুলে দিলাম। প্রবোধদাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে প্রবোধদা?

পুলিস অফিসার প্রবোধদাকে নিয়ে বাসার মধ্যে চলে গেলেন। সুব্রতদা, তখনও আমার মনে হয়নি যে, গোপাকে খুন করার পেছনে ওঁর কোনও হাত ছিল। তবুও মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। ওঁকেও পুলিস সাথে সাথে নিয়ে গেল।

প্রবোধদা পুলিসকে নিয়ে গেল একটা নর্দমার কাছে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই যে স্যার।

একটু এগিয়ে যেয়ে দেখলাম নর্দমার মধ্যে এবং এদিক ওদিক রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর পাশের ঘরে পুলিস তন্ন তন্ন করে

তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, গোপাকে তিনিই খুন করেছেন

খ্ঁজে এমন সব জিনিস বের করল, যার উত্তর শ্ধ্ একটিই হয়। ঐ ঘরে গোপাকে কেউ খ্ন করেছে। প্লিস একজন ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক অনেক রক্তের দাগ আবিষ্কার করল। ঘরের মধ্যে যে একটা টেবিল ছিল, সে টেবিলটাও ওরা নিয়ে গেল। সব চাইতে আশ্চর্য যে, ঐ ঘরের কোণে গোপার আংটিটাও পাওয়া গেল। আমার মনে হল, আমার পায়ের নিচের মাটিটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। তারপর কি হল আমার খেয়াল নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি প্রবোধদা আমার চোখে ম্খে জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, প্রথম যখন তিনি আমাদের খবর দিতে আসেন, তখন নর্দমার ঐ রক্ত ও'র চোখে পড়েছিল। বাড়ি ফিরে সে কথাটা তিনি মাকে বলতেই উপস্থিত প্লিস অফিসার ও'কে নিয়ে আমাদের বাসায় চলে আসেন। এর আগেই প্লিস আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। আজও আমরা গোপার মৃত্যুরহস্য জানি না। জেল হাজতে যেয়ে আমি ও'র সাথে দেখা করেছি, কিন্তু বার বার অন্রোধ করা সত্ত্বেও, তিনি সে কথা বলেননি। কয়েকটা মিথ্যা কথা বলে আমাকে ভুল ব্ঝাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

তারপরই এখানে মার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছি। জান স্ব্রতদা, কাল ভোরে এ সি'থির সি'দ্র ম্ছে ফেলে দিয়ে বিধবা হতে হবে। দেখলে তো, আমি কত ভাগ্যবতী।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। কোনো কথা কেউ বলল না। শেষে ম্লান হেসে দীপা বলল, "বিয়ে যাতে না হয়, সে দিকে যতট্কু চেষ্টা আমার পক্ষে সম্ভব, সেটা করেছি। বিয়ে যখন হয়ে গেল তখন তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক রাখা কি ঠিক? তোমায় কিছ্ জানাইনি তাই। তা ছাড়া, ওভাবে যখন গোপাকে খ্ন করা হয়, তখন আমিই মাসিমাকে নিষেধ করে দি, তোমাকে কোনও খবর না জানাতে। বিয়ের আগে তোমাকে দ্খানা চিঠিতে অনেক কথাই লিখেছিলাম, তুমি তো উত্তরও দাওনি। আর দেবেই বা কেন? আমার সেই অবস্থার কথা শ্নেও যখন তুমি সাড়া দাওনি, তখন অদৃষ্টকেই মেনে নিয়েছিলাম।"

স্ব্রত চমকে উঠে। "সে কি দীপা, আমি তো তোমার কোন চিঠি পাইনি।"

"বাঃ! মাসিমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েই তোমায় লিখেছিলাম। তুমি চলে যাবার বিশ পাঁচিশ দিন পরই।"

হাঁ, সে সময় শহর থেকে আমরা অনেকটা দূরে জরীপের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিন মাস পরে যখন ফিরে এলাম, তখন জানতে পারলাম আমাদের চিঠিপত্র লোক মারফত ওখানে পাঠান হয়। কিন্তু তোমার চিঠি তো আমি পাইনি।"

"সবই আমার কপাল, বাবার সাথে অনেক কথা কাটাকাটি করেও মা তাঁর মন ফিরেতে পারেনি। বাবা বললেন, অমন কত হয়, বিয়ে হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবাকে তো তুমি জান। অভাব অনটনে বাবার মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি আমার পড়া ছাড়িয়ে দিলেন। তার কারণও ঐ অভাব। তাছাড়া রেলওয়ে অফিসার বর; বিনে পয়সায়ই যে শ্ধ্ পেলেন, তা নয়, ভদ্রলোক খ্ব সাহায্যও করেছেন বাবাকে। এমন স্যোগ আমার বাবার মতো অভাবগ্রস্ত কজন লোক ছাড়তে পারেন? তাই বাবা তাড়াতাড়ি দিয়ে নিয়ে দিলেন।"

দীপার কথা শ্নে স্ব্রত অনেকক্ষণ মাথা নত করে বসে থাকল। তারপরই উঠে দাঁড়াল।

দীপা বাধা দিতে গিয়ে পরক্ষণেই সচেতন হয়ে উঠল।

স্ব্রত সেদিন একটা প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে চলে গেল। সে কিছ্তেই ব্ঝতে পারল না এর মধ্যে এমন কি রহস্য। অলোক যদি গোপাকে ভালবেসেই থাকত, তবে ওকে খ্ন করার কারণ কি? কি তার এমন স্বার্থ। দীপার কথায় একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্লিস তদন্ত করেছে, অলোকের বিচারও হল এবং বিচারে হল ফাঁসির আদেশ। অথচ দীপা বলছে গোপার খ্নের রহস্য কেউ জানে না।

তারপর চলতে চলতে সে ভাবতে থাকে সেই দ্খানা চিঠির কথা। দীপার কথাটাই সে মেনে নেয়, সবই ভবিতব্য। তা না হলে সে দ্খানা চিঠিই শ্ধ্ তার কাছে পেশছয়নি কেন? আর সে চিঠি পেলে যে সে এমন একটা অঘটন কিছ্ করতে পারত, তারই বা সম্ভাবনা কোথায় ছিল? তব্ও দীপার দিক থেকে তার উপর অভিমান স্বাভাবিক। দ্ দ্টো চিঠি লিখেও যদি সে উত্তর না পায়, তবে তার ওপর দীপার অভি-মান অহেতুক নয়। দীপার বিয়ে, এ যে কত অবাস্তব। তব্ দীপার বিয়ে সম্ভব হয়েছে অলোকের সাথে। ছোট বেলা থেকে যাদের স্নেহ ধীরে ধীরে যৌবনে এসে ভালবাসায় পরিণত হয়, তাদের মিলনে হয়তো ভগবানের একটা অভিশাপ রয়েছে। তা না হলে দীপার

বিয়ে অন্যের সাথে সম্ভব হল কি করে? তবুও তার মন চায় অশোকের মুখে সেই রহস্যের কথা শুনতে। এমন কি রহস্য রয়েছে গোপার এবং অশোকের জীবনে? অশোক কেন গোপাকে খুন করলে?

(৩)

জেলখানার জেল সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মিঃ মণ্ডল বললেন, "অশোকবাবুর সঙ্গে আপনি দেখা করতে পারেন, যদি তিনি সম্মত হন।"

সুব্রত তার দরখাস্ত পেশ করে অনুরোধ করেছিল মিঃ মণ্ডলকে।

প্রায় আধঘণ্টা পর সুব্রতর ডাক পড়ল।

একটা অপ্রশস্ত ঘরে একদিকে দুজন জেল ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তাদেরই একটু দূরে অশোক বসে।

গত কয়েক ঘণ্টার ভেতর সুব্রত অশোকের চরিত্র সম্বন্ধে যে একটা ধারণা করেছিল; তাকে দেখা মাত্র, সে ভুল তার ভেঙ্গে গেল। ওকে দেখলে মনে হয় না যে সে খুবই ভেঙ্গে পড়েছে।

সুব্রতকে দেখার সাথে সাথে অশোক প্রথমেই নমস্কার জানায়।

সুব্রত প্রতিনমস্কার করে।

"আপনার কথা আমার কিছু জানা আছে, কিন্তু এ সময় যে আপনাকে এখানে দেখব, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি।" অশোক বলল, "ক্ষতি আপনার......"

"ওসব কথা ছেড়ে দিন, অশোকবাবু। বাড়ি এসেই সব কথা শুনতে পেলাম।" সুব্রত খানিক চুপ করে থেকে সসংকোচে বলল, "এমন কি ছিল, যার জন্য আপনি গোপাকে......! আপনাকে দেখলে মনেই হয় না, আপনি অতটা নিষ্ঠুর। আজ অবধি কেউ জানতে পারেনি না কেন আপনি গোপাকে খুন করলেন। যদি বাধা না থাকে, তবে একবার বলুন।"

অশোক শুনল কথাগুলো। কী ভাবল, বলল, "আপনি যতখানি দরদ নিয়ে কথা বলছেন, অতটা না হলেও, কিছুটা আপনি আমার কাছে আশা করতে পারেন। দীপার জন্য খুবই দুঃখ হয়। আপনার সাথে বিয়ে হলে সে সুখী হত, কিন্তু ভবিতব্য অন্যরকম। তা না হলে আমিই বা এখানে এ অবস্থায় কেন। সুব্রতবাবু, আপনাদের সব কথাই আমি জানি। আপনার দুঃখও কম নয়। আমিও কম দুঃখ পাইনি। আপনাকে দেখে জীবনের শেষ মুহূর্তে বোধহয় একটু সান্ত্বনা পেলাম। সত্যি কথা, বিচার পুলিস তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু গোপার মৃত্যুরহস্য জানবার মতো সুযোগ কারও হয়নি। এমন কি, গোপা তার মৃত্যুর আগেও জানতে পারেনি সে কথা।"

অনেকক্ষণ পরে অশোক তার কথা গুছিয়ে বলল, "সুব্রতবাবু, এ সংসারে আমার বলতে বিশেষ কেউ নেই। নিজের পায়ের উপর নির্ভর করেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের মতো একটু সুযোগ পেয়েছিলাম, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে রেলওয়েতে কাজ পেলাম ডিস্ট্রিক্ট অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হিসেবে। আপনি জানেন, পাহাড়তলিতেই ছিল আমার বাসা। একদিন সুন্দরী দীপাকে রাস্তায় দেখে আমার খুবই ভাল লাগে। জীবনে সুখী হব বলে, ওকে বিয়ে করি। আপনি জানেন ওদের দারিদ্র্য। শুধু দীপাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই বিয়ের খরচটা আমিই দিই। মনে মনে একটা গর্ব হয়েছিল, এ আত্মত্যাগে দীপাকে নিবিড়ভাবে আমার মধ্যে পাব। তার কাছে আমার আসন থাকবে অতি উচ্চে। কত স্বপ্ন আমার মধ্যে ছিল।

বিয়ের পর থেকেই দীপা গোপনে কাঁদত। মনে করেছিলাম, হয়তো অমনি। কয়েকটা মাস চলে যাবার পরও ওর সেভাব যেন বেশ
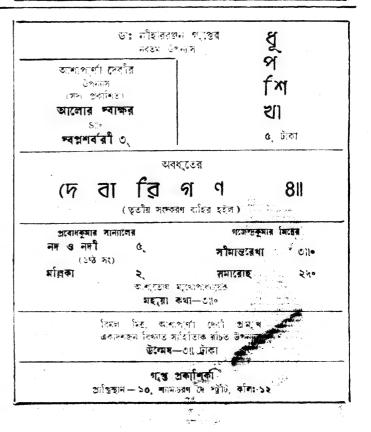
বেড়ে উঠল। ওকে দেখলেই মনে হত, সে যেন এক বিষাদ প্রতিমা। কতভাবে ওর মন পেতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার সব চেষ্টা বৃথা হল। মাঝে মাঝে ওর বিষয় নিয়ে অনেক কথাই মনে হত, তবুও ধৈর্য ধরে থাকতাম। সব চাইতে আশ্চর্য ছিল আমার প্রতি ওর কর্তব্যজ্ঞান। কোন দিক দিয়েই অসুবিধে অনুভব করতাম না। আমার কখন কোন জিনিসের দরকার, না চাইতেই আমার হাতের কাছে এসে পড়ত।

সব কিছু মিলে বেশ বুঝতে পারতাম, সে যেন আমাকে অন্নদাতা হিসেবেই সম্মান করত। আপনিই বলুন, তাতে কি আমার মত অবস্থায় কেউ সুখী হ'তে পারে, না হয়েছে?

কথাটা দীপার মার কাছে বলতেই তিনি হেসে বললেন, দীপা হয়তো নতুন জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। তুমি না হয় গোপাকে কয়েকটা দিন তোমার ওখানে নিয়ে রাখ। ওকে কাছে পেলে দীপা হয়তো সহজ হয়ে উঠবে।

মার কথাটা আমার ভালই লাগল। আমার বিশিষ্ট বন্ধু অশোক একথা শুনে সেক্সলজি সম্বন্ধে লম্বা চওড়া একটা লেকচার দিয়ে বসল। ডাক্তার বন্ধু অশোকের কথা শুনে ভাবলাম, বোধ হয় তাই। একটু বয়স্থা বিশেষত শহুরে মেয়ে বিয়ে করলে প্রথম প্রথম অমন ভুল বোঝাবুঝি নাকি হয়েই থাকে। সত্যিকথা বলতে কি সেদিন ঐ ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে আমিও হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে যতই দিন এগুতে থাকে, ততই বুঝতে পারতাম, আমার সব থেকেও যেন কিছুই নেই। সব ব্যাপারেই সহযোগিতা পেতাম, তবুও মনে হত সে যেন কত দূরে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, সবাই আমাকে স্ত্রীরত্নে ভাগ্যবান বলে কত কথা বলত। ওদের মধ্যে দীপাকে দেখলে মনে হত সে কত সুখী, কত জীবন্ত। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে সে স্তব্ধ হয়ে যেত। তার মুখের হাসি নিবত। কত জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কোন উত্তর ওর কাছ থেকে পাইনি। ও এড়িয়ে যেত।

আপনি জানেন গোপা কলেজে পড়ত। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে আমার ওখানে আসে। নানান কথার মধ্যে আপনার কথা গোপার মুখে শুনতে পারলাম। আমার মধ্যে আপনার উপস্থিতি, আমাকে পাগল করে ফেলল। ঈর্ষাই বলুন, আর মনের জ্বালাই বলুন, এ পৃথিবী আমার কাছে দুঃসহ বলে মনে হল। অতদিন যদিও দীপার সব কিছু ক্ষমা করতে পেরেছিলাম, সেদিন ওকথা শোনার পর, একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। সে আঘাতে আমি আমার ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, সব কিছু হারিয়ে ফেললাম। সব সময় মনের মধ্যে আগুন জ্বলত। মনে শান্তি বলে কিছু ছিল না। তবুও ওকে কোন দিন আপনার সম্বন্ধে কোনও কথা
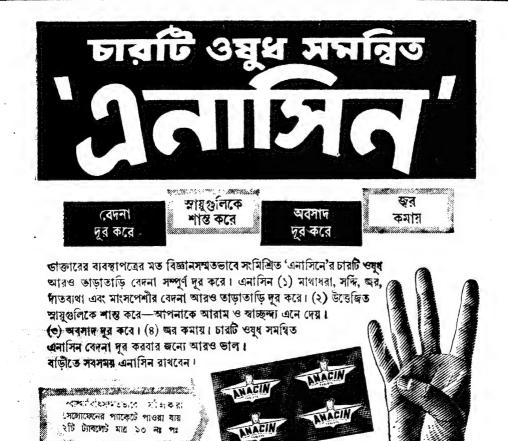
জিজ্ঞেস করিনি। ওর কি দোষ? আমার মতো সেও তো তিলে তিলে মরছে। ভাল না বেসেই যদি আমার ভেতর অতটা আঘাত আসতে পারে, তবে অতদিনের ভালবাসা কি অত সহজে ভোলা যায়? সুব্রতবাবু, আমি অত নীচ নই যে, গায়ের জোরে কারোও উপর নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে যাব। চিন্তা করে দেখেছি, দীপা নির্দোষ। ওর মাকে জিজ্ঞেস করে কোনও উত্তর পাইনি। আমার অভিযোগ শুনে তিনি অঝোরে কাঁদলেন। তারপরই হঠাৎ আমার হাত ধরে অনুরোধ করলেন, বাবা অলোক, তুমি আমাদের উপর রাগ করে, দীপার উপর প্রতিশোধ নিও না। ও বড় দুঃখী। মার কাছে হেরে ছুটে এলাম দীপাকে কিছু বলব বলে। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে একটি ফুটন্ত ফুল।

কয়েক দিনের মেলামেশার ভেতর দিয়ে বুঝতে পারলাম গোপা বেশ বুদ্ধিমতী। তার কাছেই জানতে পারলাম দীপা সব কথা মার কাছে শুনেছে। আপনার সম্বন্ধে একটু একটু করে গোপার কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পারি। ওকথা শুনে শুনে দীপা এবং আমার মধ্যে ব্যবধান যতটা বেড়ে যেতে লাগল, ততটা আবার গোপা আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। গোপারও বয়স হয়েছে। আমাদের অবাধ মেলামেশায় দীপা কোন দিন বাধা দেয়নি। একদিন বুঝতে পারলাম আমার মন আমারই অজ্ঞাতে গোপার কাছে ধরা দিয়েছে।

সুব্রতবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। এর-পরের কাহিনীর জন্য কোন দিনই আমি আমাকে ক্ষমা করতে পারিনি। একদিন একটা দুর্বল মুহূর্তে গোপার কান্নায় আমার চৈতন্য ফিরে এল।

কতক্ষণ চুপ করে থাকবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার অলোক বলতে শুরু করে। "অনেক অনুরোধে গোপা আমায় কথা দিয়েছিল, সে ওকথা কোনও দিন কারোও কাছে প্রকাশ করবে না বলে। কোন দিন সে আমাকে ক্ষমা করতে পারেনি। রাত্রি প্রভাত হবার সাথে সাথেই, গোপা ওদের বাড়ি চলে যায়। আমিই সাথে করে রেখে আসি। যাবার সময় গোপা কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। কয়েকটা মাস অস্বস্তির মধ্যে কেটে যায়। একটা দুশ্চিন্তা মাঝে মাঝে মন মুষড়ে দিত। কিন্তু তিন মাস পরে এসে গোপা যখন আমায় কথাটা বলল, তখন আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চোখের সামনে অন্ধকার দেখলাম, মনে হল পায়ের নিচে যেন মাটিটা ফেটে গেছে। চেয়ে দেখি গোপার সর্বাঙ্গে অস্পষ্ট পরিবর্তন এবং সে পরিবর্তনে শুধু একটা কথাই বোঝায়। গোপা কান্নায় ভেঙে পড়ল। **সে আত্মহত্যা করতে চাইল।** আমি অনেক বুঝিয়ে দিয়ে, পরেরদিন দেখা করতে বললাম, গোপাকে আশা দিয়ে দিলেম একটা কিছু আমি করব। গোপাকে এগিয়ে দিয়ে এসে, সোজা অশোকের সাথে গিয়ে দেখা করলাম।

অশোক আমার বাল্যবন্ধুই শুধু নয়, সে আমার একমাত্র বন্ধু। আমাদের প্রীতি খুবই গভীর। ওকে সব কথা খুলে বলতেই সে ঘরের মধ্যে গম্ভীর ভাবে পায়চারি করতে থাকে। তারপরই সে প্রশ্ন করে, কি করবে ঠিক করেছ? অনেক কথা কাটাকাটির পর, সেদিন অশোকের দুটি হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম। শেষটায় দীপার কথা, গোপার ভবিষ্যৎ সব কিছু চিন্তা করে অশোক আমাকে সহায্য করতে এগিয়ে এল। অশোক সেদিন তার একমাত্র বন্ধুকে সব জেনে শুনেও ত্যাগ করেনি, আমাকে বিপদ মুক্ত করবার জন্য সব কিছু গোপন করে সে অতবড় অন্যায়কে মেনে নিয়েছিল। শুধু তার প্রিয়তম বন্ধুকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। ওর কথা মতো আমার বাসায় সব ব্যবস্থা করে ফেললাম। কিন্তু দীপা? দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে দীপাকে সে সময়টা অন্যত্র সরিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। অনেকদিন থেকেই দীপা ওর মার কাছে যাব যাব করছিল। কিন্তু আমিই বাধা দিয়েছিলাম। ভয় ছিল, গোপার মতো জেদী মেয়ে যদি ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগে সব কিছু বলে দেয়। আমি বলার সাথে সাথেই দীপা ওর মার ওখানে একদিনের জন্য চলে গেল। গোপা নিরুপায় হ'য়ে আমার প্রস্তাব মেনে নিল। কলেজে যাওয়ার নাম করে গোপা আমার বাসায় চলে আসে। দূরে তো খুব বেশী নয়, প্রায় দু'কি আড়াই মাইল রাস্তা।

অশোক তৈরী ছিল। গোপা গিয়ে অশোকের ঘরে ঢুকল। পাশের ঘরে আমি বসে ছিলাম। মনটা খুবই অস্থির। বারে বারে হাতের ঘড়িটা দেখছিলাম। উদ্বিগ্ন হ'য়ে ঘরময় পায়চারি করছি শুধু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার জন্য। অশোক বলেছিল আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘড়ির কাঁটাটা দ্রুত চলছে, তার চাইতেও বুঝি দ্রুত চলছে আমার নাড়ি। অশোক অত দেরি করছে কেন? আমি যখন আর পারছি না তখন হুড়মুড় করে অশোক ঘরে এসে ওর দু'টা **রক্ত মাখা হাত আমার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, অলোক, আর বুঝি দীপাকে বাঁচাতে পারলাম না।** অশোকের শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। তার হাত থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে—সদ্য রক্তের ধারা। ওর চোখ দুটো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কোন প্রশ্ন করবার আর দরকার ছিল না। পাশের ঘরে গিয়ে দেখি শুধু টেবিলটাই নয়, ঘরময় রক্ত থই থই করছে। গোপা নিষ্প্রাণ যেন। আমাকে দেখেই গোপা কেঁদে উঠল, তারপরই সে বলল, জামাইবাবু আপনারা আমাকে মেরে ফেললেন?

জামাইবাবু, আপনারা আমাকে মেরে ফেললেন?

বিশ্বাস করুন সুব্রত বাবু, সেদিন গোপা জেনে গেল আমি খুনী। এ অপবাদ নিয়ে আমাকে আজও বেঁচে থাকতে হয়েছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

এক টাকা হ'লেও তা সঞ্চয় করুন

আপনার সঞ্চিত প্রত্যেকটি টাকা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন। বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের আমাদের অত্যন্ত অভাব। গ্রামে গ্রামে স্কুল, হাসপাতাল এবং সকলের জন্য বাসস্থান—অবিলম্বে প্রয়োজন। দেশের সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, অথবা জনসাধারণের একান্ত আবশ্যকীয় সুখ সুবিধার ব্যবস্থা—এ ধরনের যে কোনো কাজই ব্যয় নির্ভর। মূলধনের এই অভাব আপনার সাহায্যে, আপনার অর্থে পূরণ হওয়া সম্ভব।

নিজের স্বার্থে আপনিও একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা করতে পারেন। সরকারী পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগ সব দিক থেকেই লাভজনক। এ অনেকখানি ব্যবসায় অর্থ লগ্নী করার মত। অথচ এতে কোনো ঝুঁকি নেই। উঁচুহারে আপনি সুদ পাবেন। এমন কি এই অর্থের ওপর কোনো আয়কর পর্যন্ত দিতে হয়না। প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগের ১২ মাস পর আপনি আপনার অর্থ তুলেও নিতে পারেন।

সঞ্চয় করা আপনার অবশ্য কর্তব্য

বিভিন্ন সরকারী সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলি হল :

(১) ১২ বছরের ন্যাশন্যাল প্ল্যান সেভিংস সার্টিফিকেট
(২) ১০ বছরের ট্রেজারি সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট
(২) পোষ্ট অফিস পাশ বই
(৪) ১৫ বছরের অ্যানুইটি সার্টিফিকেট (দ্বিতীয় পর্যায়)
(৫) কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট
(৬) প্রাইজ বণ্ড ঢভ

বিশদ বিবরণের জন্য
নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

WBSC-1A BEN

সুনয়নী দেবী

স্টেলা ক্রাম্‌রিশ্‌

শিল্পী সুনয়নী দেবী সম্প্রতি ৮৭ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ভারতের মহিলা শিল্পীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন নেতৃস্বরূপা। বাংলার পটচিত্রের শৈলী অবলম্বনে যে চিত্রকলার সৃষ্টি তিনি করে গিয়েছেন তা ধ্রুপদী শিল্পীর মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে। পটশিল্পের পুনরুজ্জীবনে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। সুনয়নী দেবী ছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের দুহিতা, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগেই ভারতীয় চিত্রশিল্পের নবরূপায়ণের শুরু ও পূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখেছি। সেই ঐতিহ্যের শেষ সূত্রটি সুনয়নী দেবীর তিরোধানের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেল। —সঃ দেশ

গাছ জানে না কখন তাকে ফুল ফোটাতে হবে। পাখি জানে না কখন দস্তুরমতো তার গান গাওয়া চাই। সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদাম জাগে, এজন্যে তাদের বুদ্ধিবিচারের দরকার হয় না। সুনয়নী দেবীও এমনি করেই তাঁর ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন। কি করে আঁকতে হয়, তিনি কখনো শেখেননি, তাই তাঁর অশিক্ষিত সহজপটুত্ব অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং রেখায় রেখায় গান করে উঠতে থাকে।

তাঁর ছবির মধ্যে কোনো পূর্বকল্পিত আদর্শ নেই, তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেছে। তাতে রেখাগুলির ধারা অভিন্ন এবং সুনিশ্চিত; যেহেতু তারা তাঁর প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত, সেই জন্যে কোনো দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করেনি; তারা প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আকৃতিকে বা আকৃতি-সমবায়কে বেষ্টন করে ধরে; তারা একই কালে বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আত্মঘোষণ, তেমনি আত্মসংবরণ, বায়ু-হিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মতো তাদের আকুঞ্চনতা, আর সেই ভরা ফসল-ক্ষেতের মতোই যেন এই রেখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা বিকীর্ণ হতে থাকে।

তাঁর আঁকা বালিকাদের মুখগুলির চার-দিকে পূর্ণ-পরিণত প্রাণশক্তির উদাম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ় সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের শাড়িগুলির মধ্যে এমনি একটি ব্যঞ্জনা, যেন তারা কাপড়ে তৈরী নয়, যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া। সেই শাড়ি যেন ঐ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেষ্টন করে রক্ষা করছে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপন-বার্তা যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করেনি, অথচ যারা আপনিই তা বুঝে নিয়েছে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে এই শাড়িগুলি যেন বড়ো আদরের দোলায় দোলাচ্ছে। এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত; তারা সেই অন্তর-লোকের দূতী, যে লোক লাল এবং সবুজ শাড়ির বিলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনে আবৃত। তাদের ঐ দীর্ঘ এবং স্থির অথচ পাখির মতো উদ্যত চোখ দুটির ভিতর দিয়েই তাদের মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে তুলেছে।

এমনি করে ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারার ছন্দ দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে শস্যক্ষেতের ভিতরকার বায়ুমূর্ছনার মতো শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গাম্ভীর্যের বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে ঐক্য এবং ধ্রুবত্ব দান করেছে। আর-একটি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত; সেটি চঞ্চল, তীক্ষ্ন লঘু সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে দ্রুত ধেয়ে চলে। এমনি করে চোখ, ঠোঁট এবং হাত দুটি মিলে একখানি ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখির ওড়ার মতো ত্বরিত বেগে রচনাটির সুসংবদ্ধ প্রবাহের উপর দিয়ে চলে যায়।

এমনি করে খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সুনয়নী দেবীর আর্টের মূলতত্ত্বই হচ্ছে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত, যা একই কালে অনিত্য এবং ধ্রুব। এই তো সেই ভারতীয় প্রকৃতির প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অখণ্ড প্রবাহিত কলারীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছেন। মোগল চিত্রকলা ভারতীয় আর্টকে আয়তনে, প্রাণ-শক্তিতে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যে খর্ব করে ফেলেছিল, এই ছবিতে সেই ত্রুটি বিস্মৃত এবং মার্জনাপ্রাপ্ত হয়েছে।

দান

রচয়িত্রীর অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিশুদ্ধ ভারতীয় রেখার আকুঞ্চনভঙ্গি (Curvature) আপনার শান্ত সকরুণ সুরটিকে প্রকাশ করেছে।

যে কলারীতি দুই হাজার বছরের পূর্বেকার জিনিস তারই সঙ্গে এত সহজে সুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকালকার দিনের কোনো পুরুষ চিত্রকর এমন করে চিত্র রচনা করতে পারত না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম চেতনা এবং নারীর নিজের মধ্যে অন্তর্গূঢ় জাতীয় জীবনের অখণ্ড ধারাবাহিকতার সহজবোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েছে। সেই জন্যেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রামবধূরা তাদের আলপনায় যে-সব মোলায়েম গোল রেখার ধারা আঁকে, তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা প্রচলিত প্রাণের গতিরেখা দেখতে পাই।

সুনয়নী দেবী আর্টিস্ট পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো কোনো ভাই বহুকাল পূর্বে অজন্তার গুহায় ছবি এঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোনো কোনো ভাই আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন মার্গারিটোনে ডারেজ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এইসব ভাইদের মধ্যে কেউ কারও অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে চলে, তখন দেশকাল-নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এই জন্যেই তো সকল কালের সকল দেশের যোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়।

যে একটি দ্বিধাহীনতার জোরে সুনয়নী দেবী তাঁর তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির অনুসরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে নিয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি গাম্ভীর্য আছে। সোনালী আর কালো রঙ পরিমিতভাবে বাটোয়ারা করে দিয়ে তাঁর ছবিতে তিনি ঘনতা দেখিয়েছেন; আর মেয়েদের মুখের, দেয়ালের, পর্দার কোমল ধূসর এবং পিঙ্গল রঙের এক সমতলে তিনি লাল আর সবুজ রঙ মেলে ধরেছেন।

এইরকম চিত্রকলার মধ্যে যে নিবিড়তা আছে, সে নিজের মধ্যেই নিজে বদ্ধ থাকে, কেননা, শিল্পীর অন্তর্নিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয়। কোনো শিক্ষা, বাইরের কোনো প্রভাব তাকে পোষণ করতে পারে না; বরঞ্চ তাকে মূলভ্রষ্ট করে দিয়ে নষ্টই করতে পারে। আরও একটি বিপদ আছে—মাঝে মাঝে সুনয়নী দেবীকে তা আক্রমণ করে থাকে—সে হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা ও গল্পের সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য। তাঁর নিজের সৃষ্টি যে-সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি যদি তাঁর দৃষ্ট বা কল্পিত পদার্থের অনুকৃতি চেষ্টায় খাটাতে হয়, তা হলে তাঁর সহজ সৃজনশক্তির উৎস এইসব জঞ্জালে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তা হলে তাঁর দৃষ্টির ও লেখনী চালনার ক্ষিপ্রতাই প্রবল হয়ে উঠবে এবং হৃদয়াবেগ ও ঘটনা-বর্ণনার ব্যস্ততায় তাঁর রচনার স্বাভাবিক শান্তি চলে যাবে।

সুনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্টের সমস্ত ঐশ্বর্য আছে। তাঁর আর কিছু দরকার নেই। তিনি যদি তাঁর সেই ঐশ্বর্যভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তা হলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আপনিই প্রকাশিত হতে থাকবে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৪

প্যারিসে ভারতীয় শিল্পী

সলিল ঘোষ

সিলেকত-এ বসে কাপের পর কাপ "মোকা" চলছে, দুধ-ছাড়া অত্যন্ত কড়া কফির নির্যাস। দামও প্রায় ডবল। হঠাৎ অপর ফুটপাথের কাফে "দোম্" থেকে এল গান গাইতে গাইতে একদল স্প্যানীশ্ ছাত্র। বিচিত্র জাতীয় উৎসবের পোশাকে তারা সজ্জিত। কালো রঙের "রোব্" পিঠে ঝুলছে আর আছে নানা প্রকারের সরঞ্জাম। দড়িদড়া, গীটার বাদ্যযন্ত্র। গীটারের সঙ্গে স্পেনদেশের গানও গাইল কয়েকটা কাফের মধ্যে। পরে একজন এসে খদ্দেরদের কাছে ঘুরে ঘুরে হাত পাতল। অনেকেই কিছু কিছু দক্ষিণা দিল ওদের। ফ্রেদেরিক বললে যে, বহু দেশের ছাত্ররা ছুটির দিনে এইভাবে কিছু কিছু পয়সা উপার্জন করে নিজেদের হাত খরচা ওঠানোর জন্য। এরকম ব্যাপার বোধহয় প্যারিসেই একমাত্র সম্ভব। কেউ কিছু অস্বাভাবিক বা বেখাপ্পা মনে করে না। একটা কাল্পনিক দৃশ্য নিজের মনের মধ্যে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম। বম্বের নরীম্যান রোডের রেস্তোরাঁগুলিতে একদল বাঙ্গালী ছাত্র ধুতি পরে খালিগায়ে ওড়না চাড়িয়ে খোল করতাল নিয়ে কীর্তনের ধুয়ো ধরে ঢুকল। খদ্দেরদের কাছে গান গেয়ে হাত পাতল কিছু দেবার জন্য। প্রতিক্রিয়া কি হবে? বন্যা-ত্রাণের সাহায্য ছাড়া আমাদের দেশে ব্যাপারটা নিতান্ত বেখাপ্পা, অসম্মানজনক বলে ধরবে। প্যারিসে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। কেউ কিছু মনেই করবে না, উপরন্তু সমর্থন ও প্রশ্রয় পাবে। খুবই স্বাভাবিক একটা কিছু বলেই ধরে নেবে ওরা। ভিক্ষাবৃত্তিতে বনেদীয়ানা এনে মাঝে মাঝে অনেক সঙ্গীত শিল্পীকেও দেখেছি কাফেতে বেহালা বাজিয়ে গান করতে, পয়সা উপার্জন করতে। কাফের মালিকরাও এদের খেদিয়ে দেয় না।

আমার বন্ধু ফ্রেদেরিকের ভাবগতিকে বুঝলাম কাফের এই আড্ডা ও এখন ছাড়বে না। বেশ কয়েকদিন বাদে ও এখানে জমায়েত হয়েছে। অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশে একটু ঘুরতে, কাছে-পিঠের কয়েকটা বইয়ের দোকানেও প্রয়োজন ছিল। বিখ্যাত ফরাসী কার্টুন শিল্পী "সিনে"-র নাম আমি আগে শুনেছিলাম। দোকানগুলো ঘুরেই ওর বিপুল জনপ্রিয়তার আন্দাজ পাওয়া গেল। "সিনে" এখন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মেদে ফ্রাঁস-এর "লা এক্সপ্রেস্" পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। বামপন্থ। এই পত্রিকাটি প্যারিসের "নিউ স্টেট্স্-ম্যান" বলা চলে। সিনের কার্টুন বহু পত্রপত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় এবং এই কার্টুন শিল্পী প্রায় একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমার একটি শখ, চিত্র সম্বলিত কার্ড সংগ্রহ করা। বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, প্রত্যেক স্থানের

প্যারিসের বিখ্যাত আঁস্তাখানা 'লা সিলেকত্'

নানা বিষয়ের পিকচার পোস্টকার্ড কেনা ছিল আমার বাতিক। বিশেষ করে সংগ্রহ করতাম বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত ছবির কার্ড। প্রাচীন চিত্রকলা ছাড়াও, ইয়োরোপের সর্বত্র আধুনিক ও সমসাময়িক শিল্পীদের ছবির কাজও প্রচুর পাওয়া যায়। দামও সস্তা। দুচারটি বইয়ের দোকান বা পত্রপত্রিকা বিক্রির "কিয়োস্কে" কার্ড ঘাটতে গিয়েই দেখি, 'সিনে'র কার্টুন কার্ডের প্রাধান্য। আর সিনে অঙ্কিত "বিড়াল" (স্যাট্) সিরিজের কার্টুনের ছোট বইটি ত ফরাসীদের ঘরে ঘরে। ফরাসী বিড়াল যেমন ওদেশের মেয়েদের প্রিয়, তেমনি সিনের "স্যাট্" কার্টুনগুলিও। বিড়ালের মাধ্যমে ফরাসী সমাজের প্রতি সিনের ব্যঙ্গ, হাসিঠাট্টা ও শ্লেষের কোন তুলনা নেই। মনে আছে "Chat Reuton" ক্যাপসন্ দেওয়া সিনের একটা কার্টুন কার্ড কিনেছিলাম। মানেটা "বিড়ালের পাগলাগারদ" বা ওই ধরনের একটা কিছু কে যেন বলেছিল। বিড়াল সিরিজের সাফল্যের পর সিনে ইঁদুর সিরিজেরও একটি কার্টুন বই প্রকাশ করেছেন। নানারকমের কার্ড, গাইড বই, প্যারিসের মেট্রোর ম্যাপ, চিত্রকলার কিছু বই কিনে এনে আবার কাফেতে ফিরে এলাম। ফরাসী বইয়ের দোকানগুলিকে কেন জানি না আমার খুবই পছন্দ। তাছাড়া ওদের দেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন গাইড্ বইয়ের ত কোন তুলনা নেই। প্যারিসের ওই গাইড বইগুলি নিয়ে অচেনা অজানা শহরে একলা একলা ঘুরতে আমার এতটুকুও অসুবিধা হয়নি। ইয়োরোপে এই পিকচার-পোস্টকার্ড আর গাইড বই-এর ব্যবসাতে বোধহয় লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে। অথচ আমাদের দেশে এখনও এই ব্যবসাতে কেউ যে কেন নামছে না, তা জানি না। এমন কি ইয়োরোপের গন্ডগ্রামে গেলেও সে গ্রামের দ্রষ্টব্য স্থানের ছবিসম্বলিত কার্ড যা

নানাপ্রকার তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা পাওয়া যাবে। অথচ "টুরিজম্" করে মাথা কুটে মরছি আমরা এদেশে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের কেউ বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানগুলির উপরে এ-ধরনের পুস্তিকা বা কার্ড করল না। ছোটখাটো স্থানের কথা ত ছেড়েই দিলাম। যদিই বা করা হয়ে থাকে, খোঁজ করতে গেলে শোনা যাবে যে, সেগুলি আউট্ অব প্রিণ্ট, তা সরকার বা বেসরকারী যে কোন প্রকাশনই হোক। এই প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখি যে "ফ্রেঞ্চ পিক্চার" বলতে আমার যেসব অশ্লীল ছবির কার্ড বুঝি, তা ফরাসী এইসব বইয়ের দোকানগুলিতে কখনও চোখে পড়বে না। সে বিষয়ে এরা ইংরেজদের তুলনায় অনেক বেশী শালীনতা বজায় রেখেছে। প্যারিসের পিগাল্ এলাকার নগ্ননৃত্যের থিয়েটারগুলির আশে-পাশে অবশ্য দালালরা এই ধরনের ছবি নিয়ে ঘোরাঘুরি করে এবং বিদেশীদের কাছে তা

ফরাসী বন্ধু ফ্রেদেরিখ্

বিক্রিও করে চড়া দামে। লণ্ডন শহরের মধ্যস্থলে একটি ছোট বইয়ের দোকান দেখে-ছিলাম, যেটা একমাত্র পোরনোগ্রাফিক্ লেখা ও ছবির কার্ড এবং রঙীন ট্র্যান্স্‌-পেরেন্সী-র ব্যবসাতে বিশেষত্ব লাভ করেছে। ঠিক এই ধরনের দোকান, প্যারিসে আমার চোখে পড়েনি।

ফিরে আসতেই ফ্রেদেরিক বললে—"চলো, ফইয়ের-এ গিয়ে এবার লাঞ্চ খেয়ে আসা যাক।"

বুলেভার মঁপারনাসের উপর এই "ফইয়ের দেঁজ্যু আর্তিস্‌ত্ আঁতালেক্চুয়াল।"

বন্ধুপত্নী মিনেৎ

সিলেক্‌ত্ থেকে দুচার মিনিটের পথ, একই ফুটপাথে অবস্থিত। এই ফইয়ের-এ শুধু লাঞ্চ আর ডিনার পাওয়া যায়। দুপুরে দুঘণ্টা ও রাত্রে তিন ঘণ্টার মত খোলা থাকে। দোকানটির বিশেষত্ব হল যে, যদু-মধু যে-সে ওখানে গিয়ে খেতে পারবে না। একেবারে বনেদী আর্তিস্‌ত্, লেখক বা আঁতেলেক্চুয়াল হওয়া চাই। মালিক রেস্তোরাঁটি খুলেছে বিশেষভাবে এদের সস্তায় দুবেলা খাদ্য পানীয় পরিবেশনের জন্য। একজন খদ্দের, শিল্পী বা আঁতা-লেকচুয়াল কিনা তার প্রমাণ পত্রাদি দিয়ে নাম রেজিস্টারী করাতে হবে। নাম, ধাম, ঠিকানা, ফটোসহ একটি পরিচিতিপত্র দোকানে জমা রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে যাতে মিলিয়ে দেখতে পারে। বেশীরভাগই প্রায় বাঁধা খদ্দের, মঁপারনাস্-এর বাউণ্ডুলে সমাজের শিল্পী ও লেখকদল। কোন খদ্দেরের অতিথিরূপে যাওয়া চলতে পারে, কিন্তু দোকানের কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে যে, অতিথিও এক গোষ্ঠীর। মালিকের ফটোগ্রাফীর আলাদা ব্যবসা আছে। শিল্পী সমাজকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাঁদের সুবিধার জন্য এই বিশেষ রেস্তোরাঁ খুলেছেন। শিল্পীদের প্রতি এই ধরনের প্রশ্রয় রয়েছে প্যারিসের সর্বত্র। জনসাধারণ এদের বেশ একটা আন্তরিকতার চোখেই দেখে। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির উর্দ্ধে, শিল্পীদের চলনবলন ও জীবন-যাপনে, এরা কোন পাগলামি করছে বলে বা ব্যতিক্রম বলে ফরাসীরা মনে করে না। সেইজন্যই আমার অনভ্যস্ত চোখে, রাস্তার জনবহুল মোড়ে সাজসরঞ্জাম নিয়ে ওই শীতের মধ্যেও যখন শিল্পীদের দেখতাম ছবি আঁকতে, তখন ভালই লাগত। কাজের পথে হঠাৎ কোন ফরাসী সুন্দরী হয়ত থমকে থেমে গেলেন। শিল্পীর ছবিটি একটুক্ষণ যাচাই করে দুটো মিষ্টি কথা, আলতো মিষ্টি হাসি শিল্পীকে বিতরণ করে আবার পথ চলতে শুরু করলেন। এ দৃশ্য হামেশাই আমি দেখেছি এবং তখনই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি যে কেন প্যারিস সারা পৃথিবীর শিল্পীদের মক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথচারী জনসাধারণ শিল্পী-দের কাছে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে এমন ঘটনা কখনও শুনিনি, দেখিনি। পরন্তু নেহাৎ অচেনা হয়েও দুদণ্ড ছবিটি দেখে শিল্পীর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলে, অনু-সন্ধিৎসা প্রকাশ করে, শিল্পীকে উৎসাহিতই করতে দেখেছি।

আমরা যখন ঢুকলাম, ফইয়ের একেবারে জমজমাট্। কাফেতে শিল্পীদের আড্ডার এখন মধ্যাহ্ন বিরতি। সবাই এসে জড় হয়েছে এখানে। দরজার পাশে ওভারকোট ঝোলান রয়েছে সাদা সাদা। সিগারেটের ধোঁয়ায় বদ্ধ গরম ঘর একেবারে ভরপুর। দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে আধুনিক চিত্র-কলার সব নিদর্শন, হয়ত তা খদ্দেরদেরই আঁকা। নানারকমের সব স্ত্রীপুরুষ, পোশাক পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে আমার কাছে একেবারে আলাদা জগতের লোক। এখানকার পরিবেশ আবার কাফের মত নয়। ফ্রেদেরিক ঢুকেই কাউণ্টারের বিগত যৌবনা, সুসজ্জিতা, অত্যধিক প্রসাধন করা মহিলাকে আমার বিষয়ে যাবতীয় পরিচয় দিয়ে জানিয়ে দিল যে, খদ্দের দাম এখন দেবে না, পরে শোধ দেবে। মহিলাকেও দেখলাম বিন্দুমাত্র আপত্তি না জানিয়ে, উপরন্তু রীতিমত প্রশ্রয় দিয়ে ফ্রেদেরিককে আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জানাল। আরও দেখলাম ফ্রেদেরিক পরি-চারিকাদেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র। সবাই এসে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় ছিলে এতদিন?" ফ্রেদেরিকও সকলের সঙ্গে ফ্লার্টিনষ্টি করে, কারো গালটিপে, কাউকে আলিঙ্গন করে, যথেচ্ছভাবে চুম্বন ছড়িয়ে কম্যুনিস্ট জার্মানী ভ্রমণের কথা বলল। কম্যুনিজম্ ভীতি প্যারিসের মত শহরেও অত্যন্ত প্রবল। ফ্রেদেরিকের পরিচিত অনেককেই দেখেছি পূর্ব-জার্মানী গিয়েছিল শুনে আশ্চর্য হল। প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছে, এটা ওরা ধারণাই করতে পারছে না। এইখানে বলে রাখি, সিলেকত-এর ওয়েটার বা ফইয়ের-এর পরিচারিকাদের সঙ্গে শিল্পী খদ্দেরদের বেশ একটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক। শিল্পীরা কেউই ওদের সঙ্গে উন্নাসিক উচ্চস্তরের লোকের মত ব্যবহার করে না। ওরাও যেন নিজেদেরই একজন।

ফইয়ের-এ ছোটছোট ঘেঁষাঘেঁষি টেবিল চেয়ার। তার উপর দেয়ালের তাকে গাদা-গাদা সব শীতকালের গরম বস্ত্র খদ্দেরদের। নানাপ্রকার উচ্চকিত আলাপ-আলোচনা,

'তিন সুন্দরী' : কৃষ্ণা রেড্ডী কৃত রঙীন এনগ্রেভিং
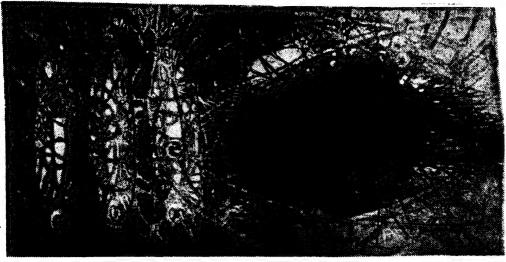
হট্টগোল। সব মিলিয়ে অপরিচিত পরিবেশে অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম। কাফেতে যে ক্ল্যাসিক্যাল ধরনের মেয়েটিকে দূরে থেকে দেখে মনে মনে খুব তারিফ্ করছিলাম, ভাগ্যক্রমে তারই পাশের আসনে বসার স্থান জুটে গেল। মেয়েটির মুখ, চুলের ফ্যাশন ইত্যাদি প্রাচীন ইয়োরোপীয় চিত্রকলার কোন প্রতিকৃতি বলেই মনে হয়। কপালের উপর দিয়ে, গালের কিছুটা ও কান ঢেকে টেনে চুল বাঁধা, আর কেমন যেন খুব ঠান্ডা গোবেচারা প্রকৃতির। ফ্রেদেরিক আলাপ করিয়েও দিয়েছিল। যদিও ওর মতে মেয়েটি পয়লা নম্বরের গবেট্। ভাবছিলাম, বিদেশী "ইন্দিয়েন্" দেখে মেয়েটি হয়ত আগ্রহান্বিত হয়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবে আর, আমিও খুব বাক্তাল্লা মেরে ইম্প্রেস্ করব যে ফরাসীদের চাইতে ভারতীয় বা একজন বাঙালীর দৌড় কম নয়। কিন্তু—সে গুড়ে বালি। হতাশ হতে হল। ভাল ইংরেজী জানে না। আর জানলেও বোধহয় ভারত সম্বন্ধে জানার জন্য বা আমার সঙ্গে ভাব করার জন্যও কোন আগ্রহ প্রকাশ করত না। সঙ্গে অবশ্য ওর শিল্পী বন্ধুও ছিল। ওরা একসঙ্গেই বসবাস করে, শিল্পীর মডেল-ও সে হয়। ফরাসী চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এরা অন্যদের বিষয় আগ্রহ প্রকাশ করা ত দূরের কথা, নিজেদের বিষয়েও পারতপক্ষে কিছু বলতে চায় না। ওরা নিজেদের নিয়ে এমনই মশগুল্ এবং ফরাসী সব কিছুর প্রতি এতই ওদের গর্ব যে, অন্যদেশ বা অন্যদের বিষয় জানার এতটুকুও আগ্রহ ওদের নেই বলেই মনে হয়েছিল। আমরা ওদের বিষয় যতটা খবর রাখি, তার এক কানাকড়িও ওরা আমাদের বিষয় জানে না। প্যারিসে একটি মাত্র লোক আমি পেয়েছিলাম, যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানে এবং অত্যন্ত সংগত দু'চারটা প্রশ্নও আমাকে করেছিল। লোকটি কিন্তু এই ইন্টেলেকচুয়াল দলেরও নয়, সে একজন হাউস-পেন্টার। বাড়ি রং করে, হোয়াইট্-ওয়াশ করে, ওয়াল-পেপার লাগায় এবং বামপন্থী, বেশীরভাগ ফরাসীদের মতই। সিলেকত্-এর এক মাসের আড্ডায় কত-রকমের স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, ভুলেও কখনও কেউ এদেশ সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ওরা যেন বিশ্বাসই করে না যে, প্যারিসের বাইরেও এক বিরাট ব্রহ্মান্ড রয়েছে। এদিক দিয়ে ফরাসীরা আমাকে খুবই হতাশ করেছিল। জার্মান বা রুশদের আমার অনেক ভাল লেগেছে ওদের অনুসন্ধিৎসার জন্য।

আক্ষেপ রয়ে গেল ওই ক্ল্যাসিক মেয়েটির সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান আর হল না। পরে যখন দেখা হত ওর সঙ্গে, শুধু হাসির বিনিময়ে বুকের নৈঋত কোণের অব্যক্ত সে ব্যথা দূর করতাম।

মোটামুটি ফইয়ের-এ ভালই খেলাম এবং পরে দেখলাম সাধারণ রেস্তোরাঁগুলির তুলনায় প্রায় অর্ধেক খরচ পড়ে। প্যারিসে খাওয়া-দাওয়ার অত্যধিক খরচ। টাকার টানাটানির মধ্যে, এটা কম বড় কথা নয়।

আবার কাফেতে ফিরে গিয়ে কফি নিয়ে বসা হল। দু'চারটা ফরাসী "গোলোয়াজ" সিগারেট পোড়ানর পর ফ্রেদেরিক একটু চাঙ্গা হয়ে বললে—"এবার ঠাঁই বদল করা যাক্। চল কিকো মোতীর সঙ্গে দেখা করে আসি। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় শিল্পীর সঙ্গেও তোমার পরিচয় হবে।"

কিকো মোতী নাম শুনে প্যারিসে অনেকে তাকে জাপানী শিল্পী বলে ভাবলেও আসলে সে খাঁটি ভারতীয় শিল্পী। বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ের লোক।

আসল নাম কাইকোবাদ মোতীওয়ালা, সংক্ষিপ্ত করে শিল্পীরূপে কিকোমোত্তী বলেই পরিচিত হয়েছে প্যারিসে। যে কয়জন ভারতীয় শিল্পী প্যারিসে খ্যাতি অর্জন করেছে, কিছুটা প্রতিষ্ঠিতও বলা চলে, তাদের মধ্যে কিকো অন্যতম। যদিও নিজের দেশে অন্যদের তুলনায় সে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। লক্ষ্মণ পাই, নিউটন ডিসুজা, নীরদ মজুমদার, রেজা, পাদামসী, কৃষ্ণা রেড্ডী এদের সকলেরই নিজের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এদেশে প্রদর্শনীও করেছে। দু'একজন শিল্পী প্যারিস ছেড়ে চলেও এসেছে নিজদেশে। কিকো ওসবের মধ্যে নেই। কয়েকটি কারণে এদেশের সঙ্গে ওর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলা চলে এবং নিজেও এখানে ওর বিষয় কিছু প্রচার হয় তা চায় না বলেই মনে হয়েছিল। "আমি যে এখানে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে আছি, খবরদার একথা বম্বেতে কাউকে বোলো না—তাহলে আমার পাওনা-দাররা চেপে ধরবে আমাকে টাকা শোধ দেবার জন্য।" কিকো বম্বে পার্শীদের কোন ট্রাস্ট থেকে টাকা ধার নিয়ে বিদেশে চিত্রকলা শিখতে যায়। টাকা ফিরে এসে শোধ দেবার কথা। কিন্তু সে আর ফিরলই না। প্যারিসে, কিকো মোতীকে আমার খুবই ভাল লেগে-ছিল। গুণী শিল্পী হিসেবে ত বটেই, মানুষ হিসেবেও।

দক্ষিণ প্যারিসে "সিতে ফালগুয়ের"-এ একটি ছোট এতেলীয়রে কিকোর আস্তানা।

সারেংগীবাদক (টেরাকোটা)
শিল্পী : কৃষ্ণা রেড্ডী

এখানেই ভাস্কর রদাঁ রোঞ্জ ঢালাই করতেন আর শিল্পী সুতাঁ একই স্থলে বাস করতেন। এখন কিকো, তাঁর ফরাসী স্ত্রী, ও ফুটফুটে ৬।৭ বছরের কন্যাকে নিয়ে বাস করেন। তার এতেলীয়রে ভারতীয় শিল্পী ছাড়াও, দেশ-বিদেশের আরও অনেক শিল্পীর আনাগোনা আছে। কিকোর বাবা ছিলেন একজন রেলওয়ে এঞ্জিন ড্রাইভার। ১৯৪৬ সালে লন্ডনের স্লেড্ স্কুল অব আর্টস-এ কিকো ভর্তি হয় চিত্রকলা শেখার জন্য। মজার ব্যাপার পাশ্চাত্যে গিয়ে কিকো, প্রাচ্যের চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজের পাশ্চাত্য ধরন পরিত্যাগ করে প্রাচ্যের রীতিপদ্ধতিতে আঁকা শুরু করেন। প্যারিসের মত নন-অবজেক্‌টিভ্ আর অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের শহরে কিকো প্রাচ্য ধরনে, কিছুটা বাস্তবধর্মী কাজ করে শিল্পীরূপে জীবন ধারণ করছেন, তা কম কৃতিত্বের কথা নয়। লন্ডনে চারুকলায় ডিপ্লোমা পাবার পর প্যারিসে এসে বিখ্যাত ভাস্কর জাদ্‌কিন্-এর কাছে শিক্ষানবিশী করেন। কিকোর অংকণ রীতি জাদকিনের খুবই প্রশংসা পায়। প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এবং প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী করতে কিকোকে জাদ্‌কিনই উৎসাহিত করেন। চিত্রব্যবসায়ী বিভিন্ন আর্টগ্যালারী গুলি কিন্তু প্রথম দিকে সম্মত হয়নি।

এদিকে তখন কিকোর অর্থাভাবও ছিল প্রবল। এচিং, এনগ্রেভিং, প্রিন্ট ইত্যাদিতে কিকোর স্বাভাবিক পারদর্শিতার জন্য জাদকিন ওকে এচিং ও এনগ্রেভিং-এর প্রবীণতম শিল্পী উইলিয়ম এস হেইটার-এর স্টুডিওতে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেন। হেইটার ইংরেজ হলেও, প্যারিসে বহুকাল ধরে বসবাস করছেন, 'মরপারনাস' এতেই ও'র স্টুডিও। কিন্তু সেখানে শিক্ষালাভ করার মত অর্থসামর্থ কিকোর ছিল না, তাই চারমাস বাদে স্টুডিও পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু পরে হেইটার কিকোকে তাঁর স্টুডিওর একজন মনিটররূপে গ্রহণ করেন। হেইটার-এর অবর্তমানে স্টুডিও পরিচালনা করা, দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করা ছিল কিকোর কাজ। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই স্টুডিওতেই কিকো কাজ করেন। এই সময়, কিকোর এচিং ও এনগ্রেভিং-এর গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ, বিখ্যাত প্রকাশক—"গিল্ড দ লা গ্রাভিওর" কর্তৃক পরিবেশিত হয়। ১৯৫৩ সালে কিকোর প্রথম প্রদর্শনী প্যারিসে সমাদৃত হয়। বিভিন্ন মিউজিয়াম তাঁর রচনার নিদর্শনও কেনে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই রীতিতে অংকিত কিকোর কাজ খুবই নতুনত্ব আনে প্যারিসের চিত্রজগতে। জীব-জন্তু অংকণে কিকোর ছবির মধ্যে চৈনিক ছন্দ ও সাবলীলতা রয়েছে, বিশেষ করে জলরঙের ছবিগুলিতে। কথাটা কতদূর সত্য জানি না, এনগ্রেভিং-এর একটি প্লেট থেকে বহুরঙের প্রিন্ট করার পদ্ধতি কিকোরই আবিষ্কৃত বলে শুনেছি। কিকো নিজে কিছু খুলে না বললেও, কিকোর সঙ্গে হেইটার-এর মনোমালিন্য হবার কারণও নাকি এই। এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তারূপে হেইটার-এর নামই এখন সর্বত্র প্রচলিত। আসলে হেইটারের স্টুডিওতে থাকাকালীন কিকো একটি প্লেট থেকেই বহু রঙা এনগ্রেভিং প্রিন্ট করার কাজে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করছিলেন। প্রথমদিকে হেইটার এ প্রচেষ্টাতে বাধাও দেন, আপত্তিও তুলে-ছিলেন। কারণ তাঁর মতে এচিং, এনগ্রেভিং একরঙা প্রিন্টেরই মিডিয়াম, বহু রঙের নয়। কিকো কিন্তু সেসব না শুনে, প্লেটকে বিভিন্ন লেবেলে কেটে একই প্লেট থেকে বহুরঙা প্রিন্ট তৈরী করেন এবং পরে হেইটার তার কৃতিত্ব লাভ করে। এই কারণেই কিকো হেইটার স্টুডিও থেকে আলাদা হয়ে যান। এখন নিজের স্টুডিওতে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের এনগ্রেভিং-এ শিক্ষাদান করছেন। এছাড়া প্রাচ্যের প্রিন্ট সম্বন্ধেও কিকো নানাপ্রকার গবেষণা, পড়াশোনা করেছেন। কিকোর ছবিতে রঙের viscosity খুবই আকর্ষণীয়। একেবারে নিজস্ব পদ্ধতিতে, বিভিন্ন রঙের জমি তৈরী করে, কিকো এই আবেদন আনতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষ্ণা রেড্ডীও এই

ধরনের কাজে খুবই পারদর্শী। টেক্‌নিক্যাল দিক দিয়ে দুজনের কাজই খুব উন্নত।

কিকোর এতেলীয়রে গিয়ে দেখি জোর আড্ডা বসেছে। অত বেলাতেও লাঞ্চ ত দূরে কথা, ব্রেকফাস্টও বোধহয় ওদের হয়নি। ঘরে ঢুকেই সামনে একটা ছোট কাঠের মই, মেজানিন্‌ ফ্লোরে যাবার। সেখানে কিকো-পত্নী এখনও বিছানাতে, শীতের দিনে আরাম করছেন। ঘরের মেঝেতে বসে আমেরিকান শিল্পী ডীন মিয়েকার, পানামা দেশের কার্টুন শিল্পী লুয়োসিন দ্য কারলো, বম্বের পার্শী কমার্শিয়াল আর্টিস্ট পারভীজ ক্যাপটেন প্রভৃতি আড্ডা দিচ্ছে, ঘরময় ছড়ানো কিকোর রেডিও যন্ত্রপাতি। রেডিও-সঙ্গীতের মৃদু রেশ আড্ডার পরিবেশকে মধুরতর করে তুলেছে। একপাশে কিকোর কন্যা খেলছে আর পাকা-পাকা সব কথা বলছে কায়লোর সঙ্গে, ভারি মিষ্টি স্বভাব। প্রথম পরিচয়ের আদান-প্রদানের পরেই জমে গেলাম ওদের আড্ডায়। বেশ দিল খুলে কথাবার্তা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিকোর এতেলীয়র এত অগোছালো যে ফরাসী মেয়েদের গৃহিণী-পণায় বিশেষ আশ্বস্ত হলাম না। কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খলা সর্বত্র, যার জন্য গৃহিণী দায়ী না হয়ে শিল্পীও হতে পারে। একদিকে কিকোর রেডিওর সব সাজসরঞ্জাম "হাই-ফাই" যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, নাড়িভুঁড়ি বার করা সারা মেজেতে ছড়ানো। টুকরো টুকরো সব আলাদা করা। একদিকে অ্যাম্‌প্লিফায়ার, আরেক দিকে লাউড্‌ স্পীকার। আবার আরেকস্থলে হয়ত কন্ট্রোলের সব চাবিকাঠি। কিকোর রেডিওর খুব শখ, যন্ত্রপাতি আলাদা আলাদা কিনে নিজেই সব জুড়েছে। এবং এইভাবে রাখাটাও এক ধরনের 'শো'। ঘরের কোণায় ছোট্ট রান্নাঘর আর ছুটকো নানারকমের সব জিনিসপত্র ঘরময় ছড়ানো এদিক সেদিক। এর মধ্যে এসে যোগ দিল পারভীজ্‌ ক্যাপ-টেনের ডেনিশ স্ত্রী ও কৃষ্ণা রেড্ডী, আমার পুরানো বন্ধু। কিকো-পত্নীও নেমে এল মই বেয়ে। আড্ডার গল্পগুজবের মধ্যেই সকলে সামান্য কিছু খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে ঠিক করল, কোথায় এক চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে তা দেখতে যাবে। আমেরিকানদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত একটি ডিজাইন স্কুলে নানাদেশের শিল্পীদের চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে। কিকো, রেড্ডী, মিয়েকার-এর ছবিও আছে প্রদর্শনীতে। মিয়েকার সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্টিং-এর একজন খ্যাত শিল্পী, অত্যন্ত দক্ষতা ওর কাজে এবং টেক্‌নিকে। লম্বা-চওড়া সুপুরুষ চেহারা। চাপদাড়িসহ স্ক্যান্ডেনেভীয়ান ভাই-কিং-দের বংশধর বলেই ওকে মনে হয়। প্রদর্শনীর রচনা-গুলি আমাকে তেমন আকৃষ্ট করল না। সেই একঘেঁয়ে তথাকথিত মডার্ন আর্টের চর্বিত-চর্বণ। কিন্তু নানাদেশের বহু শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল এবং তাদের হাবভাব ব্যবহার ভঙ্গী আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে-ছিলাম। এখনও মনে আছে, একবার কোন এক ফাঁকে ফ্রেদেরিক কিকোকে বলেছিল,—"জার্মানী যাবার জন্য তোমার কাছে যে টাকা ধার করেছিলাম, তা কয়েকদিন বাদে শোধ দেব। কোন তাড়াতাড়ি নেই ত?" কিকো উত্তর দিয়েছিল—"না— আমার এখন টাকার কোন প্রয়োজন নেই, উল্টে তোমার যদি প্রয়োজন হয়ত তো আরও নাও, আমার হাতে এখন টাকা এসেছে।" ফ্রেদেরিককে আরও প্রায় পাঁচশো টাকার মত দিয়েছিল। পঞ্চাশ হাজার পুরানো ফ্রাঙ্কের নোটগুলো এমনভাবে কিকো দিল, যেন ওটা কিছুই নয়। শিল্পীদের মধ্যে এই ধরনের প্রীতির সম্পর্ক দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম।

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে"। কৃষ্ণা রেড্ডী শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। দুই প্রাক্তনের হৃদ্যতা তাই বেশী করে জমে উঠল। বম্বেতে রেড্ডী কয়েক বছর আগে ওর প্যারিসে করা এনগ্রেভিংয়ের প্রদর্শনী করেছিল। তখন
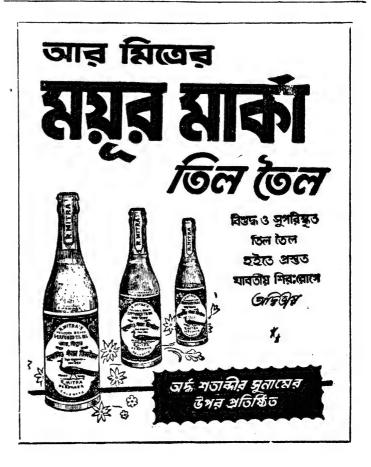
ওর সংগে প্রথম আলাপ হলেও, প্যারিসে শান্তিনিকেতনের সে বাঁধন অন্তরংগতায় পরিণত হল। কৃষ্ণা রেড্ডী সাদাসিধে লোক, বেঁটে খাটো। পোশাক পরিচ্ছদে কেমন অগোছালো নোংরা, হেইটার স্টুডিওর কালিঝুলি মাখা ওর পোশাকে। ওরই মত ছোটখাটো, ও'র আমেরিকান স্ত্রীও সাদা-সিধে প্রকৃতির। সাধারণ আমেরিকান মেয়েদের তুলনায় কথাবার্তা একটু কমই বলে। প্যারিসের দক্ষিণ উপকণ্ঠে "ভাঁব্‌স্‌"-এ ওরা বাংলো কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বেশ সাজানো গোছানো সচ্ছল ওদের সংসার। একেবারে মেকানাইজড্‌ আধুনিক সরঞ্জামসহ রান্নাঘর। প্যারিসে ভারতীয় একজন শিল্পীকে এভাবে জমিয়ে বসতে দেখে খুবই আনন্দ হয়েছিল। কৃষ্ণা রেড্ডীকে সর্বদা দেখেছি খুব গর্বের সংগে শান্তি-নিকেতনের চিত্রশিক্ষার কথা সর্বত্র উল্লেখ করতে। রেড্ডী দম্পতী দুজনেই হেইটার-এর ষ্টুডিওতে কাজ করে। রেড্ডী এনগ্রেভিং-এ ইয়োরোপ আমেরিকাতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, ভাল বিক্রিও হয় ওর প্রিন্ট। একজন সুইশ প্রকাশক, ওর ছবির পরিবেশক। টেক্‌নিকে রেড্ডীর হাত খুবই পাকা। তামার প্লেট বৈদ্যুতিক ড্রিল দিয়ে এন্‌গ্রেভ করাতে ওর সমকক্ষ হয়ত বিরল। হাত দিয়ে প্লেট না কেটে, যান্ত্রিক ড্রিল ব্যবহার করায় হেইটার-এর আপত্তি ছিল। কিন্তু কৃষ্ণা রেড্ডী বলে "তাতে ক্ষতিটা কি? আমি যে ধরনের কাজ করি, যে এফেকট্‌ আনতে চাই, তা বৈদ্যুতিক ড্রিল ব্যবহারে ভাল হয় ও সহজে কম সময়ে করা যায়। তাই কেন তা ব্যবহার করব না?" রেড্ডীর ছবির ফর্মগুলো কোন বস্তুর বাইরের প্রতিকৃতি নয়, আভ্যন্তরীণ প্রতিচ্ছবি বলা চলে। ইলেকট্রনিক মাইক্রো-স্কোপে হাজার হাজার গুণ বর্ধিত আকারে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু দেখতে যেমন হয়, রেড্ডীর ছবির আবেদন অনেকটা সে ধরনের। রেড্ডী কি করতে চায় ও "ফর্ম" বলতে ও কি বোঝে, এ নিয়ে অন্যান্য শিল্পীদের মত তারও নিজস্ব অনেক কিছু বক্তব্য ও মতামত আছে। বেশীরভাগই আমার নিকট দুর্বোধ্য ব্যাপার, তাই ফর্ম সম্বন্ধে রেড্ডীর সে তত্ত্ব-কথা উল্লেখ করতে চাই না বা তাতে কোন লাভ নেই। মোটা কার্পেট পাতা, সুন্দর সাজানো ড্রয়িং রুমে, তাপনিয়ন্ত্রিত এক শীতের সন্ধ্যায় বসে, রেডিওগ্রামে পাশ্চাত্য কোন উচ্চাংগ সংগীত শুনতে শুনতে রেড্ডী বলেছিল—"এই যে সংগীতের আবেদন, ওর অ্যাবসট্রাক্‌ট্‌ এফেক্‌ট্‌-এর একটা ফর্ম আমি আমার এনগ্রেভিং-এর মধ্যে দিতে চাই।" আমার কাছে রেড্ডীর কতগুলো কাজ, ওর ভাস্কর্যের কতগুলো নমুনা অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। আবার কিছু কিছু এনগ্রেভিং বড্ড মেকানিক্যাল বলে মনে হয়েছে, শিল্পীর হৃদয়াবেগ বা অনুভূতি যেন কাজের মধ্যে নেই। এনগ্রেভিং ছাড়াও রেড্ডী অয়েল পেন্টিং ও ভাস্কর্যের কাজ নিয়মিত করছেন।

চীনামাটির তৈরী মূর্তি।
শিল্পী : কৃষ্ণা রেড্ডী

অতিথিবৎসল রেড্ডী দম্পতির বাসস্থানে বহুবার গিয়েছি। ওদের পরিচিত বহু শিল্পীর সংগে আলাপ হয়েছে সেখানে। মিঃ ও মিসেস্‌ ডিকসন্‌ এবং ফ্লোরা রীডার-এর সংগেও পরিচয় হল ওখানে। রীডার দম্পতি আমেরিকায় টেক্সাসের বাসিন্দা। টেক্সাস-এর নাম শুনে আমরা যা বুঝি এরা কিন্তু তার ঠিক বিপরীত। ডিকসন একজন গুণী শিল্পী। খোঁড়া, লাঠি নিয়ে চলতে হয়। কোমরের একটি হাড় প্লাস্টিকের। এক ব্রীজের উপর থেকে পড়ে গিয়ে এই অবস্থা। ফ্লোরা মঞ্চ প্রযোজনা ও অভিনয়ে বিশেষজ্ঞা। এঁরা দুজনে টেক্সাসে একটি বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। টেক্সাসের তৈল-ধনপতির ছেলেমেয়েদের চিত্রকলা ও মঞ্চাভিনয়ের শিক্ষাদান করা হয় এই স্কুলে। আশ্চর্য হয়েছিলাম শুনে যে, ওরা ভারতীয় "নল-দময়ন্তী" উপাখ্যান স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা মঞ্চস্থ করে-ছিল। ডিকসন মঞ্চসজ্জা ও পোশাক পরি-কল্পনা করে ভারতীয় চিত্রকলার অনুকরণে আর ফ্লোরা পরিচালনা করে নাটকের। রঙীন ফটোও দেখিয়েছিলেন এই নাটকের। আপাতত আমেরিকান স্কলারশিপ নিয়ে ডিকসন প্যারিসে এনগ্রেভিং শিখতে এসেছে হেইটার স্টুডিওতে। অত্যন্ত আলাপী আমুদে ও মিশুকে এই দম্পতি। মনে পড়ছে এক সন্ধ্যায় ওদের হোটেলে আমাদের জবর বৈঠক। রামায়ণ মহাভারতের নানান গল্প, ভারতীয় কিংবদন্তী ইত্যাদি সব বলেছিলাম। স্তম্ভিত হয়ে সব শুনেছিল, উপভোগও করেছিল। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের নাটকও বাদ পড়েনি। "তাসের দেশ"-এর কথা শুনে দুজন একেবারে উচ্ছ্বসিত। দেশে ফিরে, ওদের স্কুলে নাটকটি মঞ্চস্থ করবে বলে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কথা দিয়েছিলাম, ভারতে ফিরে ইংরাজী অনুবাদের ব্যবস্থা করব ওদের জন্য। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। 'তাসের দেশে'র কথা মনে করিয়ে দিয়ে ওদের চিঠিও পেয়েছিলাম।

প্যারিসে থাকাকালীন ভারতীয় শিল্পী লক্ষ্মণ পাই-এর চিত্রপ্রদর্শনী চলছিল, "গ্যালারী ডওফিন"-এ। বম্বের শিল্পী পাই প্যারিসে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। ভারতীয় ফোক-আর্ট-এর ধরনে পাই-এর ছবি ওদেশে বিক্রিও হয় ভাল। প্যারিসের শিল্পজগতে ভারতীয় শিল্পীরাও যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, এতেই আনন্দিত হয়েছি প্রচুর।

এখানেই শহরের শেষ নয়, এখানেই শহরের শুরু নয়। সকাল-সন্ধ্যায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবীদের ভিড়টা এখানে কম নয়! শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফাঁকা জায়গাটুকু আর ফাঁকা থাকে না, নির্মঙ্গ বায়ু সেবনে ধড়ফড় করে।...

এমনিতেই দিনের বেলায় পাড়াটা অন্ধকার, বাড়িটা অন্ধকূপ, সকাল হবার আগে পাতালপুরীর কোন প্রকোষ্ঠ যেন! দু চোখ এক করার আগে ঘরের আলোটা জ্বালাই থাকে সর্বক্ষণ, রাত থাকতে উঠে আর একবার জ্বালাতে হয়, দেখে-শুনে অনিমেষের প্রাতঃভ্রমণের আয়োজন করে দিতে হয়। জামা, জুতো, গলাবন্ধ, ছড়ি! চা-ও এক পেয়ালা উষ্ণ, সঙ্গে দুখানা বিস্কুট!

চোখ রগড়াতে রগড়াতে, কান-মাথা জড়িয়ে গলাবন্ধ বাঁধতে বাঁধতে অনিমেষ বলে, 'সক্কালে বেড়িয়ে কিচ্ছু হবে না, রোজ রোজ খালি—'

স্বামীর কথাটা কানে না-তুলে পিছন থেকে কোটটা অনিমেষের প্রসারিত হাতে গলিয়ে দিয়ে কমলা বলে, 'তোমাকে অত মাথা ঘামাতে বলেনি কেউ, নাও পরে নাও!'

অনিমেষ গজগজ করে, 'একঘেয়ে! বুড়ো লোকের মত মিথ্যে বাঁচবার চেষ্টা!'

কমলার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। অনিমেষের জুতো জোড়াটা দোরগোড়ায় রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনিমেষ আর কিছু বলবার আগেই কমলা ভগ্নস্বরে বলে ওঠে, 'বেশ তো, চেঞ্জে যাবার ব্যবস্থা কর না, তা হলে বুড়ো লোকের মত কলকাতাতেই মুখ থুবড়ে থাকতে হবে না। কর না, কেউ তো বারণ করেনি!'

নিঃশব্দে পায়ে জুতো গলিয়ে অনিমেষ রোজ সাত সকালে সুড়ঙ্গের মত গাল-পথটা পেরিয়ে আসে। ভোর হতে তখনও অনেক দেরি। আধ-বোজা চোখে কোনও গৃহস্থের মোরগ ডাকে।

ভারি রোগ-ভোগের পর সেরে উঠতে ডাক্তার বায়ু-পরিবর্তনের কথাই বলেছিল। কলকাতার এই ধোঁয়া, ঘিঞ্জি, স্যাঁতসেঁতে-

অন্ধকার কিছুদিন ত্যাগ করা উচিত! ফুস-ফুসটাও অনিমেষের ভাল নয়, নির্মল বাতাস আর পুষ্টিকর খাদ্যের এখন বিশেষ প্রয়োজন! তাড়াতাড়ি দেহে শক্তি ফিরে পেতে হলে—

বাকি উপদেশটুকু অনিমেষই ছেলেবেলার স্বাস্থ্যপাঠের জ্ঞান থেকে পূরণ করে নিতে পারে, বড় ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উপস্থিত যেটুকু প্রয়োজন তাই বা কোথা থেকে কি ভাবে সংগ্রহ করা যায়! মুখে বললেই তো আর হল না। বিশুদ্ধ বায়ুর জন্যে চেঞ্জের দরকার, তা আবার ব্যয়-সাপেক্ষ—ওষুধপত্রে এত খরচের পর একেবারেই তা অসম্ভব! আর পুষ্টিকর খাদ্য, হাফ-পে ছুটিতে সেতো ছেলের-হাতের মোয়া!

স্বামী-স্ত্রী অনেক পরামর্শ করে যখন কোনই সুরাহা করতে পারেনি তখন এই বিকল্প ব্যবস্থা বায়ু পরিবর্তনের! শহর-প্রান্তে ফাঁকা মাঠে যেটুকু বিশুদ্ধ বাতাস আছে তা আগেভাগে গিয়ে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ করলে ভগ্ন স্বাস্থ্যোদ্ধারের কাজ হলেও হতে পারে। কিন্তু গোয়ালার এই গলির বাতাস বড় বিষাক্ত!

প্রথম দিনের উত্তেজনায় সূর্যোদয়ের পূর্বেই ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরে অনিমেষ বলেছিল, 'আঃ কি ফাঁকা! নিঃশ্বেষ নিতে কোনই কষ্ট হয় না, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে যত খুশী অক্সিজেন নাও! কি দরকার চেঞ্জে যাবার?'

ঠিক অতটা উৎসাহ বোধ না করলেও কমলা স্বীকার করে নিয়েছিল, যদি ফল একই পাওয়া যায় তা হলে পয়সা খরচ করে বায়ু পরিবর্তনের আবশ্যক নেই। অনিমেষের সুস্থ হয়ে ওঠা নিয়ে কথা!

প্রথম প্রথম অনিমেষ সে-ভাব দেখিয়েছিল, শহর প্রান্তে ফাঁকা মাঠে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের কাল বিলম্বিত হত। বাইরে চড়া-রোদের তাপ গলিমুখে সামিয়ানা-ঢাকা মনে হলে, বেলা আটটা বাজলে অনিমেষ বাসায় ফিরে এসে শহরের প্রান্তে মৃতসঞ্জিবনী লাভের সংবাদ আনত—শুধু কি বাতাস, কত গাছ, ফুল, পাখি, মানুষ—

কমলা যোগ দিত, 'আমি জানি, তুমিই দেখ! আপিস যাবার আগে তো কোনদিন চোখই চাইতে না, মনে করতে কলকাতাটা বুঝি আমাদের গলির মত এঁদোপড়া আর অন্ধকার!'

নতুন করে দেখা নতুন শহর যেন, অনিমেষ বলেছিল, 'গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না, আমার মত কত লোক সেখানে যায়।'

কমলা বলেছিল, 'বেশ তো, ওখানে যত-ক্ষণ পার থেকো না, কে তোমায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে বলেছে!'

কিন্তু ফিরতেই হয় এক সময়, বায়ু-সেবন ছাড়াও সদ্যরোগমুক্ত ব্যক্তির আরো অনেক করণীয় আছে শহর অভ্যন্তরে। পথ্য চাই, ওষুধ চাই, ডাক্তার চাই, কাজও চাই! আর সবার জন্যে চাই রসদ।

কমলাই বারণ করেছে, 'না, আর কটা দিন যাক, ডাক্তার বলুক, তারপর আপিসে যেও। আগে শরীর তারপর কাজ!'

দুষ্ট রোগের মত ভাবনাটা ছুটি-ছাটা সব শেষ হয়ে যেতে মনে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধ-ছিল, অনিমেষ চৌকির ওপর থপ করে বসে ক্লান্ত সুরে বলেছিল, 'আর দেরি করলে চাকরি যাবে।'

কমলা কিসের জোরে বলেছিল কে জানে, 'চাকরি আগে না, শরীর আগে?'

ঘন কুয়াশায় পথ দেখা যায় না। সারা রাত কি যেন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে শহরের মুখে গাঁজলা ভেঙেছে। মৈনাক দণ্ডে শহর-সমুদ্র উদ্বেল হয়ে সফেন হয়েছে, গরল উঠেছে।

অনিমেষ সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগোতে এগোতে ভাবলে, শহরে থেকে শহরের নিঃশ্বাসে শরীর মজবুত হবে না, বাইরে কোথাও না গেলে কাজে পুনঃ যোগ-দানের সে উপযুক্ত বিবেচিত হবে না। কিন্তু –

রোগ হবার পর থেকে নিজে হাতে কিছু না করলেও, টাকা-পয়সার আগম-নির্গম পথটা না-জানার মত অন্ধিসন্ধিপূর্ণ নয় অনিমেষের চিন্তায়। আধা মাইনের দিন ফুরিয়ে গেছে, বিনা মাইনের দিন শুরু হয়েছে, ছুটি শেষ মাইনে শেষ! এইবার চাকরিতে হাত পড়বে, নোটিশ আসবে—

কমলা আশা ছাড়ে না, ছেলে-ভুলোনার চেষ্টায় বলে, 'কি যে বল, অত ভারি অসুখ গেল, এরই মধ্যে শরীরে বল পাবে, দুদিনেই কাজ হয়ে যাবে?'

হিসেব করে অনিমেষ বলেছিল, 'দু মাসের ওপর হয়ে গেছে ভোর বেলায় রোজ বেড়িয়ে আসছি! ডাক্তারও বলছে কোন উন্নতি হয়নি স্বাস্থ্যের!'

কমলা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ডাক্তাররা অমন বলে, ওদের আর কি, লম্বা ফিরিস্তি দিলেই হল!'

বায়ু পরিবর্তনের জন্যে বাইরে যাওয়া এখন একেবারেই কল্পনা! পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে ফেলে না দিলে ঐ অন্ধগলি থেকে অসুস্থ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য মানুষগুলোর উদ্ধার নেই! চেঞ্জও নেই কোন।

মাঠে এক চক্কর দিয়ে আর বেড়াতে ইচ্ছে করে না, অনিমেষ একধারে একটা কৃত্রিম কাঠের গুঁড়ির ওপর চেপে বসে। সামনে পুকুরের জলটা তখনো সেলেটের মত কাল, কুয়াশার ঢাকাটা কে যেন আস্তে আস্তে সরিয়ে নিচ্ছে, অদূরে শহর-চাঞ্চল্য জাগছে। শহর-ছোঁয়া পথটায় হঠাৎ যানের ফুৎকার উঠছে।

রোজ যারা নিয়মিত আসে তারা একে একে এসে হাজির হচ্ছে। কেউ বসছে, কেউ হাঁটছে, কেউ দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে, সূর্যটা বুঝি শহর প্রাকারের অনেক নীচে! মাঠেও আজ কেমন গুমোট ভাব! শীতটার গলা চেপে ধরেছে কে, কাত হল বলে।

কোটের ওপর থেকে মুড়ি-দেওয়া গরম চাদরটা অনিমেষ খুলে ফেললে। গলাবন্ধটা আলগা করে দিলে। চেয়ে চেয়ে দেখলে, ভাবলে প্রথম দিনের মত তেমন উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দদায়ক মনে হয় না, এ মাঠে অনেক লোক, অনেক ভিড়—পায়ে পায়ে ঘাসের আগায় শিশিরবিন্দু ধুলো হয়ে গেছে, অনেক আগে-ভাগেই প্রাতঃভ্রমণকারীর পদধ্বনি উঠেছে।

অনিমেষ অস্পষ্ট কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে সঞ্চরমান মানুষগুলোকে দেখে দেখে এই প্রথম যেন ভাবলে, সবাই-ই কি এখানে তার মত বিকল্প বায়ু পরিবর্তনের আস্বাদ নিচ্ছে? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে? অর্থ-সামর্থ্যের অভাবটা ফালতু মাঠের বদান্যতায় পূরণ করছে? রোগভোগের পর শরীরে শক্তি সঞ্চয় করছে?

না, সবাই অসুস্থ নয়, সবাই অসমর্থ নয়, সবাই বিকল্প পন্থায় এখানে আসেনি। ঐ তো মাড়োয়ারি ভদ্রলোকটির ঝকঝকে মোটর-গাড়িটা মেহগনী গাছের তলায় দাঁড় করান, গাড়ির মালিক থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটছেন, খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছেন, আগাগোড়া শাল-দোশালার মুড়িতে কবেকার মিশরের মমির মত দেখতে লাগছে যখন দম নিতে থামছেন। উনি একা নন, আরো কত আছে। হ্যাঁ, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আছেন, যেমন লম্বা তেমনি চেহারার বাঁধুনি, পাকা বাঁশের মত, পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পরিপাটি, হাঁটার মধ্যে বেশ বৈশিষ্ট্য আছে, এক একটা স্টেপ যেন সভাপতির সভারোহন! আর একজন প্রৌঢ় আছেন উচ্চতায় নাতি-দীর্ঘ, কিন্তু ক্ষিপ্রতায় যুবক সদৃশ, এরি মধ্যে বোধ হয় বাইশবার চক্কর দিয়ে ফেলে-ছেন। এঁদের কাউকে দেখে অসুস্থ বা অসমর্থ মনে হয় না, বিকল্প পন্থাবলম্বন-কারীও না। এঁরা রোজই আসেন, হয়তো অনিমেষের অনেক আগে থেকেই আসছেন, নির্ভেজাল বায়ু সেবনই উদ্দেশ্য!

ক্ষিপ্রগতি প্রৌঢ় ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন, চোখ তুলে চাইলেন, দৃষ্টি বিনিময় করে বললেন, 'এরি মধ্যে বসে পড়লেন দেখছি!'

বসে বসেই অনিমেষ গায়ের চাদরটা কাঁধে ফেলে বললে, 'না, এই একটু—'

নিজের তালেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'কেবল হাওয়া খেলেই হলো না, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা চাই! ওয়াকিং একটা এক্সসারসাইজ। বাতের টেন্ডেন্সিই বলুন

আর পেটের গোলমাল বলুন, সব সেরে যায়।'

মেদবহুল মাড়োয়ারি ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'দাবাই-ওয়াই কুছ নাহি, ওয়াকিং ঠিক আছে!'

মাঠে এসে বসার জন্যে সবাই যেন অনিমেষকে দুয়ো দিচ্ছে। বিশুদ্ধ বায়ু কেবল সেবন করলেই হয় না, বায়ুস্তরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনও প্রয়োজন।

কুয়াশাটা এতক্ষণে কেটে গেছে, মাঠের গাছ-পালা-ঘাস মিলিয়ে বেশ সবুজ-সবুজ লাগছে, বাসা ছেড়ে অনেকগুলো পাখি এক-সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে।

অনিমেষ উঠে ওঁদের সঙ্গ নিলে। কিন্তু সঙ্গীরা বোধ হয় সঙ্গ চান না, যে-যার মত হাঁটতে লাগলেন, প্রৌঢ় ভদ্রলোক অনেক দূরে, বৃদ্ধ মাঝখানে, মাড়োয়ারী একেবারে পিছনে—

এই একটু আগে তার বসা নিয়ে ওঁদের যে আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল এখন ওর উখানে, পদচারণে তার কোন চিহ্নই নেই। মাঠের ঘাসে এক ফোঁটা শিশিরও নেই, কুয়াশায় দিগন্তে আঁচল-ছোঁয়া! গুটি গুটি পিছন পিছন অনিমেষ তবু এগোল।

রোজই এমনি করে বাড়ি ফেরে।

কি হচ্ছে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু শরীর যে সারছে না সে বিষয়ে অনিমেষ নিঃসন্দেহ। না বললেও কমলাও বুঝি বোঝে, টের পায়। বিশুদ্ধ বায়ুর ফাঁকটুকু পুষ্টিকর খাদ্যে পুরিয়ে দিতে চায়। বড় পেড়াপিড়ি করে।

অনিমেষ সুস্বাদু পানীয়টা মুখ থেকে নামিয়ে বলে, 'মন্দ নয়, কিন্তু—'

স্বামীর অনুক্ত বক্তব্যটুকু বুঝে নিয়ে কমলা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, 'অত খবরে তোমার দরকার কি, পাচ্ছ খাও!'

বলকারক পানীয়টা মুখে তুলে অনিমেষ তেমনি কিন্তু করে, 'তা নয় পাচ্ছি, কিন্তু—'

কমলা প্রায় রাগ করে সামনে থেকে সরে যায়। শূন্য পাত্রটা হাতে ধরে অনিমেষ চুপ করে বসে থাকে। আশ্চর্য, কমলার একটুও ভাবনা নেই, কি-দিয়ে-কি-হবে, কার-পরে-কি-হবে, বিনা-মাইনেয়-চলে-কি-করে! হয়ত ও সুস্থ বলেই এ সব কথা কিছু ভাবছে না, একটি অসুস্থ লোককে ভাবাচ্ছে না। যখন অনিমেষ সুস্থ ছিল, অফিসে রোজ যেত আসতো, পকেটে করে মাস-মাইনে আনতো তখনও কমলার কোনই ভাবনা ছিল না। এখনো তাই? কে জানে কি শক্তি আছে কমলার দুর্ভাবনা এড়াবার। দিব্যি আছে, যেন কিছুই হয়নি, যেন একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে! এমন ঘটনা সব ঘরেই ঘটছে, জন্ম-মৃত্যুর মত রোগের আনাগোনা, ভয়ের কিছু নেই, ভাবনারও কিছু নেই!

একদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফিরে অনিমেষ বললে, 'কাল থেকে আপিসে যাব ঠিক করেছি।'

স্বামীর কথায় কোনরূপে বিচলিত না হয়ে কমলা বললে, 'ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেচো—যেতে বলেচেন?'

হঠাৎ রেগে অনিমেষ বললে, 'ডাক্তার আবার কি বলবে! সব কথা ডাক্তারকে জানাতে হবে?'

কমলা গম্ভীর হয়ে বললে, 'না, বরাবর উনিই তো দেখচেন, ভাল-মন্দ উনিই বোঝেন!'

আরো যেন রেগে ওঠে অনিমেষ, 'বুঝলে আর এই অবস্থা হয় না, এক বছর ধরে রোগ সারে না, ওষুধ গিলিয়ে গিলিয়ে শেষ করে ফেলে না!'

যত দোষ এখন ডাক্তারের, ওষুধের। কমলা চুপ করে থাকে, একটানা রোগে ভুগে অনিমেষের মেজাজ ক্রমেই তেতো হয়ে গেছে। নিজের মতটি ছাড়া কারো কথা সহ্য হয় না।

আরো অসহ্য ডাক্তারের লিখিত নীরোগ-পত্র ছাড়া অফিস তাকে পুনঃ কাজে নিতে চায় না। রোগীর মুখের কথায় রোগ সারে না। কথা কাটাকাটি করে অফিসের দোর-গোড়া থেকে অনিমেষকে ফিরে আসতে হয়।

কমলা অনেক করে বুঝিয়ে-বাজিয়ে অনিমেষকে প্রাতর্ভ্রমণে পাঠায়—'আর কটা দিন দেখ, তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করো।'

তেমনি মারমুখো হয়ে অনিমেষ বলে, 'কি ব্যবস্থা করবো, ডাক্তার সার্টিফিকেট না দিলে কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে চাকরিটাই যাবে!'

চাকরি থাকার সুখ অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে, এখন যেটুকু আছে স্বামী-পরিত্যক্তার শঙ্খ-বলয় কেবল, কমলা বললে, 'যায় যাক, তুমি ভাল হও, তারপর দেখা যাবে।'

অনিমেষ মুখ বিকৃত করে বললে, 'আর দেখা যাবে!'...

একে একে ওঁরা তিনজনেই দেখলেন, লোকটি মাঠের একধারে চুপচাপ বসে আছে, কেমন নিষ্ক্রিয়, নিশ্চুপ যেন। নিত্য বায়ু-সেবীদের সঙ্গে মানায় না। আর এমন বিমল প্রভাতে জড়তা শোভা পায় না। বসে থাকবে যদি এখানে আসবার দরকার কি—এখানে যারা আসে শহর মাড়িয়ে তারা কেউই স্থাণু নয়। ছোট ছেলেটা পর্যন্ত মায়ের কোল থেকে নেমে ছোটাছুটি করছে। অদূরে শহর সহস্র হাত বাড়িয়ে তাকে মানা করছে, শান্ত হতে বলছে, কাছে টানতে চাইছে। ও কি শুনছে? কেন শুনবে? জায়গাটা শহরের শুরু নয়, শহরের শেষ নয়, শহরের এলাকা নয় বলতে গেলে এখানে শহরবাসীর সব অভ্যাস ত্যাগ করা যায়। হাঁটো, ছোটো, নাচো-কোঁদো কেউ কিছু বলবে না। নিঃশ্বাস খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে পড়বে। ভুলে যেতে পারে রামধন মিস্ত্রীর কি কিনু গোয়ালার গলির অস্তিত্বটা। হলেই বা ক্ষণস্থায়ী, তবু কত নিকটবর্তী তুমি প্রকৃতির প্রতিদিন।

অনিমেষ উঠলো, উঠে খানিকটা ঘুরে এল, আবার এসে বসল। আগের তুলনায় অনেক জনবহুল হয়ে উঠেছে মাঠটা, নতুন সন্ধানীরা এসেছে। অদূরে ঐ পিচের রাস্তার কোল ঘেঁষে অনেকগুলো মোটর গাড়ি জড় হয়ে আছে, যেন কোন অন্তরীপের ওপর দূরে থেকে নজর রাখছে। আরো দূরে শহরের যান-বাহনের শব্দটা ককিয়ে-কান্না থেমে-যাওয়ার মত মনে হচ্ছে। আর কতদিনে শহরটা এ জায়গাটুকুও গ্রাস করবে!

ক্ষিপ্রগতি প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে ছুঁড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীর খারাপ নাকি?'

অনিমেষ জবাব দেবার আগেই তিনি টিকটিকির কাটা লেজের মত ছিটকে এগিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন, বললেন 'বার বার বসছেন, কি ব্যাপার?'

অনিমেষ ম্লান মুখে বললে, 'বড্ড ভিড়!'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক হেসে সায় দিয়ে এগিয়ে গেলেন, 'যা বলেছেন!'

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পিছিয়ে থাকলেও থপ্ থপ্ করে ঠিকই এসে পড়েছেন, বসবার একান্ত ইচ্ছে থাকলেও সূর্যোদয়ের পূর্বে হাঁটার নির্দিষ্ট সংখ্যাটা পূরণের একাগ্রতায়

বিশেষ সজাগ হয়ে দুই হাঁটুর ওপর দুই হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চক্কর হো গয়া?'

'নেহি!' বসে বসেই অনিমেষ বললে।

'তব্?' অর্থাৎ বসে কেন? 'ঘুরো-ফিরো, মজা সে বায়ু পিয়ো'—ফুসফুস সজোর হবে, দিল খুশ হবে!

এমনি কয়েক দিনের পর অনিমেষের বেড়াতে এসে মাঝে মাঝে বসে-পড়ার কারণটা ও'রা জানলেন। শুনে ও'রা সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করলেন। বেচারা একে রুগ্ন, অসুস্থ, তার ওপর চাকরি-বাকরি নেই, খুবই পরিতাপের বিষয়! ভাববারই কথা!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আশ্বাস দিলেন, 'গেট রাউন্ড, ফাইট করে দেখতে হবে আইনে কি বলে। ইউ কম্ টু মি ওয়ান ডে!'

বৃদ্ধ বললেন, 'আপনার কেসটা আমাকে ডিটেল দেবেন, কথা বলে দেখবো মিস্টার তরফদারের সংগে। ভাববেন না, সুস্থ হয়ে নিন।'

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক আরো ভাল কথা বললেন, 'শরীর বানিয়ে নিন, কুছু ভাববেন না বাঙালী বাবু, হেলথ ইজ্ ইয়োর ওয়েলথ্! হে' হে', আমার কাছে আসবেন বেবস্তা করিয়ে দেবে!'

তারপর মাঠের তিন দরদী বন্ধুর কথা বাড়িতে এসে কমলাকে জানালে অনিমেষ। মা ভৈঃ। কমলা চুপ করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার দৃষ্টি কেমন অপলক যেন, ঐ রুগ্ন লোকটা আজ কদিন হল চাকরি ছুটে-যাওয়ায় নোটিশ পেয়েছে, আরো যেন কাহিল হয়ে পড়েছে, হাত-পা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আজ সব কিছুর ব্যতিক্রম যেন অনিমেষের মুখে-চোখে, যেন নোটিশ ফিরিয়ে নিয়েছে নিয়োগকর্তা চাপে পড়ে—অনিমেষ রুগ্ন হতে পারে, ভগ্নস্বাস্থ্য হতে পারে, দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু কিছুতে আজ আর অসহায় নয়, একলা নয়, পিছনে অনেক শক্তি ধরে।

অনিমেষ বললে, 'তিন জনেই বলেছেন, আমার দশ বছরের চাকরি বিনাদোষে অমনি গেলেই হল! একটা দরখাস্ত করে দেখবো, নোটিস উইথড্র করে ভাল, নইলে—'

বিকল্প পথটা অনিমেষ মনে মনে ভাবলে, যেন খুব এক-হাত নেওয়া যাবে নিয়োগকর্তাকে মুরুব্বির জোরে, এখনি নাম-ধাম-ঠিকানা তাঁর বলা উচিত হবে না।

কমলা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'নইলে কি, কাকে কি করবে?'

হাসলে অনিমেষ. এমন নিশ্চিন্তের হাসি অনেক দিন হাসেনি অনিমেষ, বৎসরাধিক একটানা রোগে ভুগে, ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের নিমিত্ত ছ মাস ধরে মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ করে।

অনিমেষ বললে, 'সে দেখবে তখন!'

'বল না শুনি, দরখাস্ত ছাড়া আর কি তুমি করবে চাকরির ব্যাপারে?' কমলা পেড়াপিড়ি করলে। তারও সহ্যের সীমা যেন উত্তীর্ণ হয়েছে।

হাতের পাকান খবরের কাগজটা খুলে সামনে মেলে ধরলে অনিমেষ, বিশেষ একটি চিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে মিটিমিটি হাসলে।

অধৈর্য কমলা বললে, 'কি যে হাস বুঝতে পারি না! আজ হঠাৎ কাগজ কেনার ঝোঁক হল কেন?'

অনেক কারণেই মানুষ রোজ কাগজ কেনে, চাকরির সন্ধান, বাড়ির সন্ধান, পাত্রের সন্ধান, রাজা-উজীর মারার সন্ধান! আজকের কাগজ কেনবার সময় অনিমেষের একটি উদ্দেশ্যই ছিল, কিন্তু কাগজটা হাতে করে দেখলে তার দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এক—

অনিমেষ বললে, 'দেখি কোনো চাকরি খালি আছে কি না।'

'এই তো বললে তোমার চাকরি যেতে পারে না, ওরা নোটিশ ফিরিয়ে নেবে!'

'তা হলেও নতুন যদি একটা পাওয়া যায় কে ওদের খোসামোদ করবে!' খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার ছবিটার ওপর অনিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে।

কমলার কেমন গোলমাল হয়ে যায়। অনিমেষের ভাবটা কিছুতেই বোঝা যায় না। এই বলছে বাঁধা চাকরি ছুটবে না, এই বলছে নতুন চাকরি পেলে করবে। যেন আজ ইচ্ছে করলেই অনিমেষ প্রাণ ধারণের উপায় করে নিতে পারে, আর তা কত না অবলীলাক্রমে।

অনিমেষ কমলাকে কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে কাগজখানা তুলে ধরে খুশী খুশী মুখে বললে, 'ছবিটা কার বলদিকি, দেখেছো কখনো?'

'কেন?' তেমনি কৌতূহল কমলার চোখে মুখে, আবার অবিশ্বাসও অনিমেষকে।

'বল না কার?' যেন ছবির লোকটি তারই একমাত্র পরিচিত, অনিমেষ বললে।

'কার আবার, ঐ তো কোন্ একটা মন্ত্রীর যেন!' বেশ তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব যেন কমলার স্বরে।

'কোন্ একটা মানে, ভাল করে চেয়ে দেখ!' অনিমেষ প্রায় মারমুখী হয়ে ওঠে।

'আমার দেখে কাজ নেই, সকালবেলা আর কাজ নেই, ওঁদের মুখ দেখে পেট ভরবে!' কমলা উঠে গেল কাগজখানা ফেলে দিয়ে।

মন্ত্রীর ছবির মুখ দেখে সত্যি পেট না ভরলেও স্বামীর সংগে তাঁর আন্তরিকতার সম্বন্ধ স্থাপনের সংবাদে কমলা গর্ব বোধ করে। আলাপ যখন হয়েছে তখন কিছু একটা হবেই। রোজ নাকি বৃদ্ধ ভদ্রলোক খবর নেন, আশ্বাস দেন নির্ভাবনার।

একে একে আরো দুজন প্রভাত-বন্ধুর অভয় বাণীর কথা শুনেছে কমলা স্বামীর মুখে।

অনিমেষ বলেছে, 'আরে আমি কি জানতুম, ও'রা সব এমন হোমরা-চোমরা! সেই যে যাঁর কথা বলেছিলুম, বেঁটে-খাটো, বেশ টাইটমত, কত বড় চাকরি করে জান, কত মাইনে পায়? আর সেই যে মেড়োটা, অত সাদাসিদে, কে জানতো লক্ষপতি, কোটিপতি!'

প্রায় গলায়-গলায় অনিমেষ এমন করে বলে, ইচ্ছে করলে নাকি ও'রা রাতকে দিন করে দিতে পারেন। অনিমেষ মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে, বরখাস্ত চাকরিটা নিয়ে কিভাবে লড়বে—প্রথমে আইনের আশ্রয়ে পুনর্বহালের জন্য আবেদন করবে, (সে প্রৌঢ় ভদ্রলোক করে দেবেন) তাতে না হলে বিভাগীয় তদন্ত, উপর থেকে চাপ দেওয়াবে (সে বৃদ্ধ ভদ্রলোক করবেন), তারপরেও যদি কিছু না হয় (যদিও অনিমেষ তা বিশ্বাস করে না, বৃদ্ধ ভদ্রলোকই ও'দের মধ্যে বিশেষ আপনার যেন, তারই কেন্দ্র থেকে উনি বিধান সভায় গেছেন), তখন মারোয়াড়ী মালিকের শরণাপন্ন হ'য়ে একটা চাকরি চেয়ে নেবে!

কমলা ঠিক অমন করে ভাবে না সব সময়। না ভাবার কারণও আছে, দেখতে দেখতে মাস পেরিয়ে গেছে, অনিমেষের চাকরি-যাওয়ার নোটিশ প্রত্যাহৃত হয়নি, দিনকে রাত করার কোনো খবর আসেনি।

কিন্তু একটা জিনিস আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে কমলা, ইদানীং বেড়াবার ঝোঁকটা বেড়েছে অনিমেষের। সকাল হবার তর সয়

না, নিজে থেকেই বেরিয়ে পড়ে, বলে-কয়ে আর বুঝিয়ে পাঠাতে হয় না!

অনিমেষ বেড়িয়ে ফিরলে, শহরের ওদিকের রোদ এদিকে কিছু আলো ছড়ালে, শোবার ঘরের আলোটা যখন নিবিয়ে রাখলে কোলের মানুষ চিনতে অসুবিধা হয় না, তখন কমলা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'আজ শরীর কেমন আছে, বেশ জোর পাচ্ছ তো?'

শরীর সম্বন্ধে আর তেমন সচেতন নয় অনিমেষ, তাছাড়া আজ কেমন অন্যমনস্কও যেন। হাতের খবরের কাগজখানার ভাঁজ খুলে বিস্তৃত করে নির্লিপ্তকণ্ঠে বললে, 'ভাল!'

কমলা পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে, অনিমেষ খবরের কাগজের একটা ছবির দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে চেয়ে কি যেন খুঁজছে।

কমলা জিজ্ঞেস করলে, 'কি দেখছো অমন করে?'

'চাকরি!' কাগজখানা চোখের ওপর তুলে অনিমেষ অদ্ভুত গলায় বললে।

'কিন্তু সে তো পেছন দিকে, সামনে সব খবর, বড়লোকদের ছবি!' কাগজখানা স্বামীর হাত থেকে টেনে নেবার চেষ্টা করলে কমলা।

এইবার অনিমেষ স্পষ্ট করে বলে, 'এই যে দেখছো ছবিটা, এর মধ্যে ঐ যে পিছন দিকে টাক-মাথা ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে চিনতে পারছো?'

কমলা বিমূঢ় হয়ে অনিমেষের মুখের দিকে চায়, কোন্ দেশের এক রাজা রাজধানী কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন, তাঁকে দমদম বিমানঘাঁটিতে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সরকারী কর্মচারীদের ভিড় হয়েছে।

'উনিই মিস্টার সেন, যাঁর কথা তোমাকে বলেছিলুম, সেই যে গো দু হাজার টাকা মাইনে পান, রোজ মাঠে দেখা হয়, খুব মিশুকে ভদ্রলোক, বোঝাই যায় না এত বড় একজন—'

অনিমেষ উচ্ছ্বাসে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল কমলার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। কমলার মুখটা অত কঠিন দেখাচ্ছে কেন?

শুষ্ক কণ্ঠে কমলা জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কি হলো বল!'

থতমত খেয়ে অনিমেষ বললে, 'আমার আবার কি হবে?'

'উনি চেষ্টা করবেন বলেছিলেন না, যাতে নোটিশটা তুলে নেয়?' হঠাৎ কমলা জেরা করতে শুরু করে।

'হ্যাঁ, না, একদিন যাব ও'র কাছে, আমাকে যেতে বলেছেন।' অনিমেষ আমতা-আমতা করে।

'আর কবে যাবে?' তেমনি জেরার ভঙ্গি আজ কমলার কণ্ঠস্বরে।

'আমার সঙ্গে খুব আলাপ মাঠে এক-সঙ্গে বেড়াই, কত কথা হয়, খুব আলাপী ভদ্রলোক, অত বড় চাকরি করেন একটুও দেমাক নেই! ঠিক যাব দেখো, উনি বলেছেন—'

আর কমলা কিছু বলেনি, অনিমেষকে তাড়া দেয়নি ছুটে-যাওয়া চাকরিটা মুরুব্বি ধরে কুড়িয়ে আনতে। তার কেমন ধারণা হয়েছে, অনিমেষের ঐ শরীরের মতই চাকরির অবস্থা, আপন নিয়মেই গেছে। যতই আইন দেখাক, মালিকের ইচ্ছে না হলে আর পুনর্বহাল সম্ভব নয়! এখন অনিমেষের শরীরটা শক্ত হলেই সে বাঁচে!...

আজ তিন দিন মাঠে কোন মানুষ বায়ু সেবনে আসছে না। কুয়াশার দিন কেটে আলোর দিন শুরু হয়েছে, অনেক ভোরেই পাখিরা গান গাইছে, কাঁচা-মিঠে বাতাসে কচি পাতা জাগছে, মেহগনীর ডালে তামার পাত যেন।

একা-একা অনেকক্ষণ অনিমেষ বসে থাকে। হঠাৎ আকাশটার চেহারাও কেমন বদলে গেছে। ঐ শহরের সঙ্গে যোগাযোগটা ছিন্ন যেন। আকাশ, বাতাস, মাঠ, মানুষ পরস্পরের সম্বন্ধে কত নিকট হতে পারে, অনিমেষ ভাবলে, আর যদি এই ফাঁকা জায়গাটা না থাকতো তাদের নিঃশ্বাস বুঝি রুদ্ধ হয়ে যেত। পরস্পরের কাছ থেকে মানুষ আরো দূরে সরে যেত!

হয়তো ওঁদের শরীর অত নির্মল বায়ুর প্রত্যাশী নয়, হয়তো বায়ু পরিবর্তনে তাঁরা দেশান্তরের সন্ধান করেছেন। বিকল্প ব্যবস্থার ওঁদের দরকারই বা কি!

কিন্তু অনিমেষের দরকার আছে। কমলাকে দেখে বেশ বোঝা যায়, সে-বেচারা আর বইতে পারছে না, ভাল-হবার, চাকরি থাকার স্তোক মানছে না। সবাই হয়তো ভেঙে পড়বে। কি অন্ধকার আর স্যাঁত-সেঁতে তাদের গলিটা, ঢুকলেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সব উৎসাহ শেষ হয়ে কমলা কেমন নির্জীব হয়ে গেছে, আর অনিমেষকে কাছ থেকে ছাড়তে চায় না। সে-ও বুঝি মেনে নিয়েছে, পরাজয় স্বীকার করেছে, শহর-ছোঁয়া মাঠে স্বাস্থ্যোদ্ধার সম্ভব নয়।

শূন্য মাঠ আজ সত্যিই শূন্য। অনিমেষ কিছুতে ভাবতে পারছে না, বায়ু- সেবনের জন্যে না হলেও লোকগুলো প্রতিদিনের অভ্যেসটাও ভুলে গেল, নাকি গৃহে তাদের কমলার মত বিরূপ পরামর্শদায়িনী আছেন? কমলাও আজকাল বলে, কিছু দরকার নেই, চুপচাপ বসে থাক দিকি, ভাল হবার হয়, আপনিই হবে।

কিন্তু অনিমেষ সেকথা ভাবতে পারে না। এই মাঠে এলেই নিজেকে সে যে পরিপূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করতে পারে, বাঁচার আগ্রহে নিজেকে বিস্তীর্ণ করতে পারে, বিকীর্ণ করতে পারে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে। কিন্তু গোয়ালার গলি নিতান্তই গলি, সংকীর্ণ, চতুর্দিক থেকে নিষ্পিষ্ট।

আর এত বড় বড়লোক এত সহজে তার বন্ধু হবে কেন, এই মাঠ আর প্রকৃতির নিকটবর্তী বলেই না! পাড়ার তো কত বড়লোক আছে, দুবেলা তো দেখা হচ্ছে, কেউ তো তার কোন খবরই রাখে না, মুখের দুটো কথা বলে না। বাঁচা-মরার সংবাদ নেয় না। একটানা রোগ ভোগের মত শহর-জঠোরে তাদের বাস, নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ার মত শোয়া-বসা, ঘুমোনো, জেগে ওঠা!

ফাঁকা মাঠে উঠো-উঠি দুদিন একা-একা বেরিয়ে ফিরে এসেছে অনিমেষ। আবার কেমন শূন্যতা বোধ করছে, নিঃসঙ্গ, অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে! পরিত্যক্ত সে যেন শহর প্রান্তে। শহরবাসী আর সে নয়!

বিনা ভাড়ায় আর টেকা যাবে না বাসা-বাড়িতে, বাড়িওলার নোটিশের মেয়াদ

(শেষ ৪১৫১

ফুরিয়ে গেছে। তবু অনেক দয়া বলতে হবে, এক বছরের ওপর বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে, হাতে-পায়ে ধরে এতদিন কমলা ঠেকিয়ে রেখেছে! আইনের প্যাঁচে পড়েছে, আর রক্ষা নেই! বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! কমলা বুঝি একদিন নিজে গিয়েছিল বাড়িওলার কাছে আরো কিছুদিন সময় চেয়ে পাওনা মেটাবার দরবার নিয়ে। দোর গোড়া থেকে ফিরে এসেছে, বাড়িওলার লোক জানিয়ে দিয়েছে, 'বাবু এখন দেখা করতে পারবেন না, বলেছেন তাঁর করার কিছু নেই, এখন আদালত যা করে, মামলা তার হাত থেকে চলে গেছে!'

তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে বাড়িওলার আইনের শরণ নেওয়ার, উচ্ছেদের মামলায় জিতলে বাড়িভাড়া বৃদ্ধি পাবে দুগুণ, আর বাঙালী ভাড়াটে না বসালে চারগুণ, আইনের ফাঁকে নতুন করে চুক্তিপত্র তৈরি হয়ে যাবে!

বাসা-বাড়ি চাকরির মতই তাকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। অনিমেষের চাকরিতে
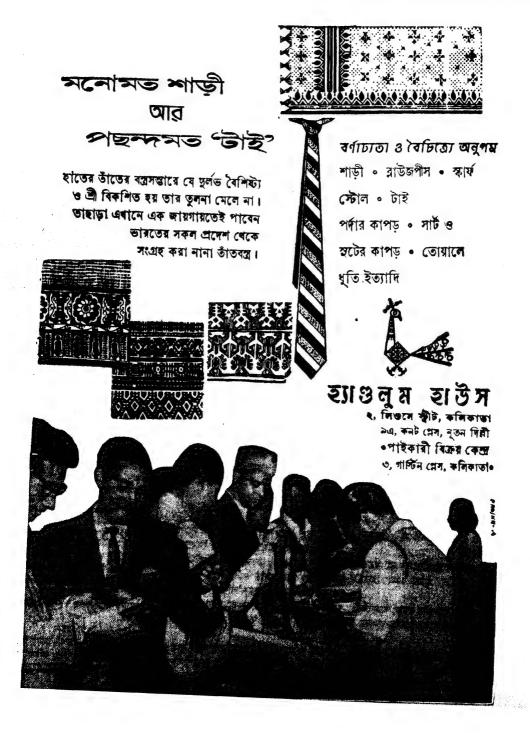
নতুন এসে সামান্য পারিশ্রমিকে যে লোকটা খাটবে, তার জন্যে নিয়োগ-কর্তার দায়িত্ব অনেক কমে যাবে। দশ বছর আর দশ দিনের দাবি তো এক নয়!

এদিকে কোন উত্তরই আসেনি অনিমেষের চাকরিতে বাহাল রাখার আবেদনের। অনিমেষেরও মন বলছে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, একদিন মিস্টার সেনের কাছে যেতে হবে। তারপর দেখে নেব—

আজ বাসায় না ফিরে মিস্টার সেনের অফিসের খোঁজ করলে কেমন হয়? তিনি তো বলেছেন, অলওয়েজ ওয়েলকাম! যখন খুশী আসবেন!

একসংগে দুটো কাজ হবে, ভদ্রলোক কেন মাঠে আসছেন না খবর নেওয়া হবে, সেই সংগে নিজের চাকরির সম্বন্ধে পরামর্শও, কেবল স্বার্থের জন্যে গেলে কেমন-কেমন লাগবে, ভদ্রলোক ভাববেনই বা কি! যতই আলাপ থাক, পরিচয় হোক, ফাঁকা মাঠে এসে পরস্পরে যুক্ত হোক, আন্তরিকতায়, মানসিকতায় একাত্ম হয়ে উঠুক, তবু স্বার্থ নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু সংকোচ থাকেই—

আজকের মত সুবিধা আর কোনদিন হবে না, এই সুযোগ অন্তর্যামী জুটিয়ে দিয়েছেন। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ!

রোদ উঠে ইট-কাঠে চড়া হওয়ার সংগে সংগে কেমন যেন মরিয়া হয়ে ওঠে অনিমেষ, মিস্টার সেন যদিও দেখা করলেন না, সময় হলো না, বোধ হয় চিনতেই পারলেন না, না চিনুন—এখন অভিমান করবার সময় নয়, কাজ উদ্ধার করা নিয়ে কথা।

পরিচিত আত্মীয়স্বজনসদৃশ, বন্ধু, একই মাঠের বায়ুসেবী, নিত্য-ভ্রমণকারী মন্ত্রীমহাশয় আছেন! তিনি নিশ্চয়ই চিনবেন, আর সেই বিশ্বাসে অনিমেষ খুঁজে খুঁজে ইট-পাথরের খাঁচা শহর ঘুরে তাঁর দেউড়িতে উপস্থিত হল। চাকরির সংগে বাড়িভাড়ার কথাটাও বলবে, তাঁর প্রভাব জাগতিক কোন বিষয়েই কম নয়, ইচ্ছে করলে তিনি সব করতে পারেন— রাতকে দিন, দিনকে রাত!

কিন্তু মন্ত্রীমশাই সাক্ষাতে রাজী হলেন না। তিনি স্পষ্ট বলে পাঠালেন, অনিমেষ চক্রবর্তী বলে কাউকে তিনি চেনেন না, কোন সূত্রেই তাঁর সংগে পরিচয় নেই, অযথা সময় নষ্ট করবার তাঁর সময় নেই!

অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে অনিমেষ চলচ্ছক্তিহীন হয়ে খানিক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকেই তার অবিশ্বাস হ'ল মনে মনে মানলেও অবস্থাটা তার কল্পনাতীত! চোখের ওপর থেকে সমস্ত আলো যেন নিবে গেল, কিন্তু গোয়ালার গলি, কি রামধন মিস্ত্রী লেনের মত বায়ু-হীন, রুদ্ধশ্বাস! শহরের শেষ নয়, শহরের শুরু নয়, সেখানে যে-মাঠটার সূর্য-ওঠার আগে মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে তা কি মরীচিকা, মিথ্যা? কে জানে।

ডুবন্ত মানুষের মতই অনিমেষের কুটি আঁকড়ানর আগ্রহ জাগে। সান্ত্রীওলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে' সাগ্রহে চার-পাশ দেখে নেয়, তারপর গোঁ ভরে ঢুকতে যায়। সান্ত্রী বাধা দেয়, পরিচয়পত্রের জন্যে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেয়। বুভুক্ষিতের ভোজ্য গ্রহণের মত কাগজে নিজের নাম লিখে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অনিমেষ, পায়ের তলার মাটি কেমন কাঁপে যেন থর থর করে। বোধ হয় মাথাই ঘুরে পড়বে শেষটা! কতক্ষণ পরে সান্ত্রী ফিরে এসে বললে, 'সাহাব বললেন কাম কি আছে লিখিয়ে দিন, কোন আদমি পাত্তা দিজিয়ে।'

অনিমেষ কি ভাবলে, নতুন করে কি সব লিখে দিলে চিরকুটটায়, সংগে সংগে খবর এল, নো ভেকান্সী!

আর মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার ওপর বসে পড়ল না অনিমেষ, গুটি গুটি বাসার দিকে এগিয়ে চলল। গাল বাড়িয়ে চড় খেলে জ্বালাটা বোধহয় বেশি বাজে, অপমানও সেই সংগে দ্বিগুণ। কমলা বুঝি মনুষ্য-চরিত্র অনেক বোঝে, অনেক আগেই বলেছিল অনিমেষের হাঁপাহাঁপি দেখে, 'মাঠের আলাপ কেউ ঘরে আনে না, তোমার যেমন কথা' সেদিনের তর্কটা বৃথাই করেছিল অনিমেষ, আজ শুনলে কমলা কি বলবে, ছি, ছি!

অনিমেষ অবাক হয়ে গেল নিজের গলিতে পা দিয়ে। এত আলো এ-গলিতে কোনদিন ছিল না, সত্যিই রাতকে দিন করে দিয়েছে! দু দশটা বাড়ির পরপর বিষফোড়ার মত কোন সদাশয় ব্যক্তির বাড়ির গা-থেকে আলো বেরিয়েছে। হঠাৎ আলোকময় হয়ে উঠেছে রামধন মিস্ত্রী লেন।

চোখ ঠিকরানো আলোয় চোখ রেখে মনে মনে হাসলে অনিমেষ। সবটাই পরিহাসের মত মনে হয়। এই গলির সব ঘরের ভেতরটা অন্ধকার করে বাইরেটা কেমন আলো করা হয়েছে, কি উদ্দেশ্য কে জানে পৌর-পিতাদের। কে খবর রাখে কার ঘরে, কি আছে, রোগ-ঘোগ, জরা, বেকারি, কত মনস্তাপ!

অবস্থাটা আরো প্রকট হল। অনিমেষ রাস্তার ওপর বসে পড়ল, তার ঘরের চারি-দিকে জিনিসপত্র ছই ছত্রাকার করে ছড়ান, দোরে একটা মস্ত তালা ঝুলছে। কমলা চুপ করে ভাংগা একটা তোরংগের ওপর বসে আছে।

আজ দুপুরে বাড়িওলার লোক পুলিস এনে তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে গেছে। এক তরফা ডিক্রী পেয়েছেন বাড়িওলা। আজই, 'এক্সিকিউট' করেছেন।

গলির নতুন আলোয় পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়টা যেন সমধিক লজ্জার, কমলা মুখ নামিয়ে নিলে, অনিমেষ চোখে হাত চাপা দিলে—এত আলোয় কিছু না থাকার লজ্জা সে লুকোবে কোথায়?...

পরের দিন প্রাতভ্রমণের এই মাঠে সকাল হবার অনেক আগেই একটি মানুষকে বোবা হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে আমাদের সেই পরিচিত মিস্টার সেন আছেন, বৃদ্ধ জননেতা মন্ত্রীমশাই আছেন, আর আছেন ব্যবসায়ী আনন্দীরাম! ও'রা অনেকদিন পরে আবার বায়ু সেবনের নিমিত্ত এসেছেন, প্রাতভ্রমণে দৈহিক জড়তা কাটাচ্ছেন। পার-মানবিক বোমার দ্বারা বায়ুমণ্ডলের যে স্তরটুকু বিষাক্ত হয়েছিল তা পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ভেসে গেছে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই শহরবাসীদের অতঃপর কোন ভয় নেই। ভোরের বাতাস নির্মলই আছে, বিশুদ্ধ আছে, পবিত্র আছে!

মিস্টার সেন প্রথমে সনাক্ত করলেন, 'সেই লোক মনে হচ্ছে, চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে!'

দ্বিতীয় সনাক্তকারী বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ সে-ই; বেচারা বড় ট্রাবলে পড়েছে মনে হচ্ছে!'

দূর থেকে ডেকে আনন্দীরাম কিছুতেই যখন কোন উত্তর পেলেন না, বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাঙ্গালীবাবু বড় সেন্টিমেন্টাল আছে। বাড়িতে লড়াই করে মাঠে বসিয়ে কাঁদছে!'

জুলু জুলু করে মাঠ-ভর্তি সহ-ভ্রমণ-কারীদের দিকে চেয়ে অনিমেষ ভাবলে, সত্যি যদি একদিন নিঃশ্বাসের বাতাস বিষাক্ত হয়ে যায় তা হ'লে কেমন হয়, বেশ দেখতে বড় ইচ্ছে করে। ক্ষতি কি?

তারপর পা দিয়ে ঘাসের ডগায় শেষ শিশিরবিন্দুটা ছেতরে দিয়ে গুটি গুটি মাঠ ছেড়ে অনিমেষ উঠে গেল।

[২০]

সেদিন সাজঘরের আড়ালে আবছা অন্ধকারে দাঁড়ানো ছায়া-ছায়া মানুষটার দিকে কারো হয়তো চোখ পড়ে নি, চোখ পড়েছিল শুধু লক্ষ্মীমণির।

কোনরকমে পার্ট শেষ করে গাঁয়ের লোকের হৈ-হুল্লোড় বিদ্রূপের চিৎকারকে তুচ্ছ করে উদাস ছুটে বেরিয়ে গেল আসর থেকে, আর তার পিছনে ধাওয়া করলো লক্ষ্মীমণির বেদনার্ত দুটি চোখ। উদাসের কাছ থেকে কোনদিন এতটুকু ভাল ব্যবহার পায় নি সে, তাই নিঃস্বতার জ্বালায় কোনদিন উদাসকে সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিশ্চয় সে উদাসের ভালবাসা পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছিল। পুজোর দিনটিতে সেই উদাস একখানা নতুন শাড়ী এনে তুলে দিয়েছিল তার হাতে। হেসে বলেছিল, পুজোপাব্বনের দিন আমার বউটাকে কানি পরিয়ে রাখলাম রে লক্ষ্মী, আমি মানুষ লয়, মানুষ লয়!

আর তা শুনে প্রথমটা যেন বিশ্বাসই হয়নি লক্ষ্মীমণির। বিশ্বাস যখন হয়েছে, তখন বিস্মিত আনন্দে দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসেছে। সুখের, আনন্দের অশ্রু। উদাস যে কোনদিন তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলবে, এমন আদর-সোহাগের সুরে, ভাবতেই পারেনি সে। তাই সঙ্গে সঙ্গে যেন মানুষ বদলে গেছে লক্ষ্মীমণি। করুণ চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছে। নতুন শাড়িখানা পরে এসে ঢিপ করে একটা গড় করেছে উদাসের পায়ে। উঠে লাজুক লাজুক চোখে তাকিয়েছে স্বামীর মুখের দিকে। আর শক্ত একখানা হাতে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে উদাস, হেসে বলেছে, পটের বিবি লাগছে তোরে।

সারাটা দিন মনের মধ্যে তার ফুর্তির মৌমাছি গুনগুন করেছে। এক-একবার শুধু সন্দেহ হয়েছে ন্যাংটেশ্বরতলার মানত ফলেছে বুঝি, কখনো বা মনে হয়েছে বেল্যাংডিহির রোজা-বউয়ের মাদুলীর ফল।

তবু খুশী হয়েছিল লক্ষ্মীমণি। ভেবেছিল নতুন করে জীবন শুরু করবে আবার। স্বামী শ্বশুর সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে এবার থেকে।

কিন্তু সব স্বপ্ন যেন মুহূর্তে ভেঙে গেল তার।

মুগ্ধ হয়ে সেও শুনেছিল উদাসের পার্ট, যাত্রা দেখছিল। কি আশ্চর্য, এত সুন্দর পার্ট করে উদাস, গাঁসুদ্ধ লোক এত তারিফ করে তার, কোনদিন জানতে চায়নি সে, দেখতে চায়নি।

লোকের মুখে বাহবা শুনে মনে মনে বেশ একটা গর্ব বোধ করছিল লক্ষ্মীমণি; নিজেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তন্ময়তা কেটে গেল হঠাৎ।

পার্ট ভুলে যেতেই বিভ্রান্ত, বিচলিত দেখাল উদাসকে, আর সবাই হাসাহাসি শুরু করলে। মরমে মরে গেল লক্ষ্মীমণি। উদাসের অপমান যেন তারও লজ্জা।

কিন্তু কেন যে পার্ট ভুল হয়ে গেল উদাসের, জানতে বাকী রইল না লক্ষ্মীমণির।

উদাস আসর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতেই লক্ষ্মীমণির চোখের দৃষ্টিও তার পিছনে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাজঘরের আড়ালে নির্জন ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দেখতে পেল লক্ষ্মীমণি, চিনতে পারলো।

পদ্ম!

স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। ভেবেছিল তার জীবন থেকে দুঃখের কাঁটাটা বুঝি সরে গেছে। যায় নি।

পরের দৃশ্যে আবার আসরে ফিরে এলো উদাস, ঘুরে ঘুরে আবার অভিনয় করতে শুরু করলে, ঘন ঘন হাততালি পড়লো, সবাই বললে এত ভাল অভিনয় কোনদিন করেনি উদাস। কিন্তু, উদাস লক্ষ্য করলো না কখন চুপিচুপি আসর থেকে উঠে চলে গেছে লক্ষ্মীমণি।

লক্ষ্মীমণির কথা তখন মুছে গেছে উদাসের মন থেকে। এতদিন পরে ফিরে পাওয়া সেই পুরোনো নেশাটায় ও তখন মেতে উঠেছে।

পদ্ম ফিরে এসেছে! পদ্ম ফিরে এসেছে!

সারা শরীরে একটা পুলকের শিহরণ খেলে যায়।

পদ্মর হাত দুখানা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে উদাস বলেছিল, তুই থাকবি তো পদ্ম, পার্ট শেষ করেই আসবো আবার, পালিয়ে যাবি না তো!

তা শুনে পদ্ম হেসেছে। রহস্যের সুরে বলেছে, পালাবো ক্যানে গো বোনাই, পালিয়ে থাকতে নারলাম বলেই তো ফিরে এলাম। তুমি যাও আমি দাঁড়িয়ে আছি।

কাপড়ের ছোট্ট পুঁটলিটা বগলে চেপে সত্যিই শেষ অবধি যাত্রা দেখেছে পদ্ম। এদিকে একে একে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে চারিধারে, যাত্রা শেষে একে একে ভিড় ফিকে হয়ে গেছে, আর পদ্মর হাত ধরে শেষরাত্রির হাল্কা অন্ধকারে খরি নদীর দিকে হেঁটে গেছে উদাস।

শুকনো খরি নদীর মাঝ বরাবর ঝিকমিক করে সরু ফিতের মত জলের ধারা—তারই পাশে বসেছে দুজনে।

উদাস বলেছে, তুই ফিরে আসবি, আমি কতবার স্বপন দেখেছি পদ্ম, কিন্তু এমনভাবে আসবি......

হেসে উঠেছে পদ্ম খিলখিল করে। বলেছে, পালা নামাবে তুমি, নাটের বেশ পরবে, আমি না এসে পারি গো বোনাই!

বলে কাপড়ের পুঁটলি খুলে গলায় কালো সুতোর ফাঁস আঁটা তেলের শিশিটা বের করে বলেছে, এসো, রঙগুলোন তুলে দিই তোমার মুখ থেকে।

হেসে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে উদাস, প্রশ্ন করেছে, মনে আছে তোর, পদ্ম?

মনে থাকবারই তো কথা। প্রতি বছরই যাত্রার পর শেষ রাতে বাড়িতে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তো উদাস, ঘুমোতো সেই দুপুর অবধি, ছায়া যখন মানুষের পায়ের কাছে এসে পড়তো। আর সেই সময় এসে তাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলতো পদ্ম; বলতো, রাজা হয়েই রইবে নাকি গো জীবনভোর, রঙ ধুতে হবে না মুখের? বলে, মুখে তার তেল ঘষে ঘষে তুলে দিতো সব রঙের দাগ।

আর দূর থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেদিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দেখতো লক্ষ্মীমণি। চাপা রাগে গুমরে মরতো সে। রাগ শুধু স্বামীর ওপর নয়, পদ্মর ওপরই নয়, পদ্মর বাপের ওপরও ভিতরে ভিতরে চটতো সে। কিন্তু উদাস সত্যিই কোনদিন পদ্মকে বিয়ে করতে চাইবে, পদ্মর বাপ মত দেবে সে বিয়েয়, ভাবেনি লক্ষ্মীমণি। আর তাই একদিন রাগের মাথায় ছুটে গিয়েছিল কাটারী নিয়ে, পদ্মর বাপকে হয়তো আরেকটু হলেই কুপিয়ে ফেলতো; যদি না পদ্ম ধরে ফেলতো শেষ মুহূর্তে।

উদাস ভাবতো, সেই দুঃখেই বুঝি গাঁ

ছেড়ে চলে গিয়েছিল পদ্ম। লক্ষ্মীমণিকে শান্তি দেবার জন্যে, কিংবা তার নিজের বুড়ো বাপটাকে লক্ষ্মীমণির আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

সে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যেই বুঝি এতকাল ব্যাকুল হয়ে ছিল উদাস।

পদ্মা তার মুখের রঙ ঘষে ঘষে তুলে দিতে দিতে কেন জানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। আর উদাস প্রশ্ন করলে, তুই, ক্যানে গাঁ ছাড়্লি পদ্ম, কোথায় যেয়ে ছিলি?

পদ্ম হেসে বললে, আমার সাথে চল্যে ক্যানে বোনাই সিখানে, নাকিন আমার লক্ষ্মী বুনটার জন্যে মন কাঁদবে তোমার?

কোন উত্তর দিলো না উদাস। সমস্ত শরীরটা তার হঠাৎ যেন জবলে উঠলো। পদ্মার মুখে এই একটা রসিকতা বহুবার শুনেছে সে, শুনে ভিতরে ভিতরে জবলে উঠেছে। কেন পদ্ম বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না যে লক্ষ্মীমণির জন্যে তার মনে কোন টান নেই, ভালবাসা নেই।

কিন্তু পদ্ম অতশত বোঝবার চেষ্টা করলো না। হাসি থামিয়ে হঠাৎ থমথমে মুখে ও প্রশ্ন করলে, ডাক্তার মানুষটা ভালো আছেন গো বোনাই?

*

খবরটা শুনেই লাঠি ঠুকঠুক করে ডাক্তারের বাড়িতে এসে হাজির হলো বুড়ি অট্টামা।

পুজোর মধ্যেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আর তার পর থেকেই সিরসিরে শীত পড়েছে। রোদের রঙ গেছে বদলে, বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ।

অবিনাশ ডাক্তার তাই ভোর বেলার মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বারান্দায় টিনের চেয়ারটায় বসে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল। গালে সাবান লাগাতে লাগাতে মুখ তুলতেই দেখলে লাঠির ডগায় রোগা শীর্ণ দেহটার ভার দিয়ে ঠুকঠুক করে এগিয়ে আসছে অট্টামা।

এমন প্রায়ই আসে অট্টামা, কখনো দুটি গাছের সীম নয়তো খেঁড়ো দিতে, কখনো শুধুই দু দণ্ড বসে গল্প করতে। বুড়ো মানুষ, রাতে ভাল ঘুম হয় না, আঁধার না কাটাতেই উঠে পড়তে হয় বিছানা ছেড়ে। কখনো কৌশল্যাকে ডাকে, কখনো বা ভোর হতেই এর-ওর বাড়ির পৈঠেতে গিয়ে বসে লাঠিটা নামিয়ে রেখে। কিন্তু গিয়ে বসলে কি হবে, সকালে উঠে সকলেরই হাজারো কাজ, ব্যস্ত বা বিরক্ত মানুষগুলো দেখেও দেখে না অট্টামাকে, ভাল করে দুটো কথাও বলে না। তাই শরীর একটু ভাল থাকলেই ডাক্তারের কাছে চলে আসে সে।

সেদিনও লাঠি ঠুকঠুক করে ডাক্তারের বাড়ির দিকেই এগিয়ে এলো অট্টামা। পাড়া ছেড়ে গাঁয়ের এক প্রান্তে ডাক্তারের বাড়ি, এতখানি হেঁটে আসতেও কষ্ট হয়। তবু কি এক নেশার আকর্ষণ যেন, না এসে থাকতে পারে না।

অবিনাশ ডাক্তার অনেকক্ষণ থেকেই দেখতে পাচ্ছিল অট্টামাকে। বারান্দার ঠাণ্ডা রোদে পিঠ দিয়ে বসে গালে সাবানের ব্রাশ বোলাতে বোলাতে একবার সামনের দিকে তাকালে অবিনাশ ডাক্তার, হাড়-জিলজিলে চেহারা নিয়ে অট্টামাকে তিড়িং তিড়িং করে প্রায় লাফাতে লাফাতে আসতে দেখে নিজের মনেই হাসলো সে।

অট্টামা অবশ্য দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পায়নি। বয়সের সংগে সংগে চোখে ছানি পড়েছে, বেশী দূর থেকে লোক চিনতে পারে না একেবারেই। সাদা কাপড়টা শুধু ফটফট

করে, মানুষ কেউ একটা, শুধু এইটুকুই বুঝতে পারে।

লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাছে এসে তাই হাঁক ছাড়লে অট্টামা। —কই গো ছেলে, আছো নাকিনি।

ডাক্তার হেসে বললে, এই তো বসে রয়েছি, চোখে আর ভাল দেখতে পাচ্ছেন না নাকি অট্টামা।

—না বাবা, দূর থেকে মনে হচ্ছিল বটে সাদা মতন কি যেন ফটফট করছে, দিষ্টি তো বাপু একটু ক্ষীণ হয়েছে। বলে ধীরে ধীরে বারান্দায় বসলে অট্টামা, লাঠিটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকাতেই স্পষ্ট দেখতে পেল।

নিজের মনেই হেসে বললে, রোদের ছটা লেগে দেখতে পাই নাই, বুঝলে ডাক্তার, দিষ্টি আমার এ-বয়সেও ধা আছে......

অবিনাশ ডাক্তার সায় দিয়ে বললে, তা ঠিক। শরীরটা বেশ ভাল আছে তো আপনার?

—শরীর? মুখ বেজার করলে অট্টামা। বললে, ওই বাতের ব্যথাটা বাবা...ও সারবে না। বলে ডান পা'টা সামনে মেলে দিয়ে নিজেই নিজের হাঁটুটা টিপতে শুরু করলে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলো ডাক্তার দাড়ি কামাচ্ছে। এতক্ষণ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারেনি। তাই নিজের মনেই বললে, দিনে দিনে কত পরিবত্তনই হলো বাবা। পরামাণিক গাঁয়ে-ঘরে আর রইলো না।

অবিনাশ ডাক্তার গালের ওপর দিয়ে চড়চড় করে সেফটি রেজর টানতে টানতে শুধু বললে, হুঁ।

অট্টামা আবার বললে, এক ঘর ছিল, তা বাপ বেটায় নাকি চুঁচুড়োয় না কোথায় গিয়ে দোকান খুলেছে। বলেই ফোকলা মুখে সশব্দে হেসে উঠলো। বললে, বাপের কালেও শুনি নাই ডাক্তার। ফ্যান খেয়ে মলো বাপ, তারও নাম পরতাপ......চুল ছাঁটবে, দাড়ি-মোচ কামাবে, তারও নাকি দোকান!

ডাক্তার প্রশ্ন করলে, এ-গাঁয়ে পরামাণিক ছিল তা হলে?

—ছিল না? হেই মা, পাঁচ বিঘে চাকরান ছিল বিধু পরামাণিকের, ঘরে-ঘরে বছরে দু' টাকা করে মাইনে......তা থাকবে কেন বলো, এখন যে গাঁয়ের মানুষ গোলাম, শহুরে হলেই সেলাম!

ডাক্তার হাসলো, কোন কথা বললে না। তারপর জিগ্যেস করলে, একটু চা খাবেন নাকি?

—চা? ছানি-পড়া চোখ দুটোয় খুশী উপছে পড়লো। —তা দেবে তো দাও। বলে নিজেই ডাকলে পাব্বতী, অ কেল্লে পাব্বুতী!

কপাটের আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনছিল পার্বতী, কিন্তু সাড়া দিল না। কেল্লে পার্বতী বলে ডাকে বলেই অট্টামার ওপর তার রাগ।

তার দিকে চোখ পড়তেই ডাক্তার হেসে ফেললে, আর অট্টামাকে ভেংচি কেটে পার্বতী ভিতরে চলে গেল।

অট্টামা পার্বতীর সাড়া না পেয়ে ভাবলে সে বাড়িতে নেই। তাই কথা ঘুরিয়ে বললে, হ্যাঁ গা ডাক্তার, গরমেণ্ট সব জমিজমা নাকি নিয়ে নেবে? ওই যে সব দু'বার দু'বার ফরম সই করে পাঠালে সেবার......

ডাক্তার হেসে বললে, সব নেবে না, পঁচিশ একরের বেশী হলে তবেই......

—জমি নিয়ে কি করবে গরমেণ্ট?

—কি আর করবে, যাদের জমি-জমা নেই, তাদের পাঁচ-সাত বিঘে করে দেবে হয়তো।

অট্টামার ফোকলা মুখখানা এবার হেসে উঠলো। বললে, হায় কপাল, পাঁচ বিঘে জমিতে দুঃখ ঘুচবে! তা হলে বিধু পরামাণিক বউ-বেটা নিয়ে চুঁচুড়োয় গিয়ে দোকান খুলতো ডাক্তার? আর ওদেরও বলি, দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে তেঁতুল রইলো গাছে বেঁকে। ভাবলে দোকান খুললেই অবনী চাটুজ্যের মত ধনী হবে।

বলে একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সিমেণ্টের ওপর বাঘবন্দীর ঘর কাটলে অট্টামা, তারপর হঠাৎ বললে, তা দেশের লোকের জমি-জমা নিচ্ছে নিক, শহর-বাজারের লোকেদের নেবে না ক্যানে!

অবিনাশ ডাক্তারের ততক্ষণে দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। ভিজে গামছায় মুখের সাবান মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলে, শহরে আবার চাষের জমি কোথায়?

—না গো ডাক্তার, তা নয়। ওই যে বলগাঁর কোঙারদের পাঁচখানা বাড়ি আছে বদ্দমানে, অবনী চাটুজ্যের রাজপেসাদ আছে কলকাতায়......

আরো কি বলতে যাচ্ছিল অট্টামা, পার্বতী এসে তার আগেই অট্টামার সমনে ঠকাস করে এক কাপ চা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অট্টামা তার দিকে তাকালে কপট ক্রোধের ভঙ্গিতে, তারপর হাসি চেপে বললে, অত দেমাক ভাল নয় লো, ভাল নয়। ওঃ ছুঁড়ি যেন মরাই-তলায় মুনিষকে ভাত দিচ্ছে। নাক নেই বেটির নথের শখ, ফেলনা বেটির কত ঠমক।

বলে চায়ের কাপে চুমুক দিলো অট্টামা। বিড়বিড় করে বললে, একেবারে জুড়িয়ে এনেছে ছুঁড়ি।

তারপর একটু থেমে ফিসফিস করে বললে, হ্যাঁ গা ডাক্তার, তোমাদের ওই বিড়ি-আপিসের পেভাকর না কি নাম.....আজকাল সব স্মরণ থাকে না বাপু......তার বিয়ের কিছু শুনেছো নাকি?

ডাক্তার এতক্ষণে যেন উৎসাহ পেল। বললে, আপনারা সব ধরে বেঁধে দিয়ে দিন, তা নইলে হবে কি করে?

অট্টামা একমুখ হেসে বললে, ও ছেলে কি লুকিয়ে বিয়ে করবে নাকি ডাক্তার। ও ভারী ভাল ছেলে, সৎপুত্র বাপের, মোল্লপুরের বউ বলছিল, পেভাকর নাকি বলেছে বাপ যেখানে বলবে, সেখানেই করবে বিয়ে।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললে, তাই নাকি? এ-বাজারে তা হলে খুব পিতৃভক্ত ছেলে বলতে হবে।

—হ্যাঁ বাবা, পিত্তিভক্ত বটে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্পগুজবে মেতে উঠলো অট্টামা।

একসময় হঠাৎ খেয়াল হলো, বেলা বেড়েছে। রোদ কাঁপছে মাঠের ওপর। তাকানো যায় না চোখ মেলে। বললে, কি চনমনে রোদ হয়েছে বাবা, উঠি আজ। আবার এতখানি পথ যেতে হবে বাবা!

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো অট্টামা। তারপর লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললে, হ্যাঁ গা ডাক্তার, পদ্ম ফিরে এয়েছে শোনলাম'

—পদ্ম? বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করলে অবিনাশ ডাক্তার।

অট্টামা বললে, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পদ্ম ফিরেছে। আমি যে শোনলাম।

(ক্রমশ)

বিদুর

রুশ সাহিত্য : 'চরম' ও 'নরম দল'

সাহিত্যে দলাদলি প্রায় স্বাভাবিক। কিন্তু সে দলাদলি যতক্ষণ শিল্পগত আদর্শ নিয়ে, ততক্ষণ নীরবে সওয়া যায়। অস্তিত্ববাদী আর ঈশ্বরবাদীদের কলহ, কিংবা বস্তু-চেতনায় মোহবাদী আর মায়াবাদীদের বিতর্ক অন্তত উপভোগ্য এই কারণে যে, যে-তারের বেড়ার মধ্যে এই যুদ্ধ চলছে, সেই বেড়ার এ-পাশে যুযুধানদের লোভ নেই। যদি তেমন লোভ থাকত, আশঙ্কার কারণ ছিল।

রাশিয়ায় যে সাহিত্য রণাঙ্গন, ১৯৫৯ সালে তৃতীয় লেখক কংগ্রেসে যেখানে শান্তি শান্তি রব উঠেছিল, সেখানে যাঁরা বীর বিক্রমে আবার লড়তে নেমেছেন, তাঁদের আদর্শ—কলহের আদর্শ—শিল্পগত নয়। ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম বলেই এই দলাদলি মালিন্যপুষ্ট। সুরকভের পতন যদি হল কোশেটভ্ আর গ্রীবাসভ্ সেই আসন লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, কে পারে আগে পৌঁছুতে।

১৯৫৯ সালের শান্তিজল মাথায় নিয়ে, রুশ লেখকরা সবাই যদি পাল্টে যেত, তবে আজ আর 'চরম' আর 'নরম' এই দুটি দলের অস্তিত্ব রাশিয়ায় সম্ভব হত না। লেখকরা এবিষয়ে কিছুটা চাতুর্য অবলম্বন করেছেন। কলহের বিষয়কে আপোসের ভাষা আর ভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপন করছেন যাতে কলহটা টিকিয়ে রাখা যায়। রাশিয়ায় তাই আপাতত লেখকদের ঐক্য এবং শান্তির ছায়াতলে দুটি পরস্পরবিরোধী দল ক্রমাগত লড়ে যাচ্ছে, 'চরম' আর 'নরম' দল (Hard and Soft)। চরম দল (কিংবা বলা যেতে পারে গরম দল) কারা? যারা পার্টির লক্ষ্য এবং ছাঁচের মধ্যে সাহিত্যিক-দের যথাসম্ভব দমন করে রাখতে চায়। 'নরম' দল অত উগ্র নয়, তারা কিছুটা স্বাধীনতা মর্জি লেখকদের দিতে রাজী আছেন। ......লেখকরা এই বিরোধে কোনো না কোনো পক্ষে যোগ দিয়ে দুই দলকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন শুধু নয়, তাতিয়ে রেখেছেন: 'দুই দলেরই কাগজপত্র আছে—তাতে আক্রমণও চালানো হচ্ছে, তবে ভাষা কি ভঙ্গি দেখলে মনে হবে আপোসের বিতর্ক চলছে। সুরকভ, কোশেটভ, গ্রীবাসভ 'চরম' দলের মাথা; 'নরম' দলে এরেনবুর্গ, যেভতুশেংকো প্রভৃতিদের নাম পাওয়া যায়। চরম দলের তিন মাথা যে একপ্রাণ, তা কিন্তু নয়, তিনজনেই চেষ্টা করছে ক্ষমতার চুড়োয় উঠে বসার। সুরকভ্ ধৈর্য ধরে চালের খেলা খেলছেন। নরমদের কাগজেও তাঁর লেখা পাওয়া যায়। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, এখন তিনি বিপাকে পড়ে দুই নৌকোতেই পা রেখেছেন। সে নৌকো সামলাতে গিয়ে হিমসিমও খাচ্ছেন।

সুরকভের পড়ন্ত পাখা-ভাঙা অবস্থার সঙ্গে কোশেটভের তুলনা করলে দেখা যাবে কোশেটভ কী রকম প্রতাপশালী হয়ে উঠেছেন। এরেনবুর্গের স্মৃতিকথার (সম্প্রতি যা প্রকাশিত) প্রতি লক্ষ্য রেখে, এরেনবুর্গের নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ না করেও, প্রকাশ্য কংগ্রেসে তিনি এরেনবুর্গের স্মৃতিকথাকে আক্রমণ করেছেন।

সেই আক্রমণ যেমন উগ্র শালীনতাহীন, তেমনি সাহিত্যবোধশূন্য। গোঁড়া রাজনীতির চশমা না পরলে কেউ বলতে পারে না, স্মৃতি চারণ অতীতের প্রতি নিবন্ধ বলেই তা অসার। বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চোখ না থাকলে যদি সাহিত্য অপাংক্তেয় হয়, তবে আমরা নাচার, কোশেটভের সাহিত্য-ব্যাখ্যার প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করি না। এরেন-বুর্গের এই স্মৃতিকথার প্রতি কোশেটভের আক্রমণের নমুনা এই রকম:

"This distorted view causes them.....to burrow in the rubbish dumps of their rather crackpot memories in order to drag out once more into the light of day long rotted literary corpses and to pass them off as something still capable of life.

দুই বন্ধু : পাস্টেরনাক ও এরেনবুর্গ (১৯৩৫)

নরমের দল চরমের মতন এমন অসহিষ্ণু নয়, নখদন্ত শাণিত করে তারা গরমদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাতে পারে না। তারা চরমদের শিল্পবোধের দীনতাকে দোষারোপ

করে, আর চরমরা বলে নরমরা তাদের অভিজাত অহংকার নিয়ে বসে আছে।

গরমদের মত, সাম্প্রতিক সোভিয়েট জীবনই লেখকদের লেখার বিষয় হওয়া উচিত; নরমরা তার বিরোধিতা করে এক দূরে সরে এসে দেখার 'তত্ত্ব' আবিষ্কার করেছে। এ'রা মনে করেন, লেখক যখন বিষয় থেকে দূরে সরে এসে দেখেন তখন বিষয়টিকে অধিক হৃদয়গ্রাহী করে বলা যায়। এরেনবুর্গ এবং অন্যান্য প্রবীণ লেখকের স্মৃতিচারণা এই তত্ত্বের উদাহরণরূপে দাঁড় করানো যেতে পারে।

রাশিয়ার তরুণ সাহিত্যিকরাও চরমপন্থীদের কাছে এক সমস্যা। এই তরুণ দল সাহিত্যের নামে যে নতুন জল আমদানী করছে, চরমপন্থীদের কাছে তা বিরক্তির ত বটেই এমন কি ভীতিকর কোনো পদার্থ। চরমপন্থীরা একে বলেন, 'বুদওআর লিটারেচার' এবং 'বেডরুম লিরিক'। এই নব্য সাহিত্য বা সাহিত্যের ধারা ভয়ংকর, কেননা শান্তভাবে এই সাহিত্য দিন দিন বেড়ে উঠছে, আর যে-সাহিত্য 'নারীদের নিজ কক্ষের' 'শোবার ঘরের' তার কোনো ব্যাপক বিস্তৃত জগৎ নেই। কোশেটভ মর্মাহত হয়ে বলেছেন :

"It's really....about the size of the bed."

বীট কবি

'আমার মাথার খুসকি যাবে না।'

কেশকলাবিদ এমন কথা শুনলে রক্তচক্ষু হবেন। এত যে নিত্য টাক পড়া চুল ওঠার নব নব ওষুধ বের হচ্ছে বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিতে তৈরী হয়ে, সে কি বৃথা! বৃথা
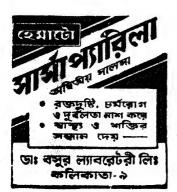
আমেরিকার বীট কবি : কোরসো, গিনসবার্গ ও ওরলভোস্কি

বই কি! কেননা মুখের সামনে মাইক্রোফন পেলে ছোকরা কবি তাঁর নিজের মাথারই চুল দেখাবেন, জীবনে কোনোদিন সেখানে চিরুনির আঁচড় পড়েনি। তাতে তাঁর প্রচুর গর্ব। এবং তাঁর বিখ্যাত কবিতা আওড়ে বলবেন :

"Nothing would rid me off Dandruff.
Vitalis Lucky Tiger, Wildroot, Brilliantine, nothing."

এই কবির নাম গ্রেগরী কোরসো, বয়ঃক্রম আঠাশ, দীনদৈন্য বেশভূষা। ইনি বীট্-কবি, অর্থাৎ আমেরিকায় 'বীটনিকস' নামে যে নব্য ছোকরারা সাহিত্যের হাল-আগন্তুক তাদেরই ইনি অন্যতম।

'বীটনিকস' শব্দটা এতদিনে আমেরিকার আরও কয়েকটি জিনিসের মতন আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। এমন কি কল্কা ও বাংলা দেশেও নবামহলে ওটা শোনা যাবে। বিলেতে যারা অ্যাংগ্রি, আমেরিকায় তাদের সমগোত্রীয়রা বীটনিকস। রাশিয়ায় 'চিকেনস্' বোধ হয়। বাংলা দেশে 'বীট'রা একেবারেই দেখা দেয়নি—একথা কেমন করে বলি।

সেদিন এক বাঙালী তরুণ কবি ও গল্প লেখকের কথা শুনলাম। কফিখানায় এসেছেন; একটু ময়লা জামা কাপড়, গালে কিঞ্চিৎ দাড়ি, তার সঙ্গে তোকমারির এক পুলটিশ আঁটা এক পাশে। জনৈক পরিচিত উদ্বিগ্ন হয়ে শুধোলেন, 'কি হল আপনার গালে?' তরুণ লেখক বসলেন চেয়ারে—অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'কিছু না।' বলে চুপ করে, আঙুল থরথর করে কাঁপিয়ে একটা চারমিনার সিগারেট বের করে ধরালেন। অতঃপর বিষণ্ণ গলায়, 'কিছু হয়নি, তবু একটা পুলটিশ দিয়েছি। লোকে ভাবুক আমার ঘা ফোড়া কিছু একটা হয়েছে। আমার শরীরের মধ্যে সব রক্ত পুঁজ হয়ে যাচ্ছে দেখে ওদের গা ঘিন ঘিন করুক।'

এই গল্প যার কাছে শুনেছিলাম, সে বেচারী কখনও বীটনিকের চেহারা দেখেনি। আমিও নয়। অবশ্য বাঙালী বীট সে দেখেছে। তবে কিনা সে আসল দেখতে চেয়েছিল। অনেক মেহনত করে আমেরিকার তিন বীট কবির ছবি সংগ্রহ করলাম। দর্শক আনন্দ পেতে পারেন।

এই তিন বীট কবির একজন অ্যালেন গিনসবার্গ, বয়স বত্রিশ, অন্যজন পিটার ওরলভোস্কি বয়স পঁচিশ, শেষজনের নাম গ্রেগরী কোরসো—তাঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বীটনিকরা নানাভাবে সাজে, সরু শরু ট্রাউজারের ওপর টকটকে লাল-কালোর চেক কাটা জামা, কনুইয়ের কাছে কালো তাপ্পি, গলার কাছে নীলের তুপ্পি, চুল অবাধ্য, জুতো ছেঁড়া, দাঁত মাজে কি মাজে না, পাগলা হাসপাতাল থেকে পেট্রল পাম্পের দোকান কোনো না কোনো জায়গায় একটা হয়ত চাকরি করে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবিতা ফেরি করে, কিংবা কোনো সভায়, একে অন্যের কদর দেখলে কাঁদে। আর? আর এরা সর্বপ্রকার নেশা করে, যৌন অত্যাচারে মত্ত হয়, হাতাশার নামে বেপরোয়া। সারা রাত পথে ঘুরে বেড়ায় এবং যখনই খুব ক্লান্ত, সংগী মাত্র কোনো বন্ধু তখন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে নিজেদের মার গল্প করে। ফায়ার হাইড্রেন্টের দিকে তাকিয়ে এরাই কবিতা লেখে, আমার চোখের জলের চেয়ে তোমার জল কি বেশী?

গল্প গ্রন্থ

দুরবীন। বনফুল। বাক-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

'জাত সাহিত্যিক', 'পাকা লিখিয়ে'—অতি ব্যবহারে মলিন এইসব বিশেষণ বনফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ করা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের সৌভাগ্য যে বনফুলের অসাধারণ সৃজনী প্রতিভা আজো সক্রিয় এবং বয়সে প্রবীণ হলেও চিন্তাধর্মে তারুণ্যের সজীবতা এখনো অক্ষুণ্ন।

ছোটবড় তিরিশটি গল্পের সংগ্রহ আলোচ্য গ্রন্থটি। অতি প্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনা অধিকাংশ গল্পের কল্পলোক সৃষ্টি করেছে। সুখের বিষয়, পাঠকদের মন থেকে অবিশ্বাসের সাময়িক নির্বাসনও লেখক দাবি করেননি। দেবভক্ত বা ভূতে বিশ্বাসী না হয়েও এসব গল্পের রসাস্বাদন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'প্রতীক্ষা' 'দেওয়াল' 'ভোরের স্বপ্ন' প্রভৃতি গল্প।

অন্য ধরনের লেখাগুলোর মধ্যে নাম করা চলে 'উইল' গল্পটির। এর বিষয়বস্তু অভিনব সন্দেহ নেই। তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে রসসৃষ্টির এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাম্প্রদায়িক এবং সাম্প্রতিক ভাষাবিরোধ জাত দাঙ্গাও একাধিক গল্পের পটভূমি রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গল্প দুটি চিত্তগ্রাহী।

স্বল্পতম কলমের আঁচড়ে পূর্ণব্যক্তিত্ব প্রকাশক চরিত্রসৃষ্টি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বনফুলের পক্ষে তা আজো অনায়াস-সাধ্য। এই গ্রন্থের সমাদর কামনা করি। ৫।৬২

উপন্যাস

যে যাই বলুক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৯। মূল্য ছয় টাকা।

"'করি, বিশ্বাস করি'। গভীরনিসৃত শান্তির বাণীর মত শোনাল তামসীকে। 'কাজ করি, ক্লান্ত হই, কূল হারিয়ে ফেলি। আবার এই বিশ্বাসের আলোতে পথ চিনে ঘরে ফিরে আসি। এ আলো নেবে না, কাঁপে না, ক্ষয় হয় না। এ আলোতে জীবনের পরমধন খুঁজে পাই।'"

রসসিদ্ধ অচিন্ত্যকুমারের আরেকটি অনুপম চরিত্রসৃষ্টি এই তামসী। বাসনা ও বিভ্রমের দোলায় সে দুলেছে, কাম্য ও কামনার দ্বন্দ্বে সে জর্জরিত হয়েছে, এবং সব শেষে বেদনা ও বঞ্চনার কৃষ্ণপক্ষ অতিক্রম করে অনির্বাণ বিশ্বাসের আলোয় এসে জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে। যে পথে তার পরমধন সে পথেই সে চলবে। যে যাই বলুক।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ের পটভূমিতে অচিন্ত্যকুমারের এই সার্থক উপন্যাসটি রচিত। বিচিত্র চরিত্রের মিছিলে মুখর এই উপন্যাস। চরিত্রগুলির অভীপ্সা ও অবক্ষয়ের মধ্যে বর্তমান সমাজ-মানসের ছায়া সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। উপন্যাসটি পাঠকের মনকে একালের সমাজ-অন্তর-পরিক্রমার পথে টেনে নিয়ে আসে। বহু ও বিচিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়।

অচিন্ত্যকুমারের অনবদ্য রচনাশৈলী ও সুন্দর ভাষা উপন্যাসটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। প্রচ্ছদপট শিল্পশোভন।

(৩৩৮।৬০)

তিথিপর্ণা—অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিমলা-রঞ্জন প্রকাশন; ৮।১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৩, টাকা।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য কবি হিসেবেই পরিচিত; কিন্তু তিনি একাধিক উপন্যাস রচনাও

করেছেন। উপর্যুক্ত উপন্যাসটিতে দুঃস্থ সাহিত্যিক বিনায়ক ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। যে জটিলতা, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি উপন্যাসের চরিত্র স্ফুরণের প্রধান গুণ, তা বিনায়কের জীবন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটির পরিণতি মেলোড্রামাটিক হলেও বিনায়কের জীবন-ট্রাজেডিই প্রধান উপভোগ্য। উপন্যাসটি স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক আবেগধর্মী, অবশ্য গল্পের রস সে-কারণে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

৬৪৩।৬১

গাঁয়ের নাম কেয়াপুর—দীপককান্তি দে। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা-১। দাম—৩, টাকা।

শ্রীযুক্ত দে উপর্যুক্ত উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের সারল্য এবং জটিলতা—দুটি দিককেই বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কেউ চায় সুপরামর্শ, তার পরিবর্তে পায় বিষ; কেউ সুবিচার চেয়ে—পরিবর্তে পায় বঞ্চনা; শুধু স্বার্থকে পরিপুষ্ট করার জন্যেই ঐ লাঞ্ছনা বা বঞ্চনা। চরিত্রচিত্রণে সাধারণ জীবন সাধারণ পরিবেশে উপস্থাপিত। উপন্যাসটি পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু তা থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায় না। ৬৬২।৬১

একটি মুখ: তিনটি মন—বাসুদেব সাহা। আলফাবিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা—১। দাম—টাকা ৩·৫০।

একটি প্রেমের কাহিনী। কাজলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। প্রকৃতভাবে সে কাকে চায়? অথবা সে কি কাউকে চায় না? রাধা, মাধুরী ও লখিয়া —যারা এলো তার জীবনে, তারা নিজেদের জীবনে কী পেল? কেননা কাজল ভালবাসতে জানে, বন্ধন মানে না। উপন্যাসটিতে কোনো নতুন বিশ্লেষণ পদ্ধতি অথবা জটিল মানসিক ক্রিয়া নেই। প্লট মামুলি হতে পারে, কিন্তু বলার গুণে তা অনেক সময় অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে ওঠে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, শ্রীসাহা সে গুণের তেমন অধিকারী নন।

৬৬৪।৬১

পরিচিতা—অজিত মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৩, টাকা।

নিঃসন্তান প্রমীলাকে ত্যাগ করে তার স্বামী। কিন্তু পিতৃগৃহেও সন্তানহীনা রমণীর শান্তি নেই। তাই অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে সে হয়ে পড়ল একান্তই আশ্রয়হীন। এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে শ্রীমুখোপাধ্যায় নারী-জীবনের যন্ত্রণাময় ব্যথা বেদনার দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন। অবশ্য প্লটের মধ্যে অভিনবত্ব না থাকলেও জটিল ঘটনার মাধ্যমে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। রামমোহন, কালীশঙ্কর প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কনে লেখক বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন।

৬৩০।৬১

কাঁচা মাটি—পাকা পথ। শ্রীদীপেন রাহা। প্রকাশক ঃ বেঙ্গল পাব্লিশার্স লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। উপন্যাস। ২০৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪, টাকা, ৫০ নয়া পয়সা।

সাদার্ন এ্যাভিনিউ-এর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ডাক্তার আভিজাত্যগর্বিত শ্রীসুবিনয় রায়ের পুত্র সলিল স্বাস্থ্যান্বেষণে সাঁওতাল পরগণায় যাইয়া দোলের দিন এক সাঁওতাল রমণী কৈলির গায়ে ফাগ দেওয়ার অপরাধে সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, কারণ তাহা না করিলে সাঁওতালদের টাঙিতে তাহার প্রাণ যাইত। লেক-পল্লীতে কালক্রমে সেই নারী কেমন করিয়া নিজেকে সেই অভিজাত পরিবেশের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করিল তাহারই কাহিনী লইয়া এই উপন্যাস।

অভিনব বিষয়বস্তু—সন্দেহ নাই। লেখক মুখপত্রে প্রশ্ন করিয়াছেন, "শিক্ষা ও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে অশিক্ষিত বুনো, গেঁয়ো, সরল, সহজ মানুষগুলোকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত করতে পারে কি?" কিন্তু সাঁওতাল রমণীর ন্যায্য প্রাপ্য লেক অঞ্চল কিনা কে জানে! তবে তাহার মুখে ফাগ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাহার সে-অধিকার নিশ্চয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সারল্যের জোরে সে বালিগঞ্জিয়ানা আয়ত্ত করিল কিরূপে? উপন্যাসের ক্রম-পরিণতির একটা নিজস্ব ধারা আছে, আশা করি লেখক পরিণতকালে তাহা আয়ত্ত করিবেন। আপাতত তাঁহার লিখনভঙ্গি সাবলীল, স্বচ্ছন্দ।

৫৫৭।৬১

পদ্মগন্ধা—শ্রীসুখময় গুপ্ত, প্রকাশক ঃ শ্রীশালগ্রাম খেমানী। প্রাপ্তিস্থান ঃ দাশগুপ্ত এন্ড কোং। ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ উপন্যাস। ৩৫৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় টাকা, পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

লেখক প্রস্তাবনায় লিখেছেন ঃ "আমি যদিও কস্মিনকালেও লেখক নই—তবু আমার হৃদয়ের গভীর প্রেরণা আমাকে পদ্মগন্ধা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।" বঙ্গসাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রে এ-প্রেরণা অনেকের মধ্যেই আসে, সেইটাই হইয়াছে মুস্কিলের কথা। এই লেখকের ভাষার উপর যে অধিকার আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু যে জমিদারের দল আজ জমিদারি হারাইয়াছেন তাঁহাদের মদ্যপান আর নারীভোগের কাহিনী আর কতদিন চলিবে? তবে কাহিনীতে বৈচিত্র্য

আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জমিদার বিদগ্ধ। তাছাড়া, নায়ক শিল্পী হইলেও লাঠি ধরিতে সক্ষম, কেবল আত্মীয় জমিদারের ও তাঁহার মোসাহেবদের উচ্ছৃংখলতায়, বিশেষ করিয়া তাঁহার অসামান্যা স্ত্রীর উপর মোসাহেবদের দৃষ্টি পড়ায়, তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া যাইতেছেন বারবার, আবার সুস্থ হইয়াও উঠিতেছেন। ইহার মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত আছে; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আছে; গান্ধী ও দেশবন্ধুর আদর্শের অমিলের কথা আছে—সবই আছে; নাই কেবল একটি সুস্থ স্বাভাবিক উপন্যাসের উপযুক্ত পরিবেশ। মনে হয়, ছায়াছবির উপর তাক করিয়াই উপন্যাসটি লেখা। তাই সেটির স্থলে অবয়বে এইরূপ অপ্রাকৃতিস্থ লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্প উপন্যাসের একটি রচনা-শৈলী আছে—সেটি আয়ত্ত করা সাধনাসাপেক্ষ।

৫৬২।৬১

ধর্ম ও দর্শন

নীলকণ্ঠ—(দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ কর্তৃক প্রণীত। শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৬ ।

শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রণীত 'নীলকণ্ঠের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়াতে আমরা সুখী হইলাম। পুণ্যশ্লোক কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী এই জীবনীর প্রথম খণ্ড বাংলার চিন্তাশীল সুধী সমাজ এবং অধ্যাত্ম রসপিপাসুদের নিকট সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার তাঁহার সর্বজন শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের সংগুরু স্বরূপে প্রকাশলীলারই প্রধানত বিস্তার সাধন করিয়াছেন। প্রবর্তক জীবন, সাধক জীবন অতিক্রম করিয়া তাঁহার সিদ্ধ জীবনের সংগে এখানে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমাদের পরিচয় ঘটে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত। এই সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ ভূমিকাটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মচারীজীর জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রেমভক্তি বিতরণে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত ক্রমপরাক্রমশীল লীলারই বিলাস পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার সিদ্ধস্বরূপে ও সর্বজীবের প্রতি গোঁসাইজীর সংবেদনেরই পারিমূর্তি প্রজ্ঞানময় প্রদ্দীপ্ত লাভ করিয়াছেন।" প্রকৃতপক্ষে প্রথম খণ্ডের ন্যায় 'নীলকণ্ঠের' দ্বিতীয় খণ্ডও মহৎ জীবনের মাধুর্যের বিন্যাসচাতুর্যে, ভাবের প্রাচুর্যে ভাবের গাম্ভীর্যে আদ্যোপান্ত ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছে। বস্তুত বাংলার জীবনী-সাহিত্যে 'নীলকণ্ঠ' স্থায়ী আসন লাভ করিবে। গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া আমরা প্রত্যেককে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিতেই অনুরোধ করিব। যিনি নীলকণ্ঠ—জীবের অবিদ্যাজনিত হলাহল পান করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধনই তাঁহার ব্রত এবং সেই ব্রত সাধনের উদ্দেশ্যেই ভগবদচরণে তাঁহার জীবন সর্বভাবে উৎসর্গীকৃত। এমন মহৎ-জীবনী বাংলার গৃহে গৃহে সমাদৃত, পঠিত অর্থাৎ নিত্য পঠিত হইবে আমরা ইহাই কামনা করি। বর্তমানে এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজন, তাহাতে আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে।

৮১।৬২

কল্কি-গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়। মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, কল্কিপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদি গ্রন্থে কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্পর্কে বহু তত্ত্ব অভ্রান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সব তত্ত্ব অনুসরণে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের সমাধীবতী মহাগৌরী, অলৌকিক যোগশক্তি সম্পন্ন স্বামী ভৈরবানন্দ ও গ্রন্থকারের সাধনালব্ধ অনুভূতি ও দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে পরিদৃষ্ট অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলী অবলম্বনে কল্কিশাস্ত্রের উপক্রমণিকারূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে কল্কি-জন্মের ২৪ বৎসর পূর্বেই কল্কিলীলা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। অপূর্ব ধর্মতত্ত্ব, সাধন-রহস্য ও দিব্য দর্শন ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। কল্কি-গীতা একখানি প্রচারধর্মী শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলী যুক্তিতর্কের পরিবর্তে ধর্মপ্রাণ পাঠকের ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। ৫৮৪।৬১

মহাপুরুষ প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে — শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ ও ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখক সুপ্রসিদ্ধ ও কৃতী সাংবাদিক। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশের চিন্তা ও কর্মজগতে একটি গৌরবময় যুগ আসিয়াছিল এবং বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুগের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও ধর্মনায়কদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহাদের পরস্পরের উপর প্রভাব ও পরস্পর হইতে পার্থক্য লেখক প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় অবশ্য এ যুগের পূর্ববর্তী। রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্পর্কে অনেক তথ্যই অনেকে অবগত, কিন্তু লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রথম ও প্রধান গুরু ভৈরবী যজ্ঞেশ্বরী, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে দুর্লভ সাহসিকতা ও প্রাঞ্জলতার সহিত পাঠকদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। ভৈরবী সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীকারদের দ্বারা পরিবেশিত হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পঁচিশ বৎসর ব্রাহ্ম থাকিবার পর হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার লইয়া বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উপাধ্যায় মহাশয়ের খৃীষ্টান থাকিয়া এবং খৃীষ্টকে মানিয়া হিন্দু আচার-ব্যবহার মানিয়া চলার দৃষ্টান্ত সকলের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। লেখক নিষ্ঠা ও মননশীলতার সহিত প্রত্যেকটি ধর্মগুরুর নিজস্ব মত ও বৈশিষ্ট্য বুঝিয়াছেন এবং নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। পুস্তকটি সেই গৌরবময় যুগের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা। ৪৭৯/৬১

বিবিধ

Autumn Annual (Tagore Centenary Number)—Presidency College Alumni Association. Editor: Amulyadhan Mukherjee; Presidency College, Calcutta-12. Price Rs. 2.50 nP.

অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র, অধ্যাপক টি এন সেন, অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ, ডাঃ হুমায়ুন কবির, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্তৃক রচিত বিশ্বকবির সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর সমন্বয়ে সংখ্যাখানি মূল্যবান। আগাগোড়া আর্টপেপারে বেশ পরিচ্ছন্ন ছাপা বিশেষ সংখ্যাখানি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

বার্ষিকী

নবজীবন (হুগলী জেলা বার্ষিকী)। সম্পাদক : সুকুমার দত্ত। ১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১। আড়াই টাকা।

সুমুদ্রিত ও সুদৃশ্য বার্ষিকী 'নবজীবন' বাংলা দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নবজাগরণের এক উল্লেখযোগ্য দলিল। হুগলী জেলা বাংলার বহু মনীষীর আবির্ভাবভূমি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ধাত্রী ও পালয়িত্রীরূপে এই জেলার একটি বিশেষ গৌরব আছে। এই সুবৃহৎ পত্রিকায় সেই গৌরবপূর্ণ অধ্যায় নানা রচনা ও চিত্রে বিধৃত হয়েছে। সম্পাদক জানিয়েছেন : 'আমরা প্রথমে একটি জেলা লইয়া শুরু করিতেছি।' তাঁদের এই পরিক্রমার শুভসূচনার পরিচয় পেয়ে আমরা আশান্বিত। বাংলার অন্যান্য জেলার গৌরবও তাঁরা যদি অনুরূপভাবে তুলে ধরতে পারেন, নিঃসন্দেহ সারা বাঙালীর আশীর্বাদলাভে তাঁরা ধন্য হবেন। হুগলী জেলাবাসীর কাছে এই বার্ষিকী আদরণীয় ত বটেই, প্রত্যেক বাঙালী এই বার্ষিকীটিকে দুর্লভ সামগ্রীর সমাদর দেবে।

প্রাপ্তিস্বীকার

পদাবলী-সাহিত্য—শ্রীকালিদাস রায়।

কি বিচিত্র এই দেশ—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত।

মহাবিশ্বের রহস্য—বি ভি লিয়াপুনভ, অনুবাদক—প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আদিম সমাজের ইতিহাস—মনোরঞ্জন রায়।

কুমারী মন—শক্তিপদ রাজগুরু।

গৌড়জন বধু—শক্তিপদ রাজগুরু।

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত কাহিনী (৩য় পর্ব)—ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল।

রবীন্দ্রনাথ—দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদক।

রস-রহস্য কল্লোলিনী—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত।

এংলিজিবিশন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিপ্লবিনী—বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ঃকলক।

অতুপর—চিত্ত সিংহ।

কলকাতার কুয়াশা—চিত্ত সিংহ।

চন্দ্রশেখর

চলচ্চিত্রে সংজ্ঞা-সংকট

ফলিত বিজ্ঞানের মত চলচ্চিত্রও একটি ফলিত শিল্প। এবং এই শিল্প তখনই ফলবান হয়ে ওঠে যখন দর্শকের সঙ্গে তার একাত্মতা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রপটের মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যখন দর্শক নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে পায়। চলচ্চিত্রের এই সংজ্ঞাটি সহজ। সংজ্ঞাটিকে প্রয়োগসিদ্ধ করে তোলা কঠিন।

কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে, চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা নির্ণয়ের কাজেই সমস্ত উৎসাহ ব্যয়িত হচ্ছে, অথচ প্রয়োগকর্মে সংগতি-পূর্ণ কোন সুষ্ঠু ধারার প্রবর্তন করবার ক্ষমতা কার কতখানি আছে তা তর্কাতীত নয়।

সত্যিকারের চলচ্চিত্র "নিও-রিয়ালিজম"-এর বাহন—এই তত্ত্ব সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে বেশ কিছুকাল। "নিও-রিয়ালিজম" বলতে কী বোঝায়? নব বাস্তব-সমীক্ষা? বাস্তবের রূপ বদলায়, বাস্তব পরিবর্তন-শীল। বাস্তবের বিশ্বরূপদর্শনে তো সব পরিবর্তনই ধরা পড়বে। তা না-হলে বাস্তবের ভূয়োদর্শন সার্থক হবে কি করে। চলচ্চিত্রে "নিও-রিয়ালিজম" কি তবে নতুন কোন পার্থিব-সত্যের ইঙ্গিত দেয়? সে সত্যের পরিচয়টি কি মেলে ধরতে চায়? "নিও-রিয়ালিজম"-এ চিহ্নিত হয়েছে অনেক ছবি। সেই সব ছবি দেখে এই তত্ত্বের সারমর্ম অনুধাবনে চিত্ররসিকরা ব্যর্থ হয়েছেন। তবে সেই বিশেষ ধরনের ছবিতে নতুনতর প্রয়োগ-ধারার পরিচয় মিলেছে। আর মিলেছে প্রতিদিনকার পরিচিত পরি-বেশের রূপ। যে পরিবেশ প্রামাণিক, কিন্তু প্রাণহীন। চলচ্চিত্রে এই নতুন পরিবেশ-সমীক্ষা বুঝি দর্শকের অন্তরকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই শোনা যাচ্ছে, "নিও-রিয়ালিজম" নামের দুর্বোধ্য প্রয়োগ-দর্শনটি চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নিচ্ছে।
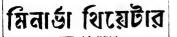
অজয় কর পরিচালিত "অতল জলের আহ্বান"-এর নায়িকার ভূমিকায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি আরেকটি তত্ত্বের কথা শোনা যাচ্ছে। তার নাম "ডিড্রামাটাইজেশন"। অর্থাৎ চলচ্চিত্রায়িত কাহিনী থেকে সকল প্রকার নাট্য-উপাদান শুষে বের করে নিতে হবে। নাটক বলে আলাদা কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। জীবনের বেদনা ও সংঘাত, আনন্দ ও অভিলাষ থেকে আবেগের যে নির্যাস আহরণ করা হয়, বাস্তবের "কল্পিত" ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে তাই যখন ঘনীভূত হয়ে ওঠে তখন আমরা বলি নাটকের সৃষ্টি হল। নাটক জীবনেরই ভাব-কল্প। এই নাট্য-সংবেদনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি জেহাদ শুরু হয়েছে। জেহাদে নাটকই জয়ী হয়েছে। কারণ দর্শকমন আবেগের স্পর্শে অভিভূত হতে চায়। আবেগে অভিভূত হতে না পারলে ছায়াছবির প্রতি বীতরাগ হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রে সম্প্রতি আরেকটি তত্ত্বের আমদানী ঘটেছে। একে বলা হয় "নিউ ওয়েভ"। সম্প্রতি আসাম চলচ্চিত্র-উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে গোহাটিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে চিত্রপরিচালক তপন সিংহ বলেছেন, যুদ্ধোত্তর কালের "নিও-রিয়ালিজম" বিদায় নিয়েছে। এর জায়গায় এসেছে "নিউ ওয়েভ"। বলা বাহুল্য, শব্দগতভাবে এই তত্ত্বটি অস্পষ্ট। এর স্বরূপ কী? সংজ্ঞা কী? হয়ত "নিউ ওয়েভ"-এর কথা যাঁরা বলেন তাঁরাও এ বিষয়ে অবহিত নন। নাকি তত্ত্বটি শুধু অনুভবেই করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! "নিউ ওয়েভ"-য়ে চলচ্চিত্রের রূপ ও রসে কী কী পরিবর্তন সম্ভব তা বিশদ-ভাবে আলোচিত হয়নি। তত্ত্বজ্ঞদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হয়ত শোনা গেছে। কিন্তু "নিউ ওয়েভ"-এর সারমর্ম দুরধিগম্যই রয়ে গেছে।

তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, জটিল তত্ত্বের জটে জটে চলচ্চিত্র দিনের পর দিন বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। এই বন্ধন যেন এক নতুন নাগ-পাশ—যাতে বাঁধা পড়ে চলচ্চিত্র সহজ, সরল

জীবনায়নের পথে এগিয়ে যেতে পারছে না। জীবনের শোভাময়, মনোময় রাজপথে চলচ্চিত্র যদি চলতে না পারে, যদি এমনিভাবে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে তবে আশংকা হয়, এই শিল্পের আত্মিক অবক্ষয়ের আর দেরি নেই। তত্ত্বের রথচক্রতলে এর অপমৃত্যু সন্নিকট।

বি-এফ-জে-এ-র পুনর্জীবন লাভ

চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের নিজস্ব সংস্থা বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এককালে বাংলা ও বাংলার বাইরের চিত্রামোদী ও চলচ্চিত্রসেবীদের কাছে সুপরিচিত ছিল। সাংবাদিকদের বিচারে প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র, শিল্পী ও কলাকুশলীদের যে "বি-এফ-জে-এ এওয়ার্ড" দেওয়া হত, তা নিয়ে চিত্রনির্মাতা ও চিত্ররসিকদের মহলে প্রবল উদ্দীপনা ও ঔৎসুক্য দেখা যেত।

অনিবার্য কারণে বি-এফ-জে-এ'র কর্মধারা গত কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি এই সংস্থাকে নতুন প্রাণে পুনর্জীবিত করে তোলা হয়েছে।

চলচ্চিত্রসেবী ও চিত্রামোদীরা শুনে সুখী হবেন, এই সংস্থার পুনর্গঠনের সংগে সংগেই এ-বছর থেকে "বি-এফ-জে-এ এওয়ার্ড"-এর পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বি-এফ-জে-এ'র সভ্যদের বিচারে ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা, হিন্দী ও বিদেশী ছবি, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম অনতিবিলম্বেই ঘোষিত হচ্ছে।

গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সভ্যদের সাধারণ সভায় সংস্থার নিম্নলিখিত কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছেঃ

সভাপতি—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ; সহ-সভাপতি — শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ; যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীবাগীশ্বর ঝা ও শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ। সমিতির সদস্য—সর্বশ্রী নির্মলকুমার ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা), মহেন্দ্র সরকার (যুগান্তর), রণধীর সাহিত্যালংকার (কলা সংসার), এ এইচ মালিহাবাদি (আজাদ হিন্দ), পংকজ দত্ত (দেশ), বি সি আগরওয়ালা (সিনে অ্যাডভান্স), কল্পতরু সেনগুপ্ত (স্বাধীনতা), এ এম কুমার (চিত্রলোক), ধীরেন মল্লিক (নতুন খবর) ও অজিত মুখোপাধ্যায় (জলসা)।

চিত্রালোচনা

নতুন বাংলা ছবি এ সপ্তাহে একটিও মুক্তিলাভ করছে না। আগামী সপ্তাহে দুটি বাংলা ছবি দর্শকদের সামনে উপস্থিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। একটি মুভীটক'-এর প্রথম উপহার **শিউলি বাড়ি**, অপরটি চিত্রশোভনার **শাস্তি**। দুটি ছবিরই আখ্যান অবলম্বন দুই প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিকের দুটি বহুপঠিত কাহিনী। "শিউলি বাড়ি" সুবোধ ঘোষের "নাগলতা"র চিত্ররূপ। "শাস্তি"র কাহিনী অবলম্বন নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র "ভুবন ডাক্তার"। এবং আরও একটি সুখবর, দুটি ছবিরই পরিচালক নবাগত। "শিউলি বাড়ি" পরিচালনা করেছেন পীযূষ বসু, "শাস্তি"র পরিচালক দয়াভাই।

• • •

তিনটি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। ছবি তিনটি হল : **ঝুলা, রঙ্গোলী** ও **সপেরা**। তিনখানি ছবিরই মূল উপজীব্য হাল্কা আমোদ।

বাসু ফিল্মস-এর "ঝুলা" দক্ষিণ ভারতের উপহার। বৈজয়ন্তীমালা, সুনীল দত্ত, প্রাণ ও সুলোচনা এই ছবির প্রধান

চিত্ত বসু পরিচালিত "ধূপছায়া"র একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

শিল্পী। কে শঙ্কর ছবির পরিচালক। সঙ্গীত-পরিচালক হলেন সলিল চৌধুরী। আর এস বি ফিল্মস-এর **"রঙ্গোলী"র** নায়ক-নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা ও কিশোর-কুমার। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অমর কুমার। শঙ্কর-জয়কিষণ সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন।

ইন্ডো আফ্রিকা ফিল্মস-এর "সপেরা"র মুখ্য শিল্পী হলেন রঞ্জন, জ্যোতি, তিওয়ারী, সুন্দর এবং জীবনকলা। বি জে প্যাটেল ও অজিত মার্চেণ্ট যথাক্রমে ছবিটির পরিচালক ও সুরকার।

* * *

আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, বেনারসী ও অতল জলের আহ্বান।**

তপন সিংহ পরিচালিত ও জালান প্রোডাকশন্স প্রযোজিত **হাঁসুলী বাঁকের উপকথার** চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত। এ মাসের মাঝামাঝি ছবির আবহ-সুররচনা সম্পূর্ণ করছেন সংগীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির বহির্দৃশ্যাবলী বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলে কোপাই নদীর তীরে গৃহীত হয়েছে। বহিরঙ্গ শিল্পগরিমা ও কাহিনী-বিন্যাসে ছবিটি পরিচালক-চিত্রনাট্যকার শ্রীসিংহের নতুন প্রতিভার পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, প্রশান্তকুমার ও নিভাননী ছবির মুখ্য চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন।

বেনারসী ফিল্ম ক্রাফট-এর প্রথম চিত্রোপহার। এই ছবিতে একজন নতুন পরিচালকের সন্ধান মিলবে। তিনি হলেন অরূপ গুহঠাকুরতা। বিমল মিত্র'র মনন-ধর্মী ও আবেগসমৃদ্ধ কাহিনী ছবিটির আখ্যান-ভিত্তি: রুমা গুহঠাকুরতা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ছবির সুরকার।

অতল জলের আহ্বান আর ডি বি'এর নবতম নিবেদন। অজয় কর ছবির পরি-চালক। প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী ও একটি ত্রিভুজ প্রেমোপাখ্যান নিয়ে ছবির বিষয়বস্তু রচিত। ছবির একদা-ব্যর্থ প্রণয়ী যুগলের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয় বিশ বছর পরে। এই দুটি চরিত্রের রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস ও ছায়া দেবী। ত্রিভুজ প্রণয়োপাখ্যানের তিন শিল্পী সৌমিত্র চট্টো-

পাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মন ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

*　*　*

বাংলা ছবিতে বোম্বাই শিল্পীর আগমন সম্প্রতিকালে শুরু হয়েছে প্রযোজক-পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "মমতা" ছবি থেকে। বলরাজ সাহনী ছিলেন এই ছবির নায়ক। প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ-ভি-এম'এর "আকাশ-পাতাল" ছবিতেও বোম্বাই শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দুর্গা খোটে ও অচলা সচদেব। এরপর এলেন হেলেন ("গলি থেকে রাজপথ") ও চাঁদ ওসমানী ("শিলালিপি")। শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎ রায়ের ছবিও বাদ গেল না। শ্রীরায় তাঁর নতুন ছবি "অভিযান"-এর নায়িকা চরিত্রের জন্য ওয়াহিদা রেহমানকে নির্বাচন করেছেন।

বাংলা ছবিতে আরও একজন বোম্বাই-তারকার পদক্ষেপ ঘটছে। তিনি হলেন গীতাবালি। পরিচালক হেমেন গুপ্ত তাঁর

আগামী বাংলা ছবি "অনামিকা"র জন্য এই শিল্পীকে নির্বাচন করেছেন। ছবির একটি বিশিষ্ট স্ত্রী-চরিত্রে গীতাবালি অভিনয় করবেন। ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সম্ভবত অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে দেখা যাবে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু-মুসলমান প্রীতি

হিন্দী ছায়াছবির ক্ষেত্রে প্রযোজক বি আর চোপরা ও পরিচালক যশ চোপরা কৌলিন্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের ছবিতে দর্শকরা নতুন কিছু আশা করেন, নতুনত্ব পেয়ে তৃপ্ত হন। চোপরা-ভ্রাতৃদ্বয়ের নবতম নিবেদন "ধর্মপুত্র" (বি আর ফিল্মস) সেদিক থেকে দর্শকদের নিরাশ করবে না।

আচার্য চতুরসেন শাস্ত্রীর একটি উপন্যাস ওই ছবির আখ্যান-ভিত্তি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অল্পাধিক দুই দশক-কালব্যাপী এক ঘটনাবহুল অধ্যায় এই উপন্যাসের পটভূমি। অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি থেকে শুরু করে দেশ-বিভাগের কাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে দ্রুত পটপরিবর্তন দেখা দেয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত।

আধুনিক ভারত-ইতিহাসের এই অশান্ত অধ্যায়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও বিরোধের যে সংঘাতটি জনজীবনকে আলোড়িত করে তোলে তা-ই চিত্রকাহিনীর প্রধান উপজীব্য। এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই যে জাতীয় সংহতির প্রাণ এবং জাতীয় জীবনের আদর্শ তা-ই ছবির বক্তব্য।

ছবির এই উপজীব্য ও বক্তব্য যে নাট্য-কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তার পরিধি দুই পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুই পুরুষ ধরে দুই পরিবারের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব চিত্রকাহিনীর ভিত্তি রচনা করেছে। বলা বাহুল্য, দুই পরিবারের মধ্যে একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমান।

বি-এ-পি প্রোডাকসন্সের "কাজল"-এর নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী।

নবাব-পরিবারের একমাত্র বিবাহযোগ্যা কন্যা যখন অবৈধ মাতৃত্বের কলঙ্কে বিড়ম্বিত, তখন হিন্দু পরিবারের ছেলে উদারতা ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে কেমনভাবে তার মুসলমান বোনকে সকল অপমানের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অবৈধ শিশুকে নিজের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বলে সমাজে স্বীকৃতি দেয় তা-নিয়েই চিত্রকাহিনীর সূত্রপাত।

অপরিণামদর্শী প্রণয়ের এই অভিশাপ নীরবে সহ্য করে যাওয়ার পর অভিভাবকের সম্মতি অনুসারে মুসলমান তরুণী তার প্রেমাস্পদকে আবার ফিরে পেল। পরিণয়-সূত্রে ওরা আবদ্ধ হল। গর্ভবতী অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে নবপরিণীতা পুনরায় জননী হবার সকল সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হল। তার প্রাক-বিবাহিত জীবনের সন্তান তখন হিন্দুর ঘরে লালিত-পালিত হচ্ছে।

কাহিনীর শেষার্ধে দেখা গেল যে হিন্দু পরিবারে আদর-যত্নে প্রতিপালিত মুসলমান সন্তান গোঁড়া হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং দেশবিভাগ-জনিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিধর্মী নিধনে অর্থাৎ মুসলমান বিনাশে মরীয়া হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত নিজের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে তার রক্তক্ষয়ী অভিযানকে কেন্দ্র করে কীভাবে সে নিজের আসল পরিচয় জানতে পারল এবং নিঃসন্তান দম্পতি কেমন করে তাদের বিবাহিত-পূর্ব জীবনের সন্তানকে ফিরে পেল তা-নিয়েই চিত্রকাহিনীর অতিনাটকীয় পরিসমাপ্তি।

হিন্দু ঘরের ধর্মপুত্র মুসলমান যুবক ও এক হিন্দু তরুণীর প্রণয় ছবির অন্যতম উপকাহিনী গড়ে তুলেছে। এ-বাদেও ছবিতে একাধিক দেশাত্মবোধক ও নাটকীয় ঘটনা সংযোজিত।

সাধারণ হিন্দী ছবির তুলনায় এই ছবির গুণের সংখ্যা অধিক। ছবির আখ্যান-বস্তুতেও দর্শকরা নতুন নাট্যোপকরণ ও ভিন্নতর পরিবেশের আস্বাদন পাবেন। ছবি দেখার কালে দর্শকরা ভারতের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিগত দিনগুলির স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেন। এবং জাতীয়তাবোধের স্পর্শ পাবেন।

চিত্রপরিচালনায় যশ চোপরা ছবির বহু দৃশ্যে সুচারু ও ব্যঞ্জনাধর্মী প্রয়োগ-কর্মের পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োগ-ধারাটি সর্বাঙ্গীণ ভাবে পরিচ্ছন্ন।

তবে চিত্রকাহিনী বিন্যাসে বক্তব্য ও আদর্শ অতি মাত্রায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। চিত্রকাহিনীর বাণী দর্শকের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার একটি সদা-সচেষ্ট অতি-সচেতন ও কষ্টসাধ্য প্রয়াস ছবিটির প্রায় প্রতি দৃশ্যে নাট্য-পরিস্থিতিতে ও সংলাপে সুপরিস্ফুট। তাই বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ও বক্তব্য-নিবেদনে সারা ছবিটিই যেন কেমন কৃত্রিম বলে মনে হয়। ছবির কাহিনীও স্থূল ভাবাবেগে পরিপুষ্ট এবং এর শাখা-উপশাখা জীবনের স্পর্শরহিত। একটি পুরোপুরি উদ্দেশ্যধর্মী ছবিতে আখ্যান-

বস্তুর বিন্যাসে শিল্পবোধের যে অপমৃত্যু দেখা যায়, এ-ছবিতে তা সুস্পষ্ট।

ছবির প্রধান সম্পদ চারজন শিল্পীর মনোগ্রাহী অভিনয়। এ'রা হলেন অশোক-কুমার, মালা সিংহ, মনোমোহন কৃষ্ণ ও নিরূপা রায়। মুখ্যচরিত্রে এ'রা সকলেই দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। এ'দের মধ্যে যে দু'জন শিল্পী বিশেষ করে দর্শকের অন্তর স্পর্শ করেন তাঁরা হলেন অশোক-কুমার ও মালা সিংহ। মুসলমানের বেশে তাঁরা ছবিতে অবতরণ করেছেন।

অন্যান্য প্রধান চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন রেহ্মান, শশী কাপুর, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, তাবাসুম, দেবেন বর্মা, রোহিত এবং শিশুশিল্পী বাবলু।

এন দত্ত'র সংগীত-পরিচালনা বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। গানের সুরারোপ অভিনবত্ব-বর্জিত।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ (ধরম চোপরা কৃত) বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যথাক্রমে প্রাণ মেহ্‌রা ও সন্ত সিং।

পরলোকে কাজরী গুহ

বাংলা ছায়াছবির অন্যতম উদীয়মানা অভিনেত্রী শ্রীমতী কাজরী গুহ গত রবিবার (৪ঠা মার্চ) অকল্যান্ড নার্সিং হোমে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ। শ্রীমতী গুহ'র স্বামী ডাঃ রণেন সরকার অকল্যান্ড নার্সিং হোম-এর একজন স্বত্বাধিকারী।

কাজরী গুহ

ছাত্রী জীবনেই শ্রীমতী গুহ'র অভিনয়-শক্তির স্ফুরণ দেখা দেয়। শৌখিন মঞ্চে বহুবার তাঁর অভিনয় ও নৃত্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া গেছে। একাধিক ইংরেজী নাটকের স্ত্রী ভূমিকায় তিনি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

চিত্রজগতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ঘটে "দ্বিচক্র" ছবিতে। ছবিটি এখনও মুক্তিলাভ করেনি। এর পর "হারানো সুর" ছবিতে অভিনয় করে তিনি চিত্রাভিনেত্রী-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। "দীপ জ্বেলে যাই" ও "সাথীহারা" ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন।

শ্রীমতী কাজরীর জননী ইংরেজ মহিলা। বর্তমানে তিনি বার্মিংহামে বাস করেন। তাঁর পিতা বাঙালী।

শ্রীমতী গুহ'র মৃত্যুতে বাংলা ছায়াছবি একজন সুঅভিনেত্রী হারাল। আমরা তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে সমবেদনা জানাই।

নাট্যাভিনয়

নিউ এম্পায়ারে দুই শিল্পী

সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের পর দেশে ফিরে পণ্ডিত রবিশঙ্কর কলকাতায় প্রথম তাঁর অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন গত ২রা মার্চ, নিউ এম্পায়ারে। বেশ কয়েক মাস পর রবিশঙ্করের সেতার শোনার এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করেছেন কলকাতার সংগীত-রসিকরা।

দুই ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে রবিশঙ্কর প্রথম বাজিয়ে শোনালেন ইমন-কল্যাণ। এর পর রাগেশ্রী। এবং সব শেষে পাহাড়ী এবং বিভিন্ন রাগ ও লোক-সংগীতের সুরে তিনি বাজালেন একটি ধুন। আলাপ, জোড় ও ঝালার মাধ্যমে রাগেশ্রীর রাগরূপ তিনি তাঁর সেতারে চিত্তগ্রাহী করে তোলেন। মীড়ের কাজগুলিও তাঁর যন্ত্রে ভাবদ্যোতক হয়ে ওঠে। গতের অংশগুলি তবলার সঙ্গে সুন্দর সমন্বয় স্থাপন করে।

তবে সুরসিকরা রবিশঙ্করের বাজনায় একটি নতুন প্রয়োগ-রীতি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন। রাগ-রাগিনীর প্রতি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা বজায় রেখে তিনি সর্বশ্রেণীর শ্রোতা-দের মনোরঞ্জনের প্রতি যেন বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ফলে তাঁকে জটিল তানের কাজ পরিহার করে নানা ছন্দ-প্রকরণের ভেতর দিয়ে এক সহজ ও আমোদদায়ক পরিবেশন-রীতির প্রতি বিশেষ আনুগত্য রক্ষা করতে দেখা গেল।

নিউ এম্পায়ারের মঞ্চে পরের দিন আত্মপ্রকাশ করলেন আরেকজন জনপ্রিয় শিল্পী। ইনি হলেন ইন্দ্রাণী রহমান। এই নিপুণ নৃত্যশিল্পী ও অনেকদিন পর তাঁর সহ-শিল্পীদের সহযোগে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক নৃত্যাংশ পরিবেশন করেন। লাবণ্য-বিকাশে ও ছন্দ-বিন্যাসে ইন্দ্রাণী রহমানের দক্ষতার প্রমাণ দর্শকরা আবার নতুন করে পেলেন।

চিঠিপত্র

জার্মান টেলিভিশনে 'হোলি ইণ্ডিয়া'

মহাশয়,—কয়েক মাস পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় পড়েছিলাম যে পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ থেকে কয়েকজন টেলিভিশন টেক্‌নিশিয়ান ভারতে এসেছেন বিভিন্ন স্থানের ছবি তুলতে জার্মানীর টেলিভিশন-এ দেখানোর জন্য। তখন সংবাদটা পড়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮-৪৫ মিঃএ টেলিভিশনে ঐ ছবি দেখান হয় সারা জার্মানীতে। এক [illegible] এই দীর্ঘ

ডকুমেন্টারি চিত্র দেখাতে। চিত্রটির শিরোনামা ছিল—Asian Face : Holy India—Old God & new temptation, ছবি দেখে এই মনে হল যে টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানের লোকদের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় দারিদ্র্যের নগ্ন চিত্র ও এই সুযোগে কমিউনিজম্ কি ভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে তাই দেখানো। চিত্রটির কিছু বর্ণনা দিই। ছবি শুরু হল ভারতের মানচিত্র দিয়ে—ভারতবর্ষ কত বড় দেশ, ইউরোপের প্রায় ¾ অংশ; প্রধান শহরগুলির অবস্থান ইত্যাদি। তারপরই ছবি আরম্ভ হল দিল্লি রেল স্টেশনের একটি নোংরা প্ল্যাটফরম্ এর দৃশ্য দিয়ে —দেখা গেল লোকাল ট্রেনে ভিড়, কুলিদের মাল বহা, জীর্ণ বেশধারী যাত্রিরা ও ভিখিরী; তারপর এল একটি কর্মচঞ্চল রাস্তার দৃশ্য—নেপথ্য ভাষণে বলা হল এই দিল্লি ভারতের রাজধানী। দিল্লিতে আর কিছু দেখা গেল না, দেখা গেল বম্বে—একটি অতি নোংরা রাস্তার দৃশ্য। রাস্তার অদূরে বস্তি ও বস্তিবাসিগণ, রাস্তায় ভিখারীদল এরা এলো সবাই একে একে Tele Camera-এর সামনে। আর দেখা গেল সমুদ্রে গনেশ ঠাকুর ভাসান এবং ট্রম্বেতে পারমাণবিক চুল্লি। ব্যাঙ্গালোরে দশেরায় মহীশূরের মহারাজাকে নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা, রাত্রের আলোক সজ্জা, এবং শোভাযাত্রা দেখবার জন্য রাস্তায় ভিড়—এর মধ্যে জীর্ণ বেশধারী ও ভিখারীরা ভাগ্যবান কারণ তারাই Tele Camera-এর আসল লক্ষ্য ছিল। দুই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখানোর পর এল মাদ্রাজ। মাদ্রাজের একটি গ্রামে রামায়ণের কাহিনী নিয়ে যাত্রা গান, কিছু জেলে পরিবার ও তাদের বস্তি, কয়েকটা মন্দির ও মন্দির গাত্রে খোদাই করা কয়েকটি মূর্তি ছাড়া এখানে আর কিছুই পাওয়া গেল না। বারাণসীতে গঙ্গার ঘাটে গোঁড়া হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখান হল।

এর পর এলো কলকাতা—এখানে দেখা গেল গোলপার্কে রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার এর দ্বার উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান, হাওড়া ব্রিজ, ব্রিজের নিচে নোংরা ঘাটগুলিতে স্নানের দৃশ্য, তারপরই কালীঘাটের গঙ্গায় ধর্মানুষ্ঠান ও স্নানের দৃশ্য, এমন কি ভাসমান একটি মৃত পশু দেহের উপর কয়েকটি কাক বসে খাচ্ছে. এটাও Tele Camera সযত্নে ধরে রেখেছে; কালিঘাট মন্দির দেখা গেল না—দেখা গেল রাস্তায় ভিখারীর দল। এবার এলো স্ট্র্যান্ড রোডের দৃশ্য—কি ভাবে বিহারী মেয়েরা রাস্তার ফুটপাথে ঘুটে দিচ্ছে এবং ফুটপাথের উপর ছোট ছোট চালাঘর; দেখা গেল অপ্রশস্ত রাস্তায় মানুষ, যানবাহন ও পশুর মিছিল। এর পরই এল ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে বামপন্থী দল পরিচালিত একটি প্রতিবাদ সভার দৃশ্য। কেরালায় দেখা গেল কিছুটা লোকনৃত্য, কম্যুনিস্ট পার্টির প্রোপাগান্ডা ও ক্রিয়াকলাপ এবং শেষে প্রাক্তন কম্যুনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ Tele Camera-এর সামনে এসে কম্যুনিজম্ এর প্রতি তাঁর আস্থা জানালেন। ছবি শেষ হল। ছবিটার শিরোনামা হওয়া উচিত ছিল পভার্টি ইন ইণ্ডিয়া। হোলী ইণ্ডিয়া নাম দিয়ে এই ছবি দেখানো মানে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে অপর কতকগুলি দেশের লোকের সামনে হেয় করার প্রচেষ্টা মাত্র বলে মনে করি। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে গরিব লোক নেই বললেই চলে. এদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান আমাদের থেকে উন্নত —তাই বলে অপর দেশের দারিদ্র্যকে নিয়ে বিদ্রূপের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই উন্নত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় না। টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানের লোকেরা কি ভারতে অন্য কোন সুন্দর জিনিস খুঁজে পেলেন না দেখানোর মত?

ইতি—

শ্রীঅতীন্দ্র গুপ্ত
হাগেন (পঃ জার্মান)

অনুষ্ঠান সংবাদ

শনিবার ১০ই মার্চ রবীন্দ্র কলা-কেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক উৎসব কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। সংগীতাংশে অংশ গ্রহণ করবেন সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, শৈলেন দাস, শ্রীলা সেন, অর্ঘ্য সেন ও রবীন্দ্র কলা-কেন্দ্রের সভা-সভ্যাবৃন্দ। যন্ত্রসংগীতে সলিল মিত্র ও আবৃত্তিতে কাজী সব্যসাচী, ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য ও স্বদেশ ঘোষদস্তিদার অংশ গ্রহণ করবেন।

একলব্য
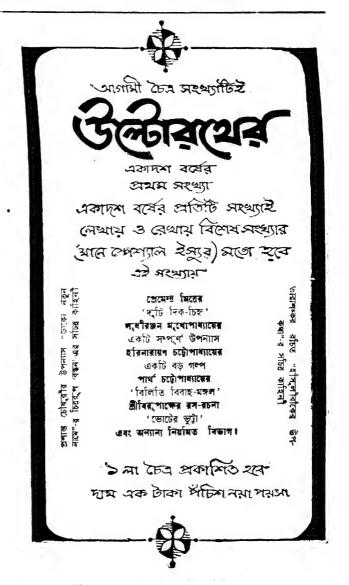
নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থা খেলাধুলোর বিভিন্ন শাখায় বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার এক পরিকল্পনা করেছেন। এর অর্থ ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, অ্যাথলেটিকস, মুষ্টিযুদ্ধ, সাঁতার, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি খেলাধুলোর বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন তাঁরাই নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাবেন। পুরস্কারের নাম অর্জুন পুরস্কার। মহাভারতে বর্ণিত মহাযোদ্ধা অর্জুনের নামে এই পুরস্কার প্রদানের পশ্চাতে হয়তো যুক্তি এই, ধনুর্বিদ্যায় অর্জুন যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, এরাও তেমন নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন।

বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্বাচনে ইতিমধ্যেই দু'জনের নাম জানা গেছে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জিকে ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। বক্সিং ফেডারেশন বছরের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে নির্বাচিত করেছেন লাইট-মিডল ওয়েটের উপর্যুপরি তিন বছরের চ্যাম্পিয়ন এল বুডি ডি'সুজাকে। প্রদীপ এবং ডি'সুজা দু'জনই ভারতীয় রেল দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রদীপ ব্যানার্জি ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে এবং ১৯৬১ সালে মারডেকা কাপে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছেন। তাছাড়া প্রদীপের অধিনায়কত্বে এ বছর রেলদল লাভ করেছে জাতীয় ফুটবলের বিজয়ীর পুরস্কার সন্তোষ ট্রফি। শুধু উন্নত ক্রীড়াশৈলীর জন্যই নয়, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব,

মাঠের মধ্যে ও মাঠের বাইরের আচার-ব্যবহার, খেলাধুলোয় আন্তরিকতা এবং যোগ্যতা, সব কিছু বিচার করে এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। এক কথায় 'স্পোর্টসম্যান' বলতে যে সব গুণাবলী বোঝায় তার অধিকারীই হবেন 'স্পোর্টসম্যান অব দি ইয়ার'।

• • •

'স্পোর্টসম্যান অব দি ইয়ার' নির্বাচনের নজীর নতুন নয়। পৃথিবীর নানা দেশেই বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ বাছাইয়ের বিধি আছে। কয়েক বছর আগে থেকে কলকাতার ভেটারেন্স ক্লাবও বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের বাছাই করে পুরস্কার দিয়ে আসছেন। কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিকরাও এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রেওয়াজ বজায় রাখতে পারেননি। মোহনবাগান ক্লাবে পদ্মশ্রী গোষ্ঠ পাল সম্বর্ধনা সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষও এই ধরনের পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও বিশ্ব-খ্যাত খেলোয়াড়দের সম্মানিত করবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'হেমস অ্যাথলেটিক ফাউন্ডেশন'। এদের পুরস্কার মহাদেশ ভিত্তিক। অর্থাৎ প্রতি মহাদেশে খেলাধুলোয় যাঁদের কৃতিত্ব ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর তাঁরাই লাভ করেন 'হেমস অ্যাথলেটিক ফাউন্ডেশনের' পুরস্কার।

এবার এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ৬ জন ক্রীড়াবিদ 'হেমস' পুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন। আমেরিকাকে উত্তর ও দক্ষিণে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে দু'টি পুরস্কার।

এশিয়া থেকে পুরস্কার পেয়েছেন জাপানের সুয়োশি ইয়ামানাকা ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ডের জন্য।

ইউরোপে 'হেমস' পুরস্কারের অধিকারী সোভিয়েট রাশিয়ার ভ্যালেরী ব্রুমেল। উঁচু লাফে ৭ ফুট ৪½ ইঞ্চি অতিক্রম ব্রুমেলের অতুলনীয় কৃতিত্বের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

অস্ট্রেলিয়ায় হেমস পুরস্কার পেয়েছেন সাঁতারু পটিয়সী ডন ফ্রেজার।

আফ্রিকার আব্দুল মেসু হেমস পুরস্কার পেয়েছেন গতিবেগের জন্য। ২০০ মিটার তিনি দৌড়িয়েছেন ২০·৭ সেকেণ্ডে।

দক্ষিণ আমেরিকার লামির মারকুয়েসের হেমস পুরস্কার লাভ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসাবে। উত্তর আমেরিকায় পুরস্কারে অধিকারী রালফ বোস্টন, ২৭ ফুট ½ ইঞ্চি অতিক্রম করে দীর্ঘ লাফে যিনি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী।

• • •

সোভিয়েট রাশিয়ায় সরকারের তরফ থেকে কীর্তিমান খেলোয়াড়দের 'অনার্ড মাস্টার স্পোর্টস' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। আমাদের জাতীয় সরকারও কয়েক বছর থেকে পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধি দিয়ে কীর্তিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের সম্মানিত করছেন। এ ছাড়া বিশ্বের কয়েকটি প্রভাবশালী সংবাদপত্রেরও শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্বাচনের নিয়ম আছে।

ইংলণ্ডে বিশিষ্ট ক্রীড়া পত্রিকা 'ওয়ার্লড স্পোর্টস' ক্রীড়াবিদদের নৈপুণ্যের বিচার করেন তাঁদের ক্রীড়া সমালোচকদের ভোট গ্রহণ করে। তাদের ১৯৬১ সালের নৈপুণ্যের বিচারে পুরুষদের মধ্যে উঁচু লাফে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী রাশিয়ার ভ্যালেরী ব্রুমেল সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন, মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন একই দেশের তামারা প্রেস। তামারা প্রেস লোহার বল ছোঁড়া ও ডিসকাস ছোঁড়ায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী।

অল্টিয়াস, সাইটিয়াস ফর্টিয়াস—অর্থাৎ আরও উঁচুতে, আর দ্রুতবেগে এবং আরও বেশী শক্তির পরিচয়ে এগিয়ে যাওয়া অলিম্পিকের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে যাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তাঁরা হচ্ছেন সোভিয়েট রাশিয়ার ভ্যালেরী ব্রুমেল, আমেরিকার ফ্রাঙ্ক বাড এবং রাশিয়ার যুরি ভ্লাসফ। ব্রুমেলের উঁচু

[illegible] বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্যালেরী ব্রুমেল

লোহার বল ছোড়া ও ডিসকাস ছোড়ায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী তামারা প্রেস

লাফের কথা আগেই বলেছি। আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলেট ফ্রাঙ্ক বাড ১০০ গজ দৌড়িয়েছেন ৯·২ সেকেণ্ডে। এত কম সময়ে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন দৌড়-বীরের পক্ষেই ১০০ গজ দৌড়নো সম্ভব হয়নি। ভারোত্তোলক য়ুরি ভ্লাসফ ক্লিন ও জার্কে তুলেছেন ৪৫৮¼ পাউন্ড। এও ভার তোলার ইতিহাসে এক রকম অসাধ্য সাধন।

* * *

জগৎজোড়া খেলার মেলায় বিশ্ব রেকর্ডের নিত্য নতুন ভাঙ্গা-গড়া। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার ক্ষেত্রে বিগত দুই মাসে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন সাপেক্ষে আরও বহু বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হবার খবর এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ করার মত কৃতিত্ব আমেরিকার উঠতি অ্যাথলেট জন উলসেসের। গত ২রা ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কে পোল ভল্টে সর্বপ্রথম ষোলো ফুটের বাধা অতিক্রম করে ১৫ দিন পরে আবার বোস্টনে ১৬ ফুট ¼ ইঞ্চি লাফিয়ে পোল ভল্টের সমস্ত পুরনো রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।

তবে উলসেসের এ কৃতিত্ব রেকর্ড হিসাবে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক সংস্থার স্বীকৃতি পাবে কিনা সন্দেহ। নিউ ইয়র্ক ও বোস্টনের ইনডোর [illegible] উলসেস ব্যবহার করেছিলেন ফাইবার গ্লাসে তৈরী নতুন ধরনের পোল বা দন্ড। অনেকের ধারণা কাচের তন্তুতে তৈরী পোলই উলসেসের নতুন কৃতিত্বের সহায়ক। এ দন্ড পোল-ভল্টের আইনসম্মত দন্ড কিনা এ নিয়ে অ্যাথলেট বিশারদরা ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন।

পোলভল্টে ১৬ ফুট অতিক্রম করা অ্যাথলেটিক জগতের এক নতুন বিস্ময়। এর আগে কোন অ্যাথলেট ১৫ ফুট ৯¼ ইঞ্চির বেশী অতিক্রম করতে পারেননি। ১৫ ফুট ৯¼ ইঞ্চি লাফিয়েছিলেন আমেরিকার বব্ গাটোস্কি ১৯৫৭ সালে। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বব রিচার্ড, ডন ব্র্যাগ, জেমস গ্রাহাম অব্রে ডুলে প্রভৃতি পোল ভল্টের কীর্তিমান অ্যাথলেটেরা একাধিকবার ১৫ ফুট ৫ ইঞ্চি লাফিয়েছেন। ১৯৪২ সালের সর্বপ্রথম ১৫ ফুট ৭¼ ইঞ্চি লাফিয়েছিলেন আমেরিকার ওয়ারমারদাম। বব গাটোস্কি পোল ভল্টে ১৬ ফুটের বাধা অতিক্রম করবার সাধনায় ব্রতী। কিন্তু ইতিমধ্যে সে বাধা অতিক্রম করেছেন জন উলসেস।

কিছুদিন আগে নিউজিল্যান্ডের ২৩ বছর বয়স্ক দৌড়বীর পিটার স্নেল এক মাইল, ৮০০ মিটার ও ৮৮০ গজ নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। স্নেল এক মাইল দৌড়েছেন ৩ মিনিট ৫৪·৪ সেকেণ্ডে। এই বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার দৌড়বীর হার্ব ইলিয়টের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৩ মিনিট ৫৪·৫ সেকেন্ড।

১৯৫৪ সালে অক্সফোর্ডের মাইল দৌড়ে গ্রেট ব্রিটেনের রজার ব্যানিস্টার ৪ মিনিটের বাধা ডিঙিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করবার পর বহু দৌড়বীর ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ পাড়ি দিয়েছেন। এদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জন ল্যান্ডি ও হার্ব ইলিয়ট, ইংলণ্ডের ডেরেক ইবটসন, জার্মানীর সিগফ্রিড ভ্যালেণ্টিন প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য, তবে ইলিয়টের মত এত বেশীবার আর কেউ ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ পাড়ি দিতে পারেননি। এবার ইলিয়টের রেকর্ড স্নেলের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে। হার্ব ইলিয়ট বিশ্বখ্যাত অ্যাথলেটিক কোচ পার্সি কেরুটির ছাত্র। পিটার স্নেলের অ্যাথলেটিক শিক্ষা গুরু লিডিয়ার্ড।

কেরুটি আর লিডিয়ার্ড অসাধ্য সাধনের সংকল্প নিয়ে কোচিং আরম্ভ করেছেন। অনুশীলন, অধ্যবসায়, সাধনা ও শিক্ষায় তাঁরা রক্তমাংসের মানুষকে মেসিনে পরিণত করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাদের মতে মানুষ যন্ত্রচালিত মেসিনের মত এগিয়ে যাবে সীমার বাইরে, নতুন নতুন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কে জানে মানুষের শক্তির শেষ কোথায়?

অ্যাথলেটিক কোচ পার্সি কেরুটী ও হার্ব ইলিয়ট

রিনা ব্যানার্জি (চক্রবর্তী)

মুকুল
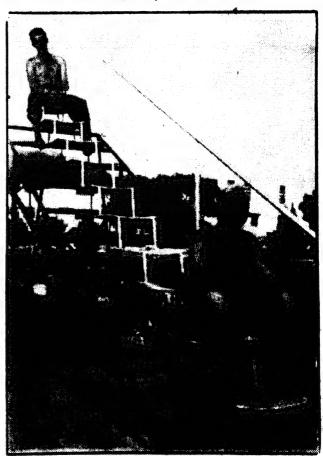
কিছুদিন আগে 'মহাজাতি সদনে'র পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

সাংস্কৃতিক চিত্র-প্রদর্শনী। উদ্দেশ্য, শিক্ষায়, দীক্ষায়, কলা, সাহিত্যে সংগীতে, সমাজ-সেবায়, অভিনয়ে, পর্বতারোহণে, এমন কি, রাজনীতি ক্ষেত্রে যাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, তাদের অমৃত-মুহূর্তের চিত্র সবার চোখের সামনে তুলে ধরা। এক কথায়, ছবির মাধ্যমে বাঙালীর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের কৃতিত্বের সংকলন। বলা বাহুল্য, খেলাধূলোর ছবিও এই প্রদর্শনীর অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল এবং খেলাধূলায় বাঙলার যেসব ছেলে-মেয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের ছবিও স্থান পেয়েছিল প্রদর্শনীতে।

মেয়েদের মধ্যে যাঁরা সাঁতারে বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছে আরতি সাহা, ভারতী সাহা, সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী বসু, অনুরাধা গুহ-ঠাকুরতা প্রভৃতি সাঁতারের সাবলীলা মেয়ের ছবি। কারো গায়ে ক্লাবের ব্লেজার, কারো অঙ্গে সুইমিং কস্টিউম। মাঝখানে একখানি ছবি রিনা ব্যানার্জির। যেন ঘরের মেয়ে।

ছবি দেখে নানা জনের নানা মন্তব্য। কেউ ছায়া দেখে কায়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ প্রশংসায় অনুদার—কারো বা বক্র কটাক্ষ।

'রিনার ছবি কেন এখানে?' একটি মেয়ে যেন চমকে উঠল। আর-একটি মেয়ে ফোড়ন কাটল 'সুন্দরী বলে'।

মেয়েটির সংগী, হয়তো দাদা কিম্বা ভগিনীপতি হবেন বললেন—হ্যাঁ, সুন্দরের প্রতি মানব-হৃদয়ের সাধারণ দুর্বলতা আছে, কিন্তু তোমরা কি ছবির নীচে যে পরিচয় দেওয়া আছে, সেটা পড়ে দেখছ না?

রিনার ছবির নীচে ইংরাজীতে যে পরিচয় লেখা ছিল, তার মানে করলে দাঁড়ায়—আন্তঃকলেজ সাঁতারের সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ন মেয়ে রিনা ব্যানার্জি।

মেয়েটির সংগী আবার যা বললেন তার অর্থ—'রিনা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, সাঁতারেও সুন্দর। সুন্দরতমও বলা যেতে পারে। ওর ওয়াটার ব্যালে? অপ্রগলভ সৃষ্টি-সুষমার সে এক অপূর্ব সৃষ্টি। সুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সাঁতারের কসরত মিশিয়ে রিনা যখন জলের বুকে কলতান তোলে, রূপে-রসে-ছন্দে তা আশ্চর্য রকমে মোহময় হয়ে ওঠে।

রিনা ব্যানার্জি (চক্রবর্তী)

প্রদর্শনীর মেয়েটির মত রিনা ব্যানার্জি সম্বন্ধে অনেকেরই অজ্ঞতা আছে। সাঁতাই নামকরা সাঁতারু মেয়েদের মত ওর কৃতিত্বের প্রচার হয়নি, ছবিও বেশি বেরোয়নি কাগজে-কাগজে। পরিচিত মহলেই রিনার পরিচিতি, প্রশংসা ও খ্যাতি।

সত্যি কথা বলতে, সন্ধ্যার গতিবেগ, কল্যাণীর কলানৈপুণ্য, কিম্বা আরতির দুঃসাহস রিনার মধ্যে নেই, কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে রিনা অতুলনীয়। সাঁতারের আশ্বাস, সামর্থ্যের বিশ্বাস আর কল্পনাশক্তির বিকাশে রিনা ব্যানার্জি সৃষ্টিশীল শিল্পী। ইণ্টার কলেজ সাঁতারের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ওয়াটার ব্যালের বিভিন্ন চরিত্রের সার্থক রূপায়ন ওর সাঁতার-জীবনের দৈবত কীর্তি। তবে উদ্ধত প্রকাশে নয়, প্রকাশ-লাবণ্যে লীলাময়ী।

ঢাকুরিয়া লেকের ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির রিনা শ্রেষ্ঠ সাঁতার পটিয়সী বললে প্রতিবাদের ভয় থাকবে। কিন্তু যদি বলি—শ্রেষ্ঠ সাঁতারশিল্পী, কোন প্রতিবাদ উঠবে না।

খেলাপ্রিয় পরিবারের প্রেরণায় রিনা ব্যানার্জির সাঁতারের সূচনা। তবে এর পেছনে ছোট একটু ইতিহাসও আছে। বাবা সুশীলকুমার ব্যানার্জি দুবার জলে ডুবতে

ডুবতে বেঁচে গেছেন। একবার ওঁদের হুগলীর বাড়িতে, আর-একবার বরিশালে বেড়াতে গিয়ে। সেই থেকে তাঁর সংকল্প ছিল ছেলেমেয়েকে সাঁতারে সুপটু করে তুলবেন। তাই রিনা ও সৌরভকে ভর্তি করে দিলেন ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিতে; রিনার বয়স তখন বারো-তেরো, সৌরভের আট নয়। নিজেও অনুরাগী হলেন, 'পথে নারী বিবর্জিতা' মতেরও তিনি সমর্থক নন। ফলে সোসাইটিরও লাভ হ'ল।

সুশীলবাবু নিজে ইঞ্জিনীয়ার, 'ব্যাঙ্কো প্রাইভেট' নামে ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের প্রোপ্রাইটার। সুতরাং ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুল, ডাইভিং বোর্ড, ক্যাণ্টিন, সবকিছু প্রস্তুত ও পরিকল্পনার ভার পড়ল তাঁর উপর। ক্লাব জমজমাট হয়ে উঠল—নলিন মালিক হলেন কোচ। সাঁতারুরও অভাব হ'ল না। প্রতিনিধিমূলক সাঁতারে রিনা ব্যানার্জি হলেন ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির প্রথম প্রতিনিধি। গর্ব করে বলবার মত না হলেও ওর মাধ্যমেই সোসাইটিতে এল প্রথম সাঁতারের পুরস্কার। তার আগে অবশ্য সোসাইটির আন্ত ক্লাব সাঁতারে এবং এক মাইল প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু প্রাইজ রিনার হাতে এসেছে এবং পরে এসেছে আরও বহু পুরস্কার। মাঝখানে ১৯৫৭ সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের পরিচালনায় প্রথম যে ইণ্টার কলেজ সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, রিনা তার চারটি বিষয়েই ফার্স্ট হয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। রিনা তখন গোখেল মেমোরিয়াল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। পরে ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য তেমন অনুশীলন সম্ভব হয় না। বি-এ পাশ করার পর 'ওয়াটার ব্যালে'র মধ্যেই বেশী আনন্দের সন্ধান পায়।

অবশ্য ওয়াটার ব্যালেতে রিনার অংশ গ্রহণ ১৯৫২ সাল থেকে। প্রথমবারে ফরমেশন সুইমিং, পরের বার জলের বুকে সাঁতারের মাধ্যমে নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'র রূপায়ন। তারপর পর পর অভিনীত 'মীনার স্বপন পুরী', 'বেহুলা', 'কালীয় দমন', 'ঋতুরঙ্গ', 'মনসা মঙ্গল', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা'। বলা বাহুল্য, প্রতিবারই রিনার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় এবং প্রতি অভিনয়ে অপূর্ব অভিব্যক্তি।

ওয়াটার ব্যালের উপযুক্ত মেয়ে। সাঁতারে সুপটু। পাঁচ বছর ধরে কথাকলি নাচ শিক্ষা গোপাল পিল্লাইয়ের কাছে। হাতের আঙুল যেন চাঁপার কলি। বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চন, টানা-টানা ডাগর দুটি চোখ। সুন্দর অবয়ব। আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাতের মধ্যে জলতরঙ্গের তালে তালে যখন সাঁতার কাটেন, মনে হয় জলের রানী।

প্রচুর—প্রচুর সাঁতারের কসরত দেখাবার সুযোগ আছে ওয়াটার ব্যালেতে। সাঁতার-নৈপুণ্য এবং শিল্পসত্তা মিশে ওয়াটার ব্যালের সৃষ্টি। সাঁতারের সঙ্গে সুর-ছন্দ-লয়-তান মিলিয়ে এর মূক অভিনয়। এ-সাঁতারে গতির পাল্লা নেই, নেই পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আছে কষ্টসাধ্য কসরত, আয়াসসাধ্য অঙ্গব্যঞ্জনা। পায়ের নূপুর নিক্কণের পরিবর্তে হস্তপদ সঞ্চালিত জল-কলতান।

চণ্ডালিকা ওয়াটার ব্যালেতে প্রকৃতির ভূমিকায় রিনা ব্যানার্জি (বাঁদিকে)

সাঁতার কাটার পর প্যাভেলিয়নে ফিরে আসছেন রিনা ব্যানার্জি

ওয়াটার ব্যালেতে একাধিকবার আমার রিনা ব্যানার্জির কৃতিত্ব দেখার সুযোগ ঘটেছে। প্রতিবারই দেখেছি, দর্শকরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। ঐকতানের তালে তালে লুটোপুটি করছে সুর রঙ্গ-ভরে আর জলের পরে সাঁতার কাটছেন রিনা ব্যানার্জি; শোনা যাচ্ছে সুর ও সাঁতারের মৃদুতম ধ্বনি পর্যন্ত। যখন সাঁতার শেষ, তখন সবার মরমে মনে পূর্বশ্রুত গানের গুঞ্জরন। একটা সুখ-স্বপ্নের আবিলতা।

সাঁতার ছাড়া ব্যাডমিণ্টন এবং টেবল টেনিসেও রিনা ব্যানার্জির কিছুটা হাত না আছে, এমন নয়। কিন্তু সেটার উল্লেখ অবান্তর।

রিনা ব্যানার্জির ছোট ভাই সৌরভও সাঁতারে সুপটু হবার নেশায় মশগুল। ছয় ফুট দীর্ঘদেহী সতেরো বছরের ছেলে এর মধ্যেই কিছুটা পটু হয়ে উঠেছে। এ-বছরই বেঙ্গল এমেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের জুনিয়র ইভেণ্টে একশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে প্রথম হয়েছে। ঐ বিষয়েই নূতন রেকর্ড করেছে অল ইণ্ডিয়া স্কুল গেমসে। সৌরভও ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্য। ক্লাবের ওয়াটার-পোলো টীমের সেণ্টার ফরোয়ার্ডও।

সেদিন পি-৩৪ রাজা বসন্ত রায় রোডে রিনা ব্যানার্জিদের বাড়িতে যখন উপস্থিত হলাম, তখন দেখি—রিনা ব্যানার্জির কল্যাণী বধূর বেশ, সীমন্তে সিঁদুর রেখা। সম্প্রতি ডঃ ধীরেন চক্রবর্তীর সঙ্গে রিনা ব্যানার্জির বিয়ে হয়ে গেছে। সাঁতার-শিল্পীর স্বামী শুধু এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট উপাধি পাননি, সাঁতার ও অ্যাথলেটিকসেও পেয়েছেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু পুরস্কার। এখন তাঁর সহধর্মিণী প্রকৃত অর্থেই সহধর্মিণী।

রিনা ব্যানার্জী গত দু'বছর কম্প্যারেটিভ লিটারেচার পড়েছেন যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এবার এম-এ দেবার কথা ছিল। চোখের অসুখের জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

দেশী সংবাদ

২৬শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য সকাল প্রায় ১০-৩০ ঘটিকার সময় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাঙ্গণে নির্মীয়মাণ ভবনের একাংশ ধসিয়া পড়ার ফলে চারি ব্যক্তি আহত হয়। উহারা ঐ সময় তথায় কাজ করিতেছিল।

আজ সকালে এক ক্ষৌরকার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটবর্তী এক সেলুনে এক যুবককে কামাইবার সময় ক্ষুর দিয়া তাহার গলা কাটিয়া ফেলে এবং ক্ষতস্থান হইতে রক্ত চুষিয়া খায়। ইহাতে যুবকটির মৃত্যু ঘটে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—গতকল্য গভীর রাত্রিতে এক গুরুতর মোটর দুর্ঘটনায় লোকসভার সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ সহ চারি ব্যক্তি সাংঘাতিক আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। চারিজনের আঘাতই গুরুতর বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদিগকে কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী বার্ষিক অধিবেশন উড়িষ্যার পুরীতে অনুষ্ঠিত হইবে। উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে শুরু করিয়াছেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড আজ কেরল ও উড়িষ্যা ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের সকল মুখ্যমন্ত্রীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আগামী ৭ই মার্চের পূর্বে বিধানসভায় নবনির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য এবং যে সকল রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেখানে পরিষদের বর্তমান সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করিয়া দলীয় নেতা নির্বাচন করিতে হইবে।

আমেরিকা ভারতকে মোট ৭৪ কোটি টাকার তিনটি নতুন ঋণ দিবেন বলিয়া ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জন গলব্রেথ আজ নয়াদিল্লিতে ঘোষণা করেন।

অদ্য সকালে মধ্য কলিকাতার একটি হোটেলের এক ঘরে দুইটি যুবকের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে ঐ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইহা জোড়া আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়া পুলিস সন্দেহ করিতেছে।

১লা মার্চ—অদ্য (১লা মার্চ) হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভাঙিগয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যপাল ভারতীয় সংবিধানের ১৬৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদেশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ সাধারণ নির্বাচনের পরে গঠিত রাজ্য বিধানসভার নবনির্বাচিত মন্ত্রিগণকে শপথ গ্রহণ করানোর দিন হইতে আর মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

২রা মার্চ—লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের ৩৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২২টিতে জয়ী হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেস দল এবার একটি আসন কম পাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সদ্যসমাপ্ত তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অদ্য কংগ্রেসভবনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন যে, বিকল্প সরকারের ধ্বনি তুলিয়া বামজোট বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা।

৩রা মার্চ—'বিকল্প সরকার' ধ্বনি আকাশ-

কুসুমে পরিণত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজ্য-নেতৃবৃন্দের নানা স্তোকবাক্য সত্ত্বেও সাধারণ সদস্যদের একাংশ ইহাকে কম্যুনিস্ট পার্টির "বরাট রাজনৈতিক পরাজয়" বলিয়া মনে করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা আগামী ৯ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজভবনে শপথ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানা যায়। বর্তমান মন্ত্রিসভার শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলেও রাজ্যপালের নির্দেশবলে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বর্তমান মন্ত্রিসভাই কাজ চালাইয়া যাইবেন।

৪ঠা মার্চ—সরকারী গেস্ট-হাউসের সম্মুখে সমবেত এক জনতার ভিতর হইতে কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এক ইষ্টকখণ্ডের আঘাতে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্তম থানুপিল্লাই আজ আহত হন। মালাব্দ কর্ষক ইউনিয়ন মুখ্যমন্ত্রীকে কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শনের যে আয়োজন করে, তৎসম্পর্কে এই জনতার সমাবেশ হয়।

পাটনা সরকারী দপ্তরখানার কোষাগার হইতে ৩.৬০ লক্ষাধিক টাকা তছরূপ সম্পর্কে এ পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। চৌদ্দবার জাল বিলের সাহায্যে যে-সব টাকা তুলিয়া লওয়া হয়, তাহার শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক টাকা ইতিপূর্বেই উদ্ধার করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে ফেব্রুয়ারী—স্যার অলিভার গুণতিলকের স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিংহলী রাষ্ট্রদূত শ্রীডবলু গোপবল্লভ সিংহলের গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। সিংহল সরকার আজ রাত্রে এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন।

গতকাল মার্গারিটা দ্বীপের এক পাহাড়ে ভেনেজুয়েলার একখানি বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় ২২ জন নিহত হন। ইহাদের মধ্যে ১৯ জন যাত্রী ও তিনজন বিমানের ক্রু। কর্তৃপক্ষের ধারণা, বিমানের আরোহীদের সকলেই মারা গিয়াছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—মার্কিন সূত্রে জানা গেল, গতরাত্রে ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে চারিটি বিমান বোমা বর্ষণ করে। তবে প্রেসিডেন্ট নোদিন দিয়েম অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করিতে সক্ষম হন। অবস্থা বর্তমানে আয়ত্তাধীন।

গতকাল দুপুরে আলজিয়ার্সের রাজপথ নররক্তে প্লাবিত হয়। সশস্ত্র ইউরোপীয়রা তিনবার দল বাঁধিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে হানা দেয় এবং মুসলমান দেখিবামাত্র গুলী করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিস ২২টি মৃতদেহ ও প্রায় ১২ জন আহতকে উদ্ধার করে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—সরকারীসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারত হইতে পশ্চিম নেপালের কৈলাবাস শহরে সশস্ত্র আক্রমণ চালানো হইতেছে বলিয়া নেপাল সরকার ভারতের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। প্রতিবাদ লিপিতে ভারত গবর্নমেণ্টকে জাতীয়তা বিরোধী নেপালী সংগঠন ভাঙিগয়া দিতে বলা হইয়াছে।

১লা মার্চ—প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান আজ জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রপতির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গঠিত হইবে। পাকিস্তানে এক পরিষদসমন্বিত আইনসভা থাকিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে।

আজ যাত্রারম্ভের ঠিক পরেই একটি মার্কিন যাত্রিবাহী জেট বিমান আকাশে বিদীর্ণ হয় এবং আইডলওয়াইল্ড বিমানবন্দর হইতে কয়েক মাইল দূরে এক জলাভূমিতে ভাঙিগয়া পড়ে। ইহার ফলে ৯৫ জন নিহত হইয়াছে বলিয়া আশংকা করা হয়।

২রা মার্চ—ব্রহ্মের সৈন্যবাহিনী এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করিয়াছে। ব্রহ্মের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নে উইন আজ প্রাতে বেতারযোগে সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা দখলের কথা ঘোষণা করেন। সৈন্যবাহিনী ব্রহ্মের প্রেসিডেণ্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রেপ্তার করে।

ইরাকে আদেল মালাম নামক এগার বৎসর বয়স্ক একটি বালকের অঙ্কশাস্ত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদেল এখন পর্যন্ত পূরণের নামতা শিখে নাই। কিন্তু বর্গ, বর্গমূল ও ঘনমূলে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়া সে বহু শিক্ষককে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। আদেল অঙ্ক না করিয়াই অঙ্কের প্রশ্নের সমাধান করিতে সক্ষম।

৩রা মার্চ—প্রেসিডেণ্ট শ্রী কেনেডী রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভকে আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদনের জন্য দুই মাস সময় দিয়াছেন। অন্যথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বায়ুমণ্ডলে নূতন করিয়া আণবিক পরীক্ষা শুরু করিবে।

দক্ষিণ নেপালের বীরগঞ্জ শহরে কারফিউ জারী করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্রোহীরা বীরগঞ্জ পুলিস ও শুল্ক ঘাটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। গত মঙ্গলবার বিদ্রোহীরা বীরগঞ্জ কারাগার ও স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসের উপরও আক্রমণ চালায়।

৪ঠা মার্চ—লাল চীনের বিশাল এলাকায় কোন এক অজ্ঞাত স্থানে এক বিরাট বিতর্কের ঝড় বহিতেছে। এই বিতর্কে চেয়ারম্যান স্বয়ং মাও সে-তুং উপস্থিত আছেন। আর আছেন দেশের ১৯১ জন সর্বাধিক ক্ষমতাবান পুরুষ ও নারী—যাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বা বিকল্প সদস্য। সোভিয়েট আদর্শগত বিরোধই এই বিতর্কের কারণ বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

পুলিস গতকাল নেপালের ভূতপূর্ব সহকারী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল সুবর্ণ সমশেরের এবং আরও ৭৫ জনের বাড়ী তালাবন্ধ করিয়াছে এবং তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

এক টাকা হ'লেও তা সঞ্চয় করুন

আপনার সঞ্চিত প্রত্যেকটি টাকা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন। বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের আমাদের অত্যন্ত অভাব। গ্রামে গ্রামে স্কুল, হাসপাতাল এবং সকলের জন্য বাসস্থান —অবিলম্বে প্রয়োজন। দেশের সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, অথবা জনসাধারণের একান্ত আবশ্যকীয় সুখ সুবিধার ব্যবস্থা—এ ধরনের যে কোনো কাজই ব্যয় নির্ভর। মূলধনের এই অভাব আপনার সাহায্যে, আপনার অর্থে পূরণ হওয়া সম্ভব।

নিজের স্বার্থে আপনিও একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা করতে পারেন। সরকারী পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগ সব দিক থেকেই লাভজনক। এ অনেকখানি ব্যবসায় অর্থ লগ্নী করার মত। অথচ এতে কোনো ঝুঁকি নেই। উঁচুহারে আপনি সুদ পাবেন। এমন কি এই অর্থের ওপর কোনো আয়কর পর্যন্ত দিতে হয়না। প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগের ১২ মাস পর আপনি আপনার অর্থ তুলেও নিতে পারেন।

সঞ্চয় করা আপনার অবশ্য কর্তব্য

বিভিন্ন সরকারী সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলি হল:

(১) ১২ বছরের ন্যাশন্যাল প্ল্যান সেভিংস সার্টিফিকেট
(২) ১০ বছরের ট্রেজারি সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট
(২) পোষ্ট অফিস পাশ বই
(৪) ১৫ বছরের অ্যান্যুইটি সার্টিফিকেট (দ্বিতীয় পর্যায়)
(৫) কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট
(৬) প্রাইজ বণ্ড

বিশদ বিবরণের জন্য
নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

WBSC-1A BEN

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 17th March, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ২০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩ চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

"ইংরেজী হটাও!"

মাতৃভাষার অধিকার সবার আগে। একথা মানি। বাংলাভাষার উন্নতি ও প্রসার বাঙ্গালীমাত্রেরই কাম্য। ভারতীয় রাষ্ট্রবিধানে বাংলাভাষা অবশ্য একটিমাত্র রাজ্যের বা অঞ্চলের ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। সর্বভারতীয়ক্ষেত্রে হিন্দীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যেভাবে চলছে তাতে কেবল বাংলাভাষীরা নয় অন্যান্য অহিন্দীভাষীরাও অসন্তুষ্ট, উদ্বিগ্ন। অনেকে মনে করছেন হিন্দীর আধিপত্যবিস্তার চেষ্টা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির দাবি যে-কোন প্রকারে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, এভাবে হিন্দীর সর্বভারতীয় দাবির অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, অথচ আঞ্চলিক ভাষাপ্রীতির আতিশয্যে অন্যদিকে নিজেদের ক্ষতি ঘটবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

মাতৃভাষার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারী ভাষা নির্ধারণে তাই আঞ্চলিক ভাষার দাবি মোটের উপর মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেই সমস্যার শেষ নয়। ভাষা-প্রীতি এবং ভাষা-ভীতি, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ভাষাসমস্যা নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে। কোন কোন আঞ্চলিক ভাষাপ্রেমীরা হিন্দীর প্রাধান্য রোধ করতে গিয়ে ইংরেজীকেও নির্বাসন দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে একজন বিশিষ্ট সভ্য প্রস্তাব করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজকর্ম, পঠন-পাঠন, প্রশ্নোত্তর, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর আলোচনা ও সভার বিবরণ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে এখন থেকে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হোক। এক কথায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষায় এবং সাংগঠনিক ব্যাপারে বাংলাভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। এই প্রস্তাব গৃহীত হবে কি না বলা কঠিন। গৃহীত হলেও প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য হবে। তবু প্রস্তাবটি যখন উত্থাপিত হয়েছে তখন এর ভালোমন্দ ধীরভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ এক কথা; আর ভাষাপ্রীতি এবং ভাষাভীতির আতিশয্যে বাংলাভাষাকে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে একান্ত প্রাধান্যদানের চেষ্টা সম্পূর্ণ অন্য কথা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও আঞ্চলিক ভাষা কতদূর এবং কী পরিমাণ ব্যবহৃত হতে পারে, সে-প্রশ্নের মীমাংসা শুদ্ধ আমাদের ভাষাপ্রীতি দ্বারা হওয়া সঙ্গত নয়। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ পরিচয় বহুকালের; সেই অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং এমনকী, আমাদের মাতৃভাষাও পরিপুষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশ-রাজ বিদায় নিলেও ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে নি, ঘটবার কারণ নেই। ইংরেজী বিদেশী ভাষা হতে পারে, কিন্তু ইংরেজীর মাধ্যমেই আধুনিক ভারতবর্ষের ভাবমণ্ডল রচিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে আধুনিক ভারতের চিন্তাসম্পদ। এমন কী, এও বলা যেতে পারে যে, বিদেশী ভাষা হলেও কালের ধারায় ইংরেজী আমাদের অন্যতম ভারতীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর বদলে বাংলা অথবা অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা (রাষ্ট্রভাষার পদবীপ্রার্থী হিন্দীও প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক ভাষা) চালু করা হলে আমাদের ভাষাপ্রেম চরিতার্থ হতে পারে, কিন্তু চিন্তার দীনতা ও অস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান এবং বৃহৎ বিশ্বের ভাবধারার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অসম্ভব হবে ইংরেজীকে তার বর্তমান স্থান থেকে অধিকারচ্যুত করা হলে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় যে, ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম, বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইংরেজী-বিদ্বেষের উৎকট নিদর্শন অবশ
অন্য কোন কোন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যাল
থেকে ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে। ভারতে
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ে
উপাচার্যগণ এখনও ইংরেজীকেই উচ্চ
শিক্ষার বাহন রাখার পক্ষপাতী। ত
সত্ত্বেও উগ্র হিন্দীপ্রেমীরা বিহারে পাট
এবং রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী
জায়গায় আগাগোড়া হিন্দী-মাধ্য
প্রবর্তনের জন্য জিদ করছেন। মাদ্রাজে
বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে তামিল ভাষা
পঠন-পাঠনের মাধ্যম করার চেষ্টা চলছে
এর কারণ ঠিক তামিলপ্রীতির আতিশ
নয়। তামিলভাষীদের প্রবল আপ
রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী প্রবর্তনে
বিরুদ্ধে। হিন্দীর প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধে
মোক্ষম উপায় হিসেবে মাদ্রাজের শিক্ষ
ব্যবস্থাপকরা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়স্ত
আঞ্চলিক ভাষা তামিলের সর্বাত্ম
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে
নতুবা মাদ্রাজের শিক্ষিত সমাজে
ইংরেজীপ্রীতি বাঙ্গালীদের চাই
অনেক বেশী। অনুমান ক
হিন্দীর বিরুদ্ধে তামিলের পাল্টা দা
দাখিল করা ছাড়া মাদ্রাজের শিক্ষ
ব্যবস্থায় তামিল ভাষা ইংরেজী
বাস্তবিকই হটাতে অগ্রসর হয়নি।

"ইংরেজী হটাও" ধুয়োটা প্রধা
উৎকট হিন্দীপ্রেমীদের। বাঙ্গা
শিক্ষিতসমাজে সে ধুয়ো যে কথ
উচ্চারিত হবে অথবা উচ্চারিত হবে
জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে, এ
কল্পনা করা যায় না। তবুও ধুয়ে
উচ্চারিত হয়েছে এবং একেবারে বি
বিদ্যালয়ের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর শ
দেশে। "ইংরেজী হটাও" অভি
কোনও বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতী হি
ওয়ালাদের অনুকরণে উৎসাহী, এর
বিসদৃশ, অবাঞ্ছিত আর কিছু
পারে না। বাংলাভাষার উৎকর্ষবৃ
জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ
নানাভাবে চেষ্টিত হোন, ভাল ক
কিন্তু ইংরেজীকে হটিয়ে বাংলাকে
শিক্ষার একমাত্র বাহন করার প্র
বাংলাভাষীদের পক্ষেই সবচেয়ে ক্ষতি
উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর বদলে বা
সর্বাত্মক ব্যবহার প্রবর্তন করা
কেবল পঠন-পাঠনের মান আরও অ
হবে না, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শি
বাঙ্গালী আরও পিছু হটতে বাধ্য
ইংরেজীর ধারাবাহিক যোগসূত্র
করে বহুভাষী ভারতবর্ষে বাং
(অথবা হিন্দীভাষী কিংবা তামিল
কখনই আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম
পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেছে।
বিরোধী দল
'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া—'
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দিল্লিতে ভবিষ্যতের ভাবনায় প্রত্যেকেই শঙ্কিত। পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীই অচিরে শঙ্কা দূর করবে।
পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনে আয়ুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
সংবিধান
জবরদস্ত গেলানো!
পাকিস্তান
Kutty

বর্মায় শাসন-কর্তৃত্ব আবার সৈন্যদলের হাতে গেছে। ২রা মার্চ জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বে যে "ক্যু দে-তা" সংঘটিত হয়েছে তাতে বর্মায় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র শিকেয় উঠল—কতকালের জন্য বা চিরকালের জন্যই কিনা কে জানে। ১৯৫৮ সালে একবার জেনারেল নে উইন কর্তা হয়েছিলেন এবং আঠারো মাস সৈন্যদলের হাতে শাসনক্ষমতা ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে কোনো "ক্যু দে-তা" হয় নি, অন্তত বাহ্যত হয় নি। প্রধানমন্ত্রী উ নু নিজেই সামরিক কর্তাদের হাতে শাসনভার তুলে দেন এবং জেনারেল নে উইন প্রতিশ্রুতি দেন যে, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দূর হলেই কর্তৃত্ব বেসামরিক হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিঞ্চিৎ দেরীতে হলেও এই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হয়েছিল। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে আবার বে-সামরিক কর্তাদের হাতে শাসনভার এলো, কিন্তু দুবছরের বেশি রইল না। শাসনক্ষমতা আবার সামরিক কর্তাদের করায়ত্ত হলো।

এবারকার পরিবর্তন বে-সামরিক রাজনৈতিক নেতাদের অনুমোদন সাপেক্ষ হয় নি, সামরিক কর্তারা বেসামরিক গভর্নমেণ্টকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন, উ নু এবং আরো অনেক নেতাকে বন্দী করা হয়েছে যদিও সুখের বিষয় এই এসবই বিনা রক্তপাতে হয়েছে। ১৯৫৮ সালে যখন জেনারেল নে উইন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন কনস্টিটিউশান বাতিল করার কোনো কথা হয় নি, শাসন সামরিক কর্তাদের হাতে গেলেও পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে নি। এবারকার ব্যবস্থা অন্যরকম। দেশের বর্তমান সঙ্গীন অবস্থার সংশোধন হলেই বেসামরিক গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হবে—এই আশ্বাস অবশ্য এবারও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য রকম-সকম সম্পূর্ণ আলাদা। পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং যে কনস্টিটিউশান ছিল সেটা আর কোনোদিনই চালু হবে না, তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা যে আগেরবারের মতো নয় এবং পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদটা অনেকটা পাকাপাকি রকমের তার একটা প্রমাণ এই যে, এবার ক্ষমতা পরিচালিত হচ্ছে একটি "রেভল্যুশনরী কাউন্সিলের" নামে। এই "রেভল্যুশনরী কাউন্সিলে"র চেয়ারম্যান হচ্ছেন জেনারেল নে উইন। "রেভল্যুশনারী কাউন্সিল" যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে ক্ষমতা সহজে বা শীঘ্র প্রত্যর্পিত হয় না

এবং পুরাতন কনস্টিট্যুশান প্রত্যাবর্তনের আশাও থাকে না।

নানাদিক থেকে ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলা ঠেকাতে পারছেন না দেখেই ১৯৫৮ সালে উ-নু জেনারেল নে উইন এবং সৈন্যদলের হাতে শাসনভার ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর থেকে বর্মায় অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফ্রিডম লীগ দলের হাতেই শাসনকর্তৃত্ব ছিল। এই দলের একতা যদি নষ্ট না হোত তাহলে ১৯৫৮ সালে উ নুকে সৈন্যদলের উপর শাসন চালাবার ভার দিতে হোত না। কিন্তু ১৯৬০ সালে আবার যখন বে-সামরিক মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হলো তখন থেকে উ নু-র অন্তর্দলীয় ঝঞ্ঝাট তেমন কিছু ছিল বলে তো শুনা যায়নি। কারণ ইতিমধ্যে উ নু "ইউনিয়ন পার্টি" গঠন করেছেন এবং সেই পার্টি সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। অ্যান্টি ফাসিস্ট-ফ্রিডম লীগ দল পার্লামেন্টে বিরোধী দলের স্থান নেয়। ইউনিয়ন পার্টির মধ্যে এমন কোনো গোলমালের কথা শুনা যায় নি, যার ফলে পার্লামেন্টে গভর্নমেন্টের অবস্থা বিপন্ন হয়েছিল এরূপ মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু দেশের অবস্থা যে বিশেষ ভালোর দিকে যাচ্ছিল না এটা অবশ্য সত্য। কিন্তু সৈন্যদলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াই তার সংশোধনের উপায় এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ নয়। আঠারো মাস শাসনক্ষমতা সৈন্যদলের হাতে ছিল, এমন কি সৈন্যবিভাগের হাতে গিয়েছিল এমন অনেক কাজ যেগুলি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবার পরেও উ নু সৈন্যদলের হাতেই ছেড়ে রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, সৈন্যদলের দ্বারা ক্ষমতা পরিচালনার ফলে বর্মার মূলে সমস্যাগুলির কোনটার সমাধান হয়েছে অথবা সমাধানের কাছাকাছি গিয়েছে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা বিশৃংখলার উপশম অবশ্যই হয়েছে। যদি দেখা যেত যে, সৈন্যদলের কর্তৃত্ব পরিচালনার ফলে অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাহলে হয়ত লোকেরাই চাইত যে সৈন্যদলের হাতে শাসনক্ষমতা আরও কিছুকাল থাক। কিন্তু লোকেদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায় নি। আঠারো মাসের পরে সৈন্যদলের শাসন হয়ত বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল না এবং সাধারণ লোকের কাছে তার পুনঃপ্রবর্তনও হয়ত তেমন আনন্দদায়ক নয়। সৈন্যদলের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার কারণ হিসাবে "রেভলুশনারী কাউন্সিলের" পক্ষ থেকে যে-সব কথা বলা হয়েছে সেগুলি পর্যাপ্ত বলে মনে হয় না।

সাধারণভাবে দেশের অবস্থার সংশোধন করার কথা ছাড়া "রেভলুশনারী কাউন্সিল" একটি গুরুতর রাজনৈতিক কারণের উল্লেখ করেছেন। শান এবং অন্যান্য উপজাতীয় নেতাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিতে উ নু সরকার নাকি সম্মত হয়েছিলেন। কনস্টিট্যুশনে "ফেডারেল" ভাবের এই বৃদ্ধির আশংকা নির্মূল করতে চান বলে সামরিক কর্তারা নু সরকারকে সরিয়েছেন। উ নু-র সংগে যাঁরা বন্দী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক শান নেতা আছেন। সৈন্যদলের মত এই যে, "ফেডারেল"-ভাব বাড়তে দিলে বর্মার রাষ্ট্রিক ঐক্য বিনষ্ট হবে, যেমন করে হোক শাসনতন্ত্রের "ইউনিটারি" ভাবের প্রাধান্য রক্ষা করতে হবে। বর্মার বিভিন্ন অংশ এবং বিভিন্ন উপজাতিকে একসূত্রে বেঁধে রাখার পক্ষে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রসার অথবা সংকোচন আবশ্যক, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কারো কারো মতে বর্মার মধ্যে নানা আকারে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে তার উপশমের জন্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের নীতি আরো উদারতরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আলগা দিলে কোনো কোনো অঞ্চলকে শেষপর্যন্ত কেন্দ্রের সংগে বেঁধে রাখা যাবে না, দেশটাই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্যও "ইউনিটারী" গভর্নমেন্টের আবশ্যকতা আছে।

যাই হোক কেবল দেশের ঐক্য নাশের আশংকায় বিচলিত হয়েই জেনারেল নে উইন এবং তাঁর "রেভলুশনারী কাউন্সিলের" সহকর্মীরা বেসামরিক গভর্নমেন্টকে পদচ্যুত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়েছেন, এরূপ মনে করলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। এই ঘটনার পিছনে আরো কারণ নিশ্চয়ই আছে, যদিও সেগুলি কী তা এখনো সব পরিষ্কার ভাবে জানা কঠিন। নানা রকম কথা শুনা যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলির কোনটা কতখানি সত্য, কোনটা আন্দাজ মাত্র, তা নির্ণয় করতে সময় লাগবে। কেউ কেউ বলছেন যে, ১৯৬০ সালে যখন সৈন্যদল কর্তৃক ক্ষমতা প্রত্যর্পিত হয় তখন সেটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই হয়েছিল এবং তখন থেকেই আবার ক্ষমতা নেওয়ার জন্য জেনারেল নে উইনের উপর সৈন্যদলের ভিতর থেকে চাপ দেওয়া চলছিল অর্থাৎ সৈন্যদল একবার ক্ষমতা পরিচালনার স্বাদ পেয়ে সেটা ভুলতে পারছিল না এবং শেষপর্যন্ত বেসামরিক হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারে নি। আবার শুনা যাচ্ছে যে উ নু বৌদ্ধধর্মকে বর্মার রাষ্ট্রীয় ধর্ম—স্টেট্ রিলিজান করেছেন বলে নাকি সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ সৈন্যদলের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়। এসব কারণ কোনটা কতটা কাজ করেছে বলা কঠিন।

"রেভলুশনারী কাউন্সিলের" পক্ষ থেকে বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে যে-কথা বলা হয়েছে, তাতে বৈদেশিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন করার অভিপ্রায় নূতন গভর্নমেন্টের নেই। শান্তির আগ্রহ, সকল দেশের প্রতি মৈত্রীর ভাব, কোনো ব্লকের সংগে যুক্ত না হয়ে "অ্যাকটিব্ নিউট্র্যালিটি" পালন, কোনো বিদেশী সামরিক সাহায্য না নেওয়া, রাজনৈতিক বন্ধনবিহীন অসামরিক বিদেশী সাহায্য নিতে অনাপত্তি ইত্যাদি বর্মার আগে যে-নীতি ছিল "রেভলুশনারী কাউন্সিলও" সেই নীতি অনুসরণ করবেন। এই ঘোষণা সত্ত্বেও অবশ্য কেউ কেউ মনে করছেন যে, নীতির কাঠামোটা এক থাকলেও তার রূপে বা ভংগীতে কিছু অদল-বদল দেখা যাবে।

১৩।৩।৬২

অন্যমনস্ক

বাতায়নিক

হই চই কিছু হয়নি। সংবাদপত্রেও খবরটা ওঠেনি। কিন্তু গত ১৯শে ফাল্গুন, শনিবার আমাদের একদিকে অবসন্ন অসাড় আর একদিকে অস্থির নির্বিকার এই শহর একবার না একবার উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে চমকে উঠে নিজের দিকে চেয়ে দেখেছে নিশ্চয়।

চমকটা খুব জোরালো হয়ত নয়। কয়েক মুহূর্ত বাদেই তা হয়ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ওপরে সবকিছু ছাপিয়ে না থাকলেও মনের নেপথ্যে সে চমকের রেশ সারাদিন থেকে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

এই ধুলো ধোঁয়ায় নোংরা অপরিচ্ছন্ন, চারিদিকের অসংখ্য কোলাহলে উদ্ভ্রান্ত শহরে সেদিন হঠাৎ একটি মৃদু চমক যাঁদের লেগেছিল আমি তাঁদের একজন। সকালে রাস্তায় বেরিয়ে মনটা নাড়া খেয়ে উঠলেও তার কারণটা তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করতে পারিনি। শুধু মনে হয়েছিল কোথায় যেন কি একটা আশ্চর্য কিছু ঘটে গিয়ে আমার সব চিন্তা ভাবনার রংই বদলে দিয়েছে। এক একদিন বহুদূর থেকে সানাই-এর সুর শব্দ-সুরভিত বাতাসে ভেসে এসে মনটাকে এইরকম করে দেয় বুঝি।

১৯শে ফাল্গুনের সাড়াটা কিন্তু ধ্বনির রাজ্য থেকে নয়, রঙের জগৎ থেকে। কানের ভেতর দিয়ে নয় চোখের ভেতর দিয়ে তার স্পর্শ এসে পৌঁছোল ঈষৎ বিহ্বল বিস্মিত মনে।

ব্যাপারটা স্থূলে গদ্যে বললে এই মাত্র—শহরের দেবদারু গাছগুলোর নতুন পাতা গজিয়েছে।

কিন্তু স্থূল গদ্য ছেড়ে সূক্ষ্ম পেলব পদ্যেও সেই পাতা গজানোর মৃদু বিস্ময় সম্পূর্ণ কি বোঝানো যায়?

ট্রামে বাসে গাড়িতে ট্যাক্সিতে বা পদব্রজে এই শহরে নিত্য ঘোরাফেরার মধ্যে, রাস্তার ধারের যে গাছগুলি সদাশয় পৌরকর্তারা নেহাৎ রেওয়াজ মাফিক বসাবার ব্যবস্থা করেছেন, সেগুলির দিকে কচিৎ কদাচিৎ আমাদের দৃষ্টি পড়ে কিনা সন্দেহ। ধুতির পাড়ের বেলা যেমন তেমনি ওগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতনই থাকি না। (শাড়ীর পাড়ের উপমা কিন্তু দিচ্ছি না।)

তারপর একদিন আমাদের ক্লান্ত ঔদাসীন্য ভেদ করে তাদের স্নিগ্ধ সম্ভাষণ মনে এসে পৌঁছোয়।

হঠাৎ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে, লোভ আর দম্ভের নিষ্প্রাণ ষড়যন্ত্রে ইটকাঠ লোহাপাথরের বেড়ায় যতই আমরা নিজেদের ঘিরে রাখবার চেষ্টা করি না কেন, ওই দেবদারু গাছগুলির মত আমাদের প্রাণ নিজের অগোচরে আর এক আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে ব্যাকুল।

ঠিক একই দিনে এক সঙ্গে সমস্ত দেবদারু গাছগুলির নবপল্লবের শিহরণ হয়ত ওঠেনি। কিছু আগে পিছে হয়ত তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সমবেত উচ্ছ্বাস আমাদের গোচর হয়ে উঠল ওই তারিখটিতে।

নির্বাচনের হিড়িকে সমস্ত শহর পোস্টার প্যাম্ফলেট পতাকায় ছেয়ে যেতে ত দেখলাম। সেই সাময়িক উত্তেজনার ছিন্ন স্মৃতি অনাবশ্যক আবর্জনা হয়ে আজও নগরের পথঘাট দেয়াল শ্রীহীন করে রেখেছে।

জোর করে ফেনিয়ে তোলা সে মত্ততার দিনগুলি যদি মনে রাখবার মত হয়, তাহলে সমস্ত শহরের ওপর বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দে মেলান একটি স্নিগ্ধ আবেশ যেদিন ছড়িয়ে গেল সেই তারিখটিও স্মরণীয় হবে না কেন?

আমাদের এই কলকাতা শহরে শুধু দেবদারু নয় আরো অনেক জাতের গাছই আছে। দেশদেশান্তর এমন কি সাগর পার থেকে সে সব গাছ বহু যত্নে আমদানি করা হয়েছে। কত জাতের গাছ যে আমাদের রাস্তাঘাটে স্নিগ্ধ সাহচর্য দেয় তার একটা তালিকা করতে গেলে বর্তমান জগতে গাছেদের আন্তর্জাতিক নাগরিকতার অনেক মজার খবর পাওয়া যাবে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি দেবদারুর প্রথম মৃদু সম্ভাষণ পেয়েছি, তারপর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপের দিন পর্যন্তও আরও বহু গাছের বিচিত্র নানা সম্ভাষণ পাওয়া যাবে। তাদের কেউ অচেনা মঞ্জরীর বর্ণবিস্ময়ে আমাদের উদাস বিহ্বল করতে চাইবে, কেউ চমকিত করতে চাইবে রঙীন চীৎকারের উল্লাসে।

ক্ষণেকের জন্যেও সচকিত চাঞ্চল্য এনে শহরের যান্ত্রিক মুষ্টি আমাদের মনের ওপর থেকে শিথিল করাই এইসব বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য ভাবতে ইচ্ছে করে। নিজেদের অগোচরেও এমনি একটি বাসনা নগর-বিন্যাসের মধ্যে হয়ত সর্বত্র প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আর একদিক দিয়ে মনে হয় এ যেন আমাদের নিরুপায় বন্দীত্ব মুক্তির ছলনায় মধুর সরবার চেষ্টা। চিড়িয়াখানার লোহার খাঁচা উঠিয়ে দিয়ে নিরীহ বা হিংস্র সব প্রাণীকে কতকটা স্বাভাবিক পরিবেশে রাখবার যেমন ব্যবস্থা হয়।

ছেলেবেলা শহর ও গ্রামের তুলনামূলক প্রবন্ধ আমাদের কাকে না লিখতে হয়েছে। শহরের তুড়ে নিন্দে করে' গ্রামের নামে যত গদগদ হয়েছি, পরীক্ষায় নম্বরও আশা করেছি তত বেশী উঠবে।

শহর যেমনই হোক, গ্রাম তখন আহা মরি কিছু নয়। পচা ডোবা, পানাপুকুর, ঝোপ ঝাড়, মশা ম্যালেরিয়ায় গ্রামের তখন অনেক দুর্দশা। কিন্তু মনের মোহ সে সব অপ্রীতিকর সত্য স্বীকার করতে দেয় নি।

গ্রাম ও শহর দুই-ই তারপর অনেক বদেলেছে ও বদলাচ্ছে। গ্রাম সম্বন্ধে ছেলেবেলায় সে ভাবালুতার ঘোর এখনও কাটবার কোন কারণ না ঘটলেও শহরের দানবীয় কলেবর বৃদ্ধির বেগে ও বিশৃঙ্খলায় কেউ কেউ শঙ্কিত হয়ে উঠেছি বোধ হয়। শঙ্কিত হলেও নিরুপায় হয়ে বর্তমান যুগের একটা অপ্রতিরোধ্য শাস্তি হিসেবে শহরকে যাঁরা মেনে নিয়েছেন তাঁরা হয়ত ভাবীকালের দুর্দশায় এ যুগের সান্ত্বনা খুঁজে মনকে এই বলে প্রবোধ দেন যে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যখন পঙ্গপালের মত বাড়বেই তখন যেটুকু সুখ-সুবিধা তাঁরা পেয়ে গেলেন ক্রমবর্ধমান মানুষের ভিড়ের ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসিতে সেটুকুও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল বলে। একজন সংখ্যাতাত্ত্বিক ত হিসেব কষে দেখিয়েই দিয়েছেন যে, এই হারে বাড়তে থাকলে একশ বছর পার না হতেই মানুষের সত্যি সত্যি আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না পৃথিবীতে। গ্রহান্তরে উপনিবেশ ততদিনে সম্ভব হবে কিনা জানি না, কিন্তু ডাঙার মাটি থেকে ঠেলা খেয়ে জলের ওপর ভাসানো ডেরা বেঁধেও মানুষ কুল পাবে না। জলে ডেরা বাঁধার মহড়া অবশ্য মানবজাতির হয়ে চীন অনেক আগে থাকতেই দিয়ে রেখেছে। সেখানে এমন অনেক পরিবার আছে বংশপরম্পরায় নৌকোই যাদের একমাত্র আশ্রয়। জন্ম মৃত্যু প্রেমের লীলা তাদের জলের ওপর ভেসেই চলে আসছে। এই অবস্থা হলে বিস্ময় রাবণের গুষ্ঠির অন্ন যোগাবার যত ফন্দিই বিজ্ঞান বার করুক নুন আনতে পান্তা ফুরোবে বলেই সন্দেহ হয়। মাটির চাষ এখনই সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছেছে। তখন ডাঙার ঘাস পাতা ঝোপঝাড় আগাছা ত বটেই, জলেরও পানা শ্যাওলা নল খাগড়া, আলজি কেল্প প্ল্যাঙ্কটন কিছুই ফেলনা হবে না। বিজ্ঞানের কড়ায় সব কিছুর ঘণ্ট বানিয়ে তা থেকে খাদ্যসার ছেঁকে নকল খাবার তৈরী হবে। নকল ক্লোরোফিল এর মধ্যেই তৈরী হয়েছে। আণবিক গড়নপেটনে আসলের সঙ্গে হুবহু মিল থাকলেও শুধু সোনার কাঠির ছোঁয়াটুকুর অভাবে তা এখনো অসাড়। ততদিনে নকল ক্লোরোফিল-এ সাড়া জাগাতে শিখে ধু ধু মরুতেও বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিদের কাজ বকরুপে সেরে জল হাওয়া রোদ থেকে খাদ্যমূল শ্বেতসার উৎপাদন করে তুলবেন। সমস্ত পৃথিবীময় মানুষের জগৎ অতিকায় উইঢিবি কি মৌচাকের মত নিরুপায় ঘনিষ্ঠতা ও নিরবকাশ ব্যস্ততার একটা নিরেট কারাদুর্গ হয়ে উঠবে। কিন্তু সেকালের সবাই এ জীবনকে অসহ্য শাস্তি মনে করবে কি? বোধ হয় না! মানুষ শুধু সবকিছু সইবার শক্তিতে মহাশয় নয়, তার মানিয়ে নেবার ও মেনে নেবার ক্ষমতা যে কি অসীম তা সে নিজেও ভালো করে জানে না। সবটাই শুধু ছাঁচে ঢালার ব্যাপার। মনটা গোড়াতে কি ছাঁচে ঢালা হয়েছে, কি পরিবেশের ছাপ তাতে পড়েছে তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করে,—আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা উদ্দীপনা। একাল থেকে সেকালের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার লোক যেমন চিরকাল থাকবে তেমনি পরম পরিতৃপ্ত থাকবারও। দীর্ঘশ্বাস তারাই ফেলে যারা একাল ওকাল দুই-এর কোনটারই ছাঁচে পুরো ঢালাই না হতে পেরে না ঘরকা না ঘাটকা।

শুধু প্রগতিবিরোধিতা বা রক্ষণশীল গোঁড়ামির প্ররোচনায় নয় যা মহৎ যা মধুর যা কল্যাণময় শুধু ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের নেশায় তা হেলায় ফেলে যাওয়ার মূঢ়তা ঠেকাবার আগ্রহে যুগে যুগে অনেক সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ নিরর্থক পরিবর্তনের স্রোতের বিরুদ্ধে সাহস করে অবশ্য দাঁড়িয়েছেন। এগিয়ে যাবার বদলে পিছিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতেও প্রয়োজন হ'লে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। চীনের আদি দার্শনিক লাওৎসে নাকি ডাঙার গরুর গাড়ি আর জলের নৌকোও বাতিল করতে চেয়েছিলেন জন-পদের সঙ্গে জনপদের যোগাযোগ দুঃসাধ্য করে তুলতে। আধুনিক সভ্যতার বেগমত্ত মন নিয়ে লাওৎসের যুক্তি আমরা সত্যিই বুঝতে অক্ষম। যন্ত্রযুগের দুর্বার গতির সামনে আরও যাঁরা বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের অনেকের উৎসাহ ত আমাদের করুণামিশ্রিত কৌতুকই জাগায়। যেমন ইংলণ্ডে প্রথম রেলগাড়ি চালাবার সময় মাঠের গরু ভড়কে যাবে বলে যাঁরা পার্লামেণ্টে পর্যন্ত চড়াও হয়েছিলেন আজকের দুনিয়ার চেহারা দেখলে তাঁদের কি দশা হত ভেবে না হেসে পারা যায় না। না এটুকু বুঝে নিয়েছি যে উচিত অনুচিত কোন যুক্তি দিয়েই, সত্য বা ভ্রান্ত কোনো আদর্শের নামে যুঝেও পরিবর্তনের বন্যাবেগ ঠেকানো যাবে না, সব সময়ে সুস্থ প্রগতি তাকে বলি বা না বলি। সভ্যতার নিত্য স্ফীতি-শীল অস্থির গতিপথের পাশে কিছু দীর্ঘ-শ্বাস যদি ছড়িয়ে থাকে ত থাকুক। ইতি-হাসের রথচক্র তাতে থামবে না।

সে রথচক্র দুর্বার বেগে অজানা

ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলুক। তার সঙ্গে তাল রেখে বাসে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে কি পদব্রজে সরবী মোটরের ধাক্কা এড়াতে এড়াতে আমরা নগরের পথে নবপল্লবভূষিতা দেবদারুর বাৎসরিক প্রথম সলজ্জ সম্ভাষণ বারেক যে এখনো পাই তাতেই কৃতার্থ।

দেশের ভাগ্য যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের কেউ কেউ নাকি সেদিন সমুদ্রতীরের বিশ্রামাগারে বসে অবসর যাপনের জন্যে তাস খেলেছেন।

সংবাদটা চাঞ্চল্যকর সন্দেহ নেই। চাঞ্চল্যটা কোথায় কি রকম হয়েছে তার সঠিক খবর রাখি না। জানি না এই তাস খেলাকে উপলক্ষ্য করে' ইতিহাসের কোন কুখ্যাত বেহালাবাদককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জ্বালাময়ী ভাষার লাভাস্রোত কেউ কোথাও বইয়ে দিয়েছেন কি না।

দিয়ে থাকলে খুব বিস্মিত হব না। কারণ সোজা জিনিস উল্টো করে দেখবার, খণ্ডদৃষ্টিতে সমগ্রতার বিকৃত বিচার করতে আমাদের জুড়ি নেই।

সংবাদটা কারুর কারুর কাছে কিন্তু অন্য অর্থে চাঞ্চল্যকর। নিষ্প্রাণ পাথরের দেয়ালে হঠাৎ প্রাণের শিকড়ের ফাটল আবিষ্কার করার মত।

রাজশক্তি যাঁদের হাতে তাঁরা তুচ্ছ তাস নিয়ে মত্ত হতে পারেন, এ খবরে শঙ্কিত হওয়ার বদলে বিশেষ আশ্বস্ত হবার কিছু আছে বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। আশ্বস্ত এই জন্যে যে, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিছুকালের জন্যে যাঁরা হয়েছেন এই সামান্য তাস খেলার ভেতর দিয়ে আমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের একটা মানবিক সম্বন্ধের সূত্র খুঁজে পাচ্ছি। দেশের পরিচালনায় এই মানবিক সম্বন্ধটুকুর দাম সবচেয়ে বেশী। কারণ এ সম্বন্ধটুকু থাকলে পরিচালনায় ভুলত্রুটি যাই হোক তা অন্তত অমানুষিক হবে না এই ভরসা একটু থাকে বোধ হয়। তাস যে খেলার বস্তু তা শিখলে তা দিয়ে তাসের ঘর বানাবার চেষ্টা অন্তত না হতে পারে।

রাজদণ্ড বস্তুটি বড় কঠিন অভিশাপে জড়ানো। সে দণ্ড ধরে থাকার অভ্যাস হাতের মুষ্টিকে এমন এক অনমনীয়তায় জমাট করে দেয় যে তা প্রীতির স্পর্শ নিতেও আর সহজে খুলতে চায় না। তাসের মত হাল্কা ক্ষীণ জিনিস নাড়াচাড়া করতে সে হাতের খিল কিছুটা নিশ্চয় ছাড়তে বাধ্য।

তাছাড়া তীরকে লক্ষ্যভেদের দুরন্ত বেগ যা দেয় সে ধনুকের ছিলা সব সময় টান করে বেঁধে রাখবার নয়, তাকে টংকার বাগ করে তোলবার জন্যেই মাঝে মাঝে শিথিল হ'তে দিতে হয়।'

ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

১৩ই মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় লিখিত "ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা" প্রবন্ধটি পাঠে খুশী হয়েছি। কিন্তু ঐ প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীসুধা দাশের চিঠি পড়ে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তিনি ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা একরকম অস্বীকার করেছেন। সমাজজীবনের উপর দিয়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দাম স্রোত বয়ে চলেছে তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট কম বলেই যেমন একদিকে সুযোগ ঘটেছে সরকার পক্ষের ঢিলেমি প্রদর্শনের, তেমনি অন্যদিকে সমাজ-বিরোধীরা উৎসাহ পাচ্ছে তাঁদের নোংরা কাজে।

শ্রী মুখোপাধ্যায় বর্তমান অবস্থার যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু কারণগুলি তিনি ব্যক্ত করেননি। অনেকেই মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি সম্পত্তি হস্তান্তরের মতো অতি সহজেই নিষ্পন্ন হয়েছে বলেই সমাজ-জীবনে কোন বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটেনি। স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন হয়েছে, সেই সঙ্গে আর একটি কাজ হয়নি অর্থাৎ লোকের চিন্তা জগতে পরিবর্তন। আত্মোন্নতি এবং নৈতিক জ্ঞানলাভের উপযুক্ত শিক্ষামূলক প্রস্তুতির কাজ অসমাপ্ত রাখতে হয়েছে। যেটুকু দেশপ্রেমের সৃষ্টি হয়েছিল তা শুধু বিদেশী শক্তি অপসারণের ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়েছে। যে নৈতিক এবং মানবিকবোধ নতুন সমাজ গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল তা দেশের লোকের মধ্যে দানা বাঁধতে পারেনি। ফলে একাধিক দেশপ্রেমের বন্যার পরেও দেশের মাটিতে ভালো ফসল ফলেনি। স্বাধীনতা এসেছে, মালিন্য ঘোচেনি। পুরনো সমাজবিরোধী মনোবৃত্তিগুলো বরং বিদায় না নিয়ে স্বাধীন আবহাওয়ায় আরও পরিপুষ্ট হয়েছে।

দুর্নীতি নিবারণে সরকারী গাফিলতি এবং ঔদাসীন্য আজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অর্থের লোভ, পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক প্রতিপত্তির জন্যে অন্যায়ের আশ্রয়, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্যে নানা অপকৌশল অবলম্বন এখনকার কালে কোন দুর্নীতির আওতায় আর পড়ে না। এর প্রশ্রয় এবং ব্যাপকতার জন্যে আমাদের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এইসব কাজকে ঘৃণা করেন তাঁরা প্রতিবিধানের জন্যে কোনদিনও ভাবেননি। রাজনৈতিক দলগুলির সংগে এক সুরে চীৎকার করে সমস্ত দায়িত্ব সরকারের কাঁধে চাপিয়েছেন। সরকার নির্বিকার, উদাসীন এবং অক্ষম। আমরা নিজেরাও কি তাই নই?

ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কীয় আলোচনায় রাষ্ট্রপরিচালকদের দায়িত্বের কথা লেখকের স্মরণ করা উচিত ছিল। উপরতলার গলদের অসংখ্য দৃষ্টান্ত যখন প্রতিদিন কাগজের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিক্রিয়া সাধারণ লোকের মনে কি রকম হতে পারে তা ভাবা উচিত। সরকার পক্ষ যদি দৃঢ়ভাবে প্রশাসনিক দুর্নীতি অপসারণে প্রয়াসী হতো তবে নিশ্চয়ই দেশের লোকের মধ্যে চাঞ্চল্য আসত। যে কোন কারণেই হোক আজ পর্যন্ত তা হয়নি এবং হবার আশাও কম। এর ফলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি অসাধু লোকের সংখ্যাও ঊর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলেছে।

আইন করে কোটি কোটি লোকের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ভয় দেখিয়েও নীতিজ্ঞান রাতারাতি ফিরিয়ে আনা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা। সোভিয়েট অথবা চীনের দণ্ডনীতি গণ-তন্ত্রের দেশে অচল। বর্তমান সরকারের পরিবর্তে অন্য কোন দলীয় সরকার অধিষ্ঠিত হলেও দুর্নীতির মহামারী ঠেকানো যাবে না, কারণ সে সরকারকেও যাঁদের উপর নির্ভর করে শাসন চালাতে হবে তাঁদের মধ্যেই তো দুর্নীতির বাসা। অতএব একমাত্র রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় এই দুরূহ ঐতিহাসিক কাজটি সুসম্পন্ন হতে পারে ধীরে ধীরে। সরকারকেও দৃঢ় হতে হবে এবং জন-সাধারণের যে অংশ আজও বর্তমান সমাজ ও রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্ত এবং দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে চিন্তা করতে অভ্যস্ত তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি একমত যে, ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতাই বর্তমান অবস্থার জন্যে অনেকখানি দায়ী। রেল, আদালত, পোস্ট অফিস, প্রভৃতি সরকারী এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কর্মীরা যদি তাঁদের স্বকীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করায় উদ্যোগী হন তবে নিশ্চয়ই অনেকখানি কাজ হতে পারে। অকারণ হয়রানি এবং ঘুষ প্রথা বন্ধ করার কাজে সরকারী এবং বেসরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলির সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারেও আমরা ছাত্র-কল্যাণের জন্যে শিক্ষকদের কাছ থেকে সহযোগিতার কথা শুনি না। ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা তাঁদের অবহেলায় যদি গোল্লায় যায় তাতে দোষ নেই। আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে অনায়াসেই বর্তমান শিক্ষক-ছাত্র সমস্যা তাঁরা সমাধান করে দিয়েছেন। সরকারের বিরুদ্ধে নানা ব্যাপারে লড়াইয়ে যতটা তাঁরা আগ্রহান্বিত, তার একাংশ আগ্রহ প্রকৃত শিক্ষাদানের ব্যাপারে নেই। এ ধরনের উক্তি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অনেককেই আজ করতে হয়। ইতি—

প্রবোধ ভট্টাচার্য
কলিকাতা।

[এ-সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। সঃ দেশ]

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৪৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

দূর থেকে চিকিৎসা করা শক্ত। আন্দাজে যেটুকু বলা যায় সে হচ্চে এইঃ—পেটের বেদনার জন্যে Mag. Phos। অজীর্ণ প্রভৃতির জন্য Kali Mur ও Natrum Phos (অম্লর লক্ষণ থাকলে)। পেটে যদি Ulcer আশংকা করো তবে Silicia। জ্বর যদি থাকে তবে Fer Phos ও Kali Sulf. Mag Phos কলিক ব্যথায় ঘন ঘন প্রযোজ্য—acute অবস্থায় ১৫।২০ মিনিট অন্তরও চলে। Kali Mur ও Natrum Phos একসঙ্গে মিশিয়ে দিলে ক্ষতি নেই।

আমার দেহের অভ্যন্তরে কোনো বিশেষ অসুখ নেই, বাইরে আছে ভিজিটর। জ্ঞান গুপ্ত সস্ত্রীক কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন, এদিকে বউমা শয্যাগত—পুপু বেচারা হয়রান হয়ে গেল। '——' আছেন তাঁর নূতন পুত্রবধূ সমেত। শীতের সময় চরে যেমন হাঁসের ভিড় হয় আশ্রমে তেমনি জমে অতিথি। হাঁসরা আপনি চরে, অতিথিদের চরাতে হয় ভাঁড়ার খুলে দিয়ে, অথচ অন্নপূর্ণা আজকাল ঘরের চৌকাট মাড়াচ্ছেন না, লেলিয়ে দিচ্ছেন অন্ন খাইয়েদের এ-সমস্ত শনিগ্রহের কাজ। ৩।১২।৩৮

কবি

॥ ৪৫০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পড়ে দুটি কারণে আমার মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হয়েছে। ১ম, তোমার ধারণা হয়েচে আমার চিকিৎসা-প্রণালী তুমি আয়ত্ত করেছ। তাতে রোগীদের অবস্থা কী হবে সে-কথা আমি চিন্তা করিনে—কিন্তু আমার সঙ্গে মোলাকাতের একটা পথ ছিল সেটা বন্ধ হোলো।

২য়, কে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে আমার এখন শরীর ভালো। অতএব আমার সম্বন্ধে একটুখানি চিন্তা করবার সুযোগটাও ঘটবে না। চেষ্টা করব শরীর খারাপ করতে—এমনি আমার অদৃষ্ট, চার দিকেই কাশি সর্দিজ্বর, সুস্থ কেবল আমিই থাকি—শরীরটার উপরে [illegible] জমে গেছে। ইতি ৭।১২।৩৮

কবি

॥ ৪৫১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, স্বপ্নে আমাকে কেন তুমি অল্প বয়সের দেখেছিলে তার কারণ তোমাকে বলি। সম্প্রতি বউমা স্থির করেছিল মায়ার খেলার নৃত্যাভিনয় করতে হবে। তাই তার পুনঃসংস্কারে লেগেছি, যেখানে তার অভাব ছিল পূরণ করচি, কাঁচা ছিল শোধন করচি—গানের পরে গান লেখা চলচে এক-একদিনে চরটে পাঁচটা। যৌবনের তরঙ্গে মন দোদুল্যমান—জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গানের সুরে যে রকম সৃষ্টির বদল করে দেয় এমন আর কিছুতে নয়। ঘোর শীতের সময় আমার তরুণ জন্ম রাগিণী লোকে অতীতের সমুদ্রপার থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বসন্তের দুর্দান্ত হাওয়া—মনের মধ্যে কূজন চলচে, গুঞ্জন চলচে—যে সব লোক বাইরে থেকে কাজের বা অকাজের হাওয়া নিয়ে আসে তাদের মনে হয় বিদেশী লোক—কেননা তাদের মধ্যে সুরের স্পর্শ একটুও নেই। শব-সাধনায় উত্তরসাধক থাকা চাই, স্বর-সাধনায় চাই উত্তরসাধিকা—কিন্তু মন্দ ভাগ্য আমি—কে কোথায়। তাই স্বপ্নের সহায়তায় কাজ চালাচ্চি। আজ সকালে কলাভবনে হ্যাভেলের স্মৃতিমন্দির উদ্ঘাটন করতে এসেচেন পাটনার পি আর দাস—আমার মায়ার খেলার মধ্যে তাঁকে স্থান দেওয়া অসম্ভব—অতএব এই সকালে যবনিকা পড়ল—দূর থেকে আমার সিদ্ধি কামনা কোরো। ইতি ১১।১২।৩৮

কবি

॥ ৪৫২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রানী, দুতিনদিন থেকে ভাবছিলুম তোমাকে চিঠি লিখব, সময় পাচ্ছিলুম না। আজ যখন নিশ্চয় ঠিক করে ছিলুম এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম।

নাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় যাব না ঠিক করেছিলু, এমন সময় আমার কর্মস্থানের গ্রহ আমার ঘাড়ে একটা কর্ত[illegible] চাপিয়ে দিল। সেই উপলক্ষ্যে যেতেই হবে।

আমার অবস্থা অনেকদিন তুমি জান না। আমার দেহে শক্তি আগের চেয়ে অনেক বেশি অচল হয়েছে। দু পা চলে হাঁপিয়ে পড়ি। সেই জন্যেই নড়তে ইচ্ছে ছিল না। ৩ থেকে প্রায় দশদিন আমার কাজের পালা। সেই দায় নি[illegible] থাকতে হবে জোড়াসাঁকোয়। বেলঘরিয়া থেকে প্রতিদিন যাও[illegible] আসা দুঃসাধ্য হবে।

যদি ভাব আমার কিম্বা আমাদের মনে বেলঘরিয়ার রো[illegible] জননতা নিয়ে আশংকা আছে তাহলে ভুল করবে। কিছু[illegible] নেই। তোমার ওখানে থাকলে আমি ভালোই থাকব আমিও জানি সকলেই জানে। কিন্তু দু জায়গায় টানাহেঁ[illegible] করার মতো দেহ আমার নেই। তাই স্থির করেছি কা[illegible]

পালা শেষ হলে কিছুদিন তোমার আশ্রয়ে থেকে তার পরে শান্তিনিকেতনে আসব বসন্ত যাপন করতে। চারিদিকে আমের বোল ধরেছে অজস্র। শীতের পুষ্পোৎসবের বিদায়ের শেষ আসর জমাবার জন্যে এখনো রয়ে গেছে হিমঝুরি আর সজনের মঞ্জরী। ওদিকে একটি দুটি পলাশের কুঁড়ি উঁকি মারচে।

তোমার বেলঘরিয়াতে বসন্তের আহ্বান চাপা দিয়েছে যন্ত্রদানবের শৃঙ্গধ্বনি—সে আহ্বান একেবারে কোথাও নেই তা বলব না। ইতি ২৫।১।৩৯

কবি

॥ ৪৫৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় যাওয়া ঘটল না—শরীরটা হোলো বাদী। সাধারণত ভাঙা শরীরকে দয়া করিবে, কিন্তু তার ভাঙনের উপসর্গ অন্যদের উপর পড়ে তাই অন্তত অন্যদের প্রতি দয়া রাখা দরকার। এখন আমার পক্ষে অন্যান্য সব ঠিকানা বাদ দিয়ে বাকি রইল এই আরামকেদারাখানা। বোলপুর বেলঘরিয়ার মাঝখানে দূত রইলেন ডাকঘর। অভিনয়ের দল কাজ শুরু করবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—দেখতে পাবে তাদের নাট্যনৈপুণ্য। আমি বসে বসে নিন্দা প্রশংসার ঢেউ গণনা করব খবরের কাগজে। ইতি ২৭।১।৩৯

দূরবিহারী কবি

॥ ৪৫৪ ॥

শান্তিনিকেতন

পরিণয় বার্ষিকী
শ্রীমতী রানী ও শ্রীমান প্রশান্ত

মিলনের রথ চলে জীবনের
পথে দিনেরাতে
বৎসরে বৎসরে আসে কালের
নূতন সীমানাতে,
চিরযাত্রী ঋতু যথা বসন্তের
আনন্দ মন্দিরে
ফাল্গুনে ফাল্গুনে আনে মাধবীর
অর্ঘ্য ফিরে ফিরে॥

১৪ ফাল্গুন, ১৩৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬টা

॥ ৪৫৫ ॥

ওঁ
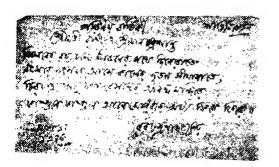
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

দোলপূর্ণিমার সকাল বেলায় মঞ্জরিত শালবীথিকায় বসন্ত উৎসব হবে। তারি সংগীত জোগানোর কাজে গুঞ্জনধ্বনি জেগে উঠেছে মনের বুদ্ধি মহলের পাশের কোঠায়—বুদ্ধির কারবার বন্ধ। সেতারে মোচড় দিয়ে যেমন মীড় বেরোয় তেমনি একটা অকারণ বেদনার বীণাযন্ত্রে লাগচে টান—মাঝে মাঝে মনকে জিজ্ঞাসা করচি এই অবৌদ্ধিক অকৃতির উদ্ভব কোন্ বিশ্বচৈতন্যের সপ্তবর্ণ রঞ্জিত রশ্মিলোকে। যদি অকস্মাৎ উৎসবের আগের রাত্রে আসতে পারো তবে রেলযাত্রার মাশুলের অপব্যয় নিয়ে অনুতাপ করবে না। —উড়িষ্যার নব রাষ্ট্রিক দরবার থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি—এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তদুপলক্ষ্যে শ্রীধামে যাত্রা স্থির হয়েছে। যদি জনসমুদ্রের তরঙ্গ আমার চারদিকে উদ্বেল হয়ে না ওঠে তাহলে বোধহয় ভালোই লাগবে। ইতি ২।৩।৩৯

কবি

॥ ৪৫৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শেষ পর্যন্ত আমার ছুটি নেই। রিহার্সাল প্রভৃতি চলেইচে। ১লা এপ্রিলের রাত্রে পৌঁছব কলকাতায়—তার পরের দিনেই বিশ্বভারতী সম্মেলন। ন্যাড়া ঘরটাকে বাসন্তিক শোভা দেবার ইচ্ছা আছে—"শ্রীমতী" সহায়তায় সম্মতা। সায়াহ্নে গীতসভা। যদি নিমন্ত্রণ পত্র পাও এসো, যদি না পাও তবু এসো।

সেদিন ক্রিয়াকর্ম-অন্তে আমাকে যদি তোমার কোটরে নিয়ে যাও তো তোমার রথে উঠে পড়ব। তুমি পরদিনে তোমার সাহচর্যে আমাকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনবে এই রকম প্রত্যাশা রইল। রেল ভাড়ার জন্যে তোমার চামড়ার থলিটার দিকে কটাক্ষপাত করব না—ঋণ বাড়াবার ইচ্ছে নেই। এখানে যে ফুলদোল হবে পূর্ণচন্দ্রালোকে, তাতে আমার পূর্ণচন্দ্রাননা নাতনী সাজবেন রাধা, তিনি কৃষ্ণের প্রেয়সী সেকথা পূর্বেই প্রচার হয়ে গেছে। ইতি

তারিখ দিতে ভুলে গেছেন।

কবি

॥ ৪৫৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

নানা দুশ্চিন্তায় ও ব্যস্ততায় তোমার অবস্থা যে রকম শোচনীয় তাতে তোমাকে আরো ভারগ্রস্ত করতে অত্যন্ত সংকুচিত হচ্চি। এখানে ফুলদোলে তোমার শুভাগমন প্রত্যাশা ছেড়ে দিচ্চি—তোমার বর্তমান অবস্থার অন্য শোচনীয়তার উপরে এটা আরো একটা দুর্গ্রহের লক্ষণ। যাই হোক যদি তোমাদের ওখানে যাই আতিথ্যের আতিশয্য দাবী করব না—জানো তো আমি গরীব। ১লা ভোর রাত্রের গাড়িতে যাত্রা করব—কেননা অনেক কাজ আছে। ইতি ২৯।৩।৩৯

নিঃশব্দ নায়গ্রা প্রপাত

দেশ বিদেশের ভ্রমণকারী দল নায়গ্রা প্রপাত দেখতে গিয়ে বর্তমানে হতাশ হচ্ছে ওর গগনবিদারী গর্জন শুনতে না পেয়ে।

এখন প্রপাতের ওপরকার জল-প্রবাহের গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশ হাজার ঘনফুট, অথচ পূর্ণমাত্রায় সগর্জনে প্রবাহিত হতে দরকার ঠিক তার দ্বিগুণ।

প্রপাতটি দেখতে বহু দেশের এতো লোকের সমাগম হয় যে ওর কাছাকাছি স্থানে ভ্রমণকারিদের ওপর নির্ভর করে বহু ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। কানাডার সেইসব প্রতিষ্ঠান এখন স্বতঃই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

মেইড অফ দি মাউণ্টেন নামক এক প্রতিষ্ঠান, নায়গ্রার জলের প্রবাহগতি কমই থেকে যদি যায়, তাহলেও বর্তমান পাহাড়ে নালাগুলিকে গভীরতর করে ওর গর্জন ফিরিয়ে আনতে পাথর-বিস্ফোরণ বাবদ চার লক্ষ টাকা খরচ করার সংকল্প করেছে।

জলপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ার হেতু হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন। ক্যুইন্সটন ও লিউস্টন নামক নতুন উঠতি দুটি উপনিবেশ তাদের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে প্রধান খাল থেকে অধিকতর পরিমাণে জল টেনে নিচ্ছে। আর উপনিবেশ দুটির জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকায় স্বতই জল টেনে নেওয়াও বেড়ে যেতে থাকবে।

ওপর থেকে জল পড়ার সঙ্গে নীচে ঢেউ তুলে প্রচণ্ডবেগে জলধারা পঞ্চাশ ফিট উঁচু পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠার দৃশ্য থেকেও ভ্রমণকারিদের বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

নায়গ্রার পূর্ণ গর্জন পুনরুদ্ধার করতে যদি নিকটবর্তী গৃহসমূহে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিমাণে কমিয়ে ফেলার দরকার হয় তাহলে ভ্রমণকারিদের প্রয়োজনটা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে বাধ্য।

পুরাতনের পরিবর্তে নতুন হৃদযন্ত্র

অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ ই ভি নোসাল একজনের দেহযন্ত্র অপর ব্যক্তির দেহে সংযোজিত করার বৈপ্লবিক অগ্রগতির কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অল্প-কালের মধ্যেই মানুষ মৃতদেহের হৃদযন্ত্রকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন পরবর্তী দশ বছরের মধ্যেই এটা কার্যকরী ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারবে। যেসব লোকের হৃদযন্ত্র পরিবর্তন করা হবে তাদের আয়ু

রাইন নদীর তীরে পার্বত্য ধাপে একটি মায়া সৃষ্টি করার মতো উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে ঝোপ এবং গাছের মধ্যে লুকানো রয়েছে জার্মানীর রূপকথার প্রমাণ আকৃতির চরিত্রসমূহ : তুষারকন্যা ও সাত বামন, সিন্ডারেলা, লিটল রেড রাইডিং হুড প্রভৃতি বহু চরিত্র। আবহাওয়া ভাল থাকলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের রূপকথায় শোনা চরিত্রগুলিকে চোখে দেখে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। বাঁদিকের ছবিখানিতে একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে পা টিপে টিপে 'পুস ইন বুট'-এর কাছে যেতে। আর ডানদিকের মেয়েটির ইচ্ছা বামনের নাকটি পরিষ্কার করে দেবার। এই রূপকথার উদ্যানটির নির্মাতা হচ্ছেন ভাস্কর আর্নস্ট হাইলম্যান

দীর্ঘতর হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

মেলবোর্নের এই চিকিৎসক, ডাঃ নোসাল, মানুষের দেহযন্ত্র এক দেহ থেকে নিয়ে অপর দেহে সংস্থাপনের অগ্রগতি আড়াই বছর ধরে লক্ষ্য করে আসছেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রের সংস্থাপন তিনি বলেন, সেটা নির্ভর করে গ্রহণকারি দেহে অনুকূল অবস্থা সঞ্চারিত করে তোলার ওপর। নতুবা অবস্থা অনুকূল করে তুলতে না পারলে রোগী অপরের দেহযন্ত্র সংস্থাপন কঠিন করে তুলবে।

অস্ট্রেলিয়ার নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানী স্যর ম্যাকফারলেন বার্নেট এক দেহ থেকে কোন দেহযন্ত্র অপরদেহে সংস্থাপনের সমস্যাটি বহু বৎসর ধরে পরীক্ষা করে আসছেন।

অল্পবয়স্ক এক পশুর হৃদযন্ত্র আর এক পশুর দেহে সংস্থাপিত করায় সাফল্য লাভ করে এখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক পশুর ক্ষেত্রে তাঁর কৌশলটি প্রয়োগ করছেন।

লিউকেমিয়ার ওষুধ

মারাত্মক লিউকেমিয়া অর্থাৎ রক্তের ক্যান্সার রোগ জয় করার জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুদিন থেকেই নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছিল। বর্তমানে আশা করা যাচ্ছে এই রোগের জন্য যে সরল চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তা সাংঘাতিক ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। পশ্চিম জার্মানীর মেনৎস শহরের বিশ্ব-বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকের ডাঃ ই কার্বিস্থ এই তথ্যটি প্রকাশ করেছেন। তাঁর পদ্ধতিতে একটি সুস্থ লোকের বক্ষাস্থি (স্টরনাম) থেকে কিছু পরিমাণ মজ্জা সিরিঞ্জের সাহায্যে গ্রহণ করে লিউকেমিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বক্ষাস্থিতে সংস্থাপন করলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসা জগতে এই ব্যবস্থাটির নতুন নামকরণ

লিউকেমিয়া চিকিৎসার এইটি শেষ ধাপ হলেও, পূর্বের অপরাপর ধাপগুলিও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। মজ্জার লিইকেমিয়া রোগ বিভিন্ন ধরনের হয়। এতে টিসু রোগাক্রান্ত হয় বলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া বাঁচিয়ে অন্য টিসু গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। তাই প্রথমেই রোগাক্রান্ত মজ্জা বিশ্লেষণ করা দরকার। এই ব্যাপারে রাসায়নিক ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। এই চিকিৎসার শেষে ডাঃ কার্বিস্থ আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মজ্জা সংস্থাপন করা চলবে। এইভাবে পূর্বে যে কয়েকটি রোগীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা হয়েছে দেখা গেছে কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের দেহে স্বাভাবিক রক্ত সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্বে এই রোগে হাতের শিরার মধ্যে সুস্থ মজ্জা প্রবেশ করানো হতো। তদপেক্ষা ডাঃ কার্বিস্থ আবিষ্কৃত স্টেরনো-স্টেরনাল পদ্ধতিতে মজ্জা সংস্থাপন অনেক কম বিপজ্জনক। এই পদ্ধতিতে অল্প পরিমাণ সুস্থ মজ্জাই যথেষ্ট এবং এতে রক্ত কণিকা জমাট বেঁধে ফুসফুসের পথরোধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিডনি সংস্থাপনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ডাঃ কার্বিস্থ এই পরীক্ষা শুরু করেন। দু বছর আগে ছজন যুগোশ্লাভ বিজ্ঞানী রিঅ্যাক্টর দুর্ঘটনার ফলে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় রশ্মি দ্বারা আক্রান্ত হন। শিরায় মজ্জা ইঞ্জেকশন করে একজন ফরাসী চিকিৎসক তাঁদের পাঁচজনকে আরোগ্য করেন। কিন্তু ষষ্ঠ ব্যক্তির মজ্জা রশ্মির আঘাতে বিভক্ত হয়ে যায়। ডাঃ কার্বিস্থ নির্দিষ্ট পন্থায় শুধু যে লিউকেমিয়া আরোগ্য হয় তা নয়, বিকিরণজনিত আঘাতও আরোগ্য করা যায়। মজ্জা বিনষ্ট করায় তীব্র তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা চলে না যেহেতু তার প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

বিশ্বের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ এই পদ্ধতিকে একযোগে বৈপ্লবিক উদ্ভাবন বলে স্বীকার করেছেন। প্রারম্ভিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ঔষধের ফলাফল অল্পদিনের মধ্যেই জানা যায়। অর্থাৎ লিউকেমিয়ার মত ভয়াবহ রোগের বিরুদ্ধে মানুষের চরম জয় এতে সূচিত হচ্ছে।

মরুর বুকে ফলের উদ্যান

মরুভূমি ও চিরন্তন অনাবৃষ্টির দরুণ লতাগুল্মহীন ধুধু প্রান্তরকে শস্য শ্যামলিমায় ভরিয়ে তোলা মানুষের চির-কালের স্বপন। প্রাচীনকালে মানুষ খাল কেটে কুয়া খুঁড়ে সেচের ব্যবস্থা করে মরুভূমিতে শস্য ফলিয়েছে। আজ সেই

প্রকৃতি বিজ্ঞানী। নতুন কারিগরী জ্ঞান, নতুন কৃত্রিম পদার্থের সাহায্যে তারা বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে রাখে। মাটির নীচে তারা জল মজুত করছে। প্রাকৃতিক মরূদ্যান তৈরী প্রকৃতির এক আশ্চর্য লীলা, কিন্তু মানুষের তৈরী মরূদ্যান আজ বহু মরুভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়

আধুনিক জমি পুনরুদ্ধারকারীদের মধ্যে হাইঞ্জ বাউম্যান নামে একজন জার্মান রাসায়নিককে এই ব্যাপারে পথিকৃত বলা যায়। এক অভিনব পন্থায় তিনি জলহীন মরুভূমির জমিকে উর্বরা করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর ছোট্ট একটি রাসায়নিক পদার্থ নির্মাণের কারখানার ইঞ্জিনীয়ার বাউম্যান এমন একটি কৃত্রিম ফেনাময় পদার্থ সৃষ্টি করেছেন যেটি শুষ্ক বালুময় জমিতে দুঃসহ তাপের মধ্যেও কয়েক সপ্তাহ জল ধারণ করে রাখতে সক্ষম। আর এই কৃত্রিম ফেনাময় পদার্থের উপর, স্বাভাবিক মাটির মতই লতাগুল্ম, এমন কি গাছপালা পর্যন্ত চমৎকার জন্মায় ও বাড়তে থাকে।

বাউম্যান ১৯৫৩ সাল থেকে দীর্ঘকাল ধৈর্যের সঙ্গে নানারকম প্লাস্টিকের ফেনার ওপর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন লতাপাতা লাগিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। চার বছর অবিরাম পরীক্ষার পর তিনি সেই বিশেষ কৃত্রিম ফেনাটি পেয়েছেন যার উপর স্বাভাবিক জমির মতো সব রকম লতাপাতা বাঁচে। অগ্নিনির্বাপক পাইপের মত জিনিস দিয়ে এই তরল ফেনা জমির উপর ছিটিয়ে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ পদার্থ কঠিন সছিদ্র শোষণক্ষম ফেনার গদিতে পরিণত হয় এবং তলার মাটি তা থেকে জলীয় ভাগ টেনে নিতে পারে না।

কয়েকজন জার্মান বিশেষজ্ঞ সৌদি আরবের এর-রিজাদ নামক স্থানে তপ্ত মরুভূমির বুকে এক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে ঐ ফেনা ছিটিয়ে দেবার কয়েক মিনিট বাদে প্রতি দশবর্গফুট স্থানে দেড় গ্যালন মাপে জল ঢেলে চলে যায়। তিন সপ্তাহ পরে এসে তারা দেখে যে তখনও প্রতি দশ বর্গফুটে আধ গ্যালনের মতো জল রয়েছে। মরুভূমিতে যেখানে ১১৫ ডিগ্রি তাপ থাকে, যেখানে সূর্যের তেজে জল সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প হয়ে যায় কিংবা জমি শুষে নেয়, সেখানে এরূপ ব্যাপার বিস্ময়কর।

এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মরুভূমির বুকে আজ দশটি কমলা লেবু ও লেবু গাছ লাগান হয়েছে। পাঁচটি ছাড়া আর সব গাছ বেঁচে আছে ও বড় হচ্ছে। তাই আশা করা যায় পত্রপুষ্প তৃণের শষ্প শ্যামলিমায় মরুভূমির রূপান্তর ঘটাবার মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন এবার

কিছু দূরে

আনন্দ বাগচী

বিচিত্র ছাইদান জুড়ে ধূপ পোড়ে, কাঁচপোকা দেওয়ালে,
অন্ধের মতন খুঁজি অবয়ব, চোখের পাতায়
পুঁথির ভাষার মত
কিছু আলো, কিছু অন্ধকার, কিছু জল,
আমি ডুবে আছি তবু কারো করতলে কারো বুকে।
রজনী শাঙন-ঘন মনে মনে ভাবি,
জানলার ওপারে শুধু অঘ্রানের রাতকানা চাঁদ,
অদৃশ্য গাছের শব্দ, ব্যঙ্গ করে
চোখ খুলতে ভয় করে ভীষণ।

জনস্রোতে ডুবে আছি মুখ তুলতে ভয় করে ভীষণ,
কার সঙ্গে দেখা হবে, কার সঙ্গে চোখাচোখি হবে,
আজীবন যার কথা ভাবি, লিখি, ভুলে যেতে চাই
যে-দেহ লুণ্ঠনে পুণ্য, বিপরীত কৌশলে হৃদয়;
অন্ধকার সহবাসে আত্মহত্যা শিল্প হয়ে ওঠে।
মুখের মিছিল দেখি চতুর্দিকে
অর্থবহ বিচিত্র রেখায়
ডাইনে বাঁয়ে বাঁকা গলি, রৌদ্রজ্যোৎস্নাহীন তমস্বিনী
নখে তীক্ষ্ণ রঙ মেখে সুন্দরী কলকাতা চেয়ে আছে
কিছু দূরে, কালস্রোতে রাজনীতি ভাসে।

অনিদ্র গোলাপ

মানস রায় চৌধুরী

নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকো না। জানো ওই অন্ধকারে
ওর সর্ব দেহ জ্বলে, ভয়াল সুন্দর আভা যেন
শোণিতের প্রসাধন
জ্বলন্ত গ্রহাণুপুঞ্জ মুখচ্ছবি এঁকেছিল লক্ষ যুগ আগে
তারপর কত কবি চিত্রকর উন্মাদ কবন্ধ গেল ক্ষণিকের
দৃষ্টি বিনিময়ে অনুরাগে
ভেবেছ অক্ষত পাবে বিরহী ওষ্ঠের তাপ,
বিনা রক্তপাতে আলিঙ্গন?

কণ্টকিত দীর্ঘ পথ। গলিত ধাতুর স্রোত,
আগ্নেয় প্রস্তর পাতালিক
গোধূলির সন্নিকটে মৃত্যুর বনিতা যেন নিদ্রাহীন জাগে
বেগান্ধ অশ্বের হ্রেষা......রাজপুত্র গিয়েছিল ওই
রূপ স্পর্শ অভিলাষে
ভগ্ন অস্থি পড়ে আছে, চতুর্দিকে হা হা শব্দ প্রতিধ্বনি
অশ্রুত ভৌতিক
তবু কি অন্ধতা তুমি দুই বাহু মেলে দেবে উষসীর ছদ্ম
পরিহাসে!

নর্তকীর বিলাসকক্ষ

সুনীল বসু

ভোজ্যপর্ব প্রাচুর্যের সীমা ঘেঁষে সাজানো টেবিলে
মত্ত-সুখে দিচ্ছ তুমি নটীদের নাচের তালিম!
বিছিয়েছো ভূমি-তটে মূল্যবান কাশ্মিরী জাজিম
গ্রীষ্ম-ঋতু অসাক্ষাতে কেটে গেল সুদূর ব্রেজিলে।

অজস্র কমলা, দ্রাক্ষা, রান্না মাংস সুপাত্রে সাজানো
উৎসবের মত্ততায় নৃত্যো-গানে, সায়াহ্ন অস্থির।
বাজে তম্বুরা এস্রাজ বাদ্যযন্ত্র অর্গ্যান পিয়ানো
কপাটের পাশে আমি নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে মুসাফির।

তোমাকে ঘিরেছে ভাঁড়, লম্পট, স্তাবক, আহাম্মক
আমার সম্পদে সব আকণ্ঠ ডুবেছে, চমৎকার।
দামী দামী আসবাব উঠেছে নীলামে, এ আলোক—
অসহ্য দু'চোখে, অর্ধ-নগ্ন-দেহে এনেছো ধিক্কার!

এনেছি মৃগের চর্ম, সুগন্ধ, কর্পূর, মসলিন
হাতির দাঁতের বাঁট, মিশরের ইস্পাতের ছোরা,
উজ্জ্বল মুক্তোর মালা, সুদূর স্পেনের ভায়োলিন—
সব সমুদ্রে ভাসাব, জলে দেব কঙ্কনের জোড়া!

উজ্জ্বল ধাতুর গড়া এ আকাশ হোক চুরমার
তুমি থাকো মত্ততায় ঘিরুক অজস্র ঘৃণ্য ভাঁড়।
ঘটুক আমার ঘরে কলঙ্কিত তিক্ত ব্যভিচার
সব দেখে ফিরে যাব হে বিদেশী অরণ্য পাহাড়॥

প্যারীস প্রত্যাগত ভারতীয় শিল্পী শক্তি বর্মন গত ৬ই থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী থিয়েটার রোডে অবস্থিত অশোকা গ্যালারীতে তাঁর ছবির একটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৬ সালে প্যারীসে যাবার আগেও তিনি তাঁর ছবির একটি একক প্রদর্শনী করে গিয়েছেন। তাঁর তখনকার ছবির সঙ্গে প্যারীসে দীর্ঘকাল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরবর্তীকালে আঁকা ছবিগুলির তুলনা করলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বর্তমান ইওরোপীয় ধারা থেকে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হয়েছে। প্রদর্শিত ছবিগুলিতে সে পরিচয় সুস্পষ্ট। একটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে ইওরোপে দীর্ঘকাল কাটালেও শক্তি বর্মন ভারতীয় চিত্রকলার ঢঙও সম্পূর্ণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। প্যারীসে তাঁর শিক্ষাগুরু চ্যাপেলেইন মিডিও এ কথার উল্লেখ করে বলেছেন, "ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করলেও তিনি সঙ্গে যা এনেছিলেন তা হারাতে প্রবৃত্ত হননি। শক্তি বর্মন কল্পনা-শক্তি এবং তার রূপান্তরে পূর্ণমাত্রায় ভারতীয়ই থেকে গিয়েছেন। এটা একটা অত্যন্ত দুর্লভ গুণ।"

প্রদর্শিত মোট পনেরখানি ছবির মধ্যে 'গন্ডোলা', 'ভেনিস' এবং একখানি ল্যান্ডস্কেপ ছাড়া সবই ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা। 'দুর্গাপূজা', 'বাউল' 'উৎসব' 'শৃঙ্গার', 'রাস্তার গায়ক' প্রভৃতি সব ছবিগুলির ক্ষেত্রেই বাঙলার পটের মতো হলুদ ও লাল রঙের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য প্রকারের রঙও অবশ্য তিনি ব্যবহার করেছেন কিন্তু মূল সুরটা তিনি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এইটাই তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য। 'ভেনিস', 'গন্ডোলা' প্রভৃতি ইওরোপীয় দৃশ্যগুলির ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। রঙের সুসমঞ্জস নির্বাচনে এবং তুলির বলিষ্ঠ টানে পরিণতকৃতি শিল্পগুণের পরিচয় বেশ ফুটে উঠেছে। ছবিগুলিতে জটিল বা অদ্ভুতদর্শন কিছু ফুটিয়ে তোলার কোন প্রয়াস নেই। বেশ সচ্ছন্দ সরলভাবে তিনি তাঁর ভাব ও বক্তব্যকে সামনে তুলে ধরেছেন।

বাউল

তিন বান্ধবী

ফ্রান্সে দু-বছর শিক্ষালাভের পরই তিনি ১৯৫৮ সালে প্যারীসে এবং লন্ডনে তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী করেন। এই দুই দেশের শিল্প সমালোচকদের দ্বারা তাঁর ছবি বৈশিষ্ট্যে, মৌলিকত্বে, এবং রঙের নির্বাচনে ও তুলির টানে ভারতীয়ত্বের জন্য প্রশংসিত হয় এবং কতকগুলি ছবি বিক্রীতও হয়। ক্রেতাদের মধ্যে আছেন নিউজীল্যান্ডের জাতীয় গ্যালারি, মিউজিয়াম অব দি সিটি অব প্যারীস এবং ইংলন্ডের লিস্টারশায়ার, হাল ও ইয়র্কশায়ার এডুকেশন কমিটি।

তৃতীয় রায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

॥ ২ ॥

কলকাতার উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রে জয়ী হলেন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅশোক সেন। বলা উচিত, পরাজিত হলেন কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্য। কারণ, যেদিন এই লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল চূড়ান্তভাবে জানা গেল সেদিন উত্তর কলকাতার চেহারাটা যাঁরা দেখছেন তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, শ্রীঅশোক সেনের জয়ের চাইতে শ্রীস্নেহাংশু-কান্ত আচার্যের পরাজয়ের ছায়াটাই দেখা গিয়েছিল বেশী।
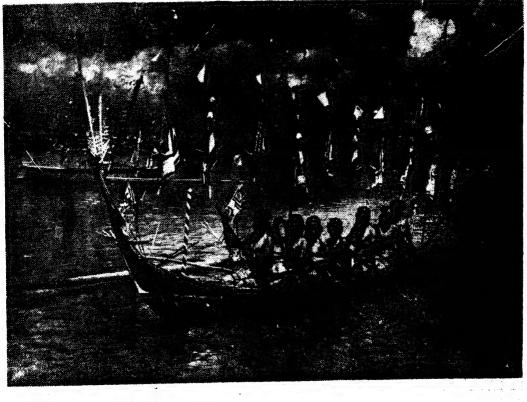
অসম্ভব নয়। সারা ভারতে, এমন কি কংগ্রেস মহলের উপরতলায়ও একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে কলকাতা "লাল শহর"। শ্রীনেহরু বলেন, "দুঃস্বপ্নের শহর"। আবার অনেকে বলেন, 'শোভাযাত্রার শহর'। মোট কথা, সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে কলকাতায় কংগ্রেসের অনুপ্রবেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। সেই ধারণাকে ভীষণভাবে ধাক্কা দিয়েছে শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্যের পরাজয়।

কম্যুনিস্ট প্রার্থীর এই পরাজয় রাজ-নৈতিক পটভূমিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণও বটে। কম্যুনিস্ট পার্টির এই পরাজয় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ঘটনাটা ঘটেছিল উত্তর কলকাতায়।

নির্বাচন-এর ফলাফল ঘোষণা করার জন্য, আনন্দবাজার পত্রিকা ও "দেশ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার এবার একটি বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। এই ব্যবস্থা মত প্রতিক্ষণে নির্বাচনের ফলাফল পর্দায় প্রতিফলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতায় এভাবে ফলাফল বা সংবাদ ঘোষণার আয়োজন এর আগে আর কোন পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে করা হয়নি। এই ব্যবস্থা (উত্তর কলিকাতা ও দক্ষিণ কলি-কাতায়) অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল বলেই প্রতি সন্ধ্যায় প্রতিফলনের সামনের রাস্তা জনাকীর্ণ হয়ে উঠত।

উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রের ফলাফল যেদিন ঐ পর্দায় ঘোষণা করা হয় সেদিনই ঘটেছিল ঘটনাটি। কলকাতার কোন একটি কেন্দ্রের ভোট গণনার ফলাফল ক্ষণে ক্ষণে উত্তর কলকাতার পর্দায় ঘোষণা করা হচ্ছিল। ভোট গণনার বিশেষ এক মুহূর্তে দেখা যায় যে কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থিত বিধানসভার প্রার্থী কিছু ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীর পিছনে পড়ে আছেন। খবরটা যথারীতি পর্দায় ঘোষণা করা হয়। খবরগুলো আসত আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস থেকে টেলিফোনে। প্রথম খবর জানাবার অল্প পরেই খবর আসে বামপন্থী প্রার্থী এগিয়ে গেছেন এবং একরকম নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে তিনিই জয়ী হয়েছেন। এই খবরটাও সংগে সংগে পর্দায় ঘোষণা করা হয়।

এই ঘোষণার প্রায় সংগে সংগেই গুটিকয়েক ছেলে উত্তেজিত হয়ে যেখান থেকে সংবাদ প্রতিফলন করা হচ্ছিল সেখানে ঢুকে পড়ে। তারা দাবি করে যে ভুল খবর কেন দেওয়া হয়েছিল। ছেলেরা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। তাই শোরগোলটা মন্দ হয়নি। সেই প্রতিফলন কেন্দ্রে যিনি সব ব্যবস্থা করছিলেন তিনি নন্দাখুণ্টিখ্যাত আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান ফটোগ্রাফার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ। পাড়ায় তিনি 'নেকোদা' ব'লে পরিচিত। কয়েকটি ছেলে নেকোদার কাছে কৈফিয়ত দাবি ক'রে শোর-গোল তোলে। তবে 'নেকোদা'র গলার জোর যাদের জানা আছে তাদের বুঝতে কষ্ট হবে না যে, চীৎকার ক'রে নেকোদার সংগে ছেলেরা পাল্লা দিতে পারেনি। ভুল খবর দেওয়া হয়নি। শুধু খবরটা বদলে গেছে। তাই দুটো খবরই সত্যি।

এর পরেই জানা যায় উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রের ফলাফল। তখন একটি ছেলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে জিগ্যেস করেছিল—'আচ্ছা, নেকোদা, শিক্ষিত মানুষরাও ভুল করল।'

নেকোদা, নিশ্চয়ই একটা উত্তর দিয়ে-ছিলেন। এবং আমার সে উত্তর জানা আছে। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন এই যে, কম্যুনিস্ট পার্টিতে বিশ্বাসী একটি যুবকের মনে আশা ভঙ্গের ধ্বনি উঠেছিল কেন? কংগ্রেসের চমকপ্রদ সাফল্য সত্ত্বেও কেন এই হতাশার প্রতিক্রিয়া? প্রশ্ন আরও আছে, কিন্তু এই প্রশ্নগুলো বিচার করলেই নির্বাচনের আলোড়নটা কোথা থেকে এসেছিল এবং কোথায় গিয়ে আঘাত করেছিল তা হয়ত বোঝা যাবে।

বলা বাহুল্য, এই বিশ্লেষণ থেকেই শুধু পশ্চিম বাংলায় নয় সমগ্রভাবে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিগত পার্থক্য—যা নির্বাচনকে কিছুটা অভিভূত করেছিল, তা বোঝা যাবে।

প্রথমেই বিবেচনা করা যাক, কম্যুনিস্ট পার্টির কথা।

বিচার করা যাক এই পার্টির রাজনীতি অথবা কর্মপদ্ধতি যার ছাপ নিশ্চয়ই কিছু থাকে নির্বাচনের উপর। নির্বাচন যে সব সময় পার্টির নীতি পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তা পুরোপুরি ঠিক নয়। কিন্তু পার্টির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

বিশেষ ক'রে সাধারণ নির্বাচনে, যে সময় পার্টির নীতি বা আদর্শ কংগ্রেসের প্রতি সভায় আলোচিত হয়েছে। সমালোচনা হয়েছে তীক্ষ্ণ ভাষায়। কম্যুনিস্ট পার্টির বৈদেশিক নীতিই সব চাইতে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে প্রাক-নির্বাচনকালে।

এই নীতির দুটো দিক সাধারণত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হ'য়েছিল। প্রথমত, পার্টির দেশের প্রতি আনুগত্য এবং দ্বিতীয়ত, ভারত-চীন বিরোধের পরি-প্রেক্ষিতে পার্টির মতামত।

কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়ে-ছিল : কম্যুনিস্ট পার্টির শিকড় এ-দেশের

মাটিকে আশ্রয় ক'রে বৃদ্ধি পায়নি; বৃদ্ধি পেয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে প্রকাশ্য সভায় বলতে শোনা গেছে যে, এমন কি পার্টির পতাকাও যখন বিদেশ থেকে আমদানী করা তখন প্রশ্ন ওঠে পার্টির আনুগত্য কোথায়? ভারতবর্ষে? না, বাইরে।

অপর দিকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে যে ঝগড়া পাকিয়ে উঠেছে সেটাও বেশ বড় ক'রে দেখান হ'য়েছে নানা নির্বাচন কেন্দ্রে। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হ'য়েছে চীন ও রাশিয়ার মতবিরোধ এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিতে স্ট্যালিন ও স্ট্যালিন-বিরোধী; অথবা চীন ও রাশিয়া পন্থী দলবিরোধ।

উত্তর কলকাতায় এ নিয়ে বেশ কয়েকটা নির্বাচনী কার্টুন দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। এর মধ্যে একটি কার্টুন-এ একটি হনুমানকে নাকে দাড়ি দিয়ে দেখান হয়েছিল। নাকের দড়ির দুটো প্রান্তের এক প্রান্ত যে হাতে ধরা ছিল তাতে লেখা ছিল রাশিয়া, অন্য প্রান্ত যে হাতে ছিল সে হাতে লেখা ছিল চীন।

এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই কারণে যে, এবারের মত ১৯৫২ বা ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বকে এত ফলাও করে দেখান হয়নি। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ক্যাম্পে যে বিরোধ ক্রমশই প্রকাশ পাচ্ছে তাকেই কংগ্রেস এবারের নির্বাচনে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিল।

অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই প্রচারের ঢেউকে বাধা দেবার কোন বিশেষ প্রচেষ্টা কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে করা সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে কম্যুনিস্ট সমর্থকদের মধ্যে যে দ্বিধা দেখা গিয়েছিল তারও নিরসন করা হয়নি। বরং দিল্লি থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির যে বিবৃতি প্রচার করা হয়েছিল এই প্রসঙ্গে তাতে নির্বাচকদের মনের দ্বিধাকে আরও স্পষ্ট ক'রে দিয়েছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক বা কর্মীদের কাছ থেকে প্রশ্ন এসেছিল পার্টি নেতাদের কাছে যে, নির্বাচকরা যখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবেন তখন তার উত্তর কিভাবে দেওয়া হবে। তারা জানতে চেয়েছিল যে, এ সম্বন্ধে পার্টির সুস্পষ্ট কোন অভিমত বা নির্দেশ আছে কিনা।

পার্টির ফতোয়ায় বলা হয়েছিল যে, স্ট্যালিনবাদকে মুছে ফেলা উচিত হবে কিনা এ প্রশ্ন মীমাংসা করতে প্রচুর সময় ও তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। নির্বাচনের আগে সেই-হেতু এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মীমাংসায় পৌঁছোন সম্ভব নয়।) মনে রাখা প্রয়োজন যে, চীন প্রকাশ্যভাবে স্ট্যালিনবাদকে নিশ্চিহ্ন করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।) কাজেই পার্টির বিভিন্ন কেন্দ্রে তাদের কর্মীদের নির্দেশ দিল অবস্থা বুঝে কাজ করতে এবং যেটা ভাল মনে হবে সেই উত্তরটাই নির্বাচকদের দিতে।

ফলে দাঁড়াল এই যে, একদিকে নির্বাচকরা কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে উঠল এবং অন্যদিকে, পার্টি কর্মীরা কংগ্রেসের এই প্রচারের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হ'ল। হয়ত এই কারণেই নির্বাচনী প্রচারকার্যের প্রথম অবস্থায় পার্টির কর্মীদের উৎসাহ খুব বেশী দেখা যায়নি। কংগ্রেস প্রচারকে খণ্ডন করার উৎসাহ পায়নি। কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিচার করলে এটা তাদের এক নম্বর দুর্বলতা ব'লেই মনে হবে।

এরপর এসেছে চীনের হামলার কথা। এ সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি আজ সর্বভারতে বিশেষভাবে সুবিদিত। এই নীতির আদি কথা ছিল এই যে, ম্যাকমেহন লাইন নিয়ে মতবিরোধ থাকা সম্ভব এবং এই বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। দ্বিতীয় কথা, লাদাক সম্পর্কে পার্টির সুস্পষ্ট অভিমত প্রায় অনুচ্চারিত।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় ১২০০০ বর্গমাইল এলাকা চীনের দখলে চলে গেছে এবং দ্বিতীয়ত, ভারত ও চীনের মধ্যে সরকারী তথ্য বিনিময়ের সময় দেখা গেছে চীন অধিকৃত ভারতভূমি ছেড়ে যাবার জন্য মোটেই ব্যগ্র নয়। তা সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট পার্টি চীনকে 'হামলাকারী' ব'লে অভিযুক্ত করেনি। পার্টির এই চীন নীতির সুযোগ সম্পূর্ণভাবে নিয়েছে কংগ্রেস এই নির্বাচনে। কংগ্রেস পক্ষের প্রচারে এই কথাটাই বার বার নির্বাচকদের সামনে রাখা হয়েছে যে কম্যুনিস্ট পার্টি 'দেশদ্রোহীর' ভূমিকায় কাজ করছে।

কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ খণ্ডন করার দুর্বল প্রচেষ্টা হয়ত

হয়েছিল, কিন্তু তা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রায় এমনি একটা অবস্থার মধ্যেই এল ভারতের 'গোয়া অভিযান'। এই সময় কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যে 'দেশদ্রোহী'র অভিযোগ আনা হ'য়েছিল তা খণ্ডন করার। পার্টি অভিযানকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেছিল ও অভিযানের সাফল্যকে অভিনন্দিত করেছিল। কিন্তু দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে পার্টি নেতাদের যখন জিগ্যেস করা হয় যে, পার্টির গোয়া নীতি ও চীন নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়, তখন পার্টি নেতাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হ'য়েছিল এবং চীন সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয় ভাষণও করতে হ'য়েছিল। এর পর চীনের কাছ থেকে কটুভাষণ শোনা যায় কোন কোন ভারতীয়-কম্যুনিস্ট নেতা সম্বন্ধে। তখন প্রায় চীৎকার ক'রেই শ্রী এস এ ডাঙ্গে বলেছিলেন 'চীনকে লাথি মেরে ভারত থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত'। তবু শ্রীডাঙ্গের পতন ঘটল এই নির্বাচনে।

মূল কথা, কম্যুনিস্ট পার্টির 'অনিশ্চিত' চীন নীতি নির্বাচকদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। কংগ্রেসকে ত নয়ই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 'শিক্ষিত' নির্বাচকদের কাছে কম্যুনিস্ট পার্টির বৈদেশিক নীতি নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। নির্বাচকদের এই বিশ্বাস কংগ্রেস পক্ষ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু একটিমাত্র নির্বাচনী সভায় যে বক্তৃতা দেন তাতে কম্যুনিস্ট পার্টির এই নীতিকেই সমালোচনা করেছিলেন অত্যন্ত তীব্র ভাষায়। তিনি বিশেষ ক'রে অভিযোগ এনেছিলেন পশ্চিম বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রীর মতের বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তার একমাত্র অর্থ যে এই রাজ্যের কম্যুনিস্ট পার্টি বিশেষ ক'রে দেশের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে চলেছে। নিঃসন্দেহে তিনি এই রাজ্য পার্টির চীন প্রীতিকেই আক্রমণ করেছিলেন সবচাইতে বেশী। এরপর প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার প্রতিধ্বনি শোনা গেল কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের মুখে। প্রাকনির্বাচনকালে শ্রীঘোষ রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে এই কথাটাই তিনি নির্বাচকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে ক্ষমতা গেলে দেশের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ হবে। ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে নির্বাচকরা যে মতামত জানিয়েছেন, বিশেষ কলকাতা 'শিক্ষিত' নির্বাচকমণ্ডলী, তাতে এটা অস্বীকার করা যায় না যে তাদের সংগে শ্রীঅতুল্য ঘোষের খুব বেশী মতবিরোধ নেই অন্ততঃপক্ষে এই চীন নীতি সম্পর্কে। অবশ্য রাজ্যের কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পাদক তা স্বীকার করেন না। তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন। সরকারীভাবে পার্টির পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তাতেও এর উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

কিন্তু কলকাতাকে বাদ দিলেও দেখা যাবে পার্টির এই নীতি অন্ততপক্ষে নির্বাচনের দিক থেকে ফলপ্রসূ হয়নি দার্জিলিং জেলায়। তিব্বত সীমান্তের কোল ঘেঁষে রয়েছে এই জেলা। এই জেলা নিয়ে রাজ্য সরকারের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। গত এক বছরের মধ্যে এই জেলায় যে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত দেখা গেছে তা থেকে অনেকেরই একটা ধারণা ছিল, এখানে কম্যুনিস্ট পার্টি অভূতপূর্বভাবে শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। এমন কি লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী একবার সরোষে ঘোষণা করেছিলেন যে, দার্জিলিং জেলার কম্যুনিস্ট পার্টি সক্রিয়ভাবে চীনের সমর্থনে প্রচারকার্য চালাচ্ছে। ঐ জেলার কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে তিনি তীব্র ভাষাও ব্যবহার করেছিলেন। শ্রীমজুমদার অবশ্য জোরালো ভাষায় অভিযোগ অস্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসী মহলে দৃঢ় ধারণা ছিল দার্জিলিং জেলা কম্যুনিজমের অন্যতম মূল ঘাঁটি হ'য়ে উঠেছে।

নেপালী ভাষা নিয়ে যে আন্দোলন হয় তাতেও অনেকের মনে হ'য়েছিল গোর্খা লীগের চাইতেও কম্যুনিস্ট পার্টিই বেশী লাভবান হ'য়েছে। তার প্রতিধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিক মহলে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, কম্যুনিস্ট পার্টি এই জেলায় এবার একটি আসন হারিয়েছে। এই জেলার মোট আসন সংখ্যা পাঁচ এবং ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে, কম্যুনিস্ট পার্টি দুটি আসন পায় (গোর্খা লীগের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করে)। কংগ্রেস পায় একটি আসন গোর্খা লীগ একটি এবং কংগ্রেস সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী একটি।
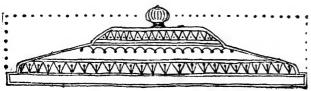
জেলার ভাষা আন্দোলন এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সুস্পষ্ট অনুপ্রবেশের পর মনে হয়েছিল কংগ্রেস এবার একটি আসনও রাখতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু নির্বাচনের রায়ে দেখা গেল, গোর্খা লীগ ও কংগ্রেস পেয়েছে দুটি করে আসন এবং বাকী একটি গিয়েছে কম্যুনিস্টদের হাতে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শিলিগুড়ি কেন্দ্রে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীমজুমদারকে পরাজিত করেছেন কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীজগদীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য। এই পরাজয় কম্যুনিস্ট আসনের ক্ষতির চাইতেও ধাক্কা দিয়েছে বেশী পার্টির নীতি পদ্ধতিকে। বলা ভুল হবে না যে, প্রায় একই পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভা কেন্দ্রেও কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীরতনলাল ব্রাহ্মণকে হার স্বীকার করতে হয়েছে কংগ্রেসপ্রার্থীর কাছে। অর্থাৎ, চীন নীতি এখানে নির্বাচকদের অভিভূত করেনি।

এরপর আলোচনা করা যাক, দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কে পার্টির মূল নীতিগুলো।

প্রথমেই ধরা যাক, পার্টির কৃষক নীতি। পার্টির ঊর্ধ্বতন মহল থেকে বার বার এবং নির্বাচনের আগেও প্রচার করা হয়েছে, কংগ্রেসের ভূমিনীতির ফলে কৃষকরা ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। পার্টি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, জমি যতক্ষণ কৃষকের হাতে পাকাপাকিভাবে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না, কৃষকের অর্থনৈতিক মানের কোন উন্নতি হবে না।

পার্টির ভূমিনীতি যে দুটো অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল সে দুটো অঞ্চল ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকা এবং মেদিনীপুরের প্রায় গোটা অংশ। এই দুটি এলাকায় কম্যুনিস্ট পার্টি সবচাইতে জোর দেয় ভূমিনীতির উপর এবং তারই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দেখা দেয় তে-ভাগা আন্দোলনরূপে। এই তে-ভাগা আন্দোলনের ভিত্তিতে পার্টির সমগ্র ভূমিনীতিকে বিচার করলে ভুল হবে না।

কয়েকদিন আগে, অর্থাৎ নির্বাচনের ফল জানার পর, মেদিনীপুর জেলার এক বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা ও মন্ত্রীকে কয়েকজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন কম্যুনিস্ট নেতাদের এই পরাজয়ের বিশেষ কোন কারণ আছে কি না। তাঁর মতে, আছে এবং বেশ বড় রকমের কারণ ছিল বলেই এই দুই অঞ্চলে এবার কম্যুনিস্টদের ব্যাপক পরাজয় ঘটেছে।

মেদিনীপুরের কথাই ধরা যাক। গত নির্বাচনে এই জেলায় কম্যুনিস্টরা পেয়েছিল চারটি আসন এবং ১৯৫২ সালে নির্বাচনে ছয়টি আসন। এবার পেয়েছে

তিনটি আসন। কংগ্রেস নেতার বিশ্লেষণ অনুসারে, ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে এই জেলায়। এই ঘটনার অধিকাংশই দেখা যায় হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। জেলার অনেক জায়গায় ধানের গোলা পুড়িয়ে দেওয়া হয়, জমির মালিককে বিপর্যস্ত করে জমি দখলের হিড়িক লেগে যায়।

কংগ্রেস নেতা বলেন, কম্যুনিস্ট নেতারা ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে প্রচার করেছিল যে, জমি একবার চাষ করলে পাকাপাকি-ভাবে জমির মালিক হয়ে যাবে যদি কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনে জয়ী হতে পারে। ফলে দেখা গেল, শুধু যে পার্টির প্রার্থীদেরই কৃষকরা বেছে নিল তা-ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে হামলাও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু নির্বাচনের পর যখন দেখা গেল, জমি ত হাতে এলই না, উপরন্তু মালিকদের মামলার চোটে তাদের প্রাণান্ত হতে হচ্ছে, তখনই দেখা দিল প্রতিক্রিয়া কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে। এই সব মামলার ফলে দেখা গেল যে, বর্গায় যারা চাষ করত তারা যদি বা কোনক্রমে টিকে গেল, তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছেলেরা সম্পূর্ণরূপে জমি থেকে উৎখাত হয়ে গেল। আগে তারা কখনও এভাবে উৎখাত হয়নি। ফলে, কংগ্রেস নেতা বলেন, আজ এই কৃষকসমাজ কম্যুনিস্টদের কথা শুনতে রাজী নয়। তাই মেদিনীপুর জেলায় বিপুল পরাজয় ঘটেছে কম্যুনিস্ট কৃষকনেতা শ্রীভূপাল পাণ্ডার।

কংগ্রেস নেতার অভিযোগ যদি সত্যি হয় তা হলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ২৪ পরগনা জেলায়ও কেন পরাজয় ঘটেছে শ্রীহেমন্ত ঘোষাল ও শ্রীসুবোধ ব্যানার্জির মত কৃষক-নেতাদের। সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষক আন্দোলন করেছে কম্যুনিস্ট পার্টি। শুধু তে-ভাগা নিয়েই নয়, বর্গাদারের স্বত্ব নিয়েও। এমন কি তেলেঙ্গানার মত কাকদ্বীপ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষকসমাজকে হিংসাত্মক কার্য-কলাপের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছে জমি তাদের হাতে আসবে এই আন্দোলনের ফলে। কিন্তু আসেনি।

এসেছে মামলা। উচ্ছেদের মামলা। ফৌজদারী মামলা। ঋণ আদায়ের মামলা। এমন কি দেখা গেছে, বহু মাঠের ধান ঘরে ওঠেনি। মাঠে পড়ে নষ্ট হয়েছে, তবু ঘরে ওঠেনি। এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। বার বার কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রীহেমন্ত ঘোষাল চীৎকার করে বলেছেন, 'অপদার্থ কংগ্রেস সরকার বর্গা-দারকে রক্ষা করতে অক্ষম; কৃষককে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই এ-পর্যন্ত হয়নি।,

স্বর্গত বিমলচন্দ্র সিংহ যখন ভূমি-রাজস্বের মন্ত্রী ছিলেন তখন বার বার তাঁকে শ্রী ঘোষালের কাছ থেকে অভিযোগ শুনতে হয়েছে যে, বর্গাদার উচ্ছেদ হয়ে গেল হাজারে হাজারে। তিনি জানতে চেয়েছেন, 'অপদার্থ কংগ্রেস সরকার এদের বাঁচাবার কোন চেষ্টা করবে কি না।' শ্রী ঘোষাল বহুবার হুংকার ছেড়ে বলেছেন, 'সরকার যদি এর প্রতিকার না করে তা হলে বাইরের জনসাধারণই এর জবাব দেবে।'

দিয়েছে এবং অত্যন্ত নিষ্করুণভাবেই জবাব দিয়েছে শ্রী ঘোষালের পরাজয় ঘটিয়ে। এই কথাটাই বলছিলেন কংগ্রেস নেতা সেদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসে। তাঁর মতে কৃষকরা ব্যাপকভাবে আস্থা হারিয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিনীতি ও পদ্ধতির উপর। অশান্তির ভিতর অশান্তিই পেয়েছে কৃষকরা। তাই আজ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এই প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা হয়ত বলা কঠিন, কিন্তু এটা বলা যায় যে, পার্টির নীতি ও পদ্ধতিতে মারাত্মক কোন দুর্বলতা না থাকলে পার্টিকে এভাবে বিপর্যস্ত হতে হত না এই নির্বাচনে যেমন হয়েছে তে-ভাগা আন্দোলন অঞ্চল-জুড়ে। হয়ত পরাজয় ঘটত না, শ্রীকংসারী হালদারের।

কোন কোন কংগ্রেস নেতা মনে করেন যে, শুধু ভূমিনীতিই নয়, শ্রমিক-নীতিও কম্যুনিস্টদের মধ্যে এবারের নির্বাচনে-বিপর্যয় ঘটিয়েছে। তাঁদের সুস্পষ্ট মত এই যে, বার বার ব্যর্থ আন্দোলনের মুখে ঠেলে দিয়ে পার্টি শ্রমিকদের আস্থা হারিয়েছে। তা ছাড়া আরও মারাত্মকভাবে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেটা শিল্পপতিদের প্রতি-ক্রিয়া। দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন যত ব্যাপক হয়ে উঠছে ততই শিল্পপতিরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান খুঁজছেন ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। ফলে, আজ একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে পশ্চিম বাংলা থেকে অন্যত্র শিল্প-সংস্থা সরিয়ে নিয়ে যাবার।

আশা করা যায়, এই আশঙ্কা অমূলক হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেছে কোন কোন শ্রমিক মহলে আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তা ছাড়াও আছে ট্রেড ইউনিয়ন
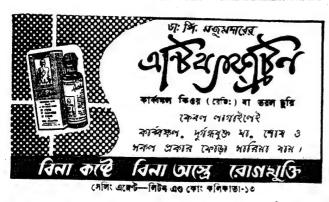
দলাদলি যা পরোক্ষভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষতি হিসেবে দেখা দেবেই।

যেদিক থেকেই বিশ্লেষণ করা যাক, দেখা যাবে এই নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিগত পদ্ধতি অনেকাংশে কাজ করেছে। এই বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায়, নীতির দিক থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি যে-সব অঞ্চলে সবচাইতে বেশী নিরুদ্বিগ্ন ছিল সেই সব অঞ্চল থেকেই প্রতিঘাত ও বিস্ময় এসেছে সবচাইতে বেশী। বর্তমান নির্বাচনে এটাই ছিল পার্টির মারাত্মক 'স্ট্র্যাটেজিক' দুর্বলতা।

এর পরেই প্রশ্ন ওঠে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়া বামপন্থী দলের নির্বাচনী জোট এবং বহু বিঘোষিত 'বিকল্প' সরকার গঠন।

গত নির্বাচনেও বামপন্থী জোট কাজ করেছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং বামপন্থী সরকার গঠনেরও শ্লোগান তোলা হয়েছিল। তার-ফলে ১৯৫২ সালের তুলনায় অনেক বেশী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে। সেই জোটে কম্যুনিস্ট পার্টির বড় শরিক ছিল প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি এবং আরও তিনটি দল। ১৯৫৭ সালের এই বামপন্থী জোটের ফলে প্রত্যক্ষভাবে যা ঘটেছিল তা বিরোধী পক্ষের শক্তিবৃদ্ধি। এই শক্তিবৃদ্ধির মূলে অংশ পেয়েছিল, প্রধানত, কম্যুনিস্ট পার্টি এবং দ্বিতীয়ত পি এস পি দল। কম্যুনিস্ট পার্টির আসন-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৮ থেকে ৪৬ এবং পি এস পি (১৯৫২ সালে এই দল ছিল না) পেয়েছিল ২১টি। এমন কি ভোটের অংশও বেশী ছিল এদের ভাগে। যেমন, কম্যুনিস্ট পার্টির ভোটাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১০.৭৬ থেকে শতকরা ১৭.৮২। আর পি এস পি পেয়েছিল শতকরা ৯.৮৫ ভাগ (১৯৫২ সালের কে এম পি পি-র তুলনায় সামান্য বেশী)। অন্য দিকে বামপন্থী জোটের আর এক শরিক ফরোয়ার্ড ব্লককে বেশ কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। এই ব্লক ১৯৫২ সালে পেয়েছিল ১১টি আসন (জোট না করে) এবং ১৯৫৭ সালে পায় ৮টি আসন (জোট করে)। ১৯৫২ সালে এই দলের ভোটাংশ ছিল শতকরা ৫.২ (জোট না করে)। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে পেয়েছিল শতকরা ৪.২ (জোট করে)। অন্য দিকে আর এস পি ও সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছিল।

তবু ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে দেখা গেছে বামপন্থী জোটের পক্ষ থেকে ২০০-র বেশী প্রার্থী দিয়েও 'বিকল্প সরকার' গঠন করা সম্ভব হয়নি। এমন কি, সম্মিলিতভাবে জোটের ভোটাংশ বৃদ্ধি পেলেও বৈধ ভোটের এক-তৃতীয়াংশের বেশী পাওয়া সম্ভব হয়নি এবং অন্য দিকে কংগ্রেসের ভোটাংশ শতকরা ৩৮.৯৩ থেকে শতকরা ৪৬.১৪ যে বৃদ্ধি ঘটেছে তা-ও রোধ করা সম্ভব হয়নি।

তাই এবারেও নির্বাচনের কয়েক মাস আগেই কম্যুনিস্ট পার্টি বামপন্থী জোটের প্রস্তাব করে বিভিন্ন বিরুদ্ধ দলগুলির কাছে। কিন্তু এবারে কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের বর্ধমান সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে এটা জানিয়ে দেয় যে-সব বিরোধী দল পার্টির নীতি নিয়ে প্রকাশ্য সমালোচনা করে তাদের সঙ্গে জোট বাঁধা হবে না। সেই অবস্থায়

পার্টির পক্ষে এ-কথা বলা সম্ভব ছিল, কারণ বিরোধী দলের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি তখন মধ্যমণি।

এ-শর্তের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত হল প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টিকে বাদ দেওয়া। কারণ ইতিমধ্যেই পি এস পি প্রকাশ্যভাবে এবং অত্যন্ত তীব্র ভাষায় কম্যুনিস্ট পার্টির চীন নীতিকে সমালোচনা করেছিল। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, ১৯৬২ সালের জোটে পি এস পি কম্যুনিস্ট পার্টিকে নির্বাচনের আসরে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত।

বামপন্থী জোটের জন্য তাই নির্ভর করতে হল ফরোয়ার্ড ব্লকের উপর বিশেষ করে, কারণ, পি এস পি-র পর এরাই দল হিসেবে বিধানসভায় বড়। আর এস পি সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট পার্টির কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে যে সাফল্য লাভ করেছিল এই দল জোটের ফলে তাতে আর এস পি-র পক্ষে ১৯৬২ সালের জোটে না যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। পারে না বলেই এই দল শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে। নীতিগত পার্থক্য, বিশেষ করে চীন সম্পর্কে কম্যুনিস্ট নীতি জোট-এর প্রধান প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিয়েছিল।, এই বিবাদের মধ্যস্থতা করে অবস্থাটা যা দাঁড়াল তাতে এস ইউ সি-কে সরে দাঁড়াতে হল। কারণ এই দল তীব্রভাবে চীনপন্থী।
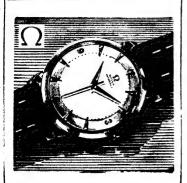
কাজেই এই নির্বাচনে যদিও বামপন্থী জোট কাজ করেছিল, তবু এই জোটের মধ্যে অনেকটা ফাঁক বা ফাঁকি ছিল। শুধু প্রত্যক্ষভাবে যেটা কার্যকরী হয়েছে তা নিরঙ্কুশভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে আসর জাঁকিয়ে তোলা।

এবারের নির্বাচন সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথম থেকে কিছুটা নিরুদ্বেগের মনোভাব নিয়েই আসরে নেমেছিল। কারণ, এদের একটা ধারণা ছিল যে, বামপন্থী জোটে যদি ১৯৫৭ সালে নিজস্ব দলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে থাকে, তা হলে এবারে আরও ২৫।৩০টি আসন পাওয়া শক্ত হবে না।

ফলে, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কম্যুনিস্ট পার্টি গত নির্বাচনে যেখানে ১০৩ জন নিজস্ব প্রার্থী দিয়েছিল এবার সেখানে ১৪৩ জন নিজস্ব প্রার্থী দিয়েছে। অর্থাৎ, 'বিকল্প' সরকার গঠন করার জন্য যে সংখ্যক প্রার্থী দেওয়া প্রয়োজন বলে পার্টি মনে করেছিল তা দেওয়া হয়েছিল। আশা ছিল, এই ১৪৩ জনের মধ্যে (২৫টি বেশী আসন যদি পাওয়া যায়) ৭০ জনও নির্বাচিত হলে কংগ্রেস শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হবে।

মনে হয়, এই গাণিতিক ভিত্তিতেই কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক এবার 'বিকল্প' সরকার গঠনের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস মহল থেকেও এই শ্লোগানকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রতি নির্বাচনী সভায় তাই কংগ্রেস নেতারা কম্যুনিস্ট পার্টির এই স্লোগানকে বিদ্রূপ করেছেন, সমালোচনা করেছেন।

নির্বাচনী 'স্ট্র্যাটেজির' দিক থেকেও এই স্লোগান শেষ পর্যন্ত বিশেষ করে কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করেছে। গত নির্বাচনে বামপন্থী জোট (নির্দলীয় ছাড়া) যেখানে এক-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েছিল সেখানে একমাত্র পি এস পি-র অবদানই ছিল শতকরা ৯·৮৫। এই অংশ বাদ দিলে এবারের বামপন্থী জোটের ভাগে থাকে প্রায় শতকরা ২২। এই ভোটাংশ নিয়ে আর যাই হোক 'বিকল্প' সরকারের স্লোগানের পক্ষে কোন যুক্তি থাকে না। দেখা যায়, এবারের বামপন্থী জোটের ভাগে যে ভোটের অংশ পড়েছে তা গতবারের অংশকে ছাড়িয়ে যায়নি। পি এস পি-কে বাদ দিয়ে জোটের ভাগে এক-তৃতীয়াংশ ভোটও পড়েনি এবারের নির্বাচনে।

এবারের নির্বাচনী জোটের প্রত্যক্ষ ফল যেটা দেখা গেছে তা পি এস পি-র বিপুল ক্ষতি। বলা চলে, রাজনীতির দিক থেকে এই দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ, নির্বাচনী আসরে পি এস পি-র প্রধান ভূমিকা ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি ও পদ্ধতিকে আক্রমণ করা। নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই দল নির্বাচকদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি বলেই, কোন কোন রাজনৈতিক মহলে এই দলকে ক্ষুদে কংগ্রেস বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

পি এস পি-র নিজস্ব নীতি ও প্রোগ্রাম ছিল না বললে ভুল হবে। ছিল, কিন্তু নির্বাচকদের কাছে তা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। তাদের কাছে এটাই বেশী মনে হয়েছে যে, কংগ্রেসের সঙ্গে এই দলের পার্থক্য একমাত্র নির্বাচনী বিরোধিতায়। তাই এই দলকে কংগ্রেসের 'ভাঙ্গাডাল' বলে যখন অভিহিত করা হয়েছে নির্বাচনী সভায় তখন নির্বাচকরা এই দলের দিকে দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি। তা ছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি বিশেষ করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল এই দলকে 'শায়েস্তা' করতে।

ফলে, এবারের নির্বাচনে এই দল কোন রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে এই দল পেয়েছিল ২১টি অসান, এবার পেয়েছে ৫টি আসন। গতবার ভোট পেয়েছিল শতকরা ৯·৮৫; এবার পেয়েছে শতকরা ৫। কয়েক জায়গায়, যেমন মেদিনীপুর জেলায় এই দল কংগ্রেসকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে, কিন্তু ক্ষতিও হয়েছে বিপুল।

দলের প্রধান ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সর্বজনসমাদৃত নেতা। তবু তিনি পরাজিত হয়েছেন লোকসভার নির্বাচনে। বলা চলে, আইনসভার রাজনীতি থেকে তিনি নির্বাসিত হয়েছেন। এই দলের দ্বিতীয় আঘাত শ্রীদাশরথি তা'র পরাজয়ে। বিধানসভায় এ'র জুড়ি কম। এ'কেও বিদায় নিতে হয়েছে বিধানসভা থেকে। সর্বোপরি কলকাতায় গত নির্বাচনে এই দল পেয়েছিল চারটি আসন। এবার তার প্রতি আসন হাতছাড়া হয়েছে। কলকাতার অন্তত বলা চলে পি এস পি-র নাম মুছে গিয়েছে। শ্রমিক মহলেও এই দলের আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, কোলিয়ারী শ্রমিক নেতা শ্রীদেবেন সেন এবং পাটকল শ্রমিক নেতা শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জি—দুজনেই পরাজিত।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

সভ্যতার সঙ্কট ও রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

কবি যদি আরও দশ বছর বাঁচতেন ও আশি বছর বয়সে না লিখে নব্বই বছর বয়সে তাঁর শেষ জবানবন্দী "সভ্যতার সংকট" লিখতেন তা হলে আর যেই হোক ইংরেজ হতো না তাঁর "villain of the piece" ততদিনে জার্মানরা ষাট লাখ ইহুদী ও সমসংখ্যক পোলকে বালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে গ্যাস দিয়ে দম বন্ধ করে মেরেছে। মার্কিনরা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে গোটা দুই আণবিক বোমা ফেলেই লাখ কয়েক জাপানীকে মুছে ফেলেছে। যারা প্রাণে বেঁচেছে তাদেরও দুর্ভোগের অন্ত নেই। তারা নতুন রকমের ব্যাধিতে ভুগছে। আণবিক বোমা হাতে থাকলে জাপানীরাও যে ইতস্তত করত তা নয়। না থাকতেই তারা যা করেছে তার হিংস্রতা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীন কোনো দিন ভুলবে কি না সন্দেহ। প্রাচ্য দেশ বলে জাপানের প্রতি কবির যে মমতা ছিল সেটা সেইদিনই লোপ পেতো জাপান যেদিন ভারতবর্ষ আক্রমণ করত। করেনি যে সেটা কবির প্রতি বা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়।

রুশ দেশের সোভিয়েট শাসন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মোহ ছিল সেটাও মিলিয়ে যেতো স্টালিনের দুষ্কৃতির কাহিনী খোদ ক্রুশ্চভের জবানীতে শুনে। তবে তার জন্যে তাঁকে আরো বছর পাঁচেক বাঁচতে হতো। আরো দশ বছর বাঁচলে তো চীন সম্বন্ধেও তাঁর মোহভঙ্গ ঘটত। প্রাচ্য এবং প্রাচীন বলে চীন যে কবির মুখ রক্ষা করত তা নয়। ফ্রান্স সম্বন্ধেও তাঁর মনে একটি নরম কোণ ছিল। আহা, ফরাসী বিপ্লবের দেশ যে! কিন্তু আলজেরিয়ায় ফ্রান্স বোধ হয় এই কয় বছরে কমসে কম দেড় লাখ আরব হত্যা করেছে। সমগ্র ব্রিটিশ আমলে ইংরেজের হাতে যত ভারতীয় নিহত হয়েছে তাদের সংখ্যা এর সিকিভাগও নয়।

তা হলে কার সম্বন্ধে কবির মোহ থাকত? ভারত সম্বন্ধে? সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশ সালের নরহত্যা, নারীহরণ, লুটতরাজ, অগ্নিকান্ড ইত্যাদির জের এখনো মেটেনি। দেশের মাঝখানে প্রাচীর তুলে কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে দু'পক্ষের খুনেদের লুটেরাদের। একই দেশের দুই পৃথক অংশ এখন পরস্পরের ভয়ে ইংরেজ আমলের তুলনায় বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে। তাদের এখন জেট বোমারু বিমান পর্যন্ত আছে, যা ইংরেজেরও ছিল না। একপক্ষ যদি কোনো গতিকে আণবিক বোমা যোগাড় করে তো অপর পক্ষও করবে। তৈরি থাকলে বেধে যেতে কতক্ষণ?

যুদ্ধ বাধুক কেউ এটা চায় না, অথচ নিরস্ত্রীকরণের ফলে মন্দা দেখা দিক এটাও কারো ইচ্ছা নয়। মন্দা এড়ানোর উপায় যদি হয় কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন তাতেও পশ্চিমের লোকের আপত্তি। আমাদেরও। আফগানিস্তানের মতো বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাৎপদ দেশ হয়ে যদি কোনও সমাধান থাকে, তবে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয় একটা মার্গ হয়তো সর্বোদয়, কিন্তু এখনো সেটা ভারতবর্ষেই অপরীক্ষিত। যতদিন না মন্দা নিবারণের উত্তম উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে ততদিন লোকে নাচার হয়ে সামরিক প্রস্তুতি সমর্থন করবে। একপক্ষের প্রস্তুতি লক্ষ করে অপরপক্ষ প্রস্তুত হবে। কোনো আয়ুধই বাদ দেবে না। তা পরীক্ষা করতে গিয়ে সবাইকে বিপন্ন করবে। নিজেও বিপন্ন হবে। সভ্যতার দোহাই দিলেও শুনবে না। ভগবানের দোহাই তো কবে বাতিল হয়ে গেছে। যীশুর জন্মদিনেও খ্রীস্টান নেশনদের যুদ্ধ স্থগিত থাকেনি।

যুদ্ধ এক হাতে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। মন্দা আরেক হাতে। অথচ দুই হাতে করে যেতে হবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি। এই হলো মোটামুটি পশ্চিমাদের পলিসি। নিকট ভবিষ্যতে এর মৌল পরিবর্তন সম্ভব নয়। পরিবর্তন ততটুকুই হবে যতটুকু উভয়পক্ষের আলাপ আলোচনার ফলে নিরাপদ। নীতির অনুশাসন মেনে শুভবুদ্ধির অনুরোধে মহৎ কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়তো ব্যক্তিবিশেষকে বা সংঘবিশেষকে এগিয়ে আসতে দেখা যাবে, কিন্তু জাতিবিশেষ বা দেশবিশেষ যে নিরাপত্তার চেয়ে আর কোনো গণনাকে বড় মনে করবে তেমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। যুদ্ধ যদি বাধে নিরাপত্তার নামেই বাধবে। একপক্ষ বলবে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্যেই যুদ্ধ। অপরপক্ষ এর উত্তরে বলবে কমিউনিজমকে নিরাপদ করার জন্যেই যুদ্ধ। আবার যুদ্ধ যদি ঠেকিয়ে রাখা হয়, তবে সেটা নিরাপত্তার নামে। মানুষকে পাইকারি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মানসে।

আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নই। যুদ্ধ বাধবে কি বাধবে না বলতে পারব না। কিন্তু এটুকু

বলতে পারি যে যুদ্ধ যদি আরো বছর দশেক পেছিয়ে যায় তা হলে প্রস্তুতির ভারে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। সুতরাং প্রস্তুতিও মন্থর হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু তার ফলে যদি মন্দা দেখা দেয়, তবে আবার ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে। অগত্যা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে সমাজের কল্যাণের দায়। সোজা বাংলায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার। বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও পাবলিক সেক্টর ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। প্রাইভেট এণ্টার-প্রাইজ এক কালে ধর্মের ষাঁড় ছিল। তার গায়ে হাত দেয় কার সাধ্য! একটু একটু করে সে বলদে পরিণত হচ্ছে। রাতারাতি বিপ্লব ঘটলে প্রতিবিপ্লবও ঘটবে। কিন্তু তিলে তিলে অলক্ষ্যে যা ঘটে যাচ্ছে সেও একপ্রকার বিপ্লবই। শুধু তার প্রতিবিপ্লব নেই। আর তার নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

ক্যাপিটালিজম বল, কমিউনিজম বল, সোশ্যিয়ালিজম বল সব ক'টারই শিকড় নেমে গেছে একই জায়গায়। পাঁচ শ' বছর আগে যে রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম ঘটে তার মধ্যেই ছিল পুনর্বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা। পুনর্বিন্যাস না ঘটলে রেনেসাঁস পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সেই সময় থেকেই ধ্যানীরা ধ্যান করে এসেছেন পুনর্বিন্যাসের। এমনি একটি ধ্যানের নাম ইউটোপিয়া। ধ্যানীর নাম সার টমাস মোর। প্রত্যেক শতকেই একাধিক ধ্যানী একাধিক ধ্যান করেছেন। কেজো মানুষরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সব উড়ে গেলেও একটা কথা মানুষের মনে গেঁথে গেছে। এই মর্ত্যভূমিকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে নিরলস কর্মসাধনার দ্বারা কাম্যলোকে পরিণত করা সম্ভব। তার জন্যে চাই জীবন ও জীবিকার, সমাজ ও অর্থনীতির, উৎপাদন ও বণ্টনের পুন-র্বিন্যাস। গতানুগতিককে অক্ষুণ্ণ রাখা চলবে না। আবার অকারণে ক্ষুণ্ণ করাও কাজের কথা নয়। কী রাখতে হবে, কী ছাড়তে হবে, কী গড়তে হবে, কী ভাঙতে হবে এ নিয়ে অনবরত চিন্তা করতে হবে, বিচার করতে হবে, জল্পনা করতে হবে, কল্পনা করতে হবে। তারপর কাজে নামতে হবে। ফল দেখাতে হবে। সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। তারই নাম প্রগতি। মানুষ উত্তরোত্তর প্রগতি করবে। এক পুরুষে যা হলো না আরেক পুরুষে তা হবে। এক শতাব্দীতে যা হলো না আরেক শতাব্দীতে তা হবে। তার চলার পথে বাধা আসবে বিপত্তি আসবে, কিছুকালের জন্যে সে পেছিয়ে যাবে, তারপর আবার এগিয়ে যাবে। মানুষের ইতিহাসে বিশ ত্রিশ বছর ধর্তব্য নয়। শতাব্দী অনুসারে যদি হিসাবনিকাশ করা হয় তা হলে দেখা যাবে মানুষ মোটের উপর এগিয়েছে।

আদিকাল থেকেই মানুষের মনে সাধ ছিল সে আকাশে উড়বে। সে সাধ পূর্ণ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেলুনে চড়ে। এখন তো সে মহাশূন্যেও ঘুরে এলো। সত্যি সত্যি একদিন সশরীরে চন্দ্রলোকে যাবে। যাবে মঙ্গলগ্রহেও। প্রগতি বইকি। তেমনি আদিকাল থেকেই মানুষের স্বপ্ন ছিল ক্রীতদাসপ্রথা উঠিয়ে দেবে। সে স্বপ্ন সার্থক হলো ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। এখন তো ভূমিদাসদের বংশধররাই রাশিয়ার তথা অর্ধেক পৃথিবীর অধিনায়ক। এ যদি প্রগতি না হয় তবে প্রগতি কাকে বলে? এমনি কত দিকে যে কত রাস্তা খুলে গেছে, কত দূরে অগ্রসর হওয়া গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সব মানুষ তার সমান শরিক নয়, সত্যি। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ তো এক আধজন মানুষই নেয়। একজনের পর একজন চলতে চলতেই পায়ে

চলার পথ জনবহুল হয়। গোড়া থেকেই যদি পণ করতে হয় যে সব মানুষকে সঙ্গে না নিয়ে আবিষ্কারে বার হব না তা হলে প্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। তখন সবাই মিলে স্থিতিশীল হওয়াই মোক্ষলাভের উপায়।

রেনেসাঁস বা পুনর্জন্মের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি পুনর্বিন্যাস। পুনর্বিন্যাস এক আধ শতাব্দীর ব্যাপার নয়। পুরাতন জীবনযাত্রাকে, সমাজব্যবস্থাকে, মৌল ধারণাকে, বদ্ধমূল সংস্কারকে ঢেলে সাজতে বহু শতাব্দী লেগে যায়। ইংলণ্ড আজ যা হয়েছে তা পাঁচ শ' বছরের পুনর্বিন্যাসের ফলে। রাশিয়া দেরিতে আরম্ভ করেছে বলে তাকে পাঁচ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দুই শতাব্দীতে ঠাসতে হয়েছে। তাতেও কুলোয়নি বলে বিপ্লব বরণ করতে হয়েছে। মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। জাপান আরম্ভ করেছে আরো দেরিতে। তাকেও লাফ দিয়ে এগোতে হয়েছে। লাফ দিতে গিয়ে সে খাদে পড়েছে। হাত পা ভেঙেছে। তবু তার অগ্রগতির বিরাম নেই। কেউ এমন কথা জোর করে বলতে পারে না যে জাপানে কোনো দিন বিপ্লব ঘটবে না। তবে তার সম্ভাবনা কম। কারণ জাপানের ধনিকরা চক্ষুষ্মান। অনেক সময় চক্ষুষ্মানরাও অবস্থার চাপে বেচাল হয়। আর একটা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে জাপানের অবস্থা চক্ষুষ্মানদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। সে ভয় আমাদের এ দেশেও আছে। মহাযুদ্ধের দাবী এমন সর্বগ্রাসী যে মানুষ সে দাবী মেটাতে গিয়ে দেখে সে আর অবস্থার প্রভু নয়, সে অবস্থার দাস। তখন অবস্থাই তাকে যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রিত করে।

জগতের রঙ্গমঞ্চে যেসব শক্তি পাঁচ শতাব্দী ধরে ক্রিয়া করছে তাদের সব ক'টার সূচনা রেনেসাঁস থেকে নয়। অধিকাংশ মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। ধর্মে ধর্মে ভেদ যত না আছে মিল আছে তার বেশী। সব ধর্মই মানুষকে শেখায় অন্তর্মুখী হতে, অন্তরের দিক দিয়ে অগ্রসর হতে। ধার্মিক মাত্রেরই প্রশ্ন হলো, আমি কি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না ঈশ্বরের উল্টো দিকে এগোচ্ছি? যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তিনি বলেন, আমি কি নির্বাণের দিকে বা মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছি না তার বিপরীত দিকে পা চালাচ্ছি? প্রগতি বলতে ধার্মিকরা বোঝেন একটা দেশ-কালাতীত সত্যের অভিমুখে অগ্রগতি। তাকে ইতিহাস বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থ-নীতির মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তা বলে তাকে আফিং গাঁজা বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

স্মরণাতীত কাল হতেই মানুষ এমনভাবে মানুষ হয়েছে যে পার্থিব ঐশ্বর্যকেই তার নশ্বর জীবনের অন্তিম লক্ষ্য বলে স্বীকার করতে লজ্জিত হয়েছে। মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে সে বলেছে, "যাতে আমাকে অমৃত না করবে কী করব আমি তা নিয়ে?" নচিকেতার মুখ দিয়ে বলেছে, "বিত্তে পরিতৃপ্ত হতে পারে না মানুষ।" যীশুর মুখ দিয়ে বলেছে, "তোমার তাতে লাভ কী যদি সমগ্র জগৎটাকে পাও অথচ আপনার আত্মাকেই হারাও।" এমনি কত মহা-পুরুষের মুখ দিয়ে কত রকম করে বলেছে যে, এই সব নয়। আরো আছে। সেই আরোকে যদি না পাই তবে আমি ইহলোকে বা ইহকালে অচরিতার্থ। আমার চরিতার্থতার জন্যে চাই একটা পরলোক বা পরকাল। বা পরজন্ম। সব ধর্মেই মানুষকে এর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এমন কি মহাযান বৌদ্ধধর্মেও। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধনসম্পদ বহুগুণিত করে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব মানুষের মধ্যে সমভাগ করে দিলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই কি সব?

সভ্যতার জন্যে একটা মেটিরিয়াল ভূমি চাই। যা না হলে সে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু তাকেই যারা একান্ত করে দেখে তারা সভ্যতার ঠাটটাকেই সভ্যতা বলে ভুল করে। বৈজ্ঞানিকরা আধপেটা খেয়ে জীর্ণ পোশাক পরে বছরের পর বছর এক একটা পরীক্ষা বা গবেষণা নিয়ে থাকেন। নিজের উপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে প্রাণ দেন। দার্শনিকদেরও আহার নিদ্রা নেই। কোনো একটা তত্ত্বের পিছনে ধাওয়া করে জীবন কেটে যায়। সংসার করার মতো রসদ জোটে না। করলেও সংসার অবহেলিত হয়। এ'রা যদি সুখের পায়রা হতেন তা হলে রেনে-সাঁসই হতো না। হলে মাঝপথে থেমে যেতো। শিল্পীদের মধ্যে সাংসারিক সাফল্য ক'জনের বরাতে জোটে? জুটলে শেষ বয়সে। যাঁরা সরস্বতীর পূজা করতে গিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা করেন তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু তাঁদের বাড়ি গাড়ি ও ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সাহিত্যের ঐশ্বর্য নয় বা চিত্রকলার বিভ নয়। সরস্বতীর ভাণ্ডারে যা জমে তা দিয়েই সভ্যতার বিচার হয়ে থাকে, লক্ষ্মী ভাণ্ডার তো আজ আছে কাল নেই।

যুদ্ধ কোনো মতে ঠেকিয়ে রাখলেও এই সভ্যতার জন্যে মাথাব্যথার যথেষ্ট কারণ আছে। অনেকের মতে রেনেসাঁসটাই একটা ভুল মোড়। মানুষ ভুল মোড় নিয়ে ভুল পথে চলেছে। তাকেই ভাবছে অগ্রগতি। এখন তার কর্তব্য হবে প্রগতির অহঙ্কার ভুলে নম্রভাবে পশ্চাদ অপসরণ। ফিরে গিয়ে ঠিক মোড় নিতে হবে। তা হলেই তার জীবনে অখণ্ডতা আসবে। তখন বিজ্ঞান আর দর্শন আর ধর্ম আর সমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা পরস্পরবিরোধী হবে না। একই মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তখন স্পিরিচুয়াল আর মেটিরিয়াল একই লক্ষ্যের ইশারা করবে। বিপরীত লক্ষ্যের নয়। সত্যিকার প্রগতির অপরিহার্য সর্ত হচ্ছে কয়েক শতাব্দী পৌঁছিয়ে গিয়ে তারপরে সব দিক রক্ষা করে সবাইকে নিয়ে অগ্রসর হওয়া।

টলস্টয় কিন্তু কয়েক শতাব্দী পশ্চাদ অপসরণেই সন্তুষ্ট হবেন না। ফিরে যেতে হবে আদি খৃষ্টান যুগে। যখন প্রেমধর্ম রাজধর্ম হয়নি, রাজধর্ম হয়ে বিকৃত হয়নি। সেই মোড়ে ফিরে গিয়ে সেইখান থেকে নতুন করে যাত্রারম্ভ হবে। নতুন পথে। যে পথের এক ধারে সঙ্ঘ অপর ধারে রাষ্ট্র সে পথে নয়। যে পথের একধারে অহিংসা অপর ধারে গ্রামোদ্যোগ সেই পথে। সঙ্ঘ আর রাষ্ট্র

মানুষকে বিপথগামী করেছে ঐশ্বর্যের অভিমুখে। ঈশ্বরের অভিমুখে সুপথগামী করেনি। সাধু সন্তেরা শত হস্ত দূরে থেকেছেন। কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন।

টলস্টয়ের অম্বিষ্ট আদি খ্রীষ্টান জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য মানবপ্রেমকে সূর্য করে তার সৌরমণ্ডলে আর সমস্ত বিষয়কে সন্নিবেশ করা। তার সংগে যা বেখাপ তাকে বাদ দিতে হবে। ভয়ের শাসন তার সংগে খাপ খায় না। অতএব রাষ্ট্র বাতিল। সংঘও তো রাষ্ট্রের সংগে হাত মিলিয়ে তার পাপের ভাগী হয়েছে। রক্তের দাগে দাগী হয়েছে আপন শক্তির মদে অন্ধ হয়ে। অতএব সংঘ নাকচ। কিন্তু এসব বাদ গেলেও ধর্ম থাকবে, নীতি থাকবে, যীশুর বাণী ও আদর্শ থাকবে, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম থাকবে। প্রেমের শাসনে মানুষ সুশৃংখল জীবন যাপন করবে। সভ্যতার বুনিয়াদ এমন গভীর করে পাততে হবে যে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বিরোধ বাধবেই না। যদি বাধে তার জন্যে বিহিত রয়েছে [illegible] মন্দের প্রতিরোধ কোরো না।

টলস্টয়ের মতে অপ্রতিরোধই প্রকৃত প্রতিরোধ। অবশ্য যিনি প্রতিরোধ করবেন তিনি আপনি ভালো হবেন। মন্দ যাতে প্রতিপক্ষের দিক থেকে পরোক্ষ সহায়তা না পায়। টলস্টয়ের ব্যাখ্যায় যা অসম্পূর্ণ ছিল গান্ধী এসে তাকে সম্পূর্ণতা দেন। প্রতিরোধ করতে হবে প্রেম দিয়ে, আত্মার তেজ দিয়ে বীরের অহিংসা দিয়ে। মন্দ হয়ে নয়, মন্দ ভেবে নয়, মন্দ উপায়ে নয়, কাপুরুষের মতো নিষ্ক্রিয় থেকে নয়। গঠনের কাজ করতে করতে। চিত্তশুদ্ধিপূর্বক।

সংঘ বিমুখ চিন্তা রেনেসাঁসের পূর্বে ছিল না। সংগে সংগেই শুরু হয়। তার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রোটেস্ট করলেন তাঁরাও প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন যে সংঘ না হলে চলে না। একচ্ছত্র সংঘের পরিবর্তে তাঁরা স্থাপন করলেন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একাধিক সংঘ। রাষ্ট্রের সংগে যোগসূত্র ছিন্ন হলো না তাঁদের সেইসব সংঘের। পরবর্তীকালে ছোট ছোট কয়েকটি সংঘ রাষ্ট্রের থেকে তফাৎ থাকে। রাষ্ট্রের থেকে সংঘের তফাৎ থাকার নতুন ঐতিহ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা গ্রহণ করেন। তাঁদের রাষ্ট্রে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব আছে কিন্তু রাষ্ট্র আর সংঘ নিঃসম্পর্কীয়। যেমন ছিল আদি খ্রীষ্টান যুগে। সংঘ জিনিসটাই যাঁদের কাছে অসহ্য তাঁদের কেউ বাধ্য করে না যোগ দিতে। সংঘ না থাকলেও ধর্ম থাকে, যেমন ছিল যীশুর আপন জীবনে।

রাষ্ট্রের কথা আলাদা। রাষ্ট্রবিমুখ চিন্তাও রেনেসাঁসের পূর্বে ছিল না। কিন্তু সংগে সংগেই শুরু হলো না। বরং দেখা গেল রাষ্ট্র আরো নিরংকুশ হয়েছে। রোমান ক্যাথলিক সংঘ ছিল তার ছত্রাধীন সকল রাষ্ট্রের উপরে। প্রোটেস্টাণ্ট সংঘগুলিকে কোনো রাষ্ট্রই উপরওয়ালা বলে স্বীকার করল না। বরং রাষ্ট্রই হলো উপরওয়ালা। অনিবার্য হলো রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তা। ইংলণ্ডের মতো যে দেশে প্রজা প্রতিনিধিদের হাতে অংকুশ চলে যায় সে দেশে তেমন নয় যেমন ফ্রান্সে, জার্মানীতে, রাশিয়ায়। কথা উঠল রাষ্ট্র বলে কেন একটা কিছু থাকবে! কার স্বার্থে? পুলিস তো দেখা যায় ধনীদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যেই হয়েছে। আর সৈন্যদল হয়েছে অন্যান্য দেশ দখল করে ধনীদের ধনবৃদ্ধির জন্যেই। অথবা তাদের অন্যদেশীয় প্রতিযোগীদের শক্তি হ্রাস করার জন্যেই।

বাকুনিন প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদ করার কল্পনা করলেন। মার্ক্স বললেন, রাষ্ট্র একদিন আপনা হতেই শুকিয়ে যাবে। সুতরাং তার মূলোচ্ছেদ

করতে হবে না। আপাতত তাকে করায়ত্ত করে শোষিত শ্রেণীর কাজে লাগানো চাই। করায়ত্ত করার যদি কোনো ভদ্র উপায় না থাকে তবে অভদ্র উপায় অবলম্বন করতে হবে। এটা ইতিহাসের নির্বন্ধ। তুমি আমি করছিনে, ইতিহাস করছে। মার্ক্স একটা শাস্ত্র লিখে শ্রেণী সংঘাতের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেলেন। আর নৈরাজ্যবাদীরা কতকগুলি ব্যক্তিকে বধ করেই রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদ পর্ব সমাপন করল।

রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তা ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে কাজে লাগানোর চিন্তাই এখন প্রবল। অধিকাংশ দেশেই প্রজা প্রতিনিধিদের হাতে অংকুশ এসে গেছে। দরিদ্রতমেরও ভোট দেবার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। সে যদি টাকার জন্যে ভোট বেচে তবে সেটা রাষ্ট্রের দোষ নয়। ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকরা এখন ঘোরতর সঙ্ঘবন্ধ। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর এক্তারে লক্ষ লক্ষ ভোট। শ্রমিকরা ভোট দেয় ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশে। শ্রমিক স্বার্থের ভিত্তিতেই ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। তবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে ধার্মিকরাও আর একপ্রস্থ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাপন করেছেন। রোমান ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়ন। তেমনি ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন করাও চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় ধর্মের রথচক্র-- মুখর। ক্যাথলিক ধর্মের। ভোটগুলো যদি ধার্মিকরা না পান কমিউনিস্ট বা সোশিয়ালিস্টরা পাবে। তাতে ধর্ম আর অর্থ দুই বিপন্ন হবে। মোক্ষও কি বিপন্ন হবে না?

আবার এমন দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছি যে, আমেরিকার ক্যাথলিকদের ছোট্ট একটি গোষ্ঠী আছে, নাম "ক্যাথলিক ওয়ার্কার।" এঁরা গ্যারিসন, থোরো আর গান্ধীর ঐতিহ্য অনুসরণ করতে চান। যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন না বলে এঁরা ইনকাম ট্যাক্স না দিয়ে জেলে যান। পরমাণবিক বোমার ভয়ে যেসব আত্মরক্ষার আশ্রয় নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে ঢোকার জন্যে যখন সাইরেন বাজানো হয় তখন এঁরা তার বিরুদ্ধতা করে কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহ ও গঠনকর্ম এঁদের মূল নীতি। এমনি অনেক খাতে টলস্টয়ের চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে। একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। হতে পারে না। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রের উপর গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তার দাবী অনেক সময় বিবেকবিরুদ্ধ। ইচ্ছা করলেই সে নাগরিকদের যুদ্ধের জন্যে কন্সক্রিপ্ট করতে পারে। নরনারীর সমান অধিকার যখন তখন সমান দায়িত্ব। নারীও যে একদিন যুদ্ধের জন্যে কন্সক্রিপ্ট হবে না এমন কোনো অংগীকার কে দিয়েছে? প্রথম দিকে হয়তো প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অত্যাবশ্যক হতেও তো পারে। আধুনিক যুদ্ধ সর্বাত্মক। হার জিতের প্রশ্নই সেখানে একমাত্র প্রশ্ন। নারীত্ব বা শিশুর শিশুত্ব যদি জয়ের অন্তরায় হয় তবে কেউ সে প্রশ্ন কানে তুলবে না। যার বিবেকে বাধবে সে জেলে পচবে বা ফাঁসীতে ঝুলবে। দেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত হবে।

শুধু যুদ্ধকালে যুদ্ধবিরোধিতা করলেই চলবে না, শান্তিকালেও সক্রিয় হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে, তার জন্যে খাটতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আজকাল এমন কোনো বড়গোছের শিল্প নেই যার সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক নেই, যা যুদ্ধের কাজে লাগবে না। অগত্যা ছোটগোছের শিল্পের উপর ঝোঁক দিতে হয়। চরকা কাটতে হয়, খাদি পরতে হয়। সত্যাগ্রহের সঙ্গে খাদির সেই সম্পর্ক মিলের কাপড়ের সঙ্গে যুদ্ধের যে সম্পর্ক। সেইজন্যে গান্ধীকল্পিত পতাকায় চরকা আঁকা। সেটা শান্তিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতীক। সত্যাগ্রহের স্মারক।

মানুষের যদি হৃদয় বলে কিছু না থাকে, যদি বিবেক বলে কিছু না থাকে, কিংবা থাকলেও সুবিধা মতো সেসব বিসর্জন দেওয়া চলে তা হলে সভ্যতার জন্যে অত গর্ব করার কী আছে? দেশসুদ্ধ মানুষকে যুদ্ধের জন্যে সব সময় প্রস্তুত রাখার অর্থই হলো হৃদয় আর বিবেককে নিম্ন মূল্য দেওয়া। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ অনেকবার ঘটেছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাতে লিপ্ত হয়নি। তাদের কন্সক্রিপ্ট করার প্রয়োজনই হয়নি। তাদের উৎপাদন যুদ্ধার্থে নয়। তাদের হৃদয় অসাড় হয়নি, বিবেক পীড়িত হয়নি। সূক্ষ্মতর বৃত্তিগুলি বিমর্দিত হয়নি। প্রকৃতির হাতে, মানুষের হাতে বহুভাবে তারা নির্যাতিত হয়েছে, কিন্তু সেসব যন্ত্রণা তাদের দেহের উপর দিয়ে গেছে, হৃদয়কে বা বিবেককে নিষ্পিষ্ট করেনি। বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে রেনেসাঁসকেও দায়ী করা চলে না। এটা শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী। ফলিত বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এর জনক জননী। যেখানে জননী আরেক সেখানেও জনক সেই একই। দুই মিলে হৃদয়কে ও বিবেককে উপবাসী রাখছে। রাষ্ট্র এর প্রতিফলন। মূল্যবোধ
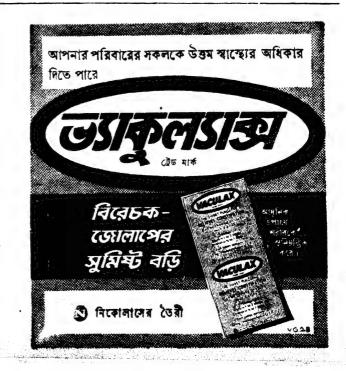
বদলালে রাষ্ট্ররূপ বদলাবে। কিন্তু রাষ্ট্র শুকিয়ে যেতে বা নির্মূল হতে বহু শতাব্দী দেরি।

আদি খ্রীস্টান যুগে বা আদি বৌদ্ধ যুগে ফিরে যাবার পথ সব সময়েই খোলা রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের সামনে। শহীদ হতে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে না, প্রবাদবাক্য যাই বলুক। বিকল্প সমাজব্যবস্থা বা বিকল্প সভ্যতা এই দু' হাজার বছরের মানব অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করে নয়, একে আত্মসাৎ করেই বিবর্তিত হবে। রেনেসাঁসের পূর্ব ও উত্তর উভয় কালই তার অঙ্গীভূত হবে। বিভিন্ন সভ্যতা তাতে স্রোত মেলাবে। স্পিরিট আর ম্যাটার দুই মিশবে। ইতিহাস সেই অভিমুখেই চলেছে। যদিও তার চাল আমাদের বেদনা দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকেও দিয়েছিল তাঁর শেষ বয়সে।

কবি তাঁর ইংরেজী ও বাংলা বিভিন্ন ভাষণে ও প্রবন্ধে বার বার বলেছেন যে,

"সভ্যতা" কথাটি এসেছে "সিভিলিজেশন" থেকে। আমরা ওটিকে নিয়েছি ওটির স্বরূপ না জেনে না চিনে। আমাদের নিজেদের শব্দ ছিল "ধর্ম" বা "সদাচার"।

অনেকের জানা নেই বোধ হয় যে, "সিভিলিজেশন" কথাটি ইংলণ্ডেও অজ্ঞাত-কুলশীল ছিল দুই শতাব্দী পূর্বে। ডক্টর জনসন ওটিকে তাঁর প্রসিদ্ধ অভিধানে ঠাঁই দিতে রাজী হননি। আর তিনিই তো তখনকার দিনের সাহিত্যিক ডিক্টেটর। কথাটির উদ্ভব "সিভিলিটি" থেকে। সেটির অর্থ ছিল নাগরিকসুলভ ভব্যতা। গ্রাম্যতার বিপরীত। ইতিমধ্যে বদলাতে বদলাতে অন্য অর্থ দাঁড়িয়েছে। বর্বরতার বিপরীত। কারো কারো মতে পশুত্বের বিপরীত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফরাসী ঔপন্যাসিক দুআমেল তাঁর যুদ্ধের কাহিনী লিখে নাম দেন "সিভিলিজেশন : ১৯১৪-১৮"। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও মনে আঘাত লেগেছিল। তাঁরই মতো বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষীর। তাঁরা তো ওকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বলে নিন্দা করে হাত ধুয়ে ফেলতে পারতেন না। কিন্তু তাঁরাও ক্লেশ বোধ করতেন বলে শ্লেষ দিয়ে ঢাকতেন। মানুষ যদিও লক্ষ লক্ষ বছর হলো পশুদশা অতিক্রম করেছে তবু তার ভিতরে পশুস্বভাব সুপ্ত রয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনায় ও ঘাত প্রতিঘাতের বেদনায় তার সুপ্তিভঙ্গ হয়। সদ্যজাগ্রত পশুর পশুত্বকে যদি ভাবি সভ্য মানুষের সভ্যতা তা হলে সেটা হবে সভ্যতার প্রতি অবিচার। তেমনি মানুষ যদিও হাজার হাজার বছর হলো বর্বরদশা ছাড়িয়ে এসেছে তবু তার ভিতরে বর্বরপ্রকৃতি গুপ্ত রয়েছে। স্বদেশের সমাজের চোখের আড়ালে যখন কোনো দূরে দেশে গিয়ে উপনিবেশ বা সাম্রাজ্য স্থাপন করে তখন আদিবাসী বা অধীনদের কাছে লেশমাত্র প্রতিরোধ পেলেই তার বর্বরপ্রকৃতির আবরণ খসে পড়ে। বিবসন বর্বরের বর্বরতাকে যদি ভাবি সভ্য মানুষের সভ্যতা তা হলে সেটাও হবে সভ্যতার প্রতি অন্যায়। সত্য হচ্ছে এই যে সভ্যতা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ভেঙে পড়ে। যেমন স্বাস্থ্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ভেঙে পড়ে। সাময়িক অসভ্যতা বা অস্বাস্থ্য নিশ্চয়ই পরিতাপের বিষয়, তার নিন্দা করব এক শ' বার। কিন্তু কেমন করে বলব যে সেইটেই সভ্য মানুষের আসল চেহারা? ধর্মের বদলে অধর্ম, সদাচারের বদলে কদাচারও তো বড় কম দেখা যায়নি প্রাচীন প্রাচ্যদেশে।

যুদ্ধের প্রস্তুতিও যুদ্ধের অঙ্গ। সেটাও একটা অসুখের সূচনা। টমাস মান-এর প্রসিদ্ধ গল্প "ভেনিস-এ মৃত্যু" লেখা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের বছর তিনেক আগে। যুদ্ধের নামগন্ধ নেই তাতে, কিন্তু মান-এর ক্লিনিকাল দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে জার্মানীর অসাধ্য অসুখ ও ইউরোপের পচনশীলতা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও সে অসুখ থামে না। কারণ যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ও যুদ্ধের অঙ্গ। সে অধ্যায় শেষ হতে না হতে শুরু হয়ে গেল পুনঃপ্রস্তুতি। কাজেই অসুখ থামল না, বাড়ল। কেবল জার্মানীর অসুখ না বলে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের অসুখ বলাও চলে। কিন্তু জাপানই বা তালিকা থেকে বাদ পড়বে কেন? তা হলে বলতে হয় সভ্যতার অসুখ। সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ নয়, যদিও কেউ কেউ তেমন কথাও বলে থাকেন। সভ্যতা স্বভাবত সুস্থ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল প্রাক-সামরিক ইংরেজী কাব্য সাহিত্য, ইউ-রোপীয় লিবারল মতবাদ। সেসব ছিল সুস্থ মানুষের কীর্তি। উত্তর-সামরিক ইংলণ্ড তাঁকে নিরাশ করে। বহু ইংরেজকেও উদ্বিগ্ন করে। তাঁরাও হালে পানি পান না। কিন্তু ইংলণ্ডের হৃদয়বান ও বিবেকীরা একদিনও নিষ্ক্রিয় বসে থাকেননি। সংশোধনের চেষ্টা প্রতিদিন অক্লান্ত। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও এ কথা কমবেশী খাটে। কিন্তু ইতিহাসের আবর্তে তাঁরাও নিঃসহায়।

শুধু সাময়িক অসভ্যতার উপর যদি নজর রাখি তবে পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পাব না। সমস্ত স্খলনপতন সত্ত্বেও পুনর্বিন্যাসের কাজ পাঁচ শতাব্দী ধরে চলেছে। পাঁচ মহাদেশ জুড়ে চলেছে। যেখানে অরণ্য ছিল সেখানে বসত হয়েছে, যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে জমি হয়েছে, যেখানে পর্বত ছিল সেখানে রেলপথ বা আকাশপথ হয়েছে, যেখানে নদী ছিল সেখানে সেতু হয়েছে। অনেক শিল্প ধ্বংস হয়েছে তা ঠিক, কিন্তু অনেক শিল্পের পত্তন হয়েছে। কৃষি অব-হেলিত হয়েছে সত্য, কিন্তু চা কফি রবার ইত্যাদির প্ল্যান্টেশন হয়েছে। নতুন নতুন ব্যাধি দেখা দিয়েছে, কিন্তু পুরাতন মহামারী রোধ করা গেছে। এইভাবে হিসাবনিকাশ করলে খরচের চেয়ে জমার অঙ্কই মোটের উপর বেশী। নীতি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও প্রচুর কাজ হয়েছে। তবে তুলনায় পেছিয়ে রয়েছে। সৌন্দর্যের বেলাও এ কথা খাটে। এই সব দিকে না এগোলে মানুষের অগ্রগতি একপেশে হবে, বিকাশ মাথাভারী হবে। তা ছাড়া সব মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে না পারলে কতক মানুষের চলা ব্যাহত হবে। বিপ্লব তো এমনি করেই ঘটে। যেখানে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সেখানে বিপ্লব ঘটে না।

যুদ্ধের মতো বিপ্লবও আমাদের কালের ঐতিহাসিক রক্তস্নান। কিছুদিনের জন্যে মানুষ পশু হয়ে যায়। যাকেই সন্দেহ করে তাকেই মেরে নিঃশেষ করে দেয়। পরে অবশ্য পস্তায়। কিছুদিনের জন্যে সভ্যতার ক্রম ভঙ্গ হয়। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের জোড় মেলে না। মানুষ এ বিচ্ছেদ অতিক্রম করে। পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করলেও পূর্বের সাহিত্যকে, সঙ্গীতকে, নৃত্যকে আপনার মনে করে। বৈপ্লবিক

প্রেরণা চিরদিন থাকে না। কিন্তু মানবাত্মার অমর সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে আনন্দ জোগায়। কে তাকে মেরে নিঃশেষ করবে! যা ভাঙবার যোগ্য, যা ভেঙে পড়ছিল, যা ভেঙে পড়তই বিপ্লব তাকেই ভাঙে। সব কিছুকে ভাঙে না, ভাঙতে চায় না, ভাঙতে পারে না। যে রাজন্যের বা যে অভিজাত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ফুরিয়ে এসেছে, তারা যদি সময়ে প্রস্থান করে, তা হলে রঙ্গমঞ্চের উপর পতন ও মৃত্যু অভিনীত হয় না। যাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অবধারিত ও আসন্ন তাদেরকে মঞ্চ ছেড়ে দিলে তো তাদেরও আক্রোশ থাকে না। হাজার পুরাতন হলেও কোনো সমাজ ব্যবস্থাই সনাতন নয়, কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণীই চিরস্থায়ী নয়। হাজার ভালো হলেও কোনো জিনিসই বরাবর টেকে না। আর একটা ভালো জিনিসের জন্যে কিংবা আরো ভালো জিনিসের জন্যে জায়গা খালি করতে হয়। পুনর্বিন্যাস না করলেই নয়। নতুন সমাজ ব্যবস্থার আবশ্যক আছে। রেনেসাঁসের মধ্যেই তার ইঙ্গিত নিহিত। মানুষ তার আবেষ্টনের পরিবর্তন সাধন করবে, পশুর-মতো সহ্য করবে না।

আবার সত্যের খাতিরে এটাও স্বীকার না করে গতি নেই যে, বিপ্লবের দ্বারা বা যুদ্ধের দ্বারা যেমন শক্তির মুক্তি ঘটে তেমন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দ্বারা নয়। ওই যে রাশিয়ানরা সাইবেরিয়া চষে ফেলছে, পাহাড়কে পাহাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে, চাঁদের বুড়ী ছুঁয়ে আসতে হাউই ছুঁড়ছে, একদিন সশরীরে শূন্যে পারে পৌঁছে যাবেও, এ কি বিপ্লবসঞ্জাত ডাইনামিজম ভিন্ন সম্ভব হতো? রাশিয়ার পুনর্বিন্যাসের জন্যে এর দরকার ছিল যদি বলি তা হলে কি ভুল বলা হবে? তেমনি জার্মানীর পুনর্বিন্যাসের জন্যে প্রয়োজন ছিল দু' দুটো মহাযুদ্ধের। নইলে জার্মানী ইংলণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পায়িত হতে পারত না। সে এক শ' বছর পিছিয়ে ছিল। এখন সমান সমান। শুনতে পাই পরাজয় সত্ত্বেও জার্মানীই নাকি ইংলণ্ডের চেয়ে অগ্রসর। তার কারণ কি এই নয় যে, পরাজয় গ্লানি মুছে ফেলার জন্যে তার জীবনে একপ্রকার ডাইনামিজম জেগেছে? সেটা ইংলণ্ডের জীবনে অনুপস্থিত। জাপানের বেলাও সেই ডাইনামিজম সক্রিয়। প্রথমে তার উদ্যোগ ছিল ইউরোপীয় জাতিদের ধরে ফেলতে, তাদের সমান হতে। এখন পরাজয়গ্লানি মোচন করতে, তেমনি বা ততোধিক অগ্রসর হতে। জাপানের পুনর্বিন্যাস কি অন্য উপায়ে সম্ভব হতো?

অথচ এই ডাইনামিজম সত্যের ধার ধারে না, ন্যায়ের ধার ধারে না, নীতির ধার ধারে না। ধর্মকে এ নিজের পাপ সমর্থন করতে বলে ও বাধ্য করে। ধর্ম এখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণীকে উৎখাত করে চালান দেওয়া হলো সাইবেরিয়ায়। তা না হলে সাইবেরিয়ার বিকাশ হতে না। তেমনি খাল কাটার জন্যে পাঠানো হলো লক্ষ লক্ষ মানুষকে তুচ্ছ কারণে বা অকারণে বিচারশালায় দণ্ডিত করে। নইলে খাল কাটা যেতো না। যুদ্ধের সময় কন্সক্রিপশন তো সেই নেপোলিয়নের আমল থেকেই ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই চালু ছিল। বাকী ছিল ইংলণ্ড; সেও প্রথম মহাযুদ্ধের শেষপর্যায়ে স্থির থাকতে পারল না। বিবেকীদের জেলখানায় পাঠিয়ে ছোকরাদের ধরে যুদ্ধে চালান দিল। দ্বিতীয় মহা-

যুদ্ধের সময় বিপদ এত আসন্ন যে সেটুকু তর সইল না। গোড়া থেকেই কনস্ক্রিপশন। এতদিনে ওটা একটা বনেদী প্রথায় পরিণত হয়েছে। আমেরিকাও ইংলন্ডের মতো ইতস্তত করেছিল। এখন তেমনি প্রস্তুত। লাল চীন তো কনস্ক্রিপশনের চূড়ান্ত করেছে শুনি। গ্রামের এক ভাগ কৃষক, এক ভাগ শ্রমিক ও এক ভাগ সৈনিক। সবাই কনস্ক্রিপট। এখন আমরাই বাকী। এর জন্যে দুনিয়ার লোক আমাদের ঈর্ষা করে। যুদ্ধকে এক হাতে বিপ্লবকে আরেক হাতে ঠেকিয়ে না রাখতে পারলে আমরাও বাদ যাচ্ছিনে। কিন্তু কেবল ঠেকিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়। নৈতিক বিকল্প জোগাতে হবে যুদ্ধের, জোগাতে হবে বিপ্লবের।

সভ্যতার সর্বপ্রধান সমস্যা হলো কেমন করে পুনর্বিন্যাস করতে হবে, কেমন করে সেটাকে বেগবান করতে হবে, কেমন করে তার মধ্যে মানুষকে টানতে হবে, কেমন করে সবাই মিলে এগিয়ে যেতে হবে, অথচ প্রাণের মূল্য জীবনের মূল্য ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য প্রেমের মূল্য সৌন্দর্যের মূল্য সত্যের মূল্য ন্যায়ের মূল্য শুভবুদ্ধির মূল্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে। কেবল কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করতে হবে যে কতক মানুষের কাছে এগুলিও জীবনমরণের ব্যাপার। কতক লোককে স্বেচ্ছায় জেলে যেতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় গুলী খেতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় বিপদ বরণ করতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় সেবাকর্মে বা গঠন-কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর প্রত্যেকটাই ত্যাগের পথ। হাঁ, কতক লোককে স্বেচ্ছায় সৃষ্টির দায় নিতে হবে। লোকে হয়তো জানবে না যে সেটাও ত্যাগের পথ। রবীন্দ্রনাথ তার জন্যে জীবনব্যাপী ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নইলে, বড়লোকের ছেলে, তাঁর কিসের অভাব ছিল? অনায়াসেই তিনি সিভিলিয়ান ব্যারিস্টার বা সওদাগর হতে পারতেন। নিদেনপক্ষে ডানপিটে জমিদার।

সভ্যতা তার দুই দিক মেলাতে পারছে না এটা স্পষ্ট। প্রাণের মূল্য জীবনের মূল্য ইত্যাদি যেসব মূল্যের নাম করেছি সেসব মূল্যের দেনা চুকিয়ে তার পরে আর অতখানি ডাইনামিজমের সঙ্গে পার্থিব উন্নতি করা যায় না। অপর পক্ষে অতখানি ডাইনামিজমের সঙ্গে পার্থিব উন্নতি করার পর প্রেমের মূল্য সত্যের মূল্য প্রভৃতির জন্যে আর তেজ বীর্য থাকে না। অক্ষমের বিলাপ রাষ্ট্রনায়কদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। সভ্যতা দু'দিক মেলাতে না পেরে দ্বিতীয় দিকেই ঝুঁকেছে। এতে আদর্শ-বাদীরা সায় দিতে নারাজ। কিন্তু প্রথম দিকে ঝুঁকলে কি বস্তুবাদীরা সেটা মেনে নিতেন? আর বস্তুবাদীরাই তো এখন সর্বত্র ক্ষমতাশালী। ধনতন্ত্রও কি বস্তুবাদী নয়? আদর্শবাদীরা কোথাও সুখী নন। কারণ কোনোখানেই তাঁদের কথায় কাজ হয় না। অথচ তাঁরা যে একেবারে ব্যর্থ তাও নয়। তাঁরা বীজ বুনে যান।

"জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" রবীন্দ্রনাথের মতো এ বিশ্বাস উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য লিবারলদেরও ছিল। তাঁরা নিজেরাও ভুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকেও ভুলিয়েছিলেন। টলস্টয়কে ভোলাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ যে সময় সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে-ছিলেন টলস্টয় সে সময় সমস্ত প্রাণ দিয়ে অবিশ্বাস করেছিলেন। সে অবিশ্বাস গান্ধীর মনেও সঞ্চারিত করেছিলেন। তাই তাঁদের "বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল" না।

সংকট যদি দেশনামাঙ্কিত বিশেষ কোনো এক সভ্যতার হতো তা হলে কবি "সভ্যতার সংকট" না লিখে "পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট" বা "পশ্চিমের অত্যাচারে ভারতীয় সভ্যতার সংকট" লিখতেন। তা তো তিনি করেন নি। তিনি সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার সংকটের কথাই বলেছেন। বলেছেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। গেয়ে উঠেছেন, "ঐ মহামানব আসে।" বলা বাহুল্য, "মহামানব" কথাটির অর্থ এখানে মহাপুরুষ বা মহান ব্যক্তি নয়। এ হচ্ছে সেই অর্থে "মহামানব" যে অর্থে এর ব্যবহার হয়েছিল "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" মধ্যজীবনে যাকে কবি দেখেছিলেন তাঁর স্বদেশে জীবনের শেষপ্রান্তে তাকেই দেখলেন তাঁর সর্বাবশেষে। মহামানব হচ্ছে বিশ্বমানব বা সর্বমানব। মানব ঐক্যের অভ্যুদয় তিনি আসন্ন বলে জেনেছিলেন।

মহামানব যদি জাগে তবে সংকট মোচন হবে বৈকি। কিন্তু তার আগে ভালো করে রোগ নির্ণয় করতে হবে। সংকটটা কেন? কী নিয়ে? এই ভারতের ঐক্য একদিন কবির কাছে ধ্রুব সত্য ছিল। অথচ এই ভারতই ভেঙে দুভাগ হয়ে গেল। খ্রীষ্টীয় সংঘের ছত্রতলে পশ্চিমের মানুষও তো একটা খ্রীষ্টেনডম রচনা করেছিল। কোথায় সে আজ? মানব ঐক্য যেমন বিভিন্ন ধর্মমতের দ্বারা বিভক্ত হয়েছিল তেমনি বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা বিভক্ত হয়েছে ও হতে যাচ্ছে। এসব মতবাদ যে কেবল বিভিন্ন তাই নয়, পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে কমিউ-

নিজমের না হয় একটা বোঝাপড়া হলো, কিন্তু রেনেসাঁসের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী জীবনাদর্শের বোঝাপড়া আরো কঠিন। আবার সেই জীবনাদর্শের সঙ্গে আদি খৃষ্টান বা আদি বৌদ্ধ জীবনাদর্শের বোঝাপড়া অধিকতর কঠিন। টলস্টয় বা গান্ধী যে কোনো অবস্থায়ই অস্ত্র ধরবেন না। মানুষের কাছে দাবি করবেন বীরের অহিংসা।

মহামানব ধীরে ধীরে জাগছে। ইউনাইটেড নেশনস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তার বার্তা বহন করে এনেছে। কিন্তু এখনো রাত অনেক বাকী। এখনো রোগ নির্ণয় হয়নি। এখনো স্থির হয়নি সভ্যতার অসুখ করেছে, না সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ। গান্ধীজী মনে করতেন আধুনিক সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ, সে অসুখ প্রথমে ইউরোপের হয়, তার পরে ইউরোপ তাকে দিকে দিকে ছড়ায়, ভারতেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে কলকাতা বম্বে প্রভৃতি শহরগুলোয়, সে ছোঁয়াচ তিনি গ্রামগুলির গায়ে লাগতে দেবেন না। আধুনিক সভ্যতা বলতে তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বুঝতেন না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বলতে বুঝতেন খৃষ্টান সভ্যতা, যা ছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। তার সঙ্গে তাঁর কোনো ঝগড়া ছিল না। তাঁর ঝগড়া একালের বৈজ্ঞানিক নাগরিক যান্ত্রিক নিরীশ্বর সভ্যতার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী গান্ধীজীর অনুরূপ নয়। তিনি সারাজীবন চেষ্টা করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে মেলাতে। এই কাজে যখনি যেদিক থেকে বাধা পেয়েছিলেন তখনি সেইদিকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বা অভিমান করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যেটা দানবিক বা বর্বর দিক সেটার নিন্দাবাদ "নৈবেদ্য"তেই যথেষ্ট তীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছিল, "সভ্যতার সংকট"-এর অপেক্ষা রাখেনি। সেই যে "দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী" সে তো তাঁর বহুকালের চেনা। "চিতার আগুন পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার বিস্ফুলিঙ্গ" বলেই পর মুহূর্তে বলেছেন, "স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।" তার মানে কি এই হলো যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাটাই অসভ্যতা বলে বর্জনীয়? তাই যদি হতো তবে প্রাচ্য বিদ্যা ও প্রতীচ্য বিদ্যাকে একনীড়ে মিলিত করার জন্যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতে হতো না। বরাবরই এ বিশ্বাস কবির মনে দৃঢ়মূল ছিল যে আধুনিক ইউরোপের একটা মানবিক দিকও আছে, সেটাই তার প্রকৃত সত্য, সেই সত্যকে স্বীকার না করে মধ্যযুগের অন্ধকারে ফিরে যাওয়াটা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। সেটাকে তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের অন্ধকার বা পশ্চাৎপদ দিক। সেদিক থেকে আগেই তিনি বাধা পেয়েছিলেন, তাকে "শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদী" বলে নিন্দা করেছিলেন। তাঁর "দুর্ভাগা দেশ"কেও বাক্যবাণে জর্জর করেছিলেন।

না। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার উপর এতদূর অপ্রসন্ন ছিলেন না যে তাকে একটা অসুখ বলে এক কথায় খারিজ করবেন। যখনি কোনোরূপে বিশেষণ না বসিয়ে "সভ্যতা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন তখনি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা অর্থে করেছেন বললে ভুল হবে না। "সভ্যতা"কে কি পাইকারিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায়? যুক্তি যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ করা চাই, সংস্কার যাই বলুক না কেন। ইতিহাস যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ করতে হয়, ঐতিহ্য যাই বলুক না কেন। জ্ঞানপিপাসা ও রসপিপাসা যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ না করলে ক্ষতি, স্বাদেশিকতা যাই বলুন না কেন। "সভ্যতা"কে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের দিক থেকে আপনার করে নিয়েছিলেন বলেই তার সংকট তাঁকে এতখানি বিচলিত করেছিল। অভিমান ছিল ইংরেজের উপরে, ঘৃণা ছিল সাম্রাজ্যবাদের উপরে, কিন্তু "সভ্যতা"র উপরে যা ছিল সেটা তার অন্তর্নিহিত মানবিকতার উপর বিশ্বাস। "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।" তাঁর এই উক্তির মধ্যস্থিত "মানুষ"

ইউরোপীয় সভ্য মানুষ। যার দানবিকতায় তিনি বিক্ষুব্ধ। অথচ যার মনুষ্যত্বে তিনি বিশ্বাসবান।

মোট কথা রবীন্দ্রনাথ নির্বিচারে গ্রহণও করবেন না, নির্বিচারে বর্জনও করবেন না। বিচারের অধিকার নিজের হাতে রাখবেন। জাতীয়তাবাদীদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। বর্জনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ তিনি অসহযোগ আন্দোলনের দিন ঘোষণা করে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। আবার গ্রহণবাদ সম্বন্ধেও তাঁর দ্বিধা তিনি কখনো গোপন করেন নি। চীনদেশে গিয়ে একটি বক্তৃতায় বলেন,

"The word 'civilization' being a European word, we have hardly yet taken the trouble to find out its real meaning. For over a century we have accepted it, as we may accept a gift horse, with perfect trust, never caring to count its teeth. Only very lately we have begun to wonder if we realize in its truth what the Western people mean when they speak of civilization." ("Civilization and Progress", lecture delivered in China in 1924,) see "Talks in China".)

গান্ধীজী শুনলে বলতেন, ঐ খয়রাতী ঘোড়াটাকে ওর আস্তাবলে ওয়াপস পাঠালেই তো হয়। দাঁত না গুণে গ্রহণ করেছিলে বলে চিরকাল পুষতে হবে এমন কী কথা আছে? কিন্তু গুরুদেবের মনটা অতখানি লজিকাল ছিল না। জীবনের শেষপ্রান্তেও তিনি ঘোড়া ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারেন নি। "মহামানবে"র উপরে বরাত দিয়ে মহাবিদায় নেন। বছর কয়েক পরে ইংরেজও চিরবিদায় নিল। কিন্তু ঘোড়াটা থেকে গেল। ওটার সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা এখনো কাটেনি। বর্জনবাদীরাও নিরস্ত হননি।

ওদিকে পশ্চিম ইউরোপের পুনর্বিন্যাস জোর কদমে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী অধ্যায় শেষ হয়ে এলো। পুঁজিবাদী অধ্যায় ইতিমধ্যে এমন একটা মোড় নিয়েছে যে শ্রমিকরাও পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত profit motive স্বীকার করেছে। তা হলে সমাজতন্ত্র পত্তন করবে কে? পুঁজিবাদের ছায়ায় সমাজতন্ত্র বাঁচবে কেন? বাড়বে কেন? দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদ এখনো জরাজীর্ণ হয়নি। তার ঐতিহাসিক ভূমিকা এখনো সমাপ্ত হয়নি। সাম্রাজ্য হারালেও সে প্রচুর লাভ করে ও লাভের ভাগ দিয়ে শ্রমিককে জুনিয়র পার্টনার বানায়। কমিউনিজম সফল হয়েছে বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নয়, বনেদী ফিউডাল দেশগুলিতেই। ফিউডাল ব্যবস্থা যে দেশে নেই সে দেশে কমিউনিজম দাঁত বসাতে পারে না। আয়ু ফুরিয়েছে ফিউডাল ব্যবস্থারই, ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার নয়, গণতন্ত্রী ব্যবস্থারও নয়।

এখন আমাদেরও কিছু দেবার পালা। বর্জন ও গ্রহণ ছাড়া তৃতীয় একটি কথা আছে। তার নাম দান। পৃথিবীর লোক আমাদের দিকে চেয়ে আছে চাতকের তৃষা নিয়ে। কী দান করব তার ধ্যান করা যাক। সে যেন পুরাতনের চর্বিতচর্বণ না হয়। কবেকার সেই প্রাচীন ভারতকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে গেলে বোঝা যাবে আমাদের আর নতুন কিছু দান করবার নেই। হাজার চেষ্টা করলেও অতীতের সে ডাইনামিজম তো ফেরবার নয়। অতীতের কাছ থেকে উপাদান আহরণ করতে পারি। কিন্তু তাতে গতিবেগ সঞ্চার করব কোন্ মন্ত্রবলে? পুনরুত্থানবাদী চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল, গান্ধীজীর মধ্যে তো ছিলই। আধুনিক ইউরোপের প্রতিপক্ষরূপে তাঁরা খাড়া করেছিলেন প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতকে। সে ধরনের চিন্তা তাঁদের জীবদ্দশাতেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দেশ থেকে এখনো বিলুপ্ত হয়নি। সহজে হবেও না। এখনো ভারতের বৈশিষ্ট্য বলতে লোকে বোঝে পুরাতনের বৈশিষ্ট্য। যেন ইতিহাস একটা অচল ঘড়ির মতো কবে থেকে থেমে রয়েছিল, সবে চলতে আরম্ভ করেছে। এই যদি সত্য হয় তবে আবার থামতে কতক্ষণ!

চাই অভিনব ডাইনামিজম। তা আমাদের ভিতর থেকেই উৎসারিত হবে। অতীতটাও আমাদের বাইরে। কেবল সেইটুকুই তার কাছ থেকে আমাদের নেবার যেটুকু এখনো সজীব ও প্রাণবান, যা অতীত হলেও অতিক্রান্ত নয়, যা বহুপুরাতন হলেও নিত্য নূতন। অপর পক্ষে পশ্চিমের সবটাই

আমাদের বাইরে নয়। স্পেসের দিক থেকে যেটা বাইরে সেটার কতক হয়তো টাইমের দিক থেকে আমাদের ভিতরে। এই জটিল তত্ত্বটাকে আমি সরল করে বোঝাতে পারব না। শুধু একটা উদাহরণ দেব। সেটা রবীন্দ্রনাথেরই জবানীতে। "কালান্তর" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে 'A man is a man for a 'that'."

—বলা বাহুল্য এ তত্ত্বটি গীতা উপনিষদ্ বা রামায়ণ মহাভারত থেকে পুনরুত্থিত হয়নি। বাইরে থেকে এসেছে, সেই সঙ্গে ভিতর থেকেও। রবার্ট বার্নস আমাদের দেশতুতো ভাই নন, কিন্তু কালতুতো ভাই। সে হিসাবে অনেক ভারতীয় কবির চেয়েও আপনার। অভিনব ডাইনামিজম সমকালের ভিতর থেকেই পাব। এ ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে যে যা কিছু সমকালীন তাই ডাইনামিক নয়।

সমকালীন সভ্যতা এখন অবিভাজ্য। দেশ অনুসারে পার্থক্য আছে ও থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু পার্থক্যটাকেই যদি একান্ত করে দেখি তবে স্বকাল আচ্ছন্ন হবে স্বদেশপ্রেমের আবেগবাষ্পে। সংকট এখন আর দেশ অনুসারে বিশ্লিষ্ট নয়। একই সংকটই সর্বত্র ঘনিয়ে আসছে। প্রেয় যদি একদিকে টানে আর শ্রেয় আরেক দিকে তা হলে সংকট অনিবার্য। ব্যক্তিবিশেষ হয়তো এর থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু কোটি কোটি মানুষের সমাজ বা সমষ্টি কি আগে আগুনে হাত না পুড়িয়ে কোনো দিন কিছু শিখেছে? তার শিক্ষার পন্থাতিই হলো আগুনে হাত দেওয়া। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনায়াসেই এড়ানো যেতে পারত, কিন্তু এড়ানো গেল না। তেমনি এ যুগের দুই মহাযুদ্ধ। তেমনি ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লব।

তার পর ইতিহাসের এই অধ্যায় শুধু শ্রেয়োবুদ্ধির সঙ্গে প্রেয়কামনার সংঘাত নয়। তা যদি হতো তবে তো অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে যেতো। সংঘাতে শ্রেয়োবুদ্ধির জয় কিংবা সভ্যতার লয় হতো। প্রেয়কামনা কাজ করছে বইকি। তা তো স্পষ্ট। কিন্তু তার অন্তরালে ক্রিয়া চলেছে ঐতিহাসিক পুনর্বিন্যাসের। "মন্দ" বলে তাকে এক কথায় খারিজ করে দেওয়া চলে না। আবার "ভালো" বলে তাকে অন্ধভাবে মাথা পেতে নেওয়াও যায় না। নীতিনিপুণেরা যদি তার বদলে এমন কোনো পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব নিতেন যা ষোলো আনা "ভালো", যার কোথাও এতটুকু "মন্দ" নেই তা হলে তো মানুষ বেঁচে যেতো। মানুষের পক্ষে মনঃস্থির করা এমন দুঃসাধ্য হতো না। কিন্তু "ভালো" আর "মন্দ" বলে দু'রকম দুটো পুনর্বিন্যাস-প্রস্তাব আমাদের সামনে নেই। নীতিনিপুণদের অধিকাংশই পুনর্বিন্যাস চান না, তাঁরা তাঁদের সেই খ্রীষ্টীয় বা ইসলামী বা বৌদ্ধ বা বর্ণাশ্রমী বিন্যাসেই সন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করছেন যে কাল বদলে গেছে, এ কালের উপযোগী পুনর্বিন্যাস চাই, তাঁরাও বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আর্টকে বাদ দিয়ে ভোগকে বাদ দিয়ে এমন এক পুনর্বিন্যাসের কথা বলেন যে মনে হয় রেনেসাঁসটা একটা প্রক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ। নীতিনিপুণদের ছেড়ে দিলে পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব আর যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা যতগুলি পন্থা নির্দেশ করছেন প্রত্যেকটি ভালোয় মন্দে মেশা। কোনোটাই সম্পূর্ণ শুদ্ধ বা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ নয়।

তা বলে নীতির প্রশ্ন গৌণ হয়ে যায় না। কাজ চালানো গোছের পুনর্বিন্যাস নিয়েও মানুষ সুখী হবে না, যদি না তার বিবেক নির্মল থাকে, তার হৃদয় কোমল থাকে, তার আত্মা তার নিজের থাকে। খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে সেই দুর্গম পন্থাকে যাতে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে মানুষের হৃদয় বিবেক দেহমন আত্মার পূর্ণতর সামঞ্জস্য সম্ভব। পরজয়বাদী হচ্ছে সেই জন যে বলে, অসম্ভব। কিন্তু কেন আমরা পরাজয়বাদী হব? "হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়।"

হামবুর্গে প্রলয়ঙ্করী বন্যা

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের ভবিষ্যদবাণী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে—৪ঠা কিংবা ৫ই ফেব্রুয়ারীতে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটেনি। পশ্চিম জার্মানীর পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে—অন্ধ বিশ্বাসী ভারতীয় সাধুসন্তদের কথা, আর ছাপা হয়েছে কি ভাবে কতটন মাখন আগুনে জ্বালানো হয়েছে, তারই সচিত্র বিবরণ। বন্ধুমহল পথেঘাটে উপহাসের হাসিতে সম্বর্ধনা জানিয়েছে—কুশল প্রশ্ন করেছে, গোয়া, কাশ্মীর কিংবা চীনের কথা উল্লেখ করে।

তবু কয়েকদিন আগে উত্তর পশ্চিম জার্মানীর ঝড় ও বন্যা যারা প্রত্যক্ষ করেছে, তারা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও পৃথিবীর মহাপ্রলয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল—গোঁড়া নাস্তিকের মনেও সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল, মানুষ সত্যই আপন ভাগ্য-বিধাতা কি-না? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের কৃত্রিম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় আস্থা গ্রহণে কি-ই বা মূল্য আছে? অথবা কৃত্রিম সভ্যতার ওপর আমরা এতই নির্ভরশীল যে, প্রাকৃতিক নিয়মের সামান্য পরিবর্তনও আমাদের জীবনে চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর সব সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম জার্মানীর ঝড় ও বন্যার কথা—আর সেই সংগে এমন একটি শহরের নাম, যার সংগে আমার পরিচয় অনেকদিনের—কাছে থেকে জানবার সুযোগ হয়েছে আমার পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম নগরী হামবুর্গকে। দীর্ঘদিন ইউরোপে বসবাস সত্ত্বেও ইউরোপীয় আধুনিক জীবনযাত্রায় আজও আমি অনভ্যস্ত, ইউরোপীয় রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহারে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। অবশ্য এর একমাত্র ব্যতিক্রম এই হামবুর্গ শহর। হামবুর্গ ইউরোপে সবচেয়ে সুন্দর শহর—আমার এ মতের সংগে অনেকেই সায় দেবেন না জানি, কিন্তু হামবুর্গ শহরের গোড়াপত্তন থেকেই স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত বলে হামবুর্গের সামাজিক জীবনে যে নাগরিকতাবোধ জাগরূক, ইউরোপের আর কোন শহরে তার তুলনামূলক পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, আমার অন্তত জানা নেই। নিজেকে জার্মান না বলে 'হামবুর্গার' বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে হামবুর্গের পুরোনো বাসিন্দা।

তাই কয়েকদিন আগে হামবুর্গ শহরের ওপর ঝড় এবং বন্যার যে তান্ডবনৃত্য প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমি হয়েছি মর্মাহত। হামবুর্গের ইতিহাসে এতবড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আর কোন নজির পাওয়া যায় না। শোচনীয়তায় এবং ভয়াবহতায় কেবলমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমাবর্ষণের সংগে এর তুলনা করা চলে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হাজার হাজার বোমাবর্ষণেও হামবুর্গের জনসাধারণের মনোবল এমন আতঙ্কিত হয়নি যা হয়েছে নিশীথ রাত্রিতে বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের আকস্মিক আক্রমণে। আর একই সংগে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, জলসরবরাহ, ট্রেন চলাচল এবং সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আধুনিকতম মানুষ নিজেকে কত অসহায় বোধ করেছিল। তা প্রমাণিত হল শুধুই একটিমাত্র রাত্রিতে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপন অসামর্থ্যের যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম, সুদূর অতীতে অসভ্য বর্বর মানুষের সংগে তার কি কোন প্রভেদ ছিল?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে-ওঠা হামবুর্গ শহরের এক-পঞ্চমাংশ কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ জলের তলায় ডুবে যায়। বন্যার জলের গভীরতা ছিল চার থেকে সাড়ে চার মিটার—জলের চাপে অনেক জায়গাতেই বন্ধ ঘরের দরজা জানলা খোলা সম্ভব হয়নি, হলেও বাড়ির ছাদের ওপর শুধুমাত্র রাত্রিবাস পরিহিত কত যে আবালবৃদ্ধবণিতা প্রচন্ড ঠান্ডায় জমে গেছে, তার সঠিক সংখ্যা কোনদিনই জানা যাবে না। তিনশতাধিক শহরবাসীর প্রাণহানি এবং প্রায় একশো হাজারেরও বেশী নাগরিকের সর্বহারা হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিদারুণ আকস্মিক—তাও আবার শিল্পপ্রধান জার্মানীর শিল্পপ্রধানতম নগরীতে। গৃহচ্যুত অধিবাসীদের অধিকাংশই হয় পূর্ব জার্মানী থেকে আগত বাস্তুহারা কিংবা
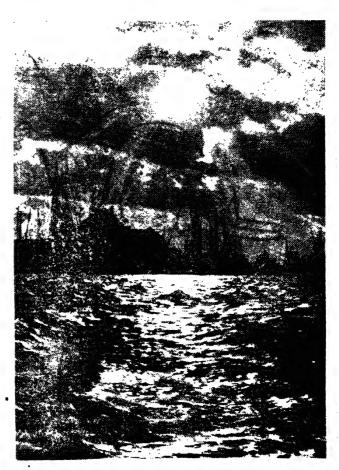
কর্মমুখর আধুনিক হামবুর্গ বন্দরের দৃশ্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্বস্বহারা—দ্বিতীয়বার সর্বহারা হবার অভিজ্ঞতা বাস্তবিকই বড় বেদনাদায়ক।

প্রায় একশো বছরেরও পুরোনো বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়ার প্রতিবাদে নিরীহ মানুষ ভগবানকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে। এ-বিষয়ে এখানকার সরকারী উচ্চপদস্থ সিভিল ইঞ্জিনীয়ারকে প্রশ্ন করায় সরাসরি উত্তর পেয়েছি—এশিয়া এবং আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিকে জার্মানীর বছরে চার বিলিয়ন মার্ক সাহায্য করার জন্যই এই দুরবস্থা। জার্মানীতে ধীরে ধীরে এখন একটা জনমত গড়ে উঠছে, যারা সব কিছুর জন্যই অনুন্নত দেশগুলিকে দায়ী করে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে শিল্পপ্রধান হামবুর্গের অন্তঃপুরে কি করে এমন শোচনীয় ঘটনা সম্ভবপর, কিংবা সরকারী সাহায্য ব্যবস্থায় ত্রুটি অথবা আগে থেকে শহরবাসীকে চরম বিপদের জন্য সতর্কীকরণ করার প্রয়োজন ছিল কি না?

এখানকার সংবাদপত্রে এ-বিষয়ে কোনরকম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা চোখে পড়েনি। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের খবরে শুধুই প্রশংসা করা হয়েছে—দশ-হাজার জার্মান সৈন্য এবং একশোর বেশী জার্মান এবং আমেরিকান হেলিকপ্টার সাহায্যকাজে যে অতুলনীয় মনোবলের পরিচয় দিয়েছে, তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু স্বাধীন মতামত প্রকাশে এখানকার সংবাদপত্র যে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে, তা কি স্মরণ করিয়ে দেয় না—সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্মানজাতির উদাসীনতা অথবা সকলরকম সরকারী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ভবিষ্যতের মানবেতিহাসের পক্ষে একান্তই বিপজ্জনক?

ছুটির সকাল। কয়েক দিনের বরফ ঝরার পর আজ প্রকৃতি শান্ত। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছি চারদিক খটখটে। মাটিতে বরফ জমে শক্ত, কাঁচের মতো। আমাদের একটি দালান, যাতে হাজার দুয়েক লোকের বাস, তার উঠোনে খেলার পার্কের বেড়া ঘেঁষে বরফ জমা মাটিতে একদল ছোট ছেলে বুকে গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছে। হাতে তাদের প্যাকিং বাক্সের কাঠ। এখন কিন্তু সেগুলো রাইফেল। একটা চৌকো জায়গায় আরো একদল ছেলে ভাঙা প্যাকিং বাক্স সাজিয়ে কিছু একটা গড়ছে। অভিযানকারী সৈন্যদল যখন ওদিকেই এগচ্ছে, তখন ওটা নিশ্চয় একটা কেল্লা হবে। কিছুক্ষণ অন্য কাজে রত থাকায় যুদ্ধের সাংবাদিকের কাজে ছেদ পড়েছিল। হঠাৎ দেখি প্যাকিং বাক্সের কেল্লা ভীষণ বিপদগ্রস্ত। শত্রুদল পরম বিক্রমে তা ধুলোয় পর্যুদস্ত করতে ব্যস্ত। হাতের বন্দুকগুলো এখন বোধ হয় গাঁইতির কাজ করছে। আরো লক্ষণীয় অভিযানকারী সৈন্যদলের পূর্বের শক্তি ছিল পাঁচ (হয়ত ঐ যুদ্ধের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী সেটা পাঁচ অক্ষৌহিণীর সমান)। এখন কিন্তু দেখি উঠোনের যত ছেলে ছুটে এসে লুটপাটে যোগ দিচ্ছে। আসল যুদ্ধে যেমন হয়, লড়াইয়ে যারা নেই, তারা লুটের বেলায় ঠিক হাজির।

এ পর্যন্ত লিখে হঠাৎ খেয়াল হল হয়ত এসব লেখা ঠিক হল না। কারণ এটুকু পড়েই অনেক "সোভিয়েত দেশ বিশেষজ্ঞ" বলতে শুরু করবেন, সোভিয়েত দেশে যুদ্ধমনোবৃত্তি এমন গভীরে পেঁছেছে যে, সে দেশের ছোট ছেলেরা পর্যন্ত খেলায় নামে জঙ্গী ম্যানুভারের মহড়া দেয়। ও জাতের সাংবাদিকদের হাতে কত কীই না ঘটে। ভরশিলভ যখন সভায় উপস্থিত, তখন তাঁরা তাঁকে দিয়ে আত্মহত্যা করিয়ে বসেন। তাঁরা যখন ঘোষণা করেন 'মলতোভ কে তোয়াজ', তিনি তখন ইনফ্লুয়েঞ্জায় নাক ঝাড়েন রুমালে।

তবে ছোট ছেলেরা বন্দুক নিয়ে খেলুক এতে এ-দেশেও কারো কারো আপত্তি আছে। তাঁদের একজন হলেন আমারই সহকর্মী সাশা। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এ ব্যাপারে তার আপত্তিতে বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'ছোটরা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলবে না এই যদি চান, তবে যত কাব্যকাহিনী সব ফিরে লিখতে হয়। আমরা তবে ছোটদের বলব না রাম-রাবণের কথা, আপনারা বাদ দেবেন ইলিয়া মুর্মেনৎস আর অন্য বীরদের গল্প। সে কি ভাল হবে? আর যতদিন ছোটরা এসব গল্প শুনবে, ততদিন তারা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলবেই।'

সাশার বক্তব্য, 'ওসব তো তীর ধনুক তলোয়ার নিয়ে খেলা। তার মধ্যে রূপকথাই বেশী। এই পিস্তল বন্দুক কেন?' তার উত্তরে জানাই, 'স্তালিনগ্রাদের (ভলগাগ্রাদ নয়, কারণ তাতে কিছুই বোঝায় না) বা লেনিনগ্রাদের লড়াইয়ের কাহিনী। ছোটদের কাছে আজ উপকথার বীর নায়ক বগাতীর-দের কীর্তির চেয়ে কিছু কম নয়। আসল কামান বন্দুকগুলো দূরে করে শুধু খেলনা কামান, খেলনা বন্দুকগুলোই রাখা ভাল। ফিফটি মেগাটনের বদলে কালীপুজোর পটকা।'

সাশার মত হল, 'বহু শতাব্দী আগে পটকা ফুটিয়েছিল চীনারা বাজির মজা হিসেবে। তারা জানত না ঐ পটকাতেই লুকিয়েছিল বিশ্বধ্বংসী বোমার সম্ভাবনা। ঐ যে খেলনা বন্দুকের কথা বলছেন, ওর মধ্যেও কি থাকতে পারে না প্রলয়ংকর যুদ্ধের বীজ? আমি সমগ্র ও পূর্ণ অস্ত্র-বর্জনের পক্ষে।'

টেবিল চাপড়ে সজোরে হেসে উঠল সাশা—খাঁটি রুশ হাসি। অন্য দেশে সাধারণত যে জোরে হাসে, সে তার হাসির দোষেতেই বিখ্যাত হয়ে যায়। শহুরে জীবনে, মধ্যবিত্ত সমাজে, অট্টহাসির চেয়ে ক্লিষ্ট হাসি, তিক্ত হাসি এবং মুচকি হাসিটাই প্রচলিত। এ-দেশেও তা দেখা যায় স্বল্পসংখ্যক উন্নাসিকদের ঠোঁটে যারা সর্বোপায়ে সফিস্টিকেটেড হয়ে ওঠাটা (তার মানে পশ্চিমী ধরনধারন অনুকরণ) সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ রুশ হাসেন জোরে এবং যখন তখন। অথচ মনে পড়ছে, একজন অত্যন্ত সুশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক এক-বার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'রুশরা হাসতে পারে?' না, তাঁর প্রশ্নে কোন ঠাট্টা ছিল না। রুশরা মনে করেন, 'জোর বৃষ্টিতে পরিষ্কার হয় আকাশ, উচ্চহাসিতে ধুয়ে যায় মনের ময়লা।' রুশরা যে এখনো জোরে হাসতে ভোলেননি, আশা করি তা কোনদিনই ভুলবেন না, তার একটা কারণ তাঁরা, অধিকাংশই 'শহুরে' বলতে আমরা যা বুঝি

রুশ দেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিশুরা পুতুলগুলিকে রুগী বানিয়ে ডাক্তারী খেলা খেলছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ডাক্তার রুগী পরীক্ষা করছে, ওদিকে রুগীর মায়ের মুখ বিষণ্ণ

তা নন। তাঁরা যতই উন্নত যন্ত্রশিল্প গড়ুন যতই দ্রুত ভেদ ঘটান গ্রামে শহরে, এখনো তাঁদের অধিকাংশের মন ও হৃদয় রয়ে গেছে গ্রাম্য নয়, গ্রামীণ। আশা করি, সেটাও তাঁরা কখনো ত্যাগ করবেন না। যেমন জোরে হাসেন তেমনি জোরে কথা বলতেও রুশরা সংকুচিত নন। যেচে আলাপ এবং মাইনে পাও কত বিয়ে করেছ (ভারতীয়দের বেলায় প্রেম করে কিনা সেটাও), ক' ছেলেমেয়ে, ঘরের ফ্ল্যাট ঘরগুলো কত বাই কত মিটার, ক ইন্‌টিরিয়েসুনো (ইণ্টারেস্টি কথাটির রূপ) ঝেনা জদারোভায়া (বউ বেশ স্বাস্থ্যবতী—রুশরা সাধারণত বেশ মোটাসোটা পছন্দ করেন। বলেন, তাতে এক বিয়ে দুজনকে বিয়ে করার সুখ পাওয়া য

নববর্ষের সকালে তুষারাচ্ছাদিত পার্ক-এ রুশী মেয়েরা বুড়ো সান্তা ক্লজের সংগে স্কেটিং খেলায় মত্ত

ইত্যাদি প্রশ্ন অনায়াসেই করা যায় এবং তার উত্তর দেওয়া চলে অবাধে। আমরা বাঙালীরা অত্যন্ত বেশী কথা বলি, আর তাতেই নাকি আমাদের অধঃপতন। অথচ এমন কর্মদক্ষ রুশেরা সাধারণ জীবনে কারণ-অকারণে যে পরিমাণ কথা বলেন, বাঙালী তার ধারে-কাছেও যেতে পারেন না। কারণ অতটা কথা বলে চলায় যতটা শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, ক্ষুদ্রজীবী বাঙালীর দেহে তা নেই। দুই রুশ যুবক যেভাবে অনর্গল ঘণ্টার পর ঘণ্টা বউ ছেলেমেয়ে বা জামা-কাপড় কিংবা আরো সাধারণ অমুক কি বললে, তমুক কি করল গোছের আলাপ চালিয়ে যান, তাতে আমাদের দেশের মেয়েরাও অবাক হন। লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবেন না কে কার পূর্বপরিচিত। সবাই যেন এক ইয়াস্‌লি মানে নার্সারীতে মানুষ। অত্যন্ত অপরিচিতকেও যেভাবে খোঁচা দিয়ে ঠাট্টা করা হয়, তার জবাবে আর কোথাও হলে মুষ্টিবর্ষণ শুরু হত। এখানে তার পিঠে আরেকটা ঠাট্টা আসে, তারপর সমবেত উল্লাস এবং সেই সংগেই শুরু হয় আনিয়েক্‌দোতের পালা, তার মানে রসিকতার গল্প।

একটি উদাহরণ দিই।

এক আর্মানী (আর্মানীরা সাধারণত খুব অর্থলিপ্সু বলে খ্যাত) একটা বিরাট আকারের মোটা বই পড়ছিল।

'কী বই পড়ছ হে?' জিজ্ঞেস করল আরেক আর্মানী।

'টাকার বিষয়ে।' বই থেকে চোখ না তুলেই বলল প্রথমজন।

'তা নামটা কী?'

'ডাস ক্যাপিট্যাল, কার্ল মার্ক্স নামে এক-জনের লেখা।'

এর জবাবে আরেকজন হয়ত বললেন—স্বর্গে তো লেনিনকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এমন সময় তাঁর সংগে দেখা একজন আর্মানী কমরেডের। তিনি সব দেখেশুনে লেনিনকে একটা বস্তায় পুরে নিয়ে গেলেন স্বর্গের দ্বারে। দরজায় টোকা মারতে সেণ্ট পিটার দেখা দিলেন।

আর্মানী কমরেড জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, এখানে কার্ল মার্ক্স বলে কেউ আছেন কি?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। ডাস ক্যাপিটেলের কার্ল মার্ক্স তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই। এই হল ডাস ক্যাপিটেলের সুদ।

এই বলেই লেনিন সমেত বস্তাটা দেয়ালের উপর দিয়ে পার করে দিলেন।'

একবার সাহসে ভর করে আমিও একটা সম্প্রতি চালু 'আনিয়েক্‌দোৎ' বলতে গিয়ে-ছিলাম:

—কোন এক ধাঁধার প্রতিযোগিতায় একটা প্রশ্ন ছিল, 'আমাদের দেশে cult of personality আছে কি?'

একজন উত্তর দিয়েছিল—cult তো আছে, কিন্তু personality কই?'

গল্পটা শুনে সহ-আলাপী গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হুম, ওটা আগেই শুনেছি। মার্কিন দূতাবাস থেকে ছড়ানো হয়েছে।'

শুভময় ঘোষ

॥ ৬ ॥

আমি একজন লোকের কথা জানি, তার একমাত্র ছেলে বিদেশে হঠাৎ মারা গিয়েছিল। সে লোকটি কিন্তু কোন-দিন স্বীকার করেনি যে, তার ছেলে মারা গেছে। বলত, আমার ছেলে মরেনি, মরতে পারে না, ওসব ভুল খবর। একদিন না একদিন সে ফিরে আসবেই এ বিশ্বাসকে সে প্রাণপণে আঁকড়ে ছিল। উৎকর্ণ হয়ে বসে থাত বাড়িতে। বাড়ির সামনে গাড়ি কিংবা রিক্‌শা থামলে দৌড়ে বেরিয়ে আসত, ভাবত ছেলে এসেছে। সবাই তাকে পাগল ভাবত। কিন্তু সে যদি পাগল হয় আমরা অনেকেই তা হলে পাগল; কারণ আমরা অনেকেই এমন অনেক অসম্ভব আশা আঁকড়ে বসে আছি, শুধু বসে নেই, উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি। তাকেই কেন্দ্র করে ঘুরে মরছি নানান জটিল পথে। তারই প্রেরণা অদ্ভুত-ভাবে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। আগেকার যুগের অ্যাল্‌কেমিস্টরা বহু রকম জিনিস ফুটিয়ে গলিয়ে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। এ যুগের হিটলার নিজেকে আর্য মনে করে আর্য রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বহু-আসলা (শুধু দো-আঁসলা নয়) নাৎসীদের নিয়ে। এ'রা বিপক্ষ দলের যুক্তি শুনতে চান না, হিসাব মানতে চান না, এ'রা সবাই ওই সরু-গলা লোকটার দলে যে তার সাড়ে তিন টাকার দাবি কিছুতেই ছাড়তে চায় না। এই সূত্র ধরে আরও অনেক এলোমেলো দর্শন, অনেক আগড়ম-বাগড়ম কথা মনে আসে। এমন কি, আমাদের আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে এই মূর্খ দেশে যাঁরা আদর্শ ডেমক্রাসি প্রবর্তন করবেন বলে আশা করে আছেন তাঁদের সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আপনার ধৈর্যের একটা সীমা আছে এ কথা মনে পড়াতে থেমে গেলাম।

এগুলো আবার পড়ে প্রচুর আনন্দ পেলেন হালদার মশায়। তাঁর মনে হল ডাক্তারবাবুর কাছে একবার যাই। তাঁর শেষ যে লেখাটা তিনি কাল দিয়েছেন সেটা যদিও তিনি সব পড়তে পেরেছেন, তবু পড়তে পারেননি এই ছুতো করে তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কাগজটা হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই মনে হল, না মিথ্যার আশ্রয় নেব না, এমনিই যাই। কিন্তু যেতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। গোয়ালের থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবুর কাণ্ডকারখানা। অনুভব করলেন, ওর মধ্যে গেলে ছন্দ-পতন ঘটবে।

ডাক্তারবাবু মুরগীগুলোকে খাওয়া-চ্ছিলেন। ওদের প্রত্যেকের নাম আছে। পেট্‌কি, ছুট্‌কি, সাঁওতালনী আর রেজলি। পেট্‌কি আর ছুট্‌কি লেগহর্ন, সাঁওতালনী আর রেজলি দেশী। এই চারটি মুরগী, আর মোরগটার নাম পুরো ইংরেজী, মিস্টার চ্যান্টিক্লিয়ার (Chanticleer), সংক্ষেপে চ্যান্টি। বিজয় একটা ছোট টুকরিতে ধান-গম-মকাই একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এসেছিল মাইজির কাছ থেকে। ডাক্তারবাবু সেগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন আর ধমক দিচ্ছিলেন সাঁওতালনী আর রেজলিকে, ওরা পেট্‌কি আর ছুট্‌কির কাছ থেকে কেড়ে খাচ্ছিল বলে। এই এক অদ্ভুত স্বভাব ওদের—বিশেষ করে দেশী মুরগীগুলোর—নিজেদের সামনে খাবার থাকতেও ওরা অপরের কেড়ে খাবে। ডাক্তার-বাবু নীতি উপদেশ দিতে দিতে এমনভাবে ওদের ধমকাচ্ছিলেন, যেন ওরা মানুষ। চ্যান্টিকেও ধমকাতে হচ্ছিল। সে নিজে না খেয়ে—কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ করে আহ্বান কর-ছিল তার প্রেয়সীদের। নিজে না খেয়ে ওদের খাওয়াবে! ডাক্তারবাবু বললেন, তুই আগে নিজে খা, ওদের খাবার তো রয়েছে। বিজয় বিজ্ঞের মতো বললে, বলা বদ্‌মাছ্‌ ছে (বড় বদমাইশ)। ডাক্তারবাবু বললেন, তুমিও কম বদমাশ নও। কাল আমার খবরের কাগজ ছিঁড়েছ কেন? বিজয় ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাববার চেষ্টা করল। তারপর হেসে ফেলল দাঁত বার করে। বললে, ওক্‌লামে ছবি ছেলে (ওতে ছবি ছিল)। ডাক্তারবাবুর কাছেও এ যুক্তিটা অকাট্য মনে হল। বললেন, ও। তারপর ছুটে এল রকেট উন্মত্ত ঝড়ের মতো, তাড়া করে গেল মুরগী-গুলোকে। তারা কলরব করে ছুটে পালাল। এতেই রকেটের আনন্দ। সে ওদের কামড়াতে চায় না, ওদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতে চায়। ডাক্তারবাবু গর্জন করে উঠলেন, রকেট, রকেট। রকেট থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ঘাড়টা ঈষৎ নীচু করে সম্ভবত মুচকি হাসিটাই গোপন করে ফেলল। 'কাম হিয়াল্'—তর্জনী তুলে আদেশ করল বিজয়

চোখ বড় বড় করে। কাম হিয়ার, কাম হিয়ার, ডাকতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। রকেট একছুটে চলে এল ডাক্তারবাবুর কাছে আর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এমন করতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। কাম হিয়ার অ্যান্ড সিট—আবার আদেশের সুরে গর্জন করে উঠলেন ডাক্তারবাবু। ছিট্ ছিট্, —বিজয়ও বলল। তারপর আড়চোখে চেয়ে দেখল ডাক্তারবাবুর দিকে। তাঁর গর্জনে সেও একটু ভয় পেয়েছিল। রকেট মাথা হেঁট করে বসল এসে ডাক্তারবাবুর সামনে। তার কান ধরে ডাক্তারবাবু বললেন, মুরগীদের তাড়া করেছিলি কেন? অ্যাঁ? কুঁই কুঁই করতে লাগল রকেট ল্যাজ নেড়ে নেড়ে। ভুটান আর জাম্বুও এল ছুটে। ভুটান বিস্মিত। জাম্বু একটু যেন খুশী। রকেটের চ্যাংড়াপনা তার ভাল লাগে না। রকেটের উপর তার হিংসাও আছে একটু। ডাক্তারবাবু রকেটের কান ছেড়ে দিলেন।

"শেক্ হ্যান্ডস্।"

রকেট থাবা তুলে ধরল ডাক্তারবাবুর
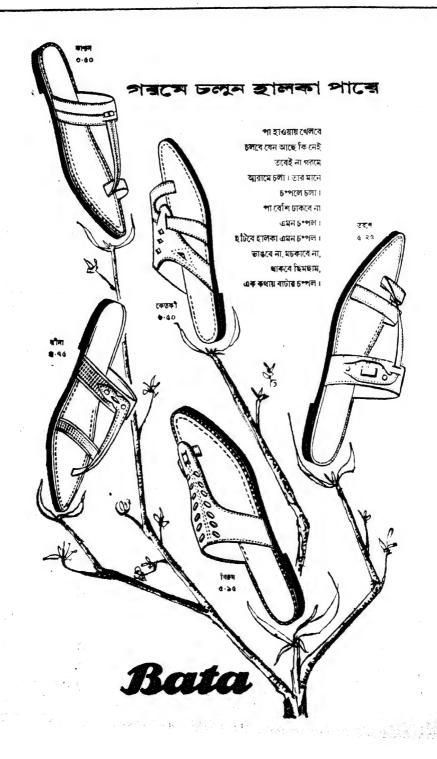
দিকে। ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে শেক্-হ্যান্ড করলেন। আনন্দের আভা ফুটে উঠল রকেটের চোখে মুখে। সে বুঝল বিপদ কেটে গেছে। তারপর যা করল তা সে প্রায়ই করে, ডাক্তারবাবুর কোলে মাথা গুঁজে লম্বা ল্যাজটা নাড়তে লাগল। ডাক্তারবাবুও তার কানে পিঠে ল্যাজে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন তাকে। তাঁর আদরের ভাষা অদ্ভুত।

"মখমল কেনো, বাঘ-নেজু, নাক-ভিজে, গুন্টু-মুখো, পাজি, পাজি—পাজকু।"

এত আদর খেয়েও রকেট কোল থেকে মুখ তোলে না। তার ভাবটা যেন এত বকেছ, কান মলে দিয়েছে, আরও আদর চাই। ডাক্তারবাবু আর এক প্রস্থ আদর করলেন।

"রকেট, রকটি, রক, রকাই, রুকোলি-রু, রুকি রুম—"

রকেট খুশী হল এবার। আর একবার শেক্হ্যান্ড করে কাছেই বসল। ভুটানও মহাখুশী, কৃতিত্বটা যেন তারই। সে পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে একবার নেচে নিলে। জাম্বু কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। সে ছোট্ট একটু হেঁচে গা দুলিয়ে চলে গেল অন্য-দিকে, তার ভাবটা যেন এসব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। এমন সময় ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন মাস্টার মশাইকে। এমনভাবে চাইলেন যেন অচেনা লোককে দেখছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিই ওই রকম, কেউ যেন তাঁর চেনা নয়, কেউ যেন আপন নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা বললেন তার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির মিল পাওয়া গেল না।

"আসুন মাস্টার মশাই। কি খবর?"

গণেশ হালদার এগিয়ে এসে হেসে বললেন, "আপনি রকেটকে যে সব নামে আদর করছিলেন তা বড় অদ্ভুত লাগল। মখমল-কেনো, বাঘ-নেজু এসব কথা তো আগে শুনিনি কোথাও।"

তুবড়ি ছুটল ডাক্তারবাবুর কণ্ঠে।

"সমাস করে ওসব আমি নিজেই তৈরি করেছি। মখমলের মতো কানের স্পর্শ যার সে মখমল-কেনো, বাঘের মতো লম্বা লেজ যার সে বাঘ-নেজু, গুন্টু গুন্টু মুখ যার সে গুন্টু-মুখো। আরও কত তৈরি করি যখন যা মনে হয়—"

"চমৎকার হয়েছে কথাগুলো।"

"অবর্ণনীয়কে বর্ণনা করবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। কিন্তু কিছু হয়নি। যাক ও কথা। একটু আগে আমাদের পাড়ায় এক রোমাঞ্চ-কর কাণ্ড ঘটে গেল, তার খবর পাননি নিশ্চয়। রীতিমত দাঙ্গা—"

"দাঙ্গা? না, কোনও সাড়াশব্দ পাইনি তো।"

"সাড়াশব্দ পাওয়া উচিত ছিল, কাকগুলো ডাকছিল তো খুব।"

"কিসের দাঙ্গা?"

"একটা বাজ এসে বসেছিল ওই ইউক্যালিপটাস গাছের উপর। আর যায় কোথা! যত কাক আর ফিঙে লেগে পড়ল তার বিরুদ্ধে। বাজটাও কিছুতে যাবে না, কখনও এ গাছে বসছে, কখনও ও গাছে বসছে, কিন্তু ওরাও না-ছোড়। শেষ পর্যন্ত তাকে পাড়া-ছাড়া করে তবে ছাড়লে। বহিঃ-শত্রুকে বিতাড়ন করে ওই দেখুন না, বিজয়-গর্বে বসে আছে সব।"

ডাক্তারবাবু উদ্ভাসিত চক্ষে একদল কাককে দেখালেন। টেলিগ্রাফের তারের উপর সার বেঁধে বসে আছে বিজয়ী বীরের মতো। একটু দূরে ফিঙেও বসে আছে দুটো।

ডাক্তারবাবু ফিঙে দুটোকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে ফিঙেদের দেখছেন, ওরা মহা ওস্তাদ লোক। বিখ্যাত ভিংরাজ পাখী ওদের আত্মীয়। ওরা শুধু যোদ্ধা নয়, বড় আর্টিস্টও। চমৎকার গান করে। অবশ্য কান পেতে না রাখলে ওদের গান শোনা যায় না। একদিন শোনাব আপনাকে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওরা তো ফরমাশ মতো গাইবে না। যখন গাইবে তখন হয়তো আপনাকে পাওয়া যাবে না। পাখীদের গান শুনতে হলে কান পেতে থাকতে হয়। হলদে পাখী-গুলো আরও দুষ্টু, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, তারপর পাতার আড়াল থেকে হঠাৎ এমন একটা মিষ্টি সুর ছাড়ে যে, চমকে যেতে হয়।"

পাখীর বিষয়ে আরও হয়তো বলতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

কাউ এসে হালদার মশায়কে নমস্কার করে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল।

"কার চিঠি?"

"ডাক্তার ঘোষালের।"

"আলাপ করেছেন নাকি?"

"গিয়েছিলাম একদিন।"

"কি লিখেছেন?"

"ও'র সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন আজ সন্ধ্যার সময়।"

"লোকটি করিৎকর্মা। ও রকম লোকের সঙ্গে ভাব-সাব রাখা ভালো।"

গণেশ হালদার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। চিঠিটি পড়লেন আর একবার। চিঠিটির লেখবার ধরন অদ্ভুত।

প্রিয় হালদার মশায়,

টু কোট দ্বিজেন্দ্রলাল—আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে যদি মদীয় কুটিরে আপনার পবিত্র পদরজঃ ঝাড়েন আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার পাইবে। টু কোট ঘোষাল—প্লীজ কাম টু মাই প্লেস দিস ইভনিং, ও ডার্লিং। ঘোষাল।

সন্ধ্যার একটু পরেই গণেশ হালদার ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির দিকে গেলেন।
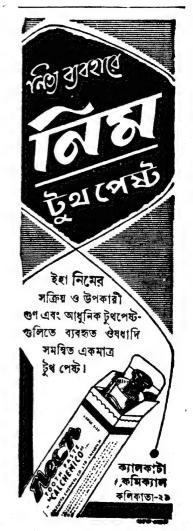
একটি সর্ গলির মধ্যে ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি। আশেপাশে আর বাড়ি নেই তেমন: ফাঁকা পড়তি জমি পড়ে আছে দ্'দিকে। নির্জনতার জন্যেই সম্ভবত বাড়িটি পছন্দ হয়েছিল ডাক্তার ঘোষালের। শহরের মধ্যে অথচ কেমন যেন পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ ভাব। গলির মধ্যে ঢ্কেই হালদার মশাই উচ্চ-কণ্ঠের বাদ-প্রতিবাদ শ্নতে পেলেন। ঘোষালের বাইরের ঘরে বসে কারা যেন তর্ক করছে। হালদার দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওই তর্কবিতর্কের মধ্যে ঢ্কতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। ভাবলেন, ফিরে যাই। কিন্তু ফেরা হল না, বাইরের কপাটটা খ্লে গেল এবং কাউ ছ্টে বেরিয়ে এল। সংগে সংগে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার ঘোষাল এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ঘরের ভিতর।

কাউ চে'চাতে লাগল, "আমার পাওনা আমাকে চুকিয়ে দিন। যদি না দেন, আমি যেমন করে পারি আদায় করে নেব।"

তার চেয়েও উচ্চকণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন ঘোষাল, "চোপ রও হারামজাদা। হালদার মশাই এলে, তিনি যা দিতে বলবেন তাই দিয়ে দেব। তার আগে তুমি এক পাও নড়তে পাবে না এখান থেকে। তোমার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে রসিদ লিখে দিয়ে তবে যাও। কে দাঁড়িয়ে ওখানে?"

হালদার মশায়ের অস্পষ্ট ম্তিটা দেখতে পেয়েছিলেন ঘোষাল।

"আমি—"

আমতা আমতা করে হালদার মশাই বললেন।

"আমি কে? হ্ ইজ আই?"

"আমি হালদার।"

"ও আস্ন, আস্ন।"

সংগে সংগে স্র করে গেয়ে উঠলেন, "তোমারি পথ চেয়ে বসে আছি বঁধ্ হে, জা-নালার কিনারে।"

তারপর হালদার কাছে আসতেই ফিসফিস করে বললেন, "সব ফাঁস হয়ে গেছে। The cat is out of the bag. কাউ জানতে পেরেছে যে, সে আমার ছেলে এবং যা বলেছিলাম, as I predicted, একদম বদলে গেছে। বনবেড়াল এখন টাইগারের রোলে প্লে করছে। আস্ন, ভিতরে আস্ন।"

হালদার মশাই ভিতরে গিয়ে দেখলেন কাউ গ্ম হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওষ্ঠাধর দ্ঢ়নিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত চোখ দ্টো জ্বলছে।

"কি ব্যাপার?"

হালদার মশাই সহজ হবার চেষ্টা করে ম্চকি হেসে চাইলেন কাউ-এর দিকে। ঘোষালও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। কাউ কোন জবাব দিলে না।

ঘোষাল বললেন, "ব্যাপার হচ্ছে এই. কাল থেকে ও'র ধারণা হয়েছে উনি কাউ নন উনি কর্ণ। আসল কর্ণ স্থের সম্পত্তি ক্লেম করেননি, উনি করছেন। ও'র এক মা —কুন্তী বলতে পারেন তাঁকে—হাজির হয়েছেন হঠাৎ শ্ন্য থেকে। She has materialised from nowhere, ছেলেকে এসে এই মন্ত্রণা দিয়েছেন। Well, I am game, আমার কিছ্ আপত্তি নেই। আপনি দ্' পক্ষের কথা শ্নে যা বলে দেবেন তাই আমি দিয়ে দেব। আপনাকেই আমরা সালিস মানছি।"

"আমাকে! আমাকে এসবের মধ্যে টানছেন কেন!"

"আমি টানিনি, ন্ক টেনেছে। আমি বলেছিলাম মিস্টার সেন আর পান্ডা যা ঠিক করে দেবে, আমি তাই মেনে নেব। কাউ তাতে রাজী নয়, ওরা নাকি আমার পেটোয়া লোক। তখন ন্ক ওকে পরামর্শ দিয়েছে আপনাকে সালিস মানতে। ও তাতে আপত্তি করেনি। It is Nook's selection."

এই বলে তিনি হাঁট্ নাচাতে নাচাতে শিস দিতে লাগলেন এবং টেবিলে আঙ্লের টোকা দিয়ে তাল রাখতে লাগলেন শিসের সংগে সংগে।

হালদার বললেন, "ন্কই বা আমাকে এসবের মধ্যে টানছে কেন।"

"ন্কের বদ্ধ ধারণা হয়েছে আপনি মহা-প্র্ষ। হয়তো সত্যিই আপনি মহা-প্র্ষ। মহাপ্র্ষেরা প্রায়ই আপনার মতো ভীতু লোক হয়। কিন্তু মহাপ্র্ষ হন বা নাই হন কাজটি আপনাকে করে দিতে হবে।"

গণেশ হালদার বড়ই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। মাথা চুলকোলেন একবার,

তারপর কাসলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

"ভেবে দেখবার তো সময় নেই। ও মাগীকে আজই বিদেয় করতে হবে। I must drive her out to day"

যদিও গণেশ হালদারের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে?"

"ওই কুন্তীকে। কাউ, তোমার গর্ভ-ধারিণীকে ডাক। এখুনি ফয়সালা হয়ে যাক।"

কাউ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবার বলল, "আমায় মায়ের সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা বলবেন তা বলে দিচ্ছি।" বলেই বেরিয়ে গেল সে।

কাউ-এর ভাব-ভঙ্গী দেখে বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন গণেশ হালদার। প্রথম দিন তাকে খুব নীরব নিরীহ মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হ'ল ঠিক উলটো। একটা আগ্নেয়-গিরি যেন এতদিনে চুপচাপ ছিল। এইবার নিজ মূর্তি ধরেছে।

একটু পরেই কাউ-এর পিছু পিছু একটি আধঘোমটা দেওয়া লম্বা মেয়ে-মানুষ এসে ঘরে ঢুকল। রাঘব ঘোষাল গণেশ হালদারের দিকে চেয়ে ভুরু দুটো ঈষৎ নাচালেন। ভাবটা এইবার আপনার কাজ শুরু করে দিন। ইতস্তত করতে লাগলেন হালদার, কিন্তু এটাও বুঝলেন কিছু একটা করতে হবে, ফাঁদে পড়ে গেছেন, পালাবার উপায় নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি চান, খুলে বলুন।"

মেয়েটির উত্তর শুনে চমকে যেতে হল তাঁকে। মেয়েটি খোনা।

বলল, "শুনেচি', রাঘব এ'ক লাখ টাঁকা জ'মিয়েছে'। আঁমি ও'র স্ত্রী', কাঁলু ও'র ছে'লে'। আঁমাদে'র দু'জ'নের স'ব সু'দ্ধ প'চাত্তর হাঁজার টাঁকা পা'ওয়া' উ'চি'ত। কি'ন্তু আঁমরা প'ঞ্চাশ হাঁজার পে'লেই চ'লে' যাঁব।"

রাঘব ঘোষালের মুখে একটা নীরব হাসি ফুটে উঠল। গণেশ হালদার কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার আর কিছু বলবার আছে?"

"নাঁ। আঁমি টাঁকা পে'লে'ই চ'লে যাব'।"

রাঘব ঘোষাল তখন বললেন, "এইবার আমার কথা শুনুন। আমার প্রথম কথা, আমি উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুরা যে এ-দেশে কি দুর্দশায় আছে তা আপনার অবিদিত নেই। সবাই জানে মিস্টার সেনের অনুগ্রহে এখানে কোনরকমে টি'কে আছি। আমার একটা ডাক্তারি পেশা আছে বটে, কিন্তু আমি সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন, মাসে দু শো টাকাও রোজগার করতে পারি না আপনি খোঁজ করলে বুঝতে পারবেন অধিকাংশ লোকই আমাকে ফি দেয় না। উদ্বাস্তু কলোনীর ডাক্তার হিসেবে শ' খানেক টাকা মাইনে পাই। সব মিলিয়ে কোনক্রমে দিন গুজরান করি। আমার মতো দরিদ্র লোক এক লাখ টাকা জমাবে এ কি সম্ভব? আমার ব্যাঙ্কের খাতা দেখলেই বুঝতে পারবেন কোনরকমে চালাচ্ছি আমি—হ্যান্ড টু মাউথ। আমার দ্বিতীয় কথা, এই মেয়েটি কালুর মা নয়। একে আমি কখনও দেখিনি। কালুর মা খোনা ছিল না। সে অনেকদিন আগে কালুকে আমার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল। কালুকে আমি চ্যারিটি বয় হিসেবে মানুষ করেছি। একে আমি চিনি না।"

"স'ব মি'ছে' ক'থাঁ। আঁমিই কাঁলু'র মাঁ। আঁমি আগে' খোঁনা ছি'লুম না।"

এ'ক ব'ছ'র আগে আমার টাঁগ'রা হ্যাদা হ'য়ে এই র'ক'ম হ'য়ে গে'ছি'। স'বই ক'পালে'র নে'ক'ন।"

ঘোষাল বললেন, "সিফিলিটিক ওম্যান।"

কাজর চোখ দুটো জবলজবল করে উঠল। কি একটা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল হঠাৎ। হাত দুটো মুঠি করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গণেশ হালদার কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনিই তোমার মা?"

"ইনিই আমার মা।"

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল কাউ।

রাঘব ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠলেন এবার। মুখে কপালে একবার হাত বুলিয়ে গির্জার পাদ্রীরা যেভাবে বক্তৃতা দেয়, সেইভাবে বলতে লাগলেন কাউকে উদ্দেশ করে।

"দেখ কাউ, তুমি যে আমার ছেলে, তার কোন প্রমাণ নেই। আর এই মেয়েটি যে কোন কালে আমার স্ত্রী ছিল, তা-ও প্রমাণ-সাপেক্ষ। এ যা বলছে, তা ডাহা মিথ্যে কথা, আনডাইলাটেড লাই। তবে একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছি, ছেলের মতই ভালবেসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তোমার সংগে বাপের মতই ব্যবহার করে যাব, তুমি যদি ওই স্ত্রীলোকটির ভাঁওতায় না ভোল। তুমি যদি ওর সংগে জুটে আমাকে চোখ রাঙাও, আমি একটি আধলা দেব না তোমায়। কিন্তু তুমি আগে যেমন ছিলে, তেমনি যদি থাকো তা হলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, I solemnly promise, তোমাকেই আমার উত্তরাধিকারী করে যাব। ওর পাল্লায় পড়ো না তুমি। ও এতদিন কোথায় ছিল? কে তোমাকে এতদিন ক্ষিধের খাবার আর তেষ্টার জল যুগিয়েছে? অসুখের সময় কে তোমাকে ওষুধ খাইয়েছে, সেবা করেছে? এখানে আসবার কিছুদিন আগে আমি পাটনায় ছিলাম, কিন্তু সেখানে তুমি একটা ছুঁড়ির সংগে লটপটিয়ে পড়লে, তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই তোমাকে নিয়ে সেখান থেকে পালাতে হল আমাকে, যদিও সেখানে আমার প্র্যাকটিস বেশ জমে উঠেছিল। সমস্ত কথা ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি এর সংগে জুটেছ কেন?"
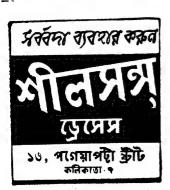
"ও' জু'টবে' কে'ন, আমিই জু'টেছি' ও'র স'ংগে। আমি খে'তে পাই না, ও' আমার' ছেলে, তাই ও'কে' খু'জে বা'র ক'রে'ছি'। ও'কে' পে'টে ধ'রে'ছিলু'ম, ও' আমাকে অ'স'ম'য়ে দে'খ'বে' না? বিষয়ের অর্ধে'ক না নি'য়ে আমি ন'ড়'ব না এ'খা'ন থে'কে'।"

গণেশ হালদারের মনে হচ্ছিল অপ্রত্যাশিত-ভাবে তিনি যেন একটা পূতিগন্ধময় নোংরা নর্দমার মধ্যে পড়ে গেছেন। শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল তাঁর। নর্দমাকে কি করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যায়, এ কথা ভাবছিলেন না তিনি, তাঁর মনে হচ্ছিল, কি করে এখন উদ্ধার পাওয়া যায়।

রাঘব ঘোষাল তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "কি করা উচিত বলুন তো এখন।"

গণেশ হালদার ইতস্তত করতে লাগলেন।

"কিছু বলুন, say something, don't shut up like a troubled snail. বিপন্ন শামুকের মতো মুণ্ডু টেনে নেবেন না। Thats not manly, ওটা কি মানুষের মতো কাজ?"

হালদার বললেন, "কাল্‌ যখন একে নিজের মা বলছে, তখন এর ভারও আপনাকে নিতে হবে। ওকে তো কাল্‌ ফেলতে পারবে না। একসংগে যদি দিতে না পারেন, মাসে-মাসে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন না-হয়।"

"বেশ, বলুন কত দেব? Name tha sum।"

"মাসে পঞ্চাশ টাকার কম কি চলবে আজকাল?"

"বেশ, মাসে পঞ্চাশ টাকাই দেব, কিন্তু ওকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাউকে প্রত্যেক মাসে আমি টাকাটা দিয়ে দেব, ও পাঠিয়ে দেবে।"

"আমি অ'র্ধে'ক বি'ষ'য় না পে'লে' ন'ড়'ব' না এ'খা'ন থে'কে'।"

রাঘব ঘোষাল নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে গিয়ে কোণের আলমারিটা খুলে তার ভিতর থেকে বন্দুক বার করলেন। তারপর হঠাৎ সেটা তুলে চিৎকার করে উঠলেন, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে, গেট আউট।" তারপরেই দড়াম করে শব্দটা হল। চিৎকার করে ছুটে পালাল খোনা মেয়েটা। কাউ দাঁড়িয়ে রইল গুম হয়ে। তারপর সে-ও চলে গেল। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল নুক।

"কি হল!"

"তাড়িয়ে দিলুম মাগীকে।"

সংগে সংগে নুকও বেরিয়ে গেল।

গণেশ হালদার উঠে দাঁড়ালেন।

"বসুন, বসুন, আপনি যাচ্ছেন কেন, আমাকে এমন বিপদে ফেলে চলে যাওয়াটা কি উচিত হবে? বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে আর কে দেখবে! তা ছাড়া আপনিও উদ্বাস্তু, আমিও উদ্বাস্তু, ডবল বন্ধন। বসুন, যাবেন না। হিম্মত করিয়ে।"

ঘাড়ের উপর প্রকাণ্ড থাবার মতো হাত রেখে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

হালদার বললেন, "মাপ করবেন আমাকে, এসব খুন-জখমের ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না।"

"খুন-জখম কোথা দেখলেন! ব্লাংক ফায়ার করলাম, ওকে ভয় দেখাবার জন্যে, just to scare her away এক বিন্দু রক্তপাত হয়নি, not a drop of blood has been shed! ফায়ার না করলে ও মাগী যেত না। সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে অতিষ্ঠ করে তুলত, would have whined and whine till your patience collapsed."

এই বলে ঘোষাল হলদে দাঁত বার করে তাঁর সেই আকর্ণ-বিস্তৃত হাসিটি হাসলেন।

হালদার জিজ্ঞেস করলেন "ও আপনার স্ত্রী নয়?"

"না। তবে আমার রক্ষিতা ছিল কিছুদিন। কাউ ওর ছেলে এ-ও ঠিক। ও যদি বরাবর ফেথফুল থাকত, ওকে আমি ছাড়তাম না। কিন্তু তা রইল না। একদিন গিয়ে দেখি, গজু গাড়োয়ান ওর ঘরে ঢুকেছে। সেই দিনই বললাম, মাপ কর, গজু গাড়োয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারব না। জগৎসিংহ বা ওসমান হলেও বা কথা ছিল। সেই দিনই I washed my hands, মাগীর প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে চলে এলাম। তারপর ও কাউকে আমার বারান্দায় বসিয়ে রেখে কোথায় যে ভেসে গেল আর টের পাইনি। এখন বারো বছর পরে ফিরে এসে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দাবি করছে। Silly—"

কিছু একটা বলা উচিত এই ভেবে হালদার বললেন, "কিছু দিয়ে মিটিয়ে নিন—"

"তাই নিতে হবে। কিন্তু সোজায় হবে না। মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতে তো রাজী হলাম, নিলে? সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না। আঙুল বেঁকাতে হবে। পাণ্ডার সংগে এখানকার দারোগার খুব দহরম মহরম। সে লোকও খুব জবরদস্ত। কথায় কথায় হাণ্টার হাঁকড়ায়। তাঁর কাছে একদিন পিটুনি খাক, তবে ঠিক হবে।" (ক্রমশ)

॥ ৩২ ॥

অনিন্দ্য পাকড়াশিকে দেখে আগরওয়ালা চমকে উঠলেন। নাভির তলায় ঝুলেপড়া প্যান্টটাকে কোমরের উপরে তুলতে তুলতে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি?"

অনিন্দ্যও যেন একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, "অতিথিদের খোঁজখবর করতে।"

আগরওয়ালা ঢোক গিলে বললেন, "কিচ্ছু প্রয়োজন ছিল না। আপনাদের আশীর্বাদে আগরওয়ালার গেস্ট রুমে কোনো অতিথিরই কষ্ট হয় না। মিস গুহকে এতনা রুপিয়া তলব আমি কি বাজে বাজে দিচ্ছি?"

অনিন্দ্য বললেন, "আপনাকে কী করে যে ধন্যবাদ দেবো। কলকাতার কোনো হোটেলে ভাল সুইট খালি ছিল না। অর্ডিনারী রুমে তো এঁদের রাখা যেতো না। বাবা নিজেই আপনাকে ফোন করে কথা বলবেন।"

আগরওয়ালা যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, "আরে, কী যে বোলেন। বিজনেসে হামরা যদি এক কনসার্ন আর এক কনসার্নকে না দেখি, তাহলে চলবে কী করে?"

অনিন্দ্য এবার আগরওয়ালার আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অবলীলাক্রমে আগরওয়ালা বললেন, "হামি এক বন্ধুরে খোঁজে এসেছি। তার বার-এ বসে থাকবার কথা। তাকে নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাবো। আপনার অতিথিদের কোনো ডিফিকাল্টি হলে হামাকে জরুর জানাবেন।"

অনিন্দ্য আর সময় নষ্ট না করে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। আগরওয়ালা সোজা লাউঞ্জের টেলিফোন বুথে ঢুকে কারুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর কাউণ্টারে এসে বললেন, "হামি মিস্টার আগরওয়ালা আছি।" তার-পর রাজস্থানী বাংলায় নিবেদন করলেন, মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি যদি তাঁর সন্ধানে এখানে আসেন, তাহলে বলে দেবেন, মিস্টার আগরওয়ালা মিসেস চাকলাদারের ওখানে চলে গিয়েছেন।

মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ পরেই শাজাহান হোটেলে এসে হাজির হয়েছিলেন। কাউণ্টারে এসেই বললেন, "ন্যাটা। আর পারা যায় না। এই বুধ বয়সে একটা দশটা-পাঁচটার চাকরি পেলে বেঁচে যেতাম।"

বোসদা বললেন, "ব্যাপার কি মিস্টার চ্যাটার্জি?"

ফোকলা বললেন, "সে-সব পরে বলছি। এখন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। একটু মাল আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন?"

বোসদা বললেন, "কেন লজ্জা দিচ্ছেন? জানেনই তো অধমদের হাত-পা বাঁধা, লাউঞ্জে ড্রিঙ্ক সার্ভ করবার হুকুম নেই।"

"এ শলা গভরমেণ্ট কবে যে ডকে উঠবে! এই শলাদের জন্যেই কি আমরা স্বদেশী করেছিলাম। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, মাস্টারদা কি এদের জন্যেই প্রাণ দিয়েছিলেন?" ফোকলা যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন।

বোসদা ঈষৎ হেসে নিজের কাজ করতে লাগলেন। ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, "শলা মাল বিক্রি হচ্ছে তাতে দোষ নেই, কিন্তু খোলা জায়গায় খাওয়া চলবে না, শিব-ঠাকুরের দেশে একি আইনরে বাপু। আপনা-দের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। ভদ্দর-লোকের ছেলে, এ-লাইনে এসেছেন, অথচ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই শুনে রাখুন, ব্যাটা-চ্ছেলেরা কোনদিন বললো বলে যে ল্যাভেটরি ছাড়া অন্য কোথাও ড্রিঙ্ক করা চলবে না।"

বোসদা বললেন, "আপনাদের সঙ্গে অনেকের তো জানাশোনা আছে, তাদের বলুন না।"
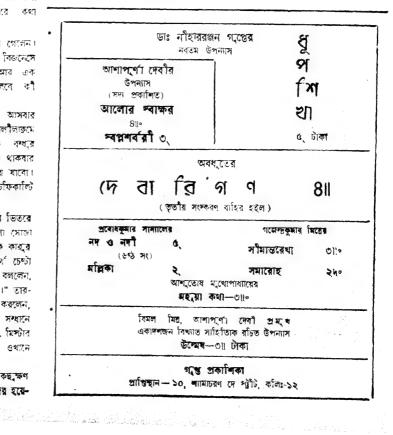
ফোকলা বললেন, "তাহলেই হয়েছে। সব ব্যাটা লুকিয়ে গজগজ করবে, কিন্তু মালের সাপোর্টে পাবলিকলি একটা কথা বলবে না। রাস্তায় সব ব্যাটা ঘোমটা দিয়ে ভাট-পাড়ার বিধবা সাজবে। এ-ব্যাটারা এমন, যদি গভরমেণ্ট কাল হুকুম দেয় তো এরা ল্যাভেটরিতে বসে বসেও ড্রিঙ্ক করে চলে যাবে, তবু একটি রা কাটবে না। একটা লোক পারতো, সে আমার দিদি, মাধব পাকড়াশির ওয়াইফ। কিন্তু দিদি আমার একদম সেকেলে। ড্রিঙ্ক জিনিসটা মোটেই দেখতে পারে না।"

বোসদা বললেন, "তাই বুঝি?"

ফোকলা বললেন, "দিনরাত শুধু মহিলা সমিতি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি, আর না হয় পুজো নিয়ে পড়ে রয়েছেন। দিদি যদি একবার বলতো লুকিয়ে মদ খাওয়ার থেকে খোলাখুলি মদ খাওয়া ভাল, তা হলে হয়তো গভরমেণ্ট একটু কান দিতো।"

স্যাটা বোস বললেন, "আপনার কষ্ট হচ্ছে, বার-এ চলে যান।"

ফোকলা বললেন, "উপায় নেই, মশাই। এক ভদ্রলোকের জন্যে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

আমি বললাম, "আপনি কি মিস্টার আগরওয়ালার কথা বলছেন? তিনি আপনার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গিয়েছেন।"

ফোকলা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ও'র জন্যেই অপেক্ষা করছি। ফোন করেছিলেন আমাকে, অথচ আমি ছিলাম না। বলেছেন, এখুনই যেন শাজাহান হোটেলে চলে আসি।"

সত্যসুন্দরদা বললেন, "মিস্টার আগর-ওয়ালা এখন মিসেস চাকলাদার-এর ওখানে চলে গিয়েছেন।"

"মিসেস চাকলাদার!" ফোকলা হা হা করে হাসতে লাগলেন। "কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই মশাই। এই শর্মা, দিস ফোকলা চ্যাটার্জিই আপনাদের আগর-ওয়ালাকে মিসেস চাকলাদারের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। মশাই, গেরস্ত বাড়ি, শান্তিতে একটু ড্রিঙ্ক করবার সুযোগ ছিল। আমাদের মতো মাতালদের শান্তিনিকেতন। রেট একটু বেশী। ড্রাই ডে-তে মিনিমাম অ্যাডমিশন চার্জ কুড়ি টাকা। তা এরা লেবু কচলিয়ে কচলিয়ে তিতো করে দেবে। আগরওয়ালারা অন্য দিনেও গেস্ট নিয়ে যেতে শুরু করেছে। দুনিয়ার যত কণ্ট্রাক্ট, যত লাইসেন্স, সব একজন চাইলে চলবে কি করে? রোজ রোজ যাচ্ছে, কোনদিন কাগজের লোকদের নজরে পড়ে যাবে। মধুচক্র ফাঁস হয়ে যাবে।"

ফোকলা চ্যাটার্জি ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "চিরকাল শুধু পরের বোঝা বয়ে বেড়ালাম। আমার থ্রু দিয়ে এণ্টারটেন করিয়ে কলকাতার কত ব্যাটা-চ্ছেলে বিজনেসে লাল হয়ে গেল। আমার মশাই লাভের মধ্যে হয়েছে খারাপ লিভার। ফ্রি মাল গিলেছি, আর মাঝে মাঝে দু' চারশ টাকা পেয়েছি। ক্যাপিটাল নেই যে। থাকলে দেখিয়ে দিতাম। অ্যাদ্দিনে কত বেকার শিক্ষিত ছেলে ফোকলা গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রিজে চাকরি পেয়ে যেতো।"

আমি বললাম, "মিস্টার আগরওয়ালা আপনার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবেন।"

"পেটের ছেলে কিছু পড়ে যাচ্ছে না—একটু দাঁড়াক্ না।" ফোকলা চ্যাটার্জি রেগে গিয়ে বললেন। কপালে হাত দিয়ে কী ভাবলেন। তারপর নিবেদন করলেন, "কিছু মনে করবেন না, বেঙ্গলী মেয়েগুলো যে গুড্ ফর নাথিং। মেয়েদের সাহায্য না পেলে কোনো জাত বড় হয় না। আমরা কেন, স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলে গিয়েছেন, নারী জাতিই আমাদের শক্তির উৎস। কিন্তু বাঙালী মেয়েরা একটুও কষ্ট করবে না। মিস্টার রঙ্গনাথনকে তো মনে আছে। ভদ্দরলোকের হাতে লাখ লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট। বেঙ্গল সম্বন্ধে ও'র বেশ শ্রদ্ধা ছিল। খুব ইচ্ছে ছিল, কোনো বাঙালী মেয়ের সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব করেন। সব খরচা দিতে রাজী। তা আপনাকে দুঃখের কথা বলবো কী, কাউকে রাজী করাতে পারলাম না। হলোও তেমনি, মিসেস কাপুর ও'র সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ করলেন। যে অর্ডারটা আমরা পেতে পারতাম সেটা মিস্টার কাপুর পেয়ে গেলেন। অথচ কাগজ খুলে দেখুন, শুধু দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। মেয়েরা যতক্ষণ না এগিয়ে আসছে ততক্ষণ এ-জাতের উন্নতি হতে পারে না, এ-কথা আপনি ডাইরীতে লিখে রাখতে পারেন।"

ফোকলা চ্যাটার্জি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাই ঘুরে আসি।" যেতে গিয়ে হঠাৎ ফোকলা চ্যাটার্জি ঘুরে দাঁড়ালেন। "স্যর মাধবের ছেলে, অনিন্দ্যকে দেখেছেন?"

বোসদা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, "আজ্ঞে, উনি জার্মান অতিথিদের দেখতে এসেছেন।"

"হুঁ", ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন। একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে কেউ কি অনিন্দ্যকে ফোন করেছিল?"

ফোকলা চ্যাটার্জির চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আমার যেন কেমন ভয় হতে লাগল। বললাম, "হ্যাঁ, ডক্টর রাইটার ফোন করেছিলেন।"

"সিওর?" ফোকলা প্রশ্ন করলেন।

"আমার এখান থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিলেন", আমি উত্তর দিলাম।

"আই সী।" ফোকলা উত্তর দিলেন।

"আমার যেন মনে হলো কেউ বাঙলায় কথা বলছে।"

আমি উত্তর দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কোনোরকমে বললাম, "ঠিকই ধরেছেন। প্রথমে আমি কথা বলেছিলাম। ডক্টর রাইটার আমাকেই সংযোগ করে দিতে বললেন।"

ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, "আচ্ছা।"

ফোকলা চ্যাটার্জি চলে যেতে আমি যেন আশ্বস্ত হলাম। আর কিছুক্ষণ প্রশ্ন করলেই আমি কী যে বলে ফেলতাম কে জানে।

বোসদা এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মুখের থেকেই তিনি যেন সব বুঝে নিলেন? তিনি জানেন, ডক্টর রাইটার বিকেল থেকে একবারও কাউন্টারে আসেন নি। তবু তিনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। আমি এবার কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময়েই বোসদা খাতার মধ্যে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "এটা হোটেল। এখানে জড়িয়ে পড়তে নেই। জড়ালেই দুঃখ।"

বোসদার কথার উত্তর দেবার মতো শক্তি আমার ছিল না। কোনোরকমে কথাগুলো না শোনার ভান করে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

সেই রাত্রে করবী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ফোকলা চ্যাটার্জির কথা তাঁকে বলবো। কিন্তু পারলাম না। দেখলাম, তিনি চুপচাপ বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়েছি। অনিন্দ্যবাবু চলে গিয়েছেন. এবং ও'রাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন আগরওয়ালা এলেও আর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

করবী দেবীর কাছেই শুনলাম, অনিন্দ্য এমনভাবে ডেকে পাঠাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। করবী দেবী উত্তর দিতে পারেননি। শুধু বলেছিলেন, "আপনার প্রয়োজন আছে। এ'দের দু'জনকে সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতো।"

আমার সঙ্গে কথা বলতে করবী দেবী ঘেমে উঠেছিলেন। "আবার আসবেন উনি কাল সকালে। ও'কে কিছুতেই ছাড়া হবে না। আমার কেমন ভয় ভয় করছে।"

বোসদার সাবধানবাণী তখনও আমার কানে বাজছিল। হোটেলে চাকরি করতে এসে, আমি জড়িয়ে পড়তে রাজী নই। তবু আমাদের চোখের সামনে আগরওয়ালা পাকড়াশিদের সর্বনাশ করবেন তা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু কিছুদিন পরে জানতে পেরেছিলাম,

পাকড়াশি বাণিজ্য সাম্রাজ্য বাইরে থেকে যতটা মনে হতো ততটা শক্তিশালী ছিল না। এই জার্মান সহযোগিতা না পেলে হয়তো তাঁদের প্রাসাদের ভিত নড়ে উঠতো। করবী গুহ তখন আনন্দে চোখের জল ফেলছিলেন। অনিন্দ্য জানে না, কিন্তু তাকে সর্বদা কাছে কাছে রেখে, আগরওয়ালার হাত থেকে তিনি পাকড়াশিদের রক্ষে করতে পেরেছিলেন।

কাগজে সেদিন ছবি বেরিয়েছিল। জার্মান সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন মাধব পাকড়াশি। তাঁর বাঁদিকে শ্রীঅনিন্দ্য পাকড়াশিকে দেখা যাচ্ছে।

এই ছবিটার দিকে তাকিয়েই করবী দেবী আনন্দের অশ্রু বিসর্জন করছিলেন।

এইখানেই শেষ হতে পারতো। শাজাহান হোটেল এবং করবী গুহের জীবন থেকে অনিন্দ্য পাকড়াশি এইখানেই সরে যেতে পারতেন। অন্তত সেইটাই স্বাভাবিক হতো। শাজাহানের নতুন কোনো অতিথির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হতো, তাঁকে নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকতাম, অনিন্দ্য পাকড়াশির অন্তরে আমাদের কোনো স্থান থাকল কিনা সে নিয়ে চিন্তা করতাম না। কিন্তু, সবার অলক্ষ্যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে এমন ঘটনা ঘটবে তা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

আমি কেবল অনিন্দ্যর ব্যবহারে আশ্চর্য হয়েছিলাম। করবী গুহর সজাগ দৃষ্টির বাইরে থাকলে, পাকড়াশি ইন্ডাস্ট্রিজের পরিবর্তে যাঁর ছবি কাগজে বের হতো তাঁর নাম মিস্টার আগরওয়ালা। কিন্তু কই অনিন্দ্য তো একবারও মনের সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেলেন না? আর সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, করবী দেবীও সে নিয়ে একটুও দুঃখিত হলেন না। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন, অন্তত আমার কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু কই?

আসলে তখনও আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝলাম কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যের একটু পরেই কালো চশমায় চোখ দুটো ঢেকে, সিল্কের শাড়ি পরে এবং সাদা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে যিনি হোটেলে এসে ঢুকলেন তিনি মিসেস পাকড়াশি। অনেক-দিন তাঁকে হোটেলে আসতে দেখিনি। হয়তো জার্মান অতিথিদের উপস্থিতির জন্যেই তাঁর আসা সম্ভব হয়নি। এখন তাঁরা বিদায় নিয়েছেন। পুত্র অনিন্দ্যকে নিয়ে মাধব পাকড়াশি হয়তো বোম্বাই কিংবা দিল্লিতে রওনা হয়েছেন। আর সৌভাগ্যক্রমে আমাদের এক নম্বর সুইটও খালি রয়েছে।

মিসেস পাকড়াশি কাউন্টারে আমাকে দেখে বোধ হয় একটু হতাশ হলেন। বললেন, "মিস্টার বোস কোথায়?"

"ও'র ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোনো কাজ হয়।"

মিসেস পাকড়াশি বললেন, "ও'র সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই। আমি মিসেস পাকড়াশি।"

বোসদাকে ডেকে নিয়ে এলাম। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, "কখন ঘর চান জেনে নিলেই পারতে। আমাকে আবার তোলা কেন?"

বললাম, "আপনার কাস্টমার। আমাদের সঙ্গে লেন-দেন করতে চান না!"

বোসদা বললেন, "না কিছু গোলমাল আছে নিশ্চয়ই। হয়তো কমনওয়েলথ সিটিজান নয় এবার। সুতরাং পুলিসের ফর্ম ফিল আপ করার হাঙ্গামা আছে।"

বোসদাকে দেখেই মিসেস পাকড়াশি কাউন্টার থেকে এগিয়ে এলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ও'রা দুজনে কীসব কথা-বার্তা বললেন। তারপর কাউন্টারে ফিরে এসেই আমাকে বললেন, "এক নম্বর সুইটের চাবিটা দাও তো।"

চাবি হাতে করে ও'রা দুজনেই উপরে উঠে গেলেন।

ঘড়ির কাঁটা ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে, আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, অথচ ও'দের দুজনের কারুরই দেখা নেই। প্রায় এক ঘণ্টা পরে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে আহত সর্পিণীর মতো ফোঁস
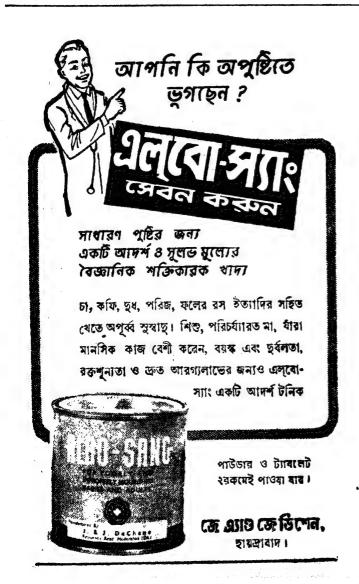
ফোন করতে করতে মিসেস পাকড়াশি হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উনি চলে যেতেই বেয়ারার হাতে স্লিপ দিয়ে বোসদা আমাকে ডেকে পাঠালেন। কাউণ্টারে উইলিয়মকে বসিয়ে রেখে আমি উপরে চলে গেলাম।

বোসদা বললেন, "বোসো।"

আমি বসলাম। বললাম, "মিসেস পাকড়াশির জন্যে কোনো স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করতে হবে? ন্যাটাহারিবাবুকে খবর দিয়ে ফ্রেশ বালিশ এবং চাদরের ব্যবস্থা করতে হবে?"

"না ও-সবের কিছুই করতে হবে না।" বোসদা চিন্তিত হয়ে বললেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা কী? তুমি নিশ্চয়ই জানো। অথচ আমাকে বলনি।"

আমি অবাক হয়ে ও'র মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা বললেন, "করবী এবং অনিন্দ্যর কথা জিজ্ঞাসা করছি। এরা এতোদূরে এগোবার সময় পেল কখন?"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

তুমি নিশ্চয়ই সব দেখেছো, সুতরাং তোমার কাছে চেপে রেখে লাভ নেই, "অনিন্দ্য করবীকে বিয়ে করতে চায়। শাজাহান হোটেলের দু' নম্বর সুইটের হোস্টেসের জন্যে মাধব ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রিন্স-অফ-ওয়েলস পাগল হয়ে উঠেছে। সুতরাং মিসেস পাকড়াশির অবস্থা বুঝতেই পারছো।"

কেন জানি না, প্রথমেই মনের মধ্যে আমার আনন্দের শব্দহীন উল্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনিন্দ্য এবং মিস গুহ। মন্দ কী? সংসারের সব উত্তাপ থেকে করবী নিশ্চয় অনিন্দ্যকে রক্ষা করবেন। আর অনিন্দ্য যদি করবীর শুষ্ক মনের মরু-ভূমিতে জল সিঞ্চন করে ফসল ফলাতে পারে, তা হলে আমাদের পরিচিত পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। আমি এর কিছুই জানতাম না। করবী বলেন নি। কিন্তু কেনই বা তিনি আমাকে বলতে যাবেন?

বোসদা বললেন, "বিপদ হল আমাদের। এমন ফ্যাসাদে কখনও পড়িনি। মিসেস পাকড়াশির ধারণা অনিন্দ্যকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে করবী। তার ছেলে-মানুষী তার সরল নিষ্পাপ মনের সুযোগ নিয়ে হয়তো মুহূর্তের কোনো অধঃপতন ঘটিয়েছে এবং এবার সে তা চড়া দামে ভাঙাতে চাইছে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এর মধ্যে আমরা আসছি কী করে?"

"মিসেস পাকড়াশি আমাদের স্নেহ করেন। যে কারণেই হোক এই হোটেলের উপর তাঁর দুর্বলতা আছে। তাছাড়া এখন বিপদে পড়ে এসেছেন। বিপদে পড়লে পরম শত্রুকেও সাহায্য করতে হয়।"

"সাহায্য?" আমি বোসদাকে প্রশ্ন করলাম।

"উনি অনুরোধ করছিলেন, আমরা যদি কেউ করবীর সঙ্গে কথা বলি। আমি বলেছি, সেটা মোটেই শোভন নয়, সম্ভবও নয়। তখন তিনি নিজেই দেখা করতে রাজি হয়েছেন। তবে অনিন্দ্য যেন না জানতে পারে।"

আমি চুপ করে রইলাম। বোসদা বললেন, "আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। উনি জেনে গেছেন যে, এই হোটেলে একমাত্র তোমার সঙ্গেই করবী কথাবার্তা বলেন।"

"কেন ন্যাটাহারিবাবু তো রয়েছেন, বয়ো-জ্যেষ্ঠ লোক।" আমি নিজেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হলো না। "পাগল হয়েছো", বোসদা বললেন। "ব্যাপারটা তুমি, আমি, মিসেস পাকড়াশি এবং করবী ছাড়া পৃথিবীর কেউ যেন না জানতে পারে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে রাজি হতে হয়েছিল।

করবী দেবী তখন দু' নম্বর সুইটে একলা চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁর কোলের উপর একখানা কবিতার বই পড়েছিল। পাখির নীড়ের মতো চোখদুটি তুলে 'বন-লতা-সেন-ভঙ্গিতে' করবী দেবী প্রশ্ন করলেন "এতদিন কোথায় ছিলেন?"

হেসে বললাম, "কোথায় আর থাকবো? শাজাহানের একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত ওঠা-নামা করছি।"

করবী গুহ বললেন, "আমি অনেকদিন পরে একটু শান্তিতে রয়েছি। আমার এখন একজনও অতিথি নেই। পাকড়াশিদের কুপোকাৎ করতে না পেরে মনের দুঃখে আগরওয়ালাও এ-দিক মাড়াচ্ছেন না। ফোন করেছিলাম। শুনলাম, ব্লাড-প্রেসার এবং ডায়াবিটিশ একই সঙ্গে আক্রমণ করেছে। সুতরাং এখন কয়েকদিন আমি চুপচাপ বসে বসে পরম আনন্দে কবিতা পড়বো, গান গাইবো, বাইরে বেড়াতে যাবো, যা খুশি তাই করবো।"

এবার আমাকে নিজের কথায় আসতে হলো। "আপনার কাছে একটা প্রস্তাব পেশ করবো।"

"প্রস্তাব?" করবী দেবী আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"হ্যাঁ কিংবা না করবার স্বাধীনতা আপনার। কিন্তু একটা শর্ত আছে। বিষয়টা কাউকে, এমনকি অনিন্দ্যবাবুকেও বলতে পারবেন না।"

অনিন্দ্যর নাম শুনেই করবীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। কোনো রকমে বললেন, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, তবে আমি দিব্য করছি তোমার শর্ত পালন করবো।"

"আমিও তেমন কিছুই জানি না। কিন্তু মিসেস পাকড়াশি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।"

মিসেস পাকড়াশি বলেছিলেন, শাজাহান হোটেলে নয়। অন্য কোথাও ও'রা দুজনে সাক্ষাৎ করবেন। করবী দেবী রাজি হননি। হোটেলের বাইরে যেতে তিনি অভ্যস্ত নন, একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। শুনে মিসেস পাকড়াশি টেলিফোনেই খিল খিল করে হেসে উঠেছিলেন। "আই সি। এখন আমার বিপদ, ঠিক আছে, আমিই দেখা করবো। কিন্তু ব্যাপারটা সে গোপন রাখবে তো?"

"আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে তো?" করবীকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"আমরা প্রখ্যাত হোটেলের কুখ্যাত হোস্টেস। মারোয়াড়ীর চাকরি করে মা-ভাই-বোনদের প্রতিপালন করি, আমাদের কথার কীই-বা মূল্য থাকতে পারে।" করবী দেবী দুঃখিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

মিসেস পাকড়াশির হোটেলে আসবার সেই দিনটি এই মুহূর্তে স্মৃতির পর্দায় আবার যেন দেখতে পাচ্ছি। যে করবী কত স্বনামধন্যকে অবলীলাক্রমে অভ্যর্থনা জানিয়ে অপরের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করেছেন তিনিই যেন আজ কেমন হয়ে গিয়েছেন। বললেন, "আমার ভাল লাগছে না। কথাবার্তার সময় আপনি থাকবেন।"

"তা কখনও হয়?" আমি বললাম। "বরং আমি বাইরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবো।"

নিজের গাড়িতে নয়, একটা ট্যাক্সি চড়ে মাধব ইণ্ডাস্ট্রীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিসেস পাকড়াশি শাজাহান হোটেলে হাজির হয়েছিলেন। ঢোকবার মুখেই যে রিপোর্টার মিস্টার বোসের সঙ্গে ও'র দেখা হয়ে যাবে আশা করিনি। মিস্টার বোস বললেন, "কী ব্যাপার, পি টি আই-এর খবরে দেখলাম প্যারিসের সমাজসেবা সেমিনারে যাবার কর্মসূচী আপনি শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করলেন?"

মিসেস পাকড়াশি মৃদুহাস্য করে উদাসভাবে বললেন, "চিন্তা করবেন না মিস্টার বোস, বোম্বাই-এর মিসেস লক্ষ্মীবক্স প্যাটেল আমার অনুরোধে শেষ মুহূর্তে ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে রাজি হয়েছেন।"

মিস্টার বোস বললেন, "সেতো অন্য কথা। ক্যালকাটার যে গৌরব আপনি প্যারিসে গিয়ে বাড়িয়ে দিতেন, তার তো কোনো ক্ষতিপূরণ হবে না।"

মিসেস পাকড়াশি বললেন, "আপনাদের প্রীতি এবং ভালবাসার জোরেই তো এতোদিন দাঁড়িয়ে রয়েছি। প্রার্থনা করুন, আমার শরীরটা যেন তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠে। উনিতো বন-এ চললেন। অনিন্দ্যকেও পাঠাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এক্সচেঞ্জ ডিফিকাল্টির জন্যে হয়ে উঠলো না।"

মিস্টার বোস হয়তো আরও প্রশ্ন করতেন, কিন্তু মিসেস পাকড়াশি এবার এগিয়ে চললেন। ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো সত্যিই যেন চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

"দু' নম্বর সুইটে মিস গুহ আছেন তো?" মিসেস পাকড়াশি আমাকে প্রশ্ন করলেন। তারপর গম্ভীর মুখে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মাত্র দশ মিনিট, কিংবা বোধ হয় তাও নয়। দু' নম্বর সুইটের দরজা খুলে মিসেস কথা না বলে মিসেস পাকড়াশি সত্যসুন্দরদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সত্যসুন্দরদা তাঁকে হোটেলের বাইরে একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন।

আমাকে দেখে বললেন, "মিসেস পাকড়াশি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন। করবীকে বোলো, মিসেস পাকড়াশির কথা না শুনলে তাঁকে কষ্ট পেতে হবে। ভদ্রমহিলা তাই আমাকে জানিয়ে দিতে বললেন।"

করবী গুহ যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এই বিশাল জগতে করবী যেন একা, আপনজন বলতে তাঁর কেউ নেই। পুরুষের একাকিত্ব মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এই বিদেশী পরিবেশে করবী দেবীর অবস্থা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে উঠলো। বেশ তো ছিলেন, কেন শুধু শুধু এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়লেন। আর উপদেশ নেবার লোক পেলেন না তিনি। শাজাহান হোটেলের কনিষ্ঠতম কেরাণী জীবনের বৃহত্তম সমস্যায় করবীকে কি পরামর্শ দেবে?

দেশের অগণিত পাঠকপাঠিকা, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। সত্য কোন পক্ষে, নীতি কোনদিকে, তা বিচার করে দেখবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। জানি সমাজের সাবধানী পুরুষ এবং মহিলারা আমার এই দুর্বলতা ক্ষমা করবেন না। হয়তো কুখ্যাত অতিথিশালার অভ্যর্থনাকারিনীর জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়া আমার কিছুতেই উচিত হয়নি। কিন্তু এইটুকু জোর করে বলতে পারি, আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও আমার মতো অসহায় বোধ করতেন।

করবী গুহ আমার দিকে একবার তাকালেন, তারপর আর কিছুতেই নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, "এ আমার কি হলো?"

কোনো অনুরাগজর্জরিতা আত্মীয়বন্ধুবিহীনা মহিলার নিরাশ হৃদয়ের কান্না কখনও শুনেছেন কি? দুঃখজর্জরিত আমাদের এই সংসারে এমন কিছু দুর্লভ দৃশ্য নয় সেটি। আমি অনেকবার শুনেছি, এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি, তারা সম্পূর্ণ এক। কান্না, দীর্ঘশ্বাস এবং অভিযোগ মেশানো সেই শব্দের বর্ণনা দেবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। একমাত্র কোনো বেঠোফেন, মোৎসার্ট বা ভাগনার সুরের মূর্ছনায় তার রূপ দিতে পারতেন। কোনো শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা ডিকেন্স হয়তো কানে শুনলে কলমে তার বর্ণনা দিতে পারতেন। সে আমার সাধ্যের অতীত।

শাজাহান হোটেলের দু' নম্বর সুইটের দেওয়ালের ইটগুলো যেন সভয়ে প্রতিধ্বনি তুললো, 'এ আমার কি হলো?'

অগোচরে তুমি এক সুদর্শন নির্মলপ্রাণ যুবককে তোমার মন দিয়েছিলে। তুমি আন্দাজ করেছিলে সেও হয়তো তোমার প্রতি সামান্য অনুরক্ত অন্তত তার মনের কোথাও তোমার জন্যে সামান্য কোমল স্থান আছে। কিন্তু কেবল সেই পর্যন্ত। তারপর? তারপর যে এতদূর এগিয়েছে, তাতো জানা ছিল না। অনিন্দ্য যে বাড়িতে বলেছে, সে যে এগিয়ে যেতে মনস্থির করেছে, তাতো সে নিজেও বলেনি। মিসেস পাকড়াশিই অজ্ঞান্তে করবী গুহকে সেই পরম আশ্চর্য, পরম প্রিয়, পরম মধুর, সংবাদটি দিয়ে গেলেন।

"সাবধান। পাকড়াশি গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রীজের সামান্যতম ক্ষতিও আমার স্বামী বা আমি সহ্য করতে পারবো না। অনিন্দ্যর বয়স কম, সে বোঝে না। ছিঃ, তাই বলে তুমি। তুমি না মেয়েমানুষ? তোমার অন্তর বলে কোনো জিনিস নেই?" মিসেস পাকড়াশি প্রশ্ন করেছিলেন।

অন্তর বলে একটা জিনিস আছে বলেই তো আজ এমন অবস্থা। করবী গুহর অন্তরটা শুকিয়ে কিসমিস হয়ে ছিল এতোদিন, এই ক'দিনেই হৃদয়ের রসে ভিজে সেটা আবার টইটম্বুর হয়ে উঠেছে।

মিসেস পাকড়াশি বলেছিলেন, "কেন যে জার্মানদের এখানে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন কত টাকা হলে ছাড়বে বলো?"

করবী গুহ ফ্যালফ্যাল করে মিসেস পাকড়াশির দিকে তাকিয়েছিলেন। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, "টাকা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। যার জন্যে আমার এই অশান্তির সৃষ্টি করেছো। যার জন্যে আমার প্যারিসে যাওয়া হলো না।" মিসেস পাকড়াশি উত্তর দিয়েছিলেন।

মিসেস পাকড়াশি তারপর নিজেই উঠে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, "মনে থাকে যেন তুমি নিজেই কথা দিয়েছো, অনিন্দ্য এসবের কিছুই জানবে না। আর যেহেতু নিজেই তোমার দরজায় এসেছি, সেই জন্যে টাকার অঙ্কটা বাড়িও না। একটু ভেবে দেখো। আমি আবার খবর নেবো।"

করবী গুহ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অনিন্দ্য পাকড়াশি অন্তত তার কথা চিন্তা করেছেন। ছেলেমানুষের মতো সব গাম্ভীর্য হারিয়ে করবী গুহ সেদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। "কই আমাকে তো এখনও বলেননি? আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা উচিত ছিল না? আমি যে রাজি হবো, সেকথা তিনি ধরে নিলেন কেমন করে?"

"হয়তো আপনার চোখেই তা ধরা পড়ে গিয়েছিল।" আমি বলেছিলাম।

"ও'র চোখেও আমি দেখেছিলাম, কিন্তু সাহস হয়নি।" করবী তখন কেবল অনিন্দ্যের কথাই ভাবছেন, মিসেস পাকড়াশির সাবধানবাণী তখন তাঁর মাথাতেই আসছে না।

করবী গুহ তারপর টেলিফোনের দিকে এগিয়েছিলেন, অনিন্দ্যকে বোধ হয় তিনি খুঁজে বার করবেন। আমি ঘর থেকে সোজা ছাদে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন সূরের শিশুরা যেন জগৎপারাবারের খেলা শুরু করে দিয়েছে। গোমেজের ঘর থেকে কলহাস্যে বেরিয়ে পড়ে মানব সমুদ্রের উপকূলে তারা যেন ছোটাছুটি করছে। এমন সময় গোমেজ যে ঘরে শুয়ে থাকতে পারেন আশা করিনি।

গোমেজের ঘরে গ্রামাফোন বাজছে। আমাকে দেখে বললেন, "শরীরটা অসুস্থ, বাজাতে যেতে পারিনি। প্রায়ই বমি আসছে। তাই শুয়ে শুয়ে মোৎসার্টের ভায়োলিন কনসার্টো শুনছি। প্রকৃত ভায়োলিন কনসার্টো মাত্র পাঁচটি তিনি রচনা করে গেছেন।" গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরে প্রভাতচন্দ্রের দেহ পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই। শুয়ে শুয়েই বলতে লাগলেন, "পাঁচটাই সালসবুর্গে সৃষ্টি, ১৭৭৫ সালে। পৃথিবীর কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, একজন উনিশ বছরের ছেলে এই ভায়োলিন কনসার্টো রচনা করেছেন?"

আমি বললাম, "আপনি উত্তেজিত হবেন না, একটু বিশ্রাম নিন।"

"শোনো", ফিস ফিস করে গোমেজ বললেন। "যদি বসুন্ধরার গোপনতম বেদনাকে আবিষ্কার করতে চাও, তবে কান পেতে শোনো।"

রেকর্ডের গান শোনবার সেদিন আমার প্রয়োজন ছিল না। আমি কান পেতো দু' নম্বর সুইটে একটু আগেই ত শুনে এসেছি।

ন্যাটাহারিবাবু পরের দিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি ব্যাপার, মশাই? দু' নম্বর সুইটের মা জননী আমার আজ আর লিনেন পছন্দ করলেন না। ফুলওয়ালাকেও বকুনি দিলেন না?"

বললাম, "জানি না।"

ন্যাটাহারিবাবু মাথা নাড়লেন। "উঁহু ভাল লাগছে না আমার। শাজাহান হোটেলে চল্লিশ বছর কাটিয়ে আমি এখন সব আগে থেকে বুঝতে পারি। বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি গন্ধ পাই।"

ফোকলা চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আগরওয়ালার গেস্ট হাউসের অফিসারটি মেয়েমানুষ না কেউটে সাপ? কাউকে মানে না। খোদ আগর-ওয়ালার স্লিপ নিয়ে এক ভদ্রলোকের জন্যে এসেছিলাম। সোজা ভাগিয়ে দিল। ইন্ডিয়ান ফার্মদের মশায় এই মুশকিল—ডিসিপ্লিন বলে কিছুই নেই। আমেরিকায়, বিলেতে এমন তো কত গেস্ট হাউস আছে। সেখানকার কোনো মেয়ে এমন সাহস করবে?"

সত্যসুন্দরদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কিছু বুঝছো?"

বলেছিলাম, "কেউ বোধ হয় কিছু বুঝতে পারছে না।"

সত্যিই করবী গুহও কিছু বুঝতে পারছিলেন না। চুলগুলো আঁচড়াবার সময় পর্যন্ত তিনি যেন পাননি। বললেন, "কেউ যদি আমাকে ভালবাসে এবং আমি যদি তাকে ভালবাসি, তাহলে তাকে বিয়ে করবার মধ্যে তো কোনো অন্যায় নেই।"

আমাকে ঘরের মধ্যে পেয়ে করবী গুহ ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলেন। আমি চুপ করে রইলাম।

করবী গুহ নিজের মনেই বললেন, "কে কি বলবে, তাতে আমাদের কি এসে যায়?"

আবার পরমুহূর্তেই তিনি যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। "লোকে খারাপ বলবে। আগর-ওয়ালার হোস্টেসকে বিয়ে করেছে পাকড়াশি সাম্রাজ্যের রাজপুত্র।"

একটু ভাবলেন করবী গুহ। "লোকেরা যা খুশি ভাবুক, কি বলেন? আর অনিন্দ্যর মা? অন্যায়। তিনি কেন আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন? তাঁর ছেলেকে সুখী করার দায়িত্ব, সেতো আমি নিচ্ছি? চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন", করবী গুহ অভিযোগ করলেন।

আমার মুখে এখনও কথা নেই। করবী বললেন, "কারুর কথা শুনবো না আমি। আমরা এগিয়ে যাবো।"

এই প্রগলভ করবীর সঙ্গে কি আমার এতোদিনের পরিচয় ছিল?

আবার দেখা হয়েছে। মিস্টার আগর-ওয়ালার গেস্ট হাউসে অতিথিদের যাতায়াত বন্ধ। আমাকে দেখেই করবী মৃদু হাসলেন। "শুনেছেন, মিসেস পাকড়াশি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আগরওয়ালাকে বলে আমার

চাকরির যাবার ব্যবস্থা করাতে পারেন জানিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু করতে পারেন।"

এবার যেন হাসিতে ভেঙে পড়লেন করবী গুহ। বললেন, "আপনিই আমাকে বিপদে ফেলেছেন। না হলে আমি সব ঠিক করে ফেলতে পারতাম।"

"আমি?"

"হ্যাঁ আপনিই তো আমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন অনিন্দ্যকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না।"

"দিব্যি ভাঙুন না, আমার কি?"

"তা কখনও হয়? অনিন্দ্যের যে তাতে ক্ষতি হবে।" করবী গম্ভীরভাবে বললেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখতে দেখতে করবী বললেন, "ভয় দেখালেই আমার মাথার ঠিক থাকে না। ছোটোবেলা থেকে কেউ আমাকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করতে পারেনি। অনিন্দ্য এসেছিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে এতো মন খারাপ কেন? আমি কিছুই বলতে পারলাম না।"

ভয়ে দেখিয়েছিলেন মিসেস পাকড়াশি সত্যি কথা। কিন্তু সেই রাত্রে তাঁকে নিজেই সত্যসুন্দরদার কাছে আসতে হলো। মুখ শুকিয়ে কালি। করবী টেলিফোনে শাসিয়েছে তার হাতেও জিনিস আছে। তার হাতেও এমন আণবিক বোমা আছে, যা মিসেস পাকড়াশির সোনার সংসার মুহূর্তে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে।

মিসেস পাকড়াশি আর যেন সেই গরবিনী মহিলা নেই। করবী গুহের আণবিক বোমায় তিনি যেন ইতিমধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছেন। মিসেস পাকড়াশিও সেদিন ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। শাজাহান হোটেলের এক নম্বর সুইট ভূত হয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে কেন টেনে এনেছিল। মিসেস পাকড়াশি বলেছিলেন, "কাউকে কোনোদিন আর বিশ্বাস করা চলবে না।"

বোসদা পাথরের মতো নির্বাক হয়ে বসেছিলেন। কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

সেই রাত্রে করবী গুহ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খুশীতে ঝলমল করছেন তিনি।

মিসেস পাকড়াশি একটু আগেই তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন জানি। করবীর হাতে একটা ছবির খাম। নিজেই বললেন, "রাজি হয়েছেন। রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, জামাই, সংসার এদের কছে না হলে মুখ দেখাবেন কি করে? বলেছেন, তিনি আর কোনো বাধা দেবেন না। প্রথমে ও'র একটু সন্দেহ ছিল, ভেবেছিলেন আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। তারপর দেখালাম।" করবী এবার খামটা নাড়ালেন। আপনাকেও দেখাতে পারবো না। এক নম্বর সুইটের ঘরের ভিতরে তোলা ছবির নেগেটিভ।

"প্রথমে চমকে উঠেছিলেন তিনি। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর গোপন অভিসারের অমন সর্বনাশা দলিল কি করে আমার হাতে এল জিজ্ঞাসা করলেন।"

করবী দেবী বলেছিলেন, পাঁচজনের হাতে ঘোরার চেয়ে একজনের কাছে থাকাই কি ভাল নয়?

আমি বললাম, "সত্যি, কোথা থেকে পেলেন? এমন ছবি যে কেউ তুলে রাখতে পারে তা আমার জানা ছিল না।"

করবী দেবী বললেন, "এই হোটেলেরই কেউ আমাকে দিয়েছে। না হলে পেলাম কেমন করে? মিসেস পাকড়াশি আমাকে ভালবাসেন না বলে কেউ কি আমার জন্যে চিন্তা করে না।"

করবী দেবী এবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন। "রাজি হয়েছেন। ভুলেও তিনি আর আমার পথে বাধা দেবেন না।"

"এবার কি? বলুনতো?" করবী গুহ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

অনভিজ্ঞের মত আমি বলেছিলাম, "এবার শাজাহান হোটেল ছেড়ে নিউ আলিপুর।"

করবী দেবী আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন। আপনি থেকে হঠাৎ তুমি হয়ে গেলাম। "আমাকে তোমরা একেবারে ভুলে যাবে। তোমরা কোনোদিন তো আমাকে শাজাহান হোটেলের সহকর্মী বলে মনে করবে না।"

"আপনিই ভুলে যাবেন। ডিনার বা ব্যাংকোয়েটে শাজাহান হোটেলে এলেও একবারও কাউণ্টারের দিকে তাকাবেন না, সোজা ব্যাংকোয়েট হলে যাবেন। আমরা তখনও রসিদ কাটবো, বিল তৈরি করবো, খাতায় লেখালিখি করবো, টেলিফোন ধরবো, স্টুয়ার্ডের বকুনি খাবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমারও ভেরিকোজ ভেনগুলো হয়তো ফুলে উঠবে।"

"তোমার এ-চাকরি ভাল লাগে না?" করবী দেবী বলেছিলেন।

"মোটেই না। একটা দশটা পাঁচটার চাকরি কোথাও করে দেবেন তো?"

"সব দেবো। আমার জন্যে এতো করেছো তুমি, আর এইটুকু করবো না।"

আমি বলেছিলাম, "গুড নাইট।"

করবী গুহ বলেছিলেন, "গুড নাইট।"

ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে সামান্য কিছুক্ষণ হয়তো ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ গুড়বেড়িয়া এসে ডাকলো। রাত্রি অনেক হয়েছে। দু' নম্বর সুইটের মেমসায়েব আমাকে ডাকছেন।

চোখে একটু জল দিয়ে আবার নেমে গেলাম। দেখলাম, করবী দেবী যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। তাঁর সমস্ত দেহটা যেন থরথর করে কাঁপছে।

নিজের মাথাটা চেপে ধরে করবী গুহ বললেন, "একি করলাম আমি। স্বাশুড়ীকে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনার কথাতো ছিল না।"

আমি তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম। "হঠাৎ এই কথা ভাবছেন কেন?"

"ভাববো না। অনিন্দ্যর মা যখন আমার ঘর থেকে শুকনো মুখে চলে গেলেন, তখন আপনি তাঁকে দেখেননি। তেজপাতার মতো তাঁর দেহটা কাঁপছে। আমি বলেছিলাম, আপনি আর কোনো বাধা দেবেন না তো? উনি বলেছিলেন, না। আরও বলেছিলেন, হয়তো খোকার চেয়ে তোমার বয়স একটু বেশী। তবু কিছু বলবো না। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি। আমার ছবিটা বিয়ের আগে ছিঁড়ে ফেলবে তো? আমার হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন, কাউকে বলবে না তো?"

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। করবী দেবী কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "এমনভাবে বিয়ে করবার কথাতো ছিল না।"

আমার সামনেই খামটা করবী দেবী ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "স্যরি। তোমাকে এতোরাত্রে কেন শুধু শুধু ডেকে পাঠালাম। এতো বড়ো হোটেলে তুমি ছাড়া কেউ যে আমার আপনজন নেই।"

পরের দিন একটু দেরিতে ঘুম ভেঙেছিল আমার। তখন হোটেলে সোরগোল পড়ে গিয়েছে। এক নম্বর সুইটে করবী গুহের প্রাণহীন দেহ তখন পুলিস দরজা ভেঙে উদ্ধার করেছে।

ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "মা জননী আমার এক শিশি ঘুমের ওষুধ একসঙ্গে খেয়ে ফেলেছে।"

করবী গুহর মৃতদেহ যখন হোটেল থেকে বার করে মর্গে পাঠানো হয়েছিল, তখনও আমি যাইনি।

ন্যাটাহারিবাবু ফিরে এসে বললেন, "একবার গুডবাই করে এলেন না? আমি মশাই সবচেয়ে ভাল চাদরটা পুলিসের গাড়িতে দিয়ে দিয়েছি। মা জননী আমার কেন যে হোটেলে এসেছিল। সেই প্রথম যেদিন ও'কে দেখেছিলুম, সেদিনই আমি সবাইকে বলেছিলাম, এতো হোটেলের মেয়ে নয়, এ-আমার মা জননী। তখন আমার কথায় কান দেওয়া হয়নি। এখন বোঝো।" নিজের মনেই বকবক করতে ন্যাটাহারিবাবু বেরিয়ে গেলেন।

[ক্রমশ]

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SA-2/60
কলিকাতা কেন্দ্র — ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য;
অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

৪
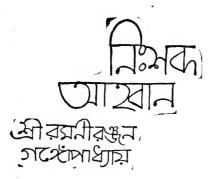
"সেদিন গোপা জেনে গেল আমি খুনী।" অলোকের দুই চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। সুব্রত নীরবে বসে থাকল। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে অলোক আবার বলতে শুরু করল, "গোপাকে বাঁচানো গেল না। অন্য ডাক্তার ডাকবার সুযোগও পাইনি। অশোক অকপটে স্বীকার করল তারই অনভিজ্ঞতার দরুন গোপা মারা গেল। কিন্তু পরক্ষণেই অশোক আমার হাত ধরে অসহায়ের মতো কেঁদে উঠল, অলোক তুমি আমাকে বাঁচাও, তুমি আমাকে বাঁচাও।

অশোকের মার কথা আমার মনে পড়ল। মধ্যবয়সে অশোককে নিয়ে বিধবা হন। কত কষ্ট করে দিনের পর দিন অভাবের সাথে লড়াই করে অশোককে তিনি মানুষ করেছেন। মেধাবী ছাত্র ছিল অশোক; মার আশা সে পূর্ণ করেছে। তারপর মনে পড়ল ইন্দ্রাণীর কথা। অশোকের বাকদত্তা। আমাকেও কত শ্রদ্ধা করে ইন্দ্রাণী, দাদা বলে ডাকে। বিয়ের পর অশোক বিলেত যাবে—শ্বশুরের টাকায়। আমার চোখ অশোকের মুখের দিকে। সে তখনও কাঁপছে; কাপড়ে চোপড়ে রক্তের দাগ। বড় অসহায়ের মতো আমার চোখের দিকে চেয়ে অশোক করুণা ভিক্ষা করছিল। আমাকে কলংক মুক্ত করতে এসে সে নিজেই কলংকিত। সে আমার অকৃত্রিম বন্ধু। তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম, অশোক?

অশোক চমকে উঠে দু পা পিছিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে বলল, অলোক, তুমি আমাকে পুলিশের হাতে দিওনা।'

সুব্রতবাবু, সেদিন অশোকের ঐ দুর্বলতা যে কত করুণ হ'য়ে ফুটে উঠেছিল, সে কথা বলার মতো ভাষা আমার নেই। সেই দুর্বল মুহূর্তে অশোকেরও বিশ্বাস হ'ল, আমি ওকে পুলিসের হাতে দিতে পারি। অশোক আমারই জন্য বিপদগ্রস্ত, এ কথা সে ভুলে গিয়েছিল। বিপদ আমারও কম ছিল না। তবুও আমার বাল্য বন্ধু অশোকের জন্যে আমার সমস্ত মন কেঁদে উঠল। আমার জীবনে সুখ ছিল কোথায়? বিয়ে করেও স্ত্রীর ভালবাসা পাইনি। এ পৃথিবীতে আকর্ষণ বলে তো আমার কিছু নেই। বাল্য বন্ধু অশোকের স্বার্থে তখন আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। আমার কথায় মন্ত্র-মুগ্ধের মত অশোক কম্পিত হাতে গোপার দেহটা কিছুক্ষণের মধ্যেই কেটে কয়েকটা টুকরা করে ফেলল। যতদূর সম্ভব দুই বন্ধুতে ঘরটা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে ফেলি। অশোককে বার বার সাবধান করে দিয়ে ওকে ওর বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। সেই খণ্ড খণ্ড দেহের অংশ চারটে থলির মধ্যে ভরে ফেললাম। রাতের গভীর অন্ধকারে পাহাড়-তলি, চাটগা শহর এবং ডবল মুরিং এর নানান জায়গায় ঐ চটের থলি ক'টা ফেলে দিলাম।

পরদিন ভোরের দিকে দীপা বাসায় এসে বলল, গোপাকে পাওয়া যাচ্ছে না। খবরটা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি সে এসেছে। মা বড় কান্নাকাটি করছে। তার পরই দীপা আমাকে জিজ্ঞেস করল, বলতে পার গোপা কোথায় যেতে পারে? দেখলাম দীপার বড় বড় চোখ দুটি ঝাপসা। সে সময় আমার মনে কি হ'ল জানেন সুব্রতবাবু? একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, যাক্ তবে ওরা আমাকে সন্দেহ করেনি। কেউ টেরও পায়নি। কেন জানি নিজের ওপর মায়া হল। বাঁচবার জন্য বড় আগ্রহ, তাই সেদিন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, সবকিছুর আশ্রয় নিয়েছিলাম। দীপাকে সান্ত্বনা দিয়ে তক্ষুনি শ্বশুর বাড়ি ছুটলাম। শেষটায় শ্বশুর মশাইকে কোতোয়ালী থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করতে বলে বাসায় চলে এলাম।

শ্বশুর মশাই কোতোয়ালী থানায় যখন পৌঁছলেন, তখন সেখানে হুলস্থুল। শুধু দু'টো টুকরো পা একটা চটের থলির মধ্যে পাওয়া গেছে। শ্বশুর মশাই সে দু'টো পা দেখে সেখানেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। ও'র জ্ঞান হবার সাথে সাথে উনি বললেন, ঐ দুটো পা নিরুদ্দিষ্ট গোপার। গোপার জ্ঞান

মা বড় কান্নাকাটি করছে

পায়ে ছ'টা আঙ্গুল ছিল। তা ছাড়া গোপার বাঁ পায়ে জন্ম দাগটা তখনও সজীব।

চতুর্দিকে হই-চই পড়ে গেল। আমি তখন পাহাড়তলিতে। একজন ভদ্রলোক এসে আমাকে খবর দিল, মা ডেকে পাঠিয়েছেন। সেই ভদ্রলোকের নাম প্রবোধবাবু। ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমার অবস্থা তখন বুঝতেই পারেন। দীপা নিজের কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিতে লাগল। সে তক্ষুণি আমাকে নিয়ে রওনা হবে। এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। গোপার মৃতদেহটা তখন আমার চোখের সামনে ভাসছিল। টেবিলটা থেকে তখনও যেন টপ টপ করে সদ্য রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল।

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর যখন আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অনিচ্ছাসত্ত্বেই বা বলি কেন ভয়ে চাটগা যেতে রাজী হলাম তখনই দেখি পুলিসের গাড়ি আমার বাসার সামনে এসে থেমেছে, সাথে প্রবোধবাবু। প্রবোধবাবু পুলিস সাথে করে সোজা চলে গেলেন একটা ছোট ঘরের পিছন দিকে। তারপর নর্দমাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে স্যার। চেয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। নর্দমার মধ্যে জমাট রক্তের ছড়াছড়ি। আমার দিকে একবার চেয়ে দেখল দীপা। সে দৃষ্টির সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমার ছিল না। তার পরই সে প্রবোধবাবুর কাছে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

ঐ ঘরটাতে একটা তালা লাগিয়ে রেখেছিলাম। পুলিসের কথায় তালা খুলে দেওয়া হল। কি আশ্চর্য, পুলিস গোপার আংটিটা ঘরের এক কোণে খুঁজে পেল। শুনলে আপনি আরও আশ্চর্য হবেন সুব্রতবাবু, ঐ আংটিটা আমিই ওকে দিয়েছিলেম আমার বিয়ের পরে। স্নেহের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে যে আংটি একদিন দিয়েছিলেম, সেই আংটিই সেদিন সব চাইতে শত্রু হল। সেই আংটিই প্রমাণ করে দিল সে ঐ ঘরে এসেছিল। পুলিস ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসে আমারই সামনে ঐ ঘরের এদিক ওদিক থেকে রক্তের চিহ্ন খুঁজে বার করল। নর্দমাতে জমাট রক্ত পাওয়া গেল প্রচুর। সব কিছুই ছিল, তবু আমরা ভেবেছিলাম কোন সূত্রই বুঝি রাখিনি, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল অনেক সূত্রই রেখে গিয়েছি। পুলিস অনেক কথাই জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু কোন কথার উত্তরই আমি দিইনি। চুপ করে থাকতে দেখে দীপা আমাকে আকুলভাবে বললে, সত্যি ক'রে আমাকে বল, তুমি কেন গোপাকে খুন করলে? তুমি এত নৃশংস, আমি এক দিনের জন্যও ভাবিনি।

দীপার কথা আমাকে কী ভীষণ আঘাত দিয়েছিল। আপনি অনুমান করতেও পারবেন না। কিছু একটা বলতে গিয়েছিলেন, পারিনি। তখনই চোখে পড়ল পুলিস অফিসারের সন্ধানী দৃষ্টি। শিকারী

মা বললেন, 'দীপার কাছে একবার যা।'

ফাঁসির হুকুম শুনে অশোক সশব্দে কেঁদে উঠেছিল। বার বার বলা সত্ত্বেও আমি কোনো প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিনি। বিচারকালীন অশোক একবার নয়, কয়েক বারই আমার সাথে এখানে দেখা করেছিল। সে চাইছিল সত্যি ঘটনা প্রকাশ করতে, কিন্তু আমি চাইনি। ওর মা, ইন্দ্রাণী এবং সবার কথা চিন্তা করে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সে

কুকুরের দৃষ্টি নিয়ে সেই পুলিস অফিসার চেয়ে আছে আমার দিকে। ভীত বিহ্বল অশোকের কথা মনে পড়ে গেল; তুমি আমাকে পুলিসের হাতে দিও না। বেরিয়ে আসা কথাটা ওখানেই স্তব্ধ হ'য়ে গেল। দীপার প্রশ্ন শুনে সেদিন মনে হয়েছিল হয়তো বা দীপার মনের কোণে আমার জন্য একটু দরদ ছিল।

পর পর সব কটা টুকরোই পাওয়া গেল। ঐ টুকরোগুলো মিলিয়ে দেখা গেল ওটা গোপারই মৃতদেহ।

বিচারের সময় প্রতিদিন অশোক এক কোণে এসে বসত। আমাদের দৃষ্টি বিনিময়ও হয়েছে। ওকে দেখে মনে হয়েছে সে কত দুর্বল, কত রোগা। ওর মুখ দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম তার মনের মধ্যে কী বেদনা। একদিন অশোক এবং ইন্দ্রাণীকে আদালতে পাশাপাশি দেখেছি। বড় আনন্দ হয়েছিল। ইন্দ্রাণীর কপালে সিঁদুর দেখে সবাই বুঝেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে আবার অলোক বলতে থাকে, এক মাস বিচারের পর, আমার প্রত্যাখ্যানে সে শিশুর মতো এখানেই বসে কেঁদেছিল। অশোক যে আমার কত প্রিয়, সে কথা আমি কি করে বোঝাব বলুন।

চিঠি পেয়েছি, অশোক বিলেত চলে গেছে। ইন্দ্রাণী গতকাল এসেছিল। কাছে বসে আমাকে কত কি খাইয়ে গেল। যতক্ষণ ছিল শুধু কাঁদল। যাবার সময় গলায় আঁচল দিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম করল। বলল, দাদা, তুমি কত মহৎ, আমরা জানি। ইন্দ্রাণী চলে গেল। আমার আশেপাশে এখানে যত লোক ছিল, তারা জিজ্ঞেস করল, কে-ও? বলেছিলাম, আমার ছোট ভাই-এর স্ত্রী।

একবার অশোককে দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাতো হবার নয়। চিঠিতে লিখেছে সে ভালই আছে। সে অবশ্য ভাল থাকতে পারে না।

দীপার দুঃখ আমি বুঝি। আমার মৃত্যু ওর মনে লাগবে এবং সে লাগাটা হ'বে সাধারণ লোকের মতো। ও যে খুব একটা আঘাত পাবে, তারও তো কোন কারণ নেই সুব্রতবাবু। আমার মতো একজন খুনে অন্তত দীপার কাছে, কোন সহানুভূতিই পেতে পারে না। এর মধ্যে সে একদিন এসেছিল। সেই একই প্রশ্ন করে সে। বার বার সে অনুরোধ করে তার প্রশ্নের উত্তরের জন্য। সব কথা বলবার মতো সৎসাহস আমার ছিল না। তাই বলেছি, গোপাকে আমি হত্যা করিনি, তবে ওর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। বুঝলাম দীপা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু উপায় তো ছিল না। জানেন সুব্রতবাবু, গোপার কাছেই নয়, দীপার কাছেও আমি খুনী হ'য়ে রইলাম। এরই নাম ভবিতব্য।"

সহসা অলোক উত্তেজিতভাবে সুব্রতর হাত ধরে বলতে থাকে, "সুব্রতবাবু, আমার অনুরোধ আমার ফাঁসির পরে যেন দীপা এ-সব কথা জানতে পারে।" অলোকের চোখে জল গড়িয়ে পড়ছিল। অস্তমিত সূর্যের আলো জানলার ভেতর দিয়ে এসে পড়েছে অলোকের চোখে মুখে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরমায়ু নিয়ে আবার অলোক অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "সুব্রতবাবু; দীপা রইল, আর রইলেন আপনি। আমার অন্তিম অনুরোধ, দীপা যেন পথের ধুলোয় মিশে না যায়।"

সুব্রত যখন জেলখানা ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াল, তখন সায়াহ্নের অন্ধকার সবে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। সে যেন আর চলতে পারছিল না। সামনেই বিরাট লালদীঘি। গাড়ি, ঘোড়া, লোকজনের কোলাহলে চতুর্দিক মুখরিত। ধীরে ধীরে সুব্রত গিয়ে সেই লালদীঘির পাড়ে একটা টুলের ওপর বসে পড়ে।

৩

সারাটা রাত সুব্রত ঘুমুতে পারেনি। সহস্র চিন্তা এসে ওকে উন্মাদ করে তুলল। তবু সে কোনই সমাধান করতে পারে না। দেয়ালের ঘড়িটা জানিয়ে দিল রাত দু'টা। আর মাত্র দু'টি ঘণ্টা পরমায়ু নিয়ে অলোক অপেক্ষা করছে অপরিসর এক কারা কক্ষে। অবস্থার আবর্তে পড়ে নিষ্পাপ হ'য়েও, সে সবার চোখে, আইনের চোখে খুনী, নৃশংস খুনী। তার সহৃদয়তা, তার বন্ধুপ্রীতি চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেল। অশোক জীবিত থেকেও, জীবন্মৃত হ'য়ে রইল। অলোক সত্যিই বলেছে। সুদূর ইংলণ্ডে থেকেও অশোকের মনটা অন্তত আজ রাতে, চাটগার ঐ কারা-প্রাচীরের আশেপাশেই ঘুরছে। ঘড়ির

দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে তার দৃষ্টি। প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি ঘণ্টা, আজকের রাতটা অশোককে জানিয়ে দিচ্ছে, কত বড় মূল্য দিয়ে, অলোক তাকে সংগোপনে রক্ষা করে গেল। নিজে কলঙ্কিত হ'য়েও সে তার প্রিয়তম বন্ধুকে, বন্ধু পত্নী ইন্দ্রাণীকে, কলঙ্ক মুক্ত করে গেল। আজ রাত চারটার পর এ পৃথিবীতে এমন কেউ রইল না যে, অশোককে গোপার মৃত্যুর জন্য দায়ী করতে পারে।

এবার ঘড়িটা জানিয়ে দিল রাত সাড়ে তিনটে। একটা তীব্র বেদনায় সুব্রতর মন কেঁদে উঠল। হয়তো এবার অলোককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে, যেখানে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ভোর বেলায় মা ডাকলেন। সুব্রত উঠে বসল। মা বললেন, 'দীপার কাছে একবার যা।' সুব্রতর মনে পড়ল অলোকের অনুরোধঃ দীপা রইল, আপনি রইলেন। যেন পথের ধুলোয় মিশে না যায়।

—সমাপ্ত—

রমাপদ চৌধুরী

[২১]

পাঁচিল তুলে ভদ্রাসন ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জমিপুকুর তখনো ভাগ হয়নি। আঘাতটা তখনো গিরিজাপ্রসাদের বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে গুমরে উঠছে। অবোধ্য একটা নিঃস্বতা যেন।

সারা জীবন ধরে কত কি স্বপ্ন দেখেছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। সারা জীবন সব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, মুখ বুজে কাজ করে গেছেন সকাল-সন্ধ্যে, কিন্তু সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে একটি মাত্র স্বপ্ন ছিল। বনপলাশিতে ফিরে আসবেন, সুখে শান্তিতে কাটাবেন শেষ জীবনটা, বনপলাশির সেই শৈশবের স্মৃতিতে ঘেরা মধুর জীবনটুকুই আবার ফিরে পাবেন। অভাব আর দৈন্যকেও ভয় পাননি গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু গিরীন যে তাঁর হৃদয়কে নিঃস্ব করে দেবে কোনদিন এ আশংকা তো তিনি করেননি!

গিরিজাপ্রসাদের মনে পড়ে একবার দাঁতের ব্যথায় অসহ্য যন্ত্রণায় মাড়িতে সেফটি-পিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিষিয়ে তুলেছিলেন তিনি। ইচ্ছে হয়েছিল ছুরি দিয়ে কেটে খানিকটা রক্ত বের করে দিতে। আসলে সেটা ছিল অসহ্য যন্ত্রণার বিরুদ্ধে একটা বোবা আক্রোশ। এই পারিবারিক কলহ যেন সেই দাঁতের ব্যথার মতই। একটু একটু করে দিনে দিনে কখন যেন চাপা যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারেননি। এই দৈনন্দিন জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশাতেই, না কি এই জ্বালা যন্ত্রণার বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশে, মাঝে মাঝেই তাঁর মনে হয়েছে দু' বাড়ির মাঝখানে, দুটি পরিবারের মাঝখানে একটা পাঁচিল তুলে দিতে পারলেই বুঝি শান্তি ফিরবে।

কোদালের কোপটা মাটির বুকে নয়, গিরিজাপ্রসাদের বুকের মাঝেই পড়বে, কে জানতো। যন্ত্রের মত, হয়তো বা আক্রোশের বশেই একটার পর একটা হুকুম দিয়ে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ, স্ত্রীকে বলেছেন হাঁড়ি আলাদা করতে, ছেলেমেয়েদের বাধা দিয়েছেন ও-বাড়ির সংগে মেলামেশা করতে, যতে কোটালকে ডেকে পাঁচিল তুলে দিতে বলেছেন, আর দিনে দিনে ফাটল বেড়েছে, ঠিক সেই শুখোর বছরের মাঠের মত। নিষ্করুণ আকাশ আর রৌদ্রদগ্ধ মাঠের মতই ভিতরে ভিতরে তাঁর সারা বুক খাঁ খাঁ করে উঠেছে। অথচ তখন আর উপায় নেই ফিরে যাবার। নেশার ঘোরেই যেন বিচ্ছেদকে বাড়িয়া তুলেছেন দিনে দিনে।

কিন্তু তারপর যা ঘটে গেছে, ঘটে গেল, তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে যেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়েছে। কাঁদিতে পারেননি, পারেননি বলেই জ্বালা বেড়েছে।

সব সময়েই তাই অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু অন্যমনস্কই কি হতে পারেন? পারেন না! ঘুরে ঘুরে কেবলই তুচ্ছ এক একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। মোহনপুরে বউ কবে কি বলেছে নিভাননীকে, গিরীন বলেছে তাঁকে। কিংবা গিরীনের ছেলেমেয়েদের ব্যবহার, কে কখন তাঁকে এড়িয়ে গেছে, কিংবা ভাল করে কথা বলেনি। প্রত্যেকটি তুচ্ছ ঘটনাই যেন ছুঁচের মত এসে বুকে বিঁধে থাকে, ক্রোধে অধীর করে তোলে তাঁকে।

বংশী মাঝে মাঝে আসে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভালই হলো গো গিরিদাদা, পেথক হয়েছো এ তোমার অনেক শান্তি।

বুড়ি অটামা লাঠি ঠুকঠুক করে এসে বলে, মন খারাপ করিস নে পেসাদ, দিনকালের যা নিয়ম তাই হয়েছে। কার না হচ্ছে এমনটা!

কিন্তু গিরিজাপ্রসাদ এ-সবের মধ্যে কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পান না। বংশীর সংগে, কিংবা অবিনাশ ডাক্তার যেদিন আসে, সেদিনও গল্পগুজব করতে ভাল লাগে না গিরিজাপ্রসাদের। নিজের মনেই তাই ঘরে টুকিটাকি কাজ করেন। ছুঁচসুতো নিয়ে এটা-ওটা সেলাই করেন।

সেদিনও পুরোনো ছেঁড়া শালখানা নিয়ে রিপু করার চেষ্টা করছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। হঠাৎ গিরীন এলো, এসে দাঁড়ালো সামনে। কোন কথা বললে না।

গিরিজাপ্রসাদ ছেঁড়া শালে রিপুর ফোঁড় দিতে দিতে একবার চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে, চোখ নামিয়ে নিলেন।

গিরীন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, বলছিলাম কি, এবার জমিজমাগুলো ভাগ করে নাও!

চোখ তুলে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, অবনী তো চলে গেল, মধ্যস্থ করতে হবে তো একজনকে।

গিরীন বাধা দিলো।—মধ্যস্থ কি হবে। তা তুমি যদি চাও...

গিরিজাপ্রসাদ কোন কথা বললেন না। একটু অপেক্ষা করে গিরীন বললে, তা হলে একদিন বসে...

এবারও কোন সাড়া দিলেন না গিরিজাপ্রসাদ। যেমন ছুঁচ ফুঁড়ছিলেন তেমনি ছুঁচ ফুঁড়তে লাগলেন ছেঁড়া শালটায়।

গিরীন চলে গেল। আর কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন নিভাননী। প্রশ্ন করলেন, কি বলছিলো ঠাকুরপো?

—শুনতেই তো পেলে।

নিভাননী বললেন, ও যাই বলুক, মধ্যস্থ কাউকে রেখো। নইলে লোকে বলবে, ছোট ভাইকে ঠকিয়ে নিয়েছ।

একটু থেমে বললেন, লোকে বলবে কেন, ওরাই বলবে দুদিন পরে।

গিরিজাপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হুঁ।

গিরীন সরে এলো বটে, কিন্তু তার বুকের ওপর তখনো যেন একটা ভারী পাথর চেপে বসে আছে। দাদার মুখের দিকে তাকাতে সত্যিই কষ্ট হয়। এমন যে হবে, এমন যে হতে পারে, সেও কি ভেবেছিল। কোত্থেকে কি যে হয়ে গল!

ফির এসে গিরীন ডাকলে, টিয়া!

টিয়া সাড়া দিলো না, ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো বাপের কাছে। সেদিন রাতে বাবা আর মাকে তার বিয়ের কথা বলতে শুনে থেকেই রাতারাতি তার শরীরে মনে যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে। আগের মত আর ছুটোছুটি করতে পারে না, জোরে কথা বলতেও কেমন সঙ্কোচ। সমস্ত শরীর ঘিরে একটা কমনীয় জড়তার জালে যেন সে বাঁধা পড়ে গেছে। যেন কেউ অলক্ষে থেকে তার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছে। অন্ধকার নির্জন রাতে যেমন নিজের পায়ের শব্দটাকেই মনে হয় কেউ অনুসরণ করছে, এও যেন অনেকটা তাই। অদ্ভুত একটা লজ্জা—সঙ্কোচ, যেন পিছু নিয়েছে।

গিরীনও যেন এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করে খুশী হয়েছে মনে মনে।

টিয়া সামনে এসে দাঁড়াতেই তার মুখের দিকে তাকালে গিরীন, তারপর ফিসফিস করে বললে, টিয়া! দেখ তো জ্যাঠা বসে বসে কি সেলাই করছে, যা না। গিয়ে তুই করে দিলেও তো পারিস!

বিস্ময়ে চোখ তুলে বাপের দিকে তাকালো টিয়া। সংগে সংগে গিরীন মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালে। নিজের মেয়ের সংগে চোখাচোখি হওয়াতেও যেন লজ্জা।

টিয়ার চোখে ধীরে ধীরে একটা খুশীর স্নিগ্ধ চাপা হাসি উঁকি দিয়েই নিবে গেল। জড়তার ধীর পদক্ষেপে পাঁচিলের ওপারে, জ্যাঠাদেরই দক্ষিণদুয়োরী ঘরখানার দিকে চলে গেল টিয়া।

আর গিরীনের মুখেও তৃপ্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই লাল পাড় শাড়ির আঁচলে হলদের হাত মুছতে মুছতে মোহনপুরের বউ এসে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করলে, বলেছো!

—হ্যাঁ। ব্যবস্থা করতে বলল। দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরীন। যেন বুকের ভেতর একটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

মোহনপুরের বউ বললে, তা হলে আর দেরী করো না।

—না।

দেরী করলে চলবেই বা কি করে! প্রভাকরের সংগেই যে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে, এতখানি আশা অবশ্য করে না মোহনপুরের বউ। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। তাই পণের টাকার ব্যবস্থাটা মোটামুটি করে রাখতে হবে। ওদিকে সব গয়নাগাটি বন্ধক দিয়ে টাকা নিতে হয়েছে হাস্কিং মেশিনটা কেনবার সময়। সেগুলোও ফিরিয়ে আনতে হবে। সুতরাং জমিজমা কিছু বেচতেই হবে। সেইজন্যেই তাড়াতাড়ি পৃথক হওয়া প্রয়োজন।

তিরিশ একর তো মাত্র জমি। তার পাঁচিশ একর রেখে বাকী পাঁচ একর গবর্নমেণ্টকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে গিরীন। অনেকদিন আগেই। ভেবেছিল, গবর্নমেণ্ট এত ঢাক পিটিয়ে যখন বলেছে, জমির জন্যে ক্ষতি-পূরণ দেবে, তখন নিশ্চয় টাকাটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেছে, টাকা তো দূরের কথা, কোন খোঁজ খবরও মেলেনি।

মোহনপুরের বউ বললে, কোন জমি বেচবে তাও তো ভাবতে হবে।

গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—হুঁ। একটু থেমে বললে চাটুজ্যেদের অবনীর মত করলেই হতো তখন, ক'টা টাকা ঘুষ দিয়ে পুরোনো তারিখে বেনামী করে রাখলে এত ঝঞ্ঝাট হতো না।

—তা ঠিক। যে পাঁচ একর ছেড়ে দিতে চেয়েছো, সে তো আর বেচতে পাবে না?

—না। যে জমিগুলো রাখবো বলছি তা থেকেই বেচতে হবে।

—তা হলে পাঁচিশ একরও থাকবে না যে! ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে সেটুকুও থাকবে না? খাবে কি?

—কেন হাস্কিং মেশিন রীতিমত ধানকল হয়ে যাবে দেখো।

মোহনপুরের বউ বিদ্রূপের হাসি হাসলে। —তবেই হয়েছে। ঘুষটুষ দিয়ে এখন নয় লাইসেন্স বের করেছো, দু' বছর বাদে লাইসেন্স যদি কেড়ে নেয়! অন্য কেউ বেশী ঘুষ দিলেই তো কেড়ে নেবে।

গিরীন বিষণ্ণ হাসি হাসলো।—তখন চাকরি করবে।

—কে দেবে চাকরি ওদের? একটা ইস্কুল নেই যে পড়ে পাশ করবে।

চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বালা করে উঠলো মোহনপুরের বউয়ের। রাগে জ্বলে উঠলো সারা শরীর। বললে, নুড়ো ঘষে দাও অমন গরমেণ্টের মুখে।

সংসারের দিঘিতে অষ্টপ্রহর সাঁতার কেটেও গায়ে না লাগে জল, না কাদা—এমন একজনই আছে। ডানা ঝাড়া দিলেই যেমন হাঁসের পালক থেকে জল ঝরে পড়ে, টিয়াও যেন তেমনি। ভোর থেকে নিষুতি রাত অবধি কাজের ঘানিতে নিজেকে বেঁধে রেখেও সংসারের কোন দুশ্চিন্তা নিয়েই তার মাথা-ব্যথা নেই।

তবু সব কিছুর মধ্যে একটাই শুধু স্বপ্ন। বিয়ের।

মা আর বাবাকে আড়ালে ওর বিয়ের সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে শুনলেই মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে টিয়া। আবার যখন বেশ কিছুদিন ধরে কোন আলোচনাই শুনতে পায় না তখন সব কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকেই কিসের যেন অভাব বোধ করে। কি যেন নেই, কি যেন নেই—বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত কথা গুমরে ওঠে। আর তখনই প্রভাকরকে মনে পড়ে যায়। তুচ্ছ ছোট ছোট দু'একটা ঘটনা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। যাত্রার আসরে যেদিন চোখোচোখি হয়েছিল একবারের জন্যে, কিংবা অট্টামার সেই প্রথম দিনের কথা: টিয়াকে বোধহয় খুব পছন্দ পেভাকরের, কিংবা এমনি ধারার কিছু একটা।

প্রভাকরের বাবার সংগে দেখা করে যেদিন গিরীন ফিরে এলো, মোহনপুরের বউয়ের সংগে পণের টাকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বললে, দেখি, যেমন করে হোক একটা ব্যবস্থা তা করতেই হবে, সেদিন কি আনন্দ যে হয়েছিল টিয়ার!

বাবা-মার দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হয়নি তার। শুধু কথাটা কোন একজনকে বলতে ইচ্ছে হয়েছে। এত বড় একটা আনন্দের খবর টিয়া তার ছোট্ট বুকে কি করে লুকিয়ে রাখবে! ইচ্ছে হয়েছে রেণুদি নয়তো রাঙা বৌদিকে গিয়ে বলতে। সুখের খবর আরেকজনকে না বলে কি আনন্দ পাওয়া যায়!

তাই সকাল বেলাতেই এক ফাঁকে রেণুদি-দের বাড়িতে এসে হাজির হলো টিয়া। দেখলে দামুদা, রাঙা বৌদি, রেণুদি সবাই হাসিহাসি মুখে। দামুদার কোলে নাদুসনুদুস চেহারা বাচ্চা ছেলে ফিরু।

টিয়াও একমুখ হাসি নিয়ে ঢুকলো, ছুটে গিয়ে দামু পালের কোল থেকে ফিরুকে তুলে নিয়ে জিগ্যেস করলে, কখন এলে দামুদা।

রেণুদি হেসে বললে, কাল রাতে এসেছে

দাদা। বলেই যোগ করলে, একটা খুব ভাল খবর আছে টিয়া।

টিয়া বিস্ময়ের চোখে তাকালে রেণুদির মুখের দিকে। সেই যে পুজোর পর চলে গিয়েছিল দামুদা, তারপর দু'একবার এসেছে গ্রামে, দু'একবার আভাস দিয়েছে এ-ব্যাপারে, কিন্তু সেদিনটা যে এত কাছে ঘনিয়ে আসবে ভাবতে পারেনি।

টিয়ার বিস্মিত চোখের দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকালো রেণুদি, বললে, দাদা বর্ধমানে বটতলায় একটা দোকান ভাড়া পেয়েছে! এমনভাবে বললে, যেন এর চেয়ে বড় সুখবর আর হতে পারে না।

দামু পালও হাসলে। ফিরুকে বললে, আয় ব্যাটা এদিকে আয়। ক্যানভাসারের ব্যাটা এবার দোকানদার হবে।

ফিরু কিছু না বুঝলেও বাপের ভাবভঙ্গি দেখেই খিলখিল করে হেসে উঠলো। টলতে টলতে বাপের দিকে ছুটে এলো টিয়ার কাছ থেকে।

দামু তাকে কোলে টেনে নিয়ে দু' হাতে ছুঁড়ে দিয়ে লুফতে লুফতে বললে, এইবার গোপেন শালা বলুক দিকি ফিরিওলা। দোকানে বাবা গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবো, যা দাম বলবো, নেবে তো নাও নয়তো পথ দেখো!

দামুদার গম্ভীর গলার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো রাঙাবৌদি, আর তা দেখে টিয়াও।

রাঙাবৌদি হাসতে হাসতে বললে, টিয়ারানী তোমার দোকানের খদ্দের নয়গো, ওকে অমন করে বলছো কেন।

দামু হেসে বললে, উঁহুঁ, টিয়াকে অমন ভাবে বলবো কেন, টিয়ার জন্যে সব কমিশন ছেড়ে দেবো! টাকায় দু আনা কি বলো টিয়া?

রাঙাবৌদি বললে, দোকান চলুক আগে তারপর অত বড় বড় কথা বলবে।

—দোকান চলবে না মানে? দুটো মাস, দুমাস পরেই ঘর ভাড়া নেবো তোমাদের জন্যে, সব নিয়ে চলে যাবো, দেখে নিও।

—চলে যাবে? হঠাৎ যেন টিয়ার গলার স্বরটা হতাশ শোনালো। বললে, সবাইকে নিয়ে চলে যাবে দামুদা?

টিয়ার মুখখানা ম্লান দেখালো। আর রাঙাবৌদির মুখ দেখে বোঝা গেল, ভিতরের উল্লাস, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দটুকু যেন চাপা রাখতে পারছে না। রাঙাবৌদি বললে, আমার কপালে শহরে গিয়ে বাস করা আছে কিনা! না টিয়া না, ওসব বিশ্বাস করো না, বিয়ের পর থেকে কতবার শুনলাম!

দামু রেগে গেল। বললে, দোকান করার টাকা ছিল না, তাই আর দোকান ঘরও তে যেখানে সেখানে নিলেই হলো না।

টিয়া তবু কোন সান্ত্বনাই পেল না। বললে, দামুদা তুমি চলে গেলে যে যাত্রা হবে না আর!

কিন্তু যাত্রার জন্যে তো দুঃখ নয় টিয়ার। তার ভাবনা অন্য। সুখে দুঃখে এই একটা পরিবারের মধ্যেই তো তার আশ্রয় ছিল। এই দুটি মাত্র সঙ্গী, বন্ধু। কথায় কথায় তাই সে রাঙাবৌদি আর রেণুদির কাছে ছুটে আসতো। মা'র বকুনি খেয়ে চোখের জল মুছতে এখানেই আসতো, বিয়ের কথা শুনে মনের উল্লাস হাল্কা করতেও এখানেই! কিন্তু দামুদা যদি একদিন সত্যিই সকলকে নিয়ে চলে যায়—

দামু হাসলো। বললে, আর যাত্রা নয় গো, আর যাত্রায় নয়। হেঁ হেঁ বাবা, এবার থিয়েটারের পালা। প্রথম অংক চতুর্থ দৃশ্য হয়ে গেল, এবার দ্বিতীয় অংক...

টিয়ার মুখের দিকে চোখ পড়তেই রেণু বাধা দিলো। বললে, না রে টিয়া, এই তো বর্ধমান, আধ ঘণ্টার তো রাস্তা, আসবো বৈকি, মাঝে মাঝেই আসবো আমরা। জমি জমা, বাড়িঘর থাকবে—না এসে কখনো চলে।

টিয়া বিষণ্ণ হাসি হাসলে। অভিযোগের স্বরে বললে, সে তো শুধু ধান কাটা আদায় করে বেচে দিয়ে যেত। সে তো সবাই আসে রেণুদি, চাটুজ্যেদের বড় তরফের ছেলেরা আসে, গুপ্তরা আসে, নিকুঞ্জ সাঁইরা আসে...

রাঙাবৌদিও এতক্ষণে লক্ষ্য করলে। বুঝতে পারলো তার আনন্দের খবরটা টিয়ার কাছে আনন্দের নয়। ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মুখে টিয়ার কাছে সরে এলো রাঙাবৌদি, টিয়ার পিঠে হাত রেখে বললে, না টিয়া, ওসব শুনো না। ও তোমার দাদার আকাশকুসুম স্বপ্ন।

রাঙাবৌদির মুখের দিকে ফিরে তাকালো টিয়া, হঠাৎ ও হেসে উঠলো, আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের পাতা ভিজে এলো।

ফিরুকে আবার ছুটে এসে কোলে তুলে নিলো টিয়া। তারপর পাগলের মত ফিরুর গালে, মুখে, কপালে চুমু খেতে খেতে হঠাৎ হাসতে হাসতে ফিরুর মোটাসোটা একখানা হাত আস্তে করে দাঁতে চেপে ধরলো। যেন ফিরুর হাতখানা সত্যিসত্যিই কামড়ে দিতে ইচ্ছে হয় তার। ফিরুর দুধে গড়া নরম তুলতুলে চেহারাখানাকে বুকে চেপে, তার গালে গাল ঘষে চটকে থেসে ফিরুকে বিপর্যস্ত করে তুলেই যেন আনন্দ!

কৌতুকের চোখে তার কাণ্ড দেখছিল রাঙাবৌদি। দু' মিনিট আগে যার চোখ ছলছল করে উঠেছিল দামুদা সকলকে নিয়ে চলে যাবে শুনে, সামান্য একটা কথায় সেই মেয়েটাই কেমন আশ্বস্ত হয়েছে। দেখে বিস্ময় জাগে রাঙাবৌদির। সত্যি, কি সরল এই মেয়েটা!

সেই কোন কিশোরী চপল একটি মেয়ে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল তাদের পরিবারের সঙ্গে, আজ তাই বিচ্ছেদের সামান্য আশঙ্কায় তার মনেও ব্যথা লাগে।

টিয়ার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রাঙাবৌদি। আর হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলো টিয়া সেই কৈশোরের বয়স পার হয়ে যৌবনের ভরা দিঘির ঘাটে এসে পা বিছিয়ে বসেছে। সমস্ত শরীরের গঠনে গৌরবে, চিবুকের নিটোল কমনীয় ভঙ্গিতে, চোখের চাহনি আর বুকের স্পন্দনের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে কি যেন পরিবর্তন ঘটে গেছে।

দুপুরেও খাওয়াদাওয়ার পর আবার এসে হাজির হলো টিয়া। সারাটা দিন রাঙাবৌদির পায়ে পায়ে ঘুরলো। আর রাঙাবৌদিকে দেখতে দেখতে তার মনেও স্বপ্ন উঁকি দিলো।

পরের দিনই চলে যাবে দামুদা, তাই সযত্নে বাক্স গুছিয়ে দিচ্ছে রাঙাবৌদি। দিনের পর দিন দুধের সর তুলে রেখে রেখে ঘি বানিয়েছে, একটা শিশিতে ভরে ঘি-টুকু স্যুটকেশে রেখে দিয়ে বললে, ভাতে দিয়ে খেয়ো যেন! কাগজে মুড়ে একটু আমসত্ব, ছোট্ট টিনের কৌটোয় বড়ি, গোটাকয়েক নারকোলের নাড়ু...একটার পর একটা গুছিয়ে ভরে দেয় রাঙাবৌদি আর মাঝে মাঝে বলে, বাক্সে দেওয়াই সার হচ্ছে, যা মানুষ, খাবে নাকি? ঐ কৌটোর মধ্যেই থাকবে!

টিয়াও এটা-ওটা সাহায্য করে। আর মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে, সেও একদিন এমনিভাবে জিনিসপত্তর গুছিয়ে দেবে অন্য একজনের জন্যে।

সব কাজ শেষ হলো এক সময়। রোদ নরম হলো বিকেলের। আর রেণু এসে টিয়াকে ডেকে নিয়ে গেল এক ধারে।

তারপর ফিসফিস করে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ রে টিয়া, তোর নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে, সত্যি?

লাজুক হাসি হেসে মাথা হেঁট করলো টিয়া।

—ঐ প্রভাকরবাবুর সঙ্গে?

এবারও মাথা তুলতে পারলে না টিয়া। শুধু বললে, আমাকে ওদের পছন্দ হবে নাকি! মিথ্যে চেষ্টা করছে বাবা।

রেণু হাসলে।—কেন পছন্দ হবে না, তোর মত সুন্দর ক'টা আছে রে গাঁয়ে?

টিয়ার শুনতে ভালই লাগলো কথাটা, তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হয় না। এ যেন কল্পনাতীত, স্বপ্নেও যা কোনদিন ভাবতে পারেনি সে, তাই ঘটতে চলেছে। প্রভাকরের সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে সত্যিই কোনদিন ভাবতে পারেনি!

তাই বললে, আমি যে লেখাপড়া জানি না রেণুদি, কত ইস্কুল কলেজে পাশ করা মেয়ে আছে...

রেণু হাসলে। বললে, হবে, হবে, দেখিস তুই।

টিয়া চোখ তুলে তাকালে রেণুদির মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, রেণুদি, তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে না? তুমি বিয়ে করবে না?

কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলো না রেণু। চুপ করে রইলো। সমস্ত মুখটা তার যেন থমথম করে উঠলো। তারপর হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লো।

—বিয়ে করবো না? খিলখিল করে হেসে উঠলো রেণু। বললে, আমি করতে চাইলেই তো হবে না ভাই। কে বিয়ে করবে আমাকে, বল তুই। আবার হেসে উঠলো রেণু।

টিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারলো রেণুদি চেষ্টা করে হাসছে, হাসি দিয়ে গোপন ব্যথাটুকু চাপা দিতে চাইছে।

রেণু একটুখানি চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, পণ দেবার মত টাকা তো নেই ভাই আমার দাদার। কোন রকমে দুটি খেতে দিতেই পারে না, আবার পণ? বিষণ্ণ হাসি হাসলে রেণু।

—তা বলে বিয়ে করবে না তুমি, বিয়ে হবে না তোমার? কান্নার মত শোনালো টিয়ার গলার স্বর।

রেণু হাসবার চেষ্টা করলে। বললে, ওসব কথা ভাবি না টিয়া। দাদার দোকানটা যদি ভাল চলে, বর্ধমানে যদি বাসা করতে পারে দাদা...

—তা হলে?

—তা হ'লে আমি ইস্কুলে ভর্তি হবো ওখানে গিয়ে, দেখিস তুই। দাদা বলেছে, পাশ করলে নার্সিং পড়াবে আমাকে... নিজের পায়ে তো দাঁড়াতে পারবো ভাই!

নার্স! নার্স হবে রেণুদি। কই, টিয়া তো কোনদিন এ-কথা ভাবেনি। ভাবতে ভয় পায়। একদিন তার বিয়ে হবে, সংসার করবে, নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে স্বামীকে দু'বেলা খাওয়াবে, ছেলে মানুষ করবে। কই, এর বাইরে আর তো কিছুই ভাবেনি সে, ভাবতে পারে নি কোনদিন। আর রেণুদি...

রেণুদিরা চলে যাবে শুনে মনে মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছিল টিয়া। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা বিচ্ছেদের ব্যথা। মনে হয়েছিল তার এই সুখদুঃখের একমাত্র আশ্রয়টুকুও বুঝি সরে যাচ্ছে তার নাগালের বাইরে। কিন্তু রেণুদির কথা শুনে অনেক রাত অবধি সেদিন ঘুমোতে পারলো না টিয়া। সত্যি তো, এত টাকা কোথায় পাবে দামুদা। কি করে বিয়ে দেবে রেণুদির!

চোখ বুঁজে শুয়ে থাকতে থাকতে টিয়া মনে মনে বললে, ভগবান, দামুদার দোকান যেন ভাল চলে, যেন বাসা করতে পারে দামুদা।

তা হ'লে, তা হলে—এত ছোট্ট আশা রেণুদির, এমন একটা তুচ্ছ স্বপ্ন—অন্তত সেটুকুও সফল করার সুযোগ পাবে।

টিয়া মনে মনে ভাবলে, রেণুদি চলে গেলে যত দুঃখই পাক ও, রেণুদি তো সুখী হবে। রেণুদি যেন সুখী হয়।

(ক্রমশ)

কতকাল পরে দেখা। চিনতে কষ্ট লাগে। তবুও চেনা গলার মধ্যে একজনকে নিশ্চয় মনে করতে হয়। কোথায় ছিলুম আমরা কিংবা কোথায় পরিচয় ছিল, এই ধরনের চিন্তা করতেও তো সময় লাগে। অথচ ভদ্রলোক আবার বলে উঠল, 'মনে পড়ছে না তো? আচ্ছা আর একটু উস্কে দিচ্ছি, সেই শিমুলতলা, আমি তুই মাধবী—'

মনের ঘোর কাটল, যেন এতক্ষণে স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়েছে। যে পরিমাণ উচ্ছ্বসিত হবার কারণ ছিল ততটা হতে পারলুম না। মুখ দিয়ে একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা।'

'কে আমি? বিদ্যুৎ না চঞ্চল?' হেসে উঠল ভদ্রলোক।

বললুম, 'তুমি শোভন।'

ঝাপটে ধরল শোভন। সিগারেট ঠোঁটে চেপে বলল, 'সেই উনিশ'শো সাঁইত্রিশ, যখন তুই সবে ম্যাট্রিক পাশ করলি, আমি সেকেন্ড ইয়ারে। আর বল্ তো সেই ছোকরাটা— মানে যেটা তোদের পার্শ্বচর।'

আবার এক ভাবনা, মনে করাও দায়। শোভনটা চিরদিনই আনাড়ি, একটায় আসতে আসতে আর একটায় পাড়ি দেয়। এখনো যেন সেই উনিশ বছরের আনকোরা তরুণ।

বললুম, 'বিভাসের কথা বলছিস তো? সে নেই।'

'নেই মানে! মৃত্যু না পলায়ন?'

'দুই-ই, প্রথমে পলায়ন, পরে মৃত্যু।' গলার স্বরটা আমার ফেঁপে উঠেছে।

'আই সি।' সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে অন্ধকার করে তুলল শোভন।

ছোট স্টেশন। দিনে কয়েকখানা ট্রেন থামে, যেন না থামলেও চলে। যাত্রীর নাম নেই। মানুষজন যা চোখে পড়ে তারা দূরে গাঁয়ের পায়েচলা পথিক। স্টেশন মাড়িয়ে কলেরগাড়ির বাহাদুরিটা দেখে যাবার ইচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাদুই কাটিয়ে দিয়েছি। এমনি চুপচাপ, মনে মনে। রাশি রাশি আশা-নিরাশার তৃপ্তিকর আন্দোলন। সময়টা এক রাশ ধোঁয়ার মত উড়ন্ত অপচয় বললেও চলে। তথাপি ক্লান্তির ছাপ আসছে না, তৃপ্তিরও নিবিড়তার সন্ধান মিলছে না।

অনেকখানি পায়েহেঁটে এসেছি। ইচ্ছে করেই এক্কা ধরি নি। নতুন কাজে এসে জায়গাটার ওপর মায়া লেগে গেছে। তাই চোখ চারিয়ে রাস্তাঘাট মানুষজন এমন কি প্রকৃতিরও বিচিত্র বেশ দেখতে চেয়েছি। দূরে শাল মহুয়ার জঙ্গল, তারপরেই রাঙামাটির প্রান্তিক মাঠ। কোথাও দু'একটি সারস অথবা হরিণের একটা আস্ত

ঝাঁক। সব মিলিয়ে জায়গাটার একটা মধুর আকর্ষণ।

কাঠের ব্যবসায় নেমেছি। নতুন কনট্রাক্ট নিয়ে এদিকটায় কাজ করার ইচ্ছে।

একখানা চায়ের দোকান টিমটিম করছে, বিক্রিবাটা নেই। সবে উনুনে আগুন চাপিয়েছে আমারই তাগিদে। ট্রেন আসতে অনেক দেরি মিছিমিছি কয়লা পুড়িয়ে লাভটা কি! সরাসরি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে এক নাগাড়ে চার কাপ ঢেলেছি, আবার ভাবছি কাপ দুই হলেও চলে।

চা-ওয়ালা বলল, 'গাড়ি এবার এসে পড়বে বাবুসাহেব।'

মুচকি হেসে বললুম, 'সময়জ্ঞান তোমাদের দেশের ট্রেনের পর্যন্ত নেই।'

চা-ওয়ালা গামছা-আঁটা মাথাটা এক টানে খুলে ফেলল, খাড়া হয়ে বসল। 'ঢের জানি বাবুসাহেব কলকাতার কথাও জানি। সময়ের কথা আর টানবেন না।'

নিরম্বু আক্ষেপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে চা-ওয়ালা ভদ্রলোককে থামানো দায় হয়ে উঠবে। বলে উঠলুম, 'হ্যাঁ, প্রায় ঐ একই রকম। আচ্ছা বলুন তো স্টেশন মাস্টার এখন কোথায়?'

এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করে বলল, 'তৈরী হচ্ছে।'

'মানে?'

'এখন সাতপোর বেলা, ট্রেন ভিড়তে কমসে কম বারোটা। কাজটা কি বলুন না, কোম্পানীর পয়সা, বাপমা নেই।' উত্তেজিত হয়ে পড়েছে চা-ওয়ালা। আমার চোখে চোখ পড়তেই হেসে উঠল, বলল, 'কটা বাজে বলুন তো?'

ঘড়ি উঁচিয়ে বললুম, 'দেখুন না।'

চোখ বড় বড় করে বলল, 'বারোটা সাড়ে-সাঁইত্রিশ। কিন্তু যাই বলুন সময়জ্ঞান আমাদের দেশের কোথাও নেই।'

ঠিক এমনি সময়ে শোভন কোথা থেকে এসে হাজির হলো।

উনিশ শো সাঁইত্রিশ। সম্ভবত পুজোর কাছাকাছি। আমরা গিয়েছিলুম শিমুলতলা। বিভাসেরই উৎসাহ বেশী ছিল; তারই মাসির বাড়ি। আমি শোভন বিভাস বিদ্যুৎ আর চঞ্চল। আর একজন ছিল, মাধবীদি। মাধবীদি আমাদের চেয়ে বড় হবে কিনা সন্দেহ ছিল, তবুও আমরা 'মাধবীদি' বলেই ডাকতুম। শোভন চঞ্চল আমাদের চেয়ে দু-এক বৎসরের বড় ছিল। এমন কি তারাও মাধবীদি ছাড়া 'মাধবী' ভুলেও বলতো না। বিভাসেরই দূরসম্পর্কের বোন বলেই আমরা জানতুম। বেশ চালাকচতুর মেয়ে, হাবভাবে পুরোপুরি আধুনিকা। সে-ই আমাদের পুরোভাগে দাঁড়ায় আমাদের দোষত্রুটির অপনোদন করে। আমরা পাঁচজন কেবল মাধবীদির নির্দেশ মেনে চলি। সময়ে সময়ে বিরক্ত হয়ে পড়ি, অথচ নড়িচড়ি না। আমাদের সবারই কিছু না কিছু পড়াশোনো ছিল। কলেজে নতুন ঢুকলে যে সমস্ত আদব কায়দা আর গুণাগুণের প্রশ্ন আসে সেগুলোকে গুছিয়ে দিতেই মাধবীদিরই ঝোঁক বেশী। একদিনের ঘটনা বেশ মনে আছে, বিভাসকে একদিনে দুবার চুল কাটাতে হয়েছিল। কলেজে পড়ুয়া ছেলেরা নাকি ওভাবে চুল রাখে না। বিভাস তথাস্তু বলে আদেশ মেনেছে। অথচ মাধবীদির বিদ্যেই বা কত! ক্লাস নাইনে উঠতে না উঠতেই ইস্কুলের দরজা বন্ধ।

সময়ে সময়ে লজ্জায় বেসামাল হতেও হতো। বিভাসের নতুন বউদি হাসি হাসি মুখ করে বলতেন, 'পঞ্চপাণ্ডব। অর্জুনটি কে?'

আমি মাথা গুঁজে থাকতুম। কে কি প্রতিবাদ করতে চাইছে শুনতেই চাইতুম না।

তার পরেই নতুন বউদি সজোরে বলতেন, 'দৌপদী?'

মাধবীদি মোটেই অপ্রস্তুত হতো না। আমরা আড্ডা থামিয়ে যে-যার আস্তানায় ফিরে যেতুম।

ছ-জনের জয়যাত্রা শিমুলতলায় যেয়ে পূর্ণতা পেল। বিভাসের মাসিমা মাঝবয়সী বিধবা। আমাদের পেয়ে তাঁর আনন্দের শেষ নেই। খাওয়া দাওয়ার বিরাট পর্ব তিনি বেশ প্রসন্ন মনেই নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেন। সারাক্ষণ হাসিখুশিতে ভরপুর।

মাসিমা হাঁকডাক ছেড়ে বলে উঠতেন, 'ও মাধবী, কি আক্কেল রে বাছা তোর। সারাদিন যে তুই ছেলে হয়েই রইলি। মেয়ে একটু হবি কি?'

মাধবীদি চোটপাট করে বলে উঠত, 'কি করতে হবে শুনি?'

'ফুর্তি করে যাও একটু। হেঁশেলটা একটু আধটু দেখার কথাও তো আসে!'

মাধবীদি উচ্ছ্বলিত হয়ে বলতো, 'এই কথা, দিন মাসিমা এ ভারটা শোভনের ওপর।'

শোভন চটে লাল। বিশেষ করে মাধবীদির ওপর ওর একটা সহজাত শত্রুতা ছিল।

মাধবীদি ঘুরিয়ে বলতো, 'বিভাসটাও বোকা, আপনাকে একটুও যদি—'

আমাকেই বাধ্য হয়ে মাসিমাকে সাহায্য করতে হলো। আর ঐ সাহায্যটাই আমার ঘাড়ে বেদম হয়ে চেপে বসল।

ওদের বাঁধন আলগা, ওরা বেরিয়ে পড়ে যখন তখন। পাহাড়ে ওঠে, শাল বনের মধ্যে যেয়ে লুকোচুরি খেলে। ফিরে এসে গল্প শোনায়। আমি আর মাসিমা শুনি। মাসিমার ছেলেমেয়ে কখনো ওদের সঙ্গ নেয়, কখনো বা বাড়ির আশে পাশেই ঘোরাফেরা করে।

আমি যে বাইরে বেরুই না এমন নয়। তবে দলছাড়া হয়ে একা-একা এধার ওধার করেছি। সময়ে সময়ে মাসিমাও আমার সঙ্গে কাছাকাছি ঘুরেছেন। সুযোগ তর্ক করেছেন এবং নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের চেহারাটাও দেখতে চেয়েছেন। সেই মাসিমাও যেন মাধবীদির সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলেন। হালকা পরিহাসের মধ্যে যুক্তির স্বাভাবিক গতিও লক্ষ্য করলুম। তাছাড়া মাধবীদির ব্যবহারিক জগতের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মাসিমা সময়ে সময়ে অস্ফুটে আর্তনাদও করে ওঠেন। আমি অতশত বুঝতে চেষ্টা করতুম না, হয় তো সেই জন্যেই মাসিমা আমাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ভাবতেন।

দিন কয়েক কাটল এমনি ভাবে। শোভনের সঙ্গে বিভাসের যেন একটা কিছু ঘটেছে। কথাবার্তা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। মাধবীদিও পরিমাণে কিছুটা মৌন। বিদ্যুৎ আর চঞ্চল অপরিমিত উজ্জ্বল।

মাসিমাও একটু অসহিষ্ণু। আড়ালে আবডালে বলতে শুরু করলেন, 'মেয়েছেলে

তো বাবা এসেছ যেমন বেড়িয়ে টেড়িয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাও। দোষ দেবে তো মানুষে আমাকেই।'

আমিই একমাত্র সূত্রধার। আমারও যেন চোখ ফুটছে।

শেষ পর্যন্ত মাধবীদি যেন অসুস্থ হয়ে পড়ল। দিন দুই একদম বেরুল না। শোভন যদিও বা বেরুবার তোড়জোড় করে, বিভাস বিছানাই ছাড়ে না, যেন মাধবীদির অসুস্থতার ভাগ তার ঘাড়ে এসে জেঁকে বসেছে। অথচ মাসিমাকে সাহায্য করার ভারটা আমার হাতছাড়া হতেই পারল না।

হঠাৎ একদিন দেখি বিদ্যুৎ চঞ্চল আর শোভন একজোটে বাগানের মাঠে লুকোচুরি শুরু করে দিয়েছে। ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে মাধবীদি লক্ষ্য করছিল। বিভাস যেন পোস্ট অফিস থেকে সবে ফিরল। কোনদিকে না তাকিয়ে সটান খেলায় যোগ দিল। শোভন এখন চোরের খেলায় মরিয়া বিভাসকেই চোর করে ছাড়ল।

মাধবীদির উল্লাসের হাসি থামতেই চায় না। আমি ছাদের ওপাশে ছিলুম, এপাশে এলুম। মাধবীদিকে দেখে মন জুড়লো। উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বলল, 'পারিজাত, তুমি! এসো বসো। আর শোন ভারী অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের, তোমার ওপর অবিচার হলো।'

মনে পড়ল নতুন বউদি হলে বলতেন, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব একটু থাকবে বইকি।

বললুম, 'এমন কথা কেন বলছো মাধবীদি?'

'তুমি খেল না বেড়াও না, মাসিমাকে আগলে আছো। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট।'

'মানে?'

মাধবীদি খোলামেলা হাসল, বলল, 'মানে সাতেও নেই পাঁচেও নেই, শান্তিতে আছো।'

ওদিকে খুব হইহুল্লোড়। বিভাসও ছাড়বে না, ফিরতি খেলায় শোভনকে চোর করবেই। মাঝ থেকে বিদ্যুৎ চঞ্চলের রেহাই।

বললুম, 'কবে ফিরছো বল মাধবীদি, আর আমার ভাল লাগছে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মাধবীদি। সংক্ষেপে বলল, 'আমিও ভাবছি তাই।'

কখন ঠিক মাধবীদির পাশেই দাঁড়িয়েছি। একাত্ম হবার ইচ্ছা জাগছে, মনমরা মাধবীদির জন্যে মায়া লাগছিল। সামনের চুলগুলো চোখের পাতা পেরিয়ে উড়োছুটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাসারন্ধ্র একটু বেশী ফাঁপা শুকনো ঠোঁট। ঘাড়ের ওপর কুচো-চুলের জট কাটিয়ে একহারা সরু হার। সব মিলিয়ে মাধবীদি যেন ভাবনা আর না-ভাবনার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। কিছু কষ্টের কোন এক স্পষ্ট দাগ যেন মাধবীদিকে অপরূপ করে তুলেছে।

গাঢ় স্বরে বললুম, 'তোমার খুব কষ্ট না মাধবীদি?'

অদ্ভুত চোখে ও চাইল আমার দিকে। একটু ম্লান হাসি ফুটে বেরুল কেবল। নিচের কোলাহল ছাপিয়ে এ স্তব্ধতা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

একটু পরে মাধবীদি বলল, 'ওসব কিছু নয়, তবে কেমন যেন একটা ভয়।'

ফস্ করে বলে ফেললুম, 'বুঝেছি।'

অধৈর্য হয়ে উঠল মাধবীদি। 'কি বুঝেছ? তুমি কতটুকু জানো?'

ঘাবড়ে গেলুম, মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

মাধবীদি হাসল, অবাক হাসি। যেন কিছুই ঘটেনি, কিছুই ঘটবে না কোনদিন। সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমন কি ওদের ঐ চোর চোর খেলার মরণবাঁচন পণটাও অতি তুচ্ছ।

সাহসে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হলুম। কাঁঠাল গাছের শির ডালটা ছাদের আলসে কাটিয়ে চিলেকোঠার ওপ্রান্তে নুয়ে রয়েছে। আলোছায়ার প্রসন্ন হাসিটা থই-থই করছে। আমি যেন এই প্রথম চোখ-চেয়ে মাধবীদিকে দেখছি, নারী সংস্পর্শের স্বাদ নিচ্ছি। একটা গলাবোজা আনন্দের ডাক বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছে।

মাধবীদির মুখখানি সত্যিই মিষ্টি। পরের বাড়িতে রাজারহালে মানুষ বলেই বোধ হয় মাধবীদির সব দিকটাই বাড়া-বাড়ির বাঁধ ঝাঁপানো। তাকলাগানো কথা। মনভরানো কণ্ঠস্বর, চোখজুড়ানো দেহছন্দ।

মাধবীদি আমার হাত ধরল, বলল, 'তুমি খুব ছেলেমানুষ, কষ্ট হবে তোমারই বেশী।'

চুপ করেই রইলুম। খুব ভাল লাগছিল। বুকটা দুলছিল খেলছিল।

আবার বলল, 'আচ্ছা তুমিই বল, কে ভাল।'

বুঝলুম না। জিজ্ঞাসার চোখ দিয়ে মাধবীদির চোখের পাতায় ছোট তিলটা দেখলুম শুধু।

'আচ্ছা বল তো শোভনকে তোমার ভাল-লাগে, না বিভাসকে?'

কিছু বলতে যাবার আগেই মাধবীদি বলল, 'বিভাস ছেলেমানুষ, বুদ্ধি নেই, বিচার নেই।'

থেমে রইল মাধবীদি। লুকোচুরির খেলায় বিভাস আগে জিতে পরে হারছে। শোভনের উচ্ছ্বাসধ্বনি আর বিদ্যুৎ চঞ্চলের দাপাদাপির স্বরটা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

আমি এবার অনেকটা এগিয়ে পড়েছি। বস্তুত মাধবীদির ওপর আমার বা আর কারো কোন অনুযোগ কিংবা অধিকার সম্বন্ধে আমার সঠিক মাত্রাজ্ঞান ছিল না। এখন বুঝলুম মাধবীদির অসুস্থতা একটা রোগ নয়, একটা চিন্তা বা মীমাংসার সময় নেওয়া। আমার জন্যে কিন্তু ওর কোন বক্তব্য নেই, কোন সঠিক ধারণাও নেই। আমার কষ্ট হলো একটু, মনটা বেড়ে ওঠার মুখেই চোট খেয়ে ঝিমিয়ে গেল।

মাধবীদি বুদ্ধিমতী। আমার জামার কলারটা একটা ছোট স্পর্শে টান দিয়ে বলল, 'তোমার মতো ভাল কাউকে দেখি নে। আশ্চর্য ভাল। তাই তো বলছি তোমাকে।'

উৎসাহ নিয়ে বললুম, 'বিভাসটা এদিকে খুব সরল হলে কি হব, ভারী যা তা কথা বলে।'

মাধবীদি অমনি পেয়ে বসল। আমি জানি, তুমি ঠিক বলবেই। ওকে কিছুতেই বিশ্বাস করো না, ঠকবে।'

মনটা একেবারে এতখানি বেঁকে বসতে চায় না, বিভাস আমার অন্তরঙ্গ। ওরই সূত্র ধরে আমার এই আসরে উপস্থিতি। ওকে নিয়েই আমার চলা বলার অধিকার। মাধবীদির কথায় খানিকটা আরাম লাগলেও খুব একটা সমর্থন ছিল না। আমি চুপ করে রইলুম।

মাধবীদি আবার বলল, 'বিভাসের গুণ অনেক, ওর জন্যে আমার ভীষণ মায়া।'

চোখের পলক নাচিয়ে হাসির ভাব আনল মাধবীদি। আমার কপালের চুলের ঝুরো ধরে টান দিয়ে বলল, 'অদ্ভুত তোমাকেও লাগে, কিন্তু শোভনের জুড়ি নেই, সত্যিই অদ্ভুত।' তাজা শ্বাস টানল মাধবীদি।
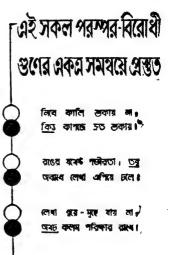
চট করে বলে বসলুম, 'শোভনটা স্বার্থপর।'
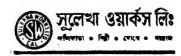
'কে বললে?' ঘুমজড়ানো গলা মাধবীদির। 'অমন হতেই হয়। বলতে পারো শক্তি রাখে। যারা পারে না তারা নিন্দে করে, হিংসা করে।'

আমি বলে ফেললুম, 'আমি কিন্তু করি না মাধবীদি, তুমি বিশ্বাস করো।'

মাধবীদি আমার কথায় কান দিল না। বলে চলল, 'কিছুই আর ভাল লাগে না পারিজাত। একটা কিছু না করলে আর পারছি না।'

কথাটা ঠিক ধরতে পারলুম না। মাধবীদির কাচের মতন চোখ দুটোকে একটিবার মাত্র দৃষ্টি দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রইলুম। মনে হলো মাধবীদি যা যা বলেছে আর বলতে চাইছে তার মধ্যে আমার প্রাধান্য নেই বললেই চলে। অভিমান দেখানোর সুযোগ এসে গেল আমার। বললুম, 'যার যা খুশী তাই করবে, কে আর বাধা দিচ্ছে!'

কথাটা অন্য পথ নিল। যেন মাধবীদির ওপর আমার অধিকারের সীমা নির্ধারণ অনেক আগেই হয়ে রয়েছে।

চমকে উঠল মাধবীদি। আমার একখানা হাত ধরল। চোখের পাতাগুলো কেবল উঠল নামল। মুখের প্রান্তে হাসির ঝিলিমিলি যেন কাঁঠাল পাতার মসৃণ অবয়বে উঠতি রোদ এসে খেলা জুড়েছে।

বলল, 'জানতুম খুব ছেলেমানুষ, এখন দেখছি একটু বোকাও। কি, তাই নয়?'

মাধবীদির ছোঁয়া, ঢলঢলে মুখের হাসিতে আমি তলিয়ে গেলুম। বললুম, 'তোমার জন্যে আমি সব পারি, যা বলবে তাই।' বীরত্বের সেরা জিনিস হলো অঙ্গীকার। যেন আমি ইতিমধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই যুদ্ধের জন্যে তৈরী।

ঠোঁট বাঁকিয়ে মাধবীদি বলল, 'বীর-পুরুষ! যাক, ঢের হয়েছে।'

আমার পৌরুষ চূর্ণ হলো। মাধবীদি আবার বলতে লাগল, 'পারিজাত, তোমরা পাঁচজনেই একেবারে এক, আবার আশ্চর্য হতে হয় যখন তোমরা পাঁচশো জনের মূর্তি ধরো। জীবনটাকে এভাবে দেখলে কারো রেহাই নেই।'

অবুঝ চোখে চেয়ে রইলুম আকাশের দিকে। কাঁঠাল ডালের মাথাভারী পল্লবের মধ্যে দুটো দুরন্ত কাঠবেড়ালীর লুকো-চুরিও দেখে নিলুম। আকাশটা ঐ পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। আমার একাগ্রতার দাম মাধবীদি দিতে চাইছে না, অথচ মাধবীদিরই বা এত এলোমেলো কথা শুনতে যাই কেন? আমাকে পাশ কাটিয়ে চলাই যার অভ্যাস তাকে নিজের বলে টানার ঝঞ্ঝাট কম নয়। মনে মনে রাগ করার সুযোগটা যেন অভিমানের চেহারায় ফুলতে লাগল। তখনো দেখছি মাধবীদির চোখে জল আসে নি, অথচ মুখের নাকের ও চোখের মধ্য তীক্ষ্ণ একটা কান্নার রূপ।

আমি হঠাৎ বলে বসলুম, 'আমি তো কিছুই জানি না মাধবীদি।'

সহজভাবেই মাধবীদি জবাব দিল, 'জানো না-জানো সেকথা নয়। পারিজাত, তোমার মন বলে একটা জিনিস আছে তো, সেটাকে ছাড়ছোড় দেবার যো আছে কি?

মাধবীদির হাতের ওপর নজর পড়ল আমার। পান্নার আংটিটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হাতের মণিবন্ধ থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত কেমন একটা পরি-পূর্ণ উন্মুখতায় আবিষ্ট। নতুন চোখ নিয়ে মাধবীদির শুধু এইটুকু দেখারই জের মিটছে না আমার। আমার হাতটা আল-গোছে টান দিল, বলল, 'পারিজাত চুপ কেন, ধরতে পারলে না তো?'

তবুও নীরব রইলুম, কথার মতো কথার সন্ধান পেলুম না। মাধবীদির মধুর সান্নিধ্যের কাছে নীরবতার দামই যেন অনেক বেশী। আঁচল গুটিয়ে মাধবীদি বলল, 'একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন তুমি পারিজাত একটু ছেলেমানুষি করবে। কষ্টের সীমাকে প্রসারিত করে নিজের ভাবুকতাকে প্রশ্রয় দেবে। আর কি বলবো বলো?'

বললুম, 'আমি কি তোমার কাছে কিছুই অবাধ্যতার ওপর জুলুম করল না। কিন্তু আশ্চর্য, চোখের কোণে জল কেন? মাধবীদি যে অহংকারী! কথায় কথায় বলে, কারো জন্যে তার কোন শোক নেই দুঃখ নেই এমন কি অনুরাগও নেই। মেয়েদের জীবন (মাধবীদির পক্ষে) ফুল ফোটার মতো সত্যি আর বিচিত্র। নিয়মের খেলায় সে একদিন ফুটবে হাসবে ঝরবে।

মাধবীদির ঠোঁট দুটো কাঁপল। চোখের পল্লব ভেজা, ভারিভারি। এখনো বাগানের মাঠে ওদের লুকোচুরি খেলার ছেদ নেই। আমিও মাধবীদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি। তার মানসজীবনের একক সাক্ষী আমি। আমার অস্তিত্বের জবাবদিহি মাধবীদি চায়, আমি দিতে পারি না, অভি-ভূত হয়ে পড়ি।

মাধবীদি বলল, 'জীবনটা একটা খেলা, নয় পারিজাত? ভালমন্দ হারজিত এসব বিচার পরে। খেলাকে কে এড়ায়?'

আমার কৌতূহল আর এতটুকু নেই। আমি হেরেছি বারবার, উপযুক্ত হবার চেষ্টা করেও পরাভূত হয়েছি।

মাধবীদি চুপচাপ আমাকে লক্ষ্য করছিল। আমার সতের বছর বয়সের তারুণ্যকে সে বোধ হয় ক্ষমা করেছিল। জানা না-জানা হৃদয়বৃত্তিকে তার মেয়েমনের বাড়ন্ত চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করছিল! বিচ্ছুরিত হাসি নিয়ে বলল, 'কারুকে বলে দেবে নাকি?'

'কি?'

'এই সব, মানে তোমার আমার হেঁয়ালি। কি বোকামিই না করলুম পারিজাত, সব চেয়ে যে কচি তার কাছেই ধরা দিলুম।'

আমার মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে যত্নের হাতে সামলে তুলল। 'এই জন্যই তো বলি, কখন কি ঘটে বা ঘটতে পারে কেউ বলতে পারে কি? এক সময় কি হয়েছিল জানো পারিজাত, তখন তোমার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় নি, বেশ কয়েক বছর আগে। বিভাসটা একটা যাতা কাণ্ড করে বসল। আমি বলেই ওর সঙ্গে আবার মিলোমিশে চলি।'

মাধবীদি সত্যিই যেন ঘৃণার চোখ নিয়ে একবার চারদিক তাকাল।

উচ্ছ্বাস এখনো কমে নি মাধবীদির। উড়াড় করে শূন্য হতে যায়। 'আমার কি, আমি তো তোমাদের দিকে হাত পেতে নেই। যাও বললেও যাবো না, আবার না বললেও চলে যাবো। তোমাদের ভয় করে চলার মতো মেয়ে মাধবী নয়। জানলে পারিজাত, এমনি করে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি বিভাসকে। অথচ ওর কথাগুলো ঠিক উল্টো।'

মাধবীদি হাঁপিয়ে পড়ল। আমার আর ভাল লাগে না। আমার কথাগুলো উড়িয়ে দিতে খুব ওস্তাদ মাধবীদি।

'তা লাগবে কেন, কারো কষ্টের কথা শুনতে বয়ে যায় তোমার।' চটে উঠল মাধবীদি।

'আমি কি তাই বলছি মাধবীদি।' আমার মিনতির সুর।

'জানি তোমরা কেউ কম নও। ছেলেদের স্বভাব পালটায় কখনো?'

রাগে আসতে পারবো না জানি। রেগে গেলে মরিয়া হয়ে ওঠে মাধবীদি। অবশ্য নিজেই আবার সামলে নেয়, স্বাভাবিক হয়।

আমার কাছ থেকে একটু নড়ে গিয়ে কাঁঠাল ডালের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ছেলেখানুষি করল। যেন মাধবীদির মনোবাসনার জটিল রূপটি ঐ কয়েকটা ঝোঁটাকাটা পাতার মতই নিচে মাটিতে নিশ্চিন্ত হল। মাধবীদির অসুস্থ চেহারার ওপর একটা বেমানান নিষ্ঠুরতা উঁকি দিয়েও গা-ঢাকা দিল। ফিরে এল আমার দিকে। মুখে হাসির আভাস টানতে চাইল—যেন অপরাধটা স্বীকার করে মাপ চাইছে।

তারপর দিন দুই কেটেও গেল। ফিরে আসার যে তাগিদটা হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠেছিল সেটা নেই বললেই চলে। মাঝখানের এই রহস্যটা আমার কাছে মেখাপ্পা লেগেছে। শোভন আর বিভাসের অন্তরঙ্গতাও বেড়েছে। দেখি সকলেই মাসিমাকে সাহায্য করতে আসে। বাড়ি ছাড়া হয়ে যাবার করুণও তেমন মতলব নেই। মাঝে মাঝে সবাই আমরা কাছাকাছি যে কোন একটা পাহাড়ের ওপর বিচরণ করে ফিরে আসি। আমেজী মেজাজে সময়টাকে উপভোগ করতে চাই। আমাদের পাঁচ বন্ধুর সম্বন্ধটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। মাধবীদি কিন্তু খুবই সাধারণ। তর্ক নেই, জারিজুরি নেই, এমনকি কথায় কথায় রাগের ধরাছোঁয়াও নেই—পুরোপুরি নতুন খোলসের মধ্যে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। এইখানে আমারই যা একটা বিশেষ চোখ খুলেছে। মাধবীদির চোখের দিকে চাইতে যাই, পারি না। ভাবি নিজের বুদ্ধি আর কতটুকু মাধবীদির কাছে আমার কি ঠকে মরবো! কিন্তু খুশিটা আমারই বেশী। মাসিমার যেমন স্নেহ পেয়েছি, অন্যদিকে মাধবীদিরও ভেতরের অংশটায় উঁকি দিতে পেরেছি। জীবনের এই সঞ্চয়টা স্থায়ী হলেই হয়।

সকালবেলায় কিন্তু অন্য সুর। মাসিমা কাঠ হয়ে বসে আছেন, মুখে কথাটি নেই। বিদ্যুৎ চঞ্চলও অসাড় হয়ে গেছে। আমি হতবাক। শোভন তার স্যুটকেশ বিছানা বেঁধে এক্ষুনি স্টেশনের দিকে ছুটল। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি।

এখনো শোভন সিগারেটের ধোঁয়া [illegible]

আছে। মুখের ওপর যে-কটা রেখা ফুটে উঠেছে সেগুলো বয়সের মাপে বেশী নয়। শীতের শেষ ধাপ, এখানে তবুও ভোর দিকটাতেই যা একটু বাড়াবাড়ি। এই দুপুরে তো তাহা আগুন। শোভনের নিখুঁত গরম স্যুটের কাছে আমার আধাখেঁচড়া সুতির প্যাণ্ট আর কমদামি সোয়েটার বেমানান লাগছে।

মুখের আধখানা সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'কি ভাবছিস পারিজাত? এতদিন পরে দেখা, তোর কাছ থেকে কি কিছুই আশা করি না?'

বললুম, 'তোকে দেখছি, ভারী চমৎকার লাগছে।'

'কি করে?' আর একটা সিগারেট বার করল।

বললুম, 'আগে বল্ দিকি কোত্থেকে উদয় হলি। আর সব খবর কি? শুনেছিস চঞ্চলের মেয়ের বিয়ে হয়েছে।'

শোভন অস্থির হাসি হাসল। বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দেওয়ালে লটকানো টাইম-টেবিলের ওপর এক পোঁচ চোখ বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। নাকের গর্তে তখন অনর্গল ধোঁয়ার উদ্গার।

বলল, 'খুব ভাল আছি রে পারিজাত. বিরাট একখানা সংসারের মালিক। খাটছি-খুটছি, চালিয়ে যাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, একটা লম্বা চওড়া বিজনেসও করছি। জানিস তো মালিক একজন আছেই।'

আমি লক্ষ্য করছি, শোভনের অঙ্গভঙ্গী কথা বলার সুঠাম অনুশীলন। সেই উনিশ বছরের শোভন আজ ছেচল্লিশে পৌঁছেও অবিকল এক। চুলগুলো আরো নিবিড় আরো মসৃণ। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাতের কবজি, আঙুলের গাঁট, চোয়াল, কপাল। শোভনকে ভয়ানক ভাল লাগছে।

'আর শোন্ যা বলছিলুম, এক্ষুনি একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। সত্যিই ভাবলে কেমন লাগে, পরিবর্তনের শেষ নেই।' শোভন থামল। জুতোর গোড়ালি ঘুরিয়ে একটা পাক খেল। লেবেলক্রসিংএর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল, 'তোর ট্রেন কটায়, কোথায় যাচ্ছিস?'

বললুম, 'ছোট পুঁজির ব্যবসা। এইখানেই শেষ পাড়ি। তাও আবার চারদিন কেটে গেল। কলকাতায় ফিরছি।'

অবাক হয়ে শোভন বলল, 'তুই এখানে চারদিন কাটালি? আমি জানতেই পারলুম না, ভীষণ অন্যায় তোর। ছাড়ছোড় হয়ে গেছে বলেই কি মনে রাখার মতো কিছু নেই পারিজাত!'

একটু যেন ভাববিহ্বলতার পরিচয় দিচ্ছে শোভন। বললুম, 'কি হলো?'

'হবে আর কি। আমিও তো মাত্র এখানে দিন পাঁচেক হয়ে গেলুম। আমার কি এক মায়াড়ে থাকলে চলে ভাই। একটা চেঞ্জের দরকার ছিল, ছিল এখানে। খুব ইমপ্র হলে কি হয় চিঠির ও নিয়ে যাচ্ছি।'

মনে হচ্ছে এবার শোভনের সাংসারিক জীবনের ইতিবৃত্ত জড় হবে। বললুম, 'আজকাল কোনদিকে আছিস, টিকিটি দেখারও যো রাখিস নি। বাপরে বাপ, সে আজকের কথা!'

'আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলতে পারি। তবে শোন পারিজাত, শোভন নিষ্ঠুর নয়।' শোভন এবার আমার একেবারে গা ঘেঁষে বসল। আমার কাঁচাপাকা চুলের চৌহদ্দি ঘেরা টাক, মোটা লেন্সের ভারী চশমা, সামনে-ঝোঁকা মুখ—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। পিঠের ওপর হাতের চাপ দিয়ে বলল, 'চেহারায় বিজ্ঞের ছাপ, সুতরাং কাঠের ব্যবসা নাকি?'

'একটু; অল্পসল্প আর কি।'

'কোথায় স্টক?'

'ঘাটাল।'

শোভন এবার উঠে দাঁড়াল। সিগারেট কেসটা পকেট থেকে হাতে আনল। বলল,

'শুরু করেছিলুম ভূপালে, খানিকটা রেখেওছি সেখানে। এখন নজর দিয়েছি চিত্তরঞ্জন আর দুর্গাপুরে। চিত্তরঞ্জনের পাশেই বাড়িঘর দোর। যাস না একদিন বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে।'

ফাঁকা হেসে বললুম, 'সেদিকটায় সুবিধে নেই, সময় আর হলো কই?'

'কেন?' যেন আঁতকে উঠল শোভন 'তুই বিয়ে থা করলি না, খুব অন্যায়, ভীষণ অবিচার।' পায়চারি শুরু করল।

বললুম, 'সুখে আছি।'

'কখখনো নয়। বুঝেছি ঐ জন্যেই ধুঁকছিস। যা-ই বলিস পারিজাত, তুই ভুয়ো, ঠিক সেই বিভাসটার মতো।

ঘুরে ফিরে আবার বিভাসের কথাই এলো। শেষটায় বিভাসের বাঁচবার কি সাধ। বাঁচাতে কেউ পারল না।

শোভনের মুখখানা থমথম করছে। দ্বিতীয়বার বিভাসকে টেনে এনে আমাকে হয়তো অজান্তে কষ্ট দিয়েছে। প্রথমেই যখন তার কথাটা উঠেছিল তখন শোভনের গলায় ব্যঙ্গের ধার ছিল। এখন কি বলবে না বলবে ঠিক করতে সময় নিচ্ছে। অস্ফুটে বলল, 'ছেলেমানুষি আর কি। কিন্তু তারপর তোরাই সব জানিস, আমি তো দলছাড়া, ধরতে গেলে দেশ ছাড়াও।'

থামল শোভন, নিজের আবেগকে টান দিতে চায়। বলল, 'তোর গাড়ি কটায়, আচ্ছা আচ্ছা আমারটাই আগে ছেড়ে যাবে। তোরটা আচ্ছা লেটের চূড়ান্ত?'

চোখে চোখ পড়তেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অহেতুক ঘাড় দেখল শোভন।

'জানিস শোভন, ওর জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই।'

কথাটা মনে ধরল না শোভনের, যেন মনে মনে একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। একটু পরে বলল, 'তোরা যা জানিস খানিকটা তার মিথ্যে। বলবি মাধবীরই কাজ, বাইরে থেকে কে কাকে চিনছে বল?'

আমি বাধা দিলুম, 'আমি সত্যিটাই জানি শোভন। মাধবীদির জন্যে আমার দুঃখ হয়।''

শোভন ম্লান হাসল, গায়ের কোটটা খুলে হাতের ভাঁজে ফেলল। মিহি সুরে বলল, 'সুখদুঃখ মানতে হয় বইকি।'

আমি প্রসঙ্গ চাপা দিলুম। চঞ্চল আর বিদ্যুতের পারিবারিক জীবন, কাজকর্মের বিবরণ সংক্ষেপে শেষ করলুম। আমারটাও অনেক ব্যাপারে কমিয়ে বাড়িয়ে যা খাড়া করলুম তাতে শোভনের চক্ষুস্থির। সে আমাকে চিরদিনই একটু অন্য রকম ভাবে দেখে এসেছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটে গুঁজে দিল। নিজেরটায় আগুন ছুঁইয়ে [illegible] টানের পর টান দিয়ে কি যেন ঝেড়ে আবার টাইম-টেবিলটা দেখার ছল করে পিছন ফিরে দাঁড়াল। লেবেলক্রসিংএর দিকে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সোজা আমার সামনে মুখ করে বলল, 'এসে গেছে। আমার কি কম ধকল নাকি, বাক্স প্যাঁটরা বিছানা নিয়ে এগিয়ে চলে এলুম। একা মিলল না তেমন একখানাতেই দু-ক্ষেপ দিল।'

আমিও উঠে দাঁড়ালুম। শোভনের পরিবারের বাড়বাড়ন্ত কেমন দেখার লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শোভন হাত নেড়ে হেঁকে ডাক দিল, 'এদিকে, এখানে।'

দেখতে পাচ্ছি একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, সঙ্গে মাত্র একটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেমেয়ে প্ল্যাটফরম ধরে ছুট দিয়েছে। মা রয়েসয়ে হেঁটে আসছেন।

শোভনের মুখে তৃপ্তির হাসি। গাড়ি আসার ঘণ্টা পড়ল।

'ঐ দ্যাখ পারিজাত, আমার মেয়ে, দশ পেরিয়ে গেছে। আর ঐ যে ছেলে, এ বছর ইস্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে।'

আমি এক দৃষ্টে ওদের দৌড়ে আসার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করছিলুম, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। শোভন বলে চলেছে, 'মেয়ের নাম রেখেছি রিমঝিম। হ্যাঁ তোকে বলাই হয়নি বড় ছেলে সঞ্জয় তাকে ইঞ্জিনীয়রিংএ ঢুকিয়ে দিলুম। তোদের শিবপুরেই তো রয়েছে। ছোট ছেলেকে মনে করছি ডাক্তারীতেই ঠেলব। ওর নাম দিয়েছে ওর মা, শুভংকর।

রিমঝিম আর শুভংকর বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে। ভদ্রমহিলা এখনো বেশ খানিকটা দূরেই পড়ে আছেন। আমি অজান্তে বলে উঠেছি, 'চমৎকার। তোর থেকে কিন্তু শোভন, তোর ছেলেমেয়ে উৎরে যাবে।'

শোভনের ইঙ্গিত আমাকে ওরা প্রণাম করল।

'তোমাদের কাকাবাবু, অদ্ভুত মানুষ— ঋষিটিশি গোছের আর কি। নাম কি জানো? পারিজাত—'

রিমঝিম উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বলল, 'পারিজাত। আচ্ছা বাবা খুব জানা-শোনা নাম নয়? ঠিক ধরেছি, স্বর্গের ফুল।'

শোভন হেসে উঠল হো হো করে। মেয়ের বেণী ধরে বলল, 'মেয়েটা এসেছিল বলে তোকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়ে গেল পারিজাত।'

শুভংকর একটু চুপচাপ। তীক্ষ্ণ চোখ আর কান দিয়ে যেন সে আসল কিছু দেখছে শুনছে।

গাড়ি প্ল্যাটফরম ছুঁল। শোভন—নিমেষে টিকিট কাটল। কলরব আর সামান্য হুড়োহুড়ির মধ্যে শোভনের সমস্ত কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি না। কুলিরা মাল শুরু করে দিয়েছেন। সাদাসিধে মানুষ, একাল সেকাল কোনকালেই তাঁর বাধা নেই, এমনি বেশবাস। অল্প একটু শাড়ির আঁচল মাথায় এসে পড়েছে। মুখটা এতক্ষণেও পুরো দেখতেই পেলুম না।

এখানে গাড়িটা কয়েক মিনিট দাঁড়ায়। উঁচু ক্লাসে বসার খুব একটা অসুবিধা ছিল না। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছি। শোভনের গোটা মুখখানায় একটা অদ্ভুত কৌতুকের ছায়া পড়েছে।

শোভন ডাক দিল, বোধ হয় ইতিমধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে কিসের কথা হয়ে গেছে। আমি হাত তুলে এগুলুম। আমার ট্রেন আরো পনের মিনিট পরে আসছে। ভেতরে ভেতরে একটা কষ্টের আঁচ লাগছে। সেটার আকার একটু পরে কেমন নেবে কে জানে!

'চিনিস একে?'

লজ্জা হবারই কথা। পরস্ত্রীর দিকে সামনে থেকে দেখা কেমন যেন একটু লাগে। আমি ইচ্ছে করলেও মুখখানা একনজরে চিনতে পারতুম না। ছেলেমেয়েকে একটু আদর করলুম। হাতে ওদের কি দেওয়া যায় সে নিয়েও চিন্তা হলো মনে। কিছু খাবার বা কিছু ফল কোনটাই পাওয়া যাবে না এখানে।

'এই দ্যাখ পারিজাত।' শোভন স্ত্রীর মুখখানা আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরল। রিমঝিম আর শুভংকর তো অবাক। আমি তো কূলই পেলাম না। চিনতে ভুল হবে কেন? সিঁথির চুল ফাঁকা হলেও মুখের আদল অনেক বদলালেও আমি ঠিকই চিনেছি। হাতদুটো খুব যেন বেশী ফরসা বেশী টসটসে। গলার মোটা হারটা একটা আস্ত প্যাঁচ খেয়ে ঘাড়ের খাঁজে ঢুকে রয়েছে। চোখের পাতার ছোট তিলটা এখনো হারিয়ে যায় নি।

চেয়ে আছে মাধবীদি আমার মুখের দিকে। আকস্মিক আঘাত বা আনন্দের তোড় সামলাতে সময় নিচ্ছে বোধ হয়। আমার দিক থেকেও কোন শব্দ নেই।

শোভনই বলে উঠল, 'দুজনেই কি আত্মস্থ হয়ে গেলি নাকি?'

আমার হাত দুটো অজান্তে নমস্কারের ভঙ্গীতে উঠে এসেছে বুকের কাছে। মাধবীদিও নীরবে নমস্কার জানাল।

শেষকালে বলতেই হলো, ভাল আছেন মাধবীদি?'

'আপনি কেমন আছেন?'

'এই চলছে আর কি।'

ট্রেন ছাড়ছে, আর সময় নেই। পোর্ট-ফোলিও খুলে পার্কার সেটটা উঠিয়ে পেনটা দিলুম শুভংকরের হাতে আর পেন্সিলটা রিমঝিমের।

শোভন ঝুঁকে এসেছে, পাশে মাধবীদিও। ট্রেন প্ল্যাটফরম কাটিয়ে অনেকটা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বর্তমান বৎসরে আকাদমি পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থের মধ্যে দাশগুপ্ত মহাশয়ের রচিত 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' পুরস্কারযোগ্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগীর কাছে সংবাদটি শুভ; দাশগুপ্ত মহাশয়কে আমরা অভিনন্দন জানাই।

এবারে বাঙলা বইয়ের আকাদমি পুরস্কার লাভ গতবারের কথা মনে করিয়ে

দেয়। গত বৎসর কোনো বাঙলা গ্রন্থ পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে বাদপ্রতিবাদ, ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছিল। এ-বছরে সাহিত্য আকাদমি সে-ক্ষোভ পুষে রাখতে দিলেন না। ফেল করা ছেলেকে যেন এবারে ক্লাস প্রমোশন দেওয়া হল।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত প্রধানত প্রাবন্ধিক, তাঁর রচিত একাধিক প্রবন্ধ-গ্রন্থের সঙ্গে যদিও বাঙলা সাহিত্যের গবেষক-পড়ুয়াদের পরিচয় সর্বাধিক তবু কবিতা, শিশু-সাহিত্য ও উপন্যাস লেখক রূপেও দাশগুপ্ত মহাশয় সুপরিচিত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ-যোগ্য। কানাড়ী সাহিত্যে এ-বছরে যে গ্রন্থটি আকাদমি পুরস্কার পেয়েছে—সেই গ্রন্থটি, অনুমান করি, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির বিচার। গ্রন্থটির নামঃ বাঙালী কাদম্বরিকার বঙ্কিমচন্দ্র, লেখক—এ আর কৃষ্ণশাস্ত্রী।

বিদুর

মধ্যে প্রবন্ধ পুস্তকের প্রাধান্য নজরে পড়ে। আশা করা অসঙ্গত হবে না, প্রবন্ধ সাহিত্যের বেশ উন্নতি হচ্ছে।

বই চুরি

কোনো সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক আমার কাছে দুটি বই পাঠিয়ে দিয়েছেন। বই দুটির নানান জায়গায় দাগ দেওয়া। ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেনঃ "এই চুরি কি বই চুরি না পুকুর চুরি? ধন্য বঙ্গদেশ!"

আমি বই দুটি নিয়ে উলটে পালটে দেখেছি। একে কোন চুরি বলা যায় বুঝতে পারছি না। পাঠকই বিচার করুন।

একটি বইয়ের প্রচ্ছদপটে (ছবি দেওয়া হল) বইয়ের নাম লেখা আছে 'ময়দানবের দ্বীপ'; লেখকঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র। অন্য বইটির মলাটে লেখা 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ'; লেখকের নাম শ্রীস্বপনকুমার (ছবি দেখুন)। প্রথম গ্রন্থের প্রকাশকঃ দি বুক এম্পোরিয়াম লিঃ, কলকাতা-৬। ১৩৫৪ সালের মাঘ মাসে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত এর-পর আর নতুন করে বইটির কোনো সংস্করণ হয় নি।

দ্বিতীয় বইটির প্রকাশক সচদেব পুস্তকালয়, ১১৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। প্রকাশকাল কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ'-এর লেখক বইয়ের প্রথম পাতায় একটি তারকা চিহ্ন সন্নিবেশ করে জানিয়েছেন যে—ঃ গল্পে বিদেশী ছায়া আছে।

প্রেমেন্দ্রবাবুর 'ময়দানবের দ্বীপ' বাংলা বই। এতে কোনো বিদেশী ছায়া আছে কি না আমরা জানি না—জানার আগ্রহও নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুঃস্বপ্নের দ্বীপ-এর লেখক বিদেশী নয় দেশী ছায়া—একেবারে হুবহু ছায়াটি নিয়েছেন—যাকে ছায়া না বলে কায়া বললে আপত্তি থাকার কথা নয়। যেমনঃ
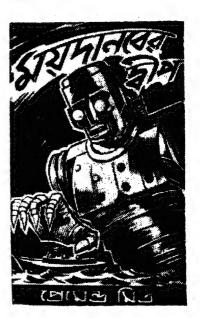
ময়দানবের দ্বীপঃ পৃষ্ঠা ১

ক. "সাইক্লোন সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে জেনেও এভাবে গোয়ার্তুমি করে বেরোনো উচিত হয়নি।"

খ. "ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির ঝাপটা ও জলের উন্মত্ত আলোড়নের শব্দের মাঝে বিজয়ের কথাগুলো ঠিক যেন আর্তনাদের মতন শোনাল।"

গ. "সত্যিই ঝড় যে এমন ভীষণভাবে দেখা দেবে তা সে বেরুবার সময় আন্দাজ করতেও পারেনি। রাজগঞ্জে তার নদীর ধারের বাগানবাড়ি থেকে সন্ধ্যায় যখন তারা মোটরবোট নিয়ে বেরিয়েছে তখনও আকাশ মেঘে ঢাকা, দমকা হাওয়ায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি নদীর ওপর পাতলা উড়ুনির মত উড়ে উড়ে যাচ্ছে। সাইক্লোন সিগন্যালের কথা জেনেও তাই সে তেমন কিছু ভয় পায়নি।"

দুঃস্বপ্নের দ্বীপঃ পৃষ্ঠা ২ ও ৩

ক. "সাইক্লোন সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় এভাবে বেরোনো আমাদের সত্যিই উচিত হয়নি।"

খ. "ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির ঝাপটা আর জলের আলোড়নের শব্দের মধ্যে রমেনের কথাটা ঠিক যেন কান্নার মত শোনাল।"

গ. "সত্যিই যে ঝড় এমন ভীষণভাবে দেখা দেবে তা তারা রায়পুরের বাগানবাড়ি থেকে বের হবার সময় কল্পনাও করেনি। অবশ্য তখনই আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি নদীর ওপর পাতলা উড়ুনীর মত উড়ছিল। সাইক্লোনের সিগন্যালকে তাই তারা ভয় খায়নি."

গোড়ায় এই। এবার শেষ দেখুন।

ময়দানবের দ্বীপঃ পৃষ্ঠা ১০৭

"রোবট'টি উচ্চৈঃস্বরে হাসছে।"
"এ আবার তা হলে কি ধরনের রোবট?
"—অত ভয় পাচ্ছ কেন ভাই, কলের মানুষ কি বন্ধু হতে পারে না?"
"—কলের মানুষ বন্ধু!"

দুঃস্বপ্নের দ্বীপঃ পৃষ্ঠা ৭৫

"যন্ত্রদানবটি হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠল।"
"এ আবার কি ধরনের রোবাট।"
"—অত ভয় পাচ্ছ কেন ভাই? কলের মানুষ কি বন্ধু হতে পারে না?"
"—কলের মানুষ বন্ধু!"

দুটি বইয়েরই গোড়ার পাতা আর শেষের পাতা থেকে মাত্র কয়েকটি মিলের উদাহরণ দেওয়া গেল। মাঝটুকু পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন।

আমরা যতদূর জানি প্রেমেন্দ্রবাবুর "ময়দানবের দ্বীপ" যথেষ্ট জনপ্রিয় গ্রন্থ। স্বপনকুমার নামক জনৈক লেখকের লেখা অথবা বইয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। কিন্তু দুঃস্বপ্নের দ্বীপ-এর চেহারা দেখে মনে হল সত্যিই দুঃস্বপ্ন দেখছি। কদর্য মলাট, বটতলারও অধম ছাপা, পাঁজির কাগজে ছাপানো—এই বই কলকাতা শহরের কোথায় যে বেচা হয় এবং কারা এর ক্রেতা আমাদের জানা নেই। সামান্য শিক্ষিত কোনো ব্যক্তিও যদি এরা ক্রেতা হতেন বহু পূর্বে স্বপনকুমারের স্বপ্ন ভঙ্গ হত।

বস্তুত দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় লেখক প্রথম লেখকের বইটি পাশে রেখে নকল করে গেছেন। এমন চুরি অভূতপূর্ব। ভাষা শব্দ বাক্যবিন্যাস যথাযথ রেখে একটি দুটি শব্দ বদলালে বা চরিত্রের নাম বদলে দিলেই কি বই নিজের হয়? কাহিনীর কথা বাদই দিলাম। সেখানে গভীর তল।

আমাদের ঠিক জানা নেই, প্রেমেন্দ্রবাবুর ছাড়া আর কোন কোন লেখকের এমন সর্বনাশ করা হয়েছে? সন্দেহ হয় তদন্ত চালালে স্বপনকুমারের লেখার ঘরে গোয়েন্দা দপ্তরের লোক বিখ্যাত ও অখ্যাত লেখকদের কিছু বই এবং কাঁচি, আঠা ও কাগজ পাবেন।

বঙ্গদেশ বলেই এমন ক্ষমাহীন ইতর কর্ম লোকচক্ষুর অগোচরে দিব্য চলে যাচ্ছে। এবং গ্রন্থের প্রকাশকরাও চোখ বন্ধ করে বসে আছেন।

স্বপনকুমারের বইয়ের প্রকাশক তাঁর গ্রন্থের পিছনে একটি মনোগ্রাম ছাপেন। সেই মনোগ্রামে লেখা 'সত্যতাই উন্নতির পথ' (ছবি দেখুন)। 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ' নিশ্চয়ই

রবীন্দ্রনাথের নাটক

রবীন্দ্র-নাট্যপ্রসঙ্গ : কাব্যনাটক। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত। স্ট্যান্ডার্ড পাব্লিশার্স। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

বাংলা নাটক-সমালোচনায় 'কাব্যনাট্য' ও 'নাট্যকাব্য' এই কথা দুটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নাট্যরস ও গীতিকাব্যরসের প্রাধান্য অনুসরণ করে শব্দ দুটি যথাযোগ্যভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু এদের ব্যবহার এখনও সেভাবে চলিত হয়নি। পারিভাষিক প্রয়োগ হিসাবে প্রচলিত না হলেও দুই শ্রেণীর নাটকের পার্থক্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই আমাদের সাহিত্যে আলোচিত হয়েছিল। 'শকুন্তলা মিরান্দা ডেসডিমোনা' প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সম্ভবত দুই জাতের নাটকের কথা উল্লেখ করেন। তখনকার দিনে পাশ্চাত্ত্য নাটক যে নূতন স্বাদ নিয়ে এসেছিল সংস্কৃত নাটকের স্বাদ তার থেকে আলাদা, একথা বুঝতে পারা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত 'নাটকাকারে কাব্যকে' নাম দিতে চান নাট্যকাব্য আর পদ্যাকারে নাটককে বলতে চান কাব্যনাটক। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রানী, 'বিসর্জন', 'মালিনী' ও 'চিত্রাঙ্গদা'—এই ছয়টি রচনাই কাব্যনাট্য অর্থাৎ এতে জীবনের ভাবরূপ অপেক্ষা বাস্তব রূপই বড়ো। বলা বাহুল্য, লেখকের আলোচনাপরিধি সুনির্দিষ্ট করার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও উল্লিখিত নাটক সবই কাব্যনাট্য কিনা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্ক হতে পারে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'চিত্রাঙ্গদা'য় কি ভাবরূপ অপেক্ষা বাস্তব-রূপই বড়ো? অনুমান করি, মূলত পদ্যাকৃতিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন; পরে আন্তরধর্ম বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে একটি সাধারণ সূত্র নির্দেশ করতে চেয়েছেন। গ্রন্থকার প্রথম অধ্যায়ে কাব্যনাট্যের লক্ষণের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বহু বিদেশী সমালোচকের মতামত উদ্ধৃত করে বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন।

পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে উপরে উল্লিখিত নাটকগুলি আলোচিত হয়েছে। লেখকের আলোচনাপ্রয়াসের বৈশিষ্ট্য তিনি নিজেই ভূমিকায় বলে দিয়েছেন, 'প্রথমে বিশ্লেষণী ও পরে সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে নাটকের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে চেষ্টা করেছি।' আলোচনার ছকটি এই—প্রথমে নাটকটির রচনাগত ইতিহাস পরে বিষয়বস্তু নির্দেশ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ভাবটি ব্যাখ্যা, তার পরে কাহিনী বর্ণনা ও শ্রেণী নির্ণয়, তারপরে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ আলোচনা সর্বশেষে রসনিষ্পত্তি। এই বিভিন্ন উপশিরোনামে তিনি প্রতিটি নাটকের আলোচনা করেছেন। এইভাবে সুবিন্যস্ত আলোচনা যে ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে তাতে সন্দেহ নেই। লেখকের নিজস্ব চিন্তাশক্তির পরিচয়ও যথেষ্টই আছে। রাজা ও রানীর কুমারসেন ইলার কাহিনী রবীন্দ্রনাথেরই সমালোচনা সত্ত্বেও লেখকের মতে প্রয়োজনীয়। লেখক দেখিয়েছেন, 'মালিনীর প্রেম সম্পর্ক রচনা করার উদ্দেশ্য—তাকে ধর্মের পরীক্ষায় দাঁড় করানো।'

লেখকের আলোচনা সুখপাঠ্য বিশ্লেষণাত্মক ও তথ্যনিষ্ঠ। ৫৭৫।৬১

গান্ধী রচনা

পল্লী পুনর্গঠন—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অনুঃ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী স্মারকনিধি, বাংলা শাখা, ৭১ সদর বাজার রোড, ব্যারাকপুর (২৪ পরগণা)। দাম তিন টাকা।

গ্রামসেবা এবং গ্রাম পুনর্গঠন সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তা ও প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এবং 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনেকদিন আগে ভারতন কুমারাপ্পা সেগুলোর একটি সংকলন বের করেন 'রি-বিল্ডিং আওয়ার ভিলেজেস' নাম দিয়ে। ইংরিজী ভাষায় লিখিত ঐ বইটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ 'পল্লী পুনর্গঠন'। বিশেষভাবে সর্বোদয় কর্মীদের কথা চিন্তা করে বইয়ের পরিশিষ্টাংশে একটি নতুন প্রবন্ধও সংযোজিত হয়েছে।

গ্রামোন্নয়নের প্রশংসনীয় এবং অতি প্রয়োজনীয় কাজে যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের কাছে আলোচ্য গ্রন্থটি অমূল্য বলে পরিগণিত হবে। উপেক্ষিত পল্লী অঞ্চলের দিকে আমাদের সংকীর্ণ শহর-কেন্দ্রিক চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী প্রায় একক চেষ্টায়। গ্রাম্যকর্মী আমাদের কাছে আজ আর অবহেলার পাত্র নন। গ্রাম-সেবার পোশাকী ভড়ং বহু পরিমাণে লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু সরকারী বেসরকারী নানা চেষ্টার ফলেও গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন এখনো সুদূর পরাহত। আশার কথা এই যে, দিগ্‌বর্তিকা হিসেবে কাজ করবার জন্য গান্ধীজীর নির্দেশ ও পরামর্শ আজো আমাদের সামনে রয়েছে। ২।৬২

প্রবন্ধ-সাহিত্য

কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা—অ রু ণ কু মা র মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। ছ' টাকা।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক আলোচনা গ্রন্থ 'কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা'য় বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও উপন্যাসের উৎস ও রূপ সম্পর্কে, তৎসহ স্বদেশের ও বিদেশের কথাসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকে প্রশ্ন ও আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সাম্প্রতিককালে ছোট গল্প বা উপন্যাসের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থটিও সেই পর্যায়ভুক্ত।

কথাসাহিত্যের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে মোট ষোলোটি আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। লেখকের বিশ্লেষণ বা বক্তব্যে তথাকথিত পাণ্ডিত্যের ছদ্মবেশ অনুপস্থিত থাকলেও ঋজু দৃষ্টিকোণ বা তথ্যের অসদ্ভাবে গ্রন্থের কয়েকটি প্রস্তাব অত্যন্ত সাধারণ, কেবলমাত্র ছাত্রপাঠকের উদ্দেশ্যেই লেখা বলে মনে হতে পারে। এসব রচনার মধ্যে তত্ত্ব বা তথ্য অবশ্যই আছে কিন্তু অতি দ্রুতভাবে সব একত্র করতে যাওয়ায় প্রবন্ধের বক্তব্য কম-বেশী শিথিল বা আড়ষ্ট বলে মনে হতে পারে। তবু এরই মধ্যে উপন্যাসের রূপ-সন্ধান, ছোট গল্পের উৎস ও রূপসন্ধান ও রূপ বৈচিত্র্য, সাম্প্রতিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস প্রভৃতি উপযুক্ত তথ্য এবং মনোরম বিশ্লেষণী পদ্ধতির জন্য উৎসাহী পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। 'পাঁচ বছরের বাংলা উপন্যাস' পর্যায়ে আলোচনায় সাম্প্রতিক উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি, শিল্প-[illegible]

আলোচনার সুযোগ ছিল কিন্তু প্রবন্ধকার সে পথ পরিহার করে কেন সাধারণ আলোচনায় প্রবেশ করলেন তা উৎসাহী পাঠকের জিজ্ঞাস্য হয়ে থাকবে। ৪৭৮।৬১

কিশোর সাহিত্য

বালক রবীন্দ্রনাথ—শ্যামল দাশগুপ্ত। মাতৃ প্রকাশনী, ৫৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম ঃ ১·৫০ টাকা।

আলোচ্য নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনকে তিনটি অংকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। অবশ্য 'জীবনস্মৃতি'তে এসব ঘটনা ও প্রসঙ্গ আশ্চর্যভাবে কবি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান নাট্যকারের কৃতিত্ব এই যে, তিনি বিভিন্ন ঘটনাকে স্থান-কাল-পাত্রযোগে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যা-সঙ্গীতের সেই কিশোর কবিকে নিজের যে মালা অর্পণ করেছিলেন, সেই স্বীকৃত ঘটনার আনন্দের মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হয়েছে। তৎকালীন ঠাকুরপরিবারের পরিবেশ সহ সমস্ত চরিত্রাংকণে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৫১৫।৬১

মিলক গ্রহে মানুষ—অদ্রীশ বর্ধন। আল্‌ফা বিটা পাবলিকেশন্‌স। পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা-১। দাম—৩,।

পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে ছায়াপথের নতুন এক গ্রহ "মিলক"—রহস্যময়, রোমাঞ্চকর। উল্কাবেগী মহাকাশ-যান নিয়ে বাঙালী তরুণ ধীমান ব্যানার্জি, আমেরিকান মহিলা লাইলা আর রাশিয়ান যুবক পানাকিন পৌঁছেছে তার বুকে। সে দেশের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরিয়ে আগুন নেবায়, সে গ্রহে রাস্তার তলা থেকে রাত্রে অদ্ভুত আলো জ্বলে, সেখানে বয়স্ক লোকদের শেষ আশ্রয় ভয়াবহ মিগল ভবন। সেখানকার অধিপতি হলেন যান্ত্রিক "মগজ"।

লেখকের কুশলতার ছাপ উপন্যাসটিতে বর্তমান। তথাপি লেখকের কাছে একটি নিবেদন যে, তাঁর এই কল্পকাহিনী অধিক পরিমাণে কষ্টকল্পিত, এতটা না হলেই বুঝি উপন্যাসটির রস জমত। ৬৬০।৬১

প্রাপ্তি-স্বীকার

জজলা—আম্নাভার্ড সাটে অনুবাদক বোম্মানা বিশ্বনাথম্‌।

ভিজিরিয়াম—বীরেন চট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা—অনুবাদক শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ।

মাটি ও পৃথিবী—সুখেন্দু সরকার।

ছোট্ট শরৎ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

কবি দাদুর গল্প—যামিনীকান্ত সোম।

অঞ্জলি—অনিল চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীনেহরু নাকি তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—'যে মানুষের আহার জোটে না তাহার কোন স্বাধীনতা নাই।' বিশু খুড়ো বলিলেন—"আশা করি তাঁর ভাষণের কোন টেপ্-রেকর্ডিং করা হয়নি।"

এক সংবাদে শুনিলাম দণ্ডকারণ্যে বসতি স্থাপন বৃদ্ধি পাইতেছে। —"গদিচ্যুতদের মধ্যে দণ্ডকারণ্যে বসবাসের হিড়িক পড়েছে কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পুরুষের সঙ্গে তুলনায় জয়ের আনুপাতিক হার মহিলাদের বেশি বলিয়া একটি নির্বাচনী সংবাদ শুনিলাম। চোখ বুজিয়া আমাদের জনৈক সহযাত্রী গান ধরিলেন—"তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো মোর জয়॥"

শ্রীমতী কেনেডী তাঁর ভারত ভ্রমণকালে শিশুদের একটি ভ্রাম্যমাণ অভিনয় মঞ্চ ভারতকে উপহার দিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম! —"বয়স্কদের একটি অনুরূপ অভিনয় মঞ্চ উপহার দিলে অন্তত পাঁচ বৎসর পরে কাজে লাগত"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

লাল চীনের বিশাল এলাকার কোন এক স্থলে এক বিরাট বিতর্কের ঝড় বহিতেছে। সোভিয়েট আদর্শগত বিরোধই এই বিতর্কের ঝড়ের কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। —"অসম্ভব হয়ত নয়। চীন সাগরের প্রচণ্ড ঝটিকাকেই তো শুনেছি টাইফুন বলে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের আশ্বাস সত্ত্বেও চাউলের দর ঊর্ধ্বগামী হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। —"মহাকাশ
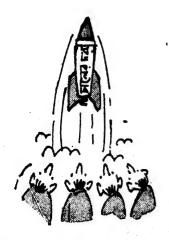
বিচরণের যুগে চাউলের দরই বা মাটিতে পড়ে থাকবে কেন"—বলেন অন্য এক

দীঘার সমুদ্র সৈকতে মন্ত্রিসভার কাঠামো রচনা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম। —"মুখ্যমন্ত্রী—আয় তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে—কথাটা অন্তত মনে মনে বলেছেন কিনা তা বলা শক্ত"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

এক সংবাদে শুনিলাম নানা রাজ্যে নাকি বিনা দ্বন্দ্বে নেতা নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। —"সাম্প্রতিক নির্বাচনী কলকোলাহলের পরে চেঁচামেচি করার গলা আর নেই বলেই হয়ত নেতা নির্বাচনে দ্বন্দ্ব হয়নি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতায় সম্প্রতি অগ্নি নির্বাপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। —"প্রকাশ থাকে, জঠরাগ্নি নির্বাপণের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই"—বলেন বিশু খুড়ো।

টোকিও অর্থনৈতিক কমিশনের বার্ষিক সমীক্ষায় বলা হইয়াছে যে, গত দুই বৎসরে যে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্বের সমস্ত অনুমান ছাড়াইয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কে নাকি কবে, কোথায় এক পাগলকে বলেছিল,—'পাগলা নৌকো ডোবাস নি যেন। পাগল বলে উঠল—'ভালো কথা মনে করিয়েছিস' এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ডুবিয়ে দিল। পরিবার পরিকল্পনার ঢক্কা নিনাদের পর লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে ঐ পাগলের কথাটাই মনে পড়ে গেল।"

রাশিয়ার ভূগর্ভে একটি গভীর সাগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'তাস' বলিতেছেন—এই সমুদ্র সেচা নাকি সম্ভব। —"কিন্তু তার কী প্রয়োজন, সাগর মেলার একটা ব্যবস্থা করে দিলে দেশবিদেশের অনেক পুণ্যার্থীরাই রাশিয়ায় সাগরস্নান করে পূতপবিত্র হবেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

কলিকাতায় অধিক জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য পাইপ বেশি করিয়া বসাইবার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কিন্তু পাইপ এখনও বসান হয় নাই এবং কবে হইবে তা নাকি (সংবাদপত্র বলিতেছেন) দেবাঃ ন জানন্তি। —"কিন্তু এই বায়বহুল কাজে হাত না দিয়ে ম্যানহোলের মুখ বন্ধ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। বর্ষা আসছে, বিনা খরচে কলকাতা জলে জলাকার হয়ে যাবে"—জলকে জল বুঝাইয়া দিলেন খুড়ো।

কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ পথ নির্মাণের পরিকল্পনা চলিতেছে। দুইজন ফরাসী বিশেষজ্ঞ নাকি সরেজমীনে পর্য-

বেক্ষণ চালাইবার জন্য ইতিমধ্যেই কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"এতে হয়ত অনেকের পক্ষে আন্ডারগ্রাউণ্ডের পথে 'ফ্রেঞ্চ লীভ' নিতে সুবিধে হবে!!"

জাপানী ছাত্রবৃন্দ রচিত ও প্রযোজিত নাটক "দি টাইগার" সম্প্রতি কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছে এবং দর্শকদের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কলকাতাটা রয়েল বেঙ্গলের দেশে অবস্থিত হলেও হালে এখানে ফেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোন কৃতী ছাত্রনাট্যকার "দি ফেউ" নাটক লিখে জাপানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলে বক্স অফিস হিট হবে বলেই তো মনে হয়॥"

কমিউনিস্ট নেতা ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের সভায় শ্রীক্রুশ্চফ নাকি মাংসের অভাবের উপর জোর দেন। তিনি বলেন—কে পরিকল্পনা পূর্ণ করিয়াছেন বা বণ্টনে

কাহার ত্রুটি তাহা বিচার্য নয়, মোদ্দা কথা হইল যথেষ্ট পরিমাণে মাংস আমাদের জোটে না। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী ছড়া কাটিলেন—"সিংহমশাই, সিংহ মশাই, মাংস চাও, রাজহংসে খেতে দেব হিংসা ভুলে যাও।"

চন্দ্রশেখর

রঙমহলে "আদর্শ হিন্দু হোটেল"

রঙমহল-এর পাদপ্রদীপ হয়ত আর জ্বলত না। আজও যে তা অনির্বাণ আছে সে শুধু এই নাট্যশালার শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংসাহস ও আত্মবিশ্বাসের জোরে। রঙমহল-এর রুদ্ধদ্বার তাঁদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার আঘাতে খুলে গিয়েছিল। নাট্যামোদীরা তাঁদের সংপ্রয়াসে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, তাঁদের সাফল্যে আনন্দিত হয়েছিলেন।

বাংলার নাট্যামোদীরা আজ আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন এই ভেবে যে, তাঁদের শুভেচ্ছা আজ সার্থক হয়েছে। রঙমহল-এর শিল্পী ও সকল কর্মী আজ প্রমাণ করলেন, তাঁদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অপার নিষ্ঠা, স্বপ্নের সঙ্গে সাধনা। রঙমহল-এর মঞ্চে শিল্পী-কলাকুশলী-গোষ্ঠীর বর্তমান নিবেদন "আদর্শ হিন্দু হোটেল" তাঁদের নিষ্ঠা ও সাধনার একটি সুন্দর, সার্থক ফলশ্রুতি।

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুপঠিত কাহিনী "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর নাট্যরূপ দিয়ে গোপাল চট্টোপাধ্যায় একদা নাট্যরসিকদের অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেছিলেন এবং লোকান্তরিত শিল্পী ধীরাজ ভট্টাচার্যের অধিনায়কত্বে এই নাটকের অভিনয় কয়েক বছর আগে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এই রঙমহল মঞ্চেই। বলতে দ্বিধা নেই, এমন সুগ্রথিত ও আবেগমণ্ডিত নাট্যরূপ উপভোগ করার সুযোগ সচরাচর মেলে না। রঙমহলের বর্তমান শিল্পী-কলাকুশলী-গোষ্ঠী এই নাটকটির পুনরভিনয় আয়োজন করে নাট্যামোদী সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। নাটকে হাসি ও অশ্রুর উপকরণ থরে থরে সাজিয়েছেন নাট্যকার। দর্শকের মন এই উপকরণরাজিতে কখনও পুলকিত, কখনও আবেগ আপ্লুত হয়ে ওঠে।

৺বিভূতিভূষণের কাহিনীর মূল রস ও আবেদন অব্যাহত ও অবিকৃত রেখে নাটকে একাধিক আবেগধর্মী ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। নাটকের প্রধান চরিত্রদের—বিশেষ করে হাজারি ঠাকুরের—স্বরূপ ও স্বভাব অপরিবর্তিত রেখে নাটকীয় রস সঞ্চারে সত্যিকার মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তিনি। নাটকের পরিণতি-দৃশ্যটিকে মরমী ও মধুর করে তুলেছেন।

অতি সুচারুভাবে নাটকটি পরিচালিত। নাটকের গতি স্বচ্ছন্দ, প্রতি নাট্যমুহূর্ত প্রয়োগসিদ্ধ, আবেগের বিন্যাস পরিমিত। এক কথায়, সর্বাংশে উপভোগ্য এই নাটক—যা দর্শকদের বিরল রসাস্বাদনের সুযোগ দেয়।

তিনজন শিল্পীর অতুলনীয় অভিনয় নাটকটিকে অসাধারণ মর্যাদা দান করেছে। এঁরা হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়।

পদ্ম ঝি'র চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় যে অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতিশয়োক্তিকেও বুঝি হার মানায়। মঞ্চাভিনয়ে পদ্ম-ঝি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের একটি স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি।

হাজারি ঠাকুরের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয়-কুশলতায় দর্শকদের মুগ্ধ, চমৎকৃত করেন। চরিত্রটিকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়।

হোটেল-ভৃত্য মতির চরিত্রে জহর রায় দর্শকদের কখনও হাসান, কখনও স্তব্ধ করে রাখেন। রঙ্গ-পরিবেশনেই হোক, আর আবেগ-সৃষ্টিতেই হোক, উভয়-মুহূর্তেই তাঁর অভিনয়ের আবেদন দুর্বার।

হাজারি ঠাকুরের স্ত্রীর রূপসজ্জায় সরযূবালা সলজ্জ পল্লীবধূর চরিত্রটিকে স্বাভাবিকতা ও সরলতায় অপূর্ব করে তুলেছেন। নাটকের অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অল্প অবকাশে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার মত অভিনয় করেছেন হরিধন মুখোপাধ্যায়, সমর চট্টোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, ঠাকুরদাস মিত্র, মিণ্টু চক্রবর্তী ও অজিত চট্টোপাধ্যায়।

কুসুম, অতসী ও টেঁপি (হাজারি ঠাকুরের কন্যা)—এই তিনটি স্ত্রী-চরিত্রে যথাক্রমে শিপ্রা মিত্র, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় ও দীপিকা দাস তাঁদের সংবেদনশীল অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্র তিনটিই তাঁদের অভিনয়ে মনোময়।

কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মীজনার্দন, অনাদি দাস, সন্তোষ ঘোষাল, সত্য দে, প্রিয়রঞ্জন, অজয়, কেষ্ট, নিখিল ও মানিক।

নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের আবহ-সংগীত ভাবোদ্দীপক। কলাকৌশলের কাজে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্রভাত

চিত্রশোভনার প্রথম নিবেদন 'শান্তি'-র নায়িকা চরিত্রে সন্ধ্যা র

হাজরা (শব্দ-প্রক্ষেপণ) ও অনিল সাহা (আলোকসম্পাত)।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচার

বি-এফ-জে-এ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ এসোসিয়েশন) গত সপ্তাহে ১৯৬১ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম ঘোষণা করেছেন। নির্বাচন সম্পাদিত হয়েছে সংস্থার সভ্যদের ভোটে (ব্যালট প্রথায়)।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের মতে বছরের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি **তিন কন্যা।** এই ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায় বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক (বাংলা ছবির ক্ষেত্রে)। হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে নির্বাচিত হয়েছেন নীতীন বসু ("গঙ্গা যমুনা")। বিদেশী চিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন উইলিয়াম ওয়াইলার ("বেন-হার")।

বছরের দশটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্ররূপে অভিহিত হয়েছে (গুণানুক্রমে) : "তিন কন্যা", "গঙ্গা-যমুনা", "পুনশ্চ", "মধ্য রাতের তারা", "সপ্তপদী", "কানুন", "চার দিওয়ারী" "উসনে কহা থা", "জিস দেশ মে গঙ্গা বৈহতী হৈ" ও "স্বয়ম্বরা"।

দশটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্রের (কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত) স্থান অধিকার করেছে : "বেন-হার", "দি এপার্টমেণ্ট", "কানাল", "গার্ল সীকস্ ফাদার", "দি মিলিয়নেয়ারেস", "অন দি বীচ", "সাউথ প্যাসিফিক" "পেপে", "দি সিঙার নট দি সঙ" এবং "এলমার গ্যাণ্ট্রি"।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন : (**বাংলা**) উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন ("সপ্তপদী"-তে অভিনয়ের জন্য); (**হিন্দী**) দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা ("গঙ্গা-যমুনা"-য় অভিনয়ের জন্য); (**বিদেশী**) চার্লটন হেস্টন ("বেন-হার") ও শার্লে ম্যাকলেন ("দি এপার্টমেণ্ট")।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ও সহ-অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন : (**বাংলা**) অনিল চট্টোপাধ্যায় ("অগ্নি সংস্কার") এবং মঞ্জু দে ("কেরী সাহেবের মুন্সী") ও দীপ্তি রায় ("মা"); (**হিন্দী**) প্রাণ (জিস দেশ মে গঙ্গা বেহতী হৈ) ও অশোককুমার (কানুন) এবং নিরুপা রায় (ছায়া) ও ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় (উসনে কহা থা); (**বিদেশী**) চার্লস লটন (আণ্ডার টেন ফ্ল্যাগস) ও শার্লে জোনস (এলমার গ্যাণ্ট্রি)।

বছরের শ্রেষ্ঠ **সংগীত-পরিচালক**-রূপে নির্বাচিত হয়েছেন : (**বাংলা**) রবিশঙ্কর ("সন্ধ্যারাগ") ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ("স্বরলিপি"); (**হিন্দী**) নৌশাদ (গঙ্গা-যমুনা)। **গীতিরচনায়** শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছেন (**বাংলা**) গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ("স্বরলিপি") ও (**হিন্দী**) শাকীল বাদায়ুনি ("গঙ্গা-যমুনা")। **সংলাপে** শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন (**বাংলা**) সন্তোষকুমার ঘোষ ("স্বয়ংবরা") এবং (**হিন্দী**) বাজাহত মির্জা, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ও এস খলিল ("গঙ্গা-যমুনা", "ছায়া" ও "উসনে কহা থা")। **আলোকচিত্রগ্রহণে** (**বাংলা**) অজয় কর ("সপ্তপদী") ও দীনেন গুপ্ত ("সন্ধ্যা-রাগ") এবং (**হিন্দী**) বাবা সাহেব ("গঙ্গা-যমুনা")। **শব্দগ্রহণে** (**বাংলা**) বাণী দত্ত ("স্বরলিপি") ও (**হিন্দী**) ধরমসে ("গঙ্গা-যমুনা")।

আঞ্চলিক এওয়ার্ড কমিটির মতে : চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য বছরের সেরা ছবি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এখনকার (পূর্বাঞ্চল) আঞ্চলিক এওয়ার্ড কমিটি প্রতিযোগিতার জন্য তালিকাভুক্ত মোট তেরটি ছবি (বাংলা, অসমিয়া ও ওড়িয়া) দেখেছেন। ছবি দেখার পর কমিটি বিভিন্ন ছবির গুণাগুণ বিচার করে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য পাঁচটি ছবি এই অঞ্চল থেকে অনুমোদন করেছেন। দিল্লিতে সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতায় এই পাঁচটি ছবি অংশ গ্রহণ করবে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, ছবি পাঁচটি হল (গুণানুক্রমে) "সমাপ্তি" ("তিন কন্যা"-র অন্তর্গত) "সপ্তপদী", "ভগিনী নিবেদিতা", "মেঘ" ও "পুনশ্চ"।

আন্তর্জাতিক বিনিময় কেন্দ্র

মিলানের (ইটালি) আন্তর্জাতিক
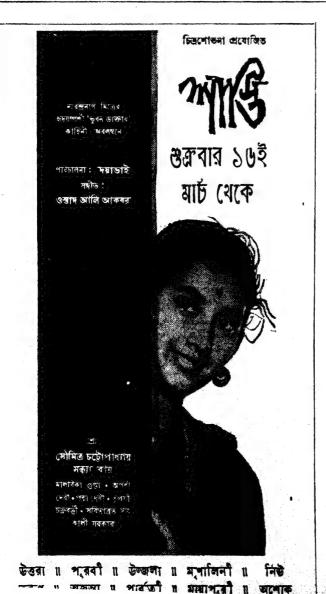
বি বি সি'র বিচিত্রা শাখার উদ্যোগে বৃটিশ বেতারে আবার বাংলা নাটকের অভিনয় প্রবর্তিত হয়েছে। এখানে 'ইনস্পিরেশন' নামক একটি নাটিকার পাত্রপাত্রীদের দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিক থেকে—বিচিত্রার প্রযোজক ও 'ইনস্পিরেশন'-এর নাট্যকার বিনয় রায়, শ্যামল লোধ, মঞ্জুলা ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, পুষ্পিতা চৌধুরী ও নির্মলকুমার ঘোষ

আকর্ষণ করেছে। সেখানে বছরে দুবার এই মেলার আয়োজন করা হয়। এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে।

মিলানের প্রথম আন্তর্জাতিক মেলায় ভারতবর্ষ থেকে চারটি ছবি যোগদান করেছিল। এগুলি চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার ছবি। ভারতের সাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা এই মেলা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না বলেই হয়ত কোন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ছবি এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

সুসংবাদ এই, গত অক্টোবর মাসে মিলান-মেলায় ভারতবর্ষ থেকে চারটি শিশুচিত্র, চারটি প্রামাণিক চিত্র ও তিনটি কাহিনীচিত্র পাঠান হয়। জানা গেছে, মেলায় প্রদর্শিত সব কয়টি ভারতীয় তথ্য-চিত্র জার্মানী ও ইটালীর টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান ক্রয় করবেন। বাংলাদেশের একটি কাহিনীচিত্র গ্রীসে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে বসে কথাবার্তা চলছে। ব্রেজিলে একটি দক্ষিণ ভারতীয় কাহিনী-চিত্রও পরিবেশিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

মিলান-মেলার মাধ্যমে ভারতীয় ছবির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথটি যে প্রশস্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। মিলানের আগামী মেলাটি বসবে ১২ই এপ্রিল থেকে নয়দিন। নামমাত্র প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে পৃথিবীর যে-কোন দেশের ছবি এই মেলায় প্রদর্শিত হতে পারে। এবং ছবির গুণ থাকলে প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশে তার পরিবেশন স্বত্ব কেনবার ক্রেতার অভাব হয় না। গত দু' বছরের অধিবেশনে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মিলান শহরের যে বিরাট অট্টালিকায় সুবিখ্যাত মিলান শিল্পমেলা বসে, চলচ্চিত্র মেলাটির অধিবেশনও সেইখানে হয়। বহু প্রেক্ষাগার সমন্বিত এই অট্টালিকায় ছবি দেখবার সবরকম সুব্যবস্থা আছে, এমন কি স্বল্প খরচে দোভাষীও পাওয়া যায়। ফলে এক দেশের ছবি অন্য দেশের ক্রেতাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

যাঁরা বিদেশে নিজেদের ছবির প্রচার চান, তাঁরা মিলান চলচ্চিত্র মেলায় যোগ দিলে অবশ্যই সুফল পাবেন।

চিত্রালোচনা

বর্তমান সপ্তাহে একটি বাংলা ও একটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবিটি হল : চিত্রশোভনার **শান্তি**; হিন্দীটি হল সেকার্টস-এর (মাদ্রাজ) **মেরা সুহাগ**।

শান্তি ছবিটির আখ্যানবস্তু প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র "ভুবন ডাক্তার" গল্প থেকে আহরিত। আদর্শের পথে চলতে গিয়ে এক তরুণ চিকিৎসকের কী-করে পদস্খলন ঘটে এবং পুনরায় অকম্পিত পদক্ষেপে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগোতে গিয়ে কেমন ভাবে সে দয়াহীন পৃথিবীর কাছ থেকে শুধু লাঞ্ছনাই বরণ করে নেয় ও তার নিঃসঙ্গ জীবন দুই নারীহৃদয়ের স্নেহ-স্পর্শে আনন্দময় হয়ে ওঠে, তা-নিয়েই ছবির আবেগধর্মী কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দয়াভাই। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র দয়াভাই সত্যজিৎ রায়ের সংস্পর্শে এসে চিত্র পরিচালনার কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তরুণ পরি-চালকের এই প্রথম ছবির নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রণয়োপাখ্যানের নায়িকা সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন তুলসী চক্রবর্তী, সবিতাব্রত দত্ত, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, মণি শ্রীমানী, কালী সরকার, পদ্মা দেবী, অর্পণা দেবী, মালবিকা গুপ্ত

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে নৃত্য সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'স্বদেশ' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে সঙ্ঘের ছাত্রীবৃন্দ

ও বুবলা। আলী আকবর খাঁ ছবির সুরকার।

দক্ষিণ ভারতের হিন্দী চিত্রোপহার **মেরা সুহাগ-এর** মূল উপজীব্য প্রণয়, রোমাঞ্চ ও নৃত্য-গীত। এচ কৃষ্ণমূর্তি ছবিটির পরিচালক। সংগীত পরিচালনা করেছেন অরুণ রাঘবন।

* * *

জালান প্রোডাকশনস-এর দ্বিতীয় চিত্র-প্রয়াস **দাদা ঠাকুর**-এর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি ছবির অন্তর্দৃশ্যের কার্যসূচী সমাপ্ত করে পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় ছবির শিল্পিগোষ্ঠী ও কলাকুশলীদের নিয়ে ভাগলপুরে গেছেন। ভাগলপুর অঞ্চলে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। সুরসিক ও বিগত দিনের স্বদেশসেবী সাংবাদিক শরৎ পণ্ডিতের (আজও যিনি জীবিত) ঘটনাবহুল জীবনকাহিনীর ভিত্তিতে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে আছেন বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, তরুণকুমার প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

* * *

প্রযোজক অনন্ত সিংয়ের আগামী ছবি **ধূপছায়া** চিত্ত বসুর পরিচালনাধীনে নির্মীয়মান। পরিচালক শ্রী বসু সম্প্রতি ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য শিল্পিদল সহ শিমুলতলায় গিয়েছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রদীপ দাসগুপ্ত। বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, দীপ্তি রায়, ছবি বিশ্বাস, বিশ্বনাথন, তরুণকুমার ও অমর মল্লিক ছবির শিল্পিগোষ্ঠীর পুরোভাগে রয়েছেন।

* * *

পরিচালক কমল মজুমদার বর্তমানে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে **অভিসারিকা** ছবিটির চিত্রগ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি ভিন্নধর্মী কাহিনীর ভিত্তিতে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। সুপ্রিয়া চৌধুরী, নির্মলকুমার, সমর চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিণ্টু দাসগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

* * *

গ্রাম্য সমাজের কুসংস্কার ও তার প্রতিকারের ওপর আলোকসম্পাতে "প্রি-না-দ" রচিত **মেঘলা আকাশ**-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন তরুণ পরিচালক অমল দত্ত। সম্প্রতি কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও সোমা সরকার ছবির মুখ্য চরিত্রের শিল্পী। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন যথাক্রমে শম্পা ও নবাগত অশোক চক্রবর্তী। ননী মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

* * *

শিশির মল্লিক দীর্ঘকাল পরে আবার চিত্র প্রযোজকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। শিশির মল্লিক প্রোডাকশনস-এর প্রথম উপহার রূপে তিনি বিশ্বনাথ রায়ের **নতুন দিনের আলো** কাহিনীটির চিত্ররূপ প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন। গত ৮ই মার্চ রাধা ফিল্ম স্টুডিও-তে অনাড়ম্বরভাবে ছবিটির শুভারম্ভ অনুষ্ঠান পালিত হয়। ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় ছবির প্রধান শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

মনে রাখবার মত ছবি

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি গত ৪ঠা মার্চ একাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে চ্যাপলিনের প্রথম জীবনের কয়েকটি অল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র এবং নির্বাচিত কিছু চিত্রাংশের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। "দি ব্যাংক" ও "দি ট্র্যাম্প" নামে চ্যাপলিনের দুটি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শিত হয়। আগামী ১৮ই মার্চ সোসায়েটির উদ্যোগে আর্ন সুকসডর্ফের "দি ফ্লুট অ্যান্ড দি অ্যারো" প্রদর্শিত হবে।

কলিকাতাস্থ জাপানী দূতাবাসের উদ্যোগে গত রবিবার (১১ই মার্চ) সকালে রক্সি প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব-বন্দিত জাপানী চিত্র "হ্যাপিনেস অব আস এলোন" এবং তথ্যচিত্র "নিকো" প্রদর্শিত হয়।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা গত ২রা ও ৮ই মার্চ লোটাস চিত্রগৃহে "চেক চলচ্চিত্র আসরের" ব্যবস্থা করেছিলেন। আসরে "উলফ ট্রাপ" (জিরি ওয়েস পরিচালিত), এবং "ইট ওয়াজ নট ওয়েডিং ইয়েট" প্রদর্শিত হয়। সংস্থা শীঘ্রই "আউট অব

রিচ অব ডেভিল" এবং "এগেনস্ট অল" ছবি দুটির প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন।

নাট্যাভিনয়

সাজঘর-এর সভারা গত ১৪ই মার্চ রঙমহলে সলিল সেন রচিত "কিংবদন্তী" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

গত ১১ই মার্চ নিউ এম্পায়ারে বঙ্গীয় নাট্য সংসদ সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী রচিত "জনক" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সৌমেন নন্দী, মিনতি গুপ্ত, শিপ্রা নিয়োগী, অজিৎ কুণ্ডু, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, চিনু গোস্বামী, প্রদীপ গুপ্ত ও অম্বুজাক্ষ সেন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। আগামী সপ্তাহে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

"দি বোহেমিয়ানস" সংস্থা গত ৯ই মার্চ মহারাষ্ট্র নিবাস হলে রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" ও চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় রচিত "সীমান্ত" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। "শেষরক্ষা"র পরিচালক ও সংগীত পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে ললিত মুখোপাধ্যায় ও কানাই মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় "সীমান্ত" পরিচালনা করেন।

গত ৮ই মার্চ মহাজাতি সদনে অন্তঃ-অফিস নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে "অলকনন্দা" গোষ্ঠী "বসন্ত-উৎসব" নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেন। নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (অমল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "দ্বান্দ্বিক"), লাভলক অ্যাণ্ড লুইস রিক্রিয়েশন ক্লাব (শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত "বিদিশা") ও টিটাগড় পেপার মিলস রিক্রিয়েশন ক্লাব (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "একটা নাটক লিখেছি")।

গত ৩রা মার্চ অভ্যুদয় নাট্য সমিতি (গলফারবাড়ি, ধানবাদ) তাঁদের চারদিন-ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত "কাঞ্চনরঙ্গ" (অভ্যুদয় অভিনীত), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "আগন্তুক" (রূপায়ন অভিনীত), মহেন্দ্র গুপ্তের "কংকাবতীর ঘাট" (এলিট কালচার অ্যাসোসিয়েশন অভিনীত) এবং ভানু চট্টোপাধ্যায়ের "আজকাল" (বার্নস ক্লাব অভিনীত) মঞ্চস্থ হয়।

গত ৫ই মার্চ মহাজাতি সদনে রূপক-এর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের "বসন্ত" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। সংগীত ও নৃত্যপরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে হরেন চৌধুরী ও রঞ্জিত রায়।

আর্টস থিয়েটার ক্লাবের সভারা গত ৬ই মার্চ থিয়েটার সেন্টার হলে শিবেশ মুখোপাধ্যায়ের "পুনরাবর্তন" মঞ্চস্থ করেন।

সি-এস-ও অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব (ইস্টার্ন রেলওয়ে) সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গত ২রা মার্চ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বন্ধু" মঞ্চস্থ করেন।

শিক্ষার্থী নাট্যসংস্থার শিল্পীরা অনিলবরণ দত্ত রচিত হাসির নাটক "একি হলো" গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা মঞ্চে মীনা

চিত্রম আশা নিবেদিত 'মেঘলা আকাশ'-এর নায়িকা শম্পা

বসুর পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের (পণ্ডিচেরী) শ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী নিউ এম্পায়ারে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি ও শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগারের যুগ্ম উদ্যোগে "ভাবীকালে" ও "মানদণ্ড" নামে দুটি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। "ভাবীকালে" শ্রীমা-রচিত একটি ফরাসী নাটকের অনুবাদ। "মানদণ্ড" গলসওয়ার্দির "জাস্টিস" অবলম্বনে সতোন অধিকারী কর্তৃক রচিত। সম্মিলিত অভিনয়-সম্পর্কে ও সুষ্ঠু প্রয়োগ-কৌশলের গুণে নাটক দুটি বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নাটক দুটির প্রধান চরিত্রগুলিতে সু-অভিনয় করেন অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল সরকার, বারীন রায়, শান্তা চট্টোপাধ্যায়, সতোন অধিকারী ও রানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগীত অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ভি বালসারা নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" কবিতাটির সাংগীতিক রূপায়ন জনসাধারণ ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। সুরকার ভি বালসারা তাঁর পরবর্তী প্রয়াসরূপে "রামায়ণ"-এর সংগীত রূপায়নের কাজে ব্রতী হয়েছেন। জনসাধারণের অনুরোধে সুরকার অনতি-বিলম্বেই "দেবতার গ্রাস" ও তাঁর একক পিয়ানো সংগীত পুনরায় পরিবেশন করবেন।

নৃত্য সংঘের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে সংস্থার সভ্যরা গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে একটি মনোজ্ঞ সংগীত-নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট শিল্পিদের মধ্যে ছিলেন ভীমসেন যোশী, সুনন্দা পট্টনায়ক, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তালাত মাহমুদ, নির্মল চৌধুরী, শ্যামল মিত্র ও বিমলভূষণ। অনাদিপ্রসাদ পরিচালিত নৃত্যনাট্য "ওমর খৈয়াম" ও বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত "স্বদেশ" নৃত্যনাট্য সম্মেলনে মঞ্চস্থ হয়।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগর বাণী-পীঠে (বেলেঘাটা) 'দরবারী'র সারারাত্রি-ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কানাই মুখোপাধ্যায়ের তবলা লহরা দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। মায়া দাস, শিবশংকর মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শক্তি বসু কণ্ঠ-সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন। অন্যান্য

সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আগত জর্জিয়ান নাচের দলের একটি নৃত্য দৃশ্য

শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন রাজীবলোচন দে, রাজা রায়, মালগু সেন (কথক) বিনয় লাহা, জয়কুমারী, পণ্ডিত রামগোপাল, সুনির্মল গুপ্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও শিশির চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি রবীন্দ্র স্মরণীতে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর ৪২তম বার্ষিক সম্মেলনে 'সংগীত সম্মিলনী'র সভাবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানের সমন্বয়ে 'স্বাদেশিকতায় রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। ধীরেন বসুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সুনীল রায়, আরতি দাস, প্রভাতভূষণ ও সুমিত্রা সেন একক সংগীতে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ দেন।

রবীন্দ্র সংগীত রত্ন

বিদেশেও আজ রবীন্দ্র সংগীত বিশেষ-ভাবে সমাদৃত। লং-প্লেয়িং রেকর্ডের সহায়তায় রবীন্দ্র সংগীতের জনপ্রিয়তা অনেকটা বেড়েছে। লং-প্লেয়িং রেকর্ডে ইতিপূর্বে গীতিনাট্য "শ্যামা" ও "কালমৃগয়া" জনসম্বর্ধনা লাভ করে। সম্প্রতি কবি-কণ্ঠে গান ও আবৃত্তির একটি লং-প্লেয়িং রেকর্ড (দি ভয়েস অব টেগোর) দেশে-বিদেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

লং-প্লেয়িং রেকর্ডের তালিকায় এবার যুক্ত হল আরেকটি সম্পদ—"রবীন্দ্র-সংগীত রত্ন" ("জেমস ফ্রম টেগোর")। রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান এই রেকর্ডে বিধৃত। গানগুলি গেয়েছেন কণিকা

জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে", "বারতা পেয়েছি মনে মনে", "বাজে করুণ সুরে", "ও আমার মন", "ও যে মানে না মানা", ও "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়"।

অপর শিল্পীর কণ্ঠে রয়েছে : "কেন চোখের জলে", "মন মোর মেঘের সঙ্গী", "আমি জ্বালবো না মোর বাতায়নে", "মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে", "আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও" ও "তুই ফেলে এসেছিস কারে"।

নাট্য-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী থিয়েটার সেণ্টার প্রবর্তিত নাট্য-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় কোর্সের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উপাধি-পত্র প্রদান করা হয়। এই বিদ্যালয়ে নাট্য-শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক, যথা—গ্রীক, লাতিন ও ইংরেজী নাটক, বাংলা ও সংস্কৃত নাটক, অভিনয়, প্রযোজনা, আলোকসম্পাত, মঞ্চ-সজ্জা, রূপসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ডাঃ অশ্রুতোষ ভট্টাচার্য, প্রবোধ ঘোষ, অশোক সেন, ডাঃ অজিত ঘোষ, তরুণ রায়, তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী ও গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

নাট্য-বিদ্যালয়ের স মা ব র্ত ন-উ ৎ স বে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়। ডাঃ রায় তাঁর ভাষণে বলেন, নির্ধারিত পাঠ্যতালিকা, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং নিয়মাধীন শিক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা থিয়েটার সেণ্টারের কর্তৃপক্ষ যেভাবে এই বিদ্যালয়ে নাট্যশাস্ত্র অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছেন, তা দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

বিবিধ সংবাদ

গত রবিবার (১১ই মার্চ) প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অয়স্কান্ত বক্সী হৃদ্‌রোগের আকস্মিক আক্রমণে তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬২ বৎসর বয়স হয়েছিল।

নাট্যশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রথমে তাঁকে অভিনেতা ও পরে নাট্যকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তিনি কিছুদিন শিশির-কুমার ভাদুড়ীর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত "ভোলা মাস্টার" নাটক একদা নাট্যমঞ্চে জনপ্রিয়তার নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। "চণ্ডীদাস", "সীতা", "খনা" প্রভৃতি সবাক-

"উল্টোরথ" নামক হাস্যরসাত্মক ছবিটি নির্মিত হয়। অয়স্কান্ত দারপরিগ্রহ করেন নি। মৃত্যুকালে তিনি তিন ভ্রাতা, দুই ভগিনী ও বহু আত্মীয়-বন্ধুকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

• • •

জর্জিয়ার (সোভিয়েট রাশিয়া) বিখ্যাত নৃত্য-দল "জর্জিয়ান ডান্স অসম্বল্" ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এ-দেশে এসে পৌঁছেছেন। ষাটজন শিল্পী নিয়ে গঠিত এই সংস্থা মার্চ ও এপ্রিল মাসে সারা ভারতে মোট আঠারোটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। কলকাতায় এঁরা পরিবেশন করবেন পাঁচটি অনুষ্ঠান। আগামী ২৯শে মার্চ এই নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হচ্ছে।

• • •

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতার জন্য ভারতের তরফ থেকে তিনটি বাংলা ছবি নির্বাচিত হয়েছে। ছবিগুলি নির্বাচন করেছেন ভারত সরকার। সত্যজিৎ রায়ের "তিন কন্যা"-অন্তর্ভুক্ত "সমাপ্তি" ও "পোস্টমাস্টার" নির্বাচিত হয়েছে যথাক্রমে কান ও সিডনি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য। অজয় কর পরিচালিত আলোছায়া প্রোডাকশন্‌স-এর "সপ্তপদী" কার্লোভি ভ্যারি (চেকোশ্লোভাকিয়া) চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়েছে।

* * *

আমেরিকার মেন য়ুনিভার্সিটির নাট্য-সংস্থা কলকাতার মঞ্চে পাঁচটি বিখ্যাত আমেরিকান নাটক নিবেদন করছেন। হিন্দী হাই স্কুলের মঞ্চে চারদিনব্যাপী এই নাট্যাভিনয় শুরু হচ্ছে ১৯শে মার্চ থেকে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।

পাঁচটি নাটকের মধ্যে তিনটি পূর্ণাঙ্গ। বাকী দুটি অল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। নাটকগুলি হল : "আহ্, উইলডারনেস" (ইউজিন ও'নীল), "মাই হার্টস ইন দি হাইল্যান্ডস" (উইলিয়ম সারোয়ান), "হ্যাপি জার্নি" (থর্নটন ওয়াইল্ডার), "স্যাটারডে নাইট" (পল গ্রীন) ও "সানরাইজ অ্যাট ক্যাম্পোবেলো"।

আমেরিকার পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন রূপ এই নাটকগুলিতে সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত। "সানরাইজ অ্যাট ক্যাম্পেবেলো" নাটকটি আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের জীবনচরিত নিয়ে রচিত।

মেন মাস্ক থিয়েটার নামে প্রসিদ্ধ এই আমেরিকান নাট্যসংস্থা ১৯০৫ সালে স্থাপিত হয়। আমেরিকার নাট্য-আন্দোলনে এই সংস্থার অবদান অপরিসীম। বোম্বাই, দিল্লি ও মাদ্রাজে নাট্যদলটি জনসম্বর্ধনা লাভ করে।

এ ভি এম-এর আগামী হিন্দী চিত্রের নায়িকা মীনা কুমারী

সর্বভারতীয় খতিয়ান

গত বছরে (ইংরেজী ১৯৬১ সালে) সারা ভারতে তৈরী হয়েছে মোট ৩০০টি ছবি। তার মধ্যে ১২৩টি ছবি তৈরী হয়েছে বম্বেতে, ১০৯টি মাদ্রাজে এবং ৩৮টি কলকাতায়। এর আগের বছরে বম্বেতে তৈরী ছবির মোট সংখ্যা ছিল ১৩৩, মাদ্রাজে ৩২০ এবং কলকাতায় ৪৩।

বম্বেতে গত বছরে তৈরী হিন্দী-উর্দু ছবির সংখ্যা ৯৫; গুজরাটি ৭; মারাঠি ১৫; পাঞ্জাবী ৫; রাজস্থানী ১।

গত বছরে সারা ভারতে রঙীন ছবি মোট তৈরী হয়েছে ১৪টি। তার মধ্যে ২টি তৈরী হয়েছে মাদ্রাজে এবং ১২টি বোম্বাইয়ে।

চিঠিপত্র

"কাঁচের স্বর্গ" প্রসঙ্গে

মহাশয়,

চিত্রগত গুণাগুণের দিক থেকে বিচার করলে যাত্রিক-এর "কাঁচের স্বর্গ" বাংলা ছবির যাত্রাপথে নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় পদক্ষেপ। ছবিটি সত্যিই সুন্দর। সৌন্দর্য বুঝি বা ত্রুটিহীন হয় না। তাই এ-ছবির প্রাণকেন্দ্র যে বিন্দুতে বিধৃত, সেখানেই একটা গুরুতর ভুল রয়ে গেছে।

বিচারকক্ষে বাদী ও প্রতিবাদীর উকীলের সওয়াল শেষ হবার পর রায় দানের সময় বিচারক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯ নং ধারার উল্লেখ করেই নায়ককে জেলে পাঠান। আসামী পক্ষের উকীল বার বার প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কোথাও এমন কোন কথা ছিল না যাতে করে আসামী নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচিত করার সুযোগ পায় এবং আবেদন-পত্রেও কোথাও সে কথা সে লেখেনি। দণ্ডবিধির ৪১৯ ধারা পড়লেই বোঝা যায় এ জাতীয় অপরাধ ঐ ধারার আওতায় আসে না।

আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা নিয়ে চিত্রনাট্য রচনা করার আগে কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিলে এ ভ্রান্তি ঘটত না। বাংলা ছবির পক্ষে এ ব্যাপারে ভাববার সময় এখনও কি আসেনি?

ইতি
দেবব্রত চক্রবর্তী
কলকাতা-৯।

একলব্য

পোর্ট অব স্পেনে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয়লাভের পর কিংসটনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও ভারতকে এক ইনিংস ও ১৮ রানে পরাজিত করেছে। ফলে পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে দুটি টেস্ট জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এগিয়ে আছে। তিনটি টেস্ট এখনো বাকি।

দুই দেশের টেস্ট খেলার ইতিহাসে এটি ছিল ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সপ্তদশ টেস্ট। এই ১৭টি টেস্ট খেলার মধ্যে কিংসটনের খেলা নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে ৭টি খেলায়। ১০টি খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ভারত যে শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একটি টেস্টেও জেতেনি তা নয়, বিদেশের মাটিতে টেস্ট জেতার সাধ এখনো ভারতের অপূর্ণ রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ছাড়া ভারত দেশের মাটিতে সব দেশের বিরুদ্ধেই জয়লাভ করেছে। আর অস্ট্রেলিয়া ছাড়া রাবারও পেয়েছে পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রাবার লাভের ফলে ক্রিকেটে ভারতের যতখানি গৌরব বেড়েছিল পর পর দুটি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর সে গৌরবের অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে একথা বলতে আজ আর কোন সংকোচ নেই। এবং আজ যদি কেউ বলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে ইংলণ্ড গত মরসুমে ভারত সফর করলে ভারতের পক্ষে রাবার লাভ সম্ভব হ'ত না, তবে সে কথার প্রতিবাদ করারও কিছু নেই।

তবে একথা সর্বতোভাবে সত্য যে, দুটি টেস্টের কোনো টেস্টেই ভারত তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। প্রথম টেস্টের সময় অসুস্থ ছিলেন দুই নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় জয়সীমা ও পাতৌদির নবাব। ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক পাতৌদি দ্বিতীয় টেস্টেও খেলতে পারেন না। তাছাড়া, দিলীপ সারদেশাই, যিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সবচেয়ে ভাল খেলেছিলেন তিনিও দ্বিতীয় টেস্টের আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে পাতৌদি ও সারদেশাইকে বাদ দিয়েই ভারতকে দল গড়তে হয়। আম্পায়ারদের খামখেয়ালীর জন্যও দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। সে কথা পরে। আগে খেলাটির আলোচনা করা যাক।

টসে জিতে এ টেস্টেও ভারত প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। এবং এই টেস্ট নিয়ে অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর পর পর ৬টি টেস্টে টসে বিজয়ী হন। কিংসটনে খেলা আরম্ভের প্রথম দিন ছিল কণ্ট্রাক্টরের ২৮তম জন্মদিন। জন্মদিনে টসে জয় তাঁর সৌভাগ্যের পরিচায়ক। কিন্তু সৌভাগ্য অল্প সময়েই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হয়। ভারতের মাত্র ১৪ রানের মাথায় কণ্ট্রাক্টর ১ রান করে আউট হয়ে যান। ব্যাটিং পর্যায়ে রুসি সুর্তিকে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে ব্যাট করতে পাঠান হয়। জয়সীমা ও সুর্তি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আক্রমণের বিরুদ্ধে বেশ দৃঢ়তার সংগে খেলতে থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৪ উইকেটে ভারতের ৮৯ রান ওঠে। জয়সীমা ২৮, সুর্তি ৩৫ ও মঞ্জরেকার ১৩ রান করে আউট হয়ে যান। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজের পর উমরিগর ও চাঁদু বোরদের অনমনীয় দৃঢ়তায় খেলার গতি পরিবর্তিত হয়। উমরিগর ও বোরদে হল, গিবস ও সোবার্সের বলকে সমীহ না করে উইকেটের চারদিকে মেরে খেলে রান তুলতে থাকেন। ঠিক ১০০ মিনিটে উভয়ের সহযোগিতায় ৯৪ রান যোগ হবার পর উমরিগর আউট হয়ে যান।

উমরিগরকে যেভাবে আউট দেওয়া হয় তা কোন সাংবাদিকই সমর্থন করতে পারেন নি। শত শত মাইল দূরে থেকে এ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য না করাই শ্রেয়। কিন্তু ভারতের যে সব সাংবাদিক এখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করছেন তাঁরা কেউ উমরিগরের আউট সমর্থন করেননি। এমন কি, রয়টারের পরিবেশিত সংবাদেও উমরিগরের আউট না হবার কথাই সমর্থিত হয়েছে।

সোবার্সের অফ্ স্টাম্পের বাইরের একটি বল উমরিগর খেলতে গিয়ে ব্যাট টেনে নেন। সোবার্স আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন জানান। কিছু পরে উইকেট কিপার মেনডনকার কণ্ঠেও আবেদনের আওয়াজ শোনা যায়। এই সময় আম্পায়ার ঊর্ধ্ব গগনে তাঁর তর্জনী উত্তোলন করে উমরিগরকে আউট দেন। প্রথমে খেলার

কিংস্টনে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন ওয়েসলী হলের

রোহন কানহাই

বোল্ড সোবার্স” পরে সেটা সংশোধন করে লেখা হয় উর্মারিগর এল বি ডবলিউ বোল্ড সোবার্স”।

এই আউটের নির্দেশে অনেকেই বিস্ময় বোধ করেন। কারণ কিংসটনের ক্রীড়াঙ্গণ সাবিনা পার্কের আকার খুব ছোট। সেখানে সাংবাদিকদের সমস্ত কিছু দেখার সুযোগও বেশী।

যাই হক উর্মারিগর সাতটি বাউন্ডারী সমেত ঠিক একশ মিনিটে অর্ধশত রান করে আউট হবার পর বোরদে নাদকার্নীর প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ের ফলে ভারত প্রথম দিনের শেষে সংগ্রহ করে ৭ উইকেটে ২৮০ রান। চাঁদু বোরদে মাত্র ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরী লাভে বঞ্চিত হন। বোরদে ১৯০ মিনিটে ১৩টি উপভোগ্য বাউন্ডারীতে গড়ে ৯৩ রান করেওয়েস্ট ইন্ডিজের দর্শকদের সামনে অনবদ্য ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখে হলের বলে আউট হন।

প্রথম দিন শুধু উর্মারিগরের আউটই নয়, সেলিম ডুরানীর আউটের নির্দেশেও সাংবাদিকরা বিস্ময় বোধ করেন। হলের যে বলে ডুরানীকে এল বি ডবলিউ আউট দেওয়া হয় সে বল শুধু লেগ স্টাম্পের বাইরেও ছিল না, অনেক উঁচু ছিল। কিন্তু আম্পায়ার বেশ একটু সময় নিয়ে ডুরানীকে আউটের নির্দেশ দেন। ডুরানী প্যাভিলিয়নে ফিরে যাবার সময় তিনবার উইকেটের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে বিষাদ মাখা মনে বিদায় নেন।

দ্বিতীয় দিন ৩৯৫ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯০ মিনিট ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ১ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। নাদকার্নীর ও ইঞ্জিনিয়ারের জুটিতে ৯৪ রান যোগ এবং নাদকার্নীর নট আউট ৭৮ এবং ইঞ্জিনিয়ারের ৫৩ রান করার কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কানহাই ও ম্যাকমরিস, সারা দ্বিতীয় দিনের শেষে যথাক্রমে ৭৫ ও ৬৬ রান করে নট আউট ছিলেন, তৃতীয় দিন তারা উভয়েই সেঞ্চুরী করে আউট হন ম্যাকমরিস করেন ১২৫ রান, আর কানহাই ১৩৮। দুইয়ের যোগসাজসে দ্বিতীয় উইকেটে সংগৃহীত হয় ২৩৮ রান। এর পর সোবার্স ও ওরেলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ৩৯৮ রান ওঠে। তবে এর জন্য উইকেট কিপার ইঞ্জিনিয়ারের ক্যাচ ধরার ব্যর্থতা বিশেষভাবে দায়ী। ডুরানীর অফব্রেক বলে সোবার্স ৪ রানের মাথায় পেছন দিকে ক্যাচ তোলেন কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ক্যাচটি ধরতে পারেন না।

সোবার্সের মত খেলোয়াড় একবার ছাড়া পেলে যা করবার তাই করেন। পরের দিন সেঞ্চুরী করে তিনি আউট হন। চতুর্থ দিন ৮ উইকেটে ৬৩১ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করবার পর ভারত ২ ঘণ্টা ব্যাটিংয়ের সময় পেয়ে ৩ উইকেটে ৮৩ রান তোলে।

পরের দিন বিশ্রাম। ৮৩ রান তুলতে ভারতের তিনজন খেলোয়াড় জয়সীমা কণ্ট্রাক্টর ও সর্দি আউট হয়ে গেছেন। ইনিংস পরাজয় এড়াবার জন্য এখনো ভারতের ১৫৩ রানের প্রয়োজন সুতরাং আবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন ভারতীয় দল।

ওয়েসলী হল

গারফিল্ড সোবার্স

একদিন বিরতির পর পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলায় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৮ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিজয়ী হয় এক ইনিংস ও ১৮ রানে। পঞ্চম দিন মধ্যাহ্ন ভোজের এক ঘণ্টা দশ মিনিট পরে খেলার উপর যবনিকা পড়ে।

এ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিনজন খেলোয়াড় কানহাই, সোবার্স ও ম্যাকমরিসের সেঞ্চুরী যেমন উল্লেখযোগ্য, মাত্র ২০টি টেস্টে ওয়েসলী হলের শত উইকেট লাভও তেমন কৃতিত্বপূর্ণ। এই খেলার শেষে হল টেস্ট খেলায় মোট লাভ করেছেন ১০০টি উইকেট।

কিংসটন টেস্টে দুই পক্ষেই কয়েকটি নতুন রেকর্ড হয়েছে যা উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রথমত, ভারতের প্রথম ইনিংসে নাদকার্নী ও ইঞ্জিনিয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অষ্টম উইকেটের নতুন রেকর্ড করেছেন। অষ্টম উইকেটে এরা করেছেন ৯৪ রান। এর আগে ১৯৫৮-৫৯ সালে মাদ্রাজে কৃপাল সিং ও রামচাঁদ অষ্টম উইকেটে ৭৪ রান করেছিলেন। এতদিন সেই রানই ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অষ্টম উইকেটের রেকর্ড।

দ্বিতীয়ত, নাদকার্নী ও সুভাষ গুপ্তের রেকর্ড ভেঙ্গে শেষ উইকেটে নাদকার্নী ও প্রসন্ন ২৬ রান যোগ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের দশম উইকেটের নতুন রেকর্ড।

ভারতের বিরুদ্ধে উইকেট পার্টনারশিপে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা তিনটি রেকর্ড করেছেন। দ্বিতীয় উইকেটে কানহাই ও ম্যাকমরিসের ২৩৮, সপ্তম উইকেটে মেন-ডনকা ও সোবার্সের ১২৭ এবং অষ্টম উই-কেটে মেণ্ডনকা ও স্টেয়ার্সের ৭৪ রান ভারতের বিরুদ্ধে নতুন রেকর্ড। এ ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৮ উইকেটে ৬৩১ রানও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে বড় রানের ইনিংস। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪ বার ৬০০ রানের উপর করলে নিজেদের মাটিতে এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে ৬০০ রান তুলতে পারেনি।

দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েসলী হলের মারাত্মক বোলিং ভারতের বিপর্যয়ের কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতের খেলোয়াড়রা স্পিন বলেও সমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। দুটি টেস্ট খেলা নিয়ে যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাই প্রথম টেস্টের ২০টি উইকেটের মধ্যে একজন হয়েছিলেন রান আউট। বাকী ১৯টি উইকেটের ১০টি নিয়েছিলেন ফাস্ট বোলার ৯টি স্পিন বোলার। দ্বিতীয় টেস্টের ২০টি উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট ও স্পিন বোলারদের ভাগ সমান সমান। সুতরাং শুধু ফাস্ট বলেই আমাদের ব্যর্থতা একথা বলা চলে না। তবে ফাস্ট বল ভীতি আমাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

নীচে দ্বিতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড ও যোগদানকারী খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল:—

ভারত—প্রথম ইনিংস—৩৯৫ (চাঁদু ৯৩, বাপু নাদকার্ণী নট আউট ৭৮, পলি উম্রিগর ৫০, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ৫৩, রুসি সুর্তি ৩৫, এম এল জয়সীমা ২৮; সোবার্স ৭৫ রানে ৪ উইকেট, ওয়েসলী হল ৭৯ রানে ৩ উইকেট, ল্যান্স গিবস ৬৯ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—(৮ উই-কেট ডিক্লেয়ার্ড) ৬৩১ (গারফিল্ড সোবার্স ১৫৩, রোহন কানহাই ১৩৮, ই ম্যাকমরিস ১২৫, জে মেণ্ডনকা ৭৮, ফ্রাঙ্ক ওরেল ৫৮; ই প্রসন্ন ১২২ রানে ৩ উইকেট, সেলিম ডুরানী ১৭৩ রানে ২ উইকেট)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস—২১৮ (ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ৪০, বাপু নাদকার্নী ৩৫, পলি উম্রিগর ৩২ রুসি সুর্তি ২৬; ওয়েসলী হল ৪৯ রানে ৬টি উইকেট, ফ্রাঙ্ক ওরেল ৪৪ রানে ৩ উইকেট)

[ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ১৮ রানে বিজয়ী]

ভারতের পক্ষে খেলেছেন—এম এল জয়সীমা, নরী কণ্ট্রাক্টর (অধিনায়ক), রুসি সুর্তি, বিজয় মঞ্জরেকার, পলি উম্রিগর, চাঁদু বোরদে, সেলিম ডুরানী, বাপু নাদ-কার্নী, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (উইকেট কিপার) রামকান্ত দেশাই ও ই প্রসন্ন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে খেলেছেন—কনরাড হাণ্ট, ই ম্যাকমরিস, রোহন কানহাই, ডবলিউ রডরিগস, গারফিল্ড সোবার্স জো সলোমন, ফ্রাঙ্ক ওরেল (অধিনায়ক), জে মেণ্ডনকা (উইকেট কিপার) স্টার্লিং স্টেয়ার্স, ল্যান্স গিবস ও ওয়েসলী হল।

খেলার তারিখ—৭ই, ৮ই, ৯ই, ১০ই ও ১২ই মার্চ।

মুকুল

শান্তি চ্যাটার্জি

আজ থেকে আটাশ উনত্রিশ বছর আগে বিকেলের গোলদীঘিতে এলে আপনি রোজই একদল মেয়েকে দেখতে পেতেন। বারো বছর থেকে পনর বছর বয়সের কয়েকটি মেয়ে। গোলদীঘির জলের দিকে মুখ করে, পা ঝুলিয়ে একই বেঞ্চে তারা দিনের পর দিন এসে বসত। মাঝে মাঝে তাদের দলে দেখতে পেতেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে। গোলদীঘির সকলে তাঁকে জানত অলোকবাবু বলে। তাঁর সঙ্গে গোল-দীঘির এই কিশোরী মেয়েদের বয়সের অনেক ব্যবধান ছিল। কিন্তু ফূর্তিবাজ, আমুদে এই ভদ্রলোকই ছিলেন এ'দের প্রধান আকর্ষণ। নানা মজার মজার গল্পে সারাটি ক্ষণ জমিয়ে রাখতেন। হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেত মেয়েরা।

দলের মধ্যে একটি মেয়ে—শুধু বার বার অন্যমনা হয়ে পড়ত। সে শান্তি। বারো তেরো বছরের কিশোরী মেয়ে। ভারতস্ত্রী সেবাসদনের ছাত্রী। শান্তি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত গোলদীঘির জলের দিকে। হুড়মুড় করে জলে নেমে পড়ছে ছেলে-মেয়ের দল। হাঁসের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে সাঁতার কাটছে। শান্তি ভাবত, সে যদি তাদের মত অমন করে সাঁতার কাটতে পারত।

প্রথম জীবনের স্মৃতির ঝুলি হাতড়ালে এই দিনগুলির কথাই বড় করে মনে পড়ে [illegible]

গৃহস্থ বধূ শান্তি আর পাঁচটা বিবাহিতা বাঙালী বধূরই মত সংসারের প্রাত্যহিকতার আড়ালে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু বাংলা দেশের সংবাদপত্রের খেলাধুলার পাতায় একদা কিশোরী শান্তি মুখার্জি অনেক সংবাদের জন্ম দিয়েছেন। ফ্রি স্টাইল সাঁতার আর দৌড়ের অনেক প্রতিযোগিতাই শান্তি মুখার্জিকে বহুবার প্রথম পুরস্কার এনে দিয়েছে।

১৯২৩ সালে মধ্য কলকাতায় এক রক্ষণ-শীল পরিবারে শান্তি মুখার্জির জন্ম। বাবা দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চাকরি করতেন রেলে। ঠাকুমা ছিলেন অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। বারো বছর বয়সের পরই সে বাড়ির মেয়েদের পায়ে শিকল পড়ত অনু-শাসনের। শান্তি মুখার্জির দিদিও বন্দী হয়েছিলেন সে অনুশাসনের বিধিনিষেধে।

"কিন্তু আমাকে আটকে রাখতে পারেনি কেউ। গোলদীঘির কাছেই আমাদের বাড়ি। বিকেল হলেই পালিয়ে যেতাম দীঘির ধারে।"

বললেন শান্তি চ্যাটার্জি। গোলদীঘির সে বৈকালী আড্ডায় যাঁরা তাঁর নিত্য-সঙ্গিনী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, আজকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শোভা সেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী বেলা মুখো-পাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভাগিনেয় কানাইলাল বসু।

এই বৈকালী আড্ডা ক্রমে ক্রমে রূপ পেল একটি ক্লাবের। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর ক্লাব। নাম দেওয়া হ'ল চিলড্রেন গার্ডেন ক্লাব। ব্যাপটিস্ট মিশনের দিকে খোলা জায়গায় রোজ বিকেলে খেলাধুলোর ব্যবস্থা হল। ড্রিল হত, হা-ডু-ডু খেলা হত। ট্রেনার হিসেবে এলেন নন্দলাল দাস, মণীন্দ্রনাথ বসু।

প্রথম কৈশোরের অদম্য উৎসাহ নিয়ে শান্তি মেতে উঠলেন খেলাধুলার চর্চায়। কিন্তু মন পড়ে আছে সাঁতারের দিকে। মাটির চেয়ে জলই বেশী টানত তাঁকে। গোলদীঘির কাকচক্ষু-জল তাঁকে বার বার হাতছানি দিত।

সুযোগ জুটে গেল অবশেষে। ছোট কাকা অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একদিন নিয়ে গেলেন কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবে। সাঁতারের প্রথম হাতেখড়ি হল শ্যাম-মোহন চক্রবর্তীর কাছে, তারপর অনু-শীলনের সময় সাহচর্য পেলেন সেকালের নামী সাঁতারু দুর্গাদাসের।

"তখনও বাড়িতে জানত না আমি সাঁতার শিখি।" বললেন শান্তি চ্যাটার্জি। "ইস্কুল

থেকে ফেরার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে সাঁতার কেটে আসতাম। ভিজে চুলই বেঁধে রাখতে হ'ত, পাছে ধরা পড়ি এই ভয়ে। একদিন হ'ল কি"—

সেদিন সত্যিই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। চুপি চুপি আসতেই ঠাকুমার সামনে পড়ে গেলেন। ভিজে চুল দেখেই ধরা পড়ে গেল সবকিছু। ঠাকুমা কাঁচি নিয়ে এসে দুই বিনুনির গোড়া ধরে দিলেন কেটে।

কিন্তু শান্তির উৎসাহ কিংবা অনুরাগ তাতে বিন্দুমাত্র দমেনি। ফ্রি স্টাইল সাঁতারে অল্পদিনের মধ্যেই ট্রেনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলেছেন তিনি।

তখন ১৯৩৪ সাল। ক্লাবের সকলে শান্তিকে বললেন, 'অল ইণ্ডিয়া গার্লস সুইমিং কম্পিটিশনে নাম দাও তুমি। তুমি পারবে।

নাম দিয়েছিলেন এবং পেরেও ছিলেন। প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছিলেন সেদিনের ফ্রক পরা এই বাঙালী মেয়েটি। তারপর তার পরের বারও। শান্তি মুখার্জি সেদিন থেকেই খেলাধুলার পাতার সংবাদ।

তারপর সাফল্যের শিখর থেকে শিখরে। খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ ঘটল। সাঁতার থেকে দৌড়। জল থেকে মাঠ। সেখানেও শান্তি সকলের আগে। মোহনবাগান স্পোর্টস, কালীঘাট ক্লাবের স্পোর্টস, খেলাঘর বালিকা ব্যায়াম সমিতি এ সমস্ত ক্লাবের স্পোর্টসে শান্তির পুরস্কার ছিল বাঁধা।

আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও ৭৫ মিটার থেকে ১০০ মিটার দৌড়ে শান্তি পর পর তিন বছর প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন।

শান্তি মুখার্জির খেলাধুলার জীবনের আয়ু বেশীদিনের নয়। ১৮ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হল গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারের শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের পর শান্তি চ্যাটার্জি যদিও সক্রিয়ভাবে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, তবুও একদিক থেকে তিনি ভাগ্যবতী, তার কারণ স্বামী হিসাবে তিনি যাঁকে পেলেন, তিনি খেলাধুলো চর্চার একজন উৎসাহী ব্যক্তি শুধু নন, খেলাধুলো প্রশিক্ষণের কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিতদের একজন। যে চিলড্রেন গার্ডেন ক্লাবের মধ্য দিয়ে শান্তি মুখার্জির খেলাধুলো জীবনের শুরু, শিশিরকুমার ছিলেন তারই সহকারী সম্পাদক। ক্রীড়া জগতের সুপরিচিত ব্রজরঞ্জন রায় এই সংগঠনের সহ-সভাপতি ছিলেন।

স্বামীর বদলির চাকুরি। শিশিরকুমার প্রথমে বদলি হলেন খুর্দা রোডে। তারপর রায়পুরে। সেখানে স্বামী গড়ে তুললেন বাণমেলা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রতচারী ও ড্রিল শেখানোর ব্যবস্থা করলেন

শান্তি চ্যাটার্জি

নিয়মিত। একাজে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল আবাল্যের। সুনাম ছিল দীর্ঘদিনের।

শান্তি চ্যাটার্জি গড়লেন দেশবন্ধু মহিলা সমিতি। তিনি হলেন অধ্যক্ষা। মেয়েদের নিয়ে হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা হল। ছোটবেলা থেকে নাচের প্রতিও ঝোঁক ছিল। মেয়েদের নাচ শেখানোর ভার নিলেন শান্তি চ্যাটার্জি। খেলাধুলো আর সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করলেন ওঁরা।

দীর্ঘদিন প্রবাস-জীবন যাপনের পর শান্তি চ্যাটার্জি সম্প্রতি আবার কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এখনও মাঝে মাঝে গোলদীঘি হাতছানি দেয় তাঁকে। কিন্তু সাংসারিক ব্যস্ততা আর বয়সের অবসাদে ফেলে-আসা জীবনের দিকে আর পিছু ফিরে তাকানো যায় না।

"তবু বড় আশা" সবশেষে বললেন শান্তি চ্যাটার্জি "ছোট মেয়েটি যদি খেলাধুলোয় নাম করতে পারে।"

চ্যাটার্জি দম্পতীর ছোট মেয়েটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। খেলাধুলোর প্রতি তার মায়েরই মত অনুরাগ। শান্তি চ্যাটার্জির বাপের বাড়ির দিকে তাঁর দুবোনই খেলাধুলোয় সমান অনুরাগিণী ছিলেন। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের এই ক্রীড়ানুরাগের ধারা উত্তর পুরুষের মধ্যেও বর্তাবে এটিই এখন তাঁদের বড় আশা।

দেশী সংবাদ

৬ই মার্চ—দীঘা সমুদ্রসৈকতে নাড়াজোল রাজবাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জী রাজ্য মন্ত্রিসভার নূতন কাঠামো সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেন বলিয়া জানা যায়।

ভারত ইউনিয়নের অঞ্চল গোয়া দমন ও দিউ-এর প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য রাষ্ট্রপতি আজ এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। অর্ডিন্যান্সটির নাম "গোয়া, দমন, দিউ (প্রশাসন) অর্ডিন্যান্স ১৯৬২।" ইহা জারি করার সঙ্গে সঙ্গেই বলবৎ হইয়াছে।

৬ই মার্চ—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ঋণ মকুব করার প্রশ্নটি সম্পর্কে সরকারী-স্তরে খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা আছে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীখান্না ও উক্ত দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীধরমবীর আগামীকাল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতেছেন।

প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী অদ্য দুপুরে কলিকাতায় শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৯৪৭ সাল হইতে উক্ত মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

৭ই মার্চ—ওয়াকিবহাল মহলে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপাল হিসাবে পাতিয়ালার মহারাজার নাম শুনা যাইতেছে। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কার্যকাল গত নবেম্বর মাসে শেষ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী রাজ্যপাল নিযুক্ত না হওয়ায় শ্রীমতী নাইডু কাজ চালাইয়া যাইতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বয়লারের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক্স-রে যন্ত্র ব্যবহার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং এই জন্য প্রায় লক্ষ টাকার এক স্কীম চালু করা হইতেছে। রাজ্যের শ্রমদপ্তর এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়াছেন।

৮ই মার্চ—নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সম্পর্কে যে সকল জল্পনা-কল্পনা হইতেছে, তাহা হইতে জানা যায় শ্রীভি কে কৃষ্ণ মেনন বর্তমানের ন্যায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থাকিবেন না। এক সংবাদে প্রকাশ, বর্তমান প্রতিরক্ষা দপ্তর দ্বিধাবিভক্ত করিয়া শ্রীমেননকে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন বিভাগের ভার দেওয়া হইবে।

সাহিত্য আকাদেমীর কার্যনির্বাহক বোর্ড ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে ১৩ খানা পুস্তক নির্বাচিত করিয়াছেন। প্রত্যেকখানা পুস্তককে ৫ হাজার টাকা করিয়া আকাদেমীর বাৎসরিক পুরস্কার দেওয়া হইবে। বাঙলা ভাষায় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য নামক পুস্তকখানা নির্বাচিত হইয়াছে।

৯ই মার্চ—বর্ষীয়ান জননেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সর্বসম্মতিক্রমে অদ্য তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী

দলের নেতা নির্বাচিত হন। অর্থাৎ তিনি পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার লাভ করেন এবং আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পুনরায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ঋণ মকুবের প্রস্তাব সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া উহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মকুব করিতে সম্মত আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১০ই মার্চ—তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর আজ সকালে রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার পূর্ণমর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হইতেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, নূতন মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সহ মোট ১৬ জন পূর্ণমন্ত্রী থাকিবেন এবং শুধু এই ১৬ জনকেই রাজ্যপাল রবিবার সকালে শপথ গ্রহণ করাইতেছেন।

১১ই মার্চ—কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নূতন মূল্যহার প্রবর্তন করিয়াছেন। এই নূতন হার উচ্চ, মাঝারি ও নিম্ন ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সিনেমা প্রভৃতি, ব্যাটারি চার্জিং এবং 'এইচ' শ্রেণীর (গার্হস্থ্য) বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

তৃতীয় যোজনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার যে পরিকল্পনা আছে তাহারই অঙ্গরূপে বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক দিবার সরকারী প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুসারে রাজ্য-সরকার আপাতত বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাঁচ লক্ষ টাকার পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ই মার্চ—আসন্ন জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে শুরু করার ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবে রাশিয়া সায় দিয়াছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আজ কমন্সসভায় একথা ঘোষণা করেন। ওয়াশিংটনের এক খবরেও এই ঘটনার সমর্থন মিলিয়াছে।

আজ সকালে আলজিয়ার্সে ২০০টিরও বেশী বোমা বিস্ফোরণে শহর প্রকম্পিত হইতে থাকে। ইয়োরোপীয়দের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। পুলিস ১৭ জন ইয়োরোপীয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

৬ই মার্চ—পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যদি পুনরায় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা শুরু করে, তবে রাশিয়াও তাহার "নূতন ধরনের অস্ত্রগুলিকে" নিখুঁত করিয়া তুলিবার জন্য ফের পরীক্ষা শুরু করিবে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেফ বলিয়াছেন যে, বায়ুমণ্ডলে পুনরায় আণবিক পরীক্ষা শুরু করার মার্কিন সিদ্ধান্ত "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক নীতির নূতন প্রকাশ।"

এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশনের ২৫টি সদস্য-দেশের প্রতিনিধিগণ আজ টোকিওতে এই কমিশনের দুই সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ করেন। এই অধিবেশনে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির 'গুরুতর ফল' সম্পর্কে আলোচনা প্রাধান্য লাভ করিবে।

৭ই মার্চ—মেলবোর্নে হৃদ্‌যন্ত্রে একটি জটিল অস্ত্রোপচারকালে একটি লোকের ৩৬ বার "মৃত্যু" ঘটিয়াছিল এবং কোন কোন সময় সে মৃত্যু আধ মিনিটেরও বেশী স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ৮৭ বৎসর বয়স্ক এই রোগীটির অবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে।

৮ই মার্চ—ইউক্রেনে মাটির নীচে ১৪ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত একটি সাগরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী 'তাস' সংবাদ দিয়াছেন। এই সাগরের গভীরতা কোন কোন জায়গায় তিন শত ফুটেরও বেশী।

প্যাকিস্তানের জঙ্গী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনপ্রকার জনমত গঠিত হইতে না পারে সেই জন্য পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। প্রকাশ, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের এই কাজে তলব করা হইয়াছে এবং সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৯ই মার্চ—মার্কিন উচ্চতম মহল এখন একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর বৈমানিকগণ দক্ষিণ ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট গেরিলাদের উপর বোমা এবং গুলীবর্ষণ করিতেছে। এই তথ্য গত তিন মাস যাবৎ গোপন রাখা হয়।

এক সরকারী ঘোষণায় জানান হইয়াছে, ব্রহ্ম সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের নিজেদের মন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

১০ই মার্চ—আজ রেঙ্গুনে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ইউনিয়ন বিপ্লবী সংসদ জেনারেল নে উইনকে সমস্ত আইন প্রণয়ন, বিচার পরিচালনা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে।

প্যারিসের দক্ষিণপূর্ব শহরতলী ইস-লেখ মুলিনাতে অবস্থিত যে বাড়িতে জাতীয় শান্তি সংসদের কংগ্রেস হইবার কথা, সেই বাড়ির সম্মুখে একখানি বাড়ির মধ্যে লুক্কায়িত একটি টাইম বোমার বিস্ফোরণে আজ তিন জন নিহত ও পঞ্চাশ জন আহত হইয়াছে। জানা গেছে ইহা ফ্যাসিস্ত গুপ্ত ফৌজি সংগঠনের কাজ।

১১ই মার্চ—আলজিরিয়ান যুদ্ধ-বিরতি আলোচনায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আজ সকালে ফরাসী ও আলজিরিয়ান প্রতিনিধিবর্গ তাহাদের পঞ্চম বৈঠকে মিলিতেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, গত মাসের গোপন আলোচনার পরেও যে সকল বিষয় অমীমাংসিত ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ৩৩—১১৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

পশ্চিমবঙ্গে ৩৭জনে
সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা
গঠিত হয়েছে।
"ও কে প্রফুল্ল?"
"আমাদেরই একজন
মন্ত্রী হয়ত।"
অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে কোন কর
ধার্য করা হয় নি।
'দিব্যি পুরুষ্টু' হয়ে
এপ্রিল-মেতে
ফিরে এস।
করদাতা
বাজেট
জয়প্রকাশ নারায়ণজী রাজনীতি
থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি বলে
জানিয়েছেন।
আমাদের
কম্যাণ্ডার
প্লেন।
সর্বোদয়
কেনেডি প্রভাব
কে ইনি? মিসেস
চ্যাটার্জি? মিসেস
ঘোষ? মিস
রায়? মিস সেন?

উনিশে মার্চ দুপুর বারোটায় সরকারী-ভাবে আলজেরিয়ায় যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা-কামীরা ফরাসী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করেন, তারপর থেকে সাত বছরের উপর যুদ্ধ চলেছে। বিদ্রোহী-দের নেতারাই এখন নিঃসন্দেহে আল-জেরিয়ার প্রতিনিধি বলে স্বীকৃত। তাঁদের সঙ্গেই ফরাসী সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সেই চুক্তি অনুসারে একটা গণভোট নিয়ে দেখা হবে যে, আলজেরিয়ানরা ফ্রান্স থেকে পৃথক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র চায় কিনা। অবশ্য এটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র; আলজেরিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রিক সত্তালাভ সুনিশ্চিত। স্বাধীন আলজেরিয়া থেকে ফরাসী সৈন্য ধাপে ধাপে সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম, আলজেরিয়ায় ফরাসীরা কোন্ কোন্ জায়গায় কতদিনের মেয়াদে সামরিক ঘাটি রাখতে পারবে, ইত্যাদি বিষয়েও চুক্তি হয়ে গেছে। অন্তর্বর্তীকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে আলজেরিয়ার বর্তমান "প্রভিসনাল গভর্নমেণ্ট" এবং ফরাসী সরকারের যৌথ দায়িত্ব থাকবে এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত সংস্থা সৃষ্টি করা হবে।

সাত বছরব্যাপী এই নৃশংস যুদ্ধের অবসানের ঘোষণায় কেবল আলজেরিয়া ও ফ্রান্সে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই আনন্দধ্বনি উঠার কথা, কিন্তু যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরেও মানুষ নিশ্চিন্তে হর্ষপ্রকাশ করতে পারছে না, কারণ সরকারীভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দেরি আছে। কত দেরি আছে, তা বলা মুশকিল এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আরো কত, কীরকম শোচনীয় ঘটনা ঘটবে, তাও বলা যায় না। ফরাসী সৈন্যদলের একাংশ খোলাখুলিভাবে আলজেরিয়ায় ফরাসী সরকারের নীতিকে পরাস্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা খুন-খারাপি চালিয়েই যাচ্ছে। তাদের দলপতি জেনারেল সালাঁ প্রেসিডেণ্ট দ্য গলকে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট বলেই আর স্বীকার করেন না বলে ঘোষণা করেছেন। আলজেরিয়ার বড়ো শহরগুলিতে ও-এ-এস্ গুপ্ত সামরিক সংস্থা নামধারী এই বিদ্রোহী সৈন্যদল যা খুশি করছে এবং দেখা যাচ্ছে যে, ভয়েই হোক বা অন্য কারণেই হোক, য়ুরোপীয় অধিবাসীরা তাদের কথা শুনে চলছে। যুদ্ধবিরতির প্রতিবাদে ও-এ-এস্ দু দিন সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করেছে এবং আলজিয়ার্স এবং ও'রা শহরে—অন্ততপক্ষে য়ুরোপীয় অঞ্চলগুলিতে—সেটা পুরোপুরি পালিত হচ্ছে বলে সংবাদ এসেছে।

আরো মুশকিল এই যে, সরকারের অনুগত সৈন্যদের কাছ থেকেও যে ও-এ-এস বিশেষ বাধা পাচ্ছে না, তা নয়। শুধু আলজেরিয়ায় নয়, খাস ফ্রান্সেও ও-এ-এস-এর প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। সৈন্যবাহিনীর, বিশেষ করে অফিসারদের এক অংশ যে ও-এ-এস-এর প্রতি

সহানুভূতিসম্পন্ন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই জন্য প্যারিসে বিপুল বহরের সতর্কতামূলক সামরিক ও পুলিসী ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কেবল ভয় দেখিয়ে ওএ-এসকে ঠাণ্ডা করা যাবে, এরূপ আশা করা কঠিন। আবার ও-এ-এসকে দমন করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে বলপ্রয়োগ করার সাহস এবং ইচ্ছাও দ্য গলের নেই। কারণ ও-এ-এসকে রীতিমত দমন করতে অগ্রসর হতে হলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা ভিতরে ভিতরে ও-এ-এস-এর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, তারা খোলাখুলি বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দিতে পারে, যার ফলে পরিস্থিতি দ্রুত গৃহযুদ্ধের রূপ নিতে পারে।

অবশ্য ফ্রান্সের অসামরিক জনমত বিপুলভাবে ও-এ-এস-এর বিরোধী। প্রেসিডেন্ট দ্য গল যদি অসামরিক জনগণের সক্রিয় সমর্থন কাজে লাগাতে প্রস্তুত থাকেন, তা হলে সামরিক বেয়াদবিকে ঠাণ্ডা করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু তাতেও গৃহযুদ্ধের ভয় থাকত, তবে সে-গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহীভাবাপন্ন সৈন্যদের সহজেই কোণঠাসা করা যেত। কিন্তু সেটা দ্য গল-এর আত্মসম্মানে বাধবে, অসামরিক জনতা এবং রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্য নিয়ে বেয়াদব সৈনাদের শায়েস্তা করতে তিনি রাজী নন। প্যারিসে ওএ-এস-এর হিংসাত্মক কার্যাবলীর প্রতিবাদে কিছুদিন আগে শ্রমিকদের দ্বারা একটা বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। তার দ্বারা সরকারের নীতির সমর্থন এবং বিদ্রোহী ও-এ-এস-এর প্রতি বিরূপতাই দেখানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যারা ডিমনস্ট্রেশন করে জানাতে চাইল যে, সরকার যদি শক্ত হাতে ও-এ-এসকে দমন করতে অগ্রসর হন, তবে জনগণ সরকারের পিছনে আছে, তাদের উপরই পুলিসের বন্দুকের গুলী চলল। সৈন্যদের অবাধ্যতা যত উৎকট হোক তারা সরকারের ঘোষিত নীতিকে পরাস্ত করার জন্য যত দুষ্কর্ম খুনখারাপিই করুক না কেন, এমন কি তারা দ্য গলকে সরাবার অভিপ্রায় যত পরিস্কারভাবেই ব্যক্ত করুক না কেন, তাদের দমন করার জন্য জনগণ তাঁকে সাহায্য করতে চাইবে, এটা দ্য গল জনগণের বেয়াদবি বলে মনে করেন। তাই যারা ও-এ-এসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তাদের উপরই মার পড়ল।

সৈন্যবাহিনী এবং দ্য'গলের মধ্যে সম্পর্কটা একটু বিচিত্র রকমের। সৈন্যবাহিনীকে দ্য'গল একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন, ফরাসী গৌরবের একটা বিশেষ প্রতীক হিসাবে দেখেন। তাঁর মনে বিদ্রোহী সৈন্যদের জন্যও যেন একটা বিশেষ স্থান আছে। তাছাড়া এটা স্মরণ করা দরকার যে আজ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অথবা সৈন্যবাহিনীর শৃংখলা ভেঙে বেরিয়ে এসে যারা দ্য গলের নীতির বিরুদ্ধতা করছে এবং একটা পাল্টা সামরিক যন্ত্র খাড়া করেছে বিশেষ করে তাদেরই সাহায্যে একদা দ্য গল ক্ষমতালাভ করেছিলেন। দ্য গল তাদের কথামতো চলতে রাজী না হওয়াতে তারা যখন থেকে [illegible] গোঁড়া ঔপনিবেশিকদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ফ্রান্সের সরকারী নীতির বিরোধিতা আরম্ভ করে তার পরও অনেকদিন দ্য'গল তাঁদের সংগে ন্যায় ব্যবহারই করেছেন এবং এখনও সেই-রকম ভাব কিছুটা আছে। গোড়া থেকে শক্ত হলে হয়ত অবস্থা আজ অন্য রকম হত এবং ও-এ-এস সমস্যা এমন বিকট আকার ধারণ করত না।

ও-এ-এসকে শক্ত হাতে দমন না করতে পারলে আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদীদের সংগে ফরাসী সরকারের যে-চুক্তি হল সেটা কার্যকর করা যাবে না এবং যুদ্ধবিরতিটাও অকেজো হয়ে যাবে। আবার ও-এ-এসকে শক্ত হাতে দমন করতে গেলেও ফরাসীদের মধ্যে যে-অবস্থার উদ্ভব হবে সেটা সামলানোও সহজ নয়। সরকারী ফরাসী সৈন্যবাহিনী হাত গুটিয়ে নিয়ে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব আলজেরিয়ান প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের উপর সমর্পণ করলে মারামারি কাটাকাটি আরো বেশ কিছুদিন চললেও ও-এ-এস শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঠাণ্ডা হত। সেক্ষেত্রে কিন্তু সংঘর্ষ আলজেরিয়ান প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের সৈন্য এবং ও-এ-এসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, দুই পক্ষের অসামরিক লোকেরাও তাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। ফরাসীদের আলজেরিয়ার মুসলমানরা মারছে এবং ফরাসী সৈন্যবাহিনী কিছু করছে না, এই অবস্থার চাপ সহ্য করে দ্য'গল সরকার দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। এইটাই ও-এ-এস হিসাব করে রেখেছিল। যে-চুক্তি হয়েছে তার শর্ত অনুসারে অন্তর্বর্তী কালে শান্তি ও শৃংখলা রাখার দায়িত্ব আলজেরিয়ান প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট এবং ফরাসী সরকার যুক্তভাবে পালন করবেন। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে ও-এ-এস'এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তাতে অংশ নিতে গেলেও আলজেরিয়ায় এবং হয়ত খাস ফ্রান্সেও যে-অবস্থার সম্মুখীন দ্য'গল সরকারকে হতে হবে সেটাও কম মুশকিলের নয়।

ফ্রান্সের আভ্যন্তর রাজনৈতিক অবস্থা যেরকম হয়েছে তাতে একটা গৃহযুদ্ধ বেধে না যাওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই—একটি ছাড়া এবং সে-কারণটি খুবই প্রবল। সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, যা খুবই ভালো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হবার পরেও ফ্রান্সের যুদ্ধ করা থামেনি। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হলো তো আলজেরিয়ায় চল্লো। রাজনৈতিক সংকট তো লেগেই আছে, ফরাসী রিপাবলিক একটার পর একটা ভোল বদলে বর্তমান ডিক্টেটরী শাসনের রূপ নিয়েছে। এ সব সত্ত্বেও ফরাসী শিল্পের প্রসার এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বেড়েই চলেছে। সে দিক দিয়ে ফ্রান্সও একটা অর্থনৈতিক মিরাকল্ দেখিয়েছে। ওপরের রাজনৈতিক গভর্নমেন্ট যেমনই হোক না কেন, ফ্রান্সের দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থা যাকে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বলে সেটার কাঠামোটাও বোধহয় খুব মজবুত, তা না হলে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ধারাটা এ-রকম অব্যাহত থাকছে কেমন করে?

১১-৩-৬২

অসংলগ্ন

বাতায়নিক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব কিছু বাংলা ভাষায় চালাবার জন্যে একটা আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলন আজ হঠাৎ ওঠেনি, এর সূচনা হয়েছে অনেক আগেই এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম ঢেউ তুলেছেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মাতৃভাষায় সব কিছু শিখবে এর [illegible]য়ে বাঞ্ছনীয় আর কি হতে পারে! দেশবিদেশের নজির তার জন্যে দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্মগত অধিকারের দাবিই যথেষ্ট।

এ আন্দোলনের . আদর্শের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও একটা আশংকার ছায়া মন থেকে একেবারে সরাতে পারছি না। সে আশংকা অন্ধ গোঁড়ামির। অন্ধ গোঁড়ামির ডালপালা মেলবার জন্যে এ জাতীয় আন্দোলনের মত উর্বর জমি আর নেই। জাতি, ভাষা, প্রদেশ ইত্যাদির ধুয়া পেলে এ গোঁড়ামি একেবারে দুর্বার হয়ে ওঠে।

যা শেখবার নিজের ভাষাতেই সহজে শিক্ষণীয় এ যুক্তি যেমন অকাট্য তেমনি এ সত্যও অস্বীকার করবার নয় যে, আজকের যুগের শিক্ষণীয় প্রায় সব কিছুই কোন বিশেষ ভাষায় মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃতি আন্তর্জাতিক। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যত গৌরবই থাক আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠ আমরা পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকেই নিয়েছি। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যোগাযোগ রাখতে গেলে ভাষার না হোক পরিভাষার মিল আমাদের রাখতেই হবে। তা না রেখে যদি সব কিছুতেই কেঁচে গণ্ডুষ করতে চাই, তাহলে ব্যাপারটা পাঁজার পোড়া ইট গুঁড়িয়ে নতুন করে ছাঁচে ফেলার মত হাস্যকর বাতুলতা হবে। অন্ধ গোঁড়ামির মধ্যে এই বাতুলতাই সব চেয়ে প্রকট। বাংলা ভাষার নামে শপথ নিয়ে তা চেয়ারের বদলে আমাদের কেদারায় বসাতে চেয়েই ক্ষান্ত হবে না পুলিসকে আরক্ষী করে তুলে অক্সিজেনকে অম্লজন বা তার চেয়েও বিদঘুটে কিছু বলতে রাজী না হ'লে কোতলের ব্যবস্থা করবে।

বিদেশীর অধীন যে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের একদা থাকতে হয়েছিল সে লজ্জা নগর থেকে তাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রস্তর মূর্তিগুলি হটিয়ে দিলে ঘোচে কি না জানি

না, কিন্তু তাদের কাছে মূল্যবান যা পেয়েছি শুধু নাম পাল্টে দিলেই তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকার দায় চুকে যায় না। বাতাস থেকে অক্সিজেন পৃথক করে তার গুণাগুণ প্রথম বিশ্লেষণ আমরা করিনি। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের নানা শাখাতেই গোড়াপত্তনের কাজে আমাদের হাত লাগাবার সুযোগ ছিল না। বিজ্ঞানের হালের মূলধনে তাই পাশ্চাত্ত্য টাঁকশালের ছাপ। তাতে দুঃখ বা লজ্জা পাবার কিছু নেই, রাগ করবারও। সার কথা যদি বুঝি তাহলে তা এই যে সাহিত্যশিল্প জ্ঞানবিজ্ঞান এদেশ ওদেশ কারুর নয়, তা চিরকালের সমস্ত মানুষের। যেখানে যে যা দিচ্ছে সব জমা হচ্ছে সর্বজনীন ভাঁড়ারে। কয়েক শতাব্দী আমরা চাঁদা কিছু যদি না দিতে পেরে থাকি, এখন দিচ্ছি ও ভবিষ্যতে দেব। এককালে মনে রাখবার মত কিছু দিয়েছিও। আর সব কিছুর কথা বাদ দিয়ে শুধু শূন্য যা দিয়েছি তার ওপর সভ্যতার জটিল বিশাল সৌধ দাঁড়িয়ে। দেওয়া নেওয়ার এই হিসাবই আসলে নিরর্থক। দেওয়ার দম্ভ যেমন অসার নেওয়ার সংকোচও তেমনি যুক্তিহীন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মত এ যুগের যা চলতি মুদ্রা তার বিশ্বজনীন ব্যবহারের সুযোগ না নিয়ে তা অকারণে নিজের ভাষায় গলিয়ে ঢালা মূঢ়তার চরম ছাড়া কিছু নয়। বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে বদ্ধ গোঁড়ারা সেই পথেই না আমাদের টেনে নিয়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দি সাহিত্যে উর্দুর ছোঁয়াচ থেকে শুদ্ধ করার শুচিবাইগ্রস্তেরা ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ কিভাবে রোধ করতে মত্ত তা দেখছি। বাংলায় তাদের ধর্মভাইদের সম্বন্ধে গোড়া থেকেই তাই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বহুকাল আগে স্বদেশী যুগের আন্দোলনকে ভিত্তি করে লেখা একটি নাটক পড়েছিলাম মনে আছে। তাতে একটি দৃশ্যের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে যে প্রচণ্ড করতালির তুফান উঠত তা স্বকর্ণে শোনবার সৌভাগ্য না হলেও অনায়াসে অনুমান করে নিতে পারি। দৃশ্যটি যতদূর মনে পড়ছে এই রকম:—বিদেশী বর্জন সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর আশ্রিতা একটি ঈষৎ জড়বুদ্ধি ছোট মেয়ের কথায় অকস্মাৎ চৈতন্যলাভ করে স্বদেশী ব্রতের মর্ম বুঝলেন। সেই ছোট মেয়েটি বাজার থেকে, বাড়ির পরিচারিকা বিলিতি বেগুন কিনে এনেছে বলে একেবারে কেঁদে-কেটে আকুল। তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েই কোন একজন ক্ষুদে প্রচারক উক্ত সংশয়ীকে চরম লজ্জা দিলেন। মূঢ় অবোধ একটা ছোট মেয়ে শুধু বিলিতি শব্দটা বেগুনের সংগে যুক্ত থাকায় যদি এমন বিক্ষুব্ধ অস্থির হতে পারে, তাহলে তাঁর কর্তব্য যে কি তা বুঝতে ভদ্রলোকের আর বিলম্ব হল না।

সামান্য একটা কথার ইঙ্গিতে জীবনের মোড় একেবারে ফিরে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয় নিশ্চয়ই। কিংবদন্তীতে ও ভাবালু নাটকে তা বেশ উপভোগ্যই হয়। 'বেলা গেল বাসনা ফেলবি না?' এই কথা কটির গূঢ় ইঙ্গিতে বিষয়মদে মত্ত কে কবে এক বস্ত্রে সংসার ছেড়ে চলে গেছে শুনতে সময় বিশেষে আমাদের ভালোই লাগে।

কিন্তু ওই মূঢ় অবোধ মেয়েটির বাতুল বিক্ষোভকে নাটকীয় মহিমা দেবার চেষ্টায় কি একটা অস্বস্তিবোধ করেছিলাম নাটকটি সেই প্রথম পড়বার সময়েই। কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে স্বদেশীয়ানাকে শুধু বাহ্যিক মূঢ় ভাবালুতার বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই দেখবার চেষ্টা হচ্ছে।

এতদিন বাদে বাংলা ইংরাজি হিন্দির স্বপক্ষে-বিপক্ষে উত্তেজনাময় তর্ক-বিতর্ক শুনে সেই অস্বস্তি ও সন্দেহই আবার জাগছে।

বাংলাভাষাকে যুক্তিযুক্তভাবে শিক্ষার বাহন অবশ্যই করা উচিত, কিন্তু সেই সংগে ইংরাজিকে যাঁরা পায়ে ঠেলতে চাইছেন তাঁরা যেন সেই মূঢ় বালিকার বিলিতি বেগুন মার্কা বিচারবুদ্ধিই এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন।

আজকের দিনে একদিকে যেমন দেশ আরেকদিকে তেমনি বিশ্বের সংগে যোগ আমাদের না রাখলে নয়। পাশ্চাত্ত্য যে সব দেশ বহুকাল ধরে স্বাধীন ও যে দেশে স্থানীয় নিজস্ব ভাষা যথেষ্ট অগ্রসর, সেখানেও অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা একাধিক ভাষা স্বেচ্ছায় শিখে থাকে। নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষা বাদে বিশ্বের সংগে স্বচ্ছন্দে ভাববিনিময়ের জন্যে আরেকটি পাশ্চাত্ত্য ভাষার ওপর দখল আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সে হিসাবে ইংরাজির চেয়ে সব দিক দিয়ে এমন উপযোগী বিদেশীভাষা আমরা পাচ্ছি কোথায়? বিশেষ করে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সে ভাষার প্রবাহের খাত সমস্ত দেশময় এখনো যখন খনন করাই রয়েছে। পরাধীনতার তিক্ত স্মৃতি তার সংগে জড়িত বলে আজ যদি এ ভাষাকে অস্পৃশ্য করতে চাই তাহলে আজকের দিনের স্বাধীনতাকেই ছোট ও তুচ্ছ করা হবে। ইংরেজের অধীন থাকবার সময় ইংরাজি বর্জনের অভিলাষের যদি বা কিছু যৌক্তিকতা ছিল আজ আর তা নেই। অধীনতার শাপে আমাদের একটি বর হয়েছে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত এই ইংরাজি ভাষার বাতায়ন। আর যেখানে যা হয় হোক ভারতবর্ষের এ যুগের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বাতায়ন যেন খণ্ডদৃষ্টির মূঢ়তায় রুদ্ধ না হয়।

গরম পড়ার সরকারী তারিখটা ঠিক জানি না, কিন্তু ট্রামের পাখা চালু দেখে বুঝলাম সে তারিখ এসে গেছে। গরমটা অবশ্য সরকারী তারিখ জেনে কি ট্রামের পাখা ঘুরতে দেখে বোঝবার দরকার হয় না। আকাশে বাতাসে শরীরে মনে তার বার্তা আপনা থেকেই আসে।

সকলের কথা জানি না, কিন্তু আমার মত কারুর কারুর কাছে এই প্রথম গরমপড়ার একটি বিশেষ স্বাদ বোধহয় আছে। কুয়াশার দিন গত, দেবদারুর পর আরো

ধোঁয়ায় মলিন করে ফেলল। সেদিন শহরের একটি রাস্তায় শিমুলের রক্তিম কটাক্ষ দেখেছি, নির্লজ্জ কামনার উগ্রতার সঙ্গে নিষ্পাপ সারল্য যেন মেশানো।

শুধু এ সব নয় শরীরে মনে একটি ঈষৎ দাহ মিশ্রিত অবসাদের অস্ফুট অনুভূতিই গ্রীষ্মের প্রথম সূচনাকে চিহ্নিত করে দেয়।

এই গ্রীষ্ম পরে যে রুদ্ররূপ নেবেন তার কথা যথাসময়ে ভাবা যাবে। কিন্তু আপাতত এই নাতিউষ্ণ আবহাওয়ার স্বাদটুকু উপেক্ষা করবার নয়।

এ স্বাদকে ঠিক মধুর বলব না, শীতের শেষের স্বাচ্ছন্দ্যটুকুর বদলে অল্পবিস্তর শারীরিক অস্বস্তিই এর মধ্যে বর্তমান। কিন্তু সেই সঙ্গে অবসাদের যে আভাসটুকু আছে নিতান্ত বিবেকপীড়িত কর্তব্যপরায়ণ না হলে তা উপভোগ্য।

গা এলিয়ে দিয়ে একটু অলস হবার, কাজে একটু-আধটু শৈথিল্য করবার কুমন্ত্রণা যেন প্রকৃতিই কানে কানে এসময়ে আমাদের দেয়। যারা সে মন্ত্রণায় ভোলে না তারা মহৎ কিন্তু যাদের মনোবল অত বিপুল নয় তাদেরও খুব দোষ দিতে পারি কি?

জাতীয় চরিত্র গঠনে আবহাওয়ার দান নিয়ে পণ্ডিতেরা কতদূর গবেষণা করেছেন জানি না, তবে শুধু আমাদের মত দু'চারজন দুর্বলচিত্তের কানে নয়, উষ্ণমণ্ডলের সমস্ত দেশের কানেই প্রকৃতি এই একটু গা এলাবার মন্ত্রণা দেয় বলেই মনে হয়।

দেশের সামনে আমাদের অনেক কাজ। সে কাজে গাফিলি করবার ওকালতি অবশ্যই করছি না। কিন্তু পৃথিবীময় বড় বড় দেশ ও রাষ্ট্রের অবিরাম ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ঝাঁপ দেখে এক এক সময়ে ক্ষীণ একটা সংশয় মনে যে জাগে তা অস্বীকার করতে পারব না। ধরণীকে সুজলা সুফলা করতে অন্নবস্ত্রের অভাব মিটিয়ে মানুষকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিরোগ করতে যা খাটবার খাটতেই হবে কিন্তু ছোটার নেশায় লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়ার মত, কাজের উন্মাদনায় ছুটির মানে ভুলে যাওয়ার বিপদ কি কোথাও উঁকি দিচ্ছে না? ঘণ্টা ধরা কাজ ও ছুটির হিসাব করছি না। হপ্তায় পাঁচদিন কাজ করে দুদিন যে দেশে ছুটি মেলে সেখানেও ছুটিটা ঠিক অহেতুক আলস্যে এলানো নয়, কাজের চাকাতেই যেন বাঁধা। হয়ত সেটাই সঙ্গত। পৃথিবীজোড়া কাজের চাকা যেদিন মসৃণভাবে আবর্তিত হবে সমস্ত মানুষের জীবনকে জড়িয়ে সেইদিনই সম্ভবত মানব সভ্যতার পরম সার্থকতা। তবু নিজের চরিত্র দোষেই হয়ত, কখনো কখনো মনে হয় প্রথম গ্রীষ্মের নাতিতপ্ত বাতাসে আমাদের মত দেশে প্রকৃতির যে কুমন্ত্রণা আছে তা শুনে ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততার মাঝে একটু-আধটু আনমনা হবার অবসর রাখলে সভ্যতার খুব বেশী লোকসান বোধহয় হ'ত না।

সময় সাহিত্য আলোচনা

দুই বসন্তে

শংখ ঘোষ

(১)

মাঝখানে অনেকদিন আমরা সৌম্য আয়তনের চতুর্ধারে ঘুরেছি, মনোরম উদ্যানে কিংবা পথের ধুলোয়। কখনো শৌখিন অবসর, কখনো চতুর বক্রতা, কখনো প্রমত্ত আহ্বান, কচিৎ-বা ছিন্ন রক্তপাতে ভরে গিয়েছে কবিতা। এর মধ্যে একরকম তৃপ্তি ছিলো হয়তো, যাকে বলা যায় ছোটো ছোটো সম্পূর্ণতার তৃপ্তি। কেননা কবিতার জগৎকে মাঝখানে অনেক-

[গত ২৩ ডিসেম্বর, ৮ম সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅশ্রুকুমার শিকদার লিখিত 'এক বর্ষকালের সাহিত্য প্রবন্ধ' শীর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত রচনার ভূমিকায় আমরা জানিয়েছিলাম যে, 'সময় সাহিত্য আলোচনা'—এই পর্যায়ে গত এক বছরের প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ করা হবে। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় আলোচনা প্রকাশিত হল। ছোটগল্প সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে পাঠকদের কাছ থেকে সুচিন্তিত আলোচনা পেলে প্রকাশ করা হবে। —সম্পাদক, দেশ]

দিন দেখেছি বহির্জীবনে ঘূর্ণ্যমান, বহির্জীবনের রূপে অথবা তার রূপহীনতায়, যেন সে জীবন-নামক আদিম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশের পথ ভুলে গিয়েছে।

কিন্তু এখন, বিগত কয়েক বছরে, কবিরা যেন আবার একটি দুঃসাহসী অনুপ্রবেশে প্রস্তুত, অন্তত অনেক কবি, যাঁরা কেবল এই কারণেই আর্ত বিচলিত যে অরণ্যের বাইরে আর নন তাঁরা, এখন তাঁরা রহস্যের মধ্যে যেন প্রবিষ্ট। আর অনভ্যস্ত এই প্রবেশের প্রথম অভিঘাত তাঁদের ঈষৎ বিভ্রান্ত করে দেবে এ হয়তো স্বাভাবিক, তবু তাদের দিশা হারানো আর দিশা নির্ণয়ের প্রবল পদক্ষেপগুলি এক নূতন আয়োজন সৃষ্টি করেছে সাম্প্রতিক কবিতায়। সংগ্রাম ও আশার পর্যায়ক্রমিক উচ্চারণে এতোদিন যাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন, আজ তাঁরাও খুঁজে বেড়াচ্ছেন শুধু নিজেদেরই মুখ।

তাই আজ কোন্ মশালে পথ চেনা যাবে তা নিয়ে ভাবনার শেষ নেই। অথবা মশাল একটু শক্ত শব্দ কি না তাই-বা কে জানে। মশালে কি পুড়ে যাবে সব? এই শুনে কেউ কেউ হা হা করে হেসে ওঠে, বলে, পথ তো কিছু নেই, এই জ্বলুনিটুই সত্যি। কোথা থেকে তুমি কোথায় যাবে? একটা প্রবল আলোড়ন ঘূর্ণিত করে তারা মশাল হাতে হারিয়ে যেতে চায়। সেই আলোতে পরস্পরের মুখে উল্কির ছায়া দেখে বিবর্ণ হয়ে যায় কেউ, ভ্রান্ত ক্লান্ত শুয়ে থাকে কোনো বন্যলতার পাশে, স্মৃতির হাহাকারে কাঁপে। কেউ-বা বলে, এই তো পথ, এই তো আলো—তারা প্রদীপ আড়াল করে স্থির পায়ে লক্ষ্যে চলে যাবে।

আজ এই মুহূর্তের কবিতায় এই তিনটি ছবি আমাদের চোখের সামনে আলোকিত হয়ে উঠেছে, পরস্পরের ব্যবধানে তিনটি স্বতন্ত্র ছবি। আর মনে হয় এই কারণেই আমরা এ-এক বছরে অনেক কবিতা পড়লুম যাকে বলা যা[illegible] পারস্পরিক কবিতা, যেন বচন-প্রতিবচন যেন কবিরা আজ তাঁদের নিজ-নিজ শিল্পাদর্শের উচ্চারিত ঘোষণায় উন্মুখ জীবনের গভীর থেকে সেই শিল্পাদর্শকে আজ তাঁরা নির্যাস করে তুলে আনতে চান আদর্শকে মূলতলে রেখে তার থেকে উদ্ভিদের মতো বেরিয়ে আসবে সজী[illegible] অভিজ্ঞতা. কবিতার পক্ষে এইটেই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু তবু যে আজ কবির শিল্পাদর্শের ঘোষণায় মুখর, তাঁদে[illegible] নেপথ্যের মুখ পরস্পরকে দেখতে দিতে এতো যে আজ সম্মত তাঁরা, তা হয়তো অকারণ নয়। এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে অতিক্রান্ত হয়ে আসবার মহূর্তে এ[illegible] পারস্পরিক মুখাবলোকনই হয়তো আ[illegible] প্রয়োজন ছিলো।

আর আয়তনগত এই পরিবর্তনের মু[illegible] দাঁড়িয়েই বাঙলা কবিতা আরেকবার ত[illegible] স্পষ্টবাচিতাকে অতিক্রম করে এক দ্ব্যর্থ[illegible] বা অ্যাম্বিগুইটির দিকে আজ স[illegible] এসেছে।

(২)

এই এক বছরের কবিতায় সবচেয়ে লক্ষ্যগোচর ছিলেন তিন তরুণ কবি : শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এই নাম-গুলি কবিতাপাঠকের মনে পড়ে এ-জন্যে নয় যে এ'রা সবচেয়ে বেশি লিখেছেন অথবা সবচেয়ে ভালো (কেননা ভালো-মন্দের বিচার—বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে—জনে জনে বড়োই ভিন্ন), মনে পড়ে এই জন্যে যে অতি তীব্র দ্যুতিতে বাঙলা কবিতার ইতিহাসে এই তাঁরা অধিকার অর্জন করে নিলেন। সম্ভবত সেইজন্যেই এ'রা একই সঙ্গে আজ সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত ও আক্রান্ত।

'তোমারে শাসাতে আমি বাদে/এগিয়ে আসে না কেউ' বলে সমস্ত চূর্ণ করে দিতে যেন এগিয়ে আসেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কেননা 'আমি মুক্তি মানে বুঝি/তোমার বুকের 'পরে বসে থাকা: গায়ে থাবা গুঁজি/তোমারে জাগাতে যেন কুমোরের মতন গম্বুজে।' এই তাঁর শিল্পের অভিজ্ঞতা, এই এক স্পর্ধিত ভয়ঙ্করতার মধ্যে উন্মত্ত ছুটে যাওয়াতেই তাঁর বিশ্বাস। বস্তুত তিনি বিশ্বাসবিহীন নন, এক মহাসর্বনাশেই তাঁর বিশ্বাস, ও-ই তাঁর অরণ্যের ছবি। বিশ্বাসহীনতার এই ভয়াল বিশ্বাসে শক্তি এখন আর একাকী নন, সাম্প্রতিক কবিতার একটি ধারাই এই বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হয়ে উঠেছে, 'নামহীন আঁধারে অস্তিত্বভ্রষ্ট।'

কিন্তু সুনীল আছেন এক আততায়ী জগতে, যেখানে থাকার অভিপ্রায় তাঁর নয়। ভ্রষ্ট অস্তিত্বের ঐ নির্মমতা থেকে মুক্তি নেই এই তিনি জানেন, অথচ 'যেখানে রূপ গেল সব রূপান্তরে', মাঝে মাঝে সাধ যায় সেখানে যাবার। তাঁর রচনা বিদায়ের, স্মৃতির, প্রত্যাখ্যানের, আত্মপীড়নের। তাঁর 'চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি বিদায় বিদায় বিদায়' কেননা কিছুতেই শেষ পর্যন্ত অস্তি-তে 'পৌঁছনো যাবে না'—মেফিস্টোফিলিস কেবলই দ্রুত ছুটে এসে জানিয়ে দেবে 'এক-পা উপরে গেলে বাঁ হাতের উল্টোপিঠে মারব তোকে বিষম তুফান!' তারপরেই আর্ত পতন। আর এই পতনের কাছে নত ভাঙা বেদনার জন্যেই কি তাঁর কবিতায় শয়নের চিত্র এতো ফিরে ফিরে আসে? অস্তি ও নেতির সংগ্রামজাত এই যে পীড়ন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় এক রক্তাভার সৃষ্টি করেছে, সেই লক্ষণও আজ আর বিচ্ছিন্ন চিহ্ন নয়, বরং এই বেদনাই আমরা এখন সবচেয়ে বেশি বিকীর্ণ দেখতে পাচ্ছি কবিতাজগতের চতুর্দিকে।

আর অন্য দিকে আছেন অলোকরঞ্জন। কোনো মেফিস্টোফিলিস তাঁর সিঁড়িকে রুদ্ধ করে দাঁড়াতে পারে না, কেননা যৌবন-বাউল এই কবি 'বুকের ভিতরে গন্ধরাজ' লুকিয়ে রাখতে পেরেছেন, তাঁর ঈশ্বরের প্রতি এই অমোঘ প্রার্থনা উচ্চারণ করতে পেরেছেন 'এই দেখো করপুটে একটি গণ্ডুষ/বিশ্বাসের জল, তুমি পান করো, আমি জল না খেয়ে মরব।' যখন 'ধিকিধিকি সন্দেহের আগুনে শহর/জনলে যায়' এই কবি তখন দুঃখ-আস্বাদের অন্য অর্থ খুঁজে পান, শুধু পরিশুদ্ধ হয়ে যেতে চান ঐশ্বরিক অসন্তোষে, প্রেমে। কিন্তু সেজন্যে এমন মনে করা ভুল যে পরিপার্শ্বকে উপেক্ষা করেন তিনি, বরং তাঁরই কবিতার চিত্রমালায় সবচেয়ে বেশি প্রকীর্ণ দেখতে পাই সর্বাবয়ব বাঙলাদেশ, 'সমস্ত আকাশ যেন মুখরিত সাজ্জাদ হোসেন' থেকে শুরু করে 'বুকজল নৌকোর গলুই' পর্যন্ত ভেসে আসে তাঁর রচনায়। বাঙলা [illegible]

সৌন্দর্যে উন্নীত করে নেবার মন্ত্র তিনি জেনেছেন, চতুর্দিকের সর্বনাশের মধ্যেও 'অটুট আলীঢ় ভঙ্গীতে' তাঁর সূর্যেক্ষাকে দেখতে পান তিনি। 'কবিতার সূচনা আনন্দে আর পরিণাম প্রজ্ঞায়' ফ্রস্ট-কথিত কবিতার এই সূত্রটিও তাঁর রচনা প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আমাদের। কিন্তু আনন্দ ও প্রজ্ঞার এই পথ দুরূহ, পথ আর সেইজন্যেই হয়তো অলোকরঞ্জনের কবিতাকে আজ এক শুদ্ধ ব্যতিক্রম বলে মনে হয়।

শুদ্ধতার এই সূত্রে দ্বিতীয় একটি নাম মনে পড়ে, আলোক সরকার। এই এক অনতিলক্ষ্য কবি, খুব নিভৃত উচ্চারণে তাঁর ভালোবাসার জগৎ রচনা করে যান, 'সমস্ত গোধূলিবেলা একই কথা' বলে যেন প্রণয়িনীরা তাঁর কবিতায় ধীর পায়ে চলে যায়। আলোকের কবিতাবলী যেন ভিন্ন ভিন্ন কবিতাই নয়, তাঁর সব রচনাই যেন এক বড়ো রচনার অন্তর্গত, যা ক্রমাগতই রচিত হয়ে চলেছে এক ধূসর বর্ণে। প্রকৃতির ছবি সেখানে ফিরে ফিরে আসে যেন ধূসর কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা, আর তাঁর শব্দ-ব্যবহারের এক আপন-রীতিও তাঁকে এক গোপন আবরণের মধ্যে রেখে দেয়, যেন তাঁর কবিতা সকলের সামনে আসবার জন্যেই নয়!

(৩)

একাগ্রকল্পনা ও স্পষ্টচরিত্র এই কবিদের উল্লেখ প্রথমেই করেছি সাম্প্রতিক কবিতার কয়েকটি ধারানির্দেশ নেবার জন্যে। এই নির্দেশ, ঈষৎ পরোক্ষরূপে, সেই কবিদেরও মধ্যে আজ পাওয়া যায়, চল্লিশের কবি নামে একদিন যাঁরা চিহ্নিত ছিলেন। তবু এঁদের কথা পরে ভাবছি এইজন্যে যে এঁরা অনেকেই এই পরিণতিতে এসে পৌঁচেছেন দীর্ঘ ও ক্রমিক পরিবর্তনের সূত্রে।

তাঁর নীল নির্জন থেকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অতিক্রান্ত এখন, সেই নীল এখন সরে গেছে পিতামহের যুগে, অর্ধ-স্বপ্নিল রোমাঞ্চজগৎ এখন আর তাঁকে আবিষ্ট করে না। 'অপ্রেমকে প্রেম বানাবার খেলা'ই কবিতার কেন্দ্র, এই আশ্বাস এখনো তাঁর আছে, তথাপি মনে হয় যে খুব সম্প্রতি অপ্রেমই তাঁর কবিতার দেহ। তাঁর উপাদান, কিন্তু লক্ষ্য নয়। 'আসলে প্রত্যেকে ওরা শিকারী জন্তুর/স্থির প্রতীক্ষায় আছে' এই অনুভাবনা এখন তাঁর 'মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে' 'রক্ত খাচ্ছে মাংস খাচ্ছে।' কবি যদিও বলেন 'আমি তোদের শবদেহের উপর দাঁড়াতে চাই' তবু এখনো পরিবেশ বিকল, চতুর্দিকে সবাই 'শূনে হি হি করে হাসতে' থাকে। এ-ও অবশ্য এক অন্ধকার, তবে কবির পরিবর্তন এখানে চরিত্রে ততো নয়, [illegible] কিন্তু জাত নয়, যা আরো গভীরমূলে, 'রাত্রি হলে একা একা পৃথিবীর ভিতর বাড়িতে' গেলে অস্তিত্বের যে 'খরস্রোত অন্ধকারে' পৌঁছনো যায়, একেবারে পরিণামে কবিকে তারই রহস্যে বিহ্বল দেখে মনে হয়, এখন যে পরিবর্তন আসন্ন তা চরিত্রগত, কেবলই পরিবেশগত নয়।

এই ভিতরবাড়ির অন্ধকার বা প্রেম-অপ্রেমের বিরোধ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও প্রবহমান। তবে এই কবির চিন্তা সেই সঙ্গে সমাজদৈহিক বিক্ষোভ এবং সাময়িক উত্তাপে সমান আক্রান্ত। 'অন্ধকারে তুমি প্রশ্ন রাখো—মানবতা স্বপ্ন শুচি' এই প্রশ্নে তিনি অনেকেরই সঙ্গে এক, কিন্তু তারপরেই 'ক্ষুধার মিছিলে তাই কান্নার মিছিলে আজ রুচি' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশের কবিতার একটা সহজ উত্তর আমরা শুনতে পাই। এই রুচি থেকেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় কতোগুলি বিরোধী বৃত্তি শিলষ্ট হয়েছে মনে হয়, ভিন্ন মানসিকতার তীব্র আবেগে যার জন্ম। তিনি চঞ্চল, তপ্ত, আর তাঁর এই তাপ ও চাঞ্চল্যের ঠিক পাশে অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতাকে মনে হয় অতিশয় সুস্থিত, নিশ্চিত, 'আমি সুখী রাজপুত্র/বিম্ববতী আমার ঘরণী।/না, আমি কোথাও যাব না।'

কিন্তু বাস্তবিকই যিনি কোথাও যাননি তিনি অরুণ সরকার। এই কবি তাঁর শৌখিন আচরণে চিরকাল বিস্মিত রাখলেন তাঁর পাঠককে! কখনোই তিনি বেশি লেখেন না, একরকম চতুরভাষণের দ্বারা নিজেকে তিনি আবৃত করে রাখতে চান বলে মনে হয়। মনে হয় শিল্পের কোনো নিভৃত মূর্তি তাঁর সাধনায় আছে, এমন-কি কবিতাতেও তাকে লোকগোচর করতে তিনি প্রস্তুত নন, আর ওদেরও বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি, যাঁদের 'শুধু দেখতে আসা, ভাসতে আসা নয়।'

শেষোক্ত ঐ দুই কবি পরিবর্তমান নন। কিন্তু প্রায় সমকালীন আর এক উল্লেখনীয় কবি রাম বসুর সাম্প্রতিক চারিত্র বিশেষ পরিবর্তিত মনে হয়। সতেজ সজীব চিত্র-

নির্মাণে এ-কবি প্রথমাবধি পারঙ্গম, কিন্তু অনেকদিন তাঁর এই শক্তির ব্যবহার ছিলো বাণীঘোষণায় অর্পিত। একরকম জীবন-বিশ্বাসের দৃঢ়তা থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, কিন্তু আত্ম-আবিষ্কারের উল্টো-পথে তাঁর রচনায় এখন ভগ্ন-বেদনার সঞ্চার দেখতে পাই। আলোকিত পথ থেকে সরে এসে এখন যেন তিনি গুহার ভিতরে বন্দী, 'আমার দুচোখ নষ্ট/প্রেমহীন বুকটা পাথর, গা ঘেঁসে কয়েকটা জন্তু।' এখন 'হয়তো মৃত্যুর চোখে একবার আপনাকে চিনি।'

কেবল রাম বসুই নন। একদিন যাঁরা স্বপ্ননির্মাণে বিহ্বল ছিলেন আজ তাঁরা আহত আর্তনাদের জগতে প্রবেশ করেছেন, এ যেমন এক দিক, অন্য দিকে তেমনি সমাজনৈতিক প্রত্যয়শীল কবিরাও আজ প্রত্যয়হীন ভূভাগের পরিবেশে আক্রান্ত, সুলভ তৃপ্তি কারোরই আর আয়ত্তে নেই। মণীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন,—কারোরই না। সমবেত এই চরিত্রান্তর-প্রয়াস আমাদের স্পষ্টভাবে এইটেই মনে করিয়ে দেয় যে কবিতা আজ স্বতন্ত্র গোত্রে প্রতিষ্ঠাকামী।

(৪)

অবশ্য এই নতুন জগতের চিত্র সর্বব্যাপী নয়। স্বভাবতই, যাঁরা প্রবীণতর তাঁরা তাঁদের অভ্যস্ত নির্মিত জগৎ থেকে বাইরে সরে আসেন নি, কেন-ই বা আসবেন! বুদ্ধদেব বসু অনেকদিন নীরব, নতুবা আর সকলেই প্রায় রচনারত। কিন্তু এঁরা প্রায় সকলেই—বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত—সকলেই এখন রচিতরচনে তৃপ্ত। এঁদের সাম্প্রতিক রচনাবলীতে এমন লক্ষণ কমই চোখে পড়ে যা তাঁরা ইতিপূর্বেই আয়ত্ত করেন নি, যার দ্বারা ইতিমধ্যেই বাঙলা কবিতায় তাঁরা প্রভূত প্রিয়তা অর্জন করেন নি।

বহিরঙ্গ পরিবর্তন অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল অরুণ মিত্রের রচনায় এবং আজও যদিও সমাজকল্যাণের দ্রাঢ়িষ্ঠ কোনো আদর্শের মৃত্তিকায় তাঁর স্থিতি, তবু সেখানে যে শস্য ফলে উঠছে তা ক্রমেই মূল থেকে ঊর্ধ্ববর্তী, স্নিগ্ধ আলোকসঞ্চিত। আজ তাঁর গদ্যকাগুলির বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যছবি নির্মাণে 'যেন কেউ নতুন ঘনিষ্ঠতার দিকে ঠোঁট খুলেছে।'

কিন্তু লেখেন নি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর এই নীরবতাকে বরং তাৎপর্যময় বলে মনে হয়। এমন এক সময়ে এসে চুপ করলেন তিনি যখন তাঁর রচনায় কবিতা আর গদ্যের সীমারেখাটি প্রায় মিলিয়ে আসছিল, আরো একবার চিন্তা করবার অবকাশ তৈরি হচ্ছিল, কোথায় এর সত্যিকার প্রভেদ। গদ্যরচনাতেই যে নকশার তুলি আছে তাঁর হাতে, এখন তিনি সেইটেকেই তুলে নেবেন বলে কি তাঁর কবিতায় এই বিরতি? অথবা এ বিরাম ক্ষণকালীন? হয়তো এর উত্তর মিলবে আরো কিছু অপেক্ষার পর।

লেখেন নি মঙ্গলাচরণ। তরুণতরদের মধ্যে প্রায় লিখছেন না অরবিন্দ গুহ। কিন্তু তাঁর কবিতার যে একরকম থমলঘু চলন ছিলো, এখন সেই ভূমিকার অনেকটা যেন অধিকার করে আছেন তারাপদ রায়, যাঁর কবিতার বড়ো আকর্ষণই লঘু চালে। সম্প্রতি মানস রায়চৌধুরীর কবিতাতেও অনুরূপ বাঁকা বিদ্রূপ বা নাটকীয় কথন-রীতি দেখা দিচ্ছে। অন্য দিকে আছে দিলীপ রায়ের বক্রচতুর ভঙ্গরচনা। এই সব কবিতার তপ্ত স্বাদ পাঠকের সঙ্গে কবিতার একটা সহজ যোগ রচনা করতে পারবে বলে মনে হয়, মনে হয় চমৎকারিত্বের প্রতি কবিদের এই উন্মুখতা পাঠকের কাছে একজাতীয় তৃপ্তি নিয়ে আসে।

(৫)

তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, পাঠকের কাছে কবিতা আজ আবার দুর্বোধ্যতার অভিশাপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। [illegible]
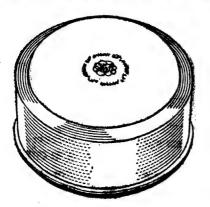
কিন্তু এইটেই একমাত্র কারণ এমন নয়। ত্রিশের কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে না, অনেক সময়ে কবিতার শারীরিক পরিবর্তনও এতোটা চোখে পড়ে। পুরাতন ইজম্-এর নূতন আক্রমণে ইমেজিজম, সিম্বলিজম, সুরিয়ালিজম অথবা এর এক অপুষ্ট পারস্পরিক মিশ্রণে কবিতাদেহ এখন নিতান্ত জটিল। পাঠকের পক্ষে হয়তো তাই আজ আরো সতর্কতা প্রয়োজন। কিন্তু এতো সতর্কতাই বা কেন? এই ভেবে অভিমানে চলে যান তাঁরা—আর তারই ফলে মনে হয় বাঙলা কবিতা অচিরেই আবার তার পাঠক হারাবে।

কিন্তু কবি তার জন্যে কী করতে পারেন? হয়তো তিনি ডে-লুইসের প্রতিধ্বনি করে বলবেন, 'আমরা বোঝাবার জন্যে লিখি না, লিখি বুঝবার জন্যে। অভিজ্ঞতার ঘোষণা নয়, অভিজ্ঞতার নির্মাণই যেখানে কবিতার উপজীব্য, সেখানে কবি হয়তো কিছু পরিমাণে পাঠক হারাবার জন্যেও প্রস্তুত হতে থাকেন। অতএব এই এক বছর যদি পাঠকের একাংশকে ক্লান্ত করে দিয়ে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেও থাকে, তবু কবির সেই একটা লক্ষ্যের কথা আমরা মনে ভাবতে পারি, আত্ম-উদ্ঘাটনের লক্ষ্য।

এই লক্ষণাবলী সাম্প্রতিক প্রায় সকল কবির মধ্যেই প্রশ্রয় পাচ্ছে, যে-কবিদের উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি তাঁদের রচনা থেকেও এর উদাহরণ দেখানো চলে। তথাপি এ-প্রসঙ্গে অন্য কয়েকজন—সিদ্ধেশ্বর সেন, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বা উৎপলকুমার বসু প্রমুখ কবিদের চিন্তা করা যেতে পারে।

'ভাসমান মায়াবী প্লাবনে/খণ্ড খণ্ড উজ্জ্বলতা লয়ে যায় বিপুল আঁধার/তন্ময় দৃশ্যের দিকে'—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের এই উল্লেখটি যেন এই সব কবিতার যথার্থ পরিচয়। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের যোজনা, বিশেষত উক্ত কবির ক্ষেত্রে, অবিরল স্বপ্নচারিতার মধ্যে যেন চলে আসে, তাঁর রচনার বিন্দুসমবায় হয়তো সে-কারণেও অপরিহার্য। ঠিক তেমনি সিদ্ধেশ্বর সেনের ভাঙা-ভাঙা লাইনগুলি কেবল চিত্রপরম্পরায় গ্রথিত, যতিহীন, উচ্ছল তার প্রবাহ। অন্যপক্ষে তরুণ সান্যাল ব্যবহার করেন পুঙ্খগঠিত প্রথানুগত কাব্যপংক্তি, কিন্তু সেই কারণেই যতিচিহ্নের, বিশেষত কমার ব্যবহার, তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে প্রধান অবলম্বন। এবং এ'দের সকলেরই এই রচনা অবিরল [illegible] থেকে [illegible]

'যতো প্রতিচ্ছবি আজ মূল তরুটির দিকে দৃষ্টি তুলে আছে'—উৎপলকুমার বসুর এই উক্তি মনে পড়ে আর এই কবির দৃষ্টিও তো সেই মূল তরুটির দিকে আবিষ্ট আর সংকেতবাহী তাঁর উচ্চারণ। অথবা এই স্বপ্নাতুর আয়োজন 'নাচায় জ্যোৎস্নার পিণ্ড তাল তাল স্বপ্নের প্রভাবে।/দূরে পড়ে রয় ধ্বনি, সৌরভবিহীন...' (বীরেন্দ্র রক্ষিত)।

চিত্রকল্প ও প্রতীকের দ্বারা, স্বপ্নে প্রভাবের দ্বারা, এই জটিলতা সৃ[illegible] তাঁদেরও কবিতাকে আজ আচ্ছন্ন করেছে একদা যাঁরা রোমাণ্টিক আবিষ্টতায় সহ[illegible] কথা বলতে পারতেন, মায়াবী প্রেমি[illegible] পরিবেশ রচনা অথবা সৌন্দর্যের প্রা[illegible] উদাত্ত বন্দনায় যাঁদের তৃপ্তি ছিলে[illegible] জগন্নাথ চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, সুনীলকুমা[illegible]

অসিতকুমার, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কবি যাঁরা। জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'মহাদিগন্ত' এক স্বতন্ত্র ধরনের প্রয়াস। সুনীলবাবুরও ঈশ্বর এখন 'মাংসল পেশীতে মূর্ত, উৎকণ্ঠার পীড়নে সুন্দর', তাঁরও রচনা এখন জটিলতাকে অঙ্গীকার করে নিল। আর, 'দু-চোখে প্রবল চিত্র' নিয়ে চিত্ত ঘোষ এখন 'অন্তরা' থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন, স্মৃতির অনুষঙ্গ এখন তাঁর কবিতায় বারবার হানা দেয়, আর 'সত্তার শিকড়ে টান লাগে।'

মাত্র উল্লেখিত ঐ কবিরাই নন, এই সব লক্ষণ সর্বত্র পুঞ্জিত। ছবি আর এখন মাত্র অলংকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে আসে না, বরং হয়তো অভিপ্রেত দ্ব্যর্থতা নির্মাণের সহায়ক হয়ে আসে এই চিত্রাবলী কিংবা সুযোগ্য প্রতীক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে অস্পষ্টতার পক্ষে কোনো পঙ্গু যুক্তি হিসেবে এই অ্যামবিগুইটি নামক গুরুতর শব্দ সমসময়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি না। সৎ রচনা অস্পষ্ট হতে পারে বলে অস্পষ্ট রচনা মাত্রেই সঙ্গত নয়—বরং অনেক সময়ে দুর্বলতারই বর্ম হিসেবে এটা একটা ভঙ্গির মতো ব্যবহৃত হতে থাকে, অন্ধ অভ্যাসের মধ্যে। হয়তো এলিয়টের সেই সতর্কবাণীও এখানে স্মরণযোগ্য যে ক্লিষ্টতম কবিতা রচিত হয় তখনই যখন কবি ভাবেন তাঁর মহৎ কোনো দার্শনিক বক্তব্য আছে যদিও বস্তুত তা নেই। এই আত্মছলনার এবং বিকৃত ভানের অবাধ প্রবেশ যে সাম্প্রতিক কবিতাকে প্রভূত পরিমাণে বিপন্ন করে নি এমন কথা কি বলা যায়?

আর তারই জন্যে হয়তো হঠাৎ কোনো ক্লান্ত তরুণ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে 'তুমি প্রতীকের শত্রু' (ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়), বুঝতে পারি এই নির্মিত বিচ্ছিন্ন দুরূহতার বিরুদ্ধে কোথাও একটি অভিমানী প্রতিবাদও সঞ্চিত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

(৬)

একদিকে যেমন এই রীতিমত দুরূহতা, অন্যদিকে তেমনি আছে অনাত্মীয় বিষয়। ঐহিক শোকতাপ, সামাজিক বিবেক, এমন-কি বিশ্বনৈতিক ভাবনার উপস্থাপনেও কাব্যবিষয় পাঠকের আয়ত্তগত হতে পারত সহজে, কিন্তু আত্মঅস্তিত্বের গূঢ়মূল আবিষ্কার, মৃত্যুর বোধ, অসুন্দর শয়তান আর পাপের ধ্যান একদল কবিকে একটি বিচ্ছিন্ন কুঠুরির মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন। এবং ঐ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বিগত বৎসরে বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়র-অনুবাদ প্রকাশকে অন্যতম প্রধান একটি ঘটনারূপে চিহ্নিত করতে হয়। এই কবি স্বয়ং আর কবিতা লেখেন না সেদিক থেকে অনুবাদের মধ্যেই তাঁর রচনাকর্ম হয়তো সজীব রাখতে চান, কিন্তু একমাত্র সেজন্যই এ-গ্রন্থ উল্লেখনীয় নয়। এ-জন্যেও নয় যে অনুবাদকর্মের একটি তুলনা বিরল দৃষ্টান্ত ও-টি। কিন্তু এই প্রকাশটি স্মরণীয় মনে হয় এই কারণে যে বোদলেয়রী-আবহাওয়া বাঙলা কবিতার তরুণতম এক অংশকে এখন আতঙ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাদের প্রধানতম পরিচয় হয়ে উঠেছে। অনেকসময়ে তাকে নয়, হয়তো তা প্রকারান্তরে বুদ্ধদেবেরই নবজাত প্রভাব।

এই বৃত্তের প্রধান একজন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কেশরাশি নেমে যায় নিরুৎসুক গভীর পাতালে' অথবা 'মদ্য মৎস্য মুদ্রা নারী সুমহান্ উচ্ছ্বসিত উজ্জ্বল ফোয়ারা' অন্য এক জগতের চিহ্ন নিয়ে আসে। 'সামনে শঙ্কিত শয্যা, আরো কাছে সেই প্রেমিকার/শায়িত কলঙ্কী দেহ' (চিন্ময় গুহঠাকুরতা), 'মাংসভুক নিষ্ঠুর ভয়াল/শব্দ করে ফাটে খুলি, মজ্জা জ্বলে, ঝরে জলভাগ' (পবিত্র মুখোপাধ্যায়), 'রসনার পূতগন্ধ মালা/ক্রমে যেন দীর্ঘ হয়, বাড়ে' (আশিস্ সান্যাল)—এই সমস্ত অনুভব অনভ্যস্ত পাঠকের মনে একরকম বিরোধিতার সঞ্চার করতেও পারে। অবশ্য এরই সঙ্গে পাশাপাশি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেন্দ্র-র মতো কবিরাও আছেন যাঁরা প্রমত্ত আগুনের মধ্যে নয় কিন্তু বিষণ্ণ নিবিষ্টতার মধ্যে তন্ময় কিংবা প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়ের মতো যাঁরা উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ।

কথাটা এই যে পুরাতনের দিকে আর ফিরে যেতে পারেন না কবিরা, পুরোনো অনুভবে কিংবা পুরোনো আঙ্গিকে। এবং সেইজন্যে নূতন সে-পরিমাণে সর্বত্র স্পষ্ট না হয়ে উঠলেও পুরাতনের প্রতি ধিক্কার সর্বত্রই প্রবল। 'স্তূপ হয়ে রয়েছে পুরোনো ফুলগুলি' 'ভাঙো তারে, চিরে যাক তীক্ষ্ণফলা উজ্জ্বল কুড়ালে' মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই আহ্বান সেই ধিক্কারেরই নির্দেশ। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের উচ্চারণেও শুনি 'ভাঙো, চুরমার করো, যদি ধ্বংসের ভেতরে কোনো ধ্বংসের দেবতা জাগে।' কিন্তু ভাঙবে কে? পুরোনো ফুলের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে নূতন নির্মাণের স্পর্ধা কবিরই স্পর্ধা, কিন্তু নূতন ফুলগুলিও অল্পদিনের মধ্যেই জীর্ণ হয়ে উঠছে না তো?

বস্তুত অনুভবই বলি বা আঙ্গিকই বলি, সে, যেমন নূতনত্ব নিয়ে আসে একদিকে, অন্যদিকে তেমনি তার চতুর্দিকে সঞ্চিত করে তোলে রাশি রাশি বুদ্বুদ। অজস্র রচনা বেরিয়ে আসে যাকে মনে হয় বানিয়ে তোলা, ফেনিয়ে তোলা! 'শব্দের পবিত্র শিখা নিয়ে ঐ অপব্যবহার' (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)—এই বিমূঢ় ধিক্কারও সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয়। বন্দর, মাস্তুল, শিল্প, পাপ; শয়তান এবং নারীদেহ বিষয়ক অনুষঙ্গগুলি তরুণ কবিদের হাতে ইতিমধ্যেই যেন অতিব্যবহারজনিত ক্লিশেতে পরিণত হয়ে চলেছে, একথাও কবিদের [illegible]

কথা নয়, কেননা স্বকীয় ধ্বনির সামর্থ্যে সেই শব্দকেও তিনি স্বতন্ত্র আত্মা হয়তো দিতে পারবেন, কিন্তু প্রথমত সেই স্বকীয়তার অর্জন চাই। নতুবা এই ব্যবহারকে পাঠক ভাববেন একরকম ধূর্ত চতুরতা, কবিতা রচনা একরকম অকারণ অভ্যাস ,আর এই ভেবে পাঠকরা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন ঈর্ষ্যাময়ী কবিতার জগৎ থেকে।

(৭)

হয়তো এই বিচ্ছিন্নতার বোধ কবিদের মধ্যে গোপনে কাজ করছে। অসম্ভব নয় যে তারই এক অচির-প্রতিক্রিয়া-রূপে সাম্প্রতিক কবিতার একটি বহির্লক্ষণ ক্রমেই জায়মান, কাব্যনাট্যের আন্দোলন যার নাম। এই একবছরে প্রকাশিত হয়েছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'প্রথম নায়ক', চারজন কবির এক নাট্যসংকলন 'চার চোখ'। রাম বসু, অলোকরঞ্জন, আলোক সরকার বা জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ইতস্তত পত্রিকায় তাঁদের নাট্যপ্রয়াস প্রকাশ করেছেন। এবং এই একবছরেই কাব্যনাট্য-সংখ্যারূপে বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশ আমরা দেখলাম। ব্যক্তিগত প্রতীক, ছিন্ন চিত্রমালা বা দূরে অবচেতনার আয়োজন থেকে কবিরা এখানে হয়তো একটু দূরে সরে দাঁড়াতে চাইছেন, পাঠক বা শ্রোতা নির্মাণ করতে চাইছেন। কেউ কেউ হয়তো নূতন পথ রচনা করতে চাইছেন কবিতার, ত্রিশের কবিরা একটা অর্বাজিত জগৎ যে পরিত্যাগ করে গেছেন, এই আবিষ্কারের উৎসাহও হয়তো অনেকের গৌণ প্রেরণা। কিন্তু আরো বড়ো কথা এই যে আত্মকেন্দ্র অনুভাবনা থেকে আরো একবার দূরে সরে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়েছে, এমন-কি মেটাফিজিকাল বিষয়েরও বহিরাবরণরূপে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে দূরেরেখাবলম্বিত চরিত্র এবং কাহিনীর।

এই শেষ কথাটি জরুরি। এই জাতীয় দাবিরই এক পরোক্ষ প্রকাশরূপে সম্প্রতি দীর্ঘকাব্য-শ্রেণীর এক ধরনের রচনাও দেখতে পাচ্ছি। জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'মহাদিগন্ত', পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'শবযাত্রা' এ-প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। কিন্তু ,কাব্যনাট্যই বলি বা দীর্ঘ-কাব্যই বলি কাহিনী বা চরিত্রসৃজনের অপরিহার্য এই দাবি না থাকলে ঐ সব লেখা নিতান্ত ব্যসনে পরিণত হতে পারে। তাই বহির্বৈষয়িক প্লটের ভাবনা আমরা ছেড়ে থাকতে পারি না। অর্থাৎ কবিরা যদি নাটকের দিক থেকেই সমস্যাটিকে না ভাবেন তবে এ হয়ে থাকবে কবিতারই এক নূতন প্রকরণ, কাব্যনাট্য-আন্দোলন [illegible] অচিরেই মিলিয়ে যাবে। [illegible] ভূমিকাতে এ-কথা তো [illegible] এই পরীক্ষা [illegible]

আর নীরেন্দ্রনাথ যদিও প্লটেই তাঁর উৎসাহ প্রকাশ করেন কিন্তু অন্তত 'প্রথম নায়কে' তাঁর আদর্শের সিদ্ধি তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। এবং নাটকের এই দাবি ততোক্ষণে প্রতিষ্ঠিতও হবে না যতোক্ষণ না কবিরা কবিতার ভাষা এবং নাটকের ভাষার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে শিখবেন, আর শিখবেন কেমন করে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হয় তাঁর চরিত্রের থেকে। কিন্তু, তাঁরা কি সত্যি সত্যি আজ সেই নাটকীয় তৃতীয় স্বরটি শুনতে পাচ্ছেন?

(৮)

অতীত আমাদের কাছে সবসময়েই উত্তেজক, বর্তমান কেবলই অর্থহীন। কিন্তু এই এক বছরের কবিতা পাঠক হিশেবে আমি তো অন্তত নিছক নৈরাশ্যের কারণ দেখি না। বরং কয়েক বছরের স্পন্দমান পরিক্রমণ এখন এক-একটি নির্দিষ্ট পথ নেবার জন্য আত্মাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে দেখে ভরসাই জাগে। তুচ্ছ কবিতার ছড়াছড়ি আছে, প্রতি যুগেই তা থাকে; গড়ে উঠছে নূতন রকম ক্লিশে বা ম্যানারিজম, সবসময়েই তা ওঠে; দ্বন্দ্ব আছে অস্তি আর নেতির, এ-দ্বন্দ্বও শেষহীন। তবু ঘরে তুলবার মতো ফসল এরই মধ্যে আমরা যা পাই তাতে ভাবীকালের সঞ্চয় কিছুই থাকল না এমন বলা চলে না। তবে কেন উত্তেজনা আসে না? এখনকার নতুন কবিরা কেন আর তেমন তেমন করে আলোড়ন করতে পারেন না আমাদের? কোনো স্থায়ী আলোড়ন, কোনো দিব্য উত্তেজনা? যেমন পারতেন কুড়ি বছর পঁচিশ বছর আগেকার কবিরা?

কিন্তু সত্যি বলতে, সেই চমক কি আর আমরা আশাই করতে পারি? রকেট আর মেগাটনের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কিছুকেই আমরা ঠোঁট বাঁকাতে শিখেছি, সব কিছুই যেন বুঝে নিয়েছি আমরা, সে-অর্থে আলোড়িত আর আমরা কোনো-দিনই হব না। সে আমাদের দুর্ভাগ্য, কবিতার ত্রুটি নয়। এই পরিবর্তমান মুহূর্তে কবিরা প্রায় সকলেই নিজের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, এখনো তাঁরা কিছু আবিষ্কার করতে চাইছেন অথবা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে, ঠিক এই মুহূর্তে কবিতা আর তার পাঠক আশা করতে পারে না। সেই আশা তার দেখা দেবে আরো এক স্তর পেরিয়ে সেইখানে পেঁৗছে, যেখানে কবির আর কোনো স্বতন্ত্র ভূমির দাবি নেই।

× এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সমস্ত কাব্য-নাট্য বিগত এক বছরের রচিত কিংবা প্রকাশিত।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে শিক্ষায় সম্পদে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বরোদা রাজ্য ভারতের অগ্রগামী রাজ্যগুলির অন্যতম ছিল। বর্তমানে বরোদা বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও সর্ববিষয়েই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। আগেকার সামন্ততন্ত্র যুগের কীর্তির অনেক দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে। যেমন সুখী ও স্বাস্থ্যবান ওখানকার অধিবাসীরা তেমনি সাজানো ছবির মতো শহর এবং নয়নবিমোহন প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী।

১। দুধের কলস মাথায় গোয়ালা; ২। প্রমোদ বিহারের জন্য বিখ্যাত সুরসাগর হ্রদ; ৩। লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ; ৪। শস্য ঝাড়াই।

আলোকচিত্রশিল্পী

বীথি সরকার

ঈশ্বর, আমলকী গাছ, কবি......

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বর, আমলকী গাছ, কবি
একটি মেয়ের মুখ......

মাথার ওপর জ্বলছে সপ্তর্ষি ও কালপুরুষ,
ঈশ্বর! আমাকে তুমি আকাশ দিয়েছো।

আমলকী গাছ! আমি অভিজ্ঞতা জ্ঞান মানবতা
এ-সবের চেয়ে আরো কিছু চাই,
আরোগ্যের চেয়ে আরো কিছু চাই, তোমার পায়ের নিচে
যেই মাটি আছে।

কবি! আমি শিশুকাল থেকে
তোমাকে দেখেছি, ক্রুশবিদ্ধ শিশু, প্রেমে হাসো
অপমানে জ্বলো, করুণায়
তুমি এক বহমান নদী। আমি তৃষ্ণা পেলে
তোমার কাছেই যাবো।

মেয়ে! তুমি আমাকে কী দেবে?

মা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শহরতলিতে ফল নিয়ে যায় ছেলে,
কতো নদী কতো সমুদ্র হবে পার,
কতো ছোটো-বড়ো পথের অন্ধকার
পার হবে সাইকেলে।

প্রথমে তো সেই ডাইনীর মেয়েটার
বয়স-কমানো জারিজুরি খুব আছে;
দ্বিতীয় বাঁকের মেয়েটির মন সাদা,
লাগলেও পারে লাগতে ঘরের কাজে;
সব শেষ বাঁকে পৌনে ন'টার কাঁটা,
পার হয়ে যাবে পুত্রবধূর কাছে॥

নায়ক নই

মৃগাঙ্ক রায়

একটি গল্প লিখব আমিই যার নায়ক;
অথচ আমার কৈশোর একলব্যের প্রতীক নয়,
যৌবন অর্জুনের শরবিদ্ধ মহাভারত নয়, অথবা
বৌদ্ধ পরিব্রাজক নই আমি। সামনে প্রবেশের
পথ নেই, পেছনে যে সব মৃত মনীষীরা
আমার মধ্যে উদ্গত হয়েছিল তাদের হেমন্তের
হরিদ্রাভ অন্ধকার। সেখানে গিয়ে তাদের
সাদা হাড়ের অপরিমিত ছায়ার ত্রিকোণে
আমার গল্প জমে উঠবে। একটি গল্প লিখব
আমিই যার নায়ক, কেননা একটি যুক্তির সিদ্ধান্তের প্রত
আমি প্রাক্‌চাতালে পা দিয়েছি॥

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৫৮ ॥

ওঁ

পুরী

কল্যাণীয়াসু,

জনশ্রুতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস করে আমি ঠিক করেছিলুম যে, তুমি গিরিডিতে গেছ, সেখানে ছাত-পিটুনিদের পিটুনি লাগাতে। কাল রাণীকারের পত্র থেকে বুঝলুম স্বস্থানেই আছ বেকার অবস্থায়। পুরী অভিমুখে যখন যাত্রা করেছিলুম মনে সংকল্প ছিল এখানে তোমাকে আমন্ত্রণ করব। এসে দেখি স্থানাভাব। উপরের তলায় দুটি শয়ন কক্ষে আছি আমরা দুই পক্ষ, আর আছে একটি ভোজনশালা, আর বাকি সমস্ত ছাত আর আকাশ। নিচের তলার অধিবাসীরা বিচিত্র শ্রেণীর—কেউবা সরকারী কাজে কেউবা আমার দরকারী কাজে। জ্বর নিয়ে এসেছিলুম—প্রথম কয়েক দিন দেহের তাপ-পরিমাণ দিনে তিনবার করে নির্ণয় করতে নিযুক্ত ছিলুম। সেটা কেটে গেল, কিন্তু দেহ মন জড়িয়ে আছে আগাগোড়া কুঁড়েমির জালে। ৯ই তারিখের পঞ্জিকায় রবিগ্রহের জন্মদিন। এখানকার পুরবাসীরা শাঁখঘণ্টা বাজাবে। তার পরদিনই দৌড় দেব। অর্থাৎ ১১ই তারিখে পেঁাছব কলকাতায়—সেই রাত্রেই যেতে হবে কালিম্পং অভিমুখে—আত্মীয় পরিজন আশংকা করচেন তার বেশি থাকা নিরাপদ নয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা আমার জন্যে ওৎ পেতে আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা জানিনে অনেকগুলো জরুরি কাজ আমি যাবামাত্র ঘাড়ে এসে পড়বে। ওর মধ্যে তোমাদের দেখা পাবো—আশা রইল কালিম্পং বাসের সঙ্গ দাবি করলে হয় তো সেটা ব্যর্থ হবে না। ক্লান্ত অবস্থায় একটা বৈরাগ্যের তলায় চাপা পড়ে গেছি—তার থেকে নিজেকে টেনে বের করব কী উপায়ে তাই ভাবচি। হায় আমার হেডনার্স। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩৪৬।

কবি

॥ ৪৫৯ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

পাহাড়ের হাওয়ায় এবার শরীরটা তেমন ভালো লাগচে না। মনটা তাই উড়ুক্ষু। জীবনের জন্য অভিজ্ঞান পত্র তোমার চিঠি পাবার আগেই পাঠিয়েছি। তুমি যে পয়েন্টগুলো লিখে দিয়েছ সেগুলো ধরে আর একটা লেখন দিলুম। সকাল থেকে পড়ে আছি। দুর্বল। ইতি ২৬।৫।৩৯

কবি

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, শরীর ক্ষণে ক্ষণে বিকল, মন উতলা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৌমাদের দ্বারা পরিত্যক্ত, সকল প্রকার কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা, ডাকপিয়নের বিভীষিকা, বাংলা দেশের বর্তমান দুর্গতি সম্বন্ধে মনের উদ্বেগ, ঘুম থেকে জেগে উঠেই চীন দেশে কী দারুণ ব্যাপার ঘটচে তারই কল্পনা, কলকাতায় ফেরবামাত্র কনগ্রেস ভবন উন্মোচনের নিমন্ত্রণ, চারুবাবুর কাছে বিশ্বভারতী সম্মেলনে উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি—এই সমস্ত নিয়ে ৭৯ বছর বয়সের জীর্ণ দেহভার বহন—আমার বর্তমান দশার পরিচয় এই। আরো যদি কিছু জানবার ইচ্ছা করো আমাকে পত্র লিখো। ১১।৬।৩৯

কবি

॥ ৪৬১ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

বুলার কাছে শুনলুম তোমরা এসেছ এবং সঙ্গে সঙ্গে এনেছ রোগ দুঃখ। প্রশান্তর শরীরের অবস্থা চিন্তার বিষয় হয়েছে। বোধ হচ্চে পরিশ্রম করে অতিরিক্ত—কিন্তু ওর বয়সে সেটাতে যদি ওকে কাবু করে তাহলে আমার তো এতদিনে কোনো চিহ্ন থাকা উচিত ছিল না। আমি সংখ্যা নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করিনে, কিন্তু শব্দ নিয়ে আমার তোলাপাড়া চলচেই, বিরাম নেই।—সম্প্রতি আশ্রয় নিয়েছি শ্রীনিকেতনের হর্ম্য শিখরে, আকাশ বাতাসের দাক্ষিণ্য অবারিত—অনেকদিন পরে দেহে মনে আরাম পেয়েছি। দুঃখ এই চারিদিকে দুশ্য যখন বিস্তীর্ণ, সংকীর্ণ তখন দৃষ্টিশক্তি। দেখা সাক্ষাতের লগ্ন শীঘ্র অনুকূল হবে না বোধ হচ্চে। ৬।৭।৩৯

কবি

॥ ৪৬২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণ। মেঘের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সমস্ত আকাশ একাকার। রিমঝিম্ রিমঝিম্ ঘন বরষে। এই হচে যথার্থ বিরহের ঋতু। "এমন দিনে তারে বলা যায়" কিন্তু কী বলা যায় ভেবে পাইনে। যেমন একটানা বৃষ্টির শব্দ তেমনি এক কথা বারবার বলবার দিন। শুনতে খুব সহজ কিন্তু ঘটে ওঠা কঠিন। বসে বসে mathematics-এ problem কষা এর চেয়ে সহজ—অদৃষ্টক্রমে সেটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। বর্ষার অন্ধকারের পরে অন্ধকার জমে ওঠে সন্ধ্যাবেলাকার, আরো ঘন অন্ধকার নীরব নিঃসঙ্গতার ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে, আর জোনাকি গাছে গাছে ঝিকমিক করে। ইতি ২৯।৭।৩৯

কবি

॥ ৪৬৩ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

ভারতবর্ষের কোন্ ভূভাগে আছ সে রহস্য ভেদ করতে পারিনি, লোকমুখে শোনা গেছে লম্বা ছুটির উপর সওয়ার হয়ে দীর্ঘকাল ফিরবে নিরুদ্দেশে। মাঝে একবার কলকাতায় গিয়ে বেলঘরিয়ায় আশ্রয়ের জন্যে শূন্যে হাতড়িয়েছি—বুলা বোধ করি দ্বার খুলে দিতে রাজি ছিল, কিন্তু মূল্যবান দ্রব্যরাজি সম্বন্ধে বদনাম কেনবার আশঙ্কায় ফ্রেন্ডস্‌-এর ফুটো ছাদের তলাতেই আশ্রয় নিয়েছিলুম। তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমিও এবার নিরুদ্দেশে উধাও হব শৈলচূড়ার অভিমুখে। রওনা হব আগামী বুধবার সায়াহ্নে। শনিবার চড়ব দার্জিলিং এক্সপ্রেসে—পথের দুদিন কোথায় কাটবে অবস্থা বুঝে নিষ্পত্তি হবে। অন্ধকারে ঢিল মারা গেল দেখি কোথায় গিয়ে ঠেকে। ১।৯।৩৯

কবি

॥ ৪৬৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

কাল জীবন এসেছেন। তাঁর কাছে শুনলুম তুমি ফিরে এসেছ, কিন্তু ভাঙা শরীর নিয়ে। এ অবস্থায় তোমার উপর কোনো ভার চাপাতে চাইনে। বিশেষত আমার নিজের শরীরের অচলতা পূর্বের চেয়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সিঁড়ি হাঁটাহাঁটি আমার পক্ষে বিপদজনক। পাহাড় যাবার পূর্বে সভা জমানো ডাক্তার দেখানো ইত্যাদি বা কিছু কাজ আছে সবই জোড়া-সাঁকোয়—পারতপক্ষে দূরের থেকে আনাগোনা বাঁচিয়ে চলাই শ্রেয় হবে। শরীরটা কষ্ট দিচ্চে।

.........হয়তো আমার যাওয়া আরো আটদশদিন পিছিয়ে যাবে।

দেহমন অবসাদে ভারাক্রান্ত। তুমি কেমন আছ বুলাকে দিয়ে খবর দিয়ো। ইতি ২।৯।৩৯

কবি

॥ ৪৬৫ ॥

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

এবার এখানে এসে অবধি শরীর বিগড়েই আছে। তার প্রধান কারণ এ পর্যন্ত আবহাওয়া অপ্রসন্নভাবেই চলেছে। সূর্যালোক না পেলে আমার মন খোলে না, শরীর থাকে মুষড়ে। কেবলি পালাই পালাই করেছে মনটা। কিন্তু খবর নিয়ে জানা যায় এবার দেবতার কুদৃষ্টি অপক্ষপাতে সব জায়গার উপরেই। কিন্তু তবু মন্দ দশারও ঠাঁই বদল করতে ইচ্ছে যায়, frying pan-এ যখন বিরক্তি ধরে তখন মনে হয় fire-টাই স্পৃহনীয়। কিছুদিন আগেই স্থির করেছিলুম সকল বাধা এড়িয়ে যাব চলে স্বস্থানে। এমন সময় রথী এখানে আসা স্থির করল, তার শরীর খারাপ। এখানে এসে ভালো আছে। তাই ঠিক করেছি আগামী ৫ই নবেম্বরে বেরিয়ে পড়ব।

যখন আমার সময় খারাপ চলে তখন আমার কলম চলে ছুটে। এবার তাই মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগের ভিতরদিয়ে চালিয়ে দিয়েছি একটা ছোটো গল্প—আন্দাজ করচি এটা ভালই হয়েছে। ছুটির পরে কোনো এক সময়ে পড়ে শোনাব। যদি ভালো বলো তা হলে বুঝব তোমাদের রুচি ভালো।

কতকগুলো কাপড় গায়ে জড়িয়ে জড়ভরত হয়ে আছি। মেঘলা শীত ভালো লাগে না। বিজয়ার আশীর্বাদ। ২৫।১০।৩৯

কবি

॥ ৪৬৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আশা করেছিলুম কলকাতায় এসে তোমার দেখা পাব। কোথাও তোমার চিহ্ন নেই। খবর নিয়ে জানা গেল তুমি গিরিডিতে অচল প্রতিষ্ঠ। প্রশান্ত নিরুদ্দিষ্ট। চোখ দুটো নিয়ে উদ্বিগ্ন আছি। তাই পাহাড় থেকে নেমে এসে আমেদের শরণ নিয়েছি। এট্রোপিন দিয়ে সে দেখলে চোখ। চশমার ব্যবস্থা করে সে উপায় খুঁজচে। খুব আশাজনক বলে বোধ হচ্চে না। অথচ এখনো চোখের প্রয়োজন ফুরয়নি। লেখা ও পড়ার মাঝখানে পর্দা ঝুলচে—সে পর্দা এখনো কতকটা স্বচ্ছ, কিন্তু ক্রমে অনচ্ছ হবার দিকে যায় তাহলে ধ্যানের পথ ছাড়া আর সকল পথ রুদ্ধ হবে। কিন্তু অনিবার্যকে স্বীকার করে নিতে হবে।

কাল সম্মেলনীতে একটা নতুন গল্প পড়ব। পরশু পালাব আশ্রমে। লোকের ভিড়ে প্রাণ কণ্ঠাগত।

তুমি নিশ্চয় ভালই আছ। কলকাতার দিকে যদি ফের তবে আশা করি শান্তিনিকেতন পথে পড়তে পারে। ইতি ৮।১১।৩৯

কবি

॥ ৪৬৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

হয়তো শুনেছ পুপুর বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। সৎপাত্র, সদ্বংশ, বর কন্যা উভয়েই উভয়ের প্রতি সমাকৃষ্ট। ডিসেম্বরের শেষ তারিখে আশ্রমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। অতএব সেই শুভকর্ম উপলক্ষ্যে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করতে পারি। তোমার নতুন গৃহনির্মাণ ও গৃহপ্রবেশের সংবাদ দূরে থেকে সম্ভোগ করেছি—আমিও সামান্যভাবে তোমার অনুসরণের চেষ্টায় আছি।

চক্ষুকর্ণ দুই ইন্দ্রিয় দ্বারই রুদ্ধ প্রায়—স্মৃতিশক্তির উপরেও পর্দা নেমে আসচে—বিদায় নেবার পথে আছি। ইতি ১৬।১১।৩৯।

কবি

এই চিঠিতে আমাদের গিরিডির বাড়ির কথা বলেছেন।

হোলী উৎসবের গোড়ার কথা

অমিতা রায়

ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই তিথিতে সর্বভারতীয় একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যাকে আমরা বলি দোলোৎসব, হোলী বা হোলক উৎসব। এ উৎসবে রাধা ও কৃষ্ণের দোললীলার স্মৃতি বাঙ্গালীর চিত্তে কিছু ঢেউ তুলেছে, আবীরে কুমকুমে বসন্তের বাতাস রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। বস্তুত, সমস্ত উত্তর ও পশ্চিম ভারত জুড়ে রাধাকৃষ্ণের স্মৃতিই হোলী বা হোলক উৎসবের প্রধান আশ্রয়। অথচ, মধ্যযুগের আগে রাধাকৃষ্ণের এই প্রতিপত্তি ছিল না। হোলীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যোগাযোগ ঘটেছে জয়দেবের গীত গোবিন্দ রচনার বেশ কিছু পরে, প্রধানত মুসলমান সম্রাট, আমীর ওমরাহদের এব রাজস্থানী হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তার বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষে মদনোৎসব, মদনরতি উৎসব, কামমহোৎসব প্রভৃতি উৎসবানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এবং তা হতো বসন্তকালেই। লোকায়তস্তরে বসন্তকালের অন্যান্য উৎসবও ছিল। দোল বা হোলী উৎসবের মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমা থেকে বাসন্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত নানা উৎসবের স্মৃতি ও আচারানুষ্ঠান বিধৃত হয়ে আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে জৈমিনীর পূর্বমীমাংসায় শবর ভাস্যতে বসন্ত উৎসবের উল্লেখ আছে। কালিদাস বসন্ত উৎসবের বর্ণনা নানা উপলক্ষে করেছেন। উত্তর ভারতে চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে প্রায় ষোড়শ শতক পর্যন্ত বসন্ত উৎসব, কাম মহোৎসব, মদনোৎসব ইত্যাদি কতকগুলি উৎসব প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের রত্নাবলী, মালতী মাধব নাটকে বসন্ত উৎসবের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। একাদশ শতকে আরব মনীষী অল-বেরুনী বসন্তোৎসবে এই হোলীর উল্লেখ ও বর্ণনা করে গেছেন।

অত্যন্ত বর্ণময় ও আনন্দময় উৎসব বলে বহুদিন থেকেই আমাদের বসন্তোৎসবগুলি দেশীবিদেশী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আধুনিক কালে এই হোলী উৎসবের ইতিকথা অনুসন্ধান করেছেন—বিশেষ ভাবে করেছেন শ্রদ্ধেয় নির্মলকুমার বসু ও নীহাররঞ্জন রায়মশায়। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল কিছু আলোচনা করা হয়তো নিরর্থক হবে না।

গ্রাম্য জীবনে কৃষি যেহেতু ধনোৎপাদনের একমাত্র উপায়, দৈনন্দিন অনেক আচারানুষ্ঠান সেই হেতু মূলত কৃষকের ভয়, বিশ্বাস, সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। এই কৃষির উপরই জনসাধারণের মরণ বাঁচনের নির্ভরতা, কাজেই কৃষিকে আশ্রয় করেই তাদের যত কিছু আচার অনুষ্ঠান ভয় বিশ্বাস, স্বপ্নকল্পনা সব গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত কিছুর পিছনে জৈবিক এবং জাগতিক প্রয়োজন বোধ অত্যন্ত সক্রিয়। বস্তুতপক্ষে মানব জীবনের এই প্রয়োজন বোধই ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যেসব ধর্মাচার এখন পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত সেইসব উৎসব ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এইসব আচারানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য একদিকে ধরিত্রীর প্রজনন শক্তিকে বৃদ্ধি করা, অন্যদিকে ক্ষতিকারক শত্রুদের তুষ্ট রেখে বসুন্ধরাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করা।

আদিম মানুষের বিশ্বাস, যে প্রজনন শক্তি ধরিত্রীকে ফলভারে নত করে, সেই শক্তি নারীকেও সুপ্রসবা করে। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে যাদুশক্তি ও প্রজননশক্তি যেমন তাদের গোষ্ঠীবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, তেমনি তাদের বিশ্বাস, খাদ্য আহরণে কিংবা খাদ্য উৎপাদনেও যাদুশক্তি,

রাধাকৃষ্ণ

বসন্তোৎসব

প্রজননশক্তির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কৃষিনির্ভর জীবনে খাদ্য-শস্যকে মাতৃরূপে চিন্তা করা হয়। ধান্যপূর্ণ লক্ষ্মীর ঝাঁপি, লক্ষ্মী-পূজায় আলপনায় ধান্যশীর্ষের ছড়াছড়ি, তুষ তুষালি, তিল কুজারি, মাঘমণ্ডল ব্রতে যে-সব মূর্তিকল্পনা, কিংবা অম্বুবাচীর পারণে ঋতুমতী মাতা বসুন্ধরার অঙ্গে আঘাত না করা, ইত্যাদি সব আচারানুষ্ঠান বসুন্ধরার মাতৃরূপ কল্পনা ব্যক্ত করে। এ শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে কৃষিনির্ভর জীবনে পৃথিবীকে মা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশে প্রচলিত কতকগুলি ধর্মাচার বা ধর্মানুষ্ঠানের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। পেরুতে ভুট্টা যে-দেবী মারফৎ আসে তাঁকে বলা হয় Jara mamma (Maiz mother), তেমনি coca mamma, axo [illegible]

শীষের গহনা গায়ে, মূল্যবান পোশাকে সজ্জিতা Zara mamma শুধু প্রচুর পরিমাণে ভুট্টার জন্ম দিতেই সমর্থ তা নয়, শত্রুর হাত থেকে এই খাদ্যশস্য রক্ষা করার দায়দায়িত্ব, ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই। কাজেই কৃষিকেন্দ্রিক জীবনে ব্রত এবং পূজাচারের ভিতরে মূলত যাদুশক্তি প্রজননশক্তির একত্রীকরণ চোখে পড়ে, এবং এই একত্রীকরণের ফলেই বোধকরি মাতৃকাতন্ত্রের পূজার প্রসার।

কাজেই ধর্মকর্মের গোড়ার কথা প্রজনন শক্তির পূজা এবং এই প্রজনন শক্তির আধার নারী মূর্তি। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতায় নারীমূর্তি মাতৃমূর্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে, কখনো শিশু বক্ষে, কখনো সন্তানবতী অবস্থায়। তাদের মধ্যে একটি মূর্তি আছে যা একাধারে ধরিত্রী দেবী মাতৃকামূর্তির প্রতীক বলা চলে। এই মূর্তির দেহ গঠনে মাতৃমূর্তির ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই রমণী মূর্তির গর্ভপথ থেকে ছোট একটি বৃক্ষ-শিশু জন্ম নিচ্ছে। এই জাতীয় নারীমূর্তির সার্থকতা উৎপাদনযন্ত্র রূপে। মানব জীবন, ফল, ফসল ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত আমাদের জীবনকে যে-শক্তি চালিত করে, তার মধ্যে আর্যপূর্ব জীবনমানস অত্যন্ত সক্রিয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর চাপে, সেই অনার্য মন আর্য ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠানের নীচে সর্বদা চাপা পড়ে থাকেনি: প্রাণধর্মের প্রাবল্যে সব বাধা ডিঙিয়ে লোকায়ত এই ধর্ম আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে সংঘাত সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কখনো এই লোকায়ত ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চাপে ফল্গু নদীর ক্ষীণ ধারার মত আত্মগোপন করে আছে, কখনো বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আপন ছাঁচে ফেলে নিয়ে নিজের স্রোতে টেনে এনেছে। কখনো বা এই মিশ্রণের ফলে এমন এক বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে যাকে পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য বা অব্রাহ্মণ্য কিছুই বলা যায় না, অথচ তাকে হিন্দু বলতে কোনো বাধা নেই। এই সংঘাত-সমন্বয়ের ইতিহাসই হিন্দু-ধর্মের ইতিহাস। হোলী বা হোলক বা দোল উৎব এই নিত্য সংগ্রাম-সমন্বয়ের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হোলী উৎসব বসন্ত উৎসবের রূপান্তর। কিন্তু আদিতে হোলক উৎসব, বসন্ত, কাম মহোৎসব, মদনোৎসব সবই পৃথক পৃথক তিথিতে পৃথক ভাবে উদ্‌যাপিত হতো। মধ্যযুগে মুসলমান রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতার ফলে হোলী উৎসব অন্য সব উৎসবকে গ্রাস করে নেয়। তখন এই উৎসব অনেক বেশি জাঁকজমকে সম্পন্ন হতো। এখন শারদীয়া দুর্গাপূজা হোলীর অনেক-খানি ক্রিয়াকলাপ অঙ্গীভূত করে নেবার ফলে হোলী উৎসবের গৌরব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বাংলাদেশে হোলী উৎসব কবে দোল উৎসবে পরিবর্তিত হলো তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। একাদশ দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ফলে মনে হয় রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা হোলী উৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং তারই ফলে সম্ভবত হোলী উৎসব দোল উৎসবে বিবর্তিত হয়।

ফাল্গুনী চতুর্দশী ও ফাল্গুনী পূর্ণি-মায় সমস্ত ভারতব্যাপী এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু সর্বত্র উৎসবের আচানুষ্ঠান একরকম নয়। হোলী উৎসব প্রধানত যেহেতু লোকায়ত উৎসব, সেই হেতু দেশকালপাত্র ভেদে এর রূপ কিছুটা বিভিন্ন। আর্য ও আর্যপূর্ব মানস সংস্কৃতির ও বিভিন্ন লৌকিক আচারের সংমিশ্রণে হোলী উৎসবের বিবর্তন [illegible]

দ্রুত। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কোথাও বিকৃত, কোথাও পরিবর্তিত, কোথাও বা আদিম মানবের রক্তস্রোত এর ভিতর দ্রুত প্রবাহিত, কোথাও বা এই দুই ভিন্ন স্রোতের সমন্বিত রূপ। হোলী উৎসব এই সব সংঘাত-সমন্বয়ের ইতিহাস সগর্বে বহন করে আছে।

বৈদিক মন্ত্র দিয়ে হোলক উৎসবের শুরু। রক্ত বর্ণ ফুলভারে নত অশোক বৃক্ষের তলদেশ এই হোম উৎসবের যথার্থ স্থান। কোথাও এই হোম মণ্ডলের নীচে চতুষ্কোণ একটি গর্ত করে তাতে পান সুপারি হরিদ্রা ইত্যাদি রাখার বিধি প্রচলিত। বলা বাহুল্য পান সুপারি, হরিদ্রা গুহ্য যাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির বাহক। শুক্লা চতুর্দশীতে চাঁদ ঠিক যখন মাথার উপরে উঠে আসে, বাতাস যখন অশোক ফুলের গন্ধে মদির, ব্রাহ্মণ তখন দেহ-আত্মা শুদ্ধ করে বৈদিক সুরে অগ্নিকে আহ্বান করেন তার হোম যজ্ঞের বাহক হতে। ব্রাহ্মণ পূজা করেন রাধা ও কৃষ্ণকে। কিন্তু হোলী উৎসবে কৃষ্ণ রাধার পূজার চলন অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালের। কারণ, যেসব লোকাচার আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে তা থেকে এ কথা বোঝা অত্যন্ত সহজ, প্রাচীন হোলী উৎসবের মদন ও রতি পরবর্তী কালে রাধা ও কৃষ্ণে বিবর্তিত হয়েছেন। বাংলা দেশে হোলী উৎসবে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের স্থান বোধ করি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কারের ফল।

কৃষ্ণ বলরাম

পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং বৈদিক হোম যজ্ঞ, হোলী উৎসবের অপরিহার্য অংগ হলেও হোমাগ্নি আনা হয় অস্পৃশ্যদের বাড়ি থেকে, এবং সেই অগ্নিকে আনতে হয় স্বয়ং ব্রাহ্মণকে অস্পৃশ্যের বাড়ি গিয়ে। কাজেই আদিতে হোলী বা হোলক যে একান্তই অব্রাহ্মণ্য উৎসব ছিল, তা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, হোলক উৎসব আদিম মানুষের ভয় ভা সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী কা আর্যজীবনে স্বীকৃতির ফলে শুভপজি ব্রাহ্মণ্য উৎসবের মধ্যে স্থান পাওয়া সা এর আদিমতম রূপ গোপন করা যায় এখনও কোথাও কোথাও হোলী উৎস 'শূদ্র উৎসব' বলা হয়।

শূদ্র উৎসব নামাকরণ কেন হে উৎসবের যথার্থ পরিচায়ক, তা বুঝতে

আনুষঙ্গিক আচারানুষ্ঠান আরো একটু তলিয়ে দেখা দরকার। আহুতি দেবার জন্য যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন তার মধ্যে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। মাটি, শণ, তাছাড়া অনেকেই জানেন, খড়ে তৈরী একটি মানব-প্রতিমা, কখনো-বা জীবন্ত একটি ভেড়াকে এই উৎসব উপলক্ষে সাড়ম্বরে দাহ করা হয়। বস্তুত এই মানব-প্রতিমা দাহ করবার রীতি ভারবর্ষের সর্বত্রই প্রচলিত। গুজরাট অঞ্চলে মানবপুত্তলী সহ একটি লিঙ্গমূর্তিকে আগুনে বিসর্জন দেওয়া হয়। তামিল-ভাষাভাষী অঞ্চলেও মানব-প্রতিমা দাহ প্রথা বর্তমান, বোধকরি এই প্রথানুসারেই হোলী উৎসবকে সেখানেও বলা হয় কামদহোনৎসব। পরবর্তী কালে এই মানব-প্রতিমা দাহর নানারকম ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই পুত্তলীদাহর সঙ্গে শিবের ক্রোধে মদন-ভস্মের গল্প, প্রহ্লাদের গল্প, কৃষ্ণের দৈত্য বধ ইত্যাদি পৌরাণিক আখ্যানের একটা সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা খুব সহজেই চোখে পড়ে। অথচ, হোলী উৎসবের দহনানুষ্ঠানে আদিম মানবের নরবলি প্রথার স্মৃতি সুস্পষ্ট। আদিবাসীদের চলিত বিশ্বাস, জীবনের বিনিময়ে জীবন লাভ হয়। মানব জীবন কামনার ধন, কাজেই সেই কামনা ধনের বিনিময়ে সকল কামনার বস্তু মেলে। যে-জমি বন্ধ্যা, যে-জমি সুশস্য নয়, তাকে ফলপ্রসূ করতে পারে একমাত্র নররক্ত। কিন্তু নররক্ত পাওয়া যখন আর সহজসাধ্য রইল না, তখন নরবলি প্রথার পরিবর্তে নরমূর্তি বলি, পশুবলি ইত্যাদি প্রথার প্রচলন হয়। অনুষ্ঠান তখন আচারে পরিবর্তিত হয়। হোলী উৎসব উপলক্ষ্য করে মথুরাতে চন্দনে পুষ্পে সজ্জিত করে একটি লোককে আগুনের উপর ঝাপ দিতে বাধ্য করা হয়। বিকল্পে সেই লোকটির সমপরিমাণ একটি সুতো দাহ করা হয়। এই দহনানুষ্ঠান প্রাচীন নরবলী প্রথার বিবর্তন মনে করার অন্য যুক্তিও আছে। নরবলি যে কারণে প্রজনন শক্তির কারক, সেই কারণে বোধ করি দেশকালপাত্র ভেদে নানারকম লৌকিক আচানুষ্ঠান সত্ত্বেও পুত্তলী দাহপ্রথা ভারতবর্ষের সর্বত্র গৃহীত হয়েছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশ্বাস, প্রজ্জ্বলিত হোমশিখা শস্যের প্রাচুর্যের নির্দেশক। গঞ্জাম অঞ্চলে প্রথম কর্ষণের পর হোমের ছাই ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, জনসাধারণের বিশ্বাস, এতে ধরিত্রী সুশস্যা হন। উত্তরপ্রদেশে চামারদের মধ্যে ধারণা, হোমমন্ডল থেকে আধপোড়া কাঠ তুলে এনে গোলাঘরে রেখে দিলে গোলাঘর কখনো শস্যশূন্য হয় না। বাংলাদেশেও এই হোমাগ্নি বা হোমকুণ্ডের ছাইকে গুহ্য যাদুশক্তি বা প্রজনন শক্তির বাহক বলে মনে করা হয়। কৃষি নির্ভর গণ্ড আদিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস হোমের আগুনে লাঙ্গলের ফলা সেঁকে নিয়ে সেই লাঙ্গল দিয়ে মাটির বুক চিরে দিয়ে ধরিত্রী সুপ্রসবা হন। কাজেই একথা মনে করতে বাধা নেই, হোলী পূজাচারের এই সব আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান আদিম কৃষি-জীবী সমাজের প্রয়োজনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
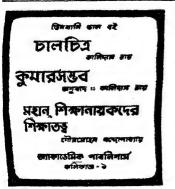
হোলী উৎসবে অঙ্গাঙ্গী সূত্রে জড়িত রয়েছে মদন-রতি, কৃষ্ণ-রাধার প্রেম ও লাস্য লীলা, আর সেই প্রেম লীলাকে কেন্দ্র করে রয়েছে সমাজ স্বীকৃত কতগুলি যৌনাচার। বিহার থেকে আরম্ভ করে বোম্বাই পর্যন্ত এই দিনটিকে উপলক্ষ্য করে লোকায়ত সমাজের সাধারণ স্তরে নানা ধরনের যৌন-মত্ততার ইঙ্গিত একেবারে চরমে পৌঁছয়। বাংলাদেশেও হোলী খেলার আনুষঙ্গিক হিসেবে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্যগীত প্রচলিত। বিহারে কবি গানের ছত্রে ছত্রে যৌনাচার বর্ণনা করা হয়। উত্তরপ্রদেশে, গোয়ালিয়রে, বারানসীতে মাটি, শণ, খড় ইত্যাদির তৈরী স্ত্রীপুরুষের নগ্ন মূর্তি কখনো প্রেমলীলায় মগ্ন, কখনো বা মিথুনা-হয়। ইন্দোরে এই দিনটি উপলক্ষ্যে নাথুরামের মন্দিরের সামনে নারীপুরুষের যৌনলীলা নৃত্যগীতে বর্ণিত হয়। হোলী উৎসবে এই জাতীয় যৌনাচারের কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। আদিম মানুষের কাছে যৌনলীলা প্রজনন শক্তির বাহক। পরবর্তী-কালে ব্রাহ্মণ্য সমাজ হাসি, ঠাট্টা, ছল, চাতুরী, তামাশা এবং সামাজিক ভাবে স্বীকৃত কিছু কিছু কামাচারের মধ্য দিয়ে হোলী উৎসবের অঙ্গীভূত যৌনাচারকে মেনে নিয়েছে। সমাজ কতগুলি সম্পর্কের বাঁধন আলগা করে, (যেমন বউদি-দেওর, ভাগিনীপতি-শ্যালিকা) হোলী উৎসবের যৌনাচারকে সমাজ বন্ধনে রাখবার চেষ্টা করেছে। বাৎস্যায়ন বসন্ত উৎসবে মত্ত নরনারীর একটি চিত্র অংকন করেছেন। জীমূতবাহনের কাল বিবেকে এই উৎসব উপলক্ষে প্রচুর নৃত্যগীত, বাদ্য, যৌন অঙ্গ-ভঙ্গীর কথার উল্লেখ আছে।

হোলী উৎসবের সঙ্গে এক মূর্খ রাজার সম্পর্ক খুব পরবর্তী কালের। বোধ করি হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-ছলনা ইত্যাদির সূত্র ধরেই হোলী-রাজ এক সময় উৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। হোলীর চতুর্থ দিনে রংয়ে, কাঁদায়, মাটিতে সেজে পালকী বা গাধার পিঠে চড়ে এক মিথ্যা রাজা নগর পরিভ্রমণ করে। সমবেত জনতা হোলী-রাজাকে নিয়ে ছল-চাতুরী, ঠাট্টা-তামাশা করে। এরকম একটি মূর্খ রাজার গল্প প্রাচীন পারস্যে প্রচলিত ছিল। এই উৎসবের নায়ক ছিল একটি মিথ্যা রাজা। উলঙ্গ রাজা গাধার পিঠে চড়ে সমবেত জনতার হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপের পাত্র হয়ে, সর্বশেষে যখন জনতার হাতে প্রহারে জর্জরিত হয়ে ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যেত, তখন এই উৎসব সমাপ্ত হতো। হোলী উৎসবের মূর্খ রাজার সঙ্গে পারস্যে প্রচলিত মিথ্যা রাজার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, তবে হোলী উৎসবে হোলী-রাজার আবির্ভাব নিছক আনন্দের একথা মনে করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। প্রাচীন ভারতে মানুষকে সং সাজিয়ে আনন্দ করার পদ্ধতি অজানা ছিল না, কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজে সে প্রথা এখন পর্যন্ত প্রচলিত।

হোলী উৎসবের সুস্পষ্ট একটি চিত্র রচনা করা দুরূহ, তবে একথা বোধ হয় সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বলা যায়, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব যত স্পষ্টই হোক না কেন, এর ভেতর লোকায়ত ধর্মের প্রভাব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবের চেয়ে কম নয়। আদিতে হোলী ছিল কৃষি সমাজের উৎসব—তাই লোকস্তরে একদিকে যাদু, অন্যদিকে প্রজনন শক্তির অপ্রতিহত প্রভাব।

প্রবন্ধের চিত্রগুলি শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক

বহুদিন ভ্রাতৃযুগলের অদর্শন। ভাবলাম খবরটা নিই একবার। বেলেঘাটায় তাদের কাঠগুদামে গিয়ে দেখি, লোকজন কেউ কোথাও নেই, কেবল গোবরা ভায়া একটা ক্যাশ বাকসের সামনে গোমড়া মুখে গালে হাত দিয়ে বসে।

অপাঙ্গে ভ্রূক্ষেপ করে দেখলাম, টাকা নেই, বাক্সর ভেতরটা ফাঁকা।

'গোবরা ভায়া, একা বসে যে? দাদা কোথায়?'

'দাদা ধর্ম করছেন।' বিরস বদনে সে বলল।

'ধর্ম? কর্ম ছেড়ে ধর্ম কেন হঠাৎ?' কাজটা যেন হর্ষবর্ধন-বিরুদ্ধ বলে আমার বোধ হয়।

'বলে কে! তীর্থি করতে বেরিয়েছেন আজ তিন মাস।'

'গেছেন কোথায়?'

'বৈদ্যনাথ বৃন্দাবন গয়া কাশি প্রয়াগ মথুরা কোথায় না! এইসব জায়গায় যাবেন বলে গেছেন। কোথায় আছেন এখন কে জানে!'

'আর যেখানেই যান ক্ষতি নেই, কেবল কাশিটাই হচ্ছে মারাত্মক।' আমি বললাম: 'ও জায়গায় প্রাপ্তিযোগ রয়েছে কিনা। কাশিপ্রাপ্তি বলে একটা কথা আছে [illegible]!'

'শুনব না কেন? হরদম শুনছি। কাশতে কাশতে মারা গেলাম।' সে প্রকাশিত করে: 'নিজেই কাশছি নিজেকেই শুনতে হচ্ছে।' বলে আরেকজনকে শোনাবার সুযোগ পেয়ে সে এক ধমক কেশে নিল।

'ওঃ, তাহলে তোমাদের দুজনেরই কাশি-বাসে? দুজনের দুরকমের।' কাশিধ্বনিতে চমৎকৃত হই। 'ধর্ম' জিনিসটা ভারী ছোঁয়াচে আমি জানতাম। তা, দাদার কোনো চিঠিপত্র এসেছে?'

'কিচ্ছু না। কোনো খবর নেই। এমনকি একটা টেলিফোন পর্যন্ত আসেনি। বলে-ছিলেন মাঝে মাঝে ট্রাঙ্ককল করবেন। তাও না।'

'তাহলে ত ভারী মুশকিল!'

'মুশকিল বলে'! দু মাসের বেতন না পেয়ে কর্মচারীরা সব ধর্মঘট করেছিল। আমি বললাম, দাদা ধর্ম করছেন, তার ওপর আবার তোমাদের ধর্ম—অত ধর্ম এখানে সইবে না। একটু আগে তাদের সবাইকে ডেকে ক্যাশ বাক্সের ডালা খুলে দেখিয়ে দিয়েছি—বিলকুল ফাঁক! একটা নয়া পয়সাও নেই দেখে তারা সবাই কাজ ছেড়ে চলে দিয়েছে।'

'তা হর্ষবর্ধনবাবুর হঠাৎ এমন ধর্মে মতি হবার কারণ?'

'তাইত ভাবছি।' বলে সে আমাকেই প্রশ্ন করে বসে: 'আচ্ছা, দাদা কি লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো পাপটাপ করত?'

'আমার ত মনে হয় না। পাপাচরণ বর্ধনদের স্বভাববিরুদ্ধ।' আমি বলি।

'পাপটাপ করলেই ত লোকে সেটা কাটাবার জন্য গুরু ধরে, মন্তর নেয়, ধর্মকর্ম করে, তীর্থে বেরয়— । এই তো জানি! আমার মনে হয় দাদা লুকিয়ে কিছু পাপ কাজ করেছে।'

'কেন এমনটা মনে হয় তোমার?'

'কিছুদিন আগে দাদা বাড়িতে এক ঠাকুর পিতিষ্ঠা করেছে। রামসীতা ঠাকুর। আট ইঞ্চি সাইজের অষ্টধাতুর যুগল মূর্তি—বেশ দেখতে। রোজ চান করে শুদ্ধ হয়ে নিজে তার পুজো করত দাদা...অনেকক্ষণ ধরে।'

'কিন্তু কি পাপ করতে পারে তোমার দাদা? আমি ত কিছু ভেবে পাই না ভাই!

'কেন, চোরা কারবার। সবাই যা করছে।

'কাঠের কালোবাজার? নেহাৎ আকাঠের মত কথা বলছ! কাঠ ত সিমেণ্ট নয় পারমিট লাগে না তার। এনতার মেলে।'

'আপনিই একটা আকাঠ।' গোবর্ধন ফোঁস করে ওঠে: 'এমন আকাঠ যে আপনাকে

ক্যাশবাক্সের সামনে গোমড়া মুখে গালে হাত দিয়ে বসে

মেরে তক্তা বানানোও যায় না। বামুন তো! গোহত্যা বেম্মহত্যা হয়ে যাবে তাহলে।'

'তা বটে!' সায় দিতে হয় আমায়।

'কি করে কাঠের কালোবাজর হয় শুনবেন তবে? ঘিয়ের মতন কাঠেও ভ্যাজাল দেওয়া যায়। সেগুন কাঠ বলে বাবলা কাঠ চালিয়ে দিলাম—আকাঠ খদ্দের পেয়ে। না হয়, শাল কাঠ বলে শাল কাঠই দিলাম কিন্তু ঘুণধরা শাল। সেই শাল কাঠের খুঁটি দিয়ে

আর, সে কি রে? কাজ কারবার গুটিয়ে কোম্পানি লাটে তুলে দিয়ে বসে আছি চুপচাপ

বাড়ি বানালে ধসে পড়বে বাড়ি, কড়ি বরগা বানালে ভেঙে পড়বে ছাদ। এটা কালো-বাজার নয়তো কি?'

শুনে আমি বিমূঢ় হই। 'কিন্তু তোমার দাদার পক্ষে এ কি সম্ভব?'

'দাদার ভগবানে মতি হবে সেইটাই কি আমি সম্ভব বলে ভেবেচি কোনোদিন?'

'ভগবৎ প্রেরণা হলে কী না হয়!' বলে মূকং করোতি বাচালং-এর শ্লোকটা ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছি এমন সময় টেলিফোনটা মুখর হয়ে উঠল। ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

রিসিভারে কর্ণপাত করে গোবর্ধন জানাল 'ট্রাংক কল' কাশির থেকে। দাদা করছে ফোন! হ্যালো দাদা! আমি গোবরা!'

'ভালো আছিস তো?' দাদার প্রথম প্রশ্ন। 'কাজ কারবার কেমন চলছে?'

'কাজ কারবার? ডকে উঠেছে সব।'

সই করা চেক বই রইলো, নগদ দেড় লাখ টাকা রেখে গেলাম আয়রনসেফে। কিন্তু বলি, আয়রনসেফের কম্বিনেশনটা বলে দিয়ে গেছ?' খুলব কি করে?'

'সে কি রে!'

'এদিকে মোটা টাকার কোটা কতক কণ্ট্রাক্ট এসেছিল, নিতে পারলাম না। মালের যোগান দেব যে তার টাকা কই? কয়েকটা সরকারী টেণ্ডারও ছেড়ে দিতে হল বাধ্য হয়েই। তার ওপর, দু মাস ধরে বেতন না পেয়ে কর্মচারীরা সব ধর্মঘট করে কাজ ছেড়ে চলে গেছে।'

'সে কি রে!' সবিস্ময় একই অব্যয়ের পুনরুক্তি দাদার।

'আর সে কি রে! কাজ কারবার সব গুটিয়ে কোম্পানি লাটে তুলে দিয়ে বসে আছি চুপচাপ। কারখানার মড়া আগলে।' গোবরা দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে: 'আয়রনসেফের কম্বিনেশন বলে যাওনি যেমন!'

'কম্বিনেশন আবার বলব কি রে! ওটা খুলতে কি আর কম্বিনেশন লাগে! সেফের কল বিগড়ে গেছে বহুকাল। জানতিস না তুই? এমনি হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে টানলেই খুলে যাবে। অমনি খোলাই পড়ে আছে আজ দু বচ্ছর।'

'তাই নাকি?' গোবর্ধন লাফিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে আয়রনসেফ উন্মোচন

বই সমেত প্রকাশ পায়। হেসে ওঠে আয়রন-সেফ। গোবরাও।

'বাঁচালে!' হাঁফ ছাড়ে গোবরা। 'ভালো, তুমি ফিরচ কবে শুনি?'

'কলকাতায়? এখন না। মাস কতক থাকব এখন কাশিতে। চারধাম ঘুরে দেখলাম। সব তীর্থ ঘুরে এখানে এসেছি এখন, জায়গাটা আমার ভারী মনে লেগেছে। এখানকার রাবড়ি আর পেড়ার তুলনা হয় না। কলকাতায় এমন জিনিস মেলে নারে। মণিকর্ণিকা ঘাটে বসলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।'

'তা বটে!' আমার সায় রাবড়ির কথায়।

'তা, তুমি কি মণিকর্ণিকাতেই বসে থাকবে আর এখানকার কাজকর্ম......'

'কেন, তুই তো রয়েছিস। যোগ্য ভ্রাতা সম পিতা। তুই-ই চালিয়ে নিতে পারবি। তুই রইলি, টাকাও রইলো, তবে আর ভাবনা কিসের?'

বলেই হর্ষবর্ধন একটা ভাবনার কথায় গিয়ে পড়েন—'ভালো কথা। ঠাকুরপুজোর কি হচ্ছে? ঠাকুরের নিত্যপুজো?'

'হচ্ছে না। কে করবে?' বামুন ঠাকুরকে বলেছিলাম......'

'কী সর্বনাশ। যে ভাত রাঁধে আমাদের? সে আবার কী পুজো করবে রে? সে কি মন্তর টন্তর জানে কিছু?......'

'সে রাজিও নয় করতে। করছেও না পুজো......'

'তুই করতে পারিস। চানটান করে শুদ্ধ হয়ে গরদ পরে তুই নিজেই ত করতে পারিস —পুরোহিত দর্পণখানা দেখে। আসল কথা হচ্ছে ভক্তি।'

'সেই ভক্তিই আমার নেই। আমার দ্বারা হবে না দাদা।'

'তাহলে ঠাকুরকে কাশিতে পাঠিয়ে দে। আমার কাছে। আমিই পুজো করব।'

'কে নিয়ে যাবে ঠাকুর?'

'তাই ত, কে নিয়ে আসবে। তুই নিজেই নিয়ে আয় না হয়। কি করে আনতে হবে বলে দিচ্ছি। গঙ্গা চান করে পট্টবস্ত্র পরে ঠাকুরকে গলায় বাঁধবি, একটা ঝোলার মতন করে তার মধ্যে রামচন্দ্র জীউকে বসিয়ে নিজের গলায় বাঁধবি, বুঝলি? যেন বুকের কাছটায় ঠেকে থাকে ঠাকুর। তারপর ঐভাবে......'

'ঐ ভাবে?' পুরো প্রেসক্রিপসনটা জানতে চায় গোবরা।

'ঐভাবে......যেন কারো সঙ্গে ছোঁয়া নাড়া না হয়......রেলগাড়িতে আসা তো ঠিক হবে না, ছোঁয়াছুঁয়ি হবার ভয় রয়েছে। হিন্দু গাড়োয়ানের গোরুর গাড়ি ভাড়া করে গোযানে চেপে সটান কাশি চলে আয়।'

'গোরুর গাড়িতে কাশি......সে তো তিন মাসের ধাক্কা! তার ওপর ঐ [illegible]

'এই মরেচে! তাহলে কি পারবি তুই?'

'দেখি কী পারি।'

'বেশ, তাহলে বোম্বে মেলেই চলে যায়। আতুরে নিয়মো নাস্তি। যতটা সম্ভব কর। গংগা চান করে শুদ্ধ হয়ে, গলায় না বাঁধতে পারিস, কোলে করেই নিয়ে আয় ঠাকুর। ফাস ক্লাসে আসবি তো, সেখানে ভিড় নেই তেমন, ছোঁয়াছুঁইরও ভয় নেই ততটা। নয়তো গোটা কামরাই রিজার্ভ করে আসিস না হয়। যতটা ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে পারিস। সব সময় নাম জপতে জপতে আসবি...... রঘুপতি রাঘব রাজারাম......'

'জানি জানি, বলতে হবে না। আমি জানি সেসব। পতিত পাবন সীতা রাম—'

'জানিস তো, ছলনা করছিস কেন দাদা!' বলে দাদা ফোন রেখে দেন। তাঁর স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে, এত মাইল দূরে থেকেও সেটা শোনা যায়।

আমার উপস্থিতিতে দুই ভাইয়ের সমস্যামোচন হয়ে গেল দেখে আমিও আশ্বস্ত চিত্তে বাড়ি ফিরি।

দিন কয়েক পর কলেজ স্কোয়ারে গোবর্ধনের সংগে দেখা হতেই শুধলাম, কীহে, ঠাকুরের কি গতি করলে?

'পাঠিয়ে দিয়েছি ত।' সে বলল: 'উত্তম-রূপে প্যাক করেই পাঠিয়েছি।'

'প্যাক করে? ঠাকুরকে?'

'হ্যাঁ। আগে ভালো করে চট দিয়ে মুড়ে তারপরে সেলাই করে......'

'অ্যাঁ? ঠাকুরকে চটে মুড়েছ? ঠাকুর না চটুন, তোমার দাদা চটে যাবেন কিন্তু। নির্ঘাত।'

'চটবেন কেন? তাঁর কথা মতন বোম্বে মেলেই পাঠিয়ে দিলাম—সেইদিন......'

'কার সংগে পাঠালে?'

'কার সংগে আবার? পার্শেল করে দিলাম ত!'

'পার্শেল করে পাঠালে......ঠাকুরকে?' বিস্ময় আমার থই পায় না।

'হ্যাঁ, ভালো করে চটে মুড়ে, ফোঁড় সেলাই দিয়ে প্যাক করে......প্যাকিং বাক্সের মধ্যে পুরে—পুরু করে খড় বিছিয়ে, যাতে চোট লেগে ঠাকুরের না অংগহানি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছি। তারপরে লোহার পাত দিয়ে বেড়ে পেরেক মেরে ফাস ক্লাস করে রেলোয়ে পার্শেলে ছেড়ে দিয়েছি। দাদা পেয়ে গেছেন এতক্ষণ!'

'রেলোয় পার্শেলে পাঠালে ঠাকুরকে? বলো কি হে?'

'ভাঙাচোরার ভয় নেই কোনো। আপনি ভাববেন না। রেলের কুলীরা তোলা নামার সময় দুমদাড় করে ফেলে না ভেঙে দেয় সেজন্যে পার্শেলের ওপর আলকাতরা দিয়ে বেশ বড় বড় অক্ষরে স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছি......'

'কী লিখেছ আবার?'

GOD WITH CARE.

অ-অসমীয়ার ঘরে আগুন লাগাবার জন্য সেই নেতাকেই দায়ী করা হয়েছিল।

মোট কথা, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারেই ছিল সুস্পষ্ট একটা কর্মপদ্ধতি বা প্রোগ্রাম। সে প্রোগ্রামের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়েছে কি না বলা কঠিন, তবে এটা ঠিক যে, নির্বাচকরা কংগ্রেসের কাছেই প্রোগ্রাম পেয়েছিল। অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রোগ্রাম যতটুকু ছিল, তার বেশী ছিল কংগ্রেস রাজত্বের সমালোচনা। এমন কি, পরিকল্পিত 'বিকল্প' সরকারেরও কোন প্রোগ্রাম নির্বাচকদের সামনে ছিল না।

হয়ত সে-কারণেই কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার কোনরকমেই দুর্বল পথে পরিচালিত হয়নি। বিপক্ষ শক্তির দুর্বল স্থানে বারবার আঘাত করেছিল বলেই হয়ত কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কলকাতার উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনকে 'প্রেস্টিজ' নির্বাচন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, অন্তত এই একটা কেন্দ্রে যদি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর পরাজয় ঘটানো যায় তা হলে তা কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে। ফলে, এই কেন্দ্রে যে পার্টি-কর্মীদের সমাবেশ ঘটেছিল তা প্রায় অভূতপূর্ব। অনেকে মনে করেন, এটা বিপক্ষ দলের 'স্ট্র্যাটেজিক' ভুল। হতে পারে; তবে এটা ঠিক, কলকাতায় এই নির্বাচনী সংগঠন বিপক্ষ দলকে অন্যান্য কেন্দ্রে দুর্বল করে দিয়েছিল।

সেই সঙ্গে ছিল কংগ্রেস সংগঠন কম্যুনিস্টদের ঘাঁটিতে। বিরোধী পক্ষ কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিল এই সব ঘাঁটি সম্বন্ধে। যেমন মহেশতলা, বিষ্ণুপুর, হাসনাবাদ, কালীঘাট, বালীগঞ্জ, কাশীপুর, সুকিয়া স্ট্রীট, ভাটপাড়া ইত্যাদি কেন্দ্রে। নির্বাচনের পর দেখা গেল এই সব কেন্দ্রেই কংগ্রেস সংগঠন করেছিল সবচাইতে বেশী।

এই সংগঠন নিশ্চয়ই বিরোধী পক্ষ আশা করেনি কংগ্রেসের কাছ থেকে। সেই কারণে নির্বাচনের ফলাফল যখন প্রকাশিত হলো এই সব কেন্দ্রের তখন বিরোধী পক্ষের হতবাক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বিরোধী পক্ষের আশা ছিল, কংগ্রেস এবারের নির্বাচনে কলকাতা থেকে প্রায় মুছে যাবে। কারণ, গত নির্বাচনের যে ইঙ্গিত ছিল কলকাতায় তা কংগ্রেসের পিছু-হটার ইঙ্গিত। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস ৮টি আসন কলকাতায় হারিয়েছিল এবং মোট আসন-সংখ্যা পেয়েছিল ৮। এবার তাই কম্যুনিস্ট প্রার্থী কলকাতায় কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস কলকাতা থেকে এবার আরও ছয়টি আসন উদ্ধার করেছে। আর কম্যুনিস্ট পার্টি হারিয়েছে তিনটি আসন। গত নির্বাচনে ছিল ১০টি আসন, এবার পেয়েছে সাত। কম্যুনিস্ট পার্টির পরাজয়ের মধ্যে বড় রকমের আঘাত এসেছে কালীঘাটে শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেনের পরাজয়ে। কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীমতী বিভা মিত্র তাঁর গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন এবার। আর হারাতে হয়েছে বালিগঞ্জের, তালতলার এবং কাশীপুরের (যা পি এস পি-র হাতে ছিল) আসনগুলি।

এবারের হিসেবমত দেখা যায়, কলকাতার ২৬টি আসনের ১৪টি আসন কংগ্রেসের হাতে এসেছে। বিরোধী পক্ষ পেয়েছে বাকী ১২টি। কংগ্রেসের পক্ষে কলকাতার ফলাফল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সাফল্য বামপন্থী রাজনীতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। বিরোধী পক্ষের প্রকৃত পরাজয় ঘটেছে কলকাতায়।

কলকাতায় এই বিপর্যয় সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের হতাশ হবার কারণ ঘটেনি। কারণ, ভোটাংশের সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি ঘটেছে ভোটাংশের সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি ঘটেছে কম্যুনিস্ট পার্টির। গত নির্বাচনে এই পার্টি পেয়েছিল শতকরা ২২·৪১; এবার পেয়েছে শতকরা ৩২·৬৩। অন্য দিকে কংগ্রেস গত নির্বাচনে পেয়েছিল (আসন হারিয়েও) প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২·৮৯; এবার পেয়েছে শতকরা ৪৭·০৪। হিসেবের দিক থেকে ভোটবৃদ্ধি বেশী হয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টির, অন্তত কংগ্রেসের তুলনায়। তবে এই বৃদ্ধির ভোট যুগিয়েছে পি এস পি, যার ভোটাংশ কমেছে শতকরা ৯·১২। অর্থাৎ কংগ্রেসের দিকে কলকাতার ঝুঁকি ঘটেছে শতকরা ৩·০৫।

কলকাতায় কংগ্রেসের জয় থেকে এটা

ধরে নেওয়া ভুল হবে যে, কংগ্রেসের নির্বাচনী সংগঠনে কোথাও কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। কয়েকটি জেলায় এই নির্বাচনী সংগঠন দুর্বল ছিল বলেই কংগ্রেসকে এবার কয়েকটি জেলায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

যেমন ঘটেছে কোচবিহারে। এই জেলাকে নির্বাচনী ভাষায় বলা চলে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের জেলা ছিল। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস এই জেলার সাতটি আসনই অল্প আয়াসেই পেয়েছিল। এবারের নির্বাচনে সেই সাতটি আসনের একটি ছাড়া আর সব ক'টিই কংগ্রেসকে হারাতে হয়েছে। এই আসনগুলো হারাতে হয়েছে ফরোয়ার্ড ব্লক এবং কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে। ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছে পাঁচটি এবং কম্যুনিস্ট পার্টি একটি।

কোন কোন রাজনৈতিক মহলের মতে সাম্প্রতিককালে কোচবিহারে যে পুলিসের অত্যাচার ঘটে গিয়েছে তারই ফলে কংগ্রেসকে এবার আসনগুলো হারাতে হয়েছে। কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য কি না বলা কঠিন; কারণ, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের আগে কোচবিহারে পুলিসের গুলিতে ছয়জন নিহত হয়েছিল খাদ্য আন্দোলনে। কিন্তু ১৯৫৭ সালে সেখানে সব ক'টি আসনই কংগ্রেস পেয়েছিল। এমন কি কংগ্রেস সেখানে পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৮·০৯ ভাগ, ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছিল শতকরা ১২·১৫ ভাগ এবং কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছিল শতকরা ৭·০৫ ভাগ। এবার কংগ্রেস আসনও হারিয়েছে, ভোটাংশেও প্রায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এবার পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৮·৪৯। অন্য দিকে কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছে শতকরা ১৬·৭৫ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছে শতকরা ৩৮·২৮।

ভোটাংশের ওঠা-নামাই কোচবিহারের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ফরোয়ার্ড ব্লকের ভোট বৃদ্ধি হয়েছে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৬·১৩ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৯·৭০। মুখ্যত এই বৃদ্ধি এসেছে কংগ্রেসের অনুকূলে যে ভোট ছিল তা থেকে। ফলে যে জেলা সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের দিকে ছিল, বর্তমান নির্বাচনের ঝুঁকি দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫·৮৩ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কারো কারো মতে, কংগ্রেসের ঔদাসীন্য এবং সংগঠনী দুর্বলতাই এবারের বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে এই জেলায়। তা ছাড়া পাট ও তামাকের দর অনেকাংশে দায়ী বললে ভুল হবে না। দামের নিম্নগতি থেকে কৃষকদের কংগ্রেস বাঁচাতে পারেনি,—এটা বেশ বড় কারণ হ'য়েই দেখা দিয়েছিল।

এবারের নির্বাচনের সময় কংগ্রেস পক্ষ থেকে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। অনেক
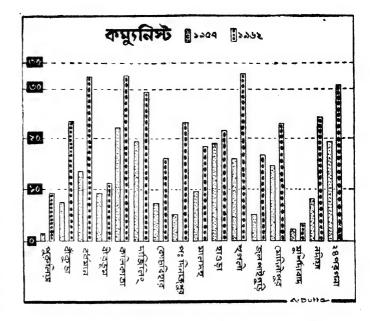
সময় একটা যুক্তি শোনা যায় যে, পরিকল্পনার কাজ যেখানে যত ভালভাবে হয় সেখানেই কংগ্রেসের বুনিয়াদ পাকা হয়। এমন কি, বিধানসভায় এক সময় সমগ্র বিরোধীপক্ষ থেকে অভিযোগ এসেছিল যে, তাদের এলাকায় কংগ্রেস সরকার কোন পরিকল্পনার কাজ হাতে নেয়নি। পরিকল্পনার কাজ কোন অঞ্চলে ভালভাবে না হয়ে থাকলে সে-অঞ্চল কংগ্রেসের হাতে চলে যাবে কিনা তা বলা কঠিন, তবে এটা অন্তত দেখা গেছে যে, পরিকল্পনার কাজ যেখানে বেশ ভালভাবে করা হয়েছে সেখানেও কংগ্রেস বিপর্যস্ত হয়েছে।

যেমন, বীরভূম জেলা। এই জেলায় পরিকল্পনার কাজ যেমন হয়েছে, চাষের জল যোগাবার জন্য ময়ূরাক্ষীর মত বড় সেচ পরিকল্পনাও কার্যকরী করা হয়েছে। অথচ গত নির্বাচনের মত এবারের নির্বাচনেও কংগ্রেস সফল হয়নি এই জেলায়। গত নির্বাচনে জেলার ১০টি আসনের পাঁচটি এসেছিল কংগ্রেসের হাতে; এবার এসেছে চারটি।

তবে বীরভূম জেলা সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় যে, এখানকার নির্বাচকদের সামগ্রিক ঝুঁকি বদলেছে কংগ্রেসের দিকে। গত নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২০·০৮; এবার পেয়েছে শতকরা ৪০·৬১। অন্য দিকে, কম্যুনিস্ট পার্টি গতবারের তুলনায় এবার পেয়েছে শতকরা ২·০৪ ভাগ বেশী। সামগ্রিকভাবে তাই বলা চলে, কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকি দেখা দিয়েছে শতকরা ১৪·৪১।

আরও দুটি জেলায় কংগ্রেসকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তা হ'ল মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা। নদীয়া জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ১০টি আসনই কংগ্রেসের হাতে এসেছিল ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে। এবার কংগ্রেস পেয়েছে ৬, অর্থাৎ হারিয়েছে ৫টি আসন। তার চাইতেও বেশী উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই জেলায় কংগ্রেসের ভোট-

সংখ্যা এবার বেশ কিছুটা কমেছে। গত নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটসংখ্যা ছিল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৫·৪৯; এবার হয়েছে ৪৪·৪২। কম্যুনিস্টদের ভোটসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৬·৪০।

এই জেলায় দুটি নির্বাচনের মধ্যে কংগ্রেস সংগঠনে বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। জেলা কংগ্রেসের মধ্যে যে দলাদলি ছিল, তা প্রকাশ্যে আলোচিত হয়েছে এবং জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব এক দলের হাত থেকে অপর হাতে গিয়েছে। অনেকের মতে জেলা কংগ্রেসের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্বাচনের ফলাফলেও প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু বীরভূমের ক্ষেত্রেও সে-কথা প্রযোজ্য, নদীয়ার পক্ষেও সে-কথা কিছুটা খাটে। যদি পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে জলকর হিসাবে সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চেপে থাকে এবং সে-কারণে বীরভূমের নির্বাচকরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে থাকে, তা হলে নদীয়ার কিছু অংশেও সে যুক্তি প্রযোজ্য। এ যুক্তি সর্বত্র প্রযোজ্য হতে পারে না; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা যে বড় কারণ হয়ে উঠতে পারে তা বোঝা যায় বর্ধমান জেলার দিকে তাকালে। জেলার যে-অংশে দামোদর পরিকল্পনার জন্য জলকর ধার্য আছে সেই সব অঞ্চলে সাধারণভাবে নির্বাচকরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে বলা চলে।

তবে মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধে সে-কথা প্রযোজ্য কিনা বলা কঠিন। এই জেলায় কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে বড় করে যেটা দেখানো হচ্ছে তা কংগ্রেস মহলের অন্তর্বিরোধ। কিন্তু অন্তর্বিরোধ মুর্শিদাবাদ বা নদীয়া বা বর্ধমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই মুর্শিদাবাদে দেখা যায় যে, এবারের ফলাফলে জেলার কংগ্রেস সংগঠনে যেন ধস নেমে গিয়েছে। গত নির্বাচনে এই জেলার ১৬টি আসনের মধ্যে ১৫টি ছিল কংগ্রেসের হাতে; এবার এসেছে ৮টি। এমন কি, ভোটসংখ্যাও শতকরা ৪০·৯৯ থেকে কমে এবার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৯·৮৪।

অনুরূপভাবে কংগ্রেস আসন হারিয়েছে মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুরে, বাঁকুড়ায় ও হুগলী জেলায়। এইসব জেলায় নির্বাচনী শক্তি পরীক্ষায় কংগ্রেসকে কিছুটা হার-স্বীকার করতে হয়েছে। কেন এইসব হার হয়েছে তা কংগ্রেস মহলের বিচার্য বিষয়; তবে এটা বলা চলে যে, এইসব জেলায় বিরোধীপক্ষের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন পশ্চিম দিনাজপুরে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১৩·৯০ অংশ ঝুঁকেছে বামপন্থীদের দিকে। তেমনি কংগ্রেসবিরোধী ঝুঁকি দেখা গিয়েছে হুগলী জেলায় শতকরা ৯·৬২ ভোট।

এবারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, গত নির্বাচনের তুলনায় ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকি দেখা গিয়েছে পশ্চিমবাংলার বেশীর ভাগ জেলায়। তাই বাঁকুড়া জেলায় যদিও চারটি আসন কংগ্রেসকে ছাড়তে হয়েছে, তবু সমগ্র জেলায় কংগ্রেসের ভোটাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২১·৬০ এবং নির্বাচকদের ঝুঁকি গিয়েছে কংগ্রেসের দিকে শতকরা ৫·৫৮। আর যেসব জেলায় কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকি সুস্পষ্ট হয়েছে তা হ'ল পুরুলিয়া (শতকরা ৯·২১), বীরভূম (শতকরা ১৪·৪৯), কলকাতা (শতকরা ৩·০৫), দার্জিলিং (শতকরা ৬·১১), মালদহ (শতকরা ২·১৯), হাওড়া (শতকরা ৭·৯৬), মেদিনীপুর (শতকরা ৬·৬৬) এবং ২৪ পরগনা (শতকরা ৪·০৪)।

বিরোধীপক্ষের দিকে ঝুঁকি গিয়েছে নদীয়ায় (শতকরা ১৬·৪৫), মুর্শিদাবাদে (শতকরা ২·১৯), জলপাইগুড়িতে (শতকরা ০·১১), হুগলীতে (শতকরা ৯·৬২), পশ্চিম দিনাজপুরে (শতকরা ১৩·৯০), কোচবিহার (শতকরা ৯·৩২) এবং বর্ধমানে (শতকরা ১·৯৪)। গতবারের নির্বাচনের হিসেবে দেখা যায় যে, দু-তিনটি জেলা ছাড়া বেশীর ভাগ জেলায় নির্বাচকদের ঝুঁকি ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

অন্য আর এক দিক দিয়েও কংগ্রেসের পক্ষে এ-নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেভাবেই হোক, স্বতন্ত্র পার্টি বর্তমান নির্বাচনে বিশেষ একটা আশঙ্কা নিয়েই কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলোর সামনে দেখা দিয়েছিল। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, অন্যান্য রাজ্যেও।

প্রথম নির্বাচনের সম্মুখীন হয়ে স্বতন্ত্র পার্টি অন্ততপক্ষে নির্বাচকদের মনে দাগ কাটতে পেরেছে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার যে ফলাফল জানা গেছে তাতে দেখা যায়, স্বতন্ত্র পার্টি ১৬৮টি আসন দখল করেছে। কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট পার্টি—

পক্ষের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনা এসেছে স্বতন্ত্র পার্টির বিরুদ্ধে। এই দল প্রতিক্রিয়াশীল দল বলেই সাধারণ নির্বাচকদের কাছে পরিচিত হয়েছিল। তবু, এ-নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টি সবচাইতে বেশী রেখাপাত করেছে বিহার রাজ্যে বিধানসভায় ৩১৮টি আসনের মধ্যে ৫০টি আসন দখল করে।

বিহার সম্বন্ধে কংগ্রেস মহলে স্বতন্ত্র পার্টি সম্বন্ধে আশঙ্কা যে না ছিল এমন নয়। এবার কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন পাটনায় যখন বসে তখনই এ-সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিল। এটা লক্ষ্য করেই পাটনা অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তীব্র ভাষা ব্যবহার করেছিলেন স্বতন্ত্র পার্টির সমালোচনা করতে গিয়ে। কংগ্রেস নেতারা সেই সময় এই পার্টিকে হেলিকপটার, পাগড়ি ও টুপির বিচিত্র সমাবেশ বলে বিদ্রূপও করেছিলেন।

কারণ, পাটনায় কংগ্রেস অধিবেশন যখন চলছিল তখন অনেকেই দেখেছে স্বতন্ত্র পার্টির হেলিকপটার। এই হেলিকপটার সম্বন্ধে পরে যেটা শোনা গেছে সেটা আরও চমকপ্রদ। আজ আর অবিদিত নেই যে, স্বতন্ত্র পার্টির এই হেলিকপটার আসে আমেরিকার কাছ থেকে নয়, আমেরিকার বিরোধী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কোন একটি কম্যুনিস্ট দেশ থেকে। চমকটা এখানেই শেষ হয়নি, হেলিকপটার চালনা শিক্ষা দেবার জন্য সে-দেশ থেকে টেকনিসিয়ানও এসেছিল বিহারে। পরে অবশ্য সে-দেশের প্রতিনিধি জানতে পারে যে, এই হেলিকপটার এসেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনের কাজে। হেলিকপটারের চটক বিহারে অন্ততপক্ষে বেশ কিছুটা যে ফলপ্রসূ হয়েছে তা নির্বাচনের ফল দেখেই বোঝা যায়।

তবু, এটা স্পষ্ট যে, বিহারের রাজনীতিতে স্বতন্ত্র পার্টির জমিদারি নীতি বেশ কিছুটা মিশে গিয়েছে। এককালে যারা ক্ষুদে রাজা ছিলেন, প্রজাদের দাপটে রাখতেন, তাঁরাই এখন স্বতন্ত্র পার্টির প্রধান হয়ে উঠেছেন। বিহারে এই প্রাক্তন রাজাদের প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর যতদিন অটুট থাকবে, ততদিনই স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিপত্তি থাকবে। ততদিন পর্যন্ত বিহারের রাজনীতি প্রভাবান্বিত করবেই।

হয়ত এই কারণেই উড়িষ্যায় প্রাক্তন রাজাদের গণতন্ত্র পার্টির নাম বদলে স্বতন্ত্র পার্টি রাখা হয়েছে। মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে এই পার্টি কংগ্রেসের সাফল্যে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মনে হয়, প্রজাদের উপর কমে আসা প্রভাব জিইয়ে রাখার জন্যই পার্টির নাম বদলে ফেলা হয়েছে।

ইতিমধ্যে অন্যান্য যে-সব রাজ্যে স্বতন্ত্র পার্টি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার মধ্যে রাজস্থান ও গুজরাট অন্যতম। গুজরাটে বিধানসভার ১৫৪টি আসনের মধ্যে ২৬টি আসন স্বতন্ত্র পার্টি পেয়েছে। ফলে বিহারের মত এ রাজ্যেও এই পার্টি আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রধান বিরোধী দল বলে গণ্য হবে। রাজস্থানে স্বতন্ত্র পার্টি পেয়েছে ৩৬টি আসন এবং সেই সঙ্গে জনসঙ্ঘ পেয়েছে ১৫টি আসন। নির্দলীয় নির্বাচিত হয়েছে ২২ জন। এর ফলে রাজস্থানে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি, যদিও কংগ্রেসই হয়েছে বৃহত্তম দল। ক্ষমতা হয়ত কংগ্রেসের হাতেই যাবে, কিন্তু প্রধান বিরোধী দল হিসাবে স্বতন্ত্র পার্টির প্রভাব নিঃসংকোচে বৃদ্ধি পাবে। অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, পাঞ্জাবেও স্বতন্ত্র পার্টি বিধানসভার আসন জয় করেছে। ফলে এইসব রাজ্যে স্বতন্ত্র পার্টি আইনসভার মধ্যে জোরালো বিরোধী দল হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে।

এই পার্টি একটি আসনও পায়নি পশ্চিম বাংলা, মহারাষ্ট্র ও আসামে। এই তিনটি রাজ্যে স্বতন্ত্র পার্টি কোন আসন পায়নি। তাই রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, স্বতন্ত্র পার্টির পরাজয় ঘটেছে এই তিনটি রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই পার্টি সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আসন পাকা ক'রে নিয়েছে। সুযোগ পেলেই এই পার্টি কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে গণ্য হবার চেষ্টা করবে। এই পার্টি তাই কংগ্রেসের কাছে নবতম চ্যালেঞ্জ।

প্রতিক্রিয়াশীল দল হিসেবে হিন্দু মহাসভা ভারতের রাজনীতি থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে। জনসঙ্ঘেরও অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ১৯৫৭ সালের মত এবারের নির্বাচনেও এই দুটি দল পশ্চিম বাংলায় একটি আসনও পায়নি। দুটো নির্বাচনেই নির্বাচকরা এই দুটো পার্টির প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি।
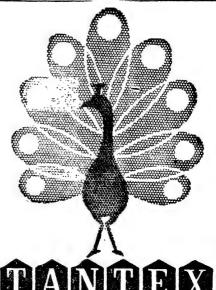
জনসংঘ পশ্চিম বাংলায় কোন আসন না পেলেও পাঁচটি রাজ্যে কিছু আসন পেয়েছে। এই পাঁচটি রাজ্য বিধানসভায় মোট ১১৫টি আসন পেয়েছে। তার মধ্যে সবচাইতে বেশী পেয়েছে মধ্যপ্রদেশে। এই রাজ্যে জনসংঘ ৪১টি আসন, পি-এস-পি ৩৩টি আসন এবং নির্দলীয়রা ৩৯টি আসন পাওয়ার ফলে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের আসন খানিকটা টলে উঠেছে। এই সংকট থেকে মুক্ত হ'য়ে কংগ্রেস যদি প্রধান হ'য়ে উঠতে পারে তবেই মধ্যপ্রদেশের রাজ্য-নীতি সুস্থ পথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। না হ'লে প্রতিক্রিয়া-শীল দলগুলো প্রবল হয়ে ওঠার সুযোগ খুঁজবে। মধ্যপ্রদেশের (ডাঃ কাটজুর পরাজয়ের পর) বর্তমান সংকট এসেছে এই দিক থেকেই।

এ ছাড়া আর যেখানে জনসংঘ প্রবল হয়ে উঠেছে তা হ'ল উত্তর প্রদেশ। এই প্রদেশে বেশ কিছুদিন থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ চলেছে। সে বিবাদ যে এখনও

বেশ তীব্র হ'য়ে আছে (বিহারে যেমন আছে) তার আভাস এই নির্বাচনেও পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় এই নেতৃত্বের লড়াই-এ সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে জনসংঘ, এবং উত্তর প্রদেশের নূতন বিধানসভায় এই দলই হবে বৃহত্তম বিরোধী দল। লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান নির্বাচনের ফলে অন্ততপক্ষে সাতটি রাজ্যের বিধানসভা থেকে এই দল নির্বাসিত হয়েছে। তবু, ১৯৫৭ সালের তুলনায় এই দলের আসনসংখ্যা বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৯টি। কম্যুনিস্ট পার্টি ও স্বতন্ত্র পার্টির পরেই জনসংঘের স্থান নির্ধারণ করা যায়, অন্তত দলগত আসনসংখ্যার হিসেব অনুসারে।

পশ্চিম বাংলার মত আসামেও জনসংঘ রাজ্য বিধানসভা বা লোকসভার কোন আসনই পায়নি। আসাম সম্বন্ধে এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কম্যুনিস্ট পার্টিকেও জনসংঘের মত বিদায় নিতে হয়েছে এই রাজ্যের আইনসভার রাজনীতি থেকে। রাজ্য বিধানসভা বা লোকসভার কোন আসনই কম্যুনিস্ট পার্টি পায়নি।

অথচ বলা যায়, পশ্চিম বাংলার পরেই অন্য যে রাজ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তা আসাম। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে গঠিত আসাম বিধানসভায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা সংখ্যায় বেশী না হলেও বিশেষভাবে সক্রিয় ও প্রবল ছিল। এমন কি, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের পর এক উপনির্বাচনে কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রীফণী বোরা কংগ্রেস নেতা শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়াকে যখন পরাজিত করে তখন শুধু আসামেই নয়, কংগ্রেসের উর্ধতন মহলেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। এবারের নির্বাচনে আসামের কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত।

আসামে বর্তমানে নির্বাচনের বড় রকমের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল তথা-কথিত অসমীয়া ভাষা আন্দোলন এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বিক্ষোভ।

আসামের ভাষা আন্দোলনের সময় সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে যে বীভৎসতা প্রকাশ পেয়েছিল তার দাগ এখনও মুছে যায়নি। বাঙালীরা নির্যাতিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এবং পুলিসের গুলীর সামনে আত্মাহুতি দিয়েছে কাছাড় অঞ্চলে। এই অবস্থার মধ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মত কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও এসেছিল অন্তর্বিরোধ। কিন্তু এই অন্তর্বিরোধের হাত থেকে আসামের কোন রাজনৈতিক দলই রেহাই পায়নি। কাজেই এ যুক্তি অচল হয়ে যায় যে, তথা-কথিত ভাষা আন্দোলনের মূল্য দিয়েছে একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি।

অন্তর্বিরোধের দিক থেকে বিচার করলে কংগ্রেসেরই সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা। কারণ, দেখা যায়, নির্বাচনের পরে কংগ্রেসের এই অন্তর্বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আসামে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে।

তা ছাড়া, আসামে কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যপদ্ধতির সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের অজানা নেই যে, গত কয়েক বছর ধরেই এই পার্টি আসামের বিভিন্ন এলাকায় এদের প্রভাব বিস্তার করেছে নানাভাবে। তবু, আসামের নির্বাচকরা কম্যুনিস্ট পার্টিকে তাদের সমর্থন জানায়নি। বিস্ময় এসেছে এই দিক থেকে।

কম্যুনিস্ট পার্টির বিঘোষিত নীতি ছিল, কেরলের পর পশ্চিম বাংলা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা ছিল পশ্চিম বাংলার পর আসাম। সেই আসামে পার্টি বিপর্যস্ত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিরাশ হ'তে হয়েছে।

নির্বাচনের সমগ্রভাবে যে রাজনৈতিক চেহারা দেখা যাচ্ছে তাতে কম্যুনিস্ট পার্টির স্থান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আসাম থেকে, গুজরাট থেকে পার্টিকে মুছে দিয়েছে এই নির্বাচন।

অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিম বাংলা ছাড়া আর সব রাজ্যে পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান নির্বাচনে এই দল রাজ্য বিধানসভার আসন পেয়েছে ১২টি বিহারে, ১টি মধ্যপ্রদেশে, ২টি মাদ্রাজে, ৬টি মহারাষ্ট্রে, ৩টি মহী-

শুরে, ৯টি পাঞ্জাবে, ৫টি রাজস্থানে, ১৪টি উত্তর প্রদেশে, ৪৯টি পশ্চিম বাংলায় এবং ৫১টি অন্ধ্রে। লোকসভায় ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের মত এবারে এই পার্টি দখল করেছে ৪৯৪টি আসনের মধ্যে ২৯টি আসন।
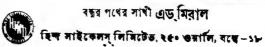
রাজনীতির বিচারে পশ্চিম বাংলার নির্বাচন তাই সবচাইতে বেশী উল্লেখ-যোগ্য। এই রাজ্য কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। পার্টির পক্ষে তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল নির্বাচনী চটকের। সেই প্রয়োজনেই বামপন্থী জোটের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন শেষে দেখা যাচ্ছে, জোটের ফলে ফরোয়ার্ড ব্লক বিরোধী দলের মধ্যে (কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া) এবার যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্য দিকে, কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিধানসভায় ফরোয়ার্ড ব্লক নিজস্ব শক্তির অধিকারে কথা বলার দাবি জানিয়েছে—কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নয়। ফলে বামপন্থী জোটের মধ্যে হতাশা আরও গভীর হয়ে দেখা দেবার সুযোগ ঘটেছে।

অন্য দিকে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস দলই দাবি করতে পারে যে, জেলায় জেলায় যত অন্তর্বিরোধই থাক না কেন, বিধান-সভার নেতৃত্ব নিয়ে অন্ততপক্ষে কোন বিরোধ নেই। তা ছাড়া বিরোধীপক্ষের প্রধান ঘাটিগুলো অধিকার করে চমক লাগিয়েছে কংগ্রেস এই পশ্চিম বাংলায়। নির্বাচনের দিক থেকে কংগ্রেস পক্ষে এটাই প্রধান লাভ, রাজনৈতিক জয়।

সব মিলিয়ে বর্তমান নির্বাচন সম্বন্ধে যা নজরে আসে, তা প্রধানত এই যে, (১) এবারের নির্বাচন অনেকাংশে রাজনৈতিক ভিত্তিতে হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় এই লক্ষণ সুস্পষ্টভাবেই এবার দেখা গেছে। শুধু শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলেই নয়, কোন কোন গ্রামাঞ্চলেও নির্বাচকদের রাজনৈতিক চেতনা এই নির্বাচনে প্রতি-ফলিত হয়েছে।

(২) রাজনীতির লড়াই এই নির্বাচনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলেই এবার পশ্চিম বাংলায় বেশী সংখ্যক নির্বাচক ভোট দেবার জন্য এগিয়ে এসেছে। ১৯৫৭ সালে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচকদের সংখ্যা ছিল ১,৫২,১৬,৫৩২। তাদের ভোট সংখ্যার (দ্বি-আসনযুক্ত কেন্দ্রগুলিতে প্রত্যেক নির্বাচক দুটো করে ভোট দিয়েছিল) শতকরা ৪৭·৭৩ ভোট দ্বিতীয় নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত করেছিল। এবারের নির্বাচনে নির্বাচকসংখ্যা ছিল ১,৬১,৮৪,৬৮৫। তাদের মধ্যে শতকরা ৫৮·৮৬ জন এবার ভোট দিয়েছিল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভোটদানের শতকরা হার ছিল ৫৩·৬৯; অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় সর্বভারতীয় শতকরা হারের বেশী ভোট পড়েছে এই নির্বাচনে।

(৩) পুরুষের সংখ্যা বেশী হলেও মেয়েদের সংখ্যাও এই নির্বাচনে কম ছিল না এবং তাঁরা দলে দলে এবার ভোট দেবার জন্য গ্রামে ও শহরাঞ্চলে এগিয়ে এসেছে। ফলে, প্রতি জেলায় এবার ভোটদানের সংখ্যা অনেকাংশে বেড়েছে।

(৪) এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে-সব অঞ্চলে ভোটদানের শতকরা হার ৫০-এর উর্ধ্বে উঠেছে সেখানেই ভোটের মোট অংশ গিয়েছে কংগ্রেসের অনুকূলে। যেমন, হুগলী জেলায় প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার এবার ছিল ৬৩·১৯ এবং এখানে কংগ্রেস পেয়েছে ঐ ভোটের শতকরা ৫০·৯৩ আর কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছে শতকরা ৩৩·০৯। হাওড়ায় প্রদত্ত ভোটের হার শতকরা ৫৮·৩২; তার মধ্যে শতকরা ৫০·১০ পেয়েছে কংগ্রেস, শতকরা ২১·৬৬ পেয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টি। কলকাতায় ভোট দিয়েছে শতকরা ৬৬·১৯ এবং তার মধ্যে ৪৭·০৪ জন দিয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে এবং শতকরা ৩২·৬৩ জন কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে। মেদিনী-পুরে ভোট দিয়েছে শতকরা ৬০·২৯ জন; তার মধ্যে শতকরা ৫২·২২ জন দিয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে এবং শতকরা ২৩·০৯ জন কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে। ২৪ পরগনায় ভোট দিয়েছে শতকরা ৬১·৪১ জন; তার মধ্যে শতকরা ৪৮·৭৩ জন দিয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে এবং শতকরা ৩০·৯৬ জন কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে।

(৫) শহর ও শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেস এবার যেমন সাফল্যের সংগে অনুপ্রবেশ করেছে, অন্য দিকে বিরোধী দলের পক্ষেও নূতন রাজনৈতিক ক্ষেত্র লাভ হয়েছে বিভিন্ন জেলায়, গ্রামে, পল্লীতে। যেমন, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহারে।

(৬) এবারের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রভাব বিস্তারে যে প্রবল প্রচেষ্টা হয়েছিল তা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় পার্টির শক্তি ও অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়েছে সত্যি, কিন্তু অন্যান্য রাজ্য থেকে রাজনৈতিক আঘাত সহ্য করতে হয়েছে অনেক বেশী। কোন কোন রাজ্যে, যেমন আসামে, পার্টির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছে।

(৭) এই নির্বাচনের বড় আশংকা আংশিকভাবে বাস্তবরূপে দেখা দিয়েছে। যদিও পশ্চিম বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে একটি আসনও দখল করতে পারেনি, তবু স্বতন্ত্র পার্টি আজ কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান 'চ্যালেঞ্জার' হয়ে উঠেছে। কোন কোন রাজ্যে, যেমন বিহারে স্বতন্ত্র পার্টি নির্বাচকদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

(৮) প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর মধ্যে দু-একটি দল ভারতের কোন কোন অংশে জোরদার হয়ে উঠেছে এই নির্বাচনে। যেমন, জনসংঘ হয়েছে উত্তর প্রদেশে এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সহায়তায় দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম দল হয়েছে মাদ্রাজে।

তবু, আশার কথা, এবারেও প্রতিক্রিয়া-শীল দলগুলো পশ্চিম বাংলায় কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। পশ্চিম বাংলার নির্বাচন রাজনীতি-ঘেঁষা হয়েছে বলেই নির্বাচকদের তৃতীয় রায়ে এত চমক লেগেছে। কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য।

সমাপ্ত

॥ ৭ ॥

এমন সময় নুক্ ফিরে এল।

ঘোষাল সোৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন—"তোমার সঙ্গে কিছু কথা হল নাকি?"

নুক্ জবাব দিল না।

"এ কি, তোমার হাতের চুড়ি আর গলার হার কোথা?"

এ কথারও কোন জবাব না দিয়ে নুক্ ভিতরে চলে গেল।

"দেখলেন, কি কাণ্ড করে এল! এই কিছুদিন আগেই ওকে চুড়ি আর হার গড়িয়ে দিয়েছি তিন হাজার টাকা খরচ করে। স্বচ্ছন্দে দিয়ে চলে এল! নাঃ, অনেক রকম মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করেছি, কিন্তু এরকমটা আর দেখি নি। She is a problem girl. ও মানুষ নয়, মূর্তিমতী হেঁয়ালি একটা—"

হঠাৎ ডাক্তার ঘোষালের মুখ ভয়ংকর হয়ে উঠল। দাঁত কিড়মিড় করে ঘুঁষি পাকিয়ে তিনি বললেন, "হারামজাদীকে ঠেঙিয়ে পস্তা উড়িয়ে দেব আজ।"

তিনি ছুটে ভিতরের দিকে যাচ্ছিলেন, গণেশ হালদার তাঁকে আটকালেন।

"না, না, মারধোর করবেন না। বসুন, একটু স্থির হোন—"

রাঘব ঘোষালের মতো বলিষ্ঠ লোককে জোর করে বসাবার সাধ্য হালদার মশায়ের ছিল না। কিন্তু তিনি নিজেই বসে পড়লেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল সবিস্ময় কৌতুকহাস্য। তিনি ভুরু দুটো কপালে তুলে চোখ বড় বড় করে বললেন, "হোয়া—ট্! আপনিও গড়্ড খেয়েছেন নাকি?"

"গড়্ড খেয়েছি, মানে?"

সত্যিই কথাটা বুঝতে পারেন নি গণেশ হালদার।

"আমাদের সারকেলে গড়্ড খাওয়ার একটি মানেই হয়। প্রেমে পড়া! আপনি জানেন না বুঝি? আপনি একেবারে ভিন্ন জাতের লোক দেখছি! হা-হা-হা! ওর প্রতি হঠাৎ দরদ দেখে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার ও প্যাঁচে পড়বেন না। কিন্তু সাবধান করা বৃথা। আপনার ভিতর লোহা থাকলে, I mean base metal, ও আপনাকে টানবেই। ও একটি সাংঘাতিক চুম্বক, she is a powerful magnet."

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সুবেদার, পাণ্ডা দুজনেই হাবুডুবু খাচ্ছে। নুকই ওদের ফাঁসিয়ে রেখেছে এখানে। Nook has hooked them here। তাতে আমাদের ব্যবসার সুবিধে হয়েছে খুব। পরে আপনাকে—এই দেখুন, আবার আমি একটা টপ্ সিক্রেট আপনাকে বলে ফেললুম। বলা উচিত ছিল না।"

তারপর অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে আবার ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "আশা করি নুক্ শুনতে পায় নি। শুনলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। ও একটা বাঘিনী। She is a tigress."

গণেশ হালদার সত্যিই বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

বললেন, "আমি এ রকম মেয়ে দেখি নি—"

"আমি সারা জীবন মেয়েমানুষ চরাচ্ছি মশাই, আমিই কি দেখেছি? দেখি নি। ও না জানে কি, না পারে কি! ইংরিজী জানে, বাংলা জানে, সংস্কৃত জানে, গান গাইতে পারে, মোটর চালাতে পারে, ছোরা খেলতে পারে। তার উপর ওই রূপ! মানুষের কলজের ভিতর বসে যায় একেবারে। হীরের তৈরী বাঘ-নখ একটি।"

অপ্রত্যাশিতভাবে কাউ এসে প্রবেশ করল ভিতর দিক থেকে।

"মাসীমা বলছেন, খাবার দেওয়া হয়েছে, খেয়ে নিতে—"

"তোমার মা কোথা গেলেন?"

"আমি জানি না, মাসীমা জানেন।"

"তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে না?"

"না। মাসীমা এখানে থাকতে বললেন।"

"মাসীমা কি এ বাড়ির মালিক নাকি?"

কাউ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

"এ তো আচ্ছা জবরদস্তি দেখছি। আমার বাড়িতে আমি কেউ নই। I am a cipher in my household. কান্ট বি।"

এক লম্ফে ঘোষাল ভিতরের দিকে চলে গেলেন। হালদার ভাবলেন এই সুযোগে সরে পড়ি। কিন্তু তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারলেন না, তাঁর মনে হতে লাগল কে যেন তাঁকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছে চেয়ারটার সঙ্গে। তিনি উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন। ঘোষাল কি বললেন তা শুনতে পাওয়া গেল না, কিন্তু নুকের তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল একটু পরেই।
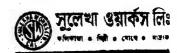
"আমার গয়না আমি যাকে খুশি দিয়েছি, তোমার তাতে কি।"

তারপর, "হ্যাঁ, কাউ এখানে থাকবে। ওকে নইলে আমার চলবে না। তোমার ভালোর জন্যেই ওকে যেতে দিই নি। ও এখানে থাকবে, থাকবে, থাকবে—"

এর পরই দড়াম্ করে একটা শব্দ হল। এবং তারপরই আর একটা বিরাট শব্দ হল, মনে হল একটা হাঁড়ি চুরমার হয়ে গেল বুঝি। গণেশ হালদার তড়াক করে উঠে ভিতরে ছুটে গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন তা দেখবেন বলে প্রত্যাশা করেন নি। দেখলেন, ডাক্তার ঘোষাল সর্বাঙ্গে ডাল মেখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কোট প্যান্ট ডালে মাখামাখি, মাথা থেকে কপাল থেকে টপটপ করে ডাল পড়ছে। তাঁর হাতে একটা মোটা লাঠি। ঘরের আর এক প্রান্তে নুকু দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে বঁটি। কাউ নেই। গণেশ হালদারকে দেখেই নুকু বঁটিটা ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

গণেশ হালদারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঘোষাল হেসে ফেললেন, তারপর জিব বার করে ঠোঁটের উপর যে ডালটা পড়েছিল, সেইটে চাটতে চাটতে বললেন, "অদ্ভুত মেয়ে, না? Isn't she interesting?"

গণেশ হালদারও হাসলেন একটু।

"যান, স্নান করে ফেলুন।"

"তা তো ফেলবই। আহা, ডালটার চমৎকার টেস্ট্ হয়েছিল। সমস্ত বরবাদ করে ফেললে হারামজাদী।"

"আপনি স্নান করুন। আমি আজ যাই।"

"একটু বসুন না বাইরে। আমি চট করে আসছি—"

"এখন আমার একটু কাজ আছে। কাল না হয় আসব।"

"কাল? জানেন না, কাল always পলাতক? বিশেষ করে আগামী কাল? Tomorrow is very elusive. যাক, আপনি যখন থাকবেন না, যান। Many thanks. Good night."

গণেশ হালদার বেরিয়েই দেখলেন একটা মোটর এসে দাঁড়াল। মোটর থেকেই সুবেদার খাঁ হাঁক দিলেন—"ডাক্তার ঘোষাল, মাল এসে গেছে। আনিয়ে নিন। শ্রীমতী ঝিনুক কোথায়?"

এইটুকু শুনেই গণেশ হালদার চলে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন গিয়ে একটু লেখাপড়া করবেন। কিন্তু বিধাতা সেদিন জ্ঞানার্জনের অন্য রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর বাইরের দরজার কাছে নুকু দাঁড়িয়ে আছে।

নুকুই এগিয়ে এসে বললে, "আমার দুর্ভাগ্য যে, যখনই আপনি আমাদের ওখানে যাচ্ছেন তখনই এমন একটা কিছু ঘটছে যাতে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার জীবনকাহিনী যদি শোনেন আমাকে অত খারাপ মনে হবে না। আজই আপনাকে শোনাতাম, কিন্তু দেখতে পেলাম মোটর আমাদের বাড়িতে ঢুকল, এখনই আমার খোঁজ পড়বে। তাই এখন আর দাঁড়াতে পারছি না। কিন্তু আপনাকে আমার জীবনের সব কথা বলবার ভারি ইচ্ছে, কখন আপনার সুবিধা হবে বলুন তো?"

"কি করব আমি আপনার জীবনকাহিনী শুনে? শুনে লাভ কি বলুন?"

"আমার তৃপ্তি। হয়তো অন্য লাভও আছে, কিন্তু সে কথা এখন বলা যাবে না। আগে সব শুনুন, পরে বিচার করবেন।"

একটু ইতস্তত করে গণেশ হালদার শেষে বললেন, "আমি এখানকার স্কুলের শিক্ষক। আমাকে কেন্দ্র করে কোন খারাপ গুজব রটে এটা আমি চাই না। কিন্তু আপনাদের সংস্রবে এলেই গুজব রটবে। নানা লোকে নানা কথা বলবে। আমি কার মুখ চাপা দেব? সেইজন্য আমি এসবের মধ্যে যেতেই চাইছি না। আমাকে মাপ করবেন।"

"আপনাদের গাঁয়ের গিরিশ বিদ্যার্ণবকে মনে আছে?"

"হ্যাঁ, খুব ছেলেবেলায় তাঁকে আমি দেখেছি। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"তিনি আমার বাবা। বাবা আর দাদা রায়টে মারা গেছেন। ডাক্তার ঘোষাল আমাদের দুই বোনকে, এক কাকাকে আর ভাইপোকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। সে সময় ওঁর যে সাহস দেখেছিলুম তা অপূর্ব।"

"আপনি আমাদের গাঁয়ের মেয়ে? আপনাকে কখনও গাঁয়ে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।"

"আমি গাঁয়ে খুব কম থেকেছি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। গাঁয়ে বিশেষ যেতাম না, ওই দাঙ্গার ঠিক আগে গিয়ে পড়েছিলাম। আপনার বোন বুলি আমাকে চেনে। তার মুখেই আপনার কথা প্রথম শুনি, তখন আপনি বিলেতে। এখানে আপনি যখন এলেন তখন আপনার নাম শুনে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু প্রথমে বুঝতে পারি নি যে, আপনি আমাদের গাঁয়েরই গণেশ হালদার। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি—"

"মা আর বুলি কোথায় জানেন?" ঝিনুকের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন গণেশ হালদার।

"আপনি শোনেন নি?"

"না, আমি কিছু জানি না। তাদের কোন খবর যোগাড় করতে পারি নি।"

"আপনার মা গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। রাধাবল্লভজীর মূর্তিকে কাপড় দিয়ে বুকে বেঁধে দু হাতে দুখানা দাও নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন বলেই বুলি বেঁচেছে।"

"বুলি এখন কোথায়?"

"ঠিক জানি না। কার সঙ্গে যেন কলকাতার দিকে চলে এসেছিল শুনেছি। আমি ঠিক জানি না।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গণেশ হালদার। ঠিক সেই সময় মোটরের হর্নটা খুব জোরে জোরে বাজতে লাগল।

"ওরা আমাকে ডাকছে, আমি যাই।"

ঝিনুক চলে গেল। হালদার দাঁড়িয়েই রইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এ সংবাদটা শোনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মনে হল দাঙ্গা হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পরে তিনি বিলেত থেকে ফিরেছিলেন। দেশেও গিয়েছিলেন, কিন্তু একটাও চেনা মুখ দেখতে পান নি। গ্রামে পুরোনো লোক কেউ ছিল না। এমন কি, পুরোনো মুসলমানরাও না। গ্রামে পাঞ্জাবী আর বিহারী মুসলমানরা বসবাস করছিল। হঠাৎ একটা বিপুল গর্বে তাঁর মনটা ভরে উঠল। মা যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়েছিলেন! তিনিই বুলিকে রক্ষা করেছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুমূর্ষু বাবার মুখটাও মনে পড়ল। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত তাঁর সমস্ত চেহারাটাই ভেসে উঠল চোখের উপর। চোখ বুজে-ছিলেন তিনি, চোখের দু' কোণ বেয়ে জল পড়ছিল। ছেলেবেলায়-দেখা এই ছবিটাই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল তাঁর চোখে। তিনি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঝিনুক ফিরে গিয়ে দেখল সুবেদার খাঁ, পান্ডা আর ঘোষাল তিনজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার প্রত্যাশায়। ঘোষাল স্নান করে কাপড়-চোপড় বদলেছেন।

ঝিনুককে দেখে উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এলেন তিনি, যেন কিছুই হয় নি।

"হ্যালো, নুক, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? সুবেদার সাহেব অস্থির হচ্ছেন তোমার জন্যে। লালপুরের মাঠে যেতে হবে তোমাকে। এবার জালে অনেক মাছ উঠেছে। It is a big catch this time."

সুবেদার খাঁ সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। চুপি চুপি বললেন, "লালপুরের মাঠের কাছে যে গুমটিটা আছে, তার থেকে কিছু দূরে পশ্চিমেই ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালটা। সেই সিগনালের নীচেই যে ঝোপটা আছে সেই-খানেই ব্যাগটা ফেলেছি। গিয়ে নিয়ে এস এক্ষুনি। এত রাত্রে যদিও ওখানে অন্য লোক যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তবু এখনই নিয়ে আসা ভাল। সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি গাড়িটা নিয়ে এখনই চলে যাও।"

ঝিনুক চুপ করে রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল, "গতবারের অংশ আমি এখনও পাই নি। তা না পেলে আমি যাব না।"

ঘোষাল আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, "ওকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, she is a tough nut, ও বড় শক্ত ঘাঁটি। পান্ডা, দিয়ে দাও ওর প্রাপ্যটা—"
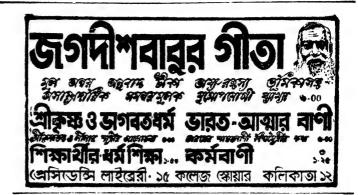
পান্ডা তৎক্ষণাৎ কোটের ভিতরের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে দিলেন নুকককে।

"দশখানা নম্বরী নোট আছে, গুনে নিন।"

ঝিনুক গুনলে না, নোটের তাড়াটা বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিল।

"আমরা তা হলে তাসে বসি। সেনও এক্ষুনি আসবে। তুমি আর দেরি ক'রো না। সেন আসবার আগেই তুমি বেরিয়ে পড়।"

ঝিনুক ভিতরে গিয়ে একটা বেঁটে কোট পরে এল। তারপর সোজা গিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসল এবং চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে গাড়িটা ব্যাক করে বোঁ করে বেরিয়ে গেল।

ঝিনুক চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরেই মিস্টার সেন এলেন আর একটা গাড়ি করে, আর তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে তনিমা।

তনিমাকে দেখে বিগলিত হয়ে পড়লেন ঘোষাল।

"আরে আসুন, আসুন, আসুন। সূর্য

আজ পশ্চিম দিকে উদিত হয়েছে দেখছি, the sun has preferred the west today, what a wonder. কি সৌভাগ্য আমার।"

মুচকি হেসে নমস্কার করলেন তনিমা। ঘোষাল প্রতি-নমস্কার করে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

"আপনাকে দেখে আনন্দও যেমন হচ্ছে, ভয়ও তেমনি করছে। আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে খেলতে বসেন তা হলে তো নির্ঘাত নিঃস্ব হয়ে যাব আজ। you will suck me outright."

মুচকি হেসে তনিমা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "তা হলে খেলব না। বাপি, আমি বরং ফিরে যাই, ফিরে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিই তোমাকে। কেমন?"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ঘোষাল।

"আরে না, না, সে কি হয়! আপনার সঙ্গে খেলব, হেরে যাব জেনেও খেলব, আপনার সঙ্গে হেরে যাওয়ার একটা সুখ আছে যে। আজ শুধু আপনার সঙ্গে খেলব না, সর্বস্বপণ করে খেলব। I shall stake everything today."

বক্র দৃষ্টিতে মুচকি হেসে ঘোষালের দিকে চেয়ে রইলেন তনিমা সেন ঘাড় বেঁকিয়ে। মিস্টার সেনের চক্ষে এসব মোটেই অশোভন ঠেকল না। মিস্টার সেন জাতীয় লোকের কাছে ঠেকে না। তাঁর ডায়োসেসনে-পড়া মেয়ের তিনি ইয়ার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ের সঙ্গে পিতার গাম্ভীর্য রক্ষা করাটা তিনি সেকেলে কুসংস্কার মনে করেন। তনিমার গত জন্মদিনে তাকে এক সেট হ্যাভেলক এলিস কিনে উপহার দিয়েছেন। কিছুদিন আগে লোলিটা (ললিতা?) নামক বইটা কিনে নিজে পড়েছেন, মেয়েকেও পড়িয়েছেন, আধুনিক সাহিত্য-কৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে।

তনিমা তাস খেলায় নাকি সিদ্ধ-হস্তা। ঠিক তার বাপের উলটো। মিস্টার সেন খেলতে বসলেই হেরে যান। ডাক্তার ঘোষালের কাছে তাঁর নাকি দেড় হাজার টাকার উপর ধার হয়ে গেছে। তাস খেলার ধার! সেই ধার শোধ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে তনিমাকে নিয়ে আসেন।

"বাপি থাকব?"

"থাকো না। এসেইছ যখন দু হাত খেলে যাও।"

ঘোষাল দু হাত জোড় করে বললেন, "দয়া করুন, প্লীজ স্টে।"

মিস্টার সেন হেসে উঠলেন। তিনি সাধারণত মুচকি হাসেন, জোরে হাসেন না। কিন্তু যখন হাসেন তখন অদ্ভুত শব্দ হয় একটা। সে শব্দ প্রায় অবর্ণনীয়। মনে হয় কুলকুচোর করার শব্দের সঙ্গে হেঁচকি ওঠার শব্দ মিশছে।

পান্ডাও অনুরোধ করলেন তনিমা সেনকে। দয়বেশ পান্ডা বেঁটে মোটা লোক। মনে হয় যেন একটা চতুর্ভুজের উপর তাঁর মুণ্ডু গলা হাত পা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পিতলের বোতাম-ওলা ঢিলে কালো বা নীল রঙের গলাবন্ধ কোট গায়ে দেন। মুখটাও চতুষ্কোণ, কান দুটোও প্রায় সেই রকম, মনে হয় যেন মুখের অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে। দু থাক চিবুক, ভুঁড়ো নাক, ঝাঁকড়া ভুরু। তাঁর কথা-বার্তার মধ্যে একটু যেন হুকুমের সুর থাকে। যখন অনুরোধ করেন তখনও সেই সুরটা বাজে। প্রচুর ঘুষ এবং খোশামোদ পেয়ে পেয়ে এই অবস্থা হয়েছে।

তনিমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আমাদের সুখী করতে যদি আপনার অনিচ্ছা থাকে, যেতে পারেন।"

তনিমা ঘাড়টি এক দিকে কাত করে চোখে মুখে নিরুদ্ধ হাসির আভা বিকীর্ণ করে বললেন, "আচ্ছা, থাকব।"

সুবেদার খাঁ যাবার জন্যে উসখুস করছিলেন, এ সুযোগ তিনি উপেক্ষা করলেন না।

"আপনারা তো চারজন হয়েই গেলেন। আমাকে ছেড়ে দিন তা হলে আজ। আমি সমস্ত দিন ডিউটিতে ছিলাম, বড় ক্লান্ত লাগছে, বসতে ইচ্ছে করছে না। ডাক্তারবাবুর 'বাইক'টা কি ঠিক আছে? পেতে পারি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সারটেনলি।"

সুবেদার খাঁ বাইকে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। সবাই ভিতরে ঢুকে টেবিলের চারধারে বসলেন।

"কাউ, আমাদের কফি দাও।"

ঘোষাল চীৎকার করে দ্বারের দিকে চাইলেন। কাউকে দেখা গেল না।

"কাউ নেই নাকি?"

ঘোষাল ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

তারপরই ফিরে এসে বললেন, "নো কাউ, নো নুক। আমিই জলটা চড়িয়ে দিয়ে এলাম ইলেকট্রিক কেতলিতে। কফি না হলে জমবে না। নুক খানিকটা শিককাবাব বানিয়ে রেখেছে দেখছি। আনব?"

মিস্টার সেন মুচকি হেসে বললেন,

"শুধু মাংস কুকুরে খায়। মানুষ মাংসের সংগে আরও কিছু চায়, কি বলেন, মিস্টার পান্ডা। আমি অবশ্য বাড়িতে এক পেগ চড়িয়ে এসেছি।"

ঈষৎ নাকি সুরে তনিমা বললে, "বাপি, তুমি আজকাল বড্ড বেড়েছ। মাম্মি যদি জানতে পারে কুরুক্ষেত্র কান্ড করবে।"

ঘোষাল কিছু না বলে আলমারি থেকে এক বোতল হুইস্কি বার করে বললেন, "হিয়ার ইউ আর"—বলেই টেবিলের উপর রাখলেন সেটা ঠক্ করে। তারপর গ্লাস বার করতে লাগলেন।

সকলেরই চোখে মুখে বেশ একটা প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল।

সেদিন সুঠাম মুকুজ্যের অভিযান একটু নূতন ধরনের হয়েছিল। তিনি সেদিন দিনে না বেরিয়ে অনেক রাত্রে বেরিয়েছিলেন। রেল লাইনের ধারে যে উঁচু টিলাটা ছিল সেইখানেই গিয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাত্রে বেরুলে রকেটকে সংগে নিয়ে বেরোন তিনি। রকেট বাধ্য কুকুর, চুপ করে বসে থাকে তাঁর কাছে, থাবার উপর মুখ রেখে। টুঁ শব্দটি করে না। ডাক্তার মুখার্জির একটা ছোট টেলিস্কোপ আছে। সেইটে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বেরোন, রাতের আকাশ দেখতে। মাঝে মাঝে এর থেকে তিনি প্রচুর আনন্দ আহরণ করেন। অনেক দিন আগে সন্ধ্যার আকাশে বৃহস্পতি গ্রহের একটা চাঁদকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। যদিও একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো, তবু এটা যে বৃহস্পতিরই চাঁদ তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। আনন্দে মেতে উঠেছিলেন সেদিন। তার কিছু দিন পরে একটা বইয়েও পড়েছিলেন যে, ছোট টেলিস্কোপ দিয়েও বৃহস্পতির চাঁদ দেখা যায়। তখন থেকে বৃহস্পতি গ্রহ আকাশে উঠলেই তিনি টেলিস্কোপটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিছুদিন আগে আর একটা জিনিস দেখেও তিনি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন।

টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে একজায়গায় তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একটা জ্যোতিষ্ক দেখতে পান। তাঁর মনে হল এ জায়গায় তো এ রকম নক্ষত্র আগে দেখিনি। তা হলে বোধ হয় ওটা ধূমকেতু, আমাদের পৃথিবীর দিকে আসছে। দিন দুই পরেই ঠিক দেখা গেল একটা ছোট ধূমকেতু দেখা দিয়েছে আকাশে।

সেদিন তিনি গিয়েছিলেন অ্যানড্রোমিডা (Andromeda) নক্ষত্রপুঞ্জে যে নীহারিকাটা আছে সেইটে দেখতে। এর সম্বন্ধে সেদিন একটা বইয়ে অনেক নূতন খবর পড়েছিলেন, তাই এটাকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। অ্যানড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল দুটি কারণে। প্রথম কারণ অ্যানড্রোমিডার সংগে আমাদের রেবতী নক্ষত্র জড়িত। দ্বিতীয় কারণ অ্যানড্রোমিডার সম্বন্ধে গ্রীক উপাখ্যানটি। গ্রীক পুরাণে অ্যানড্রোমিডা সিফিউস রাজার সুন্দরী কন্যা। কিন্তু সে কন্যার জীবনে নিদারুণ অভিশাপ নেমে এসেছিল তার মায়ের জন্য। তার মা বড়াই করে বেড়াতেন যে, তাঁর মেয়ে Neireidesদের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। এই কথা শুনে সমুদ্রাধিপতি Poseidon ক্রুদ্ধ হয়ে সিফিউসের রাজ্যে বিরাট ভয়াবহ এক সামুদ্রিক দানবকে পাঠিয়ে দিলেন। সে সিফিউসের Cepheus রাজত্ব ধ্বংস করতে লাগল। শেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ভবিষ্যদ্বাণী হল যে, সিফিউস যদি তাঁর মেয়েকে ওই দানবের কবলে দিয়ে দেন, তা হলে তাঁর দেশ রক্ষা পাবে। নিরুপায় সিফিউস শেষে তাঁর মেয়ের হাতে পায়ে শিকল বেঁধে তাকে টাঙিয়ে দিলেন এক সামুদ্রিক পাহাড়ের উপর। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন বীর পারসিউস। এ গল্পটা যখন প্রথম পড়েন (কিছু দিন আগেই পড়েছিলেন গল্পটা) তখন কেন জানি না তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছিল আমাদের দেশবিভাগের কথা। মনে হয়েছিল পাকিস্তানই বুঝি ভারতবর্ষের অ্যানড্রোমিডা। যে সর্পিল কুন্ডলিত নীহারিকাটাকে নিয়ে জ্যোতির্বিদেরা এত গবেষণা করেছেন সেটাকে তিনি কল্পনা করে রেখেছিলেন ওই সামুদ্রিক দানবটার সংগে। পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভেঙেছিল যখন পড়লেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন যে, সামুদ্রিক দানবটাকে নিয়েও আর একদল নক্ষত্রপুঞ্জ চিহ্নিত হয়ে আছে আকাশে।

সেদিন ওই ছোট সাদা মেঘের মতো নীহারিকাটার দিকে চেয়ে তিনি মনে মনে আকাশ-ভ্রমণ করছিলেন। কয়েকদিন আগেই তিনি গ্রহনক্ষত্রের বই পড়েছিলেন একটা। তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি মনে মনে এমন একটা যানে চড়েছিলেন, যার গতি-বেগ মিনিটে এগারো মিলিয়ন মাইল। চলেছিলেন তিনি অ্যানড্রোমিডার ওই নীহারিকার উদ্দেশে। অঙ্কের হিসাব অনুসারে পৌঁছতে প্রায় দেড় মিলিয়ন বৎসর লাগার কথা। কিন্তু কল্পনায় কি এত সময় লাগে? চাঁদ নিমেষের মধ্যে পার হয়ে গেলেন, তারপরই দেখা গেল আমাদের সুদূরতম গ্রহ প্লুটো, সেটাও পার হলেন। তারপর আমাদের সৌরজগতের এলাকা ক্রমশ পার হতে লাগলেন, দেখলেন সৌরজগতের সীমানার কাছাকাছি নানা চেহারার একদল ধূমকেতুর ঘোরাফেরা, সময় হলেই পৃথিবীর সীমানায় এসে চমৎকৃত করে দেবে সকলকে। কিছুক্ষণ পরেই লুব্ধক নক্ষত্রের কাছাকাছি এসে পড়লেন, তারপর স্বাতীর, তারপর জ্যেষ্ঠার। চেনা অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ পেরিয়ে যেতে যেতে শুধু নক্ষত্রই দেখলেন না, অনেক জ্যোতির্বাষ্পও দেখলেন, জ্যোতির্ময় মেঘের মতো ঝলমল করছে সব, তারপর......হঠাৎ রকেটের চীৎকারে তাঁর স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রকেট এক ছুটে টিলা থেকে নেমে চলে গেল ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে। আর তারপরই ঝিনুকের আর্ত চীৎকার।

(ক্রমশ)

॥ ৩৩ ॥

শুনেছি, নিভৃত মধুর ভাবনার অবসরে পুরনো দিনের স্মৃতিরা ভিড় জমায়। একান্তে মধুর ভাবনায় ডুবে থাকার মতো সচ্ছল অবসর আজও আমার নেই, তবুও সময়ে অসময়ে এবং কারণে-অকারণে শাজাহান হোটেলের বেদনাবিধুর স্মৃতির মেঘগুলো আমার হৃদয়ের আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে। কেন এমন হয়, কেমন করে হয় তা জানি না, জানবার মতো কৌতূহলও আমার নেই। তবে এইটুকু এতোদিনে বুঝেছি যে, শাজাহান হোটেলকে না দেখলে পৃথিবীর পাঠশালায় আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। মানুষের মনের গহনে যে গোপন মানুষটি লুকিয়ে রয়েছে তাকে যদি চিনতে হয় তবে পথের ধারে পান্থশালায় নেমে আসতে হবেই।

যেদিন পরম বিস্ময়ে ধর্মাধিকরণের অভাবনীয় রহস্যময় রাজপুরীতে প্রবেশ করেছিলাম সেদিন অন্ধকার পথের নিশানা দেবার জন্য আমার পাশে এক অভিজ্ঞ জীবন দরদী ছিলেন। সেদিন কোনো কিছুই আমাকে খুঁজে বার করতে হয়নি, যা আমার জানবার প্রয়োজন, যেমনভাবে তা দেখবার প্রয়োজন তা সেই পরমস্নেহশীল বিদেশী নিজেই ব্যবস্থা করেছিলেন। শাজাহানের সরাইখানায় অসংখ্যের ভিড় থেকে অসাধারণকে খুঁজে বার করে আমাকে দেখাবার জন্যে কেউ নেই। তবু এই আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় ভুবন পথপ্রদর্শকহীন এক সামান্য কর্মচারীকে মণিমাণিক্য উপহার দিয়েছে। কল্পনার রঙে যে পরমপ্রতিভাবান শিল্পীরা সাহিত্যের পটে নব নব চরিত্রের সৃষ্টি করেন, তাঁরা আমার নমস্য। কিন্তু আমি অভিজ্ঞতার ক্রীতদাস। আমার স্মৃতির কারাগারে বন্দী পুরুষ ও নারীর দল সুযোগ পেলেই বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়, তাদের মুক্তি দাবি করে, আমি স্বাধীন মনে কল্পনার সৃষ্টিকে প্রশ্রয় দেবার সুযোগ পাই না।

আজও তারা কারার বন্ধন ছিন্ন করে চৌরঙ্গীর পাঠকের মনের জানালার ধারে এসে দাঁড়াতে চাইছে। কিন্তু হোটেলের সামান্য কর্মচারী আমি কী করবো? নিজের অক্ষমতার তীব্র যাতনা সেইদিন বুঝতে পেরেছিলাম যেদিন শাজাহান হোটেলে মিসেস্ পাকড়াশি পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। ককটেল পার্টি—রিসেপশন টু অনিন্দ্য অ্যান্ড শ্যামলী।

অনিন্দ্যর বিবাহ উপলক্ষে ডিনার পার্টি পাকড়াশি হাউসে ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শাজাহানের উর্দিপরা বয়রা সেখানে গিয়ে পরিবেশন করেছিল। আমারও যাবার হুকুম হয়েছিল। বোসদা বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন; তাই আমাকে সে যাত্রা রক্ষে করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ম্যানেজারকে বলবার প্রয়োজন নেই, তোমার বদলে আমিই যাবোখন।"

সেদিন অনেক রাত্রে বোসদা হোটেলে ফিরে এলেন। আমি তখন একটা চেয়ার বার করে ছাদের উপর চুপচাপ বসেছিলাম। বোসদা যখন ফিরে এলেন, তখন ঘামে ও'র শার্ট ভিজে গিয়েছে। আমাকে বসে থাকতে দেখে রাগ করলেন। বললেন, "শুধু শুধু এখনও জেগে রয়েছো কেন?"

আমি হাসলাম। বোসদা বললেন, "আমরা যেন অশোক কাননে বন্দিনী সীতার দল। শাজাহানের বাইরে যাওয়া ভুলেই গিয়েছি। এতদিন পরে হোটেলের বাইরে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম" গলার টাইটা আলগা করতে করতে বোসদা বললেন, "দেড় হাজার লোকের স্পেশাল কেটারিং তো সোজা জিনিস নয়। হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছি।"

আমি তখনও চুপ করেছিলাম। বোসদা বললেন, "কী এত ভাবছো?"

বললাম, "কিছুই না।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে বোসদা বললেন, "আমরা ছোটোবেলায় সুর করে গাইতাম—ভাবিতে পারি না পরের ভাবনা।"

বললাম, "সারাজীবনই তো আপনি আমাদের মতো পরের ভাবনা ভেবে গেলেন।"

বোসদা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন "হাইকোর্টের ইংরেজ ব্যারিস্টার সায়েব তোমাকে যে কী করে বুদ্ধিমান বলতেন, জানি না। তোমরা কী আমার পর?"

"যাদের আপন ভাবছেন, একদিন হঠাৎ বুঝবেন, তারা সবাই পর।" আমি বোসদার দিকে তাকিয়ে বললাম।

অন্ধকারে সিগারেটের অস্পষ্ট আলোকে আমার মুখটা বোসদা বোধ হয় ভালভাবে দেখতে পেলেন না। বললেন, "কেন? বিপদে পড়লে তুমি কি আমাকে দেখবে না?"

মনে মনে বললাম, 'নিজেকে আমার বুঝতে একটুও বাকি নেই। এই তো দু' নম্বর সুইটে আমার সাহায্যপ্রার্থিনীকে কেমন দেখলাম।'

সত্যসুন্দর বোস দেখে দেখে এবং শাজাহানের বিষ গ্রহণ করে করে যেন নীলকণ্ঠ হয়ে গিয়েছেন। আকাশের দিকে একঝলক ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে বললেন, "সংসারের হোটেলখানায় কেউ কাউকে সার্ভ করতে পারে না। আমরা কেবল ভাল ওয়েটারের মতো সামনে ট্রে ধরতে পারি, তার থেকে যে যার তুলে নিতে হবে।"

কথা শেষ করেই বোসদা এবার হেসে উঠলেন। বললেন, "এখন তোমাকে আর ঐ ট্রে ধরতে হবে না। তোমাকে যা ধরতে হবে তার নাম পেগ। কারণ মিসেস পাকড়াশি ককটেলের ব্যবস্থা করেছেন, এই হোটেলেই। শুধু ডিনারে আজকাল কলকাতার কোনো শুভ কাজই সম্পন্ন হয় না। এখন পাকস্পর্শের পর জলস্পর্শ। অর্থাৎ কোনো হোটেলে একদিন বিশেষভাবে নির্বাচিত অতিথিদের সেবাযত্ন। এ-সবের ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে, কারণ কাল থেকে তোমার বার-ডিউটি, মিস্টার সরাবজী হবেন তোমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু সে-সব পরে শুনবে, এখন ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"আর আপনি? আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"আমি এখন স্নান করবো। স্নান সেরে গায়ে একটু পাউডার ছড়িয়ে কিছুক্ষণ কুমীরের মতো চুপচাপ বিছানার উপর পড়ে থাকবো, তারপর রাত-ডিউটির জন্যে একতলায় নেমে যাবো।"

এই পরিশ্রমের পর রাত-ডিউটি। আমি বারণ করেছিলাম। আমার হয়ে মিসেস্ পাকড়াশির বাড়িতে তিনি যখন কাজ করে এসেছেন, তখন আমি এবার ওঁর বাড়ীতে যাই। কিন্তু সত্যসুন্দরদা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, "আমি না তোমার উপর-ওয়ালা। ডিউটি-চার্ট তৈরি করবার দায়িত্ব আমার না তোমার?"

একরকম জোর করেই বোসদা আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

অবসন্ন দেহটা ক্লান্তিভরা রাত্রের অন্ধকারে বিছানার নিশ্চিন্ত প্রশ্রয়ে কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল খেয়াল করিনি। হঠাৎ মনে হলো ঘরের দরজায় যেন টোকা পড়ছে। রাতে দরজায় ধাক্কার সংগে আমি পরিচিত। দরজার নম্বর ভুল করে, আবার কেউ কি আমাকে জাগিয়ে তুলছে? কিন্তু এবারকার ধাক্কায় টেলিগ্রাফের সংকেত নেই। যে বাজাচ্ছে সে যেন খুব সাবধানে টোকা দিচ্ছে যাতে আমি ছাড়া আর কারুর রাতের ঘুম ভেঙে না যায়।

প্রথমে একটু রাগ হয়েছিল। তারপর ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলতেই যাঁকে দেখলাম, তাঁর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। একটা টর্চ হাতে করে সত্যসুন্দরদা দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "স্যরি, তোমাকে এমন সময় ডেকে তুলতে বাধ্য হলাম। তোমাকে ঘরটা এখনি ছেড়ে দিতে হবে।"

"এখনি?"

"হ্যাঁ এখনি। ব্যাপারটা পরে বলছি। এখন চল লক্ষ্মীটি, তোমার বিছানার চাদরটা সোজা করে দিই।"

দ্রুতবেগে বোসদা বিছানাটা ঠিক ঠাক করে দিলেন। আমাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি মুখে চোখে একটু জল দিয়ে নাও।"

ভিতরে মুখে চোখে জল দিতে দিতেই শুনলাম, বোসদা কাদের বলছেন, "আসুন। আপনারা ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন, বিশ্রাম না করলে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, এক ভদ্রলোক আমার বিছানায় বসে পড়ে জুতো খুলতে আরম্ভ করেছেন। জুতো খুলতে খুলতেই তিনি বললেন, "মিস্ মিত্রের কী ব্যবস্থা হবে?"

বোসদা বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

রাত্রের ম্লান আলোকে ঘুম-জড়ানো চোখে দেখলাম, একটা হাল্কা ফাইবারের ব্যাগ হাতে, ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বোসদা তাঁর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, "আসুন।"

ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, "সে কি, আপনি আমার ব্যাগ বইবেন, তা কখনও হয় না।"

বোসদা সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "আসুন।"

হাঁটতে হাঁটতে এবার আমরা বোসদার ঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। [illegible]

ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "একটু দাঁড়াও, আমি চাবিটা নিয়ে আসি।"

ভদ্রমহিলা লজ্জায় যেন নীল হয়ে গিয়েছেন মনে হলো। বললেন, "কেন আমার ব্যাগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমার অত্যন্ত লজ্জা করছে।"

আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে এক বিষণ্ণ-নয়না সুন্দরীকে আবিষ্কার করলাম। আমারই চোখের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি যেন প্রিন্সেস অব স্যাড্ আইজ্ ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁর দৃঢ় নমনীয় গ্রীবার মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য খুঁজে পেলাম তা স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কর্কশও না, মধুরও না। সামান্য হাই তুলে ভদ্রমহিলা বললেন, "এতো রাত্রে কাউকে এমনভাবে বিপদে ফেলার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।"

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরেও বৈশিষ্ট্য। নাচের ঘুঙুর যদি আরও চাপা হত, ট্রামের ঘর্ঘর যদি ঘনশ্যাম ঘাসের 'ভেলভেটে' আরেকটু অস্পষ্ট হতো, আরেকটু সংযত, তাহলে অনেকটা যেন মিস্ মিত্রের স্বর হ'ত তারা।

চাবি নিয়ে এসে বোসদা দরজাটা খুললেন। চাপা গলায় বললেন, "আজকের রাতটা কোনোরকমে এখানে কাটিয়ে দিন।"

মিস্ মিত্র ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "কার ঘর আমি জোর করে অধিকার করলাম?"

বোসদা বললেন, "সে-সব পরে খোঁজ করা যাবে, এখন শুয়ে পড়ুন।"

ভদ্রমহিলা শুনলেন না। বললেন, "কার ঘর না বললে, আমার ঘুমই আসবে না।"

বোসদা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, "মিঃ স্যাটা বোসের।"

"কী বোস্?" ভদ্রমহিলার বিষণ্ণ চোখে এবার সত্যিই হাসি ফুটে উঠলো।

বোসদা বাধ্য হয়ে, এবার নিজেই উত্তর দিলেন, "ছিলাম সত্যসুন্দর, কপাল দোষে স্যাটা হয়েছি!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমরা বাসেই থাকতে পারতাম, কিংবা কয়েকটা ঘণ্টা লাউঞ্জেতে কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু কী যে করলেন আপনি। এখন আপনারা শোবেন কোথায়?"

"আমার তো শোবারই প্রশ্ন ওঠে না, মিস্ মিত্র, আমি তো ডিউটিতে থাকবো। আর এই শ্রীমানেরও একটু পরে কাজ রয়েছে।"

বাথরুমের দরজাটা খুলে বোসদা বললেন, "চাবিটা একটু শক্ত আছে, সামনের দিকে টেনে একটু জোরে ঘোরাবেন, তাহলেই দরজা খুলে যাবে।"

মিস্ মিত্রকে নমস্কার করে আমরা দু'জনে বেরিয়ে আসছিলাম। ভদ্রমহিলাও সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। কোনোরকমে বললেন, "আপনাকে কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝে উঠতে পারছি না।"

শুভরাত্রি জানিয়ে বোসদা আমাকে নিয়ে নিচেয় নেমে এলেন। বললেন, "আর কোনো উপায় ছিল না। তোমাকে ছাড়া কাউকে জাগাবার মতো অধিকারও আমার নেই।"

বোসদা বললেন, "ভদ্রমহিলা হচ্ছেন হাওয়াই হস্টেস। ওঁদের প্লেনে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় সকলে হোটেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। প্লেনের অফিসারদের জন্যে সাধারণত আমাদের

বললাম, "কিছুই না।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে বোসদা বললেন, "আমরা ছোটোবেলায় সুর করে গাইতাম—ভাবিতে পারি না পরের ভাবনা।"

বললাম, "সারাজীবনই তো আপনি আমাদের মতো পরের ভাবনা ভেবে গেলেন।"

বোসদা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন "হাইকোর্টের ইংরেজ ব্যারিস্টার সায়েব তোমাকে যে কী করে বুদ্ধিমান বলতেন, জানি না। তোমরা কী আমার পর?"

"যাদের আপন ভাবছেন, একদিন হঠাৎ বুঝবেন, তারা সবাই পর।" আমি বোসদার দিকে তাকিয়ে বললাম।

অন্ধকারে সিগারেটের অস্পষ্ট আলোকে আমার মুখটা বোসদা বোধ হয় ভালভাবে দেখতে পেলেন না। বললেন, "কেন? বিপদে পড়লে তুমি কি আমাকে দেখবে না?"

মনে মনে বললাম, 'নিজেকে আমার বুঝতে একটুও বাকি নেই। এই তো দু' নম্বর সুইটে আমার সাহায্যপ্রার্থিনীকে কেমন দেখলাম।'

সত্যসুন্দর বোস দেখে দেখে এবং শাজাহানের বিষ গ্রহণ করে করে যেন নীলকণ্ঠ হয়ে গিয়েছেন। আকাশের দিকে একঝলক ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে বললেন, "সংসারের হোটেলখানায় কেউ কাউকে সার্ভ করতে পারে না। আমরা কেবল ভাল ওয়েটারের মতো সামনে ট্রে ধরতে পারি, তার থেকে যে যার তুলে নিতে হবে।"

কথা শেষ করেই বোসদা এবার হেসে উঠলেন। বললেন, "এখন তোমাকে আর ঐ ট্রে ধরতে হবে না। তোমাকে যা ধরতে হবে তার নাম পেগ। কারণ মিসেস পাকড়াশি ককটেলের ব্যবস্থা করেছেন, এই হোটেলেই। শুধু ডিনারে আজকাল কলকাতার কোনো শুভ কাজই সম্পন্ন হয় না। এখন পাকস্পর্শের পর জলস্পর্শ। অর্থাৎ কোনো হোটেলে একদিন বিশেষভাবে নির্বাচিত অতিথিদের সেবাযত্ন। এ-সবের ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে, কারণ কাল থেকে তোমার বার-ডিউটি, মিস্টার সরাবজী হবেন তোমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু সে-সব পরে শুনবে, এখন ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"আর আপনি? আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"আমি এখন স্নান করবো। স্নান সেরে গায়ে একটু পাউডার ছড়িয়ে কিছুক্ষণ কুমীরের মতো চুপচাপ বিছানার উপর পড়ে থাকবো, তারপর রাত-ডিউটির জন্যে একতলায় নেমে যাবো।"

এই পরিশ্রমের পর রাত-ডিউটি। আমি বারণ করেছিলাম। আমার হয়ে মিসেস্ পাকড়াশির বাড়িতে তিনি যখন কাজ করে এসেছেন, তখন আমি এবার ওঁর [illegible] যাই। কিন্তু সত্যসুন্দরদা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, "আমি না তোমার উপর-ওয়ালা। ডিউটি-চার্ট তৈরি করবার দায়িত্ব আমার না তোমার?"

একরকম জোর করেই বোসদা আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

অবসন্ন দেহটা ক্লান্তিভরা রাত্রের অন্ধকারে বিছানার নিশ্চিন্ত প্রশ্রয়ে কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল খেয়াল করিনি। হঠাৎ মনে হলো ঘরের দরজায় যেন টোকা পড়ছে। রাত্রে দরজায় ধাক্কার সঙ্গে আমি পরিচিত। দরজার নম্বর ভুল করে, আবার কেউ কি আমাকে জাগিয়ে তুলছে? কিন্তু এবারকার ধাক্কায় টেলিগ্রাফের সংকেত নেই। যে বাজাচ্ছে সে যেন খুব সাবধানে টোকা দিচ্ছে যাতে আমি ছাড়া আর কারুর রাতের ঘুম ভেঙে না যায়।

প্রথমে একটু রাগ হয়েছিল। তারপর ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলতেই যাঁকে দেখলাম, তাঁর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। একটা টর্চ হাতে করে সত্যসুন্দরদা দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "স্যরি, তোমাকে এমন সময় ডেকে তুলতে বাধ্য হলাম। তোমাকে ঘরটা এখনি ছেড়ে দিতে হবে।"

"এখনি?"

"হ্যাঁ এখনি। ব্যাপারটা পরে বলছি। এখন চল দিকিনি, তোমার বিছানার চাদরটা সোজা করে দিই।"

দ্রুতবেগে বোসদা বিছানাটা ঠিক ঠাক করে দিলেন। আমাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি মুখে চোখে একটু জল দিয়ে নাও।"

ভিতরে মুখে চোখে জল দিতে দিতেই শুনলাম, বোসদা কাদের বলছেন, "আসুন। আপনারা ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন, বিশ্রাম না করলে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, এক ভদ্রলোক আমার বিছানায় বসে পড়ে জুতো খুলতে আরম্ভ করেছেন। জুতো খুলতে খুলতেই তিনি বললেন, "মিস্ মিত্রের কী ব্যবস্থা হবে?"

বোসদা বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

রাত্রের ম্লান আলোকে ঘুম-জড়ানো চোখে দেখলাম, একটা হাল্কা ফাইবারের ব্যাগ হাতে, ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বোসদা তাঁর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, "আসুন।"

ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, "সে কি. আপনি আমার ব্যাগ বইবেন, তা কখনও হয় না।"

বোসদা সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "আসুন।"

হাঁটতে হাঁটতে এবার আমরা বোসদার [illegible]

ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "একটু দাঁড়াও, আমি চাবিটা নিয়ে আসি।"

ভদ্রমহিলা লজ্জায় যেন নীল হয়ে গিয়েছেন মনে হলো। বললেন, "কেন আমার ব্যাগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমার অত্যন্ত লজ্জা করছে।"

আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে এক বিষণ্ণ-নয়না সুন্দরীকে আবিষ্কার করলাম। আমারই চোখের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি যেন প্রিন্সেস অব স্যাড্ আইজ্ ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁর দৃঢ় নমনীয় গ্রীবার মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য খুঁজে পেলাম তা স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কর্কশও না, মধুরও না। সামান্য হাই তুলে ভদ্রমহিলা বললেন, "এতো রাত্রে কাউকে এমনভাবে বিপদে ফেলার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।"

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরেও বৈশিষ্ট্য। নাচের ঘুঙুর যদি আরও চাপা হত, ট্রামের ঘর্ঘর যদি ঘনশ্যাম ঘাসের 'ভেলভেটে আরেকটু অস্পষ্ট হতো, আরেকটু সংযত, তাহলে অনেকটা যেন মিস্ মিত্রের স্বর হ'ত তারা।

চাবি নিয়ে এসে বোসদা দরজাটা খুললেন। চাপা গলায় বললেন, "আজকের রাতটা কোনোরকমে এখানে কাটিয়ে দিন।"

মিস্ মিত্র ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "কার ঘর আমি জোর করে অধিকার করলাম?"

বোসদা বললেন, "সে-সব পরে খোঁজ করা যাবে, এখন শুয়ে পড়ুন।"

ভদ্রমহিলা শুনলেন না। বললেন, "কার ঘর না বললে, আমার ঘুমই আসবে না।"

বোসদা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, "মিঃ স্যাটা বোসের।"

"কী বোস্?" ভদ্রমহিলার বিষণ্ণ চোখে এবার সত্যিই হাসি ফুটে উঠলো।

বোসদা বাধ্য হয়ে, এবার নিজেই উত্তর দিলেন, "ছিলাম সত্যসুন্দর, কপাল দোষে স্যাটা হয়েছি!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমরা বাসেই থাকতে পারতাম, কিংবা কয়েকটা ঘণ্টা লাউঞ্জেতে কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু কী যে করলেন আপনি। এখন আপনারা শোবেন কোথায়?"

"আমার তো শোবারই প্রশ্ন ওঠে না, মিস্ মিত্র, আমি তো ডিউটিতে থাকবো। আর এই শ্রীমানেরও একটু পরে কাজ রয়েছে।"

বাথরুমের দরজাটা খুলে বোসদা বললেন, "চাবিটা একটু শক্ত আছে, সামনের দিকে টেনে একটু জোরে ঘোরাবেন, তাহলেই দরজা খুলে যাবে।"

মিস্ মিত্রকে নমস্কার করে আমরা দুজনে বেরিয়ে আসছিলাম। ভদ্রমহিলাও সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। কোনোরকমে বললেন, "আপনাকে কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝে উঠতে পারছি না।"

শুভরাত্রি জানিয়ে বোসদা আমাকে নিয়ে নিচেয় নেমে এলেন। বললেন, "আর কোনো উপায় ছিল না। তোমাকে ছাড়া কাউকে জাগাবার মতো অধিকারও আমার নেই।"

বোসদা বললেন, "ভদ্রমহিলা হচ্ছেন হাওয়াই হস্টেস। ওঁদের প্লেনে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় সকলে হোটেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। প্লেনের অফিসারদের জন্যে সাধারণত আমাদের

আলাদা ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আজ শোচনীয় অবস্থা। ঘর খালি নেই। তাঁরাও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। ভদ্রমহিলা একবার বললেন, 'আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই, লাউঞ্জের সোফাতেই গড়িয়ে নিচ্ছি।' কিন্তু তা কখনও হয়? বাধ্য হয়েই তোমাকে ডেকে তুললাম। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার তো। সকালেই দু' একটা ঘর খালি হয়ে যাবে। তখন ওদের সরিয়ে দেবো।"

আমি বোধ হয় আর একটা হাই চেপে রাখার চেষ্টা করছিলাম। বোসদা পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "হোটেলে যদি কাজ করতে হয়, তাহলে রাত জাগার অভ্যাস রাখা ভাল। রাত্রে কারা জেগে থাকে জানো?"

আমি বললাম, "ছোটবেলায় শুনেছি, দুষ্টু এবং অবাধ্য ছেলেরাই রাত্রে জেগে থাকে।"

"ঠিক। পৃথিবীর অবাধ্য দুষ্টু ধেড়ে খোকারাই রাত্রে জেগে থাকে। সারারাত্রের অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে ভোরের সান্ধ্য মুহূর্তে তারা ঘুমিয়ে পড়ে।"

কিছুই কাজ নেই, জেগে থাকা ছাড়া। কাউণ্টারে আমরা দু'জন জেগে বসে রয়েছি। বসে বসে বোসদা একটুকরো কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকছেন। পেন্সিলের আঁচড়ে শাজাহানের লাউঞ্জকে নকল করবার চেষ্টা করছেন। বাইরে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে শাজাহান হোটেলের প্রায়-মিলিটারি পোশাক। তার হাতেও একটা ছোট্ট পেন্সিল ও খাতা।

এক অদ্ভুত স্বাধীনতার আনন্দে মনটা ক্রমশ যেন ভরে উঠলো। কেউ কোথাও নেই, শাজাহান হোটেলের সর্বেসর্বা যেন আমরাই। এই বিশাল হোটেলের অসংখ্য ঘরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেন পরম বিশ্বাসে আমাদের উপর সব দায়িত্ব অর্পণ করে নিঝুম রজনীতে ঘুমিয়ে রয়েছেন। রাতের রেলগাড়ির ড্রাইভারের মতো অতিদূর তীর্থের যাত্রীদলকে আমরা দু'জনে যেন কোনো সোনার প্রভাতের দিকে নিয়ে চলেছি। মণি-মাণিক্যে ভরা সেই নতুন প্রভাতে এই ঘুমন্ত মহাদেশের তীর্থযাত্রীরা কি পরম বৈভব খুঁজে পাবেন জানি না; কিন্তু আমরা তখন তাঁদের আনন্দে ভাগ বসাবার জন্যে জেগে থাকবো না। হোটেলের দায়িত্ব অন্য কারুর উপর দিয়ে, দিনের আলোতে আমরা আমাদের প্রিয় রাত্রিকে ডেকে আনবার চেষ্টা করবো।

মিস্টার আগরওয়ালা নতুন হোস্টেস রেখেছেন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যেও দেখলাম, দু' নম্বর সুইট থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমি চিনতে পারিনি। বোসদা কানে কানে বললেন, ইনি আমাদের দেশের একজন নামকরা
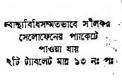
শ্রমিকনেতা। আগরওয়ালাদের কারখানা-গুলোর শ্রমিকদের ইনিই নেতৃত্ব করেন। একটা ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। গাড়িটা শ্যামবাজারের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দারোয়ানজী পকেট থেকে নোটবই বার করে কী একটা টুকে নিলেন।

বোসদা হেসে বললেন, "গাড়ির নম্বরটা আমরা রাত্রে টুকে রেখে দিই। অতো রাত্রে যারা যাতায়াত করে, তাদের কপালে যে কী আছে, তার ঠিক নেই।"

বোসদার মুখেই শুনলাম, আগে নম্বর লেখার ব্যবস্থা ছিল না। তখনও আমরা স্বাধীন হইনি। লণ্ডনের এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক কলকাতায় এসেছিলেন। একদিন কাজ শেষ করে, রাত্রিবেলায় তিনি কাউণ্টারে এসে বোসদাকে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাণ্ট্রিকে জানতে চাই।"

বোসদা তখন সবে কাজে ঢুকেছেন। বলেছিলেন, "সে আমাদের সৌভাগ্য।"

অতিথি বলেছিলেন, "কোনো কাণ্ট্রিকে খুব কম সময়ের মধ্যে ভালভাবে জানবার কী উপায় বলোতো?"

বোসদা তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন। ভদ্রলোক একটা সিগারেট লাইটার বোসদাকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, "এতো বড়ো হোটেলে এতো বিদেশীদের সঙ্গে মিশে এই উপায়টা তোমার জানা নেই?"

বিদগ্ধ ও সম্মানিত অতিথিকে বোসদা বলেছিলেন, "আমাদের সবচেয়ে বড়ো সরকারী লাইব্রেরী এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

ভদ্রলোক এবার লজ্জা কাটিয়ে উঠিয়ে বলেছিলেন, "ইউ মাস্ট মিট এ গার্ল—লোকাল গার্ল।"

বোসদা বলেছিলেন, "স্যরি!"

অতিথি লজ্জা পেয়ে রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু আশা ছাড়েন নি। বেয়ারার কাছ থেকে খবর পেয়ে কোনো আর্টিস্ট সাপ্লায়ার বোধ হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল। আর্টিস্ট সাপ্লায়ার তাঁকে অনেক ছবি দেখিয়ে বলেছিল, "পছন্দ করে নিন স্যর।"

হুজুর পছন্দ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বেয়ারার সঙ্গে বখশিস নিয়ে বোধ হয় কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল। সে বলেছিল, "বিনা পারমিশনে সিংগেল-বিছানা ঘরে বাইরের কাউকে সে ঢুকতে দেবে না।" অতিথিরও তখন মেজাজ সপ্তমে চড়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন, "কুছ পরোয়া নেই, আর্টিস্ট গার্লকে আমি ঘরে আনবোই না।"

আর্টিস্ট সাপ্লায়ার বলেছে, "তাতে কিছু এসে যায় না স্যর। আমাদের জানাশোনা ভাল ট্যাক্সিওয়ালা আছে।"

সেই ট্যাক্সি নিয়েই রাত চারটের সময় আর্টিস্ট সাপ্লায়ার কাউণ্টারে এসেছিল। একশ পাঁচ নম্বর ঘরের সায়েবের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। "এত রাত্রে!" বোসদা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

সাপ্লায়ার বলেছিল, "ওঁর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।" একটু পরেই দু'জনকে এক সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে দারোয়ান গেট থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে কাউণ্টারের কাছে ছুটে এসে বলেছিল, "সাব্ একবার বেরিয়ে আসুন।"

বেরিয়ে এসে বোসদা দেখলেন, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় এক বিদেশী ভদ্রলোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বোসদার চিনতে দেরি হয়নি—মাননীয় অতিথি। দুর্বৃত্তেরা তাঁর টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর জামাকাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে তখনও হোটেলের অন্যান্য অতিথিরা জেগে ওঠেন নি। না হলে ঐ অবস্থায় তাঁকে হোটেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া বেশ মুশকিল হতো।

তখনই পুলিস ডাকা হয়েছিল। পুলিস আসতেই মাননীয় অতিথি চিৎকার করে উঠেছিলেন, "আমি সমস্ত ওয়ার্ল্ডে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু ইউ ইণ্ডিয়ানদের মতো চোর দেখিনি। তোমরা অনেস্ট নও, এই জন্যে তোমরা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাচ্ছো না। আমি ভাইসরয়ের কাছে কমপ্লেন করবো, আমার সমস্ত টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে; আমাকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।"

পুলিস জিজ্ঞাসা করেছিল, "ওই সময় আপনি বেরিয়েছিলেন কেন?"

অতিথি চিৎকার করে বলেছিলেন, "তোমাদের মেড্-ইন-ইণ্ডিয়া গুডসে ভেজাল থাকে, তোমাদের কারেন্সি জাল হয়, এমন কি তোমাদের গার্লসে পর্যন্ত ভেজাল।"

বেচারা পুলিসের লোক বলেছিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তরটা।"

অবস্থা সুবিধের নয় বুঝে ভদ্রলোক রিসেপশনিস্টকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কী লিখি বলুন তো?"

রিসেপশনিস্ট বলেছিলেন, "জয়-রাইড লিখে দিন। সঙ্গে একজন কম্প্যানিয়ন আর্টিস্ট ছিলেন।"

পুলিস বোসদাকে ট্যাক্সির নম্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নম্বর লিখে রাখবার নিয়ম ছিল না, দারোয়ানও লেখেনি। সেই থেকেই ম্যানেজার অর্ডার দিয়েছিলেন, গভীর রাত্রে যেসব গাড়িতে অতিথিরা আসবেন বা যাবেন, তার নম্বর লিখে রাখতে হবে।

"নম্বরটা থাকলে সুবিধে হতো। না থাকলেও ঠিক বার করে ফেলবো।" পুলিস বলেছিলেন।

এবং সত্যিই তারা এক মহিলা এবং একজন আর্টিস্ট সাপ্লায়ারকে ধরে নিয়ে এসেছিল। মাননীয় অতিথি বলেছিলেন, "তোমাদের কাণ্ট্রির এইসব ডিজ-অনেস্ট মেন অ্যাণ্ড উইমেনদের গুলি করে মারা উচিত। তবে যদি তোমাদের মরালিটি হাই হয়।"

"ফাঁসি হবে না, তবে জেল নিশ্চয়ই হবে, বোসদা বলেছিলেন।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামান্য জেলও হলো না।"—শাজাহানের কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোসদার গল্প শুনছিলাম।

আমি বললাম, "কেন?"

বোসদা বললেন, "সেইদিনই ক্রিমিন্যাল কোর্টের দুটো রোগা রোগা উকিল মাননীয়

অতিথির সংগে দেখা করতে এসেছিলেন।"

"গেট আউট, গেট আউট", বলে সায়েব তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর বোসদার কাছে এসে বলেছিলেন, "তোমার সংগে একটু প্রাইভেট কথা আছে।"

আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি চাই, এইসব এলিমেণ্ট, যারা তোমাদের ফেয়ার নেম কলঙ্কিত করছে, কাস্টমারকে যারা ঠকাচ্ছে, তাদের প্রচণ্ড শাস্তি হোক। কিন্তু এইসব ডাকাতদের তোমাদের দেশের উকিলরা ডিফেণ্ড করে?"

বোসদা বলেছিলেন, "তা করে।"

"লেট দেম ডু সো"—সায়েব চিৎকার করে উঠেছিলেন। "কিন্তু তা বলে ব্ল্যাকমেলিং!"

"মানে?" বোসদা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"মানে, এই কেসের রিপোর্ট নাকি খবরের কাগজে বেরোবে?"

বোসদা বলেছিলেন, "তা বেরোতে পারে।"

"তোমাদের নিউজপেপাররা এইসব সামান্য খবর ছাপায়? ওই উকিল দুটো বললে, খবর বেরোবে এবং বেরোবার পর কাগজের কাটিং তারা আমার ওয়াইফের কাছে পাঠিয়ে দেবে! কতবড় স্পর্ধা। ইণ্ডিয়ার লোকদের আমরা ভদ্র বলে জানতাম।"

বোসদা তাঁর অতিথিকে কোনো ভরসা দিতে পারেননি, এবং ভরসা না পেয়েই সায়েব আবার টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতে আরম্ভ করেছিলেন। দু-একবার ট্যাক্সি নিয়ে ছোটাছুটিও করেছিলেন।

"এবং"—বোসদা বললেন, "কেমন করে জানি না শেষ পর্যন্ত মামলা না করেই তিনি শাজাহান থেকে পালিয়েছিলেন।"

একটু থেমে বোসদা বলেছিলেন, "তিনি এখন কোথায় জানি না, কিন্তু আমরা এতো বছর পরেও রাত জেগে গাড়ির নম্বর খাতায় টুকে চলেছি।"

রাত্রি যে শেষ হয়ে আসছে এবার বুঝলাম। লেনিনবাবু একটা গামছা হাতে স্তব পাঠ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এতো সকালে আইনকানুন মানা হয় না তাই। না হলে হোটেলের কোনো কর্মচারীকে ঐ বেশে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। স্তব পাঠ করতে করতেই তিনি আমাদের সামনে এসে বললেন, "কী ব্যাপার? আপনারা দু'জনে একসংগে জেগে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? স্পেশাল কিছু থাকলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।"

বোসদা ও আমি চুপ করে রইলাম। তারপর আমি প্রশ্ন করলাম, "কোথায় চললেন?"

"মায়ের কাছে। মা আমার সব দোষ ক্ষমা করবেন। সারাদিন ধোপার ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে যত পাপ করেছি, তা এবার মার চরণে বিসর্জন দিয়ে আসবো।" বোসদার দিকে তাকিয়ে লেনিনবাবু বললেন, "আপনি তো স্যার সায়েব মানুষ, আপনাকে বলে লাভ নেই। এই ছোকরাকে, এই ব্রাহ্মণসন্তানকে অ্যালাউ করুন। ভোরবেলায় স্নানের অভ্যাসটা করে রাখুক।"

বোসদা মৃদু হাসলেন। বললেন, "আমি কি ওকে আটকে রেখেছি? ইচ্ছে হলে যাক।"

ন্যাটাহরিবাবু বললেন, "তা হলে চলুন। এই সকালে ঘাটে গিয়ে দেখবেন কতজন সারারাতের পাপ ধুয়ে ফেলছে। আমাদের হেড বারম্যান, রামসিং এতোক্ষণে স্নান শেষ করে পুজোয় বসে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "আপনি একাই যান।"

উনি চলে যেতে বোসদা বললেন, "পাগল। ফেরবার সময় লোকটা এক ঘটি জল সংগে করে নিয়ে আসবে। প্রথমে হোটেলের সামনে একটু ছড়িয়ে দেবে। পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে বালিশ বিছানার পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলবে, "মা, দুর্গতি-নাশিনী, দেখিস মা।"

একটা ঘর এই ভোরবেলায় খালি হয়ে গেল। আমেরিকান দম্পতী রাঁচির দিকে চলে গেলেন। বোসদা বললেন, "ওপরে আমাদের একটা ঘর না হলে তো চলে না। দেখো কেউ উঠেছেন কি না।"

উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, বোসদার ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। হাওয়াই হোস্টেস মিস মিত্র এখনও ঘুমিয়ে রয়েছেন। আমার ঘরের দরজাটা খোলা। গুড়বেড়িয়া বললেন, "সায়েব উঠে পড়েছেন। চা খেয়েছেন।"

দরজায় নক্ করতেই হাওয়াই জাহাজের ভদ্রলোক বললেন, "কাম্ ইন।"

ঢুকে গিয়ে আমি বললাম, "রাত্রে আপনার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে। নিচের একটা ঘর খালি হয়েছে। আপনি চলুন।"

গুড়বেড়িয়ার হাতে মালপত্র চালান করে দিয়ে, ভদ্রলোককে নিচের ঘরে ঢুকিয়ে বোসদাকে খবর দিয়ে এলাম।

বোসদা হেসে বললেন, "এখানে থেকে থেকে ভাগ্যটা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তোমার কপালের জন্যে হিংসে হচ্ছে। ভদ্রমহিলাকে কখন যে বিদেয় করে একটু ঘুমোতে পারবো জানি না।"

আজ এতদিন পরে বোসদার সেই কথাগুলো মনে পড়লে কেমন হাসি আসে। আশ্চর্যও লাগে। সুজাতা মিত্রের কথা, বোসদার কথা, ভাবলে মনটা কেমন হয়ে যায়। আজও কোনো কর্মহীন নিঃসংগ সন্ধ্যায় আমি যেন সুজাতা মিত্রকে খুব কাছাকাছি দেখতে পাই। অকারণে আমার বয়সী চোখ দুটো সেই সুদূর অতীতে ফিরে যেতে চায়। আমি বুঝি এ অন্যায়, সংসারে সুদীর্ঘ পথে এই চঞ্চলতা মানায় না। আমার পরিচিতা একান্ত আপনজন সকৌতুকে এবং সস্নেহে অভিযোগ করেন, "তোমার সব ভাল। শুধু এই ছেলে-মানুষীটুকু ছাড়া। সংসারের পাঠশালায় এতো শিখেও তুমি সেই কৈশোরেই রয়ে গেলে। বড় হয়ে উঠলে না।"

যিনি আমার কাছে বার বার এই অভিযোগ করেন, তিনি হয়তো চান আমার অপরিণত মন কৈশোরের প্রবৃত্তি কাটিয়ে যৌবনের রঙে নিজেকে রঙীন করে তুলুক। কিন্তু কেন জানি না, বেশ বুঝতে পারি, কৈশোর থেকে সোজা আমি বার্ধক্যে এসে দাঁড়িয়েছি। ওঁদের দু'জনকে স্কুটারের পিঠে ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসতে দেখে আমি সুজাতাদিকে বলেছিলাম, "শুনুন—

কদমে চলেছে দুই সাঁঝের তারকা
স্কুটারের পিঠে,
ফাঁপানো চুলের গুচ্ছে লাল ফিতে
ওড়নায় লেপটানো পিঠ অসম্বৃত
অদম্য অকুতোভয় স্কুটারের
তরুণ চালক;"

আর আবৃত্তি করতে দেননি, সুজাতাদি আমার কানটা চেপে ধরেছিলেন। আমি বলেছিলাম, "লাগছে। ছেড়ে দিন।"

বোসদা বলেছিলেন, "আঃ, না হয় বলেই ফেলেছে।"

সুজাতাদি বলেছিলেন, "ওড়না ও কোথায় পেল?"

এতদিন পরে সে-সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

সেদিন ভোরবেলায় বোসদার সংগে কথা বলতে গিয়ে সে-সবের কিছুই বুঝি নি। [ক্রমশঃ]

চূর্ণ লয়

শওকত ওসমান

"সামনে শনিবার বিকেলটা বেড়িয়ে আসা যাক।" অবসরই মেলে না, তবু ডায়ানা প্রস্তাব দিয়েছিল।

এই অনুরোধ অপ্রত্যাশিত।

সময় থাকে না, সে কথাও সত্যি। ডায়ানা ডিসুজা কাজ করে এক স্টোরে। সেখানে শনিবার ছাড়া রাত্রি আটটার আগে ছুটিই হয় না। ববি রোজারিও ব্যাঙ্কের জুনিয়র অফিসার। পরিস্থিতি আরো নীচের দিকে। অনেক সময় রবিবারেও অফিস করতে হয়।

উদ্যোগী ডায়ানা নিজে!

অনন্য-অভিজাত থাকলেও ববি কথাটা তলিয়ে দেখে। কারণ, সে পাড়ার আর দশটা ইয়ংম্যানের মত নয়। গার্ল-ফ্রেন্ড, বীয়ার-বিলিয়ার্ড, ক্লাব, ডান্স, নতুন কাপড়-চোপড়ের ঠাট—এসব থেকে সে ফারাকই থাকে। তার নিজস্ব একটা জগৎ আছে। আপন শান্ত পরিবেশ-উপভোগই যেখানে দৈনন্দিনতার প্রয়াস। মাঝে যে হল্লা চাগান দেয় না, তা নয়। সেটা নাটকের ক্ষেত্রে। রোজারিও ত মঞ্চে রাজত্ব-স্থাপনের পক্ষপাতী। বছরে একবার-দু'বার পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সে মেতে উঠবেই। ববির উদ্দীপনা এইরকম সামগ্রিক। কেটে কেটে দেখলে, সে সর্বদা পদ্মাসনে ধ্যানস্থ। পাতলা একহারা ফর্সা চেহারা। দু-চোখ যেন ঘুমের পর এইমাত্র স্বপ্ন-মোছা। চুল একটু বেশীই লম্বা, হ্যাটে ঢাকা পড়ে না। ওর চলন দেখে মনে হয়, বিনয়-উচ্ছল বৈষ্ণব স্মার্টনেস বজায় রেখে হাঁটছে। কেউ আজ ভাবতে পারবে না, রোজারিও পর্তুগীজদের বংশধর।

গত ছ' মাস থেকে ববি রোজারিও নিজের মধ্যে পূর্বপুরুষোচিত একটা চাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করছিল। তার ঝাপটায় প্রথমে সে আত্মস্থ হতে পারেনি। ডায়ানা ডিসুজাকে কি সে আগে দেখেনি কোনদিন? কতবার দেখেছে। একই পাড়ার মেয়ে ত। একটা কি দুটো বাড়ি ছাড়াছাড়ি। ওদের বেড়া-ঘেরা কম্পাউন্ড, কুলগাছ, হাঁসমুর্গীর আস্তানা রোজারিওদের বাড়ির পইঠা থেকেই দেখা যায়। অফিস যাওয়ার সময় কতদিন দেখেছে, ডায়ানার মা এক পাল টার্কি-তিতিরকে খাবার দিচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ সেদিন রোজারিও ডায়ানাকে নতুন করে দেখলে। গোলাপী রঙের ফ্রক, কালো স্লিপার, বব্ চুল ছাপিয়ে ডায়ানা যেন আর কেউ। চোখে-মুখে সত্তাগ্রাসী আভা—যা

ডেকে নেয়, ঢেকে দেয়। রোজারিওর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। অফিস যাওয়ার পথেই ব্যাপারটা ঘটে। রোজারিও প্রস্তুত ছিল না। তারপর থেকে বাড়ির কম্পাউণ্ডে ডায়ানাকে ত সে দেখছেই। কিন্তু নবীনতা এই জগতে মুহূর্তে পুরাতন। চাঞ্চল্যের ঝড়ে রোজারিওর মত রুচিবন্ত ছেলে স্থির থাকতে পারে নি। তার ত্রিভুবন বদলে গিয়েছিল, বদলে যেত নিমেষে নিমেষে। ডায়ানার ঈষৎ সোজাসুজি চোখের চাওয়ায় মনে হত, তার অন্তর বিঁধে কে যেন টান দিচ্ছে। কী দুঃসহ যন্ত্রণা, কী দুঃসহ আনন্দ! যন্ত্রণা আনন্দ হয়, আগে তা রোজারিও জানত না। সে ভাবতে গেছে, একেই প্রেমে-পড়া বলে। লভ্। কিন্তু 'লভ্' শব্দের একটা বিশেষ অর্থই আছে এই ফিরিঙ্গি পাড়ায়। রোজারিও তাই ভাবতে গিয়েও থেমে গেছে। সে কী ডায়ানার সান্নিধ্য চায় নি? কতবার হয়তো করে ওদের বাড়ি গেছে, চুপচাপ বসে আবার চলে এসেছে। মুখর নিবেদনের সঙ্গে যেন কত কুৎসিত অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে। রোজারিও নীরবতাই বেছে নিয়েছিল। একদিন সমাগত সন্ধ্যায় এই পথে হাঁটার সময় সে দেখেছিল, গেটের ওপাশে ডায়ানা দাঁড়িয়ে। ডায়ানাই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। দুটো মামুলী জিজ্ঞাসাবাদের পর সে হঠাৎ রোজারিওর দুই হাত কর-তালুর মধ্যে নিয়ে বলেছিল, "you are so good, তুমি এত ভালো।" পরক্ষণে সে দৌড় মেরে চকিতে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল। রোজারিও কতক্ষণ মাটির সঙ্গে সাঁটা দাঁড়িয়েছিল, সে জানে না। সংবিৎ ফিরতে বুঝেছিল, এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা রুচি-বিরুদ্ধ। কিন্তু সমস্ত শরীর অসহ্য নাড়া-খাওয়া। স্বপ্নার্পিতের মত হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছিল, এখনই হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। টলমল সাঁকো-পথে হাঁটার সময় পার্শ্বস্থ অবলম্বন বাঁশের মত সে নিজের বুক চেপে ধরেছিল। প্রকৃতি এই দুঃসহ কৌতুক-খেলা কেন খেলে যায়? সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল ববি রোজারিও নিজেকে, উত্তর-প্রাপ্তি অসম্ভব জেনেও।

দু মাস কেটে গেল। আজ একত্রে তারা বেড়াতে যেতে পারবে। প্রস্তাব ডায়ানার। রোজারিও অফিসে সেদিন জানিয়ে দিয়েছিল—দেড়টার পর তার পক্ষে থাকা আর সম্ভব নয়। কোন কাজ বাকী থাকলে রবিবারে এসে করে দিয়ে যাবে। সেই মোতাবেক সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে নিজেকে সে সাজিয়ে নিয়েছিল। নতুন ধোলাই স্যুট, মোজা-জুতো, বাটনহোলে একটা লাল গোলাপ গুঁজেছিল পর্যন্ত। এমন আত্ম-সজ্জার কথা আগে কোনোদিন সে ভাবেনি। মনে মনে লজ্জা পেয়েছিল রোজারিও।

এই শহরে পাহাড় নেই। উঁচু টিলা অনেক। সবই উপত্যকা-সমন্বিত। শীতেও সমস্ত শহর সবুজ থাকে। বেড়ানোর জন্যে তাই দূরে যেতে হয় না। টিলাই যথেষ্ট। সেখানেও দেখা যায়, সবুজ ঘাসের নির্বিবাদ জাঁকালো সংসার।

শহরের দু-একটা রাস্তা পার হওয়ার পর ডায়ানার কাছে একটা ছোট ভ্যালি বড় সুন্দর লাগল। রোজারিও তাই সেখানে গিয়ে বসার পক্ষপাতী। এই শহরে কোন এক জায়গায় গেলেই মন ভরে ওঠে। শীতের রোদ্দুর ত কাছে টেনে রাখে, দূরে যেতে দেয় না।

ওরা দু-জনে উপত্যকার এক জায়গায় বসে পড়ল। এখানে সবুজ ঘাস আছে, বলা বাহুল্য। দুটো মিজিরী গাছ নিজেদের ডালপালা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। সূর্যের আলো তাই সহজে চোখে-মুখে থাবা মারতে পারে না।

ডায়ানার পছন্দ আছে! রোজারিও এই জায়গায় বসে কয়েকবার তারিফ করল। টিলা থেকে প্রায় পনর ফিট নীচে তাদের অবস্থান।

আজ ত রোজারিও পথ হাঁটেনি যে, ক্লান্তি ধরবে। পৃথিবীর সম্রাট কি পথ হাঁটে? সে আছে, এইটুকুই কী যথেষ্ট নয়?

তারা বসে আছে। দুইজনেই নীরব। যেন কারো কোন কথা নেই। ডায়ানার এক হাত শুধু ববির করতালুর মধ্যে বন্দী।

তারা বসে থাকে। কখনও দিগন্তের দিকে চোখে, কখনও অপরের অক্ষি-পটে অনিবেষ্ট-সন্ধানী। মাঝে মাঝে ডায়ানা মৃদু হাসে। রোজারিও ত স্বপ্নের কাছে আত্ম-

সমর্পণের পর স্তব্ধ। যেটুকু কথা, তা হাতই বলে। চোখ সায় দেয়। আর স্পন্দিত বক্ষ যোগায় শব্দ-ভুবন। অন্তপ্রবাহে রুদ্ধবাক আগ্নিগিরি ভাষণ-নিরত।

ডায়ানা একবার উচ্চারণ করলে, ববি! ডায়ানা!

—ববি!

—ডায়ানা!

ধ্বনি যেন নিমেষে প্রতিধ্বনি সাজছে দুই নামে. আঘাতে আঘাতে বেজে-ওঠার অভ্যাসে। নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা হয় আরো পরূ, প্রসারী হয় ঈষৎ খুঁতে। তিল-কলঙ্ক-বর্ধিত শোভা-সুন্দর মুখ যেন।

আনমনা ডায়ানা ববির বুকে আলগোছে মাথা রাখলে। ভিত স্বস্থানে। রোজারিওর নিশ্বাস হঠাৎ যেন থেমে আসে। তার থুতনির নীচে ডায়ানার মাথা, ঘাড়। নারীদেহের সৌরভে হত-চকিত সে। বাসন্তী বাতাবী-মঞ্জরী আর বৃষ্টিস্নাত মাটির সোঁদা গন্ধ যেন একাকারে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। রোজারিওর মনে হয়, ওই ঘ্রাণ-রেখার সড়কে সে পৃথিবীর তাবৎ চাওয়া-পাওয়া অস্তিত্বের হদিস পেতে সক্ষম। অস্তিত্বের বিলুপ্তি এই সৌরভ-অরণ্যেই সম্ভব।......ধীরে ধীরে নিজের ঠোঁট রাখলে রোজারিও সঙ্গিনীর অনাবৃত ঘাড়ের কোমল ত্বকে। কী করছে কেন? তা সে জানে না। অজানিতেই ঠোঁট আরো চেপে ধরে সে। ডায়ানা তখন নিজের এক হাতে সঙ্গীর ঘাড়ে রেখে চাপ দিতে থাকে। রোজারিও অনুভব করে, তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে হয়ে আসছে ঘ্রাণের পরিধায়। ঠোঁট তুলে নিলে সে।

ডায়ানা এবার আরো একটু শরীর এলিয়ে রোজারিওর চোখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তাকায়। সঙ্গী হাসে না, অপলক চেয়ে থাকে। এইভাবে অর্ধ-শায়িতা ডায়ানা হঠাৎ ফিসফিস্ কণ্ঠে বলে, "Do you know, Rogerio, I love you too"। সঙ্গিনীর হাতে দৃঢ় চাপ দেয় রোজারিও, কথা বলে না।

অনন্ত-শয়ান মুহূর্তে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এই ত সেই লগ্ন...। মানুষের বুক অন্ধকার ধরিত্রী-বক্ষের মত মাঝে মাঝে পরিমাপের বন্ধনে বাঁধা পড়ে না। সর্বগ্রাসী তার প্রসার। এমন অপার্থিব পরিলুপ্তিক্ষণ কতবার আর আসে জীবনে?

ডায়ানা বুকে ঢলে রোজারিওর ঘাড়ে হাত রেখে চাপ দেয়। আকাশ আরো নীচে নামুক পাহাড়-শিখরেই অবনত-ঠোঁট রোজারিও। ডায়ানা তৃষিত ঠোঁট উপরে তোলে ক্রমশ। দুই নিঃশ্বাসের মোহানায় আবর্তিত সমগ্র পৃথিবী......

পিছু হটে ডায়ানা সঙ্গীর কণ্ঠ দুই হাতে জড়িয়ে নিজেকে উত্তোলিত করে ঠোঁটের উদগ্র পিপাসায়। রোজারিও আরো প্রবল আকর্ষণে সঙ্গিনীর মুখ নিজের কাছে আনবে, তাই দুই হাতে নারী-দেহ জড়াতে যায়।

হঠাৎ তার পিঠে গদাস্-শব্দে একটা ঢেলা এসে পড়ল। খুব জোরে লাগেনি। তবু চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বাঁধন ছেড়ে দিয়ে রোজারিও ইতিউতি তাকায়। সে ভাবলে, এই জায়গায় বহু কুঁচো ছেলে খেলতে আসে—তারাই ঢেলা ছুঁড়েছে।

আবার ডায়ানা সঙ্গীর বুকে মাথা রাখলে নবীনতর আহ্বানে। রোজারিওর সাড়া দানে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু এবার এক—দুই—তিন—চারটে ঢেলা এসে পড়ল আশপাশ থেকে। আলতোভাবে একটা লাগল ডায়ানার পায়ে।

দুইজনে উচ্চকিত, তারা পেছনে তাকায় এবার।

তারা কী পরেছিল—লুঙ্গি, না পাজামা পান্তলুন, না ধুতি—তাদের মাথা খালি কী শিরোভূষণে ঢাকা—সেই মুহূর্তে সেদিকে রোজারিওর খেয়াল থাকার কথা নয়। তারা দেখলেঃ পনর-বিশজনের একটা দঙ্গল জমে গেছে পনর-বিশ হাত দূরে উপরের টিলায়। বোঝা যায়, এতক্ষণ তাঁরা দর্শকরূপে খাড়া ছিলেন। এবার একজন সক্রিয় মুখপাত্র মুখ ব্যবহার করলেঃ "এই হারামীর ফ্যাৎ—"।

রোজারিও বাংলা ভাল বোঝে, সুতরাং গালটা হজম করলে।

মুখপাত্র আবার চীৎকার দিয়ে উঠলঃ "এই জারগুয়া ফ্যাৎ......ইডা খিষ্টানর মুল্লুক নঅ......বেশরা-বেহায়া কাম ইন্দি চইলব ন...(হে জারজ-পুত্র! ইহা খৃষ্টানের মুল্লুক নয়। বেশরা-বেহায়া কাজ এখানে চলিবে না)......।"

রোজারিও কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই আবার বসতে যাচ্ছিল। সঙ্গিনী তখনও হতদিশা, উপবিষ্ট। সেও ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। রোজারিও তাকে বসার জন্যে অনুরোধ করবে, ভাবছে......

সেই মুহূর্তে ডায়ানা তার হাতে হেঁচকা টান দিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "ববি, come on, quick!" কারণ, ওদিকে পাটকেল-বৃষ্টি তখন শিলা বৃষ্টিতে পরিণত। শুধু মিনৃজিরী গাছের কয়েকটা স্নেহশীল, ভূমি-প্রয়াসী ডাল তাদের বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

আর বিলম্ব করা চলে না! তারা দুইজনে উপত্যকার ঢালু পথে দৌড়াতে লাগল স্পন্দিত-বক্ষ, উত্তাল-নিঃশ্বাস, শক্ত মুঠির পারস্পরিকতায় নৈকাট্য-উজ্জ্বল ডায়ানা ডিসুজা, ববি রোজারিও।

দুই নিশ্বাসের মোহানায় আবর্তিত সমস্ত পৃথিবী

স্বপ্নদেখা মেজাজের পক্ষে ভাল

পাশ্চাত্যের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা স্বপ্ন দেখা বিষয়ে এবং স্বপ্ন দেখার অভ্যাস সম্পর্কে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের মতে বেশ মধুর স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা থাকলে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমানো উচিত। এইভাবে শয়ন করলে নিদ্রার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা যায়। তাঁদের মতে ঘর অন্ধকার থাকলে দুঃস্বপ্ন এবং মন ভেঙে দেবার মতো স্বপ্নের সৃষ্টি করে।

নাসিকার নীচে সুগন্ধি রেখে, মৃদু আলো জ্বালিয়ে, ফিসফিস করে কথা বলে এবং কোলে বালিস রেখে নিদ্রায় ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মনোরম স্বপ্নে নিমগ্ন করে তোলা যায়।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে এমন অবস্থায় উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করলে স্বপ্নের মেজাজটা অধিকতর তৃপ্তিদায়ক হয়ে ওঠে অথবা স্বপ্ন শেষই হয়ে যায়।

একটি পরীক্ষার ব্যাপারে দুটি পৃথক দলের ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়—একদল যারা প্রায় প্রতি রাত্রেই স্বপ্ন দেখে, আর অপরদল যারা অতি কদাচিত দেখে বা কোনদিনই স্বপ্ন দেখেনি।

পর পর চার রাত্রি পরীক্ষায় নিয়োজিত দু' দলেরই লোককে ঘুম থেকে তুলে স্বপ্ন দেখছিল কিনা প্রশ্ন করা হয়। যারা স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ত নয়, তারা স্বপ্ন দেখার কথা অপেক্ষাকৃত কম মনে করতে পারে। যদিও তারা কোনদিনই স্বপ্ন দেখেনি বলে দাবি করে, কিন্তু প্রশ্ন করে জানতে পারা যায় যে, পরীক্ষায় নিয়োজিত থাকা কালে প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি স্বপ্নও দেখেছে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে স্বপ্ন প্রত্যেক মানুষই দেখে যদিও কতক ব্যক্তির স্মৃতি থেকে তা অত্যন্ত দ্রুত অপসৃত হয়।

এক আঠারোদিন ব্যাপি নিরীক্ষণে দৈনিক স্বপ্ন বৃত্তান্ত ধরে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হয়।
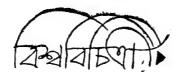
এতে দেখা যায় যে, যারা অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে স্বপ্নটা মনে করতে পারে, তারা তাদের গোপন অনুভূতি ও দুশ্চিন্তা সম্পর্কে সচেতন। আর যারা স্বপ্নে দেখা বিষয়ের খুঁটিনাটি ভুলে যায় তারা তাদের ভাবাবেগ দমন করতে চায়।

স্বপ্ন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে, কেউ স্বপ্ন দেখছে কিনা সেটা বলে দেওয়া যায় চোখের পাতার নীচে অক্ষিগোলকটি নড়ছে কিনা দেখে। স্বপ্ন দেখার সময় মনেতে সৃষ্ট কাহিনীকে চোখ অনুসরণ করে, যেমন ঘটে চলচ্চিত্র দেখার সময়।

নিদ্রিত ব্যক্তি পাহাড়ে বা কোন উঁচু জায়গায় ওঠার স্বপ্ন দেখলে তার চোখও ওপর থেকে নীচের দিকে বা নীচ থেকে ওপরে ওঠানামা করে। স্বপ্নে প্রচুর দ্রুতগতি ঘটনা থাকলে চোখের তারার গতিও দ্রুত হয়।

চোখের গতি লক্ষ্য করে স্বপ্ন দেখার মাঝখানে একশ একানব্বই জন নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিতে তাদের মধ্যে একশ বাহান্নজন তাদের স্বপ্নটা খুঁটিনাটি সমেত মনে করতে সক্ষম হয়।

তাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, স্বপ্নে দেখা দৃশ্য অনুযায়ীই তাদের চোখও নড়াচড়া করেছে। চোখের গতির ওপর লক্ষ্য রেখে ডাক্তাররা স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হয় না এই পুরনো প্রতিপাদ্যটি ভুল প্রতিপন্ন করেন।

গড়পড়তায় স্বপ্ন দেখার সময় কুড়ি মিনিট স্থায়ী হয় যদিও একঘন্টা ধরে স্বপ্ন দেখার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

হিসেব করে দেখা গিয়েছে গড়পড়তা লোকে তার ঘুমের শতকরা বাইশ ভাগ সময় স্বপ্ন দেখে কাটায়।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাহিত এক তথ্যানুশীলনে দেখা যায় পুরুষ এবং নারীর মধ্যে স্বপ্ন দেখার এইমাত্র পার্থক্য, যে পুরুষরা স্বপ্নের দৃশ্যে রঙের সমাবেশ কদাচিৎ দেখে, কিন্তু মেয়েরা অধিকাংশতই স্পষ্ট রঙ দেখতে পায়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য স্বপ্নে কোন বস্তুর যে রঙ দেখা যায় সেটা ঐ বস্তুর আসল রঙ নাও হতে পারে।

স্বপ্ন সম্পর্কিত গবেষণায় নিয়োজিত একজন জানায় যে সর্বদাই সে গাছ ও সাপ দেখে সবুজ রঙের।

অনেকে জানায় যে তারা রঙ দেখতে পায় স্বপ্নে আগুনের দৃশ্য থাকলে। সবচেয়ে বেশী রঙ দেখে বধির ব্যক্তিরা।

কিন্তু স্বপ্ন আমরা বেশী দেখি কি কম দেখি, রঙীন বা রঙহীন হোক, অনুশীলনে এটা দেখা গিয়েছে যে স্বপ্ন আমাদের মেজাজের পক্ষে সুফলদায়ক।

এটা প্রমাণ করার জন্য জনকতক স্বেচ্ছা-ব্রতীকে একটি হাসপাতালের পরীক্ষাগারে রেখে পাঁচ রাত্রি ধরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করা হয়।

যতবার চোখের গতি দেখে ওরা স্বপ্ন দেখছে মনে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই ওদের জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বপ্ন দেখায় ঐভাবে বঞ্চিত হতে স্বেচ্ছাব্রতী কজনই উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। মনোনিবেশে ওরা অক্ষম হয়ে পড়ে এবং গোগ্রাসে খাওয়ার মতো ক্ষুধায় প্রপীড়িত হয়ে ওঠে।

ওদের মধ্যে একজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পরীক্ষা করা থেকে সরে পড়ে। আর বাকি কজনে পাঁচরাত্রিব্যাপি ধকল পোয়াতে অসমর্থ হয়।

এই লক্ষণগুলি ঘুম না হওয়ার দরুণ দেখা দেয় নি। পরবর্তী পরীক্ষায় ঐ একই ব্যক্তিদের জাগিয়ে তোলা হয় যখন দেখা যায় ওরা স্বপ্ন দেখছে না এবং সে ক্ষেত্রে ক্লান্তির ভাব ছাড়া আর কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া ওদের মধ্যে ঘটে নি।

এই সব তথ্য দ্বারা বোঝা যায় যে স্বপ্ন হচ্ছে মনের আবেগ থেকে পরিত্রাণের কপাটক এবং ওটা না থাকলে মানসিক দুঃখ বেদনা আরো জমে উঠতে থাকে।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কৃত্রিম জ্ঞানবৃদ্ধি

অধুনা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যাপক নিয়োগের ফলে দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে হয়ত মানুষের বদলে কৃত্রিম জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা বহু কাজ সম্পাদন সম্ভব হবে। পশ্চিম-জার্মানীর কার্লসরুহের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন গবেষক [illegible]

সমস্যাবলী সম্পর্কে গবেষণামূলক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এটুকু বেশ বোঝা গিয়েছে যে, স্বয়ংক্রিয় অথবা ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে শিক্ষাগ্রহণ করার মত শক্তিযুক্ত করা চলে। এই সব যন্ত্রে কৃত্রিম বোধশক্তির কুশলতা বর্তমান এবং মানুষের আচরণ অনুকরণ করবার শক্তিও এদের প্রভূত। চেতনাশক্তি না থাকলেও চিন্তাশক্তির অনেকগুলি সাধারণ ধারা এরা সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারে। একটি ইলেকট্রনিক মগজের শক্তি মানুষের মস্তিষ্কের চেয়েও বেশী, কেননা এর মধ্যে অজস্র খবরাখবর সংগ্রহ করে রাখা যায় এবং বহু রকমারী সব যন্ত্রের সমন্বয় এর মধ্যে রয়েছে,—যেমন সংখ্যা পরিগণক যন্ত্র, পঠন-যন্ত্র ইত্যাদি।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি শিক্ষাগ্রহণ করে আলোক-রেখার সাহায্যে। কার্লস্রুহের একটি পরীক্ষার বৃত্তান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রথমে বড় একটি কাচের পরদায় একটি গোলকধাঁধার ছায়া দেখা গেল। তারপর আলোর রেখা সেই গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে পথ বের করে বাইরের দিকে যেতে চেষ্টা করল—যেখানে বাধা পায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য রাস্তা খোঁজে। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রন যন্ত্রটির লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে ভাল এবং কম দূরত্বের রাস্তাটি খুঁজে বের করা। সঙ্গে সঙ্গে ঐ পরীক্ষাটি যদি আবার করা হত তাহলে দেখা যেত যে এবারে যন্ত্রটির লক্ষ্য ভুল হয়নি। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এদের ঘটনা মনে করে রাখবার ক্ষমতা থাকে।

মানুষের মত ঐ যন্ত্রে পঞ্চেন্দ্রিয় আছে কিনা সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, তবে উপরোক্ত গবেষক মণ্ডলী এ বিষয়ে একমত যে, মানুষের মত এরাও ঠেকে শেখে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

বোধ-শক্তি-সম্পন্ন যন্ত্রের মহিমায় ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে অনেক কিছুই অদলবদল হতে পারে। সামাজিক জীবন, আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি, যান্ত্রিকতা প্রভৃতি সব কিছুই পাল্টে যেতে পারে।

ছোট ছেলেমেয়েদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য পশ্চিম জার্মানীর এক লেখক পরিকল্পিত "স্ট্রুয়েলপিটার" চরিত্রটি রূপায়িত করে তুলেছেন এই তরুণী। ট্রাউজারটা ওর ছোট ভায়ের এবং পরচুলটা ও নিজেই তৈরী করেছে। ওর চুল অবিন্যস্ত করে তোলায় ওকে সাহায্য করে এক কেশবিন্যাস প্রতিষ্ঠানের কজন অভিজ্ঞ সহযোগী সেখানে ও 'কেশবিন্যাস শিল্পী' রূপে কাজ করে। কার্নিভালের সময় বহু কেশবিন্যাস প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে এবং কল্পনা-শক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয় প্রদানকারিকে পুরস্কার দেয়। বহু তরুণী এইসব প্রতিযোগিতায় যোগদান করে তাদের দক্ষতাকে যাচাই করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে

শিল্পে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার

১৯৬০ থেকেই বুলগেরীয় শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে ও নির্মাণমূলক কাজকর্মে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার হয়ে আসছে এবং সম্প্রতি তা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আজকাল ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং তেল ও গ্যাস ড্রিলিংয়ের কাজে স্বাভাবিক গামা তেজস্ক্রিয়তা পদ্ধতি এবং নিউট্রন গামা পদ্ধতি বেশ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে কারবোনেট ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ ব্যবহার করে পাথরের স্তূপ থেকে কয়লার স্তর পৃথক করার উপায়ও বের করা হয়েছে।

কলকব্জা-নির্মাণের ক্ষেত্রে ঢালাই, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি ব্যাপারে দোষত্রুটি আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য ব্যাপকভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে সোফিয়ার জি বিয়েভ্ভ বয়লার কারখানায়, স্তারা জাগোরার নাইট্রোজেন সার কারখানায়, মারিৎসা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, ক্রেমিকোভৎসি ধাতুশিল্প কারখানায় এবং অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে।

এ ছাড়া কন্ট্রোল-এর কাজের জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ ব্যবহার করা হচ্ছে।

একলক্ষগুণ বর্ধিত চিত্রগ্রহণ

সামান্য একটানা খড় খড় আওয়াজে হঠাৎ যেন চোখ কান সচকিত হয়ে ওঠে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে অদ্ভুত দৃশ্য, যেন কতকগুলি খাল চলেছে, খালগুলি যেন হঠাৎ সচল হয়ে উঠলো। উজ্জ্বল পর্দার উপর দর্শক এই দৃশ্য দেখছে। কিন্তু কি জিনিস সে দেখছে? সে দেখছে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ গুণ বর্ধিত দেহ

তন্তু ও সংবাহিকা নলের বিভিন্ন সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম অংশ। জীবন্ত দেহকোষের অতি ক্ষুদ্র অংশের প্রাণ সম্বন্ধে গবেষণা করা হয় পশ্চিম জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের "বায়োফিজিকস এন্ড ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি ইন্স্টিটিউটে।" য়ুরোপের মধ্যে এই সুবৃহৎ ও আধুনিক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি কেন্দ্রটি সম্প্রতি আরও সম্প্রসারিত করার ফলে পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনে যে সব গবেষণা করা সম্ভব ছিল, এখন এখানেই তা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কীয় একান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্য এখানে করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের কক্ষটিতে ইলেকট্রনের অনুবীক্ষণের কার্যক্ষেত্র সম্বন্ধে বিরাট বিরাট চিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোষের গঠন, স্বাভাবিক ও অসুস্থ কোষ, কোষের পরিবর্তন এই চিত্রগুলির বিষয়বস্তু। এখান থেকে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যতে চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষকরা চিকিৎসা ও ঔষধের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। কারণ যে কোন কারণে মানুষ, পশু অথবা গাছপালার দেহে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সব সময়ে সেই প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র হচ্ছে এই জীবন্ত কোষ। কোন বিষাক্ত পদার্থ হোক, শারীরিক বৃদ্ধির সহায়ক হোক, খাদ্যবস্তু কীট বা বীজাণু হোক, ঔষধ কিংবা বিষ হোক, শরীরের প্রত্যেকটি কোষ সেই একমাত্র কেন্দ্র যেখানে বহু বিভিন্ন রাসায়নিক, ভৌতিক পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বে প্রত্যেকটি কোষের একক প্রতিক্রিয়া ধরা না পড়ে কোষগুলির সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া ধরা পড়তো।

ত্রিশ বছর আগেও বিজ্ঞানীরা কোষের সাধারণ ক্রিয়া প্রক্রিয়া দেখেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কারণ অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপগুলি যে কোন বস্তুকে কেবল তিন হাজার গুণ বর্ধিত করতে পারে এবং বর্ধিত চিত্রগুলিও তেমন সুস্পষ্ট হয় না। ১৯৩২ সালে মিঃ আর্নস্ট রুস্কা এবং বোডোফন বোরিস নামে দু'জন জার্মান পদার্থবিদ প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নির্মাণ করেন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বাধা অপসারিত হয়।

যুগান্তকারী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিস্কারের ব্যাপারে এই বৈজ্ঞানিকদ্বয় বিজ্ঞানের যে সত্য অনুসরণ করেন সেটি হচ্ছে যে কোন শূন্য স্থানে ইলেকট্রন রশ্মি যখন বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা উত্তেজিত কোন চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে, তখন তার ভৌতিক গুণাগুণ সাধারণ চলতি কাচের পরকলা দ্বারা ভগ্ন আলোকরশ্মির সমান। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পরকলার কৌশলে কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশ যখন উজ্জ্বল পর্দার উপর বর্ধিতাকারে দেখা যায়, ঠিক সেই সময়ে একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার সাহায্যে এই অংশের ছবি তোলা হয়। ইলেকট্রন রশ্মির কোন বস্তুর অত্যন্ত পাতলা ফালির মধ্য দিয়ে যেতে পারে। মাইক্রোটোনের জন্য ব্যবহৃত সুক্ষ্ম ছবিগুলি মোমের উপর স্থাপিত এক ইঞ্চির ৩।৬৪ ভাগ পুরু যে কোন বস্তুকে ১০,০০০ টুকরায় কাটতে পারে।

এই আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি মারাত্মক ক্যান্সার রোগের গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে' মানুষের এক অজেয় শত্রুকে পরাভূত করতে সমর্থ হয়, তবেই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক অপার সার্থকতা অর্জন করবে।

শরীর সুস্থ রাখতে মুরগী

বর্তমানে অবস্থা ভালো হলেও ভারতের শহরগুলির অধিবাসীদের পরিবারে রান্না খাওয়ার কি খুব পরিবর্তন হয়েছে? অন্ততঃপক্ষে 'নিজেদের শরীরটা ঠিক রাখার দুর্ভাবনা খাদ্যাভ্যাসে কতখানি পরিবর্তন এনেছে? এই ক্ষেত্রে গবেষণার অভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে অন্তত পশ্চিম জার্মানীর একজন উৎসাহী যুবক শরীর সুস্থ রাখার জন্য নারীদের বাসনার সুযোগ নিয়ে মুর্গী বিক্রী করে লক্ষপতি হয়েছে।

দশ বছরের কিছু বেশী পূর্বে, জার্মান নারী তাঁদের পারিবারের জন্য যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে পারলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হতেন। বর্তমানে কিছুদিন যাবৎ তাঁদের সেই অতীত দুশ্চিন্তার পরিবর্তে তাঁরা বর্তমানের সেবাযত্নের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। কিন্তু টেবিলে যখন যথেষ্ট খাদ্য থাকে, মহিলারাও তখন প্রায়ই বেশী লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। আর তাই শরীর যাতে বেশী মোটা না হয়ে যায় সেদিকেই এখন জার্মান মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে।

জার্মানীর হাস মুর্গীর আমদানীকারকগণ তাঁদের ব্যবসা সম্পর্কে খুব ভালো পরিসংখ্যান রাখেন বলে এই তথ্যটি জানতে পারা গেছে। ১৯৫৪ সালের পর থেকে ফেডারেল সাধারণ তন্ত্রে হাঁস-মুর্গীর চাহিদা শতকরা ২৩৫ গুণ বেড়ে গিয়েছে। এই অসাধারণ কাটতি সম্পর্কে আমদানীকারকগণের ভাষ্য হ'ল এই যে, "হাঁস-মুরগী আহার করলে দেহের মেদ বৃদ্ধি হয় না" এই, কথাটা ক্রমশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এর সংগে আরও কথা রয়েছে। তাঁরা বলেন, ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের নাগরিকগণ সাধারণতঃ উচ্চ রুচিজ্ঞানের পরিচয় দেন এবং হাঁস-মুর্গীর দামও ওঠা-নামা করে না। কাজেই পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অগ্রীম তালিকা করার সময় মুর্গীর ডিসের হিসেব পূর্ব থেকেই করা যায়, তার কারণ হল এগুলির দাম সব সময়েই স্থির থাকে, অন্য মাংসের বেলায় তা থাকে না।

পারিবারিক রান্নার তালিকায় এগুলি গ্রহণ করা হয়েছে বলেই যে মুর্গীর চাহিদা বেড়ে গেছে তা নয়। এগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় পরীক্ষা করলে ছত্রিশ বছর বয়স্ক ফ্রেইডরিখ জাহর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়। তিনি ১৯৫৪ সালে ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকে একটি গলির মধ্যে একটি রেস্তোরাঁ খোলেন। তাতে একমাত্র মুর্গী ভাজা ও ঝোল পাওয়া যেত। এখানকার সাফল্য তাকে এতো বেশী উৎসাহিত ক'রে তোলে যে, তিনি এখন গর্বের সংগে বলতে পারেন, হাঁস-মুর্গীর বাজারে এতো চাহিদা সৃষ্টিতে, তাঁর শতকরা ৫০ ভাগ কৃতিত্ব রয়েছে।

মিউনিকের ছোট একটি রেস্টুরেন্টে এই অসাধারণ লাভের ফলে তিনি এখন ত্রিশটি জার্মান শহরের মোট পঞ্চাশটি রেস্তোরাঁর মালিক। এই রেস্তোরাঁগুলিতে প্রতিদিন ত্রিশ হাজার মুর্গী রাঁধা হয়। খরিদ্দারেরা বসে খেয়ে যেতে পারেন অথবা বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। মিউনিক শহরের কাছেই তাঁর নিজস্ব একটি পোলট্রি রয়েছে। এর অর্থ হল প্রতি বছর এই ব্যবসাতে আট কোটি মার্কের লেনদেন হয়। এ ছাড়া হাজার হাজার লোক, রেস্তোঁরার জন্য মুখরোচক জিনিষ তৈরী করেন।

পুরুষ ধাত্রী

জাভার পূর্বে বালি দ্বীপে পুরুষদেরই সন্তান প্রসব করাতে দেওয়া হয়।

একজন পুরুষ ধাত্রী এক বিবৃতিতে বলেন : "কাজটা কঠিন এবং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মেয়েদের ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় না।"

বালি দ্বীপের পুরুষদের ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য গভর্নমেণ্ট থেকে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে কিশোর বয়স্ক সমেত পুরুষ ছাত্ররা কিভাবে যন্ত্রপাতি জীবাণুশূন্য করে রক্ষা করতে হয় এবং মাতাকে পথ্য ও সন্তানপালন সম্পর্কে কি ধরনের উপদেশ দিতে হয় সে-সবই শিক্ষা করে।

পুরুষ-ধাত্রীরা তাদের কাজটার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। সন্তান প্রসব করানোর কাজ না থাকলে তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিশুদের রূপকথার গল্প পড়ে শোনায়।

নিয়মমাফিক প্রথমে সে বাঁশের সরু ফালিতে তার প্রমোদ সূচী ছকে দেয়। তারপর বারোয়ারি কুটিরের মেঝেতে বসে তার রূপকথা শুনিয়ে ছোটদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

কলকাতা থেকে একটা প্রগাঢ় আত্মশ্লাঘা নিয়ে এসেছিলাম ঃ আমি রীতিমত তাড়াতাড়ি হাঁটি, অনেকের তুলনায়। এখানে এসে এ বিশ্বাসের মৃত্যু হল। মার্কিনী ললনারাও আমার চেয়ে দ্রুতচারী। বাতাস যেন সব সময় ওদের কানে কানে বলছে, কেমন, হেরে গেলে তো? আমি তোমায় ছাড়িয়ে গেলাম। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটার প্রয়াস। আমেরিকা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বড় হয়েছে, তারই ছাপ বুঝি এদের চলার রীতিতে।

এ প্রসঙ্গ মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ করুণ একটা অভিজ্ঞতার ছবি ভাসে। সেদিন সকালে ম্যাস অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে রজার্সের সঙ্গে দেখা। তখন নতুন এসেছি এখানে। 'গুডমর্নিং' বলাটাও ভাল করে রপ্ত হয় নি। রজার্সই প্রথমে বলল; 'গুডমর্নিং'। যদিও আমারই বলা উচিত ছিল, আমিই ওকে প্রথম দেখেছিলাম। পথ চলা শুরু। রজার্স কলেজে যাচ্ছে। আমিও তাই। ভালই হল। পথটা একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

—'আজকের আবহাওয়াটা আশ্চর্য ভাল, তাই নয়? আকাশটা কি সুন্দর নীল?—' রজার্সের চোখ চিকচিক।

বোস্টনের আবহাওয়ার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। কাল সারাদিন মেঘলা ছিল। আজ আবার যেন বিশ্ববিধাতা এক প্রকাণ্ড ঝকঝকে নীলবেলুনের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছেন বোস্টনকে। মার্ক টোয়েন নাকি বলছেন, 'বোস্টনের আবহাওয়া তোমার ভাল লাগছে না? আচ্ছা এক মিনিট ধৈর্য ধর।'

—'হ্যা সত্যি চমৎকার রজার্স।'

আবহাওয়া তো নিশ্চয় সুন্দর! কিন্তু রজার্সের সঙ্গে খানিকটা চলার পরেই যে ওভারকোটের তলাটা ভিজে ভিজে। দ্রুত নিঃশ্বাস সাবধানে নিই, ছোকরা আবার টের না পায়। আমাদের দেশের এক গুণী ব্যক্তির উক্তিঃ আমরা এখন গোরুর গাড়ির যুগ থেকে বাইসাইকেলের যুগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমেরিকা সম্পর্কে ভদ্রলোক কী বলছেন আমার জানা নেই। তবে 'আরে! ওরা তো রকেটের যুগে' বললে নিশ্চয় সত্যের অপলাপ হবে না। এই উক্তিগুলো ব্যক্তিজীবনের চলাফেরায়ও যে কী অসম্ভব সত্য তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে সুনীল গগনের তলায় এই সুন্দর সকালে।

একটা ড্রাগস্টোরের সামনে আসতেই মাথায় বুদ্ধিটা বিদ্যুতের মত খেলে গেল। ড্রাগস্টোরটাকে মনে হল যেন সাক্ষাৎ বিপদতারণ মধুসূদন।

বললাম, 'রজার্স তুমি এগোও, আমি একটু ড্রাগস্টোরে ঢুকব। কলেজে আবার দেখা হবে।'

রজার্স উল্লসিত, 'চমৎকার, আমিও ঢুকব। [illegible] সিগারেট কিনতে হবে।'

হায় মধুসূদন, চমৎকারই বটে! মুখে বললাম,—চমৎকার।

অতএব ড্রাগস্টোর। রজার্স সিগারেট কিনল। আমাকেও একটা কিছু কিনতে হয়। মান বাঁচানো বড় দায়! একটা সাময়িক পত্রিকা কেনা যাক। ড্রাগস্টোরের অভিধানগত অর্থ যদিচ 'ওষুধের দোকান', এখানকার ড্রাগস্টোর এক অদ্ভুত সমাহারদ্বন্দ্ব। ড্রাগ কথার এমন বিস্তৃত অভিব্যক্তি আগে জানা ছিল না। চা কফি সিগারেট, চিঠির খাম, ডাকটিকিট, ক্যামেরা, সাময়িক পত্রিকা —কোনটা চাই? একটা গাছের সঙ্গে পরিচয় ছিল ছেলেবেলায়। হাজাররকম আগাছা তার উপর। আসল গাছটাকে আর চেনাই যেতো না। ফুল ফুটত আগাছার শীষে, পাখি ডাকত আগাছার ডালে। ঠাকুরমা বলতেন, ও গাছ নারায়ণ, সবাইকে কেমন আশ্রয় দিয়েছে। গাছটার নামই হয়ে গেল নারায়ণবৃক্ষ। ঠাকুরমা বেঁচে থাকলে আমার এ তুলনা শুনে রাগ করতেন এ অপরাধবোধ মনের মধ্যে নিয়েই বলছি, ড্রাগস্টোরে ঢুকলে, আমার সেই দুর্ভাগা গাছটার কথা মনে পড়ে, যে পৃথিবীতে নিজের নির্দিষ্ট আসনটা নিজের করে পেল না। ড্রাগস্টোরে ওষুধের ব্যবসা গৌণ।

সেদিন কলেজে পৌঁছে চুপচাপ একঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর নড়াচড়া করে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, পাদুটো আমার সঙ্গেই বিরাজ করছে, খসে পড়েনি।

অবশ্য সব আমেরিকান তরুণেরই রজার্সের মত অশ্ববিক্রম, একথা বললে অতিরঞ্জনের অপবাদ আসবে। কিন্তু ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে, ফিলাডেলফিয়ায় বোস্টনে, সর্বত্র —ভুরি ভুরি রজার্সকে তীরের মত আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছি এবং বিস্ময় মেনেছি। প্রতিযোগীর পৌরুষ মনের মধ্যে আসন নিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সযত্নে তাকে রুখেছি। ওরা হাঁটছে, আর আমি ঊর্ধশ্বাসে দৌড়ে ওদের ছাড়িয়ে গেলাম। সেটা কি তেমন আনন্দদায়ক হবে?

এই করুণ ঘটনার পর থেকেই রজার্সের সঙ্গে আলাপ জমল। ও তাড়াতাড়ি হাঁটে যদিও, কথা বলার ব্যাপারে অত্যন্ত মাত্রাজ্ঞানী। মিতবাক্ রজার্সকে আমার ভাল লেগেছিল। অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়াশুনো করেছে এবং করছে। সেটাও হয়ত ভাল লাগার একটা কারণ হতে পারে। নিজের অজান্তেই ওর গল্প মাঝে মাঝে আধো আধো করেছে। বেশী বলতে চায় না। 'বাবা যখন যুদ্ধে মারা গেলেন, আমার বয়স তিন, মার বয়স বাইশ। মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো তোমাকে, তাহলে বুঝবে কি করে এতটা এগিয়েছি'—বলেছিল একদিন কথায় কথায়।

আরও আগের কাহিনী শোনা যাক। একদিন সেই ড্রাগস্টোরে ঢোকার ব্যাপারটা বলেছিলাম। রজার্স হেসেছিল,—'তখন বলনি কেন?

—'তোমরা অত তাড়াতাড়ি হাঁট কেন রজার্স?'

—'আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটি, না তোমরা আস্তে হাঁট, সেটাই ভাববার কথা।— রীতিমত গাণিতিক প্রশ্ন রজার্সের কৃত্রিম গাম্ভীর্যে।

অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা। এবং সেজন্যই বোধ হয় মনে করতে ভাল লাগে। একদিন লাঞ্চের সময় কমলালেবুর অর্ধেকটা রজার্সের দিকে বাড়িয়ে বলেছিলাম, খাবে? ওর সহজ গলার প্রত্যাখ্যান, নো থ্যাঙ্ক ইউ। অপ্রয়োজনে অন্যের কিছু গ্রহণ করা এদের রীতি নয়। এই বুঝি ঋণজালে বাঁধা পড়লাম, ভাবখানা এই। দরকার হলে সোজাসুজি চেয়ে নিতে অবশ্য আপত্তি নেই। যথা 'মে আই হ্যাভ এ সিগারেট'—

কোন ধূমপায়ীর প্যাকেট শূন্য বোঝা গেল।

কিন্তু রজার্সকে কমলালেবু খাওয়ানো চাই-ই। একদিন সুযোগ পাওয়া গেল। একটা এক্সপেরিমেন্ট নষ্ট হয়েছে। রজার্স মুখ ভার করে ভাবছে।—'রজার্স বড় ক্লান্ত আজ, কমলালেবুর মধ্যে প্রাণ থাকে, ভরসা থাকে।'—কমলালেবুর কয়েকটা কোয়া বাড়িয়ে দিলাম। কী একটা অনিচ্ছার মধ্যেও তুলে নিল।—'নিজেকে কী রকম অপরাধী লাগছে। তুমি কমলালেবু খাওয়াতে অত ব্যস্ত কেন? একটা লেবু নিজে খেয়ে শেষ করতে পার না?' রজার্সের সংশয় কাটেনি।

—'অত সহজে অপরাধ করা যায় না রজার্স। আমাদের দেশে এতো খুব স্বাভাবিক। খাওয়ার সময় ইচ্ছে হলে বন্ধুদের ভাগ দেওয়া। এতে খাওয়ার আনন্দ বাড়ে।'

আমার মনস্তত্ত্ব বুঝেছিল রজার্স। এরপর আর কোনদিন আপত্তি করেনি, এমন কি সংশয়ও নয়। একদিন বলল, 'আজ আমার খিদে পেয়েছিল, ভাগ্যিস দিয়েছিলে।'

তারপর একদা গ্রাজুয়েট হাউসের ডিনার টেবিলে রজার্স বাঙ্গালী হল। খাওয়া শেষ হয়েছে। এবার চা কিংবা কফি। রজার্সই জিজ্ঞাসা করেছিল,—চা না কফি? বললাম,—চা, চল নিয়ে আসি।—'তুমি বস, আমি নিয়ে আসছি। চা এল। রজার্সকে দশসেন্ট এগিয়ে দিলাম। অপ্রত্যাশিত উত্তর, 'ওটা থাক্, আমি তোমার চা কিনেছি আজ।'

খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বন্ধুর পকেটকে ভরসা করে রেস্টুরেন্টে আড্ডা জমাবার রীতি এখানে অপ্রচলিত। অবশ্য তরুণী বান্ধবীর বেলায় বন্ধুপ্রবরদের পকেট হাওয়ার মুখে অর্গলহীন দরজার মত অবারিত। সে কথা থাক্।

—তুমি, কি বাঙ্গালী হতে চললে রজার্স?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হতে ইচ্ছে করে।

এসব ছোট ছোট ঘটনার সেতু দিয়ে রজার্সের সঙ্গে পরিচয় কখন গাঢ় হয়ে গিয়েছিল। আর সে জন্যই বোধহয় সেদিন সোজাসুজি রাগটা আমার উপর ঢেলে দিয়ে স্বস্তি পেয়েছিল। আসল রাগের পাত্র অনেক বিস্তৃত, সারা ভারত। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।—'কেন গোয়া থেকে পোর্তুগীজদের জোর করে হটাল ভারত? এই বুঝি তোমাদের অহিংসার নীতি। নীতি নয়, বল, রাজনীতি।'

তখন সবে কলেজে পা দিয়েছি। কয়েকদিন থেকেই রজার্স জল্পনা করছিল। বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে—'ভারত গোয়ায় যুদ্ধ করবে সত্যিসত্যি?

অবশেষে গোয়া যখন ভারতের হল, রজার্স একেবারে খেপে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ওর হুংকার—'তোমরা ভণ্ড, সব বিশ্বাস গেল তোমাদের উপর—। অহিংসা তোমাদের মুখের কথা শুধু। হাতে হাতে প্রমাণ হল এবার।' স্বল্পবাক্ রজার্সকে অতটা উত্তেজিত হতে আগে দেখিনি।

শুধু রজার্স নয়। অনেকেই সেদিন উত্তেজিত, সবাই কৌতূহলী। এ বিদ্যায়তনের কক্ষে কক্ষে উত্তেজনা। বিজ্ঞানীরা সবাই বুঝি ক্ষণিকের জন্য রাজনীতিতে নেমেছে। ঠিক তা নয়, ভারতের অহিংসার আদর্শ সম্পর্কে খট্‌কা লেগেছে এদের। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে—'চীনকে কিছু বলছ না, আর গোয়ার ব্যাপারে বীরত্ব! চীনকে ভয় পাও বুঝি?' সেদিন সমস্ত 'ভারতীয় ছাত্রেরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল যেন।

আমাদের জবাবের বিস্তৃত বিবরণ এখানে অপ্রয়োজনীয়, কারণ তা প্রায় ছকে বাঁধা।—'আমরা চোদ্দ বছর অপেক্ষা করেছি। অহিংসা কথার অর্থ নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া নয়। চীনের ব্যাপারে অধৈর্য হওয়ার সময় এখনো আসে নি।' ইত্যাদি

রজার্স আমাকে একা পেয়ে বলেছিল—'কথা সাজানোর ব্যবসাটা ভাল জানা আছে তোমাদের। কোথায় শিখলে?' আমি রাগ করিনি। রজার্সের রোষ একটা আদর্শের অপমান বার্তা শুনে, আমার উপর নয়।

ববও যে গোয়ার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে কল্পনা করিনি। গণ্ডগোলে ব্যাপারের কাছাকাছি ঘেঁষা তার স্বভাবের বাইরে। হাসিতামাশা নিয়ে থাকতে পারলে আর কিছু চাই না। ববের আসল রহস্যটা বোঝা গেল পরে। প্রচুর দিলখোলা গালিগালাজের পর কানে কানে বলে গেল,—'আমি খুব খুশী হয়েছি বন্ধু! পোর্তুগীজ দস্যুগুলো আমাদের অহর্নিশ মাথাব্যথার কারণ।'

ফ্রাঙ্কও তর্ক করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে এক বিচিত্র মনস্তত্ত্ব আমি উপহার পেলাম, 'সেদিন কিছু মনে করো নি তো? সত্যি কথাটা কি জানো? ইউরোপের সঙ্গে কী রকম একটা প্রাণের টান অস্থিতে মজ্জায় বাজে, কিন্তু প্রাচ্যের সঙ্গে এ টানটা কিছুতেই আসে না।'

কিন্তু সব আমেরিকান বব কিংবা ফ্রাঙ্ক নয়। যথা, রজার্স। গোয়ার ঘটনার পর কয়েকদিন আমাকে এড়িয়ে চলেছে, ভাল করে কথা বলেনি। সত্যি বেজেছে ওর। ভারতকে ও শ্রদ্ধা করে, তার চেয়েও শ্রদ্ধা করে অহিংসাকে, শান্তিকে। রজার্সের বাবা যখন যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন, ওর বয়স ছিল তিন, আর ওর মার বয়স বাইশ!

এবং আরো একজনকে আহত হতে দেখেছি। রেভারেণ্ড বীভার। এখানকার এক ইউনিটারী চার্চের যাজক। ভারতীয় দর্শনে অবারিত প্রবেশ তাঁর। সৌম্য শান্ত রেভারেণ্ডকে আমার ভাল লাগে। গান্ধীজীর অনুরক্ত ভক্ত।—'ভারত যা করেছে তাতে নিন্দার কিছু দেখি না, কিন্তু অহিংসার বাণী ভারতের প্রাণ এ কথাটা শুধু বলো না!—নিজের অজান্তে রেভারেণ্ড আমাকে চাবুক মেরেছিলেন।

—কিন্তু রেভারেণ্ড, আমরা যে চোদ্দ বছর অপেক্ষা করেছি।

—বড় আদর্শের জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করলেও ক্ষতি নেই।

—কিন্তু প্রতিটি ভারতবাসী যে মনেপ্রাণে চেয়েছে গোয়া এই মুহূর্তে আমাদের হ'ক।

—'বেশ তো স্বীকার করে নিলাম, সবার সম্মতিক্রমেই ভারত আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, বুদ্ধ কিংবা গান্ধীর জন্ম ভারতে বলেই, ভারত ফলিত অহিংসাবাদের পীঠস্থান হবে তার কোন নিশ্চিত আশ্বাস নেই।

কী উত্তর দেব এর? রেভারেণ্ড অনেক উঁচু আসন থেকে কথা বলছেন। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন ভাসে। অহিংসাবাদের কথা হামেশা বলেছি। অথচ বাস্তবের মানদণ্ডে 'অহিংসা' কথাটার তাৎপর্য কী তা আমরা সুস্পষ্ট করেছি কি কখনো? হয়ত গোয়ার ঘটনা তা করেছে। এরপর আর কেউ আমাদের কাছে দুঃসাধ্য কিছু আশা করবে না। গোয়ায় আমাদের আত্মোদ্ঘাটন অতএব আত্মশুদ্ধি হয়েছে। দ্বিতীয়বার প্রবঞ্চকের অপবাদ আর আমাদের বোঝা বাড়াবে না।

—অনিমেষ চক্রবর্তী

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে দিল্লীর ললিত কলা আকাদামি প্রতি বৎসরই সারা দেশের শিল্পীদের নির্বাচিত ছবি ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আসছেন। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টেরই একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আকাদমির পক্ষে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি সংগ্রহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ-বছরের প্রদর্শনী দর্শকদের বিমূঢ় করে তোলে। এই প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয় আর সেই সঙ্গে প্রদর্শিত কৃতিত্বগুলির মধ্যে ভারতের জাতীয় শিল্পৈতিহ্যের বিকাশের চেয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারা প্রভাবান্বিত নানা জনের নানা ধরনের প্রচেষ্টাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সে-কথা ধরলে প্রদর্শনীটিকে ভারতের জাতীয় শিল্পসৃষ্টির প্রদর্শনী বলে কেউ অভিহিত করতে আপত্তি তুললে সেজন্য তার ওপর দোষারোপ করা যায় না। এছাড়া আরো একটি ব্যাপারও বিসদৃশ লাগে। প্রদর্শিত মোট একশ নব্বইটি শিল্প সৃষ্টির মধ্যে ছাব্বিশখানির আলোকচিত্র টাঙিয়ে রাখা হয়েছে—কারণ মূল সৃষ্টিগুলি বিক্রীত হয়ে গিয়েছে অথবা আকারে বড় হওয়ার জন্য টাঙাতে অসুবিধা ঘটেছে। এই বিকল্প ব্যবস্থা আর্টের প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে অনুমোদন করা যায় না। সংখ্যার দিক থেকেও এক স্থানে এতো বেশী দ্রষ্টব্যের সমাবেশও শিল্প-মাধুর্য উপভোগে নিবিষ্ট হওয়ায় অসুবিধা ঘটায়।

নামকরা এবং অনন্যকৃতী শিল্পীদের অনেকেরই ছবি এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল না, আবার অনেক প্রখ্যাতনামার নিকৃষ্ট কাজ কেন এবং কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে, সেটাও দুর্বোধ্য। হয়তো, কোন কোন মহলের অনুযোগ যে, আকাদমির সাধারণ পরিষদে শিল্পীদের প্রাধান্য থাকায় নির্বাচন ব্যাপারে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিরুচিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা তাঁদের নিজেদের অঞ্চলের শিল্পী-দের কাজকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকেন,—এ অনুযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বহু ছবির মধ্যে বিশেষ প্রশংসা-দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোলাম মহম্মদ, অবনী সেন, অহুর বসু, লক্ষ্মণ প্যাই, আমিনা কর জেন্দে, গুজেরাল, শিবক্স চাবড়া, কৃষ্ণ রেড্ডী, কান-ওয়াল ও দেবযানী কৃষ্ণ, সোমনাথ হোড়, রঙ্গ ফার্বার, ই এইচ রাওয়েন, জ্যোতি ভাট প্রভৃতির ছবি। এঁদের মধ্যে অনেকেই আকাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী। এছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ ছবির মধ্যে শিক্ষানবীশী ছাপ পরিস্ফুট, যা এমনি একটা প্রতিনিধি-মূলক প্রদর্শনীর যোগ্য কিনা বিবেচ্য।

জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত একখানি চিত্র।

ভাস্কর্য বিভাগেও নতুন সৃষ্টির অভাবটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিল্পীরা কেন এই প্রদর্শনীটিকে তাঁদের সৃষ্টি সমগ্র দেশের শিল্পরসিক ও জনসাধারণের সামনে পৌঁছে দেবার উপযুক্ত সহায় বলে মনে করেন না, সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। দেখবার এবং চমৎকৃত হবার মতো সৃষ্টি বলতে আকাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত
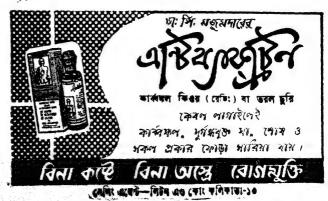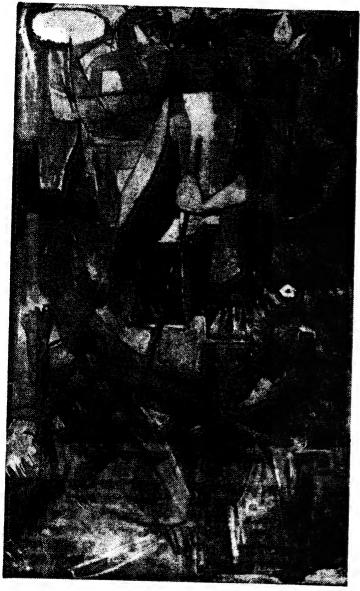
দুর্গা • শিল্পী : কমলা রায়চৌধুরী

ধনপালের কাজ, ধনরাজ, ভগৎ ও রাঘব কানোরিয়ার কাজ। চিন্তামণি কর, অমরনাথ সেহগল প্রভৃতির পরিবেশিত কাজগুলি ইতিপূর্বেই দেখা।

আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের গ্যালারিতে ১১ই থেকে ২০শে মার্চ এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

• • •

প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত পর-পর জনকতক শিল্পীর প্রদর্শনী সম্প্রতি দেখা গেল, যাঁরা পাশ্চাত্য ধারার অঙ্কন রীতির অনুসরণে এদেশের পুরাণ ও ধর্মমূলক বিষয়বস্তুকে চিত্রায়িত করার মধ্যে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টায় রত হয়েছেন। এঁদের পথ-প্রদর্শক বলা যায় নীরোদ মজুমদার। তাঁর পরে বিনয় চৌধুরী, শক্তি বর্মন প্রভৃতি কজনের একক প্রদর্শনীর পর গত ১৫ই মার্চ আর্টস অ্যাড প্রিন্টস গ্যালারিতে উদ্বোধিত হয়েছে কমলা রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনী। পাশ্চাত্য প্রভাব এবং বিষয়বস্তু ও ভাবের দিক থেকে এই দলের শিল্পীদের মধ্যে একটা নিকট মিল থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই একটা নিজস্ব মৌলিক ভঙ্গীর উদ্ভাবনে সচেষ্ট রয়েছেন।

কমলা রায়চৌধুরীর ছবি ইতিপূর্বে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়, তবে একক প্রদর্শনী তাঁর এই প্রথম। কলকাতায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্যারিসে দীর্ঘকাল আঁদ্রে লোতের স্টুডিওতে পাশ্চাত্য অঙ্কন-রীতি শিক্ষা করেন এবং সেই সূত্রে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় এবং সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাঁর আগেকার ছবিগুলিতে সেই প্রভাবটাই বেশী ছিল। এই প্রদর্শনীর মোট আটখানি ছবিতে তাঁর একটা নিজস্ব ভঙ্গীর পরিচয় দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। জ্যামিতিক রেখার সাহায্যে আকৃতির সৃষ্টির মধ্যে ভাস্কর্য-রীতির অনুসৃতি এবং লাল, হলদে, নীল ও সাদা রঙের প্রয়োগে পট ও ভারতীয় দেওয়াল-চিত্রের ধরনটা এই ভঙ্গীতে লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে কিছুটা পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং বিষয়বস্তু, ভাব ও আকৃতির গঠনের ভারতীয় ধারার সমন্বয়ে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলায় সফল হয়েছেন। রঙ তিনি ব্যবহার করেন কোমল প্রলেপে। রঙের সুসমঞ্জস বিন্যাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'দুর্গা', 'নিরঞ্জন' এবং কালির সংহার মূর্তি'। কোমল প্রলেপ হলেও রঙ স্তিমিত নয় কোন ছবিতেই।

প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী, যাঁদের ছবি সম্প্রতি দেখা গেল, তাঁদের সকলেরই পৌরাণিক ও ধর্মমূলক বিষয়বস্তুর প্রতি একটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্তত তাঁদের প্রদর্শনীতে যেসব ছবি দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিষয়বস্তু নির্বাচন করার প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এঁরা কৃতি শিল্পী নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিষয়বস্তুর নির্বাচনে বৈচিত্র্য সৃষ্টির ব্যাপারে কেন সচেতন নন, সেটা তাঁরাই বলতে পারেন। আর শিল্পরসিকদের কাছে সে অভাবটা বিশেষভাবেই অনুভূত হয়।

কমলা রায়চৌধুরীর প্রদর্শনীটি আগামী ২৫শে মার্চ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

[২২]
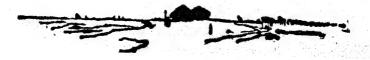
ঝড়ের বেগে বাইক চালিয়ে কাটোয়া থেকে গাঁয়ে ফিরছিল উদাস। দুপুর-রোদ তখন মাথার ওপর। তবু অন্যদিনের মত অপেক্ষা করে থেকে বিকেলের বাসটার মাথায় সাইকেলটা তুলে দিয়ে রাস্তার মোড়ে নেমে পড়ার আয়েসটুকু নিতেও ইচ্ছে হয় নি উদাসের।

সমস্ত মন তখন ফূর্তিতে নেচে উঠেছে তার। তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরে সবাইকে না শুনিয়ে যেন আনন্দ নেই। বাইক চালাতে চালাতে মাঝে মাঝেই নিজের পকেটে একটা হাত ঠেকিয়ে দেখে উদাস, আর হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ওর মুখ। দীর্ঘ-দিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার আনন্দ। ঝড়ের বেগে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলে উদাস, ঝড়ের মতই দুপুরের উত্তপ্ত বাতাসের হলকা এসে লাগে মুখে চোখে, বুক চিতিয়ে ঘাড় উঁচু করে সে-বাতাসের স্পর্শ নেয় উদাস, মুখেচোখে ঝাপটা লাগে উষ্ণ হলকার, তবু ভাল লাগে। কারণ জীবনের একমাত্র স্বপ্ন তার সার্থক হয়েছে।

লাইসেন্স পেয়েছে উদাস, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরির আশাও পেয়েছে।

মনে মনে লক্ষ্মীমণির ওপর খুশী হয়ে ওঠে উদাস। মনে মনে অনেক কথা ভাঁজে, কি বলবে সে লক্ষ্মীমণিকে, কি ভাবে আদর করবে। লক্ষ্মমণিকে বলবে, তোর বাপের চেষ্টাতেই হলো রে বউ, নইলে এত তাড়াতাড়ি লাইসেন মিলতো না।

শুনে লক্ষ্মীমণি নিশ্চয় মুখ বেজার করবে, কিংবা কোন কথাই বলবে না। তবু যেমন করে পারে তার মুখে আজ হাসি আনবে উদাস।

আর পদ্ম? পদ্ম হয়তো সত্যিই খুশী হবে। লাইসেন্সটা হাতে নিয়ে দেখতে চাইবে, দেখবে হয়তা নেড়েচেড়ে। একবার তার মুখের দিকে, একবার লাইসেন্সটার দিকে তাকিয়ে হয়তো কৌতুক হাসবে।

কিন্তু আজ পদ্ম নয়, কেবলই লক্ষ্মী-মণির কথা মনে পড়ছে তার। বড় রাস্তা ছেড়ে সাঁওতাল পাড়ার পাশ দিয়ে মেঠো পথে বাঁক নিয়েই মনে পড়লো, একদিন লক্ষ্মীমণির বাপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই মোড়েই, কাটোয়ার বাসে উঠে।

বিয়ের পর ধীরে ধীরে লক্ষ্মীমণির ওপর থেকে সব ভালবাসা কি ভাবে যেন মুছে গেল। যে-টুকু ছিল তাও উবে গেল উদাসের জীবনে পদ্ম আসার পর থেকে।

তবু ভিতরে ভিতরে একটা অসহ্য অন্যায়-বোধে বিমর্ষ হয়ে পড়ে উদাস, কখনো কখনো। মনে হয় নিজের স্বার্থের জন্যেই বুঝি লক্ষ্মীমণির জীবনটাকে নষ্ট করেছে। সেই সঙ্গে নিজের জীবনটাও। তাই মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞতায়—একটা অস্পষ্ট কর্তব্য-বোধে মনটা লক্ষ্মীমণির ওপর নরম হয়ে পড়ে।

পুজোর সেই দিনটার কথাও মনে পড়ে। সামান্য একটু আদর সোহাগ পেয়ে লক্ষ্মী-মণির শীর্ণ মুখে—দুটি ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে কি অদ্ভুত পুলক জেগে উঠেছিল মুহূর্তের মধ্যে। সারাটা দিন লক্ষ্মীমণির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে উদাস কাজের ফাঁকে ফাঁকে। মনে হয়েছে, বউটা তার মুহূর্তের মধ্যে মানুষ বদলে গেছে।

কিন্তু তারপর পদ্ম ফিরে এলো। পদ্ম ফিরে এসেছে এ-খবর শুনলো লক্ষ্মীমণি। কিন্তু কোন অভিযোগ করলো না, অনুযোগ করলো না আর। শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল তার মুখে সেটা, দপ করে নিভে গেল।

সবাই আশ্চর্য হলো। এ যেন ভিন্ন মানুষ। দিনরাত মুখ বুজে কাজ করে যায়, ডাকলে তবেই সাড়া দেয়, চাইলে খাবার এগিয়ে দেয়। কিন্তু কোন কথা বলে না, চিৎকার করে না, ঝগড়া করে না, ঘাটের ধারে কিংবা এখানে-ওখানে পদ্মর সঙ্গে উদাসকে হেসে কথা বলতে দেখলেও মুখে তার কোন ভাবান্তর হয় না।

বংশীও আশ্চর্য না হয়ে পারে না। বলে, বউয়ের অসুখ-বিসুখ কিছু হলো নাকি রে উদাস।

তেঁতুলে-বাগদীদের বুড়ি ধাই বলে, বউয়ের তোমার ছেলেপিলে হবে নাকি গো।

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। উদাসের নিজের কাছেও রহস্য মনে হয়। কিন্তু যত রাগরোষই থাকুক, উদাস লাইসেন্স পেয়েছে শুনলে লক্ষ্মীমণি নিশ্চয় খুশী হবে। আনন্দে হেসে উঠবে। হয়তো বলবে, এবার চাকরি নিয়ে চলো কাটোয়ায় ঘর করবে।

নিজের মনেই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলেছিল উদাস, গাঁয়ের মুখে নতুন গোড়ের সামনে এসে দেখলে এক দল লোক জটলা করছে—হংস পণ্ডে, গোপেন, আরো অনেকে।

বাইক থেকে না নেমেই এক হাতে পকেট থেকে লাইসেন্সটা বের করে হাত তুলে দেখালে উদাস। চিৎকার করে বললে, এই যে গো পণ্ডেদা লাইসেন্স পেয়ে গেলাম!

ওরা চমকে ফিরে তাকাতেই হাসতে হাসতে বাইক থেকে নামলো উদাস। বললে, বাপ বলে শিবচক্কর বাহন নইলে বাবুর আমার চলে না! হেঁ হেঁ, এবার আর দ্বিচক্কর নয় গো চার চক্কর......

ফূর্তিতে আনন্দে চিৎকার করে সগর্বে বলছিল কথাটা, কিন্তু লোকগুলোর মুখের

দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল উদাস। সবারই মুখ এমন থমথমে কেন?

সপ্রশ্ন চোখ তুলে একে একে সবারই মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে গেল উদাস। সকলেই চোখোচোখি হওয়ার ভয়ে মুখ নামিয়ে নিলো।

শুধু গোপেন ধীরে ধীরে বললে, তুই ঘরে যা উদাস, ঘরে যা তাড়াতাড়ি।

দ্রুত কাছে এগিয়ে এলো উদাস। বিস্ময়ে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় উদাস হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, ক্যানে, ক্যানে, কি হয়েছে গোপেন-দাদা, কি হয়েছে বলো?

কেউ কোন কথা বললে না। শুধু হংস চাটুজ্যে বললে, তুই যা তাড়াতাড়ি।

আর অপেক্ষা করলো না উদাস। ঝড়ের বেগেই বাইক চালিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। দূর থেকে দেখলে, তাদের বাড়ির সামনে লোক গিসগিস করছে। বাগ্দী পাড়া, বাউড়ি পাড়ার লোক, কোটাল পাড়ার লোক ভিড় করে আছে চতুর্দিকে।

উদাসকে দেখে সবাই সরে গিয়ে পথ করে দিলে। কিন্তু কেউই মুখ ফুটে কিছু বললে না।

প্রতিদিনের মতই দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর লক্ষ্মীমণির সংগে গল্প করতে এসেছিল পদ্ম।

পুজোর দিনে গাঁয়ে ফিরে আসার পর থেকে কি ভাবে যেন তাকে আপন করে নিয়েছিল লক্ষ্মীমণি। কারণে অকারণে আগের মত পদ্মকে আসতে দেখলে আর বিরক্ত হতো না সে, মুখখানা তার চাপা বিদ্রোহে কঠিন হয়ে উঠতো না, চিৎকার করে পাড়ার লোককে শুনিয়ে বাঁকা বাঁকা কথা ছুঁড়ে দিতো না।

পদ্ম নিজেও তাই বিস্মিত হয়েছিল। এ যেন অন্য মানুষ। রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, আবার হাসি-গল্প-আনন্দে মেতেও ওঠে না আর পাঁচ জনের মত। সদা সর্বদাই মুখখানা থমথমে, একটা চাপা দুঃখে ম্লান।

প্রথম যেদিন লক্ষ্মীমণির সংগে দেখা করতে এলো, সেদিন উদাসও ছিল। উঠোনে বসে সাইকেলের চাকার ফুটো সারাচ্ছিল।

পদ্ম হাসতে হাসতে ঢুকলো বাঁশের বাতার ফটকটা খুলে। বললে, কেমন আছিস গো বুন, দেখতে এলাম তোকে।

অন্যদিন হলে লক্ষ্মীমণি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলতো, অত ছুতোছাতার পেয়োজন নাই গো, যাকে দেখতে এয়েছো দেখবে যাও।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি কোন কথাই বললে না, শুধু চোখ তুলে তাকালে একবার পদ্মর মুখের দিকে।

দু'একটা সাধারণ প্রশ্ন করলে পদ্ম,

লক্ষ্মীমণি কেমন আছে, ধান হয়েছে কেমন, শ্বশুরের শরীর ভাল কিনা।

মৃদু গলায় দু'একটা উত্তর দিলে লক্ষ্মীমণি। তারপর শুধোলে, তোমার শরীর ভাল তো দিদি। কোথায় ছিলে?

পদ্ম হাসলে, কোন উত্তর দিলে না। তারপর দু'একটা আজেবাজে কথা বলতে বলতে ও গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে বসে উদাস সাইকেল মেরামত করছিল।

উঠোনের ওপর সাইকেলটা শুইয়ে রেখে রবারের টিউবটায় পাম্প করতে করতে এক বালতি জলে সেটা ডুবিয়ে ডুবিয়ে দেখছিল উদাস।

পদ্ম গিয়ে ভালমানুষের মত প্রশ্ন করলে, ও কি করছো গো বোনাই।

উদাস হেসে বললে, ছেঁদাটা খুঁজছি রে পদ্ম, জলে ভুরভুরি উঠবে একুনি দেখ ক্যানে।

দেখতে দেখতে জলে বুদ্বুদ উঠলো, আর পদ্ম হেসে উঠে বললে, ওমা তাই গো, পুকুরের মাছের পানা ভুরভুরি উঠছে বটে। কৌতুকে হেসে উঠে লক্ষ্মীমণির দিকে তাকালে পদ্ম। দেখলে লক্ষ্মীমণি এক মনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চিঁড়ে কুটছে।

পদ্ম সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে উদাস একটুকরো রবার কাঁচি দিয়ে গোল করে কেটে রবারের চাকায় তালি মারছে।

সাইকেল মেরামত শেষ হতেই চাকায় হাওয়া ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো উদাস। যাবার সময় বললে, শালার বাবলার কাঁটায় কাঁটায় রাস্তায় সাইকেল চালানো দায়।

পদ্ম হেসে বললে, কাঁটা নইলে কি কমল মেলে গো বোনাই।

ঠিক কি ভেবে বললে বুঝতে পারলো না উদাস। শুধু যাবার সময় হেসে ফিরে তাকালে তার মুখের দিকে।

আর উদাস চলে যেতেই পদ্মকে ডেকে বসালে লক্ষ্মীমণি। গল্প জুড়ে দিলো। এমন ভাবে কথাবার্তা শুরু করলে যেন কত অন্তরঙ্গ বন্ধু দু'জনে।

সেই প্রথম নয়। তারপরও বহুবার দেখেছে পদ্ম। উদাস যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই মুখ থমথম করে লক্ষ্মীমণির। মুখেচোখে কি এক বিষণ্ণতা, কিন্তু দুপুরে যখন উদাস থাকে না, উদাসের বাপ বংশী পড়ে পড়ে ঘুমোয়, তখন পদ্মকে কাছে বসিয়ে গল্প করে লক্ষ্মীমণি আপনজনের মত। যেন কোন অভিযোগ নেই তার বিরুদ্ধে, কোন অভিমান নেই।

কোন কোনদিন বিকেলে বংশী ঘুম থেকে উঠলে দু'গেলাস চা বানিয়ে একটা কাঁসার গ্লাসে চা ঢেকে রেখে পুকুর পাড়ের বাঁশ ঝাড় থেকে ডাক ছাড়ে লক্ষ্মীমণি, ও পদ্মদিদি! চা খাবে এসো গো!

পদ্ম দাওয়া থেকেই সাড়া দেয়।

তারপর এ-বাড়িতে এলেই লক্ষ্মীমণি গ্লাসটা নিয়ে বলে, নাওসে তোমার চা, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

কখনো দুটি গুগলির চচ্চড়ি পাঠিয়ে দেয় লক্ষ্মীমণি পদ্মর জন্যে, কখনো এটা ওটা। আর পদ্ম মনের অন্ধকার হাতড়ে রহস্যের কিনারা খুঁজে বেড়ায়। লক্ষ্মীমণি এমন ভাবে মানুষ বদলে গেল কি করে খুঁজে পায় না।

এক এক সময় তাই মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে। মনে হয়, লক্ষ্মীমণির ওপর অবিচার করেছে সে, অন্যায় করেছে। এত ভাল লক্ষ্মীমণি। এত ভাল তার ব্যবহার।

যত দেখে, ততই যেন মুগ্ধ হয় পদ্ম। আর দিনে দিনে লক্ষ্মীমণিকে কত অন্তরঙ্গ মনে হয়।

সেদিনও দুপুরে তাই খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করতে এলো পদ্ম। বাইরে থেকেই ডাকলে, লক্ষ্মী বুন, ঘুমুলি নিকি লো?

অন্য দিন পদ্মর গলার আওয়াজ পেয়েই হাসিমুখে ছুটে আসে সে। কিন্তু দু-তিনবার ডাক দেওয়ার পরও কোন সাড়া পেল না পদ্ম।

ভাবলে, লক্ষ্মীমণি হয়তো থালা-বাসন ধুতে ঘাটে গিয়েছে। তাই বেরিয়ে এসে বাইরে উঁকি দিলে। দেখতে পেল না। পিছন দিকের পাঁচিলে হয়তো ঘুঁটে দিচ্ছে ভেবে দেখে এলো, না সেখানেও নেই।

আর ঠিক সেই সময়েই একটা গোঙানি শুনতে পেল পদ্মর ঘরের ভেতর থেকে। কান পেতে শুনলে একমুহূর্ত, তারপর ছুটে গেল।

গিয়ে দেখলে রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে আছে লক্ষ্মীমণি, গোঙাচ্ছে থেকে থেকে, আর ...

ছুটে গিয়ে লক্ষ্মীমণির দু' কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকানি দিলো পদ্ম।—লক্ষ্মী, বুন, অ বুন, কি হয়েছে তোর!

আচ্ছন্নের মত চোখের ভারী পাতা দুটো একটু ফাঁক হলো, একবার যেন তাকালো সে পদ্মর মুখের দিকে, বোধহয় বুঝতে পারলো না।

আবার বমি করলে লক্ষ্মীমণি।

আর পদ্ম জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে বল। কি হয়েছে তোর!

ধীরে ধীরে এবার একটা হাত এসে পড়লো পদ্মর হাতের ওপর। দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো লক্ষ্মীমণির চোখের কোণ বেয়ে।

তারপর লক্ষ্মীমণি ধীরে ধীরে অস্ফুটে বললে, পদ্ম?

—হ্যাঁ। আমি, পদ্ম। ব্যগ্র স্বরে বললে পদ্ম। বললে, কি হয়েছে তোর বল্। ডাক্তারকে ডেকে আনবো?

—না। অস্ফুটস্বরে বললে লক্ষ্মীমণি।

তবু শুনলো না পদ্ম, ছুটে বেরিয়ে আসতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে শিল-নোড়ায় পা লেগে হোঁচট খেলে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো পদ্ম।

শিলের ওপর তখনও খানিকটা পড়ে আছে। এদিকে ওদিকে পড়ে আছে ধুতরোর বীজ।

সারা শরীর যেন মুহূর্তে শিউরে উঠলো তার। ঘর থেকে বেরিয়েই কোটাল-পাড়ার মধ্যেই চিৎকার করে উঠলো পদ্ম, লক্ষ্মী বুন বিষ খেয়েছে গো, লক্ষ্মী বুন বিষ খেয়েছে!

চতুর্দিক থেকে লোক ছুটে এলো। ভিড় করে এলো লোক—তেঁতুলে বাগ্দীদের পাড়া থেকে, বাউড়ি পাড়া থেকে, কোটাল-পাড়া থেকে।

আর ঊর্ধ্বশ্বাসে অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির দিকে ছুটলো পদ্ম।

লক্ষ্মী বুন বিষ খেয়েছে। তাকে বাঁচাতে হবে। যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে!

একদিন তার বাপকে কাটারী করে কুপিয়ে দিয়েছিল এই লক্ষ্মীমণি, সেদিন নিজের মান-সম্মান বাঁচাবার জন্যে, অপবাদ বাঁচাবার জন্যে ডাক্তারের কাছে সব কথা চেপে গিয়েছিল পদ্ম।

কিন্তু আজ মান-অপমান, অপবাদ-দুর্নামের কথা মনে পড়লো না পদ্মর, মনে হলো না লক্ষ্মীমণি বিষ খেয়েছে, এ-খবর আসলে তার ওপরই অপবাদ ছড়াবে! ওর কেবলই মনে হলো, লক্ষ্মী বুনকে বাঁচাতে হবে, লক্ষ্মী বুনকে বাঁচাতে হবে।

যে মানুষটাকে এক সময় সে-ও সহ্য করতে পারতো না, যাকে জীবনের কাঁটা মনে হতো, আজ তাকেই যেন সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছে। যেন তার জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই পদ্মর কাছে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে কি যেন ভাবলো পদ্ম। তারপরই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

গাঁয়ে ফিরে এসেও অবিনাশ ডাক্তারের সংগে দেখা করতে যায়নি পদ্ম। যাবে না ভেবেছিল।

এক-ঠ্যাঙা ওই মানুষটার দিকে তাকালেও কষ্ট হয় পদ্মর। কষ্ট হতো। একখানা পা নেই, দুটো কাঠের ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে ডাক্তার, একখানা খাকি বুশ সার্ট গায়ে, একটা বোতাম ছেঁড়া, চুল উস্কখুস্ক। তিন কুলে কেউ কোথাও নেই, বিদেশ বিভুঁই এই গ্রামে এসে ঘর বেঁধেছে, অথচ দু' দিনেই তো গ্রামকে করে নিয়েছে আপন, গাঁয়ের উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায়, নিজের মুনিষ লাগিয়ে অপরের পুকুরের পানা সাফ করাতে যায়—এমন একটা লোককে এ-গাঁয়ের কেউ পছন্দ করে না, বদনাম দেয় পদ্মর নাম জড়িয়ে—এসব দেখে সত্যিই বড় কষ্ট হতো পদ্মর। তবু মুখ বুজে সহ্য করেছে সব কথা। ভেবেছে, সে যদি সরে আসে ডাক্তারের কাছ থেকে, তা হলে বড় অসহায় হয়ে পড়বে লোকটা। তেপান্তরের মাঠে একা পড়ে থাকে, কে দেখবে লোকটাকে, কে তার সুখ-সুবিধের দিকে তাকাবে। তাই পাড়াপড়শীদের উপহাস উপেক্ষা করেছিল পদ্ম। কিন্তু যেদিন বুঝলে, তাকে জড়িয়েই সারা গাঁয়ে অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছে ডাক্তারের, আর তাই অসুখবিসুখে তাকে কেউ ডাক দেয় না, বলগাঁর ডাক্তারকে ডেকে আনে, সেই দিন থেকেই মনস্থির করে ফেলেছিল পদ্ম। ডাক্তারের ভালোর জন্যেই নিজে সরে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু সেসব কথা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলার সময় নেই তখন, বলার মত মনের অবস্থাও নয় পদ্মর।

জলে-ভেজা দুটি চোখ কচলে পদ্ম বারবার বলে, একটুখ তাড়াতাড়ি চলো গো ডাক্তার, লক্ষ্মী বুনটারে বাঁচাতে হবে; বাঁচাতে হবে বুনটারে!

তাড়াতাড়িই হেঁটে চলে ডাক্তার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে। আর পদ্মর মনে হয়, প্রতিটি মুহূর্ত যেন কত দীর্ঘ সময়। যেন পথ আর ফুরোয় না! পদ্মর সংগে তাল রেখে দ্রুত হাঁটিতে চেষ্টা করে অবিনাশ ডাক্তার, পারে না।

যেতে যেতে অবিনাশ ডাক্তার আবার প্রশ্ন করে, তুই কেন চলে গিয়েছিলি পদ্ম, ফিরে এসেও দেখা করিস নি কেন?

প্রথমটা কোন জবাব দেয় না পদ্ম। শুধু কাতর গলায় বলে, সব বলবো গো ডাক্তার, সব বলবো তোমায়। লক্ষ্মী বুনটারে আগে তুমি বাঁচাবে চলো, ধুতরোর বীচি খেয়েছে বুনটা! বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলে পদ্ম।

অবিনাশ ডাক্তার আবার লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করে ক্রাচে ভর দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত ওরা যখন এসে পৌঁছলো, তখন আর কিছুই করবার নেই।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকলো অবিনাশ ডাক্তার, পদ্মর পিছনে পিছনে।

তারপর একটা ক্রাচে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্মীমণির একখানা হাত তুলে নিয়ে খানিক পরেই নামিয়ে রাখলো।

উৎসুক চোখ মেলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালে পদ্ম। আর লক্ষ্মীমণির পাশে বসে পড়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে সজোরে মাথা নাড়ল অবিনাশ ডাক্তার। না, না, না।

আর সশব্দে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো পদ্ম।

তারপর কখন যে ডাক্তার ক্রাচ দুটো তুলে নিয়ে ভিড় ঠেলে চলে গেছে, কখন গ্রামের চৌকিদার খবর নিতে এসেছে, কিছুই জানে না পদ্ম।

ঘণ্টাখানেক পরে থানার দারোগা আর সিপাই এসেছে, বুড়ো বংশী হাতজোড় করে তাঁদের কাছে অনুনয় করে বলেছে আড়ালে গিয়ে, তারপর তাঁরা এক সময় চলে গেছে—কিছুই লক্ষ্য করেনি পদ্ম।

ও যখন উঠে এলো, দেখলে বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে উদাস। তার চোখেও জল।

ধীরে ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়ালো পদ্ম। কাঁধে হাত দিয়ে বললে, ওঠো। বোনাই।

তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো উদাস অর্থহীন চোখ মেলে। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না চোখ মেলে। গভীর একটা অনুশোচনায় যেন তার সমস্ত বুক দগ্ধ হচ্ছে।

তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলো উদাস। বললে, লক্ষ্মী বউ ক্যানে আত্মঘাতী হলো রে পদ্ম, ক্যানে আত্মঘাতী হলো? কিছুই বলে গেল না ক্যানে?

পদ্ম নিজেও সে প্রশ্নের কোন জবাব পেল না ভেবে ভেবে। কেন আত্মহত্যা করলো লক্ষ্মীমণি, কেন?

আত্মহত্যাই যদি করবার মন হয়েছিল তার, তবে সেই প্রথম যেদিন পদ্মকে দেখেছিল, উদাসের আলিঙ্গনের মধ্যে, সেদিনই করেনি কেন!

কি আশ্চর্য, যখন সব রাগ বিদ্বেষ ভুলে পদ্মকে আপন করে নিল লক্ষ্মীমণি, যখন সংশয় সন্দেহ জয় করলো লক্ষ্মীমণি তখনই কেন সে বিষ খেলো!

পদ্মর হঠাৎ মনে হলো, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রেখে যাবার জন্যে নয়, উদাসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রেখে যাবার জন্যে নয়। উদাস আর তার মাঝখান থেকে ইচ্ছে করেই হয়তো সরে গেছে লক্ষ্মীমণি। অসীম অতৃপ্তির জ্বালায় ওদের সুখী করতে চেয়েছে।

আর একথা মনে হওয়ার সংগে সংগে সমস্ত শরীর তার শিউরে উঠলো।

(ক্রমশ)

শ্রীচরণরাজ্যে শ্রীচরণ

সুধাংশু ঘোষাল

শ্রীচরণে কি হয় আর কি না হয় বলাটা নেহাত চারটিখানি কথা নয়। মানুষ হিসাবে সবার দাম সমান, কিন্তু সবার চরণের দাম কি সমান? কারো শ্রীচরণের দাম বেশী, কারো কম। কারো চরণ উদ্দাম, কারো চরণ দুর্দাম। তবুও এই চরণ-চালনায় 'চরৈবেতি'। আদিকালে মানুষ খালি পায়ে না হয় খড়ম পরে ঘুরে বেড়াত। দিনে দিনে চরণের বরাত ফিরল। কোন সে কালে হবুরাজা পায়ে ধুলো লাগার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় চিন্তা করতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছিলেন। গোবুমন্ত্রীর মগজে নাকি সমস্যা সমাধানের একটা উপায়ও গজিয়ে ছিল। কিন্তু এক 'ব্যাটা' মুচি (গোবুমন্ত্রীর খেদোক্তি—"কেমন করে পেরেছে ব্যাটা জানতে।") কিভাবে যেন তার মনের কথা জানতে পারে। হল জুতো-আবিষ্কার; শ্রীচরণের নসীব জাগল। পামশু, কাবুলিশু, কত রকম-বেরকমের 'শু' পরে হল দিব্যি বহালতবিয়তে শ্রীচরণের ঘোরাফেরা। দুনিয়ায় দুনিয়াদারি করতে, গুরুজনের সম্মান রাখতে আমরা তাঁদের জুতো ছুঁয়ে (গুরুচরণ স্পর্শ করার সুযোগ কি আর আছে!) প্রণাম করি। অবশ্য এতে নৈতিক, এমন কি আধিভৌতিক কোন বাধা নেই। কারণ, এই প্রক্রিয়ায় আমরা দ্বিপদ শ্রদ্ধাস্পদ প্রাণীটির সংগে সংগে এ যুগের দধীচি চতুষ্পদ প্রাণীটির দেহাব-শেষটিকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগ পাই। অবশ্য কেউ কেউ অভিযোগ করেন, শ্রীচরণে আগে যেমন ভক্তি ছিল, এখন নাকি আর তেমন নেই। পৌরাণিক-যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রণাম করবার রীতির প্রচলন ছিল। এমন কি গুরু-শিষ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হলে শিষ্যমনে গুরুভক্তির এমন বান বয়ে যেত যে শিষ্য প্রথমে বাণ ছুঁড়ে গুরুচরণবন্দনা করত। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে লক্ষ্যভেদ করতে যাবার আগে, প্রথমেই বরুণবাণ হতে বারিবর্ষণ করে গুরু দ্রোণের পা ধুয়ে দেন, ও তারপর আর একটি বাণ মেরে তার চরণ স্পর্শ করেন। গুরুভক্তির নিদর্শন হিসাবে বিম্বিসার বুদ্ধের পাদনখকণা রেখে যে মন্দির রচনা করেন সেটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পরে অজাতশত্রু রাজা হয়ে এসব নষ্ট করে দেন। কারো কারো অভিযোগ দিনে দিনে ভক্তি নাকি এমনভাবেই উবে যেতে চলেছে। তাই 'শ্রীচরণেষু' কথার ব্যবহারও আসছে কমে। কিন্তু শ্রীচরণেষুর তিল তিলভাবে অকাল মৃত্যুর সংগে সংগে শ্রীচরণে 'শু'-এর সংখ্যা চলেছে বেড়ে। অর্থাৎ শ্রীচরণেষু ক্রমহ্রাসমান, তবে শ্রীচরণে—'শু' ক্রমবর্ধমান। আজ লক্ষ্মণের মতো যদি কেউ স্ত্রীলোকের মুখের দিকে না তাকিয়ে পায়ের দিকে চেয়ে থাকেন, তবে তিনি শু-শ্রী পদশ্রী দেখবেন সন্দেহ নেই। পদ আছে বলেই তো পৃথিবীতে পদত্যাগ, পদবৃদ্ধি এমন কত কি! শ্রীচরণে কি হয় বা না হয় জানতে হলে আমাদের বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের দিকে নিমেষ অক্ষিপাত করতে হবে। আসুন, আজ দুদণ্ড বিভিন্ন প্রাণীর চরণ রাজ্যে বিচরণ করা যাক।

পৃথিবীর ক্ষুদে এককোষী প্রাণী অ্যামিবার দেহ একটি ছোট্ট কোষ। এদের দেহের যে কোন জায়গা থেকে পা গজায়। সেই পায়ের সাহায্যে কিছুদূর যাবার পর আবার নতুন পা গজায় আর পুরানো পা দেহের সংগে মিশে যায়। বারবার পদলুপ্ত আর প্রদপ্রাপ্তি পৃথিবীতে কজনের ভাগ্যে ঘটে, বলুন। অ্যামিবার পরমাত্মীয় কতকগুলি ছোটো ছোটো প্রাণী এক বা একাধিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিপের মতো বা সুতোর মতো অংশ নাড়াচাড়া করে দিব্যি জলে ঘুরে বেড়াতে পারে।

পদত্যাগ করার নজীর-নজরানায় যারা প্রথম তাদের মধ্যে চিংড়ি বা কাঁকড়া শ্রেণীর প্রাণীরা বেশ সংকোচহীন। উকা (uca) নামে এক কাঁকড়ার পা যদি সাঁড়াশি বা চিমটার সাহায্যে চেপে ধরা যায় (অথবা সুতোর সাহায্যে যদি কোন পা বাঁধা হয়), তবে প্রাণীটি নিজের ইচ্ছে মতো এই পা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে পালিয়ে যাবে। মনুষ্যসমাজে চাকরিবাকরির বাজারে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এই কাঁকড়াটির ক্ষেত্রে পদত্যাগ করায় অসুবিধার চেয়ে সুবিধা হয় যথেষ্ট বেশী। এরা যখন বালিতে গর্ত করে লুকিয়ে থাকে, তখন

১, ২, কয়েক রকমের কাঁকড়া ও পতঙ্গ শ্রীচরণ মারফৎ প্রিয়া-সম্ভাষণ করে থাকে। ৩, মানুষের পায়াভারী হবার মূলে হচ্ছে—টাকা ও পোকা। ৪, অক্টোপাসের পেশী-বহুল [illegible] শিকার [illegible] করে

প্রায়ই এদের পায়ের কিছুটা গর্তের বাইরে বেরিয়ে থাকে। কোনো শিকারী প্রাণী যখন খাবার অভিপ্রায়ে কাঁকড়াটির পা খুব জোরে চেপে ধরে, তখন কাঁকড়াটি (চরণাশ্রিত?) শিকারী প্রাণীকে নিরাশ করে না। সে তার পা দেহ হতে পৃথক করে দেয় এবং গর্তের আরও ভেতরে গিয়ে আত্মগোপন করে। এভাবে দেহের অংশ বিশেষ বিসর্জন (autotomy) দিয়ে জান বাঁচানো আরও কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। শিকারী প্রাণী কাঁকড়ার কাছে উদ্ধতভাবে বা শরমে জড়ানো স্বরে মিনতিভরা সুরে একটিবারও বলে না—"দেহি পদপল্লবমুদারম্।" নাকের বদলে নরুন পেয়ে আত্মপ্রসাদ, বোধকরি, শিকারী প্রাণীরা স্বীকার করতে চায় না। 'উকা' নামক কাঁকড়াটির অবশ্য প্রথম তিনটি পা বিচ্ছিন্ন করতে (অন্য পায়ের তুলনায়) বেশী চাপ দিতে হয়। পদহীন কাঁকড়া দিন কয়েক সাক্ষীগোপাল বা ঠুঁটো জগন্নাথের মতো চুপচাপ পড়ে থাকে। তারপর ঐ স্থান হতে আবার নতুন পা গজাতে শুরু করে (Regeneration)। এই পা ক্রমশ বড়ো হয়ে স্বাভাবিক পায়ে পরিণত হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, কমবয়স্ক কাঁকড়ার নতুন পা গজাতে ও পদবৃদ্ধি হতে সময় লাগে কম; অধিক বয়স্কদের ক্ষেত্রে সময় লাগে বেশী। বস্তুত এই কাঁকড়াদের ক্ষেত্রে পদত্যাগ প্রকৃতপক্ষে আয়ু বৃদ্ধি ও পরে পদপ্রসারণ ঘটায়।

হাতের কারবার পায়ে সারা যায় কয়েকটি ক্ষেত্রে। চিংড়ি ও কাঁকড়া পায়ের ডগার সাঁড়াশীর মতো দাড়া দিয়ে শিকার ধরে ডান হাতের ব্যাপার চটপট সেরে ফেলে। অ্যামিবা-বাবুদের চরণে যারা ঠাঁই পায়, তাদের দেহস্থ করে অ্যামিবার শান্তি। অক্টোপাস সাগরবাসী, আটটি পেশীবহুল চরণের অধিকারী। প্রতি পায়ে পেয়ালার মতো উঁচু সারি সারি শোষক আছে। এই শোষক বিশিষ্ট ঠ্যাং (এক একটা ঠ্যাং দশ ফুট বা আরো লম্বা হতে পারে) দিয়ে সাগরতলে পাথর আঁকড়ে বা প্রবালদ্বীপের আশেপাশে এরা শিকারের অন্বেষণ করে।

মাকড়শার ঠ্যাং চারজোড়া। এরা প্রাণি-রাজ্যের দামোদর। খাদ্য খাবার পর এদের পেটের নির্দিষ্ট অংশ প্রসারিত হয়ে পায়ের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

মানুষের দুটো পা; সেই দু'পায়ের পদসেবায় নাজেহাল। ভাবুন দেখি, যদি আমাদের হাজার গণ্ডা পা হতো তবে অবস্থাটা কেমন হতো। বোধহয় এজন্যেই যাদের রাজত্বে পদসেবার বালাই নেই, পরকালে জবাব দেবার ঝামেলা নেই, সেসব প্রাণীদের পায়ের সংখ্যা গিয়েছে বেড়ে। যারা পাড়াগাঁয়ে থাকেন, তারা নিশ্চয়ই কেন্নো দেখেছেন। অক্টোপাস, আর তেঁতুলে বিছে কোন ছার'! পায়ের সংখ্যার দিক হতে এরা যে অনেক প্রাণীকে টেক্কা দিয়েছে, তা কেন্নোরা বুক ফুলিয়ে, গলাবাজী করে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বলতে পারে। এক একটা কেন্নোর দেহে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দু'শ' জোড়া পা থাকতে পারে।

পায়ে পায়ে ঘষে ঝগড়া যে সর্বদা হতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্যি আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। পতঙ্গেরা যেসব শব্দ করে, তা মোটেই কণ্ঠসংগীত নয়। তা হচ্ছে অঙ্গসংগীত। পুরুষ পতঙ্গের অনেকে শরীরের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট অংশ হতে নির্দিষ্টভাবে শব্দ উৎপন্ন করে প্রেয়সীকে আহ্বান জানায়। এক ধরনের ঝিঁঝি পোকার পুরুষেরা কর্কশ পায়ে পা ঘষে প্রিয়াসম্ভাষণ করে। স্ত্রী পতঙ্গ সেই ধ্বনি শুনে, "সখী, ওই বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি মনোমাঝে" বলে লঘুডানার ভর করে রঙ্গে রঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে পুরুষের কাছে হাজির হয়। কাঁকড়াবিছার শরীরের প্রথমার্ধে ছ' জোড়া উপাঙ্গ আছে। প্রথম জোড়া আকারে- সবচেয়ে ছোটো; আর দ্বিতীয় জোড়া সবচেয়ে বড়ো। প্রজননকালে স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়া-বিছা পরস্পর মিলিত হবার আগে এই দ্বিতীয় উপাঙ্গ দুটির সাহায্যে একে অপরকে স্পর্শ করে। অবশ্য প্রণয় কার্য সমাধা হলে স্ত্রী কাঁকড়াবিছা পুরুষটিকে খেয়ে ফেলে। সনাতন প্রথা আর প্রচণ্ড বুভুক্ষার আগুনে স্বামীকে আহুতি দিয়ে বিয়ের রাতে সিঁদুরে টিপটি সে নিজেই মুছে ফেলে। পতঙ্গতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড লক্ষ্য করেন যে প্রেয়িংমণ্টিস্ নামক পতঙ্গের স্ত্রী অনুরূপভাবে পুরুষের শ্রীচরণ ও দেহের অন্যান্য অংশ খেয়ে তাকে উত্তেজিত

করে। আরগোনাটো হচ্ছে অক্টোপাসের জ্ঞাতভাই। এদের পুরুষ নির্দিষ্ট একটি চরণ স্ত্রী-দেহে প্রবেশ করিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই বিচ্ছিন্ন অংশে জননকোষপূর্ণ থলি থাকে—যা হতে নতুন জীবনের সূচনা হয়। পুরুষ ফিডলার কাঁকড়া হাতছানি না দিয়ে একটি বিশাল পা নাড়িয়ে, পা-ছানি দিয়ে প্রিয়া সম্ভাষণ করে। চরণ দেখিয়ে চরণে ঠাঁই বইকি!

অমেরুদণ্ডীদের রাজ্য ছেড়ে এবারে আসুন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চরণ রাজ্যে বিচরণ করা যাক। বিবর্তনবাদীরা বলেন মাছেদের বুকের কাছের পাখনা জোড়া ও দেহের পিছনের পাখনা জোড়া চতুষ্পদ প্রাণীদের ক্ষেত্রে পায়ে রূপান্তরিত হয়েছে। ফুসফুস মাছেরা আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। এরা সামনের ও পিছনের পাখনা জোড়া দিয়ে বেশ হামাগুড়ি দিয়ে থাকে। কাজেই এখানে পাখনা পায়ের কাজ করে। অতীতের অনেক মাছের জীবাশ্ম দেখে বলা যায় যে, তারা সেই পাখনা দিয়ে সাঁতার কাটার চেয়ে চলাফেরা করতে বেশী অভ্যস্ত ছিল। বিবর্তনের ইতিহাসে মাছ থেকে উভচর প্রাণী; উভচর হতে সরীসৃপ ও সরীসৃপ হতে দুই শাখায় পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উদ্ভব হয়েছে। চতুষ্পদ প্রাণীদের পা চারটি এসেছে মাছেদের পাখনা হতে। পাখিদের বেলায় সামনের পা জোড়া হয়েছে দুটি ডানা, আর মানুষ ও অন্যান্য দ্বিপদ স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে তা হয়েছে দুটি হাত।

ব্যাঙ উভচর প্রাণী। এর সামনের পায়ে চারটে আর পিছনের পায়ে পাঁচটা আঙুল আছে। কুনো ব্যাঙের পিছনের পায়ের আঙুলগুলো পাতলা পর্দা দিয়ে পরস্পর জোড়া, দেখতে যেন কতকটা নৌকার দাঁড়ের মতো। কোলা ব্যাঙ আর দক্ষিণ আমেরিকার "পিপা" ব্যাঙদের বেলায় এটা আরও স্পষ্ট। তাই পাতিহাঁসের মতো এরা জলে বেশ সহজেই সাঁতার কাটতে পারে। গেছো ব্যাঙ "হাইলা"-র প্রতি আঙুলের ডগা স্ফীত। তক্ষক ও টিকটিকি জাতীয় কয়েকটি সরীসৃপের পায়ের তলায় নরম গদী থাকে। (অনেক সময় এই গদী বা আঙুলের স্ফীত ডগা হতে আঠালো রস বের হয়।) তাই খাড়া দেয়ালে ওঠার সময় বা গাছে লাফালাফি করার মুহূর্তে এরা পড়ে যায় না। কচ্ছপ ও সাপেরাও সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত। সাগরবাসী কচ্ছপদের পায়ের আঙুলগুলো পরস্পর সংলগ্ন।..."সাপের পাঁচ পা" কথাটির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে কোন শ্লেষ থাকুক না কেন, সাপের পূর্বপুরুষদের যে পা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কখনো কখনো পাইথনের দেহের পিছনের দিকে অপরিণত পায়ের মত অংশ দেখা যায়। জীবতত্ত্ববিদেরা এ দুটিকে বিবর্তনের প্রমাণ বলে থাকেন। এই সাপটির হাড়ের (এক্স-রে) ফটো তুললে, যে কোমরের অস্থির সঙ্গে পা সংযুক্ত থাকে, এক্ষেত্রেও ঐ অস্থিবিশেষ দেখা যায়। এসব সাপের পা-ওলা পূর্বপুরুষের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চতুষ্পদ সরীসৃপ হতে পাখির উৎপত্তি হয়েছে। সরীসৃপদের সামনের পা পাখিদের বেলায় ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে কোন পাখির ডানায় স্পষ্ট নখ থাকে না, তবুও আজ হতে পনেরো কোটি বছর আগের আদিম পাখি (আর্কিঅপটেরিক্স)-দের ডানার তিনটি আঙুলে নখ ছিল। প্রয়োজন হলে ঠিক সরীসৃপের মতো এরা ডানার আঙুল তিনটে দিয়ে গাছের ডাল ধরত। পাখির পা বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপদের পিছনের পা জোড়া। নানারকমের পাখির পা বিবিধ বৈচিত্র্যে ভরা। যেসব পাখি জলে সাঁতার কাটে, যেমন পাতিহাঁস, তাদের পায়ের আঙুলগুলো পরস্পর পাতলা পর্দা দিয়ে জোড়া—নৌকোর দাঁড়ের অনুরূপ। সারস, বক—এদের 'জলে নামবো...তবু বেণী ভিজাবো না' ব্যাপার; শিকারের সন্ধানে লম্বা ঠ্যাং জলে ডুবিয়ে দিলেও এদের দেহ কিন্তু জলের সংস্পর্শে আসে না। মেক্সিকোর জাকানা পাখির পায়ের আঙুল পায়ের চেয়েও লম্বা। জলে ভাসমান পদ্মপাতার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তাই সে পদ্ম পাতা সমেত জাকানা পাখি ডুবে যায় না।

উটপাখি প্রতি পদক্ষেপে ২৫ ফুট যেতে পারে। ভাসমান পদ্মপাতার উপর হেঁটে যেতে সাহায্য করে জাকানা পাখির লম্বা আঙুলগুলো। সীলের পা সাঁতার কাটার ব্যাপারে মোক্ষম। ক্যাঙারুদের লাফিয়ে চলা তাদের লম্বা পিছনের পা জোড়ার দৌলতে।

উটপাখির উচ্চতা বারো ফুট বা আর একটু বেশী হতে পারে। দ্রুত গমনকালে এরা প্রতি পদক্ষেপে ২৫ ফুট অতিক্রম করে অতি সহজেই ঘণ্টায় ২৫ মাইল যেতে পারে, টিয়া মোরগ, কাকাতুয়া ইত্যাদি পাখি যারা পুষেছেন, তার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন পা উঁচু করলে এদের অঙ্গুলগুলো মুড়ে যায়। কোন অ্যানাটমিস্টকে জিজ্ঞাসা করলে শুনবেন এদের পায়ের গঠন এমন যে পা ভাঁজ হলেই, আঙুলগুলো মুড়ে যাবে পেশীর কারিকুরিতে। এই জন্যেই ঝড়জলে পাখির পা স্বাভাবিকভাবে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে; ফলে পাখিরা পড়ে যায় না।

আসুন, এবারে স্তন্যপায়ীদের দুনিয়ার খবর নেওয়া যাক। ডাকবিল এক আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা সরীসৃপদের মতো ডিম পাড়তে পারে। ডাকবিল, খাল, বিল, নদী, পুকুর ও জলায় ঘুরে বেড়ায়। প্রয়োজন বিশেষে এরা জলে সাঁতার কাটে। বলাবাহুল্য শ্রীচরণের গঠনও পাতিহাঁসের সঙ্গে তুলনীয়। সীল ও তিমিকে অনেকেই মাছ বলে থাকেন। বস্তুত এরা মাছ নয়, স্তন্যপায়ী প্রাণী—এদের শাবক মার দুধ খেয়ে বড়ো হয়। সীলের চারটি পেশীবহুল পায়ের প্রতি পায়ের আঙুলগুলো সংলগ্ন। সক্ষমভাবে সাঁতার কাটা ছাড়া প্রাণীটি বরফের উপর হামাগুড়ি দিতেও পারে। তিমি সাগরের মায়া কাটিয়ে ডাঙার বুকে ফিরে আসে না কোনদিনও। এদের সামনের পা প্রশস্ত একটি দাঁড়, কিন্তু পিছনের পা হয়েছে লুপ্ত। বিবর্তনবাদীদের অভিমত, যে-প্রাণী জলে জীবনযাপনে যত অভ্যস্ত হবে, অভিযোজনের ফলে তার পিছনের পা ততই ছোটো হতে থাকবে, এমনকি পরিশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে (প্রাকৃতিক নির্বাচনের সক্রিয়তায়)।

শ্রীপদ যেমন কখনো-সখনো ছোটো হয়, তেমন এরা আবার বড়োও হতে পারে।" ক্যাঙারুর পিছনের পা জোড়া সামনের পা জোড়ার তুলনায় অনেক লম্বা। এই লম্বা পা জোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে চলার জন্য দায়ী। ঘোড়ার শ্রীচরণের ব্যাপার কম চমকদার নয়। যদি দ্রুতগামী ঘোড়ার লিকলিকে পা দেখিয়ে কেউ বলেন, ঘোড়া প্রতি পায়ের কেবলমাত্র একটি আঙুলে ভর দিয়ে দৌড়ায়, তবে একথা সোনার পাথর বাটির মতো মনে হবে। অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন ঘোড়ার পূর্বপুরুষেরা মাত্র ১১ ইঞ্চি উঁচু প্রাণী, আজ থেকে ছ'কোটি বছর আগের দুনিয়ার বাসিন্দা। এই সুদীর্ঘ সময়ে ঘোড়ার উচ্চতা বেড়ে ৬০ ইঞ্চি হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের পায়ের দৈর্ঘ্য বেড়েছে। পদ-সম্প্রসারণ ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বপুরুষের পায়ের মাঝের (অর্থাৎ তৃতীয়) আঙুলে ছাড়া আর যেসব আঙুল চলাফেরায় সহায্য করত, তাদের কতগুলি আংশিক ও কতকগুলি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। এসব তো অশ্বপুর্ব। কিন্তু মানুষের ব্যাপার-স্যাপার কি রকম দেখা যাক।

মনুষ্য সমাজে পায়াভারী হবার কারণ দুটি—টাকা ও পোকা। শেষোক্ত কারণে পায়াভারী হলে, তা অতিসহজেই চোখে পড়ে। রাস্তায় (বিশেষ করে উড়িষ্যায়) আমরা অনেকেই এমন লোক দেখেছি যার একটি বা দুটি পা ফোলা—হাতির পায়ের সঙ্গে তুলনীয়। এর একটি পায়ের ওজন ১ মণ ১০ সের পর্যন্ত হতে পারে। গজেন্দ্র গমন কথাটা সাহিত্যে উপমা হিসেবে দিলখোশ হলেও, "তৎ পদং দর্শিতং" অবস্থায় কতটা সাহিত্য প্রেরণা জাগে, সেটাই জিজ্ঞাস্য। এক ধরনের সুতো কৃমি জাতীয় পোকা মশার মাধ্যমে দেহে স্থানান্তরিত হয়ে লিম্ফনালী বন্ধ করে দেবার জন্যেই এই পদস্ফীতি হয়। মানুষের পদরাজ্য চটকদার বটে, রসঘন রহস্যঘনও বটে। চাকরির খোঁজে বড়সাহেবের দপ্তরে ছোটাছুটি; ছেলে দুরন্ত, দাও দেবতার পায়ে সঁপে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বিজ্ঞাপন দেখে না হয় খোঁজ নিয়ে ছুটে আর ছুটে। হৃদয়ের মাঝে ঠাঁই পাবার জন্যেও তো এই ধরনের ছোটা। এক কথায় শ্রীচরণের নেই ছুটি, আছে কেবল ছোটাছুটি। সৃষ্টির আদিতে যে ছোটা শুরু হয়েছে, সারা জীবজগৎ "যুগ হতে যুগান্তর পানে" ছুটে চলেছে এক অদ্ভুত গতির নেশায়, সুদূরের আহ্বানে সাড়া দিতে। এটাই তো বিশ্বসত্তার চিরন্তন চিরন্তন সুর। চলার উন্মাদনায় আমরা অনুপ্রাণিত নয় কি?

শার্ঙ্গদেব

বেতার সপ্তাহে সুগমসংগীত

বেতার সপ্তাহ উপলক্ষে লাইট মিউজিক তথা সুগমসংগীত শুনে প্রচলিত কাব্যসংগীত সম্বন্ধে উৎসাহিত হতে পারলাম না। এর জন্য গায়ক গায়িকাদের দোষ দিই না—আসল অভাব চিন্তার এবং আকাশবাণী এত বড় প্রভাব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কাব্যসংগীতের বৈচিত্র্য ও মনোজ্ঞতা সম্বন্ধে যথার্থ প্রেরণা প্রদান করতে অসমর্থ হয়েছেন—এটাই আমাদের পরিতাপের বিষয়। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বহুবার যা বলেছি এবারও তাই বলব কেননা বেতারে ইতিপূর্বে বহুবার যে মামুলি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারও তাই হোলো এবং আশংকা ভবিষ্যতেও তাই হবে।

কথা হচ্ছে, বেতার সপ্তাহ যে পালন করা হয় তার নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটি যে কী তা বোঝা আমাদের অসাধ্য হয়ে পড়ে যখন আমরা দিনানুদৈনিক অনুষ্ঠান থেকে এই অনুষ্ঠানের কোনো পার্থক্যই অনুভব করি না। ব্যাপারটা যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তা থেকে মনে হয় নেহাৎ এই রকম একটি বেতার সপ্তাহ পালন করবার একটা নির্দেশ ওপর থেকে আছে বলেই কোনরকমে এক সপ্তাহের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করে কাজটা সেরে দেওয়া হয়। এই আয়োজনের মূলে যেন কোনো চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই। সরকারী দপ্তরে যেভাবে দৈনিক চিঠিপত্র মামুলি পদ্ধতিতে ফাইলজাত করে ওপরওলার কাছে "ডিসপোজাল" দেখানো হয় এও সেই ব্যাপার; মনোভাবটা—এটা করতে হবে করে ফেলো গোছের—সার্থকতার দায়িত্ব কারুরই নেই। এই যদি হয় তবে বেতার সপ্তাহ পালন করা অর্থহীন এবং এই অপব্যয়ের কোনো সংগত কারণও দেখা যায় না।

আশ্চর্যের বিষয় কাব্যসংগীত সম্পর্কে বেতার প্রতিষ্ঠান বরাবর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানদের অনুসরণ করে আসছেন। দেখা যায় যখন যেভাবে ব্যবসায়ীরা সংগীতের মোড় ফেরাচ্ছেন আকাশবাণীতেও সেইভাবে সংগীতের গতি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা একটা পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন—জনসাধারণের রুচিকে কীভাবে কাজে লাগালে তাঁদের গানগুলির চাহিদা বাড়বে এবং লাভের অংক স্ফীত হবে সেটা আঁচ করেই তাঁরা তাঁদের কার্যপদ্ধতি স্থির করেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা কৃতকার্য হয়ে আসছেন। এদিক থেকে তাঁদের কিছু বলবার নেই কেননা যাঁরা ব্যবসা করতে নেমেছেন তাঁরা লাভের দিকটা দেখবেন ঠিক। কিন্তু বেতার প্রতিষ্ঠান উক্ত পন্থা অনুসরণ করছেন কেবলমাত্র কাজটা চালিয়ে যাবার জন্য—তাঁরা কোনো একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করাকে নিষ্ফল প্রয়াস বলে মনে করেন। এরও কারণ থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরকারী কর্মচারীরা নেহাৎ হতাশ হয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। অনেকে প্রথমে শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হন এবং তৎপরতার প্রমাণও দিয়ে থাকেন, কিন্তু বাধা আসে তাঁদেরই ওপরওলাদের কাছ থেকে নানা ভাবে নানা দিক থেকে। ফলে ভাল পরিকল্পনা অংকুরেই বিনষ্ট হয়। তখন কর্মীদের মনে নৈরাশ্য ঘনিয়ে আসে—সমস্ত উৎসাহ নিবে গেলে গতানুগতিক পথে ভ্রমণ করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। অপরপক্ষে কাজ দেখাতে পারলে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অভাবনীয় উন্নতির সুযোগ ঘটে। তাতে, তাদের উৎসাহ অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

এ সবই অবশ্য আমাদের অনুমান; কাব্যসংগীত সম্বন্ধে বেতার প্রতিষ্ঠানের নিশ্চেষ্টতার বিশেষ কারণটা প্রমাণ সহকারে বলা শক্ত তবে উৎসাহের অভাবটা সুস্পষ্ট এটা সকলেই অনুমান করতে পারেন। বেতার সপ্তাহের অনুষ্ঠান একটা বিশেষ অনুষ্ঠান—সেই অনুষ্ঠানে যেসব কাব্যসংগীত প্রচার করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ছিল, কিন্তু প্রায় কোনো গানেরই এতটুকু বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য পাওয়া গেল না। দুঘণ্টা ধরে এইসব গান শোনাও অতিশয় পীড়াদায়ক। আমার পরিচিত যতজনকে জিজ্ঞাসা করেছি তাঁদের কেউ ধৈর্য ধরে দুঘণ্টার প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ শোনেননি। সবাইকার এক উত্তর—"মশাই কাঁহাতক আর এ সব শোনা যায়—খানিক পরেই রেডিও বন্ধ করে দিলুম।" শ্রোতাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য দায়ী কি বেতার কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য নয়? একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁরা এমন কতকগুলি গান কেন শোনালেন যা শ্রোতাদের মনে এতটুকু রেখাপাত করল না? এমন কোনো চিন্তার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন কি যাতে আমাদের মনে এতটুকু ধারণা হয় যে বেতার প্রতিষ্ঠানে কাব্যসংগীতের উন্নতির এতটুকু সম্ভাবনা বর্তমান? কাব্যসংগীত সম্বন্ধে বেতার প্রতিষ্ঠান বোধ করি আদৌ শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন না। "লাইট মিউজিক" আখ্যা দিয়ে তাঁরা কাব্যসংগীতকে নেহাৎ অগৌরবের পর্যায়ে ফেলে রেখেছেন। এক সময় তাঁরা রাগসংগীতের উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রেরণায় রাগসংগীতের কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। আসলে অধিকাংশ শ্রোতা রেডিও শোনেন কিছু মনোরম সংগীত শোনবার জন্য। এই মাধুর্যের আস্বাদ তাঁরা লাভ করতে সমর্থ হতেন যদি বেতার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কাব্যসংগীত বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যে সার্থক হয়ে উঠত। রাগসঙ্গীত স্বীয় গৌরবে অধিষ্ঠিত। তার ভাবের ব্যাপকতা স্বাভাবিক নিয়মে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু কাব্যসংগীত একটুকরো বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ যা শ্রোতার বিশেষ অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং তাকে রসাবিষ্ট করে। এই কারণেই বৈচিত্র্য কাব্যসংগীতের প্রধান গুণ। সেই বৈচিত্র্যের প্রকাশ যদি না ঘটে তাহলে সেই গানে চিত্ত সাড়া দেয় না আর সেইখানেই কাব্যসংগীত অসার্থক। রাগসংগীত যে নিয়মে চলে কাব্যসংগীত সেই নিয়মে চলে না। কাব্যসংগীতে অল্পের মধ্যে অসামান্যের আভাস আনতে হয় নতুবা সে সাধারণ কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়; সেসব কবিতার কোনো বিশেষত্ব বা "ক্যারেক্টার" নেই। অতএব কাব্যসংগীতে রসসঞ্চার করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বেতার কর্তৃপক্ষ হয়ত মনে করেন একটা গান লিখে তাতে সুর দিলেই তা মিউজিক হয়ে গেল এবং তখন তাকে অনায়াসেই লাইট মিউজিক বলে চালানো যায়। কিন্তু এই ধারণা অতিশয় ভ্রান্ত; কাব্যসংগীতের কারুকলা রীতিমত সূক্ষ্ম, তার রূপায়নকে সার্থক করতে হলে কলা সম্বন্ধে উচ্চবোধ থাকা দরকার, প্রয়োগরীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বেতার প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এই প্রচেষ্টা এবং শ্রদ্ধার অভাব দীর্ঘকাল থেকে লক্ষ্য করে আসছি। এই মনোভাবের অবসান ঘটানো দরকার। কাব্যসংগীত সম্বন্ধে তাঁরা অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠুন শ্রোতৃসাধারণ এটা চান—চরিত্রবর্জিত আধুনিক নামক সুর সহযোগে আবৃত্তি থেকে লিরিককে প্রকৃত কাব্যসংগীতে রূপান্তরিত করবার সার্থক প্রয়াস বেতার প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত হলে সংগীতের একটা বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা উৎসাহিত হব।

উন্নয়ন, অর্থ, মৎস্য, দুর্নীতি দমন, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ১০টি বিভাগের ভার লইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। খুড়ো বলিলেন—"উপায় কী। ভগবান দশাবতার হয়েছিলেন শুধু
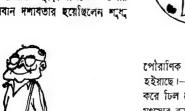
লীলার জন্যে নয়, প্রয়োজনে। এক্ষেত্রেও তাই। তবে সাদামাটা কথাটাও বলে রাখি, দশচক্রে ভগবানের রূপের কথাটাও তিনি যেন স্মরণ রেখে সতর্ক থাকেন!!"

মন্ত্রিসভা সংগঠনের সংবাদে শুনিলাম কয়েকজন মহিলা এইবারে মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইয়াছেন।—"গৃহিণীদের সচিবের পদ আমরা বহু আগেই দিয়েছি", বলে আমাদের শ্যামলাল।

প্রসঙ্গত বাজেটের কথা আসিয়া পড়িল। ঘাটতি বাজেট হইলেও নূতন কর ধার্য করা হইবে না বলিয়া ডাঃ রায় আশ্বাস দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহ-

যাত্রী বলিলেন—"এদিকে আমাদের ঘরের সচিবদের কিন্তু অন্যরকম রূপ। পারিবারিক বাজেট ঘাটতি হলেও তাঁরা করভার চাপাতে কোন সমীহ করেন না।"

বিধান সভার অধিবেশন যথারীতি শুরু হইয়াছে। —"এবং যথারীতি তুমুল হট্টগোলের ফার্স্ট রাউণ্ডও সম্পন্ন হয়ে গেল।"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

মন্ত্রিসভা সংগঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি ব্যঙ্গচিত্র "আনন্দবাজার

পৌরাণিক লক্ষ্যভেদের কাহিনী চিত্রিত করা হইয়াছে।—"বর্তমানের 'বুলস্ আই' তাক করে ঢিল ছোঁড়ার চিত্র হলেই ভালো হতো, মৎস্যের রূপের সঙ্গে যে অনেক শিকারীরই পরিচয় প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে"—বলে শ্যামলাল।

বৃহত্তর কলিকাতায় (৩২টি মিউনিসিপ্যালিটি সহ) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। —"খুব ভালো কথা। এই সঙ্গে নির্বাচন-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হলে আরো ভালো হয়"—বলেন বিশুখুড়ো।

শুনিলাম অর্থ কমিশনের অবিচারে (বিমাতাসুলভ আচরণও কেহ কেহ বলিয়াছেন) নাকি পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ঘাটতি হইয়াছে। অবিভক্ত বাংলার এক সহযাত্রী ঢাকার ছাদ পিটাইবার কালে গীত গান শুনাইলেন—"আমরা ছিলাম দুইটি ভাই গেলাম বিয়া করিতে, আপনার পুতেরে ভালা বউ দেয় গো, সতাই মা, সতাই মা ধর্মে যোন্ এই বিচার করে গো।"

ভারতে ১৯৮১ সালের মধ্যে বেকার সমস্যা থাকিবে না বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন —"আর থাকলেই বা কে কেয়ার করছে; ততদিনে চন্দ্রলোকের শিল্পাঞ্চলে কাজ জুটিয়ে নিতে কোন অসুবিধাই কারো হবে না!"

এক সংবাদে শুনিলাম রেল বিভাগের আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ নাকি পরিবহণের সময় লৌহ ও ইস্পাত চুরির খেসারত দিতেই চলিয়া যায়। শ্যামলাল বলিল—"কেয়া আফৎ, এর পর আবার অনেকের শেষ পারানির কড়ির জোগানও দিতে হয়!!"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমতী কেনেডিকে নাকি কয়েকটি ভারতীয় পুতুল উপহার দিয়াছেন। —"কিন্তু শ্রীমতী কেনেডির দেশে বোধহয় ডলের চেয়ে ডলারের কদর বেশি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

নির্বাচনান্তে কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতা ও

হারাইবেন তা ধারণা করিতে পারেন নাই। —"'আপনি কি হারাইতেছেন' বিজ্ঞাপনটি আগে থেকে পড়া থাকলে হয়ত সুবিধে

হলেও হতে পারত"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

গান্ধী স্মারক কমিটি কেনেডি জায়াকে একটি চরকা উপহার দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ শুনিলাম। "কিন্তু তার কি শোনাতে পেরেছেন—ঘর ঘর চরকার ঘর্ঘর ঘর্ঘর শব্দ"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ইংলণ্ডে ভাষার প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের নাকি একটি সোসাইটি আছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরাই শুধু বাংলা ভাষার প্রতি নিষ্ঠুরতার তাণ্ডব দমনে কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি!"

মাদ্রাজের এক সংবাদে শুনিলাম সেখানে কোন চিত্রতারকার সমাগমে জনতার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে পুলিস বাধ্য হইয়া বেত চালাইয়াছে।—"জানা থাকলে চিত্রতারকা-পাগলরা হয়ত গান ধরত—আমায় বেত মেরে কি......ইত্যাদি" বলে শ্যামলাল।

এক বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ জনৈক ব্যক্তি একটি জটিল অস্ত্রোপচারের সময় ৩৬ বার মরিয়াও নাকি এখনও বাঁচিয়া আছে।—"সেক্সপীয়ার কি একেও 'কাপুরুষ' আখ্যায় আখ্যাত করবেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

"রাজ্যপাল সন্ধানে"—একটি সংবাদ শিরোনামা। সংবাদে বলা হইয়াছে অধিকাংশ রাজ্যপাল এপ্রিল মাসে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং এইজন্যই বিভিন্ন রাজ্যের জন্য উপযুক্ত রাজ্যপালের সন্ধান কার্য ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন —"হালের রেওয়াজ মতো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে দরখাস্তের সংখ্যা এত বেশি হয়ে যাবে যে সেসব পড়ে শেষ করাই হবে দুরূহ। তার চেয়ে সাবেকী নিয়মে [illegible] হাতী ছেড়ে দিলে হয়ত [illegible] কাজটা [illegible]

বিদুর

অজ্ঞাত প্রতিভা

খুব ছেলেবেলায়, আমার বেশ মনে আছে, পাঁজির এক বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে ভীষণ ঠকেছিলাম। বিজ্ঞাপনে বলেছিল, মাত্র একটি টাকা পাঠালে আমি ডাকে ঐন্দ্রজালিক আঙটি, এক প্যাকেট তাস, রেশমী রুমাল একটা, আর এক শিশি আতর পাব। তাস বা রুমালের ওপর আমার লোভ ছিল না, ওই ঐন্দ্রজালিক আঙটির লোভই কাল হল। একটা টাকা যথা ঠিকানায় মনিঅর্ডার করলাম, আর দিন গুনতে থাকলাম কবে ঐন্দ্রজালিক আঙটিটা পরে বন্ধুদের কাছে আলাদীনের মতন ভোজবাজি দেখাতে পারব। দিন মাস এবং বছর কেটে গেল, সেই ঐন্দ্রজালিক আংটি আর এল না! আজও নয়।

রাঁচি থেকে এক তরুণ কাব্যযশপ্রার্থী একটি চিঠি লিখেছেন সম্প্রতি, আর তাঁর চিঠি পড়ে আমার সেই ঐন্দ্রজালিক আঙটির কথা মনে পড়ল। তিনি লিখেছেন, তাঁর লেখা অখ্যাত অজ্ঞাত অথচ নতুন প্রতিভাবানদের রচনা সংকলনে প্রকাশ করা হবে এই আশ্বাস পেয়ে তিনি কয়েক জায়গায় টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকাটা মারা গেছে। গ্রন্থ প্রকাশ ব্যবসায়ে এমন অসাধুতা দেখে ছেলেটি বড় মর্মাহত।

মর্মাহত আমরাও। কিন্তু কি করতে পারি! ইদানীং বাঙলা দেশের কোনো পত্রিকায় এই মর্মে বিজ্ঞাপনও দেখেছি যে, একটি কাব্য (ও গল্প) সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে, তরুণ উদীয়মান (!) সাহিত্যিকদের লেখা সংগ্রহ করে, লেখা ছাপার খরচ বাবদ দশ টাকা চাঁদা পাঠাতে হবে।

সাহিত্য যশ যার কাম্য, হাতে লেখা পত্রিকায় নিজের নাম দেখতে দেখতে যার চোখে জল এসে গেছে, তার কাছে দশ টাকার বিনিময়ে ছাপার অক্ষরে নাম দেখতে পাওয়া বড় সোজা কথা নয়। ফলে দশটা টাকা পত্রপাঠ মনিঅর্ডার হয়ে যায়, পৃথক এনভেলাপে থাকে বেচারী কবির একটি দুটি কবিতা কিংবা গল্প-লেখকের গল্প। অজ্ঞাত লেখক স্বপ্ন দেখেন তাঁর প্রতিভা অচিরেই গঙ্গা নদীর দু প্রান্তে স্বীকৃত হবে। কিন্তু মাস যায়, বৎসর যায়, বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই কবিতা বা গল্পের সংকলন আর প্রকাশ পায় না। টাকা? না সেটাও আর ফেরৎ আসে না। কারণ ঐন্দ্রজালিক আংটির মতন ওই সংকলন প্রকাশও এক ইন্দ্রজাল।

প্রসঙ্গ এখানে শেষ নয়। আমি এমন অভিযোগও শুনেছি, অনেক তরুণ লেখক [illegible] হবে এই আশায় [illegible]

প্রকাশ বাবদ অর্থও দিয়েছেন। হয়ত বইটা প্রকাশ করাও হয়েছে, তারপর আর লেনদেন কেনাবেচা সম্পর্কে প্রকাশক লেখকের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও রাখেননি। কেউ কেউ বলেন, বিত্তহীন প্রকাশককে এইভাবে পুঁজি জুটিয়ে ব্যবসা বজায় রাখতে হয়। কথাটা সত্য কি না জানি না।

কথাটা উঠল বলে সম্প্রতি আর-একটি সংবাদ পরিবেশন করি।

ফরাসী দেশে অগুনতি সাহিত্য পুরস্কার, তার মধ্যে আরও একটি পুরস্কার বাড়ল, নাম 'প্রিজিঅনস প্রাইজ'। এই পুরস্কার পাবেন তাঁরা, যাঁরা প্রতারিত লেখক, অর্থাৎ নিজের খরচায় বই ছেপেছেন; স্ব-খরচে ছাপা বইয়ের মধ্যে যে লেখকের বই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে এ পুরস্কার তাঁর।

হিসেব বলছে যে, ফরাসী দেশে যত বই বছরে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বই লেখকরা নিজের টাঁকের কড়ি খরচ করে ছাপেন। এই সব লেখক কারা? যারা হালে সাহিত্যে এসেছেন, যাঁদের বই প্রকাশক ছাপতে রাজী হননি, ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু দেশটা ফ্রান্স; ফরাসী রক্তের মজা এই, 'অজ্ঞাত প্রতিভা' বহু। কাজেই কিছু প্রকাশক আছেন যাঁরা 'অজ্ঞাত প্রতিভাদে'র বই ছাপার ব্যবসায়' বিশেষজ্ঞপ্রায় হয়ে উঠেছেন।

এ'রা প্রতিভার প্রতি খুব সদয়। এক একটা বই ছাপা বাবদ লেখকের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকেন। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে সামান্য কিছু বই ছাপেন, যা বা ছাপেন তাও বিক্রির জন্যে গরজ করেন না।

পুরস্কারটির যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা বলেন যে, গাঁটের কড়ি খরচা করে বই ছাপালেই যে লেখককে উন্মাদ ভাবতে হবে তার কোনো মানে নেই। বহু প্রতিভা আছেন যাঁরা এই-ভাবেই নিজের পকেটের পয়সা খরচা করে তাঁদের প্রথম বই ছেপেছেন—যেমন আঁদ্রে জিদ, মার্শেল প্রুস্ত, আঁরি বার্গ'শ, র‍্যাঁবো এবং আরও অনেকে। কাজেই [illegible]

অথচ অজ্ঞাত প্রতিভাদের লেখার বিচার করে একটি পুরস্কার দিলে প্রতারণার অন্তত খানিকটা মুখোশ খুলবে।

'অজ্ঞাত প্রতিভা' আবিষ্কারের এই পথটি মন্দ নয়। বাঙলা দেশেও এর চল হলে দোষ

নেই, কেননা অর্ধেকটা ত চালু আছেই। আর বাঙলা দেশেও অজ্ঞাত প্রতিভা প্রচুর।

বিবাহোপন্যাস

বাংলা দেশে এক ধরনের নতুন উপন্যাস ক্রমেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের সঙ্গে এ-ধরনের উপন্যাসের যোগাযোগ কতটা আমাদের সমালোচকরা তা বাতলে দিতে পারেন, আমি পারি না। তবে, এই সব উপন্যাস যে একটা আলাদা জাতের তা বোধ হয় অনেক পড়ুয়াই স্বীকার করে নেবেন।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি এই জাতের উপন্যাসের নাম দিয়েছি, 'বিবাহোপন্যাস'। আমার মনে হয় না, এটা খুব গর্হিত কর্ম হল। যে উপন্যাস ইতিহাসকে আশ্রয় করে তাকে যদি আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলি, যার কাহিনী খুন জখম ও গোয়েন্দা অধ্যুষিত তাকে যদি বলি গোয়েন্দা উপন্যাস তবে যে উপন্যাস বিয়ের উপহারের জন্যে তাকে 'বিবাহোপন্যাস' বলা কি অনাহ্য হল!

বিবাহোপন্যাস সম্পর্কে গবেষণা করলে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো উপাধি দেন বলে এযাবৎ শুনিনি, শুনলে গবেষণায় নিরত হতাম। কিন্তু সাধারণভাবে যা দেখছি তাতে এই জাতীয় উপন্যাসের একটা মোটামুটি চরিত্র আশা করি আমি নির্ণয় করতে পারি।

প্রথমত, বিবাহোপন্যাসের প্রাথমিক ধর্ম হল, এমন একটি টানা গল্প যার মুদ্রিত পৃষ্ঠাসংখ্যা সোয়াশ থেকে দেড়শ বা দুশ। এই গল্পর স্বাদ কেমন হওয়া উচিত তার জবাবে প্রকাশকরা বলবেনঃ 'এই মিষ্টিমিষ্টি গল্প একটা। প্রেমফ্রেম নিয়ে লিখবেন।' অর্থাৎ রসটা মিষ্ট হওয়া চাই। মোরব্বা না মধু কার মতন মিষ্টি তা অবশ্য লেখকই জানতে পারেন। প্রেমফ্রেম নিয়ে লিখতে হবে, কাজেই দুই নায়ক এক নায়িকা বা দুই নায়িকা এক নায়কের একটি ভালোবাসা-বাসির ফ্রেম রাখতে হবে।

তারপর দরকার নাম। নামটাই আসল। নামের জোরেই বিবাহোপন্যাস বিয়ের তিথিতে টোপর বা বরণডালার মতন বেচা-কেনা হয়। নামেই যে তরে যেতে হবে এ-কথা মনে রেখে লেখকরা কে কত বেশী বিয়ে-ছোঁয়া নাম দিতে পারেন, তার একটা প্রতি-যোগিতাও যেন করে যাচ্ছেন। কনে বর মালা চন্দন শঙ্খ ফুল চাঁদ—অর্থাৎ বিয়ের অনুষঙ্গের সঙ্গে সহজে যে-সব শব্দ জড়িত লেখকরা তার প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। আমায় সেদিন এক সাহিত্যিক বন্ধু বলছিলেন, তিনি তাঁর আগামী উপন্যাসের নাম দেবেন, 'বাসর শয্যা পাতি'। আমি চক্ষু বিস্ফারিত করলে, তিনি এক নিশ্বাসে এক কুড়ি হালের বিবাহোপন্যাসের নাম বলে গেলেন যা শোনা-মাত্র মনে হবে, সবার লক্ষ্য বাসর নববধূ ফুলশয্যা। তাঁর কথা অত্যুক্তি নয়, বইয়ের বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ ফেরালে পাতায় পাতায় আমরা এর সমর্থন পাব। হৃদয় নীড় আর শয্যায়, বরণডালা আর বধূতে বাংলা দেশ যেভাবে ছেয়ে গেল, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে বিয়ের বাজার বাংলা উপন্যাসকে সাত-পাকে বেঁধে ফেলেছে।

নামের পর প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদ মানেই তিন-চারটে রঙের খেলা, একটি নারী মুখ। (একজন প্রবীণ লেখক এক প্রচ্ছদ-শিল্পীকে চিঠিতে লিখেছিলেনঃ ভাই, মেয়ের মুখটি আরও মিষ্টি করবে, নতুন বউয়ের মতন, মুখে চন্দন থাকবে।) যে-প্রচ্ছদ যত বেশী চোখে ধরবে, বিয়ের বাজারে তার তত গরব। এবং তার চলাও তত গরবিণীর মতন।

প্রচ্ছদ এবং নামের পর থাকে দাম। মূল্য সুলভ করার দিকেই প্রকাশকরা ঝোঁক দেন, দু'তিন টাকার মধ্যে সাধারণত এর দাম হয়ে থাকে। অর্থাৎ ক্রেতা যেন সস্তা কাস্কেট ফুলদানি বা মিনেকরা সিঁদুর কৌটার দামে এই বই কিনতে পারেন।

এই বইয়ের পরিণতি কি আমার পক্ষে সঠিকভাবে তা জানা নেই। তবে শুনেছি, প্রথম দিন নতুন বউয়ের উপহার সামগ্রীর পাশে, পরের দিন বউয়ের বাক্সে, তারপরে স্কুল-কলেজে পড়া ননদ-দেওরের হাতে এবং শেষে স্থান-কাল-পাত্র বদলাতে বদলাতে পুরনো কাগজওলার বস্তায়।

বই যিনি পান, তিনি কি বই পড়েন? কদাচিত। কেননা, তখন বই পড়ে সময় নষ্ট করার মতন তাঁর অবস্থা নয়। বিয়ের পর নতুন বউ দুপুরে একটু না ঘুমিয়ে পারে না, রাত্রেই বা সময় পাওয়া যায় কোথায়—ওটা নিশিযাপন পর্ব।

পরে যখন বইয়ের খোঁজ পড়ে তখন সেই বইয়ের পাতা আস্তাকুড়-ঘুরে আবার কাগজের কারখানায়।

'বই চুরি' সম্পর্কে

মাননীয়,

'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

১৩৬৮ সনে দৈনিক দেশ পত্রিকায় আমার 'ময়দানবের দ্বীপ' বইটি কি ভাবে নকল করা হয়েছে তার খবর পেলাম। এবিষয়ে 'সাহিত্য সংবাদ'-এ "বিদুর" যা লিখেছেন তার চেয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য।

শুধু একটা কথা আপনার পত্রিকা মারফৎ পাঠক সাধারণকে জানাবার সুযোগ দিলে বাধিত হ'ব। 'ময়দানবের দ্বীপ' সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনী। 'রোবট' শব্দটি অবশ্য বিদেশী। 'রোবট' বলতে যা বোঝায় সেই কলের মানুষ আর আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু ধ্যানধারণা আবিষ্কারকে ভিত্তি করে লেখা কাল্পনিক এই কাহিনীটি প্রায় পঁচিশ বছর আগে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে ছোটদের একটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়।

নমস্কারান্তে

বিনীত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একটি সংবাদ

খবরের কাগজে অতি সম্প্রতি এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা আমাদের পাস্টারনাকের কথা মনে করিয়ে দেয়। মিখাইল নারিৎজার একজন রুশ লেখক এবং ভাস্কর। লেনিনগ্রাড আর্ট স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। সম্প্রতি রুশ পুলিস তাঁকে তাঁর একটি উপন্যাসের জন্যে গ্রেপ্তার করেছেন।

নারিৎজার-এর বিরুদ্ধে রুশ পুলিসের অভিযোগ এই, তিনি তাঁর উপন্যাস 'অসমাপ্ত সঙ্গীতে'র পাণ্ডুলিপি পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'অসমাপ্ত সঙ্গীতের' পাণ্ডুলিপি পাঠাবার জন্যে নারিৎজার অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন। প্রথমে এক ফরাসী ভ্রমণকারীর সঙ্গে পাণ্ডুলিপি পাঠাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, পরে আর-এক বিদেশীর সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীতে পাঠিয়ে দেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে পাণ্ডুলিপিটি পৌঁছেচে এই সংবাদ পাবার পর লেখক মূল পাণ্ডুলিপির একটি প্রতিলিপি ক্রুশ্চভের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, হয় রাশিয়ায় তাঁর এই উপন্যাস প্রকাশ করতে দেওয়া হোক, না হয় তাঁকে সপরিবারে দেশ ত্যাগ করতে আজ্ঞা করা হোক। বলা বাহুল্য, পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

উপন্যাসটি বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এম নারিসোভ এই ছদ্মনাম নিয়েছেন।

আশা করা যায় অচিরে 'অসমাপ্ত সঙ্গীত' পাশ্চাত্ত্য জগতে একটি বিতর্কের ঝড় তুলবে।

ভাষাতত্ত্ব

Nasal and Nasalization in Bengali.
মহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত, পনের টাকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম জোনসের যখন বিশেষভাবে নজর পড়ে, তখন থেকেই ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনে আধুনিক পর্বের সূত্রপাত হয়েছে বলা চলে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্ম হয় ইউরোপে। সংস্কৃতির সাহায্যে গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মানিক, স্লাভ ইত্যাদি ভাষাগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও তুলনাভিত্তিক গবেষণা তখন থেকে প্রসার লাভ করে। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা সম্বন্ধে বীম্‌স্‌ সাহেব উনিশ শতকের সত্তরের দশকে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন। তারপর এ বিষয়ে আরো অনেকে অনেক আলোচনা করে গেছেন। বাংলা-ভাষার উৎস-সন্ধান ও পরিণতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ আলোচনা প্রকাশিত হয় উনিশ শ' ছাব্বিশ খ্রীষ্টাব্দে। অধ্যাপক হাই সাহেবের বর্তমান ইংরেজী আলোচনা এদেশের ভাষাতত্ত্ব গবেষণার সুদীর্ঘ ধারাতেই উল্লেখযোগ্য সংযোজন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে আর ফার্থের এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের উৎসাহে, প্রেরণায় তিনি বাংলাভাষার শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর এই বর্ণনামূলক গবেষণা করেছিলেন। বাংলার নাসিক্য ও অনুনাসিক ধ্বনি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে তাঁর এই আলোচনা বিশেষজ্ঞের কাজ। পণ্ডিত সমাজে বইখানি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে। ছাপা, বাঁধাই মনোরম।

রবীন্দ্রস্মৃতি

রবিচ্ছবি। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। গীত-বিতান, ২৫-বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫। ছয় টাকা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের 'রবিচ্ছবি' বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে। গ্রন্থটি একটু আলাদা ধরনের। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লেখকের হয়েছিল, ফলস্বরূপ ব্যক্তি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সাধারণের নিকট অনালোকিত ঘটনা জানবার সুযোগ লেখকের ঘটেছিল। 'রবিচ্ছবি' তার সুন্দর প্রকাশ।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সাহিত্যে কিরূপে প্রতিফলিত হয়, অন্তর্ভুক্ত না নিবন্ধ'

পুস্তক পরিচয়

পর্বে লেখক তার চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিপ্রদাসের জমিতে মধুসূদনের সাহেব বন্ধুদের পাখি হত্যা নিয়ে আলোচনা আছে, যতোদূর জানি, এই ঘটনার উৎস সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গুপ্তই প্রথম রহস্য উন্মোচন করলেন। এই রকম আরো অনেক। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক গোপন তথ্য এই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো। বইটি আরো সুখপাঠ্য হয়েছে লেখকের সরল লাবণ্যযুক্ত ভাষার গুণে। এই জাতীয় রচনায় সচরাচর যে 'প্রিটেনশন্‌' চোখে পড়ে, রবিচ্ছবি'তে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুমুদ্রিত ও শোভন এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

৪৩৮।৬১

বাংলার আলপনা

আলিম্পন। দুর্গা মুখোপাধ্যায়। দশ টাকা।

পুস্পপট। দুর্গা মুখোপাধ্যায়। দশ টাকা।

প্রকাশক : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ২২ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হ'তে হয়, এবং আদ্যন্ত পড়া শেষ ক'রে শ্রদ্ধান্বিত হ'তে হয় লেখিকা ও প্রকাশক উভয়ের প্রতি, কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করার সুযোগ সমালোচকের ভাগ্যে কচিৎ ঘটে, বিশেষ ক'রে এই বাংলা দেশে। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থ দুটি আমাদের সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রথমটি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের চিরাচরিত বিষয় (শুধু বাংলার কেন, ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেরও) 'আলপনা' প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয়টি গৃহসজ্জা ও গৃহসজ্জার অন্যতম উপকরণ 'ফুল' প্রসঙ্গে রচিত। শুধুমাত্র প্রাকরণিক ও আপাত-কৌতূহলে রচিত হ'লে অবশ্য উচ্ছ্বসিত হবার কোনো

কারণ ছিল না, তা হ'তে হয় বিশেষ ক'রে এই জন্য যে, উভয় গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ-রচনার পিছনে যে শ্রম ও নিষ্ঠা ব্যয় করেছেন তা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রেও গ্রন্থ দু'টি স্মরণযোগ্য।

'আলপনা' বিষয়ে নতুন পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যুগ-যুগান্ত ধ'রে বাঙালী তার সংস্কৃতি ও মননশীলতার অপূর্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে আলপনার মাধ্যমে। পাড়াগাঁর ব্রত পার্বণ থেকে শুরু ক'রে যে-কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানই অসম্পূর্ণ থাকে আলপনার অভাবে। এক এক পরিবেশে এর এক এক রূপ, আনুষ্ঠানিক ভিন্নতায় তার তাৎপর্যের ভিন্নতা ধরা পড়ে। 'আলিম্পন' গ্রন্থে লেখিকা আলপনার উৎস ও বিকাশ প্রসংগে সুন্দর ও প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন। অসংখ্য রকমের আলপনার অংকন পদ্ধতি ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আলপনার বিষয়ও সংযুক্ত। বাংলা ও ভারতের একশো আটটি আলপনার সুমুদ্রিত 'প্লেট' অত্যন্ত মূল্যবান।

দ্বিতীয় গ্রন্থে গৃহসজ্জার উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যের প্রসারে ফুল ও ফুলের বিভিন্ন ব্যবহার আলোচিত। সেই সংগে গৃহ, ঋতু ও পরিবেশের পরিবর্তনে ফুলদানীর ব্যবহার সম্পর্কেও লেখিকার আলোচনা ব্যাপক ও মনোজ্ঞ। প্রাঞ্জলতার প্রয়োজনে অসংখ্য দুর্মূল্য 'প্লেট' ও ছবি সংযুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থ দু'টির জন্য লেখিকা রুচিবান পাঠকের ধন্যবাদ অর্জন করবেন। এর প্রচার আমাদের কাম্য।

৬০৬।৬১, ৬০৭।৬১

কবিতা

তুষার থেকে সাগরে—শ্যামলবিহারী সরকার। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা-১। দাম—দু' টাকা।

প'য়ত্রিশটি কবিতার সংকলন। সুখ-দুঃখময় জীবনের রেখাচিত্র কবিতাগুলির রস গাঢ়তর করেছে। অবশ্য শ্রীসরকার প্রযুক্তি প্রয়োগে প্রাচীনপন্থী। কিন্তু মানব-হৃদয়ের যে জীবন-জিজ্ঞাসা চিরন্তন তা কবিতাগুলির দেহ নির্মাণে সাহায্য করেছে। তাই 'বাসনার ফাঁদে' আবদ্ধ হয়েও তিনি লিখেছেন—

তবুও উঠিছে গান দীর্ঘ দিবানিশি,
মানব হৃদয়ে এ যে প্রাণের বন্ধন।

'সাগর বেলায়' গদ্য কবিতা, ও রাবীন্দ্রিক। শ্রীসরকার পদ্য-ছন্দে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; কিন্তু গদ্য-কবিতায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

৬৬৩।৬১

পত্রলেখা—কামাখ্যাশঙ্কর গুহ। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯ কলিকাতা-১। দাম—টা ২·৭৫।

প্রবীণ কবির কাব্যগ্রন্থটিতে অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বোধের সংগে আদর্শ আবেগের যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রেম এবং প্রকৃতি কবিকে যে প্রেরণা দান করেছে, তা যেমন ছন্দে সংহত, তেমনি বাগ্‌দীপ্ত। অবশ্য শ্রীগুহ রবীন্দ্র ভাবধারায় আপন চিন্তাকে আলোকিত করেছেন। সেই আলোকেই তিনি লিখেছেন, 'না জন্মানো আমি'তে মানবিক আদি চেতনার কথা। প্রাসাদভর্তৃকা, ব্যথিতা, পাষাণী অহল্যা, কামদেবের কল্পনা, স্যাফোর কল্পনা প্রভৃতি কবিতা ভালোই লাগে।

৬৬১।৬১

সোনালী মেয়ে—অজিত ভট্টাচার্য। ফ্রেন্ডস বুক ক্লাব; ১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য—দেড় টাকা।

প'য়ত্রিশটি কবিতার সংকলন। লেখক এখনো কবিতার অবয়ব গঠনের নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে পারেননি। জীবন-জিজ্ঞাসাই শ্রীভট্টাচার্যের কবিতা লেখার মূলে কারণ। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসাকে যদি কাব্যিক উপাদানে মূর্ত করে তোলা না হয়, তাহলে সাধারণের সংগে কোনো পার্থক্য থাকে না। আশা করি, শ্রীভট্টাচার্য শুধু পুস্তক প্রকাশের দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজের প্রকাশ-শক্তিকে সর্বাগ্রে সংহত ও সুদৃঢ় করবেন। বলা বাহুল্য, একালের তথাকথিত অনেক কবির ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

১৫০।৬১

ছোট গল্প

রূপস্নান—রাজ সিংহ। পরিবেশক : দাশগুপ্ত এন্ড কোং। কলিকাতা-১২। মূল্য ২·০০ টাকা।

বিভিন্ন স্থান-পরিবেশ ও মানুষকে কেন্দ্র করে এক একটি মানবিক মুহূর্তকে লেখক বিভিন্ন গল্পে মূর্ত করে তুলেছেন। লেখক শুধু যা দেখেছেন বা জেনেছেন,—তাকেই রূপদান করেননি, এক একটি মুহূর্তের মধ্যে ভবিষ্যতের যে-বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাকেও তিনি চিন্তাশীলতার দ্বারা উদ্ধার করেছেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই যে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন তা ঠিক নয়। 'দুই প্রপাতে' যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, 'ত্রয়ী'তে হয়তো তা ব্যর্থ হয়েছে। তবে লেখকের নিরলস আয়াস থাকলে ভবিষ্যৎ-এ তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেন। প্রচ্ছদপটে কিছুটা সুরুচি আশা করা, নিশ্চয়ই অন্যায় নয়।

২৬০।৬১

কিশোর-সাহিত্য

নাট্যে প্রণাম। স্বপনবুড়ো। তিন টাকা।
টাকা গাছ। লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী। এক টাকা সত্তর নঃ পঃ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭।

শিশুদের উপযোগী সাহিত্য। প্রথম গ্রন্থের লেখক স্বপনবুড়ো এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী শিশু সাহিত্যের পড়ুয়াদের মাঝে বিশেষ পরিচিত। সুতরাং, শিশুদের নিকট এই গ্রন্থ দু'টির প্রকাশ একটি খবর-বিশেষ।

'নাট্যে প্রণাম' কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি নাটকের সংকলন; অভিনয়ে যে-গুলি জ'মে ওঠার সুযোগ কম, কিন্তু পড়তে ভালো লাগে। বাঙালী মনীষী ও মহাপুরুষ, অর্থাৎ কোনো-না-কোনোভাবে যাঁরা বাঙালীর মনোরাজ্যে অধিকার স্থাপন করেছেন, সেই-রকম কয়েকজনের জীবনের কোনো-কোনো ঘটনা অবলম্বন ক'রে নাটকগুলি রচিত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, প্রফুল্লচন্দ্র অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও ক্ষুদিরাম এইসব নাটকের প্রধান চরিত্র। শিশুদের ভালো লাগবে।

'টাকা গাছ' একটি বড় গল্প, ছোট উপন্যাসও বলা যায়। কাহিনীর চরিত্রগুলি সাধারণ স্তরের মানুষ, প্রায়ই পথবাসী ও দরিদ্র। প্রধান চরিত্র কানু, জুতো পালিশ করে। এই কিশোর মনের সুন্দর, স্বপ্নময় বিকাশ কাহিনীর মুখ্য পটভূমি। রচনার গুণে বইটি আগোগোড়া পড়া যায়, পরিবেশ ও চরিত্রগুলিও অতিশয় জীবন্ত। দু'টি বইয়েরই ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

১৩,১৪।৬২

উপন্যাস

দিনের পর দিন—রামগোপাল নাথ। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম : ২‧ টাকা।

প্রায় সময়বসী দুই বিপত্নীক বড় মিস্ত্রী ও পংগু ঠাকুরপ্রসাদ দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাস করে। ঠাকুরপ্রসাদের সেই ছোট্ট মেয়ে বিলাসী এখন অনেক বড় হয়েছে। বড় মিস্ত্রীর সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় সেই মেয়েকে দেখলে। সহায় সম্বল-হীন বাদলাকে আশ্রয় দেয় বড় মিস্ত্রী। বাদলাই বিলাসীর সর্বনাশ করে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বড়মিস্ত্রীর স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠে বিলাসীর জন্য। সে-ই তাকে স্থান দেয়। উপন্যাসটির কোনো চরিত্রই পূর্ণতা লাভ করেনি। তাছাড়া এ-কালের তথাকথিত উপন্যাসগুলিতে যে বিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়, এ-উপন্যাসেও যে তা করা হয়েছে উপযুক্ত গল্পেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫৭০।৬১

গান গেয়ে যাই—ভবেশ দত্ত। জ্ঞানতীর্থ; কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : ২ টাকা।

পদ্মা পারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পালা গাইয়ে শ্রীধর মণ্ডলের সুর অসহ্য হয়ে ওঠে অভাবিনী স্ত্রী রাধার কাছে। একদিন শ্রীধরের কণ্ঠস্বরের মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই স্বরের পুনরুজ্জীবন হয় পুত্র লখিন্দরের কণ্ঠে। এদিকে শ্রীধরের মৃত্যুর পর সংসার ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, প্রেয়সী ও বাগদত্তা গৌরীর বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে ফেরার পথে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। রাধারও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। এইভাবে উপন্যাসটিতে শুধু পদ্মা পারের নয়, একটি সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারের ধ্বংস কাহিনীকে রূপায়িত করা হয়েছে। জীবন সংগ্রামে বারবার পরাজিত হয়েও মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেবে। এই শক্তির পরিচয়ের মাধ্যমে যথার্থ লেখক হওয়া যায়। 'গান গেয়ে যাই' উপন্যাসে সে শক্তির পরিচয় নেই। ৬৭৮।৬১

বিবিধ

কী হেরিলাম নয়ন মেলে—মায়া দাস। গ্রন্থপীঠ; ২০৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—২·৫০ টাকা।

এই গ্রন্থে লেখিকা কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত, সিংহল, নালন্দা, রাজগীর প্রভৃতি যে যে স্থানে ভ্রমণ করেছেন সেই সব স্থানের অতীত এবং বর্তমানের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু স্থান-মাহাত্ম্যই অবশ্য বর্ণনীয় বিষয় নয়; নিসর্গ-শোভা ও সৌন্দর্য এবং সাধারণ মানুষ বর্ণনানুক্রমে এসেছে। লেখিকা সেইসব মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন উপর্যুক্ত গ্রন্থটিতে। কয়েকটি চিত্র গ্রন্থটিকে অলংকৃত করেছে। কিন্তু প্রথমেই যে চিত্র দেওয়া হয়েছে, তা 'ঝিলম নদী' না, 'নাগিন লেক'? তথ্যবহুল গ্রন্থে এ ধরনের ত্রুটি না থাকাই উচিত। ৫৭১।৬১

রসসার তন্ত্র—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ডি এস-সি (আয়ুর্বেদ), আরোগ্য (আয়ুর্বেদ), আরোগ্য নিকেতন; ৭১-বি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট; কলিকাতা-৬। মূল্য—টাঃ ৩·২৫ নঃ পঃ।

এই গ্রন্থে বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্রীযুক্ত সেন মহর্ষি চরক ও মহর্ষি সুশ্রুতের সংহিতা থেকে সংকলন করে ভারতীয় রসবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আর্য ঋষিগণ রোগনাশক যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ করেছেন এবং আয়ুর্বেদমতাবলম্বী চিকিৎসকগণ পুরুষানুক্রমে যে ঔষধের ব্যবহারে সুফল লাভ করেছেন, গ্রন্থকার সেই ঔষধের গুণাবলী বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাই গ্রন্থটিকে "Hand book of Indian Chemistry in Bengali" বলা যেতে পারে।

অধ্যাপক কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থে পারদ, গন্ধক, রসসিন্দুর, হীরাকস, শিলাজতু, প্রবাল, কড়ি, শংখ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শুক্তি, মনঃশিলা প্রভৃতির বিশদ বিবরণ ও গুণ বর্ণনা করেছেন।

ডঃ শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী ভূমিকায় বলেছেন, 'এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়'। ৬৪৭।৬১

ভালোবাসা ও বিবাহ। যজ্ঞেশ্বর রায়। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ।৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায় বাঙালী পাঠকের

আশাপূর্ণা দেবীর

অগ্নিপরীক্ষা ৩॥৹ গল্পপঞ্চাশৎ ৮৲ ছাড়পত্র ৪॥৹ নবনীড় ৩॥৹ নির্জন পৃথিবী ৪৲ বলয় গ্রাস ৪৲ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲ সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫৲

সুমথনাথ ঘোষের

অহল্যার স্বর্গ ৩৲ ছায়াসঙ্গিনী ২৸৹ জটিলতা ২৸৹ জায়া ও জননী ৫৲ দিগন্তের ডাক ৩৲ নীলাঞ্জনা ৭৲ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲ সর্বংসহা ৫৲ সুদূরের পিয়াসী ৩॥৹ পরপূর্বা ৪॥৹

প্রমথনাথ বিশীর

অনেক আগে অনেক দূরে ৪৲ কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥৹ গল্পপঞ্চাশৎ ৮৲ ভূতপূর্ব স্বামী ২৲ মাইকেল মধুসূদন ৪৲ রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ১ম—৫৲ ২য়—৫৲ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫৲ হংসমিথুন ২৲ রবীন্দ্র-সরণি ১২৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অরণ্য ৬৲ অপারেশন ৬॥৹ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥৹ নূপুর ৪৲ উত্তরফাল্গুনী ৬॥৹ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৬॥৹ কালো হাত ৫॥৹ কালো ভ্রমর (১ম ও ২য়) ৫৲ (৩য় ও ৪র্থ) ৫৲ বেলাভূমি ৮৲ ঘুম নেই ৪॥৹ নীল তারা ৪॥৹ মধুমিতা ৫॥৹ চক্র ৩৲ মায়ামৃগ ২॥৹ উল্কা ২॥৹ নিশিপদ্ম ৪॥৹

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

আরাকান ৫৲ ইরাবতী ৪॥৹ উপকূলে ৩৲ তরঙ্গের পর ৫৲ চন্দনবাই ৫৲ সপ্তকন্যার কাহিনী ৩॥৹

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

অলকাতিলকা ৪॥৹ নবনায়িকা ৩॥৹ পঞ্চতপা ৬॥৹ সমুদ্র সফেন ৪॥৹ সাত পাকে বাঁধা ৪॥৹

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫॥৹ আরণ্যক ৫৲ দেবযান ৫৲ গল্প-পঞ্চাশৎ ৮॥৹ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲ মেঘমল্লার ৩॥৹ কুশলপাহাড়ী ৪॥৹ মুখোশ ও মুখশ্রী ৩৷৹ যাত্রাবদল ৩৷৹ কিন্নর দল ৩৲ উৎকর্ণ ৪৲ আদর্শ হিন্দু হোটেল (উপন্যাস—৪॥৹ নাটক—২৲) অভিযাত্রিক ৪॥৹ হে অরণ্য কথা কও ৩৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কালিন্দী ৭৲ উত্তরায়ণ ৫॥৹ কৈশোর স্মৃতি ৪৲ স্থলপদ্ম ২৸৹ প্রতিধ্বনি ৩৲ ইমারৎ ৩৲ কবি (উপন্যাস—৪॥৹, নাটক—২৲) বিংশ শতাব্দী ২॥৹ অভিযান ৫॥৹ না ২॥৹ দিল্লিকা লাড্ডু ২৷৹ সন্দীপন পাঠশালা ৪॥৹

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲ আকাবাঁকা ৫৲ তুচ্ছ ৪॥৹ উত্তরকাল ৪॥৹ দেশ-দেশান্তর ৩॥৹ অরণ্যপথ ৩॥৹ মধুচাঁদের মাস ২৸৹ বেলোয়ারী ৭৲ জলকল্লোল ৫৲ আগ্নেয়গিরি ২॥৹ বন্যাসঙ্গিনী ৩৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮॥৹ মনে ছিল আশা ৪৲ প্রেরণা ৩৲ দুটি ২৷৹ কমা ও সেমিকোলন ২॥৹ কোলাহল ২৸৹ আবছায়া ২৸৹ ভাড়াটে বাড়ী ৩৲ স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ ৩৲ প্রভাতসূর্য ৪৲ গল্পপঞ্চাশৎ ৯৲ নারী ও নিয়তি ২॥৹ জন্মেছি এই দেশে ৪॥৹ পৃথিবীর ইতিহাস ৪৲ বিধিলিপি (নাটক) ২৲ বাহির বিশ্ব ৩৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

অনামিকা ৪৲ চেনামহল ৫॥৹ মিশ্ররাগ ৪৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

চরণদাস ঘোষের

দান ৩॥৹ নিরক্ষর ৪॥৹ নাগরিকা ২॥৹ সহধর্মিণী ৪॥৹

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ইন্দ্রানী ৩৲ কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৲ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ১ম—৬৲ ৩য়—৬৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ৬॥৹ ২য় ৬॥৹ প্রাণকুমার ৬॥৹

== শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন ==

কালিদাস রায়ের
আহরণ ৫৲

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
অনুপূর্বা ৬৲

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
কাব্য-মালঞ্চ ৫৲

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শতনরী ৫॥৹

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬৲

প্রমথনাথ বিশীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬৲

সুনির্মল বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪৲

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কুহু ও কেকা ৬৲
বেণু ও বীণা ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কথাচিত্র ৩৲ গল্পপঞ্চাশৎ ৮॥৹ নয়ানবৌ ৫॥৹ মিলনান্তক ৪॥৹

বাণী রায়ের

প্রেম ৪৲ স্বর্গবিজয় ৩৲

প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ১২॥

৮১ জন বিখ্যাত লেখকের ২০২টি শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনার সংকলন — প্রমথ বিশীর ২২০ পৃষ্ঠার ভূমিকা

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের

কাব্য বিচার ৬৲
রবিদীপিতা ৫॥৹

বিশ্বপতি চৌধুরীর

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩॥৹
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

কালিদাস রায়ের

সাহিত্য প্রসঙ্গে ৫৲

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের

কাব্যসাহিত্যের ধারা ৪॥৹

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

ভারত সংস্কৃতি ৫৲

ডাঃ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬৲

দেবেশ দাশের

প্রথম ধরেছে কলি ৪৲
সেই চিরকাল ৩॥৹

বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের রোমান্টিক কবিতার সংকলন

ঐকতান ২॥৹

মিত্র ও ঘোষ :: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। ভালোবাসা ও বিবাহ তাঁর নতুন গ্রন্থ।

নামকরণ থেকেই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠক কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। প্রণয় ও পরিণয়, এই দুটি প্রায় অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় মানুষের জীবনের একটি বৃহৎ অংশ বিবর্তিত। বলা বাহুল্য, এই দু'টি বিষয়ই প্রাচীন কাল থেকে বিবিধ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমানে একটি আর্টের পর্যায়ে উন্নীত। অতীত ও বর্তমানের পরিবেশে দু'টি বিষয় পর্যালোচনা করলেই প্রাগুক্তির তাৎপর্য ধরা পড়বে। বহু-পত্নীত্বের আমলে নারী ছিল পুরুষের ভোগবিলাসের উপকরণবিশেষ, পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল শুধু প্রজননের, পুত্রার্থে পুরুষ তখন পত্নী গ্রহণ করত। ভালোবাসা নামক কোনো বৃত্তি তখন প্রকাশ পায়নি। ক্রমে ভালোবাসা তার নিজস্ব রূপ নিয়ে অধিকার দাবি করল।

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায় উল্লিখিত বিষয়টির উপর নজর রেখে প্রণয় ও পরিণয়ের মনস্তত্ত্ব এবং কার্যত তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনার সাবলীল গুণ গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। সুস্থ জীবনের নির্দেশ দেবার জন্য এ-ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৬৫৫।৬১

রাশিয়ার ভবিষ্যৎ—লিওনার্ড সেপিরো। অনুবাদ—জগদানন্দ বাজপাই। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯, মূল্য : ২৫ নঃ পঃ।

প্রচার জাতীয় পুস্তিকা। বিশেষ কোনো পক্ষ অবলম্বন করেই এই পুস্তিকা রচিত। 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্ম কথা', 'শান্তির ভিত্তি' প্রভৃতি সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তা নিরপেক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে লিখিত নয়।

৬৮৬।৬১

আধুনিককালের বিপ্লব—হিউ সেটন ওয়াটসন, অনুবাদ : কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায় পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হায়াৎ খাঁ লেন কলিকাতা-৯। দাম ২৫ নঃ পঃ।

এই পুস্তিকাটিতে শিল্প বিপ্লব, বিপ্লবাত্মক শক্তিসমূহ, বিপ্লবাত্মক শাসন প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মধ্যে নিন্দার ঝাঁঝ এতো বেশি যে, পুস্তিকান্তর্গত তত্ত্বগুলি হজম করা দুঃসাধ্য।

৬৮৩।৬১

পত্রিকা

দর্শক—সম্পাদক শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৫ নয়া পয়সা। [illegible] বাঙলা সাময়িক পত্রিকা 'দর্শক'-এর আলোচ্য বিশেষ সংখ্যাখানি এদের সুনাম রক্ষা করেছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্নচর্চা ও সংগ্রহশালা, শৈলী পরিচিতি, প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস, চন্দ্রকেতুর গড়, মুদ্রাতত্ত্ব লেখমালা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও আলোচনা শিল্প বিষয়ে জ্ঞানান্বেষীদের বিশেষ কাজে লাগবে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন ভাস্কর্য ও গুহাচিত্র এবং এখনকার বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা ছবিতে সংখ্যাখানি সুশোভিত। সংখ্যাখানি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

প্রাপ্তিস্বীকার

আধুনিক বাংলায় বাইবেল......পোলের শেষ পত্রাবলী তিমথী ও তীতাস সমীপে—এ পি কার্লটন ও সুবোধবিকাশ দত্ত অনূদিত।

পূর্বমেঘ—বিজন চক্রবর্তী।

শালবন—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আহির ভৈরো—শ্রীপারাবত।

রবিতীর্থে—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

আশ্রয়—জরাসন্ধ।

নিশিপদ্ম—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

নৈমিষারণ্য—**বিকর্ণ**।

রক্তের স্বাদ লোনা—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু।

পাপুই দ্বীপের কাহিনী—নবেন্দু ঘোষ।

রবি-কথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দ্বাপর থেকে কলি (একাঙ্ক নাটক)—শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র।

আলিবাবা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

পারস্য উপন্যাস—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

ঝড়ের জোনাকি—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রত ছড়া আলপনা—বেলা দে।

ইন্দিরাদির গল্পের ঝুলি—ইন্দিরা দেবী।

শ্যামাবাজি—সুভাষ ঘোষ।

মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরের কাহিনী—নিরুপমা দত্ত।

সুয্যিঠাকুর—অলক চক্রবর্তী

রক্ত কমল—অজিত সরকার।

কে এই রূপসী?

চেহারায় নবীন উজ্জ্বলতা আসে
কমল-গোলাপী ব্রীজের পরশে!

গোলাপী ব্রীজ... আপনার সৌন্দর্য্য বিকাশে এর সৃষ্টি ... মনমাতানো গন্ধে আপনাকে দিন ভোরই মাতিয়ে রাখে। রূপ-শ্রীকে উজ্জ্বল করে তুলুন—সবার চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি আপনাকে ঘিরেও চেয়ে থাকবে, যেদিন কমল গোলাপী ব্রীজ আপনার চেহারার রূপ জাগাবে।

এয়াসমিক লণ্ডনের হয়ে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

চন্দ্রশেখর

মুভী-টক'এর সদ্যোমুক্ত "শিউলিবাড়ি" চিত্রের একটি দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

ভাববার কথা

বোম্বাই-এর একাধিক চিত্রপ্রযোজক বাংলা ছবি তৈরীর কাজে এগিয়ে এসেছেন। এ-সংবাদ চিত্রামোদীদের অজানা নয়। বাঙালী দর্শকরা হয়ত এতে আনন্দিতই হবেন। অনেকে আবার হয়ত এতে আত্মশ্লাঘাও বোধ করতে পারেন।

কিন্তু আমাদের চিত্রপ্রযোজকরা অর্থাৎ বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীরা বোম্বাই-এর চিত্রপ্রযোজকদের এই প্রয়াসকে শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই জানাবেন। কিন্তু শুভেচ্ছা-জ্ঞাপনের সংগে কিছুটা শংকা বোধ করবেন না কি?

তাঁদের অর্থাৎ বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের মুখেই অনবরত এই বিলাপ শুনতে পাই, হিন্দী ছবি নাকি বাংলা ছবিকে কোণঠাসা করে রেখেছে। একেই বাংলা ছবির ব্যবসায়িক অঞ্চল সীমাবদ্ধ। তার ওপর এই অঞ্চলে হিন্দী ছবিরই নাকি আধিপত্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দী চিত্রপ্রযোজকরা যদি বাংলা ছবি তৈরীতে আত্মনিয়োগ করেন তবে বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের সত্যিই শঙ্কিত হবার কারণ আছে।

জানি না, বাংলা ছবির প্রযোজকরা এ-নিয়ে উদ্বেগ বোধ করছেন কিনা। বাংলা চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা কী তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে কলিকাতার মাত্র চারটি চালু স্টুডিওতে কয়টি নির্মীয়মান বাংলা ছবির কাজ চলছে তা বাংলা চিত্রশিল্পের শুভানুধ্যায়ীদের অজানা নয়।

কলকাতায় নিয়মিতভাবে ছবি তৈরী করে যাচ্ছেন এমন চিত্রপ্রযোজক সংস্থার সংখ্যা একাঙ্গুলিগ্রাহ্য। যে-সব নতুন প্রযোজক সংস্থার সাক্ষাৎ মেলে তাঁদের অধিকাংশই একটি ছবি নিবেদন করে অদৃশ্য হয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে বাংলা ছবির ভবিষ্যত নিয়ে যাঁরা দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন তাঁরাও, দুর্ভাগ্যবশত, এ-ব্যাপারে নিশ্চেষ্টই থেকে যান। যাঁরা বাংলা ছবির দুর্দিন নিরোধের জন্য সচেষ্ট হতে চান, তাঁরাও হয়ত লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় খুঁজে পান না।

দক্ষিণ ভারতে ও বোম্বাইয়ে নির্মিত হিন্দী ছবির ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সারা ভারতে প্রসারিত। সারা ভারতের দর্শকদের তুষ্ট করে এই দুই চিত্রপ্রযোজনা কেন্দ্রের প্রযোজকরা নিজেদের অঞ্চলের চিত্রশিল্পকে সাবলম্বী করে তুলেছেন। কলকাতায়ও এমনিভাবে যদি হিন্দী ছবি তৈরী হত তবে বাংলা চিত্রশিল্প সারা ভারতে ব্যবসায়িক সীমারেখাটি প্রসারিত করতে পারত। এ-ধরনের প্রয়াসের কথা এখানকার চলচ্চিত্র-সেবী মহলে নিয়তই আলোচিত হচ্ছে। কোন কোন চিত্রব্যবসায়ী কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরীর পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোন পরিকল্পনাই আজও পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হল না।

বাংলা ছবির কাহিনীর প্রতি দক্ষিণ ভারত ও বোম্বাই-এর চিত্রনির্মাতারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট। তাঁরা ভালো বাংলা গল্পের সন্ধানে সদা ব্যস্ত। তাঁরা জানেন, ভালো আখ্যানবস্তুর গুণে তাঁদের ছবি সারা ভারতের দর্শকশ্রেণীর কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবে। এবং এক্ষেত্রে তাঁরা আলস্য বর্জন করে হিন্দী ছবির ব্যবসায়িক প্রসারের পথটি দিনের পর দিন প্রশস্ত করে চলেছেন।

অথচ আমাদের চিত্রপ্রযোজকরা এই সুযোগটুকু কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক। কলাকৌশলের দিক থেকে বাংলা ছবির মান দক্ষিণ ভারতের অথবা বোম্বাই-এর ছবির তুলনায় এতটা উন্নত না হলেও নিন্দনীয় নয়। অভিনয়-সম্পদের দিক থেকেও বাংলা ছবি সমৃদ্ধ। তদুপরি বাংলাদেশে ভালো গল্প মেলে। এত সব অনুকূল অবস্থার মধ্যেও বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীরা কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরীর কাজে নিরুৎসাহ। এদিকে বোম্বাই-এর চিত্রপ্রযোজকরা শুধু তাঁদের হিন্দী ছবি দিয়েই যে সারা ভারত থেকে অর্থোপার্জন করে চলেছেন তা নয়। সম্প্রতি বাংলা ছবি তৈরী করে বাংলা দেশ থেকেও অতিরিক্ত অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হয়েছেন। আর বাঙালী চিত্রপ্রযোজকরা নিশ্চেষ্ট বসে থেকে তাঁদের উদ্যোগ-আয়োজন পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।

বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের এই নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরীর কাজে একাধিক চিত্রপ্রযোজক অগ্রণী হয়েছিলেন, এ সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম। তাঁদের প্রয়াস সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক কোন নতুন

জালান প্রোডাকশন্স-এর "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"র একটি দৃশ্যে রবি ঘোষ, লিলি চক্রবর্তী, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ আমরা এখনও পাইনি। এই ব্যাপারে বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের আমরা বিশেষভাবে অবহিত হতে অনুরোধ করি।

রেকর্ডে "মায়ার খেলা"

"মায়ার খেলা", রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, "নাট্যের সূত্রে গানের মালা"। কবির প্রথম যৌবনের গীতি-নাট্যগুলির মধ্যে "মায়ার খেলা" (রচনা সাল ঃ ১২৯৫) অন্যতম। "মায়ার খেলা"র সৃষ্টির প্রায় অর্ধ শতাব্দ পরে কবি এই গীতিনাট্যটির রূপান্তর সাধন করেন। "সখী-সমিতি" নামে এক মহিলা-সংস্থা "মায়ার খেলা"র রচনা-সালের শেষভাগে গীতিনাট্যটি প্রথম মঞ্চস্থ করেন। পরবর্তীকালে বহু সংস্থা কর্তৃক বহুবার "মায়ার খেলা" মঞ্চস্থ হয়েছে, আজও হচ্ছে।

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ সম্প্রতি এই গীতিনাট্যটি রেকর্ডে (৩৩⅓ ও ৭৮ আর-পি-এম'য়ে গৃহীত) পরিবেশন করেছেন। গীতিনাট্যটি পরিচালনা করেছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

"মায়ার খেলা"র বিষয়বস্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদের অজানা নয়। এই গীতি-নাট্যের ভাবরহস্য ঃ শুধু সুখের জন্য প্রেম চাইতে গেলে প্রেমের স্পর্শ কোনদিনই মেলে না। সুখও দূরে সরে যায়। গীতি-নাট্যের বক্তব্য মায়াকুমারীদের শেষের গানটির বেদনাময় বিভাস রাগিণীর ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে ঃ "এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।"

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রেকর্ডে "মায়ার খেলা"র প্রাথমিক রচনা অনেকাংশে অনুসৃত। ফলে, নতুন রচনায় যে-গানগুলি বর্জিত রেকর্ডে সেগুলি শোনবার সুযোগ মেলে। অমর, অশোক ও কুমার—এই তিন প্রত্যাখ্যাত ব্যর্থ প্রেমিকের পরস্পর ভাব-বিনিময়ের গানগুলি (মায়ার খেলা"র রূপান্তরে যা বর্জিত) রেকর্ডে গৃহীত।

"মায়ার খেলা"র শান্তা ও প্রমদা দুই বিপরীত প্রকৃতির নারী। শান্তা বলে ঃ "আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো।" প্রমদার কথা হল ঃ "পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।" রেকর্ডে এই দুই নারীর গানের ভূমিকায় কণ্ঠদান করেছেন যথাক্রমে মঞ্জু গুপ্ত ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সংগীতে এ'রা দুজনেই যশস্বিনী শিল্পী। দরদ-ভরা কণ্ঠে এ'রা গানগুলি গেয়েছেন। গীতিনাট্যের গান যে শুধু গানই নয়, একই সঙ্গে অভিনয়—এই সত্যটি শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠসংগীতে সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্র-সংগীতের সুরবিন্যাসের বিশুদ্ধতাই শুধু নয়, ওর যদি কোন নিজস্ব "ঘরানা" থেকে থাকে, তবে তার সঠিক পরিচয়টি শ্রোতারা পাবেন শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে।

সুখের ছলনায় ভ্রান্ত, শান্তার হৃদয়বল্লভ অমর প্রমদার প্রেমের দুয়ারে অতিথি হয়ে এসেছে। অমরের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শ্যামল মিত্র। আধুনিক বাংলা গানের এই প্রখ্যাত শিল্পী প্রমাণ করলেন, রবীন্দ্র-সংগীতেও তিনি সমান পারদর্শী। শুধু কণ্ঠমাধুর্যেই নয়, রবীন্দ্র-সংগীতের "মুড" ও গায়কীর আবেদনেও তাঁর গান অনবদ্য। রবীন্দ্র-সংগীতের আসরে শ্রীমিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। গীতি-নাট্যের অপর দুই ব্যর্থ প্রণয়ী, অশোক ও কুমারের গানগুলি গেয়েছেন যথাক্রমে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পীদের অন্যতম। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীতে সুরের বিশুদ্ধ ব্যাকরণটি খুঁজে পাওয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের [illegible]

রঙমহল-এর বর্তমান আকর্ষণ 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকের একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর্ব দরদ দিয়ে তিনি এই গীতিনাট্যের গানগুলি গেয়েছেন।

রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পীদের আসরে শৈলেন মুখোপাধ্যায় নবাগন্তুক। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই তরুণশিল্পী সংগীত-রসিকদের কাছে নিজকে অপরিহার্য করে তুলেছেন। তাঁর কণ্ঠ মধুর, তাঁর গানের 'মেজাজ'টি মরমী। গীতিনাট্যের গানগুলিতে তিনি তাঁর ওই স্বভাবসিদ্ধ গুণের পরিচয় দিয়েছেন।

মায়াকুমারীদের গানগুলি বনানী ঘোষ, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, আলপনা রায়, সুমিত্রা সেন, কৃষ্ণা সেন ও শ্রীপর্ণা ঘোষের কণ্ঠে সুখশ্রাব্য।

সবশেষে বলি, লং-প্লেয়িং রেকর্ডে এই গীতিনাট্যের কয়েকটি গান শ্রোতাদের অভিভূত করে রাখে। গানগুলি হল: "সুখে আছি, সুখে আছি" (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), "আমার পরাণ যাহা চায় (মঞ্জু গুপ্ত), "আমি কী যেন করেছি পান" (শ্যামল মিত্র), "জেনে শুনে বিষ করেছি পান" (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়) ও "আপন মন দিয়ে কেঁদে মরি" (শৈলেন মুখোপাধ্যায়)। গানগুলি বারবার শোনবার মত।

লং-প্লেয়িং রেকর্ডটির শব্দধারণ সুষ্ঠু।

চিত্রালোচনা

এ-সপ্তাহে মুক্তি লাভ করেছে দুটি ছবি। একটি বাংলা, অপরটি হিন্দী। বাংলা ছবিটি হল: শিউলিবাড়ি, হিন্দী ছবিটির নাম অপলক চপলক।

নবগঠিত চিত্রপ্রযোজক-সংস্থা মুভীটেক-এর প্রথম চিত্রোপহার শিউলিবাড়ির আখ্যান-ভিত্তি সুবোধ ঘোষের জনপ্রিয় উপন্যাস "নাগলতা" অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। জন্ম-[illegible] নিয়তিতাড়িত এক অসাধারণ বাঙালী চরিত্র এই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। দয়াহীন পৃথিবীতে আপন পৌরুষকে শুধু আশ্রয় করে কেমনভাবে সে একদিন অসাধ্য সাধন করে এবং কর্মবীর ও পথিকৃৎ রূপে প্রবাসী বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করে, তা কাহিনীর এক বিস্ময়কর উপাখ্যান। তার দয়িতা ও দুহিতাকে ঘিরে রূপ নিয়েছে আনন্দ ও বেদনার এক মধুর উপকাহিনী।

এক তরুণ চিত্রপরিচালকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই ছবির মাধ্যমে। তাঁর নাম পীযূষ বসু। তপন সিংহের সুযোগ্য প্রধান সহকারীরূপে তিনি এতকাল বাংলা চিত্র-জগতে পরিচিত ছিলেন। ইতিপূর্বে আচার্য জগদীশ বসুর জীবনী অবলম্বনে একটি অল্প দৈর্ঘ্যের প্রামাণিক চিত্রের কৃতী পরিচালকরূপে তিনি প্রশংসা অর্জন করে-ছিলেন।

শিউলিবাড়ি সম্পর্কে আরেকটি উল্লেখ-যোগ্য সংবাদ এই, এর সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন ছবির নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, চন্দন রায়, গীতালি রায়, মণি শ্রীমাণী, মিহির ভট্টাচার্য ও শিশুশিল্পী অমল চট্টোপাধ্যায় ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তপন সিংহ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। আলোকচিত্রগ্রহণের কাজ সম্পাদন করেছেন দীনেন গুপ্ত।

মুকুল পিকচার্স-এর অপলক চপলক একটি নৃত্যগীতসংবলিত প্রণয়মধুর ছবি। রূপ কে শোরি পরিচালিত এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন জোহর, কুমকুম, রবীন্দ্র কাপুর, সজ্জন, তবসাম ও জীবন। চিত্রগুপ্ত ছবির সুরকার।

• • •

সত্যজিৎ রায়ের আগামী রঙীন ছবি (ইস্টম্যান কালার) কাঞ্চনজঙ্ঘা বর্তমানে [illegible]

সপ্তাহে ছবিটি মুক্তিলাভ করতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। শৈলশহর দার্জিলিং-এর পটভূমিতে এ-ছবির কাহিনী বিস্তৃত। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে অনধিক দু দিনের ঘটনার ভিত্তিতে এ-ছবির ভিন্নধর্মী কাহিনী রচনা করেছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

এন-সি-এ প্রোডাকশন্স-এর এই বলিষ্ঠ চিত্রপ্রয়াসের প্রধান চরিত্ররাজির রূপ দিয়েছেন অলকানন্দা রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেন (এ'রা তিনজনই নবাগত), ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। সত্যজিৎ রায় নিজেই ছবির সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

• • •

গত সপ্তাহে তপন সিংহ পরিচালিত জালান প্রোডাকশন্স-এর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র নেপথ্য সুর রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আগামী ১লা বৈশাখ ছবিটি মুক্তিলাভ করবে বলে জানা গেল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বহুপঠিত কাহিনীর চিত্ররূপের প্রধান শিল্পীঃ কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (বনোয়ারী), অনুভা গুপ্ত (কালোশশী), রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় (পাখি), দিলীপ রায় (করালী), নিভাননী (সুচাঁদ), লিলি চক্রবর্তী (নসুবালা), রবি ঘোষ (পানু)। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় রয়েছেন প্রশান্তকুমার, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন রায়, রথীন ঘোষ, বীরেশ্বর সেন প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

• • •

প্রশান্ত চৌধুরীর 'ডাকো নতুন নামে' কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী সপ্তক-এর প্রথম নিবেদন 'বন্ধন' আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবিগুলির অন্যতম। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ছবিটির পরিচালক। ছবির নায়কের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যা রায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা দে, রেণুকা রায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, শ্রীপতি চৌধুরী, ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। রাজেন সরকার ছবির সংগীত পরিচালক।

• • •

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 'নতুন দিনের আলো' কাহিনী অবলম্বনে ও অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনাধীনে শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স-এর যে ছবিটি সম্প্রতি ফ্লোরে গেছে তার নামকরণ হয়েছে, রুচিরা।

বনফুল-এর 'কণ্ঠি' নাটিকার ভিত্তিতে শিল্পভারতীর প্রযোজনায় ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যে ছবির শুভ-সূচনা মুহূর্তের অনুষ্ঠান-সংবাদ সম্প্রতি বেরিয়েছিল, তার নাম রাখা হয়েছে বর্ণচোরা।

• • •

বোম্বাই-এর চিত্রপরিচালক-প্রযোজক-কাহিনীকার কমল আমরোহি একটি বাংলা ছবি তৈরীর কাজে অনতিবিলম্বে আত্ম-নিয়োগ করছেন বলে জানা গেল। ছবির নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ [illegible] শ্রীআমরোহির [illegible]
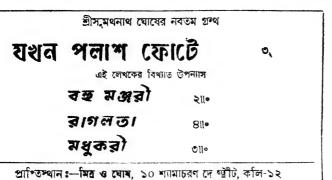
আর-ডি-বি'র "অতল জলের আহ্বান" ছবিতে তন্দ্রা বর্মণ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মগ্লানি ও আত্মশুদ্ধি

সুসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রর 'ভুবন ডাক্তার' কাহিনী ছায়াছবিতে 'শাস্তি' নামে (চিত্রশোভনা প্রযোজিত) রূপান্তরিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ছবিতে 'ভুবন ডাক্তার'-এর নামই শুধু নয়, চিত্রনাট্যের প্রয়োজন সাপেক্ষে কাহিনীরও আংশিক পরিবর্তন ঘটেছে।

এক আদর্শবাদী তরুণ চিকিৎসক কাহিনীর প্রধান-পুরুষ। নাম তার ভুবন। দুর্দিনের দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে পারেনি বলে তার সাময়িক পদস্খলন ঘটে। এবং প্রিয়জন ও পরিচিত পরিবেশের কাছ থেকে গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে তাকে ক্ষণিক ভুলের চরম মূল্য দিতে হয়।

অপরাধের শাস্তি সে নীরবে গ্রহণ করল তার সমাজের কাছ থেকে, এবং সেই সঙ্গে কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অবিচল প্রত্যয়ে নিজেকে সে দিনে দিনে শুদ্ধ করে তুলল। তার ওপর বিশ্বাস যারা হারিয়েছে, তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার সাধনায় নিজেকে সে নিয়োজিত করল। সিদ্ধিলাভ তার কীভাবে ঘটল তা নিয়েই চিত্রকাহিনীর বিস্তার।

দুঃখের দিনে দুটি নারীহৃদয়ের স্নেহ ও অনুকম্পা তার জীবনে নিয়তির প্রসন্ন আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। এক বিধবা জননী ও তার কন্যাই এই দুই নারী। বিধবার ভাগ্যবিড়ম্বিতা কন্যাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে ভুবন নিজে কী করে বাঁচল অর্থাৎ কেমন করে অন্তরের অপরাধ-বোধ ও সকল গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেল, তা নিয়েই চিত্রকাহিনীর পরিণতি। গ্রাম্য তরুণী ভুবন ডাক্তারের জীবনে সহ-ধর্মিণী হয়ে এল কি? হয়ত তাই। চিত্র-নাট্যের শেষে এ-ধরনের একটি আভাস রয়েছে।

ছবিতে মূল কাহিনীর উদ্ঘাটন প্রয়াস-বাকে। চিত্রনাট্যে (শাকুচ রচিত) ভুবন ডাক্তারের উপাখ্যান বাহুল্যবর্জনের ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত।

নবাগত চিত্রপরিচালক দয়াভাই কাহিনী বিন্যাসের কোন কোন মুহূর্তে রসবোধ এবং সেই সঙ্গে পরিমিতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রাম্য পরিবেশ রচনায় তাঁর শিল্প-নিষ্ঠা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রাম্য গার্হস্থ্যজীবনের রূপটি পরিবেশন করার কালে পরিচালক পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে বাস্তবকে অনুসরণ করেছেন। ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেও পরিচালকের শিল্পবোধ লক্ষণীয়।

প্রয়োগকর্মের এত সব গুণ সত্ত্বেও ছবিটি সামগ্রিকভাবে দর্শকের মন ভরে তোলে না। তার কারণ, ছবিতে এমন একটি ভাববস্তু অনুপস্থিত যার অভাবে আর সব গুণই বিফল হয়ে যায়। এই বস্তুটি হল: অন্তঃ-প্রবাহী সংবেদন। এই সংবেদনের রসে যদি প্রয়োগ-ধারার কারুকৃতি আপ্লুত হয়ে না ওঠে, তবে ছবি উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। এই কারণেই ছবিটির আবেদন অনিবার্য নয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির প্রধান চরিত্রটির অর্থাৎ ভুবন ডাক্তারের রূপসজ্জায় অবতরণ করেছেন। বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে তিনি চরিত্রটির যন্ত্রণা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মর্ম-পরিচয়টি লাভ করেছেন এবং স্বীয় অভিনয়ে তিনি তা প্রতিফলিত করে তুলে-ছেন। এই চরিত্রাঙ্কনে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের

স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক গ্রাম্য তরুণীর চরিত্রে সন্ধ্যা রায় অল্প অবকাশে দর্শকমনে রেখাপাত করেন। তাঁর অভিনয় স্বচ্ছন্দ। তাঁর বিধবা জননীর ভূমিকায় অপর্ণা দেবীর অভিনয় সংবেদনশীল।

নায়কের জননীর চরিত্রে পদ্মা দেবীর অভিনয় সুন্দর। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন সবিতাব্রত দত্ত, কালী সরকার, মালবিকা গুপ্ত, 'তুলসী চক্রবর্তী, মণি শ্রীমাণী, সন্তোষ সিংহ ও মিহির ভট্টাচার্য।

সংগীত-পরিচালক আলী আকবর ছবির আবহ-সুর রচনায় নতুন করে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তবে ছবিতে আবহ-সংগীতের ব্যবহার আরও পরিমিত হতে পারত। সাগর সেনের গাওয়া 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে' রবীন্দ্রসংগীতটি সুগীত ও সুপ্রযুক্ত।

সুধীশ ঘটক ছবির আলোকচিত্র গ্রহণে আলো-আঁধারির সুষ্ঠু বিন্যাস ও দৃশ্যগঠনে কল্পনাশক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর ক্যামেরার গুণে ছবির শিল্পসৌন্দর্য অনেকখানি বেড়েছে।

কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে উন্নতির অবকাশ ছিল।

নাট্যাভিনয়

দক্ষিণ কলিকাতার থিয়েটার সেণ্টারে মঞ্চস্থ 'মুখোশ'-এর 'অঘটন আজো ঘটে'-র শততম রজনী পূর্ণ হয়েছে গত ১৭ই মার্চ। দিলীপকুমার রায়ের ভক্তিরসাত্মক রচনার ভিত্তিতে তৈরী এই নাটকের অভিনয় যে জনচিত্ত জয় করেছে, শততম রজনী পূর্তিই তার প্রমাণ। নাটকের শততম নাট্যাভিনয়ে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নাটকটির সাফল্য উপলক্ষে থিয়েটার সেণ্টার একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করছেন। উৎসবটি এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে 'এক পেয়ালা কফি', 'আর হবে না দেরী', 'অলীকবাবু', 'রজনীগন্ধা', 'রুপোলী চাঁদ' ও 'অঘটন আজো ঘটে' মঞ্চস্থ হবে।

* * *

শৌভনিক সংস্থা গত ৮ই মার্চ থেকে মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গালয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকটি অভিনয় করছেন। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত বছর শৌভনিক দল পাঁচটি রবীন্দ্র-নাট্য মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাটকগুলি হল : 'রাজা ও রানী', 'রাজা', 'মুক্তির উপায়', 'বাঁশরী' ও 'গোরা'।

• • •

দক্ষিণ কলিকাতায় শিল্পমেলার ফিল্ম পাবলিসিটি প্যাভিলিয়নে দমদম-এর "ময়ূখ" নাট্য সম্প্রদায় হিন্দী নাটক "হামারা গাঁও" অভিনয় করেন।

• • •

গত ১৯শে মার্চ স্টার রঙ্গমঞ্চে মিত্রা ক্লাবের সভ্যরা আর জি আনন্দ রচিত "হাম হিন্দুস্তানী হ্যায়" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

• • •

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের বালিগঞ্জস্থিত বাসভবন "শিশির কুঞ্জে" গত ১৮ই মার্চ শিল্পপ্রী সংস্থা "কাবেরী" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন।
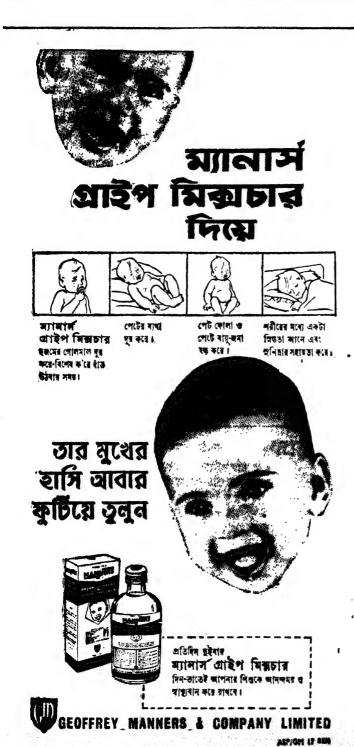
রনেসাঁস ফিল্মস-এর "ঢেউয়ের পরে ঢেউ" চিত্রে নবাগতা শম্পা ও শ্রীমান স্বপন

সংগীত অনুষ্ঠান

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি উদয়ন সংস্থার পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে (সি আই টি রোড ও শুঁড়া ইস্ট রোডের সংযোগস্থলে)।

চারদিনব্যাপী এই অধিবেশনের প্রথম দিনে (১৩ই মার্চ) "রবীন্দ্র ও বঙ্গ সংস্কৃতি দিবস" পালিত হয়। অনুষ্ঠানে চিন্তামণি ভট্টাচার্যের মঙ্গলাচরণ পাঠের পর রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রতা ঘোষাল। কীর্তন, বাউল ও অতুলপ্রসাদের গান গাইলেন যথাক্রমে পারুল বিশ্বাস, লক্ষণ দাস ও ভূপেন চক্রবর্তী। সংগীতানুষ্ঠানের পর উদয়ন সংগীত বিদ্যালয় ও ছন্দগীতিকার প্রযোজনায় "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনীত হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিশুনাট্য সংসদ প্রযোজিত শিশুনাট্যাভিনয় "স্বপন"। এর পর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসে। গান করেন তারাপদ চক্রবর্তী, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সালামত আলী ও নাজাকত আলী। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন রবিশঙ্কর এবং শিশিরকণা ধর চৌধুরী, নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন শিপ্রা ভট্টাচার্য ও শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় দিনের আধুনিক গানের আসরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মুকেশ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও পান্নালাল ভট্টাচার্য। চিন্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না" গানটি সকলকে আনন্দ দেয়। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন জহর রায় ও মিন্টু দাসগুপ্ত।

চতুর্থ দিনে শিল্পী মৈত্রী সংসদ মিহির ভট্টাচার্যের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" নাট্যাভিনয় পরিবেশন করেন।

গত ১০ই মার্চ কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্র কলা-কেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উপনিষদের গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন শৈলেন দাস। কলা-কেন্দ্রের সভ্য-সভ্যারা পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান। সমবেত ও একক সংগীতের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী, পূর্ণিমা চৌধুরী, বাদল চক্রবর্তী, প্রশান্ত গুপ্ত, প্রশান্ত নন্দী, অর্ঘ্য সেন, শৈলেন দাস ও অরবিন্দ চক্রবর্তী। আবৃত্তিতে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য ও স্বদেশ ঘোষ দস্তিদার এবং যন্ত্রসংগীতে সলিল মিত্র, সমীর নাগ, মনোরঞ্জন সিংহ ও বিশ্বনাথ দাস অংশ গ্রহণ করেন।

এর পরে দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্রের একাধিক একক সংগীত ও তাঁদের দ্বৈত কণ্ঠে "নৃত্যের তালে তালে" গানটি শ্রোতাদের আনন্দ দেয়। পরিশেষে তারাপদ চক্রবর্তী রাগপ্রধান গান পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠসংগীতে মানস চক্রবর্তী ও রজত মৈত্র এবং তবলায় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সহযোগিতা করেন।

চিঠিপত্র

চিত্রপরিচালকের বক্তব্য

মহাশয়,

গত সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় জনৈক পত্রদাতা 'কাঁচের স্বর্গ' ছবির একটি ত্রুটি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ত্রুটিটি আর কিছুই নয়, যে-অপরাধে শেষ পর্যন্ত ছবির নায়ক সঞ্জয় চৌধুরীর কারাদণ্ড হল, পত্রদাতার মতে তা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯ ধারার আওতায় পড়ে না—যা ছবিতে দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পত্রদাতা আরও প্রশ্ন করেছেন যে, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এই ধরণের দোষ এড়াবার জন্যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবার সময় কি আজ আসেনি?

অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন। এবং উত্তর দেবার সময় নিজেদের ত্রুটি (যদি আদৌ তা ঘটে থাকে) ঢাকবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করেই বলতে পারি যে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শই নেওয়া হয়েছিল। এ-ছবির আইন-উপদেষ্টা কলকাতার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। চিত্রনির্মাতা হিসেবে আমাদের আইন সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান নেই যে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর সন্দেহ করবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করব। ত্রুটি যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে, তা-হলে এটাই। ইতি—

তরুণ মজুমদার
যাত্রিক-এর পক্ষে
কলিকাতা-৩৩

একলব্য

কলকাতার হকি মরসুম এখন মাঝপথে। লীগের আধাআধিরও বেশী খেলা শেষ হয়ে গেছে।

মত ১৫ দিন ধরে লীগের খেলা চলেছে ঢিমে তালে। বড় বড় ক্লাবকে ক্রীড়াঙ্গণে দেখা যায়নি। কারণ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলায় যোগ দেবার জন্য বড় বড় ক্লাবের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া বাঙলা দল গিয়েছিল ভূপালে। জাতীয় হকির প্রথম খেলাতেই দিল্লির কাছে ১—০ গোলে হেরে বাঙলা দল ফিরে এসেছে। কলকাতার হকি লীগ খেলায়ও আবার জমে উঠেছে।

হকি মরসুম মাঝপথে এসে পৌঁছলেও ক্রিকেট কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এই সপ্তাহে সি এ বি নক আউট ফাইন্যালের উপর যবনিকা পড়েছে। কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা এখনো সম্ভব হয়নি।

নক আউটে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব বিজয়ী হয়ে তৃতীয়বার মেহরা চ্যালেঞ্জ কাপ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী হিসাবে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে একভাবে স্পোর্টিং ইউনিয়ন মেহরা কাপ ঘরে তোলে।

তবে এবার মাঠের খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ফাইন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গতবারের বিজয়ী মোহনবাগান এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন তিন দিনের মধ্যেও প্রথম ইনিংস শেষ করতে না পারায় সি এ বি আইনের বিধান অনুযায়ী টস করে জয়পরাজয়ের মীমাংসা করা হয়েছে। টসে বিজয়ী হয়েছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

কিছুদিন আগে সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক একটি খেলা এবং নক আউট ফাইন্যালে মোহনবাগান ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলার মধ্যে বেশ একটি মিল দেখছি। লীগের খেলায় এলবার্ট স্পোর্টিংয়ের প্রথম ইনিংসের ৪১৭ রানের উত্তরে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মাতপের মধ্যে কালীঘাট ক্লাব ৯ উইকেটে ৪২১ রান করে নাটকীয়ভাবে এক উইকেটে বিজয়ী হবে এটা ধারণার অতীত ছিল।

আবার নক আউট ফাইন্যালে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ৩৬৪ রানের উত্তরে মোহনবাগান ৬৪ রান তুলতে ৪টি উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করবে এটাও কেউ আশা করতে পারেনি। দেখতে পাচ্ছি বিপর্যয়ের মুখে দেশের মাটিতে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে আমাদের খেলোয়াড়রা পেছপাও নয়। টেস্ট খেলাতেও বহুবার এর পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু বিদেশে আমাদের খেলোয়াড়দের এই গুণের একান্ত অভাব। টেস্ট খেলার সঙ্গে অবশ্য আমি সি এ বি'র খেলার তুলনা করছি না। তবে উপমা হিসাবেই বলছি, দেশের মাটিতে বিদেশী দলের বিরুদ্ধে আমাদের খেলোয়াড়রা যে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, বিদেশে সেটা পারেন না। ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফর বা এবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর তার প্রমাণ।

যাক সে কথা। সি এ বি নক আউট ফাইন্যালে মোহনবাগানের পক্ষে পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে প্রধানত দুজন খেলোয়াড়ের কৃতিত্বে। এই দুজন খেলোয়াড় হচ্ছেন এস এস মিত্র ও চুনী গোস্বামী। চুনী গোস্বামী শেষ পর্যন্ত ৭৪ রান করেও নট আউট থাকেন।

ফুটবলের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় হিসাবেই চুনীর পারিচিতি। কিন্তু ক্রিকেটেও যে তার প্রতিভা বর্তমান সেটা এই বছরেই ভালভাবে প্রমাণিত হল। শুধু ব্যাটিং নয়, বোলিংয়েও চুনী ৯৮ রানে প্রতিপক্ষের ৫টি উইকেট নিয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। ফিল্ডিংয়েও ভাল।

যার মধ্যে প্রতিভা আছে চর্চার ফলে একদিন তার স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী। এই কলকাতার মাঠে একাধিক খেলোয়াড় দেখেছি, ফুটবল এবং ক্রিকেটে যাদের সমান কৃতিত্ব। আমি সাধারণ কৃতিত্বের কথা বলছি না। বিশেষ কৃতিত্বের উপরই আমি জোর দিতে চাই। টেস্ট খেলোয়াড় পংকজ রায় ফুটবল ছেড়ে ক্রিকেটে জোর দেবার ফলে পরবর্তী জীবনে ক্রিকেটার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু ফুটবলেও তাঁর দক্ষতা ছিল সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী। নির্মল চ্যাটার্জির কথাও বলা যেতে পারে। ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলায় সুনাম অর্জন নির্মল চ্যাটার্জির খেলোয়াড়-জীবনের দ্বৈত কীর্তি। ফুটবল এবং ক্রিকেট, দুই খেলাতেই নির্মল চ্যাটার্জি ছিলেন নিপুণ শিল্পী। এই রকম আরও বহু খেলোয়াড়ের উপমা দেওয়া যায়। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রেও উপমার অভাব নেই। সবচেয়ে প্রথমে যার নাম মনে আসে তিনি হচ্ছেন ডেনিস কম্পটন। কম্পটনের ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই খেলাই আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে এই কলকাতার মাঠে। দেখেছি দুই খেলাতেই তাঁর উন্নত ছলাকলা। কম্পটন ক্রিকেটে যেমন বিশ্ববরেণ্যদের অন্যতম, ফুটবলেও তেমন প্রথম সারির প্রধানদের মধ্যে তাঁর আসন।

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে চুনী গোস্বামী যদি আন্তরিকভাবে ক্রিকেট অনুশীলন করেন, তবে ফুটবলের চেয়েও এতে বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন। তাঁর মধ্যে প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। আমি বলি, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

* * *

খেলাধুলোয় যাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়াসংস্থার সুপারিশ মত ভারত সরকার তাঁদের অর্জুন পুরস্কার দান করেছেন। এ বছর যে কুড়িজন ক্রীড়াবিদ অর্জুন পুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন—ফুটবলে প্রদীপ ব্যানার্জি, হকিতে পৃথ্বীপাল সিং, টেনিসে আর কৃষ্ণন, ক্রিকেটে সেলিম দুরানী, ভারোত্তোলনে এ এন ঘোষ, মেয়েদের হকি খেলায় অ্যান লামসডেন, সাঁতার বিষয়ে ভাইভার বাজরংগী প্রসাদ, অ্যাথলেটিকসে গুরুবচন সিং, রাইফেল চালনায় মহারাজা কার্নী সিং, স্কোয়াশ র‍্যাকেটে ক্যাপ্টেন কে এস জৈন, মুষ্টিযুদ্ধে এল স্কুইড ডিসুজা, [illegible]

সি এ বি নক আউট ফাইন্যালের বিজয়ী স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব

দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে 'অর্জ্জুন পুরস্কার' গ্রহণের জন্য সমাগত ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়াশাখার কুশলী ক্রীড়াবিদগণ

মিন্টনে নন্দু নাটেকার, বাস্কেটবলে সরাবজিৎ সিং, জিমন্যাস্টিকসে শ্যামলাল, মল্লযুদ্ধে হাবিলদার উদয় চাঁদ, ভলিবলে এ পালানিবাসী, দাবা খেলায় ম্যানুয়েল আওরন, টেবল টেনিসে জয়ন্ত ভোরা, গলফ খেলায় পি জি শেঠি এবং পোলো খেলায় মহারাজ প্রেম সিং।

ভারত সরকার কয়েক বছর ধরে দেশের কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়দের 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' প্রভৃতি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করছেন। এখন 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' প্রভৃতি খেতাবের সঙ্গে অর্জ্জুন পুরস্কারের পার্থক্য কি। প্রথম সম্মান ভারত সরকারের নিজস্ব দান, যা দেওয়া না দেওয়া সরকারের ইচ্ছাধীন। সরকার কোন বছর দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। কিন্তু অর্জ্জুন পুরস্কার হবে খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠদের বার্ষিক পুরস্কার এবং এ পুরস্কারের প্রাপকদের নির্বাচনের ভার জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার উপরে।

এখন দেখা যাচ্ছে খেলাধুলার প্রায় প্রতি বিষয়েই একজন করে অর্জ্জুন পুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন। স্কোয়াশ র‍্যাকেট, গলফ, এমন কি দাবা খেলার জন্যও পুরস্কার মিলেছে। বাদ গেছে তাস, পাশা, বিলিয়ার্ড, কাবাডি, সাইকেল চালনা প্রভৃতি কয়েকটি খেলাধুলো। যেটা মোটেই কাম্য নয়।

ধরে নেওয়া যেতে পারে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় এই সব খেলাধুলার কথা বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় উইলসন জোনসের নাম বাদ যাওয়া খুবই দৃষ্টিকটু হয়েছে। দলগত খেলায় ভারত হকির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন (যদিও রোম অলিম্পিকে সে সম্মান হাতছাড়া)। কিন্তু একক খেলায় উইলসন জোনসের কৃতিত্ব সবার উপরে। বিলিয়ার্ডে উইলসন জোনস বিশ্ববিজয়ী। বহু আগেই জোনসের রাষ্ট্রীয় সম্মান হিসাবে সরকারের খেতাব পাওয়া উচিত ছিল। সে সম্মান তো পানই নি। এবার অর্জ্জুন পুরস্কারও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি।

কাবাডির বেলাতেই বা এত কার্পণ্য কেন? যতদূর জানি কাবাডি তো আই ও এ-র অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান।

মেয়েদের হকি খেলার জন্য পৃথকভাবে অর্জ্জুন পুরস্কার দানও সরকারের নীতির পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত। মেয়েদের হকিতে যদি প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে মেয়েদের সাঁতার, টেবলটেনিস, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিণ্টনই বা বাদ যাবে কেন? সম্ভবত একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় বলে এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের পৃথক পুরস্কার দেওয়া হয়নি। যেহেতু উইমেনস হকি অ্যাসোসিয়েশন ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত নয়, পৃথক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু মেয়েদের জন্য পৃথক পুরস্কার।

কিন্তু এইখানেই আমার আপত্তি। কারণ সরকার এবং অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের কর্তারা বলছেন, এক ধরনের সমস্ত খেলাধুলো একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনতে হবে। অথচ ভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনকে সরকারই পুরস্কার দিয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আজ যদি মহিলাদের হকি সংস্থা পৃথকভাবে স্বীকৃতি পায় তবে কাল মহিলাদের টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, টেবলটেনিস প্রভৃতি সব খেলাধুলার মহিলা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠবে না—এ কথা কে বলতে পারে?

অর্জ্জুন পুরস্কার সম্বন্ধে আরও একটি কথা। স্বীকার করি, খেলাধুলায় দেশের ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্যই এই পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পুরস্কার দেবার যেমন ঢালাও ব্যবস্থা হয়েছে তাতে অচিরেই এর গুরুত্ব কমে আসবে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে উন্নতি হোক না হোক কয়েক বছরেই অর্জ্জুনে অর্জ্জুনে দেশ ছেয়ে যাবে।

মুকুল

হিরণ্ময়ী বসু (ঘোষ)

কয়েক সপ্তাহ আগে প্রমীলা বসুর খেলাধুলো সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বোধ হয় বলেছিলাম—

'যখনকার কথা বলছি তখন প্রমীলা বসুর নামের পাশাপাশি আর যে মেয়েটির নাম লেখা থাকত সে হিরণ্ময়ী বসু। সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়ে। যেন দুটি বোন। শুধু সতীর্থ এবং সহ অ্যাথলীটই নয়, দুজনেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী গণেশানন্দের মানস-কন্যা।'

সেই হিরণ্ময়ী বসুর খেলাধুলো নিয়ে আজ আলোচনা করব।

'দেশ' পত্রিকার আজকের পাঠক যদি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পেছনে ফিরে যান তবে দেখতে পাবেন তখনকার 'দেশে'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় এই মেয়েটির ছবি। কখনো দৌড়ের ভঙ্গিতে, কখনো হার্ডল রেসে, কোন সময় বা হাই জাম্পে তার কৃতিত্বের নজীর বন্দী হয়ে আছে। এর কারণ তখনও খেলাধুলায় মেয়েরা বেশী এগিয়ে আসেনি। আর যে কয়জন এগিয়ে এসেছিল তার পুরোভাগে ছিল হিরণ্ময়ী বসু।
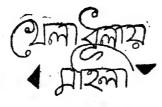
শুধু 'দেশ' কেন, তখনকার সমস্ত দৈনিক ও সাময়িকীর খেলার পাতা হিরণ্ময়ীর হিরণ্ময় দ্যুতিতে আচ্ছন্ন। ১৩৪৩ (ইংরাজী ১৯৩৭) সালের জৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' বহু প্রাইজে পরিবেষ্টিত হিরণ্ময়ী বসুর একখানা ছবির নীচে লেখা রয়েছে—"সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী হিরণ্ময়ী দৌড়, হাই জাম্প ও নীচু বেড়া দৌড়ে (হার্ডলস) এ বছর অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। এবার এই মেয়েটি পাঁচটি বিষয়ে প্রথম, পাঁচটি বিষয়ে দ্বিতীয় ও তিনটি বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।"

আজ যারা খেলাধুলোর আসরে নবাগত বা খেলাধুলোর নতুন ভক্ত হিরণ্ময়ী সম্বন্ধে তাদের জানবার কথা নয়। এর দুটি কারণ। প্রথম, হিরণ্ময়ী বসু এখন খেলাধুলোর প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতার অধিবাসিনী নন, তিনি থাকেন যন্ত্রদানবের রাজত্বে, জামসেদপুরে। দ্বিতীয় কারণ, বিধির বিধান। হিরণ্ময়ী বসু আজ স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী নন। বছর দশেক আগে হঠাৎ তাঁর মধ্যে মানসিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাক্তার বলেন ইনস্যানিটি। যদিও এখন আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক তবু জীবনের সুর ছিঁড়ে গেছে। যিনি একদিন খেলার মাঠে ছিলেন সবচেয়ে অশান্ত, অফুরন্ত আনন্দের উৎস, আজ সব কিছুতেই তিনি নির্বিকার; নির্লিপ্ত।

১৯৩৮ সালে টাটার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুবোধকুমার ঘোষের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিয়ের সময় সারদা মন্দিরের সহপাঠিনীদের লেখা ছোট্ট একখানি বই থেকেও খেলাধুলোয় তখনকার শ্রেষ্ঠ বাঙালী মেয়ে সম্বন্ধে কিছু তথ্য আহরণ করা যায়।

সারদা মন্দির তখন গ্রামের মধ্যে একটি ভাড়াটে বাড়িতে। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখ। একটি লাল ফ্রকপরা রোগা লিকলিকে মেয়ে এল ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হতে। শুনলাম কামারপোল পাঠশালা থেকে এসেছে, অঙ্কে নাকি খুব ভাল। এক মাইলের একটু বেশী রাস্তা তাই হেঁটে আসে।

১৯৩০ সালের ১০ই জুলাই তারিখে সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয় উঠে এল তার নবনির্মিত নিজস্ব বাড়িতে। ঘুপসির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সে ফাঁকা মাঠের উপরে; দু দিকে তার বড় পাকা রাস্তা। রাতদিন অগণিত মানুষ, মোটরকার, বাস চলছে সেই রাস্তার উপর দিয়ে। আমরাও যেন ছোট্ট আবেষ্টনীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলাম উদার আকাশের নীচে।

ড্রিল, ব্যায়াম আরম্ভ হয়েছিল সেই অল্পপরিসর গ্রামের ভাড়াটে স্কুলবাড়িতে। পূজনীয় রাধাকান্ত বাবু (রাধাকান্ত বসু) ছিলেন কসরতের মাস্টার মশাই। এখানে এসে সেই ড্রিল ও ব্যায়াম রূপান্তরিত হল স্কোয়াড ড্রিল, ডাম-বেল ড্রিল, ইন্ডিয়ান ক্লাব ড্রিল, ফিজিক্যাল ড্রিল, লেজিম ড্রিল এবং আরও কত কি খেলাধুলায়, প্রথম প্রথম ঐ লিকলিকে লাল ফ্রকপরা মেয়েটিকে দেখা যেত বৌ-বসন্তি ও 'মার' দেওয়া খেলায় "ডোল মারি কিত্ কিত্"

হিরণ্ময়ী বসু

বলে ডাক দিয়ে শেয়ালের মত দৌড়ত্তে। খেলার সময় হিরণ্ময়ীকে 'ডাক' পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হত সকলে। সবাই মনে করত, ও যখন গেছে তখন একটা না একটাকে 'মোর' করবেই। এদিকে বেশ ঠাণ্ডা এবং সরল প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু খেলা আরম্ভ হলে বিপক্ষ দল যদি কোনও রকমের অন্যায়ের প্রশ্রয় নেবার চেষ্টা করত, তা হলে হিরণ্ময়ী একা এক শ' হয়ে তর্জনী নাচিয়ে গলাবাজি করে প্রতিবাদ করত প্রচণ্ড।

তারপর হল ছাত্রী সংঘের সৃষ্টি ১৯৩২ সালে। গ্রুপ ভাগ হল। রোগা মেয়েটি হল একটি গ্রুপের লীডার। সারদা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অমিয় মহারাজ একদিন বললেন—১৯৩৩ সালে যে যে মেয়ে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যোন্নতি, গ্রুপ পরিচালনা, নিয়মিত উপস্থিতি এবং পড়াশুনা প্রভৃতি সব বিষয়ে ভাল ফল করবে তাদের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে প্রথম ৭ জনকে এরোপ্লেনে চড়ানো হবে। তখন বিমানে আকাশ ভ্রমণ প্রায় স্বর্গ-ভ্রমণের শামিল ছিল ছাত্রীদের কাছে। যথাসময়ে ৭ জন ছাত্রীর বিমানবিহারের সুযোগ এল। বলা বাহুল্য, হিরণ্ময়ী ছিল ৭ জনের অন্যতমা।

তারপর ১৯৩৪ সাল। খেলাধুলোর সংগে লেখাপড়াতেও হিরণ্ময়ী সমান কৃতিত্ব দেখাল। মধ্যবাংলা পরীক্ষায় বৃত্তি পেল। হিরণ্ময়ীর বাবা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু চিরদিন শিক্ষাব্রতী। মেয়ের কৃতিত্বে কামারপোলের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন স্কুলের মেয়েদের।

১৯৩৫ সাল। সেই প্রথম বছর সে বছর পল্লীগ্রামের একটি স্কুল থেকে কলকাতার গার্লস ইণ্টার স্কুল স্পোর্টসে মেয়েরা যোগ দেয়। প্রথম বছরের সারদা মন্দিরের মেয়েদের সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তার পরের বছর উইমেনস অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে হিরণ্ময়ীর ইণ্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ। দৌড়, হার্ডলস ও উঁচু লাফে ও শ্রেষ্ঠ বাঙালী মেয়ে। নানা স্পোর্টস থেকে রাশি রাশি পুরস্কার আহরণ। সাইকেল চালনায়ও অসাধারণ পটু। সরিষা থেকে কলকাতায় যাওয়া আসায় ৫২ মাইল পথ সাইকেল চড়েই হিরণ্ময়ী পার হয়েছে একাধিকবার।

১৯৩৭ সালে ইণ্টার স্কুল স্পোর্টসে সারদা মন্দিরের স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ ইণ্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ হিরণ্ময়ীর। স্কুলের বাইরে অন্যান্য স্পোর্টসেও ওর কৃতিত্ব সবার উপরে। হিরণ্ময়ীর তখন বেস্ট ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস গার্ল হিসাবে খ্যাতি।

১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করবার পর হিরণ্ময়ীর যাঁর সংগে বিয়ে হয় তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবামন্ত্রে দীক্ষিত। অমিয় মহারাজের প্রচেষ্টায় এই মিলন সুন্দর হয়।

স্পোর্টসের কয়েকটি প্রাইজ নিয়ে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ী বসু

বিয়ের পর জামসেদপুরের ছোটখাটো স্পোর্টস অনুষ্ঠানের অনেক আসরে সভানেতৃত্বের জন্য ওর ডাক পড়ে। বেশ হেসে খেলেই দিন কেটে যায়। কিন্তু হঠাৎ কোথা দিয়ে কি ঘটে যায়। উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখনো পুরোপুরি সুস্থ নয়।

হিরণ্ময়ীর পিতৃকুল স্পোর্টস ভক্ত। জ্যেঠতুতো ভাই গিরিন বসু মোহনবাগান ক্লাবে নিয়মিত ফুটবল খেলেছেন ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। ৪৩ সালে ছিলেন প্রথম দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড। গিরিনের ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্র বাস্কেটবলে বাঙলার নামকরা খেলোয়াড়। আর এক ভাই সুশীল বসুর নাম অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে।

হিরণ্ময়ী বসুর একমাত্র ছেলে দেবপ্রিয় এ বছরই ইকনমিকসে এম এ পাস করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখন তৈরী হচ্ছে আই এ এস দেবার জন্য। পড়াশুনায় খুবই ভাল কিন্তু খেলাধুলোয় পটু নয়। তবে আগ্রহ যথেষ্ট। দেশবিদেশের নামকরা লেখকদের খেলার বই পড়া অন্যতম নেশা।

হিরণ্ময়ী বসুর রাশি রাশি স্পোর্টসের প্রাইজের অধিকাংশই ছিল সারদা মন্দিরের সংগ্রহ ভবনে। ইনস্যানিটি দেখা দেবার পর পুত্র দেবপ্রিয় তার অনেকগুলো নিয়ে নিয়েছিল জামসেদপুরের বাড়িতে। দেখে যদি মন ভাল হয়। কিন্তু ছেঁড়া তার আর জোড়া লাগেনি। অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্যে এখনও স্পোর্টস ও লেজিম ড্রিলের কিছু কিছু উল্লেখ থাকে। আর উদাসভাবে চেয়ে আছেন কিশোরজীবনের স্মৃতির সাক্ষী রাশি রাশি স্পোর্টসের প্রাইজের দিকে।

দেশী সংবাদ

১২ই মার্চ—তৃতীয় অর্থ কমিশনের রিপোর্ট আজ সংসদে পেশ করা হইলে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এবারও যথারীতি 'বিমাতা'র ন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডীর পত্নী শ্রীমতী কেনেডী এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের বিশেষ বিমান কাঞ্চনজঙ্ঘায় আজ সকাল ৯-৩৫ মিনিটে নয়াদিল্লি পৌঁছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং দিল্লির মেয়র শ্রীমতী কেনেডীকে বিমানঘাঁটিতে অভ্যর্থনা করেন।

১৩ই মার্চ—উভয় দেশ যে-সব এলাকা দখল করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, ভারত সেখান হইতে পারস্পরিক সৈন্য প্রত্যাহারের এক প্রস্তাব চীনের নিকট উত্থাপন করে। তাহা ছাড়া লাদকের আকসাই চীনে চীন কর্তৃক নির্মিত সড়ক অসামরিক কাজের জন্য ব্যবহার করিতে দিতেও ভারত রাজী ছিল, কিন্তু চীন উহা প্রত্যাখান করিয়াছে।

আজ লোকসভায় রেলওয়ে বাজেট পেশ করা হইয়াছে। এই বাজেটে ১৯৬২-৬৩ সালে রেলওয়ে মাশুল বাবদ ৫২৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে এই আয়ের পরিমাণ৫০১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এই বাজেট পেশ করেন।

১৪ই মার্চ—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৬২-৬৩ সালের যে বাজেট পেশ করেন এবং এই প্রসঙ্গে যে ভাষণ দেন তাহাতে যদিও নূতন কোন কর ধার্যের প্রস্তাব নাই, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে করভারপ্রপীড়িত দেশবাসীর করের বোঝা যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গোয়া, দমন ও দিউকে কেন্দ্রশাসিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়া এবং ঐ অঞ্চলের প্রশাসন বিহিত করিয়া লোকসভায় আজ বিপুল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান সংশোধন বিল ও অপর একটি বিল গৃহীত হইয়াছে।

১৫ই মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর বিতর্কের প্রথম দিনেই কংগ্রেস ও বিরোধী—উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে গত নির্বাচনকালে অসদুপায় ও অপপ্রচারের প্রশ্রয়দানের অভিযোগ উত্থাপন করেন। বিভিন্ন সদস্যের অভিযোগ লইয়া মাঝে মাঝে সভাকক্ষে উত্তাপের সঞ্চার হইয়া থাকে।

১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের শেষে ভারত সরকারের বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৫৯১২ কোটি টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। সরকারী ঋণের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সংগৃহীত হয় দেশের অভ্যন্তরে এবং অবশিষ্ট ১৫২০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় বিদেশ হইতে।

১৬ই মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোক-সভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে কোন ভারতীয় এলাকার সীমা নির্ধারণ লইয়া আলাপ-আলোচনার এক্তিয়ার চীনের নাই। তবে ভারত সরকার এ বিষয়ে কিছু অবগত নহেন। একথা তিনি সদস্যদের জানাইয়া দেন।

দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর চারটি বাজারে প্রায় ১৪৪ জন ছোটখাট দোকানদার বর্ধিত হারে ভাড়া না দেওয়ার জন্য হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেড তাহাদের ৩১শে মার্চের মধ্যে দোকান ছাড়িয়া দিবার নোটিস দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ সব দোকানদারের অধিকাংশই বাঙালী।

১৭ই মার্চ—সংশোধিত নূতন হারে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন দেওয়ার কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই শুরু করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় টাকা রাজ্য সরকার এই মাসের ৩১শে তারিখের মধ্যে জুনিয়র ও সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহকারী মন্ত্রী শ্রীসতীশ চন্দ্র আজ নয়াদিল্লিতে স্ট্যাণ্ডিং মেট্রিক কমিটির এক সভায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে, মেট্রিক ওজনের বাটখারা ব্যতীত অন্য প্রকার ওজনের বাটখারা ব্যবহার আগামী মাস হইতে দেশে অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮ই মার্চ—ডিব্রুগড় জেলার বড়ডুবি থানা অঞ্চলের মহাকালী চা বাগানের এক শ্রমিক পরিবারের ৯ ব্যক্তি ছত্রাক আহারের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুক্রবার রাত্রিতে তাহারা উহা রান্না করিয়া ভাতের সঙ্গে খায়।

দোলের প্রাক্কালে অকস্মাৎ বদাউন, পিলভিট, মোরাদাবাদ, রামপুর এবং বেরেলী জেলায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত জেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই মার্চ—পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে লণ্ডনে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। লণ্ডনে অবস্থিত পাকিস্তানী ছাত্রদের মধ্যে এক শ্রেণীর উদ্যোগে এই কমিটি গঠিত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রিত্রয় গতকাল রাত্রে জেনেভায় এক বৈঠকে মিলিত হইয়া বার্লিন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, নিরস্ত্রীকরণ, আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৩ই মার্চ—সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী আঁদ্রে গ্রমিকো বলেন যে, রাশিয়া অন্যান্য দেশকে আণবিক অস্ত্র দিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি আছে, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স অনুরূপ দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ১৯৬৩ আর্থিক বৎসরে বৈদেশিক সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বাবদ ৫৭৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করিতে কংগ্রেসকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অন্যান্য দেশকে সাহায্যদানের দায়িত্ব প্রধানত আমেরিকান জনগণকেই বহন করিতে হইবে।

১৪ই মার্চ—আজ জেনেভায় ১৭টি রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমেই রাষ্ট্রপুঞ্জের জনৈক মুখপাত্র "পারস্পরিক আশঙ্কা এবং অবিশ্বাসের বিরাট গহ্বরের" উপর একটি সেতু নির্মাণের আহ্বান জানান।

১৫ই মার্চ—জেনেভা হইতে রয়টার জানাইতেছেন, অদ্য সম্মেলনের আসল কাজ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর দুইটি বৃহৎ আণবিক শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের দুইটি পরস্পর বিরোধী পরিকল্পনা পেশ করেন।

পাকিস্তানের নূতন সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ হঠাৎ একদিনের জন্য ধর্মঘট করেন। ছাত্রগণ পাকিস্থানে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পার্লামেণ্টারী ও যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দাবি করেন।

১৬ই মার্চ—শ্রীক্রুশ্চেফ আজ ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া আর একটি পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠাইয়াছে। সোভিয়েট নিউজ এজেন্সি 'তাস' এই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন।

গতকাল রাত্রে ফ্লাইং টাইগার্স এয়ার লাইনের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, সামরিক বাহিনীর ৯৬জন লোক ও ১১জন বিমান কর্মচারী সহ একখানি সুপার-কনস্টেলেশন বিমান গুয়াম হইতে ম্যানিলা যাইবার পথে নিখোঁজ হইয়াছে।

১৭ই মার্চ—গতকাল বরিশাল এবং চট্টগ্রামে আয়ুব প্রণীত নয়া জঙ্গী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কয়েক সহস্র ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারীরা শাসনতন্ত্রের কয়েকটি কপি প্রকাশ্য রাস্তায়, কলেজ প্রাঙ্গণে এবং জিলা শাসকের অফিসের সম্মুখে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করে। পুলিস বরিশালে এবং চট্টগ্রামে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে। ফলে বরিশালে বহু ছাত্র আহত হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৮ই মার্চ—আজ রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় ফরাসী প্রতিনিধি দলের এক মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, ফ্রান্স এবং আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। আগামীকাল ১৯শে মার্চ বেলা দ্বিপ্রহর হইতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বলবৎ হইবে।

শ্রীহট্টের নিকটবর্তী সুলেমানপুর গ্রামে ভূগর্ভস্থ গ্যাসজনিত বিস্ফোরণে ৫৫ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটি কূপ খননের কালে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা

মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ মিত্র ও ঘোষের সগর্ব ঘোষণা ॥

বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম উপন্যাস

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

মাত্র এক মাসে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত

প্রথম খণ্ডের—দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে

॥ ষোল টাকা ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
অসামান্য উপন্যাস

বিবাগী ভ্রমর

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল
॥ সাত টাকা ॥

অবধূতের নবতম গ্রন্থ

দুর্গমপন্থা ৪৲

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল

মরুতীর্থ হিংলাজ ২১শ মুদ্রণ ৫৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কালিন্দী ৭৲
অভিযান ৫॥০
উত্তরায়ণ ৫॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮॥০
দেবযান ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০
অনেক আগে
অনেক দূরে ৪৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস

বহ্নিবন্যা ৪র্থ মুদ্রণ আসন্ন ৮॥

উপকণ্ঠে 'কলকাতার কাছেই' দ্বিতীয় পর্ব ৭৲

মনোজ বসুর নূতনতম উপন্যাস

বন কেটে বসত ৭৲

আশাপূর্ণা দেবীর

অগ্নিপরীক্ষা পঞ্চম মুদ্রণ ৩॥

শঙ্কু মহারাজের গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও গোমুখীর অদ্বিতীয় ভ্রমণ-কাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা ৬৲

অসংখ্য চিত্র, মানচিত্র, পথপঞ্জী সহ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

বিমল করের
খোয়াই ৩৲

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
নিশ্চিন্তপুরের মানুষ ৫॥০

মানবেন্দ্র পালের
দূরে থেকে কাছে ৫॥০

প্রশান্ত চৌধুরীর
ডাকো নতুন নামে ৪৲
(বন্ধন চলচ্চিত্রের কাহিনী)

প্রভাত দেব সরকারের
এই দিন এই রাত ৩॥০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
অন্য শিবির ৩॥০

সন্মথনাথ ঘোষের
সুদূরের পিয়াসী ৩॥০
অহল্যার স্বর্গ ৩৲

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এই তীর্থ ৩॥০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সূচীপত্র

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 31ST MARCH, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ২২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ১৭ চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

ইংরেজীর স্থান

এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবটি প্রথাগতভাবে ঠিক মামুলী অনুষ্ঠান হয়নি। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা করেছেন প্রথমে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর দীক্ষান্ত ভাষণে; পরের দিন এই বিতর্কে প্রতিপক্ষের অভিমত ব্যক্ত করেছেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং উপাচার্য শ্রীসুরজিত লাহিড়ী। বিষয়টি পুরনো; উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী থাকবে কিম্বা থাকা উচিত কি না, এ নিয়ে তর্ক চলছে অনেককাল ধরে, ইংরেজীর বাদী এবং প্রতিবাদী কোন পক্ষই হার মানেন নি এখন পর্যন্ত। সে যাই হোক, বিষয়টা সুধু বৈঠকী বিতর্কের নয়; ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন্ ভাষা কী পরিমাণ ব্যবহৃত হবে এবং হওয়া উচিত সে-বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের। চলনসই সিদ্ধান্ত যে গৃহীত হয়নি তা নয়; কিন্তু মুশকিল এই যে তবুও একটা নতুন কিছু করবার উৎসাহে শিক্ষাজগতে মাঝে মাঝে হাওয়া উল্টো দিকে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

অধ্যাপক বসু মহাশয় সেই উল্টো রীতি প্রবর্তনের একজন প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে ইংরেজীকে না হটালে শিক্ষার উন্নতি অসম্ভব। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, তাই নাকি বিদেশী ভাষায় উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অতএব বসু মহাশয় বিধান দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সব স্তরে এবং সব বিষয়ে ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষায় পড়াশোনা গবেষণা ইত্যাদি পরিচালনার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্তন করা হোক। মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ কম নয়, কিন্তু এক কলমের খোঁচায় মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার একমাত্র বাহন করা কী করে সম্ভব তা আমাদের ধারণাতীত। অধ্যাপক বসু সুপণ্ডিত বিজ্ঞানী; উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পঠনপাঠনের জন্য কী ধরনের পুঁথিপত্র অবশ্য প্রয়োজন তাঁর নিশ্চয়ই তা অজানা নয়। মাতৃভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে শিক্ষার সর্বনাশ সাধনে উদ্যোগী হওয়া বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক কি না, বসু মহাশয় সেটা আশা করি ভেবে দেখবেন।

ইংরেজীকে বিদায় করার আগে নিশ্চিত হতে হবে মাতৃভাষায় উচ্চ-শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভবপর কি না। ইংরেজী বিদেশী বলেই অবিলম্বে বর্জনীয় কেন হবে? এই "বিদেশী" ভাষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় অনেক কালের এবং সে-পরিচয় যে নিষ্ফল হয় নি তার অজস্র নিদর্শন আমাদের জাতীয় জীবনের অসংখ্য স্তরে। মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বজায় রেখেও আমাদের মানতে হবে আমাদের মাতৃভাষা তথা ভারতের কোন আঞ্চলিক ভাষাই এখনও সর্বতোভাবে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হওয়ার উপযুক্ত নয়। কাজেই অধ্যাপক বসুর পরামর্শ মত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সব বিষয়ে ইংরেজীর বদলে অবিলম্বে মাতৃভাষা চালু করার ফল কী হবে? আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের চিন্তা-ধারার আত্যন্তিক বিচ্ছেদ। আসলে ইংরেজীকে হটানোর প্রশ্নটা জরুরী নয়। আমাদের বিরোধ ছিল ইংরেজরাজের সঙ্গে; সেই ইংরেজ-রাজ বিদায় নেবার পর ইংরেজীর আধিপত্য সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিরূপতা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছে। ইংরেজী এখন তার সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে বটে, কিন্তু সেই কারণেই দরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী এখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সানন্দ স্বীকৃতি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

জাতকুল বিচার করে ইংরেজীকে বিদেশী ভাষা গণ্য করে লাভ নেই। ইংরেজী ছাড়া ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীর আলাপ পরিচয়, ভাবের আদানপ্রদান অসম্ভব। হিন্দী বনাম ইংরেজীর লড়াই-এর পরিণাম যাই হোক, ভারতবর্ষের এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের, এক আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর যোগাযোগ রাখতে, ভাব-গত ঐক্য শক্তিশালী করতে ইংরেজী ছাড়া গতি নেই। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে ইংরেজী যত না বিদেশী হিন্দী তার চেয়ে অনেক বেশী বিদেশী। ভারতবর্ষের ভাষা-বিরোধ যে সমস্ত ভয় ও সংশয় সৃষ্টি করেছে তার থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া। জন্মসূত্রে ইংরেজী বিদেশী ভাষা হয় হোক, ঐতিহাসিক সূত্রে ইংরেজী ভাষা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মননে ও কর্মে স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন করার সংকল্প প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু সে-সংকল্প পূরণের জন্য তাড়া-হুড়ো করে শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি করা কাজের কথা নয়। মাতৃভাষা সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হবার মত যথেষ্ট প্রস্তুত নয়, এ কথা স্বীকার করলে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় না। মাতৃভাষার উত্তরোত্তর উন্নতিবিধান আমরা সকলেই চাই; কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য এবং বৈষয়িক উন্নয়নের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইংরেজী ভাষাকেও অপরি-হার্য গণ্য করি। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় আমাদের ক্ষতির চেয়ে লাভ হয়েছে বেশী। কোন কোন রাজ্যে হিন্দী-ওয়ালারা বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ইংরেজীকে বিদায় করতে গিয়ে অবশেষে ঠেকে ঠেকে শিখছেন যে তাতে ফল ভালো হয় নি, শিক্ষার মান অবনত হয়েছে, শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় পারদর্শী হতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে গঠিত কুঞ্জরু কমিটিও সুপারিশ করেছেন উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ মাতৃভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে রচিত না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করা কখনই সঙ্গত হবে না। ভাষার প্রশ্নে স্বাদেশিকতার শুচিবায়ু-গ্রস্ত বিচারবিতর্কের অবতারণা আমাদের দেশের পক্ষে বর্তমানে সব দিক দিয়েই ক্ষতিকর।

'হুম্‌।...তুমিও তাহলে একটা দলের নেতা। তা, তোমার দলে আছেন কারা?'
'আমি আছি, গিন্নী আছেন, আমার নয় ছেলে।'
এম এল এ
পশ্চিম পাকিস্তানে ঘুড়ি ওড়ানো নিষিদ্ধ।
একমাত্র ডিক্টেটারই তা পারেন।
বার্মার সংবাদে প্রকাশ —
'গৃহিণী বাঘিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন।'
বার্মা
নে উইন সরকার
প্রজা সমাজতন্ত্রী মহলে কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়ে পড়বার তালে আছে।
অনাথ বালকটির কী হইবে তবে?
কংগ্রেস
প্রজা সমাজতন্ত্রী-দল

উনিশ শো চুয়ান্ন সালে স্বাক্ষরিত তিব্বত সম্পর্কিত ভারত-চীন চুক্তির মেয়াদ আগামী ২রা জুন শেষ হবে। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে তার জায়গায় একটি নূতন চুক্তি সম্পাদনের কথা তুলে চীনা সরকার ভারত সরকারকে চিঠি লিখেছেন। উত্তরে ভারত সরকার চীনা সরকারকে কী লিখেছেন তার আভাস পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদের ১২ই মার্চের ভাষণ থেকে পাওয়া যায়। ভারত সরকার চীনাদের জানিয়েছেন যে, নূতন চুক্তির কথা আলোচনা করতে হলে তার আগে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার এবং চীনা সরকার যদি তাদের আক্রমণাত্মক নীতি ত্যাগ করে খাঁটি "পঞ্চশীল" অনুযায়ী আচরণ শুরু করেন, তা হলেই সেই শান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু পুনায় একটি বক্তৃতায় বলেন যে, ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে করতে ভারত সরকার সর্বদাই প্রস্তুত। চীনা সরকার এই বক্তৃতার উল্লেখ করে ভারত সরকারকে এক চিঠি দেন, তাতে শ্রীনেহরু কর্তৃক ঘোষিত শান্তিপূর্ণ সমাধানের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার জন্য ভারত সরকারকে তাগিদ দেওয়া হয় এবং চীন ভারত এবং এশিয়ার স্বার্থে ভারত-চীন মৈত্রী এবং বর্তমান বিবাদের শান্তিপূর্ণ সব মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেকচার ঝাড়া হয়। তারই উত্তরে ভারত সরকার জানান যে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য আগে দরকার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

কিন্তু চীনারা ভারতভূমির যেসব অংশ দখল করে বসেছে সেখান থেকে তারা সরে যাবে আপোস-মীমাংসার আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য—এরূপ আশা করার কোনো কারণ নেই। সম্প্রতি চীনে যে ধরনের মতামত প্রকাশ হচ্ছে তা থেকে মনে হয় যে, চীনা সরকার ধরে নিয়েছেন যে, ভারতে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেসী কর্তারা চীনাদের কবলিত ভারতভূমির পুনরুদ্ধার করা হবে বলে যেসব গরম গরম কথা বলেছেন সেগুলির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। নির্বাচন পর্ব শেষ হয়ে গেলে ভারত সরকার পিকিং সরকারের মনমতো আপোস করতে রাজী হবেন। নির্বাচনী বক্তৃতাতেও প্রত্যেকবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন যে ভঙ্গীতে চীনাদের হিমালয়ে অনধিকার অবস্থান এবং পাকিস্তানের কাশ্মীরে অনধিকার অবস্থানের কথা একসঙ্গে

বলেছেন তা থেকেও চীনারা আশ্বস্ত বোধ করতে পারে। কারণ চীনাদের অ্যাগ্রেশান দূর করা এবং পাকিস্তানীদের অ্যাগ্রেশন দূর করা—এ দুটোই এক পর্যায়ে ফেলে শ্রীকৃষ্ণ মেনন সর্বদা বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি হচ্ছে যে, কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানের অপসারণ দাবি করলেও ভারত পাকিস্তানকে কাশ্মীর থেকে সরাবার জন্য কখনো যুদ্ধ করবে না। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ মেননের বক্তৃতার ধারা থেকে চীনের কম্যুনিস্ট সরকার ধরে নিতে পারেন যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা চীনাদের হটাবার চেষ্টা ভারত সরকার কোনোদিন করবেন না। সুতরাং যতদূর পর্যন্ত তারা দখল করে নিয়েছে ততদূর পর্যন্ত দখলে রেখেই চীনারা "শান্তিপূর্ণ মীমাংসার" জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দিয়ে যেতে পারে।

লাদাক অঞ্চলে চীনাদের অনধিকার প্রবেশ ও অবস্থান সম্পর্কে কোনো কথা তুললেই চীনা সরকার যে কেবল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন তা নয়, এমন কথাও বলেন, যার মর্ম হচ্ছে এই যে, পূর্বাঞ্চলে "ম্যাকমেহন লাইনের" দক্ষিণে যে তাঁরা এগোননি সেইটাই তাঁদের অনুগ্রহ বলে আমাদের মানা উচিত। অর্থাৎ মিথ্যা করে চীনা ম্যাপে ভারতের যে সমস্ত অংশ চীনের বলে দেখানো আছে সে সমস্তের উপর দাবি চীনা সরকার এখনো ছাড়ছেন না এবং কোনো একটা সীমানা যে কোথাও কোনদিন ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেটা মানা হয়েছে এই সত্যটাও চীনা সরকার স্বীকার করতে রাজী নন। গত—সর্বশেষ—বার চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাই যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন একরকম তিনি জোর-জবরদস্তি নিমন্ত্রণ আদায় করে আসেন। ভারতভূমি থেকে চীনারা সরে না যাওয়া পর্যন্ত আপোস-মীমাংসার আলোচনা করে লাভ নেই। তখনো এইটাই ছিল ভারতের জনমত। তা সত্ত্বেও শ্রী চৌ এন লাই যখন শ্রীনেহরুর সংগে কথা বলতে আসতে চান তখন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তিনি এলে যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করা হয়। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় যে, চীনারা একচুলও নড়তে রাজী নয়। এমন কি ভারত ত্যাগ করার পূর্বেই শ্রী চৌ এন লাই শ্রীনেহরুর বিরুদ্ধে কথা খেলাপের অভিযোগ পর্যন্ত করতে দ্বিধা-বোধ করেননি।

যাই হোক, সেই নেহরু-চৌ সাক্ষাৎকার এবং আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, দুই পক্ষের কর্মচারীরা মিলে সীমানা সম্পর্কে অতীতের যেসব দলিলপত্রাদি আছে সেই-গুলি বিচার বিশ্লেষণ করে একটা রিপোর্ট তৈরি করবেন। সেই অনুসারে দিল্লিতে, পিকিংএ এবং শেষবার রেংগুনে দুই পক্ষের কর্মচারীদের বৈঠক ও আলোচনা হয় এবং রিপোর্ট তৈরী হয়। সেই রিপোর্ট ভারতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ভারত সরকার গত বছর পার্লামেণ্টে সেটা পেশ করেছেন, কিন্তু সে রিপোর্ট পিকিংএ এখনো প্রকাশিত হয়নি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, সে রিপোর্টে যেসব তথ্যপ্রমাণাদি রয়েছে তা থেকে যে কোনো নিরপেক্ষ পাঠকই বুঝতে পারেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে কার বক্তব্য বেশী ন্যায় ও যুক্তিসংগত।

কিন্তু পিকিং সরকার ন্যায় ও যুক্তিসংগত মীমাংসার জন্য ব্যস্ত নন, চীনারা যতদূর এসে চেপে বসেছে সেইটা পাকা করাই পিকিং সরকারের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সফল হবে বলে তাঁদের ভরসা করার কারণও আছে। ভারত সরকার ভারতবাসীদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে, চীনারা ভারতভূমির যতটা কবলিত করেছে সেটার পুনরুদ্ধার করা হবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি তা না করা সম্ভব হয়, তবে অন্য উপায় অবলম্বন করা হবে, কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। সামরিক প্রয়োজন এবং নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে পথ ঘাট ইত্যাদি তৈরির কাজ চলছে বটে, যেসব ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে চীনারা বিনা বাধায় আর এগুতে হয়ত পারবে না, কিন্তু যতদূর এসে তারা চেপে বসেছে সেখান থেকে তাদের হটাবার কল্পনা করে ভারত সরকারের প্রস্তুতি চলছে এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। যতদিন পরিস্থিতি "সচল" ছিল তখনই যদি কিছু করা না হয়ে থাকে তা হলে পরিস্থিতি একটা অবস্থায় জমে গেলে কিছু করা সম্ভব হবে না। যদি ভারতের দিক থেকে কিছু প্রস্তুতি হতে থাকে তবে চীনাদের দিক থেকে তার চেয়ে নিশ্চয়ই কিছু কম হচ্ছে না। তা হলে দু তিন বছর পরে ভারত "প্রস্তুত" হয়ে বলবে "সরো, নয়ত যুদ্ধং দেহি"—এরূপ একটা অবস্থা কল্পনা করার চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে যে, সেটা কত অবাস্তব। অথচ আমাদের কর্তাদের কথায় এই রকম একটা ধারণা অনেকের মনে সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে চীনারা যা করে নিয়েছে তা পাল্টাবার জন্য কোনো সক্রিয় নীতি অনুসরণের চেষ্টা না করলেও তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ খাড়া করে না রেখে উপায় নেই, তা না হলে একেবারেই মান থাকে না। চীনারা ভারত গবর্নমেণ্টকে যে রকম বেকুব বানিয়েছে এবং ভারত সরকারকে, এমনকি পণ্ডিত নেহরুকেও, যেভাবে গালাগালি করেছে তাতে ১৯৫৪ সালের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরে তার জায়গায় আর একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারত সরকারের আগ্রহ বোধ হতে পারে না। আসলে ১৯৫৪ সালের চুক্তি অনেক আগেই অকেজো হয়ে গেছে। ঐ চুক্তি অনুসারে তিব্বত অঞ্চলে ভারতের যে-সব বাণিজ্যবিষয়ক এবং কূটনৈতিক সুখ-সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল, চীনারা সে-সমস্ত বাতিল করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের স্বাধীনতা এবং জাতীয় কৃষ্টির সংহাররূপ চৈনিক দুষ্কৃতিকে আন্ত-র্জাতিক স্বীকৃতিদান করে পাপ সঞ্চয় করা ছাড়া ১৯৫৪ সালের চুক্তির দ্বারা ভারতের আর কোনো লাভ হয়নি। পাপের দ্বারা যে বৈষয়িক লাভ কিছুই হয়নি এবং প্রায় সংগে সংগেই যখন প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করতে হয়েছে এর জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ।

২৩-৩-৬২

অ্যামেচার

বাতায়নিক

কলকাতায় বাসা পাওয়াই ভাগ্য, তার ওপর একটু জমি পাওয়া ত কল্পনাতীত। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু সেই বিরল সৌভাগ্যেরই অধিকারী।

কলকাতায় তাঁর ছোটখাট একটা বাড়ি আছে আর দু-চারটে গাছপালা লাগাবার মত জায়গা তিনি বাড়ির সঙ্গে পেয়েছেন।

কিন্তু এই সৌভাগ্য যেভাবে তিনি কাজে লাগিয়েছেন অনেকেরই তা মনঃপূত বোধ-হয় হবে না। তাঁর নির্বুদ্ধিতা এবং রুচি ও শখের অভাবে কেউ যদি রীতিমত বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হন তাতেও দোষ ধরবার কিছু নেই। কারণ সত্যিই কলকাতার মত শহরে এই দুর্লভ সুযোগটুকু পেয়েও তিনি না করেছেন ভালো করে ফুলের বাগান না তরিতরকারীর চাষ। জায়গাটা একরকম এলোমেলো জঙ্গলই তিনি করে রেখেছেন।

ফুল গাছ সেখানে নেই এমন নয়; কিন্তু সে এমন গাছ যার নাম জানতেও উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গাছের বদলে লতাই তাকে বলা উচিত। কিন্তু লতিয়ে ওঠার ভঙ্গিটুকু ছাড়া লতা বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে কোন দিক দিয়েই তা মেলে না। অসহায়তা পেলবতা কমনীয়তার ধার সে ধারে না। বন্য দুরন্ত প্রাণশক্তির প্রাবল্যে তরু শ্রেণীকে লজ্জা দিয়ে, একটু প্রশ্রয় দিলেই তেতালার ছাদ পর্যন্ত সবুজের বন্যাতরঙ্গে প্লাবিত করে দেয়। বছরে একবার চৈত্রের শেষে সে কখনো কখনো যুঁই-এর মত ছোট শাদা ফুলের সমারোহ আনে বটে, কিন্তু সেও যেন তার নিজের খেয়াল খুশিতে। সে ফুলের চেহারা ও গন্ধে সাধারণ রসিকজনের মন ভোলবার নয়। মিষ্টতার চেয়ে সে সুবাসে বন্য অপরিচিত অস্বস্তিকর একটা কি যেন আছে।

আমার পরিচিত গৃহস্থবন্ধু মাঝে মাঝে এ লতাটিকে শাসন করতে বাধ্য হন, বিশেষ করে উৎসাহের আতিশয্যে ও প্রাণোচ্ছলতায় যখন তাঁর বাড়িটিকেই সে বাতিল করতে উদ্যত হয়। লতাটি কিন্তু কোনো আরণ্য দেবতার বরে অজর অমর। গোড়া পর্যন্ত কেটে ফেলবার পরও দেখা যায় পরের বছর সমান উৎসাহে নবীন মেঘের মত পত্রপুঞ্জ মেলে সেই ত্রিতল শিখরের দিকে সে অসংখ্য বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করছে।

এই অবাধ্য অপ্রয়োজনীয় বন্য লতার একেবারে মূলোচ্ছেদ করে সব জানালা শেষ

করে ফেলতে হয়। বন্ধু যে তা পারেন না সে তাঁর দুর্বোধ এক দুর্বলতা।

এই দুর্বলতার চেয়ে বিস্ময়কর আর একটি নির্বুদ্ধিতা তাঁর ওই বাগানেই নাতি-বৃহৎ একটি আম গাছে মূর্ত হয়ে আছে।

আম গাছটি বছর আষ্টেক ধরে তাঁর বাড়িতে দেখছি। চরিত্রভ্রষ্ট করে তাকে লতাধর্মী করবার চেষ্টাই প্রথম দিকে হয়েছিল জাপানী উদ্যানের কিংবদন্তী শুনে।

আম গাছটি কিন্তু বৃক্ষত্ব বর্জন করে লতা হয়ে উঠতে পারেনি। স্বভাব ও দীক্ষার দ্বন্দ্বে দোমনা হয়ে সে বরং সব কাজের বার হয়ে গেছে। তার দুর্বল শীর্ণ কাণ্ডে ও ডালপালায় তরুর দৃঢ়তা নেই আবার লতার পেলবতাও নয়। মাঝে থেকে তার নিজের জীবনধর্মই সে গেছে ভুলে। প্রতি বছর বসন্ত সমাগমে নধর সবুজ নব পত্রের শোভা কয়েক দিনের জন্যে তার অঙ্গে দেখা যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। নতুন কচি পাতার আশ্বাস নব মুকুলে আর সার্থক হয় না। মুকুল ধরাবার কোন তাগিদই তার যেন নেই।

নিরেট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া এ আম গাছটি লালন করার কি হেতু থাকতে পারে বুঝতে না পেরে একদিন বন্ধুকে সোজাসুজি প্রশ্নটা করে ফেললাম।

তিনি একটু চুপ করে থেকে সকৌতুকে বললেন, আপনারা আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের জগতের মানুষ হয়েও আমার বাগানের মর্ম বুঝলেন না! আশ্চর্য।

একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বললাম, আধুনিক শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে আপনার বাগানের সম্বন্ধ কি?

সম্বন্ধ কিছু নেই, কিন্তু মিল আছে! তিনি হেসে বললেন, আম গাছের অর্থটা তার আম ফলানোর সঙ্গেই জড়িত। সেই অর্থটাকেই ছেঁটে বাদ দিয়ে ও আম গাছ আরেক বিশুদ্ধ তাৎপর্য পেয়েছে আমার বাগানে।

এ ত সস্তা হেঁয়ালি হ'ল মাত্র! অধৈর্যের সঙ্গে বললাম।

সস্তা কি না জানি না, কিন্তু হেঁয়ালি নিশ্চয়! বন্ধু জবাব দিলেন, আর এই হেঁয়ালি দিয়ে ছাড়া শিল্পচেতনা থেকে জীবনের নোংরা স্থূলে স্পর্শের ছাপ ধুয়ে মুছে সাফ করা যায় না।

জীবনের ছাপ ধুয়ে মুছে সাফ করবই বা কেন?

কেন তা আপনাদের যুগকেই জিজ্ঞাসা করুন।—বলে তিনি হেসে উঠলেন। আমাকেও হাসতে হ'ল বোকা বলে ধরা পড়বার ভয়ে।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম, নিষ্ফলা আম গাছের বিশুদ্ধ তাৎপর্য না হয় বুঝলাম, কিন্তু ওই বুনো বাজে লতাটা নির্মূল করেন না কেন!

ওটার মধ্যে নিরর্থকতার সাধনা আছে আর তার চেয়ে বেশি আছে বন্যতার স্মারক সংকেত।

আমায় বিমূঢ় বিহ্বল দেখে তিনি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যেই বললেন, আমাদের বাগানে যেসব ফুলগাছ থাকে, তা শুধু পোষ মানানো নয়, তার সৌন্দর্যও আমাদের মনের মাপে সৃষ্টি করা ও সাজানো। কিন্তু ওই নাম না জানা বন্য লতা আমার মনের ফরমাশের ধার ধারে না। ওর উদ্ধত অবাধ্যতার মধ্যে তাই উদ্দেশ্যহীন আনন্দের স্বাদ পাই, আর পাই ভয়ঙ্কর দুর্বার সেই বন্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেবার ইঙ্গিত, পাহারা একটু শিথিল করলেই যে বন্যতা আমাদের সমস্ত সভ্যতা সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করে ঢেকে দেবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছে।

আপনার ওই বন্য লতার মতই যুক্তি ও কথাগুলো কেমন ডালপালায় জট পাকিয়ে গেল না? বন্ধুর চোখের কৌতুক কুণ্ঠনে ভরসা পেয়ে বললাম।

যুক্তি আঁকড়ে থাকাটাই যে কোথাও কোথাও কুসংস্কার, তা এখনো বুঝলেন না! বলে বন্ধু সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।

নিজের কুড়েমি অক্ষমতা আর কুরুচির খুব মজার হেঁয়ালি সাফাই তৈরি করেছেন বটে! শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে বন্ধুকে শুনিয়ে এসেছি।

বাড়িতে ফিরে কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে বন্ধুর সাফাইটা নিছক নির্দোষ কৌতুক, প্রচ্ছন্ন হুল ফোটানো পরিহাস, না আর কিছু।

হেঁয়ালি রসিকতা করতে গিয়ে নিজেরও অজান্তে গহন কিছুর স্ফুলিঙ্গ তাঁর কথায় চমকে উঠেছে কি?

* * *

আধুনিক এক সমালোচনার কেরামতি দেখে সম্প্রতি চমৎকৃত স্তম্ভিত বিহ্বল হয়েছি। সমালোচনার এ নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে সব কিছুর চেহারা অর্থ ইঙ্গিত একেবারে আমূল বদলে যায়। হঠাৎ বুঝতে পারা যায়, এতদিন ধরে যা বুঝে এসেছি, তা ভুল। নতুন করে বুঝি যে, বনের পাখি দেখে বা তার কলকাকলি শুনে মুগ্ধ হ'তে গেলে তার বাসার ডিমটা ভেঙে না ঘাঁটা-ঘাঁটি করলে নয়।

এ সমালোচনার একটা নমুনা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছড়াটাই ধরা যাক। এ ছড়া আমরা অনেক পুরুষ ধরে সারা জীবন শুনে আসছি। কিন্তু এর আসল অর্থ ও ইঙ্গিত কিছুই বুঝিনি। অনুমান করতেও পারিনি এর মধ্যে কি গভীর ভয়াল জীবনরহস্য লুকিয়ে আছে। ছড়াটিতে সামান্য বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর-এর পরই যে নদীতে বান আসে তার কারণ প্রচ্ছন্ন প্রবল মৃত্যু-ইচ্ছা ছাড়া কিছু নয়। ফুট নোটে এ কথার সমর্থনে অন্তত সাতটি মহাপণ্ডিত ও তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম দিতে পারি। ছাপার ভুল হবার ভয়ে দিলাম না, কারণ নামগুলি Sandor Ferenczi, Sigmund Freud জাতীয়।

নদীতে বান ডাকাবার মৃত্যু ইচ্ছা (যার আরো গালভরা নাম অনায়াসে দেওয়া যায়) তার পরের ছত্রে কোথায় না যাচ্ছে! 'শিব-ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান'-এর মধ্যে লিবিডো ফ্যালিক সিম্বল থেকে ইডিপাস কমপ্লেক্স পর্যন্ত অনেক কিছুই তেমন মনঃসমীক্ষা বিশারদ সমালোচক ডুবুরী নামালেই পাওয়া যেতে কতক্ষণ। শেষ কটি ছত্র ত একেবারে কমপ্লেক্সের কাঁটায় গিজ গিজ করছে। 'এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান, এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ি যান'-এর মধ্যে পিতৃপ্রতীক, আদিম অপরাধ বোধ থেকে গোটা মনঃসমীক্ষার শাস্ত্রই বর্তমান।

এই অপরূপ নতুন সমালোচনা চল্লিশ বছর আগেকার বিদেশী ট্রেংটিং ছটের নকল বলে হেয় করবার চেষ্টা কেউ যেন না করেন। ওরকম অনেক নতুন হুজুকেরই কুলজি নিয়ে তাহলে টান পড়বে। সম্প্রতি বাংলা দেশের শ্রদ্ধেয় সর্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের একজন এই সমালোচনার খপ্পরে পড়েছেন বলেই একটু ভাবিত হচ্ছি। নিজের সার্থক-তম রচনাগুলির এই সাংঘাতিক বিশ্লেষণ দেখবার পর লজ্জায় ঘৃণায় আর তাঁর কলম সরতে চাইবে কি?

চৌরঙ্গী

মহাশয়,

১০ই চৈত্রের "দেশে" শংকরের "চৌরঙ্গী"তে শংকরের জবানীতেই হাওয়াই হস্টেস মিস মিত্রের একটি সুন্দর বর্ণনা পড়লাম—"নাচের ঘুঙুর বাঁধ......" ইত্যাদি (দেশ পৃঃ ৭২৫)। পড়তে পড়তে মনে হ'ল জগন্নাথ চক্রবর্তীর সম্প্রতি প্রকাশিত "মহাদিগন্ত" কাব্যগ্রন্থে পড়েছি। "মহাদিগন্ত" খুলে মিলিয়ে দেখলাম লাইনগুলি হুবহু এক (৭ম সর্গ, শ্লোক ৬৬২-৬৫); অথচ শংকর স্রেফকথা উল্লেখ করেননি বা উদ্ধৃতি-চিহ্ন পর্যন্ত ব্যবহার করেননি। শেষাংশে (দেশ পৃঃ ৭২৮) শংকর "মহাদিগন্ত" থেকে আরও পাঁচটি শ্লোক ব্যবহার করেছেন, অবশ্য উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে, এবং যেহেতু কাহিনীর মধ্যে পংক্তিগুলি আবৃত্তি করা হচ্ছে বলেই বলা হয়েছে (কার কবিতা অবশ্য তা উল্লেখ করা হয়নি) সেজন্য এটি তত দোষের হয়নি। কিন্তু পূর্ববর্তী অংশে (পৃঃ ৭২৫) যেহেতু পংক্তিগুলি কোন সংলাপের অন্তর্গত নয়, উদ্ধৃতি-চিহ্ন না দেওয়া আমার মতে অন্যায়। শুধু তাই নয় 'শান্তাদি'র বদলে 'মিস মিত্র' নামটি ব্যবহার করলেও এবং লাইনগুলিকে রান-অন করিয়ে গদ্যে রূপান্তরিত করলেও "মিস মিত্রের স্বর হ'ত তারা" যে গদ্য নয় তা পাঠকপাঠিকার কানই বলে দেবে। শংকর এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী উভয়েরই অনুরাগী পাঠিকা হিসাবে এই মন্তব্য না ক'রে পারছি না। ইতি—

তাপসী চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩

ধ্বনি

মহাশয়,

আপনার 'দেশ' পত্রিকার কয়েকটি বর্তমান সংখ্যাতে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব কর্তৃক লিখিত 'পঞ্চতন্ত্র—ধ্বনি' শীর্ষক রচনা এবং ১৭ সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী মহাশয়ের তৎসম্পর্কিত আলোচনা দেখিলাম। মূল রচনা অপেক্ষা সমালোচনাটি অধিকতর উল্লেখযোগ্য এবং আমি নানা বিষয়ে সমালোচকের সহিত একমত পোষণ করি। দেশ—১৬ সংখ্যাতে অনুরূপ সন্দর্ভের প্রারম্ভেই জনাব আলী সাহেব লিখিতেছেন, "ইংরেজি সব ক'টি ধ্বনি ভালো করে শিখে নিলে কন্টিনেন্টাল (?) তথা আরবী ফার্সী ইত্যাদি ভাষা শিখতে প্রচুর সুবিধা হয়" এবং ১৭ সংখ্যার রচনাতে 'জর্মন (?) ধ্বনি' সম্বন্ধে বহু অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কি জানি কাহাদের জন্য এবম্বিধ প্রবন্ধ বিরচিত হইতেছে। যাঁহারা ফ্রেঞ্চ, জার্মান ইত্যাদি ভাষা জানেন, তাঁহাদের নিকট এই রচনা ভ্রম-প্রমাদ বাহুল্য বশত এবং অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত বলিয়া মূল্যহীন; এবং যাঁহারা এই সকল ভাষাতে অনভিজ্ঞ তাঁহাদের নিকট ইহা দুর্বোধ্য। তদুপরি 'কন্টিনেন্টাল ভাষা' বলিয়া কোন ভাষা নাই; ইউরোপে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ভাষাই রহিয়াছে। সমালোচকের তীব্র মন্তব্য প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী মনে করি। আলী সাহেব স্বরতত্ত্ব (স্ফুটধ্বনি) বিষয়ক আলোচনা আধুনিক পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করিলে প্রবন্ধটি উপাদেয় হইত। তিনি মূলত শ্রুতিগ্রাহ্য পদ্ধতি (acoustic method) অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাতে বহুবিধ ত্রুটি আছে এবং যাহা অসম্পূর্ণ। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাতে অনুরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট বর্ণগোষ্ঠীর (Phonemes) উচ্চারণের পার্থক্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং যোগরূঢ় পরিভাষার সাহায্যে সাংকেতিক অনুলিখন (Phonetic transcription) দেখাইয়া বিচার করিলে সুশোভন হইত। দেখা যায় তিনি সাধারণ্যে প্রচলিত জার্মান শব্দ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 'জর্মন' শব্দ কি ভাবে নিষ্পন্ন হইল? বর্তমানস্থলে ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান স্বরতত্ত্বের ঈষৎ আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক। কয়েকটি রাজকুমারের নীতিশিক্ষার্থে বিষ্ণুশর্মা কর্তৃক বিরচিত পৃথিবীর বহুভাষাতে অনূদিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের একটি 'গরুড়-চাণ্ডালী', হাস্যোদ্দীপক বাংলা ভাষার অভিনব সংস্করণ তিনি বহুজনহিতায় বাঙ্গালীদের উপহার দিতেছেন। আলী সাহেব সুরসিক; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা তাঁহার গল্প (গপ্প) কথা-কাহিনী 'কেচ্ছা'র মত চলে না; ইহা প্রণিধানার্হ।

হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী
এম এ ডি ফিল (বার্লিন)

কলকাতার ভাষা প্রসঙ্গ

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন—তেসরা মার্চ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত জনাব বুলবন ওসমানের "কলকাতার ভাষা প্রসঙ্গ" পড়ে বিস্মিত হয়েছি। প্রবন্ধটি নানা তথ্যের ভুলে ভরা। ভাষা নিয়ে লঘু প্রবন্ধ রচনার হাত লেখকের নেই যার ফলে প্রবন্ধটি বিভ্রান্তিকর হয়েছে।

ভদ্রলোক অনেক অসংলগ্ন কথার সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন ও ভুল তথ্যের তালিকা আউড়ে গেছেন। ঝাঁপ Jump থেকে আসেনি—এসেছে 'ঝম্প্র'

থেকে! খুড়তে যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা 'খন্তা', রাঁধতে যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা খুন্তি। খন্তা এসেছে সংস্কৃত 'খনিত্র' থেকে। SHOVEL থেকে শাবল এসেছে এটা নতুন শুনলাম। শাবল আর 'খন্তার' আকার এক। SHOVEL-এর সঙ্গে তার আকারগত সাদৃশ্য কোথায়? shovel-এর এদেশী প্রতিশব্দ 'বেলচা'—শাবল নয়। culture-এর সঙ্গে কুলাচারের সম্বন্ধ টানবার চেষ্টা করেছেন লেখক। কুলাচার কে clan ritual বলা যেতে পারে, কিন্তু culture-এর সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায়? তিনি আবার চেষ্টা করেছেন 'পাদ্রী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে। তাঁর হয়তো জানা নেই PADRE কথাটার চল একটু অর্থে পৃথিবীর নানা দেশে এখনো আছে। 'মশাই'য়ের সঙ্গে 'ম'সিয়ে'র কোনো যোগই নেই। মহা আশয়-মহাশয়, শব্দটির পিতৃত্ব ফরাসী নয়। মুই ME আমি ও চট্টগ্রামের 'আঁই তে' তিনি ফরাসী গন্ধ পেয়েছেন। আমি এসেছে 'অহম্' থেকে যেমন এসেছে তুমি ত্বম থেকে। এখানে ফরাসী গন্ধ পাওয়া খুব লম্বা নাকের প্রয়োজন। কুরুশ কথাটা CROSS থেকে আসেনি এসেছে 'ক্রোশে'—CROCHET থেকে এ তথ্যটা তাঁর অজানা। তাঁকে আরো জানিয়ে রাখি লংকা কথাটা সিংহলে চালু—সিংহলীরা অবশ্য তার আগে একটি শ্রী যোগ করে। লংকার সোস্যালিস্ট পার্টির নাম 'লংকা সম-সমাজিস্ট পার্টি'।

CUTTER বলে কোনো গৃহে বা খামার বাড়িতে ব্যবহৃত অস্ত্রের নাম আমার অজানা। দা (দাও) বা কাটারির সাদৃশ্য আছে এমন কোনো বিদেশী অস্ত্রের পরিচয় জানি না। স্যাঁকরারা 'কাতুরী' নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করে ধাতুর পাত বা তার কাটবার জন্যে। তার সঙ্গে কাটারির সম্পর্ক নেই। TOOKER বস্তুটি কি? গবেষণা করে তিনি বের করেছেন 'টুকরী' এসেছে TOOKER থেকে। আবার লিখছেন 'কাচারা' এসেছে Catawah থেকে। সর্দির একটা ইংরেজী প্রতিশব্দ আছে বটে তবে সেটা Catarrah নয়। প্রায় একই আওয়াজের আরো দুটি শব্দ আছে ইংরেজীতে একটির অর্থ 'চোখের ছানি' অন্যটির 'জলপ্রপাত'।

তিনি কোথায় খবর পেলেন যে কলকাতায় লেডিকেনি পাওয়া যায় না। পান্তুয়া গোল হলেই লেডিকেনি হয় আর পুড়ে গেলে কালজাম হয় এ কথাটা ছোট ছেলেরা জানে। লেডিকেনি বা লেডিগেনি খাস কলকাতার চীজ, পদ্মা বা বর্ডার পেরিয়েছে হালে।

আমার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না মাড়ানো লোকও যখন এতগুলো অসঙ্গতি ধরতে পেরেছে তখন অনুমান করি পণ্ডিত ব্যক্তিরা আরো অনেক তথ্যের ভুল দেখিয়ে দেবেন।

আশা করি বুলবন ওসমান সাহেব ক্ষুণ্ন হবেন না।

ইতি
রেখা সরকার

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

১৮ সংখ্যা ২৯ বর্ষ দেশ পত্রিকায় বুলবন ওসমান সাহেবের লেখা "কলকাতার ভাষা প্রসঙ্গ" পড়লাম। এক জায়গায় লেখক লিখেছেন, "লম্প একটা বিশেষ ধরনের বাতি, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র 'ও'কে 'ও' নামে ডাকা হয় কিনা জানি না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে লম্পকে কেউ চিনবে না।" আমার বাড়ি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার পাংসা থানায়। আমি ফরিদপুর, যশোহর এবং বরিশাল জেলায় যেখানেই গেছি 'লম্প' কথাটির প্রচলন দেখেছি। আমরা নিজেরাও লম্প বলতাম এবং এখনও আমার মা-দিদিমারা 'লম্প' বলে থাকেন।

বুলবন সাহেব কি কখনও পূর্ব পাকিস্তানে গেছেন? যদি না যান তবে একবার গিয়ে শুনে আসুন 'লম্প' কথাটি আজও সেখানে প্রচলিত।

ইতি—বিনীত—
সত্যেন সাহা
রাঁচি।

রবীন্দ্রনাথ ও একটি গানের সমস্যা

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৯শে ফাল্গুন দেশ পত্রিকার ১৮ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে, তার শেষ পত্রটির (৪৪১-সংখ্যক পত্র) অন্তর্গত একটি তথ্য আমাকে ভাবিত করেছে। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে লেখা এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"একটা নতুন গান লিখে পাঠাই। সুরটা ভালোই হয়েছে।" এর পর কবি গানটি উল্লেখ করেছেন—'আমার প্রিয়ার হিয়া বাতাসে আজ ভাসে।'

সমস্যা এখানেই। কেননা, ঐ গানটির প্রচলিত পাঠ হলো—'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে।' অতএব এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রচলিত পাঠটি ২রা সেপ্টেম্বরের চিঠিতে উল্লিখিত গীত-রূপটির পাঠান্তর। কিন্তু তাতো নয়। কারণ, দেখতে পাচ্ছি প্রচলিত পাঠটি ২৫শে আগস্ট ১৯৩৮-এ রচিত! (দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৪ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, সানাই)।

এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে : এই বিখ্যাত গানটির কোন রূপটি আগে রচিত? এই প্রসঙ্গে আরো স্মরণীয়—গানটি পরে কবিতায় পরিণত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কাব্যরূপের নাম 'ছায়া-ছবি'; সানাই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে উদ্ধৃত কবিতাটির রচনার কোন তারিখ নেই; শুধু ১৩৪৫ সালে রচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৪৫ সাল মানে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ। কেউ কি জানাতে পারেন কোন তারিখে কবিতাটি লেখা? তাহলে এই সমস্যার মীমাংসা হবে যে গানটি আগে রচিত, না কবিতাটি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—একটি রচনার তিনটি পাঠান্তর। দুটি গীতরূপ, একটি কাব্যরূপ। পরপর প্রথম স্তবক উদ্ধার করছি বোঝবার সুবিধার জন্যে:—

কাব্যরূপ:

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে।

গীতরূপ: (২রা সেপ্টেম্বরের পত্রে উদ্ধৃত।)

আমার প্রিয়ার হিয়া বাতাসে আজ ভাসে
বৃষ্টি সজল বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে।

দ্বিতীয় গীতরূপ: (২৫শে অগস্ট, ১৯৩৮)

আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে
হায় হায়।
বৃষ্টি সজল বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে
হায় হায়।

সমান্তরালভাবে বিচার করলে প্রচলিত পাঠটি ২রা সেপ্টেম্বরের পত্রে উল্লিখিত পাঠের চেয়ে সার্থক এবং প্রকৃষ্ট মনে হয়। 'প্রিয়ার হিয়া' কথাটির 'প্রিয়ার ছায়ায়' রূপান্তর, 'বাতাসের' জায়গায় 'আকাশে' এবং নবযোজিত 'হায় হায়' refrain-টুকু স্পষ্টতই পরবর্তী পরিমার্জন। অতএব আমার বক্তব্য হলো : ২রা সেপ্টেম্বরের পত্রে উল্লিখিত গানটি নিশ্চয়ই অনেক আগে লেখা, অথবা প্রচলিত পাঠের ২৫শে অগাস্ট তারিখটিতে ভুল আছে। রবীন্দ্ররচনাবলীর অনুরাগী পাঠকবৃন্দ আমার এই সমস্যার মীমাংসা করলে বাধিত হবো। ইতি ১১ই মার্চ ১৯৬২।

সুধীর চক্রবর্তী

অভ্যর্থনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তপন বললে, টু বি ফ্র্যাঙ্ক, আবার প্যাঁ—প্যাঁ—প্যাঁচে পড়া গেল হে!

প্যাঁচে পড়বার এবং পড়াবার একটা স্বাভাবিক শক্তি তপনের আছে, সুতরাং আমি খুব বিচলিত বোধ করলুম না। ওর দিকে একবার তাকিয়েই তক্তপোশের ওপর সাজানো পেশেন্সের তাসগুলোকে অনুধাবন করে চললুম।

—আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর তোমার খালি তাস আর তাস!—চটে গিয়ে তপন তাসগুলোকে এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিলে। হাঁ-হাঁ করে ওঠবারও সময় পাওয়া গেল না।

—ভালোও লাগে এ-সব! যেমন রাবিশ তোমার গল্প, তেমনি বিশ্রী তোমার হ্যাবিট। এত কুঁড়েমি করতেও পারো!

অগত্যা তাসগুলো গুছিয়ে তুলে ফেলতে হল। বললুম, সকালবেলাতেই একেবারে মার্-মার্ করে ছুটে এসেছ যে। ব্যাপার কী?

—মাথা আর মুণ্ডু! ভারী মুশকিল হয়েছে সুকুমার। মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—

—মিসেস ঘো—ঘো আবার কে?

—ঘো-ঘো নয়—ঘোষাল!—এতক্ষণে তপন নামটাকে সম্পূর্ণ ওগরাতে পারল : এখানকার গার্লস্ স্কুলের নতুন হেড-মিস্ট্রেস। আজ বিকেলে তিনি আমাদের বাড়িতে আসছেন।

—কেন?—এইবার আমার মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল : তুমি কি তাঁর স্কুলে চাকরি চাও? তোমার ব্যাঙ্কের চাকরিটা তো নেহাত মন্দ নয়! নাকি ভর্তি হতে চাও আবার? কিন্তু বি-এ পাস করবার পরে স্কুলে কি আবার ভর্তি হওয়া যায়? তা-ও মেয়েদের স্কুলে? তার ওপর তোমার মুখে তো আবার গোঁফও রয়েছে। ওই গোঁফ সুদ্ধ তোমায় ভর্তি করতে কি উনি রাজী হবেন?

তপন এবার দস্তুরমতো—যাকে বলে—গর্জন করল।

—লুক হিয়ার সুকুমার, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

—কোন্ কোন্ সময় ভালো লাগে? বলে ফেলো—নোট করে রাখি।

—অল্ রাইট্, আমি চলে যাচ্ছি—

চলেই যাচ্ছিল, আমি খপ করে ধরে ফেললুম।

—বোসো, বোসো—ঠাণ্ডা হও। ঘোলের সরবত আনিয়ে দিই।

—হ্যাং ইয়োর ঘো-ঘো—

—ষাল?

—না, সরবত। ওদিকে মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—

—ঘোল?

—না—না—হেড-মিস্ট্রেস। সত্যি ভাই, খুব মুশকিল হয়েছে। কী যে করি, বুঝতে পারছি না।

তপনের মুখের চেহারা দেখে এবারে আমার মায়া হল : কী হয়েছে বলো তো?

বিশদ বিবরণটা জানা গেল এতক্ষণে। মিসেস ঘোষাল তপনের মা-র বাল্যসখী। একই স্কুলে দু-জনে পড়তেন। তপনের মা ক্লাস টেন পর্যন্ত এসেই থমকে যান, মিসেস ঘোষাল টক টক করে বি-এ পাস করেন। মিস্টার ঘোষালকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সে ভদ্রলোক বছর সাতেক পরেই আফ্রিকা না আমস্টারডাম কোথায় একটা কাজ জুটিয়ে উধাও হয়েছেন। কারণ আর কিছু নয়, ভদ্রমহিলার পরিচ্ছন্নতার বাতিক অসাধারণ। প্রত্যেকটি জিনিস টিপ-টপ রাখা চাই। চেয়ারে পা তুলে বসলে প্রলয় ঘটাবেন, টিপয়ের ফুলদানি আধ ইঞ্চি এদিক ওদিক হলে ঝিয়ের চাকরি যাবে, খাওয়ার সময় কেউ হুশ-হাশ আওয়াজ করলে টেবিল ছেড়ে উঠে যাবেন। শোনা যায়, দিনে চার বার দাঁত মাজতে আপত্তি করাতেই নাকি শেষ পর্যন্ত মিস্টার ঘোষালকে প্রাণ নিয়ে উগাণ্ডা কিংবা উরু-

গয়েছে পালাতে হয়েছে। এসব রোমাঞ্চকর কাহিনী তপন তার মা-র মুখেই শুনেছে।

—এ রকম ভয়ানক জীবকে তুমি বাড়িতে আসতে বললে কেন?

—আরে, আমি বলেছি নাকি? কাল একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাঙ্কে এসেছিলেন। এ-কথা সে-কথার পরেই ফস্ করে চিনে ফেললেন! বললেন, 'ও, তুমি লোকনাথবাবুর ছেলে? তোমার মা-র নাম তো মালতী? আরে মালতী তো আমার ছেলেবেলার সই, সুরবালা বললে তখুনি চিনে ফেলবে।' আমি বুঝতে পারলুম এই সেই সাংঘাতিক মিসেস ঘোষাল। আর উনিও সঙ্গে সঙ্গে নাক কুঁচকে বললেন, 'তুমি নস্যি নাও কেন? ছি—ছি—খুব ন্যাস্টি অভ্যেস। ওসব ছেড়ে দাও।'

—তার পরেও তুমি ওঁকে আসতে বললে?

—ছি—খুব ন্যাস্টি অভ্যেস

—সুন্তোর!—তপন আবার চটে উঠল : আমি কি পা-পাগল? নিজেই বললেন, 'আমি কাল সন্ধ্যের দিকে যাব তোমাদের বাড়িতে।' আমি বললুম, 'বাবা মা কেউ এখানে নেই—দু মাসের জন্যে হরিদ্বারে গেছেন, একেবারে কুম্ভ সেরে ফিরে আসবেন।' উত্তরে বললেন, 'কেন, তুমি তো আছো। আমি তোমাদের বাড়ি দেখতে যাব। কিন্তু খবরদার, চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কোরো না। আমি যখন-তখন যা-তা খাইনে।'

—যাক, এক দিক থেকে বাঁচোয়া।

—তা বটে। কিন্তু ভাই, এই মাসখানেকের ভেতরে বাড়ি-ঘরের অবস্থা তো সঙ্গীন। ঝুল-ধুলোর জন্যে ভাবছি না—ও ঝেড়ে-টেড়ে সাফ করা যাবে। কিন্তু আর সব যা হয়ে রয়েছে ভাই—রেগুলোর সুন্দরবন! চাকরটা আবার পরশু দেশে পালিয়েছে—এই সেভেনথ্ টাইম ওর চাচা মারা গেল। একটা জিনিস লক্ষ করেছ হে? ওদের অনেক চাচা থাকে আর তারা খুব কুইক্‌লি মারা যায়।

সরু গোঁফ পর্যন্ত সেই খুশিতে চকচক করছে।

আমি চিন্তা করে বললুম, হুঁ, চাচাদের মৃত্যুর হার খুব বেশী। যাক, ও নিয়ে তুমি কষ্ট পেয়ো না—তোমার আর তো চাচা নেই। তা এখন কী করতে চাও?

—তুমি আমাকে হেল্প করো। বিপদে বন্ধুর কাছেই আসতে হয়।

আমি আবার ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখলুম। তারপর বললুম, তোমার সেই যে মুখোশটা—মানে সেই অরেঞ্জ মাস্ক—সেটা এখনো আছে নাকি? যদি থাকে, তা হলে আমি বরং সেইটে পরে সন্ধ্যেবেলা তোমাদের বাগানে দাঁড়িয়ে থাকব। মিসেস ঘোল, আই অ্যাম সরি—মিসেস ঘোষাল গেটে ঢুকতেই একটা তাড়া লাগাব ঘোঁত করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবেন এবং তুমিও—

তপন তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। রেগে বললে, তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝ-ঝ-ঝকমারি। যা পারি, একাই করব। কারুর সাহায্য আমার দরকার নেই।

আমি বললুম, কারেক্ট। একেই বলে তেজ। তোমার কথা ভেবেই তো বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হে বীর, সাহস অবলম্বন করো—'

তপন দরজাটা দড়াম্ করে আছড়ে বেরিয়ে গেল—যেন বেশ রোমাঞ্চকর নাটকের প্রথম দৃশ্যে যবনিকা পড়ল। আর যবনিকা পড়ে ভালাই হলো, কারণ বিবেকানন্দের বাণী থেকে ওই একটিমাত্র লাইনই আমার মুখস্থ। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ পর্যন্ত বাংলার সব পরীক্ষাতেই রচনা লিখতে গিয়ে 'এই জন্যই কবি গাহিয়াছেন' বলে ওই লাইনটাই আমি চালিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু বিকেলে অফিস থেকে মেসে ফিরেই মনটা কি রকম চিড়বিড় করতে লাগল। যেন একটা আরশোলা বেরিয়ে এসে ক্রমাগত আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। শেষে বুঝতে পারলুম, ওটা আরশোলা নয়—বিবেক। তপনের এই দারুন দুঃসময়ে বন্ধু হিসেবেও অন্তত আমার ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

অতএব বেরিয়ে পড়া গেল।

দরজার কড়া নাড়তে হল না—দেখি, সামনেই দাঁড়িয়ে। মুখে ভরাট খুশির হাসি—ওর পরিপাটি করে ছাঁটা সরু গোঁফ পর্যন্ত সেই খুশিতে চকচক করছে। বোঝা গেল, একটা স্বর্গীয় পরিতৃপ্তিতে ও উদার হয়ে আছে—আমার ওপর এতটুকুও রাগ নেই এখন।

হেসেই বললে, ক'টা বেজেছে হে?

ঘড়ি দেখে বললুম, সাড়ে পাঁচটা।

—তা হলে মিসেস ঘো-ঘো—

—ঘোল বলতে চাইছ?

—না-না—ঘোষাল পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন। দেখে যাও—কেমন সাজিয়েছি বসবার ঘরটা। তোমার মনে হবে যেন কলকাতার আর্টিস্ট্রি হাউসে এসে ঢুকেছ।

—রিয়্যালি?—শিহরিত হয়ে আমি ভেতরে পা দিলুম।

মেজেতে কার্পেট পাতা। চেয়ার-টেবিলগুলো চক-চক ঝক-ঝক করছে। একটা ফুলদানিতে গোটা কয়েক গাঁদা ফুল সাজানো।

তপন দারুন খুশী হয়ে গোঁফে তা দিলে। বললে, দেখছ কী? আজ ছুটি নিয়েছিলুম অফিস থেকে। সারা দুপুর বসে বসে চেয়ার-টেবিল বার্নিশ করেছি।

—বার্নিশ করেছ? তুমি?—তপনের ওপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল : এ বিদ্যেও তোমার আছে নাকি?

—বিদ্যে থাকে নাকি?—তপন হে-হে করে হাসল : অ্যাকোয়ার করতে হয়। বললে বিশ্বাস করবে না—জীবনে এই আমার প্রথম বার্নিশ। আর ফর্মুলাটা—কী বলে গিয়ে—একেবারে ওরিজিন্যাল!

—অ্যাঁ!

—হুঁ-হুঁ—পরে বলব। আচ্ছা, এবার দেয়ালের দিকে তাকাও।

আমি তাকালুম এবং লাফালুম। তৎক্ষণাৎ।

—এসব কি হে?

—ছবি।

—কার ছবি? কিসের ছবি?

—কিসের ছবি? আমি তার কী জানি! কিন্তু কেমন দেখাচ্ছে ভাই বলো!

আমি তাকাল্ম এবং লাফাল্ম তৎক্ষণাৎ

বলল্ম, ব্ঝতে পারছি না ভাই। মাথা ঘ্রছে। ওটা কি হে? গোবরের গাদা নাকি?

—না, নীলবসনা স্ন্দরী। তার পাশে কী আছে বলো দেখি?

আমি বলল্ম, একটা ভাঙা মোটর? না-না, শ্যাওড়া গাছে পা দিয়ে মাথা নিচু করে একটা পেত্নী ঝ্লছে বোধ হয়?

—ওটা প্রতীক্ষা। রাজকন্যা প্রাসাদশিখরে বসে আছে।

আমি গোটাকয়েক খাবি খেল্ম। একটু সামলে নিয়ে বলল্ম, রাজকন্যা প্রাসাদ-শিখরে কেন প্রতীক্ষা করছে ভাই? ঘ্ড়ি ধরতে চায় নাকি?

তপন ব্যাজার হয়ে বললে, ঘ্-ঘ্ড়ি ধরবে কেন? রাজপ্ত্র পক্ষীরাজে আসবে কিনা, সেই জন্যে ওয়েট করে রয়েছে।

—অ-অ।

—তার এধারে যেটা দেখছ—

—থাক থাক—আর দরকার নেই। যা বলেছ ভাই, কলকাতার আর্টিস্ট্রি হাউস এর কাছে একেবারেই নাবালক। কিন্তু এসব মডার্ন আর্ট রাতারাতি তুমি পেলে কোথায়?

—পাব আবার কোথায়? নিজেই আঁকল্ম বসে বসে।

—অ্যাঁ!

মাথা ঘ্রে পড়েই যাচ্ছিল্ম, অনেক কষ্টে সামলে নিতে হল। তপনের ম্খটা আমি ভালো করে দেখতে পেল্ম না—শ্ধ্ ওর পরিপাটি ছাঁটাই করা গোঁফ জোড়াই নাচতে লাগল চোখের সামনে।

—আমারও প্রথমে খেয়াল হয়নি—তপন বলে চলল, ঘর সাজাতে সাজাতে হঠাৎ নজরে পড়ল। দেখি দেওয়ালে রাধাকেষ্ট, কালীঘাটের পট, মা-র বোনা কার্পেটের 'পতি পরম গ্র্', কোন্ এক সায়েবের সঙ্গে তোলা বাবার অফিসের এক পেল্লায় গ্র্প ফটো। রাবিশ। এসব দেখলে মিসেস ঘো-ঘো—

—ষাল—

—হ্যাঁ, ঘোষাল নিশ্চয় মাথা ঘ্রে পড়ে যেতেন। তাই ভাবল্ম, নিজেই যা পারি করে ফেলি। মডার্ন আর্ট তো কেউ বোঝে না, আমার ছবি দিয়েই কি-কি-কি—

—কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড করতে চাও?

—না, কিস্তিমাত করতে চাই। ব্যাস্—লাল-নীল পেন্সিল, কালি, এই সব নিয়ে বসে গেল্ম। বললে বিশ্বাস করবে না মাত্র দ্ ঘণ্টায় বা-বারোখানা ছবি ম্যানেজ করে ফেলেছি। কী মনে হয় তোমার? ইম্প্রেসড্ হবেন না ভদ্রমহিলা? মানে মিসেস ঘো-ঘো—

আমি ঘোল বলতে যাচ্ছিল্ম, কিন্তু আর বলা গেল না। পৃথিবীতে অনেক রকমের শক্ আছে—কোনোটা সহ্য করা যায়, কোনোটা স্রেফ ধরাশায়ী করে ফেলে মান্ষকে। আমার গলা শ্কিয়ে উঠল, বোঁ বোঁ করতে লাগল মাথার ভেতরে। দেখল্ম, সামনেই টিপয়ের ওপর একটা কাঁচের জগে লাল রঙের কী রয়েছে। নিশ্চয় সরবৎ। ওরই এক 'লাস খাওয়া যাক—নইলে তপনের কলাচর্চার এই গদাঘাত আমি সইতে পারব না।

গেলাস কই? গেলাস নেই। জগৎ স্দ্ধ তুলে গলায় ঢালতে যাচ্ছি, হাঁ-হাঁ করে সেটা কেড়ে নিলে তপন।

—আরে আরে—খেয়ো না, খেয়ো না! মারা পড়ে যাবে।

—মারা পড়ব? কেন? সরবত খেয়ে কেউ কখনো আবার মারা পড়ে নাকি?—আমি আবার হাত বাড়াল্ম।

—কে বলেছে তোমায় সরবত?—জগটা নিয়ে তপন চট্ করে সরে গেল নাগালের বাইরে: ও তো কালি-মেশানো লাল জল। ওর ভেতরে রয়েছে দ্-দ্টো জ্যান্ত ট্যাংরা মাছ—ধাঁ করে একটা গলায় ঢ্কে গেলেই

আর দেখতে হবে না। মানে, মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—মর্ক গে, সেই ভদ্রমহিলাকে চমকে দেবার জন্যে একটা ওরিজিন্যাল অ্যাক্-অ্যাক্-অ্যাক্য—কথাটা বলবার জন্যে তপন আঁকু-পাঁকু করতে লাগল আর আমি বিধ্বস্ত হয়ে ধপাত করে সামনের চেয়ারটাতেই বসে পড়ল্ম। আর বসে পড়বার সংগে সংগেই মনে হল, তপনের এই আর্টিস্টি হাউসে আরো মিনিট দ্য়েক থাকলেই একটা শোচনীয় দ্র্ঘটনা ঘটে যাবে। হয় আমি প্রাণ নিয়ে পালাব—নইলে আমার জান বেরিয়ে যাবে, আমাকে জানান না দিয়েই। ভেবে-চিন্তে দেখল্ম আমার দিক থেকে প্রথমটাই স্ববিধে এবং আমি উঠে দাঁড়াতে গেল্ম।

কিন্তু সংসারে বসে পড়া যত সহজ, উঠে দাঁড়ানো তার চেয়ে ঢের কঠিন। দেখল্ম চেয়ারটার দ্টো অভিসন্ধি। হয় আমাকে টেনে রাখতে চায়—নইলে আমার সংগে উঠে আসতে চায়। কোনো মতলবটাই তো ভালো বলে বোধ হচ্ছে না! একটা কুটিল সন্দেহে আমার মন ভরে গেল।

—ব্যাপার কি হে তপন? তোমার চেয়ার যে আমায় ছাড়তে চায় না! এর মানে কী?

—ছাড়তে চায় না?—তপন তার সর্ গোঁফ আলো করে মনোরম একটি হাসি হাসল : ও কিছ্ নয়—বার্নিশ!

—কিছ্ নয়, বার্নিশ? এ কিসের বার্নিশ? চেয়ারের সংগে লোককে চেপে ধরবে বার্নিশের এত বাড়াবাড়িই বা কেন?

—কিছ্ নয়, বার্নিশ

—মরিয়া হয়ে দাপাদাপি শ্র্ করে দিল্ম আমি। পরিষ্কার ব্ঝতে পারল্ম, এই চেয়ার ছাড়বার আগে অনেকখানি জামাকাপড় এবং বেশ কিছ্টা ঘাড়ের চামড়ার মায়া আমায় পরিত্যাগ করতে হবে। আর এক-সংগে এতখানি ত্যাগস্বীকার আপাতত সম্ভব নয় বলেই মনে হল আমার।

তপন উৎসাহ দিয়ে বললে, ট্রাই—ট্রাই এগেন, ঠিক উঠে পড়বে। মানে গঁদের আঠাটা একট্ বেশী পড়ে গেছে কিনা, তাইতেই—

—গঁদের আঠা!

—ইয়ে, ওই গঁদের সংগে লাল জ্তোর কালি মিশিয়েই বার্নিশটা তৈরী করেছিল্ম কিনা! আমার ওরিজিন্যাল ফর্-ফর্-ফর্—

ওর ফর্-ফর্ শ্নে প্রাণ ধড়ফড় করে উঠল আমার। আমি হাহাকার করে বলল্ম : তুমি ক্রিমিন্যাল—তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তার পরেই 'ট্ বী অর নট ট্ বী দ্যাটস্ দ্য কোশ্চেন!' সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল্ম, আমি হাউই—আমি উল্কা—আমি রকেট্—আমি ভস্টক নম্বর ফিফ্টি ফাইভ! একটি উল্লম্ফন, জামার আর্তনাদ এবং ছিটকে উঠে দেওয়ালে ঠিকরে পড়া! 'আমি অবসান—নির্বাসন!'

নাকে চোট লেগেছিল দার্ন, কিন্তু কাপড়-জামার দিকে তাকিয়ে সে ব্যথা নিতান্তই মরীচিকা বলে বোধ হল। দেখি, জামা-কাপড় বার্নিশের রঙে একাকার। আর পাঞ্জাবির খানিকটা অংশ জয়ধ্বজার মতো উড়ছে চেয়ারের গায়ে—আদ্দির নতুন জামাটা এক-ধোপের বেশী গায়ে পরিনি!

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে আর্তনাদ করল্ম : আই সে তপন, আমি তোমার নামে কেস করব।

তপন কী বলতে যাচ্ছিল, সংগে সংগেই বাইরে থেকে ভারিক্কী মেয়েলী গলার ডাক এল : তপন আছো—তপন?

—এসে গেছেন!—তপন চিড়বিড়িয়ে উঠল : আস্ন মাসীমা, আস্ন।—তারপর ধিক্কার-ভরা গলায়—যেন সব অপরাধ আমার—এমনিভাবে বলে চলল : ছি-ছি, কী একটা সীন ক্রিয়েট করলে? আর কার্পেটটাও কী বিশ্রীভাবে কুঁচকে দিলে ওদিকে—রাম রাম!

রাগের মধ্যেও বলতে যাচ্ছিল্ম, ভদ্র-মহিলা ঘরে ঢোকার আগে ওই মারাত্মক চেয়ার তিনটে সরাও, কার্পেট নয় পরেই হবে; কিন্তু ঠিক তক্ষ্নি একই সংগে দ্টো ঘটনা ঘটল—যাকে বলে ডবল অ্যাক্শন! তপন এধার থেকে কুঁচকে যাওয়া কার্পেটে জোরে একটা টান মারল আর ওদিক থেকে চৌকাট পেরিয়ে সেই ম্হ্র্তে ঘরে পা দিলেন মিসেস ঘো-ঘো—ঘোষাল। চকিতের জন্যে আমি দেখতে পেল্ম একখানা গোল ম্খ, কালো ফ্রেমের এক জোড়া বিরাট চশমা, একটা চওড়া শাড়ির পাড়, একটি ঝ্লন্ত ভ্যানিটি ব্যাগ এবং পরক্ষণেই কানে এল একটি তীক্ষ্ম চিৎকার : ও মা গো!

গোল ম্খখানা, চশমা, ব্যাগ এবং একটি বপ্ ম্হ্র্তের মধ্যে দেখা দিয়েই দ্বিগ্ণ বেগে দরজার বাইরে অদ্শ্য হল। জ্তো-পরা এক জোড়া পা একবার শ্ন্যে নেচে উঠল, ধপাত্ করে কী যেন আছড়ে পড়ল, সিঁড়ি বেয়ে কে যেন ডিগবাজি খেলো, তার পরেই অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ফ্রন্ট ডোর! মিসেস ঘোষাল হয়ে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, মিসেস ঘোল হয়ে গড়িয়ে চলে গেলেন তিনি।

এমনিই হয়ে থাকে—অন্তত বিজ্ঞান তাই বলে। কার্পেটের কোণায় পা থাকলে এবং সেই অবস্থায় কার্পেটে একটা হ্যাঁচকা টান পড়লে সেই পদাধিকারী কিংবা কারিণী—মাধ্যাকর্ষণের স্বাভাবিক নিয়মটা মানতে বাধ্য। চিরদিনই তা মেনে আসছে। তারই প্র্যাক্টিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দেখে আমি ম্গ্ধ হয়ে চেয়ে রইল্ম।

বাইরে বাগান কাঁপিয়ে দ্রুত পদধ্বনি উঠছে। প্রাণ হাতে করে পালাচ্ছে কেউ—তাকে ফার্স্ট এইড নেওয়ানো যাবে বলেও মনে হল না।

তপন কার্পেটের ওপরে বসে পড়েছে—তারই আঁকা ছবির সেই গোবর-গাদা—না—না—নীলবসনা স্ন্দরীর মতো। আমি বলতে যাচ্ছিল্ম, অন্তত ভদ্রমহিলা এ যাত্রা তোমার মারাত্মক চেয়ারের হাত থেকে তো বেঁচে গেলেন—কিন্তু সব সান্ত্বনাই কি দেওয়া যায় সব সময়ে? আরো নিজের নতুন পাঞ্জাবির আধখানা চেয়ারের গায়ে জয়-ধ্বজার মতো শোভা পাচ্ছে যখন?

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৬৮ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমার জিনিসপত্রের মধ্যে তোমার শালখানি দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছিলুম। মনে মনে তোমার দাক্ষিণ্য কল্পনা করেছি। এখানে আমার ধনী কুটুম্ব সমাগম হচ্চে—তুমি জানো আমার স্বল্প মূল্যের গাত্রবস্ত্র ঐশ্বর্যশালীদের গোচর-যোগ্য নয়। তাই গোপনে নীরবে কৌশলে আমার লজ্জা নিবারণের কথা চিন্তা করেছিলে। এতে আমার মর্ম স্পর্শ করেছে। কিন্তু ব্যবহার করতে সাহস হোলো না, পাছে শেষ-পর্যন্ত সম্মান রক্ষা করতে না পারি। তাছাড়া বেশবাসের অপরাংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা ব্যয়সাধ্য হবে। তাই ফিরিয়ে দিচ্চি ডাকযোগে; সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করচি।

সমারোহ চলচে। আমার নতুন বাড়ির ঊর্দ্ধ শিখরে বসে নিরাসক্ত ভাবে নিম্নলোকের মর্ত্যলীলার আভাস পাচ্চি। ইতস্তত জনস্রোত প্রবাহিত হচ্চে, বাঁশির আওয়াজ আসচে; মনে মনে কিছু কিছু স্মৃতির উদ্বোধন হচ্চে যেন সে পূর্ব-জন্মের। এবারকার মতো এ রাস্তা বন্ধ—পরজন্মে কোনো গোধূলি লগ্নে সাহানায় বাঁশি বাজবে কি? ইতি ২৯।১২।৩৯

কবি

॥ ৪৬৯ ॥

[illegible]

॥ ৪৭০ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

[illegible]

[illegible] পরশে আমি তুমি
[illegible] সে [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥ ৪৭১ ॥
ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তুমি স্বভবনে ফেরবার যে তারিখ নির্দেশ করেছিলে তারি অনুসরণ করে তোমাকে একটা কবিতা পাঠিয়েছিলুম। সে কবিতাটি তোমার চিঠির উত্তরে আমার মনে এসেছিল। তার কোনো সাড়া না পেয়ে ভাবছি তোমাদের অনুপস্থিতির মধ্যে সে চিঠি হয়তো তলিয়ে গেছে। এ রকম পূর্বেও ঘটেছে। তার পরে তোমাকে সেদিন অন্য কবিতা পাঠিয়েছি- সেটার বিশেষ সার্থকতা নেই। অনেকদিন থেকে তোমাদের সঙ্গে ছিন্ন ছিন্ন সংস্পর্শে মনটা কি রকম পীড়িত হয়ে থাকে—এক-দিকে আমার চলনশীলতার দৌর্বল্য অন্যদিকে নানা রকমের কাজের তাগিদে আমার অবকাশকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়—ভাল লাগে না। যদি সপ্তাহ প্রান্তের ছুটিতে কোনো এক সময়ে আসতে পারো, তা হলে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে নিই। যদি এগারই মাঘে তোমরা এখানকার উৎসবে যোগ দাও, তা হলে কেমন হয়? উৎসব শান্তভাবেই হবে।

শীত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল মাঘের আগমনে নরম হয়ে আসচে। ক্রমে বসন্তের স্পর্শ লাগবে বলে প্রতীক্ষা করে আছি। ইতি ১৮।১।১৯৪০

তোমাদের কবি

॥ ৪৭২ ॥
ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, হঠাৎ খবর পাচ্চি মহাত্মাজী আসচেন মস্ত দলবল নিয়ে। কোথায় কাকে রাখব তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সবাই। একটুমাত্র জায়গা নেই—এর মধ্যে তোমাদের বন্ধুকে স্থান দেবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি এই উপলক্ষে তোমাদের আনতে পারতুম খুবই খুশী হতুম—উপায় নেই। ব্যাপারখানা আমার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০।

কবি

॥ ৪৭৩ ॥

রানী [illegible]
[illegible]

যুগল প্রেমের কল্যাণমালা
চাহে গাঁথিতে গাঁথিতে,
[illegible] পার হতে
[illegible] হতে
[illegible] যে [illegible] বিদায়
তোমাদের [illegible]।

যে মিলনমালা বন্ধু দিবারে
গন্ধ দিতেছে বিদায়ে,
সেই বিরহের অতিথি
নিল যাহা তার প্রীতি,
আমি দুই হাত ভরি তাহা
দিনু তার সাথে বিদায়॥

আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ ফাল্গুন
১৩৪৬

॥ ৪৭৪ ॥
ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

বার বার মনের মধ্যে এই ইচ্ছে জাগে কিছুই না করবার সাধনা করি- যে সাধনা দেখতে পাই ঐ শিমুল গাছে, যে আপনার অপর্যাপ্ত ফুলের সমস্ত ঐশ্বর্য ঝরিয়ে দিয়ে আজ নীলাকাশের দিকে তার রিক্ত শাখার নীরব মন্ত্র পাঠিয়ে দিচ্চে। এই উপকরণহীন সব চেয়ে সহজ সাধনা কিছুতেই আর ঘটে উঠতে চায় না। মনে পড়তে থাকে শিলাইদহের বসন্তকাল, তেতালার ঘরের নির্জন জানলার ধারে বসে দেখচি নিচের বাগানে গাছের চূড়ায় চূড়ায় ফুলের কুঁড়ি উঠচে রোমাঞ্চিত হয়ে, আর মনে হচ্চে নৃত্যচঞ্চল দোয়েলগুলোর শিস দিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজই নেই। সামনে সোনার তরঙ্গে উদ্বেল সর্ষেক্ষেত আপন দিগন্তবিস্তৃত অহংকার আর ধরে রাখতে পারচে না—তার পরপ্রান্তে পদ্মার রৌদ্রোজ্জ্বল জলরেখা, এবং তারও পরপারে পাণ্ডুর বালুরাশি নীলিমায় গিয়ে নিলীন। তখন আমার সংকীর্ণ প্রতিপত্তি ছিল কাঁটা-বনের মতো, তাতে মাঝে মাঝে যশের ফুলও ফুটচে, কাঁটাও ভিড় করেছে যথেষ্ট; কিন্তু দায়িত্ববিহীন অবকাশ ছিল গানের সুরে গুঞ্জরিত। আজ দত্তাপহারক বিধাতা নিয়েছেন সেই অবকাশ হরণ করে।

চললুম বাঁকুড়ায়, তার পরে ফিরব স্বস্থানে। ততদিন আমের বোল ঝরে গিয়ে গুটি ধরবে, আর পলাশ শাখায় আরম্ভ হবে নিঃস্বতা। কিন্তু দূরে শালবীথিকায় তখনো চলবে ফুলের উৎসব। মনের মধ্যে বসন্তের আহ্বান আসবে, কিন্তু সাড়া দেবার সময় পাবে না। ধারাবাহিক কর্তব্য চলতে থাকবে। মানুষের জীবনে প্রথম দিক আর শেষের দিক কর্তব্যের সীমার বাহিরে। প্রথম দিকে জাগরণের আভাস মাত্র আর শেষের দিকে সুপ্তির আমন্ত্রণ। কিন্তু আধুনিক কালের ব্যবস্থায় মধ্যাহ্ন সূর্যের শাসন চলে সকল প্রহরেই। গান তৈরি করেছিলুম "কখন যে বসন্ত এল এবার হোলো না গান।" সেই "এবার" রয়ে গেল চিরদিন। ইতি ২৮।২।৪০

কবি

॥ ৪৭৫ ॥
ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তুমি একটু ভুল করেছ—ইতিহাসটা বলা যাক। দুর্গম দীর্ঘ পথে প্রবল প্রয়াসে দামোদর পার হয়ে বাঁকুড়ায় গিয়ে পৌঁছেছিলুম। সেই পথে ফেরার সংকল্প ত্যাগ করে কলকাতা হয়ে ফেরবার প্রস্তাব হোলো। কলকাতায় দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে এখানে আসবার কথা ছিল। হেন কালে

সন্ধ্যেবেলায় রেল কম্পানির কোনো কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেন হাওড়া স্টেশনে আটটা বেলায় উত্তরমুখী গাড়ি আসবার পূর্বে সেখানে কোনো একটা রেল কামরায় তাঁরা আমাকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কি না তা জানা যাবে হাওড়ায় এসে পৌঁছিয়ে। তোমাদের খবর দেবার যথেষ্ট সময় ছিল কিনা তখন সেটা ভেবে স্থির করবার মতো যথেষ্ট শক্তি আমার দেহে ছিল না।

আগামী বসন্ত-পূর্ণিমায় এখানে বসন্ত উৎসব হবে। কিছু গান বাজনা হবে। কিন্তু তখন তোমরা কোথায় তা তো জানিনে। যদি এ প্রদেশে উপস্থিতি সম্ভব হয় তা হলে বসন্তের এই আমন্ত্রণ স্মরণ কোরো। বোলপুর অতি ক্ষুদ্র শহর, ই আই আরের অনাদৃত লুপ লাইনভুক্ত, এদিক দিয়ে কেউ কখনো দিল্লি বম্বাই মাদ্রাজ লাহোর সিমলায় যায় না, তবুও যদি টাইম টেবিল খুলে দেখ তা হলে এর দেশ কাল নির্ণয় করতে পারবে—হয়তো ছোট অক্ষরে। আর পাঁজি দেখলে কোনো এক সীমানায় পূর্ণিমা তিথির সন্ধান মিলবে। ডিসেম্বর জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন মাসের অভিজাত স্তরে তাকে কোনো প্রান্তে দেখতে পাবে না। একে সাধারণ লোকে দোল পূর্ণিমা বলে। ইতি ৫।৩।৪০

কবি

॥ ৪৭৬ ॥

ওঁ

মঙপু

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের ঘরে আমার কড়ে আঙুলের যে আংটিখানি ভ্রমক্রমে ফেলে এসেছি সেটা যদি খুঁজে পাও তা হলে সেটা রেখে দিয়ো, ফিরে পাঠাবার চেষ্টায় বৃথা মাশুল ব্যয় কোরো না।

কিন্তু আমার অভিভাবক বিশেষের উদ্দাম উৎসাহে বেলঘরিয়া সদনে আর যে একটা অপঘাত ঘটেছে সেটার জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। পশুপতি ডাক্তারের রচনার একটি পাণ্ডুলিপি এবং সুকুমার সেনের রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বই দুখানি নিরুদ্দেশ হয়েছে। যদি পাও তোমার আংটির সঙ্গে সেগুলিকে আত্মভাণ্ডারজাত করে রেখো না। এখানে সুস্থ থাকবার অন্য সকল সুযোগই আছে কেবল ঐ হারাধনগুলির শোকে দেহমন আছে পীড়িত।

আর একটা সন্ধানের বিষয় আছে খোঁজ করে আমাকে জানিয়ো। ডাক্তার জীবন রায়ের একটি চিকিৎসাবিধান অনুসরণ করে ক্যালকেরিয়া ফ্লুরোরের সহস্রক শক্তির এক শিশি সঙ্গে এনেছিলুম। তাঁর যে উপদেশ পেয়েছিলুম আমার স্মৃতিপটে সেটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অল্প একটু মনে আছে, পরে পরে চারদিন সেবন করতে হবে, কিন্তু তার পরে সব অন্ধকার। সহস্রক শক্তির ওষুধ তিনদিন খেয়ে মনে সন্দেহ হোলো যে হয়তো বা ভুল শুনেছি—তাই স্তব্ধ হয়ে আছি, তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করে যদি কর্তব্য নির্দেশ করে দাও তা হলে আবার সাহস করে লাগব।

হাত এত অপটু যে লেখনী চালনা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে। মনের গতির সঙ্গে শরীরের উদাম পাল্লা দিতে পারচে না, তবু হিতৈষীরা দীর্ঘজীবনের আশীর্বাদ করে। ভাগ্যে কলিযুগে আশীর্বাদের ফল ফলে না। ইতি ২৩।৪।৪০

কবি

॥ ৪৭৭ ॥

ওঁ

মঙপু

কল্যাণীয়াসু,

অপেক্ষা করে ছিলুম তোমরা যথাসময়ে এখানে আসতে পারবে। আত্মীয় সমাজের সীমানার অত্যন্ত বেশী বাইরে গিয়ে পড়লে জন্মদিনের আনন্দ উৎসবের রস জল মিশিয়ে ফিকে হয়ে যায়। এবারে যেখানে আছি সেখানে ভিড়ের আশঙ্কা, সেই জন্যে তোমরা এলে ঐ দিনের উৎসব সম্পূর্ণ হতে পারত। কিন্তু অপরিহার্যের জন্যে পরিতাপ বৃথা।

যেখানে প্রশান্তের ডাক পড়েছে সেখানে সে যেতে দ্বিধা না করে যেন। এই রকম জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে লাগাবার সুযোগ যত পাওয়া যায় ততই ভালো।

আমার চিকিৎসা বিধান অনেকবার তুমি মেনেছ আর একবার মানলে ঠকবে না। অবিলম্বে বায়োকেমিক ক্যাল-কেরিয়া সালফ দুই এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করবে। একটুও ভয় কোরো না। তোমার অবস্থা ঠিক জানতে পারলে ওখানে থাকতে থাকতেই ওষুধটা খাওয়াতুম। যদি ফাটে তবু খেয়ো। ঠিক সময়ে ওষুধ পড়লে ফাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

পা টলমল করে, কিন্তু শরীর ভালই আছে। অমিয়কে সঙ্গী পেয়ে খুশী আছি।

হারাধন রক্ষিত পার্সেলটা এসে পৌঁচেছে। ইতি ২৭।৪।৪০

কবি

॥ ৪৭৮ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আছ কোথায়? শুনলুম দার্জিলিঙে। নিশ্চিত খবর জানিনে। পরশু ছিলুম মংপু কাল এসেছি কালিম্পঙে। কাল ছিল আমার পঞ্জিকাবিহিত জন্মদিন। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করে পাঠিয়েছিলুম—মনটা প্রস্তুত ছিল না।

তোমার প্রশস্ত চীনে বাটি এসে পৌঁচেছে—চীন দেশের উপযুক্ত তার আয়তন। এই পাত্রটি মনে মনে তোমার শ্রদ্ধার রসে পূর্ণ করে গ্রহণ করলুম। রথীর কাছে এইমাত্র শুনলুম এখনো তোমরা বেলঘরিয়া ছাড়নি। এই চিঠি সেই ঠিকানাতেই পাঠালুম। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৪৭

কবি

॥ ৪৭৯ ॥

ওঁ

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন আছে। ইতিপূর্বে বেল-ঘরিয়ার ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম বোধ হয় তখন তুমি ছিলে দার্জিলিঙে—সে চিঠি তোমার হাতে পৌঁছিয়েছে কিনা জানিনে। আমি তোমাকে কিছু ঘন ঘন Calcaria Sulf 6 খেতে পরামর্শ দিয়েছিলুম।

সুরেনের(১) মৃত্যুতে মনে খুব বেদনা পেয়েছি। অমন মানুষ দেখা যায় না, তবু আপনার স্মৃতিচিহ্ন মুছে নিয়েই চলে গেল।

এবার পাহাড়ে এসেও শরীর তেমন ভালো চলচে না। ইতি ১৪।৫।৪০

কবি

১ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীনতা লাভের পর সমস্ত রাজ্য স্বেচ্ছায় গণতন্ত্রভুক্ত হলেও একমাত্র হায়দ্রাবাদে সৈন্য পাঠিয়ে রাজ্য দখল করে নিতে হয়। ঐশ্বর্যের দিক থেকে হায়দ্রাবাদ পৃথিবীর সর্বাধিক সম্পদশালী রাজ্যের অন্যতম ছিল। নিজামের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের পরিমাণ নিয়ে দেশে বিদেশে নানা কিম্বদন্তী আজো প্রচলিত। হায়দ্রাবাদের ঐশ্বর্যের কাহিনী যে অনেকাংশেই সত্য তার নিদর্শন ওখানকার অধিবাসী এবং ঘরবাড়ি প্রাসাদ সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত।

১। সালংকারা বনজারে (জিপসী) সুন্দরী; ২। সামাজিক এক আচার অনুষ্ঠানে বনজারে মহিলাবৃন্দ; ৩। মোজামজাহির বাজার; ৪। ইতিহাসখ্যাত গোলকুণ্ডা দুর্গ; ৫। হায়দ্রাবাদ শহরের একাংশ (পিছনে চার মিনার দেখা যাচ্ছে)।

আলোকচিত্রশিল্পী

বীথি সরকার

পো কা টা

উৎপলা মুখোপাধ্যায়
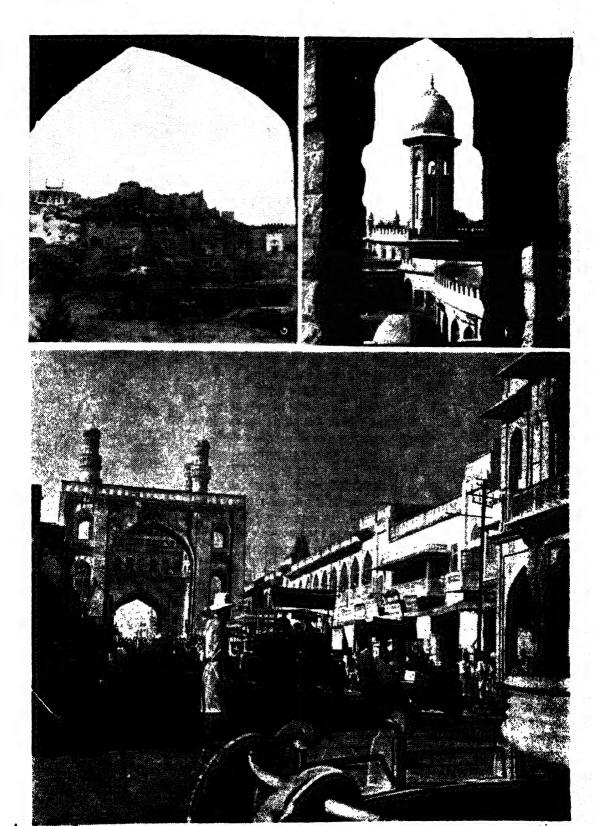
পোকাটা
এমনই বোকাটা,
ঘরে জ্বলছিল আলো, কম পাওয়ারেরই আলো
জানলা ছিল খোলা।
পোকাটা
সূচীতীক্ষ্ণ দেহটা,
ঘন সবুজ পোশাক আর স্বচ্ছ ডানার ওড়না,
জানলা দিয়ে দেখলে আলোটা
কেননা জানলা ছিল খোলা,
যদিও আলোটা ছিল কম পাওয়ারের।
পোকাটা
কাঁপিয়ে স্বচ্ছ ডানাটা
এল দল থেকে ছিটকে
বসেছে পেলমেটে, এমব্রয়ডারি করা টেবিলঢাকায়,
ডিভানের পেছন দিয়ে চলেছে
সাইডবোর্ড আর ঝকঝকে পালিশ করা ম্যানটেলপীসে।
বাইরে
চুনকাম করা কাঞ্চনজঙ্ঘা
চুপচাপ দাঁড়িয়ে
ঝন্ ঝন্ ঝিঁঝি ডাকছে
কত রকমের সবুজ,
বোধ হয় এখানে ওখানে দু'টো ফুলও ফুটেছে,
সুগন্ধ গন্ধরাজ আর রক্তবর্ণ জবা দেখছে মজাটা
আলোটা জ্বলছে।
হঠাৎ
ও কি, কে নিবিয়ে দিলে কম পাওয়ারের সেই আলো
কাঞ্চনজঙ্ঘা তবু দাঁড়িয়ে রইল,
বাঁকা হাসি হেসে চাঁদ বললে আমিও আছি,
শুধু ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেল।
বেঁচে গেল পোকাটা?

সেই পথ

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

সে স্মৃতি অম্লান আজো—সেই পথ রহস্য নিবিড়—
আজো ভরে রেখেছে তো সুধা দিয়ে দুখানি হৃদয়,
দুই জোড়া মুগ্ধ চোখে পরিয়েছে অঞ্জন অক্ষয়,
লাবণ্য এনেছে প্রাণে, উষ্ণশ্বাসে ছোঁওয়া সুরভির।
সেই পথ গন্ধে ভরা স্বপ্নে ভরা বনকেতকীর—
সে পথে ভেঙেছে ঘুম—ঘুচে গেছে সমস্ত সংশয়—
জেনেছি আমারি তুমি—কারো নয়—আর কারো নয়—
হাওয়ায় লেগেছে ছন্দ—সুখালস স্পন্দ ঝিরিঝির্।

সে পথে এসেছ বুকে হৃদয়ের একান্ত গভীরে,
আচ্ছন্ন করেছ সত্তা অমৃতের অপূর্ব আস্বাদে,
সর্ব অঙ্গে কী বিপুল মত্ততার এনেছ প্লাবন।
সাহারার বুকে বুকে থইথই দুরন্ত শ্রাবণ—
দিয়েছ দুহাত ভরে দূরতম আকাশের চাঁদে
কী আলো জেলেছ স্নিগ্ধ অতলান্ত অখণ্ড তিমিরে।

অ ন্ত রা লে

শান্তি লাহিড়ী

চল ঘরে ফিরে যাই, যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে গেছে।
এখন পোশাক খুলবে মিথ্যে রাজা, মিথ্যে প্রণয়িনী,
যাকে এইমাত্র দেখলি পুত্রশোকে অন্তিম দশায়
সে কেমন হেসে উঠবে।   বলবে কেমন স্বপ্ন দেখালাম তোকে?

চল ঘরে ফিরে যাই, বরফকুচির মত হিম
কনকনে সাদা ভাতে নুন, লঙ্কা—অমৃত তৃপ্তিতে
গোগ্রাসে সাবাড় করে ছিন্ন-কন্থা—বাঁশের চাটাই!

তবুও, ওখানে কেউ শোকাতুরা হেসে উঠবে না।

'ভেন্দেত্তা'

সৈয়দ মুজতবা আলী

এই নামে প্রকাশিত মপাসাঁর একটি ছোটগল্প বহু পাঠকের সুপরিচিত। কর্সিকার এক বুড়ীর একমাত্র ছেলেকে খুন করে আততায়ী সার্দিনিয়া পালিয়ে যায়। বুড়ী প্রতিশোধ নেবার জন্যে খড়ের মানুষ তৈরি করে প্রথমটায় তার গলার ভিতর মাংস রেখে কুকুরকে ট্রেন করে, কি করে তার গলা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে হয়, পরে মাংস বাদ দিয়ে। ট্রেনিং শেষ হলে বুড়ী সার্দিনিয়া গিয়ে সেই কুকুরকে দিয়ে পুত্রের আততায়ীকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ায়।

* * *

এবারের ঘটনাটি অতখানি রগরগে না হলেও বড় বিষাদময়। অকুস্থল ঐ কর্সিকারই কাছে, তবে সমুদ্রের ওপারে উত্তর ইতালির জনপদভূমিতে। কালঃ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৪। যুদ্ধের শেষের দিক।

মিত্রপক্ষে ও জর্মানিতে তখন ইতালি দেশেও জোর লড়াই চলছে। এবং জর্মনদের পিছনে ইতালীয় গেরিল্লারা (এদের কিছুটা কম্যুনিস্ট, বাকিরা ফাসিস্ট ও নাৎসি-বিরোধী) যেমন জর্মনদের বিরুদ্ধে তীব্র গোপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তেমনি আপন দেশবাসী ফাসিস্ট এবং জর্মন-মিত্রদের বিরুদ্ধেও। এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইটাই হয়ে উঠেছিল তীব্রতর, তিক্ততর। রাজনৈতিক দলাদলির নাম করে সবাই আপন আপন শত্রু নিধনে লেগে গিয়েছে। ইতালি প্রতিশোধের দেশ এমনিতেই—আইন-আদালত থাকাকালীনও, আর এখন তো কথাই নেই।

১৫ জুলাইয়ের সকাল বেলা উত্তর ইতালির ছোট গ্রাম মন্তালবাতে দশ বছরের মেয়ে আলফা জুবেল্লি বাড়ির সামনের বাগানে সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলাধুলো করছিল। এমন সময় আচমকা বাড়ির গেট খুলে কয়েকজন গেরিল্লা বাগানে ঢুকলো। গুলি করার জন্য তৈরী তাদের কাঁধে ঝুলছে টমিগান। একজন সেই ছোট্ট মেয়েটিকে শুধলে, 'তোর মা কোথায়?'

ভয়ে আলফার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ফ্যালফ্যাল চোখে বাড়ির দিকে সে তাকিয়ে রইল স্থাণুবৎ।

তোর মা কোথায়?

কয়েক মিনিট পরে গেরিল্লারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তাদের মাঝখানে আলফার মা —পরনে তখনো রান্নাবান্না করার সময়কার এপ্রন। এবং আলফার কাকা—আলফার

বাবাকে ইতিপূর্বে ইতালি সরকার জর্মনদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী জর্মনিতে শ্রমিক হিসেবে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। চেঁচাতে চেঁচাতে আলফা মায়ের গা জড়িয়ে ধরতে গেরিল্লারা গুণ্ডার মত তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। কাঁদতে কাঁদতে সে তাদের পিছনে পিছনে ছুটলো। প্রায় এক'শ গজ দূরে গিয়ে গেরিল্লারা আলফার মা আর কাকাকে একটা বাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড় করালে। আলফা দেখল, টমিগানগুলো গর্জন করে উঠলো আর তার মা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

লাশের গায়ে গেরিল্লারা এক টুকরো কাগজ পিন্ করে দিয়ে পাহাড়ে উধাও হয়ে গেল। কাগজে লেখা ছিল, 'নাৎসি

একটা বাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করালে
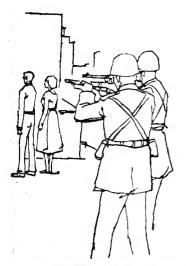
গুপ্তচরের এই গতি।' নিচে স্বাক্ষর ছিল 'স্তেল্লো'।

এই নৃশংসতায় ছোট্ট গাঁটি শিউরে উঠলো। আর এই 'স্তেল্লো'টি কে তাকেও সমস্ত গাঁ চেনে। ত্রিশ বছরের কম্যুনিস্ট আউরেলিয়ো বুস্সি। গ্রামের লোক আরো

খবরের কাগজে দেখে

জানতো, পাশের ছোট্ট শহরের ঐ বুস্সি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার পূর্বে প্রায় এক বৎসর ধরে—স্বামী যখন বিদেশে—সিম্নোরা জুবেল্লির প্রণয় কামনা করে নিরাশ হয়েছে। এবং সবচেয়ে ভালো করে গ্রামের লোক জানতো, সিম্নোরা জুবেল্লি বা তার দেওর কখনো জর্মনদের গুপ্তচরের কাজ করেনি—এসব অজ পাড়াগাঁয়ে একে অন্যের হাঁড়ির খবর জানা থাকে। আসলে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যর্থ-প্রেমিক আউরেলিয়ো বুস্সির খুনিয়া প্রতিহিংসা।

কিন্তু তখন কোথায় আদালত, কিসের আইন? কে দেবে সাজা? ভ্রাতৃযুদ্ধ, গৃহবিবাদ চলে আপন 'আইনে'।

মায়ের মৃত্যুর পর আলফার আত্মীয়দের কাছে আলফা আশ্রয় পেল। মাসের পর মাস বেচারী কথা প্রায় বলেইনি। নির্জনে চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটলো।

যুদ্ধ শেষ হল (১৯৪৫ এপ্রিল)। গেরিল্লারা নিজেদের নিজেরাই দেশের ত্রাণকর্তা বানিয়ে বিজয়োল্লাসে মত্ত হলেন। কে তখন শুধোয় যুদ্ধের সময় কে কোন্ অন্যায় কোন্ ন্যায় করেছে, কি না করেছে? হিটলারের ফেউ মুসোলিনি আর তার রক্ষিতা ক্লারা পেতাচ্চিকে গুলি করে মেরে মিলান শহরে এনে পায়ের গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদের কেটে ফেলে নর্দমায় ফেলা হল। ইতালির লোক মৃতদেহ দুটোকে লাঞ্ছনা অবমাননায় একশেষ করলে।

আলফা বড় হচ্ছে। দেখতে দেখতে সে খাঁটি ইতালিয়ান সুন্দরীর রূপ নিল। কিন্তু তবু সে রইল আগেরই মত নির্জীব, এবং প্রায়ই শোনা যেত রাত্রে ঘুমের ঘোরে বুক-ফাটা কান্নার সঙ্গে মাকে ডাকছে।

মনে হল এ মেয়ে জীবনে কখনো তার মায়ের নৃশংস অপঘাত মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছবি মনের পট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। এবং আরেকটা নাম সে কখনো তার স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না—আ উ রে লি য়ো বু স্ সি—তার মাতৃহন্তা। বয়েস তার যতই বাড়তে লাগল, শান্ত বুদ্ধির বিকাশ হতে লাগল, ততই তার হৃদয় এবং মনে গভীর হতে গভীরতর রেখায় জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠতে লাগলো একটিমাত্র শব্দ : প্রতিহিংসা। এবং দিনের পর দিন প্ল্যান কষা—কি করে সে প্রতিহিংসা কার্যে পরিণত করে মায়ের নির্মম নৃশংস পাপিষ্ঠ হত্যাকারীকে তার দাদ দিতে হয়।

তারপর কয়েক বৎসর গেল এবং মনে হল আলফা বুঝি ১৫ই জুলাই ১৯৪৪ সালের ঘটনার কথা শেষমেশ ভুলে গিয়েছে। তার সৌন্দর্য আরো খেড়ে গেল। সে তার সখীদের সঙ্গে নাচের মজলিসে যেতে আরম্ভ করলো। সেখানে এক ছোকরা কেরানী রিকো বাসাদন্নার সঙ্গে পরিচয় ও ক্রমে প্রণয় হল। ১৯৫৫ সালের মধ্য নিদাঘে তাদের বিয়ে হল। মনে হল, এবারে সব-কিছু ভালোর দিকেই যাবে—আর ভাবনার কারণ নেই। সুখী তরুণী সুন্দরী স্বামী-সোহাগিনী, আর্থিক সচ্ছলতা, সব-কিছুই। কিন্তু তার হৃদয়ের ভিতর কি চলছে সেটা কেউ দেখতে পেল না। তার মায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে সে কাউকে একটি মাত্র কথা বলতো না—এমন কি তার স্বামীকেও না। কিন্তু প্রতিহিংসার কঠোর, অলংঘ্য আহ্বান তার হৃদয়ে প্রতিদিন তীব্রতর স্বরে ধ্বনিত হতে লাগল। পরে মনস্তত্ত্ববিদরা রায় দেন, এই আহ্বান আলফাকে ম্যানিয়াকে (বায়ুগ্রস্ত) পরিণত করে তুলেছিল, এবং এই প্রতিহিংসা-ম্যানিয়া তার স্ত্রীজনসুলভ তাবৎ হৃদয়বৃত্তিকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল।

তারপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সব কিছু পালটে গেল—চরম ক্ষণ এসে আলফার জীবনের নূতন অধ্যায় খুলে দিল। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে আলফার স্বামী উত্তর ইতালির কারখানা-কেন্দ্র তুরিন শহরের কাছে বদলি হল।

অদ্ভুত যোগাযোগ! একদিন দৈবাৎ আলফা খবরের কাগজে দেখে তার সেই সুপরিচিত জঘন্য নাম—আউরেলিয়ো বুস্সি!

সেই সেদিনকার গেরিল্লা নিকটবর্তী ছোট্ট শহর ক্লেভালকুরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে।

সিম্নোরা আলফার বয়স তখন একুশ, বাইশ॥

(আগামীবারে সমাপ্য)

প্রার্থনার প্রাঙ্গণে

অজিতকুমার দাস

আমেরিকার প্রথমা মহিলা কেনেডি-জায়া জ্যাকেলিনের ভারত দর্শন হয়ে গেল। কথা ছিল তিনি কলকাতাতেও আসবেন। বাঙ্গালীর মত অনেকেই বিশ্বাস করেন যে কলকাতা দেখা না হলে ভারতদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তবু অসুস্থতার জন্য কলকাতাকে সূচি থেকে বাদ দিতে হল। যদি তিনি কলকাতায় আসতেন তবে একটা রবিবারের সকাল তাঁকে কলকাতাতেই কাটাতে হত। এবং সে সকালটা তিনি কলকাতার কোন প্রসিদ্ধ গির্জাতে যেতেন, সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতেন। সম্ভবত তাঁর স্বাস্থ্য ও সম্পদ কামনা করে বিশেষ প্রার্থনাও হত।

যেখানেই জ্যাকি (জ্যাকেলিনের বদলে দেওয়া তার স্বামী, অনুরাগী এবং গুণ-মুগ্ধদের সংক্ষিপ্ত আদুরে ডাক নাম) এই সফরে যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আলাদা প্লেনে উড়ে বেড়াচ্ছেন এক ঝাঁক সাংবাদিক, এরা ব্যাপকতমভাবে এবং সূক্ষ্মতম দৃষ্টি দিয়ে এর যাওয়া আসা, হাসি, কাশি, দর্শক, জনতার উচ্ছ্বাস এবং দর্শনীয় যা কিছু দেখছেন তাতে অতিপ্রিয় দর্শনার মনের আবেশ আহ্লাদ এবং স্বামী পুত্র-কন্যার অদর্শনে কোন উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা তন্ন তন্ন করে লেখায় ছবিতে টেলিভিশন ফিল্মে, টেপ রেকর্ডারে তার নিত্য নূতন নিখুঁত বিবরণী বিদেশে, বিশেষ করে জ্যাকির স্বদেশে পাঠাচ্ছেন।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছিল, কলকাতায় যখন মিসেস কেনেডী গির্জাতে যাবেন, রিপোর্টার ফটোগ্রাফাররা সেখানেই তাঁর সঙ্গে গিয়ে প্রার্থনার সময় ভিড় করবেন কিনা।

মূলত প্রশ্নটা আরও অনেক গভীর। প্রার্থনার সময় মানুষ একান্তভাবে তার অন্তরের কথা ভগবানকে নিবেদন করতে চায়। অথবা গির্জাতে গিয়ে সে ধর্ম-যাজকদের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। মন্ডলীর উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর উপদেশের মধ্যে নিজের অনেক প্রশ্নের উত্তর, অনেক সমস্যার সমাধান খোঁজে।

ঠিক সেই সময় হয়তো যখন তিনি চোখ বুজেছেন, তখন কতকগুলি কৌতুহলী চোখ তাঁর দিকে নিবদ্ধ রইল, তাঁর মুখের ভাব পরিবর্তনের প্রতিটি চিহ্ন নোটবুকের পটে এঁকে নেবার জন্য। এই অবস্থাটা মানবতা বা শালীনতার বিরোধী কিনা। ব্যক্তি স্বাধীনতার দিনে সপ্তাহে কয়েক মিনিট মাত্র ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের নামে কেউ, তিনি যত স্বনামধন্য বা ধন্যা হোন না কেন, নিজের এই প্রাইভেসীটাকে বিসর্জন করবেন কিনা। প্রার্থনার প্রাঙ্গণে সাংবাদিকের অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধ করা উচিত কিনা।

প্রশ্নটা মিসেস কেনেডির ভারত দর্শনে আসার অনেক আগেই উঠেছিল। তবে কেনেডিদের নিয়েই। একথা অনেকেই জানেন যে জন কেনেডি যখন তাঁর ডেমোক্রেটিক দলের থেকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন পেলেন, তখন মনোনয়নে একটা নূতন ধরনের সাড়া পড়ে গেল। কারণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি একজন ক্যাথলিক এবং এর আগে কোনও ক্যাথলিক, অক্যাথলিক-প্রধান আমেরিকায় রাষ্ট্রচালনার ভার কখনও পাননি।

এই অসাধারণ ব্যাপারটাই ঘটে গেল এবং জন কেনেডিই হলেন প্রেসিডেন্ট।

কেনেডিরা শুধু ক্যাথলিক নন, এঁরা খুব ধর্মভীরু, নিয়মিত গির্জায় যান এবং রাষ্ট্রপতি হবার পরও এঁর কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

এবার আরম্ভ হল রিপোর্টারদের কাজ। প্রেসিডেন্টের পিছু পিছু এরাও গির্জেয় যেতে আরম্ভ করেছেন, তাঁর অনুগামী হয়ে, ধর্মেকর্মে না হলেও, শ্রবণে দৃষ্টিতে।

বেনারসে গঙ্গা মাঝিতে শ্রীমতী কেনেডির নৌকা ভ্রমণ

উদ্দেশ্য নানা রকমের। যিনি দেশটাকে চালাচ্ছেন। যে মণ্ডলীতে তিনি উপবিষ্ট, তার উদ্দেশ্যে যাজক কি উপদেশ দিচ্ছেন? সেই মণ্ডলীর পুরোধা হিসাবে তিনি কোন প্রার্থনা বিধাতা পুরুষের কাছে নিবেদন করছেন? আর তার কোন বিশেষ অংশের সময়ে রাষ্ট্রের কর্ণধার কি তাঁর কান খাড়া করলেন।

আপত্তি হল। কেনেডির পক্ষ থেকে নয়। জনসাধারণের এক অংশের কাছ থেকে। তাঁরা বললেন রিপোর্টারদের উদ্দেশে, দোহাই তোমাদের লোকটাকে অন্তত গির্জার ভিতরে তাড়া করে যেও না।

প্রত্যুত্তর এল সাংবাদিকদের কাছ থেকে, "তোমরা দয়া করে নিজের চরকায় তেল দাও। আমাদের কাজে নাক ঢুকিও না। আমরা আমাদের কর্তব্য করছি।" আরও বলা হল, "আমরাই বুঝি একা প্রেসিডেন্টের পেছনে যাই। আমরা তো অনেক দূরে বসে থাকি। কেউ টেরও পায় না। আর প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী যে ঠিক তাঁর সঙ্গে বা পিছনেই বসে থাকেন, তখন তো কিছু বলা হয় না। গির্জার কেউ তো তখন প্রতিবাদ করে বলে না, "আমাদের মধ্যে খুনে, গুণ্ডাটা আবার কে?"

আসল কথা প্রার্থনার সময়ে যে কারণে প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী যান, অনেকটা সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে রিপোর্টাররাও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কোনও দুর্ঘটনা, কোন অঘটন ঘটে গেলে যেন তার খবরের ব্যাপারে মার খেতে না হয়।

তা' ছাড়া প্রার্থনার প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের অনধিকার প্রবেশ ঘটার সময়েই ঠিক সংবাদের প্রাঙ্গণে প্রার্থনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

আবার মিসেস কেনেডির ভারত সফরে ফিরে আসা যাক। ভারতের পথে তিনি রোমে থেমে পোপের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তাঁর আশীর্বাদও অবশ্যই এই ধর্মভীরু মহিলার যাত্রাপথের পাথেয় হয়ে রয়েছে। তাঁর পথের পাঁচালীর পাঁচমিশালী খবরের মধ্যে এর প্রাধান্য কি কিছু কম?

তিব্বতের যেসব লামা বক্সারে বৃটিশ আমলের কাঁটাতারে-ঘেরা ডিটেনশন ক্যাম্পে নিজেদের নূতন আশ্রয় গড়েছেন, একটা করে বাঁশের মাচাকে মন্দিরে রূপান্তরিত করে, তন্ময় হয়ে বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন, মন্ত্র উচ্চারণ করছেন তাঁদের প্রার্থনা শেষে জিজ্ঞাসা করেছি,—"কেন তোমরা গুম্ফা ছেড়ে চলে এলে।" উত্তর নিরুত্তর করে দেয়—"প্রার্থনা করার অনাবিল স্বাধীনতা রক্ষা করতে এসেছি।"

তিন বছর আগে নেফা ফুট্‌হিলসে দলাই লামার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে তিব্বতী আয়শ্রপ্রার্থী দল এলেন একটা ভারতীয় আর্মি ক্যাম্পে, তাঁদের বিশ্রাম ও চা-পান শেষ করবার পর, যে যার সঙ্গে আনা জিনিস গুছিয়ে নিতে লাগলেন, প্রকাশ্যে নির্ভয়ে বের করে। পরনে যে বাকু তার অজস্র ভাঁজের আড়াল থেকে একজনের বের-করা পরম সম্পদগুলি দেখছিলাম। কোলের দিকের এক ভাঁজ থেকে বের হল ছোট্ট একটি কুকুর, তিব্বতী ম্যাস্টিফ্। চোখ প্রায় বোজাই ছিল। বাইরে এসে মিটমিট করে তাকাচ্ছে। সলজ্জ, কিন্তু সপ্রতিভ। স্বাধীন আবহাওয়ার সঙ্গে শুভদৃষ্টি।

আর বাকুর পিঠের ভাঁজ থেকে বার হল, একটি বুদ্ধের মূর্তি। এ-দুটি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আনেনি। জিজ্ঞাসা করি, কি করে বাঁচিয়ে আনলে এতটা পথ, এত দুর্গমপথ? উত্তরটা বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায়, "আমি বাঁচাবার কে? যিনি আমায় বাঁচালেন, তিনিই তো সঙ্গে!"

পূর্ব-পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী সর্বস্ব ফেলে রেখে চলে এসেছেন। কিন্তু পারতপক্ষে কেউ ঠাকুরটিকে ফেলে আসেননি। দণ্ডকারণ্যে শরণার্থীদের বসতির অনেক ছবি দেখেছি। মন ভরেনি ভরল, যেদিন দেখলাম, কর্তারা ওখানেও খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তনের আসর পেতেছেন। বিত্ত গেছে যাক, চিত্ত বাঁচুক।

গোয়া সীমান্তে দেখা আমেরিকান "বাল্টিমোর সান" কাগজের পক্ককেশ অতি-প্রবীণ সংবাদদাতা ফিল পটারের সঙ্গে। ইনি গোয়া অভিযান শুরুর আগেই করাচী হয়ে পাঞ্জিম পৌঁছেছিলেন। পাঞ্জিম ক্যাথলিকদের বিশেষ প্রিয় তীর্থস্থান। সেণ্ট জেভিয়ারের দেহ এখানে রক্ষা করা হয়েছে। কয়েক বছর অন্তর বিশেষ দিনে একবার করে জনসাধারণকে দর্শনের অধিকার দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনা-বাহিনী যখন গোয়ার সীমান্তে এবং গোয়া-মুক্তি আসন্ন, তখন দিনের পর দিন গোয়া রেডিও থেকে গোয়ার ক্যাথলিকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনতাম, "তোমরা প্রার্থনা কর, যেন সব 'বিপদেই' গোয়াবাসীরা সাহস শৌর্য না হারায়।" এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অবশেষে বিপদের মুহূর্তে নূতন প্রেরণা পাওয়ার জন্য সেণ্ট জেভিয়ার্সের দেহকে অপ্রত্যাশিতভাবে গোয়াবাসীর দর্শনের জন্য উপস্থাপিত করা হল। আর হল ম্যাস্ বা সমবেত প্রার্থনা।

এই প্রার্থনায় ফিল পটার উপস্থিত ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা, বলতো কি প্রার্থনা এই বৃহৎ মণ্ডলীর সামনে তাঁদের ধর্মযাজক উচ্চারণ করেছিলেন? প্রার্থনারত প্রায় সবাই তো মুক্তিকামী ভারতবাসী।" উত্তরে জানলাম, গোয়ার রাজনৈতিক মুক্তি বন্ধ হোক, এমন কথা একজনও উচ্চারণ করেনি। প্রার্থনার মূল কথা ছিল, অ-ক্যাথলিকদের ধর্মান্ধ আঘাত যেন ক্যাথলিকদের পুণ্যস্থান এবং তাঁদের পরমপুরুষ সেণ্ট জেভিয়ার্সের কোন ক্ষতি না করে।

এর পরে গোয়ামুক্তির অনেক ছবি দৈনিক কাগজে বেরিয়েছে। তার একটি ছবির কথা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। গোয়া-মুক্তির পর পাঞ্জিমের রাজপথে চলেছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গাড়ির সারি। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে অযাচিতভাবে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন গোয়াবাসী ভারতীয় ক্যাথলিক নায়কের কয়েকজন। মুখে পরম নির্ভর ও প্রশান্তির হাসি, তাতে রয়েছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য অভ্যর্থনার সুস্পষ্ট ছাপ। গোয়ার পরাধীনতা নির্মূল হয়েছে। কিন্তু একটি আঁচড়ও পড়েনি একটি ক্যাথলিক ধর্মস্থানে। সেণ্ট জেভিয়ার্স শুধু যে যথাস্থানে আগের মতই আছেন তা নয়, প্রথম সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও ছিলেন একজন ক্যাথলিক। তিনি এগিয়ে এসে সেণ্ট জেভিয়ার্সের কাছে নতজানু হয়ে অন্য ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন।

ভারত সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি
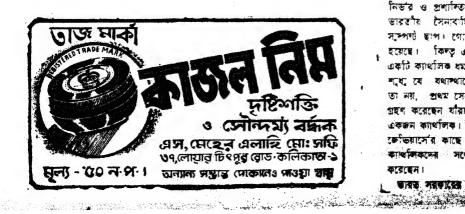
প্রাক্ মুক্তির প্রার্থনা ব্যবস্থায় পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের রাজনৈতিক মতলববাজের ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে।

এই ধর্মনিরপেক্ষ সরকারী নীতি সম্ভব হয়েছে শুধু সাধারণ ভারতবাসীর সহযোগিতাতেই। আরেকটু বাড়িয়ে বলা যায় যে, মূলত হিন্দুধর্মের বর্তমানের ব্যাপক উদারতায়। ধর্মনিরপেক্ষতাটা সব সময়ে চোখে পড়ে না। ওটা অনেকটা খোলা হাওয়ার মত। যতক্ষণ আছে কদর নেই। একটু কম পড়লে বা ঝড় উঠলেই প্রাণান্তকর অবস্থা, কিন্তু উদারতার মধ্যে একটা হৃদয় জয় করার মোহিনী শক্তি থাকে। স্থানকালপাত্রবিশেষে তা বিরাট খবর হয়ে ওঠে।

বৃহস্পতিবার, ১৬ই মার্চ। সকালে গঙ্গার পারে নৌবিহারে বারানসীর মন্দিরঘাট পরিদর্শন করছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট-জায়া জ্যাকেলিন কেনেডি। গাঁদাফুলে ঢাকা স্টীমলঞ্চটি তরতর করে বয়ে চলেছে। পেছনে আরও দুটো স্টীমলঞ্চে করে প্রায় ১৫০ জন সাংবাদিক চলেছেন। বেশির ভাগই আমেরিকান। যেই একটি মন্দিরের কাছে মিসেস কেনেডির লঞ্চটি এল, বেজে উঠল মন্দিরের ঘণ্টা। উদ্দেশ্য, স্বাগত জানান।

বিদেশীর কাছে বারানসীর পরিচয়—"Benares—the Holy City of the Hindus."
তার মন্দির থেকে অ-হিন্দুর উদ্দেশ্যে স্বাগত জানিয়ে ঘণ্টা ধ্বনি? "What ? But she is a Christian !" মন্তব্য করলেন একজন মার্কিনী খৃষ্টান টেলিভিশান ব্যাখ্যাকার। "Yes, but it is Hindu hospitality flowing out from the temples to the distinguished guest who has come all the way to Benares." উত্তর দিলাম।

বহু টেপরেকর্ডারে সেই ঘণ্টাধ্বনিকে আবদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। হয়তো এতদিনে মিসেস কেনেডির যাত্রার বিবরণীর সংগে বিভিন্ন তরংগে তা দেশে-বিদেশে পরিবেশিত হয়েছে।

হৃদয়-দুয়ার যেই খোলা হল, অমনি মন্দিরের প্রাংগণের বাইরে এসে পৌঁছাল সেই শাশ্বত আহবান—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" হোলির শুভদিনেই সেই আবির রংয়ের পোশাক-পরা, বিচিত্র রংএর ফুলের মালা গলায় ভিন্নধর্মী বিদেশিনীর মন রাঙিয়ে দিল বারানসীর মন্দিরের পূজারী।

প্রার্থনাসুলভ উদার বিশ্বজনীনতা বিশ্বের সামনে প্রথম শ্রেণীর সংবাদরূপে প্রচারিত হল।

সাংবাদিক ছাড়া আর কে ঘটাতে পারত এই পরিচয়?

শ্রীনেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন, আচার্য কৃপালনী যদি বিদেশে গিয়া একবার ভারতের দিকে তাকান তবে তিনি ভারতের যে কতখানি উন্নতি হইয়াছে তাহা সঠিক বুঝিতে পারিবেন।

খুড়ো বলিলেন—"তা হয়ত পারবেন। তবে কুতুবমিনার থেকে তাকিয়ে যা দেখা যাচ্ছে তাতে নীচের ঘর-বাড়ি-মানুষকে পুতুল-পুতুল ছাড়া আর অন্য কিছুই মনে হয় না।"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জনৈক বিরোধী সদস্য অভিযোগ করিয়াছেন, —সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর গলদ ছিল বলেই কৃষির ব্যাপারে যতটা অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নাই। —"কিন্তু আমরা তো মুখ্যমন্ত্রী মশায়ের চোখের অপারেশন সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছে বলেই শুনেছিলাম।" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

দিল্লির খবরে প্রকাশ, লোকসভার পরাজিত সদস্যদের উপর "বাড়ি ছাড়ুন" নোটিস দেওয়া হইয়াছে। আমাদের

জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"সদস্যগণ হয়ত মনে মনে বলছেন—ধন আর মান আর এই খাসা বাসা করেছিনু আশা!!"

দিল্লিরই অন্য এক সংবাদ—শ্রীনেহরুর বাসভবনে সংসদের বিদায়ী সদস্যগণকে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হয়। নেহরুজী সবাইকে লইয়া হোলি খেলায় মাতিয়া উঠেন—"হয়ত মনের বেতারে গানও চলেছে—রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ডাক ও তার বিভাগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা শুনিলাম পঞ্চান্ন। পরিষদের সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত এক সভায় জহরলালজী নাকি সদস্যসংখ্যার কথা শুনিয়া সহাস্যে মন্তব্য করেন—গণতন্ত্রের বৃদ্ধির প্রতীক! এত বেশী সদস্য থাকিলে পরিষদ জনসভা হইয়া উঠে। —"কিন্তু তাই বলে ভারতের বাণী নাম্পে সুখমস্তি তো আমরা ভুলতে পারিনে।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এক সংবাদে শুনিলাম এপ্রিল হইতে মেট্রিক ওজন ছাড়া অন্য ওজন অবৈধ। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন— —"পাষাণ ভাঙ্গার হাতসাফাইটা হয়ত ওজনের বাজারে বরাবরের মতোই বৈধ থাকবে!!"

বিদ্যুৎহার বৃদ্ধি সংগত কিনা তাহা নির্ণয়ের জন্য সরকার একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। —"কিন্তু কমিটির কী প্রয়োজন? মূল্য-বৃদ্ধির ব্যাপারে 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' নীতিটা মনে রাখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শুনিলাম, পাকিস্তান নাকি আরো বেশি গঙ্গাজলের দাবি জানাইয়াছেন।—"মনে না করে উপায় নেই—ভাগের মা গঙ্গা পায় না।"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় জনৈক সদস্য নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, অশীতিপর মহাস্থবির তাঁর মন্ত্রিসভায় কতকগুলি ভাঁড় রাখিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"মন্ত্রিপর্যায়ের খবরাখবর আমরা বড় একটা রাখিনে, তাই এই নিয়ে কিছু বলা আমাদের সাজে না। তবে এ কথা বলবই —মহারাজ যদি গোপালকে না রাখতেন তা হলে তাঁর রাজসভা নেহাতই মনুমেন্টের তলা হয়ে উঠত!!"

রুশ-চীনের সম্বন্ধে ফাটল ধরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। শুনিলাম, রাশিয়া চীনের সঙ্গে আর ধারে কারবার করিবেন না। —"কিন্তু হাজার হোক, বন্ধু তো! সুতরাং কড়া কথা না বলে

বরং 'বাকী চাহিয়া লজ্জা দিবেন না' নোটিস দিলেই হয়ত সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ, পথ-দুর্ঘটনার ফলে জনৈক ব্যক্তির চারিবার "মৃত্যু" হয় অর্থাৎ হার্টের কাজ

বন্ধ হইয়া যায়। সর্বশেষে চিকিৎসকগণ তাহাকে একটি বিদ্যুৎচালিত হৃদয় দান করিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন—উহাতেই হৃদয়ের কাজ চলিবে।—"কিন্তু হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে—কাজেও কি বিদ্যুৎচালিত হৃদয় সাড়া দেবে?"—প্রশ্ন করে আমাদের শ্যামলাল।

সিডনীতে শুনিলাম জনৈক ভদ্রলোক একটি উড়ন্ত হেয়ার কাটিং সেলুন তৈয়ার করিয়াছেন। —"আমাদের ইট-আলিয়ান বা ব্রিক্ সেলুনের মালিকরা অবহিত হউন।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এবার হোলি খেলায় তেমন উচ্ছৃংখলতা পরিলক্ষিত হয় নাই; অশোভন আচরণের জন্য মাত্র ১৭৯জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল —"এ আর এমন কী, Hooli-গানে দু-একজন তালকানা থেকেই থাকে!"

বেলগ্রেড হইতে প্রাপ্ত সংবাদে শুনিলাম, সেখানে নাকি একটি ১৬ মাইল লম্বা দুধের পাইপ স্থাপন করা হইয়াছে—উহার মধ্য দিয়া দিনে ৪৪০০ গ্যালন দুধ সরবরাহ করা হয়।—"তার চেয়ে অনেক গ্যালন বেশি দুধ আমরা হাইড্রেন্টের ভিতর দিয়ে সরবরাহ করে থাকি।"—বলেন বিশুখুড়ো।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে আমাদের ক্রিকেট খেলার ফলাফল দেখে অনেকেই মর্মাহত হইয়াছেন। বাকী খেলাগুলিতে তাঁরা কী করিবেন এ লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেও আর ভরসা হয় না। জনৈক ক্রীড়ারসিক স্মরণ করাইয়া দিলেন—"এটা চৈত্র মাস। বাবা তারকনাথের চরণে সেবা বলে আর্তনাদ করা ছাড়া আমাদের করণীয় আর কিছু নেই।"

রাজগি ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

রবীন্দ্রনাথ একদা ত্রিপুরায় বলিয়াছিলেন, "এই রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। * * এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগসূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।

"রাধাকিশোর ও বীরচন্দ্রের লেখার মত চিঠি আমি খুব অল্পই দেখেছি। সেগুলি যেমন সংযত, তেমনই সুসংস্কৃত—তেমনি সরস। মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ।" (১)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও প্রবণতার বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকার সূত্র ত্রিপুরার প্রতি কবির আকর্ষণের যে অন্যতম কারণ ছিল, তাহা তাঁহার আপন কথায় সপ্রিব্যক্ত। স্মরণযোগ্য শতাধিক বর্ষকাল মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধক ও স্রষ্টাদিগের মধ্যেও বহু মনীষীই ত্রিপুরার এই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতিদানে সম্মানিত করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় একদা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন ত্রিপুরার একটি সুবর্ণমুদ্রা "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য শ্রীশ্রীমতী মহারাণী গুণবতী মহাদেব্যা" বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ সন্দর্শনে পুলকিত ও উৎসাহিত হইয়া তৎসূত্রেই "বঙ্গভাষা সংবর্দ্ধন সভার" ত্রিপুরেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (২) অনুরূপ আকর্ষণেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ খ্যাতিমান পণ্ডিতবৃন্দের ত্রিপুরার সহিত সংযোগের কথা সমসাময়িক ইতিহাস সাক্ষ্যবহন করিতেছে।

ত্রিপুরায় বঙ্গভাষার প্রসার ও উন্নতি সম্বন্ধে অতীত সময়ে কেহ কেহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর (দেববর্ম), কৈলাসচন্দ্র সিংহ, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বিদ্দজনের প্রকাশিত আলোচনাসমূহে সীমীত পরিসরের মধ্যে ইহার সামগ্রিক আলোচনা সম্ভব হয় নাই। একারণেই এগুলি ভাষার গতিশীলতার ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত নহে। ভাষা ও সাহিত্যে বহুমুখীরূপ এবং ধারার আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক। সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সংস্কৃতিমূলক প্রধান ধারাটির বাহিরেও ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা ক্রমোন্নত হইয়া যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সাবলীল ও শক্তিসম্পন্ন ব্যবহারিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, আমাদের বর্তমান আলোচনা বাংলা ভাষার সেই বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট রূপটি লইয়া।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য

ইহাই হইল রাজগি ত্রিপুরার সরকারী বাংলা। ইহাই আবার প্রশসনিক আমলাই বাংলা। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে দুইখানি মূল্যবান অথচ অধুনাবিস্মৃত ঐতিহাসিক আদালতি দলিল সর্বাগ্রে উদ্ধৃত হইতেছে। এই দলিলগুলির রচনা, গঠন ও প্রয়োগ ইত্যাদি আঙ্গিকে সাহিত্যের বিচারেও এগুলি উচ্চ মূল্যায়নে সম্মানিত হইবে, সন্দেহ নাই। প্রায় নব্বই বৎসর পূর্বে (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) প্রচারিত সমকালীন দলিল দুইটিতে বাংলা ভাষায় মৌলিক তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য এবং প্রয়োগ, বহু শতকের প্রভাবিত আরবী-ফারসীর কেবলমাত্র আকস্মিক ও আবশ্যিক উপস্থিতি,

রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকিশোর

(১) ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থ, ৩৬২ পৃষ্ঠা।

(২) রেশমী রাজা—কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা।

ইংরেজী হইতে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রথমটির প্রসারিত হেতুবাদ এবং 'বলাৎভয় বিরহে', 'স্বত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব', 'যুগমস্তু', 'সুনন্নুধাবনী', 'জেনেদবন্দি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং ইহার নবম ধারার ভাষাবিন্যাসে মুন্সিয়ানা ও ব্যাকরণের লুকোচুরি খেলা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভাষার গতি যে পরবর্তী সময়ে সাধু ও মৌলিক ধারা হইতে সরল বা প্রাঞ্জল ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ক্রমেই পাওয়া যাইবে।

(নিদর্শন ১)

স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৩ বার্ষিক
১ম সংখ্যক নিয়মাবলী

ঐই নিয়মাবলীতে ১২৮৩ শক ত্রিপুরার (৩) ২রা মাঘ তারিখে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন।

ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্যে রাজকীয় বিধিসকল লিপিবন্ধক্রমে প্রচলিত করিবার নিয়মাবলী।

হেতুবাদ।

সমুদয় চরাচরের যথানিয়মে শান্তি-রক্ষার্থে এবং বলাৎভয়বিরহে (৪) নির্বিঘ্নে সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত কালযাপন করণার্থ যত্ন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য এবং প্রজাবর্গের স্বত্ত্বাধিকারীত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব রক্ষা করাই একমাত্র প্রধান ধর্ম বটে, সেই শান্তি ও স্বত্ত্বরক্ষার জন্য দেশের ঐ সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির আদায় দ্বারা সামাজিক ব্যবহার বিষয়ক নিয়ম স্থির হওয়া বিষয়ে যেহেতু কার্যের শাসনপ্রণালী নিয়মপ্রণালী পারতন্ত্র না হইলে মানববৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতারহিত ও সুখসমৃদ্ধির ও স্বত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব উদ্ধার ও সংরক্ষণের উপায়ান্তর নাই। সেই সকল নিয়ম ও বিধি লিপিবন্ধ হইয়া স্বাধীনরাজ রাজত্বসকলে প্রচারিত হওয়া উচিত ও তদ্দ্বারা সময়ে ২ দেশীয় ও বিদেশীয় বিধিসকল পরস্পর তুলনা ও পর্যালোচনাকরতঃ স্বরাজ্য প্রচলিত বিধির ব্যাপকত্বে যে যে অংশে অসম্পূর্ণতা নিমিত্ত দোষ জন্মে, সেই সেই দোষের সংশোধনকরণের উপায় স্থির করা যাইতে পারে; প্রজাবর্গ রাজনিয়ম সমস্ত অবগত হইয়া তদনুগামী হওয়তঃ স্বীয় স্বীয় ধনসম্পত্তি ও স্বত্ত্বাধিকার রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে। রাজনিয়মের প্রতিকূলতাচরণের প্রতিকার অবিলম্বে হইবার পথ হইতে পারে, সুবিচার বিধান হইবার জন্য বিচারকগণের সাহায্য হইবার উপায় হইতে পারে ফলতঃ দেশীয় ন্যায়ানুগত বিধি সমস্তের সুনন্নুধাবনী (৫) শ্রেণীমতে লিপিবন্ধ না থাকিলে সময়ে সময়ে বিচারকদিগের বিচারকার্যের ভ্রমপ্রমাদ সংযুক্ত হইয়া রাজার কর্তব্যকার্যসমূহে বিঘ্ন সংঘটন হইবার নিতান্তই সম্ভাবনা। এই ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে ভূতপূর্ব মহারাজগণের রাজত্বসময়ে যদ্যাপিও নানা বিধান প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যথানিয়মে সেই সকল বিধান শ্রেণী ও লিপিবন্ধ না থাকা প্রযুক্ত অসীম অসুবিধার কারণ হইয়াছে। যেহেতু সেই সকল অসুবিধা রহিত এবং ত্রিপুরা স্বাধীন রাজত্বের রাজকীয় নিয়মসকল লিপিবন্ধক্রমে প্রচার করা বিহিত, অতএব ইহা দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মসকল করা গেল।

১ ধারা। সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ইত্যাদি বিষয়ের কার্যবিধান যুগমস্তু (৬) পূর্বাপেক্ষা উত্তম করিবার নিমিত্ত এবং সকল লোকদিগের চিরমঙ্গল সাধননিমিত্ত যখন যে বিধিব্যবস্থা প্রচলিত করা হয়, তাহা বঙ্গভাষা ও অক্ষরে লিপিবন্ধরূপে হইবে। অলিখিত কোন বিধান কদাপি কোন কার্যে পরিণত হইবে না। সেই সকল বিধান যে বৎসরের প্রচারিত হয়, সেই প্রত্যেক বৎসরের প্রথমাবধি একাদিক্রমে অঙ্কচিহ্ন অর্থাৎ নম্বরাবলী করা যাইবেক।

ধারা ২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণ পূর্বাবধি যে নিযুক্ত আছে কি

(৩) ইংরেজী ১৮৭৪ অথবা ১২৮০ বাংলা সনে প্রবর্তিত নিয়মাবলী। সন স্থলে শক শব্দের ভ্রমাত্মক প্রয়োগ ঘটিয়াছে।

(৪) বলাৎ+ভয়+বিরহে=বলাৎভয়বিরহে। বল-উপজাত ভয় বিবর্জিত অর্থে তৎকালে প্রচলিত হইত।

(৫) সু+অনুধাবনী=সুনন্নুধাবনী। উত্তমরূপে অনুধাবিত অর্থে ব্যবহৃত।

(৬) সংস্কৃত ক্রিয়ায় অস্ (হওয়া)+তু (অনুজ্ঞায়)=অস্তু। যুগ এবং অস্তু শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে যুগোপযোগী অর্থে ব্যবহৃত।

উত্তরকালে হইবেক, তাহারা ঐ সকল নিয়মাবলীর প্রকৃত তাৎপর্যে ও অর্থানুসারে কার্য করিবে ও সকল লোকদিগের স্বত্ত্বাধিকারী এবং লভ্যাধিকারীত্বের যে যে নিয়মাবলীতে অবলম্বন করে, তাহা সকলের বিজ্ঞাপনার্থে ঘোষণা করা যাইবে।

ধারা ৩। উত্তরকালে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে ইহা বিবেচনা করিবার পথ হয় যে, কোন নিয়মাবলীর তাৎপর্য ও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল কিনা, এজন্য ঐ সকল বিচারক কি ক্ষমতাপন্ন কার্যকারকগণ সময়ে সময়ে ঐ সাক্ষাৎকারে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক হইলে অনুভবানুসারে ঐ নিয়মাবলীর যেরূপ মতান্তরকরণ কিংবা সংশোধন উপযুক্তবোধ হয়, তাহা ঐ শ্রীশ্রীযুত কর্তৃক হইতে পারিবেক।

৪ ধারা। যে তারিখে শ্রীশ্রীযুতের সম্মতি প্রদত্ত হয়, তাহা ঐ নিয়মাবলীর শিরোভাগে লিখিত থাকিবেক ও সেই তারিখাবধি সেই নিয়মাবলী প্রচলিত হইল এই প্রকার গণ্য হইবেক ও তৎপর তাহার অর্থ ও মর্মানুসারে কার্য হইবেক অন্য কোনমতে নহে।

৫ ধারা। যখন যে নিয়মাবলী প্রচলিত হয়, তাহার এক ২ প্রবস্ত নকল উপযুক্ত কার্যকারক দ্বারা প্রস্তুত হইয়া শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের ইংরেজি সহি ও পদ্মমোহর সংযুক্ত প্রত্যেক দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণ সমীপে যাইয়া অফিসে বর্তমান থাকিবেক; বৎসরান্তে সেই বৎসরের সমুদয় নিয়মাবলী একত্রিত হইয়া জেনেদবন্দি হইবেক। যে বিষয়ের যে নিয়মাবলী নূতন জারী হয়, তাহার অর্থ যদি সে বিষয়ের পূর্বের জারীহওয়া নিয়মাবলী সমুদয়ের কিংবা তাহার মধ্যে কোন মর্মের অর্থের সহিত না মিলে, তবে বোধ করিতে হইবে যে, পূর্বের জারীহওয়া নিয়মাবলী যে পর্যন্ত নূতন জারীহওয়া নিয়মাবলীর অর্থের সহিত মিলিত না হয়, পূর্বকার নিয়মাবলী সেই পর্যন্ত মতান্তর হইল পূর্বকার নিয়মাবলী রহিত হইল, এই প্রকার কোন স্পষ্ট আদেশ না থাকিলেও তাহা হইবেক।

৬ ধারা। যদি কোন বিচার ক্ষমতাপন্ন কার্যকারক কোন নিয়মাবলী কিংবা তাহার কোন অংশের অর্থ ও মর্ম পরিগ্রহ করিতে না পারেন, তবে স্বীয় উপরিস্থ কার্যকারক স্থানে তাহার অর্থাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। ঐ উপরিস্থ কার্যকারক শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের সম্মতিযুক্তে ঐ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ ধারা। ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে শাসন সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত যে সমস্ত কার্যকারক ও যে সমুদয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণের ক্ষমতা থাকিবেক, যে কোন বিষয়ে কোন নূতন নিয়মাবলী প্রচার হওয়া উচিত বিবেচনা করিলে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে তাহার প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রেত হইলে শ্রীশ্রীযুতের আদেশানুসারে উপযুক্ত কার্যকারক দ্বারা সাধারণের বোধগম্যরূপে প্রচলিত সুললিত সরল সাধুভাষায় তাহার পাণ্ডুলিপি হইয়া শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ও পঠিত হইবেক। তৎপর তাহা শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের মনোনীত হইলে উপরিউক্ত বিধানানুসারে প্রবল ও প্রচার করা যাইবেক।

৮ ধারা। এই নিয়মাবলী কিংবা উত্তরকালে যে সকল নিয়মাবলী প্রচারিত হয়, তাহা ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বের সমুদয় দেশে ব্যাপ্ত হইবে কোন ব্যক্তি জ্ঞাতাংশ অথবা বংশমর্যাদা প্রযুক্ত ঐ সকল নিয়মাবলীর বিধানের বর্জিত হইবে না।

৯ ধারা। এই নিয়মাবলী কিংবা উত্তরকালে যখন যে নিয়মাবলী প্রচলিত হয়, তাহার অর্থকরণে এক বচনবোধক শব্দ বহু বচন, বহু বচনবোধক শব্দে এক বচন ও স্ত্রী লিঙ্গবোধক শব্দে পুং লিঙ্গ ও পুং লিঙ্গবোধক শব্দে স্ত্রী লিঙ্গও বুঝাইতে হইবে। ইতি—

Sd. M. R. Roy ৭

(নিদর্শন ২)

স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৪ বার্ষিকী সংখ্যক নিয়মাবলী।

এই নিয়মাবলীতে ১২৮৩ ত্রিপুরার...... তারিখে (৮) শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র

---

(৭) ত্রিপুরার সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি রাজা মুকুন্দরাম রায় স্বাক্ষরিত।

(৮) ১৮৭৮ ইংরেজী অথবা ১২৮৩ বাংলা সনে প্রচারিত। প্রাপ্ত দলিলে তারিখ সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

মাণিক্য বাহাদুর স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্যে যে সকল বিচার আদালত সংস্থাপিত আছে ও উত্তরকালে হয় তাহার বিচারকারীগণ স্বারা নিষ্পত্তিপত্রাদি লিখিত হইবার বিধান করিবার নিয়মাবলী।

হেতুবাদ।

এই ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে যে সকল দেওয়ানী ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত আছে ও তাহাতে যে সকল মোকন্দমা নিষ্পত্তি হয়, তাহার বিচার বিষয়ের রোবকারী এবং উভয় পক্ষের গুজারিত সাক্ষিগণের সাক্ষ্যতাও শেষ নিষ্পত্তিপত্র সর্বদাই বিচারকারী স্বারা লিখিত না হইয়া আমলা স্বারা লিখিত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে ইহা নিতান্ত অসংগত ও শোচনীয় প্রথা বটে। ইহা স্বারা কোনমতেই সম্বিচার বিহিত হইবার ভরসা করা যাইতে পারে না বরং সময়ে সময়ে মোকন্দমাকারীদিগের স্বত্বের নীলাম হইবার সম্ভাবনা আছে যে-হেতু এই অন্যায্য ব্যবহার রহিত ও নিবারিত হওয়া উচিত ও উপযুক্ত বোধ হইয়াছে, অতএব নিম্নোক্ত বিধান করা গেল।

১ ধারা। ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্য প্রদেশে যে সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত আছে ও উত্তরকালে হইবেক, তাহার সকল শ্রেণীর বিচারকর্দিগের অবশ্যই কর্তব্য হইবে যে, তাহাদের স্বারা যে যে বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয়, তাহা অর্থাৎ বিচার্য বিষয়বস্তু এবং সেই সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেই সেই নিষ্পত্তির হেতু সকল আপনাদের হাতে লিখেন ও তাহাতে অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তার্পণ করিতে না দেন ও তাহা সর্বদাই আদালতের চলিত ভাষায় লিখা যায় যদি বিচারকের স্বীয় ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হয় ও বিচারকারী আদালতের চলিত ভাষা পরিস্কাররূপে লিখিতে সক্ষম নহেন, তবে বিচারকারীর স্বীয় হস্তে স্বীয় ভাষা লিখিত হইয়া আদালতের চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইবেক।

২ ধারা। উক্ত সকল শ্রেণীর আদালতের মোকন্দমাতে কি কার্যে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়, তাহা নিরতই বিচারকারী স্বারা লিখিত হইবে। যদি বিচারকারী শারীরিক দৌর্বল্য অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে সমুদয় জবানবন্দী লিখিতে অশক্ত হয়, তবে সমস্ত জবানবন্দী বিচারপতির আজ্ঞাধীনে ও কর্ণগোচরে আমলা স্বারা লিখিত হইবেক, তাহার সার-ভাব বিচারকারী স্বয়ং লিখিবেন ও যে যে কারণে সমুদয় জবানবন্দী বিচারকারী কর্তৃক লিখিত হইতে পারিল না, তাহার হেতুবাদ জবানবন্দীর নিম্নে তাহা লিখিবেন।

৩ ধারা। সকল শ্রেণীর বিচারকর্দিগের ইহা অতি দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাদিগের স্বারা এই নিয়মাবলীর অন্যথাচরণ করিলে তাহাদিগের নিষ্পত্তি ঐ হেতুমূলেই রহিত হওয়ার যোগ্য হইবেক।

Sd. B. C. Deb (৯) Sd. Nilmoni Das
Dewan.

ত্রিপুরায় প্রচলিত প্রশাসনিক বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্বন্ধে এযাবৎ বেশী আলোচনা হয় নাই। সম্প্রতিকালে আমাদের জনৈক অধ্যাপকবন্ধু "ত্রিপুরার রাষ্ট্রভাষা" প্রসঙ্গে একটি সাময়িক পত্রে (১০) খানিকটা আলোচনাপূর্বক আমাদের সংগ্রহ হইতেই সরকারী ভাষার ১৫।২০টি দালিলিক নিদর্শন বাছিয়া সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি ত্রিপুরা দরবারে মধ্যযুগে বাঙালীর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল কিনা, ত্রিপুর-রাজবংশের ইতিহাস, বাংলায় রচিত রাজাবলী, রাজমালা ইত্যাদি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রভৃতি অধিকতর অনুধাবনীয় বিষয়াদি

(৯) স্বাক্ষর—মহারাজ বীরচন্দ্র দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর।
(১০) সমকালীন (কলিকাতা)—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪।

সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ও সন্দিহান প্রশ্ন আরোপ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিটিই ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার প্রবর্তন সম্পর্কে দিকনির্দেশক জ্ঞান করি। উদ্ধৃত পত্রে আচার্যদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টীয় মধ্য-চতুর্দশ দশক হইতে ত্রিপুর দরবারে বাংলা ভাষা গৃহীত হইয়াছিল এবং ত্রিপুর দরবারে তদবধি একটি বলিষ্ঠ এবং কার্যকরী বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় কার্যে রাজভাষারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। রাজদরবারে ও প্রশাসনিক কার্যে বাঙালীর প্রভাব ছিল কিনা অথবা কতদূর ছিল, তৎসম্বন্ধে কেবলমাত্র একটি আলোচনার উল্লেখই (১১) কৌতূহলী পাঠকের সমীক্ষার পরিসর অনেকখানি বৃদ্ধি করিবে। ইহা শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতি-কুমারের সুচিন্তিত মতেরও পরিপোষক হইবে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ মতান্তরে চতুর্দশ শতকে রাজমালায় বর্ণিত ত্রিপুরেশ্বর রত্ন-মাণিক্য (আদি) গৌড়দেশ হইতে সৈনিক, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি বহু বঙ্গসন্তান ত্রিপুরায় আনয়নপূর্বক উপ-নিবিষ্ট করান। উপনিবিষ্টগণের মধ্যে রাষ্ট্র-নীতি অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও সুপণ্ডিত খাণ্ডব ঘোষ, জয়নারায়ণ সেন বৈদ্যরাজ ও আচার্য পণ্ডিতরাজ (ব্রাহ্মণ) ত্রিপুরার দরবারে বিশিষ্ট সম্মানলাভ এবং রাজকার্যে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ইহাদিগেরই বিশেষত বড়খাণ্ডব ঘোষের বংশধরগণের মধ্যে ২১।২২ জন কৃতী সন্তান পুরুষ-পরম্পরায় ত্রিপুর দরবারে উজীর, নারায়ণ, সেনাপতি, বিশ্বাস, ওয়াদদেদার, দেওয়ান প্রভৃতি পদে ও লজবে ধারাবাহিকভাবে রাজ-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজমালা গ্রন্থলেখক সুপণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে তদীয় গবেষণা-পূর্ব গ্রন্থরচনা উপলক্ষে তাম্রশাসনাদি ও কাগজে লিখিত পুরাতন সনন্দসমূহ দর্শনে এই বংশাবলীর এবং তাঁহাদিগের রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা এবং আরও প্রকৃষ্ট প্রামাণ্যসূত্রে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ত্রিপুরা-দরবার বেশ কয়েক শতাব্দীকাল বঙ্গসন্তানগণের সাংস্কৃতিক প্রভাবে সুগভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ফলে, স্মরণাতীত কালাবধি বঙ্গদেশের প্রত্যন্তে অবস্থিত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যখণ্ডে বঙ্গ-ভাষাই রাজভাষার গৌরব অর্জন করে। শত শত বৎসরের বহিঃবিপ্লব এবং আন্তর্দেশীয় ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও বাংলা ভাষার ভিত্তি রাজ্যের সর্ববিধ সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক-ক্ষেত্রে দৃঢ়তর হইয়াছে। অবশ্য কালের প্রভাবে ইহা সাময়িকভাবে নবতর রূপ পরিগ্রহমাত্র করিয়াছে।

সমগ্র বঙ্গদেশের ন্যায় ত্রিপুরায়ও অন্তত ২।৩ শতাব্দীকাল রাজভাষায় যেমন ফরাসী-আরবী ও উর্দু শব্দ বহুল পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, পক্ষান্তরে সংস্কৃত ও দেশজ এমনকি পাহাড়ী সর্বজন পরিচিত ও বোধগম্য শব্দ ত্রিপুরা কদাপি বর্জন করে নাই। অনুরূপ কারণেই, বহু ইংরেজী শব্দের বাংলা অথবা মৌলিক প্রতিশব্দ রচনার পরিবর্তে, সম্প্রতিকালে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সহজবোধ্য সামান্য কিছু ইংরেজী শব্দই রাজভাষায় গৃহীত হইয়াছে। আঞ্চলিক-সংবেষ্টনী-নির্ভর প্রশাসনিক-রাজভাষা বিশুদ্ধ-সাহিত্য-কর্ম নহে। ইহা হইল সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ভাব বিনি-ময়ের অন্যতম বাহন। সুতরাং প্রশাসনিক আবশ্যিক সংযমের গণ্ডীতে সংযত থাকিয়া "সাধারণের বোধগম্য প্রচলিত সুললিত সরল সাধু ভাষায়" রাজকার্য পরিচালনের মধ্যেই যে প্রযোজিত ভাষার সর্বোত্তম কার্য-কারিতা ও সার্থকতা, ঐ আদর্শ পূর্ব-বিধৃত নিয়মাবলীতে (৭নং ধারা) অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সুষম সাযুজ্যের প্রকাশই ত্রিপুরায় রাজ-ভাষার ক্রমবিকাশের মূল সূত্র। প্রয়ো-জনের পরিসরও অবশ্যই রাজগির সীমানার মধ্যেই সীমায়িত ছিল। বহিঃরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাজ্যের পলিটিক্যাল বিভাগ হইতে ইংরেজীর মাধ্যমেই সংসাধিত হইত।

'হাওলাতী ভাষার' টেবুতে আমরা এখন অনেক স্থলেই বিভ্রান্ত হইতে চলিয়াছি। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, ভাষার সংস্কার সাধন এবং পরিশোভিত পরিবর্ধন আমরা করিব না। অবশ্যই করিতে হইবে এবং সুখের কথা, অধুনা অনেক ক্ষেত্রে বাংলা সরকারের প্রশাসনিক
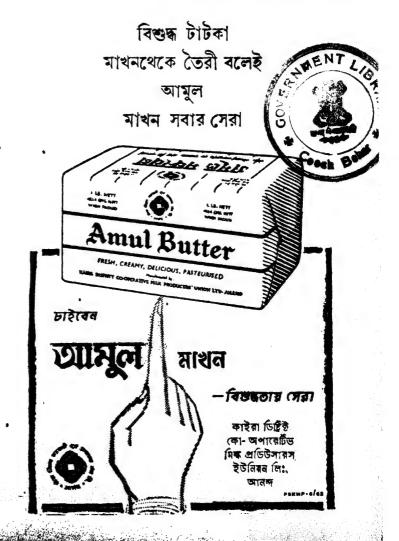
(১১) সমাচার শারদীয় সংখ্যা (আগরতলা), ১৩৬৮ বাং—১০২ পৃষ্ঠা।

ভাষায় সহজার্থজ্ঞাপক ও শ্রুতিমধুর বহু শব্দচয়ন এবং ব্যবহার শুরু হইয়া গিয়াছে। পরিভাষা সংসদ-সংকলিত পুস্তিকাগুলি(১২) হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল, যথা—

মহাকরণ, করণিক, পরিসংখ্যান, পর্ষৎ, অধিকার, অধিকর্তা, সমাহর্তা দন্ডাধিকরণ, ন্যায়াধিকরণ, প্রতিলেখ, লঘুলিপিক, প্রজ্ঞাপন, বর্গীকরণ, সমীকরণ, বাস্তুকার, যান্ত্রিক ইত্যাদি।

শোনামাত্রই অর্থগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না। তাই বলিয়া প্রশাসনের বহুমুখী ক্ষেত্রে সংস্কৃতের দুরূহ এবং সমাসবদ্ধ প্রতিশব্দ গ্রহণ কার্যকরিতার পক্ষে কতদূর সহায়ক হইবে তাহা বলা সুকঠিন। যথা,—

মূলপ্রেষণ-করণ, পার্লালিক প্রাক্-করণ, আসেধাজ্ঞা, আধর্ষপত্র, মহাপ্রেষাধিকারিক, প্রপন্নাধিকার, সাধিত্র সংস্কারক, দুষ্কৃতি-বিমর্ষ-বিভাগ ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, অনেক বিদেশী শব্দ সম্পর্কে চলতি শব্দই বহাল রাখা হইয়াছে। পারিভাষিক বিদ্বান্মন্ডলীর এই সিদ্ধান্তের সংগতি সুস্পষ্ট। যেমন,—

খাসমহাল, কানুনগো, রাইফল, লিফ্‌ট, লিনোটাইপ, হর্ন ইত্যাদি।

এখন আলোচ্য মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। তাহা হইল রাজ্যের ত্রিপুরার সরকারী ভাষা। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিপুর দরবার প্রশাসনিক ভাষাসৃষ্টিতে ও তাহার প্রয়োগে বাংলার মূল বুনিয়াদ ও কাঠামো ঠিক রাখিয়াছেন। প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের পারস্পরিক বোধ্য ভাষাই ইহার ফলশ্রুতি। এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে ত্রিপুরায় যে সকল প্রতিশব্দ গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়েকটির উল্লেখ হইল—

শাসন বিভাগ (Administration)
সংসার বিভাগ (Palace departments)
অর্জিত বিদায় (Earned leave)
অনুগ্রহ বিদায় (Privilege leave)
আকস্মিক বিদায় (Casual leave)
ব্যবস্থাপক সভা (Legislative council)
শিকস্তি (Dilluvian)
পয়স্তি (Alluvian)
পরিচিহ্ন (Decorations)
হেতুবাদ (Preamble) ইত্যাদি।

যে যে স্থলে সহজবোধ্য প্রতিশব্দ গ্রহণে অসুবিধার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল, তত্তৎস্থলে চলতি বিদেশী শব্দই বহাল রহিয়াছে, যথা,—

সেক্রেটারী, এফিডেবিট, পুলিস, ওয়ারেন্ট, গেজেট, খান্দান, ইস্তফা, এত্তেলা, রোবকারী, জরপ বা জরব (সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাঙ্কন) ইত্যাদি।

দেশজ এমন কি পাহাড়ী আশ্রিত শব্দও সমভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

কের, খারচী, ফুরুই বা ফুরাই, আলু; উনুই, রিয়, দুবড়া, খুম্কি, ঢক্, টাক্‌নী, কদ্‌বা, চন্ডাই, তৈথুং ইত্যাদি।

প্রশাসনিক ভাষায় ইংরেজী বাক্য অথবা বাক্যাংশ যে কী সুন্দর সাবলীল বাংলায় অনূদিত হইয়া সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হইত তাহা লক্ষণীয়। সামান্য কয়টি উদাহরণ বলা যায়, যথা—

Copies of the minutes and resolutions of the Council of Ministers are respectfully submitted to H.H. the Maharaja Manikya Bahadur for information.

মহামান্য মন্ত্রীপরিষদের কার্যবিবরণী ও নির্দ্ধারণ সমূহের প্রতিলিপি গোচর প্রার্থনায় সসম্ভ্রমে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ পেশ হয়।

To request the favour of furnishing the departments concerned with appropriate replies on the points at issue.

সংসৃষ্ট বিভাগ হায়ে বিবেচ্য বিষয়সমূহের যথাযথ উত্তর প্রেরণের বাসনায় নিবেদন।

Copy forwarded to so & so for information and necessary action.

অবগতি ও বিহিতের বাসনায় প্রতিলিপি 'অমুক' সমীপে প্রেরিত হয়।

For compliane
আচরণার্থ, তামিলার্থ
For information
গোচরার্থ
Minister's office—Revenue & General Department
মহামান্য মন্ত্রী আফিস—রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।
Current Penal Code (of Tripura)
চলৎ দন্ডবিধি
Interest control Act
কুসীদ নিয়ামক আইন
For appropriate action
উচিতানুষ্ঠানের জন্য
For thorough investigation
প্রকৃষ্ট তদন্তের জন্য
For smooth running and regularisation
কার্যসৌকর্যার্থ ও নিয়মিত করণার্থ
Ex-officio
পদবলে অথবা পদাধিকারে
Offices concerned
সংসৃষ্ট আফিস হায়ে
Contrary to the orders
আদেশের ব্যতিক্রমে

(১২) সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), ১ম ও ২য় স্তবক।

Until further orders
ভিন্নাদেশ তরে
With due regard to the budget allotment
বজেট বণ্টনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
Keeping the pension in suspense or abeyance
পেন্সন আবদ্ধ রাখিয়া
In continuation of
অনুস্মৃতিতে বা অনুসরণে
Law to come into force
আইন প্রবল গণ্য হওয়া
Good conduct pay
সদাচরণের জন্য বিশেষ বেতন
Whereas it is expedient
যেহেতু প্রতীতি হইতেছে
Officer-in-charge
ভারপ্রাপ্ত-কার্যকারক
Meritorious and distinguished service
প্রতিভান্বিত ও প্রখ্যাত সেবা
Expeditous and efficient service
কর্মতৎপরতা ও কার্যকুশলতা
In extension of the previous orders
পূর্বাদেশের সম্প্রসারণে
Compulsory and free Primary Education
বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা
Taking everything into consideration
যাবতীয় অবস্থা পর্যালোচনায়
Flag flying at half mast
পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় রাখা
ইত্যাদি।

ত্রিপুরার সরকারী বাংলায় বিদেশী শব্দের বিকৃত প্রচলনও অবশ্য লক্ষণীয়, যথা—

এডিকং (aide-de-camp)
রন্ফিরা (round duty)
হৈঃ চৈ এস্তাহার (Hue and Cry Notice)
হুকুমদার (who comes there ?)
কুমেদান (Commandant)
লেস্নাই (Lance Naik)

ইত্যাদি।

রাজকর্মচারিগণের মাসিক বেতন ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা ত্রিপুরায় প্রচলিত ছিল, যেমন মাসহারা, দরমাহ, খরচী, খোরপোষ ইত্যাদি। একদিকে এই সকল স্থানীয় পরিচিত শব্দের যেমন প্রতিশব্দ প্রচলনের চেষ্টা হয় নাই, অপরপক্ষে 'পেন্সন' শব্দ পেন্সনই রহিয়া গেল এবং তাহা একমাত্র অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইল।

ত্রিপুরার সরকারী চিঠিপত্রের প্রারম্ভে 'মহাশয়' এবং অন্ত্যে 'আপনার একান্ত বশংবদ ভৃত্য' লিখিবার রেওয়াজ কখনও হয় নাই। তৎপরিবর্তে, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন আফিসের অথবা সর্বশ্রেণীর অফিসিয়েল পত্রব্যবহারে 'সবিনয় নিবেদন' ও 'নিবেদক' দ্বারাই সহজভাবে কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। আধা-সরকারী পত্রে 'বিনীত', অথবা 'ভবদীয়' এবং প্রার্থনা পত্রাদিতে 'আজ্ঞাধীন'-ই যথেষ্ট বিবেচিত হইত।

রাজদরবারের ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের চলতি কথ্য ভাষার মধ্যে সৌজন্যের যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত তৎসম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধদৃষ্টি সম্ভবত সর্বাধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। ত্রিপুরার রাজদরবারে অথবা পারিবারিক পরিবেশে মান্যজনের সহিত চলতি কথোপকথনে করুন স্থলে 'করন যাক', বসুন স্থলে 'বসন যাক্', পান খান স্থলে 'পানের মরজী হউক' ইত্যাদি বাচনভঙ্গী বিশেষ সৌজন্য ও শালীনতা-দ্যোতক। রাজ্যেশ্বরকে মহারাজ সম্বোধনের পরিবর্তে 'শ্রীশ্রীযুত', 'ধর্মাবতার' অথবা 'সাক্ষাৎ' শব্দ ব্যবহার এবং রাজ্যেশ্বরের দিক হইতেও আমার, আমি-বাচক শব্দের স্থলে 'এপক্ষ' শব্দের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। এই দরবারী ভাষায় ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়ারূপে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা স্থাপন, কর্ম ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ, পরোক্ষ উক্তি, অনির্দেশক সর্বনাম, হেতুবাচক ও উদ্দেশ্যপূরক অব্যয় ইত্যাদির সুনিপুণ ব্যবহার কথ্য-ভাষাকে শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রকাশের একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছিল। পারিবারিক সম্বন্ধোল্লেখে পিতামহকে ঠাকুরদাদার স্থলে 'দেবা', পিতামহীকে ঠাকুরমার স্থলে 'দেবী', বউদিদিকে 'ভাওজ', মাতাকে 'মাঁন', বড়দাদাকে 'দাদা অথবা দা'-ডাঙ্গর', মধ্যমকে 'দা'-মধ্যম' ও ছোটকে 'দা'-ছোট' সম্বোধনের রীতিও অনুরূপ লক্ষণীয়। এই কথ্যভাষার বিশদ আলোচনা বিষয়বস্তু-বহির্ভূত বলিয়াই এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ-মাত্র করা হইল।

ইতোপূর্বে উদাহরণ স্বরূপই ত্রিপুরার সরকারী বাংলার সামান্য কতিপয় প্রচলিত শব্দ ও পরিভাষা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রশাসনিক কার্যে ব্যবহৃত বাংলার বিশিষ্ট দালিলিক নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে ত্রিপুরায় এই ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে

সম্প্রতিকালের ইতিহাসের খানিক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ত্রিপুরার রাজকার্যের সর্ববিধ বিষয়ে বাংলার ব্যাপক ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছে। তাম্রলেখ, শিলালিপি, সনন্দ, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাঙ্কন, রাজখান্দান ব্যঞ্জক পদ্মমোহর, প্রশাসনিক কার্যে ব্যবহৃত রাজাজ্ঞা মোহর, সীলমোহর, আফিস-আদালতে ব্যবহৃত আফিস মোহর, ছেপ্ত-স্ট্যাম্প, রসিদ টিকেট, বিচারাদালতে সাক্ষীর জবানবন্দী ও রায়প্রদান, রোবকারী, মেমো, সারকুলার, এস্তাহার, বিজ্ঞাপন, রাজ্যের আইন, নিয়ম, বিধি, নানাবিধ ফরম, যাবতীয় সরকারী চিঠিপত্র, আবেদন প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ কার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল। সময় সময় এই রাজভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কেও রাজ্যেশ্বরের, সর্বোচ্চ বিচারাদালতের এবং রাজমন্ত্রীর আদেশ বিঘোষিত হইয়াছে। আদেশগুলিতে কেবলমাত্র ভাষার ব্যবহার

সম্পর্কেই নহে, প্রাঞ্জলরূপে ভাবপরিস্ফুরণ এবং লিপিকার্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধেও রাজ্য-সরকার অবহিত থাকিয়া প্রজাসাধারণ তথা সরকারী কার্যকারকগণকে সুনির্দিষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এযাবৎলব্ধ নথী, নজীর, দলিলাদি দৃষ্টে বিগত শতকে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্রই (১৮৬২-১৮৯৬ ইং) এবিষয়ে স্মরণীয়কালে পথিকৃৎ ছিলেন। কাব্য ও সঙ্গীতরচনা এবং সমসাময়িক সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে বিশদালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, রাজ্যশাসন প্রণালীকে সংযত ও সুসম্বদ্ধ করা, আইনকানুন প্রচলন, বিচারাদালতের অধিবেশনে আজ্ঞা অনুজ্ঞাপ্রদান ইত্যাদি রাজকার্যে বীরচন্দ্র নিঃসন্দেহেই ত্রিপুরার প্রশাসনক্ষেত্রে 'রেনেসাঁ' অর্থাৎ নবযুগের প্রবর্তক ছিলেন।

তৎপুত্র মহারাজ রাধাকিশোর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকা অবস্থায়ও বহুকাল শাসন এবং বিচারবিভাগীয় কার্যে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত থাকিয়া বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। রাজ্যভার গ্রহণান্তর একদা তিনি রাজমন্ত্রীকে জানাইলেন,

"আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি।" (১৪)

প্রাক্-বীরচন্দ্র ত্রিপুরার প্রশাসনিক বাংলায় বিগত শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আরবী-ফরাসী প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার দলিলাদি হইতে দৃষ্ট হয়। সারা বাংলার সর্বত্রই অনুরূপ অবস্থা হইয়াছিল। বীরচন্দ্রের যুগটা ছিল বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-সংবাদ প্রভাকরের এবং "পর্বত স্বাধীন ত্রিপুরার" রাজদরবার ও তখন সমকালীন সাহিত্যের ভাবগঙ্গায় অবগাহন স্নানে প্রবৃত্ত। তবুও, সাহিত্য সাধনার প্রাণকেন্দ্র হইতে সুদূরে থাকিবার কারণেই সম্ভবত, দেখিতে পাই, এই যুগের দলিলগুলিতে একদিকে নবপ্রবর্তিত সাধুভাষায় সঙ্গে আভিধানিক মরা অথবা সংকর শব্দের খাপছাড়া প্রক্ষেপ, অন্যদিকে দুর্বোধ্য ও অল্পপরিচিত মুসলিম শব্দের অনায়াস এবং আকস্মিক আত্মপ্রকাশ। ব্যাকরণগত স্খলনও যেন ভাষায় নবারুণ রাগের উদয়পথকে অস্বস্তিকরভাবে মাঝে মাঝে মেঘমলিন করিয়া তুলিতেছে। ভাব ও ভাষার সাধনার ধারাবিবরণীতে ইহার রীতি প্রকৃতি পরিবর্তনের প্রাণবন্ত প্রয়াস অপরিহার্য। সুতরাং যতির বিরাম সামান্য ঘটিলেও গতিশীলতায় ইহার শক্তি ছিল অব্যাহত।

মহারাজ রাধাকিশোরের রাজত্বকালে (১৮৯৭-১৯০৯) সরকারী কার্যে ত্রিপুরায় বাংলাভাষার সর্বোত্তম উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্বভাবতই এই সময়ে একদিকে যেমন উর্দুর প্রভাব প্রশমিত হয়, অপরদিকে প্রশাসনিক ভাষায় গ্রহণীয় সর্বক্ষেত্রেই বোধগম্য বাংলা প্রতিশব্দসমূহ সঞ্চয়িত হইতে থাকে। পরবর্তী রাজ্যেশ্বরগণের আমলে রাজ্যশাসন প্রণালী ও কাঠামোতে ক্রমেই ইংরেজী শিক্ষায় এবং কায়দায় প্রভাবিত বহিরাগত বাঙালী উচ্চ কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে, রাজ্যান্তরের সহিত সংযোগস্থাপনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে, স্বরাজ্যেই ইংরেজী শিক্ষিতের ক্রমপ্রসারে এবং সর্বশেষে—সামান্য কারণ বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রশাসনিক কার্যে যান্ত্রিক কার্যোপযোগিতার সাঙ্গীকরণের উপলক্ষ্যে টাইপরাইটার স্টেনোগ্রাফারের আবশ্যিক আমদানিতে ইংরেজী ভাষার অধিকতর ব্যবহার ক্রমেই অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এ সময়েও দেখিতে পাই, রাজকীয় আদেশ এবং অভিপ্রায় প্রশাসনিক বিভাগকে বঙ্গভাষার আবশ্যিক ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশসমূহের প্রতিপাল্য অনুবর্তিতা সম্বন্ধে বারম্বার সতর্ক ও সাবধান করিয়াছে। পুরাতন আমলা ও রাজকর্মচারিগণ এ বিষয়ে পূর্বাপরই নিষ্ঠাসম্পন্ন ও সদাজাগ্রত ছিলেন। ভাষাজননীর প্রতি তাঁহাদিগের অতন্দ্র সেবা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

আইনের দৃষ্টিতে, পূর্বতন নৃপতিবর্গের আদেশ দ্বারা প্রবর্তিত বাংলাভাষাই প্রচলিত বিধান রদবদল না হওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজভাষা। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সহিত ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির সময় হইতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ফলে বিচারাদালতসমূহে সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদি প্রচলিত রীত্যনুযায়ী বাংলায় লিপিবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সম্প্রতিকালেও ত্রিপুরার সর্বোচ্চ বিচারাদালতের মাননীয় বিচারপতি মহোদয় পূর্বতন নিয়ম বহাল রাখিতে আদেশ জারী করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রশাসনিক অধিকরণসমূহ অবশ্য ভিন্নতর পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

অতঃপর ক্রমে ক্রমে আমরা রাজগি ত্রিপুরার প্রশাসনিক কার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা কিভাবে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত তৎসম্বন্ধে কতিপয় দালিলিক নিদর্শন উপস্থিত করিব। তৎপূর্বে, আলোচনার বিষয়বস্তু রাজকার্যে বাংলা ভাষার প্রবর্তন, ইহার ব্যবহার ও সৌষ্ঠববৃদ্ধি সম্পর্কে রাজকীয় ও প্রশাসনিক আদেশসমূহের আরও কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের বাংলা হস্তাক্ষর ছিল সত্যই যেন 'মুক্তার পাঁতি'। (১৫) ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজাদেশগুলি সমধিক আকর্ষণীয়।

(নিদর্শন ৩)

নং ৯ মেমো

খাস আপীল মোহর

Sd. M. R. Roy
Sd. Nilmoni Das
Dewan

রোবকারী দরবার খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ১২৮৪ ত্রিং ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৬)

অত্র রাজগীস্থ আফিসসমূহে যে সকল আরজি ও জওয়াব ও দরখাস্তাদি দাখিল হয় তাহা নিতান্ত কদর্য ও কদক্ষরে বাহুল্য কথায় লিখা হওয়া হেতু সময়ে ২ অনেক অসুবিধার কারণ ও তাহা বোধগম্যের ও পাঠের অনুপযোগী হওয়ায় আদালতের সময়ে ২ অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে ও অনর্থক সময় কর্তন করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএবঃ—

হুকুম হইল যে

বর্তমান সনের আগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে যে সকল আরজি ও জওয়াব ও

(১৪) [illegible]

(১৫) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা—মহারাজ বীরচন্দ্রের হস্তলিপি নিদর্শন (৪১নং পাণ্ডুলিপি চিত্র) দ্রষ্টব্য।

(১৬) খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অথবা ১২৮১ বাংলা সন।

দরখাস্ত ইত্যাদি অত্র রাজগীস্থ আফিস-সমূহে দাখিল করিবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাতে প্রয়োজনীয় বিবরণযুক্তে সংক্ষেপরূপে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে তদভাবে উল্লিখিত কাগজাত কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। তামিলার্থ অত্র রোবকারীর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি পাহাড় আদালতে ও আপীল আদালতের বিচারপতির নিকট প্রেরণ হয়। আপীল আদালতের উচিত যে, এই রোবকারীর মর্ম আপন আপন অধীনস্থ আদালতসমূহে অবগত করাইয়া সর্বদা দৃষ্টি রাখে যে উল্লেখিত আরজী আদি কাগজাত কদক্ষর ও বাহুল্য বিবরণে দাখিল হইতে না পারে। ইতি সং শ্রীনবীনচন্দ্র দাস
মোহরের

(নিদর্শন ৪)

খাস আপীল মোহর
৯নং সেহা
Sd. R. K. Deb. ১৭

রোবকারী কাছারী খাষ আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুর অধিবেশীত শ্রীলযুত রাধাকিশোর যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায় ও শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব বিচারপতিগণ। ইতি সন ১২৮৯ ত্রিং ৩২শে আষাঢ়। (১৮)

অধঃস্থ আদালত সমস্ত হইতে নানা বিষয় সম্পর্কে যে সকল এস্তমেজাজি রোবকারী সমাগত হয় ঐ সমস্ত এস্তমেজাজি রোবকারী মধ্যে কোন রোবকারীর হস্তাক্ষর ও এবারত এত অস্পষ্ট ও কদর্য যে তাহার ভাবগ্রহণ করা সুকঠিন অতএব ভবিষ্যতেও এইরূপভাবে রোবকারী ইত্যাদি লিখিত হইয়া আগত না হওয়ার পক্ষে অধঃস্থ আদালত কার্যকারকদিগকে সতর্কতা নেওয়া আবশ্যক। এতাবেতা

আদেশ হইল যে—

এই রোবকারীর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি আপীল ও তদধীনস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত আদালতে প্রেরণপূর্বক লিখা যায় যে কোন এস্তমেজাজি রোবকারী কি মেমো ইত্যাদির হস্তাক্ষর কদর্য অথবা এবারতের গোলমাল অর্থাৎ যদ্দারা লিখিত বিষয়ের ভাব ও তাৎপর্য গ্রহণ করিতে কঠিনতা কি দ্বিঅর্থ বিবেচনা হয় তবে ঐ সমস্ত আদালতের সম্পর্কিত কার্যকারকদিগকে উপযুক্ত ফল প্রদান করা যাইবে। ইতি সং শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী
মোহরের

(নিদর্শন ৫)

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট
প্রথম খণ্ড (খ)
১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ, ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার
ষোড়শ ভাগ-শ্রাবণ, প্রথম পক্ষ-সপ্তম সংখ্যা
(ক্রোড়পত্র)

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।
(১৩২৭ ত্রিং ১৫ই শ্রাবণ তারিখের ১১নং সারকুলার সংসৃষ্ট)
(ক্রোড়পত্র)

সারকুলার নং ৩ (১৯)—এরাজ্যে আফিস ও আদালতসমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা, এবং সর্ববিধ রাজকার্যে আবহমানকাল হইতে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা স্বর্গীয় মহারাজবাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংশোধনার্থে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে "নিষ্পত্তিপত্রাদি লিখিবার আইন" শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল গণ্য আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে এবিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্বার কর্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা কর্মচারীমাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

সর্ববিধ রাজকার্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে উৎকর্ষবিধান করা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ভিন্ন, আদালত ও আফিসসমূহের কাগজপত্রে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।

কোন বিচারক বা অন্যশ্রেণীর কার্যকারকের বাঙ্গালা ভাষা জানা না থাকিবার দরুণ অথবা উক্ত ভাষায় স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরি ইত্যাদি অন্য ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংসৃষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উক্ত কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গানুবাদ সহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে।

স্বাঃ শ্রীঅভয়কুমার গুহ
ভারপ্রাপ্ত—কার্যকারক।

স্বাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা
মন্ত্রী

(নিদর্শন ৬)

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট
প্রথম খণ্ড (খ)
১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ, ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার
ষোড়শ ভাগ-শ্রাবণ প্রথম পক্ষ-সপ্তম সংখ্যা।
(৭৪ পৃষ্ঠা)

সন ১৩২৭ ত্রিং তাং ১৫ই শ্রাবণ। (২০)

সারকুলার নং ১১—এরাজ্যের আফিস ও আদালতসমূহে সর্ববিধ রাজকার্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রী-আফিসের ১৩২৪ ত্রিং ১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সারকুলার দ্বারা বিধান করা হইয়াছে। বর্তমান সময়ে কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে। উক্ত সারকুলারের মর্মানুযায়ী কার্য হওয়া শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রেত। অতএব অতঃপর উপরিউক্ত সারকুলারের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য করা রাজকর্মচারিগণের কর্তব্য হইবে।

স্বাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত
চিফ দেওয়ান।

(১৭) স্বাক্ষর—যুবরাজ রাধাকিশোর দেববর্ম গোস্বামী বাহাদুর।
(১৮) খৃষ্টীয় ১৮৭৯ অথবা বাংলা ১২৮৬ সন।
(১৯) ইহা ১৩২৪ ত্রিপুরাব্দের (১৯১৪ ইং, ১৩২১ বাং) ১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সার্কুলার। পরবর্তী ১১নং সার্কুলারের ক্রোড়পত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।
(২০) খৃষ্টীয় ১৯১৭, বাংলা ১৩২৪ সন।

॥ ৪ ॥

ডাক্তার মুখার্জি কল্পনায় অনেকদূর চ'লে গিয়েছিলেন, তাই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর কিছু সময় লাগল। করবামাত্রই তিনিও উঠে দ্রুতপদে নেমে গেলেন। রকেট ঝিনুককে কামড়ায় নি, কিন্তু তার চারধারে চীৎকার আর দাপাদাপি করে এমন কাণ্ড করছিল যে, তা কামড়ানোর বাড়া। ডাক্তারবাবু ডাকতেই থেমে গেল রকেট। বিস্ময়বাস্ত ঝিনুকের দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন তিনি। ঝিনুক যে ভদ্রলোকের মেয়ে, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। ঝিনুককে তিনি আগে দেখেননি, চিনতে পারলেন না। ঝিনুক কিন্তু তাঁকে চিনেছিল। ডাক্তার মুখার্জি এ শহরে বিখ্যাত ব্যক্তি।

ডাক্তার মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এ সময়ে এখানে কি করছিলেন? আমার মতো আপনারও নক্ষত্র-দেখার বাতিক আছে নাকি?"

ঝিনুক সপ্রতিভভাবে বলল, "না, আমি নক্ষত্র দেখতে আসি নি। একটা ব্যাগ খুঁজতে এসেছি। আমার এক আত্মীয় একটু আগে ট্রেনে আসছিলেন, তাঁর হাত থেকে একটা ব্যাগ পড়ে গেছে এইখানে। সেইটেই খুঁজছি, যদি পাওয়া যায়—"

"ও, তাই না কি? পেয়েছেন?"

"না, এখনও পাইনি। এইখানেই ঝোপে-ঝাপে আছে কোথাও।"

ডাক্তার মুখার্জি পকেট থেকে টর্চ বার ক'রে দেখতে লাগলেন এদিকে ওদিকে আর রকেট শুঁকতে লাগল ঝিনুককে। একটু পরেই ডাক্তার মুখার্জি বেশ বড় একটা ব্যাগ দেখতে পেলেন।

"এই তো রয়েছে একটা ব্যাগ। এইটে কি?" সুঠাম মুকুজ্যে তুলে নিলেন সেটা।

"এ তো বেশ ভারী দেখছি। এ ব্যাগ তো হাতে ঝুলিয়ে নেবার নয়। কি আছে এতে?"

[illegible]

রুপো, হীরে-জহরত, আফিং-কোকেন যে-কোনও জিনিস থাকতে পারে। যারা বেআইনীভাবে সুবেদার খাঁয়ের মারফত জিনিস পাঠায়, তারাই বলতে পারে, কি আছে ওর মধ্যে। ঝিনুক একজন বাহক মাত্র।

"আমি ঠিক জানি না।"

এর পরই ঝিনুকের গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি। একটু দূরে ছিল সেটা, গাছের আড়ালে।

"ও গাড়িটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"অত দূরে দাঁড় করিয়েছেন কেন? সঙ্গে ড্রাইভার আছে?"

"না, আমি নিজেই ড্রাইভ করে এসেছি।"

"তবে চলুন, আমিই তুলে দি এটা আপনার গাড়িতে। আচ্ছা দাঁড়ান, বেচুকে ডাকি, বেশ ভারী এটা।"

তিনি পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের আওয়াজ হল একটা। গুলিটা ডাক্তার মুখার্জির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। লাগল না।

"এ কি কাণ্ড!"

সবিস্ময়ে বলে উঠলেন তিনি। ঝিনুকও অবাক হ'য়ে গেল। প্রথমে সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপরই পারল। অন্ধকারে সুবেদার খাঁর লম্বা চেহারাটাও দেখতে পেল সে। সুবেদার খাঁ বাইক চড়ে ঝিনুকের কাছেই এসেছিলেন। এসেই তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, ঝিনুকের সঙ্গে অপরিচিত কে একজন কথা কইছে, তখনই তাঁর মনে হ'ল, বামালসুদ্ধ ঝিনুক ধরা পড়েছে নিশ্চয়। সম্ভবত পুলিসের কোন লোক। হয়তো সন্ধে বেলা থেকেই লুকিয়ে ছিল আশেপাশে। অন্য কোন সম্ভাবনা কল্পনাই করতে পারলেন না তিনি। তারপর যখন হুইস্‌ল বাজল, তখন তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না। বুঝলেন পুলিসই এসেছে। তিনি অনায়াসে নিঃশব্দে সরে যেতে পারতেন, কিন্তু ঝিনুককে পুলিসের কবলে ফেলে আর যে-ই পালাক, সুবেদার খাঁ পালাবেন না। তিনি নিমেষের মধ্যে ঠিক করে ফেললেন, এই পুলিসটাকে জখম করে ঝিনুককে নিয়ে পালাবেন তিনি মোটরে করে। সাইকেলটাও তুলে নেবেন মোটরের কেরিয়ারে। তাঁর সঙ্গে একটা লোডেড রিভলবার সর্বদা থাকে।

ঝিনুক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সুবেদার খাঁর দিকে। কাছাকাছি এসে বললে, "কি করলেন আপনি! উনি ডাক্তার মুখার্জি। ভাগ্যে গুলিটা লাগেনি ও'কে। ছি, ছি, কি কাণ্ড করলেন বলুন তো—"

রকেট এতক্ষণ চুপ করেছিল, কিন্তু সুবেদার খাঁকে দেখে আবার তেড়ে গেল সে।

"নো রকেট, কাম্ হিয়ার।'

স্থিরকণ্ঠে আদেশ করলেন ডাক্তার মুখার্জি। রকেট চুপ করল। এগিয়ে এলেন সুবেদার খাঁ।

"আমি খুবই দুঃখিত ডাক্তার সাহেব। আমি আপনাকে ঠিক দেখতে পাই নি। আমি খরগোশ শিকার করতে এসেছিলাম। সন্ধ্যার পর এদিকটায় খরগোশ বেরোয়—আমি প্রায়ই শিকারে আসি। আপনার লাগে নি তো?"

"বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা একটু ছড়ে গেছে। বিশেষ কিছু নয়।"

বেচু গাড়ি নিয়ে হাজির হল। ঝিনুকের দিকে চেয়ে প্রশান্ত হাসি হেসে ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "বেচু আপনার জিনিসটা তুলে দিয়ে আসুক।"

ঝিনুক ডাক্তারবাবুর প্রশান্ত হাসি দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। তার ভয় হচ্ছিল কি কান্ডই না উনি করবেন। কিন্তু কিছু করলেন না তিনি।

"বেচু, এই ব্যাগটা ওই গাড়িতে তুলে দিয়ে এস।"

বেচু ব্যাগ নিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার মুখার্জি তখন সুবেদার খাঁকে বললেন, "আপনি কেন গুলি চালিয়েছিলেন তা আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা জানি—"

শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন সুবেদার খাঁ।

"কি কথা?"

"এ অঞ্চলে খরগোশ নেই। আমি এ অঞ্চলে প্রায়ই আসি, খরগোশ কখনও চোখে পড়ে নি।"

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন সুবেদার খাঁর দিকে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "তবে চোখের দৃষ্টি প্রখর থাকলে হয়তো দেখা যায়। আমার চোখের দৃষ্টি হয়তো তত প্রখর নয়।"

বেচু ফিরে আসতেই বললেন, "আমার ওষুধের বাক্সটা বার করে নিয়ে এস আর বড় টর্চটা।"

ওষুধের বাক্স থেকে টিঞ্চার আয়োডিন বার করে আঙুলে লাগালেন। তারপর নিজের রুমালটা ছিঁড়ে বললেন, "এখানটা ব্যাণ্ডেজ করে দে।" সেটাও আয়োডিন দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন।

নীরব বেচু এবার সরব হল।

"কি করে লাগল ওখানে?"

"টিলা থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম পা হড়কে।"

সুবেদার খাঁ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তারবাবুর গাড়ি চলে যাওয়ার পর ঝিনুক বলল, "উনি বুঝতে পারেন নি বোধ হয়।"

"তুমি যে এত বোকা তা তো জানতাম না। উনি সবই বুঝেছেন, কিন্তু কিছু বললেন না। এখন বলে তো কোন লাভও নেই। কিন্তু ওঁর উপর নজর রাখতে হবে। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের।"

"কি আছে ওর ভিতর?"

"আমি ঠিক জানি না। তবে খবর পেয়েছি সোনা রুপো আর জুয়েলারি আছে। হংকং থেকে আসছে। আমার মনে হয় আজ রাত্রেই এগুলোকে বিক্রি করে ফেলা উচিত। ধরা পড়ে গেলেই সর্বনাশ। আমরা হংকং-এর এজেন্ট দুজনকে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি। অন্তত সে টাকাটা আমাদের পাওয়া দরকার। হরিবোলের মারফত নম্বর ওয়ান বলে পাঠিয়েছিল সোনা রুপো জহরত এলে ভালো দাম দেব। চল, সোজা আমরা হরিবোলের কাছেই যাই।"

ঝিনুক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"চল, যাই—"

ঝিনুক তবু নড়ে না।

"ভয় পেয়েছ নাকি?"

"না, ভয় পাই নি। ভাবছি—"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি আমরা না হয় নরকে নেমেছি নিজেদের স্বার্থের জন্য। একটা আদর্শের জন্যও বলতে পারেন। কিন্তু আপনি নেমেছেন কেন। আপনার স্বার্থ কি শুধু টাকা?"

"হঠাৎ এ কথা আজ জানতে চাইছ কেন? এতদিন তো চাও নি?"

"হঠাৎ মনে হল কথাটা—"

"মনে হল কেন জান? আমি মুসলমান এই কথাটা কিছুতে ভুলতে পারছ না, এই তো?"

"সত্য কথাটা ভুলব কি করে?"

"মুসলমান হলেও আমি ভদ্র হতে পারি এ বিশ্বাসটাও কি নেই? বিশ্বাস কর তোমারও যেমন একটা আদর্শ আছে, আমারও তেমনি আছে।"

চুপ করে রইল ঝিনুক।

সুবেদার খাঁ বললেন, "আমি এই উপায়ে যত টাকা রোজগার করি তা তোমাদের জন্যই খরচ করি। তোমাদের মানে হিন্দু উদ্বাস্তুদের। অনেক ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ দি [illegible]

দিয়েছি। এ খবর এতদিন কেউ জানত না, আজ তোমাকে এখন বলছি। তোমাকেও বলতাম না, কিন্তু দেখছি তোমার মনে সন্দেহ জেগেছে। আমাকে সন্দেহ করো না ঝিনুক। আমি মুসলমান হলেও তোমাদের হিতৈষী।"

সুবেদার খাঁর গলার স্বর একটু কেঁপে গেল। এই কম্পনটা অনেকক্ষণ থেকে আশা করছিল ঝিনুক।

বলল, "আপনি হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভালবাসেন তা জানি। কিন্তু যে কথাটা জানি না সেইটেই স্পষ্টভাবে এখন জানতে চাইছি। আপনার এ ভালবাসায় কি কোনও স্বার্থ নেই?"

সুবেদার খাঁ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "এর উত্তর আর একদিন দেব। হয়তো আমাকে দিতেও হবে না, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। এখন চল যাই। একটা কথা শুধু বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি, আমি নীচ নই, কোনও বিশেষ মতলব নিয়ে আমি এ কাজে নামি নি।"

ঝিনুক কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়িটার দিকে অগ্রসর হল।

ডাক্তার মুখার্জি সেদিন মাঠ থেকে বাড়ি ফিরলেন না। সোজা নিজের ল্যাবরেটরিতে গেলেন। গিয়েই প্রথমে তাঁর আঙুলটা ড্রেস করে নিলেন ভালো করে। রুমাল খুলে স্টিকিং প্ল্যাসটার দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন ক্ষতটা। বিশেষ লাগে নি, রক্তও তেমন পড়ছিল না। এ নিয়ে বেশী হইচই হয় তা তিনি চাইছিলেন না। কি ভেবে ইনজেক্শনও নিয়ে নিলেন নিজেই নিজের পেটে ছুঁচ ফুটিয়ে। বেচু একটু বিস্মিত হচ্ছিল, কিন্তু তার বিস্ময় বাঙ্ময় হল না। ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে তার কৌতূহলের অন্ত ছিল না বলেই বোধ হয় সে কৌতূহলের ধারও ছিল না আর তার কাছে। অতি-ব্যথায় যেমন নির্ব্যথা হয়, অনেকটা তেমনি। ডাক্তারবাবু লিখতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অত রাত্রেও এক রোগী এসে হাজির। বললে, দুবার আপনাকে খুঁজে গেছি। যদি এখন—। ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "কাল দশটার পর এস। এখন কিছু হবে না।"

"এখানে সমস্ত রাত থাকার অসুবিধা আছে ডাক্তারবাবু, ধরমশালায় জায়গা নেই।"

"তুমি হোটেলে থাক গিয়ে। যা খরচ লাগে আমি দেব। তাড়াহুড়ো করে চিকিৎসা হয় না।"

লোকটি চলে গেল।

ডাক্তারবাবু লিখতে শুরু করলেন।

"সঙ্গে সঙ্গে লিখে না ফেললে হয়তো মনের ভাব অনেকখানি উবে যাবে। আমাদের মনের ভাব ইথারের চেয়েও ভলাটাইল (Volatile)। আমরা অহরহ মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি, মৃত্যুর অসংখ্য সম্ভাবনার ভিতর দিয়ে সর্বদাই পার হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সর্বদা সে খবর আমরা পাই না। সামনে একটা বাঘ বা সাপ দেখলে আমরা ভয়ে চমকে উঠি, কিন্তু অসংখ্য মারাত্মক ব্যাক্টিরিয়া যে সদাসর্বদা আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে এ খবর জেনেও আমাদের তত ভয় করে না। প্রত্যক্ষ দর্শনের জোর অনেক বেশী। স্থান কালের উল্লেখ করব না, কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাকে লক্ষ করে রিভলবার ছুঁড়েছিল একটা লোক। পরমায়ু ছিল তাই লাগে নি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তার সঙ্গে জড়িত ছিল একটি নারী, যে নারী মা হয়, মেয়ে হয়, প্রেয়সী হয়, তাদেরই একজন। আমি অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পাই নি, কিন্তু তবু মনে হল মেয়েটি রূপসী। সে বলল সে নাকি ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া একটা ব্যাগ কুড়োতে এসেছে ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে। কেন সে ওখানে ব্যাগটা নিতে এসেছিল তা জানবার দরকার নেই, যে দরকারের কথা সে বলল তা-ও যাচাই করবার চেষ্টা আমি করি নি, কারণ সে যা বলল তা যে মিথ্যা তা বোঝবার জন্য খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। এই জন্যেই যেন বেশী ভালো লেগে গেল মেয়েটিকে। নিজের কাজ হাঁসিল করবার জন্যে অনায়াসে কেমন অভিনয়টা করে গেল। ওর কথা ভেবে হঠাৎ মনে পড়ল একটি ছোট ছেলের কথা। সে তখন খুবই ছোট ছিল। বছর চার পাঁচের বেশী নয়। চা খাচ্ছি, সে এসে বলল, আমাকে চা দাও। বললাম, এতটুকু ছেলে চা খায় না, বড় হলে চা খায়। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। তার দৃষ্টির ভাবটা বেশ স্পষ্ট, বড়, মানে কত বড়? আমি তখন পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললাম, যখন গোঁফ হবে তখন চা খেও। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল এবং একটু পরেই ঘুরে এসে বললে, এইবার দাও। গোঁফ হয়েছে। দেখি সে কালীর দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে ঠোঁটের উপর গোঁফ এঁকে এনেছে। তখন এ দেখে খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সবাই ওই রকম কালী দিয়ে গোঁফ এঁকে কাজ হাঁসিল করবার চেষ্টা করছে। সেটা যে হাস্যকর হচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না অনেকে। একটু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে বেশ মজা লাগে। এই মজার আস্বাদ আজ কিছুটা পেয়েছি—ওই মেয়েটিকে দেখে। তারপরই করুণা হয়েছিল, মনে হয়েছিল উঃ, জীবনযুদ্ধ কি নিদারুণ ব্যাপার! মানুষকে কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যায়। অনেকে নিপুণভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে,

অনেকে পারে না। প্রাণিজগতে এবং উদ্ভিদজগতেও এ ছদ্মবেশ ধারণের নানা-রকম বিস্ময়কর নমুনা দেখা যায়। এক বিশেষ জাতের গিরগিটিই শুধু বহুরূপী নামে পরিচিত, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে—প্রধানত পেটের তাগিদে—অনেককেই বহু রূপ ধারণ করতে হয়। যখন বায়োলজি পড়তাম তখন ওদের নানা কাহিনী পড়ে বিস্মিত হয়েছি। সেদিন একটা দেখলামও। মাঠে বসেছিলাম। পাশেই শুকনো কাঠির মতো পড়ে ছিল কি একটা। অনেকক্ষণ সেটাকে লক্ষই করিনি। হঠাৎ কানের ভিতরটা চুলকে উঠল, আমার কানে কাঠি দেওয়ার অভ্যাস আছে। একটা কাঠির খোঁজে এদিক-ওদিক চাইতেই দেখতে পেলাম সেটাকে। হাত দেওয়া মাত্রই কিন্তু লাফিয়ে চলে গেল। কাঠি নয়, ফড়িং। বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে আত্মরক্ষা করবার জন্যই জীবজগতে ছদ্মবেশের প্রয়োজন। উপনিষদ বলেছে, অরূপই আনন্দের প্রেরণায় বহুরূপ ধারণ করেছেন। কি সত্য, তা জানি না। কিন্তু এটা দেখছি বহুরূপ ধারণ না করলে সংসারে চলে না। পিতার কাছে আমার যে রূপ, পুত্রের কাছে সেই রূপেই নূতন রঙের আমেজ লাগাতে হয়। প্রভুর কাছে আমি যে রূপে থাকি, ভৃত্যের কাছে সে রূপে থাকি না। বন্ধুকে যে রূপে দেখা দিই, শত্রুকে সে রূপে দিই না। প্রত্যেকেই আমরা বারবার রূপ বদলাচ্ছি। অনেক সময় টেরও পাই না যে, বদলাচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় যে মেয়েটি চোরাই মাল সরাতে এসে অতগুলো মিথ্যা কথা বলে গেল সে কি মিথ্যাভাষিণী ছাড়া আর কিছু নয়? আমি জানি সে অনেক-কিছু। সে নিশ্চয় সত্য কথাও বলে, আবার ছলনাও করে। সে প্রাণভরে ভালও বাসে, ঘৃণাও করে। এক রূপে থাকবার উপায় নেই আমাদের, আমরা সবাই বহুরূপী। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই বহুরূপী মেয়েটা যদি ধরা পড়ে তা হলে আর একজন বিচারক-বেশী বহুরূপী তাকে সাজা দেবেন। যে সমাজ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, সেই সমাজকে রক্ষা করতে হলে চোর-ডাকাতকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। চোর-ডাকাতদেরও নিজেদের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। যে লোকটি আমাকে লক্ষ করে গুলী চালিয়েছিল সে সম্ভবত ওই মেয়েটিরই দলের লোক। মেয়েটিকে নিরাপদ করবার জন্যেই গুলি করেছিল আমাকে। নিজের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য কে না গুলি চালিয়েছে পৃথিবীতে? পৃথিবীর সভ্য লোকেরাই তো এ কাজ করে, অনেক সময় তারা এজন্য বীর বলেও গণ্য হয়, খবরের কাগজে তাদের খবর ছাপা হয়, আমরা তাদের ছবি টাঙিয়ে রাখি, ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম ওঠে। আমি যদি ওই লোকটার সঙ্গে যুদ্ধ করে ওকে পেড়ে ফেলতে পারতাম, যদি ওকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে পারতাম থানায়, তা হলে আমারও জয়-জয়কার হ'ত। হয়তো আমারও নাম কাগজে ছাপা হত। কিন্তু এসব ব্যাপার আমার কাছে বড়ই হাস্যকর মনে হয়। পৃথিবীতে অহরহ যুদ্ধ হচ্ছে, আমিও একজন যোদ্ধা, শুধু শুধু আর একজন যোদ্ধাকে বিপর্যস্ত করা কি উচিত? আমি যাদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই গুলি-গোলা ছুঁড়ছি সেই ব্যাক্‌টিরিয়াগুলো যদি কোনও মন্ত্রবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করে আমাকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যায়, কেমন হয় তা হলে, তারা যদি বলে আমরা আমাদের নিজেদের বাস্তুভূমিতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিলাম এই লোকটা নানাভাবে আমাদের উৎখাত করবার চেষ্টা করছে? ও লোকটা আমাকে লক্ষ করে গুলী ছুঁড়েছিল, আমি বেঁচে গেছি এইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আবার পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে ও আবার আক্রমণ করবে এবং এই হৈ-চৈও হৈ-চৈও ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। আমিও একজন যোদ্ধা, প্রত্যেকেই যোদ্ধা হ'তে বাধ্য, যোদ্ধা না হলে বাঁচা যায় না, কিন্তু আমার মনের কথা হচ্ছে আমি যোদ্ধা হতে চাই না। আমি চাই সবায়ের সঙ্গে যথাসম্ভব বনিবনাও করে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধটা দেখি। কিন্তু তা অসম্ভব। কিছুতেই হচ্ছে না। এত চেষ্টা করেও বনিবনাও হয় না কারও সঙ্গে। কেউ কাছে আসে না, সবাই পালিয়ে যায়, কিংবা অতর্কিতে আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। আকর্ষণের যে সূত্র এখনও খুঁজে পাই নি, এইটেই বোধ হয় আমার জীবনের ট্র্যাজেডি, হয়তো অনেকেরই জীবনের ট্র্যাজেডি, কিন্তু অধিকাংশ লোক সেটা বুঝতে পারে না, অনুভব করে না। আমিই বুঝেছি সকলের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা না পড়তে পারলে আনন্দ নেই, কিন্তু সে আনন্দ পাওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই বোধ হয়। আমি কাছে এলেই সবাই পালায়, আমাকে দেখতে পেলে কেউ বা গুলী ছোঁড়ে, কেউ বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে, অনেকেই আড়ালে নিন্দে করে, কিংবা চক্রান্ত করে আমাকে অপ্রস্তুত করবার। মানে, আমাকে কেউ চায় না, হয় আমাকে দিয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করাতে চায়, কিংবা তাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় হ'লে সরিয়ে দিতে চায়। সুসভ্য মানব-সমাজেও একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের অন্য সম্বন্ধ নেই। আমার পক্ষে এটা মর্মান্তিক। আরও মর্মান্তিক এই জন্যে যে, সকলেই মনে করে আমি খুব সুখী।"

এই পর্যন্ত লিখে চুপ করে বসে রইলেন সুঠাম মুকুজো। অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

॥ ৩৪ ॥
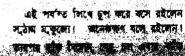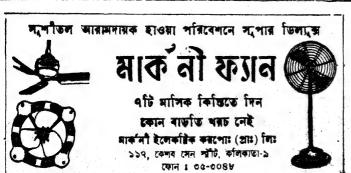
সুজাতা মিত্রের কাহিনীতে একদিন আমাকে আঅসতেই হবে। কিন্তু তার আগে কক্‌টেল এবং মিস্টার সরাবজী।

মিস্টার সরাবজী ভারতীয় প্রথায় হাত-জোড় করে খাঁটি বাঙলায় বলেছিলেন, "আসুন, আসুন। এই বার-এ আপনাকে পেলে আমি আর কিছুই ডর করি না।"

সরাবজী আমাদের নতুন বার ম্যানেজার। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, পাকা আপেলের মতো টক-টকে চেহারা। বয়সের ভারে একটু যেন নুয়ে পড়েছেন। অবাক হয়ে বললাম, "আপনি বাংলা জানেন?"

"কী যে বলেন! এই কলকাতা শহরে আমি যখন এসেছি তখন আপনারা এই ওয়ার্লডে আসেননি, আমার নিজেরই তখন চৌদ্দ বছর বয়স।" সরাবজী তাঁর সাদা প্যাণ্টের বক্‌লেসটা টাইট করে নিয়ে আমার পিঠে হাত রাখলেন।

আমি বললাম, "আবগারি খাতাগুলো ঠিক করে রাখা দরকার, ওগুলোর নাম শুনলে ভয় লাগে।"

সরাবজী তাঁর চোখের মোটা চশমাটা খুলে প্রসন্ন হেসে বললেন, "ওদের আমি ভয় পাই না। আমি যদি ডিউটি ফাঁকি দেবার না চেষ্টা করি, যদি আমি ড্রিংকে জল না মেশাই, যদি আমি কোনো সন্দেহ-জনক মেয়েকে একলা বার-এ বসে থাকতে না দিই, তা হলে এক্‌সাইজ ডিপার্টমেণ্টকে আমি কেন ভয় করতে পাবো?"

শাজাহানের বার-এ সরাবজী নিজের হাতে বোতলগুলো সাজিয়ে রাখছিলেন। হেড্‌ বারম্যান রাম সিং সায়েবের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। সরাবজী অভ্যস্ত হাতে একটা বোতল আলোর দিকে নিয়ে নেড়ে দেখলেন কতটা আছে, তারপর আবগারি ডিপার্টমেন্টের স্টক রেজিস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে ও'র যেন একটু সন্দেহ হলো। বললেন, "রাম সিং, খাতায় লেখা চার পেগ, অথচ পাঁচ পেগের মত মাল রয়েছে মনে হচ্ছে।"

হাতের মাপ তো কোথাও একটু কম, কোথাও একটু বেশী পড়ে যায়।"

সরাবজী বললেন, "আমি এর ভিতর নেই। নিজের হাতে আমি কাউকে কমও দেবো না, বেশীও দেবো না।"

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সরাবজী বললেন, "আমরা যখন এই লাইনে আসি তখন এক আধপেগ ড্রিংকের জন্যে কেউ মাথা ঘামাতো না। তখন যার দাম ছ' টাকা ছিল এখন তা ছিয়াশী টাকাতেও পাওয়া যায় না। এখন কাস্টমারকে এক ফোঁটা কম দেওয়া মানে ফাঁকি দেওয়া।"

সরাবজী এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। নিজের মনেই বোতলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তারপর আমাকে বারে একলা রেখে সেলারে চলে গেলেন। মাটির গর্ভে দেড় শো বছরের প্রাচীন একটা অন্ধকার ঘর আছে, সেখানে সাধারণের যাওয়া নিষেধ। সেই অন্ধকার সেলারের কোণে এমন বোতলও আছে যা শাজাহানের প্রতিষ্ঠাতা সিম্পসন সায়েব নিজের হাতে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তারপর শাজাহানের বুকের ওপর দিয়ে ইতিহাসের চাকা কতবারই তো গড়িয়ে গিয়েছে। সোলা-টুপি এবং খাকি প্যাণ্ট পরে তরুণ ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নেমে হিন্দুস্থানের প্রথম রাত্রি শাজাহান হোটেলে কাটিয়েছেন। সেদিন সেই নিঃসঙ্গ সৈনিককে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে এই কুঠুরি থেকেই স্কচ বোতল বেরিয়ে এসেছে। গঙ্গা নদীতে পালতোলা জাহাজের বদলে যেদিন কলের জাহাজ দেখা গিয়েছিল সেদিনও শাজাহানের সেলার থেকে পাঠানো পানীয়তেই উৎসব-রাত্রি মুখর হয়ে উঠে-

ছিল। তারপর খাকি টুপি এবং হাফ্‌প্যাণ্ট পরা একদল লোক হাতে নকশা নিয়ে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের দলপতি দাড়িওয়ালা ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন স্পেনসেসের বড়াপোচখানায় উঠেছিলেন। আর দলের কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছিলেন আমাদের এই শাজাহানে। বার-এ বসে বসে তাঁরা দিনরাত কাগজের কি সব নকশা আঁকতেন। বারম্যানরা বলতো, পাগলা সায়েবের দল এসেছে—এরা কলের গাড়ি আনবে বিলাইত থেকে। তামাম হিন্দুস্থানের পায়ে এরা বেড়ি পরিয়ে দেবে—লোহার রাস্তা তৈরি করবে, এবং একদিন তার উপর দিয়ে বিরাট বিরাট দৈত্য ছোটাছুটি করবে। দৈত্যদের লড়াই-এ হারিয়ে দিয়ে সায়েবরা লোহার বাক্সে বন্দী করে রেখেছে। দৈত্যরা এখন তাই কিছুই করতে পারে না, শুধু মাঝে মাঝে মনের দুঃখে নিশ্বাস ছাড়বে—আর সেই কালো নিশ্বাসে হিন্দুস্থানের সুখের গ্রাম, সোনার ধানক্ষেত পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। সায়েবরা মনে মনে তা জানে, মাঝে মাঝে ওদের মনে দুঃখ হয়—সেইজন্যে দিনরাত মদে চুর হয়ে থাকেন। সায়েবরা বিদায় নিয়েছেন। একদিন এই বাধাবন্ধহীন ফুর্তিকেন্দ্র শাজাহানের পানাগারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সর্বনাশ হয়েছে। কেউ কোনোদিন যা ভাবতে পারেনি তাই হয়েছে—পামার কোম্পানী ফেল করেছে। রাতারাতি অনেক রাজা ফকির হয়েছেন। ভূতপূর্ব রাজার দলকে মনোবল দেবার জন্যে শাজাহানের সেলার থেকে আবার ব্রাণ্ডি, হুইস্কি এবং জিন-এর বোতল বেরিয়ে এসেছে। হুইস্কির মোহিনী মায়ায় কলকাতা আবার সব ভুলে গিয়েছে। নতুন বড়লাট এসেছেন, নতুন ছোটলাট এসেছেন—আবার নতুন বোতল ভেঙে নবাগতদের স্বাস্থ্যপান করা হয়েছে। তার পর শাজাহানের কর্তারা একদিন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। বড়াপোচখানায় নতুন কল এসেছে। লিফ্‌ট। পায়ে হেঁটে আর কাউকে উপরে উঠতে হবে না। অবশ্য বড়াপোচখানায় এখন এই লিফ্‌ট কেবল লেডিজদের জন্যে। তাঁরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে একটা খাঁচার মধ্যে গিয়ে বসছেন, আর দু'জন বেয়ারা দড়ির কপিকল দিয়ে সোঁ সোঁ করে টেনে তাঁদের উপরে তুলে দিচ্ছেন। এর পর কেউ কি আর লিফ্‌ট-বিহীন এই সেকেলে শাজাহানে আসবে? সে-চিন্তাও তাঁরা যখন করেছেন তখন তাঁদের সামনে ছিল শাজাহান হুইস্কি—স্পেশালি বট্‌ল্‌ড ইন স্কটল্যাণ্ড ফর হোটেল শাজাহান। এমনি করেই একদিন শাজাহানের আকাশে নতুন শতাব্দীর সূর্যোদয় হয়েছে। দিন পাল্টিয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টিয়েছে, পোশাক পাল্টিয়েছে, রাজা পাল্টিয়েছে, হোটেলের মালিক পাল্টিয়েছে, বারমেড্‌ পাল্টিয়েছে, বারম্যান পাল্টিয়েছে কিন্তু হুইস্কির পরিবর্তন হলো না। 'আকাশের চন্দ্র সূর্য এবং মাটির হুইস্কি—এদের কোনোদিন পরিবর্তন হবে না'—হরস সায়েব আমাকে একবার বলেছিলেন। ও'র কাছেই শুনেছিলাম সেলারে সিম্পসন সায়েব যে এক কেস রেড ওয়াইন রেখে গিয়েছিলেন, তার একটা বোতল খোলা হয়েছিল সেবার যখন লর্ড কার্জন আমাদের এই হোটেলে পদার্পণ করেছিলেন। তার পর বাকি ক'টা বোতল আজও কোনো বৃহৎ অতিথির আবির্ভাব অপেক্ষায় শতাব্দীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে রয়েছে।

সরাবজী একটু পরেই ফিরে এলেন। এখন দুপুরবেলা—লাঞ্চের ভিড় শেষ হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন ক্লাইভ স্ট্রীট কর্তা এক কোণে বুঁদ হয়ে বসে রয়েছেন, লাঞ্চ করতে এসে নেশার ঘোরে আপিসের ঠিকানা ভুলে গিয়েছেন, বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "টুম্‌ জানটা হায়? বিল্‌কুল্‌ গড়বড় হো গিয়া।"

বেয়ারা বেচারা বলছে, "হুজুর, আপনি কোন্‌ আপিসে কাজ করেন তা আমি কি করে জানবো?"

নেশার ঘোরে সায়েব এবার আমাকে ডেকে পাঠালেন, "তোমরা এই সব গুড-ফর-নাথিং ফেলোদের রেখেছো কেন?"

সরাবজী এবার কাউণ্টার থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সায়েবকে বললেন, "তুমি অমুক অফিসে কাজ করো।"

সায়েব চমকে উঠলেন, "এতক্ষণে মনে পড়ছে আমি ওখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অথচ কোথায় কাজ করি তা মনে করতে না পেরে আমি দেড় ঘণ্টা এখানে বসে আছি।"

সায়েব চলে যেতে, সরাবজীকে বললাম, "কেমন করে বললেন?"

সরাবজী হাসলেন, "এদের প্রায় সবাইকে আমি চিনি। শুধু অফিস নয়, [illegible] বাড়ির ঠিকানাও হোটেলের লোকদের [illegible] রাখতে হয়, [illegible]
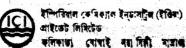
খাবার সামর্থ্য থাকে না। ড্রাইভার থাকলে অসুবিধে হয় না, কিন্তু অনেকে যে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসেন। তখন গাড়ি পড়ে থাকে, ট্যাক্সি করে আমরা বাড়ি পেঁাছে দিই।"

এর পর গল্প করবার মতো সময় আমাদের ছিল না। সন্ধ্যের ককটেলের অনেক কাজ।

যদি কখনও আধুনিক পৃথিবীতে আদিম সভ্যতার রসাস্বাদন করতে চান তবে সুযোগ পেলেই ককটেলে আসবেন। মিসেস পাকড়াশির পার্টিতে আমি সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। সরাবজী আমার কানে কানে বলেছিলেন, ককটেলের চারটে অধ্যায় আছে। প্রথম প্রহরে ঠাকুর ঢেঁাক অবতার, দ্বিতীয় প্রহরে ঠাকুর ধনুকে টঙ্কার, তৃতীয় প্রহরে ঠাকুর কুকুরকুণ্ডলী, চতুর্থ প্রহরে ঠাকুর বেনের পুঁটুলি।

প্রথম অধ্যায়ে অতিথিরা সহজ সাধারণ। তখন—কেমন আছেন? হাউ ডু ইউ ডু? মিসেস সেনকে দেখছি না কেন? উনি কি রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিলেন নাকি? পুওর মিস্টার সেন! যা হোক, মিসেস পাকড়াশি এতদিনে তা হলে একটা কাজের কাজ করলেন। আরও দু বছর আগে অনিন্দার বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এখন ওয়েস্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন — অ্যাভারেজ ম্যারেজেব্‌ল্ এজ্ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে সংসার পাতছে। আর ইণ্ডিয়াতে বিয়ের বয়েস শুধুই বাড়ছে। কিছুদিন পরে হয়তো অ্যান্টি-সারদা অ্যাক্ট পাশ করতে হবে।......কংগ্রাচুলেশনস্ মিসেস পাকড়াশি। হোয়াট অ্যাবাউট এ ড্রিংক?'

'নিচ্ছি, মিস্টার ব্যানার্জি। আমি অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিচ্ছি। তা বলে আপনারা লজ্জা করবেন না। আপনারা ওদের দুজনের হ্যাপি লাইফ ড্রিংক করুন। ক্যারি অন। শ্যামপেন ককটেলও রয়েছে, আচ্ছা চলি, ওখানে মিস্টার আগরওয়ালা একলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমাদের জন্যে উনি অনেক করেন। রিয়েল ফ্রেণ্ড।'

মিসেস পাকড়াশি চলে যেতেই ব্যানার্জিকে বলতে শুনলাম, 'হ্যালো পি-কে, মিসেস পাকড়াশির পার্টির মাথামুণ্ডু বুঝি না। ড্রেস ইভনিং করা উচিত ছিল। তা না লাউঞ্জ সুট। ব্যাড্। আফটার অল্ ইভনিং সুট না হলে পার্টির ডিগনিটি থাকে না। ক্যালকাটা যেভাবে উচ্ছন্নে যাচ্ছে তাতে এমন একদিন আসছে যেদিন তোমারই অফিসের ক্লার্ক হয়তো লুঙ্গি পরে তোমার পাশে এসে বসবে। তুমি কিছুই বলতে পারবে না।'

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে। শোনা গেল, 'কেন আমরা কোট প্যান্ট টাই পরে গরমে সেদ্ধ হচ্ছি? কি দরকার এই সব ফরম্যা-লিটির? [illegible]

দো রোব রম বানাও। স্কচ হুইস্কি, ব্রাণ্ডি সরাব ঔর এ-বিটি। জলদি জলদি খিদমতগার, তুম বহুৎ আচ্ছা আদমী হ্যায়।' '...শ্রীমতী অনিন্দ্যকে দেখছো। ভ্রূ নয় তো যেন এক জোড়া ধনু। সহর্ষে সেই ভ্রূধনু ভঙ্গ করে ভদ্রমহিলা কথা বলছেন।' আর একজন বললেন, 'ঠিক হলো না। বলো মৃগলোচনা সুন্দরী তাঁর যৌবন মত্ত তনু-দেহ হিল্লোলিত করে কথা বলছেন!'

তৃতীয় অধ্যায়—হুইস্কির কল্যাণে তখন দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার। তখন চারিদিকে কথার ফুলঝুরি—জানেন, আমার ওয়াইফ কি সিলি? ড্রিংক করেছি শুনলে কাঁদতে আরম্ভ করে। আরে, এ কী ধরনের ন্যাকামো? সত্যি বলছি, আমি একটা এ ডবল এস্। মাধব পাকড়াশিও তাই। আবার বাঙালী মেয়ের হাঙ্গামায় গেলেন। মোমের পুতুল ছোকরার লাইফটা মিজারেবল্ করে দেবে। হ্যাঁ বাবা, বিয়ে যদি করতে হয় পাঁচ-নদীর তীরে। ওয়াণ্ডারফুল, ওদের মেয়েরা ড্রিংকের কদর বোঝে। রবি ঠাকুরও ওদের বুঝেছিলেন। না হলে এত দেশ থাকতে পাঞ্জাবের নামটা জাতীয় সংগীতে আগে ঢোকালেন কেন? পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ—কবি একদম মেরিট অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছেন। ওই দেখ রাজপাল কেমন মিসেস রাজপালের সঙ্গে বসে মনের সুখে পেগের পর পেগ ফাঁক করে দিচ্ছে। কি নিয়েছে ওরা? প্যারাডাইস? ওয়াণ্ডারফুল, জিন, অ্যাপ্রিকট আর অরেঞ্জের মিক্সচার সত্যিই স্বর্গীয়। যে নাম দিয়েছিল তার পেটে সামথিং ছিল, আর ওই নিঃসঙ্গ সুন্দরী, উনি কী টানছেন? ও'র দাম অনেক, অনিন্দ্য পাকড়াশির স্ত্রী সম্বন্ধে বোম্বাই-এর ফ্যাশন কাগজে প্রবন্ধ লিখবেন। হোয়াট? হোয়াইট লেডি নিয়েছেন—জিন আর লাইম। পুওর গার্ল—দেখে মনে হচ্ছে প্রিয়বিরহক্লিষ্ট। ও'র আসঙ্গমুগ্ধ নারী-চক্ষু কাউকে খুঁজে পাক, ও'র অধর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠুক, তখন ও'কে একটা পুরো গেলাস পিংক লেডি দাও। তাতে থাকবে

জিন, সঙ্গে ডিম এবং গ্রেনাডিন। ওয়াণ্ডার-ফুল। তখন ও'র মৃগলোচনে কাজলের মসিরেখা ফ্লোরেসেণ্ট পেন্টের মত জ্বলজ্বল করবে। আরে ব্রাদার, তোমার হলো কি? এরই মধ্যে হাত গুটিয়ে বসে আছো? তুমিও কি আজকালকার ফ্যাশনেবল্ লেম্বুপানি সায়েব হয়ে গেলে নাকি? বোকামি ক'রো না। এমন সুযোগ রোজ আসবে না। এমন চান্স পাবে না। শ্যাম্পেন কক্‌টেলে লোকে কিছু তোমাকে রোজ ইনভাইট করবে না। মনে থাকে যেন এক এক পেগ বারো টাকা। টেনে নাও ব্রাদার। অক্ষিতারকার কটাক্ষ, স্ফুরিত অধরের হাস্য ভুলে গিয়ে কারণ-সাগরে ডুব দাও।'

চতুর্থ এবং শেষ অধ্যায়ে অনেক কম লোক। তৃতীয় বারেই বোল্ড আউট হয়ে অনেকেই পালিয়েছে। হোস্টের তখন যাবার ইচ্ছে, কিন্তু পালাবার উপায় নেই। অতিথি-দের মধ্যে ড্রিংক ছেড়ে ওঠবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কেউ নেশার ঘোরে অহিংসপথে সত্যাগ্রহ করে বসে আছেন। আর কেউ হয়ে উঠেছেন হিংস্র। যেন কাঁচের বাসনের দোকানে মত্ত ষাঁড় ঢুকে পড়েছে। গেলাস ভাঙছে, খালি বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে। কী যে হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। মিসেস পাকড়াশি স্বামীর সঙ্গে সরে পড়েছেন। পাকড়াশি ইন্ডাস্ট্রিজের পি-আর-ও শুধু বিল মেটাবার জন্যে, এবং প্রয়োজন হলে পুলিসের হেফাজত সামলাবার জন্যে রয়ে গেলেন। এক এক করে হলঘর প্রায় শূন্য হয়ে গেল। কিন্তু তখনও দু-একজন সেখানে বসে থাকতে চান। পি-আর-ও বললেন, 'স্যার, বার বন্ধর সময় হয়ে আসছে।'

'শাট্ আপ। এ কী ধরনের ভদ্রতা? নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসে না খেতে দেওয়া?'

পি-আর-ও বেচারা তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা আর অতিথিরা কাজ শেষ করবার জন্য ঢকঢক করে আরও কয়েকটা পেগ সেরে ফেললেন, তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা তখন ভাঙা গেলাসের হিসেব করতে বসি। 'কালকে বিল পাঠিয়ে দেবেন, আজকে কাউণ্টারসাইন করে দিয়ে যাচ্ছি'। বলে পি-আর-ও বেরিয়ে যান।

এর নামই কক্‌টেল পার্টি। ঝলমলে সন্ধ্যায় পুত্র এবং পুত্রবধূকে নিজের দু-দিক নিয়ে মিসেস পাকড়াশি যখন বার-এ ঢুকেছিলেন, তখন সবটা কল্পনা করে নিতে পারিনি। অতিথিরা সেই একই সার্কাস পার্টি। কারণ কলকাতা শহরে যারা নেমন্তন্ন করে তাদের কাছে একটা মাত্র লিস্টি আছে। সেই একই লিস্টি দেখেই সবাই আর-এস-ভি-পি মার্কা কার্ড পাঠাচ্ছেন।

অনিন্দ্য পাকড়াশি আজ যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে একবার একটু থেমেছিলেন, হয়তো দু-একটা কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মিসেস পাকড়াশি বললেন, "খোকা, এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে গল্প করবার সময় নয়, গেস্টরা তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

অনিন্দ্যর সঙ্গে আর কথা বলবার সুযোগ পাইনি। বলবার ইচ্ছেও ছিল না।

তবু বারবার হালকা হাসির ফোয়ারার মধ্যে, রঙীন মদের সোনালী নেশার ভিতর দিয়ে একটা বিষণ্ণ মহিলার মুখ বারবার অহেতুকভাবে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে বার থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ও তাঁকে মন থেকে তাড়াতে পারিনি।

মিসেস পাকড়াশির পার্টিতে আমার হয়তো কোনো লাভ হয়নি। কিন্তু হোটেলের হয়েছিল—একটা কক্‌টেল থেকে আমরা দশ হাজার টাকার চেক পেয়েছিলাম। আবগারি ইন্সপেক্টর হিসেব পরীক্ষা করতে এসে বললেন, "চমৎকার, এই রকম কক্‌টেল যত হয় তত আপনাদেরও লাভ, গভর্ন-মেন্টেরও লাভ।"

"বেয়ারাদেরও লাভ।" সরাবজী হাসতে হাসতে বললেন।

"দুনিয়াতে সবারই লাভ, শুধু ক্ষতি যদি কারুর হয় তার নাম সোল—আত্মা।" গলার আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখি হব্‌স সায়েব।

হব্‌সের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে খুব আনন্দ হলো। মাথার টুপিটা খুলতে খুলতে সায়েব বললেন, "মার্কোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এক বন্ধুর জন্যে ঘর চাই। কিন্তু ম্যানেজারকে পেলাম না।"

"এর জন্যে ম্যানেজারের কী প্রয়োজন? আমরা তো রয়েছি।" অভিমানভরা কণ্ঠে আমি অভিযোগ জানালাম।

হব্‌স বললেন, "তা হলে ব্যবস্থা করে দাও।"

ও'কে নিয়ে বার থেকে বেরোবার পথে সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সরাবজীকে দেখেই মিস্টার হব্‌স যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি? তুমি এখানে?"

সরাবজী ম্লান হাসলেন। "সবই তাঁর ইচ্ছা। আমরা কী করতে পারি?"

সরাবজী [illegible] হব্‌স [illegible] [illegible]

পারে আন্দাজ করে আমি এগিয়ে গেলাম। কাউন্টারে খাতায় হব্‌স সায়েবের বন্ধুরে কোনো জায়গা করে দেওয়া যায় কি না দেখতে লাগলাম। হব্‌স এসে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "কলকাতার হোটেলজীবনকে আমি যতদূর জানি তাতে এইটুকু বলতে পারি, রিসেপশনিস্ট ইচ্ছে করলে সব সময় জায়গা করে দিতে পারে।"

বোসদা কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "একদিন সত্যিই তা ছিল। কিন্তু ফরেন ট্যুরিস্ট, বিজনেস, ট্যুর এবং কনফারেন্সের দৌলতে সে-ক্ষমতা কোথায় উবে গিয়েছে। ম্যানেজার নিজেই সব সময় বুকিং-এর উপর শ্যেন দৃষ্টি রেখেছেন।"

হব্‌স সায়েবের বন্ধুর অবশ্য কোনো অসুবিধা হলো না। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে জায়গা খালি ছিল, পাওয়া গেল।

হব্‌স সায়েব প্রশ্ন করলেন, "সরাবজী কবে থেকে এখানে এলেন?"

"এই কিছুদিন।" আমি বললাম।

"ও'র মেয়ের কী খবর?"

আমি কিছুই জানি না। সুতরাং বোকার মতো ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হব্‌স এবার প্রশ্ন করলেন, "মার্কো কোথায়?"

"বেরিয়ে গিয়েছেন। বোধ হয় মিস্টার বায়রনের কাছে গিয়েছেন।"

একটু হেসে বললেন, "তোমাদের এই হোটেলটা আমি যেন এক্স-রে চোখ দিয়ে দেখতে পাই। বোধ হয়, তিনি কর্পোরেশন স্ট্রীটে মেকলে পান করতে গিয়েছেন।"

লর্ড মেকলের নামে যে কোনো পানীয় আছে তা জানতাম না। হব্‌স হেসে বললেন, "পেনাল কোডের রচয়িতা ঐতিহাসিক মেকলে বেঁচে থাকলে আঁতকে উঠতেন। বাঙালীরা তাঁর কী সর্বনাশ করেছে। দেশী মা কালী মার্কা ধেনোর নাম দিয়েছে মেকলে। তোমাদের অনেক আচ্ছা আচ্ছা কাপ্তেন জন হেগ, ভিন্সপস স্কচ ফেলে মেকলে খেতে যান।"

হব্‌স এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছুক্ষণ দেখেই যাই। মার্কোর সঙ্গে একটু প্রয়োজনও ছিল।"

আমরা দুজনে লাউঞ্জে এসে বসলাম। বোসদা এগিয়ে এসে বললেন, "ও'কে কিছু অফার করো। চা বা কফি পাঠিয়ে দেবো? আমরা সামান্য হোটেল কর্মচারী কীই বা ও'কে দিতে পারি। পৃথিবীর খুব কম লোকেই হোটেল সম্বন্ধে ও'র থেকে বেশী জানে।"

হব্‌স বললেন, "বেশ, কফি খাওয়াও। উনিশ শতকের অষ্টম দশক থেকে তোমাদের হোটেলে কতবারই তো খেয়ে গেলাম, আর একবার খাওয়া যাক।"

বোসদা আমাদের জন্যে কফির অর্ডার [illegible]

ঝুঁকে পড়েছে। বললেন, "ইউরোপের সেরা কোনো ঔপন্যাসিক যদি এখানে এসে কয়েক বছর থাকতেন, তা হলে হয়তো এক আশ্চর্য উপন্যাস লিখতে পারতেন। ওয়েস্টের বহু হোটেল আমি দেখেছি—কিন্তু ইস্টের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সিম্পসন, সিলভারটন, হোবার্টন থেকে আরম্ভ করে তোমাদের মার্কো পোলো, জুনো এমনকি এই সরাবজী সব যেন বিশাল ঐতিহাসিক উপন্যাসের এক একটা চরিত্র।"

হাতে সময় ছিল। হব্‌সকেও সময় কাটাতে হবে। তাই বোধ হয় গল্প জমে উঠলো। কফির কাপে চুমুক দিয়ে, হব্‌স বললেন, নরি সরাবজী যে কোনোদিন তোমাদের হোটেলে এসে চাকরি নেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ওকে আমি সেই প্রথম যুদ্ধের আগে থেকে দেখছি। তখন হাফেসজীর দোকানে ছোকরা ড্রিংক সার্ভ করতো। আমার মনে আছে, আমাদেরই এক বন্ধু একবার একসাইজ ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট করেছিল। ওর আসল নাম সরাবজীও নয়—বোধ হয় ম্যাডান না ওই ধরনের কি একটা। সরাবের লাইনে থেকে থেকে ছোকরা সরাবজী হয়ে গেল।

ম্যাডানের তখন কত বয়স—চোদ্দ বছরের বেশী নয় বোধ হয়। বেচারা কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার হাত চেপে ধরেছিল। অত কম বয়সের ছেলেদের মদের দোকানে চাকরি দেবার নিয়ম নেই, রিপোর্ট করেছে কে, এবার চাকরি গেল। আমার দুঃখ হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করে সে রিপোর্ট আমি চাপা দিতে পেরেছিলাম। তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পার্সীদের মধ্যে এমন দারিদ্র্য তো নেই। ওদের এত ট্রাস্ট আছে, এত দান নেবার সুযোগ আছে যে, কোনো কম-বয়সী ছেলের পথে ঘোরবার প্রয়োজন নেই।

তাই মনে একটু সন্দেহও জেগেছিল। বিপদ মিটলে একদিন হাফেসজীর দোকানে গিয়েছিলাম। সেদিন বার-এ তেমন ভিড় ছিল না। একটা ছোটো পেগের অর্ডার দিয়ে বসলাম। সরাবজী আমাকে দেখেই ছুটে এল। আস্তে আস্তে বললে, "আপনি এইভাবে না দেখলে এতক্ষণে আমাকে চৌরঙ্গীর পথে পথে ঘুরতে হতো।"

আমি বললাম, "তোমার কাজ সেরে এসো। কথা আছে।"

সুরাবজীকে বলেছিলাম, "তুমি এত কম বয়সে ছোটো কাজ করছো কেন?"

সরাবজী ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে বলে-ছিল, "আমি অরফ্যান বয়। আমি অরফ্যান স্কুলে মানুষ হয়েছি। আমার মাথায় বুদ্ধি নেই, তাই ও'রা অত চেষ্টা করলেন, তবু পড়াশোনা হলো না। ও'রা বলেছিলেন, কোন্ একজন [illegible] একে-[illegible] কিন্তু হলো না। আমার মাথায় ঢুকলো না। [illegible] পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছি।"

আমি বলেছিলাম, কোনো ট্রাস্টের সাহায্য নিলে পারো। সরাবজী রাজী হয়নি। "না স্যার, জন্ম থেকে বাবা মা-ই যাকে সাহায্য করতে রাজী হলো না, সে কি করে অন্যের কাছে সাহায্য চাইবে? সেটা ভাল দেখায় না। গড্ নিশ্চয়ই চান আমি কেবল নিজেকেই সাহায্য করি। আমি আপনাদের আশীর্বাদে কেবল সেই চেষ্টাই করবো।"

[ক্রমশ]

রাহা ছিলেন সাধারণ লোক
নিজের স্ত্রী
... ছেলেমেয়ে
ছোট্ট একটি বাড়ী
ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পড়ালেন
তারা যখন বড় হলো
মেয়েদের বিয়ে দিলেন বেশ ঘটা ক'রে
ছেলেকেও ভালো চাকরীতে ঢোকালেন
এখন শান্তমনে অবসর নিয়েছেন

মরুসাগরের লিপিমালা

সুবোধকুমার মজুমদার

১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা তখন সবেমাত্র নীরব হয়েছে। এমন সময় মধ্যপ্রাচ্যের মরুসাগর অঞ্চলে এক চাঞ্চল্যকর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কাহিনী শুনে পৃথিবীর লোক চমৎকৃত হ'ল। শোনা গেল, সাগর উপকূলে দুর্গম গিরিগুহায় বহু প্রাচীন লিপিমালা আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে বললেন, এগুলি হচ্ছে বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি—এযাবৎ যা পাওয়া গেছে, তার থেকেও প্রায় হাজার বছরের বেশী পুরাতন। দলে দলে সাংবাদিক ছুটে এলেন, বাইবেলের দেশ প্যালেস্টাইনে—"Dead-Sea Scrolls" সংক্রান্ত টাটকা খবর সংগ্রহের আশায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সংবাদপত্রে, বড় বড় হরফে ছাপা হতে থাকল মরুসাগর লিপিমালার রোমাঞ্চকর কাহিনী। কোন কোন পণ্ডিত এমন মতও প্রকাশ করলেন যে, সমগ্র অঞ্চলটি জুড়ে এককালে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যে এমন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যার ফলে এই গ্রন্থাগারটি মাটির তলে চাপা পড়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। কেবল রক্ষা পেয়েছিল কয়েকটি বহুমূল্য নিদর্শন—সুদীর্ঘ চামড়ার পাতে লেখা ও সযত্নে বস্ত্রখণ্ডে জড়িত Old Testament এর কয়েকটি পাণ্ডুলিপি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যদিয়ে এগুলির আবিষ্কার সম্ভব হয়।

এই আবিষ্কারের কাহিনী খুব চমকপ্রদ। মরুসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ Jericho শহরের কিছু দক্ষিণে, অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলে মহম্মদ আধিব নামক এক বেদুইন যুবক তার ছাগলের পাল চরাত। একদিন ঘটনাচক্রে একটি ছাগল পাল থেকে ছিটকে পড়ে। মহম্মদ ছাগলটিকে খুঁজে বার করার অনেক চেষ্টা করল। দুর্গম পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ভেঙে, বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে অনেক ছোটাছুটি করে সে বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল—কিন্তু কিছুতেই ছাগলটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এদিকে মরুভূমির মধ্যাহ্ন-সূর্য ঠিক মাথার উপরেই তখন অগ্নিবর্ষণ করছে। শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে সে একটা পাথরের আড়ালে বিশ্রাম করতে বসল। অন্যমনস্ক ভাবে সামনের পাহাড়ের গায়ে এক সারি বড় বড় পাথরের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একটা জায়গায় এসে তার দৃষ্টি থেমে গেল। সে জায়গায় অদ্ভুত ধরনের একটি গুহা আছে বলে তার মনে হ'ল। অথচ জায়গাটা এত উঁচুতে যে তার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। কৌতূহল
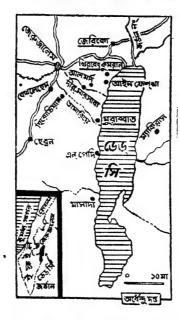
মেটোবার জন্য মহম্মদ একটা পাথর ছুঁড়ে দিল গুহার মধ্যে। ভিতরে ঝন্ ঝন্ শব্দে কি যেন ভেঙে গেল। একটু চমকে উঠল বেদুইন যুবক। তার শুনতে ভুল হয়নি তো? আর একবার সে পাথর ছুঁড়ে দিল। এবারও সেই একই শব্দ। কৌতূহল দমন করতে না পেরে এবার সে অতি কষ্টে পাহাড়ের গা বেয়ে গুহার দিকে এগিয়ে গেল। ভিতরে এক ঝলক তাকাতেই তার নজরে পড়ল দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো—বড় বড় কয়েকটা জালা। এবার তার ভয় পাবার পালা। একলাফে গুহা থেকে নেমে সে দিল এক ছুট। পিছনে পড়ে রইল তার ছাগলের পাল। এই নির্জন গুহায় নিশ্চয়ই কোন জিনের আস্তানায় সে এসে পড়েছে—অতএব পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই শ্রেয় নয় কি?

সেই রাত্রে মহম্মদ আধিব তার আবিষ্কারের কাহিনী এক বয়ঃজ্যেষ্ঠ আত্মীয়কে গল্প করে শোনাল। সে অনেক চালাক-চতুর এবং মহম্মদের মত জিনের ভয় তার ছিল না। বরং তার মনে আশা হয়েছিল নিশ্চয়ই কোন গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে গুহাটিতে। বড় বড় জালাগুলিতে সোনাদানা, হীরা-জহরত ছাড়া আর কি থাকবে? পরের দিন মহম্মদকে নিয়ে সে চলল গুহার দিকে। গুহামুখে পৌঁছে তারা সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল—কোথাও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কোথাও হামাগুড়ি দিয়ে। স্বল্প আলোতে তারা দেখল তাদের সামনেই সাত-আটটি মাটির ছোট-বড় জালা। ঢাকনা খুলে দেখা গেল দুটি জালা একেবারে শূন্য। তৃতীয়টির মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়ার একটা বাণ্ডিল পাওয়া গেল। ন্যাকড়া এত সূক্ষ্ম ও ভংগুর যে হাত লাগতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছিল। এরকম তিনটে বাণ্ডিল তারা সবশুদ্ধ সংগ্রহ করল। কোথায় তারা ভেবেছিল গুহা থেকে গুপ্তধন পাওয়া যাবে—আর কি জিনিসই না তারা পেল? তবু যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে তারা ঘরে ফিরল। কিন্তু সবটা বাণ্ডিল খুলে তারা তো অবাক! সমস্ত ঘর-জোড়া এক চামড়ার পাত—লম্বায় প্রায় সাড়ে সাত গজ—তাতে আবার কি সব হিজিবিজি লেখা! ভুতুড়ে ব্যাপার নয় তো? পরের দিন তারা ছুটল বেথলেহেম শহরে—তাদের জানাশোনা কাণ্ডো নামে এক ব্যবসায়ীর কাছে। তার আছে জুতার দোকান—হয়ত চামড়াগুলি কিনেও নিতে পারে। চামড়া
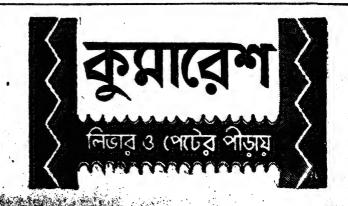
কিনতে কান্ডোর কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তার খটকা লাগল দুর্বোধ্য অক্ষরের বিদ্ঘুটে লেখাগুলো দেখে। বিনা বাক্যব্যয়ে চামড়া কিনে নিল কান্ডো। কিন্তু মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটল Syrian Church-এর পাদ্রী সাহেবদের কাছে। এ'রা পণ্ডিত লোক—লেখাগুলি পড়ে হয়ত অর্থ বলে দিতে পারবেন। ধূর্ত ব্যবসায়ী ঠিকই বুঝেছিল যে বহুমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তার হাতে এসেছে। ঠিকমত এর খদ্দের জোটাতে পারলে রাতারাতি তার পক্ষে বড় লোক হওয়া অসম্ভব হবে না। পাদ্রী সাহেবরা তখন তখনই এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করতে না পেরে কিছুদিন এগুলি তাদের কাছে রাখতে চাইলেন। কিছু অর্থের বিনিময়ে তাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে কান্ডোর আপত্তি ছিল না। এরপর কান্ডো তার সাকরেদ জর্জ ইশায়া ও কয়েকজন বেদুইন যুবককে নিয়ে মরুসাগর উপকূলে বিখ্যাত গুহাটিতে খনন কাজ চালানোর জন্যে অগ্রসর হল। সম্ভবত তারা এই সময়ে আরও সাতটি লিপি সংগ্রহ করে। Syrian Church-এর পাদ্রীদের এ খবর জানান হলে তাঁরাও কান্ডোকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। সরকারী অনুমতি ব্যতীত এধরনের কাজ কিছু বে-আইনী ছিল। কেননা দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর একমাত্র সরকারেরই অধিকার আছে। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান যদি বিনা

বেদুইন যুবক মহম্মদের আবিষ্কৃত প্রথম গুহা

অনুমতিতে খনন কাজ চালায় তাহলে আইন অনুযায়ী তাদের দন্ডনীয় হতে হবে। এই সরকারী নিষেধাজ্ঞার যথেষ্ট ন্যায়সংগত কারণ আছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ ব্যবসায়ীর লোভ ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়। মাটির বিভিন্ন স্তর পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ধ্বংসস্তূপের বয়সকাল নির্ণয় করে থাকেন। পরে দেখা গেছে যে খনন কাজ চালাবার সময় কান্ডো ও জর্জ কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধার ধারে নি। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, মৃৎপাত্রের অসংখ্য টুকরা ও সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডও যা প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে বহুমূল্য সম্পদ তা তারা গুহার বাইরে অনেক আবর্জনার মধ্যে অনাদরে ফেলে দিয়েছিল। পরে এগুলি সযত্নে উদ্ধার করে সরকারী সংগ্রহশালায় রাখা হয়েছে।

নিজেরা বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে পাদ্রী সাহেবরা সদ্য আবিষ্কৃত লিপিগুলি হিব্রু-বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof. Sukenik-এর কাছে নিয়ে যান। প্রথম দর্শনেই অধ্যাপক নিঃসন্দেহে বুঝেছিলেন এই লিপিগুলি অত্যন্ত প্রাচীন। কান্ডোর কাছ থেকে তিনি আরও তিনখানি লিপি সংগ্রহ করেন। কান্ডো ততদিনে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছে। তার আশংকা যে তার বেআইনী কাজ আর বেশী দিন গোপন থাকবে না। ব্যাপারটি বেশী জানাজানি হলে পুলিসের কানে তার নাম উঠবেই—আর তার ফলে তাকে জেলে যেতে হবে। তার হাতে তখনও যা কিছু ছিল ভয় পেয়ে তা তার বাগানের মাটির তলায় পুঁতে ফেলল। দীর্ঘদিন পর যখন এগুলিকে উদ্ধার করা হল তখন দেখা গেল ভিজে মাটির তলায় থাকতে থাকতে অমূল্য নিদর্শনগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।

অধ্যাপক সুকেনিক্ ছাড়াও পাদ্রী সাহেবরা এই লিপিমালা American School of Oriental Research-এর অধিকর্তা Dr. John Trevorকে পরীক্ষা করতে অনুরোধ করেন। ট্রেভরকে প্রথম যে লিপিটি দেখান হয় সেটি পরীক্ষা করে তিনি বলেন যে, এটি Book of Isaiah সংক্রান্ত, Old Testament-এর একটি সুপ্রাচীন পান্ডুলিপি। Old Testament-এর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন একটি পাপাইরাসের সংগে তুলনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নবাবিষ্কৃত লিপিমালা, এযাবৎ প্রাপ্ত যে-কোন পান্ডুলিপির চেয়েও হাজার বছরের বেশী পুরাতন।

ডাঃ ট্রেভরের ইচ্ছা ছিল যে Dead-Sea Scrolls সম্বন্ধে আরও খোঁজ-খবর নেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদীদের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ বেধে যায়। ট্রেভর বাধ্য হয়েই তাঁর অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ রাখলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি হলে আঠার মাস পরে মরুযবনিকার আচ্ছাদন উন্মোচন হল। এবার জেরুজালেম মিউজিয়ামের কিউরেটার G. Lankester Harding মরুসাগর লিপিমালা উদ্ধারের কাজে মন দিলেন। তাঁর প্রথম কাজ হল—সেই বিখ্যাত গুহা খুঁজে বার করা যেখানে [illegible] লিপিগুলি [illegible]

হয়। প্রয়োজন মত আরও ব্যাপক খননকার্য চালিয়ে আরও নিদর্শন সংগ্রহ করার দিকেও তাঁর নজর ছিল। তাছাড়া এযাবৎ কতগুলি অসম্পূর্ণ লিপি পাওয়া গিয়েছিল। টুকরো অংশ খুঁজে বার করে আসলটির সংগে জোড়া না দিতে পারলে অর্থোদ্ধার সম্ভব হচ্ছিল না। অত্যন্ত জটিল এই কাজগুলি একে একে সম্পন্ন করার দুরূহ সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন—Harding এবং তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী Joseph Saad

এ'রা খবর পেয়েছিলেন যে সর্বপ্রথম Syrian Church-এর পাদ্রীসাহেবদের কাছ থেকেই মরুসাগর লিপিমালার হদিশ জানা যায়। অতএব তাঁদের কাছেই সেই বিখ্যাত গুহাটির ঠিকানা পাওয়া যাবে মনে করে তাঁরা Syrian Church-এর দিকে অগ্রসর হলেন। সেই সময়ে আরব-ইহুদী সংঘর্ষ আবার শুরু হয়ে যায়—জেরুসালেমের রাস্তাঘাটে গোলাগুলী চলতে থাকে অবিরাম। অতি কষ্টে কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে হার্ডিং ও সাদ পাদ্রীদের আস্তানায় এসে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটল জর্জ ইশায়া নামক সেই ব্যক্তির সংগে, যে ছিল কান্ডোর প্রধান সাকরেদ ও মন্ত্রণাদাতা। জর্জ স্বীকার করল যে, এই চার্চ থেকে একবার মরুসাগর লিপিমালা উদ্ধারের জন্য একটা গুহায় যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে কিছুতেই গুহাটির সঠিক অবস্থান জানাতে রাজী হল না। অনেক অনুনয় বিনয় ও অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও কিছু লাভ হল না। প্রত্নতাত্ত্বিক দুজন হতাশ হয়ে প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কিন্তু হঠাৎ একজন বৃদ্ধ পাদ্রীকে দেখে যোশেফ সাদের মাথায় এক সুবুদ্ধির উদয় হল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল পাদ্রীসাহেবটি সরল ও সাদাসিধা-ধরনের। সত্য ঘটনাকে গোপন করার কৌশল তিনি হয়ত জানেন না। তাই তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে সাদ বিনীতভাবে বললেন যে, তাঁরা প্রত্নতত্ত্ববিদ—মরুসাগর লিপিমালা আবিষ্কারের উদ্দেশেই তাঁরা এদিকে এসেছেন। শোনা গেছে, এই চার্চের পাদ্রীসাহেবরা কিছুদিন পূর্বে মরুসাগর অঞ্চলে একটা ছোটখাট অভিযান চালিয়েছিলেন। অনুগ্রহ করে সদাশয় ফাদার এই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি? ধূর্ত জর্জ ইশায়া চোখের ইশারায় অনেক করে পাদ্রীসাহেবকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেও পাদ্রীসাহেব সরল বিশ্বাসে, অকপটে যা জানেন তাই বলে গেলেন। যে সব তথ্য তিনি জানালেন তার অধিকাংশই আগে এ'রা সংগ্রহ করেছিলেন। কেবল একটি কথা স্থির জানা গেল যে, গুহাটির অবস্থান Jericho শহরের কিছু দক্ষিণে—মরুসাগর উপকূলে। শুধুমাত্র এইটুকু ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে গুহান্বেষণ নিরর্থক। এই স্থানের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরাই বুঝবেন যে আরও সঠিক বিবরণ না পেলে গুহামুখ খুঁজে বার করা অসম্ভব ছিল Harding ও Saad-এর পক্ষে। কোনকিছুর কূলকিনারা না করতে পেরে Joseph Saad ঠিক করলেন সৈন্য বিভাগের সাহায্য নেবেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে মরুভূমির যুদ্ধে অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন কয়েকজন বেদুইন-সৈনিকের সাহায্য পেলে গুহামুখ খুঁজে বার করা সম্ভব হতে পারে। এদের সাহায্যেই অবশেষে তিনি গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছান। যদিও তাঁর দীর্ঘদিনের শ্রম সার্থক হল, তিনি নিরাশও হয়েছিলেন অনেকখানি। গভীর দুঃখের সংগে তিনি দেখলেন যে, পূর্ব অনুসন্ধানকারীর দল যথেচ্ছভাবে সমস্ত গুহাটিকে খুঁড়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথ সবটাই প্রায় বন্ধ করে গেছে। তিনি অনুমান করলেন যে, এই গুহা থেকে ন্যূনপক্ষে চল্লিশ, পঞ্চাশটি জালা আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বেশীর ভাগই নিশ্চয় অসাধু ও অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী-

মুরাব্বাটে প্রাপ্ত একটি প্যাপাইরাস লিপি

দের হাতে পড়েছে। এই অমূল্য সম্পদ উদ্ধারের কোন আশা আছে কি?

কালক্ষেপ না করে Harding ও Saad প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকের কাজ ছেড়ে এবার গোয়েন্দাগিরির কাজে লেগে গেলেন। প্রতি পদক্ষেপ তাঁদের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হল। বিশেষ করে, সাধারণ আরববাসীদের কাছ থেকে তাঁরা কোন সহযোগিতা পাননি। এরা অত্যন্ত ভীরু-প্রকৃতির হয়ে থাকে—যদি একবার এদের মনে পুলিসের ভয় প্রবেশ করে, এরা আর কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না। অনেক চেষ্টার পর, অনেক বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে এঁরা শেষপর্যন্ত বেথলহেমের ব্যবসায়ী কাণ্ডোর সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু এর কাছ থেকে মরু-সাগর লিপিমালার অবশিষ্টাংশ বার করতে তাদের উপস্থিত বুদ্ধি, কূটকৌশল ও অপরিসীম ধৈর্য ব্যয় করতে হয়েছিল, সে সব ঘটনা স্বতন্ত্র একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর বিষয়বস্তু হতে পারে। Harding-Saad-এর সম্মিলিত চেষ্টা শেষে জয়যুক্ত হয়েছিল। হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে কাণ্ডোর কাছ থেকে তাঁরা লিপিগুলি সংগ্রহ করেন। তাঁদের আচরণ সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁদের পক্ষে পুলিসের গোয়েন্দা লাগিয়ে কাণ্ডোকে গ্রেপ্তার করা কঠিন ছিল না। সাকরেদেরাও নিশ্চয়ই ধরা পড়ত ও সমুচিত শাস্তি পেত। কিন্তু সমস্ত লিপিগুলি কি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হত? কাণ্ডোর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, জর্জের শঠতা মধ্যে মধ্যে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেও তাঁরা জানতেন যে এরা অতি দরিদ্র অশিক্ষিত ব্যবসায়ী—অর্থের প্রলোভন কাটিয়ে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার মত উচ্চ আদর্শবোধ এদের নেই। তাই তাঁরা এদের আচরণ কিছুটা সহানুভূতি ও প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন।

১৯৪৭ সালের প্রথম আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত মরুসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের এই অঞ্চলটিতে প্রায় এগারটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দুটি গুহা—মুরাব্বাট ও কুমড়ানে অত্যন্ত মূল্যবান দলিলপত্রাদি পাওয়া গেছে। কুমড়ানে একটি তাম্রশাসনও আবিষ্কৃত হয়েছে। সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের চেয়ে, মরুভূমির বেদুইন দলই আবিষ্কারের কাজে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছে। এদের সুবিধা এই যে, সমস্ত অঞ্চলটি এদের নখ-দর্পণে। কোথায় কোন পাহাড়ে, কোন গুহা আছে, এরা যতটা জানে, ততটা শহরবাসী শিক্ষিত কর্মীদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অর্থের প্রলোভনেই হোক আর যে কারণেই হোক, বেদুইনরা এগিয়ে না আসলে, মরু-সাগর লিপিমালার অনেকগুলিই আমাদের জ্ঞান গোচর হত না।

পৃথিবীর অনেক নামকরা প্রত্নতাত্ত্বিক, [illegible] পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত আছেন। সমস্ত লিপিগুলির মোট এক-তৃতীয়াংশের সম্পাদনা ও প্রকাশ এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। অন্যগুলি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়। গবেষকদের কাছে সব থেকে বড় সমস্যা—এই লিপিমালার সময় নির্ণয়। তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। কেবল লিখন-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তাঁরা যে বিভিন্ন রায় দিয়েছেন, তাতে এগুলিকে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত যে-কোন সময়ের মধ্যে ফেলা যেতে পারে। কোন কিছুর কূল-কিনারা না পেয়ে সরাসরি কেউ কেউ লিপিগুলোকে সম্পূর্ণ জাল দলিল বলতেও ইতস্তত করেননি। আমেরিকান গবেষকরা প্রথম গুহাটিতে প্রাপ্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডকে Carbon Fourteen Test নামক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু ফল সন্তোষজনক হয়নি। এই পরীক্ষার ফলে প্রধান একটি তারিখ পাওয়া গেছে—৩৩ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু পণ্ডিতরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, এই পরীক্ষায় দুশো বছরের ভুল, আগে পিছে, থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। ১৯৫১ সালে কুমড়ান গুহায় প্রাপ্ত একটি গ্রীক রৌপ্য-মুদ্রা সন্দেহের কিছু নিরসন করেছে। এই মুদ্রাটির তারিখ হল ১০ খৃষ্টাব্দ। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন লিপির আনুমানিক কাল প্রথম শতাব্দী। অবশ্য কয়েকটি লিপি যে আরও প্রাচীন, সে প্রমাণও আছে। ব্যাপক খনন-কার্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, মরু-সাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকেই জনবসতি ছিল। সম্ভবত যে সম্প্রদায় Old Testament-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তাঁরা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই অঞ্চলে বসবাস করতে আসেন।

গবেষকরা প্রতি বৎসর এই লিপিমালা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ রচনা করছেন। এযাবৎ প্রকাশিত প্রায় ১২খানি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। তাদের কাজ সবে শুরু হয়েছে। সমস্ত লিপিগুলির বিশদ আলোচনা এখনও সময়সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেছে যে, বেদুইনদের কাছ থেকে আরও লিপি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নূতন আবিষ্কারের ফলে আলোচনার ধারার পরিবর্তন হতে পারে—হয়ত নূতন আলোর সন্ধান পেলে বিশ্লেষণের কাজেরও সুবিধা হবে। খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি ও মধ্য প্রাচ্যের সুদূর অতীত—এই দুই বিষয়ে Dead-Sea Scrolls অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের নিরলস সাধনা জগতের [illegible]

পুরোনো দিনের কথা। রোমান সাম্রাজ্যের তখন জয় জয়কার। সভ্যতায় পৃথিবীর মাথায়। সমৃদ্ধি তার মুঠোর মধ্যে তাই জলুসের শেষ নেই। জাঁকজমক উপচে পড়ছে। স্বর্গে ইন্দ্রপ্রস্থ, পৃথিবীর বুকে রোম। ইন্দ্রসভার গৌরব-পারিজাত, জুলিয়াস সিজারের দম্ভ কলোসিয়াম-স্থাপত্যে বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়। মধ্যে খেলার মাঠ। তাকে বৃত্তাকার করে হাজার হাজার দর্শকের আসন। লোক ভরে গেছে। খেলা শুরু হবে। কেবল রাজন্যবর্গের অপেক্ষা। সম্রাট সপারিষদ উপস্থিত হলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জানাল—হেল সিজার। নাটকীয় পরিণতির আর দেরি নেই। দামামা বেজে উঠল। অ্যাম্ফিথিয়েটারের মধ্যে প্রতিযোগী প্রস্তুত। ঠিকরে পড়ছে স্বাস্থ্য, যেন শিল্পীর গড়া নিখুঁত মর্মর মূর্তি। কিন্তু পারবে কি ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে জুঝতে! এখনই হয়ত লোকটার রক্ত-মাংস ছিঁড়ে খাবে। রক্ষিবাহিনী বেসমেন্ট থেকে নিয়ে আসে খাঁচা। দরজা খুলে দেয়। লোকে পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। সিংহগর্জনে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার গায়।...এ কি, পরমুহূর্তে তড়িতাহত হয়ে ফিরে আসেন সিংহ মশাই। দর্শকবৃন্দ হতবাক, সিজার মর্মাহত। কি হল পশুরাজের। কেন এই দুর্মতি। কে কানে দিল অহিংসার মন্ত্র। কপিলাবস্তু থেকে বুদ্ধদেব কি বাধ সাধতে এলো হাজার বছর পরে। সিংহপ্রবর ধীর পদে ফিরে আসেন। বল্লেন—না আমি পারব না। কখনই নয়।

সবাই ব্যস্ত সমস্ত। জিজ্ঞাসা করে—কেন? কি ব্যাপার?

—অসম্ভব। আমায় তোমরা ক্ষমা কর।

—প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই?

—প্রতিকার! খালি প্রতিবন্ধকতার ষড়যন্ত্র। বলেছে, ভোজন সমাধা হলেই বক্তৃতা দিতে হবে। দরকার নেই ভুরি-ভোজনে। না হয় একাদশী পালন করব। নিরম্বু উপবাসী থাকব। তাও ভালো। ভরাপেটে বক্তৃতা—না—না—না!

ভোজন সভায় বক্তৃতা দেওয়া কি এমনই দুরূহ। এক ভদ্রলোক রসিকতা করে গল্পটা বলেছিলেন বটে। আমারও মনে হয় এতে গল্পের চেয়ে সত্যের ভাগ বেশী। বিশেষ করে ভারতীয় নেতাদের বেলা। হয়ত আমাদের ভাষার বিস্তার কম, যা হাতের কাছে পাওয়া যায় বেশ ভারী। কিম্বা অভাব-অনটনে মনটা হালকা হবার সুযোগ পায় না, সে যেন জমাট বাঁধা দারিদ্র আর কর্তব্য। তাই বক্তৃতা মানেই গালভারী কথা—আবেগ আর উত্তেজনা। ভুরিভোজের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা কমে আসে, মনটা

উদার হয়। তখন বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই চায় একটু মজলিশী গল্প, দুটো হাসির কথা। কিন্তু সে তো আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই ভোজন সভায় বক্তৃতা দিতে উঠলেই সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের নেতাদের একটু অসহায় দেখায়। অন্তত আমারও তাই মনে হয়।

একবার বেশ বিপদে পড়েছিলেন মুন্সিজী। সে কিন্তু ভোজনান্তর বক্তৃতার অন্য দিক। মিঃ কে এম মুন্সি তখন সবে ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী হয়েছেন। প্রাণ-খুলে দিন-দুপুরে বক্তৃতা দিচ্ছেন, হাটে মাঠে ঘাটে। সহায় অনুগত প্রচার বিভাগ। এক ভোজনসভায় গিয়েছেন। আহারাদি সমাপ্ত হল। ভুরিভোজনের পর রাজনৈতিক লেবু কচলান কর্মকর্তাদের মনঃপুত নয়। তার চেয়ে হাসি-ঠাট্টা হোক উপরি হিসেবে আছে নাচ গান। মুন্সিজী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। প্রচার বিভাগ পরম তৎপর। তাঁর অনাগত বক্তৃতার হ্যাণ্ডআউট কাগজে কাগজে বিলি হয়ে গেছে। কাল ভোর না হতে ছাপা হবে। তখন কি জবাবদিহি করবেন। সে যাত্রা এক বন্ধু তাকে রক্ষা করেন। কর্ম-কর্তাদের সুমতি হয়। বক্তৃতা দানের শাস্ত্র রক্ষা করেন।

পাঠক হয়ত হাঁফিয়ে উঠেছেন। ভাবছেন আমার বক্তব্য কি? কোথায় চলেছি? উদ্দেশ্য কি? মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসরে নেমেছিলাম, কিন্তু মতিভ্রমে পড়ে ঘটনাকে ছোট করে অঘটনের জাল বুনছি। বিজ্ঞ সাংবাদিক ধারাবিবরণের বদলে 'হাইলাইট' ছেঁকে আসর মাত করেন। আমি অর্বাচীন, ঘটনার 'লাইট' অংশটা নিয়ে কারবার ফাঁদি। চলেছি ভোজনসভায়। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রতি বছর লণ্ডনের ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সাংবাদিকরা চিরকাল পরের অতিথি হয়। খায় দায় বগল বাজায় আর সমা-লোচনা করে, কিন্তু আতিথ্য করার দায়টা যে কতখানি তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায় ভারটা মাথায় পড়লে। অলড্উইচ লণ্ডন শহরের কেন্দ্রে। সেখানে ভারত ভবন তার সামনে দিয়ে কিংসওয়ে ধরব। একটু এগোলেই গ্রেট কুইন স্ট্রিট। নিয়ন আলো দিয়ে লেখা কনট রুম। অভিজাত পরিবেশে নাম-করা প্রতিষ্ঠান। পৌঁছতেই অভ্যর্থনা জানাবে দৌবারিক সুবেশী এবং সুভাষী। আজ লণ্ডনে আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্ট্রাইক চলেছে। এক দিনের জন্যে ধর্মঘট। তাদের মাইনে বাড়াবার দাবি। সারা লণ্ডনের পথে ঘাটে বিশৃঙ্খলা। পুলিস আটকে দিল মাঝপথে। রাস্তা বন্ধ। ঘুরে যেতে হবে। আমার মনে হল, লণ্ডন শহরে যানবাহনের বিশৃঙ্খলা, সাংবাদিকরা নড়ে চড়ে বসেছে। পাতা ভর্তি 'ডেসপ্যাচ' পাঠাচ্ছে। আমার লেখাটারও ওই রকম খেই হারিয়ে দেই না কেন—দেখা যাক কি দাঁড়ায়। পাঠকরা কি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

দুর্মুখ উত্তর দেয়—তিরস্কারের লগুড় নিয়ে তেড়ে আসবেন। সাত হাজার মাইলের দূরত্ব এই যা ভরসা।

১৯৫৯ সালের কথাটা পাড়ি। সে বছরও কনট রুমে এই অনুষ্ঠান হয়। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান এসেছিলেন প্রধান অতিথি হয়ে। লেবার পার্টির ডেপুটি লিডার জেমস গ্রিফিথস ছিলেন আর ভারত সরকারের তরফ থেকে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

মনে আছে, পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী আজ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান নন,

সুপার ম্যাক, ম্যাক ম্যাজিক, ম্যাক মিরাকল হয়ত বা ম্যাক ভিটা, ম্যাকইনটশ। যাই হোক, ম্যাকের ওপর আমাদের মোহ নেই। ম্যানুফ্যাকচারাররা তা নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করুক। আমরা 'মিলন' নিয়ে সন্তুষ্ট। আমাদের ভাষায় যার মানে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব।

ম্যাকমিলান বলেন, প্রকাশক হিসেবে ভারতবর্ষের সংগে তাঁর বহুদিনের বন্ধুত্ব। সেই সুযোগে মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। প্রকাশকের কথা যখন উঠল, তখন বলি—৩৫ বছর আগের ঘটনা। প্রথম পার্লামেন্টে দাঁড়াচ্ছি। কোন নির্বাচনী সভায় বক্তৃতার মাঝখানে একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি 'হল ও নাইটের' লেখা অ্যালজেব্রা প্রকাশ করেছ?

নিশ্চয় প্রশংসার কথা। উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

লোকটা বলে ওঠে—তা হলে তোমায় ভোট দিচ্ছি না। ওই বই পড়ে আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি।

আমি উত্তর দেই—আসলে দোষটা তোমার। কারণ ভুল বইটা বেছে নিয়েছ। প্রশ্নোত্তর সমেত বইটা কেনা উচিত ছিল।

তখন বিলেতে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নিয়ে খুব জল্পনা কল্পনা। ব্যাপারটা 'টপ্ সিক্রেট'। ম্যাকমিলান কাউকে জানতে দেবেন না। আসন টলমল, তাও ভি আচ্ছা। জেমস গ্রিফিথস বললেন—ম্যাকমিলান স্কট আমি ওয়েলশম্যান, দুজনেই পার্লামেন্টে অনুপস্থিত—এই সুযোগে ইংরেজরা না নির্বাচনের তারিখ ঠিক করে ফেলে।

এ বছর অতিথির মধ্যে আসছেন সরকার পক্ষের ডানকান স্যান্ডস—কমনওয়েলথ রিলেশনস সেক্রেটারী। লেবার পার্টির নেতা গেটস্কেল এবং লিবারেল পার্টির চেয়ারম্যান ডেসমন্ড ব্যাংকস। ভারতের অস্থায়ী হাই-কমিশনার মিঃ টি এন কাউল—আই সি এস। তা ছাড়া লর্ড মাউন্টব্যাটেন, ফেনার ব্রকওয়ে, মিস জেনি লি (বিভানের স্ত্রী)। নামকরা আরও অনেকে।

হোটেলে তখনও সাজ সাজ রব। চার্ট মিলিয়ে নামের কার্ড বসান হচ্ছে টেবিলে। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এখনই অতিথিরা এসে পড়বে। আমি ভাবছিলাম, ইংরেজরা ভোজনসভায় সংগে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বিশ্বসমস্যাই জীবনের সর্বস্ব নয় একথা তারা মানে। লর্ড ম্যানক্রফট ভোজনান্তর বক্তৃতায় এক্সপার্ট। গত বছর তিনশ জায়গা থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল মাত্র ছাপান্নটা গ্রহণ করেছিলেন। চিতোরের রাণার পণ করেছেন এ বছর একেবারে মুখ বুজে থাকবেন। তাঁর মতে দুটো শক্তিশালী জাত আছে 'বোর' Bore এবং 'বোর্ড' Bored। এদের খাতায় তিনি নাম লেখাতে চান না এও বলেছেন—ভবিষ্যতে যদি কোথাও মুখ খোলেন, ছ মিনিটের বেশী বলবেন না। হবু বক্তাদের কোন উপদেশ দিতে চান কি না, তার উত্তরে বলেন—বক্তৃতার আর্ধেকটা বলা হয়ে গেলেই বসে পড়া উচিত।

আরও একটা ঘটনা মনে আছে, তবে বক্তার নামটা মনে পড়ছে না। উৎসবে খাওয়া দাওয়া সারতেই বেলা গেল। নাচ গানের পালা আছে। সেটার মেয়াদ ছোট হয়ে যাচ্ছে। সভাপতি বক্তৃতা দিতে উঠলেন। সবাই ভাবছে, তাড়াতাড়ি শেষ হলেই ভালো।

তিনি বললেন—"আমি আজ দুটো বক্তৃতা তৈরী করে এসেছি। একটা বড়, একটা ছোট। সময় হিসেব করে যেটা উপযোগী মনে হয় দেব।"

লোকে আশ্বস্ত হয়। নিশ্চয় তিনি বেশী সময় নেবেন না।

—"এখন ভাবছি বড় এবং ছোট দুটো বক্তৃতাই দেব।"

নাচ-গানভক্তরা হতাশায় মুষড়ে পড়ে। তিনি ধীর স্থির—অচঞ্চল। সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি তিনি পুরোপুরি করতে চান, লোকে কি করতে পারে।

তিনি বলে চলেন—"প্রথমটা হল, থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ। আর ছোটটা, থ্যাংক ইউ।"

তিনি বসে পড়েন। হাত তালিতে হল ভেঙে পড়ে।

সেদিন এক ভদ্রলোক বলছিলেন, ভোজন-সভায় বক্তৃতার মান 'উঁচু রাখতে হলে বক্তাদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা রাখা উচিত। যেমন ২০ মিনিট বক্তৃতা দিলে ১০ পাউন্ড। ১০ মিনিট দিলে ২০ পাউন্ড। আমি ভাবছিলাম, তার মানে কি দাঁড়ায়, কিছু না বললে দক্ষিণা ৪০ পাউন্ড।

স্যার রেমন্ড প্রিস্টলি অবশ্য দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার একটা ফর্মুলা দিয়েছিলেন। দক্ষিণ মেরু অভিযান করে ফিরেছেন। তখন যুবক। চারিদিকে দাবি উঠেছে বক্তৃতা দেবার। লর্ড কার্জনকে খুলে বলেন বিপদের কথা। কার্জন উপদেশ দিলেন—তিন গেলাস শ্যাম্পেন খেয়ে নিয়ো—বেশী নয় কম নয়। উপদেশ মেনে আসরে নামলেন। বক্তৃতার তুবড়ি ছুটল। অনুষ্ঠান-কর্তা জামা টেনে বলেন, আর তিন মিনিট সময় আছে। তিনি তার পরও আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। ভেবেছিলাম শ্যাম্পেনটা ফিগার অফ স্পিচ—বাহবার শ্যাম্পেন—হাত-তালির শ্যাম্পেন। এগুলো থেকে আত্মসংযম বড় মুশকিল।

লেখার উত্তরাকাণ্ডে ফিরে আসি আসল কথায়। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে এল। খাবারের শতকরা ৮০ ভাগ ইংরাজী ২০ ভাগ ভারতীয়। নাম সব ফরাসী। ওয়েট্রেস-বাহিনী সারিবন্দী হয়ে আসে আর যায়। যেন প্যারেড করছে। তাদের মাদাম আর মশিয়ে বলা শেষ হল। এবার অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। 'জনগণ-মন' আর 'গড সেভ দি কুইন' সংগীত দিয়ে শুরু। লন্ডনস্থ ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ তারাপদ বসু সবাইকে স্বাগত জানান এবং বলেন লেবার ও লিবারেল পার্টির বিবাহের প্রস্তাব চলেছে। ডানকান স্যান্ডস হয়ত প্রধান সাক্ষীর কাজ করবেন, কিন্তু যতদিন না মালাবদল হয়,আমরা আলাদা আলাদা অভ্যর্থনা জানাব।

ডানকান স্যান্ডস ভারত ও বৃটেনের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেন। কটাক্ষ করেন বিবাহ প্রস্তাবের। এও বলেন—নেহরুর কথায়, রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকদের কোন কোয়ালিফিকেশন লাগে না। তিনি জুড়ে দেন—তবে তফাত সাংবাদিক যা জানে তার চেয়ে বেশী লেখে। রাজনৈতিক নেতাদের মন খুলে বলা সব সময় সম্ভব নয়। আর বৈদেশিক সংবাদদাতারা Diplomat in reverse। বৈদেশিক সমালোচনার বিবরণ পাঠান। সুতরাং তাদের সংযমও বিশেষ প্রয়োজন।

গেটস্কেল বলেন—সবার বাটন হোলে গোলাপ আমার লাল কার্নেশন। এটা ইচ্ছাকৃত কিনা জানি না। ধরে নিচ্ছি আমি বর। কিন্তু সবাই জানে, কনে বিশ্বস্ত বধূ হতে পারবে না তখন বেস্টম্যানের পক্ষে উচিত হবে কি সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ান। ডেসমন্ড ব্যাংকস বলন, যে মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয় তারাই বিয়ে করে। লিবারাল পার্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ সুতরাং গাঁঠছড়া বাঁধার প্রয়োজন দেখি না।

গেটস্কেল আরও বলেন, স্বাধীন ভারতে বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষ থেকে বেশী সংখ্যক ইংরেজ বাস করে। এতে প্রমাণ হয় দুই দেশের বন্ধুত্ব কত নিবিড়। তাঁর শেষ কথা—দুই দেশের মনের মিল সম্ভব কারণ উভয়েই সহনশীল এবং হাস্যরসকে উপভোগ করতে পারে।

সুরসিক ভারতবাসী! অন্য কোন সার্টিফিকেট পেলে আমি এত আনন্দিত হতাম না। অনুষ্ঠানের শেষ দেখতে গিয়ে যদি শেষ বাস হারাই, মাঝরাতে শ্রীচরণের শরণ নিয়ে দীর্ঘপথ পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে হয় তাও আক্ষেপ করব না।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

চোখ খুললে স্বল্পক্ষণ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকল অবনী। কিছুই যেন দেখছে না।

জয়শ্রী সামান্য ঝুঁকে আবার মৃদুভাবে ধাক্কা দিল, 'কি হলো, এমন করছিলে কেন? কি হয়েছিল?' অবনী তখনও জয়শ্রীর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু কে তাকে ডাকছে, কেন ডাকছে, তার সংগে সামনের ওই মেয়েটির কি সম্পর্ক, কিছুই যেন ধরতে পারছিল না। অথচ জয়শ্রীকে সে দেখছিল এবং সে যে তাকে কিছু বলছে, তা বুঝতে পারছিল। সব যেন ঘোলা জলের মতন কেমন অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিরুদ্ধ। তারপর একটু একটু করে যখন চোখের ওপর থেকে আচ্ছন্নতার যবনিকা অপসারিত হল, তখন

অনুতাপ

নিখিল সরকার

অবনী বুঝল, জয়শ্রী, তার স্ত্রী, তাকে ডাকছে। গলার কাছে একটা শক্ত হাত যেন এতক্ষণ ধরে চেপে বসছিল আর ক্রমশ দম ফুরিয়ে আসার তীব্র এক যন্ত্রণা অনুভব করছিল। জায়গাটা বেদনায় এখনও টনটন করছে। জয়শ্রী এখন আরও কাছে সরে এসে ওর বিছানাটার এক কোণে বসল। অবনীর বুকে একটা হাত রাখল। তারপর উৎকণ্ঠিত স্বরে শুধলো, 'কি হয়েছিল?'

অবনী এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জয়শ্রীর দিকে তাকাল। মনের অপ্রসন্ন বিষণ্ণ ভাবটা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। জয়শ্রীকে এই মুহূর্তে বড় করুণ ভীত ও কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। অবনী সেই মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। পরে আস্তে করে বলল, 'জানিনা।' এক সময় জয়শ্রীর ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে অন্য একটা কথা ভাবল। অবনী জানে না ঘুমের মধ্যে সে কি করছিল এবং কেনই বা করছিল, কিন্তু এখন বুঝল, সে ভয় পেয়েছিল। এত সময় ধরে অবনী একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। একটা শক্ত হাত তার গলাটা টিপে ধরেছে। যেন কেউ প্রবল আক্রোশে তার অবরুদ্ধ জ্বালা মেটাতে চাইছে। অবনী মানুষটাকে চিনতে পারল না। ভয়ে অসহায়ের মতন চীৎকার করে উঠেছিল শুধু।

এখন আর ঘুম আসবে না অবনীর। অথচ ঘুমটা ওর প্রয়োজন। সংসারের আরও কটা অতি আবশ্যক সামগ্রীর মতনই অপরিহার্য। ঘুম না এলে, পরিবর্তে দুরন্ত অপ্রতিরোধ্য এক যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এবং ক্রমে ক্রমে তাকে অবশ ও ক্লান্ত করে। শুধু তাই নয়, এই দুঃসহ কাতরতা সময় সময় তাকে চাকিতে মৃত্যুর কথাও মনে করিয়ে দেয়। তখন অবনীর করণীয় কিছুই থাকে না। শুধু, কোনও ঐশ্বরিক পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে যেন বলতে ইচ্ছে করে, আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচাও। আজ, এখন মনে মনে অবনীর সেরকমই প্রার্থনা জানাতে ইচ্ছে হল।

অবনী শুয়ে শুয়ে একসময় লক্ষ করল সূর্যের আলো এখন অনেকটা তির্যক হয়ে ঘরের দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে অবশ দুর্বল কোন মানুষের মতন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সেদিকে কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে ও তাকিয়ে থাকল। মনের এই নির্লিপ্ত ভাবটা কাটার পরমুহূর্তেই ওর মনে হল, ঘরটা এসময় বড় শান্ত, উত্তাপ-বর্জিত। শুধু এ বাড়িটাই নয়, সমস্ত মুখর পাড়াটাকেই কোন ঐন্দ্রজালিক যেন স্তব্ধ ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

অবনী উঠে বসল। জয়শ্রী আস্তে আস্তে পেছনে একটা নরম পাশবালিশ দিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই দিবাকর ডাকল। জয়শ্রী চাদরটা অবনীর গলা পর্যন্ত টেনে ঠিকঠাক করে দিতে দিতে বলল, 'আমি আসছি একবার নীচে থেকে, এসে ফলের রসটা করে দেব।' বলে নীচে চলে গেল জয়শ্রী। অবনী সেদিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জয়শ্রী চলে গেলে অবনী ডানপাশের খোলা জানলা দিয়ে আস্তে আস্তে আকাশটাকে দেখতে লাগল। আকাশটার জায়গায় জায়গায় খণ্ড খণ্ড শ্বেতবর্ণ মেঘ। পুঞ্জিত খণ্ড মেঘের পাশেই কিছুটা জায়গা মেঘমুক্ত, সেখানে হালকা নীলের বিস্তার। সেই নীলের ধার ঘেঁষে এক টুকরো মেঘ কোন দেবাঙ্গনার স্খলিত বসনের মতন পড়ে আছে, আর সে বসনের ধারগুলো স্বর্ণ রোদের জরি দিয়ে যেন মোড়ান। কটা চিল মন্থরভাবে মনের আনন্দে অনেক উঁচুতে

শূন্যের বুকে সাঁতার কাটছে। অবনী বহুক্ষণ ধরে আকাশের এই অকৃপণ সজ্জা দেখল। দেখতে দেখতে একসময় মনে হল, পরস্পর সম্পর্কবিহীন অনেক কথা ভাবনা হয়ে ওর মনের চতুর্দিকে এক পাঁচিল তৈরী করেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ও সেই ব্যূহ ভেদ করে কোন মুক্ত জায়গায় ফিরে আসতে পারছে না। প্রাণান্ত চেষ্টা করেও যখন পরাজিত, তখন অবনী আরও বিষণ্ণ ও ক্লান্ত হল। এবার ব্যথিত দৃষ্টিটাকে গুটিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে রাখল।

বাঁপাশে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর ওষুধের শিশি, ফল, কাপ, গ্লাস। মেঝেয় কাচের কুঁজোয় জল। ঘরের এক কোণে একটা আলনা, সেখানে অবনীর কিছু জামা কাপড়। এগুলো কিছুক্ষণ দেখার পর মনটা হঠাৎ তিক্ত ও প্রবল ঘৃণায় যেন ভরে উঠল। পরক্ষণেই একরকম জোর করে সঙ্কুচিত ঘৃণিত দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে এনে আবার খোলা জানলা দিয়ে মুক্ত ও প্রসারিত করল। সামনের বাড়ির ছাতের কোণাটায় বসে একটা কাক তখন থেকেই একটানা ডাকছে। বাড়িগুলোর ওপাশেই ছোটমতন একটা পার্ক। এখান থেকে একটা গাছের মাথা দেখতে পেল অবনী। অনেকগুলো পাখি উড়তে উড়তে এসে আগডালে বসল। পত্রান্তরাল থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না ওদের। কিছুক্ষণ পর তার থেকে দু'তিনটে উড়ে গেল। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় খুব গভীর এক বেদনা অনুভব করল অবনী। নিজের কথা ভেবে একটা ভারী ঘন নিশ্বাস ফেলল। আজ কতকাল যেন হয়ে গেল, সে এই ইটের ঘরটায় নির্বাসিত। ঘরটাকে মাঝে মাঝে হিংস্র সুপ্ত কোন জানোয়ারের মতন মনে হয় ওর। কে যেন তাকে এই ভয়ংকর জীবটার সামনে বেঁধে রেখে গেছে এবং ওটা একবার জেগে উঠলেই ওর দিকে ছুটে আসবে। অবনী যেন সেই সময়ের জন্যই প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষা করে আছে। সময় সময় একলা ঘরে থাকতে ভীষণ ভয় পায় অবনী।

এ ঘরটায় এখন আর কেউ বড় একটা আসে না। এমন কি দিবাকরও না। কাল এসেছিল ও। চৌকাটের ওখানে দাঁড়িয়েই জয়শ্রীকে উদ্দেশ করে বলেছিল, 'আজ ফিরতে একটু দেরী হবে মা।'

'কেনরে?' জয়শ্রী একটা কাপে, পাত্র থেকে দুধ ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করেছিল।

'কলেজে সোসাল।'

'তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর বাবার শরীরটা ভাল না।'

অবনী জয়শ্রীর দিকে তাকিয়েছিল। প্রসারিত দৃষ্টিতে মৌন করুণ আবেদন ফুটে উঠেছিল। কেন এসব কথা বলতে গেল জয়া, তাছাড়া আমি তো আজ থেকে ভুগছি না। আমার জন্যে ওদের কোনো কাজে বাধা দিলে ওদের চেয়ে কষ্ট যে আমারই বেশী হয়! দিবাকর চলে গেলে অবনীর মনে হয়েছিল কতদিন পর যেন ওকে দেখেছে। খুব বিমর্ষ লাগছিল।

মন্থর ভারী দুপুর এখন বোঝার মতন মনে হয় অবনীর। গলার কাছের যন্ত্রণাটা আজ অন্যদিনের চেয়ে আরও বেড়েছে। প্রথম প্রথম এ কষ্টটা সব সময় অনুভব করত না। কিন্তু এখন ওর অস্তিত্বের সঙ্গেই যন্ত্রণাটা যেন সর্বক্ষণের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। কদিন হাসপাতালেও ছিল অবনী। সে দিনগুলোর কথা এখনও তাকে পীড়িত ব্যথিত করে। গত কথা মনে হলে সমস্ত শরীর কেমন যেন শীতল হয়ে আসে। ওর পাশের বেডেই ছিল রাধিকাবাবু। সংসারে আত্মীয় বলতে তার এক বিধবা মা। সামান্য চাকরি করত কোন এক অফিসে। অবনীও রাধিকাবাবুর মাকে দেখেছে। ছেলের শিয়রে বসে কতদিন তাঁকে মৃদু দৃঢ় অথচ করুণ গলায় সান্ত্বনা দিতে শুনেছে অবনী। ছেলের গায়ে বৃদ্ধা মা হাত রেখে কতদিন বলেছেন, 'অত ভাবিস না, ভাল হয়ে যাবি।' রাধিকাবাবু কোন কথা বলত না। শুধু নিষ্প্রাণ বিষাদ চোখে মার দিকে তাকিয়ে থাকত। অবনী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্রথম কি করে বুঝলেন যে আপনার এ অসুখ।'

রাধিকাবাবু সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে অনুচ্চ ফ্যাসফ্যাস গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'প্রথম প্রথম কোন অসুখবিসুখকে গায়ে মাখতাম না। সাধারণ সর্দি কাশি। ভেবেছি সেরে যাবে এমনিতেই। কিন্তু সারে না দেখে একদিন ডাক্তার দেখালাম। ওষুধ দিলেন ডাক্তারবাবু। তবু কিছু হল না।' এই পর্যন্ত বলে রাধিকাবাবু থামল। অবনীর মনে হল রাধিকাবাবু অকস্মাৎ কথার সুতো হারিয়ে ফেলেছে। পরে সেই ছেঁড়া সুতোয় গিঁট দিতে দিতে আবার আগের কথায় ফিরে এল রাধিকাবাবু। 'গলা দিয়ে কাশির সঙ্গে একদিন রক্তও পড়ল। সেদিন ভীষণ ভয় পেলাম। এক্সরে করান হল। কিছুদিন চিকিৎসাও হল। কিন্তু কিছুই হল না। তারপর একদিন এখানে এলাম।' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল রাধিকাবাবুর।

রাধিকাবাবুর কথা শুনে অবনী এই প্রথম ভীষণ ভীত ও শঙ্কিত হয়েছিল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিল ও। তারপর থেকে প্রতিটি মুহূর্তেই মনে হয়েছে, এখানে থাকলে ও মরে যাবে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার আগের দিনটা এখনও অবনীর কাছে একটা রহস্য হয়ে আছে। সেদিন আকাশের অবস্থাটাও ভাল ছিল না। আশে পাশের বেডে অনেকেই ছটফট করছে, গোঙাচ্ছে। রাধিকাবাবুর গলায়ও অস্ফুট কাতর একটা শব্দ। প্রথমে ভেবেছিল অবনী, রাধিকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে হল, না ঘুমোয়নি, ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে। অনেক এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল অবনী। হঠাৎ কী এক তৎপর দ্রুত শব্দে অবনীর ঘুম ভেঙে গেল। একজন নার্স তার খাটের কাছ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। অবনী ভয়ার্ত জড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। আপনারা অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, শুয়ে পড়ুন।' বলে চলে গেল নার্স। পাশের লম্বা রাস্তাটায় জুতোর দ্রুত শব্দ, কথার গুঞ্জন শুনল অবনী। ধীরে ধীরে সে শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ অস্পষ্ট হয়ে এল। অবনী ঘুরে পাশের দিকে তাকাল। অন্যান্য বিছানার কয়েকজন ইতিমধ্যেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে জেগে উঠেছে। সবাই সবিস্ময়ে দেখল, রাধিকাবাবুর বিছানাটা ফাঁকা। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি অবনী। কী এক অজ্ঞাত শঙ্কা ওকে অঙ্কুশের আঘাতে বিদ্ধ করতে করতে ক্রমশ অবশ করছিল।

পরদিন বিষাদ রাত্রির পর ঘরে যখন ভোরের আলো এসে পড়েছিল তখন অবনী ঘুমে। সকালের রৌদ্রকিরণ গায়ে মুখে মেখে নিয়ে এক সময় যখন চোখ মেলল তখন গত রাত্রির কথা মনে পড়ায় পাশের শূন্য বিছানাটার দিকে তাকিয়ে ও নিজের কথা ভেবে আবার কেন যেন বিমর্ষ হয়েছিল। সেদিনই ফিরে এসেছিল অবনী। রাধিকা-বাবুকে সে রাত্রে কোথায় কেন নিয়ে যাওয়া হল, ভেবে কিছুই ধরতে পারেনি ও। এত-দিন পর আজ শুধু একটা অনুমান করতে পারে। গলা দিয়ে অবনী এই মুহূর্তে একটা কাতর শব্দ করল।

জয়শ্রী আবার ওপরে উঠে এল। হাতে একটা বই। বইটা একটা চেয়ারের ওপর রেখে ওষুধের টেবিলটার কাছে গেল। অবনী ওকে একমনে দেখছিল। কটা [illegible] লেবুর খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছে [illegible]

জয়শ্রী। পরে একটা ছাঁকনি দিয়ে অন্য একটা কাপে ঢেলে ওর কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়াল। অবনীর মাথাটাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বাঁহাতে ওর মাথাটা ধরে শান্ত স্বরে বলল, 'নাও।'

অবনী মৃদু আপত্তি করল। 'না, এতটা খেতে পারব না' বলে গলায় হাত বুলোল।

'না খেলে শক্তি পাবে কি করে।' বলে কাপটা ডানহাতে অবনীর মুখের কাছে নিয়ে গেল জয়শ্রী। তারপর আস্তে আস্তে খাইয়ে দিয়ে শুধলো, 'আর একটু দেব?'

অবনী মাথা নাড়ল।

ধুয়ে মুছে ঠিক জায়গায় কাপটাকে রেখে আবার অবনীর আছে ফিরে এল জয়শ্রী। আঁচল দিয়ে ভিজে হাতটা মুছতে মুছতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী, শোবে এখন?'

'না।' অবনী মৃদুভাবে বলল। বলে জয়শ্রীর ম্লান বেদনাগভীর চোখ দুটোর ওপর ওর দৃষ্টি স্থির রাখল। জয়শ্রী পিঠের পাশে লম্বাটে ধরনের পুরু বালিশটা ঠিক করে দিল। বুকের চাদরটা আর একবার ঝেড়ে আবার গলা পর্যন্ত টেনে দিল। তারপর বইটা হাতে নিয়ে চেয়ারটায় বসল।

অবনী জয়শ্রীর দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ওর মনে হল সে যেন একটা ছবি দেখছে খুব মনোযোগ দিয়ে। যে মুখ দীর্ঘদিন দেখেছে, প্রত্যহ প্রায় সর্বক্ষণ, আজ সে মুখ দেখতে দেখতে মনে হল, এ মুখের সঙ্গে সেদিনের, প্রতিদিন ধরে দেখা মুখের অনেক পার্থক্য। এ মুখ যেন জয়শ্রীর নয়, অন্য একজনের। ওর মুখের আদলে অবয়বে একটা অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এসেছে। গাল বসে গেছে, হাড়ের খাঁজ অস্বাভাবিক রকম মনে হচ্ছে। চোখের কোলে কি এক বিষণ্ণতার ছাপ। দীর্ঘ রাত্রি জাগরণে মানুষকে যেমন ক্লান্ত হৃতশ্বাস দেখায়, জয়শ্রীকেও যেন এখন অনেকটা সেরকম দেখাচ্ছে। জয়শ্রী যেন সংসারের সঙ্গে লড়তে লড়তে এখন খুব পরিশ্রান্ত অবসন্ন। ওকে আস্তে করে ডাকল অবনী। জয়শ্রী ওর দিকে তাকাল এবং ওর শিয়রের কাছে এসে বসল। শুধলো, 'কিছু বলবে?'

অবনী অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে জয়া, এভাবে উপোস করে রাত জেগে আর শরীরটা নষ্ট করো না।'

কোন জবাব দিল না জয়শ্রী। অবনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তারপর গভীর ভালবাসা ও মমতাভরা গলায় বলল, 'তোমার চেয়ে আমার জীবনটা বড় হল!' অবনী কিছু না বলে চুপ করে থাকল। জয়শ্রীর সঙ্গে কতদিন নির্মম নির্দয় ব্যবহার করেছে সে। এই বোধটা এখন ওকে খুব পীড়ন করছে। কিছুক্ষণ পর অবনী স্বগতোক্তির মতন করে বলল, 'আমি আর ভাল হবো না জয়া।'

জয়শ্রীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। অনেক কথা বলে মনের ভারকে হালকা করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এক অবরুদ্ধ আবেগ যেন ওর সমস্ত কথাকে চূর্ণ করে পালিয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর নিজেকে সংযত করে বলল, 'এসব অলক্ষুণে কথা তুমি বলো না তো, কে বলল তুমি ভাল হবে না?'

অবনী কিছু বলল না। খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে লাগল। বুকের মধ্যে কোথায় যেন স্ত্রীর জন্যে গভীর প্রগাঢ় এক সহানুভূতি ও মমতা বোধ করল অবনী। তারপর জয়শ্রীর একটা হাতের ওপর নিজের রুগ্ন শীর্ণ একটা হাত রাখল। পরে মনে মনে বলল, জয়া, এ তুমি বৃথা আশ্বাস দিচ্ছ আমায়। তুমিও জাননা, এরোগ মানুষের হ'লে সারে না। তুমি ভাবছ, একদিন আমি ভাল হয়ে উঠব, কিন্তু আমার জীবনে সে দিন হয়ত আর আসবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই চৌকাটের কাছে এসে হিরণ শব্দ করল।

জয়শ্রী ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয় হিরণ।'

'আজ কেমন আছে কাকা?'

অবনী হিরণের দিকে তাকাল। হিরণ এসে কাকার বিছানাটার এক পাশে বসল। অবনী ওকে চেয়ারে বসতে বলেছিল। কিন্তু হিরণ সেখানেই বসে থাকল। এবং জয়শ্রীর দিকে তাকিয়ে শুধলো, 'এখন কি আগের ডাক্তারবাবুই দেখছেন?'

'হ্যাঁ' জয়শ্রী বলল। বলে বইটা পড়তে লাগল।

অবনী কিছুক্ষণ হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বৌদি আসে নি?'

'মার শরীর খারাপ, সর্দিকাশি।'

অবনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখের সামনে কেমন যেন অদ্ভুত একটা ছায়া ভেসে থাকল। ক্রমশ চেতনা আচ্ছন্ন হল ওর। দূরশ্রুত কোন স্মৃতির গন্ধ যেন ওকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

দাদা যখন মারা গেল তখন হিরণের বয়েস সতেরো। দাদার মৃত্যুর পর ওকে নিয়ে বৌদি এ বাড়িতে মাত্র দুদিন এসেছিল। দ্বিতীয় দিন হিরণকে লক্ষ করে বৌদি বলেছিল, 'ঠাকুরপো আমার অবস্থা তো এখন বুঝতেই পারছ, তোমার দাদাও এমন একটা কিছু রেখে যায় নি যা দিয়ে আমাদের চলে।' এই পর্যন্ত বলে বৌদি

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর প্রত্যাশা নিয়ে আগের কথাটা শেষ করেছিল, 'তার থেকে আমার হিরণকে তোমার এখানে রাখ, ছেলেটার পড়াশুনোয় খুব ঝোঁক।'

অবনী সরাসরি কোন কিছু না বলে চুপ করে রইল। পরে দূরে থেকে কথা বলার মতন অনেকটা মৃদু উদাসীন নিস্পৃহ গলায় বলেছিল, 'না বৌদি, তা হয় না। তার চেয়ে মাঝে মাঝে দরকার হলে চাইবেন, যা পারি সাহায্য করব।'

উত্তর শুনে বউদি আর একটিও কথা বলল না। এমনই একটা কিছু সে আশঙ্কা করেছিল। তবু সংসারের এই আকস্মিক নিরাবলম্ব অবস্থায় কিছুটো আশা নিয়ে কথাটা অবনীর কাছে পেড়েছিল। কিন্তু আশাহত হয়ে সেই যে হিরণকে নিয়ে চলে গেল বৌদি, এরপর আর একটা দিনের জন্যও এ বাড়ি এল না। অবশ্য, অবনী শুনেছে, বৌদি একটা প্রাইমারী স্কুলে কাজ নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছেলেকে মানুষ করেছে। হিরণের দিকে তাকিয়ে আজ এই মুহূর্তে একটা গভীর অনুশোচনা বোধ করল অবনী। কী করে সে এতটা নিষ্ঠুর হতে পেরেছিল সেদিন! আজ বৌদির মুখটা খুব স্পষ্ট করে মনে পড়ল অবনীর। এতদিন পর কেন যেন আজ এই প্রথম বুকটা খুব ফাঁপা মনে হল ওর। একটা ঘনীভূত বেদনার বাষ্প যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ওকে আহত করতে চাইছে। দাদার অবর্তমানে বৌদির অসহায় অবস্থার কথা ভেবে এই প্রথম এক গভীর মমতা ও সহানুভূতি অনুভব করল। দুয়েকবার জয়শ্রী গিয়ে কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিল। অবনীই পাঠিয়েছিল। কিন্তু বৌদি তা নেয় নি। হঠাৎ ওর মনে হল, হয়ত বৌদি তাদের চিরদিনের মতই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তা না হলে তার এই অসুখের কথা শুনে নিশ্চয়ই একদিন আসত। কিন্তু কেন আসবে, বলতে পার অবনী! তুমি নিজেই যে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছ। তবু তো হিরণ এসে মাঝে মাঝে তোমায় দেখে যায়, তুমি ক'দিন ওদের দেখতে গিয়েছিলে? তুমি ত ওদের নিকট আত্মীয়ই ছিলে! ভেবেছিলে আত্মসর্বস্ব হয়ে সংসারে বেঁচে থাকবে, কিন্তু তা যায় না অবনী, তা যায় না। কথাগুলো মনে মনে নিজেকেই যেন শোনাতে চাইল অবনী। আর পরমুহূর্তেই করুণ তৃষিত অনুতপ্ত অথচ নিখাদ ভালবাসায় পূর্ণ এক দৃষ্টি নিয়ে হিরণকে দেখতে লাগল। হিরণ কাকার দিকে চেয়ে কেমন বিব্রতবোধ করল। চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'কাকিমা, এবার আমি উঠবো।'

অবনীর ঘোর কাটল। মৃদু ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আর একটু বোস।'

তারপর আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবনী রিক্ত পরিত্যক্ত কোন মানুষের মতন বেদনার্ত গলায় বলল, 'বৌদিকে আসতে বলার মতন মুখ আর নেই, তবু বলিস একবার' কথাটা অর্ধপথেই থামিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। যেন এই মুহূর্তে যে আবেগ ভর করেছিল ওকে তা সহজ ও স্বাভাবিক করে আনছে।

হিরণ চলে গেলে জয়শ্রীও উঠে নীচে গেল। বইটা অবনীর কাছে খোলা রেখেই চলে গেছে ও। কী খেয়ালে বইটা টেনে নিল অবনী। তারপর একরকম বিনা কৌতূহলেই মন্থরভাবে চোখ বুলোল। মানুষ মনে মনে কোন একটা কথা গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে যেমন করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে সব কিছুকে প্রত্যক্ষ করে, অনেকটা সেরকম। কিন্তু সেই নৈর্ব্যক্তিক উদাস আসল ভাবটা কেটে যাওয়ার পর একসময় যখন চেতনাকে স্পর্শ করল অবনী, তখন অনেক কাল আগের শোনা একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। গল্পটা সে ঠাকুমার পাশে শুয়ে শুয়ে শুনেছিল। দাদাও ছিল তার পাশে। এতকাল পর আজ আবার এ গল্পটাই দেখতে পেল বইটায়।

তখন কোশল রাজ্যের সিংহাসনে বসেছেন অম্বরীষ। রাজ্যের মধ্যে হাহাকার। মাঠ তৃণশূন্য। নিষ্পত্র বৃক্ষরাজি। কঙ্কালসার মানুষ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান।

গল্পটার পেছনে ছুটতে গিয়ে একসময় অবনী অনুভব করল, তার দম ফুরিয়ে গেছে, আর দৌড়তে পারবে না। একটু জিরনো দরকার। ঠিক সেই মুহূর্তে রুগ্ন, ক্লান্ত, শীর্ণ অবনীর সামনে অন্য এক সুস্থ, স্বাভাবিক সুন্দর অবয়বের মানুষ এসে দাঁড়াল। অবনী তাকে চিনতে পারল না প্রথমটায়। পরে চিনল। ওই লোকটি ওর দিকে শান্ত গভীর মমতা-ভরা চোখ দুটো প্রসারিত করে যেন বলল, তুমি ভুলে গেছ অবনী, আমায় ভুলে গেছ। একবার মনে করে দেখত। অবনী মনে করবার চেষ্টা করল।

গল্পটা তার আবার মনে পড়ল। ঋষি ঋত্বিকের এক পুত্র অম্বরীষের রাজ্যকে বাঁচিয়েছিল। আত্মদান করে। দধীচির মতন। তার নাম হয়েছিল দেবরাত।

অবনীর গলা শুকিয়ে আসছিল। সব যেন কেমন রুক্ষ সজীবতাবর্জিত। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কে যেন একটু একটু করে সবার অলক্ষ্যে দীর্ঘ দিন ধরে তার জীবন থেকে তৃষ্ণাতুর শীতল সব পানীয় শুষে নিয়েছে, আর সেই শূন্য ফাঁকা জায়গাটার চতুর্দিকে একটি পিপাসার্ত আত্মা উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে ঘুরে ক্রমশ ক্ষীণায়ু হচ্ছে।

আজ এতকাল পরে ভাবতে গিয়ে একটা জিনিস বুঝল অবনী, দীর্ঘ জীবনে এই উপাখ্যানটা সময়ের হাতে একদা কেমন যেন বর্ণহীন ফ্যাকাশে লুপ্ত স্মৃতির মতন হয়ে গেছে। এতকাল পর, আবার স্মৃতির জঞ্জাল ঘাটতে গিয়ে আজ এই মুহূর্তে গভীর এক বেদনার সঙ্গে, আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে লুকনো নিরুজ্জ্বল একটা পাত্র যেন তুলে আনল অবনী। সে দান করতে শেখেনি। এবং এই চিন্তা নিবিষ্ট মনে ভাবতে ভাবতে গাঢ় এক অনুতাপে মগ্ন হতে লাগল।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যারিসে যখন উগ্র প্রকৃতিবাদের আধিপত্য, তখন—উনিশ শতকের নবম দশকে—এদুয়ার্দ দুজার্দাঁ নামে এক ভদ্রলোক 'Les lauriers sont coupe'es' (কুঞ্জপথে আর যাবো না) নামে ছোট্ট একটি উপন্যাস ছাপিয়েছিলেন। এমিল জোলা তখন সারস্বত সমাজের প্রধান। তাঁর ছিলো সিদ্ধান্তবাদী উপন্যাস: সাংবাদিকতা, কালচিত্র, জনপ্রিয় ডারুয়িনবাদ প্রভৃতি মস্ত সব ব্যাপার যথেচ্ছ থাকতো তাতে; এবং, রচনাটি যাতে কালক্রমে দলিল হিশেবে গণ্য হয়, আসল ঝোঁকটা থাকতো সেই দিকে। প্রবল শোরগোল চলছে তখন এই সব উপন্যাস নিয়ে। কিংবা ফরাশিগণ তৎকালে চোখ গোল-গোল ক'রে পড়ছেন পোল বুর্জের সেইসব হাঁড়ি-চড়ানে হৈচৈয়িক উপন্যাস যাদের ভিতর একটুও খোলা হাওয়ার আনাগোনা নেই: দমবন্ধ সব জটপাকানো কাহিনী, একবার পড়লেই পুরোনো হ'য়ে যায়, আর এ-কালে তো বস্তাপচা গন্ধের জন্য তা পড়তেই পারা যায় না; নয়তো অনেকে উপভোগ করছেন মোপাসাঁর সেই সব 'জীবনখণ্ড'—'slices of life'—ফ্লবেয়্যার-প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যার প্রশংসায় শতমুখ। এমন যখন অবস্থা, তখন কোনো রোগা বই—যা আবার কোনোমতেই সমকালের দলিল কিংবা কালচিত্র ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, এবং স্পন্দিত, তপ্ত ও স্বেদাসিক্ত 'জীবনখণ্ড'ও যাকে কিছুতেই বলা চলে না—প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে যা সাংকেতিকতা নামক ক্ষীণকণ্ঠ একটি সাহিত্যিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, তা তখন কী ক'রে উচ্চকিত চ্যাঁচামেচির মধ্যে নিজের মিনমিনে গলা শোনাবে? যাকে 'avantgarde' বা 'অগ্রদূত' বলে, প্রতীকীবাদী এবং বিম্বধর্মিগণ তখন ঠিক তাই। কয়েক বছর এদিক-ওদিক হ'লেই ফ্লবেয়্যার-এর মৃত্যু ঘটে যাবে, আর ফ্রান্সের সব সাঁলোতেই হুগনার তখন ভীষণ শোরগোলের কারণ। সাংকেতিকতা বা প্রতীকীবাদ নামে যে-নতুন কুপ্রকার আন্দোলন শুরু হয়েছে তার ডাকে সাড়া দেবার উপযোগী সময় আসতে তখনো অন্তত সিকি শতাব্দী বাকি: 'avantgarde'-তে নামভূমিকায় আসতে হ'লে সচরাচর ওটুকু সময় লেগেই থাকে।

কিন্তু প্রতীকীবাদ 'avantgarde'-এর চেয়েও বেশি কিছু ছিলো। আসলে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সূত্রপাতই হ'লো তার মধ্যে, আর কোনো-কোনো দিক থেকে চলচ্চিত্রেরও। এই প্রতীকীবাদীদের একজন গৌণপুরুষ ছিলেন এদুয়ার্দ দুজার্দাঁ—অল্পবয়সী একজন সংগীত-সমালোচক, হ্বাগনারের ভীষণ অনুরাগী।

জেমস্ জয়েস্

১৮৮৭ সালে 'La Revue Inde'peod-ante' কাগজে ধারাবাহিকভাবে 'Les luariers sont coupe'es'-কে প্রকাশ করতে শুরু করেন; বন্ধু জর্জ মুর তখন প্রকৃতিবাদী—তিনি এবং অন্যান্য প্রতীকী-বাদীরা মনোযোগ দিয়ে উপন্যাসটি পড়তেন। আজকে যদি কেউ এই উপন্যাসটিকে 'কাহিনী'র জন্য পড়তে বসেন, তাহ'লে তাঁর বেশ মজা লাগবে—যে-সততা ও অকপটতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে বর্ণনা করা হয়েছে, হয়তো সেই সরল সততার জন্যই ভালো লাগার মতো একটি কৌতুকপ্রদ উপন্যাস ব'লে মনে হবে এটাকে। ব্যাপারটা কী? না, এই রকম: প্যারিসের একটি সদ্যোযুবা একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘুমোতে চায়; অভিনেত্রীটি তাকে শতহস্ত তফাতে রাখে বটে, কিন্তু তার কাছ থেকে উপহার বা টাকাকড়ি নিতে একটুও দেরি বা দ্বিধা করে না; যুবকটিকেই তার সমস্ত দেনা শোধ ক'রে দিতে হয়। উপন্যাসে কেবল একটি সন্ধেবেলার বিবরণ দেয়া হয়েছে; সেই সন্ধেবেলাটিতে, যুবকটি ভেবেছিলো, শ্রীমতী বোধহয় অবশেষে তারই হবে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই আশা করাটা তার ভুল হয়েছিলো। গল্প বলতে তো শুধু এইটুকু; সোজাসুজি ব'লে দিলে তার চেয়ে পাংশুল, তুচ্ছ ও সাধারণ আর-কিছুই হ'তে পারে না। কিন্তু তবু প্রথম উষার শিশিরবিন্দু-গুলি এর প্রাত্যাহিকতায় ঝলমল করছে। লেখার ভঙ্গি তাজা, সজীব এবং কল্পনা-কুশল। তাছাড়া বইটির ভিতর এমন একটি তপ্ত চিত্রলতা ছড়িয়ে আছে যা তার প্রথম পাঠকদেরও চোখে পড়েছিলো। যদি জিগেস করি যে, এমন একটি পুরোনো, শিথিল ও সাধারণ গল্প কেমন ক'রে এ-রকম সংরক্ত চিত্রলতা অর্জন করেছে, তখন এর উত্তর হয় যে কথকতার ভঙ্গিটাই আমাদের আকর্ষণকে সব সময়ে সজাগ ও তীক্ষ্ম রাখে। এই জিনিশটিকেই জেমস জয়েস দেখতে পেয়েছিলেন; অনেক বছর পরে বইটিকে তিনি এই কারণেই প্রশংসা করেছিলেন যে, 'এর প্রথম পংক্তি থেকেই' পাঠক 'গ্রন্থের নায়কের মনে আটকে থাকেন।' তিনি যে শেষ পংক্তি পর্যন্ত সেখানেই থাকেন—এই কথাটাকে আমরা প্রসঙ্গত যোগ ক'রে দিতে পারি।

স্বগতকথন বা 'monologue inte'rieur' নামক ব্যাপারটিই এর কারণ, যার সূত্রপাত ঘটেছিলো এই চটি বইটিতেই। স্থানে-কালে নির্ভরশীল যে-বস্তুময়তা, তার আঙ্গিক বদলে দিলে সে; আধুনিক উপন্যাস আর বশংবদ থাকলো না কোনো বিশেষ স্থান বা কালের। এই কথাগুলিকে আলাদা ক'রে নিয়ে ভেবে দেখলে হয়তো অন্তঃসারশূন্য ব'লে বোধ হবে; কেননা বইটির ভিতর যা-যা ঘটেছিলো, তা প্রায় সবই ঘটেছিলো একটি মোহ্যমান, আবিষ্ট ও শৌখিন ফরাশি যুবকের সচেতনতায়, আর গ্রন্থের ভিতর স্থান বলতে আছে কেবল কতগুলি বুলভার। তাছাড়া একজন অভিনেত্রীর পশ্চান্ধাবন করাটার সঙ্গে বহুস্তর ও 'সময়শাসিত' কথকতার যোগা-যোগ কী? বলাই বাহুল্য, দুজার্দাঁ ১৮৮৭তে উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে তাঁর এই সাহিত্যিক চমকের জটিলতা সম্বন্ধে অতি অল্পই অবহিত ছিলেন। ভেবে-ছিলেন, আগাগোড়া একটি অন্তর্ময় উপন্যাস লিখবেন, কখনো তাঁর উপন্যাসের নায়কের মনের বাইরে যাবেন না; গোটা ব্যাপারটা ঘটবে কেবল একটিমাত্র সন্ধের—কয়েক ঘণ্টায়, এবং ঘটবে কেবল চিন্তারই ভিতর, কোনো ক্রিয়াকলাপে নয়। যথা-রীতি সাময়িকপত্রে বেরোলো, পুস্তকা-কারেও বেরোলো অচিরেই, কেউ-কেউ তার নতুনত্বে আকৃষ্ট হলেন—তাদের সংখ্যা

আইজেনস্টাইন ও চ্যাপলিন (হলিউড ১৯৩০)

অবশ্য খুবই কম, তারপরে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে মিলিয়ে গেলো। এক যুগ পরে দুজার্দা তাঁর গদ্যপদ্যের বিচিত্র সংকলনে এটাকে নামগল্প হিশেবে পুনর্মুদ্রিত করলেন, এবং সম্ভবত এই সংস্করণটিই জয়েসের হাতে এসে পড়েছিলো। তখন বিশ শতক শুরু হ'য়ে গেছে। ১৯০২ সালে একবার প্যারিস থেকে ডাবলিন যেতে-যেতে রাস্তায় গল্পটা প'ড়ে ফেললেন জয়েস (তারও একযুগ পরে 'ইউলিসিস' বেরিয়েছিলো, আর তার প্রথম সূচনা হয়েছিলো এই বিচলিত ভ্রমণের বিবরণ দিয়েই)। বিশ বছর পরেও এই আইরিশ ঔপন্যাসিক বইটিকে ভুলে যাননি;-তখন তিনি বইটিকে সম্মান জানালেন তাঁর ডাবলিন-ওডিসির আঙ্গিকের প্রধান উৎস ব'লে—রচিত হ'লো চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস।

জয়েস যখন তাঁর নাম উল্লেখ করলেন, দুজার্দা তখনো বেঁচে। বলতে গেলে প্রায় কেউই তখন তাঁর নাম জানে না; অস্পষ্টতার মধ্য থেকে তিনি তখন ধর্ম ও সংগীত বিষয়ে বই লিখছেন। 'ইউলিসিস'-এর লেখক তাঁকে যে-বিপুল সম্মান দিলেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রায় করুণভাবেই তিনি সাড়া দিলেন; সকৃতজ্ঞ পুনরুৎসর্গে ;তাঁর বইয়ের নতুন সংস্করণ হয়েছিলো ১৯২৪-এ) মৃতের রাজ্য থেকে তুলে আনা ব্যক্তির সংগে নিজের চিত্রকল্প যখন মিলিয়ে দিলেন, তখন তিনি সচেতনভাবেই জানতেন যে এই অলৌকিক মায়া যিনি ঘটালেন, সেই জয়েসকে তিনি খৃষ্ট ব'লে সম্বোধন করছেন। অতিকায় শিল্পীটি কিন্তু এই পৌরাণিক উল্লেখের গূঢ়ার্থ হারিয়ে ফ্যালেননি; অতিরিক্ত বিনয়ে—যা একদিক থেকে আত্মগরিমারই মুখোশ—জয়েস 'ইউলিসিস'-এর একটি কপিতে এই কথা লিখে পাঠালেন, 'অন্তর্ময়তার প্রবক্তাকে—ধৃষ্ট তস্কর।'

২

এটাকে জড়িয়ে ধীরে-ধীরে গুরুতর একটি বিতর্ক গজিয়ে উঠলো। 'স্বগত-কথন' বা 'monologue intérieur' ব্যাপারটি কী? সংজ্ঞার্থই বা কী দেয়া হবে তার? আইজেনস্টাইন বলেছেন যে 'অন্তরীণ সংলাপ' হ'লো 'নায়কের পুনরভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করার সময় বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্য লোপ ক'রে কেলাসিত চেহারা দেবার সাহিত্যিক পদ্ধতি' ('literary method of abolishing the distinction between subject and object in stating the hero's re-experience in crystallized form') মাত্র। তাই যদি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে রোম্যাণ্টিকদের কথাও প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে, কেননা 'বিষয় থেকে স'রে গিয়ে বিষয়ীর মনে ঘোরাফেরা ক'রে আবার বিষয়ের কাছে ফিরে আসা রোম্যাণ্টিকদের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ক'রে এর্নস্ট টিয়োডর আমাডিয়ুস হোফমান, নোফালিস, জেরার্দ দ্য নেরভাল প্রভৃতির কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়।' আইজেনস্টাইনের এই কথাগুলো স্পষ্ট হবে যখন আমরা চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের উৎসসন্ধানে বেরোবো। উইলিয়ম জেমস-এর 'মনস্তত্ত্বের সূত্রাবলি'তে (১৮৯০) এক জায়গায় বলা হয়েছে :

'মনের ভিতরে যে-স্বাধীন জলস্রোত বহমান, প্রতিটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রতিমা বা চিত্রকল্প যে শুধু কেবল তার ভিতর ডুবেই থাকে তা নয়, তার দ্বারা রঞ্জিত ও অনুরঞ্জিত হয়। প্রতিটি প্রতিমা তার তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মূল্য লাভ করে সেই উজ্জ্বল-বর্তুল বা উপচ্ছায়া বা ছায়ালোকের কাছ থেকে, যা তাকে ঘিরে থাকে, বা তার সংগে সম্পৃক্ত, এবং যা তাকে সংগে ক'রে কাছে-দূরে নিয়ে যায়।' তারপর আরো আছে : 'চেতনা বা ভাবনা কখনো ছেঁড়া-ছেঁড়া বা টুকরো-টুকরোভাবে আত্মপ্রকাশ করে না।...কতগুলি টুকরোকে জোড়া লাগিয়ে বানানো হয়েছে, চেতনা কিছুতেই তা নয়। সে স্রোতের মতো, নিয়তই বহমান।...তাকে বরং বলতে পারি ভাবনার স্রোত, চেতনার প্রবাহ, অন্তর্জীবনের অবিচ্ছেদ গতি।' 'চেতনা-প্রবাহ' কথাটা কোত্থেকে এসেছে, তা সহজেই বোঝা যায়। পরবর্তীকালে আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে ভার্জিনিয়া য়ুলফ মস্ত উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন উইলিয়ম জেমস থেকে। ১৯১৮ সালে মে সিনক্লেয়ারও ডরোথি রিচার্ডসনের উপন্যাসের আলোচনায় 'চেতনাপ্রবাহ' কথাটির পুনর্ব্যবহার করেছিলেন। উইলিয়ম জেমস যে-কথা বলেছেন, তার একটি আক্ষরিক সাহিত্যিক তর্জমা 'ইউলিসিস' থেকে তুলে দেয়া যায়: একটি অন্ত্যেষ্টিতে যাচ্ছেন লিয়োপোল্ড ব্লুম, চুপচাপ ব'সে আছেন চারচাকার গাড়িতে :

'তারা বার্কলে স্ট্রিটে মোচড় দিতেই নদীর ধারের রাস্তার একটা বাড়ি থেকে হুড়মুড় ক'রে তাদের উপর এসে পড়লো বড়ো-বড়ো ঘরের ঝনঝনে ঝমঝমে কোলাহল ও গান। কেলিকে দেখেছো কি কেউ, কোনোদিনও? ক-য়ে এ-কার ল-য়ে হ্রস্ব ই-কর। মৃতেরা কুচকাওয়াজ ক'রে এলো "সল" থেকে। বদ এই লোকটা, ঠিক যেন বুড়ো আন্তোনিয়ো। ...

আমার, নিজেই নিয়ো নিজেকে—এই তার মতলব। নাচতে-নাচতে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরপাক! "দুর্দশার সুরে বন্ধ মাতৃমূর্তি"! ধর্মের পথ। আমার বাসাটা ও ওখানে। মস্ত জায়গা, বিরাট। দুরারোগ্যদের জন্য বিশেষ একটা ধন্বন্তরি-বিভাগ আছে ওখানে। খুবই উৎসাহজনক। মেরিমাতার সরাইখানা : মুমূর্ষুদের জন্য চমৎকার সুব্যবস্থা! হাতের কাছেই কবরখানা—খুব কাছেই, তলার দিকে। বুড়ি রিয়োর্ডান ওখানেই অক্কা পেয়েছিলো। কী ভীষণ দেখায় ওদের—এই স্ত্রীলোক-গুলিকে। যে-পেয়ালাটায় পথ্য খেতো, চামচে দিয়ে কিনা তার ঠোঁট ঘষতো বারবার। তারপরে তার রোগশয্যার চারদিকে পর্দা টাঙিয়ে দিলে। কেন? না, এখন সে মরবে। বেশ ভালো ছিলো ছাত্রটি, ভিমরুলের কামড় খাবার পর সেই আমাকে পট্টি বেঁধে দিয়েছিলো। থুরথুরেরা যে-হাসপাতালে গিয়ে মরবে ব'লে শোয়, এখন নাকি সেখানে আছে সে। এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায়—মাঝে আর কিচ্ছুই নেই।'

বলাই বাহুল্য, এখানে আমরা একেবারে ব্লুমের মনের ভিতর এসে পড়েছি। পাঠক আর উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে যে-বনেদি বিরোধ ছিলো, তা একেবারে ভেঙে গেলো। সাবেককালের মতো ঔপন্যাসিক নামক তৃতীয় ব্যক্তিটি এখন আর এই দুয়ের ভিতর সেতুবন্ধ হ'য়ে থাকলেন না। বনেদি চালের উপন্যাসে চরিত্রদের মনের খবর জানাতেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু জয়েস—এই সঙ্গে ভার্জিনিয়া য়ুলফ ও ডরোথি রিচার্ডসনের নামও করা উচিত—ঠিক চরিত্রের মনের ভিতর এনে হাজির করলেন আমাদের; মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘর যেখানে 'আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি' জেগে উঠতে থাকে। কবে থেকে এর সূচনা হ'লো বলা মুশকিল! রিচার্ডসন, হ্যামলেট, ডিকেন্স কোথাও-কোথাও এর ধারকাছ দিয়ে গিয়েছেন। আর লরেন্স স্টার্নের 'ট্রিস্ট্রাম স্যান্ডি' যে একদিক থেকে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসেরই প্রথম নিদর্শন ১ সে-বিষয়ে অন্তত জয়েস আর য়ুলফের পরে আর-

কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সত্ত্বেও জয়েসই যে এর চূড়ান্ত নিদর্শন ও পরাকাষ্ঠা, এটাও এখন সন্দেহাতীত। আইজেনস্টাইনের সঙ্গে জয়েসের একবার দেখা হয়েছিলো প্যারিসে। জয়েস ছেলেবেলা থেকেই চোখে কম দেখতেন, তখন—' ২০-এর যুগে—চোখ দুটি প্রায় খুইয়ে বসেছেন, একেবারে অন্ধপ্রতিম; তবু আইজেনস্টাইনের কাছে চলমান ছায়াছবির কথা শুনে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বর্ণমালার সাহায্যে তিনি যা করতে চাচ্ছেন, বহুবিধ উপায় ও কৌশল হাতে আছে ব'লে একজন চলচ্চিত্র-নির্মেতার কাছে তা কত সহজসাধ্য। শুধু যে সহজ তাই নয়, অনায়াস এবং সাবলীলও বটে। কিন্তু ততদিনে তাঁর 'ইউলিসিস' বেরিয়ে গেছে : রিরংসার নগ্ন ও অশালীন প্রকাশ ঘটেছে এই অভিযোগে তখন তা বাজেয়াপ্ত হ'লেও এই অসাহিত্যিক কারণের জন্য গোপনে তার প্রচার অধিকতর বিক্রমের সঙ্গে বর্ধমান। আর যে-সব কৌশল তাতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন, কিছুদিন পরেই রুপোলি পর্দায় তার প্রকাশ দেখে এ-কথাই মনে হয় যে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলিকেই উত্তরসূরিগণ চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করেছেন।

৩

জয়েসের চোখ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলো, খুবই কম দেখতেন; ফলে তাঁকে চিত্রকল্প রচনায় রঙের চেয়ে বেশি সাহায্য নিতে হয়েছিলো শব্দের; তোরঙ্গ-শব্দ (লিউয়িস ক্যারলকে ধন্যবাদ), স্তূপীকৃত বিশেষণ, আর অন্বয়-প্রণালীর নানাবিধ তোলাপাড়ার মধ্য দিয়ে কৌশলে তাঁকে ছবি ফুটিয়ে তুলতে হ'তো : 'She was just a young thin pale soft shy slim slip of a thing then' জয়েসের এই বাক্যটি উদ্ধৃত ক'রে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন যে এখানে বিশেষণ-গুলি শ্রাবণের বর্ষার মতো অজস্রতায় ঝ'রে পড়লেও কোনোটিকেই ত্যাগ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, কেননা শরীরের কোনো বাঁকা কিংবা ভোলের কোনো আভাস না দিয়েও যে-রমণীর বর্ণনা করা হ'লো তার ছবিটি কি মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না? 'উয়োমুন' (Womoon) বা ঐ জাতীয় বিখ্যাত তোরঙ্গশব্দ (যার অসংবৃত ও আতিশয্যমূলক ব্যবহারে 'ফিনেগানস ওয়েক' প্রায় দুর্বোধ) এবং এই জাতীয় অনুষঙ্গ ও ধ্বনির নিপুণ ব্যবহারেই জয়েস আওয়াজের মধ্য দিয়ে

আমাদের কাছে ছবি ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু সেই ছবিগুলি নিছকই ছবি নয়;—তারা যে ছবি এ-কথা বললেই তাদের সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না কিংবা শুধু মাত্র নয়নমোহন হ'য়েই তারা ফুরোয় না। এই কথাগুলো বোঝবার জন্যই এতক্ষণ ধ'রে আমরা অন্তর্ময় বাঙ্ময়তা ও চেতনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করেছি। চার্লি চ্যাপলিনের

---

১ বাংলা ভাষায় চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন কী, সে-বিষয়ে অনেকে কৌতূহল পোষণ করতে পারেন। তিরিশের একেবারে গোড়ার দিকে বুদ্ধদেব বসু-প্রণীত 'লাল মেঘ' নামক উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহের প্রথম সুচিন্তিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; পরে তাঁর বহু উপন্যাসে এই কৌশল ব্যবহৃত হয়েছিলো; 'কালো হাওয়া'র হেমন্তীর মনোবিপর্যয়, 'তিথিডোর'-এর বিখ্যাত [illegible], 'নির্জন স্বাক্ষরের' সোমেন, এবং [illegible] জন্য কোনখানের [illegible] ও তার [illegible]

সবচেয়ে সম্পূর্ণভাবে উপন্যাস লিখেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; তাঁর 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' নামক তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি কোনো-কোনো দিক থেকে [illegible], বিশেষ ক'রে [illegible] [illegible]

ছবিতে যেখানে ক্ষুধার্তের হাতে জুতোর পেরেক মুর্গির ঠ্যাঙে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়, সেখানে আমাদের কাছে—সেই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আঘাতে—মনের অন্যসব অনুধাবন ক্ষমতার বিকলতাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য, পদ্ধতিটি এক। আমরা সেই ক্ষুধার্তের চোখ দিয়ে বন্ধুকে, তার জুতোকে এবং অন্যসব কিছুকে দেখতে শুরু ক'রে দিলাম। আজকের দিনে যে-কেউ ফিল্ম তুলতে যান, তিনি না জেনেশুনে অনায়াসে এটা ব্যবহার করবেন যে, একজন লোক চিত হ'য়ে অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছে, ঈথার দেয়া হ'লো, জ্ঞান লুপ্ত হচ্ছে, ঝাপশা হ'য়ে যাচ্ছে সব, ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমশ অসহায় হ'য়ে পড়ছে—ক্যামেরার কাচ তখন সেই লোকের চোখের কাজ করবে : ক্যামেরা যা তুলে দেবে তা ঝাপশা কতগুলি ছবি, ধীরে-ধীরে বা বিলীয়মান; ওদিকে আবহ-সঙ্গীতও ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেলো—এবং এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিকলতা শব্দ, ছবি ও অন্যসব কিছুর অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হ'লো! খুব ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত, অত্যন্ত সহজ : বুঝতে কারোই কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, এবং আজকের দিনে এটি এত স্বাভাবিক ব'লে ঠেকবে যে তা বোঝাবার জন্য কোনো তত্ত্বকথারও দরকার হবে না। কিন্তু জয়েস যা করতে চাচ্ছিলেন, পরে তাকে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করার সময় আইজেনস্টাইনকে তত্ত্ব বানাতে হয়েছিলো; এটা কীভাবে করা যায় তা তাকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে হয়েছিলো, এবং তিনি বলেছিলেন যে, 'শুধুমাত্র শব্দচিত্রই চেতনাপ্রবাহের প্রতিটি দশা ও প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে পুনর্গঠিত করতে পারে। কী চমৎকার সব নকশা বানাতে পারে মনটাজ! মানুষের চিন্তা যেমন, তেমনি কখনো তার প্রতিমাগুলি হবে চাক্ষুষ, কখনো-বা তা নির্ভর করবে ধ্বনির উপর—কখনো-বা দুটোই এক সঙ্গে ঘটবে, কখনো-বা যুগপত্তা বর্জিত—কিছুতেই এক সঙ্গে ঘটবে না। তারপর হয়তো থাকবে কেবল কতগুলি ধ্বনি—নিরাকার, কিংবা হয়তো ধ্বনিনির্ভর কতগুলি প্রতিমা, সুস্পষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত কতিপয় আওয়াজ—শব্দময় কতগুলি প্রতিমূর্তি।...তারপর আচমকা স্পষ্ট, বুদ্ধিনির্ভর সুগঠিত কতগুলি কথা— উচ্চারিত কথার মতোই "বুদ্ধিজাত" ও অসংবৃত্ত। কালো পর্দার উপর ধাওয়া ক'রে এলো প্রতিরূপহীন কতগুলি রেখা, তারপরে যোগসূত্রহীন অসংলগ্ন কতগুলি আরক্ত কথাবার্তা—শুধু বিশেষ্য, তাছাড়া আর-কিছু নয়, কিংবা কেবল কতগুলি ক্রিয়াপদ, তারপরেই হঠাৎ কোনো কথার ভিতর ভাব বা আবেগপ্রকাশক শব্দ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো, সঙ্গে কতগুলি উদ্দেশ্যহীন আঁকাবাঁকা এলোমেলো ছাঁচ বা নকশা, তারা ঘুরপাক খাচ্ছে, আবর্ত তুলছে, আর সব ঘটছে একই সঙ্গে—ঘটনাক্রমের ভিতর পরম্পরা নেই, বরং একটা আরেকটার সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে তাদের ঘটনাকালে কোনো তফাৎ নেই। তারপরেই পরিপূর্ণ স্তব্ধতার উপর দিয়ে দৌড়ে চ'লে এলো কতগুলি চাক্ষুষ প্রতিরূপ, তারপরেই বহুস্তর কতগুলি ধ্বনির বিচ্ছুরণ তাদের ভিতর যোগাযোগ রচনা ক'রে দিলো, তারও পরে শব্দ ও ছবি দুটোই একসঙ্গে এবং দুটোই বহুস্তর। তারপর তা সন্নিবিষ্ট হ'লো কার্যকলাপের বহিঃপ্রবাহে—প্রায় ছুঁড়ে ফেলা হ'লো যেন তাদের, তারপরেই অন্তর্লীন বাগধারায় প্রক্ষিপ্ত হ'লো বহির্দেশের ক্রিয়াকলাপের উপাদানগুলি।' এখানে আইজেনস্টাইন যে-পদ্ধতির কথা বলছেন, তাতে কোনো চরিত্রের মানসিক সংঘাতের টানাপোড়েনের ভিতর সরাসরি আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়া যায় : সন্দেহ, সংরাগ, যুক্তি—সব—কেউ ধীরে, কেউ দ্রুত—ছন্দের দোলায় ভিতর ধীরে-ধীরে চিত্রকল্প রচনা ক'রে যুগপৎ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে উঠলো—কোনো বহিঃসংঘাত নেই, কোনো বহিশ্চঞ্চলতাও নেই—একটি কঠিন ও অনড় মুখের অন্তরালে তীব্র এক বিতর্ক ও দোলাচল সম্পন্ন হয়ে গেলো। কোনো-একটি ধাক্কা দিয়ে তা শুরু করতে হয় : কখনো ঈর্ষা, কখনো রাগ, কখনো প্রজ্বলন্ত অভিমান, কখনো-বা মদ্যপানের পর প্রচণ্ড খোঁয়ারি। এরাই অবকাশ দেয় এই অন্তর্সংঘাতকে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা সহজে দাঁত-নখ বের করতো না—যেন দরজা খুলে দেয়া হ'লো পশুশালার, আর হিংস্র ও ক্ষুধিত শ্বাপদের মতো বিভিন্ন ভাবনারা অসংযত ও প্রচণ্ড হ'য়ে বেরিয়ে পড়লো। স্রষ্টার উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য যে কেবলমাত্র তাদের পারম্পর্য রক্ষা করা, তা নয়—বরং এই সব আপাতবিরোধী ভাবনা, কথা, চিত্র ও উত্তেজনার ভিতর সেতুবন্ধ রচনা ক'রে একসঙ্গে তাদের উদ্ভাসিত ক'রে তোলাও তাঁরই সুকঠিন দায়িত্ব।

৪

নষ্ট পাড়ার রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লিয়োপোল্ড ব্লুম জলত্যাগ করতে বসেছিলো। তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলে তাকে পাহারোলা; এর আগে আকণ্ঠ গিলেছে ব্লুম, ফলে কথা কাটাকাটি শেষকালে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেলো, যেখানে ব্লুমের বিরুদ্ধে 'বিধিবদ্ধভাবে' অভিযোগ করা হ'লো; তৎক্ষণাৎ—বলা নেই, কওয়া নেই—দেখা গেলো আদালতের দৃশ্য : উকিল, ব্যারিস্টার, পেশকার, হাকিম, সমাগত নরনারী, ফোঁপর-দালাল পুলিশ সব সুদ্ধ—অবশ্য তারা সবাই ব্লুমের চেনা লোক; একযোগে সবাই অভি-যোগ করছে তার বিরুদ্ধে—এমনকি কবে কোন মেয়েকে দেখে তার ভিতরে রিরংসা জেগেছিলো এবং যার খবর কেবলমাত্র তার অবচেতন ছাড়া চরাচরে আর-কেউ রাখতো না, দেখা গেলো সেই মেয়েটিও এখন অভি-যোগ পেশ করতে ছাড়লে না। বোঝা গেলো, কিছুতেই তার আর ছাড়া পাবার উপায় নেই। ঠিক এমন সময়ে একজনের মত শোনা গেলো যে অত দোষ থাকলেও ব্লুমের ছোট্ট একটা গুণও আছে। এ-কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে, একমুহূর্তও অবকাশ না-দিয়ে, তৎক্ষণাৎ শুরু হ'য়ে গেলো শোভাযাত্রা ও উচ্ছ্বসিত করতালি, এবং শোভাযাত্রার পুরোভাগে আর-কেউ নয়, ডাবলিনের নতুন মেয়র শ্রীযুক্ত লিয়োপোল্ড ব্লুম, এবং তারই পরিপূরকভাবে অচিরাৎ পট-পরিবর্তিত হয়ে তুঙ্গে নিয়ে গেলো : আমরা পরমভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রথম লিয়োপোল্ড নামক এক সম্রাটকে দেখতে পেলাম। সমস্ত ব্যাপার পর-পর রুদ্ধশ্বাসে ঘ'টে গেলো, অথচ আসলে কিন্তু ব্লুম তখনো রাতশহরের ঐ বাঁকা গলির মুখে পাহারোলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ব্লুম অপ্রকৃতিস্থ এ-কথাটা জয়েসকে কোথাও ব'লে দিতে হ'লো না; তার প্রয়োজনও ছিলো না, তিনি শুধু তার ভাবনার ভিতর সব যুক্তি ও স্বাভাবিক-তাকে টানের পর টান মেরে ছিঁড়ে দিয়ে তার গোপন বাসনাগুলি আর ভীষণ ভয়কে, তার সদিচ্ছা, উচ্চাশা, অপরাধবোধ আর হতাশাকে [illegible] প্রকাশ্য [illegible]

দিলেন, উন্মোচিত হ'লো তার চেতনা আর অবচেতনঃ পাপবোধ, অহমিকা, দিবাস্বপ্ন, রাজ্যপিপাসা, ব্যর্থতার স্মৃতি সব একের পর এক চ'লে এলো সার বেঁধে কুচকাওয়াজ ক'রে। আমরা বুঝে নিতে পারলাম যে, লোকটা বেধড়ক গিলেছে ব'লেই মাতলামি করছে, স্বাভাবিক অবস্থায় নেই—কিন্তু যেহেতু আমরা তার বুকের ভিতরে ঢুকে গিয়ে তপ্ত আর দপদপে হৃৎপিণ্ডটিকেও দেখতে পারছি সেইজন্য তার প্রতি গোপনে আমাদের অনুকম্পা ও সহানুভূতিও জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। কিংবা আরো ধরা যাক—নষ্টপাড়ায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে ব্লুম, আছে তিনটি বেশ্যা, রাতশহরের নানা আওয়াজ ও স্তব্ধতা, আর হাওয়ায় মদের ঝিমধরা গন্ধ, আর কোন-এক বিভীষণ চাপ; সেখানে কথা বললো কখনো কোনো হাতপাখা, কখনো-বা কোনো অপ্সরামূর্তি; এলো নাদুশনুদুশ মস্ত চেহারার ভারিক্কি বাড়িউলি, ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল লাগলো, আর তারপরেই ব্লুম মুহূর্তের মধ্যে মেয়ে হ'য়ে গেলো, আর বাড়িউলি বেলা রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো 'বেলো' নামক তাগড়াই জোয়ান পুরুষ; হুড়োহুড়ি চললো দু'জনে—আস্ত ডাবলিনটাই রূপান্তরিত হ'লো পাতালে, মায়াবিনীর কুক্ষিগত কোনো রসাতলের সঙ্গে কোনো তফাতই তার থাকলো না, আর কোথাও না-বলা সত্ত্বেও এই তথ্যটা আমরা চট ক'রে বুঝে নিতে পারলাম যে, ব্লুমের দাম্পত্যজীবন মোটেই সুখের নয়, স্ত্রীর সঙ্গে তার মেজাজের তফাৎ আছে প্রচুর, আর তাদের যুগল। জীবনের নানা তথ্য কোথাও সরব না হ'য়েও ব'লে গেলো কেন এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ভবঘুরে ব্লুমের জীবন নারকীয় কৃষ্ণাভায় ভরপুর।

এই মাতলামি আজগবি হ'লো না কেন? সমস্ত যুক্তিকে ভেঙে দিয়ে ব্লুম কখনো আসামী হ'য়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, কখনো, বা সম্মানিত মেয়রসাহেব হ'য়ে পড়ে, কখনো-বা সম্রাট, জগতের মুক্তির দূত, আবার কখনো এক অবলা নারী, আর মস্ত এক মেয়েমানুষ হঠাৎ হ'য়ে যায় ভীষণ এক মরদ। অপ্রকৃতিস্থতা আর অস্বাভাবিকতার চূড়ান্তঃ আপাত চোখে এটাই আমাদের মনে হ'তে পারে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখবো, গোপনে তারই ভিতর যুক্তি আর স্বাভাবিকতার এক কঠিন মিনার গ'ড়ে উঠলো ধীরে-ধীরে, দম-আটকানো সিঁড়ি আর বারান্দা দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমাদের উঠে যেতে হয় তার উপর, উঠে দেখি সারি-সারি অনেকগুলি ঘর প'ড়ে আছে সেখানে, পায়রার খোপের মতো একেকটা ঘর, কোনো-কোনো ঘরের দরজা সপাটে খোলা, কোনো ঘরের দরজায় বা [illegible]

আবার আমরা যাওয়ামাত্র মন্ত্রবলে আপনা থেকেই খুলে গেলোঃ অর্থাৎ কোনো কিছু না-বলা সত্ত্বেও ধীরে-ধীরে আমাদের কাছে উন্মোচিত হ'য়ে যায় ব্লুমের অন্তর্জগৎ—তার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, সন্দেহ, অসুখ, দুঃখ, কষ্ট, বিবেক ও লোকোত্তর তাড়না—সব সমেত।

যদি এটা চলচ্চিত্রে দেখানো হ'তো, তাহলে কী করা হ'তো? পাঠক 'ওয়াল্টার মিটির গোপন জীবন' নামক জেমস থারবারের বিখ্যাত গল্পটির চিত্ররূপের কথা মনে করে নিতে পারেন। ওয়াল্টার মিটি এক অতি-সাধারণ ভদ্রলোক, ভিতু, মধ্যবিত্ত, ভাবুক, স্বপ্নদ্রষ্টা—একশোর মধ্যে নেহাৎই নিরেনব্বুই জনের একজন। ড্যানি কে আছেন ওয়াল্টার মিটির ভূমিকায়। রাস্তায় দেখলেন এক ঘোড়ায়-চড়া টেক্সাসের কাউ-বয়, আঁটো পাতলুনে হোলস্টার আছে, পরনের কুর্তার উপর কার্তুজের বন্ধনী; 'যদি এ-রকম হওয়া যেতো'—এ-কথা ভাবার আগেই, তৎক্ষণাৎ, স্বয়ং ওঁকেই দেখা গেলো সে-ই বেশে! যা-ই তাঁকে আকর্ষণ করে, মনে-মনে তা-ই তিনি হ'য়ে যান। কখনো টেক্সাসের বীরপুরুষ, কখনো প্রেমিক—ঠিক একেবারে দু' নম্বর ডন য়েয়ান, কখনো অমুক, কখনো তমুক। কিন্তু যা-ই তিনি হন না কেন ভিতরে ঠিক সেই ভিতু, কাপুরুষ, মুখচোরা মধ্যবিত্ত লোকটি লুকিয়ে থাকে এবং তুঙ্গমুহূর্তে সে-ই পোশাকের তলা থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রে বসে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সময়ের ব্যাপার কী হবে? 'ইউলিসিসে'র অনেকখানি জুড়ে আছে নষ্টপাড়ার অংশ, অথচ আস্ত বইটার ঘটনাকাল হ'লো ১৯০৪ সালের ডাবলিনের একটিমাত্র দিনরাত্রি। ব্লুমের এই বিভিন্ন রূপান্তর ঘটছে রাতের বেলায়, তার মনের ভিতর—নষ্টপাড়ার এক রাস্তায়; যখন আবার পুনর্মূষিক হ'লো সে তখনো সেই রাত, সেই পাহারোলা, সেই নষ্টপাড়া এবং কব্জি-ঘড়িতে মিনিটের কাঁটা ঘুরেছে কয়েকটি মাত্র ঘর। কিংবা উপন্যাসের সেই শেষ কয়েকপাতা যেখানে যতিচিহ্নহীন একটি শায়িত ভাবনাকে তুলে ধরা হ'লো, যেখানে কোনো বাক্যবন্ধই আস্ত কিংবা সম্পূর্ণ নয়—একটার গায়ে যেখানে আরেকটি বাক্য সংলাপ কি সংগোপন ইচ্ছা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, যেখানে ধীরে-ধীরে একটি আস্ত জীবন ফুটে ওঠে—প্রথম প্রেম সম্বন্ধ, যেখানে হলুদ অন্তর্বাস, নোংরা অস্নাত শরীর, কিংবা খাদ্যবস্তুর তালিকা প্রভৃতি খুঁটিনাটি পর্যন্ত বর্তমান—সেখানে পৌঁছে সহজেই—এই আন্তরিক স্বগতোক্তির ধারা বেয়ে—আমরা আইজেনস্টাইনের উল্লিখিত তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছোতে পারি। এটি যে [illegible]

স্রোত, তা তো সহজেই ধ'রে নিতে পারা যায়। আপাতচোখে যুক্তি কিংবা শৃঙ্খলার কোনো বালাই না-থাকলে হবে কি, তলায় একেবারে সুকঠিন গণিতের মতো কাজ করছে সর্বজ্ঞ লেখকের বিধান, যার দ্বারা তিনি শেষ পর্যন্ত অন্তর্যামীর মতো সব কিছুর ভিতরেই—ওই বিশৃঙ্খলা ও যুক্তি-হীনতার মধ্যে—বরং এক নিগূঢ় যুক্তি ও শৃঙ্খলাকে হাজির ক'রে দেন। কিংবা সতর্ক পাঠক—যিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত—তিনি তো স্পষ্টই লক্ষ করবেন যে, যখন একটি নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হবার বর্ণনা দেওয়া হ'লো বইতে, তখন প্রসূতির ব্যথার উদ্রেক থেকে শুরু ক'রে নবজাতকের আগমন পর্যন্ত যে-বিপুল অংশ বিবৃত হয়েছে তার ভিতর ধীরে-ধীরে ইংরেজি ভাষার বিবর্তনের একটি ইতিহাসও গোপনে পুরে রাখা হয়েছেঃ অভিনিবেশ দিলেই দেখা যায় ইংরেজি গদ্যের আদিরূপ থেকে ক্রমে-ক্রমে ইংরেজি গদ্যের একেবারে আধুনিক যুগে এসে পড়ি আমরা—যখন প্রসূতি যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তখন গদ্যের যেন প্রথম জন্ম হ'লো—কোনো সুবিহিত বিধি নেই, নেই কোনো মসৃণ প্রবহমানতা, বরং খোঁচার মতো বিভিন্ন অংশে স্তম্ভিতের মতো তাকিয়ে থাকে চেনা-অচেনা লুপ্ত-সুপ্ত নানা শব্দের টানাপোড়েন; কিন্তু সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দিয়ে যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লো, অমনি সেই অংশের বর্ণনাতে ভাষা অত্যন্ত আধুনিক ও মসৃণ, সহজ ও সাবলীল এবং স্বাভাবিক ও প্রবহমানা হ'য়ে উঠলো। ভাষা—অর্থাৎ যে-ধ্বনিস্পন্দ দিয়ে জয়েসের এই জন্মের ব্যাপারটি বিবৃত করেছেন, তা—একেবারে ভাঁজে-ভাঁজে পরতে পরতে বিবৃত বিষয়ের সঙ্গে মিশে আছে—বাক্যবন্ধের গড়নের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সচেতনভাবে ধাপে ধাপে আস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ ক'রে দেওয়া হ'লো।

এখন এ-সব দেখে আমরা চমৎকৃত হই, লেখকের রচনার পিছনে এই গভীর ভাবনা ও নিষ্ঠা দেখে সশ্রদ্ধ না হ'য়েও কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু এই সব কৌশল যেহেতু জয়েসেরই উদ্ভাবিত, সেইজন্য পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে তাদের প্রয়োগ দেখে স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁকে চলচ্চিত্রের অন্যতম স্রষ্টা বা উপদেষ্টা বললে ভুল হয় না। যে-কোনো ছায়াছবিতে আজকের দিনে আমরা এই সব পদ্ধতির প্রয়োগ দেখে থাকি। 'হারানো সপ্তাহশেষ'-এর সেই সুবিখ্যাত বিভীষিকার দৃশ্য, সেই দুঃস্বপ্ন, যেখানে রে মিল্যান্ড আকণ্ঠ মদ্যপান ক'রে নিজের ঘরে এসে চিত হ'য়ে শুয়ে আছেন, আর ঘরের দেয়াল শাদা চুনকাম-করা ক্যাম্বিসকাপড়ে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছেঃ ধীরে ধীরে যা ছিঁড়ে ধবধবে ক্যাম্বিসকাপড়ের উপর ইঁদুরটি বেরিয়ে

এলো, আর ভীষণ একটি বাদুড় কোত্থেকে ছুটে এসে অপার্থিব চীৎকারে চারপাশে শিহরন তুলে যায় উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, এবং তৎক্ষণাৎ তীব্র ধাতব আর্তনাদের সংগে-সংগে সেই ধবল ক্যাম্বিস কাপড়ের উপর দিয়ে গলগল ক'রে গড়িয়ে পড়লো রক্তের ধারা! দৃশ্যটির দিকে একটু অভিনিবেশ প্রয়োগ করলেই মূলে উৎসে জেমস জয়েসের উপস্থিতি অনায়াসেই আমাদের চোখে প'ড়ে যায়। অপরাধবোধ, বিবেক, নেশার দাসত্ব, হতাশা, অনাস্থা—সব কীভাবে মনের ভিতর রূপান্তরিত হ'তে-হ'তে এই চিত্রকল্পে পরিণত হয়ে গেলো, তা মনে রাখলেই দেখবো আস্ত দৃশ্যটা অবাস্তব ও আজগুবি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্লীন অর্থময়তায় সঞ্জীবিত হ'য়ে নতুন আরেকটি আয়তন দান ক'রে ব'সে আছে: আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে, এটি নায়কের মনের ভিতরকার কারখানাঘর এবং সেখানে তার ভয়, বিবেক আর অপরাধবোধ যুক্তির অতিরিক্ত এক টানাপোড়েনে পরিবর্তিত হ'য়ে-হ'য়ে এই বিভীষিকার জন্ম দিয়েছে। অনেকে বললেন, এর পিছনে হোফমান, এডগার অ্যালান পো, পুশকিন, গোগোল প্রভৃতির ছাপ স্পষ্ট। 'ইশকাবনের বিবি'তে তাসের চেহারা ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে সেই যে ডাচেসের বিদ্রূপ-ভরা মুখ হ'য়ে গিয়েছিলো এখানে কি তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে না? কিংবা ঝোড়ো-হাওয়ায় কাঁপা কালো রাতে কোনো-এক নির্জন বাড়ির ভারি, চাপা, ভারাতুর কোঠায় মোমবাতির আলোয় অহিফেন-সেবকের চোখের সামনে যেভাবে শাদা চাদরে মোড়া মৃতদেহ উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গুণ্ঠন-মোচন ক'রে লিজিয়া নাম্নী প্রথম, পত্নীতে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়ে ইচ্ছুক বাহুযুগল বাড়িয়ে দেয়, এখানে কি তারও লক্ষ করা যায় না। মুহূর্তে কি আমরা বুঝতে পারি না ভীষণ টান লেগে এখন এদের মনের মধ্যে যুক্তির সবগুলি সুতো পটপট ক'রে ছিঁড়ে গেলো? হোফমান-এর "ছায়াহারা" প্রভৃতি গল্প, গোগোলের বিখ্যাত "এক পাগলের দিনলিপি", "নাক" বা "ওভারকোট" প্রভৃতি অবদান, ডস্টয়েভস্কির "কুমির" নামক মর্মান্তিক ঠাট্টা প্রভৃতি বহু বিভিন্ন লেখকের বহু রচনাকেই নজির হিশেবে এখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায়। স্বয়ং আইজেনস্টাইন নেরভালের মতো কবির কথাও উল্লেখ করে-ছিলেন। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখা ভালো যে চরাচরে কিছুই যেহেতু স্বয়ম্ভূ নয়, সেইজন্যে পিছন দিকে অভিনিবেশ দিলে অনেককেই সার দিয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়; আমরা শুধু বোঝার বা আলোচনার সুবিধের জন্য সর্বজনগ্রহণের উপযোগী একটা জায়গা থেকে শুরু করি। উল্লিখিত মহাজনদের হাতে এই সব কৌশল অতি ক্ষীণভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো, এবং মূলত তাদের নজর ছিলো রোমাঞ্চিকা হওয়ার দিকে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বানানোর ভাবটা বড্ড চোখে পড়ে; জিনিশটা যে আদ্যোপান্ত তৈরি করা, তা বুঝতে দেরি হয় না; ভিতর থেকে তারা যতটা হ'য়ে ওঠে, তার চেয়েও বেশি উগ্রভাবে বাইরে থেকে চাপানোর ভাবটা আত্মজাহির ক'রে বসে। জয়েসই প্রথম, যিনি সচেতনভাবে তাঁর রচনায় আদ্যোপান্ত এর ব্যবহার করেছিলেন, তারা চরিত্রের মনের কারখানা থেকে হ'য়ে ওঠে—এ-বারের বন থেকে টিয়েপাখি বেরোয় সোনার টোপর মাথায়, বেরোয় নিগূঢ় ভিতর থেকে। এবং একে বাদ দিলে, তাঁর রচনাই থাকে না। কোনো কৌশলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা।

দুজার্দাঁর কথা তুলে এই আলোচনার সূচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুজার্দাঁর লেখায় বড়ো ত্রুটিটা কোথায় তা উল্লেখ না করলে জয়েসকে বুঝতে অসুবিধে হ'তে পারে। অতীতকে জানাবার জন্য দুজার্দাঁকে একটি আজগুবির অবতারণা করতে হয়েছিলো: নায়কের সংগে অভিনেত্রীর কথা হ'লো রাত আটটায় আবার দেখা হবে; মধ্যে এই ক' ঘণ্টা সময় নায়ক একা-একা কী করে? সে তখন—পাঠকদের সুবিধের জন্য—লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বাড়ি ফিরে গিয়ে তাদের ভিতর যে-সব পত্র বিনিময় হয়েছিলো তা পড়তে শুরু ক'রে দিলো। পাঠককে বিগত অতীত জানাবার এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় দুজার্দাঁ খুঁজে পাননি। তার জন্য এমনকি একটি হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য বিষয়েরও অবতারণা করতে হয়েছিলো দুজার্দাঁকে। নায়ক অভিনেত্রীটিকে যে-সব প্রেমপত্র লিখেছিলো, তার নকল রাখতে তার নাকি একচুলও ভুল হয়নি—সরকারি চিঠি তো, নজির রাখার জন্য এমনকি প্রসংগসূত্র সুদ্ধু যেন লেখা। এবং এই অবসরে তাও কিনা সে পড়লো এক-এক ক'রে—এবং তার সংগে সংগে আমরা পাঠকরাও পড়লাম। প্রেমপত্রের নকল রেখে ভালো করেনি সে? না হ'লে বেচারা পাঠকরা সব ব্যাপার জানতো কী ক'রে? কিন্তু ব্যাপারটি এত অবাস্তব, হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য যে, এই একটি দুর্বলতায় বেচারা দুজার্দাঁর বইটি মার খেয়েছিলো। জয়েস কিন্তু এ-জাতীয় কোনো দুর্বলতার প্রশ্রয় দেননি। ১৯০৪ সালের একটি দিনেই তিনি আস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পুরে দিয়েছেন: 'টাইম প্রেজেন্ট' এবং 'টাইম পাস্ট' সব একসংগে আমাদের কাছে উন্মোচিত ক'রে দেয়া হ'লো: গীতার বিশ্ব-রূপ দর্শনের মতো ব্লুমের মনের মধ্যেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আমরা যুগপৎ বিরাজ করতে দেখলাম: তার মনের মধ্যেই সজীব, চঞ্চল ও অস্থির হ'য়ে উঠলো 'মাছ, মাংস ও মাৎসর্য'। একটি গোটা দিনের ভিতর এক আস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বকাল—ব্যাপারটাকে এইরকমভাবে হাজির ক'রে জয়েস সময়ের সমস্যা সমাধান করেছেন।

পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে ঠিক অনুরূপ পদ্ধতি নিয়েছেন বিখ্যাত সুইডিশ চিত্র-পরিচালক ইংগমার বের্গমান। তাঁর 'বুনো স্ট্রবেরি' চিত্রেও মাত্রই একটি দিনরাত্রি বিবৃত—কিন্তু তার ভিতরেই বৃদ্ধ নায়কের পুরো জীবনটি আমাদের জানা হ'য়ে যায়। স্বপ্ন, স্মৃতি, দুঃস্বপ্ন ও ভাবনা—এরাই ক্রমে-ক্রমে একটি দিনের ভিতর দীর্ঘ ছিয়াত্তর বছরকে ভ'রে দেয়।

৫

জেমস জয়েসের এই মস্ত উপন্যাসটির (র‍্যালফ ফক্সের ফতোয়া অনুযায়ী আধুনিক মহাকাব্য বলা যেতে পারে) ভিতর যা-কিছু ঘটেছে সব হ'লো একদিনের ব্যাপার, ঘটনাপট ডাবলিন, আর বিষয় একটি ভ্রমণ—হিংস্র, আমিষখোর ও রক্তারক্তিতে ভরা একটি ভ্রমণ (যদিও রোমাঞ্চসিরিজের মতো খুন-জখম-রাহাজানি নেই): অর্থাৎ এটা হ'লো সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একজন আধুনিক মানুষের চলাফেরার বিবরণ: ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে মাঝারিমের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সাঙ্গ করা হ'লো, নায়ক গেলেন একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, খবর-কাগজের আপিসে; গ্রন্থবিতান, শস্তা ভাটি-খানা, মদ্যাগার, হাসপাতাল, সমুদ্রবেলা, নষ্ট পাড়া, কফিখানা ইত্যাদি যাবতীয় জায়গায় ঘুরে ছুঁয়ে পুনরায় এসে শয্যায় আশ্রয় নিলেন। ধীরে-ধীরে এই তুচ্ছ, মলিন, পোকাপড়া দৈনন্দিনের মধ্যেই [illegible]

বৃত্তান্ত সফেন সমুদ্রের উপর দিয়ে মস্ত এক পালতোলা জাহাজ চলেছে—কিন্তু এই প্রাচীন উপাখ্যানটি কখনো স্পষ্ট ও উগ্রভাবে ফুটে ওঠে নি, বরং জাঁতিকলের মতো ভিতর থেকে বইটাকে কামড়ে আছে, কেননা কেবলমাত্র তার আবহাওয়াটাই ঝুলে আছে উপন্যাসের মধ্যে, কশাইখানায় যেমন ঝুলে থাকে দগদগে মাংসখণ্ড, 'কার্নিশে যেমন ঝুলে থাকে বাদুড়ের কালো ছায়া'।

ইউলিসিস হলেন শ্রীযুক্ত লিয়োপোল্ড ব্লুম—'ধর্মান্তরিত একজন ইহুদি'—লোলুপ, অলস, মর্যাদাজ্ঞানহীন, বিষণ্ণ, কৃত্রিম, দয়াবান, অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন; এবং যখনি তিনি কোনো উচ্চ আদর্শের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখনি সেই বন্য হংসের অনুসরণ তাঁকে নামিয়ে নিয়ে আসে আরো অনেক নিচুতে। খুঁটে-খুঁটে বের ক'রে নিতে চান জীবনকে, জানতে চান তার সব কোণ ও সীমান্তর, আর তার এই বিরাট উদ্যমের উপায় হ'লো দপদপে একটি শরীর। পেনিলোপি হলেন শ্রীমতী মারিয়ন ব্লুম, বড্ড বেশি সদয়, নিজেকে বড্ড বাজে খরচ করেন, প্রেমপ্রার্থীদের প্রতি একেবারে বিগলিতকরুণা, দয়ার শরীর,—বিশেষত উপন্যাসের শেষাংশে যে-দীর্ঘ পত্রবহুল যতিচিহ্নহীন ভাবনা স্রোতের মতো ব'য়ে যায় তাতে তাঁর শারীরিক ক্ষুধা বা রিরংসার অতৃপ্তিই দপদপ্ করে, যাকে তিনি কেবল চিন্তাতে নয় কার্যক্ষেত্রে চরিতার্থ করতে চান। তৃতীয় ব্যক্তিটি হ'লো স্টিফেন ডেডেলাস নামক জনৈক তরুণ, যাকে পাঠকেরা ইতিপূর্বে দেখেছেন জয়েস-প্রণীত 'শিল্পীযুবকের প্রতিকৃতি' নামক গ্রন্থে, এবং যার ডেডেলাস নামক পদবি গ্রীক পুরাণের মোমের পাখনার কিংবদন্তী স্মরণে আনে; ডেডেলাসকে দেখেই ব্লুম তাকে তার আত্মার সন্তান ব'লে শনাক্ত করতে পারলে—ঠিক যেমনভাবে টেলিমেকাসকে দেখেই ইউলিসিস নিজেরই নন্দন ব'লে চিনেছিলেন। স্টিফেনের পথ ভিন্ন, সে চায় বুদ্ধির সাহায্যে জীবনকে জেনে নিতে (পাঠক নিশ্চয়ই জানেন যে 'শিল্পী-যুবকের প্রতিকৃতি, নামক উপন্যাসের প্রথম লেখনে স্টিফেন ডেডেলাসের নাম ছিলো স্টিফেন হিরো; পরে যে ডেডেলাস নামক গ্রীক নামটি ব্যবহার করা হ'লো তা নিশ্চয়ই সুচিন্তিত ও অভিপ্রেত, কেননা যে পাখা ঝাপটিয়ে সশুত্র ডেডেলাস আকাশে উড়েছিলেন, এবং যে-পাখার মোম গ'লে গিয়ে পুত্র ইকারুসের মৃত্যু ঘটিয়েছিলো, সেই পাখনা দুটির জ্বলন্ত ও গলমান মোমকে আমরা এই মস্ত উপন্যাসে ধীরে-ধীরে ঝ'রে পড়তে দেখি, কেননা সেই শিল্পী-যুবককে এই মোহভঙ্গের ব্যাধিতাড়িত মহাকাব্যে জয়েস শুধু এক অনিবার্য শেষ রেখার দিকেই টেনে নিয়ে গেছেন।) ব্লুমের সঙ্গে ডেডেলাসের [illegible]

রাত্রে—উপন্যাসে যার নাম 'নাইট টাউন'। এই 'শর্বরীশহর' যে মায়াবিনী কির্কীর প্রাসাদ এবং ওডিসিয়ুসের 'পাতালপ্রবেশের' তর্জমা, তা অনায়াসেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে; কেননা এই নষ্ট পাড়ার অতিপ্রাকৃত ও অলিগলি-সংকুল কানাগলিতে ব্লুম আর ডেডেলাসের মধ্যেই অল্পেই বন্ধুতা হ'য়ে গেলো। উপন্যাসের মধ্যে যাকে সংকট বলে, তুঙ্গ ব'লে যাকে চেনানো যায়, এটাই হ'লো সেই অংশ; এইখানেই ছোটোখাটো অনেক পুরাণ ও কিংবদন্তী ভনভন্ ক'রে ঘুরতে থাকে, আর একটি হিংস্র ও নারকীয় অধিজ্যতা তাকে টান ক'রে তোলে। নারকীয় স্রোতে ভ'রে যায় সব—মাটি আলো আকাশ হাওয়া সব; গ'লে-গ'লে ঝ'রে পড়ে ব্যক্তিত্ব ও অস্মিতা, অনায়াসে লিঙ্গবদল হ'য়ে যায়, এবং আস্তে-আস্তে গোটা বিশ্ব—এমনকি এই হত ও হৃত-ভাগ্য ও ভোগাসক্ত ব্লুম সুদ্ধু—এক নিরানন্দ ইন্দ্রজালের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে, আর তারই ভিতর গমগম ক'রে বাজতে থাকে আদিপৃথিবীর ডাইনিপুরুতের অর্থহীন, শূন্য, নিরানন্দ কণ্ঠস্বর।

কাহিনী বলতে এই মস্ত বইতে আছে শুধু এইটুকু; কিন্তু এই কাঠামোটিকে পাতার পর পাতা ধ'রে ভ'রে রেখেছে দপদপ করা রক্তমাংস, যা না-থাকলে এটা নিছকই একটি নিরর্থক তত্ত্বকথা ও হোমরের নিষ্প্রাণ তর্জমায় পরিণত হ'তো। কিন্তু এটা তো হোমরের তর্জমা নয়, বরং তার একটি আধুনিক অ ন্ত রা খ্যা ন। ফাউস্টের কিংবদন্তী ছাড়া আর কোনো পুরাণ য়ুরোপের শিল্পীদের এতবার আকর্ষণ করেনি, আর বহুবার ব্যবহার করা সত্ত্বেও জয়েস যে দ্বিতীয়রহিত ও সজীব, তা কি কেবল এইজন্য যে এটা একটি 'tour de force'—ক্ষমতার লীলাময়তা—আর কিছুই নয়? জয়েসের পরবর্তী উপন্যাসের কথা মনে রাখলে অবশ্য একে আর ক্ষমতার লীলাময়তা বলা যায় না, কেননা তাঁর পরাকাষ্ঠা ঘটেছে তো 'ফিনেগানস ওয়েক'-এ, যেখানে শব্দের ভোজবাজির ভিতর আস্ত চরাচরকে ভ'রে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু 'ইউলিসিস'এ তো তা নয়; একটু অভিনিবেশ দিলে যে-কোনো পাঠকই অনায়াসে বুঝে নিতে পারবেন জয়েস কী বলতে চাচ্ছেন। প্রচুর ব্যবহার করেছেন তিনি অলৌকিকের, প্রায় যেন ফ্যান্টাসি এই উপন্যাস, বিশেষ ক'রে কোনো জবাবদিহি না ক'রে যেভাবে আজগবির ব্যবহার করেছেন, তাতে বাইরে থেকে অনায়াসেই একে ফ্যান্টাসি ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু তবু এটা পুরোপুরি ফ্যান্টাসি নয়, যেমন হ'লো লিউয়িস ক্যারল, কি কার্লো কলোদি, কি জেমস ব্যারি বা অবনীন্দ্রনাথ কি [illegible]। এটা

ঠিক, ক্যারলের বিষয়ই ছিলো তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা,—অ্যালিস যে বিস্ময়ের দেশে গেলো সেখানেই দেখানো হ'লো যে স্বাভাবিক পৃথিবীর একজন প্রতিনিধি গেছে আজব দেশে; পিটার প্যান-এও তা-ই—ওয়েন্ডিরা স্বভাবের পৃথিবীরই প্রতিনিধি, সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'র' আমিটিও তা-ই; তাদের বিস্ময় থেকে ধীরে-ধীরে বিস্ফারিত হয় 'নেই-দেশ' কি 'আয়নার রাজ্য' বা 'আজব দেশ'। কিন্তু জয়েসের মধ্যে কোনো বিস্ময় নেই : লিঙ্গ বদলে গেলো—যেন তা অতি স্বাভাবিক, হররোজ ঘ'টে থাকে; পাখা কথা বললো, কথা বললো দেয়ালের ছবির কুমারীরা, দরজার কড়া, খুর, বহুর, জলপরি, ঝর্না, বোতাম প্রভৃতি সব পদার্থই। কিন্তু এরা যে প্রাণ পেলো, কথা বললো, একটা অভিজ্ঞতার সক্রিয় অংশিদার হ'লো—কোনো বিস্ময়ই নেই এইজন্য। ব্লুম কখনো কাঠগড়ার আসামী, কখনো ডাবলিনের মেয়রসাহেব, কখনো-বা সম্রাট প্রথম লিয়োপোল্ড—কিন্তু তাও কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, সব স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া হয়। এ-সবকে স্বাভাবিক ভাবলো ব'লেই তো মর্মন্তুদভাবে ফুটে বেরুলো অস্তিত্বের সর্বনাশ। তারপর, এই-সব নারকীয় হট্টগোলের পরেই আবার উপন্যাসের রচনাভঙ্গি বদলে গেলো—পাতার পর পাতা জুড়ে ডেডেলাস আর ব্লুমের বর্ণনা করা হ'লো, কথা নেই বার্তা নেই

সংলাপ নেই, অনেকটা যেন মূকাভিনয়। পাতা ভ'রে উঠলো খুঁটিনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় : তারা হাত-পা ধুলো, নিজেদের সাফ ক'রে নিলে, আলোচনা করলে নানা বিষয়ে; এত ডিগ্রি কোণ ক'রে বসলো —কখনো আধ-শোয়ার ভঙ্গিতে, এমনকি আমরা যেন তাদের ঠোঁট নড়া সুদ্ধু দেখতে পাই, কিন্তু কোনো কথা শুনতে পাই না, যেন অনেক দূর থেকে দেখি খোয়ারি কাটার পরেকার সেই দশা, আর বিষম হট্টগোলের পরেই সেই ভারাতুর স্তব্ধতা যেন সবলভাবে আমাদের বুককে ঠেশে চেপে ধরে।

এতক্ষণের আলোচনার মধ্যে এটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে সংলাপ এই পুস্তকে কীরকম গুরুতর অংশ নিয়ে আছে। অথচ ভীষণ চ্যাঁচামেচির ঠিক পরক্ষণেই আর কোনো কথোপকথন নেই, কেবল তাদের ক্রিয়াকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। আবার তার পরের অংশ হচ্ছে পুস্তকের সেই যতিচিহ্নহীন চীৎকৃত ভাবনা, যা তার উপসংহারকে রুদ্ধশ্বাস ও নিষ্ঠুর ক'রে তোলে। শব্দের এই রকম সুচিন্তিত বিন্যাস ও ব্যবহার আমাদের কাছে সবাক চিত্রের কতগুলি কৌশলকে মনে করিয়ে দেয়। সব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যেন : কী ভাবে তারা ঘরে ঢুকলো, কী ভাবে জলের শব্দ হ'লো টুপটাপ ও ঝরঝর, ঠোঁট নড়ছে, সব দেখছি অন্য সব শুনছি, কিন্তু কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। 'মঁসিয় য়ুলোর ছুটির দিন', নামক জাক তাতির চলচ্চিত্রটি মনে ক'রে দেখুন—যেমন —যেমন রেস্তোরাঁয় দৃশ্য : ঠোঁট নড়া, অঙ্গভঙ্গি সব দেখা যায়, কথার আদলও মাঝে-মাঝে ফুটে ওঠে, কিন্তু কোনো স্পষ্ট-সংলাপ কানে আসে না। 'মঁসিয় ভার্দু'তে চ্যাপলিন একটি নরহত্যা সমাধা ক'রে নিশীথরাত্রে যে-সাংগীতিক চান্দ্রবিলাস শুরু করেন, তা যেমন একটি নৃশংস কাজকে চাপা দিয়ে রাখে, তেমনি নষ্ট পাড়ার ওই কানে তালা লাগানো চ্যাঁচামেচিও যেন ব্লুমের হৃদয়ের উৎকট মৃত্যুকে চেপে রাখতে চায়। শুধু কেবল উৎক্ষেপনের কৌশলই নয়, আগাগোড়া পুরো ব্যাপারটিকে প্রায় যেন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘটানো হ'লো। এই শব্দবিন্যাস নামক ব্যাপারটি পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নিঃসংকোচে গ্রহণ করেছে। আবহসংগীত নামক ব্যাপারটি যে শব্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, তারও মূলসূত্র হয়তো এখানেই লিপিবদ্ধ ছিলো।

৬

আরেকটি ছোট্ট বিষয় আছে, কিন্তু ছোট্ট হ'লেও যা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই আলোচনায় আগে তার আভাস দেয়া হয়েছে, কিন্তু এখন তা আরো স্পষ্ট করা উচিত। আজকাল বিদেশেও চার ঘণ্টার ছবি তোলা শুরু হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ দর্শনীয় ছবিই বেশি সময় দর্শককে ব্যতিব্যস্ত ও উত্তেজিত রাখতে চায় না। সেইজন্য চিত্র-নির্মাণের বেলায় সবচেয়ে বেশি লক্ষ রাখতে হয় সময়ের উপর—কেননা একটা মুহূর্তও বাজে খরচ করার উপায় থাকে না। একটি উপন্যাস আমরা দীর্ঘ দিন ধ'রে চেখে-চেখে পড়তে পারি, কিন্তু একটি চলচ্চিত্রকে নির্দিষ্ট কতগুলি মিনিটের মধ্যে শেষ করতেই হয়। তখনি প্রয়োজন পরে কোন-কোন জিনিশ কতক্ষণ ধ'রে কোন কোণ থেকে কীভাবে দেখানো হবে—এটা ভেবে নেয়ার। 'ইউলিসিস' উপন্যাসটি একটিমাত্র দিনের ঘটনা হ'লেও সন্ধে থেকে মধ্যরাত অবধি যা-যা ঘটেছিলো তারই বর্ণনায় অধিক বাক্যব্যয় করেছে। অথচ প্রাতঃকাল থেকে গোধূলি পর্যন্ত অনেক কিছুই ঘটেছিলো : অন্ত্যেষ্টি খবর-কাগজের আপিশ, গ্রন্থবিতান প্রভৃতি নানা স্থানের অভিযান সেখানে বিবৃত হয়েছে কিন্তু তাতে তুলনামূলকভাবে জয়েস অনেক কম পাতা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ কখনো গতি বা বেগ খুবই দ্রুত, আবার কখনো অতিশয় মন্থর ও শ্লথ। গতির এই নিয়ন্ত্রণটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, কেননা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা তা হ'লো বেগ বা আন্দোলন—যে-কারণে তার ডাক নাম 'মুভি'। তা যে কতগুলি স্থিরচিত্রের প্রতিফলন, সংকলন বা পরম্পরা নয়, এটাই তার কারণ। এই বেগ ব্যাপারটি যে অজস্র ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়, তা আজকের দিনে তর্কাতীত। বেগ বা আন্দোলন বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'লো একটি অন্তর্লীন অধিজ্যাতা, যা জলস্রোতের মতো অনিবার্যভাবে ভাটার দিকে এগোয়। এই আন্দোলনকে বোঝাবার জন্য বহু কৌশল ব্যবহার করা হয় : খুঁটিনাটি, পৌনঃপুনিক ও বহুমুখী উল্লেখ, গুপ্ত সংযোগ, নাটকীয় নিয়মিত প্রভৃতি বহু কিছু : তুলনা, প্রতিতুলনা, বিরোধাভাস এরাও তাদের দাবি সূচ্যগ্রপরিমাণ ছাড়ে না। আইজেনস্টাইন যে, মন্টাজের তত্ত্বকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলেছিলেন, তা প্রধানত এই কটি জিনিশের উপর নির্ভরশীল। 'ওডেসা-সোপানে'র অবিস্মরণীয় পরিকল্পনার ভিতর এদের স্তূপাকারে লক্ষ করা যায়। কশাক সৈন্যের নিয়মিত পদক্ষেপ, সোপান পংক্তির কঠিন পরম্পরা, এবং জনতার শৃঙ্খলমুক্ত উল্লাস—একটার গায়ে আরেকটাকে ছুঁড়ে মেরে যে তীব্র আন্দোলন তিনি তৈরি করেছিলেন তা তাঁর নিজের ব্যাখ্যাতেই কেবল নয়, নানা মুনির নানা ভাষণেও উপরিউক্ত রুদ্ধশ্বাস গতিবেগ খুঁটিনাটি, আবৃত্ত ও বহু-মুখী উল্লেখ ও বিরোধাভাসের ঘূর্ণ্যমান সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে ব'লেই ব্যক্ত হয়েছে। কোনো-একটি জিনিশ বারে-বারে ঘুরে এলো, কিন্তু প্রতিবারই তার অন্তর্লীন অর্থময়তা পরিবর্তিত হচ্ছে—এই জিনিশটি আমাদের মনের ভিতর স্রোত ও আবর্তের কুটিল চঞ্চলতা গ'ড়ে তোলে। তাছাড়া একই জিনিশকে কখনো দ্রুত বা কখনো ধীর লয়ে ঘটিয়ে স্নায়ুর উপর আঘাত করলেও চঞ্চলতা জেগে ওঠে। যা অতর্কিত, তা মুহূর্তে ঘ'টে যায়, আবার যা অবশ্যম্ভাবী তা যখন অতিশয় ধীরে ঘটতে থাকে, তখন আমাদের বোধ জাগ্রত ও ক্ষুরধার হ'য়ে ওঠে : কেননা 'গতি বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝে থাকি, তা যে অন্য আরো বহুকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ও বিজড়িত, গতি যে আসলে আয়তনের পরিবর্তন স্তরভেদের পরম্পরা এটা যেভাবে 'ইউলিসিস'এ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, চলচ্চিত্র ঠিক সেইভাবেই তাকে সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে।

৭

কোনো চলচ্চিত্রনির্মেতার চেয়ে একটি বড়ো সুযোগ ছিলো জয়েসের যে-কারণে অচিরাৎ ও প্রত্যক্ষ না-হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ যুগে তিনি প্রত্যেক সচেতন জিজ্ঞাসুর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য থেকে যাবেন আইজেনস্টাইন, ওয়াল্ট ডিজনে বা চার্লি চ্যাপলিনের বরাতে যে-সৌভাগ্যটি নেই; কেননা 'চলচ্চিত্র' ব্যাপারটি নানা কারণে অতিশয় স্বল্পজীবী ও ক্ষণস্থায়ী—তাই একদা প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য হওয়া সত্ত্বেও এই তিন অবিস্মরণীয় প্রতিভা কেবল ইতিহাসের স্বম্ভ হ'য়েই থাকবেন—সাধারণের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ক্রমশ ছিন্ন হ'য়ে আসবে। যেহেতু চলচ্চিত্র ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর সবচেয়ে নির্ভরশীল, কেননা কল্পনা থাকলেও যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এখানে স্বীকার না-ক'রে চলে না, সেইজন্য কালক্রমে দুর্বলেরাও এই তিন প্রতিভার উপর টেক্কা দেবার স্বপ্ন দেখতে পারেন। কিন্তু সেটা হয়তো শুধুই স্বপ্ন, কেননা এঁরা তিনজনে হলেন স্রষ্টা, যে-সম্মান চিরকাল তাঁদের দিয়েছে। জয়েসও আর কোনো সূত্রে না-হোক—নিশ্চয়ই এই সূত্রে স্বীকৃতি পাবেন।

পশুপক্ষী বাতিকগ্রস্ত বৃটেন

অস্ট্রেলিয়ার এক সাংবাদিক সম্প্রতি লণ্ডন বেড়িয়ে দেশে ফিরে সিডনী থেকে প্রকাশিত তার কাগজে লেখেনঃ "পোষা কুকুর, বিড়াল, পাখি বা মাছ না থাকলে সামাজিক চিড়িয়াখানায় কারুর ঠাঁই হয় না।" বৃটেনের লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত পশুপক্ষীর সংখ্যা ধরলে এই উক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। গণনা থেকে আরো জানা যায় যে, কুকুর ও বিড়ালের চেয়ে খাঁচার পাখি বর্তমানে সংখ্যায় প্রভূত বেশী। সেই সংগে সবরকমেরই পশুপক্ষী পোষার বাতিক যে কি পরিমাণ বেড়ে চলেছে, তারও একটা চমকপ্রদ হিসেব পাওয়া যায়।

বৃটেনে খাঁচায় পোষা পাখির সংখ্যা এখন এক কোটি দশ লক্ষ। লাইসেন্স নেওয়া কুকুরের সংখ্যা ২৭,০১,৫৫৫ এবং এছাড়া আছে লাইসেন্স না-করা এবং রাস্তার কুকুর। ১৯৩৮, ১৯৫০ এবং ১৯৫৬ সালে লাইসেন্স-করা কুকুরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪০,০০,০০০; ৩০,৮৯,৪৫০ এবং ২৮,২১,০৭১। বিড়াল সম্পর্কে কোন সঠিক সংখ্যা নির্ণয় কঠিন ব্যাপার। কোন কোন ব্যক্তির হিসেবে বৃটেনে বিড়ালের সংখ্যা ৮০,০০,০০০ এবং বছরে তাদের খাওয়াতে খরচ হয় প্রায় আঠাশ কোটি টাকা। ১৯৬০ সালে জাতীয় মার্জার সপ্তাহ উদ্‌যাপন কালে এক বিশেষজ্ঞ বিড়ালের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ বলে অনুমান করেন অর্থাৎ বৃটেনের মানুষ অধিবাসীর প্রতি চারজনের ভাগে একটি করে। কিন্তু কম সংখ্যাটা ধরলেও তা ১৯৫৬ সালের তুলনায় ২০ লক্ষ বেশী।

বৃটেনের লোকে সর্বসাকুল্যে কুকুর, বিড়াল ও পাখি মিলিয়ে ২ কোটি ২২ লক্ষ প্রাণীকে গৃহে স্থান দিয়েছে। আর ঐ পোষা জীবদের টিনে প্যাক করা খাদ্যের জন্য বছরে প্রায় ৭০ কোটি টাকা খরচ হয়। ছ বছর আগের এক হিসেবে দেখা যায় যে, খাঁচায় পোষা পাখির দানা বাবদ বছরে খরচ হয় প্রায় ২২ কোটি টাকা। অর্থাৎ পোষা প্রাণীদের খাওয়াতে মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে ৯২ কোটি টাকা। এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় বৃটেনের লোকে পশুপক্ষী পোষায় কি পরিমাণ বাতিকগ্রস্ত।

পশুপক্ষীদের উপর নির্যাতন প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য বৃটেনে ২২০টি সমিতি আছে। এদের মতে পোষা জীবটি যাই হোক গড়পড়তা লোকে তাদের ওপর মমতা ঢেলে দেয়। পোষা জীবরা ঠিকমতো ব্যবহার পায় না এমন গৃহও অবশ্য কিছু আছে। অনেকে রাখে, বাড়িতে একটা পোষা জীব রাখা ফ্যাসন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে। সেসব ক্ষেত্রে পশুগুলিকে হয় অতিমাত্রায় খেতে দেওয়া হয় নয়তো যথেষ্ট পরিমাণ খেতে পায় না। কুকুরেরা যথেষ্ট ব্যায়াম করতে পারে না এবং বেশীর ভাগ সময়টাই শিকলে বাঁধা অবস্থায় থাকে।

অবিবেচক ব্যক্তিরা অনেক সময়ে দু-তিন বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলনা হিসেবে কুকুর বা বিড়াল বাচ্চা কিনে দেয়। সেসব পোষা জীবগুলির ছোটদের নির্যাতনে নাকালের অন্ত থাকে না। ভেবেচিন্তে কাজ না করা, অনুভূতির অভাব এবং তাচ্ছিল্য-ভাবই পশুদের নির্যাতিত হওয়ার কারণ তবে পশুমঙ্গল সমিতি ক্রমেই এই অবস্থা দূর করে দিচ্ছে। অনেকের কাছে গৃহপালিত পশুপক্ষী গৃহের একটা অলংকাররূপে পরি-
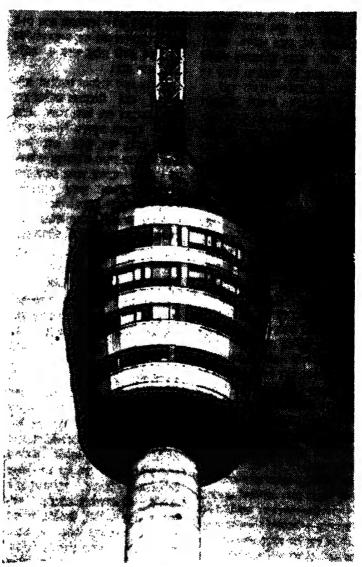
১৯৫৫ সাল থেকে সারা পৃথিবীর পঞ্চাশ লক্ষ লোক স্টাটগার্টের টেলিভিশন টাওয়ারটি পরিদর্শন করে। ১৪৯০ ফিট উঁচু বণসার জঙ্গল ছাপিয়ে কংক্রীটের এই বিরাট পিনটি মাথা উঁচু করে রয়েছে। টেলিভিশন মাস্তুল সমেত এই টাওয়ারটিরই উচ্চতা ৬৫১ ফিট। পনেরজন যাত্রী সহ মাত্র বাহান্ন সেকেণ্ডে দ্রুতগামী একটি লিফ্‌ট টাওয়ারের চূড়োয় পোঁছয়। এর প্রথম তলাটি হচ্ছে ৪৬৩ ফিট উঁচু এবং এখানে রয়েছে একটি ট্রান্সমিশন কামেরা একটি রান্নাঘর এবং দুটি রেস্তরাঁ। ওর ওপর তলায় অবজারভেশন গ্যালারি, যেখান থেকে স্টাটগার্টের দৃশ্য, নেকার উপত্যকা এবং ব্ল্যাক ফরেস্ট দেখা যায়। অবজারভেশন গ্যালারি এবং রেস্তরাঁয় একসঙ্গে ছশ লোকের সংকুলান হতে পারে

গণিত হয়, তাদের কাছে ওরা আর কোন কাজের নয়। কিন্তু সেটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। বিশেষ করে বিড়াল, কুকুর এবং খাঁচার পাখি তাদের প্রতি যত্ন ও স্নেহ যা দেখানো হয়, সে অনুপাতে অনেক বেশী বুদ্ধিমান হয়। আর প্রয়োজনীয়তার কথা ধরলে ওদের অনেকেই রীতিমত কাজেরও হয়। অন্ধদের সহায় কুকুরগুলিই তার দৃষ্টান্ত। অন্যান্য ক্ষেত্রে জিনিসপত্তর আনা, ছোটদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া এবং স্কুল থেকে বাড়িতে আনা ইত্যাদি বহু কাজে লাগে। সাহসী পোষা জীব তাদের মালিকদের প্লাবন, অগ্নিকান্ড এমন কি আত্মহত্যা থেকে যে রক্ষা করে, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে পরিভ্রমণ কালে এক মহিলা অকস্মাৎ এক পাগল ষাঁড় দ্বারা আক্রান্ত হতে স্যামী নামক কুকুর মহিলাকে রক্ষা করে। লাইন নামক আর একটি কুকুর তার মালিককে ষাঁড়ের গুঁতোয় প্রাণনাশ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

ক্যাইনী নামক এক কুক্কুরির সম্মানে একটি ছোট মফঃস্বল শহরের দু'শ অধিবাসী ডিনারের ব্যবস্থা করে তার গলায় সোনার পাতমোড়া কলার পরিয়ে দেয় ও যে পরিবারে ছিল তাদের সকলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য।

আগুনের গন্ধ পেয়ে ক্যাইনী থাবা দিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে আগুন-লাগা বাড়িটির ভিতরে প্রবেশ করে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে কর্তা, কর্ত্রী এবং তাদের সন্তানদুটিকে জাগিয়ে তোলে।

ওয়েলসে প্রকান্ড এক অ্যালসেশিয়ান নিজের প্রাণ দিয়ে তার কর্ত্রীর জীবনরক্ষা করে। মহিলা কুকুরটিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। একটা গলি পার হবার সময় পূর্ণ গতিতে একখানি বাস এসে পড়ে। কুকুরটি তার কর্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই চাকার তলায় পড়ে প্রাণ হারায়।

পোষা বিড়ালরাও অনেক সময়ে অত্যোদ্ভুত সাহসের পরিচয় দেয়। এসম্পর্কে এদেশেরই একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। এক ব্যক্তি এক-দিন মাঝরাতে ফোঁসফোঁসানি শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে দেখে তার ঠিক মাথার ওপর ফণা তুলে রয়েছে একটা কেউটে সাপ, আর অপর দিকে সাপটির প্রতি চোখের সবুজ তারা বিস্ফারিত করে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার পোষা বিড়ালটি। যেন বিড়ালের দৃষ্টিতে সাপটি এমন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে যে, লোকটিকে আর ছোবল মারতে পারছে না। বিছানা থেকে গুঁড়ি মেরে সরে গিয়ে লোকটি তার পিস্তল নিয়ে আসে। সাপটি সত্যিই সম্মোহিত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার উদ্দেশে সে-ব্যক্তি বিড়ালের চোখের সামনে একটা হাত রাখে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটি ফোঁস করে ওর দিকে এগিয়ে ছোবল মারতে উদ্যত হয়। আর তখনই সাপটি মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয়।

ফেইথ নামক একটি বিড়াল "পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসিনী" বিড়াল আখ্যা লাভ করে। এই উপাধিটি সে পায় ১৯৪০ সালে। সে সময় সে লন্ডনের এক গির্জা সংলগ্ন যাজকের বাড়িতে তার বাচ্চাদের নিয়ে থাকতো। একদিন বোমায় সেই বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়। ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে ফেইথ তার বাচ্চাদের আড়াল করে ধ্বংসস্তূপের নীচে থেকে যায়। বিড়ালদের মধ্যে সে-ই প্রথম সাহসিকতার জন্য পশু মঙ্গল সমিতির কাছ থেকে একটি রৌপ্য পদক ও সার্টি-ফিকেট লাভ করে।

ভারতের ময়না বৃটেনের পক্ষীপ্রিয় অধি-বাসীদের কাছে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মানুষের স্বর নকল করার এদের ক্ষমতা ওদেশের লোককে বিস্মিত করে। লেমুর, কুমীর, সাপ, বানর এবং সিংহ শাবক বর্তমানে পোষা জীবজন্তুর তালিকা-ভুক্ত হয়েছে। যুদ্ধের আমল থেকে কোন কোন অঞ্চলে শৃগাল শাবক গৃহপালিত পশুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এদের সবায়ের উপরে টেক্কা মেরেছে লন্ডনের এক-দল নর্তকী তাদের ফ্ল্যাটে বাচ্চা অজগর রেখে দিয়ে।

অন্ধদের জন্য কথ্য-পুস্তক

১৯৫৪ সালে মারবুর্গে অন্ধগণের জন্য জার্মানীর শ্রাব্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এতে এখন ৪০০টি পুস্তক আছে। এই বইগুলি টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা হয়েছে এবং এগুলি রেকর্ড করতে চার হাজার ঘণ্টা সময় লাগে। এই গ্রন্থাগারটি এখন প্রায় ১১,৫০০ টেপ রেকর্ডারসহ ২৫০০ রেকর্ড অন্ধদের শোনবার জন্য ধার দেয়। এই গ্রন্থাগারের ম্যানেজার এবং মারবুর্গে অবস্থিত জার্মানীর অন্ধদের একমাত্র কলেজের পরিচালক অধ্যাপক কার্ল স্ট্রেল বলেন যে, গত ২০০ বছরে লিখিত নানা বিখ্যাত পুস্তকের শ্রাব্য পুস্তক এই গ্রন্থাগারে রয়েছে। ধর্ম-সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস, জীবনী ইত্যাদি এই গ্রন্থাগারে আছে। এ ছাড়াও রয়েছে বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক। বর্তমানে এই গ্রন্থাগার থেকে মাসিক ১০ হাজার পুস্তক শুনতে দেওয়া হচ্ছে।

ইলেকট্রনিক "ডিম"

পশ্চিম জার্মানীর ব্যাভেরিয়া রাজ্যের মনোরম রাজধানী মিউনিখের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অল্পদূরে আমের হ্রদ কিংবা আমেরসী নামে প্রাকৃতিক শোভাময় একটি গ্রীষ্মাবাস আছে। এই আমের হ্রদের সন্নিকটে সুন্দর অথচ অদ্ভুত ধরনের যেসব ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে, তা এখানকার শান্ত পরিবেশের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে ১৮০ ফুট ব্যাস ও ১১০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চারটি বিরাট সবুজ প্লাস্টিকের গোলাকৃতি জিনিস বসানো হচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় এই "সবুজ ডিমগুলি" পশ্চিম জার্মানীর প্রথম রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপনের গ্রাউন্ড স্টেশন, যার সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি থেকে প্রতিক্ষিপ্ত বেতার সংকেত এখানে গৃহীত হওয়ার পর উচ্চ স্বরগ্রামে প্রচারিত হবে। এইভাবে জাপান অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলি-ভিসন অনুষ্ঠান সরাসরি য়ুরোপের টেলিভিসন স্টেশনগুলিতে রিলে করা যাবে। ফলে য়ুরোপের লোকেরা ঐ দুই দেশের অনুষ্ঠান একযোগে দেখতে পাবে।

এখানকার রেডিও টেলিস্কোপগুলির ৭০ ফুট উচ্চ এরিয়ালগুলি সিংয়ের মত সেকেলে শ্রবন যন্ত্রের আকারে গঠিত। এগুলির মুখের দিকে অর্ধবৃত্ত টেলি-স্কোপের মত দেখতে হবে। ৩০ ফিট ব্যাস মঞ্চের উপর স্থাপিত এই যন্ত্রগুলি চারি-দিকে ঘুরবে। এটি দরকার এই জন্য যে এরিয়ালগুলিকে রিলের জন্য নির্বাচিত উপগ্রহসমূহের কক্ষপথ অনুসরণ করতে হবে যাতে উপগ্রহ থেকে প্রেরিত রেডিও সংকেত বিনা বাধায় ও অবিকৃতভাবে ধরা যায়। এরিয়ালগুলির কোণাকৃতি অপর-প্রান্তে স্থাপিত কেবিনটি সমগ্র ব্যবস্থার গতিপথ অনুসরণ করবে এবং তার মধ্যেই থাকবে গ্রাহক ও প্রেরক ব্যবস্থার যাবতীয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর যন্ত্রপাতি।

১৯৬৩ সালের প্রারম্ভে মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রায় ২০টি উপগ্রহ রীলে করার উদ্দেশ্যে কক্ষপথে স্থাপন করবেন। পৃথিবী এবং উপগ্রহগুলির মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান থাকবে পাঁচ থেকে দশ হাজার কিলোমিটার। আমের হ্রদের "সবুজ ডিম্বগুলি" এমনভাবে অবস্থিত যে প্রতিটি উপগ্রহ থেকে কেবল ২০ মিনিট মাত্র বেতার সংকেত এগুলিতে ধরা যাবে অর্থাৎ উপগ্রহ থেকে রিলে শেষ হলে অপর উপগ্রহ থেকে রিলে শুরু হবে। এই ব্যবস্থায় সংকেত প্রেরণ কোন সময়ে ব্যাহত হবে না।

এই "সবুজ ডিম্বগুলি" নির্মান সম্পূর্ণ হলে টেলিকম্যুনিকেশনের যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। উপ-গ্রহগুলি কক্ষপথে স্থাপিত হলে য়ুরোপের সর্বত্র ১৯৪৬ সালে টোকিওর অলিম্পিক ক্রীড়া দেখা যাবে। এ ছাড়াও উপগ্রহগুলি স্থাপিত হলে মহাদেশগুলির মধ্যে বেতারে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও ছবি পাঠাবার সুবিধা হবে ও একযোগে [illegible] পাঁচ থেকে ৬০০ "কথা" [illegible]

(২৩)

থানার দারোগার হাতে ক'টা টাকা গ্ন্ণে গ্ন্ণে দিয়ে রেহাই পাওয়া গেল। বংশীই দিলে টাকা ক'টা।

খবর পেয়ে গিরিজাপ্রসাদও এসেছিলেন। লক্ষ্মীমণির মৃতদেহ সদরের মড়াঘরে নিয়ে গিয়ে কাটাছেঁড়া করবে, ছুরি দিয়ে কেটে ফালাফালা করে দেবে, ভাবতেও শিউরে ওঠে সকলে।

দারোগা কোন্ ফাঁকে টাকা নিয়েছে, নিয়েছে কিনা, তা জানতেন না গিরিজা-প্রসাদ। দারোগার সঙ্গে বংশীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তাই প্রশ্ন করলেন, ডেড বডি কি নিয়ে যাবেন নাকি?

দারোগা চুপ করে রইলো। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করলো গিরিজাপ্রসাদ কোন তরফের লোক।

গিরিজাপ্রসাদ এবার স্পষ্ট করেই বললেন, ঘরের বউ আত্মহত্যা করেছে, এমনিতেই কষ্ট, আর কাটাকুটি করলে......

দারোগা এবার হেসে উঠলো।—না, না, মাস্টার মশাই, ও নিয়ে টানাটানি করবো না। পোড়াতেই বলে দিলাম। আপনাদের ডাক্তারবাবু যখন আপত্তি করছেন না......

একটু থেমে দারোগা আবার বললে, পুলিসে চাকরি করি বটে, কিন্তু আমাদেরও মানুষের প্রাণ, বুঝলেন মাস্টার মশাই!

বলে গোপেন মোড়লের বাড়িতে চা-জলখাবার খেয়ে সিপাইদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল দারোগা। বনপলাশির লোক নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

লক্ষ্মীমণি আত্মঘাতী হয়েছে শুনে গাঁ-সুদ্ধ লোক ভিড় করে এসেছিল। কিন্তু পুলিস দেখেই যে-যার সরে পড়েছিল ভয়ে ভয়ে। কি থেকে কি হয় কেউ কি বলতে পারে। হয়তো বাড়ির বাইরে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলেই চালান করে দেবে থানায়। পুলিসের আতঙ্ক সারা গাঁয়ের মনেই। শুধু ডাক্তার, গিরিজা-প্রসাদ, আর দু'একজন ভদ্রলোক সাহস করে এগিয়ে এলো। গোপেন মোড়ল এলো তার বাংলা বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে দারোগা-বাবু আর সিপাইদের আপ্যায়ন করতে।

দারোগা পুলিস আসতে দেখে কোটাল-পাড়া বাউড়ি পাড়ার তেঁতুলে বাগ্দীদের মেয়েবউরা ভেবেছিল জল ঘোলা না করে ছাড়বে না। বাড়ির বউ আত্মঘাতী হলে কে দোষী তা কি আর বলে দিতে হয়? হয় শাশুড়ী ননদ, নয়তো স্বামী। শাশুড়ী ননদ যখন নেই লক্ষ্মীমণির তখন উদাসকেই কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে ভেবেছিল সবাই।

কিন্তু কিছুই হলো না। দারোগা চলে গেল, আর নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো গাঁয়ের লোক। কিংবা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলো, উদাস-বংশীকে নিয়ে পুলিসে টানাটানি করলো না বলে।

জনকয়েক লোক মিলে বাঁশ কেটে আনলে, মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে।

তারপর এক সময় তারা চলে গেল, লক্ষ্মীমণির শবদেহ নিয়ে। পিছনে পিছনে বংশী।

উদাস তখনো বাড়ির দাওয়ায় বসে আছে স্থাণুর মত, বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। একে একে সকলেই চলে গেল। সকলের মনেই একটা শোকের ছাপ। কোটালপাড়ায় যেদিন প্রথম বউ হয়ে এসেছিল লক্ষ্মীমণি, সেদিন কেউই তাকে পছন্দ করে নি। উদাসের মত ছেলের কিনা এমন বউ! তার পর দিনে দিনে লক্ষ্মীমণির রুক্ষ স্বভাব আর রুক্ষ কথাবার্তার জন্যে গ্রামের লোকও বহুবার মুখ ফুটে বলেছে, বউটা মলে পাড়া ঠাণ্ডা হয়; উদাস বাঁচে!

কোটালপাড়ার হাজারো অশান্তির মূলে ছিল লক্ষ্মীমণি, যে শুধু নিজের শান্তিই হরণ করে নি, পাড়াপড়শির জীবনেও বারবার অশান্তি ডেকে এনেছে।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি মারা যাওয়ার পর, লক্ষ্মীমণি আত্মঘাতী হওয়ায় তারাও দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এতকাল সবাই দোষ দিত লক্ষ্মীমণিকে। কিন্তু কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে যেন সকলের মনেই সমবেদনা কেঁপে উঠলো লক্ষ্মীমণির জন্যে। আর সকলের চোখেই যেন একটা সন্দেহ, একটা অভিযোগ—উদাসের বিরুদ্ধে।

এতদিন যারা উদাসের প্রতি সহানুভূতি দেখাতো, বলতো, এমন বউয়ের সঙ্গে ঘর করার মত অভিশাপ আর নেই, তারাই উদাসকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলে।

মুহূর্তের মধ্যে গাঁয়ের চেহারা বদলে গেল। নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল লক্ষ্মীমণির আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে।

উদাসকে, বংশীকে সবাই প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁ গো কি হয়েছিল তোমাদের, বিষ খেলে ক্যানে বউটা?

উদাস আর বংশী, কেউই কোন উত্তর দিতে পারে নি। উদাস নিজেও কারণ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছে। সত্যি তো, কেন বিষ খেল লক্ষ্মীমণি, কেন এভাবে মৃত্যুবরণ করলে। আর মৃত্যুর আগে দুটো কথাই বা বলে গেল না কেন, রহস্যের হদিস দিয়ে গেল না কেন উদাসকে।

চুপচাপ একা একা বসে থাকে উদাস, আর ক্ষণে ক্ষণে একটা কথাই মনে পড়ে। কেন বিষ খেলো লক্ষ্মীমণি, কেন, কেন। কই, এই একটা মাসের মধ্যে তো কোনদিনই তার সঙ্গে এমন কিছুই হয় নি যার জন্যে মনে আঘাত লাগতে পারে লক্ষ্মীমণির। কোন কথাই তো বলে নি উদাস। আর পদ্ম? না, এর আগে অনেক বড় আঘাত পেয়েছিল লক্ষ্মীমণি, অনেক বেশী অপমান কুড়িয়েছে সে। কই, তখন তো আত্মহত্যার কথা তার মনে জাগে নি। তবে? ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারাই পায় না উদাস। অথচ, মনে মনে নিজেকে অপরাধী ঠেকে। বেশ বুঝতে পারে, গাঁয়ের লোক তাকেই দোষী ভাবছে। ভাবছে, লক্ষ্মীমণি যখন আত্মহত্যা করেছে, তখন নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ আছে এর পিছনে।

লোকের সন্দেহের দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্যেই গাঁ ছেড়ে খড়ি নদীর ধারে ধারে বোষ্টমদের পড়ো কুঞ্জের দিকে চলে যায় উদাস। গোঁসাইদিদির কুঞ্জ। বাবুরি বনতুলসীর ঝোপ, পুকুর পাড়ে ছড়ানো ডেলু ফুল। ফুলে ফুলে ছাওয়া সজনে গাছ; আর ভেঙে পড়া কুঞ্জ। কেউ কোথাও নেই, সেই কবে গোঁসাইদিদি নবদ্বীপ চলে গেছে, তার পর থেকে আগাছায় জঙ্গলে ভরে গেছে চতুর্দিক। নির্জন, নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে দু' একটা কাল কেউটে নয়তো সিঁদুরটুপি সাপ এঁকে বেঁকে চলে যায়। সেইখানে এসে চুপ করে বসে থাকে উদাস, আর ভাবে। কি যে ভাবে ও নিজেও বুঝতে পারে না।

তারপর এক সময় বিকেলের রোদ পড়ে যায়, সন্ধ্যে হয়ে আসে। আর ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে উদাসের। কেবলই ভয় হয়, লক্ষ্মীমণি হয়তো এসে দাঁড়াবে সামনে। যে-কথাটা বলে যায় নি হয়তো সেই কথাটাই বলতে আসবে।

এক একদিন ভীষণ ভয় পেয়ে যায় উদাস, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। বংশী না থাকলে, বাড়ি ঢুকতেও ভয় পায়।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটে চলেছিল। আর এমনি ভাবেই গাঁয়ের সকলকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছিল উদাস। এমন কি পদ্মকেও। পদ্মর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও যেন লজ্জা হতো, অস্বস্তি হতো। তবু আসতো পদ্ম, কোন কোন দিন পাঁচু কোটাল। উদাসকে, বংশীকে, দুবেলা ডেকে নিয়ে যেতো, ভাত রেঁধে খেতে ডাকতো পদ্ম।

সেদিনও তাই ডাকতে এলো পদ্ম। বললে, চলো গো বোনাই, তোমার নেগে বুড়ো বাপটাও আমার জলগণ্য করে নাই।

কথাটা শুনে চোখ মেলে তাকালো উদাস পদ্মর মুখের দিকে। তাকিয়েই রইলো। যেন কথাটা তার কানে যায় নি।

পদ্ম হাসলো। বললে, ফ্যালফেলিয়ে কি দেখছো গো, দেখ নাই নিকি আমায়!

উদাস তবু হাসলো না। পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খপ করে তার হাতখানা ধরলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিলে পদ্ম।—মা, না। চিৎকার করে বলে উঠলো।

বিস্মিত বিব্রত বোধ করলে উদাস। অনুনয়ের কণ্ঠে বললে, তুই আমার ঘরকে আয় পদ্ম। চোখে জল এসে গেল উদাসের। —লক্ষ্মীকে বড় ভয় নাগে রে আমার, একা মানুষ আমি থাকতে নারবো, থাকতে নারবো।

পদ্ম কোন কথা বললে না, শুধু কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলো উদাসের মুখের দিকে, তারপর বললে, বুড়া বাপটা বসে আছে, খাবে এসো বোনাই।

বলে তরতর করে বাড়ির পথ ধরলে। আর উদাসের সারা বুক কেঁপে উঠলো দুঃসহ ব্যথায়, আশঙ্কায়।

পাঁচু কোটাল আর উদাসকে পাশাপাশি জায়গা করে দিলো পদ্ম, এনামেলের দুখানা থালায় ভাত এনে নামিয়ে দিলে।

কিন্তু ক্ষিদে মরে গেছে তখন উদাসের। ওর মনের মধ্যে তখন একটা আলোড়ন উঠেছে। পদ্মর চোখে এমন ভর্ৎসনার দৃষ্টিও বুঝি কখনো দেখেনি। এমন উপেক্ষার ব্যবহার কখনো পায় নি। কিন্তু কেন? এতদিন অশান্তি আর অসহ্য ক্ষোভ দুঃখের মধ্যে উদাস ভেবেছে লক্ষ্মীমণি তার জীবন থেকে সরে গেলেই সে সুখী হবে, শান্তি পাবে। ভেবেছে, পদ্ম আর তার মাঝখানে ওই একটাই পাঁচিল। তাই কখনোসখনো মনের গোপনে লক্ষ্মীমণির মৃত্যু কামনাও করেছে সে। কিন্তু আজ হঠাৎ পদ্মর উপেক্ষায় নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হলো উদাসের।

তবু ধীরে ধীরে পাঁচু কোটালকে বললে, এ গাঁয়ে আর মন বসছে না গো আমার।

পাঁচু কোটাল ভাতের গ্রাস মুখে তুলে একটু অপেক্ষা করলে। তারপর বললে, কি করবে তবে, যাবে কোথায় বলো।

—কাটোয়ায় নয়তো বর্দ্দমানে। লাইসেন পেয়েছি, ডাইভারী করবো, ঘর করবো সেখানে গিয়ে।

পাঁচু কোটাল চুপ করে রইলো, একবার শুধু মুখ তুলে তাকালো পদ্মর দিকে। মুখ ঘুরিয়ে নিলো পদ্ম।

বংশীও একদিন এসে বললে, ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দাও গো পদ্মর সাথে, নোলে বিবাগী হয়ে যাবে।

পাঁচু কোটালেরও তাই ইচ্ছে। খুশী হয়ে বললে, সে তো আমারও সাধ তোমারও সাধ, তা পণ্ডিতকে ডেকে বলো ক্যানে দিন দেখে দিতে একটা।

কিন্তু মেয়ে যে তার অমত করে বসবে ভাবতে পারে নি পাঁচু কোটাল। বংশীও ভাবতে পারে নি।

পদ্মর বাপের কাছ থেকে কথাটা শুনলো উদাস, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। লক্ষ্মীমণির মৃত্যুর পর থেকেই লক্ষ্য করেছে উদাস, পদ্ম কেমন যেন তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ঠিক সেই আগের মত হেসে রসিকতা করে কথা বলে না, কাছে এসে সোহাগ করে দাঁড়ায় না গা ছুঁয়ে। লক্ষ্মীমণি বেঁচে থাকতে তাকে মনে হয়েছে দুজনের মাঝখানে একটা বিভেদের পাঁচিল, লক্ষ্মীমণির মৃত্যু যেন দুজনের মাঝখানে এনে দিয়েছে একটা গভীর খাদ।

উদ্‌ভ্রান্ত চোখে পদ্মকে দূরে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে উদাস, আর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে।

সেদিনও যথারীতি খেতে ডাকলো পদ্ম। —চলো বোনাই, ভাত দুটো মুখে দিয়ে আসবে। বলেই চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানা শক্ত মুঠিতে ধরে ফেললো উদাস। বললে, কি হয়েছে তোর বল পদ্ম!

হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে পদ্ম হেসে উঠলো।—কই, কি আবার হবে গো আমার।

—বিয়ে করবি না তুই আমায়, কাটোয়ায় ঘর করবো তোকে নিয়ে গিয়ে, আমার যে কত সাধ ছিল রে পদ্ম। বলতে বলতে চোখ ভিজে এলো উদাসের।

পদ্ম হাসলো। বিষণ্ণ চোখে উদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, না গো বোনাই, তা হয় না।

—ক্যানে? বিস্মিত হলো উদাস।

পদ্মও ছলছল চোখে বললে, নক্ষী বুনটারে অনেক কষ্ট দিলাম গো বোনাই, মিত্যু হলো তার, তার আত্মাটারে একটু শান্তি দাও গো, একটু শান্তি দাও।

পদ্মকে অনেক বুঝিয়েও রাজি করাতে পারলো না উদাস। পদ্মর মুখে সেই এক কথা মিত্যু হয়েছে নক্ষী বুনটার, এইবার ওকে একটু শান্তি দাও গো, শান্তি দাও।

লক্ষ্মীমণির মৃত্যুতেও এতখানি আঘাত পায় নি উদাস, এমন কি যেদিন গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল পদ্ম, সেদিনও না। ব্যথায় অপমানে আর একটাও কথা বললে না পদ্মকে।

পরের দিনই সাইকেলটা বের করে চাকা দুটো পরিষ্কার করলে, হাওয়া ভরলে রবারের নলে, তারপর কাটোয়ার পথে বেরিয়ে পড়লো।

পদ্ম ভেবেছিল, সন্ধ্যে হলেই আগের মতই ফিরে আসবে উদাস। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, উদাস ফিরলো না আর।

মনে মনে পদ্মও হয়তো ভেবেছিল, সেও চলে যাবে। সেই নিগণ ইস্টিশনের ধান কলে গিয়ে কাজ নেবে। তাই ভাবলে, যাবার আগে ডাক্তারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে।

[illegible] থেকে [illegible] ফিরে কাপড়খানা কাচলে পদ্ম। রোদে শুকিয়ে নিয়ে পরলে সেখানা। চুল বাঁধলে যত্ন করে, ভিজে গামছায় মুখ ঘষে ছোট্ট আরসিখানায় নিজের মুখ দেখলে।

তারপর কাপড়ের ছোট্ট পুঁটলিটা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশে।

ডাক্তার অনেক করেছে তার জন্যে, যাবার আগে একবার দেখা দিয়ে যাবে পদ্ম। আহা, অসহায় মানুষটা! গাঁয়ের এক প্রান্তে পড়ে থাকে, কেউ খোঁজ নেয় না। বড় দুঃখ পদ্মর তার জন্যে।

দূরে থেকেই তাকে দেখতে পেলো ডাক্তার।

ঘরের সামনে বাঁশের বাতা দিয়ে ঘিরে ছোট্ট এক টুকরো বাগান করেছে অবিনাশ ডাক্তার। খুরপি দিয়ে মাটি ঝুরিয়ে ফুলের চারা বসাচ্ছিল, হঠাৎ একটা রোদে-ঝলসানো সাদা ফুটফুটে কাপড় চোখে পড়লো।

খুরপিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অবিনাশ ডাক্তার। তাকিয়ে রইলো।

হ্যাঁ, পদ্মই বটে। পদ্ম আসছে তরতর করে এঁকে বেঁকে, দ্রুত পায়ে।

সারা গায়ে তখন ঘাম ঝরছে অবিনাশ ডাক্তারের। ধীরে ধীরে খাঁকি বুশ সার্টটা খুলে কাঁধে নিলো, দুটো হাত ঘষে ঘষে ধুলো মুছলো হাত থেকে।

পদ্ম ততক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে। আর পদ্মর চলন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুগ্ধ হয়ে গেল অবিনাশ ডাক্তার।

স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরা নিটোল সুন্দর একটা যৌবনের শিখা যেন। কালো মসৃণ চেহারাটার প্রতি অঙ্গ থেকে যেন একটা সুষম ছন্দ ফুটে উঠছে।

এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে বহুবার পদ্মর দিকে তাকিয়ে দেখেছে অবিনাশ ডাক্তার। আর সেই মুগ্ধতা নিজের মনেই চেপে রেখেছে চিরদিন। একটা ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস শুধু কখনো কখনো তার বুক নিঙড়ে বেরিয়ে এসেছে।

আর ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে গেছে আরেকটি সুন্দর মুখ। সুন্দরী, শিক্ষিতা একটি নারীর মুখ। যার জীবনের সঙ্গে অবিনাশ ডাক্তারের জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল একদিন, শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে যাকে ঘরে এনেছিল অবিনাশ ডাক্তার।

—তারপর? পদ্ম জিগ্যেস করেছিল একদিন। ডাক্তারের ব্যথাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করেছিল পদ্ম।

আর অবিনাশ ডাক্তার জীবনের যে দুঃখ কারো কাছে কোনদিন প্রকাশ করে নি, সেই গোপন আঘাতের কথা খুলে বলেছিল অশিক্ষিত গ্রাম্য কোটালদের একটি মেয়ের কাছে।

বলেছিল, তারপর যুদ্ধে গেলাম রে পদ্ম। যুদ্ধে গিয়ে একটা পা রেখে এলাম।

ভাবলাম, একটা পা গেছে যাক। আরেকটা পায়ে ভর দিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবো।

যে-কথা অবিনাশ ডাক্তারের মনের মধ্যে গুমরে মরেছে, ভিতরে ভিতরে তার বুক কুড়ে কুড়ে খেয়েছে যে বেদনা, শোনাবার লোক পেয়ে সেদিন তা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছিল সে।

বলেছিল, তারপর যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম পদ্ম, এসে দেখলাম অন্য পা-টাও আমার খোয়া গেছে। বলে অনেকক্ষণ নিঃঝুম হয়ে বসে থেকে কান্না-ভাঙা গলায় অবিনাশ ডাক্তার বলেছিল, তাই শহর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এলাম রে পদ্ম, পালিয়ে এলাম।

শুনতে শুনতে চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে পদ্মর, আঁচলে চোখ মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

আর অবিনাশ ডাক্তার বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, আমার এই কাটা পায়ের জন্যে কোন লজ্জা, কোন দুঃখ নাই রে পদ্ম। কিন্তু যেদিন জানলাম, যুদ্ধের বোমা-বারুদের মধ্যেও যার স্বপ্ন দেখেছি, যার কাছে ফিরে এসে এই খোঁড়া পায়ের দুঃখ ভুলতে চেয়েছি, সেই চলে গেছে, সেদিন......সেদিন আর সহ্য করতে পারলাম না পদ্ম। মনে হলো বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি সবাই আমায় দেখে হাসছে, মনে হলো...

সব কথা সেদিন স্পষ্ট করে বলতে পারেনি অবিনাশ ডাক্তার। আর তার পর থেকেই অবিনাশ ডাক্তারকে যেন বড় আপন মনে হতো পদ্মর। এই নিঃস্ব অসহায় মানুষটার জন্যে দুঃখ হতো তার।

পদ্মর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে সেই পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেছে। কখন যে অবিনাশ ডাক্তারের মন চলে গেছে সেই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির পৃথিবীতে, টের পায়নি ডাক্তার।

তন্ময়তা ভাঙলো পদ্মর হাসিতে।

পদ্ম কখন যে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর তার দিকে উদাস ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে কি যে ভাবছিল অবিনাশ ডাক্তার, হঠাৎ চমকে উঠলো পদ্মর সশব্দ হাসিতে।

রসিকতা করে পদ্ম বললে, কি গো ডাক্তার, পদ্মকে তোমার চিনতে নারছো নিকি!

কথা শুনে চমকে উঠলো অবিনাশ ডাক্তার। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আয়, ঘরে আয়।

বলে বাড়ির বারান্দায় গিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো পদ্মর দিকে।

তারপর হঠাৎ বলে ফেললে, তুই অনেক সুন্দর হয়েছিস পদ্ম!

খিলখিল করে হেসে উঠলো পদ্ম। কোন কথা বললে না। তারপর প্রশ্ন করলে, কই, পাব্বতী কই গো, টুকুন চা খাবো বলে এলাম।

অবিনাশ ডাক্তার হাসলো।—পার্বতী নেই রে, তার বাপ নিয়ে গেছে তাকে, বিয়ে ঠিক হয়েছে তার, তাই আর কাজ করবে না।

—পার্বতী নেই?

—না।

—তুমি একা মানুষ...

বলতে গিয়েও পারলো না পদ্ম, চুপ করে গেল। পুঁটলিটা বুকে চেপে থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

অবিনাশ ডাক্তার ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, ভেবেছিলাম তুই আর আসবি না পদ্ম।

এবারও সে মুখ নীচু করে রইলো।

ডাক্তার একটুখানি চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলে, কেন গিয়েছিলি তুই, পদ্ম, গাঁ ছেড়ে?

পদ্ম হেসে উঠলো। বললে, তোমার নেগেই গিয়েছিলাম গো, তোমার নেগেই।

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো অবিনাশ ডাক্তার।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ গো, তোমার দুন্নাম, কত কি বলতো লোকেরা, অসুখ বিসুখে তোমায় ডাকতো না, বলগাঁর ডাক্তারকে ডেকে আনতো......

—আমার দুর্নাম? হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলো অবিনাশ ডাক্তার।

পদ্ম আবার বললে, হ্যাঁ গো তোমার নেগেই। কোটাল পাড়ার বাগ্দী পাড়ার লোক অকথা-কুকথা বললে, তাই রেগে চলে গেলাম ইস্টিশনে...

—তারপর?

—ভাবলাম, ধান সিজোনোর কাজ করেছি সেই একটুকুন বেলা থেকে, তা ধান কলে কাজ নোব। তাই টেনে চড়ে বসলাম, গিয়ে কাজ নিলাম ধান কলে। আমি সব সইতে পারি গো ডাক্তার, তোমার দুন্নাম আমার বুকে বজ্জর মত বাজে।

—আমার দুর্নাম? আবার হো হো করে হেসে উঠলো অবিনাশ ডাক্তার। তারপর উঠে দাঁড়ালো ক্রাচে ভর দিয়ে; বললে, আয়। কাছে আয়।

বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকালো পদ্ম। বিভ্রান্তের মত। তারপর এক পা এক পা করে কাছে এগিয়ে এলো।

ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে ডাক্তারও দু'পা এগিয়ে গেল।

তারপর হাত বাড়িয়ে পদ্মর খাটো কাপড়ের আঁচলটা পদ্মর মাথায় ঘোমটার মত করে টেনে দিলে। তারপর হা হা করে সশব্দে হেসে উঠে বললে, বিয়ে করবো তোকে আমি, বিয়ে করবো। ল' ফুল ম্যারেজ... দুর্নাম? দেখি কে কত দুর্নাম দিতে পারে।

বলে আবার সশব্দে হেসে উঠলো ডাক্তার। আর পদ্মর বিভ্রান্ত বিস্মিত দৃষ্টিটা হঠাৎ বড় লজ্জিত হয়ে পড়লো। আর টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো সিমেন্টের মেঝের ওপর।

অবিনাশ ডাক্তার তখনও হাসছে হা হা করে, সশব্দে। হাসছে পাগলের মত।

বিদুর

রহস্য-উপন্যাস

ইতিপূর্বে একটি বাংলা অ্যাড্‌ভেঞ্চার উপন্যাসের সঙ্গে আর-একটি বইয়ের প্রায় আক্ষরিক সাদৃশ্য নিয়ে লিখেছি। তারপর পক্ষকাল কাটল। বহু পাঠক ইতিমধ্যে আমাদের কাছে চিঠি লিখেছেন। সাহিত্য সংবাদের পাতায় তাঁদের চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়; প্রয়োজনও দেখি না। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা চলে।

পাঠকদের অভিযোগ, বাংলা রহস্য-উপন্যাসের শতকরা নিরানব্বইটি বিদেশী 'মিস্ট্রি নভেল' থেকে আত্মসাৎ করা। অ্যাডভেঞ্চার এবং বিজ্ঞান-কাহিনীর বেলায়ও তাই। শুধু বাংলা ভাষায় নাম ধাম বদল করে লেখা হয় এই যা পার্থক্য।

দ্বিতীয় অভিযোগ, বেশীর ভাগ বাংলা গোয়েন্দা ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনীই অপাঠ্য। বিদেশী কাহিনীর কাঠামো চুরি করা সত্ত্বেও খারাপ ভাষায়, গোঁজামিল দিয়ে এবং এমন অযত্নের সঙ্গে এ-সব বই লেখা হয় যে, সামান্য রুচিবান পাঠকের পক্ষেও তা পড়া কষ্টকর।

পত্রলেখকদের অভিযোগ কতটা সত্য পাঠকই তার বিচার করবেন, আমার এ-বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞতা নেই। আমি অন্য কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

বাংলা ভাষায় রহস্য-উপন্যাস লেখার রেওয়াজ কম। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের এখানে এই বিশেষ সাহিত্য শাখাটির দীনতা নিশ্চয় পাঠককে পীড়িত ও হতাশ করে। কিন্তু কেন? কেন আমরা অনেকেই মোটামুটি একটা ভাল রহস্য-উপন্যাসও লিখতে পারি না, চেষ্টাও করি না? কারণ খুঁজতে গিয়ে কেউ যদি বলেন, এরা অক্ষম, তবে সব কথা বলা হল না। আমার ধারণা, অন্যান্য কারণও রয়েছে।

প্রথমত, রহস্য, আড্‌ভেঞ্চার অথবা বিজ্ঞান-কাহিনী রচনার জন্যে সামাজিক ও মানসিক যে পরিবেশ প্রয়োজন, আমাদের বাংলা দেশে তার সুযোগ নেই। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্সের আবহাওয়া আমাদের নয়; আমাদের এখানে সমাজ-বিরোধী যেসব দুষ্কর্ম, তার মধ্যে হঠকারিতা এবং মানসিক আবেগ যত প্রবল, মগজের কারবার তত কম। কলকাতা শহরে নিশ্চয় খুন রাহাজানি হয়, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই, খবরের কাগজের পাতায় যেটুকু পড়ি তাতেই তৃপ্ত। আ্যাড্‌ভেঞ্চার বাঙালীর স্বভাবের বাইরে। আমরা ঘরকুনো, আরামপ্রিয়, বাইরের ঝঞ্ঝাটে মাথা ঘামাতে চাই না। [illegible] কিংবা রূপকুণ্ডের ডাক একেবারে হালের ব্যাপার। কিন্তু এ-রকম একটি দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে সমস্ত বাঙালী সম্প্রদায়ের স্বভাব বিচার করা যায় না।...আর বিজ্ঞান-কাহিনীর কথা না তোলাই ভাল, আমাদের বিজ্ঞানে বড় জোর একটা কুকার তৈরি হয়। বিজ্ঞান-অনুশীলন এবং বিজ্ঞানের প্রতি সমাজের একটা বড় অংশের আকর্ষণ না থাকলে চিত্তের যে স্বাভাবিক ঝোঁক ওদিকটায় পড়ার কথা, আমাদের তা নেই।

পাঠক প্রশ্ন করবেন, তবে বাঙালী পাঠক রহস্য-উপন্যাস পড়ে কেন? তার জবাবে বলব, উত্তেজক গল্প পড়ার আকর্ষণে। বলব, যাঁরা পড়েন তাঁরা ত লেখেন না; কাজেই তাঁদের কাছে প্রশ্ন উপভোগের, আর যাঁরা লেখেন তাঁদের কাছে প্রশ্ন আয়োজনের। উপভোক্তা সহস্রজন হতে পারেন, বাধা নেই; কিন্তু উদ্যোক্তা ক'জন হতে পারেন, বিশেষ করে যেখানে আয়োজনের অভাব।

বস্তুত এই কারণেই, পাঠকের উপভোগের চাহিদা মেটাতেই যা কিছু বাংলা রহস্য-উপন্যাস লেখা। লেখকদের আন্তরিক ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকে না। কলকাতা শহরকে নিউইয়র্ক বা চিকাগো কল্পনা করা মুশকিল, কিন্তু দুষ্কর্মের কাহিনী লিখতে বসলে এ-দেশীয় লেখক চিকাগোর দুষ্কর্ম, রীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করে কার্যোদ্ধার করতে চান বটে, কিন্তু সেটা ধোপে টেকে না।

চেস্টারটন একবার একটি রহস্য-কাহিনী সঙ্কলনের ভূমিকায় বলেছিলেন, এই জাতির লেখা আসলে হচ্ছে গলা-কাটার ব্যাপার; কে কত মসৃণভাবে গলা কাটতে পারল তার ওপরেই লেখা এবং লেখকের বিচার। অর্থাৎ সোজা কথা হল, তুমি পাঠককে কিভাবে কত নিখুঁত কায়দায় বোকা বানালে তার ওপরেই তোমার বাহাদুরি।

আমার ধারণা, রহস্যকাহিনীর আসল মন্ত্র এখানেই। পাঠককে সামনে বসিয়ে তার সঙ্গে খেলতে হবে, এবং হারাতে হবে। সাহিত্যের অন্য জাতির লেখায় পাঠক লেখকের বাঁশি শুনে হ্যামেলিনের ইঁদুরের মতন নাচতে নাচতে ছোটে, তার নিজের কিছু করার থাকে না; কিন্তু রহস্য বা গোয়েন্দা কাহিনীর বেলায় পাঠকের একটি ভূমিকা আছে—লেখকের মুখোমুখি বসে সে ধাঁধার খেলায় মন লাগায়। যে গোয়েন্দা উপন্যাসের লেখক পাঠকের সঙ্গে এই মজার খেলা খেলতে পারেন না, তাঁকে ধিক!

পুরোপুরি রহস্য কাহিনী আর গোয়েন্দা-কাহিনী ঠিক এক জিনিস না হলেও এখানে সুবিধার্থে এক করে নেওয়া হয়েছে। এই রহস্যকাহিনীর কতক ধর্ম আছে এবং কিছু সর্ত আছে যা পালন না করলে এ-সাহিত্য জাতে ওঠে না। যেমন—

১। সমস্ত রহস্য-কাহিনীই আসলে নীতি-কাহিনী। পাপ থাকবে কিন্তু পুণ্যের জয় হওয়া চাই। আগ্রহ-উৎকণ্ঠা বাড়াবার জন্যে পাপের সবচেয়ে চূড়ান্ত অপকর্মকেই আমরা নিতে পারি—আর সে-অপকর্ম হত্যা।

২। খুব জবর রকমের একটা খুন

আমদানি করার চেয়ে হাতের সব তাস ফেলে দিয়ে যদি সরল ঘটনাকে এমনভাবে সাজানো যায় যাতে সমাধানের জটিলতা বাড়ে তবে সে-লেখা অনেক উ'চু দরের হয়।

৩। লেখক খুশি মতন গোঁজামিল দিয়ে যা মন চাইছে তা আমদানি করতে পারেন না, এরও একটা সম্ভাব্য সীমা আছে।

৪। যুক্তি এবং বিচারের আয়ত্তে কাহিনী ও চরিত্রদের থাকতে হবে।

৫। মূল বিষয় চেপে রেখে রহস্য-কাহিনী লেখা চলবে না।

৬। গল্পের মধ্যে যদি ওষুধপত্র, আইন কিংবা অন্য কোনো বিশেষ বিষয়ের গুরুত্ব থাকে তবে তা নির্ভুল হওয়া চাই।

৭। মানবচরিত্র বিচার, চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ঘটনা এবং মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ একান্তভাবেই প্রয়োজন।

৮। শেষ কথা, ভালো করে লেখা এবং সাহিত্যবাচ্য লেখা না হলে এই জাতীয় কাহিনীর কোনো মূল্য নেই।

বাংলা রহস্য-উপন্যাসের আশ্রয় যদি বিদেশী হয় তাতে আমার অন্তত আপত্তি নেই, যদি দেখি সুতোটা নেওয়া হয়েছে মাত্র, মাল্লাটা বাঙালী লেখক নিজেই গে'থেছেন। এই সুযোগ দেওয়ার একমাত্র কারণ, বাংলা রহস্য-সাহিত্যকে যদি পাঠকের জন্যে টি'কিয়ে রাখতে হয় তবে রোমাঞ্চ-বিবর্জিত বাংলা দেশের লেখকের বিদেশীর দুয়ারে হাত না পেতে উপায় নেই। আমরা বোধ হয় খুশী হব, যদি দেখি গলা-কাটার ব্যাপারটা সূক্ষ্ম ও ভদ্রভাবে করা হয়েছে। আসলে এটা ত গলা-কাটার খেলাই।

বাঙালী কবিদের প্রতি

সাহিত্য আকাডেমি থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে একটি পত্র দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন বাঙালী কবিদের কাছে নীচের অনুরোধটা জানানো হয়। আমরা তাঁর অনুরোধের মর্ম জানালাম।

এশিয়ার কবিদের জন্য 'Beloit poetry journal'-এর যে বিশেষ সংখ্যা নিউইয়র্ক থেকে এসিয়া সোসাইটির কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন তার জন্যে ভারতীয় কবিদের কবিতা প্রয়োজন। এই কবিতা ইংরিজীতে অনুবাদ করে দিতে হবে। মূল কবিতা ইংরিজীতে লেখা হয়ে থাকলেও ক্ষতি নেই।

কয়েকটি শর্ত :

ক। কবির বয়েস চল্লিশের কম হওয়া আবশ্যক। কবির এবং অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী-পরিচয় কবিতার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

খ। ইংরিজী ভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশ হয়নি এমন কবিতাই গ্রাহ্য।

গ। হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় লেখা কবিতার ইংরিজী তর্জমার প্রয়োজন নেই, মূল ভাষায় লেখা কবিতা পাঠালেও চলবে।

ঘ। ১৫ই মে (১৯৬২) তারিখের মধ্যে কবিরা যেন তাঁদের কবিতা পাঠিয়ে দেন।

বাঙালী কবিরা তাঁদের লেখা সাহিত্য আকাডেমির অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারীর কাছে পাঠাতে পারেন, অথবা সরাসরি পূর্বোক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে; নিউইয়র্কের ঠিকানায়। ঠিকানাটি এই :

Mrs. Bonnie R. Crown, Publications Director, the Asia Society—112 East 64th Street, New York 21, New York (U.S.A.)

সাহিত্যগ্রন্থমালা

আমাদের প্রকাশকরা গল্প উপন্যাস আর ছাত্র-পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। নয়ত এতদিনে বাঙালী জীবিত লেখকদের সম্পর্কে একটি করে চটি বইও কেন প্রকাশ করা হল না? বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সেবকদের সাহিত্য-কর্ম যে আলোচনার যোগ্য, আমরা কদাচিৎ তা মনে করেছি। বিভিন্ন পত্রিকায় অন্যান্য-দের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা কখনও-সখনও চোখে পড়লে এর দ্বারা স্থায়ীভাবে কোনো প্রয়োজনীয় অভাব মেটে নি। সম্প্রতি তারাশঙ্করের সাহিত্য বিষয়ে সমালোচনা-মূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার যথেষ্ট
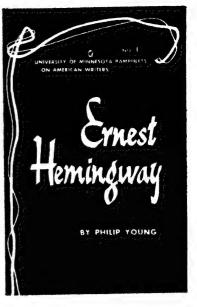
অবকাশ থাকা সত্ত্বেও একেবারে হালে এক তরুণ সমালোচকের মানিকবাবু সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। [illegible]র রায় চৌধুরীর সাহিত্য-কর্ম অবলম্বন করে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে বলে শুনেছি। বিক্ষিপ্তভাবে এই তিনটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে যদিও বাঙালী পাঠক প্রকাশক এবং গ্রন্থের লেখকদের সাধুবাদ দেবেন—তবু প্রয়োজন ও কর্তব্য বিচার করলে আমরা মাত্র এই তিনটি গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা তৃপ্ত হতে পারি না। বৃটিশ কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল বুক লীগ একত্রে যেমন করে বৃটিশ লেখকদের ওপর প্যাম্ফলেট প্রকাশ করেছেন, আমেরিকা থেকে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় যেমনভাবে আমেরিকার লেখকদের বিষয়ে প্যাম্ফলেট প্রকাশ করেছেন, আমাদের বাংলা দেশে কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো বিচক্ষণ প্রকাশক যদি বাঙালী জীবিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের ওপর ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, বাংলা ভাষার পাঠক ও সমালোচক-দের যথেষ্ট উপকারে আসবে। বড় বই ছাপানো হয়ত আর্থিক সঙ্গতিতে না কুলোতে পারে, কিন্তু প্যাম্ফলেট জাতীয় চটি বই প্রকাশ এমন কিছু দুঃসাধ্য কর্ম নয়। বাঙালী অনেক প্রকাশকেরই তেমন সঙ্গতি আছে, অভাব শুধু আগ্রহের। আমরা কোনো প্রকাশককে এ-বিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখলে খুশী হব।

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্ররচনা-কোষ (প্রথম খণ্ড : প্রথম পর্ব) **শ্রীচিত্তরঞ্জন** দেব ও **শ্রীবাসুদেব** মাইতি। **পরিবেশক**—ক্যালকাটা পাবলিশার্স; কলি:—৯। দাম : ৬·৫০ নঃ পঃ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। ৩০।৬।১, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬। দাম : ৪·৫০ নঃ পঃ।

বাংলা ভাষায় আলোচ্য বই দুটি নতুন ধরনের। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা অথবা তাঁর জীবনের পরিচয় এ বই দুটি থেকে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চা যাঁরা করবেন তাঁদের সহায়তা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এদের সংকলন করা হয়েছে। একটি থেকেও পাঠক অবশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা পাবেন না। কোন কবিতা, প্রবন্ধ গল্প, এবং রচনা-প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে তারই হদিস দেওয়া হয়েছে 'রবীন্দ্র-রচনা-কোষ'এ। এ বইয়ের সংকলকদের পরিকল্পনা বৃহৎ। দুই খণ্ডে এবং অনেকগুলি পর্বে কোষগ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডে থাকবে সমস্ত কবিতা ও গানের শিরোনাম ও প্রথম ছত্র, গল্প-উপন্যাস নাটকে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর নাম, ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদির নাম, রবীন্দ্র-জীবন সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং কবি কর্তৃক উদ্ধৃত বাক্যাংশ প্রভৃতির উল্লেখ। প্রথম পর্বে স্বরবর্ণ শেষ হয়েছে।

অনেকগুলি প্রসঙ্গ এক সঙ্গে অক্ষরানুসারে বিন্যাস করবার ফলে কিছু পরিমাণ জটিলতা এসে পড়েছে। ইনডেক্সের রীতি সম্বন্ধে সংকলকরা সম্পূর্ণ অবহিত নন মনে হল। বাক্যাংশ উদ্ধৃত করে, ইনডেক্স করা অন্যত্র দেখা যায় না। ইউরোপ শব্দটি প্রায় দশ পৃষ্ঠা অধিকার করেছে। ইউরোপ ও ইউরোপীয় শব্দ দুটি রবীন্দ্রনাথ কোথায় কোথায় ব্যবহার করেছেন তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আর আছে এই ধরনের বাক্যাংশ : ইউরোপ থেকে আপিসের সৃষ্টি; ইউরোপ থেকে বিশ্বভারতীতে গ্রন্থ উপহার ইত্যাদি। দুটি ভাগের সার্থকতা কি তা স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ' অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। তাকে পরিবর্তিত করে 'ইউরোপ' করবার অধিকার সংকলকদের নেই। তাঁরা ইউরোপ থেকে রেফারেন্স দিয়ে বলতে পারতেন 'য়ুরোপ দেখুন', তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ' যতবার এবং যেখানে যেখানে ব্যবহার করেছেন তার সবগুলির নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের নীতি কি তা উপলব্ধি করা কঠিন। কারণ বিষয়-মূল্যহীন অনেক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে; আবার যা থাকা উচিত ছিল মনে হয় তা পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—'আনা' প্রত্যয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে কবি কি বলেছেন তার নির্দেশ এখানে নেই; রবীন্দ্রনাথ ভালো এসরাজ-বাজিয়ে ছিলেন; নিজেই বলেছেন। তারও উল্লেখ নেই। বিপুল পরিমাণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ ইনডেক্স করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়মূল্যে-সমৃদ্ধ নির্বাচিত প্রসঙ্গ-গুলির সটীক আক্ষরিক বিন্যাসের পরিকল্পনা করলে বইটি অধিকতর উপযোগী হত। এক অক্ষরানুক্রমিক বিন্যাসের মধ্যে অনেক কিছু ধরাতে গিয়ে স্বাভাবিকরূপেই কিছু বিশৃংখলা এসে গেছে। আক্ষরিক বিন্যাসও সর্বত্র সুষ্ঠু নয়। দৃষ্টান্ত 'ও' অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সংকলকদের গভীর শ্রদ্ধা, তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। বেদনা পাই এই ভেবে যে, গ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনাটি আর একটু বিচার করে স্থির করলে বইটি অনেক বেশী উপযোগী হত। রবীন্দ্র-রচনার পরিমাণ বিপুল। এই সম্বন্ধে তথ্যপুস্তকের অভাব পীড়াদায়ক; সুতরাং ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'রবীন্দ্র-রচনা-কোষ' পাঠকদের রবীন্দ্র-রচনার আলোচনায় সহায়তা করবে।

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান'-এ রবীন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থের অক্ষরানুক্রমিক সূচী পাওয়া যাবে। রচনাটি কাব্য, উপন্যাস অথবা প্রবন্ধ গ্রন্থ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ আছে। প্রথম প্রকাশের তারিখ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোন খণ্ডে পাওয়া যাবে সে বিষয়েও টীকা দেওয়া হয়েছে। কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধ গ্রন্থের নীচেই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা বা গানের নাম এবং প্রথম লাইন ও গল্প-প্রবন্ধের নামের সূচী পাওয়া যাবে। নাটকের অন্তর্গত গানগুলির সূচীও সংকলন করা

হয়েছে। শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের তালিকা সন্নিবেশিত করায় বইটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তা না জানলে কবিতা, গান, গল্প ও প্রবন্ধ সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না—এই হল আলোচ্য বইটির ত্রুটি। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-রচনার এই সূচীটি হাতের কাছে থাকলে পাঠক উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই। বইয়ের নাম রবীন্দ্র-রচনাসূচী হলে যথার্থ হত।
(৩৪০।৬১, ৩২২।৬১)

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বাণীনিকেতন, ২১৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

রিয়লিস্ট রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বাণীনিকেতন। মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্রচর্চা-সাহিত্য-পাঠকদের নিকট বই দুখানি সুপরিচিত, রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসবে এগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একালের অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' প্রথম প্রকাশনে (১৯৩৯) ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও কবিতা বিপ্লবীদের মনে মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ বা বিপ্লব বলিতে সাধারণত আমরা যাহা বুঝি রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাহার সমর্থন নাই, সমালোচকরা তাঁহাকে তাহাদের সমর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই, রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে সর্ববন্ধনমুক্তির বাণী অভয়মন্ত্রের কথা আছে, তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন; সরকারী লোক হয় বইটি পড়েন নাই, নাম দেখিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন, বা সত্যই দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন—চিত্তক্ষেত্রে বন্ধনমোচন যাহার যত সম্পূর্ণ হইবে, সংসারক্ষেত্রে আত্মত্যাগের ক্ষমতাও তাহার পক্ষে তত সহজ হইবে।

'রিয়লিস্ট রবীন্দ্রনাথ'-এ লেখক দুই বোন, মালঞ্চ ও বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা, রবীন্দ্র-জীবনের শেষ পর্বের এই সকল উপন্যাস ও নাটকের আলোচনা করিয়াছেন মনোবিকলনতত্ত্বের বিচারে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'গল্পের মধ্যে লেখকের অলক্ষ্যে মনস্তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে—তুমি তাকে অবারিত করেছ, কিন্তু দুঃশাসনের নীতিতে তার আব্রু নষ্ট হয়নি।' ১৯৪, ৩২৬।৬১

মহাআনন্দের সাগরতীরে। সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, ৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—২০। মূল্য চার টাকা।

অ-বাঙ্গালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচার-কল্পে এই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও প্রকাশক নিখিল ভারত বঙ্গভাষা

প্রসার সমিতি যে পুণ্যকর্মে ব্রতী, এই গ্রন্থ-সংকলনও তাহারই অংগ। রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব পালনে সমিতি এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেন, যাহার সূত্রে 'নানা জাতির নানা ভাষাভাষী নরনারী কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে কবিরই মাতৃভাষা বাঙলা ভাষার মাধ্যমে।' দেশ-বিদেশের বহু গুণী, মনীষীর রচনাধারা এই পরিকল্পনার আনুকূল্য করিয়াছে। শ্রদ্ধানিবেদনের এই অভিনবত্বেই গ্রন্থখানির মূল্য, রচনা-বিচারে নয়। সম্পাদক-প্রকাশক মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও কর্মনিষ্ঠায় বিশেষ সাধুবাদের যোগ্য। ৩৭৪।৬১

রবীন্দ্র-প্রণাম—শ্রীরমেন দাস সম্পাদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, এ-১৩২-৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

অনেক মানুষ একটি মন—শ্রীরমেন দাস (সবুজ সাথী)। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। মূল্য দুই টাকা।

রবি-কাহিনী—শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত। আলোক-ভারতী, ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্রনাথ—শ্রী অ নি ল চ ন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁর জীবনকথার সহিত পরিচয় সাধন করাইয়া দিবার জন্য শিশু ও কিশোর-পাঠ্য অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এই-গুলিও তাহাদের অন্তর্গত। 'রবীন্দ্র-প্রণাম'-এ সুনির্মল বসু, শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, স্বপন বুড়ো, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রভৃতির কুড়িটি লেখা সংগৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষাৎ-দর্শনের বিবরণ লিখিয়াছেন, কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের বিবৃত নিজের জীবনের কোনো-কোনো ঘটনা পুনর্বিবৃত করিয়াছেন—বইখানি কিশোর বয়স্কদের মনোহারী হইবে। 'অনেক মানুষ একটি মন'-এর লেখক রবীন্দ্র-জীবনের অনেক ঘটনা চিত্তাকর্ষকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'রবি-কাহিনী' ও 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্র-জীবনকথা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত। 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া রচিত।

৩৭৯, ৩৫৪, ২৫৯, ১৯৪।৬১

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি—শ্রীশান্তশীল দাস। সাহিত্যসদন, এ-১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখকের [illegible] পঁচিশটি কবিতার সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখকের সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই কবিতা-সঞ্চয়ে যে স্নিগ্ধতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। ৩১৩।৬১

লহ প্রণাম—শ্রীবিভা সরকার। এম সি সরকার, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

এখানিও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখিকার রচিত পঁচিশটি কবিতার সংগ্রহ—কাব্যগুণে না হইলেও উদ্দিষ্টের প্রতি শ্রদ্ধায় উল্লেখযোগ্য। ২৭০।৬১

উপন্যাস

সেদিন চৈত্র মাস। দিব্যেন্দু পালিত। বসু চৌধুরী, ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাহিত্য হল বহতা নদীর মতো। তার ধারাটি সর্বদা একই খাতে বয় না। দু-এক যুগ হয়ত বয়, কিন্তু তার পরেই তার খাত বদলায়, পথ পালটায়। এই পরিবর্তনই তাকে জীবন্ত করে রাখে। কিন্তু পরিবর্তন মাত্রেই যে স্বাগত অভ্যর্থনার যোগ্য, এমন কথাও বলা সম্ভব নয়। একমাত্র তখনই তাকে স্বাগত জানাতে পারি, সে যখন একটি স্পষ্ট প্রগতির বার্তা নিয়ে আসে। লক্ষণ দেখে মনে হয়, বাংলা কথাসাহিত্যে এখন পরিবর্তনের পালা চলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কোনও স্পষ্ট প্রগতির পথ উন্মোচন করবে কিনা, সেটা এখনও বিতর্কের বিষয়। বিতর্ক উঠত না, গল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষা এখন চলেছে, তার পিছনে যদি কোনও ঋজু পরিকল্পনা থাকত। স্বীকার করা ভাল, তেমন কোনও পরিকল্পনার আভাস সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, পরীক্ষাগুলিকে অনেক সময় উদ্ভট এবং উন্মার্গ বলে মনে হয়।

এত কথা বলবার কোনও দরকারই হত না। দরকার হল, তার কারণ, আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখকের যে মানসিকতা সূচিত হয়েছে, তা পরীক্ষাপ্রয়াসী। 'সেদিন চৈত্র মাস' একটি উপন্যাস। কিন্তু অন্যান্য অনেক উপন্যাসের সঙ্গে এ-বইয়ের কিছুটা পার্থক্য আছে। ঘটনার উপরে লেখক এখানে জোর দেন নি। জোর দিয়েছেন ভাবনার উপরে। এবং বিভিন্ন চরিত্রের মনোভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে পাঠককে তিনি একালীন মানবজীবনের মৌল সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই সমস্যা হয়ত লক্ষ্যহীনতার ব্যাধি, অথবা হয়ত নিঃসংগতাবোধ। অথবা এই যুগের [illegible] কোনও অসুখ,

আধুনিক মানুষের চিত্ত এখন ক্রমেই যার দ্বারা অধিকৃত হচ্ছে। এই কথাটিকে বলার জন্য শ্রীদিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে যে আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন, নূতন পরীক্ষার প্রয়াস তাতে স্পষ্ট। কিন্তু একই সংগে লক্ষণীয় যে, সেই প্রয়াস উন্মার্গ নয়, তার মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত পরীক্ষা-রীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

বলেছি, 'সিদিন চৈত্রমাস'-এ ঘটনার উপরে জোর দেওয়া হয়নি। এখন বলা দরকার যে, চরিত্রের সংখ্যাও এখানে কম। নিঃসঙ্গতা-বোধের আবহাওয়াটি তার ফলে স্পষ্ট হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত তরুণ লেখক। কিন্তু বয়সে নবীন হওয়া সত্ত্বেও যে প্রবীণ ক্ষমতার তিনি পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আশা করতে ইচ্ছা হয় যে, বাঙালী পাঠকের হাতে কিছু স্থায়ী মূল্যের সাহিত্য তুলে দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না।

৪৬৪।৬১

সাময়িক পত্রিকা

গঙ্গোত্রী (১ম সংখ্যা, ১৩৬৮)। সম্পাদক : দুর্গাদাস সরকার। সহঃ সম্পাদক : অধীর সর্বজ্ঞ, শান্তনু দাস। গ্রন্থসভা, ৪/১ আফতাব মস্ক লেন, কলিকাতা—২৭।

দাম : ৫০ নঃ পঃ।

ত্রৈমাসিক কবিতার সংকলনটিতে কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আরতি দাস ও দুর্গাদাস সরকার। কবিতা-গুলি মামুলি ধরনের নয়। প্রতিটি কবিতায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিহ্ন বর্তমান। পত্রিকাটিতে পুস্তক আলোচনার মান উন্নত। আলোচনা করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় গভীর ভাবব্যঞ্জক। কাব্য সম্পর্কিত পৃথক প্রবন্ধ থাকলে পত্রিকাটি সমৃদ্ধতর হ'ত।

সম্প্রতি—সম্পাদক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। ২৮, কিষণলাল বর্মণ রোড, শালকিয়া, হাওড়া। মূল্য ৬০ নঃ পঃ।

সাহিত্যরুচিসম্পন্ন পরিচ্ছন্ন কতিপয় পত্রিকার মধ্যে 'সম্প্রতি'র একটা স্থান আছে। প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার লেখকদের মধ্যে অনেকেই নতুন হলেও রচনাগুলি সাহিত্যদীপ্তিতে উজ্জ্বল। আলোচ্য দ্বিতীয় সংকলনে লেখকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত প্রবন্ধে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, গল্পে লক্ষ্মীজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখর বসু, কবিতায় আলোক সরকার, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, দিলীপ সিংহ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, পুষ্কর দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

প্রাপ্তি-স্বীকার

এসো নীপবনে—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধক কমলাকান্ত—শ্রীঅর্চনাপুরী।

দেশোন্নয়নে গণতন্ত্র — অমলেন্দু দাশগুপ্ত।

প্রতিরক্ষার অর্থনীতি — জুলে ম্রেমকেন অনুবাদক মানবেন্দ্র রায়।

পরাভূত দেবতা—অনুবাদক—অমলেন্দু দাশগুপ্ত

বিশ শতকের আমেরিকায় ধর্ম—হার্বার্ট ওয়ালেস স্নাইডার। অনুবাদক—সনাতন গোস্বামী।

প্যারিসে শিক্ষালাভ অন্তে ওদেশের প্রভাবকে আত্মস্থ করে এবং তার সংগে ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পৌরাণিক ও ধর্মমূলক বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে প্রতিভা স্ফুরণের দৃষ্টান্ত আর্টস এণ্ড প্রিন্টস গ্যালারীর পরপর কটি প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে। সেই শিল্পীদের মধ্যে দক্ষতা ও মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও অনেকটা একই ধারার অনুগামী হওয়ায় চিত্ররসিকদের মধ্যে একটা একঘেয়েমির ' অনুভূতি জেগে ওঠা স্বাভাবিক। তাই একটা ব্যতিক্রম হিসেবে গত ২৬শে মার্চ উদ্বোধিত মিসেস টপসী ক্লার্কের ছবির একক প্রদর্শনীটি বিশেষভাবেই মনোরঞ্জন করবে। শুধু তাই নয়, একজন বিদেশিনী শিল্পীর তুলিতে এদেশের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক শোভা এবং মানুষের প্রতিকৃতি এমন দরদমাখা হয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে যে সেদিক থেকে প্রদর্শনীটি একটু বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে বলা যায়।

মিসেস ক্লার্কের জন্ম স্কটল্যাণ্ডে এবং শৈশব কাল থেকেই তাঁর মধ্যে চিত্রাঙ্কনের ঝোঁক দেখা দেয়। স্কটল্যাণ্ডের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই তিনি চিত্রাঙ্কন বৃত্তি অবলম্বন করেন।

পরে ভারতে এসে তিনি শ্রীযুক্তা সাবিত্রী সরকারের পরিচালনাধীনে ব্রিটিশ উইমেন্স ক্লাবের শিল্প বিভাগে কাজ করেন। এদেশে তাঁর ছবি প্রথম দেখা যায় গত বছর মার্চ মাসে আর্টিস্ট্রি হাউসে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ছবির প্রদর্শনীতে এবং সেই সময়েই বিশেষ করে তাঁর প্রতিকৃতি অঙ্কন সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করে। এখানকার সরকারী আর্ট কলেজেও তিনি এক বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে টাঙানো মোট সাতাশখানি ছবি ফল ফুল প্রভৃতি নিয়ে 'নিজীব জীবন', প্রাকৃতিক শোভা এবং প্রতিকৃতি অংকনের মধ্যে দিয়ে শিল্পী বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর মনের রকমারি প্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। বিলেতের প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব কতক ছবির ক্ষেত্রে পরিস্ফুট থাকলেও অধিকাংশ ছবির মধ্যে প্রাচ্য শিল্পধারার অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে রঙের প্রয়োগে।

ফলের ডালি

উদ্ভট বা দুর্বোধ্য করে তোলার কোন প্রয়াস নেই কোন ছবিতে এবং সবগুলি ছবির ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর শ্রীটুকু ফুটিয়ে তোলার দিকেই শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। সেটা 'কাশ্মীরের সূর্যাস্ত' (৯নং), 'বাঙলার গ্রাম' (১০নং), 'পুষ্করিণী' (১৬নং) বা 'বসন্তের প্রকৃতি' (২৬নং) প্রভৃতি ছবির ক্ষেত্রে যেমন পরিস্ফুট, তেমনি 'লাল ফুল', 'ডালিয়া', 'ফল' প্রভৃতি

ওড়িষ্যার একটি লোক

নিজীব-জীবন চিত্র এবং 'ব্যাংককের মহিলা' (৪নং), 'সাধু' (১৭নং), 'কর্মী' (৬নং) এবং 'ওড়িষ্যার লোক' (২১নং) প্রভৃতি প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেও সমানভাবে পরিস্ফুট। গূঢ় কোন বিষয় বা জটিল মনস্তত্ত্বের রূপায়নে তাঁর ঝোঁক নেই। প্রকৃতির মধ্যে যা সহজ ও সুন্দর, সরলভাবে রেখা ও রঙের সাহায্যে তা অভিব্যক্ত করার প্রতিই তাঁর লক্ষ্য।

বিষয়বস্তু ভেদে রঙের নির্বাচনে যথেষ্ট রকমারিতা দেখা যায়। মূলত তিনি বাস্তবধারার অনুগামী এবং রেখা ও রঙের ব্যবহারেও বাস্তবকে অনুসরণের মধ্যে নতুনত্ব কিছু অবশ্য নেই। মিসেস ক্লার্ককে কোন মৌলিক ধারার স্রষ্টা বলেও অভিহিত করা যায় না। কিন্তু বাস্তবানুসৃতির মধ্যেও রূপমাধুর্য পরিস্ফুট করে তোলার দক্ষতার কথা বিচার করলে মিসেস ক্লার্কের কতকগুলি ছবি সার্থক শিল্পসৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায়। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার মতো যথেষ্ট মৌলিকত্ব প্রায় কোন ছবির ক্ষেত্রেই নেই। কিন্তু সুন্দরকে দীপ্ত করে ফুটিয়ে তোলায় শিল্পীর একটা সহজ প্রবণতা অধিকাংশ ছবিতেই পরিব্যাপ্ত এবং সেই সংগে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপও পাওয়া যায় যা ছবিগুলির প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে।

চন্দ্রশেখর

সুন্দর ও সার্থক চিত্রসৃষ্টি

সাবিনয়ে ও সগৌরবে "শিউলিবাড়ি" (মুক্তাটিক নিবেদিত) ছবিটি যাঁরা উপহার দিলেন, অর্থাৎ ছবির যাঁরা প্রযোজক ও পরিচালক, তাঁরা বয়সে তরুণ। বাংলা ছবির রাজ্যে এ'রা নবাগন্তুক। স্থিতনিষ্ঠ আন্তরিকতা ও অবিচল প্রত্যয়ের মূলধন নিয়ে তাঁরা প্রবেশ করেছেন বাংলা ছায়া-ছবির জগতে। "শিউলিবাড়ি" তাঁদের প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র। এবং তার চেয়েও বেশী। এই ছবি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করল, ছবির জগৎ থেকে তাঁরা ফিরে যেতে আসেন নি, অনেক কিছু দেবার জন্য এসেছেন।

সংপ্রয়াসী ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলেই তাঁরা সুবোধ ঘোষের অনবদ্য কাহিনী "নাগলতা"-র চিত্ররূপ দানে সাহসী হয়েছিলেন। তাঁদের সততা, সাহস ও উৎসাহের সার্থক ফলশ্রুতি হয়ে দেখা দিয়েছে "শিউলিবাড়ি"।

ছবির নায়ক বিজনবিহারী বাঙলা দেশের এক অনতিগত অতীতের প্রতিনিধি। ওই যুগে পথিকৃৎ বাঙালীর দেখা মিলত। বৃহৎ ও মহৎ নিয়ে কাটত তাঁদের জীবন। বহুর জন্য বাঁচতেন তাঁরা। অনাগতের জন্য তৈরি করতেন পথ।

বিজনবিহারী পরহিতব্রতী পথিকৃৎ বাঙালী চরিত্রের এমনি এক জীবন্ত প্রতীক। কৈশোরে পৃথিবীর কাছ থেকে দুঃখ পেয়েছিল বিজন। প্রতিদিনকার পরিচিত পরিবেশের কাছ থেকে সে পেয়েছিল অবজ্ঞা ও অপমান। বাঙালীর সমাজে তার স্থান হল না। গভীর অভিমানে বাঙলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল বিজন-বিহারী। বাঙলার নরম মাটি ছেড়ে তার পলাতক প্রাণটি একদিন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল বিহারের কাঁকর আর পাথরের বুকে। মানুষের সমাজ ছেড়ে পালিয়ে এল শাল-জঙ্গলে। বন কেটে তৈরি করল বসত। তার অবমানিত আত্মা আত্মীয় খুঁজে পেল পাহাড়ী অঞ্চলের সরলপ্রাণ মানুষদের মধ্যে।

সমাজ-বিতাড়িত বিজনবিহারী মানুষের গড়া সমাজকে আর মেনে নেয়নি। তাই একদিন তার একদা-বাল্যসঙ্গিনী বিধবা নিরুপমাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে সে দ্বিধা করেনি। প্রাণে প্রাণে হল তাদের পরিণয়, অন্তরে অন্তরে মিলন। লৌকিক আচারের অনুমতি গ্রহণ করেনি ওরা। প্রেমের অনুশাসনে ওরা স্বীকার করে নিল ওদের বিবাহিত জীবন। তারপর একদিন তাদের কোল জুড়ে এল সুনন্দা—তাদের স্পর্ধিত, অ-লৌকিক প্রেমের পুণ্যফল।

বিজনের ঘরে নিরুপমা এল, এর পর এল সুনন্দা। আর সেই সংগে বুঝি ভেসে এল বাঙলার প্রাণ ও মাটির একটি স্পর্শ, ছুঁয়ে গেল যেন বিজনের অন্তরকে। বিহারের ...লরুক্ষ মাটির বুকে বাংলা দেশের মাটির ...ন্জ সাধ তুলে নিয়ে এসে একদিন ছড়িয়ে ...য়েছিল বিজন। শিউলির চারা এনে পুঁতেছিল তার বাড়ির উঠোনে। বাড়ির নাম হল শিউলিবাড়ি। বিহারের সেই শাল-জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ী অঞ্চলে যেদিন নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠল, তারও নাম হল শিউলিবাড়ি।

অভিমানে বাঙালীকে আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না বিজন। বাঙালী এল, বাঙালীর সমাজ গড়ে উঠল। আর সেই সংগে শিউলিবাড়ির সমাজে এসে বাসা বাঁধল নির্লজ্জ নীচতার দুষ্ট কীট। বিজনের কলঙ্কিত জন্মপরিচয়ের কথা জানা ছিল শিউলিবাড়ির এক কুচক্রী প্রবাসী বাঙালীর। একদিন প্রকাশ্যে তার বিষাক্ত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হল বিজনকে।

শিউলিবাড়ির সমাজ ঘৃণা করল না বিজনকে। বরঞ্চ দূরে করে দিল খলচরিত্রকে। কিন্তু বিজন-নিরুপমার কন্যা সুনন্দা মেনে নিতে পারল না তার কুলপরিচয়ের এই নিদারুণ কলঙ্ক। তার অবাঞ্ছিত জন্মের জন্য সে অভিযুক্ত করল তার পিতা-মাতাকে। সুনন্দার অভিযোগ শেষ পর্যন্ত সত্যের স্পর্শ পেয়ে কেমন করে আত্মোপলব্ধিতে মিলিয়ে গেল তা নিয়েই কাহিনীর নাট্য-পরিণতি গড়ে উঠেছে।

নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তপন সিংহের চিত্রনাট্য ও পীযূষ বসুর চিত্রপরিচালনার মণিকাঞ্চনযোগে সুবোধ ঘোষের কাহিনী চলচ্চিত্রপটে নতুন প্রাণ পেয়েছে। চিত্রনাট্যে

চিত্ত বসুর পরিচালনায় নির্মীয়মান "দুপহারা" ছবির একটি মধুময় দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

আচারের ভয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে যাবার মুহূর্তে তাঁর অভিনয় অপরূপ।

নায়ক-নায়িকার কন্যা সুনন্দার রূপসজ্জায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির নাট্যপরিণতির মুহূর্তে পিতা-মাতাকে অভিযোগ করার কালে এবং নিজের জীবনের বিড়ম্বনা ও হতাশা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শিল্পী-ব্যক্তিত্ব ও অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

নায়কের পিতার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনোগ্রাহী। পুষ্করের ভূমিকায় দিলীপ রায় তাঁর স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে একটি সদাচারী যুবকের চরিত্র-সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে দর্শকদের সাধুবাদ পাবার মত অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেশ্বর সেন। ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসনের চরিত্রে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ও দেহাতী ভাষায় তাঁর বাচনভঙ্গী নিখুঁত। বীরেশ্বর সেন ঝুমরো রাজার চরিত্রের উদার ও সজ্জন রূপটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবির কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে যাঁদের অভিনয় প্রশংসনীয় তাঁরা হলেন চন্দন রায়, গীতালি রায় ও মণি শ্রীমানী। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তরুণকুমার, মিহির ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, ভোলা বসু প্রভৃতি।

নায়কের কিশোর বয়সের ভূমিকায় শ্রীমান অমল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার বাল্য-সঙ্গিনীর চরিত্রে সুস্মিতা দর্শকমনে মায়ার সৃষ্টি করে।

ছবির সংগীত পরিচালনায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় জীবনপ্রবাহের সহজ, সুন্দর সুরটি খুঁজতে চেয়েছেন। ছবিতে তাই গান বলতে রয়েছে পল্লীবাংলার দুটি গান—একটি ভোরবেলাকার লোকসংগীত ও অপরটি শ্যামাসংগীত। ভোরবেলাকার "রাই জাগো" গানটি ছবিতে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। রসের দিক থেকে এই গানের পৌনঃপুনিক ব্যবহার সার্থক। ছবির আবহ-সংগীতে রবীন্দ্র-সংগীতের ও কীর্তনের সুরের ব্যবহার মনে দোলা দেয়।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর "রুচিরা"-র শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠানে ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অন্যতম প্রধান শিল্পী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অগ্রদূত পরিচালক-গোষ্ঠীর বিভূতি লাহা।

ছবির মূলে আবহ-সুরটি মনোরম। ছবির আবহ-সংগীত রচনায় দরদ দিয়ে স্বরোদ বাজিয়েছেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ।

দীনেন গুপ্তর আলোকচিত্রগ্রহণ এ-ছবির অন্যতম প্রধান সম্পদ। ছবির পটভূমি ও পরিবেশ এবং আলো-অন্ধকারের রূপ তাঁর ক্যামেরায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সুনীতি মিত্র (শিল্পনির্দেশ)। অন্যান্যদের মধ্যে সুবোধ রায় (সম্পাদনা), অতুল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল, সুশীল সরকার ও অবনী চট্টোপাধ্যায় (শব্দগ্রহণ) এবং মদন পাঠক (রূপসজ্জা) উল্লেখযোগ্য।

চিত্রালোচনা

নতুন কোন বাংলা ছবি এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে না। শুধুমাত্র একটি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটির নাম **বর্মা রোড।**

কাশ্মীর ফিল্মস নিবেদিত **বর্মা রোড-**য়ে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী চিত্রায়িত। কাহিনীতে রয়েছে এমন এক চোর যে দেশপ্রেমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে, এবং এমন এক কর্নেল যে বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিচিত হয়। অশোককুমার ও শেখ মুখতার ছবির এই দুই চরিত্রের শিল্পী। অন্যান্য প্রধান শিল্পী হলেন কুমকুম, বিজয়া চৌধুরী ও মোতী সাগর। তারা হরিশ ছবির পরিচালক, চিত্রগুপ্ত হলেন সুরকার।

• • •

অগ্রগামী গোষ্ঠীর **কান্না** আগামী ১লা বৈশাখ মুক্তিলাভ করবে বলে শোনা যাচ্ছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মর্মী ও ভিন্নধর্মী কাহিনী এই ছবির আখ্যানভিত্তি। ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও নবাগতা নন্দিতা বসু। রাধামোহন ভট্টাচার্য ও সুলতা চৌধুরীকে ছবির দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে। সুধীন দাশগুপ্ত ছবির সুরকার।

• • •

অগ্রগামী-গোষ্ঠী বর্তমানে আরও একটি দুঃসাহসিক প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের "নিশীথে" গল্পটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন। সম্প্রতি অগ্রগামী-দল এলাহাবাদে ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন উত্তম-কুমার, নন্দিতা বসু ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

• • •

বাংলা ছবিতে এ-ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। অভূতপূর্ব কাজটি সাধন করেছেন রেনেসাঁস ফিল্মস ঢেউ-এর পরে ঢেউ ছবিতে। ছবির চিত্রপরিচালকদ্বয় টেনিসনের "এনোক আর্ডেন" কবিতার আখ্যানবস্তু অবলম্বনে তৈরি করেছেন ছবিটি। ছবিটির নতুনত্বের দাবি শুধু এ-কারণেই প্রতিষ্ঠিত নয়। সারা ছবিটি তোলা হয়েছে দীঘার সমুদ্রতীরে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। দীঘার বেলাভূমি ঝাউবনের পটভূমিতে ছবির জীবনকাব্যটি গড়ে উঠেছে। সমুদ্রের গর্জন ও ঝাউ বনের উদাস রাগিণীর মধ্যে জীবনের কড়িকোমল সুরটি ফুটিয়ে তোলায় চেষ্টা করেছেন চিত্রপরিচালকরা। ছবির মুখ্য তিনটি চরিত্রের শিল্পী হলেন শম্পা, শংকর ও বাদল। এ'রা তিনজনই ছবিতে এই প্রথম অভিনয় করলেন। রবিশংকর ছবির সুররচনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

• • •

রামধনু পিকচার্স-এর তের নদীর পারে ছবিটি এখন সম্পাদকের টেবিলে। গ্রামে-শহরে ভ্রাম্যমান সার্কাস দলের শিল্পীদের জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে ছবির আখ্যান-বস্তু। বারীন৹ সাহা ছবির পরিচালক। চিত্রনাট্য ও আলোকচিত্র গ্রহণের দায়িত্বও তিনিই পালন করেছেন। প্রিয়ম হাজারিকা ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ছবির দুই প্রধান শিল্পী। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

• • •

আর-ডি-বি'র দুটি পরবর্তী ছবির নাম সাত পাকে বাঁধা ও এক টুকরো আগুন। সাত পাকে বাঁধা-র কাহিনীকার ও চিত্র-নাট্যকার হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ছবির পরিচালক ও শিল্পিবৃন্দ এখনও নির্বাচিত হননি।

এক টুকরো আগুন ছবিটি পরিচালনা করবেন বিনু বর্ধন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায়ের লেখা কাহিনী ও চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে তৈরী হচ্ছে ছবিটি। কালী বন্দ্যো-পাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, বিশ্বজিৎ এবং একজন নবাগতা অভিনেত্রীকে ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে দেখা যাবে। হেমন্ত মুখো-পাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

• • •

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার পর চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ যে ছবির কাজে আত্মনিয়োগ করছেন তার কাহিনী-ভিত্তি হল সমরেশ বসুর নির্জন সৈকতে। এই গল্পের চিত্ররূপ প্রযোজনা করছেন সরকার প্রোডাকসন্স তথা প্রযোজক দিলীপ সরকার। এ-বাদে জালান প্রোডাকসন্স-এর আরও একটি বাংলা ছবির পরিচালন-দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করছেন। ছবিটি তৈরী হবে সমরেশ বসুর "বাঘিনী" অবলম্বনে।

• • •

শহরের গৃহসমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দানের কাজে ব্রতী হয়েছেন নবগঠিত প্রযোজক-সংস্থা প্যারাডাইস পিকচার্স। [illegible]

গানের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। চিত্ত বসুর পরিচালনায় ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ অনতিবিলম্বেই শুরু হবে। অমল মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক। এ-পর্যন্ত ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার ও সন্ধ্যারাণীকে ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবন্ধ করা হয়েছে।

লোকনৃত্যগীতের অনুষ্ঠান

'ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার' সংস্থা গত রবিবার নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে যে-অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন, কলকাতার সংগীত-রসিকদের নিকট তার নূতনত্বের আবেদন অন্তত ছিল না। মাত্র কিছুকাল আগে এই নিউ এম্পায়ারেই 'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার' ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোক-সংগীত ও লোকনৃত্য এবং সেই সঙ্গে কিছু রবীন্দ্রসংগীত, একটি অতুলপ্রসাদ-গীতি এবং বৈদিক স্তোত্রগীতি কয়ার রীতিতে পরিবেশন করেছিলেন। আলোচ্য অনুষ্ঠানটি সব দিক দিয়ে 'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার' শিল্পি দলের সেই অনুষ্ঠানের অনুরূপ। লোকনৃত্যগীতির দু-একটি নূতন সংযোজন সত্ত্বেও 'ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার' দল বুঝি সাধারণভাবে বিষয়ে এবং আঙ্গিকে কোন নূতন শিল্পধারণার ইঙ্গিত দিতে চাননি।

উপস্থাপনার দিক দিয়েও এই দলের সামগ্রিক প্রস্তুতির কিছু অভাব লক্ষ্য করা গেছে। কয়ার-কণ্ডাকটর শ্রীঅরুণ বসুর সংকেতে এবং নির্দেশে আতিশয্য ছিল; ফলে সেই নির্দেশের সঙ্গে শিল্পীদের যোগসাধনের অভাবও যেন প্রায়শ প্রকট হয়ে ওঠবার উপক্রম করেছে। নেপথ্য-ভাষ্য যিনি পাঠ করেছেন তাঁর কণ্ঠসম্পদ আছে। কিন্তু ভাষ্যকে অতি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর করে তোলবার ঝোঁকটুকু বর্জনীয়। একটি বৈদিক স্তোত্রগীতিতে ('সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম') অনুষ্ঠানের আরম্ভ। রবীন্দ্র-সংগীতে সমাপ্তি। মাঝে রবীন্দ্র-সংগীত, অতুল-প্রসাদের গান ছাড়া ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য ও লোকসংগীতের (কিছু আঞ্চলিক, দুটি সলিল চৌধুরী রচিত) অনুষ্ঠান। গানের চেয়ে নৃত্যের অনুষ্ঠান-গুলি দর্শকদের বেশী আনন্দ দিয়েছে। গানে অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ৬০জন শিল্পী। বিভিন্ন লোকনৃত্যে রূপ দিয়েছেন পনেরজন শিল্পী।

নাট্যাভিনয়

বাংলা দেশের নাট্য-আন্দোলনের প্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর বে-সরকারি সংস্থাকে বর্তমানে অর্থ সাহায্য করছেন, "শ্রীমঞ্চ" তাদের অন্যতম। "শ্রীমঞ্চ" গোষ্ঠী বর্তমানে গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত প্রহসন "য্যায়সা-কা-ত্যায়সা" দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে নিয়মিতভাবে অভিনয় করছেন। গত ২০শে মার্চ থেকে নাটকটির অভিনয় চলছে। ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। প্রেমাংশু বসু নাটকটির পরিচালক।

ইনডস্কো ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের বার্ষিক নাট্যাভিনয় উপলক্ষে গত ২০শে মার্চ মিনার্ভায় "ঝিন্দের বন্দী" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

অহীন্দ্রম নাট্যসংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সংস্থার সভ্যরা গত ১৯শে মার্চ অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকটি অভিনয় করেন। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেন হরিধন মুখো-পাধ্যায়, বেণী চট্টোপাধ্যায়, শৈল চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, বিনয় দাস ও অরুণা মুখোপাধ্যায়।

গত ২০শে মার্চ বালী রেলওয়ে কলোনীতে রবীন্দ্রনাথের "সম্পত্তি সমর্পণ"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন কিশোর শক্তি সংঘ। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-কাহিনীর নাট্যরূপ দেন এবং নাটকটি পরিচালনা করেন অরুণাভ মজুমদার।

একলব্য

ভূপালে আইসবাগ স্টেডিয়ামে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় হকিতে এবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে পাঞ্জাব। ফাইন্যালে পাঞ্জাব ও ভূপালের খেলা একদিন গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পাঞ্জাব একটি গোল করে বিজয়ী হয়। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে পাঞ্জাবের এটি অষ্টম জয়। এর আগে আরও ৭বার বিজয়ীর পুরস্কার রঙ্গস্বামী কাপ তারা ঘরে তুলেছে। তা ছাড়া ৪বার রানার্সও হয়েছে পাঞ্জাব। ভারতীয় হকি ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের দান বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। বহু কৃতী ও গুণী খেলোয়াড় তৈরি করে তারা ভারতীয় হকিকে সমৃদ্ধ করে আসছে। পাঞ্জাবের অধিবাসীদের কাছে হকিই সব চেয়ে প্রিয় ও আকর্ষণীয় খেলা। এবং প্রায় সারা বছরই তাদের হকি নিয়ে প্রস্তুতি।

এবার ২৩টি দল নিয়ে জাতীয় হকি খেলার তালিকা গড়া হয়। এর মধ্যে গতবারের বিজয়ী রেলওয়ে এবং বিজিত পাঞ্জাব সমেত সেমিফাইন্যালিস্ট সার্ভিসেস ও বোম্বাই দল কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পায়। চতুর্থ রাউন্ড থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পায় গতবারের অপর সেমিফাইন্যালিস্ট উত্তর প্রদেশ এবং মহীশূর, মাদ্রাজ ও বাংগলা দল।

বাংগলাকে চতুর্থ রাউন্ডের প্রথম খেলাতেই দিল্লির কাছে ১—০ গোলে হার স্বীকার করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। বাংগলা দলে একজনও বাঙালী খেলোয়াড় ছিল না এটা সত্যিই বাংগলার হকির পক্ষে কলংকের কথা। যেখানে প্রথম ডিভিসন লীগে টীমের সংখ্যা ২০টি সেখান থেকে জাতীয় হকিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য একজনও বাঙালী খেলোয়াড় পাওয়া যায় না, এটা সত্যিই দুঃখের কথা। যাই হোক, অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া বাংগলা দল জাতীয় হকিতে দিল্লির সংগে অবশ্য মন্দ খেলেনি। এবং তাদের দিল্লির কাছে ১—০ গোলে হার স্বীকারও ক্রীড়াধারার সম্পাতিসূচক ফলাফল নয়। অনেকটা দুর্ভাগ্যের জনাই বাংগলাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, গতবার জাতীয় হকিতে বাংগলা কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছিল এবং এবারের মত একই ভাবে প্রথম খেলায় হেরেছিল পাঞ্জাবের কাছে ১—০ গোলে।

জাকর্তায় আগামী এশিয়ান গেমের জন্য জাতীয় হকির উপর এবার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ এই খেলায় খেলোয়াড়দের গুণাগুণের নিরিখেই গড়া হবে এশিয়ান গেমে ভারতের হকি টীম। জাতীয় হকির খেলা আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেনি। তবে খেলার বিবরণ থেকে যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় এবারকার দলে কিছু কিছু নতুন মুখ দেখা যাবে। কারণ অনেক তরুণ খেলোয়াড় হকির উন্নত ছলাকলায় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। রোম অলিম্পিকে ভারতের বিশ্বজয়ীর খেতাব হারিয়ে গেছে। বিশ্ব হকিতে ভারতের এখন দ্বিতীয় দলের মর্যাদা। দেখা যাক নবাগতদের নতুন কৃতিত্বে ভারত আবার বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করতে পারে কিনা।

নীচে এই বছরের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলার ফলাফল এবং পূর্ববর্তী বিজয়ী ও বিজিত দলের নাম দেওয়া হল:—

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির সহধর্মিণী মিসেস জ্যাকেলিন কেনেডির সম্মানার্থে আয়োজিত প্রদর্শনী পোলো খেলার পর জয়পুরের রামবাগ পোলো মাঠে খেলোয়াড়দের সংগে মিসেস কেনেডি। ডানদিক থেকে দ্বিতীয় জয়পুরের মহারাজা,

প্রথম রাউণ্ড

ভূপাল (৩) : উড়িষ্যা (০)
মহাকোশল (৫) : আসাম (১)
বিহার (৩) : কেরালা (০)
মধ্যভারত (২) : অন্ধ্র (১)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

ভূপাল (ওয়াক ওভার) : সম্মিলিত স্কুল (স্ক্র্যাচ)
দিল্লি (৪) : বিহার (২)
মহাকোশল (১)(৪) : রাজস্থান (১)(০)
বিদর্ভ (১) : মধ্যভারত (০)

তৃতীয় রাউণ্ড

ভূপাল (৪) : পাতিয়ালা (০)
দিল্লি (৩) : হায়দরাবাদ (০)
মহাকোশল (৪) : মহারাষ্ট্র (০)
বিদর্ভ (০)(২) : গুজরাট (০)(১)

চতুর্থ রাউণ্ড

ভূপাল (ওয়াক ওভার) : মহীশূর (স্ক্র্যাচ)
দিল্লি (১) : বাঙলা (০)
মহাকোশল (৩) : উত্তর প্রদেশ (০)
মাদ্রাজ (২) : বিদর্ভ (০)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

সার্ভিসেস (২) : দিল্লি (১)
পাঞ্জাব (১) : মাদ্রাজ (০)
ভূপাল (১) : বোম্বাই (০)
রেলওয়ে (৩) : মহাকোশল (০)

সেমি ফাইন্যাল

ভূপাল (০)(১) : রেলওয়ে (০)(০)
পাঞ্জাব (১)(৪) : সার্ভিসেস (১)(১)

ফাইন্যাল

পাঞ্জাব (০)(১) : ভূপাল (০)(০)

জাতীয় হকির বিজয়ী ও বিজিত

বিজয়ী	রানার্স
১৯২৮—উত্তর প্রদেশ	রাজপুতনা
১৯৩০—রেলওয়ে	রাজপুতনা
১৯৩২—পাঞ্জাব	বাঙলা
১৯৩৬—বাঙলা	মানভাদার
১৯৩৮—বাঙলা	ভূপাল
১৯৪০—বোম্বাই	দিল্লি
১৯৪২—দিল্লি	পাঞ্জাব
১৯৪৪—বাঙলা	গোয়ালিয়র
১৯৪৫—ভূপাল	উত্তর প্রদেশ
১৯৪৬—পাঞ্জাব	দিল্লি
১৯৪৭—পাঞ্জাব	বোম্বাই
১৯৪৮—ভূপাল	বোম্বাই
১৯৪৯—পাঞ্জাব	বাঙলা
১৯৫০—পাঞ্জাব	ভূপাল
১৯৫১—পাঞ্জাব	সার্ভিসেস
১৯৫২—বাঙলা	পাঞ্জাব
১৯৫৩—সার্ভিসেস	পাঞ্জাব
১৯৫৪—পাঞ্জাব	সার্ভিসেস
১৯৫৫—সার্ভিসেস ও মাদ্রাজের যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান	
১৯৫৬—সার্ভিসেস	উত্তর প্রদেশ
১৯৫৭—রেলওয়ে	বোম্বাই
[illegible]	বোম্বাই
১৯৫৯—রেলওয়ে	সার্ভিসেস
১৯৬০—সার্ভিসেস	উত্তর প্রদেশ
১৯৬১—রেলওয়ে	পাঞ্জাব
১৯৬২—পাঞ্জাব	ভূপাল
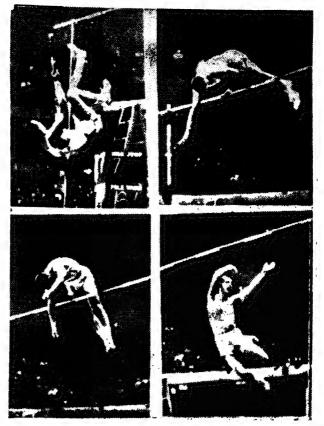
পোলভল্টে ১৬ ফুট অতিক্রমকারী বিশ্বের প্রথম অ্যাথলীট আমেরিকার উলসেলের পোলভল্টের বিভিন্ন ভঙ্গি

* * *

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার মত জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অর্থাৎ রনজি ট্রফির ফাইন্যাল খেলাও শেষ হয়ে গেছে। ফাইন্যালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ২৮৭ রানে হারিয়ে বোম্বাই উপর্যুপরি ৪বার এবং সর্বসুদ্ধ ১৩বার রনজি ট্রফি ঘরে তুলেছে। মোট ২৮বারের প্রতিযোগিতায় ১৩বার বিজয়ীর সম্মান লাভ ক্রিকেট ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়। আরও বলবার মত ঘটনা, ভারতের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য বোম্বাইয়ের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়দের ব্যতিরেকেই বোম্বাই এবার বিজয়ী হয়েছে এবং শুধু বিজয়ীই হয়নি, উমরিগর, ইঞ্জিনিয়ার, নাদকার্ণী, রামকান্ত দেশাই এবং সরদেশাইকে ছাড়াই তারা বিজয়ী হয়েছে এক ইনিংস ও ২৮৭ রানে। বোম্বাইয়ের আর যেসব কৃতী ব্যাটসম্যান এবং বোলার [illegible]

পড়েছেন, তাদের কথা নাই বা তুললাম।

আরও বলবার কথা, পাঁচ দিনব্যাপী ফাইন্যাল খেলা আড়াই দিনেই শেষ হয়ে গেছে এবং যেখানে বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংসের ৫৩৯ রান করতে ঠিক ৫০০ মিনিট সময় লেগেছে, সেখানে রাজস্থানের দুই ইনিংস শেষ হয়েছে মাত্র ২৯৮ মিনিটে। ১৮৫ মিনিটে তারা প্রথম ইনিংস শেষ করে ১৫৭ রানে, দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করতে লাগে ১১৩ মিনিট এবং রান হয় ৯৫।

বোম্বাইয়ের জয়লাভের মূলে অজিত ওয়াদেকার ও রামচাঁদের ব্যাটিংয়ের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ওয়াদেকারের ২৩৫ এবং রামচাঁদের ১০০ রান দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

রনজি প্রতিযোগিতার খেলা ভারতের জাতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও প্রতি বছর বিদেশী দলের ভারত সফরের ফলে এর আকর্ষণ যে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সবার দৃষ্টি এখন টেস্ট খেলার দিকে। বড় খেলা না হলে দর্শকের চোখ ভরে না, খেলোয়াড়রাও উৎসাহ পায় না। বড় খেলার জন্যই ছোট

খেলার দিকে কি ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ কি সাধারণ দর্শক কারোই তেমন দৃষ্টি নেই। ফলে জাতীয় ক্রিকেট আজ অনেকখানি উপেক্ষিত। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কোন বিদেশী দলের ভারত সফরের কথা নেই। এই সময়ে রনজি প্রতিযোগিতার দিকে ভালভাবে দৃষ্টি দিলে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়তে পারে, কিছু কিছু নতুন খেলোয়াড়ও তৈরী হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ফাস্ট বোলার বাছাই করে তাদের উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। ফাস্ট বোলারের অভাবেই ক্রিকেটে ভারত আজও দুর্বল। না হলে ব্যাটিং ও স্পিন বোলিংয়ে ভারতের হাতে এখন যে অস্ত্র আছে, তাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে এমন বিপর্যয় হবার কথা নয়। তাই বিদেশী দলকে ভারতে আনার প্রচেষ্টা বা বিদেশে গিয়ে খেলবার আগ্রহের চেয়ে এখন ঘরের দিকেই একটু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

* * *

ব্রিজটাউনে ভারত ও বারবাডোজ দলের চার দিনব্যাপী খেলার দ্বিতীয় দিনে ফাস্ট বোলার গ্রীফিথের বলের আঘাতে মাথায় ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ভারতের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করছেন জেনে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন।

নরীর অবস্থা যা হয়েছিল, তাতে সারা ক্রিকেট-বিশ্বই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। গ্রীফিথের ফাস্ট বল তাঁর কানের পাশে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলে তিনি তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে তখনই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে খবর আসে নরীর আঘাত গুরুতর নয়। তাঁকে ডাক্তার বিশ্রাম গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। পরে দেখা যায়, নরীর অবস্থা

রণজি ট্রফি

খুবই গুরুতর এবং আশঙ্কাজনক। বলের আঘাতে মাথার মধ্যে জমা রক্ত তার মস্তিষ্কের উপর চাপ দিচ্ছে এবং তাঁর বাম অঙ্গে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। ফলে নরীর মাথায় দুবার অস্ত্রোপচার করতে হয়। প্রথমবারের অস্ত্রোপচারে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু তাতে কণ্ট্রাক্টরের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ত্রিনিদাদ থেকে মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ঘোরালালকে আনিয়ে আবার অস্ত্রোপচার করা হয়। এবারও অস্ত্রোপচারের জন্য সময় লাগে দু ঘণ্টা। নরীর জীবন সম্বন্ধেই সংশয় দেখা দেয়। তাঁর দেহে রক্ত প্রদানের প্রয়োজন হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল প্রথমেই রক্তদানের জন্য এগিয়ে আসেন। পরে চাঁদু বোরদে, নাদকার্নী এবং উমরিগরও রক্তদান করেন। নরীর জীবন-রক্ষার জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে বিশ্বের ক্রীড়ামোদীদের নিকট আবেদন জানান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি এবং সম্পাদক।

এ থেকেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। নরীর সহধর্মিণী ডলী কণ্ট্রাক্টরও সংবাদ পেয়ে ভারত থেকে ছুটে যান আহত স্বামীর শয্যার পাশে।

খেলার সময় আহত হওয়া এমন কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়। সচরাচরই এটা ঘটে থাকে। এই খেলাতেই মঞ্জরেকারও নাকে আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু কণ্ট্রাক্টরের আঘাত এমনই গুরুতর হল যে, সারা বিশ্বই এতে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। এই আতঙ্কের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজবাসীর মানবিকতা ও আতিথেয়তা ভারতবাসী মাত্রের মনেই আশার সঞ্চার করেছে। তাঁরা নরীর চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেননি, স্বয়ং অধিনায়ক ওরেল রক্তদান করেছেন, ভক্ত কণ্ট্রাক্টরের দিকে আতিথেয়তার উদার হাত বাড়িয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গণ্যমান্য বহু অধিবাসী। 'দূরকে নিকট বন্ধু ও পরকে ভাই' করার এক মহামিলন ক্ষেত্র হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গন।

নরী কণ্ট্রাক্টরের আঘাতে বাম্প বল নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, ক্রিকেট নীতির খেলা, শালীনতার খেলা, এখানে বেশী বাম্প বল দিয়ে ব্যাটসম্যানদের ভীতি সঞ্চার নীতিবিরুদ্ধ। কেউ বলছেন, বাম্প বলে ফাস্ট বোলারের ন্যায্য অধিকার। আইন করে সেটা বন্ধ করা অর্থহীন। এ বিষয়ে আর একদিন আলোচনা করা যাবে।

সুখলতা পাল

কি সাঁতার, কি অ্যাথলেটিকস, কি অন্য খেলাধুলো এক এক সময়ে এক একটি মেয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্যের সম্মানে অপরকে অনুরাগী করতে চেষ্টা করছে।

সাঁতারের কথাই বলি। সাঁতারে বাঙালী মেয়েদের প্রথম খ্যাতির সোপানে আরোহণ করেন বাণী ঘোষ। বাণী ঘোষের অস্তমিত প্রতিভার কোলে লীলা চ্যাটার্জির উত্থান। লীলা চ্যাটার্জির পড়ন্ত প্রতিভায় সুখলতা পালের আগমন।

অথচ জলেই সুখলতার ভয় ছিল সবচেয়ে বেশী। জলকে নয়, জলজন্তুকে। কলেজ স্কোয়ার ট্যাঙ্কে প্রথম যেদিন সুখলতা বেড়াতে গিয়েছিল সেইদিনই বড় বড় মাছ এবং কাছিম দেখে ওর মনে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। শান

মঞ্জুল

বাঁধানো ঘাটে দাঁড়িয়ে লোকগুলো জলের মধ্যে মুড়ি ও ময়দার টোপ ফেলছে আর লাল বড় বড় রুই মাছ পাখনা মেলে এগিয়ে এসে সেই টোপ খাচ্ছে। মাঝে মাঝে চার পায়ে সাঁতার কেটে জলের উপর ভেসে উঠছে এক একটা কাছিম। সুখলতার শিশু মনে সেই থেকেই আতঙ্ক। তখন ও ভাবতেও পারেনি কোনদিন ঐ জলেই মাছের মত ডানা মেলে তরতর করে এগিয়ে যাবে। জলের বুকে সাঁতারের সাফল্যের পরে ও নিজেই অবাক হয়ে গেছে।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বাঙলার সাঁতারে সুখলতার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। শুধু বাঙলাই বা বলি কেন? ভারতেও তখন সুখলতার সমকক্ষ কোন সাঁতারু মেয়ে ছিল না। ঐ তিন বছর কলকাতার সমস্ত সাঁতার প্রতিযোগিতার একশো ও দুশো মিটার ফ্রিস্টাইলে ওর প্রথম স্থান বাঁধা ছিলই। ১৯৪১ সালে কলেজ স্কোয়ার ট্যাঙ্কে নিখিল ভারত সাঁতার প্রতিযোগিতাতেও দুই বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে ওর পদক ও প্রশংসাপত্র লাভ। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের এক নম্বর সাঁতারু মেয়ের সম্মান।

বাড়ির কর্তাদের কটাক্ষ এবং বাড়ির বাইরের বিপরীত পরিবেশের [illegible]

সুখলতা পালের সাঁতার শেখার পেছনে বাবার আগ্রহই প্রধান। সুখলতার বাবা শরৎচন্দ্র পাল ছোটবেলা থেকেই খেলা-ধূলোর পূজারী, নিজে সাঁতার কেটেছেন, মুষ্টিযুদ্ধ লড়েছেন, অ্যাথলেটিকসে দৌড়-ঝাঁপ করেছেন, ফুটবল, হকি খেলেছেন।

১৯১১ সালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওয়াই এম সিএর বার্ষিক রিভার পিকনিকের সময় নৌকাডুবিতে ১১টি ছেলের জীবনলীলা সাংগ হয়ে যাবার পর যখন কলকাতায় সাঁতার আন্দোলন আরম্ভ হয়, শ্রীপাল তখন থেকেই সাঁতারের সংগে যুক্ত। ১৯১১-র সেই ভয়াবহ নৌ দুর্ঘটনার স্মৃতিই শ্রীপালের মনে ছেলেমেয়েদের সাঁতার শেখাবার প্রেরণা এনে দেয়। তা ছাড়া খেলাধূলোয় মেয়েদের উৎসাহ দেবার ক্ষেত্রে শরৎবাবুর ভূমিকাও উল্লেখ্য। তিনি উইমেনস ওয়ার্লড (প্রাক্তন উইমেনস ওয়ার্লড স্পোর্টস)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং উইমেনস ইন্টার কলেজ স্পোর্টস এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরলোকগত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি যখন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ইনস্পেক্টর অব কলেজেস' ছিলেন তখন প্রধানত আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীব্রজরঞ্জন রায়, শ্রীশরৎ পাল এবং শ্রীযুক্তা সরলা চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় উইমেনস ইন্টার কলেজ স্পোর্টস এসো-সিয়েশনের সৃষ্টি হয়। শ্রীশরৎ পাল হন এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক।

খেলাধূলো সম্পর্কে বাবার এই অনুরাগেই সাঁতারের প্রতি সুখলতার অনুরাগ জন্মে। ফলে তিনটি বোন সুখলতা, আশালতা ও শিবানী এবং প্রায় সমবয়সী পিসি রমা পাল ভর্তি হয় বৌবাজার ক্লাবে। সেখানেই পশুপতি চৌধুরীর কাছে সাঁতার শেখা এবং অল্পদিনের মধ্যেই সুখলতার শ্রেষ্ঠত্ব।

তখন পরিবেশ ছিল প্রতিকূল। মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। পথচারী এবং বায়ুবিহারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে বড় মেয়েদের সাঁতার শেখার পক্ষে ছিল সদা-সঙ্কোচ। তবু ঐ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই সুখলতা বৌবাজার সুইমিং ক্লাবকে আঁকড়ে ধরে লতার মত দিনে দিনে এগিয়ে যেতে লাগল। ইচ্ছে ছিল আরও অনেকদূর এগিয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৪১ সালে কল-কাতায় জাপানী বোমার আক্রমণে ওদের কার্সিয়াং পালিয়ে যেতে হল। সেখানে নতুন করে শেখার বা অনুশীলনের কোন সুযোগ ঘটল না। দুবছর পরে যখন কলকাতায় ফিরে এল তখন বাড়ির সবাই তাকে দেখল নতুন চোখে। সাঁতারের সাব-লীলা ঊর্মিমুখর তন্বী মেয়ে তখন হারিয়ে গেছে। তখন সুখলতার [illegible] চেহারা, সে চেহারায় চাপল্যের চিহ্ন নেই।

[illegible] বিবাহ। ১৯৪৪-এর [illegible]

সাঁতারের কয়েকটি ট্রফির সংগে সুখলতা পাল

শুভ পরিণয়ের বার্তা ঘোষণা করল। বর বিখ্যাত ব্যবসায়ী রামকানাই যামিনীরঞ্জন পালের স্বত্বাধিকারীর ছেলে। নাম কৃষ্ণকান্ত পাল।

সুখলতার এখন এক ছেলে ও, এক মেয়ে। ছেলের বয়স মাত্র এক বছর। মেয়ের ১৪। ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ক্লাস এইটের ছাত্রী। তবে নাম কাবেরী হলে কি হয়, মায়ের মত জলের বুকে কলতান তুলবার বাসনা নেই।

দেশী সংবাদ

১৯শে মার্চ—ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমদানী রপ্তানী নীতি নির্ধারণ কমিটি রপ্তানীলব্ধ আয় সম্পর্কে তিন প্রকার আয়কর হ্রাস করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। এই কমিটি সাধারণের নিকট মুদালিয়ার কমিটি নামে পরিচিত।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটের উপর চারিদিনব্যাপী সাধারণ আলোচনার প্রথম দিবসে বিরোধী সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কেন্দ্রের নিকট ন্যায্য পাওনা আদায়ের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতার অভিযোগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট এই আবেদন জানাইয়াছেন যে, জেনেভায় যখন ১৭ জাতীয় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন চলিতেছে, তখন তাহারা যেন আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা লইয়া আর অগ্রসর না হন।

২০শে মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেটের সাধারণ আলোচনার দ্বিতীয় দিন সীমান্তে পাকিস্তানী হামলার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং বিরোধী পক্ষ হইতে একাধিক সদস্য উক্ত পাকিস্তানী দৌরাত্ম্য রোধ করার জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার হইতে কঠোরতর ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেন যে, তৃতীয় যোজনায় রাজ্যের পৌর এবং পল্লী এলাকাগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিজের হাতে লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন উভয়েই স্বীকার করেন, গত কয়েক মাস যাবৎ চাউলের দর বাড়িতেছে।

২২শে মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট সম্বন্ধে বিতর্কের তৃতীয় দিবসে বিরোধী দলের সদস্যগণ সাধারণভাবে বাজেটের সমালোচন করিয়া এই রাজ্যে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ও জীবিকার ব্যয় বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

অতিরিক্ত পাঁচ দফা বকেয়া মহার্ঘ ভাতা আদায়ের দাবিতে অদ্য বিকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবন প্রাঙ্গণে প্রায় তিন হাজার কর্মচারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

২৩শে মার্চ—এই রাজ্যের যে সব কয়লাখনি এলাকা সরকারে বর্তাইয়াছে, সেই খনিগুলি হইতে কয়লা তোলার ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন নিজ হাতে লইতে চাহেন, ঐ বিষয়ে জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনের হস্তক্ষেপ চাহেন না—সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য বিধান পরিষদে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন।

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের এক শ্রেণীর শিল্পপতি কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপমুক্ত একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, তাঁহারা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁহাদের অভিমত পেশ করিয়াছেন।

২৪শে মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে বাজেট ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবি সম্বন্ধে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানান যে, অর্থ কমিশন কর্তৃক সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অংশ বৎসরে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৮ কোটি টাকা ধার্য করিলে কেন্দ্রীয় সরকার উহা দিতে রাজী হন নাই। উহার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ জানানো হইবে।

২৫শে মার্চ—সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ শ্রমিক যথার্থভাবে কাজ না করার ফলে কলিকাতা মহানগরীর ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে শুধু বর্ষাকালেই নয়, অদূর ভবিষ্যতে বিনা বর্ষণেই মহানগরী প্লাবিত হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

লেক ময়দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের প্রথম দিন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বিদেশী ভাষা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অন্তরায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করেন, দ্বিতীয় দিন রবিবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং উপাচার্য শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী উহার দৃঢ় বিরোধিতা করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে মার্চ—সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ ঘোষণা করিয়াছে যে, আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত আলোচনা চালাইতে তাহারা প্রস্তুত আছে।

বেলা ঠিক বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আলজিরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি বলবৎ হয়। কিন্তু আলজিরিয়াকে স্বাধীনতাদানের বিরোধী ফরাসীগণকে লইয়া গঠিত 'ওয়াস' বা গোপন সেনাবাহিনী সংস্থা দুইদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করিয়াছেন। ফলে ৫টার পূর্বেই শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তার উপর জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া ওঠে।

২০শে মার্চ—১৭ রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ভারত আজ প্রস্তাব করে যে, নিরপেক্ষ দেশসমূহে আণবিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলে উহা বর্তমান পর্যবেক্ষণ কার্যের সহায়ক হইতে পারে।

ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্য গল আজ জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে সমগ্র ফরাসী জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আলজিরিয়ার দীর্ঘ সংগ্রাম শেষ হইতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন ফ্রান্স ও নূতন আলজিরিয়ার পক্ষে এক কল্যাণকর ও উদার সহযোগিতার দ্বারও উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

২২শে মার্চ—সোভিয়েট প্রতিনিধি শ্রীসেমিওন সারাপকিন আজ জানান যে, আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য বৃহৎ ত্রিশক্তিবর্গের আলোচনায় "সম্পূর্ণ অচল অবস্থার" সৃষ্টি হইয়াছে। মাত্র গতকাল এই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গের দাবি হইল যে, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে "গুপ্তচরবৃত্তি" প্রশ্রয় পাইতে পারে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন উহা নাকচ করিয়া দিয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সহিত আলোচনার জন্য নয়াদিল্লিতে আসিবার আমন্ত্রণ গ্রহণের পূর্ব শর্ত হিসাবে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান মন্ত্রী বা অফিসার পর্যায়ে কাশ্মীর সমস্যা লইয়া আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীরাজেশ্বর দয়ালের নিকট প্রস্তাবটি জানাইয়াছেন।

মহাশূন্যে গবেষণায় সহযোগিতা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও ক্রুশেচফের মধ্যে সর্বশেষ পত্র বিনিময় হইবার পর গতকল্য রাত্রে মার্কিন ও সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার নিমিত্ত মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে মিলিত হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৩শে মার্চ—জেনারেল দ্য গল আজ ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে বলেন যে, সরকার নির্দয়ভাবে আলজিরিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করিবেন। প্রেসিডেন্টের বিবৃতি হইতে ইহা বোঝা যায় যে, আলজিরিয়ায় ফরাসী সরকারী বাহিনীর অধ্যক্ষকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মাও সে-তুং-কে প্রায় এক মাসের উপরে প্রকাশ্যে দেখা যায় নাই। ওয়াকিবহাল মহল বলেন, তিনি অসুস্থ।

২৪শে মার্চ—ঢাকায় ছাত্র-পুলিসে আবার সংঘর্ষ বাধে। পুলিস আজ জেল রোডের একটি ছাত্র মিছিলের উপর কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে ও লাঠি চালায়। পরে এ সম্পর্কে কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ব্রহ্মদেশের একেবারে উত্তর প্রান্তে কাল্পনিক কাহিনী বর্ণিত পিগ্‌মী বা বামন জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত চিহ্নিত করার কালে বর্মী সেনারা এই অদৃষ্টপূর্ব লুপ্তপ্রায় জাতিটির সন্ধান পায়। এখনও তাহারা সংখ্যায় কয়েক হাজার। লিলিপুটের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল।

২৫শে মার্চ—পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আবার ধরপাকড় শুরু হইয়াছে। অদ্য সকালে গোয়ালন্দে আয়ুবশাহী স্বৈরনীতির প্রতিবাদে স্টীমারঘাটে পিকেটিং করার সময় প্রায় শতাধিক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐদিন খুলনা স্টীমারঘাটেও পিকেটিং করা হয় বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া যায়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, বাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা
মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, বাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 7th April, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ২৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২৪ চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

লেখকের ভূমিকা

লেখকের কাছ থেকে পাঠকের প্রত্যাশা অনেক; সে-প্রত্যাশা চিত্তবিনোদনের, রসাস্বাদনের। লেখক মানে অবশ্য এখানে সৃজনধর্মী সাহিত্য-শিল্পী। রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং আরো অনেকেই অবশ্য লেখক অথবা কথক। কিন্তু তাঁদের কথা আলাদা। আলাদা হলেও আমাদের কালে রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনেতারা দেখা যাচ্ছে সাহিত্য-শিল্পীদের আলাদা থাকতে দিতে নারাজ। যে-সব রাষ্ট্রে সর্বাত্মক মতবাদের এবং দলের প্রাধান্য সেখানে ত কথাই নেই, সাহিত্য-শিল্পীরও পূর্ণ আনুগত্য চাই রাষ্ট্রাদর্শ এবং রাষ্ট্র-বিধানের কাছে। সেখানে লেখকের ভূমিকা নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রকর্তাদের কিম্বা দলীয় সংস্থার নির্দেশ মত। আমাদের দেশে সে-অবস্থা নয়। তবুও যখন দেখি, সাহিত্য-শিল্পীরা রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রনেতাদের সংগে সহযোগিতা করছেন, লেখকের ভূমিকা নিরূপণে তখন আশংকা হয় আমাদের দেশেও লেখকরা প্রকারান্তরে 'কমিটমেণ্ট' তথা বাধাবাধকতার নীতি মেনে নিতে অগ্রসর হয়েছেন।

দিল্লিতে সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে ভারতীয় লেখকবৃন্দের একটি আলোচনা-চক্রের অধিবেশনে যে বিষয়টি সম্প্রতি আলোচিত হয়েছে, সেটি হল জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় লেখকদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত। আর কোনও দেশে সম্ভবত লেখকেরা এ-ধরনের প্রশ্ন আলোচনায় তৎপর নন্। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা, রক্ষা এবং উন্নয়নের প্রশ্নটা আমাদের দেশে সম্প্রতি খুবই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা মূলত রাজনৈতিক. আরও চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে বলা যায় ভারতবর্ষের মত সুবৃহৎ দেশে যেখানে ভাষা, ধর্ম ও জাতের ব্যবধান বিস্তর ও বিচিত্র, সেখানে সর্বভারতীয় চেতনা নিরন্তর খণ্ডিত হচ্ছে নানা রকম আঞ্চলিক এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিরোধ ও প্রতিযোগিতার ফলে। এর কোনও সাহিত্যিক সমাধান সম্ভব বলে মনে হয় না।

জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা সম্পর্কে ভারতীয় লেখকদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নিশ্চয়ই নেই। তবে লেখকেরাও সামাজিক প্রতিবেশের প্রভাবে অল্পাবিস্তর আঞ্চলিক মনোভাবাপন্ন হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু আঞ্চলিকমাত্রেই অবশ্য জাতীয় সংহতির প্রতিকূল নয়। গত দেড়শ' বছরে ভারতীয় সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কর্মে এমন কোনও সংকীর্ণতা অথবা বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায় না, যাকে ভলতেয়রের অনুকরণে ধিক্কার দিয়ে বলা প্রয়োজন, "দূর করো এই কলঙ্ক"। লেখকের ভূমিকা সৃজনশীল সাহিত্যের কল্পলোকে; সেখানে রুচিভেদ আছে, প্রতিভার পার্থক্য ও বৈচিত্র্যও অনস্বীকার্য; যুগভেদে সৃজনপদ্ধতির প্রকরণ ও প্রয়োগকৌশলে অভিনবত্বের অন্ত নেই। কিন্তু লেখকের এই নিজস্ব সৃষ্টিজগতে শিল্পভাবনার বিস্তার ছাড়া আর কোন ভূমিকাই লেখকের উপর বাইরে থেকে আরোপ করা যায় না। দিল্লির আলোচনা-চক্রে সর্দার পানিক্কার যথার্থ বলেছেন, শিল্পের আনুগত্যই মুখ্য; সিজারের প্রাপ্যের মত লেখকের কাছ থেকে সমাজের তথা রাজনীতির দাবি আদায় করতে চাওয়া মানে লেখকের স্বচ্ছন্দ শিল্পীসত্তার বিলুপ্তি ও প্রচারকের আবির্ভাব!

দিল্লিতে আলোচনা-চক্রে লেখকের ভূমিকা এবং জাতীয় দায়িত্ব সম্পর্কে যে-সমস্ত অভিমত প্রকাশিত হয়েছে, তার সংগে সাহিত্যাদর্শ বিচারের বিশেষ সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি দেখা যায় না। একথা ঠিক যে, জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা বর্তমানে আমাদের দেশে মস্ত বড় একটি সমস্যা। উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, দেশ এখনও সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থেকে মুক্ত হইতে পারেনি। অনুরূপ না হলেও নানা ধরনের বিভেদ ও বিদ্বেষ য়ুরোপের কোন কোন দেশেও কম নয়। শিল্পীর 'আত্মমর্যাদা-বোধ ও মানবিকতা সেজন্য বড় একটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। সমাজকল্যাণ-ভাবনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পে স্বতঃই সঞ্চারিত হয়ে থাকে। সেজন্য সমবেতভাবে প্রস্তাব পাশ, সংকল্প গ্রহণ ইত্যাদি সাহিত্যা-দর্শের পক্ষে কদাচিৎ স্বাস্থ্যকর বা সুফলপ্রদ হতে দেখা যায়। দিল্লির আলোচনা-চক্রে যে লেখকবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের অভিমত, জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার সহায়তার জন্য জাতির সম্মুখে একটা প্রেরণামূলক লক্ষ্য স্থাপন করা উচিত। উচিত বটে, কিন্তু লেখকেরা যদি এই রকম কোনও বাঁধাধরা প্রেরণাকে তাঁদের সাহিত্য-সৃজনকর্মের সূত্র বলে গ্রহণ করেন, তাহলে রাষ্ট্র-নেতাদের স্তুতি ও স্বীকৃতি হয়ত সহজে মিলবে, কিন্তু সাহিত্য নামে যে বস্তু সৃষ্টি হবে, তার না থাকবে কোনও বিস্ময়, না বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্ব।

লেখকের ভূমিকা ও দায়িত্ব কোনও সর্বতোপ্রযোজ্য সাধারণসূত্রে বিধৃত করা কেবল দুরূহ নয়, অনেক অংশে নিরর্থকও। লেখকমাত্রেই জাতীয় সংহতির চারণ হবেন, এমন কোনও বিধিনিয়ম মান্য করার পরামর্শ, উপদেশ, আদেশ অথবা নির্দেশ কোন দেশেই সফল হয়নি। সৃজনীপ্রতিভার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি পরিচালিত হয়, সার্থকতা পায় বা পেতে চেষ্টা করে তার নিজেরই নিয়মে। লেখকের শিল্পকর্ম মহৎ অথবা বৃহৎ, না ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর সে-বিচার পরে। সে-বিচার পাঠক-সাধারণের এবং সমালোচকের। সে-বিচার কঠোর হোক আপত্তি নেই। কিন্তু লেখকের ভূমিকা ও দায়িত্ব একান্তভাবে লেখকের প্রতিভা, প্রকৃতি এবং প্রতি-বেশের উপর স্বচ্ছন্দ-নির্ভর। সেখানে কোন অনুজ্ঞাই শিরোধার্য গণ্য করা যেতে পারে না। তবে সাহিত্যের স্বধর্ম ও স্বকীয়তার হানি না করে যে লেখক জীবন ও জগতের কল্যাণ-ভাবনাকে তাঁর সৃজনী আবেগের সংগে সংযুক্ত করতে পারেন, তাঁর সাহিত্যকর্মের মাহাত্ম্য নিঃসন্দেহে জাতীয় ঐতিহ্য পরিপুষ্টির সহায়ক।

কালীপদ মুখার্জি অস্বীকার করে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তান ভারতীয় এলাকা দখল করেছে—এ কথা তিনি বলেন নি।
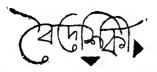
সিরিয়ায় আবার পটপরিবর্তন চলছে। বছর আড়াই তিন ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের ভিতর মিশরের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরিয়া আলাদা হয়। ঠিক ছ'মাস পরে—২৮শে মার্চ আবার "ক্যু"। পলিটিশিয়ানদের সরিয়ে দিয়ে সামরিক কর্তারা গবর্নমেন্ট হাতে নিয়েছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে সিরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার জন্য যখন বিদ্রোহ হয়, তখন প্রেসিডেন্ট নাসের জোর করে সিরিয়াকে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেন নি। প্রথমে অবশ্য বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অবিলম্বে সে আদেশ প্রত্যাহৃত হয়, সিরিয়াকে আলাদা হয়ে যেতে দেওয়া হয়। মিশরের সঙ্গে সংযুক্তির ফল স্বভাবতই সর্ববিষয়ে সকল সিরিয়াবাসীর মনঃপূত হয়নি, কোনো কোনো ব্যাপারে হয়ত সিরিয়াবাসীদের বোধ হয়েছে যেন সিরিয়া মিশরের অধীন হয়ে গেছে। এর জন্য কিছুটা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল, যেটা নাসের-বিরোধীরা কাজে লাগিয়েছিল। যদিও ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে সিরিয়াকে আলাদা করার ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত স্বার্থবোধের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে গেলেন।

মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত হবার পরে জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে যে-সব বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল গত ছয় মাসে তার অনেকগুলি উল্টে দেওয়া হয়েছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নূতন সরকারের প্রতি অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছিল। তাতে মিশরের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে হাওয়াও আবার ঘুরতে আরম্ভ করে। এই সময়ে সামরিক হাইকমাণ্ডের দ্বারা "ক্যু" সংঘটিত হলো। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বিবাদ আছে এবং হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে "ফ্রি অফিসার্স" বলে একদল খাড়া হয়েছেন। এই দল খোলাখুলি প্রেসিডেন্ট নাসেরের ভক্ত এবং মিশরের সঙ্গে সিরিয়ার আবার সংযুক্তি চান। এই দল উত্তর ও পূর্ব সিরিয়ায় অবস্থিত সৈন্যদের সমর্থন পাচ্ছেন। "ফ্রি অফিসার্স" অভিযোগ করছেন যে, সৈন্যবাহিনীর হাইকমাণ্ডের ভিতরেই একদল আছে যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জনাই সব কিছু করছে। যে-পলিটিশিয়ানদের সরানো হোল তাদের এরাই গদিতে বসিয়েছিল এবং এখন যে তাদের সরানো হোল তাও জনসাধারণের চোখে ধুলো দেবার উদ্দেশ্যেই। "ফ্রি অফিসার্স"-এর দাবি—সামরিক হাইকমাণ্ডকে এই স্বার্থান্বেষী দলের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, পুনরায় মিশর ও সিরিয়া সংযুক্ত হবে এবং জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল বিধিব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।

"ফ্রি অফিসার্স" এবং দামাসকাশ-এ অবস্থিত সামরিক হাইকমাণ্ডের মধ্যে একটা মিটমাট না হলে সিরিয়ায় ব্যাপক গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। মিটমাটের চেষ্টা বোধহয় হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যেই দামাসকাস-এর কর্তাদের সুর কিছুটা বদলেছে। তাঁরা বলছেন—মিশরের নেতৃত্বে স্বাধীন আরব রাষ্ট্রদের একটা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হবে

কিনা এই প্রশ্নের উপরে সিরিয়ায় একটা গণভোট নেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব এবং মিশরের সঙ্গে সিরিয়ার সংযুক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সামরিক হাইকমাণ্ডের এই প্রস্তাবের উপর মিটমাট হবে কিনা সন্দেহ। হাওয়া মনে হয় "ফ্রি অফিসার্স"এরই অনুকূলে বইছে। তবে ব্যাপক গৃহযুদ্ধ যাতে না ঘটে তার চেষ্টা সকলেই করবে, অন্ততপক্ষে গৃহযুদ্ধ চাই না এটা প্রমাণ করতে সকলপক্ষই চেষ্টা করবে। প্রেসিডেন্ট নাসেরও নিশ্চয়ই সতর্কভাবে চলছেন যাতে একথা কেউ বলতে না পারে যে, মিশরের চাপে সিরিয়াবাসীরা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য হচ্ছে। তবে সিরিয়ার সামরিক অফিসার এবং বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে নাসেরের ভক্তগণ এবং মিশর-সিরিয়া সংযুক্তি সমর্থকদের দিকে হাত না বাড়িয়ে থাকাও প্রেসিডেন্ট নাসেরের পক্ষে কঠিন। যাই হোক আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝা যাবে সিরিয়া অদূর ভবিষ্যতে আবার ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে কিনা।

* * *

ফরাসী গবর্নমেন্টে এবং আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতিমূলক যে চুক্তি হয়েছে তা ভন্ডুল করে দেবার জন্য আলজেরিয়ায় বিদ্রোহী ফরাসী সৈন্যের সংস্থা শেষ চেষ্টা করে চলেছে। ফরাসীরা ফরাসীদের মারছে, এটা ফ্রান্স সহ্য করতে পারবে না, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ও-এ-এস্ (গুপ্ত সামরিক সংস্থা) তার নৃশংস নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। হয়ত ও-এ-এস্ ভেবেছিল যে, প্রেসিডেন্ট দ্য গল নিজেই ঘাবড়ে যাবেন এবং ফরাসী ও আলজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের একযোগে ও-এ-এসকে দমন করবার পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, ও-এ-এস'-এর এরূপ ধারণা করা ভুল হয়েছিল। আলজেরিয়ায় ও-এ-এসকে দমন করার ব্যাপারে ফরাসী কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। যদি কর্তৃপক্ষ এরূপ দৃঢ়তা দেখিয়ে যেতে পারেন, তবে ও-এ-এস্‌কে দমন করতে হয়ত খুব বেশি দিন লাগবে না। তবে এখনো আরো খুনোখুনি কিছুকাল চলবে। ভয় এই যে ও-এ-এস-এর কার্যাবলীর ফলে আলজিরিয়ায় মুসলমান ও ফরাসী বাসিন্দাদের মধ্যে সম্ভাব প্রতিষ্ঠার কাজের কাঠিন্য বাড়বে।

* * *

নেপালের রাজা মহেন্দ্র শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য দিল্লিতে আসবেন। এটা ভালো খবর। কাঠমাণ্ডু থেকে অবশ্য প্রচারিত হচ্ছে যে, নেপালী বিদ্রোহীরা ভারতভূমি থেকে নেপালে উপদ্রব চালাবার যে-সুযোগ পাচ্ছে সেই বিষয়ে আলাচনা করে এই সমস্যার একটা সমাধান করাই রাজা মহেন্দ্রের দিল্লি আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য। নেপালের রাজকীয় প্রচারকগণ যাই প্রচার করুন, আমরা আশা করি, দিল্লিতে নেহরু-মহেন্দ্র আলোচনার ক্ষেত্র আরো ব্যাপক হবে। নেপালে যাঁরা বিদ্রোহ চালাচ্ছেন তাঁরা উপদ্রবকারী নন, তাঁরা নেপালের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। কেবল তাঁদের দমন করার কথা চিন্তা না করে তাঁদের সহযোগিতায় কীভাবে নেপালের উন্নতি সাধন করা যায় সে-বিষয়ে শ্রীনেহরুর পরামর্শ গ্রহণ করতে রাজা মহেন্দ্র যদি ইচ্ছুক হন, তবে সেটা সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর হবে। ভারত সরকার নেপালের আভ্যন্তর ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে চান না। কিন্তু নেপালের এবং ভারতের মঙ্গল যে একসূত্রে বাঁধা একথা উভয় দেশের নেতাদেরই সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

৩।৪।৬২

অ্যাংগল্ম্‌

বাতায়নিক

সাহিত্য-সমালোচনার যে আজব নমুনা সম্প্রতি দেখেছি তাই থেকে উল্টো আর সোজা তর্কের কিংবা বলা যায়, এগিয়ে যাওয়া আর পিছু হাঁটা ভাবনার কিছু মজার উদাহরণের কথা মনে পড়ে গেল। গত যুগের অদ্বিতীয় ব্যঙ্গ-রসিক এক ইংরাজ লেখক সামনে চলা আর পিছনে নামা চিন্তার তফাৎ বোঝাতে এই রকম মজার একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন মনে পড়ছে।

তাঁর মতে চিন্তা ভাবনা যুক্তি দুরকমের হয়। উচ্ছ্বাস অত্যুক্তির অযৌক্তিক বাগ-বিস্তারের ভেতর দিয়েও এক ধারা সামনের দিকে স্থির লক্ষ্যে পোঁছোতে পারে. কিন্তু যুক্তি-শৃংখলার ভড়ং নিয়েও আর এক ধারা পিছু সরতে সরতে অর্থহীনতার শূন্যে মরুতেই লুপ্ত হয়।

তাঁর দেওয়া নমুনা যতদূর মনে পড়ছে, কতকটা এই রকম:—

বিশুদ্ধ বস্তুবাদী আধুনিক তাত্ত্বিকের সামনে উনুনের আঁচ উস্কে দেবার বাঁকা শিক, কোথাও পড়েছে। সে শিক দেখে তাঁর প্রথম উক্তি হ'ল,—আহা বেচারা বাঁকা শিক।

তাঁকে সবিনয়ে হয়ত বলা হল যে পৃথিবীতে আগুন নামে একটি আশ্চর্য বস্তু আছে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদ্যাশক্তি স্বরূপ রহস্যভয়াল ব্যাপারও তাকে বলা যায়। এই ব্যাপারটিকে সামান্য উনুনের বেষ্টনী দিয়ে বশ মানাবার কাজে লাগে বলে শিক বাঁকা হয়।

তত্ত্বজ্ঞ তৎক্ষণাৎ রায় দিলেন,—তাহলে শিক যাতে না বাঁকে সে জন্যে আগুন বাতিল করা হোক।

বাঁকার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বিরূপতা ও সোজার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতিতে এ রায় খুব বেশী মনে ধরলেও কাতরভাবে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা না করে পারা গেল না যে আগুন নামে ওই বস্তু বা ব্যাপারটি না হলে মানুষের চলে না। মানুষের সভ্যতা এক হিসেবে ওই আগুনের আঁচেই শুরু হয়েছে।

বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী তত্ত্বজ্ঞ খানিক কি ভাবলেন। তারপরে দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, আগুনের মত সাংঘাতিক সর্বনাশা জিনিস নিয়ে খেলা না করলে যার সভ্যতাই লোপ পায় সেই প্রাণীটির টিঁকে থাকবার কোন দাবী আছে বলে মনে হয়

না। মানুষের মত এ রকম আজগুবী গোলমেলে জটিল জীবকে জীইয়ে রাখার চেয়ে শিক-এর সরলতা অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়।

তর্কের নমুনাটি নিতান্ত হাস্যকর উৎকট আতিশয্যে ভরা সন্দেহ নেই, কিন্তু যুক্তিবাদের নামে শাঁস ছেড়ে ছোবড়া নিয়ে অনেক বিষয়েই আমরা টানাটানি কি সত্যিই করি না, বিচার করতে বসে লেজটুকেই পরম জ্ঞান করে ধড়মুণ্ড দিই না উড়িয়ে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন নিয়ে যে বিবাদ চলেছে, তাতেই ত মনে হচ্ছে, উনুনের শিক সোজা করার উৎসাহে আগুনটাই নিবল কি না সে বিষয়ে কারুর কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাহন নিয়ে অন্ধ গোঁড়ামির বাড়াবাড়িতে সওয়ারীকেই খানায় ফেলা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে আমরা কেমন বেহুঁশ।

বানানে আমি চিরকাল মাটো। হ্রস্ব দীর্ঘজ্ঞান ত কমই, ষত্ব নত্বও রীতিমত ফ্যাসাদে ফেলে। 'পাশ্চাত্য'-এ ত এর দ্বিত্ব অনেককাল অজানা ছিল, স্বপ্নের দ্বিতীয় ব ফলা নিয়ে বহু পূর্বে এক প্রকাশকের সঙ্গে সত্যিকার হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল, এবং কজ্ঝটিকার আসল বানান আমার কাছে বহুদিন শব্দানুসারী হ্য-এর আড়ালে অস্পষ্ট থেকে গেছে।

আমার মত বানান-বিশারদ খুব বেশী আছেন বলে আমি মনে করি না। নিজের এ অক্ষমতা অকপটে স্বীকার করে কিছু লিখতে হলে অসংকোচে আমি অভিধান নিয়ে বসি। শুনেছি ইংরাজি ভাষাও শব্দানুসারী অক্ষরে শিক্ষা দেবার পরীক্ষা শুরু হয়েছে, বাংলা ভাষার সে রকম কোনো বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্প্রতি যখন নেই তখন আমাদের জীবনে লেখার বাতিক না ছাড়তে পারলে অভিধানকে নিত্যসঙ্গী করতেই হবে।

হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ-র এক সমস্যায় পড়ে অভিধানের শরণ নিতে নিতে এইমাত্র একটা কথা মনে হ'ল।

আমাদের বাংলা অভিধানে উচ্চারণ দেওয়া থাকে না কেন?

বাংলা ভাষার উচ্চারণে ইংরাজির মত অত গণ্ডগোল অবশ্য নেই। কিন্তু যতদূর জানি জার্মানের মত দ্বিধা-হীন উচ্চারণ পদ্ধতিও তার অক্ষরে নিহিত নয়।

অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অভিধান মূলত সেই ভাষাভাষীদের জন্যেই গ্রথিত হলেও সেখানে যদি উচ্চারণের ইঙ্গিত দেওয়া থাকতে পারে তাহলে বাংলা অভিধানেও তা থাকতে দোষ কি?

বাংলা ভাষায় কয়েকটি উচ্চারণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় নির্দেশ দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। যেমন মন বন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ অকার দিয়ে উচ্চারিত হবে না, তাতে একটু ওকারের ছোঁয়া থাকবে এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। যেখানে এরকম দ্বিধা সেখানে বিকল্প উচ্চারণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু খেলা কি ঢেলা জাতীয় শব্দের উচ্চারণে শুদ্ধ একার যে এলায়িত সে নির্দেশটুকু থাকার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সমস্ত শব্দেই না হোক যেগুলির উচ্চারণে আক্ষরিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় সেগুলি সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই ব্যতিক্রম শব্দটাই ধরা যাক। ব্যতিক্রম শব্দের ব্য-এর উচ্চারণে একারের একটু এলায়িত ছোঁয়া শিক্ষিত সমাজে চালু। আবার ব্যবহার আর ব্যাকরণের ব্য ও ব্যা-র উচ্চারণের বিশেষ তফাৎ নেই। অভিধানে এই সব উচ্চারণ সমস্যা মীমাংসার ইঙ্গিত কেনই বা থাকবে না!

অনেক শব্দের উচ্চারণ এখনো তর্কাতীত হয়ত নয়। কিন্তু উচ্চারণের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা রচনার চেষ্টা এখন থেকেই হওয়া উচিত মনে হয়।

ইংরাজি উচ্চারণের ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজের আধিপত্য এখন বি-বি-সিতে অনেকখানি এসেছে বলা যায়। উচ্চারণের একটি শুদ্ধ সংস্কৃত বিদগ্ধ ধারা প্রণয়ন ও প্রবর্তনের জন্যে এ প্রতিষ্ঠান সদা সচেষ্ট। আমাদের বাংলা বেতার কেন্দ্র এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে সচেতন কোনো আয়োজন সেখানে হয়েছে বলে জানি না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থান থেকে আঞ্চলিক উচ্চারণের ক্রম-পার্থক্য সব দেশের ভাষাতেই দেখা যায়। এককালে নদীয়া শান্তিপুরের এদিক দিয়ে যে প্রাধান্য ছিল আজ কলকাতার বিদ্বৎ সমাজ তা লাভ করেছেন বললে ভুল হয় না।

আকস্মিক দেশ বিভাগের ফলে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার মাঝে সেই নগর-কেন্দ্রেও যে উচ্চারণ বিভ্রাটের সূত্রপাত হয়েছে তা নিবারণের জন্যে আভিধানিক নির্দেশের কিছু সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

আলোচনা

'দুই বসন্তে'

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,

শঙ্খ ঘোষের 'দুই বসন্তে' সাহিত্য আলোচনা পড়ে সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা (যা ইদানীং আমার মনকে খুব বেশী দোলা দিচ্ছিল) বলতে ইচ্ছে হ'ল। এজন্যে সুযোগ দিলে বাধিত হব।

প্রথমেই স্বীকার করে নিই যে, আজকের দিনের কাব্যপ্রচেষ্টা 'তিরিশের কাল' থেকে অনেক বেশী এবং সামগ্রিক বিচারে একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক কাব্য-ভাবকল্পে যে মনন ও বিরহ দীপ্যমান তা ভবিষ্যতেরই সুষ্ঠু রূপাভাস। এতদ্‌সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কাব্য উদ্যানে ঘোরা-ফেরা করলে বেদনা জাগে। এবং তা নানা কারণে। 'সবচেয়ে বেশী লিখেছেন' এবং 'সবচেয়ে লক্ষ্য গোচর' হয়েছেন এমন কবিরও অনেক-গুলি কবিতা পাঠ করলেই মাত্র একটি কি দুটি সৎ ও সুন্দর কবিতার আস্বাদন পাই। এবং যেহেতু এমন ঘটে অর্থাৎ যেহেতু এ'রা দশটা কবিতা লিখলে একটা রসোত্তীর্ণ বা অন্যবিধ লক্ষণে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ হয়, তার ফলে কবিতা-পাঠকদের মুশকিলে পড়তে হয়। এইসব রচনার মধ্যে অনেক সময় চমকপ্রদ শব্দ যোজনা থাকলেও অসামান্য অনুভূতির অভাবটা-কে অস্বীকার করতে পারি না। কবি যেন 'চিত্রকল্প' সৃষ্টি করতে গিয়ে মনের কথাটা বলতে পারেন না। 'দুই বসন্তে'র লেখক শঙ্খ ঘোষের কবিতা-ই দেখা যাক। শঙ্খ ঘোষের বহু কবিতা পাঠে পাঠকের অতি সহজেই মনে হবে যে, শব্দের সঙ্গে কবির এক গভীর সখ্য আছে। কবিতার ঔজ্জ্বল্যও অনস্বীকার্য। ফলে শঙ্খ ঘোষের অনেক কবিতাই পড়তে আরম্ভ করলে চমৎকার লাগে। কিন্তু শেষ হয়ে গেলে অতৃপ্তির বেদনা। তার কারণ পূর্বেই বলেছি। কবির বক্তব্য অব্যক্ত থেকে যায় বলে। মনের কথা মনেই রয়ে যায়।

সাম্প্রতিক কবিতার আর একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে শঙ্খ ঘোষ কিছু বলেন নি। সেটা হচ্ছে, অধিকাংশ কবিতাই সামগ্রিকভাবে পাঠক-মানসে কোনও দাগ কাটতে পারে না। হয়ত কোনও বিশেষ পংক্তি বা বিশেষ একটা 'Image' মনে থেকে যায়। ব্যস্, এইমাত্র। কিন্তু এমন হবে কেন? অলোকরঞ্জনের কবিতায় এই জিনিস পাওয়া যায়। এবং তার কারণ, আমার মনে হয়, অলৌকিক বিষয়ে অলোকরঞ্জনের প্রবণতা।

এমন কয়েকটি কবিতা আজকাল নজরে পড়ছে যার মধ্যে কতগুলি বিশ্রী শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যা স্বভাবতই পাঠককে বিড়ম্বিত ও অসুস্থ করে তোলে। এইসব শব্দ কোনও মতেই কাব্যমন্দিরের শুচিতা রক্ষা করে না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথাই বলছি। তাঁর একটি কবিতা 'প্রাণপণ কবিতাগুচ্ছ' (ধ্রুপদী/কার্তিক, ১৩৬৮) যেন প্রাণপণ চেষ্টা করেই লেখা 'বোঝাবার জন্যে লিখি না, বুঝবার জন্যে লিখি'—ডে-লুইসের এই মতের সঙ্গে শক্তি চট্টো-পাধ্যায়েরও মিল আছে নাকি!

এই ধরনের কবিতা রচনা করলে কবি 'লক্ষ্যাগোচর' হবেন নিঃসন্দেহে, তবে একথাও অসত্য নয় যে, কবি পাঠক হারাবেন।

সবশেষে একটা কথা। সাম্প্রতিক কবিতা যদি পাঠকদের কাছে পুনরায় দুর্বোধ্যতার অভিশাপ নিয়ে আসে তবে তার জন্যে দায়ী সিদ্ধেশ্বর সেনের মত কবি যাঁর অধিকাংশ 'যতিহীন—ভাঙা ভাঙা পংক্তি সমন্বিত কবিতা'-কে কুণ্ডলী পাকানো ভয়াল সাপের মত মনে হয়। ইতি

জীবন ভৌমিক
হাওড়া

॥ ২ ॥

মাননীয়েষু,

শংখ ঘোষের কবিতা সম্পর্কিত শ্রমনিষ্ঠ আলোচনাটি পড়লাম। আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে যে দুয়েকটি কথা মনে এসেছে, সেগুলো নিবেদন করছি।

আমাদের জীবন যত বেশী জটিল হয়ে পড়েছে, তত বেশী কাব্য থেকে আমরা সরে গেছি। এত দুর্ভরতার মধ্যে আমরা সরসতা খুঁজতে চাই এবং সেজন্য কবিতার পাঠক, বর্তমানে অনুল্লেখ্য হ'লেও নিতান্ত কম নয়। তবু কবিতা আমাদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ বা আনন্দের কাজ করতে পারছে না। একথা লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন, কোন কবিতাই আশানুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু এটি কেন হবে? কবিতা যদি জীবনেরই আর এক নাম হয়ে থাকে তবে কি তা' জীবনেরই মত নির্মম?

যেসব কবির নাম আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে, তাঁরা অনেকেই, এই তরুণ বয়সেও যেন কিঞ্চিৎ রূঢ় এবং একঘেয়ে। এটুকু ভেবে দেখতে হবে যে, আমাদের ছাত্রজীবনে অতি সহজেই যেমন কবিতাপাঠে উৎফুল্ল হ'তাম, এখন আর তা' হই না। এজন্য কেবল পাঠককে দোষ দিলেই কবির কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। কবিদের বুকের ভেতর যদি গন্ধরাজ লুকিয়ে থাকেও তবে তার ঘ্রাণ আমরা এখনো পাইনি। ইতি

পিনাকী ভাদুড়ী
কলিকাতা-২৬

'চৌরঙ্গী'

লেখকের বক্তব্য

শ্রীমতী তাপসী চট্টোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছেন। তাঁর মতো আমিও জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতার ভক্ত। ব্যক্তিগত জীবনে আমি এই প্রতিভাবান কবির একজন ছাত্র। তাঁর 'মহাদিগন্ত'কে আমি সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে মনে করি। চৌরঙ্গীর বিভিন্ন অংশে আমি সমর সেন, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সম্মান দেবার চেষ্টা করেছি। এবার সেই আসরে আমি জগন্নাথ চক্রবর্তীকে বসাতে চেয়েছি।

শংকর
২৮।৩।৬২

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৮০ ॥

ওঁ

কালিম্পঙ্

কল্যাণীয়াসু,

আজকাল এমন স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে যে ইতিপূর্বে তোমাকে চিঠি লিখেছি কি না মনে আনতে পারচি নে। যাই হোক মাঝে মাঝে তোমার শরীরের খবর পাঠিয়ো।

কিছুদিন সঘন বরষা গগন আঁধার ছিল, আকাশের এই অপ্রসন্নতা আমাকে পীড়িত করে, আজ আকাশ নির্মল, তাই "মন কো কমলদল খোলিয়া।" দার্জিলিঙে গিরিরাজের মুখশ্রী কী রকম।

য়ুরোপে রাষ্ট্রিক দুর্দিন যে রকম ঘনিয়ে উঠচে তাতে হঠাৎ কোনদিন কোথায় বজ্রপাত হবে এবং কার কপাল ভাঙবে সবই অনিশ্চিত। ইতি ১৬।৫।৪০

কবি

॥ ৪৮১ ॥

ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ্

কল্যাণীয়াসু,

আকাশ মাঝে মাঝে মুখভার করে, আবার তার মেজাজের বদল হতে থাকে, কাল সন্ধ্যের দিকে মনে হোলো দক্ষিণ দিকের কোণ থেকে একটা নালিশ জমে উঠচে আজ সকালে দেখি সেটা বাতিল হয়েছে। কিন্তু ঐ দেখ, বলতে বলতে একরাশ কুয়াশা উঠে সকালবেলাটাকে গিলতে আরম্ভ করে দিলে—এই ব্যাপারটা চলবে বেলা দশটা পর্যন্ত—একেই বলে অ্যাঙ যায় ব্যাঙ যায় খলসে বলে আমিও যাব—বৃষ্টি যায় বন্যা যায় কুয়াশা বলে আমিই বা বাকি থাকি কেন? শহরের বাবু যারা পাহাড়ের রাস্তায় পদচারণ করে ক্ষিধে জমিয়ে চা-রসযুক্ত প্রাতরাশ সম্ভোগ করতে চায় তারা কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধমনে বেরিয়ে পড়েছে—ছাতাটা বগলে আছে দুর্দিনের সঙ্গে অ্যাপীস্‌মেন্টের ব্যবস্থা রইল। তোমাদের দার্জিলিঙের রাস্তায় নিঃসন্দেহ এখন ম্যাকিণ্টশের একাধিপত্য।

যুদ্ধের অবস্থাটা মোটেই আশাজনক নয়। শুনতে পাই আমাদের স্বদেশীয় অনেকেই এই নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করচেন। ভীরুর আনন্দ এতেই—জগৎজোড়া বিভীষিকা তাদের কাছে মজার জিনিস হয়ে উঠেছে। কিছুকাল থেকে আমার মন খারাপ হয়ে আছে, তার কারণ বোধ হয় দূরের দুর্যোগ আমার মনের মধ্যে কুয়াশা জমিয়ে রেখেছে। জানি মানুষের বহু দিনের সঞ্চিত পাপ হঠাৎ প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে নেয়। মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার ও নির্দয়তা সভ্য দেশের ইতিহাসে অন্তঃশীলা হয়ে বয়ে এসেছে, ঐশ্বর্যের মায়াজালে তাকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ যখন হিসাব নেবার দিন আসে তখন আবরণ খুলে যায়। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত আর এক রকমের, এ নিত্য, এর কোনো আব্রু নেই—পঙ্কিল জলের প্রবাহিণীর মতো জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন আবিলতা চলেছে—বৃহৎ সংসারে এর স্বাস্থ্যকর ব্যবহার-যোগ্যতা নেই এই লজ্জার অবসান দেখিনে।

আমাদের এখানকার দূরের বাণী ডাকের পেয়াদার হাতে—তার বেতারের হাতে নেই। কেমন আছ? ইতি ২৫।৫।৪০

কবি

॥ ৪৮২ ॥

ওঁ

কালিম্পঙ্

কল্যাণীয়াসু,

Calc. Sulph খেয়ে যখন তোমার উপকার হোলো না বরং তোমার ঘা বেড়ে চলেছে তখন ওটা বন্ধ করাই ভালো। এইবার পরীক্ষা করে দেখ Salicia। ৯৯৯ নয় বায়োকেমিকও। গিরিলক্ষ্মী তার বেগনী চেলির উপরে সোনালী রোদ্দুরের উড়ুনি উড়িয়েছে। বুলি-বুলা কালিম্পঙে আসর জমিয়েছে। এবার জনতা এখানে যথেষ্ট। ২৯।৫।৪০

কবি

॥ ৪৮৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, কাল টেলিফোনের কর্তারা শান্তিনিকেতনে টেলি-ফোনের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে গেলেন তাতে ফল ভালো হবে কি না সন্দেহ করি। কোলাহলের একটা বাধা ছিল দূরত্ব, সেটা অপসারিত হলেই প্রয়োজন থাক বা না থাক শব্দ সমুদ্রে ঘা পড়বে কেবলি, শব্দভেদী বাণ আসতে থাকবে এখানে শিকারকে লক্ষ্য করে বের করতে। ভগবান মনুকে প্রশ্ন করতে হবে আছি তবু নেই বললে অপরাধ হয় না কোন কোন নিদারুণ ক্ষেত্রে। আজও কৃপণ আকাশ প্রতিদিন দাক্ষিণ্যের ভান করচে আমরা কেবলি শূন্যকে দিচ্চি ধিক্কার। আষাঢ় শেষ হয়ে এল—আসন্ন শ্রাবণের দিকে তাকিয়ে আছি এ বছরের বর্ষার জলসত্রের জন্যে। আসল কথা ভালো লাগচে না অথচ সেজন্যে ঝগড়া করবার লোক পাচ্চিনে—শমন জারি করব কোন্ আসামীকে তার ঠিকানা কোথায়—আর বড়ো আদালতই বা কোন্ সদরে? ইতি ২৭ আষাঢ় ১৩৪০

কবি

॥ ৪৮৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, এইমাত্র ঘনঘটা করে আকাশটা ঝোড়ো চেহারা ধরেছে। যেন শ্রাবণের নাম রক্ষা করতে এল। কিন্তু বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ—রাজ কুলেষু চ। বারবার বঞ্চনা করেছে এবারও করবে। রাগ করে মনে করচি এ বছর বর্ষামঙ্গল করব না। কিন্তু বেরসিক আকাশ—পার্বণীর পরে কোনো লোভ নেই—মর্ত্যবাসী যাদের আছে লোভ তারা কবিকে গান দেবে।

সামনে আমার একটা ফাঁড়া আছে—সেই অক্সফোর্ডের অনুষ্ঠান। মাতব্বর লোকেরা জমা হবে, নিজেকে তুচ্ছ বোধ হবে।

শরীরটা মাঝামাঝি অবস্থায় আছে? বর্তমান আবহাওয়ারই মতো—অর্থাৎ স্পষ্ট কিছুই নয়। কলমটা মজুরি করতে থাকে তাগিদে প'ড়ে, মনটা মুখ বেঁকিয়ে বসে থাকে।

তোমাদের খবর দুই এক লাইন লিখে দিয়ো। ইতি
২ শ্রাবণ ১৩৪৭

কবি

॥ ৪৮৫ ॥
ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, শ্রাবণ নিজ মূর্তি ধরে নেবে এসেছে। এতদিন ব্যঙ্গ করছিল। আকাশ গর্জন করে উঠচে—ধারাবর্ষণেও কৃপণতা নেই। আশা করি এখনো চাষীদের সময় পেরিয়ে যায় নি। জীবন আমাকে সাতদিনের ওষুধ পাঠিয়েছে খেতে রাজি আছি। কিন্তু জানিনে কী লক্ষ্য করে তার এই ওষুধ। এবারে কলকাতা থেকে আসবার পূর্বে একটা বোতলে পরীক্ষার জন্যে মূত্র ধরা হয়েছিল। তার ফলের খবর পাইনি—ভেবেছিলুম সেটা পরীক্ষা করা হয়নি। জীবনের পত্রের আভাসে বোধ হচ্চে এলবুমেন কিম্বা ফসফেট হয়ত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেদিনকার urine নিতান্ত সাময়িক—তার পরে এখন সহজ হয়ে এসেছে। কোনো উপসর্গ অনুভব করিনি। তবু ওষুধ খাব। আমাকে চিন্তিত করেছে আমার দৃষ্টি—তার জন্যে Silacia, Nat, Mur, Calc, Fluor, খেয়ে থাকি—সেগুলো বন্ধ রাখব। কিন্তু চক্ষু অন্ধ করে আর কোনো রোগের দিকে দৃষ্টি দেবার উৎসাহ আমার নেই। তবু কথা দিচ্ছি কাল থেকে জীবনের ওষুধ চালাব। সুধাসমুদ্র কলকাতায় যাচ্চে তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে দেখো।—মন প্রসন্ন হয়েছে—বর্ষামঙ্গল চালানো যাবে। বউমা দাঁত তোলাতে কলকাতায় গেছেন বোধ হয় দেখা হবে। ইতি ২৪।৭।৪০

কবি

॥ ৪৮৬ ॥
ওঁ

শান্তিনিকেতন

Miss Allan-এর খবর নিয়ো তার জ্বর আসবার সময় এলো।
August 1940

কবি

॥ ৪৮৭ ॥
ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

একেবারে চার প্যাকেট সাবান—একেই না বলে স্ত্রীবুদ্ধি, তা মেয়েলি বোকামি খুব যে খারাপ লাগে তা বলতে পারিনে।

নানারকম দায় ঘাড়ে চেপেছে। হীরেন্দ্র দত্তের সম্বর্ধনা, সাহিত্য পরিষদে বাণী চাই। আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন বেরিয়েছে অভিমত চাই। আনন্দবাজারে ছেলেদের বিভাগে কবিতা পাঠিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করা চাই, সোম মঙ্গলবার ক্লাস নিতে হবে। সর্বোপরি আছে অরবিন্দ, বেচারাকে অনেক পিটুনির পর ঠাণ্ডা করে দিয়েছি সে চাটগাঁয়ে চাকরি পেয়েছে—কলকাতা থেকে লোকের আমদানি চলচে—তা ছাড়া রাত্রে বিছানায় শুতে যেতে হয়, দিনের বেলায় খাবার আসে—কী মুশকিল ভেবে দেখ। কাল আসবে সুধাকান্ত, তার আলাপ টগবগ করে ফুটে উঠবে কানের কাছে। গল্প লেখা চলেইচে কোনো ইন্‌স্পিরেশন নেই নিকটের পাড়ায়। সংসারের খুচরো দুঃখ আরো অনেক কিছু আছে—যেমন চিন্তা করে দেখো আমও আসে তার দামও দিতে হয় না, তার জাতও ভালো, চেহারাও মন্দ নয় অথচ মুখে দিয়ে সুখ পাওয়া যায় না। আমার দুঃখের এই ফর্দ তোমার কোন্‌ ঠিকানায় পৌঁছবে জানিনে। কোমল হৃদয়ে দুঃসহ ব্যথা লাগবে এই আশঙ্কা। ইতি ২০।৮।৪০

কবি

॥ ৪৮৮ ॥
ওঁ

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়াসু,

জীবনের রণক্ষেত্র থেকে ভগ্নদূত এবার বেরিয়ে চলে এসেছি ধ্বজ পতাকা সমস্ত ফেলে দিয়ে। চাকা ভাঙা রথে আছি চলৎশক্তিহীন হয়ে। বর্তমানে আমার অবস্থিতি কালিম্পঙে, ডাক্তারহীন দেশে যাওয়া নিষেধ। ওদিকে বাংলা দেশের সমতট প্রদেশে গরম অসহ্য, দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

তোমার সম্বন্ধে জনশ্রুতি সন্তোষজনক নয়। তুমি জানিয়েছ Calc, Sulf, তোমার পক্ষে অকার্যকরী। এটা অশাস্ত্রীয়। Silacia-র সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খেয়ে দেখতে পারো।

লেখাপড়া আমার বন্ধ চলাফেরা তথৈবচ। অসুস্থদেহী বউমার ঘাড়ে আমার অস্বাস্থ্যের দায় চাপিয়ে বসে আছি—তাঁর সঙ্গিনী আছেন সেই ইংরেজ মেয়েটি, কিছু কিছু শুশ্রূষার কাজ পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে। এতদিন এখানে শরৎ রৌদ্রের প্রভাব ছিল আমি আসতেই আকাশে মেঘের আচ্ছাদন পড়েছে। ২০।৯।৪০

কবি

কবির অক্সফোর্ড ডিগ্রি পাবার অনুষ্ঠানের সময় শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম, এবং অনুষ্ঠানের পরেও কয়েকদিন ছিলাম সেখানে। তার কিছুদিন আগে থেকেই Miss Allan নামে একটি বর্ষীয়সী ইংরেজ ভদ্রমহিলা কবির শুশ্রূষার জন্যে এসেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে থাকার অল্পদিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হন। শুশ্রূষা পাওয়া দূরে থাকুক তাঁর রোগের চিন্তাতেই কবিকে বিব্রত হতে হয়েছিল। কারো অসুখ হয়ে কষ্ট হচ্ছে এ খবর পেলে কিছুতেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। ইতিপূর্বে বার বার আমার চিঠিগুলোর মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিস্‌ অ্যালেনের জন্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছেন, ক্ষণে ক্ষণে আমাকে কি মীরাদিকে গিয়ে দেখে আসতে বলছেন, কারণ আমরা দুজনে কবির নতুন বাড়িটার একতলায় ছিলাম তখন—কবির বাস দোতলায়। আমি একবার ঠাট্টা করে বলেছিলাম কে কার সেবা করছে তার ঠিক নেই। ভদ্রমহিলা আপনাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন আপনারই তাতে কাজ বাড়লো। অত্যন্ত ব্যথিত মুখে বল্লেন "আশ্চর্য"। তোমরা ওর কষ্টটা বুঝতে পারছো না। এই দারুণ গরম, ঠাণ্ডাদেশের মানুষ, তার উপরে ১০২°/১০৩° জ্বর উঠছে। বেচারা কষ্ট পেলেও মুখ ফুটে বলে না, কারণ সংকুচিত হয়ে রয়েছে আমাদের বিব্রত করছে বলে। আমার ওর জন্যে ভারি কষ্ট হচ্ছে। আঃ! কোনোরকমে ও সেরে উঠলেই ও যেখান থেকে এসেছিল সেখানে পাঠিয়ে দেব। এই গরমে শান্তিনিকেতনে বিদেশীদের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। মনে কোরো না এতটা গরম সহ্য করা ওদের পক্ষে [illegible]।"

যে পাস্তেরনাক ছবি আঁকতেন

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগেও 'পাস্তেরনাক' বলতে পশ্চিম দেশের লোক যাঁর কথা ভাবত, তিনি যে 'ডাঃ জিভাগো'র রচয়িতা নন্—সে কথা বলাই বাহুল্য। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কলাবিদ এবং চিত্রশিল্পী লিওনিড পাস্তেরনাক; তাঁরই পুত্র বোরিস পাস্তেরনাক গত তিন চার বছর সাহিত্য-জগতের অজস্র বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যশই যাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বিশ্বের চিত্রামোদীরা এ-বছর ৪ঠা এপ্রিল লিওনিড পাস্তেরনাকের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছেন। কারণ লিওনিড কেবল রাশান্ চিত্র আন্দোলনকেই নতুন খাতে প্রবাহিত করেননি; সমসাময়িক শিল্প-জগতের সর্বত্রই গভীর আলোড়নের সৃষ্টিও করেছিলেন তিনি। সোভিয়েত দেশ-গুলোর স্টেট গ্যালারিতে, ব্যক্তিগত এবং সরকারী অগণ্য সংগ্রহে লিওনিডের আঁকা ছবি যেমন সযত্নে রাখা আছে, তেমনিই তার কদর লুক্সেমবুর্গ, বার্লিন (কুফ্যার্-স্টিককাবিনেট্), অক্সফোর্ড, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, টেট গ্যালারি, ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট মিউজিয়াম, ব্রিস্টল, বার্মিংহাম, সাদ্যামটন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কত-না চিত্রামোদীর মক্কা-মদিনায়! পোর্ট্রেট শিল্পীরূপে লিওনিডের খ্যাতি কম ছিল না; বীটোভেন্ থেকে তলস্টয়, আইনস্টাইন—সবাইকেই শিল্পী ধরে রেখেছেন তাঁর ক্যানভাসে।

পোর্ট্রেট আঁকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লিওনিড। মডেলের বাহ্যিক রূপটুকু ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছতে পারত তার ব্যক্তিত্বের উৎসমূলে। চরিত্রের জীবন্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি সহজেই আরোপ করতেন তাঁর আঁকা ছবিতে। আঙ্গিক আর [illegible] ওপর অসাধারণ দখল আর গভীর এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল লিওনিড পাস্তেরনাকের আঁকা পোর্ট্রেটগুলির প্রাণ।

তরুণ লিওনিড চিত্রবিদ্যার সম্যক পরিচয় পান মুনিখের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব্ আর্ট-এ অধ্যয়নকালে। ফরাসী চিত্রধারা তাঁকে সে-যুগে কম প্রভাবান্বিত করেনি। কিন্তু, অনতিকাল পরেই মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর ফুটে উঠল লিওনিডের প্রতিটি আঁচড়ে, পরিবর্তনশীল জীবনের জঙ্গম রূপকে শাশ্বত করে তোলবার ক্ষমতা আত্ম-প্রকাশ করল।

শিক্ষক ও সতীর্থদের উৎসাহে লিওনিড প্রস্তুত হলেন শিল্পকেই জীবনের উপজীব্য করতে। অথচ, পিতামাতার অনুরোধ এড়াতে না পেরে আইনের ডিগ্রিও তাঁকে নিতে হল।

১৮৮৯ সালে লিওনিড মস্কোতে পাকা-পাকি আস্তানা গাড়লেন বিখ্যাত পিয়ানো-শিল্পী রোজা কাউফমানকে ঘরনীরূপে পেয়ে। কালক্রমে দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে এল তাঁদের ঘর আলো করে।

পিটার্সবার্গ ললিতকলা আকাদেমি-সংশ্লিষ্ট শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে

বোরিস পাস্তেরনাকের পিতা শিল্পী লিওনিড পাস্তেরনাক

শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত পত্নী রোজালীর প্রতিকৃতি

লিওনিড কর্তৃক অঙ্কিত বিখ্যাত জার্মান সুরকার বীথোভেন-এর প্রতিকৃতি

লিওনিড কর্তৃক অঙ্কিত পুত্রকন্যাদের ছবি বরিস, যোসেফিন, লিডিয়া ও আলেক্সান্দার

কলাভবন প্রিন্স ল্‌ভোভ-এর প্রচেষ্টায় ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পবিদ্যাপীঠে পরিণত হয়, লিওনিড সেখানেই শিক্ষকতার সুযোগ পেলেন মস্কোয় এসে।

১৮৯৩ সালে স্বনামধন্য রেপিন, কিভ্‌শেঙ্কো আর ভেরেশ্চাগিনের সঙ্গে লিওনিড পাস্তেরনাকও পেলেন এক অভাবনীয় আমন্ত্রণ : তলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জার ভার। এই সূত্রে তলস্টয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যই শুধু পেলেন না লিওনিড, পেলেন তলস্টয়ের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ। কিছুদিন বাদে 'রিসারেকশান' গ্রন্থটিরও অঙ্গসজ্জার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হল। ফলে, তলস্টয়ের ঘরোয়া জীবনের বহু চিত্রই লিওনিডের তুলির আঁচড়ে অমর হয়ে রইল।

স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য সপরিবারে বার্লিনে বেশ কিছুকাল কাটালেন লিওনিড, চিকিৎসার সুবিধার্থে। এবং বার্লিনে লিওনিড পেলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্বীকৃতি ও সমাদর।

লিওনিডের গুণমুগ্ধ এক ধনী ইংরেজ সমঝদার, লর্ড ডেবার্নন (D'Abernon) ১৯০৭ সালে তাঁর কন্যার চিত্র আঁকানোর উদ্দেশ্যে শিল্পীকে লন্ডনে আনালেন। ইংল্যান্ডে প্রবাসকালে, আঠারো শতকের ইংরেজ শিল্পীদের মাস্টারপীসগুলির মূল কপি তিনি দেখবার সুযোগ পেলেন; বিশেষ করে, টার্নারের শিল্পরীতির স্বরূপ উপলব্ধি করে লিওনিড তাঁর আত্মজীবনীতে টার্নারকে অভিহিত করেছেন ফরাসী ইম্প্রেশনিজম-এর জনক বলে। স্বীকৃতি, যশ, খ্যাতি, অর্থ—কোনও প্রলোভনই লিওনিডকে বাঁধতে পারল না লন্ডনে; সব অনুরোধ তুচ্ছ করে, কন্টিনেন্ট ভ্রমণ শেষে তিনি ফিরে গেলেন মস্কোতে, তাঁর আর্ট-আকাদেমিতে।

জার্মান ভাষায় ম্যাক্স অসবোর্ন-এর ভূমিকা সমেত ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হল লিওনিডের আঁকা ছবির অ্যালবাম। কলা-সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ-উৎকর্ষের অভূতপূর্ব এই সমন্বয়ের মধ্যে শিল্পী লিওনিডের একনিষ্ঠ শ্রম চরম সার্থকতা পেল। ছাপাখানার ঘরে শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বয়ং তিনি পাথর কেটেছেন, ব্লক বানিয়েছেন, নিখুঁত করে তুলেছেন প্রতিটি ডিটেল। গ্রাফিক শিল্পের প্রতি যেমন অকৃত্রিম ছিল তাঁর অনুরাগ, তেমনি গভীর তাঁর অভিজ্ঞতা!

চার-দশকের শেষভাগে, দ্বিতীয়বার, পাস্তেরনাক সস্ত্রীক ইংল্যান্ড ভ্রমণে গেলেন। ১৯৩৯ সালে, মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে, রোজা পাস্তেরনাকের আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়ল লিওনিডের দেহ-মন। মস্কো ফিরে যাওয়া অসম্ভব দেখে তিনি অক্সফোর্ডে তাঁর মেয়ের কাছেই থেকে গেলেন। জীবনের এই শেষ পাঁচ বছরও তিনি সমানে ছবি এঁকে গেলেন, আর লিখে গেলেন তাঁর স্মৃতিকথা।

তিরাশি বছর বয়সে, ১৯৪৫ সালের মে মাসে, অক্সফোর্ডেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পোর্ট্রেট, স্কেচ, ল্যান্ডস্কেপ, স্টিল-লাইফ—কোনও মাধ্যমেই তাঁকে কম সফল দেখা যায় না। তেলরং, জলরং, পাস্টেল, রং-পেন্সিল, কয়লা ছাড়াও নিজের উদ্ভাবিত মসলা দিয়েও তিনি কম ছবি এঁকে যাননি। সর্বত্রই তিনি রেখে গিয়েছেন স্বকীয়তার ছাপ।

তলস্টয় পাস্তেরনাককে বলেছিলেন যে, এই সংসারে সবই জঙ্গম, সবই অনিত্য, ধ্বংসের কবল থেকে কোন কিছুই রক্ষা পাবে না। কেবল, মানুষের শিল্পে যদি এক তিলও সত্য থেকে থাকে, অমর হয়ে থাকবে সেই শিল্প।

লিওনিড পাস্তেরনাকের জন্ম-শত-বার্ষিকী উপলক্ষে, তাঁর শিল্পীখ্যাতি আজ অম্লান দেখে স্বভাবতই আমার মনে পড়ে গেল [illegible]
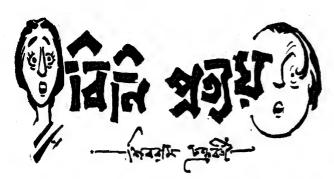
বিনিকে নিয়ে......কী আর বলব। যা মুশকিল হয়েছে আমার।

বিশ্ব-ব্যাকরণের মধ্যে না থাকলেও বিনিপ্রত্যয় বলে একটা জিনিস আছে যার সংজ্ঞা হয় না। আমার বোন বিনির মতন মেয়ের খর্পরে যে পড়ে কেবল তার ভেতরেই এই বোধ গজায়। একরকমের প্রজ্ঞা...... বোধিও হয়ত বলা যায় যা তার অন্তরে সঞ্চারিত হয় যার দ্বারা......

যার দ্বারা সে অজ্ঞান হতে হতে সামলে ওঠে।

এই যেমন আজ সকালেই!

একটা জরুরি ঠিকানা কি করে পাই তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি সেই দুর্ভাবনার দারুণ মুহূর্তে বিনি এসে উপস্থিত।

'হাঁ দাদা? সেই লোকটার নাম কি বলতো সেই যে কমেডিয়ান?'

'কে?' ভাবনার মধ্যিখানে হোঁচট খাই।

'সেই যে বাদামী রঙের বেঁটে মানুষটি চোখে চশমা......বিলিতি হাসির বইয়ে প্রায়ই যাকে দেখা যায়।

'ড্যানি কেয়ীর কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই ত। ড্যানি কেয়ীই ত। আশ্চর্য, তার নামটাই ভুলে গেলাম!'

'কিন্তু সে তো মোটেই বেঁটে নয়। বেশ লম্বা চেহারার। আর রঙও তার বাদামী না, তাছাড়া, তার চশমাও নেই।'

'হ্যাঁ, তা বটে।' বলল বিনি : 'তাহলেও তুমি ত বুঝেছ আমি কাকে মীন করেছি।'

তা বুঝেচি বটে। বিনি প্রত্যয়ের দ্বারাই বুঝেছি। এটাকে টেলিপ্যাথি বলতে পারেন কিম্বা অষ্ট বিভূতির কোন একটিও হতে পারে, যা কোন কষ্ট না করেই আমার আয়ত্তে এসে গেছে। আসলে এটা বিনির সাহচর্য। তার সঙ্গে বহু বিনিদ্র দিবসের বাক্যবিনিময়ের ফল।

'ড্যানি কেয়ীর একটা ছবি এসেছে মেট্রোয়, তার টিকিট কাটতে যাচ্ছিস বুঝি? তা যা! আমিও যেতাম কিন্তু আমি একটা খুব জরুরি ঠিকানা নিয়ে পড়েছি......খোঁজ

'ঠিকানা? কার ঠিকানা গো? কিসের ঠিকানা?'

'এক উপমন্ত্রীর।'

'উপমন্ত্রী? তা, দমকলে খোঁজ করলেই পারো।'

'দমকল? দমকলে খোঁজ করতে বলছিস?' বিস্ময়ে আমার দম আটকায় : 'তারা তো আগুন নেবায় রে? আমার মাথার আগুন কি নেবাতে পারে? ও, বুঝেছি। তুই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে খবর নিতে বলছিস? তাই না?'

আবার সেই বিনি-প্রত্যয় কাজে লাগে। অকৃত্রিম এবং অব্যর্থ।

'তাই তো বলছি আমি। সেখানেই ত পাঁচ বছর অন্তর মন্ত্রীদের দম দিয়ে আবার চালু করে দেওয়া হয়।'

'তাই বল।' তারপরে আমি রাইটার্স বিল্ডিং নিয়ে পড়ি। বিনি চলে যায়। টেলিফোন করি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অনুসন্ধান বিভাগে।

বরাম না রাম্?

'হ্যালো হ্যালো হ্যালো......'

'হ্যালো......কাকে চাই?' ললিত লালনা কণ্ঠের লহরী শোনা গেল।

আমি উপমন্ত্রীর নাম বললাম।

বলি, নাক আছে তো?

'কে আপনি?'

'আমি? আমি শিবরাম চক্রবর্তী।'

'বরাম, না, ব্রাম্?'

'সে কি?' শুনে আমার চমক লাগে। —'তার মানে?'

'মানে, আপনি শিবরাম, না, শিব্রাম্?'

'যেটা ইচ্ছে।' আমি জানাই ঃ 'ও দুইই আমি।'

'উপমন্ত্রী মশাই এখন আপিসে নাই।'

'কোথায় গেছেন? কখন আসবেন?'

'মাপ করবেন। মন্ত্রীদের গতিবিধির কথা জানাতে মানা আছে।'

'কী মুশকিল! আমার যে তাঁকে ভীষণ দরকার। দয়া করে তাঁর বাড়ির ঠিকানাটা বলুন তাহলে। বাড়িতে নিরিবিলি পেলেই আমার সুবিধে আরো।'

'বাড়ির ঠিকানা? অসম্ভব। বাড়ির ঠিকানা আমি বলতে পারব না।'

'জানা নেই আপনার?'

'জানি বই কি, কিন্তু বলা নিষেধ।'

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে বিনির আতঙ্কিত আর্তনাদ ভেসে আসে।—'দাদা দাদা! ওমা, এ কী!' আওয়াজটা ছুটে এসে আমার টেলিফোন সূত্র ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

রিসিভার ফেলে ও-ঘরে দৌড়ই। —'কী! কী হয়েছে?'

'এই যে! তোমার বিছানার চাদরটা! কী হয়েছে দ্যাখো না একবার।'

'কিছুইত দেখতে পাচ্ছিনে। ঠিকই ত আছে।'

'কী নোংরা হয়েছে, ইস্! তেলচিটে পড়ে গেছে। এমন নোংরা বিছানায় তুমি শোও কি করে গো? কী নোংরা তুমি বাবা!

'আমি মুখ বুজে খাই, চোখ বুজে শুয়ে পড়ি। চোখ খুলে ঘুমুইনে।'

'বলি নাক আছে তো? টের পাও না নাকে?' বলে বিনি উদাহরণ-স্বরূপ হয়ে ওঠে, নাকে কাপড় চাপা দেয়ঃ 'নাক ডাকিয়ে ঘুমোও বলে কি নাকে গন্ধ পাও না? তোমার চাদরের গন্ধে যে ভূত পালায়।'

'ভূত পালাতে পারে।' আমি প্রতিবাদ করি ঃ 'আমি ত এখনো ভূত হইনি। ভূতপূর্ব অবস্থাতেই আছি।'

'যাও নিয়ে যাও।' চাদরটা গুটিয়ে আমার হাতে তুলে দেয় সে। —'নাও, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে রেখে দাও গে। আর সব ময়লা কাপড়ের সঙ্গে। ধোপা এসে নিয়ে যাবে এখন।' বলে সে বিছানায় ধোপদুরস্ত চাদর পাতে।

বিনি কী বলতে চেয়েছে বুঝতে পারি। কিন্তু এবার আমার প্রজ্ঞা না খাটিয়ে গুরু আজ্ঞামতই চলি। চাদরটা ধোপার ময়লা কাপড়ের ঝুপরিতে না রেখে আমার

টেবিলের পাশে ফালতু কাগজের আবাসে গ‌ুঁজে দিই। দেখবার মত একখানা দৃশ্য হয় বটে।

হদিশ আমি পেয়ে যাই

টেলিফোন নিয়ে পড়ি আবার।

'হ্যালো......শ‌ুন‌ুন! ও'র বাড়ির ঠিকানাটা আমার ভীষণ ভীষণ ভীষণ ভীষণ দরকার।'

'ব‌ুঝলাম, কিন্তু বাধা আছে। অফিসিয়াল রেগ‌ুলেশনে বাধে।'

'আমাকে আন্‌-অফিসিয়ালি বলতে পারেন না? লক্ষ্মীটি!'

'মাপ করবেন। নিষেধ অমান্য করতে পারব না।'

'তাহলে আর কি করে তাঁকে পাব!' সখেদে আমি বলি।

'মিস্টার রাম্‌, কিছ‌ু মনে করবেন না। আমি অতিশয় দ‌ুঃখিত।'

'তা তো ব‌ুঝলাম।' করুণ কণ্ঠে আওড়াই: 'আপনাকে দ‌ুঃখ দেওয়ার জন্য আমিও দ‌ুঃখিত। ক্ষমা করবেন আমাকে। তাঁর ঠিকানা দেখছি পাবার কোনো উপায়ই নেই।' আমার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে।

'দেখ‌ুন, কিছ‌ু মনে করবেন না। আমাদের হাত পা বাঁধা।' তিনি মধ‌ুর কণ্ঠে জানান: 'আপনি একবার টাইমটেবলটা উলটে দেখ‌ুন না। সেইখানেই তাঁর ঠিক ঠিকানা পাবেন।'

টাইমটেবল? শ‌ুনে তো আমি থাবড়ে যাই। মন্ত্রিবর কিছ‌ু মেল ট্রেন নন (এমন কি তিনি মেল হলেও) যে নম্বরওয়ারি প্ল্যাটফর্মে তাঁর যাতায়াতের খবর পাবো? মেয়েটির এহেন রসিকতা করার মানে?

অজানার মর্মভেদের সাধনায় রয়েছি বিনি তার মাঝখানে এসে হানা দেয়—'এর মানে?' সে চেঁচিয়ে ওঠে: 'নোংরা চাদরটা তুমি এখানে এই ওয়েস্ট পেপার বাসকেটের মধ্যে গ‌ুঁজে রেখেছ কেন?'

'তুমি তা তাই বললে। ওয়েস্ট পেপারের মধ্যে রাখতে বললে না?'

চালাকি কোরো না। 'আমি যা বলেছি তুমি বেশ ব‌ুঝেছ। 'কী বলেছি আমি?'

'বলই না। তুমি বললে তবে তো আমি ব‌ুঝব।'

'আমি বলেছি বাজারের থলির মধ্যে রাখতে।'

'তা আমি পারব না।' সাফ বলে দিই: 'থলের ভেতর ঐ ময়লা চাদর ঠেসে নিয়ে বাজারময় আমি ঘ‌ুরতে পারব না। তাহলে বাজার রাখব কার মধ্যে? না, তুই নিয়ে যা ওটা, তোর ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে প‌ুরে রাখ বরং।'

না, বিনি প্রত্যয়ের দ্বারা কিছ‌ুতেই আমি আর ব‌ুঝব না। ব‌ুঝতে চাইব না। চ‌ূড়ান্ত হয়েছে। এবার আমি মরীয়া। যেটি বলবে ঠিক সেইটিই করব আমি। কথা মতন কাজ। কাজ বাজিয়ে অন্য কথা।

কিন্তু উপমন্ত্রীর ঠিকানাটা? মেয়েটা বলল রেলের টাইম টেবলের পাতা হাঁটকাতে......

ও, তাই! বিনিপ্রত্যয় হঠাৎ এসে আমার মগজের মধ্যে ঘাই মারে। আমি ছাড়তে চাইলেও কমলি আমায় ছাড়ে না!

মেয়েটি টাইম টেবল দিয়ে কী বলতে চেয়েছিল আমি ব‌ুঝতে পারি। সংগে সংগেই উপমন্ত্রী মশায়ের বাড়ির হদিশ আমি পেয়ে যাই।......

টেলিফোন ডিরেক্টরীর মধ্যেই ঠিকানাটা ছিল!

অন্ধ্র রাজ্যে আধুনিকতার ঠিক পাশে পাশে প্রাচীন ধারার মানুষ ও জীবনযাত্রা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে (১) আদিলাবাদ জেলার আদিবাসী মহিলাদের উৎসব নৃত্য, কিংবা (২) কয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষের সম্মিলিত উৎসব নৃত্য। ইসলাম যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন প্রভৃত এবং হায়দ্রাবাদ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তা হয়ে ওঠাও স্বাভাবিক। বিখ্যাত নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে (৩) মীনা মসজিদ, এবং (৪) প্রধান ন্যায়ালয়।

আলোকচিত্রশিল্পী

বীথি সরকার

ছেলেগুলো

দিনেশ দাস
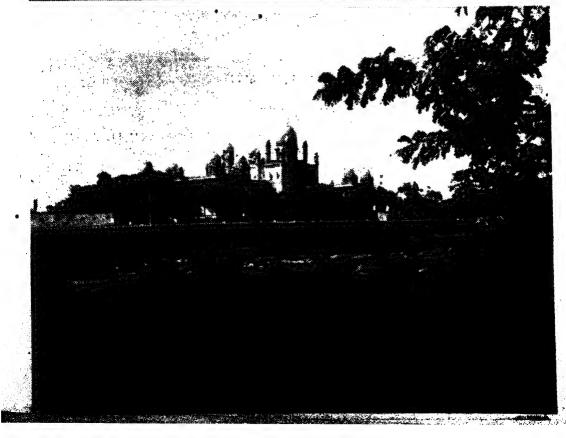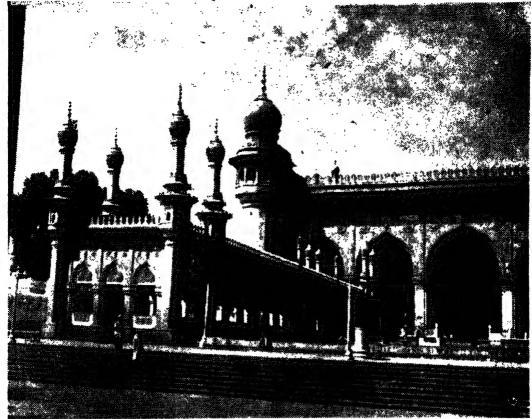
স্কুলের শেষের ঘণ্টা বেজে গেলে পরে
অদ্ভুত স্তব্ধতা নামে ঘরে দোরে চত্বরে প্রাচীরে
মনে হয় হাজার প্রাণের কলকল
কার জাদুমন্ত্রে যেন হিম হয়ে জমেছে অচিরে।

কান পেতে শোনো
পরিচিত কণ্ঠস্বর কথা কয় তবুও এখনো
তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠ বারেবারে
ভারী দরজায় এসে ঘা দেয় নিঃসাড়ে।

অথচ তারা তো নেই বাগানে, থামের পাশে ঘুলঘুলিটায়
নেই তারা কোণের কোঠায়
তবু যে কখন এল বাতাসের তোড়ে
সন্ধ্যার পাখির পথরেখাটুকু ধরে।

তাদের অদৃশ্য পথে মন বাঁধে বাসা
সহসা উজাড় করে দিতে চায় যত ভালবাসা।
ক্রমশ তাদের কণ্ঠ ওঠে কলকলি
নির্জন জঙ্গলে যেন পাখির কাকলি।

হঠাৎ নীরার জন্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাস স্টপে দেখা হল তিন মিনিট অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মত বিঁধে থাকতে স্নিগ্ধ পাড়ে, দিকচিহ্নহীন
বাহান্ন তীর্থের মত এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্র দ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে? তুমি
আজই কি ফিরেছো?
স্বপ্নের সমুদ্র সে কি ভয়ংকর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিন দিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙটির মত দূরে
তোমার দিগন্ত, দুই উরু ডুবে গেছে নীল জলে
তোমাকে হঠাৎ মনে হল কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মত,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্নে দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মত লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মত তোমার ও শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো।

জানলায় সহাস্য মুখ, 'আজ যাই, বাড়িতে আসবেন!'
রোদ্রের চিৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল।
'একটু দাঁড়াও', কিংবা 'চলো লাইব্রেরীর মাঠে', বুকের ভিতরে
কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে-পড়া চোখে
সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা, বাস, ট্রাম,
রিকশা, লোকজন
ডিগবাজির মত পার হয়ে, যেন ওরাং উটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে
পৌঁছে গেছি অফিসের লিফটের দরজায়।

বাস স্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ।

(২)

কেউ জানে না, আল্‌ফা যেদিন প্রথম খবরের কাগজে তার মাতৃহন্তার নাম দেখল তখন তার মনে কি চিন্তা উদয় হয়েছিল। পূর্বেও এ-বিষয় নিয়ে সে কখনো কারো সঙ্গে আলোচনা করেনি। আজও করলো না। বস্তুত ভবিষ্যতে যখন সমস্যা তার কঠিনতম রূপ নিয়ে চরম সময়ে পৌঁছল তখনো সে ঐ নিয়ে কারো সঙ্গে সামান্যতম আলোচনা করেনি।

শুধু তার স্বামী লক্ষ্য করলো, আল্‌ফা আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

আল্‌ফা আবিষ্কার করেছিল তার মাতৃহন্তা আউরেলিয়ো বুস্‌সির নাম জানুয়ারি মাসে (১৯৫৬ খৃঃ)। এরপর মার্চ অবধি সে গম্ভীর।

মপাসাঁর নেকলেস গল্পে মাতিল্‌দ্‌ কী কঠোর পরিশ্রম করে হারানো নেকলেসের দাম তুলেছিল তার বর্ণনা আছে মাত্র কয়েকটি ছত্রে—দশ বছরের নিদারুণ খাটুনির নিখুঁত ছবি। মপাসাঁ যদি এই তিন মাসের কাহিনীটি লিখে যেতেন তবেই এর প্রতি সুবিচার হত। এ কাহিনীর রিপোর্টার কার্ল রাও উত্তম রিপোর্টার; কিন্তু তিনি তো মপাসাঁ নন।

অবশেষে মার্চ মাসের (১৯৫৬) সন্ধ্যার দিকে নাটকের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হওয়ার লগ্ন এল।

আল্‌ফা তার স্বামীর পিস্তলটি দেরাজ থেকে বের করে ওভার-কোটের পকেটে পুরলো। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বাস্‌ ধরে রওয়ানা দিলে ক্রেভালকুয়োরের দিকে—যেখানে বুস্‌সি মাত্র তিন মাস আগে মুনিসিপাল চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। সামান্য কয়েক মাইলের রাস্তা।

অতি শান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে আল্‌ফা মুনিসিপাল আফিসে গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। ঐ তো সে! যাকে সে বারো বছর ধরে খুঁজছে!

আর তার ভাবনা নেই।

আল্‌ফার হাত কাঁপেনি। পিস্তলটি পকেট থেকে বের করে ছটি গুলি চালিয়ে দিলে চেয়ারম্যান সাহেবের বুকের ভিতর। আউরেলিয়ো বুস্‌সি তার পায়ের কাছে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লেন।

কয়েক মিনিট পরেই আল্‌ফাকে দেখা গেল পাশের থানায়।

"আমাকে অনুগ্রহ করে গ্রেপ্তার করুন। আমি আউরেলিয়ো বুস্‌সিকে গুলি করে মেরেছি।"

এ ছাড়া পুলিস তার কাছ থেকে একটি বর্ণও বের করতে পারেনি। মাত্র ঐ কটি শব্দ।

উত্তেজনায় তার মুখ পাংশু বটে, কিন্তু চোখে তখনো জল এল না, যখন পুলিস তাকে হাতকড়ি পরিয়ে হাজতে নিয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পরেই ভেরচেল্লি শহরে আল্‌ফা জজদের সামনে দাঁড়িয়ে। চৌদ্দদিন ধরে মোকদ্দমা চলেছিল। সমস্ত ইতালী দেশ প্রচণ্ড আবেগ, রাগ দুঃখ বেদনার সঙ্গে এই মোকদ্দমায় যেন আপন আপন ভাগ নিলে। সেই পুরনো রাজনৈতিক দলাদলি আবার নূতন করে দেখা দিলে। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির চেয়ে বড় হয়ে উঠলো, মানুষ আল্‌ফা জুবেল্লির দশ বছর বয়সের নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তখন তার বয়েস দশ। আজ সে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে শান্ত, —হাকিমদের দিকে নির্ভয়ে তাকায়।

পাছে না বুস্‌সিপক্ষ আল্‌ফাকে খুন করে, তাই পুলিস বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল।

মোকদ্দমা শেষ হল। 'কেস্‌ আল্‌ফা জুবেল্লি।'

কিন্তু এ কেস্‌ রাজনৈতিক দলাদলির মোকদ্দমা নয়। তার বহু বহু ঊর্ধ্বে।

শিশু তার মায়ের খুনীর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। এই সব কথা! এবং এই বহু কথা!

মনস্তত্ত্ববিদরা স্বাক্ষী-হিসেবে বললেন, মায়ের অপঘাত মৃত্যু দেখে ঐ বয়েসের ছোট্ট মেয়ের মনে যে গভীর দাগ কাটে সেটা মোছবার মত নয়। তার সমস্ত নার্ভস উল্টেপাল্টে গেছে। এমন কি শরীরের দিক দিয়েও তার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। মাতৃত্বের আনন্দ থেকেও সে বঞ্চিতা হয়ে গিয়েছে।

আদালত ঘরের অসহ্য উত্তেজনা ও প্রতীক্ষার ভিতর হাকিমরা রায় দিলেন—পাঁচ বছরের জেল, এবং তারপর এক বৎসর মনস্তত্ত্ব হাসপাতালে পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা।

সোজা পায়ে কঠিন কদমে আল্‌ফা দুই পুলিসের মাঝে আদালত পরিত্যাগ করলো। দুনিয়ার ভিড়ের উপর দিয়ে সে যেন তাকিয়ে আছে, দূরে, বহু দূরে। তার ছোট্ট গ্রাম সেই মন্তাল্বার দিকে—যেখানে সে দেখেছিল তার মা কি ভাবে টমিগানের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

তারপর পাঁচ বৎসর কাটালো আল্‌ফা উত্তর ইতালির এক জেলে। প্রতি সপ্তাহে—এই

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর—তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করার জন্য জেলে যেত। তার স্বামী রিকো বাসাদন্না প্রতিবারে এসে বন্ধুবান্ধবদের খবর দিত, আল্ফা শান্ত এবং সন্তুষ্ট। ভদ্রলোক অদ্ভুত একদারনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব তাই করে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি তুরিন শহরে বদলি হয়ে সেখানে নূতন বাসা বেঁধেছেন; প্রতি সপ্তাহে আল্ফাকে এই নূতন নীড়ের খবর দেন। আর কতদিন! আর বেশী দিন নয়। তোমার জন্য সব তৈরী। তুমি বেরিয়ে এলেই হল।

১৯৬১ সালের জুন মাসে আল্ফার জেলবাস খতম হল। কিন্তু তারপর তাকে যেতে হল দক্ষিণ ইতালীতে, হাসপাতালে, তুরিন থেকে প্রায় ১৮৮০ কিলোমীটার দূরে। সেখানে তার স্বামী প্রতি সপ্তাহে দেখতে যেতে পারে না। কিন্তু মাসে একবার করে যায়, শুধু তাকে বলবার জন্য যে সে তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

৮ই নবেম্বর ১৯৬১, আল্ফাকে হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ডেকে পাঠালেন হাসপাতালের বড় ডাক্তার। অধ্যাপক জুলিয়ো ফ্রেদা খবর দিলেন আল্ফার আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সাত মাস পূর্বেই সে খালাস। তার জিম্মাদার অধ্যাপক। সে যেন বাড়ি চলে যায়।

হাজার মাইল দূরে তুরিনে আল্ফার স্বামী রিকো বাসাদন্না বেতারে শুনলে তার স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত মুক্তি। কিন্তু বেচারী এই হাজার মাইল যায় কি করে। আল্ফা তো ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

হাসপাতাল থেকে সেই সন্ধ্যায় যখন আল্ফা বেরলো তখন খবরের কাগজের রিপোর্টাররা তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

"আমি আমার নিরপরাধ মায়ের অহেতুক মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তার প্রায়শ্চিত্ত (penance) ও করেছি। আমি সন্তুষ্ট এবং মুক্ত। এখন আমি আমার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। নূতন জীবন আরম্ভ করবো। অতীতের করাল ছায়া আমার মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

আমাকে দয়া করে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না।"

• • •

বিশ্বাস করবেন না, খবরের রিপোর্টাররা এই গভীর মনোবেদনার বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল। তারা তাকে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধোয় নি।

পরের দিন সকাল বেলা ডাক গাড়িতে করে সে তুরিনে পৌঁছল। প্লাটফর্মে তার স্বামী আর ননদীর সহ্যের সীমা বুঝি পেৌঁছে গেছে। স্বামী তাকে আলিঙ্গন করলে। আল্ফা যেন সে মুক্তির বন্ধন থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নিতে চায় না।

এরপর সংবাদদাতারাও বলছেন, "এই মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতায় মানবজীবনের একটি নিদারুণ ট্র্যাজেডি শেষ হল।" তিনি প্রশ্ন শুধোচ্ছেন, "এইখানেই কি শেষ? পারবে কি আল্ফা নূতন করে জীবন পত্তন করতে? মন্তাল্বার করাল ছায়া কি তার স্মৃতিকে বিমূঢ় করবে না? ব্যবস্থা তো তার স্বামী সব তৈরী করে রেখেছে। কিন্তু!

এমন কি ইতালীর খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আল্ফা সম্বন্ধে কিছু লেখে না। তাকে চান্স দিতে চায়। যে মেয়ে তখনই শুধু শান্তি পেল যখন সে তার মাতৃহন্তাকে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে দেখলে।" (১)

(১) কাহিনীটি বেরিয়েছে সুইস কাগজ ভেল্টভখেতে; আমি মোটামুটি অনুবাদ করেছি।

• শাঙ্গদেব

আকাশবাণীর প্রধান সঙ্গীত প্রযোজকের প্রত্যুত্তর

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৬২তে প্রকাশিত আমাদের আলোচনা সম্পর্কে আকাশবাণীর প্রধান সঙ্গীত প্রযোজক শ্রীজয়দেব সিং ২৪।৩।৬২ তারিখের ইংরেজি চিঠিতে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, যে অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে আমাদের আলোচনা করা হয়েছে সেটি যথাযথ নয় এবং এই কারণেই তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে গুরুতর ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এমন কথা বলেননি যে, ভরতের সময় কোনও গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি বলেছেন যে, ভরতের সময় যে গ্রাম ছিল তাকে অনড় বলা চলে না (there was no fixed scale as such) অনুবাদক এই "ফিকস্‌ড্‌" শব্দটিকে "সুনির্দিষ্ট" অনুবাদ করেছেন যা ইংরেজিতে well determined বোঝায়। এর ফলে পাঠকেরা ধরে নিয়েছেন যে, ভরতের সময় কোনও গ্রামের নির্ধারণই হয়নি। তাঁর ইংরেজি পাঠে তিনি বলেছেন, The shifting scales or moorchana served as the basis for compositions in 'Jatis' and later on in 'Ragas':
এর সরল বাংলা করলে এই দাঁড়ায় যে, নড়নশীল গ্রামসমূহ বা মূর্ছনাগুলি জাতি সমুদয়ের এবং পরবর্তীকালে রাগসমূহের ভিত্তিরূপে অধিষ্ঠিত ছিল। তাঁর নিবেদন—অনুবাদক যদি "সুনির্দিষ্ট" না বলে "অপরিবর্তনীয়" বলতেন, তাহলে বোঝার ভুল ঘটত না। তাঁর মূল কথা হল এই যে, এই পরিবর্তনশীল গ্রামগুলির ব্যবহার পরবর্তীকালে রহিত হয়ে যায় এবং অপরিবর্তনীয় গ্রামের প্রচলন হয়।

শ্রীজয়দেব সিং-এর এই বক্তব্য থেকে তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা গেল এবং আমাদের যে একটা ধারণা হয়েছিল যে, তিনি ভরত সম্বন্ধে পরম্পরার উপর নির্ভর করেছেন তার অপনোদন হওয়াতে আমরা সুখী হয়েছি। শেষ পর্যন্ত ষড়জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম প্রভৃতির পরিবর্তে একটি সাধারণ গ্রাম যে পরিকল্পিত হয়েছে, এটা আমরা সকলেই স্বীকার করি, তবে মূর্ছনাকে shifting scale বলতে আমাদের আপত্তি আছে। জাতিগুলি হয় ষড়জগ্রামে, নয় মধ্যমগ্রামে অবস্থিত। আসলে গ্রাম ওই দুটিই কিন্তু মূর্ছনা প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যাপ্তি বোঝাবার জন্য। অর্থাৎ ষড়জগ্রামে অবস্থিত জাতিগুলিতে ষড়জগ্রামস্থ মূর্ছনা প্রযুক্ত হত এবং সাধারণত এইসব গান খাদে গাওয়া হত; আর এই মূর্ছনায় নির্দিষ্ট আরোহণ অবরোহণ থেকে বোঝা যেত এর একটি নির্দিষ্ট জাতির রূপ কী রকম হবে। প্রথমে সপ্তককে কেন্দ্র করে সপ্তস্বরের যথা-সম্ভব ক্রমিক আরোহণ অবরোহণ নির্ণয় করা হয়েছে। এর পরে ধীরে ধীরে এর যাবতীয় বিন্যাস এবং স্বরাদির বিলোপ ঘটিয়ে যত বিন্যাস হতে পারে তাও নির্ণয় করা হয়েছে। এই মূর্ছনা থেকে স্বর-বিন্যাস আরম্ভ হয়েছে আর শেষ হয়েছে বিবিধ কূটতানে। মূর্ছনাই হচ্ছে এই স্বরবিন্যাস বা তান-নির্ণয়ের মূল ভিত্তি। সংগীতরত্নাকরে জাতিগানের স্বরলিপিসহ উদাহরণ দেওয়া আছে। লিপিপ্রমাদ পরিহার করে এই গানগুলি বিচার করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, এইসব গান যে গ্রামে অবস্থান করছে সেগুলি হয় ষড়জ, নয় মধ্যম: কিন্তু সুর কতটা চড়ায় যাবে এবং কতটা খাদে আসবে, সেটি বোঝা যাচ্ছে মূর্ছনার নির্দেশে। অতএব মূর্ছনার উদ্দেশ্য Shifiting Scale বলি কী করে? অনেকেরই ধারণা আছে, মূর্ছনা মূলত scale, কিন্তু সেটা হতে পারে যদি খরজ পরিবর্তন করা হয় অথবা এক একটি মূর্ছনাকে এককভাবে দেখা হয়। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়; ষড়জগ্রামের ষড়জকে মূল স্বর রেখে এক একটি মূর্ছনা নির্ধারিত হয়েছে—মধ্যমগ্রামের মধ্যমকে মূল স্বর রেখে এক একটি মূর্ছনা নির্ণয় করা

হয়েছে। এইভাবে দুটি গ্রামে মিশ্র না ঘটিয়ে স্বরের কত রকম বিন্যাস হতে পারে সেইটি গাণিতিক নিয়মে বের করা হয়েছে। এইটাই মূর্ছনার মূল উদ্দেশ্য। তবে মূর্ছনা যে জাতি বা রাগের পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করছে, এটা অবশ্য স্বীকার্য; কেননা সুরের মূল বিন্যাস এই মূর্ছনা থেকেই নিরূপণ করা যায়। আমার বক্তব্য—মূর্ছনা গ্রামের ব্যাপ্তিনির্দেশক এবং এই নির্দেশ রাগ বা জাতির পরিচয় নির্দেশে সহায়তা করে।

আকাশবাণীর প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন অনুবাদকে মূল্যানুগ করতে বিশেষ চেষ্টা করেন নতুবা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অপদস্থ হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্র (দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীজয়দেব সিং মহাশয়ের পত্র নিয়ে আলোচনা উপলক্ষে সাম্প্রতিককালে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মূল নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগটি দেখবার অবসর হল। এটি শ্রীমনোমোহন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। এর ইংরেজি Introduction-এ সংগীতরত্নাকরের যথার্থ মূল্যায়ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি বলেছেন—"And it may be claimed that our knowledge of the music chapters of the NS are much fuller than that of Sarngadeva (13th century) the reputed author of the Sangitaratnakara who used this text. For the chapter on Tala in this last named work consists of 400 couplets whereas the NS devotes no less than 502 couplets to this subjects, and in its treatment we meet with many topics of which Sarngadeva takes no notice.

শ্লোকের সংখ্যা দিয়ে নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে রত্নাকরের তুলনা না করাই উচিত। অপ্রয়োজনীয়বোধে শার্ঙ্গদেব নাট্যশাস্ত্রের সংগীতাংশের সর্বকিছু গ্রহণ করেন নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অতি যত্নে নাট্যশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণিত বস্তুগুলিকে সুবোধ্যভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন এবং উক্ত গ্রন্থের তালাধ্যায়ই তার প্রমাণ। রত্নাকরের তালাধ্যায় পড়লে নাট্যশাস্ত্রের সংগীতাংশ বুঝতে বিশেষ সহায়তা হয়। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে রত্নাকর নাট্যশাস্ত্রকেই প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। রত্নাকর সম্পর্কে এই সত্যটি বিশেষভাবে না বলে যা বলা হয়েছে তাতে এই গ্রন্থের গৌরব লাঘব হয়েছে বলেই মনে হয়। শ্রীমনোমোহন ঘোষ আরও বলেছেন—Besides the author of the Sangitaratnakara has only 17 couplets (ch IV 316—332) on the Dhruva (ধ্রুবা) songs, while the NS has on this subject one entire chapter (XXXII) consisting of 425 couplets,

প্রকৃতপক্ষে দুটি বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। নাট্যশাস্ত্রের উক্ত অধ্যায়ে যে গীতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা "ধ্রুবা"; আর রত্নাকরে যে গীতের কথা বলা হয়েছে তার নাম "ধ্রুব"। রত্নাকরের "ধ্রুব" গান সালগ-সূড় নামক প্রবন্ধ সংগীতের প্রকার ভেদ — আর নাট্যশাস্ত্রের ধ্রুবা নাটকের বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবহৃত নানা ধরনের গান। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত শ্রেণীর গান আদৌ প্রবন্ধ পর্যায়ের গান নয়। রত্নাকর ধ্রুবা-গান নিয়ে আদৌ আলোচনা করেননি — কেবলমাত্র জাতি গানের প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ জাতি কোন্ কোন্ ধ্রুবায় ব্যবহৃত হত তার উল্লেখ করেছেন। সেকালের নাটকে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন গানের অংশবিশেষ গাওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল। সম্ভবত ধ্রুবা নামটিই এই আবশ্যিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। পুরাকালের জাতিগীতি, বস্তু প্রকরণ প্রভৃতি গীত বিভিন্ন ধ্রুবায় ব্যবহৃত হত।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এশিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচিত সুযোগ্য সম্পাদক কেবলমাত্র পাতা উল্টেই সংগীতরত্নাকর সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছেন; কিন্তু সে ধারণাটি এভাবে প্রকাশ না করলেই শোভন হত। গ্রন্থটি এসিয়াটিক সোসাইটির মত বিদ্বৎসমাজ থেকে প্রকাশিত বলেই এই ত্রুটি দেখিয়ে দিতে হল নইলে কিছু বলবার প্রয়োজন হত না।
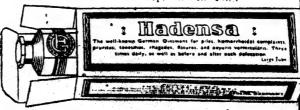
নিতাই কর্ণধার

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ঠাসাঠাসি ভিড়ে গুটিসুটি দিয়ে বসে একমনে বাউল গান শুনছিলাম, বুঝতেই পারিনি কখন নিষুতি রাতের তৃতীয় প্রহর গড়িয়ে এসেছে। মনেও নেই কখন খড়ের উপর হাত পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, আপাদমস্তক কম্বলে জড়িয়ে কুকুরকুণ্ডলী হবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম এসেছিল।

ভোর হল। আশপাশের জড়াজড়ি মানুষগুলো একে একে উঠে গেল। ঘুচে গেল মনুষ্যসঙ্গের তাপ। সেই প্রত্যুষে বুঝলাম বীরভূমের নদীতীরের শুকনো মাঠের শীত কাকে বলে। সপসপ করছে তৃণশয্যা, গায়ে জড়ানো কম্বলটা যেন হিম-কুহেলির উত্তরীয়। ঠাণ্ডায় অষ্টাবক্র হয়ে গিয়েছে দেহ।

মাঘের প্রথম প্রভাত। সূর্যের প্রথম উঁকি। শীর্ণ অজয়ের কুয়াশাচ্ছন্ন তীরে ইতিমধ্যেই স্নানার্থীর ভিড়, রাধামাধবের মন্দিরে বেশ কিছু পূজার্থীর সমাবেশ। বৃদ্ধ বাউলটির দোতারায় ভৈরবীর ঝংকার।

উঠে দাঁড়ালাম। কম্বলটি ঝেড়ে নিয়ে ভালো করে গায়ে জড়ালাম আবার। ঝুলিটি মাথায় দিয়ে শুয়েছিলাম—সেটি আবার তুলে নিলাম হাতে। অজয়ের জলে মুখ-হাত ধুয়ে প্রণাম করলাম জয়দেবের মন্দিরে। তারপর মেলার এলাকা ছাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম কেন্দুবিল্বের গ্রাম প্রান্তের বৃদ্ধ বটগাছটিকে নিশানা করে।

পৌষ-সংক্রান্তির সেই জয়দেবের উৎসব। দিনমানের বাতাসে নবান্নের সুরভি, রাত্রের আকাশে বাউলের গান।

আর মকরের হিমশীত।

আবার চলেছি বীরভূমের পথে। এবার সমীরাঞ্চলে বসন্তের স্পর্শ। তরুশাখায় বসন্তের ইশারা। কাঁধের কম্বলটি গুরুভার।

যাত্রা শুরু মল্লারপুর থেকে। রামপুর-হাট মহকুমার এই ক্ষুদ্র গ্রামটি গত কয়েক বৎসরে বেশ জেঁকে উঠেছে ও ক্রমে ক্রমে অর্ধনাগরিক রূপ নিচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণ-ব্যাপী প্রধান রাস্তাটিতে ছোটবড় অনেক দোকানপাট। তেলকল ও চালকল আছে। আছে উচ্চ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়। প্রাচীনকালে এই মল্লারপুর ছিল মল্লরাজার রাজধানী। সুপ্রসিদ্ধ মল্লেশ্বর মহাদেব মল্লারপুরে আসীন। প্রবাদ যে 'বীরভূমৌ সিদ্ধনাথঃ রাঢ়ে চ তারকেশ্বর'—তন্ত্রোক্ত এই সিদ্ধনাথ শিবই মল্লারপুরের মল্লেশ্বর। আবার ভিন্ন মতে ভাণ্ডীর বনের ভাণ্ডেশ্বর শিবই হচ্ছেন বীরভূমের সিদ্ধনাথ।

এই মল্লারপুরে এসে পৌঁছলাম শেষ রাত্রে সাহিবগঞ্জ লুপ লাইনে মল্লারপুর স্টেশন—বোলপুর ছাড়িয়ে আরো ত্রিশ মাইল দূরে। রেলের কজন কর্মচারী আর কটি রেলযাত্রী ছাড়া সবাই ঘুমচ্ছে। স্টেশনে সরকারী আলো, তারপরই শুক্ল-পক্ষের জ্যোৎস্না। স্টেশন এলাকার ঠিক বাইরে গাছের নিচে ঝাপসা আলো-অন্ধকারে ঘুমচ্ছে দুটি নড়বড়ে বাস।

মধুর একটি গন্ধ এসে লাগল নাকে। শেষ রজনীর শীতল সমীরণে বকুলগন্ধে বুঝি মিশেছে আম্রমঞ্জরীর সুবাস। পূর্ব-দিগন্তে উষার মৃদুতম আভাস। ডাক দিল পূর্বাশা। পা বাড়ালাম পূর্বাভিমুখী কাঁচামাটির গ্রাম ছাড়ানো পথে।

দুপাশে দিগন্ত জোড়া শস্যবিহীন ক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দূরের কুটির আর বড়ো বড়ো গাছ চাঁদের আলোয় ঝাপসা কালো হয়ে চোখে পড়ছে। উজ্জ্বল চন্দ্রাভায় কাঁচাপথের উঁচুনীচুগুলিতে আলোকালোর ছিটবুনানি, পায়ের নিচে হিমের ময়ান-মাখানো নরম মাটি। স্টেশনে আর যারা নেমেছিল তারা স্টেশনেই থেকে গেছে। বাসের অপেক্ষায় আমি স্টেশনে বসে থাকিনি। এ পথে সাধারণত বাস চলে না। এখন দিন দুই কয়েকবার যাওয়া-আসা করছে। পয়লা বাস ছাড়বে বেলা সাড়ে আটটায়—জমায়েত যাত্রীর পালকে ঝেঁটিয়ে বাক্সবন্দী করে নিয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দে দৌড় লাগাবে। তার নিরাসক্ত নিষ্ঠুরতায় ধুলোর ঝড়ে উঠবে পথের দীর্ঘশ্বাস। কে চায় বাসের অপেক্ষায় প্রত্যুষের মধুর মুহূর্তগুলি নষ্ট করতে? সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে মহানন্দে আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি।

মাইল দেড়েক যেতেই উত্তরবাহিনী দ্বারকানদী। নদীর পূর্ব তীর ধরে উত্তর দিকে মাইল চার পাঁচ দূরে তারাপীঠ। তার আগে ডাবুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। আমি অবশ্য সোজা যাব, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে নদী পার হয়ে পূর্বদিকে সোজা হাঁটব। আরো অন্তত সাত মাইল। দ্বারকা মহা পুণ্যময়ী স্রোতস্বিনী। বর্ষায় কলস্বনা বেগবতী তটিনী, এখন শেষ শীতে শীর্ণ জলধারা। জলে পা দেবার আগে তার পবিত্র সলিল অঞ্জলি ভরে মাথায় ছিটিয়ে নেব।

একটি লোক বসে আছে নদীতীরে ওপারের দিকে মুখ করে। গুনগুন করে গান গাইছে। কাছে আসতে গানের কথাগুলি কানে স্পষ্ট হল:

এ ঘোর কলির ভবনদী
ও তুই অমনি হবি পার,
এ ঘাটে নিতাই কর্ণধার॥

তাড়াতাড়ি আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। গান শুনেই বুঝেছি সহযাত্রী মিলেছে একই পথের পথিক, একই ভাবনার ভাবুক।

চেহারাটি ছোটখাটো। মাথার চুলগুলি কদমছাঁট। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় সাদা উড়ুনির নিচে কণ্ঠি, —হাতে একটি বাদামী রঙের খদ্দরের ঝোলা। মুখ ফিরিয়ে সম্বোধন করলে জয় নিতাই।

ভোরের আলোয় একচক্রা গ্রাম

বাঁকারায়ের মন্দির : বীরচন্দ্রপুর

বড় আশ্চর্য সম্বোধনটি। একেবারে বুকের কাছে টেনে আনে যেন। নিত্যানন্দ এমনিই টেনেছিলেন, পরকে করেছিলেন আপন, দূরকে করেছিলেন নিকট, অন্ত্যজকে করেছিলেন ভাই।

উত্তরে প্রতিধ্বনি করলাম জয় নিতাই!

সাড়ায় সাড়া জাগল। ঢেউ লাগল উভয় কূলে। এক গাল হাসি হেসে বললে, এক চাকায় চলেছেন তো?

ঠিক।

খুব ভালো হল। পাঁচ মিনিট সবুর করুন। প্রাতঃসন্ধ্যাটা সেরে নিই। এক সঙ্গে যাব।

আবার হাঁটু মুড়ে বসল নদীর কূলে। টুক করে ঝোলা থেকে বার করল কাঁচের একটি শিশি। ছিপি খুলে ক-ফোঁটা জল ডান হাতের তালুতে ঢেলে নিল। পবিত্র গঙ্গোদক, সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

চক্রবাল ভেদ করে সূর্য উঠেছে এতো-ক্ষণে। ওপারে বৃক্ষশ্রেণীর মাথা লালে লাল। আজ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। এই তিথিতে অধমতারণ পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর জন্মভূমি বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্ভুক্ত একচক্রা গ্রাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহান স্মৃতিতীর্থ। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের নামানুসারে একচক্রার ঠিক আগের গ্রামটির নাম বীরচন্দ্রপুর।

প্রসাদ ভাই আর আমি হেঁটে চলেছি পাশাপাশি। ভোরের নূতন আলো, মধুর হাওয়া। জনবিরল পথ। চওড়া হলেও প্রচুর এবড়ো খেবড়ো। নিত্যানন্দ জন্মোৎসবের সময় কটা দিন বাস চলে। বর্ষা পড়তে না পড়তেই উঁচু নীচু কাঁচামাটি ভেঙে এক হাঁটু কাদা, কোথাও বা এক কোমর। তখন গরুর গাড়ির চাকা পর্যন্ত পাঁকে বসে যায়। [illegible]

মাথায় সবুজ শীষ মাথা নাড়ে। এখন দুধারের মাঠ শস্যহীন। মাঝে মাঝে কোথাও বাবলার বনে নতুন পাতার ছোঁয়া, পলাশের ডালে ডালে রক্ত আভা, দূরে দিগন্তে নীলাঞ্জনের পাড়।

আমার সঙ্গীভাগ্য ভালো। পথে পথে কতো সঙ্গী পেয়েছি, আবার হারিয়েছি পথের প্রান্তে। তারা তাদের বিচিত্র চরিত্র আর বিচিত্র জ্ঞান দিয়ে আমার মনের ঝুলিকে ভরে গেছে। খাসা লোক প্রসাদদা। এক মিনিটে আপনি থেকে তুমি। আমি তাকে দাদা বলি, সেও আমাকে দাদা ডাকে। দাদায় দাদায় কোলাকুলি।

নাম জপ করতে করতে হাঁটা শুরু করেছিল—কথায় ভেড়াবার জন্যে আমি বলেছিলাম—

আমি দাদা পাপী তাপী মানুষ। পাশে পাশে যাব, তাতে তোমার জপের পুণ্য কিছু লাঘব হবে না তো?

শুনেই দু-কান ছোঁয়া হাসি। হাসি থামতে বললে—

তুমি দাদা পাপী? তাই বুঝি পতিত পাবনের দরবারে চলেছ? তা চেহারা দেখে তো জগাই-মাধাই মনে হয় না! পরনে গেরুয়া, কাঁধে ঝুলি-কম্বল—দিব্যি বক-ধার্মিকটি সেজেই তো বকের দেশে চলেছ!

আমি শুধোলাম—বকের দেশে চলেছি মানে?

তা জানো না? অমৃত সমান মহা-ভারতের কাহিনী তাহলে শোনো। জননী কুন্তী আর দ্রৌপদী সতীকে নিয়ে রাজ্যহারা পাণ্ডবরা যখন অজ্ঞাতবাসে কাল কাটান তখন তাঁরা এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নেন। সেই আশ্রয় ছিল ঐ একচক্রা গ্রামে। গ্রাম থেকে কিছু দূরে গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যে থাকতো বক রাক্ষস। ভীমের হাতে বকাসুর বধ হয়েছিল, মনে আছে তো?

হ্যাঁ, শুধু বক কেন, হিড়িম্বার ভাই হিড়িম্বকেও তো ভীম বধ করেছিলেন, তাই না?

ঠিক বলেছ। জতুগৃহ থেকে পালাবার পথে এই হিড়িম্ব রাক্ষস পাণ্ডবদের আক্রমণ করেছিল। ভীম ছিলেন শ্যালক-নাশন। নিজের শালা হিড়িম্ব আর রাজার শালা কীচক—মহাভারতের দুই নামজাদা শ্যালক তাঁর হাতে পঞ্চত্ব পেয়েছিল। যাই হোক, ঐ একচক্রের অদূরে গভীর বনের মধ্যে বক হিড়িম্ব দুই অসুরের বাস ছিল সে যুগে। জায়গাটার নাম কোটাসুর—মানে হচ্ছে অসুরের কোটা।

শুরু হল আগলভাঙা স্রোত। বীরভূমের বিভিন্ন স্থান নিয়ে বহু পৌরাণিক কিংবদন্তী। ত্রেতার রামায়ণ আর দ্বাপরের মহাভারতের সঙ্গে এই কলির বীরভূমের বহু যোগাযোগ রয়েছে। এই বীরভূমি একদা ছিল গভীর অরণ্যভূমি। প্রাচীন- [illegible]

উপযুক্ত ক্ষেত্র। বনবাসী রামসীতা এই অরণ্যে কাল কাটিয়েছেন, পাণ্ডবরা করেছেন অজ্ঞাত বাস। সেই সুপ্রাচীন স্মৃতি নিয়ে বীরভূমের কয়েকটি স্থান আজও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই সব স্থান মাহাত্ম্য প্রসাদদার নখদর্পণে।

গল্প চলছে, আমরাও চলেছি। বাঁ দিকে ফেলে গেলাম ছায়া-ঢাকা গোরবাজার গ্রাম। বর্ধিষ্ণু দক্ষিণগ্রাম পার হয়ে পৌঁছলাম হাজিপুরে। এখান থেকে পথ দ্বিমুখী হয়েছে। প্রধান শাখাটি চলেছে বড়তুরী গ্রামের উদ্দেশে। বাঁ দিকের শীর্ণতর শাখাটি ধরে একটু এগোলেই বীরচন্দ্রপুর। বীরচন্দ্রপুরের পরে একচক্রা। মল্লারপুর স্টেশন থেকে সবসুদ্ধ মাইল আট নয় তো হবেই। এই দীর্ঘ পথ গল্পের ছলে ভুলে ভুলে কী করে যে অতিক্রম করলাম বুঝতেই পারিনি। চক্রবাল ছাড়িয়ে সূর্য বেশ কিছুটা উপরে উঠেছে। দুপাশে আর শুকনো মাঠ নেই—সবুজ ক্ষেত সূর্যালোকে চকচক করছে। নতুন রবিশস্যভরা ক্ষেত—প্রধানত কলাই আর আলুর চাষ। সামনে বীরচন্দ্রপুর গ্রাম—নিমগাছের ডালে ডালে কচি পাতার আমন্ত্রণ, আমের শাখায় শাখায় নবীন মুকুল—যেন পিচকিরি করে শ্বেত-চন্দন ছিটিয়ে দিয়েছে কে।

বীরচন্দ্রপুর গ্রামের মুখে এসে সংকীর্তন দলের সঙ্গে মিলে গেলাম। বাঁকা রায়ের মন্দির থেকে বার হয়ে কীর্তনদল গ্রাম পরিক্রমা করছে। যে কথা শ্রীগৌরাঙ্গ বলে-ছিলেন বার বার, সেই আশ্চর্য কথাকটি বারে বারে গেঁথে গেঁথে বাণীমাল্যের অর্ঘ্য সাজাচ্ছে :

নিতাই সর্বস্ব যার
সে আমার আমি তার।

॥ ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বারো বৎসর পূর্বে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে একচক্রার এক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নানা সদ্‌গুণসম্পন্ন নিষ্ঠাবান পণ্ডিত—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা নামে তিনি স্বগ্রামে খ্যাত ছিলেন। নিত্যানন্দের জননী ছিলেন ময়ূরেশ্বর রাজনন্দিনী পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ তাঁদের প্রথম সন্তান। এই প্রথম সন্তান যখন গর্ভে তখন মাতা পদ্মাবতী স্বপ্ন দেখেন—স্বর্গের দিব্যপুরুষগণ যেন গর্ভস্থ মহাপ্রাণকে সম্বোধন করে বলছেন—হে অনন্ত দিব্য-প্রকাশ, ধন্য তোমার গর্ভবাস। দেবগণের এই স্তুতিবাক্যের নিদর্শনস্বরূপ এই নিত্যানন্দ-জন্মস্থান একচক্রা-গর্ভবাস নামে খ্যাত।

একচক্রা-গর্ভবাসের প্রধান দর্শনীয় বস্তু সূর্যমুখী গর্ভবাস মন্দির। বহু প্রাচীন মন্দির—ছোটখাটো চেহারা, বাংলার চারচালার ছাদের চূড়া, দেয়ালে পদ্ম-কাটা ইঁটের সুন্দর কারুকার্য। এই স্থানে নিত্যানন্দ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এই মন্দির পদ্মাবতীর সূতিকাগৃহের প্রতীক। মন্দিরে কোনো মূর্তি নেই। মাঝখানে ছোট একটি বেদী। সেই বেদীর সামনে শিশু নিতাই কোলে মাতা পদ্মাবতী ও পিতা হাড়াই পণ্ডিতের একটি রঙিন পট। মন্দির প্রকোষ্ঠের এক কোণায় সিদ্ধ বকুলের একটি মোটা ডাল আছে। সেই বকুল গাছের ডালে দোলনা বেঁধে শিশু নিতাই খেলা করতেন। বকুল গাছটি আর নেই—প্রস্তরীভূত রুক্ষ ডালটি তারই স্মৃতিচিহ্ন। মন্দিরের ঠিক গা ঘেঁষে বিরাট এক বট। বটের ডালপালা মন্দিরের চূড়া স্পর্শ করেছে। মন্দিরের সামনাসামনি বিশাল এক অশ্বত্থবেদী। পাশে বট ও সামনে অশ্বত্থের শাখাবিস্তারে মন্দিরের সম্মুখস্থ মাটির প্রাঙ্গণটি নিত্য ছায়াশীতল।

এই জন্মভূমিতে নিত্যানন্দ বারোটি বৎসর মাত্র অতিবাহিত করেছিলেন। শৈশব ও বাল্যের সেই কটি বৎসর তিনি এখানকার শ্যামল প্রান্তরে খেলা করেছিলেন, বৃদ্ধ বকুলের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছিলেন, চঞ্চল আনন্দে সাঁতার কেটেছিলেন অদূরবর্তী যমুনার জলে। ভক্ত বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে দ্বাপরের যিনি যশোদা, কলিযুগে তিনিই শচীমাতা। কলির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ নরদেহ ধারণ করে প্রকট হয়েছিলেন এবং শ্রীবলরামরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন নিত্যানন্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যে শুভ

সন্ধ্যায় ভাগীরথীবিধৌত নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের উদয় হল, ঠিক সেই সময় একচক্রার বালক নিত্যানন্দ এক গম্ভীর হুংকার করলেন।

যেদিন জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুংকার করিলা নিত্যানন্দ॥

এ হুংকার কৃষ্ণমিলন সম্ভাবনায় বলরামের আনন্দ হুংকার।

হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অতিথি হলেন এক নবীন সন্ন্যাসী। হাড়াই ও পদ্মাবতী পরম সমাদরে সন্ন্যাসী সেবা করলেন। পরদিন প্রত্যুষে সূতিকাগৃহের সামনের ঐ অশ্বত্থ গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিদায়োন্মুখ সন্ন্যাসী হাড়াই-এর কাছে একটি ভিক্ষা চাইলেন।

অতিথিপরায়ণ ব্রাহ্মণ বললেন—কী ভিক্ষা বলুন। যদি সাধ্য থাকে অবশ্য দেব।

সন্ন্যাসী বললেন—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে আমাকে ভিক্ষা দিন।

এ কী নির্মম ভিক্ষা! ভিক্ষাচ্ছলে একী নিষ্ঠুর আদেশ! নিতাই যে প্রাণস্বরূপ! প্রাণ হৈল নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই। কাতর কণ্ঠে নিতাই-জননীকে ডেকে হাড়াই সন্ন্যাসীর ভিক্ষার কথা বললেন। শুনে জননীর বুক ফেটে যায়! নয়নাশ্রু রোধ করে পতিব্রতা সতী পদ্মাবতী স্বামীকে বললেন,—

সন্ন্যাসীর প্রতি তোমার প্রতিজ্ঞা—এ তোমাকে পালন করতে হবে বইকি!

অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর হাতে প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তুলে দিলেন হাড়াই ও পদ্মাবতী।

এই সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গের সংসারত্যাগী জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ। সন্ন্যাস নাম শ্রীশংকরারণ্যপুরী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করে অবশেষে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডারপুর তীর্থে তিনি অন্তর্হিত হন ও নিজের তেজ নিত্যানন্দে সমর্পণ করেন।

সন্ন্যাসীর হাত ধরে নিত্যানন্দ বালক বয়সে সেই যে পিতা মাতা ও মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ করলেন—আর তিনি একচক্রায় ফেরেননি। পিতামাতার সঙ্গে আর তাঁর সাক্ষাত হয়নি।

বাঁকা রায় এক অলৌকিক চরিত্র। বলরাম যদি নিত্যানন্দরূপে ধারণ করে একচক্রায় অবতীর্ণ হন, তাহলে সেই বলরামের স্থানীয় অনুজ শ্রীকৃষ্ণরূপী এই বাঁকা রায়। হাড়াই ওঝার কনিষ্ঠ পুত্রের জীবনকাহিনী থেকেই এই বাঁকা রায় বা বঙ্কিমদেবের উদ্ভব। নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাঁকা নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীর মধ্যে অন্তর্ধান করেন। শোকগ্রস্ত পিতামাতাকে নিতাই এই বলে প্রবোধ দেন যে বাঁকা আবার আবির্ভূত হবেন। একচক্রার দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়ে যমুনা নদী বয়ে চলেছে। এক পারে একচক্রা, অপর পারে বীরচন্দ্রপুর। এই যমুনা গিয়ে মিশেছে দ্বারকানদীতে। এই যমুনার কদমখণ্ডি ঘাটে নিত্যানন্দ দারুরূপী বঙ্কিমদেবকে প্রাপ্ত হন ও প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বঙ্কিমদেব বলরামের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ, নিত্যানন্দের অনুজ বাঁকা।

কথিত আছে, নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করার পরে শোকাভিভূত গ্রামবাসিগণ একচক্রা গ্রাম পরিত্যাগ করেন। একচক্রা গ্রাম যে ক্রমে ক্রমে জনমানবশূন্য হয়েছিল তা সত্য। গর্ভবাস-সূতিকা মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে বিশাল এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তার সাক্ষী। এই মন্দিরের সু-উচ্চ ভিত্তি এখনো রয়েছে, রয়েছে বড়ো বড়ো ফাটলধরা কয়েকটি বিরাট মোটা দেয়ালের মাথা ভাঙা নিশান। ভিত্তি জুড়ে বন্যগুল্ম আর কাঁটালতার জটলা। দেয়ালের ফাটলে ফাটলে প্রাচীন শিকড় পাকিয়ে পাকিয়ে রয়েছে। প্রবাদ যে নিমাই-নিতাই-এর এই বিশাল পাকা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীচৈতন্যের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিত। অবহেলায়, অযত্নে সাড়ে পাঁচশত বছরের এই আকাশচুম্বী মন্দির দিনে দিনে ধ্বংসের পথে এগিয়েছে। বর্তমানে এই প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপকে পুনর্নির্মাণের কথা ভাবাও যায় না।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র যখন পিতার জন্মভূমি দর্শন করতে আসেন, তখন যমুনার এপারে বীরচন্দ্রপুর গ্রামের তিনি প্রতিষ্ঠা

করেন। এই গ্রামেই তিনি বাঁকা রায় বা বঙ্কিমদেবকে স্থাপন করে যান। তাঁর অধস্তন এক গোস্বামী বংশ এই গ্রামে বসবাস করেন। সেই থেকে এই বীরচন্দ্রপুর গ্রামে বঙ্কিমদেবের প্রতিষ্ঠা ও সাড়ম্বর আরাধনা।

একচক্রার নূতন মন্দিরে নিমাই-নিতাই-এর যুগল-বিগ্রহ দর্শন করে সবে একটি অস্থায়ী চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসেছি। ডান হাতে চায়ের ভাঁড় আর বাঁ হাতে একটি তেলেভাজা জিলিপি, —প্রসাদদার গলা বেজে উঠল কানের কাছে—

উঁহু, উঁহু, বসে পড়লে চলবে না দাদা, চলো বীরচন্দ্রপুর ঘুরে এসে একেবারে বসব। এখন বসলে আর উঠতে পারবে না।

ভাঁড়ের চা-টা এক চুমুকে গলায় ঢেলে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললাম—

এই তো যমুনা পেরিয়ে এলাম, আবার ওপারে যাব? পা যে আর চলছে না!

বুকের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন দাদা, তিনিই যমুনা পার করাবেন। ওঠো, ওঠো, পা ঠিক চলবে।

যমুনা নদী নদী নয়, নদীর অর্ধাবলুপ্ত সোঁতা। উপরে একটি কাঠের পুল। এক-ধারে কদমখণ্ডি ঘাট, অপর ধারে নিতাই-এর বাল্যলীলা-কানন। গ্রামের মধ্যে অনেক বসতি। কাঁচাবাড়ি—সুন্দর করে খড় বা টিন দিয়ে ছাওয়া। কাঁচা পথে একটু এগোলেই বাঁকা রায়ের বিশাল মন্দির। দূরে থেকে আকাশে মন্দির চূড়া দেখা যায়। এখানকার স্থানীয় গোস্বামী বংশ সংস্কৃতি-বান ও ধনবান। বাঁকা রায় তাঁদেরই। চার-দিকে প্রাচীর ঘেরা বিশাল সমতল প্রাঙ্গণ। নবসংস্কৃত বৃহৎ মন্দির ও সামনে নাট-মন্দির। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। দক্ষিণে শ্রীরাধা ও বামে বীরচন্দ্র-মাতা জাহ্নবী। মন্দিরের পিছনে বিশাল উন্মুক্ত চত্বরে মেলা বসে। এবারও মেলা বসেছে—প্রধানত খাবারের দোকান আর মনোহারী দোকানের মেলা। ময়রারা মোটা-মুটি এসেছে মল্লারপুর থেকে। অন্য দোকানদাররা নানা মেলার ব্যাপারী। দোকান তুলে মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ায় তারা। বাঁকা রায়ের মেলায় কোনো বইএর দোকান নেই। মুখরোচক খাবারের খরিদ্দারের ভিড়ই বেশী।

বাঁকা রায়ের মন্দিরের ঠিক পিছন দিকেই ছোট একটি মন্দির। এটিও নবসংস্কৃত। এখানে আছেন কৃষ্ণ জগন্নাথ। বাম পাশে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ—নীল যমুনার নীল রঙে তাঁর বরদেহ সুমার্জিত।

আরো কয়েক পা গেলে প্রাচীন এক শিব মন্দির। মন্দিরটি অতি জীর্ণ। সামনের শিখরে বড় বড় ফাটল—মনে হয় এখনি

গর্ভবাস মন্দির • একচক্রা
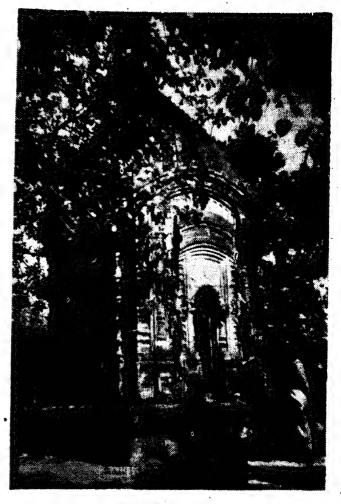
বুঝি চূড়াসুদ্ধ ছাদ ধসে পড়বে। মন্দির গর্ভে শিলারূপী শিব। হাড়াই পণ্ডিত নাকি এই শিবের পূজা করতেন।

এখানকার পঞ্চবটী নিভৃত সাধকের সাধনার উপযুক্ত স্থান। চারদিকে অযত্ন বর্ধিত গাছপালার জঙ্গল। অদূরে বাঁকা রায়ের মন্দিরে চাকরান ঢাকীদের বাদ্যরব কানে আসছে। কাছাকাছি কয়েকজন যাত্রী ঘোরাফেরা করছে। তবু এই ভাঙা শিব মন্দির আর পঞ্চবটীর সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ছমছমে লাগে।

॥ ৩ ॥

একচক্রার নিত্যানন্দ-নিকেতনে শ্রীপঞ্চমীর দিন থেকেই উৎসবের আরম্ভ। সেদিন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথির অর্চনা করে উৎসব শুরু। সপ্তমীর দিন অদ্বৈত আচার্যপ্রভুর জন্ম বন্দনা। আজ ত্রয়োদশীর দিন প্রধান উৎসব—শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুর জন্মোৎসব। আগামী পরশু মাঘী পূর্ণিমার দিন নিত্যানন্দ-ভক্তনিধি সেবাপ্রাণ ত্রিভঙ্গদাস বাবাজীর স্মরণ কীর্তন।

রাঘব পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত যুগল বিগ্রহ বর্তমানে নিত্যানন্দ-নিকেতনের নূতন মন্দিরে আসীন। নিত্যানন্দ-নিকেতন নব-রূপে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে। নূতন মন্দিরটি একালের পাকাবাড়ি, টালির ছাদ, চূড়াবিহীন কোঠাঘর। প্রায় কোমর সমান উঁচু ভিত, সামনে বারান্দা, তারপর প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে মহার্ঘ রাজবেশে সজ্জিত শুভ্রবর্ণ নিতাই গৌরের দারুমূর্তি। শিরে উজ্জ্বল উষ্ণীষ, কর্ণে স্বর্ণবর্ণ কুণ্ডল, অঙ্গে বর্ণাঢ্য বেনারসী পোশাক। জ্যেষ্ঠ বলরাম-রূপী নিতাই-এর মূর্তিটি আকারে বৃহত্তর—ভঙ্গিটি দৃপ্ত। নিমাই-এর দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদের ভঙ্গিমা কটিতে মোহন মুরলী। উভয়েরই অপূর্ব দেবজ্যোতির

দেহকান্তি, নয়নাভিরাম সাজগোজা, বদন-মণ্ডলে প্রেমের আনন্দ-আভা। মন্দির প্রকোষ্ঠের দ্বারের ঠিক মাথায় একটি রঙিন চিত্র। চিত্রে কলম্বনা নীলাম্বু-যমুনা—তীরে কেলিকদম্ব শাখে মুখোমুখি শুক ও সারী।

নূতন এই মন্দিরটির সামনে সুবৃহৎ পাকা নাটমন্দির। নাটমন্দিরের মাঝখানে একটি মাল্যশোভিত তুলসীমঞ্চ। তুলসী-মঞ্চের চারদিক ঘিরে নানা নয়নাভিরাম পটে বৈষ্ণব চিত্রাবলী। সম্মুখে ধূপধূনার সুরভি। তুলসীমঞ্চ ঘিরে বসে প্রত্যূষ থেকে নাম গান করছেন কীর্তনদল। কলিতে নামৈব কেবলম, নাম গানেই মুক্তি। ভক্তরা এই নাম গানে এসে যোগ দিচ্ছেন, কেউ কেউ ভাবা-বেগে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করছেন দু হাত তুলে।

দক্ষিণে অনুরূপ আর একটি মন্দির। সামনে চারদিকে দেয়ালঘেরা সিমেন্ট-বাঁধানো পরিচ্ছন্ন উঠান। এই প্রাঙ্গণটির নাম শ্রীঅনঙ্গাম্বুজ কুঞ্জ—মন্দিরে রাসমঞ্চে দশ-সখী পরিবৃতা রাধাকৃষ্ণ।

নিত্যানন্দ-নিকেতনের ঠিক সম্মুখেই ভগবানজী নারায়ণজী ধর্মশালা। মুর্শিদাবাদ জিলার খাগড়ার বদান্য ভক্ত শ্রীচুনীলাল ভগবানজী ধর্মশালাটি নির্মাণ করেছেন। একতলা পাকাবাড়ি। আট দশটি ঘর, প্রশস্ত উঠান ও বারান্দা, রন্ধনগৃহ ও টিউব-ওয়েল। ধর্মশালা যাত্রীতে ঠাসা—ঘরগুলি তো ভর্তিই, বারান্দাতেও দাঁড়াবার স্থান নেই। এই ধর্মশালার পিছনে ধানক্ষেতের গা দিয়ে কাঁচামাটির পথে পশ্চিম দিকে এগোলে আরো কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। প্রথমে বাঁ দিকে পড়বে বকুলতলা আশ্রম। সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে নিম বকুল ও বটগাছের একটি সমন্বয়—গাছ তিনটিকে ঘিরে শ্বেতপ্রস্তরের বাঁধানো বেদী। চারদিকে আম কাঁঠাল ও বেল গাছ। আশ্রম-মন্দিরটি অতি মনোরম। প্রবাদ এই স্থানটি নিত্যানন্দের বাল্যলীলার প্রধান ক্ষেত্র ছিল। এই মন্দিরের কাছেই একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। বাঁধানো চারিপাড় জুড়ে মুকুলঘন অনেকগুলি আম গাছ। এই পুষ্করিণীর গভীরে বাঁকা রায় অদৃশ্য হয়েছিলেন।

উত্তর-পূর্ব দিকে মাঠের মাঝখানে চোখে পড়বার মতো একটি উচ্চস্থান। কয়েকটা বিশাল বিশাল কেলিকদম্ব ও মুচুকুন্দ গাছের জটলা। চষা ক্ষেতের মাঝখানে প্রাচীন গভীর অরণ্যের স্মৃতিচিহ্ন যেন। বৃদ্ধ গাছগুলির ছায়ায় একটি অর্ধনির্মিত মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। পাশে একটি অবহেলিত মাটির কুটির। মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই, কুটিরে কোনো প্রতীক নেই। এই স্থানেই নাকি পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাস ছিল।

নূতন পুরাতন নিত্যানন্দ-নিকেতনের সব মন্দিরগুলি পূর্বমুখী। পিছনে পশ্চিম দিকে অশ্বত্থ বট আর নিমের চূড়া আকাশ ঢেকে রেখেছে। পরেই মস্ত একটি ফাঁকা জায়গা। নিকানো মাটি, ছায়াশীতল। সীমানা জুড়ে উঁচু উঁচু গাছের জটলা—নিম, কদম্ব আম আর মুচুকুন্দ। তারপর একটি দোতলা কাঁচাবাড়ি। চালটি নিপুণ-ভাবে কিনার ছাঁটা নতুন খড়ে সুন্দর করে ছাওয়া। নিকানো বারান্দার সামনে গাছের ছায়ায় কুড়ি পঁচিশজন মেয়েছেলে মহোৎ-সবের কাজে লেগেছেন—একদল কুটছেন কুটনো, একদল বাটছেন বাটনা। এটি নিতাই-এর ভাণ্ডার। পাশে রান্নাবাড়িতে কাজ করছেন মুণ্ডিতমস্তক নিতাই-সেবকরা। পরিশ্রমে হিমসিম খাচ্ছেন এই সেবক ও সেবিকারা। কতো ভক্ত, কতো দূরাগত যাত্রী। সকলে এক সঙ্গে পঙ্গতে বসবেন। বেলা না গড়িয়ে যায়। এতো পরিশ্রমেও মুখে তাঁদের হাসি—হাসি মুখে অভ্যর্থনা—জয় নিতাই!

বৈষ্ণবের ভক্তি সেবা বিনয় ও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন মূর্ত সেবাইত শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। মুর্শি-দাবাদের এক শিক্ষিত ও সম্পন্ন পরিবারে বিধুভূষণের জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাকালে নিতাই তাঁকে ডাকেন। সেই ডাকে তিনি এই একচক্রায় আসেন। আর ফিরে যাননি। সমস্ত যৌবন নিতাই-এর সেবায় উৎসর্গ করে তিনি এখন পলিতকেশ বৃদ্ধ। দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ একবস্ত্রধারী এই সদাহাস্যময় ব্রাহ্মণকে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। আজন্ম ব্রহ্মচারী তিনি, আমৃত্যু নিতাই-নিবেদিত তাঁর জীবন।

প্রাচীন শিবমন্দির : বীরচন্দ্রপুর
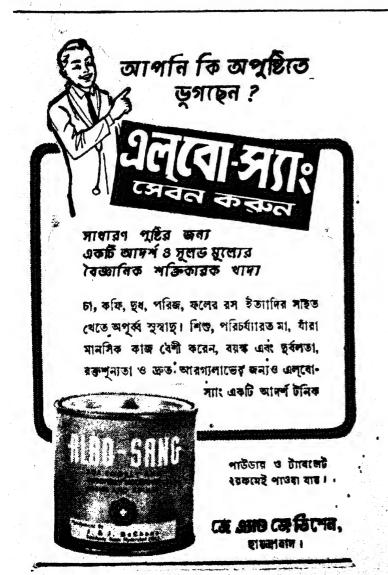
এই নিত্যানন্দ-উৎসবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুহৃদ ভাগবত শাস্ত্রী পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী। ইনি নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভূত,—রামদাস বাবাজী মহারাজের ঘনিষ্ঠ প্রিয় শিষ্য। কবি, নাট্যকার ও বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা। পাঠ ও কীর্তনে বিদগ্ধ বৈষ্ণব সমাজে তাঁর খ্যাতির অন্ত নেই। প্রতিবারের মতো এবারও তিনি উৎসবে এসেছেন। নাট-মন্দিরে বসে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের কাছে বিতরণ করছেন নিত্যানন্দ-লীলামৃত। আগামী মাঘীপূর্ণিমার দিন ত্রিভঙ্গদাস বাবাজীর স্মরণোৎসবে গোস্বামী মহাশয় তাঁর স্বরচিত সূচককীর্তন করবেন।

নিত্যানন্দ-তীর্থের এ যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের কাছ থেকে লাভ করলাম ত্রিভঙ্গদাস বাবাজীর জীবনী। একচক্রার কাছাকাছি কীর্তিপুর গ্রামে ত্রিভঙ্গদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কাল থেকেই তিনি নিতাইপ্রেমিক। অতি অল্পবয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন ও রাধা-গোবিন্দের ভজন কীর্তন করে তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। একদিন নিত্যানন্দের শ্রেষ্ঠ করুণা তাঁর উপর বর্ষিত হল। নীলাচলে তীর্থবাসকালে এক শুভ রজনীতে তাঁর স্বপ্ন মধ্যে প্রভু আবির্ভূত হলেন। পথভোলা বৈরাগী পথিককে জীবনের পথ সন্ধান দিলেন নিতাই কর্ণধার। চরণিকের হাতের দণ্ড ভেঙে দিয়ে কর্মের ঘাটে তিনি তাঁকে পার করে আনলেন।

একচক্রা গর্ভবাস
যাহা মোর নিত্যবাস
তাহা অতি মলিন হইল।
লয়ে মোর সেবাভার
করিবারে সুসংস্কার
অবিলম্বে তুমি তথা চল॥

সেই আদেশ শিরোধার্য করে ত্রিভঙ্গদাস একচক্রায় আগমন করলেন। জনহীন অরণ্য মধ্য থেকে নিত্যানন্দ-স্মারক পুণ্যস্থানগুলি তিনি উদ্ধার করলেন। তারপর

ভিক্ষাঝুলি কাঁধে করি
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি
নিরমিলা নিতাই-ভবনে॥

একচক্রা-গর্ভবাসের বর্তমান মন্দিরাদি ত্রিভঙ্গদাসের প্রচেষ্টায় নির্মিত। তিনিই এই বৈষ্ণব মহাতীর্থকে নূতন করে জাগ্রত করেন। ১৩৫১ সালে এই একচক্রার মাটিতে ত্রিভঙ্গদাস দেহরক্ষা করেন। সেদিন ছিল মাঘী পূর্ণিমা। প্রতি বৎসর নিত্যানন্দ-জন্মোৎসবের একদিন পরে মাঘী-পূর্ণিমার দিন একচক্রায় সমবেত ভক্তগণ ভক্তপ্রতিম ত্রিভঙ্গদাসের স্মরণোৎসব করেন।

॥ ৪ ॥

আম মুকুলের গন্ধ-আকুল দ্বিপ্রহরে নাট-মন্দিরে বসে নিত্যানন্দ-লীলা শ্রবণ করতে করতে লোকটির প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি পড়েছিল।

পরিভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে শ্রীপর্বতে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের সাক্ষাত হল। নিত্যানন্দ বললেন—

প্রভু, আর আমার তীর্থ দর্শনে প্রয়োজন নেই। শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেমী তুমি, সর্বতীর্থসার তুমি—তোমার দর্শন পেয়েছি, আর তীর্থ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। কিন্তু প্রভু, এতেও জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা যে মিটল না? তীর্থ তো সবই দেখলাম, কৃষ্ণ তো কোথাও দেখলাম না!

মাধবেন্দ্রপুরী বললেন—তুমি গৌড় যাও, —সেখানে নবদ্বীপে তুমি নিমাই-রূপী শ্রীকৃষ্ণকে পাবে।

নবদ্বীপে এসেছেন নিত্যানন্দ। বলাই এসেছেন কানাই-এর সন্ধানে। আকৈশোর সন্ন্যাসী—ধূলিধূসর কোপীন- সম্বল দেহ, নগ্ন পদ, হাতে দণ্ড, কমণ্ডলু। রুক্ষ-কঠোর উদাসীন এক তপস্বী—প্রেম কাঙাল বিরহ-উষর যার কবাট বক্ষ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে কলির শ্রীকৃষ্ণ শচীনন্দন গৌরাচাঁদ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীবাসজায়া মালিনীর স্নেহস্পর্শে তিনি শিশুভাবে আকুল হলেন। শচীদেবীকে নিভৃতে বললেন—মাগো, আমিই তোমার সেই হারানো ছেলে বিশ্বরূপ, আবার মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। তীর্থে তীর্থে নিত্য-ভ্রাম্যমাণ মরু-সন্ন্যাসী এতোদিনে পেলেন গঙ্গাতীরবর্তী সমাজ-সংসারের স্নিগ্ধ মরূদ্যান। বিবাগী পথিকের নিত্য-সঙ্গী দণ্ডকমণ্ডলু ভেঙে ফেলে ভাসিয়ে দিলেন ভাগীরথীর জলে। ত্যাগের অমোঘ বিধানে

নিমাই যখন সন্ন্যাস নিলেন তখন সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের প্রথম ভাবনা—

বিষ্ণুপ্রিয়ার কী হবে? কে মোছাবে শচী-মার অশ্রুজল—

নাটমন্দিরের একটি কোনে বসেছিল লোকটি। পরনে একটি সাদা বর্হিবাস, শীর্ণ গায়ে একটি খাটো চাদর। গলায় কণ্ঠি, মাথার প্রায় পাকা চুলগুলি কদম-ছাঁট। আনন্দোজ্জ্বল মুখ, ঠোঁট দুটি একটু একটু কাঁপছে, বন্ধ দু-চোখের কোণে অশ্রুধারা।

বিকেলের পঙ্গাতে আলাপ হল এই বাবাজীর সঙ্গে। প্রাঙ্গণ জুড়ে লাইনের পর লাইন। সামনে পাতা পেতে নিকানো মাটিতে পাশাপাশি সব বসে গেছি। ধনী দরিদ্র, শহুরে আর গ্রাম্য, পুরুষ আর নারী, ব্রাহ্মণ আর লেট-বাইন। এই পঙ্গাতে কোনো জাতিবিচার নেই, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই। কে শুদ্ধ আর কে ব্রাত্য, কে সাধু কে পাপী,—নিতাই-এর অন্নপ্রসাদের পংক্তি ভোজনে সকলেরই আমন্ত্রণ।

বাবাজী ঠিক আমার পাশে বসেছিলেন। আমাদের সামনের পংক্তিতে মুখোমুখি বসেছিল একটি নিম্নশ্রেণীর কৃষাণ রমণী। বধূটির সঙ্গে তিনটি শিশু—সবচেয়ে ছোটটি স্তনলগ্ন। দামালটিকে মা সামলাতে পারে না। সে পাত থেকে কপ কপ করে তুলে খায়। ছোট বোনটি তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদে আর মার আঁচল ধরে টানাটানি করে। বিপর্যস্ত অবস্থা বেচারী বধূটির।

বাবাজী হঠাৎ উঠলেন। হাতের নড়া ধরে দুষ্ট ছেলেটিকে তুলে নিয়ে এসে নিজের কোলের উপর বসালেন। বললেন—

খা ব্যাটা খা—আমার সঙ্গে বসে যতো খুশি খা।

'কালের বাচ্চাটাকে মাটিতে ফেলে ধড়মড়িয়ে উঠে এল বউটি। ককিয়ে উঠল একেবারে,—

করেন কি ঠাকুর, এ'টো হাতে আপনার পাত যে নষ্ট করে দিল!

মোটা ভাতের সঙ্গে নিতাই-এর ডাল এক-পাতে সাপটে মেখে বৃদ্ধ আর বালক কপাকপ মুখে পুরেছে। চিবোনোর ফাঁকে একগাল হেসে বাবাজী বললেন—রাখ রাখ বেটি, তোর ছেলে যে নিতাই-এর নাতিন, জানিস নে?

বাবাজীর নাম ভক্তদাস। সেই থেকে আর তাঁকে ছাড়িনি। চোখে চোখে রেখেছি।

সন্ধ্যার মুখে আবার একবার গেলাম বীরচন্দ্রপুরে। সেখানে বাঁকা রায়ের আরতি দেখে আর মেলার ভিড় দেখে ফিরে আসতে রাত নটা। তার মানে নিষুতি রাত।

তবে উৎসবে রাত দিন নেই। নাটমন্দিরে গোপালদাস কীর্তনীয়ার পালা-কীর্তন বসেছে। প্রায় সারারাত্রির অনুষ্ঠান। যাত্রীনিবাস ফাঁকা, নাটমন্দিরে তিল ধারনের স্থান নেই। সবাই চতুর্থ প্রহরের জন্য প্রস্তুত হয়ে জমিয়ে বসেছে। নিত্যানন্দ-জন্মোৎসব আনন্দোৎসব। তাই আজ পালা হবে রাস-লীলা। একটি বালক কীর্তনীয়া মিলনাত্মক কয়েকটি পদ অতি মধুর কণ্ঠে গাইল। তারপর দীর্ঘ মঙ্গলাচরণের পর গভীর রাত্রে শুরু হল পালা।

নাটমন্দিরের ভিড়ে বেশিক্ষণ থাকিনি। সূতিকা মন্দিরের সামনে অশ্বত্থবেদীর উপর বসে আছি। পেট্রোম্যাকসের ছটা এখানে আসেনি। ডাল পাতা ভেদ করে ত্রয়োদশীর চন্দ্রিমা মন্দিরের দেয়ালে আর অশ্বত্থ-বেদীর বুকে আলোছায়ার আলিম্পন রচনা করেছে। পাশে আছেন ভক্তদাস। জানি রাতটা এইখানে এইভাবেই কাটবে। তাই আপত্তি সত্ত্বেও ভক্তদাসের শীর্ণ পিঠে আমার কম্বলখানা ছড়িয়ে দিয়েছি।

বীরভূমের ঐ অখ্যাত গ্রামে চন্দ্রালোকিত মুক্ত আকাশের নিচে অজানা বন্ধুর সঙ্গে কাটানো ঐ আশ্চর্য রাতটি ভোলবার নয়। কতো কথা যে হল বৃদ্ধ ভক্তদাসের সঙ্গে!

আমি বললাম,—

এই মূলে ব্যাপারটাই আমার ভারি আশ্চর্য লাগে। স্নেহময় সংসারে আজন্ম লালিত যে নিমাই, প্রেমময়ী রূপসী তরুণীর তরুণ রূপবান স্বামী যে নিমাই, বিদ্যায় বিভূষিত আভিজাত্যে মণ্ডিত সামাজিক সংস্কারে সুশৃংখলিত যে নিমাই—সেই নিমাই সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন। আর বালককাল থেকে সংসারহারা যে নিতাই, আশ্রয়হীন পাথেয়হীন চীরমাত্র সম্বল অবধূত যে নিতাই—তিনি কিনা হলেন সংসারী, দুই স্ত্রী নিয়ে এই গঙ্গাতীরবর্তী সমাজে এসে বংশপ্রতিষ্ঠা করলেন! জগন্নাথের এ কী বিচিত্র লীলা!

ভক্তদাস বললেন—

এই লীলার গোপনতত্ত্বটি না বুঝলে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বোঝা যাবে না ভাই! এইটুকু মনে রেখো, নিমাই হলেন বিরহ, আর নিতাই হলেন মিলন। নিমাই হলেন আকাংক্ষা, আর নিতাই আকাংক্ষার পূর্ণতা।

একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলুন!

হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে ঘর ছেড়ে পথে বার হলেন নিমাই, কৃষ্ণ-সন্ধানে পাগলিনীর মতো ধেয়ে চললেন বৃন্দাবনের অরণ্যে, কৃষ্ণ বেদনায় ব্যাকুল বিরহিণীর মতো নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরের কঠিন পাথর চোখের জলে ভাসালেন। আর শেষ পর্যন্ত এই নীল-কান্তমণিকে বক্ষে নেবার বিহ্বলতায় নীলাম্বুরাশিতে দিলেন আত্ম-বিসর্জন। তাই না?

হ্যাঁ, বলুন।

কিন্তু নিতাইকে দ্যাখো। নবদ্বীপে নন্দনাচার্যের ঘরে প্রথম যেদিন তিনি নিমাইকে দেখেছেন সেদিন থেকেই তিনি চরিতার্থ। চির-ঈপ্সিত ধন এক লহমায় তিনি লাভ করেছেন, তাঁর মরদৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হয়েছেন গৌরসুন্দর নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। আর বিরহ-ব্যাকুলতা নেই, সমস্ত জীবন ভরে এখন থেকে শুদ্ধ আনন্দ-আকুলতা। আর সন্ন্যাসে তাঁর প্রয়োজন কী? পরম আনন্দ-মন্ত্র তিনি পেয়েছেন। সেই মন্ত্রকে তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই মন্ত্রের প্লাবনে সংসারকে তিনি ভাসিয়ে দিলেন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বৃদ্ধ ভক্তদাস বললেন—

মন্ত্রটি কী বলো তো? সংসারীর পথের পাথেয়, পারের কড়ি,—ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে!

আলো-অন্ধকার প্রাঙ্গণ পার হয়ে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রসাদদা। হাতে তার জপের ঝুলিটি। এক পাশে বসে নিচু গলায় বললে,—

কী কথা হচ্ছে আপনাদের?

বৃদ্ধ হেসে বললেন—আর কী কথা? আমাদের ঐ পতিত পাবন নিতাই কর্ণ-ধারের কথা!

নিতাই কর্ণধার! প্রসাদদার সেই গান!

বাবাজী আপন মনে বলে চললেন—এই সংসার সমুদ্রে কতো ঝড়, কতো ঢেউ, কতো ঘূর্ণি? পারের কাণ্ডারী নিত্যানন্দ। তাঁর নৌকায় প্রেমের হাল, প্রেমের পাল! জগাই মাধাইকে যেদিন উদ্ধার করলেন সেই দিনই পাপীতাপী সংসারী মানুষের কাছে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। প্রাণ পড়ে থাকে নীলাচলে, কিন্তু এই দুঃখময় সংসারের প্রেমালিঙ্গনে পা দুটি যে বাঁধা পড়ে গেছে! তাই তো অবধূত নিত্যানন্দ সংসারী! সংসার ছাড়া দুঃখ কোথায় দুর্গতি কোথায়? সমাজ ছাড়া ঘৃণা কোথায়, পাপ কোথায়?

ভক্তদাস বাবাজীর কথা শুনতে শুনতে আমি সেই পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সমাজরূপের কথা চিন্তা করছিলাম। সেই যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নব-অভ্যুত্থানের এক বিরাট সামাজিক প্রয়োজন ছিল। এই অভ্যুত্থানের পুরোধা ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁর তিন শিষ্য অদ্বৈতাচার্য, কেশব ভারতী ও ঈশ্বরপুরী। তিনজনই শ্রীচৈতন্যের গুরুস্থানীয়। এঁদের কাছ থেকে কৃষ্ণপ্রেমের মন্ত্র লাভ করে চৈতন্য সংসার ত্যাগ করেন। আবার এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অবধূত নিত্যানন্দ সমাজ-সংসারে পুনঃ প্রবেশ করেন এবং বিশাল এক সামাজিক আবেদনকে জাগ্রত করেন।
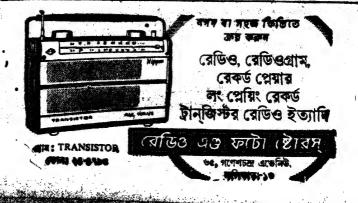
বল্লালী ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজ তখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে—ব্রাহ্মণ্যগর্বী উচ্চ সম্প্রদায় আপামর জনসাধারণকে হেয় অপাংক্তেয় করে রেখে পরম সন্তোষ লাভ করছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘৃণার ও অস্পৃশ্যতার গণ্ডি—সেই গণ্ডির এপারে ওপারে কতো জঘন্য অনাচার, কতো বীভৎস অত্যাচার। অস্তমিত বৌদ্ধ-ধর্মের অন্ধকারে সমাজহারা আশ্রয়হারা ভিক্ষু ভিক্ষুণীর দল পাপস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে। এদিকে রাজ্যের শাসক মুসলমান, নিম্নশ্রেণীর লোক দলে দলে পরধর্ম গ্রহণ করছে। উচ্চনীচ পাংক্তেয় অপাংক্তেয়ের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে উদার মানব-প্রেমে হিন্দুধর্মকে নব বলীয়ান করার ব্রত নিয়েছিলেন জাতনাশা নিত্যানন্দ।

পশ্চিমে মুচুকুন্দ গাছ। তার শিখরে চাঁদ। পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে শ্বেত চন্দন ধারা—প্রভু নিত্যানন্দের শুভ্র আশীর্বাদের মতো। প্রাসাদদা মালার ঝুলিটা কোলে রেখে গুনে গুনে শুরু করলে,—

জগৎ যারে ত্যাগ করে।
নিতাই তাকে বুকে ধরে॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলে
জগৎ যারে দূরে ঠেলে
ভয় নাই তোর আছি বলে
নিতাই তারে রাখে কোলে॥

॥ ৩৫ ॥

"ড্রিংক সার্ভ করে সরাবজী আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বেচারার চোখ দুটো ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে।" মিস্টার হবস আমাকে বললেন। "আজকের সরাবজীকে দেখে সেদিনের সেই ছেলেটিকে তোমরা চিনতে পারবে না। তখনও তার যেন কৈশোরের ঘোর কাটেনি। তারই মধ্যে সে মদের দোকানে এসে ঢুকেছে। কলকাতার রাত্রির রূপকে দেখছে।"

মিস্টার হবস যেন অতীতের পাতাগুলো উল্টে দেখবার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ নিজের মনেই ভাবলেন। তারপর বললেন, "তাকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এমন খোকামি করছো কেন? তুমি যদি চাও আমি নিজেই পার্শী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি। তুমি লেখাপড়া করো, তারপর চাকরী পেয়ে যাবে।

সেদিনকার ওইটুকু ছেলের মধ্যেও কিন্তু আত্মপ্রত্যয় ছিল। সে বলেছিল, 'আপনি যতোই চেষ্টা করুন আমার কিছু করতে পারবেন না। ঈশ্বর চান, আমি কষ্টের মধ্য দিয়ে এইভাবে বড় হয়ে উঠি। না হলে এই বয়সে সবার যখন বাবা-মা থাকে তখন আমি অনাথ কেন? তবুওতো আমি ইস্কুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মাথায় বুদ্ধি এল না কেন? ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা থাকবে, তাহলে আমি তো ইস্কুলের সেরা ছেলে হতে পারতাম, সব পরীক্ষায় প্রথম হতে পারতাম। কিন্তু তা হলাম না কেন? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য রকম। না হলে এমন হবে কেন? অনাথ আশ্রম থেকে তাই নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চলে এসেছি।"

হবস সায়েব আবার একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্বাধীন ভারতবর্ষে তোমরা তো মেয়েদের সব বিষয়ে সমান অধিকার দিয়েছো তাই না?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

হবস সায়েব হাসতে লাগলেন। "এবার তাহলে একটা ছেলে ঠকানো প্রশ্ন করি। বলো দেখি, কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীনতা [illegible]

"সরাবজীকে জিজ্ঞাসা করো, সে এখনি বলে দেবে। নারী স্বাধীনতার বিরোধী দলের শেষ দুর্গ হলো হোটেল। বার লাইসেন্সে লেখা আছে কোনো নিঃসঙ্গ মহিলাকে বার-এ ঢুকতে দেওয়া হবে না। মেয়েরা তোমাদের দেশে একা একা এখন যেখানে খুশি যেতে পারে, এভারেস্টের চূড়ায় উঠলেও কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু আজও বার-এ কোনো মহিলা একলা গেলে প্রবেশ নিষেধ। সঙ্গে পুরুষ সঙ্গী থাকলে অবশ্য কোনো আপত্তি নেই। যতক্ষণ ইচ্ছে যে কোনো ড্রিঙ্কের আনন্দ উপভোগ করা চলতে পারে।"

মিস্টার হবস হাসতে লাগলেন। বললেন, "সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী এই নিয়ম কোনো মহিলা একবার আদালতে যাচাই করে দেখলে পারেন। তবে নিয়মটা

অনেকদিন থেকেই চলছে। এবং যারা আইন করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। নিঃসংগ মহিলারা বার-এ আসতে চান অন্য উদ্দেশ্যে। আর আজও তাঁরা এসে থাকেন। খারাপ বারগুলোতে ঢুকলেই বোঝা যায়। সেকেন্ড হ্যান্ড দেহের পসরা সাজিয়ে দেশ বিদেশের মেয়েরা বড়শিতে রুই কাতলা ধরবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।' তোমাদের এখানেও যে . ব্যবস্থা নেই তা নয়, তবে অনেক সংযত ও ভদ্রভাবে!"

মিস্টার হবস হাসলেন। "নিয়মটা বোধ হয় খারাপ নয়। কিন্তু পুরুষে শুধু এই আইনের জোরেই করে খাচ্ছে। ফর্সা জামা এবং ফুল প্যান্ট পরে গরীব অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেরা মেয়ে ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। 'হ্যালো ডলি, আজ কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে।' যত রাত হোক তোমার জন্যে আমি বসে থাকবো।'

ডলি বলে, 'পিটারের মাকে কথা দিয়ে দিয়েছি। পিটারকে এসকর্ট হিসেবে নিয়ে যাবো। একটা টাকা দিলেই হবে।'

'আমি বারো আনায় রাজী আছি। আমার পয়সার দরকার।' ছোকরা বলে।

'তোমরা যে চিংড়িমাছের মতো হয়ে গেলে। দেখছি, তোমাদের দাম মেয়েমানুষের থেকেও কম। বারো আনা পয়সার জন্যে ওই গুন্ডা রাজস্বে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে বসে থাকতে রাজী আছো?'

আবগারী আইনকে ফাঁকি দেবার জন্যে এই এসকর্ট বা সংগীদের না হলে অনেক বার-এ ঢোকা যায় না। আর এইভাবেই ম্যাড্রান অর্থাৎ সরাবজী কলকাতায় প্রথম অন্ন সংস্থান করেছিল।"

হবস বললেন, "সরাবজীর মুখেই শুনেছি, এক ছোকরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তাকে এই সুযোগ করে দিয়েছিল। বয়স তার কম—আইন অনুযায়ী এই বয়সের সংগী নিয়েও বার-এ ঢোকা যায় না। কিন্তু হাফেসজী বার-এর মালিক মিস্টার হাফেসজী আইন সম্বন্ধে অত খুঁতখুঁতে ছিলেন না। তিনি এসকর্টের বয়স নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কম বয়সের এসকর্টরা যে দামে সস্তা হয়, এবং বেচারা মেয়েদের পক্ষে খরচের ভার কিছুটা কমে যায়, তা তিনি বুঝতেন। তিনি শুধু বলতেন, 'তোমরা ঐ অসভ্যতাটুকু কোরো না—একটা লেমনেড নিয়ে দুজনে ভাগ করে খেও না। এতে হোটেলের সুনামের ক্ষতি হয়, অন্তত দুটো বোতল সামনে রাখো।'

সরাবজী যখন কলকাতার পথে পথে দুমুঠো অন্নের জন্য ঘুরছে তখন ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়। সে বদলী খুঁজছিল। সিরাজিয়াকে সেই রোজ বার-এ নিয়ে যায়। তার সঙ্গে বসে থাকে [illegible]

আসে, দর-দাম ঠিক হয়ে যায়, তখন নতুন আগন্তুককে সিনথিয়ার পাশে বসতে দিয়ে সে কেটে পড়ে। সংগীকে রোজ আসতে হয়, অথচ তার কয়েকদিনের জন্যে খড়্গপুরে যাওয়া দরকার। রেলের কারখানায় জানা শোনা একজন ভদ্রলোক আছেন—তার কাছে চাকরির তদ্বির করতে হবে।

তাই ছোকরা ম্যাডান, অর্থাৎ সরাবজীর সংগে পরিচয় হতে তাকে সিনথিয়ার সংগে আলাপ করিয়ে দিল। বললে, 'মাত্র এক সপ্তাহের কাজ কিন্তু। আমি ফিরে এলেই তোমাকে কেটে পড়তে হবে। তখন যেন গণ্ডগোল পাকিও না। দু'একজন আগে আমাদের লাইনে এই নোংরা চেষ্টা করেছে, মেয়েরা দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়েছে, হয়তো একটা সিগারেট দিয়েছে তাতেই মাথা ঘুরে গিয়েছে। কিন্তু বাজারে ঠ্যাঙানি বলে একটা জিনিস এখনও আছে। সামনের দুটো দাঁত যদি ঘুসি মেরে উড়িয়ে দিই তা হলে সেখানে আর দাঁত গজাবে না, মনে থাকে যেন।'

ম্যাডান রাজী হয়ে গিয়েছিল। এখন ক'দিন তো খেয়ে বাঁচা যাক। সিনথিয়ার সংগেই সে প্রথম বার-এ ঢুকেছিল। প্রথমে একটু ভয় ভয় করেছিল। সিনথিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলে দিয়ে মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেছিল, 'দেখি তুমি লাকি চ্যাপ কি না। হয়তো এখনি কাস্টমার পেয়ে যাবো।'

সরাবজীর কেমন ভয় লাগছিল। এমন বেয়াড়া পরিবেশ জীবনে সে কখনও দেখেনি। সিগারেটের ধোঁয়ায় এমন অবস্থা যে, মনে হচ্ছে যেন ঘরের মধ্যেই কাঁচা ঘুঁটেতে কেউ আগুন দিয়েছে। দূরে গোটা তিনেক লোক বাজনা বাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা ইশারায় মেয়েদের ডাকছে—বসে বসে লেমনেড না গিলে এখানে এসে একটু নাচো গাও। আমাদের বার-এর এমন সামর্থ্য নেই যে আবার পয়সা দিয়ে নাচ-গানের মেয়ে রাখবে। অথচ মিউজিক ও ডান্স লাইসেন্স রয়েছে। প্রতি বছর এক আঁচলা পয়সা দিয়ে লাইসেন্স রিনিউ করতে হচ্ছে, প্রতিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে যে নৃত্যে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের বেশভূষা ভদ্র হবে।

সরাবজী দেখেছিলেন, বার-এর মধ্যে শুধুই লেমনেড চলেছে। জোড়ে জোড়ে সিনথিয়া এবং তার মতো এসকর্টরাই বসে রয়েছে। ঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সিনথিয়া বলেছে রাত ন'টা পর্যন্ত এইভাবে চলবে, তারপর খরিদ্দাররা আসতে শুরু করবে। আজ আবার ভাল জায়গা পেলাম না। একটু দেরি করলেই ভাল জায়গা-গুলো অন্য মেয়েরা নিয়ে নেয়। সেলার-গুলো একটু কোন চায়। কোনগুলো সব ভর্তি হলে তবে ওরা আমাদের দিকে [illegible]।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সিনথিয়া বলেছে, 'আমার বাপু অতো ধৈর্য নেই। সেই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আমি বসে থাকতে পারবো না। আর এক রহিমকে কিছু পয়সা দিলে হয়। তাও তো এমনিই এক টাকা দিতে হয়, আর কতো দেবো?'

সরাবজীর বোধ হয় গলা শুকিয়ে আসছিল। সে আর একটু লেমনেড খেতেই সিনথিয়া হাতে একটা টোকা দিয়েছিল। 'হ্যালো ম্যান, তুমি কি আমাকে ডোবাবে নাকি? কতক্ষণ এখানে বসতে হবে ঠিক নেই, আর তুমি এরই মধ্যে অর্ধেক গেলাশ সাবাড় করে দিয়েছো। যদি আবার লেমনেড কিনতে হয় তোমাকে পয়সা দিতে হবে বলে দিলাম। আমার পয়সা অতো সস্তা নয়, কোথায় খদ্দের তার নেই ঠিক, অথচ খোলামকুচির মতো পয়সা ছড়িয়ে চলেছি।'

সরাবজী আর কোনোও কথা বলেনি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, সামনে গেলাশের মধ্যে জলের কণাগুলো তখনও অ্যাদিম মুক্তির স্বাদ পেয়ে নেশাখোরের মতো নাচছে। সিগারেটের গন্ধে কাশি আসছে। ঘরের মধ্যে এবার যেন দু'জন সেলার এসে ঢুকলো। বিরাট লম্বা—যেন কড়ি কাঠে মাথা ঠেকে যায়। সিনথিয়া চেয়ার ছেড়ে

তাদের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু তার ছিপে মাছ আটকালো না। সিনথিয়া ফিরে এসে একটু হাঁপালো, তারপর আবার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াটা সঙ্গীর মুখের উপর ছেড়ে দিল। সঙ্গীর তখন সেদিকে খেয়াল নেই। সে একমনে জলবিন্দুর রাজ্যে যে সঙ্গীত ও নৃত্য চলেছে, তাই দেখছে।

সিনথিয়া বললে, 'ঠিক আছে এখন আর একটু খেয়ে নাও। কাল থেকে বেরোবার আগে দু'তিন গ্লাস জল খেয়ে আসবে। এখানে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। ভাগ্য ভাল থাকলে হয়তো একঘণ্টা পরেই পয়সা নিয়ে চলে যেতে পারবে।'

আরও কথা হতো। কিন্তু হঠাৎ যেন সিনথিয়া ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ল। হলের আদিম উল্লাসের মুখে কে যেন ছিপি এ'টে দিল। বেয়ারা এসে সব মেয়েদের টেবিলের দিক দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল, সবার সঙ্গী আছে তো? না হলে গবর্ণমেণ্টের লোক বিপদে ফেলবে, কী যে ও'দের মর্জি—মাঝে মাঝে দেখতে আসেন কোনো মেয়ে একলা বসে আছে কি না।

সরাবজী শুনলে ম্যানেজার বলছে, 'দেখুন স্যার। সবার এসকর্ট রয়েছে। জেনুইন কাস্টমার।'

ইনস্পেক্টর এবার ও'দের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সিনথিয়া এ-সবে অভ্যস্ত। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সরাবজীর আঙুলগুলো নিয়ে খেলতে লাগলো। তারা যেন গল্প করছিল এমনভাব দেখাবার জন্যে বললে, 'আচ্ছা জন, তারপর কী হলো?'

সরাবজী ভয় পেয়ে গিয়েছে। সে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ছে। তাকে উঠে পড়তে দেখে ম্যানজার অসন্তুষ্ট হলেন। ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ'কে সঙ্গে করে আপনি বার-এ এসেছেন?'

সে বেচারা বুঝতে পারছিল না কী উত্তর দেবে। সিনথিয়া কিছু বলেও দেয়নি। সিনথিয়া এবার তার দিকে চোখ টিপলে। সেও কোনো রকমে মাথা নাড়লো।

ইনস্পেক্টর বোধ হয় সব বুঝলেন। হেসে বললেন, 'একেবারে নতুন বুঝি।'

ম্যানেজার বললেন, 'কী বলছেন স্যার, জেনুইন কাস্টমার। প্রায়ই আসে।'

ম্যানেজারের কানের কাছে মুখ এনে ইনস্পেক্টর বললেন, 'হ্যাঁ, লেমনেড খাবার এমন সুন্দর জায়গা তো আর কলকাতায় নেই!'

তারপর খরিদ্দার এসে গিয়েছে। নিজের পয়সা নিয়ে সরাবজী চলে এসেছে। তারই শূন্য স্থানে এসে বসেছে হাফেসজী বারের নতুন অভ্যাগত।

পরের দিন সিনথিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। সিনথিয়া বলেছে তোমার পয় আছে। গতকালের লোকটা দিল্ খুলে ড্রিংক করিয়েছে, তারপরেও টাকাকড়ি নিয়ে ছোটোলোকমি করেনি। মেহনত পুষিয়ে দিয়েছে। এমন খদ্দের রোজ পেলে আমাদের দুঃখের কিছুই থাকবে না।

সরাবজী আবার গিয়ে বসেছে। সিনথিয়ার পাশে বসে লেমনেড খেতে খেতে সে খদ্দের-এর আবির্ভাব কামনা করেছে। আজও আশ্চর্য সৌভাগ্য। গেলাশে এক চুমুক দেবার পরেই আগন্তুক এসে গিয়েছেন। পান-সঙ্গিনী হিসেবে সিনথিয়াকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। সরাবজী গেলাশটা ছেড়েই উঠে আসছিল। সিনথিয়া বললে, 'মুখের জিনিসটা ফেলে যেয়ো না। ওটা শেষ করে চলে যাও।'

পরেরদিন সরাবজী আবার সিনথিয়ার কাছে গিয়েছে। 'রিয়েলি লাকি চ্যাপ!' সিনথিয়া বলেছে। 'কাল কী হলো জানো? খদ্দেরকে নিয়ে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলাম, তার ট্রেন ধরবার তাগিদ ছিল। ফিরে এসে আফসোস হলো, আর একবার গিয়ে বসা যেতো। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দিয়ে যা ভুলই করেছিলাম। একাই ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ম্যানেজার সাহস করলে না। বললে, 'আবগারী দারোগারা প্রায়ই আসছে—গোলমাল পাকাবে। তাছাড়া তোমার তো এক রাউণ্ড হয়েও গেল—অন্য বোনদের করে খাবার সুযোগ দাও।'

সিনথিয়া নিজে থেকেই কিছু বেশী পয়সা দিয়েছে। বলেছে, 'তুমি অতো ল্যাদাড়ু কেন? টেবিল ছেড়ে চলে যাবার আগে খদ্দেরের কাছে বকশিশ চাইবে। আমিও তখন বলবো আমার লোককে কিছু দিয়ে দিন। আমরা তো ভদ্রঘরের মেয়ে—বাবা মাকে লুকিয়ে এসেছি। পয়সা না পেলে ও বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে, আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।'

সরাবজী তবু পয়সা চাইতে পারেনি। চুপচাপ বসে থেকে সে বার-এর রূপ দেখেছে। মালিকের সঙ্গে পরিচয় করেছে। দেখেছে রাত্রের অন্ধকারে পুলিসের লোকরা মাঝে মাঝে বার-এ আসে। হাফেসজী ছোটাছুটি আরম্ভ করে দেন। আদর আপ্যায়ন করেন। কোন ড্রিংক করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তারপর পুলিস খাতা চায়—বার ইনস্পেকশন বুক। ইংরিজীতে হুড় হুড় করে পুলিস অফিসার লিখে দেন—

—"Inspected the bar at 11 p.m. Mr. Hafesji was in personal attendance. Place full of customers. All ladies had escorts. Nothing unusual to report."

কথা থামিয়ে হবস এবার একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আজও প্রতি রাত্রে কলকাতার বারগুলোর খাতায় ওই একই মন্তব্য লেখা হচ্ছে। তোমাদের শাজাহানেও তাঁরা নিশ্চয় আসেন এবং ঐ একই কথা লিখে দিয়ে যান।"

আমি বললাম, "আমাদের [illegible]

হবস বললেন, "হাফেসজীর বারেও কখনও লেখা হতো না।
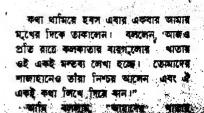
কয়েকদিন পরেই সির্নাথিয়ার পুরনো সংগী ফিরে এসেছিল। সির্নাথিয়া কিছুতেই নতুন এসকর্টকে ছাড়তে চায়নি। বলেছিল, 'এমন পয়মন্ত ছেলেকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।'

কিন্তু ম্যাডান রাজী হয়নি। বলেছে, 'আমি অন্যায় করতে পারবো না। ওর কাজ আমি নিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন।'

ভগবান এবার বোধহয় একটু মুখ তুলে তাকালেন। সির্নাথিয়ার 'সংগী' হাফেসজীর বার-এ চাকরি পেয়ে গেল। ম্যাডান নিজেকে ধন্য মনে করেছে। সকালে যখন বার খোলে তখন কোনোই কাজ থাকে না। হাফেসজীর বার খালি পড়ে থাকে। দু' একজন যদি বা আসে তারা এক-আধ পেগ টেনেই পালায়। আবার দুপুরে একদল আসে। মফঃস্বলের লোক। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুন্দরী কলকাতার সান্নিধ্যসুখ উপভোগের সময় নেই তাদের। তারপর রাত্রি। হাফেসজী নিজে এসে কাউন্টারে বসেন। বার-এর রঙ এবং রূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়।"

মিস্টার হবস এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার দেরি করিয়ে দিচ্ছি না তো?"

বললাম, "মোটেই না। সরাবজীকে চেনবার এমন সুযোগ আপনি না থাকলে কোনোদিন পেতাম না।"

হবস মাথা নাড়লেন। "আমি নিজেই ওকে বুঝতে পারলাম না। আজ এখানে তাকে না দেখলে হয়তো সরাবজী আমার কাছে আরও পাঁচটা লোকের একটা হয়ে থাকতো। কিন্তু এখন সে আমারই কৌতুহলের সৃষ্টি করছে।"

আমি বললাম, "সরাবজীকে আপনি আমার কাছে গল্পের নায়কের মতো করে তুলছেন।"

হবস বললেন, "অবজ্ঞা কোরো না, তোমাদের এই হোটেলের প্রতিটি ইটের মধ্যে এক একটা উপন্যাস লুকিয়ে রয়েছে। ইংরিজীতে সস্তা হোটেল উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তা নয়—প্রকৃত মানুষের গল্প, তার সুখ দুঃখের ইতিবৃত্ত।"

হবস এবার একটু থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন। "বুড়ো বয়সে বকবক করা মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। আর চিন্তার শক্তি যখন উবে যায় তখন কোটেশন দেবার রোগে ধরে। আমারও একটা কোটেশন দিতে ইচ্ছে করছে। তোমাদের হোটেলেই স্যাটা আমাকে বলেছিল,

a bar is a bank where you deposit your money and lose it; your time and lose it; your character and lose it; your self-control and lose it; your own soul and lose it.

সবই খরচের খাতায়। এই পচা ব্যাঙ্কে তোমার টাকা, সময়, চরিত্র, সন্তানের সুখ শান্তি এবং আত্মাকে গচ্ছিত রেখে খোয়াতে হয়। কিন্তু একজন ফুলে ওঠে। সে হাফেসজী। অন্যের খরচ-করা পয়সা হাফেসজীর ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা পড়ে।

ম্যাডান যে কবে সরাবজী হয়ে গিয়েছে খবর পাইনি। অনেকদিন ওর সংগে দেখাও হয়নি। তারপর কয়েক বছর পরে হঠাৎ ধর্মতলার মোড়ে ওর সংগে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই সে ছুটে এল। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে। বললে, আমাকে মনে পড়ছে? আপনার দয়াতে সেবার চাকরিটা রক্ষে হয়েছিল? আমি হাফেসজীর দোকান ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি? ঝগড়া হলো নাকি?'

'না ঈশ্বর মুখ তুলে তাকিয়েছেন। আমি নিজেই একটা দোকান করেছি।'

'বার? সে তো অনেক পয়সা লাগে।'

'ঈশ্বর যাঁকে দেখেন তার তো কিছুই প্রয়োজন হয় না। ধর্মতলায় তালতলার কাছে একটা বার পেয়ে গেলাম। যে মালিক সে অসুখে ভুগছে। তাকে বিলেত চলে যেতে হলো। তাই আমাকে পার্টনার করে নিয়েছে। আমি দেখাশোনা করবো, তাকে লাভের ভাগ দেবো।'

জোর করে সে আমাকে বার-এ ধরে নিয়ে গিয়েছে। সমস্ত দেখিয়ে বলেছে, 'অনেক শান্ত দোকান। ওখানকার মতো নয়।' আমি দেখেছি অনেকে বসে ড্রিংক করছে। কিন্তু হৈ হৈ হট্টগোল নেই।

ম্যাডান বলেছে, 'আমি নাম পাল্টিয়ে নিয়েছি। সরাবের লাইনেই যখন থাকতে হবে তখন আমি সরাবজী।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সরাবের সংগে নিজে কোনো সম্পর্ক না করলে চলবে কেন?'

সরাবজী লজ্জায় জিভ কেটেছে। 'কী যে বলেন, আমার ঠোঁট জীবনে মদ স্পর্শ করেনি। হাজার হাজার পেগ মদ বোতল থেকে ঢেলে অন্য লোককে দিয়েছি, কিন্তু তার আস্বাদ কী আমি জানি না।'

আবার দেখা হয়েছে। সরাবজী আমাকে তার বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছে। বলেছে, 'আপনার জন্যেই তো সব। সেদিন যদি হাফেসজীর দোকানে টিকতে না পারতাম, তা হলে আমার কিছুই হতো না।'

সরাবজী বলেছে, 'যাকে বিয়ে করছি সেও আমার মতো অনেক দুঃখে অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে। বেচারা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল—হাজার হোক মদের দোকানে কাজ করি।'

সরাবজীর বউকে প্রায়ই মার্কেটে দেখেছি। সত্যি লক্ষ্মী বউ। নিজে রেস্টুরেন্টের বাজার করেন। অন্য কারুর হাতে বাজারের ভার দিলেই ঠকাবে। মাংসর দাম বেশী লেখাবে, ওজন কম দেবে।

আমি বলেছি, 'আপনি বাজার করেন?'

মিসেস সরাবজী বলেছেন, 'আমি না দেখলে ও-বেচারাকে দেখবে কে? নিজে বাজার করি বলে জিনিসটা ভাল হয়, খদ্দেররা প্রশংসা করে, অথচ দাম কম লাগে।'

আমি প্রশ্ন করেছি, 'আপনি কি দোকানেও স্বামীকে সাহায্য করেন?'

মিসেস সরাবজী বলেছেন, 'ওইখানেই তো মুশকিল। ওখানে আমার যাওয়া সম্পূর্ণ বারণ। আমি একবার বলেছিলাম

কিচেনের লোকদের সংগে একটু কথা বলে আসবো। কিন্তু উনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। আমি বাজার নিয়ে বাড়ি যাই। মেনু ঠিক করে দিই। উনি সেখান থেকে মাল-পত্তর নিয়ে দোকানে চলে আসেন। যেদিন কাজে আটকে পড়েন, সেদিন কিচেনের মেটকে পাঠিয়ে দেন। কেউ না এলে আমি টেলিফোন করি, কিন্তু তবু দোকানে যাওয়ার হুকুম নেই।'

আমি বললাম, 'আপনার স্বামী তাহলে আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন!'

'মোটেই না। উনি বলেন, দুনিয়ার যেখানে খুশি যেতে পারো, কিন্তু আমার বার-এ নয়।'

'আর আপনিও বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিয়েছেন!' আমি উত্তর দিলাম।

মিসেস সরাবজী বোধ হয় একটু লজ্জা পেলেন। কিন্তু আমার সংগে তাঁর স্বামীর কি সম্পর্ক তা জানেন, তাই ফিস ফিস করে সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, 'আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু উনি কি বলেন জানেন? উনি বলেন, তোমার দেহে না সন্তান আসবে? বার-এর বাতাস পর্যন্ত সেই অনাগত অতিথির ক্ষতি করতে পারে।"

হবস এবার বোধহয় হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "সরাবজীর সন্তান হয়েছে খবর পেয়েছি। আরও খবর পেয়েছি সমস্ত দোকানটাই সে কিনে নিয়েছে। ওর অংশীদার আর বিদেশ থেকে ফিরবেন না, তাই সামান্য যা সঞ্চয় ছিল এবং স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে দিয়ে সরাবজী বার ও রেস্টুরেণ্টটা কিনে নিলে।

আমার সংগে বার-এ আবার দেখা হয়েছে। সরাবজী বলেছে, এসব আপনার জন্যেই সম্ভব হয়েছে, এই বার আপনার নিজের বলেই জানবেন।।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে। সরাবজী বললে, 'আমার এই বার হাফেসজীর বারের মতো নয়। আমি ভালো জিনিস দিই, জল মেশাই না। মেয়েদের ঢুকতে দিই না। তবুও শান্তি নেই।'

প্রশ্ন করলাম, কেন?

সরাবজী বললে, 'আমার বার সাড়ে দশটায় বন্ধ। কিন্তু বিকেল থেকে যারা বসে থাকে, তারা ক্রমশ গরম হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। প্রথম পেগে স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় পেগে আনন্দ, তৃতীয় পেগে লজ্জা এবং চতুর্থ পেগ থেকে পাগলামো। তখন আমার ভাল লাগে না। রোজ কিছু না কিছু গোলমাল লেগেই থাকে।'

সরাবজী বললে, 'আমার বার-এর যথেষ্ট সুনাম আছে। যারা শান্ত পরিবেশে শান্তিতে ড্রিংক করতে চায় তারাই আসে। তবু মাঝে মাঝে গোলমাল শুরু হয়ে যায়।'

[illegible] বেয়ারা এসে বললে, কেবিনে এক সায়েব ডাকছেন।

সরাবজী উঠে পড়লে। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে আমিও ওর পিছু পিছু গেলাম। ইণ্ডিয়ান সায়েব ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'নট্‌টা গুড্‌ডা ড্রিংক—পানি ডালটা।'

জিভ কেটে সরাবজী বললে, 'কী বলছেন আপনি? আমার বার-এ ও-সব জোচ্চুরি চলে না। বলেন তো বোতল পাঠিয়ে দিচ্ছি—তার থেকে আপনার সামনে ঢেলে দেবে।'

খরিদ্দার বললেন, 'পাইব্ পেগস্ আল-রেডি ড্রিংক করেছি, তবু মনে হচ্ছে যেন স্বামী বিবেকানন্দের চেলা।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে বার-এর কাউণ্টারে আসতে আসতে সরাবজী বললে, 'আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। এমন কেস রোজই দু একটা এসে পড়ে, নতুন লোক বুঝতে পারে না।'

একটা হুইস্কির বোতল হাতে করে কেবিনে এসে সরাবজী বললে, 'আমরা ডাইরেক্ট মাল নিয়ে আসি। যদি বলেন, সামনে সীল খুলে সার্ভ করছি।'

আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। শুনলাম, এবার ভদ্রলোক আসল প্রসংগ অবতারণা করলেন। 'গার্ল চাই।'"

হবস্ এবার হেসে ফেললেন। বললেন, "ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে সরাবজী যা উত্তর দিয়েছিল তা কোনো সাহিত্যিকের কানে গেলে বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জন করতো। সরাবজীর হাত ধরে ভদ্রলোক বললেন, 'প্লিজ্...প্লেজার গার্ল।'

সরাবজীও তাঁর হাতটা চেপে ধরলো। তারপর তাঁকে বোঝাতে লাগল, 'গার্লস হিয়ার নো গুড্। হাউস গার্ল, গার্লস ইন ইয়োর ফ্যামিলি ফার ফার বেটার। হোটেল গার্লস টেক অল মানি।' সরাবজী নিজের ভাব প্রকাশের জন্যে তারপর যেন অভিনয় শুরু করলে। তুলনামূলক সমালোচনা করতে গিয়ে জানালেন, 'স্ট্রীট গার্লস ডোণ্ট লাভ ইউ, দে লাভ ইওর মানিব্যাগ। হাউস্ গার্ল—মাই সিস্টার ইন্ ইওর হাউস্—লাভ ইউ। ইফ সি হিয়ারস, সি উইল উইপ'—এবার সরাবজী কেঁদে কেঁদে অভিনয় করতে লাগলেন। ভদ্রলোক বোধ হয় যেন একটু লজ্জা পেলেন। কোনোরকমে মদের বিল চুকিয়ে, একটা পয়সাও টিপ্‌স না দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

সরাবজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখলেন তো? আগে একলা ছিলাম, তখন সব সহ্য হতো। এখন বয়স হচ্ছে, মেয়ের বাবা হয়েছি, কেমন যেন অসহ্য লাগে।'

আমি কিছুই না বলে ফিরে এসেছি। খবর পেয়েছি, সরাবজীর দোকান এখন [illegible]। অনেক [illegible]।

যা অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না তাও ন্যায্যমূল্যে সরাবজীর বার-এ পাওয়া যায়। সরাবজী বলেছে, 'ঈশ্বর ওপরে আছেন, সৎপথে থেকে ব্যবসা করছি, তিনি দেখবেন।'

আরও একদিন সরাবজীর সংগে দেখা হয়েছে। ভদ্রলোক মুখ শুকনো করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি গাড়িতে যাচ্ছিলাম। গাড়ি থামিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?'

সরাবজী বললে, 'ড্রিংক করলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় কেন বলতে পারেন?'

বললাম, 'হয়তো অ্যালকহলের রাসায়নিক ফল।'

সরাবজী বললে, আমি কান মলেছি। মাতালদের আমি কোনোদিন আর কিছু বলবো না। জানেন, দোকানে আসবে এক সংগে; এক সংগে মদ খাবে, এক সংগে মস্করা করবে, তারপর এক সংগে ঝগড়া বাধাবে। সেদিন রাত ন'টার সময় দু' ভদ্রলোক নেশার ঘোরে প্রচণ্ড চিৎকার করছিলেন। টেবিলে গেলাস বাজাচ্ছিলেন। গান গাইছিলেন। আর একদল লোক—এঁরা আমার দোকানের লক্ষ্মী রোজ তিন চারশ

টাকার মদ নেয়, তাঁরাও পাশে বসেছিলেন। তাঁদের একজন আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনার বার যে তাড়িখানা হয়ে গেল। ভদ্রলোকেরা এখানে আর ড্রিংক করতে আসবেন না। হাফেসজীর মেয়েধরা বারের লোকগ্লোকে আপনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ওদের সামলান, না হলে আমরা আর আসবো না।'

বাধ্য হয়ে আমি গিয়ে ভদ্রলোক দ্'জনের কাছে দাঁড়ালাম। তাঁরা দ্'জনে তখন রেডিওতে ক্রিকেট খেলার রিলে শুনছেন। ইণ্ডিয়া এক ওভারে এম সি সি-কে খতম করে, পরের ওভারে অস্ট্রেলিয়াকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে। এক ভদ্রলোক বলছেন, তা হয় না। আর এক ভদ্রলোক বলছেন, আমার যা খ্শি তাই করবো। তাতে কার পিতৃদেবের কী? এবার অকথ্য গালাগালির বর্ষণ। আমি বললাম, 'আপনারা এ কি করছেন?'

ওরা বললে, 'বেশ করছি। তুমি কে হে হরিদাস পাল?'

আমি বাধ্য হয়েই বললাম, 'এ-রকম হৈ চৈ বার-এর বাইরে চলতে পারে। এতে অন্য কাস্টমারদের অস্মবিধে হচ্ছে।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে যেন কে'দে উঠলেন। 'জানেন, মাতাল হয়েছি বলে বার করে দেবে বলছে। বারের মালিক-এর এতো বড়ো স্পর্ধা।'

অন্য কয়েকজন ও'দের দলে গিয়ে, চিৎকার করে বললেন, 'মালিকের এতো সাহস। দাদার, আমরা এখনি সবাই এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। মদ খেয়ে হৈ হৈ করবে না, তো কি গীতা পড়ে শোনাবে?'

সরাবজীর চোখ এবার ছল ছল করে উঠলো। 'সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন? যারা আমার কাছে কমপ্লেন করেছিল, তারাও টেবিল ছেড়ে ওয়াক-আউট করে গেল। আমি তাঁদের হাত ধরে বললাম, 'আপনারা বললেন বলেই, আমি ভদ্রলোককে বারণ করতে গেলাম।' ওরা কী বললে জানেন?

বললে, 'আমরা মাতাল মান্ষে নেশার ঘোরে যদি কিছ্ম বলেই থাকি, তা বলে আপনি একজন ভাইকে অপমান করবেন? হ্ আর ইউ? কলকাতায় কি আর মালের দোকান নেই? এই দোকানে ঘ্ঘ্ চরবে। আমরা এখানে প্রয়োজন হলে পিকেটিং করবো।'

সরাবজী বললে, 'প্রায় তিন সপ্তাহ আমার হোটেল বন্ধ, কেউ আসে না। শেষে বাধ্য হয়ে আজ এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বহ্ কষ্ট করে তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছি। হাতজোড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, যদি আমার কোনো দোষ হয়ে থাকে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে আপনারাই আমাকে বলতে বলেছিলেন, তাই ভদ্রলোককে আমি গোলমাল করতে বারণ করেছিলাম। ভদ্রলোক রাজী হয়েছেন। আবার দলবল নিয়ে আসবেন। কিন্তু ভদ্র-লোক সাবধান করে দিয়েছেন, 'মাতালদের কথায় বিশ্বাস করে ভদ্দরলোকদের আর কখনও অপমান করবেন না।'"

হব্স যেন আবার বর্তমানে ফিরে এলেন। বললেন, "এই সরাবজীকেই আমি চিনতাম। বেশ গ্মছিয়ে এবং ভদ্রভাবে ব্যবসা করছিল। একটিমাত্র মেয়ে, তাকেও বাইরে ইস্কুলে রেখে পড়িয়েছে। ওর মেয়েকেও আমি দেখেছি। চিড়িয়াখানাতে আলাপ হয়েছিল, মেয়েকে সঙ্গে করে বাবা গিয়ে-ছিলেন। এই পর্যন্তই জানতাম। কিন্তু সরাবজী কী করে ধর্মতলা থেকে শাজাহানে হাজির হলো জানি না।"

হব্স এবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমাদের ম্যানেজার মনে হচ্ছে আজ আর ফিরবে না! ব্যাপার কী? হোটেল ছেড়ে প্রায়ই আজকাল বেরিয়ে যাচ্ছেন। একা স্যাটা বোস কী এই হোটেল চালাবে?"

হব্স উঠে পড়লেন। যাবার আগে বললেন, "যাক, সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এটাই আনন্দের কথা।"

আবার যখন ডিউটিতে ফিরে গিয়েছি সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁর টিকলো নাক, প্রশস্ত ব্কও যেন ঈশ্বরের চরণে বিনয়ে নত হয়ে রয়েছে। কম কথা বলেন তিনি। তব্ আজ যেন তাঁকে আমার বহ্মদিনের পরিচিত মনে হলো। শাজাহানের বার-ম্যানেজারের মধ্যে যেন আর একজন আমিকে খ্'জে পেলাম। আমারই মতো নিজের পায়ে হাঁটা পথেই তিনি যেন সংসারের স্দীর্ঘ সমস্যা অতিক্রম করে এসেছেন।

হেড্ বার-ম্যান বলেছে, "জব্বর সায়েব বাব্, সব কক্টেল যেন হাতের ম্ঠোর মধ্যে। কতরকমের মিক্সিং যে জানেন।"

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি বার-এ তিলধারণের জায়গা নেই। বিজনেসের যন্ত্র-পাতিতেও তেল দরকার হয়, সেই আধ্মনিক ল্ব্রিকেশন তেল হলো হ্ইস্কি। ব'্দ হয়ে চোখ ব'্জে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলারা গলায় হ্ইস্কি ঢেলে দিচ্ছেন, খালি গেলাস আবার বোঝাই হচ্ছে। স্বল্প-ভাষী সরাবজী আমাকে বললেন, "ম্তদেহ টিঁকিয়ে রাখতে হ্ইস্কির মতো জিনিস নেই। যদি কোনো ম্তদেহ সংরক্ষণ করতে চাও তবে তাকে হ্ইস্কির মধ্যে রাখো—আর জ্যান্ত লোককে যদি মারতে চাও, তাহলে তার মধ্যে হ্ইস্কি ঢালো।"

সরাবজীর সঙ্গে [illegible] আমার পরিচয় নিবিড় হয়েছে। বুঝেছি, [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] নেই। কিন্তু [illegible]
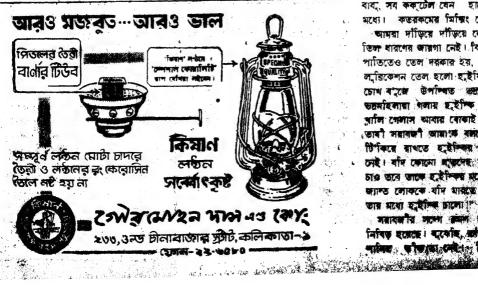
থাকার তীব্র বাসনা আছে, আর আছে ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস।

সরাবজী যেন আজও সব বুঝতে পারেন না। অন্তরের দ্বন্দ্ব থেকে আজও যেন মুক্ত হতে পারেননি তিনি। এবং সে গল্পের শেষ অংশ আমি তাঁর নিজের মুখেই শুনেছিলাম।

বার-এর এক কোণে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন—কবে এই বার-পর্ব শেষ হবে, সুরা-পিয়াসীদের মনে পড়বে তাদেরও বাড়ি আছে, সেখানে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। তারা বিল চুকিয়ে উঠে পড়বে, বার-ম্যানরা চেয়ারগুলো ঠিক করে রাখবে, আমি ক্যাশ বন্ধ করে হিসেব করবো, তারপর ছুটি।

সরল মানুষ সরাবজী। বললেন, "বাবুজী, আমার তো লেখাপড়া হয়নি। কিন্তু যারা পড়াশোনা করে, যারা চিন্তা করে, তাদের আমার খুব ভাল লাগে বাবুজী। আমার স্ত্রীর কাছে আমি দুঃখ করি।" সরাবজী আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা তো তবু বই টই পড়ো। মানুষ কেন হুইস্কি খায় বলতে পারো?"

আমি বললাম, "মিস্টার স্যাটা বোসের ধারণা, হুইস্কির মধ্যে ভীরু সাহস খোঁজে, দুর্বল শক্তি খোঁজে, দুঃখী সুখ খোঁজে, কিন্তু অধঃপতন ছাড়া কিছুই পায় না।"

ছোটছেলের মত সরল বিশ্বাসে সরাবজী হেসেছিলেন। সরাবজী প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা, আমরা যারা মদ বিক্রি করি তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেননি?"

আমি পরম বিস্ময়ে ও'র মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। উনি চেয়ারে বসে পড়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে সব বলছি। হয়তো তুমি বুঝবে। লেখাপড়া জানি না বলে আমি নিজে উত্তর খুঁজে পাইনি। আমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, সে অনেক লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু নিজের মেয়েকে এ-সব জিজ্ঞাসা করা যায়?"

মেয়েকে সত্যিই ভালবাসেন সরাবজী। তাঁর জীবন মরুভূমিতে একমাত্র মরুদ্যানের মতো সে। বললেন, "তুমি আমার মেয়েকে জানো না। এমন বুদ্ধিমতী এবং পণ্ডিত মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না। এবং সে সুন্দরীও বটে", সরাবজী বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন। "কত মোটা মোটা বই যে সে পড়ে। জানো, সে রোজ আমাকে চিঠি লেখে। আমারও খুব বড় বড় চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি যে লেখাপড়া শিখিনি, আমার যে বানান ভুল হয়। মেয়ের কাছে লজ্জা হয়। মেয়ে অবশ্য বলে 'বাবা তুমি ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না। তুমি আমাকে বড় বড় চিঠি লিখবে। জানো সে এখন বিলেতে পড়ছে। যে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়ে অনাথ আশ্রম থেকে এসেছিল' তার মেয়ে। গর্বে যেন বুক [illegible]

কোনো মহাপুরুষ বলেছিলেন, পৃথিবীতে যত রকমের প্রেম আছে তার মধ্যে মেয়ের প্রতি বাবার ভালবাসা সবচেয়ে স্বর্গীয়। 'He beholds her both with and without regard to her sex." স্ত্রীর প্রতি আমাদের ভালবাসার পিছনে কামনা আছে, ছেলের প্রতি ভালবাসার পিছনে আমাদের উচ্চাশা আছে, কিন্তু মেয়ের প্রতি ভালবাসার পিছনে কিছুই নেই। বইতে পড়া কথাগুলোই আজ যেন সরাবজীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখলাম।

সরাবজীর দুঃখের কথা সেদিনই শুনেছিলাম। সরাবজী কোনোদিন স্ত্রী বা মেয়েকে বার-এ আসতে দেন নি।

ভোর নটা পর্যন্ত বাড়িতে থাকেন তিনি। তারপর বাজার নিয়ে রেস্টুরেণ্টে আসতেন। দুপুরে বাড়ি থেকে ভাত আসতো। বিকেলে একবার চা খাবার জন্যে বাড়ি যেতেন। তারপর শুরু হতো বার-পর্ব। যত রাত বাড়বে তত সমস্যা বাড়বে। সাড়ে দশটায় দরজা বন্ধ করা প্রতিদিনই সমস্যার ব্যাপার। অনেকে উঠতে চায় না। অনেকে বলে, বার খুলে রাখো। বলতে হয়, খুলে রাখবার লাইসেন্স নেই। লোকে গালাগালি করে, গেলাশ ভাঙে। সরাবজী দেখতে পারেন না। কয়েকজনের জন্যে রিকশা বা ট্যাক্সি ডেকে দেন। নেশার ঘোরে হয়তো গাড়ি চাপা পড়বে।

লোকগুলো যখন আসে কেমন সুস্থ। হাসে, নমস্কার করে, কেমন আছে খবর নেয়। কিন্তু তারপরেই ধীরে ধীরে রঙ বদলাতে শুরু করে। কতবার ইচ্ছে হয়েছে বলেন, সামান্য একটু খেয়ে বাড়ি ফিরে যান। হাউস গার্লরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বলতে সাহস হয় না।

মেয়ে বলেছে, 'বাবা তোমার দোকানে যাবো।'

"না মা, ওখানে যেতে নেই। ওখানে আমার অনেক কাজ, খুব ব্যস্ত থাকতে হয়।"

"কেন বাবা, গেলে কী দোষ হয়?"
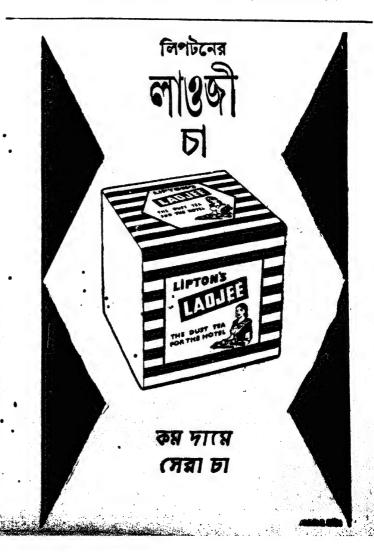
"ছিঃ অবাধ্য হয়ো না মা, ওখানে যেতে নেই।"

বড় হয়েছে মেয়ে, ফুলের মতো বসন্তের সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর মেয়ে। কত বুদ্ধি, কত জ্ঞান, কত বিদ্যা অথচ কত সরল। সংসারের কিছুই জানে না। মেয়ে কতবার বলেছে, "বাবা তোমার মতো আমিও ব্যবসা করবো।"

বাবা বলেছেন, "না মা, তুমি প্রফেসর হবে। বিরাট পণ্ডিত হবে। দেশ বিদেশের লোকরা বলবে ওই মূর্খ লোকটার মেয়ে কত শিখেছে।"

মেয়ের বিলেত যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে ছেড়ে সরাবজী কেমন করে অতোদিন থাকবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না; কিন্তু উপায় কী? ডক্টর মিস সরাবজী হয়ে তাঁর মেয়ে যেদিন আবার ফিরে আসবে সেদিন? সেদিন তো কাগজে তাঁর মেয়ের ছবি বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু সে রাত্রে মেয়ের যে কী হলো। সরাবজীর বার-এ এখন তাণ্ডব-নৃত্য শুরু হয়েছে। মেজের উপর তখন একজন শুয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে গাঁজা বেরোচ্ছে। বেঞ্চের উপর দু'জন গুম হয়ে গেলাশ নিয়ে বসে আছে। বলছে, "বেয়ারা, আউর এক পেগ লে আও।"

বেয়ারা বলেছে, "হুজুর এই পেগের বিলটা। আমরা কী করবো হুজুর, একসাইজ আইন। বিল পরের পর আসবে, আর মিটিয়ে দিতে হবে।"

সরাবজী কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছিলেন, "আপনাকে কী দেবো?"

"একেবারে নির্ভেজাল হুইস্কি। যেন গলা দিয়ে নামতে নামতে সব জ্বালিয়ে দেয়।"

বেয়ারারা একা সব সামলাতে পারছিল না। তাই সরাবজী নিজেও ছোটাছুটি করছিলেন। এমন সময় মাতালদের মধ্যে কার আবির্ভাবে যেন চাপা গুঞ্জন উঠলো।

"কে?" চমকে উঠে সরাবজী দেখলেন তাঁর মেয়ে।

"তুই? তুই এখানে?" সরাবজী কোনো রকমে বললেন।

মেয়ে বাবাকে চমকে দেবার জন্যেই এসেছিল। বাবাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরবে। আর ক'দিন? তারপর কতদিন আর বাবার সঙ্গে দেখা হবে না। অথচ এখন বাবার পাশে বসে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করছে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে, "বাবা, তুমি যখন অনাথ আশ্রমে ছিলে তখন তোমাদের মাখন দিতো।"

বাবা বলবেন, "না মা, মাখন কোথায়। তিন টুকরো পাঁউরুটি কেবল।"

মেয়ে নিজেও যেন এমন দৃশ্য কোনোদিন দেখেনি। একটা বিরাট কড়ার মধ্যে কতকগুলো অপ্রকৃতিস্থ লোক যেন টগবগ করে ফুটছে। বাবার হাতের পেগ-মেজারটা কেঁপে উঠে কিছুটা মদ টেবিলে পড়ে গেল। মেঝেতে যে লোকটা পড়েছিল সেও এবার যেন উঠে বসে বললে, "আমিও একটা বড়া পেগ চাই।"

মেয়ে যেন স্তম্ভিত। আনন্দ করে বাবাকে নিয়ে পালাবে বলে ঠিক করেছিল। তার মুখে কে যেন কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। "বাবা আমার সঙ্গে যাবে না?"

মেয়ের হাত ধরে বাবা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, তাঁর দেহ কাঁপছে। কোনো রকমে বলেছেন, "তুমি বাড়ি যাও। এখন বার বন্ধ করবার উপায় নেই। ওরা রেগে গিয়ে সব ভেঙে দেবে।"

বাড়িতে ফিরে এসে সরাবজী দেখেছিলেন মেয়ে শুয়ে পড়েছে।

পরেরদিন মেয়ের সামনে যেতে তাঁর যেন ভয় করেছে। যেন মেয়ের কাছে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন।

বিলেত যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। কিন্তু মেয়ে যেন কেমন মনমরা হয়ে আছে। সভ্যতার সর্বনাশা রশ্মি যেন মেয়েটার মনকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

সরাবজী ভেবেছেন মেয়েকে গিয়ে জড়িয়ে ধরবেন। বললেন, "কেন মা তুই এ-সব ভাবছিস, তুই পড়াশোনা কর। তুই কত বড় হবি" কিন্তু কিছুই বলতে পারেননি।

তারপর যাবার দিনে ভোরবেলায় বোধহয় বাবা ও মেয়ের একান্তে দেখা হয়েছিল। মা তখন ঘুমিয়ে। বাবা নিভৃতে মেয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন।

"তুই কিছু বলবি? তোর মুখ দেখে ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে তুই আমাকে কিছু বলতে চাস?"

মেয়ের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছে। কোনোরকমে বলেছে, "আমার ভয় করছে বাবা। যাদের সেদিনকে তোমার দোকানে দেখে এলাম তাদের মা, বোন, স্ত্রী, মেয়েরা হয়তো চোখের জল ফেলছে। তারা তোমাকে কী ক্ষমা করবে?"

বাবা চমকে উঠেছিলেন। বলতে গিয়েছিলেন, "আমি কী করবো? আমার কী দোষ? আমি তো আর ওদের টেনে নিয়ে এসে বার-এ ঢোকাচ্ছি না। আমি সৎপথে ব্যবসা করি।" কিন্তু কিছুই বলতে পারেননি।

মেয়ে ট্রেনে চড়ে বোম্বাই গিয়েছে। এবং সেখান থেকে জাহাজে বিলেত। কিন্তু সরাবজী নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি শুধু মেয়ের বিষন্ন মুখ দেখতে পেয়েছেন। মেয়ে যেন তাঁকে প্রশ্ন করছে—তারা কী তোমায় ক্ষমা করবে?

মনের দ্বন্দ্বে কাতর হয়ে পড়েছেন সরাবজী। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, "আমি কি বলেছি তোমরা অতো পেগ খাও। এক পেগ খেয়ে উঠে গেলেই পারো।...আমি কী করবো, আমি না খাওয়ালে তোমরা অন্য দোকানে গিয়ে খাবে।" কিন্তু মেয়ে যেন তাকে প্রশ্ন করছে। তিনি মনে মনে বলেছেন, "ওদের স্ত্রী, মেয়েরা তো বারণ করলেই পারে। আমি কী করবো? আমি সামান্য মদের ব্যবসায়ী, যত দোষ আমারই হলো?"

কিন্তু কিছুতেই পারেননি। যতই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন ততই যেন একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে বসেছে। সেই চিহ্নটা যেন ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে।

সরাবজী ভয় পেয়ে গিয়েছেন। স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন যত লোক তাঁর দোকানে এসেছে তাদের মা, বোন, বউ, মেয়ে সবাই চোখের জলে তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছে। সেই অভিশাপের বিষবাষ্প যেন শুধু তাঁকে নয়, তাঁর সংসার, এমন কি তাঁর মেয়েকেও গ্রাস করছে।

সরাবজী পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন, তারপর একদিন মরিয়া হয়ে বার বিক্রি করে দিয়েছেন। সেই রাত্রেই মেয়েকে তিনি চিঠি লিখতে বসেছিলেন, "আমার কী দোষ? ওরা যদি নিজে এসে দোকানে বসে মদ খেয়ে নিজেদের সংসার নষ্ট করে থাকে, তাতে আমার কী দোষ?"

এইখানেই শেষ হলে ভাল হতো। বিক্রির টাকাটা ব্যাংকে রেখে সরাবজী ছোট্ট সংসার চালিয়ে নিতে পারবেন ভেবেছিলেন।

কিন্তু সেখানেই মুশকিল হলো, ব্যাঙ্ক ফেল পড়লো। যেদিন বিক্রির চেকটা ব্যাংকে জমা দিয়েছিলেন তার দু'দিন পরে।

হয়তো অভিশাপ, হয়তো চোখের জলের ফল।

সরাবজী কী করবেন? মেয়েকে তাঁর পড়াতে হবে। অবশিষ্ট যা আছে তাতে মেয়েকে বিলেতে রাখা যাবে না।

কাজ চাই। কিন্তু ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়া লোককে কে চাকরি দেবে?

তাই ঘুরে ফিরে আবার বার। তবে চাকরি। সরাবজী ফিস ফিস করে আমাকে বললেন, "এবার আমি তো চাকরি করছি। আমি কী করবো? যদি কোনো অভিশাপ কেউ দেয় সে নিশ্চয় আমাকে লাগবে না।"

সরাবজীর চোখে নিশ্চয়ই জল ছিল না। কিন্তু আমার মনে হলো যেন সেখানে দু'ফোটা জল রয়েছে। সরাবজী আমাকে যেন দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি চোখ বুজে ঈশ্বরকে বোধহয় আর একবার প্রশ্ন করছেন, 'চাকরি করলে নিশ্চয়ই কোনো দোষ নেই? আমাকেও তো সংসার প্রতিপালন করতে হবে।'

আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতভাগ্য সরাবজী উঠে পড়ে এবার নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আর আমি সংসারের সৌরমণ্ডলে এক নতুন নক্ষত্র আবিষ্কারের আনন্দে বিস্মিত অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্যারিস, ১২ মার্চ, ১৯৬২

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার অসংখ্য পাঠকপাঠিকার কাছে ফরাসী দেশের গল্প, ফরাসী জাতির বাহ্যিক আচরণের ভেতরে যে একটি ভাবগম্ভীর রূপ বিরাজ করছে, তার কথা বলতে বসে কেবলই ভাবছি কোথায় আরম্ভ করি! কত কিছু বলার আছে! টুরিস্টের চোখে দেখা মদের গেলাস নিয়ে প্রমোদবিলাসে মত্ত প্যারিসের কথা নয়, সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে এই প্যারিস শহরেই অথবা প্যারিস শহরের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে ফরাসী দেশের দূরদূরান্তরে, গ্রামে-শহরে - বনে - প্রান্তরে-পাহাড়ে-সমুদ্রতীরে, ফরাসী জাতির যে কর্ম, চিন্তা, ধর্ম অথবা তার যে জীবনস্পন্দন শুধু ফরাসী সভ্যতার নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বসভ্যতার প্রেরণার উৎসরূপে অবস্থিত, আমি তার কথাই বলতে চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে ছোট দুই-একটি কথা বলে নিতে চাই। আমার ক্ষোভ ও অভিযোগ। বিশ্বসভ্যতায় ফরাসী সভ্যতার দানের কথা বাদ দিলে ফরাসী জাতি ও তার দৈনন্দিন কর্ম, ধর্ম, আচার সম্বন্ধে আমরা যেমন অজ্ঞ আমাদের দেশে, এ দেশের লোকও ঠিক তেমনি আমাদের দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ভারতীয় সভ্যতা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এ কথাটা হয়ত অনেকেই বলবে; মনু, বেদ, পুরাণের গল্পও হয়ত শুনতে পারেন অনেকের মুখে। ফরাসী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগে চন্দননগর, পণ্ডিচেরীর অবস্থান কোথায় সে কথাটাও অনেক ছেলেমেয়েই বলে দেবে। নবীন ভারতে রাজনৈতিক কারণে নেহরুর নাম জানে প্রায় সবাই, আবার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে 'তাগোর' (রবীন্দ্রনাথ)-এর নামও জেনে গেছে অনেকেই। কিন্তু সব মিলিয়ে ফরাসী জাতি জেনেছে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অস্পৃশ্যতা, ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো "পবিত্র" গরুর কথা। সতীদাহ এখনও হয় কিনা এ [illegible]

এই যে পারস্পরিক অজ্ঞতা—এ দূর করার উপায় কি? আমাদের সরকারী মহলে একটা কথা প্রায়ই শুনে আসছি। আমরা যেসব ভারতীয় বিদেশে আছি, আমরাই হলাম ভারতের বেসরকারী রাষ্ট্রদূত। স্বীকার করি সে কথা। কিন্তু ভারতের কথা বিদেশের মাটিতে প্রচার করার কোন দায়িত্বই কি নেই ভারত সরকার ও ভারতের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের? প্যারিসে ভারতীয় দূতাবাস বা ভারত সরকারের টুরিস্ট অফিস যে প্রচেষ্টা করছেন তা অত্যন্ত নগণ্য, অসম্পূর্ণ ও নৈরাশ্যকর। আমাদের দূতাবাস থেকে ন' মাসে ছ' মাসে সাইক্লোস্টাইল করা নিউজ-প্রিন্টের কয়েকটি পৃষ্ঠা প্রকাশ করা হয়।

ফরাসী ধর্মানুষ্ঠানে আঞ্চলিক পোশাকে সজ্জিতা তিন তরুণী

তাতে থাকে ভারতের চতুর্থ শ্রেণীর রাজনীতিবিদের বক্তৃতার সারাংশ (পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা বাদে) এবং ফ্রান্সের পঞ্চম শ্রেণীর কাগজে ভারতের স্তুতির সারাংশ। এ ছাড়া থাকে শিল্প ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় দুই-চারটে চুটকি খবর। ভারতীয় ফিল্ম ডিভিসনের তোলা কিছু ছবি আছে দূতাবাসে। ছবিগুলি ভালো হলেও তার অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় বিবৃত। ফরাসী দেশে ইংরেজী ভাষায় প্রচার ফিল্ম পাঠাবার কি সার্থকতা তা শুধু নয়াদিল্লির সরকারী মহলই বলতে পারবেন। এ বিষয়ে ভারতীয় দূতাবাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কয়েকবার কিন্তু [illegible] কিছুই হয়নি।

ভারতবর্ষের প্রচার বিষয়ে ফরাসী দেশে সবচেয়ে বড় অভাব বোধ করেছি একটি সুসংবদ্ধ সংস্কৃতি কেন্দ্রের। ইউ এস আই, ব্রিটিশ কাউন্সিল অথবা আলিয়াঁস ফ্রাঁসেসের মত প্রতিষ্ঠানের কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, তার সেই সংস্করণও খুলতে পারিনি আমরা এ দেশে। প্যারিসে বছরে দুবার ভারতীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়। দেওয়ালী ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় ছাত্র-সংসদের পরিচালনাধীনে। আর একবার ছাত্রদের আন্তর্জাতিক গার্ডেন পার্টিতে একটি ভারতীয় স্টল ভারতীয় ছেলেমেয়েরা পরিচালনা করেন। ভারতীয় ছাত্রদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। আর তাঁদের বলবই বা কি? ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের থাকবার জন্য একটা হোস্টেলই আজ পর্যন্ত ভারত-সরকার বা ভারতের বেসরকারী মহল করে দিতে পারলেন না টাকার অভাবের অজুহাতে! ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার আর কি করে হবে?

আপনারা হয়ত ভাবছেন ভারতবর্ষের প্রচারের কথা কেন বলছি এখানে। খুব সাধারণ ব্যাপার। ফরাসী দেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে, ফরাসী দেশের বহু লোকের সঙ্গে কথা বলে এই ধারণাই হয়েছে আমরা যে এ দেশের লোক সরলভাবে, আন্তরিক-ভাবে আমাদের দেশ ও আমাদের সভ্যতা সম্বন্ধে জানতে চায়। আমাদের দেশ সম্বন্ধে একটা বিরাট শ্রদ্ধা, বিরাট কৌতূহল রয়েছে এ দেশের লোকের। ফরাসী দেশে অসংখ্য মানুষের অন্তরের এই কথাটি জানিয়ে দিলাম আপনাদের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখেছি যে, ভারতের প্রচার ভারতীয়দের চাইতে বেশী করেছে এ দেশের পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিসন। কয়েকদিন আগে স্থাপিত হল প্যারিসে একটি ভারতীয় গ্রন্থাগার। তা ছাড়া ত রয়েইছে "সরবন" বিশ্ববিদ্যালয়ের "Institut de la Civilisation Indienne" (ভারতীয় সভ্যতা ইনস্টিট্যুট)। আজ মানবসভ্যতার অতি সঙ্কটমুহূর্তে বুঝি ফরাসী জাতি ভারতীয় মনীষার পুণ্যসলিলে অবগাহন করে সভ্যতার বিভিন্ন যুগে ভারতীয় ঋষি যে-অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন সেই উক্তারের [illegible]

মধ্যে নিজের স্থিতির নিরাপত্তাই খ‍ুঁজে পেতে চাইছে। তাই কাগজে, লোকমুখে, রেডিও-টেলিভিসনে আজকের পৃথিবীর রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে ভারতের প্রত্যেকটি সুচিন্তিত পদক্ষেপকে "Sagesse Hindon" বলে বিবৃত হতেই শুনেছি। আন্তরিকভাবে আশা করি, ভারতীয় সরকার ও আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকেই ফরাসী জাতির ভারতবর্ষকে চেনার এই আগ্রহকে পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন।

একটা কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, ফরাসী দেশ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে-শিল্পে-সুরে যুগ-যুগ ধরে সমস্ত বিশ্ব-মানবতাকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই ফরাসী দেশের চিন্তা, মেধা, সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র ল্যাটিন কোয়ার্টারে আমার হোটেলের একতলার কোণের দিকে তিন বছরের ঘরের বিছানায় বসে আপনাদের কাছে চিঠি লিখতে লিখতে এইসব কথাই ভাব-ছিলাম। বাইরে আবার সেই দুপুর থেকে টুপ টুপ করে বরফ পড়ছে, পড়ছেই। ঝুপ ঝুপ করে নয়, তুলোর পাঁজাও নয়। শক্ত, ছোট ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ, কিন্তু অনেক, অনেক। জানালার ভেতর দিয়ে উঠোনের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সব সাদা। ন্যাড়া গাছের মাথাগুলো, মেট্রোর লাইনের ধার-গুলো, পার্কের ঘাস, রাস্তা, গাড়ি সব সাদা। রুপোলী রঙ মাখিয়ে দিয়েছে যেন কোন অদৃশ্য হাত। প্যারিস শহরে ঠিক এই সময়টাতে বরফ পড়া একটু অস্বাভাবিক। বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে নিশ্চয়ই এখন বসন্তের মনমাতানো সুর, আর পলাশের আগুন। এখানেও আমরা অপেক্ষা করছি প্রত্যেক বছরের মত বসন্তসুন্দরীর সলজ্জ আগমনের। তখন শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের মনও মাতোয়ারা হয়ে যাবে। একটু রোদের জন্য, একটু গরম হাওয়ার জন্য কত আকুল আগ্রহ, ব্যাকুল প্রতীক্ষা। আসুক না বসন্ত একটু দেরিতেই, তাই বলে উৎসব শুরু করতে বাধা কোথায়? বসন্ত ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী Anna Perenna-র সম্মানে যুগের পর যুগ ধরে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। আজ সেটা শুধু ঐতিহ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারিস শহরে "Mi-careme" অথবা "Marti gras" শুধু একটা কথার কথা। কিন্তু Nantes Nice ইত্যাদি শহরে আজও "Mi-Careme" উপলক্ষে খুব জাঁকজমক করে উৎসবের আয়োজন করা হয়—কার্নাভাল হয়। ফরাসী দেশের এই লোক-উৎসব প্রায় অবলুপ্তির
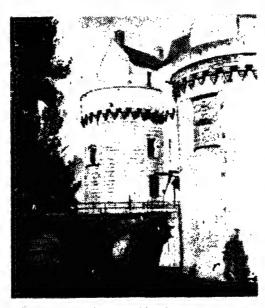
নান্তিল্-এর ঐতিহাসিক দুর্গ

পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে—একটা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে। তবু আজও কোন কোন শহরে পুরনো ঐতিহ্যের স্মরণে ব্যবসায়ী দোকানী, দোকানের কর্মচারী অথবা লণ্ড্রীওয়ালা রাজা ও রানী নির্বাচন করেন এবং তারপর নাচগান, আমোদ-প্রমোদসহ বিরাট মিছিল বার করেন। বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে ফুল-পাতা-কাগজে সাজানো নানারকম বিজ্ঞাপনসহ রথ, বাদ্যভাণ্ড ইত্যাদি সহকারে মিছিল বের হয়। বিভিন্ন রঙের কাগজের Confetti (পাঞ্চিং মেশিনের ছোট ছোট গোল কাগজের টুকরো) এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। টন টন Confetti ছড়ানো হয় সবার গায়ে মাথায়। আমাদের দেশের আবীরের মত! ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল অথবা দিল্লির স্বাধীনতা উৎসবে সংস্কৃতি মিছিল যদি দেখে থাকেন তবে অনেকটা সাদৃশ্য খ‍ুঁজে পাবেন এই মি-কারেমের মিছিলের সঙ্গে।

৪০ দিন অত্যন্ত কঠোর সংযমে থাকতে হয়। এই অধ্যায়কে বলা হয় 'কারেম'। 'কারেম' শুরু হয় এক বুধবার। তার আগের মঙ্গলবারকে বলা হয় "Marti gras"। এইদিনই খুব আমোদফূর্তির মধ্যে কার্নাভাল হয়। আর ৪০ দিনের অধ্যায়ের তৃতীয় সপ্তাহের বৃহস্পতিবার হয় 'মি-কারেমে'র উৎসব। আজও লৌকিক আচার অনুযায়ী "Marti gras"-এর দিন মাংসের বাসনপত্র আগুনে দিয়ে দেওয়া হয়।

কার্নাভালের ইতিহাস কিন্তু আরও পুরনো। আজকের দিনে কার্নাভালের সময় মুখোশ পরার যে ব্যাখ্যা করা হয়, তা কিন্তু কার্নাভালের সৃষ্টির সময়কার ব্যাখ্যার চাইতে ভিন্ন। আনন্দের এই উচ্ছ্বাস এবং মুখোশ পরার উদ্দেশ্য হল সাময়িক-ভাবে অশুভ শক্তির কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া। জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে মানুষ সাময়িকভাবে জানোয়ারদের অমিত শক্তির (প্রতীক) অধিকারী হয়। কার্নাভালের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে মুখোশ-নৃত্যই সবচেয়ে জনপ্রিয়। রেনাসাঁস্-এর সময় মুখোশ পরার অন্য ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয়, জন্তুর মুখোশ পরে ক্ষণকালের জন্যও মানুষ 'ভালো বর্বরে' পরি-ণত হয়। এই বর্বরতা হল সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে যে আনন্দময় সরলতার প্রকাশ তারই প্রতীক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে কার্নাভালের প্রকাশ হয় 'অপেরা'র মুখোশ নৃত্যে। ১৭৯০ সালে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার চালু হয় কিছুদিন বাদে। আজকের প্যারিসের 'অপেরা'তেও মুখোশ-নৃত্য হয়।

রবিবারের বরফ-ঝরা দিনে মি-কারেমে'র কথাই ভাবছিলাম—শীগগিরই আসছে মি-কারেমের উৎসব। আর 'মি-কারেমে'র সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমার বহুদিনের সুখ-স্মৃতি। Nantes শহরে। ফরাসী দেশের পশ্চিম উপকূলে Britagne-এর নীচের দিকে শহর। মাঝারি গোছের শহর, কিন্তু শিল্পপ্রধান। বলতে গেলে প্যারিসের পর এখানেই আমার ফরাসী জীবনের সঙ্গে পরিচয় শুরু। শুরু হয়েছিলও 'মি কারেম' উৎসব দিয়েই।

ফ্যাক্টরী ছুটি হয়ে গেল. বেলা সাতটার সময়। [illegible]

দেখা যায়। মিছিল শেষ হলে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব Nantes এর High Society-র সঙ্গে।" অর্থাৎ আধুনিক ফরাসী তরুণ-তরুণীর সঙ্গে!

খেয়েদেয়ে গেলাম বন্ধুটির বাড়ি। কিন্তু রাস্তায় অসম্ভব ভিড়। অগুনতি লোক শহর, গ্রাম থেকে এসে ভিড় জমিয়েছে গির্জার চত্বরটার ধারে—যেখানে শহরের বড় রাস্তাটা সোজা চলে গেছে Looie নদীর দিকে।

বন্ধুটির পাঁচতলার ঘরে Dalida-র একটা গানের রেকর্ড বাজছে। ঘরের সামনে এক চিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে অগুনতি মাথা দেখতে পেলাম। বাড়ির জানালায়, বারান্দায়, কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। চারদিকে উড়ছে রংবেরঙের কাগজের ফিতে ও কাগজের 'কনফেটি'! বসন্তের হাওয়া এসেছে বুঝি পশ্চিমের এই শহরটাতে। ও কি! দুটো মিলিটারী ট্যাঙ্কের মত গাড়ি এসে কামান দাগতে শুরু করলো কেন? না, আগুনের গোলা নয়! 'কনফেটি'র গোলা ও সুগন্ধি জল। শোনা যাচ্ছে বাজনা! এগিয়ে আসছে মিছিল। জনসমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠল।

ওই তো আসছে ফুলের রথে চড়ে বসন্তরানী। হ্যাঁ, রানীই বটে। অপরূপা সুন্দরী। সেজেছেও অপরূপ করে। সখী-পরিবেষ্টিতা রানী চটুল চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করে এবং বহু বক্ষে মদনবাণ নিক্ষেপ করে চলে গেল। রানী মাঈ কি জয়! Vive la reine! না, না, শেষ হয়নি। সুন্দর সুন্দর ছেলে-মেয়েরা Britagne-এর রঙবেরঙের অপরূপ পোশাক পরে লোকনৃত্য করতে করতে চলেছে রাস্তা দিয়ে। মুখোশনৃত্যও বাদ যায়নি। এক ঘণ্টা ধরে চলল এই মিছিল।

এর পর গেলাম বন্ধুটির সঙ্গে তার 'হাই সোসাইটি'তে। বন্ধুটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু দূরেই এই বাড়ি। দুই হাতে জনসমুদ্র ঠেলতে ঠেলতে হাজির হলাম দোতলার ড্রয়িং রুমে। বিরাট পার্টির আয়োজন করেছেন "হাই সোসাইটি'র অন্যতমা সদস্যা (আমার বন্ধুটির বান্ধবী) এই বাড়ির বাসিন্দা (বাসিন্দা বলছি এই জন্যে যে, মেয়েটি তার বাপ-মার সঙ্গে থাকে) অপরূপ সুন্দরী একটি তরুণী মেয়ে, বছর ২২।২৩ বয়স হবে। পরিচয় হল একটু পরেই। মেয়েটি সাদর অভ্যর্থনা করে ড্রয়িং রুমে অন্যান্য আমন্ত্রিত (হাই সোসাইটির অন্য সদস্য-সদস্যা) তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। খাদ্য, পানীয়, বাজনা, নাচ, কনফেটি। মি-কারেমের পার্টি। উৎসব করো! আনন্দ করো। খাওয়া, পান ও নাচের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী [illegible]

হচ্ছিল না এই তরুণ দলের। আধুনিক ফরাসী দেশ, তার সমাজ, তার চিন্তা, কর্ম ইত্যাদি বুঝতে হলে সমাজের কাঠামো তরুণ-যুবক-নবীনদের শক্তির উৎস ও ব্যবহার জানা প্রয়োজন। উৎসবের পবিত্র আনন্দে মত্ত তরুণ দলের স্বপ্নলোকে কোন্ অচেনা ভবিষ্যতের আলো-আঁধারির খেলা সেটা একবার জানা প্রয়োজন। দেশের এবং সমাজের ভবিষ্যৎ এই তরুণদল সমাজের কাছে কতটুকু পাচ্ছে এবং সমাজকে তার বিনিময়ে কতটুকু দিচ্ছে তা বলব অন্য এক জায়গায়। তবে পরস্পরের
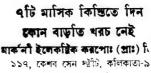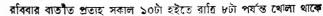
বাহুসংলগ্ন, বাজনার তালে তালে পা-মিলিয়ে-যাওয়া উচ্ছ্বসিত তরুণতরুণীর পার্টি ফ্রান্সে প্রায়ই দেখতে পাবেন। ফরাসী সমাজের গভীরে গিয়ে সুস্থ পরিবেশে তরুণ-তরুণীর সাবলীল, সৌহার্দাপূর্ণ সম্পর্ক ফরাসী সমাজ-ব্যবস্থায় কতটা প্রভাব এনেছে তাও জানা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করব।

রাত নটা। আমি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বাড়ি চলে এলাম। পরে জেনেছিলাম পার্টি চলেছিল রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। রাত বারোটার পর শহরের এক 'কাফে'তে ও শহরের কেন্দ্রস্থলে গোল চত্বরটাতে যেখানে Mairie (আমাদের কর্পোরেশন?') থেকে নাচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আজ এখানেই শেষ করি।

আমার শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানবেন।

ইতি—

—অজিতকুমার দাস

॥ ১ ॥

ঝিন্‌কে সেদিন রাত্রে ঘোষাল ডাক্তারের আড্ডায় ফিরবার আগে নিজের বাড়ি গেল। ডাক্তার ঘোষালই ঝিন্‌কের পরিবারের জন্য একটা আলাদা আস্তানা ক'রে দিয়েছিলেন। ঝিন্‌কে অবশ্য প্রায় অধিকাংশ সময়ই ডাক্তার ঘোষালের বাসায় থাকত, কিন্তু তার ছোট বোন শামুক, কাকা যতীনবাবু আর ভাইপো কনক থাকত আলাদা একটা বাড়িতে। সে বাড়ির সমস্ত খরচ চালাত ঝিন্‌কে। কেমন ক'রে চালাত যতীশবাবু সে খবর রাখা প্রয়োজন মনে করতেন না। তিনি যেন ধরেই নিয়েছিলেন সংসার চালাবার দায়িত্ব তাঁর নয়। তিনি এমন একটা ভাব দেখাতেন যে, দেশ ছেড়ে তিনি আসতে চাননি, ঘোষালের ধাপ্পায় আর ওই মেয়ে দুটোর জেদে তাঁকে তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে চলে আসতে হয়েছে। সুতরাং তারাই সংসার চালাক। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, তিনি যেন কোনও পলাতক রাজা, বাধ্য হয়ে নিজের রাজত্ব ছেড়ে বিদেশে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বাস করছেন; বাস করতে হচ্ছে তাঁকে। যারা তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে এনেছে তারাই তাঁর ভরণ-পোষণ করবে, করতে বাধ্য তারা। তিনি নিজে কিছু কাজ করতেন না, বলতেন—আমি কাজ করতে অভ্যস্ত নই। কাজ করবার দরকার হয়নি কখনও। দেশে খাওয়ার অভাব ছিল না। জমিতে ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, গাছে নারকেল ছিল, দুধের বান ব'য়ে যেত বাড়িতে, তরি-তরকারি প্রচুর হ'ত নিজেদেরই বাগানে। দেশে তাঁর কাজ ছিল থিয়েটার করা, বাচ খেলা, মাছ ধরা আর মোড়লি ক'রে বেড়ানো। তাঁর এখনও ধারণা, দেশে যদি তিনি থেকে যেতেন তা হলে এই হই-হল্লার তুফানটা কেটে গেলে আবার সাবেকভাবে থাকতে পারতেন তিনি। মুসলমানরা সবাই খারাপ নয়। অনেকেই তাঁকে ভালবাসত। হুজুগটা কেটে গেলে আবার তিনি তাঁর [illegible] আসনে ফিরে পেতেন। একটা কথা অবশ্য তিনি চেপে যান। মুসলমানরা যখন তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল, তাঁর দাদাকে এবং ভাইপোকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, মেয়ে দুটোকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তিনি যে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন, ডাক্তার ঘোষাল নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে গুলী চালিয়ে ওই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন না হলে যে এখানে এসে এইসব বাহাদুরি করবার সুযোগও তিনি পেতেন না—এসব কথা যতীশবাবু উল্লেখ করেন না। ঝিন্‌কে এখানে তাঁকে বেশ ভালোভাবেই রেখেছে। তিনি দেশে প্রত্যহ একটা মাছের মাথা খেতেন, এখানেও তাই খান। বাজারের সেরা তরিতরকারি ঝিন্‌কে তাঁর জন্যে কেনবার ব্যবস্থা করেছে। খাওয়ার পর দই পায়েস মিষ্টান্ন খাওয়া তাঁর অভ্যাস, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। খুব সরু আলো চালের ভাত, মুগের ডাল, একদিন অন্তর মাংস (হয় খাসি, না হয় মুরগি, না হয় কাছিম)—কোনরকম অভাব রাখেনি ঝিন্‌কে। তিনি প্রতিদিন যখন খেতে বসেন তখন মনে হয় বাড়ির কাকা নয়, যেন বাড়ির জামাই খেতে বসেছেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও জামাইয়ের মতো। ফিতে-পাড় কাঁচি ধুতি, পেটেন্ট লেদারের পাম-শু, গ্রীষ্মকালে ভালো আদ্দির পাঞ্জাবি, শীতকালে দামী গরম জামা, শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, এমনকি বালাপোশ, পর্যন্ত কিনে দিয়েছিল তাঁকে ঝিন্‌কে। কিন্তু তবু তিনি ঝিন্‌কের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সন্তুষ্ট হতেন যদি বাড়ির কর্তৃত্বটা তাঁর হাতে থাকত। কিন্তু ঝিন্‌কে সেটা দেয়নি। তাঁর ইচ্ছা ঝিন্‌কে শামুক দুজনে যা রোজগার করবে, সব তাঁর হাতে এনে দেবে, তিনিই যাকে যা দেবার দেবেন। বলতেন, আমি পোষা-ময়না হ'য়ে থাকতে চাই না। আমি ওদের গুরুজন, আমিই বাড়ির কর্তা, আমাকে সেইরকমভাবে রাখতে হবে। না হলে—। না হলে তিনি যে কি করবেন তা আর খুলে বলতেন না। কিন্তু সর্বদাই একটা চোখ-রাঙানির ভাব নিয়ে থাকতেন। প্রথম চোখ-রাঙানি—আমাকে কেন দেশ থেকে জোর ক'রে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় চোখ-রাঙানি—এখানে কেন আমাকে বাড়ির সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হ'ত তিনি এসব লাঞ্ছনা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সহ্য করবেন না। কিন্তু করতেন। সকালে যখন গরম চায়ের সঙ্গে মাখন-লাগানো টোস্ট আর ডিম-ভাজা আসত সুট্ সুট্ ক'রে খেয়ে নিতেন। তারপর খবরের কাগজ নিয়ে পড়তেন, বর্তমান গবর্নমেন্টকে গালাগালি দিতেন খানিকক্ষণ, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করতেন। ওঠ-বস করতেন কয়েকবার, তারপর পার্কে গিয়ে চক্কর দিতেন অবশেষে। এখানে শরীরটাই হয়ে

উঠেছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। কি ক'রে শরীরটা ভাল থাকবে এই নিয়ে ক্রমাগত খুঁতখুঁত করতেন। নানারকম খুঁতখুঁতুনি ছিল তাঁর। তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল চাইলেন। জল পেয়ে চোঁ চোঁ ক'রে খেয়ে ফেললেন, তারপর বললেন জলটা ভারি মিষ্টি লাগছে। তার মনেই শরীর খারাপ হয়েছে। আর একদিন সেই একই জল খেয়ে বললেন, জলটা বিস্বাদ লাগছে আজ। এরও ওই এক সিদ্ধান্ত, শরীর খারাপ হয়েছে। সকাল বেলা প্রায়ই পেট চাপড়াতেন। বলতেন, পায়খানা পরিষ্কার হয় না। বলতেন, এ দেশের জলই এমন কষা যে, পায়খানা পরিষ্কার হওয়া অসম্ভব। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি—নানারকম ওষুধ খেতেন। বলতেন, কিছুতে কিছু হয় না। দেশে না ফিরলে শরীর ভালো থাকবে না। পনেরো দিন অন্তর ওজন নিতেন। ফিতে দিয়ে নিজের বুক, পেট, কবজি মাপতেন। একটু উনিশ-বিশ হলেই দুশ্চিন্তা। মাথা নেড়ে বলতেন, এ দেশে

শরীর টিকবে না। দেশেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দেশে যাওয়ার কোনও চেষ্টা করতে কেউ কখনও দেখেনি তাঁকে। সকলকে কেবল শাসাতেন, আর নয়, এইবার চলে যাব। পাড়ায় একটা চায়ের দোকান ছিল, সেখানে চপ কাটলেটও পাওয়া যেত, সেখানে প্রায়ই যেতেন যতীশবাবু। রোজ চপ কাটলেট খেতেন আর ফলাও ক'রে গল্প করতেন দেশের। এ দেশের সঙ্গে ও দেশের তুলনা-মূলক সমালোচনা ক'রে চায়ের দোকানের মালিক গোষ্ঠবাবুর দিকে চোখ পাকিয়ে বলতেন, যথেষ্ট হয়েছে, এ দেশে আর থাকব না মশাই, এ দেশে আমাদের শরীর টে'কে না।

এরকম একটা বাঁধা খদ্দের বেহাত হয়ে যাবে ভেবে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত করবার প্রয়াস পেতেন গোষ্ঠবাবু। বলতেন, এ দেশে যখন এসেই পড়েছেন, এইখানেই মন বসিয়ে থাকুন, কোথাও যাবেন না। ক্রমশ এ দেশের জল-হাওয়া আপনার সয়ে যাবে। শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। আমাদের বাড়িও শুনেছি পদ্মার ধারে ছিল এককালে। আমার ঠাকুরদা সেখান থেকে এসেছিলেন। আমরা তিনপুরুষ এ দেশে বাস করছি। খাসা আছি। এ দেশের জল-হাওয়া বেশ বরদাস্ত হয়ে গেছে আমাদের। দেখুন আমার বুকের ছাতি আর হাতের গুলি। রোজ আধ সের চালের ভাত হজম করছি। তোফা আছি। থেকে যান, যাবেন না। যতীশবাবু সাময়িকভাবে বোধ হয় আশ্বস্ত হতেন। দু-চার দিন আর যাওয়ার কথা তুলতেন না। তারপর আবার তুলতেন কিছুদিন পরে। এই প্রসঙ্গটা নিয়ে বারবার আলোচনা করাও তাঁর সময় কাটাবার একটা উপায় ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত হয়তো চলেই যেতেন, কিন্তু একটা ব্যাপারের জন্য তিনি এ দেশ থেকে নড়তে পারছিলেন না। আর সেটা এমন ব্যাপার যে, কাউকে বলাও চলে না। তিনি যদিও কোনও প্রমাণ পাননি কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারছিলেন যে, ঝিনুক-শামুক দুজনেই দেদার টাকা রোজগার করছে। কিভাবে রোজগার করছে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চাইতেন না, কিন্তু তিনি যে সে উপার্জনের কোনও অংশ পাচ্ছেন না এতেই তিনি বড় ক্ষুব্ধ হয়ে থাকতেন মনে মনে। পাকিস্তান থেকে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন, প্রচুর টাকা নিয়ে এখানে যদি আসতে পার তা হলে এখানেও বেশ সুখে থাকতে পারবে। টাকা ছড়াতে পারলে এখানেও বেশ আরামে থাকা যায়। যতীশবাবু প্রচুর টাকার আভাস পাচ্ছিলেন, কিন্তু তা ধরতে ছুঁতে পারছিলেন না, সেইটে হস্তগত করবার আশাই ছিল তাঁর এখানে থাকার প্রধান আকর্ষণ।

সেদিন অনেক রাতে ঝিনুক যখন এল তখনও তিনি জেগে বসে আছেন। ঝিনুক শামুক বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তাঁর ঘুম হয় না। বাড়িতে তিনি একা থাকেন, কনককে পর্যন্ত ঝিনুক বোর্ডিংয়ে দিয়ে দিয়েছে। তাঁর ঘুম আসে না। ডিটেকটিভের মনোভাব নিয়ে জেগে থাকেন যতীশবাবু। ভাবেন, ওরা রোজই নিশ্চয় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে আসে। টাকাটা রাখে কোথায়? কত টাকা আনে? এইসব চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না। তিনি ওত পেতে বসে থাকেন।

ঝিনুকের সঙ্গে সত্যিই সেদিন অনেক টাকা ছিল। ওরা যে চোরা-কারবারে লিপ্ত তার থেকে মাঝে মাঝে বেশ দমকা টাকা পাওয়া যায়। সেদিন সন্ধ্যার সময়ই ঝিনুক পান্ডার কাছ থেকে হাজার টাকা পেয়েছিল। তারপর ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছ থেকে যে ভারী ব্যাগটা তারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাতে অনেক দামী মাল ছিল। সুবেদার খাঁ মালটাকে নিজের হেফাজতে রাখতে ভরসা পান নি। ডাক্তারবাবুর আপাত-নিরীহ ব্যবহারে তাঁর সন্দেহ ঘোচেনি। যে ধনী ব্যবসায়ীটি সাধারণত তাঁদের মাল গোপনে কেনেন সুবেদার খাঁ সেই দিন রাত্রেই ব্যাগটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। এই ক্রেতার সঙ্গে এ'দের কারো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। পরিচয় রাখাটা নিরাপদ নয়। এদের কারবারটা চলে বড় অদ্ভুত উপায়ে। শহরের প্রান্তে হরিবোল নামে এক অন্ধ বৈরাগী থাকে। তার বাড়িতেই চোরা মালটা আনা হয় প্রথমে। সেখানেই মালটার একটা দামও ঠিক ক'রে ফেলেন সংগ্রাহকরা। তারপর সেই জিনিসগুলো আর দামের বার্তা নিয়ে একটা রিকশায় চড়ে হরিবোল যায় সেই ধনী ক্রেতার কাছে। ধনী ক্রেতা হরিবোলের মারফতই একটু দর-দস্তুর করেন। তারপর মালটা কিনে নেন। হরিবোলই রিকশায় ক'রে মাল নিয়ে যায়, টাকাও নিয়ে আসে। এরজন্য প্রতিবারে সে এক শ' টাকা নগদ পায়। হরিবোল ঠিক করেছে ওই টাকা জমিয়ে সে ছোট-খাটো একটি মন্দির করবে তার কুঁড়ে ঘরের পাশে, আর সে মন্দিরের নাম দেবে হরিবোল মন্দির। সুবেদার খাঁ তাকে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন এই ব্যবসার কথা যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায় তা হলে তার মৃত্যু হবে। আর সে যদি ভালোভাবে কাজ করতে পারে তা হলে তার মজুরি ছাড়াও পরে আরও কিছু টাকা "বোনাস" স্বরূপ তাকে দেওয়া হবে। হরিবোল যে শুধু টাকার লোভেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা নয়, এর সঙ্গে কৃতজ্ঞতার আমেজও ছিল কিছু। ডাক্তার ঘোষালের রোগী সে। প্রায়ই পেটের অসুখে ভোগে এবং ডাক্তার ঘোষাল বিনা পয়সায় তার চিকিৎসা করেন। ডাক্তার ঘোষালই ওকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। দিনের বেলা হরিবোল মাকি ঠকঠক করে হরিনাম গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়। এই লোকই যে এত বড় একটা

ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে তা কল্পনা করা সত্যই শক্ত। তা ছাড়া সে অন্ধ ব'লে আরও সুবিধা হয়েছিল। কারও মুখ দেখতে পেত না।

সেদিন ব্যাগের ভিতর ছিল সোনারুপোর বাট আর কিছু জহরত, চুনি পান্না হীরে, এই সব। সুবেদার খাঁ এর দাম ঠিক করেছিলেন প'চাত্তর হাজার টাকা। কিন্তু ধনী ক্রেতাটি এ দাম দিতে রাজি হন নি। জিনিসগুলি দেখে তিনি বললেন, এসব পাচার করতে আমাকে আরও অনেক খরচ করতে হবে, বেগও পেতে হবে প্রচুর। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী দিতে চান নি। সুবেদার খাঁ রাজি হলেন না এ টাকায়। অবশেষে ষাট হাজার টাকায় রফা হয়। হরিবোলকে সেদিন কয়েকবারই রিকশায় করে যাতায়াত করতে হয়েছিল। অবশ্য প্রত্যেকবারই আলাদা রিকশায়। সুবেদার খাঁ এসব ব্যাপারে খুব সাবধানী। এ ব্যবসায়ের বারোজন অংশীদার। এই শহরে চারজন—ঘোষাল, পাণ্ডা, সুবেদার খাঁ আর ঝিনুক। বাইরের আটজন। সকলেই সমান অংশ পায়। হংকং-এর দুজন অংশীদারকে দশ হাজার টাকা আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুকের অংশে যে পাঁচ হাজার টাকা হয়েছিল, সে টাকাটা সে তো পেয়েই ছিল, সুবেদার খাঁ নিজের অংশের টাকাটাও সেদিন দিয়েছিলেন তাকে। ঝিনুক প্রথমে নিতে চায়নি। সুবেদার খাঁ কিন্তু যখন বললেন যে, না নিলে তিনি এ ব্যবসার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না, তখন ঝিনুককে রাজি হ'তে হল। কারণ সুবেদার খাঁর সাহায্য না পেলে এ ব্যবসা অচল। ঝিনুক জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার অংশের টাকা আমাকে দিতে চাইছেন কেন? সুবেদার খাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার আদর্শের সঙ্গে যে আমার আদর্শের কিছুমাত্র অমিল নেই সেইটে প্রমাণ করবার জন্য। আগেই তোমাকে বলেছি, এই ব্যবসায়ের সব টাকা আমি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্যই খরচ করছি, ও টাকা আমি নিজের কাজে লাগাই না, আমি যা মাইনে পাই তাতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। বিহার রায়টে আমার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আমি এখন একা। আমার বেশী টাকার দরকার নেই। টাকাতে আমার লোভও নেই। এভাবে আমি এ টাকা রোজগার করছি কেবল দুঃস্থ উদ্বাস্তুদের সাহায্য করবার জন্য। রূপকথার রবিন হুড আমার আদর্শ। গরীব মুসলমান উদ্বাস্তুদেরও সাহায্য করতে হবে। কিন্তু আপাতত তার সুযোগ নেই। তা ছাড়া যারা নিপীড়িত অত্যাচারিত অসহায় তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নেই, তারা সব এক জাত, তারা গরীব। তাদের কারও উপকারে এ টাকা লাগলে তা সার্থক হবে। তুমি যখন এ পথে নেমেছ তুমিই এ টাকা নাও। এর পর ঝিনুক আর কিছু বলতে পারে নি। কিন্তু তার সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে, এত টাকা সে রাখবে কোথায়। ব্যাংকে বা পোস্টাফিসে রাখবার উপায় নেই, পুলিস ধরবে। বাড়িতে রাখা আরও বিপজ্জনক, যতীশবাবু শ্যেন-দৃষ্টি মেলে বসে আছেন। অবশেষে আধুনিক-মনা ঝিনুক তাই করতে বাধ্য হয়েছিল যা প্রাচীন-পন্থীরা করতেন। একটা লোহার বাক্সে নোটগুলো পুরে সেটা পুঁতে রেখে এসেছিল একটা মাঠের প্রান্তে। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য জায়গাটা ঢেকে দিয়েছিল ঘাসের চাপড় আর ইঁট-পাটকেলের স্তূপ দিয়ে। এ কাজ সহজসাধ্য নয়। তাই প্রত্যহ সেখানে সে যেতে পারত না। হাতে বেশী কিছু টাকা জমলে যেত। তাও গভীর রাত্রে। অন্য সময়ে টাকাটা সে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। এবার ভাবছিল অন্য আর এক জায়গায় পুঁতে রাখবে। কিন্তু এত রাত্রে তা করবার সুবিধা ছিল না।

সুবেদার খাঁ যখন ঝিনুককে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তখন গভীর রাত। ঝিনুকের সাড়া পেয়ে যতীশবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। বাড়িতে ও'দের কথাবার্তা খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় হয়। সেই ভাষাতেই তিনি ঝিনুকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কলকাতার ভাষায় অনুবাদ করলে তা নিম্নলিখিতরূপ হয়।

"কি রে ঝিনুক, ফিরলি? আজ বড় রাত হল। এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? ঘোষালবাবুর বাসায়? সেখানে তাসের আড্ডা খুব জমেছিল বুঝি?"

"সে তো রোজই জমে।"

আজ তা হলে এত বেশী দেরি হল কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না তাঁর, যদিও ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। বেশী দেরি হওয়া মানেই যে বেশী টাকা রোজকার করা এ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। ও মেয়ে যে বিনা মজুরিতে বেশী কাজ করবে এ তিনি বিশ্বাসই করতেন না, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করতে পারছিলেন না তিনি। কোনদিনই পারেন না। একটু থেমে তাই বললেন, "শামুকও আজ আসেনি এখনও।"

শামুক মিস্টার সেনের বাড়িতে কাজ করে। সে বাহাল হয়েছিল মিস্টার সেনের পক্ষাঘাতগ্রস্ত পত্নীর শুশ্রূষা করবার জন্য, কিন্তু ক্রমশ সে মিস্টার সেনের বাড়িতে কর্তী হয়ে উঠেছে। মিস্টার সেনের উত্থান-শক্তি-রহিতা পত্নীর নির্দেশে বাড়ির সব কাজই করে।

এমন কি মিস্টার সেনের 'টাই'ও বে'ধে দেয়। মিসেস সেন নাকি রোজ বে'ধে দিতেন। মিসেস সেন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মিস্টার সেন নিজেকে নাকি বড়ই অসহায় মনে করতেন। বন্ধুদের বলতেন, আমি এখন কোথায় আছি জান? যে নৌকো ডুবছে তার উপর দাঁড়িয়ে আছি। সে নৌকো থেকে পালাবার উপায় নেই, আমার পা দুটো নৌকোর পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, কর্তব্যের দড়ি দিয়ে। বলতেন আর হাসতেন তাঁর সেই কুলকুচো-হে'চকি হাসি।

ঝিনুক বলল, "হয়তো আজ মিসেস সেনের অসুখ বেড়েছে। প্রায়ই তো তাঁর ফিট হয়। হয়তো রাত্রে থাকতে হবে—"

যতীশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "বেশী কাজ করলে তোরা ওভারটাইম পাস না? কত ক'রে দেয়?"

ঝিনুক কোনও জবাব না দিয়ে হে'ট হয়ে তার বাক্সটা খুলেছিল টাকাগুলো রেখে দেবে বলে। হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে নিঃশব্দ চরণে যতীশবাবু তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"আপনি উঠে এলেন কেন?"

"না, এমনি। জিজ্ঞাসা করছিলাম তোরা কত ক'রে ওভারটাইম পাস।"

সর্পিণীর মতো ফোঁস ক'রে উঠল ঝিনুক।

"তা জেনে আপনার লাভ কি?"

"লাভ-লোকসানের কথা নয়, আমি তোমাদের কাকা, তোমাদের বিষয় সব কথা জানবার অধিকার আমার নেই কি?"

"না। সে অধিকার আপনি অনেক আগেই হারিয়েছেন। আপনি যদি কাকার কর্তব্য করতেন আমরা অন্যরকম হতাম। আপনি আমাদের গুন্ডার মুখে ফেলে দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিলেন, ডাক্তার ঘোষাল না থাকলে আমাদের যে কি হ'ত তা ভাবতেও পারি না। তবু আপনাকে আমরা ত্যাগ করিনি। শুধু তাই নয়, যতটা সম্ভব সুখে রাখবার চেষ্টা করেছি।"

"তা না করলেই পারতে। এভাবে বসে বসে ভাল লাগে নাকি?"

"বসে না থেকে আপনি করবেন কি? আপনি ম্যাট্রিকও পাস করেন নি, এক মজুরগিরি ছাড়া অন্য কাজ আপনার জুটবে না, আত্মসম্মান থাকলে তাই করতেন। তা তো পারবেন না, সুতরাং আপনাকে বসেই থাকতে হবে। যতদিন আমাদের সামর্থ্যে কুলুবে আপনার খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না। এর বেশী আর আমাদের কাছে দাবি করবেন না কিছু।"

"আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। জলিল মিঞা খবর পাঠিয়েছে যে, সেখানে ফিরে গেলে আমাকে তার মাছের ব্যবসার অংশ দেবে, আর আমাকে ব্যবসার ম্যানেজার করে দেবে।"

"বেশ, আপনি ফিরে যান। আমরা ফিরব না।"

"ফিরতে হলে টাকা চাই। অন্তত হাজার দশেক টাকা না হলে তার ব্যবসার অংশীদার হ'তে পারি না। তোমরা দুই বোনে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা রোজগার করছ, আমাকে একটি পয়সা দাও না, আমাকে পোষা ময়না বানিয়ে রেখেছ। এ আমি আর সহ্য করতে পারি না।"

একটু থেমে তারপর কোমল কণ্ঠে মিনতির সুরে বললেন, "আমাকে রোজ কিছু কিছু করে দে, তাই জমিয়েই আমি দেশে ফিরে যাব। তোরা যা রোজগার করিস তার অর্ধেক দিলেই এক বছরের মধ্যেই আমি দেশে ফিরতে পারি। রোজ কিছু কিছু করে দে। আজ কত এনেছিস দেখি—"

হঠাৎ যতীশ ঝিনুকের হাতটা ধ'রে ফেললেন।

"দেখি, লক্ষ্মীটি কত পেয়েছিস আজ, দেখি—"

ঝিনুক এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখল যতীশের গায়ে অসুরের শক্তি। সহজে হাত ছাড়ানো যাবে না।

"আমার হাত ছেড়ে দিন। জোয়ান মেয়ের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না আপনার! ছেড়ে দিন।"

"যতক্ষণ না আমায় টাকা দিবি, ছাড়ব না হাত। আমাকে পর মনে করছিস কেন ঝিনুক? এত টাকা রোজগার করছিস, শেষ পর্যন্ত তা নিয়ে কি করবি? আমার সঙ্গে পরামর্শ করিস না কেন, আমি তোর কাকা, আমাকে পোষা ময়না করে রেখেছিস কেন? শোন, শোন, কথা শোন।"

"আমার হাত ছেড়ে দিন।"

যতীশবাবুর হাতের মুষ্টি দৃঢ়তর হল। চোখে মুখে লোভ মূর্ত হ'য়ে উঠল কুৎসিতভাবে। ঝিনুকও হার মানবার পাত্রী নয়। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ঝিনুকের কাপড়চোপড় বিস্রস্ত হ'য়ে পড়ল। তার ভয় হতে লাগল, বুকের ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিলগুলো পড়ে না যায়। হঠাৎ সে কামড়ে ধরল যতীশের হাতটা। তার ধারালো দাঁত করকর ক'রে ব'সে গেল যতীশের হাতের মাংসে।

"উঃ, এ কি করিস রাক্ষুসী। ছাড়, ছাড়, ছাড়—"

নিমেষের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল ঝিনুক। রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে লাগল। চীৎকার করে উঠল একটা পে'চা, ডেকে উঠল একদল শেয়াল। ঝিনুক ছুটতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই তার মনে হল এভাবে কোথায় চলেছি। এখনি তো পুলিসের হাতে পড়ে যেতে পারি। দূরে একটা চৌকিদারের হাঁকও শোনা গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে একটা বড় গাছের তলায়। ভাবতে লাগল কোথায় যাবে এখন?

ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি? সেখানেই রাখবে টাকাগুলো? তৎক্ষণাৎ মনে হল, না, ওখানে রাখা নিরাপদ নয়। ডাক্তার ঘোষালের টাকার প্রতি লোভ নেই তা ঠিক, কিন্তু তিনি জুয়াড়ী মানুষ, টাকা হাতে পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তা ছাড়া মিস্টার সেনের ওই মেয়েটা, রং-মাখা কাজল-পরা, পেট-কাটা কাঁধ-কাটা ব্লাউস-পরা ওই প্রেতিনীটা এখন ভর করে আছে ওর উপর। ও এলেই ঘোষালের চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে ওঠে তার অর্থ ঝিনুকের অবিদিত নেই। আবেগের মাথায় এক নিমেষে ওর হাতে সব তুলে দিতে পারে ঘোষাল। না, ঘোষালের কাছে টাকা রাখা চলবে না। পরমুহূর্তেই মনে হল 'কাউ'কে কি বিশ্বাস করা চলবে? সে তো তাকে ভক্তি করে। তার সাহায্য নিয়ে কি দু-একদিনের জন্য টাকাটা কোথাও

লুকিয়ে রাখা যায় না? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল তার মায়ের কথা। ঝিনুক তাকে নিজের হার আর চুড়িগুলো দিয়ে বলেছিল, এইগুলো নিয়ে তুমি এখন চলে যাও। পরে তোমাকে আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। সে কি চলে গেছে? অত সহজে চলে যাওয়ার পাত্রী সে নয়। তার হাতে যদি কোনরকমে টাকাটা পড়ে যায় তাহলে টাকাটা আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ টাকা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না ঝিনুক। এই টাকার জোরেই তার স্বপ্নকে সফল করে তুলবে সে। এর থেকে একটি আধলা সে কাউকে দেবে না। সুবেদার খাঁর কথা মনে হল। তাঁর হাতে গিয়ে টাকাটা তুলে দিলে অবশ্য ভয় নেই। কিন্তু তাঁর বাসাটা কোথায় তা সে ঠিক জানে না। তিনি এক ঠিকানায় বেশী দিন থাকেন না, প্রায়ই বাসা বদল করেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঝিনুক ভাবতে লাগল। নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল তার।

(ক্রমশ)

সর্বনাশটা মাথায় নিয়ে কামিনী তবু কাঠ হয়ে ছিল। হাউমাউ করে কেঁদে নয়নের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। অন্ধকারে কেমন জবুথবু হয়ে বসে ছিল হাঁটু দুমড়ে। বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল তার, তা থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠছিল, মাংস পোড়া গন্ধ আসছিল, আর খোলা দরজা দিয়ে তখন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল আলোর আশায়। কানীবুড়ী আলো আনতে গিয়েছিল। সেই ভয়ংকর অন্ধকারের মধ্যে শরীরে যেন ভরা পোয়াতির টানটান ব্যথাটা নিয়ে কামিনী পাথর হয়ে ছিল। তার শূন্য ফাঁকা দৃষ্টির সামনে তাপ হারানো রক্তের মত চাপচাপ অন্ধকার শক্ত হয়ে দানা বেঁধে উঠছিল অথচ শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু তার তীব্রতায় সজাগ হয়ে ছিল। ভয়ানক আর সজাগ। একটু পরে আলো এলো। কুয়োতলা দিয়ে কানীবুড়ী হাত আড়াল করে প্রদীপ ধরে রান্নাঘরের দিকে গেল। অল্পক্ষণ পরে একটা কুপি এনে ঝুলিয়ে দিল ঘরে। ঘরের এবড়ো খেবড়ো মেঝেতে একখাবলা ম্লান আলো টিমটিম করে উঠল। আর সেই আলোয় কামিনী দেখল নয়নকে। শেষ সময়ে বুঝি রক্তবমি করেছিল, রক্তগুলো গলার ওপর মাথার পাশে কানের পিছনে শুকনো রঙের মত লেগেছিল, ঘাড়টা একটু হাত হয়ে ছিল, ঠোঁট সামান্য ফাঁক, সমস্ত মুখখানা রক্তহীন শক্ত শক্ত ফ্যাকাশে।

আচমকা ডান হাতের আঙুলটা আপনা থেকেই নয়নের নাকের তলায় ধরেছিল কামিনী, যদি, তবুও। না নিঃশ্বাস পড়ছিল না নয়নের। আঙুলটা সরাতে গিয়ে নয়নের নাকের ডগার সংগে ছুঁয়ে গিয়েছিল, ঠাণ্ডা। আঙুল থেকে উঠে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গিয়েছিল একটা হিমস্রোত সেই মুহূর্তে। তারপর নয়নের বুকে হাত রেখেছিল, কান পেতেছিল, কোন শব্দ ছিল না, যেন একটা ইটের চাতালে কান পেতেছিল সে। শব্দ না, তাপ না, আর কানীবুড়ী এসে কামিনীকে ধরেছিল।

'ও বউ পাগল হলি নাকি...এ সোমসার অসার বউ...সামাল দে, সামাল দে।'

বিড়বিড় করে কানীবুড়ী তারপর বলে গিয়েছিল ঘটনাটা। হঠাৎ কী হল ডাগর-ডোগর ছেলেটা মাঠ থেকে ছুটে এসে দাওয়ায় পড়ল, সে রাত্তিরে যমে মানুষে টানাটানি, ধারে কাছে জনবসতি নেই, কানী যা টুকিটাকি জানত করল, আর ভোর নাগাদ চোখ উল্টে শেষ। শেষ সময়ে নাকি কামিনীকে খুঁজেছিল নয়ন।

কামিনী তবু স্থির হয়ে বসেছিল। বুকের মধ্যেটা টনটন, ধোঁয়াটা বুঝি পাক খাচ্ছিল ভেতরে, গলার কাছে নিঃশ্বাসটা অনেকক্ষণ ধরে দলা পাকিয়ে ছিল, চোখের সাদা জমিটা ব্যথা ব্যথা করে বুঝি রক্তের ফোঁটা বেরুবে মনে হয়েছিল। তবুও ধুলো-মাখা শরীরটা নিয়ে কামিনী যেন বটতলার শিবঠাকুরটি হয়েছিল। এ দুদিনে অনেক ধুলো জমেছে কামিনীর শরীরে। ধানকলের ধুলো, ম্যানেজার সাহেবের 'বাংলো বাড়ির মেঝের ধুলো।

কামিনী হাঁটছিল আগে আগে, কানী-বুড়ী পেছন পেছন। তার মাথার ভেতর কেবলই জট পাকিয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যার দৃশ্য-গুলো, ভাবনাগুলো আর হাত দুটো ভীষণ কাঁপছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল কামিনীর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়নের ছোট্ট মাথাটা মাটিতে পড়ে ফটাস করে ফেটে যাবে। মনে হচ্ছিল তার কাঁপা কাঁপা হাত থেকে জড়ান কাঁথাটা, ন্যাকড়াগুলো যেন ছড়িয়ে পড়বে মাটিতে। মাথাটা কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ওখানে হাতুড়ি পিটছে কেউ। জায়গাটা ফাঁকা, বনজংগলের আবরু নেই, বাঁ পাশে কেবল মরা গাজরি গাছটা ভূতের মত দাঁড়িয়ে। বুকে বাতাসের আঁচড় লাগছিল, সে চোখ চাইতে পারছিল না। আজ জোনাকিও ছিল না, এই অমাবস্যায় নাকি জোনাকি জ্বলে না। আর বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘ দলা পাকাচ্ছে আকাশে, গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশটা যেন অষ্টপ্রহর নামছে।

সন্ধ্যার ট্রেনটা যখন বৃষ্টিতে নেয়ে কামিনীকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল

তখন বৃষ্টির তেমন জোর ছিল না। যেন হাওয়ার ঝাপটায় নেমে আসছে ইলশেগুঁড়ির ছাট। কিন্তু এখন আরো তোড়ে নেমেছে। মাসটা আষাঢ় কিন্তু যেন শ্রাবণের ধারা লেগেছে, দলা দলা মেঘ সারা আকাশ জুড়ে অন্ধকার হয়ে আছে।

'ও বউ...পথ ঠাওর রাখিস।'

কানীবুড়ী হাঁকছিল।

লাল মাটির বুকে জল যেন ঢল নামিয়ে দিচ্ছে রক্তের। বিদ্যুৎ ঝিলিকে টাটকা রক্ত ক্ষতের মত ভয়ংকর দেখাচ্ছে লাল পাঁক। আর খ্যাপা বাতাস গরগর করছে থেকে থেকে।

'আকাশের গতিক ভাল না রে বউ... সামাল দিয়া পথ চলিস।'

বিড়বিড় করছে কানীবুড়ী।

ক্রোশ দেড়েক পশ্চিমে গেলে তবে শ্মশানটা চোখে পড়বে। এখান থেকেও দূরের ট্রেনের শব্দটা ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। নাকে একটা গন্ধ এসে ঝাপটা দিচ্ছিল কামিনীর, বড় বিশ্রী গন্ধ। গন্ধটা আসছে
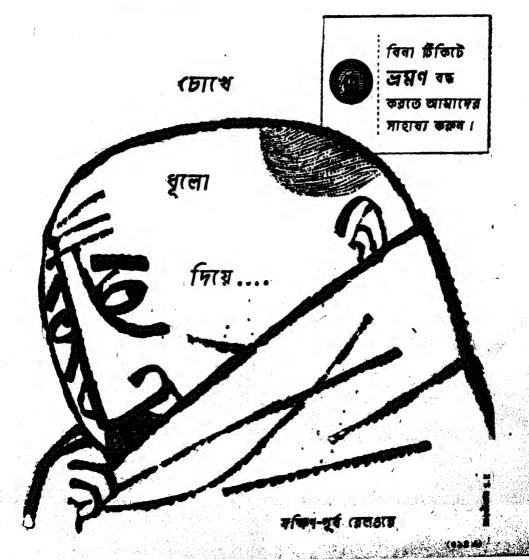
দুহাতে জড়িয়ে থাকা পুঁটলিটার ভেতর থেকে। একবার সে নাক বন্ধ করল, একটু পরে আবার খুলল। আবার ধক করে গন্ধটা এসে নাকে ঝাপটা দিল। শরীরের ভেতর রক্তের স্রোত আলগা ভাঁটিতে শীতল করে দিয়ে সরে যাচ্ছে। সাঁইসাঁই বাতাসের শব্দ। মুখে জলের ঝাপটা এসে লাগছে, চোখ গাল বেয়ে গলায় বুকে পড়ছে। জলের স্বাদে নিজের পিপাসাটাকে তীব্রভাবে অনুভব করল কামিনী। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে তার। রক্তস্রোত শীতল, না-খাওয়া, স্নান না করা শরীর দুর্বল। পশ্চিম আকাশটা চিড় খেয়ে গেল বিদ্যুৎ-এ। মাটি রক্তাক্ত মুখে হাঁ করে ঘোলা জলটা যেন চেটে নিচ্ছে।

'ও বউ......বউ।'

কানীবুড়ীর ডাকটা উড়িয়ে নিচ্ছে বাতাস। কামিনীর কানে কোন শব্দ যাচ্ছে না। মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে শির-দাঁড়াটা যেন মাঝখান থেকে মচকে যাবে হঠাৎ। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা, অদ্ভুত। সমস্ত শরীরটা শীতল, পা পাথর। এ জলে পিছল পা টেনে নেয়, হড়কে যায়। সাবধানে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে লাগল কামিনী, পেছনে লাঠি ঠুকঠুক কানীবুড়ী। ভয় করে, বড় কষ্ট কামিনীর বুকে। হেই মাগো আমারে নাও, হেই বাবাগো আমারে নাও। কী দোষে আমারে শাস্তি দিলে গো, আমারে এ দন্ড দিলে কেন গো, আমি তো কোন পাপ করি নাই।

অকারণে চমকাল কামিনী। আমি তো কোন পাপ করি নাই...বাক্যটি ঘুরতে লাগল বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে... বাক্যটি ঘুরতে লাগল...আমি তো কোন পাপ করি নাই...সারা গায়ে কাঁটা...বাক্যটি বুকের মধ্যে শব্দ করে ফেটে গেল।

'সামাল গো বউ...পথ দেইখা চল...জোর নামছে গো...নদীটারে ঠাওর রাখিস।'

অন্ধকারে বৃষ্টির ঝাপটায় হারিয়ে যাচ্ছে কানীবুড়ীর কথাগুলো। আর বাতাস বইছে খ্যাপার মত, বিদ্যুৎ-এর কাটাকাটি চোখ ধাঁধায়, চোখের নজর কেড়ে নেয়। রাস্তা বদলে গেছে, পাথর ছড়ানো টালমাটাল রাস্তা, বড় বড় চাংড়া, পা হড়কালে রক্তপাত নিশ্চিত। কামিনী হাত দিয়ে কাঁথায় জড়ানো পুঁটলিটা বুকে আঁকড়ে ধরল। সামনে নদী আছে, হাত সাতেক চওড়া নদী, এখন কোমর জল, অন্য সময় পায়ের পাতা ডোবে না, কিন্তু কোমর জলে ঘূর্ণির টান। বুকের হাঁসফাঁস কষ্টটার জ্বালায়, জলের ঝাপটায় কাঁপন ধরেছে কামিনীর। বিদ্যুৎ চমকে উঁচু নীচু তেপান্তর হাসছে যেন রক্তাক্ত মুখে, আর তালের সারি অশরীরী ছায়ার মত মাথা দোলাচ্ছে।

'সামাল গো বুড়ী।'

জলে পা ডুবিয়ে বলল কামিনী।

'আমার হাতটা ধর গো বউ।'

একহাতে পোঁটলাটা অন্যহাতে কানী বুড়ীর হাত ধরে জলে নামল কামিনী।

হেই মাগো চেটেপুটে সব নিলি আমার। বিড়বিড় করল সে। ঘরের মানুষটা তিন মাস হল কোথায় চলে গেছে, ঘা খেয়ে খেয়ে খ্যাপা হয়ে গেল মানুষটা শেষের দিকে। কানের কাছে ফিসফিস করে কে কাঁদছে। আবেগের সময় মানুষটার বুকে চাপড় মেরে কথা বলার স্বভাব ছিল। ফিসফিস করে কে কাঁদছে। বউ আমি তর, তর পোলার শত্তুর। বউ আমি তরে ছাড়া, সংসার ছাড়া কিছু জানি না। তুই আমারে পথ খুইজা দে, আমি কী করুম আমারে বইলা দে বউ।

জলের নীচে পাথরে হোঁচট খেয়ে সামলে নিয়েছে কানীবুড়ী আর হাঁপাচ্ছে। শীত ধরেছে তার হৃৎপিণ্ডে, দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে। তবুও মুখ বুজে হাঁটছে আস্তে আস্তে। বিদ্যুৎ-এর আলোয় লাল তেপান্তর দগদগে ঘায়ের মত লাগছে চোখে। তালের পাতায় চাপা তীব্র সুরে গোঙাচ্ছে বাতাসে।

'ও বউ।'

'কী কও।'

'পথটারে ঠাওর রাখিস।'

কানীবুড়ী বিড়বিড় করছে আর কামিনীর মনে হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ-গুলো উঠে আসছে গলা দিয়ে। উঠে আসছে আর নীচের থেকে অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর।

নদী পেরুতেই বাজ পড়ল কক্কড় শব্দে। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল কামিনীর দৃষ্টি। শরীরটা টলছে, পা দুটো টলছে, হাতের বোঝাটা ভারী মতন। বুকের ভেতর নিঃশ্বাসটা দাপাচ্ছে। আর আমার বড় কষ্ট গো মা, আমায় তুই ছিবড়ে করে দিলি বাবাগো। আমার মানুষটা বিবাগী হল, আমার পোলাটারেও তুই খাইয়া ফেললি। চোখে আমি আঁধার দেখি গো।

পেছল মাটিতে পা হড়কে যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টিটা অন্ধ, 'পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। হাতের বোঝাটা ছিটকে গেল।

'হেই আগো...কী হল গো...ও বউ কথা ক।'

কানীবুড়ী চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। শূন্য মাঠটায় বাতাস গজরাচ্ছে। অন্ধকারে ঠাওর করে এসে কানীবুড়ী কামিনীকে ধরল।

'ও বউ...ওঠগো বউ...চোখ চা।'

ওঠে না, কামিনী। জলে ভিজে ভিজে হাড় কেঁপে অবশ হয়েছে শরীর। কাঁপছে থরথর করে, কাঁপছে আর লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কোণ বেয়ে। বৈশাখ মাসের দুপুরের খড়ের গাদার মত তাপ সারা শরীরে। কানীবুড়ী কাঁপা কাঁপা হাতে সাপটে ধরে কামিনীর শরীরটা। কামিনী কাঁপছে, সেই সঙ্গে কানীবুড়ীও। হুত মা বৃষ্টির
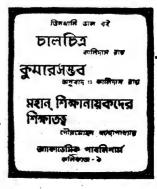
ঝাপটার তার চেয়ে বেশী জয়ে। নাকে মুখে শনের মত বৃষ্টির জল বিঁধছে।

পাঁকে মুখ গুঁজে কামিনী শুয়ে আছে। দূরে ছুটন্ত ট্রেনের শব্দ আসছে। লাইনের ওপর চাকা গড়াচ্ছে, নাট বল্টু ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজছে। পা বেয়ে জোঁক উঠছে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। কামিনী জিভ দিয়ে একবার ঠোঁটটা চাটল, বিস্বাদ। বৃষ্টি আর ঘাম মিশে বিস্বাদ। মরণ আসছে তার সামনে। তার পিঠের শিরদাঁড়ার কাছে কী যেন নামছে হিস্‌হিস করে। কে যেন চীৎকার করে ডাকছে কামিনীকে, ঝড়ের শব্দ নিয়ে গলাটা চিরে যাচ্ছে।

'ও বউ...বউগো।'

'কি কও।'

'আর পারি নারে বউ...পরাণটা জ্বইলা গেল।'

কামিনী প্রাণপণে দু-হাতে নিজের গলাটা টিপে ধরে চীৎকার করে উঠতে চাইল। ভয়ংকর শব্দ করে তল্লার মাটিটা কাঁপছে, হিংস্র বেগে বাতাস উড়ছে, বৃষ্টির ঝাপটায়। কানীবুড়ী এবার বুকে চেপে ধরল কামিনীকে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে মাটিতে আর সাপিনীর মত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঠের রক্তপাঁকে যেন ডুবে যাচ্ছে কামিনী, ঘোলা জলে টাল খাচ্ছে কানীবুড়ী।

'হেই গো বউ...চোখ চা কথা ক' বউ।'

একসময় পাঁক থেকে মুখ তুলল কামিনী। মানুষ বলে যেন আর চেনাই যায় না তাকে, মুখটা কাঁদ কাঁদ, বুক থেকে কাপড় গেছে সরে। খোলা বুকে যেন রং করা মাটির প্রতিমা; চোখ রক্তজবা। কী যেন বলে বিড়-বিড় করে।

'বউ।'

'উঃ।'

'কী কস তুই?'

'আমার নয়ন হারায়ে গেছে গো।'

'কাঁদিস না বউ আমি খুইজ্জা দেখি।'

যেন একটা পাথরের মূর্তি, কামিনী শূন্য ফাঁকা দৃষ্টিটা নিয়ে জলে কাদায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর কানীবুড়ী অন্ধকারে ঠাওর করে মাটিতে হাত বোলায়, 'নয়নটা গেল কোথায় গো', চালশেপড়া দৃষ্টি নিয়ে স্যাঁতসেঁতে তরল অন্ধকারে কানীবুড়ী চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। চোখের ডিম দুটো ফেটে যেন বাষ্প বেরিয়ে আসছে, আর সে যেন দেখছে ছায়া শরীর নিয়ে কারা যেন নদীর ওপার থেকে উঠে আসছে। চারটি ছায়াশরীর, চার বাহকের কাঁধে বোঝা হয়ে এইবার বুঝি কানীবুড়ী শূন্যে উড়ে যাবে।

'নয়ন গো...উরা যে আইল গো...'

কানীবুড়ী বুকের ভেতরটা চিরে গেল আর্তনাদে, বৃষ্টির জল লেগে শরীরটা ক্রমশ শীতল, আরো শীতল, হিম শীতল করে দিচ্ছে। কানীবুড়ী যেন এবার দেখল চার বাহকের কাঁধে চড়ে নয়ন যাচ্ছে, এক গুপ্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে তারা, অন্ধের মত মাটি হাতড়াচ্ছে কানীবুড়ী, হাতে নরম মতন পোঁটলাটা ঠেকতেই সমস্ত শরীর পেতে পোঁটলাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, দুহাতে বুকে আঁকড়ে ধরল।

'দিমু না......নয়নরে দিমু না।'

কানীবুড়ীর ভাঙা গলাটা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীৎকার করে উঠল। আর কামিনী হাত বাড়িয়ে তাকে ধরল।

শ্মশানে এসে পৌঁছুতে সেই মাঝরাত্তির। দেওয়াল-শূন্য ভাঙা আটচালাটা বাতাসের ধাক্কায় টলছে, বাঁশের খুঁটিতে মড় মড় শব্দ উঠছে। বাতাসের গোঙানির সঙ্গে বাঁশের খুঁটির শব্দ মিশে কেমন ভয়ঙ্কর থমথমে হয়ে আছে সমস্ত পরিবেশটা। আর সেখানে তখন শ্মশানকালীর পুজো বসেছে। বুড়ো হাজরি ঠাকুর কুশের আসনে উবু হয়ে বসে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় সুরে মন্ত্র বলছে, চৈতন্য ডোম তার বিশাল কদাকার চেহারাটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্খলিত কণ্ঠে ডেকে উঠছে মা, মা: হারু চাষা কাঁসি বাজাচ্ছে আপনমনে, গগন, মহিম' হরনাথের দলটা গাঁজার আসর বসিয়েছে আগুনের কুণ্ডটার পাশে। কামিনীর চোখে পুরোপুরি কোনু দৃশ্যই এখন আর ধরা পড়ছে না, কানীবুড়ী বেড়ার খুঁটিটা ধরে দম নিচ্ছে। কামিনী দেখছে গাঢ় নীল শরীর, টকটকে লাল জিভ, টানা চোখ, গলায় হাতে কাটা মুণ্ড ঝুলছে তা থেকে যেন রক্ত ঝরছে। আর দূরে দপ্-দপ্ করছে চিতা জলে ভিজে। সে আগুনের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল, মাটির বুকে আগুন, আগুনের কত রঙ আর শিখা। অন্ধকার কাঁপছে বৃষ্টির ঝাপটায়, মাটিটা কাঁপছে, আগুন কাঁপছে। হারু চাষার হাতে ফ্যাটা কাঁসিটা বাজছে ঠুনঠুন। কামিনীর চোখের সামনে সমস্ত সংসারটা, পরিবেশটা নরক হয়ে যাচ্ছে। নরক অন্ধকার, বাতাস নেই, আগুনের জলে ভেজা ধোঁয়া নাচছে, পাটকিলে রঙের ছাই উড়ছে হাওয়ায়। আগুন ছাপিয়ে ধোঁয়া উঠছে, ধোঁয়াটা ফুলে ফেঁপে বিশাল হয়ে যাচ্ছে।

কামিনীর চোখে সব ঝাপসা হয়ে গেল। ধানকলের ম্যানেজারবাবু চোখ মটকে ধোঁয়া ছাড়ল মুখ দিয়ে, ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে যেন ঘিরে [illegible] কামিনীকে। হাত-পা

ম্যানেজার সাহেবের লম্বা মস্ত কালো রঙের কুকুরটা হঠাৎ চীৎকার করে উঠল। ঘরের নীল রঙের পর্দাটা শব্দ করে নাচছে, তুমি আমার বাপ, আমি তোমার বুন, ছাইড়া দাও বাপ, আমার ঘরে পোলা আছে...এই দেখ বাপ আমার শাঁখা...এই দেখেন দাদা আমার সিঁদুর...কাঁশিটা বাজছে ঢং ঢং ভাঙা কাঁসির আওয়াজটা চেরা চেরা, আঁ আঁ করে আর্তনাদ করছে মাতাল শ্রীকেষ্ট। কাঁসিটা বাজছে। আর কামিনী যেন পড়ছে, গাছের কেটে নেওয়া নিরীহ ডালটার মত, তার শরীর থেকে ফট ফট শব্দ উঠছে। হায় গো এ আমি কোথায় আইলাম...বাতাস নেই, অন্ধকার, অন্ধকার, আগুনের শিখাটা দাউ দাউ করে লাফাচ্ছে। হাজারি ঠাকুরের গলাটা চিরে যাচ্ছে, মা মা। অন্ধকারে ঝপ ঝপ দাঁড় ফেলছে মানুষটা...পালাইয়া চল কামিনী, এ দ্যাশটা বিষ ঢালছে গো...তারপর জঙ্গল কেটে বসতি হ'ল...মানুষটা খ্যাপা হয়ে গেল শেষে। বাইরে ভয়ংকর গলায় চীৎকার করছে কুকুরগুলো, চিতার পোড়া ছাই উড়ে উড়ে চোখে পড়ছে... ম্যানেজার সাহেবের পাঁচ আঙুলে ছয় আংটি তাদের বিচিত্র আলো ফেলে ফেলে অন্ধকারে কামিনীকে খুঁজছে। আয় মরি...না, না ওকথা কইও না...বড় সাধ আছিলো গো আমার। বড় সাধ আছিলো গো...হায় হায় গো। আর পারি না, পারি না। চাল গুদামের লরিগুলো হর্ন বাজিয়ে ছুটছে, প্রচণ্ড শব্দে বাংলো বাড়িটা কাঁপছে, ঝন ঝন শব্দ করছে, জানলার কাঁচগুলো।

'বউ তুই আমারে ধর...শক্ত কইরা ধইরা রাখ গো...আর পারি না।'

কার গলার কান্নার স্বর যেন ঝড় হয়ে বইছে?

'বড় সাধ আছিল যে আমার।'

আটচালাটার বাইরে অন্ধকারে শেয়ালগুলো জলে ভিজছে, ওরা গন্ধ পেয়েছে।

'মা, মা' চৈতন্য ডোম চীৎকার করে উঠল।

'কী দোষে আমারে শাস্তি দিলে গো মা, আমার সব চেটেপুটে নিলে বাবা গো।'

প্রচণ্ড শব্দে বুকটা ফেটে যাচ্ছে কামিনীর আর কানীবুড়ী বেড়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বিড়বিড় করছে। কামিনী দেখছে চিতার আগুনের আলোয়, যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, এই সংসারটা এই পরিবেশটা বিশাল এক চণ্ডালের মূর্তি ধরে কামিনীকে ধরতে এগিয়ে আসছে, ধরতে পারলেই তাকে ঐ জ্বলন্ত চিতাটার উপর ফেলে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠবে। একটা ভয়ার্ত ক্লান্ত আত্মার মত কামিনী এইবার নিজেকে আড়াল করতে চাইল, সরে যেতে চাইল আড়ালে। আটচালাটার বাইরে শ্মশানের প্রহরী কুকুরটা গলা মিলিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

পা ফেলে, পা ফেলে চণ্ডালটা আসছে, [illegible] ধরেছে, নিজেকে হারিয়ে নবার জন্য একবার ছটফট করে উঠল সে, শরীরের নিঃশেষিত শক্তি একসঙ্গে জড়ো করে উঠে দাঁড়াতে চাইল, তারপর ছুটে বেরিয়ে যেতে। কারা যেন চেপে ধরে আছে কামিনীকে, লোমশ হাতের মুঠোগুলো লোহার মত, তাদের তীক্ষ্ম নখ দিয়ে তার শরীরটা চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে, তা থেকে রক্ত ঝরছে, খণ্ড খণ্ড শরীরটা থেকে ওরা এবার বুকের পাঁজরা ছিঁড়ে নিচ্ছে আর কামিনী যেন সত্যি সত্যি একটা শব হয়ে যাচ্ছে, বুকের ভেতর থেকে নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে এসে ঝড়ের শব্দ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। কামিনী নিঃশ্বাস নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে, পায়ের নীচের মাটিটা কাদা হয়ে গেল, পাঁক হয়ে গেল। ভুড়ভুড়ি কেটে সেই পাঁকের মধ্যে যেন ডুবে যেতে লাগল সে। ডুবতে ডুবতে ভাসতে চাইল। নিজের শরীরটাকে ঐ প্রচণ্ড মুষ্ঠি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কামিনী এবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, ছোঁ মেরে পোঁটলার মত নয়নকে তুলে নিল মাটি থেকে। বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে পোঁটলাটা থেকে। কামিনী এক ছুটে আটচালাটার বাইরে বেরিয়ে এলো বৃষ্টির মধ্যে। ও বউ, কোথা যাস বউ...' পাগল হলি তুই।'

পেছনে চীৎকার করতে করতে কানীবুড়ী এল।

অন্ধকারে ,বাতাসের ঝাপটায় টলছে কামিনী, তবুও এগুচ্ছে পশ্চিম দিকটায়। দূরের জলে ভেজা চিতাটা জ্বলছে মিটমিট করে। কামিনী আলো থেকে সরে নরম কাদা মাটির উপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। দূরের চিতাটার নিবু নিবু টকটকে লাল আলোয় কামিনী নোখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল। রক্তমাখা লালমাটি কামিনীর হাতের চাপে গলে গলে যাচ্ছে।

চিতাটা থেকে এবার ভীষণ শব্দ হচ্ছে,

বাঁশ দিয়ে এবার পা ভাঙা হচ্ছে শবের, কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে মটমট করে, হাড় ফাটছে, ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আর পা ফেলে ফেলে অমোঘ এক নিয়তির মত চন্ডালটা এগুচ্ছে কামিনীকে ধরতে। ছটফটে আঙুলগুলো তার মাটি আঁচড়াচ্ছে, তার বুকের ভেতর থেকে শব্দ উঠছে, কারা যেন মটমট করে বুকের পাঁজরাটা ভেঙে দিচ্ছে, বড় সাধ আছিলো গো...তার বুকের ভেতর থেকে মাংস নিয়ে খাবলা করে ছুঁড়ে দিচ্ছে কারা ঐ চিতার আগুনে। আর হিংস্র বেগে মাটি খুঁড়ছে কামিনী, মস্ত বড় একটা গর্ত খুঁড়তে হবে তাকে, তারপর সে আর নয়ন তার মধ্যে ঢুকে যাবে, তাহলেই বেঁচে যাবে তারা। কামিনী আর পারছে না, অস্থির হয়ে উঠছিল, অসহ্য একটা জ্বালা দাপাদাপি করছে তার মধ্যে, মোচড় দিয়ে উঠছে সমস্ত শরীরটা, কণ্ঠার কাছে টনটন ব্যথাটা ফুলছে আর ফুলছে, অন্ধকারে শেয়ালের গলা বাতাসে টাল খাচ্ছে। দ্বিগুণ বেগে কামিনী কাদামাটির বুকে আঁচড় কাটতে লাগল।

[২৪]

বাংলোবাড়ির দাওয়ায় বসে বসে তামাক টানছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। কাটোয়া থেকে একটা গড়গড়া আনিয়েছেন, নলের গায়ে রূপোলী তারের কাজ করা। নলটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে টানছিলেন, আর আবেশের ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। কম বয়সে সেই কবে দু' একদিন শখ করে গড়গড়ায় টান দিয়েছিলেন, তারপর সারা জীবন ইস্কুল-মাস্টারী করতে হয়েছে। ছেলে পড়াতে হয়েছে অবসরের ফাঁকে ফাঁকে, তাই এমন আয়েসের সুযোগ পাননি কোনদিন। সস্তা সিগারেট খেয়েছেন, তাও হিসেব করে। গাঁয়ে ফিরে সেই সস্তা সিগারেটের খরচটাও অত্যধিক মনে হয়েছে। তা ছাড়া সিগারেটটাও তেমন সস্তা যে নেই আর, খরচ চালাবেন কি করে। তাই হুঁকো ধরেছিলেন প্রথম প্রথম। কিন্তু নিজের শিক্ষাদীক্ষা, গোপন অহংকারের সঙ্গে হুঁকোটাকে ঠিক যেন মানিয়ে নিতে পারেননি। বিলাস এবং আয়েস দুটোর প্রতিই মনে মনে তাঁর যে আকর্ষণ কম তা নয়। তাই একটা গড়গড়া আনিয়ে নিয়েছিলেন। ধীরেসুস্থে বেশ আয়েস করে টান দেওয়া যায়। ঠিক এই সময়-থেমে-থাকা কর্মহীন জীবনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

দাওয়ায় বসে গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে গোয়াল ঘরের ওপারের সজনে গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। চোখের সামনে গাছটাকে ফুলে ফুলে ভরে উঠতে দেখলেন। দিনে দিনে ফুল ঝরে পড়লো, এখন কচি কচি সজনে ডাঁটায় গাছটা ভরে গেছে। পাতা নেই একটাও, নিষ্পত্র শাখা-প্রশাখা থেকে সারি সারি ডাঁটা ঝুলছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে; শুক্লপক্ষের রাত্রে আরো সুন্দর দেখায়।

ডালগুলো নড়ছে। কেউ বোধ হয় আঁকসি দিচ্ছে নীচে থেকে।

নিজের মনেই হেসে ফেললেন গিরিজাপ্রসাদ। ছোট মেয়ে কমলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। গাছভর্তি সজনে ডাঁটা দেখে কমলা একদিন বলেছিল, একটা গাছে এত ডাঁটা হয় বাবা, আর আমরা কিনা আনায় পাঁচটা [illegible] কিনে খেতেম। কৌতুকের কথা

অবশ্য নয়। গিরিজাপ্রসাদ নিজেও কিছুদিন থেকেই ভাবছেন। হৃদয় মোড়ল একটা সুপুরি গাছ লাগিয়েছিল, সেই গাছ থেকে আশি টাকার সুপুরি বেচেছে এবার গোপেন। সজনে আর সুপুরি নয়, আরো কত কি তো লাগানো যায়, চালান দেয়া যায় শহরে বাজারে। তাতে তো গ্রামের অবস্থা ফিরতো। তা নয়, সারা বছর শুধু ধানের চাষ। আর দু' চার ঘর আখ করে, গুড়ের শাল বসায়। অন্য কোন কিছুতে কারো কোন উৎসাহ নেই।

গিরীনকে একবার বলেছিলেন। হেসে-ছিল গিরীন, তুমি গাছ বসাবে, গাঁয়ের লোক চুরি করে শেষ করে দেবে।

তা করবে ঠিকই। কিন্তু দু' একটা গাছ লাগাবে কেন। বিঘে দরুনে জমিতে বসালে কত আর চুরি করবে। বরং দেখাদেখি সবাই বসাবে।

গিরীন হেসে বলেছে, তখন আর এই দাম পাবে নাকি? ধানের মত অবস্থা হবে, চাষের খরচ পোষাবে না। কেউ করে না বলেই তো এত দাম ও-সবের।

চুপ করে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ। জবাব খুঁজে পাননি। তবু মনে মনে বুঝেছেন, গ্রামের লোকের কোন উৎসাহ নেই এ-সবে। মাছের পনা ফেলতেও তাই গররাজি সবাই। এত বড় বড় পুকুর রয়েছে গাঁয়ে। কিন্তু কারো দু' আনা অংশ, কারো চার আনা। মাছ হলো কি না হলো, কোন ভাবনা নেই কারো। অন্য কেউ টাকা খরচ করে পনা ফেললে তখন শুধু ভাগ নিতে আসবে।

অথচ মাছের চাষেই কি কম লাভ হতে পারতো।

বংশীকে বলেছিলেন একদিন। সেও হেসেছিল। বলেছিল, গাঁয়ে থাকো গো গিরিদাদা, আর কিছুদিন যাক, তখন বুঝবে গাঁয়ের লোক কেমন। বলে কার বাড়ির কাছে হবে এই ঝগড়া করে আরেকটা টিপকল হতে দিলো না!

গিরিজাপ্রসাদ কত লোকের কাছ থেকে যে শুনলেন এ-ধরনের কথা। গাঁয়ের লোক খারাপ, গাঁয়ের লোক খারাপ। সকলেই যদি বোঝে, তবে হয় না কেন উন্নতি। রেশারেশি, ঝগড়াবিবাদ, স্বার্থপরতা—এসবের জন্যেই যে কিছু হবার উপায় নেই, তা সকলেই বোঝে, অথচ কেউই সেটুকু বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসে না কেন? একটা পাপ-চক্রের মধ্যে যেন সকলেই আবদ্ধ, একটা পাঁকের কুণ্ডতে পড়ে আছে। উঠে আসার উপায় নেই। কেন? কেন?

বংশীকে একদিন রেগে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

আর বংশী হেসে বলেছিল, একটাই পাপ গো গিরিদাদা, দারিদ্য। ওই পাপ দূর করো, সব পাপ দূরে হয় যাবে।

শুনতে ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল, কথাটা ষোল আনা সত্যি। কিন্তু তারপরই সন্দেহ হয়েছে। গাঁয়ের তুলনায় শহর তো অনেক সচ্ছল, তবু পাপচক্র থেকে শহরের লোক তো পরিত্রাণ পায়নি। নিজের মনেই তাই একটা সন্দেহের খটকা রয়ে গেছে।

না, অন্য কেউ টাকা দিক বা না দিক, বেশ কিছু টাকার পনা ফেলবেন এবার। আর কিছু না হোক, ছেলেমেয়েদের বিয়ের খরচ তো কমবে।

মেয়ের বিয়ের কথা মনে পড়লেই আতঙ্ক বোধ করেন গিরিজাপ্রসাদ। রাতে ঘুম হয় না নিভাননীর। মাঝ রাত্রে স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে মনে পড়িয়ে দেন।

গিরিজাপ্রসাদ প্রথম প্রথম বিচলিত হতেন, এখন আর হন না। অমরেশকে কলকাতার কলেজে পড়াচ্ছেন, সে চলে গেছে। মেয়েদেরও বোর্ডিংয়ে রেখে, নাতো বড়ছেলের
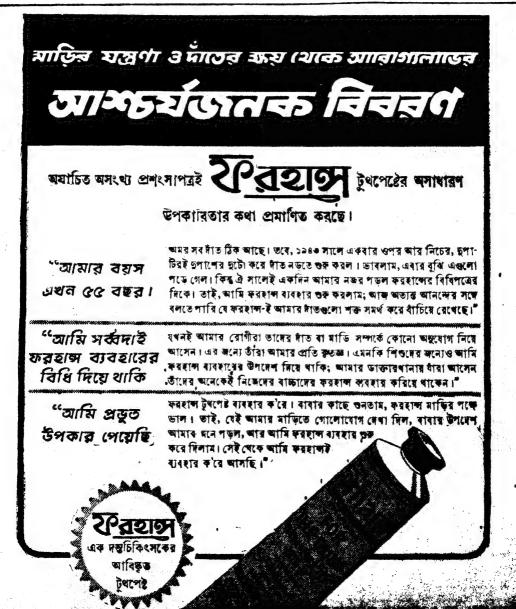
কাছে পাঠিয়ে পড়াবেন ইস্কুলে কলেজে।

পড়াশ্‌নো করবে মেয়েরা, চাকরি করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। সর্বস্ব খ্‌ইয়ে পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

সাত সাতটা মেয়ে গোপেন মোড়লের, সেও শ্‌নে হেসেছে। বলেছে, তাও কখনো হয় গো। ম্‌খে যাই বলো পড়াতেও হবে, পণ দিয়ে বিয়েও দিতে হবে...

বাধা পেয়ে রেগে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ। বলেছেন, তোমার এখন আমের ম্‌কুলের অবস্থা গোপেন, ভাবছো, যত বোল হয়েছে তত আম থাকবে।

—তা কেন ভাববো। না খেয়েদেয়ে টাকা জমাবো, আবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফতুরও হবো। কিন্তু উপায় কি...মেয়েদের তো তা বলে চাকরি করতে পাঠাতে পারবো না।

পঞ্চ চাট্‌জ্যে বলেছে, আইন হচ্ছে গো। পণ আর থাকবে না।

একধারে খ্‌টিতে ঠেস দিয়ে বসে হ্‌কো টানতে টানতে সশব্দে হেসে উঠেছে বংশী। বলেছে, ভাল কথাই বললি। আইন ক্যানে হচ্ছে জানো গো তোমরা।

—কেন?

বংশী হাসতে হাসতে বলেছে, সারা দ্‌নিয়া বেলাক হয়ে গেল, সব্বত্ত বেলাক হবে আর বিয়ের ব্যাপারে হবে না। তাই কত্তাদের বড় ব্‌কে বাজছে গো গিরিদাদা।

সকলেই হেসে উঠেছে সে-কথা শ্‌নে। সত্যিই তাই। আইন তো পণ বন্ধ করবে না, বিয়ের বাজারকেও কালো-বাজার করে দেবে।

তারপর গোপেন মোড়ল হাসতে হাসতে বলেছে, যাই বলো পণ আছে তাই রক্ষে। মেয়ে আমার কালো, তব্‌ তো টাকাপয়সা দিয়ে বিয়ে দিতে পারছি গো।

গিরিজাপ্রসাদ কোন কথা বলেননি। উঠে চলে এসেছেন ভিতর বাড়িতে। এ লোক-গ্‌লোর সঙ্গে কথা বলতেও যেন সারা শরীর জ্বলে ওঠে।

তব্‌ তো টাকাপয়সা দিয়ে বিয়ে দিতে পারছি! কিন্তু টাকাপয়সা যাদের নেই। আছে ক'জনের?

এইসব য্‌ক্তিহীন কথাবার্তার জন্যেই গ্রামের লোকগ্‌লোকে ইদানীং আর সহ্য করতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ। এমন কি বংশীকেও না। কথাবার্তায় সব সময়ে যেন বংশীর ব্‌কের ভেতরকার একটা অদৃশ্য জনালা ফ্‌টে বেরিয়ে আসতে চায়। সব-কিছ্‌র অন্ধকার দিকটাই যেন শ্‌ধ্‌ দেখতে পায় সে। কেন কে জানে!

গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই এক একসময় আশ্চর্য লাগে। বিশ্বাস হতে চায় না ছোট-বেলাকার সেই বংশী আর এই বংশী একই মান্‌ষ।

ম্‌খে ম্‌খে বংশী ছড়া বানাতে পারতো তখন, স্‌রে স্‌রে স্‌রে গান করতো। তারপর একবার সেই প্‌জোর সময় যাত্রা এলো অপেরা পার্টির।

অধিকারীর পায়ে পায়ে ঘ্‌রছে তখন বংশী। যাত্রাদলের রাঁধ্‌নী বামন্‌টারও তোষামোদ করছে ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা বলে। যাত্রাদলের ছোট ছোট ছেলেগ্‌লো রান্নার ঠাকুরকে ঠাকুরদাদা বলতো, তাই শ্‌নে প্রথম দিন কি যে হেসেছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

একদিন দ্‌প্‌রে মনে আছে, গ্‌প্তদের বৈঠকখানায় ঘ্‌মিয়ে আছে অপেরা পার্টির সবাই, গিরিজাপ্রসাদ উঁকি মেরে দেখেন, হাতির মত কালোকুলো মোটাসোটা চেহারার অধিকারী শ্‌য়ে আছে মাদ্‌রে, আর বংশী তার পা টিপে দিচ্ছে।

একটা পার্ট পাবার জন্যে কি না করেছে বংশী। তারপর একদিন তিনটে গর্‌র গাড়িতে মালপত্র তুলে অপেরা পার্টির লোকরা চলে গেল। আর সেই দিন থেকেই বংশীরও খোঁজ মিললো না।

ধ্‌মকেতুর মতই উবে গিয়েছিল, ধ্‌ম-কেতুর মতই ফিরে এলো আবার, বছরখানেক পরেই। তখন একেবারে অন্য মান্‌ষ। গলায়

তুলসীর মালা, কপালে গোঁসাইদিদির মত গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, মুখে মৃদু মৃদু গান। মুখে সব সময়েই হাসি লেগে আছে।

সন্ধ্যে হলেই খড়ি নদীর ধারে গোঁসাই-দিদির কুঞ্জে গিয়ে বসতো, কীর্তন গাইতো, আখর বুনতো।

চার পাশের গাঁয়ে নাম ছড়িয়ে পড়লো। বংশী কোটাল নয়, কেত্তনে বংশী দাস। কত লোক ভিড় করে গিয়ে গান শুনতো বংশীর।

সেই মানুষ কি করে যে এমন হয়ে গেল, কেন হলো, বুঝতে পারেন না গিরিজা-প্রসাদ।

জিগ্যেস করলে হেসে হেসে বলে, তুমিও হবে গো গিরিদাদা, তুমিও হবে। আলো না থাকলে কি করি বলো, আঁধারটুকুই দেখি।

না, গিরিজাপ্রসাদ তা হবেন না, হতে পারবেন না। সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে তাঁর সত্যি, কত কি আশা ছিল, সব ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু স্মৃতির স্বর্গ যে এখনো তাঁর মনের গোপনে বেঁচে আছে।

শুধু স্মৃতিই হয়তো।

রান্নাঘরের পাশের আম গাছটার দিকে তাকিয়ে তাই মনে হয়। আমের মুকুলে ভ'রে গেছে গাছটা। পাতা দেখা যায় না, এত বোল এসেছে এবার। মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসছে বাতাসের দমকে দমকে। মৌমাছির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে ঘন হয়ে। দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন একটা জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে গাছটার মাথায়।

শুধু ওই গাছটায় নয়। গাঁয়ের সব গাছই এমনি বউলে ভরে গেছে। কিন্তু...

ছোটবেলায় শোনা সেই ছড়াটা মনে পড়ে যায়।

গেঁয়ো বউয়ের তিনটি গান।

আম, মাছ আর নবান।

নবান হয়ে গেল। কিন্তু পুরোনো দিনের সেই উৎসব নেই আর। পাঁজি দেখে দিন ঠিক করে নবান্ন হয়ে গেল সারা গাঁয়ে, কিন্তু সে যেন শুধুই রীতিরক্ষা। এতটুকু আনন্দস্ফূর্তি নেই, হই চই নেই। তেমনি এই আমের বউল দেখেও মন কারো খুশিতে ভরে ওঠে না আর।

টাকা, টাকা, টাকা। টাকা ছাড়া আর যেন কিছু নেই। সব আনন্দ মরে গেছে, আছে শুধু একটাই। শুধু ধানের দর। ধানের দর উঠলে তবেই গাঁয়ের লোকের মুখে হাসি ফোটে!

কিন্তু টাকাটাই কি তুচ্ছ করবার মত?

নলে বাউড়ির বউ প্রমাণ করে দিলে টাকাটা মোটেই তুচ্ছ করবার মত নয়।

•

রায়বাড়িতে মুনিষের কাজ করতো নলে বাউড়ি। জমিতে লাঙল দিতো চাষের সময়, মই দিতো, ধান রুইতো, আর বছরের বাকি সময়টুকুও ঘর ছাওয়াতো, কাদা দিতো দেয়ালে, ফাই ফরমাশ খাটতো।

শুকনো রোগা চেহারা, চুলগুলো বারো আনা পেকে গেছে, কিন্তু লোকটা মুখ বুজে খাটে। নেহাৎ অসুখবিসুখে না পড়লে ছুটিছাটা নেয় না। তাও এসে দেখা করে বলে যায়, শরীলে বইছে না গো কত্তা, আজকের দিনটা ছুটি দেন!

সেই নলে বাউড়ি হঠাৎ একদিন কাজে এলো না।

অনেকখানি বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে গিরিজাপ্রসাদ যতে কোটালকে জিগ্যেস করলেন।

যতে কোটাল হাসলো, হাসি চাপলো, তারপর চুপ করে রইলো।

গিরিজাপ্রসাদ আবার প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে বল না!

লজ্জায় মাথা নীচু করে যতে বললে, সে আজ্ঞে আপনাকে কইতে নজ্জা নাগছে।

তার হাবভাব দেখে গিরিজাপ্রসাদ আর নিভাননী দু'জনেই হেসে ফেললেন।

নিভাননী রসিকতা করে বললেন, আবার একটা বিয়ে করতে গেছে না কিরে!

যতে মুখ তুলে চাইলে একবার নিভাননীর আর গিরিজাপ্রসাদের মুখের দিকে, তারপর মাথা নীচু করে বললে, আজ্ঞে না, একটা দুর্ঘটন হয়ে যেছে ওর ঘরে।

—কি হয়েছে? আতঙ্কিত স্বরেই প্রশ্ন করেন গিরিজাপ্রসাদ।

আর যতে কোটাল মাথা হেঁট করেই উত্তর দেয়, নলেদাদার বউ মাগী ওকে ছেড়ে পালিয়েছে গো।

—পালিয়েছে? বিস্মিত হলেন গিরিজাপ্রসাদ। নলে বাউড়ির দুঃখে একটু সমবেদনা বোধ করলেন।

অট্টামা একদিন বলেছিল, কালোর মত মোষ আর নলের মত মুনিষ হলে তবেই চাষ করে আনন্দ, পেসাদ।

কালো অর্থাৎ মোড়লদের পুরোনো মোষটা। আর নলে বাউড়ির মত বিনয়ী অথচ পরিশ্রমী মুনিষ। তা না হলে সত্যিই বুঝি চাষ করা বিরক্তির কাজ।

কিন্তু নলে বাউড়িকে গাঁ-সুদ্ধ সবাই যখন পছন্দ করে, প্রশংসা করে, ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তখন লোকটার এমন কি দোষ থাকতে পারে, যার জন্যে তার বউ পালিয়ে যাবে অন্যের সঙ্গে।

গিরিজাপ্রসাদ কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। শুধু ভাবলেন, স্ত্রীচরিত্র সত্যিই বোঝা ভার।

একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর যতে কোটালকে বললেন, যাতো গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় নলেকে।

যতে চলে গেল। ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। পিছনে পিছনে নলে বাউড়ি।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, কোথায় গিয়েছে সে, খোঁজ পেয়েছিস?

নলে বাউড়ি মাটিতে চোখ এ'টে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে করে উঠোনের মাটি তুলতে তুলতে ঘাড় কাত করলে।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, যা তাকে একবার নিয়ে আয় আমার কাছে।

ছোটবেলায় এমন অনেক বিচার মীমাংসা দিতে দেখেছেন গিরিজাপ্রসাদ, নিজেও বিচার করেছেন বড় হয়ে। আর মাথা হেঁট করে সে বিচার মেনে নিয়েছে বাউড়িপাড়ার, বাগদীপাড়ার সকলেই। তাই ভাবলেন, নলে বাউড়ির বউকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবেন, যান সঙ্গে চলে গেছে সে, তাকেও ধমক-ধামক দেবেন।

কিন্তু নলে বাউড়ি মুখ তুললে না। শুধু বললে, সে আসবে না আজ্ঞে!

—আসবে না!

নলে মাথা নাড়ালো।

রেগে গেলেন গিরিজাপ্রসাদ। রাগের স্বরে যতেকে বললেন, তবে তোরা আছিস কেন, কোটালপাড়া বাউড়ি পাড়ায় এত লোক, ধরে নিয়ে আসতে পারিস না তাকে। ঘরের বউ অন্যের সঙ্গে চলে গেল—

কথাটা হয়তো বুকে গিয়ে বি'ধলো বাউড়িপাড়ার লোকদের।

দিন কয়েক পরে সকাল বেলাতেই গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলেন গিরিজাপ্রসাদ। গোড়ের পার ধরে খানিকটা এগিয়ে এসে দেখলেন চিৎকার করতে করতে একদল লোক আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছলো। সকলেই চিৎকার করে উঠলো, ধরে এনেছি কত্তা, বিচার দেন গো আপনি।

পাশের গাঁয়ের পরান বাউড়ি। বুড়ো-সুড়ো মানুষ, চুলগুলো সব পেকে গেছে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে লোকটা। তারই সঙ্গে চলে গিয়েছিল নলে বাউড়ির বউ।

গিরিজাপ্রসাদ বউটার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন। রোগা শীর্ণ কুৎসিত চেহারা, বয়স পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বোঝা দায়। সারা শরীরে কোথাও কোন যৌবনের রেখা-মাত্র নেই। না কোন আকর্ষণ।

গিরিজাপ্রসাদ নিজেই কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করলেন। পরান বাউড়ির মধ্যে কি এমন আকর্ষণ বোধ করছে নলের বউটা বুঝতে পারলেন না। একটা জবুথবু বৃদ্ধ। অবস্থাও এমন কিছু ভাল বলে মনে হলো না। আর ওই বুড়োটাই বা এই কুৎসিত রোগজীর্ণ চেহারার মেয়েটার মধ্যে কি পেয়েছে!

ভাবতে ভাবতে বাংলাবাড়ির উ'চু দাওয়াটায় এসে বসলেন গিরিজাপ্রসাদ। লোকগুলো ভিড় করে বসলো নীচে মরাই-তলায়।

অনেকক্ষণ কোন কথা খুঁজে পেলেন না গিরিজাপ্রসাদ। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলেন।

ওদিকে ভিতরবাড়িতে যাবার সদর দরজায় আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে মোহনপুরের বউ, নিভাননী, বিমলা আর কমলা। গিরীন হয়তো বাইরে কোথাও গেছে। ক্যানাল ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আর্জি করতে। যে-সব জমি এক ফোঁটা জল পায়নি চাষের সময়, তার ওপরেও ট্যাক্স ধরে দিয়েছে, তাই যেতে হয়েছে তাকে।

গিরিজাপ্রসাদ নলে বাউড়ির বউয়ের দিকে তাকালেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে কি রে! ধমক দিলেন তাকে, কি ভেবেছিস কি?

বউটাকে আর বুড়ো পরানকে সামনে বসিয়ে বাউড়িপাড়ার সবাই পিছনে বসেছিল।

গিরিজাপ্রসাদের ধমকের উত্তরে প্রথমটা

কোন কথাই বললে না বউটা। পরাণ বাউড়িও মাথা নীচু করে রইলো।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো নলে বাউড়ির বউ, ক্রুদ্ধ চোখে সে একবার তাকালে নলে বাউড়ির দিকে, তারপর গিরিজাপ্রসাদের উদ্দেশে বললে, ওর ঘরকে যেতে কয়ো না গো আমার, যেতে কয়ো না। ও মানুষ লয়, পেটে রাক্কস আছে অর।

গিরিজাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন না কিছু।

বউটা আবার চিৎকার করে উঠলো। আমার উপ আছে না যৈবন আছে গো, কিসরে নেগে যেছি ওর ঘরে। পেটের নেগে, পেটের নেগে।

ক্রমশই যেন রাগে ফেটে পড়ছিল বউটা। আবার বললে, ঘর নিকোবো, গরুকে ছানি দোব গো, ধান শিজোবো, . ভাত রাঁধবো—ওর ঘরেও কাজ করছি, এর ঘরেও কাজ করতে হবে গো, বুঝলেন। কিন্তুক, ওই রাক্কস খেতে দেয় না গো, খেতে দেয় না। মাঠ থিকে ফিরে এসে সব হাম হাম করে খেয়ে লিবে নিজে। সকাল সনজে কাজ করি তবু ভাত দেয় না তোমার মুনিষ! সব নিজে খেয়ে লিবে।

ঝড়ের বেগে কথাগুলো বলে যায়। আর গিরিজাপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকেন তার দিকে, দেখেন, রাগে ফুলে ফুলে উঠছে বউটা। যেন বহুদিনের সঞ্চিত রাগটা এতদিনে প্রকাশ করতে পেয়ে মন হাল্কা করছে।

ভাত। শুধু ভাতের জন্যে ঘর ছেড়েছে বউটা! এখানেও কাজ করে জীবন কাটে, ওখানেও কাজ করে জীবন কাটবে। কিন্তু নলে বাউড়ি যে ওকে খেতে দেয় না, সব ভাত ক'টা নিজেই খেয়ে নেয়।

অনেকগুলো কথা অনর্গল বলে গিয়ে বউটা হাঁপাতে লাগলো। ধীরে ধীরে বললে, মাঠ থেকে যখন ফিরে আসে মানুষটা, দেখেন নাই আপনারা। সব ভাত ক'টা না দিলে রাঙা পানা চোখ করে, মনে হয় লাঙলের ফালাটা দিয়ে মানুষকে মেরে দিবে।

শুনলেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু কোন বিচারই দিতে পারলেন না। বললেন, যা হোক একটা মীমাংসা করে নে বাপু তোরা। বলে উঠে চলে এলেন।

সদর দরজার আড়াল থেকে নিভাননী শুনলেন, মোহনপুরের বউও শুনলো, নিভাননীর কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

দুটো পরিবার পৃথক হয়ে গেছে, ঘরবাড়ি উঠোন, খামারবাড়ি ভাগাভাগি হয়েছে, মাঝখানে একটা পাঁচিল উঠেছে। কিন্তু তা বলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও কেন বন্ধ করতে হবে মোহনপুরের বউ বুঝতে পারে না। তবু কেমন একটা অস্বস্তি থেকেই, কিংবা হয়তো স্বামীর ভয়েই একটু দূরত্ব রেখে চলে মোহনপুরের বউ। টিয়াকেও কাছে যেতে দেয় না। কথা বলতে দেখলে ধমক দেয়।

মোহনপুরের বউ সেজন্যেই বাইরে হই চই শুনে যদিও নিভাননীকে দেখেও সদর দরজার আড়ালে দাঁড়ালো, তবু আগের মত কাছ ঘেঁষে আসতে পারলো না। ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়ালো এমনভাবে, যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ।

আড়চোখে পরস্পর পরস্পরকে দেখলো, কিন্তু কথা বললে না। এটাই সবচেয়ে কষ্টকর মোহনপুরের বউয়ের কাছে।

বাউড়ি বউয়ের কথা শুনতে শুনতে সবাই হেসে উঠলো। বিমলা, কমলা, টিয়া। নিভাননী আর মোহনপুরের বউও। কিন্তু মোহনপুরের বউ হাসতে হাসতে তাকালো টিয়ার দিকে, দু' একটা কথাও বললে টিয়াকে লক্ষ্য করে। আর নিভাননী হেসে ফেলে তাকালেন বিমলার দিকে, দু' একটা কথাও বললেন বিমলাকে। অথচ দু' জনেই কথাটা শোনাতে চাইলো পরস্পরকে।

সেই প্রথম প্রথম গিরিজাপ্রসাদ খেতে বসলে মোহনপুরে বউ যেমন ঘোমটা টেনে আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাসুরকে শুনিয়ে শুনিয়েই চাপা গলায় বিমলাকে জিগ্যেস করতো, আর কিছু লাগবে কিনা,—এ যেন তেমনি ভাসুর ভাদ্রবউয়ের সম্পর্ক বড়-জায়ের সঙ্গে।

তারপর এক সময় দু' পক্ষই নিজের নিজের কাজে চলে গেল। ছোট লাইনের ছোট্ট স্টেশনে জমা হওয়া ক'টা মানুষ যেমন কয়েক মিনিট পাশে পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে ট্রেনের জন্যে তারপর নিজের নিজের কামরায় উঠে পড়ে, ঠিক তেমনি।

বিমলাও হাসতে হাসতে পালিয়ে এলো নিজের ঘরটিতে। নলে বাউড়ির বউয়ের কথাগুলো তার কাছে হাসির কথা বলেই মনে হলো। ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্যও মনে হলো না। রাঁধা ভাতগুলো খেয়ে নেয় স্বামী, শুধু এই কারণে নাকি বউ স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্য লোকের ঘরে পালিয়ে যায়!

বিমলার মনে হলো, সব মিথ্যে, সব মিছে কথা। প্রেম ভালবাসা, রূপ যৌবন এ-সবের চেয়ে বড় কিছু আছে নাকি? থাকতে পারে না।

ওর মনেও তখন একটাই স্বপ্ন। প্রভাকর।

সেই নির্জন নিঃশব্দ রাত্রের রাতটার কথা মনে পড়লেই সারা শরীরে একটা তীব্র পুলকের শিহরণ খেলে যায়। গিরিজাপ্রসাদ যেদিন মরাইগুলো দেখবার জন্যে [illegible] মিনিটের জন্যে উঠে গিয়েছিলেন, আর [illegible]

প্রভাকর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল।

মুহূর্তের লুব্ধতায় বিমলার পিঠের ওপর একখানা হাত রেখেছিল প্রভাকর, আর সেই ক্ষণেক স্পর্শের মোহ একটা চিরন্তন স্বাদ হয়ে বেঁচে আছে। মনে মনে কতবার সেই দিনটির কথা রোমন্থন করেছে বিমলা।

তারপরও কয়েকবার এসেছে প্রভাকর। নতুন ইস্কুলের জন্যে আপীল দরখাস্ত সই করাতে, খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করতে। আর বিমলা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে প্রভাকরের উৎসাহের মূলে আছে এমনি এক রোমাঞ্চের হাতছানি।

দু' একটা অতি সাধারণ কথাবার্তা, হাসি আনন্দ, ঈষৎ স্পর্শ, চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। এরই ফাঁকে কি করে যে দু'জন দু'জনের এত কাছে এসে গেছে। পরস্পরের প্রতি একটা অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞার মত।

তারপর সেই একটি দিন।

স্টেশনে যাবার কাঁচা রাস্তার ধারে নতুন গোড়ের পূব পাড়ে ইস্কুলবাড়ির জন্যে জমি দেখতে এলো প্রভাকর আর ব্লক আপিসের আরেকজন ভদ্রলোক।

প্রথম প্রথম গ্রামের কারো বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু অবনীমোহন টাকা দিতে চাইলেন দেখে এবং ইস্কুলটা সত্যিই শেষ পর্যন্ত হবে এই ভরসা পেয়ে গাঁয়ের সকলেই এগিয়ে এলো।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য, গোপেন মোড়ল, যে-কিনা প্রথম থেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটাকে, সেই বলে বসলো, ইস্কুলবাড়ির জন্যে জমি যা লাগবে আমি দোব।

নতুন গোড়ের পূব পাড়ে খানিকটা ডাঙা জমি, তারও পরে মোড়লদের আমবাগান। সেখানেই বিঘেখানেক ডাঙা জমি ছেড়ে দিতে চাইলে গোপেন। বললে, জমিজমা সেই তো গরমেন্টই নেবে গো লুটেপুটে, তার চেয়ে নয় গাঁয়ে একটা ইস্কুলই হোক।

গাঁয়ে ইস্কুল হবে, ইস্কুলের জন্যে পাকা বাড়ি হবে, মাস্টার আসবে, গাঁয়ের ছেলেরা পাশ করে বেরোবে......এর চেয়ে আর আনন্দের কি থাকতে পারে।

শুধু বংশী বললে, পাশ করে লাভ কিছু হবে না গো, লাভ হবে না। ওই উদোসের মত শহুরে হতে চাইবে সব, বাবু হতে চাইবে। চাকরি খুঁজবে শুধু।

গুপ্তদের মেজো ভাই বাধা দিয়ে বললে, তবু তো চাকরি পাবার যোগ্যতা হবে পড়াশুনো করলে। তা নইলে......

কথা শেষ করতে দিলে না বংশী। বললে, লাভ তোমার হবে বৌক। তিন তিনটে ছেলে তোমার, পাশ করে বেরুলে পণের দর উঠবে হৈ হৈ করে, কি বলো!

সকলে হেসে উঠলো তার কথা শুনে। কিন্তু বংশীর কথায় কেউ কান দিলে না। সকলের মনেই তখন একটা নতুন নেশা ঢুকেছে। যে গ্রামটাকে কেউই মনে মনে পছন্দ করতো না, এমন গাঁয়ে ভিটেবাড়ি, জমিজমা বলে একটা আত্মধিক্কারে জ্বলতো, সেই গ্রামটার গর্বেই যেন রাতারাতি উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

তাই যেদিন প্রভাকর এলো জমি দেখতে সেদিন গাঁয়ের সকলেই ভিড় করে এলো। বিশেষ করে বাউড়ি, বাগ্দীদের ছেলেরা। ইস্কুলে পড়তে পাবে, শিক্ষিত হতে পাবে এই আশায় ছোট ছোট ছেলেগুলোর চোখ মুখ উৎফুল্ল।

প্রভাকর, গিরিজাপ্রসাদ, গোপেন মোড়লের পিছনে পিছনে সকলেই দল বেঁধে চললো। বাপের সংগে সংগে বিমলা কমলাও।

টিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে কপাটের আড়াল থেকে। তারও যাবার ইচ্ছে ওদের সংগে, কিন্তু সাহসে কুলোলো না।

গিরীনও গায়ে জামাটা চড়িয়ে নিয়ে ওদের পিছনে পিছনে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে টিয়াকে বললে, মাকে বল, ওদের দু'জনের জন্যে একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। ফেরার পথে নিয়ে আসবো ওদের।

বলেই গিরীন চলে গেল, আর ফুর্তিতে আনন্দে মা'র কাছে ছুটে এলো টিয়া। নিজেই ময়দার টিনটা এনে থালার ওপর ঢালতে শুরু করলে।

প্রভাকরের জন্যে এটুকু ব্যবস্থা করতে পেলে, দুটো লুচি নিজের হাতে ভেজে দিতে পারলে যেন জীবন সার্থক হয়ে যাবে তার!

ময়দা মাখতে মাখতে কখন যে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে, টেরই পায়নি। হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙতেই দেখলে মা মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

তা দেখে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল টিয়া। মুখ লুকোবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে গেল গ্লাস বাটি থালা ধুতে। তারপর পুকুরের পাড় থেকে ওপাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে।

এত লোকের সামনেই প্রভাকরের সংগে হেসে হেসে কথা বলছে বিমলা।

সেদিকে তাকিয়ে টিয়ার মুখ থেকে হাসিটুকু আপনা থেকেই কখন উবে গেল।

(ক্রমশ)

তৃতীয় অর্থ কমিশনে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কর বণ্টনের অসাম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শ্রীহেমন্তকুমার বসু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রশ্ন করেন—মন্ত্রীরা কী করেন, রাজ্যের ন্যায্য পাওনা আদায় করিয়া আনিতে পারেন না?—"অতঃপর 'আফগান ব্যাঙ্ক' উপদেষ্টাদের নিকট টাকা আদায়ের পন্থা শেখার জন্য মন্ত্রীদের ট্রেনিং নিতে তিনি বলেছেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানা যায় নি।"—বলেন খুড়ো।

বণিক ও শিল্প সমিতি সংঘের অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর ভাষণে শ্রীনেহরু ঘোষণা করিয়াছেন—ভারতের অর্থনীতির লক্ষ্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। শ্যামলাল বলিল—"আমরা ভেবেছিলাম গুড় ব্যাড খাওয়া-দাওয়াই বুঝি অর্থনীতির লক্ষ্য।"

কোন এক বিধানসভার সদস্য মন্ত্রী হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁর সমর্থক জনৈক বন্ধু নাকি আমরণ অনশন-এর সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই সংবাদ পড়িয়া অনেকেই হতবাক্ হইয়াছেন।—"কিন্তু হতবাক্ করে দেওয়ার মতো আরো সংবাদ হয়ত আছে, আমরণ অনশনের চেয়ে কঠিন পণ—বাঁধব না বাঁধব না চুল—কিন্তু এ খবর আমরা কে-ই বা শুনেছি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

সংসদের সদস্যদের মধ্যে বিগত পাঁচ বৎসরে তিনজন ২ হইতে ৪ মিনিট কথা বলিয়াছেন, তিনজন বলিয়াছেন ৫

মিনিট, চারজন বলিয়াছেন ৬ মিনিট। আর ১০৪ জন ৫ বৎসরের মধ্যে একবারও একটি কথা বলেন নাই।—"তাঁরা বুদ্ধিমান; তাঁরা জানেন বোবার শত্রু নেই"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শ্যামলাল বলিল—"আ ন ন্দ বা জা র পত্রিকায় বিধানসভার মহিলা মহলের কথা শুনলাম, মহিলাদের ছবি দেখলাম, কিন্তু মহিলা মহলে 'নূতন রান্না'র কোন খবর দেখতে পেলাম না!!"

সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলিয়াছেন — পরজন্ম; কিন্তু কারণে [illegible]

'সভ্যতা' প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো বলিলেন—"বহুদিন আগে স্বর্গত বিপিন পাল মশাই তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—'সভ্যতা নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে একবার বড়ই সমস্যায় পড়েছিলাম। সভ্যতা সত্যি সত্যি কী। অভিধানে দেখলাম—সিভিলাইজেশন হল ওপোজড টু বারবারিজম; আর বারবারিজম হল ওপোজড টু সিভিলাইজেশন'— শ্রীজয়প্রকাশ বর্ণিত এই মানব সভ্যতা যে কোথায় তা-ও আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে"—বলিয়া খুড়ো তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন।

দিল্লিতে কনফেকশনারদের এক সভায় বলা হইয়াছে, উন্নত ধরনের কনফেকশনারি দিয়া বেশ ভাল বৈদেশিক

মুদ্রা অর্জন করা যায়।—"তা যায়; কিন্তু আস্কে বা সরু চাকলি চালু না করলে এটা হবে নিউকাসেলে কয়লা চালানের মতো"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

খৃস্টান মিশনারিদের ব্যাপক প্রচার হইতে পাকিস্তানকে 'বিশুদ্ধ' রাখিবার জন্য করাচীর 'ডন' কাগজ হুঁশিয়ারী প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই, গোবর ভক্ষণে সব পরিশুদ্ধ হয়ে যায়!!"

সম্প্রতি একটি চাল বোঝাই লরি রাজ্য বিধানসভার একটি গেটের রেলিং-এ আসিয়া ধাক্কা দেওয়ার ফলে রেলিং ভাঙিয়া যায়।—"পানের দোকান, চায়ের দোকান, ফুটপাথ, গাছ পালায় তো অনেক 'ধাক্কাই মারা গেল, এবার বিধানসভা, মারি তো হাতী"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হইবে কি না এই লইয়া শিক্ষাব্রতীরা আবার নূতন করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন

মারাত্মক ভুল হইবে, অন্যপক্ষ বলিতেছেন—আংরেজী হটাও। আমাদের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা কেরানী বা বিবাহের কারণং। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের কী-ই বা বলিবার আছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা না বলিয়া পারিলাম না। কোন অফিসের বাবুরা পিয়নকে পাঠাইয়াছিলেন বাজার হইতে কাটলেট কিনিয়া আনিতে। ঘণ্টাখানেক পরে পিয়ন (হিন্দুস্থানী তো বটেই) একটি ক্যাটেলগ আনিয়া হাজির করে। আংরেজি হটাওর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!!

ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর হাসপাতালে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী ডলি তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে যান। সংবাদে বলা হইয়াছে, শ্রীমতী ডলিকে দেখিয়া কন্ট্রাক্টর প্রথমে হাসিলেন এবং পরে সানন্দে তাঁর হাত চাপিয়া ধরিলেন।—"এ ডলি ক্যাচ!"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক।

অভিযোগে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক অপচয় সংক্রান্ত ব্যাপারে অডিট-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া হয় নাই। শ্যামলাল বলিল—"সরকারী নীতি সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল নই। তবে সাধারণের সোজা নীতি হল—সরকারী কা মাল, দরিয়া মে ডাল!!"

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কৃষি পরিকল্পনার আবহতত্ত্বের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।—"কিন্তু আমরা দেখছি বৃষ্টি হবে না ঘোষিত হলে ছাতা নিয়ে বেরুতে কেউ ভুল করেন না। সুতরাং এই তত্ত্বের চেয়ে 'কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মন্দ মন্দ দিতেছে বা'-ই ভালো—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শুনিলাম অদূর ভবিষ্যতে নাকি বিনা বর্ষণেই কলিকাতা প্লাবিত হইতে পারে।—"মন্দ কী, ছেলেমেয়েদের এবং

কলকাতা কর্পোরেশনের বাসিন্দাদের (পিতা স পুত্রঃ পুত্রঃ ইত্যাদি) [illegible] আর কে [illegible]। আর [illegible] [illegible]

বাড়ির মতো স্কুল

শিশু যখন স্কুলে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করে তখন অনেকের কাছে স্কুল আর বাড়ি দুটো আলাদা জিনিস। বাড়ি তাদের কাছে পরম আনন্দের স্থান আর স্কুল হ'ল নিরানন্দ ও ভয়ের জায়গা। কিন্তু এমন স্কুল কি হতে পারে না যা হবে বাড়ির মতোই আনন্দময় আর মাস্টারমশাইরা শুধু বয়স্ক বন্ধু? সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর একমাত্র সরকার পরিচালিত স্কুল-তথা-বাড়ি প্রতিষ্ঠানটি এইদিক দিয়ে একটা আদর্শ স্থাপন করেছে।

পশ্চিম জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশে এইরকম একটি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এটিকে স্কুল ও বাড়ির সুন্দর সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। স্কুলটি পরিচালনা করেন রাজ্য সরকার। একটি পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে স্কুলটি অবস্থিত।

স্কুলটি এতো সুনাম অর্জন করেছে যে, একমাত্র ১৯৬০ সালেই এইখানে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করানোর জন্য, পিতামাতা-দের ৩০০০ আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। এখানে একটি হাইস্কুল ও একটি স্কুল আছে এবং ২০০-র কিছু বেশী ছাত্রছাত্রী নেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের আরও দুটি উচ্চতর স্কুল আছে এবং তাতে আশেপাশের গ্রাম-গুলির আরও দুশো ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতে পারে, কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠানের বাড়িতে থাকতে পায় না।

সম্প্রতি কয়েকজন সাংবাদিক এই স্কুল-তথা-বাড়িতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পুরো একদিন কাটিয়ে আসেন। তাঁরা এদের সঙ্গে ক্লাশে বসে পড়াশুনার পদ্ধতি দেখেছেন, তারপর পাঠকক্ষে গিয়ে এদের সঙ্গে বসেছেন, এদের সঙ্গে আহার করেছেন, বিকেলবেলা খেলাধুলো করেছেন, এদের আঁকা ছবি ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী দেখেছেন। ছাত্ররাও সাংবাদিকগণের সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি বুঝতে চেষ্টা করেছে।

নিজের পেশা ও বৃত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ডাঃ মোরা-ওয়েটস্ তাঁর অতিথিবর্গের কাছে এই স্কুল-তথা-বাড়ির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এটি প্রচলিত অর্থে বোর্ডিং স্কুল নয়, হস্টেলও নয়, এটা হ'ল এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে জীবন ও শিক্ষাকে একটা বিশেষ উপায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের মতে বাড়ি শুধু ঘুমোবার জায়গা নয় আর স্কুলও শুধু প্রতি ঘণ্টায় পরিবর্তনশীল লেখাপড়া শেখার ড্রিল গ্রাউন্ড নয়। অল্প কথায় বলতে গেলে, আমরা চাই এমন একটা স্কুল, যেখানে শিশুদের স্বাভাবিক গুণগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকবে, তারা যুক্তিসংগত পরিশ্রম করবে, প্রাণ খুলে আনন্দ করবে, ভালো ক্ষিধে থাকবে এবং পড়াশুনা ও খেলাধুলায় শৃংখলা থাকবে।"

সর্বোপরি এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হ'ল, দেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মনে একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, ওরা হবে মনে ও চিন্তায় স্বাধীন কিন্তু নৈতিক গুণগুলি সম্পর্কে সচেতন। শিক্ষকগণ হবেন কাজে উৎসাহী এবং তাঁদের নির্বাচিত বৃত্তিকে সফল করে তুলতে সচেষ্ট।

অধ্যক্ষ ডাঃ মোরাওয়েটসের মতে, এই লক্ষ্য পূরণ করার পথে একটি প্রধান ব্যবস্থা হ'ল, শিশুদের সর্বমুখীন শিক্ষা। শিক্ষক, ক্লাশেই শুধু শিক্ষক থাকবেন, ক্লাশের বাইরে তিনি হবেন ছাত্রছাত্রীদের বয়স্ক বন্ধু। সৌহার্দ্যের মূল ভিত্তি হ'ল দৈনন্দিন মেলামেশা ও অকুণ্ঠ আলোচনা। [illegible] প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই। সাধারণত স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যে ভর্ৎসনা করা হয় এবং ছুটির পর আটকে রেখে তাদের যে শাস্তি দেওয়া হয় তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরায়। সেইজন্য এই প্রতিষ্ঠানে ওগুলি রহিত করা হয়েছে। খোলাখুলি আলোচনা অথবা শিক্ষকের কাছে বা অধ্যক্ষের কাছে ব্যক্তিগত-ভাবে নির্ভয়ে নিজের সুবিধে অসুবিধে ব্যক্ত

করা, রিপোর্ট বুকে খারাপ মন্তব্যের চাইতে বেশী ফলপ্রদ হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের বাড়িতে যেসব ছাত্র থাকে তাদের প্রত্যেকদিন স্কুলের ওয়ার্কশপে গিয়ে খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় অথবা নিজেদের থাকার জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনার স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সময়ানুবর্তিতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

এখানকার ৪৫ জন শিক্ষক, তাঁদের পেশা সম্পর্কে সচেতন এবং কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পান। এ'দের মধ্যে কেউ অন্য পেশা গ্রহণ করতে স্বীকৃত নন। এই বাড়িস্কুলের শিক্ষকগণের কাছে ছাত্রছাত্রীরা, সাধারণ স্কুলের শিক্ষকগণের তুলনায় অনেক বেশী অসংকোচে নানারকম প্রশ্ন করতে পারে।

ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণের কেউবা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, কেউবা পাইকারী ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, ইঞ্জিনীয়ার, আইন-ব্যবসায়ী, আবগারি কর্মচারী, কেউবা বেতার মেকানিক, পোস্ট অফিস ড্রাইভার, রুটি প্রস্তুতকারী। এখানে মাসিক ফী হ'ল প্রায় ১০০ ডি এম, এর সঙ্গে ৫০ থেকে ৭০ ডি এম অতিরিক্ত ব্যয়। যুক্তিসংগত মনে হলে ব্যয় অনেক সময় যথেষ্ট হ্রাস করা হয়। আগামী বছর থেকে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। সবচাইতে বড় কথা হ'ল সমাজের সর্বস্তরের ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে মেলামেশা ক'রে শিক্ষা গ্রহণ করে।
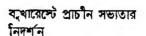
বুখারেস্টে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

গত বৎসর রুমানিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদির সন্ধান পেয়েছেন।

আর, আর, পি একাডেমীর আর্কলজিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং বুখারেস্ট নগর ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় কৃত ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে রুমানিয়ার রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানব জীবন সম্পর্কিত বহু সামগ্রী পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একশো লক্ষ বৎসর পূর্বেকার বস্তুরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

এই নিদর্শনগুলি থেকে এরূপ কয়েকটি জাতির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যারা রোমান-বাইজেন্টাইন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং পরে স্লাভ জাতির সংস্পর্শে আসে। এই স্লাভ জাতি পরে রুমানিয়াতেও এসেছিল। ফান্দেনী জলাশয়ের তীরে আবিষ্কৃত অর্ধকুটিরগুলি থেকে ছয় শতাব্দী পূর্বের মৃৎপাত্র, লৌহ-ছুরিকা, ধনুকের ছিলা ইত্যাদি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়।

বুখারেস্টের নিকট কর্নিকায় একটি মঠ অনুসন্ধানকল্পে খননকার্য চলার সময় অনেক সমাধি আবিষ্কৃত হয়। এই সমাধিস্থান থেকে প্রাচীন লৌহযুগের কঙ্কাল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত রুমানিয়ায় যে সকল সমাধিস্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, এই সমাধিস্থানটি তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই নতুন আবিষ্কারগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদদের পরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠবে এবং এই থেকেই রুমানিয়ায় মানব অস্তিত্বের প্রারম্ভিক যুগের হদিশ পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

রবীন্দ্রশতবার্ষিক স্মরণ-গ্রন্থ

রবীন্দ্রশতবার্ষিক উপলক্ষে সাহিত্য আকাদামি একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি (Tagore : A Centenary Volume)। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর মতন শ্রদ্ধেয় ও গুণী ব্যক্তির উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে যাঁরা এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন, আশা করি তাঁরা দায়িত্ব পালনে কোনো ত্রুটি রাখবেন না। সাহিত্য আকাদামির পক্ষ থেকে মুখবন্ধ পরিচয়ে বলা হয়েছে :

"If the best homage to a great man is to understand the significance of his life and work this publication should serve its purpose amply. It
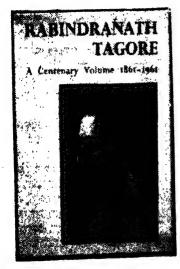
contains serious studies on the many aspects of Tagore's personality and genius contributed by eminent writers and savants from many parts of the world."

গ্রন্থটি মোটামুটি চারটি অংশে ভাগ করা : রবীন্দ্রস্মৃতি, রবীন্দ্র-চর্চা, বিদেশে রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য। বলা বাহুল্য, প্রতিটি বিভাগেই যোগ্য ব্যক্তি এবং খ্যাতনামারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখে এই গ্রন্থের তাৎপর্য ও মূল্য বৃদ্ধি করেছেন। বিশেষত এলমহার্স্ট, আর্নল্ড আড্রিয়ান বাকে, পার্ল বাক, তোশিকিকো কাত্তায়ামা, আলবার্ট স্যুইৎসার, রবার্ট ফ্রস্ট, থিয়েডোর হেস প্রভৃতি বিদেশী গুণিজনের রচনা সংগ্রহ হওয়ায় গ্রন্থটির যে আন্তর্জাতিক চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে, তার জন্যে সম্পাদকবৃন্দ ধন্যবাদার্হ। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্মৃতিকথা এই সংকলনে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ভারতীয় লেখকদের মধ্যে শ্রীনেহরুর ভূমিকা ছাড়া, রাধাকৃষ্ণনের ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, মুলকরাজ আনন্দ,

বিদুর

আবু সঈদ আয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, পৃথ্বীশ নিয়োগী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতির রচনাও নিশ্চয় উল্লেখ করার মতন। অবনীন্দ্রনাথ, রথেন-স্টাইন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মুইরহেড বোন, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ছবিও এই গ্রন্থের সম্পদ।

বইটির মূল্য তিরিশ টাকা। হয়ত বেশী। কিন্তু আয়তন ও প্রকাশ-ব্যয় বিবেচনায় এই মূল্যকে স্বীকার করে নিতে হয়।

সাহিত্যে প্রগতি

সচরাচর আমরা যে-কথা শুনি না তেমন কোনো কথা শুনলে কান ফেরাতে পারি না। কৌতূহল বোধ করি। সেদিন এক ইংরেজি সাপ্তাহিক কাগজে এক প্রবীণ ইংরেজ ভদ্র-লোকের একটা মজার লেখায় চোখ বুলিয়ে মনে হল, এ-প্রশ্ন ত আমাদের কোনো বাঙালী পাঠকও করতে পারেন, করলে কি জবাব দেবেন লেখকরা, কিংবা আধুনিক সাহিত্যের ভক্তরা।

প্রশ্নটা সাহিত্যের প্রগতি বিষয়ে। ভদ্র-লোক খুব বিনীতভাবে শিক্ষার্থীর মতন প্রশ্নটি তুলেছেন। তিনি বলেছেন : যাঁরা আধুনিক সাহিত্যের লেখক এবং সমঝদার তাঁরা বলেন—দেখুন মশাই, আমাদের বিশ্বাস করুন, আমরা সাহিত্যশিল্পকে ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছি, আগে যা করা হয়নি, আমরা সেই অসাধ্য কাজ করছি।

যখন মানুষ নতুন কিছু করে, করতে যায়, তখন সব সময় তারা আমাদের এই বলে আশ্বাস দেয় যে, আমরা যা করছি সেটা ভাল, তোমরা আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখ। ভদ্র-লোক বলছেন, বেশ ত, বিশ্বাস রাখছি; কিন্তু এই বিশ্বাস কি আমরা আগে সভ্যতার অন্যান্য প্রগতির ওপর রাখিনি। রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, যন্ত্রসভ্যতা, এমন কি অ্যাটমের মহাশক্তি-আবিষ্কারের সময়ও আমরা বিশ্বাস রেখে এসেছি। কিন্তু, তোমরা আমাদের কোথায় এনেছ? সুখ শান্তি তৃপ্তি অথবা আনন্দের জগতে নয়। বরং এমন এক সঙ্কটের মুখে যখন মনে হয়, তোমাদের বিশ্বাস করে এখানে এসে আমরা সর্বস্ব হারিয়েছি।

মানুষের প্রতিটি নতুন চিন্তা অপর চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সভ্যতার অন্য অন্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্যের নতুন চিন্তা আসে না। এমন কথা মনে করা অন্যায় — জগতের আর পাঁচটা আধুনিক চিন্তা থেকে গা সরিয়ে সাহিত্য স্বয়ম্ভু কোনো চিন্তা করতে সক্ষম। যদি তাই হত, তবে নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত, সক্রেটিস থেকে কিয়েৰ্কেগার্ড পর্যন্ত, এবং আরও অনেক চিন্তাধারা থেকে সাহিত্য মুক্ত থাকতে পারত। তাই কি আছে? হলফ করে এমন কথা কোনো আধুনিক সাহিত্যিক কি বলতে পারে, অন্য শাস্ত্রের প্রভাব তার মনোজগতে ছায়া ফেলেনি? মার্কসিস্ট সাহিত্য কি তাহলে? ফ্রয়েডের গলাধঃকরণ কেন তবে? ডারউইনের পর ঈশ্বর-বিমুখ সাহিত্যের পাল্লা অত ভারি হল কেমন করে?

ফুৎকারে এ-সমস্যার জবাব দিয়ে লাভ নেই। যাঁরা, যে-সব আধুনিক সাহিত্যিক ভাবছেন, সাহিত্যের মহাদিগন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার উত্তেজনায় কাজ করে যাচ্ছেন, শেষাবধি তাঁরা পাঠককে কোথায় নিয়ে যাবেন? আধুনিক বিশ্ববাসীর কাছে আবিষ্কৃত অ্যাটমের সাম্প্রতিক রূপ যেমন সঙ্কট আর সমস্যার বস্তু, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ রূপও যদি সেই রকম ভয়াবহ হয়ে ওঠে, তবে বুঝতে হবে সেই কবর আমরা নিজেরা খুঁড়েছি।

লেখাটায় ভদ্রলোক কোথাও বিদ্রূপ মনে কিছু বলেননি, এমন কি কর-কোষ্ঠী বিচারকের মতন কোনো ভবিষ্যৎবাণীও করেননি। তিনি শুধু লেখক এবং পাঠক-দের সং হয়ে ভাবতে বলেছেন।

আমি, ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী, কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত হামেশা চোখে পড়ে যখন মনে হয়, শতকরা সত্তরটি অতি আধুনিক সাহিত্য হয় ভেক ধরেছে, না হয় বাজারের মাছঅলার মতন মাল বেচার চেষ্টায় ঠিক ওই কথাটা বলছে : বিশ্বাস করে নিয়ে যান, ঠকবেন না।

আমি বলি না, বিশ্বাস অনুচিত। আমার ধারণা, যে-দর্জি ছাঁটে বার বার তিনবার ভুল করেছে—তাকেও ধুরন্ধর ভাবা আমার মতন

দীনের পক্ষে মুশকিল, নতুন করে কাপড় খরচার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে চতুর্থবার আর তার কাছে যব না।

পাকিস্তানে বইয়ের জালিয়াতি

কোনো লেখকের লেখা বই, কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি, কোনো গায়কের গাওয়া রেকর্ড করা গান যে বেওয়ারিশ সম্পত্তি নয়, এই নীতিকথাটা নিতান্ত অজ্ঞেও জানে। জানে না কেবল পূর্ব পাকিস্তানের কিছু কিছু প্রকাশক। কিংবা জেনেও জানতে চায় না, না-ঘুমিয়েও ঘুমের ভাণ। আর এই অজ্ঞতার, না অজ্ঞতা বলা ভুল, অগ্রাহ্য করার আশ্চর্য মনোবৃত্তি নিয়ে ভারতীয় বাঙালী সাহিত্যিকদের বই বিনা অনুমতিতে ছেপে বেঁধে বাজারে কেনাবেচা করছেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রকাশকরা। এ যে কেমন করে হয় আমরা বুঝতে পারি না, বুঝতে পারি না—কপিরাইট অ্যাক্টের আওতায় কেন এই দুষ্কর্ম পড়ে না।

খুব সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এ-সম্পর্কে যে সংবাদটি বেরিয়েছে, তার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি: "বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের বইয়ের বাজার কলিকাতার আধুনিক জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ে ছাইয়া গিয়াছে। এই বইগুলি সবই পাকিস্তানে ছাপা। এবং এ-জন্য পাকিস্তানী প্রকাশকবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের নিকট কোনোরূপ অনুমতি পান নাই। গত দুই বৎসরের মধ্যে এইরূপ কলিকাতার বিভিন্ন লেখকের তিনশত উপন্যাস ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ......এই সমস্ত বই প্রকাশের ব্যাপারে পাক প্রকাশকরা যে আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন মানিয়া চলেন না, বা কোনোরূপ অনুমতি লন না, তাহা খোদ ঢাকার এক সংবাদপত্র স্বীকার করিয়াছেন।"

পূর্ব পাকিস্তানের প্রকাশকরা কেমন করে এ-কথা বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক কপিরাইট অ্যাক্ট তাঁরা স্বীকার করেন না? পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদের বই যে মনোবৃত্তি এবং বেপরোয়া-ভাব নিয়ে তাঁরা ছাপছেন, কোনো বৃটিশ বা আমেরিকান লেখকের বই একবার তাঁরা ঢাকার ছাপাখানায় ছেপে সেই সংবাদটি উক্ত গ্রন্থের মূল প্রকাশককে একবার জ্ঞাত করতে পারেন কি? ইংরেজী ভাষা বলে ছাপার গরজ নেই, এ যদি তাঁদের জবাব হয়, তবে বলব পরীক্ষামূলকভাবেও একবার কার্যটি করে দেখান যে, [illegible] পাকিস্তানে কিছু নেই, কেউ তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তার চেয়েও সোজা প্রস্তাব, পাক্ প্রকাশকরা যে-ভাবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি অভিধান গ্রন্থ ব্লক করে ছেপে নিয়েছেন—ঠিক সেই-ভাবে অক্সফোর্ড বা চেম্বার্স অভিধান একবার ছেপে দেখুন না জল কোন সমুদ্রে গিয়ে দাঁড়ায়! আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এ-সাহস তাঁদের হবে না।

তা ছাড়া কপিরাইট অ্যাক্ট বাতিল হয় কি করে? আমার যতদূর জানা আছে, কপিরাইটের বহু ত্রুটি বর্তমানে সংশোধিত:
"The Copyright Union has reme died this in Europe and th Commonwealth and the Unesc Conference gives ground for res hope ...."
পাকিস্তান কি কমনওয়েলথ নয়? পাকিস্তান কি ইউনেস্কো কনফারেন্সের কপিরাইট নীতি স্বীকার করে না? হয়ত এ-সব কথা অবান্তর, কেন না, আইন মানা না-মানার মধ্যে যে নীতির প্রশ্ন আছে, তাতে [illegible]
[illegible]

বিদেশ ভ্রমণ

মানবতার সাগর সংগমে—শচীন সেনগুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ছ টাকা।

১৯৫৮-র জুলাই মাসে দিল্লি থেকে রুমেনিয়া শান্তি কমিটির ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনে আমন্ত্রিত ভারতীয় ডেলিগেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গত শচীন সেনগুপ্ত যে দূর যাত্রার সুযোগ পেয়েছিলেন সেই কাহিনীই তাঁর এই বইখানিতে চিত্তাকর্ষকভাবে বলা হয়েছে। দিল্লি থেকে অমৃতসর—সেখান থেকে লাহোরের আকাশ দিয়ে, সিন্দুপ্রদেশ পেরিয়ে কাবুল ছুঁয়ে—সেখান থেকে আবার সোভিয়েত প্লেনে হিন্দুকুশ, গিরিমালা অতিক্রম করে, তিরমিজ হয়ে তাসকেণ্টে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। তিরমিজের গান-বাজনার কথা বলতে বলতে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণের প্রসংগ এসে পড়েছে। তারপর, আবার তাসকেণ্টের কথায় ফিরেছেন। তৈমুর, বাবর,—সমরকন্দ, বুখারা—এইভাবে পৃথিবীর নানা দেশ-কালের কথা উঠেছে। লেনিনগ্রাদে উইণ্টার প্যালেস, চিত্রশালা, ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট, —যেখানে লেবেদেফের লেখা 'শুভংকরী'র রুশীয় অনুবাদ দেখেছিলেন শচীনবাবু,—তা ছাড়া আরো নানা অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানবসমাজের বর্ণনায় এই ভ্রমণকাহিনী চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ রচনা হয়ে উঠেছে। মস্কো বিমানঘাটি ছেড়ে দেশে ফেরবার পথে, পৃথিবীর এই বিচিত্র মানবসমাজের ভাবনা-সূত্রেই পঞ্চশীলের আদর্শ আর আণবিক মারণশক্তির আশংকা মনে জেগেছিল। পঞ্চাশ হাজার ফিট ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ছশ মাইল বেগে তাঁদের প্লেন উড়ছিল তখন। সামনে আহারের আয়োজন। সেই অবস্থায় লেখক বলে গেছেন "খেতে খেতে ভাবলাম পঞ্চাশ হাজার ফিট উপর দিয়ে মিনিটে দশ মাইল বেগে উড়ে যেতে যেতে মাখন-ঢালা গরম ভাত খাচ্ছি ভিল-কাটলেট সহযোগে, আর পেয়ালায় কফি স্থির হয়ে আছে, এতটুকু টলকাচ্ছে না। মানুষ এত বড়। স্পুটনিকের কথা মনে পড়ল। মানুষ তো আরো বড়।" ৪০।৬১

উপন্যাস

জাগর দীপ—অঞ্জলি বসু। মৌরীট পাবলিশার্স, ৫১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ঃ ৩, টাকা।

প্রেমের পথ ঘোরালো। সেই প্রেমকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরাই লেখিকার উদ্দেশ্য। অপর্ণাকে কেন্দ্র করে

নীরদ, মনসিজ, অমিয় ঘুরপাক খায়। এদের মধ্যে কেউ কুটিল, কেউ হয়তো অন্যত্র বাক-বন্ধ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নীরদ এবং অপর্ণার মিলনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি হয়েছে। লেখিকা বহু চরিত্র আমদানী করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ চরিত্র পরিণতিহীন। তা ছাড়া কাহিনীটি অতি-মাত্রায় ঘটনাকেন্দ্রিক। কেননা, যে নীরদের সংগে সংগীতের আসর থেকে ফেরার পথে ঘটনাচক্রে পরিচয়, শেষে ঘটনাপরম্পরায় তারই সংগে পরিণয় হয়েছে। ৬৭৬।৬২

শেষ অভিসারে—শ্রীসুদীন চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানতীর্থ, ১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ঃ ২·৫০।

মৃত পিতার কৃতজ্ঞ বন্ধু ডাঃ সেনের বাড়িতে লালিতপালিত হয় সুখেন। বারবার পরীক্ষায় অকৃতী হয়ে সাহিত্যিক সুখেন অন্যত্র চলে যায়। সুখেনের সংগে আবাল্যবর্ধিত আত্মীয়ার সংগে চলে মনে মনে টানা-পোড়েন। এমন সময় আর-এক নায়িকা, মায়া এসে উপস্থিত হয়। সংগে

সংগে অন্য নায়ক শ্রীমন্তও উপস্থিত। এর পর ছকে বাঁধা মামুলি কাহিনী। উপন্যাস-টিতে কোনো অভিনবত্ব নেই। অলস অবসরে কারুর ভালো লাগতে পারে মাত্র। ৬৭৯।৬১

তীর ও তরংগ—হিরণ্ময়ী বসু মুখার্জি বুক হাউস, ৫৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ঃ টাঃ ২·৫০।

এই উপন্যাসটি চরিত্রপ্রধান। জৈবতাড়নায় বিধ্বস্ত তিলোত্তমাই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাসুদেবের মত চরিত্র এই কাহিনীকে আত্মসংঘাতময় করে তুলেছে। অবশ্য ঘাত-প্রতিঘাতগুলি ঘটনানুগ; মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। জীবনের ভয়াবহ পরিণামে যে চরম অনুশোচনা—তিলোত্তমা-জীবনের উপসংহার সেখানেই ঘটেছে। দোষ ত্রুটি বাদ দিয়েও বলা যায়, উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। ৬৩৮।৬১

ছোট গল্প

আকাশে অনেক ঘুড়ি—শ্রীসুচরিত চৌধুরী। জলসীমা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম। তিন টাকা।

কয়েকটি গল্পের মধ্যে লেখক এখানে যে তন্ময় রচনার পরিচয় দিয়েছেন তা শতবার প্রশংসার যোগ্য। বিশেষত প্রথম কাহিনীতে স্বপ্নের আশ্রয় গ্রহণ করে যেভাবে তিনি

কাহিনীর পট উন্মোচন করেছেন তা যে-কোন সৎ গদ্য-ব্যবসায়ীর পক্ষে অনেকখানি।

তবে. এত সুন্দর রচনার মধ্যে তিনি মাঝে মাঝে 'বিমূর্ত' ইত্যাদি এমন কয়েকটি শব্দ এমন বেখাপ্পাভাবে ব্যবহার করেছেন যে, অনেক সময় পড়তে পড়তে হোঁচট খেতে হয়। আর যে আঙ্গিকে শ্রীযুক্ত চৌধুরী গল্প বলেছেন সে আঙ্গিকে এসব শব্দের কি কোন প্রয়োজন ছিল?

হয়ত ছোটদের লক্ষ্য করেই লেখা আরম্ভ হয়েছিল—কিন্তু শেষ অবধি তা যেন বেশ বয়স্ক পাঠককে লক্ষ্য করেই শেষ করা হয়েছে। স্কুলের দৃশ্য, মাস্টার মশায়, একজন প্রেমিকার কথা যেভাবে বলা হয়েছে তা আমাদের ভাল লেগেছে। ৫৬৯।৬১

কিশোর সাহিত্য

বারো মাসের বারো রাজা—অনুবাদ: মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি ষোলটি চেক রূপকথার সংকলন। মূল চেক থেকে এই ছোট্ট রূপকথাগুলির অনুবাদ করেছেন মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়।

যে ষোলটি রূপকথা এই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিই রূপকথা হিসেবে অপূর্ব; কিন্তু ততোধিক অপূর্ব এই রূপকথাগুলির অনুবাদ-কর্ম। পড়তে পড়তে কখনই মনে হয় না যে, এই কাহিনীগুলি মৌলিক নয়, অনুবাদ। নিঃসংকোচে বলা যায়, এই গ্রন্থটি বাংলা শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির এর আগে বহু সৎ শিশু ও কিশোর সাহিত্য প্রকাশ করে শিশু ও কিশোর পাঠকদের এবং শিশুসাহিত্যানুরাগীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন; এবার এই গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে আবার নতুন ক'রে তাদের ধন্যবাদভাজন হলেন। ২৯০।৬১

খোকা এল বেড়িয়ে—সুখলতা রাও। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড; কলিকাতা-৭। দাম: দু' টাকা ত্রিশ নয়া পয়সা।

"খোকা এল বেড়িয়ে" আঠারোটি ছোট ছোট রূপকথা এবং উপকথা জাতীয় কাহিনীর সংকলন। এগুলি একেবারে শিশু বলতে যা বোঝায় তাদের জন্যেই বিশেষ করে রচিত। এই ধরনের রচনায় লেখিকার যথেষ্ট সুনাম আছে; এই গ্রন্থটি তাঁর সেই সুনামের হানিকর হবে না—এ কথা বলা যায়। এবং আশা করা যায়, গ্রন্থটি শিশুমহলে সমাদৃত হবে। ১৩।৬২

কবিতা

ভক্তজননী—দুর্গাদাস। জ্ঞানদা প্রকাশনী, ৬০।১, নরসিংহ অ্যাভিনিউ কলিকাতা—২৮। দাম: ৪, টাকা।

একাদশ সর্গে সমাপ্ত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থটিতে ভক্ত সন্তানের উচ্ছ্বাসময় নিষ্ঠা প্রাধান্য লাভ করেছে। উপাধিহীন কবির কাব্যরচনা মূল্যোদ্দেশ্য বলে মনে হয় না। তিনি আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য দেবী শক্তিময়ীর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছেন,—

তব প্রেরণায়
ভক্ত জননীর পূত জীবনকাহিনী
দীন হয়ে লিপিবদ্ধ করিলো জননি।

লেখকের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত, মর্জি তার প্রাচীন, মন অনাধুনিক, প্রবৃত্তি মধ্যযুগীয়। ৫১৬।৫৯

শেষের গান—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী। পরিবেশক: সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোং; ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—২, টাকা।

গ্রন্থখানির কবিতাগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেছেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ। কবিতাগুলির আঙ্গিকে আধুনিকতা না থাকলেও, বক্তব্য ও কালের মর্জিতে পরিস্ফুট। কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

তাঁর আবেগ, যা একালে প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর মানসীর কাছে যে সব কবিতা উপহার দিয়েছেন, সে সব কবিতার মাধুর্য বেশী ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি, পরাপ্রকৃতি, মনীষীপ্রেরণা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কবির প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও এ পৃথিবীতে আত্মানুসন্ধান তাঁর মূলে বিষয়। এবং তারই মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি অমৃত মৌ-সন্ধানী পাখী।" কাব্যগ্রন্থটির 'শেষের গান' নামকরণের ইঙ্গিতটুকু দুর্বোধ্য থেকে গেল।

৫৩।৬১

ধর্ম ও দর্শন

প্রণব রহস্য ও যুগধর্ম—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন। ৫৫, সুবার্বন স্কুল রোড, কলিকাতা—২৫। মূল্য দুই টাকা।

অনাদিকাল হতে ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়রূপে আনন্দলীলা চলছে। এই লীলা কেন তিনি করেন, তা তাঁরই ইচ্ছার বশীভূত, অপরের পক্ষে বলা অসম্ভব; তবে বেদান্ত-দর্শন প্রণবের রহস্য সম্পর্কে যা বলেছে এই গ্রন্থে সহজবোধ্য করে তা বর্ণিত হয়েছে। মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে যে প্রণব-সাধনা—সেই সাধনার মূলীভূত কারণসহ তার উদ্দেশ্য এই গ্রন্থে নির্ণীত হয়েছে। গায়ত্রীর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা আরো প্রাঞ্জল হওয়া উচিত ছিল মনে হয়। ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিদের কাছে এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে।

৫৮৯।৬১

নাটক

রবির আলো—রমেন দাস। এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১৲ টাকা।

নাটিকাটিতে রবির আলোর কোনো বিচ্ছুরণ হয়নি, বরং অবান্তর বক্তব্যে ও নির্দেশে শিশুদের কাছে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। শিশুদের জন্য নাটিকা রচনায় যে দক্ষতা ও উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় থাকা দরকার, 'রবির আলো'তে তার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ নেই।

৩৫৫।৬১

বিবিধ

আন্তর্জাতিক যুব উৎসব—পিটার হালাজ। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হায়াত খাঁ লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য ঃ ৩৭ নয়া পয়সা।

পুস্তিকাটির অনুবাদ করেছেন বাণী দাশ ও দীপক গুহ রায়। গ্রন্থটির নামের সঙ্গে গ্রন্থের তথ্যের কী সামঞ্জস্য আছে, তা দুর্বোধ্য। অবশ্য, ভূমিকায় সে-সম্পর্কে কৈফিয়ত থাকলেও তা অর্থহীন। পিটার হালাজ যে-সব তথ্য জানিয়েছেন, আমাদের দেশের মানুষের কাছে তার কোনো মূল্য নেই; বরং ভ্রান্তিই উৎপাদন করবে।

৬৮২।৬১

অর্থনৈতিক সহযোগিতা—বি, জে, পি, উড্স্। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য—চার আনা।

গ্রন্থটি বাক্-সর্বস্ব। কোনো বক্তব্যকে তথ্য-নিষ্ঠা বা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। সুতরাং গ্রন্থটিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার যে-সব কারণ নির্দেশ করা হয়েছে তা অবান্তর মনে হয়।

৬৮১।৬১

পত্রিকা

গ্রামসেবকের চিঠি (রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬১—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ উন্নয়ন বিভাগের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সম্পাদিকা ঃ শ্রীসুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'মাতৃভূমির যথার্থস্বরূপ গ্রামের মধ্যেই', 'আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র কৃষিপল্লীতে', এই কথা রবীন্দ্রনাথ যৌবনকাল হইতে কায়মনোবাক্যে চিরদিন প্রচার ও আচরণ করিয়া গিয়াছেন। সে। কথা স্মরণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-উন্নয়ন বিভাগের কর্মিবৃন্দ এই সংখ্যাটি প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ রচনাও সেই কথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই সংকলিত। শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীআশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের গ্রামসেবা-উদ্যোগ ও পল্লী-জীবন ও প্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগের বিষয় লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক রচনা হইতে অনেকগুলি সুনির্বাচিত উদ্ধৃতিও আছে। সংখ্যাটি চিত্রসম্পদেও সমৃদ্ধ।

নবান্ন (ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা)। ৩০।১ ঘোষপাড়া লেন, কলিকাতা—৩৬। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ৭৪।

এই সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি সুলিখিত রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রিকাটি ক্ষীণকায়, চিত্রবিরল, কিন্তু রচনার গুণে অনেক বৃহদাকার চিত্রালংকৃত বিশেষ সংখ্যা অপেক্ষা সমৃদ্ধ।

চলচ্চিত্র—প্রকাশক শ্রীগোপাল সেন; ৪৮বি হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। মূল্য এক টাকা।

প্রথমে কেবলমাত্র চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও আলোচনাদি নিয়ে প্রকাশিত হয়ে এখন এতে নাট্যালোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে পত্রিকাখানির নামটির যাথার্থ্য রক্ষিত হয়নি। সেকথা না ধরলে পত্রিকাখানি চলচ্চিত্র ও নাটক সম্পর্কিত প্রবন্ধাদির সমাবেশে সমাদৃত হবার মতো একটি প্রকাশন। আলোচ্য (২য় বর্ষ পৌষ) সংখ্যাখানিতে এন্থনী এসক্যুইথ ও বেলা বালাংসের চলচ্চিত্র বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ, বংশী চন্দ্র গুপ্তের 'চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা' সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অভিমত এবং বাংলা নাটকে আঙ্গিকের প্রাধান্য সম্পর্কে 'আলোচনার সারাংশ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত বহুরূপী অভিনীত 'বিসর্জন'-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

ফসল (গল্পসংখ্যা)—সম্পাদক শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা।

নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত রুচিসম্মত সাময়িক পত্রিকার মধ্যে 'ফসল' নিঃসন্দেহে একটা স্থান করে নিতে পেরেছে। পূর্ববর্তী সংখ্যার মতো আলোচ্য গল্পসংখ্যাখানিতেও সে-পরিচয় সুস্পষ্ট। এই সংখ্যায় আছে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নন্দলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গল্প। সাহিত্যরসিকদের কাছে সংখ্যাখানি সমাদর লাভ করবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

Jewel of Palmistry—Raj Jyotishi Dr. Harish Chandra Sastri.

The Poetry of W. B. Yeats—Bhabatosh Chatterjee.

কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং—বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রাজকন্যার স্বয়ম্বর—মনোজ বসু।

সঙ্গীত প্রবেশিকা (উত্তর ভাগ)—শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায়।

লালদীঘি—দধীচি মৈত্র।

ছবি তোলা—নীরোদ রায়।

ডার্করুম—নীরোদ রায়।

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

Sri Aurobindo on Social Sciences Humanities—Kewal L. Motwani.

ভক্তি প্রসঙ্গ—স্বামী বেদান্তানন্দ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—নিতাই বসু।

পাণ্ডুলিপি—চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা।

দক্ষিণ মেরুতে—পল-সিপল অনুবাদক সনাতন গোস্বামী।

নয়নী ও রাজনীতি—জবালা খাঁ।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে—ফিলিপ ইয়ং অনুবাদক রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

ধর্ম ও অনুভূতি (২য় ভাগ)—কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক।

থিয়েটার রোডের অশোকা গ্যালারীতে গত ২৯শে মার্চ উদ্বোধিত লক্ষ্মণ পাইয়ের ছবির প্রদর্শনীটি স্বকীয় শিল্পপ্রতিভা এবং মৌলিকত্বের দিক থেকে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় লক্ষ্মণ পাইয়ের ছবির প্রদর্শন এই প্রথম নয়। কিছুদিন আগে আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ দেখা গিয়েছিল। তবে একক প্রদর্শনী কলকাতায় তাঁর এই প্রথম।

১৯২৬ সালে গোয়ায় জন্ম, এই ভারতীয় শিল্পী প্রথম শিক্ষালাভ করেন বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল অফ আর্টসে এবং পরে সেইখানেই সহকারি অধ্যাপক পদে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেন। ১৯৫১ সালে তিনি প্যারিসে গিয়ে ভিত্তি-চিত্রে উন্নততর টেকনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। এছাড়া ১৯৫৮ সালে তিনি লণ্ডনের সেণ্ট্রাল স্কুল অফ আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌টসেও এক বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ইওরোপের শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবধারা ও অঙ্কন রীতির সঙ্গে পরিচয় এবং বর্তমান সময়ে ওদেশের মনীষী পর্যায়ের শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেও লক্ষ্মণ পাই সকলের প্রভাবকে আত্মগত করে একটা নিজস্ব মৌলিক ভঙ্গীর উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। রঙ ও রেখার ছন্দে একটা কাব্যিক সুষমা স্ফুরিত করে তোলায় বেশ একটা বৈশিষ্ট্য তিনি আয়ত্ত করেছেন। প্রধানত নারী দেহের চিত্রে অত্যন্ত রমনীয়, ইন্দ্রিয়গত রেখা দেখা যায় যা মানব আকৃতিকে আদর্শ রূপে প্রকাশ করে।

তেলরঙে ও জলরঙের আঁকা ছবি ছাড়া বুদ্ধের জীবনকাহিনী অবলম্বনে বারো-খানি এচিং এই প্রদর্শনীতে টাঙানো হয়েছে। এছাড়া আছে রেশম কাপড়ের ওপর আঁকা চারখানি ছবি। তাঁর এচিংগুলি এবং

বুদ্ধ জীবনের একটি ঘটনা (এচিং) শিল্পী—লক্ষ্মণ পাই

অন্যান্য ধারারও কতক ছবির অংকন রীতিতে কাপড়ের ওপর নক্সা তোলার টেকনিকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এইটেই তাঁর প্রেরণার উৎস বলে মনে হয়। বোঝা যায় যে, এই প্রেরণাই তাঁকে রেশমী কাপড়ের ওপর উজ্জ্বল রঙের সমাবেশে ছবি আঁকায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

স্বচ্ছন্দ গতিময় রেখা এবং পরিবেশসম্মত রকমারি রঙের প্রয়োগে চমৎকার বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সুন্দর সাবলিল ও সহজ ভঙ্গীর বিন্যাসে বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যকে মনোরম করে তোলায়ও যেমন তেমনি সূক্ষ্ম এবং অনুদাত্ত রূপ মূর্ত করে তোলায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

ছবির বিষয়বস্তুর মধ্যে প্যারীসের কতকগুলি দৃশ্য আছে। সূক্ষ্ম কালো রেখার সাহায্যে বাঁধা কয়েকখানি ছবি স্থাপত্য রীতির প্রতি তাঁর ঝোঁকের নিদর্শন। জমিতে রঙ চাপিয়ে রঙপেষা ছুরির সাহায্যে তৈরী "তুষারপাত" (১১ নং), "নিয়তি" (২৬ নং) প্রভৃতি ছবিগুলির পরিকল্পনায় ও বিন্যাসে তিনি অভিভূত হবার মতো অসাধারণ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। "পাখি" (৩নং), "নগ্ন নারী", (৭নং), "গাছের পাতা" (৯নং), "ঘাস" (১০নং) "আশা" (১৪নং), "ঘনিষ্ঠতা" (১৬নং) প্রভৃতি ছবিগুলির ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় উজ্জ্বল বর্ণের প্রলেপে অলঙ্করণের রীতি পরিহার করে তিনি রেখার প্রবাহে চমৎকার রূপ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। বুদ্ধের জীবন কাহিনী অবলম্বনে এচিংগুলি সুসমঞ্জস রঙ ও বলিষ্ঠ অথচ অতিসূক্ষ্ম রেখায় বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ সৃষ্টি। চিত্ররসিক মাত্রই প্রদর্শনীটি দেখে তৃপ্তিলাভ করার মতো উপাদান পাবেন।

ইতিপূর্বে 'গীত গোবিন্দ', 'রামায়ণ' এবং গান্ধীজীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে আঁকা লক্ষ্মণ পাইয়ের ছবি দেশে ও বিদেশে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। এ পর্যন্ত তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী প্যারিসে হয়েছে ছ বার এবং তাছাড়া মিউনিক স্টুটগার্ট ব্রিমেন, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী সেসব দেশের চিত্ররসিক ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পসংগ্রহালয়ে তাঁর কতক ছবি স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার
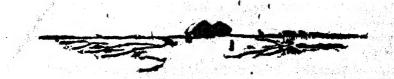
অরোরার 'ভগিনী নিবেদিতা' (পরিচালক: বিজয় বসু) ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে গণ্য হয়ে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। বাংলা ছবি 'হট্টগোল' শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (ইংরেজী: ফিল্মস ডিভিশন প্রযোজিত) শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। 'সাইট্রাস কালটিভেশন' শ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে।

এ বাদে তামিল চিত্র **পাবা মণিপ্পু** (কাহিনীচিত্র হিসাবে) সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে। ছবিটি গুণানুক্রমে সর্বভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মারাঠী চিত্র **প্রপঞ্চ** তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

সত্যজিৎ রায়ের **সমাপ্তি** বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করেছে। আলোছায়া প্রোডাকশন্স-এর **সপ্তপদী** সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে।

শকুন্তলা অসমীয়া ভাষায় শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে রৌপ্যপদক লাভ করেছে। ওড়িয়া চিত্র **নুয়াবৌ** সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে।

ধর্মপুত্র শ্রেষ্ঠ হিন্দী চিত্র হিসাবে রৌপ্যপদক পেয়েছে। গঙ্গা **যমুনা** সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে।

সাবিত্রী ও **নানহে মুনহে সিতারে** যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে। **আওয়ার ফেদার্ড ফ্রেন্ডস** এবং **রোমান্স অব ইন্ডিয়ান কয়েনস্** যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসাবে সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে। বছরের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক চিত্র হিসাবে ইংরেজী ভাষায় নির্মিত **দি কয়র ওয়ার্কার্স** সার্টিফিকেট অব মেরিট পেয়েছে।

চন্দ্রশেখর

"ফিল্মস্টার" নয়, শিল্পী

শিল্পীদের মনের "গোপন কথা" জানার সুযোগ চিত্রামোদীদের খুব কমই ঘটে। চিত্রাভিনেতা বা চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইসব সাক্ষাৎকারে ও'রা "অন্তরঙ্গ" সুরে যা বলেন তাও যেন খুবই কৃত্রিম, সাজানো কথা। তাঁদের মনের আসল কথাটি বুঝি জনসাধারণের আর কিছুতেই জানা হয়ে ওঠে না।

সম্প্রতি বৃটেনের দুজন বিখ্যাত শিল্পী পাইনউড স্টুডিওতে অবসর-আলাপের সময় তাঁদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছেন। শিল্পী দুজন হলেন জন মিলস ও জ্যানেট মুনরো। ও'রা সত্যিই যে তাঁদের অন্তরের কথা বলেছেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কারণ, এমন সুরে ও এমন প্রসঙ্গে তাঁরা তাঁদের মনের কথা বলেছেন যা সহজেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

নিজের জীবনের সুখের উৎস কী জন মিলস তা অকপটে বলতে পেরেছেন। জন মিলস-এর কন্যা হেলি ও তাঁর ভগিনী জুলিয়েট—এ'রা দুজনেই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। জন মিলস বলেছেন, "যখনই সুবিধে পাই আমরা একত্রে থাকবার চেষ্টা করি। এবং এটাই আমাদের সুখের অন্যতম উৎস। এ তো তথাকথিত অভিনেতার মুখের কথা নয়! এ যেন এক সরল সংসারী লোকের কথা। প্রতি দিবসের আনন্দকে তিনি কন্যা ও ভগিনীর সান্নিধ্যে পূর্ণ করে তুলতে চান।

অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা সারাক্ষণ সারাদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত শুধু গ্ল্যামার আর অর্থের মরীচিকার পেছনেই ছুটে চলেছেন এ-ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। ঘর-সংসারের দিকে তাঁদের মন নেই, আপনজনের মায়া বলতে তাঁদের কিছু নেই—তাঁদের সম্বন্ধে এ-ধারণাই জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল। এবং জনসাধারণের ধারণা হয়তো খুব অমূলকও নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জন মিলস-এর কথা শিল্পীদের জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন ইঙ্গিত দিতে পারে।

জন মিলস-এর পরিবারের বার্ষিক ব্যয়ের অঙ্ক নাকি ১০০,০০০ পাউন্ড—এ-রকম একটি জনশ্রুতির প্রতিবাদেই শিল্পী

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে সম্মানিত অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের "ভগিনী নিবেদিতা"-র নাম-ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত সত্যজিৎ রায়ের "সমাপ্তি"-র একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা দাশগুপ্ত।

উপর্যুক্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা আমাদের ব্যক্তিগত খরচ কমাবার চেষ্টা করি। এর একমাত্র কারণ হল খরচ করার মত বেশী টাকা আমাদের নেই।" সরলভাবে তিনি বলেন যে, তাঁদের রোজগারের একটা মোটা অংশ ট্যাক্স দিতেই চলে যায়। এবং অর্থই যে সুখের উৎস নয় সেটাই তিনি বিশেষ করে বলতে চেয়েছেন। কন্যা ও ভগিনীকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে পারার মধ্যেই তাঁর জীবনের সুখ নির্ভর করে—অর্থ রোজগারেও নয়, অর্থব্যয়েও নয়।

অভিনেত্রী জ্যানেট মুনরো আরও মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি অনেকটা বিরক্তির সঙ্গেই বলে ফেললেন—"আমাকে স্টার আখ্যা দিলে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। আজকাল স্টার বলতে কিছু নেই।" "ফিল্ম স্টার" শব্দটি নিয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে শ্রীমতী মুনরো বলেন যে, একদা হয়ত ফিল্ম স্টার ছিল, কিন্তু আজ আর তাঁদের অস্তিত্ব নেই। এমন একদিন ছিল যখন জনসাধারণ তাঁদের গ্ল্যামার-জীবনের সংবাদ আহরণে উদগ্রীব ছিলেন। জনসাধারণ এমন বিচিত্র নারীর সংবাদ জানতে চাইতেন যাঁরা জীবনে কোনদিন রান্নাঘর চোখেও দেখেন নি, যাঁরা নিয়মিত দুধ দিয়ে স্নান করতেন।

শ্রীমতী মুনরো বলেন, আজ এমন ফিল্ম স্টার আর নেই। কয়েক বছর আগে ফিল্ম স্টার বলতে লোকেরা যা মনে করতেন, সেই অর্থে ম্যারিলিন মনরোও আজ ফিল্ম স্টার নন। আমাকে "ফিল্মস্টার জ্যানেট মুনরো" বললে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। আমি শিল্পী—এটাই আমার আসল পরিচয়। আর কাউকে "স্টারলেট" বলা তো আরও উদ্ভট। শ্রীমতী মুনরো জোরের সঙ্গে বলেন, আজকালকার ছবিতে "স্টার" বলতে কেউ নেই। শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রয়েছেন। তাঁরাও সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের মতই তাঁদের ব্যক্তিত্ব। সবশেষে তিনি বলেন, আজকের যুগের ছবির সাফল্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ছবি যদি ভালো হয় তবে জনসাধারণ সম্পূর্ণ "অপরিচিত" শিল্পী-দেরও দেখতে যান।

শ্রীমতী মুনরোর শেষ কথাটি সত্যিই মূল্যবান। যাঁরা তথাকথিত "ফিল্মস্টার" হয়ে টিকে থাকতে চান, তাঁদের আচার-ব্যবহার, ভাষা ও ভূষণ বিচিত্র ধরনের। তাঁদের দেখলে মনে হয়, তাঁরা যেন আলাদা এক জগতের লোক। সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের থাকতে হয়। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সমাজে, অথবা শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে তাঁদের প্রবেশাধিকারের পথটি যেন রুদ্ধ। তাঁরা নিজেদের একটি আলাদা সমাজ গড়ে তোলেন। সে সমাজের জীবনযাপন, মানসিকতা, রীতিনীতি, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের লোকের পরিচয় অতি অল্প। অসংখ্য মানুষের মিছিল থেকে তাঁরা দূরে সরে দাঁড়িয়ে থাকেন। সহজ, সুন্দর, সুস্থ জীবনের অধিকারও বুঝি তাঁদের নেই।

এবং এর জন্যে তাঁরাই দায়ী। ছায়াছবিতে অনেক ধরনের ভূমিকায়ই তাঁদের অবতরণ করতে হয়। এটা হয়তো তাঁদের জীবিকার দাবি। কিন্তু ছায়াছবির বাইরে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা ভঙ্গিতে, এমনকি অশালীন রূপসজ্জায় তাঁরা নিজেদের "গ্ল্যামার" জনমনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশন করে থাকেন। তাঁদের এই নগ্ন গ্ল্যামার দেখে অসুস্থ রুচির চিত্রামোদীরা আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন। পথে যখন তাঁরা বেরিয়ে আসেন তখন তাদের চারধারে চঞ্চলমতি চিত্রামোদীরা অসুস্থ উল্লাসে ভিড় করে দাঁড়ায়। অভব্য মন্তব্য প্রকাশ করে। এই জনপ্রিয়তা "ফিল্মস্টার"দের আত্মমর্যাদাকে আঘাত করে কিনা জানি না। কিন্তু শ্রীমতী মুনরো যা বলেছেন সেই অর্থে ছায়াছবির কিছুটা ক্ষতি সাধন করে।

শিল্পীরা চিত্রামোদীদের কাছে "সম্পূর্ণ অপরিচিত" হয়ে থাকতে পারেন না হয়তো। তবে মনে-প্রাণে, বেশ-ভূষায়, আচার-ব্যবহারে তাঁরা যদি বিচিত্র "ফিল্মস্টার" হয়ে না ওঠেন তবে চিত্ররসিকরা ছবির পর্দায় তাঁদের মধ্যে সহজেই সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেতে পারেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পীকে আবিষ্কার করতে পারেন। তাই ফিল্মস্টার না হয়ে শিল্পী হওয়ার আনন্দ, গৌরব ও মর্যাদা অনেক বেশী। এর জন্যে

"স্টার সিস্টেম"-এর অভিশাপ থেকেও ছায়াছবি অনেকটা মুক্তি পেতে পারে।

চিত্রালোচনা

বর্তমান সপ্তাহে নতুন কোন বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেনি। আগামী সপ্তাহে দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি দর্শকদের সামনে এসে উপস্থিত হবে। একটি হল : তপন সিংহ পরিচালিত জালান প্রোডাকশন্স-এর **হাঁসুলী বাঁকের উপকথা,** অপরটি : অগ্রগামী গোষ্ঠী প্রযোজিত ও পরিচালিত **কান্না।** দুটি ছবিরই কাহিনীকার যশস্বী সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * *

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ অভিযাত্রিক-এর **অভিযান** ছবির অবাঙালী নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ওয়াহিদা রহমান এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন এবং যথারীতি ছবির কাজ শুরু করেছেন। এ ছবিরও আখ্যান অবলম্বন তারাশংকরের কাহিনী। ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (নায়ক), রুমা গুহঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও চারুপ্রকাশ ঘোষ। সত্যজিৎ রায় নিজেই ছবির সংগীত-পরিচালক।

* * *

অতল জলের আহ্বান-এর পর একটি নয়, তিনটি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন আর-ডি-বি প্রযোজক-সংস্থা। ছবি তিনটি হল : **সাত পাকে বাঁধা, এক টুকরো আগুন ও ছায়া-সূর্য।** প্রথম দুটি ছবির সংবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শেষের ছবিটির কাহিনীকার আশাপূর্ণা দেবী। শোনা যাচ্ছে, এই ছবিতে এক তরুণ চিত্র-পরিচালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তাঁর নাম পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

* * *

শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল"-এর হিন্দী চিত্ররূপ **সওতেলা ভাই** (আলোক ভারতী প্রযোজিত) আগামী সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে। মহেশ কাউল ছবিটির পরিচালক। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুরু দত্ত ও প্রণতি ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন বিপিন গুপ্ত, বেলা বসু, রাজকুমার ও অসিত সেন। অনিল বিশ্বাস ছবিটির সুরকার।

* * *

বিমল ঘোষ প্রোডাকশন্স-এর **বধূ** অনতি-বিলম্বেই মুক্তি পাবে। শৈলেশ দে রচিত একটি আবেগধর্মী পারিবারিক কাহিনী এই ছবির ভিত্তি। ছবির শিল্পীদের পুরোভাগে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ

অগ্রগামীর নতুন ছবি "কান্না"-র নায়ক-চরিত্রে উত্তমকুমার। ছবিটি আগামী বৃহস্পতিবার মুক্তি লাভ করবে।

রায়, অনুভা গুপ্তা, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

কলকাতায় জর্জিয়ার লোক-নৃত্য

প্রতীচ্যের সভ্যদেশে এখন "বিটনিক"-যুগ দেখা দিয়েছে। সে-সব দেশে আজকাল নাচ বলতে বোঝায় অশালীন "রক-এন-রল", নয়ত "টুইস্ট"। এই "বিটনিক" যুগে বিদেশী শিল্পীদলের সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ নাচও যে বিদগ্ধ কলারসিকদের মুগ্ধ করে রাখতে পারে, তা অনেকের কল্পনাতীত হয়েই থাকত, যদি না জর্জিয়ান শিল্পিদের লোকনৃত্য দেখবার সুযোগ তাঁদের ঘটত।

গত সপ্তাহে জর্জিয়ান শিল্পিদল (জ্যর্জিয়ান ডান্স আঁসাবল্) কলকাতায় নিজাম প্যালেসের উদ্যানে তাঁদের দেশের লোকনৃত্য পরিবেশন করেন। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের আমন্ত্রণে এই শিল্পিদল ভারত-পরিভ্রমণে আসেন। ভারতের কয়েকটি প্রধান শহরে নৃত্য পরিবেশন করে তাঁরা কলকাতার দর্শকদের সামনে এসে উপস্থিত হন গত ২৯শে মার্চ। শিশু-রঙমহল-এর সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার কলকাতায় এই মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

লোক-নৃত্যের তালে তালে ও ছন্দে ছন্দে লাবণ্যসৃষ্টির এক অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন ষাটজন শিল্পী নিয়ে তৈরী জর্জিয়ান নৃত্য-গোষ্ঠী। শিল্পীর দেহপটেই নৃত্য-শিল্পের বিকাশ। তাই দেহপটের সৌন্দর্য নৃত্য-শিল্পে বুঝি অপরিহার্য। জর্জিয়ার শিল্পীরাও অসামান্য দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। কিন্তু তাঁদের দেহ-সৌন্দর্য শিল্প-শর্তের অতিরিক্ত উপভোগের স্থূলে পসরা সাজিয়ে তোলে নি। শিল্পরুচিকে তা অনুসরণ করেছে প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি দেহ-ভঙ্গিতে।

নারী কী মর্যাদায় মহিমান্বিত তা প্রত্যক্ষ করা গেল জর্জিয়ার লোকনৃত্যে। যুগল-নৃত্যে নারী সংযমের ভেতর দিয়ে তার রূপের শোভা বিস্তার করে, পুরুষ সম্ভ্রমের সঙ্গে তার মাধুর্যকে গ্রহণ করে। এবং পরিশেষে নারী তার রূপ-বৈভব সমর্পণ করে দেয় পুরুষের মর্যাদার কাছে। এটাই জর্জিয়ার জাতীয় চরিত্র। এবং তাই ফুটে উঠেছিল তাঁদের লোকনৃত্যে।

পুরুষের নাচের ভঙ্গি স্বভাবতই মেয়েদের থেকে আলাদা। তাঁদের ক্ষিপ্রগতি, বাহুসঞ্চালনের মধ্যে আবেগ ও পৌরুষের স্পর্শটি দর্শকদের কৌতূহলাবিষ্ট করে রাখে। সারা শরীর নিশ্চল রেখে তাঁদের পদসঞ্চালন দেখবার মত।

লোকনৃত্যের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয় ড্রাম ও একর্ডিয়ান। ড্রামের বাজনার মাধ্যমে কৌতুক-সৃষ্টি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

এক কথায়, জর্জিয়ান শিল্পীদের রূপ-সজ্জা এবং তাঁদের নৃত্যকুশলতা কলকাতার দর্শকদের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে। শিল্পিদলের অধিনায়িকা ছিলেন স্তালিন পুরস্কার বিজয়িনী লিনো রামি শিভিলি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পিদলকে সংবর্ধনা জানিয়ে বক্তৃতা দেন শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সৈনিকের কাহিনী

জ্যোতি প্রেক্ষাগৃহে গ্রিগরি চুখরাই পরিচালিত বিখ্যাত রুশ চিত্র "দি ব্যালাড অব্ এ সোলজার" ছবিটি গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে। ১৯৬০ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করে।

গত বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ছবির কাহিনী বিস্তৃত। ছবির নায়ক এক তরুণ সৈনিক। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সবেমাত্র সে যুদ্ধে যোগদান করেছে। তার মন পড়ে থাকে বাড়িতে। তার মায়ের কাছে। সংসারে আপনজন বলতে শুধু তার মা, আর কেউ নেই।

মায়ের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অল্প কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ির পথে সে রওয়ানা হয়। দীর্ঘ বিপদ-সংকুল পথে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। এবং সেই সঙ্গে যাত্রাপথে পরিচিত হয় অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে তার আচমকা দেখা হয়ে যায় এক তরুণীর সঙ্গে। একদিন একরাত্রির এই পরিচয় রূপ নেয় প্রণয়ে। কিন্তু পথের সঞ্চয় পথপ্রান্তেই ফেলে চলে যেতে হয় সৈনিককে।

শেষ পর্যন্ত বাড়িতে যখন সে এসে পৌঁছল তখন তার হাতে আর সময় নেই। মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য মা আর ছেলের দেখা হল। ধুলো উড়িয়ে চলে গেল সৈনিকের গাড়ি। অশ্রুসিক্ত নয়নে চেয়ে থাকেন তার মা। তারপর প্রতিদিন মা এসে দাঁড়ান পথের ধারে। এই পথে তার ছেলে আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

আবেগনিবিড় এই উপাখ্যানের চিত্ররূপ দর্শকদের অভিভূত করে রাখে। শিল্প-সৌন্দর্যে ও রসমাধুর্যে অপরূপ এই ছবির দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী ভ্লাদিমির ইভাসভ (সৈনিক) ও শানা প্রোখোরেনকো (পথের প্রণয়িনী)।

"দি ফর্টি ফার্স্ট" ছবির [illegible] পরিচালক গ্রিগরি চুখরাই এবং [illegible] দর্শকদের [illegible] পরিচিত [illegible] উঠেছে। এ-ছবিতেও [illegible] বোখের [illegible]

জর্জিয়ার লোকনৃত্য

কলকাতায় অনুষ্ঠিত জর্জিয়ান ড্যান্স অাসাব্ল্-এর কয়েকটি নৃত্য দৃশ্য। নীচের সারির [illegible] রামিশভিলি

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষকালব্যাপী নবম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৮ই এপ্রিল থেকে। মার্কাস স্কোয়ারে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্যবারের মত এবারকার অধিবেশনও বৈচিত্র্যের আয়োজনে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

প্রখ্যাত সংস্থার পরিবেশনায় নাট্যাভিনয়, যাত্রা, শিশু-অনুষ্ঠান এবং জনপ্রিয় শিল্পীদের ভক্তিমূলক গান, সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান প্রভৃতি অন্যান্যবারের মত এবারকার অধিবেশনেরও বিশেষ আকর্ষণ। এবারকার অধিবেশনের কর্মসূচীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে "বিবেকানন্দের গান" সংযুক্ত হয়েছে। গান করবেন শৈলেন ভট্টাচার্য। তা বাদে নতুন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনৃত্য ও গীত। পরিবেশন করবেন ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার।

শিক্ষার সর্বস্তরের বাংলাভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ ও বাংলা চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কেও এবারকার অধিবেশনে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে।

নাট্যাভিনয়

বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের ৬০০তম অভিনয়-রজনী পূর্ণ হবে আগামী ৮ই এপ্রিল। একাদিক্রমে অভিনয়-সংখ্যার দিক থেকে "সেতু" নতুন ইতিহাস রচনা করল। শুধু তা-ই নয়। প্রায় তিরিশ মাস ধ'রে "সেতু"র অভিনয় চলছে। এই সময়ের মধ্যে "সেতু"র টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ দশ লক্ষ টাকারও কিছু বেশী। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এই ব্যবসায়িক সাফল্যের নজির নেই।

• • •

কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর মিনিস্টেরিয়েল স্টাফ-এর সাংস্কৃতিক সংস্থা "কৃষ্টি-চক্র" গত ২৮শে মার্চ স্টার থিয়েটারে তাঁদের পঞ্চম নাট্যোপহাররূপে প্রবোধকুমার সান্যালের "হাসুবানু"র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। অনিল মিত্র কাহিনীর নাট্যরূপ দেন ও নাটকটি পরিচালনা করেন। গীতা দে, দীপিকা দাস, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা সুন্দর অভিনয় করেন।

• • •

পথের ডাক নামে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীর নাট্যরূপ গত ২৮শে মার্চ মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়। নাট্যাভিনয়টি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন "নাট্যম্" সম্প্রদায়।

• • •

গিরিশ নাট্য উৎসবের একটি বিশিষ্ট উপহার "নির্বোধ" গত শনিবার বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ হয়। জন্মসম্বর্ধিত এই 'নাট্ক দস্তয়েভস্কির "দি ইডিয়ট" অবলম্বনে রচনা করেছেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। নাটকটি পরিবেশন করেন "[illegible]"

জালান প্রোডাকসন্সের "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা"-র একটি দৃশ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিভাননী।

ফিল্ম ফেডারেশন, প্রযোজকগণের আঞ্চলিক সমিতি এবং ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে ছয়টি ভারতীয় ছবি বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ছবিগুলি হল: "জিস দেশ মে গঙ্গা বৈহতী হ্যায়", "হাম দোনো", "গঙ্গা যমুনা", "দেবী", "সমাপ্তি" ও "পোস্টমাস্টার"। কান, বার্লিন, মেলবোর্ন, সিডনী ও কার্লোভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিগুলি যোগদান করবে। লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের "দেবী" বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছে। আগামী ৭ই মে থেকে ২১শে মে পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বার্লিন উৎসব শুরু হবে ২২শে জুন। দেবানন্দ প্রযোজিত "হাম দোনো" ছবি এই উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। সিডনী চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের "সমাপ্তি" ও "পোস্টমাস্টার"। এই উৎসব শুরু হবে আগামী ১লা জুন।

• • •

নাট্য সংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে "শচীন্দ্রনাথ স্মৃতি পুরস্কার" দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসাবে ৫০১ টাকা তিনি পান। নাট্যকার সংঘের কার্যনির্বাহক সমিতির এক জরুরী সভায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে "শচীন্দ্রনাথ স্মৃতি পুরস্কার" দেওয়া সম্বন্ধে ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের প্রেরিত এক প্রস্তাব বিবেচিত হয়। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, ডঃ গুপ্ত প্রতি বৎসর এই পুরস্কারের জন্য সংঘকে ৫০১ টাকা দেবেন। তদনুযায়ী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

• • •

পুলা চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত এবং কান ও লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষভাবে সম্মানিত যুগোশ্লাভিয়ার "দি নাইন্থ সার্কল" ছবিটি গত রবিবার রক্সী সিনেমায় প্রদর্শিত হয়। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটী এবং যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রদূতাবাসের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

• • •

সানফ্র্যান্সিসকোর আগামী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তপন সিংহ পরিচালিত জালান প্রোডাকসন্স-এর "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" ছবিটি বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে। উৎসব [illegible]

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রপ্রযোজক

লণ্ডনে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ইংরেজী ছবি প্রযোজনা করবার গৌরব সর্বপ্রথম অর্জন করেন উমেশ মল্লিক। তিনিই ইংলণ্ডের প্রথম ভারতীয় চিত্রপ্রযোজক। সম্প্রতি তিনি তাঁর দ্বিতীয় চিত্রপ্রয়াসে হাত দিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবির নাম ছিল "দি ম্যান হু কুড নট ওয়াক"। এই ছবিতে পিটার রোনাল্ডস, এরিক পোটাম্যান ও প্যাট কালভিন অভিনয় করেছিলেন।

শ্রীমল্লিকের দ্বিতীয় ছবির নাম "এ গাই কল্‌ড্ সিজার"। চিত্রকাহিনী তাঁরই রচনা। তাঁর দ্বিতীয় চিত্র প্রয়াসটি হবে একটি 'ক্রাইম' ছবি। লণ্ডনের পটভূমিতে ছবিটি তোলা হবে। এই ছবির পরিবেশন-স্বত্ব ক্রয় করেছেন কলম্বিয়া সংস্থা। কোনার্ড ফিলিপস ও জর্জ মুল ছবির দুই মুখ্য শিল্পী। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ম্যাক্স ভারনেল।

"হোয়েন [illegible] ফ্যাক্টস স্ট্যাম্পিড" নামে আরেকটি ছবি তৈরি [illegible] ব্যবস্থা করেছেন শ্রীমল্লিক। এই চিত্রকাহিনীতে ভারতের এক মহারাজার কল্পিত চরিত্রাঙ্কন নিয়ে ভারত সরকার আপত্তি তুলেছেন। তাই ভারতে ছবির চিত্রগ্রহণের অনুমতি পাননি শ্রীমল্লিক। মালয়ের ছবির চিত্রগ্রহণের আয়োজন করছেন প্রযোজক।

"ক্লাইভ অব ইণ্ডিয়া" নামে একটি কাহিনীর চিত্ররূপের পরিকল্পনাও রয়েছে শ্রীমল্লিকের। পার্লামেণ্টে ক্লাইভ তাঁর ভারত-শাসনের স্বপক্ষে যে জবাব দিলেন তা ফ্ল্যাশব্যাকে ছবিতে দেখানো হবে। যুগোশ্লাভিয়ায় এ-ছবির অধিকাংশ দৃশ্য গৃহীত হবে।●

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের "বধূ"-র একটি দৃশ্যে মঞ্জুলা সরকার, বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

চিঠিপত্র

নাট্যকারের বক্তব্য

মহাশয়,

বিশ্বরূপা'য় চলমান নাটক "সেতু" ধারাবাহিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করে ছ'শো রজনীর পথে এগিয়ে চলেছে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সুযোগে "সেতু"র সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্পর্ক নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি আছে তা নিরসন করার প্রয়োজন বোধ করছি।

বলা বাহুল্য, "সেতু" বিধায়ক ভট্টাচার্যের যেমন কোন মৌলিক রচনা নয়, তেমনি নয় আমার কোন গল্পের, উপন্যাসের বা একাঙ্ক নাটকের ছায়াবলম্বিত নাট্যরূপ।

প্রকৃতপক্ষে "সেতু" আমার একটি [illegible] নাটক (প্রায় চার ঘণ্টার অভিনয়ো-[illegible] থেকে গৃহীত। [illegible]

লেখক বা নাট্যকার হিসেবে "সেতু"র সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কই এখনও বিদ্যমান।

ইতি

কিরণ মিত্র

কলিকাতা-৩৫

জার্মান টেলিভিশন-এ 'হোলি ইণ্ডিয়া'

মহাশয়,

'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅতীন্দ্র গুপ্তের চিঠি পড়লাম।

পশ্চিম জার্মেনী থেকে যে দলটি ভারতে বিভিন্ন স্থানে ছবি তুলে জার্মান-টেলিভিশন মারফৎ পরিবেশনের উদ্দেশ্যে এ-দেশে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমার পরোক্ষে আলাপ হবার সুযোগ ঘটেছিল।

গত বছরের আগস্ট মাসে এই দলটি আমার এক ঘনিষ্ঠ কেরলীয় বন্ধুকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলি ছোট ছোট অন্তরঙ্গ ছবি তোলার জন্য অনুরোধ করেন। আমার বন্ধু প্রথমে আপত্তি করেন কিন্তু পরে রাজী হয়ে যান। দলটি আমার বন্ধুকে রাজী করিয়ে নিম্নলিখিত দৃশ্যগুলি গ্রহণ করেন: সকাল বেলায় সাইকেল চালিয়ে অফিসে আসা, অফিসের পর সাইকেল চালিয়ে পার্লামেণ্টের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া, বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীর সঙ্গে বসে সাধারণ সাজ-পোষাক পরে কফি পান করা। এবং সেই সঙ্গে দলটি স্বামী-স্ত্রীর কয়েকটি বিক্ষিপ্ত কথোপকথনের রেকর্ডিং করে নেন। মোটামুটি একটি সাধারণ পরিবারের একটি সাধারণ চিত্রায়ণ তাঁরা করেছিলেন।

এ-ছাড়াও দিল্লিতে তাঁরা অন্য যে সব ছবি তুলেছিলেন তার খবর আমি রাখি না। ধারণা ছিল যে, যে আন্তরিকতার সঙ্গে দু'তিন-দিনের বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা ছবিগুলি তুলেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই সেগুলি নিজের দেশে পরিবেশন করবেন।

কিন্তু শ্রীগুপ্ত'র চিঠি পড়ে ভুল ভেঙেগেছে। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিটি আমার বন্ধুকে তর্জমা করে শোনাবার পর সে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে।

বড় অবাক লাগে চিত্র সম্পাদনার সময় জার্মান টেলিভিশন-এর দলটি নোংরা প্ল্যাটফর্ম, ভিখারী, বস্তী ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলেন না বলে। বিদেশে আমাদের দেশকে ছোট করে দেখানোর বিকৃত পরিবেশন-রুচি কি বন্ধ করা যায় না? ইতি—

কালিদাস নিয়োগী

নয়াদিল্লি-৩

একলব্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর পর তিনটি টেস্টে বিজয়ী হয়ে 'রাবার' পেয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাকী দুটি টেস্টের গুরুত্ব ও আকর্ষণ কমে গেছে। তবুও দেখবার বিষয়, এই দুটি টেস্টের কোনো টেস্টে ভারত জিততে পারে কিনা। 'অবশ্য অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এবং যে পরিমাণে ভারতের মনোবল ভেংগে গেছে তাতে জেতার কথা চিন্তা করা আকাশ-কুসুম কল্পনা। বর্তমান অবস্থায় পরম শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে ভারত যদি অমীমাংসিতভাবেও খেলা শেষ করে সেটাও লাভ।

পোর্ট অব স্পেনের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতকে হারিয়েছিল ১০ উইকেটে, কিংসটনের দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ১৮ রানে। সম্প্রতি ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভালে তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে এক ইনিংস ও ৩০ রানে। সুতরাং পর পর তিনটি টেস্টেই ভারতের চরম ব্যর্থতা এবং শোচনীয় পরাজয়।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য, তিনটি টেস্টেই ভারতকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। প্রথম দুটি টেস্টে পুরো শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় টেস্টের আগে বারবেডোজের সংগে ৪ দিনব্যাপী খেলায় ভারতের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর বলের আঘাতে ভীষণভাবে আহত হওয়ায় দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভারতকে তৃতীয় টেস্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। মাথায় অস্ত্রোপচারের পর কন্ট্রাক্টরের জীবন নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছিল এবং সবাই স্বীকার করবেন, ঐ ধরনের মানসিক উদ্বেগ নিয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে ক্রিকেট খেলায় মন ঢালা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

যাই হোক, নরী কন্ট্রাক্টরের অভাবে দলের সহ-অধিনায়ক পাতৌদির তরুণ নবাব মনসুর আলী খাঁর উপর ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার পড়ে।

এখানে বলা প্রয়োজন, আকস্মিকভাবে অধিনায়ক নির্বাচিত হলে পাতৌদি বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট অধিনায়কের মর্যাদা পেয়েছেন। তরুণ নবাব মনসুর আলীর বর্তমান বয়স মাত্র একুশ বছর। একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার আয়ান ক্রেগ ছাড়া এত কম বয়সে আর কারও পক্ষেই দেশের অধিনায়কত্ব করা সম্ভব হয়নি। আয়ান ক্রেগ ১৯৫৭-৫৮ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক নির্বাচিত হন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর, পাতৌদির চেয়ে এক বছর বেশী।

আর এক দিক দিয়েও পাতৌদির নবাবের অধিনায়ক নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তরুণ নবাবের পরলোকগত পিতাও ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ড সফরে ভরতের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে পিতাপুত্রের একটি দেশের অধিনায়কত্ব করার আর মাত্র একটি নজীর আছে। সে নজীর ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে। এখানে পিতা-পুত্রের নাম এফ টি ম্যান ও এফ জি ম্যান। ১৯২২-২৩ সালে এফ টি ম্যান অধিনায়ক হিসাবে ইংলণ্ড টিম নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে ১৯৪৮-৪৯ সালে ইংলণ্ড দল যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিল তখন অধিনায়ক ছিলেন এফ টি ম্যানের পুত্র এফ জি ম্যান।

এখন খেলাটির কথা আলোচনা করা যাক। পূর্ব রাত্রে বৃষ্টি হবার ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাংক ওরেল

ব্রিজ টাউনের কেন্সিংটন ওভালে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনে [illegible]
[illegible]

টসে বিজয়ী হয়েও ভারতকে প্রথম ব্যাট করতে দেন। ব্যবস্থা মত খেলার পিচ অবশ্য ঢাকা ছিল। বৃষ্টির ফলে উইকেট ভিজে ছিল না। ভারতের খেলার সূচনাও হয় ভাল। মাত্র ৪৫ মিনিটে কোন উইকেট না পড়ে ৫০ রান ওঠে। কিন্তু তারপরই বিপর্যয় দেখা দেয়। মধ্যাহ্নভোজ পর্বে ৯০ রান উঠতেই ৪টি উইকেট পড়ে যায়। তবু প্রথম দিনে ২৫৮ রান সংগ্রহ ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের উজ্জ্বল ক্রিকেটের নিদর্শন। সারদেশাই, জয়সীমা, পাতৌদির নবাব এবং সেলিম ডুরানী উন্নত ব্যাটিং নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

প্রথম দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১০ মিনিট ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৫ রান করেছিল। দ্বিতীয় দিন খেলা শেষ হবার সময় তারা ৪ উইকেটে ২৬৩ রান তোলে। প্রায় ভারতের মতই রানের গতি। এর জন্য কৃতিত্বের অধিকারী তরুণ অধিনায়ক মনসুর আলী। তিনি স্পিন ও স্পিড-এর সমন্বয়ে আক্রমণ রচনা করেন, আর বেশীর ভাগ সময় রক্ষণমূলক ফিল্ড সাজিয়ে দ্রুত রান তোলার পক্ষে বাধার কারণ হন। শেষ দিকে তিনি নাদকার্নী ও ডুরানীকে যখন বল করতে পাঠান তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নামকরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কানহাই, সোবার্স, ম্যাকমরিস, হাণ্ট কেউই সহজ আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেন না। যাই হোক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের মধ্যে কানহাইয়ের ৮৯ রানের মাথায় রান আউট হয়ে যাবার ঘটনা দুঃখজনক। তবে ভারতের পক্ষে দুঃখজনক মাত্র ২৬ রানের মাথায় কানহাইয়ের অব্যাহতি পাবার ঘটনা। ২৬ রানের মাথায় নাদকার্নীর বলে কানহাই স্লিপে ক্যাচ তুললে উমরিগর ক্যাচটি ফেলে দেন। তবে এই ত্রুটি ছাড়া ভারতের ফিল্ডিং ও বোলিং প্রশংসার দাবি রাখে।

একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সংগ্রহ করে ৮ উইকেটে ৪২৭ রান। সারা দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাত্র ১৬৪ রান সংগ্রহ সত্যিই বিস্ময়জনক। এই জন্য ভারতের তরুণ অধিনায়ক পাতৌদির নবাবের প্রশংসা প্রাপ্য। জো সলোমন ৯৬ রান করে আউট হওয়ায় সেঞ্চুরী লাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু এর জন্য সলোমন নিজেই দায়ী। এত মন্থর গতিতে তিনি রান তুলেছেন যে, দর্শকরা অনেক সময়ই বিরক্ত বোধ করেছেন। সলোমন কেন, স্বয়ং ওরেলের খেলাও ছিল মন্থরতা দোষে দুষ্ট। তার ৩৫ রান সংগ্রহ করতে ২১০ মিনিট সময় লাগে। এর পর অবশ্য কিছুটা হাত খুলে মারতে আরম্ভ করেন এবং দিনের শেষে ৬৪ রান করে নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪৭৫ রানে

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারতের তরুণ অধিনায়ক নবাব মনসুর আলি খাঁ

প্রথম ইনিংস শেষ করবার পর ভারত ২১৭ রান পেছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করে। দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ভারত তোলে ১০৪ রান। এই-দিনের খেলা হয়তো ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় মন্থরতম খেলা হিসাবে উল্লেখ করা থাকবে। কারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪৮ এবং ভারতের ১০৪ রান নিয়ে এইদিন সংগৃহীত হয় মাত্র ১৫২ রান। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় এই রান কোনমতেই সমর্থনীয় নয়। চতুর্থ দিনের শেষে ভারত ১০৪ রান সংগ্রহ করায় ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তখনও ১১৩ রানের প্রয়োজন থাকে। ৮টি উইকেট হাতে থাকায়

ল্যান্স গিবস

অনেকের মনে আশা জাগে, ভারত হয়ত ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু ভারতের পক্ষে ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভব হল না।

পঞ্চম দিন চা পানের কিছু আগে ১৮৭ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে গেল। অতি সতর্কতার সঙ্গে খেলে সময় নষ্ট করার প্রচেষ্টা যে কত বড় ভুল এদিন ভালভাবেই তার প্রমাণ হয়ে যায়। আগের দিনের দুই নট আউট খেলোয়াড় সারদেশাই এবং মঞ্জরেকার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ব্যাট করছিলেন। মধ্যাহ্নভোজের সময় ২ উইকেটে উঠেছিল ১৪৯ রান। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের পর স্পিন বোলার ল্যান্স গিবসের সারাত্মক বোলিং-এর ফলে বাকি ৮টি উইকেট মাত্র ৩৮ রানে পড়ে যায়। গিবস ৩৮ রানে দখল করেন ৮টি উইকেট। ভারত এক ইনিংস ও ৩০ রানে পরাজয় স্বীকার করে।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড এবং দুই দলে অংশ গ্রহণকারী খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল।

ভারত—প্রথম ইনিংস—২৫৮ (পাতৌদির নবাব ৪৮, এম এল জয়সীমা ৪১, সেলিম ডুরানী নট আউট ৪৪, দিলীপ সারদেশাই ৩১, বাপু নাদকার্নী ২২; ওয়েসলী হল ৬৪ রানে ৩ উইকেট, ফ্রাঙ্ক ওরেল ১২ রানে ২ উইকেট, গারফিল্ড সোবার্স ৪৮ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৪৭৫ (জো সলোমান ৯৬, রোহন কানহাই ৮৯, ফ্রাঙ্ক ওরেল ৭৭, কনরাড হাণ্ট ৫৯, গারফিল্ড সোবার্স ৪২, ডেভিড এলান নট আউট ৪০, ই ম্যাকমরিস ৩৯; পলি উমরিগর ৪৮ রানে ২ উইকেট)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৭ (দিলীপ সারদেশাই ৬০, বিজয় মঞ্জরেকার ৫১, রুসি সুর্তি ৩৬; ল্যান্স গিবস ৩৮ রানে ৮ উইকেট, চার্লি স্টেয়ার্স ২৪ রানে ২ উইকেট)।

[**ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩০ রানে বিজয়ী**]

ভারতের পক্ষে খেলেছেন—দিলীপ সারদেশাই, এম এল জয়সীমা, রুসি সুর্তি, বিজয় মঞ্জরেকার, পলি উমরিগর, পাতৌদির নবাব (অধিনায়ক), চাঁদু বোরদে, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, বাপু নাদকার্নী, সেলিম ডুরানী ও রামকান্ত দেশাই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে খেলেন—কনরাড হাণ্ট, ই ম্যাকমরিস, রোহন কানহাই, গারফিল্ড সোবার্স, জো সলোমন, ল্যান্স গিবস, ফ্রাঙ্ক ওরেল (অধিনায়ক), চার্লি স্টেয়ার্স, ওয়েসলী হল, ডি এলেন ও এ ভ্যালেণ্টাইন।

খেলার তারিখ ২৩শে, ২৪শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে মার্চ, ১৯৬২।

মুকুল

অমলা নন্দী (শঙ্কর)

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সহধর্মিণী অমলাশঙ্করেরও নৃত্য-কলা-পটিয়সী হিসেবে বিশ্বখ্যাতি। কিন্তু আজ যার পায়ে নাচের নূপুর একদিন তাঁর পায়ে 'রানিং শু' উঠেছিল এ খবর অনেকের কাছেই অজানা। শুধু অমলা দেবীই নন, ভারতীয় সংস্কৃতির পূজারী এই শিল্পী দম্পতি অতীতে মাঠের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অমলা দেবীর ক্ষেত্রে আগে নূপুর, পরে রানিং শু। উদয় শঙ্করের বেলায় আসে ক্রিকেট বুট, পরে নাচের ঘুঙুর। তবে এ কথা অনস্বীকার্য, নৃত্যশিল্পে যে খ্যাতি ও সম্মান, এ'দের খেলাধুলায় তার শতাংশের একাংশও নয়।

দেহমনের আনন্দ লাভের উপকরণ হিসাবেই খেলাধুলা। সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছে খেলাধুলার সহজাত প্রবৃত্তি। ছোট শিশু মায়ের কোলে শুয়ে হাত পা নেড়ে খেলা করে। বুড়ো দাদু ছোট নাতির ঘোড়া সেজে মেঝের উপর হামাগুড়ি দেন। পল্লীবধূ জল আনতে গিয়ে পানাপুকুরে একটু সাঁতার কেটে আসে। আবার রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে নেহরু অবসর সময়ে ব্যাড-মিণ্টন র‍্যাকেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে ওঠেন, মার্শাল টিটো টেনিস খেলেন, আইজেনহাওয়ার খেলেন বেসবল। তাই বলছিলাম দেহমনের আনন্দ লাভের উপকরণ হিসাবে আর সহজাত প্রবৃত্তির গুণে সবাই খেলাধুলার পূজারী। প্রবৃত্তি যখন প্রাচুর্যের আস্বাদ পায় তখনই তাতে আসে আসক্তি।

শঙ্কর দম্পতির জীবনে কোনদিন খেলা-ধুলায় আসক্তি এসেছে কিনা জানি না। তবে অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে অমলা শঙ্কর (তখন অমলা নন্দী) বেশ একটু নাম কিনে-ছিলেন। ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলায় বেনারস হিন্দু স্কুলে উদয় শঙ্করেরও একটু নাম ছিল।

একবার বেশ ভাল রান করার জন্য স্কুলের ছেলেরা তো ভবিষ্যৎ নৃত্যশিল্পীকে মাথায় করে এমন নাচ নেচেছিল যে, সেই ভয়ে আর কোনদিন উদয় শঙ্কর ক্রিকেট খেলেননি। অবশ্য শঙ্করের নিজের কথায়, মাথায় করে নাচার ভয়ে নয়—'রেপুটেশন' নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে ঐখানেই ক্রিকেটের ইতি। ক্রিকেট এবং ফুটবলকে শঙ্কর যতদিন ভাল না বেসেছেন, ওরা শঙ্করকে ভালবেসেছে তার চেয়ে বেশী এবং হাতে এবং পায়ে তার স্মৃতিও রেখে দিয়েছে। ক্রিকেট বল লেগে বাঁহাতের আঙুলের মধ্যমায় এবং ফুটবলে বা পায়ের বুড়ো আঙুলের পরের আঙুলে যে চোট লেগে-ছিল তার চিহ্ন আজও বর্তমান। লণ্ডনে রয়াল কলেজ অব আর্টসে পড়বার সময়ও ফুটবল নিয়ে একটু মেতেছিলেন, কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারেননি। স্বামীকে ছেড়ে সহধর্মিণীর কথায় আসা যাক। অমলা নন্দী পল্লীগ্রামের মেয়ে। শিশু-

খেলার মাঠে অমলা নন্দী
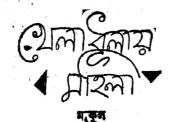
জীবন কেটেছে যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত বাটাজোড় গ্রামের বাড়িতে। ডানপিটে মেয়ের মত ছোটবেলায় সাঁতার কাটা, দৌড়-ঝাঁপ করা, গাছে ওঠা, দোলনা চড়া কিছুই বাদ যায়নি। ১০ বছর বয়সে বাবা অক্ষয়কুমার নন্দী যখন মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে এলেন তখন ছুটোছুটি আরম্ভ হল গড়ের মাঠে। ১০ নম্বর চৌরঙ্গী রোডে বাবার ছিল জুয়েলারী দোকান। প্রায়ই বাড়ির সবাই মিলে বেড়াতে যেত সেই দোকানের সামনের গড়ের মাঠে। রাত ৮টা ৯টা পর্যন্ত চলত ছুটোছুটি আর কাবাডি খেলা।

১৯৩১ সালে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অক্ষয়বাবু গেলেন প্যারিসের ইণ্টারন্যাশনাল ও কলোনিয়াল এক্সিবিশনে। সঙ্গে নিলেন মেয়ে অমলাকে। উদ্দেশ্য ওখানে কোন জায়গায় ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা করে আসবেন। অমলা নন্দী তার আগে কিছুদিন সেণ্ট মার্গারেট স্কুলে এবং কিছুদিন উলু-বেড়িয়ায় প্রকৃতির ছায়া ঘেরা বাণীবন গার্লস হাই স্কুলে পড়েছেন।

প্যারিসে যাবার পর ও'রা পরিচিত হলেন উদয়শঙ্করের সঙ্গে। উদয়শঙ্কর তখন তাঁর দলবল নিয়ে ইউরোপের নানা জায়গায় ভারতীয় নৃত্যকলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। সে দলে রবিশঙ্কর, তিমির-বরন সিমকি, বিষ্ণুদাস সিরালীর মত সব সুনিপুণ শিল্পী। উদয়শঙ্করের মা এবং পরিবারের আর দু'একজনও রয়েছেন সঙ্গে। অমলা নন্দীর সঙ্গে পরিচিত হবার পরই শঙ্করের মায়ের স্নেহ পড়ল অমলার পরে। অমলার শিশু মনেও পড়ল উদয়শঙ্করের ব্যক্তিত্বের প্রভাব। বাবা ফিরে এলেন কলকাতায়। অমলা নন্দী উদয়-শঙ্করের দলের সঙ্গে রয়ে গেলেন। প্রায় এক বছর ইউরোপের নানা জায়গায় ভ্রমণের পর কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

তারপর কিছুদিন সুনীতি শিক্ষালয়ে অধ্যয়ন এবং ১৯৩৫ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশিকা পাস। ১৯৩৬এ আশুতোষ কলেজে প্রবেশ। ইতিমধ্যে নাচে অমলা নন্দীর যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে। কলেজের অ্যানিভার্সারি, মিউজিক কনফারেন্সে তাঁর সাদর আমন্ত্রণ সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলায়ও অনুরাগ। টালিগঞ্জে রসা রোড সাউথএর ফার্স্ট লেনে ওদের বাড়ি। নাম 'জুয়েল হাউস'। বাড়ির পেছনে বোরিয়েল গ্রাউণ্ড। নীল আকাশের নীচে উন্মুক্ত সবুজ প্রাঙ্গণ। সেই মাঠেই ভাই অশোক নন্দীর সঙ্গে দৌড়ের অনু-শীলন।

খেলাধুলায়, বিশেষ করে কলেজের খেলাধুলায়, মেয়েদের তখন সাড়া কম। বাঙলার পরলোকগত রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টর অব কলেজেস। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকতায় যখন উইমেনস ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হল তখন মেয়েদের মধ্য থেকেও কিছুটা সাড়া পাওয়া গেল। বহু কলেজ-ছাত্রী ক্লাস থেকে বই হাতে করে এসে স্পোর্টসের চর্চা আরম্ভ করলেন।

১৯৩৭-৩৮ সালের স্পোর্টস [illegible] কিছুটা [illegible]

সবচেয়ে বড় বাড়ি 'গলস্টোন ম্যানসনের' সবুজ লনে কলেজ ছাত্রীদের অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের আসর বসল। সে আসরে আশুতোষ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী অমলা নন্দীর অনন্য ভূমিকা। ফেলে আসা দিনের স্মৃতি ভাল করে মনে নেই। স্পোর্টসের প্রাইজ এবং প্রশংসাপত্রগুলো রয়েছে ওদের মাদ্রাজের ত্যাগরাজ নগরের বাড়িতে। তবু অমলা শঙ্করের মনে পড়ে বর্শা ছোঁড়া, দৌড় ও অবজারভেশন টেস্টে উনি ফার্স্ট হয়েছিলেন। দীর্ঘ লাফে হয়েছিলেন দ্বিতীয়। রিলেতে বিজয়ী আশুতোষ কলেজের চারজনের একজন। প্রধানত অমলা নন্দী এবং অর্পিতা দাসের কৃতিত্বে আশুতোষ পেয়েছিল কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ।

১৯৩৮ সালে আশুতোষ কলেজ ছেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক স্পোর্টসে অমলা নন্দীর অংশ গ্রহণের ঐটাই প্রথম এবং শেষ ঘটনা। ১৯৪১ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বি এ পাস করেন। ১৯৪২-এ উদয়শঙ্করের সঙ্গে বিয়ের পর বিশ্বের সংস্কৃতি ভাণ্ডারে শঙ্কর দম্পতির দানের সূচনা।

তাই বলে খেলার মন কিন্তু কখনো মরেনি। সময় পেলে ভাই অশোকের সঙ্গে রাইফেল ছুঁড়েছেন টালীগঞ্জের রাইফেল রেঞ্জে। ব্যাডমিণ্টন ও টেবল টেনিস খেলেছেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে ঘেরা আলমোরার উদয়শঙ্কর ভারতীয় কলাকেন্দ্রে, মাদ্রাজের ত্যাগরাজ নগরে।

হাসতে হাসতে বললেন, আমাকে—'এই সেদিনও জ্যাভেলিন প্র্যাক্টিস করে এসেছি।'

কালনায় বেড়াতে গিয়ে নদীর চরে অনেক পাটকাটি পড়ে থাকতে দেখে তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিলেন বর্শা ছোঁড়ার মত।

'স্পোর্টস কি আপনার নৃত্যশিল্পে কিছু সাহায্য করেছে কিংবা নৃত্যশিল্প স্পোর্টসকে?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম অমলা শঙ্করের কাছে।

উত্তরে বললেন—'বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় আগ্রহ থাকলে কোন কিছুই করা অসম্ভব নয়।

শ্রীমতী শঙ্কর না বললেও আমরা জানি, শিল্পের সঙ্গে খেলাধুলার কত নিকট সম্বন্ধ। শিল্পের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হয়েছে:—

"Art is the expression of pleasure in work কিংবা —Art is most simply and most usually defined as an attempt to create pleasing forms."

এর অর্থ দর্শক চোখের আনন্দদায়ক কোন কিছু সৃষ্টি করাই শিল্প।

এ কথা যদি মেনে নেওয়া যায় তবে খেলাধুলাও শিল্প, আর্টস। খেলাধুলার বিভিন্ন ভঙ্গীর মধ্যে আছে অনুপম শিল্পশ্রী, ছন্দের বিকাশ। বিশ্বের বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের খেলাধুলার ছলা-কলা শিল্পের মধ্যে ধরে রাখার কি কম চেষ্টা হয়েছে! গ্রীক ভাস্কর্যই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে ব্রতচারী নৃত্যও খেলাধুলার অঙ্গীভূত। খেলাধুলা এবং নৃত্যকলা—দুই ক্ষেত্রেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দৈহিক ছন্দের চারু সুষমা। প্রথম ক্ষেত্রে শক্তির সঙ্গে শিল্পের জ্যোতি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুরের ব্যঞ্জনার মধ্যে ভাবের বিন্যাস।

পরবর্তী জীবনে নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্কর

বোধ করি এই কারণেই শঙ্কর পরিবারের সবাই ক্রীড়ারসিক। আমলা দেবী বললেন, উদয় শঙ্করের মেজো ভাই রাজেন্দ্র শঙ্কর, সেজো ভাই দেবেন্দ্র শঙ্কর খেলাধুলার পরম অনুরাগী। ছোট ভাই রবি শঙ্কর সেতারের কান মোচড়াতে মোচড়াতে রেডিওর কান মোচড়ান ক্রিকেটের ধারাবিবরণী শোনবার জন্য। অমলা শঙ্করের ১৯ বছরের ছেলে আনন্দ গোয়ালিয়রের সিন্দিয়া স্কুলে পড়বার সময় ফুটবল খেলেছে নিয়মিত। সুন্দর স্পোর্টসম্যানের অবয়ব। মেয়ে মমতার এখনো খেলবার বয়স হয়নি। বাড়িতে গিন্নী সেজে থাকতেই ভালবাসে।

দেশী সংবাদ

২৬শে মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, পাকিস্তান একতরফা সিদ্ধান্তে পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রাম জেলায় কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণে অগ্রসর হইয়াছে। ভারত সরকার এই কার্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক, নিম্নবুনিয়াদী এবং প্রাক-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনহার সংশোধনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, রাজ্যপাল উহা অনুমোদন করিয়াছেন।

২৭শে মার্চ—১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ১০১ কোটি টাকার হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তির জবাব দেন নাই। রাজ্য সরকারের ১৯৫৯-৬০ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিতে গিয়া কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল মন্তব্য করিয়াছেন, এ ব্যাপারে সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড খাদ্য বিভাগের—ঐ সময় পর্যন্ত তাঁহারা ৫৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার অডিট সম্পত্তির জবাব দিতে পারেন নাই।

বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীকে সি রেড্ডী আজ নয়াদিল্লিতে বলেন যে, কাঁচামাল, কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তির অভাব এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় নিম্নতম লক্ষ্যেও পৌঁছিতে পারা যাইবে না বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

২৮শে মার্চ—জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদন সংক্রান্ত লোকসভার কমিটি আজ পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী রেলওয়ে—হাওড়া—আমতা ও হাওড়া—শিয়াখালা লাইট রেলওয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুপারিশ করিয়াছেন।

আজ আসাম বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে বিতর্কের সময় বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতির প্রার্থী হিসাবে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি শ্রীরথীন সেন গত বৎসর ১৯শে জুন হাইলাকান্দিতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, তাহার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য কমিটি নিয়োগের দাবি করেন।

২৯শে মার্চ—পশ্চিম দিনাজপুর জেলার হিলি এলাকায় ভারতের একটি ভূখণ্ড পাকিস্তানী সৈন্যদল দখল করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আজ লোকসভায় উভয়পক্ষের সদস্যগণ তৎসম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

শিয়ালদহ—বজবজ লাইনে গড়িয়াহাট ও [illegible] রোড নামে দুইটি ফ্ল্যাগ স্টেশন হইবে ঠিক হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে এই স্টেশন দুইটির নির্মাণকার্য শেষ হইবে। ইহার জন্য ব্যয় হইবে ৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি হাসপাতাল বিলের বিতর্ককালে বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ সরকারী হাসপাতালসমূহে অব্যবস্থাদির তীব্র সমালোচনা করেন। প্রায় সব হাসপাতালেই রোগীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও নানারূপ দুর্নীতিতে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে।

৩০শে মার্চ—ভুয়া কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে রেল ওয়াগন সংগ্রহ করিয়া একশ্রেণীর সমাজবিরোধী লোক কয়লা, খনিজ লৌহ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টির দ্বারা দেশের শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে বলিয়া এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়।

শ্রমিকদের অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্যদানের জন্য চা ও রবার বাগান সম্পর্কিত বেতন বোর্ড যে সুপারিশ করিয়াছেন ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং মালিকদিগকে উহা যথাসম্ভব শীঘ্র রূপায়িত করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন।

৩১শে মার্চ—ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণকে ও কলিকাতার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি পুলিস কমিশনারকে নিজ নিজ এলাকায় অবাঞ্ছিত পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ও তাহাদিগকে বহিষ্কারের ক্ষমতা দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র দার্জিলিং জেলা ১৯৬১ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে বিজ্ঞাপিত অঞ্চলরূপে ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া আজ নয়াদিল্লিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখন হইতে এই অঞ্চলে অনুমতিপত্র লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। তবে যাহারা এই অঞ্চলের অধিবাসী, তাহাদিগকে অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে না।

১লা এপ্রিল—[illegible] দুঃস্থ পরিবারগুলির অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬২-৬৩ সনের বাজেটে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছেন।

লাল চীন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট প্রদেশের ৪০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড দাবি করিয়াছে। এই জেলার সীমান্তে চীনা সৈনিকদের টহলদারী খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২৭শে মার্চ—গতকল্য বরিশাল শহরে পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে প্রায় ৩০।৩২ জন বিক্ষুব্ধ ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিন শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মার্কিন স্বরাষ্ট্রদপ্তরের কর্মচারিগণ গত রাত্রিতে বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট চীনকে সর্বপ্রকার সাহায্যদান বন্ধ করিয়াছে। মার্কিন সরকারী কর্ণধারগণ আরও বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অ-কম্যুনিস্ট দেশগুলিকে সাহায্য দান করিতেছে।

২৮শে মার্চ—অদ্য প্রত্যুষে বিনা রক্তপাতে সিরিয়ার সেনাবাহিনী দেশের কর্তৃত্বভার দখল করিয়াছে এবং পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

২৯শে মার্চ—বুয়েনস এয়ার্সের সংবাদে প্রকাশ, আর্জেন্টিনার সেনা-বিভাগীয় কর্মকর্তারা অদ্য প্রেসিডেন্ট ফ্রন্ডিজিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে নৌ-বিভাগীয় বিমানযোগে প্লেট নদীর মোহানায় মার্টিন গার্সিয়া দ্বীপে বন্দি-জীবন যাপনের জন্য পাঠাইয়া দেন।

ভারতের কড়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তান আগামী শনিবার সাড়ম্বরে কর্ণফুলী বাঁধের উদ্বোধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কর্ণফুলী সর্বার্থসাধক পরিকল্পনাটি নির্মাণে ১০ কোটিরও বেশী ডলার খরচ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮ কোটি ডলার দিয়াছে মার্কিন সরকার।

৩০শে মার্চ—আগামী এপ্রিল মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন আরম্ভ হইবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে নূতন করিয়া দ্বিতীয়বার ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। নির্বাচনের উপর ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করা যাইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে কর্ণফুলী বাঁধ নির্মাণের কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য পাকিস্তানের একতরফা সিদ্ধান্তে ভারত যে প্রতিবাদ করিয়াছিল, পাকিস্তান তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে মার্চ—আলজিরিয়ায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রশক্তিকে যাহারা ক্রমাগতই উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে, সেই 'ওয়াস' বা গোপন সেনাবাহিনী সংস্থার দ্বিতীয় প্রধান ভূতপূর্ব জেনারেল এডমণ্ড জৌহো আজ প্যারিসের সান্তী কারাগারের নির্জনতায় বন্দী। এতদ্দ্বারা ফরাসী সরকার গোপন সেনাবাহিনী সংস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন।

সিনেট [illegible] কমিটির চেয়ারম্যান মার্কিন সেনেটের [illegible] রাসেল পাকিস্তানকে আমেরিকার সর্বাপেক্ষা দৃঢ় বন্ধুদের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে "মেঠো বুলা এবং ভণ্ড" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

৩১শে মার্চ—সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, শুক্র গ্রহপৃষ্ঠে জীবনের চিহ্নমাত্রও নাই। কাজাখস্তান জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর অধ্যাপক ফেসেনকোভ বলেন, শুক্র গ্রহপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৭৫ ভাগ কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস। অতএব সেখানে জীবকোষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

১লা এপ্রিল—পাকিস্তানের তথাকথিত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র [illegible] আর [illegible] দুইদিন বাকী আছে। [illegible] সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব পাকিস্তানের [illegible] জেলাতেই একটিও মনোনয়নপত্র দাখিল করা [illegible] নাই। [illegible] সংবাদ পাওয়া যাইতেছে [illegible] পূর্ব পাকিস্তানীরা [illegible] করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রী[illegible]
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—[illegible] টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরাজপদ [illegible] প্রেস, [illegible]
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : [illegible]